ষাণ্মাসিক মাসিক বসুমতী

৪১শ বর্ষ] ১৩৬৯ সালের কার্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত [২য় খণ্ড

ষাণ্মাষিক সূচীপত্র

ছোটদের আসর—

গল্প ও কাহিনী--

উপন্যাস—

ইতিহাস—

বিবিধ কাহিনী—

অনুবাদ—

কবিতা—

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ—

গল্প—

কবিতা—

মহরম উৎসব

—জে, গডক্রে খোদিত

(এনগ্রেভিং)

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৪১শ বর্ষ—কার্ত্তিক, ১৩৬৯] ।। স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ।। [২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা

কথামৃত

এইভাবে আরও কয়েক বৎসর আনন্দে অতিবাহিত হইল। তাহার পর ১৩২৬ সালে শ্রীশ্রীমায়ের দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে। ক্রমে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং স্থূলদেহে লীলাসম্বরণ করিবার ইঙ্গিতও তিনি প্রকাশ করেন। একদিন গৌরীমাকে বলেন, "আমার ত যাবার সময় হ'য়ে এলো, মা। * * দেহান্তে তুমি আমার অস্থি আশ্রমে নিয়ে রেখো।"

গৌরীমার আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, শ্রীশ্রীমা শীঘ্রই লীলাসম্বরণ করিবেন। তিনি অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরসেবা এবং আশ্রমের নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত অধিকাংশ সময় তিনি কোন কোন আশ্রমকুমারীসহ শ্রীশ্রীমায়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া সেবাশুশ্রূষা করিতেন।

লোককল্যাণে শ্রীশ্রীমায়ের দেহ যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইল। স্বামী সারদানন্দ পূজা এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করাইলেন। গৌরীমা কালীঘাটে কালীপূজা এবং আশ্রমে চণ্ডীপাঠ ও নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "তোমারা দুঃখ করো না, আমাকে যেতে হবে।"

১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, মহানিশায় পরমা প্রকৃতি মহেশ্বরী শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী মহাসমাধিযোগে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইলেন। মহাসমাধির অবস্থা বুঝিতে পারিয়া গৌরীমা শোকবিহ্বল হইয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

পরদিবস অগণিত নরনারী বেলুড়মঠ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দিব্য দেহের অনুগমন করেন। পুণ্যপ্রবাহিনী ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে মাতাঠাকুরাণীর ঘৃতচন্দনানুলিপ্ত পুষ্পমাল্যশোভিত শ্রীঅঙ্গখানি দেখিতে দেখিতে হোমশিখায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তাঁহার পরম পবিত্র অস্থিভস্মের কিয়দংশ বহন করিয়া গৌরীমা এবং বর্ত্তমান সম্পাদিকা শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এতদুপলক্ষে আশ্রমে কয়েকদিবসব্যাপী মহোৎসব হয় এবং শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর অস্থিপ্রতিষ্ঠা-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণ ও অন্যান্য ভক্তগণ যোগদান করেন, এবং বেদপাঠ, হোম, কালীকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সংবর্দ্ধনা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা ইত্যাদি বিবিধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

যে মহাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গৌরীমা মাতৃজাতিসেবার ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন যাঁহার পবিত্র নামে এই আশ্রম উৎসর্গ

করিয়াছেন, যাঁহার অশেষ আশীর্বাদ লাভ করিয়া আশ্রম সর্ব্বতোভাবে ধন্য হইয়াছে, সেই শক্তিরূপিণী কল্যাণময়ী শ্রীশ্রীমাতৃদেবী আজ সন্তানগণের চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন। এই নিদারুণ মাতৃবিয়োগ-ব্যথা কত গভীরভাবে মাতৃগতপ্রাণা কন্যাকে আঘাত করিয়াছিল তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। গৌরীমার নিজের লেখনীমুখে তাঁহার অন্তস্তলের যে বেদনা প্রকাশ পাইয়াছিল, সাধারণ সাহিত্যের বিচারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও, ভক্তি-সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাহা সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এই শোকগাথার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল,—

ওরে রে দারুণ প্রাণ, কেন দেহে রৈলে।
পাছু গোঙারিয়া মার সঙ্গে নাহি গেলে॥
আজ শূন্য ভুবনে শূন্য পরাণে, কেন-বা আছি জানি না।
মণিহারা ফণী, বিনে সেই মণি, বাঁচে কি অমনি শুনি না॥

জগতে ভারতে মোদের বরাতে সেই শ্রীপাদপদ্ম লুকাইল।
বসুন্ধরা যাঁর চিহ্নে ভূষিতা, ত্রিভুবনারাধ্য যাঁর পাদপদ্ম ছিল॥
তাঁহার আরাধ্য ও-পাদপদ্ম আর কি হৃদয়ে ধরিব।
আপন হাতে দিয়ে জবাঞ্জলি আর কি সে-পদে পূজিব॥
স্নেহ মূর্ত্তিমতী তোমার মূরতি আর কি নয়নে হেরিব।
রাধাদামোদর-চাঁদের প্রসাদ আর কি তোমারে খাওয়াব॥
আর কি তোমার আশ্রমে আসিয়া মধ্য আসনে রাজিবে।
চারিদিকে সব তোমার কিঙ্করী তোমারি গুণ গাহিবে॥

শ্রীপদ পূজন করিয়া স্তবন অন্ন ভোগ আদি সঁপিব।
সবারে লইয়' ভুঞ্জিবে জননী, হেরি' আপনা ভুলিব।
আচমন করাইয়া পদ ধোয়াইব।
লইয়া মাথার কেশ মোছাইয়া দিব॥
(এসেছিলে যবে মাগো আশ্রমে তোমার)
পদ ধোয়াইতে দুটি আঁখে ঝরে জল।
তাহাতেই ধৌত ভেল শ্রীপদযুগল॥
আর না হেরিব স্মরি, দিয়ে নিজ জল।
নয়ন ধোয়ায় বুঝি ও-পদকমল॥

গৌরীমার শিক্ষা এবং আশ্রমের সার্থকতা সম্বন্ধে বর্ত্তমান সমাজের হিন্দু মহিলাগণ কিরূপ ধারণা পোষণ করেন, তাহা সুধীসমাজে সুপরিচিতা দুইজন বিদুষী মহিলার ভাষায় উল্লেখ করা হইল।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী লিখিয়াছেন,—

"তাঁহার দৃষ্টান্ত যেন আমাদের হিন্দুসমাজের প্রত্যেক নারীকে পথ দেখাইয়া দেয়। নারীশক্তি যে নরশক্তি হইতে কোন অংশে তুচ্ছ নহে, নারী যে মহামায়া মহাশক্তির অংশসম্ভূতা,' ইচ্ছা করিলে নারী যে সমাজের জন্য প্রকৃত শুভকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিপূর্ব্বক দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ তাঁহার মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত হইতে এই সত্য যেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। * * প্রকৃত উচ্চশিক্ষিতা ধার্ম্মিকা নারীর হস্তে নারীশিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকা যে কত প্রয়োজনীয় তাহার দৃষ্টান্ত আজ এই সারদেশ্বরী আশ্রম। * * শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, একদিন আমাদের সমস্ত নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুকৃত হউক।"

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী লিখিয়াছেন,—

"আমাদের নিজেদের জন্য—আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়েদের জন্য যে মুক্তির স্বপ্ন—যে জীবনলাভের দুরাশা আমার মনের নিভৃত কোণের কল্পনাতে মাত্র পর্য্যবসিত ছিল, সেই স্বপ্ন যে * * জীবন্ত সত্যরূপে আমাদের দেশের বুকে তাহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—একথা যদি সময়ে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইত, তাহা হইলে বুঝি আজ নিজের জীবনেরও কোন শ্রেষ্ঠতর সৌভাগ্যলাভ আমার দুর্ল ভ হইত না। * *

"ঘরের কাজের সাহায্যে মাত্র, নিজেদের স্বার্থের সংসারে মাত্র, আমাদের আর পুরিয়া রাখিও না, দেশের জ্ঞানের ক্ষেত্রে—শিক্ষার ক্ষেত্রে—ত্যাগের আদর্শের ক্ষেত্রেও তোমাদের ভগিনী কন্যাদের তোমরা ডাক। একদিন এ ডাক ভারতে ছিল, নারীদের এ স্থানও এদেশে ছিল। * *

"এই জ্ঞানপিপাসা—মানবের এই চিরন্তনী তৃষা—এ আমাদের বহু আদিম যুগের সম্পত্তি। একদিন আমাদেরই একজন নারী ব্রহ্মবাদিনী গার্গীরূপে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবেত্তা মীমাংসা-সভার নেত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশ্ববারা একদিন বেদের সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী একদিন জগৎকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্' * * এতদিন মণ্ডনমিশ্র-শঙ্করাচার্য্যের বিচারসভায় উভয়ভারতী বিচারক আচার্য্যার পদ পাইয়াছিলেন। লীলাবতী, খনা একদিন আমাদের ঘরেই জন্মগ্রহণ করিত। তাই আবার বলি সেদিন আজ আমাদের কোথায়! কিন্তু আজ এই আশ্রমের * * ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীদিগকে দেখিয়া সেই দিনের কথাই আমাদের মনে হইতেছে। * * এই আদর্শ হিন্দুদের ঘরে ঘরে সত্য হইয়া উঠুক, ইহাই আজ আমার একান্ত কামনা।"

গৌরীমার ব্যবহার এবং আন্তরিক স্নেহ মানুষকে সহজেই আপন করিয়া লইত। তাঁহার তত্ত্বপূর্ণ উপদেশে কত ব্যথিত হৃদয় সান্ত্বনা পাইয়াছে। একমাত্র অবলম্বন পতিকে হারাইয়া ব্যথাতুরা বিধবা আসিয়া তাঁহার কাছে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তাহার অশ্রু মুছাইয়া বলিয়াছেন, স্বামী তোমায় ফাঁকি দেননি, মা। (দামোদরকে দেখাইয়া) ঐ ছাখ, সিংহাসনে ব'সে আছেন—জগতের স্বামী।"

প্রাণপ্রিয় সন্তানকে হারাইয়া পাগলিনী জননী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছেন। গৌরীমা সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন, "সন্তান তোমার শান্তির রাজ্যেই গেছে মা, দুঃখ ক'রো না, এখন থেকে আমিই তোমায় 'মা' ব'লে ডাকবো।" কঠোর সন্ন্যাসিনীর মাতৃহৃদয় কাহারও দুঃখ দেখিলে চিরদিন এই ভাবেই কাঁদিয়া উঠিত।

আশ্রমের বাহিরে কত দুঃস্থা নারী গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। তিনি এইরূপ অনেক নারীকে চাউল, বস্ত্র এবং অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেন। তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য ভক্তগণ যে বস্ত্র দিয়া যাইতেন, তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি অনেক বিধবা নারীকে দিয়া আসিতেন। কোন কোন সন্তানের নিকট তিনি সরুপাড় ধুতি চাহিয়া লইতেন। সন্তানগণ মায়ের ইচ্ছা অবিলম্বে পূর্ণ করিয়া নিজেদের কৃতার্থবোধ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, আশ্রমের বাহিরেও এমন কত দুঃখিনী মাতা ও ভগিনী তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের জন্য মাতাজীর উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন, যাঁহারা বহুবিধ কারণবশতঃ অন্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নিজেদের দুঃখ-দৈন্য প্রকাশ করিতে অক্ষম। —গৌরীমা গ্রন্থ হইতে।

প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষা

শ্রীদিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম. এ. (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত)

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারী এক স্বর্ণখচিত আসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তাঁহার বিপুল কর্মপ্রবাহ গৃহের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সমাজের ও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতীয় রমণীর এই সর্বতোমুখী কর্মসাফল্যের মূলে রহিয়াছে তাঁহার সমুন্নত পর্যায়ের শিক্ষাধারা যাহার কিঞ্চিৎ অনুধাবন আলোচ্যমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

কন্যার শিক্ষার প্রতি পিতার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিতা হইয়া কন্যা বিদুষী রমণীরূপে সমাজে পরিচিতা হউক, প্রগতিশীল পিতার ইহা ছিল ঐকান্তিক কামনা। সে যুগে বাল্যবিবাহ প্রথার সর্বনাশা শিকড় সমাজের বুকে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়া নারীশিক্ষার আয়োজনে প্রাচুর্যের কোন অভাব ছিল না। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত অন্ততপক্ষে ষোড়শী না হইলে কন্যার বিবাহ সাধারণত অনুষ্ঠিত হইত না। পিতৃগৃহে বাসকালীন বিবাহের পূর্বকার বৎসরগুলি কন্যা বাণীবন্দনায় আত্মনিয়োগ করিতেন। পরিণত-বিবাহের প্রচলন ভিন্ন, অশিক্ষিতা কন্যার পক্ষে প্রতিষ্ঠাবান পাত্র লাভের দুষ্প্রাপ্যতা ও ভারতে নারীশিক্ষা প্রসারের একটি সক্রিয় কারণ (ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্—অথর্ববেদ, একাদশ, ৫, ১৮)। উপরন্তু বৈদিক এবং তদোত্তর যুগে ধর্মীয় আচার-বিধি ও যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে নারী ছিলেন পুরুষের সহযোগিনী। তাঁহার কল্যাণহস্তের স্পর্শ না পাইলে নিবেদিত অর্ঘ দেবতার অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বস্তুত, বাল্যে ও কৈশোরে উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ না করিলে তাঁহার পক্ষে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সার্থক রূপদান সম্ভবপর হইত না। গৃহ্যসূত্র প্রণেতা গোভিলের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে—ন হি খলু অনধীত্য শক্নোতি পত্নী হোতুমিতি।

ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোদ্বাহা—এই দুই শ্রেণীতে মহিলা শিক্ষার্থিগণ বিভক্ত ছিলেন। জ্ঞান-শৈলীর সু-উচ্চ শিখরে আরোহণ করা ছিল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মবাদিনীর জীবনের লক্ষ্য। একটি নির্দিষ্ট, সম্ভবত অষ্টম বৎসর বয়সে উপনয়ন বিধির অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার ছাত্রীজীবনের উদ্বোধন হইত। উপ পূর্বক 'নী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন উপনয়ন শব্দটির প্রকৃত অর্থ হইল অধ্যয়নার্থ বালক অথবা বালিকাকে আচার্য সমীপে আনয়ন। এই উপনয়ন অনুষ্ঠান কেবলমাত্র গুরুর দ্বারাই যে নিষ্পন্ন হইত তাহা নহে, ক্ষেত্রবিশেষে পিতাও কন্যার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। তিন দিবসব্যাপী এই অনুষ্ঠানের পর নবজন্ম বা দ্বিজত্ব লাভ করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মচর্য আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। ব্রহ্মচারিণীকে শারীরিক ও মানসিক এই উভয়বিধ নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়া জীবন যাপন করিতে হইত। মেখলা পরিধান, গৃহকর্মাদি সম্পাদন, ভিক্ষাগ্রহণ, মৃগচর্মধারণ, অগ্নি-প্রজ্বালন প্রভৃতি কঠিন অভ্যাসগুলি তাঁহাদের আয়ত্ত করিতে হইত। উপরন্তু শ্রম অর্থাৎ সংযম, তপশ্চর্যা এবং দীক্ষার অনুশীলন ও ব্রহ্মচারিণীর আবশ্যিক কর্ম ছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আচার্যের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্যই যে তাঁহারা এই আয়াস সাপেক্ষ কার্যাদি সম্পাদন করিতেন তাহা নহে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক, চারিত্রিক ও নৈতিক তথা সর্বতোমুখী উৎকর্ষ সাধন। উপনয়ন সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণত দ্বাদশ বৎসর কাল যাবৎ ব্রহ্মবাদিনীগণ এইরূপ কঠোর নিয়মাবলীর মধ্য দিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। অবশ্য বিবাহ বা অন্য কোন সঙ্গত কারণে নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাঁহাদিগকে পিতৃগৃহে গমনের অনুমতি দেওয়া হইত।

সদ্যোদ্বাহা বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলা শিক্ষার্থিগণ কেবল মাত্র বিবাহের পূর্ব পর্যন্তই সাধারণভাবে শিক্ষাগ্রহণ করিতেন। ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় তাঁহাদের ক্ষেত্রেও উপনয়ন-বিধি আবশ্যিকরূপে অনুষ্ঠিত হইত। উত্তর জীবনে পতির সহযোগিনীরূপে যাহাতে ধর্মীয় কার্যাদি সুসম্পাদন করিতে পারেন, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহাদিগকে শিক্ষা দান করা হইত। গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

প্রাচীন কালে নারীগণ কি কি বিষয় অধ্যয়ন করিতেন, তদ্বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেক স্থলেই অস্পষ্ট। মনে হয় ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব এই চতুর্বেদ, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ (Grammar), ভূতবিদ্যা (Biology), রাশি বা অঙ্কশাস্ত্র (Arithmetic), দৈব (Divination), নিধি (Chronology), তর্কশাস্ত্র (Dialectics), নীতিশাস্ত্র বা রাজনীতি (Politics), দেববিদ্যা (Theology), কল্প (Ceremonial), ছন্দ (Metrics Prosody), নক্ষত্রবিদ্যা (Astronomy) প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ তাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন। এইগুলিকে 'অপরা বিদ্যা' বলা হইয়া থাকে। নারীদিগের পঠন-পাঠন শুধু এই শাস্ত্রগুলির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, অনেক মহীয়সী রমণী পরাবিদ্যা বা আত্মবিষয়ক জ্ঞানের (Supreme or Highest Knowledge) অনুশীলনেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। জৈমিনি প্রণীত পূর্ব মীমাংসার ন্যায় নীরস ও জটিল বিষয়ের অনুশীলনেও তাঁহারা

দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নারী কাশকৃৎস্না নামে অভিহিতা হইতেন (A. S. Altekar, The Position of Women in Hindu Civilization, P. 11)।

এই প্রসঙ্গে কয়েকজন মহীয়সী রমণীর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, যাঁহাদের মনীষার বিমল খ্যাতি দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া আজও দীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞান-তপস্বী যাজ্ঞবল্ক্যের বিদুষী স্ত্রী মৈত্রেয়ীর নাম সকলেরই পরিচিত। যাজ্ঞবল্ক্য কর্মবহুল গার্হস্থ্য জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্বে সমুদয় ঐশ্বর্য মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী—এই দুই পত্নীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে পার্থিব সুখ-সম্পদে নিরাসক্তা মৈত্রেয়ী স্বামীর অতুল বিত্তের উপর বিন্দুমাত্র আসক্তি প্রকাশ না করিয়া স্বামীর নিকট ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে অনুশাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং কিং কুর্যাম্'—তাঁহার মুখনিঃসৃত এই উক্তি এক ঐতিহাসিক প্রবচন। আর এক জন বিদুষী রমণী গার্গী, যাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল, সমসাময়িক যুগের বিস্ময়। রাজর্ষি জনক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে এক বিতর্ক সভার আয়োজন করিলে গার্গী তাহাতে যোগদান করেন। এই সভায় যাজ্ঞবল্ক্য যখন নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া ঘোষণা করেন, গার্গী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং অশ্বল, জারৎকারব আর্তভাগ, ভুজ্যু লাহ্যায়নি, উষস্ত চাক্রায়ণ, কহোল কৌষীতকেয়, বিদগ্ধ শাকল্য প্রভৃতি ভারতবর্ষের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জনের সমক্ষে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি আত্মবিষয়ক (Highest Truth) দুইটি সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেন। রামায়ণে উল্লিখিতা শ্রমণী শবরীর কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়। মুনিবর মাতঙ্গের শিষ্যা, কৃষ্ণ-অজিন-পরিহিতা, সিদ্ধা এই তাপসী পম্পা নদীর তীরে বাস করিতেন। ঋক্ ও সামবেদের মন্ত্র রচয়িতারূপে রোমশা, অপালা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, সিকতা নিবাবরী, ঘোষা, ইন্দ্রাণী, শচী, কদ্রু, জুহূ, পৌলোমা, সবিতা, উর্বশী, যমী, সাবিত্রী, দেবযামী, নোধা, আকৃষ্টভাষা প্রভৃতি মহীয়সী মহিলার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পরিণয় অনেক সময় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে অনেক মহিলা অবিবাহিতা থাকিয়া বাণীর সাধনায় আজীবন নিযুক্তা ছিলেন। আর বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা ছিল যাঁহাদের প্রবল, তাঁহারা স্বামীর তত্ত্বাবধানে বিদ্যানুশীলন করিয়া যাইতেন (R K. Mookherji, Ancient Indian Education,)। মহিষী বাসবদত্তা বা রাজ্ঞী ইন্দুমতী কেবলমাত্র যে তাঁহাদের স্বামীর প্রিয়তমা ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা প্রিয়শিষ্যাও ছিলেন (গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—রঘুবংশ, অষ্টম, ৬৭)।

অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে বহুসংখ্যক মহিলা শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হইতেন। আচার্যা এবং উপাধ্যায়া এই দুই প্রকরণে তাঁহারা বিভক্ত ছিলেন। বেদ ও তৎসমুদয় শাখা প্রশাখাদিতে যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি ছিল অসামান্য, আচার্যা নামে অভিহিত সেই সকল অধ্যাপিকাগণ কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। পক্ষান্তরে, উপাধ্যায়া, যাঁহাদের পারদর্শিতা কেবলমাত্র বেদাঙ্গাদি যথা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁহারা বেতনের বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে শিক্ষাদান করিতেন।

প্রাচীন ভারতে সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল কিনা-এই প্রশ্ন পাঠকের মনে উদিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ শিক্ষালাভেচ্ছু ছাত্রীগণ গৃহে থাকিয়া পিতা, ভ্রাতা বা স্থানীয় কোন অধ্যাপিকার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন (অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা। পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎপরঃ। স্বগৃহে চৈব কন্যায়াঃ ভৈক্ষচর্যা বিধীয়তে। বর্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেব চ।—হারীত)। কিন্তু পাণ্ডিত্যের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হওয়া ছিল যাঁহাদের লক্ষ্য, সেই সকল জ্ঞানপিপাসু মহিলা শিক্ষার্থিগণ দূরদেশে যাইয়া সুযোগ্য আচার্যের তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপিকার অভাবের দরুণ মহিলা শিক্ষার্থীদিগকে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদিগের সহিত যুগপৎ একই শিক্ষকের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করিতে হইত। উত্তর রামচরিতে বর্ণিত আছে যে, আত্রেয়ী, শ্রীরামচন্দ্রের পুত্রদ্বয় কুশ ও লবের সহিত পণ্ডিতপ্রবর মহর্ষি বাল্মীকির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে সহশিক্ষা ব্যবস্থার নিদর্শনস্বরূপ পুরাণে কথিত কহোদ ও সুজাতা, রুরু ও প্রমদ্বরা এবং মালতীমাধবের কামন্দকী ও ভূরিবসুর কাহিনী উল্লেখ করা যাইতে পারে (A. S. Altekar, The position of women in Hindu Civilization, P. 14)

স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ব্যতীত বিবিধ কলা বা অঙ্গ বিদ্যায় নারীদের পারদর্শিতা অর্জন করিতে হইত। বাৎস্যায়ণ প্রণীত কামসূত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থাদির সাক্ষ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন যুগে ৬৪ কলাবিদ্যার অনুশীলন করা হইত। ইহাদের মধ্যে নর্তন, বাদ্য-বাদন, শরীর-সজ্জা, মূর্তি-নির্মাণ, মাল্য-গ্রন্থন, কেশ-মর্দন, দ্যূত-ক্রীড়া, ধাতুবাদ ('the art of melting and reducing to ashes stones, minerals and the like'), অস্ত্র-নিক্ষেপ, বাহু, দণ্ড, মুষ্টি ও অস্ত্র—এই চতুর্বিধ মল্লক্রীড়া, ব্যূহ-রচনা, সারথ্য, আলেখ্য, বস্ত্র-রঞ্জন, রত্নশাস্ত্রে পারদর্শিতা, সূচীশিল্প, সন্তরণ, কাঁচপাত্র নির্মাণ, জলসেচন ও সংহরণ, লৌহাস্ত্র নির্মাণ, বস্ত্র-সংমার্জন, দুগ্ধ-দোহন ও ঘৃত প্রস্তুতীকরণ; নৌকা, রথ প্রভৃতি যানবাহনাদি নির্মাণ এবং জল, বায়ু ও অগ্নির সংযোগ ও নিরোধ প্রক্রিয়া বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, ব্রাহ্মী, যবনলিপি, খরোষ্ঠী, পাহারি, গন্ধর্ব-লিপি, মহেশ্বরী, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি অষ্টাদশ লিপির কতকগুলির লিখন ও পঠন বিষয়ে নারীকে শিক্ষাগ্রহণ করিতে হইত।

উপরি বর্ণিত কলাশাস্ত্রাদির অনুশীলনে নারীগণ যে উৎকর্ষ অর্জন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বৈদিক যুগে সুর সহযোগে সাম-মন্ত্র গান ছিল স্ত্রীলোকের এক আবশ্যিক কর্ম (পত্নীকর্মৈব এতেঽত্র কুর্বন্তি যদুদ্গাতার:—শতপথ ব্রাহ্মণ, চতুর্দশ, ৩, ১, ৩৫)। পরবর্তীযুগের মহিলারাও নৃত্য ও যন্ত্র এই দ্বিবিধ ললিতবিদ্যায় অসামান্য নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন। বেতনভুক অধ্যাপকবৃন্দ কখন কখন রাজদুহিতাদের নৃত্য-গীতাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন। বিদর্ভরাজ মাধবসেনের ভগিনী এবং অগ্নিমিত্রের মহিষী মালবিকা যৌবনবয়সে আচার্য গণদাসের নিকট 'ছলিক' নামে এক অতি দুরভিনেয় নৃত্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। 'পরম নিপুণা' ও 'মেধাবিনী' এই রমণীর নৃত্যনৈপুণ্য কালিদাস নিম্নোদ্ধৃত ছত্রে এক অনুপম ভঙ্গীতে বর্ণনা করিতেছেন—

অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সম্যগর্থঃ
পাদন্যাসো লয়মনুগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।
শাখাযোনির্মৃদুরভিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ
ভাবো ভাবং নুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব॥

অর্থাৎ, "অঙ্গের ভাবভঙ্গীর দ্বারা হৃদয়ের এবং সেই সঙ্গে গেয় বস্তুর সমস্ত অভিপ্রায় সুব্যক্ত হইয়াছে। লয়ানুসারে পাদন্যাস হইয়াছে এবং সেই জন্য রস-বিষয়ে তন্ময়তা ঘটিয়াছে; নৃত্যকালে ঠিক মাত্রানুসারে হস্তপদাদির নর্তনস্বরূপ 'শাখাযোনী' নামক যে অভিনয় আছে, তাহার সর্বপ্রকার ভেদ পরিদর্শিত হইয়াছে। এমনভাবেই সমস্ত 'ভাব' প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব ত্রিসীমানেতেও আসিতে পারে নাই। অথচ রাগ-প্রবাহ আদ্যন্তই অব্যাহত। সুতরাং কোন দোষ ঘটে নাই" (রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী, প্রথমভাগ, পৃঃ ৩৪৮)। দময়ন্তী, অনসূয়া, শকুন্তলা, কাদম্বরী, প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের স্বনামধন্যা নায়িকারা অধিকাংশ কলাশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিবিধ কলাশাস্ত্রের অনুশীলনে বারাঙ্গনাগণ অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মনু প্রভৃতি ধর্ম-শাস্ত্রকারদের দৃষ্টিতে অবহেলিতা হইলেও, শিক্ষা কৃষ্টি ও দানশীলতায় তাঁহারা সমাজের তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। সংগীত, নৃত্য ও নানা কলাশাস্ত্রে পটীয়সী গণিকা অম্বপালী ছিলেন বৈশালী নগরীর গৌরবস্বরূপিণী। ভগবান তথাগতের সমসাময়িক এই বিদুষী রমণী উপার্জিত অর্থ অকাতরে জনহিতকর কার্যে ব্যয় করিতেন (H, C. Chakladar, Social Life in Ancient India, VII)। অন্যান্য গণিকাদের মধ্যে রাজগৃহের সলাবতী এবং মৃচ্ছকটিকে বর্ণিতা বসন্তসেনার নাম চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

রাজপরিবারের দুহিতারা সামরিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে (Military and Administrative Science) শিক্ষালাভ করিতেন। অনেক সময় প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রাজমহিষীগণ রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন। বস্তুত, জীবনের প্রভাতবেলায় সামরিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ না করিলে রাজ্যশাসনের গুরুদায়িত্ব তাঁহারা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিতেন না। প্রাচীন ভারতের মহিলা শাসকগণের মধ্যে মহিষী নায়নিকা বা নাগনিকার (খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতক) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার স্বামী প্রথম শাতকর্ণি বেদশ্রী ও শক্তিশ্রী নামক নাবালক পুত্রদ্বয় রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বামীর পরলোক গমনে মহিষী নায়নিকা দাক্ষিণাত্যের সুবিস্তীর্ণ শাতবাহন রাজ্যের শাসনরজ্জু স্বহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন (K. A. Nilakanta Sastri, A Comprehensive History of India, vol ii, p. 303)।

শাসনকার্যে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ভারতীয় নারীদের মধ্যে গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার (খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক) নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বাকাটক নৃপতি দ্বিতীয় রুদ্র সেন যখন অকালে প্রাণত্যাগ করেন, রাজকুমারদ্বয় দিবাকর সেন ও দামোদর সেন ছিলেন তখন নিতান্ত বালক। পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া রাজ্ঞী প্রভাবতী প্রথমে জ্যেষ্ঠপুত্র দিবাকর ও পরে কনিষ্ঠ দামোদরের অভিভাবিকাস্বরূপ যোগ্যতাসহকারে বাকাটক রাজ্যের শাসনকার্য সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল ধরিয়া পরিচালনা করিয়াছিলেন (R. C. Majumdar & A. S. Altekar, New History of the Indian People, vol. VI, p. 103-4)।

চালুক্য নৃপতি চন্দ্রাদিত্যের মহিষী বিজয়ভট্টারিকা (সপ্তম শতক) এবং কাশ্মীর দেশের সুগন্ধা ও দিদ্দাও শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। কল্যাণীর চালুক্য বংশীয় সম্রাটেরা দেশ শাসনে যে সাফল্য অর্জন করেন, তাহার মূলে মল্লিলাদেবী, কেতলাদেবী, অক্কাদেবী প্রভৃতি নিপুণা মহিলা কর্মীর অনবদ্য অবদান রহিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, নারীদিগের মধ্যে সামরিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। বস্তুত, দেশে উপযুক্ত সংখ্যক নারীসেনার অভাব ছিল বলিয়াই মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তকে বিদেশ হইতে মহিলা রক্ষী-বাহিনী (Amazonian body-guard) আনিতে হইয়াছিল (V. A. Smith, Early History of India, P. 123)।

স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রাচীন যুগের কোন সময়েই নারীশিক্ষা ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ লাভ করে নাই। ইহার ব্যাপ্তি কেবলমাত্র বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। নারীশিক্ষা প্রবাহের ঢেউ কৃষ্টিবান বৌদ্ধ ও জৈন পরিবারেও আসিয়া লাগিয়াছিল। বৌদ্ধনারীদিগের মধ্যে ভিক্ষুণীগণই জ্ঞানানুশীলনে অধিকতম পারদর্শিতা অর্জন করেন। ভগবান তথাগত প্রথমে অনিচ্ছুক হইলেও পরিশেষে মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতি এবং প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে মহিলাদিগের সংঘে প্রবেশাধিকার অনুমোদন করেন। মহাপ্রজাপতি পাঁচশত সম্ভ্রান্ত শাক্য রমণীর সহিত ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন। ভিক্ষুণী ধম্মাদিনার কাহিনী এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁহার স্বামী সন্ন্যাস জীবন যাপনে অভিলাষী হইয়া অগাধ বিত্তরাশি ধম্মাদিন্নাকে অর্পণ করিতে চাহিলে ধর্মশীলা এই মহিলা স্বামীর প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া সংঘে যোগদান করেন এবং কালক্রমে বিদুষী ভিক্ষুণীরূপে খ্যাতিলাভ করেন। ভিক্ষুণী কিসা গৌতমীর নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে। নিজের একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া শোকাতুরা এই রমণী মৃত সন্তানকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য ভগবান বুদ্ধের নিকট আসিয়া প্রার্থনা জানাইলেন। যে স্থানে কোনদিন শোক প্রবেশ করে নাই, এইরূপ কোন গৃহ হইতে সর্ষপ আনিতে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু মানব জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা মাত্র। পুত্রহারা রমণীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল এবং বুদ্ধের চরণপ্রান্তে তিনি আত্ম-নিবেদন করেন। পরিশেষে জ্ঞানানুশীলনে তিনি এতদূর উৎকর্ষ অর্জন করিয়াছিলেন যে, জেতবনবিহারের পরিদর্শিকার (Superintendent) গৌরবময় পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অন্যান্য মহীয়সী বৌদ্ধনারীদের মধ্যে মৌর্য সম্রাট অশোকের কন্যা রাজকুমারী সংঘমিত্রা, সুভা, অনোপমা ও সুমেধার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কৌশাম্বীর জৈন নৃপতি সহস্রানীকের বিদুষী কন্যা জয়ন্তীর বিদ্যাবত্তার কাহিনী সুপরিচিত।

ভারতে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। এই দেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে গৌরবময় অধ্যায় বলিতে আমরা প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগকেই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পর হইতেই নারীশিক্ষার

স্রোতস্বিনীধারা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে। স্ত্রীশিক্ষার এই অবনতির মুখ্য কারণ সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথার বহুল প্রচলন। শাস্ত্রকারদিগের নির্দেশানুযায়ী বাল্যাবস্থায় বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া কন্তার পক্ষে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করা সম্ভবপর ছিল না। বৈদেশিক আক্রমণও সম্ভবত নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। আসমুদ্র হিমাচলবিস্তৃত মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যবন, পহলব, শক, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির আক্রমণে ভারতের ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় দুর্যোগের ঘনঘটা। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে নারীশিক্ষার গতি স্বভাবতই নিম্নগামী হইতে থাকে। কালক্রমে মহিলারা বেদানুশীলন বা বেদমন্ত্রপাঠের অধিকার হইতেও বঞ্চিতা হইলেন। যে উপনয়ন বিধি একদিন ভারতীয় নারীর পক্ষে আবশ্যিক কর্ম ছিল, যাহার বিমল আভায় তাঁহারা দ্বিজত্ব লাভ করিতেন, তাহার অনুষ্ঠান নারীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। ভারতীয় নারী শূদ্রের পর্যায়ভুক্ত হইয়া সমাজের নিম্নতম স্তরে অবনমিত হইলেন। অবশ্য এই সকল দুর্ভেদ্য বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াও অনেক ভারতীয় রমণী পরবর্তীকালে জ্ঞানানুশীলনে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হাল-সঙ্কলিত 'গাথাসপ্তশতী'র অনেক গাথা রেবা, রোহা, মাধবী, অনুলক্ষ্মী, শশিপ্রভা প্রমুখ মহিলা কবিদের দ্বারা বিরচিত হইয়াছিল। উত্তরযুগের আর একজন মহীয়সী রমণী বিজয়াঙ্কা, যাঁহার কাব্যনৈপুণ্য রাজশেখরের ন্যায় বিদ্বজ্জনের খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ভারতশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদ্বয়—শঙ্করাচার্য এবং মণ্ডনমিশ্রের ইতিহাস বিখ্যাত বিতর্ক দ্বন্দ্বে বিচারিকার কার্য যিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন, মণ্ডনমিশ্রের সেই বিদুষী পত্নীর নামও ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

হে স্বপন !

স্বামী বিবেকানন্দ

ভালো মন্দ যাই হয় হোক,
সুখের সুস্মিত হাসি দেখা দেয় যদি,
অথবা উদ্বেল হয় দুঃখ-পারাবার,
সবারি আপন অংশ আছে অভিনয়ে,
কারো হাসি কারো কান্না, যখন যেমন,
রয়েছে আপন সাজ প্রত্যেকের তরে—
রৌদ্রে জলে আবর্তিয়া চলে দৃশ্যান্তর।

হে স্বপন ! সার্থক স্বপন !
কাছে দূরে প্রসারিত কর মায়াজাল,
পেলব কোমল কর তীব্র রেখা যত,
সব রুক্ষতারে তুমি নম্র ক'রে তোলো।

তোমারি মাঝারে আছে সব ইন্দ্রজাল।
তোমারি পরশে
প্রাণ পুষ্পে হিল্লোলিত
জাগে মরুভূমি,
মধুর সঙ্গীতে ভরে
ঘনঘোর অশনি-গর্জন,
মৃত্যু আনে মধুময় মুক্তির আস্বাদ।*

অনুবাদক—শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

(* Thou Blessed Dream : ১৯০০, ১৭ই অগস্ট প্যারিস হইতে ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত। উদ্বোধনের সৌজন্যে)।

৩ দুর্গাসূক্তম্

জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ১ ॥

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥ ২ ॥

অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা।
পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্বী ভবা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ ॥ ৩ ॥

বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতিপর্ষি।
অগ্নে অত্রিবন্মনসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্ ॥ ৪ ॥

পৃতনাজিতং সহমানমুগ্রমগ্নিং হুবেম পরমাৎসধস্থাৎ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা ক্ষামদ্দেবো অতি দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ৫ ॥

প্রত্নোষি কমীড্যো অধ্বরেষু সনাচ্চ হোতা নব্যশ্চ সৎসি।
স্বাং চাগ্নে তনুবং পিপ্রয়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমায়জস্ব ॥ ৬ ॥

গোভির্জুষ্টমযুজো নিষিক্তং তবেন্দ্র বিষ্ণোরনুসঞ্চরেম।
নাকস্য পৃষ্ঠমভি সংবসানো বৈষ্ণবীং লোক ইহ মাদয়ন্তাম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ

[কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় আরণ্যক এবং মহানারায়ণ উপনিষদে এই কয়েকটি মন্ত্র আছে। যদিও ঐ মন্ত্রগুলির অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা আছে, তাহা হইলেও ইহা দুর্গাসূক্ত-রূপে প্রসিদ্ধ এবং কোন কোন মন্ত্র সায়ণও দুর্গাপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোন ব্যাখ্যাকার সবগুলিই দুর্গাপক্ষে ব্যাখ্যা করেন। সায়ণ বলিয়াছেন, এই মন্ত্র কয়েকটি অনিষ্ট-নিবৃত্তির জন্য জপনীয়। সেইজন্য উহা স্বরের সহিত উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে অনুবাদ দেওয়া হইল।]

যাঁহা হইতে মানুষ প্রভৃতি জ্ঞান লাভ করে, সেই দেবীর উদ্দেশ্যে যাগকালে আমরা সোমরস নিষ্কাশন করি। সেই দেবী সর্বজ্ঞা; যাহারা আমাদের শত্রু হইতে ইচ্ছা করে, তিনি তাহাদিগকে দগ্ধ করেন। তিনি আমাদের সকল বিপদ নাশ করিয়াছেন। নাবিক যেমন পোতের দ্বারা সমুদ্র অতিক্রম করে, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে তারণ করেন।১

যিনি মন্ত্রশাস্ত্রে নবদুর্গারূপে প্রসিদ্ধা, অগ্নিতুল্যবর্ণা, যিনি নিজ তাপের দ্বারা আমাদের শত্রুকে দগ্ধ করেন, যিনি বিশিষ্টরূপে প্রকাশমানা, পরমাত্মা অর্থাৎ মহাদেব কর্তৃক দৃষ্টা, ফলের নিমিত্ত উপাসক কর্তৃক সেবিতা, আমরা সেই দুর্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করি। হে দেবি! তুমি সংসার হইতে উত্তম রূপে জীবকে ত্রাণ কর সেই হেতু তুমি ত্রাণকারিণী। তোমাকে নমস্কার।২

হে দেবি! তুমি স্তবার্হ, তুমি মঙ্গলময় উপায় সকলের দ্বারা আমাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে অতিক্রম করাইয়া সংসারের পরপারে লইয়া যাও। তোমার অনুগ্রহে আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবীরূপ পুরী বিস্তীর্ণ হউক। আমরা তোমার পুত্র, আমাদের জন্য তুমি সুখদাত্রী হও।৩

হে সর্বজ্ঞে, সকলবিপদহন্ত্রি! নাবিক যেমন নৌকার দ্বারা সমুদ্র অতিক্রম করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে তারণ কর। হে দেবি! অত্রি মুনি যেমন 'সকলের সুখ হউক' এইরূপ সর্বদা মনে মনে ভাবনা করেন, তুমিও সেইরূপ মনে মনে গুণের উচ্চারণ করিয়া আমাদের (স্থূল এবং সূক্ষ্ম) শরীরের রক্ষক হও।৪

তুমি পরকীয়সেনা-জয়কারিণীদিগের মধ্যে সর্বোত্তম, অতএব তুমি শত্রুর অভিভব-কারিণী। হে দেবি! তুমি উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থান কর। তোমার ভৃত্যের সহিত তোমাকে তোমার অবস্থান-দেশ হইতে আহ্বান করি। সেই দেবী আমাদের সকল বিপদ নাশ করেন, এবং তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে অতিপাতক হইতে রক্ষা করেন।৫

হে দেবি! তুমি যাগে স্তবনীয় হইয়া সুখ বিস্তার কর। কর্মফল প্রদান করিয়া কর্মের সম্পাদনা কর। তুমি স্তুত হইয়া যাগদেশে অবস্থান কর। অতএব দেবি! আমাদের হবির দ্বারা তুমি তোমার শরীর তৃপ্ত কর এবং তারপর আমাদিগকে সৌভাগ্যযুক্ত কর।৬

হে দেবি! আমরা নিজ নিজ সৌভাগ্যের উদ্দেশ্যে দুঃখাদিশূন্য সর্বব্যাপী তোমার ভৃত্য হইয়া তোমাকে পশুর দ্বারা, অমৃতধারার দ্বারা স্নান করাইয়া সেবা করিব। স্বর্গে বাসকারী দেবতাগণ তোমাতে ভক্তি প্রদান করিয়া আমাদিগকে ইহলোকে বাঞ্ছিত ফল প্রদানপূর্বক হৃষ্ট করুন।৭

[সায়ণ-ভাষ্যানুযায়ী বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্যকৃত]

মৃত্যু-ফাঁদ

"সাকী" (এইচ্. এইচ্. মুনরো)

চরিত্র

দিমিত্রি, কেদারিয়ার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যুবরাজ।

ডা: ষ্ট্রনেৎস্ কর্ণেল গিরনিৎসা মেজর ভনতিয়েফ ক্যাপ্টেন শুলৎস্	ক্রানিৎস্কি রক্ষীবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ।

দৃশ্য—যুবরাজের সার্ণস্থিত দুর্গের অভ্যন্তরস্থ একটি পার্শ্বপ্রকোষ্ঠ।

সময়—বর্তমান দিন। দৃশ্যাবস্থ—রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকায়।

[পার্শ্বপ্রকোষ্ঠটি ফাঁকা ফাঁকা ভাবে সাজানো। দেওয়ালের গায়ে বলকান-দেশীয় কতকগুলি কম্বল লম্ববান। ঘরের মধ্যস্থলে অপ্রশস্ত একটি টেবিল। দক্ষিণে জানালার কাছে আর একটি টেবিল মদের বোতল এবং পান-পাত্র দ্বারা সজ্জিত। ঘরের চারপাশেই এখানে ওখানে কতকগুলি পিঠ-উঁচু চেয়ার রাখা রয়েছে। বাঁ দিকে টালি দিয়ে ছাওয়া আগুনের চুল্লী। মাঝখানে দরজা।]

(যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে গিরনিৎসা, ভনতিয়েফ এবং শুলৎসকে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে দেখা যাবে।)

গিরনিৎসা। যুবরাজ কিছু কিছু আঁচ করতে পেরেছে বলে মনে হয়; তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে।

শুলৎস্। করতে দাও তাকে আঁচ। আর আধঘণ্টার মধ্যেই বাছাধন ভাল করেই জানতে পারবেন।

গিরনিৎসা। আনগ্রিয়েক বাহিনী সহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই আমরা প্রস্তুত হব।

শুলৎস্। (পিস্তলটি খাপ থেকে বার ক'রে একটা কাল্পনিক ব্যক্তির দিকে তাক্ করে)। তারপর—তে ধর্মাবতার, আপনার জন্য সামান্য এক পাপ স্বীকার! খুব বেশী গুলী আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে বলে মনে হয় না।

গিরনিৎসা। পিস্তল কোনকালেই আমার প্রিয় অস্ত্র নয়। আমি কাজ হাসিল করব এইটি দিয়ে।

[তরবারীটি অর্দ্ধেক নিষ্কাশিত করে এবং একটা শব্দ ক'রে পুনরায় সেটা কোষবদ্ধ করে।]

ভনতিয়েফ। ওর প্রাপ্য আমরা ওকে দেবই দেব। তবে একটা বালককে আমাদের খুন করতে হবে এই যা দুঃখ। ছেলেমানুষ না হয়ে একটা বয়ঃপ্রাপ্ত লোক হ'লে মেরে সুখ পাওয়া যেত।

গিরনিৎসা। সুযোগ পাওয়ামাত্রই আমাদের তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক লোক হ'লে ও বিয়ে করত, উত্তরাধিকারীদের জন্ম দিত। আর তারপর ওর পরিবারের সবাইকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে হ'ত। কিন্তু এই বালকটিকে মেরে ফেলার অর্থ হ'ল একটি রাজবংশের সর্বশেষ পুরুষটিকে খতম করা এবং যুবরাজ কার্লের পথ পরিষ্কার করা। এ বংশের একটি শাবকও জীবিত থাকাকালীন আমাদের সদাশয় কার্ল সিংহাসন অধিকার করতে পারছেন না।

ভনতিয়েফ। হ্যাঁ, আমি মানি এটা আমাদের বিরাট সুযোগ। তবু বালকটি আমাদের হাতে না ম'রে যদি স্বাভাবিক ভাবে মারা গিয়ে আমাদের পথ পরিষ্কার করতো, তাহ'লেই সব থেকে ভাল হ'ত।

শুলৎস্। চুপ! ঐ ও আসছে।

[মাঝখানের দরজা দিয়ে যুবরাজ দিমিত্রির প্রবেশ। অশ্বারোহী সৈনিকের ঢিলেঢালা পোষাক তাঁর পরণে। তিনি সোজা ঘরের মাঝখান পর্যন্ত আসেন, একটা কেস থেকে সিগারেট বার করতে করতে উদাসীন ভঙ্গীতে অফিসার তিনজনের দিকে তাকান।]

দিমিত্রি। আপনাদের আর অপেক্ষা করার দরকার নেই।

[তারা মাথা নিচু ক'রে সম্ভ্রম প্রদর্শন ক'রে প্রস্থান করে। শুলৎস্ সবার শেষে বেরিয়ে যেতে যেতে যুবরাজের দিকে উদ্ধত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। যুবরাজ মাঝখানের টেবিলের ওপর ব'সে পড়েন। দরজা বন্ধ হওয়ামাত্র তিনি সেইদিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে থাকেন, তারপর হতাশার ভঙ্গীতে হঠাৎ মাথা নত ক'রে বাহুতে মুখ গোঁজেন·····দরজায় ধাক্কা মারার শব্দ। দিমিত্রি লাফ মেরে দাঁড়িয়ে ওঠেন। সাধারণ নাগরিকের বেশে ষ্ট্রনেৎসের প্রবেশ।]

দিমিত্রি। (আগ্রহের সঙ্গে) ষ্ট্রনেৎস্! কী সৌভাগ্য আমার, তোমাকে পেয়ে কী যে খুশী হলাম!

ষ্ট্রনেৎস্। ভেতরে প্রবেশ করবার অনুমতি লাভ করতে আমায় যে বেগ পেতে হয়েছে, তা যদি তুমি জানতে তাহ'লে নিশ্চয়ই খুশী হতে পারতে না। শেষে তোমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য একটা জরুরী আদেশ পেয়েছি এই অজুহাত আবিষ্কার করতে হল। ওরা আমার পিস্তলটি ওদের কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য করল। কী এক নতুন আইন নাকি হয়েছে।

দিমিত্রি। (ম্লান হেসে) কোন না কোন ছলে ওরা আমার সমস্ত অস্ত্রই আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আমার

তরবারীটি ধার দিতে দেওয়া হয়েছে, আমার পিস্তলটি পরিষ্কার করা হচ্ছে, আমার শিকারের ছুরিটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ট্রেনেৎস্। (ভীত হয়ে) কী সর্বনাশ দিমিত্রি। তুমি কি বুঝতে পারছো না—?

দিমিত্রি। হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পারছি। আমি ফাঁদে আটকা পড়েছি। আজ থেকে তিন বছর আগে চোদ্দ বছরের এক বালক হিসেবে আমার এই সিংহাসনে অধিরোহণ করার দিনটি থেকে আমি এই সর্বনাশ মুহূর্তটি সম্পর্কে সজাগ এবং সতর্ক থেকে এসেছি। কিন্তু সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও আজ আমি আমার অজ্ঞাতসারেই সেই মুহূর্তটির কবলিত হয়ে পড়েছি।

ট্রেনেৎস্। কিন্তু তোমার রক্ষীরা!

দিমিত্রি। তুমি কী ওদের উর্দীগুলির প্রতি লক্ষ্য করেছ। ফ্রানিৎস্কি বাহিনী ওরা মনে প্রাণে যুবরাজ কার্লের পক্ষে। গোলন্দাজ বাহিনীও সমান প্রতিকূল। একমাত্র আনদ্রিয়েক বাহিনী সম্পর্কেই ওদের যা কিছু সন্দেহ ছিল এবং তারাও আজ রাত্রে তাদের শিবিরে ফিরে যাচ্ছে। লন্‌ইয়াদি বাহিনী ওদের স্থান গ্রহণ করার জন্যে এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে।

ট্রেনেৎস্। তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুগত?

দিমিত্রি। হ্যাঁ, কিন্তু তাদের আনুগত্য এসে পৌঁছুচ্ছে এক ঘণ্টা বা তারও বেশ কিছু সময় পরে।

ট্রেনেৎস্। দিমিত্রি! তুমি এখানে এইভাবে খুন হবার জন্যে বসে থাকতে পার না। তোমাকে শীগগির এখান থেকে পালাতে হবে।

দিমিত্রি। ট্রেনেৎস, এক পুরুষেরও বেশী হল এই কার্ল চক্র আমাদের বংশের অস্তিত্বকে লোপ করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এখন আমিই একমাত্র অবশিষ্ট; তুমি কি মনে কর ওরা এখন আমাকে ওদের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দেবে? সে ধরণের নীরেট মূর্খ ওরা নয়।

ট্রেনেৎস। কিন্তু এ যে ভয়ানক। তুমি ওখানে বসে কথা বলছ যেন দাবা খেলার চাল দিচ্ছ।

দিমিত্রি। (দাঁড়িয়ে উঠে) ওঃ ট্রেনেৎস! তুমি যদি জানতে মৃত্যুকে আমি কী রকম ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষ নই কিন্তু মরতে আমি চাই না। জীবনকে যুগপৎ ভীষণ এবং মনোহর বলে বোধ হয় এই তরুণ বয়সেই। আর সে জীবনের কতটুকুই বা আমি আস্বাদন করতে পেরেছি। (জানালার কাছে এগিয়ে যায়!) জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ অরণ্য সমাচ্ছন্ন পরীরাজ্য ঐ পর্বতমালার দিকে। ঐ দেখ গ্রেডভিৎস, যে জায়গাটায় আমি গত শরতের সারা সময়টা শীকার করে বেড়িয়েছি। তারও ওপরে বাঁ দিকে বহুদূর ছাড়িয়ে ভিয়েনা সহর। তুমি কখনও ভিয়েনা গিয়েছো ট্রেনেৎস? আমি একবার মাত্র সেখানে গিয়েছিলাম। যাদুনগরীর মত মনে হয়েছিল আমার সহরটিকে দেখে। পৃথিবীতে এমন আরও কত সহর রয়েছে যেগুলি আমি কখনও দেখিনি। আঃ, তাই আমি বাঁচতে চাই। ভাব দেখি একবার; আজ এখানে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, যেমন করে আমরা বহুবার এই ধূসরবর্ণ প্রাচীন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলেছি, আর আগামী কাল একটা মোটা হাদা চাকর ঐ কোণায়—হ্যাঁ সম্ভবতঃ ঐ কোণাটায়ই—একটা রক্তের দাগ মুছতে থাকবে।

[চুল্লীর কাছে বাঁ-দিকের কোণাটার প্রতি তিনি নির্দেশ করেন।]

ট্রেনেৎস্। কিন্তু এই ভাবে সব কিছু জেনে-শুনে তুমি ঐ কসাইগুলোর হাতে মৃত্যু বরণ করতে পার না দিমিত্রি। আত্মরক্ষা করার মত কোন হাতিয়ারই যদি ওরা তোমার কাছে ফেলে না গিয়ে থাকে তাহ'লে আমি আমার বাক্স থেকে একটা ওষুধ দিচ্ছি যা খেলে ওরা তোমার স্পর্শ করবার আগেই তোমার মৃত্যু ঘটবে।

দিমিত্রি। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, না বন্ধু, ও আমার চাই না। ওদের কাজ শুরু হবার আগেই তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিৎ; ওরা তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করবে না। কিন্তু বিষপান আমি করব না। আমি কখনও কাউকে খুন হতে দেখিনি আর আমার খুন হওয়াটাও তুমি দেখতে পাবে না।

ট্রেনেৎস। তাহ'লে আমি তোমায় ছেড়ে যাব না। মরবার আগে আমায় তুমি খুন হতে দেখবে।

[সৈন্যদের মিলিত পদধ্বনির সঙ্গে দূরে এক ব্যাণ্ডবাদ্যের আওয়াজ শোনা যায়।]

দিমিত্রি। আনদ্রিয়েক বাহিনী মার্চ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা এখন আর বেশী সময় নষ্ট করবে না (চুল্লীর কাছের কোণাটায় কাঠ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন)। চুপ, ওরা আসছে!

ট্রেনেৎস। (দিমিত্রির দিকে সহসা দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে)! শীগগির! একটা মতলব মাথায় এসেছে! তোমার গায়ের জামাটা খুলে ফেল দেখি।

[দিমিত্রির জামাটা খুলে ফেলে তিনি তাঁর বুক পরীক্ষা করছেন এমন ভাব দেখাতে লাগলেন। ধাক্কা লেগে দরজা খুলে যায় এবং অফিসার তিন জন প্রবেশ করেন। ট্রেনেৎস হাত নেড়ে তাদের নীরব থাকতে ইসারা করে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন। অফিসারেরা কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।]

গিরনিৎসা। ডাঃ ট্রেনেৎস্, আপনি কি অনুগ্রহ করে একটু বাইরে যাবেন? যুবরাজের সঙ্গে আমাদের কিছু কাজ রয়েছে। জরুরী কাজ ডাঃ ট্রেনেৎস্।

ট্রেনেৎস্। (মুখ ফিরিয়ে) ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কাজটি আরও গুরুতর বলে আমি আশঙ্কা করছি। দুরূহতম কর্তব্য আমায় সম্পাদন করতে হবে। আমি জানি আপনারা আপনাদের যুবরাজের জন্য সানন্দে জীবনপাত করতেও প্রস্তুত কিন্তু এমন কতকগুলি বিপদ রয়েছে যেগুলিকে আপনাদের বীর্যবত্তাও প্রতিরোধ করতে সমর্থ নয়।

গিরনিৎসা। (হতবুদ্ধির ভাবে) আপনি কী বলতে চাইছেন?

ট্রেনেৎস্। যুবরাজ তাঁর দেহের কতকগুলি উদ্বেগজনক উপসর্গের চিকিৎসা করবার জন্য আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি ওঁকে পরীক্ষা করে দেখলাম। আমার কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর·····যুবরাজের ছ'দিনের বেশী বেঁচে থাকার ভরসা আমি দিতে পারছি না।

[দিমিত্রি কৃত্রিম অবসাদে অবসন্ন হয়ে টেবিলের কাছের চেয়ারটায় বসে পড়েন। অফিসারেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পরস্পরের মুখাবলোকন করতে থাকে।]

গিরনিৎসা। ঠিক বলছেন? আপনি এক দারুণ কথা বলছেন কিন্তু। কোন ভুল হয়নি তো আপনার?

ট্রেনেৎস্ (দিমিত্রির কাঁধে হাত রেখে)। ভগবান করুন, আমার কথা যেন ভুলই প্রতিপন্ন হয়।

[অফিসারেরা পুনশ্চ পরস্পরের দিকে ফিরে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলতে থাকে।]

গিরনিৎসা। আমাদের কাজটাকে তা'হলে এখন স্থগিত রাখা যেতে পারে।

ভনতিয়েফ (দিমিত্রিকে)। ধর্মাবতার। বিধির নির্বন্ধ কেউ খণ্ডন করতে পারে না।

দিমিত্রি (ভেঙ্গে পড়ে)। আপনারা আমায় একটু একা থাকতে দিন।

[অভিবাদন জানিয়ে ওরা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। দিমিত্রি ধীরে ধীরে মাথা তোলেন, তারপর লাফ মেরে উঠে দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে থাকেন, তারপর উৎফুল্লভাবে ট্রেনেৎসের দিকে ঘুরে দাঁড়ান।]

দিমিত্রি। ওদের চোখে ধূলো দিয়েছো তুমি? হে ভগবান, আচ্ছা মতলব ঠাউরেছিলে ট্রেনেৎস্।

ট্রেনেৎস্। (দিমিত্রির মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে) এর মধ্যে কোন দৈবজ্ঞানের ব্যাপার ছিল না দিমিত্রি। তোমার চোখের দৃষ্টিই আমাকে এর ইঙ্গিত দিয়েছিল। আমি দেখেছি নৈতিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঠিক এমনটিই দেখায়।

দিমিত্রি। যাই ইঙ্গিত করুক না কেন কিছু আসে যায় না, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ এইটাই আসল কথা। যে কোনও মুহূর্তে লনইয়াদি বাহিনী এখানে এসে পৌঁছুবে, আর একবার তারা এসে পড়লে গিরনিৎসা চক্রের আর সাহস হবে না কিছু করার। তুমি ওদের বোকা বানিয়েছ ট্রেনেৎস্, তুমি ওদের বোকা বানিয়ে ছেড়েছ।

ট্রেনেৎস্ (বিষণ্ণভাবে)। ওহে বালক, আমি ওদের বোকা বানাই নি··· (দিমিত্রি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।) সত্যিকারের পরীক্ষাই আমি করছিলাম যখন ঐ বর্বরগুলো তোমাকে হত্যা করবার জন্য ওখানে অপেক্ষা করছিল। রোগানুসন্ধানের যে বিবরণ আমি দিয়েছি তার মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু নেই। তোমার শরীরে অসুখ রয়েছে।

দিমিত্রি (ধীর স্বরে)। যা তুমি ওদের কাছে বলেছ তার সবটুকুই সত্যি?

ট্রেনেৎস্। সবটুকুই সত্যি। তোমার আয়ু আর ছ'দিনও নেই।

দিমিত্রি (তিক্ততার সঙ্গে)। একই সন্ধ্যায় মৃত্যু আমার কাছে দু'বার এসেছে। বোধ হচ্ছে এবার সে যথার্থই এল। (উত্তেজিতভাবে।) তুমি কেন ওদের আমায় খুন করতে দিলে না? ওদের করুণার ওপর নির্ভর করে আরও কয়েকদিন বেঁচে থাকার যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে সেটাই তো ছিল ভাল। (দক্ষিণদিকের জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকায়। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়।) ট্রেনেৎস! তুমি একটু আগে আমাকে একটা নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় করে দিতে চেয়েছিলে। এখন তার থেকেও নিষ্ঠুরতর এক মৃত্যুর হাত থেকে আমায় অব্যাহতি পেতে দাও। আমি একটি রাজ্যের অধিপতি। মৃত্যুর খেয়াল-খুশীমত আমি চলব না। ঐ ছোট শিশিটা আমায় দাও।

[ট্রেনেৎস প্রথমে ইতস্তত: করেন, পরে একটা ছোট বাক্সের থেকে একটা শিশি বার করে তাঁর হাতে দেন।]

ট্রেনেৎস। চার কি পাঁচ ফোঁটাতেই কাজ হবে।

দিমিত্রি। ধন্যবাদ। তা'হলে বন্ধু, এবার বিদায়। শীগ্‌গির চলে যাও। তা না হলে যে সামান্য সাহস আমি সঞ্চয় করেছি সেটুকুও হয়তো হারিয়ে ফেলবো। সাহসী হিসেবেই আমি তোমার স্মৃতিতে বেঁচে থাকতে চাই। বিদায় বন্ধু, যাও।

[ট্রেনেৎস খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর করমর্দন করেন, তারপর বাহুতে মুখ লুকিয়ে বেগে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। দরজাটি বন্ধ হয়ে যায়। দিমিত্রি ক্ষণকালের জন্য তাঁর বন্ধুর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর তাড়াতাড়ি পাশের টেবিলে গিয়ে মদের বোতলটার ছিপি খুলে ফেলেন। একটা পানপাত্রে কিছু মদ ঢালতে গিয়েও তিনি থমকে দাঁড়ান, যেন তাঁর মাথায় হঠাৎ কোন এক নতুন মতলব এসেছে, এমনি ভাবে। তিনি দরজার কাছে গিয়ে পাল্লা দুটোকে ধাক্কা মেরে খোলেন এবং দাঁড়িয়ে কান পেতে কিছু শুনবার চেষ্টা করেন, তারপর চেঁচিয়ে ডেকে ওঠেন, "গিরনিৎসা, ভনতিয়েফ, শুলৎস।" দ্রুতপদে টেবিলের কাছে ফিরে এসে তিনি শিশিটির সমস্ত পদার্থটুকু মদের বোতলের মধ্যে ঢেলে দেন এবং খালি শিশিটাকে ঠেলেঠুলে পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখেন। অফিসার তিনজনের প্রবেশ।]

দিমিত্রি (চারটি পানপাত্রে মদ ঢেলে)। যুবরাজ মৃত—যুবরাজ দীর্ঘজীবি হোন! (আসন গ্রহণ।) পুরাতন কুল-বৈরিতার এইবারই অবসান হবে, বংশরক্ষা করার মত আমার পরিবারে আর একজনও জীবিত রইল না। যুবরাজ কার্ল ই এইবার সিংহাসনে অধিরোহণ করবেন। যুবরাজ কার্ল দীর্ঘজীবি হোন! ক্রানিৎস্কি রক্ষীবাহিনীর ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিপের কল্যাণ কামনা করে মদ্য পান করুন।

[অফিসার তিনজন পরস্পরের দিকে একবার কটাক্ষপাত করে মদ্যপান করে।]

গিরনিৎসা। ধর্মাবতার, আপনার মত বীর্যবান যুবরাজ আর আমরা পাব না।

দিমিত্রি। একথা সত্যি, কেননা আপনাদের আর কখনও অন্য কোনও যুবরাজের অধীনে কাজ করতে হবে না। দেখুন, আমি পান করছি। [পান-পাত্র নিঃশেষিতকরণ।]

গিরনিৎসা। অন্য কোনও যুবরাজের অধীনে কাজ করতে হবে না, এর অর্থ?

দিমিত্রি। (উত্থিত হয়ে) এর অর্থ আমি ক্রানিৎস্কি রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে পরলোকে যাত্রা করছি। তোমরা এখানে আজ রাত্রে আমায় খুন করতে এসেছিলে। (ওরা চমকে ওঠে) কিন্তু মৃত্যু সর্বাগ্রে তোমাদেরই গ্রাস করে বসল। আজকের এমন সন্ধ্যাটা মাটি হয়ে যাবে? তাই, আমি তোমাদের হত্যা করেছি, ব্যস্!

শুলৎস্। মদ! ও আমাদের বিষ খাইয়েছে!

[ভনতিয়েফ, বোতলটাকে আঁকড়ে ধরে পরীক্ষা করতে থাকে। শুলৎস্ তার শূন্য পানপাত্রটা শুঁকতে থাকে।]

গিরনিৎসা। আঃ! আমাদের বিষ খাইয়েছে!

দিমিত্রি মাঝখানের টেবিলের কিনারায় বসে আছেন। সে তার তরবারী উন্মুক্ত করে তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে যায়।]

দিমিত্রি। নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোমার ইচ্ছা তুমি পূরণ করতে পার। রোগের দরুণ আমি কয়েক দিনের মধ্যেই মরতাম আর বিষ খাওয়ার দরুণ তো দু'-এক মিনিটের মধ্যেই মরব। তুমি যদি একটু অতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করতে চাও আপত্তি করব না।

[গিরনিৎসা টলতে থাকে এবং টেবিলের ওপর তরবারীটি ফেলে দিয়ে একটা আর্তনাদ করে পেছনের চেয়ারের ওপর পড়ে যায়। গুলাৎস্ টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং ভল্তিয়েফ্ টলতে টলতে দেয়ালে ধাক্কা খায়। সেই মুহূর্তেই দূরাগত এক সৈন্যদলের সজীব পদধ্বনির আওয়াজ শোনা যায়। দিমিত্রি তরবারীটি জোরে চেপে ধরে আন্দোলিত করতে থাকেন।]

দিমিত্রি। আহা! লন্ইয়াদী বাহিনী মার্চ করে এগিয়ে আসছে। আমার বিশ্বস্ত ফ্রানিংস্কি রক্ষীরা পরলোকে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। ঈশ্বর যুবরাজকে দীর্ঘজীবি করুন (উন্মাদের মত হাসতে থাকেন)। কর্ণেল গিরনিৎসা, আমি কখনও ভাবতে পারিনি মৃত্যু···এত কৌতুকজনক···ভবে। [পতন ও মৃত্যু।

যবনিকা

অনুবাদক—বিনয়কৃষ্ণ চন্দ।

অতীত ও বর্ত্তমান

(টমাস্ হুডের কবিতা)

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আমার মনে পড়ছে ওগো পড়ছে আমার মনে
সেই গৃহটি যেথায় আমি জন্মেছিলাম আগে,
নেহাৎ ছোট জানলা দিয়ে ভোরে অরুণ-আলো
করতো প্রবেশ উঁকি মেরে গভীর অনুরাগে।
কক্ষণো তা আসতো নাকো হঠাৎ ইসারায়,
অথবা সে লাগায়নিকো সুদীর্ঘ একদিন ;
কিন্তু এখন হয় বাসনা রাত্রি যদি এসে
বহন ক'রে নিয়ে যেতো নিশ্বাস মোর ক্ষীণ।

আমার মনে পড়ছে ওগো পড়ছে আমার মনে
প্রস্ফুটিত গোলাপগুলো লালচে এবং শ্বেত,
সুনীল কুসুম এবং আরো স্থলপদ্মগুলি—
আলোয় তারা তৈরি হয়ে উজ্জ্বল রাখে ক্ষেত।
সুশ্রী ফুলের গাছগুলোতে বাঁধতো পাখী বাসা,
এবং আমার ভাইটি যেথায় তাহার নিজের হাতে,
পাহাড়িয়া পুষ্পতরু লাগায় জন্মদিনে,
সে-গাছ আজো বেঁচেই আছে, প্রাণটা আমার মাতে।

আমার মনে পড়ছে ওগো পড়ছে আমার মনে
যেথায় নিতি খেতাম দোলা, আজো সে-গাছ আছে;
ভাবতাম হাওয়া আসবে ছুটে সতেজ শোভন রূপে
উড়ন্ত সব ছোট ছোট বাবুই পাখীর কাছে।
আত্মা তখন উড়তো আমার হালকা পাখা পেয়ে,
এখন যে তা আমার কাছে বেজায় ভারী লাগে।
গ্রীষ্মকালের পুষ্করিণী করতো শীতল কচিৎ
মোর কপালের উষ্ণতাকে, গরম কি তায় ভাগে

আমার মনে পড়ছে ওগো পড়ছে আমার মনে
কালো কালো অনেক উঁচু দেওদারু গাছগুলি ;
মনে মনে ভাবতাম তখন আসমানের খুব কাছে
গাছগুলো বেশ দাঁড়িয়ে আছে লম্বা মাথা তুলি।
এমনি ছিল বালককালের নেহাৎ জ্ঞানাভাব,
এখন কিন্তু পাইনে মোটেই একটুকু সুখ মনে ;
যখন আমি বালক ছিলাম স্বর্গ ছিল কাছে,
স্বর্গ এখন অনেক দূরে আছে সঙ্গোপনে।

বাঙলার গৌরব

রমেশচন্দ্র দত্ত

রণজিৎকুমার সেন

সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, একমাত্র সাংস্কৃতিক আলোচনার মাধ্যমেই হয়তো তাঁদের সম্পর্কে প্রায় সব কথা বলা যায়, কিন্তু বাংলার মনীষার ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র দত্ত এমন একজন ব্যক্তি, যিনি বাংলার সাহিত্য ও জীবন-ধারার অন্যতম প্রতিভা ও প্রাণ-প্রতিভূ হওয়া সত্ত্বেও এক কথায় তাঁর সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তিনি একাধারে স্বদেশনিষ্ঠ, বিচক্ষণ রাজকর্মচারী, কংগ্রেসের অন্যতম অধিনায়ক, বাগ্মী, সাহিত্য-উপাসক, কবি ও ঔপন্যাসিক, ঋগ্বেদের অনুবাদক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও গ্রন্থপ্রণেতা, রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থায় পারদর্শী, কার্জন-বিজয়ী ও সুতার্কিক, রাজা ও প্রজার বন্ধু, বিজ্ঞ ব্যবস্থাপক, গায়কবাড়ের অমাত্য ও বরোদার দেওয়ান, ভারতের অন্যতম কল্যাণকামী কর্মবীর এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। জীবনের বহু কর্মে ও গুণে গুণবান পুরুষ রমেশচন্দ্র ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ উনিশ বছর বয়সে বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে ব্যারিষ্টারী ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। পথে মাল্টা দ্বীপের শোভায় মুগ্ধ হ'য়ে তিনি সেই 'সুন্দর বসন্ত' নামে যে-কবিতাটি রচনা করেন, তা অনেকাংশে মাইকেলি রীতির অনুসারি হ'লেও মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। কবিতাটি এই—

সুন্দর বসন্তকান্তি শোভিছে ধরায়,
নিরানন্দ প্রবাসীর কি সুখ তাহায়!
মাতৃভূমি পরিহরি বিদেশ ভ্রমণ,
অনন্ত সমুদ্র বক্ষে করি পর্যটন॥
চারিদিকে উর্মিরাশি ভীষণ কল্লোলে,
উল্লাসে প্রমত্ত যেন আস্ফালিয়া চলে।
প্রবল সাগর বায়ু উচ্চরবে ধায়,
প্রবাসীর কর্ণে যেন দুখ-গান গায়।
সুন্দর বসন্ত যথা জগতে পশিছে,
জীবন-বসন্ত মম যৌবনে উদিছে।
ঐ শোন যশো দেবী ভৈরব নিঃস্বনে,
ডাকে মোরে, যুঝিবারে যশের কারণে।
সময়ে-সময়ে কেন ভীরু চিন্তা করি,
দূরে যাক বিষণ্ণতা, চিন্তা-অশ্রুবারি।
নির্ভয়ে যুঝিব আমি যশের কারণ,
নাহি খেদ, হয় যদি শরীর পতন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বাঙালীর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই রমেশচন্দ্র এই পরীক্ষায় গৌরবের অধিকারী হন; এতদ্ব্যতীত ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাতেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যদিও তিনি চিরকাল ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থাশীল ছিলেন, তবু বিলেতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে, ভারতের উন্নতির জন্য ভারতবাসীকে আধুনিক প্রগতিশীল ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার প্রয়োজন আছে। তাঁর অগ্রজকে লিখিত একখানি পত্রের একাংশে এ কথার উজ্জ্বল নিদর্শন পাই। যেমন—

'...We in India have an ancient and noble civilisation. but nevertheless we have much to learn from modern civilisation. And I hope, as we become more familiar with Europe and with England, we shall adopt some great virtues and some noble institutions which are conspicuous in Europe in present day, and which we need so much. Our children's children will live to see the day when India will take her place among the nations of the earth in manufacturing industry and commercial enterprise, in representative institutions, and in real social advancement. May that day dawn early for India.'

রমেশচন্দ্র দত্ত

সুখের বিষয় যে, রমেশচন্দ্রের সেই স্বপ্নের ভারত আজ আমরা স্বাধীনচিত্তে দর্শন করার অবকাশ পেয়েছি।

যখন তিনি, সুরেন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁদের সম্বর্ধনা দানের জন্য যাঁরা উদ্যোগী হন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কিশোরীচাঁদ মিত্র। তাঁর সরকারী চাকরীর প্রথম অবস্থাতেই রমেশচন্দ্র সারা বাংলা ও উড়িষ্যার কোথাও বা এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর, কোথাও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর, কোথাও অস্থায়িভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর, আবার কোথাও বা সুপারিন্টেনডেণ্ট ও কমিশনারের পদ অলঙ্কৃত করেন। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট তাঁকে ১৮৯২ সালে সি, আই, ই, উপাধি দান করেন ও ১৮৯৫ সালে বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদে মনোনীত করেন। চাকরীস্থলে কালা আদমীর এই উচ্চপদ লাভের ফলে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তাকে ব্যঙ্গ ক'রে 'হিতবাদী' পত্রিকা লেখেন—

হলো কালা আদমি কমিশনার
ঢাকো লাজে বদন ঢাকো।
এ যে সাদা প্রাণে লাগছে দাগা
কি সুখে আর জীবন রাখো।'...ইত্যাদি।

তবু 'ইংলিশম্যানের' আচরণ ভিতরে ভিতরে রমেশচন্দ্রকে লক্ষ্য করছিল। তিনি স্থির করেন—এ চাকরী তিনি ত্যাগ করবেন, এবং চরিত্রবল তাঁর এত প্রখর ছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্টের অব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ১৮৯৭ সালে পুনরায় বিলাত যাত্রার সুযোগে তিনি সুদীর্ঘ চাব্বিশ বছরের উচ্চপদ ও সম্মানের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। এবারে বিলাতে গিয়ে তিনি দুটি বিষয়ের প্রতি নিজেকে বিশেষভাবে নিযুক্ত রাখেন, প্রথমত, সাহিত্যসাধনা, এবং দ্বিতীয়ত: ভারতের রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জনের জন্য আন্দোলন। এ সময়ে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের কাউন্সিল তাঁকে ভারত-ইতিহাসের লেক্চারার পদ গ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি সানন্দে সে পদ গ্রহণ করেন। এখানে তিনি যে যে বিষয়ে বক্তৃতা দেন, তার মধ্যে প্রধান ছিল **Study of Indian History; The History, civilisation and religion of the Ancient Hindus; The Epic poetry of Ancient India; The Epics and the Epic age of India,** প্রভৃতি। ভারতীয়দের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি যে সব আন্দোলন করেন, তার বিস্তৃত বিবরণ পাই তাঁর **'Speeches and Papers'** এবং জে, এন, গুপ্ত রচিত **Life and work of Ramesh chunder Dutt, C. I. E (London 1911)** গ্রন্থে। বিলাতে থাকাকালেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তার ১৫শ বার্ষিক লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য রমেশচন্দ্রকে আবেদন করা হয়। রমেশচন্দ্র সানন্দে এ আবেদনে সাড়া দেন। **'Indian Nation'** ১৮৯৯ সালের ২রা অক্টোবর এ সম্পর্কে লেখেন: **'A better selection could not be made. By his learning, experience, position, Sobriety and soundness of judgment, he seems to be specially marked out for the honour which it has been decided to confer on him.'**

বিগত ১৯৬১ সালের পুলিশি শতবার্ষিকীর অবকাশে আমরা জনসাধারণের তরফ থেকে এদেশীয় পুলিশি শাসনের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু কথা শুনবার সুযোগ পেয়েছি। বস্তুত: পুলিশের দায়িত্ব সমধিক; একদিকে শিক্ষা, আর একদিকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—এ দু'য়ের সমন্বয় ভিন্ন পুলিশি কার্য শৃঙ্খলার সঙ্গে সুসম্পাদিত হয় না। এই প্রসঙ্গে ১৮৯৪ সালে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হবার পর রমেশচন্দ্র ছোটলাটকে শাসন বিষয়ক যে কার্যবিবরণ পাঠান, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লেখেন—

'...Two things are necessary to improve the Bengal Police. In the first place, We must allow the Police sub-Inspector a pay at which it is possible to get educated and intelligent youngmen. Fit for the great powers and responsibilities of thana officers. When we pay less we simply pitch for inefficient or dishonest men into these responsible posts. In the second place the police force ought to be handled more intelligently than it is at present, Sub-Inspectors should be treated with greater consideration than they now receive, their good and jealous work should be more carefully noted and rewarded, and their apparently dishonest or inefficient work should be more promptly discouraged than it is at present, They should feel that they are being judged by their work; they should feel a zeal to show good work, a confidence that their good work will be appreciated.'

তাঁর এই অভিজ্ঞতাপ্রসূত দূরদৃষ্টিসম্পন্নতার ফল ফ'লতে দেরী হ'লো না। পুলিশি ব্যবস্থা সংস্কারকল্পে ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে স্যার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের নেতৃত্বে যে পুলিশ-কমিশন গঠিত হয়, রমেশচন্দ্রকে আহ্বান করা হয় তাতে সাক্ষী দেবার জন্য। এই একই সময়ে আর এক গৌরবময় আহ্বান আসে তাঁর 'এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'র পরিশিষ্টাংশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল ও স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার জন্য। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সে কাজ সমাধা করেন।

এর দু' বছর বাদে বরোদার গায়কোয়ারের অনুরোধে রমেশচন্দ্র বরোদা রাজ্যের রাজস্বসচিবের পদ গ্রহণ করেন। তিনি দেখেছিলেন—ধনীরা অলস ও কৃষি-শ্রমিকেরা অতিরিক্ত পরিশ্রম ক'রেও নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থায় অক্ষম। এই অসাম্য যেমন ভারতে, তেমনি দেশীয় রাজ্যগুলিতেও একই ভাবে সমাজকে পঙ্গু ও অচল ক'রে তুলছিল, আজও যার একই জের চলেছে সর্বত্র। চিরকালের সংস্কারমুখী মনে রমেশচন্দ্র এটা সহ্য ক'রতে পারেননি। বরোদার রাজস্বসচিবের ভার নিয়েই তিনি তাঁর মনোগত সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন—যার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বরোদা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এখানে নিজের কার্যবিধি সম্পর্কে তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে যে পত্র লেখেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লেখেন—

'I am trying to strike out new lines of progress, to develop new policies and reforms, and am determined to move forward and to carry the state forward. I am trying to gather together the scattered forces which were present here, to encourage enterprise and talent in younger men, to welcome new ideas and new schemes, to initiate progress in all lines, and to make Baroda a richer and a happier state...I am trying to relieve the agriculturists of excessive taxation on their land, I am endeavouring to get together capitalists to start new mills and industries, and if I can build up the Legislative Council I will make the work of the State proceed in the interest of the people and in touch with the people.'

সমাজবাদী কর্মী রমেশচন্দ্রের আসল পরিচয় এইখানে। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভূমি-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি ছিলেন খাঁটি প্রগতিবাদী। সমসাময়িক অনেক সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধৃত ক'রে বলা যায়: ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের প্রধান সমালোচনায় ভূমিরাজস্বের অত্যধিক হার এবং অনিশ্চয়তা সম্পর্কে মহাবিদ্রোহের পরে শাসনব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান খরচ মেটাবার প্রয়োজনে ভূমিরাজস্বের হার ক্রমশ: বাড়ানো হয়েছে। ভূমিরাজস্ব ছাড়া অন্যান্য করভারেও কৃষক জর্জরিত। পরিশ্রমী এবং মিতব্যয়ী হওয়া সত্ত্বেও কৃষক দুর্ভিক্ষ এবং অনশনের সীমানায় অবস্থিত। দেশের সেচ ব্যবস্থা অবহেলিত। জমির উৎপাদন অবনতির মুখে। সেচ-ব্যবস্থা উপেক্ষিত কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার উন্মুক্ত করবার প্রয়োজনে সরকার বিপুল অর্থ লোকসান দিয়ে রেলপথের প্রসারে ব্যস্ত। ধার করা টাকায় রেলপথ স্থাপন বাবদ সুদ, ভারতীয় ঋণের সুদ এবং বেসামরিক ও সামরিক ব্যয় মেটাবার জন্য Home charges ক্রমশ: স্ফীত হয়ে উনিশ শতকের শেষ ভাগে দাঁড়ালো ১৭ মিলিয়ন পাউণ্ডে। এই টাকা প্রতিবছর বিলেতে পাঠাতে হয় ভারতীয় রাজস্ব থেকে। তদুপরি ইউরোপীয় কর্মচারীরা লক্ষ লক্ষ টাকা দেশে পাঠাতেন তাঁদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে। এই 'Economic Drain' দিয়ে ভারতের সম্পদ চলে যেতো ইংলণ্ডে। ভারতের প্রাচীন শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত কিম্বা মুমূর্ষু। ভারতীয় মূলধনে গড়ে ওঠা বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করবার জন্য কটন এক্সাইজ এ্যাক্ট চালু হয়েছে। রমেশচন্দ্র বরাবর মন্তব্য করেছেন: 'It would be a sad story for future historians to tell that the Empire gave the people of India peace, but not prosperity; that the manufacturers lost their industries; that the cultivators were found down by a heavy and variable taxation which precluded any saving; that the revenues of the country were to a large extent diverted to England, and that reccuring and disolating famines swept away millions of the population'.

—ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল এই মন্তব্যে প্রতিফলিত। আধুনিক গবেষণা তাঁর অনেক মন্তব্যকে আরও বিকশিত করেছে, এবং কোনো কোনো বিষয়ে নূতন আলোকপাত করেছে। রমেশচন্দ্রই সর্বপ্রথম ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন, তারপর আর কেউ এই ইতিহাস রচনায় এগিয়ে আসেননি।

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য রমেশচন্দ্র ১৯০৬ সালে পুনরায় বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু বিশ্রাম লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'লো না। বঙ্গব্যবচ্ছেদ নিয়ে তখন প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু হয়েছে। এ সম্পর্কে লর্ড কার্জনকে তিনি 'খোলা চিঠি' দেন এবং বিলাতের পার্লামেন্টে গোখেলের সহযোগে যে আলোচনা সুরু করেন, তা তাঁর দৌহিত্রী শ্রীমতী সুষমাকে লিখিত এক পত্রের কিয়দংশ থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। প্রসঙ্গত তিনি লেখেন: '...The partition will not be undone immediately, because Morley (India Secretary) has said it is a 'settled thing', but I don't despair of its being modified later on. I had the map of India before me, and explained to Mr. Morley how a partition can be effected without offending the people...In other matters, Gokhale and I have not been unsuccessful, and for the first time, after more than ten dreary years, some concessions in the way of extended representation in the Legislative councils has been announced. This is a good begining, The present Parliament is quite different from any that preceded it; there is a large number of earnest Members who are all for India, and the Labour Party feel for India. The credit is due to to Gokhale of having drilled these earnest members in Indian affairs these three months, and I have also done my best during the month I have been here.'

এই ভাবে বিলাত থেকে রমেশচন্দ্র ভারতের পক্ষে কাজ করেছেন এবং বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি সঞ্চার করতে প্রয়াস পেয়েছেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন ক'রে তিনি পুনরায় চাকরীতে যোগদান করেন। তাঁর 'Baroda Administration Report' থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, স্বল্পকালের মধ্যে বরোদাকে তিনি কতখানি উন্নতির শিখরে তুলেছিলেন।

কংগ্রেসের ১৫শ লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার পর পুনরায় কংগ্রেস থেকে তাঁর ডাক এলো কাশীতে অনুষ্ঠিত ২১শ বার্ষিক অধিবেশনে। এখানে যে শিল্পসম্মেলনের ব্যবস্থা হয়, রমেশচন্দ্র তার সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৭ সালে সুরাটে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনেও তিনিই সভাপতি নির্বাচিত হন, এবং এই বছরই ভারত-সচিব লর্ড মর্লে তাঁকে ডি-সেনট্রালাইজেশন কমিশনের অন্যতম সদস্য রূপে নির্বাচিত করেন। একাজে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে শাসন সংস্কার ও পৃথক নির্বাচন সম্পর্কে তিনি নিজের মতকে দৃঢ় করেন এবং কমিশনের কোনো কোনো কাজে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে সরাসরি মর্লেকে তিনি বিলাতে চিঠি লেখেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও প্রথম সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র। ১৯০৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে তাঁকে যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, তার উদ্বোধনী সঙ্গীত রচনা করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। গানটি এই—

বন্ধুর ভালে চন্দন-টিকা কণ্ঠে কমল মালা,
দেশ-বন্ধুর শুভ আগমনে হৃদি-মন্দির আলা।
মাধবে মাধবী-কঙ্কন বাঁধ বন্ধুর মণিবন্ধে,
লোক-বন্ধুর গৌরব-গাথা গাঁথ মনোরম ছন্দে।
বেদের সরস্বতী এসেছেন লইয়া বরণ ডালা,
ইন্দু-কিরণ-নন্দিত যাঁর মুকুট-রশ্মি জালা।
বন্ধুর তরে তোরণ রচনা ক'রেছে নূতন বর্ষ,
নবীন পুষ্পে নব কিশলয়ে উথলি নবীন হর্ষ।
বর্ষণ করে লাজ অঞ্জলি কল্যাণী পুরবালা,
জন-বন্ধুর আগমন পথে লক্ষ কুসুম ঢালা।

এই ১৯০৯ সালেই বরোদায় ৩০শে নভেম্বর রমেশচন্দ্রের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 'রমেশ ভবন' নামে একটি সারস্বত ভবন নির্মাণ করেন। এ কাজে সমগ্র ভারতবাসীর নিকট রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আবেদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন :···'কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য কেন, রমেশচন্দ্রের সর্বতোমুখী ক্ষমতার স্মরণনিদর্শন বাঙ্গালী জাতি চিরদিন শ্রদ্ধা প্রীতি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবে।···রমেশচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র কেবল বঙ্গভূমির সীমা মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না, তিনি কেবল বঙ্গের সুসন্তান ছিলেন না, তিনি সমগ্র ভারতের সুসন্তান ছিলেন। আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকুশল রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতবর্ষরূপ মহারাষ্ট্রের যাবতীয় অধিবাসীর নিকট প্রার্থী হইতেছি।···'

রমেশচন্দ্র যে সমস্ত ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন, তার একটা মোটামুটি হিসেব এইরূপ : Three years in Europe, The Peasantry of Bengal, The Literature of Bengal, A History of Civilisation in Ancient India based on Sanskrit Literature, Lays of Ancient India, Rambles in India during twenty four years, Reminiscences of a Workman's Life, England and India, Mahabharata the Epic of Ancient India, Ramayana, Open Letters to Lord Curzon, The Lake of Palms, The Economic history of India, Speeches and Papers on Indian Questions, India in the Victorian Age, Baroda Administration Report, Indian Poetry Selections, The Slave Girl of Agra ; বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কন, জীবন-প্রভাত, জীবন-সন্ধ্যা, শতবর্ষ, ঋগ্বেদসংহিতা, হিন্দুশাস্ত্র, সংসার, সমাজ, সংসারকথা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রভৃতি।

প্রথম জীবনে যদিও মধুসূদন দত্তের মতো রমেশচন্দ্রও ইংরেজি ভাষাতেই রচনা সুরু করেন, তবু বাংলা সাহিত্যেও তাঁর দান অসামান্য। বাংলা রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তিনি বিশেষভাবে ঋণী। এ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র নিজেই বলেছেন : 'বঙ্কিমবাবু তখন 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভবানীপুরে একটি ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখান প্রথমে বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলা বাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল ; আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?' আমি বিস্মিত হইলাম! বলিলাম : 'আমি যে বাঙ্গালা লেখা কিছুই জানি না! ইংরাজি বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনাপদ্ধতি জানি না।' গম্ভীরস্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন : 'রচনাপদ্ধতি আবার কি, তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনাপদ্ধতি হইবে! তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে!' এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল।'

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল রমেশচন্দ্রের জীবনে। তিনি যে পদ্ধতি ও যে ভাষায় তাঁর বাংলা গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন, তার অনেকাংশ বঙ্কিমীরীতি অনুসারী সন্দেহ নেই, তবু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, রমেশচন্দ্রের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিককে মণ্ডিত করেছে। এ ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। পরবর্তীকালে তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই বলেছেন : 'তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল, তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্রকর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্যে, কি দেশহিতে সর্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে—বস্তুতঃ ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি···এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ।··· তাঁহার জীবনের সেই সদা প্রসন্ন অক্ষুণ্ণ নির্মলতা আমার স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।'

পরকীয়া

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

এখন সহজ হ'য়ে মিশে গেছি অকাজের ভীড়ে,
ত্রুটিহীন অভিনয়ে হাসি কাঁদি নায়কের মত,
আদিম অরণ্য নীল বিস্তৃত বিস্ময় দুটি চোখে
বিকেলের সোনা-রোদ ছায়া ফেলে মমতার মত
তবুও। ক্লান্তির ঘামে ভিজে যায় দেহ মন কিছু
যখনু প্রার্থনা নিয়ে ফিরে আসি পরিচিত নীড়ে।

এই নীড়ে কেউ নেই। একা আমি এই লগ্নলীন।
প্রশ্নের শায়ক হেনে জীবনকে বিক্ষত কিছু ক'রে
দেখেছি ঘমিয়ে আছে অলৌকিক চেতনার মাঝে
একান্ত আমার সে। নেশামুগ্ধ সূর্যের প্রহরে
ছিল সে অনেক দূরে লাজে ভয়ে পাখীর মতন।
কারণ : অপার ক্ষোভ নিষ্করুণ এই রুদ্র দিন।

দিনের বঞ্চনা পেয়ে এই রাত ডাকি বারে বারে,
তুমি আমি মিশে যাই পরকীয়া প্রিয় অভিসারে।

বিবাহে বৈচিত্র্য

এম, আব্দুর, রহমান

[বিগত ফাল্গুন (১৩৬৮) সংখ্যায় জনপ্রিয় মাসিক বসুমতীতে—"বিবাহে বৈচিত্র্য" শীর্ষক আমাদের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর যে কোন কারণেই হোক, উক্ত বিষয়ে আর লেখা দেওয়া সম্ভবপর হয়নি, অতঃপর আমরা ধারাবাহিক ভাবে নাহ'লেও প্রায়শঃ—মাসিক বসুমতীর প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে বিশ্বের বিবাহে-বৈচিত্র্য মূলক কাহিনী উপহার দেবার চেষ্টা করব। —লেখক]

লবণের বদলে বিবাহ

লবণ মানুষের খাদ্য-সামগ্রীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপকরণ। এই লবণ আজ সহজলভ্য এবং সস্তা হলেও এক কালে ইহার 'কদর-কিম্মত' ছিল ঢের বেশী। আজও দূর দুর্গম অঞ্চলে এবং পার্ব্বত্য এলাকায় লবণ দুষ্প্রাপ্য। এই লবণের বদলে বৌ পাওয়া যেতো এককালে বিভিন্ন এলাকায়। আজিকার এই সুসভ্য যুগেও বছর তিনেক আগে "সিয়েরা-লিওনের" এক চাষী লবণের বিনিময়ে তার বৌকে বিক্রি করে দিয়েছিল।(১)

ব্র্যাণ্ডির বদলে বিবি

ব্র্যাণ্ডির বদলে বৌ পাওয়ার ঘটনা বিরল নয়। স্কাণ্ডিনেভিয়া-মুলুকে ব্র্যাণ্ডির বিনিময়ে বিয়ে হতো। সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে হলে ২৪ হ'তে ২৬ বোতল মদ দিতে হতো। আর সমাজে সে-মেয়ে খাতির পেতো—২৪ অথবা "২৬ বোতলের বিবি" বলে। ২০ বোতলের কম মদে বিয়ে হলে, সে-বিয়ে হতো সাধারণ বিয়ে। কুড়ি বোতলের অধিক না হলে সে বিবি দামী জানানা বলে সমাজে গণ্য হতো না।(২)

ইন্দুরের লাঙ্গুল নইলে বিয়ে ভণ্ডুল

পশ্চিম জাভার ইন্দ্র-মাজু অঞ্চলের শাসক বিবাহ ফি হিসেবে বর এবং কনেকে অফিসে পঁচিশটি লেজ জমা দিবার জন্য আদেশ জারি করেছেন যে, উক্ত পরিমাণ ইন্দুরের লাঙ্গুল, ফি-বাবদ জমা না দিলে, বিবাহের অনুমতি পাওয়া যাবে না। এই সর্ত্ত বিবাহে-ইচ্ছুক প্রত্যেক যুবক-যুবতীকে অবশ্যই পালন করতে হবে। বান্দুং ও বান্দুং শহরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ইন্দুরের উৎপাত অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় তার প্রতিকারের অন্যতম পন্থা হিসেবে বুদ্ধিমান শাসক মিঃ এইচ, এ দাসকী এই অভিনব আদেশ জারি করেছেন। এই আদেশ খুব বেশীদিন আগেকার নয়,-মাত্র পাঁচ-ছ' বছর পূর্ব্বের (৩)

জুয়াখেলায় জরু লাভ

ইংরাজি ১৯৫৭ সালের ঘটনা। মোরাদাবাদ এলাকার কাহিনী। এক ব্যক্তি জুয়া খেলতে গিয়ে যা' কিছু টাকা পয়সা ছিল সব খুইয়ে ফেলে, শেষতক ঝোঁকের মাথায় বাজি ধরে আপন স্ত্রীকে। সে বাজিতেও সে হেরে যায়। এবং নিজের স্ত্রীকে দিয়ে দেয় প্রতিদ্বন্দ্বী জুয়াড়ীকে।

(৪) এরূপ ঘটনা আর একটি ঘটেছিল কানপুরে, ১৯৬১ সালে। সে ক্ষেত্রেও জুয়াড়ী সব কিছু হেরে গিয়ে বৌকে বাজি ধরে। হেরে যায়। তারপর বিজেতা জুয়াড়ীর সেই বিজিত জুয়াড়ীর স্ত্রীর উপর নিজের অধিকার সাব্যস্ত হয়। সে বৌ কিন্তু ছিল রায়বাঘিনী, তেজস্বিনী জানানা। দু'জনকেই সে জুতাপেটা ক'রে সায়েস্তা করে। "তৌবা"-"তৌবা" করতে করতে ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে জান্ বাঁচায় সেই দুই জুয়া-পাগল।(৫)

বাজি রেখে বিয়ে

গ্রীস রাজ্যের বিবরণী! আটলাণ্টা এবং মেলা-নিয়ন। দৌড়-ঝাঁপের দুই প্রতিযোগী একজন তাদের মেয়ে আর একজন ছেলে। ক্লাবের বন্ধু-বান্ধবদের সামনে প্রস্তাব হ'ল বাজি রেখে দৌড় দিতে হবে। কি বাজি? মেয়েটি যদি হারে তাহলে সে বিয়ে করতে বাধ্য হবে ছেলেকে। দৌড়-প্রতিযোগিতায় ছেলেটিরই জিত্ হলো। মেয়েটি তার কথা রাখলো। বিয়ে হ'ল, তাদের মধ্যে। খুব জাঁকজমক হ'ল। খবরের কাগজে কাগজে বের হ'ল তাদের শাদীর-সন্দেশ।

ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্য। টেনিস-খেলার ছেলে প্রতিযোগী মেয়ে টেনিস খেলুড়ীকে হারিয়ে দিয়ে বিয়ে করেছিল। এ সংবাদ এই দু'বছর আগেকার। (৬)

টেলিফোনে শাদী কবুল

নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তান। আজব কিছু একটা করে তাক লাগিয়ে দেবার নেশা জেগেছে সেখানকার অনেক নওযোয়ান-নওযোয়ানীদের মনে। বড় রকমের তাজ্জব-মার্কা কাজ কি আর করবে? শেষ পর্য্যন্ত নতুন ধরণের "শাদী।" পাত্র রইলেন বিলেতে আর পাত্রী রইলেন পাকিস্তানে, টেলিফোনে হ'ল "ইজাব কবুল" অর্থাৎ বিবাহের সম্মতি দান, এবং শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। যতদূর জানা যায়—টেলিফোনে বিয়ে এইটিই প্রথম।(৭)

আটলাণ্টিকের পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দুটি দেশ—আর দুই দেশের দুই ছেলে-মেয়ে। কোন সূত্রে আলাপ হয় তাদের, তারপর প্রণয়। পরিণয়ের সময় কিন্তু হয়ে উঠে না। বিয়ের চেয়ে কাজ তাদের কাছে বড়। তাই ব'লে বিয়েটাও ফেল্না নয়। দীল-পাপিয়া তাদের কুহুকুহু ক'রে উঠে, অধীর হয়ে উঠে মন। কিন্তু সময় নাই, সময়

---

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২।১০।৬০

(২) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮।১।৬১

(৩) যুগান্তর, ৪।৩।৫৭

(৪) পয়গাম ৫।১।৫৭

(৫) পয়গাম ১৪।১১।৬১

(৬) (৭) পাঃ কঃ বুঃ অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহ থেকে।

নাই হাতে। শেষমেশ টেলিফোনের সাহায্যেই সমাধা হ'ল বিবাহ অনুষ্ঠান।(৮)

এক যুবক কোন দৈব-নির্ব্বাচিতা পাত্রী বিয়ে করবার মতলবে অজানা-অচেনা এক অনামিকার উদ্দেশ্যে এক চিঠি লিখে সেই চিঠি বোতলে পুরে ছিপি এঁটে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়।

বোতলের দৌত্যে বিবাহ

অনেক দিন পরে ভাসতে ভাসতে গিয়ে সেই বোতল এক তরুণীর নজরে পড়ে। তরুণী তার ছিপি খুলে পায় এক পত্র আর পত্র-প্রেরকের নাম-ঠিকানা। পত্র-বিনিময় সুরু হয়, তারপর প্রেমে পড়ে তারা। এবং বিয়েও হয় তাদের মধ্যে।(৯)

তাসমানিয়ার সুন্দরী তরুণী আইলিন ক্লার্ক। চকোলেট বিস্কুট কারখানায় প্যাকেট তৈরির কাজ করতো সে। একদিন একটা চকোলেটের মোড়কে সে নিজের নাম-ধাম লিখে দেয়। বৃটেনে পৌঁছয় ঐ বাক্স। সারে কাউণ্টির অন্তর্গত কারশালটনের

চকোলেট প্যাকেটে পত্নীলাভ

এক ফল-বিক্রেতা কেনে সেই বাক্স। তারপর সেটি সে দিয়ে দেয় তার ছেলে লেসলীকে। লেসলীর তখনও বিয়ে হয়নি—যুবক সে। বয়স মাত্র তেইশ। ঐ সময়ে একদিন তাসমানিয়ার মানচিত্র দেখতে দেখতে তার মনে পড়ে যায় মোড়কের কথা আর তরুণীর নাম-ঠিকানা। তারপর শুরু হয় পত্র লেখা। উত্তর আসে—উপহার আসে যায় ডাকে। প্রেম হয় গভীর হতে গভীরতর। লেসলী অধৈর্য্য হয়ে উঠে এবং ভাগ্য-পরীক্ষার মতলবে তাসমানিয়ার পথে পাড়ি দেয়। সাক্ষাৎ হয় প্রেমিকার সঙ্গে। তারপর হয় তাদের বিয়ে।(১০)

(৮) আনন্দবাজার ৪।৪।৬১

(৯) আনন্দবাজার ৪।৪।৬১

(১০) আনন্দবাজার ৬।৮।৬১।

এক কালে এসিয়া মহাদেশের কয়েকটি রাজ্যে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় বিনিময় প্রথায় বিবাহ প্রচলিত ছিল। বরকে বিবাহকালে তার মা অথবা বোনকে "এওয়াজ" (Exchange) স্বরূপ দিয়ে দিত, তাদের হাতে—যাদের কাছ থেকে সে বৌ নিতো। যে

বহিনের বদলে বৌ

পাত্র এই রূপ বিনিময় করতে না পারতো, তার বিয়ে হওয়া হতো মুস্কিল।(১১) তবে কনের বাবাকে অধিক পরিমাণ টাকা কড়ি দিতে পারলে অবশ্য কনে পাওয়া যেতো। এক সময়ে এ দেশেও কন্যাপণ ছিল। নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু এবং অন্যান্য কারণে কন্যাপণের পরিবর্ত্তে বরপণের বাজার আজ আক্রা। কিন্তু অনুন্নত সমাজে এখনও নারীর 'দাম' আছে। দুর্গম বনাঞ্চলে এবং পাহাড়ী এলাকায় এখনও কনের বাবাকে এক জোড়া বা ততোধিক গরু, শূয়ার কিংবা মোষ উপহার দিতে হয়, তারপর তার মেয়েকে বিয়ে করার অনুমতি পাওয়া যায়। বছরের পর বছর ধরে হবু শ্বশুরের বাড়ীতে জন-মজুর খাটতে হয়, তারপর সেই শ্বশুর মহাশয় প্রসন্ন হলে, তার কন্যাকে পাওয়া যায় বধূরূপে, এরূপ বিধিও আছে, ঐ সব এলাকায়।

কিন্তু কোন কারণে যদি হবু শ্বশুর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেন, তাহ'লে সে হবু জামাই-এর "খাটুনীই" সার হয়। চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে আসতে হয় তার বাড়ী হতে। আর ভাগ্য ভালো হলে কাজ হাসিল। সে চিরকাল রয়ে গেল সেই শ্বশুর বাড়ীতে অথবা বৌ-এর বাড়ীতে। কারণ সে-সব সমাজে সাধারণত বৌ স্বামীর ঘর করতে যায় না, স্বামীকেই যেতে হয় স্ত্রীর করতে।(১২)।

(১১) মিঃ আবুল হাসানাতের যৌন-বিজ্ঞান, (১ম সং পৃঃ ২১৩।

(১২) পঃ বঃ মুঃ অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহ থেকে।

উৎসর্গ

গোবিন্দ গোস্বামী

স্মৃতির সীমান্ত জুড়ে
কতো যে অচেনা সুরে
ভেসে আসে হৃদয়ের গান ;
সেই প্রেম বারংবার
রমণীয় করেছে সংসার,
বরণীয় করে গেছে প্রেমিকের দান।

তাইতো এখানে এসে
তোমাদের ভালোবেসে
রেখে যাই কালির প্রণাম ;
হাজার বছর পরে
পৃথিবীর ঘরে ঘরে
খুঁজে দেখো কবিতার কতটুকু দাম

বিধানচন্দ্র

ব্যোমকেশ মজুমদার

শালপ্রাংশু মহাভুজ, দীর্ঘ দেহ
উন্নত মস্তক।
একমাত্র জননেতা, জগতের
বিশিষ্ট ভিষক।
জলদগম্ভীর কণ্ঠ, বক্ষ মাঝে
সাহস দুর্জয়।
দুরন্ত পৌরুষ কোথা মুহূর্ত্তেকে
হইল বিলয়!
বাংলার আকাশ হতে মুছে যায়
শেষ রশ্মিরেখা।
অনন্ত তিমির রাত্রি ওই বুঝি
দিল আজ দেখা॥

আমার দেখা—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

আমার জন্মের অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাম আমাদের গ্রামের সবার কাছে পরিচিত ছিল। তবে কবি হিসেবে নয়, জমিদার হিসেবে। আমাদের পরিবারের লোকেরা জানতেন একটু বিশেষ ভাবে। আমার বাবা তাঁর ছাত্রজীবনেই রবীন্দ্রনাথকে স্বরচিত কবিতা দেখাবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন। আমার এক জ্যেঠামশাই সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের বাগানে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং সেই থেকে কবিগুরুর সুনজরেই পড়ে যান। সাজাদপুরের অনেকেরই ধারণা যে এই হারাণ চক্রবর্তীই (আমার জ্যেঠা মহাশয়) ছিলেন 'ছুটি' গল্পের নায়ক ফটিক চক্রবর্তী। যদিও রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্ট করে কোনখানে লেখেন নাই, তবে তাঁর অনেক অনেক লেখাতে একথা স্পষ্ট যে ছুটি গল্প সাজাদপুরেরই একটি ক্ষ্যাপাটে ছেলেকে নিয়ে লেখা। আর গল্পটির প্রারম্ভিক ঘটনাটি যে সাজাদপুরেই ঘটেছিল তা 'ছিন্নপত্রের' ২৮নং চিঠিতে স্পষ্ট লেখা আছে।

এই সব কারণেই শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথের নামের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে এবং যখন রবীন্দ্রনাথের কোন বই পেতাম, বুঝি আর না বুঝি পড়েই যেতাম। আমাদের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বইটি ছিল। গোরা বইটি বোধ হয় প্রথম মুদ্রণ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি তখনই এই বই আমি পড়েছিলাম এবং শুধু বুঝেছিলাম ও ভাল লেগেছিল—

'খাঁচার মধ্যে অচীন পাখী কমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনো বেড়ি দিতেম পাখীর পায়'।

বাবার কাছে শিখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের গান 'তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে'। সেকালে রবীন্দ্রনাথের গান 'রবীন্দ্র সংগীত' বলে বিশেষ বিভাগে স্থান পায়নি। এত করেও মন কিছুতেই তৃপ্ত হচ্ছিল না সেই কল্পনার মানুষটির দর্শন ব্যতীত। কিন্তু দর্শন তো সহজে ঘটে না, ছবি দেখেই আশ মিটাতে হয়। রবীন্দ্রনাথের একখানি প্রতিকৃতি আমার এত ভাল লেগেছিল যে একটি কবিতাই লিখে ফেললাম, 'কল্পনার মানুষ রবীন্দ্রনাথ' নাম দিয়ে সেটা 'খেয়ালী' পত্রিকায় ছাপাও হল। আমি তখন হেমনগরের জমিদারের ছেলেদের অভিভাবক শিক্ষক। তিনি 'খেয়ালী' পত্রিকায় আমার কবিতাটি দেখে অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন: কবিতাটি তুমি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। এই কি কবি-সম্রাটের কাছে পাঠাবার মত কবিতা! এ কবিতা পাঠালে কবি বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দেবেন। আমার সাহিত্যিকবন্ধু সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন: বাজে কাগজের ঝুড়িতে যাবে না নরেশবাবু, তিনি আমাদের মত ক্ষুদ্র নন। তিনি আপনার কবিতা পড়বেন এবং আমার দৃঢ় ধারণা আপনাকে অভিনন্দন জানাবেন।

: রবীন্দ্রনাথ যে কত আনন্দময় পুরুষ তা আমি জানি, আর হাস্যরসিক তো বটেই, যোগ করলেন যোগেশবাবু (হেমনগরের জমিদার) বললেন, শোন এক মজার গল্প: সেবার চীন থেকে ফিরছেন রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবত: ১৩৩০ সালের কথা। চাঁদপাল ঘাটে তাঁকে অভিনন্দন দেবার আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, বড় বড় জমিদার, জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ তখন আমাদের মুখে মুখে। কাজেই আমিও গিয়েছি। আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। 'বেলা যায়' কবিতা লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যে তখন বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। প্রমথবাবুর হাতে সুন্দর সুন্দর অনেক ফুল ও ফুলের মালা ছিল। আমার হাত শূন্য। রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলেন তখন নিজেকে বড়ই রিক্ত মনে হয়েছিল। কি ভুল করলাম নিউমার্কেট থেকে কিছু ফুল কিনে আনলুম না কেন? কিন্তু কি করা যায়। ভাবতে ভাবতেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে এসে পড়লেন। আমি আর চিন্তা না করে প্রমথবাবুর হাত থেকে খপ করে একটা মালা তুলে নিয়ে ঝপ করে ফেলে দিলাম রবীন্দ্রনাথের গলায় আর হাত জোড় করে জানালাম নম্র নমস্কার। এ ব্যাপারের জন্য প্রমথবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কিছু বলতে পারলেন না শুধু কটমট করে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে! আর কবিগুরু কি করলেন,—একবার আমার মুখের দিকে আর একবার প্রমথবাবুর মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে সামনে এগিয়ে গেলেন। অন্য কোন লোক হলে কি আর আমাকে ছাড়তেন, দুটো একটা কটুবাক্য পুরস্কার নিশ্চয়ই দিতেন বই কি!...

কাজেই আমি বলছি নরেশ, কবিতা তুমি পাঠিয়ে দাও। কবিগুরু নিশ্চয়ই তোমার মর্যাদা বুঝবেন।

আর একবার হেসেছিলাম কিন্তু সে কবিতা আমাকে পাঠাতে হয়েছিল। আর তারপর সত্যি সত্যি একদিন সেই মহাকবির স্বহস্ত-লিখিত আশীর্বাদলিপি এলো আমার দ্বারে। সেদিন সুধীরবন্ধু আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন: কি গো চক্রবর্তী 'আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।'

তারপর আরো কয়েক বছর কবিগুরুর জন্মতিথি উপলক্ষে প্রণাম পাঠিয়েছিলাম। কবিগুরুও এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির লেখা ক্ষুদ্র মনে না

করে আশীর্বাদ পাঠাতেন নিজে হাতে লিখে। শেষের দিকে যখন নিজে পারেননি তখন কবিগুরুর পক্ষ হয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনিল চন্দ।

বন্ধুবর সুধীরবন্ধু তখন হেমনগরে পরিবার রেখে প্রায়ই কলকাতায় থাকতেন। আমাকেও যোগেশবাবুর সংগে বছরের বেশী সময়ই কলকাতাতে থাকতে হত

সুধীরবন্ধুকে একদিন অন্তরের গোপন ইচ্ছাটা জানালেম: আমাকে একবার কবিগুরু দর্শন করাতে পারেন?

সুধীরবন্ধু বললেন: ঠিক আছে, একদিন সুযোগমত যাওয়া যাবে। ডাঃ কে, সি, মুখার্জী প্রায়ই রবীন্দ্রনাথকে দেখতে যান। তাঁর কাছ থেকে খবর নিয়ে আপনাকে জানাবো।

অবশেষে সেই শুভলগ্ন এলো আমার জীবনে।

শরতের সোনালী প্রভাত। রৌদ্রোজ্জ্বল কলকাতার রাজপথ। সুধীরবন্ধুর সংগে উপস্থিত হলাম ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে। প্রথম থেকেই বুকটা দুরু দুরু করছিল। কেমন করে দাঁড়াবো, কেমন করে কথা বলবো, কবিগুরু কি বলবেন অথবা বলবেনই না বেশী কিছু··· বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলাম।

সুধীরবন্ধু এসে বললেন: চলুন।

সুধীরবন্ধুর পেছনে পেছনে কম্পিতবক্ষে কবিগুরুর কক্ষে প্রবেশ করলাম। চোখ আমার জুড়িয়ে গেল। কি দেখলাম! কবিগুরু আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি বই পড়ছিলেন।

আমি তাঁর পায়ের সংগে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। সেই স্পর্শে হৃদয় আমার ভরে গেল এক অপূর্ব প্রশান্ত আনন্দে।

কবিগুরু বললেন: বসো।

আমি মেঝেতেই বসে পড়লাম সেই মহামানবের চরণতলে। তিনি প্রশ্ন করলেন: তোমার বাড়ী সাজাদপুর শুনেই ভারী আনন্দ হচ্ছে। বহুদিন সাজাদপুরের লোক দেখিনি।

আমি কোন কথাই বলতে পারলুম না।

কবিগুরু বললেন: এখনো কি সাজাদপুরে তেমনি দই, দুধ, ছানা, মাখন, চিতল মাছ পাওয়া যায়?

আমি বললাম: হ্যাঁ, খুব ভাল দই এখনো হয়, দুধ তো মোটে চার পয়সা সের। আর চিতল মাছ, বিরাট বিরাট চিতল মাছ এখনো বাজারে আমদানী হয়।

কবি যেন আত্মগতভাবেই বললেন: সে একদিন ছিল আমার। সাজাদপুরের জীবন যেন আমার জন্মান্তরের জীবন। সাজাদপুরের ছবি আমার মনের ক্যামেরার ছবি। অনেক সময় ইচ্ছা হয় সেই জন্মান্তরের সাজাদপুরকে দেখে আসি, কিন্তু দেহ অপটু হয়ে পড়েছে, আর বোধ হয় দূরে কোথাও যেতে পারবো না।

আমি আস্তে আস্তে বললাম: আমরা তো "বাণী সম্মিলনী" নাম দিয়ে সাজাদপুরে একটা সাহিত্যসভা স্থাপন করেছি। আমাদের আশা ছিল আর একবার আপনার দর্শন পাবে সাজাদপুরের লোক।

: সে আর এ জন্মে হল না। আবার যদি এদেশে জন্মগ্রহণ করি তবে হয়তো যাবো, সেইদিনের প্রতীক্ষায় থাকো··· স্মিতহাস্যে বললেন কবি।

তারপর বললেন: সাজাদপুরের কে যেন আমাকে জন্মদিনের কবিতা পাঠিয়েছিল, তুমিই কি?

বললাম: আজ্ঞে হ্যাঁ, তার সংগে একটি গল্পও ছিল 'দরদী রবীন্দ্রনাথ'।

কবি বললেন: মনে পড়েছে। তোমার সেই গল্পটা দেখে বহুদিনের বিস্মৃতির দ্বার খুলে গেল। সাজাদপুরের আলো-হাওয়া, বর্ষার জ্যোছনা-পাখীর গান, সাজাদপুরের ঘটনাবলী মনের সংগে জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে কিন্তু সে মন এখন পড়েছে আর এক জীবনের আড়ালে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন কবি। এতো ভালো লাগছিলো তা এতদিন পরে ভাষায় কেমন করে প্রকাশ করবো।

প্রণাম করে উঠে আসবার সময় গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন: ওহে, তুমি বোধ হয় একটা কথা ভুলে গেছো?

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, বললাম: মনে পড়ছে না ঠিক।

কবি বললেন: তোমাদের বয়সী যাঁরাই আসেন সকলেই খাতাটি বাড়িয়ে দেন রবি ঠাকুরের স্বাক্ষরের জন্য, কিন্তু তুমি দেখছি ব্যতিক্রম।

আমি বিনীত ভাবে উত্তর দিলাম: ব্যতিক্রম আমি নই। আপনার স্বাক্ষর লাভ করবার সৌভাগ্য আপনার দর্শন লাভ করবার আগেই আমার হয়েছে। আবার যখন আপনাকে চিঠি লিখবো তার উত্তরেই পাবো আপনার অনেক লেখা।

মৃদু হেসে বললেন কবি: ও, সাজাদপুরের লোকেরা তা হলে খুব চালাক তো।

আবার প্রণাম করে বিদায় নিলাম। আজ এতদিন পরে ধারণাই করতে পারি না যে কবিগুরুর সামনে দাঁড়িয়ে কি করে কথা বলেছিলাম। বিশ্ববরেণ্য মহামানবও যে সাধারণ জীবনে কত উদার কত অমায়িক তা অত কাছে না গেলে বোঝবার উপায় নেই।

সেদিনের ইহলোকের কবি আজকের মানুষের অন্তর্লোকে ঠাঁই নিয়েছেন। অন্তরের সিংহাসনে বসিয়ে আজ জগৎ তাঁকে পূজা করছে। আর কবি সান্নিধ্যের সেই স্মৃতিমুখর মহালগ্ন আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে।

দূরের মেয়ে

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন খেয়ালে জনম নিয়েছ কন্যা,
মনমের ভুমে বইয়ে দিয়েছ বন্যা,
নিটোল প্রেমের পরম অনুভূতি—
জাগাও মনে তাই তো তোমায় স্তুতি।

হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গিয়েছ মেয়ে,
খুঁজি তোমায় দিগন্ত দূর ছেয়ে,
আবার যদি না পাই তোমার দেখা—
তা হ'লে আমি সহায়বিহীন একা।

কারমেন

প্রস্পের মেরিমে

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]
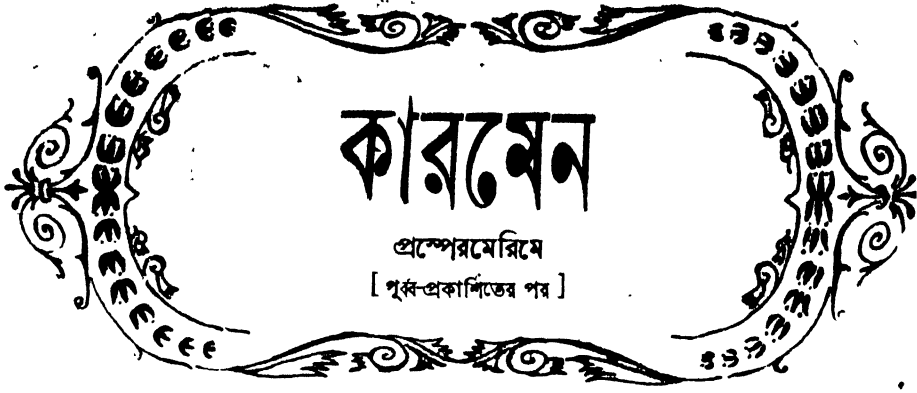
কারমেন আমাকে বাসৃকে বলল, উঠে এস। কোন কিছুতেই আশ্চর্য হয়ো না। সত্যি ওর কোন কাজে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ওকে ফিরে পেয়ে উল্লসিত কি ক্ষুব্ধ হলাম, জানি না। দরজায় পাউডার-মাখা দীর্ঘদেহ ইংরেজ পরিচারক। সে আমাকে সুসজ্জিত ড্রইংরুমে নিয়ে এল। কারমেন তৎক্ষণাৎ বাসৃকে বলল, মনে রেখ, তুমি কিন্তু একটি স্পেনিশ শব্দও জান না। তুমি আমাকে চেন না। ইংরেজটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আপনাকে আগেই বলেছি। ওকে দেখেই বুঝতে পেরেছি ও বাসৃক্। ওদের ভাষা কি অদ্ভুত এখনই শুনতে পাবেন। ওর ধরণধারণ ঠিক জন্তুর মত নয় কি? দেখে মনে হয়, একটা বিড়াল হেঁসেলে ঢুকে ধরা পড়েছে।

আমি বাসৃকে বললাম, আর তুই? তোকে দেখে মনে হয়, তুই একটা বেহায়া বজ্জাত। ইচ্ছে হচ্ছে, তোর নাগরের সামনেই তোর মুখখানা ছিঁড়ে দিই।

ও বলল, ওরে আমার নাগর রে! তুই একা একাই সব বুঝে ফেলেছিস। এই পাঁঠাটাকে তোর হিংসে হচ্ছে। ক্যু ন্ত কঁদিলেজোর সন্ধ্যার আগে তুই যা ক্যাবলা ছিলি, তার চেয়েও তোর ক্যাবলামি বেড়েছে দেখছি। তোর ঘটে কি ছিটেফোঁটা বুদ্ধিও নেই? তুই কি দেখছিস না এখন আমি মিশরের ব্যাপার ঘটাচ্ছি। দেখছিস না, কি ভানুমতির খেল দেখাচ্ছি।

আমি বললাম, তুই যদি আবার এভাবে মিশরের ব্যাপার ঘটাস তবে আমিও এমন ব্যবস্থা করব, যাতে তুই আর তোর খেলা শুরু করতে না পারিস।

—উঃ ত্যাখ, না। তুই আমাকে চালাবার কে রে? তুই কি আমার ভাতার? কানাটাব ত কোন আপত্তি নেই। এখানে তুই এমন কী দেখছিস? তুই আমার একমাত্র মিন্‌শোরো (৫৭)। এতেই তুই খুশি নোস কেন?

—লোকটা কী বলছে? ইংরেজটি জানতে চাইল।

—ওর তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খেতে চায়। এই অনুবাদ করে কারমেন হেসে সোফায় লুটিয়ে পড়ল।

—মসিও, এই মেয়েটা যখন হাসত তখন ওর সঙ্গে আর যুক্তিতর্ক চলত না। বিশ্বসংসার তখন ওর সঙ্গে হাসত। এই ভারিক্কী ইংরেজও হাসতে লাগল। লোকটা যেমন নির্বোধ। সে হাঁক দিয়ে আমার জন্য জল আনতে বলল। জল খাওয়ার সময় কারমেন বলল, ওর আংটিটা দেখছিস? চাস ত ওটা তোকে দিতে পারি।

আমি জবাব দিলাম, তোর মিলর্ডকে পাহাড়ে টেনে নিয়ে দুজনে মাকিলা হাতে লড়তে পারলে আমি হাতের একটা আঙুল দিয়ে দিতে পারি।

মাকিলা? লোকটা কি বলছে? ইংরেজ প্রশ্ন করল।

কারমেন কেবলই হাসছিল। ও বলল, মাকিলা মানে কমলালেবু। মজার নাম নয়? ও আপনাকে লেবু খাওয়াতে চাচ্ছে।

—বটে? আচ্ছা, কাল আবার লেবু নিয়ে এস। যখন আমরা কথাবার্তা বলছিলাম, একটি লোক ঘরে ঢুকে বলল,—ডিনার তৈরী। ইংরেজ উঠে দাঁড়াল। আমাকে এক পিয়াস্ত্র দিয়ে কারমেনকে বাহু বাড়িয়ে দিল। যেন কারমেন একা হেঁটে যেতে পারবে না। কারমেন তখনও হাসছিল। ও আমাকে বলল, যাদুমণি, আজ তোমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করতে পারছি না। কিন্তু কাল যখন প্যারেডের ড্রাম বাজবে লেবু নিয়ে এখানে চলে এস। ক্যু ন্ত কঁদিলেজোর ঘরের চেয়েও সাজানো ঘর পাবে। বুঝতে পারবে আমি তোমারই চিরদিনের কারমেনচিতা। পরে আমরা মিশরের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব।

আমি কোন জবাব দিলাম না। যখন রাস্তায় নেমে এসেছি ইংরেজ হেঁকে বলল, কাল মাকিলা নিয়ে এস। কারমেনের উচ্ছ্বসিত হাসি শুনতে পেলাম।

যখন বেরিয়ে এলাম তখনও জানিনা কি করব। রাত্তিরে একটুও ঘুম হল না। সকালবেলা এই অবিশ্বাসিনীর ওপর এমনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম যে, স্থির করলাম ওর সঙ্গে দেখা না করেই জিব্রালটার ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু ড্রামের প্রথম গুড়গুড় আওয়াজ হতেই আমার সব সংকল্প ভেসে গেল। লেবুর ঝুড়ি নিয়ে কারমেনের ওখানে ছুটলাম। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম—আধখোলা খড়খড়ির ভিতর দিয়ে কারমেনের বড় কাল চোখ আমাকে দেখছে। পাউডার মাখা পরিচারকটি আমাকে তক্ষুণি ভিতরে নিয়ে গেল। কারমেন একটা কাজে ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিল। শুধু আমরা দু'জন রইলাম। কারমেন আবার সেই কুমীরের হাসিতে ফেটে পড়ল। লাফিয়ে উঠল আমার কাঁধে। ওর এমন মোহিনী রূপ আগে কখনও দেখিনি। সুরভিত বধূর সাজে সেজেছে কারমেন। চারদিকে সিল্কেমোড়া আসবাব। জরির কাজকরা পর্দা। এর মধ্যে আমি যেন একটা ডাকাত এসে ঢুকেছি। আসলে আমি ত ডাকাতই।

কারমেন বলল, মিনশোরো, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান? ইচ্ছে হচ্ছে এখানকার সব কিছু ভেঙে চুরে, ঘরদোরে আগুন ধরিয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যাই। তারপর কী আদর। কী হাসি। নাচল কারমেন, ছিঁড়ে ফেলল গায়ের জামা। নেচেকুঁদে, ভেংচি কেটে এমন দুষ্টামি করল যে হনুমানও ওর কাছে হার মানবে। শেষে স্থির হয়ে আমাকে বলল, শোন, মিশরের ব্যাপারের কথা বলছি। আমি চাচ্ছি ও আমাকে নিয়ে রঁদা যাক। সেখানে আমার এক সন্ন্যাসিনী বোন আছে (আবার অট্টহাসি)। আমরা একটা জায়গায় হয়ে যাব। জায়গাটার নাম আগেই তোমাকে বলে দেব। সেখানে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝেড়েপুছে সব নিয়ে নাও। ওকে একেবারে সাবাড় করে দেওয়াই ভাল। কথা বলতে বলতে ওর মুখে শয়তানী হাসি ঝিকিয়ে উঠল। এই হাসি কখনও কখনও ওর মুখে দেখেছি। এই হাসি দেখলে অন্যের মুখের হাসি শুকিয়ে যেত। ও বলতে লাগল, কিন্তু কি করতে হবে বুঝতে পেরেছ? দেখ, কানাটা যেন এগিয়ে থাকে। তুমি একটু পিছিয়ে থেক। গলদা চিংড়ীটা সাহসী ও চতুর। ওর ভাল পিস্তল রয়েছে···

···বুঝতে পারছ? কারমেন আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আমি শিউরে উঠলাম। বললাম, না। আমি গার্সিয়াকে ঘৃণা করি, কিন্তু ও আমার সঙ্গী। একদিন হয়তো ওকে আমি তোমার কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেব কিন্তু বাঝাপড়াটা আমাদের দেশের নিয়মমাফিক হবে। দৈবগতিকে আমি বেদে। অনেক বিষয়ে আমি চিরকাল দিলখোলা ন্যাভাড়ী থেকে যাব। আমাদের দেশের প্রবাদই রয়েছে।

উত্তরে কারমেন বলল, একেবারে হাঁদারাম তুই। আসল পায়লো (৫৮) সেই বামনটার মত যে দূরে থুতু ফেলে ভেবেছিল বড় হয়েছে, (৫৯) তুই আমাকে ভালবাসিস না। দূর হয়ে যা।

ও আমাকে চলে যেতে বলল। আমি যেতে পারলাম না। কথা দিলাম আমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাব। ইংরেজটার জন্ত ওত পেতে থাকব। কারমেনও প্রতিশ্রুতি দিল। জিব্রালটার থেকে রঁদা যাত্রার সময় পর্যন্ত ও অসুস্থতার ভাণ করবে। আরো দু'দিন জিব্রালটারে কাটালাম। সাহস বটে কারমেনের, ছদ্মবেশেও আমার সরাইয়ে পর্যন্ত এসেছিল।

আমি রওনা হয়ে গেলাম। আমারও একটা মতলব ছিল। কোন্ পথে এবং কখন কারমেন ও ইংরেজ যাবে জেনে আমাদের আড্ডায় ফিরে এলাম। দাঁকাইর ও গার্সিয়া আমার জন্ত অপেক্ষা করছিল। বনে পাইনের গাছের ফল জড় করে চমৎকার আগুন জ্বালিয়ে আমরা রাত কাটালাম। আমি গার্সিয়াকে তাস খেলার কথা বললাম। ও রাজী হল। দ্বিতীয় বাজি খেলার সময় গার্সিয়াকে বললাম, ওখেলায় চুরি করছে। গার্সিয়া হাসতে লাগল। আমি তাসগুলো ওর মুখে ছুঁড়ে মারলাম। ও বন্দুক নিয়ে রুখে দাঁড়াতে চাইল। আমি বন্দুকটা পা' দিয়ে চেপে ধরে বললাম, তুই নাকি মালাগার সেরা মরদের মত ছুরি চালাতে জানিস। আমার সঙ্গে একবার লড়ে দেখতে চাস? দাঁকাইর আমাদের ছাড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে আমি গার্সিয়াকে দু তিনটা ঘুঁষি মেরে ফেলেছি। গার্সিয়া রাগে সাহসী হয়ে উঠেছে। সে ছুরি বার করল। আমিও আমারটা বার করলাম। দুজনেই দাঁকাইরকে সরে দাঁড়াতে বললাম। দাঁকাইর লক্ষ্য রাখবে। কেউ যেন বেআইনী মার না মারে। দাঁকাইর যখন দেখল আমাদের থামাবার কোন উপায় নেই, তখন সে সরে দাঁড়াল। গার্সিয়া ইতিমধ্যেই ইঁদুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে বিড়ালের মত দু'ভাজ হয়ে তৈরী হয়েছে। বাঁ হাতে মার ঠেকাবার জন্ত টুপিটা নিয়েছে, ডানহাতে ছুরিটা এগিয়ে রয়েছে। এই হচ্ছে আন্দালুসীয় রক্ষাপদ্ধতি। আমি ন্যাভাড়ীদের মত ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। বাঁ হাত উঁচুতে তুলে ধরলাম বাঁ পা এগিয়ে দিলাম। আর ছুরিটা ডান উরু বরাবর ধরে রাখলাম। আমার দেহে তখন অসুরের বল। গার্সিয়া তীরের মত আমার দিকে ছুটে এল। আমি বাঁ পায়ে ভর দিয়ে ঘুরে গেলাম। ওর সামনে কিছু রইল না। কিন্তু আমি ওর টুঁটির নাগাল পেলাম। আমার ছুরিটা এমনভাবে বসে গেল যে আমার হাত এসে ওর চিবুকে ঠেকল। ছুরিটা এত জোরে টেনে বার করলাম যে ফলাটা ভেঙে গেল। সব শেষ। এক হাত উঁচু হয়ে ফিনিক দিয়ে রক্ত বেরোল, ভিতরের ছুরির ফলাটা ছিটকে বেরিয়ে এল। একখণ্ড কাঠের মত মুখ থুবড়ে পড়ল গার্সিয়া। কী করলে তুমি? দাঁকাইর চীৎকার করে উঠল।

আমি বললাম, আমরা দু'জন একসঙ্গে বাঁচতে পারতাম না। আমি কারমেনকে ভালবাসি। আমি একা ওকে নিয়ে বাঁচতে চাই। তাছাড়া গার্সিয়া একটা বদমাস। বেচারা রমঁদাদোকে ও কী করেছিল আমি ভুলিনি। আমরা দু'জন মাত্র রইলাম। আমরা খারাপ লোক নই। শোন, জীবনে মরণে তুমি আমার বন্ধু হবে কী? পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ দাঁকাইর হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, জাহান্নামে যাক্ তোমার পীরিতের কচলাকচলি। গার্সিয়ার কাছে কারমেনকে চাইলেই পারতে। সে কাণাকড়ির দামে কারমেনকে বেচে দিত। এখন আমরা শুধু দু'জন। কালকে কি উপায় হবে?

উত্তরে আমি বললাম, আমাকে একা সব কিছু করতে দাও। আমি এখন তামাম দুনিয়াকেও পরোয়া করি না। গার্সিয়াকে কবর দিয়ে দু'শ গজ দূরে আমরা তাঁবু খাটালাম। পরদিন কারমেন ও ইংরেজকে ভৃত্য ও খচ্চর চালক নিয়ে যেতে দেখলাম। দাঁকাইরকে বললাম, আমি ইংরেজটার ভার নিলাম। বাকিগুলো নিরস্ত্র। তুমি ওদের ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা কর।

বুকের পাটা ছিল বটে ইংরেজের। কারমেন ওর হাতে ধাক্কা না দিলে ও আমাকে মেরে ফেলত। এক কথায় বলতে গেলে, সেদিন কারমেনকে নূতন করে জয় করলাম। প্রথমেই কারমেনকে জানালাম ও বিধবা হয়েছে। যা ঘটেছে সব শুনে কারমেন বলল, চিরকাল হাঁদারাম তুই। গার্সিয়া তোকে মারল না কেন? তোর ন্যাভাড়ী রক্ষা-পদ্ধতি ত নিছক বোকামি। তোর চেয়ে অনেক চতুরকে গার্সিয়া জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছে। আসলে, ওর সময় হয়েছিল। তোরও সময় আসবে।

তোরও আসবে যদি তুই আমার সত্যিকারের রমী না হোস, আমি উত্তর দিলাম।

৫৮। পরদেশী।

৫৯। বেদে প্রবাদ-অব এসরজলে ত অর নারসিশিছ্‌লে, সিন সিজমার লাসিং গেল।

—সত্যি। কফির তলানিতে আমি অনেকবার দেখেছি আমরা একসঙ্গে যাব। যাকগে, বীজ বুনলে, ফল ফলবেই। এই বলে কারমেন কাস্তাইনেত বাজাতে লাগল। বরাবর দেখেছি কোন নাছোড়বান্দা ভাবনা তাড়াতে কারমেন কাস্তাইনেত বাজাত।

নিজের কথা বলতে গেলে সব ভুলে যাই। এত সব বিবরণে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন নিশ্চয়। কিন্তু আমার কথাও প্রায় ফুরোল। এই জীবন বেশ কিছুদিন চলল। দাঁকাইর ও আমি আমাদের পুরানো বন্ধুদের চেয়ে সাহসী কয়েকজন সঙ্গী জুটিয়ে নিলাম। চোরাই চালান করতে লাগলাম। আপনার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই—মাঝে মাঝে রাজপথে ডাকাতিও করেছি। অবশ্য যখন কোন উপায়ান্তর থাকত না,—একেবারে নিরুপায় হয়েই তা করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা পথিকদের নির্যাতন করিনি। টাকা পয়সা নিয়েই আমরা ক্ষান্ত হতাম।

কয়েকমাস কারমেনকে নিয়ে সুখে কাটালাম। কারমেন আগে থাকতে দাঁও মারবার সুযোগের সন্ধান দিয়ে আমাদের অভিযানের কাজে লাগতে লাগল! মালাগা, কর্দোভা বা গ্রেনাডা যেখানেই ও থাক না কেন আমার এক কথায় সব ছেড়ে কোন নির্জন সরাইয়ে বা তাঁবুতে চলে আসত। একবার মাত্র মালাগায় ও আমার অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। সেখানে ও এক ধনী ব্যবসায়ীকে বেছে নিয়েছিল। হয়তো আবার জিব্রালটারের ছেনালি শুরু করার ইচ্ছা ছিল। ব্যাপারটা জানামাত্র আমি বেরিয়ে পড়লাম। দাঁকাইর শত চেষ্টা করেও আমাকে ঠেকাতে পারল না। দিনের বেলায় মালাগায় ঢুকলাম। কারমেনকে খুঁজে বার করে তৎক্ষণাৎ ওকে নিয়ে চলে এলাম। আমাদের মধ্যে ভীষণ বোঝাপড়া হল।

কারমেন বলল, যেদিন থেকে তুমি আমার সত্যিকারের রম হয়েছ, সেদিন থেকে আমি তোমাকে আর আগের মত ভালবাসতে পারছি না। তুমি যখন আমার মিনশোরো ছিলে তখন তোমাকে আমি অনেক বেশী ভালবাসতাম। আমি এভাবে অত্যাচার সইতে পারব না। তা'ছাড়া হুকুম মেনে চলা আমার ধাতে নেই। আমি মুক্তি চাই। খুশিমত বাঁচতে চাই। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমাকে সহ্যের শেষ সীমায় ঠেলে দিও না। বেশী বিরক্ত করো না আমাকে। তাহলে তুমি কানাকে যা করেছ তোমাকেও তাই করার জন্য লোক খুঁজে বার করব আমি।

দাঁকাইর মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিল। কিন্তু আমরা পরস্পরকে এমন সব কথা বলেছি যা বুকে বিঁধে রইল। আমরা আর আগের মত হতে পারলাম না। কিছুদিনের মধ্যেই দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এল। সৈন্যরা আমাদের হঠাৎ আক্রমণ করল। দাঁকাইর ও আরো দু'জন সঙ্গী নিহত হল। বন্দী হল দু'জন। আমি সাংঘাতিক আহত হলাম। আমার বিশ্বস্ত ঘোড়াটা না থাকলে সৈন্যদের হাতে পড়তাম। অবশিষ্ট একমাত্র সঙ্গীকে নিয়ে ক্লান্তিতে অবসন্ন গুলীবিদ্ধ শরীরটাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে এলাম। ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। গুলী-খাওয়া শশক যেমন কাঁটাঝোপে মরতে আসে, মনে হল আমিও তেমনি মরতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গী আমাকে একটা পরিচিত গুহায় নিয়ে এল। তারপর সে কারমেনের খোঁজে গেল। কারমেন গ্রেনাডায় ছিল। তৎক্ষণাৎ ছুটে এল। পনর দিন এক মুহূর্তও চোখ বোজেনি। এমন সযত্ন নিপুণ হাতে ও আমার সেবা করল যে কোন নারী কখনও তার প্রিয়তমের জন্য তা করেনি। যখন আমার উঠে দাঁড়াবার মত শক্তি হল ও আমাকে অতি সংগোপনে গ্রেনাডায় নিয়ে এল!

সর্বত্র বেদেদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় রয়েছে। ছ'সপ্তাহেরও বেশী গ্রেনাডায় কাটালাম। আমার বাসার পর দু'টো বাসা। তারপরই করেজিদরের বাড়ি। সে আমাকে খুঁজছে। বেশ কয়েকবার জানালার খড়খড়ির পিছন থেকে আমি তাকে যেতে দেখেছি। ক্রমে আমি সেরে উঠলাম। রোগশয্যায় আমি অনেক ভেবে আমার জীবনধারা পালটে ফেলবার পরিকল্পনা করলাম। কারমেনকে স্পেন ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বললাম। আমেরিকায় গিয়ে আমরা সদ্ভাবে বাঁচব। কারমেন আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিল। বলল, আমরা বাঁধাকপি ফলাতে জন্মাই নি। পরদেশীদের আয়ে বাঁচাই আমাদের ধর্ম। জিব্রালটারের নাথানবেন জোসেফের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা হয়েছে। সুতী কাপড়ের মাল রয়েছে। ওটা চালান করতে তোমাকেই দরকার। তুমি কথা ঠিক না রাখলে আমাদের জিব্রালটারের সাঙ্গাতরা কি বলবে। এ ভাবে আবার আমাকে টেনে নামাতে দিলাম। আবার দুষ্কর্ম শুরু করলাম।

গ্রেনাডায় যখন লুকিয়ে ছিলাম, কারমেন ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যেত। ফিরে এসে লুকাস নামে এক সুচতুর পিকাদরের কথা প্রায়ই বলত। কারমেন ওর ঘোড়ার নাম, এমনকি ওর এমব্রয়ডারি করা ভেস্টের দাম পর্যন্ত জানত। আমি ওর কথায় কান দিই নি। কয়েকদিন পরে আমার অবশিষ্ট একমাত্র সঙ্গী আমাকে বলল, সে জাকাতিনের এক ব্যবসায়ীর বাসায় লুকাসের সঙ্গে কারমেনকে দেখেছে। আমি শংকিত হয়ে উঠলাম। কারমেনকে জিজ্ঞাসা করলাম কি ভাবে ও কেন লুকাসের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে।

কারমেন বলল, ও একটা লোক বটে। ওর সঙ্গে কাজ কারবার চলতে পারে। ষাঁড়ের লড়াইয়ের মাঠে ও বারশ' রিউ (৬০) আয় করেছে। দু'টোর একটা কাজ করতে হবে। হয় ওর টাকাটা হাতাতে হবে, নয়তো ভাল ঘোড়সওয়ার এই সাহসী যোয়ানকে আমাদের দলে নিতে হবে। অমুক অমুক লোক মারা গেছে তাদের স্থান পূর্ণ করতে হবে। তোমার সঙ্গে ওকে নিয়ে নাও।

আমি উত্তর দিলাম, আমি ওকে বা ওর টাকা এই দু'টোর কোনটাই চাই না। তোমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে মানা করে দিচ্ছি।

সাবধান। কারমেন জবাব দিল, যখন কেউ আমাকে কোন কাজ করতে মানা করে তা করতে আমার একটুও দেরি হয় না।

সৌভাগ্যবশত পিকাদর মালাগায় চলে গেল। আমি ইহুদীর সুতীর মাল চালানের কাজে ব্যস্ত রইলাম। এই অভিযানে আমাকে অনেক কিছু করতে হয়েছিল। কারমেনকেও। লুকাসের কথা ভুলে গেলাম। হয়তো সে সময় কারমেনও ওকে ভুলে ছিল। এই সময়ই মন্তিল্লার কাছে ও পরে কর্দোভায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমাদের শেষ সাক্ষাৎকারের কথা আর আপনাকে বলার

দরকার নেই। সে বিষয়ে আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন। কারমেনই আপনার ঘড়িটা চুরি করেছিল। ও আপনার টাকাকড়ি বিশেষ করে আপনার আঙ্গুলের আংটিটা নিতে চেয়েছিল। ও বলেছিল, ওটা নাকি যাদু আংটি। ওর বিশেষ দরকার। আমাদের ভীষণ ঝগড়া হল। আমি ওর গায়ে হাত দিলাম। ফ্যাকাশে হয়ে গেল কারমেন। কাঁদল। এই প্রথম ওকে কাঁদতে দেখলাম। তার ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হল আমার ওপর। আমি ক্ষমা চাইলাম, কিন্তু সারাটা দিন কারমেন মুখভার করে রইল। আমি যখন মন্তিল্লা রওনা হলাম ও আমাকে চুমু খেতে চাইল না। আমার বুকে বিষম বোঝা চেপে রইল। তিনদিন পর যখন ও কাছে এল দেখলাম ওর হাসিমুখ। ফিঙের মত ও আনন্দ চপল। সব ভুলে কাছে এল। প্রথম প্রেমমুগ্ধের মত আমরা দু'টো দিন কাটালাম। বিদায়ের প্রাক্কালে কারমেন বলল, কর্দোভায় উৎসব দেখতে যাচ্ছি। পয়সা-ওয়ালা মক্কেল গেলে আমি জানতে পাবব। তোমাকে খবর দেব।

ওকে যেতে দিলাম। একা বসে এই উৎসবের কথা ও কারমেনের মেজাজ পরিবর্তনের কথা ভাবতে লাগলাম। এরই মধ্যে নিশ্চয় ও আমার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। কেন না ওই প্রথম ফিরে এসেছে। একটা চাষী আমাকে বলল, কর্দোভায় ষাঁড়ের লড়াই হচ্ছে। আমার রক্ত টগবগ করে উঠল। উন্মত্তের মত বেরিয়ে পড়লাম। চলে গেলাম সেখানে। সবাই লুকাসকে দেখিয়ে দিল। বেড়ার ধার ঘেঁষে একটা বেঞ্চিতে কারমেনকে দেখলাম। ওকে একমিনিট দেখেই প্রকৃত সত্য বুঝতে পারলাম। ঠিক যেমন ভেবেছিলাম—লুকাস প্রথমদিকে ষাঁড়টার সঙ্গে হেসে খেলে লড়ছিল। সে ষাঁড়টার কপাল থেকে ফিতার ফুলটা (৬১) তুলে নিয়ে কারমেনকে উপহার দিল। কারমেন অমনি ফুলটা খোঁপায় পরল। ষাঁড়টা যেন আমার হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য লুকাসকে আক্রমণ করল। ঘোড়াশুদ্ধ উলটে ফেলে দিল ওকে। লুকাস নিচে পড়ে, ঘোড়াটা ওর বুকের ওপর, আর দুটোর ওপর ষাঁড়টা। কারমেনের দিকে তাকালাম। কারমেন আর ওর জায়গায় নেই। আমি যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে তখন বেরোন অসম্ভব। ষাঁড়ের লড়াই শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। তারপর আমি বাসায় ফিরে এলাম। বাসাটা আপনি চেনেন। সারা সন্ধ্যা ও অনেক রাত পর্যন্ত মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম। শেষ রাত্রিতে দুটো নাগাদ কারমেন এল। বিস্মিত হল আমাকে দেখে। ওকে বললাম, আমার সঙ্গে এস।

আচ্ছা চল, ও জবাব দিল।

ঘোড়াটা নিয়ে এলাম। কারমেনকে ঘোড়ায় বসিয়ে নিলাম। একটি কথা না বলে বাকি রাতটুকু পথ চললাম। দিনের বেলায় এক নির্জন সরাইয়ে এসে থামলাম। কাছেই এক সাধুর আশ্রম। কারমেনকে বললাম, শোন, আমি সব ভুলে যাব। তোমাকে কিছু বলব না। শুধু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমার সঙ্গে আমেরিকা যাবে। সেখানে শান্ত হয়ে থাকবে। না, ও থমথমে গলায় উত্তর দিল। আমি আমেরিকা যেতে চাই না। এখানেই বেশ আছি। কারণ তুমি লুকাসের কাছে রয়েছ। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ সেরে উঠলেও সে পুরণো কথা মনে রাখবে না। তা'ছাড়া, ওকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন? তোমার প্রেমিকদের খুন করে করে আমি হয়রান হয়ে গেছি। এবার আমি তোমাকে খুন করব।

ওর বন্য চোখের স্থির দৃষ্টিতে ও আমাকে বিদ্ধ করল। বলল, আমি বরাবর জানি তুমি আমাকে খুন করবে। প্রথম যখন তোমাকে দেখি ঠিক তখন আমার দোর গোড়ায় একজন পাদ্রীকে দেখেছিলাম। কাল রাত্তিরে কর্দোভা ছেড়ে চলে আসার পথে তুমি কি কিছুই দেখনি? একটা খরগোশ তোমার ঘোড়ার পায়ের তলা দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গেল। এই অদৃষ্টের লিখন।

—কারমেনচিতা! আর কি তুমি আমাকে ভালবাসবে না?

ও কোন জবাব দিল না, পা'দুটো আড়াআড়ি ভাবে রেখে একটা মাদুরে বসল। মাটিতে আঁক কাটতে লাগল আঙুল দিয়ে।

কারমেনকে বললাম, কারমেন। আমরা আমাদের জীবন বদলে ফেলব। এমন কোথায়ও চলে যাব যেখানে কোনদিন আমাদের বিচ্ছেদ হবে না। তুমি জান কাছেই একটা ওক গাছের নীচে একশ অন্জ (৬২) লুকানো আছে। ইহুদী বেন জোসেফের কাছেও গচ্ছিত ধন আছে।

ও হেসে বলল, প্রথমে আমি; পরে তুমি। আমি জানতাম এই ঘটবে।

আবার বললাম, ভেবে দেখ। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। আমি সাহস হারিয়ে ফেলছি। তুমি তোমার পথ বেছে নাও। আমি আমারটা বেছে নেব।

ওকে রেখে আশ্রমের দিকে এগিয়ে গেলাম। সাধুটি তখন প্রার্থনা করছিলেন। প্রার্থনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। একবার ইচ্ছা হয়েছিল আমিও প্রার্থনা করি। কিন্তু পারলাম না। সাধুটি যখন প্রার্থনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন, আমি কাছে গেলাম। তাঁকে বললাম, বাবা! দারুণ বিপদগ্রস্ত কোন মানুষের জন্য কী আপনি প্রার্থনা করবেন?

—প্রত্যেক ক্লিষ্ট মানুষের জন্য আমি প্রার্থনা করি, সাধুটি জবাব দিলেন। সৃষ্টিকর্তার কাছে উপস্থিত হওয়ার সময় হয়েছে এমন কোন আত্মার জন্য আপনি মাস অনুষ্ঠান করবেন কী?

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আমার অস্বাভাবিক উদ্‌ভ্রান্তভাব লক্ষ্য করে তিনি আমাকে কথা বলতে চাইলেন। বললেন, সম্ভবত আমি আপনাকে দেখে থাকব।

বেঞ্চিতে একটি পিয়াস্ত্র রেখে বললাম, কখন আপনি মাস অনুষ্ঠান করবেন?

—আধ ঘণ্টার মধ্যে। এই সরাইওয়ালার মেয়ে সব ব্যবস্থা করতে আসবে। সত্যি করে বল, যুবক। তোমার মনে কি এমন কিছু আছে যা তোমার বিবেককে পীড়া দিচ্ছে? একজন খ্রীষ্টানের উপদেশ শুনবে কী? কান্নায় ভেঙে পড়ার অবস্থা হয়েছিল আমার। আমি

৬১। ফিতার ফুলের রঙ দেখে কোথা থেকে ষাঁড়টাকে আনা হয়েছে বোঝা যেত। হুক্‌ দিয়ে ষাঁড়ের চামড়ার সঙ্গে ফিতার ফুলটা আটকে দেওয়া হত। ষাঁড়টাকে না মেরে ঐ ফুলটা ষাঁড়ের কপাল থেকে তুলে নিয়ে কোন নারীকে উপহার দেওয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা বলে স্বীকৃত ছিল। মেরিমের পাদটীকা।

৬২। স্পেনীয় মুদ্রা।

আবার ফিরে আসব, এই বলে পালিয়ে এলাম। গীর্জার ঘণ্টা না শোনা পর্যন্ত ঘাসের ওপর শুয়ে রইলাম। মাস সাঙ্গ হওয়ার পর সরাইয়ে ফিরে এলাম।

আশা করেছিলাম কারমেন পালিয়ে যাবে। ও আমার ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সরাইয়ে ফিরে দেখলাম, ও যায়নি। আমার ভয়ে পালিয়েছে, এই চিন্তা ওর পক্ষে অসহ্য। আমি চলে যাওয়ার পর ও ওর পোষাকের কোণের সেলাই খুলে সীসা টেনে বার করেছে। টেবিলের সামনে বসে একটা জলভর্তি মাটির পাত্রের তলায় যে সীসা আগে ফেলেছে ও, এইমাত্র যে সীসা ফেলল ও, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। জাদুতে এমনি মগ্ন হয়ে ছিল, আমি যে ফিরে এসেছি তাও বুঝতে পারেনি। কখনও একটুকরা সীসা নিয়ে চারদিকে ঘোরাচ্ছিল। ওর মুখ বিষাদে মাখা। মাঝে মাঝে ওদের কোন একটা জাদুময় গান গেয়ে ডন পেড্রোর প্রণয়িনী মারি পাদিল্লার আবাহন করছিল। প্রবাদ আছে মারি পাদিল্লা (৬৩) হচ্ছেন বারি ক্রালিসা বাবেদেদের রাণী।

ওকে বললাম, কারমেন, আমার সঙ্গে আসবে কী? ও উঠে দাঁড়াল, ছুঁড়ে ফেলে দিল পাত্রটা। মাথায় ওড়না টেনে দিয়ে, যাওয়ার জন্ত তৈরী হল। আমার ঘোড়া আনা হলে ও আমার পিছনে ঘোড়ায় উঠে বসল। আমরা যাত্রা করলাম।

কিছু পথ গিয়ে বললাম, কারমেন, এভাবে তুমি আমার সঙ্গে পথ চলবে, নয় কি?

হ্যাঁ, আমি মৃত্যু পর্যন্ত তোমাকে অনুসরণ করব। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর আমি বাঁচতে পারব না।

একটা নির্জন গিরিসংকটে পৌঁছে ঘোড়া থামালাম।

এখানেই? বলে কারমেন এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ওড়না খসিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল পায়ের কাছে। কোমরে একটা হাত রেখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর স্থির দৃষ্টি আমাতে নিবদ্ধ। বলল, বেশ বুঝতে পারছি তুমি আমাকে খুন করবে। কপালে তাই লেখা আছে? কিন্তু তুমি আমাকে হার মানাতে পারবে না।

ওকে বললাম, তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি। কথা শোন। গোটা অতীত মুছে ফেলব। তুমি জান তোমার জন্ত আমি সব হারিয়েছি। তোমার জন্তই আজ আমি ডাকাত, খুনী। কারমেন! আমার কারমেন। তোমাকে বাঁচাতে দাও। আমাকেও বাঁচতে দাও।

ও উত্তর দিল, হোসে, তুমি অসম্ভবকে চাচ্ছ। আমি আর তোমাকে ভালবাসি না। তুমি এখনও আমাকে ভালবাস! তাই তুমি আমাকে খুন করতে চাচ্ছ। তোমাকে এখনও মিথ্যা বলে ভোলাতে পারি, কিন্তু তোমাকে আর দুঃখ দিতে চাই না। আমাদে দুজনের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেছে রম হিসাবে রমীকে মেরে ফেলবা অধিকার তোমার আছে কিন্তু কারমেন চিরকাল মুক্ত থাকবে বেদে হয়ে ও জন্মেছে, বেদে হয়ে ও মরবে। প্রশ্ন করলাম, তু তাহলে লুকাসকে ভালবাস?

—হ্যাঁ, ওকে তোমার মতই ক্ষণিকের জন্ম ভালবেসেছিলাম হয়তো তোমার মতও নয়। এখন আমি আর তোমাকে একটু ভালবাসি না। তোমাকে ভালবেসেছিলাম বলে নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছে

আমি ওর পায়ে আছড়ে পড়লাম। ওর হাতে ধরলাম চোখের জলে ওর দু'হাত ভিজিয়ে দিলাম। এক সঙ্গে কাটিয়ে এমন সব সুখের মুহূর্তের কথা মনে করিয়ে দিলাম। ওকে খু করতে চিরজীবন ডাকাত হয়ে থাকতে রাজী হলাম। ও যা চা সব কিছু করতে রাজী হলাম—সব, সব। শুধু ও আমাকে আবা ভালবাসবে।

ও শুধু বলল, তোমাকে আবার ভালবাসব? অসম্ভব। তোমা সঙ্গে আর আমি বাঁচতে পারব না। রাগে আত্মহারা হয়ে ছুরি বা করলাম। তখনও ভেবেছিলাম ভয় পেয়ে ও আমার কক্ষ ভিক্ষা করবে। কিন্তু কারমেন দানবী।

চিৎকার করে উঠলাম, শেষ বারের মত বলছি—আমার স থাকবে কী?

মাটিতে পা' ঠুকে কারমেন বলল, না! না! না! আমা দেওয়া আংটিটা আঙুল থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল কাঁটা ঝোপে।

দুবার ছুরি দিয়ে ওকে আঘাত করলাম। ছুরিটা কানা গার্সিয়ার আমার ছুরিটা ভেঙ্গে যাওয়ার পর আমি ওটা নিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বা আঘাতের পর ও পড়ে গেল। ওর দীর্ঘকাল চোখের স্থির দৃষ্টি এখন আমার চোখে ভাসছে। একটু পরে ওর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল, চোখের পাতা বুঁজে এল। বিমূঢ় হয়ে ওর মৃতদেহের পাশে এক ঘণ্ট বসে রইলাম। মনে পড়ল—কারমেন প্রায়ই বলত, কোন বনে ওর মৃতদেহ কবর দিলে ও খুশি হবে। ছুরি দিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ে কারমেনকে সেখানে রাখলাম। বহুক্ষণ খুঁজে ওর আংটিটা পেলাম। গর্তের মধ্যে ওর পাশে আংটিটা আর একটা ছোট ক্রশ রেখেছিলাম। হয়তো ভুল আমারই। ঘোড়ায় উঠে বসলাম। কর্দোভা অবধি ঘোড়া হাঁকিয়ে প্রথম যে রক্ষীশিবির পেলাম সেখানে নিজের পরিচয় দিলাম। বললাম, আমি কারমেনকে হত্যা করেছি কিন্তু ওর মৃতদেহ কোথায় আছে আমি বলিনি। সাধুটি ধর্মাত্মা। তিনি ওর জন্ত প্রার্থনা করেছেন। ওর আত্মার শান্তির জন্ত মাস অনুষ্ঠান করেছেন।

আহা বেচারা! আসল অপরাধী বেদেরা। ওরাই কারমেনকে ওভাবে গ'ড়ে তুলেছিল।*

অনুবাদক—প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

সমাপ্ত

৬৩। কিংবদন্তী আছে মারি পাদিল্লা রাজা ডনপেড্রোকে সম্মোহিত করেছিলেন। ইনি রাণী ব্লাঁসন্ত বুরবঁকে একটি সোনার মেখলা উপহার দেন। রাজার সম্মোহিত দৃষ্টিতে এই মেখলা একটি জীবন্ত সাপ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তাই রাজার মন এই ভাগ্যহীনা রাজকুমারীর প্রতি বিরূপ হয়েছিল।—মেরিমের পাদটীকা।

* মূল ফরাসী থেকে অনূদিত।

নগাধিরাজ হিমালয়

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ সঙ্কলিত

[ধ্যানমৌন, তুষারশুভ্র, সৌম্যস্নিগ্ধ হিমালয়ের হিমকন্দরে অখণ্ড প্রশান্তি আজ বিন্দুমাত্র বিদ্যমান নেই। অপরিসীম স্নিগ্ধতায় সেই পরম রমণীয় পরিবেশে আজ অস্ত্রের ঝঙ্কার, অসি বাজে ঝনঝন। হিমালয় প্রান্তে দিকে দিকে মৃত্যুর ইসারা, ধ্বংসের সঙ্কেত বিপর্য্যয়ের সর্বনাশা ইঙ্গিত, ভয়ঙ্করের বিষাণ। হিমালয়ের হিমশৃঙ্গ আজ পরিণত যুদ্ধক্ষেত্রে।

বৈদেশিক আক্রমণ আজ হিমালয় অঞ্চল যুদ্ধক্ষেত্রে রূপান্তরিত করলেও ভারতের সঙ্গে তার অন্ত সম্পর্ক। সে সম্পর্ক আত্মার। সে সম্পর্ক অনাদিকালের। ভারতের শিরোদেশে অতন্দ্র প্রহরীর মতই হিমালয় চিরকাল চিরজাগ্রত। ভারতের নরনারীর মুক্তির, চিন্তার, কল্পনার জগতে হিমালয়ে এক নতুন দিগন্তের দিকনির্দেশ দিয়েছে। ভারতের মহাকবির কাব্যে, গায়কের গানে, শিল্পীর তুলির রেখায় হিমালয় নব নব বন্দনায় ভরে উঠেছে মহাকাব্যে গাথায়। এমন কি পৌরাণিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে হিমালয়ের সঙ্গে স্মরণাতীতকালের সম্পর্ক। হিমালয়কে আমরা শুধু পর্বতশৃঙ্গই মনে করি না তাকে দেবত্বও দিতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করিনি। এখানে সে শুধু পর্বতপুঞ্জই নয় সে জগজ্জননীর জনক। জননীর জনক রূপে ভারতীয় সাধকরা তাকে কল্পনা করেছেন। যার প্রকাশ ঘটেছে শাক্তপদাবলীতে, পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থে। নশ্বর জীবনের অনিত্যতা মায়ামোহ অতিক্রম করে বহু ভারতীয় সাধক হিমালয়ের অঙ্কে সতীর স্থান লাভে জ্যোতির্ময়ের সন্ধান পেয়েছেন, অনন্ত জীবনের স্পর্শে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছেন, সকল প্রশ্নের চরম উত্তর খুঁজে পেয়ে পরমে মিলিত করেছেন নিজেদের।

যুগে যুগে হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছে। এই বিশেষ হিমালয়-সাহিত্য-সঙ্কলনে 'মাসিক বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকা এই কথাটিরই অনুরণন ও প্রতিফলন দেখতে পাবেন। হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের প্রীতি-মধুর অচ্ছেদ্য সম্পর্কের এক পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য এই সঙ্কলনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও সংগ্রহ প্রকাশিত। —সম্পাদক]

ভারতের উত্তরপ্রান্তে নগাধিরাজ হিমালয়। হিমালয় ভারতের নিত্যরক্ষক ও প্রতিপালক। এই হিমালয় পর্বতমালার প্রাচীন নাম—মহাহিমবন্ত, দেবভূমি, কেদারখণ্ড, উত্তরখণ্ড ইত্যাদি। অপর নাম হিমাদ্রি, হিমাচল, অচলরাজ, গিরিরাজ প্রভৃতি। সমগ্র হিমালয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০০ মাইল আর বিস্তৃত কোথাও ৩০০, কোথাও ৫০০ মাইল। এই হিমালয়কে নিয়ে কত যুগ-যুগান্ত ধরে কত প্রাচীন কবি, দার্শনিক তাঁদের কাব্য, দর্শনকে মহিমান্বিত করেছেন। কত মুনি-ঋষিরা হিমালয়ের তপোবনকে আশ্রয় করে কত গুহ্যতত্ত্বের মীমাংসায় কালাতিপাত করেছেন, কত সংস্কৃত কাব্যকার হিমালয়ের বর্ণনায় অন্তর্নিহিত গুহ্য রহস্যকে মূর্ত করে তুলেছেন। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ তার সাক্ষ্য দেয়। এই তুষারমৌনী হিমালয়ের স্তরে স্তরে পরিভ্রমণ করেছেন—প্রাচীনকালে একে একে বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্কর, শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর, কালিদাস প্রভৃতি। সে যুগের তীর্থযাত্রী ও অভিযাত্রিকেরা আজকের মতই অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। হিমালয়কে তাঁরা দেখেছেন দেবতাদের লীলানিকেতন রূপে। আজকের দিনের আধুনিক কবিরা, তীর্থযাত্রীরা, ভ্রমণকারীরা, অভিযাত্রিকেরা নতুন ছন্দ দিয়ে, নতুন ব্যঞ্জনা দিয়ে, নতুন উদ্দীপনা ও অনুসন্ধিৎসা দিয়ে ভৌগোলিক আবেষ্টনে তার গূঢ় রহস্যের উন্মোচনে সমুদ্গ্রীব। হিমালয় প্রসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক কালের লেখকদের কিছু কিছু রচনা এখানে উদ্ধৃত করা হল। মহাকবি কালিদাস এই হিমালয়কে দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় বলে বর্ণনা করেছেন—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

* * * *

"পৃথিবীর উত্তর সীমায় দেবতাত্মা, হিমালয় নামে পর্বতরাজ অবস্থিত আছেন। এই অচলরাজ পূর্বদিকে পূর্বসমুদ্র এবং পশ্চিমদিকে পশ্চিম সমুদ্র অবগাহন পূর্বক পৃথিবীর উপযুক্ত পরিমাণদণ্ডের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। ১। পুরাকালে মহারাজ পৃথুর আদেশে পৃথিবী যখন গো-রূপ ধারণ করেন, তখন সমস্ত পর্বত মিলিত হইয়া এই হিমালয়কে বৎস কল্পনা করিলে দোহনকুশল মেরুগিরি দোগ্ধার কার্য নির্বাহ করিয়াছিল, তাহাতে শৈল সকল বসুধা হইতে বহুতর উৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরত্ন ও দীপ্তিশালিনী ওষধি সকল দোহন করিয়াছিল। অতএব হিমাচল বৎসরূপে প্রথমে প্রচুর পরিমাণে পান করায় ইহাতে অনন্ত প্রকার রত্ন বিদ্যমান আছে। ২। এই অচলরাজের শিখরসমূহে বিভিন্ন বর্ণের বহুবিধ মূল্যবান ধাতু আছে, উহাদের বিচিত্রবর্ণসমূহ, জলধর খণ্ডসকলে প্রতিফলিত হইয়া থাকে তাহাতে অযথাসময়ে মনে হয় যে সন্ধ্যা হইয়াছে, অদূরে অলকাবাসী অপ্সরাগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া নিজ নিজ প্রিয়জন সমাগমের উপযুক্ত

বেশভূষা ধারণ করিতে উদ্যত হয় এবং ব্যস্ততাপ্রযুক্ত এক স্থানের পরিধেয় অলঙ্কার অন্য স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া যায়। ৪। মেঘগণ এই পর্বতরাজের নিতম্বদেশ পর্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকে। নিম্নস্থিত সানুদেশে মেঘের ছায়া পতিত হওয়ায় আতপতাপে পরিক্লান্ত সিদ্ধগণ সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন; এবং যখন বৃষ্টি দ্বারা উত্তেজিত হন, তখন তাঁহারা মেঘমালার উপরিস্থিত অন্যান্য সানুদেশে গমন করিয়া থাকেন। * * * এই পর্বত দিব্যাঙ্গনাগণের সম্পূর্ণ বিহারযোগ্য। এই পর্বতস্থিত কীচক নামক বংশবিশেষের ছিদ্র মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইলে বংশীর নায় শব্দ হয়, যেন কিন্নরগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিবার জন্য উদ্যত হইলে প্রথমেই হিমাচল স্বয়ং বংশীবাদনপূর্বক তান প্রদান করিতেছেন। ৮। হিমাচলস্থিত হস্তিগণ কপোলজাত কণ্ডু অপনয়ন করিবার জন্য সৌরভবিশিষ্ট দেবদারু তরুর স্কন্ধদেশে গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করাতে বৃক্ষের ক্ষীর ক্ষরিত হইতে থাকে, সুতরাং সেই সুগন্ধ চতুর্দিকস্থ সন্ধিপ্রদেশ সকল আমোদিত করিয়া থাকে। ৯। হিমাচলের উপরিস্থিত পথসকল ঘনীভূত হিমসজ্ঞ দ্বারা সমাচ্ছন্ন, সুতরাং স্ব স্ব গুরুভার নিতম্বভরে ক্লান্ত কিন্নরীগণ সেই দুর্গম পথ দিয়া গমনকালে কোনমতেই মন্দগতি পরিহাব করিয়া দ্রুতপদে গমন করিতে সক্ষম হয় না। ১১। হিমালয় পর্বতগণের রাজা, তাঁহার সেই গিরিরাজ নাম সফল করিবার নিমিত্ত পর্বতবাসী চমরী সকল ইতস্তত: পুচ্ছসঞ্চালন করিয়া শারদীয় চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রচামরসমূহের শোভা চতুর্দিকে বিসারিত করিয়া থাকে। ১৩। এই গিরিবরের গুহাগৃহ মধ্যে কিন্নর ও কিন্নরীগণ বিহার করিয়া থাকে, কিন্নরগণ ক্রীড়া কালে কিন্নরীদিগকে বসনবিহীন করিলে তাহারা লজ্জিত হয়, তখন গৃহদ্বারের সম্মুখে সহসা মেঘসমূহ যবনিকার ন্যায় লম্বমান হইয়া তাহাদের লজ্জা নিবারণ করে। ১৪। এই নগরাজের সমীরণ, ভাগীরথীর নির্ঝরের বারিকণা বহনপূর্বক ক্রমে ক্রমে দেবদারুতরু মৃদু মৃদু আন্দোলিত করিয়া এবং ময়ূরপুচ্ছ বিভাজিত করিয়া প্রবাহিত হয়। মৃগয়া শ্রান্ত ব্যাধগণ সেই শীতল, সুগন্ধি ও মন্দ মন্দ পবন সেবন করিয়া থাকে। ১৫। হিমাচল একপ উন্নত যে দিবাকরও ইহার শিখরের নিম্নদেশে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব উচ্চতর শিখরস্থ সরোবরের পদ্ম সকলের মধ্যে সপ্তর্ষিগণের হস্তোদ্ধৃত কমল সমূহের অবশিষ্টগুলিকে সূর্যদেব ঊর্ধ্বমুখ কিরণ দ্বারা প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন। ১৬। হিমাচল যজ্ঞসাধন সোমলতাদি নানাবিধ উদ্ভিদ উৎপাদন করেন এবং বসুন্ধরা ধারণে তাঁহার সবিশেষ সামর্থ্য—আছে। অতএব বিধাতা হিমালয়কে যজ্ঞের একভাগ প্রদান করিয়া যাবতীয় পর্বতের রাজা করিয়া দিয়াছেন। ১৭॥ (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ)।

* * * *

"হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে তাতার ও চীন সাম্রাজ্য। পূর্বে ও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ ও সিন্ধু নদী, দক্ষিণে আর্যাবর্ত বা ভারতভূমি। হিমালয়ে নেপাল ও ভূটান দুইটি স্বাধীন এবং কাশ্মীর, সিকিম ও টিহরি প্রভৃতি মিত্র ও করপ্রদ রাজ্য অবস্থিত। এই বিশাল পর্বত শ্রেণী হইতে তিনটি প্রধান নদী—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অসংখ্য উপনদীর সহিত একত্র হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আমলে এই পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন উচ্চ স্থানে শৈলাবাস প্রস্তুত হইয়াছে। হিমালয়ে কোটি তীর্থ বিরাজিত আছে তন্মধ্যে পশ্চিমে, কাশ্মীরে অমরনাথ, মধ্যে গাড়বাল জেলায় কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, পূর্বে নেপাল প্রদেশে পশুপতিনাথ, উত্তরে কৈলাস পর্বত ও মানস সরোবর প্রসিদ্ধ ও ও সর্বজনবিদিত। রাওলপিণ্ডি হইয়া কাশ্মীরস্থ অমরনাথ, হরিদ্বার, দেরাদুন, রামনগর, কাটগুদাম বা কোটদ্বার হইয়া মধ্যভাগস্থ তীর্থসমূহ, গোরক্ষপুর, জয়নগর বা জনকপুর হইয়া নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন।···হিমালয় পর্বত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। শীতকালে ইহার উত্তর ভাগস্থ শৃঙ্গগুলি একেবারে বরফাবৃত ও দক্ষিণ ভাগস্থ শৃঙ্গদেশগুলি বরফে ঢাকিয়া থাকে। এখানকার জল ও বায়ু অতি পরিষ্কার ও সাধনভজনের উপযোগী।

···হিমালয়ের নিভৃতগুহায় ও মানস সরোবর প্রভৃতি স্থানে অনেক উন্নত সাধু মহাত্মা আপন সাধনভজনে রত আছেন। ···হিমালয় প্রকৃতির লীলাভূমি, পৃথিবীতে যতগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্য-সমন্বিত স্থান আছে একা হিমালয়ে তাহার সমস্তই সমষ্টিরূপে বিরাজিত। উন্নত পর্বতশৃঙ্গে বরফস্তূপ, নানাবিধ ফলফুল সমন্বিত নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে হরিণ। পিক, বউকথাকও, ঘুঘু প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পশু ও পক্ষীর মধুর রবে হিমালয়ের স্থানে স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ ও ফোয়ারা ইত্যাদি দর্শন পর্বতবাসী জনগণের স্বভাবসুলভ কোমল প্রকৃতি ও আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া কৃতার্থ মনে করেন। কেহ বা প্রাচীন আর্যঋষি বা পিতৃপুরুষগণের সাধনভজনের স্থান সমূহের প্রকাশক ব্যাসগুহা, পরাশ্রমাশ্রম, মুচকুন্দ গুহা, বশিষ্ঠাশ্রম, গণেশগুহা প্রভৃতি আশ্রম এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দেবদেবী মূর্তি যথা অমরনাথ, কেদারনাথ, পশুপতি নাথ, যমুনা দেবী, গঙ্গা এবং যমুনার অবতীর্ণ স্থান প্রভৃতি দর্শনে এবং গঙ্গাদেবী যে বিভিন্ন নামধারী দেবদেবী ও সাধকগণের নামে নাম ধারণ করিয়াছেন যথা অলকানন্দা, মন্দাকিনী, ব্যাসগঙ্গা, কর্ণগঙ্গা, নন্দগঙ্গা, গরুড়গঙ্গা, পাতালগঙ্গা, কর্মনাশা গঙ্গা, নন্দগঙ্গা, বিষ্ণুগঙ্গা, কাঞ্চনগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, সরস্বতীগঙ্গা, বালাস্বতী-গঙ্গা, রুদ্রগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, শৌনকগঙ্গা, ভৃগুগঙ্গা, ভাস্করগঙ্গা, জাহ্নবীগঙ্গা, অসিগঙ্গা, বরুণাগঙ্গা, হনুমানগঙ্গা, প্রভৃতিতে স্নানাবগাহনে ও বিভিন্ন নামধেয় প্রয়াগ তীর্থে যথা দেবপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, ঋষিপ্রয়াগ, শৌনকপ্রয়াগ, ও ভাস্করপ্রয়াগ 'প্রভৃতি স্থানে স্ব স্ব অভিমতানুযায়ী কার্যাদি সম্পাদন দ্বারা কৃতার্থ মনে করেন।" (হিমালয় ভ্রমণ—পরিব্রাজক শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী)।

"একে ত ক্রমাগত সোজা উপরের দিকে ওঠা, প্রতিপদে পা ভেঙ্গে এবং নিঃশ্বাস আটকে আসে, তার উপর পায়ের নিচে বরফের স্তূপ! যেখানে বরফ একটু গলছে, সেখানে যেন বালি রাশির ওপর দিয়ে যাচ্ছি! প্রতি পদক্ষেপেই পা ডুবে যাচ্ছে। আবার যেখানে জমাট কঠিন বরফ, সেখানে ভয়ানক পিছল, একটু অসাবধান হয়ে পা ফেল্লেই আর কি মুহূর্তের মধ্যেই ইহজীবনটা ডিঙ্গিয়ে পরলোকের দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়।

চলতে চলতে পায়ের যাতনা ক্রমে অনেকটা কমে এল। আস্তে আস্তে পা দু'খানি অসাড় হয়ে পড়ল, তখন সেই তুষারশীতল স্পর্শ আর তাদের কাতর করতে পারলে না। বেশ বেগের সঙ্গেই চলতে লাগলুম। সময় সময় খানিকটা বরফ তুলে নিয়ে গোলাকার করে দূরে ছুঁড়ে ফেলি! দেখতে দেখতে তা ধুলোর মত গুঁড়ো হয়ে যায়।

পা অবশ হয়ে ক্রমে ক্রমে ভারি হয়ে এল, তবু প্রাণপণ শক্তিতে পথটুকু চলতে লাগলুম। খানিক পরে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌছুলুম। বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।

এখানে এসে দেখলুম অপর পাশে খানিকটা নিচে কিছু দূরে বিস্তৃত একটা সমতল ক্ষেত্র। দুই পাশে দুটি অভ্রভেদী পাহাড় ধনুকের মত সেই সমতল ভূমিকে কোলে নিয়ে রয়েছে। অলকানন্দা দূরে দূরে আঁকা বাঁকা দেহে অতি ধীর গতিতে চলে যাচ্ছে। কোথাও সামান্য স্রোত দেখা যাচ্ছে, অনেক স্থানেই জল দেখবার যো নেই। পাতলা বরফগুলি ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে, তাই দেখে স্রোতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। কোথাও বা স্রোতের সম্পর্ক মাত্র নেই। আগাগোড়া জমে গিয়েছে, কেবল নদীগর্ভের নিম্নতায় নদীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যাচ্ছে। দুগ্ধফেননিভ বহুদূরবিস্তৃত তুষাররাশির উপর অস্তোন্মুখ তপনেরও লাল রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে এমন বিচিত্র শোভা হয়েছিল যে বোধ হল সে যেন পৃথিবীর শোভা নয়, সে দৃশ্য অলৌকিক। আমি মনে কল্পনা করলুম, শান্তিহারা অধীর হৃদয়ে ঘুরতে ঘুরতে আজ বুঝি বিধাতার আশীর্বাদে দুঃখ কোলাহলময় পৃথিবীর অনেক উর্ধ্বে বরণীয় স্বর্গরাজ্যের দ্বারে উপনীত হয়েছি। ঐ তুষারমণ্ডিত সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অলকানন্দার শোভাময় উপকূল, আমার কাছে সুরনদী মন্দাকিনীর প্রবালে বাঁধানো সুরম্য তীর বলে বোধ হয়েছিল। চারিদিকে কেমন শান্তি, কত পবিত্রতা, দুঃখ-কষ্ট, পথশ্রম সমস্ত ভুলে গেলুম। এই অসীম যন্ত্রণাময় দগ্ধজীবনের গুরুভারও যেন লঘু হয়ে গেল। অদূরে নারায়ণের তুষার-মণ্ডিত মন্দির। সমতলভূমির উপর আর একটি ছোট মন্দির ও কতকগুলি ছোট ছোট পাথরের ঘর। নদীর ধারে যেমন বালির ঘর বেঁধে মেয়েরা খেলা করে এবং খেলা সাঙ্গ করে তারা বাড়ী চলে গেলে যেমন ঘরগুলি সেই নির্জন নদীতীরে পড়ে থাকে, অলকানন্দার তীরে সেই শুভ্র সমতল প্রদেশে এই ছোট ঘর ও মন্দির দেখে আমার মনে হল, বুঝি দেববালারা এসে খেলাচ্ছলে এগুলি তৈরী করেছিল, বেলা অবসান হওয়ার খেলা সাঙ্গ করে তারা বাড়ী ফিরে গিয়েছে।
(হিমালয়—জলধর সেন।)

• • • •

সমগ্র হিমালয় হলো শৈব ও শাক্তের লীলাভূমি। যত দুর্গমেই যাও, মহাদেব এবং পার্বতীর মন্দির পাওয়া যাবে সর্বত্র। যতদূরে যাও, যেখানে খুশি যাও—মহাকালীর স্থাপনা। শক্তির আরাধনা চলছে আবহমান কাল থেকে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে ধরো। পেশোওয়ার থেকে রাওলপিণ্ডি, ঝিলম্, শিয়ালকোট, জম্মু, পাঠানকোট,—তারপর চলে এসো পাঞ্জাব রাজ্যে। হিমাচল প্রদেশে, কাংড়া-কুলুতে, এসো সিমলায়, গাড়োয়ালে, কুমায়ুনে,—শুধু শিব ও দুর্গা, চণ্ডী, মহাকালী, মহিষমর্দিনী। তারপর উত্তরদিকে যাও,—সমগ্র কাশ্মীরে শিব ও শক্তি পূজা। নেমে এসো নীচে কুমায়ুনে, তারপর পূর্বদিকে তিব্বতে ঢোকো, মানসসরোবরের পথে পাবে শক্তি আরাধনা। তিব্বতের খাচরনাথ গুম্ফার গর্ভলোকে মহাকালীর মূর্তি, অমাবস্যায় সেখানে পশু বলিদান হলো বিধি। হিন্দুদর্শনের বনস্পতির থেকে নানা শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে—কোনটা শৈব, কোনটা শাক্ত, কোনটা বা বৌদ্ধ। ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে কেবল পরস্পরের ভিতরে সংহতি সাধন করে চলেছে। এই সংস্কৃতি রাষ্ট্রের কোন সীমান্ত রেখাকে মানে নি, রাজনৈতিক জরীপকে স্বীকার করে নি, তুষারমণ্ডিত শত শত গিরিশৃঙ্গমালার অবরোধকে গ্রাহ্য করে নি। কেবলমাত্র আন্তরিক ধর্মবিশ্বাসের শক্তিতে চিরকাল ধরে তারা হিমালয়ের পারাপার করে এসেছে। ঠিক এই কারণেই সিকিমে গিয়ে আমার মনে হয়েছে। এটা তিব্বতের অংশ, নেপালে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে এটা ভারতের অংশ। যাঁরা কুমায়ুন, কাংড়া, হিমাচল প্রদেশ, লাডাক,—অথবা কাছাকাছি উত্তর বিহারের কোন কোন উত্তরাঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, কিংবা যাঁরা সিমলা থেকে তিব্বত হিন্দুস্থান রোড ধরে গেছেন কিন্নর দেশে—তাঁরা জানেন খণ্ড খণ্ড তিব্বত এই ভারতের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। আবার যখন দেখি তিব্বতের অসংখ্য গুম্ফায় হিন্দুর দেবদেবীর নিত্য আরাধনা চলে। তখন বুঝতে পারি। খণ্ড খণ্ড ভারত তিব্বতের মর্মে মর্মে বাসা বেঁধে রয়েছে অনাদি কাল থেকে। (দেবতাত্মা হিমালয়, প্রবোধকুমার সান্যাল)।

• • •

"অভ্রভেদীর ওই ধবল শৃঙ্গে
ফুটায়ে পদ্ম রাগ,
তাহে চরণ দুখানি রাখ
শুভ্র-সুষমা চাহি না, ভীম ভৈরবীরূপে জাগ।"
(কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন।)

নীল ধবলের চূড়া! মুহ্যাতীত জীবনের মত
দৃশ্য এক হেরিলাম, সসম্ভ্রমে হইনু প্রণত;
স্তব্ধ হয়ে গেল চিত্ত, দেখিলাম একি নেত্র-আগে,
বিস্ময়? আনন্দ? চিন্তা উর্ধ্বে—মহা উর্ধ্বে লাগে।
সৃজন প্রত্যুষে কি এ বিরাটের বিরাট কল্পনা,
আপনি দেখিয়া মুগ্ধ আপনার অপূর্ব রচনা।
বুঝি সে কবির কবি। করেছিলা পাই ছিন্নমায়া
হেরিয়া যে রূপোচ্ছাস, তাহার কি সম্বৃত এ মায়া?
কেমনে বাখানি আমি রূপ, না এ আঁখির গৌরব?
প্রাণে প্রাণে একি নৃত্য, সঙ্গে সঙ্গে একি কলরব?

• • • •

শিরে তুষারের জটা, পক্ককেশ রাজর্ষির মত
মহাযোগে সমাসীন, বল যোগী, কত যুগ গত?
পেলে দীর্ঘ তপস্যার কত বর কত আশীর্বাদ
তবু তপ ছাড় নাই! আত্মালগ্ন দেবের প্রসাদ
যেন সতীদেহ স্কন্ধে চলিয়াছে পাগল মহেশ,
আপনার ভাবে ভোর, নাই শ্রান্তি নাই কোন শেষ!
যুগ যুগ ধরি তুমি লুটিতেছ স্বর্গের ভাণ্ডার
সহস্র ধারায় তাহা করে জড়ে জীবনীসঞ্চার;
তব রস সঞ্চারিত ধরণীর ধূলি স্তরে স্তরে।
তাই তার মাতৃস্তনে সুধাধারা স্নেহসম ক্ষরে।"
(হিমালয় বর্ণনা: প্রমথনাথ রায়চৌধুরী)

"হঠাৎ এল কুজ্‌ঝটিকা হাওয়ায় চড়িয়া
ঘুম পাহাড়ের বুড়ি দিল মন্ত্র পড়িয়া।
কুহেলিকার কুহকে হায়, সৃষ্টি ডুবিল,
ঝাপসা হল কাছের মানুষ দৃষ্টি নিবিল।
ভস্মভূষণ ভোলানাথের অঙ্গ বিভূতি।

বিশ্বপরে ঝরে যেন বিশ্ব-বিস্মৃতি।
সকল গ্লানি যায় মুছে সেই দৈব ধূম পানে,
অরুণ আভার অঙ্গে জাগে আরক্ত পরাণে।

* * *

ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াসায়,
গুল্ম-ঘেরা পাহাড়গুলি আবার দেখা যায় ;
নীল আলোকের আবছায়াতে বিলীন তরুচয়,
'কাঞ্চি' মণির চলমলিয়ে হাল্কা হাওয়া বয়।
মেঘ টুটে ফের ফুটে ওঠে আকাশ ভরা নীল,
নীল নয়নের গভীর দিঠি যেথায় খোঁজে মিল।
শান্তি হ্রদে সাঁতারি তার মিটে না আশা,
নীল নীড়ে, হায়, আঁখি-পাখীর আছে কি বাসা!

* * *

সাঁতার ভুলে মেঘ চলে আজ লস্করী চালে,
অস্তরবির সোহাগ তাদের গুমর বাড়ালে।
মেঘের বুকে কিরণ নারী পিচকারী হানে,
ইন্দ্রধনুর, চূর্ণ শোভা ছড়ায় বিমানে।
মেঘে মেঘে পান্না চুনির লাবণ্য লাগে,
আচম্বিতে তুষার গিরি উজ্জ্বল জাগে।
দিব্যলোকের যবনিকা গেল কি টুটি ?
অপ্সরীদের রঙ্গশালা উঠে কি ফুটি ?

* * *

গিরিরাজের গায়ের টোপর ওই গো দেখা যায়—
স্বর্ণসারে সিঞ্চিত কি স্বর্ণ সুষমায়।
পায়ের কাছে মৌন আছে পাহাড় লাখে-লাখ
আকাশ-বেঁধা শুভ্র চূড়া করেছে নির্বাক!
নরচরণ চিহ্ন কভু পড়েনি হোথায়,
নাইক শব্দ বিরাট স্তব্ধ,—আপন মহিমায়।
সন্ধ্যা-প্রভাত অঙ্গে তাহার আবীর ঢেলে যায়,
রুদ্ধ গতি বিদ্যুতেরি দীপ্তি জাগে তায়!
শিখায় শিখায় আরম্ভ হয় বর্ণ মহোৎসব,
বিদুর ভূমে রক্ত-ফসল হয় বুঝি সম্ভব!
মর্ত্ত্যে যদি আনাগোনা থাকে দেবতার,
ওই পাদ পীঠ তবে তাঁদের চরণ রাখিবার!

ওই বরফের ক্ষেত্রে হলের আঁচড় পড়ে নাই,
ওই মুকুরে সূর্য তারা মুখ দেখে সবাই!
হোথায় মেঘের নাট্যশালা, রঙ্গ কুয়াসার ;
হোথায় বাঁধা পরমায়ু গঙ্গা-যমুনার!
ওইখানেতে তুষার নদীর তরঙ্গ নিশ্চল,
রশ্মি-রেখায় ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে অবিরল।
উচ্চ হতে উচ্চ ও যে—মহামহোত্তর,—
নির্মলতার ওই নিকেতন অক্ষয় ভাস্বর।

* * *

হয়তো হোথাই যক্ষপতির অলকানগর,
হয়তো হবে হোথাই শিবের কৈলাস-ভূধর।
রজতগিরির শঙ্করেরি অঙ্কোপরি, হায়,
কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মুরছায়।
হয়তো আদি বুদ্ধ হোথায় সুখাবতীর মাঝে,
অবলোকন করেন ভূলোক সাজি কিরণ সাজে।
কিংবা হোথা আছে প্রাচীন মানস-সরোবর,
স্বচ্ছ-শীতল আনন্দ যার তরঙ্গ নিকর।
কবি-জনের বাঞ্ছা বুঝি হোথাই পরকাশ,—
সরস্বতীর শুভ্র মুখের মধুর মৃদু হাস!

* * *

লামার মুলুক লাসা কি ওই ঢাকা কুয়াশায়,
বাঙলা দেশের মানুষ হোথা আজো পূজা পায়!
এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি উৎসাহ শিখায়,
ঘুচিয়ে ছিল নিবিড় তমঃ নিজের প্রতিভায়!
এই পথেতে গেছেন তাঁরা দেখেছেন এই সব,
এইখানে উঠেছে তাঁদের হর্ষ-কলরব।
এমনি করে স্বর্ণশৃঙ্গ বিপুল হিমালয়,—
আমার মত তাদের প্রাণেও জাগিয়েছে বিস্ময়!
দেশের লোকের সাড়া পেয়ে তাই কি তাঁহারা
চেয়ে আছেন মোদের পানে হয়ে আপন-হারা।
চোখের পলক নাইক তাদের পড়ে না ছায়া
মমতা কি যায়নি তবু, ঘোচেনি মায়া ?
তাই বু'ঝ হায় ফিরে যেতে ফিরে-ফিরে চাই,
কে যেন হায় রইল পিছে কাহারে হারাই।"

(দার্জিলিঙের চিঠি : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)।

Characteristic of the Hindu race

This analytical power and the boldness of poetical visions, which urged it onward are the two great internal causes in the make-up of Hindu race. They together, formed as it were, the keynote to the national character.

This combination is what is always making the race press onward beyond the senses—the secret of those speculations which are like the steel blades the artisans used to manufacture—cutting through bars of iron, yet pliable enough to be easily bent into a circle.

—*Swami Vivekananda*

হারমান হেসে

সুনীলকুমার নাগ

বিগত পনেরো-বিশ বছর ধরে প্রায় প্রতি বছরই দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের ব্যাপারটা নানা অপ্রীতিকর আলোচনার সূত্রপাত করে চলেছে। নানা কারণবশতঃ এক শ্রেণীর সাহিত্য-রসিকের মনে এইরকম একটা ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে বর্তমানে শুধুমাত্র সাহিত্য কীর্তির শ্রেষ্ঠতার জন্যই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে না—ভেতরে ভেতরে রীতিমতো রাজনীতির খেলা চলছে। এটা সত্যি হতে পারে, আবার মিথ্যেও হ'তে পারে। বর্তমানে আমরা হারমান হেসে সম্পর্কে আলোচনা করবো। হেসে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৪৬ সালে। সুখের বিষয় যে গত বিশ বছরে যে তিন চারজনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারটা অপ্রীতিকর আলোচনার সূত্রপাত করেনি, অর্থাৎ রাজনীতির তাগিদে পক্ষপাত দুষ্ট বলে কোনো দলেরই মনে হয় নি—হেসে তাঁদের অন্যতম।

হেসে (Hermann Hesse, 1877—1962) জাতিতে ছিলেন জার্মাণ—যদিও তাঁর পঁচাশী বছর জীবনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই (ঠিক পঞ্চাশ বছর) খাস জার্মাণীর বাইরে, সুইজারল্যাণ্ডে কাটিয়ে গেছেন। বর্তমান পৃথিবীর মানুষ হয়ে, দু' দু'টো মহাযুদ্ধ বলতে গেলে প্রায় চোখের ওপর ঘটতে দেখেও হেসে যে আমৃত্যু সত্যি সমস্ত রকম রাজনৈতিক পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে ছিলেন—এটা প্রকৃতির একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। হেসের এক গুণমুগ্ধ ভক্ত-সমালোচক একবার লিখেছিলেন যে, সুইজারল্যাণ্ডের শৈল-সহরে বসে নির্লিপ্তের মতো হেসে দেখতেন নীচের সমতল ভূমিতে জাতিগত, বর্ণগত এবং শ্রেণীগত স্বার্থের কোন্দলে দিশেহারা মানুষ দিনের পর দিন কেমন একটু একটু করে রাজনীতির ঘোলা জলে ডুবে চলেছে। কখনো হয়তো মনে হয়েছে ওদের বিভ্রান্তি ঘুচাবার জন্য কিছু একটা করা দরকার, কিছু লেখা দরকার এবং বলা দরকার—কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয় এমন ধারা প্রচারকার্যমূলক কোনো ব্যাপারের প্রতি কখনো হেসের মন সায় দেয়নি। কাজেই বরাবর উনি অক্লান্তভাবে সাহিত্য-সেবাই করে গেছেন। এক সাহিত্যের মাধ্যমে শান্তির পথে, শুভ বুদ্ধির পথে মানুষকে প্রভাবিত করবার জন্যই হেসে বরাবর চেষ্টা করে গেছেন। প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারীর পুত্র হেসের পক্ষে এইটেই নিশ্চয়ই স্বাভাবিক কাজ ছিলো।

হেসের বাবাই শুধু নন, ঠাকুরদাদাও একজন প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারী ছিলেন। এবং ওঁরা দু'জনেই তাঁদের সময়ে দীর্ঘ কাল এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে কাটিয়ে গেছেন। গত কয়েক শ' বছর ধরে ভারতবর্ষে ইয়োরোপের নানা দেশের মিশনারীদের কার্যকলাপ চলছে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কালে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ সমস্ত মিশনারীরা নেহাৎ ভারতীয় জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই সময় এবং অর্থব্যয় করতেন না—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে প্রত্যেক দেশের মিশনারীরা কার্যতঃ তাদের দেশের সরকারের স্বার্থে ভেতরে ভেতরে কাজ করতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে জার্মাণ-মিশনারীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপও সুবিদিত। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মিশনারীই যে যীশুর পবিত্র নামকে এভাবে কলঙ্কিত করতেন তা নয়—হেসের বাবা এবং ঠাকুরদা যে তাঁদের দীর্ঘ ভারত-অবস্থান কালে নিজেদের রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। হেসের নিজেরও বাল্যবয়স থেকেই বাসনা ছিলো ভারত ভ্রমণ করবার। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে ১৯১১ সালে ওঁর সে বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। হেসের ভারত ভ্রমণের ফলে তাঁর নিজের চিন্তাধারায় এবং সাহিত্য-চর্চায় কী পরিবর্তন এসেছিল, সে-কথা আমরা পরে আলোচনা করছি। তার আগে ওঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

হারমান হেসের পূর্বতন আটপুরুষ ধরে দেখা যায় বিবাহসূত্রে য়ারোপের মধ্যাঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি দেশের সাংস্কৃতিকধারার দে যুক্ত রয়েছে। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড এবং আজকালকার চেকোস্লোভাকিয়ার ত কথাই নাই রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, ইতালী, স এবং ডেনমার্কের অনেক পরিবারের সঙ্গেও হেসে পরিবারের দান-প্রদান ছিল। এর ফলে দেখা যায় হারমান হেসের যখন ল্যকাল, সে-সময়ে পরিবারটি জার্মাণ হলেও জার্মাণীর সরকারী বাদের সমর্থক নয়। পিতৃভূমির প্রতি তাঁদের আনুগত্যবোধ কারো চাইতে কম তা নয়—কিন্তু এই আনুগত্য প্রকাশের য় বা পন্থা হিসেবে তাঁরা জার্মাণীর পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে তাদের জনগণকে শত্রু বলে মনে করতে রাজী নন—যে জন্য র্মাণ সরকার অন্ততঃ দুই যুগ ধরে চেষ্টা করছিলেন। কেবারে বাল্যবয়স থেকেই সংকীর্ণ জাতীয়তার ঊর্ধ্বে এই সর্ব-নবিকতাবোধের পরিবেশটি নিঃসন্দেহে হেসের মানসিক গঠনে ত্যন্ত কার্যকর হয়েছিল।

হেসে-পরিবারের ছেলেরা কয়েক পুরুষ ধরেই স্থানীয় পাদ্রী বা দেশে মিশনারীর কাজ করে আসছিলেন। আর অল্প কয়েকজন জারীকেও পেশা করে নিয়েছিলেন। হারমান হেসের অভিভাবক-নীয়দের ইচ্ছা ছিল যে উনিও পাদ্রী হবেন। তাই স্কুলের ড়াশুনোও সেইভাবে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু হেসের যখন তেরো চৌদ্দ বছর বয়স তখন একদিন বাড়ীতে খবর এলো যে উনি দুদিন ধরেই স্কুল পালাচ্ছেন, আজো স্কুলে পাওয়া যাচ্ছে না ক। বলাই বাহুল্য, জ্যেঠা-খুড়ো অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন বালক সের এমন ধারা উচ্ছৃঙ্খলতায়। সন্ধ্যে নাগাদ যখন বাড়ী রলেন উনি, দেখলেন সকলেরই মুখচোখ থমথম করছে। ওঁর রণা ছিল সবাই খুব বকাবকি করবেন, কিন্তু অনেক রাত পর্যন্তও উই কিছু বললেন না। বয়স্কদের এই নীরবতার ফলে বালক সের মনে একটা দুঃসহ অস্থিরতা দেখা দিলো। শেষ পর্যন্ত মায় ভেঙ্গে পড়লেন উনি। এরপর এক জ্যেঠামশায় এলেন কাছে। কোনোরকম চোটপাট না করে, শান্তভাবেই বললেন: াকাটির দরকার নেই এখন ঘুমোবার চেষ্টা করো। কাল সকালে বার্তা হবে।

সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না হারমান। স্কুল—লোনোর ফলে গোটা পরিবারের লোকজন যে কী পরিমাণ ব্যথিত য়েছেন—এটা সহজেই বুঝতে পারলেন। একবার মনস্থ করলেন ভবিষ্যতে ইস্কুল-পালাবার ঝোঁকটা যে-করেই হ'ক কাটিয়ে উঠতে ব, সারা রাত ধরে ভেবে চিন্তে দেখলেন ইস্কুলের পড়াশুনোর প্রতি -বসানো সহজ হবে না। তাই হেসে ঠিক করলেন বাড়ীর কজনদের খোলাখুলিই বলবেন কথাটা।

ইস্কুলের সব কিছুই যে হেসের খারাপ লাগতো ঠিক তা' নয়। তিহাস, ভূগোল এবং সাহিত্য খুবই ভালো লাগতো বিশেষ করে হিত্য। মুস্কিল হতো অন্যান্য বিষয়ের ক্লাশের সময়ে—যেমন ইবেল। ভবিষ্যৎ জীবনে হেসে যাতে পাদ্রী হতে পারেন সে জন্য লের পাঠ্যসূচী নির্বাচন করেছিলেন অভিভাবকগণ। সমস্যাটাও া ছিলো এইখানেই। ভবিষ্যতে পাদ্রী হবার জন্য কোনোই কর্তব্যবোধ করতেন না হেসে, কাজেই বাইবেলের ক্লাশের সময় প্রায় নিয়মিতই উনি বেরিয়ে পড়তেন। ইস্কুলের অদূরেই ছিলো ছোটো একটা বন। এই বনে এসে লুকোতেন হেসে। তারপর ইস্কুল ছুটির পরে বাড়ী ফিরতেন। কয়েকমাস শ্যামল বনানীর এই সান্নিধ্য কিন্তু হেসের মানসিকতায় একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটালো। চার লাইন, ছ'লাইনের ছোটো ছোটো কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন উনি।

যাই হ'ক, পরদিন সকালে কি হ'লো দেখা যাক। হেসের ধারণা ছিলো, রাতের বেলায় কেউ কিছু না বললেও সকালে নিশ্চয়ই একচোট ধমক-ধামকের সম্মুখীন হতে হবে ওঁকে—চাই কি মারধোর চলাও অসম্ভব নয়। কিন্তু এ সবের কিছুই ঘটলো না। গুরুজনেরা সবাই সস্নেহে কাছে ডাকলেন হেসেকে। তাঁরা বললেন যে ইস্কুলের শিক্ষক মহাশয়রা সকলেই ওঁর ওপর খুশী, অনেক বিষয়েই অন্যান্য ছাত্রদের চাইতে ওঁর জ্ঞান বেশিই হয়েছে; কিন্তু বাইবেলের ক্লাশে ক্রমাগত অনুপস্থিত থাকবার জন্য তাঁর পরীক্ষায় পাশের সম্ভাবনা নেই। কাজেই নিয়মমাফিক ইস্কুলের পড়াশুনোয় এখনই ইস্তফা দিলে কোনো সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। সুতরাং বর্তমানে দু'টি পথ খোলা রয়েছে। প্রথমতঃ নতুন পাঠ্যসূচী ঠিক করে আবার ইস্কুলের পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়া, আর না হয় কোনো হাতের কাজ শেখা। গুরুজনেরা এ-কথা পরিষ্কার ভাবেই জানালেন যে হেসের অভিরুচিমতো এ দুটোর যে-কোনো একটা ঠিক করে নিতে পারেন—তাতে তাঁদের আপত্তি থাকবে না, বা অভিমান করেও কথাটা বলছেন না তাঁরা। সেই সঙ্গে এ কথাও জানালেন যে স্বাধীন ভাবে হেসে যা শিখবেন বলে বর্তমানে সিদ্ধান্ত নেবেন, সে বিষয়ে কোনোরকম ফাঁকি তাঁরা অবশ্যই মার্জনা করবেন না।

আজকের দিনে ত' নয়ই এমন কি তখনকার দিনেও জার্মাণীতে সাধারণ স্কুল-কলেজের সার্টিফিকেটের অভাবে কারো পক্ষে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বা ঐ ধরণের চাকুরী ব্যতীত অন্য কোনো রকম কাজকর্মের পক্ষে অসুবিধে দেখা দিতো না। কাজেই, আমাদের দেশে সাধারণত একটা ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাকে যে চোখে দেখে মানুষ, ওদের দেশে তা নয়। সকলেই যে কোনো ব্যাপার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়ে থাকেন।

হেসে কয়েক দিন চিন্তা করে তাঁর অভিভাবকদের জানালেন যে, ভবিষ্যতে যাতে একজন মেকানিক হওয়া যায় এইরকম কিছু উনি শিখতে চান—অর্থাৎ হাতেকলমে কাজ শিখবেন। সেই রকমই বন্দোবস্ত করা হলো। এবং যথাসময়ে হেসে মেকানিকের নির্দিষ্ট শিক্ষায় কয়েকটা বছর কাটালেন। কিন্তু কুড়ি-একুশ বছর বয়সের সময় খুব গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন হেসে এবং চিকিৎসকেরা এ কথাও বললেন যে এ অসুখ থেকে সেরে উঠবার পরেও শারীরিক পরিশ্রম বেশি করা হেসের পক্ষে উচিত হবে না। সুস্থ হয়ে উঠবার পরে হেসে কি করবেন তা' নিয়ে আত্মীয়স্বজনেরা ভাবতে লাগলেন। এদিকে হেসে ক্রমে সেরে উঠতে লাগলেন। শরীর তখনো বেজায় দুর্বল। একটু-আধটু বেড়াবার কথা বলেছেন চিকিৎসকেরা। তাই হেসে মাঝে-মাঝে এক-একদিন বাড়ীর কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পরিচিত এক ভদ্রলোকের বইয়ের দোকানে এসে বসতেন। কয়েকদিন পরে যখন আরো একটু সুস্থ হয়ে

উঠলেন তখন একাই এসে বসতেন ঐ বইয়ের দোকানে। যখন যে বইখানা পড়তে ইচ্ছে হতো সেলফ থেকে নিয়ে পড়তেন। খরিদ্দার এলে মাঝে মাঝে সেলসম্যানদের সাহায্য করতেন। এইভাবে ক্রমশঃ বইয়ের ব্যবসার দিকে ঝোঁক গেলো হেসের। এবং শেষ পর্যন্ত আত্মীয় স্বজনের অনুমতি নিয়ে বইয়ের ব্যবসাই আরম্ভ করে দিলেন।

পাঁচ বছর পরে দেখা গেলো হেসের বইয়ের ব্যবসা বেশ ভালোই চলছে। আত্মীয় স্বজনেরা আশাই করতে পারেন নি যে হেসের মতো লাজুক এবং ভাবুক প্রকৃতির মানুষ বইয়ের ব্যবসা করে দাঁড়াতে পারবেন। কিন্তু কার্যত ওঁর সাফল্য দেখে সকলেই প্রকৃত খুশীবোধ করলেন। এটা ১৯০৪ সালের কথা। ব্যবসায়ে হেসের সাফল্যের কথা যখন আত্মীয় পরিজনের মুখে মুখে ফিরছিল ঠিক এমনি সময় আর একটা খবর শুনে অবাক হয়ে গেলেন সবাই। কি ব্যাপার? না, হেসে উপন্যাস লিখেছেন একখানা "পিটার ক্যামেনজিণ্ড।" নিজের পয়সায় ছেপে বই বের করছেন দেখে যে সমস্ত বন্ধুবান্ধবেরা গোড়ায় টিটকারি দিয়েছিলেন এবার তাঁরাও আশ্চর্য হয়ে গেলেন যখন দেখা গেলো পর পর কয়েকমাস হেসের উপন্যাসখানার প্রতি মাসেই একটি করে নতুন সংস্করণ বেরুতে লাগলো। মাঝে মাঝে এক-আধটা সাময়িকপত্রে কিছু কিছু কবিতা এবং প্রবন্ধ হেসের বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু হেসে বাস্তবিকই একজন পুরাদস্তুর লেখক হয়ে উঠতে পারেন এটা কেউই ভাবেন নি কখনো। আসল ব্যাপার হ'লো গল্প এবং উপন্যাস রচনার জন্য কয়েক বছর থেকেই হেসে নিজেকে তৈরী করছিলেন। প্রচুর লিখছিলেন এবং সংশোধন করছিলেন—নিজের লাজুক প্রকৃতির জন্য দীর্ঘদিন চাপা ছিল খবরটা, এবার সবাই জানতে পারলেন হেসের উপন্যাস লেখবার জন্য অনুশীলনের কথা—একই বিষয়বস্তুর উপর চারখানা ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপি দেখা গেলো হেসের বাড়ীতে পড়বার ঘরে। মূল পাণ্ডুলিপি তৈরী হবার পরে ধীরে ধীরে সংশোধন করেছেন হেসে—তার ফলে এতো অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠলো জিনিষটা যে, সে ভাবে প্রেসে পাঠানো হয়তো উচিত হবে না মনে করে আবার পরিষ্কার করে লিখলেন, তারপর আবার কিছুদিন পরে সুরু হলো সংশোধন কার্য।

এই ভাবেই হেসে উপন্যাস লেখার কাজে নিজেকে নিজে দক্ষ করে তুলেছিলেন। কাজেই ছাপার অক্ষরে "পিটার ক্যামেনজিণ্ড" যদিও হেসের প্রথম উপন্যাস, কিন্তু এর পূর্ব-ইতিহাসটুকু বুঝিয়ে দেয় যে লেখার অভিজ্ঞতায় হেসে আদৌ নবীন ছিলেন না।

হেসে নিজেই বলে গেছেন যে "পিটার ক্যামেনজিণ্ড" প্রকাশিত হবার পর থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য লেখা ছাড়া আর কখনো কিছু করতে হয় নি ওঁকে। বইয়ের ব্যবসা থেকেও উনি বছর দুইয়ের মধ্যে একেবারে সরে আসেন। তারপর চলতে লাগলো শুধু লেখা।

হেসের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ যখন ঘোষিত হ'লো, তখন অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে দেখা গেলো যে, ওঁর একখানি বইও ইংরেজী ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে না। সে সময় পর্যন্ত গল্প-উপন্যাস-কবিতা ও প্রবন্ধ মিলিয়ে জার্মাণ ভাষায় যদিও প্রায় সাঁইত্রিশখানা বই ছিলো হেসের, কিন্তু তার মধ্যে একখানাও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয় নাই সে-সময় পর্যন্ত। এটা নিশ্চয়ই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, বিশেষ করে যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জার্মাণ ডিটেকটিভ উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ দর অভাব ছিল না। এর কারণস্বরূপ এক-একজন সমালোচক এবং এক-একজন সাহিত্যের ইতিহাসকার এক-এক রকম কথা বলেছেন। একদল বলেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের বিরোধিতা করবার জন্য হেসে বলতে গেলে এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই জার্মাণী সরকারী মহলের সুনজরে ছিলেন না। অনেকে অর্থাৎ অনেক পদস্থ সরকারী কর্মচারী তাঁকে দেশদ্রোহী এবং জার্মাণ জাতির শত্রু বলেও আক্রমণ করেছেন প্রকাশ্যে। এইজন্যই খাস জার্মাণী থেকে যে সব প্রতিষ্ঠান বিদেশী ভাষায় জার্মাণ বইয়ের অনুবাদ করাতেন তাঁরা হেসের বইয়ের অনুবাদ করান নি। আর ইংলণ্ড বা আমেরিকানরা যে হেসের বইয়ের অনুবাদ করেন নি তার কারণ ওঁদের বিশ্বাস ছিল যে হেসের বইয়ের বিশেষ কাটতি হবে না ও-সমস্ত দেশে—হেসের উপন্যাসগুলির বক্তব্য এবং চরিত্রগুলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বড় বেশি 'টিপিকালি জার্মাণ' বলে মনে হয়েছে ওঁদের।

এই দুই দল সমালোচকের কথার মধ্যেই কিছু কিছু সত্যতা আছে আমরা তা পরে দেখতে পাবো। যে "পিটার ক্যামেনজিণ্ড" লিখে হেসে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে এবার সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

নায়ক পিটার অনেক দিক থেকেই হেসে নিজে। নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা হেসে তাঁর প্রথম উপন্যাসের নায়কের মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন যে অনেকে এখানাকে আত্মজীবনীমূলক রচনা বলেই মনে করেন। নায়ক পিটারের সঙ্গে হেসের নিজের যে মিল তা শুধু চিন্তা জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাস্তব জীবনে নয়। পাদ্রী হবার জন্য ইস্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী হেসে কী পরিমাণ অপছন্দ করতেন তা আমরা দেখেছি—পাদ্রী না হয়ে ইচ্ছে করেই তিনি প্রথম জীবনে হয়েছিলেন একজন মেকানিক। সে সময়কার জার্মাণীতে নতুন শিল্প-সভ্যতার প্রভাবে সমাজ জীবনের সর্বত্রই সাজসাজ রব। কেউ পাদ্রী না হয়ে মেকানিক হবার চেষ্টা করে—কেউ কবি না হয়ে সেনাপতি হবার স্বপ্ন দেখে, কেউ বা শিল্পীর প্রতিভাকে স্টক এক্সচেঞ্জের দালালীর পেশায় নিয়োগ করবার জন্য প্রয়াসী হয়। কিন্তু ব্যক্তি জীবনের নিজস্ব রুচির ওপর জবরদস্তি করে এ ভাবে কেউ শেষ পর্যন্ত লাভবান হ'তে পেরেছে কি? 'আধুনিক'তার তাড়নায় পাদ্রী হওয়া পছন্দ না করে হেসে মেকানিক হয়েছিলেন কিন্তু যার তিন পুরুষ পাদ্রী হয়ে বসে আছে সে ইস্কুলে ধর্মের বই না পড়লেও যে কোনো সাধারণ মানুষের চাইতে তার পক্ষে বেশি ধর্মপ্রবণ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক—বিশেষ করে তাঁদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে। হেসেরও ঠিক তাই হয়েছিল। পাদ্রী না হলেও ভেতরে ভেতরে বেশ খানিকটা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির হয়ে উঠেছিলেন তিনি একেবারে যুবা বয়স থেকেই। হেসের প্রথম নায়ক পিটারকেও দেখা যায়, কি যে তার মন চায় তা সে নিজেই ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারে না। ধর্ম-সম্পর্কীয় নানা গল্প ও কাহিনী শুনতে শুনতে অনেক সময় নিজেকে অভিভূত বোধ করেও কিন্তু ওর যুক্তিবাদী মন শেষ পর্যন্ত শক্তি-সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় এবং 'অবতার' 'মহাপুরুষ' প্রভৃতির গালগল্পের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলো ও সুদূর প্যারিসে। প্যারিসে এসে শিল্প কর্মকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করলো।

... হলো পিটার। নিজের ব্যর্থতা দেখে ... হতে লাগলো; এদিকে পেশায় ব্যর্থতার ... ছিলো চরম অভাব-অনটন। শেষ পর্যন্ত দৈববাণী লাভ পিটার। সন্ত ফ্রান্সিস পুণ্য শরীরে আবির্ভূত হয়ে জানালেন ... চ্যালেঞ্জ করা নয়, তার বিরোধিতা নয়, তার সঙ্গে ... অনুভব করবার জন্যই তোমার অন্তর ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ... এ জাগিদকে হেলায় নষ্ট করো না। এরপর পিটারের স্বভাবতই ধর্ম হয়ে উঠলো প্রধান, শিল্পকর্ম গৌণ।

হেসের দ্বিতীয় উপন্যাস "আনটারম র‍্যাড"-ও কিছুটা আত্মজীবনী-... । যে কারণেই হ'ক হেসের ইস্কুল পালানোর কথা আমরা ...লেই বলেছি। এই দ্বিতীয় কাহিনীর মাধ্যমে হেসে দেখিয়েছেন ...হীন এবং বিরক্তিকর পড়াশুনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ... করে একটি তরুণের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলো এবং শেষ পর্যন্ত জলে ... মরলো।

তৃতীয় উপন্যাস "ক্লাকবার্গ" এ হেসে একটি ছোটো শহরের ... জীবনযাত্রাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

যে বছর হেসের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হ'লো সেই বছরই ... করেছিলেন উনি। দশ বছরের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা- ... উপন্যাস "রসহাল্ড" প্রকাশিত হ'লো ১৯১৪ সালে। সে বছর ...রোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সুরু হ'লো। এই উপন্যাসেই হেসে ...প্রথম যৌনজীবনকে তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য দিলেন। এ কাহিনীর ...নায়িকার জীবন মোটেই সুখের হয়নি। অনেকের মতে এর ...হিনী ভাগ বাস্তবিকপক্ষে হেসের নিজের সাংসারিক জীবনেরই চিত্র। ... বিবাহিত জীবনের অবসান হয়েছিল বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্যে ... ১৯২৩ সালে। ১৯৩১ সালে উনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন।

হেসের একখানি বিচিত্র-উপন্যাস হ'লো "ন্যুলপ"। এর ...হিনীতে দেখা যায় একটি ভবঘুরে যুবক নানা আশ্চর্য উপায়ে ... মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে প্রত্যেকেরই কিছু না ... কাজে আসছে, প্রত্যেকেরই জীবনে আনন্দের জোগান দিচ্ছে, ...চ ও নিজে শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে মারা যাচ্ছে। মৃত্যুর ...মুখি দাঁড়িয়ে ও পরমেশ্বরের নিকট তার প্রতি অবিচারের ... পেশ করেছে। কেনই বা মানুষের জন্ম আর কেনই অকালে তা শেষ করা! এই রচনাটি হেসে দেখবার ... করেছেন যে বাল্য এবং শৈশবের পরে মানুষের জীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়—তা ক্রমশঃ পঙ্কিলতার দিকে টেনে ... থাকে। যেমন পবিত্রতা, সুখ, স্বপ্ন এবং রঙিন আশার মধ্যে ...বের জীবনের সুরু হয়, তেমনই নোংরামির মধ্যে সমস্যা ভারাক্রান্ত- ... চরম ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হয় মানুষের জীবন।

'ন্যুলপ' প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। গোটা ইয়োরোপে তখন ... গেলে সর্বত্র আগুন জ্বলছে। নব্য-জার্মাণী বিভীষিকার কারণ ... উঠেছে সভ্য জগতের—চোখে। হেসে জাতিতে জার্মাণ। ...দেশীয় বেশির ভাগ লেখক এবং শিল্পীই কাইজারের সাম্রাজ্য-লিপ্সার ... করতে সুরু করলেন প্রকাশ্যে। বেশির ভাগ লেখকরাই এই ... নিয়ে তাঁদের সাহিত্যের বক্তব্যের মোড় ফেরাতে চেষ্টিত হলেন। ... ধারা গুরুত্বপূর্ণ সময়েই হেসে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, এ যুদ্ধের

জন্য মানুষ হিসাবে জার্মাণ জাতির ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ ... না। এই অর্থহীন যুদ্ধের জন্যে প্রাণ দেওয়া চরম মূর্খতার পরিচায়ক প্রত্যেক বিবেকবান এবং কৃষ্টিবান জার্মাণের উচিত এই যু... বিরোধিতা করা, লোকক্ষয় যাতে বন্ধ করা যায় তার জন্য চেষ্টা কর... কী দুঃসাহস।

দুঃসাহসই বটে! হেসের এমনি ধারা প্রকাশ্য উক্তির ... বলতে গেল সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন, সরকারী তরফে তো বটে... ব্যক্তিগত বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনেরাও গোটা জার্মাণী... মুষ্টিমেয় যে ক'জন শান্তিবাদী মানুষ ছিলেন সে সময়ে, তাঁরা অনেকে... গোপনে হেসের সংসাহসের তারিফ করলেন বটে কিন্তু আবার এ কথা বললেন যে বর্তমান অবস্থায় তোমার জার্মাণী ত্যাগ করে চলে যাও... উচিত।

১৯১২ সাল থেকে বছরের বেশিরভাগ সময়ই হেসে সুইজারল্যা... বসবাস করতেন। এবার স্থায়ীভাবেই সংসার পাতলেন ওখানে তারপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জার্মাণীতে উনি অনেক বারই এসেছেন। কিন্তু সে নেহাৎ বেড়িয়ে যাবার জন্য। আস্তানাটা সুইজারল্যাণ্ডেই রেখেছেন। ১৯২৩ সালে হেসে সুইজারল্যাণ্ডেরই নাগরিক হয়ে যান। কাজেই যদিও হেসে জার্মাণ ভাষায় লিখতেন, কিন্তু আইনের দিক থেকে মৃত্যুর সময় বা নোবেল পুরস্কার লাভের সময় উনি সুইস ছিলেন।

সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান সুরু করবার পূর্ব পর্যন্ত হেসের সাহিত্যের সুর মোটামুটি ভাবে একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করে চলছিল বলা যায়। প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রেরই রয়েছে একটা ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, যা পাওয়া যাবে না তাকেই পাবার জন্য একটা তীব্র আকুতি এবং তার ফলে একটা মানসিক সংকট। প্রতিটি কাহিনীর বাস্তব লক্ষণও উল্লেখযোগ্য এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঈশ্বর বা কোনো সাধু-সন্তের আবির্ভাব বা পরোক্ষ প্রভাবের ফলে ঘটনাবলীর জট-ছাড়ানো। অর্থাৎ একটা আধ্যাত্মিক লক্ষণ রয়েছে কিন্তু তার প্রভাব বেশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেখানো হয়েছে। আধ্যাত্মিক চিন্তা এই সময় পর্যন্ত হেসেকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করতে পারেনি—যদিও শিল্পের দীনতা, অসম্পূর্ণতা ব্যর্থ সহায়তার কথা তিনি বহুবার বহুভাবেই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর আদর্শ শিল্পই ছিলো অধ্যাত্ম চিন্তা নয়।

স্থায়ীভাবে সুইজারল্যাণ্ডে ঘরবাড়ী করে নেবার পর হেসের প্রথম উপন্যাস হলো "ডেমিয়ান"। ১৯১৯ সালে প্রকাশও এই উপন্যাসে হেসে প্রথম মহাযুদ্ধের বিষময় ফল দেখাবার চেষ্টা করেছেন—বিশেষ করে জার্মাণীর পক্ষে। পরাজিত জার্মাণী, পঙ্গু জার্মাণী, গোটা পৃথিবীর অভিশাপ জর্জর জার্মাণীর কি হবে? কি তার বর্তমান, ভবিষ্যৎই বা বা কি? কেই বা দেখাবে পথ? একটা দারুণ হতাশা গোটা জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কাইজার বিমুক্ত জার্মাণীর লক্ষ লক্ষ মানুষ আগ্রহের সঙ্গে পড়লো এ বই। একদল তরুণ সুইজারল্যাণ্ডে এসে দেখা করলো হেসের সঙ্গে। তারা আবেদন জানালো পিতৃভূমিতে ফিরে যেতে। কিন্তু হেসে রাজী হলেন না। এ উপন্যাসেও হেসে দেখিয়েছেন শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি মানুষের যে মানসিক সংকট বর্তমান শিল্প সভ্যতার যুগের পৃথিবীতে তার হাত থেকে একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তিই মানুষকে রক্ষা করতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে আসবার পূর্বে

হেসের সাহিত্যে নতুন যে চিন্তা দেখা গেলো সে হলো মনোবিশ্লেষণের প্রয়াস এবং তাঁর অধ্যাত্মচিন্তায় নীটশের প্রভাব।

হেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "সিদ্ধার্থ" প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। অনেকের মতে তো এইখানাই হেসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। সিদ্ধার্থ-এ দেখা যায় হেসে তাঁর চিন্তাজগতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। যে আধ্যাত্মিকতা এতদিন পর্যন্ত অন্য পাঁচ রকমের চিন্তাধারণার একটিমাত্র ছিলো, তা এবার স্পষ্টতই সর্বপ্রধান জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুন্দরকে সৃষ্টির মধ্যেই হেসে আর তাঁর সাহিত্য সাধনা সীমিত রাখতে প্রস্তুত নন—সত্য এবং মঙ্গল এবার ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেলো তাঁর সাহিত্যিক বক্তব্যের মধ্যে।

আড়াই হাজার বছর আগের ভারতবর্ষের পটভূমিকায় রচিত হেসের 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসখানা আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও রচনাটি তাঁর বিস্ময়কর শিল্পচাতুর্যের সাক্ষ্য বহন করে। এর কাহিনী অংশে দেখা যায়: সিদ্ধার্থ, একটি ব্রাহ্মণ যুবক, অন্তরের তাগিদে সন্ন্যাস নিলো। ওর গুণমুগ্ধ বন্ধু গোবিন্দও সন্ন্যাস নিলো ওর সঙ্গে। কিছুদিন পরে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে ভারতের জনমানসে দেখা দিলো প্রচণ্ড আলোড়ন। সিদ্ধার্থ এবং গোবিন্দ—দু'জনেই এলো বুদ্ধ-দর্শনে। গোবিন্দ বুদ্ধদেবের ভক্ত হয়ে গেলো। কিন্তু সিদ্ধার্থ হলো না। সিদ্ধার্থ মনে করলো ব্রহ্মজ্ঞান এমন একটা বস্তু যা একজনের লাভ হলেই তার ফলে অন্যের লাভ হয় না। অর্থাৎ কিনা ঈশ্বর সান্নিধ্য ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের বাস্তবজীবনে অনুভূত হওয়া উচিত—, জিনিসটা কারো মারফৎ হওয়া উচিত নয়—তা সে ব্যক্তি যতই উচ্চমার্গের হন না কেন। এরপর সিদ্ধার্থ একসময় সন্ন্যাস বর্জন করলো, এলো সহরে একটি নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে রীতিমতো সংসারী হলো, অর্থোপার্জনের চেষ্টা করলো এবং কার্যত: ধনীও হ'লো। এদিকে কমলা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলো এবং সর্পাঘাতে মারা গেলো। একটি ছেলে রেখে গেলো কমলা। সিদ্ধার্থের ছেলে। ছেলেকে নিয়ে নতুনভাবে জীবন সুরু করলো সিদ্ধার্থ। দিন যায়। পিতাপুত্র পরস্পরের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগলো ক্রমশ:। তারপর ছেলে একদিন নিরুদ্দিষ্ট হলো সিদ্ধার্থকে ছেড়ে।

এদিকে বিশটা বছর পার হয়ে গেছে। যৌবনের আশা আকাঙ্খা প্রায় সবই একটি একটি করে ঝরা ফুলের মতো শুকিয়ে গেছে। একদিন হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধার্থ চলে এলো একটা নদীর ধারে। খেয়ামাঝি বাসুদেবের সঙ্গে বহুকাল আগে সন্ন্যাসজীবনে পরিচয় হয়েছিল একবার। দু'জনেই চিনতে পারলো দু'জনকে। কিন্তু সুখ-দুঃখের কথার পরে খেয়ামাঝি বাসুদেবের মুখ থেকেই সিদ্ধার্থ শুনলো অমূল্য সত্য কথাটি: সময় অনেকটা এই নদীটার মতো, শুধু চলছে তো চলছেই, সুরুতে স্রোত, মাঝখানে স্রোত, শেষে স্রোত, —আসলে সর্বত্রই এক, একটি স্রোত। গোটা সৃষ্টিটাও এই রকম—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সসীম মনের বিকারমাত্র, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য বা পার্থক্য বোধ শুধু সত্যজ্ঞানের অভাবের লক্ষণ মাত্র। প্রকৃত জ্ঞান হলেই মানুষ বুঝতে পারে যে একের সঙ্গে অন্যের আত্মার কোনোই প্রভেদ নাই। এই ভাবেই চিন্তা করতে করতে সিদ্ধার্থ শেষ পর্যন্ত স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা অনুভব করলো।

"সিদ্ধার্থ"-এর পর থেকে হেসের সাহিত্যসাধনা একটি সরল পথ ধরে এগোতে লাগলো। সে হলো আধ্যাত্মিকতার পথ। সরাসরি ভাবে প্রবন্ধের মাধ্যমে হেসে তাঁর দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক মত প্রকাশের চেষ্টা তো করছেনই, উপন্যাসের মাধ্যমেও এইটিই তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো এতদিনে।

"সিদ্ধার্থের" ছয় বছর পরে লেখা "ষ্টেপেন্‌উলফ" উপন্যাসে হেসে নৈতিকতা এবং মানবিক কৃষ্টি-বিবর্জিত নগর সভ্যতার অসাড়তা দেখাবার চেষ্টা করলেন। উচ্চতর অধ্যাত্ম চিন্তা ব্যতীত যে মানুষের মন কোনো কিছু পেয়ে স্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারে না—এই কথাটাই নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ষ্টেপেন্‌উলফের তিন বছর পরে লেখা "নারজিস এণ্ড গোল্ডমাণ্ড" উপন্যাসখানির মূল বক্তব্য একই যদিও, কিন্তু শিল্পকর্ম হিসেবেও এ একখানি অসাধারণ সৃষ্টি। দুটি পরস্পর বিরোধী চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন হেসে। নারজিস একজন দর্শন-বেত্তা সুপণ্ডিত মঠাধ্যক্ষ। গোল্ডমাণ্ড মঠের একজন শিক্ষার্থী যুবক। একদিন দেখা গেলো গোল্ডমাণ্ড অকস্মাৎ মঠ ত্যাগ করবার সংকল্প ঘোষণা করলো। ও বললো: বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাকে অর্জন করতে হবে, তা না হলে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার্জনের ফলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হতে পারে না। আমি মঠ ত্যাগ করে বাস্তব জীবনে পৃথিবীকে জানবো। সকলেই বিশেষ করে গোল্ডমাণ্ডের গুরু নারজিস অনেক বোঝালেন ওকে, মঠ-জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কিছুই বললেন। কিন্তু কোনই ফল হ'লো না। গোল্ডমাণ্ড মঠ থেকে বেরিয়ে এলো, সাধারণ মানুষের মতো দুঃখকষ্ট ভোগ করবার জন্য। বাস্তব জীবনে এসে ও একটির পর একটি রমণীর লালসায় ইন্ধন জোগাতে লাগলো। ক্রমাবনতি হ'তে লাগলো ওর নৈতিক জীবনের।

হেসের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই জার্মাণীর জাতীয় চরিত্রের কোনো না কোনো দিক প্রতিফলিত হয়েছে নানা চরিত্রের ভেতর দিয়ে। কিন্তু 'নারজিস এণ্ড গোল্ডমাণ্ড' (ডেথ এণ্ড দি লাভার)-এ এই জিনিসটি যতোটা পূর্ণাঙ্গভাবে ফুটে বেরিয়েছে ততোটা আর কোনো উপন্যাসেই হয়নি বলে জার্মাণ সমালোচকেরাই মনে করেন। কাজেই জীবন সম্পর্কে একটা রীতিমতো দার্শনিক ধরণের গুরুত্ববোধের যে খ্যাতি জার্মাণদের আছে, নারজিস এবং গোল্ডমাণ্ড চরিত্র দুটির মধ্যে তা পরিপূর্ণভাবে দেখা যায়। আসলে ওদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা থিয়োরী এবং প্র্যাকটিসের দ্বন্দ্ব। একজন অন্যায় এবং কুশ্রীতাকে এড়িয়ে চলবার জন্য বাস্তব-জীবনটাকেই এড়িয়ে চলছে—আর একজন মনে করে জীবন সম্পর্কে থিয়োরী যেটুকু আহরণ করা সম্ভব তা' শেষ করে তারপর তা' ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা প্রয়োজন—এটা করতে গিয়ে বাস্তব জীবনের নানা অভাবিত এবং জরুরী অবস্থার চাপে যেটুকু অসুন্দর অবস্থার সঙ্গে খাপখাওয়ানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তাকে মানিয়ে চলাই শ্রেষ্ঠতর জীবনদর্শন। হেসে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে এই শেষোক্ত ধরণের জীবনযাত্রা একটা আর্ট-বিশেষ। শিল্পীর নিষ্ঠা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গেই বাস্তব জীবনকে গ্রহণ করা উচিত।

হেসের সাহিত্য প্রতিভার আর একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি "মাজিষ্টার লুডি।" সমাজের ওপরতলার মানুষেরা কী রকম অবাস্তব ভাবে সমাজজীবনকে গণ্য করে থাকে, এ উপন্যাসে সেই চিত্রই দেখাবার চেষ্টা করেছেন হেসে। এর প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রেণীসংগ্রাম নয়, শুধু বাস্তববোধের অভাব। শ্রেণী-সংগ্রাম হেসের মতে আজকে 'পৃথিবীর

প্রধান সমস্যা নয়। ব্যক্তির নিজের ভেতরের সমস্যাই বেশির ভাগ সামাজিক সমস্যার মূল কারণ বলে হেসের বিশ্বাস।

গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ও উপন্যাস—সব নিয়ে হেসের মোট বইয়ের সংখ্যা চল্লিশের ওপর। তার মধ্যে মাত্র কয়েকখানা, বোধ হয় খানপনেরো এখন পর্যন্ত ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। আমরা এর মধ্য থেকেই কয়েকখানা সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করলাম।

আজকের দিনে যাকে বলা হয় 'অন্ত জগতের মানুষ', একদিক থেকে হেসে ছিলেন তাই। রাজনীতির ধারে কাছেও যেতেন না কখনো। ১৯৪৬ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে যাবার পর জার্মাণরা যখন হেসেকে সাহিত্য-শিল্পের জন্য শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার 'গ্যেটে প্রাইজ' দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো, তখন দেখা গেলো হেসে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন প্রাইজটা নেওয়া ঠিক হবে কিনা তা' বুঝবার জন্য। যখন সকলেই, এমন কি সে সময়কার জার্মাণ সরকারেরও একাধিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি জানালেন যে "গ্যেটে প্রাইজ" নেওয়া মানে এ নয় যে, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের জার্মাণ রাজনীতির কিছু আপনাকে সমর্থন করতে হবে—শুধুমাত্র এ-কথা পরিষ্কারভাবে জানবার পরই হেসে রাজী হয়েছিলেন পুরস্কারটি গ্রহণ করতে।

বিভিন্ন শ্লাভ এবং ফরাসী ভাষায় বিগত পঞ্চাশ বছর ধরেই হেসের এই অনুবাদ হয়ে আসছে নোবেল প্রাইজ পাবার পর থেকে ইংরেজীতে। এখন পর্যন্ত ওঁর যে ক'খানি বই বেরিয়েছে তাতেই যোগ্য সমালোচকগণ হেসেকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলে মেনে নিয়েছেন।

সুইজারল্যাণ্ডে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার পর থেকেও হেসে ইয়োরোপের প্রায় সব দেশেই প্রচুর বেড়িয়েছেন। ওঁর সব চাইতে প্রিয় জায়গা ছিলো ইতালী। ফুরসুৎ পেলেই একটু ইতালী ঘুরে আসতেন হেসে—কখনো কখনো এমন কি বছরে আটবারও এসেছেন ইতালীতে।

বর্তমান শতাব্দীর ইয়োরোপের অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন হেসে। ক্রোচে, দান্নুৎসিও, রোঁলা, টমাস মান, হাউপ্টম্যান, মেটারলিঙ্ক, ফ্রয়েড, এ্যাডলার, আইনষ্টাইন, ক্রাল, কামু, সার্ত্র, হাইডেগগার প্রভৃতি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন হেসে সম্পর্কে। টমাস মানকে এ যুগের জার্মাণীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলা হয়। আর টমাস মান বলতেন: সাহিত্য-স্রষ্টা হিসেবে হেসে কোনো দিক থেকেই আমার চাইতে ছোটো নন, মানুষ হিসেবে তো আমি ওঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধাই করি এবং ভালবাসি।

সেই এক তাল গাছ

অর্পিত মজুমদার

সেই এক তাল গাছ—
এখনো দাঁড়িয়ে আছে।
পুঞ্জীভূত বঞ্চনার বেদনা বহ্নিরা—
সকাল সন্ধ্যায়—তার তল দিয়ে—
'দাবি'-মা-মানার 'স্লোগান' দিয়ে
মিছিল করে পার হয়—আমাদের দাবি···

: পৃথিবীর পথে প্রান্তরে—
নিয়ত যে দাবির স্লোগান দিয়ে
হাজারো মিছিলের মহোৎসব চলে,—
সাক্ষী তার—ওই তাল গাছ—
মহাকালের কাঠরায় সে সাক্ষী ॥

মিছিল প্রেতাত্মা হয় একদিন—
তাদের পাতায় দীর্ঘশ্বাস ঝরে,
অশরীরি দীর্ঘশ্বাস ॥

তবুও দাঁড়িয়ে থাকে সেই তালগাছ,
দীর্ঘশ্বাস 'দানা' বাঁধে—
রাত্রি আসে বঞ্চনার পাহাড়ে পাহাড়ে,—
সাঁঝের 'শুকতারা'—লক্ষতারা'র মিছিল হতে ফিরে আসে—
ভোরের পৃথিবীতে, (চোখে তার সাধনায় রং।)
মিছিলের মৃত্যু হয়—জন্ম নেয় আর এক মিছিল।
সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীর মাটিতে—
ভেসে ওঠে স্লোগানের সুর,—
আমাদের দাবি·············

তবুও দাঁড়িয়ে থাকে সেই তালগাছ।
শকুনেরা 'বাসা' বাঁধে,—
কোকিল কাকলি তোলে,—
ক্যাংটা ছেলেটা খেলা করে তার তলে—
জাবর কাটে বৎসসম্ভবা গাভী।
তবু ও দাঁড়িয়ে থাকে সেই তালগাছ,—
ইতিহাস লেখেনা সে—
মাঝে মাঝে ফেলে দীর্ঘশ্বাস ॥
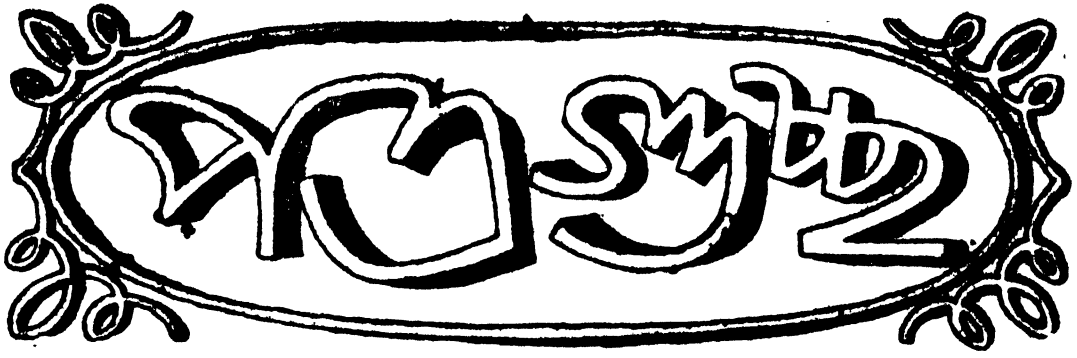
রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে

কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র—তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ-সভা।

বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয় নি। তোমার সাহিত্যরসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশন-পাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।·····

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ, এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়।···যে লেখায় প্রাণ আছে, প্রতিপক্ষ তার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের, তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে-চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালির ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়। কল্পনা শক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্য দান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন,—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে গুণে ভালোয় মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল লেখায়।—রবীন্দ্রনাথ।

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত

D. A. G's Office, Rangoon.
22. 3. 12.

প্রমথ,—তোমার পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি। এমন ত হয় না। যে আমার স্বভাব জানে তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশি জবাবদিহি করা বাহুল্য।···

···আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ। তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাইরে একখানা ছোটো বাড়িতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

(২) চাকরি করি। ১০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং ১০৲ allowance পাই। একটা ছোটো দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয় কোনো মতে কুলাইয়া যায় এইমাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

(৩) Heart disease আছে। যে-কোনো মুহূর্ত্তেই—

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology & Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript; 'নারীর ইতিহাস' প্রায় ৪০০-৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম, তাও গেছে।

ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এ বৎসর publish করিব। আমার

দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল। সবই গেল।···

···আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন Heart diseaseএর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া Oil-painting সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil-painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। Novel, History, Painting—কোনটা? কোনটা আবার সুরু করি বলত? তোমার স্নেহের শরৎ।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—তোমার আগেকার চিঠিরও এখনো জবাব দিই নি। ভাবছিলাম—তুমি কেন যে আমাকে চিরকাল এত ভালবাস। আমি এ কথা অনেকদিন থেকেই ভাবি।··প্রমথ, একটা অহঙ্কার করব, মাপ করবে?

যদি কর ত' বলি। আমার চেয়ে ভাল novel কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না, যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্ব্বে নয়। এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে আমি অসত্য খাতির চাই না, আমি সত্য চাই।—শরৎ

১৭ই এপ্রিল, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—তোমার পত্র কাল পাইয়াছি, আজ জবাব দিতেছি।··· তোমাকে অন্ততঃ পড়িবার জন্যও 'চরিত্রহীন'-এর যতটা আবার লিখিয়াছিলাম (আর অনেকদিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি। আগামী মেলে অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই পাইবে। কিন্তু, আর কোনও কিছু বলিতে পারিবে না। পড়িয়া ফিরাইয়া দিবে। তাহার প্রথম কারণ, এ লেখার ধরণ তোমাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। Appreciate করিবে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। তাই এটা ছাপিয়ো না। সমাজপতি মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, কেননা তাঁহার সত্যই ভাল লাগিয়াছে।···আমার এসব বকাটে লেখা—এর যথার্থ ভাব কেই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে, কেই বা ভাল বলিবে।···তুমি যদি সত্যই মনে কর এটা ছাপার উপযুক্ত, তা' হলে হয়তো ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হলে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয় এই চেষ্টা করিবে তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না। যদি আংশিক পরিবর্ত্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না। তবে একটা কথা বলি, শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়াই চরিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন Ethicsএর student, সত্য student. Ethics বুঝি, এবং কাহারও চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না। যাহা হউক পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো। তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য আছে সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়।···যদি ছাপবার উপযুক্ত মনে হয় তাহা হইলেও বলিয়ো। আমি শেষটা লিখিয়া দিব। শেষটা আমি জানিই। আমি যা' তা' যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না। গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য করে লিখি এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না। বৈশাখের যমুনা কেমন লাগল? 'পথনির্দ্দেশ' বুঝতে পারলে কি? শীঘ্র জবাব দিয়ো—

২৪শে মে, ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—দ্বিজুদার মৃত্যুসংবাদ Rangoon Gazette-এ পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়েছিলাম। তাঁহাকে আমি যে কম জানিতাম তাহা নহে, অবশ্য তোমাদের মত জানিবার অবকাশ পাই নাই, কিন্তু যেটুকু জানিতাম আমার পক্ষে তাহা বড় কম ছিল না।···

তাঁহার মান্য রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমার সাধ্য নিশ্চয় করিতাম,···তিনি সাহিত্যিক এবং যোদ্ধা ছিলেন। তিনি আমার মূল্য বুঝিতেন এবং না বুঝিলেও তাঁর কাছে আমার অপমান ছিল না। সেইজন্য মনে করিয়াছিলাম লিখিয়া পাঠাইব। তিনি ভাল বুঝিলে প্রকাশ করিবেন, না ভাল মনে করিলে প্রকাশ করিবেন না। তাহাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না, অভিমানও হইত না। কিন্তু এখন যে সে আমার দাম কষিবে। হয়ত বলিবে প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়, হয়ত বলিবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও বা file কর। সুতরাং আমাকে ভাই ক্ষমা কর। তুমি আমার কতবড় সুহৃদ তাহা আমি জানি। সে কথাটা একদিনের তরেও ভুলিব না, তুমি আমাকে ভুল বুঝিলে বা আমার উপর রাগ করিলেও আমার মনের ভাব অটল থাকিবে, কিন্তু এ অন্য কথা। অপরের কাগজের জন্য আমি নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করিব না। আমি ছোট কাগজে লিখি ভাই, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমি সেখানে সম্মান পাই, শ্রদ্ধা পাই, এর বেশি আর কিছু আশা করি না। আর একটা কথা—চরিত্রহীন সম্বন্ধে।···লিখিয়াছেন, ···বাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছেন—ওটা এতই নাকি immoral যে, কোনও কাগজেই বাহির হইতে পারে না। বোধ হয় তাই হইবে, কারণ তোমরা আমার শত্রু নও যে মিথ্যা দোষারোপ করিবে, আমিও ভাবিতেছি ওটা লোকে খুব সম্ভব এইভাবেই প্রথমে গ্রহণ করিবে।···

···আমার নিজের নামের জন্য আমি এতটুকুও মনে ভাবি না। লোকে যা ইচ্ছে আমার সম্বন্ধে মনে করুক।—যাক এ কথা। 'কাল'ই আমার বিচার করিবে। মানুষ সুবিচার অবিচার দুই-ই করিবে, সেজন্য দুর্ভাবনা করা ভুল।···আমি শুধু পদ্য লিখতেই পারি না, তা ছাড়া সব রকমই পারি।···আমি সম্পাদকের কাছে নিজের লেখা যাচাই করিতে পারিই না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকে লিখিত

ডিসেম্বর ১৯১৫

প্রিয় সুধীর,—কাল রাত্রে তোমার পত্র পাইলাম। বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না? তবে প্রায় অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি দু' এক মাস দেরি হয় বরং সে ভাল, কিন্তু পাছে এমন করিয়া সুরু করিয়া খারাপ হইয়া শেষ হয়, সেই আমার বড় ভয়।

তবে, আর ছাপা বন্ধ হইবে না, পরের মেলেই একটা যাবে।

হয়ত বেশী হইবে। আর একটা কথা, rewrite করার জন্ম অনেক সময় ভয় হয়, পাছে যাহা একবার পূর্ব্বে বলিয়াছি, হয়ত আবার তাহা বলিতে পারি। যতটা ছাপা হইয়াছে, তাহার অনেক Copy আমি পাই নি। যদি Registry করিয়া সমস্ত ছাপাটা পাঠাও বোধ করি সিকি পরিশ্রম আমার কমিয়া যায়। অতি অবশ্য সবটুকু গোড়া হইতে পাঠাইয়া দিবে। তাড়াতাড়ি করিয়া ত সবটুকু ১৫ দিনে হয়; কিন্তু সে কি ভাল? তবে আর যত বিলম্বই হোক মাঘ মাসের শেষে বেশি ছাপা শেষ হয়ে যেতে পারবেই। আমার হাতের অবস্থা ঠিক তেমনি, বোধ করি আর ভালই হবে না। ইচ্ছা আছে ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় যাব। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

১৪ মার্চ্চ, ১৯১৬

··শুনিয়াছ বোধ হয়, আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে পারি না বলিলেই চলে। তবে লেখাপড়ার কাজ পূর্ব্বের মতই করিতে পারি। কিন্তু মন এত বিমর্ষ যে, কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করে না—করিলেও তাহা ভাল হয় না। শুধু যেগুলা আগে লেখা ছিল—অর্থাৎ অর্দ্ধেক, বারো আনা, চার আনা, এমন অনেক লেখাই আমার আছে—সেইগুলাই কোনমতে জোড়া-তাড়া দিয়া দিই। চরিত্রহীন সম্বন্ধে ওটা করিতে চাই নাই বলিয়াই এতদিন ২ অধ্যায় করিয়া পাঠাইতেছিলাম। এবার তুমি আমার কাছে বসিয়া না হয় সবটা ঠিক করিয়া লইও। আমি কবিরাজি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোন মতেই গেল না। আজকাল সপ্তাহে একটা, কখনও বা দেড় সপ্তাহে একখানা করিয়া জাহাজ ছাড়িতেছে।··বেশ ত আসতে ইচ্ছা কর এসো। কিন্তু টিকিট পাবে কি?

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীকে লিখিত

বাজে-শিবপুর, হাওড়া

২৮·৩·২৫

তোমার চিঠি পড়িলাম। এবার কাশীতে গিয়া এত লোকের ভীড়ের মধ্যেও, কেবল তোমাকেই শুধু আত্মীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। অথচ কিছুই তোমার জানিতাম না। এই পত্র পড়িতে সময় কিছু নষ্ট হইল বটে, কিন্তু সময় কি শুধুই প্রহর দণ্ড পল বিপল? তার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়? সে দিক্ দিয়া তোমার এই সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে এবং আমার পড়িতে ও চিন্তা করিতে কিছুই নষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ কিছু সঞ্চয় হইল··মেয়েদের ২৩ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই সঙ্কটজনক সময়, কারণ ২২।২৩-এর পরে, যখন সত্যকার প্রেম জাগ্রত হয়—তখন কেবল আধ্যাত্মিক ভালবাসাতে ইহার সকল ক্ষুধা মেটে না। কিন্তু এ তো গেল একটা দিক—শারীরিক দিক। কিন্তু আর একটা বড় দিক আছে—সেইটাই চিরদিনের মীমাংসাবিহীন সমস্যা। সংসারে সচরাচর এরূপ ঘটে না, কিন্তু যে দুই চারিজনের অদৃষ্টে ঘটে, তাহাদের মত ভাগ্যবানও নাই—দুর্ভাগ্যও নাই। ইহাদের দুর্ভাগ্যের উপর কাব্যজগতের সকল মাধুর্য্য সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে··অথচ এত বড় সত্যও আর নাই—

সুখ দুখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই।

··সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবল মাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্য্যাদাহীন প্রেমের ভার, আলগা দিলেই দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে।··তা ছাড়া শুধু নিজেদের কথা নয়, ভাবি সন্তানের কথাটা সব চেয়ে বড় কথা, তাহাদের ঘাড়ে অপরের বোঝা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা অতি বড় প্রেমেরও নাই।··একটা কথা।—যথার্থ ভালবাসিলে মেয়েদের শক্তি ও সাহস পুরুষের অপেক্ষা ঢের বেশী। কোনো কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করে না। পুরুষেরা যেখানে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, মেয়েরা সেখানে স্পষ্ট কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিতে দ্বিধাই করে না।··সমাজের অবিচার অত্যাচারের যে কেহ প্রথমে প্রতিবাদ করে, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়।···

ইং ১৯২৫

···সত্যকার ভালবাসার জন্য জগতে দুঃখভোগ নাকি করিতে হয়। কেহ না করিলে সমাজের অর্থহীন অবিচারের প্রতিবিধান হইবে কিসে? সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া, আর ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাওয়া যে এক বস্তু নয়—এই কথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়।···

শ্রীঅতুলানন্দ রায়কে লিখিত

কল্যাণীয়েষু—শ্রাবণের [১৩৪০] 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র—সাহিত্যের মাত্রা—সম্বন্ধে তুমি আমার অভিমত জানতে চেয়েছো। এ চিঠি ব্যক্তিগত হলেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত করা যায়, কিন্তু অনেক চারপাতা জোড়া চিঠির শেষ ছত্রের 'কিছু টাকা পাঠাইবার' মতো এরও শেষ ক'লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইয়োরোপ তার যন্ত্রপাতি ধনদৌলত-কামান-বন্দুক মান-ইজ্জত সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করবো যে, বয়েস ত অনেক হলো, ও-বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাবো।

কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তোমাদের সন্দেহ তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হলো ওরা 'মত্ত হস্তী' 'ওরা বুলি আওড়ালে' 'পালোয়ানি করলে' 'কসরৎ কেরামত দেখালে' 'প্রব্লেম সলভ করলে' অতএব ওদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকরও নয়। শ্লেষ বিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে। অথচ, ক্ষোভ প্রকাশও যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমনি বিফল। কার তৈরী-করা বুলি পাখীর মতো আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি 'খেল' দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর।

'সাহিত্যের মাত্রাই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, এ কথা অস্বীকার করি নে যে, কবির এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাট-বাজার, হাতী-ঘোড়া, জন্তু জানোয়ার—ভেবেই পাইনে মানুষের সামাজিক সমস্যার নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগ-সই হলেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছুদিন পূর্ব্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে

ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্ত্তক-সংঘের মতিবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হ'লো কি? প্রমাণ করলে কি? বিড়ালের যুক্তিতে এ কথা ত ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে, যে-হেতু অতি-নিকৃষ্ট-জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে, তুমি আপত্তি করো নি, অতএব, অতি-উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসবো, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এ সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায় অন্যায়ের বিচার হয় না। এ সব উপমা শুনতে ভালো, দেখতেও চকচক করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে, তা অকিঞ্চিৎকর। বিরাট ফ্যাক্টরির প্রভূত বস্তু-পিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ কথা প্রতিপন্ন হয় না।

আধুনিক কালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ ওটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদলে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোষ করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না। তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে না কটু কথা দিয়ে? কবি বলেছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতেই নয়। ওটা মরীচিকা।

কবি বলচেন, "উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, "উপন্যাস সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি, চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে" তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েছেন এই বলে যে, "যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।" বচনটি স্বীকার করে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে—হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিন কাল বদলেছে এবং বয়েসও বেড়েচে; সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তা হলে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করি নে। তারা অনায়াসে বলতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ করে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা করে দেখিয়েছেন, 'বুলির' খাতিরে ও দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি সমালোচনা করবো না, কারণ, ও দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, ধর্ম্মপুস্তক ত বটেই, হয় ত বা ইতিহাসও বটে। ও দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানানো চরিত্র নাও হতে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজকাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।

চিঠিটার ইনটালেকট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রব্লেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক, আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের। এর গ্রন্থিই সব চেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমারসম্ভবের প্রব্লেম, উত্তর কাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়। যোগাযোগ বইখানা যখন বিচিত্রায় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবলপরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ্-অফ ওয়ারের শেষ হবে কি ক'রে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্ত্তে এসে। আমাদের জলধর দাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লোক ভারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অদ্ভুত উপায়ে। কোঁস করে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এটা কি হল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না?

পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইবসেনের নাটকগুলি ত একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে?" না পড়তে পারে, কিন্তু তবুও এটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে একদিন এমনও হতে পারে, ইবসেনের পুরনো আদর আবার ফিরে আসবে বর্ত্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।

স্বাঃ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে লিখিত

২৫ শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়েষু,—প্রত্যেকটি সংখ্যাই আমি মনোযোগের সঙ্গে পড়েচি, আলস্যে বা উপেক্ষায় কোন দিন দূরে ঠেলে রাখিনি।

সকল বিষয়েই যে একমত হতে পেরেছি তা নয়, এর সমালোচনার ভাষা মাঝে মাঝে কঠোর ও সুতীক্ষ্ণ ঠেকেছে, কিন্তু অকারণ বিদ্বেষ বা ব্যক্তিগত ঈর্ষার আক্রমণে কোন আলোচনাই কোন দিন কলঙ্কিত হতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। এটা আনন্দের কথা। কিন্তু যদি কখনো এমন ঘটেও থাকে, যা আমার চোখে পড়ে নি, তার সম্বন্ধেই এই কথাই আজ বলবো যে, যা হয়ে গেছে সে যাক, কিন্তু নূতন বৎসরের প্রারম্ভে তোমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা চাই যে, লেখায় অসহিষ্ণুতা যদি বা সহা যায়, ক্রূরতা, নীচতা, অসত্য অপবাদে মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস দীর্ঘদিন পাঠক-সমাজ সইতে পারেন না, তাঁদের চোখে ধীরে ধীরে লেখক আপনিই হয়ে আসে ছোট, তার স্বরূপ ধরা পড়ে। তখন কাগজের মর্য্যাদা হয় নষ্ট, উদ্দেশ্য হয় শিথিল, আলোচনা হয় নিষ্ফল পণ্ডশ্রম,—সর্ব্বপ্রকারেই তার কল্যাণের সামর্থ্য যায় ক্ষীণ হয়ে। এর চেয়ে অবনতি কাগজের আর নেই। কেবল অসত্য বা অন্যায়ের জন্যই নয়, নিশ্চয় জেনো। কুশ্রীতা কখনো দীর্ঘজীবী হয় না।

স্বাঃ—শরৎচন্দ্র।

"ওই যারা আসে রক্তপিপাসু মোদের হত্যাকামী,
হে বাসব, তব বজ্র পড়ুক তাহাদেরই শিরে নামি।
অতি সুচতুর, আর্য, অসুর হোক বা সে ক্রীতদাস,
গোপনে তাদের হানিও মরণ, আঁধারে করিও গ্রাস।"
—ঋগ্‌বেদ—(১০) ১০২।৩৩

অনুবাদ—রামপ্রসাদ সেন

ঋগ্‌বেদ

(১) ৩০।৭।

ইন্দ্র তোমারে করি যে স্মরণ শান্ত গৃহের কাজে,
ইন্দ্র তোমারে কবি যে স্মরণ রণ-বিগ্রহ মাঝে।

(১) ৩৩।১০।

বারি বর্ষণ না হয় যখন, শস্যশূন্য ধরা
ইন্দ্র তখন তুলি লয় হাতে, বজ্র অগ্নিভরা।
হানে অম্বরে দারুণ অশনি, বহ্নি-ফণিনী তারি,
বিদীর্ণ করি তম-মেঘরাশি বসুধায় আনে বারি।

(১) ৩৫।২।

অগ্নি-উজল স্বুবর্ণ রথ দীপ্ত কিরণে ভরি—
হের, নভে ওই উদিছে সবিতা তমসা ভিন্ন করি।
জাগিয়া উঠিল বিশ্বভুবন কল্যাণকর লাগি,
জাগিল অমর, তাহারি সঙ্গে মরলোক উঠে জাগি।

(১) ৪৮।১৫।

পোহাল নিবিড় তিমির রজনী ঘুচিল অন্ধকার,
হে উষা, তোমার আলোকরশ্মি খুলিল স্বর্গদ্বার।

(১) ৫০।২।

তিমির-মোচন বিশ্বলোচন মেলিলে আলোক আঁখি,
নিশীথের তারা তস্কর সম আপনারে ফেলে ঢাকি।

(১) ৫৮।৪।

ঝঞ্ঝার বায়ে ক্ষিপ্ত অগ্নি দীপ্ত আভায় ফোটে,
গর্জিত শিখা ঘেরিয়া ঘেরিয়া মহীরুহ পরে ওঠে।
নাহি তার জরা, বৃষভের মতো ধায় সে তীব্র বেগে,
পুড়ে হয় কালো, শ্যামল বনানী বহ্নি পরশ লেগে।

(১) ১১৩।৪।

শুয়ে ছিল যারা সংকোচে, ভয়ে, উষার আভাস লেগে,
নয়ন মেলিয়া একে একে তারা উঠিল সকলে জেগে।
কেহ চাহে শুধু রাশি রাশি ধন, কেহ চাহে শুধু সুখ,
কারো বা বক্ষে ত্যাগের তন্ত্রী ঝংকারে উন্মুখ।
চক্ষের কালো উষাই ঘুচাল তমরাশি দূরে ঠেলি,
আলোকে রচিয়া নূতন ভুবন সম্মুখে দিল মেলি।

(১) ১১৩।৫।

অন্তবিহীন যৌবন তব হে উষা, স্বরগকন্যা,
হরিও আঁধার, শুভ্রবসনা, প্রবাহি আলোক-বন্যা।
আজিকে জগৎ তমসামগ্ন, আতঙ্কে কাঁপে প্রাণ,
বিশ্বলক্ষ্মী, দাও উদবারি তব আলোকের দান।

(১) ১১৩।১৪।

উঠ উঠ জাগো, জীবনদায়িনী উষা এল পরকাশি,
অরুণ ঝলকে মিলাল পলকে রজনীর তমরাশি।
উষা সবিতার আগমন-পথ প্রযুক্ত করি আনে,
চল সেই পথে, অমিত আলোতে অমৃতের সন্ধানে।

(১) ১২৪।৩।

ওই আসে উষা স্বরগকন্যা আলোকবসন পরি,
বৈভবে তার পূর্ব-গগন বিস্ময়ে ওঠে ভরি।
উষা আসে সদা সূর্যের পথে, জাত সে সকল ক্রান্তি,
দণ্ড ও পল, না হয় বিফল, কভু না ঘটায় ভ্রান্তি।

(১ ১৩১।১।

অসীম আকাশ তোমারে ইন্দ্র জানায় নমস্কার,
বিপুলা ধরণী তোমার চরণে রাখিল প্রণতি তার।
দেবতা মানব সবার অর্ঘ্য, সকলেরই বলিদান,
ইন্দ্র, তোমার চরণে সঁপিল হয়ে এক মনপ্রাণ।

(১) ১৪০।৩।

অগ্নির মাতা অরণিকাষ্ঠ, মন্থনে বার বার,—
কালো হয় যবে, প্রসবে তখন অগ্নি-পুত্র তার।
সেই শিশু মেলে রক্ত-রসনা পূর্ব-গগন পরে,
ধ্বান্তারিরূপে আঁধার নাশিয়া দীপ্তি প্রকাশ করে।
নিত্য তাহারে পূজিও যতনে রাখিও তাহারে পুষ্ট,
রক্ষীরে তার সম্মানদানে নিয়ত করিও তুষ্ট।

(২) ১১।৭।

বেগবান তব মেঘ-তুরঙ্গ গুরুগুরু হ্রেষা রবে,
অতুল শোভায় দিকে দিকে ধায় বর্ষণ-উৎসবে।
বার্তা প্রচারে মহা অম্বরে—এল এল ওই বারি,
উল্লাসে মাতে তৃষা-কাতর ধরাতলে নরনারী।

(৭) ৭৪।৩।

প্রতিদিন উষা রাত্রি পোহালে হেথা আসি আলো জ্বালে,
রক্তিম হাসি উঠে উদ্ভাসি পূর্ব গগন ভালে।

(৭) ৮৬।৫।

হে বরুণ, তুমি কর গো মোদের পাপবন্ধন মুক্ত,
আজিও রয়েছে কৃশ-কালিমা এই তনু সনে যুক্ত।
আপনারে মোরা বাঁধিয়া রেখেছি পাপের রজ্জু দিয়া,
হে রাজন, এই পশুবন্ধন দাও গো উন্মোচিয়া।

(৯) ১১২।১।

নানা জনে হেথা নানা কাজ করে আমাদের ঘরে ঘরে,
ছুতোর চিরিছে কাষ্ঠফলক কুমোরেতে হাঁড়ি গড়ে।
ঔষধ দিয়া আতুরে সেবিয়া বৈদ্য সে দেখে নাড়ী,
প্রবীণ পূজারী সোমরসে পূজি ইন্দ্র বজ্রধারী,—
"আপনারে কেবা দিবে বলিদান"—কহিছে কণ্ঠ ছাড়ি।

(৯) ১১২।৩।

একই গৃহে থাকি তবু সাধি মোরা নানাজনে নানা কাজ,
মাতা মোর পিষে জাঁতায় গোধূম, পুত্র বৈদ্যরাজ।
আমি শুধু গাঁথি ছন্দ মিলায়ে আঁধার নাশিনী শ্লোক,
—জাগুক বিশ্ব, আলোক প্লাবনে আতঙ্ক দূর হোক।

(১০) ৩৭।৪।

হে সূর্য, তব কোন্ সে আলোকে ঘুচাও সবার ভয়?
কোন্ সে আলোকে প্রকাশ বিশ্ব? এই জাগে বিস্ময়।

(১০) ১০২।৩।

ওই যারা আসে রক্তপিপাসু মোদের হত্যাকামী,
হে বাসব, তব বজ্র পড়ুক তাহাদেরই শিরে নামি।
অরি সুচতুর, আর্য, অসুর হোক বা সে ক্রীতদাস,
গোপনে তাদের হানিও মরণ, আঁধারে করিও গ্রাস।

মাতৃরূপায়াঃ সংস্কৃত ভাষায়া আক্ষেপ

শ্রীকুরুনাথ ন্যায়তীর্থঃ

মাতা সংস্কৃত ভারতী বদতি হে সন্তানবর্গাঃ কথম্?
মৎ সেবাবিরতা রতাশ্চ বহুধা দোষাদি সংকীর্ত্তনে।
যুষ্মাকং মতিরীদৃশী কলুষিতা সর্ব্বস্ব নাশপ্রদা।
দুর্দ্দান্তস্য কলে র্নিপীড়ন বশাদুৎপন্ন ভূতা কিমু?

প্রাচীনা জননী ক্ষয়ার্ত্তহৃদয়া সত্তর্থদানেঽক্ষমা।
শক্তীনামনুসারতঃ সুতগণৈঃ সেব্যা ন কিং শ্রদ্ধয়া?
মৎ সেবা বিফলা ভবেন্ন চ পুনঃ সন্তিঃ সদা বাঞ্ছিত—
মর্য্যাদপ্যধিকং প্রিয়ং হিতকরং দত্তাচ্চতুর্ব্বর্গকম্॥

নো বোদা ন দর্শনং ন চ পুনস্তন্ত্রাদি শাস্ত্রং মহৎ।
নো নিত্যং ন চ ধর্ম্মকর্ম্মনিবহং কাম্যঞ্চ নৈমিত্তিকম্॥
আর্য্যত্বঞ্চ ময়া বিনা সুতগণাঃ! শক্যা ন সংরক্ষিতুম্
আর্য্যাক্ষাতু নিরর্থিকা ভবতি হা! বালোনৃসিংহোযথা॥

যুষ্মাকং কুলপূর্ব্বজাঃ স্থিরধিয়ো মৎ সেবয়া দুর্ল্লভম্
আবিষ্কৃত্য নবং নবং বহুবিধং তত্ত্বং বিচিত্রং পুরা॥
নিঃস্বার্থা নিয়তং প্রচার্য্য জগতাং শিক্ষাগুরুত্বং গতা
বৎসাঃ! পূর্ব্বপথানুগা ভজত রে! মাং কামধেনূপমাম্॥

পাশ্চাত্যো বহুশিক্ষিতা অনুদিনং মৎসেবয়া তীব্রয়া
বিজ্ঞানে গণিতে রসায়নবিধৌ শিল্পে চ বাস্তক্রমে।
দুর্ব্বারাস্ত্র বিনির্ম্মিতৌ স্থলজল ব্যোমাদিযানোন্নতৌ।
প্রাপ্তাঃ শ্রেষ্ঠপদং সমীক্ষ্যতনয়া! গৃহীত চৈবাদরম্॥

[ছবি পাঠানোর সময় ছবির পিছনে নাম, ঠিকানা, ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

—শান্তিময় সান্যাল

যন্ত্র

ও

প্রকৃতি

—সুজিতকুমার কাঞ্জিলাল
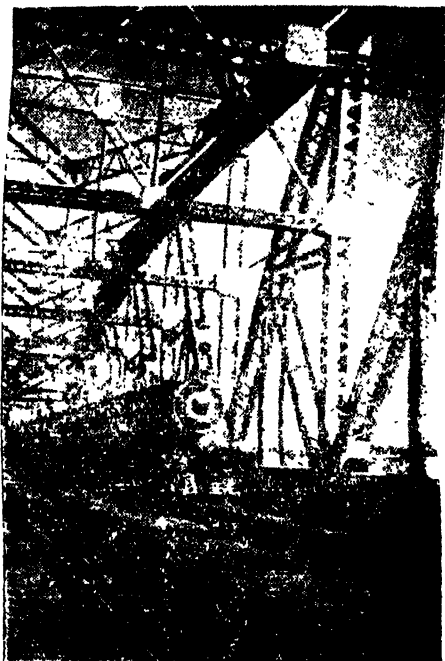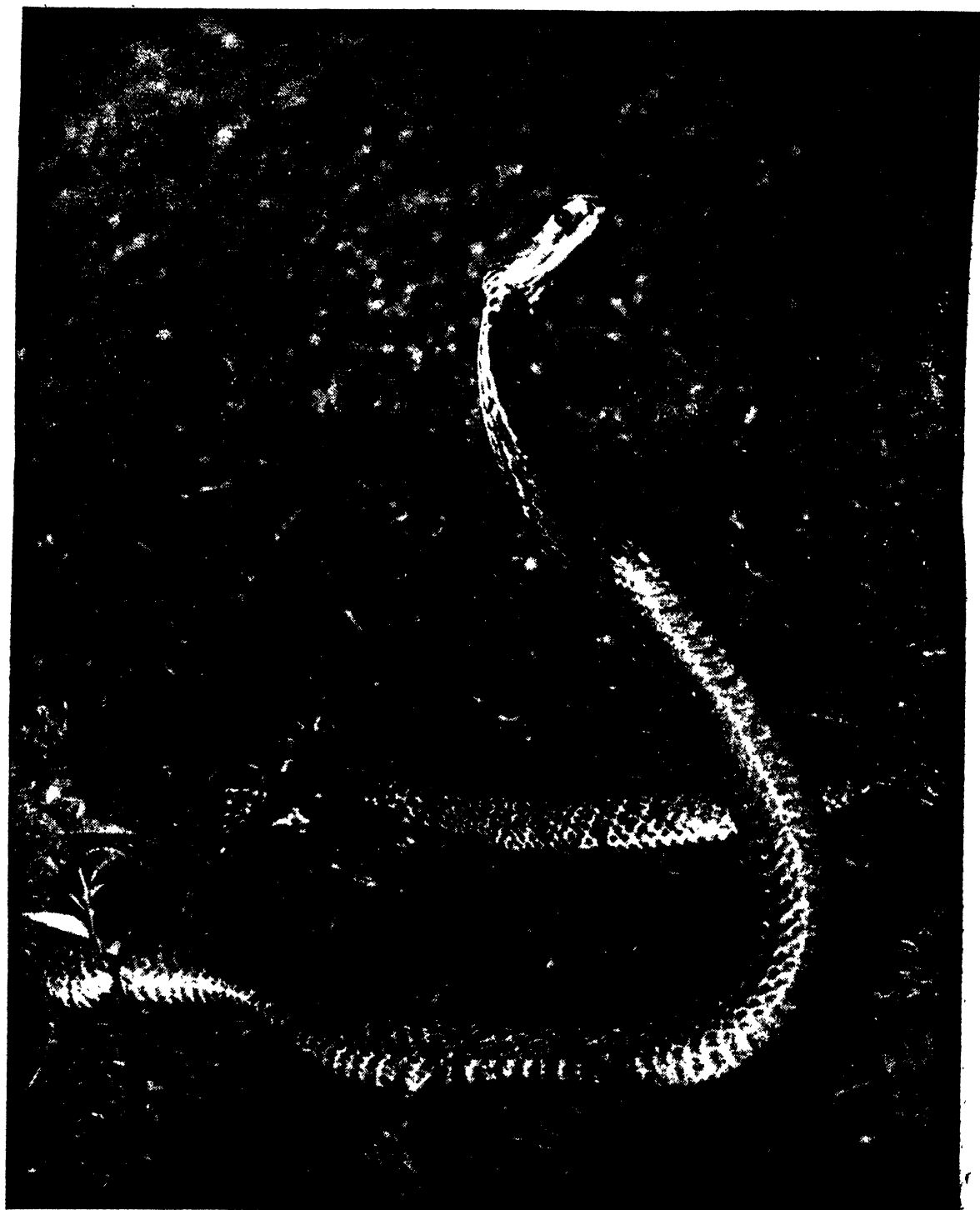
কাশীধাম —দীপক চাকলাদার

॥ প্রবহমান গঙ্গা ॥

—চিত্ত নন্দী

মৌনমুখ

নিষিদ্ধ এলাকা

কালপুরুষ

আমাদের চিঠি পাওয়ার পর, মনীষার মা এসেছিলেন একদিন হাসপাতালে দেখা করতে। নার্সেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, অবনী কে? প্রায়ই মাঝে মাঝে ঐ নামটা মনীষার মুখে শোনা যায়।

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে মনীষার মা প্রশ্ন করেছিলেন—ও কেমন আছে এখন?

একটু ভালর দিকে।

মনীষা একবার চোখ খুলল, তারপর নীরবে পাশ ফিরে শুল। যতক্ষণ মা ছিল, আর এ পাশে ফেরেনি। যখন বুঝতে পারল মা চলে গেছে, তখনই আবার এ পাশ ফিরল। একজন নার্সকে শুধাল—মা এসেছিল, না?

হ্যাঁ, কথা বললেন না কেন?

ম্লান হাসল মনীষা. উত্তর দিল না।

এখন মনীষা অনেকটা সুস্থ হয়েছে।

বেলা প্রায় ৫টা। সূর্য্য অনেকটা পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। মাঠের উপর হামাগুড়ি দিচ্ছে স্বর্ণালী রৌদ্রের নরম রশ্মিজাল। একটি অল্পবয়সী নার্স অ্যানা তার চুলগুলি পরিপাটি করে চিরুণী দিয়ে আঁচড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে বলছে—কি চুল তোমার ভাই।

মনীষাও তার চিবুক ধরে একটু নাড়া দিয়ে বলল, খুব ভাল লাগে?

হ্যাঁ, বলে ঘাড় নাড়ল অ্যানা।

অ্যানার কেন জানি না মনীষাকে খুব ভাল লাগত। ডিউটিতে থাকলে তো কথাই নেই, 'অফ ডিউটিতেও' সে এসে মনীষার সেবা শুশ্রূষা করত। রাত্রিতেও শুয়ে থাকত প্রায়ই ওরই খাটে—এক বিছানায়। মনীষা বলত রোগীর বিছানায় শুতে নেই। অ্যানা হেসে বলত—দিন-রাত যে রোগী ঘাঁটছি! নাও, একটু সরো দেখি পড়ে যাবো যে! মনীষা একটু সরে যেত, ঠাসাঠাসি করে এক বিছানায় শুয়ে পড়ত দু'জন। হাসপাতালের গ্লাসে ওর খেতে রুচি হয় না দেখে অ্যানা একটা কাঁচের গ্লাস এনে দিয়েছিল। নূতন একটা সেট থালা বাটিরও ব্যবস্থা করেছিল মনীষার জন্যে বিশেষ করে।

একটু ভাল হলে অ্যানা বলেছিল—দিদি, তুমি যেদিন এখান থেকে ছাড় পাবে, আমার রান্না খেয়ে যাবে কিন্তু।

কিন্তু, বলে একটু থেমে ইসারাতে দেখিয়ে দিল জেলখানার ফিমেল গার্ডকে।

হেসে বলল অ্যানা—সে তুমি ভেবো না, আমি 'ম্যানেজ' করে নেব। দেখে নিও তুমি।

পাগলী—বলে আদর করে গালে তার একটা মৃদু চড় মারল মনীষা।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মনীষাকে বলল অ্যানা—আচ্ছা দিদি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি উত্তর দেবে?

এই কি তোমার ধারণা হল এত দিনে? তোমার কাছে লুকোবার আমার আর যে কিছু নেই ভাই—বলে জড়িয়ে ধরল অ্যানাকে।

আচ্ছা—অবনী কে?

অ্যানার কানে ফিস ফিস করে মনীষা কি বলল। অ্যানার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

লেডী ডাক্তার এসে ঢুকলেন। শুধালেন মনীষাকে—কেমন আছ?

অনেকটা ভাল। বেশ, দুই তিন দিনের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যাবে। অ্যানা বুঝি তোমার চুল আঁচড়িয়ে দিচ্ছিল!

হ্যাঁ, দেখুন না, ও বললেও কিছুতে শোনে না। কিছুটা অনুযোগ, কিছুটা আবদার মিশ্রিত ছিল মনীষার উত্তরে।

লেডী ডাক্তার একটু হাসলেন—ওর ঐ রকম স্বভাব, যাকে ভালবাসবে প্রাণ ভরে বাসবে, পারতপক্ষে এতটুকু আঁচ লাগতে দেবে না তার গায়ে। সেজন্যে দুঃখটাও কি কম পেয়েছে।

অ্যানার মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল।

আচ্ছা, অ্যানা, তোমার কাজ করো—হালকা হেসে চলে গেলেন লেডী ডাক্তার। কিন্তু পরিবেশ তাতে মোটেই লঘু হল না।

অ্যানা বলল, যাই তোমার দুধটা নিয়ে আসি। প্রায় চলে যাচ্ছিল—হাত ধরে টানল মনীষা। আমি কিছু বুঝিনে, না। থাক, তোমাকে দুধ আনতে হবে না। আর রোজ তো তুমি আনতে যাও না। চুপ করে বস এখানে। আজ আর ছাড়ছিনে তোমাকে। জোর করে ওকে বসিয়ে দিল মনীষা।

থমথমে মুখ তুলে একবার তাকায় অ্যানা। ছলছল করে উঠেছে তার দুটি চোখ।

ষ্টুয়ার্ট সাহেব ছিল মিশনারী। সেবার উদ্দেশ্যে, ধর্ম্ম-প্রচারের শুভবুদ্ধিতে চালিত হয়ে যেদিন এদেশের মাটিতে এসে পদার্পণ করল, সেদিন ছিল তার জীবনে স্মরণীয়। আশ্রয় পায়নি এদেশের কারো কাছে। কেউ বিঁধেছে বিদ্রূপবাণে, কেউ পথ দেখিয়ে দিয়েছে বিপথের। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে এক প্রান্তরের মাঝে সন্ধান পেয়েছে এক কুটীরের। মানুষের আদিম-পুরুষের বাহুল্যবর্জ্জিত নগ্ন সংস্কৃতির ধারক এক সাঁওতাল তার কোটরে থাকে দিনের পর দিন। সঙ্গে তার মা-মরা এক মেয়ে।

একদিন দুপুর বেলায় ক্লান্ত হয়ে এসে সাহেব বসেছে এর কুটীরে। কথাবার্তায় স্থির হয়ে গেল, এখানেই থাকবে সাহেব। কাজ সুরু করবে এই বাপ-বেটাকে সেবা করেই।

শহরের শেষ-প্রান্তে ছিল সেই কুটীর। একদিন শহর থেকে বাপ আর ফিরে এল না; মেয়ে তো কেঁদেই অস্থির। ষ্টুয়ার্ট তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে রেখে নিজে বেরিয়ে পড়ল তার বাই-সাইকেল নিয়ে।

প্রথমেই গেল থানায়। কোন-কিছু দুর্ঘটনা হয়ে থাকলে ওরা নিশ্চয়ই জানবে, এই ভরসায় থানায় যাওয়া।

শুনল—মোটর এ্যাকসিডেন্টে একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল খুব গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছে। নাম জানা যায়নি।

থানা থেকে হাসপাতাল। সেখানে গিয়ে শুনল—কিছুক্ষণ আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। কোন জ্ঞান ছিল না তার, কিছুই বলে যেতে পারেনি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেব জোরে সাইকেল চালিয়ে আসছেন। পাশ দিয়ে সাঁ করে একটা ট্রাম বেরিয়ে গেল; আর একটু হলে ধাক্কা লাগত—তিনিও একটা এ্যাকসিডেণ্ট এড়ালেন! ভাবছেন তিনি—ছোট মেয়েটাকে কি ভাবে বুঝ দেওয়া যাবে! সত্যি কথা বলবেন, না বলবেন—আপাততঃ থানায় খোঁজ নিতে বলে এসেছি। মিথ্যে কথা বলে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবেন! জীবনে কোনদিন এ-পর্য্যন্ত মিথ্যে কথা বলেননি। হ্যাঁ, তাই বলবেন—মিছে কথাই জানাবেন মেয়েকে। না হলে ওকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না, হয়ত-বা কেঁদে-কেঁদেই মরে যাবে মেয়েটা।

যা ভাবলেন তাই বললেন।

অনেকদিন কেটে গেছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেবই ওর নাম রেখেছিলেন অ্যানা। মিশনে ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন তারপর ওকে মিশনারী হাসপাতালে নার্সিং শিখতে পাঠিয়েছেন।

ষ্টুয়ার্টকে অ্যানা ভালবাসত ঠিক নিজের বাপের মত। বাড়ীর কোন কাজ করতে দিত না সাহেবকে। তখন মিশন অনেক বড় হয়েছে। মিশনের নিজস্ব বাড়ী হয়েছে। নানা জাতের ছেলেমেয়ে, বেশির ভাগই সাঁওতাল, ওখানে তখন থাকে, খায় দায় আর পড়াশুনা করে। ষ্টুয়ার্ট ভালবাসে সবাইকে! কিন্তু মিশনের আবাসিকরা লক্ষ্য করে অ্যানার উপরই যেন সাহেবের বেশি স্নেহ-মমতা। হয়ত তাই, তবে ষ্টুয়ার্ট বুঝতে পারত না সেটা।

মিশনেরই এক ছেলে যোসেফ, নাম-ও সাহেবেরই দেওয়া। সাহেব তাকে ছোট্ট থেকে মানুষ করেছে, লেখাপড়া শিখছে মিশনে থেকেই। সে যখন বড় হল, অ্যানার দিকে তার নজর গেল। যখন-তখন গিয়ে অ্যানার ঘরে হাজির হয়, ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলে।

অ্যানা একদিন বলল সাহেবকে। ফাদার, যোসেফকে এখান থেকে তাড়াও।

বিস্মিত ষ্টুয়ার্ট তার মুখের দিকে তাকালেন—অস্ফুট এক কাহিনী অস্পষ্ট ছায়াপাত করেছে অ্যানার মুখমণ্ডলে। রক্তমাংসের মানুষ ষ্টুয়ার্ট! পবিত্র ক্রুশের চাপে পড়ে সকল বৃত্তি, সকল প্রেরণা চাপা পড়ে না। মাঝে মাঝে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করতে চায় তারা। তবু সে-সব দমন করতে হয়।

শুধালেন—কেন, মাই ডটার!

জানি না,—ও থাকলে আমি-ই কোন্‌দিন চলে যাব এখান থেকে, দেখে নিও।

অ্যানা খুব রেগেছে। ষ্টুয়ার্ট ইজিচেয়ার থেকে উঠে গিয়ে অ্যানার হাত ধরে কাছে এনে বসালেন একটা চেয়ারে। তারপর বললেন—আচ্ছা রাগ কর না, দেখছি আমি।

বেলা প্রায় ১০টা। ষ্টুয়ার্ট গিয়েছিলেন এক রোগীর বাড়ীতে—গত কাল-ই যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। আজ সকালে গিয়ে দেখেন, সে মারা গিয়েছে। তাই মনটা খুব খারাপ ছিল। এসেই সাইকেলটা বারান্দার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বারান্দায় উঠেই দেখেন—সামনেই যোসেফ, বেরিয়ে আসছে অ্যানার ঘর থেকে। কঠোর স্বরে বললেন—

যোসেফ, কি করছিলে ওঘরে?

একটা পড়া দেখিয়ে নিতে গিয়েছিলাম।

সাহেবের গলা পেয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে এসে বলল অ্যানা—মিছে কথা। এই দেখ, ফাদার বলে ততোধিক ক্ষিপ্র হস্তে যোসেফের সার্ট তুলে ফেলল উপর দিকে এক টানে। বেরিয়ে পড়ল একটা ছোরা।

এই ছোরা দিয়ে এতক্ষণ আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল, ফাদার। ওর নামে তোমার কাছে বলেছি এই অপরাধে।

কিসে থেকে কি হয়ে গেল—ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিলেন ষ্টুয়ার্ট যোসেফের গালে। ঘুরে পড়ে গেল যোসেফ।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন ষ্টুয়ার্ট—মিশনের ভারপ্রাপ্ত ফাদার ষ্টুয়ার্ট। সেই অবস্থাতে বসে পড়ে কোলে তুলে নিলেন যোসেফের মাথাটি, চোখে তার জল এসে গেল। নিজেই তার মাথায় জল ঢালতে লাগলেন,—অ্যানাকে বললেন হাওয়া করতে। নীরবে মাথা নীচু করে আদেশ পালন করল অ্যানা।

একটু সুস্থ বোধ করলে ফাদার ষ্টুয়ার্ট তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে এক বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

দিন কয়েক পর যোসেফকে ডেকে একদিন ফাদার বললেন—তোমার এখানে থাকা আর পোষাবে না। ভগবান জানেন, এ হিংসার কথা নয়, রাগের কথা নয়,—তোমার মঙ্গলের জন্যই এ ব্যবস্থা করতে হচ্ছে আমাকে বাধ্য হয়ে।

আশ্চর্য্য, যোসেফ মুখ নীচু করে চলে গেল। কিন্তু ওর যাওয়ার ধরণটাতে সন্দেহ হল ষ্টুয়ার্টের। এতে হয়ত ও আরো বেপরোয়া, আরো হিংস্র হয়ে উঠবে। তাতে হয়ত অ্যানারও কোন ক্ষতি হতে পারে! কন্যাপ্রতিম অ্যানার অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বুঝি ফাদারের বুক।

সে ভাব গোপন রেখে পরদিন সকালে তিনি অ্যানাকে ডেকে বললেন—দেখ, তুমি এই সময় কোন একটা কাজ কিছু শিখে নাও। আমার আর ক'দিন! মনে করছি, কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে দেশে যাব।

বেশ ভাল কথা ফাদার। কিন্তু কি কাজ আমি এখন শিখতে পারি?

আমার কথা যদি শোন, নার্সিং শেখ। মানুষের সেবা, রোগার্ত্তের দেখাশুনা করা—এর চাইতে বড় কাজ আর পৃথিবীতে নেই। তবে সেবার অহঙ্কার ক'র না। চাও তো বদরপুরে মিশনারী হাসপাতালে বন্দোবস্ত করে দিই।

বেশ—তাই করো, ফাদার।

চলে গেল অ্যানা নার্সিং শিখতে।

মাস দুই-তিন পরে ষ্টুয়ার্ট সাহেব একদিন বদরপুরে গিয়ে হাজির অ্যানাকে দেখতে। মোটে মন টিকছে না তার।

হাসল অ্যানা—'হোমে' গিয়ে থাকবে কি করে ফাদার?

ফাদারও হাসল—তাই ত ভাবছি। না, এ দেশ আমাকে ছাড়তেই হবে।

তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু। তিনমাসের বেশি কিছুতেই যেন না হয়।

মাথায় হাত দিয়ে স্নেহ-মাখানো সুরে বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, পাগলী।

হোমে যাবেন ষ্টুয়ার্ট সাহেব। সব ঠিকঠাক। তারিখ জানিয়ে অ্যানাকে একটা চিঠি দিয়েছেন ষ্টুয়ার্ট। অ্যানাও আসবে বলে লিখেছে।

হঠাৎ অ্যানার নামে টেলিগ্রাম গেল—ষ্টুয়ার্ট খুব অসুস্থ। শীগ্গিরই যেন সে চলে আসে।

টেলিগ্রাম পেয়েই ছুটল অ্যানা। ষ্টুয়ার্ট তখন হাসপাতালে। প্রাণটা শুধু বোধ হয় আছে অ্যানাকে দেখবার জন্যে। এখানে এসে শুনল—একদিন সন্ধ্যেবেলা ফিরবার পথে সাইকেলের সঙ্গে ইচ্ছা করে ধাক্কা লাগিয়ে এক সাইকেল-আরোহী তাকে ছোরা মারে। ইঙ্গিতে অ্যানাকে ডাকলেন। ঝুঁকে পড়ল সে ফাদারের মুখের উপর। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ষ্টুয়ার্টের বুকের উপর। তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন ফাদার অতি নিম্নস্বরে—অপরাধী কে, আমি জানি; তবু তাকে ক্ষমা করে গেলাম। কোনদিন সে যদি ভুল বুঝতে পারে—সংশোধন করতে পারবে নিজেকে, অনুতপ্ত হবে কৃতকর্ম্মের জন্য। আর কিছু বলতে পারলেন না। মাথাটা একপাশে টলে পড়ল।

Doctor, Doctor—বলে ছুটে গেল অ্যানা পাশের ঘরে। Quick, Quick, Please To Bed No. 39.

ডাক্তার ছুটে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। ফাদারের বুকের উপর পড়ে সে কি কান্না অ্যানার। আর একজন নার্স এসে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে সুস্থির করে তোলে।

অ্যানাই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে ঐ মিশনের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই, তার প্রাণের একান্ত সাধনার স্থলে।

এইজন্যেই লেডী-ডাক্তার বলে গেলেন ও যাকে ভালবাসে, প্রাণ ভরেই বাসে। আর সে কারণে দুঃখও কম পেতে হয়নি।

মনীষা ছাড়া পাওয়ার দিনে সত্যি-সত্যিই ওকে নিজের হাতের রান্না খাইয়েছিল অ্যানা। বলে দিয়েছিল যাবার সময়—কোন অসুবিধা বুঝলে আমাকে জানিও। ছোটবোন একটা তোমার আছে, মনে রেখো। চোখ দুটো বুঝি একটু ছলছল করে এল অ্যানার। মনীষা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ফিমেল গার্ড একটু রসালো দৃষ্টিতে তাকালো মনীষার দিকে। কি যেন বলল অস্ফুটে, শোনা গেল না।

মনীষা সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে জেলখানায়।

মনীষার নামে একটা চিঠি এসেছে। চিঠিতে আছে, ও যদি পড়তে চায় তবে ওর যাবতীয় পড়ার খরচ পত্র-লেখক বহন করবে। মনীষার চরিত্রের অজস্র প্রশংসা করেছে পত্র-লেখক। সমাপ্তিতে সম্পর্কের ঘরে লেখা আছে—দাদা।

এত প্রশস্তি থাকা সত্ত্বেও মনীষা সে চিঠি রাখেনি; পড়ে ফেরৎ দিয়েছে। সে চিঠির কোন উত্তরও দেয়নি।

মনীষাকে সে-কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, উত্তরে সে বলেছিল—এমন কোন পত্র-লেখককে সে জানে না। তাছাড়া, তার পড়াশুনার খরচ যে উপযাচক হয়ে দিতে চায়, তার সঙ্গে তো কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। লিখে ঢাক পিটাবার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

বুঝলাম, মনীষা ঘা খেয়েছে অনেক। মানুষকে তাই সন্দেহ চোখে দেখতে শিখেছে। তবু বলেছিলাম—পড়াশুনা তো তুমি করতে এক আবারও করতে চাও?

হ্যাঁ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াব। তাতেই আমার খরচটা একরকম চলে যাবে। একটা চিঠি দেবেন? বইগুলো আনিয়ে নেব।

হেসে বললাম—এখানে কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেবার আশায় আছ?

হাসল মনীষাও—না, তা নয়। তবে পড়াশুনাটা চর্চা না রাখলে পরে অসুবিধা হয়।

হঠাৎ ডাক্তারবাবু ঢুকলেন এসে অফিসে। পরক্ষণেই মনীষাকে লক্ষ্য করেই প্রশ্নবাণ—কেমন আছ এখন? ধন্য মেয়ে বাবা তুমি। মেয়ের যে এমন কঠিন প্রাণ, আমরা ডাক্তার মানুষ হয়েও কল্পনা করতে পারিনা। আমার দিকে ফিরে বললেন—জানেন, অসুস্থ অবস্থায় ওর মা এসেছিলেন দেখা করতে, তা উনি একেবারে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকলেন—কথা বলা তো দূরের কথা।

কেন যে দেখা করিনি তা যদি আপনারা জানতেন, তবে এ-কথা কখনই বলতে পারতেন না। আর যদি সত্যি ঘটনা প্রকাশ করি তবে সন্দেহ করবেন মেয়ের মাথা খারাপ; না হলে মায়ের নামে এভাবে কেউ কখনও Scandal ছড়াতে পারে! আমাদের তো কুমারী নামেই দোষ! থাক—সে সব খারাপ কথা। তাতে আর এখন কারোরই প্রয়োজন নেই। আচ্ছা এবার উঠি—নমস্কার। হাত তুলে নমস্কার করেই উঠে দাঁড়াল মনীষা।

ডাক্তারবাবু ইঙ্গিতে বসতে বললেন তাকে। আবার বসল মনীষা।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব—ঠিক ঠিক উত্তর দিও ধর্ম্মতঃ—অবনী কে?

ছেলেটি আমার বয়সী। পড়াশুনায় যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট। গতবারে স্কুলফাইন্যালে জুনিয়ার স্কলারশিপ পেয়েছে। আমি ওর কাছে পড়া বুঝিয়ে নিতাম। অবশ্য আমাদের বাড়ীতেই আসত ও। অমন চরিত্রবান ছেলে আমি দেখিনি।

ডাক্তারবাবু মুখ টিপে হাসলেন। বললেন—শেষ উদ্ধার তো করতে পারেনি।

মা-ই কি করতে পারল? মায়ের তো অত জানাশুনা আছে! আমার রেজাল্ট খারাপ হল তো মায়েরই জন্যে।

কেন?—দুজনেই সমস্বরে আমরা প্রশ্ন করলাম।

অবস্থা তো আমাদের ভাল না, জানেন-ই। দেশ বিভাগের পর এদেশে এসে কোন কিছু না পেয়ে আমাদের দু'ভাইবোনকে নিয়ে মা এসে যথারীতি আশ্রয় নেন শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্ম্মে। দু'মাস পরে dispersal scheme-এ এখানে এসে ঐ কলোনীতে কোন রকমে একটা ঘর বেঁধে আমরা বাস করতে থাকি। এখানে থাকতে থাকতে একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে যায় অবনীর সঙ্গে। অবনীদা আমরা আসার সময় অনেক সাহায্য করেছে। নিজে ঘাড়ে করে বড় বড় ট্রাঙ্ক, স্যুটকেসগুলো পার করে দিয়েছে। কিন্তু ওরা এসেছে অনেক পরে। বাজার করে ফিরছিল অবনীদা, আমি উঠোনে

একটা লাউয়ের ডগাকে যতবার চালে তুলে দিতে যাই ততবারই ওটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাটিতে নেমে পড়ে। অবনীদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। এবার কাছে এসে বলল—সর, দেখি। ঐ ভাবে বুঝি লতা থাকে! একটা support দিতে হবে তো!

ওমা—তুমি কোথা থেকে!

যারে, আমরা তো সম্প্রতি এসেছি ঐ বাদুড়িয়া ক্যাম্পে। দে, খানিকটা দড়ি কি শাড়ীর পাড় থাকে তো! খানিকটা লম্বা চাই কিন্তু। একেবারে মটকা পেরিয়ে যাবে, এতটা লম্বা!

অনেকক্ষণ খুঁজে পেতে বের করে এনে দিলাম দুখানা শাড়ীর পাড়।

এক প্রান্ত লাউয়ের ডগায় বাঁধতে বাঁধতে শুধাল অবনীদা—পড়াশুনা করছিস তো?

ঘাড় নেড়ে জানালাম—না।

কেন?—বিস্মিত নয়নে প্রশ্ন জাগে অবনীদার।

কেন আবার? সময়ও পাইনে, তা ছাড়া বলে দেওয়ারই বা লোক কোথায়!

কি এমন কাজটা করিস্ যে সময় পাস্‌নে। বলে দেওয়ার লোক—হ্যাঁ, এ কথাটা বলতে পারিস বটে।

বা রে—কাজ যে কত, তুমি জানবে কি করে! মায়ের সমিতির যত কাজ সবই তো আমায় করতে হয়। আর—

কি বলছিস্ বুঝতে পারছি না তো—সমিতি, কাজ। তা ছাড়া, কিছু লুকোচ্ছিস্ যেন মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আজ আমার সময় নেই। বাজার রয়েছে সঙ্গে। একদিন আসছি, বেশ ভালো করে আদ্যোপান্ত সব শুনে যাব। সেদিন এরকম করলে কিন্তু গাঁট্টা—বুঝলি তো? দেখ, আমি চালে উঠছি, দড়িটা তুই ছুঁড়ে দিতে পারবি তো? পারবি, আচ্ছা?

লাউয়ের ডগা তুলে দিয়ে আধঘণ্টা বাদে চলে গেল অবনীদা।

দিন সাতেক পরে আবার এল অবনীদা। বললাম তাকে আদ্যোপান্ত ইতিহাস। শুনে সে বলল—সবই তো ভাল বুঝলাম; কিন্তু তোর যে পড়াশুনা কিছুই হচ্ছে না।

এখানে থাকলে আর হবেও না—একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল আমার।

তাই তো দেখছি।

যেটুকুও বা হচ্ছিল, মায়ের বাড়াবাড়িতে তা-ও হবার উপায় নেই।

কেন, মামীমা আবার বাধা দিচ্ছেন কোথায়? তিনি তো সমিতির কাজ নিয়ে থাকেন!

নামে!—আমার তখন রাগে ও দুঃখে সর্বশরীর কাঁপছে। কাজ যেমন নিয়ে আসেন, তেমনি সেই কাজে বাজেলোকও অনেক নিয়ে আসেন।

কি সব যা-তা বলছিস মনী!

সবই সত্যি অবনীদা। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। প্রায়ই দেখি, নানাধরণের লোক আসে, আর মা-ও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কারো সঙ্গে থাকে গাড়ী। ওরা যখন আমাদের এখানে এসে বসে, তখন আমাকেই সব করতে হয় ওদের জন্য। আধ-ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার থেকে ওরা বেরিয়ে যায়—মা-ও সেই সঙ্গে। দেখনি মায়ের চালচলন আজকাল? অনেক বদলেছে অবনীদা, অনেক—অনেক। ফলে এর সমস্ত দুর্ভোগটা ভুগতে হয় আমাকে। রান্নাবান্না, সংসারের যাবতীয় কাজ, ছোট ভাইটার দেখাশুনা—সবই একা করতে হয়। মা শুধু সমিতি আর বাইরের লোকের সঙ্গেই কাটায়। ফলে ছোট ভাইটাও গোল্লায় যাচ্ছে।

অবনীদা চুপ করে বসে আছে। আমি একটা ধাক্কা দিয়ে বললাম—কি, কথা বলছ না যে!

হুঁ—বলে অন্যমনস্ক হয়ে রইল তেমনি। বোধ হয় আমার কথাগুলো তার কানে যায়নি।

এমন সময় মা এসে ঢুকলেন, হাতে তাঁর একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। পরনে সরু নরুণ পাড় ধুতি।

অবনীদা উঠে গিয়ে একটা প্রণাম করতেই মা তাকে বললেন—থাক, বাবা। ভালো আছ তো? আচ্ছা, তোমরা গল্প করো। আমায় আবার এখুনি বেরোতে হচ্ছে সমিতির কাজে।

অবনীদা না জানতে চাইলেও মা নিজেই আগে থেকে কৈফিয়ৎ দিয়ে রাখলেন।

সত্যি সত্যি মা বেরিয়ে গেল। কেন এল, কেন-ই বা গেল, সংসারের কি, কোথায় হচ্ছে না হচ্ছে, কোন খবর শুধালে না, আমিও বলা প্রয়োজন মনে করলাম না।

অবনীদাকে বললাম—দেখলে তো অবনীদা? বুঝলে কিছু?

হুঁ—বলে অবনীদা উঠে পড়ল। আজ আসি মনী।

ডাক্তারবাবু মাঝপথে বলে উঠলেন—এ থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, তোমার মা সত্যিই সমিতির কাজে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না।

মানি আপনার কথা। কিন্তু প্রমাণের অগোচরে কি কোন কাজ হয়-না, না হতে পারে না? আপনি কি বলতে চান—আমার মত বয়স্থা মেয়ের সামনে এই সব Scandalous ব্যাপার আমারই মা দেখিয়ে দেখিয়ে করে বেড়াবেন? মনস্তত্ত্ব আমরা পড়িনি ডাক্তারবাবু, তবু মেয়েদের মন নিয়ে জন্মেছি, মেয়েদের চোখ দিয়ে দেখতে শিখেছি। তাতে আমরা যা বুঝি, তা আপনারা হয়ত পারবেন না। এর বেশি আর বলবার কিছু নেই।

ডাক্তারবাবু অস্বস্তি বোধ করছিলেন এসব কথায়। আর কথা না বাড়িয়ে তিনি বললেন—আচ্ছা, আজ উঠি।

মনীষাও এরপর চলে গেল ভিতরে।

অ্যানার কাছে মনীষা একখানা চিঠি লিখেছে—দেখা করার জন্য। তাই অ্যানা এসেছে।

মনীষা বলল—ভাই তুমি আমার যা করেছ, তার ঋণ এ জন্মে শোধ দিতে পারব না, তবে এখানে থাকতেও আর ভাল লাগছে না। কি করা যায়, সেই পরামর্শের জন্যে তোমায় ডাকিয়েছি।

আইনের কথা তো বলতে পারব না ভাই, তবু বলি, তোমার বাড়ী ফিরে যাওয়াই উচিত।

রাগতস্বরে বলে উঠল মনীষা—এবার গেলে মা আমাকেই ঠেলে দেবে আগুনের মুখে। শেষের দিকে যা কাণ্ড হচ্ছিল তা যদি দেখতে।

অ্যানা এবং আমি মনীষার মুখের দিকে তাকিয়ে।

ভ্রূক্ষেপ না করে মনীষা বলল—দলে দলে লোক আসত মায়ের কাছে সমিতির নাম করে। আসলে আসত আমারই জন্যে।

নরেনবাবুর ছিল রেশনের দোকান। তিনিও আসতেন। রেশনের দোকানের কারবারেই তিনি বড়লোক। আগে তেমন

একটা কিছু ছিলেন না। নিজের বুদ্ধিবলে রেশনের দোকানের সম্মুখ এবং পশ্চাৎ-পথ দিয়ে বেশ-কিছু আমদানী করে'ছন। হাতের এবং কাগজ-কলমের কৌশলে অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি। বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের, সৌখীনতায় সেজন্য ভাঁটা পড়েনি। অথচ বিপত্নীক।

নরেনবাবু আমাদের রেশন দিতেন, অথচ টাকা নিতেন না। একথা আমি জানতেই পেতাম না, যদি না মা তার গায়ের একটা সোয়েটার বুনতে বলতেন আমাকে, আর আমি তা অস্বীকার করতাম। মা বললেন—এই সামান্য কাজটা পারবে না তো বিনা পয়সায় রেশনটা তো গিলতে পারো!

আমি যখন জানলাম, তখন একদিন অবনীদাকে দিয়ে বলে পাঠালাম দোকানে—রেশন দিচ্ছেন টাকা নিচ্ছেন না কেন ভদ্রলোক? উদ্দেশ্য তো ভাল নয়। তাতে তিনি অবনীদাকে যথেষ্ট অপমান করেন এবং মুখ ভেঙচিয়ে বলেন—উদ্দেশ্য তো ভাল নয়। তোমার উদ্দেশ্য তো ভাল। তুমি এত দরদ দেখাতে আসো কেন?

বলার সঙ্গে সঙ্গে ধাঁ করে এক ঘুঁষি মারল অবনীদা নরেনবাবুর মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে। চীৎকার করে নরেনবাবু পড়ে গেলেন মাটিতে, চক্ষের নিমিষে অবনীদা পালাল। নরেনবাবু ওর নামে 'কেস' করেছিলেন, কিন্তু ও তখন পলাতক। এতদিনে ধরা পড়েছে। জেলে আছে—এই দেখ ভাই চিঠি। ও যেন কি করে জেনেছে আমিও এখানে।

একখানা চিঠি এগিয়ে দিল মনীষা। অ্যানা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়ছে চিঠিখানা। মনীষা তাকিয়ে আছে। পড়া শেষ হয়ে গেলে মনীষা বলল—একটা উপকার যদি করো ভাই এসময়! দুটো হাত ওর চেপে ধরল।

খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যানা। তারপর বলল—বেশ, কি করতে হবে বলো।

ওকে জামিনে বের করতে হবে, তার ব্যবস্থা করে দাও ভাই কোন উকিল-মোক্তারকে ধরে। এই উপকারটুকু যদি করো, চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

চোখদুটো ছলছল করে এল মনীষার। অ্যানাও খুব নরম হয়ে গেল। বলল—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি আজই। দুই-তিন দিন পরে এসে তোমাকে আবার জানিয়ে যাব কি হয় না হয়। তুমি বরং আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে দাও, সুবিধা হবে।

অবনীকে জামিনে বের করে নিয়ে এসে আবার দেখা করেছে অ্যানা। সঙ্গে ছিল অবনী।

ইতিমধ্যে অবনী একবার অ্যানাকে সঙ্গে নিয়ে মনীষার মায়ের সঙ্গেও দেখা করে এসেছে।

অবনী-ই পরিচয় করিয়ে দিল—ইনি মনীষার অসুখের সময় হাসপাতালে যা করেছেন, তার তুলনা হয় না, মাসীমা।

কি যে বলছেন আপনি। আমাদের duty-ই তো তাই।

তা তো জানি বাছা, তবু সবাই কি এমন করে? আরও তো কত নার্স রয়েছে হাসপাতালে—

বাধা দিয়ে বলল অ্যানা—মনীষাদিও তো আমাকে কম স্নেহ করেননি। তিনি যদি তা না করতেন—

হঠাৎ বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। মনীষার মা বললেন—একটু ব'স মা, আমাকে বোধ হয় এখুনি একবার বেরোতে হবে।

মিনিটখানেক পরেই এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এলেন তিনি। ভদ্রলোক ঘরে পা দিয়েই অবনীর মুখের দিকে তাকিয়েই বললেন—আচ্ছা, আমি আসছি একটু ঘুরে। ওদিকে একটা কাজ আছে, সেরে আসি।

না, বসুন তো—একরকম জোর করেই বসিয়ে দিলেন মনীষার মা নরেনবাবুকে।

হেসে বলল অবনী—ভয় নেই। এটা তো আর রেশনের দোকান নয়।

গম্ভীর মুখে বসে রইলেন নরেনবাবু।

আধঘণ্টাখানেক বাদে ফিট ফাট হয়ে বেরিয়ে এলেন মনীষার মা। বললেন—চলুন। উঠে দাঁড়ালেন নরেনবাবু, কিন্তু এই সময় মনীষার ছোট ভাই এসে ওর মাকে লক্ষ্য করে বলল—সন্ধ্যের আগে ফিরবে তো মা?

মোটরে উঠে মা বললেন—না ফিরি তো সন্ধ্যেটা দিয়ে দিস্।

মোটর ছেড়ে দিল।

অবনী আর অ্যানা মুখ তাকাতাকি করতে লাগল। তারপর এক সময় উঠে পড়ল।

কাউকে না জানিয়ে সন্ধ্যাবেলা অ্যানা এসে হাজির হল মনীষাদের ঘরের সামনে। উঁকি মেরে দেখল, ঘরের মধ্যে কেউ আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। অন্ধকারে হাতড়ে অনুভব করে দেখল ঘরে তালা দেওয়া। বুঝল, ছোটছেলে কোথায় গিয়েছে মায়ের অনুপস্থিতির সুযোগে।

চলে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় কোথা থেকে ছেলেটি এসে হাজির।

অ্যানাই হেসে বলল—কোথায় গিয়েছিলে বলো তো?

ওঃ আপনি! তা মা তো এখনও বাড়ী ফেরেনি। কোন কাজ নিয়ে এসেছেন বুঝি! দাঁড়ান, বাতি জ্বালি আগে।

চাবি খুলে দিতেই পিছন পিছন ঘরে ঢুকল অ্যানা।

বাতি জ্বালা হলে পরে অ্যানাই পূর্ব-জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিল—কোন কাজ নিয়েও আসিনি, তোমার মায়ের কাছেও নয় ভাই, আমি তোমাকে দেখতেই এসেছি!

অ্যানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেটি। যেন এ সুর সে অনেক দিন শোনেনি। ওর দিদির কাছে মাঝে মাঝে শুনেছে বটে, ইদানীং আর শোনেনি। মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্ব্বাক বিস্ময় ওর সারা দেহে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করতে লাগল।

কাছে ডাকল অ্যানা, আদর করে ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল—মাসীমা তো এখনও ফেরেননি। তুমি ছেলেমানুষ। কি করে কাটাবে এই বাড়ীতে? আর, খাওয়া-দাওয়ারই বা কি হবে?

বিষণ্ণ করুণসুরে সে বলল—আমার এক রকম অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। মা ফিরে এসে রান্না-বান্না ক'রে আমাকে ডাক দিলেই আমি উঠে খেয়ে নিই।

অ্যানা কি বলবে ভেবে পায় না। একটু থেমে বলল—যদি না-ই ফেরেন মাসীমা রাত্রিতে।

জোর করে ঘাড় নেড়ে বললে—তা কখনোই হয় না। যে ভাবে গাড়ীতে করে যায়, সে ভাবেই আবার গাড়ীতে করে চলে আসে।

তবু, যদি কোনদিন কোন কারণে না-ই ফিরতে পারেন,—একটা ঢোঁক গিলে নিল অ্যানা—তবে আমার কাছে চলে যেও, কেমন? এখানকার হাসপাতালে চলে যেও, আমাকে দেখতে পাবে।

মা যদি না ফেরে! বালকের চোখেমুখে ভয় থমথম করছে। দিদির চলে যাওয়ার রাত্রির কথা মনে পড়ে। আগের দিন রাত্রিতে যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে শোনে, দিদিকে পাওয়া যাচ্ছে না। মা হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে গেলেন নরেনবাবুর কাছে। একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন সব ঘটনা।

আচ্ছা দাঁড়াও, আসছি। তুমি বাড়ী যাও।

কি মনে করে দোকানের এক কর্মচারীকে অবনীর বাড়ীতে পাঠালেন নরেনবাবু। অবনী নেই। কাল বিকেল থেকেই নেই।

মনে মনে হাসলেন তিনি—এবার ঠিক বাগে পেয়েছেন,—ছুটোকেই ফাঁসাবেন তিনি।

ঘণ্টাখানেক পরে থানা হয়ে মনীষাদের বাড়ীতে এসে কিছু পরামর্শের পর বললেন ওর মাকে—থানায় ডায়েরী করে দাও। আর বলে দাও, সন্দেহ হয়—অবনীই তোমার মেয়েকে নিয়ে সরে পড়েছে।

মা তবু বলেছিলেন—না, না, সে খুব ভাল ছেলে—তার দ্বারা কি একাজ সম্ভব?

নরেনবাবুর মন থেকে যায়নি তখন পর্য্যন্ত দোকান চড়াও হয়ে অবনীর সেই ঘুঁষি মারার কথা। বললেন—এই দেখ, এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কোথায় পাবে যে, যে-সময় মনীষাকে পাওয়া যাচ্ছে না, ঠিক সে-সময় অবনীও নেই।

মা তাই ডায়েরী করলেন থানায়।

মা যদি না-ই ফেরে, আমি-ও ঐ রকম ডায়েরী করব পরে নরেনবাবুর নামে।

হাসল অ্যানা। তারপর বলল—তাহলে আমি যা বললাম তাই ক'র, তারপর ডায়েরী ক'র। আগে কিন্তু আমার ওখানে যেও, বুঝেছ?

ঘাড় নেড়ে ছেলেটি জানাল—বুঝেছে।

ওর মা ফিরেছিলেন, তবে অনেক রাত্রিতে। খানকয়েক পাঁউরুটি কিনে দিয়েছিলেন নরেনবাবু আর এক হাঁড়ি মিষ্টি। ছোটছেলেটা খাবে।

ছোটছেলেটা কিন্তু সেদিন খায়নি অনেক সাধ্য-সাধনাতেও। মায়ের উপর রাগই হয়েছিল তার। এমন কি মাকে বলেছিল—এবার থেকে সেও যাবে সঙ্গে; এমনভাবে বাড়ীতে থাকবে না একা-একা।

মা তাকে বলেছিলেন—না। আমার সঙ্গে তুমি কোথায় যাবে? আমার কত জায়গায় কাজ থাকে।

অত রাত পর্য্যন্ত প্রায় দিনই কি কাজ থাকে ?

উত্তরে মা ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন ছেলের গালে।

ছেলে তখন মরিয়া। বলল—আমি ব'লে তাই মারতে পারলে। আর দিদির বেলায় তো কিছু বলোনি।

না, বলিনি! দিদি পীর নাকি? দেখিসনি ওর হাতে খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়েছিলাম।

এবার ওর মনে পড়ে গেল ঘটনাটা। চুপ করে গেল।

সমরেশবাবু যেন কোন অফিসের বড়বাবু। সমিতির কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। সেই সূত্রে ওদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করতেন।

পূজা সামনে। সমিতির থেকে নাকি যাদের কাজ খুব ভালো হয়েছে, তাদের কিছু টাকা নগদ দিচ্ছে। মনীষার মায়ের কাজ নাকি নিখুঁত এবং উচ্চাঙ্গের। তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তাকেও ঐভাবে অর্থ দেওয়া হবে।

মনীষা সেখানে উপস্থিত ছিল। সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সমরেশবাবুর দিকে। সমরেশবাবু মাথা নীচু করে বলে চললেন—সত্যি আপনার হাতের কাজ এত সুন্দর, আর এত অল্প সময়ে আপনি কাজ তুলে দিতে পারেন, আশ্চর্য্য।

নির্জলা মিথ্যা ও স্তুতিবাদ মনীষার সারা অঙ্গে বিষের জ্বালা ধরিয়ে দিল। অতিকষ্টে সে তা দমন করে রাখল।

আচ্ছা, পূজোর বন্ধের আগে টাকা নিয়ে আসব আর একদিন। নমস্কার—বলে চলে গেলেন।

মা-মেয়েতে সেদিন এ নিয়ে খুব তর্কাতর্কি হল।

মেয়ে বলল—মা, এ টাকা তুমি নিতে যেও না। সমরেশবাবুর নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে।

একরাশ বিস্ময় কণ্ঠে ঢেলে মা বললেন—কেন, কি দেখলে এর মধ্যে বদ মতলবটা তার।

সেও কি বলে দিতে হবে? সমিতির কি কাজ তুমি করো, তুমি ভালোই জানো। আমাকেই তো সব করতে হয়। সেটা আশা করি তুমি জানিয়েছ এতদিনে। এমন কিছু কাজ হয় না আমাদের যার জন্যে আমরা এই অর্থ পেতে পারি। তা ছাড়া, ওটা যে ওরই সুপারিশে হচ্ছে না, তা কি করে জানলে?

তা আমার জানার দরকার কি?

বাঃ, তোমাকে সম্মানিত করছেন, আর তুমি সেটা জানবে না, তা কি হয় কখনও? তবে তোমারও নিশ্চয় কোন স্বার্থ আছে এতে!

মা খুন্তি দিয়ে কড়াইয়ে কি যেন নাড়াচ্ছিলেন। সেই খুন্তি তুলে এক ঘা বসিয়ে দিলেন—বাঁ হাত তুলেও মনীষা আটকাতে পারল না সেই মার। মা বললেন—মেয়ের আস্পর্দ্ধাকে বলিহারী দিই। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বলে আবার এক খোঁচা দিলেন খুন্তির, গরম খুন্তির ছ্যাঁকা লেগে পুড়ে গেল বাঁ হাতের কনুইয়ের উপরে কিছুটা জায়গা।

অ্যানা এসে নিজেই দেখা করল মনীষার সঙ্গে। বলল—কিছুই করতে পারলাম না ভাই। তোমার কথা তো আইনে টিকবে না। তবে বাড়ীর অবস্থা যা দেখলাম, তাতে বাড়ী গিয়ে তুমি শান্তি পাবে না।

দু' চোখ জলে ভরে উঠল মনীষার। মনে পড়ল লেডী ডাক্তারের কথা—ও যাকে ভালবাসে প্রাণভরেই বাসে; আর সেজন্য ভোগেও কম নয়।

খানিক পরে তাই বলে উঠল—আমাকে ভালবেসে দুঃখই পেলে ভাই।

হাসল অ্যানা—বিষণ্ণ, করুণ হাসি। তারপর বলল—যাও, এখনকার মত "আশ্রম"ই তোমার নিরাপদ আশ্রয়।

তোমাদের ছেড়ে আশ্রমে গিয়ে আমার মন টিকবে না। আমি পালাব ওখান থেকে। দেখে নিও। এখানে তো সে সুবিধা নেই।

এর পরদিন কোর্টের পুলিশ ওকে নিয়ে যায় কোন্ এক 'আশ্রমে' যেন।

যাবার সময় আর একবার বলে গেল আমাকে লক্ষ্য করে—আশ্রম থেকে পালাব আমি ঠিকই। দেখবেন।

প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা। হঠাৎ মাস তিনেক পরে কাগজে পড়লাম, মনীষা নামে এক অপ্রাপ্তবয়স্কা নারী··আশ্রম থেকে কাউকে না বলে কোথায় চলে গিয়েছে।

পুলিশ তার সম্ভাব্য গন্তব্যস্থল যতগুলি ছিল, সবগুলিতে খোঁজ করেছে। অবনীর বাড়ীও বাদ যায়নি, যদিও সে-বাড়ীতেও কোনদিন যায়নি এখানে আসবার পর থেকে।

শেষে এল অ্যানার কাছে। কোন সংবাদ তার কাছে দিয়েছে কিনা। কিছুই না। হতাশ হতে হল পুলিশকে। একখানা চিঠি শুধু দিয়ে গেছে মনীষা যাওয়ার আগে, লিখেছে তাতে—যা বলে এসেছি, কাজে তাই করলাম। আশ্রম আমায় বাঁধতে পারেনি। তোমার জন্য দুঃখ হয়। তবে তোমার নাকি ভাগ্যই এই। অনেক করেছ আমার জন্য। এই ব্যথাই শুধু নিয়ে গেলাম যে তোমার জন্য কিছু করতে পারলাম না। ইতি—

'মনীষাদি'

প্রশান্ত চৌধুরী

আজ এতদিন পরেও রোগশয্যায় শুয়ে সেই কাঁটাপুকুরের বিয়েবাড়ির আস্তাবলের অন্ধকার ছাতটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সোহাগী ! তার লাল রঙের নিচু পাঁচিল,—ছাতের ওপর ছড়ানো মুরগীর পালখ,—একটা তেলচিটে ছেঁড়া মাথার বালিস,—সব কিছু যেন দেখতে পাচ্ছে সোহাগী চোখের সামনে। মনে হচ্ছে, ফেলে-আসা অনেকগুলো বছরের পর্দা সরিয়ে আজকের এই অপরাহ্নবেলায় কাঁটাপুকুরের বিয়েবাড়ির সেই আস্তাবলের ছাতটা যেন সোহাগীর এই দোতলার ছোট্ট ঘরটার মধ্যে উঁকি মেরে ফিস্‌ফিসিয়ে বলছে,—মনে আছে সোহাগী ?

আছে ;—আছে। এতগুলো বছর ধরে প্রাণপণে ভুলে যাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মনে আছে। সব মনে আছে সোহাগীর।

মনে আছে,—সেদিনের সেই বিয়েবাড়ির আস্তাবলের অন্ধকার ছাতের পাঁচিল থেকে উঁকি দিয়ে নিচের চৌবাচ্চার পাড়ে টুন্‌কির ছাড়া পোশাক পড়ে থাকতে দেখে যখন নিজের অনিবার্য ভবিষ্যৎটাকে দেখতে পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সোহাগী,—ঠিক সেই সময়েই এসেছিল সেই মানুষটা।

সোহাগীর মাথায় হাত রেখে সেই মানুষটা খুব স্নেহের সঙ্গে বলল,—কাঁদছ কেন ? কী হয়েছে ? উঁ ?

কান্নার জলে ঝাপসা চোখে মুখ তুলে তাকিয়ে সোহাগী দেখতে পেল, সানাইপার্টির মানিক বুড়ো নয়, কিছুক্ষণ আগে টুন্‌কিকে নিয়ে যে-লোকটা নিচে নেমে গেছল, সেও নয় ;—অন্য একজন। গৌরবরণ তার রঙ, ধারালো মুখ, মাথায় বাঁকা করে বসানো পাৎলা সাদা কাপড়ের টুপি, গায়ে কলকা-দার মুসলমানী পাঞ্জাবি, পরণে ঢোলা পায়জামা। বয়েসে অনেক বড় সোহাগীর চেয়ে। চল্লিশের কাছাকাছিই বোধহয় হবে বয়েস তার। দেখে দিল্লি-লখনৌয়ের মানুষ বলে মনে হলেও মানুষটা কিন্তু পরিষ্কার বাঙলাতেই আবার বলল,—এই মেয়েটা, ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদছিস কেন ? অ্যাঁ ?

সোহাগী কী বলবে বুঝতে না পেরে কান্না চেপে বোকার মতন চেয়ে রইল চুপচাপ।

—এত জায়গা থাকতে এই আস্তাবলের ছাতে এসেছিস কী করতে ? উঁ ? আর জায়গা পেলিনে ?

—মানিকবুড়ো যে বসিয়ে রেখে গেল। বলল, কোথাও যাসনি। তাই জন্যেই তো।

—চতুর্দোলায় তো দুটো ছুঁড়ি তোরা। আরেকটাকে দেখছি না যে ? সেটা গেল কোথায় ? সেটা ছাতে আসেনি বুঝি ?

টুন্‌কির কথা মনে পড়ে যেতেই নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আবার ফুঁপিয়ে উঠল সোহাগী।

—এ তো আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল ! ভিড়ভাড়াক্কা থেকে সরে এসে ফাঁকায় বসে একটু জিরোবো বলে খুঁজে খুঁজে এই ছাতটাতে উঠে এসে দেখি কিনা,—আমাদের চতুর্দোলার সখী কাঁদছে বসে বসে। ওরে এই,—কাঁদছিস কেন বল্ না ? খিদে পাচ্ছে ?

—ন্‌না।

—তবে ? কিসের কষ্ট হচ্ছে ?

সোহাগী দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে গুক-গুক্ করে কাঁদতে লাগল আরো।

—নে বাবা, যত ইচ্ছে কাঁদ্। শুধু চেঁচিয়ে কাঁদিসনি দোহাই। অনেক খুঁজে এই ফাঁকা নির্জন জায়গাটায় চুপচাপ বসে একটু ওষুধ খেতে এসেছি। বুঝলি ?

সোহাগী তেমনি কাঁদতে লাগল। হাঁটুর মধ্যে আরো মুখ গুঁজে।

বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে বুকটাকে যখন কিছুটা হালকা মনে হল, তখন আস্তে আস্তে হাঁটুর মধ্যে থেকে মুখ তুলে সোহাগী দেখতে পেল ছাতের ওদিকে এক কোণে আকাশ পানে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সেই মানুষটা।

পিছন দিক থেকে কালো ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল মানুষটাকে। এমন কি পাঁচিলের ওপরে যে শিশিটাকে রেখে এক হাত দিয়ে ধরে ছিল মানুষটা, সেটাকেও দেখাচ্ছিল ছায়ার মতো। যেন কালো রঙ দিয়ে আঁকা একটা মানুষের ছবি।

কিছুক্ষণ পরে সেই শিশিটাকে রুমালে জড়িয়ে পাঞ্জাবীর পকেটের

মধ্যে রেখে দিল মানুষটা। তারপরে, সোহাগীর স্পষ্ট মনে হল, লোকটা যেন কিসের একটা যন্ত্রণায় একবার একটা কাতর ধ্বনি করে উঠেই চুপ হয়ে গেল আবার।

আকাশে জ্বলজ্বলে নিটোল একটা চাঁদ। আকাশ জুড়ে সাদা মেঘ ভেসে চলেছে হু-হু করে। মনে হচ্ছে, পাঁচিলের ধারে ছায়ার মতো দেখাচ্ছে যাকে, সেই মানুষটাই যেন ভেসে চলে যাচ্ছে দূরে, দূরে, অনেক দূরে।

সোহাগীর ভয় করতে লাগল কেমন। গা ছমছম্ করতে লাগল। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে দাঁড়াল মানুষটার পাশটিতে।

মানুষটা একবার ফিরে তাকাল সোহাগীর দিকে। তারপর আবার সমুখের দিকে চোখ মেলে দিয়ে বলল,—উঠে এলি যে?

—ভয় করছে।

—কিসের?

—তা' জানি না।

—নাম কি?

—সোহাগী।

—কতদিন থেকে চতুর্দোলার সখী সাজছিস?

—এই পরথম্। আমি তোমায় চিনতে পেরেছি কিন্তু এতক্ষণে।

—বটে? খুব বাহাদুর তো!

—হ্যাঁ। তুমি তো বাজনদারদের আগে-আগে খুব হাত নাড়তে-নাড়তে তাল দিতে-দিতে যাচ্ছিলে। চতুর্দোলা থেকে দেখেছি আমি। তুমি বুঝি মাষ্টার ওদের? ওস্তাদ ওদের?

—হুঁ। কি করে জানলি তুই রে?

—ভবদিদির সঙ্গে সার্কাস দেখতে গেছলুম তো একবার। সেখানে যে-লোকটা বুকে অনেকগুলো মেডেল লাগিয়ে বাজনদারদের সামনে দাঁড়িয়ে তালে-তালে হাত নাড়ছিল শুধু, ভবদিদি বলেছিল, সেই হচ্ছে ওদের মাষ্টার, ওদের ওস্তাদ।

—তোর ভবদিদি তো জানে দেখছি অনেক কিছু!

—জানেই তো। কত কী জানে। আর আমাকে খু-উ-ব ভালবাসে।

—থাকিস কোথায়?

—বসাক্-বস্তিতে।

—হুঁ।

—ওটা কিন্তু আসল বাড়ি নয় আমার। আমার আসল বাড়ি কোন্‌টা জান?

—কোন্‌টা?

—ঐ যে। ঐ যে দেখছ বারান্দা সামনে, তলায় সার সার ময়রার দোকান,—ঐটে। ঐখানে আমার আসল বাপ আছে, আসল মা আছে। ভবদিদি বলেছে। সত্যি।

মানুষটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সোহাগীর মুখের দিকে।

সোহাগী বলল,—জান, একটু আগে ঐ বারান্দায় আমি আমার আসল মাকে দেখেছি।

—এই বয়েসেই নেশা ধরেছিস?

—আমি তো নয়, ভবদিদি নেশা করে। আফিঙ খায়। জানো, সেই ভবদিদি একদিন আমাকে বলেছিল যে, বসাক-বস্তির কুসুমদাসীর মেয়ে নই আমি। কাঁটাপুকুরের ময়রা-বাড়ির মেয়ে আমি, হাসপাতালে আমাকে বদল করে নিয়েছে ওরা। ওরা আমাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

বলতে বলতে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল আবার সোহাগী।

মানুষটা কান্নার আওয়াজের মতো করে হেসে উঠল একবার, তারপর বলল,—তোরও বদল? বাঃ! বেশ! চমৎকার!

সোহাগী কান্না থামিয়ে বলল,—তোমার চেনা-জানা কারুর এমনি বদল হয়েছে বুঝি গো?

—হ্যাঁরে, খুব চেনা, খুব।

—আমারই মতন? হাসপাতালে মেয়ে-বদল?

—উঁহু, মেয়ে নয়, ছেলে। ছেলে ছিল সেটা।

মাথার ওপরকার সমস্ত আকাশটা জুড়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘের দল হু-হু করে ভেসে যাচ্ছিল। সেই দিকে চোখ রেখে মানুষটা কেমন আবছা গলায় বলতে লাগল,—

তোর কান্না একরকমের, তার কান্না আরেক রকমের। তুই নরকের ধুলোবালিতে হামাগুড়ি দিলি, নরকের মাটিতে দাঁড়াতে শিখলি, চলতে শিখলি, বড়সড় হলি,—তারপর হঠাৎ একদিন জানলি, জন্মের সময় তোর কাছে স্বর্গের দরজার চাবি ছিল একটা। সেটা ছেলেতাই হয়ে গেছে। আর, আমার?

—তোমার?

চমকে উঠে মানুষটা বলল,—আমার মানে, তার;—আমার সেই চেনা-ছেলেটার।

—কী হয়েছিল তার?

সোহাগীর কেমন যেন মনে হল, সেই না-দেখা অচেনা ছেলেটার গল্পটা শুনতে পেলে কষ্টটা তার হালকা হবে হয়ত, দোসর খুঁজে পাবে সে একটা মনে-মনে। তাই আবার বলল,—বল না তার কথা? সে-ও বুঝি আমার মতন কাঁদে? খুব কাঁদে? যখন-তখন?

—হ্যাঁ। কান্নার শেষ নেই তার।

এই যে বাড়িটা দেখছিস, এর চেয়েও বড় একটা বাড়িতে মানুষ হয়েছিল সে। সে-বাড়িতে কত দাসী, কত নফর, কত আমলা-গোমস্তা। সেই বাড়ির ছোট-বৌয়ের ঘরে ছিল তার দোলনা টাঙানো। বিধবা ছোট বৌয়ের নয়নের মণি ছিল সে। মা জগদ্ধাত্রীর মতো একটা মুখ যখন-তখন তার মুখের ওপর নেমে এসে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিত তার গাল। স্বর্গ নেমে আসত পৃথিবীর ধুলোয়।

—আরেকটু সোজা ভাষায় বল গো। তারপর?

ছেলেটা বড় হল। বাড়িতে তিন কর্তা ছিল। বড়, মেজ, আর সেজ। ছোটকর্তা মরে গেছল তো আগেই। মেজ কিংবা সেজ কর্তা সুনজরে দেখতেন না ছেলেটাকে। ঘরে ঢুকলে বিরক্ত হতেন খুব, একটুতেই বকাবকি করতেন। শুধু বড়কর্তা বকেন নি কখনো।·····ছেলেটা বড় হতেই মাষ্টার এল তার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বছরের পর বছর ফেল করতে লাগল ছেলেটা। মেজ আর সেজকর্তা মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'হবে কোত্থেকে!' শুধু বড় কর্তা বললেন,—'বেশ তো, পড়াশুনো ওর মাথায় না ঢোকে তো চিনেবাজারের বাসনের দোকানটাতেই না হয় বসুক গিয়ে ছেলেটা।'—তাই বসল গিয়ে ছেলেটা। বয়েস আর কতই বা তখন? বছর পনেরো। কাজ আর কী,—শুধু ক্যাশমেমো কেটে টাকা-পয়সা বাক্সয় রাখা। বাদবাকি আসল কাজ যা-কিছু করবার, তার জন্যে

পুরোনো বিশ্বাসী কর্মচারীর তো অভাব ছিল না কিছু দোকানে। কিন্তু ঐ সামান্য কাজটুকু করবারও সময় ছিল নাকি ছেলেটার? দোকানের একেবারে ভেতর দিকে বাসনের র‍্যাকের আড়ালে ব'সে বাজনা প্র্যাকটিশ করত সে।

—কি বাজনা?

—সে কি একটা। ছোটকর্তারও খুব গান-বাজনার শখ ছিল নাকি। অনেক রকমের বাজনা ছিল তাঁর। সেই বাজনাগুলোর একটা না একটা নিয়ে প্যাঁ-পোঁ টুং-টাং করত সে আপন মনে। দোকানের কর্মচারীরা তারিফ করত খুব। বলত, ছোটবাবুর চেয়েও পাক্কা হাত হবে তার।···গুরুও জুটে গেল আপনা-আপনি। খদ্দের হয়ে এসেছিল ল্যাজাক্‌-আলো কিনতে,—ছেলেটার বাজনার হাত দেখে শিষ্য করে নিল সঙ্গে সঙ্গে। চিনেবাজারের বাসনের দোকানের পিছন দিকে বাসনের আড়ালে রোজ দুপুরে গান-বাজনার তালিম চলতে লাগল পুরোদমে।···সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরলেই বাড়ির ছোট গিন্নির ঘরের শ্বেত পাথরের মেঝের ঝকঝকে কাঁসার থালায় গরম-গরম ফুলকো লুচি সাজানো থাকত তার জন্যে, আর ক্ষীর এক বাটি। ছোট গিন্নি বলতেন,—'খুব খাটুনি হচ্ছে নারে।' ছেলেটা হাসত মুখ টিপে-টিপে।

—তারপর?

—তারপর বড় কর্তা হুম করে মারা গেলেন একদিন হঠাৎ। দুবার বললেন বুক কেমন করছে, তারপরেই সব শেষ।···শ্রাদ্ধের দিন এল এক মাস পরে। খুব ঘটা। লোকজন আত্মীয়-স্বজনে ভরে উঠল বাড়ি। ছেলেটা বলল, শ্রাদ্ধের দিন মন্ত্র প'ড়ে অন্ন-জল-বস্ত্র দান করতে চায় সে বড় কর্তার নামে। মেজ আর সেজকর্তা ভ্রূ-কুঁচকে বললেন,—'থাক, তোমাকে করতে হবে না কিছু।' ছেলেটার মন খারাপ হয়ে গেল খুব।···লোকজন খাওয়ানোর দিন সন্ধ্যেবেলা চারি দিকে যখন খুব হৈ চৈ, তখন ছেলেটা বাগানের অন্ধকারে একলাটি চুপটি করে ব'সে ভাবছিল বড়কর্তার কথা। এমন সময় দেখতে পেল, বড়কর্তার শালা একটা আধাবয়সী রোগা মানুষকে চড়-চাপড়-কোঁৎকা মারতে-মারতে আর গাল দিতে-দিতে বাগানের রাস্তা দিয়ে খিড়কির দরজার দিকে নিয়ে চলেছেন। ছেলেটা অন্ধকার থেকে উঠে ছুটে গেল সেই দিকে। বলল,—'মারছেন কেন?' বড়কর্তার শালা বললেন,—'শালা উটকো লোক, ফর্সা একটা জামা গায়ে গলিয়ে পঙক্তি ভোজনে বসেছিল, ঘাড় ধরে তুলে এনেছি। ভূতের কাছে মামদোবাজী।' ছেলেটা বলল,—'খেলেই বা। কত তো ফেলা যাচ্ছে।'···এই নিয়ে সুরু। তারপরে তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি। চাকর-দরোয়ান-মালীতে জড়িয়ে দু-পাঁচ জন লোকও জমে গেল বাগানের পিছন দিকের রাস্তায়। হঠাৎ রাগের মাথায় বড়কর্তার শালা বলে বসলেন,—'জন্মের ঠিক নেই যার, তার আবার এত তড়ফানি কিসের?' সেই শুনে ছেলেটা দিখিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে মেরে বসল এক চড় বড়কর্তার শালার গালে।

—তারপর?

—চড় তো নয়, বোমা ফাটল। সেই বোমায় এতদিনের আড়ালের পাঁচিলটা ভেঙে গেল নিমেষে। ছেলেটার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল, চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল, বাজ ভেঙে পড়ল তার মাথায়। ছেলেটা জানল, সে এ-বাড়ির কেউ নয়,—ছোটগিন্নি তার মা নন। এ-বাড়ির এক দাসীর ছেলে সে। এ বাড়ির ঠাকুর ঘরের বাসন মাজার যে ঝি, তারই গর্ভে জন্ম হয়েছিল তার। তবে, ছোটকর্তাই বাপ ছিলেন বটে তার।

—ছেলেটা কি করল তখন গো?

—চলে গেল বাড়ি ছেড়ে পাগলের মতন। ঘুরল হেথায়-সেথায় আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে। দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল। মাথাটা ঠাণ্ডা হল, পাগলামীটা ছুটল। গিয়ে দাঁড়াল ছেলেটা তার গান-বাজনার গুরুর কাছে। গুরু চাকরি জুটিয়ে দিলেন থিয়েটারে। বাজনা বাজাবার চাকরি। সেখান থেকে গেল শ্যামবাজারের বায়োস্কোপের বাড়িতে। কনসার্ট পার্টির হেড বাজিয়ে হল সে। তারপর সেখান থেকে···

শেষ হল না মানুষটার গল্প। তার আগেই আস্তাবলের অন্ধকার ছাতে সেই লোকটা এসে উঠল, যে-লোকটা অনেকক্ষণ ঠুন্‌কিকে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নিচে। লোকটা সোহাগীর দিকে চেয়ে বলল,—এই নিচে আয়, ঠুন্‌কি ডাকছে তাকে।

সোহাগী বলল,—না। মানিক বুড়ো আমাকে কোথাও যেতে মানা করে গেছে।

লোকটা বলল,—তবেই হয়েছে। মানিক বুড়োর আশায় বসে থাকলে আজ সারা রাতে আর নামতে হবে না তোকে ছাত থেকে। বুড়ো কালীমার্কা বোতল টেনে কাৎ হয়েছে গলির মোড়ের শেতলাতলার ধারে। ভোররাত্তিরে হোস্‌পাইপের জল লাগবার আগে ওর হুঁশ হবে ভেবেছিস? আয় নিচে,—কত খাবার আছে ভাল-ভাল।

—নূনা।

সোহাগী অসহায়ের মতো মুঠো ধরল বাজনদারদের ওস্তাদের জামার খুঁট। বলল,—আমায় বাঁচাও। আমি যাব না ওর সঙ্গে।

ওস্তাদ ঘাড় কাৎ করে তাকাল একবার সোহাগীর মুখটার দিকে, তারপর লোকটার দিকে চেয়ে কড়া ধমকের গলায় বলল,—ও' যাবে না। যা তুই।

নেমে গেল লোকটা। মনে হল, অন্ধকারে ওস্তাদকে এতক্ষণ চিনতে পারেনি। গলা শুনে চম্‌কে উঠে সুড়সুড় করে নেমে গেল তাই।

সোহাগী দুহাতে ওস্তাদকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল,—আমি বাড়ি যাব।

—যাবি বৈকি।

—কিন্তু মানিক বুড়ো যে···

—আমি তো আছি।

—তুমি? তুমি নিয়ে যাবে আমাকে?

—তা ছাড়া উপায় কি?

—এখুনি চল তা হলে। এক্ষুণি।

—খেয়েছিস কিছু?

—না।

—খাবি না?

—না।

—বড্ড ভয় করছে?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে, চল্ তবে ;—তোকে পৌঁছে দিয়েই আসি একবার।

ওস্তাদের পিছু পিছু নেমে এল সোহাগী আস্তাবলের ছাত থেকে। রাস্তায় নেমে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ফেলল ওস্তাদ। বলল,—উঠে পড়্। এই সখীর বেশে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে বলবে কি? কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে জান্ যাবে আমার। আয়।

গাড়িতে উঠে একটা বাদে আর সব খড়খড়িগুলোই বন্ধ করে দিল ওস্তাদ। গাড়িটা চলতে হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল সোহাগী।

ওস্তাদ বলল,—কি রে? কি হল আবার? আবার কান্না কেন?

সোহাগী বলল,—আমাকে আমার আসল মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে পার না তুমি?

এই প্রশ্নের উত্তরে ছোট্ট একটি 'না' ছাড়া আর কিছু বলবার ছিল না ওস্তাদের। কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু সেই ছোট্ট 'না'-টুকু বলতে অনেকক্ষণ সময় লাগল ওস্তাদের। অনেকক্ষণ। অনে-এ-কক্ষণ।

আর একটিও প্রশ্ন করল না সোহাগী। চোখ মুছে স্থির হয়ে বসে রইল।

হাড়-জিরজিরে একজোড়া ঘোড়া লাগানো থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়িটা তার লোহা লাগানো নড়বড়ে চাকা নিয়ে ছুটতে লাগল জোর কদমে।

একসময় সোহাগী বলল,—এমন হয় না কেন যে, পেটের মেয়ের গায়ে হাত পড়লেই বুঝতে পারে মায়েরা যে, সে তারই মেয়ে?

এবারে চুপ করার পালা ওস্তাদের। উত্তর নেই এ-প্রশ্নের।

দর্জিপাড়ার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন গাড়ি। ওস্তাদ বলল,—ঐ যে টালি-ছাওয়া টিনের লম্বা বাড়িটা দেখতে পাচ্ছিস, ওরই দোতলার ঘরটায় থাকি আমি।

আর কোনো কথা হল না। বসাক-বস্তির কাছাকাছি এসেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল দুজনে।

সোহাগী বলল,—তুমি খুব ভাল লোক।

ওস্তাদ সোহাগীর ওড়না ঢাকা দেওয়া মাথাটা হাত দিয়ে নেড়ে বলল,—কোনও দরকারে পড়লে যাস্ আমার কাছে। বুঝলি? বলবি, দুলালচাঁদ মল্লিকের সঙ্গে দেখা করব, ব্যস্।

এই বলে ফিরে গেল ওস্তাদ হন্ হন্ ক'রে, আর সোহাগী একছুটে বসাক-বস্তির খোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এর পর বছর-তিনেকের মধ্যে আরো বার-পাঁচেক সোহাগীর সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই ওস্তাদের—পথেঘাটে, গঙ্গার ধারে। প্রত্যেকবারেই ওকে দেখে হেসেছে ওস্তাদ। দূর থেকে হাত নেড়ে ইসারায় বলেছে,—ভাল আছিস তো?

পরের বছরে দেখাটা হল একেবারে সামনা-সামনি। গঙ্গার ধারের সরু একটা গলির মধ্যে শিবমন্দিরে নমস্কার সেরে আসছিল সোহাগী, এমন সময় একেবারে মুখোমুখি দেখা।

ওস্তাদ বলল,—কিরে মেয়েটা? ভুলেই গেলি যে দেখছি আমাকে। য়্যাঁ?

সোহাগী বলল—ওস্তাদ!

ওস্তাদ বলল,—হ্যাঁ রে, জ্যান্ত ওস্তাদ, ভূত নই। তুই যে রকম বড় বড় চোখ করেছিস, মনে হচ্ছে ভূত দেখলি যেন।

সোহাগী বলল,—এতকাল ছিলে কোথায় গো?

ওস্তাদ বলল,—ব্যাণ্ডমাষ্টার হয়ে দিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়িয়েছি একটা সার্কাসপার্টির সঙ্গে। পুরো এগারো মাস বাদে ফিরলুম আবার।

—ঐ সেই দর্জিপাড়ায়?

—হুঁ। এখনো মনে আছে তোর? ও-ঘর আমার বাঁধা ডেরা। পাঁচ বছরের আগাম ভাড়া দিয়ে রেখেছি। দোতলায় ঐ একটা ঘর, আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। বেশ নিরিবিলি আরামসে থাকা যায়।

চলতে চলতে কথা বলছিল ওরা। পথের দুধারে তেলের গুদোম, ডালের আড়ৎ, মশলার দোকান, কাপড়ের দোকান। সেই কাপড়ের দোকানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওস্তাদ। অনেক রকমের সব ছাপা শাড়ি ঝুলছিল সামনে। ওস্তাদ বলল,—ভাল কথা, একটা শাড়ি পছন্দ করে দে তো।

সোহাগী বলল,—কি হবে?

ওস্তাদ বলল,—একজনকে দোব।

লাল রঙের ওপর কালোর ফুল আঁকা একটা শাড়ি পছন্দ করল সোহাগী। ওস্তাদ দাম চুকিয়ে শাড়িটা সোহাগীর হাতেই গুঁজে দিয়ে বলল,—যা, পালা, বাড়ি যা।

সোহাগী বলল,—আমাকে? আমাকে কেন?

ওস্তাদ বলল,—সামনে দুর্গোপুজো আসছে না? তোর যদি একটা মামা কিংবা কাকা থাকত, দিত না তোকে? যা, পালা, বাড়ি যা।

আর একটুও না দাঁড়িয়ে উল্টোমুখে গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলে গেল ওস্তাদ। হতভম্ব সোহাগীর নমস্কার করাটাও হল না।

এর পরে ওস্তাদের সঙ্গে সোহাগীর দেখা হয়েছিল এক দুর্যোগের রাতে। সেই শেষ দেখা। আজ এতগুলো বছর পরেও সেই শেষ দেখার দিনটার কথা একটুও ভুলতে পারেনি সোহাগী। সেই সর্বনেশে ভয়ঙ্কর দিনটার স্মৃতি বিষাক্ত একটা কাঁটার মতো বিঁধে আছে তার মনের মধ্যে! কাঁটা নয়, তার চেয়েও বেশি। একটা মশালের মতো গেঁথে আছে তার মনের মধ্যে। মশালটা ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে জ্বলছে আজো। আজো মাঝে মাঝে সেটা পুড়িয়ে মারে সোহাগীকে।

সেদিন আকাশেই শুধু দুর্যোগ ঘনিয়ে আসেনি, তার চেয়ে ঢের বেশি দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল সোহাগীর জীবনে।

রাজারা যেমন বয়েস হলে উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার আয়োজন করেন দিনক্ষণ দেখে, ঠিক তেমনি, সেই ঘনঘোর দুর্যোগের দিনে কুসুম দাসী তার দোতলার ঘর থেকে নিচে নেমে এসে জানাল,—আজ থেকে দোতলার ঘরে উঠবে সোহাগী। কলকাতা রেঙ্গুনের জাহাজের খালাসী লতিফ মিঞা খবর পাঠিয়েছে, আসবে সে আজ রাতে কুসুমদাসীর ঘরে। কুসুমের বদলে সোহাগীকেই থাকতে হবে ঘরে, তার সেবা করবার জন্যে। পুরোণো চেনা-জানা মানুষ; তাকে দিয়েই 'বৌনি' হবে সোহাগীর নতুন দোকানের।

যতদিন নন্দ শুঁড়ি বেঁচে ছিল, ততদিন পয়সার জন্যে ভাবতে হয়নি কুসুম দাসীকে। একাই একশো ছিল সে। হাত পাতলেই দু-পাঁচ টাকা ঠনঠন করে বেরিয়ে পড়ত। কী একটা মারামারিতে সেই নন্দ শুঁড়ি খুন হয়ে যাওয়া ইস্তক কুসুমের দিনগুলো খারাপ চলছিল বড়।

এবার তাই সোহাগীর টোপ ফেলে লতিফ মিঞাকে গেঁথে একটু তবু নিশ্চিন্ত হতে চায়। মানুষটার হাত দরাজ। ইয়ারবক্সুর সংখ্যাটাও বেশ তেজালো।—তাছাড়া সোহাগী যখন বেশ ডাগরটি হয়েছে, তখন আর কেন?

কথাটা শুনে শিউরে উঠল সোহাগী। আর্তনাদ করে উঠে বলল,—না-আ-আ-আ-আ!

এমন না তো এখানকার সব মেয়েরাই বলে প্রথম দিন। হাতে পায়ে ধরে, কাঁদে, কাঁপে ভয়ে। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। যাদের এমনিতে হয় না, তারা মার খায়। মার খেয়ে ট্যাঁটামো থামায়। হাড়িকাঠে গলা বাড়াবার আগে বলির পাঁঠা চিৎকার করে, ঠ্যাং ছোঁড়ে, পালাতে চায়:—কিন্তু তাই বলে কি বলি বন্ধ থাকে নাকি? মার খেয়েও ট্যাঁটামো যায় না যাদের, তাদের খাবারের সঙ্গে আফিঙ কিংবা সিদ্ধি খাইয়ে দেওয়া হয় খানিকটে। তাইতেই কাবু হয়ে পড়ে। তারপর প্রথম রাতটা পার করে দিতে পারলে তারপর আর হাঙ্গাম-হুজ্জৎ করে না কোনো মেয়ে। তাই সোহাগীর কান্না শুনে একটুও বিচলিত হল না কুসুম দাসী। শুধু বলল,—ঢং করিসনি মুখপুড়ী, ছেনালী করিসনি আর,—জানতিস্ না যে এই কাজ করতে হবে তোকে?

জানত। জানত বৈকি। তবু কাঁদল, তবু পা জড়িয়ে ধরল কুসুমদাসীর।

কুসুম দাসী অটল।

কুসুমদাসীর মা-ও একদিন অটল হয়েছিল এমনি।

তার মা, তার মা, তার মাও। এছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না তাদের, জানা ছিল না তাদের। কুসুমেরও নেই।

প্রথম দিনের বিভীষিকায় পালিয়ে গেছে কত মেয়ে। গেছে বটে, কিন্তু ফিরে এসেছে আবার। যাবে কোথায়? কোথায় কে কোন্ দরজা খুলে রেখেছে তাদের জন্যে?

সোহাগীর কিন্তু চকিতে মনে পড়ল,—আছে আছে, একটা ঘর খোলা আছে তার জন্যে। দর্জিপাড়ার রাস্তায় টিনের বাড়ির দোতলায় ঘর সেটা। সেই ঘরে ওস্তাদ থাকে। অনেক বড় তার বুক, অনেক দয়া তার বুকে।

সেইখানে পালাবে সোহাগী। তার পায়ে আছড়ে পড়ে বলবে,—বাঁচাও আমাকে। সেই অনেকদিন আগে আস্তাবলের ছাত থেকে বাঁচিয়েছিলে যেমনি, তেমনি বাঁচাও আমাকে। আজ আমার বড় বিপদ।

সকাল থেকেই ঝড় আর জল চলছিল। কাক আর চড়াইপাখির শব্দহীন একটা ভয়-পাওয়া সকাল। সেই সকালেই সোহাগীর মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করে দিয়ে দপদপিয়ে চলে গেল কুসুম দাসী নিজের কাজে। আর সোহাগী?

সোহাগীর দেহের ভেতরকার সবকিছু সেই থেকে তার গলার কাছে এসে আটকে রইল!

দুপুরে মুসুরডাল-বাটা নিয়ে এল কুসুম দাসী। নিয়ে এসে মাখিয়ে দিলে সোহাগীর সর্বাঙ্গে। বলে গেল,—ঘণ্টাখানেক বসে থাক্ চুপচাপ। তারপর ওগুলো ঝরিয়ে দিয়ে তেল হলুদ মাখিয়ে দেব, তখন চান করবি। এ হোল গিয়ে তোদের সাবানের বাবা।

মুসুরডাল-বাটায় যেন লঙ্কার জ্বালা!

সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল সোহাগীর। পুড়ে যেতে লাগল সমস্ত দেহ। তবু স্থির হয়ে বসে রইল সোহাগী;—একটুও কাঁদল না একটুও ছটফট করল না।

দুপুরবেলা ভাত খেতে ব'সে যখন দিব্যি পরিপাটি করে কাঁটা বেছে বেছে চুনো-চানা মাছের ঝাল দিয়ে ভাতের গরাস মুখে তুলতে লাগল সোহাগী, তখন খোদ্ কুসুম দাসীই অবাক হয়ে গেল!

সোহাগীর চেয়ে বছর খানেকের বড় যে বকুল, সবে গেল বছর থেকে যার ব্যবসায় পত্তন হয়েছে;—সেদিন চিৎকার ক'রে, মাথা ঠুকে, বাড়িউলী মাসির গা জড়িয়ে ধ'রে অঝোরে কেঁদেছিল যে,—সেই বকুল তো সোহাগীর পাশে এসে উবু হয়ে ব'সে বলেই ফেলল,—ধন্যি মেয়ে তুই সোহাগী! দেখালি বটে সাহস। আমার তো ভাত দূরের কথা, এককোঁটা জলও নামেনি সেদিন গলা দিয়ে।

চুনোমাছের সরু ফিনফিনে কাঁটা থালায় কানায় লাগিয়ে রাখতে-রাখতে সোহাগী বলল,—এখন নামছে তো সব?

বকুল বলল,—কি কথার কি উত্তরের ছিরি দেখ! তা' নামবে না কেন?

—তবে আর এক দিনের জন্যে ঢঙ করে লাভ?

—ঢঙ্!

বকুল গালে হাত দিয়ে চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকিয়ে রইল সোহাগীর দিকে।

—ঢঙ, ছাড়া আর কি? জানতিস না তুই যে, এই তোকে করতে হবে?

—তা' জানতুম।

—তবে? ছোটবেলা থেকে জানতিস্ যে এই তোকে করতে হবে; করছিসও তাই।—মাঝ মধ্যিখানে একদিন কাঁদা আর মাথা ঠোকার মানে আছে কিছু?

—কিন্তু সব জেনেও কান্না যে পেয়েছিল সেদিন! সকলেরই তো কান্না পায়।

—আমার পায় না।

—ভয়?

—তাও না।

—তাও না!

কেমন যেন পিছিয়ে গেল বকুল। ও' নিজেই ভয় পেল। ভয় পেয়েই যেন উঠে গেল সেখান থেকে।

দুপুরবেলা বৃষ্টি ধরে এল। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদের ঝলকানিও দেখা যাচ্ছিল।

কুসুম এসে খুশি-খুশি গলায় বলল,—দুপুরবেলা ঘুমিয়ে নিস্ ভাল ক'রে, বুঝলি।

ঘুম কিন্তু একটু হল না সোহাগীর। বুকের মধ্যে তোলপাড়, মাথার মধ্যে জগদ্দল পাথরের ভার। আতঙ্কে কাঁটা হয়ে আছে সমস্ত দেহ। আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবল ভাবতে লাগল,—আবে বৃষ্টি হোক্, আবো, আরো জোরে। ভেসে যাক্ সমস্ত পথঘাট। তাহলেই তো সেই জাহাজের খালাসী লতিফ মিঞা আসতে পারবে না আজ।

কিন্তু আজকের রাতটা না হয় বাঁচল সোহাগী? কাল, পরশু, তরশু, নরশু, ধরশু?
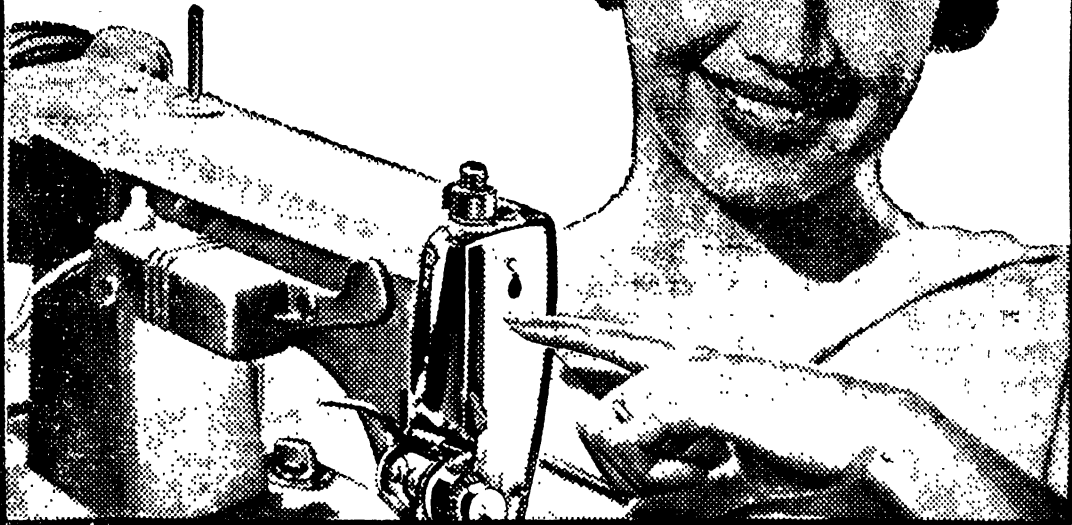
কুসুম দাসী চোখে-চোখে রেখেছে আজ সোহাগীকে। ওকে ঘরের মধ্যে ঘুমোতে দিয়ে নিজে চৌকাঠের বাইরে মাদুর পেতে শুয়েছে। টোপ গেলবার মুখেই তো মাছের যত ছটফট, যত ল্যাজ-আছড়ানি, যত ছিপ ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা। তারপর একটু খেলিয়ে হাঁপিয়ে দিতে পারলেই ব্যস্ সুড়সুড় করে উঠে আসবে জালের মধ্যে। টোপ ধরবার মুখেই তাই একটু সজাগ চোখ রাখতে হয়। কুসুম দাসীও রেখেছে।

সোহাগী ঘর থেকে বলল,—ঘরের ভেতর এসে শোও না গো মা। খামোকা মাদুরে শুতে গেলে কেন?

কুসুম বলল,—কোমরে একটু রোদের তাপ লাগাচ্ছি বাছা। তুই ঘুমো দিকিনি। রাতে কি আর ঘুমোতে পাবি আজ? একলা-একলা বিছানাতে একটু হাত-পা ছড়িয়ে আরাম কোরে শুয়ে ঘুমো।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে মেঘের ফাঁক দিয়ে সত্যিই একফালি রোদ এসে পড়েছিল তখন দালানে। কিন্তু এই ব'লে আসলে কুসুম যে পাহারা দিচ্ছে তাকে, একথা বেশ বুঝতে পারল সোহাগী। কিন্তু যাতে এই পাহারা না দেয় কুসুম, তারই জন্যেই তো কান্নাকাটি থামিয়ে চুপ করে থেকেছে সোহাগী সকাল থেকে। নিশ্চিন্তের ভঙ্গি করে বাঁটা বেছে বেছে মাছ খেয়ে অবাক করে দিয়েছে বকুলবালাদের,—যাতে কুসুমের মনে হয় যে, এ মেয়েকে পাহারা দেবার দরকার নেই আর,—এ মেয়ে পালাবে না।

তবু পাহারা? তবু নজরবন্দী?

টিনের চালার কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপটি করে শুয়ে শুয়ে এলোমেলো কত কী ভাবতে লাগল সোহাগী। যদি আজ কোনোরকমেই পালাতে না পারে সোহাগী,—তাহলে? মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে আবার মেঘের মধ্যে; কিন্তু বৃষ্টি আর পড়ছে না। রাস্তায় জল দাঁড়াবার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, তাও ঘুচে গেল। তাহলে?

তাহলে লতিফ মিঞা! জাহাজের খালাসী। একমুখ দাড়ি-গোঁফ। কাছি-টানা শক্ত কঠিন একটা হাত। হাতে উলকিও আছে নিশ্চয়ই একটা। বিষধর সাপের উলকি একটা; কিংবা মেয়েছেলের। পান-দোক্তার ছোপ লাগা মোটা-মোটা দাঁত। বাজখাঁই গলা। বিকট হাসি। দানব! দানব! দানব!

মুখ ঘুরিয়ে নিল সোহাগী। যেন ওর চোখের সামনে দানবটা দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। আর, মুখ ঘুরিয়েই দেখতে পেল বাইরের মাদুরে কুসুম ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকছে তার।

উঠল সোহাগী। বুক কাঁপতে লাগল। পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল চৌকাঠ পর্যন্ত। শুধু বুক নয়, সারা দেহটাই কাঁপতে লাগল সোহাগীর। পা আর ওঠে না। শেষ অবধি উঠল। ঘুমন্ত কুসুমকে ডিঙিয়ে গেল সোহাগী। ব্যস! এইবার—

সঙ্গে সঙ্গে নিতান্তই শান্ত গলায় কুসুম বলল,—কলতলায় যাচ্ছিস বুঝি রে?

—হ্যাঁ।

কলতলার ইটের পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে খুব খানিকটা কাঁদল সোহাগী নিঃশব্দে। তারপর গুটিগুটি ফিরে এসে শুয়ে পড়ল আবার বিছানায়। আর, যতরাজ্যের ক্লান্তি এসে তখন ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিল!

ঘুম ভাঙল যখন, তখন সন্ধে হয় হয়। রাত্রের দিকে আর এক প্রস্থ জল ঢালবার জন্যে আকাশে আবার নতুন করে তোড়জোড় চলছে তখন।

কুসুম বলল,—আয় সাজগোজ সারা ক'রে নে চটপট।

সেদিন কুসুমই সাজিয়ে দিয়েছিল সোহাগীকে। গিলটি-করা অনেক রকমের গয়নায় সোহাগীকে সাজিয়ে দিয়ে বলেছিল,—তোর ভাবনা কি মা সোহাগী? এমন মুখের ছিরি এ-তল্লাটে নেই কারুর। পয়সা তোর বাক্সে ধরবে না। তা' সেদিন যেন এই মা-টাকে ভুলে যাসনি ঐ পাঁচুবালার মতন।

ঐ এক ভয় এখানকার মায়েদের। ব্যবসা জমে ওঠবার পর মেয়েরা ভুলে যায় মায়েদের। দু-টাকা চাইলে চার আনা ছুঁড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় মুখের ওপর। ভিক্ষে ছাড়া আর পথ থাকে না তখন। পাঁচুবালার মা ভিক্ষে করতে করতে গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে রাস্তায়।

সোহাগীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়েই কুসুম দাসীর মনে পড়ে গেল হঠাৎ যে, বড় মহারাজের মন্দির থেকে প্রসাদী ফুল আনা হয়নি তো! কুসুম দাসী তাই ছুটল তাড়াতাড়ি নিজেই। বলল,—ওমা! দেখিছিস আমার বেভুলুন কাণ্ড! শনিঠাকুরের ফুল আনা হয়নি এখনও! কী কেলেঙ্কার! যাচ্ছি আমি সোহাগী। যাব আর আসব। বুঝলি?

হন্তদন্ত হয়ে ছুটল কুসুম নিজেই। আর, সেজেগুজে সোহাগী কাঠের মতো বসে রইল ঘরে।

হঠাৎ সোহাগীর মনে হল,— তাই তো, বসে আছে কেন সে? পালিয়ে যাবার এতবড় সুযোগটা এমন সহজে যখন হাতের মুঠোয় এসে গেছে, তখন বোকার মতন বসে আছে কেন সোহাগী এখনও? এখনও পালায়নি কেন সে?

পালিয়েছিল সোহাগী। সুযোগটা নষ্ট করেনি একটুও। যে মুহূর্তে পালাবার কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল, সেই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েছিল পথে, বস্তির আর সকলের অলক্ষ্যে।

আকাশ জুড়ে ঘনঘোর অন্ধকার। আরেকটা প্রচণ্ড ঝড় আর প্রবল বৃষ্টির ভয়ে সমস্ত শহরটা তখন থমথম করছিল। পথে লোক চলাচল কম ছিল। ভিখিরিগুলো তাদের ময়লা ছেঁড়া কাপড়-চোপড় মুড়ি দিয়ে গুটিয়ে-সুটিয়ে বসেছিল গাড়িবারান্দাগুলোর তলায়। বিদ্যুতের আলো চিড়িক্ দিয়ে উঠছিল থেকে-থেকে। জলে-ভেজা পথে মিটমিটে গ্যাসের আলোগুলোও যেন সর্দিজ্বরের রুগীর মতন ধুঁকছিল।

অনেক পথ পেরিয়ে আর, অনেক দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সোহাগী যখন দর্জিপাড়ার সেই টিনের বাড়ির দরজায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তখন সুরু হয়ে গিয়েছিল আবার ঝড় আর জলের তাণ্ডবলীলা।

—কে গা?

রাতের অনেক আগেই গভীর রাতের অন্ধকার নেমে এসেছিল সেদিন কলকাতায়, তাই সেই সাঁঝের বেলাতেই হ্যারিকেনের আলোটা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়ে সোহাগীর মুখের সামনে তুলে ধ'রে হিন্দুস্থানী একটি বুড়ি শুধিয়েছিল,—কৌন্ হো তুম্?

এই ঝড়-বাদলের দিনে এমন দুর্যোগ মাথায় নিয়ে একটা কাঁচা

বয়েসের অচেনা মেয়েকে বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়তে দেখে খুবই বিস্মিত হয়ে উঠেছিল সেই বৃদ্ধা বাড়িওয়ালী।

তার প্রশ্নের উত্তরে সোহাগী বলেছিল, দুলালচাঁদ মল্লিকের কাছে এসেছে সে। সে তার আত্মীয়া হয়। খুব নিকটের জন। ভাইঝি।

বাইরে ঝড় আর জলের অমন মাতামাতি না চললে বুড়ি নির্ঘাত দরজা বন্ধ করে দিত সোহাগীর মুখের ওপর। বলত, অপেক্ষা কর বাইরের রোয়াকে কিংবা ঘুরে এস কোথাও; দুলালবাবু বাইরে গেছে সেই সকালবেলা, এখনও ফেরেনি। কিন্তু এই ঝড়-জলের দিনে তেমন কথাটা আর বলতে পারেনি বুড়ি। হ্যারিকেনের আলোয় সোহাগীর আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে ভাঙা-ভাঙা বাঙলায় জানিয়েছিল যে,—সোহাগী ইচ্ছে করলে দোতলায় উঠে গিয়ে মল্লিকবাবুর ঘরের সামনের বারান্দায় বসে থাকতে পারে।

কাঠের একটা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গিয়েছিল সোহাগী। আর উঠে গিয়েই দেখেছিল, হ্যারিকেন নিয়ে বুড়ি একতলার কোন একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতেই সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে লেপটে একাকার হয়ে গেল।

ভয়, ভয়, ভীষণ ভয়!

বুক ভর্তি সেই ভয় নিয়ে সোহাগী একলা উবু হয়ে বসে রইল ওস্তাদের চাবি-বন্ধ ঘরের সরু বারান্দাটার দেয়াল ঘেঁসে।

জল, জল, আর জল! ঝড়ের শোঁ-শোঁ শব্দ আর জলের আওয়াজে ডুবে গেছে সমস্ত কিছু। সোহাগীর মনে হয়েছিল, সারা শহরে কোথাও কেউ কথা বলছে না, কাঁদছে না, খেলছে না, ঝগড়া করছে না, গান গাইছে না;—সবাই ঘরের কোণে বসে কান খাড়া করে শুনছে শুধু ঝড়-বাদলের আওয়াজ।

জলের ছাটে বারান্দাটা ভিজে যাচ্ছিল যখন, সোহাগী তখন জলের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্তে অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বিদ্যুতের আলোয় দেয়ালের হুকে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছিল একটা চাবি। সেই চাবি দিয়ে ওস্তাদের ঘরের তালা খুলে ঢুকে পড়েছিল সে ঘরে। উচিত-অনুচিতের কথা ভাববার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন সোহাগীর। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিল তখন তার সমস্ত দেহ মন। ক্লান্তিতে আর ভয়ে।

ঘরে ঢুকে হাতড়ে-হাতড়ে একটা তক্তাপোষ খুঁজে পেয়ে তারই বিছানায় লুটিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। ঘরের দরজাটাও বন্ধ করেনি। তারপর সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ওস্তাদের বিছানায় শুয়ে খোলা-দরজার ভিতর দিয়ে বিদ্যুতের চ'কানি দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল যে এক সময়, তা' সে নিজেও টের পায়নি।

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একটা প্রচণ্ড নিষ্পেষণে! তারপরেও অনাস্বাদিত একটা বিহ্বলতায় কেটে গিয়েছিল আরো কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর ভীতিপ্রদ একটা নিরন্ধ্র অসাড়তা। এবং তারপর—

লতিফ! লতিফ মিঞা!—তার কবল থেকে রেহাই মিলল না সোহাগীর শেষ পর্যন্ত!—অসাড়তা কেটে যাবার পর এই ভেবে একটা আর্তনাদ করে উঠেই বিদ্যুতের আলোয় সোহাগী শিউরে উঠে দেখতে পেয়েছিল, মানুষটা লতিফ নয় লতিফ নয়,—দুলালচাঁদ মল্লিক;—ওস্তাদ!

এরপর আর চেতনা ছিল না সোহাগীর।

চেতনা হয়েছিল সেই সকালবেলা। রাতেরবেলার সমস্ত দুর্যোগের চিহ্ন সম্পূর্ণ মুছে ফেলে আকাশ তখন রোদ্দুরে ঝলমল্।

সোহাগী উঠে বসেছিল। রাতেরবেলার দুর্যোগের বোঝা ভারী পাথরের মতন চেপে রয়েছে তখনও তার সর্বাঙ্গে। অপরিসীম ক্লান্ত সে। ক্লেদাক্ত সে।

খোলা দরজা দিয়ে একটা বস্তি দেখা যাচ্ছিল। গতরাতের দুর্যোগে তার চাল উড়ে গেছে কোথায়। সোহাগীর ওপর দিয়ে তার চেয়ে অনেক বড় দুর্যোগ চলে গেছে কাল রাতে। সব উড়ে গেছে তার। কিছু নেই আর তার। কিছু নেই। সে আজ সর্বস্বান্ত।

সোহাগী কাঁদেনি কিন্তু একটুও। পাথরের মতন কঠিন হয়ে গিয়েছিল সে। বরং থেকে-থেকে অদ্ভুত একটা হাসি মোচড় দিয়ে উঠছিল তার বুকের মধ্যে।

চারিদিক তাকিয়ে কোথাও খুঁজে পায়নি সে ওস্তাদকে। একতলা থেকে সেই বুড়ি এসে বলেছিল গয়লার দুধ-টুধ কিছু লাগবে কি? সোহাগী বলেছিল,—না। সে চলে যাবে এখনি।

সত্যিই তাই করেছিল সোহাগী। দর্জিপাড়ার দোতলা ঘর থেকে নেমে সটান্ সোজা চলে এসেছিল কুসুম দাসীর কাছে।

কুসুম দাসী চমকে গিয়েছিল ওকে দেখে। রাগ আর উল্লাসে মেশানো গলায় শুধিয়েছিল,—কোথায় ছিলি তুই কাল রাতে? কোথায় ছিলি? কথা বলছিস না যে?

সোহাগী হেসে বলেছিল,—তোমার লতিফ মিঞার চেয়েও বড় খদ্দের জোগাড় করেছিলুম মা কাল রাতে। সে তোমার লতিফ মিঞার চেয়েও অনেক অনেক বেশি জানোয়ার। কিন্তু পায়ে পড়ি মা তোমার, আরো একটা মাস রেহাই দাও আমাকে। একটা মাস বাদে তুমি যা বলবে, তাই করব আমি। একটা মাস একটু জিরোতে দাও আমাকে।

রাজি হয়েছিল কুসুম। যে-পাখি খাঁচার শিকল কেটে উড়ে গিয়েও স্বেচ্ছায় ফিরে আসে আবার, সে যে আর পালায় না কোনওদিন, তা জানা ছিল কুসুমের;—তাই কোনোরকম জোর-জবরদস্তি করেনি। একটা মাস আর কতবড়ই বা।

কিন্তু তারই মধ্যে জানা গেল ব্যাপারটা।

সোহাগী মুছে ফেলতে চেয়েছিল চিহ্নটাকে। কুসুম হতে দেয়নি তা'। বলেছিল, তাড়ার কি আছে? ছেলে কি মেয়ে দেখাই যাক্ না আগে। গাছের প্রথম ফলটাই দেবতাকে দিতে হয়, রাজার প্রথম ছেলেই হয় যুবরাজ। কপালগুণে মেয়েই যদি হয়, তখন?

তা' হয়েছিলও তো তাই। মেয়েই। চাঁপা তার নাম।

কুসুম একগাল হেসে বলেছিল,—এ তোর লাখ টাকার সম্পত্তি হল রে সোহাগী।

লাখ টাকার সম্পত্তি পেয়ে সোহাগী কেঁদেছিল কিন্তু।

আজ এতকাল পরেও কি শেষ হয়েছে সে-কান্না?

অতীতকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সোহাগী বর্তমানের ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।—চাঁপাটা আসছে না কেন এখনও? সানাইপাড়ার সঙ্ দেখতে তো অনেকক্ষণ হল গেছে সে। সুবল কামারের শালা অবিশ্যি গেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু এত দেরী হবারই বা কারণটা কী?

রোগশয্যায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল সোহাগী।

নিচের ছেঁড়া-কাগজের গুদোমে বেল-বাঁধার ধুপধাপ ঠুকঠাক শব্দ হচ্ছিল। সেই শব্দের মাঝখান থেকেও কাঠের সিঁড়িতে মানুষের পায়ের আওয়াজটা কান এড়াল না সোহাগীর।

সোহাগী গলা বাড়িয়ে বলল,—কে রে? চাঁপা? চাঁপা এলি?

—হ্যাঁ মা।

—কেমন সঙ দেখলি?

—বলছি। আসছি।

সোহাগীর ঘরের মধ্যে না ঢুকে কাঠের বারান্দাটা দিয়ে চাঁপা সোজা চলে গেল নিজের সেই ছোট্ট খোপটির মধ্যে। সানাইপাড়ার খোঁড়া-ওস্তাদের খাতাখানাকে রাখল নিজের বই-খাতার গোছার ওপর। তারপর ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে দাঁড়াল। ও চোখের সামনে এখনও দেখতে পাচ্ছে যেন সেই আরশোলাটাকে, যেটা অনেক উড়ে অনেক ঘুরে অনেক লুকিয়েও শেষ অবধি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ল টিকটিকিটার মুখের মধ্যে। ও এখনও যেন কানের কাছে শুনতে পাচ্ছে মৃত্যুপথযাত্রী খোঁড়া-ওস্তাদের সেই অসহায় কাতরোক্তি,—যাঃ!

সেই একটিমাত্র 'যাঃ' হাজারখানা 'যাঃ' হয়ে বাজতে লাগল যেন চাঁপার কানের কাছে।—যাঃ! যাঃ! যাঃ! যাঃ! যাঃ! চাঁপার ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছে।

—চাঁপারে?

ডাক এল সোহাগীর।

—যাই মা।

তাড়াতাড়ি সাড়া দিল চাঁপা। আর, সাড়া দিয়েই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সোহাগীর ঘরের মধ্যে।

—ও কিরে, বাইরের কাপড়-চোপড় ছাড়িসনি এখনও?

—না মা।

—তাহলে করছিলি কি রে এতক্ষণ?

—কিছু না, এমনি এমনি রাস্তা দেখছিলুম দাঁড়িয়ে।

—কী হয়েছে বল্।

—কিছু না তো।

—কাছে আয়। বোস আমার বিছানায়।

—কাপড়-চোপড় বদলে আসি?

—না। আগে আয়। বল্ কী হয়েছে? চোখমুখ শুকনো কেন?

—কিছু না, কৈ? বাঃ রে। শুকনো আবার কোথায়?

—মা-ছুঁয়ে বল্ আমার।

—একটা রাজহাঁস পুড়ে গেল মা।

—রাজহাঁস?

—সত্যি নয়। কাগজ আর ফুল দিয়ে তৈরি রাজহাঁস। প্রকাণ্ড বড়। গোটা একটা মটরগাড়িকে ঢেকে ফেলেছিল। সেইটা পুড়ে গেল। তার সাদা ধপধপে ছড়ানো ডানাটা জ্বলতে-জ্বলতে ছাই হয়ে গেল পুড়ে। সকলে কত জল ছিটোলে, তবু রক্ষে করা গেল না রাজহাঁসটাকে। গলা, বুক, চোখ, ঠোঁট, কিছু রইল না মা।

—ও কী রে বোকা মেয়ে! কাগজের একটা রাজহাঁস পুড়ে গেল বলে তুই কাঁদছিস কেন? দুর পাগল!

—আর একটা মানুষও মরে গেল যে মা।

—মানুষ!

—হ্যাঁ মা। ঠিক এক সঙ্গে; একই সময়ে।

—রাজহাঁসের আগুনে?

—না মা, আগুনে নয়, সানাইপাড়ার ঘরের মধ্যে শুয়ে-শুয়ে মরে গেল সে।

—আহা!

—তার ছুটো পা ছিল না মা।

—আহা রে!

—আর তার চোখের মধ্যে কী একটা ঘা ছিল। মাঝে মাঝে সেই ঘায়ে ঢাকা পড়ে যেত চোখের মণি। তখন অন্ধ হয়ে যেত একেবারে। আবার মাঝে মাঝে দেখতে পেত। ওর কেউ ছিল না মা। কেউ না। সানাইপাড়ার মানুষগুলো থাকতে দিয়েছিল তাকে। ওস্তাদ বলে ডাকত।

—চাঁপা!

—সানাইপাড়ার সানাইওলারা তার কাছে কত গৎ শিখেছে যে। জানো মা, তার সুর লেখা একটা খাতা আমি এনেছি। দেখবে?

উত্তরের অপেক্ষা না করে চাঁপা একছুটে নিজের সেই ছোট্ট খোপ থেকে খোঁড়া-ওস্তাদের খাতাটাকে নিয়ে এসে রাখল যখন সোহাগীর বিছানার কাছে, সোহাগীর কপালে তখন বিন্দু-বিন্দু ঘাম, নিঃশ্বাসের কষ্টে বুক তার ঘনঘন উঠছে-নামছে।

ভয় পেল চাঁপা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এ কী হয়ে গেল মা'র? কী করবে ভেবে না পেয়ে চাঁপা সোহাগীর মুখের কাছে হেঁট হয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল,—মা, মা, মাগো, কী হয়েছে তোমার? কিসের কষ্ট হচ্ছে? বলো মা, বলো, বলো।

কোনো কথার উত্তর না দিয়ে সোহাগী হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরল খোঁড়া-ওস্তাদের খাতাটাকে। তারপর তার প্রথম পাতায় খাতার মালিকের নামটুকু পড়েই খাতাটাকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে বলল,—পুড়িয়ে ফ্যাল্ খাতাটাকে। এক্ষুণি পুড়িয়ে ফ্যাল আমার সামনে।

চাঁপা কিছু বুঝতে না পেরে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সোহাগীর দিকে, তারপর মেঝের ওপর থেকে খাতাটাকে তুলে নিয়ে শুধু একটিবার বলল,—কী হয়েছে মা?

সোহাগী তেমনি অস্থির উত্তেজিত কণ্ঠে বলল,—পুড়িয়ে ফ্যাল আগে। আমার চোখের সামনে।

আর কোনো প্রশ্ন করল না চাঁপা। অসুস্থা সোহাগীকে উত্তেজিত করতে সাহস হল না তার। প্রশ্ন করল না বটে, কিন্তু একটা জটিল জিজ্ঞাসা জমা হয়ে রইল তার বুকের মধ্যে। সেই জিজ্ঞাসা বুকে চেপে রেখে ঘরের মেঝেতে খোঁড়া-ওস্তাদের খাতাটাকে রেখে বেশ খানিকটা কেরোসিন তেল ঢালল তাতে; তারপর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ফেলে দিল খাতাটার ওপর।

দাউদাউ করে জ্বলে উঠল খাতাটা।

চাঁপা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খাতাটার দিকে।

পুড়ছে, পুড়ছে, পুড়ছে!

খাতাটা সহসা খাতা থেকে প্রকাণ্ড একটা রাজহাঁস হয়ে গেল। আগুনের শিখায় রাজহাঁসের ডানাটা একটু একটু করে কুঁকড়ে ছোট হয়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।...রাজহাঁসের সুন্দর গলাটা আগুনের শিখায়

গুটিয়ে তুমড়ে বেঁকে বীভৎস হয়ে যেতে যেতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।···এক লহমায় বদলে গেল আবার দৃশ্যটা। খাতা নয়, রাজহাঁস নয়,—একটা মানুষ পুড়ছে চিতায়। তার পা-দুটো খোঁড়া। দু-মুঠো পান্তার জন্যে তাকে খাঁদুদের বস্তির মেয়েদের গান শেখাতে হতো।

পুড়ে ছাই হয়ে গেল খাতাটা।

একটা মানুষের কতদিনের কত সাধনার কত আদরের একটা খাতা তার সমস্ত পাতাগুলোকে নিয়ে এতটুকু একটু ছাই হয়ে পড়ে রইল সোহাগীর ঘরের মেঝেয়।

চাঁপা সেই ছাই একটা জুতোর বাক্সের ঢাকনাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিতে চলে গেল বাইরে।

সোহাগী তাকিয়ে দেখল,—মেঝেতে শুধু আঠা-আঠা একটুখানি চটচটে হলদে দাগ ছাড়া আর কিছু নেই।

বড় একটা নিশ্বাস ফেলে সোহাগী তাকাল বাইরের সরু বারান্দাটার দিকে। চাঁপা তখন নর্দমায় সমস্ত ছাইটা ফেলে দিয়ে জল ঢালছে তাতে।

জলে ধুয়ে নল বেয়ে সেই ছাই ভেসে গেল রাস্তার ড্রেনে···সেখান থেকে কত আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে ভাসতে ভাসতে ছাই চলে যাবে কোথায়? কতদূরে?

কে জানবে, ঐ ছাইয়ের মধ্যে ছিল হতভাগ্য এক সুরকারের অনেক সুরের স্বরলিপি? কে জানবে, ঐ ছাইয়ের মধ্যে ছিল সেই দুর্ভাগা মানুষটার জীবনের কথা?

হ্যাঁ, ছিল।

ঐ গানের খাতাটার মধ্যে ছিল খোঁড়া-ওস্তাদের জীবনের কথা,—খোঁড়া-ওস্তাদের নিজেরই হাতের লেখায়। খাঁদুর কাছ থেকে চাঁপার মা সোহাগীর নাম শুনে ঐ খাতাটাকে সোহাগীর কাছে পৌঁছে দেবার বাসনাতেই হয়তো যাবার আগে খাতাখানাকে দিতে চেয়েছিল সে চাঁপার হাতে। কিংবা নিছক চাঁপাকে গোটাকতক গান দেবার জন্যেই। কিংবা কিছুই না ভেবেই হয়তো। হয়ত শেষ সময় চাঁপা সামনে ছিল বলেই।

কারণটা যাই হোক চাঁপার হাতে পৌঁছেছিল খাতাটা ঠিকই। চাঁপার মা সোহাগীর হাতেও। কিন্তু তবু খোঁড়া ওস্তাদের জীবনের একটি বিশেষ দিনের কথা অজানাই রয়ে গেল সকলের কাছে। পড়া আর হল না কারুর।

খাতাটাকে পুড়িয়ে ফেলবার আগে একটিবার যদি পাতা উল্টোতো তার সোহাগী, তাহলে এক জায়গায় এসে নিশ্চয়ই সে দেখতে পেত,—

"····মার অসুখ। মা? কে আমার মা? মা নয়, খিদিরপুরের মল্লিকবাড়ির ছোটগিন্নির বাড়াবাড়ি অসুখ।—যায় যায়। খবরটা দিল ভুটু-সহিস। কলকাতায় ডাক্তারখানা থেকে ইঞ্জেকশন কিনতে এসেছিলেন সরকার মশাই। পথেই দাঁড়িয়েছিল গাড়িটা। আমি যাচ্ছিলুম। দেখতে পেয়ে ছুটে এসে খবর দিল ভুটু। শুনলুম,—আমাকে নাকি দেখতে চান তিনি। খুব খুঁজছেন। খবরটা দিয়েই পালিয়ে গেল ভুটু। ভুটু ভালবাসত আমায়। আমার সকালবেলার ডিম সেদ্ধ কতদিন দিয়েছি ওকে।

সেদিন সারাটা রাত ধরে ভাবলুম, কী আমার করা উচিত? ঘুম হল না সারারাত। মা···আঃ, আবার মা বলে ফেলছি,··· মল্লিকবাড়ির ছোটগিন্নির মুখখানা মনে পড়ে যেতে লাগল কেবলই।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই ছুটলুম রিষড়েয়। প্রথম আটক পড়ল গেটেতেই। বলল, ঢুকতে দিতে মানা। আমি চিৎকার করে বললুম,—বল গিয়ে, আমি শুধু একবার মাকে দেখেই ফিরে যাব। দরোয়ান ফিরে এসে জানাল, সেজবাবু বলে পাঠিয়েছেন, আমাকে যেন ওরা ভাল করে সমঝিয়ে দেয় যে, আমার মা এ-বাড়িতে থাকে না, কাশীর ডালকি মণ্ডিতে খোঁজ করি যেন আমি।

ফিরে এলুম রাগে আর দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে মনে হল, ভুল করেছি। ফিরে না এসে দাঁড়িয়ে রইলুম না কেন গেট-এর ধারে। বাবুরা বেরুলে পায়ে ধরলেই তো পারতুম। মাকে দেখতে পাওয়ার চেয়ে কি মান-অপমানটাই বড় হবে আমার? পায়ে ধরলে নিশ্চয়ই অনুমতি মিলে যেত। ষোলো-সতেরোটা বছর ধরে যাঁরা বাড়িতে ঠাঁই দিতে পেরেছেন, কয়েক মিনিটের জন্যে বাড়িতে পা দিতে কেন আপত্তি হবে তাঁদের?

পরের দিন সকালে গিয়ে শুনলুম, শেষ হয়ে গেছে সব। ভুটু-সহিস ছুটে এসে বলল,—মা নাকি শেষ সময়ে কেবল খুঁজেছেন আমাকে।

শুনে ছুটে গেলুম শ্মশানে। কিন্তু···কিন্তু···ওরা আমাকে যেতে দিল না কাছে। একটিবার দেখতে দিল না আমাকে আমার মায়ের মুখ।

অনেকক্ষণ পরে চিতায় আগুন দিল ওরা। দূর থেকে শুধু আগুনটাই দেখতে পেলুম।

সেই আগুন জ্বলল আমার মাথার মধ্যে।

আগুন! আগুন! আগুন!

সেই আগুন নিভোতে ঢুকলুম ভাটিখানায়। অনেক মদ খেলুম। অনেক, অনেক, অনেক।—মাথার আগুন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতায় সকালবেলায় যে বৃষ্টিটা ছিল ইঁদুর, সেই বৃষ্টিটা তখন হাতি হ'য়ে উঠেছে। যত জল, তত ঝড়। খুব ভাল লাগছিল;—খু-উ-ব। মনে হচ্ছিল,—হোক্, হোক্, ভেসে যাক্ সব। চুলোয় যাক্ সব। গোল্লায় যাক্ সব।

একটা দেশী-মদের দোকানে ঢুকে আবার মদ খেলুম। কাঁচা মদ। গলা জ্বলল, বুক জ্বলল, একটা জ্বলন্ত আগুনের গোলা ধ্বক্‌ধ্বক্ করে ঠেলা মারতে লাগল মাথার মধ্যে। অসহ্য যন্ত্রণা। আর, তার চেয়েও অসহ্য একটা উত্তাপ। সেই উত্তাপটা সারা শরীরের সমস্ত আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে উন্মাদ করে তুলল। বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে গিয়েও উত্তাপটা কমল না কিছুতেই। বাড়তেই লাগল ক্রমশ। মনে হতে লাগল, সরষের দানার মতো অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট আগুনের দানা আমার সর্বাঙ্গের চামড়া ফুঁড়ে বাইরে ছিটকে পড়ছে সারাক্ষণ! কিছু একটা করবার জন্যে সমস্ত শরীরটা যেন নিস্‌পিস্ করতে লাগল। এমন একটা কিছু, যা কুৎসিত, যা নিষ্ঠুর, যা কদর্য, যা অশ্লীল, যা ভয়ঙ্কর!

বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দেখতে পেলুম একটা রোগা কুকুরকে;—পানের দোকানের টিনের চালার নিচে কুঁকড়ে শুয়েছিল। সজোরে মারলুম তার পেটে এক লাথি। কুকুরটা ছিট্‌কে পড়ল রাস্তায় মুখ থুবড়ে। তারপর কাৎরাতে-কাৎরাতে আর শরীরটাকে টানতে-টানতে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে কোথায় চলে গেল অন্ধকারে।··· কুকুরটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠল না। তবে আর কী হল? তবে আর কী হল?

পথ থেকে ইটের টুক্‌রো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলুম গ্যাসের আলোর কাঁচ লক্ষ্য করে। ভেঙে গেল কাঁচ। গ্যাসের আলো নিভে গেল। নির্জন রাস্তাটা অন্ধকারে ঢেকে গেল।···তবু মন ভরল না। এ আর কী হল? কতটুকু হল?

দর্জিপাড়া এসে গেল। প্রলয় চলছে। কিন্তু কই, একটা বাড়িও তো ভেঙে পড়ল না রাস্তায়!

ঢুকলুম বাড়িতে। ঢুকতে অসুবিধে হল না একটুও। অনেক দিনের কবজা-ভাঙা নড়বড়ে কাঠের দরজাটা ঝড়ের ধাক্কায় হাঁ-হাঁ করছিল খুলে। তা' না হলে ডেকে কারুর সাড়া পাওয়া যেত নাকি সে-রাতে?

বাড়িউলীর বেড়ালটা কাঠের সিঁড়ির তলায় চটের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল নিশ্চিন্তে। পা দিয়ে ওটাকে সজোরে থেঁৎলে দিলুম চটের সঙ্গে।···বেড়াল নয়। কার ছাড়া-কাপড় জড় করা ছিল চটের ওপর!

কাঠের সিঁড়ি বয়ে দোতলায় উঠলুম। ঘর খোলা। বিদ্যুতের আলোতে দেখলুম, গয়না-গাঁটিতে সেজে একটা মেয়েমানুষ শুয়ে আছে আমার বিছনায়।—মেয়েছেলে! মেয়েছেলে!!

সাবাস! এই তো! এই তো! বহুত আচ্ছা!

ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলুম।·····

মাঝরাতে অচেতন মেয়েটাকে একলা ফেলে পালাতে হল ঘর ছেড়ে। আবার নেমে পড়তে হল ঝড়জলের রাস্তায়।

কি করব! সন্ধেরাতের অচেনা মেয়েমানুষটা মাঝরাতে একটা চিৎকার ক'রে উঠে হঠাৎ সোহাগী হ'য়ে গেল যে!

সোহাগী। সেই চতুর্দোলার ছোট্ট সখী। সেই দুঃখী মেয়েটা। কাঁটাপুকুরের ময়রাবাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে কান্না চেপে রাখতে পারত না যে। সে যে বাঁচতে চেয়েছিল। ভাল হতে চেয়েছিল। আমি যে তাকে বড় গলায় বলেছিলুম, বিপদে পড়লে আসিস আমার কাছে।

জীবনে আর কোনোদিন মুখ দেখাতে পারব নাকি ঐ মেয়েটার কাছে? দাঁড়াতে পারব নাকি ওর সামনে?

ছুটে গেলুম আবার মদের দোকানে। বললুম,—আবার মদ দাও। আরো মদ দাও।

মদ, মদ, মদ,—মদে ডুবিয়ে দিলুম নিজেকে। হাজার হোক্ ঝিয়ের ছেলে তো, কত ভাল হব আর? বল না? তোমরাই বল না? আমাদের কি ভাল হওয়া মানায়? আমাদের কি ভদ্দরলোক হওয়া চলে?

আমরা এক মিনিটের জন্যে অন্দরে পা দিলে ভদ্দরলোকদের বাড়ি যে অপবিত্র হয়ে যায়! শ্মশানে গিয়ে আমরা মুখ দেখালে ভদ্দরলোকেদের বাড়ির গিন্নিমায়ের আত্মা যে নরকে যায়!

আমাদের যে ছন্নছাড়া হতেই হবে, হতেই হবে। [ক্রমশঃ।

She who hesitates is won. —*Oscar Wilde.*

প্রাণতোষ ঘটক

আমি নিষেধ করেছিলাম লক্ষ্মীকে। সে কর্ণপাত করতে চায় না যেন।

যখন তখন এসে দেখা দেয় আমার ঘরে। অপ্রত্যাশিত আগমন, কিন্তু বিদায় নেওয়ার লক্ষণ থাকে না। যেতে বললেও যেতে চায় না। এসে কথা বলে যা খুশী। স্থান কালের বিবেচনা পর্যন্ত নেই, এমনই বেহায়া আর নির্লজ্জ। লক্ষ্মীর ধরণ-করণ ভাল নয় আদপেই। বড্ড যেন চোখে লাগে। দৃষ্টিকটু ঠেকে চোখে। এতটুকু বোধ শক্তি নেই লক্ষ্মীর। অথচ কুমারী থাকলেও নেহাৎ কচি খুকী নয় সে। মেয়ে মেয়ে যথেষ্ট বেলা হয়েছে।

—লক্ষ্মী, আর নয়। এবার এসো। মা হয়তো তোমায় খুঁজতে বেরুবেন।

বাধ্য হয়ে কত সময়ে বলতে হয় আমাকে এই ধরণের কথা। সোজাসুজি বিদায় করতে পারি না, ভব্যতা বজায় রাখতে চক্ষুলজ্জায় বাধে।

কে কার কথা শোনে। লক্ষ্মী হয়তো খবরের কাগজের একখানি পৃষ্ঠায় চোখ রেখে একাগ্র মনে তখন পড়তে থাকে, কথা কানে যায় কি না যায়। একটা কথা একাধিকবার বললেই লক্ষ্মী আবার চটাচটি করে। বলে,—বিরক্ত করছেন কেন বলুন তো।

—কি আছে কাগজে? আমি শুধোই, বংসামান্ত একটা রহস্ত ভেদ করতে। খবরের কাগজে এমন কি বা ছাপা হ'ল, লক্ষ্মীকে জানতেই হবে।'

—সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখছি। কি কি নতুন ছবি এলো, তাই দেখছি। আপনার কিছু ক্ষতি হয়েছে, আমি কাগজ পড়ছি?

—না, ক্ষতি আর কি হবে। বললাম,—মনের রাগ মনে রেখে। বললাম,—ওদিকে ঘড়িতে দেখেছো ক'টা বেজেছে? বেলা প্রায় দু'টো।

আমার কাজের টেবলে আছে একটি টাইমপিস। এলামিং সমেত। রাখতে হয় আমাকে। ঘড়ি না থাকলে কাজের সময়ের হিসাব রাখা যায় না। রাজমিস্ত্রী, ফিটার আর কুলী-কামিনদের মধ্যে কে কখন যায় আসে, ফাঁকি দেয় কতটা—লক্ষ্য রাখতে হয় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে।

—ওটা আপনার ঘড়ি নয়, ঘোড়া।

অবজ্ঞার ভঙ্গীতে বলল লক্ষ্মী। তাচ্ছিল্যের সুরে। কথা বলে, চোখ ফেরায় না কাগজের পাতা থেকে।

—যাই হোক, বাসায় যাও এখন। বেলা অনেক হ'ল। আমাকে কাজ করতে দাও। বলতে হয় আমাকে। হাতের কাজ বাকী পড়ে। কে কখন আসে, কে কখন দেখতে পায়, তাই ভীষণ অস্বস্তিতে থাকতে হয় আমাকে। যতক্ষণ লক্ষ্মী থাকে আমার ঘরে।

—আপনার হাত দু'টোকে কি ধরে রেখেছি আমি? লক্ষ্মী বললে একটু কঠিন সুরে। বললে, কাজ করুন না আপনি। আমার দিকেই বা অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছেন কেন? কে বলেছে হাতের কাজ বন্ধ রেখে—

—কেউ দেখলে কি মনে করবে। ভুল বুঝবে। মনে করবে হয়তো আমি—

আমার কথা এতক্ষণে তার কর্ণকুহরে পৌঁছেছে। দেখলাম, কাগজ রেখে দিলে লক্ষ্মী। তারপর শাড়ীর আঁচল খুঁজতে থাকলো পিঠে হাত চালিয়ে। ঐ একখানি বোধ করি শাড়ীই আছে লক্ষ্মীর। বাসা থেকে যখন বেরোয় তখন শুধু

পরে। একটি নীলাম্বরী শাড়ী। এখানে সেখানে সেলাই নীল সুতোর। সহসা চোখে পড়ে না। শাড়ীর রঙে সেলাই মিলিয়ে থাকে। আঁচল চেপে চেপে মুখ মুছতে থাকে লক্ষ্মী। মধ্যদিনের খর রোদ বাইরে। আমার ঘরের টিনের চালায়। বৈশাখ মাস। আগুনের বন্যা বইছে যেন বাতাসে। ঘেমে উঠেছে লক্ষ্মী। একেই ক্ষীণকায়া, ছিপছিপে দেহ গঠন। নিদারুণ উত্তাপে আরও কাহিল দেখায় তাকে। কেমন যেন পাণ্ডুর দেখায়। রক্তহীন যেন সে। আঁচল চেপে চেপে মুছলেও লক্ষ্মীর চোখের কোলের কালিমা যেমনকার তেমনি থাকে। নিত্যকার এই আকৃতি তার। চোখের তলায় কালি।

—লোকে দেখবেই বা কি! আর বলবেই বা কি! আমি তো ভেবে ঠাওরাতে পারছি না। আপনি এত ভীতু কেন বলতে পারেন?

ধমকানির সুরে একটা একটা কথা বলতে থাকে লক্ষ্মী থেমে থেমে। চোখ পাকিয়ে।

—তুমি দেখছি গরীবের চাকরীটা খোয়াবে এবার। বললে শুনবে না। ভান করবে অবুঝের মত। আমার চাকরী গেলে তুমি কাজ দেবে আমাকে? ওপরওয়ালাদের চোখে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না।

—চাকরী! খিল খিল করে হেসে উঠলো লক্ষ্মী। হাসির অর্থ বোঝা যায় না। হাসতে হাসতে বললে,—আমাকে একটা চাকরী দিন না আপনার কাছে। কেনা গোলামের মত থাকবো। যাকে বলে বাঁদী। মাসে মাসে মাইনে দেবেন।

চমকে উঠলাম আমি। আমি হেন চাকুরিজীবীর কাছে লক্ষ্মী কর্মপ্রার্থী! বললাম,—সম্ভব হবে না। আর্থিক দিক দিয়ে অক্ষম।

—আমার ভারী ইচ্ছে আমি নার্স হই। লক্ষ্মী বললে হাসি থামিয়ে। কথা বলতে বলতে আমার কাছাকাছি এগিয়ে আসে। বলে,—সাধ আছে, সাধ্য নেই এই যা দুঃখু।

—খুব ভাল কথা। তুমি এখন বাসায় যাও। মা খোঁজাখুঁজি করবেন।

—মা? চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলে লক্ষ্মী।—মা? মা এখন কোথায়! সে গেছে কাজ করতে। বাবুদের বাড়ী। বাসন মাজে। ফিরতে ফিরতে বার নাম সেই বেলা চারটে।

—তুমি কিছু খেয়েছো?

—মা এসে খেতে দেবে। বাসিভাত আর তরকারী আনবে। বাবুদের বাড়ী থেকে। রোজই আনে। বিনা দ্বিধায় কেমন কথা বলছে লক্ষ্মী। নিজেদের সংসারের চিত্র, অকপটে ব্যক্ত করছে। সহজ সুরে। সরল মনে।

—বাসি ভাত!

—হ্যাঁ তাই। খুব মিষ্টি লাগে। যারা খেতে পায় না তাদের কাছে। অমৃতের সমান।

—কিছু খাও লক্ষ্মী। কথা শোন আমার। ঐ যে আছে আমার টিফিন কেরিয়ার। বলতে বলতে আমিই এগিয়ে যাই।

—আপনার কম পড়বে। না থাক। আমি বাসায় ফিরে গিয়ে খাবো।

দুয়োরপানে এক পা এক পা চলতে থাকে লক্ষ্মী। যেন এখনই যাত্রা শুরু করবে। বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে।

দু' টুকরো পাঁউরুটি আর একটা ডিম। তার হাতে ধরিয়ে দিই।

হাতে যেন স্বর্গ পায় লক্ষ্মী। খানিক নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে মুখে তোলে হাত। এক কামড় পাঁউরুটি মুখে তার। বললে,—আমি যাই এখন। আবার আসব ফাঁক পেলেই কাল পরশু যেদিন সুবিধে হবে। আপনি মনের সুখে কাজ করুন। কাজ আর কাজ, আর কাজ—

কথা শেষ হওয়ার আগেই দুয়োর পেরিয়ে বেরিয়ে যায় লক্ষ্মী। কি একটা সস্তা গন্ধতেলের মৃদু সুগন্ধ রেখে যায়।

আমি স্বস্তির শ্বাস ফেললাম। মূর্তিমতী বাধা বিপদ আর ভয় যেন ঐ লক্ষ্মী। অমঙ্গল তার সঙ্গে সঙ্গে চলাফেরা করে। প্রকট দারিদ্র্যের প্রতীক সে। নিঃস্ব আর রিক্ত। তৃষ্ণাতুর। ক্ষুধার্ত।

আমার আবার সরকারী চাকরী। মাস মাইনের। বেতন যাই হোক না কেন, লজ্জা আর সঙ্কোচের, তথাপি সরকারী কাজ। সুখ সুবিধে সুপ্রচুর। আজকের দিনে যখন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অগণিত তখন আমার মত একজন নগণ্য ওভারসিয়ার যে শেষ পর্যন্ত একটা সরকারী কাজ পেয়ে যাবে—আমি নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। আমার সৌভাগ্যকে প্রশংসা করি আমি স্বয়ং। যদিও অবশ্য বেকার অবস্থায় প্রতি বছরেই লটারীর টিকিট কিনে কিনে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি আমি। শিকা আর ছিঁড়ে হয় না। স্রেফ টিকিট কেনাই সার হয়েছে। কলকাতার পথপ্রান্তে জ্যোতিষীকে হাত আর কপাল দেখিয়েছি। ভাগ্য-গণনার আশায়। আমার ভবিষ্যৎ জানতে। কপালে কি লেখা আছে? হাতের জটিল রেখার বক্তব্য কি? সব কিছু দেখে শুনে গ্রহাচার্য যা বলেছিলেন তারপর আমার উচিত ছিল আত্মহত্যার সাহায্য নেওয়া। কড়িকাঠে দড়ি ঝুলিয়ে আর হাতের কাছে সেঁকো বিষ রেখে কতদিন চেষ্টা করেছি। শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। দেশে আমার মা আছেন, বেরীবেরীতে অন্ধ বাবা আছেন, ভাই-বোনেরা আছে। তাদের মুখে অন্ন জোগাবে কে? তাই নানারকমের ভয়াবহ ব্যবস্থার পরে মরতে পারলাম কৈ? স্বেচ্ছায় মরণ বরণ শহীদরাই করতে পারে।

—বৃন্দাবন তো দেখছি এখানেই। আজকাল আবার নাম হয়েছে মধুচক্র! তাই নয়?

কথা বলতে বলতে আমার কুটরীতে আসেন এস, ই। অর্থাৎ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার। রাশভারী প্রকৃতির লোক। গম্ভীর কণ্ঠস্বর। হাসি কাকে বলে জানেন না। হাসতে ভুলে গেছেন যেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয় আমাকে। ভদ্রলোকের কথার উত্তর দিতে সাহস হয় না। একটি কলমের খোঁচায় তিনি হয়তো আমাকে বরখাস্তের ব্যবস্থা করবেন। কিম্বা বদলীর আদেশ জানিয়ে দেবেন কলকাতার মহাকরণ থেকে। হয়তো আমাকে যেতে হবে সেই সিকিম আর গ্যাংটকে। পি, ডব্লিউ, ডির পরিচালনায় কাজ চলেছে সড়ক আর সাঁকো নির্মাণের।

—মেয়েটি কে হে চক্রবর্তী? বললেন চৌয়েরে খাতা টেবল থেকে তুলে নিয়ে। খাতার চোখ বুলিয়ে নিলেন এস, ই। বললেন,—দেখো ফেঁসে যেও না যেন। গলায় না ঝুলে পড়ে।

—আচ্ছা মুস্কিলে পড়েছি স্যার, বললাম আমি আমতা আমতা করে। ঢোঁক গিলে বললাম,—বিনা কারণে যখন তখন এসে পড়ে। এসে কাজের ক্ষতি করে। থাকে আশেপাশেই কাছেই কোথাও।

কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত
KOLAY
GLUCOSE
BISCUITS
MADE IN INDIA
KOLAY Glucose
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

—আর কিছু নয়তো? এস, ই চালানের ফাইল তুলে নিলেন, ষ্টোরের খাতা রেখে দিয়ে। বললেন,—যা ভাবছি তা নয়?

আজ্ঞে না স্তর। একেবারেই তা নয়। বিশ্বাস করুন. হলপ করে বলতে পারি। নিজের কুকুর পথ্য পায় না—

খুশী হলাম শুনে। নিশ্চিন্ত হ'লাম। এস, ই বলতে থাকেন নিস্পৃহ ভঙ্গিমায়। বললেন,—আরও খুশী হবো, আর যদি কোনদিন দেখতে না পাই।

—আমি সার বহুৎ মানা করেছি। ভয় দেখিয়েছি। কান দিতে চায় না। যখন তখন এসে বিব্রত করে। কাজের ক্ষতি করে।

—কি চায় সে?

—কি জানি সার! কি যে চায় কিছুই ধরতে পারি না। তেমন কিছুই চায় না। শুধু আসে আর যায়। সময় নেই অসময় নেই এসে পড়ে যখন খুশী।

—মাথা খারাপ নয়তো? দেখে যেন তাই মনে হয়।

—তাও সার মনে হয় না। কথাবার্তা বেশ স্বাভাবিক। কোন লক্ষণ নেই মাথার গণ্ডগোলের।

—তবুও শতহস্তেন বাজিনঃ, দূরে থাকাই ভালো। সাপ আর মেয়েছেলে দুই-ই সমান। সাবধানের মার নেই জানবেন।

এস, ই বলে গেলেন কথাগুলি, উপদেশের সুরে। কথার শেষে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন জোর কদমে। তিনি আসেন মাঝে মাঝে বিনা নোটিশে। কাজের তদারক করেন। খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। কাজের গতি লক্ষ্য করেন। দেখেন, কাজে ফাঁকি পড়ছে কি না। মালমসলার ব্যবহার যথাযথ হয় কিনা।

কণ্ঠ শুকিয়ে যায় বোশেখী গরমে। এক গ্লাস জল খেয়ে তবে যেন শান্ত হয় বুকের দুরুদুরু। সুবাধ্য কর্মীর মত আমি আমার নির্দিষ্ট কাজে মন দিই। খাতা আর কলম টেনে নিই। বিরাট একটি ষ্টেটমেণ্ট তৈরী করতে হবে এখন। আজকের ডাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হবে অতি অবশ্য। মাল-মসলার হিসাব, ক্যাশের সর্ব শেষ অবস্থা। কি কি বাবদে কত টাকা খরচ হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। মরবার ফুরসৎ নেই আমার। অঙ্কে না ভুল হয়। হিসাবে না থাকে গরমিল।

—মিষ্টার চক্রবর্তী আছেন না কি? চেনা চেনা কথার সুর। চালার বাইরে থেকে কথা বললেন কনট্রাক্টর। আশে পাশে যন্ত্র চলছে কংক্রীট মিশেলের। শব্দে কান পাতা দায়। সেই সঙ্গে কুলী-কামিনদের কলরোল। কামিনরা গান গাইছে ছাদ পিটতে পিটতে। কুলীর দল হাসি-তামাসার সঙ্গে কাজ করছে।

—কি খবর বলুন। আসুন, ভেতরে আসুন। অগত্যা বলতে হয় আমাকে। হাতের কাজ বন্ধ রেখে।

লোকটি স্থূলকায়। বিশাল বপু তাঁর। চলতে ফিরতে হাঁসফাঁস করেন। ঘরে এসে একটি চেয়ার দখল করলেন। বললেন,—এক পাত্র জল খাওয়ান দাদা। গরমের ঠেলায় আর পারি না। জান নিকলে যাচ্ছে।

জল গড়িয়ে দিলাম এক গ্লাস। ঢক ঢক শব্দ ভাসলো আমার চালাঘরে। হাতের গ্লাস রেখে দম নিয়ে বললেন,—বিলের টাকা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে, এস, ই কিছু বললেন না কি? টাকা না পেলে কাজ চালানো যাবে না আর। ধারকর্জ ক'রে টাকা জোগাতে আর পারছি না।

—সরকারের হাতে টাকা। ধ'রে নিতে পারেন এক রকম, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। সময় হ'লেই পেয়ে যাবেন। বলতে হবে না। আমি আশার আলো দেখিয়ে বললাম। আর কি বলতে পারি আমি। বেশী বললে অন্য কিছু ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়।

পকেট থেকে একটি খাম বের ক'রে টেবলে আছড়ে ফেলে দিলেন কনট্রাক্টর। বললেন,—নিয়ে নিন না দু'শো একশো। সিমেণ্টের হিসেবটা ঠিক ক'রে দিন। বিলটা না আটকে যায়। দেখবেন একটু।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে হয় আমাকে। ইলেকট্রিক শক লাগে যেন। বললাম,—মার্জনা করতে হবে। আমি পারবো না টাকা নিতে। শেষে কি চাকরীটা হারাবো!

ফস করে একটি সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন লোকটি। মুঠোয় ধরা সিগারেট টানতে থাকলেন ঘন ঘন। যেন তামাক খাচ্ছেন হুঁকোয়। এক মুখ ধোঁয়া উগড়ে দিলেন আমার মুখের উপরে। বললেন,—সবাই নেয় মশাই। সরকারী কাজে আমাদের দিতেই হয় চার-পাঁচ পার্সেণ্ট। দাদন দিতে হয় আমাদের। না দিলে কাজ চালানো যায় না। জানেন তো সবই। পকেটে রেখে দিন খামখানা।

আমি গান্ধীজীর ভক্ত আজন্ম। ন্যায়, সত্যনিষ্ঠা, সততার প্রতি আসক্তি আমার। জীবনে কখনও একটি মিথ্যা কথা বলিনি। অন্যায় পাপের পথ এড়িয়ে চলতে চাই। প্রলোভন ত্যাগ করতে হয় অনেক। খামখানি ফিরিয়ে দিই আমি। ভদ্রলোকের বুক পকেটে সিঁদিয়ে দিই। বললাম,—আমাকে ক্ষমা করুন।

—হাসালেন মশাই আপনি। লোকটি হেসে উঠলেন দানবের মত। হাসতে হাসতে বললেন,—একটু আমোদ আহ্লাদ করবেন, থাকবেন ভোগে-সুখে, তা নয়। দিন নেই রাত্তির নেই শুধু কলম পিষছেন। কথার শেষে সুর নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন,—মেয়েটা আসছে আর ফিরে যাচ্ছে উপোসী। দয়ামায়াও নেই মশাই আপনার। কেমন ধরণের মানুষ আপনি! আচ্ছা বেরসিক।

লোকটির যাতে মনের পরিবর্তন আসে, তাই আমি বললাম,—গান্ধীজী বলতেন যে—

—রেখে দিন মশাই ও সব ছাঁদা কথা। মামুলী বুকনি বড় বড়। কথা শেষ করতে না দিয়ে নিজেই বললেন সহাস্যে। চেয়ার পিছনে সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠলেন। বললেন,—একদিন দেখবেন আমার কথা আপনার মনে পড়বে। তখন দুঃখ করতে হবে। আঙুল কামড়াতে হবে। খানিক থেমে আবার বললেন,—যান না একদিন, গাড়ী দিচ্ছি আমি। জীপখানা দিয়ে দিচ্ছি। মেয়েটাকে নিয়ে ঘুরে আসুন ফাঁকায়। ড্যাম-ট্যাম বারাজ-টারাজ দেখিয়ে আনুন। বাঙলোয় গিয়ে থাকুন একটা রাত।

—অনেক কাজ আমার। সময় কোথায়! মরবার ফুরসৎ নেই।

—ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় মশাই। কি আর বলি বলুন। বলতে বলতে লোকটি বিদায় গ্রহণ করলেন কত যেন অনিচ্ছায়। ঘরের বাইরে পৌঁছে বললেন,—মরেই তো আছেন মশাই। আবার মরবেন কি!

তাই থাকতে চাই আমি। মৃত্যু অনেক মঙ্গলের। এই পাপের পৃথিবীতে বেঁচে থেকে লাভ নেই। নরকবাসের সামিল প্রায়!

দিন শেষে কাজ ফুরালে আমি ঘরেই বসে থাকি। আমার চালার ঠিক বিপরীত আকাশে সূর্যাস্তের পালা চলতে থাকে। নিরেট শুভ্রতা কেমন ধীরে ধীরে রক্তলাল আকার ধারণ করে। এক থালা অভ্র-আবীর যেন। পশ্চিম আকাশ জুড়ে সিঁদুর-লাল রঙ ছড়ায়। গাছের শীর্ষে যেন কে দুধ-আলতা ঢালে। অস্তভানু ডুবে যায় কখন।

আলো আঁধারির খেলা চলবে খানিক। তারপরেই পাখীর শেষ ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণে চাঁদ উঠবে। আবছা অন্ধকার ছড়াবে আমার চালায়। দেখতে দেখতে কখন বিস্তীর্ণ, সীমাহীন, ফসলহীন শুষ্ক ফাট-ধরা জমিতে সোনালী আভা—চোখে পড়বে। একটি একটি তারা জাগবে মহাশূন্যে। আরও কিছুক্ষণ পরে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত হবে। সোনার থালা ঝলমলিয়ে উঠবে আকাশে। সুধা আর সুষমার ঝর্ণাধারা নামবে চাঁদের বুক থেকে। দেখতে পাওয়া যাবে চাঁদের চতুর্দিকে চন্দ্রবলয়।

সেদিনও প্রতীক্ষায় থাকি আশায় আশায়। সেদিন চতুর্দশী। শুক্লাতিথির।

কুলী আর কামিনরা গান ধরেছে কাজের শেষে। মাদল বেজে চলেছে বস্তীর দিকে। বাতাসে ভেসে আসছে গানের সুর, নাচের ছন্দ। কুলীরা গান গাইছে। কামিনরা নাচের আসরে নেমেছে। হাঁড়িয়া বিতরণ করছে নিজেদের মধ্যে। যে যত পারো পান কর মনের আনন্দে। এসো গান গাও। নাচের সঙ্গী হও। অনাবিল হাসি আর নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসায় অবগাহন কর।

চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে চালা থেকে বেরিয়ে সীমাহীন প্রাঙ্গণে আশ্রয় নিই আমি। আরামকেদারা আছে আমার একটা। টেনে নিই সেই ক্যাম্বিশের সস্তা ডেক-চেয়ার। নতুন একটি মহাগ্রহ যেন হঠাৎ আবির্ভূত হয় আকাশে। অনেক বারের দেখা অনেক রাতে। তবুও মনে হয় এক অনন্যসাধারণ রূপ আর ব্যক্তিত্ব দেখা দিয়েছে আকাশ-প্রান্তে। লজ্জায় যেন মুখ ঢাকছে পৃথিবী। চাঁদের শোভার তুলনায় পৃথিবী যেন ম্লান। কুটিল পাপের আঁধারে আচ্ছাদিতা।

দূর যেন ডাক দেয় আমাকে। চাঁদ হাতছানি দেয়। ইশারায় আহ্বান জানায়।

আমিও চেয়ারের আরাম ভুলে উঠে চলতে থাকি মন্থরতম গতিতে। সারা দিনের শেষে, কর্মক্লান্ত আমি। বিশ্রামের আলস্যে যেন অবসন্ন। পায়ে চলা আঁকাবাঁকা পথ আমাকে নীরব নির্দেশ দেয়। কারও পদপাত পড়ে না এই নির্জন প্রান্তর-পথে। তাই ক্ষীণাঙ্গী সরীসৃপ ঐ পথ যেন দুঃখশ্বাস ফেলছে থেকে থেকে। চাঁদের আলোয় পথও আজ জেগে উঠেছে হঠাৎ।

সেদিন বাসনা হ'ল কেমন, দূরে যাই আমি। মাইল কয়েক গেলেই দেখতে পাবো এক টুকরো বসতি। জনতা থেকে অনেক দূরে আছে তারা। সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই।

একটিবার মনে পড়লো, ঘরের দুয়োর উন্মুক্ত রেখে এসেছি পেছনে। একবার ছ্যাঁৎ করলো বক্ষ মাঝে। সুখের কথা, ঘরে কিছুই নেই আমার। কেন না আমার কিছুই নেই এমন, যা কেউ আত্মসাৎ করতে চাইবে। চুরি করবে দুর্নাম মাত্র কিনতে। আছে একটা জলের কলসী। শূন্য টিফিন কেরিয়ার। একটা তক্তাপোষ আমকাঠের। প্যাঁটরায় কিছু জামা কাপড়। নগদ পাঁচ দশ টাকা।

যদি কোন রিক্তজন চুরি করে লাভবান হয়, আমি আনন্দিত হব আন্তরিক। কারণ উপরি উক্ত দ্রব্যাদি অপহরণে লোকসান বৈ লাভ নেই বিন্দুমাত্র। জামা-কাপড় যা আছে তাও পুরানো। জোড়াতালি দেওয়া। মূল্য নেই কিছুই। দশ টাকার নোটখানি অচল। নম্বরের দিকে ছিঁড়ে গেছে। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই।

পথ যেন ডাক দেয় আমাকে। কতকাল পদপাত পড়ে না পথিকজনের। তাই এখানে সেখানে গুল্ম গজিয়ে উঠেছে। ছোট ছোট ঝোপ। পথের দুই পাশে বিস্তৃত ভূখণ্ড—সেই দিগন্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় নজরে পড়ে অনেকটা। দেখা যায়, খেজুর আর তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে। যেন প্রহরী তারা। অতন্দ্র, অনলস। এক জোড়া খরগোস, ছুটে পালিয়ে গেল আমার পদশব্দে। এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে অন্য ঝোপে।

যেতে হবে বহু দূরে। কয়েক মাইলের ব্যবধান। বেশ লাগে একা একা চলতে। মনে হয় আমিই যেন এই আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথের একমাত্র অধীশ্বর। যথেচ্ছা চলবো, আবার থামবো যেখানে মন চাইবে। ক্লান্তি এলে ব'সে পড়বো পথপ্রান্তে। পথের ধূলোয়। সঙ্কোচ থাকবে না। কেউ নেই দেখবার।

আকাশের চাঁদ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পথে আলো দেখিয়ে। আমাকে আঁধারের কবল থেকে, পথের কাঁটা থেকে রক্ষা করছে।
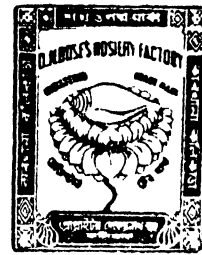
আমি এগিয়ে চলেছি, অন্য এক গ্রহের সন্ধানে যেন। সভ্যতা থেকে অনেক দূরে সেই বসতি। আজ দেখতে পাবো আমি। সাধ মিটবে কতদিনের।

সেবাগ্রাম। কে একজন সাহেবের সৃষ্টি। তাঁরই স্বপ্ন এক, বাস্তবে তার রূপান্তর। প্রতিষ্ঠাতার মেহনৎ পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে। ছোটখাটো একটি মনুষ্য-সমাজ আছে সেবাগ্রামে।

বেশ কিছু দূর থেকে হ্যাজাকের দুগ্ধশুভ্র আলো চোখে পড়লো। অব্যক্ত উত্তেজনায় আমিও পা চালাই তাড়াতাড়ি। আর কতটা পথটা! আর কতক্ষণ! আমি যেন চলেছি এক মন্দিরে। জাগ্রত দেবতার সন্ধান পেয়েছি সেই দেবালয়ে।

হ্যাজাকের আলো স্পষ্টতর হ'তে থাকে। দেখার আনন্দে অধৈর্য আসে যেন। আর তর সইছেনা। কূলে এসে গেছি। তরী ভিড়াতে হবে।

আলো জ্বালিয়ে মাঠেই ব'সে আছেন বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ একজন। তাঁর পাশের বেতের মোড়ায় জনৈকা বৃদ্ধা শ্বেতাঙ্গিনী। দু'জনে ফল বিতরণ করছেন এক পাল শিশুদের। আম, জাম, জামরুল, কদলী। লজেন্সের প্যাকেট।

ছোট ছোট পর্ণকুটির, ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে যত্র তত্র। দেখায় যেন সাধুদের আশ্রম। পবিত্র, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। আমি একজন আগন্তুক। সাহেব আর মেম আমাকে দেখতে পেয়ে নতমাথায় অভিবাদন জানালেন। সাহেব বুকে ক্রুশ চিহ্নের সঙ্কেত জানালেন। আমিও নমস্কার জানালাম দেশীয় প্রথায়।

কিন্তু ওদের দু'জনের মুখে যেন বিষণ্ণতা। কেমন যেন বিমর্ষ! শোকসন্তপ্ত। সেবার কাজে নেমেছেন, কিন্তু আছেন যেন মরণের প্রতীক্ষায়। শেষ ডাক শুনলেই সাড়া দেবেন তৎক্ষণাৎ।

পায়চারী থামিয়ে আমি কিছু বলবার জন্য দাঁড়ালাম ও'দের দু'জনের সমুখে। সাহেব পরিষ্কার বাঙলা ভাষায় বললেন,—আমরা কি করতে পারি আপনার জন্য?

—কিছু নয়। আমি এসেছি আপনাদের দর্শনে। প্রণাম জানাতে। গান্ধীজী বলতেন যে, সেবাই নাকি শ্রেষ্ঠতম ধর্ম। তাই আমার সামান্য সাহায্য যদি গ্রহণ করেন, তবে কৃতার্থ হই।

অঙ্গুলি নির্দেশে সাহেব দেখিয়ে দিলেন, একটি সাদা বাক্স। গায়ে লেখা Charity Box।

যৎসামান্য অর্থ, সসম্ভ্রমে রেখে দিলাম দাতব্য-আধারে। তারপর বিদায় জানিয়ে চললাম যে পথ ধরে এসেছি। কয়েক গজ অতিক্রমের পর ফিরে তাকাতে হয় একবার। আর একবার দেখতে চাই আমি। দেখলাম, একটি ফটকের ওপরে অর্ধ বৃত্তাকারে একটি সাইন বোর্ড। জ্যোৎস্নালোকে স্বচ্ছ! পড়লাম, 'সামুয়েল মেমোরিয়াল লেপরসি হসপিটাল।'

সাহেবের একমাত্র ছেলে না কি শোনা যায় অকালে মারা গেছে এই বাঙলা দেশেই। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় সামুয়েল। তারই স্মৃতি বহন করছে এই চিকিৎসালয়।

একটি উদ্যোগ, আন্তরিক উদ্যমের জীবন্ত পরিচয় চোখে দেখতে পেয়ে খুশীতে ভরা মন নিয়ে গভীর রাতে ফিরতে ফিরতে সহসা দূর থেকে দেখতে পেলাম, আমার চালার সামনে কিছু লোক, জমায়েৎ হয়েছে। চাঁদের আলোয় দেখতে পাই মাত্র, চিনতে পারি না কে বা কারা। আমার ঘরে আলো জ্বলছে—দৃষ্টিতে ধরা পড়লো।

ভীষণ বিস্মিত হ'লাম আমি। কল্পনাতীত এক ছবি দেখে। আমি ঘরে নেই, তবুও কেন এই জনসমাগম! কে বা তারা! কি বা চায়!

—কোথায় ছিলেন মশাই এতক্ষণ? এস, ই কথা বললেন আমাকে দেখেই;

কিছু বলতে পারি না উদ্বেগে। চালার মধ্যে ঢুকে দেখি, পল্লীমঙ্গল হাসপাতালের ডাক্তার। চেয়ারে বসে বসে কি যেন লিখছেন।

লক্ষ্মীর মার কোলে শুয়ে আছে লক্ষ্মী বিবর্ণ, নিস্পন্দ। মৃত্যুর স্নিগ্ধ ছায়া লক্ষ্মীর নিরুদ্বেগ মুখে। তার পাশেই প'ড়ে আছে একটি ফুলের তোড়া। শুধু গন্ধরাজ, লক্ষ্মী হয়তো এসেছিল আমাকে দিতে। প্রায়ই ফুল এনে দিয়েছে সে আমাকে।

ডাক্তার বললেন,—ডেথ, ডিউ টু ষ্টার্ভেশন অনাহারে মৃত্যু।

শ্বাস পড়লো আমার। চাকরী যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। ভাগ্য ভাল যে আমি ছিলাম না ঘরে। লক্ষ্মী না অলক্ষ্মী কে জানে!*

---

* যুগান্তর পত্রিকা হইতে]

মৃত্তিকার গ্লানি

সন্তোষকুমার অধিকারী

তীর বেঁধা বলাকার রক্তাক্ত হৃদয়
বুঝি আমি। কাঁপে দেহ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায়
বেদনাতে; তবু এক অনন্ত দুর্জয়
জীবন আমাকে ডাকে। আঁকে দুর্নিবার
আশার উজ্জ্বল ছবি; দিগন্তের মেঘ
হাতছানি দেয় দীপ্ত আকাশ বলয়ে।

প্রত্যাশায় কি উচ্ছল দুরন্ত আবেগ
অথচ ব্যথার্তি ম্লান মৃত্তিকা হৃদয়ে।
জীবন আমায় ডাকে বাধা দেয় মন।
দুরান্তের পথে বাজে সমুদ্রের ডাক,
দু'চোখে প্রত্যয়জ্বলা কাঁপে দিগঙ্গন,
অথচ আমার মন শ্রান্তিতে নির্বাক।

হৃদয়ে আকাশনীল দিগন্ত কল্পনা,
শীর্ণদেহে মৃত্তিকার ঘৃণার যন্ত্রণা।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভারতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইংরাজীর পরিবর্তে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন—সে প্রস্তাব একদা রবীন্দ্রনাথও দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ। সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর। সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা আর চিন্তা অধিকাংশ স্থানেই ইস্কুলের ছেলের মতন।'—তাই সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন। অথচ শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও সুরজিৎ লাহিড়ী শ্রীবসুর মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। বস্তুত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের এই প্রস্তাবের ফলেই সারা দিকে সাড়া পড়ে গিয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। কোলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র শ্রীবসুকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন, শুধু আনন্দবাজার বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক বসুর দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের সমস্ত লোককে ইংরাজী শিখিয়ে মাতৃভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংহতি পাবার আশা করা দুরাশা মাত্র। ভাষায় যা প্রভেদ তা অতি সামান্যই—তার জন্যে ইংরাজীর প্রয়োজন হয় না। ইংরাজী ব্যতীতই বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে ঐক্য সাধন অসম্ভব নয়, বিপরীতে বলা যায় ইংরাজীর অবর্তমানে ভারতের ভাষাগুলির প্রচার সম্ভব হবে। আর যদি প্রদেশের অনুযায়ী মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাহলে জাতীয় সংহতি বাড়বে বই কমবে না।

অবশ্য বিজ্ঞানই এই তর্কে প্রধান হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের বইয়ের একান্ত অভাব বলে অনেকে অভিযোগ করছেন। কিন্তু এ কথা অনভিজ্ঞের কথা। বিজ্ঞানের বই আজকাল বাংলায় অনেক লেখা হচ্ছে। তাছাড়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক বিজ্ঞান-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের অনেক সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞানের বই আছে। আর তাছাড়া বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এখনও ব্যবহার করা হয়নি, তাহলে পাঠ্য-পুস্তক এবং তত্ত্ব-পুস্তক যে অনেক বেশী প্রকাশিত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এর পর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পরিভাষা কী রূপ নেবে তা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। অধ্যাপক বসুর মতে আমাদের ভাষায় যদি কোনও বিদেশী শব্দের সহজবোধ্য পরিভাষা না থাকে (অনেক ক্ষেত্রেই নেই), সেক্ষেত্রে বিদেশী শব্দগুলি নিশ্চয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে। আর তাছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার সুরু হলে পরিভাষাও তৈরী হতে আরম্ভ করবে। নতুন ওজন চালু হওয়ার আগে তার হিসাব মনে হয়েছিল কত শক্ত। এখন তা চালু হওয়ায় ক্রমশঃ সহজ বলে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তা আরও সহজ বলে মনে হবে। ঠিক তেমনি ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হলে, আজ যে পরিভাষা রূপান্তর অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তাই তখন বাংলায় সহজবোধ্য রূপ নেবে। মনে রাখবে, বাংলা-সাহিত্যের আজ যে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়—তার জন্যে বহুদিনের সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল।

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে: 'অধ্যাপক সত্যেন বসুর সমাবর্তন উৎসবে বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার বক্তৃতা মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ স্বরূপ হয়েছে।'—খুব সত্যি কথা। আঞ্চলিক ভাষাকে সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি প্রতিবাদ করছেন—তাঁদের বিরুদ্ধেই এই চ্যালেঞ্জ।

সবচেয়ে আশ্চর্য হতে হয়, যখন দেখি আনন্দবাজার পত্রিকার কমলাকান্ত শর্মা যুক্তিহীন কথার দ্বারা শ্রীবসুর প্রস্তাবকে বানচাল করতে উদ্যোগী হয়েছেন। কোলকাতার 'অমৃত' পত্রিকা অধ্যাপক বসুর বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন করে লিখেছেন: 'সত্যি বলতে কী এমনিতেই বহু দেরী হয়ে গেছে। এমন দেশবরেণ্য বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত বসুর আন্তরিক আবেদন সত্ত্বেও যদি প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্রতীগণ তাঁদের পুরণো যুক্তিগুলি আবার গুরুগম্ভীরভাবে আওড়াতে আরম্ভ করেন, তাহলে বুঝতে হবে দেশগঠনের কাজ ত্বরান্বিত হতে এখনও অনেক দেরী।'—এই মন্তব্যের আলোকে আনন্দবাজার পত্রিকার কমলাকান্ত শর্মার যুক্তি ভিত্তিহীন বলে মনে হয়।·····কমলাকান্তের গায়ে প্রাচীনপন্থীর গন্ধ। তিনি এখন স্বপ্ন দেখুন, আজেবাজে কথা লিখে নাম খারাপ করার চেয়ে এ'টাও ভালো। কেননা তাঁর প্রবন্ধে এমন কোন যুক্তি নেই যা পড়ে তাঁর বন্ধুরা ছাড়া আর কেউ তাঁকে বলতে যাবেন—'আপনার প্রবন্ধের বিষয় ভাবতে ভাবতে কাল সারা রাত নিদ্রা হয়নি।' বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের সঙ্গে আনন্দবাজারের কমলাকান্ত শর্মার তা না হলে আর তফাৎ রইলো কোথায়? কমলাকান্ত শর্মা ভুলে যাচ্ছেন কেন, যে ইতিহাস বাস্তবই, স্বপ্ন যা তা স্বপ্নই?

আশার কথা, বাংলা দেশে এমন উন্নাসিক প্রাচীনপন্থী লোকের সংখ্যা খুবই কম। তাই ইংরাজীর পরিবর্তে বাংলা ভাষার সর্বাত্মক ব্যবহারের প্রস্তাব এত জোরালো হতে পেরেছে। শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী হয়ত শিক্ষা সরস্বতীকে শাড়ী পরাতে লজ্জা পাচ্ছেন, কিন্তু দেশবাসী একযোগে এই কাজে লাগলে শ্রীলাহিড়ীর লজ্জা নিশ্চয়ই কেটে যাবে। রবীন্দ্রনাথ ও স্যার আশুতোষের সেই ইচ্ছা সার্থক হোক—দেশবাসী তথা সাংবাদিকদের সেজন্য উদ্যোগী হতে সাদর আহ্বান জানাই।

সৃষ্টিকর্ত্তা কে?

অনেক দিন থেকে আমার মনের ভিতর একটা প্রশ্ন জাগিতেছিল,—সৃষ্টি কর্ত্তা কে? সেই চিন্তায় আমি অধীর হইয়া পড়িলাম; আর্য্য ঋষিদের শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া দেখিলাম—অনাদি পুরুষ নিরঞ্জন নাভিপদ্মের মলা তুলিয়া পৃথিবী জন্মাইলেন এবং সৃষ্টিহেতু তাঁর সঙ্গে পাঠাইলেন শক্তিকে। শক্তির গর্ভে তিন পুরুষ সনাতনের জন্ম হয়, সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা, পালন কর্ত্তা বিষ্ণু এবং সংহার কর্ত্তা শিব।

মনে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম তবে বুঝি তাই হবে। এতেও সম্পূর্ণ স্থির হতে পারিলাম না, আবার জানতে ইচ্ছা হইল বিজ্ঞান জগতের অভিমতটা।

বিজ্ঞান খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম তাহাতে পাইলাম, বৈজ্ঞানিক জিনস্ ও জেফ্রিসের মতবাদে বহুকাল পূর্ব্বে একটি বিরাট তারকা সূর্য্যের খুব নিকট দিয়া যাইতেছিল, তারকাটির আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সূর্য্যের জ্বলন্ত বাষ্পীয় গোলকের উপর এক জ্বলন্ত বাষ্পের পিণ্ড ঠেলিয়া বাহির হইল। ক্রমে তারকাটি সূর্য্যের এমন নিকটে আসিয়া পড়িল যে, তাহার আকর্ষণের প্রভাব পিণ্ডটির উপর সূর্য্যাপেক্ষা বেশী পড়ায় ইহা সূর্য্য হইতে বাঁকা শশার আকারে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু পিণ্ডটি তারকার উপর পড়িবার পূর্ব্বেই তারকাটি যে দিক থেকে আসিতেছিল তাহার বিপরীত দিকে সূর্য্য হইতে দূরে গিয়া পড়িল। সে কারণে সূর্য্য হইতে আর বেশী বাষ্প বাহির হইতে পারিল না।

এই প্রকাণ্ড বাষ্প পিণ্ডটি সূর্য্য হইতে পৃথক হইয়া অন্তরীক্ষে তাপ ছড়াইতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমশঃ শীতল হইতে লাগিল, তারপর শশাকার পিণ্ডটি ভাঙ্গিয়া কয়েকটি তরল গোলকে পরিণত হইল। সূর্য্য ও আগন্তুক তারকার আকর্ষণ শক্তির মাঝে পড়িয়া এই তরল গোলকগুলি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই তরল গোলকগুলি এক একটি গ্রহ এবং আমাদের পৃথিবী তাহাদের মধ্যে একটি।

পৃথিবী যখন জন্মেছিল তখন ইহা উত্তপ্ত ছিল, উহার ভিতর জলীয় বাষ্প, লৌহ, নিকেল প্রভৃতি নানা প্রকার গ্যাস ছিল। হাল্কা গ্যাস উপরে এবং ভারী গ্যাস নিচে ছিল। ক্রমশঃ তরল গ্যাসীয় পদার্থ শীতল হইয়া কঠিন ভূত্বকে পরিণত হইয়াছে এবং তারপর বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখী নানাবিধ জীবজন্তুর উদ্ভব হইয়াছে। এবং সর্ব্বশেষ মানুষ জাতির জন্ম হয়।

বিজ্ঞান জগতের অভিমতে এইটুকু জানিতে পারিলাম, এবং ইহাই যেন বিশ্বাস যোগ্য হইতে লাগিল, শাস্ত্রমতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম শাস্ত্রটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র।

এই সব ভাবিতেছিলাম, তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা? ঋষিদের বেদ পুরাণ মিথ্যা? আবার মনে উদয় হইল না শাস্ত্র কিছুতেই মিথ্যা হইতে পারে না। তবে এর মূল্য কোথায়?

শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করিতেছিলাম, অনাদি পুরুষ নিরঞ্জন কে সে? নাভির ময়লা হতে পৃথিবীর উৎপত্তি তাহাই বা কি? সৃষ্টি হেতু শক্তিকে পাঠাইলেন সেই বা কে?

ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলাম যাহার আদি অন্ত নাই, স্থির অটল তাহাই অনাদি নিরঞ্জন, সে একমাত্র সূর্য্যই হবে। তারকার আকর্ষণ প্রভাবে যে জ্বলন্ত গ্যাস নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাকেই ঋষিরা নাভির মলা বলেছে। তবে শক্তি কি? হাঁ স্থির করেছি বাষ্প-পিণ্ডটি তখন যে শক্তি ধারণ করেছিল, যে শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর উৎপত্তি, তাহাকেই ঋষিরা শক্তি আখ্যা দিয়েছে।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কে সে? ব্রহ্মা অর্থে পাইলাম যিনি অগ্নিদেবতা তিনিই ব্রহ্মা। তবে পৃথিবী উৎপত্তির সময় উহা অগ্নিময় পিণ্ড ছিল, উহাকেই ঋষিরা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলেছে, একে একে সবই পাইলাম এখন বাকী আছে বিষ্ণু আর শিব। পালনকর্ত্তা বিষ্ণু কে সে? আর সংহাররূপী শিবই বা কি?

পৃথিবী ঠাণ্ডা হইয়া প্রথমে উদ্ভিদ, প্রাণী, তৃণ-লতার জন্ম লইল, তারপর মনুষ্য বাসের উপযোগী হইল, বৃক্ষলতা তৃণগুল্ম রূপে আমাদের খাদ্য ও জীবন ধারণের উপাদান যোগাইতেছেন ইহাই বিষ্ণু, আর পাহাড় পর্ব্বত গর্ভে যে আগ্নেয়গিরি ভূমিকম্প রূপে যে গ্যাসীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে ইহাই সংহাররূপী শিব।

সব কিছুই পাইলাম তবে ঋষিরা একরূপ কাল্পনিক নাম দিয়েছেন কেন?

ইহাই মনের ভিতর ভাবিতেছিলাম, তারপর স্থির করিলাম—সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই বোধ হয় ঋষিরা তার সাকার রূপে কাল্পনিক নাম রেখেছেন।

ভগবানের অনন্ত রূপ অনন্ত ভাব একমাত্র জ্ঞানেই তাহা উপলব্ধি করা যায়। সে ভাব সাধারণ মানুষ বুঝবে কি করে? গীতায় একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।

আমার মায়ারূপী প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আটটি প্রধান ভাগে বিভক্ত।

এই অষ্টবিধা প্রকৃতি ভগবানের জড়রূপা প্রকৃতি, এইরূপে জীব মোহবলে তাঁকে চিনতে পারে না কাজেই ঋষিরা এই মায়ারূপী প্রকৃতির বর্ণনা না করে (প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরকে জড়রূপে ব্যাখ্যা না করে) ব্রহ্মের সাকার রূপ বর্ণনা করেছেন। ভক্তি ও বিশ্বাসে যাহাতে জগতে সবাই তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারে।

যেমন মানুষের চিন্তাধারা যে দিকে ধাবিত হয় সেই বিষয়ে সে জ্ঞান লাভ করতে পারে বা করে থাকে। সেইরূপ অনন্ত জ্ঞানের সমষ্টি হলেন ভগবান, যদি মানুষ প্রত্যেকটি বিষয় বিচার করে যাচাই করে গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তাঁকে লাভ করা অতি দুষ্কর।

চার অন্ধের হস্তি দর্শনের গল্প অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন, হস্তি যে কিরূপ তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারিল না, সেইরূপ এই বিশ্বের জ্ঞানজগতে আমরা অন্ধ স্বরূপ।

কাজেই সাধারণ মানুষ যাতে বিচারে নিমগ্ন না হইয়া বিশ্বাসে তার সাধনা করে সেই উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র তৈরী হয়েছে। তবে এ-কথা ঠিক সৃষ্টির উৎপত্তির মূল কারণ, সূর্য্যই হোক আর তারকারাশিই হোক এর মূলে যে এক চেতন ও ইচ্ছাময় মহাশক্তির প্রভাব রহিয়াছে, সে কথা আমাদের ঋষিরা ভাল ভাবেই জানতেন।

আমাদের এই মহামূল্য শাস্ত্রে অমূল্য সম্পদ লুকায়িত আছে তাহা আমরা বুঝতে চেষ্টা না করে, আমরা শুধু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগতের জয়ধ্বনি করিতেছি। লীলাময়ের অমৃতের রাজ্যে অমৃতের সন্ধান না করে আমরা শুধু জড়-জগতের সন্ধান খুঁজিতেছি।

—শ্রীকানাইলাল সরকার।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাণি দেবী

গাড়ীতে আমরা জুতো খুলে রেখে এসেছিলাম, কারণ বালির ওপর জুতো পায়ে হাঁটা যায় না। শান্তাদির পায়ে গেলো কাঁটা ফুটে।

উঃ! বলে তিনি বসে পড়লেন একটা পাথরের ওপর।

আমি শান্তাদির পা থেকে সাবধানে কাঁটাটা বার করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

যোগলেকারের সঙ্গে তখন ঢালু পাড় বেয়ে নিচের দিকে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে কমলেশ।

কিছুক্ষণ পরে শান্তাদির পা থেকে কাঁটাটা বার করবার পর আমরা দুজনে ঢালু পাড় দিয়ে সমুদ্রের দিকে চললাম।

এখানে সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গময়ী। ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমির ওপর।

পুরীর মত এখানকার বালুতটটি প্রশস্ত চওড়া, সমান,—বা পরিষ্কার নয়। উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো সমুদ্রের ধারটা। কোথাও বা বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়ানো।

শামুকের খোলা, মাছের আঁশ, পোড়া কয়লা, ডাবের খোলা ইত্যাদি ছড়ানো নোংরা আর নির্জন সমুদ্রতটটি। সমুদ্রের ধারেই ফোর্ট। ফোর্টের ভেতর থেকে সারি সারি কামানের মুখগুলো উঁচিয়ে আছে, সমুদ্রের দিকে।

কমলেশ নেমেছে সমুদ্রের একেবারে ধারে।

একটা বড় ঢেউ এসে ওর পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো।—সর সর করে—ঢেউ-এর টানে খানিকটা জলের ভেতর নেমে যেতে যেতে,—দুহাত তুলে চিৎকার করে উঠলো ও'।

দৌড়ে গিয়ে যোগলেকার দুহাত দিয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে ওকে ওপরে টেনে নিলো।

খিল্ খিল্ করে হেসে, ওর বুকের ওপর গড়িয়ে পড়লো কমলেশ।

আবার আসছে ঢেউ,—ঢেউ-এর পরে ঢেউ। কমলেশ সরে আসবার পাত্র নয়। ঢেউ ভাঙা ফেনিল জলের সঙ্গে সে ছুটোছুটি করে খেলা করলো, আর বারে বারে ছেলেমেয়ের মত চিৎকার করে জড়িয়ে ধরলো যোগলেকারকে। আবার ছুটে গেলো ঢেউ এর দিকে।

ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি একাই চললাম অন্য দিকে।

শান্তাদি বললেন—পা টা বড্ড টাটিয়ে উঠেছে রে,—আমি আর হাঁটতে—পারছি না।—তবে তুই যেন বেশী দূর যাস্‌নে খুকি। ভারি নির্জন জায়গাটা, আবার আকাশে মেঘও করেছে খুব।

বড় পাথরটার ওপর বসলেন শান্তাদি। খানিকটা হাঁটবার পর দেখলাম সমুদ্রটা বাঁক ঘুরে দক্ষিণ দিকে বেঁকে গেছে। ত্রিবেন্দ্রাম হয়ে ভারত মহাসাগরের দিকে ছুটেছে আরব সাগর। যেখানে চির-বিরহিণী কন্যাকুমারী মালা হাতে নিয়ে অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষা করছেন তাঁর দয়িতের জন্য।

নেশাগ্রস্তের মত আমিও ঐ পথ ধরে এগিয়ে চললাম।

অনেকটা পথ চলবার পর ফিরে চাইলাম পেছন দিকে—আর ওদের জলতরঙ্গলীলা আর চোখে পড়েনা।

ক্লান্ত ভাবে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লাম আমি।

বুকের ভেতর একটি প্রশ্ন কাঁটা হয়ে ফুটছে;—হায় রাজা,—তুমিও?

আকাশে, কালো মেঘ আরো ঘনিয়ে এলো! তার ছায়া লেগে, চাইনিস ইঙ্ক এর মত কাজল কালো হয়ে উঠলো সমুদ্রের জল! উদ্দাম হয়ে উঠেছে সাগর বাতাস।

কোন এক দুঃসহ বেদনায়—হা, হা, শ্বাসে, ছুটে এসে আছাড়ি-পিছাড়ি করে কাঁদছে যেন, আরব সাগরের ফুলে ফুলে ওঠা ঢেউগুলো! ওদের অশান্ত মনের করুণ কান্না আমি শুনতে লাগলাম একা বসে। কতক্ষণ কেটে গেছে, সে খেয়াল ছিলো না আমার!

—তুমি এখানে এসে বসে আছো? আমি যে কখন থেকে খুঁজছি তোমায়! কি সাংঘাতিক মেঘ করেছে খেয়াল নেই। বলতে বলতে যোগলেকার এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। ওর শার্ট প্যান্ট সব ভিজে লেপটে গেছে গায়ের সঙ্গে।

ঐ আরব সাগরের একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে যেন আছড়ে পড়লো আমার বুকের ওপর। আমি চাইলাম ওর মুখের দিকে। —এ কোন যোগলেকার? একে তো আমি চিনিনা।

আমি গম্ভীর মুখে বললাম,—ভিজতে আর বাকি আছে কি তোমাদের? মনের সুখে তো ভিজেছো এতক্ষণ, এই বার না হয় কষ্ট করেই ভিজবে একটু বৃষ্টিতে!··তুমি এগোও আমি যাচ্ছি তার পরেই।

—তোমার হলো কি? মাথাটা হঠাৎ বিগড়ে গেলো নাকি? ঈষৎ ঝাঁঝালো সুরে বললো, যোগলেকার।—আমার কি হয়েছে তা জানবার প্রয়োজন তোমার এখনও আছে নাকি? ভেবে কথা বলো!—উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিলাম আমি।

—আশ্চর্য! তোমাকে চেনা দায় দেখছি। বলতে বলতে হন হন করে ফিরে চললো যোগলেকার।

হায় নির্মম পুরুষ। তোমার কাছ থেকে একটু অনুতাপ মিশ্রিত অনুরাগ, একটু সহানুভূতি পাবার আশা কি এতই দুরাশা হল আমার কাছে আজ? মাত্র ক'দিনে তোমার একি পরিবর্তন? আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল। আমারও দুচোখে নামলো জলের ধারা। ঝড়ের টাল সামলাতে সামলাতে একা ছুটে চলেছি আমি। চলতে চলতে বার বার পাথরে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেলাম। কৈ আমাকে সাহায্য করবার জন্য তো একবারও এগিয়ে এলো না সে।

খানিকটা এগিয়ে দেখলাম, পাগলের মত ছুটে আসছেন শান্তাদি।

—আর যোগলেকারের হাতটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, উঁচু বালির পাড় দিয়ে গাড়ীর দিকে ক্ষিপ্র পায়ে চলেছে কমলেশ কাপুর!

আমাকে দেখতে পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে বললেন শান্তাদি—

—তুই, কেমন ধারা মেয়ে রে বাপু এ্যাঁ? খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়ে গেলো যোগলেকার। দেখ তো! এই খোঁড়া পা নিয়ে, ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে শেষে আমাকেই আসতে হলো।

আমি ছুটে গিয়ে দুহাতে শান্তাদিকে জড়িয়ে ধরলাম।

বেলা বারোটা বাজল, আমাদের হোটেলে ফিরতে।

সুব্রতর কাছে জানা গেলো, বিদেশী সৈন্যদের জন্য আজ সন্ধ্যায় এখানে এক প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করেছেন এখানকার নেভি কর্তৃপক্ষ।

ম্যানেজার আমাদেরও নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠিয়েছেন।

হোটেলটি সাজানো হচ্ছে।

লাঞ্চের পর কমলেশ বললো—

—চলুন এখন বোলগ্যাড়িন দ্বীপে যাওয়া যাক্। ভারি চমৎকার জায়গা, স্বয়ং নেহেরুজী একথা বলেছেন,—তিনি মাঝে মাঝে এসে থাকেন ঐ বোলগ্যাড়িন—প্যালেসে।

দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা এদিকে এলেই, ওখানে বাস করে যান, দু'চার দিন।

শান্তাদির পায়ে কাঁটা ফোটার ব্যথা, সেজন্য তিনি যেতে চাইলেন না।

আমিও বললাম,—বড্ড মাথা ধরেছে, আমি এখন বিশ্রাম করতে চাই।

সুব্রত, যোগলেকার আর কমলেশ, ওরা তিনজন গেলো একটা ছোট বোট নিয়ে বোলগ্যাড়িন দ্বীপে।

যাবার সময় অবশ্য কমলেশ আমাকে বলে গেলো,—বড্ড আয়েসি আপনারা, মানে যাকে বলে খাঁটি বাঙালি মেয়ে।

জবাব দিলেন শান্তাদি—কি আর করি বলো,—জন্মটা তো আর পাল্টে নেওয়া যাবে না।

ওরা চলে যাবার পর আমি বললাম,—শান্তাদি, এ জায়গাটা আমার কি জানি কেন, একটুও ভালো লাগছে না। তোমাদের বল্লারশা এর চেয়ে অনেক ভালো, আর তা ছাড়া মা'র জন্যে হঠাৎ ভারি মন কেমন করছে।

—ঠিক কথাই বলেছিস ভাই, আমারও যেন মনটা এখান থেকে পালাই-পালাই করছে। কেন যে মরতে এসেছিলাম, এখন ভাবছি সুব্রত রওনা হয়ে গেলেই আমরাও পালাবো। আমার আর বিদেশ বেড়িয়ে কাজ নেই। হাতের বোনাটা থামিয়ে কেমন এক বিষাদভরা দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন শান্তাদি।

দুটি চোখ ওঁর হঠাৎ জলে ভরে এলো। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে আবার বললেন তিনি—উনি ঠিক কথাই বলেছিলেন,—আমাকে ছেড়ে তুমি তিনটে দিনও কোথাও গিয়ে টিকতে পারবে না দেখো।

তা, কি করে পারবি বল? সেই তেরো বছরে বিয়ে হয়েছে, আর এখন তেত্রিশ বছর বয়স হলো,—এই বিশ বছরে যে ওঁকে ছেড়ে এক রাত্তিরও কোথাও থাকিনি রে। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী গেছি, বা তোদের বাড়ী গেছি, সঙ্গে করে উনি নিয়ে গেছেন, আবার ওঁর সঙ্গেই ফিরে গেছি। আর যাওয়াতো, ছুটিতে একমাত্র এলাহাবাদে, সে তো উনি সঙ্গেই থাকেন, সেজন্যে তো ওঁকে ছেড়ে থাকার অবস্থাটা আগে কখনও বুঝতে পারিনি। এই ক'দিনে তা হাড়ে, হাড়ে, টের পেলাম। বোনায় মন দিলেন শান্তাদি।

—সেই ভালো শান্তাদি। তুমি ফিরে যাও, সত্যদার কাছে। আর আমি মাদ্রাজ থেকে সোজা রওনা দেবো মায়ের কাছে। জবাব দিলাম আমি।

বিকেল পাঁচটায় বোলগ্যাড়িন দ্বীপ থেকে ফিরে এলো ওরা। আমি তখন লনে, ঝোপের আড়ালে সমুদ্রের ধার ঘেঁসা এই জায়গাটিতে বসেছিলাম। কতগুলো, এলোমেলো চিন্তার জোট পাকিয়ে গেছে যেন মস্তিষ্কে, সেগুলোকে ধীরে ধীরে ছাড়াবার চেষ্টা করছিলাম।

—কিন্তু মনের জোট যে কত জটিল হতে পারে, সে ধারণা তো আমার ছিল না। জীবনের এই প্রথম উপলব্ধির গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো আমার সমগ্র মানসিক সত্তাগুলো।

যোগলেকার এসে বসলো আমার পাশের চেয়ারটিতে। আবেগ উচ্ছসিত কণ্ঠে বললো সে—কি চমৎকার বোলগ্যাড়িন দ্বীপটা জানো রমি? সত্যি কথাই বলেছে মিস কাপুর, ওখানে গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। তুমি তো গেলে না, গেলে তোমারও ঠিক ঐ কথাই মনে হতো।

আমি চাইলাম ওর মুখের দিকে—মনে হলো, যেন খুসির বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ওর চোখে-মুখে।

—আমি না যাওয়াতে তোমাদের আনন্দপর্বের কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি বলেই তো মনে হচ্ছে।—জবাব দিলাম আমি।

—বরং গেলে তা ঘটতো।

—এ কথার মানে? যোগলেকারের বিস্মিত প্রশ্নের জবাবে বললাম আমি।

—মানে এই যে, আনন্দ দেবার মানুষ তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলো। সে ক্ষেত্রে আমার উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয় বলেই মনে হয়েছে আমার। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো যোগ.লেকার। তারপর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো, তোমার মনের এই সঙ্কীর্ণ অন্ধকার দিকটার সঙ্গে এতদিন আমার পরিচয় ঘটেনি বমি। আমি দেখেছিলাম শুধু আলোর দিকটা।···তুমি যখন আমাকে এতটাই হীন বলে মনে করো, তখন তোমার উচিত আমার সম্ভ্রমকে বর্জন করা। আর এটাও জেনে রাখো, সন্দেহ আর ঈর্ষার কাঁটাবনে প্রেমের চারাগাছ কখনও বাঁচে না বা ফুলে-ফলে পূর্ণতাও লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। উঠে দাঁড়ালো যোগ.লেকার।

—দাঁড়াও। বলে আমিও উঠে দাঁড়ালাম ওর মুখোমুখি হয়ে। ওর চোখের ওপর নিজের চোখের জ্বালাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললাম —আমার কথার জবাব দাও। তোমার মুখের যে সততার দীপ্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, সে কি শুধু আমার চোখের বিভ্রান্তি? তুমি কি পৃথিবীর সেই অতি সাধারণ পুরুষ? যারা প্রেমের নামে মেয়েদের করে প্রতারণা, মেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যাদের বিবেকে একটুও বাধে না!—আজ সকাল থেকে তোমার আচরণ যে তোমার সম্বন্ধে এই ধারণাই আমার মনে বার বার জাগিয়ে দিচ্ছে। আমি যে বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি। বলো, তুমি বলো কোন্‌টা সত্যি? আমাদের সেই বল্লারশার দিনগুলো সত্যি? না, আজকের এই অভিশপ্ত দিনটি সত্যি! দারুণ উত্তেজনায় আমার সর্বাঙ্গ তখন থরথর করে কাঁপছিলো।

—এর জবাব এই মুহূর্তে আমি দিতে পারবো না, আর কোনো জবাবই এখন তোমার মনোমত হবে না বা তোমার মনের ধারণাগুলোকে মুছে দিতে পারবে না।···তাই এই জবাবের দায়িত্ব দিলাম আমি, আমাদের আগামীকালের ওপর। আমাদের জীবনের বাকি দিনগুলোই দেবে এর নির্ভুল জবাব। ধীরকণ্ঠে কথাগুলো বললো যোগ.লেকার। তারপর গভীর দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেলো সে।

আকাশে আবার জমেছে ঝুল কালো মেঘের রাশ। গাঢ় অন্ধকারে কোন্ অদৃশ্য হাতের বিদ্যুৎ-চাবুক লক্‌লকিয়ে নেচে উঠলো। হু-হু-করা সাগর বাতাসে, ভেসে আসছে নারকোল বনের দীর্ঘশ্বাস।

দুর্যোগের আশঙ্কায় মুক্ত আকাশের তলে প্রমোদ উৎসবটি বন্ধ রেখে হোটেলের হলেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একে একে আসছে সব নিমন্ত্রিতের দল। আলোয়, ফুলে, উড়ন্ত রঙিন বেলুনের মালায়, বারবিলাসিনীর চটকদার সাজের মতো সেজেছে মালাবার হোটেল।

ভেতরে সুরু হয়েছে নাচ, গান, হাসি হুল্লোড়!

স্তব্ধ পাষাণের মতো বাইরে একা বসেছিলাম আমি!

ঐ আনন্দমেলার আমি তো কেউ নই! বরং আকাশের ঐ নিবিড় অন্ধকার মেঘমালা, ঝোড়ো হাওয়া আর নারকোল বনের ঐক্যতানের সঙ্গে বিদ্যুল্লতার নৃত্য, এদের সঙ্গে আছে আমার মনের মিল।

—কি সৃষ্টি ছাড়া মেয়ে রে বাবা, এ্যাঁ! এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে

একা একা বসে কেন? ওঠ ওঠ—বলতে বলতে শাস্তাদি এসে আমার হাত ধরে টেনে চেয়ার থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন—

—মায়ের জন্যে মন খারাপ বুঝি? বেশ তো, কালই বলছি বার্থ রিজার্ভেসনের জন্যে, যোগলেকারকে! যেদিন পাওয়া যাবে, সেই দিনই রওনা দেবো! লক্ষ্মীসোনা আমার; মন খারাপ করো না! বলতে বলতে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন শাস্তাদি।

—আহা কি সরল মানুষ এই শাস্তাদি। ওঁর গভীর স্নেহের স্নিগ্ধ ধারায়, মনের দাহ জ্বালা কিছুটা জুড়োলো। ওঁর সঙ্গে গেলাম হোটেলের ভেতর।

এ দেশীয় দু'চার জন শিল্পীকে আনা হয়েছে নিমন্ত্রিতদের মনোরঞ্জনের জন্য। একটু আগে কথক নাচ শেষ করেছে একটি মেয়ে। এখন বীণা বাজিয়ে গান গাইছে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। কোন্ রাগ ধরেছে ওরা তা ঠিক না বুঝলেও নিপুণ শিল্পীদের দ্বৈতকণ্ঠের দক্ষিণী ভাষার করুণ সুরলহরী মুগ্ধ করেছে সকলকে। সকলকার অনুরোধে ওরা আরও একটি ভজন গাইলো।

এবারে ডিনার পর্ব সুরু হলো।

যোগলেকার, কমলেশ আর সুব্রত, কয়েকজন সৈনিকের সঙ্গে বসেছিলো এক টেবিলে। আজ কমলেশের নগ্ন সজ্জা, হার মানিয়েছে আর সকল দিনকে।

গায়ে ওর ব্লাউস নেই। শুধু একটি রূপোলি ব্রোকেটের ব্রেসিয়ারের ওপর শাদা চুমকির কাজ-করা নাইলন শাড়ী পরেছিলো ও'!

আমি আর শাস্তাদি খানিকটা দূরে বসেছিলাম।

খাবার নিয়ে আমার নাড়াচাড়া করাই সার হলো, কিছুই নামলো না, গলা দিয়ে।

এখন চলেছে বিলিতি অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে ফিরিঙ্গি মেয়ের ভাঙা গলার ইংরিজি গান। ডিনারের শেষে এলো দামী মদ!

কেউবা ফলের রস মিশিয়ে, অথবা সোডা মিশিয়ে পান করলো,—আবার অনেকে নির্ভেজাল মালই গলায় ঢালতে লাগলো।

ওকি?

যোগলেকারের দিকে চেয়ে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো।

কমলেশ ওর হাতে তুলে দিলো একটি কাঁচের পাত্র।

ওতে টলটলে তাজা রক্তের মত ওটা কি?

কৈ! আজ ও'-তো কোনো আপত্তি জানালো না? চুমুকে চুমুকে সবটা পান করলো যে।

উঃ! দুহাতে বুকটা চেপে ধরলাম আমি।

—কি হলো রে? সভয়ে জিজ্ঞেস করলেন শাস্তাদি।

—কিছু না শাস্তাদি। কি যেন একটা আটকেছে বুকে।—বিকৃত গলায় জবাব দিলাম আমি।

—জল খা। জল খা।

এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল আমার মুখের কাছে তুলে ধরলেন শাস্তাদি।

খানিকটা জল পান করে, একটু জল ঘাড়ে মাথায় দিয়ে, সোফায় মাথাটা হেলিয়ে দিলাম আমি।

—না বাপু! ভালো বুঝছি না। নিশ্চয়ই তোর কোনো অসুখ বিসুক করেছে। চোখ-মুখের চেহারা যে ভারি খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। এখন ভালোয় ভালোয় যে তোকে বাড়ী পাঠাতে পারলে বাঁচি।—আপন মনে বকতে লাগলেন শাস্তাদি।

ওদিকে অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে নাচ সুরু হয়েছে। অনেকগুলি যুগল মূর্ত্তি নাচছে!

ও কি?

ঐদিকে চেয়ে আবার শিউরে উঠলাম আমি। কমলেশ উঠেছে নাচতে।

না, সুব্রতকে বা অপর কারুকে নয়! ও' যোগলেকারের হাত ধরে ওকে আবাহন জানাচ্ছে, ওর নাচের জুটি হবার জন্য।

এতক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বুঝলাম ওর অভিসন্ধি।

সুব্রতকে চায়নি ও'। চেয়েছে যোগরাজ যোগলেকারকে।

ও' চেয়েছে আমাদের ভালোবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করতে। তাই এই মালাবার হোটেলে আমাদের আনবার জন্যে ওর এত আয়োজন।

যোগলেকারের বুকে বুক, হাতে হাত বেঁধে নাচছে, অর্কেষ্ট্রার তালে তালে, কমলেশ কাপুর।

ঘূরপাক খাচ্ছে ওরা।

ওদের পদাঘাতে ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমার বুক,—আমার সোনালী স্বপ্ন, আমার প্রেমের তাজমহল।

আর নয়! আর নয়!

আমি ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—একটু বাইরে বসিগে শাস্তাদি। মাথাটা যেন কেমন করছে।

—আহা! তাই যা। তাই যা। ঘরটা সত্যি বড় গরম হয়েছে। জবাব দিলেন শাস্তাদি।

টলতে টলতে আমি চলে এলাম লনে। সমুদ্রের ধার ঘেঁসা ঝোপটার পাশে একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম;—ঠিক আজ যেখানে বসে আছি আমি। [ক্রমশঃ।

প্রেম

প্রদীপকুমার চৌধুরী

ঘোড়ার লেজের মতো বিনুনি দুলিয়ে
বলেছে জোনাকি সেন—এলেন বিদেশ থেকে ঘুরে
চলুন বেড়িয়ে আসি ঢাকুরিয়া লেকে।
এসেছে বিজুরি বোস মুখে রঙ মেখে—
দু'জনে সিনেমা যাবো, ট্রামে চলুন ভবানীপুরে
পরে বাসায় যাবেন, বাড়ি পৌঁছে দিয়ে।
অবশেষে কৃষ্ণকলি আমার গ্রামের চেনা মুখ
চোখের পাতার মতো আমার হৃদয় স্পর্শ করে—
আগে বিশ্রাম করুন, বেরুবেন পরে।
চোখ তার নীল পদ্ম অত্যন্ত উৎসুক॥

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীশ্রীমা

অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক অনেক বছর আগেকার কথা। ধু ধু করছে মাঠ। সেই মাঠের উপর দিয়ে চলেছে যাত্রীদল। তাদের সঙ্গে আছে একটি বালিকা বধূ। দক্ষিণেশ্বরে স্বামী সন্দর্শনে চলেছে সে। পথিকের দল সূর্য্যাস্তের আগেই মাঠ পার হ'তে চায়। কারণ, রাত্রির অন্ধকারে মাঠের এই নিরীহ রূপ পালটে যায়। নিশাচর দস্যুর ভয়ে ভীত পথিকের দল তাই তাড়াতাড়ি পা চালায়। কিন্তু পথশ্রান্তা কিশোরীটি আর পারে না তাদের সাথে সমান তালে চলতে। সে পিছিয়ে পড়ে। দিনান্তে ক্লান্ত রবি মেঘশয্যায় শায়িত। নিবিড় তমিস্রাবৃত ধরণী। গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত যাত্রীদল, সঙ্গীহারা মেয়েটি একাকী চলেছে। হঁ-রে-রে-রে। হঠাৎ জনহীন প্রান্তরে এই বিকট চীৎকার শুনে চমকে উঠল মেয়েটি। মশাল হাতে মুখোস মুখে ভয়াল দর্শন এক দৈত্য বুঝি বা এসে দাঁড়াল তার সামনে। কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কে রে তুই?' স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হল—'বাবা, আমি তোমার মেয়ে। স্বামীর ঘর করতে চলেছি।' নির্মম দস্যুর হৃদয় কোন এক অজানা মধুর অনুভূতিতে ভরে গেল। কোমল কণ্ঠের 'বাবা' ডাক তার অন্তরে আনল এক বিরাট পরিবর্তন। মেয়েটিকে সে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। পরদিন তাকে নিরাপদে পৌঁছে দেবার বেলায় বাগদিনী তাদের এই এক রাত্রির মেয়ের আঁচলে বেঁধে দিল পথের খাবার। দুর্দ্ধর্ষ বাগদী ডাকাত তার এতদিনের ডাকাতির ব্যবসা একদিন এই মেয়েটির কথায় ছেড়ে দিল।

প্রশ্ন জাগে কে এই অসাধারণ শক্তিশালিনী মেয়েটি? ইনি-ই হলেন সর্বজন পূজ্যা আমাদের শ্রীমা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভক্তশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের নাম সারা পৃথিবীতে তুলেছে আজ এক বিরাট আন্দোলন। কিন্তু, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও মাতা সারদাদেবীর অপূর্ব সম্মিলন বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে, তথা সমগ্র পৃথিবীতে। একদিন যে ত্রিবেণী তীর্থ ধারার সৃষ্টি করেছিল, সে কথা আজ কেউ ভুলে না গেলেও শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অনন্তবিস্তৃত পূত প্রভাবের অন্তরালে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর অপূর্ব ত্যাগধর্ম ও মাতাত্মের কাহিনী যে কিছু পরিমাণে চাপা পড়ে গেছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ভাববিহ্বল প্রেমবিলাসে যে নারীত্বের সার্থকতা নেই, নারীত্বের পরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে, নিজ জীবনের মাধ্যমে সারদাদেবী সেকথা প্রমাণ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে সন্তান গর্ভে ধারণ করলেই মা হওয়া যায় না। মা হওয়া বড় কঠিন কাজ। মায়ের দায়িত্ব অনেক। সন্তান পেটে না ধরেও রমণী জননী হ'তে পারে, যদি সে দায়িত্ববোধ তার থাকে। সে দায়িত্বজ্ঞান ছিল সারদাদেবীর। তাই স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের জননী না হ'য়েও তিনি পেরেছিলেন অগণিত ভক্তবৃন্দের আদর্শ মা হ'তে, পেরেছিলেন ঠাকুরের কথাকে সফল ক'রে মৃত্যুর পরেও সমগ্র জাতির কাছে একটি সুমহান আদর্শ রেখে যেতে। যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে প্রত্যেক নারীই পারে এই নশ্বর জীবনের সকল ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতাকে অগ্রাহ্য করতে।

ত্যাগাভাবই মানুষের জীবনকে করে তোলে অতৃপ্ত ও দুঃখময়। ভোগের নিবৃত্তি নেই বলেই পৃথিবীতে এত সংঘাত, এত অশান্তি, এত দুঃখ। ত্যাগের পথই যে শান্তির পথ, কল্যাণের পথ, সারদা

দেবী তা বুঝেছিলেন। তাঁর জীবনকে আমরা ত্যাগের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে পেতে পারি। সব কিছু বিলিয়ে দিয়েই তিনি পেয়েছিলেন সব কিছু, হয়েছিলেন ঠাকুরের আদর্শ স্ত্রী। দক্ষিণেশ্বরে নহবৎখানায় আত্মগোপন করে থাকা সারদাদেবী যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শুধু সেবাদাসী ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন তাঁর আত্মার ঘরণী, সহকর্ম্মিনী, সহধর্ম্মিণী ও সহমর্ম্মিণী। বস্তুতঃ সারদা দেবী যদি আসক্তিপ্রিয়া সাধারণ রমণী হ'তেন, তাহলে হয়তো সম্ভব হ'তো না পাগল গদাধরের শ্রীশ্রীপরমহংসদেব হওয়া। তিনি প্রতিকূল হ'লে ঠাকুরের সমস্ত আশা ভরসাই যেত অকালে বিনষ্ট হ'য়ে। কৃতজ্ঞচিত্তে রামকৃষ্ণদেব নিজেই একথা স্বীকার করে গেছেন বারবার।

প্রত্যেক নারীর মধ্যেই আছে মহামায়ার ঐশী শক্তি। সে শক্তিকে কুপথে বা বিপথে চালনা না করে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে নারীর অসাধ্য আর কিছুই থাকে না। সে তখন শক্তিময়ী, ত্যাগবতী, অনন্যা ও অসাধারণ। শ্রীশ্রীসারদাদেবী পেরেছিলেন 'সেই সুপ্ত শক্তির সময়োচিত জাগরণের দ্বারা নারীর যথার্থ মহিমা স্থাপন করতে। নারী যে শুধু মানুষের ঐহিক জীবনেরই ধর্ম্মসহচরী নয়, সে যে পারে স্বপ্রতিষ্ঠ, ত্যাগী ও মহিমময় পুরুষকে তার ঐহিক ঐশ্বরিক সর্ব্ব কর্ম্মেই অনুপ্রেরণা দিতে, পারে ধর্ম্মের পথে, সংযমের পথে, ত্যাগের পথে পুরুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, তার প্রমাণ শ্রীমার জীবন। তাঁর মহতী অনুপ্রেরণা বা সহায়তা না পেলে আজকের দিনের আর সব সাধারণ পুরুষের মতই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও হয়তো তলিয়ে যেতে হ'ত মৃত্যুর অন্ধকারে, জীবনের ক্ষুদ্রতায়।

এই স্বার্থময় ক্ষুদ্র জীবনপঙ্কের মধ্যে সারদাদেবীর জীবন যেন একটি প্রস্ফুটিত পূর্ণ শতদল। আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে পরমপ্রেয়সী সারদাদেবী বুঝি অনন্তসাধারণ হ'য়েই জন্মেছিলেন। কিন্তু তা সত্যি নয়। জয়রামবাটীর অতি সাধারণ এক দরিদ্রঘরে তাঁর জন্ম। প্রাত্যহিক সকল কর্মে তিনি অভ্যস্তা, কারও আনন্দে তিনি আনন্দিতা, কারও দুঃখে আবার দুঃখিতা। পাগলী ভাজ এবং অবুঝ ভাইঝির শত অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি করুণাপ্লুতা। ভক্তদের প্রতি স্নেহে তিনি সাধারণ স্নেহময়ী মা, আবার তাদেরই অন্যায়ে তিনি কঠোরা জননী। মা আমাদের বহুরূপী। পেটুক ভক্তছেলেকে কচুর শাক খাওয়াতে যেমন বাগ্রা জগতের সমস্ত পাপ ও অনাচারকে নিজের মধ্যে টেনে নিতে, তেমনি উৎকণ্ঠিতা। যে কোন সাধারণ রমণীর মতই স্বামীকে তিনি ভক্তি করেন, শ্রদ্ধা করেন, সেবা করেন। তাঁকে একবারটি চোখের দেখা দেখবার জন্যে তিনি দেওয়ালের বেড়ায় ফুটো করেন, আবার তাঁরই ইচ্ছায় আপনা হ'তে সমস্ত অধিকার তুলে দেন অনাত্মীয়ের হাতে। অসুস্থ স্বামীকে কি করে একটু বেশী খাওয়ানো যায়, সে চিন্তায় যেমন তিনি সতত ব্যস্ত, এবং সেজন্যে সামান্য একটু ছলনাতেও যাঁর আপত্তি নেই, তিনিই কিন্তু তাঁর স্বামীর দেবদুর্লভ মহিমা সম্পর্কে সদা সচেতন। সারদাদেবীর সবই সাধারণ; গৈরিকবসনা যোগিনী নন তিনি, তিনি বাংলার গৃহস্থবধূ।

কিন্তু তথাপি তিনি হয়েছিলেন অসাধারণ। তাঁকে দেবী বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, যে অন্তর ঐশ্বর্য্য ও চরিত্রমাধুর্য্য মানুষকে সাধারণের স্তর থেকে অসাধারণত্বে মানবত্ব থেকে দেবত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, সে অন্তর ঐশ্বর্য্য ও চরিত্রমাধুর্য্য ছিল সারদাদেবীর সহজাত। তাই তিনি অতিসাধারণ হ'য়েও পেরেছিলেন দেবীপদবাচ্য হ'তে, পেরেছিলেন সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, করুণা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে নারীর সম্পূর্ণ সর্বাঙ্গীণ রূপটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে।

এদিক থেকে বিচার করলে দারিদ্র্যপিষ্টা, লজ্জাশীলা পল্লীবালা সারদাদেবী যে কোন দেশের, যে কোন জাতির যে কোন কালের মানুষের আদর্শস্থল।

আধুনিক কালের উগ্র ব্যক্তিস্বাধীনতার দিনে সারদাদেবীর পবিত্র জীবনকথার ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন অপরিসীম। স্বাধীনতার প্রকৃত রূপকে কেউ কোনদিন ঢেকে রাখতে পারে নি, পারবে না, পারা যায় না। পরাধীন দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়ামির যুগে অবগুণ্ঠনের আড়ালেও সারদাদেবীর স্বাধীন সুন্দর রূপটিকে কেউ ঢেকে রাখতে পারে নি। কিন্তু মাকে এই স্বাধীনতা লড়াই করে, ঝাণ্ডা হাতে উন্মত্ত বিদ্রোহিনীর বেশে, অথবা খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে আদায় করতে হয়নি। অন্তরের ঐশ্বর্য্যের সাথে ধর্ম্মের মহান বন্ধনই তাঁকে দেশাচার ও কালাচারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে এ স্বাধীন রূপটি দিয়েছিল। এ স্বাধীনতার মধ্যে ছিল না উগ্রতা, ছিল না আত্ম-প্রতিষ্ঠার অশোভনতা, ছিল না সবলমত প্রচারের কোন নির্লজ্জ দাবী। ছিল শুধু সহজ, সলাজ, প্রাণবন্ত একটি রূপ, ঐকান্তিক সেবা, বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমাতৃত্ব, অপূর্ব্ব ত্যাগ, ক্ষমা, অগণিত শিষ্য-সম্প্রদায়কে পরিচালনার ধৈর্য্য, পরছিদ্রান্বেষণের অভাব, ও নিরভিমান দীনভাব।

এ সকলই তাঁর চরিত্রকে সহজ সুন্দর এক বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট করেছে। তাঁর সেই মাতৃময়ী রূপ, এতদিনের ব্যবধানেও সমান ভাস্বর। প্রণাম করি সেই সুখদা বরদা বৈরাগিনী মাকে। জয়তু শ্রীমা।

গাস্টলি

কমলা গুপ্ত

সুনয়নী তরফদার হতাশ হয়ে শুয়ে পড়লেন। মাঘের শীতেও তাঁর কপালে ঘাম দেখা গেল। নাঃ বরাতই খারাপ। মেহেতা সাহেবের দেখা নেই, ঘড়ির কাঁটা অপ্রতিহত গতিতে তিনটে, সাড়ে তিনটের ঘর পেরিয়ে যথারীতি চারটের ঘরে এগিয়ে চলেছে। চারবার রিং করেও মেহেতা সাহেবকে পাওয়া গেল না। অথচ কাল সন্ধ্যার সময়ই ঠিক হয়েছে ফিরোজ মেহেতা সুনয়নী তরফদারকে নিয়ে ফ্লাওয়ার শোতে যাবেন। কি যন্ত্রণা! নিশ্চয়ই ওই ভিজে বেড়াল শেফালিকা মিত্তিরের বাড়ির কড়াপাকের বাতাবি চাখছে, কিম্বা ফটফটে রিতা পেরগিলকে নিয়ে আর্ট গ্যালারিতে ঘুরছে। কম নয় এই এক একজন।

রিতার বয়স কি কম হ'ল? চোখের কোণে যতই সুর্মা টানুক আর ভুরুর সব চুলগুলি উপড়িয়ে যতই অজন্তা স্টাইলে বাঁকা ভুরুর রেখা আঁকুক, ও মেয়ের বয়স পঁয়ত্রিশের কম নয়। আর কি টেষ্ট! ম্যাগনোলিয়া ঝাড়ের পাশে যেদিন বনভোজনের আয়োজন হয়েছিল, মনে আছে হলদে স্যাটিন শালওয়ারের উপর সবুজ সিল্কের জামা, তাতে চুমকি বসানো লাল ওড়না উড়িয়ে একেবারে বনলক্ষ্মী সেজে বসেছিলেন। আর যার চক্ষুকেই ফাঁকি দিক, সুনয়নীর তীক্ষ্ণ জ্বালাময়ী দৃষ্টিকে এড়ানো সম্ভব নয়। সেদিন চায়ের টেবিলে হঠাৎ রিতার মাথা ধরাটা যে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত, আর এস্প্রিন, সারিডন, ইউ, ডি, কলো, সব কিছুর ব্যবহার করেও সে মাথাধরা না ছাড়া যে আরও ইচ্ছাকৃত তা' কি তিনি বোঝেন না? সিকনিং! এবমিনেবল্! হানড্রেড পারসেন্ট টু নিল, ফিরোজ মেহেতা রিতাকে নিয়েই ঘুরছে।

হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল মিসেস্ তরফদারের। কিন্তু কাঁদলে চোখের কাজল নষ্ট হয়ে যাবে, গালের বাদামী গোলাপী রঙগুলোয় ছাপ লাগবে এই ভয়ে কাঁদলেন না। এদানিং আবার ম্যাক্সফাক্টরের বদলে কলগেট পামাল্ড ব্যবহার করছেন।

কান্নাটা অনেক কষ্টে সংযত করলেন। কান্নার বদলে মনের জ্বালা জুড়োতে আর কি কি করা যায় ভাবছিলেন, এমন সময় ফোন বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

আশান্বিত হয়ে ত্বরিত পদে এগিয়ে গেলেন সুনয়নী। "সাউথ থ্রী টু ফোর নাইন স্পিকিং।"

"সরি প্লিজ। রং নাম্বার।"

হাল ছেড়ে বসে পড়লেন মিসেস তরফদার।

কত চৈত্রসন্ধ্যা কত জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী কাটিয়েছেন মেহেতার সঙ্গে। এমন রসজ্ঞ লোক খুব কম দেখেছেন সত্যি। মেহেতার সঙ্গে ব্রীজে পার্টনার হওয়া, টেনিস মিক্সড ডাবলে অক্লেশে জেতা, কিম্বা ফকনার কি এলিয়ট পড়ে অবসরক্ষণ কাটানোয় পেয়েছেন পরম তৃপ্তি। পঞ্চাশোর্দ্ধে বয়স মেহেতার, কিন্তু মনটা মুকুলকুসুমিত কমলদলের মত সৌরভময়, প্রাণবন্ত। কিন্তু এই সৌরভ

বিতরিত হয় শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া সবার জন্য। বিশেষ করে পাওয়া যেন অসম্ভব।

রসভারাক্রান্ত চোখ ছুটি যেন জলে উঠল। ঝরে না পারার কাভে জ্বালা দ্বিগুণিত হয়ে উঠল। এমন সময় বেয়ারা এসে কার্ড দিল। সূর্য্যকান্ত রায়। কুঞ্চিত ভ্রূর মাঝে বিষণ্ণতার রেখা অপসারিত হল। বেয়ারাকে অনুমতি সূচক মাথা নাড়িয়ে, স্থির হয়ে বসলেন। রেড লিপষ্টিক নীচের ঠোঁটে ঘসে নিলেন আর একবার। শিনেল ফিফটি ওয়ান ছড়িয়ে দিলেন গায়ে। সূর্য্যকান্ত রায় নামজাদা ব্যারিষ্টার। বছরে ইনকমট্যাক্স তাঁর গড়ে বত্রিশ হাজার।

সত্যি বলছি আপনার ক্লায়েণ্টদের আমার হিংসে হয় রায়সাহেব। তারা কেমন যখন ইচ্ছে আপনার দেখা পায়।

ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই এরকম সরস অভ্যর্থনা আশা করেন নি সূর্য্যকান্ত। বহুকাল আগের কাহিনী তাঁর মনে পড়ে গেল। কিছু না বলে বসে পড়লেন সবুজ মখমল ঢাকা দিওভানের উপর।

সুনয়নীকে বাড়ি পাবেন তাও আশা করেন নি। তবু এসেছিলেন যদিই পাওয়া যায়, ফ্লাওয়ার শো দেখতে যাবার সঙ্গী হিসাবে এমন একটি প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল কামিনী। সুনয়নীর এরকম হোমলি মুড অনেকদিন দেখেন নি। বিবাহের পূর্ব্বের দিনগুলি মনে পড়ল।

সুনয়নীর নয়নছটায় হতচকিত ছিলেন যে কয়টি জীব, সূর্য্যকান্ত তাদের মধ্যে প্রধান। পিক্‌নিক্‌, পার্টি, ককটেল, ডান্স, সিনেমা সবেরই দক্ষিণহস্ত ছিলেন সূর্য্যকান্ত। সভাভঙ্গ হলেও সূর্য্যকান্তের ছুটি হত না। সুনয়নীর কোমল করপল্লব আশ্রয় গ্রহণ করত তাঁর উষ্ণ হাতের মধ্যে। হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠত। আকারে ইঙ্গিতে সুনয়নী তার সমর্পিত ভালবাসাকে যখন গ্রহণ করলেন, তখন সূর্য্যকান্ত কৃতার্থ বোধ করলেন নিজেকে। জীবনসঙ্গিনী হিসাবে এমন দুর্দ্দান্ত গ্ল্যামর গার্ল পেয়ে নেশায় মেতে উঠেছিলেন।

পুরাতন কথা ভেবে সূর্য্যকান্ত হঠাৎ খুসি হয়ে উঠলেন। ফ্লাওয়ার শোর কথা বলতেই সুনয়নী বললেন, "এক মিনিট অপেক্ষা করুন রায়সাহেব। এখনি আসছি আমি, দেখবেন অধৈর্য্য হবেন না যেন।" উজ্জ্বল হাসিতে ঘর ভরে দিয়ে সুনয়নী চলে গেলেন।

মনে পড়ল জিমখানার এক পার্টির কথা। সুনয়নীর সঙ্গে সেই হল প্রথম আলাপ। ভোজন ও পানান্তে খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল—ভাগ্যক্রমে খেলা সেদিন জমেনি। কিন্তু সূর্য্যকান্তের জীবনে জীবন নিয়ে গ্যামলিং-এর সেই সূচনা। অতি তুচ্ছ ঘটনায় দু'জনে কাছাকাছি এসে পড়লেন। খেলা হচ্ছিল 'হিজ ম্যাজেষ্টিস্ গেম'। কিছু না ভেবেই বোধ হয় বলেছিলেন 'হিজ ম্যাজেষ্টি ডিমাণ্ডস্ এ বিউটিফুল লেডি'। ও তরফ থেকে কেটি বেহরাম আর এপাশ থেকে সুনয়নী চ্যাটার্জীকে সবলে টেনে নিয়ে দু পক্ষের ক্যাপ্টেন যখন হাজির করল, তখন দুজনেই হাঁপাচ্ছেন। মিসেস কেটি বেহরামের কপালে ঘাম, সুনয়নীর চোখে বিদ্যুৎ। সূর্য্যকান্তের অর্থ সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব অনেক গুজবই কানে আসত অনেকের। সুনয়নীও বোধ হয় শুনেছিলেন।

দীপ্তদামিনী সুনয়নীকে পার্টিতভঙ্গের পর পৌঁছে দিলেন বাড়ি। গ্রহণ করলেন পরদিনের চায়ের নিমন্ত্রণ।

আলাপ এমনি করে বেড়ে চলল। শত্রু-মিত্র সকলেই যখন সুনয়নীর সঙ্গে সূর্য্যকান্তের বিবাহ স্থির করে নিয়েছেন, তখন হঠাৎ প্রফেসর রামজীবন তরফদারের সঙ্গে আলাপ হ'ল সুনয়নীর। সুনয়নীর পিতৃবন্ধুর সুযোগ্য পুত্র। কেম্ব্রিজের রাংলার। নিতান্তই সাদামাটা চেহারা এবং তার চেয়েও সাদামাটা চালচলন। গানে, নাচে, পিকনিক পার্টিতে কোনও রস পান না, তবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনে তৃপ্তি পান। তাঁর চোখে সুনয়নীর রূপ-গুণ কিছুই ধরা পড়ল না। গালের রঙও নয়, পোষাকের খর্ব্বতাও নয়। সুনয়নী অবাক হয়ে শুনলেন, রামজীবন তাঁর শ্যাম্পেনের মাত্রা দেখে স্বগতোক্তি করেছিলেন 'গাস্ট্লি'। এর পর রামজীবনকে বহুদিন সুনয়নীর ছায়া মাড়াতে দেখা যায়নি। কিন্তু সূর্য্যকান্ত মনে মনে বুঝেছিলেন তাঁর পরাজয় নিশ্চিত। নিষ্প্রভ আঁখিতারা অলক্ষ্যে সজল হয়ে উঠত সুনয়নীর। প্রায় বিকেলেই শোনা যেত সুনয়নী চ্যাটার্জ্জী নট এ্যাট হোম। সূর্য্যকান্ত ভাবতেন সুনয়নী বোধ হয় একা-একা চোখের জল ঝরাচ্ছেন, তাঁর অবহেলিত গ্ল্যামর ফুঁসে ফুঁসে উঠছে অধীর ক্রন্দনে। কিন্তু নট্ এট্ হোমটা যে রামজীবনের ল্যাবে কাটছে তা' কে জানত। দিন সাতেক পরে একদিন দেখলেন, ফিজিক্স লেক্চার থিয়েটারের সামনের লনে দাঁড়িয়ে আছে সুনয়নীর বিরাট প্লিমাথ। ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন রামজীবন তরফদার। উৎফুল্ল মুখ।

দিন কয়েক পরেই বিবাহ হয়ে গেল। সুনয়নী হলেন জয়ী। নাম হ'ল মিসেস তরফদার। দুর্বমনস্ক সরল প্রকৃতি রামজীবনকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু রামজীবনকে তাঁর আদর্শের বাইরে আনা গেল না। চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গ করে সেধে বিবাহের প্রপোজাল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন সুনয়নী; রামজীবনকে চোখের জলে ভিজিয়ে ভেবেছিলেন, তাঁর যৌবনের কলোচ্ছাসে রামজীবন জেগে উঠেছেন। বিবাহের পর ধারণা ভাঙল। টের পেলেন, রামজীবনের পিতা নিজের বন্ধুর কাছে কথা দিয়েছিলেন বন্ধু-কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেবেন। তাঁদের সম্মানার্থেই শুধু এ বিবাহ। সুনয়নীর রূপ যৌবন রামজীবনকে বিন্দুমাত্র মুগ্ধ করেনি। মুহূর্ত্তে বিমুখ হয়ে উঠলেন মিসেস্ তরফদার।

রামজীবনকে জব্দ করার অনেক পন্থাই জানতেন সুনয়নী। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটনা বিপর্য্যয়ে সব ওলট পালট হয়ে গেল। রামজীবন লেকচার থিয়েটারেই একদিন থমর্বসিসে মারা গেলেন। সুনয়নী কাঁদলেন, কিন্তু মুক্তিকে খুসি মনেই বরণ করলেন। বহুদিন পরে নিশ্চিন্ত মনে মুখে তুললেন শ্যাম্পেন। কানের কাছে কে যেন বলল, 'গাস্টলি'—চমকে ফিরে দেখেন না, নবলব্ধ বন্ধু ফিরোজ মেহেতা তাঁর পুষ্পপেলব হাতখানি স্পর্শ করে বলছেন, "আঃ লাভলি," ফিরোজ মেহেতাকে হঠাৎ আবিষ্কার না করতে পারলে তাঁর জীবন কাটান দায় হ'ত। কি নিয়ে থাকতেন সুনয়নী ?

কাপড়ের ওয়াড্রোব খুলে শাড়ির স্তূপ সামনে নিয়ে সুনয়নী এই কথাই ভাবছিলেন। ফিরোজ মেহেতাকে না পেলে তাঁর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। জীবনে কি পেয়েছেন তিনি ? অর্থ, রূপ, করমর্দ্দন ? জীবন পাত্র যে শূন্যই পড়ে আছে। রামজীবনকে বিয়ে করেছিলেন জিদের বশে, ভালবাসতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বাইরের কৃত্রিম সাজসজ্জা আর উচ্ছ্বাসকে রামজীবন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন সুনয়নীকেও। রামজীবন তাঁকে চেনেননি।

মনে আছে বিয়ের দিন সাতেক পরেই রামজীবন তাঁর মাসীমাকে একখানা চিঠি লেখেন। চিঠিখানা পড়ার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না সুনয়নীর। পড়ার ঘরে খুঁজতে এসেছিলেন বুর্ণাপ্রাঁভের কাব্য গ্রন্থ। টেবিলের উপর রাখা ছিল বইখানা—নিচে চাপা দেওয়াছিল ছোট নীলবর্ণের খাম। সুনয়নীর কেন জানি না মনে হ'ল সযত্নে টিকিট দুটো আঁটা হয়েছে। রামজীবনের হাতের লেখা ভালো নয়, তবু তারই মধ্যে পরিষ্কার ছোট ছোট অক্ষরে ইংরেজীতে লেখা—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী। পোঃ দশঘরা। জিলা হুগলী। কি ভেবে চিঠিটি খুলে ফেললেন। রামজীবন লিখেছেন তাঁর মাসীমাকে পত্র।

শ্রীচরণেষু মাসীমা,

ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছি মাকেও মনে পড়ে না। তুমি সে স্থান পূর্ণ করেছিলে। শিক্ষা দীক্ষায় বাবা যা' চাইতেন তার সুযোগ দিতেও তুমি ত্রুটি করনি। তোমার কাছেই শুনেছি বাবা আমার সঙ্গে সুনয়নীর বিবাহ দেবেন বলে স্বীকৃত ছিলেন। তোমার কথা কখনও অমান্য করতে জানি না তাই তোমার আদেশেই তাকে বিবাহ করেছি। তুমি দুঃখ করোনা মাসী, সুনয়নী আমাকে ব্যথা দিতে পারবে না। আমার মনের সবটুকুই যে তোমার গভীর স্নেহের মাধুর্য্যে ভরা। তাতে বাইরের কোন কিছুর আঘাত আর লাগবে না। কিন্তু তোমার একটি কথা রাখতে পারব না মাসী, সুনয়নীকে নিয়ে তোমার ঘরে তুলতে পারব না। তোমার ঘরে, আমাদের গ্রামে যাবার যোগ্যতা সে লাভ করেনি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিও। তোমার রামকে তোমার স্নেহমাখা চিঠি থেকে বঞ্চিত কোরনা। ইতি—তোমার রামজীবন।

মাসীর সে চিঠি তখনই বন্ধ করে ডাকে ছাড়তে দিয়েছিলেন সুনয়নী। বুর্ণাপ্রাঁভের কবিতা পাঠ আর হ'ল না। সেদিনের অলস মধ্যাহ্ন কেটে গেল অশ্রুবিসর্জ্জনে।

মনে মনে সহস্রবার সেদিন নিজেকে গঞ্জনা দিলেন, কেন বিয়ে করেন নি সূর্য্যকান্তকে। এক একবার ভাবলেন জোর করে দশঘরা গেলে কেমন হয় ? প্রেষ্টিজে বাধল সুনয়নী তরফদারের। জীবনের ভুল সংশোধন করতেই হ'বে। এবার পেতেই হ'বে ফিরোজ মেহেতাকে। বৃথাই ভয় তাঁর। রিতা শেরগিল কিম্বা শেফালিকা মিত্তিরকে আশঙ্কা কেন ? ক্ষণপ্রভার কাছে জোনাকি তুচ্ছ নয় কি ? শেফালিকা মিত্তিরকে ভেবে হাসি পেল সুনয়নীর। জরিপাড় শাদা শান্তিপুরী শাড়ি পরে গায়ে কাশ্মিরী শাল জড়িয়ে নারী কল্যাণ সমিতির বক্তৃতা মঞ্চেই তাঁকে মানায় ভাল। যখন তখন ফিরোজ মেহেতাকে ফোন করেন, কিম্বা স্বহস্তে রেঁধে খাওয়ান, তাঁদের রিফিউজী হোমের জন্য টাকা বাগাতে, কিম্বা কোনও চ্যারিটি শো'য়ে প্রিসাইড করাতে। শেফালিকা যে অক্সফোর্ডের এম, এ, তার চিহ্ন বেশে বেশে কোথাও নেই। এমন মেয়েকে সুনয়নীর ভয় কিসের ?

পায়ে মখমলের জুতো পরে বেরিয়ে এলেন সুনয়নী। সূর্য্যকান্ত বিমুগ্ধ হ'লেন সন্দেহ নেই। গায়ে আগুন রঙের রেশমী শাড়ি

বিকেলের কড়া রোদকে অগ্রাহ্য করে ঠোঁটে টকটকে লাল লিপষ্টিক ঘষেছেন, চোখের কোণে ঘন অঞ্জন। সুনয়নীর ছত্রিশ বছর বয়সটা কোথায় পালিয়েছে ঠিক নেই। অন্যমনস্ক সূর্য্যকান্তকে উদ্দেশ করে বললেন, "গাড়ী তৈরী রায় মশায়, চলুন।" মিণ্টো গার্ডেন বাড়ি থেকে সাত মাইলের পথ। সুনয়নী ফাষ্ট ড্রাইভ পছন্দ করেন। ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালালেন সূর্য্যকান্ত।

বাইরের স্নিগ্ধ হাওয়া লাগল সুনয়নীর মুখে। নিচু গলায় বললেন, "মেহেতোর খবর রাখ রায় সাহেব?" মেহেতোর খবর তুমি না জানলে আর কারুর জানা কি সম্ভব? তোমার স্নেহচ্ছায়ায় পালিত ফিরোজ মেহেতোর খবর আমি কি করে পাব বল?"

স্নিগ্ধ সুরে সুনয়নী বললেন, "রায়সাহেব, মনে আছে তুমিই বলছিলে আমি দাহ সর্বস্ব, ছায়া আমার নেই; আমার ছায়ায় কি কেউ দাঁড়াতে পাবে? ছায়ার অভাবে আমি নিজেই দগ্ধ হই।"

স্পিডোমিটারের কাঁটা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশে উঠল। দূরে দেখা দিল কলকোলাহল মুখরিত মিণ্টোগার্ডেন। সূর্য্যকান্ত দেখেন সুনয়নীর চোখে সজল মেঘের ছায়া নেমেছে। কেন তিনি নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না তা তিনিই জানেন। ঈষৎ থমকে মোটরের চাবি ঘুরিয়ে দিলেন। নিঃশব্দে পার্কিং করলেন মোটর শেডে। সুনয়নী মোটর থামাতেও নিশ্চুপ ছিলেন। সূর্য্যকান্তর কেন যেন মনে হ'ল এই উপযুক্ত সময়। সারি সারি অটোমোবাইলের মাঝখানে বসে মাঘের রোদভরা পুষ্পকাননের দিকে চেয়ে মনে হ'ল বলতেই হ'বে। কোনও কবিতা কি কাপলেট মনে পড়ল না। শুধু বললেন, "উড ইউ ম্যারী মী—প্লিজ।" সুনয়নী যেন সজাগ হয়ে উঠে বললেন—"হাউ সিলি। হাউ ভেরি সিলি।' বিব্রত রায় সাহেবকে ফেলে এগিয়েই গেলেন সুনয়নী! ককেট!

সূর্য্যকান্তর সম্বিৎ ফিরে এসেছে তখন। মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করতে দেরী হয়নি। হাসিমুখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। ফ্লাওয়ার শো'র প্রবেশ পথেই দাঁড়িয়েছিলেন সুরনাথ ও নয়নতারা। রিসেপশন কমিটির প্রধান হলেন এঁরাই। নয়নতারাকে একটু আড়াল রেখে সুরনাথ হাসি চেপে বললেন, "লাকি ডগ।" বহুকাল পরে সূর্য্যকান্তর সঙ্গে সুনয়নীকে দেখে এ মন্তব্য করা আশ্চর্য্য নয়।

সুনয়নী ততক্ষণে এগিয়ে গেছেন জনারণ্যে। এগিয়ে যেতেই শুনলেন নতুনতম খবর। ফিরোজ মেহেতার মোষ্ট রিডিকুলস্ বিবাহ সংবাদ। ফিরোজ মেহেতো বিগত যৌবনা শেফালিকা মিত্তিরকে বিবাহ করবেন আগামী রবিবারে। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা মুখটা শুকনো করে জানালো সমবেদনা, শত্রুপক্ষ আড়ালে বলল, "রাইটলি সার্ভড।"

ফিরোজ মেহেতার সঙ্গে এ ব্যাপারের পর সাক্ষাতের ইচ্ছা ছিল না সুনয়নীর। কিন্তু কার্ণেশন ডিসপ্লে হচ্ছিল যেখানে সেখানে জোর করে টেনে নিয়ে গেল তাকে নয়নতারা। নয়নতারার কন্যা একজন প্রাইজ উইনার। নানাবর্ণের উজ্জ্বল কার্ণেশনের মধ্যে দেখতে পেলেন ফিরোজ মেহেতো শেফালিকা মিত্তিরের পাশে বসে আছেন। হাতে ধূমায়িত কফির পেয়ালা, মুখে তৃপ্তির হাসি।

"কনগ্রাটস—কনগ্রাচুলেশন আই সে।" দাঁত চেপে জানালেন সুনয়নী। একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেহেতো সুনয়নীকে দেখে। মৃদু হেসে বললেন, "দেখ মিসেস্ তরফদার তুমি বলতে বিয়ে না করলে বেশী বয়সে কষ্ট পেতে হবে, তাই তোমার কথা রক্ষা করলুম। সত্যিই তুমি এডভাইস দাও ভাল। আমাদের বিয়ের দিন সব তারই কিন্তু তোমার।

শেফালিকাও ঘাড় নেড়ে স্নেহমাখা সুরে সায় দিলেন।

সুনয়নীর বেদনা চাপা পড়ল তার চটুল হাসিতে। বললেন, "মেহেতো, গ্রেট পেলস্ এ্যাক্ট এ্যালাইক—আমাদেরও যে তার আগের দিনই বিয়ে। সূর্য্যকান্ত তোমাকে বলেনি নাকি? হাউ নটি।" ততক্ষণে সূর্য্যকান্ত পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। হতচকিত বিহ্বল হয়ে ভাবলেন এটাই কি একসেপ্টেন্সের আধুনিকতম প্রথা?

খবর শুনে মেহেতো উচ্ছসিত আনন্দে হেসে উঠলেন। সুনয়নী কিন্তু স্বকর্ণে শুনলেন কে যেন রুদ্ধস্বরে বললো—'গার্স্টলি'।

দৃষ্টি

সবিতা দত্ত

রত্না শ্বশুরবাড়ী থেকে আসার পর একদিন গল্পচ্ছলে মাকে বলে,—"আমাকে আর বৌদিকে তুমি একই দৃষ্টিতে দেখো মা, সমবয়সী দু'জনের মাঝে দু'রকম ব্যবহারে মনে বড্ড কষ্ট লাগে, আমি শ্বশুর বাড়ী গিয়ে এ জিনিষটা খুব অনুভব করেছি বলেই তোমাকে বলছি মা।"

রত্নার কথায় বাধা দিয়ে হেমপ্রভা বলেন—"যত সব অনাসৃষ্টি কথা বাপু তোর, এক দৃষ্টি আবার কি? বৌ কাজকর্ম্ম করবে না তো কি আলমারীতে সাজানো থাকবে?"

প্রতিবাদ করে রত্না—"না মা আলমারীতে কি আর জীবন্ত মানুষের থাকতে ভালো লাগবে? কাজকর্ম্ম তো মানুষ মাত্রেই করে, তবে সেখানে দৃষ্টি যদি এক থাকে তাহলে শতকাজের মাঝে মেয়েরা শান্তি ও শান্তি পায়। তুমি আমাকে যে চোখে দেখে বৌদিকেও দেখো, তুমিও সুখী হবে বৌদিও শান্তি পাবে।"

সহসা যেন হেমপ্রভার চেতনা জাগে, সত্যিই তো একদৃষ্টি তো আমার নয়, রত্নারই সমবয়সী জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শর্ম্মিলা, মা হারা মেয়ে, কিন্তু কই মমতাময়ী মায়ের মত স্নেহ সম্ভাষণ তো তিনি করেন না, সস্নেহে ডেকে চুলও বেঁধে দেননি কোনও দিন, বেড়াতে যেতেও বলেন না, সারাদিন বেচারী সংসারের কাজে হিমসিম খাচ্ছে, সবাইকে স্নেহযত্ন করে কিন্তু কই সেজন্য তো তিনি কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখান নি কোনও দিন, উপরন্তু এ-সব কাজ বৌয়েরই এই কথাই তিনি জানতেন।

শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে এই স্নেহের অভাবটুকু রত্না খুব অনুভব করেছে এ-কথা মাকে সে জানিয়েছে। প্রৌঢ়া হেমপ্রভার অন্ধচক্ষু খুলে দিয়েছে তরুণী কন্যা। আজকালকার মেয়েরা জানেও কত হেমপ্রভা তার শাশুড়ী ননদের কাছে যেমন বশ্যতা স্বীকার করে থাকতেন, আজ শাশুড়ী হ'য়ে সেই প্রভুত্ব জাহির করছেন, এইটা যেন রীতি এই তাঁর জানা ছিল। সামান্য ভুলটুকু সংশোধন করে কেউ তো বলেনি কোনও দিন। সামান্য দোষ ত্রুটি যদি আমরা নিজেরাই নিজেদের মন থেকে খুঁজে বার করে নিই, তাহ'লে কত সহজ হয়ে যায় আমাদের জীবন-যাত্রা, কত শান্তি আসে মনে হেমপ্রভার অনুশোচনা হয় বৈ-কি। তাঁর কত সাধের, কত আদরের ছেলের বৌ।

নিস্তব্ধ-দুপুরে বিশ্রাম করছিল শর্ম্মিলা, কিন্তু মনটা অশান্তিপূ

ছিল। ঘটনাটা সকালের, তাড়াতাড়ি শ্বশুরকে পান দিয়েছিল শর্ম্মিলা, চুণ বেশী হওয়াতে শ্বশুর মশায়ের মুখ পুড়ে গিয়েছিল, এ-কথা বলাতে শর্ম্মিলা রাগ করে আর পান সাজেনি, রত্নাকে বলেছিল সাজতে। বিয়ের আগের একদিনের কথা মনে পড়লো শর্ম্মিলার। বাবাকে পান দিয়েছিল, সেদিনও চুণ বেশী হওয়াতে বাবা বলেছিলেন —"চুণ-খয়েরের সমান করে সাজতে পারিস না?"

সেদিন তো কই শর্ম্মিলা রাগ করেনি বরং অনুতপ্তই হয়েছিল, বাবার মুখ পুড়ে গেছে জেনে আরও ভাল করে পান সাজবার চেষ্টা করেছিল। দু'জনেই তো স্নেহময় পিতা, তবে এ প্রভেদ কেন? শর্ম্মিলা মনে মনে বড় অনুতপ্ত হয়। ছিঃ ছিঃ, সে একি কাজ করলো। বাবার কথা মনে হোল শর্ম্মিলার।

বাবা বলতেন—"আমায় যেমন স্নেহ করিস ভালবাসিস, মমতা-ভরা যত্ন করিস, ঠিক এমহিটি ভেবে সবাইকে করিস মা, খুব সুখী হবি।"

তিনটে বাজার সংগে সংগে শর্ম্মিলা উঠে পড়লো। ষ্টোভ জ্বেলে চা করে আগে শ্বশুরের ঘরে নিয়ে গেল, হরিসাধনবাবু সহাস্যমুখে বিছানা ছেড়ে উঠে বললেন—"মা-মণি, আজ এত তাড়াতাড়ি যে।"

শর্ম্মিলা হাসিমুখে শ্বশুরের হাতে চায়ের কাপটি দিল। চায়ের আসরে রত্না বললে,—"আজ আমরা সিনেমা যাব, বৌদি তুমি তৈরী হয়ে নাও।"

শর্ম্মিলা কুণ্ঠিত হয়ে বলে—"না ভাই, সিনেমা যাওয়া চলবে না, মায়ের শরীর খারাপ, কাজকর্ম্ম আছে।"

হেমপ্রভা সকাল থেকেই মনটাকে স্নেহরসে সিঞ্চিত করে রেখেছিলেন, তিনি বললেন—"না বৌমা তোমরা যাও, এবেলা আমিই দেখব। ছেলেমানুষ, কোথাও বেরুতে পায় না।" কণ্ঠস্বরে আক্ষেপ।

এক বছরের মধ্যে এমন স্নেহ-সম্ভাষণ এই প্রথম শুনলো শর্ম্মিলা, চমক লাগে মনে। স্নেহের আবেগে চোখের কোণে জল এসে গিয়েছিল। রত্নার সব লক্ষ্য পড়ে। সে তাড়াতাড়ি বলে—"আমরা দুজনেই সিফন পরব, কি বল?" মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় শর্ম্মিলা।

পাঁচটায় অফিস থেকে ফিরে অবাক হয়ে যায় শঙ্কর। রত্না শর্ম্মিলার দুজনেরই প্রসাধনপর্ব্ব সারা হয়ে গেছে, শুধুমাত্র শাড়ী বদলানোই বাকি, অন্যদিন অফিস-ফেরং শঙ্কর দেখে রান্নাঘরে ধোঁয়ার মধ্যেই শর্ম্মিলার কাজের ব্যস্ততা। আলুথালু বেশবাস, চুলবাঁধা নেই, মুখে বিরক্তির চিহ্ন, কেমন যেন ক্লান্ত অবসন্ন ভাব থাকে চেহারার মধ্যে, কতদিন সখ করে রজনীগন্ধার মালা এনে খোঁপায় দেবার অনুরোধ জানিয়েছে, কিন্তু সে অনুরোধ শর্ম্মিলা উপেক্ষা করেছে। ফুল ঝরে গেছে, বিবর্ণ হয়েছে মালা। বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে মন। সেজন্য অপ্রত্যাশিত ভাবে আজকের পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় শঙ্কর। মনে কিন্তু খুব আনন্দের সঞ্চার হয়।

রত্নাই প্রথম চমক ভাঙায়—"দাদা, আমি আর বৌদি সিনেমা যাব, চট্ করে তৈরী হয়ে নাও।"

"সে কি রে? কি সিনেমা?" শঙ্করের মুখে হাসি।

হেমপ্রভা বলেন—"যা বাবা, মেয়ে দুটোকে একটা সিনেমা দেখিয়ে আন।"

মেয়ে দুটো! এমন কথা তো মা কোনদিন বলেনি। আত্ম-তৃপ্তিতে মনটা ভরে ওঠে শঙ্করের।

শিশুর অনুশাসন-শিক্ষা

বীথিকা দে

সন্তানের সুনামে পিতামাতা গৌরবের অধিকারী হয়ে থাকেন। অপরদিকে সন্তানের অপযশে পিতা-মাতাকেই সর্বোতভাবে দায়ী হতে হয়, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শিশুকে নিজ মনোমত ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার স্বপ্ন প্রত্যেক পিতা-মাতা দেখে থাকেন; কিন্তু সেই স্বপ্ন সার্থক করে তোলা যে কত কঠিন দায়িত্ব তা অনেকেই চিন্তা করে দেখেন না। বিশেষ করে মায়ের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী।

একবার এক প্রতিবেশীর বাড়ী বেড়াতে গেছি। যে ঘরটিতে বসলাম, পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম লাগল। ভদ্রমহিলার পাঁচ ছয় বছরের ছেলেটি মাঠে খেলছিল। হঠাৎ সে ঘরে এসে ঢুকলো। তাকে আদর করে কাছে টেনে নাম জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু ছেলেটির সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। লক্ষ্য করলাম ছেলেটি একটু যেন অবাক হয়ে ঘরের চারিদিকে তাকাচ্ছে, আর তার মা কেমন যেন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে টেনে কোলে বসাচ্ছেন। কিন্তু দুষ্ট ছেলেটি এক ঝটকায় মায়ের হাত ছাড়িয়ে "সব লণ্ডভণ্ড করে দেব" বলতে বলতে একটানে একটি শাড়ী টেনে ফেলে দেওয়াতে বেরিয়ে পড়লো ধূলোপড়া বাক্সের স্তূপ। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম সস্তা ধোপ ভাঙ্গা শাড়ী চাদর দিয়ে বইয়ের র‍্যাক, বাক্স, বিছানা ঢাকা হয়েছে। সহজেই বোঝা যায় আমাদের আসবার উপলক্ষ্যে কেবলমাত্র এই ঘরটিকেই একটু পরিচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভদ্রমহিলা ছেলেটিকে দুমদুম করে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন।

ছেলেটির এই ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণভাবে তার মা দায়ী। ভদ্রমহিলা নিশ্চয় নিয়মিতভাবে ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন না; তাই সেদিন ছেলেটির চোখে অনভ্যস্ত ঠেকায় এই বিভ্রাট। শিশু তার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যা দেখে, যা শোনে তাতেই সে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

কথায় আছে "উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ ভাল"। শিশু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এই প্রবাদটি অতি সত্য। শিশু দেখছে আপনি নাওয়া, খাওয়া, ঘুম ইত্যাদি কোন কিছুতেই অনুশাসন মেনে চলেন না, কিন্তু তাকে শেখাচ্ছেন কঠিন অনুশাসন; স্বভাবতঃই তার মন বিদ্রোহ করে উঠবে। সে হয়তো তিরস্কারের ভয়ে কোনরকম প্রকাশ্য প্রতিবাদ করবে না; কিন্তু মনে মনে হয়ে উঠবে অসহিষ্ণু ও অসন্তুষ্ট। ফলে আপনার শিশুটি হয়ে দাঁড়াবে একগুঁয়ে ও জেদী স্বভাবের। শিশুকে নিজের মনের মত ও আদর্শবান করে গড়ে তুলতে হলে আপনাকে কিছুটা কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বৈকি। নাই বা গেলেন প্রতি সপ্তাহে সিনেমা। শিশুকে সিনেমা নিয়ে যাওয়া যেমন ক্ষতিকর, তেমনি ক্ষতিকর তাকে বাড়ীতে রেখে যাওয়া। কারণ সে যদি দেখে প্রায়ই তার বাবা-মা সেজেগুজে বেরিয়ে যান, কিন্তু তাকে সঙ্গে নেন না—এতে তারা খুবই মানসিক আঘাত পায়। বরং মাঝে মাঝে তাকে সঙ্গে নিয়ে একটু পার্কে বেড়িয়ে আসুন। দেখবেন সে কত খুসী হবে আর আপনার সন্তানের এই খুসীর ছোঁয়ায় আপনার মনও ভরে উঠবে।

আপনার ছয় সাত বছরের শিশুটি অসাবধানতার ফলে খাবার জায়গায় সামান্য একটু জল ফেলায় জন্য তাকে খুব বকলেন কিন্তু

সে তখনই দেখলো তার বাবা গ্লাসের জল নিয়ে ভাতের থালার পাশেই হাত ধুলেন। বারবার এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে তার অবচেতন মনেও একটা বিদ্বেষ ভাব জাগে বৈকি। তার মনে হয় কেবল তার বেলাতেই এটা করতে নেই, ওটা করতে নেই ইত্যাদি নিষেধ ও শাসনের বেড়া—কিন্তু বাবা-মাতো সেই 'নিষিদ্ধ' কাজগুলো করেন।

অনেক মাদেরই দুঃখ ও অনুযোগ করতে শোনা যায়, দুষ্ট ছেলের জন্য টেবিলের উপর ফুলদানীতে ফুল সাজিয়ে রাখতে পারেন না, খেলনা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখতে পারেন না। আপনি এক কাজ করুন ফুলগুলি যখন ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখবেন আপনার ছেলেকে কাছে ডাকুন; তার পর তাকে বলুন ফুলদানীতে ফুলগুলি সাজাতে। বলা বাহুল্য সে খুব খুসী মনেই ফুলগুলি সাজাতে শুরু করে দেবে। কিন্তু সুকৌশলে তার হাত দিয়েই ফুলগুলি আপনি নিজের মনের মতন করে সাজিয়ে নেবেন। তারপর তার এই ফুলসাজানোর একটু প্রশংসা করুন।

তার বাবা কর্মস্থল থেকে ফিরলেই তাঁকে আপনার ছেলের সামনে ডেকে সাগ্রহে তার ফুলসাজানো দেখান। বাবাকেও এ বিষয়ে খুব আনন্দ প্রকাশ করে ছেলেকে দুবার বাহবা দিতে হবে বৈকি। এবার দেখুন তো আপনার ছেলে আর ফুলদানী উল্টে ফেলছে কিনা? এমনি ভাবে সাজান খেলনার তাক অথবা ড্রেসিং টেবিলের জিনিষগুলি; যার প্রতি আপনার শিশুটির নজর পড়ে সুকৌশলে তাকে দিয়ে সাজিয়ে নিন।

আপনই করলেন সব, কিন্তু এমন কৌশলে করলেন যে শিশুটি জানলো সবই তার কৃতিত্ব। তারপর আপনি দুবার তার কাজের প্রশংসা করুন। যদি আপনার শিশুটি মেয়ে হয় দেখবেন সে রোজই আপনাকে সাহায্য করছে। আর যদি সে ছেলে হয় দেখবেন দুইদিন পরেই সে আপনার ফুলদানী বা ড্রেসিং টেবিলের কাছেও ঘেঁসবে না; সে ফুলদানীতে ফুল সাজাতেও আসবে না বা উল্টেও ফেলে দেবে না। এতদিন ফুলদানীটি অথবা ড্রেসিং টেবিলটি তার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু ছিল—সেইজন্য সেটার প্রতি তার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল, বরং বলতে পারেন আক্রোশ ছিল। যেহেতু ফুলদানীটি ছুঁলেই আপনি বকতেন, সেইজন্য সুযোগ পেলেই সে সেটা উল্টে দিয়ে একটা শিশুসুলভ আনন্দ পেত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিশুকে তিরস্কার করে অথবা উপদেশ দিয়ে তাকে কতকগুলো নিয়ম ও অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য করলেই শিশুকে সুশিক্ষা দেওয়া যায় না অথবা শিশুপালনের কঠিন দায়িত্ব পালন করা হয় না। শিশুকে সুশিক্ষা দিতে হলে খুব অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন। আগেই বলেছি এর জন্য বাবা-মাকে কিছু স্বার্থ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতেই হবে।

আরও একটি বিষয়ে আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। শিশুদের কোন কোন অপকর্ম বেশ কৌতুকের সৃষ্টি করে। কিন্তু হয়তো কাজটি খুবই অন্যায়। এক্ষেত্রে কখনই সেই বিশেষ কাজটি নিয়ে তার সামনে হাসাহাসি করবেন না। তাহলে স্বভাবতঃই সে বারবার সেই কাজটি করবে। কারণ, সে এটা অন্যায় বলে মনে করবেই না বরং এটা তার কৃতিত্ব বা বাহাদুরী মনে করে উৎসাহিত হবে। তবে তিরস্কারও করবেন না কারণ তার কাজটি যে কেন অন্যায় সে বোঝবার মত জ্ঞান শিশুর তখনও হয়না, ফলে তিরস্কার ও নিষেধ করার জন্য সেই কাজটি করার প্রতি স্বভাব সুলভ আকর্ষণ বোধ করবে। আপনি কেবলমাত্র নিস্পৃহতা দেখাবেন। এর পরও হয়তো সে আরও দুই এক বার করবে তারপর সেও নিস্পৃহ হয়ে যাবে।

তাই আবার বলি, আপনার শিশু দশজনের একজন হোক কেবল মাত্র সেই স্বপ্ন দেখলেই চলবে না; সেই স্বপ্ন সার্থক করার ভিত্তি গড়ার ভার মাতা-পিতার উপর। সে দায়িত্ব মাতা-পিতাকে পালন করতেই হবে।

ভারত পথিক বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রেম

সুচরিতা সেনগুপ্তা

"লোকে পেট্রিওটিজম অর্থাৎ দেশানুরাগের কথা বলে। আমিও পেট্রিওটিজমে বিশ্বাসী। আমারও দেশানুরাগের আদর্শ আছে।"—বলেছেন যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের স্বল্পকালস্থায়ী জীবনকাল ভারতবর্ষের পক্ষে একটি যুগসন্ধিক্ষণ। বিগত কয়েক শতাব্দী ভারতের বুকের উপর দিয়ে রাজনৈতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঝড় বয়ে গেছে। বিদেশী কবলিত শৃঙ্খলিত ভারত তখন নানা অত্যাচারে জর্জ্জরিত। বাঙ্গলা দেশ অসার চিত্ত, মুমূর্ষু, অজ্ঞ ও অন্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ধর্ম্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র নানা সমস্যার জটিলতা ও বিশৃঙ্খলতায় কর্ণধারহীন ভারততরণী তখন টলমল করছে; এমন সময় নবযুগ প্রবর্ত্তক হয়ে যাঁরা আবির্ভূত হলেন তাঁদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমিক যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। মহামনীষী রামমোহন রায়, রাণাডে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশব সেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আরও জন কয়েক ভারতকর্ণধারের নামের শীর্ষে স্বামী বিবেকানন্দের নাম স্থাপন করলে আশা করি অতিশয়োক্তি কিম্বা ভুল হবে না। যদিও হিসাব করলে দেখা যায় এঁদের জন্ম ও কর্ম্মকালের মধ্যে কয়েক বছরের ব্যবধান রয়েছে, তবু একই শতাব্দীর মধ্যে এঁদের বিপুল কর্ম্মযোগ-স্রোত যুগ-প্রবর্ত্তনার মন্দাকিনী ধারায় বয়ে গেছে দেখা যায়।

বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সাধারণতঃ, বৈরাগ্য মানুষকে পার্থিব, ব্যবহারিক সকল বিষয় ও বাসনা থেকে নিস্পৃহ ও উদাসীনতার পথে টেনে নিয়ে যায়। শ্রীচৈতন্যের বৈরাগ্য দেশ ও জাতিকে ধর্ম্ম-স্রোতাভিমুখী ও প্রেম চৈতন্যমণ্ডিত করেছিল, কবীর, রামানুজেরা ভোগ-বিষয়, মায়া-মোহ মুক্তির পরম আদর্শ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু যুগাচার্য্য বিবেকানন্দের বৈরাগ্য শুধু তাতেই শেষ নয়, তিনি ভোগসুখ স্পৃহা শূন্য, মায়া-মোহ অনাসক্ত শুদ্ধ বৈরাগ্য গ্রহণ করেও অসংখ্য জীব-বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারেন নি তাই আমরা তাঁকে দেশের অগণিত উপেক্ষিত, বঞ্চিত নিরাশ হৃদয় নরনারীর মধ্যে পরম হিতৈষী, নিকটতম বন্ধু, কর্ম্মযোগের আদর্শ প্রতীক রূপে দেখতে পাই।

গভীর কণ্ঠে তাই তাঁকে বলতে শোনা গেছে—"বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর," এই অসংখ্য আর্ত্ত

জীবের দুঃখ দেখে সিক্ত কণ্ঠে বলেছেন "শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই। কি হবে রে এই জড়পিণ্ডগুলোর দ্বারা? আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই। এ জন্ম আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাবো। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' এই বাণী শোনাতেই আমার জন্ম।"

আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ করার মূলে যে স্বামীজীর শুধু বৈরাগ্য ও ধর্ম প্রেরণাই ছিল তা নয়, দেশবাসীগণের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার, উপায় উদ্ভাবন, ক্ষয়িষ্ণু, অবদমিত ক্লিষ্ট আত্মার অসহায় অশ্রুমোচনই সে পরিভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

'দেশ ও দেশবাসী' সমুদ্র ও ঢেউ-এর সম্পর্কের মত। দেশ বলতে যেমন দেশবাসী, দেশবাসীর কাছে জন্মভূমি তেমনি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী', এই স্বদেশকে বিবেকানন্দ গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। উদাত্তকণ্ঠে তাঁকে বলতে শোনা গেছে—"আমার জন্মভূমির মত দেশ আর কোথায় আছে?···এদেশের পবন আধ্যাত্মিকতার স্পন্দনে তরঙ্গায়িত। এদেশ দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুশীলন ও উদ্ভাবনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে।···আমাদের এই মাতৃভূমিতেই জীবনমৃত্যুর সমস্যা, সর্ব্বদুঃখের মূল বাসনার তীব্রদহন হইতে মানবের মুক্তির সমস্যা সর্ব্বপ্রথম মীমাংসিত হইয়াছিল এবং তাহা এরূপভাবে হইয়াছিল যে, জগতের অপর কোন দেশ সেরূপ মীমাংসায় এ পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতেও পারিবে না।" ভারতের প্রাচীন মহত্ত্ব ও ঐতিহ্য স্বামীজীর জীবনে পরম আদর্শ ও মহান গরিমার বিষয় ছিল; জাগিয়েছিল দেশমাতৃকার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অকম্পিত অম্লান প্রেমানুরাগ। যার বিমল প্রেরণায় নিজের অমূল্য-জীবন উৎসর্গীকৃত করে আপ্লুতকণ্ঠে বলেছিলেন—"যদি আমার জীবন সহস্র মানব জীবনের মত দীর্ঘকালস্থায়ী হইত তাহা হইলে ঐ সুদীর্ঘ-জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমার স্বদেশবাসী নরনারীর সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিতাম। কারণ, আমার বলিতে যাহা কিছু আছে,—এই জড়দেহ, মননশক্তি এবং আধ্যাত্মিকশক্তি, এই সমস্তের জন্যই আমি আমার জন্মভূমির নিকট ঋণী।" কি প্রবল ও অপরিসীম স্বদেশানুরাগ, অতুল শ্রদ্ধার প্রকাশ। তাঁর স্বদেশ ভাবনার কেন্দ্রে সর্ব্বদাই এক 'অখণ্ড ভারতবর্ষ' বিরাজ করতো।

'বর্ত্তমান ভারত' 'পরিব্রাজক' ইত্যাদি গ্রন্থ বিবেকানন্দের প্রগাঢ়োজ্জ্বল দেশপ্রীতি ও জাতি বাৎসল্যের পরিচয়বাহী। 'বর্ত্তমান ভারত' প্রবন্ধটি ১৮৯৯সালে রচিত। উক্ত প্রবন্ধে ভারতপথিক বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তার উৎকৃষ্ট ও উজ্জ্বল অভিব্যক্তি ঘটেছে বলা যায়। তাঁর এই পরম ও বিশিষ্ট স্বদেশচিন্তার অপর নাম 'ভারতোপলব্ধি' যাকে অন্যনামে, 'আত্মোপলব্ধি' ও বলা চলে। এই আত্মানুসন্ধানই স্বামীজীকে বোধ করি 'ভারতসন্ধানে' অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতপথিক বিবেকানন্দ তাই সারাভারত পরিক্রমণ করেছিলেন শুধু ধর্ম্মকামী সন্ন্যাসীরূপেই নয়, জন্মভূমির কল্যাণে আত্মোৎসর্গকারী দেশভক্ত ও পরিব্রাজকরূপে।

স্বদেশ তাঁর আরাধ্যা। শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠে বললেন—"জগজ্জননী তোমাদের স্বদেশ, স্বজাতিরূপে প্রকাশিত রয়েছেন। আগামী পঞ্চাশ বৎসর এই মাতৃভূমিই তোমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হউন, অন্যান্য দেবতা নিদ্রিতা। এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রতা।"····· এক সময় জনগণকে উদ্দীপ্ত করলেন—"কোন্ নিষ্ফলা দেবতার সন্ধানে তোমরা ধাবিত হইবে? তোমাদের সম্মুখে তোমাদের চতুর্দ্দিকে যে জাগ্রত দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পার না?"

আচার্য্য—বিবেকানন্দ ছিলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। কিন্তু বেদান্ত ধর্ম্মের প্রবক্তা হলেও জ্ঞান বৈকল্য, জীবন বিমুখ আধ্যাত্মিকতা তাঁর অভিপ্সিত ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে নিরাসক্ত, সর্ব্বত্যাগী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতী সন্ন্যাসী হয়েও জীবসেবী, মানব প্রেমিক। জ্ঞানযোগের সঙ্গে কর্ম্মযোগের, বেদান্ত প্রচারিত ধর্ম্মের সঙ্গে লোকজীবনের অপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব একটি সমন্বয় স্থাপন করেছিলেন। স্বামীজী প্রচারিত যে মহান ধর্ম্মের নাম "মানব ধর্ম্ম,' তার মূলকথা, মুখ্য উদ্দেশ্য জনসেবা অথবা জীবসেবাই ব্রহ্মোপলব্ধির সর্ব্বোত্তম উচ্চতম পন্থা। নরদেহাশ্রয়ী সগুণায়িত নির্গুণ ব্রহ্মই বিবেকানন্দের নারায়ণ। মানবাত্মায় ব্রহ্মোপলব্ধি তাঁর অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য, জীবসেবার মূলতত্ত্ব। বিবেকানন্দের মতে, হীন পতিতের, অজ্ঞ আর্ত্তের সেবা ব্রহ্মস্পর্শের নামান্তর মাত্র। এই মহিমান্বিত প্রেমানুভূতিই তাঁর ব্রহ্মসন্ধানী দৃষ্টিকে—সংসার অভিমুখী, জীবসেবানুরাগী করে তুলেছিলো। তাই তিনি—দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন—"যতদিন দেশের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকে ততদিন তাকে খাদ্যদানই আমার ধর্ম্ম।" তাই বলেছিলেন—"জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" এই প্রেমমন্ত্রের দীক্ষা দিয়েছেন বিশ্ববাসীকেও। মুগ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন "আমি জগতের সব নরনারীকে ভালবাসিতে পারি। আমার নিকট সকলেই শ্রীভগবানের স্বরূপ। মানুষকে শ্রীভগবানবোধে ভালবাসিতে পারিলে কতটা সুখ হয় ভাবুন দেখি।"·····

এই সর্ব্বপ্রেমিক সন্ন্যাসী দেশের কোটি কোটি পতিত, নির্য্যাতিত দরিদ্রকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করতে সদা উন্মুখ চিত্তে বেদনার্ত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়েছিলেন—"এসো, ভারতের এই লক্ষ লক্ষ নীচুতলার মানুষের জন্য আমরা রাত্রিদিন প্রার্থনা করি।"

মাতৃভূমির জনগণই বিবেকানন্দের কাছে এক অখণ্ড ভারতবর্ষ। তাদের আর্ত্ত ও মুমূর্ষু অন্তরের জাগৃতি, তামসিকতায় পিষ্ট, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অবনত প্রাণের পুনরুদ্বোধন করাই ছিল মহাব্রতীর জীবন তপস্যা। বলেছিলেন "মাতঃ, আমি নাম যশ দ্বারা কি করিব, যখন আমার জন্মভূমিকে অসীম দারিদ্র্যের অতলে নিমজ্জিত হইতে দেখিতেছি? লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী একমুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।···কে ভারতের ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণের মুখে অন্ন যোগাইবে? কে তাহাদিগকে এই হীন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবে? মাতঃ! কি প্রকারে আমি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও।"

ধর্ম্মপ্রচারক ও ঈশ্বরবিশ্বাসী হলেও সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধ আচার-বিচার প্রথা, অমূলক ও অযৌক্তিক বিশ্বাসকে বিবেকানন্দ কখনও প্রশ্রয় দেন নি। পৃথিবীর জল, আলো, বাতাস ও মানুষের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশের প্রথম পরমলগ্নে শিশু নরেন্দ্রকে তাই দেশাচারের বিরুদ্ধে সহজ সরলকণ্ঠে বলতে শোনা যায়—"মা, বাঁ হাতে গ্রাশে জল খেলে হাত এঁটো হয় হোক নোংরা তো হয় না। আমি বাঁ হাতেই জল খাবো।"

তাই দেখা গেছে, স্বগৃহে বৈঠকখানায় মুসলমান ভদ্রলোকের ব্যবহৃত হুঁকোয় মুখ লাগিয়ে স্পর্শ করতে; উদ্দেশ্য, সামাজিক

কুসংস্কারের অন্যায় করা। স্বামীজী ছিলেন যুক্তিবাদী। যুক্তিকে, মানুষের স্বাধীনচিন্তা ও বিচারবুদ্ধিকে তিনি মানব মনের মুক্তির স্বর্গদ্বার বলেছিলেন। তাই আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি "মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য—মনীষা—মুনি? চিন্তাশীলতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন"। উচ্চবর্ণাশ্রয়ী কর্ণধারগণের ধর্মীয় ভণ্ডামী, পুরোহিততন্ত্রের নিষ্ঠুর যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে স্বামীজীর বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠ শোনা গেছে "যে ধর্ম দরিদ্রের দুর্দশা দূর করতে পারে না, মানুষের মনে মহৎবৃত্তির জাগরণ ঘটাতে পারে না, তার নাম কি ধর্ম?··যেখানে দশ বা বিশ লক্ষ সন্ন্যাসী ও কয়েক কোটি ব্রাহ্মণ গরীবের রক্ত শোষণ করে চলেছে সেটা কি কোন দেশ? না নরক? সেটা কি কোন ধর্ম? না, শয়তানের নৃত্যশালা?"

তৎকালীন হিন্দুসমাজ দেহের মহাব্যাধি অস্পৃশ্যতা ও কর্ণকৌলিন্য দূর করার জন্য তিনিই প্রথম সচেষ্ট হন। মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্ছনা, মানবতার অবমাননা, মানুষের প্রতি মানুষের হীন দৃষ্টি, প্রভুত্বব্যঞ্জক অপমান, অসম্মানসূচক ব্যবহার, ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে, মানুষে মানুষে ভেদবিভেদ অসাম্য দেশ ও জাতিকে তখন চরম দুর্দশা, কঠিন অভিসম্পাতের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, ভারতপথিক বিবেকানন্দ যা দেখে বেদনা-বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কঠোর প্রতিবাদের কণ্ঠে বলেছিলেন—"নিষ্ঠুর সমাজ তাহাদের উপর যে মুষ্টির আঘাত বর্ষণ করিতেছে তাহা তাহারা অনুভব করিতেছে। অথচ জানে না কোথা হইতে তাহারা আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ।"

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মন্ত্রের উদ্গাতা ভারতপথিক বিবেকানন্দের স্বল্প-স্থায়ী মর্ত্য-জীবনের বিরাট ও মহান আদর্শের সঙ্গে শুধু ভারতই নয়, সমগ্র বিশ্ব পরিচিত। তাঁর অভূতপূর্ব কর্মযোগের অপূর্ব ও বিপুল প্রেরণা ও চেতনার কাছে শ্রদ্ধাবনত, কৃতজ্ঞ।

সমগ্র বিশ্বের আত্মায় আত্মায় যে নর-নারায়ণ, 'জীব মাত্রেই যে 'শিব' বিরাজিত তাদেরই মনুষ্যত্ব জ্ঞান ও প্রেমের উদ্বোধন করতে করতে এক সময় তিনি মুক্তকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন—"আমি জগতের সর্ব নরনারীকে ভালবাসিতে পারি। আমার নিকট সকলেই শ্রীভগবানের স্বরূপ।"

ভারতবাসীর অন্তরতম বন্ধু বিবেকানন্দ, ভারতবর্ষের মহাতপস্বী, যুগ প্রবর্তক বিবেকানন্দ, ভারত দর্শনের মহাজ্ঞানী, বেদান্ত—প্রবক্তা বিবেকানন্দ, ভারতমাতার আদর্শ সন্তান বিবেকানন্দ, যাঁর স্বদেশ বাণী—'জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত',—সেই যুগাচার্য বিবেকানন্দ জাতির বুকে চির অমর।

ভারত-জীবনের হতচেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে, নববলে বলীয়ান, নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ করতে যে দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ একদা তেজোদ্দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল,—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"—ভারত-উদ্বোধন-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ঋষি প্রধানতম হোতা বিবেকানন্দ,—ভারতের জন চৈতন্যের বোধাসনে চিরপ্রার্থিত, সদা আরাধ্যকে প্রণাম।

অনিত্য

শ্রীমতী বসু

পথিক আমি পথের পানে, তাকাই বারে বারে
বহুঘরে মন যে আমার বাঁধে নারে।
পথ এঁকে দেয় আমার মনে নিত্য নতুন আনন্দ
পথে পথেই খুঁজে ফিরি, মোর জীবনের ছন্দ।

চলতি পথে কত পথিক এলো যে মোর পাশে
কখন তারা আপন হ'ল সহজ অবকাশে।
যখন আবার হারাই তাদের হঠাৎ পথের বাঁকে,
চিহ্ন কিছু বুকের মাঝে জমাট হ'য়ে থাকে।
কিসের যেন কি এক বেদন, কান্না হ'য়ে বাজে,
কি যে পেলেম—কি হারালেম, নিজেই বুঝি না যে'।

চলি আবার—আবার চলি, হয়ত বা আনমনা,
নতুন কোন সাথীর সাথে কখন যে হয় চেনা।
একটু আগেই পাওয়া ব্যথা, যাইযে কখন ভুলে,
আবার কথায়, গানে মাতি, হাসি পরাণ খুলে।

এমনি মোদের জীবন পথে কত যে দাগ পড়ে,
নতুন কোন চিহ্ন এসে আবার ঢাকে তারে।
কোন চিহ্নই স্পষ্ট ক'রে—রয় কি অবশেষে?
হালকা ভেবে জীবনটারে—তাই তো চলি হেসে।

সনেট

(*E. B. Browning*-এর If thou must love ɪɪ
হইতে অনুবাদ)

ভালই বাসিবে যদি মোরে, অন্য কোন কারণেতে নয়
শুধু যেসো ভালবাসা তরে। বোলো না এ কথা
"আমি ভালবাসি তার হাসি··তার চিন্তা সূত্র গাঁথা
মিশে যাহা আমা সাথে একটি ধারায়,
নির্ভরতা বয়ে আনে—তৃপ্ত শান্ত অনুভূতি সারা দিন ধরে"
ঐ সব গুণগুলি, ওগো প্রিয়তম,
পরিবৃত্তি হতে পারে, অথবা তোমারি চ'লে শুধু—
তখনি এ প্রেম তব নিঃশেষিত হবে। মোরে কেন না তাই
করুণামণ্ডিত হয়ে আমার এ অশ্রু জল মুছাবার তরে,—
কাঁদিতে পারে না কেহ চিরদিন ধরে, ক্রন্দন ভুলিব যবে
যেই অশ্রু জল ছিল তব দীর্ঘ সুখকর,
তার সাথে ভালবাসা হারাইতে হবে।
শুধু ভালবাস মোরে ভালবাসা তরে, যাতে চিরকাল
ভালবেসে যেতে পার, শাশ্বত সে ভালবাসা ক্ষয় নাহি তোর।

অনুবাদিকা—মানসী বসু
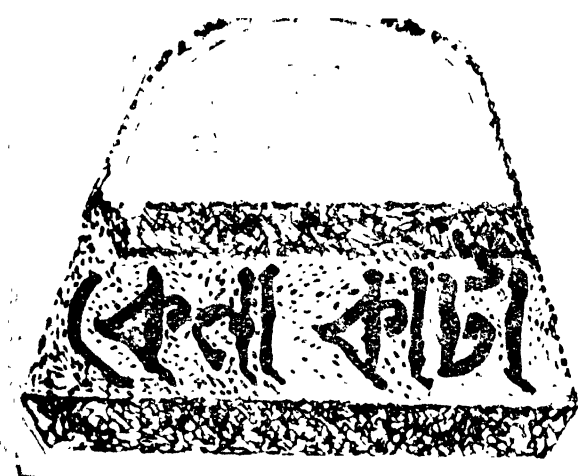
বনসৃষ্টি—কয়েকটি কথা

কতকগুলো অতি বাস্তব প্রয়োজনেই বনভূমি চাই। জাতীয় বননীতি যেটা গৃহীত হয়েছে—শতকরা ৩৩.৩ ভাগ বনাঞ্চল রাখতে হবে। ভারতের অন্যান্য স্থলের কথা বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কথাই বিশেষভাবে ধরা যাক। দেখা যাবে যে, এখানে বনসম্পদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, যার জন্য আবশ্যক দ্রুত বনীকরণ বা বনসৃষ্টি।

সরকারী দাবী অনুসারে মৃত্তিকা রক্ষণ, জনশিক্ষা, শিল্পোন্নয়ন এ সকলের জন্যে এমন কি বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাবার জন্যেও বনাঞ্চলের বিশেষ প্রয়োজন। উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত বনরাজি না থাকার জন্যেই মৃত্তিকার ক্ষয় হচ্ছে এবং নদীবক্ষে পলিমাটি জমা হয়ে চলেছে অতি মাত্রায়। দেশের বহু শিল্পই বন-নির্ভর, যেমন কাগজ, দিয়াশালাই, বাঁশ, কাষ্ঠখণ্ড ইত্যাদি। এই সকল শিল্পের সমধিক উন্নতির আশা রাখলে বনসম্পদ বাড়াতে হবে, পরিকল্পনা মত নতুন নতুন বনসৃষ্টি করতে হবে। পরিমিত বৃষ্টির ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যোন্নয়নের ব্যাপারেও বনাঞ্চলের গুরুত্ব স্বীকার না করলে হবে না।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের একটি হিসাব—ভারত বিদেশ থেকে এখনও বছরে ৩২ কোটি টাকা মূল্যের কাষ্ঠদ্রব্য আমদানী করে থাকে। তার মধ্যে অবশ্য বেশিটাই হলো রেলওয়ে স্লিপার। আর বাইরে থেকে আমদানী অর্থ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়ে যাওয়া, ভারতের পক্ষে যা এখন কঠিন ব্যাপার। দ্রুত বনীকরণের মাধ্যমে বনসম্পদ আশানুরূপ বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হবে।

বনসম্পদের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ আজও একটি আত্মনির্ভরশীল রাজ্য নয়, এটা সত্যি। দেশ বিভাগ হয়ে যাওয়ার ফলেই অন্যান্য দিকের ন্যায় এদিকেও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এখানে রাজ্য সরকার একটি নিউজপ্রিন্ট কারখানা স্থাপনের কথা ভাবছেন। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠখণ্ড এই রাজ্য থেকেই পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এর জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্য্যাপ্ত সাহায্য ও সহযোগিতা পেতে হবে, অন্ততঃ যতদিন না পশ্চিমবঙ্গ বনসম্পদ অধিক পরিমাণে বাড়াতে পারছে।

একটি সরকারী হিসাবে দেখা যায়—জাতীয় বননীতি অনুসারে যেখানে ৩৩.৩ শতাংশ বনাঞ্চল রাখা চাই, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মোট বনভূমি হচ্ছে রাজ্যের সমগ্র ভূমির শতকরা ১১ভাগ মাত্র। এই হিসাবে হিমালয়ের বনাঞ্চল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল ও [illegible] সমস্ত বনভূমিই ধরা হয়েছে। [illegible] রাজ্যের বনসম্পদের ঘাটতি এখনও বিশেষভাবে বিদ্যমান। একথা ঠিক, বনভূমি হতে ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় একর পিছু আজ পশ্চিমবঙ্গেরই সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিসটি ভুলে বসলে চলবে না, বনসম্পদে এই রাজ্যটি স্বয়ংসম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক, আশানুরূপ সম্পদশালী নয়।

দেশে গাছের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে, বনসৃষ্টির কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যে সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে বেসরকারী প্রচেষ্টাও না থাকলে হতে পারে না। বনমহোৎসব করে বৃক্ষ রোপণই বড় কথা নয়, রোপিত গাছগুলোর রক্ষণাবেক্ষণই বড় কথা। বন ধ্বংস না করে বনভূমি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত বাড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ও উদ্যম রাখতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গে এই উদ্যম ও প্রচেষ্টা একটু বেশিরকম সংহত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলা হয়। এখন অবধি এই রাজ্যকে বিহারের পালামৌ অঞ্চল, আসাম রাজ্য ও আন্দামান থেকে যথেষ্ট কাষ্ঠদ্রব্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে উপযুক্ত এলাকায় বনসৃষ্টি মারফৎ এই অবস্থার প্রতিকার খুঁজতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তর অবশ্য এই আশা পোষণ করেন—এই রাজ্য বছরে বছরে দ্রুত বর্দ্ধমান চারাগাছ রোপণ করে একর পিছু একটন কাষ্ঠের স্থলে তিনগুণ কাষ্ঠ উৎপাদিত করা সম্ভবপর। মোটকথা সরকারী পরিকল্পনার বাস্তব ও রূপায়ণের ওপরই দেশের বনসম্পদ বৃদ্ধি বেশিটা নির্ভর করছে, এটুকু বলা যায়।

গুঁড়া লৌহপিণ্ড ও এর ব্যবহার

দেশের যে-কোন বৃহৎ নির্মাণ কাজের জন্য লৌহ চাই, ইস্পাত চাই। স্বাধীনোত্তর ভারতেও লৌহ ও ইস্পাতের সমাদর বেড়েছে এই সম্পদ উৎপাদিত হচ্ছে আগের তুলনায় অনেক বেশি—ব্যবহারও চলেছে বিপুল পরিমাণে। কিন্তু এর ফাঁকে গুঁড়া লৌহপিণ্ড নিয়ে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—প্রশ্নটি হচ্ছে কি করে এর সম্যক্ সদ্ব্যবহার করা যায়।

খনি সমূহ থেকে লৌহপিণ্ড উত্তোলন করতে যেয়ে গুঁড়া বা ক্ষুদ্রাকৃতি লৌহপিণ্ড পড়বেই, এটা ঠিক। সরকারী বিবরণে জানা যায় যে, লৌহখনিগুলি আধুনিকীকরণ করার ফলে গুঁড়া লৌহপিণ্ড খনি-গর্ভে বরং বেশি করে জমছে। অর্দ্ধ ইঞ্চির চেয়েও ছোট যে লৌহপিণ্ডের খণ্ড, গুঁড়া লৌহপিণ্ড পর্য্যায়ে ফেলা হচ্ছে তাকেই। এই শ্রেণীর লৌহপিণ্ড ক্রমেই স্তূপীকৃত হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন লৌহখনিতে। অল্পদিন আগেকার একটি সরকারী হিসাব: একমাত্র বিহার ও উড়িষ্যার খনিসমূহে ক্ষুদ্রাকৃতি লৌহপিণ্ডের খণ্ড বা গুঁড়া লৌহপিণ্ড যা জমা হয়ে আছে, তারই পরিমাণ হবে প্রায় ৬০ লক্ষ টন।

এই বিপুল লৌহ-সম্পদকে জাতীয় প্রয়োজনে কি ভাবে লাগানো যায়, কোন্ ব্যবস্থায় এর পুরো সদ্ব্যবহার হতে পারে, তা এখনও একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়ে যে ভাবছেন না, এমন নহে, পরন্তু গুঁড়া লৌহপিণ্ডের অর্থনৈতিক সদ্ব্যবহার বিষয়ে জাতীয় ধাতব গবেষণাগারেও নিয়মিত গবেষণা চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে এর সুফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এবং এই শ্রেণীর লৌহপিণ্ডকে যথার্থ কাজে লাগাতে ভাবতে হবে না, এইটুকু আশা রাখা যায়।

ইত্যবসরে বিদেশের বাজারে গুঁড়া লৌহপিণ্ড চালানো যায় কিনা, সেইদিকেও সরকার দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন। বহির্ভারতে এক্ষণে অতি সামান্য পরিমিত গুঁড়া লৌহপিণ্ড অবশ্য রপ্তানী হয়ে যায়, আর তার
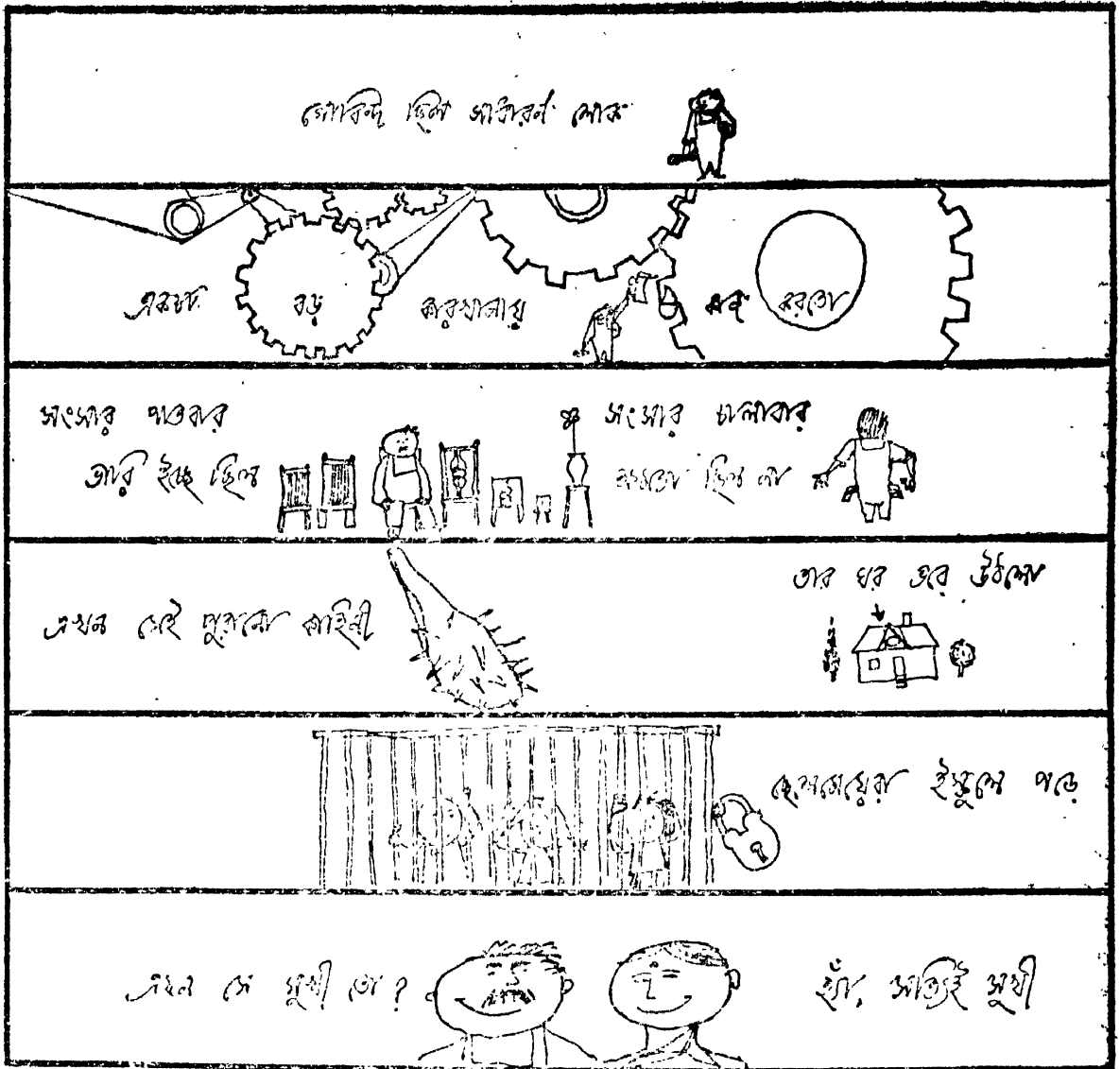
কেন? সে ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজে টাকা জমাতো। গোবিন্দ মাত্র ৫ টাকা দিয়ে তার সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলেছিল। তার আসল টাকা তো নিরাপদই ছিল, তার ওপর বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা হারে সুদও জমছিল। গোবিন্দ প্রতিমাসেই নিয়মিত টাকা জমাতো এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার বেশ মোটা টাকা জমে গেল। সে একজন বুদ্ধিমান লোক। সে তার নিজের ভবিষ্যতের জন্যে, তার নিজের পরিবারের জন্যে সঞ্চয় করতো যাতে তার ভাবী দিনগুলি স্বচ্ছন্দে কাটে…

কখনো আপনি নিজের পরিবারের জন্যে সঞ্চয়ের কথা ভেবেছেন কি?

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

যুক্তরাজ্যে সমিতিবদ্ধ; সদস্যদের দায়িত্ব সীমিত

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহঃ ১৯, নেতাজী সুভাষ রোড; ২৯, নেতাজী সুভাষ রোড, (লেডেন্স ব্রাঞ্চ); ৩১, চৌরঙ্গী রোড; ৪১, চৌরঙ্গী রোড (লয়েড্‌স ব্রাঞ্চ); ৬, চার্চ লেন; ১৭, ব্র্যাবোর্ন রোড; ১বি, কনভেণ্ট রোড, ইণ্টালী; ১৭ এসডি, ব্লক এ, নলিনী রঞ্জন এভিনিউ, নিউ আলিপুর; ১৬৩, রাসবিহারী এভিনিউ।

NGB/7C-BEN

...খানাই উৎপাদিত হয় লোহার খনিতে। রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হলে ভারত বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করতে পারবে অনেকটা। অন্যত্র যেখানে যেখানে লৌহখনি আছে, সেই সকল দেশে গুঁড়া লৌহপিণ্ড সম্পদের ব্যবহার কি ভাবে করা হয়, তা জেনে নিলেও কাজের হতে পারে আর এ জানবার উদ্যমেরও নিশ্চয়ই অভাব নেই।

গুঁড়া লৌহপিণ্ডসমূহকে সাধারণ অবস্থায় ব্লাষ্ট ফার্নেসে গলানো যায় না বলেই আরও অসুবিধা—এর জন্যে প্রয়োজন সিন্টারিং পদ্ধতি, অন্যান্য রাষ্ট্রে যা দীর্ঘদিন চালু। এদেশে এখন অবধি একমাত্র জামসেদপুর, ভদ্রাবতী ও ভিলাই কারখানায় ঐ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে—ক্রমে অবশ্য এ চালু হবে রাউরকেলা, দুর্গাপুর ও বোকারোতেও। যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হোক, গুঁড়া লৌহপিণ্ডের একদিকে আভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি চাই, অন্যদিকে চাই বাইরে এর রপ্তানীর সুযোগ-সম্প্রসারণ। এই দুই দিকে লক্ষ্য রেখে নিবিড় আলোচনা-গবেষণা হলে ফলপ্রদ হওয়ারই প্রবল সম্ভাবনা।

খাদ্যাভ্যাসের রদবদল

বাঁচবার জন্যে সব মানুষকেই খাদ্য গ্রহণ করতে হয় আর সে একদম জন্ম থেকেই। কোন একটা বিশেষ ধারা খাদ্য-খাবার খেতে খেতে খাদ্যের একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে। চট করে যা রদবদল করা অনেক সময় অনেকের পক্ষে কঠিন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো—একবার অভ্যাস হলো বলেই তাকে আঁকড়ে থাকা ঠিক কিনা; বাস্তব জীবনে সত্যি এ কতটা চলতে পারে? খাদ্য বিষয়ে একটা সংস্কার গড়ে তুলতে যাওয়া সমীচীন গণ্য হতে পারি কি?

আজ পৃথিবীব্যাপী খাদ্য সমস্যা রয়েছে, আমাদের নিজেদের দেশেও। ঠিক যে খাদ্যটির যখন যেখানে চাহিদা হবে, সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে পর্যাপ্ত সরবরাহ সম্ভবপর, এ নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেন না। বাঙালীদের বরাবর ভাত খাওয়ার অভ্যাস—যা-কিছু খাদ্যই গ্রহণ করা হোক, দু-মুঠো ভাত পেলে তাদের সর্বোত্তম তৃপ্তি। দীর্ঘদিনের এই অভ্যাসকে রাতারাতি পাল্টে দেওয়ার দাবী করা চলে না। এ একটি প্রধান খাদ্যের স্থলে অপর একটি প্রধান খাদ্য আমদানী করতে চাইলে, যেমন ভাতের জায়গায় রুটি, বেশ কিছুটা সময় প্রয়োজন বৈ-কি!

রুচি ও অভ্যাস খাদ্য বা অপর যে-কোন ব্যাপারেই হোক, পৃথক্ পৃথক্ লোকে পৃথক্ পৃথক্ হতে পারে—'ভিন্ন রুচয়োহি নরাঃ'। একজনের কাছে যা অমৃত মনে হবে, আর একজন হয়ত তা মুখেই তুলতে চাইবেন না। কেউ সর্বদা নিরামিষ খেতেই ভালবাসেন, কেউ বা আমিষ প্রিয়। দুধ যা সর্বদিক থেকে পুষ্টিকর খাদ্য, তাও কত ছেলে-বুড়োর কাছে পরিত্যাজ্য। তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে—এ সকলই নিছক অভ্যাসের ব্যাপার। খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস আবার পরিবার হিসাবেও আলাদা হয়, যেমন আলাদা হয় বা হতে পারে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাতিতে-জাতিতে, অঞ্চলে-অঞ্চলে। একটি গৃহে যে-জিনিষ খাওয়া হয়ত চলতি, অন্যত্র হয়ত তা নিষিদ্ধ, উল্টোদিক থেকেও ঠিক একই কথা বলা চলে।

এ-ও অবশ্য লক্ষ্যণীয় যে, সাধারণভাবে যে-স্থলে যে জিনিসটি পর্যাপ্ত পাওয়া যায় বা অধিক উৎপাদিত হয়, সেই স্থানের মানুষের খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে ঐ জিনিসটিকে কেন্দ্র করেই। বাঙালীর মাছ-ভাত না হলে চলে না, এই অভ্যাস তার দৃঢ়তম। এর কারণ স্পষ্ট—হাত বাড়িয়ে খাদ্য ধরতে যেয়ে এই জিনিসই সে হাতে পেয়ে এসেছে—আজকের দিনে তার যত বিড়ম্বনাই দেখা দিয়ে থাক।

আজকের দিনে দুনিয়াটা পরস্পরের খুব কাছাকাছি হয়ে গেছে। প্রয়োজনের তাগিদে এক জায়গার মানুষ যাচ্ছে অপর জায়গায়, কখন কি ভাবে কাকে কাটাতে হবে, নিশ্চয়তা নেই। অথচ যেখানেই থাকা যাক আর যখনই তা হোক, সর্বোপরি চাই খাদ্য। সেই অবস্থায় খাদ্য গ্রহণের একটি বিশেষ রুচি বা অভ্যাসকে আঁকড়ে থাকলেই মুস্কিল। খাদ্যাভ্যাসের রদবদল করার মতো মনের প্রস্তুতি চাই, যখন যেমন, তখন তেমন—মনটি যদি এমনি সুস্থে ধরে গড়ে উঠলো, তাহলে অনেক ভাবনা কমে যায়।

ঘরে থেকেও সব সময় রুচিমাফিক খাদ্য যে সংগ্রহ করা যাবে, আজকের দিনে সে গ্যারাণ্টি নেই। বাঙালীকে ভাত কম খেতে এবং গম খাওয়ার অভ্যাস করতে বলা হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী চাউল যোগাড় করা যাচ্ছে না বলেই তো খাদ্যাভ্যাস পাল্টাবার এই কঠিন দাবী। সহজভাবে যে এই দাবী মেনে নিতে না পারলে, তারই দুর্ভোগ। মাছ-ভাত হয় ভালো, না হলে অন্য যে পাওয়া যায়, তা-ই খেয়ে তৃপ্ত হব, এমনি না হলে নয়।

গবেষণাদির মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে অনেক নতুন খাদ্য-সামগ্রী বিশ্বের নানা স্থানে তৈরীর চেষ্টা চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে সফলতাও অর্জিত হয়েছে—ভারতেও সেইরূপ সাফল্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। যেমন সরকারী খাদ্য গবেষণাগার শতকরা ৭৫ ভাগ বাদামের ময়দার সঙ্গে ২৫ শতাংশ ছোলার ছাতু মিশিয়ে আর সেই সাথে পরিমিত খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণ যুক্ত করে 'বহুমুখী খাদ্য' তৈরী করতে সমর্থ হয়েছেন। ট্যাপিওকার সঙ্গে বাদামের খাদ্য মিশিয়ে এবং বাদামের ময়দার সঙ্গে গমের আটা মিশিয়েও নয়া পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করা চলছে।

খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য জনগণের নিকট জাতীয় সরকার দাবী রেখেছেন। যে-অভ্যাস দীর্ঘদিনের সহসা এর রদবদল কঠিন ব্যাপার, তবুও চেষ্টা চলেছে সেইদিকে—খাদ্যাভাসের কিছুটা পরিবর্তনও হচ্ছে ক্রমিক ধারায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি খাদ্য ও পুষ্টি গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে বা হচ্ছে—যার লক্ষ্য হবে নতুন নতুন পুষ্টিকর খাদ্য বের করা। তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য যতটা সম্ভব কম খাওয়ার অভ্যাসের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তা-ও লক্ষ্য করবার।

এই তো গেল একদিকের কথা, প্রসঙ্গটির আরও একটি দিক আছে। সেটা হলো খাওয়ার পরিমাণগত দিক, মাত্রাভিত্তিক খাদ্য গ্রহণের প্রশ্ন। এর সঙ্গে মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রশ্নটি নিবিড়ভাবে জড়িত, সন্দেহ নেই। আর কোন দিকে না তাকিয়ে একটা জিনিসই পেট বোঝাই করে খেয়ে যাওয়া—এইরূপ অভ্যাস অনেককেই পেয়ে বসে। খাদ্য গ্রহণের এই অভ্যাসের রদবদল হলে ক্ষতির কারণ নেই, বরং ভাল। আসলে চাই, পরিমিত সুষম খাদ্য, পুষ্টিকর খাদ্য, যা খেতে যেয়ে খাদ্য গ্রহণের অভ্যাসের রদবদলের দরকার হলে করতে হবে। ভুক্ত খাদ্য যথেষ্ট পরিপাক হচ্ছে কিনা, সেদিকে সব সময় বিশেষ নজর রাখা আবশ্যক। স্বাস্থ্যের পক্ষে যে খাদ্যই অনুকূল বিবেচিত হবে না, তাই পরিত্যাগ করতে হবে, খাদ্য গ্রহণের রুচি বা অভ্যাস পরিবর্তন সেই অবস্থায় না হলে নয়।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

ষোড়শ স্তবক

১। আনন্দরসলহরী ব্রজভূমিতে, এর পর আরো কিছু দিন কেটে গেল শ্রীকৃষ্ণের···পরমানন্দে। তা কাটবেই বা না কেন? কথকদের কথকথায় নানান্ কথা ওঠে, আর দেখতে দেখতে সব কথাকেই যে ডুবিয়ে দিয়ে ছাপিয়ে যায় তাঁরই মনোহরণ বিচিত্র-চরিত্রের চিত্রণ। তাঁর আমোদকেও যে আমোদিত করে, তাঁর কানে-শোনাকেও যে করে তোলে সার্থক। হবে না আনন্দ,— যখন ব্রজপুরের জনতা ভাবেন,···আহা অবলীলায় কত খেলাই না দেখালো ঐটুকু ঐ চোখের পুতুল, কত গুণই না ও জানে,···আর তাঁদের মন চুরি হয়ে যায় লীলাকিশোরের চরণনখর থেকে অলকাবলীর বিভঙ্গ-ভঙ্গে! সম্মান আদর দিয়ে সেবা করে তাঁর রূপলক্ষ্মীকে! হবে না আনন্দ যখন লক্ষীর কেলি-কলা-কলাপের চেয়েও তাঁর কাছে মনঃপ্রোত বলে মনে হয় আভীরিণী রহস্যময়ীদের পরম ভালবাসা। কী ভালোই না লাগে যখন তাঁর ললাটে তাঁরা এঁকে দিয়ে যান কুঙ্কুম-তিলক, বিশেষ করে চূড়ায় জড়িয়ে দিয়ে যান বকুলফুলের বিনোদ মালা।

আর পরমানন্দে কাটবেই বা না কেন সেই-হেন শ্রীকৃষ্ণের সময়,··· যিনি আজ কলাপেশলা গোপীদের মূর্ত্ত সৌভাগ্য, যাঁর রূপের পায়ে লুটিয়ে থাকেন কোটি কন্দর্প, যাঁর দর্পের বরাশ্রয়ে সুখী হন অষ্টদিক্‌পাল, যাঁর অভিনন্দন ফুটে ওঠে মহেশ্বরাদি সর্ব্বদেবতাদের বন্দনায়, এবং যাঁর উদার কৃপায় অত্যয় দূর হয়ে যায় দ্বাদশ আদিত্যের?

নন্দনেশ্বরের যদিও তিনি মদখণ্ডনকারী, যদিও তিনি গিরি-গোবর্দ্ধনধারী, এবং যদিও তিনি শ্রীগোবিন্দ-নামের পূর্ণাধিকারী, তবুও এখনো যে তাঁর অন্যূন রয়েই গেছে গোধন-বর্দ্ধনের ধৃতি, তবুও যে এখনো তিনি ধেনু চরান লাবণ্য-বিথার সঙ্গে, আগেকার দিনের মতই সহচরদের সঙ্গে নিয়ে এখনো যে তিনি বেড়িয়ে বেড়ান মাঠে মাঠে, কাটিয়ে দেন সন্ধ্যা সকাল।

অতএব শ্রীকৃষ্ণের কেটে যাচ্ছিল দিন···পরমানন্দে।

এই সময়ে এল ধী-শোধিকা একাদশী। উপবাস নিলেন মহারাজ শ্রীনন্দ। দ্বাদশী পালনের আনন্দ উপভোগ করবেন, হৃদয়ে পোষণ করেছিলেন আশা। কিন্তু সেদিন স্বল্প ছিল দ্বাদশীর স্থিতিকাল। তাই নিশার চরমযামে, তিনি তাঁর নিত্যকল্যাণকামী তিন চারটে প্রাণের বন্ধু নিয়ে সত্বর পৌঁছে গেলেন যমুনার তীরে। দেখলেন যমরাজের ভগিনী বহে চলেছেন শ্রীমতী যমুনা। মনে মনে স্থির করলেন···গাত্রাক্ষালন করে স্নান করবেন আনন্দে। অবহিত হয়ে তিনি তাই অবগাহন করলেন যমুনার নীল জলে। কিন্তু,—

২। যে ভাবে স্নান করা উচিত তার অন্যথাচরণ ঘটছে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন বরুণদেবের পুরপ্রহরীরা। কী সাংঘাতিক কাণ্ড! যমুনাদেবীর জলরাশিকে আঘাত করা···আলোড়ন করা! ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তাঁদের চিত্ত। বলপ্রয়োগ করে শ্রীকৃষ্ণ-জনককে তাঁরা ধরে নিয়ে এলেন তাঁদের প্রভুর সকাশে।

৩। যমুনার তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহারাজের বন্ধুবর্গ। তাঁরা যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন প্রতিকারহীন উদাসীনতায়। কি হল কি হল বলে কৃষ্ণকে ডাক দিয়ে ভয়ে তারস্বরে চীৎকার করে উঠলেন,—

"হায় হায়, রক্ষা কর কৃষ্ণ, রক্ষা কর। সুরাসুরদের তুমি প্রতিকর্তা, আর্ত্তের তুমি বন্ধু, বদ্ধের তুমি মুক্তিদাতা,···রক্ষা কর। সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। ব্রজের মাননীয় তোমার পিতা···যমুনায় স্নানে নেমেছিলেন···তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে গর্ব্বোদ্ধত কে জানে কতকগুলো কে। শিগগীর এস, তুমি ছাড়া এ বিপদে কে আর ত্রাণ করতে পারে, কেইবা তাদের সংহার করে।"

৪। আভীরদের আর্ত্তস্বর আপন বেগে ছড়িয়ে পড়ল দূর থেকে দূরান্তে। যে বাণী শোনবার নয়, শ্রীকৃষ্ণের কানে এসে পৌঁছল সে বাণীর ভয়ঙ্কর কটু নাদ। তিনি বুঝতে পারলেন,···এই দুর্ব্বার কীর্ত্তিটি বরুণদেবের ভৃত্যাধমেরাই করেছে, তারা চোখ থেকেও অন্ধ।

যেমন ছিলেন তেমনিই উপস্থিত হয়ে গেলেন কৃষ্ণ বরুণদেবের প্রাসাদে। তাঁকে যেন টেনে নিয়ে গেল বরুণদেবেরই তরুণ সুকৃতি। বরুণপুরীর পুরস্কারের মতই যেন হল তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব।

৫। ভগবৎ-ক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন হয়ে পড়ল প্রত্যেক গোকুল-বাসীর, প্রত্যেক গোকুল-কুলবালার চিত্ত।

বড় বড় চোখ মেলে যদিও তাঁরা কেউই দেখতে পেলেন না তাঁদের নিত্য দেখা শ্রীহরিকে, তবু তাঁদের মনে হতে লাগল যেন তিনি একই গ্রামে বসে রয়েছেন, একই আলয়ে রয়েছেন দাঁড়িয়ে।

৬। তাহলে নিশ্চয় প্রবাসে গেছেন ভগবান,···এই ধারণাই শেষে ঘনিয়ে উঠল অবলাদের মনে, অনুরাগিণীদের মনে। সর্ব্বাঙ্গে বল নেই; শরীর যেন ভাঙ্গো ভাঙ্গো; সহস্র সহস্র যুগ বলে মনে হতে লাগল এক একটি মুহূর্ত্তকে। শুনতে পান না, দেখতে পান না, বাক্য নেই, স্পন্দন নেই,···অন্তঃকরণও যেন চলে গেছে কৃষ্ণের সঙ্গে,···এমনি হল তাদেরও দশা। আর কেবল মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল,—

"রাধার কি হবে! প্রিয়ের বিরহে ক্ষীণাঙ্গী রাধার তাহলে কি হবে? আর এও তো সত্য;···যিনি জীবন তিনি বিদায় নিলেও, জীবনের মতই তো বিলোল হয়ে যায় না প্রেম। ঐ প্রেমই তাহলে একমাত্র বাঁচিয়ে রাখতে পারে রাধাকে।"

এই ভেবে, পদ্মপাতার পাখা দিয়ে বন্ধু-বধূরা বীজন করতে লাগলেন রাধিকাকে, চন্দনজলের ছিটে দিয়ে নেভাতে চাইলেন তাঁর তনু-দাহ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষে মূর্চ্ছা-সখী এসে কোনক্রমে বিস্তার করলেন নিবৃত্তি।

আলতো হাতে তুলো ধরে, তার কম্পন দেখে বুঝতে হয়···নিশ্বাস পড়ছে কি না, সখীরা সেই উপায়েই বুঝতে চেষ্টা করলেন,···রাধার দেহে প্রাণ আছে কি না, নিজেরাও বেঁচে আছেন কি না।

'কৃষ্ণ আসছেন' এই কথাটি একটি বধূর মুখ থেকে বেরোতেই, অতিকষ্টে রাধার পদ্মআঁখি বারেক খুলল, স্থির হল পল্লব, স্থির হল তারা,···কিন্তু হায় রে, সেই স্থির হয়েই রইল···দুটি পদ্মের মত রেখা ···নীল বিরহের সায়রে।

'নিমেষের মধ্যেই কৃষ্ণ এখানে আসবেন'···সখীর মুখের এই হেন কথায় বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হল রাধার;···কিন্তু হায় রে নিমেষ যদি যুগ যুগ হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে বিরহ ব্যথার কি নিন্দে করা চলে ?

নয়ন উন্মীলন করে কৃষ্ণকে দেখতে দেখতে চিরদিন অগ্নিময় হয়েই তো ছিল রাধিকার হৃদয়, এখন যেন সেই নয়ন ফেটে ধারাশ্রাবণ-অশ্রুর ছলনায় বেরিয়ে আসতে লাগল হৃদয়স্থিত রাশি রাশি কৃষ্ণজ্যোতিঃ।

৭। এদিকে মূর্ত্ত তেজঃ-সঞ্চয়ের মত করুণাসাগর শ্রীকৃষ্ণকে বরুণালয়ে সমুপস্থিত হতে দেখে, আনোদয় হল প্রচেতার। তিনি সসম্ভ্রমে এগিয়ে এলেন, প্রণাম করলেন ভগবানকে। প্রণয়ে অভিভূত হয়ে উপহার নিয়ে এলেন সেরা এবং অত্যাশ্চর্য্য সব অর্ঘ্য। পূজা করলেন সর্ব্বজয়ীকে। অতঃপর মূর্ত্তিমান চিদানন্দ-রসের মত শ্রীভগবানকে উদ্দেশ করে পাঠ করলেন স্তব,—

৮। "হে বামদেবাদিদেবের আদিদেব, হে দেবকী-গর্ভরত্ন, আপনি অবতীর্ণ হয়ে লাঘব করেছেন রত্নগর্ভা পৃথিবীর ভার। হে কামকোটি কমনীয়, আজ আমরা কৃতার্থ হয়েছি আপনার অখণ্ড ও অনিন্দনীয় মহা-প্রকাশে। হে নন্দকুমার, আপনার চরণধূলি হরণ করুক আমার মনের ধূলি। প্রকট হোক পরমানন্দ। আজ পরিশোধিত হল আমার পুরী ও পুরবাসীবর্গ, কৃতার্থ হল আমার জন্মও।

৯। হে প্রভু, আপনি কাল-নামে খ্যাত। আপনার অপাঙ্গ ভঙ্গে ভেঙে যায় জাগতিক বৈভব, অজ্ঞানের ঘোরে ঘুরতে ঘুরতে আমরা সে উপলব্ধি করতে পারি না আপনাকে, আপনার মায়ার খেলাই তার হেতু। যাযাবর প্রমুখ মুনিদেরও দুর্জ্জয় এই মায়া। পরম্পরাগত সেই মায়ার মোহে, হে মাধব, আর আমার মত দীনকে অন্ধ করে দেবেন না।

১০। হে জনার্দ্দন, হে অবারি, আমাকে সন্তপ্ত করেছে আমারি এক অনুচর। এখানে সে নিয়ে এসেছে আপনার পিতৃদেবকে। সম্পূর্ণ বুদ্ধির অভাব মূলেই ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। এখন তার সুবুদ্ধি খুলেছে। কিন্তু হে প্রভু, সে আমার অপকার করেও উপকার করে ফেলেছে একটি।

১১। ঐ রাতুল দুটি চরণের পদ্মপরাগ আমার এই দুর্বিনীত মাথায় এনে লাগিয়েছে, জুড়িয়ে দিয়েছে আমার অপরাধের গরল-জ্বালা। অতএব হে দেবাদিদেব, আমার বন্দনা গ্রহণ করুক আপনার ঐ অভূতপূর্ব নবীন বপুঃ,···যার রূপের কাছে হার মেনেছে নবতমাল,···যার গলায় দুলছে বনমালা,···যার নেত্রে কাঁপছে শতপত্রের পত্র-লালিত্য,···যার নাতিবন্ধুর উদরেও আজানুলম্বিত দুবাহুর বর্ত্তুলতায় আশ্রয় নিয়েছে পুঞ্জীভূত তেজ,···এবং যার চরণ—কমলের বন্দনা ওঠে অমরবৃন্দের স্তবগানে।"

১২। বন্দনা-শেষে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বসৌভাগ্য ধাম চরণকমল দু'খানি মধুগন্ধি নির্ম্মল জল ঢেলে স্বহস্তে ধুইয়ে দিলেন জলনাথ, সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে গেল বিশ্ব আপদ!

১৩। তারপরে দনুজদমনকে তিনি পুনর্ব্বার বললেন,—

"আমার এই জলসাম্রাজ্যের রত্নগুলির মধ্যে যেটি আপনার রুচিকর বলে মনে হয়, হে ভগবান, অসীম দয়ায় সেটি গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন আমাকে। সমস্তই আপনার। অধিক কি, আমরাও আপনার। আমাদের সুকৃতির ফলোদয় হয়েছে বলেই ক্ষণিকের জন্যও আপনার চরণসেবার সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। আপনার পিতৃদেবকে আমি এখানে এনে রেখেছি। আপনাকে দেখে সার্থক হোক তাঁর দু'নয়ন, সার্থক হোক তাঁর বিরামহীন বাৎসল্য। হে দণ্ডধর, ক্ষমা করুন অপরাধ,···ভৃত্যের অপরাধে স্বামীর দণ্ড···ক্ষমা। আমার প্রতি এই উদ্দণ্ড দণ্ডই···সমুচিৎ।"

কৃতাঞ্জলি হয়ে নম্রকণ্ঠে পাশভৃৎ বরুণ যখন বারম্বার প্রার্থনা করলেন ক্ষমা, যখন জল হয়ে গলে গেল তাঁর মদ, উদার-করুণায় তখন উথলে উঠল শ্রীকৃষ্ণের অন্তর। বাণীতে অমৃত ঝরিয়ে তিনি বললেন,—

"হে পশ্চিম-দিগন্ত-নাথ, পরিতুষ্ট হয়েছি আপনার স্নিগ্ধ হৃদয়ের প্রেমে। এ-প্রেমে···বুদ্ধির মালিন্য নেই। জলাশয় থেকে আমি বহু দূরে থাকি। আর···এই এতো সব···আমাকে দেওয়াই বা কেন? আমার এই ধন আপনারি থাকুক।"

তারপরে পিতৃদেবকে পুরোভাগে নিয়ে ব্রজপুরে ফিরে গেলেন মাধুর্য্য-ধুরন্ধর শ্রীনন্দনন্দন। তাঁর নয়নে রহস্য, ভ্রূভঙ্গে বিস্ময়, অধরে মৃদু হাস্যের মধুরতা।

১৪। তিনি আসছেন কি আসছেন না এই নিয়ে প্রথমে সহচরীদের মধ্যে উঠেছিল অনেক বিতর্ক, মঙ্গল কোলাহল, তারপরে কৃষ্ণ এসেছেন···জনসঙ্ঘের মুখে এই সঠিক খবর পেয়েই, তাঁদের চঞ্চল মনঃস্রোত বইয়ে দিল প্রমোদ-সুধাধারার, এবং তারপরে তাঁরা সকলেই মিলিত হৈ হৈ ও আলাপের মধ্য দিয়ে বিরহিণী রাধিকাকে এমন ভরসা দিতে আরম্ভ করলেন মিলনের, যে সেই বিপুল উৎসাহের দাপটেই যেন সুজীর্ণ হয়ে গেল প্রেম-রহস্য।

১৫। ব্রজেশ্বরের মুখ থেকে অতঃপর ব্রজবাসীরা শুনলেন বরুণালয়ের কাহিনী,···প্রথমে কত ভয়ই না তিনি পেয়েছিলেন, তারপর কত সমাদর, কত বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন বরুণ-পুরীর শ্রী, একটুকুও খুঁত নেই, একটুকুও মালিন্য নেই সেখানে,···তারপর বনমালীর কাছে বরুণের সে কী আনত্য,···বরুণ-স্তুতির কী লালিত্য! কাহিনী শুনতে শুনতে আনন্দে গম্ভীর হয়ে গেল ব্রজবাসীদের মুখ। আভীর হলেও তাঁরা বুঝতে পারলেন,···তাঁদের শ্রীকৃষ্ণটিই বিশ্বজগতের রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই মূর্ত্তিমান বেদার্থ। নিস্তর্ক্য হয়ে তাঁরা ভাবলেন,—

"জ্ঞানাতীত ইনিই ঈশ্বর। ইনি কি স্বয়ং আমাদের দেখিয়ে দেবেন না নিজের মহোদার ব্রহ্মাখ্য পরমজ্যোতিঃ?"

ব্রজবাসীদের এই অস্ফুট মনোবাসনার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করতে বিশেষ বিলম্ব হল না শ্রীকৃষ্ণের। মহাকারুণিক স্থির করলেন,—

"নরাকার-বপুঃ ব্রহ্ম···ব্রহ্মের চেয়েও আনন্দ-কন্দ-কমনীয়"···

এই সিদ্ধান্তটি ব্যতিরেকই ভাবের মধ্য দিয়ে, ব্রজবাসীদের বুঝিয়ে দিতে হবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে দূর করে দিতে হবে কুতর্ক-মূলক তামসিক বুদ্ধির মূঢ় সন্দেহজাল। স্থির করেই শ্রীভগবান ব্রহ্মাকারে রূপান্তরিত করে দিলেন ব্রজবাসীদের অধিক সুখাস্বাদ প্রিয়ধিষণার বৃত্তিটিকে।

১৭। ব্রজবাসীদের তখন হল অবিকার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার। কিন্তু কোথায় যেন, কিসের যেন, বাধা পেলেন তাঁরা। আনন্দ নেই, অনানন্দ নেই, শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে যা পেয়েছিলেন তার কোনো নিদর্শনই নেই, কোনো জ্ঞানই নেই, পুষ্পসিদ্ধ কোনো অনুভূতিও নেই। ব্যথিয়ে উঠল তাঁদের হৃদয়। মহাকারুণিক, তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

"মুক্তি রাক্ষসীর জঠর চিরে যে সব ভক্তেরা আবদ্ধ হন, তাঁরা নির্মোহ হয়ে একমাত্র অনুভব করতে পারেন...পরিচয়হীন এক প্রণয়। কিছুতেই তাঁদের দিয়ে স্বীকার করানো যায় না মুক্তির এই বন্ধন।"

অতএব শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আপনজনদের পুনর্বার ব্রহ্মাকার-বৃত্তি থেকে নিষ্ক্রামিত করে, বারংবার দর্শন করিয়ে দিলেন নিজের পরমলোক বৈকুণ্ঠধাম,...কুণ্ঠার যেখানে জন্ম হয় না, কুণ্ঠা যেখানে আসে না, অনাবৃত যেখানে কল্যাণ, নিত্যসমৃদ্ধি যেখানে আনন্দের।

১৮। সমাধি থেকে সমুত্থান করলেন যেন ব্রজবাসীরা। তাঁরা দেখতে পেলেন বৈকুণ্ঠকে...মূর্তিমান ব্রহ্মানন্দের মত দর্শনীয়তমকে...তমসঃপরমকে। পরিপূরিত হয়ে গেলেন পরমাহ্লাদে। তারপর বৈকুণ্ঠীয় বস্তুটি যে কেমন,...বিশেষ বিবেচনা করতে বসে, দেখে শুনে ছুঁয়ে ঘ্রাণ করেও কিছুই ধরতে পারলেন না তাঁরা।

১৯। ক্ষণমাত্র কাল ব্রহ্মকৈবল্য,...এবং তার চেয়েও বলবান বৈকুণ্ঠসুখ,...অনুভব করতে করতে তাঁদের মনে হল, যুগসহস্র যেন কেটে গেছে এবং নিখিল সৌভাগ্যবান ভগবানের শ্রীমুখ দেখতে না পেয়ে তাঁরা যেন এক দীনতার চরে এসে ঠেকেছেন। দশা দেখে করুণা হল কৃষ্ণের। নবীন দর্শন দিয়ে পুনর্বার তাঁদের আনন্দ-বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে এবং পরিতাপও বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে, বৈকুণ্ঠকে পুনর্বার কুণ্ঠরূপ দান করলেন কারণরসবিগ্রহ শ্রীভগবান।

২০। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে মহানন্দে নির্বৃত হয়ে গেলেন ব্রজবাসীরা। যেন ঢেউ খেলে গেল তেজ।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মভূত বৈকুণ্ঠ, এবং এই দুটির যথাক্রমিক সাযুজ্য ও যুজ্যমানতার চেয়েও শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ও লৌকিক লীলা-লাবণ্যাদিতে অবগাহন করা যে পরম রমণীয়,...এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন তাঁরা।

২১। যাঁরা বিতর্ক ও কুতর্ক মূলে রূঢ় ও ভীরু মতবাদের প্রশ্রয় নিয়ে জ্ঞানী হন, অথবা সম্মান করেন জ্ঞানের, হায় রে, তাঁদের পক্ষেও সহজ নয় এই বংহিষ্ঠ মহিমার ধারণা করা; যাঁরা দুঃশীল তাঁদের গবেষণাও তত্র নিষ্ফল।

লীলায়িত বঙ্কিম কটাক্ষের একটি মাত্র তরল তরঙ্গে যিনি চরম সুন্দর প্রযোজনা করেছিলেন সাযুজ্য-মুক্তির, এবং তারপর যিনি তাঁর অতি দুর্ঘট-ঘটন-বিঘটন-বিধি-বিশেষের ব্যবহার করে মুক্তি-গ্রহ থেকে নিষ্কাশিত করে এনেছিলেন ব্রজবাসীদের, তাঁর লীলাশক্তির দুঃসাধ্য বলে কি কিছু থাকতে পারে?

[ক্রমশঃ।

ইতি ব্রহ্মালোকদর্শনো নাম ষোড়শঃ স্তবকঃ।

পুস্তক ও প্রকৃতি

[Wordsworth-এর Books And Nature কবিতার অনুবাদ]

আনন্দ

ওঠ, ওঠ, মিতা, ফেলে দাও বই,
নইলে নিশ্চয় হবে তুমি দুই।
ওঠ, ওঠ মিতা, চোখ মেলে চাও,
কেন এত পড়, কিবা ফল পাও।

পাহাড়ের পরে চলেছে তপন,
শস্যক্ষেতে করে জ্যোতি বিকিরণ।
সতেজ সে জ্যোতি হরষে মগন,
অস্ত রবির সোনালী কিরণ।

বই। নিরানন্দ, অন্তহীন দ্বন্দ্ব,
এসো, শোনো বন-বিহগের কণ্ঠ।
মধুর সে কণ্ঠস্বর, মনে হয়
বিজ্ঞতার বঙ্গবাণী এতে রয়।

শোনো, পাখী গায় কেমন পুলকে;
এসো, এসো ছুটে বস্তুর আলোকে;
পাখি সে তো নহে হীন প্রচারক,
কর প্রকৃতিরে তোমার শিক্ষক।

প্রকৃতির আছে অবারিত ধন,
ভরে দিতে পারে আমাদের মন।
স্বাস্থ্যসনে পাই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান,
আমাদের মাঝে সত্যের সন্ধান।

এক শিহরণ ফাগুন বনের
দেয় বহুজ্ঞান জন-মানবের;
সুনীতি-কুনীতি হতে আছে জ্ঞান
এত জ্ঞান ঋষি করে না প্রদান।

কত সুমধুর প্রকৃতির জ্ঞান,
মাঝে পড়ে লোক-বুদ্ধি-বিধান
রমণীয়ে করে বিকৃতি-সাধন,
খুন করে মোরা করি বিশ্লেষণ।

জেনেছো অনেক বিজ্ঞান ও কলা,
বন্ধকর রসহীন গ্রন্থমালা।
এসো, এসো আর নিও সাথে মন,
চেয়ে দেখো, কর জ্ঞানের গ্রহণ।

উদ্ভিদ্‌-অভিধান

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কতৃ্ণ—[হিং সৌধিয়া বা রোহিষ] ১ সুগন্ধি তৃণ-বিশেষ, রামকর্পূর। পর্যায়—পৌর, সৌগন্ধিক, ধ্যাম, দেবজগ্ধক, রোহিষ, সুগন্ধ ভূতৃণপীত, সুশীতল, কাতৃণ, ছত্রা, ছত্রিক, ভামক, ধ্যামক, পূতি, মুদ্গল, দেবগন্ধক। ২ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে।

কথবেল—[সং কপিত্থ, হিং কয়েথ, কৈথ, ফুইকোএৎ, মং কবঠ, কবিঠ, গু কোট, কাঠ, কোঠবড়ী, ক বেললু, তৈং এলাগাকায়া, ও কঁইথ, মলয়—বেলক] কথবেল, কটবেল, কয়েত, কয়েদবেল teronia elephantum. নারঙ্গীবর্গের ফলতরু। পর্যায়—কপিপ্র, দধিথ, গ্রাহী, মন্মথ, দধিফল, পুষ্পফল, দন্তশঠ, কপিগণ, মালুর, মঙ্গল্য, নীলমল্লিকা, গ্রাহিফল, চিরপাকী, গ্রন্থিফল, কুচফল, করণ্টক, গন্ধফল, দন্তফল, করভবল্লভ, কাঠিন্যফল, করঞ্জফলক।

কদ্—কদ্‌বেল।

কদম, কদম্ব—[সং নীপ, গিরিকদম্ব, হিং কদম, কেলা কদম, গু কুম্ব, কেলিকদম্ব, তা বেল্লকদম্ব, তেং কোদম্ব, রুদ্রথা, কদিমীমালু বা কদম্প চেত্তু, কর্ণা কদরেছু] কদম, কেলিকদম nauclea cadamba, বিখ্যাত তরু। ৭০-৮০ ফুট বড়। অনেক ফুল গোলাকারে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া কন্দুকের ন্যায় দেখায়। পর্যায়—প্রিয়ক, হলিপ্রিয়, কাদম্ব, ষট্‌পদেষ্ট, প্রাবৃষেণ্য, হরিপ্রিয়, বৃত্তপুষ্প, সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদম্বর্য, সীধুপুষ্প, মদাঢ্য, কর্ণপূরক। (১) ধারাকদম্ব—[সং সুবাসঃ, প্রাবৃষেণ্য] anthocephalus cadamba (২) ধূলিকদম্ব—[সং ক্রমুকপ্রসূনঃ, বসন্তপুষ্প] adina cordifolia.

কদম্বক—১ দেবতাড়বৃক্ষ, ২ হরিদ্রা, ৩ সর্ষপ, ৪ দারুহরিদ্রা।

কদম্বদ—সর্ষপ।

কদম্বপুষ্প—মুণ্ডিতিকা বৃক্ষ, মুণ্ডিরী।

কদম্ববাদী—নীপজাতীয় কদম্ববি।

কদম্বী—দেবদালী লতা।

কদর—শ্বেতখদির, কাঁটা বাবলা। পর্যায়—সোমবল্ক, ব্রহ্মশল্য, খদিরোপম, শ্বেতসার, খদির।

কদল—১ কলা দ্রষ্টব্য ২ চাকুলে লতা, ৩ শিমূল।

কদলক—কলাগাছ।

কদলা—১ চাকুলে, ২ কজ্জলী গাছ, ৩ ডিম্বিকা, ৪ শিমূল।

কদলী—কলা দ্রঃ।

কদু—অলাবু দ্রঃ।

কদ্রাব—শস্যবি, paspalum scrobiculatum.

কনক—১ পলাশ, ২ নাগকেশর, ৩ ধুতুরা, ৪ কাঞ্চন বৃক্ষ, ৫ কালীয় বৃক্ষ, ৬ চাঁপা, ৭ কালকাসুন্দা, ৮ কণগুগ্‌গুল, ৯ লাক্ষা গাছ।

কনক করবীর—[হিং কণিয়র কনের] বোধ হয় হলুদ কলিকা ফুল (যোগেশচন্দ্র রায়)।

কনক চাঁপা—[সং কর্ণিকার, কনক চম্পক] বড়ুকাদিবর্গের বৃহৎ তরু pterospermum acerifolium, ochna squamosa.

কনক ঝিঙ্গা—বৃক্ষবি polygonum elegans.

কনক ধুতুরা—স্বর্ণবর্ণ ফুল, datura fastuosa.

কনকপ্রভা—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

কনকপ্রসবা—স্বর্ণকেতকী।

কনকরম্ভা—সুবর্ণ কদলী।

কনকা—ehrelia umbellulata.

কনকারক—রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ, কোবিদার।

কনকরাঙ্গা—বৃক্ষবি amaranthus gangeticus.

কনকাহ্ব, কনকাহ্বয়—১ নাগকেশ ফুল, ২ ধুতুরা।

কনড়কা—commelyna bengalensis.

কণ্টকারী—[সং কণ্টকারিকা, কণ্টকারী, হিং কটেরী, লঘুকটাই, ভট্‌কটৈয়া, রেঙ্গনী, ম রিঙ্গনী, ভুঁইরিঙ্গনী, লঘুরিঙ্গনী, গু বেঠিভোরিঙ্গনী, ক নেলগুল্লু, তেং নেবটামুলকা, ব্রাকুটিচেট্টু, গু কণ্টমারিষ] কাঁটকারি, কেঁটকিরি, solanum jacquini, s. diffusum, s. xanthocarpum. কাঁটাপূর্ণ লতাবিং। বৃহত্যাদিবর্গের ক্ষুপ। নদীর চরে ও উচ্চ শুষ্কভূমিতে জন্মায়। পর্যায়—নিদিগ্ধিকা, স্পৃশী ব্যাঘ্রী, বৃহতী, প্রচোদনী, কুলি, ক্ষুদ্রা, দুঃস্পর্শা, রাষ্ট্রিকা, অনাক্রান্তা ভণ্টাকী, সিংহী, ধাবনিকা, কণ্টকারিকা, কণ্টকিনী, দুঃপ্রধর্ষিণী, নিদিগ্ধা, ধাবনী, ক্ষুদ্রকণ্টিকা, বহুকণ্টা, ক্ষুদ্রফলা, কণ্টালিকা, চিত্রফলা। শ্বেতকণ্টকারী—[সং লক্ষণা, তা কন্দনবত্তী, তেং বকুদ কায়া বা নোলমুলকু] ফুল শাদা ও দুষ্প্রাপ্য।

কণ্টকাল—১ কাঁটাল গাছ, ২ মাদার।

কণ্টকালুক—যবাস বৃক্ষ।

কণ্টকিনী—১ বেগুন, ২ শোণ ঝিণ্টি, ৩ মধুখর্জুরী।

কণ্টকিল—বেউড় বাঁশ।

কণ্টকিলতা—শসার লতা।

কণ্টকী—১ খদির বৃক্ষ, ২ ময়না গাছ, ৩ গোক্ষুর গাছ, ৪ বেউড় বাঁশ, ৫ কুল গাছ, ৬ কাঁটাল, ৭ কাঁটা বেগুন।

কণ্টকীদ্রুম—১ খদির বৃক্ষ, ২ বার্ত্তাকী বৃক্ষ।
কণ্টকীকল—কাঁটাল।
কণ্টকুরণ্ট—ঝাঁটি।
কণ্টতনু—বৃহতী।
কণ্টদলা—কেতকী ফুল।
কণ্টপত্র—১ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচ গাছ, ২ শৃঙ্গাটক, শিঙ্গারা, পানিফল।
কণ্টপত্রক—পানিফল।
কণ্টপত্রফলা—ব্রহ্মদণ্ডী বৃক্ষ।
কণ্টপাদ—বঁইচ গাছ।
কণ্টফল—১ ছোট গোক্ষুর, ২ কাঁটাল, ৩ ধুতুরা, ৪ লতা, করঞ্জ, ৫ তেজঃফল, ৬ এরণ্ড ফল।
কণ্টফলা—দেবদালী লতা।
কণ্টল—বাবলা গাছ। পর্যায়—বাবল, স্বর্ণপুষ্প, সূক্ষ্মপুষ্প।
কণ্টবল্লী—শ্রীবল্লীবৃক্ষ।
কণ্টবৃক্ষ—তেজঃফল বৃক্ষ।
কণ্টাকারী—বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচ গাছ।
কণ্টাফল—কাঁটাল।
কণ্টাণ্ডগতনা—নীল ঝিণ্টি।
কণ্টালু—১ বাঁশলি, ২ বৃহতী, ৩ বার্ত্তাকী, ৪ বাবলা।
কণ্টিকারী—কণ্টকারী দ্র°।
কণ্ঠালা—বামুনহাটী।
কণ্ঠীরবী—বাসক বৃক্ষ।
কণ্ঠীল—বামুনহাটী।
কণ্ডুর—১ করলা লতা, ২ কুন্দর তৃণ।
কণ্ডুরা, কণ্ডুকরী—১ শূকশিম্বী, আলকুশী, ২ অত্যম্লপর্ণী।
কণ্ডুঘ্ন—১ আরগ্বধ, সোঁদালু, ২ শ্বেত সর্ষপ।
কণ্ডুঘ্ন বর্গ—চন্দন, বেণামূল, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম্ব, কটজ, সর্ষপ, মৌল, দারুহরিদ্রা, মুথা।
কর্ণিকার—বৃক্ষবি°, কর্ণিকার pterospermum macerifolium.
কনিষ্ঠক—শূকতৃণ।
কনীচি—কুঁচ।
কনের—কর্ণিকার বৃক্ষ।
কন্থরী, কন্থারী—বৃক্ষবি°। পর্যায়—কন্থা, দুর্ধর্ষা, তীক্ষ্ণ, কণ্টকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্রুরগন্ধা, দুষ্প্রবেশ।
কন্দগুড়চী—গুড়চীবি°। পর্যায়—কন্দোদ্ভবা, কন্দামৃত বহুছিন্না, বহুগ্রহা, পিণ্ডালু, কন্দরোহিনী।
কন্দট—শ্বেতোৎপল, সাদা সুঁদি ফুল।
কন্দফলা—ছোট করলা, উচ্ছে।
কন্দবহুলা—ত্রিপর্ণিকা বৃক্ষ।
কন্দমূল—মূলো।
কন্দর—১ আদা, ২ গুল, ৩ গাজর।
কন্দরাল—১ গর্দভাণ্ড বৃক্ষ, ২ পাকুড় গাছ, ৩ আখোটগাছ।
কন্দরালক—প্লক্ষ বৃক্ষ, পাকুড় গাছ।
কন্দরোদ্ভবা, কন্দরোহিণী—গুড় চীবি°।
কন্দর্পজীব—কাঁঠাল।
কন্দল—কদলী বিশেষ, ভূমিকদলী।
কন্দলতা—মালাকন্দ (?)।
কন্দলী—১ গুল্ম বি, ২ কদলী।
কন্দবর্ধন—ওল।
কন্দবল্লী—বন্ধ্যাকর্কোটকী।
কন্দশাক—আলু, ওল, মূলো, গাজর, মান, কচু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কদলীকন্দ, হস্তিকর্ণা, কেমুক, কেসুর, শালুক।
কন্দশূরণ—ওল।
কন্দাঢ্য—ভূমিকুষ্মাণ্ড।
কন্দামৃতা—গুড়চীবি°।
কন্দালু—কাসালু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিপর্ণিকা।
কন্দিরা—লজ্জালু বৃক্ষ।
কন্দী—ওল।
কন্দুরি—coccinia grandis, momordica monsdelpha
কন্দোট—১ শ্বেতোৎপল, ২ নীলোৎপল।
কন্দোত—কুমুদ, শেলাফুল
কন্দোদ্ভবা—গুড়চী বিশেষ।
কন্দ্রী—জঙ্গলী পিয়াজ scilla indica
কন্ধ—মুথাবি°।
কন্ধর—মারিষ শাক, নটেশাক।
কন্যক—ঘৃতকুমারী।
কন্যা—ঘৃতকুমারী, বড় এলাইচ ভূমিকুষ্মাণ্ড, বন্ধ্যাকর্কোটকী, মহৌষধবি° (ময়ূর পক্ষের ন্যায় ১২টি পাতা, স্বর্ণবর্ণ ক্ষীর অর্থাৎ আটা ও কন্দ হইতে উৎপত্তি—সুশ্রুত)।
কপাটেশ্বরী—শ্বেতকণ্টকারী।
কপি—আমলকী, করঞ্জবি°।
কপি—সর্ষপাদি বর্গের শাকবি° brassica oleracea. প্রকার ভেদ—ফুলকপি (ফুল চূড়ার মত হয়), বাঁধা কপি, তাল কপি (পাতা গুটাইয়া তালের মত হয়), ওল কপি (মূল ওলের মত স্ফীত হয়)। বিদেশ হইতে এদেশে আনীত, শীতকালে জন্মায়।
কপিকচ্ছু—আলকুশী দ্র°।
কপিকচ্ছুফলোপমা—জতুকালতা।
কপিকচ্ছুরা—আলকুশী দ্র°।
কপিকা—নীল সিন্ধুবার বৃক্ষ, নীলনিসিন্দা গাছ।
কপিকোলি—শেয়াকুল।
কপিচূড়া—আমড়া গাছ।
কপিচূত—আমড়া।
কপিণ্থ—কদবেল দ্র°।
কপিপ্পলী—১ রক্ত অপামার্গ, ২ সূর্যাবর্ত্ত বৃক্ষ।
কপিপ্রভা—১ আলকুশী, ২ অপামার্গ।
কপিপ্রিয়—১ আমড়া, ২ কদবেল।
কপিভক্ষা—কদলী।
কপিরোমফলা—আলকুশী (ফল বানরের লোমের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ শূক দ্বারা আবৃত)।
কপিল—বরুণ বৃক্ষ (?)।
কপিলদ্রাক্ষা—দ্রাক্ষাবি°। পর্যায়—মৃদ্বীকা, গোস্তনী, কপিলফলা, অমৃতরসা, দীর্ঘফলা, মধুবল্লী, মধুফলা, মধুলী, হরিতা, হারহারা, সুফলা, মৃদ্বী, হিমোত্তরা, পথিকা, হেমবতী, শতবীর্যা, কাশ্মরী। [ক্রমশঃ।
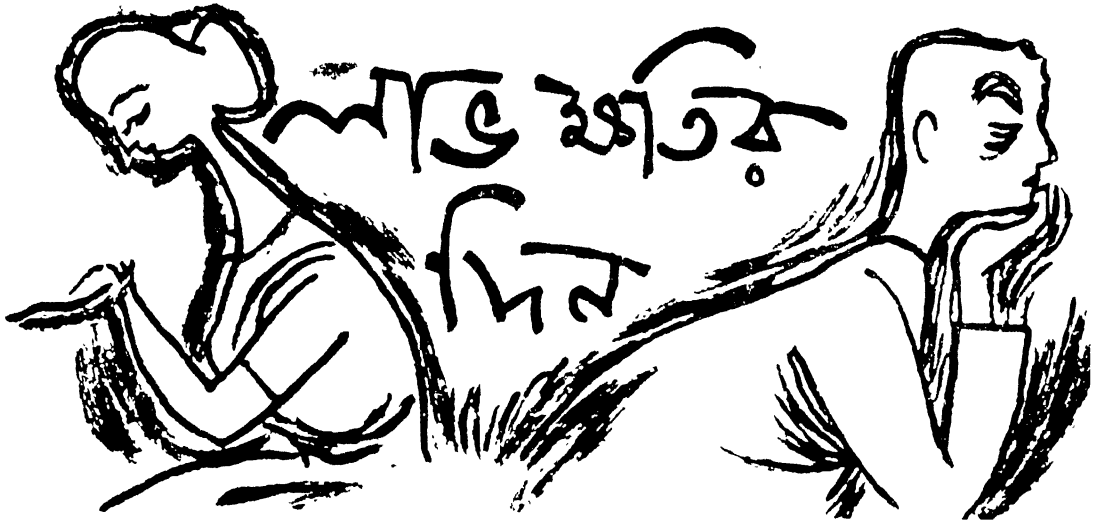
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পাঁচটা বাজবার আগে-আগে, ঠিক যখন অনীতা অফিসের বাইরে পা বাড়াবে তখন টিপ টিপ বৃষ্টি আরম্ভ হল। অনেক আগে থেকে, ভরা দুপুরেই হঠাৎ রোদ মিলিয়ে গিয়েছিল। লম্বা বারান্দার একদিকে দাঁড়িয়ে এক সময় লক্ষ্য করেছিল অনীতা, আকাশে পুরু কালো মেঘ জমে উঠছে, হাওয়া দিয়েছে—ভাদ্রের দুপুরেও অনীতার মনে হয়েছিল তখনকার সেই হাওয়া খুব ঠাণ্ডা।

কিন্তু তখন বৃষ্টি আসে নি। আবার রোদ উঠেছিল—গরম রোদ। বৃষ্টি এল এখন—অনীতা যখন ট্রাম ধরবে তখন। কয়েকটা ফোঁটা পড়ে অনীতার মাথায়—যেন এক-একটা বিরক্তির ঠাণ্ডা ফোঁটা। অনীতা পিছিয়ে আসে। অফিসেই দাঁড়িয়ে থাকে। আবার লিফটে চড়ে ওর ওপরে যেতে ইচ্ছে করে না। এখন অফিসে কেউ নেই। এখন ভরা বিকেলে।

ট্রাম লাইনের দিকে তাকিয়ে অনীতা চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ইচ্ছে করলে একটু ছুটোছুটি লাফালাফি করে ট্রামে উঠে পড়া যায়। একটু ভিজলে কোন ক্ষতি হবে না কিন্তু জলের জন্যে নয়, ট্রামে উঠতে ইচ্ছে করে না অনীতার। এখান থেকে সোজা বাড়ি যেতে মন চায় না। বৃষ্টি থামবে কখন!

আজ, একটু আগে-আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল অনীতা। নিউমার্কেটে ঘুরে ঘুরে নিজের জন্যে, ওর সংসারের জন্যে দু-একটা জিনিস কিনতে চেয়েছিল। যদিও এখন মাসের শেষ, তাহলেও অসুবিধা নেই। ওর কাছে আজকাল সব সময় টাকা থাকে। এখন অনীতার সংসারের কোন অভাব নেই।

কিন্তু আজকাল বিরক্তির রেখায় অনীতার মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে, হঠাৎ কখন বৃষ্টি নামে ঠিক নেই। আর অফিসের পর ডালহৌসী স্কোয়ারে এই টিপ টিপ বৃষ্টি কী সাংঘাতিক! এমন করে একটা পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকার কী মানে হয়!

একটা ট্যাক্সিও দেখা যায় না। যেগুলো যায় হুসহুস করে তারই চোখের সামনে দিয়ে—প্রত্যেকটির ভেতর লোক বসে আছে। এখন খালি ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু পেলেই বা কী হবে! অনীতা এখান থেকে যাবে নিউমার্কেটে। ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াবে। পর্দার কাপড় কিনবে। ডালমুট কিনবে। তারপর বাইরে এসে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকবে। খালি ট্যাক্সি দেখতে পাবে না। আর হয় তো বৃষ্টিও থামবে না তখন। থামলেও, হেঁটে-হেঁটে ট্রাম ধরতে গেলে কাদায় কাদায় শাড়িটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। শাড়ির ওপর বড় মায়া অনীতার।

বৃষ্টি। বৃষ্টি। বৃষ্টি। থামে না। থামবে না। এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিকেল ফুরিয়ে যাবে। পা টনটন করবে। অন্ধকার হবে। আর তখন যদি ট্রাম চলে, চলবে কি-না কে জানে, অনীতাকে বাড়ি ফিরে যেতেই হবে। বাড়ি ফিরতে বড় ভয় অনীতার। বাড়িতে বেশিক্ষণ বসে থাকলে ওর নিশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হয়, ছুটির দিনে ঘরে বসে-বসে ভাল হজম হয় না। বেলায় খেয়ে সারা দুপুর ঘুমিয়ে বিকেল বেলা মনে হয় যেন জ্বর হয়েছে।

অফিসে চাকরি নেবার পর শরীর অনেক ভাল হয়েছে অনীতার। বয়সও যেন কমেছে। কত দেখেছে অনীতা! কত জেনেছে! সাহস কত বেড়েছে তার! একা-একা এখন সব জায়গায় সে যেতে পারে। খুশিমতো জিনিস কিনতে পারে। বাড়ির চেহারা এর মধ্যেই সে তো বদলে দিয়েছে।

এখন বৃষ্টি আরও জোরে নামে। এবার ট্রাম বন্ধ হবে—ঠিক হবে। হোক। বৃষ্টি থামলে অনীতা হেঁটে হেঁটেই যাবে। এখান থেকে, এই ষ্ট্র্যাণ্ডরোডের মোড় থেকে, হেয়ার ষ্ট্রীট ধরে সে পড়বে ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে তারপর রাজভবনের পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে এসে দাঁড়াবে চৌরঙ্গীতে। রিক্সা? না না, বড় গরীব গরীব দেখায়। যদি একটা খালি ট্যাক্সি পায় তো নিয়ে নেবে—না হলে হেঁটে-হেঁটেই পৌঁছে যাবে ভবানীপুর।

এই প্রথম, ডালহৌসী স্কোয়ারে বৃষ্টির বিকেলে—বিকেল কি আর আছে এখন—অল্প অল্প অন্ধকার হয়েছে না? কে জানে—অনীতার বাড়ির কথা মনে হতেই আর একজনের কথা মনে হয়—যে মানুষ প্রথম তার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিল—তার কথা।

সুনীল নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে। যাই হোক না কেন বাইরে অফিস ছুটি হয়ে যাবার পর, ঝড় জল মিছিল স্ট্রাইক—আশ্চর্য, সুনীল ঠিক সময় কেমন করে যেন বাড়ি পৌঁছে যায়। আর, ভাবতে আরও খারাপ লাগে অনীতার, সে তারই অপেক্ষায় বসে থাকে। বার বার বাইরে তাকায়। যেন হারিয়ে যাবে অনীতা, বিপদে পড়বে—যেন সে একটা ছোট মেয়ে। কোন কোনদিন ট্যাক্সিতে ফিরলে মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে যায় সুনীলের। সে এসে দাঁড়ায় ট্যাক্সির কাছে ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দেবার আগেই এখনও সাবধান করতে থাকে অনীতাকে।

"একা একা ট্যাক্সিতে এমন করে কেন আস—"

"আঃ, তুমি শুধু শুধু ভয় পাও, আজকাল সব মেয়েই দরকার হলে ট্যাক্সি নেয়। ভয় নেই, আমার কিছু হবে না।"

"একটু দেরি করে বাড়ি ফিরলে কী-ই বা এমন ক্ষতি হত?"

"বাঃ তুমিই না বললে আজ সিনেমায় যাবে? একটা খালি ট্যাক্সি হাতের কাছে পেয়ে গেলাম তাই—"

"ট্রামে এলেও সিনেমায় যাবার সময় থাকত—আর, আমিই তো তোমার অফিসে যেতে পারতাম—"

"না না," অনীতা একটু ভয় পেয়ে বলে, "তুমি কখনও আমার অফিসে যেও না," নিজেকে সামলে নিয়ে দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে সে বলে, "সব সময় খুব ব্যস্ত থাকি, আর তা'ছাড়া স্ত্রীর অফিসে—"

"থাক থাক, বুঝেছি"—অনীতাকে কথা শেষ করতে দেয় না সুনীল। কেমন অদ্ভুত বিশ্রী দেখায় ওর মুখ। সুনীল কী বোঝে সে-ই জানে। সরে যায় অনীতার সামনে থেকে। আর, অবাক হয়ে যায় অনীতা সুনীল একবারও সিনেমায় যাবার কথা তোলে না। অনীতাও মনে করিয়ে দেয় না তাকে। ইচ্ছেও করে না। একটা সুন্দর বিকেল, একটা অপরূপ সন্ধ্যা, একটা লম্বা রাত দেখতে দেখতে নীরস অবসন্ন ক্লান্তিকর মনে হয় অনীতার। বাড়ি ফিরে কী লাভ!

না, সুনীলকে একদিনও তার অফিসে আসতে দেবে না অনীতা। একটা কথা, এখন এখানে কেউ নেই বলে মনে হয় অনীতার, যা সে স্পষ্ট করে মুখের ওপর বলতে পারে না সুনীলকে, অনীতা একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখে, না কেউ নেই, যেন ভাবতেও লজ্জা হয় অনীতার—

সুনীলকে সে এখানকার কারুর সামনে আনতে চায় না। এই কয়েক মাস একটানা চাকরি করে করে, জীবনের অনেক—অনেক রূপ দেখতে দেখতে, একটি সোজা কথা মাথায় আসে অনীতার—সুনীলের কিছু নেই। বলবার মতো কিছু নেই। দেখাবার মতো কিছু নেই।

একটা কথা, যা এখানে আসবার পর, এই চাকরিতে ঢোকবার পর, সুনীলের কথা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে বুঝিয়ে দিল অনীতা—বুঝিয়েছিল একেবারে স্পষ্ট করে নয়, অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে-দিয়ে যে সংসারে নির্লজ্জ অভাবের জন্যে সে চাকরি নেয়নি, সে এখানে এসেছে উপরি কিছু উপার্জনের লোভে—একা-একা বাড়িতে সারাদিন ভাল লাগে না বসে সময় কাটাতে।

সে বলতে পারেনি, একটা মানুষ আছে তার বাড়িতে যার ওপর অনীতার মতো মেয়ে নির্ভর করতে পারে না, ভবিষ্যৎ সুন্দর করে
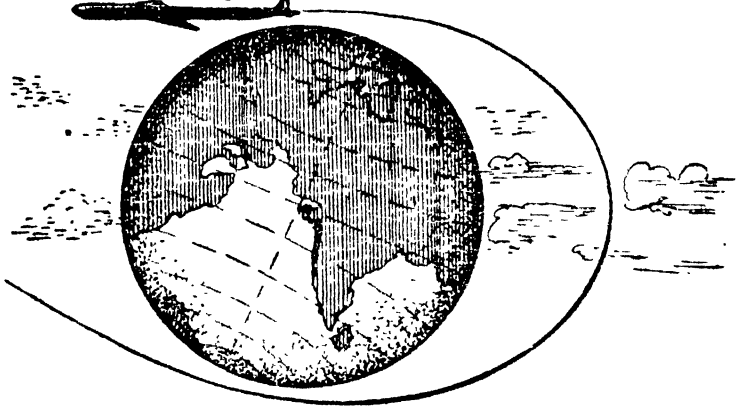
তোলবার ক্ষমতা নেই সে মানুষের। কিন্তু তখন এই ভাবনার সময়-সময়, চাকরি নেয়ার আগে-আগে, এই কথাগুলি এমন রূঢ় হয়ে অনীতার মাথায় আসেনি। সে দেখেছিল, একটা অসহায় মানুষ তাল রাখতে পারছে না জিনিসপত্রের আগুন দামের সঙ্গে। একটা মানুষ হাঁপাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে—তার মনে হয়েছিল, অল্প অল্প করে সব হারিয়ে যাচ্ছে অভাবের বোবা অন্ধকারে। হাসি-যৌবন-জীবন—সব। তখন নিজে বাঁচতে চায়নি অনীতা, সুনীলকেই বাঁচাতে চেয়েছিল। সারা দুপুর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অভিযোগ-অনুযোগের খোঁচায় একটা দীনক্লান্ত মানুষকে আরও বিব্রত করতে চায়নি বলেই নিজে চাকরি করতে বেরিয়েছিল। একটা কথা, এখনও সুনীল স্বীকার না করতে চাইলেও অনীতা জানে, নিজেকে, তার স্বামীকে, একটা নড়বড়ে সংসারকে সে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, তখনই বিরক্তির রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে অনীতার চোখে আর কপালে, প্রশংসার একটা কথাও একদিন বলেনি সুনীল। কোন মূল্য দেয়নি তার এই সহযোগিতার। সুনীল নিজের চোখেই দেখেছে সব—পয়লা তারিখেই বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে, ইলেক্ট্রিক বিল জমা পড়েছে, মুদির জিনিস এসেছে আর মন-মাথা দুই-ই হাল্কা হয়েছে ওদের দুজনের। তবু—তবু সুনীল একেবারে চুপ। হাসির পাতলা রেখাও ওর ঠোঁটের ফাঁকে দেখেনি অনীতা। তখন সুনীলকে ভাল লাগে না অনীতার। এই খাঁচার বন্ধনে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সংসার করতে মন চায় না। বাড়ি ফিরতেই ইচ্ছে করে না। যতক্ষণ বৃষ্টি হয় হোক, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল, এখন আবার মনে হয় অনীতার, অনেক ভাল। থমথমে সংসারের চেয়ে, অসহায় সুনীলের করুণ মুখের চেয়ে এই কান্না-কান্না আকাশ আরও বেশি জোরে বাঁধে অনীতাকে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্তির রেখায়-রেখায় ভর করে অনীতার মনে একটা মুখ, সুনীলের বিমর্ষ ক্লান্ত চেহারাটা আবার আর এক পশলা বৃষ্টির ঝাপ্টায় ফুটে ওঠে। অনীতা মুছে ফেলতে চাইলেও ফুটে ওঠে। আর তখন আগেকার মতো এখনও আর একবার মনে হয় অনীতার, আসল কথা, সুনীল ঈর্ষা করে তাকে। এই ঈর্ষাই তাকে পোড়ায়—গম্ভীর থমথমে করে তোলে। যেন সুনীলের সব অক্ষমতা ধরা পড়ে গেছে অনীতার কাছে।

এখন অনীতা জানে, বুঝতে পারে, নিজেও অফিসে চাকরি করে বলে তার কাছে স্পষ্ট হয় সুনীলের কাজের ধরন। অনীতার মতোই সকাল দশটায় হাঁপাতে-হাঁপাতে ট্রামের একদিকে ভিড়ের চাপে কোণঠাসা হয়ে কিম্বা বাসে ঘামতে-ঘামতে আর একজনের ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে-পড়তে নিজেকে সামলে নিয়ে একটা ক্লান্ত মানুষ পৌঁছে যায় অফিসের দরজায়। হয়তো নামের গায়ে লাল দাগ বাঁচাবার জন্যে ঘন ঘন অনীতার মতোই লিফ্‌টের ঘণ্টা বাজায়। তারপর নিজের জায়গায় বসে গলার, কপালের আর মুখের ঘাম মুছে ফেলে রুমাল বের করে। তেষ্টায় গলা কাঠ হয়ে যায়, জল দেবার জন্যে একটা বেয়ারার দেখা পায় না সুনীল অনেকক্ষণ। তখন কে জানে সে নিজেই জল এনে তেষ্টা মেটায় কিনা। অনীতা মেটায় বৈকি মাঝে মাঝে।

সারাদিন অনীতা একটা পরিষ্কার ছবি দেখতে পায় সুনীলের অফিসের, দেখতে পায় তার স্বামীর অফিসে কোন প্রতাপ নেই, দাপট নেই। একটা মানুষ ঘাড় গুঁজে ফাইল ঘাঁটে। অফিসারের ডাকে অল্প বিচলিত হয়—বিরক্তও। ক্যানটিনে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের টিফিনে সস্তায় খাওয়া সেরে নেয়। তারপর পাঁচটা বাজলে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে আসে। কোথাও যেতে চায় না সুনীল। কোথাও গেলেই পয়সা খরচ। নিজের জন্যে সে খরচ করতে চায় না। এখনও সুনীল হয়তো মনে মনে ভাবে, সংসারের সব ভার যেন তার একার।

যে কাজ সুনীল করে—এতদিন করে এসেছে, অন্য আর এক অফিসে ঠিক তেমন কাজ নামমাত্র চেষ্টায় অনীতাও জোগাড় করে নেয়। অনীতা হাসে, হালকা হয়, একটা ভাঙা খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়ে জীবনের আর এক স্বাদ পায়। মুঠো মুঠো রঙ এনে, নিজের টাকায় কিনে খাঁচায় লাগায়—ভাঙা খাঁচাটাকে সুন্দর করে, রঙীন করে। সুনীল দেখে না।

না দেখুক। ঈর্ষায় জ্বলুক। অক্ষম স্বার্থপর অকৃতজ্ঞ—এতগুলো বিশেষণ অনীতা বর্ষার বিকেলে অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে উচ্চারণ করে। দেখে না, অনীতাকে দেখে না, সংসারের রঙ দেখে না, কিছুই দেখে না—সুনীল অন্ধ, ঈর্ষায় অন্ধ। ওর এই অকারণ ঈর্ষার কোন অর্থ খুঁজে পায় না অনীতা।

অনীতা সুন্দর হয়। কাজের মানুষ হয়। অনীতা বাঁচতে চায়, অনেক দিন বাঁচতে চায়। ভবিষ্যতের অন্ধকারের ভয়ে ওর শরীর এখন হিমের মতো কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে যায় না। ও বাঁচবে, অনেক দিনই বাঁচবে। কেউ না থাকলেও একা-একাই বাঁচবে, ওর চাকরিই ওকে বাঁচিয়েছে, বাঁচিয়ে রাখবে।

আগের কথাও এখন এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটু ভেবে নেয় অনীতা। সকাল থেকে রাত অবধি সুনীলের টিমটিমে সংসারে অল্পে-অল্পে কেমন করে সে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল—শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এক-পা বাইরে বাড়াতে পারেনি, মুখ তুলে আকাশের দিকেও যেন তাকাতে পারেনি। নিজের কোন সখ্‌ক প্রশ্রয় দিয়ে বাজার ঘুরে ঘুরে একটা জিনিস কিনতে পারেনি। অনীতা জানতে পারেনি আজও বিশাল আকাশ ঝকঝক করে ময়দানের ওপারে—শীতের সকালে হাল্কা রোদ কী অপরূপ মনে হয়! অনীতা জানত না হাজার-হাজার মানুষ কী ব্যস্ততায় সকালে ভিড় করে অফিসের দরজায়। একটা নতুন জগতে বিচরণ করে অনীতাও যেন নতুন হয়ে ফুটে ওঠে।

"হ্যালো মিসেস ঘোষ," এখনও অনীতাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লিফ্‌টের বাইরে পা বাড়িয়ে ভৌমিক তার কাছে এগিয়ে আসে, "বৃষ্টিতে আটকে পড়েছেন?"

সিনিয়ার অফিসারের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে অনীতা বলে, "হ্যাঁ। একটা ট্যাক্সিও পাচ্ছি না—"

"পাবেনও না এখন। কতদূর যাবেন?"

"একবার নিউ মার্কেটে যাওয়ার দরকার ছিল—"

"মে আই গিভ ইউ এ লিফ্‌ট? ও-রাস্তা দিয়েই তো যাব আমি।"

অনীতা আস্তে বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ!" তারপর একটা বেশ বড় গাড়ির মধ্যে নিজের হাল্কা শরীর এলিয়ে দিয়ে ও কথা বলে যায় ভৌমিকের সঙ্গে। তখন সুনীলের কথা অনীতার মনেও থাকে না।

অনীতা এখনও ফিরল না। অনেক রাত হল। প্রায় সাড়ে

আটটা। এখনও থেকে-থেকে মেঘ ডাকছে। জলে-ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগছে। এখনও রাস্তায় অনেক জল। ট্রাম বন্ধ। আজ বোধ হয় আর ট্রাম চলবে না। আর অনেক ঘুরে-ঘুরে ইচ্ছেমতো পথ ধরে ঝরর্, ঝরর্, করে বাস আসছে। মাঝে মাঝে ট্যাক্সির হর্ণ বাজে। কাদা ছিটিয়ে-ছিটিয়ে চাকাগুলো অদ্ভুত আওয়াজ তোলে। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকায় সুনীল। এখানে থাকে না একটাও ট্যাক্সি। অন্যদিকে চলে যায়। অনীতা ফিরবে কেমন করে? ও ফিরবে কখন—কখন?

হঠাৎ ভয় পায় সুনীল। অনীতার ভাবনা এমন করে ভাবছে বলেই ভয় পায়। কিছু বলতে পারবে না ওকে—জিজ্ঞেস করতে পারবে না। ওর ভাবনা ভাবলে, ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে অনীতা রেগে যায়। তাই এখন, রাত হয়ে গেলেও, বেশি ব্যস্ত হতে পারে না সুনীল। একা-একা চলাফেরা করলে আজকালকার মেয়েদের যে কোন বিপদ হয় না, সে কথাটা অনেকবার সুনীলকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে অনীতা—বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে আর এখন আগের মতো নেই।

না, নেই। সে কথাটা সুনীলও বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে বলেই অনীতা ফিরলে, অনেক দেরি করে ফিরলেও সে একটা কথাও বলে না—কিছু জিজ্ঞেস করবে না। আর যদি নিজের থেকেই কোন কৈফিয়ৎ দেয় অনীতা, যদি কথা বলে যায়, তাহলেও সুনীল চুপ করেই থাকে। মুখ বুজে একদিকে সরে যায়। তখন হয় তো অনীতা ভাবে, সে দেরি করে ফিরেছে বলেই সুনীল রেগে গেছে। কিন্তু সত্যিই রাগে না সুনীল। একদিনও না—কোনদিনও না। আজকাল অনীতার ওপর তার রাগ করতে ইচ্ছেও হয় না।

কোথাও যাবার জায়গা নেই বলেই সুনীল অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসে। আর সংসারের সব খরচের ভাবনা তাকে ভাবতে হয় না বলেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে-বসে একটার পর একটা সিগ্রেট খায়। আর টাকার ভাবনা নেই বলেই মাথাটা যেন অনেক হাল্কা হয়ে যায়। তখন মাথায় আজেবাজে ভাবনা ভিড় করে। ঝকঝকে জিনিসগুলোর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। সাজানো ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। মানুষ নেই—এ বাড়িতে একটাও মানুষ নেই। কার সঙ্গে কথা বলবে সুনীল!

সে করে! তখন ঘরে এত বেশি জিনিস ছিল না। সুনীলের মাথা এত বেশি হাল্কা ছিল না, তখন অভাব ছিল। আর সংসারে যেন মানুষ ছিল—কথা বলার মানুষ ছিল। এখন অভাব নেই। এখন অনীতা বাড়িতে নেই। কথা বলার মানুষও নেই। একা একা সুনীল একটার পর একটা সিগ্রেট খায়। আর ওর মনে হয়, কোন দায় নেই, এ সংসারে তার কোন প্রয়োজনও নেই। এই ঝকঝকে সাজানো ঘর ছেড়ে নিঃসঙ্গ সুনীলের বার বার মনে হয়, অনেক মানুষের ভিড়ে অনেকক্ষণ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলে ও বাঁচবে—অনেকদিন বাঁচবে।

অনীতা এখনও ফিরল না। অনীতা ফিরবে কখন—কখন!

একা একা অন্ধকার বারান্দায় সুনীলকে রোজ বসে থাকতে দেখে মাঝে মাঝে অনীতা বলে, "সাত সকালে বাড়ি ফিরে এমন ভূতের মতো বসে থাক কেন?"

"কোথায় আর যাব! ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।"

"সে আর আমি জানি না? কি করে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ একা একা বসে থাকতে পার!"

সুনীল হেসে পুরানো দিনের কথা অনীতাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যেই বোধ হয় বলে, "তুমিই তো আগে আমার জন্যে এমন করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে—সেই বৃষ্টির বিকেলে আমি যখন দেরি করে বাড়ি ফিরতাম?"

অনীতাও হাসে, "বসে-বসে কত সময় নষ্ট করেছি তখন। তখন থেকেই যদি বুদ্ধি করে একটা চাকরি নিয়ে নিতাম। তোমার জন্যেই তো—শুধু শুধু আমাকে খাঁচায় ভরে রেখেছিলে। ভাবতে, আমি কিছুই করতে পারি না—বাইরে একেবারে অচল, না?"

সুনীল আস্তে আস্তে বলে, "অফিসটাকেই তো আমার একটা লোহার খাঁচার মতো মনে হয়—"

বাধা দিয়ে অনীতা বলে, "কেন মনে হয় বুঝি না। আমি এখন বাড়িতে বসে খেয়ে-ঘুমিয়ে বুড়িয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না।"

এখনও হাসে সুনীল, "নতুন চাকরি করলে অমন সকলেরই মনে হয়। কিছুদিন দেখ, ট্রামে ঝুলতে-ঝুলতে যাও, জলে ভিজতে-ভিজতে বাড়ি ফের—তারপর দেখবে—"

অনীতা বলে, "না কিছুই দেখব না। হাজার কষ্ট করলেও চাকরি ছেড়ে বাড়ি বসে ভাবনায় ভাবনায় আমি আর বুড়িয়ে যেতে পারব না। সেই খাঁচার চেয়ে এ খাঁচা অনেক ভাল। এ খাঁচায় বসে রোজগার করা যায় আর সে খাঁচা?" যেন সুনীলকে একটা কঠিন প্রশ্ন করে অনীতা। সুনীল উত্তর দিতে পারে না।

উত্তর দেবার কিছু নেই সুনীলের। কেন চাকরি ছাড়বে অনীতা? কেন ঘরে বসে সময় নষ্ট করবে—অভাবের সংসারে ভাবনায়-ভাবনায় শুকিয়ে মরবে! সুনীলের আশায় ঝড়ের অন্ধকারে পথ চেয়ে বসে থাকবে! অনীতার একটা ছোট কথায় যেন একগুলো প্রশ্ন তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ তুলে গমগম করে ওঠে সুনীলের কানের কাছে। কিন্তু কোন উত্তর নেই সুনীলের। এখন সংসারে অভাব নেই। তাই অনীতাও এখন এখানে নেই। এখন একা-একা অন্ধকার বারান্দায় বসে একটার পর একটা সিগ্রেট খেয়ে যায় সুনীল। আর কোন কাজ নেই বলে গাড়ির আওয়াজ হলেই মাথা তুলে দেখে অনীতা ফিরল কি-না।

অনীতা ফেরে আরও অনেক পরে, যখন বেশ ক্ষিধে পেয়ে যায় সুনীলের—তখন অনীতার হাতে কয়েকটা বড় বড় প্যাকেট নিয়ে সেই অন্ধকার বারান্দায় হাসি মুখে সুনীলের পাশে এসে দাঁড়ায়।

"কেমন করে ফিরলে?"

অন্যদিকে তাকিয়ে অনিতা বলে, "ট্রামে।"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনীতা একবার নিজের মুখটা দেখে নেয়, "নারায়ণ ঠিক সময় চা-টা দিয়েছিল তো?"

"হ্যাঁ, দিয়েছিল!"

"আমিও," সুনীলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন একটা কৈফিয়ৎ দেবার দরকার মনে করে অনীতা, "আজ অনেক আগেই ফিরতে পারতাম—যা বৃষ্টি—"

"ও," সুনীল আর একটা সিগ্রেট ধরায়।

"নিউ মার্কেট ঘুরে এলাম," ভৌমিকের কথাটা ইচ্ছে করেই চেপে যায় অনীতা, "এক বন্ধুও গিয়েছিল সঙ্গে। খুব খাইয়ে দিয়েছে। আমি আর কিছু খাব না। তুমি খেয়ে নেবে এখন?"

ঠাণ্ডা গলায় সুনীল বলে, "বল নারায়ণকে—দিয়ে দিক।"

প্যাকেটগুলো খুলতে খুলতে অনীতা দেখায় সুনীলকে, "দুটো বেডকভার কিনলাম। পর্দার কাপড়গুলো খুব সুন্দর না?"

না দেখেই সুনীল বলে, "হ্যাঁ", তারপর জোরে ডাকে "নারায়ণ—"

অনীতা প্যাকেটগুলো ঠেলে দেয় একদিকে। সে জানে, সুনীল দেখবে না। ও ঈর্ষা করে তাকে! অনীতা চুপ করে। শাড়ী বদলায়, চুল খোলে। সুনীলের সামনে খাবার ধরে দেয়। ওর গম্ভীর মুখ দেখে মনে মনে নিজেও রেগে যায়। কেউ কথা বলে না।

অনেক রাত্তিরে, যখন বৃষ্টির রেশ থাকে আকাশে আর গাছের পাতায়, যখন মশারীর ভেতরে পাখার হাওয়ায় অল্প অল্প ঠাণ্ডা লাগে সুনীলের, তখন সে ভয়ে ভয়ে খুব আস্তে ডাকে, "নীতা"—

"কী?"

"ঘুম পেয়েছে?"

"পাবে না? কত রাত হল। কাল ভোরে উঠতে হবে না? অফিস নেই? ঘুমোও—ঘুমোও চুপ করে"—অনীতা সুনীলের খুব কাছে সরে এসে ওকে একটা চিমটি কেটে খিলখিল করে হাসে।

আর তারপরে, অনেক পরে—অনীতা ঘুমিয়ে পড়লে আবার অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সুনীল। আবার একটা সিগ্রেট ধরায়। আর সিগ্রেট খেতে খেতে আকাশটা একবার দেখে নেয় সুনীল। আর তখন ওর বুক ঠেলে একটা আকুল প্রার্থনা যেন বেরিয়ে আসতে চায়, ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও সেই সব দিন—অভাবের দিন—কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারে না সুনীল। ঘন ঘন সিগ্রেট টানে আর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভিজে থমথমে আকাশের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়, সে বোকা—কী ভীষণ বোকা! তখন বিছানায় এসে শোয় সুনীল। ঘুমিয়ে পড়ে।

একটা দামী খাটের দুদিকে দুটো মানুষ মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকে।

পরাজয়

কৃত্তী সোম

ভাবি তবু ভুলে ঠিক যাব
ভাবি আর ভালবাসব না
কিন্তু যখন দেখি তাকে
অনুভবে বাসনা যন্ত্রণা।

কেন যে শপথ করলাম
ছদ্মবেশী পরাজিত মনে
একনাটকে সব হারালাম
রৌদ্র জ্বলে অগ্নিময়ক্ষণে।

বিচার

সাবিত্রী সেনগুপ্তা

রুটি চাই, রুটি চাই, চীৎকার করতে করতে বিরাট এক ক্ষুধার্ত জনতা রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের ঘোড়ার গাড়ীখানা ঘিরে দাঁড়াল। জনতার মধ্যে এক বৃদ্ধ একখানা কাঠের গুঁড়োর তৈরী রুটি, রাজার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল— দেখো, দেখো রাজা, কি খেয়ে বেঁচে আছি আমরা—দেখো।

তার জন্য আমি কি করতে পারি? বলেই সম্রাট লুই ঘোড়ার পিঠে চাবুক বসিয়ে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটে চললো। জনতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সম্রাটের ধুলো উড়িয়ে যাওয়া গাড়ীখানার দিকে। এত নিষ্ঠুর রাজা? তাদের রুটির দাবীকে অগ্রাহ্য করে অবজ্ঞা করে চলে গেল?

সেদিন রাজাও প্রাসাদে ফিরে বড় অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন। বুভুক্ষু জনতার কাতর রুটি ভিক্ষা তাঁর কানের কাছে বাজতে লাগল সারাক্ষণ। রাত্রে নিদ্রায় শান্তি পেলেন না রাজা। স্বপ্নের মধ্যে তাঁকে যেন ঘিরে ধরেছে বুভুক্ষু দল।

হঠাৎ লুইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল পরিচিত কণ্ঠস্বরে। তাঁকে যেন কে বলছে—আমার কথা ভুলে গেলে লুই?

সম্রাট চমকে উঠলেন, এ কণ্ঠস্বর যে তাঁর পিতামহের।

সমস্ত রাজপুরী উৎকণ্ঠায় সেদিন অধীর হয়ে আছে, রাজবৈদ্য কিছুক্ষণ আগে জবাব দিয়ে গেছে। এমন সময় সম্রাট চতুর্দশ লুই সকলকে ঘর থেকে চলে যেতে বললেন। তারপর পৌত্র লুইকে কাছে ডেকে বললেন—আমার পথ কখনো অনুসরণ কোরো না লুই, আমাকে অনুসরণ করলে সারা ফ্রান্সে রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজবংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

কিন্তু লুই পিতামহের পথই অনুসরণ করে এতদিন এসেছেন।

পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর, ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং পূর্বপুরুষের পথই অনুসরণ করে চললেন।

মিরাবক ভেবেছিলেন ষোড়শ লুই নিশ্চয় পূর্বপুরুষের পথ পরিত্যাগ করে সৎপথে চলবেন, কিন্তু তাঁকেও বংশের ধারা বজায় রাখতে দেখে এবার মিরাবক নূতন করে বিদ্রোহ করে বেড়াতে লাগলেন। প্রজাদের ন্যায় ও ন্যায্য দাবী জানাবার পরামর্শ দিলেন এবং সচেতন করে তুললেন।

ষোড়শ লুই এই খবর শুনে মনে মনে ফন্দী করলেন বিদ্রোহী মিরাবককে বন্দী করে রাখবেন, কিন্তু মিরাবককে বন্দী করলে আরও যদি জ্বলে ওঠে দেশ?

এদিকে মিরাবকও ভাবতে লাগলেন কি ভাবে রাজার কাছ থেকে প্রজাদের ন্যায্য দাবী আদায় করা যায়।

একদিন ষোড়শ লুই সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন, এমন সময় গাড়ীখানা আটক করে আদায় করে নেওয়া হল নূতন দাবী ও শাসনতন্ত্র রচনার প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু পরদিনই রাজসভায় ঘোষণা করা হোলো, উন্মাদ জনতার বে আইনি প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন মূল্যই নেই রাজার কাছে। এই বলার সঙ্গে সঙ্গে সেইদিনের সভার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হোলো।

বুভুক্ষু ফ্রান্স আজ সত্যই উন্মাদ হয়ে গেছে তারা সভা থেকে বেরিয়ে এসে রাজবাড়ীর সামনে মাঠের মধ্যে জড়ো হয়ে প্রতীজ্ঞা করলো—আজ থেকে গরীব দেশবাসীর প্রতি অন্যায় যদি হয় এর প্রতিশোধ তারা নেবেই।

ক্ষিপ্ত দেশবাসীর ভয়ে প্যারী ছেড়ে ভার্সাইয়ে চলে গেলেন সম্রাট সপরিবারে।

আর সেই মুহূর্তে বাস্টিলের কারা প্রাচীর আক্রমণ করলো এক ক্ষুধার্ত জনতা। দুই পক্ষের তুমুল লড়াই শুরু হোলো। লড়াইয়ে জিতে বন্দীদের মুক্তি করে নিয়ে এবার জনতা চলল ভার্সাইয়ের পথে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর জনতার মুখে শুধু একটি বাণী—রুটি দাও, রাজা, রুটী চাই। বলতে বলতে তারা সম্রাটের দরবারের সামনে গিয়ে কাতরকণ্ঠে জানাল তাদের দাবী। দেখ রাজা আমাদের পরণে কাপড় নেই, পেটে খাবার নেই। আমাদের খাবার দাও, কাপড় দাও পরবার।

এবার রাজা নিরুপায় কণ্ঠে জানাল—খাবার তাঁর কাছে এখন নেই।

বেশ তবে চলুন প্যারীতে সেখানে গিয়ে আমাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবেন।

নিরুপায় রাজা রাণী ও তাঁদের একমাত্র শিশু পুত্র চলল ক্ষুধার্ত জনতার সাথে প্যারীর পথে।

প্যারীতে এসে বিদ্রোহীরা বন্দী করে রাখলো রাজা ও রাজ-পরিবারের অনেককে।

প্রজার কাছে এবার হবে রাজার বিচার। দুঃস্থ প্রজাদের অর্থ নিয়ে বিলাস করা, পররাষ্ট্রকে উত্তেজিত করা নিজের প্রজাদের বিরুদ্ধে, এর কৈফিয়ৎ চাই এর বিচার চাই।

বিচার হোলো—রাজার মৃত্যুদণ্ড। রাজার পর আনা হোলো রাজবংশের শেষ বাতি রাজপুত্রকে। অবোধ শিশু নিজের জীবন দিয়ে শোধ করে গেল পূর্ব পুরুষের ঋণ। আর বাতি জ্বালাবার জন্য কেউ থাকলো না।

তারপর আনা হোলো ফ্রান্সের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা রাণী আঁতোনাতেকে। তখন দেখা গেল তাঁর মাথার সব কটি চুল সাদা হয়ে শরীরের চামড়া কুঁচকে বীভৎস হয়ে গেছে প্যারীর সৌন্দর্য শিরোমণি রাণী মেরীর। তারপর সকলের চোখের সামনেই উৎকট উল্লাসে সেই অপরূপ লাবণ্যে ভরা চাঁদের কণাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল।

এরপরে রাজ পরিবারের আরও সাতজন বিখ্যাত রাজকর্মচারীর

মাথা কেটে, বিজয়োল্লাসে জনতা চীৎকার করে বেড়াতে লাগল সারা প্যারী সহর। তাদের মুখে সেদিন যে বাণী শোনা গেল তা হচ্ছে প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক্, প্রজাতন্ত্রের জয় হোক্।

সাহিত্যিকদের বিচিত্র খেয়াল

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের নানা আজব খেয়ালের গল্প আজ তোমাদের শোনাচ্ছি।

জার্মাণ কবি শিলারের নাম হয়ত তোমরা শুনেছ, কিন্তু শোননি তাঁর অদ্ভুত খেয়ালের কথা। তিনি কবিতা রচনার সময় ডেস্কের মধ্যে পচা আপেল রাখতেন। পচা আপেলের গন্ধ তাঁর মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করত।

আলেকজাণ্ডার ডুমারের ছিল এক বিচিত্র খেয়াল। তিনি প্রবন্ধ লিখতেন গোলাপী রঙের কাগজে, কবিতা লিখতেন হলদে রঙের কাগজে আর উপন্যাস লিখতেন নীল রঙের কাগজে।

সমারসেট মম আজ লেখক হিসেবে জগদ্বিখ্যাত। তিনি সব সময়েই প্যাডের কাগজে লেখেন এবং প্যাডের প্রতি পৃষ্ঠায় লেখেন ২৫০টি শব্দ। তিনি নিয়মিত সকালে ১০০০ শব্দ লিখতে অভ্যস্ত।

বলজাক এবং ডিকেন্স ছিলেন সমারসেটের ঠিক উল্টো। বলজাক লিখতেন মধ্যরাত্রি থেকে পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত। লেখার মাঝে নিয়মিত কফি পান করতেন। আর ডিকেন্স লিখতে বসতেন প্রকাশকের তাগিদে। সামনে ঘড়ি দেখে লিখতেন তিনি।.....

বঙ্কিমচন্দ্রের নামের এবং লেখার সঙ্গে তোমরা সকলেই পরিচিত। তিনি দুই দিকে দুই সামদান জ্বালিয়ে—কখনও কখনও রাত দুটো-আড়াইটে পর্য্যন্ত উপন্যাস অথবা প্রবন্ধ লিখতেন। আবার নবীনচন্দ্র ছিলেন ঠিক তার উল্টো। সকালে ছাড়া তিনি কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে লিখতেন না।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও রাত জেগে লিখতেন। লেখবার সময় তিনি মুখে লজেন্স রাখতেন। আর যখন কোন বিষয় চিন্তা করতেন তখন গড়গড়া ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক জর্জেস সিমেন্স তাঁর উপন্যাসের প্লট ভেবে নেবার পর টেলিফোন ডাইরেক্টরীর পাতা থেকে উপন্যাসের চরিত্রগুলির নাম বেছে নেন, কোন উপন্যাস লেখা শুরু করলে তিনি কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। এমন কি টেলিফোনেও কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। সমস্ত দিন ধরে তিনি চরিত্রগুলিরই একজন হয়ে যান।

আবার সাহিত্যিক পি, জি, উডহাউস নাকি আলাপ-আলোচনার মধ্যেই লিখতে ভালবাসেন। লেখাভর নাকি গান ও পিয়ানো না বাজলে লেখা জমে না। কিন্তু মার্সেল প্রস্ত লেখার সময় হট্টগোল সহ্য করতে পারেন না। একালে জে, বি, প্রিষ্টলেও তাঁর লেখার ঘরের দরজা 'সাউণ্ড প্রুফ' করিয়ে নিয়েছেন।

ইটালীর কবি গাব্রিয়েল দ্য-আনুনৎসিও একবার লণ্ডনে এসেছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন একশোটা ছাতা। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন: 'লণ্ডনের জলো আবহাওয়ার সঙ্গে লড়তে হলে দু'চারটে ছাতায় কুলুবে না।' অকাট্য যুক্তি।

ফরাসী নাট্যকার মলেয়ার নতুন নাটক রচনা করবার পর তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে প্রথমে তাঁর নিরক্ষরা দাসীকে তা পড়ে শোনাতেন। দাসী যদি তা বুঝতে পারতো, তখন তিনি তার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হতেন।

সবশেষে যাঁর কথা বলব তিনি ফরাসী কবি ও নাট্যকার জেরার্ড দ্য নারভাল। তাঁর প্রিয় জিনিষ ছিল একটি বৃহদাকার চিংড়ি মাছ। নারভাল প্রায়ই প্যারীর রাজপথে নীল ফিতেয় বেঁধে সেই মাছটিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর আর একটি প্রিয় জীব ছিল কচ্ছপ।

শুভঙ্কর

শ্রীআর্য্যকুমার পালিত

তোমরা শুভঙ্করী পড়, শুভঙ্করীর অঙ্ক কষ, কিন্তু শুভঙ্কর কে ছিলেন, কোথায় তাঁহার বাড়ী ছিল,—এ সব বোধ হয় কিছুই জানো না। শুভঙ্কর বাঁকুড়ার লোক। তিনি বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের অধীন কর্মচারী ছিলেন। আমাদের দেশের মায়েরা ছেলেদের গান বলিয়া ঘুম পাড়াইয়া থাকেন। "ছেলে ঘুমুল পাড়া জুড়ুল, বর্গী এলো দেশে"—গানটির সহিত তোমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। মল্লভূমেও বর্গী আসিয়াছিল। মল্লভূমে তখন গোপাল সিংহ রাজা। গোপাল সিংহ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। বর্গীরা বিষ্ণুপুর আসিয়া পড়িয়াছে এক প্রজারা নানাস্থানী হইয়াছে—এ সংবাদ শুভঙ্কর আসিয়া গোপাল সিংহকে প্রথম দেন।

অনেকে বলেন পলাশডাঙ্গার নিকট পথন্যা গ্রামে শুভঙ্কর বাস করিতেন। সেখানে নাকি শুভঙ্করের ভিটা আছে। আবার অনেকে বলেন হদলনারানপুরের নিকট রামপুর গ্রামে তিনি বাস করিতেন। তাঁহার অন্য পরিচয় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বাঁকুড়ায় শুভঙ্করের দাঁড়া প্রসিদ্ধ। ইহা শুভঙ্করের অমর কীর্ত্তি।

যিনি শুভ করেন তিনি শুভঙ্কর। অঙ্ক শাস্ত্রকে সহজ করিয়া শুভঙ্কর লোকের শুভ করিয়াছিলেন। এই হিসাবে তিনি শুভঙ্কর হইতে পারেন। আবার শুভঙ্কর তাঁহার নাম ছিল ইহাও হইতে পারে। অনেক প্রাচীন পুঁথিতে "শুভঙ্কর সেন" দৃষ্ট হয়। তিনি বাঙ্গলা ভাষায় বহু সংখ্যক আর্য্যা লিখিয়াছিলেন। এই সব আর্য্যার সাহায্যে অনেক জটিল অঙ্ক খুব সহজেই করিয়া দিতে পারা যায়। আর্য্যা ছাড়া তিনি "কাগজসার" নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। উহাতে জমিদারী সম্বন্ধীয় লেখাপড়া করিবার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। ঐ পুস্তক এখনও ছাপা হয় নাই। শুভঙ্করের আসল আর্য্যা পুস্তকও এখনো ছাপা হয় নাই। শুভঙ্কর এত সংখ্যক আর্য্যা লিখিয়াছিলেন—যাহার তুলনায় তোমরা যাহা জান তাহা পরিবর্ত্তিতাকারে দু'একটা মাত্র।

শুভঙ্করের দেখাদেখি তাঁহার পরে আরও অনেকে আর্য্যা লিখিয়াছিলেন। অনেকে শুভঙ্করের আর্য্যা চুরি করিয়াছিলেন। শুভঙ্করের নাম ভৃগুরাম ছিল না। ভৃগুরাম নামে অন্য একজন আর্য্যা লেখক ছিলেন। তিনি কোনও রাজার আমিন ছিলেন। তিনি বাঁকুড়ার লোক ছিলেন না। তাঁহার কোনও আর্য্যায় "পাই", "কোনা", ইত্যাদির উল্লেখ নাই। বাঁকুড়া ছাড়া অন্য কোথাও "পাই", "কোনা", ইত্যাদি মাপের প্রচলন নাই? একই আর্য্যা

"শুভঙ্কর" ভণিতায় একরূপ। "ভৃগুরাম" ভণিতায় অন্যরূপ দেখা যায়। ইহা ছাড়া শুভঙ্কর ও ভৃগুরাম যে একই লোক নন তাহার বহু প্রমাণ আজকাল প্রাচীন পুঁথিতে দৃষ্ট হইতেছে।

আর্য্যা এক প্রকার ছন্দের নাম। শুভঙ্করের অঙ্ক কষিবার প্রণালীগুলি আর্য্যা ছন্দের অনুকরণে রচিত বলিয়া উহাদের নাম আর্য্যা হইয়াছে. আর্য্যা ছাড়া শুভঙ্কর ঐ ছন্দে বহু অঙ্কও লিখিয়াছিলেন। উঁহাদিগকে তখন "ডাগুানী" বলা হইত। প্রাচীন পুঁথির স্তূপ ঠেলিয়া বাঁকুড়ার প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় শুভঙ্করের "শুভঙ্করী" এবং "কাগজসার" নামক পুস্তক দুইটি সম্পাদিত করিয়াছেন। পুস্তক দুইটি শীঘ্র মধ্যে বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হইবে।

গল্প হলেও সত্যি

মানস মুখোপাধ্যায়

একখানি রেলের কামরা। দুইজন সাহেব ও একজন সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী ইহার আরোহী। সাহেব দুইটি সন্ন্যাসীর জাঁক-জমকহীন সাধারণ পোষাক দেখিয়া তাঁহাকে ইংরাজী অনভিজ্ঞ ভাবিয়া ইংরাজীতে তাঁহার সম্বন্ধে নিন্দাচর্চ্চা করিতে লাগিলেন।

একটি ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে ঐ সন্ন্যাসী ষ্টেশনমাষ্টারের নিকট ইংরাজীতে একগ্লাস জল চাহিলেন। সামান্য সন্ন্যাসীর মুখে ইংরাজী বুলি শুনিয়া সাহেবরা ত' অবাক্। এত নিন্দা যিনি নীরবে শুনিয়া আসিয়াছেন তিনি ত' সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত কটুকথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলে কিরূপে?" সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের মত মূর্খ অনেক দেখেছি। তাই চুপ করিয়া থাকাই উচিত মনে করেছি।"

এই কথা শুনিয়া সাহেব দুইটি রাগিয়া মারামারি করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর মনে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তিনিও আস্তিন গুটাইলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ দুই বাহু দেখিয়া সাহেব দুইটি পিছাইয়া গেলেন। সন্ন্যাসীর বসনের নীচে লুকান এত সাহস ও যোদ্ধার বল দেখিয়া সাহেব দুইটি ভাবিলেন, ইনি কে? ইনি কে জান? ইনি আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ।

দুষ্টু ছেলে

সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

নামটি যে তার পাপু সোনা।
মামার বাড়ী দেয় যে হানা॥
দুষ্টুমি তার মামুর সাথে।
চায় না যেতে বাড়ীর পথে॥
বাবার কোলে মামার বাড়ী।
দুইবেলা সে দেয় যে পাড়ি॥
ছোট মামুর সঙ্গ পেলে।
দুষ্টুমি তার যায় বেড়ে॥
কিন্তু মায়ের গল্প পেলে।
পাপু যে হয় শান্ত ছেলে॥

ভগীরথের শঙ্খধ্বনি

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য ছিল রাষ্ট্রকূট বংশের রাজাদের। তখনকার রাজা হচ্ছেন প্রথম অমোঘবর্ষ। তিনি রাজসভায় বসে আছেন। একজন সভাসদ্ তাঁকে বললেন, "বাংলার রাজা দেব পাল তো উত্তর ভারতের সম্রাট হয়ে বসেছেন।" রাজা বললেন, তাই নাকি? সভাসদ আরও বললেন, "দেবপালের অসীম ক্ষমতা!" অন্য এক সভাসদ ফোঁড়ন কাটলেন, "রাষ্ট্রকূট বাজের মত নয়।" সভা কবি বসেছিলেন চুপ করে। আবার তার মুখ ফুটল। এপাশে ওপাশে বার দু এক মাথা নেড়ে বললেন, "যথার্থ বাক্য।" ধ্রুব রাজা আর তৃতীয় গোবিন্দ কি ভাবে দেবপালের বাবা ধর্মপালকে শায়েস্তা করেছিলেন সে কথা গান গেয়ে শুনালেন। রাজা অমোঘবর্ষের রক্ত গরম হয়ে উঠল। সৈন্য সাজাবার আদেশ দিলেন তিনি সেনাপতিকে। এগিয়ে চললেন উত্তর-ভারতের দিকে। দেবপালের সাম্রাজ্য। দেবপালের কানে খবর এল। মন্ত্রী দর্ভপাণি রাজাকে বললেন, "আপনার বাবাকে ওরা তো আগে হারিয়েছিল তাই মনে করেছে এবারেও এসে এক হাত দেখে যাবে। এবার ওদিকে দেখিয়ে দিতে হবে। গৌড়রাজের ক্ষমতা।" সেনাপতি জয়পাল দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, "হাঁ, এবার ওদিকে দেখাব।" যুদ্ধ বেধেছিল দেবপালের সাথে অমোঘ-বর্ষের। অমোঘবর্ষকে মুখ কালো করে ফিরে যেতে হয়েছিল তার রাজ্যে। শোনা যায়, দেবপালের সাম্রাজ্য সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

গুজরাট আর রাজপুতানায় রাজত্ব করতেন গুর্জর প্রতিহার বংশের রাজারা। গুর্জর প্রতিহার বংশের রাজারা এর আগে পাল রাজাদের সঙ্গে টেক্কা দিয়েছে, হারিয়ে দিয়েছে। দেবপালের সময়ে গুর্জর প্রতিহাররাজ হচ্ছেন মিহিরভোজ। তিনিও চাইলেন দেবপালকে এক হাত দেখতে। তিনি দেবপালের কাছে এক দূত পাঠালেন, "দুটো সর্ত্ত আছে আমার—হয় নতি স্বীকার করুন, নইলে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হোন।"

মন্ত্রী পড়ে শোনালেন রাজাকে। দেবপাল হেসে উঠলেন। রাজা উত্তর দিলেন—"যুদ্ধের জন্যে আপনি তৈরী আছেন তো? যাচ্ছি কিছু সৈন্য নিয়ে।" দূত চলে গেল উত্তর নিয়ে।

দু'জনের সৈন্য মুখোমুখি হোল। প্রথমে বাধল নৌ-যুদ্ধ। গৌড়বঙ্গের নৌবহরের সম্মুখীন হয় কার সাধ্য? অবশ্য মিহির ভোজকে এক শক্তিশালী নৌবহর গড়তে হয়েছিল। কেন না, সমুদ্র তীরে তার দেশ। জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে হয় তার প্রজাদের। গঙ্গার বুকেই দু'দলের নৌবাহিনী জাগিয়ে তুলল তুমুল কোলাহল। উত্তাল হয়ে উঠল জলতরঙ্গ। সমুদ্র মন্থনের মতো নদীর জলেও মন্থনের মতো চলল। মিহিরভোজের নৌবহর হোল বিধ্বস্ত। নৌকা ভাঙ্গল কত শত, ডুবল লোক হাজার হাজার। এবার স্থল যুদ্ধ। হস্তীবাহিনী', পদাতিক, অশ্বারোহী। মিহিরভোজ হাতীতে চেপে যুদ্ধ করছিলেন। দেবপালও। এক সময় দু'জন দুজনের সামনাসামনি হলেন। মিহিরভোজ দেবপালের হাতীকে খতম করে দিলেন। দেবপাল দেখলেন মহাসঙ্কট। প্রাণ যায় বুঝি। তিনি করলেন কি, তলোয়ার হাতে অমিত সাহসে এগিয়ে গেলেন মিহিরভোজের হাতীর কাছে। হাতীর শুঁড়ে

লাগালেন তলোয়ারের কোপ। দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল শুঁড়। রক্ত ঝরতে লাগল। মিত্তিরভোজকে নিয়ে হাতী বিকট চীৎকার করতে করতে তীব্রবেগে ছুটল পিছন দিকে। তাঁর সৈন্যদল ভাবল রাজা বুঝি খুব আহত হয়ে পালাচ্ছেন। সৈন্যরাও রণে ভঙ্গ দিল। "গৌড়রাজের জয়, গৌড়রাজের জয়"—গৌড়রাজের সৈন্যরা মহানন্দে জয়ধ্বনি করতে লাগল।

দেবপাল ফিরে এলেন রাজধানীতে। গৌড়ে। মন্ত্রী দর্ভপাণি রাজার নামে শ্লোক লিখলেন : "অরিনৃপতিমুকুটস্থাপিতচরণ: সকলভুবন বন্দিতশৌর্য্য:।"

সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রা) শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা যবদ্বীপ, মালয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জগুলির প্রভুত্ব বিস্তার করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের রাজধানীর নাম ছিল শ্রীবিজয়। তার থেকে তাঁদের সাম্রাজ্যের নাম হয় শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য। দেবপাল যখন গৌড় সাম্রাজ্যের সম্রাট তখন শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের সম্রাট বালপুত্রদেব। ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে তখন বৌদ্ধধর্ম প্রায় চলে গেছে, তার রেশ রয়ে গেছে গৌড়দেশে—মগধ থেকে বঙ্গ পর্যন্ত। উল্কা মাটিতে পড়বার আগে দপ করে যেমন জ্বলে উঠে ও নিঃশেষ হয়ে যায় তেমনি ভারতের বুক থেকে পুরোপুরি বৌদ্ধধর্ম চলে যাবার আগে গৌড়দেশে শেষের মত প্রদীপ্ত মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিয়েছে। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম চর্চার জন্যে তাঁরা অনেক সাহায্য করে গেছেন। এই হিসেবে ভারতের বৌদ্ধধর্মে পাণ্ডা ছিলেন পাল রাজারা। আর ওদিকে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। বালপুত্রদেব তাই দেবপালের সভায় এক দূত পাঠান। আজি তাঁর, নালন্দায় সুমাত্রা ও যবদ্বীপের ছাত্রদের জন্যে একটি সঙ্ঘারাম তৈরী করবেন তার জন্যে সাহায্য চাই। দেবপাল বালপুত্রদেবকে পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। গৌড়দেশ থেকে একজন বৌদ্ধপণ্ডিত শৈলেন্দ্ররাজগণের ধর্মাচার্য হয়ে যান। তাঁর নাম কুমার ঘোষ। মধ্যজাভায় বরোবুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দিরটি তৈরী করতে গৌড়দেশ থেকে শিল্পীরা গিয়েছিলেন। দেবপালের রাজত্বকালে একজন আরবীয় পর্যটক গৌড়ে এসেছিলেন। তাঁর নাম সুলেমান। তিনি লিখে গেছেন, দেবপালের সৈন্যদলে পঞ্চাশ হাজার হাতী ছিল ও সৈন্যদলের কাজ করবার জন্যে পনর হাজার লোক ছিল। প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করে দেবপাল পরলোকগমন করলেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্য স্তিমিত বীর্য হয়ে পড়তে থাকে। রাজবংশে অন্তর্বিরোধ ও পারিবারিক কলহ দেখা দেয়। দেবপালের ছেলে থাকলেও রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন তাঁর সেনাপতি জয়পালের ছেলে। প্রথম বিগ্রহ পাল বা শূরপাল ছিলেন ধার্মিক, সংসার বিরাগী। চার বছর মাত্র রাজত্ব করে তাঁর ছেলে নারায়ণ পালের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নারায়ণ পাল সুদীর্ঘ চুয়ান্ন বছর রাজত্ব করেন। বয়সের ভারে তাঁর দেহ যেমন শীর্ণ হয়ে পড়েছিল তাঁর রাজ্যও তেমনি রূপ ধারণ করেছিল। নারায়ণ পালের রক্তের ছিল না চাঞ্চল্য, ছিল আলস্য। বাবার মতই তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়। তাই তাঁর আমলে বাইরে থেকে বার বার অভিযান হয়েছে, দৃঢ় নেতৃত্বের অভাবে শক্তিশালী বাঙালী সৈন্যরা সে সব অভিযানকে ঠেকাতে পারেনি। পালরাজ বংশের ও সেনাপতিত্বের উত্তরাধিকারী হয়েও শূরপাল ও নারায়ণ পালের রক্তে বীরত্বের বীজ কেন যে রইল না! কি ঘটেছিল তা-ই নিয়ে আমাদের কারবার, কি হতে পারত—এ নিয়ে জল্পনা কল্পনার নেই আমাদের দরকার, কেন হয়নি—এদিকে অবশ্য একটু নজর দিতে পারি, খুঁজে পেতে দেখতে পারি কারণগুলো। কেদার মিশ্রের ছেলে গুরব মিশ্র ছিলেন নারায়ণ পালের মন্ত্রী। আভ্যন্তরীণ কলহ আর বহিঃশত্রুর আক্রমণে তাঁর আমলে পাল রাজ্যের দুর্দশা সত্যিই চরমে পৌঁছেছিল। উড়িষ্যা গৌড় সাম্রাজ্যের অধীনতা অস্বীকার করল। উড়িষ্যার রাজা হলেন শৈলোদ্ভব রাজা শ্রীনিবাস। ক্রমে পাল সাম্রাজ্য থেকে কামরূপও বিচ্ছিন্ন হোল। সেখানকার রাজা হর্জর স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ বিরাট বাহিনী নিয়ে গৌড়ে হানা দিলেন। নারায়ণ পাল নির্মম ভাবে পরাজিত হলেন। পাল রাজ্যের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হোল। রাষ্ট্রকূটরাজ অবশ্য গৌড়ের বুকে বেশিদিন থাকলেন না। চলে গেলেন। নারায়ণ পালের কিন্তু নিস্তার নেই। ওদিকে প্রতিহাররাজ ভোজ আর্যাবর্তের অন্যান্য অংশ থেকে পাল রাজাদের নাম ঘুচিয়ে দিয়েছেন। ভোজের ছেলে মহেন্দ্র গৌড়ের দিকে এগিয়ে এলেন। নারায়ণ পালের হাত থেকে বিহার (মগধ) ও উত্তরবাংলা ছিনিয়ে নিলেন। এর পরেই কলচুরিরাজ কোক্কল্লদেব আক্রমণ করলেন। গৌড়রাজ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে তিনি আবার নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। নয় শতকের শেষ ভাগে পাল রাজ্যের যা অবশিষ্ট থাকলো তাকে সাম্রাজ্য এমন কি রাজ্য বলতেও ইতস্তত: করতে হয়। পাল সাম্রাজ্যকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁর ছেলে রাজ্য পালের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটরাজ তুঙ্গের মেয়ে ভাগ্যদেবীর বিয়ে দিলেন। এতে করে তেমন কোনও সুফল হয়নি। অবশ্য কোনও রকমে মগধ ও উত্তরবাংলা মহেন্দ্রের হাত থেকে পুনরাধিকার করেন। হতমান পালরাজ নারায়ণ পাল পরলোকগমন করেন কিছুদিন পরেই। আজীবন লজ্জার হাত থেকে বেঁচে গেলেন তিনি।

নারায়ণ পালের পর রাজা হলেন তাঁর ছেলে রাজ্যপাল। কোনমতে রাজ্যপালন করে গত হয়েছেন তিনি। তারপর তাঁর ছেলে দ্বিতীয় গোপাল সিংহাসনে বসেছেন। দ্বিতীয় গোপালের পর রাজা হয়েছিলেন তাঁরই ছেলে দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। এদের আমলে বাংলার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রাজা আক্রমণ চালাতে থাকেন। তাঁদের পুন:পুন: আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উত্তরবাংলা ও পশ্চিমবাংলার কিছু কিছু অংশে কাম্বোজবংশীয় এক রাজা অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজার নাম রাজ্যপাল। ওদিকে চন্দেল্লরাজ যশোবর্মা, কলচুরিরাজ প্রথ· যুবরাজ তাঁর ছেলে লক্ষ্মণরাজের আক্রমণে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে পরাজিত হতে থাকে ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। দক্ষিণবাংলা ও পশ্চিমবাংলার কিছু অংশে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব হরিকেল বা বঙ্গাল রাজ্যের পত্তন করেন। বর্ধমানপুর ছিল তাঁর রাজ্যের প্রধান নগরী। এরপরে পূর্ব ও দক্ষিণবাংলায় অর্থাৎ বঙ্গ ও বঙ্গাল-দেশে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সন্ধান পাই। চন্দ্রবংশের আদিনিবাস ছিল বঙ্গে। সেখানে লহরচন্দ্র প্রথম মাথা তুলেন। তারপর পূর্ণচন্দ্র ও সুবর্ণচন্দ্রের নাম শুনি। এঁদের পর ত্রৈলোক্যচন্দ্র। ত্রৈলোক্যচন্দ্র তাঁদের রাজ্যকে হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পর রাজা হন শ্রীচন্দ্র। শ্রীচন্দ্র প্রায় চুয়াল্লিশ

বছর রাজত্ব করেছিলেন। তারপর গোবিন্দচন্দ্র রাজা হন। একাদশ শতকের গোড়ার দিকে। গোবিন্দচন্দ্রের আমলে চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল আক্রমণ করেন বঙ্গাল দেশ। এই রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে কেন্দ্র করে নাথ ও ধর্মের সম্পর্কে জনসমাজে এক কাহিনীর প্রচলন হয়েছিল। সেই কাহিনী অবলম্বন করে পল্লী কবিরা গীতিকা রচনা করেছিলেন। সেই গীতিকা গোপীচাঁদের গান বা ময়নামতীর গান নামে পরিচিত। তার কাহিনীটি বেশ চিত্তাকর্ষক।

বাংলা দেশে মাণিকচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পত্নী রাণী ময়নামতী। তিনি ছিলেন যোগসিদ্ধা। যোগ প্রভাবে মৃত্যুকে জয় করা যায়। তাই তিনি রাজাকেও সেই জ্ঞান শিক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। রাজা রাজী হলেন না। তাঁর মৃত্যু হোল। ময়নামতী এতে যমের উপর খুব রেগে গেলেন। শিব আবির্ভূত হয়ে তাঁকে শান্ত করলেন, পুত্রবর দিলেন। আরও বললেন, তবে পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ না করালে ১১ বছর বয়সে তার মৃত্যু হবে। এই পুত্রের নাম হোল গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্র রাজার ছেলে। অল্প বয়সেই ঘটা করে তার বিয়ে হয়ে গেল। গোপীচন্দ্র সংসার রসে মত্ত হয়ে পড়লেন। রাণী এমন সময় তাকে বললেন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে। সেই রাজ্যে সিদ্ধযোগী ছিলেন জলন্ধরীপাদ। তিনি হাড়িরূপে রাজ্যে বাস করতেন। তাই এঁকে হাড়িসিদ্ধা বলত। ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে বললেন। গোপীচন্দ্র প্রথমে সম্মত হলেন না। রাণীদের কুপরামর্শে চালিত হয়ে তিনি তাঁর মায়ের যোগপ্রভাব পরীক্ষা করতে চাইলেন। ময়নামতী সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। গোপীচন্দ্রকে এবার যোগীর বেশ ধরে সন্ন্যাস নিতে হোল। হাড়িসিদ্ধা তাঁর গুরু হলেন। এক বছর অনেক কষ্ট সহ্য করে গোপীচন্দ্র রাজ্যে ফিরে এলেন। রাণীরা তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেতে চাইল। গোপীচন্দ্র কিছু দিতে পারলেন না। অপদস্থ হলেন। রেগে গিয়ে হাড়িসিদ্ধাকে মাটির নীচে পুঁতলেন। খবর পেয়ে হাড়ির শিষ্য কাহ্নপাদ রাজসভায় এলেন। কাহ্নপাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখে গোপীচন্দ্র মুগ্ধ হলেন। হাড়িসিদ্ধাকে মাটির নীচ হতে উঠানো হোল। যোগপ্রভাবে তিনি তখনও জীবিত ছিলেন। কাহ্নপাদ কৌশলে গুরুর ক্রোধাগ্নি হতে গোপীচন্দ্রকে রক্ষা করলেন। গোপীচন্দ্র যোগের কি অলৌকিক শক্তি বুঝলেন। সংসারে তাঁর বৈরাগ্য এল। মাথা মুড়িয়ে, কাণে শঙ্খকুণ্ডল পরে, কাঁথা নিয়ে যোগী সাজলেন। ময়নামতী অজস্র মিনতি করতে লাগলেন। রাণীরা অঝোরে কাঁদতে লাগল। গোপীচন্দ্র কৃতসঙ্কল্প। বাংলার যুবকরাজা যৌবনে রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হোলেন। সারা রাজ্য জুড়ে করুণ ক্রন্দনরোল উঠল:

"হায় হায় কর্যা রাণী ধুলায় লুটায়।
উদুনার রোদনে পাষাণ গল্যা যায়।
কান্দয়ে নগরবাসী রাজাপানে চায়্যা।
বালবৃদ্ধযুবা কান্দে আর শিশু মাইয়া।
সারী শুক পক্ষী কান্দে না করে আহার।
দাসীগণ কান্দে রাজার করি হাহাকার।"

যা হোক, এমনি ভাবে পাল বংশের উত্তাল ভরা নদীর ধারা যখন প্রায় শুকিয়ে এসেছে তখন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের ছেলে প্রথম মহীপাল হোলেন গৌড়ের রাজা। বিস্তৃত পাল সাম্রাজ্য শুধুমাত্র উত্তর রাঢ়ে সঙ্কুচিত হয়েছে। পাল রাজাদের হস্তচ্যুত হয়েছে অন্য সমস্ত প্রদেশ, বাকী আছে শুধু এটুকু। বিখ্যাত পাল রাজাদের এই হোল রাজ্য। প্রথম মহীপাল ভাবেন, শুধু ভাবেন। কি ভাবে পাল রাজাদের গৌরব আবার ফিরান যায়। ধর্মপাল ও দেবপালের কথা শুনেন তিনি সভাকবির মুখ থেকে। ধর্মপাল ও দেবপাল তাঁর পূর্বপুরুষ, তাঁদের বীরত্ব কি পালবংশের রাজ্যে আর এক ফোঁটা নেই? তাঁদের বংশের প্রথম রাজা গোপাল তো রাজা হয়েছিলেন জনসাধারণের চেষ্টায়। তাঁদের পেছনে জনসাধারণের শুভেচ্ছা আছে। তারাই তাঁদিকে সিংহাসন দিয়েছে। এ সব ভেবে মহীপাল নূতন উদ্যমে গড়লেন সৈন্যদল। সৈন্যদিকে শোনালেন আশার বাণী:

গড়ব সবে নূতন করে রাজ্য মোদের আবার
দেশের লোক দাও গো যোগ সেনাদলে বাংলার।

এইভাবে মহীপাল পাল-সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরাতে চেষ্টিত হোলেন। তাঁর রাজত্বকালে দেখা যায় একদিকে তিনি বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত, অন্য দিকে দেশের নানান সংস্কার ও প্রজাদের উপকার করতে ব্যগ্র। তাঁকে দেশের লোকে খুব ভালবাসত। তাঁর নামে গান বেঁধে সবাই গাইত। ঘরে-মাঠে, নদীতে ডাঙ্গাতে। "ধান ভানতে মহীপালের গীত"—প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছিল। মহীপাল দীঘি, আর মহীপাল, মহীপুর, মহীসন্তোষ প্রভৃতি দিনাজপুরের গ্রাম আজও মহীপালের জনপ্রিয়তা ঘোষণা করছে। রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ ও কলচুরিরাজের শত্রুতা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। তবু তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল "অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য" পুনরাধিকার করা। তিনি প্রথমে উত্তর ও পূর্ববঙ্গ অধিকার করলেন। ১০২৬ খৃষ্টাব্দের একটি লিপি থেকে জানতে পারা যায়, তাঁর রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। পাল সাম্রাজ্যের কিছু অংশ উদ্ধার করে পালবংশের হৃতগৌরব অনেকখানি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি পালবংশের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা, বিপদসঙ্কুল বিশৃঙ্খল সমুদ্রে তিনি সুদক্ষ কাণ্ডারীর মত ভগ্নতরীকে উঠাতে সম্মত হয়েছিলেন।

প্রথম মহীপালের পর রাজা হলেন তাঁর ছেলে নরপাল। মহীপালের রাজত্বকালে কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব বাংলা দেশে অভিযান করেছিলেন। নরপালের রাজত্বকালে গাঙ্গেয়দেবের ছেলে লক্ষ্মীকর্ণ অভিযান চালালেন। মগধ পর্যন্ত আসতেই জয়পাল গিয়ে বাধা দিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ গোড়াতেই হেরে গেলেন। হারবার পর তাঁর আক্রোশ বেড়ে গেল। আর আক্রোশ গিয়ে পড়বি তো পর বৌদ্ধবিহার ও মঠগুলোর উপর। মগধে বিক্রমশীল বিহারের তখন অধ্যক্ষ ছিলেন দীপঙ্কর। তাঁর কাণে গেল সে-কথা। রাজায় রাজায় লড়াই, মাঝখানে ধর্মের পীড়ন। তিনি লক্ষ্মীকর্ণের শিবিরে গেলেন। তাঁকে বুঝালেন ধর্মের অযথা পীড়ন করেন। আর লড়াই-ই বা কেন। অহিংসা পরম ধর্ম। শান্তি পরম কাম্য। নির্বাণ চরম লক্ষ্য। জয়পাল দীপঙ্করকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁর কথা তো মানবেনই। লক্ষ্মীকর্ণকে তাই আগে ভাগে বুঝালেন। বৃথা বিবাদ। দীপঙ্কর তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রভাবে মনীষার দীপ্তিতে লক্ষ্মীকর্ণের মনে ছায়াপাত করলেন। দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় নরপালের সঙ্গে লক্ষ্মীকর্ণের সন্ধি হোল। মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হোলেন তাঁরা।

রক্তের স্বাক্ষর

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

ডিসেম্বর মাস। বেশ কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। রাত বোধহয় ন'টা সাড়ে ন'টার কম নয়। মিশনারী অরফানেজ স্কুলের বাঁধাধরা রুটিনের শিকল-পরা জীবনের পক্ষে খুব কম রাত নয়। বেশীর ভাগ মেয়েই তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে কম্বলের তলায় ডুব মারবার মতলব করছে। শুধু সামনেই যাদের ফাইনাল পরীক্ষা তাদের একটা কোচিন্ ক্লাস বসেছিল মাদার সুপীরিয়রের ঘরের লাগোয়া বারান্দায়। স্কুলের পর মাদার নিজেই এটার পত্তন করেছেন। মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কাছে এসে তাদের 'অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব'গুলো খুলে বসে সামনে।

মাদার ওদের সাহায্য করেন—সুযোগ দেন পরীক্ষার পড়া তৈরী করবার।

আজও তেমনি পড়া শেষ হলে মাদারকে খাতা দেখিয়ে একে একে বিদায় নিল সকলে। শুধু সীমা দাঁড়িয়েছিল একা। মাদারের চোখের ইংগিতে সে যেন ইচ্ছা করেই পিছিয়ে পড়েছিল সকলের থেকে।

সব মেয়েরা চলে গেলে ওকে নিজের কাছে ডাকলেন মাদার। বললেন—সীমা তুমি যদি প্রয়োজন মনে করো আমি তোমাকে ডিনারের পরে আরও দু'ঘণ্টা করে পড়াতে রাজী আছি। অবশ্য তুমি নিজেও যথেষ্ট পরিশ্রম করছো। তবু আমি মনে করি এতে তোমার আরও উপকার হবে। কারণ আমরা সবাই জানি কনভেন্টের এবারকার রেজাল্ট তোমার ওপরেই নির্ভর করছে।

কথাটার মধ্যে যেটুকু প্রশংসা প্রচ্ছন্ন ছিল সীমার মনে তাতে ভীরু আনন্দের দোলা লাগায়। সে নম্রভাবে বলে—তাই হবে মাদার। আগামী কাল থেকে আমি রাত্রে আবার পড়তে আসবো। আমার পক্ষে এ তো মস্ত সৌভাগ্য।

মাদার ওকে আরো কাছে টেনে নেন। ওর মাথায় একখানি হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। বলেন—আমি নিশ্চয় জানি সীমা তোমার জীবন সার্থক হবে। জীবনে তুমি প্রতিষ্ঠা পাবে—যশ পাবে ·····যেদিন এতটুকুবেলায় ছোট্ট তোমাকে কোলে করে নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম, সেইদিন থেকে আমি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছি।

মাথা নীচু করে ধন্যবাদ জানায় সীমা! তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

ওকে বিদায় দিতে ওর পানেই পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন মাদার। তাঁর যেন মনে হয়—সীমা আজ অন্যদিনের চেয়ে বেশী গম্ভীর। একটা ছদ্ম আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে। তাই ও পিছন ফিরে কয়েক পা যেতেই তিনি আবার ডাকেন—সীমা শোনো।

নিজেকে সম্বরণ করে মাদারের কাছে ফিরে এসে দাঁড়াতে সীমার মিনিট দু'য়েক দেরী হয়। তবুও এবারে সে মাদারের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে না। তাঁর চোখের সামনেই অবাধ্য দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ে ওর গালের ওপর।

চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ান মাদার। সস্নেহে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন—কী হয়েছে সীমা? এত কেন মনখারাপ দেখছি তোমার আজ?

স্নেহের স্পর্শে সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ে। মাদারের টেবিলের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সীমা।

একটু পরে মুখ তুলে কান্নাভেজা গলায় বলে—কেন আমায় এখানে আনলেন মাদার? আমার মরে যাওয়াই ভালো ছিল। কেন আমার জন্যে এত পণ্ডশ্রম করলেন?

মাদার বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করেন—এ সব কী বলছে তুমি? একটা জীবন কী এত তুচ্ছ? ভগবান আমাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু কাজ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সে কাজ না করে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করবার অধিকার তো আমাদের কারুরই নেই।

মাদারের কথায় সান্ত্বনা পায় না সীমা। আরও কাঁদে শুধু, গোঁয়ারের মত মাথা নেড়ে বলে—না মাদার না। আমার এ জীবনটা একটা জীবনই নয়। কেউ নেই—কিছু নেই—শুধু একটা নিজের প্রাণ নিয়ে আমার কী হবে?··আপনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলছেন? কিন্তু আমার জীবনটাকেই তো আমি জানি না। আমার অতীত নেই—বর্তমানের ভিত্তি কী?

মাদার বাধা দিয়ে বলেন—ও কথা বলছো কেন সীমা? এই বিরাট পৃথিবীতে যিনি তোমায় পাঠিয়েছেন তিনিই তোমায় জায়গা করে দেবেন।

—কিন্তু এই কনভেন্টের বাইরে যে পৃথিবী তার সাথে যে আমার কোন পরিচয়ই নেই।—আমি কে? আমার নাম শুনে মনে হয় আমি বাঙালী। আপনার কাছেও কবে যেন একবার শুনেছিলাম আমি বাঙালী। তাই আমাদের স্কুলে যে বাংলার টিচার আছেন তাঁর কাছে অবসর সময়ে আমি বড় যত্ন করে বাংলা শিখেছিলাম। আগে আগে মনে আশা হোত হয়ত কোনদিন আমার কোন আত্মীয় এখানে আমায় খুঁজতে আসবেন।—কত হারিয়ে যাওয়া মেয়েই তো এমন করে তাদের প্রিয়জনকে ফিরে পেয়েছে এই কনভেন্ট থেকে।

আবার কতজনের হয়ত বাপ-মা নেই কিন্তু অন্য সব আত্মীয়রা কেউ না কেউ আছেন। এখানকার পড়া শেষ হলে তারা তাঁদের কাছে চলে যাবে। একদিন না একদিন সংসারের স্নেহ-প্রীতির স্বাদ পাবে। আর আমি? আমার কে আছে মাদার?··পাশ করলে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমি পাশ করতে চাই না মাদার, পাশ করলে আমি কোথায় যাবো?

মাদার সহসা সীমার কথার উত্তর দিতে পারেন না। মিশনারীদের তত্ত্বিরে বহু অনাথা মেয়েই এই আশ্রমটিতে মানুষ হয়। তবু তার ভিতরেও অনেক ইতরবিশেষ শ্রেণী বিভাগ আছে।

মৃত হলেও বহু মেয়ের মা-বাপের নাম ধাম পরিচয় লেখা আছে অফিসের খাতায়। দূর সম্পর্কীয় হলেও কারো কারো আপনজনেরা মাঝে মাঝে আসেন—খবরাখবর নিয়ে যান। এদের ভবিষ্যতের ভরসা আছে। জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার সম্ভাবনা জানা যায়।

সীমার মত অজ্ঞাত পরিচয়ও অবশ্য আছে। তবে তাদের সংখ্যা কম। যারা আছে তাদেরও বেশীর ভাগই ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে। যে যার ভবিষ্যত চিন্তা করে স্বতন্ত্র ধারায়।

কিন্তু এমন ব্যাকুল প্রশ্ন বোধহয় মাদারের কানে ইতিপূর্বে আর

কখনও এসে পৌঁছায় নি। পৃথিবীর অজানা কাননের এই অনাঘ্রাত ফুলটির বেদনা মাদারের অন্তর স্পর্শ করে মমতা জাগে এই ভীরু পাখীটিকে দেখে যে বদ্ধ খাঁচায় থেকে থেকে উন্মুক্ত আকাশকে ভয় করতে শিখেছে। একটুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে সীমাকে আশ্বাস দেন মাদার। ধীরে ধীরে সীমার হাতের 'পরে একটি হাত রেখে বলেন—এত কেন ভাবছো সীমা? পৃথিবী যত রূঢ় কঠিনই হোক না কেন, তোমার মত মেয়েকে যদি সে সাদরে গ্রহণ করতে না পারে, তবে তাতে তার নিজের লোকসানও বড় কম নয়। করুণাময়ের উপর আস্থা রাখো। তাছাড়া আমি তো রইলামই। কনভেন্টের বাইরে যদি একান্ত তোমার ভালো না লাগে, তবে আমি নিজে রেকমেণ্ড করে তোমাকে এই কনভেন্টের মধ্যেই যা হোক একটা কিছু কাজ করে দেবো। কেমন?

ওঠো, আর মন খারাপ করে থেকো না। মনকে তৈরী করো পরীক্ষার জন্যে তৈরী হও। আর দেখ, বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা, খুব সাবধানে তুমি ও-বাড়ীতে শুতে যেও। আজকে রাতে আর পড়াশুনো নয়। আজকের মত বিশ্রাম নাও তুমি। আশা করি, কাল সকালে তোমার শরীর-মন সুস্থ হবে।

সীমা মুখ তোলে। ধীরে ধীরে হাতের তালু দিয়ে মুখটা মুছে নেয়। তারপর নতজানু হয়ে মাদারের হাতের ওপর একটা চুম্বন দেয়। তারপর বিদায় নেয় সে-রাতের মত।

* * * *

মাস দু'য়েক পরে। যেদিন সীমার পরীক্ষা শেষ হলো, সেদিন সন্ধ্যায় বিছানায় শুয়ে বহুদিন পরে অসময়ে একটু বিশ্রাম করছিল সীমা। শরীরটার অবস্থা রণক্লান্ত সৈনিকের মত শ্রান্ত। একটু বিশ্রাম এবার তাকে দিতেই হবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, একটু শান্ত নির্জন অবকাশ পেলেই মনটা তার ভারি অস্থির হয়ে ওঠে। ছুটোছুটি করে হাজারটা চিন্তা, হাজারটা জিজ্ঞাসা এসে হাজির করে দেয় মাথার ভিতর।

এবার কি করবে সীমা? এখানকার সিনিয়র কেমব্রিজ কোর্স তো শেষ হয়ে গেল। পরীক্ষা যা দিয়েছে, তাতে পাশ করার সম্বন্ধেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এবার যে তাকে পা বাড়াতে হবে কনভেন্টের বাইরে, যেখানে মাথার ওপর নেই মাদারের স্নেহচ্ছায়া। পাশে নেই আশৈশব সঙ্গিনীদের মিষ্টি ভালবাসা।

আঃ কত পুণ্যে যে এক বছরের সীমা মাদারের চোখে পড়েছিল—আজমীঢ়ে না কোথায় যেন কোন দেহাতী মেলায়। তা না হলে এতদিনে যে কী হোত তা ভাবতেও ভয় পায় সীমা। হয়ত না খেতে পেয়ে পথের ধুলোয় শুকিয়ে মরতে হোত—লেখাপড়া শেখবার সুযোগ তো পেতোই না। হয়ত বা নিজের পেটের দুটি অন্নসংস্থানের জন্যে যার তার বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করতে হোত তাকে।

—না না সে রকম ভাবে বেঁচে থাকতে চায় না সে। অমনতর পথের কুকুরের মত অন্যের অবহেলার ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া তার কাছে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। জীবিকার প্রয়োজনে কষ্ট স্বীকার করতে রাজী আছে সীমা পরিশ্রম করতেও সে পিছপাও নয়। আশা রাখে যোগ্যতার বিচারের সে অন্য প্রতিযোগীদের চেয়ে পিছনে থাকবে না।

তবু কেমন ভয় করে। পৃথিবী কোন তৌলে তাকে ওজন করবে কে জানে?

যে কোন সম্ভ্রান্ত জায়গাতেই তো পরিচয়-পত্রের দরকার। যদি তখন তারা পিতৃ-পরিচয়, বংশ পরিচয় চায়? না দিতে পারলে যদি অপমান করে?—নিজের পদবীটা ছাড়া যে আর কোন পরিচয়ই নিজের জানে না সীমা।

সীমা রায়—ব্যস এইটুকু। কিন্তু শুধু এইটুকু পরিচয়ে কী এত বড় পৃথিবীটাতে চলা খুব সহজ হবে?

জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত অবকাশ পেলেই এ বিষয়ে অনেক ভেবেছে সীমা। আজও এই প্রথম হাঁফ ফেলবার মত ছুটি পেয়ে সারা সন্ধ্যেটা ধরে এই কথাগুলোই ভাবলো নতুন করে।

সমাধান মিললো না—বেদনাই বাড়লো শুধু।

সতীর্থরা আজ যে যার আনন্দে মসগুল। ছুটিতে বাড়ী যাবে তাদের তো কথাই নেই। গোণা-গাঁথা ক'টি জিনিস তারা বিলবার বাক্সে তুলছে আর নামাচ্ছে। যাত্রার উদ্যোগটার মধ্যে দিয়ে যাত্রার আনন্দটাকে উপভোগ করছে যেন।

অবশ্য সকলেই কিন্তু বাড়ী যেতে পারছে না এর মধ্যে। যাদের আত্মীয়রা দূরবাসী বা আগ্রহহীন তাঁরা হয়তো অনেকে একেবারে রেজাল্ট বেরুলে নিতে আসবেন কষ্ট করে। তাদের মতে—আলাদা যখন খরচ লাগে না তখন অত তাড়াতাড়ি কিসের?

কিন্তু তার জন্যে তাদের আনন্দের জোয়ারে এতটুকুও ভাঁটার টান পড়বার সম্ভাবনা নেই। কিশোরী প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত খুশীতে তারা উজ্জ্বল দিশাহারা।

লনের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে গিয়ে যে যার মনের মত আলোচনায় ডুবে গেছে! কেউ বা মেতেছে অদূরাগামী স্কুল সোশ্যালটিকে কী করে সার্থকতর করে তোলা যায় তারই পরিকল্পনায়। কেউ বা ঘটা করে কাগজ পেনসিল নিয়ে বসেছে সাম্প্রতিক সম্ভাব্য বনভোজনের ফর্দ করতে।

মোট কথা ওরা সকলেই ভবিষ্যতের সুখ চিন্তায় বিভোর। ওদের মধ্যে থেকে শুধু সীমা নামে একটি মেয়ে কখন যে নিজেকে নিয়ে পালিয়ে গেছে ওরা কেউ তা লক্ষ্য করেনি। লক্ষ্য না করাটাই স্বাভাবিক কারণ সোশ্যাল পার্টি ভেবেছে সীমা বনভোজনে বেশী অনুরাগী আর বনভোজনের ব্যবস্থাপিকারা ভেবেছে সীমা ঠিক গিয়ে সোশ্যালের জল্পনা করছে।

কিন্তু ওর এই অনুপস্থিতি মাদার লক্ষ্য করেছিলেন। তাই প্রায় অন্ধকার হলঘরটায় নিজের জন্য নির্দিষ্ট বিছানাটিতে মুখ গুঁজে সীমা যখন একলাটি শুয়েছিল তখন সেখানে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন মাদার। স্নেহমাখা স্বরে ডাক দিলেন—সীমা। এখানে একলাটি শুয়ে কী করছো তুমি?

চমকে ওঠে সীমা। বাঁ হাতের কব্জি দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে—মাদার আপনি? না না মাদার আমি এখানে কিছুই করিনি। এখনি—মানে শুধুই একটু শুয়েছিলাম।

—তুমি একটি দুষ্টু মেয়ে। মিছিমিছি এ রকম মন খারাপ করে থাকার জন্যে আমি তোমাকে শাস্তি দিতে এসেছি।

সীমা অল্প একটু হাসে। ওর নম্র দু'টি চোখ মাদারকে যেন বলতে চায়—আমি তৈরী মাদার।

মাদার বলেন—তোমার শাস্তি হচ্ছে কাল সকালবেলাতেই

তোমাকে একটা ষ্টেনোগ্রাফী ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হতে হবে। একটা দিনও তোমাকে ছুটি দেবো না আমি। সীমা বলে—এই শাস্তি? কৈ এটা তো শাস্তির মত লাগছে না?·····কিন্তু মাদার—

—কী যেন একটা কথা বলতে গিয়ে চুপ করে যায় সীমা।

মাদার বল্লেন—কী বলছিলে? বলো। আমার কাছে সংকোচ করো না সীমা।

—না মাদার আমি বলছিলাম কী—মানে ষ্টেনোগ্রাফী স্কুলে তো—

—বুঝেছি। তুমি টাকাকড়ির ভাবনা ভাবছো? ও ভাবনাটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও না সীমা। ওটা নিয়ে তুমি নাই বা ভাবলে।

—না না মাদার। তা আমি ভাবিনি। আমার জন্যে আজ হঠাৎ আমি ভাববো কেন?

—বেশ তাহলে কাল সকালে ঠিক সাড়ে ন'টায় তুমি তৈরী হয়ে আমার ঘরে এসো। আমি নিজেই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেবো। কেমন? স্কুলটাও এখান থেকে বেশী দূর নয়। প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে আমার জানা আছে। আমি তাঁকে বলেও রেখেছি তোমার কথা। অসুবিধা কিছু হবে না তোমার।

—আমি ঠিক সময়ে আসবো।

মাদার চলে গেলেও ঘরের মধ্যে বহুক্ষণ একলা দাঁড়িয়েছিল সীমা। কিন্তু একটুও আর মন খারাপ লাগছে না তার। মাদারের স্নেহস্পর্শে সে যেন পায়ের তলার মাটি খুঁজে পেয়েছে তার—ফিরে পেয়েছে বেঁচে থাকার আনন্দকে।

আর মাদার? মাদার ফিরে যেতে যেতে ভাবছিলেন—তিনি নীতিচ্যুত হলেন না তো?

তিনি তো সন্ন্যাসিনী। স্বদেশ ছেড়ে সুদূর প্রবাসে এসেছেন মানবসেবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

সেই সেবার রীতি নীতি সর্বদা সর্বজীবে সমান হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়।

কারো প্রতি পক্ষপাতের ছায়া পড়া সেখানে নিতান্তই অনুচিত। কিন্তু আজ সীমার প্রতি অকৃত্রিম মমতা বলে যে, প্রতিশ্রুতি তিনি এইমাত্র সীমাকে দিলেন তা কী একটু অন্যায় প্রশ্রয়দুষ্ট হয়ে গেল না?

কিন্তু এ সমস্যার আজ আর তিনি কী সমাধান করবেন?

প্রথম যেদিন সীমাকে তিনি দেখেছিলেন সেদিন তো তাঁর এ মমতা ছিল না?

দিনে দিনে যদি এ মমতা মনকে তাঁর আচ্ছন্ন করে ফেলে থাকে তবে আজ হঠাৎ তাকে একেবারে উচ্ছেদ করা কী সম্ভব?

বেশ মনে আছে তখন সবে কিছুদিন হয়েছে এদেশে এসে কলকাতার কাছাকাছি এই মিশনারী অরফানেজ স্কুলের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে তাঁকে। তখন বয়েস ছিল অল্প আর উৎসাহ ছিল অফুরন্ত। শুধু এই স্কুলের কাজ নিয়ে থেকেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি হোত না কেন।

ছুটিতে ছুটিতে ভারতবর্ষের অখ্যাত বিখ্যাত সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে এদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দাম একটা বাসনা ছিল মনের মধ্যে।

এমনি একটা ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে আজমীরের কাছে একটা ছোট গ্রামের হাট দেখতে গিয়েছিলেন সেদিন। পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করছিলেন।

তারপর বেড়ানো শেষ করে যখন তাঁর ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ীটার কাছে এলেন তিনি, তখন গাড়োয়ানটা তাঁকে বললে ঐ কয়েকটা লোক তাঁকে কিছু বলতে চায়। প্রথমটায় একটু অবাক হলেন তিনি। কয়েকটা লোক একটু দূরেই জটলা করছিল নিজেদের মধ্যে। সকলেই স্থানীয় লোক। তিনি গাড়ীতে না উঠে একটু এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে।

মাতব্বর গোছের একটা পাগড়ি-পরা লোক তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো সুমুখের একটা মুদিখানার দোকানের কাছে।

বছর দেড়েকের একটা মেয়ে ছোট একটা কাগজের ঠোঙার থেকে মুড়ি আর মুড়কী খাচ্ছে একমনে। গালের ওপর চোখের জলের দাগটা তখনও স্পষ্ট। হাত-পা সারা অঙ্গ ধুলোয় মাখামাখি। তবু মুখখানার দিকে না তাকালে থাকা যায় না—যেন ধুলোর 'পরে সত্তঝরা একটা ফুল।

সেই মাতব্বর গোছের লোকটা এগিয়ে গিয়ে হাতটা ধরে তুলে আনলে মেয়েটাকে। ভাঙা ভাষায় অনেক কষ্টে সে বুঝিয়ে বললে মাদারকে—ওরা শুনেছে মাদার দয়াময়ী। আর শুনেছে মাদারের একটি অনাথশিশুর ইস্কুল আছে। তাই ওরা অনেক সাহস করে মাদারকে অনুরোধ করছে তিনি যদি দয়া করে এই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যান, তবে বড়ই ভালো কাজ করা হয়। মেয়েটা একটা আশ্রয় পায়। তা না হলে ওকে এই পরের দয়া সম্বল করেই বেঁচে থাকতে হবে।

প্রথমটায় কি করবেন ভেবে পান নি মাদার। পথের মাঝখানে এমন একটা গোলমাল—একটা ঝামেলায় পড়ে বেশ বিড়ম্বনা বলেই মনে হয়েছিল তাঁর।

কার মেয়ে ও?

এ প্রশ্নের উত্তরে লোকগুলো যা বলেছিল, তা একেবারেই যথেষ্ট নয়।

বলেছিল—একটা সন্ন্যাসী গোছের লোক নাকি ওই মেয়েটাকে সঙ্গে করে মাসখানেক আগে এইখানকার এই হাটে আসে। সঙ্গে তার আর একটা ছেলেও ছিল। তারপর সেই সন্ন্যাসী রাতারাতি কলেরায় মারা যায়।

ছেলেটা একটু বড়। অনেক চেষ্টা করে তাকে এখানকার জমিদার-বাড়ীতে একটা চাকরের কাজ জোগাড় করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মেয়েটা নিতান্তই বাচ্চা, ওকে মানুষ করবার মত সঙ্গতি এখানকার কারুরই নেই। এখানে থাকলে সামনের শীতে ওটা নির্ঘাত মারা পড়বে। নিছক মানবতাবোধেই মাদার এগিয়ে এসেছিলেন মেয়েটার কাছে।

শেষবারের মত জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তবু ওরা কোন্ ধর্মের লোক? কোন প্রদেশের থেকে এসেছিল এখানে? সে সব কিছুই জানো না তোমরা?

ওদের মধ্যে একজন বলে—হিন্দু হবে মেমসাব। ওরা হিন্দু। সন্ন্যাসীঠাকুররা তো হিন্দুই হয়।

আবার আর একজন বললে—ওরা বাংলাদেশের আদমি আছে মেমসাব। বাঙ্গালী আছে—বাংলায় বাতচিত করে। ছেলেটার নাম শুনিয়েছি—পানু চৌধুরী আছে। মেয়েটা কি বাংলা বোলে ওস্‌কী নাম সীমা রায়।

বলাবাহুল্য সেদিন ওদের দেহাতী হিন্দি বুঝতে মাদারের যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছিল।

আর কোন কথা বলেন নি মাদার। ধুলায় ধূসরিত মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন একেবারে। আশপাশের লোকগুলো অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর পানে।

আর সবার চেয়ে বিস্ময়ভরা চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল তাঁর কোলের মধ্যের ঐ মেয়েটা।

নামবার চেষ্টা করে নি, কেঁদে ওঠে নি এমন কী একটু ভয় পর্য্যন্ত পায় নি। উল্টে বরং লালামাখা হাতে মাদারের গলাটা জড়িয়ে ধরেছিল ভাল করে।

তারপর বাড়ী ফেরার পথে ঘোড়ার গাড়ীর দোলা পেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল মাদারের কোলের মধ্যে।

সেবারের মত বেড়ানোয় ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন মাদার।

সব চেয়ে বড় কথা ওকে বোর্ডিংয়ে ভর্ত্তি করে দিতে হবে। এত কাছে রাখা নীতিবিরুদ্ধ।

কর্ত্তব্যবোধে কলকাতায় এসে পুলিশের মারফতে ওর পরিচয় সম্বন্ধে পর্য্যন্ত তদন্ত করেছিলেন মাদার কিন্তু কোথায় কোন সূত্র পান নি।

পুলিশের মতে ঐ রকম সন্ন্যাসী শ্রেণীর মধ্যে এক ধরণের লোক দেখা যায় যারা বহুবিধ উদ্দেশ্যে এ রকম দু'টি ছোট ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে চলে আসে বহুদূর জনপদে। এবং দিনে দিনে তাদের নিজেদের নামধাম সমস্ত কিছু ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই সন্ন্যাসীটাও সম্ভবতঃ সেই দলভুক্ত হবে। কারণ অমন দীনদরিদ্র পরিবেশে এমন একটা সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে একান্ত অশোভন বলে মনে হয় নাকি? এর পরও দু' একটা কাগজে সীমার ছবি দিয়ে তার মা-বাপের খোঁজ করেছিলেন মাদার। কিন্তু কোনো জায়গা থেকে যখন একটা জবাবও এলো না, তখন বাধ্য হয়েই চুপ করে গিয়েছিলেন শেষ পর্য্যন্ত।

তাই অরফানেজেই রয়ে গিয়েছিল সীমা। ছোট্ট থেকেই বোর্ডিংয়ের স্বতন্ত্র বিছানায় শুয়ে সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে এসেছে। একদিনের তরেও কোনখানে নড়চড় হয়নি।

কিন্তু কোনদিন শীতকালে নাইট রাউণ্ডে বেরিয়ে সারি সারি ঘুমন্ত মেয়ের মাঝখানে ছোট্ট সীমার গায়ে ঢাকা কম্বলখানা যদি একটু গুছিয়ে ভালো করে ঢেকে দিয়ে থাকেন মাদার, তবে তাতেও কি পক্ষপাতের অপরাধ হয়েছে? যদি তা হয়েও থাকে, তবে ঈশ্বর জানেন তার থেকে মুক্তি পাবার কোন পথ মাদারের জানা ছিল না।

একদিনের কথা নয়, দিনে দিনে তিলে তিলে সুদীর্ঘ এই বোলটা বছরের পুঞ্জীকৃত মমতা একেবারে অস্বীকার করবার মত মনের জোর আজ এই জীবন-সায়াহ্নে আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন না মাদার সুপিরিয়র। এর জন্তে ঈশ্বর যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। তা ছাড়া এই মমতার জন্তে কি তিনি একাই সম্পূর্ণ দায়ী? এর জন্তে বারো আনা দায়ী সীমা নিজে।—মানে সীমার ওই আশ্চর্য সুন্দর স্বভাব। তা না হলে কত অনাথ ছোট ছোট মেয়েই তো এখান থেকে সীমার মত একটু একটু করে বড় হয়ে উঠলো চোখের সামনে—কিন্তু তবু কৈ? সীমার মত তো মমতা পড়েনি কারোর ওপরে। তার কারণ বোধ হয় এখানে এই এক পরিবেশে থেকেও ওরা সীমার মত কেউ হয়নি। এমনতর সহজাত ব্যক্তিত্বের একটি আভাস ওদের মধ্যে ফোটেনি। প্রতি কাজে প্রতি কথায় এত নিষ্ঠা এত গভীরতা তাদের স্বভাবের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। সীমা যেন ভালবাসা লুঠ করে নিতে জানে। স্কুলের বুড়ো দারোয়ান হতে সুরু করে স্কুলের প্রতিটি মেয়ে সীমাকে ভালবাসে। তবে? তবে আর মাদারের দোষ কি?

[ক্রমশঃ]

সংগীত শিক্ষা

রণেশ মুখোপাধ্যায়

ও কেনারাম, গান শুনবি? আয় না বাবা এখানে,
গান কারে কয় শিখিয়ে দেবো, দু'চোখ ভরে দেখে নে!
আ-সা করে তান ধরবি উল্টে দু'চোখ আকাশে,
তা-না-না-না-য় বিশটি মিনিট কাটায় যে ঠিক পাকা সে!
তান শুনছিস্? বাট্-সরগম? গমক? না, তাও শোননি?
এক দুই তিন, চার পাঁচ ছয়—মাত্রাটাও কি গোননি?
কণ্ঠ ছেড়ে গাইলে তবে উঠবে গলায় সুপুরি,
পেটের ভেতর সুর থাকে সব তুলবে টেনে ডুবুরি।
মগজ ফুঁড়ে সুরগুলো সব ঘুরবে ছুটি হাওয়াতে,
গোঁত্তা-মারা ঘুঁড়িতে হয় যেমন সুতো খাওয়াতে।
চিঁচ্-কাঁদুনে মিচ্‌কে-গলা কামারশালায় চাঁছিয়ে,
গাইতে গিয়ে গোকুল গোঁসাই সভায় এলো হাসিয়ে।
উলকো মাছের ফুলকো খেয়ে কোকিলের ডিম মিশিয়ে,
তেষট্টি দিন ভুগে বলাই মরালো গলা বিষিয়ে!
তাই বলি কি, মগজ ভরে বিদ্যে নে যা ঘরেতে,
হাত পা ছোঁড়া, শিরচালনা, এসব তো তার পরেতে!
উঠলি বড়ো? না শিখবি তো মিথ্যে কেন বকালি?
কষ্ট করে গান শেখাতে নষ্ট সারা সকাল-ই!

ছোট গল্প

শ্রীশান্তিময় ঘোষাল

গল্প লিখতে বসেছিল রমেন,—ছোট গল্প।

ছোট গল্পে রমেনের হাত ছিল বেশ, বাজারে চাহিদাও কম ছিল না, ছোট গল্প লিখেই রমেনের যত নাম, পয়সাও কিছু রোজগার হতো ; একটা কিছু লিখে নিয়ে গেলে কাগজের সম্পাদকেরা যা হয় কিছু আগামও দিত। তাতেই রমেনের বাজার খরচটা কোনও মতে চলে যেত। বাকী খরচগুলো উপন্যাস লিখেই চালাতে হতো তাকে। তবে উপন্যাস তো বেশী লেখা চলে না, সময়ও লাগে প্রচুর ; আর স্বত্ব বিক্রী করে যা পায় সে, তাতে অত খেটে মজুরী পোষায় না রমেনের। তার চেয়ে ছোট গল্পই ভাল ; নগদ গোটা কুড়ি টাকা পেতে খুব বেশী কষ্ট হয় না।

প্রথম জীবনে রমেন লিখতে শুরু করেছিল খানিকটা অন্তরের প্রেরণাতেই ; লিখেও ছিল প্রচুর, সত্যিকার দরদও ছিল লেখার মধ্যে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দরদ মেশান লেখা পরিবর্তিত হল সাংসারিক চাহিদা মেটাতে নিতান্তই অর্থ নৈতিক সঙ্কীর্ণতায়। যৌবনে পা দিয়েই রমেন লেখাকে জীবনের একমাত্র সম্বল করে নিয়েছিল, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সাধ তার কখনও ছিল না। রমেন এখন বদ্ধঘরের গুমোট কোণটায় বসে ভাবে, কামারশালের হাতুড়ী পেটা বুড়ো কামারটাও বোধ হয় তার চেয়ে সুখী। তার চেয়েও বেশী রোজগার করে। কেরাণীরাও মাসে একটা কিছু পায়, যা দিয়ে অন্ততঃ সারা মাসের দেনা মেটান কিছুটা সম্ভব। রমেন এই প্রৌঢ় বয়সেও আর কলম চালাতে পারে না ; উপায়ও নেই, কলম না ঘসলে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে উপোস করে করে মরতে হবে। রমেনের লেখার একমাত্র প্রেরণা এখন, যা হয় কিছু পেটে দিয়ে কোনও মতে বেঁচে থাকার তাগিদ।

লিখতে বসে কিছুতেই লেখা হচ্ছে না, না-না উদ্ভট সব চিন্তা রমেনকে ঘিরে ধরেছে। একটা লাইনও লিখতে পারছে না সে, অথচ না লিখে উপায়ও নেই। বার বার বেহুঁশ ছেলেটার দিকে চোখ পড়ে যাচ্ছে তার। ছেলেটার জ্বর হয়েছে আজ প্রায় হপ্তাহটাক হল। বার্লি কিনবারও পয়সা ছিল না, মুদি ধার বন্ধ করে দিয়েছে গত মাস থেকে। একটাও কাণাকড়ি আজ তার হাতে নেই ; বৌ-এর গহনা যা ছিল তাও শেষ হয়েছে। স্ত্রীর দিকে তাকাতেও আজ রমেনের লজ্জা হয়। উপন্যাস গত মাসে একটা বিক্রী হয়েছে তার, সামান্যই কিছু পেয়েছিল তা থেকে রমেন। এখনও কিছু বাকী আছে, সে টাকা রমেন এখন পাবে না ; বিক্রীর উপর কমিশন হিসাবেই সে টাকা পাওয়ার কথা আছে।

আবার বিক্ষিপ্ত চিন্তায় রমেনের মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। গল্পের কোনও চিহ্ন মনে এলো না তার। গল্প লেখার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় আরও খানিকটা বসে রইল সে।

রোগা ছেলেটার সামনে খাতা খুলে বসে থাকতে দেখে লতার হঠাৎ মাথাটা গরম হয়ে উঠলো, লতা ছুটে এসে খাতাটা ছুঁড়ে মেঝের উপর ফেলে দিল। চিৎকার করে বলে উঠলো—যাও না, বই-এর দোকানে দেখগে যদি কিছু জোটে, মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলেই গাছ থেকে টাকা ঝরবে না। সাহিত্য না ছাই !

মৌন রমেন চেয়ে রইল স্ত্রীর দিকে, কথা বলার ক্ষমতা তার ছিল না। কথা বাড়িয়ে অশান্তি সে অনেক বাড়িয়েছে, অনেক বুঝিয়েছে লতাকে ; কিন্তু কাজ হয়নি। সত্যিই তো লতার জীবনের সাধ-আহ্লাদ সবই ছিল, এক অকর্মণ্যের সঙ্গে তার জীবনটাকে নেহাৎই মূর্খের মত জড়িয়ে ফেলেছিল, প্রথমে বোঝেনি, সাহিত্যিক-এর স্ত্রী হওয়ার মর্যাদার লোভেই তখন তাকে পেয়ে বসেছিল ; তাই তো লতা রমেনকে বরণ করে নিয়েছিল। ভেবেছিল, মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে রমেনের অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছল্যও একদিন আসবে ; কিন্তু তা এলো না। মর্যাদা নিয়ে লতা আর বেশীদিন রমেনকে সহ্য করতে পারলো না। অর্থ তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল কয়েক বছরের মধ্যে। এর জন্যে অবশ্য রমেন লতাকে দোষ দেয় না। দৈনন্দিন অভাবই লতাকে অমানুষ করে তুলেছে।

গল্প লেখার সাধ সেদিনের মত মিটে গেল রমেনের। পা টেনে টেনে চলতে লাগলো সে কলেজ স্কোয়ারের দিকে মুখ করে। নতুন উপন্যাসখানার স্বত্ব যেখানে বিক্রী করেছে রমেন, তারা একটু ভদ্র, কম হলেও পাওনা টাকাটা প্রথমেই তারা রমেনকে দিয়েছিল। এইটুকুই শুধু আশা, কমিশনের টাকাটার একটা অংশ হয়তো তারা রমেনকে দান করবে। নিদেনপক্ষে এক কাপ চা-ও তো খেতে বলবে। ছেলেটা যে বাঁচবে না, এ রমেন জানে। জন্ম দিয়ে পাপ করেছে সে। পকেটে পয়সা না থাকলে বাপ হওয়ারও অধিকার থাকে না, এটা রমেন প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি।

রমেনকে দেখে চমকে উঠলো 'সাহিত্য প্রকাশিকা'র জাঁদরেল ম্যানেজার। মনে মনে বললে—নিশ্চয় আবার পয়সার জন্যে !

—এই যে রমেন বাবু, নমস্কার। কি মনে করে ? আপনার পাওনা-গণ্ডা তো চুকিয়ে দিয়েছি আগেই।

—জানি। ছেলেটার বড় অসুখ। কমিশনের একটা অংশ যদি আগাম দেন, একবার বাঁচাবার চেষ্টা করে দেখি !

—Sorry রমেনবাবু! আমরা কোনও ছ্যাঁচড়া কারবার করি না। বৈশাখের আগে কোনও পেমেন্ট আপনি পাবেন না।

—ফিরিয়ে দেবেন না ম্যানেজার বাবু। আপনার পায়ে ধরি ; যা হয় কিছু দিন, ভিক্ষে চাইছি। যা হয় কিছু দিন।

—ঝামেলা বাড়াচ্ছেন কেন ? আপনার অভাব কোনও দিন ঘুচবে না।

মায়ের মমতা ও
অষ্টারমিল্কে
প্রতিপালিত

—দয়া করুন !

—আমরা তো দান খয়রাত করতে বসিনি ।

—ফিরিয়ে দেবেন না ।

—আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল । হবে না মশাই । আমার অন্য কাজ আছে । ম্যানেজার নোট গুণতে বসেছিলেন, সারা দিনের আয়ের অংকটা দেখছিলেন, দেখা হল না, হিসাব মেলান রইল পড়ে, নোটের তাড়াটা ড্রয়ারে রেখে সেখান থেকে উঠে গেলেন ।

অপমানে লাঞ্ছনায় রমেন অপমানিত বা লাঞ্ছিত মনে করলো না ; সে এখন উন্মাদ, বিভ্রান্ত, মন তার অন্য পথ বেছে নিতে চায় । সৎপথে এতদিন তো জীবনটাকে চালাতে চেষ্টা করলো রমেন, কিন্তু পারলো না । এ পথে মানুষের মত বেঁচে থাকা সম্ভবও নয় । রক্ত নিংড়ান পয়সা, তাও ভিখারীর মত চেয়ে পায় না রমেন, অথচ তারই মত কত কত লেখকের লেখা বেচে আজ এরা অর্থের পাহাড়ে বসে আছে । এরাই সম্ভ্রান্ত ! ভদ্র ! মনুষ্যপদবাচ্য । আর যারা শিল্পী, জীবনের সব কিছু দিয়ে যা সৃষ্টি করলো, এদের কাছে তারও কোনও দাম নেই ! শিল্পের দাম না হয় না দিলে, কিন্তু শিল্পীকে এরা কুকুর বেড়ালের মত ঘৃণা করে ।

প্রথমে মনের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিল, তারপর সুযোগ বুঝে রমেন ড্রয়ারের সমস্ত টাকাটাই কাপড়ে বেঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো সাহিত্য প্রকাশিকার দরজা পেরিয়ে ।

তারপর আর কেউ রমেনকে দেখেনি, টাকাগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিল রমেন লতাকে,—ছেলেমেয়েকে মানুষ করে গড়ে তুলতে অনুরোধ করেছিল সে ।

লতার অবস্থা এখন ভালই । মেয়েটা কলেজে পড়ছে, ছেলেটা স্কুল ফাইনাল দেবে । প্রথম প্রথম লতা আর তার মেয়ে চিত্রাঙ্গদা রমেনের কথা খুব ভাবতো ; তারপর ধীরে ধীরে রমেন যেন কোথায় মিলিয়ে গেল । শুধু একদিন সেদিন চিত্রাঙ্গদা লতাকে এসে বললে, —"মা আমি অমিতকে কথা দিয়েছি ।" শুধু সেইদিন লতার চোখে জল এসেছিল, রমেনের কথা ভেবে । বিয়েতে অমত ছিল না লতার ; শুধু ভাবলো আজ যদি রমেন থাকতো । এদের সকলের সুখের জন্যে একজন আজ সব হারা । সাহিত্যিক রমেন মিত্র আজ ফেরারী ।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে । লতা রমেনের কথা আজ বড়বেশী করে ভাবছে । হঠাৎ কাঁচের সারসিতে কার যেন ছায়া এসে থামলো । লতা চমকে উঠলো । তারপর মৌন নিথর ।

চিত্রাঙ্গদা অমিতকে খুবই ভালবাসে । মনে মনে বরণ করে নেয় । আপত্তি নেই । নতুন যৌবনের প্রথম প্রেমের ছোঁয়া । দার্জ্জিলিং বেড়াতে গেল চিত্রাঙ্গদা পরীক্ষার পর, অমিতদের সেখানে একটা বাড়ী আছে । অমিতের মা-বাবা আর তার ছোট বোন মীনা তারাও গেছে । চিত্রাঙ্গদা অমিতকে সঙ্গে নিয়ে টাইগার হিল দেখতে গেল । প্রকৃতির এত রূপ ! দুজনে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল । হিমালয়ের কোলে সূর্যের প্রথম ছোঁয়ার মায়ায় । অমিত চিত্রাঙ্গদার হাতে ছোঁয়া দিল,—সূর্য্যের মত সত্যিই কি তুমি আমার ?

—আজও কি বিশ্বাস হয় না ?

—কথা দাও !

—দিলাম ।

ফাগুন মাস ! আগুন লেগেছে বনে বনে । চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অমিতের বিয়ে হয়ে গেল । নিস্তব্ধ রাত্রির নিশ্চুপ স্তব্ধতা ভেঙ্গে ভেঙ্গে মাঝে মাঝে বাসরঘরের মধুর রাগিণী ভেসে ভেসে আসছে লতার কানে । লতা আজ আবার নতুন করে ভাবছে রমেনকে । মনে মনে বলছে—আজ যদি একবারটি আসতে, যদি চিত্রাঙ্গদাকে একবার অন্ততঃ আশীর্ব্বাদ করে যেতে । জানালার কাঁচের সারসিতে আবার সেই রোগা লম্বা মূর্ত্তিটা ভেসে উঠলো । ছায়ায় ঘেরা বারান্দার কোণের এই ছায়ামূর্ত্তি দেখে লতা চিৎকার করে উঠলো ।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ ।

বাসরের মধুর রাগিণী বন্ধ হয়ে গেল । সবাই ছুটে এলো । প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে নিচের খোলা ড্রেণে পা পড়ে গেল । আর্ত্ত চিৎকার শোনা গেল । অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এলো লতার ।

সকলে ধরাধরি করে রমেনকে ঘরে নিয়ে এলো । বড় বড় চোখের চাহনিতে লতা চিনতে পারলো রমেনকে । রুগ্ন স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বললে,—তুমি এলে চিত্রাঙ্গদাকে আশীর্ব্বাদ করতে, আমিই বাদ সাধলুম । অনেক, অনেক অন্যায় করেছি । তুমি কী আমায় ক্ষমা করবে না ? শুধু একবার বল—'লতা, আমি তোমায় ক্ষমা করেছি ।' শুধু একবার চিত্রাঙ্গদাকে আশীর্ব্বাদ করে যাও ।

রমেন কথা বলতে পারলে না । অস্ফুট ভাষা ঠোঁটের কোণেই মিলিয়ে গেল । ঠোঁটটা একবার কেঁপে উঠলো । শুধু হাতটা তুললো রমেন । ইঙ্গিতে হয়তো ক্ষমা করলো লতাকে, আশীর্ব্বাদ জানাল চিত্রাঙ্গদাকে ।

তারপর ! এত আশা, এত কামনা, সাহিত্যিক জীবনের এত অধ্যবসায় সব স্তব্ধ ।

রাস্তার ধারে সানাইয়ের বিদায় মাধুরিমা তখনও শোনা যায় । আকাশের শেষ ধ্রুবতারাটা এখনও দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে ।

প্রত্যহ সে মরে যায়

চন্দ্রশেখর রায়

প্রত্যহ সে মরে যায় : মরে মরে বাঁচার বাসনা
ব্যর্থতার পচা গন্ধে আলগোছে তোলে প্রতিধ্বনি ।
অ-মৃতের ধ্যান ক'রে মৃত্যুঞ্জয় তপস্যার পানে
(কিছু ফল পেল কিনা) ভুলেও সে ফিরেও দেখে না ।

প্রত্যহ সে মরে যায়—স্মৃতি থাকে বাঁচার যন্ত্রণা ।
কামনার বহ্নি এঁকে চেয়ে থাকে মনের রমণী ।
সময় সারেঙ বাজে ছায়াচ্ছন্ন মৃত্যুর আহ্বানে ;
দ্বারদেশে মৃত্যু ওই ? মৃত্যুদূত কোথায় জানে না ।

মৃত্যুর তপস্যা করে : মরে মরে কঠোর কঠিন
বাঁচার বাসনা থেকে শোধ হয় সব রক্তঋণ ।

সাহিত্য দর্পণ (১ম খণ্ড)

আলোচ্য গ্রন্থটি এক মূল্যবান অনুবাদ কর্ম, মূল সংস্কৃত থেকে বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে অনুবাদকদ্বয় এই দুরূহকর্ম সাধন করেছেন। সাহিত্য বলতে কি বোঝায় এ সম্বন্ধে অতীতে যে অভিমত গৃহীত হয়েছিল, আলোচ্য গ্রন্থে তার আভাষ পাওয়া যায়। সাহিত্য-দর্পণের মূল রচয়িতা গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য কথাটিকে ব্যবহার না করলেও গ্রন্থের নামকরণ করতে সাহিত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। এ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, সাহিত্য বলতে যে কোন রসাত্মক রচনাকেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ; কাব্যই যে সাহিত্যের প্রধানতম সংজ্ঞা, তাঁর রচনা সেই তথ্যই প্রকাশ করে। এই গ্রন্থে অলঙ্কারসহ সমগ্র দৃশ্যকাব্য বা নাট্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের এক প্রামাণ্য পরিচয় বিধৃত হয়েছে এতে এবং সেজন্যই সাহিত্যানুরাগী ও শিক্ষার্থী এই উভয়বিধ পাঠকের কাছেই বর্তমান গ্রন্থটি সমাদৃত হবে। অনুবাদকদ্বয় অতিশয় শ্রম ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই দুরূহ কর্মে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মূল গ্রন্থের অনেক অস্পষ্টতাই তাঁদের দ্বারা খণ্ডিত হয়ে গ্রন্থটিকে আরও মূল্যবান করে তুলেছে। অনুবাদের ভাষা রীতিও বিষয়বস্তুকে আরও বিকশিত করে তুলেছে, অনুবাদ অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল যা যে কোন অনুবাদ কর্মেরই সার্থক হয়ে ওঠার মূল সূত্র। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রেরই কাছে গ্রন্থটি যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই রুচিসঙ্গত। বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত। অনুবাদক—অবন্তীকুমার সান্যাল ও গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—আট টাকা।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

Rules and forms under The Companies Act

ব্যবসা-জগতের অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান এক দলিল বলেই বোধ হয় আলোচ্য গ্রন্থটির সম্যক পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। ব্যবসায়িক কর্মজগতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গেলে বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত সূত্রগুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন। এতে কোম্পানী আইনের সব ক'টি ধারা ও নির্দেশনামা যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। ব্যবসায়িক জগৎ সম্বন্ধে তথ্যবহুল এই অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থটিকে অনুসন্ধিৎসু ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই যে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ ; বস্তুতঃ কর্মজগতের এক বৃহৎ অংশের অংশীদারগণের কাছে এই গ্রন্থটি প্রামাণ্য বলেই গৃহীত হবে। আমরা এরূপ প্রয়োজনীয় একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। Published by Finance and Commerce, 134/1, Mahatma Gandhi Road, (3rd Floor, Room No 54) Cal-7. Price Rs. 12·50 nP.

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

যাঁদের বিজ্ঞানসাধনা সারা পৃথিবীকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, জ্ঞানবিজ্ঞানে পৃথিবীকে ভরিয়ে তোলার মহান সাধনায় যাঁদের জীবন উৎসর্গীত, বিজ্ঞানের সাধনার মাধ্যমে জগতের কল্যাণসাধন যাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র মনীষী অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ সালে এই মনীষী ৭৬ বছর বয়েসে লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর এই ৭৬ বছরের জীবন সাধনা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের গৌরবময় ইতিহাস। ক্যাথারিন ওয়েনস পেয়ার রচিত কিশোরদের উপযোগী গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল এই কর্মীশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাধকের জীবনকাহিনী বাঙলায় অনুবাদ করেছেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় তাঁর দক্ষতা সর্বজনবিদিত। তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক লেখাগুলি যেমনই সুখপাঠ্য তেমনই সারগর্ভ। আলোচ্য গ্রন্থটিও তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের জীবনে এই জাতীয় গ্রন্থের তাৎপর্য অপরিসীম। তাদের জীবনগঠনে এর সহায়তা মূল্যবান। এই সকল মহান জীবনের আদর্শ ভবিষ্যতের মানুষদের জীবনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাদের জীবন আলোকিত করে তুলতে পারে। সহজ প্রাঞ্জল ও মনোরম ভাষায় সুলিখিত এই গ্রন্থটি পাঠক-পাঠিকার দরবারে যথোচিত সমাদর পাবার দাবী রাখে। গ্রন্থটির ভূমিকা রচনা করেছেন বর্তমান ভারতের অন্যতম বৈজ্ঞানিক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, গান্ধী রোড। দাম—দুই টাকা মাত্র।

সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (২য় খণ্ড)

ঊনবিংশ শতকে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ হয়, তার মূর্ত প্রকাশ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার এক সমন্বয় ঘটানই ছিল সে দিনের মনীষীবৃন্দের আন্তরিক অভিলাষ। এই সমন্বয় সাধনের অন্যতম প্রচেষ্টা রূপেই সেদিন জন্মলাভ করে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। প্রাচ্য সংস্কৃতির মূল ধারায় শিক্ষাদান ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে সংস্কৃতের মাধ্যমে প্রচার করা, এই উভয়বিধ কর্মধারাই গৃহীত হয়েছিল সংস্কৃত কলেজের পরিচালকগণের দ্বারা। দেশের সাংস্কৃতিক জাগরণে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান তাই অমূল্য। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এই

হয়েছে। নিষ্ঠা ও শ্রমের সঙ্গে লেখক এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে যে সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাকে প্রামাণ্য বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই মূল্যবান প্রামাণ্য গ্রন্থটিকে যথাযোগ্য সমাদর করবেন বলেই আমরা আশা করি। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই ক্রটিহীন। লেখক—শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য। প্রকাশক—সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা। ১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ দাম—দুই টাকা মাত্র।

শত সহস্র জিজ্ঞাসা

সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তকের সরল বঙ্গানুবাদ আলোচ্য গ্রন্থটি। বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অপরিসীম। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অসংখ্য বস্তুর মধ্যেও যে জানবার মতন অনেক তথ্যই লুকিয়ে আছে সে বিষয়ে আমাদের সম্যক সচেতনতা নেই, বর্তমান রচনায় সেই নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের বাড়ীর ছোটখাট সব জিনিষেরই যে একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, সুন্দর ভাবে সেই নিয়েই আলোচনা করেছেন লেখক। লেখকের মুন্সীয়ানায় এই অতি সাধারণ বিষয়বস্তু ও গল্পের মতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা বইটি-পাঠে-উপকৃত হবেন বলেই আমাদের ধারণা। অনুবাদিকার ভাষা সহজ ও সাবলীল বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করতে যা একান্ত সহায়ক। ছাপাই বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—এম• ইলিন, অনুবাদিকা—প্রতিভা গাঙ্গুলী, প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাইভেট লিমিটেড, ১২বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম দুই টাকা পঁচিশ ন: প:।

ইতশ্চেতঃ

ব্যঙ্গরসাত্মক এই রচনা সংগ্রহের আবির্ভাব ঘটেছিল প্রথম যুগান্তর পত্রিকার সাময়িকী বিভাগে ধারাবাহিক ভাবে। চলতি সংবাদের উপর লঘু ও গুরু এই উভয়বিধ রচনাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরস চুটকী জাতীয় এই রচনাগুলিতে সাহিত্য, সমাজনীতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ই রচয়িতার দ্বারা আলোচিত হয়েছে এবং আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যে তিনি সম্যক অবহিত একথাও অস্পষ্ট নেই! তীক্ষ্ণ অথচ সরস বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের দ্বারা তিনি সমকালীন সাহিত্য, সমাজনীতি ও বিজ্ঞানের যে ছবিটি পাঠকমনে ফুটিয়ে তোলেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। চলতি ঘটনার অনেক সরস দিক চিরতরেই সংবাদপত্রের পাতায় বিলুপ্ত হয়ে যায়, এককলমীর রচনাসমূহকে গ্রন্থাকারে গ্রথিত করে প্রকাশক অন্তত তার কিয়দংশকে রক্ষা করেছেন এবং এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হও। বাংলা রসসাহিত্যের ভাণ্ডারে আলোচ্য গ্রন্থটি যে এক উল্লেখ্য সংযোজন একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায়। প্রচ্ছদ রুচিশোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—কলমী। প্রকাশক—রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ দাম—ছয় টাকা।

মিলন মধুর রাতি

সাম্প্রতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ যে ক'টি নাম বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, অনন্যতায় চিহ্নিত, 'প্রাণতোষ ঘটক' তারই অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই কথাশিল্পীরই এক অধুনাতম রচনা। কাহিনীর বয়ানে এক নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়, একদিক থেকে দেখলে রহস্য রোমাঞ্চ জাতীয় রচনারই অন্তর্ভুক্ত করা চলে বর্তমান গ্রন্থটিকে, আবার নিপুণ চরিত্রচিত্রণে ও মানবিক আন্তরিকতায় বিশেষ বিশেষ জায়গা এতই উজ্জ্বল যে সার্থক কথাশিল্পেরই এক সংহত রূপ ধরা দেয় যেন। রচনাটির সব চেয়ে বড় সম্পদ এর ভাবারীতি, সমৃদ্ধ মধুর ও চিত্রধর্মী এই শৈলীই যেন এর মূল প্রাণসত্ত্বা, লেখককে ভাষার যাদুকর বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। চরিত্রচিত্রণেও মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন লেখক, ছোট ছোট চরিত্রগুলিও দাগ কাটে পাঠক মননে। উপভোগ্য এক রচনা বলেই যে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে একথা সহজেই বলা যায়। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—প্রাণতোষ ঘটক। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা পঁচিশ ন: প:।

যাদু কাহিনী

যাদুবিদ্যা বা ইন্দ্রজাল বহুকালাবধি পৃথিবীর সর্বত্রই লোক-মনোরঞ্জন করে আসছে, এই বিদ্যাকে পেশা করে বহু মানুষই যশ, খ্যাতি ও সম্পদের চাবিকাঠিটি করায়ত্ত করেছেন সর্ব দেশেই, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই যাদুবিদ্যা তথা যাদুকরদের সম্বন্ধেই কয়েকটি বিস্ময়কর কাহিনী পরিবেশন করেছেন। পৃথিবীখ্যাত কয়েকজন যাদুকরের বিচিত্র জীবনধারা ও কর্মের যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে তা, যেমন কৌতুকাবহ তেমনই বিস্ময়কর। আলোচ্য বিষয়ে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁর রচনা একাধারে কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। কাউন্ট ক্যালিওস্ট্রো, অদ্বিতীয় হ্যারি হুডিনি, যাদুকর গণপতি, শীর্ষক রচনাগুলি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। যাদু জগতের এক বিচিত্র রম্যকাহিনী হিসাবেই সমাদৃত হওয়ার যোগ্য তাঁর রচনা, বস্তুত: এই বিশেষ বিষয়বস্তু অবলম্বনে তাঁর আগে বোধ হয় আর কোনও সাহিত্যকর্মীই কোন প্রচেষ্টা করেননি। লেখকের শৈলী বিশেষ আন্তরিক, বিষয়বস্তুকে যা প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আমরা বর্তমান গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক ক্রটিহীন। লেখক—অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব)। প্রকাশক—রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—আট টাকা।

যতদূরেই যাই

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি আধুনিক কাব্য পুস্তক। কবি কয়েকটি সুন্দর কবিতার মাধ্যমে তাঁর অন্তরের আকুতিতে সুষ্ঠু ভাবেই রূপায়িত করেছেন। আশ্চর্য বলিষ্ঠ তাঁর প্রকাশ ভঙ্গী, জীবনের যত মূঢ়তাকে ব্যঙ্গ করার ভঙ্গীতেও তিনি কত সরল কত ঋজু। জীবনের অকৃপণ দাক্ষিণ্য হৃদয়বত্তা থেকে বঞ্চিত জনের প্রতিও তিনি সহজভাবেই বলতে পেরেছেন, "লোকটা জানলই না," এই আক্ষেপই কবির হৃদয়ে প্রধান। দরদী মনে তাঁর একমাত্র আক্ষেপ দু আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে যে জীবন অবিরতই খসে পড়ছে তার জন্য, জীবন বঞ্চিত মানুষের আর্তিই তাই তাঁর কাব্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আর্তিই তাঁর শেষ কথা নয়, মানবতার উপাসক কবি বিশ্বাস করেন যে মানুষ বাঁচবে, সব বাধা সব বিপদ অতিক্রম করেও তারা আবার তুলে ধরবে তাদের অমলিন ভালবাসাকে সগর্বে, সমস্বরে বলে উঠবে "আমরা জেগেছি।" সৌন্দর্যে বলিষ্ঠতায় কবিতাগুলি প্রকৃত উপভোগ্য, আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থান পাওয়ার যোগ্য। এর প্রচ্ছদ

শোভন, অপরাপর আঙ্গিকও ভাল। লেখক—সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

চক্ষে আমার তৃষ্ণা

আলোচ্য উপন্যাসটি প্রখ্যাতা লেখিকার অধুনাতম গ্রন্থ; সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিশেষ দিগদর্শনের জন্য তিনি চিহ্নিতা, বর্তমান রচনাও সেই ধারার অনুসারী। এক অতৃপ্তা রমণীর যৌবন বেদনাকেই অতি দক্ষতার সঙ্গে রেখায়িত করেছেন লেখিকা এই গ্রন্থে। অতৃপ্ত কামনার, তীব্র তৃষিত আকাঙ্খার নিপুণ চিত্রায়ণে, বিস্ময়কর পরিবেশ সৃষ্টিতে এক বিচিত্র জগতের দ্বার খুলে গিয়েছে পাঠকের সামনে। বিদেশী নায়িকার প্রবল তৃষ্ণা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যেন শিহরিত হয়ে ওঠে পাঠক অন্তর। প্রেমের এক বিশিষ্ট রূপ এখানে উদ্‌ঘাটিত, যার তীব্রতা যার জ্বালা বিস্ময়কর রূপেই অনন্য। ধরা ও অধরা এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জগতের রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে—চক্ষে আমার তৃষ্ণায়, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে সাহিত্যের অঙ্গনে এক নূতন ভাবধারার পরিচয়বাহী বলে চিহ্নিত করা যায় এই রচনাকে। তীব্র অনুভূতি সঞ্জাত ভাবাবেগ কাহিনীর প্রাণসত্তা, আর মননশীলতার স্বাক্ষরে তার আবেদন অতি প্রবল। লেখিকার শক্তিশালী শৈলী এ রচনার অন্যতম প্রধান সম্পদ, সমৃদ্ধ তীক্ষ্ণ ও বেগবান এই ভাষারীতি সত্যই অতুলনীয়। আমরা এই রচনার সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ ইঙ্গিতময়, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখিকা—বাণী রায়। প্রকাশক—রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—ছয় টাকা।

সূর্য গ্রহণ

অতীতে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ বহুলোকের মনে এক অন্ধ ভীতির সঞ্চার করত, এ সম্বন্ধে নানারকম কুসংস্কারও প্রচলিত ছিল, প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আদিম মানুষের অজ্ঞতাই তার কারণ, কিন্তু বিজ্ঞানের আলো যখন এ সমস্ত ব্যাপারের রহস্য উদঘাটিত করে দিল তখন মানুষ বুঝল জানল সূর্য-চন্দ্র গ্রহণে অবিশ্বাস্য বা অপ্রাকৃত কিছুই নেই এবং স্বভাবতঃ তার মনে জেগে উঠল এক বৈজ্ঞানিক অভীপ্সা। সৌরজগৎ সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবাহী পুস্তিকাটি সেই অভীপ্সারই পরিপূরক। বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদিত এই রচনাতে সূর্যগ্রহণের রীতি ও প্রকৃতি অত্যন্ত সহজভাবে বর্ণিত হয়েছে, যে কোন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষেই এ বই পড়ে সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব। মূল রুশ থেকে অনুবাদ করেছেন বিনয় মজুমদার, অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও সবল। আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—অধ্যাপক ভতভিয়েব ওগানিরেজফ্‌, প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—এক টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

তারকার মৃত্যু ও কালরাত্রি

রহস্যমূলক রচনার রচয়িতা হিসেবে অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঠক সমাজে সুপরিচিত। এককালে তাঁর সম্পাদিত রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ পাঠক সমাজে এক বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। তারকার মৃত্যু ও কালরাত্রি নামক তাঁর দুটি রহস্যকাহিনী একত্রিত হয়ে গ্রন্থরূপ গ্রহণ করেছে। কাহিনী দুটি লেখকের রহস্যসৃষ্টির অসামান্য ক্ষমতার আশ্চর্য নিদর্শন। প্রথমটি কয়েকটি হত্যা কাহিনীর রহস্য সন্ধান ও দ্বিতীয়টি এক প্রাচীন রাজপরিবারের এক আশ্চর্য চরিত্রের বংশধরের বিচিত্র কাহিনী। পরিবেশ গঠনে, কাহিনী বিন্যাসে এবং রহস্যের গ্রন্থিমোচনে লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রহস্যকে ঘনীভূত করে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতার ছায়া বিদ্যমান। কৌতূহলোদ্দীপক ও শ্বাসরুদ্ধকারী ঘটনাগুলির যথাযথ সংস্থাপনে, চরিত্রগুলির যথাযোগ্য পরিচর্যায় গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। লেখকের রচনারীতি ও বর্ণনাভঙ্গী মনোরম। রহস্যকাহিনী যাঁদের প্রিয় পাঠ্যবস্তু এ গ্রন্থটি তাঁদের অনেকখানি আনন্দ দেবে। প্রকাশক—গ্রন্থপীঠ ২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—এক টাকা আশী নঃ পঃ মাত্র।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড

সাধারণ কান্না-হাসির দোলা-জাগানো মামুলী এই প্রেমের উপন্যাসটিতে সাধারণ পাঠকের মনোহরণ করার মত বেশ কিছু উপাদান আছে। নায়ক এক অস্থিরচঞ্চল যুবক, পথ তাকে ডাক দেয় ইশারায় বারবার, আর এই মুশাফির জীবনে যে সব প্রেমের আহ্বান তার কাছে পৌঁছয়, তাই নিয়েই গড়ে উঠেছে কাহিনী। উপন্যাসের মূল নারীচরিত্র ময়না নানা কারণেই উল্লেখ্য। পেশায় দেহজীবিনী হলেও ময়না যে কল্যাণী নারীরই মূর্ত প্রতীক, এ কথাটাই লেখকের মূল বক্তব্য। এই চরিত্রটির রূপায়ণে তিনি যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সেজন্যই ময়না পাঠকের যথাযোগ্য সহানুভূতি লাভেও বঞ্চিতা হয় না। লেখকের ভাষারীতি সহজ ও সাবলীল, কাহিনীর গতি অব্যাহত রাখতে যা সহায়তা করে। বইটির আঙ্গিক সম্বন্ধেও অনুযোগ করার কিছু নেই। লেখক—শৈলেশ দে। প্রকাশক—বাক্‌-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

ঝিকিমিকি জোনাকি

রহস্য ও রোমাঞ্চ কাহিনীর বিভাগটি উন্নাসিক সাহিত্যের দরবারে এ যাবৎ প্রায় অপাংক্তেয় হয়ে থাকাতে বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটি যথাযথ পরিণতি লাভ করতে পারেনি আজও। সুখের বিষয়, সাম্প্রতিককালে বহু সাহিত্যিকই এ বিষয়ে মনোযোগী হয়ে উঠেছেন ও বহু নতুন মুখের দেখা পাওয়া যাচ্ছে এই বিভাগে। আলোচ্য গ্রন্থের নবীন লেখকও তাঁদের অন্যতম। ইতিপূর্বেই আরও যে কয়েকটি রহস্য-রোমাঞ্চ জাতীয় কাহিনী ইনি পরিবেশন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থটিও সেই জাতীয়। কাহিনীর বয়ানে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় রয়েছে। ধাপে ধাপে রহস্যের জাল বুনে শেষে পাঠককে চরম পরিণতি সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তোলার ক্ষমতাও তাঁর করায়ত্ত। সাহিত্যের এই আপাত উপেক্ষিত বিভাগটি যে বর্তমান রচনাকারের সম্যক অবহিতি লাভ করেছে এটা সত্যই আনন্দের বিষয়, কারণ পাঠক সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ এই ধরণের কাহিনীতে আসক্ত, বাংলা ভাষায় ভাল গোয়েন্দা কাহিনীর অভাবটা তাঁদের কাছে খুব সান্ত্বনাদায়ক নয়। লেখকের ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। বইটির আঙ্গিক, ছাপা, ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ, ৫।১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯ দাম—দুই টাকা পঁচাত্তর নঃ পঃ।

পঞ্চাশোর্দ্ধ্বে বাঙালী—মনীষী-মেলা

॥ নির্দেশ-চিত্র ॥

শিল্পী—রেবতীভূষণ ঘোষ

সর্ব্বশ্রী (১) মন্মথ রায় (২) রাধারাণী দেবী (৩) হারীতকৃষ্ণ দেব (৪) অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (৫) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (৬) সত্যেন্দ্রনাথ বসু (৭) কুমুদরঞ্জন মল্লিক (৮) কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (৯) প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর (১০) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১১) লেডী রাণু মুখার্জ্জি (১২) নরেন্দ্র দেব (১৩) যামিনী রায়, শিল্পী (১৪) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৫) কৃষ্ণধন দে (১৬) পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৭) প্রবোধকুমার সান্যাল (১৮) কালিদাস রায়, কবিশেখর (১৯) তুষারকান্তি ঘোষ।

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদেব তখন থাকেন শান্তিনিকেতন ভবনের দোতলায়। তাঁর খাবার আসে, হেমলতা দেবীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়ে নীচু বাংলা থেকে। জ্যোৎস্না দেবীর জননী কাশী রওনা হয়ে যাবার পর সেই রাত্রেই গুরুদেবের পরিচারক এসে বলে,—দাদাবাবুর খাবার চাই। কোথায়? না শান্তিনিকেতন ভবনে। রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত জ্যোৎস্না দেবী ভাবলেন,—কি জানি, দাদা হয়ত কোন কারণে আটকে গেছেন শান্তিনিকেতন ভবনে, আজ সেখানেই খাবেন। তাড়াতাড়ি যা রান্না করেছিলেন, সব গুছিয়ে পরিচারকের হাতে দিলেন, এবং মা যাবার আগে যে চমচম তৈরী করে রেখে গিয়েছিলেন, তা থেকে চারখানা দিলেন।

একটু বাদেই বাড়ী আসেন সন্তোষ বাবু, এসেই বলেন—ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে, খাবার দাও।

বোনেরা অবাক! জ্যোৎস্নার দিদি বলেন—একটু আগে যে তোমার খাবার কাকাবাবুর চাকর এসে নিয়ে গেল, তুমি খাও নি?

সন্তোষ বাবু বলেন,—সে কী? আমি ত সেখানে ছিলাম না,—তাহলে হয়ত কোন ভুল হয়েছে; যাক—কাল জানা যাবে।

পরদিন গুরুদেব সকালবেলা এসে উপস্থিত। এসেই বলেন,—কাল রাত্রে বেশ একটা মজা হয়েছে। নূতন চাকরটি নীচু বাংলাকে নূতন বাংলা শুনে, তোমাদের এখান থেকে আমার রাত্রের খাবার নিয়ে গেছে। আমি চমচম খেয়েই বুঝতে পেরেছি, আমার বৌঠানের হাতে ছাড়া এমন চমচম হয় না; তখন দাসচন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সত্য তথ্যটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তারপর কৌতুক-হাস্যে বলেন,—তা বৌঠান কোথায়?

সন্তোষ বাবুর স্ত্রী শৈল বলেন,—তিনি পালিয়েছেন।

বিস্মিত গুরুদেব বলেন, কোথায়?

—কাশীতে।

উপর্য্যুপরি বিস্ময় একটু প্রশমিত হলে গুরুদেব বলেন,—আচ্ছা, কাল রাত্রের খাবার কে তৈরী করেছিল? সকলে জ্যোৎস্নার নাম বলায় তাঁর দিকে ফিরে বলেন,—খাসা রেঁধেছিলি ত? রুটিগুলো খুব নরম হয়েছিল, তা কাল থেকে রাত্রের খাবারটা তুই-ই আমাকে করে পাঠাস্; তবে কালকের খাবারের চেয়ে পরিমাণে অনেক কম দিস্। তা চমচমও কি তুই করেছিলি?

জ্যোৎস্না,—না, মা যাবার আগে আমাদের জন্য করে রেখে গিয়েছিলেন।

গুরুদেব স্মিতহাস্যে বলেন,—দেখলি? আমি কেমন বৌঠানের রান্না চিনতে পারি!

বন্ধুর তৃতীয়া কন্যাটিকে গুরুদেব বড়ই ভালবাসিতেন, অবশ্য তাঁর ভালবাসা সূর্য্যকিরণের মতই সকলের উপরে সমভাবে বর্ষিত হত। জ্যোৎস্না দেবী জ্ঞানোন্মেষের পর যখনই শান্তিনিকেতনে থাকতেন, প্রতি সন্ধ্যায় গুরুদেবের নিকট যেতেন। তখন সেখানে শান্তিনিকেতনের শিক্ষকবৃন্দ এবং আরও অনেকে আসতেন ও নানা আলাপ আলোচনা চলত। জ্যোৎস্না দেবী অনেক সময়ই গিয়ে গুরুদেবের পায়ের কাছটিতে—নীচে বসতেন ও পায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। যদিও গুরুদেব কারও কোনো সেবা নেওয়া অথবা পায়ে হাত দেওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না, তবুও জ্যোৎস্নার সেবায় তিনি আপত্তি করতেন না, বরঞ্চ পা দুখানি আরও প্রসারিত করে দিতেন। তেমনি একদিন, একটি স্বল্প-পরিচিতা মহিলা এসে স্থান গ্রহণ করলেন জ্যোৎস্না দেবীর পার্শ্বে। তিনি সে সভার বড় বড় আলোচনায় কান না দিয়ে খুব মৃদু স্বরে জ্যোৎস্না দেবীকে,—তিনি কে, রোজই এখানে আসেন কিনা, প্রভৃতি নানা জিজ্ঞাসাবাদ করে বললেন, আপনার সঙ্গে গুরুদেবের কত দিনের আলাপ? জ্যোৎস্না দেবী হঠাৎ কোনো জবাব দিয়ে উঠতে না পেরে একটু স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

গুরুদেব শিক্ষকদের সঙ্গে অন্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকলেও মৃদুস্বরের ঐ প্রশ্নটি তাঁর পরিষ্কার কর্ণগোচর হয়। জ্যোৎস্নাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেন,—চুপ করে রইলি যে? বল না, তোর সঙ্গে আমার কতদিনের আলাপ?

জ্যোৎস্না মাথা চুলকে বললেন,—কি জানি, মনে পড়ছে না।

গুরুদেব বলে উঠলেন, আমি বলব? তোর সঙ্গে আমার পরিচয় তোর তিন মাস বয়সের সময় থেকে। তখন যা তোর রূপ ছিল তা বর্ণনা করা যায় না।

পার্শ্বস্থিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—একথা কেন বললেন? বলুন আমাদের প্রকাশ করে।

গুরুদেব হাসতে হাসতে বলেন, ঠিক যেন দার্জ্জিলিঙের ভুটিয়া কুকুরের ছানা,—বড় বড় ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখে কুতকুত করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। বর্ণনা ও উপমা শুনে সকলে হেসে অস্থির।

একবার গুরুদেবের পা ফুলেছে। অনেক চিকিৎসায়ও ভাল হচ্ছে না,—কয়েকদিন ভাল থাকেন, আবার পা ফুলে ওঠে। তিনি জ্যোৎস্না দেবীর মাকে বললেন, বৌঠান, পা ফোলার জ্বালায়

অস্থির হয়ে উঠেছি, আপনি কিছু ওষুধ বলতে পারেন? জানেন কিছু টোটকা-নাটকা?

শ্রীশবাবুর স্ত্রী বললেন,—জানি একটা দেশী ওষুধ,—ভাটপাতার রস আর খড়ি গুলে গরম করে প্রলেপ দিলে সারতে পারে। তখন সমস্যা—করে কে? গুরুদেব তখন উত্তরায়ণের আদি খড়ের বাড়ীতে থাকেন একাকী; একমাত্র সাধু চাকর সম্বল।

জ্যোৎস্না দেবী সাগ্রহে বললেন,—রোজ দুপুরে গিয়ে আমি কাকাবাবুর পায়ে প্রলেপ দিয়ে আসব। গুরুদেব তাঁর পিঠ চাপড়ে চলে এলেন।

পরদিন ওষুধ তৈরী করে জ্যোৎস্না দেবী গিয়ে দেখেন, সাধু দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় অচেতন,—গুরুদেব লেখায় মগ্ন। প্রলেপটি গরম গরম মালিশ করে লাগানোর বিধি; গরম করার জন্য চাই একটি দেশলাই। ঘরের এদিক ওদিক সন্ধান-রত জ্যোৎস্নাকে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন,—খুঁজছিস্ কী?

জ্যোৎস্না—দেশলাই।

গুরুদেব—দেশলাই? আমার ঘরে তুই খুঁজছিস্ দেশলাই! আমি কি সিগারেট খাই, না তামাক খাই, যে আমার ঘরে দেশলাই থাকবে?

তখন মুস্কিলে পড়ে জ্যোৎস্না দেবী রন্ধনশালা খুঁজে অনেক কষ্টে একটি দেশলাই যোগাড় করে, কাগজ পুড়িয়ে ওষুধটি গরম করে গুরুদেবের পায়ে প্রলেপ দিলেন।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন,—কোথায় পেলি দেশলাই?

জ্যোৎস্না,—রান্নাঘরে তাকের ওপর।

গুরুদেব—সর্ব্বনাশ! সাধুর সম্পত্তিতে হাত? ও যখন উনুন ধরাতে গিয়ে দীপ-শলাকা খুঁজে পাবে না, তখন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। আর তুইও ত একটি আস্ত ডাকাত। জিনিষ সাধুর—সাধুকে প্রত্যর্পণ করে যেও কিন্তু সাধু-মনে।

তারপর থেকে জ্যোৎস্না দেবী বাড়ী থেকেই নিয়ে যেতেন দেশলাই, ও বেশ কিছুদিন এ ভাবে মালিশ ও প্রলেপের পর গুরুদেবের পা ফোলা সেবারের মত একেবারেই সেরে যায়।

একদিন মালিশের সময় দেখা করতে আসেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা রমা দেবী। তিনি জ্যোৎস্নাকে পায়ে মালিশ করতে দেখে বলেন,—রবিদা, আমরা আপনার একটু পা টিপে দিতে চাইলে কিছুতেই রাজী হন না, আর এখন জ্যোৎস্নাকে পা ছেড়ে দিয়ে ত বেশ চুপ করে বসে আছেন?

গুরুদেব হাসিমুখে বলেন—আরে ও যে ডাকাত! ওর হাত থেকে কি আমার রেহাই পাবার উপায় আছে?

একদিন গুরুদেব জ্যোৎস্না দেবীকে তাঁর একটি কবিতা পড়ে শোনান ও মতামত জিজ্ঞাসা করেন; কবিতাটির নাম নিষ্ফল উপহার, তার প্রথমটা— নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল
ঊর্দ্ধে পাষাণ তট শ্যাম শিলাতল

আগের লেখা প্রথম লাইনটি বদলে তিনি লেখেন,—'নিম্নে আবর্ত্তিয়া ছুটে যমুনার জল'।

জ্যোৎস্না দেবী শুনে বলেন,—না কাকাবাবু, আমার ভাল লাগছে না, আগেরটাই ছিল সুন্দর।

গুরুদেব বললেন, কেন? কেন তোর ভাল লাগছে না? পরেরটিও ত সুন্দর।

জ্যোৎস্না দেবী বলেন, না, আমার কানে ওটা মোটেই সুন্দর লাগছে না।

গুরুদেব হাতের খাতাখানা দিয়ে তাকে মৃদু এক ঘা মেরে হেসে বলেন—অ্যাঁ! পৃথিবীর মানুষ আমাকে মহাকবি বলে স্বীকার করেছে, আর তুই বলবি, আমার লেখা ভাল লাগছে না? কেন লাগছে না তা বল।

জ্যোৎস্না দেবী বলেন, পূর্ব্বের লেখা ছত্রে যমুনার যে একটি সুন্দর চিত্র মনে ভেসে ওঠে,—পরেরটিতে তা হয় না, আর শব্দ-বিন্যাসও আগেরটিরই সুন্দর মনে হয়।

কবিতাটি দুই রূপেই প্রকাশিত হয়। মেয়েরা পড়াশোনা করে গুরুদেব চিরকালই তা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। অনেক দিন পর জ্যোৎস্না দেবী শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে বলতেন,—এই ত্যাখ, তোর অনেক খোরাক জমিয়ে রেখেছি,—বলে দেখাতেন, টেবিলের উপরের এক রাশ মাসিক, সাপ্তাহিক, গল্পের বই, যা তিনি সাহিত্যিকদের কাছ থেকে সর্ব্বদাই উপহার পেতেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু রঙ্গ করতেও ভুলতেন না। বলতেন—আজই নিয়ে যা ঐ সের দশেক মাল আমার টেবিল থেকে।

জ্যোৎস্না দেবী বলেন, আচ্ছা নেব।

—কি করে নিবি?—

—কিছু কিছু করে নিয়ে যাব।

—না, তা হবে না, একবারে নিতে হবে,—

—তাহলে বারান্দায় নিয়ে রাখব, সেখান থেকে আস্তে আস্তে নেব।

—উঁহু, তাও হবে না, তোর জন্য অনেক দিন ওগুলো জমা আছে; একবারে এখনি সব পরিষ্কার করা চাই। বলে হাসতে হাসতে ভৃত্যকে ডেকে বললেন—ঝুড়ি এনে এই বইগুলো দিদিমণির বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আয়।

গুরুদেবের দয়া যে কত পেয়েছেন জ্যোৎস্না দেবী, তা আর তিনি বলে শেষ করতে পারেন না।

পিয়ার্সন হাসপাতালের বড় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কঠোর-কর্ত্তব্য পরায়ণ, অক্লান্ত কর্ম্মী, সেবা-ব্রতধারী, উদার ধর্ম্মপ্রাণ এই ডাক্তারবাবু সমগ্র শান্তিনিকেতন ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সুদূর গ্রামাঞ্চলের ব্যাধি নিপীড়িত মানুষের এক পরম ভরসার স্থল। যদিও তিনি বহুদিন পূর্ব্বের পাশ করা প্রাচীন ডাক্তার,—নেই কোন বিলাতী ছাপ,—এবং তিনি নিজে বলেন,—আমি কে? আমি কিছুই জানি না,—তবু তাঁর চিকিৎসায় এদিকের সকলের অখণ্ড বিশ্বাস, এবং সত্যই তাঁর রোগ নির্ণয় ক্ষমতা এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিস্ময়কর!

তাঁর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ভক্তিমতী মহিলা। তিনি বলেন,—তিনি শান্তিনিকেতন এসেছেন তাঁর অল্প বয়সে, গুরুদেব দেহরক্ষা করার প্রায় সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে। সে সময়ের শান্তিনিকেতনের সামান্য একটু চিত্র তাঁর নিকট পাই। তিনি বলেন,—তখনও এই প্রতিষ্ঠান এত বড় হয়ে ওঠেনি; তখন এখানে কর্ম্মী ছিল অল্প, ছাত্র-ছাত্রীও তাই—কিন্তু সকলে এক প্রীতির সূত্রে গ্রথিত হয়ে যেন এক পরিবারভুক্ত ছিল। সকলেরই মনে ছিল আনন্দ। এখানে তখন না ছিল কারো অপরিমিত অর্থ, না পাওয়া যেত পর্য্যাপ্ত

আহার্য্য। ডাল-ভাতের উপরে একটা কুমড়োর তরকারী অথবা দুটো ডালের বড়া হলে, সকলে যেন বর্তে যেতেন। মাছ-মাংস খাওয়ার বিলাসিতা ছিল কদাচিৎ—দুই মাইল দূরের বোলপুর বাজারে ভিন্ন তা পাওয়াও যেত না।

সাধারণ কর্ম্মীর মাইনে ছিল পঞ্চাশ-ষাট টাকা, তাও আবার মাঝে মাঝে দুই তিন মাস বাকী পড়ত। সন্তান-সন্ততি সহ পরিবারটি তখন খায় কী? সম্বল ঐ ডাল আর ভাত! কিন্তু গুরুদেবের সদয় ব্যবহারে, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, ঐ অর্থের অনটন যেন কারো গায়েই লাগত না, মন যেন সর্ব্বক্ষণ আনন্দ-রসে সিক্ত থাকত। জানি না সেটা এখানকার আলো-হাওয়ার গুণ,—কি মহর্ষি দেবের আশীর্ব্বাদ,—কি গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব। তখন মাঝে মাঝে প্রায়ই গুরুদেব নাচ-গানের দল নিয়ে শান্তিনিকেতনের বাইরে যেতেন। দেশ-বিদেশ ঘুরে নাচ-গানের মাধ্যমে কিছু অর্থ-উপার্জ্জন করে নিয়ে এলে, আবার সকলে কিছুদিন নিয়মিত মাইনে পেতেন এবং বিদ্যালয়ের নূতন নূতন বিভাগ খোলা হত।

রোগ-যন্ত্রণায় দেহ-মনের অবস্থা পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারদির মনে আজও উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে গুরুদেবের জন্মদিনের বিশেষরূপ ও সমারোহ। সেই বিশেষ দিনটিতে গুরুদেব দুগ্ধফেননিভ বস্ত্রে শোভিত হয়ে, চন্দন-চর্চ্চিত-ললাটে তিনি যখন হাসিমুখে প্রণামার্থিনীদিগকে কুশল প্রশ্ন করতেন, তখন তাঁর যে এক বিচিত্র রূপ ফুটে উঠত তা সাধারণ মানুষে সম্ভবে না। তাঁকে তখন দেবলোক কি গন্ধর্বলোক নিবাসী এক দেব-মূর্ত্তি বলে মনে হত এবং দেবতার মতই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে আত্ম-নিবেদনের ইচ্ছা আপনা থেকেই মনে জেগে উঠত।

প্রায়ই গুরুদেবের জন্মদিনে, তাঁকে এখানকার মহিলারা প্রত্যেকে কিছু না কিছু স্বহস্তে রেঁধে খাওয়াতেন,—ব্যবস্থা করতেন ক্ষিতিমোহন বাবুর স্ত্রী ঠানদি। একবার ঠানদি বল্লেন, সব মেয়েরা এবার খাবার করে দাও বিভিন্ন রকম। সমস্ত শান্তিনিকেতনবাসিনী তৈরী করেন পিঠে, পুলি, পরমান্ন। ডাক্তারদি' দিয়েছিলেন কুমড়োর জেলি ও রস-পুলি। বিকেলে সকলে উত্তরায়ণে গিয়ে দেখে,—অগণিত পাত্রে গুরুদেবের জলযোগ সজ্জিত।

হাসিমুখে সেই সজ্জিত আহার্য্যের সম্মুখে বসে মিতাহারী গুরুদেব বললেন,—কাউকে নিরাশ করব না, সব খাবার এক বিন্দু করে চেখে দেখব। তখন প্রত্যেকটি খাবারের নাম এবং প্রস্তুতকারিণীর নাম তাঁকে বলে দেওয়া হয়। ডাক্তারদি'র কুমড়োর জেলিতে হাত দিয়ে বললেন,—এটা একটা নূতন জিনিষ, কখনও খাইনি ত? সামান্য একটু আস্বাদন করে বললেন,—ভালোই।

আর এক জন্মদিনে মহিলারা তাঁকে দিলেন বস্ত্র। রুমাল থেকে আরম্ভ করে পোষাক-আশাক, যার যা মন চায় দিলেন। গরদের ধুতি ও বাটিকের কাজ-করা উত্তরীয় দিলেন অনেকেই। রেশমী অথবা সূতী হস্ত-প্রস্তুত নানাবিধ সৌখীন টুকিটাকি জিনিষ—সবই তিনি হাসিমুখে গ্রহণ ক'রে, সকলের শ্রম-সার্থক করেন।

আর একবার আশ্রমবাসী মহিলা ও পুরুষ সকলে মিলে তাঁকে দেন চামড়া ও কাষ্ঠনির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য। চামড়ার কাজের মধ্যে ছিল, বাটিক ও খোদাই কাজের মোড়া, পোর্টফলিও, পাদুকা, অর্থাধার, কুশন-কভার, ব্যাগ প্রভৃতি। কাষ্ঠদ্রব্যের মধ্যে, 'পোকারের' কাজে অলঙ্কৃত নানাবিধ ছোটখাট দরকারী জিনিষ। তিনি আশ্রমবাসী ও বাসিনীদের হাতের শিল্পকর্ম্ম দেখে অত্যন্ত খুসী হতেন এবং সকলকে নূতন প্রেরণা, উৎসাহ ও আশীর্ব্বাণীতে অভিষিক্ত করতেন। তাঁর জন্মদিনের উজ্জ্বল রূপটি আজও ডাক্তারদি' জীবনের দুঃসহ আবর্ত্তের মধ্যে পড়েও ভুলতে পারেন না।

ডাক্তারদি'র প্রথম গুরুদেব-সাক্ষাৎ। মনভরা সরম-কুণ্ঠা, লজ্জা-জড়িত চরণ নিয়ে তিনি যান গুরুদেব-দর্শন মানসে উত্তরায়ণে। পৃথিবী-বিখ্যাত জ্ঞানতপস্বী নোবেল-লরিয়েট, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ—তাঁর সঙ্গে কী কথা বলবে স্বল্পশিক্ষিতা পল্লীবালা? তবুও মৃদু চরণে গিয়ে তাঁর পাদস্পর্শ করেন! গুরুদেব ডাক্তারের স্ত্রী শুনে পরম আগ্রহে স্বাগত সম্ভাষণ করে বলেন,—তোমার দেশ কোথায়? 'আগরতলা' শুনে খুসীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

বাংলার এককোণে পার্ব্বত্য প্রদেশ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকাল, প্রাচুর্য্যে ঝলমল। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, দুগ্ধবতী গাভী,—দেশ ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ, প্রজারঞ্জক রাজার শাসনে রাজা-প্রজা সকলেই খুসীর বন্যায় প্রাণবন্ত! পাহাড়ে-জঙ্গলে বিচরণ করে নানাবিধ বন্য জীব, বাঘ, হস্তীযূথ। প্রতি বৎসর কিছু বন্য-হস্তী মানুষের হাতের ফাঁস, গলায় পরে আসে রাজধানীতে। সে সব হাতী ধরার বিবরণ লোমহর্ষক উপন্যাসের চেয়ে কম আশ্চর্য্য নয়, নূতন ধরা হাতীকে পোষ মানানোর ব্যাপার আবার আরও চমকপ্রদ।

গুরুদেবের সঙ্গে আগরতলার নিকট সম্বন্ধ। তিনি সেখানে রাজ অতিথি হয়ে জীবনে অনেক সময় মনের আনন্দে কাটিয়ে এসেছেন। কত নাটক, কত কবিতা লিখেছেন ত্রিপুরা সম্বন্ধে।

গুরুদেব এমন রসালো ভাষায় হাতীর গল্প, বাঘের গল্প আরম্ভ করে দিলেন, যে ডাক্তারদির আর মনে রইলো না,-একজন পৃথিবী বিখ্যাত মহামানবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মনে হল,—স্বদেশের এক অতি নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা বহুদিন পর, আশ মিটিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছেন—কত পুরানো কাহিনী। অনেকক্ষণ এ ভাবে কাটার পর হঠাৎ তাঁর মনে হয়, এ কী! আমি কোথায়? এত কথা বলে কার সময় নষ্ট করছি? মুহূর্ত্তে বিস্মৃতি থেকে স্মৃতিতে ফিরে এসে তড়িদ্-গতিতে প্রণামান্তর বিদায় চাইলেন। দরদীস্বরে গুরুদেব বললেন,—আবার এসো!

তাঁর পুত্র-কন্যা সকলেরই জন্ম শান্তিনিকেতনে, প্রথমা কন্যা ও প্রথম পুত্রের নামকরণ করেন গুরুদেব—সুমিতি ও সুমিত্র। ডাক্তারদির নাম? জিজ্ঞাসাই করা হয়নি, এতক্ষণ পর জিজ্ঞাসায় জানি—সরযূবালা দেবী।

ডাক্তারদির মুখে গুরুদেবের কয়েকটি বিচিত্র অনুভূতির কথা শুনে অতিমাত্রায় বিস্মিত হই। একবার গুরুদেবের কিছুদিন যাবৎ জ্বর হওয়ায় ডাক্তারবাবু 'ফাইলেরিয়া' কিনা পরীক্ষা করার জন্য রাত্রি বারোটায় তাঁর রক্ত নিতে যান। ঐ রোগের পরীক্ষার জন্য ঐ সময়ই রক্ত নেওয়ার বিধি।

দুপুর রাত্রি, চতুর্দ্দিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ, অখণ্ড নীরবতায় সব যেন থম থম করছে। গুরুদেবের শয়নকক্ষে যাওয়ার পর তিনি বললেন,—তুমি এসেছ? আমায় বাঁচিয়েছ,—তারা এসেছিল।

ডাক্তারবাবু বিস্ময়ে নির্ব্বাক ! ভাবেন—এই নির্জ্জনতায় এ কথার অর্থ কী ?

গুরুদেব আবার বললেন,—তিনটি সুন্দরী মেয়ে আমার বিছানায় বসে হাপুস নয়নে কাঁদছিল,—আমি যত জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কে গো ? কোথা থেকে এসেছ ? কাঁদছ কেন ? তারা কোন কথা বলে না,—কেবল কাঁদে আর কাঁদে। ডাক্তার, তুমি এসে আমায় ওদের কান্নার হাত থেকে বাঁচালে।

ডাক্তারবাবু বিস্ময়ে হতবাক।

আরও একদিন চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ডাক্তারবাবু গিয়েছিলেন গুরুদেবের নিকট অতি প্রত্যুষে। সেদিনও গুরুদেব আবার সেই পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। বললেন,—কাল রাত্রেও তারা এসেছিল, সেই তিনটি সুন্দরী মেয়ে, সমস্ত রাত আমার বিছানার পাশে বসে কেঁদেছে।

এ কী রহস্য ? কেন এই ক্রন্দন ? এ কী গুরুদেবের ভাব-প্রবণ মনন-শীল মনের কল্পনা কুহেলিকা—না নিছক স্বপ্ন না কোন অশরীরী আত্মার মুক্তির জন্য মহামানবের নিকট আকুল ক্রন্দন ? কে জানে তা ? আজ আর এ সন্দেহ নিরসন করার কোন উপায় নেই।

গুরুদেবের অন্তিমকালের শেষ দু' একটি কথা অন্য এক বন্ধুর নিকট শুনি—শেষ রোগশয্যায় তাঁর সেবা নিরত দু' একটি সেবা-ব্রতীর নিকট গুরুদেব মৃত্যুর ৩'চার দিন পূর্ব্বে বলেন,—আমি এবার বুঝতে পারছি, আমার এ পৃথিবীর দিন ফুরিয়ে এসেছে, এবার যাবার সময় হয়েছে।

সেবা-ব্রতীরা বলেন,—কেন গুরুদেব একথা বলছেন ? আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।

মৃদু হেসে তিনি বললেন,—না রে, আমি বুঝতে পারছি আর দিন নেই। কেন,—তা বলব, ঐ ভিতরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে কাছে এসে বোস। তোরা আমার নিজের বলেই তোদের বলছি। তাঁরা তাই করলেন।

গুরুদেব মৃদুস্বরে বলতে লাগলেন,—সমস্ত পৃথিবী ঘুরে ঘুরে, আমার মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, যে পৃথিবীর অতি সভ্য মানুষদের মধ্যে আমি একজন,—কারণ জানতাম, আমি যেমন কোন অশোভন কাজ পছন্দ করতাম না,—তেমনি নিজেও কখনও করিনি। এ আমার মনের গোপন অভিমানের কথা। অভিমান-অহঙ্কার বিন্দুমাত্র থাকলেও ত তাঁর নিকট যাওয়া যায় না,—তাই তিনি নিজের কাছে নেওয়ার আগে আমার জ্ঞাত কি অজ্ঞাত সব অভিমান, সব অহঙ্কার ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছেন। নিজের দেহকে আমি সর্ব্বক্ষণ যথাসাধ্য আচ্ছাদিত করে রেখেছি, কেউ দেহের কোন স্থানে হাত দিলে, কখনোই ভাল লাগেনি। এমন কি অসুখের ভিতরেও দেহের পরিচ্ছন্নতার তাগাদায় অন্যের হস্ত-স্পর্শে সর্ব্বদেহ সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। আজ এই দেহটা নিয়ে সকলে ছিনিমিনি খেলছে। দুদিন আগেও দেহটা আমার নিজের ভেবে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করেছি,—কিন্তু কাল থেকে সে কথা মোটেই মনে হচ্ছে না ; কাজেই সঙ্কোচবোধও দূর হয়ে গেছে। এর থেকেই মনে হচ্ছে,—দিন ফুরিয়ে এলো !

পরদিনই হয় অপারেশন,—তার দিন দুই বাদেই সব শেষ ! মৃত্যু তাঁর দেহকে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে নিলেও, মনে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী চিরজীবী হয়ে বেঁচে রইলেন চিরদিনের জন্য। সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবার সাধ্য কাহারও হবে না,—এমন কি মহাকালেরও নয়।

শপথ

রমেন চৌধুরী

স্বাধীন ভারতে ভারতবাসীর শোনো শপথ—
করো শপথ, করো সবাই...
আমাদের মাঝে কোনো বিভেদ
ছোটো আর বড়ো কোনো বিভেদ
নাই নাই নাই কিছুই নাই !'
বহুবর্ষের দুরিয়া আঁধার সঞ্চিত
যে আলো উজল পতাকারে করে রঞ্জিত
সে যে আমাদের বহু দুঃখেতে অর্জ্জিত
তারে প্রাণ দিয়ে বাঁচাবো তাই—
এই শপথ করো সবাই !
সে দুর্ম্মদ নিপাত যাক
দেশের শান্তি চায় না যে,
দূর করে দাও দেশবাসী
চক্রান্তকারী সব কাজে ;
আত্মজনের বক্ষরক্ত নয় শোষণ
রক্ত চোখের তীব্রদহন নেই শাসন
হিংসাবিহীন মহা ভারতের বিনাশ নাই—
এই শপথ করো সবাই !

হাত

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যুঁই ফুল ফোটে। শিউলিও বলে ওঠে কথা
আকাশ অদৃশ্য মেঘে। সূর্য-বিহ্বলতা
অস্ত যায়।
অন্ধকার ভরা কি শুধু অসীম শূন্যতায় ?
মেঘ-তারা-ঘাস
আর সেই আনমনা নীল দিয়ে ভরা যে-আকাশ
আমার এই ছোটো জানালায়
কাকে ডেকে কী কথা জানায় ?

আসে ঝড় আসে ঝঞ্ঝা
আর কালো রাত
আমরণ বাঁচবার আছে এক স্বাদ,
থরথর সেই এক জয়-পাওয়া হাত।

প্রতীক্ষা

আরতি মজুমদার

অনিমা মিত্র ওখানে অনু চাকরী জগতে এসে তৃপ্তিও যেমন পেয়েছে তেমনই পেয়েছে অভিজ্ঞতা—বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পৃথিবীকে দেখলো বাস্তব চোখে। জানলো মানব জীবনে আছে কত বিচিত্র লোক। বাড়ীর দু-একটি বেদনা দুঃখময় পৃথিবী ছিল অজ্ঞাত। বাড়ীর ছোট মেয়ে, একটু মাত্রা ছাড়িয়ে আদর পেয়েই মানুষ, আর সেই সাথে অনু পেয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা। অভাবের তাগিদে নয় সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় চাকুরী নিয়েছে। তাই চাকরী জগতে এসে শান্তি ও আনন্দই পেলো অনিমা মিত্র। কাজটিও হয়েছে তার মনের মতো। ফেলে আসা কৈশোরের স্বপ্ন বাস্তবে হলো রূপায়িত—আজ অনু শিক্ষিকা। দেশের শিশু ও কিশোর প্রাণগুলি ওরই শিক্ষায় আরও সজীব হবে, হবে আরও প্রাণপূর্ণ। সহকর্মিণীরা যখন স্কুলের একঘেয়েমীতে করুণ অথচ রুক্ষ হয়, তখনও অনু সহজ ও স্বাভাবিক আনন্দে থাকে পূর্ণ। অনুর রূপে আর সজ্জায় আছে রুচির মিল। তাই সহজেই সকলের দৃষ্টি করে আকর্ষণ। প্রতিটি স্কুল ফাংসনে অনিমা মিত্রের চাই ডিরেকসন দেওয়া। সকল বিষয়েই কবিৎকর্মা শিক্ষিকা। স্নেহপূর্ণ সাহচর্যে সকল ছাত্রীকে বন্ধন করেছে। সকলেই অনিমাদিকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। সহকর্মিণীদের মধ্যে বয়সে ছোট হলেও বুদ্ধির তারিফ পেয়েছে সকলের কাছেই। সহকর্মিণীরা অনিমাকে স্নেহও করেন।

স্কুলের যখন এই অবস্থা, তখনই এলো নব নিয়োজিত এম· এ· বি· টি· কমলা বসু। বয়সে অনিমার চেয়ে কিছু বড় হবে। কিন্তু আশ্চর্য সুন্দরী। সুন্দর দোহারা গড়ন স্বাস্থ্যের জৌলসে ঝিক্‌মিক্ করে। যেন এক ঝলক আলো। অবশ্য নিরুত্তাপ। এসেই আপন করে নিল সকলকে।

অনিমাকে বললো—অনু, তুমি আমায় দিদি বলে ডেকো, আমি তোমার বয়সে বড় অন্তত অভিজ্ঞতার দিক থেকে।

রূপকে অনু চিরকালই ভালবাসে। আর ভালবাসলো নিরহঙ্কারা, সহজ কমলা বসুকে। যতদিন যায় ততই অনু অবাক হয় কমলা বসুর অদ্ভুত চরিত্র দেখে। ভাবে এই বয়সেই কেমন ধীর, স্থির, শান্ত, সমাহিত ভাবটি আয়ত্ত করেছে কমলাদি। আরও অবাক হয় অনু, রূপের প্রতি কমলা বসুর উদাসীনতা দেখে। যে জগতে যৌবনের প্রান্ত পেরিয়েও যৌবনের রূপকে ধরে রাখার আকুলতা; সেখানে ভরা যৌবনে কেন এই অবহেলা ? না, অগাধ বিদ্যারও কোন অহঙ্কার নেই কমলা বসুর, মধুর একটু হাসি দিয়ে যেন সে আচ্ছাদিত করে রাখছে একটি দুঃসহ বেদনাকে। অনু বুঝলো যে কমলা বসুর জীবনে এমন একটি দুঃখ আছে যা তাকে পাথর করে দিয়েছে। সে সঙ্কল্প করলো এই দুঃখের কাহিনী শুনবার। কোন আত্মীয় খবর নেয় না মিস বসুর। কোন চিঠি আসে না তার নামে।

পৃথিবীর সমস্ত নিঃসঙ্গতা এসে যেন কেন্দ্র করেছে কমলা বসুর জীবনকে। কয়েকদিন অনু চেষ্টা করেছে ওদের বাড়ী নিয়ে যেতে, কিন্তু কমলা বসু রাজী হয়নি।

দুর্গাপূজা এসে গেলো, চারিদিকে জাগলো বিচিত্র আগমনীর উৎসব। শরৎ এসেছে নিজে, প্রকৃতি সজ্জায় ভার নিতে, যোধনের মাঙ্গলিক রচিত করতে। স্কুলের ছুটির দিন নিকট হতে নিকটতর হচ্ছে। সকলের মনে লেগেছে গৃহে ফিরে যাওয়ার আনন্দ। ছুটিতে সকলেই চলে গেল নিজালয়ে। যায়নি তখনও কমলা বসু আর তার ঝি। এমনি একটি সন্ধ্যায় অনু এলো বোর্ডিংয়ে। এসেই প্রশ্ন করলো—কমলাদি' বাড়ী যাচ্ছেন ? তার আগে একদিন আমাদের বাড়ী চলুন না ?

কমলা বসু একটু হেসে বলে—আমার তো ভাই বাড়ী নেই। কোথায় আর যাব ? এখানেই আছি আমি।

অনু বলে—তবে আপনার মা-বাবার কাছে তো যাবেন ? তাঁরা কোথায়···একি কমলাদি কি হয়েছে ! ও রকম হয়ে গেলেন কেন ? অনু লজ্জিত হয় ভেবে যে, অজ্ঞাতে কি দুর্বল স্থানেই না সে আঘাত করেছে কমলা বসুর।

অনুতপ্ত হয়ে, আলোচনার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিতে অনু বলে—চলুন কমলাদি, আমরা ছাদে যাই, সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, চলুন।

তবুও কমলা বসুর মুখে সাড়া নেই। দৃষ্টি চলে গেছে যেন বর্তমানকে ছাড়িয়ে বহু দূরে। অনু ভয়ে তাঁর হাত ধরে আবার ছাদে যেতে বলে। এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে এলো কমলা বসুর। অনুকে তাড়াতাড়ি বসিয়ে বলে—না না অনু, এখানেই বসো। আমি জানি তুমি কি জানতে চাও। আমার এত রূপ গুণ থেকেও আমি এত নীরব কেন ?—এই তোমার প্রশ্ন। আজ বলবো তোমায়। জানি না কেন তোমাকে আমার ভাল লাগে।

উদাস করা এই শারদ-রাত্রি, এই মেঘে ঢাকা জ্যোৎস্না বোধ হয় কমলা বসুকে অনেকদিন আগের একটি স্মৃতি মনে করিয়ে উদাসী করে তুলেছে। তার গোপন বেদনা আজ উতলা হয়েছে প্রকাশিত হতে। অনুর একটু সমবেদনার কাঙ্গাল হয়েছে আজকের কমলা বসু। আলো নেভা ঘরে জানালার পাশে চাঁদের আলোয় বসে কমলা বসু বলে চলে তার ফেলে আসা জীবন-কাহিনী। দুটি চোখে বিস্ময়পূর্ণ নীরব আকুলতা নিয়ে শুনে চলে অনু। বিশ্বজগৎ ভুলে গেছে এই দুটি নারী। অনুর কমলাদি বলে চলেছে—যেন গল্প।

আমার বাবা স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজবাড়ীর চিকিৎসক ছিলেন। তখনও ভারত স্বাধীন হয়নি। বাবা অজস্র আয় করেছেন। আমিই একমাত্র মেয়ে। অভাব দেখিনি কোন দিকে। শিশু বয়স হতেই

জানি, তুল আমার বর্ণনাতীত। মা কত রকম করে সাজাতেন আমায়। আমার শিক্ষার প্রতিও মা-বাবা তৎপর ছিলেন। সকল প্রকার সম্ভাব্য শিক্ষাই আমি পেয়েছি। সেদিক থেকে আমার সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। পড়াশুনাতে বেশ ভাল ছিলাম—কত প্রাইজ পেয়েছি আজও মনে পড়ে।

মা কতদিন আনন্দে উচ্ছল হয়ে বলেছেন—চাই না মেয়ের প্রাইজ পাওয়া, বেঁচে থাকলেই হলো।

বাবা বলতেন—দশটার চেয়ে একটা মেয়েই ভালো। কত জিনিষ পেয়েছি প্রতিদিন বাবার কাছ থেকে, তার হিসেব নেই। এত নিকটে থেকেও মা-বাবা বুঝেন নাই এ তাদের বিষকন্যা। স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছি। কোলকাতায় হোস্টেলে থেকে বেথুন কলেজ হতে বি. এ. পাশ করেছি ইংলিশে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়ে। বাবা আনন্দে অধীর হলেন। আমাকে ঘিরে ধরলো মায়ের আশীর্বাদ। কিন্তু জীবন এগিয়ে যে চলেছে দুঃখের দিকে, তার হদিস আমিও পাইনি, মা-বাবাও পাননি। এম. এ. ক্লাশ-এ ভর্তি হয়েই বাবার কাছে গেছি—ফিরবো পুজোর ছুটি কাটিয়ে। আমারই সমবয়সী একজন পিসতুতো বৌদি প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসতো। একদিন আমি আমার ঘরে মায়ের একটি জামা সেলাই করছিলাম, এমন সময়ে সেই বৌদি এসে, একথা সেকথার পর জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা কমলা, মামা যদি তোমার বিয়ে ঠিক করেন, আশা করি আপত্তি করবে না। তুমি বড় হয়েছো বাইরের অনেক কিছু দেখেছো, সেজন্যই তোমার মতামতের প্রয়োজন আছে।

বুঝলাম, মা বাবাই বৌদির মারফৎ আমার মত জানতে চেয়েছেন। বলেছি—আমার আবার মতামত কি? মা বাবা যা বলেন তাই হবে। তবে এখনি বিয়ের কথা কেন? আগে এম. এ. টা পাশ করি?

বাবা, মা বুঝালেন যে বিয়ের পরেও পড়তে পারবো, বিয়ে দেয়া তাদের কর্তব্য, ইত্যাদি। তাছাড়া বাবার ব্লাডপ্রেসার, কখন কি হয় বলা যায় না। তাই একমাত্র মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে চান জীবনে। আমি অভিমান করে বলেছি—তাই বুঝি আমাকে সরাতে চাও?

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন—পাগলি, তা কি হয়? মা কি ছেলের বোঝা! তা নয়। তোর অবনী কাকু, (বাবার বন্ধু) একটি ভাল ছেলের কথা বলেছেন। ছেলেটি বিলাত-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার। ভাল পোষ্টে আছে। পরিবারটিও বেশ ভাল। তাই আমার ইচ্ছা, এদের সাথে কাজ করি। অবশ্য তোর অমতে আমি কিছুই করবো না।

আমি বলেছি—বাবা, আমি তো তোমাদের অবাধ্য হতে শিখিনি। তুমি যা বলবে তাই আমার মঙ্গল হবে।

মা তৃপ্তমুখে বলেছেন—কি? আমি বলেছি না যে কমলা, আর পাঁচটি মেয়ের মতো নয়। ও যে আমার শিক্ষায় বড় হয়েছে।

বাবা বলেছেন—আমিও জানতাম। তবুও পিতার কর্তব্য মেয়ে বড় হলে তার মতামতকে শ্রদ্ধা দেখান। তবেই তো সে পাবে অন্যের শ্রদ্ধা। তাই না কমলার মতের আগেই কথা অনেক দূর এগিয়ে রেখেছি।

কিছুদিন পর বাবা গেলেন কুমিল্লায় ছেলেদের বাড়ী দেখে আসতে। বাবার সাথেই আরেকজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন আমাদের বাড়ী। শুনলাম, ছেলের বাবা চমৎকার লোক। বন্ধুদের কাছে শুনেছি, কনে দেখা এক ভীষণ ব্যাপার। তাই ভয় হয়েছিল প্রথমে খুবই। কিন্তু ভদ্রলোক যখন মা বলে কাছে ডেকে বসিয়ে দুটি বালা পরিয়ে দিলেন তখন বেশ ভালই লেগেছে। তিনি বলেছিলেন—তোমাকে আমি এম. এ. পড়াবো। আমার ছোট মেয়েটিও বি. এ. পড়ে। তারও ইচ্ছা আরও পড়বার। দু'জনেই পড়বে।

বৃদ্ধের মিষ্ট ব্যবহারে শ্বশুরবাড়ী ভীতি কেটে গেল। পরদিনই ভদ্রলোক চলে গেলেন। বিয়ের দিন ঠিক হলো ২রা অগ্রহায়ণ। একদিকে পুজো, আরদিকে বিয়ে। সব মিলে বাড়ী সোরগোলে পূর্ণ। এত হঠাৎ ঠিক হলো সব, আমি যেন কেমন হকচকিয়ে গেলুম। এমনি সময়ে সেই ভদ্রলোক একখানা চিঠিতে জানালেন যে তাঁর ছেলে বাড়ী এসেছে। তিনি মনে করেন যে ছেলেমেয়ের সাক্ষাতের প্রয়োজন আছে বিশেষত দুজনেই যখন পরিণত বয়সের। বাবা তো এককথায় রাজী। সপ্তাহখানেক পর ছেলে তার এক ভগ্নীপতি ও দুজন বন্ধু নিয়ে আমাদের বাড়ী এলো, আমার যে কি রকম লাগছিল নিজেও বুঝিনি। বৌদির কাছে শুনলাম মেয়ে দেখার ইচ্ছা ছেলের মোটেই ছিল না; কেবল বাবার কথাই রাখতে এসেছে। বৌদি আবার ঠাট্টা করে বলেছিল—আচ্ছা, আমার ননদটিকে একবার দেখুক তো? অনিচ্ছা, ইচ্ছা পরে বুঝবো। মাথা ঘুরে মূর্চ্ছা না গেলেই হয়।

পাশের বাড়ীর বৌদি বলেছিল—না গো, ছেলে যা সুন্দর দেখলাম তাতে মনে হয় তোমার ননদটিই মূর্চ্ছা যাবে।

বিকেলে নীচে বসবার ঘরে গেলাম। ছেলের ভগ্নীপতিই আমাদের পরিচয় করালেন।

কোন কথা নয়, একটি গান শুনতে চেয়েছিল মাত্র। গেয়েও ছিলাম। সুন্দর রুচির পরিচয়ে অভিভূত হয়েছিলাম। বিদায়ের এক ফাঁকে ছেলেটি বলেছিল—আবার দেখা হবে।

মুখের কিছু পরিবর্তন নিয়েই বোধ হয় উপরে এসেছিলাম। বৌদিরা জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে?

বলেছি—কিছু না।

তারা ফিরে গেলো; কিন্তু জানলো না পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের অহঙ্কারী মেয়ে কমলা বন্ধুর মনটিও তাদের সাথী হয়েছিল। সবার সাথে মিশতে পারতাম না বলেই আমাকে অহঙ্কারী বলতো অনেকে। রাত্তিরে খাওয়ার পর বাবা আমার পছন্দ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছি—তোমাদের পছন্দ, কোন দিনই আমার অপছন্দ হয়নি। আজ কেন হবে?

মা-বাবার নীরব আশীর্বাদে আমি পূর্ণ হলাম। কিন্তু সে আশীর্বাদ হয়তো আর আমার জীবনে সফল হলো না।

নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর আসছিল না। উঠে তাই জানালার পাশে বসলাম। সেদিনও এমনি চাঁদের আলো ছিল। বসে বসে ভাবছিলাম, মাত্র আজ সকালেও যদি কেউ বলতো যে প্রথম দেখাতেই প্রেম হতে পারে তবে হেসে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু এখন আর সে প্রচণ্ড শক্তি নেই! আমাকে যেন আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনকে শাসন করতে গিয়েও যেন বিফল হয়েছি। কি অদ্ভুত দুটি চোখ যেন আমাকে আকর্ষণ করে চলেছে। কেবল সেদিনটিই নয়, রোজই একটি সুন্দর দীপ্তমুখ আমার নিরালা সময়টুকু হরণ করে নিয়েছে।

প্রচুর আনন্দের মাঝে পূজা শেষ হলো। লক্ষ্মীপূজা শেষ হতে না হতেই বাড়ীতে আবার হৈচৈ শুরু হলো—বিয়ের উৎসব ঘনিয়ে এলো যে। বাবার একটি মাত্র মেয়ে, খরচ হবে একটু মাত্রা ছাড়িয়েই। বাড়ীতে কত লোকজন এলো তার শেষ নেই। আমাদের অত বড় বাড়ী একেবারে পূর্ণ হয়ে গেল। সকলেই বিভিন্ন জোগাড়যন্ত্রে ব্যস্ত। কোলকাতা থেকে বহু জিনিষ এসেছে; আরও আসবে। এই বিপুল আয়োজনে আমার সহজ স্থানটুকু যেন আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। একদণ্ড নিরালা থাকার উপায় নেই। সমবয়সী আত্মীয়ারা কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ছিল না। এরই মাঝে একটু নিরালা হলেই আমি শুনেছি—আবার দেখা হবে—সেই আশ্চর্য ছেলেটি বলেছে। এই নিয়ে পুলকিত মনে নাড়াচাড়া করেছি, হেসেছি। মা কাছে ডেকে কত উপদেশ দিয়েছেন। নতুনের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হতে নিজেকে যেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত মনে করেছি। ঠিক এমনি সময়ে, বিয়ের দিন দশ-বারো আগে আর একটি চিঠি এলো কুমিল্লা থেকে। কি লিখেছে, জানতে সকলে বাবার ঘরে জড়ো হলো। আমি আস্তে ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ পরে খেয়াল হলো, আমাদের বাড়ীটা যেন বড় বেশী চুপচাপ। কি হয়েছে ভাবছি, এমন সময়ে আমাদের চাকর হরি এসে বললো যে চিঠি পড়ে বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

ছুটে নীচে এলাম। এসে দেখি ঘরভর্তি লোক, পাড়ারও দু-চারজন আছেন। বাবা অজ্ঞান, মা বসে কাঁদছেন। আমি ভাবলাম এতদিনে ছেলেরা বোধ হয় কোন অসঙ্গত দাবী তুলেছে; তাই ব্লাড-প্রেসারের রোগী বাবা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে অজ্ঞান হয়েছেন। ঘৃণায় মন বিষিয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মা নীরবে আঙুল দিয়ে একখানা খোলা খাম দেখালেন। অনিচ্ছা এবং বিরক্তিসহ চিঠিখানা নিয়ে আমার ঘরে এলাম। আসতে আসতে ভেবেছি, বাবা কেন এত উতলা হয়েছেন? যারা অন্যায় দাবী করতে পারে, তাদের সাথে বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়াই ঠিক। কিন্তু চিঠি পড়ে দাবীর কিছুই দেখলাম না। দেখলাম সে চিঠি কেবল আমারই দুর্ভাগ্য ঘোষণা করেনি, ঘরে এনেছে ওদেরও এক মর্মান্তিক দুঃখের খবর। কি ছিল সে চিঠিতে? সে চিঠিতে ছিল আমার ভবিষ্যৎ-জীবনের এক ইঙ্গিত। যা বহন করে আজও চলেছি নিরুদ্দেশের দিকে। ছেলের বাবা লিখেছেন যে তাঁর ছেলে পূজোর সময় নোয়াখালির এক বন্ধুর বাড়ী যায়। এবং সেখানের এক দাঙ্গায় নিখোঁজ হয়েছে। কোন খবর পাওয়া আর সম্ভব নয়। কাজেই আমার বাবা অন্যত্র মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন। মনে আমার কি যে হয়েছিল, তা তোমায় বুঝাতে পারবো না। যারা আদরে আদরে এ'কদিন আমাকে ভরে তুলেছিল, তারাই সামনে বলতে লাগলো, রূপ নয়তো বিষ। আমি ও তাই ভাবতাম। আমারই জন্য এরকম হলো বোধ হয়। অন্তত আমার সৌভাগ্য দিয়ে তো তাকে আটকাতে পারলুম না বিপদের মুখ থেকে। মা, বাবার সামনে যাইনি। আমাকে দেখলেই মা ডুকরে ওঠেন, বাবা অস্থির হয়ে পড়েন। আমি যেন মূর্তিমতী দুর্ভাগ্য।

২রা অগ্রহায়ণের দিন চারেক আগে অবনীবাবু আবার এসে বলেন—আর একটি ছেলে ঠিক করেছি। ঐদিনই বিয়ে দাও।

বাবা কোনও আপত্তি করেন নাই, কেবল বলেছেন—আমি আর কিছু পারবো না। তুমি যা বোঝ কর।

আমি পাশের ঘর থেকে শুনেছিলাম সব। আমার মন বলেছে এবার অবাধ্য হও। কি এক শক্তি যেন আমায় বাবার কাছে নিয়ে গেল। বাবা তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমিই প্রথম বলেছি—বাবা, এ বিয়ে ভেঙ্গে দাও। আর কোথাও আমি বিয়ে করতে পারবো না, আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। কারণ তিনি তো মারা যাননি। কত নিখোঁজ লোক আবার ফিরেও তো আসে। সেই প্রতীক্ষায় আমি থাকবো!

বাবা ধীরে ধীরে বলেছেন—বেশ, মা, তাই হবে। আশীর্বাদ করি যেন তোমার প্রতীক্ষা সফল হয়।

মা বলেছেন—হতভাগী, এ তোর কি রকম মরণ ডাকলি?

মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছি—না মা, এই আমার বেঁচে থাকা, সত্য করে। আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে? তিনি বলে গেছেন আবার দেখা হবে। সেই আশায় আমাকে থাকতে দাও।

মা আস্তে আস্তে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছেন, তুই শান্তি পা জীবনে এই আমার কামনা।

তারপর? তারপর আমি কোলকাতা এসে এম্‌. এ. পাশ করেছি বি. টি. পাশ করেছি। ইতিমধ্যে অনেকেই জড়াতে চেষ্টা করেছে আমাকে। কিন্তু আমার শীতলতাকে তারা জয় করতে পারেনি। আমার নীরবতাকে বিদ্রূপ করে সরে গেছে। আমিও আস্তে আস্তে সরে এসেছি আমার এই জীবনে। বাবাকে চিঠি লিখেছি যে

সর্দি-কাশি থেকে সত্যিকার উপশম পেতে হ'লে
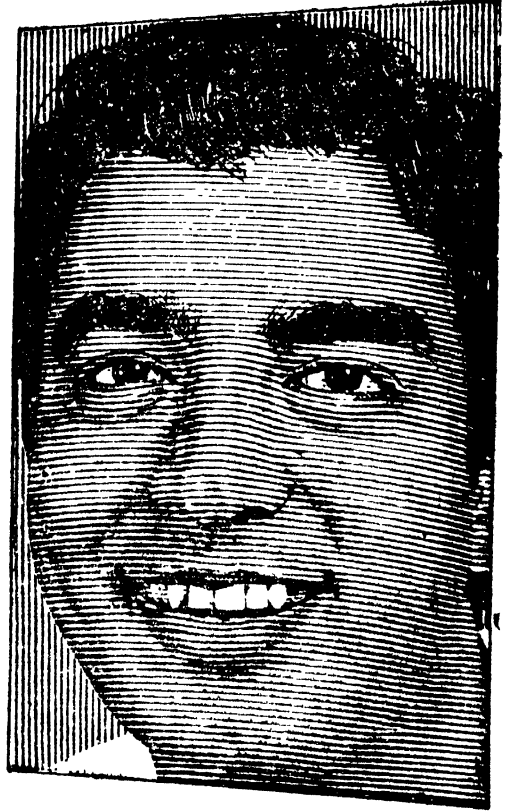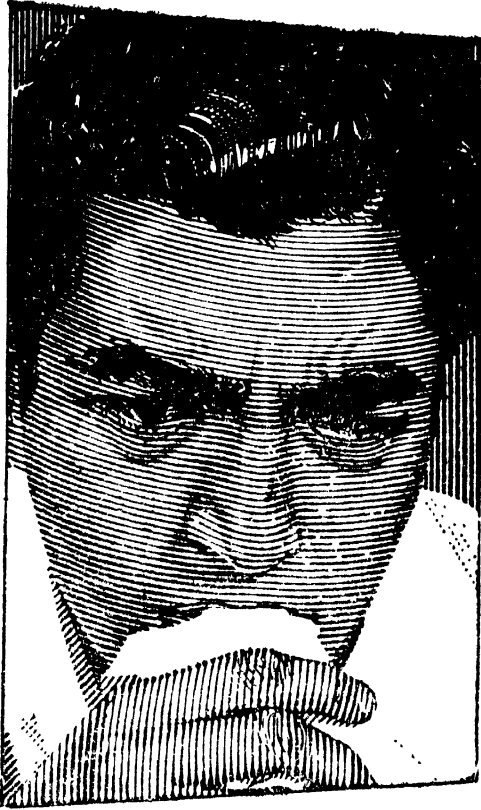
সিরোলিন 'রোশ' খান

সর্দি-কাশি কখনো অবহেলা করবেন না—নিরাপদে, তাড়াতাড়ি সত্যিকারের উপশমের জন্যে সিরোলিন খান। সিরোলিন যে কেবল আপনার কাশি বন্ধ করে তা নয়—যে সব অনিষ্টকর জীবাণুর দরুণ আপনার কাশি হয়, সেগুলিকেও ধ্বংস করে। সিরোলিন দ্রুত ও আরামের সঙ্গে গলার কষ্ট সারায়, শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে সাহায্য করে ও দুর্দমনীয় কাশিও আরাম করে। নিরাপদ, উপকারী এবং খেতে সুস্বাদু ব'লে সিরোলিন বাড়ীশুদ্ধ সকলের কাছেই প্রিয়। ছেলেমেয়েদের তো কথাই-নেই।

ভারতের ঘরে ঘরে জনপ্রিয় সর্দি-কাশির ওষুধ

বাড়ীতে হাতের কাছেই সিরোলিন রাখতে ভুলবেন না

'রোশ' এর তৈরী একমাত্র পরিবেশক: ভলটাস লিমিটেড

JWTVT 2400

এবার আমি স্কুলে কাজ নেবো। একটি ভাল স্কুলে কথাবার্তাও হয়েছে। চাকুরী জীবনের প্রথম দিনই পেলাম স্নেহ আর আশীর্বাদ ভরা বাবার চিঠি। কিন্তু সেদিনই একখানা টেলি বয়ে আনলে বাবার মৃত্যু সংবাদ। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বাবা মারা গেলেন। সে দুঃখ যে কি তোমায় বুঝাতে পারবো না। বাবাকে একটু দেখতে পারলুম না পর্যন্ত। কিন্তু শোকে অধীর হলে চলবে না। কেউ নেই যে আমাদের। বাড়ী গিয়ে বাবার শেষ কাজ করে মাকে নিয়ে এলাম আমার কাছে। বাড়ী বিক্রি করতে চেয়েছিলাম। মা দিলেন না। মা নিজেকে সংসারের কাজে ডুবিয়ে দিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে মায়ের দীর্ঘশ্বাস আমাকে বড় বাজতো। আমি জানতাম মায়ের দুঃখ। আজ দু বছর হলো সে দীর্ঘশ্বাসও ফুরিয়ে গেছে আমার জীবনে। এখন আমি সম্পূর্ণ একা। তবুও আশায় বসে আছি কবে দেখা হবে সেই আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখের মানুষটির সাথে। যে কথা দিয়ে গেছে, "আবার দেখা হবে।" তার তো মৃত্যু হতে পারে না। সে তো কেবল কথা নয় সে তো ছিল দুটি অন্তরের একান্ত ইচ্ছে। এরই বিশ্বাসে আমার এই প্রতীক্ষা।

ঐ বলেই কমলা বসু নীরব হলো। এতক্ষণে নির্বাক্ বিস্ময় কাটিয়ে অমু প্রশ্ন করে—আচ্ছা কমলাদি, আপনি কি এই ছেলেটির নাম জানেন? আমার মনে হয় একে আমি জানি।

একটু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কমলা বসু বললো—জানি। এর নাম অমিতাভ মিত্র। উকিল মন্মথ মিত্রের ছেলে।

দুটি জলভরা চোখ তুলে অমু আস্তে আস্তে বললো—এই অমিতাভ আমারই বড়দা। ওর যখন বিয়ে ঠিক হয় আমিই তখন বি· এ· পড়তাম। দাদাকে আমরা হারিয়েছি—আবার ফিরে পেতে চাই। কিন্তু তোমার মত প্রতীক্ষা বোধ হয় আমাদেরও নেই। তবুও আমাদের মনও কিছুতেই মানে না যে দাদা মারা গেছে। কামনা করি ভগবান যেন অন্তত তোমার একনিষ্ঠ সাধনার মূল্য স্বরূপ দাদাকে ফিরিয়ে আনেন। আমি বলি দাদাকে আসতেই হবে। তোমার এই প্রতীক্ষা ব্যর্থ হলে বুঝবো ভগবান মিথ্যা, বিশ্ব সংসার মিথ্যা।

সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেটি আর আসবে কিনা জানি না। প্রিয়ার প্রেমের প্রতীক্ষা, ভগ্নীর স্নেহের আহ্বান, মা বাবার সান্ত্বনাকে সফল করে নিয়ে কি আসতে পারবে। সেই ছেলে!—

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সমরেন্দ্র ঘোষাল

"না এ পথ তোমাদের বৈধ নয়,
তোমরা বিশ্বাসভঙ্গকারী;
তোমরা মানবতাকে খুন করেছো।
আমি তোমাদের আমার সমগ্র দেশের হয়ে,
আর সেই পরম শান্তি-আকাঙ্খী দেশের হয়ে,
তোমাদের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত করছি।
তোমাদের সাম্যবাদীর ছদ্মরূপের অন্তরালে অন্তর্নিহিত
তোমাদের সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সার বিরুদ্ধে,
আমি তোমাদের অভিসম্পাত করছি মাও ও চৌ।"
—কেননা আমি যে হর্ষবর্দ্ধনের কাছে শপথ করেছিলাম
ভারতের সৌহার্দ্য আর অপরিসীম উদারতাকে
হিউয়েন সাঙ কোনদিনও ভুলবে না
আর ভুলবে না তার দেশ।

"না তোমরা মানবতার নামে কলঙ্কের মসি মাখিয়েছো।
তোমরা ন্যায়কে পদদলিত করে অন্যায়ের ধ্বজা উড়িয়েছো।
তোমরা মর্টার আর ট্যাঙ্কের বিধ্বংসী আওয়াজের বিভীষিকায়
এক যুদ্ধ বিমুখ দেশের বাতাস ভারী করে তুলেছো।
আমি তোমাদের অভিসম্পাত করছি মাও ও চৌ;
তোমাদের ক্ষমতার আসন থেকে
তোমরা অচিরেই বিচ্যুত হবে।"

-কেন না আমি যে বিক্রমাদিত্যকে আলিঙ্গন করে বলেছিলাম:
ফা হিয়েন তার ভালবাসার মর্য্যাদা রাখবে।

বেতার কেন্দ্রে উচ্চাঙ্গ সংগীতে বিভিন্ন ভাষার মর্য্যাদা লাভ

উচ্চাঙ্গ সংগীতে আমাদের মাতৃভাষার স্থান নিয়ে মাঝে বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল তার মূল কারণ ছিলাম আমি। যে দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বিচার বিবেচনা নিয়ে গভীর কর্ত্তব্যবোধে ১৯৬০ সালের মার্চ্চ মাসে বেতার কেন্দ্রে আমার প্রোগ্রামের দিনে বাংলা রচনায় খেয়াল গাইবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। গাইতে বসে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে বাধা পেলাম—তাঁরা বললেন, 'বাংলা-ভাষায় খেয়াল গাওয়া চলবে না—হিন্দীতে গাইতে হবে।' আমি বললাম,—'যদি উচ্চাঙ্গ সংগীতের শ্রেণীগত গানের যথাযথ রীতি-নীতি ও পদ্ধতি বজায় রেখে পরিপূর্ণভাবে বাংলা ভাষাতে গাইতে পারা যায় তাহলে আপনারা গাইতে দেবেন না কেন? এমন কোনও আইনও থাকতে পারে না যে সে নির্দ্দেশ দিতে পারে, একটা ভাষাতে চিরকাল গেয়ে যেতে হবে! সুতরাং আপনাদের এই অবাস্তব নির্দ্দেশ পালন করতে পারি না; বাংলা দেশের বাঙালী শ্রোতাদের কাছে হিন্দীতে গান গাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য নয়—প্রধান কর্ত্তব্য ভাবযুক্ত বাংলা ভাষা দিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করে যাওয়া। আমি মনে করি আপনাদেরও তাকেই প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে করে, এইভাবে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচারের চেষ্টা করা উচিত।'

যাই হোক অবশেষে প্রোগ্রামের সময় এসে যাওয়ায় এবং আমার অটল মনোভাব দেখে বাংলা খেয়াল গাইতে দিলেন। সে দিনের সেই গাওয়া গান শুনে সাধারণ শ্রোতারাও খুব আনন্দিত হয়েছেন বুঝতে পারলাম। উঁচুদরের শ্রোতারা বললেন—'কথা ও সুর দুইই উপভোগ্য হওয়ায় খুবই ভাল লেগেছিল, এ রকম ভাবেই গাওয়া কর্ত্তব্য।'

বেতার কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু জিদ ছাড়লেন না। তাঁরা আমার উপর চার্জ্জ আনলেন। জানালেন—'আপনি বাংলা ভাষায় খেয়াল গেয়ে আমাদের আইন অমান্য করতে বাধ্য করিয়েছেন,—এর যথাযথ কৈফিয়ত আপনি লিখে পাঠান।' বিচার যুক্তি সবই লিখে পাঠালাম এবং তাঁদের আইন যদি সত্যই থাকে তাহলে সেই আইন কি বলে তাও জানতে চাইলাম কিন্তু কোনই উত্তর পেলাম না। কেবল তাঁরা লিখলেন,—'আপনার যুক্তিতে আপনি থাকতে পারেন, আমরা কিন্তু আপনাকে আর বাংলা ভাষায় খেয়াল গাইতে দেব না—হিন্দীতেই গাইতে হবে। কিন্তু ট্রাডিশনাল চাই।' বুঝলাম এঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাজ্যে হিন্দীকেই সিংহাসনে বসিয়ে রাখতে চান। সংগীতের রূপ গানের মধ্যে দিয়ে সকল ভাষাতেই যে প্রকাশিত হতে পারে এত বড় সত্য কথাটা তাঁরা যে বুঝেন না, তা কি করে মানি করি! পরের কনট্রাক্ট দু'একটাতে আমার ভাষার দাবি গ্রাহ্য না হওয়ায় প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেল।

মাস দুই আগে বেতারমন্ত্রী এসেছিলেন কলকাতায়। সাংবাদিকরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'এখানের এক প্রখ্যাত প্রবীণ সংগীতশিল্পী বেতার কেন্দ্রে বাংলা ভাষায় খেয়াল গাইতে চেয়েছিলেন কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ গাইতে দেননি, না দেবার কারণ কি আপনার কাছে জানতে চাই।' উত্তরে তিনি বলেন—'বাংলা ভাষায় গাইতে না দেবার কোন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না, প্রত্যেকের মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশিত না হলে এর প্রচার ও বিস্তৃতি

কি করে ঘটবে। আমি দিল্লী ফিরে গিয়ে উচ্চ পর্য্যায়ে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।'

তারপর গত ২০শে অক্টোবর নিখিল ভারত বেতার সংগীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান দিবসে সংগীতে প্রকৃত সুগ্রাহী বেতারমন্ত্রী মহাশয় তাঁর ভাষণে প্রচার করলেন নূতন রচনা নিয়েও প্রত্যেকের মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সংগীত বিশুদ্ধ রাগ-তাল রেখে পরিবেশিত হবে। শুধু বাংলা ভাষার নয় প্রত্যেকের মাতৃভাষারই উচ্চাঙ্গ সংগীতে যথাযোগ্য স্থান লাভ হল। বেতার কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু আমার প্রতি নীরবই আছেন! ঘটনাটি আকর্ষণীয় মনে করে এই বিবৃতি প্রচার করলাম।

পরিশেষে আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য হবে বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি ও ভজন গানকে যথাযথ ভাবে ঐ নামে ব্যবহার করা। কঠোর সাধনালব্ধ যে সংগীত এবং শিল্পসমৃদ্ধিতে যার অফুরন্ত রূপ তাকে যথার্থ ভাবে রক্ষা করে দেশবাসীর কাছে যদি তার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে চাই, তাহলে সেই সংগীতের গানে মাতৃভাষাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ভাষারূপ ও প্রকৃষ্ট উপায়রূপে গণ্য হতে হবে।

—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির

গত ১৪ই নভেম্বর সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাস ময়দানে নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে উৎসব মণ্ডপে শ্রীজওহরলাল নেহরুর জন্মদিন ও শিশু উৎসব নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শিল্পবৃন্দের দ্বারা 'ভারতভূমি' নৃত্যনাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত এম, এল, সি মহাশয়। সূত্রধরের রূপদান করেন নৃত্যনাট্য রচয়িতা প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়, নৃত্যে ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন অনুপশঙ্কর,

অরুণকুমার, স্বপ্না সেনগুপ্তা, শোভা মিত্র, অরবিন্দ মিত্র, জয়শ্রী মিত্র, অনিল ঘোষ, গোপাল মিত্র, শঙ্কর পাল প্রভৃতি। ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের সম্পাদক শ্রীঅসিত চক্রবর্তী উদ্যোক্তাদের ও দর্শকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সংগীত-শিল্পীর কৃতিত্ব

শ্রীমতী মালবিকা বসু (মজুমদার) সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বেতার সংগীত প্রতিযোগিতায় হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতে খেয়ালে, পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি কলিকাতা টেলিফোনের এ্যাসিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীএ. সি. বসু মহাশয়ের কন্যা ও

মেটাল বক্স কোম্পানীর অফিসার শ্রী ডি. কে. মজুমদারের পত্নী। বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রখ্যাত সংগীতবিদ শ্রীঅমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইনি সংগীত শিক্ষা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংগীত-নৃত্য-নাট্য আকাদামী হইতে ইনি হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছেন।

গত তিন বৎসর একাদিক্রমে নিখিল ভারত বেতার সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথমে ধ্রুপদ, পরে ঠুংরি ও এবারে খেয়ালে প্রতিবার প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়া ইনি সংগীত জগতে এক সর্বভারতীয় রেকর্ড করিয়াছেন। এযাবৎ অন্য কোন প্রতিযোগী এইরূপ অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

আমরা শ্রীমতী বসুর (মজুমদার) আরও উন্নতি কামনা করি।

সাম্প্রতিক রেকর্ড

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" এবং 'কলম্বিয়া' রেকর্ডে এবার ভালো ভালো আধুনিক গানের ছড়াছড়ি। তার উপর পূজা রেকর্ড নির্বাচনে এক শত তিনটি পুরস্কার ঘোষণা করায় রেকর্ড ক্রেতাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়। নির্বাচন প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৩১শে অক্টোবর, জনসাধারণের অনুরোধে সে তারিখ পিছিয়েছে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত। আমরা এখানে রেকর্ডগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি :—

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

(N 82984)—শ্যামল মিত্র : আঁকা বাঁকা ঐ যে পথ,—যা যা রে যা পাখী (আধুনিক)।

(N 82985)—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় : যদি জানতে গো,—আমি পারিনি বুঝিতে (আধুনিক)।

(N 82986)—উৎপলা সেন : মহুয়া বনে পাপিয়া,—মন যে আমার যায় উড়ে (আধুনিক)।

(N 82987)—নির্মলেন্দু চৌধুরী : আকাশের বিজলী হানা,—পান দিলাম, সুপারি দিলাম রে (পল্লীগীতি)।

(N 82988)—ইলা বসু : কত রাজপথ জনপথ,—দুটি চোখ লাজুক লাজুক (আধুনিক)।

(N 82989)—সনৎ সিংহ : চলেছে চাঁদের বাড়ি, যদি কেউ কোনদিন (আধুনিক)।

(N 82990)—বাসবী নন্দী : ও সোনা সোনা আলোর কণা, —নিজেই যেতে চাই (আধুনিক)।

(N 82991)—সতীনাথ মুখোপাধ্যায় : আজো তো এলো না। কে ডাকে আমারে (আধুনিক)।

(N 82992)—মান্না দে : এক ঝাঁক পাখীদের মত,—চার দেয়ালের মধ্যে (আধুনিক)।

বেতার শীর্ষসংগীত প্রতিযোগিতায় ধ্রুপদ ও ধামারে প্রথম স্থানাধিকারী যোলো বৎসরবয়স্ক শ্রীমান্ নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডা: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নিকট হইতে পুরস্কার গ্রহণ করিতেছেন। ইনি কলিকাতার বিখ্যাত গায়ক সংগীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র এবং প্রখ্যাত সংগীতবিদ অধ্যাপক অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ।

(N 82993)—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ম্যাগনেলিয়া আর ক্যামেলিয়া,—ইলোরা-অজন্তার (আধুনিক)।

(N 82994)—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য—ফটিকলাল (কৌতুক নক্সা)।

আমার কথা (৯২)

পূর্ণ দাস বাউল

আমার কথা বিভাগে মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাগণকে আজ পর্য্যন্ত যাদের পরিচিতি জানান হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু আজ যাঁর কথা জানাচ্ছি, তিনি শুধু সুনাম বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনই করেননি বরং বাংলার প্রাচীন যে ঐতিহ্য বাউল সঙ্গীত তাকে বংশপরম্পরায় যাঁরা প্রচার ও প্রসার করে এসেছেন, তিনি হলেন তাদের বর্ত্তমান একমাত্র ধারক ও বাহক শ্রীপূর্ণ দাস। তাই তার কাছে একদিন গেলাম কিছু জানবার জন্য। শ্রীদাস যা বলে গেলেন তা হল :—

১৯৩৩ সালে বীরভূমের বীরচন্দ্রপুরে আমার জন্ম। যদিও আমাদের আদি আখড়া—গুণবেঙ্গিতে। অক্রুর গোঁসাই যিনি বীরভূম জেলার একাধারে সাধক, বাউল সম্প্রদায়ের গুরু ও বহু গানের স্রষ্টিকর্ত্তা তিনি ছিলেন আমার দাদু। জয়দেব কেঁদুলীর মেলায় গান করতে এসে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন, শান্তিনিকেতনে আমি বাউলের মেলা করব। তোমার আসা চাই। তখন তিনি আমার পিতা নবনী দাসকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যান। কবিগুরু আমার পিতার গানে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার ফলে বহুদিন তিনি তথায় ছিলেন। আমার জীবনেও সৌভাগ্য হয়েছিল কবিকে দেখার এবং তাঁর পাদমূলে বসে তাঁকে গান শোনাবার। আমার বয়স তখন মাত্র নয় কি দশ বছর। আমার পিতাই নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে। এদিকে বীরভূম গোপাল ক্ষেপা, রসরাজ গোঁসাই ও নবনী দাস মাতিয়ে তুলেছেন। বীরভূম বলতে তখন এই তিন জনেরই নাম। নতুন করে এঁরা বাউলের যুগ ফিরিয়ে এনেছেন। এঁরা শুধু গায়কই ছিলেন না সাধকও ছিলেন। আদি বাসস্থান থেকে এঁরা ছড়িয়ে পড়েন গানের প্রচার ও প্রসারের জন্য। যখন যেখানে যেতেন তখন সেটাই তাঁদের ঘর। মানুষ যাইতেছে-আসিতেছে, সম্মুখে কে আছে। অক্রুর গোঁসাইয়ের ধারা 'তোরা আয় রে কে যাবি রে গৌরচাঁদ হাসপাতালে, নদীয়াপুরে' —রসরাজ গোঁসাই-এর, 'যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজবে না।' ভাবের উপর এঁরা সব গান রচনা করতেন। একশ বছর আগে গ্রামে যখন স্কুল স্থাপিত হয় তখন এঁরা গাইলেন, —'ভাল করে পড় না স্কুলে, নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে সদর স্কুল জেলা নদীয়ায় হেডমাষ্টার দয়াল নিতাই যেতে প্রেম বিলায়।' চণ্ডীদাসের যে ধারা সহজ ভাবে সহজ কথা বলা সেই ধারাকেই এঁরা বজায় রেখেছিলেন, অর্থাৎ সহজভাবে সহজ কথা বলা, মনের মানুষকে মনের মত করে পাওয়া:—'এই মানুষে, সেই মানুষে, মানুষে মানুষ দেয় গো ধরা।' গোপাল গোঁসাই গাইতেন। মানুষকেই তারা সাধনা করতেন, ভজনা করতেন। নয় বছর বয়সে জয়পুরে কংগ্রেস অধিবেশনে আমি প্রথম গান গাই এবং পুরস্কার স্বরূপ পাই Gold medal। আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে শান্তিদেব ঘোষ আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেন। গোড়ায় বলেছি বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এর কিছুদিন আগেই একবার গিয়েছিলাম। শান্তিদেব ঘোষের দৌলতে শান্তিনিকেতন রেডিও থেকে গান গাইবার সুযোগ পেলাম। এরপর ১৯৫৫ সালে গাই কলিকাতায় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে। এবং সেখানে গান গাওয়ার পরই সুযোগ পেলাম রাইকমল ছায়াচিত্রে—'পোড়া বিধি, আমার বাদী হল কৃষ্ণপ্রেম হতে দিল না' গানখানি Play back করার। এরপর কলিকাতার যুব সম্মেলনে গান গাইলাম। উঠলাম কবিগুরুর বাড়ীতে। এখানেই শ্রীনির্ম্মল চৌধুরীকে—'যেমন বেণী তেমনি রবে'—গানটি তুলে দিলাম। শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস পল্লীগীতির যিনি একমাত্র সাধক তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুস্থানের কালীদা, রাইচাঁদ বড়াল ও যামিনীবাবু আমাকে তাঁদের কোম্পানীতে রেকর্ড করালেন, এর বছরখানেক পরেই 'জোনাকীর আলো' ছায়াচিত্রে গান গাই ও অভিনয় করি। আজ পর্য্যন্ত ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমার গান শোনাবার সৌভাগ্য হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন হুমায়ুন কবীর, লক্ষ্মী মেনন, অশোক সেন, বি গোপাল রেড্ডি, বিধান রায়, শ্রীপ্রফুল্ল সেন প্রভৃতি। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র থেকেই আমার আহ্বান এসেছে। কিছুদিন আগে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে হেলসিঙ্কিতে বিশ্বযুব সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি এবং তাসখণ্ড রেডিও টেলিভিশন থেকে গান শুনিয়েছি। ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে নিজেকে আরও বিস্তার করে দেওয়া অন্যান্য স্থানে, তার জন্য সকলের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

পূর্ণ দাস বাউল

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সাত

॥ ক ॥

সুন্দর সাহেবের গৃহে আশ্রয় নিলেও শিবনাথ আগের মতই তার সহপাঠী বন্ধু বড়বাজার অঞ্চলের নরেন্দ্রনাথের গৃহে যাতায়াত করতো।

সুন্দর সাহেব যদিও তাকে বার বার বলে দিয়েছিল তার যখন যা দরকার কোন রকম দ্বিধা মাত্র না করে তাকে জানাতে—তথাপি শিবনাথ তাকে তার পাঠ্যপুস্তকের কথা জানাতে পারে নি। পূর্বের মতই মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রনাথের ওখানে গিয়ে তার পাঠ্যপুস্তক দেখে যা পড়বার পড়ে আসত। শুধু যে পাঠ্যপুস্তকের জন্যই শিবনাথ নরেন্দ্রর গৃহে স্কুলের ছুটির পর যেতো তা নয়, নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার নিবিড় একটা সৌহার্দ্য যেন গড়ে উঠেছিল।

নরেন্দ্র রীতিমত ধনী বংশের সন্তান।

বড়বাজার ও সুতানটীর আদি প্রতিষ্ঠাতা যে বাঙালী শেঠ, বসাক, মল্লিক, সিংহ, শীল, বড়াল প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা সে সময় বড়বাজার অঞ্চলে আধিপত্য করতো, তাদের অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র মল্লিকের একমাত্র ছেলে ছিল নরেন্দ্র।

সুরেন্দ্র মল্লিকের বিশাল চৌহদ্দি জোড়া চারমহালা বাড়ি লোকজন অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে যেন গম-গম করতো।

পূজামণ্ডপ, দালান, বাগান, পুকুর।

গঙ্গাতীরে নিজস্ব ঘাট পর্যন্ত যাবার তৈরী পাকা পথ।

দু'তিনখানা পাল্কী গাড়ি।

বার মাসের তের পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, ভোজ, খানাপিনা হৈ হৈ ব্যাপার।

যদিও লটারী কমিটির উদ্যোগে ভাগীরথীর পূর্ব তীরবর্তী গ্রামগুলো তখন দীর্ঘকালের [illegible] ছেড়ে অতি দ্রুত আধুনিক এক শহরের রূপ নিচ্ছে; কলকাতার [illegible], জঙ্গল-জলা, খাল-পুষ্করিণী এদিক ওদিক যা ছড়িয়ে ছিল [illegible] হয়ে যাচ্ছে, অধিকাংশ মাটির ঘর ইট কাঠের বাড়িতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তথাপি বড়বাজার অঞ্চলে চক মিলান বড় বড় বাড়ির কিন্তু অভাব নেই।

এবং অভাব ছিল না ধনী ব্যবসায়ীদের দৌলতেই।

নরেন্দ্রর অনুরোধে নয় প্রথম দিন নিজের তাগিদেই শিবনাথ নরেন্দ্রর গৃহ অনুসন্ধান করতে করতে ঐ বিরাট চারমহলা বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল।

যে বাড়িতে তখন শিবনাথ থাকতো সেই অরিন্দম সরকারের ঘর বাড়ি ঐশ্বর্য নরেন্দ্রর পিতা সুরেন্দ্র মল্লিকের ঐশ্বর্যের তুলনায় কিছুই নয়।

ইতিপূর্বে নাম শুনলেও বড়বাজারে কখনো শিবনাথ পা দেয় নি।

চারিদিকেই যেন ধনী-ব্যবসায়ী শেঠ, বসাক, মল্লিকদের ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি।

সেদিনটা ছিল রবিবার, স্কুল বন্ধ।

বাড়ির সামনে এসে থমকে যখন দাঁড়িয়ে গিয়েছে শিবনাথ, এমন সময় পাল্কী গাড়িতে চেপে সুরেন্দ্র মল্লিক বের হয়ে আসছিলেন।

গাড়িটা আর একটু হলেই হুড়মুড় করে একেবারে শিবনাথের ঘাড়ের উপর এসে পড়ত, কিন্তু গাড়ির চালক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘোড়ার রাশ টেনে গাড়িটা থামিয়ে দেয়। হঠাৎ গাড়িটা থামায় সুরেন্দ্র মল্লিক, প্রায় হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেন।

এই কি হলো রে?

প্রশ্নটা করে গাড়ির জানালা পথে মুখ বাড়াতেই পাশেই রাস্তার 'পর দণ্ডায়মান শিবনাথের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের নজর পড়ে।

কে? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

থতমত খেয়ে গিয়েছিল শিবনাথও। সে আমতা আমতা করে বলে, আজ্ঞে—

কি নাম তোমার।

আজ্ঞে শিবনাথ লাহিড়ী।

ব্রাহ্মণ!

আজ্ঞে—

কাকে চাও?

আজ্ঞে এটাই কি সুরেন্দ্র মল্লিক মশাইয়ের গৃহ?

হ্যাঁ। আমিই— কি দরকার বল!

আমি নরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় শিবনাথ।

সুরেন্দ্র মল্লিকের স্নেহমধুর কণ্ঠস্বরে লুপ্ত সাহস শিবনাথের অনেকটা তখন আবার ফিরে এসেছে।
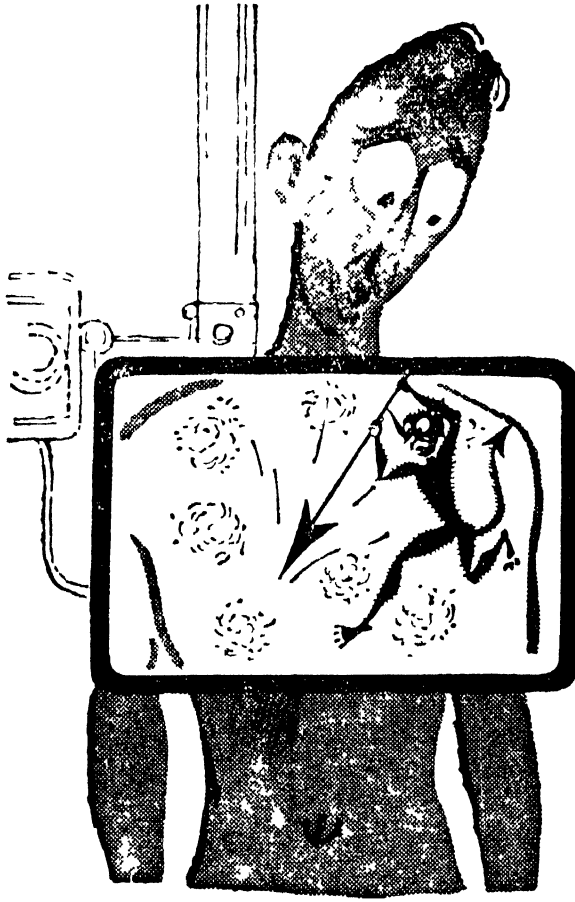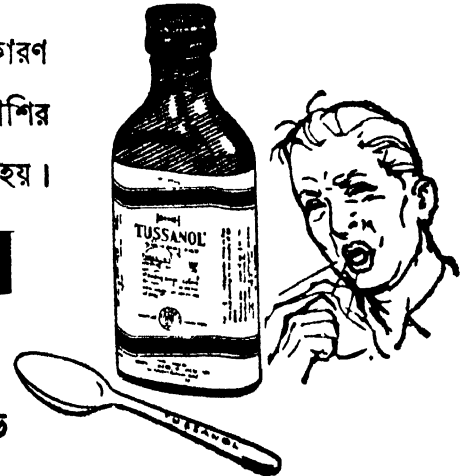
নরেন্দ্র! তার সঙ্গে তুমি অধ্যয়ন কর বুঝি?

আজ্ঞে, আমরা একই শ্রেণীতে পড়ি।

হুঁ, যাও—ভিতরে সে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে সংস্কৃত পাঠ নিচ্ছে।

কথাটা বলে আবার কি ভেবে সুরেন্দ্রনাথ একজন ভৃত্যকে ডেকে বললেন, ওরে, নরেন্দ্র যেখানে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে সংস্কৃত পাঠ নিচ্ছে, এই ছেলেটিকে সেখানে নিয়ে যা—

ভৃত্যকে আদেশ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ আবার পাল্কীগাড়িতে উঠে বসলেন এবং গাড়িটা চলে গেল।

ভৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের দিকে অগ্রসর হলো শিবনাথ।

নরেন্দ্র সংস্কৃত পাঠ নিচ্ছে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে, কথাটা শুনে শিবনাথ একটু যেন বিস্মিতই হয়েছিল। কারণ পূর্বে সমাজে যাঁরা সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন বা আরবী-ফার্সী শিখে নবাব-সরকারের রাজকাজের যোগ্যতা অর্জন করতেন, তাঁরাই বিদ্বান ছিলেন বা বিদ্বৎসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু ইদানীং কলকাতায় যাঁদের নিয়ে নতুন বিদ্বৎসমাজ গড়ে উঠছিল তাঁরা ইংরাজী-জানা লোক। কারণ ইদানীং তাঁদেরই যা কিছু যোগাযোগ ছিল ইংরাজদের বিদ্বৎ-সমাজের সঙ্গে।

পলাশীর যুদ্ধের পরে অনেক দিন পর্যন্ত ইংরাজরা রাজকার্যাদি নবাবী আমলের রীতি অনুযায়ী চালিয়েছিল আরবী ও ফার্সীর এত কদর ছিল, কিন্তু ক্রমশ যখন তারা ঐ ভাষা বাতিল করে ইংরাজী ভাষার প্রচলন করতে লাগলো—আরবী ফার্সী যারা শিখেছিল তাদের শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগল এবং নতুন করে তাদের ইংরাজী শিখতে শুরু করতে হলো।

ঐ সঙ্গে সঙ্গে আরবী, ফার্সীবিদ মৌলবী মুন্সী, ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা যারা শিক্ষকতা করে স্বচ্ছন্দে অর্থ উপার্জন করতেন তাদেরও ক্রমশ একঘরে হয়ে যেতে হয়েছে বর্তমান বিদ্বৎ সমাজ থেকে।

যদিও তখন কেন্দ্রীয় মহানগরী কলকাতায় উইলসনের প্রস্তাব অনুযায়ী বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস সংস্কৃত কলেজের জন্য বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ করেছেন এইজন্য যে, সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা কলেজ প্রতিষ্ঠার আশু উদ্দেশ্য হলেও ক্রমশ ঐ শিক্ষায়তনের মাধ্যমেই হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য বিদ্যা ও ইংরাজী শিক্ষারই প্রসার হবে বলে তিনি মনে করেন।

দুই বৎসর, তারপরও ব্যাপারটা কাগজের পৃষ্ঠাতেই বন্দী হয়েছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নবগঠিত জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন এবং সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটি একসঙ্গে হয়ে প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করবার সংকল্প করেন এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে ৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের একটি ভাড়াটে বাড়িতে কলেজের পাঠ্যারম্ভ শুরু হয়।

অথচ ঐদিকে ইতিমধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনে ধর্মতলা ও চিৎপুরে ফিরিঙ্গী শারবোর্ণ ও ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল থেকে যা শুরু তার পরিণতি হয়েছিল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার —আত্মীয় সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হাইড ইষ্ট প্রভৃতির চেষ্টায় মহাবিদ্যালয় বা হিন্দুকলেজে।

তারপর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে স্কুল সোসাইটি সভা।

সব উদ্দেশ্য একই—নতুন প্রণালীতে বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া।

পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করছে শুনে শিবনাথের বিস্ময়ের সত্যিই যেন সীমা ছিল না।

ভৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বহির্মহলের একটি কক্ষ সংলগ্ন বারান্দায় এসে শিবনাথ দেখলো, পণ্ডিত বৃদ্ধ রামদুলাল তর্কচূড়ামণির কাছে বসে নিবিড় নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে সারস্বত ব্যাকরণ পাঠ নিচ্ছে। শিবনাথকে আসতে দেখে স্মিত হেসে নরেন্দ্র বলে, আয় বোস—

তর্কচূড়ামণির গৌরবর্ণ, দেবদুর্লভ চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত ললাট ও চক্ষু শিবনাথের মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করে।

সে পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম করে সামনে বসে।

পণ্ডিত মশাই হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন, মঙ্গল হোক।

তারপর নরেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই ছেলেটি?

নরেন্দ্র বলে, আমার সহাধ্যায়ী, একই স্কুলের আমরা ছাত্র—

কি নাম?

শিবনাথ লাহিড়ী।

ব্রাহ্মণ।

আজ্ঞে—

আরো দু'একটা কথার পর তর্কচূড়ামণি বললেন, ব্রাহ্মণ সন্তান তুমি কেবল ইংরাজীই শিক্ষা করছো? সংস্কৃত অধ্যয়ন করো না?

শিবনাথ মাথা নীচু করে বসে থাকে।

তর্কচূড়ামণি বললেন সস্নেহে, দেশের আদি ভাষাটা শিক্ষা করবে না কেবল বিদেশী ম্লেচ্ছ ভাষাই শিক্ষা করবে, এ মনোবৃত্তি কেন হে শিবনাথ?

শিবনাথ তথাপি নিশ্চুপ।

সেদিনকার পাঠ শেষ হয়েছিল, তর্কচূড়ামণি গাত্রোত্থান করতে করতে মৃদু হেসে শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, সংস্কৃত ভাষার মধ্যেও অনেক মহামূল্য রত্ন আছে হে শিবনাথ, অধ্যয়ন করে দেখো—

তর্কচূড়ামণি অতঃপর খড়মের শব্দ তুলে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

শিবনাথ এতক্ষণ কোন কথা বলেনি বটে কিন্তু এখন বলে, তুই সংস্কৃত পড়িস নরেন—

কি করবো বাবা ছাড়েন না—

তা'হলে কি তুই এরপর সংস্কৃত কলেজেই ভর্তি হবি নাকি রে? বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে শিবনাথ।

দেখি—বাবা যা বলবেন—

তাহলে তুই হিন্দু কলেজে পড়বি না?

এখন কি করে বলি?

আমি কিন্তু হিন্দু কলেজেই ভর্তি হবো।

হিন্দু কলেজে ভর্তি হবি?

হ্যাঁ—কেন জানিস?

কেন?

ডিরজিও সেখানে শিক্ষক।

নরেন্দ্র নামটা শুনে কেমন যেন একটু আশ্চর্যই হয়, কারণ তখন পর্যন্ত ঐ নামটা সে শোনে নি। তাই বোধ করি বোকার মতই প্রশ্ন

জানিস না তুই ডিরিজিও কে ?

না, তুই তাকে চিনিস নাকি ?

চিনি না তবে দেখেচি।

দেখেচিস !

হ্যাঁ !

কোথায় ?

ড্রামণ্ড সাহেবের বাড়িতে—

ড্রামণ্ড সাহেব ? সে আবার কে রে ?

তুই দেখচি কোন খবরই রাখিস না। নরেন—ড্রামণ্ড সাহেবই তো ধর্মতলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। ঐ ড্রামণ্ড সাহেবেরই ছাত্র ডিরিজিও—ঐ ধর্মতলা একাডেমি থেকে শিক্ষালাভ করে এই তো কয়েক দিন হলো হিন্দু কলেজের শিক্ষক হয়েছে ডিরিজিও—

নরেন্দ্র আবার প্রশ্ন করে, লোকটা বুঝি সাহেব ?

না, ফিরিঙ্গী—তুই তো দেখেছিস ধর্মতলায় বাগান, পুকুর মস্ত বড় চৌহদ্দি নিয়ে লাল রংয়ের দোতলা বাড়িটা—মনে পড়ে ? ঐ যে রে—জীবনকৃষ্ণর বাড়িতে যেতে পড়ে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়েছে—

সেই বাড়িতেই তো ডিরিজিও থাকে। জীবনকৃষ্ণর সঙ্গে ডিরিজিওর আলাপ আছে—

সত্যি !

হ্যাঁ—জীবনকৃষ্ণও সামনের বছর হিন্দু কলেজে ভর্তি হবে—জানিস ?

জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও শিবনাথ ও নরেনের সহাধ্যায়ী। তার বাড়ি বৌবাজার—

জীবনকৃষ্ণও ধনীর সন্তান। জীবনকৃষ্ণর বাবা অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—তখনকার কলকাতার ইংরেজ সমাজে যে সব বাঙালী বেনিয়ানদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল তাদেরই অন্যতম ছিলেন।

ককরেল ট্রেল এণ্ড কোম্পানীর বেনিয়ান অতুলকৃষ্ণ। বৌবাজার অঞ্চলে তাদের তিনমহলা বাড়ি।

কথাটা অবিশ্যি মিথ্যা নয়।

জীবনকৃষ্ণর সঙ্গেই একদিন শিবনাথ ডিরিজিওর গৃহে গিয়েছিল সন্ধ্যায়। সেখানে তখন একটা বিতর্ক সভা চলেছিল। মহাপাঠশালা বা হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র ঘিরে ছিল ডিরিজিওকে। মানুষটার দিকে তাকিয়ে শিবনাথের যেন মনে হয়েছিল যেন অরুণবহ্নি। মনে হয়েছিল যেন ঝক্ ঝকে একটা তলোয়ার। গোলাপ মুখ—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মাঝখানে সিঁথি কাটা, আর কি সতেজ মিষ্টি কণ্ঠস্বর।

মানুষ আর ঈশ্বর নিয়ে সেদিন তর্ক চলেছিল। ডিরিজিওর সেদিনকার কয়েকটা কথা আজও যেন শিবনাথ ভুলতে পারেনি।

ঈশ্বর—ভগবান, যদি কেউ থাকেন তো থাকুন। আর যাদের জীবনে অফুরন্ত অবসর আছে তারা স্বর্গলোক কোথায় এবং সেখানে কোথায় ঈশ্বর বসে আছেন—খুঁজে বেড়াক তারা। কিন্তু ইহজীবনে আমি বলবো মানুষই ঈশ্বর, মানুষই তার সর্বময় প্রভু বা কর্তা এবং মানুষের চিন্তাই ঈশ্বর চিন্তা। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর পৃথিবীতে কিছু নেই। চিরদিনের সংস্কার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরে এ যেন তীব্র কুঠারাঘাত। তাই প্রথমটায় চমকে উঠেছিল শিবনাথ।

ঈশ্বর বলে কোন বস্তু নেই, মানুষই ঈশ্বর। পথে আসতে আসতে সেদিন শিবনাথ জীবনকৃষ্ণকে শুধিয়েছিল, কথাটা তুই বিশ্বাস করিস জীবনকৃষ্ণ ?

জীবনকৃষ্ণ বন্ধুর প্রশ্নের স্পষ্টাস্পষ্টি উত্তর না দিয়ে ঘুরিয়ে কথাটা বলেছিল, তুই বিশ্বাস করিস না শিবনাথ ?

থতমত খেয়ে গিয়েছিল শিবনাথ পাল্টা প্রশ্নে, আমি ?

হ্যাঁ, বিশ্বাস করিস না ?

না। মৃদুকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল শিবনাথ।

এবারে আর অস্পষ্টতা কিছু ছিল না জীবনকৃষ্ণের কথায়, সে স্পষ্টকণ্ঠে বলেছিল, কিন্তু আমি করি—

করিস ?

হ্যাঁ যেটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে কেবলমাত্র কল্পনায়ই তাকে আমি মেনে নিতে পারি না। জীবনকৃষ্ণের দৃঢ়কণ্ঠের জবাবে এবারে যেন পরম বিস্ময়ের সঙ্গেই তাকিয়েছিল শিবনাথ চমকে ওর মুখের দিকে।

জীবন !

কি ?

তোর বাবা মা জানেন এসব কথা ?

কোন কথা ?

ভয়ে ভয়ে কেমন যেন সংশয় ও দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে শিবনাথ শুধিয়েছিল, এই যে তুই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস করিস না।

হো হো করে হঠাৎ হেসে উঠেছিল জীবনকৃষ্ণ তারপর হাসতে হাসতেই বলেছিল, জানি না—জানে কি না। তবে এও ঠিক

জানলেও কোন ক্ষতি নেই আমার। তার পরই গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল, যুক্তি দিয়ে যা সত্য বলে মনে জেনেছি তাকে সকলের কাছেই স্বীকার করবার মত সাহস আমার আছে শিবনাথ এমন কি মা-বাবার কাছেও।

আচ্ছা জীবনকৃষ্ণ ?

কি ?

তোদের বাড়িতে তো তুই-ই বলেছিস দোল-দুর্গোৎসব হয় গৃহ-দেবতাও আছেন রাধা-কৃষ্ণ—

আছে। সেই সব পূজাদি ও দেবতা তোর কাছে তাহলে মিথ্যা ?

হ্যাঁ—ও সবকিছুই আমি অন্ধ কুসংস্কার বলেই মনে করি—

এর পর আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করে নি জীবনকৃষ্ণকে শিবনাথ ; কেমন একটা ভয়ে যেন বুকটা তার কেঁপে উঠেছিল।

জীবনকৃষ্ণকে তার পর থেকে সাধ্যমত সে এড়িয়েই গেছে সত্যি কিন্তু তবু স্কুলে তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই তার প্রতি কি যেন এক অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করেছে।

নরেন্দ্র ব্রাহ্মণ সন্তান না হলেও নিষ্ঠাবান হিন্দু কায়স্থের সন্তান। এবং শিবনাথের মনে হলো সে যেন জীবনকৃষ্ণের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ সে ইংরাজী স্কুলে পড়ে ইংরাজী শিক্ষা করলেও বাপের ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে সে ইংরাজীর সঙ্গে সংস্কৃতও অধ্যয়ন করছে।

মনের মধ্যে স্বতঃই একটা প্রশ্ন জাগে যেন শিবনাথের তবে কে সত্য। নরেন্দ্রনাথ না জীবনকৃষ্ণ।

হঠাৎ নরেন্দ্রর প্রশ্নে যেন চম্‌কে ওঠে শিবনাথ।

কি ভাবছিস রে শিবনাথ ?

য়্যাঁ। কই কিছু না তো।

এমন সময় ভৃত্য এসে জানালো নরেন্দ্রকে, তার জননী দুর্গা দেবী অন্দরে ডাকছেন।

নরেন্দ্র বলে, চল শিবনাথ, মা ডাকছেন।

শিবনাথের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নরেন্দ্রের আগ্রহে তাকে অন্দরে যেতেই হলো তার সঙ্গে।

এবং সেই দিনই প্রথম সেই দেবী প্রতিমার মত দুর্গা দেবীকে দেখে শিবনাথ। মা তো নয় যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। [ক্রমশঃ।

ভাড়াটে

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তহীন অসীম আকাশ। সে আকাশকে সীমিত করে মাথা তুললে একটি বাড়ী। দেওয়ালের মধ্যের আকাশটাও অসীমের অংশ রইল বটে, কিন্তু সীমার মধ্যে ধরা পড়ল। এমনি করে জন্ম নিল একে একে বহু বাড়ী অসংখ্য। বিচিত্র তাদের আকার, বিভিন্ন তাদের ভঙ্গী, অপরূপ তাদের নির্মাণ কৌশল। দেওয়াল-গুলোও কোনটা কাঁচের মত স্বচ্ছ, তার মধ্যে দিয়ে বাইরের আকাশটা দেখা যায়, অনুভব করা যায় কিন্তু পার্থক্যের ব্যবধান থেকে যায়। কতক দেওয়াল বিচিত্র রং-এর ; তার মধ্যে দিয়ে আকাশের সত্যকার রূপটা বোঝা যায় না, নানা বর্ণ বৈচিত্র্যে রঞ্জিত দেখায় ; সেই রং-এর নেশায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায় বাড়ীর বাসিন্দা। বেশীর ভাগ দেওয়ালই জমাট, নীরেট ; তার ভেতর দিয়ে বাইরেটা দেখাই যায় না। সে দেওয়ালগুলোর আড়ালে বাস করে থমথমে অন্ধকার, আলস্য, নৈরাশ্য, অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা।

বাড়ীগুলো তৈরী হতে না হতেই জুটে যায় ভাড়াটে। "টু লেট" টাঙাতে হয় না। আজকের দিনের মত ভাড়াটের সঙ্গে চুক্তি ক'রেই বুঝি বাড়ীগুলো তৈরী হয় তাদের বাসের জন্য। বিজ্ঞ ভাড়াটেরা বিভিন্ন বাড়ীর শ্রেণী বিভাগ করলে দেওয়ালগুলোর প্রকৃতির মাপ-কাঠিতে। কাঁচের মত দেওয়ালগুলোকে বললে "সত্ত্ব" ; রঙীনগুলোকে বললে "রজ" ইট পাথরের জমাটগুলোকে বললে "তম"। এই তিন প্রকৃতির ঘেরা বাড়ীর উঁচু দেওয়ালগুলো বাইরের আকাশকে আড়াল করে সৃষ্টি করলে উঠানের ওপর ছোট, একটা আকাশ। ঐ দেওয়ালের মধ্যে বাস করে মনে হয় ঐ ছোট্ট আকাশটাই পরম সত্য, কারণ তার বাইরে ত কিছু দেখা যায় না। কখনও কখনও মনে হয় বটে, একটা যেন অনুভূতি জাগে যে ঐ ছোট্ট আকাশটা বুঝি কোন অসীম নীলাকাশেরই অংশ ; কিন্তু সে ত অনুভূতি কল্পনা, প্রত্যক্ষ ত নয়। উঠোনের ওপরের আকাশটা প্রত্যক্ষ এই প্রত্যক্ষর যে ভ্রম কাঁচের দেওয়ালের ভাড়াটেরা তার নামকরণ করলে 'মায়া'।

ভাড়াটেদের শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগলো। বাড়ীগুলোও তাদের প্রয়োজন মতই যেন বেড়ে যেতে লাগলো, বদলাতেও লাগলো।

হঠাৎ একদিন বাড়ীতে ফাটল দেখা দিল। সে ফাটলের মধ্যে দিয়ে কেউ দেখলে বাইরের অসীম আকাশ, দেওয়ালের বন্ধনের থেকে মুক্তির আনন্দে হ'ল উল্লসিত ; কেউ পেল ভয়—বাড়াটা যাবে বুঝি ভেঙ্গে, রামধনুর বর্ণ বৈচিত্র্যের যে আনন্দ তারা ডুবে ছিল বুঝি শেষ হোল সে খেলার ; কেউ বাইরের দুর্যোগের ঝাপটার ভয়ে প্রাণপণে ফাটল বন্ধ করবার চেষ্টা করতে থাকে চোখ বুজে পিঠটা ফাটলে ঠেস দিয়ে।

ফাটল যখন বড় হয়, মেরামতের বাইরে মনে হয়, তখন মনে পড়ে বাড়ীওয়ালাকে। এ বাড়া ত বাড়াওয়ালার ; আমরা ত ভাড়াটে ! মেরামতের দায়িত্ব ত বাড়ীওয়ালার। মনে পড়ল বাড়ীওয়ালাকে, কিন্তু ভাড়াটের সাহস হোল না তার কাছে নালিশ জানাতে, নিজেদের দাবী পেশ করতে। এতদিন যে বাস করেছি নিয়মিত ভাড়া ত দিইনি। ভাড়াটা নিয়মিত দিলে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে একটা যোগ থাকত, দাবী চলত। ভাড়াটা যে বহুদিন বাকী ; কোনমুখে দাবী জানাব।

একদিন বাড়ীটা ভেঙ্গে যে ধূলোমাটির বুক থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তার বুকেই মিলিয়ে গেল।

ভাড়াটে গৃহশূন্য হয়ে আশ্রয়ের জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ভাল বাড়ী দেখে ঢুকতে যায় ; প্রশ্ন করে দ্বারী, আগের বাড়ীর ভাড়া মিটিয়েছ ত ? কতদিনের বাকি ?

যে ভাড়াটের যেমন "রেকর্ড" তেমনি বাড়ীই ত সে পাবে। ভাড়া বাকী ফেলে যারা পালিয়েছে তাদের কি আলো হাওয়াওয়ালা ভাল বাড়ী জোটে ? অন্ধকার স্যাঁত স্যাঁতে বাড়ী ছাড়া কী তারা আশা কোরতে পারে ?

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

(আলেকজাণ্ডার পুশকিনের The Captain's Daughter)

এক

গ্রিনেভের বাবা রুশ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন একেবারে কিশোর বয়সে। কয়েক বছর পর যখন সামরিক বিভাগ ছেড়ে অসামরিক জীবন শুরু করলেন, তখন বয়সে একেবারে তরুণ। অবসর গ্রহণের সময় সামরিক বিভাগ থেকে ওঁকে উপাধি দেওয়া হলো।

এঁর কিছু পৈতৃক জমিজমা ছিল, এইখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন উনি। বিয়ে করলেন এই অঞ্চলেরই গরীব পরিবারের একটি মেয়েকে। পর পর আটটি ছেলেমেয়ে ওঁদের শৈশবেই মারা গেলো। গ্রিনেভের জন্ম হলো তার পর। একমাত্র ও-ই বেঁচে রইলো মায়ের কোল জুড়ে।

পাঁচ বছর বয়স থেকেই গ্রিনেভকে দেখাশুনোর ভার পড়লো স্যাভেলিচের ওপর। স্যাভেলিচ মানুষটা খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির। গ্রিনেভের দৌরাত্ম্য ও সহ্য করতো। এমন কি ওর হাতেখড়িটাও হলো স্যাভেলিচের কাছে। বছর সাতেকের চেষ্টায়, মানে গ্রিনেভের যখন বছর বারো বয়স তখন দেখা গেলো ও বেশ লিখতে ও পড়তে শিখেছে। এরপর একমাত্র ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্যে এক ফরাসী পণ্ডিতকে নিযুক্ত করলেন গ্রিনেভের বাবা। তাকে দেখে স্যাভেলিচ রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠলো। বললো: এতদিন তো আমরাই দেখে এসেছি গ্রিনেভকে, সেই এইটুকু বেলা থেকে ওকে নাওয়ানো-খাওয়ানো থেকে অক্ষর পরিচয় অবধি, আর এখন কিনা হাজার মাইল দূর থেকে মাষ্টার আনা হলো, কেন দেশে কি আর লোক ছিলো না?

ফরাসী পণ্ডিত জাতে নাকি নাপিত, কিছু দিন সৈন্যবাহিনীতে ছিলো, বিদ্যাবুদ্ধিরও প্রচুর নামডাক আছে, বহু দেশ ঘুরেছে। জীবন সম্বন্ধে রীতিমত একজন অভিজ্ঞ লোক। বেশ হাসিখুশি মেজাজের মানুষ। তবে ওঁর দু'টো খুব মারাত্মক দোষ ছিল। যেমন খেতো মদ, তেমনি ঝোঁক ছিল মেয়েদের দিকে।

নতুন মাষ্টার-এর সঙ্গে গ্রিনেভের কয়েক দিনের মধ্যেই মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠলো। সবাই ওপর ওপর দেখে খুশী হলো যে নতুন মাষ্টারকে গ্রিনেভ বেশ বন্ধু ভাবেই নিয়েছে, কাজেই পড়াশুনোও ভালো ভাবেই চলছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু এভাবে বেশিদিন চললো না। মোটা ধুমসী ধোবানীটা আর এক চোখো কানী গয়লানীটাই যতো ফাসাদ বাধালো। ওরা দু'জনেই একদিন কেঁদে কেটে গ্রিনেভ-এর মায়ের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো। বয়সে ওরা দু'জনই নেহাৎ তরুণী। কেঁদে কেটে নালিশ জানালো নতুন মাষ্টার-এর বিরুদ্ধে। বললো, তিনি নাকি ওদের ইজ্জত নষ্ট করেছেন।

গ্রিনেভের মা শুনে তো রেগে আগুন। বললেন বাবাকে। গ্রিনেভের বাবা উত্তেজিত ভাবে এসে ঢুকলেন নতুন মাষ্টার-এর জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে। দুপুর বেলা। নতুন মাষ্টার তখন নেশায় চুর হয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। আর গ্রিনেভ তখন একখানা ঘুড়ি তৈরী করতে ব্যস্ত। অনেক দিন ধরেই ওর আশা ছিল একখানা রঙিন ঘুড়ির। কয়েকদিন আগে মস্কো থেকে আনা বিরাট পৃথিবীর মানচিত্রখানা পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারলো না বেচারা। ভূগোল পড়ার কি হবে সেজন্যে ভেবে সময় নষ্ট না করে মাষ্টার মশায়ের দিবানিদ্রার ফাঁকে মানচিত্রটা কেটেকুটে ও ঘুড়ি বানাতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সবই প্রায় হয়ে গেছে। উত্তমাশা অন্তরীপের অঞ্চলটা কেটে একটা ফালি বের করে ঘুড়িটার লেজ জুড়বে, ঠিক এমনি সময়ে বাবা ওর কান ধরে টেনে তুললেন। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়লেন নতুন মাষ্টারের ওপর। প্রথমে ঘা কতক দিয়ে তারপর টেনে দাঁড় করালেন ওঁকে। বেচারা একেবারে অকস্মাৎ এ অবস্থায় হতভম্ব হয়ে গেলো। বাবা ওকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন।

নতুন মাষ্টারের এই দশা দেখে স্যাভেলিচের আর খুশী ধরে না! গ্রিনেভের পড়াশুনোর এইখানেই শেষ হলো। এরপর শুধু খেলাধুলো আর হৈ হুল্লোড় স্থরু হলো পাড়া পড়শী ছেলেদের সঙ্গে। কখনো
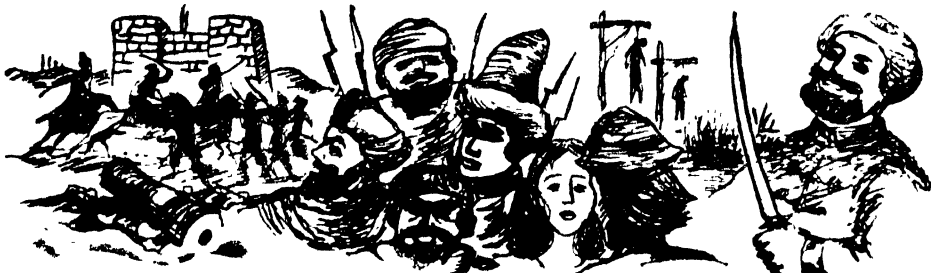
বা পায়রা ওড়ায়, বনে বাদাড়ে বেড়ায়। এইভাবেই চলতে লাগলো। দেখতে দেখতে ওর ষোলো বছর পূর্ণ হলো। এবার একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিলো গ্রিনেভ-এর জীবনে।

একদিন গ্রিনেভ-এর মা বসবার ঘরে বসে আচার তৈরী করছিলেন। গ্রিনেভকে দেখা গেলো এক পাশে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন ঢোক গিলছে আর দেখছে আচারের বয়ামটার দিকে। আর এক পাশে ওর বাবা একখানা কেদারায় বসে নিবিষ্ট মনে সামরিক বিভাগের বার্ষিক গেজেটটা পড়ছিলেন আর মাঝে মাঝে নিজের মনে নানা উক্তি করছিলেন থেকে থেকে—হুঁ এরই মধ্যে মেজর হয়ে গেলো লোকটা তো আমার অধীনে ছিল সামান্য একজন সৈনিক হয়ে···আঃ··· এক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি লড়তাম আমরা।

এইরকমই চলছিল কিছুক্ষণ ধরে। গ্রিনেভ ক্রমশ আচারের বয়ামটার দিকে এগোচ্ছিল। কিন্তু এবার হঠাৎ থমকে গেলো বাবার গলা শুনে। গেজেটখানা একপাশে রেখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—গ্রিনেভের বয়স এখন কতো হলো?

—এই ঠিক ষোলো পূর্ণ হয়েছে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে মা বললেন—পিসিমার যেবার চোখ খারাপ হয়েছিলো, ওর জন্মও হয়েছিলো সেই বছর।

—ঠিক হয়েছে, বাবা একটু নড়ে চড়ে বসলেন, এইটেই ঠিক কাজকর্ম করবার বয়স, লেখাপড়া তো আর কিছু হবে না ওর। সারাদিন আছে কেবল বন আর পায়রা ধরবার তালে। হুঁ। ওকে আমি সৈন্যবাহিনীতে ঢুকিয়ে দেবো।

আচমকা কথাটা শুনে গ্রিনেভের মায়ের হাত থেকে চামচেখানা খসে পড়লো। চোখ দু'টি ভরে এলো জলে। গ্রিনেভের মনটা কিন্তু আনন্দে নেচে উঠলো। সহরে থাকা যাবে, তা' ছাড়া ধোপদুরস্ত সামরিক পোষাক আরো কতো কি। মুহূর্ত্তের মধ্যে ও কল্পনায় দেখতে লাগলো যেন মস্ত একজন সেনাপতি হয়েছে। সামরিক সমস্ত কিছুর প্রতি বাবার শ্রদ্ধার বহর দেখে দেখে গ্রিনেভ-এর ধারণা হয়েছে সেনাপতি হওয়ার চাইতে বৃহত্তর এবং মহত্তর আর কিছু হতে পারে না এ জীবনে।

গ্রিনেভ-এর বাবার সিদ্ধান্তের নড় চড় হ'তে দেখা যায় না কখনোই। কাজেই ওর মা তাঁর ইচ্ছেতে বাধা দেবার কোনো চেষ্টা করলেন না। সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গে কাজটা করে ফেলা গ্রিনেভের বাবার ছেলেবেলার অভ্যাস। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই উনি ঘোষণা করলেন পরের দিনই বেরিয়ে পড়তে হবে গ্রিনেভকে। এ পর্য্যন্ত বাবার কথায় গ্রিনেভ ক্রমশ উৎফুল্ল হয়েই উঠছিলো, কারণ বাড়ীর বাইরে মা-বাবার চোখের আড়ালে যা খুশী তাই করে বেড়াবার সম্ভাবনা, ওকে প্রায় দিশেহারা করে তুলেছিলো। সব চাইতে বড়ো কথা সহরে, একেবারে খাস রাজধানীতে থাকা যাবে।

কিন্তু একটুক্ষণ পরেই বাবা যা বললেন তা শুনে গ্রিনেভ-এর মুখ শুকিয়ে গেলো। উনি বললেন যে সহরে, বিশেষ করে রাজধানীতে থাকলে সামরিক বিভাগের লোকেরা কেবল বিলাসিতা শেখে, ওদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন হয়, আসল কাজের কিছুই শেখা হয় না।

কাজেই ঠিক হ'লো গ্রিনেভকে যেতে হবে সুদূর ওরেনবুর্গে। সেখানকার অধিনায়ক ওঁর বিশেষ পরিচিত; উনি আর কালবিলম্ব না করে তাঁর উদ্দেশ্যে একখানা চিঠি লিখতে বসলেন।

চিঠিখানা লেখা শেষ হ'লে গ্রিনেভ-এর হাতে দিয়ে বাবা বললেন—এই নাও, যত্ন করে রেখে দাও চিঠিখানা। আমার বিশেষ বন্ধু জেনারেলকে লিখে দিলাম। ওঁর হাতে গিয়ে দেবে। উনিই তোমার উপরওয়ালা হবেন।

পরদিন। গ্রিনেভ-এর যাত্রার সময় হয়ে এলো। নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী এসে গেলো দেউড়িতে। মা কাঁদতে কাঁদতে গ্রিনেভ-এর মুখে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। আর বার বার করে বলতে লাগলেন শরীরের দিকে নজর রাখবার জন্যে। বাবা অনেক আদেশ-উপদেশ দেবার পরে বললেন—সব সময় নিজের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে।

নানা কারুকার্যখচিত একটা কোট পরলো গ্রিনেভ। স্যাভেলিচকে মা সঙ্গে দিলেন। মা-বাবার আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো গ্রিনেভ। চোখ মুছতে মুছতে গাড়ীতে এসে বসলো স্যাভেলিচ-এর পাশে। গাড়ী ছেড়ে দিলো।

গ্রিনেভ-এর গাড়ী যখন সিমবিরস্ক-এ এসে পৌঁছলো, তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এসেছে। একটা সরাইখানার সামনে এসে থামলো গাড়ীটা। ঠিক হ'লো আজ রাত এবং কালকের দিনটা এইখানেই কাটাবে ওরা। গ্রিনেভের কিছু কিছু জিনিষপত্র কেনাকাটা বাকী আছে। দেশের বাড়ীর দোকানে সে সব পাওয়া যায় না। তাই আগে থাকতেই ঠিক হয়ে আছে—ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে যাবে স্যাভেলিচ কেনাকাটার জন্যে।

তাই পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একা একা খানিকক্ষণ সরাইখানায় ওর ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তা দেখতে লাগলো। সহরটা নিতান্ত ছোট্টো, পথঘাটও অপরিষ্কার, নোংরা, পথচারীদের মধ্যেও নজরে আসবার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলো না। কাজেই একটু পরে সরাইখানার মধ্যেই পায়চারি করতে লাগলো ও। এ-ঘর ও-ঘর দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত একটা ঘরের দরজা খোলা দেখে ঢু'পা ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলো, একটি লোক বিলিয়ার্ড খেলছে। বয়স আন্দাজ প্রায় পঁয়ত্রিশ হবে। লম্বাটে গড়নের স্বাস্থ্যবান চেহারা।

গ্রিনেভকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটি ইশারা করে কাছে ডাকলো। অল্প সময়ের মধ্যেই দু'জনের আলাপ জমে উঠলো।

লোকটির নাম জুরিন। রুশ সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার। এই ছোট সহরে আছে কিছুদিন ধরে সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে। গ্রিনেভও সৈন্যবাহিনীতে ঢুকতে যাচ্ছে শুনে বাহবা দিলো জুরিন। এরপর সুরু হ'লো তার গুরুগিরি। সৈনিকের আদবকায়দা, চালচলন, খেলাধূলো সব কিছুই সবজান্তই কিছু কিছু বললো ও। গ্রিনেভ অকস্মাৎ সাবালক হয়ে উঠবার আনন্দ অনুভব করতে লাগলো।

জুরিনের প্রতিটি কথাই গ্রিনেভ মনে করতে লাগলো অন্যান্য সৈনিকদের সঙ্গে মেলামেশার জন্যে তথা নিজের দক্ষ সৈনিক হয়ে ওঠার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ওর মনে হতে লাগলো জুরিনের সঙ্গে কী শুভক্ষণেই না দেখা হয়ে গেছে। তা' না হলে সৈনিকের হালচাল শিখে ওঠা কী দুঃসাধ্য ব্যাপারই না হতো।

জুরিনের উপদেশ মতো গ্রিনেভও খেলায় যোগ দিলো। বার কয়েক দেখিয়ে দেবার পর ও নিজেই খেলতে লাগলো এবার জুরিনের বিরুদ্ধে। কিছুক্ষণ এমনি খেলবার পর জুরিন বললো—এসো বাজী ধরে খেলা যাক্, তা' না হলে মনে হয় খেলাটা অর্থহীন।

গ্রিনেভ রাজী হলো। সুরু হলো বাজী ধরে খেলা। সেই সঙ্গে চলতে লাগলো মাঝে মাঝে একটু একটু মদ্যপান। দুটো ব্যাপারেই প্রথমটা আপত্তি তুলেছিল গ্রিনেভ। কিন্তু জুরিনের অব্যর্থ যুক্তিতে সে আপত্তি নিমেষে উবে গেলো।—বারো মাস তিরিশ দিন এতো শত্রু পাবে কোথায় তুমি? শত্রু ঠেঙাবার কাজ যখন না থাকবে তখন তো কাজ বলতে এ ছাউনি থেকে সে ছাউনিতে, এ দুর্গ থেকে সে দুর্গে—তার মানে পথে পথে। এ জীবনকে সহনীয় করে তুলতে হ'লে চাই খেলা, আর মদ।

এ সমস্ত অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে আর বলার কি থাকতে পারে? সারাদিন চলতে লাগলো বাজী ধরে খেলা আর মদ। তারপর সন্ধ্যে নাগাদ যখন এক সময় জুরিন বললো যে গ্রিনেভের এখন পর্যন্ত এক শ' টাকা হার হয়েছে। তখন টনক নড়লো ওর। এদিকে তখন নেশায় ওর সমস্ত শরীর টলছে তার ওপর বাজীতে হার-এর কথা। দুই মিলে কিছুক্ষণ বাকাহারা করে রাখলো গ্রিনেভকে।

তারপর কাচুমাচু হয়ে বললে—কিন্তু দেখুন, আমার টাকাকড়ি রয়েছে অন্য লোকের কাছে। আমার চাকর স্যাভেলিচ-এর কাছে, সে এখন বেরিয়েছে কেনাকাটার জন্যে।

—আহা তাতে কি হয়েছে, না হয় পরেই দেবে'খন। সহানুভূতির সঙ্গে বললো জুরিন—চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসছি তোমার ঘরে।

গ্রিনেভের দোরগোড়াতেই দেখা হলো স্যাভেলিচ-এর সঙ্গে। একি দশা হয়েছে তোমার? গ্রিনেভকে টলতে দেখে আঁতকে উঠলো—কে করলে এই সর্বনাশ! হা ভগবান্! এমন শয়তানও আছে পৃথিবীতে।

—চোপরাও। বাইরের লোকের সামনে স্যাভেলিচ-এর অভিভাবকগিরি সহ্য করলো না গ্রিনেভ। ধমকে বললো—আমার বিছানা করে দাও, নিজেও শুয়ে পড়ো এখন, আর বকর বকর করতে হবে না তোমাকে।

পরদিন সকাল বেলা। ঘুম ভেঙে যেতেই অসহ্য মাথার

যন্ত্রণাবোধ করতে লাগলো গ্রিনেভ। আবছা ভাবে মনে পড়তে লাগলো আগের দিনের কথা। এক এক করে সব কিছু মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলো ও। কিন্তু হঠাৎ স্যাভেলিচ-এর আবির্ভাবে গ্রিনেভ-এর চিন্তায় ব্যাঘাত হলো। চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে ও বললো—তোমার মতো এই কচি বয়সে কেউ পাল্লা দিয়ে মদ খায়। হুঁ! এসব তুমি শিখলে কার কাছ থেকে? তোমার মা, বাবা, ঠাকুরদা কাউকে কোনো দিন তো দেখিনি এসব। নিশ্চয়ই সেই নতুন মাস্টারের কাছ থেকে তুমি মদ খাওয়া শিখছো।

হঠাৎ সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর স্যাভেলিচ-এর এ সমস্ত কথায় গ্রিনেভ রীতিমতো লজ্জিত এবং অপমানিত বোধ করলো। ও বিছানার ওপরই পাশ ফিরে বললো—আমার চা লাগবে না, তুমি বেরিয়ে যাও।

কিন্তু স্যাভেলিচ-এর চলে যাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। উপরন্তু বলতে লাগলো—কি হয় মদ খেয়ে, দেখছো তো কি রকম মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে এখন। মদ খেলে মানুষ অপদার্থ হয়ে যায়। সরবৎ খাবে এক গ্লাস, আনাবো?

গ্রিনেভ কথার কোনো উত্তর দেবার আগেই একটি ছেলে ঢুকলো ঘরে। এক টুকরো চিঠি ও হাতে দিল। গ্রিনেভ চিঠিখানা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললো—প্রিয় বন্ধু, গতকাল বাজীর খেলায় তুমি আমার কাছে যে একশত টাকা হেরেছিলে, পত্রবাহক ছেলেটির হাতে দয়া করে সে টাকাটা পাঠিয়ে দিও, বিশেষ প্রয়োজন।

ইতি তোমার—জুরিন

কিছুটা অসহায় বোধ করলো গ্রিনেভ। কিন্তু যেন কিছুই হয়নি, এই রকম একটা ভাব করে স্যাভেলিচকে হুকুম করলো—ছেলেটিকে একশত টাকা দিয়ে দাও তো।

—একশত টাকা? কেন? কিসের জন্যে? বিস্মিত হয়ে বললো স্যাভেলিচ।

—আমার দেনা আছে। যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত ভাবেই বললো গ্রিনেভ।

—দেনা? কখন কি করে দেনা হলো তোমার? নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার আছে ভেতরে। সে যাই হ'ক টাকা আমি কিছুতেই দেবো না।

—দেখো বেশি বাড়াবাড়ি করো না। বেশ কিছুটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে রাগত ভাবে বললো গ্রিনেভ—তুমি চাকর, চাকরের মতো থাকবে। তোমার কাছে যদিও রয়েছে, কিন্তু টাকা তো আমার। আমার টাকা আমি যে ভাবে খুশী খরচ করবো। আমার ইচ্ছে হয়েছে আমি বাজীতে খেলে হেরেছি। এখন যা বলছি শোনো। এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছো, শীগগির টাকা বের করে দাও।

অকস্মাৎ গ্রিনেভের এই অপ্রত্যাশিত রূঢ় ব্যবহারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো স্যাভেলিচ। একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কেঁদে ফেললো ও।

—শীগগির টাকাটা এনে দাও ওকে, আবার ধমকে উঠলো গ্রিনেভ, তা না হলে দূর করে দেবো।

এরপর স্যাভেলিচ বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁদতে কাঁদতে একশত টাকা এনে দিলো ছেলেটিকে।

ছেলেটি টাকাটা পেতেই চলে গেলো।

স্যাভেলিচ উঠে পড়ে চেষ্টা করতে লাগলো কত তাড়াতাড়ি সিমবিরস্ক ছেড়ে যাওয়া যায় সেই জন্যে। কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ফিরে এসে বললে—গাড়ী তৈরী হয়েছে।

একটা দারুণ মানসিক অশান্তির মধ্যে সিমবিরস্ক ত্যাগ করলো গ্রিনেভ।
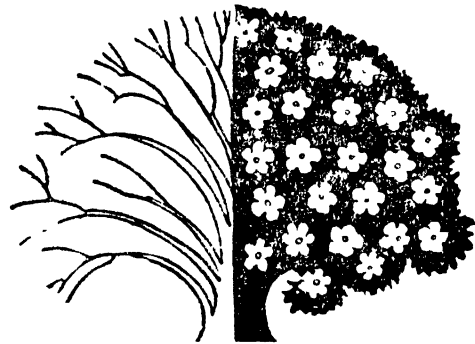
দুই

গাড়ী ছুটে চলেছে। একটা চিন্তাই আচ্ছন্ন করে ফেললো গ্রিনেভকে। যে লোকটি বহুকাল ধরে রয়েছে পরিবারের মধ্যে, চাকর হলেও তার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সততা এবং কর্মক্ষমতার জন্যে সে পরিবারের সকলের আপন; সকলের ভালোমন্দে সে অকপটে নিজের বক্তব্য বলে এসেছে এতকাল কর্তব্য বা তা করে এসেছে নিজের থেকেই। কাজেই ওর ওপরে কোনো কথা বলার চিন্তা কোনো দিনই স্থান পায়নি কারো মনে। আর আজ কিনা একেবারে সরাসরি চাকর হিসেবেই সম্বোধন করে ধমকাতে হলো। অনুশোচনার জ্বালা অনুভব করতে লাগলো গ্রিনেভ। তারপর একসময় মনে হলো স্যাভেলিচের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলা দরকার। তাই বললো—দেখো স্যাভেলিচ, সত্যি আমি খুব দুঃখিত। লোকটির পাল্লায় পড়ে কাল সারাদিন, বোকার মতো কেটেছে আমার। তোমার ওপরও অবিচার করেছি।

—কি যে বলো, ভাবাবেগে ধরা গলায় স্যাভেলিচ বলে উঠলো—তোমার আর কি দোষ, দোষ তো আমারই, নতুন জায়গায় একা একা তোমায় রেখে কেনাকাটা করতে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছে। সেই জন্যেই বুঝি লোকটার খপ্পরে পড়ে আর একশত টাকা খোয়া গেল। বাড়ীতে যদি সবার কানে যায় যে তুমি মাতাল হতে আরম্ভ করেছো, তা' হলে তাঁরা যে কে কি ভাববেন আমাকে, আমি শুধু সেই কথাই চিন্তা করছি।

এইভাবে কথা বলতে বলতে স্যাভেলিচ আর গ্রিনেভ একটু-ক্ষণের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ভুলে আবার পূর্বের মতো পরস্পরকে আপনার জন মনে করতে আরম্ভ করলো।

গন্তব্যস্থান সম্পর্কে গ্রিনেভ আগে থেকে যতটুকু শুনেছিল তাতে দু'পাশের জমিজায়গা এবং পথঘাটের অবস্থা দেখে ও বুঝতে পারলো যে কাছাকাছি এসে গেছে। বেলা পড়ে এলো। ও উৎসুক ভাবে একবার ডানদিকে আবার বাঁ দিকে চলন্ত গাড়ী থেকে নতুন জায়গা দেখতে লাগলো।

শঙ্কিত ভাবে গাড়ীর চালক হঠাৎ বললো গ্রিনেভকে—যদি বলেন তো আবার ফিরে যাই।

—কেন? এত দূর এসে হঠাৎ এ কথা বলছো কেন।

—আজ্ঞে আকাশের অবস্থা ভালো নয়, এদিকটা একদম ফাঁকা, ঝড় উঠছে, সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে, দেখুন না একবার। বলেই গাড়ীর চালক চাবুকটা নেড়ে পূব দিগন্তের দিকে দেখালো।

দেখতে পেলো পেঁজা তুলোর মতো একফালি মেঘ পূবদিগন্ত থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠছে। ও ভাবলো গাড়ীর চালক হয় অতি সতর্ক আর না হয় ভীরু প্রকৃতির তাই বললে—আর একটু জোর চালাও, ঝড় উঠবার আগেই আমরা পৌঁছে যাবো।

কিন্তু গ্রিনেভের এই কথা শেষ হবার আগেই বাতাসের বেগ বাড়তে লাগলো। এলোমেলো ঘূর্ণি হাওয়ায় বিব্রত বোধ করতে লাগলো সকলে। বাতাসের দাপটে কিছুক্ষণ গাড়ীটা উলটো-পালটা পথে বিপথে চলতে লাগলো। তারপর গাড়ীর ভেতরে বসে এক সময় গ্রিনেভের মনে হলো যে ঘোড়া দুটো আর চলছে না। তাই ভেতর থেকে চীৎকার করে ও জিজ্ঞাসা করলো—গাড়ী থামালে কেন?

গাড়োয়ান তার জায়গায় বসেই উত্তর করলো—কোথায় পথ তা আর দেখা যাচ্ছে না। জানালার এক ফাঁক দিয়ে এক ঝলক দেখবার চেষ্টা করলো গ্রিনেভ। ঘন অন্ধকার। সহস্র নাগিনীর ফোঁসানীর মতো বাতাস বিক্ষুব্ধ। বৃষ্টির চাইতে শিলাপাত হচ্ছে বেশি। এতক্ষণে গ্রিনেভের মনে হলো অনেকক্ষণ ধরে কানে স্পষ্ট কিছু শোনা যাচ্ছে না। শুধু বাতাসের সোঁ সোঁ আর সবত্র শিলাপাতের ঠন-ঠন শব্দ ছাড়া।

স্যাভেলিচ একচোট গাল মন্দ করলো—কেন, গাড়োয়ান তো আগে থেকেই হুঁসিয়ার করে দিয়েছিলো। বলেছিলো না ফিরে যাবার জন্যে?

মাঝে মাঝেই বাইরের দিকে দেখতে লাগলো গ্রিনেভ। এক সময় ওর চোখে পড়লো সাদাটে শিলার স্তূপের মধ্যে কালো কালো কি একটা নড়ছে। ও চীৎকার করে উঠলো গাড়োয়ানের উদ্দেশ্যে—দেখো তো ওটা ভালুক না মানুষ।

—আজ্ঞে মানুষ, দেখছি দাঁড়ান, হ্যা, আমাদের দিকেই আসছে। তারপর লোকটির উদ্দেশ্যে বললো—ওহে, এদিককার পথঘাট তুমি চেনো?

—চিনি বৈকি। লোকটি বললো।

—আজ রাতের মতো একটা থাকবার জায়গা দেখে দিতে পারো?

—হ্যা পারি। বলতে বলতে লোকটি গাড়োয়ানের পাশে জায়গা করে নিলো। তারপর যেদিক থেকে হাওয়া বইছে সেইদিকে হাত তুলে দেখিয়ে বললো—চালাও।

—এই বাতাসের মধ্যে ওদিকে এগোনো যায়? গাড়োয়ান চেঁচিয়ে বললো।

—উপায় নেই, ঐদিকেই যেতে হবে, দেখছো না ধোঁয়ার গন্ধ আসছে, ঐ'দকেই গ্রাম। লোকটি বললো।

পথের বাধা কাটাতে কাটাতে একটু একটু করে এগোতে লাগলো ঘোড়া দুটো। বাতাসের গজরানি আর গাড়ীর ঝাঁকুনি খেতে খেতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো গ্রিনেভ।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখলো গ্রিনেভ। বিচিত্র স্বপ্ন। সারা জীবনেও এ স্বপ্নের ঘোর ওর কাটলো না। ও দেখতে লাগলো যেন গাড়ীটা বাড়ী ফিরে এসেছে। কথার অবাধ্য হবার জন্যে বাবা

নিশ্চয়ই রেগে যাবেন এই রকম একটা চিন্তা এলো ওর মাথায়। কিন্তু হঠাৎ মাকে দেখা গেলো—বেশি গোলমাল করো না, তোমার বাবার অসুখ, এবার বোধ হয় আর বাঁচবেন না। তোমাকে দেখতে চাইছেন। এসো।

ভয়ে বিহ্বল হয়ে গ্রিনেভ অনুসরণ করতে লাগলো মাকে। একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখতে পেলো অনেকেই একটা খাটের চার পাশ ঘিরে রয়েছে। সবারই মুখ চোখে শোকের ছায়া। কিন্তু গ্রিনেভ দেখলো বিছানায় যিনি শুয়ে রয়েছেন তিনি বাবা নন, অন্য কে একজন। চাষীর মতো জামাকাপড় পরা কে একটা লোক হাসতে লাগলো ওর দিকে তাকিয়ে।

—এর মানে, গ্রিনেভ বললো মাকে, ইনি তো আমার বাবা নন।

—তাতে কি হয়েছে, তোমার বিয়ের সময় ইনিই তোমার বাবার কাজ করবেন, নাও ওর আশীর্বাদ চেয়ে নাও।

কিন্তু মায়ের এ কথায় গ্রিনেভ আদৌ রাজী হতে পারলো না। তারপর হঠাৎ চাষীটি এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে কোথেকে একখানা কুড়াল নিয়ে এদিক ওদিক চালাতে আরম্ভ করলো। প্রাণভয়ে পালাতে চেষ্টা করলো গ্রিনেভ। কিন্তু পারলো না। চার দিকে মৃত দেহ ছড়ানো, জমাট রক্তে পিছলে তারই ওপর পড়ে যেতে লাগলো ও। চাষীটি নরম ভাবেই বললো—ভয় পেয়ো না, কাছে এসো, আমার কাছে, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করবো।

ভয়ে আর বিস্ময়ে গ্রিনেভ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে ঠিক এমনি সময় স্যাভেলিচের ধাক্কায় ওর তন্দ্রা ভেঙে গেলো—এই, আরে ওঠো, ওঠো আমরা এসে গেছি।

—এসে গেছি? চোখ রগড়াতে রগড়াতে গ্রিনেভ বললো—কোথায়?

—সরাইখানায়।

সরাইখানায় পৌঁছে পথচারী লোকটিকে এবার ভালো করে দেখলো ওরা। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে যৎসামান্য জীর্ণ পোষাকে ঠক ঠক করে কাঁপছে ও। গ্রিনেভের মায়া হ'লো লোকটির দশা দেখে। নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে ওর জন্যেও খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলো গ্রিনেভ।

রাতটা সরাইখানাতেই কাটলো ওদের। পরদিন খুব ভোরে আবার গাড়ী তৈরী হলো ওরেনবর্গের উদ্দেশে। আর একবার পথচারী লোকটির দিকে নজর পড়লো গ্রিনেভের। ও তখনো শীতে কাঁপছিলো। স্যাভেলিচ নানা ভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু সে সব অগ্রাহ্য করে গ্রিনেভ ওর নতুন গরম কোটটা দিলো আধ বুড়ো পথচারীকে। লোকটি বললো আপনার দয়ার কথা আমি কোনো দিন ভুলবো না। এর পর ওদের গাড়ী ছাড়লো। ওরেনবুর্গ-এ পৌঁছে গ্রিনেভ সরাসরি জেনারেল এর সঙ্গেই দেখা করলো। বাবার দেওয়া চিঠিখানা ওঁর হাতে দিয়ে গ্রিনেভ কিছুটা বিস্ময় ও সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখতে লাগলো জেনারেলকে। মাথার চুলগুলি লম্বা, প্রায় সবই পেকে গেছে। আধময়লা পোষাক, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এখুনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছেন।

চিঠিখানা পড়া শেষ করে জেনারেল সস্নেহে গ্রিনেভকে কাছে ডেকে বসালেন। দু'চার কথার পর বললেন—তোমর বাবা আমার পুরনো বন্ধু। অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা পাশাপাশি কাটিয়েছি।

তোমাকে অফিসারের পদই দেবো একটা রেজিমেণ্টে। তবে আমার এখানে আপাতত কোনো কাজ নেই। তোমাকে যেতে হবে বেলোগরস্ক দুর্গে। সেখানে ক্যাপটেন মিরোনোভ তোমাকে সমস্ত কিছু শেখাবেন। যুদ্ধ জিনিসটা যে কি তা সেখানে থাকলেই ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে তুমি। আজ আমার এখানে বিশ্রাম করো। কাল রওনা হবে।

গ্রিনেভ মনে মনে প্রমাদ গণলো। ও আগেই শুনেছে বেলোগরস্ক হ'লো কির্গিজ স্টেপস অঞ্চল। নেহাৎ এঁদো জায়গা হবারই সম্ভাবনা। কিন্তু করবারও কিছু নেই। জেনারেলের হুকুম। যেতেই হবে।

পরদিন সকালে স্যাভেলিচকে নিয়ে বেলোগরস্ক-এর উদ্দেশে গাড়ী ছুটালো গ্রিনেভ।

তিন

ওরেনবুর্গ থেকে বেলোগরস্ক দুর্গের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ মাইল। নতুন জায়গা আর সেখানকার লোকজনেরা বিশেষ করে ক্যাপটেন মিরোনোভকে কি রকম হবে, এই সমস্তই গাড়ীতে বসে বসে ভাবছিল গ্রিনেভ।

কিছুদূর থেকে গাড়োয়ান বেলোগরস্ক দুর্গের দিকে দেখালো। গ্রিনেভের তো প্রাণ উড়ে গেলো দুর্গের চেহারা দেখে। ছোটো বড়ো খানকয়েক কাঠের বাড়ী। গির্জাটিও কাঠের। বেশির ভাগ বাড়ীর ছাউনিই খড়ের। দুর্গের প্রবেশদ্বারের সামনে এসে থামলো গাড়ীটা।

সোজা সামনের অফিস ঘরে ঢুকলো। একটি বুড়ো সৈনিক বললো—সবাই ভেতরে আছেন, আপনি যেতে পারেন।

ভেতরে ঢুকতেই একজন বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দেখা হলো গ্রিনেভের, উনি উল নিয়ে বুনছিলেন।

—ক্যাপটেন ফাদার গেরাসিম-এর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। আমি তাঁর স্ত্রী। আপনি বসুন।

গ্রিনেভ বসে নিজের পরিচয় দিলো।

বৃদ্ধা অপেক্ষমান লম্বা চওড়া একটি কশাক সৈন্যকে আদেশ করলেন—ম্যাক্সিমিচ এই নতুন অফিসার ভদ্রলোকের জন্যে কোয়ার্টারের বন্দোবস্ত করে দাও, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় যেন।

ম্যাক্সিমিচের সঙ্গে বৃদ্ধার আরো কয়েকটি যা কথাবার্তা হলো তার ফলে গ্রিনেভ বুঝতে পারলো যে, উনি অর্থাৎ ক্যাপটেনের স্ত্রী এ দুর্গের সরকারী কাজকর্মের সমস্ত ব্যাপারেই বেশ ওয়াকিবহাল এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সব কিছু উনিই দেখাশুনা করেন।

পরদিন সকালবেলা। গ্রিনেভ নিজের কোয়ার্টারের ভেতরে পোষাক পরছিল, এমন সময় বাইরে থেকে দরজা ঠেলে একটি তরুণ অফিসার ঢুকলো। নিজের পরিচয় দিয়ে ও বললো—তুমি কাল এসেছো শুনেছি, এলাম আলাপ করতে।

একটুক্ষণের মধ্যেই ওরা দু'জন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। অফিসারটির নাম শাভরিন।

ইতিমধ্যে ভ্যাসিলিসা অর্থাৎ ক্যাপটেনের স্ত্রী ডেকে পাঠালেন ওদের দু'জনকে। ক্যাপটেনের কোয়ার্টারে ওদের আজ নেমন্তন্ন। দু'জনে যেতে যেতে দেখলো কোয়ার্টারের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় ক্যাপটেন জনা কুড়ি সৈনিককে প্যারেড করাচ্ছেন।

ভ্যাসিলিসা অভ্যর্থনা করে ওদের যথাস্থানে বসালেন। তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ঝিকে ডেকে বললেন, ক্যাপটেনকে খেতে আসতে বলবার জন্যে। মেয়ের খোঁজ করলেন।

ক্যাপটেনের মেয়ে ইভানোভার বয়স বোধহয় বছর আঠারোর বেশি নয়। সলজ্জ ভাবে এসে খাবার টেবিলটার এক কোণায় বসে কি একটা সেলাই করতে আরম্ভ করলো।

ক্যাপটেন একটু পরেই এসে পড়লেন। খেতে খেতে নানা আলোচনা চলতে লাগলো। গ্রিনেভের বাবার জায়গা জমি দাস দাসী প্রভৃতির কথা শুনে ভ্যাসিলিসা অবাক হয়ে গেলেন—ওঃ কী বড়লোক। আমাদের মাত্র একটি ঝি—নালাসা। থাক তাতে আমাদের দুঃখ নেই। বেশ আছি। আমাদের চিন্তা শুধু মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়ে গেলো? কোথায় বা পণের টাকা আর কোথায় বা পাত্র! কি যে হবে। এক ভরসা যদি মেয়ে দেখে খুশী হয়ে দাবীদাওয়া না তুলে কেউ মেয়েটাকে নেয়। তা না হলে তো ওকে চিরকুমারীই থাকতে হবে।

গ্রিনেভ আড়চোখে একবার তাকালো ইভানোভার দিকে। লজ্জায় ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। ওর জন্যে মায়ের যে দুশ্চিন্তা সে জন্যে মুখ চোখে কিছুটা অসহায়তার লক্ষণও দেখা গেলো। গ্রিনেভের দুঃখ হ'লো ওর জন্যে? প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে ও ক্যাপটেন-এর দিকে তাকিয়ে বললো—শুনলাম উপজাতীয়রা নাকি আমাদের দুর্গ আক্রমণ করবার মতলব আঁটছে?

—কোথায় শুনলে? ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলেন।

—ওরেনবুর্গে।

—যতো সব বাজে গুজব। বহুদিন আগে একবার উৎপাত আরম্ভ করেছিলো ওরা। সেবার বেশ করে শায়েস্তা করে দিয়েছি। তারপর থেকে সব চুপচাপ আছে। আর কখনো ওরা কিছু অশান্তি ঘটাতে পারবে বলে মনে হয় না। আর যদি তেমন বাড়াবাড়ি কিছু করেই কখনো, তো এমন শিক্ষা দিয়ে দেবো যে আর দশ বছরের মধ্যে মাথা তুলতে হবে না।

—এতো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দুর্গে থাকতে ভয় করে না আপনার? ভ্যাসিলিসাকে জিজ্ঞাসা করলো গ্রিনেভ।

—আগে আগে করতো, কিন্তু এখন সয়ে গেছে। বিশ বছর তো হয়ে গেলো এখানে আছি।

—ওঁর দুর্জয় সাহস। শাভরিন বললো।

—আর ইভানোভার? গ্রিনেভ জিজ্ঞাসা করলো।

—ইভানোভা বেজায় ভীতু। বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই কাঁপতে থাকে। ভ্যাসিলিসা বললেন। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—সুনীলকুমার নাগ

আমি এ-কথা বলি না যে, দস্যু, চোর ও যে-সমস্ত জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে তাহাদিগকে বাধা দিতে বা দমন করার ব্যাপারে হিংসা ত্যাগ কর। —মহাত্মা গান্ধী

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাগার

দীপককুমার বড়ুয়া

সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সুললিত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করে রেখেছে ভারতের প্রজ্ঞা আর সাধনার সুদীর্ঘ কাহিনী। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারত চেষ্টা করে এসেছে কি ভাবে জ্ঞান ও শিক্ষার সম্পদ বাড়ানো যায় এবং তারই ফলে স্বাভাবিক ভাবে এসেছে বেদ, উপনিষদ, ত্রিপিটক এবং জৈন আগমাবলী। প্রাচীন যুগে মুনিঋষিদের উপদেশগুলির রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেনি, সেগুলি শুধু স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত হয়ে শিষ্য-পরম্পরা চলে আসছিল। কিন্তু যখন লেখার উপকরণ আবিষ্কৃত হল এবং মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাব হ'ল তখন থেকেই মানবের জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষণ ও গঠনের প্রশ্ন তীব্র আকার ধারণ করে। এই ঘটনা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ঘটেছিল প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান মিশর, ক্রীট, মেসোপটেমিয়া, অ্যাসীরীয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান পুরোপুরি জ্ঞানের সুশৃঙ্খলা ও বিস্তারের সাথে জড়িত। তাই গ্রন্থাগারের ইতিহাস শিক্ষার ইতিহাসের সাথে গভীর ভাবে সংযুক্ত।

ভারতও গ্রন্থাগার সংরক্ষণের এক সুমহান্ ঐতিহ্য বহন করে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। এখানে গ্রন্থাগারের ইতিহাস জ্ঞানচর্চ্চার ইতিহাসের মতো সুপ্রাচীন। তবে এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রাচীন যুগে গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠেছিল মন্দিরে, সংঘারামে ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে। পাব্লিক লাইব্রেরী বা সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে এখন যা' বোঝায়, তা' তখন ছিল না। এর প্রধান কারণ হলো যে শিক্ষা সে সময়ে কেন্দ্রীভূত ছিল সমাজের অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে শুধু।

সংস্কৃত সাহিত্যের "ভারতী ভাণ্ডার" ও "সরস্বতী ভাণ্ডার" শব্দযুগল বর্ত্তমান গ্রন্থাগারকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু যে হেতু হাতে লেখা পুঁথি সে সময়ে খুব মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ছিল, সে হেতু তখনকার গ্রন্থাগারগুলিতে পুঁথি নকল করারও ব্যবস্থা ছিল এবং দুষ্প্রাপ্যতা, দুর্মূল্য ও ধর্ম্মীয় পবিত্রতার জন্য মন্দিরের "ভাণ্ডারে" পুঁথি দানকে এক মহাপুণ্যের কাজ বলে গণ্য হতো। প্রথম আমরা ভারতে গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের উল্লেখ পাই পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্তে। তাঁর লেখায় আমরা দেখি যে জেতবন-সংঘারামে পাঠকক্ষ ও গ্রন্থাগার ছিল। "এই গ্রন্থাগারগুলি শুধু বৌদ্ধ সাহিত্যে সুসজ্জিত ছিল তা' নয়, সেইখানে ছিল বৈদিক এবং অন্য অবৌদ্ধ গ্রন্থ এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের অনেক বই।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় সপ্তম শতাব্দীতে আরেকজন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ ভারতে এসে এই সংঘারামের গ্রন্থাগার ও অন্যান্য ভবনের শুধু ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন।

হিউয়েন-সাঙ কাশ্মীরের রাজপ্রাসাদের গ্রন্থাগারেরও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে তাঁর পুঁথি লেখবার জন্য সেই গ্রন্থাগারে প্রায় কুড়িজন করণিক নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শাস্ত্র ও সূত্র অধ্যয়নের জন্য দুই বৎসর এই গ্রন্থাগারটির সদ্ব্যবহার করেছিলেন। (১)

এই চৈনিক তীর্থযাত্রীর লেখাতেই আমরা জানতে পারলাম দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চিপুর সংঘারামের সুসজ্জিত গ্রন্থাগারটির বিষয় এবং সেখানকার বিখ্যাত শিক্ষকদের অগাধ পাণ্ডিত্যের গুণগান।

কিন্তু সবচেয়ে উন্নততর এবং সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত এবং সুসংগঠিত প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগারটি হলো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। নালন্দার কর্ত্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন যে, গ্রন্থাগার ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পঙ্গু ও অচল। তাই বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল একটি বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য যা' শিক্ষক এবং ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানপিপাসা মেটাতে পারে। যেখানে গ্রন্থাগারটি অবস্থিত ছিল সেই অঞ্চলকে বলা হতো "ধর্ম্মগঞ্জ" এবং এইখানেই গড়ে উঠেছিল তিনটি বিরাট গ্রন্থাগার ভবন যাদের নাম ছিল "রত্নসাগর" "রত্নদধি" ও "রত্নরঞ্জক"। (২) এইগুলির মধ্যে "রত্নদধি" ছিল একটি নবতলবিশিষ্ট অট্টালিকা, যেখানে সংরক্ষিত ছিল "প্রজ্ঞাপারমিতা", তান্ত্রিক ও অন্যান্য মূল্যবান পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ। (৩) ছাত্ররা রাত্রিদিন এই গ্রন্থাগারে পুঁথি অনুলেখন ও অধ্যয়নেই ব্যস্ত থাকতেন।

ইৎ-সিঙ, আরেকজন চৈনিক পরিব্রাজক যিনি নালন্দায় প্রায় দশ বৎসর (৬৭৫-৬৮৫ খৃ:) অবস্থান করে প্রায় ৪০০ সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন, নালন্দার এই গ্রন্থাগার দেখে বিস্মিত হয়ে লিখেছেন: "যখন কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করতেন তাঁর পুস্তকসংগ্রহ গ্রন্থাগারের সাথে সংযোজিত হতো এবং তাঁর ব্যক্তিগত অন্যান্য দ্রব্য বিলিয়ে অথবা করে দেওয়া হতো।" (৪)

১। Mookherji, R. K. Ancient Indian Education, p. 526.

২। Vidyabhushana, S. C. A History of Indian Logic, P 516.

৩। Sankalia, H. D. The University of Nalanda. P. 63.

৪। Indian Librarian, vol—9, no. 2, Sept, 1954, p. 54.

নালন্দার গ্রন্থাগারকে অর্থনৈতিক সাহায্যের বিষয় উল্লেখ আছে পালরাজা দেবপালদেবের তাম্রানুশাসনে। এই অনুশাসনে দেখা যায় যে যবদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব দেবপালকে অনুরোধ করছেন নালন্দাতে নবনির্মিত সংঘারাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার সংরক্ষণের নিমিত্ত পাঁচটি গ্রাম দান করার জন্য। তিনি গ্রন্থাগারে পুঁথি লেখারও যথেষ্ট ব্যবস্থা করেছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুশাসনের দু'টি কথায়: "ধর্মরত্নস্য লেখনার্থম্।" (৫)

তিব্বতীগ্রন্থ "Pag-Sam-Jon-Zang"-এ নালন্দা গ্রন্থাগারের শোচনীয় পরিণতির এক করুণ উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে: "তুরস্ক অভিযানকারীদের ধ্বংসলীলার পর নালন্দার মন্দির ও চৈত্যগুলির মুদিতভদ্র নামে একজন সন্ন্যাসীর দ্বারা সংস্কার করা হয়। এর কিছু পরে মগধরাজার মন্ত্রী কুকুটসিদ্ধ নালন্দাতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যখন একদিন সেখানে উপাসনা চলছিল, তখন দু'জন নিঃস্ব তীর্থিক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। কতকগুলি অল্পবয়স্ক অপরিণামদর্শী শ্রমণ ঘৃণাবশতঃ তাঁদের উপর জল ছুড়লে তাঁরা ক্রুদ্ধ হন। তীর্থিক সন্ন্যাসীরা বার বৎসর সূর্য-উপাসনার পর যজ্ঞ করে যজ্ঞবেদী থেকে জলন্ত কাঠ ও ভস্ম নিক্ষেপ করলেন ঐ বৌদ্ধমন্দিরে। তা'তে চারিদিকে আগুন লেগে "রত্নদধির" অমূল্য গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়।" (৮)

আরেকটি উন্নত গ্রন্থাগার দেখা যায় বিখ্যাত বিক্রমশীলা সংঘারামে। যেহেতু এটা পালরাজাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেহেতু তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম এখানে প্রবল ছিল, সেইজন্য তন্ত্র-পুস্তক সংগ্রহে বিক্রমশীলা গ্রন্থাগার অদ্বিতীয় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র পুস্তক সংগ্রহে মনোযোগী ছিলেন না, পুস্তক প্রকাশেও যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। এই গ্রন্থাগারে আমরা দেখি যে পুরানো ও অকেজো পুঁথি নষ্ট অথবা পুনঃ সংস্থাপন করার ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থাগারের কাজ শুধুমাত্র শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, উপরন্তু এখানে জনসাধারণের বিশেষ করে তিব্বতের জ্ঞানপিপাসু নরনারীর ক্রমাগত চাহিদাও পূরণ করার চেষ্টা চলতো, বই লেনদেনের মাধ্যমে।

তবকৎ-ই-নাসিরীতে বিক্রমশীলা গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষের আর একটি করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। অনেকে মনে করেন যে বক্তিয়ার খিলজী দুর্গ মনে করে এই গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিলেন। শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক পুস্তক নিয়ে ভিক্ষুরা পালিয়ে গেলেন তিব্বত এবং বৃহত্তর ভারতের নানা স্থানে।

পালরাজাদের আর একটি স্মরণীয় কীর্তি ওদন্তপুরী সংঘারাম, যেখানে ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল্যবান গ্রন্থের একটি ঐশ্বর্য্যময় গ্রন্থাগার। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই সমৃদ্ধিশালী ওদন্তপুরী গ্রন্থাগারটিও ধ্বংস হয়েছিল ১১৯৭ খৃঃ মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে।

বর্তমান কাথিওয়াড়েই ছিল সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ হীনযানীয় বলভী বিশ্ববিদ্যালয়। একটি শিলালিপিতে লিখিত আছে যে বলভী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি সম্রাটের আনুগত্যে সমৃদ্ধ হয়েছিল। মৈত্রক সম্রাটরা (৪৮০—৭৭৫ খৃঃ) এই গ্রন্থাগারটি সংরক্ষণের জন্য সরাসরি সাহায্য করেছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ৫৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম গুহসেনের লিখিত অনুশাসনের "সদ্ধর্মস্য পুস্তকোপচয়ার্থম্" পংক্তিটিতে। হিউয়েন-সাঙ এবং ইৎ-সিঙ দু'জনেই এই গ্রন্থাগার দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

মধ্যভারতে হিউয়েন-সাঙ আরেকটি সংঘারাম ও গ্রন্থাগার দেখেছিলেন। সংঘারামটি বর্তমান বেরারে অবস্থিত ছিল এবং সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুনের দ্বারা পরিচালিত হত। এই বিদেশী পর্যটক লিখেছেন: "এই সংঘারামটির আচ্ছাদনযুক্ত বিচরণপথ ও বিশাল কক্ষ ছিল এবং সবচেয়ে উপরের কক্ষে ছিল গ্রন্থাগার।" এই গ্রন্থাগারে মহাযানী পুস্তকের সংখ্যাই বেশী ছিল।

একাদশ শতাব্দীতে হায়দ্রাবাদের নাগাই-তে একটি বিরাট মন্দির-গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থাগারে ছয়জন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে চালুক্যরা পাটান-এ একটি বিরাট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আমরা দেখলাম যে প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগারের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে বৌদ্ধযুগে এবং শেষ হয়েছে মুসলিম শক্তির উত্থানে। প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ভারতবর্ষ সব সময়েই নূতন নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী এবং পুরাতন গ্রন্থাগার সংরক্ষণে মনোযোগী। প্রাচীনকালে এইসব ধর্মীয় গ্রন্থাগারই বর্তমান যুগের বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলো। এইরূপে বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে প্রচণ্ড ঢেউ উঠেছিল, তা আরও প্রখর ও ব্যাপক হয়েছিল পরবর্তীকালে মহারাজাধিরাজদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় ও জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষার আগ্রহে।

৭। Epigraphia India, vol—xvii, p. 310 (Nalanda Copper Plate of Devapala).
Vidyabhushana, S. C. Mediaval School of Indian Logic, p. 146.

বহু যুগ পূর্বেই আমাদের পথ আমরা বেছে নিয়েছি, ছাড়বার উপায় নেই। যে যাই বলুক, আমাদের বাছাইটা যে ভুল হয়েছে, তা কখনই নয়। জড়ের চিন্তা না ক'রে চৈতন্যের চিন্তা করা, মানুষের ভাবনা না ক'রে ঈশ্বরের ভাবনা করাটা কি ভুল পন্থা বলতে পারো? আর পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস, ইহলোকের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, অপরিমিত ত্যাগশক্তি, ঈশ্বরে পরম নির্ভরতা, আত্মার অবিনশ্বরত্বে দৃঢ় বিশ্বাস,—এগুলি তোমাদের মজ্জাগত। ছাড়তে চেষ্টা কর দেখি! আমি স্পর্ধার সঙ্গে বলছি, ছাড়তে তোমরা পারবে না। বাইরে জড়বাদী সেজে, দু-চার মাস জড়বাদের বুলি আউড়ে তোমরা আমাকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করতে পারো,—কিন্তু আমি তো ঠিক জানি, তোমরা কি উপাদানে তৈরি। যেই আমি হাত ধরে টানব, তোমাদের নাস্তিক-ভাব দূরে পালাবে,—যে আস্তিক্যবুদ্ধি নিয়ে জন্মেছ, সেই নিয়ে আবার ঠিক পথে ফিরে আসবে। স্বভাব কখনও ছাড়তে পারো কি?"

—স্বামী বিবেকানন্দ

পার্লামেণ্ট প্রসঙ্গ

(জুলফিকার)

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা হয়ত অনেকেই মনশ্চক্ষে বিরোধী দলের শাণিত শ্লেষ ও প্রশ্নবাণে জর্জর সরকারী মুখপাত্রের কাতর মুখচ্ছবি দেখে থাকেন, অথবা কোন মন্ত্রীপুঙ্গবের অকাট্য যুক্তি ও তথ্যবহুল এমন কোন প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশা করে থাকেন, যা আক্রমণকারী বিপক্ষ দলকে নিমেষে হতবাক করে দিতে পারে।

ফৌজদারী আদালতে কোন জবর মামলা (cause celebre) শুনানীর সময় দর্শকমহলে যেমন কৌতুক ও উত্তেজনার সাড়া জাগে, অনুরূপ চাঞ্চল্য ও বাগাড়ম্বরের সন্ধান এখানেও মিলবে—একথা যদি কেউ ভাবেন তাহলে সত্যই ভুল করবেন।

বস্তুতঃ, এখানকার পরিবেশ অধিকাংশ সময়েই নিস্তরঙ্গ, অনুত্তেজক। কেমন যেন একটা ক্লান্ত, মুহ্যমান ভাব।·· সবুজ বেঞ্চিগুলোর বেশীর ভাগই খালি থাকে, সিকি অংশও লোক বসে কিনা সন্দেহ।

সরকার তরফের আণ্ডার সেক্রেটারী পাশের বন্ধুটির সঙ্গে দিব্যি আসর জমিয়ে তুলেছেন,—ওঁদের ক্লাবের আসন্ন ব্রীজ টুর্ণামেণ্টের কথা নিয়ে কিম্বা হয়ত কোন খ্যাতনামা চিত্রতারকার হালফিল কেলেঙ্কারীর কেচ্ছা নিয়ে। এদিকে হয়ত কোন নবীন সভ্য সোৎসাহে একটানা বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। চিনির উপর আমদানী শুল্ক বাড়ালে দেশবাসীর স্বাস্থ্যের কি নিদারুণ অবনতি ঘটবে, সেটা বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন,—শারীর বিজ্ঞানের উদ্ধৃতি দিয়ে।

ঘরের এখানে-ওখানে আলোচনারত সভ্যদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। হরেক রকম বিষয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে—চিনি আমদানীর সঙ্গে যাদের কোনটারই বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

একজন সভ্য তাঁর ভাষণ শেষ করে যেই আসন গ্রহণ করলেন, অমনি ঘণ্টা বেজে উঠল, আর হুদ্দাড় করে একগাদা সভ্য বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুকলেন। এই দৃশ্যটার বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন বেশ একটা সরস উপমার অবতারণা করেছেন—'অল ইন্ এ ফ্লাটার লাইক হেন্স ডিষ্টার্বড্ ইন দেয়ার কুপ্।'

ওয়েষ্ট মিনষ্টারের যে কক্ষে হাউস অব কমন্সের বৈঠক বসে, সেটা খুবই স্বল্পায়তন। মফঃস্বলের যে কোন টাউন হলের চেয়েও ছোট। কি করে এইটুকু ঘরে ছয় শতাধিক এম-পি'র স্থান সঙ্কুলান হয়, সেটা ভেবে অনেকেই আশ্চর্য্য হবেন। ঘরটায় বড় জোর তিনশো লোকের জায়গা হতে পারে। অবিশ্যি বহু সভ্যই গরহাজির থাকেন, এই যা রক্ষে। বড় বড় বিতর্কের সময় কষ্টেসৃষ্টে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসতে হয়।

সভ্যদের সামনে কোন ডেস্ক বা টেবিল নেই, যার উপর তাঁরা সাথের কাগজপত্র রাখতে পারেন। এমন কী স্পীকার যে হাতের কাছে এক গ্লাস জল রাখবেন, তারও উপায় নেই। শুকনো গলা ভিজিয়ে নিতে তাঁকে লোক দিয়ে বাইরে থেকে জল আনাতে হয়।

রক্ষণশীল দল কর্তৃক পরিত্যক্ত লর্ড র‍্যানডলফ চার্চিল পুনরায় দলভুক্তির আশায় একবার জোর বক্তৃতা সুরু করেছেন। কনজারভেটিভ সভ্যেরা তাঁর উপর খড়্গহস্ত।··· ভদ্রলোকের বাক্যস্রোত বাধা পাচ্ছে, গলা শুকিয়ে গেছে। কাতরকণ্ঠে এক গ্লাস জল চাইলেন। কনজারভেটিভ দলের জনৈক তরুণ সদস্য চার্চিলের জন্য জল আনতে ছুটলেন। জল নিয়ে ফিরে এলে, লর্ড র‍্যানডলফ তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে বললেন (অবিশ্যি অন্যান্য সভ্যের কর্ণগোচর হয় এমনি ভাবে), 'আই হোপ দিস উইল নট হার্ম ইউ উইথ ইওর পার্টি ?'

জলের অভাবে মদ্যপানে বাধা নেই। মদ এখানে সব সময়েই মেলে। হাজার হোক রাজপ্রাসাদের অংশ ত বটে! সুরা সরবরাহের সময় নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না এখানে, এখানকার বার অষ্টপ্রহরই খোলা। এটা ত আর সাধারণের তাড়িখানা নয়!

মাঝে মাঝে খানিকটা প্রাণস্পন্দন জেগে ওঠে। বক্তার কথার পিঠে হয়ত জনৈক সদস্য হঠাৎ একটা অপ্রিয় বা বিরূপ টিপ্পনী কেটে বসলেন। ব্যস্ ফিসফাস, অবান্তর অনুচ্চ আলোচনা সব নিমেষে স্তব্ধ হয়ে যায়। সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসা ভদ্রলোকটির উপর, যাঁর কণ্ঠ থেকে মন্তব্যটি উচ্চারিত হয়েছিল।···

বক্তৃতা প্রসঙ্গে হয়ত বিশেষ একটা দলকে কটাক্ষ করে বক্তা একটা বেখাপ্পা বা চটুল মন্তব্য করে বসলেন। আর যাবি কোথা! দলীয় সভ্যেরা ভীম বিক্রমে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন আর কি! দশটা টেরিয়ার যেন একটা ইঁদুরকে তাড়া করেছে—এমনি অবস্থা তখন বেচারীর। অথচ এমন কিছু মারাত্মক আপত্তিকর কিম্বা ঝাঁঝালো কোন বাক্য প্রয়োগ করেননি তিনি, উচ্চকণ্ঠে সভাকক্ষ নিনাদিত হয়ে ওঠে!

'অর্ডার, অর্ডার!' 'উইথড্র।···শেম!'

তবুও বক্তা যদি অটল থাকেন, উক্তি প্রত্যাহার করতে অসম্মত হন, তবে ত কুকুর-কুণ্ডলী অবস্থা ! সে পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে অনেক ঝানু স্পীকারও হিমসিম খেয়ে যাবেন।···একটু দূরে কোণায় বসে যাঁরা ঝিমুচ্ছেন বা খোসগল্পে মসগুল, তাঁরা অনেক সময় বুঝতেই পারেন না কিসের থেকে কি হল! এরূপ অবস্থায় মফঃস্বল হতে আগত কেউ দর্শকের গ্যালারীতে বসে তাঁদের এলাকার মাননীয় সভ্যের ভাব সাব দেখে নিশ্চয়ই হকচকিয়ে যাবেন। তাঁর মনে হবে এঁরা যেন চিড়িয়াখানার একঝাঁক পাখী—এমনি কিচিরমিচির ঝটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছেন সবাই···অবিশ্যি, 'কাম-অন-ফাইটের' মত পরিস্থিতি কদাচিৎ উদ্ভব হয়ে থাকে। এই যুদ্ধমান অবস্থায় হট্টগোল, কটূক্তি ও আস্ফালনের বহর দেখলে বিদেশীরা সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন। অতএব মাভৈঃ! অস্মদ-দেশীয় লোকসভার সদস্যদের কহিচিৎ উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য ক্ষুব্ধ বা লজ্জিত হবার কারণ নেই। যাঁদের নিকট আমরা পার্লামেন্টারী আদব কায়দার পাঠ গ্রহণ করেছি তাঁদের তুলনায় যে আমাদের ব্যবহার এমন কিছু গর্হিত বা অশোভন তা বলা চলে না।

সভ্যদের বহুপ্রকার বাধা নিষেধ মেনে চলতে হয়। অনেক সময় তাঁদের অনেক অদ্ভুত আচারও পালন করতে হয়। আনকোরা সদস্যদের এসব দেখে শুনে ঘাবড়ে যাবার কথা; নতুন সভ্যদের এই অসোয়াস্তিকর অবস্থাটা অনেকটা নতুন ভর্তি হওয়া স্কুলের ছেলের মত। এ সম্বন্ধে রবার্ট বারনেস্, এম,পি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা স্মরণ করে লিখেছেন,—

'আই শ্যাল্ রিমেম্বার ফর দি বেষ্ট অব্ মাই ডেজ এ ফিউ উইকস ইন্ দি হাউস অব কমন্স। দে আর মোষ্ট ফ্রাইটেনিং ইভন্ দ্যান্ ইন মাই ফার্ষ্ট ডে এ্যাট পাবলিক স্কুল এ্যাণ্ড ইনভীড ভেরী রেমিনিসেন্ট অব দেম, ফর আই হ্যাড টু লার্ন এ্যাজ মেনি কনভেনশনস এ্যাণ্ড ট্যাবুজ এ্যাণ্ড মিষ্টিরিয়াস রাইটস অ্যাজ এনী ইস্কি ফোরটিন ইয়ার ওল্ড ফ্যাগ।'

হাউস অব কমন্সের অধিবেশনে যোগ দিতে নতুন পোষাকে সুসজ্জিত বারনেস্ প্রথম যেদিন পার্লামেন্ট স্কয়ারের সামনের রাস্তা পার হচ্ছিলেন, তাঁর টপ হ্যাট আর মর্নিং কোটের দিকে নজর পড়তেই মোড়ে মোতায়েন পুলিশ কনেষ্টেবল লম্বা এক সেলাম ঠুকে দু'হাত তুলে দাঁড়াল। ধাবমান যান বাহনের সারি 'মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত' নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। দু'সারি গাড়ীর ফাঁক দিয়ে নিরাপদে পথ অতিক্রম করে গেলেন বারনেস। তাঁর তৎকালীন বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থাটাকে বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন, 'আই ফেল্ট অল দি সেনসেশনস অব দি ইজ্রায়েলাইটস হোয়েন দি সী ওবলাইজিংলী ডিভাইডেড ইন ফ্রন্ট অব দেম।'

রাস্তায় তাঁর এই অস্বাভাবিক খাতির পাওয়ার হেতুটা অবিশ্যি পরে জানা গেল। সেবার হাউস অব লর্ডস থেকে যাঁকে নতুন স্পীকার মনোনীত করা হয়েছিল তাঁকে সম্রাটের তরফ থেকে কতকগুলি বিশেষ প্রিভিলেজ বা ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর মধ্যে একটা হচ্ছে যে ইচ্ছে করলে তিনি লণ্ডনের পুলিশ কমিশনারের উপর নিম্নোক্ত ফতোয়া দিতে পারবেন: 'পার্লামেন্টের অধিবেশন-কালীন এই সভা গৃহে আসিবার পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং কোন প্রকার যান বাহন যেন কোন সদস্যের আসা বা যাওয়ায় কোনরূপ বাধা বা ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।'

স্পীকার মহোদয় কয়েকদিন পূর্বে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে উপরোক্ত নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যাতে শকটসকুল পথ অতিক্রম করে সভ্যরা নিরাপদে পার্লামেন্টে উপস্থিত হতে পারেন।

ক্লোকরুমে হ্যাট ও ক্লোক রাখতে গেলে চোখে পড়বে প্রত্যেকটা পেগের সাথে এক একটা গোলাপী রঙের ফিতে ঝুলছে। পূর্ব্বে যখন পার্লামেন্টের সদস্যেরা কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে চলাফেরা করতেন (সে কালে ইংলণ্ডের গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের তলোয়ার ছিল পোষাকেরই অঙ্গ) তখন এই ফিতের সঙ্গে তলোয়ার বেঁধে রেখে তাঁরা সভাকক্ষে প্রবেশ করতেন। দেড়শ বছর আগে লণ্ডনের অগ্নিকাণ্ডে (দি গ্রেট ফায়ার অব লণ্ডন) পুরাতন ক্লোকরুমটা পুড়ে যায়। সেই থেকে সভ্যরা তরবারী বর্জ্জন করেছেন, কিন্তু লাল ফিতে আজও ঝুলছে। সাধে কি ইংরেজদের গোঁড়ামী ও ফরম্যালিটি নিয়ে অন্যান্য ইউরোপীয়ানেরা ঠাট্টা মন্তব্য করে থাকেন!

সভায় প্রবেশ করে সভ্যরা সবাই সামনের দিকে নত হয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। নতুন সদস্য ভেবেই পান না এই বিনীত অভিবাদনটা কার উদ্দেশে? এই শ্রদ্ধাস্পদ মহান ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই স্পীকার নন। ···তবে কে?

পূর্বে যখন হাউস অব কমন্সের অধিবেশন সেন্ট ষ্টিফেন্স গির্জ্জায় বসত, তখন স্পীকারের সীটের ঠিক পেছনেই ছিল 'অল্টার'। সে সেন্ট ষ্টিফেন্স গির্জ্জার অস্তিত্ব বহুদিন হল বিলুপ্ত হয়েছে, বর্ত্তমান হাউসে কোন বেদীও নেই, তবু কিন্তু শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ঠাটটুকু ঠিক ঠিক চলে আসছে, যুগের পর যুগ।

স্পীকার মনোনয়ন ব্যাপারটাও খুব মজার। যে দুজন সভ্য যথাক্রমে স্পীকারের নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করেন, তাঁরা তাকে আসন গ্রহণ করবার আহ্বান জানিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চেয়ারের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। স্পীকার তখন নিতান্ত অনিচ্ছার ভাব দেখাতে থাকেন। ওঁদের দুজনাকে মৃদু ধাক্কা দেন, শিরঃসঞ্চালনে জানাতে চান তাঁর অসম্মতি। অনিচ্ছার এই অভিনয় হাস্যোদ্দীপক হলেও এটা একটা ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এটা সেই যুগের স্মৃতি যখন স্পীকারকে কমন্স সভার মুখপাত্র হিসাবে সম্রাট সকাশে উপস্থিত হতে হত। তখন অনেক ব্যাপারেই স্পীকারকে রাজার অসন্তোষভাজন হতে হয়েছে।···বার্ণেসের কথায় 'ইট ওয়াজ এ থ্যাঙ্কলেস জব ফর এনি এ্যাংগ্রি মনার্ক ফেসড উইথ দি রিফিউজ্যাল অব দি হাউস অব কমন্স টু গ্র্যাণ্ট সাপ্লাইজ আনটিল গ্রেয়াব গ্রীভান্সেস অয়ার রিড্রেসড, ওয়াজ টেম্পটেড টু ভিজিট হিজ ডিসপ্লেজার আপন দি আনফরচুনেট স্পীকার।' সেকালে এজন্য অনেকেই স্পীকারের দায়িত্ব স্কন্ধে নিতে সহজে সম্মত হতেন না। তখনকার দিনে স্পীকারকে তাঁর আসনের দিকে টেনে নিয়ে যাবার সময় তিনি যেরূপ আর্ত্ত চীৎকার আরম্ভ করে দিতেন, আজকাল কেউ তা শুনলে মনে করত বুঝি বা তাঁকে ইলেকটিক চেয়ারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

রাজা যেদিন সিংহাসন থেকে ভাষণ দেবেন সেদিন তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য এম, পিদের আহ্বান জানানোর রীতিটাও খুব অদ্ভুত।

••হাউস অব লর্ডস থেকে কমন্স সভায় আসার পথের দীর্ঘ করিডোরটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে বাইরের দিক থেকে যেমনি হাঁক শোনা যায় 'ব্ল্যাক রড' অমনি কমন্স সভার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর বাইরে দরজার গায়ে তিনবার ঠক ঠক শব্দ ওঠে। তখন কাঠের প্যানেল সরিয়ে প্রতিহারী দেখার ভান করে, কে ঢুকতে চাইছে।••তারপর রাজদূত ব্ল্যাক রড প্রবেশ করেন। অঙ্গে তাঁর কালো পরিচ্ছদ। গ্যাঙওয়ে পর্যন্ত এগিয়ে এসে তিনি তিনবার মাথা নুয়ে অভিবাদন (বাও) জানান, তারপর হাউস অব পীয়ারসে সবাইকে যাবার জন্য রাজাজ্ঞা ঘোষণা করেন।

সর্বাগ্রে স্পীকার, তাঁর পিছে প্রাইম মিনিষ্টার তারপর লীডার অব অপোজিশান, তাঁর পশ্চাতে মন্ত্রীরা, তারপর প্রাক্তন মন্ত্রীরা, (বর্তমানে বিপক্ষদলের সদস্য), তারপর অন্যান্য সকলে—সারিবদ্ধ পিপীলিকার মত সবাই চললেন রাজার মুখনিঃসৃত ভাষণ শোনবার জন্য।

১৯২২ সালে স্কটল্যাণ্ডের ক্লাইড থেকে নবাগত একদল লোক এই দাসত্বভাবাত্মক দৃশ্য দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে এই প্রথার উচ্ছেদকল্পে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নি। আজও এ প্রথা চালু আছে এবং বোধ হয় কোনদিনই এর বিলোপ হবে না, অন্ততঃ ইংলণ্ডের রাজা যতদিন থাকবেন। ম্যাক্সটন, মলেন, কার্কউডের মত প্রগতিশীল সদস্যেরাও পাক্কা ডাইহার্ড কনজারভেটিভের মত এই প্রাচীন প্রথার সমর্থন করেছিলেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে সব অদ্ভুত প্রথা বা নিয়ম প্রচলিত আছে, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলো নিরর্থক ও হাস্যকর মনে হলেও, একটু চিন্তা করলে ওদের সপক্ষে যুক্তির সন্ধান মিলবে।••বক্তৃতা দিবার সময় কেউ যদি উত্তেজিত হয়ে বেঞ্চির সামনে বিছানো কার্পেট ছাড়িয়ে চলে আসেন, অমনি 'অর্ডার অর্ডার' বলে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়, এ নিয়ম যখন প্রবর্তিত হয়েছিল, তখন সদস্যদের কাছে তলোয়ার থাকত। উত্তেজিত অবস্থায় এগিয়ে যাওয়ায় বিপদ ছিল, কাজেই বিক্ষুব্ধ বিপক্ষ দলের তরবারীর দ্বারা বিদ্ধ হবার আশঙ্কাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত।

দুই পক্ষের সভ্যদের মধ্যে হাতাহাতি আজও হয়ে থাকে।••বর্তমান নিয়মে পার্লামেন্ট চেম্বারে অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। একবার ক্যালিডোনিয়ান বল থেকে ফিরবার মুখে পরনের হাইল্যাণ্ডারের পোষাকশুদ্ধই পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগদান করতে এলেন জনৈক স্কচ সদস্য। ঢুকবার মুখে প্রতিহারী তাঁর মোজার সাথে আটকানো ছোরাটা (skean dhu) (হাইল্যাণ্ড কষ্টুমের এটা অবিচ্ছেদ্য অংশ গোর্খাদের যেমন খুকরী বা শিখদের কৃপাণ) বাইরে খুলে রেখে আসতে বাধ্য করলো।

একবার ফায়ার আর্মস ডিবেটের সময় একজন এম, পি একটা খেলনা পিস্তল সঙ্গে এনেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হল। আর একবার একজন সভ্য একখণ্ড লোহার রেলিং এনেছিলেন সাথে করে, তাঁর কোন একটা বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য। কিন্তু স্পীকার বললেন ওটা নিয়ে ঢোকা চলবে না, কেন না ওটা কাউকে ছুঁড়ে মারলে তার মারাত্মক রূপে আহত হবার আশঙ্কা আছে। এই একই অজুহাতে ডেসপ্যাচ কেস নিয়ে ঢোকা বারণ। দূর থেকে ওটা নিক্ষেপ করলে আক্রান্ত ব্যক্তির অন্ততঃ ভগ্ননাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য মহিলা সভ্যদের হ্যাণ্ডব্যাগ বা ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে প্রবেশের কোন বাধা নেই।

মাননীয় সভ্যদের পালনীয় যে সকল বিধি বা নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, কোন ক্ষেত্রেই সেগুলো শিথিল করা হয় না। সভাকক্ষে পত্রিকা বা পুস্তকপাঠ নিষিদ্ধ। অনেক গণমান্য তোমরা চোমরা সভ্যদেরও সময় সময় সংবাদপত্র পড়ার অপরাধে তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। স্যর জন সাইমন একবার ট্রেজারী বেঞ্চে বসে দৈনিক কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। সাথে সাথে তাঁর এই নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের প্রতি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। ফলে স্যর জনকে বেরিয়ে আসতে হয়। কাগজ পড়ার নেশায় ভদ্রলোক অপদস্থ হওয়াটা গায়ে না মেখে, বাইরে এসেই পত্রিকা পড়তে লাগলেন। নেহাৎ যদি কিছু পড়তেই হয় সেটা হচ্ছে 'ব্লু বুক' (পার্লামেন্টের কার্য্য বিবরণী) কিন্তু দিন দিন তার কলেবর এমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে ভয় হয় কোন দিন হয়ত সেটা পড়াও রুলড আউট অব অর্ডার না হয়ে যায়। কি জানি রাগের মাথায় কেউ যদি ওটা কারো মাথায় ছুঁড়ে মেরে বসে।

একবার লর্ড কুশেনডন (Cushendon) (তখনও তিনি লর্ড হন নি, সাদাসিদে মিঃ রোনাল্ড ম্যাকনীল) চার্চিলকে বই ছুঁড়ে মারেন। বইটা ছিল 'এ ম্যানুয়াল অব পার্লামেন্টারী প্রসিডিওর'। এতে তাঁর অপরাধের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। কেননা পার্লামেন্ট পদ্ধতির পুস্তকটা ছুঁড়ে ফেলার হঠকারিতা লোকসভার প্রতি অশ্রদ্ধা-সূচক আচরণ বলেই প্রতিপন্ন হবে।

বেশী দিনের কথা নয় মিঃ বুকানন একবার বেকার ভাতার (আন্এমপ্লয়মেন্ট রিলিফ) অকিঞ্চিৎকরতার বিষয় বলতে গিয়ে, উত্তেজিত অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের মুদ্রিত রিপোর্টখানা দু' টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে (বইটার মলাটটা ছিল খুব শক্ত খাপের) না পেরে, শেষটায় ওটা মাটিতে আছড়ে ফেলে তার উপর পদাঘাত করে সরকারী ব্যবস্থার উপর তাঁর ক্ষোভ ও অনাস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন।

সভাকক্ষে ধূমপান একটা মহা অপরাধ। গির্জ্জায় বসে কেউ যদি গলা ছেড়ে সিনেমার চটুল সংগীত সুরু করে দেয়, তাতেও বোধ হয় লোকেরা ততটা শকড হবে না, যতটা হবে পার্লামেন্ট কক্ষে কেউ যদি (ভুলেও) পাইপ বার করে জ্বালাতে যায়, অথচ সভার অধিবেশনের সময় কেউ যদি মোজা বুনে চলে তাতে আপত্তি করা চলবে না। ইউজিন ওয়াসন (Wason) যুদ্ধের সময় যখন পার্লামেন্টের সীটিং চলছে, তারই মধ্যে সৈন্যদের জন্য দিব্যি মোজা বুনে যেতেন। কেউ ওটাকে অশোভন বা নীতি-বিরোধী বলে ভাবেন নি।

রাতভর যখন সীটিং চলে, তখন অনেকেই লম্বা ঘুম দিয়ে নেন। ইস্কুলের ছাত্র বা আপিসের কেরাণীর মত ঘুমিয়ে পড়লে আপনার উপর কোন তিরস্কার বর্ষিত হবে না। সুতরাং তন্দ্রাতুর সভ্যেরা পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতে পারেন। তবে বেঞ্চগুলোর পিঠের দিকটা খুব খাড়া ও উঁচু, কাজেই ঠেস দিয়ে ঘুমানোটা বিশেষ আরামপ্রদ নয়। একজন কড়া স্পীকারের আমলে আসনগুলোর এই ভাবেই সংস্কার করা হয়েছিল।

সভ্যরা ইচ্ছা করলে কমলালেবু পকেটে নিয়ে সভায় আসতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে কমলার কোয়া চুষে তৃষ্ণা মেটাতে পারেন। চলতি সভার মাঝে লেবু খাওয়ার অশালীনতা নিয়ে কেউ যদি আপত্তি তোলেনই তবে স্যর উইলিয়াম পিটের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সে আপত্তি খণ্ডানো যেতে পারে। পিট সাহেব বক্তৃতার সময় মাঝে মাঝে লেবুর কোয়া মুখে পুরতেন। তা নিয়ে কেউ কখনও আপত্তি তোলেন নি, কাজেই একটা নজির সৃষ্টি করে গেছেন তিনি।

ইচ্ছা করলে সভ্যরা মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বসে থাকতে পারেন, যদিও একালের দৃষ্টিতে এটা নিতান্ত ভদ্রতাবিরুদ্ধ। সময় সময় সভ্যদের মাথায় টুপী চড়াতেই হয়, এই টুপী চাপানোর নিয়মটা বহুদিন থেকে চলে আসছে। আগেকার দিনে ডিভিশনে যোগ দেবার সময় টুপী খুলতে হত। টুপী পরে বসে থাকলে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ সহজতর হত। আজকাল খোলা মাথায় অনুরূপ পরিস্থিতিতে সদস্যেরা অর্ডার পেপার দিয়ে কাগজের টুপী বানিয়ে মাথায় চাপান, স্পীকারের নজরে পড়বার জন্যে।

সভায় শান্তিরক্ষার জন্য স্পীকারের হাতে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। লণ্ডনে যাঁরা গেছেন, 'বিগবেন' ঘড়িটা নিশ্চয়ই তাঁরা দেখেছেন কিন্তু এই ক্লক টাওয়ারের ভিতরে যে একটা কারাগার আছে অনেকের কাছেই সেটা অজ্ঞাত। সভ্যেরা (শ্রোতারা ত বটেই) কেউ যদি অধিবেশন কার্য্যে বিঘ্ন বা ব্যাঘাত ঘটান, তবে ইচ্ছা করলে স্পীকার বিনা বিচারে অপরাধীকে এই ঘড়িঘরে আটকে রাখতে পারেন। অবশ্য স্পীকার কদাচিৎ তাঁর এই ক্ষমতার প্রয়োগ করে থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে একজন সদস্য লর্ডস ও কমন্স সভার যৌথ কমিটিতে (জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি) উপস্থিত হবার জন্য আহূত হয়ে সমন অগ্রাহ্য করেন। অবিলম্বে তার উপর সতর্কীকরণ নোটিশ বার হল। ভদ্রলোক তখন স্কটল্যাণ্ডে,··ঠিকানা অজ্ঞাত, কাজেই পরোয়ানা তাঁর হাতে পৌঁছুল না। তখন স্পীকার তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করলেন। ইউষ্টন থেকে রাতের গাড়ীতে বেচারা কেবল এসে লণ্ডনে নেমেছেন, অমনি অপিসার অব দি হাউস তাঁকে ধরে এনে সরাসরি পুরে দিলেন ঘড়িবুরুজের কয়েদখানায়। যতদিন না জয়েন্ট কমিটির মিটিং শেষ হল, ভদ্রলোকটিকে নজরবন্দী করে রাখা হল।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আস্তরের দিকটা,—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'সীমি সাইড', খুঁটিয়ে দেখতে গেলে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক হাস্যকর রক্ষণশীলতা, এমন কি ব্যক্তিস্বাধীনতা-বিরোধী কিছু কিছু ব্যাপার চোখে পড়বে, কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে বিচার করলে পৃথিবীর খুব কম দেশেই লোকসভা এত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং সত্যকার জনমত প্রতিফলিত করে।

জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হলেও অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিবাদ জানাবার লোকের অভাব হয়নি অদ্যাবধি। সম্প্রতি বৃটেনে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ঘটলেও, পার্লামেণ্ট সদস্যদের মধ্যে ন্যায়, সত্য ও সর্বোপরি জাতির মর্য্যাদা বোধের অপ্রতুলতা আজও দেখা দেয় নি। দলগত বিরোধ যতই প্রবল হোক না কেন, জাতীয় সঙ্কটের দিনে ভিন্ন দলীয় সকলেই একযোগে দেশবাসীর হৃদয়ে সাহস ও প্রেরণা যোগান। আপামর ব্রিটিশারের জাতীয় মর্য্যাদাবোধ খুবই প্রখর। ন্যাশানাল অনার বা জাতীয় স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্য ইংরেজ যে কোন ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকারে বা কৃচ্ছ্রসাধনে পরাঙ্মুখ নয়। ব্রিটেনের এই মহান আদর্শ যদি ভারত অন্তরের সহিত গ্রহণ করতে পারে, তবেই তার অর্জিত স্বাধীনতার যথাযথ মর্য্যাদা দিতে পারবে এবং তার সংরক্ষণে সুনিশ্চিত হতে পারবে।

মানুষ কোন পথে ?

একদিন ছিল যখন মানুষ পায়নি সভ্যতার স্পর্শ, জেগে ওঠেনি তার অন্তর, জ্ঞান ও শিক্ষার আলোয়। সেই অজ্ঞান অন্ধকারের তমিস্রা ভেদ করে আজকের মানুষ এগিয়ে এসেছে বহুদূর, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ তার বিস্ময়কর অগ্রগমন ঘটেছে, পৃথিবীর সব রহস্য সব দুর্গমতাকে জয় করে আজ সে অভিযান সুরু করেছে গ্রহ-গ্রহান্তরেও, কিন্তু তবু কি পেরেছে সে আদিম যুগের সব সংস্কারকে পদানত করতে? মানুষ যে আজও বর্ব্বর একথা বলার মত কারণ কি ঘটছে না অবিরতই? যুদ্ধ মানুষের সেই আদিম বর্ব্বরতারই এক সুদৃঢ় নিদর্শন, শান্তি, সাম্য ও বিশ্বপ্রেমের মুখোস ভেদ করে আজও তাই বারবার প্রস্তর যুগের বর্ব্বর মানুষের ছায়া কলঙ্ক মলিন করে তুলছে ধরণীর আকাশ বাতাস। বহু বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক মহাচীনের প্রতিবেশী নিরপরাধ রাষ্ট্র ভারতে সশস্ত্র অভিযান সেই আদি বর্ব্বরতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সভ্যতা, সংস্কৃতি, ন্যায় এ সমস্তের মাথায় পদাঘাত করে চীন আজ তার যে পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছে তার ফলে মানব সভ্যতা কথাটিই যেন নিতান্ত অর্থহীন এক শব্দে পরিণত হয়েছে। একথা সকলেই জানেন যে বহুবছর ধরে এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয় সম্পূর্ণ শান্তি ও মৈত্রীর সঙ্গেই সহাবস্থান করে আসছে, এবং একথাও কারুরই জানতে বাকি নেই যে বহুদিনাবধি বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লব বিধ্বস্ত চীনকে সর্ব্বাপেক্ষা সহানুভূতি ও সাহায্য ভারতই দিয়ে এসেছে, ভারতের বর্ত্তমান কর্ণধার শ্রীজওহরলাল নেহেরুর চীনাপ্রীতি তো সর্ব্বজনবিদিত, জাপান যখন চীন আক্রমণ করে তখন সর্ব্বোচ্চ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল ভারতের কণ্ঠেই, অথচ নয়াচীনের রক্তকুঠার আজ নেমে এসেছে তারই মস্তকোপরি। বহুদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু ভারতের বিরুদ্ধেই শুরু হয়েছে সাম্যবাদী চীনের সাম্রাজ্যবাদী প্রথম অভিযান। চীনের আচরণ আজ সমস্ত দুনিয়ার সামনে এই দৃষ্টান্তই খাড়া করে যে মানুষ যত সভ্য বলেই গর্ব্ব করুক না কেন, প্রস্তরযুগের বর্ব্বরতাকে সে বর্জ্জন করতে পারেনি আজও সর্ব্বাংশে, আজও তার সমস্ত কল্যাণ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে যে কোন সময়ই আত্মপ্রকাশ করতে পারে আত্মহননের সর্ব্বনাশা প্রকৃতি, যার সামনে তাসের প্রাসাদের মতই ভেঙ্গে পড়তে পারে সভ্যতা সংস্কৃতি ও কল্যাণের সামগ্রিক কাঠামোটাই।

আমার দেখা বিধানচন্দ্র

আমীনুর রশীদ চৌধুরী

ইংরাজী ১৯৩১ সালের প্রথম দিক। কাশি আমার লেগেই আছে। যখন সিলেটে কারো চিকিৎসায়ই ফল পেলাম না, তখন আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার পরিমল কর বললেন, "ওহে, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় শিলং-এ এসেছেন তাঁকে দেখাবে কি?" আমি তো সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলাম। পরিমল বাবু কোনকালে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সেক্রেটারীর কাজ করেছেন। তাই কোনও কিছুরই অসুবিধা হল না। ঘটনাক্রমে আমার বাবাও তখন শিলং-এ বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং থাকতেন আমাদের নিজেরই বাড়ীতে। তাই ছুট করে একদিন মোটরে শিলং পৌঁছলাম।

সেই দিন বিকালেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে গেলাম বাবা, ডাক্তার পরিমল কর আর আমি।

আমার আগেই একজন রোগী গিয়েছিলেন, তাঁকেই ডাক্তার রায় দেখছিলেন। দরাজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কি করা হয়?"

রোগী উত্তর দিলেন, "ইস্কুল মাষ্টারী।"

তার পরের প্রশ্ন, "বেতন কতো?"—

"ষাট টাকা"।

খস খস করে প্রেসক্রপশন লিখে সমবেদনাভাবে ডাক্তার রায় বললেন, "তোমার তো যক্ষ্মাই হয়েছে। তবে এখনও প্রথম অবস্থা, অষুধ পথ্যি করলে কাজে আসবে।"

রোগীটি নমস্কার করে যখন ডাক্তার রায়কে বত্রিশ টাকা ফি দিতে গেলেন, তখন ডাক্তার রায় বললেন, "না হে না এ টাকা আমি নেব না, এ টাকা দিয়ে তুমি পথ্যি কিনে খেও।"

তার পর আমার পালা। সব কিছু দেখার পর যখন ব্লাড প্রেসার দেখতে আরম্ভ করলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমার তো কাশি হচ্ছে, আপনি ব্লাড প্রেসার দেখছেন কেন?"

তিনি হেসে বললেন, "একটা প্রফেশনাল সিক্রেট বলে দিই। Low blood pressure is associated with T. B".

আমার মা, দিদিমা সবাই T. B.-তে গেছেন এই কথা ডাক্তার রায়কে বলা হয়েছিল।

সব দেখা শোনা হয়ে গেলে পর ডাক্তার রায় জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাবার সাথে লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লিতে যাও?"

আমার বাবা তদানীন্তন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। এটা ডাক্তার রায় জানতেন। আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, যাই তো মাঝে মাঝে।"

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন "Does not arise" বলে একটা "Parliamentary Expression আছে জানো?"

আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, জানি।"

তিনি দরাজ গলায় হেসে বললেন, "তোমার বেলায়ও Does not arise বুঝেছ?"

আমি বুঝলাম যে আমার যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর খুশী মনেই ফেরত এলাম।

এরপর বহুবার ডাক্তার রায়ের সান্নিধ্যে গিয়েছি, বহু জায়গায় তাঁর সেই দরাজ গলার আওয়াজ শুনেছি, সে গলার আওয়াজে রোগীরা মৃত্যুভয় ভুলে গিয়ে বেঁচে উঠতো। যে হাসিভরা মুখ দেখলে মনে হতো সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীর ছোঁয়া লেগে গেছে, আর ভয় নেই। কিন্তু সেই প্রথম দিনের দেখা মানুষটির দরদী মনের যে পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম—সে পরিচয় পরবর্তীকালে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ডাক্তার ও মনীষীর মাঝে পাইনি।

প্রদীপ

শ্রীগোরাচাঁদ গোস্বামী

প্রদীপ থাকোরে জ্বলি
আঁধারে দেখাও পথ
শক্তি তোমার অল্প তবু
জানি আছে হিম্মৎ।
মিথ্যারে হানি শেল
তুমি সত্যেরে ধর তুলি
সবার তরে পাত তুমি বুক
সকল বিভেদ ভুলি।।

মানবের মাঝে তোমার মহিমা
নহে তাহা অতি তুচ্ছ
জ্ঞানের প্রদীপও জ্বালাও তুমি
ঘুচাও মনের কালিমা তুচ্ছ।
তোমার দান শুচি ও শুভ্র
তাই, মোর প্রণাম লহিও।
কুলবধূ-সবে জ্বালায় প্রদীপ
তাদেরও প্রণাম লহিও।।

কবি নিরালা স্মরণে

অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি 'নিরালাব' মৃত্যুতে হিন্দী সাহিত্যের এক বিরাট মহীরুহের পতন হল। সূর্য্যকান্ত ত্রিপাঠী—যিনি 'নিরালা' এই ছদ্মনামে সমধিক পরিচিত—সাম্প্রতিক হিন্দী সাহিত্যের জনক। যে কয়জন সাহিত্যসাধক নতুন পথের সন্ধান দিয়ে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, সূর্য্যকান্ত তাঁদের অধিনায়ক।

১৮৯৮ সালে নিরালার জন্ম বাঙলা দেশে—মেদিনীপুরের মহিষাদলে। ১৯১৬ সালে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর কাব্যচেতনার প্রথম অভিব্যক্তি ঘটেছিল বাঙলা ভাষার মাধ্যমে—তাঁর মাতৃভাষা হিন্দীতে নয়।

নিরালা তাঁর প্রথম জীবনে কিছুদিন 'মতওয়ালা' ও 'সমন্বয়' সম্পাদনা করেন। এই সময় তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মহান আদর্শে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। এই দুই মহান্ ঋষির প্রভাব তাঁর সাহিত্যে ও জীবনে শেষ দিন পর্য্যন্ত আমরা পাই। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে 'রবীন্দ্র কবিতা কানন' নামে এক পুস্তক রচনা করে তিনি এক ইতিহাস রচনা করলেন। তাঁর আগে কোন অবাঙ্গালী সাহিত্যিক হিন্দী বা অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্র পরিচিতিমূলক এরূপ কোন পুস্তক রচনা করেন নি। রবীন্দ্র প্রতিভার ওপর নিরালার শ্রদ্ধা যে কত গভীর—তা আমরা এই পুস্তকের মাধ্যমে জানি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাই তাঁর সাহিত্যে সারাজীবন ধরে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

হিন্দী সাহিত্যে নিরালাজী ছায়াবাদের বিশিষ্টতম প্রবক্তারূপে খ্যাত। প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের ভাঁটা-ধরা কাব্যধারায় তিনি আনলেন জোয়ার। সেই জোয়ারের আখ্যা দেওয়া হল 'ছায়াবাদ'। এই ছায়াবাদ প্রবর্ত্তনের পেছনে সুমিত্রানন্দন, প্রসাদজী, মহাদেবী বর্ম্মা প্রমুখ কবিদের প্রচেষ্টাও ছিল প্রচুর। বাস্তবতা ও রহস্যময়তার মধ্যবর্ত্তী এই ছায়াবাদ। প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে আধুনিক রীতির এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। বহুলোক বহুভাবে এই ছায়াবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগতের অস্তিত্বকে সমষ্টিরূপে চৈতন্য প্রদান করে মানুষকে তার পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করে তোলা। আবার কারুর মতে, ছায়াবাদ হোল প্রবহমান মানব হৃদয়ের বিভিন্ন প্রতিফলন যা সুখ-দুঃখ-হতাশ-নৈরাশ্য প্রভৃতি অনুভূতির সমষ্টিগতরূপে প্রকাশিত।

এই সম্পর্কে শ্রীমতী মহাদেবী বর্ম্মা বলেছেন, ছায়াবাদ নিরালম্ব অধ্যাত্ম বা দলগত মতের পুঁজি নয়, ছায়াবাদ আমাদের অন্তরে এনেছে সমষ্টিচৈতন্য এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি, সেই সৌন্দর্য্যানুভূতি আমাদের অন্তরে জেগে আছে।

নিরালাজী স্বয়ং বলেছেন, গত তিন শতাব্দী ধরে যে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে কাব্যলক্ষ্মী চলছিলেন, আমি সে পথ বিস্তৃত করেছি, কণ্টকাকীর্ণ পথকে মসৃণ, তৃণগুল্মহীন করেছি।

নিরালা হিন্দীকাব্যে গদ্য কবিতার প্রবর্ত্তক। মুক্ত-ছন্দের প্রবর্ত্তন করে তিনি হিন্দী কবিতাকে যুক্তছন্দের জাল থেকে মুক্তি দিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি বহু নতুন ছন্দ আমদানী করে হিন্দী কাব্যকে দিলেন এক নতুন রূপ। তাঁর গীতিকবিতায় ছিল অপূর্ব্ব রসমাধুরী। রবীন্দ্রানুসারী হয়ে তিনি গান ও কবিতার এক সার্থক সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর রচনা ছিল পৌরুষদীপ্ত সাহসিকতায় সমুজ্জ্বল; তাঁর প্রতিভায় ছিল বলিষ্ঠ আদর্শবাদ।

নিরালাজীর ব্যক্তিগত জীবন ছিল বড় দুঃখময়। অতি অল্প বয়সে তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে। দুঃখ ও দৈন্য, শোক ও সন্তাপ তাঁর নিজের জীবনে নিত্যসহচর ছিল বলে তিনি সাধারণ মানুষের হাসি ও অশ্রুর কথা, আশা ও আকাঙ্খার কথা এবং মূক ও মূর্খ, চিরবঞ্চিত ও অভিশপ্তদের ব্যথা তাঁর সংবেদনশীল লেখনীর মাধ্যমে অত্যন্ত দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, কুশাসন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়েছিলেন প্রতিবাদ। এই কারণে, অনেকে তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলে অভিহিত করেন।

উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, জীবনী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি প্রায় ষাটখানা বই লিখেছেন। তার মধ্যে কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম—'অনামিকা' কাব্য, ১৯২৩), 'প্রভাবতী' (উপন্যাস, ১৯৪৬), 'নয়ে পত্তে' (কাব্য, ১৯৪৬), 'অর্চ্চনা' (কাব্য, ১৯৫০) ও 'ছায়া' (প্রবন্ধ, ১৯৫৭)।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের জনক হিসাবে নিরালার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নতুন মত ও পথ প্রবর্ত্তন করে হিন্দীসাহিত্যের কণ্টকাকীর্ণ পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করার জন্য, হিন্দী-সাহিত্যকে পত্রপুষ্প ও ফলফুলে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলে সাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য আধুনিক সরকার তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম না জানাতে পারেন, কিন্তু উত্তরসূরীরা উদাত্তকণ্ঠে তাঁর জয়গান করবে।

ধারাবাহিক আত্ম-জীবনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পরিমল গোস্বামী

১৭
চীনাদের আবির্ভাব

আজ ১৬ই নবেম্বর, ১৯৬২। দ্বিতীয় স্মৃতি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম গত বছরের মে মাস থেকে। মোট ১৬ মাস লিখেছি, এটি তার পরবর্তী মাসের অধ্যায়। সবই মাসিক বসুমতীতে মাসে মাসে প্রকাশিত।

ইতিমধ্যে দেশে চীনাদের আক্রমণে নতুন সঙ্কট দেখা দিল! এ সময় আমি দ্বিতীয় স্মৃতির গোড়াতেই যা লিখেছিলাম তা আরও একবার স্মরণযোগ্য। বলেছিলাম শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীরা নবযুগ এনেছেন জাপানের উপর পরমাণু বোমা নিক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি ক'রে। সে সময় কয়েক সেকেণ্ডে দেড় লাখের উপর নরহত্যা ক'রে এই উজ্জ্বল যুগের সূচনা।

ইতিমধ্যে নবযুগের প্রগতি প্রায় স্থাণুভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাগ্‌যুদ্ধের সাহায্যে বাজার গরম রাখছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে অনেক খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে। বড় যুদ্ধ লাগে-লাগে ক'রেও লাগেনি। এ শুধুই ক্ষণ বিরাম মাত্র, হতাশ হবার কোনো কারণ ছিল না। সভ্যতা যে 'মোমেনটাম' বা ভরবেগ একবার লাভ করেছে তা বন্ধ হবার নয়, মাঝে মাঝে তার আপাত শৈথিল্য দেখা গেলেও তা ভ্রান্তি মাত্র। মনে হচ্ছে এবারে এ যুগকে এগিয়ে নেবার ভার পড়েছে চীনাদের উপর। তবে নবসভ্যতার এই গতিপথ এমনই বিচিত্র যে সম্মানটা তারাই শেষ পর্যন্ত পাবে কি না জোর ক'রে বলা যায় না।

কলকাতা শহরে বাস ক'রেও গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্বাদ আমরা পেয়েছি। শহরের উপরেই বোমা পড়েছে কয়েকবার। তার কথা আমরা ভুলিনি। তাই তো সমস্ত মনপ্রাণ ক্ষুধার্ত হয়ে আছে বোমার আঘাতের জন্য। আশা ক'রে আছি শীতান্তে আমাদের মাথায় বোমা পড়বে। ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছি। কিন্তু যদি না পড়ে, যদি নবসভ্যতার তৃতীয় ভগীরথ চীন সরকার কোনো কারণে তার এই গুরু দায়িত্বভার পালনে অক্ষম হয়, তা হলে কিছুকাল আমাদের জীবন মরুভূমি ব'লে বোধ হবে। তখন হয়তো অন্য কেউ এসে বিশ্বশান্তি নামক মরীচিকাকে লক্ষ ক'রে বোমা ফেলবে, গুলি চালাবে। সভ্যতাকে এই ভাবে এগিয়ে নেবার লোকের অভাব হবে না। সেই ভরসাতেই মানুষ আজও বেঁচে আছে।

কোথায় গেল সেই সব পরম নিশ্চিন্ত সর্বনাশকর দিনগুলি। কি দায়িত্বহীন সেইসব দিন আমরা কাটিয়েছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। তখন লেখকদের একটা অদ্ভুত সমাজ ছিল, একটা চরিত্র ছিল। এবং সেটাই ছিল সবচেয়ে ক্ষতিকর। কানের কাছে সর্বদা মোহমুদ্গর আওড়াবার কেউ ছিল না। কেউ ব'লে দেয়নি যে জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে পয়সার গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়ানো, যেখানে আভাস আছে তার চারিদিকে ছোঁক ছোঁক ক'রে ঘোরা। কারণ, 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ?' সংসারে কেউ যখন কারো নয়, তখন লোকের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে টাকা উপার্জনে মন দেওয়া।

আজ চীনের আক্রমণে নতুন আর একটা যুগের সূচনা হ'তে চলল, এ যুগকে তাই অভিনন্দন জানাই। এবং এই উপলক্ষে বিশ্বযুদ্ধ লাগলে তার মতো মনোহর যুগপরিচয় আর কিছু হবে না। কিছুই বলা যায় না। আজ যাকে সামান্য মনে হচ্ছে, কাল তা অসামান্য হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মাত্র দুটো পরমাণু বোমা দেড় লক্ষ লোক মেরেছিল ব'লে এ যুগের নাম হয়েছে পরমাণু-যুগ। পরমাণুর সাহায্যে লোক বাঁচানোর পথ প্রথমেই আবিষ্কৃত হ'লে কখনও এ যুগের নাম পরমাণু যুগ হ'ত না। যুগান্তকারী ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে এ যুগে একের পর এক, কিন্তু কোনো ওষুধ বা আবিষ্কর্তার নামের সঙ্গে যুগের নাম যুক্ত করা হয়নি। যদি এমন কোনো মারাত্মক জীবাণু আবিষ্কৃত হ'ত যার সামান্য এক মুঠোর সাহায্যে পৃথিবীর সকল মানুষকে এক সেকেণ্ডে মেরে ফেলা যেত, তা হলে পরমাণু যুগ কেটে দিয়ে তার স্থানে লেখা হ'ত জীবাণু যুগ। করপোরেশনের পথের নাম যেমন একের পর এক বদল হয়, যে যখন প্রভাবশালী, তার নাম তখন স্মরণীয় হয়ে ওঠে, এও তেমনি।—(যদিও তুলনাটা অতি বড়র সঙ্গে অতি ছোটর হল, তবু চরিত্রের দিক থেকে দুয়ের মধ্যে অসঙ্গতি নেই।)

এই পরিচ্ছেদটি যখন (১৮-১১-৬২) লেখা হচ্ছে তখন মন আশায় উৎফুল্ল। এখন নিফা অঞ্চলে কঠিন লড়াই চলছে। ওয়ালং অঞ্চলে চীনাদের আক্রমণের তেজ বাড়ছে, ভারতীয়দের বীরত্বপূর্ণ প্রতি-আক্রমণ চলছে। —১৮-১১-৬২ তারিখের খবর। যখন এ লেখা ছাপা হবে, তখন কি হবে, অনুমান করা কঠিন। ইতিমধ্যে যদি বিশ্বযুদ্ধ না বাধে, তা হ'লে আমি অবশ্যই দুঃখিত হব। কারণ

নতুন নতুন পরমাণু-বোমার অতি প্রচণ্ড আঘাত যদি ব্যাপকভাবে মানুষ মারার কাজে না লাগে, তা'হলে বিজ্ঞানের এত বড় কৌশলটা বৃথা যাবে, সভ্যতা ব্যর্থ হবে। অ্যান্টিবায়োটিক শ্রেণীর আশ্চর্য্য ওষুধ সমস্ত আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও এ যুগের নাম যখন অ্যান্টিবায়োটিক যুগ হ'ল না, তখন এইসব অতি আধুনিক বিশ্বধ্বংসকারী পরমাণু-বোমার নাম দেওয়া যেতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক বোমা। (এবং ব্রড স্পেকট্রাম)। যুগের নাম হোক অ্যান্টিবায়োটিক পরমাণু যুগ। অ্যান্টিবায়োটিক মানে প্রাণের শত্রু। উপযুক্ত নাম।

কিন্তু যে নামেই ডাকা হোক, যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে আর একবার সমসাময়িক লেখক ভ্রাতা বা বন্ধুদের দিকে ফিরে চাইতে বার বার ইচ্ছা হচ্ছে। চলতে চলতে অনেককে হারিয়েছি চিরদিনের মতো, অনেকে ঘটনাচক্রে দূরে সরে গেছেন, অনেকে শয্যালগ্ন হয়ে আছেন।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, এঁদের আর বাইরে বেরোবার উপায় নেই। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—আমাদের বুড়োদা। তিনি এখন প্রকৃতই মহা স্থবির। কিন্তু কয়েকমাস আগেও কাছে গিয়ে দেখেছি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো বিছানা থেকে উঠে বসেছেন এবং সকল দুর্বলতা ভুলে যৌবনে ফিরে গিয়েছেন। গল্প বলার এমন নেশা সহজে দেখা যায় না। গল্প বলার ঝোঁক আমাদের হেমেনদারও এতটুকু কম নয়। তিনি বর্তমানে তাঁর গঙ্গার ধারের ত্রিতল বাড়ির সর্বোচ্চ তলায় থাকেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙা। বোধ হয় এক বছর আগেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি এক তলায়। কখনও দোতলায়। তখনও অবধি তিনি নিচে চিৎপুর রোডে নেমে এসে রকে ব'সে থাকতেন অন্য বাড়ির। কখনও বা বিপরীত দিকের চায়ের দোকানে। সন্ধ্যায় গেলে সেখানেই তাঁকে পাওয়া যেত। কিন্তু নিচে নামলে এখন তাঁর পক্ষে উপরে ওঠা কঠিন হয়, সে জন্য তিনি এখন স্থায়ী ভাবে ত্রিতলবাসী। এখানেও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি গত কয়েক মাসের মধ্যে। কিন্তু অত উপরে ওঠা আমার পক্ষেও এখন কিছু কষ্টকর। এমন অবস্থায় দু'পক্ষই একটা রফা ক'রে দোতলায় দেখা করা যেত, কিন্তু হেমেনদার অবস্থা স্মরণ ক'রে সে প্রস্তাব উত্থাপন করিনি। আড্ডা দেবার ইচ্ছা হ'লে ত্রিতল পর্যন্তই ধাওয়া করি। পুজোর আগে শেষ যেদিন গিয়েছিলাম (সম্ভবত জুন মাসে) তখন আমার সঙ্গে ছিল সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। আর ছিল দুজন, এবং হেমেনদার সঙ্গে যতবার দেখা করেছি গত দু'বছর, প্রত্যেকবারই তারা আমার সঙ্গী হয়েছে। —সুধাংশু প্রকাশ চৌধুরী আর অমল দেব।

হেমেন্দ্রকুমার বন্ধু-বৎসল। কারো উপর কোনো বিদ্বেষ পোষণ করতে দেখিনি। বেশ উদার মনটা। আমার অনুরোধে যুগান্তরে যখন "যাঁদের দেখেছি" পর্যায় শুরু করেন, তখন তাঁর এক বন্ধু আমার কাছে এসে তাঁর বিরুদ্ধে অকারণ অনেক কথা বলতে শুরু করলে আমি তাঁকে চুপ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। হেমেন্দ্রকুমার পরে তাঁরই সম্পর্কে যে রচনাটি লিখলেন, তাতে তাঁর নিন্দাকারীর প্রতি অজস্র শ্রদ্ধা এবং প্রীতি বর্ষিত হ'ল। এই সামান্য একটিমাত্র ঘটনাতেই হেমেন্দ্রকুমারের অন্তরের পরিচয়টি পেয়ে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আরও বেড়ে গেল। হেমেন্দ্রকুমার যে কি পরিমাণ উদার এবং মিষ্টস্বভাবের তার পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি আমার কাছে লেখা তাঁর চিঠির মধ্যে। তাঁর একখানা চিঠি আমি শিশিরকুমার ভাদুড়ি অধ্যায়ে ছেপেছি। বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়ের ভাষা আছে তাতে। অন্য সময় লেখা-দেওয়া বিষয়ে বিলম্ব হওয়াতে অথবা সম্মানদক্ষিণা তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হ'লে যে দুখানা চিঠি লিখেছেন তা বড়ই উপভোগ্য। কবিতায় লিখেছেন। দুটোতেই সঙ্কোচপূর্ণ এবং অপরাধী-অপরাধী ভাব। ছন্দের আবরণে মুড়লে সঙ্কোচ অনেকটা কেটে যায়, এবং হাসতে হাসতে বললে অপরাধও কেটে যায়।

গত ২২-১-৫১ তারিখে তিনি পুজোর লেখা পাঠাইতে দেরি হওয়ায় লিখছেন—

ভো পরিমল গোস্বামীরে—সু-ধীর সুধী সম্পাদক!
বিলম্বিত কলমবাজের লজ্জা ভীতি উৎপাদক!
উদরটা মোর ঔষধালয়, রুগ্ন শরীর অথর্ব,
মানুষ-হাপর হলাম বুঝি ভেবেই মরি—কি করব?
জীবন্মৃত হয়েও তবু ওড়াতে চাই কথার ঘুড়ি,
মনে মনে পঙ্গু হাতে ভীমের গদা জোরসে ছুঁড়ি!
হায়রে, দেহ বশ মানে না, করবে কেবল বিদ্রোহ,
কেমন ক'রে দেখাই তবে আমার মানস বিগ্রহ?
সেই সেকালের রঙিন স্বপন স্পষ্ট চোখে দেখতে পাই,
রোগ-যাতনায় মেলায় কোথায় কিন্তু যখন আঁকতে যাই।
প্রাণপণে ভাই, কলম ধ'রে লিখে দিলাম খানিকটা,
যদিও পেলাম কাঁচের কুচো খুঁজতে গিয়া মাণিকটা।
বড়ই হ'ল বিলম্ব ভাই, ক্ষমার পাত্র আমি নই,
সাব্যস্ত যা করবে সখা, তাতেই দেব ট্যারা সই।

অনিচ্ছাকৃত অপরাধের আসামী হেমেন্দ্রকুমার রায়।

দ্বিতীয় চিঠিখানা এই—

প্রিয়ংবদ পরিমল গোস্বামী করকমলেষু—

বলিতে পার কি বন্ধু করিয়া বিনতি,
মাস গেল আশা করে হবে ফলবতী?
গুহ্যকথা জানো সখা, নহি ধনপতি,
টাকার দুর্ভিক্ষে সদা দুর্দম্য দুর্গতি।
মাঝে মাঝে হয় ভাই হেন মতিগতি,
একছুটে বনে ঢুকে হয়ে পড়ি যতী।
কিন্তু সে শকতি কোথা? এবে বৃদ্ধ অতি।
এবং দুর্ভক্ষ্য তৃণ! পাব না ফুরতি।
বিমনায়মান হয়ে চাহি তব প্রতি,
ঠারে ঠোরে বুঝে নাও নিঃস্বের কাকতি।
একটা জবাব দিলে হবে কিছু ক্ষতি?
আমি জানি হবে নাকো তুমি যে সুমতি।
ব্যাধির প্রমোদ-গৃহ এদেহ সম্প্রতি,
চতুর্দশপদী লিখে এবার বিরতি।

হেমেন্দ্রকুমার
৩।৮।৫১

এখানা পূর্বের চিঠিখানার প্রায় একমাস আগে লেখা। সাময়িকী বিভাগে লেখার দক্ষিণা প্রার্থনা!

সাধারণ চিঠিও—অর্থাৎ নিতান্তই একটি কাজের কথাতেও
বিতা! এবারের পূজোর লেখার প্রুফ দেখা বিষয়ে অনুরোধ।
খছেন—

হাস্পদ বন্ধুবর,

আরও অনেক উল্লেখ্য ও কৌতুককর কথা বাদ দিতে হ'ল, কারণ
পনার হুকুম—'লেখা ছোট করতে হবে।'

কিন্তু শোধবাবার সময় পেলুম না···

আমি নিজে গিয়েই দেখে দিয়ে আসতে পারতুম, কিন্তু—

যাব কি ভাই, যাব কি, শেসটা খাবি খাব কি ?
বলেছেন যে চিকিৎসক—'থামাও পদযাত্রার সখ।'
দেখলে তোমার মুখখানা, ভবে যে মোর বুকখানা।
উপায় নাই গো উপায় নাই, মরতে ব'সেও জীবন চাই।

ইতি—হেমেনদা
৭।৯।৬২

হেমেন্দ্রকুমার বহুমুখী গুণী লোক। নিজে পেণ্টার, কবি, গল্প-
খক, উপন্যাস-লেখক, নৃত্যবিদ, ছোটদের প্রিয় লেখক, অ্যাও
য়াট নট ?

হেমেনদা ত্রিতলবাসী হওয়াতে আমার যত অসুবিধাই হোক, যে
দিন সেখানে গিয়েছি একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।
টা নতুন অনুভূতি।

গঙ্গার তীরে বাড়ী। হেমেনদার কাছে গিয়ে বসলে মনে হয়
গাজে ভেসে চলেছি সবাই মিলে।

যেন সমাজ সংসারের সকল বাঁধন ছিঁড়ে ভেসে চলেছি। কত
কাল ধরে যেন চলেছি এক জানা তীর থেকে অজানা আর এক
র। সন্ধ্যার আধো-আলো আধো-অন্ধকারে মৃদু কুয়াসার আবরণে
নদীর এপারে ওপারে আলো জ্বলে উঠতে থাকে তখন সব
লয়ে বেশ একটা অবাস্তব উদাস করা ভাব। এ ভাব অবশ্য
স্থায়ী কিন্তু মনকে নাড়া দিয়ে যায়। ক্ষণকালটাই তখন
য়িকভাবে কালের পরিধি হারিয়ে ফেলে।

কাদের সঙ্গে এখনও ভেসে চলেছি এভাবে ? সবাই নেই সঙ্গে।
রা যারা প্রায় সমসাময়িককালে কলকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্রে এসে
ছিলাম, সেই আমরা সবাই আর একত্র নেই। অগ্রজদের মধ্যে
লিদাস রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্র কুমার রায়, বনবিহারী
াপাধ্যায়। এদের দান প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু
তে আনন্দ যে এঁরা জীবিত এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেবার
এঁদের এখনও সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যায়নি। অগ্রজদের মধ্যে আরও
কে জীবিত আছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যে কারণেই হোক
ঙ্গ পরিচয় আমার ঘটেনি।

ভাবতে দুঃখ বোধ হয় যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক
্যাপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস অকালে আমাদের ছেড়ে গেছেন।
শেখর বসুর মৃত্যু অপেক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যু যথাকালে ঘটেছে।
বিভূতিভূষণ, মানিক, সজনীর মৃত্যু মর্মান্তিক।

আরও একটি প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে মনে পড়ল। তিনি মৃত্যুর
র একটি জগৎ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। এবং তার ইতিহাস না
জানলেও তার ভূগোল এবং নীতি বিষয়ে অনেক তথ্য জানতেন।
অনেককে বলেছিলেন যদি তাঁর বিশ্বাস সত্য হয় তবে তিনি মৃত্যুর
পর দেখা দেবেন। এ প্রতিশ্রুতি তিনি অনেককে দিয়েছিলেন—এ
কথা আগে বলেছি। বলেছি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু দেখা
দেননি। আমাকেও না।

ভাগ্যের পরিহাস!

আমারই একটি ব্যাপারে সম্প্রতি এক ভৌতিক কাণ্ড ঘটেছে, এবং
আশ্চর্য কথা এই যে, তার সঙ্গে বিভূতিবাবু জড়িত। একেবারে
ষোল আনা ভৌতিক ব্যাপার। এটি আমি অল্পদিন হল আবিষ্কার
করেছি। শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'অনুভবন'
নামক একখানি সংকলন গ্রন্থ বেরিয়েছে। সবই ভূতের গল্প। তার
মধ্যে বিভূতিভূষণের গল্পের ঠিক পরেই আমার গল্পটি স্থান পেয়েছে।

এখন প্রকাশকেরা বইয়ের প্রতি বাঁ-পৃষ্ঠায় বইয়ের নাম, এবং
ডান-পৃষ্ঠায় লেখকের নাম ছেপেছেন। সবই ঠিক আছে, কেবল
আমার গল্পটির বেলায় পর পর ডান দিকের তৃপৃষ্ঠায় আমার নাম
(ঠিকই ছাপা হয়েছে), কিন্তু পরবর্তী ডান দিকের চার পৃষ্ঠায়
বিভূতিভূষণের নাম ছাপা। অর্থাৎ আমার ভূতের গল্পের উপর
বিভূতিভূষণ কিছু অধিকার বিস্তার করেছেন। এখন ব্যাপারটা
দাঁড়িয়েছে এই—

(১) বিভূতিবাবু ভূতে বিশ্বাসী ছিলেন।

(২) বিভূতিবাবু মৃত্যুর পর আমাকে দেখা দেবেন প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন।

(৩) ভূতের গল্পের সংকলন গ্রন্থে আমার ১২ পৃষ্ঠার গল্পের
পাঁচ পৃষ্ঠায় বইয়ের নাম। তৃপৃষ্ঠা আমার নাম এবং চার পৃষ্ঠা
বিভূতিবাবুর নাম।

(৪) এবং বইখানি ভূতের গল্পের।

এ থেকে সিদ্ধান্ত কি ?

বিজ্ঞানজগতের একটি ক্ষতি

আজ (১৮-১১-৬২) রাত্রে ডেনিশ বিজ্ঞানী নীলস্ বোরের
মৃত্যুসংবাদ শুনলাম রেডিওতে। শুনে মনটা একটুখানি খারাপ
হল। তাঁর প্রতি আমার একটা আকর্ষণ ছিল। তার কারণ,
পরমাণুর গঠনের আবিষ্কারে রাদারফোর্ডের পরবর্তী ধাপ এগিয়ে যাবার
কৃতিত্ব এঁর। অ্যাটমের প্রতি আমার আকর্ষণ রূপকথার প্রতি
শিশুদের আকর্ষণের মতো।

নীলস্ বোরের কথা বিশেষভাবে বলছি এজন্য যে, তাঁকে আমি
দেখেছি এবং তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত
টেকনিক্যাল, আমার জ্ঞানের বাইরে। কিন্তু অ্যাটমের গল্প এবং
তার সঙ্গে এইসব বিজ্ঞানীদের কথা বহুদিন ধরে প'ড়ে এবং শুনে
তাঁদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধাবিস্ময়পূর্ণ রোম্যাণ্টিক মনোভাব
গ'ড়ে উঠেছিল।

অ্যাটম বা পরমাণুর গঠনতত্ত্ব নিয়ে অনেকদিন ধ'রে আলোচনা
চলছিল। অ্যাটমের ভিতরে কি আছে, তা জানা সহজ ছিল না,
প্রবেশের দরজা পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছু কিছু আভাস মেলে,
অথচ সিসেমি দরজা খোলে না। অবশেষে রাদারফোর্ড প্রথম ঝাঁপিয়ে
অ্যাটমের অভ্যন্তরে। ডিম যেমন শুক্রকীটের দ্বারা নিষিক্ত হয়

—ডিমের ভিতরে শুককীট মাথা গলায়, রাদারফোর্ডও তাই করলেন অ্যাটমের মধ্যে কিন্তু ভিতরের গঠন-রহস্য সব ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। নীলস্ বোর দিলেন পরবর্তী ব্যাখ্যা (মাঝখানে অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখে বিরত রইলাম।) অ্যাটম-তত্ত্ব অনেকখানি এগিয়ে গেল।

নীলস্ বোরকে আমি দেখেছি, এই আমার গর্ব। গত ১১৬০ সালের ১১ই জানুয়ারি মঙ্গলবার অপরাহ্নে বিজ্ঞান-কলেজের মেঘনাদ সাহা ইনস্টিট্যুট লেকচার থিয়েটারে অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম বহু বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের সঙ্গে। শ্রদ্ধেয় চেহারা, শিশুর মতো সরল বাগ্‌ভঙ্গি, স্থির-মস্তিষ্কে আবেগহীন ভাষায় তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবার আগ্রহ। দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল। এঁরা সব ঋষিতুল্য ব্যক্তি, অত্যন্ত সরল এবং সহজ চিন্তাধারা।

দ্বিতীয় স্মৃতির কৈফিয়ৎ

এ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি তার কি কিছু দাম আছে?—নিজেরই মনে প্রশ্ন জাগে। বিরাট বিশ্বের অন্তহীন রহস্যের মাঝখানে ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট ছেলেমি বা খেলার কথাই হয়তো বেশি বলেছি। আমার চোখে যাঁরা বড়, তাঁদের সম্পর্কে যথেষ্ট বলবার ক্ষমতা বা ভাষা আমার নেই। কাজেই তাঁদেরও চরিত্রের মানবিক দুর্বল দিকটাই বেশি করে দেখেছি আমি। এসব না গভীরতায় না বিস্তারে বড়। জগতের কল্যাণ হবে এমন কোনো কথাই লেখা গেল না। ক্ষমতা নেই।

পৃথিবীর এক কোণে অল্পপ্রশস্ত জমিতে যে গলি পথ বেয়ে চলে এসেছি তার প্রতি মমতার অন্ত নেই। এখনও ফিরে ফিরে ডাকে। এক একটি অবসাদের মুহূর্তে যখন পিছন ফিরে তাকাই, তখন অকারণ এক একটা তুচ্ছ ঘটনা বড় হয়ে ওঠে মনের মধ্যে। এক এক সময় অনেক ছবি ভিড় ক'রে আসে, মনের স্মরণপাত্রখানা ছাপিয়ে পড়ে। কিন্তু তবু তার আনন্দ একমাত্র আমারই আনন্দ। আমারই জীবনের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

বড় বড় জিনিষ ভাবতে গিয়ে ভয়ে ফিরে এসেছি, মাথা ঘুরে যায়। বিশ্ববিধাতার কথাও ভাবতে যাই কিন্তু বোধের মধ্যে আসে না। তবে এই মনে হয় যে যদি এমন কেউ থাকেন, তবে আমার প্রচারের উপর তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। তেলের দোকানের বিজ্ঞাপন লেখার মতো বিশ্বস্রষ্টার বিজ্ঞাপন লিখতে মন সরে না। তাঁর চরিত্রের সার্টিফিকেট লেখাও আমার দ্বারা অসম্ভব। প্রার্থনা ক'রে বা তোয়াজ ক'রে নিজের স্বার্থের জন্য কিছু আদায় করার কল্পনা দ্বারা কল্পিত বিধাতাকে হীন করার প্রবৃত্তি আমার নেই।

তাই জীবনে আমি ওপথে যাইনি। সাধারণ জিনিসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা, তার মধ্যেই আমার ছোট জগৎটা। কবির মতো জানার ভিতর দিয়েই অজানার সন্ধান করেছি হয়তো মাঝে মাঝে, কিন্তু সেই অজানার সন্ধান পেলে কখনো বলব না ছেলের চাকরি ক'রে দাও, এবং লটারিতে আমায় কিছু টাকা পাইয়ে দাও। কিছুই বলব না, শুধু বিস্মিত হব। এবং কথাটা গোপালদাকে গিয়ে জানিয়ে আসব বোস ইনস্টিট্যুটে।

অমর্ত্য নামের মাল্যে

অরুণাচল বসু

এলায় চৈত্রের হাওয়া
ঝাউবনে গহন রোদ্দুর,
মাঠের বিকেল এই
পাখিদের কণ্ঠ ঢালে সুর।
ঐ দূরে নীলাকাশ
টলোমলো অস্ত মেঘগুলি,
অলক্ষ্যে রঙের ঝর্ণা
আঁকে কার রূপার্ত অঙ্গুলি!
এখানে মুহূর্ত বোসো,
ঐ কালো দীঘির সোপানে
হৃদয়ের একটি লগ্ন
বিথারিত জলাঙ্গীর প্রাণে!
জীবনে অনেক যায়,
কতো যায়, কে হিসাব রাখে?
যেতে-যেতে তবু তার কিছু চিহ্ন
অস্তমেঘে যে উদাসী আঁকে
আমি তার বিন্দুটুকু তুলে রাখি
আত্মার ছায়ায়—
অমর্ত্য নামের মাল্যে
খরোখর হাওয়া কেঁপে যায়।

মন্ময় কি তন্ময়

শ্রীউমাপদ নাথ

অলকা, এখন তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি এই যে আমি।
সমুদ্র-বুকে লবণমেদুর বিবিক্ত প্রেমস্বাদে
এখন আমার জীর্ণ তরণী ডোবা!
অলকা, স্বপনশিথিল সে-আমি অনাবিল পরমাদে।

অনেক দৃশ্যে এ পঙ্কাঙ্কে জীবনের কুশীলব
বিচিত্র বেশে জেগেছে অনেক নিশি;
প্রচুর চিকণ সুগন্ধি কেশ-সহ
আমার যুঠোয় আজকে, অলকা, গেছ নিঃসীম মিশি'।

চাঁদিনী রাতের আরো ঢের মানে বয়সের অভিধানে
পেয়েছি খুঁজিয়া। নীরব রাত্রে দেখি,
মানুষী গন্ধ শুধু মিছে নয়, একান্ত অশ্বিত;
ষোড়শী অলকা, ডুবেছো আমার চন্দ্রিমী ঘোলা চোখে।

তোমার উর্ধ্বে উঠেছি আজকে, তাই এ প্রসক্তি কি?
জোয়ান তৃণকে বিচালি ভাবতে কী যে কৌতুক! বলিতে,
আমারই মধ্যে ষোড়শ পা পিছে, অলকা,
দুর্যোধনের মতো ডুবে আমি তব যৌবন-দীঘিতে।
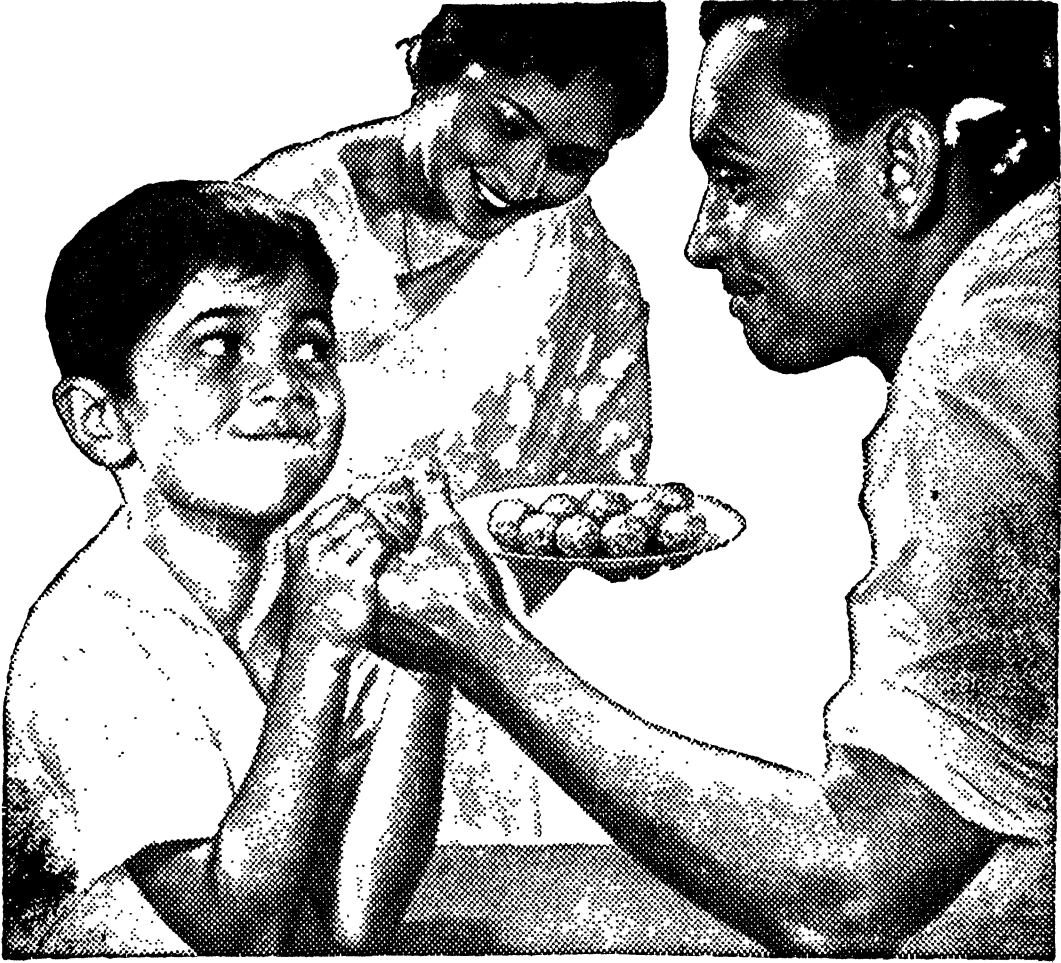
বর্ত্তমান বৎসরের অক্টোবর মাসটি সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই মাসের শেষের দিকে প্রায় একই সময় ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তে চীনের ব্যাপক সশস্ত্র আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধে ক্যারিবিয়ান্ সাগরে পৃথিবী-ব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা ঘটে। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের বিচক্ষণতায় এবং বিশ্ব-শান্তি রক্ষার জন্য ঐকান্তিকতায় ক্যারিবিয়ান্ সাগরের দ্বৈপায়ন রাষ্ট্র কিউবার বিপদ তথা সমগ্র মানব জাতির বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা কাটিয়া গিয়াছে। লর্ড রাসেলের ভাষায় "ক্রুশ্চেভের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও তাঁহার হৃদয়ের বিশালতা মানব জাতিকে রক্ষা করিয়াছে।" কিন্তু ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তের বিপদ ক্রমেই বিস্ফারিত হইতেছে, যাহা হয়ত কেবল এশিয়ারই বিপদ নহে—সমগ্র পৃথিবীর বিপর্য্যয়ের সূচনা। ভারতের মিত্রতাকে অবমাননা করিয়া চীন যে বিশ্বাসঘাতক শত্রুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহার পরিণতি খুবই ভয়ঙ্কর হইতে পারে।

১৯৫৭ সাল হইতে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে চীনাদের অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব সীমান্তেও তাহারা ম্যাক্‌ম্যাহন লাইন অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু পরে তাহারা এই কথা বলিয়া পূর্ব্ব সীমানা হইতে পশ্চাদপসরণ করে যে, যদিও ম্যাক্‌ম্যাহন্ লাইন চীনের স্বীকৃত সীমানা নহে, তবুও শান্তিপূর্ণভাবে সীমানার প্রশ্ন মীমাংসিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা ঐ সীমানা অতিক্রম করিবে না। ইহার পর পশ্চিম সীমান্ত লইয়া বাদ-প্রতিবাদ এবং ছোট-খাটো সঙ্ঘর্ষ চলিতে থাকিলেও, পূর্ব্ব সীমান্ত মোটামুটি শান্ত ছিল। গত ৮ই সেপ্টেম্বর চীন এই শান্তি ভঙ্গ করিয়া ম্যাক্‌ম্যাহন লাইন লঙ্ঘন করে। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে সমগ্র চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা ছিল। ভারতের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, চীন তাহার আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা বন্ধ না করিলে শান্তিপূর্ণ আলোচনার আবহাওয়া সৃষ্ট হইতে পারে না; অতএব চীন অবিলম্বে তাহার সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধ করুক। চীন ইহার উত্তরে ভারত এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিরুদ্ধে অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করে; সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সীর (নেফার) সমগ্র উত্তর সীমান্ত জুড়িয়া চীনের প্রকাণ্ড সামরিক তৎপরতা আরম্ভ হয়। চীনাদের এই তৎপরতা যেমন আকস্মিক, তেমনি প্রকাণ্ড। সীমাবদ্ধ অঞ্চলে সীমান্ত সঙ্ঘর্ষের পরিবর্ত্তে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের মত আসে এই আক্রমণ। বস্তুতঃ ভারত ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না, সীমান্তের সঙ্ঘর্ষে বিশ হাজার সৈন্য এবং মর্টার ও কামান ব্যবহৃত হইবে, ইহা ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ ভাবিতে পারেন নাই। তাই, ২০শে অক্টোবরের এই ব্যাপক আক্রমণে চীনারা নেফা, ভুটান ও তিব্বতের সীমান্তে সংযোগস্থলে ভারতীয় বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে এবং অতি দ্রুত ঢোলা, খিনজেমেন, বুম্‌লা এবং তাওয়াং অধিকার করিয়া লয়। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম সীমান্তে লাদাখ অঞ্চলেও চীনাদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এখানেও কতকগুলি ছোট ছোট ঘাঁটি এবং কারাকোরাম গিরিবর্ত্মের নিকটবর্ত্তী দৌলৎ-বেগ-অলদি ভারতীয় বাহিনী ছাড়িয়া আসতে বাধ্য হয়। চীনাদের সীমান্ত আক্রমণ এইভাবে ভারত-অভিযানের রূপ লওয়ায় ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং সমগ্র দেশকে সর্ব্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মিত্র রাষ্ট্রের নিকট অস্ত্র-সাহায্যের জন্য আবেদন জানান হয়। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স হইতে অতি দ্রুত অস্ত্র আসে; কিন্তু এই সব অস্ত্র-সজ্জিত ভারতীয় সৈন্য নূতনভাবে সন্নিবেশিত হইবার পূর্ব্বেই আরম্ভ হয় চীনাদের পরবর্ত্তী আক্রমণ। নেফার ক্যামেং ডিভিসনে চীনারা তাহাদের অভ্যস্ত রণকৌশল প্রয়োগ করিয়া নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি জং অধিকার করে এবং পার্শ্ব হইতে আক্রমণের কৌশল (আউট্‌ফ্লাঙ্কিং মুভমেণ্ট) অবলম্বন করিয়া সেলা গিরিবর্ত্ম অধিকার করিয়া লয়; বমডিলাও পতন ঘটে। লোহিত ডিভিসনে ওয়ালং চীনাদের অধিকৃত হয়। সুবনসিডি ডিভিসনে লঙ্গ তাহারা পূর্ব্বেই অধিকার করিয়াছিল। বস্তুতঃ সমগ্র নেফায় ভারতীয় বাহিনীর প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রণক্ষেত্রের অবস্থা যখন এইরূপ—নেফায় বমডিলা ও ওয়ালং অধিকার করিয়া আরও কিছু দক্ষিণে চীনারা যখন আগাইয়া আসিয়াছে এবং লাদাখ অঞ্চলে চুসুলের উপর চীনাদের প্রকাণ্ড আক্রমণ চলিতেছে, সেই সময় চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষের এক অদ্ভুত ঘোষণা উচ্চারিত হইল। ২১শে নভেম্বর চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন যে, ঐ দিন মধ্য রাত্রি হইতে তাঁহাদের সৈন্যেরা আর যুদ্ধ করবে না, ১লা ডিসেম্বর তারিখে তাহারা ১৯৫৯ সালে নভেম্বর মাসের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন লাইনের সাড়ে বারো মাইল দূরে সরিয়া যাইবে।

এই 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন লাইন' কথাটি বিশেষ কষ্টবোধ্য। ১৯৫৯ সালে ঐ সময় চীনারা প্রকৃতপক্ষে ম্যাকম্যাহন লাইন অতিক্রম করিয়া ভারতীয় এলাকায় অবস্থান করিতেছিল। সেই সময়ে উভয়পক্ষের অবস্থানক্ষেত্রকে চীনারা 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন লাইন' বর্ণিয়া বর্ণনা করে, এবং উহারই সাড়ে বারো মাইল দূরে তাহারা সরিয়া যাইতে চাহে। এইভাবে অপসরণের পরেও চীনারা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় এলাকাতেই থাকিবে। পক্ষান্তরে ঐ সময় ভারতীয় সৈন্য যে স্থানে ছিল, সেখান হইতে তাহারা বারো মাইল দক্ষিণে সরিয়া আসিলে ভারতকে আরও জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। এইভাবে দুইপক্ষের সৈন্য অপসারণের ভিত্তিতে যুদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থা

করিবার জন্য চীনারা বহু পূর্ব হইতেই প্রস্তাব করিয়া আসিতেছে। গত ২০শে অক্টোবর চীনাদের ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইবার চার দিন পরেও (২৪শে অক্টোবর) এই প্রস্তাবের তাহারা পুনরাবৃত্তি করে। ভারত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই; তাঁহাদের দাবী—শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য পূর্ব সীমান্তে অন্ততঃ ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বের অবস্থানক্ষেত্রে চীনাদিগকে সরিয়া যাইতে হইবে। গত ২১শে নভেম্বর চীনারা তাহাদের যে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে এবং পরে সে সম্পর্কে যে লিপি ভারত সরকারের নিকট পাঠায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে ভারত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত ২৪শে অক্টোবরের প্রস্তাবকে একপাক্ষিক তৎপরতার দ্বারা কার্য্যকরী করিবার প্রয়াস; অন্য পক্ষের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়াই চীনা সৈন্যকে ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসের "নিয়ন্ত্রণাধীন রেখার" সাড়ে বারো মাইল দূরে সরাইয়া লইবার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ জানান যে, তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে চীনা সৈন্য ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থান-ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক বেশী পিছনে সরিয়া আসিবে। চীনাদের এই সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা সত্যই ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ববর্ত্তী অবস্থানক্ষেত্রে ফিরিয়া যায় কিনা, তাহা বাস্তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ এই সিদ্ধান্তে ছিল। অবশ্য, যুদ্ধ বন্ধ করিবার আট দিন পরে চীনা সৈন্যের ফিরিয়া যাইবার কথা। এই আট দিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকা বিপজ্জনক; কারণ চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষের প্রকৃত মনোভাব অজ্ঞাত। নেফার যুদ্ধ শেষ করিয়া আসামের সমতলভূমিতে ব্যাপকতর ও প্রচণ্ডতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য আট দিন যুদ্ধ বন্ধ রাখার কৌশল অবলম্বিত হওয়া অসম্ভব নয়। এই জন্য ভারত সরকার যুদ্ধায়োজন বিন্দুমাত্র শিথিল না করিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চীনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এই নিবন্ধ লিখিবার সময় চীন-ভারত যুদ্ধের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ২১শে নভেম্বর তারিখে চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন, তাহাতে যদি আন্তরিকতা থাকে, তাহা হইলে ডিসেম্বর মাসের প্রথমে যুদ্ধ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা। ভারত বরাবরই সীমান্ত-বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চাহিয়াছে; সে মীমাংসার সম্ভাবনা ভারত কখনও উপেক্ষা করিবে না। আর চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ যদি কালক্ষেপণের কৌশল হিসাবে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই প্রচণ্ডতর ও ব্যাপকতর আকারে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, এবং চৈনিক কম্যুনিজম ও ভারতীয় সোস্যালিজম, দুইয়ের ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত সে আগুন নিবিবে না। ভারতের বিরুদ্ধে চীনের সশস্ত্র অভিযান (সীমান্ত বিরোধ নহে) এবং গত ·ক মাসের যুদ্ধে ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে প্রবল বিরুদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারত বিবর্ত্তনপন্থী সোস্যালিষ্ট রাষ্ট্র, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সে সামরিক জোট-নিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং ঐকান্তিকভাবে শান্তিকামী। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারতের এই নীতি ·শিয়া ও আফ্রিকার-সদ্য-স্বাধীনতা প্রাপ্ত জাতিগুলির পক্ষে দিগ্‌দর্শন স্বরূপ। চীনের এই আক্রমণ আরম্ভ হইবামাত্র ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিক্রিয়া-শক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, পরিকল্পিত অর্থনীতির বিরোধিতা এবং জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি বর্জ্জনের দাবী যাহাদের রাজনীতির একমাত্র উপজীব্য, তাহারা অত্যন্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে এবং উচ্চনিনাদে স্বদেশপ্রেমের ঢাক বাজাইতেছে। চীনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কতকটা যুক্তির সঙ্গেই তাহারা বলিতে পারিতেছে—ভারতের শান্তিকামী নীতি ভুল, এই নীতির জন্যই ভারতের প্রয়োজনীয় সমর-প্রস্তুতি ছিল না; দেশ রক্ষার জন্য অস্ত্র-সম্ভার কিনিবার পরিবর্ত্তে বাহির হইতে দেশ গঠনের উপকরণ ক্রয় করা ভুল হইয়াছে; জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ না করিয়া ভারত যদি ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক জোটে ঢুকিত, তাহা হইলে চীন কখনও ভারত আক্রমণে সাহসী হইত না। ভারতের এই সঙ্কটে স্বভাবতঃ এই ধরণের প্রচারের শ্রোতা বাড়িয়াছে এবং নেহেরু গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত বোধ করিতে হইতেছে। প্রাক্তন দেশরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা, উহা প্রকৃতপক্ষে শ্রীনেহরুর শান্তিকামী নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির বিরুদ্ধেই পরোক্ষ আক্রমণ। চীনের সতর্কিত আক্রমণ ভারতের বাধ্যবাধকতাহীন বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতিতেও বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। চীনাদের আকস্মিক ব্যাপক আক্রমণের সম্মুখীন হইবার জন্য ভারতকে কতকটা অসহায়ভাবে পাশ্চাত্য শক্তির নিকট অস্ত্র প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স অবশ্য বিনা সর্ত্তে এবং দরকষাকষি না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে অস্ত্র জোগাইয়াছে। বিনা সর্ত্তে সঙ্গত মূল্য দিয়া এই অস্ত্র ক্রয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের নিরপেক্ষতা নষ্ট হয় নাই সত্য, কারণ বিদেশ হইতে অস্ত্র ক্রয়ের আইন-সঙ্গত অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই আছে। কিন্তু ভারতের বন্ধু বলিয়া পরিচিত রাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতার সময় অস্ত্রের জন্য একমাত্র পাশ্চাত্য শিবিরের প্রতি এই নির্ভরশীলতার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে, ভারতের পররাষ্ট্র নীতির প্রতি যাহার পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন চীন-ভারত যুদ্ধে নিরপেক্ষ; এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরও সে আশ্বাস দেয় যে ভারতকে মিগ বিমান সরবরাহের এবং ঐ বিমান নির্ম্মাণের জন্য কারখানা স্থাপনের পূর্ব্বকার প্রতিশ্রুতি সে পালন করিবে। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের আচরণে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, চীনের ভারত আক্রমণ কম্যুনিজম ও অ-কম্যুনিজমের ব্যাপার নহে—ইহা স্বদেশে বিজয়ের সাফল্যে উন্মাদ চৈনিক নেতৃবৃন্দের ঔদ্ধত্য মাত্র, যাহার সহিত কোনও মতবাদের বা রাজনৈতিক শিবিরের সম্পর্ক নাই। বস্তুতঃ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সহ বহু কম্যুনিষ্ট পার্টি (অ-কম্যুনিষ্ট জগতের বৃহত্তম পার্টি ইতালীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি যাহার অন্যতম) চীনের ভারত আক্রমণের নিন্দা করিয়াছে। যাহা হউক, এই ডিসেম্বর মাসে যদি চীন-ভারত যুদ্ধের অবসান হয়, তাহা হইলে এই যুদ্ধের ফলে যে প্রতিক্রিয়াশীল ধারার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা স্তব্ধ হইবে; কিছুকাল পরে এই ধারা ফিরিবেও। আর যদি যুদ্ধ চলে এবং ক্রমে উহা ব্যাপকতর ও প্রচণ্ডতর হয়, তাহা হইলে ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-শক্তি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিবে, ফ্যাসিস্তপন্থী সরকার ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও সম্ভব। পররাষ্ট্র ক্ষে[illegible]কান্তভাবে পাশ্চাত্য শিবিরের প্রতি নির্ভরশীল হইবে এবং তাহার জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ব্যর্থ হইবে। বস্তুতঃ চীন ও ভারতের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে উহা শুধু চীন ও ভারতের ব্যাপারে আর থাকিবে না। সোভিয়েট রুশিয়া যাহাতে

চীনের পক্ষে যোগ না দেয়, ততক্ষণ প্রথম দিকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবেন না ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সতর্ক নীতির অনুসরণ অসম্ভব হইবে। চীন ও ভারতের দীর্ঘস্থায়ী পুর্ণাঙ্গ যুদ্ধ বিশ্ব-যুদ্ধে পরিণত হইতে বাধ্য।

কিউবার নিরাপত্তা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল হইতে মাত্র নব্বই মাইল দূরবর্তী ক্ষুদ্র দ্বৈপায়ন রাষ্ট্র কিউবা তাহার প্রবল প্রতিবেশীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে ; পশ্চিম গোলার্দ্ধে সেই প্রথম সোস্যালিষ্ট সমাজ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। ১৯৫৯ সালে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবার বিপ্লবী দল যখন দুর্নীতিদুষ্ট বেতিস্তার একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদ করেন, তখন তাঁহারা মার্কসবাদী বা লেনিনপন্থী ছিলেন না—সোস্যালিজম্ কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারা চাহেন নাই ; দুর্নীতিমুক্ত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা এবং জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের এই প্রগতিশীল নীতির প্রতি আমেরিকার অনেক উদারপন্থী সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপ্লব সফল হইবার পর জনকল্যাণমূলক অর্থনীতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় আমেরিকার ধনিক স্বার্থে আঘাত লাগিল এবং আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মহলে ও রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলিতে প্রবলভাবে কিউবা-বিরোধী অভিযান আরম্ভ হইল। এই অভিযানের জন্য মার্কিণ সরকারের সহিত কিউবার বিপ্লবী সরকারের সম্পর্ক ক্রমেই অবনত হইতে থাকে। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় কিউবার সহিত সোস্যালিষ্ট শিবিরের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। এই অবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবেই গত বৎসর এপ্রিল মাসে আমেরিকার অর্থে পুষ্ট এবং মার্কিণ অস্ত্রে সজ্জিত দেশত্যাগী কিউবানরা আমেরিকা এবং অন্য কয়েকটি ল্যাটিন রাষ্ট্র হইতে কিউবার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান আরম্ভ করে। এই অভিযান বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহার পর নূতনভাবে এবং ব্যাপকভাবে কিউবার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া তাহাকে শিক্ষা দিবার প্রস্তুতি চলিতে থাকে। আমেরিকার নব্বই মাইলের মধ্যে "কমুনিষ্ট ঘাঁটী" কখনও বরদাস্ত হইবে না—ইহা খোলাখুলি বলা হয়। কিউবা-বিরোধী সামরিক আয়োজনের সহিত মার্কিণ সরকারের যোগাযোগ প্রকাশ্য নহে সত্য, তবে ইহার পশ্চাতে আমেরিকার গোপন হস্ত অস্পষ্ট ছিল না। সাম্প্রতিক কালে কিউবা-বিরোধী তৎপরতা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া ওঠে। গত অক্টোবর মাসের প্রথমে হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক টি, ডব্লিউ. মার্শাল এই তৎপরতা সম্পর্কে লণ্ডনের 'নিউ ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন—তিনি লেখেন—

(1) Training Cuban emigres in the technique of Sabotage in the camps in Guatemala, Costa-Rica and the United States itself,...

(2) Literally daily violations of Cuban air space by reconnaissance aircraft,...

(3) Daily bursts of machine-gun fire from inside the naval base at Guantanamo (U.S.) into the surrounding Cuban countryside ;

(4) Harbouring in Guantanamo some of the worst of Batista's torturers, who have recently been active in such incidents as the murder of a whole peasant family and killing and mutilating a fisherman ;

(5) Stationing big ships just outside and sometimes even inside the International limit...

(6) And of course the blockader.

অর্থাৎ, গুয়াতেমালা, কোস্তা-রিকা, এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও প্রবাসী কিউবানদিগকে নাশকতামূলক কাজে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, প্রতিদিন কিউবার আকাশে বৈদেশিক বিমান ঘুরিতেছে, কিউবাস্থিত গুয়াণ্টানামোর মার্কিণ নৌ-ঘাঁটি হইতে মেসিন-গান চলিতেছে, এই ঘাঁটিতে আশ্রয়প্রাপ্ত বেতিস্তার গুণ্ডারা অত্যাচার করিতেছে, বড় বড় বৈদেশিক জাহাজ কিউবার উপকূলে ঘুরাঘুরি করিতেছে, কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধ তো রহিয়াছেই।

এই সময় কিউবার বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযান চালাইবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আন্দোলন আরম্ভ হয়। নভেম্বর মাসে কংগ্রেসের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত প্রচারে কেনিডির সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল—কিউবার বিপদ অপসারণে বর্ত্তমান মার্কিণ শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের অক্ষমতা। এই সময় প্রেসিডেণ্ট কেনেডি কিউবা সম্পর্কে সতর্ক থাকার উদ্দেশ্যে পনর হাজার সৈন্য সজ্জিত রাখার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। অতঃপর, অক্টোবর মাসের শেষভাগে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি অকস্মাৎ নির্ব্বাচনী প্রচার-সফর হইতে ওয়াসিংটনে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করেন যে, কিউবায় পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপের ঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছে, দূর-পাল্লার ঘাঁটী নির্ম্মাণের কাজ এখন চলিতেছে ; অতএব কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিণ নৌবহরের অবরোধ আরম্ভ হইল। তিনি জানান কিউবাগামী সমস্ত জাহাজ মধ্য-সমুদ্রে তল্লাসী করা হইবে, যন্ত্রবাহী জাহাজগুলিকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা হইবে এবং উহা সম্ভব না হইলে ঐ সব জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিউবা হইতে পারমাণবিক অস্ত্রের ঘাঁটী উচ্ছেদের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট আবেদন জানান। বলা বাহুল্য, আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিপজ্জনক ; শান্তির সময়ে মধ্য-সমুদ্রে অন্য দেশের জাহাজ তল্লাসী করার এবং উহা ডুবাইয়া দিবার আয়োজন শুধু আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী নহে—প্রকৃত পক্ষে উহা যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। সোভিয়েট-সূত্র হইতে প্রথমে প্রকাশ পাইয়াছিল যে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমেরিকার অবরোধ অগ্রাহ্য করিবে এবং মধ্য-সমুদ্রে সোভিয়েট জাহাজ আটক করা হইলে উহারা প্রতিরোধ করিবে। এই সময় রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্ট সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের নিকট সংযম অবলম্বনের জন্য আবেদন জানান। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলও এই প্রসঙ্গের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ

রাসেলকে জানান যে, তাঁহারা উগ্রতা প্রদর্শন করিবেন না এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসারই চেষ্টা করিবেন। ইহার পর কয়েকখানি কিউবাগামী সোভিয়েট জাহাজ ফিরিয়া যায়, পেট্রোলভর্ত্তি জাহাজগুলিকে মার্কিণ নৌবহর আটক করে নাই। এদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে কিউবা-প্রসঙ্গের প্রকাশ্য আলোচনার অন্তরালে উ থাণ্টের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষে মীমাংসার চেষ্টা চলিতে থাকে; প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ও মিঃ ক্রুশ্চেভের মধ্যে পত্র-বিনিময় চলে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, কিউবা সোভিয়েট ইউনিয়নের বন্ধু-রাষ্ট্র, তাহার অর্থনৈতিক উন্নতির এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ভার সোভিয়েট ইউনিয়ন গ্রহণ করিয়াছে; সাম্প্রতিক কালে আমেরিকার এবং তাহার সমর্থনপুষ্ট কতকগুলি লাতিন আমেরিকান রাষ্ট্রের কিউবা-বিরোধী জঙ্গী আয়োজন এত ভয়ের হইয়া ওঠে যে, কিউবার প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী জানান যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা অথবা লাতিন আমেরিকার অন্য কোনও রাষ্ট্রের দ্বারা কিউবার নিরাপত্তা বিপন্ন না হইবার আশ্বাস পাই নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী অপসারিত হইতে পারে। গত ২৪শে অক্টোবর প্রেসিডেণ্ট কেনেডি কিউবার নিরাপত্তা সম্পর্কে এই আশ্বাস দেন, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে কিউবার ঘাঁটী অপসারণের কাজ আরম্ভ হয়; তবে, কাস্ত্রোর আপত্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধান সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, আমেরিকার দাবীতে সোভিয়েট ইউনিয়ন পরে কিউবা হইতে তাহার বোমাবর্ষী বিমানও সরাইয়া লইয়াছে। কিউবার নিরাপত্তা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি এখনও স্বাক্ষরিত হয় নাই; তবে, উহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারাই হউক, অথবা অন্য কোনও আন্তর্জ্জাতিক কর্তৃপক্ষের দ্বারাই হউক, ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী অপসারণে তদারক হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কাস্ত্রো দাবী জানাইয়াছেন যে, নিরাপত্তা-চুক্তির মধ্যে গুয়াণ্টানামো ঘাঁটি অপসারণের সর্ত্তটি রাখিতে হইবে। এই সর্ত্তে আমেরিকা এখনও রাজী হয় নাই; তবে, ঘটনাস্রোত যখন মীমাংসার দিকে গিয়াছে, তখন এই সম্পর্কে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কিউবাকে উপলক্ষ করিয়া গত অক্টোবর মাসে যে বিপজ্জনক অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা দূর করিবার জন্য ক্রুশ্চেভ যে সংযম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহাকে ভীরু ও তোষণকারী বলিয়া নিন্দা করিতেছে; কিন্তু বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের নিকট তাঁহার মর্য্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটী গোপনে স্থাপন করে নাই: মার্কিণ পর্য্যবেক্ষক বিমানগুলি অনায়াসে উহার আলোকচিত্র সংগ্রহ করিয়াছিল।

ইহা হইতে এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন আমেরিকার জঙ্গীবাদী রাজনীতিকদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, তাঁহারা আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন; কিউবাকে রক্ষা করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিশ্রুতি মৌখিক নহে—এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য যে প্রয়োজন হইলে পূর্ণাঙ্গ পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি লইতেও প্রস্তুত। বস্তুতঃ কিউবার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমেরিকার প্রতিশ্রুতি আদায় করিবার উদ্দেশ্যে এক ভয়ঙ্কর কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। ইহাতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের অসাধারণ কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। কিউবা সংক্রান্ত সমগ্র ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত বিজয় তাঁহারই—তিনি শান্তিপূর্ণভাবে (সাময়িকভাবে আশঙ্কার সৃষ্টি হইলেও, মীমাংসা শান্তিপূর্ণভাবেই হইয়াছে) কিউবা-সমস্যার সমাধান করিলেন। একদিকে এই প্রগতিশীল লাতিন আমেরিকান রাষ্ট্রটি নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করিল; অন্য দিকে শান্তিকামী রূপে সোভিয়েট ইউনিয়নের নৈতিক মর্য্যাদাও বৃদ্ধি পাইল।

আমেরিকার নির্ব্বাচন

গত ৬ই নভেম্বর আমেরিকায় কংগ্রেসের সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ডেমোক্রেটিক দলটি সেনেটে চারিটি অতিরিক্ত আসন লাভ করিয়াছে এবং প্রতিনিধি-পরিষদে দুইটি আসন হারাইয়াছে। তবুও ইহাকে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ব্যক্তিগত বিজয় বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে; কারণ, ডিমোক্রেটিক দলের প্রগতিশীল প্রার্থীরাই অধিক সংখ্যায় জয়ী হইয়াছেন এবং পরাজিত হইয়াছেন প্রতিক্রিয়া-পন্থীরা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,—ইতিপূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির বহু প্রস্তাব প্রতিক্রিয়াপন্থী ডিমোক্রাট ও রিপাবলিক্যানদের সমবেত চেষ্টায় অগ্রাহ্য হইয়াছে। এখন আশা করা যায়, কি স্বরাষ্ট্র, কি পররাষ্ট্র, উভয় ক্ষেত্রেই প্রেসিডেণ্ট কেনেডি অধিকতর স্বাধীনতার সহিত কাজ করিতে পারিবেন। ২৪।১১।৬২

—মিহির

শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-মন্ত্রী ও বিখ্যাত আইনরথী]

প্রতিষ্ঠা, সম্মান এবং প্রতিপত্তির প্রাচুর্য যাঁদের অমায়িকতা সারল্য ও ঔদার্যকে বিন্দুমাত্র খর্ব করতে পারেনি বরং সেগুলিকে আরও বিবর্ধিত করে তুলেছে, খ্যাতি ও যশ যাঁদের এই সাধুচিত্তবৃত্তিগুলিকে আরও বিকশিত করে তুলতে সহায়তা করেছে, বাঙলা তথা ভারতের অন্যতম প্রখ্যাতনামা আইনবিদ পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই তালিকার অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

নদীয়া-দেবগ্রামের বিশিষ্ট ভূস্বামী স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় ডাঃ উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার অন্যতম অগ্রগণ্য চিকিৎসক হিসেবে স্মরণীয়। গিরিশচন্দ্রের পুত্রবধূদের

শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যে বিখ্যাত মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। উমাদাস বিবাহ করেন পাবনা হরিপুরের স্বনামধন্য সন্তান স্বর্গীয় দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া মৃণালিনী দেবীকে। দেশসেবার ক্ষেত্রে দুর্গাদাস চৌধুরীর সন্তান-সন্ততিদের অবদানের গুরুত্বও কম নয়। আমাদের জাতীয় জীবনে এঁদের সংযোগ নানা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় বিদ্যমান। বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী, আইনরথী যোগেশ চৌধুরী, প্রখ্যাত শিকারী ও ব্যারিষ্টার কুমুদ চৌধুরী, বাঙলা সাহিত্যের দিকপাল মহারথী সাহিত্য নায়ক বীরবল প্রমথ চৌধুরী, কর্ণেল মন্মথ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন সুহৃদ চৌধুরী, প্রবীণতম ব্যারিষ্টার অমিয় চৌধুরী দুর্গাদাসের সাতটি কীর্তিমান পুত্র। পূর্বোক্ত কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর জননী স্বনামধন্যা কবি প্রসন্নময়ী দেবী দুর্গাদাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা। শিল্পী আর্য্য চৌধুরী, শ্রীমতী দেবিকারাণী, সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জয়ন্তনাথ চৌধুরী প্রভৃতি দুর্গাদাসের পৌত্র-পৌত্রীদের মধ্যে কয়েকজন।

উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মৃণালিনী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ১৯০৩ সালে ২২এ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল, হিন্দু স্কুল, বিদ্যাসাগর কলেজ ও ল-কলেজে ইনি শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায়, ১৯২৩ সালে বি, এ, পরীক্ষায় এবং ১৯২৬ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে "উকীল" রূপে গণ্য হন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বিলেত যাত্রা করেন। ঠিক দু'বছর পরে (সেপ্টেম্বর ১৯২৯) আজকের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার·· সেদিনকার তরুণ শঙ্করদাস কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিলেন ব্যারিষ্টাররূপে। কর্মের প্রশস্ত পথে জীবন পথিকের পড়ল পদচিহ্ন। আকাশচুম্বী খ্যাতি ও প্রাসিদ্ধির শুভ সূচনা-মুহূর্ত এল জীবনে। বাঙলার কীর্তিমান সন্তানের জীবনের জয়যাত্রা হল আরম্ভ, কর্মের সরণি বেয়ে সফলতার সীমান্তে উত্তরণ পর্বের শুরু, তারপর সাফল্যের এক একটি সিংহদ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে আর বিজয়ী বীরের মত শঙ্করদাস সেখানে আপন প্রতিভার জয়পতাকা করেন উড্ডীন।

দীর্ঘকাল-ব্যাপী ব্যারিষ্টারি জীবনে এনে দিয়েছে বিপুল প্রতিষ্ঠা, প্রভূত সম্মান, জয়-লক্ষ্মীর বরমাল্য। ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হিসেবেও ইনি যথেষ্ট ধীশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার নির্বাচিত হন। দু'বছর পর পদত্যাগ করেন। বর্তমান বছরের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ বিরাট কর্মভার গ্রহণ করেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কোষাধ্যক্ষ, ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজের সহকারী সভাপতি, বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশনের অ্যাপিল কমিটির চেয়ারম্যান, প্রদেশ রিটার্নিং অফিসার, পাণিঘাটা ইউনিয়ন বোর্ডের পঞ্চায়েতের সভাপতি প্রমুখ সম্মানাত্মক আসনগুলিও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত।

ভারতের বৃহত্তম নগরীর বাসিন্দা শঙ্করদাস। কলকাতা তাঁর কর্মকেন্দ্র। কিন্তু তিনি গ্রামকে ভোলেননি। কলকাতার কলকোলাহল, যান্ত্রিক আবহাওয়া তাঁর মন থেকে শালবীথিভরা ছায়ানিবিড়, রূপরসঘন গ্রামকে মুছে দিতে পারেনি। গ্রামের সঙ্গে তাঁর যোগ কিছুমাত্র কম নয়। গ্রামের উন্নয়নসাধনে তিনি যেমনই যত্নবান, তেমনই তৎপর। সেখানে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, একটি মাইনর স্কুলকে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে পরিণত করা,

প্রতি পূজায় দরিদ্রদের হাজার হাজার বস্ত্র ও শীতে কম্বল বিতরণ প্রভৃতি নানাবিধ সৎকাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর গ্রামকল্যাণকল্পনার তিনি রূপ দিয়ে চলেছেন।

আসামের আবগারী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ইলা বন্দ্যোপাধ্যায় এঁর সহধর্মিণী। তিন পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ যুক্তরাজ্যে, মধ্যম যুক্তরাষ্ট্রে পাঠগ্রহণে মগ্ন।

গৌরবর্ণ, মধুভাষী, ষাট বছর বয়স্ক শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন জনসেবায় উৎসর্গীকৃত। নানা কাজের মানুষ তিনি। জনহিতকর বহু কার্য তাঁর দ্বারা সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

শ্রীমন্মথেন্দ্র ভঞ্জ

[সাহিত্যসেবী ও বিখ্যাত চিত্র ও নাট্য সাংবাদিক]

বহুকাল আগে "অরুণ" বলে একটি কাগজ আত্মপ্রকাশ করত। সাহিত্যপত্রিকা এবং হাতে লেখা। অন্যান্য কাগজে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি এঁরা যথাযথ স্বীকৃতিসহ উদ্ধৃত করতেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত হোত "শঙ্খ"। "শঙ্খ"তে প্রকাশিত একটি কবিতা এঁরা একবার উদ্ধৃত করেছিলেন। কবিতাটির বৈশিষ্ট্য যে এর রচয়িতা মাত্র দশ বারো বছরের একটি বালক। বালকটির নাম বুদ্ধদেব বসু। "অরুণ" এর সঙ্গে বহুজন সংশ্লিষ্ট ছিলেন—এই বহুজনের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম—শ্রীমন্মথেন্দ্র ভঞ্জ মহাশয়। বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য সাংবাদিক। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও যাঁর যোগাযোগ কম নয়।

দক্ষিণ-বারাসত এবং জয়নগর-মজিলপুর যে জায়গাটিতে মিশছে, সেই সন্ধিস্থলটির নাম বহড়ু। এখানকার বাসিন্দা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয় কলকাতায় বসবাস শুরু করেন ও বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাঁর পুত্র স্বর্গীয় হেমচন্দ্র ভঞ্জ বিবাহ করেন উত্তর কলকাতার স্বনামধন্য স্বর্গীয় জয় মিত্র মহাশয়ের পৌত্রী স্বর্গীয়া দুর্গামণি দেবীকে। দুর্গামণির এক সহোদরার পাণি গ্রহণ করেন বাঙলার নাট্যলোকের অমর মহারথী স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। হেমচন্দ্র ও দুর্গামণির কনিষ্ঠ পুত্র মন্মথেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে। বাল্যকালেই মন্মথেন্দ্রনাথ পিতৃমাতৃহীন হন। পাঠ গ্রহণ করেন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে (মেন) ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯২৪ সালে অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর অ্যাটর্নিসিপ পড়ার জন্যে articled clerk হলেন স্বর্গত অ্যাটর্নি কুঞ্জবিহারী ঘোষের ; পরের বছর চলে এলেন জ্যাঠামহাশয় স্বর্গীয় কালিদাস ভঞ্জের অফিসে articled clerk হয়ে। ১৯৩৭ পর্যন্ত আইনজগতের সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকেন।

বাল্যকালে সাহিত্যানুরাগের উন্মেষ তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছে। আইনজগতের সঙ্গে তাঁর এই দীর্ঘকালীন যোগ তাঁর সাহিত্যসাধনাকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করতে পারে নি। তাঁর লেখনীর বিরাম এর মধ্যে কোনদিনই হয় নি, সাহিত্যজগতের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সামান্যমাত্রও ছিন্ন হয় নি। যে "চন্দ্রশেখর" ছদ্মনাম তাঁকে ভারতের নাট্যজগতে সমালোচক হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি দান করেছে—সেই নামে তিনি পূর্বোক্ত "অরুণ" এও লিখেছেন। বাল্যবন্ধু এবং সতীর্থ সাহিত্যসেবী শ্রীগোপাললাল সান্যালের মধ্যস্থতায় "আত্মশক্তি"তে লেখক হিসেবে মন্মথেন্দ্র যোগ দিলেন। আত্মশক্তির সম্পাদক তখন ছিলেন বিপ্লবীনায়ক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। "চন্দ্রশেখর" নামটি ছাপার অক্ষরে সেই প্রথম প্রকাশিত হল। পরে উপেন্দ্রনাথের স্থলাভিষিক্ত হলেন আজকের দিনের বিখ্যাত রসসাহিত্যিক শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। গোপাললাল হলেন অন্যতম কর্মকর্তা। নটগুরু শিশিরকুমারের তখন বহু প্রতীক্ষিত শুভ আবির্ভাবে রঙ্গলোকে নবযুগের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। এই সময়ে শিশিরকুমারের আলমগীরের উপর মন্মথেন্দ্র এখানে একটি রচনা লেখেন। প্রখ্যাত সমালোচকের মঞ্চ সমালোচক হিসেবে সেই প্রথম আবির্ভাব। সে যুগের বিখ্যাত দৈনিক "ফরোয়ার্ড" তারপর আত্মশক্তির মালিকানা গ্রহণ করলেন (১৯২৬), এর ফলে এই সাপ্তাহিকটি নানাভাবে শ্রীবৃদ্ধির সম্মুখীন হতে সমর্থ হয়। এই গোষ্ঠী এরপর "বাঙলার কথা" দৈনিক পত্রিকাটির পত্তন করেন। এর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন গোপাল সান্যাল। এ সময়ে গোপাল সান্যাল আত্মশক্তির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন প্রখ্যাত নাট্যকার স্বর্গত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। পরবর্তীকালে এই তিনটি পত্র পত্রিকার নাম পরিবর্তন হয়। ফরোয়ার্ড হয় লিবার্টি, আত্মশক্তি হয় নবশক্তি এবং বাঙলার কথা হয় বঙ্গবাণী। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বিখ্যাত সাংবাদিক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সে সময়ে এই বঙ্গবাণীর সহযোগী সম্পাদকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। শিশির এর নাট্যসমালোচনার ভার এরপর মন্মথেন্দ্র অল্পকালের জন্যে গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ইংরাজী "দীপালি"র সঙ্গে প্রধান সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে ১৯৩৮ সালে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হলেন। দেবকী কুমার বসুর সহকারী হিসেবে নিউ থিয়েটার্সে তিনি যোগ দিলেন। ১৯৪৪ পর্যন্ত সহকারী পরিচালক হিসেবে নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এ সময়ে সাপুড়ে, নর্তকী, উদয়ের পথে, দিকশূল, ওয়াসিয়তনামা (কৃষ্ণকান্তের উইলের হিন্দী) প্রমুখ বিখ্যাত ছবিগুলি নিউ থিয়েটার্স উপহার দেন। প্রমথনাথ বিশীর "মৌচাকে ঢিল" এবং ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চান্দ্রর কাহিনী অবলম্বনে "শাঁখাসিঁদুর" ছবি দুটি মন্মথেন্দ্র পরিচালনা করে চিত্র-পরিচালক হিসেবেও বাঙলা চলচ্চিত্রের সেবা করেন। ১৯৪৯ সাল থেকে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নাট্য সম্পাদকের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন।

১৯২৫ সালে মন্মথেন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ অ্যাটর্নি এবং বিদগ্ধ সাহিত্য-সেবী স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ

মন্মথেন্দ্র ভঞ্জ

হন। মনুজেন্দ্র ভঞ্জের মতে কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দরকার। Dictation এলে কাজে মন থাকে না। আগ্রহ এবং একাগ্রতায় শৈথিল্য আসে। চিত্র সাংবাদিকদের সৎ হতে হবে এবং বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগে আলোচ্য বস্তুর শুধু দোষ নয়, দোষ ও গুণ দুটোই সমানভাবে দেখাতে হবে।

শ্রীহিমাংশুকুমার মৈত্র

(ফাইনান্সিয়েল্ এডভাইজার্ ও চীফ একাউণ্টস্ অফিসার, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে)

১৯৪৭ সাল। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর। সেখানে দেখা গেল একদিন বিকেলবেলায় এক ভদ্রলোক মিলিটারী পোষাক পরে পথ চলছিলেন। কাঁধে তিনটি ফুল দেখে বুঝেছিলুম তিনি একজন ক্যাপ্টেন্। খানিকটা পরিচয় পেলাম এঁর কাছ থেকে, তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, বোধ হয় ১৯৪৮ সালের ৺পুজোর সময়, কালীবাড়ীতে। বিশেষ করে নাটকাদির আলোচনার মাধ্যমে।

ইনিই শ্রীহিমাংশুকুমার মৈত্র। বর্ত্তমানে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের ফাইনান্সিয়েল্ এডভাইজার ও চীফ একাউণ্টস্ অফিসার। ১৯১৯ সালের ২৪শে অক্টোবর মাতুলালয়ে (ইংরেজ বাজার, মালদা) শ্রী মৈত্রের জন্ম হয়। পিতা শিশিরকুমার মৈত্র রায়গড় ষ্টেটের অর্থ-মন্ত্রীর পদ হতে অবসর গ্রহণ করে বর্ত্তমানে রায়পুরেই বসবাস করছেন। মাতার নাম শ্রীমতী মহামায়া দেবী।

শ্রী মৈত্র রায়পুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৩৫ সনে ম্যাট্রিক পাশ করেন; আই, এ, পাশ করেন বাংলাদেশের হেতমপুর কলেজ থেকে ১৯৩৭ সনে। তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ হতে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি, এ পাশ করলেন ১৯৪০এ।

হিমাংশু কুমার মৈত্র

রিপন কলেজে ভর্ত্তি হয়ে আইনও পড়েছিলেন কিছুকাল। কোথায় আইনজ্ঞ হয়ে মুখের জোর (Gift of the gab) দেখাবেন, না পাঞ্জার জোর দেখাবার জন্য ১৯৪৩ সালে ঢুকে পড়লেন সেনাবিভাগে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাসমর থেমে গেল। ১৯৪৬ সালে ক্যাপ্টেন্ হিমাংশুকুমার মৈত্র যুদ্ধ-ফেরং প্রার্থী (War-Seivice Candidate) হিসাবে সর্বভারতীয় পরীক্ষাতে বসলেন। ১৯৪৮ সালের ৩রা মে শ্রী মৈত্র শিক্ষানবীশ হয়ে যোগদান করেন ভারতীয় অর্থ নৈতিক হিসাব-রক্ষক ও পরীক্ষক (Indian Accounts & Audit Service) বিভাগে। শিক্ষানবীশের পর তিনি কিছুকাল নাগপুরে তার ও ডাক বিভাগের অডিট অফিসে ডেপুটি একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল্ ছিলেন। তিনি কিছুকাল কলকাতায় টিল্ কর্টে রুলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তারপর চলে আসেন ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল্ হয়ে। বর্ত্তমানে তিনি আবার কলকাতায় ইষ্টার্ণ রেলওয়েতে ফিরে এসেছেন।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীহিমাংশুকুমার মৈত্র সুন্দলপুর (নদীয়া) নিবাসী শ্রীসত্যানন্দ বাগ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শুভ্রা দেবীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'ন।

তিনি ফুটবল খেলেছেন কলেজী-জীবন পর্য্যন্ত। বলাবাহুল্য, শ্রী মৈত্রের জ্যাঠামহাশয় স্বর্গীয় বিনয়কুমার মৈত্র (ওরফে পটলবাবু) মহাশয়-ই তাঁহাকে ফুটবল খেলায় অনুপ্রাণিত করেন। আর ৩৩।৩৪ বৎসর আগে রায়পুরে বেঙ্গলী স্পোর্টিং এসোসিয়েশন স্থাপনা করে রায়পুরবাসীদের ফুটবল ক্রীড়ামোদী করে তোলেন এই বিনয়কুমার মৈত্রই। শ্রীহিমাংশু মৈত্র ১৯৫১ সন অবধি অফিস ক্লাবেতে টেনিস্ এবং ব্যাড্‌মিণ্টন্ খেলাধূলাও করেছেন যথেষ্ট। তারপর চক্ষু-রোগে আক্রান্ত হয়ে খেলাধূলা একেবারে ছেড়েছেন।

মৈত্র মহাশয়ের নাট্যানুরাগ অত্যন্ত প্রবল। বিভিন্ন নাটকে বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যথেষ্ট অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন এবং দর্শক-সমাজে বিপুল প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

ডাক্তার শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু

[উত্তর প্রদেশের খ্যাতনামা সমাজসেবী চিকিৎসক]

সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশ হইতে শ্যামাচরণ বসু মহাশয় সুদূর লাহোর শহরে আসেন। বিশিষ্ট বাঙ্গালী হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশে। এমনকি, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁহার নাম প্রকাশিত হয়। শেষদিকে তিনি এলাহাবাদে আসিয়া তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হন। ইঁহার দুই পুত্রই কৃতী। জ্যেষ্ঠ স্বর্গত শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব কেবলমাত্র অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ ছিলেন না—প্রথম জীবনে তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতির সহিত আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন—আর পরবর্ত্তী জীবনে তিনি প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবে অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, "The Sacred Books of the Hindus" এবং অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুস্তক সম্ভার তৎ-প্রতিষ্ঠিত 'পাণিনি অফিস' (এলাহাবাদ) হইতে প্রকাশ করিয়া ভারতীয় ভাষাসমূহের আদি-জননীর মহিমা সমুজ্জ্বল করিয়াছেন.

তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি উল্লেখযোগ্য। শ্যামচরণবাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম মেজর বামনদাস বসু (B. D. Basu)—তিনি ভারতীয় সৈন্য বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বনামধন্য হন "Rise of Christian Powers in India" (5 Volumes), "Ruin of Indian Trade & Industry" এবং "Indian Medicinal Plants" (18 Volumes)—পুস্তক তিনটী লিখিয়া। যদিও সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন, তথাপি প্রথমোক্ত দুইটী পুস্তকে ব্রিটিশের ভারতীয়দের উপর অত্যাচার ও অবিচারের কথা নির্ভয়ে তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তৃতীয় পুস্তকটি ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় সহায়ক।

শ্রীশ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু ১৮৮৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তার বসুর মাতা ৺চপলাকুমারী দেবী রায়পুরের (এম, পি,) প্রসিদ্ধ আইনজীবী (২৪ পরগণায় ছোটজাগুলিয়া নিবাসী) পরলোকগত অম্বিকাচরণ ঘোষের কন্যা ছিলেন। বসু-পরিবারের আদি নিবাস সাতক্ষীরা মহকুমার (খুলনা) ট্যাংরা-ভবানীপুর। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট, স্থানীয় পৌরসভাপ্রধান ও কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ৺ রণেন্দ্রনাথ বসু সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভ্রাতা ছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ এলাহাবাদ এ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুল হইতে প্রবেশিকা, মুইর সেন্ট্রাল কলেজ হইতে আই-এস-সি এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রহিসাবে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি যুক্তপ্রদেশের সরকারী চাকুরিয়া হিসাবে কিছুকাল লক্ষ্ণৌতে থাকিয়া মনান্তর হওয়ায় পদত্যাগ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি এলাহাবাদে নিজস্ব পেশা আরম্ভ করেন। পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেন যে, অধিকাংশ রোগী নিঃস্ব ও নিঃসহায়। ফলে মর্মবেদনার জন্য তিনি প্রত্যহ বিনাব্যয়ে অসুস্থদেহীদের দেখিতে থাকেন এবং বর্তমানেও তিনি সেই ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

১৯১২ সালে তিনি ৺প্রতাপচন্দ্র ঘোষের পৌত্রী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু শ্রীমতী বসু ১৯১৬ সালে পরলোকগমন করেন। ডাঃ বসু পুনর্বিবাহ করেন নাই।

১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া জাতীয়তাবাদী কর্মী হিসাবে পরিচিত হন এবং গয়া কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরিত হন। এই সময় তিনি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, শ্রীজওহরলাল নেহরু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন।

ডাঃ বসু একজন প্রথম শ্রেণীর সমাজসেবী হিসাবে সমগ্র উত্তর-প্রদেশে সুপরিচিত। এলাহাবাদে কংগ্রেস হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও অবৈতনিক পদে উহার কাজকর্ম তদারক, স্থানীয় পৌরসভার সদস্যরূপে, ভারতীয় রেডক্রসের সভা, স্থানীয় মেডিক্যাল সংস্থার সম্পাদক ও সভাপতি, ইউ-পি, মেডিক্যাল কাউন্সিল ও এ্যাসোসিয়েশনের সহিত দীর্ঘকাল জড়িত এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সক্রিয় সংযোগ উল্লেখযোগ্য।

প্রারম্ভিক

[সারমাইয়া কিরাসানোভ-এর একটি কবিতা থেকে]

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সূচনার অনাদি অতীতে
ছিলনা কিছুই জানি, এই আলো
এই পৃথিবী,
এই তুমি,
ছিলনা সমুদ্র আর ঝুরো ঝুরো বালির পাহাড়,
শুধু রুক্ষ বাষ্প ছিল, ছিল কালো মেঘ ;
এই টুকু জানি।

কার হাত সৃষ্টি-পাত্র নিয়ে এলো, বলো,
কে দিল পৃথিবী, আর
তোমাকে আমার কাছাকাছি ?
মনে হয় কোন এক বিচিত্র সমুদ্র-অশ্ব
ডানার নির্ভয় ঝাঁকে দিয়ে গেছে তোমার চেতনা।

তোমার সে স্বপ্নভংগ দেখা—
একটি কারণে শুধু স্রষ্টার সৃষ্টি হ'য়ে আছি ;
উছল সাগর-তীরে ঝ'ড়ো মেঘ গুলি।

সমুদ্র ফেনিল কেন বুদ বুদ ওঠে ?
তোমার দৃষ্টি নিয়ে হাজার প্রদীপ জ্বেলে দেবে—
সেই তো পরম হ'য়ে ওঠা।
বাতাস উছল হয় কেন !
যেন তার ঢেউ-এ ঢেউ-এ ভেসে যেতে পারি ;
যেন চোখে পড়ে
তোমার প্রারম্ভিক, তোমার কোমল হ'য়ে বাঁচা।

অবাক প্রত্যয় জাগে শুধু :
তোমার জন্মটুকু বিধাতার কাজের সূচনা,
আর সব সৃষ্টি বুঝি জন্ম নিল শেষে—
উদগ্র দৃষ্টি নিয়ে :
দেখে নেবে বিধাতার পরম সৃষ্টিকে ;
সে সৃষ্টি তুমি!

বার্ধক্যে

বারানসী

নীলকণ্ঠ

আটাশ

আর্যাবর্তের অতীতকালের অবিস্মরণীয় এই কাশীতে রাজা ব্রহ্মদত্ত ছদ্মবেশে বেরিয়েছিলেন দেশ দেখতে। নিজের দেশ নিজে দেখবেন, এই মহৎ সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিলেন রাজধানী ছেড়ে রাজপথে। তাঁর রাজ্যে ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী এবং মূঢ়, সাধু এবং পাপী কে কেমন থাকে, গুণী তার প্রাপ্য পায় কি না, দোষী পায় কি না সাজা, সবাই জানে কিনা, মানে কি না দেশের একজন রাজা আছেন, রাজা নিজেই বেরিয়েছিলেন তার সঠিক সন্ধানে। রাজসভায় বসে, পালংকে শুয়ে, পার্ষদের স্তবে বাস্তবকে উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্ত। চোখ আর কান খুলে রেখে এবং সেই সংগে খুলে রেখে রাজবেশ ব্রহ্মদত্ত বেরিয়েছিলেন, রাজা বলে তাঁকে চিনতে না পারলে রাজ্যের লোক রাজা সম্বন্ধে তাঁকে কি বলে তাই শুনতে আর রাজ্যের আসল চেহারা চোখে দেখতে। নিজের আসল চেহারা গোপন রাখতে না পারলে রাজ্যের আসল চেহারা দেখা অসম্ভব—সেকাল পর্যন্ত এ জ্ঞান রাজ্যের যিনি মাথা তাঁর মাথায় ছিলো। এই কাহিনী সেই কালের; সেই কাশীর।

রাজপুরোহিতকে সংগে করে ছদ্মবেশী রাজা জনপদ ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলেন এক গ্রামের এক জমিদার-বাড়ীতে। জমিদার তাঁকে রাজা বলে চিনতে পারলেন না কিন্তু সন্দেহ করলেন অত্যন্ত ধনী, অত্যন্ত সম্ভ্রান্তবংশের মানুষ বলে। ছদ্মবেশ রাজঅংগকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু রাজমহিমাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করবে কেমন করে? ধূলায় ঢাকা হীরে জহুরীর দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে তুলবার কারণ হতে পারে, কিন্তু তার চোখে কাচ বলে চলবার চেষ্টা করলে পারবে কেন? রাজা ব্রহ্মদত্ত-ও তাই পুরো ফাঁকি দিতে পারলেন না জমিদারকে। দ্বিপ্রহরে স্নানের পর জমিদার ছদ্মবেশী রাজার জন্য রাজকীয় আহার্যের আয়োজনই করলেন। চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় ভরে দিলেন পাত্রের পর পাত্র। আহারে আমন্ত্রিত মাননীয় অতিথিকে ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করলেন। রাজভোগ্য খাবার খেতে ডাকলেন অতিথিকে জমিদার, আর পুরোহিতকে জমিদারের দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো।

ছদ্মবেশী রাজা ব্রহ্মদত্ত সেই রাজকীয় আহার্য স্পর্শ করলেন না। পুরোহিতকে এগিয়ে দিলেন খাবারের থালা। রাজা ব্রহ্মদত্তর পুরোহিত রাজা ব্রহ্মদত্তরই যোগ্য। তিনি সেই আহারের পাত্র তুলে দিলেন জমিদার-বাড়ীর দরজায় দণ্ডায়মান এক তাপসের হাতে। ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল আনন তাপস হাসলেন। তারপর তাকিয়ে দেখলেন, পথ দিয়ে যাচ্ছে বৌদ্ধভিক্ষু। তাঁর হাতে তুলে দিলেন খাবারের থালা। বৌদ্ধভিক্ষু খাবারের থালা হাতে প্রবেশ করলেন জমিদার-বাড়ীতে। ছদ্মবেশী রাজা ব্রহ্মদত্তের পায়ের কাছে থালা রেখে বললেন বৌদ্ধভিক্ষু: রাজন্‌, এ আহার্য আপনারই সেবার জন্যে, আপনি গ্রহণ করুন।

বিস্ময়ে বিমূঢ় জমিদার। রাজার জন্যে প্রস্তুত অন্নপাত্র অন্য পাত্রে না গিয়ে ফিরে এলো রাজার কাছেই। যেন রাজার যিনি রাজা, এ তাঁরই কোনও খেলা। অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর রাজাকে প্রশ্ন করলেন জমিদার: আপনার খাবার অন্যকে দিলেন কেন?

রাজা বললেন: আপনার দানের যোগ্য ব্রাহ্মণ আমি নই, আমি আজন্ম আরামে অভ্যস্ত। আর যিনি সদ্ ব্রাহ্মণ তিনি সমাজকে দেন তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা, শিষ্যকে দেন মহৎ উত্তরাধিকার, রাজাকে দেন সুপরামর্শ, পৃথিবীকে দেন পুণ্যের, স্বর্গের স্পর্শ। এমন একজন যোগ্য পাত্র উপস্থিত থাকতে এই দানের অমর্যাদা আমি কি করে করি?

তখন পুরোহিতকে পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন জমিদার: আপনিও অন্যকে দিয়ে দিলেন কেন আপনার প্রাপ্য? রাজপুরোহিত বললেন নির্দ্বিধায়: আমি যোগ্য নই আপনার দেওয়া আর ওঁর কাছ থেকে পাওয়া এই দুর্লভ আহার্য গ্রহণের। কারণ আমি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু প্রকৃত সত্য সম্পর্কে আমি আজও অজ্ঞ। আমার সংসার আছে, ছেলে আছে, আছে সহধর্মিণী। রাজসেবার বিনিময়ে ভোগেসুখে আমার লালসা যায়নি আজও। কিন্তু আপনার দরজায় দণ্ডায়মান ওই তাপসকে দেখে আমার ভুল হয়নি যে উনিই এর যথার্থ যোগ্য। কারণ উনি ভোগলিপ্সু নন; উনি যেখানে যা পান তাই খান। ওঁর তৃপ্তিতে আমার পুণ্য, এই বিশ্বাসে ওঁকে দিয়েছি আমার অপ্রাপ্য।

তাপসকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনিও কেন বিমুখ করলেন মুখের গ্রাসকে।

প্রশান্ত হাস্যে প্রসন্নানন মহাপ্রাণ যে উত্তর দিলেন, সে উত্তর এক তাঁর মুখেই মানায়: আমি সংসারমুক্ত বটে, তবে আমিও মুক্ত পুরুষ নই। মাথার ওপর চাল আছে আমার অরণ্যাশ্রমে; বনে আমার জন্যে রয়েছে ফলমূল, লোকালয়ে আছে সংসারীর দান। আমার শয্যা আছে, হরিণচর্ম; বারিপূর্ণ কলসী আছে তৃষ্ণায় শান্তি দিতে; ঘরের অন্ধকার দূর করতে আমার আছে মাটির প্রদীপ। আহারের চিন্তা আজও আমাকে উদ্বিগ্ন করে। তাই, মুক্ত বলতে যা বোঝায়, সেই খাঁটি মুক্ত হতে পারিনি আজও। কিন্তু এই যে ভিক্ষু, সর্বলোভমুক্ত এই মানুষটির ঘর নেই, নেই শয্যা, নেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়, সুনিশ্চিত আহার, সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় না, উপবাসে ভীত নন, তৃষ্ণায় নদীর অথবা পুষ্করিণীর জল, লজ্জা নিবারণ করেন ছিন্নবস্ত্রের টুকরো পরিধান

নয়। এঁকে দিলে দানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়,—তাই আমার নয় বা তাঁ দিয়েছি এঁকে। ইনিই যোগ্য।

জমিদার ভিক্ষুর দুটি হাত ধরে জানতে চাইলেন, ক্ষুধার্ত, উপবাসী ভিক্ষু এমন সুখাদ্যের সন্ধান পেয়েও কেন ফিরিয়ে দিলেন রাজাকে দানপাত্র।

বৌদ্ধভিক্ষু উত্তর করলেন, সাধারণ প্রশ্নের অসাধারণ উত্তর: আমি ক্ষুধার্ত,—একথা সত্য, আমি উপবাসী একথাও সত্য। কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য এই যে,—এ খাদ্যের যোগ্য আমি নই। রাজার জন্যে প্রস্তুত এই চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় আমার আহার্য নয়। এ খাদ্য নিলে আমার ধর্মরক্ষা অসম্ভব হয়। রাজার যেমন ধর্ম আছে, ভিক্ষুরও তেমনি ধর্ম আছে জানবেন। রাজার খাদ্য ভিক্ষু খেলে ভিক্ষুর চলে না, যেমন ভিক্ষুর খাদ্য রাজার পক্ষে অচল। তাই রাজার যোগ্য আহার্য রাজপাত্রে দিলাম। মনে রাখবেন, দান করলেই হয় না। যোগ্যকে দান করলে তবেই দান করা হয় যথার্থ। গরীব লোককে হাতী, কুকুরকে পায়েস, সন্ন্যাসীকে শাল-দোশালা দিতে নেই কখনই। [জাতকের গল্প : কালিদাস রায়]

উপবাসী ভিক্ষু পর্যন্ত জানতো ভিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়ার নিগূঢ় তাৎপর্য। এই অনাদি অনন্তকালের ভারতের আত্মার আলোই কাশী। বার্দ্ধক্যে বারাণসী সেই কাশীরই আলোকচ্ছটা।

এই কাশীতেই সেই সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ-শংকরের সংগে স্বয়ং জগন্মাতার সাক্ষাৎকার সেবায়। আর কোথায়,—কাশী ছাড়া আর কোথায় দেখা হতে পারে অসীম কালের সংগে অনন্ত আকাশের? কাশী ছাড়া আর কে বহন করতে পারে তার বুকে একই সংগে বিশ্বনাথের আসন আর বিশ্বের যত অনাথের জন্যে উত্তরবাহিনী গংগার মৃতসঞ্জীবনী? কাশী ছাড়া আর কার এই উদাত্ত আহ্বান: মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব। এই শিবভূমিতে—অদ্বিতীয় শংকরের ধ্যানভূমিতে—দ্বিতীয় শংকর—অদ্বিতীয় বিবেকানন্দ প্রথম দেখেছিলেন দুই চোখে জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা যশোদা মাঈকে সেদিন গগন রায়ের বালিকা কন্যা মণিকার মধ্যে। শিশিরের মধ্যে পেয়েছিলেন সিন্ধুর সম্ভাবনা। সন্নিকটের মধ্যে দেখেছিলেন দূরের ভাবনা। রক্তের মধ্যে শুনেছিলেন অনুরক্তের পদধ্বনি। পৃথিবীর মহত্তম সেই আবিষ্কারের কথা ইতিহাসের পাতায় নেই বিধৃত। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার সন তারিখ খুঁটিনাটি সহ পাঠ্য ছেলেমেয়েদের। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সংগে ত্রৈলংগের, স্বামী বিবেকানন্দর সংগে বালিকা যশোদামাঈর, রবীন্দ্রনাথের সংগে আইনষ্টাইনের সাক্ষাৎ, মহত্তম জাতীয় সম্পত্তি, জাতির ইতিবৃত্তে কোথাও নেই সেই বৃত্তান্ত তবুও, যা পড়ে ছেলেমেয়েরা আবিষ্কার করবে নিজের মধ্যে বিশ্বের, বিস্ময়ের যোগসূত্র। আর নেই বলেই ইতিহাসের বইতে ভারতবর্ষের নামটুকুই চোখে পড়ে তাদের, ভারতবর্ষের সত্য, জীবন্ত, উজ্জীবন্ত ইতিহাস তাদের চোখে পড়ে না। দেশের বালককে তাই রবীন্দ্রনাথ যখন প্রশ্ন করেন, নদী দেখেছ? তখন গংগা যমুনার সংগমস্থলে দাঁড়িয়ে নদীর সংজ্ঞামুগ্ধ বালক বলে, না, নদী দেখিনি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস তার নদ নদী, সমুদ্র, পর্বত, মরুকান্তার ছড়িয়ে যেমন তেমনই আচার্য শংকর থেকে সুরু করে বিবেকানন্দ পর্যন্ত এসে শিক্ষিতের পৌঁছে থেমে যায়নি। সে ইতিহাস লেখা হয়ে চলেছে আজও, মহৎ মানুষের জীবন দিয়ে লেখা সেই তমো থেকে মহত্তমে উত্তীর্ণ হবার সেই ইতিহাসই ভারতবর্ষের অন্তরের ইতিহাস। অন্তর দিয়েই তবে পেতে হয় তার পরিচয়। ভারতবর্ষের অন্তরতম সেই ইতিহাসের নামই কাশী।

সন ১৮৯০। স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন কাশীতে। ভারতবর্ষের অন্তর-ইতিহাসের অন্তরতম পরিচয় পেতে এসেছেন কাশীর অন্তর্গত গাজীপুরে। গাজীপুর হচ্ছে যোগীশ্রেষ্ঠ পাওহারী বাবার জায়গা। এই গাজীপুরেরই গগনরায়ের মেয়ে মণিকা। তখন তার বয়স ন'বছর। বিবেকানন্দ মণিকার মধ্যে কি দেখলেন, সেকথা এক তিনিই বলতে পারেন—যিনি বিবেকানন্দের মধ্যে একদিন আঠারো সূর্যের আলো জ্বলতে দেখেছিলেন। অথবা বলা যায় সে কথাও। মণিকার মধ্যে যশোদামাঈকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিবেকানন্দ; নরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে একদিন যেমন বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। খালি চোখে মানুষ লক্ষ কোটি মাইল দূরের তারাদের দেখতে পায়। সেই মানুষেরই চোখে খালি পড়ে না ঘরের কাছের 'একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশিরবিন্দু'। বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ, রমণীর মধ্যে রমণীয়কে আবিষ্কার, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের আস্বাদ, ক্ষুদ্রের মধ্যে রুদ্রের আভাস, রূপের মধ্যে অপরূপের, বচনীয়ের মধ্যে অনির্বচনীয়ের স্পর্শ পান যাঁরা, তাঁরাই তাঁদের শৈশবে অন্তর লক্ষ্যে পড়েন না; যৌবনে পরিগণিত হন ক্ষ্যাপা বলে। এবং কেউ কেউ যাদের জন্যে তাঁরা আসেন মর্তলোকে তাদের হাতেই ক্রুসবিদ্ধ হন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হন না। বলেন: এদের ক্ষমা করো, এরা জানে না এরা কি করছে!

একটি বালিকাকে দেখিয়ে বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন গগন রায়কে, এ কে? গগন রায় বললেন: ওকে আশীর্বাদ করুন; ও আমার মেয়ে। ওর নাম মণিকা। আবার তাকালেন ন'বছরের বালিকা মণিকার দিকে। মণিকা নয়, এ সেই মণিহার যা সাজে মা সকলের কণ্ঠে। শত সূর্যের দীপ্তি এর অন্তরের আলোর কাছে কালো দেখায় রীতিমতো। সমুদ্রের গভীরতা, ধূর্জটির ধ্যান এর আয়ত চোখের অতলে অদৃশ্য দৃশ্যমান। কিন্তু সে চোখ কার আর, স্বামীজীর ছাড়া যার দৃষ্টির প্রদীপে দেখা দেবে সামান্য বালিকার মধ্যে জগন্মাতার প্রতিমূর্তি। পাথরে যে দেখবে থর থর কাঁপতে জাগ্রতচৈতন্যকে, শিলায় যে দেখবে অন্তঃসলিলাকে, কেবল সেই তো দেখবে মণিকা-র মধ্যে সেই মণিকারকে—এই জগৎ যাঁর মণিহার!

স্বামিজী বলেন: এই মেয়েটি কে আপনার, আমি পূজা করব। কুমারীর মধ্যে কুমার-জননীকে জাগাবো আমি।

পূজা করলেন মণিকাকে বিবেকানন্দ। কুমারী পূজা। পূজার শেষে ধ্যানাবিষ্ট স্বামী বিবেকানন্দ উক্তি করলেন, স্মরণীয় উক্তি করলেন অবিস্মরণীয় স্বামিজী: এ মানবদেহে নিয়ে এসেছে ঐশী শক্তির স্রোতকে। বহু জন্মের সাধনাতে ছাড়া এর মধ্যে যার প্রকাশ দেখেছি তা কারুর সাধ্য নয়।

মণিকাই পরবর্তী জীবনে যশোদামাঈ হয়ে ওঠেন। রূপ, গুণ, যশ থেকে আরও উর্দ্ধে উঠলে তবেই যশোদামাঈ হওয়া যায়। যশ দাও,—মানুষের মহৎ প্রার্থনা! যশোদার প্রার্থনা তার চেয়েও মহৎ। সেই প্রার্থনার চেহারা মণিকার মধ্যে দেখেছিলেন স্বামিজী। মানুষের মহত্তম প্রার্থনার উত্তরেই উত্তরকালে মণিকার মধ্যে উড্ডীন হয়েছিলো যশোদার উত্তরীয়।

পার্বত্য ভাইবোন

—দিলীপ সবকার

মেমোরিয়াল

—পি, জি, দাস

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশন

—নীহাররঞ্জন শেঠ

মোনা লিসা

—বিজয়া দাশগুপ্ত

হ্যালো

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এ মাসের প্রচ্ছদপট

যুদ্ধ !!! ভারত সীমান্তে আবার বৈদেশিক শত্রুর নগ্ন আক্রমণ সমগ্র পৃথিবীতে অভূতপূর্ব বিরোধিতার আলোড়ন তুলেছে। সমগ্র দুনিয়ার প্রায় সকল সভ্য সমাজ এই ঘৃণ্য, জঘন্য ও বর্বরতুল্য আক্রমণকে প্রকাশ্যে ধিক্কার দিতে সুরু করেছেন। ভারতের এই যুদ্ধে প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় পাওয়া যাচ্ছে সভ্য জগতের সহানুভূতি ও সহযোগিতা।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শত্রুহননকারী যুদ্ধরত সৈনিকের ঐতিহাসিক ভারতীয় শিল্পকীর্তির একটি নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। মূর্তিটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্প ও মন্দিরগাত্রচিত্র। আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ।

প্রতীক্ষা

—দীপক ঘোষ
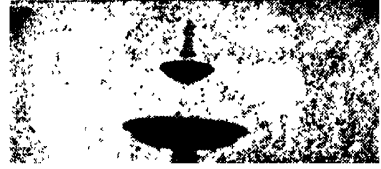
যশোদার বিবাহ হয় জ্ঞানশংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে। বিবাহিত জীবনের সমস্ত ব্যবস্থাকে অটুট রেখে সংসারের সব সংসাঙ্গাদের মধ্যে সারকে খোঁজার অন্বেষণ সুরু হয় তাঁর। দেশ-বিদেশে ঘোরেন তিনি স্বামীর সঙ্গে। বেশভূষায় ফ্যাশান-দুরস্ত মহিলা, একই সঙ্গে একই অঙ্গে প্রসাধনে সজ্জিতা, সাধনে বিসজিত এক বিচিত্র বিমুগ্ধকর পবিত্র পরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। লখনৌ-এর অভিজাত-সমাজের মধ্যমণি মণিকার মধ্যে তখনই জেগে উঠেছে জন্মপূর্ব সংস্কারের অন্তঃসলিলা। সমস্ত দিনের কাজের মধ্যেই আসে সেই আহ্বান, যা কাণে গেলে প্রাণে বাজলে রাধার মতোই উপায় থাকে না অভিসারে না বেরিয়ে। সংসার-যাত্রা থেকে অভিসার-যাত্রার লগ্ন ঘনিয়ে আসে যশোদার। টি ও ডিনার পার্টি, হৈ হৈ, জলসা, তর্ক, বিতর্ক, নানারকম আলোচনার নানান রকম আলোর উৎস লখনউ-এর সেই বিখ্যাত গৃহ, মণিকার অধ্যাপক স্বামী জ্ঞানশংকরেরই বিদ্যা ও জীবনচর্চার ক্ষেত্র। সেই তীর্থক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছে এক ইংরেজ তরুণ; নাম,—রোণাল্ড নিকসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিমানবাহিনীর কর্মী ছিলেন কেমব্রিজের বিদ্যোৎসাহী ছাত্র নিকসন। সেই সময় একদিন শত্রু-ঘাঁটিতে বোমা ফেলার আদেশ নিয়ে বিমানে বহির্গত নিকসনকে অনুসরণ করে শত্রুর বিমান। নিকসন্ তা জানতেন না এবং যখন শত্রুর আঘাতে বিধ্বস্ত হবার মুহূর্ত উপস্থিত, তখনই নিকসন হঠাৎ অনুভব করলেন বিমানের চালক তিনি নন। কোন অদৃশ্য চালক যেন বিমানের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে সুনিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখ থেকে সুনিশ্চিততর জীবনের নব নব চারণ ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। নিয়ে না এলে নিকসন্ ফিরতে পারতেন না সেদিন। শত্রুরা ওঁৎ পেতে ছিলো সেখানে; কোনও ব্রিটিশ বিমান সেদিনকার যুদ্ধশেষে ফিরে আসেনি। নিকসন ফিরে এসেছিলেন বললে ভুল হবে। কেউ তাঁকে সেদিন ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলো। ফিরে আসার পর, বারবার নিকসনের মনে তোলপাড় করে ফেরে এক প্রশ্ন—কে সে, যে সেদিন তাঁকে বাঁচালে,—সে কে?

এতদিন ইংরেজ নিকসন-এর কাছে সবার উপরে ছিলো নেশন; এখন থেকে তাঁর আরম্ভ হলো অন্বেষণ। সব নেশনের সব ধর্মের চেয়ে যিনি বড়, যাঁর আনন্দময়ী ছাড়া অন্য কোনও নাম নেই, এক গোরা সৈনিক-বৈমানিকের সুরু হলো তাঁরই জন্য মহৎ অন্বেষণ। ভারতবর্ষে এলেন তিনি। চরমবিদ্যা, পরমজ্ঞানের ধাত্রী ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষে এলেন। জ্ঞানশংকর চক্রবর্তী নিয়ে এলেন তাঁকে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক করে, সেইখানে আনন্দময়ী, সদানন্দময়ী মণিকার মধ্যে যশোদা মা-কে পেলেন রোণাল্ড নিকসন নন,—রোণাল্ড নিকসনের মধ্যে যিনি নব জন্মগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করছেন, সেই,—কৃষ্ণপ্রেম।

এই রোণাল্ড নিকসন্ লখনউতে জ্ঞানশংকরের বিদুষী স্ত্রী মণিকাকে মা বলে ডাকেন না শুধু, মায়ের মতোই দেখেন। নিকসন্‌কে মণিকা ডাকেন, গোপাল বলে। নিকসন্ দেখেন তাঁর

মণিকা মা, হাসি গল্পগুজবে মেতে আছেন, পার্টিতে যাচ্ছেন, 'য়্যাট হোম' দিচ্ছেন, স্বামীর সংগে যাচ্ছেন দেশবিদেশে। সবই করছেন, তবুও সবার থেকে যেন অনেক দূরে ঘুরে বেড়ায় মায়ের দুটি চোখ। সেই চোখে কখনও কখনও নিক্‌সন্ যেন তাঁর ছায়া দেখতে পান, যাঁর অন্বেষণে সাত সমুদ্র পারের দেশ থেকে এসেছেন মহামানবের সাগরতীরে তিনি। একদিন ধরা পড়ে যান গোপালের চোখে মা মণিকা। গল্পগুজবে যখন ফেটে পড়ছে অধ্যক্ষ জ্ঞানশংকরের গৃহ, তখন সকলের অলক্ষ্যে চকিতে দিশাহারা মণিকা নিষ্ক্রান্ত হন সে-ঘর থেকে। গিয়ে ঢোকেন নিজের ঘরে। কেবল তাঁর চক্ষু এড়াতে পারেন না যাঁকে তিনি গোপাল বলে ডাকেন। মাকে অনুসরণ করে নিক্‌সন্ এসে দেখেন, ধ্যানাবিষ্ট এ যেন আরেকজন কে? এই ধরার আসনে উপবিষ্ট কে অধরার আভাসে মুহূর্তে মুহূর্তে রোমাঞ্চিত।

মণিকা তাঁর গোপালের কাছে লুকোতে পারলেন না নিজেকে। সংসারের গুটিপোকা থেকে ভক্তির প্রজাপতি বেরুনোর খবর অন্বেষণে বহির্গতের দৃষ্টি এড়াবে কি করে? মন্দিরের চূড়া চোখে পড়বে না তীর্থংকরের?

যশোদামাঈর জীবনে তখন অন্তরতমের ডাক এসে পৌঁছেছে। বালগোপাল এসে দাঁড়ান যশোদার চোখের সামনে যখন-তখন। এবং তখন আর বহিরংগ জীবন ধরে রাখতে পারে না তাঁকে। বন্ধু-বান্ধব, হৈ-চৈ গল্প-গুজব মিথ্যা হয়ে যায় সব। সত্য হয়ে দেখা দেয় শুধু অনির্বচনীয় অনুভূতি। ইন্দ্রিয়াতীত দর্শন-শ্রবণে ব্যাকুল যশোদার রূপান্তর ঘটে যায় কখন: যশোদামাঈর জীবনের সেই নিগূঢ় সত্য দিন থেকে দিনে নিকসনের জীবনেও প্রতিফলিত হয়।

সাধ্যে নয়, সাধনায় নয়; বেদনায়। তিনি ধরা দেন সেই অধরা, অহেতুক বেদনায়। কাকে দেন, কেন দেন, তা নিয়ে প্রশ্ন করা চলে, কিন্তু আশা করা চলে না উত্তর। একজনের জন্যে প্রাণ কাঁদে, সেই পরম একজনের। দর্শনের পাতায় নয়, চোখের পাতায় এসে দাঁড়ান তিনি। জ্ঞানের ওপারে যিনি দাঁড়িয়ে, গানের ওপারে, তিনি দয়া করেন, প্রমাণ দেন, তিনি আছেন। আমরা যারা সব কিছুর কারণ খুঁজি, তারা বলি, পূর্বজন্মের সংস্কার। কিন্তু সমস্ত কারণের যিনি অতীত, কে বলবে কি কারণে, নাকি অকারণেই তাঁর আবির্ভাব বিশেষ একজনের স্থূলদৃষ্টির সামনে। ডাকলে যিনি সাড়া দেন না, না-ডাকতেই তিনি এসে দাঁড়ান জ্ঞানের এপারে, গানের এপারে, একজনের হৃদয়যমুনার তীরে এসে দাঁড়ান বংশীধারী।

সেই পরমাশ্চর্য পবিত্র অঘটন ঘটে গেল কখন মণিকার জীবনে। জীবনের মণিকার কখন নিজের গলার হার অযাচিতভাবে পরিয়ে দিয়েছেন ভক্তের কণ্ঠে,—ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে পেয়েছে কখন পরশপাথর, সে মুহূর্তটির সন্ধান পায় না, সে-ও যে জানার মাঝে অজানার পেয়ে গেছে সন্ধান।

আলো এসে পড়েছে মণিকার জীবনে। চরমের পরম আলোক। সেই আলোকে যশোদামাঈ নয় কেবল, দলের পর দল মেলে ফুটে উঠেছে শতদল, রোণাল্ড নিক্‌সন্। যার অন্বেষণে বহির্গত এই তরুণ বিদেশী, সে আজ পেয়ে গেছে সেই খনির সন্ধান, অজানা খনির নূতন মণি'র পেয়েছে পথ। আর তাকে ঠেকায় কে? এখন শুধু উজাড় করে, কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষা কেবল।

রোণাল্ড নিক্‌সন্ নয়; কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের জীবন্ত প্রমাণ এই কৃষ্ণপ্রেম। যশোদামাঈর জীবন-ব্যাখ্যা কৃষ্ণপ্রেমের আলোয় না পড়লে অনুধাবন করা অসম্ভব। কৃষ্ণের অযাচিত প্রেমে রূপান্তরিতা যশোদামাঈর অযাচিত স্নেহে উজ্জীবিত কৃষ্ণপ্রেম।

যে কৃষ্ণ, সেই যশোদার বালগোপাল। যশোদার গোপাল যে, সেই কৃষ্ণপ্রেম।

[ক্রমশঃ।
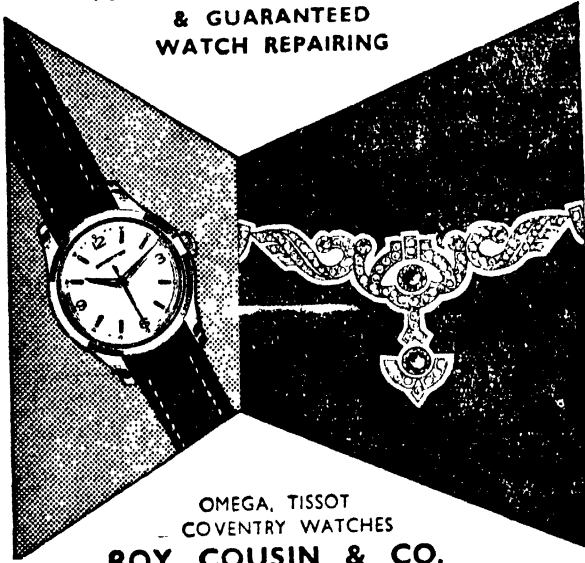
ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া প্রথম টেষ্ট অমীমাংসিত

সম্প্রতি ব্রিসবনে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম টেষ্ট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো। এর আগে ব্রিসবনে প্রায় প্রত্যেক টেষ্টেরই একটা মীমাংসা হয়ে গেছে। এবারকার খেলা মীমাংসা হয়নি। যুদ্ধোত্তরকালে ইংলণ্ড এখানে চারটা টেষ্ট ম্যাচেই পরাজয় বরণ করেছে। ১৯৬০-৬১ সালে ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের সঙ্গে "টাই" অর্থাৎ উভয় দলের সমান রাণ হওয়ার পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া ব্রিসবনে একাদিক্রমে সাতটি টেষ্ট ম্যাচেই জয়ী হয়েছে।

ক্রিকেট জগতে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। এই দুই দল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। টেষ্ট খেলায় এই দুই দলের সব মিলনকে কেন্দ্র করে বিশ্বের সকল স্থানে ক্রীড়ামোদীদের উত্তেজনা ও উদ্দীপনা দেখা যায়। এবারকার ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া দলের মিলন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। উভয় দলই বিশেষ শক্তিশালী করে দল গঠন করে। প্রায় টেষ্ট আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে "বেনড-আতঙ্ক" দেখা দেয়। বেনড "লেগ স্পিন" বল সুরু করলেই ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা অস্বস্তি বোধ করেন। এর ফলে ইংলণ্ডের ব্যাটিং-এর শক্তি বৃদ্ধির দিকেও বেশী নজর রাখতে হয়েছে। প্রথম টেষ্টে সম্মান রক্ষার জন্য উভয় দলের অধিনায়ক কোন রকম ঝুঁকি নেননি। বেনডের দ্বিতীয় ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণার বিলম্ব দেখে ভালভাবে উপলব্ধি করা গেছে। অপরদিকে ডেক্সটারও শেষ দিকে অষ্ট্রেলিয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি। ৩৬০ মিনিটে ৩৭৮ রাণ করিতে পারিলে জয়ী হবে—এই অবস্থায় ইংলণ্ডদল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে আক্রমণাত্মক খেলার নীতি গ্রহণ করেননি। ফলে খেলাটি সাধারণ ভাবেই অমীমাংসিত থেকে যায়।

এই খেলায় দুই দলের অধিনায়ক রিচি বেনড ও টেড ডেক্সটার যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। বেনডের বোলিং বিশেষ প্রশংসনীয় হয়। তিনি একাই ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের ছয়জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেন। তা ছাড়া তিনি প্রথম ইনিংসে ৫০ রাণ করেন। ডেক্সটার প্রথম ইনিংসে ৭০ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৯ রাণ করে, মাত্র এক রাণের জন্য শত রাণে বঞ্চিত হন। অষ্ট্রেলিয়ার বি, সি, বুথ ১১২ রাণ করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। তবে একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে শেফার্ডকে বাদ দিয়ে বুথকে দলভুক্ত করা হয়। তিনি তাঁর দলভুক্তির প্রমাণ দিয়েছেন বলা চলে। আর একজন ব্যাটসম্যান বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করেছেন—তিনি হলেন বিল্লি লরি। তিনি ৯৮ রাণ করে মাত্র দু' রাণের জন্য শত রাণে বঞ্চিত হন। টেষ্টের প্রথম সম্মান উভয় দলেরই থেকে গেল। তাঁরা এখন দ্বিতীয় টেষ্টের জন্য উদ্যোগ আয়োজন করবেন—তা বলাই বাহুল্য।

রাণ সংখ্যা

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ৪০৪ (বি, বুথ ১১২, কে, ডি, ম্যাকে নট আউট ৮৬, আর বেনড ৫১, সিম্পসন ৫০, নীল হার্ভে ৩৯; ট্রু ম্যান ৭৬ রাণে ৩ উইঃ ও বেরী নাইট ৬৫ রাণে ৩ উইঃ)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ৩৮৯। (পারফিট ৮০, ব্যারিংটন ৭৮, ডেক্সটার ৭০, পুলার ৩৩ শেফার্ড ৩১; বেনড ১১৫ রাণে ৬ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস (৪ উইঃ ডিঃ) ৩৬২। (ডব্লিউ লরি ৯৮, আর, সিম্পসন ৭১, নীল হার্ভে ৫৭, ও' নীল ৫৬, পিটার বার্জ নট আউট ৪৭; ডেক্সটার ৭৮ রাণে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস (৬ উইঃ) ২৭৮। (ডেক্সটার ৯৯, পুলার ৫৬, ডি, শেফার্ড ৫৩; ডেভিডসন ৪৩ রাণে ৩ উইঃ ও ম্যাকেঞ্জি ৬১ রাণে ২ উইঃ)।

মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ভারতের ব্যর্থতা

ভারতের মাটিতে এবার একটা আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়ে গেলো। মাদ্রাজে ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালে ভারত ও মেক্সিকোর খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। হার্ড কোর্টেই খেলার ব্যবস্থা থাকে। খেলার আগে মেক্সিকো দলের অধিনায়ক প্রবীণ খেলোয়াড় কর্ণে রাস বলেছিলেন যে তাঁর দেশের কোর্টগুলি লাল পাথরের তৈরী হলেও এখানকার কোর্টেরই অনুরূপ; এখানকার কোর্ট খুব দ্রুত ও নিখুঁত বলা চলে। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কৃষ্ণানের ভূয়সি প্রশংসা করে বলেন যে কৃষ্ণান ভারতের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়।

ভারতের মাটিতে খেলা হবে। তার উপর হার্ড কোর্ট—সকলেই ভারতের সাফল্য সম্পর্কে আশান্বিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়রা সকলকে নিরাশ করেছেন।

মেক্সিকো ভারতকে ৫—০ খেলায় পরাজিত করে ডেভিস কাপের মূল প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। মেক্সিকোর ওসুনার খেলা দেখে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁর নিখুঁত মারগুলি সত্যই দেখার বিষয়। এণ্টনী ও প্যানাফক্সের খেলাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কৃষ্ণানের সাফল্য সম্পর্কে সকলের দৃঢ় আশা ছিল। কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় বরণ করেন। এর আগে মেক্সিকোতে ওসুনা একবার কৃষ্ণাণকে পরাজিত করেছিলেন। নিজদলে পরাজিত

হওয়ায় কৃষ্ণান ডাবলসের খেলায় অংশ গ্রহণ করেননি। কৃষ্ণানের পরেই ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে জয়দীপ মুখার্জ্জী ও প্রেমজিৎ লালের স্থান। সাময়িকভাবে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করলেও তাঁরা অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের ন্যায় খেলেছেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁরা যে ভাবে সহজ পয়েন্ট নষ্ট করেছেন, তাতে সকলেই ভারতের ভবিষ্যৎ টেনিসের উপর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এবারকার আখতার আলির খেলার কিছুটা প্রশংসা করা চলে পরাজিত হলেও তাঁর খেলা সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে। এবার অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা 'কোচ' দ্বারা ভারতীয় খেলোয়াড়দের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা হয়েছিলো। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড় কোন সময়েই তাঁদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। নিখিল ভারত টেনিস এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলী এবারকার শিক্ষা গ্রহণ করবেন—এটাই সকলে আশা করেন। নিম্নে সকল খেলার ফলাফল প্রদত্ত হলো :—

সিঙ্গলস

এ্যান্টনিও প্যালাফক্স (মেক্সিকো) ১—৭, ৬—২ ও ৬—২ সেটে জয়দীপ মুখার্জ্জীকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ওসুনা (মেক্সিকো) ৮—৬, ২—৬, ৭—৫, ৬—৮ ও ৬—৪ সেটে রমানাথ কৃষ্ণাণকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ম্যারিও লামাস (মেক্সিকো) ৬—২, ৬—২ ও ৬—৩ সেটে প্রেমজিৎলালকে (ভারত) পরাজিত করেন।

রুপিট রাস (মেক্সিকো) ৬—৪, ২—৬, ৫—৭, ৬—৪ ও ৬।৩ সেটে আখতার আলিকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডাবলস

ওসুনা ও প্যালাফক্স (মেক্সিকো) ১০—৮, ১২—১০ ও ৬—৪ সেটে জয়দীপ মুখার্জ্জী ও প্রেমজিৎলালকে (ভারত) পরাজিত করেন।

সপ্তম কমনওয়েলথ গেমসের পরিসমাপ্তি

পার্থে সপ্তম ব্রিটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেমস সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। টেরাকোটা পেরা লেক ষ্টেডিয়ামে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ৩৫টি দেশের সহস্রাধিক প্রতিনিধি এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ চার বৎসর ধরে ৩৫০০০০০ পাউণ্ড অর্থ ব্যয়ে এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

চীনের ভারত আক্রমণের ফলে দেশে জরুরী অবস্থার জন্য ভারত এবারকার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে নি।

এবার অষ্ট্রেলিয়া ৩৮টি স্বর্ণ-পদকসহ দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইংলণ্ড ২৯টি স্বর্ণপদকসহ 'রাণার্স আপ' হয়। এর পরেই নিউজিল্যাণ্ড ও পাকিস্তান স্থান লাভ করে।

এইবারকার ক্রীড়ানুষ্ঠানে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে বহু খ্যাতনামা এ্যাথলীট যোগদান করা সত্ত্বেও 'ট্রাক ও ফিল্ডে' একটি বিষয়েও বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এর কারণ মনে হয় এখানকার গরম আবহাওয়ার সঙ্গে প্রতিযোগীরা খাপ খাওয়াতে পারেন নি। তবে এই বিষয়ে সাঁতারুরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সর্ব্বাধিক। সাঁতারে নয়টি বিশ্ব রেকর্ড হয় ও তিনটি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ডের সমান হয়।

পদকের খতিয়ান

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
অষ্ট্রেলিয়া	৩৮	৩৬	৩১
ইংলণ্ড	২৯	২২	২৭
নিউজিল্যাণ্ড	১৩	১২	১০
পাকিস্তান	৮	১	০
কানাডা	৪	১২	১৫
স্কটল্যাণ্ড	৪	৭	৩
ঘানা	৩	৫	১
জামাইকা	৩	১	১
কেনিয়া	২	২	১
সিঙ্গাপুর	২	০	০
ওয়ালেস	০	২	৪
রোডেসিয়া	০	২	৫
উগাণ্ডা	১	১	৪
বাহামাস	০	১	০
ত্রিনিদাদ টোবাগো	০	০	২
ফিজি	০	০	২
পাপিয়া নিউ গায়েনা	০	০	১
বারবাডোজ	০	০	১
বৃটিশ গায়না	০	০	১
জার্সি	০	০	১
মালয়	০	০	১
নর্দার্ণ আয়র্ল্যাণ্ড	০	০	১

রোভার্স কাপে ইষ্টবেঙ্গল ও অন্ধ্রপুলিশ যুগ্ম-বিজয়ী

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা রোভার্স কাপে এবার এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। কলিকাতার জনপ্রিয় দল ইষ্টবেঙ্গল ও দক্ষিণ-ভারতের শ্রেষ্ঠ দল অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশকে (হায়দ্রাবাদ) এবার যুগ্ম-বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। রোভার্স কাপের দীর্ঘ ৫১ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হলো।

অন্ধ্র পুলিশ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ছয় মাস মাত্র এই কাপ রাখার যোগ্যতা লাভ করে।

বর্ত্তমান যুগে রোভার্স কাপে হায়দ্রাবাদের রেকর্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ছয়বার এবং এর পর ১৯৫৭ সালে পুনরায় হায়দ্রাবাদ রোভার্স কাপ লাভ করে। এ ছাড়া এই পর্য্যন্ত কোনবারই তারা ফাইন্যালে পরাজিত হয়নি।

ইষ্টবেঙ্গল এর আগে ১৯৪৯, ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে ফাইন্যালে উঠলেও একমাত্র ১৯৪৯ সালে তাদের এই কাপ লাভের সুযোগ হয়েছে। এবারকার প্রতিযোগিতায় আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, প্রথম দিন অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ প্রথমে গোল করে; কিন্তু খেলার একেবারে শেষ সময়ে ইষ্টবেঙ্গল গোলটি পরিশোধ করে। দ্বিতীয় দিনে ঠিক তার উল্টো দেখা যায়। এইদিন ইষ্টবেঙ্গল প্রথমে

গোল দেয়; কিন্তু শেষ সময় অন্ধ্র প্রদেশ দল গোলটি পরিশোধ করে। ইষ্টবেঙ্গল ও অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ দু'টিই ভারতের অন্যতম শক্তিশালী দল। জয়ের সম্মান পুরাটা যখন কোন দলের ভাগ্যে যায়নি তখন উভয় দলকেই স্বাগত জানান সকলের কর্তব্য।

প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় দুই কোটী টাকা সংগৃহীত

ভারতের সকল স্থানে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের নানারূপ চেষ্টা চলেছে। ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়া-পরিচালকরা নিজ নিজ ভূমিকা গ্রহণের জন্য এগিয়ে এসেছেন। ক্রীড়াবিদরা তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান—অর্থাৎ পদকগুলি জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেছেন। তাঁদের জীবনে এগুলি ফিরে পাবার নয়। তা সত্ত্বেও দেশের ডাকে তাঁরা সাড়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। ক্রীড়া-পরিচালকরা—বিভিন্ন খেলাধূলার ব্যবস্থা করেছেন। তবে এর মধ্যে ক্রীড়ামোদীদের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এই সকল প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়েছেন।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে সম্প্রতি একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই খেলার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এই যে, যাঁরা "ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট" ও প্রবেশ-দর্শনী দেন—তাঁরাই মাঠে প্রবেশ লাভ করতে পারেন। ক্রীড়ামোদীদের মধ্য থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়। এই খেলায় 'ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট' ও দর্শনীতে দু'কোটীর বেশী টাকা সংগৃহীত হয়েছে। ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা এই খেলায় যোগদান করেন। খেলায় বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ ও রাজ্যপালের একাদশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মুখ্যমন্ত্রীর একাদশের মুস্তাক আলি ও রাজ্যপালের একাদশ লালা অমরনাথ অধিনায়কত্ব করেন। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

রাণ সংখ্যা

মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ—১ম ইনিংস (৬ উই: ডি:) ৩৩৭। (সরদেশাই ৮৬, আমরোলিওয়ালা ৮৫, পি, এস যোশী ৪৪, নাদকার্ণি ৩৮, জি এস রামচাদ নট আউট ২৭)।

রাজ্যপালের একাদশ—১ম ইনিংস ৩৪১। (এস কি অধিকারী ৮৩, উম্রীগড় ৬২, বি কে কুন্দরাম নট আউট ৪৩, এস পি গুপ্তে ৬০ রাণে ৪ উই: ও গিলক্রাইষ্ট ৮২ রাণে ৩ উই:)।

মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ—২য় ইনিংস ২০২। (দিওয়াকার ৭১; আমরোলিওয়ালা ৫১; ভোসলে ১৭ রাণে ৪ উই: ও কিং ২৫ রাণে ৩ উই:)।

রাজ্যপালের একাদশ—২য় ইনিংস (৮ উই:) ১৭৫। (ভূরাণী ২৬, ভোসলে ২৫; এস পি গুপ্তে ৫৪ রাণে ৪ উই: ও নাদকার্ণি ২২ রাণে ২ উই:)।

জাতীয় সন্তরণে নিমাই দাসের কৃতিত্ব

ত্রিবেন্দ্রামে এবার জাতীয় সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হয়ে গেলো। দেশের জরুরী পরিস্থিতির জন্য গতবারের বিজয়ী সার্ভিসেস এবার যোগদান করেনি। সিনিয়ার বিভাগে রেলওয়ে দলগত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। বোম্বাই "রাণার্স আপ" হয়। তবে এই বিভাগে বাঙ্গালার কৃতিত্বই সর্বাধিক। বাঙ্গালা থেকে মাত্র দু'জন প্রতিযোগীকে পাঠানো হয়েছিলো। এই দু'জন প্রতিযোগী আঠার পয়েণ্ট পেয়ে সিনিয়র বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করে। এর মধ্যে নিমাই দাসের কৃতিত্বও সর্বাধিক। তিনি ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইলে প্রথম স্থান লাভ করে একাই তিনটি স্বর্ণ-পদক লাভ করেন।

বাঙ্গালা দল সিনিয়ার বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও, মহিলা ও জুনিয়ার বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন। সিনিয়ার বিভাগে রেলওয়ে দলগত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলেও, দলের বেশীর ভাগ সাঁতারুরা মূলত: বাঙ্গালার প্রতিনিধি। রেলওয়ে দলের সাফল্য সত্যই অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। নিম্নে বিভিন্ন রাজ্যের দলগত পয়েণ্টের তালিকা দেওয়া হ'লো:—

সিনিয়ার বিভাগ:—১ম—রেলওয়ে (৫৭ পয়েণ্ট), ২য়—বোম্বাই (৪৩ পয়েণ্ট), ৩য়—পশ্চিমবঙ্গ (১৮ পয়েণ্ট) ৪র্থ—মহারাষ্ট্র (১০ পয়েণ্ট), ৫ম—কেরালা (১ পয়েণ্ট), ৬ষ্ঠ—উত্তর প্রদেশ (৬ পয়েণ্ট), ৭ম—দিল্লী (১ পয়েণ্ট) ও ৮ম গুজরাট (কোন পয়েণ্ট পায়নি)।

মহিলা বিভাগ:—১ম পশ্চিম বঙ্গ (৩২ পয়েণ্ট), ২য়—বোম্বাই (১৭ পয়েণ্ট), ৩য়—মহারাষ্ট্র (৮ পয়েণ্ট) ও ৪র্থ—কেরালা (৩ পয়েণ্ট)।

জুনিয়ার বিভাগ:—১ম—পশ্চিম বঙ্গ (৩৮ পয়েণ্ট), ২য়—বোম্বাই (১৭ পয়েণ্ট), ৩য়—উত্তর প্রদেশ (৪ পয়েণ্ট), ৪র্থ—কেরালা (৩ পয়েণ্ট) ও ৫ম—মহারাষ্ট্র (১ পয়েণ্ট)।

অচিন্ত্য অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৩২

গৌড়ীয় ভক্তেরা দেশে ফিরে গেল। দশজন সন্ন্যাসী থাকল প্রভুর সঙ্গে। আর থাকল গদাধর।

সার্বভৌম বললে, 'এবার তবে তুমি আমার ঘরে চল, নিত্য ভিক্ষা গ্রহণ করবে।'

প্রভু বললেন, 'এটা সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। প্রত্যহ একই ঘরে সন্ন্যাসী ভিক্ষে করে না।

'তা হলে মাসে অন্তত দশদিন করো।'

'না, একদিন।'

সার্বভৌমের অনেক কাতরতার পর মাসে পাঁচদিন ভিক্ষা করতে রাজী হলেন প্রভু। আর বাকি পঁচিশ দিনের পাঁচদিন পরমানন্দ, চারদিন দামোদরস্বরূপ আর দুদিন করে বাকি আটজন। মাসভোর সাধুসেবা করতে পারবে সার্বভৌম।

বেশ, তাই সই। তবে আজ তুমি চলো আমার বাড়ি। একা-একা এস। অনেককে একদিনে একত্র নিমন্ত্রণ করতে পারি এমন আমার সাধ্য নেই।

তাই যাব।

সার্বভৌমের মেয়ের নাম ষাঠী, সেই সুবাদে গৃহিণীর নাম ষাঠীর মা। ষাঠীর মাকে খবর দিতেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, তখুনি চড়িয়ে দিল রান্না। সবদ্রব্যই ঘরে আছে, শুধু শাক সব্জিই আহরণ করতে গেল ভট্চায।

প্রভু এসে দেখলেন বিরাট আয়োজন। নিম-শুকতো থেকে সুরু করে চাঁপাকলা সহ ঘন দুধ। কত রকমের শাক আর ঘণ্ট আর ভাজা আর বড়ি। বড়া আর ঝোল। কত রকম পুলি আর পিঠে। ঘৃতসিক্ত পরমান্ন। সন্দেশ আর দই। সর্বোপরি অন্ন ব্যঞ্জনের উপর তুলসীমঞ্জরী।

প্রভু সবিস্ময়ে বললেন, 'দুই প্রহরের মধ্যে এত সব রাঁধলে কী করে? একশো উনুনে যদি একশো জনও কাজ করে তবে এত অল্প সময়ে এত বোধ হয় পাক করা যায় না। তাৎপর তুলসীমঞ্জরী দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য কৃষ্ণকে উৎসর্গ করেছ। তুমি কী ভাগ্যবান। তোমার সমস্ত উদ্যোগ সফল। মনে হচ্ছে কৃষ্ণ এ সবের আস্বাদ নিয়েছেন, নইলে অন্নব্যঞ্জনের এত সুন্দর বর্ণ কেন, কেন তবে এত সুগন্ধ উঠছে? আমারও কত ভাগ্য আমি এই প্রসাদের অংশ পাব।'

আসন আগের থেকে পাতা ছিল তা লক্ষ্য করে প্রভু বললেন, 'এ আসন কৃষ্ণের জন্যে পাতা। এ তুলে নাও। আমাকে অন্য পাত্রে অন্য স্থানে প্রসাদ দাও।'

'তুমি এ কী বলছ?' সার্বভৌম আপত্তি করল। 'এ-সব আয়োজন যদি তোমার মনঃপূত হয়ে থাকে, জানবে সমস্তই তোমার ইচ্ছায়। এতে আমার উদ্যোগ বা গৃহিণীর কৌশল কোনোটাই কাজের কথা নয়। আসন তুলতে যাব কেন? আসনও তোমার ইচ্ছায়। সুতরাং এই আসনেই বোসো।'

'বা, এ যে কৃষ্ণের আসন। কৃষ্ণের আসনে বসি কী করে?'

'যেমন করে তার প্রসাদ পাবে।'

প্রভু সার্বভৌমের মুখের দিকে তাকালেন।

সার্বভৌম বললে, কৃষ্ণে নিবেদিত অন্ন যেমন প্রসাদ, কৃষ্ণে নিবেদিত আসনও তেমনি প্রসাদ। যদি অন্ন খেতে পার, আসনে বসতে অপরাধ কিসের?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কৃষ্ণের সমস্ত ভুক্তশেষই ভক্তের প্রাপ্য।' 'কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়।'

সার্বভৌম প্রভুর পা ধুইয়ে দিল।

'কিন্তু যাই বলো এত খাদ্য আমি খাব কী করে?'

'তোমার খাদ্যের পরিমাণ কী তা আমার জানা আছে।' বললে সার্বভৌম, 'নীলাচলে তুমি রোজ বায়ান্ন বার খাও দ্বারকাতে ষোল হাজার মহিষীর মন্দিরে, আর ব্রজে তো তোমার আত্মীয়ের ছড়াছড়ি, তারপর তোমার সখী গোপিনীরা। প্রত্যেকের ঘরে রোজ তোমার দু'বেলা বাঁধা আহার। এ সব ছেড়ে দিই গোবর্ধনযজ্ঞে তুমি যত ভাত খেয়েছ তার এখানকার অন্ন এক গ্রাসেরও কম হবে। দয়া করে এক গ্রাস মাধুকরী তুমি গ্রহণ করো।'

'তুমি তো ঈশ্বর, মুঞি ক্ষুদ্র কোন ছার।
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার॥'

স্মিতমুখে প্রভু বসলেন আসনে।

এমন সময় অমোঘের আবির্ভাব।

অমোঘ সার্বভৌমের জামাই, ষাঠীর স্বামী। কুলীন ব্রাহ্মণ, শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই হয়ে আছে। যাকে-তাকে যখন-তখন নিন্দা করে, মুখর রসনাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে জানে না। তার সম্বন্ধে সার্বভৌমের সব সময়ে ভয়, কখন কী উৎপাত বাধায়। হাতের কাছে একটা লাঠি এনে রেখেছে, যদি তেমন কিছু বিঘটন করে, প্রহার করবে।

কিন্তু নিজ হাতে পরিবেশন করতে হলে লাঠিতে মনোযোগ রাখা কঠিন।

'বাপরে বাপ! একটা সন্ন্যাসী এত খাবে!' হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অমোঘ এসে উপস্থিত। 'এতে অন্তত দশ-বারো জনের পেট ভরে!'

সার্বভৌম চকিতে লাঠি কুড়িয়ে নিল আর নিমেষে ছুট দিল অমোঘ।

সার্বভৌম ছাড়বে না কিছুতেই। পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু অমোঘের সঙ্গে ক্ষিপ্রতায় পারবে সার্বভৌমের সাধ্য কী।

ধরতে পারল না অমোঘকে। গাল দিতে-দিতে ফিরে এল। এসে দেখল নিন্দা সত্ত্বেও আনন্দসুন্দর নেত্রে হাসছেন গৌরহরি।

'ষাঠীর মা ভেবেছিল অমোঘ ধরা পড়বে আর এ অন্যায়ের প্রতিকার হবে। কিন্তু স্বামীকে রিক্তহাতে ফিরতে দেখে তার দুঃখ দ্বিগুণতর হল। মাথায় বুকে করাঘাত করতে-করতে বললে, 'ষাঠী বিধবা হোক।'

সার্বভৌম আর তার স্ত্রীর সাধ মিটিয়ে খেলেন প্রভু।

আচমন করবার পর সার্বভৌম মুখবাস দিল, মালা চন্দনে ভূষিত করল, পরে দণ্ডবৎ হয়ে বললে, 'প্রভু, আমাকে মার্জনা করো। আমি তোমাকে নিন্দা শোনাবার জন্যেই আমার ঘরে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম—'

'বা, অমোঘ তো অন্যায় কিছু বলেনি।' প্রভু স্বচ্ছমুখে বললেন, 'আমার পাতের অন্নে সত্যি-সত্যিই তো দশবারো জনের পেট ভরতে পারত। আর অমোঘের কথায় তোমার অপরাধ কী।'

প্রভু বাসায় চললেন, সার্বভৌম তার পিছু নিল। আত্মনিন্দা করতে লাগল। আমার অসাবধান হবার কী হয়েছিল!

প্রভু তাকে শান্ত করে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

ঘরে ফিরে এসে গৃহিণীকে বললে, 'যে আমার চৈতন্য গোসাঁইয়ের নিন্দা করে তাকে হত্যা না করলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। নয় তো আত্মহত্যা করব। কখনো ও-নিন্দুকের মুখদর্শন করব না।'

'কিন্তু,' ষাঠীর কথা ভেবে কিছু বোধ হয় বলতে চাইল গৃহিণী।

'তুমি ষাঠীকে বলো ও ঐ অপদার্থটাকে ত্যাগ করুক। পতি যদি পতিত হয় তাকে তার স্ত্রী বিধিমত ত্যাগ করতে পারে।'

'অমোঘ পতিত হয়েছে?'

'ভগবানের নিন্দা করার দরুণই সে পতিত। সে পাতকী।'

'তাকে ত্যাগ করবে ষাঠী?'

'নিশ্চয়ই করবে। কী বলছে শাস্ত্র? পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ। যতক্ষণ স্বামী অপতিত, পাতকশূন্য, ততক্ষণই স্ত্রী তাকে ভজনা করবে। নচেৎ নয়, কখনো নয়।'

ষাঠী কাঁদতে লাগল।

এদিকে অমোঘের আর দেখা নেই। কোথায় গেল কে বলবে।

সকালে শোনা গেল রাত্রিতে অমোঘ যেখানে ছিল সেখানে তার ওলাউঠা হয়েছে।

'বেশ হয়েছে।' বলে উঠল সার্বভৌম, 'দৈব আমার সাহায্য করতে এসেছে।'

'তুমি কী বলছ ?' গৃহিণী ব্যাকুল হয়ে উঠল।

'ঠিকই বলছি।' যারা মহৎ তাদের যে অবমাননা করে তার আয়ু শ্রী যশ, ধর্ম, তার সমস্ত কল্যাণ, নষ্ট হয়ে যায়। আর সন্দেহ কী, সেই কারণেই অমোঘ মরতে বসেছে।'

গোপীনাথ ছুটল প্রভুর কাছে।

প্রভু জিগগেস করলেন, 'সার্বভৌম কেমন আছে ? তার মনের দুঃখ মিলিয়ে গেছে তো ?'

'কই আর গেল। স্বামী-স্ত্রী তো সেই থেকে উপবাস করে আছে। দুঃখের উপর দুঃখ, অমোঘের ওলাউঠা হয়েছে। জীবনের আশা নেই।'

'সে কী কথা ?' প্রভু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। 'আমাকে এখুনি অমোঘের কাছে নিয়ে চলো।'

আর কথা নেই, প্রভু অমোঘের শয্যাপার্শ্বে এসে উপস্থিত হলেন। অমোঘের বুকে শ্রীহস্ত অর্পণ করলেন। বললেন, 'এই ব্রাহ্মণ-হৃদয় সহজ নির্মল ছিল, ছিল কৃষ্ণের বিশ্রামের যোগ্য স্থান, কিন্তু মাৎসর্য-চণ্ডাল এসে বসল বিজয়ীর মত, পরম পবিত্র স্থানকে কলুষিত করে দিল। তুমি সার্বভৌমের সঙ্গ করেছ, সুতরাং তোমার কল্মষের ক্ষয় হয়েছে। আর কল্মষ দূর হলেই জীব কৃষ্ণনামে উন্মুখ হয়। অমোঘ, তুমি ওঠ, কৃষ্ণ নাম বলো, ভগবান তোমাকে কৃপা করবেন।'

আমোঘ চোখ মেলে চাইল। এ কি, তুমি ? তুমিই সেই দীনদয়ার্দ্র নাথ ?

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো।'

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ।' অমোঘ উঠে বসল। শুধু উঠে বসল না, দাঁড়াল খাড়া হয়ে। প্রেমোন্মাদে নাচতে লাগল।

সেই প্রেমের তরঙ্গ দেখে প্রভু হাসতে লাগলেন।

নৃত্য থামিয়ে প্রভুর চরণ ধরল অমোঘ। বললে, 'প্রভু, দয়াময়, আমার অপরাধ মার্জনা করো। এই ছারমুখে তোমার নিন্দা করেছি, এই মুখ আর রাখব না।' বলে দু হাতে দু গালে চড় মারতে লাগল প্রাণপণে।

গোপীনাথ নিরস্ত করল শেষ পর্যন্ত।

অমোঘের গায়ে প্রভু ব্যথাহরণ স্নেহস্পর্শ রাখলেন। বললেন, 'সার্বভৌম সম্পর্কে তুমি আমার প্রিয়পাত্র। সার্বভৌমের গৃহের দাসদাসী এমন কি কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়। সুতরাং, তোমার কোনো অপরাধ নেই। তুমি শুধু কৃষ্ণ নাম করো, বলো কৃষ্ণ কৃষ্ণ।'

তারপর সার্বভৌমের বাড়ি এসে সার্বভৌমকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'কেন তোমরা উপবাস করে আছ ? অমোঘ শিশুসমান, পুত্রসমান, তার প্রতি কেন ক্রুদ্ধ হও ? ওঠো, স্নান করো, জগন্নাথকে দর্শন করে এস, পরে আহার করো—আর, তবেই আমার সন্তোষ।'

সার্বভৌম বললে, 'অমোঘকে তুমি কেন বাঁচালে ? ওর অপরাধের মার্জনা নেই। ওর মরাই তো উচিত ছিল।'

'কী বলো তার ঠিক নেই। আমোঘ যে কৃষ্ণনাম নিয়েছে। অমোঘ যে বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছে।' প্রভু করুণা কোমল চোখে তাকালেন : 'ওর আর অপরাধ কোথায় ?'

জগাই-মাধাই উদ্ধার পেয়েছে, অমোঘও উদ্ধার পেল।

'সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥

প্রভু ঘোষণা করলেন, 'আমি এবার বৃন্দাবন যাব।'

খবর শুনে প্রতাপরুদ্র বিমর্ষ হলেন। সার্বভৌম আর রামানন্দকে ডাকালেন। বললেন, 'প্রভু যদি নীলাদ্রি ছেড়ে চলে যান, বাঁচব কি করে ? তোমরা তাঁকে ধরে রাখবার উপায় করো।'

সার্বভৌম রামানন্দকে নিয়ে প্রভু সকাশে উপস্থিত হল। বললে, 'এখুনি যাবে কী ? কার্তিক মাসে যেও। আবার একবার রথযাত্রা দেখ।'

কার্তিক এলে পরে বললে, 'এখন দারুণ শীত। দোলযাত্রা দেখে যাও।'

আজ নয় কাল এ মাস নয় ও মাস এই বলে নিবৃত্ত করতে লাগল। কী করে যেতে দিই, বিচ্ছেদক্লেশ সইব কী করে ?

যদিও প্রভু সর্বস্বাধীন তবু ভক্ত-ইচ্ছা ছাড়া চলতে পারেন না। 'ভক্তগণে স্ফূর্তি আমি বাহিরে-অন্তরে' 'যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু—নহে নিবারণ। ভক্ত ইচ্ছা-বিনা-তবু না করে গমন ॥'

আবার বর্ষান্তরে রথের প্রাক্কালে গৌড়ীয় ভক্তেরা নীলাচলে যাবার মন করল। অদ্বৈতের ঘরে আবার মিলিত হল সকলে। নিত্যানন্দ বললে, 'আমিও যাব।' যদিও প্রভুর আদেশ গৌড়ে থেকে প্রেমভক্তি প্রকাশ করি, তবু এ যাত্রায় আবার তাঁকে একটু চোখে দেখবার আকাঙ্খা হচ্ছে। কিছুতেই যে ও প্রেম নিরোধ করতে পারি না।'

এও কি প্রেমভক্তির প্রকাশ নয়? 'নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে?'

আচার্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই সবাই বলল। চলল ঘোষেরা তিন ভাই, বাসুদেব মুরারি আর গোবিন্দ। প্রভুর জন্যে বিচিত্র ভক্ষ্যদ্রব্য দিয়ে প্যাঁটরা সাজিয়ে চলল রাঘবপণ্ডিত। পট্টডোরী নিয়ে কুলীনগ্রামের খানেরা। শ্রীখণ্ডের নরহরি আর রঘুনন্দন। শিবানন্দের উপর ব্যয়বহনের ভার, পথের তদারকি।

এবারে সঙ্গে বৈষ্ণব গৃহিণীরাও চলেছে। চলেছে অদ্বৈতের স্ত্রী, সীতাদেবী, চলেছে মালিনী শ্রীরামঘরনী। শিবানন্দও সস্ত্রীক চলেছে। আচার্যরত্নও তাই। প্রভুকে ভিক্ষা দেবার জন্যে প্রভুর নানা প্রিয় খাদ্য নিয়েছে সংগ্রহ করে।

ভক্তে-ভগবানে আবার মিলন হল। আবার চলল কীর্তনবিলাস। আগের মতই চলল গুণ্ডিচা-মন্দির-প্রক্ষালন, রথাগ্রনর্তন। হোরাপঞ্চমী লীলাদর্শন। আগের মতই আবার ঝুলন জন্মাষ্টমী বিজয়াদশমী, দেওয়ালি আর রাসযাত্রা।

চাতুর্মাস্যও কেটে গেল। নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভু নিভৃতে যুক্তি করতে বসলেন। বললেন, 'তোমার প্রতি বৎসর নীলাচলে আসবার কী দরকার? তুমি গৌড়ে থেকেই আচণ্ডাল হরিনাম বিতরণ করো এ আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার অভিপ্রেত কাজ, তুমি জানো, অন্যের পক্ষে দুষ্কর, শুধু তুমিই তা সম্পন্ন করতে পারো।'

নিত্যানন্দই মূল ভক্তিতত্ত্ব। নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া ভক্তি লাভ হবে না। 'নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।' 'হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই।'

নিত্যানন্দ বললে, 'প্রভু, তুমি প্রাণ আমি দেহ। দেহ আর প্রাণ কী করে আলাদা থাকে? তবে তোমার অচিন্ত্যশক্তিতে তাও সম্ভব। তাই তুমি যা করাবে তাই করব। আমার আবার স্বাতন্ত্র্য কোথায়?'

নিতাই আবার তাই গৌড়ে ফিরে চলল। ফিরে চলল আর সকলে।

কুলীনগ্রামীরা জিগগেস করলে, 'প্রভু, আমাদের কর্তব্য কী বলুন।'

'বলেছি তো, বৈষ্ণব সেবা আর নামসঙ্কীর্তন।'

'কিন্তু বৈষ্ণব কে?' আবার প্রশ্ন করল সত্যরাজ।

আগের বার সামান্য লক্ষণ বর্ণনা করেছিলেন এবার প্রভু বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করলেন। আগের বার বলেছিলেন যার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শোনা যায় সেই বৈষ্ণব। এবার বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠের খোঁজ নাও। যে নিরর্গল কৃষ্ণনাম বলছে সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।

'কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥'

আবার বর্ষান্তরে তাঁকে যখন এই প্রশ্নই করা হল, তিনি বললেন, এবার বৈষ্ণব প্রধানের খোঁজ নাও। যাকে দেখামাত্রই মুখে কৃষ্ণনাম এসে পড়ে সেই বৈষ্ণব প্রধান।

'যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥'

বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, বৈষ্ণবতম। যার মুখে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় সে বৈষ্ণব, যার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হচ্ছে সে বৈষ্ণবতর, আর যাকে দেখলেই অন্যের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় সে বৈষ্ণবতম।

শুধু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি থেকে গেল প্রভুর সঙ্গে।

ওড়নিষষ্ঠীতে জগন্নাথকে যে নববস্ত্র দেওয়া হল তা ধোয়া নয়, কোরা-মাড়-দেওয়া। তা দেখে বিদ্যানিধির মন বিগড়ে গেল। মাড়-দেওয়া কাপড় হাতে ধরলেও হাত অপবিত্র হয় তাই জগন্নাথের সেবকেরা দিল জগন্নাথকে? এ কী অন্যায় কথা।

রাত্রে স্বপ্ন দেখল বিদ্যানিধি। দেখল জগন্নাথ আর বলরাম দু'জনে তাকে প্রচণ্ড চড় মারছে। আমার কী অপরাধ? তোমার অপরাধের অন্ত নেই। আমার মণ্ডবস্ত্রে তুমি দোষদৃষ্টি দিয়েছ। আমার আবার জাত কী! আমার সেবকের আবার জাত কী! কোথায় আমাদের আচার-অনাচার!

যত মার খাচ্ছে ততই যেন আরাম পাচ্ছে বিদ্যানিধি।

প্রভুকে সব ব্যক্ত করতে প্রভু বললেন, 'তোমাকে অনুগ্রহ করবার জন্যেই এই শাস্তিবিধান।'

কিন্তু আর কত আমাকে নীলাচলে ধরে রাখবে?

আরো এক বৎসর তো চলে গেল।

এবার যাবই বৃন্দাবন। আর বৃন্দাবনে যেতে হলে আমায় গৌড়দেশ দিয়েই যেতে হবে। গৌড়দেশে আমার দুই আকর্ষণ—জননী আর জাহ্নবী। দুই করুণাস্রোত। দুই স্নেহাশ্রয়। [ক্রমশ।

রহস্যরাজ হিচকক

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

"ট্যাক্স" ছবিটির তখন নির্মাণকার্য চলছে। একটি অভিনয় প্রয়াসী মেয়ের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষা শেষ হল, কর্মকর্তাদের একজন ঘোষণা করলেন—হবে না। মেয়েটির মধ্যে "রোম্যান্টিক অ্যাপিল" নেই একেবারে। "হাই মুন" ছবিটি তখনও মুক্তিলাভ করে নি। মেয়েটি কি ব্যর্থই হয়ে গেল? তাকে সরে যেতে হল চলচ্চিত্র জগত থেকে? চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্বাক্ষর কি তার তা হলে পড়ল না? কিন্তু শেষ অবধি তা হল না। হিচকক তাকে ডেকে নিলেন, সাদরে গ্রহণ করলেন ভগ্নোদ্যম, ব্যথাহত, আশাহীন সেই মেয়েটিকে হিচকক তখন ওয়ার্নারের হয়ে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ছবি "ডায়াল এম ফর মার্ডার" নির্মাণে ব্যস্ত। সেই ছবির জন্যে মেয়েটিকে নির্বাচিতা করলেন। তাঁর পরবর্তী আরও দু'খানি জগদ্বন্দিত ছবি "টু ক্যাচ এ থিফ" এবং "রেয়ার উইণ্ডো"-তেও মেয়েটিকে সুযোগ দিলেন। তিনখানি ছবির মাধ্যমে মেয়েটিও সারা জগতের বিপুল প্রশংসা ও সাধুবাদে ভরে উঠল, সে প্রমাণ করল হিচককের নির্বাচন ভ্রান্ত নয়, প্রতিষ্ঠা করল হিচককের দূরদর্শিতা, প্রায় ফিরে যাওয়া একটি ব্যর্থ মেয়েকে যেভাবে তিনি সারা জগতের অপরিসীম অভিনন্দন লাভের সুযোগ দিলেন সেই অনুসারে তাঁকে মেয়েটির আবিষ্কর্তা অনায়াসে বলা চলে। মেয়েটির নাম গ্রেস কেলি (জন্ম ১৯২৮)। অনেক ছবির মধ্যে তাঁর অভিনয় প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া গেছে। হলিউডের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী আজ মোনাকো রাজ্যের অধিশ্বরী।

নিজের কাহিনী সম্পর্কে হিচকক স্বীকার করেছেন যে তাঁর কাহিনীগুলির মধ্যে যুক্তির খুব একটা যোগ নেই। ব্যাখ্যামূলক ঘটনাগুলি অনুপস্থিত, চরিত্রগুলি যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় তারপর এক অভাবিত কেন্দ্রে সব কিছু গিয়ে মিলে যায়। হিচকক সকল রহস্য সমাধানের বিরোধী। তাঁর মতে রহস্যের জাল সৃষ্টি করা নির্মাতার কাজ, কিন্তু তার গ্রন্থিমোচনের কাজ শুধু নির্মাতার একলার নয়, দর্শকদেরও। তিনি বলেন দর্শকদেরও একটা করণীয় কাজ আছে। সেই কাজটাই তারা করুক তা ছাড়া রহস্যচিত্রের রহস্যের যবনিকা উন্মোচনে রহস্যের আমেজটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। নির্মাতাই যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেকটি রহস্যের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেন তা হলে এই রহস্যজাল ঘনীভূত করার কারণটাই বা কি ছিল? না করলেই তো হোত। এইভাবে তিনি দর্শকদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলির জাগরণে এবং বুদ্ধিবৃত্তির যথোপযুক্ত বিকাশে সহায়তা করে থাকেন বললে অত্যুক্তি হয় না। চলচ্চিত্রে তিনি "ওয়ান ম্যান আর্টফর্ম" ভাবধারায় বিশ্বাসী। এই নীতি তিনি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করে চলেন। তাঁর মতে একজনের পরিচালনা আর অন্যজনের চিত্রনাট্য এ চলতেই পারে না। আমার ছবিতে আমি কি দেখাব বা না দেখাব, কি ভাবে আমি তাকে রূপ দেব কোন আঙ্গিকে আমি কাহিনীবিন্যাস করে আমার বক্তব্য কি ভাবে প্রকাশ করব, অন্যজনের পক্ষে সেটা জানা সম্ভব নয় আমার মনের চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে আসা সম্ভব নয়। পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার ভিন্ন ব্যক্তি এই জন্যেই হওয়া চলে না। এক ছবিতে দুই চিন্তাধারায় সঙ্ঘর্ষ বাধবে যে।

হিচককের সারা জীবনের আলেখ্য অনুসরণ করলে তাঁর সবৈব বিশ্লেষণ করলে, তাঁর ভাবধারার সূক্ষ্ম বিচার করলে আপনি তাঁর মধ্যে তিনজনকে দেখতে পাবেন—শার্লক হোমস, ফলস্টাফ এবং হারুণ অল-রশীদ। এক হিচককের মধ্যে এই তিনজনের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

বিচিত্র মানুষ হিচকক। রহস্যসন্ধানী, রহস্যের দিশারী, রহস্যস্রষ্টা এই দিকপাল মানুষটির জীবনে কতগুলো হাস্যকর উপকরণও আছে। মানুষটির কতকগুলি অদ্ভুত স্বভাব ছিল, সচরাচর যার তুলনা মেলা ভার—দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'একটি এখানে লিপিবদ্ধ করলে মনে হয় হিচককের জীবনের সব কটি দিকই আলোকিত হবে। হিচককে চা খাওয়ান একটি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ছিল। খুব চেঁচামেচি করতেন? প্রত্যাখ্যান করতেন? নানাপ্রকার বায়না করতেন? মোটেই না—সুবোধ বালকের মত চা-টি খেয়ে ফেলতেন—তবে হাঙ্গামা কিসের? বলছি—চায়ের সঙ্গে পেয়ালাটারও মায়া ত্যাগ করতে হোত—মানে? পেয়ালাটা কি হিচকক বাড়ী নিয়ে যেতেন—কি মুস্কিল? তা কেন নিয়ে যাবেন? তাঁর বাড়ীতে কি পেয়ালা নেই? তবে? চা খাওয়া শেষ হলেই পিছন দিক দিয়ে পেয়ালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেন—তা হ'লেই বুঝুন তাঁকে চা খাওয়ান হাঙ্গামা কি না।

শর্মিলা ঠাকুর—ছায়াছবির বাইরে

আর একটি হাস্যকর ব্যাপার ছিল যেখানে সেখানে যে কোন অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। এ এক সাধনা ছাড়া কি? খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেও কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ বেমালুম জাগরণের দেশ থেকে তিনি সুপ্তির দেশে পৌঁছে যেতে পারতেন। গতিবাদের জয় ছাড়া আর কি? এক বিখ্যাত প্রযোজক তাঁর সম্মানার্থে ভোজসভা আহূত করেছেন। কফি পরিবেশিত ৩০।। আগেই মাননীয় প্রধান অতিথির নাসিকাধ্বনি ভোজসভাকে মাতিয়ে তোলে। এই ঘন ঘন নিদ্রার কারণ না কি দৈহিক স্থূলতা, দেহের ওজন এক শো পাউণ্ড কমানোর পর দেখা গেছে এই অদ্ভুত অভ্যাসটি বহুল পরিমাণে কমে গেছে।

পশ্চিম থেকে দুই প্রতিভা রহস্যকে উপজীব্য করে দেশের এবং বিদেশের কোটি কোটি মানুষের মন ভরিয়ে চলেছেন। সাহিত্যের মাধ্যমে অ্যাগাথা ক্রিষ্টি এবং ছায়াছবির মাধ্যমে অ্যালফ্রেড হিচকক।

বাংলা চলচ্চিত্রের জীবন সমস্যা

খগেন রায়

যেন অনেকটা নাটকীয় ভাবে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের আধুনিকতম দুর্দশার কাহিনী প্রচারিত হতে সুরু হয়েছে। পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এই দুঃখের আখ্যায়িকার প্রচার প্রতিদিন তীব্রতর হচ্ছে এবং রাজ্য সরকারের কানে এই কথাটাই বারবার প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্প আজ মুমূর্ষু। জনসাধারণও শুনে কম বিস্মিত হচ্ছেন না।

প্রাণস্পন্দন যে প্রতি মুহূর্তে ক্ষীণতর হচ্ছে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিছুদিন আগে সরকারী দফতরখানায় যে আলোচনা সভা বসেছিল সেখানে এই শিল্পের দেহে যে মারাত্মক রক্তস্বল্পতা বা চিকিৎসা শাস্ত্রে যাকে বলে পারনিসাস্ এ্যানিমিয়া রোগে ভুগছে সেকথা খুব আবেগ ভরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য জানানোটা ছিল গৌণ উদ্দেশ্য। প্রধান লক্ষ্য ছিল—এই রোগের আশু চিকিৎসা, যদি সরকার পুরোপুরি চিকিৎসক হতে রাজী হন। হবেন কিনা সন্দেহ!

সত্যই আমাদের অবস্থা দুঃসহ। আমাদের মধ্যে বারো আনা অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলাকুশলী, পরিচালক, গীত-শিল্পীর কাজ নেই—তাঁরা কাজের সন্ধানে এ-দরজা, ও-দরজা করে বেড়াচ্ছেন। সব চেয়ে মর্মান্তিক কথা এই কর্মহীনতা, এই দারিদ্র্য, এই হাহাকার সার্বজনীন বা সর্বাত্মক নয়। সাড়ে চোদ্দ আনা প্রদর্শক, দুই বা তিন আনা অভিনয়শিল্পী ও এক আনা চিত্রকুশলী—যার মধ্যে পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী, সম্পাদক প্রভৃতি আছেন—এই অপরিসীম বঞ্চনা থেকে মুক্ত। এর ছোঁয়াচ পর্যন্ত তাঁদের লাগে না। তাহলে দোষ কি তাদের, যারা বিভূতিসম্পন্ন হয়ে এই ব্যবসাটিকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, সেখান থেকে আপাত দৃষ্টিতে এর রূপান্তর গ্রহণ করবার সম্ভাবনা নেই। তবে কি বলব শিল্পের এই বিপাক নেহাতই আকস্মিক, না ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিত ভাবে এই অবস্থায় সব জিনিষটাকে এনে দাঁড় করানো হয়েছে? আর আজকে যারা অসহায় শিশুর মত হাহাকার করছেন তাদের হাত কতখানি মালিন্যমুক্ত? যে অর্থনৈতিক স্ফীতাবস্থার চাপে আজ তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে চলেছেন, সেই অবস্থা সৃষ্টির জন্য অজ্ঞাত ভাবে বা সজ্ঞানে তারা কতটা দায়ী?

আজ ধীর মস্তিষ্কে গোটা পরিস্থিতিটার বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। আজ যারা সম্পদশীলতার তুঙ্গে দাঁড়িয়ে সদম্ভে বলছেন—না, আপনাদের অসুখটা ব্যাধিকল্পনা মাত্র। আসলে আপনাদের কিছুই হয়নি এবং স্থিতাবস্থাটাই একমাত্র পথ, শুধু তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে নিবেদন করলেই চলবে না। আত্মানুসন্ধানও করতে হবে আত্মবিশ্লেষণ করে নিজের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, আমি আমার অবস্থার জন্য কতখানি দায়ী।

গত তিন চার বছর ধরে যে লজ্জাকর অবস্থা চলে আসছে, আমরা কলাকুশলীবৃন্দ বা প্রযোজক সমাজ বা সাধারণ অভিনেতারা তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিনি। অনেক আর্টিষ্টকে "কালো টাকা" দেওয়া হয়, এর প্রমাণ আমাদের কাছে নেই—যেমন প্রমাণ পান না আয়কর বিভাগ। কিন্তু একরকম প্রমাণ আছে যেটা পাওয়া যায় circumstantial evidence-এর মাধ্যমে, ব্লাক মানি কথাটা আমাদের অজানা ছিল না। কিন্তু প্রযোজক সমাজ এই ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব দেননি। উলটে, কে আগে অমুক আর্টিষ্টকে গুরুতর টাকার থলি দিয়ে হাত করে ধন্য হবেন, তাই নিয়ে নিজের মধ্যে নোংরা প্রতিযোগিতা করেছেন। পরিচালকদের অনেকের কথা নাই বললাম। ব্লাক মানির যোগসূত্র হিসাবে অনেক রথী-মহারথীর রেকর্ড অন্তত তাদের মনের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে। কলাকুশলীরা যদি দৃঢ় হতেন তবে এই কালোবাজারী ব্যাপার বন্ধ করতে মাত্র একদিন লাগতো। তারাও নিজেদের মধ্যে নীরব প্রতিযোগিতা করে কে আগামী বড় ছবিটার কাজ পাবেন তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। সামগ্রিক ভাবে চিন্তার অবসর ছিল না।

সিনে ফিল্মসের 'বর্ণচোরা' ছবিতে—সন্ধ্যা রায়

"হাউস প্রোটেকসন" খারাপ, "হোল্ড-ওভার" প্রথা ও নিন্দনীয়। কিন্তু যখন চিত্রপ্রদর্শক বলেন, "আপনাদের অভিনয় শিল্পীদের দেবার মত লাখ-লাখ টাকা আছে, আমাদের প্রোটেকসন, হোল্ড-ওভারটাই কি একমাত্র বাধা?" তখন তাদের কথা নির্ভুল না জেনেও আমরা কি যুক্তি দেখাব? আজকে যারা চিত্রপ্রদর্শকের যুক্তিহীন প্রোটেকসন, হোল্ড-ওভারের কথা বলছেন তাদের মধ্যে কালোবাজারী আর্টিষ্ট নিয়ে ছবি তোলবার প্রচেষ্টা কি স্তব্ধ হয়েছে না এক সুন্দর দ্বিমুখী নীতি অনুধাবন করে চলেছেন তারা? ভাবের ঘরে চুরি সবচেয়ে নিন্দনীয় নয় কি?

আমার ধারণা বাধ্যতামূলক ভাবে প্রোটেকসন, ও হোল্ড-ওভার বন্ধ করা খুব সহজ হবে না। সেটা বুঝতে পেরেই বোধ হয় নতুন নতুন সিনেমা ভবন নির্মাণের সাহায্যে একটু বাঁকা পথে এগুলির নিরসন করবার কথা উঠেছে। আমাদের এগুতে হবে **by the path of least resistance.**

বাঁচবার পথ আছে এবং সেটা একমাত্র সিনেমা ভবনের সংখ্যা বাড়ানো নয়। বাঁচবার উপায়—সমবায়িক প্রথায় চাহিদার আনুপাতিক সংখ্যক ছবি তৈরী করা। চাহিদা ও জোগান্ যদি পারস্পরিক সমতা রক্ষা না করে চলে তবে বিপদ দেখা দেবে। মনে রাখতে হবে বছরে চল্লিশখানা বাংলা ছবির দরকার হলে আমরা উনচল্লিশখানা করব, কিন্তু একচল্লিশখানা করব না। ছবির সংখ্যা প্রয়োজনের অধিক হলেই "প্রোটেকসন" দংষ্ট্রা বিস্তার করে আমাদের শুধু ভয় দেখাবে না ক্ষত বিক্ষত করবে। যদি ছবির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয় আরো ভাল। সিনেমা গৃহের সংখ্যা বাড়ালে বেকারের সংখ্যাও বাড়বার আশংকা দেখা দিতে পারে। অবশ্য বেকারের সংখ্যা যোগবিয়োগ করে নাও বাড়তে পারে। কিন্তু কম ছবি তুললে—অবশ্য সাময়িক ভাবে—প্রযোজকদের **bargaining power** নিশ্চয় বাড়বে। নতুন সিনেমা তৈরী না করে যদি **quota** বেঁধে দেওয়া যায় যে আবশ্যিক ভাবে বছরে দশ বারো সপ্তাহ পশ্চিম বাংলার প্রতি সিনেমাগৃহকে বাংলা ছবি দেখাতে হবে, তবে নিঃসন্দেহে বাংলা ছবির প্রদর্শনক্ষেত্রের পরিধি বাড়ে? যতদূর মনে হয় পশ্চিমবংগ সরকার এই সম্ভাব্যতার কথা গভীর ভাবে চিন্তা করছেন। পশ্চিমবাংলার বুকের ওপর কলকাতার অন্তত পঁচিশটি চিত্রগৃহে, লিলুয়া, রিষড়া, জগদ্দল, বারাকপুর (আংশিকভাবে) প্রভৃতি স্থানে বাংলা ছবি কিছুতেই দেখানো চলে না। বাংলা ছবি সে সব জায়গায় "নিজ বাসভূমে পরবাসী।" এই সুন্দর অত্যাচারটি বহুদিন ধরে চলে আসছে।

আর একটি জিনিষের প্রচলন এখনই দরকার। সেটা হচ্ছে অভিনয় শিল্পীর পারিশ্রমিকের উচ্চতম অংক নির্ধারণ করে প্রযোজক সমাজের পক্ষে সেটাকে বাধ্যতামূলক করা। অবশ্য এই **ceiling** বেঁধে দেবেন প্রযোজকদের প্রতিষ্ঠান—ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েশন। আমেরিকার আয়ের **ceiling** নেই কিন্তু জাপানের চলচ্চিত্র-শিল্পীর ক্ষেত্রে আছে। জাপান বাংলা দেশের চেয়ে অন্তত বিশগুণ সমৃদ্ধ। তবে আমরা পারব না কেন? অনেক প্রযোজক এই ব্যাপারে নৈরাশ্যবাদী। তারা বলেন, "দেখবেন, আমরাই গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করব।" আমি বলি এই ভয়টা অমূলক। সিলিং বেঁধে দিলে দেখা যাবে চার-পাঁচ জন শিল্পীকে আর ছবিতে দেখা যাচ্ছে না। প্রযোজক সমাজ যদি দৃঢ় থাকেন তবে দেখা যাবে ছয় মাসের মধ্যে "তোমাদের দামে কিনব" বলে কেউ কেউ এগিয়ে আসবেন। পরিবেশক ও প্রদর্শকের যুক্তি অমুক আর্টিষ্ট না থাকলে ছবি চলবে না। ওটা বাজে কথা। আসল কথা, যদি জুজু আসে, এই ভয়েই এদিক দিয়ে আজ পর্যন্ত চেষ্টা হয়নি। আলোচনা উঠতে না উঠতে চাপা পড়ে গেছে। যদি আমরা বাঁচবার চেষ্টা করি আমরা বাঁচবই। আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে হয়—এটা মহাকবির নির্দেশ। নিজের অঙ্গে সেই সঞ্জীবনীর আঘাত আমাদের করতে হবে। হাউস প্রোটেকসন আমাদের মূল সমস্যা নয়—মূল সমস্যা আমাদের শৈথিল্য, আমাদের প্রতিকার অভাব।

চিত্রবাহার নিবেদিত "মউঝরি" ছবিতে দীপিকা দাস এবং দিলীপ রায়

দাদাঠাকুর

* * * বোধ হয় শুনেছেন যে জালান কোম্পানী "দাদাঠাকুর" নিয়ে ফিল্ম করেছেন। যাঁরা ফিল্ম দেখেছেন, এসে যা বললেন শুনে লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। নলিনীকান্তের বই দাদাঠাকুরকে হত্যা করে এত মিথ্যা প্রক্ষেপ দিয়েছে যে খবরের কাগজে সমালোচনা দেখে মনে হয়—ভেজালের যুগে মিথ্যার আদর খুব। দাদাঠাকুরের নলচে, খোল দুই বদলেছে। দাদাঠাকুরকে একজন চরিত্রহীনের পতাকা উত্তোলনে, ইংরেজের গুলীতে প্রাণ দেওয়ায় যে দাদাঠাকুর পুত্র শোকে কাঁদে নাই তারও চোখে জল এনেছে। দর্পনারায়ণ, লতা সব কল্পিত। সুভাষচন্দ্রের ফেরীওয়ালা দাদাঠাকুরের পাশে এসে দাঁড়ানো মিথ্যা কথা। সুভাষচন্দ্র বিদুষকের সময় মান্দালয় জেলে। দাদাঠাকুরকে এরা দর্শকের অর্থ লুটবার জন্য পেটেন্ট ঔষধ আবিষ্কার করেছে। জীবিত লোক মিথ্যা সিনেমার জন্য মামলা করতে পারে, তবে জালান ধনী, দাদাঠাকুর কাতর ধ্বনি ছাড়া কি করবে? * * *—শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সাধারণ মানুষের মিছিলে মাঝে মাঝে সাধারণেরই বেশে এমন এক-একজন অসাধারণ মানুষের সন্ধান মেলে যাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে। বৈভব বলতে সচরাচর মূলত যা বোঝা যায় তার থেকে অনেক মহার্ঘ বৈভব এঁদের অধিকারভুক্ত—এই বৈভব এঁদের জন্মসূত্রে লব্ধ, ঈশ্বরদত্ত। সংখ্যায় এঁরা কম কিন্তু মহিমায় উজ্জ্বল। জীবনের এক-এক নতুন ভাষ্যের এঁরা মন্ত্রোদ্গাতা। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের স্থান এঁদেরই প্রথম সারিতে। এই বিরাশী বছর বয়স্ক বৃদ্ধ বঙ্গসন্তান বাঙলার এক অসামান্য সম্পদ। একদিকে অসাধারণ কবিত্ব শক্তি, দ্ব্যর্থ রচনায় অভূতপূর্ব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝর, অন্যদিকে অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তা, অটুট ব্যক্তিত্ব এবং তীব্র আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচেতনতা এই পরমাশ্চর্য মানুষটির মধ্যে এদের আশ্চর্য সম্মেলন তাঁকে এক অত্যাশ্চর্য গরিমায়, বিশেষ বৈশিষ্ট্যে এবং সর্বজনের শ্রদ্ধায় বিভূষিত করেছে। যে কোন আকস্মিকতার মধ্যে একাধিক ভাষায় কথা রচনা করে সঙ্গে সঙ্গে স্বরসহযোগে গান গাওয়া, বাক্যের নানাবিধ কুশলী ব্যবহারে বাক্যের প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটীর পর্যন্ত নগ্নগাত্রে নগ্নপদে মাথা উঁচু করে অবাধ গতিবিধি, সর্বোপরি এক অটুট ব্যক্তিত্ব সেই সঙ্গে কাঞ্চনকৌলিন্যের সঙ্গে কোনদিন হাত না মেলানো, শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের অর্থাৎ দাদাঠাকুরের আশ্চর্য জীবনপ্রকাশ।

এঁর অভূতপূর্ব জীবন ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। এঁর জীবনী অবলম্বনে চিত্র নির্মাণের সংবাদ আমাদের মধ্যে যে পরিমাণে আনন্দসঞ্চার করেছিল, মুক্তিপ্রাপ্ত সেই চিত্রটি আমাদের মনে ঠিক ততখানি হতাশার সৃষ্টি করেছে। ছবিতে কাল্পনিক কাহিনী ও ঘটনার সমাবেশে আসল চরিত্রটি হারিয়ে গেছে, কাল্পনিক কাহিনী আসল ঘটনার সঙ্গে সমান তাল রেখে চলতে পারে নি, পদে পদে তালভঙ্গ ঘটেছে এবং এই সমাবেশের ফলে মূল সুরটুকুও হারিয়ে গেছে আর সত্যের অপলাপে চরিত্রটির প্রতি অবিচার হয়েছে নিদারুণ, সর্বোপরি দর্শককুল হয়েছেন প্রতারিত।

দাদাঠাকুরের জীবনী শুনে যে আগ্রহ নিয়ে তাঁরা ছবিটি দেখতে গেছেন, প্রেক্ষাগৃহ থেকে তাঁরা ফিরেছেন নিরাশ হয়ে, এই ছবির মধ্যে এক অর্ধাংশ জুড়ে প্রেমোপাখ্যানের মর্মকথা শুনতে তাঁরা চাননি, মাতালের স্বদেশানুরাগ এই ছবির মধ্যে দেখার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের নেই, এই ছবিতে মাঠের 'পরে গান গেয়ে মিছিল দেখার আগ্রহ তাঁদের দ্বারা বিন্দুমাত্র অনুভূত হয়নি বরং তাঁরা এই ছবির মধ্যে দিয়ে দাদাঠাকুরের অসাধারণ জীবনালেখ্যের পূর্ণ প্রকাশ চেয়েছিলেন, তাঁর জীবনের যে সব বিশেষ বিশেষ ঘটনা, তাঁর অনবদ্য কৌতুকসমূহ তাঁর বিখ্যাত বিখ্যাত উক্তি ও রচনাসমূহ চিত্রের মধ্যে তাদেরই সমাবেশ ছিল দর্শকের অতি স্বাভাবিক এবং একমাত্র কাম্য। কিন্তু তাদের সমস্ত বাসনা নিষ্ফলতায় হল পর্যবসিত। এদেরই মধ্যে যে ক'টি সত্য ঘটনা স্থান পেয়েছে সেগুলির প্রদর্শনও ত্রুটিমুক্ত নয়। স্থান-কাল-ঘটনায় গোলমাল হয়ে গেছে এবটা ওর সঙ্গে, ওরটা তার সঙ্গে মিশে গিয়ে এক পরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

অভিনয়াংশে অসাধারণ দক্ষতার ছাপ রেখে গেলেন স্বর্গত নট ছবি বিশ্বাস। মহৎ সৃষ্টির ইতিহাসে রূপদীপ্ত শিল্পীর এই শেষ স্বাক্ষর। বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তরুণকুমার, বিশ্বজিৎ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, বিধায়ক ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, অমর মল্লিক, শিশির বটব্যাল, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শৈলেন গাঙ্গুলী, সুনীল বসু, অরুণ চৌধুরী, তমাল লাহিড়ী, মমতাজ আহমেদ, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী প্রভৃতি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়।

এই সমালোচনার প্রারম্ভে এই ছবিটির সম্বন্ধে স্বয়ং দাদা ঠাকুরের যে অভিমতটি উদ্ধৃত হল তা কবি শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর পত্র থেকে গৃহীত।

রক্তপলাশ

রহস্য এবং কৌতূহল—অপরাধপ্রধান কাহিনীর এই হল মুখ্য উপাদান। তাদের সুষ্ঠু সমন্বয়ে অপরাধমূলক কাহিনী উপভোগ্য হয়ে ওঠে, এদের অভাব কাহিনীতে ব্যর্থতা আনে। যে অপরাধধর্মী কাহিনীর মধ্যে রহস্য শিহরণ রোমাঞ্চের শূন্যতা প্রতীয়মান হয় সে ক্ষেত্রে তার স্বধর্ম বিচ্যুতি ঘটে। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে এখানে দর্শক এক অবিচ্ছিন্ন রহস্যের আস্বাদ গ্রহণেই উৎসুকচিত্ত।

এম-কে-জি প্রোডাকসন্সের নিবেদন "রক্তপলাশ" ছবিটির কাহিনী এক হত্যাপরাধকে উপজীব্য করে রূপ নিয়েছে। নির্মাতারা জানিয়েছেন যে এক বিদেশী গল্প থেকে এর আখ্যানবস্তু গ্রহণ করা হয়েছে। একটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নায়ক ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়ে, তার ফলে তার মধ্যে এক বিরাট আতঙ্ক দেখা দেয়, সেই আতঙ্ক ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং সে পলাতক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় এবং মূলে ভয়ই প্রধান। পুলিশও সেই সময়ে তাকেই খুঁজে

কণিকা মজুমদার—আপন গৃহকোণে

যেতাছে। নিহত ব্যক্তির বোনের সঙ্গে নায়ক প্রণয়পাশবদ্ধ। হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী একটিমাত্র বালক। বছর নয়-দশ তার বয়েস। তারই সাক্ষ্যে শেষে নায়ক মুক্তি পেল এবং এক মধুময় পরিণতির মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত হল।

কাহিনীটিকে যে ভাবে সাজানো হয়েছে তাতে তার রূপ দাঁড়িয়েছে একটি প্রণয়োপাখ্যান, একটি হত্যারহস্য তার আনুসঙ্গিক উপকরণ মাত্র। প্রণয় হয়ে উঠেছে মুখ্য হত্যারহস্য এখানে গৌণ। পার্শ্ব কাহিনী মাত্র। এর ফলে দর্শকের মনে রোমাঞ্চ রস দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। রহস্য বস্তুটির বিরাট অভাব ছবিটিকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছে। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনে এতটুকু বিহ্বলতা আসে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ছবিটির মধ্যে নানাবিধ গুণের সমাবেশ ঘটেছে, ছবিটির মানবিক আবেদন দর্শকের মনে রেখাপাত করে। ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব ছবিটির মধ্যে যথাযথ রূপ পেয়েছে। কিন্তু, অপরাধ কাহিনীর আসল বস্তুটিই নেই। চরম মুহূর্তেও যখন দর্শক ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে এক কোন বিরাট অজ্ঞাত রহস্যের বহু প্রতীক্ষিত উন্মোচনের, সেখানে তাকে নিদারুণ ভাবে হতাশ হতে হয়। অথচ এই অভাবগুলি পূর্ণ করবার অফুরন্ত সুযোগ কাহিনীর মধ্যে ছিল।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায় এবং সুরযোজনা করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অভিনয়াংশে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছে শ্রীমান বাসুদেব। তার অভিনয় ছবিটির প্রাণস্বরূপ। তার অভিব্যক্তি ও প্রকাশভঙ্গী বিশেষ অভিনন্দনের দাবী রাখে। নায়কবেশী অনিল চট্টোপাধ্যায়, নায়িকারূপিনী সন্ধ্যা রায় এবং পুলিশ অফিসার রূপী কমল মিত্র অভিনয়ে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিপিন গুপ্ত, জীবেন বসু, মিহির ভট্টাচার্য, দীপক মুখোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় উৎপল দত্ত, নিরঞ্জন রায়, বীরেশ্বর সেন, শিশির বটব্যাল, জহর রায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, রেণুকা রায় এবং প্রবীণ অভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি-জি) মহাশয়ের অভিনয়ও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

সংবাদ-বিচিত্রা

ভারতের বলদৃপ্তসত্তার মূর্তিমান বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতাব্দীর শুভমুহূর্ত আগত প্রায়। স্বামীজীর পবিত্র শতবার্ষিকী পালন জাতির অবশ্য পালনীয় পুণ্য কর্তব্য। এই পবিত্র অনুষ্ঠান অবশ্যই যথোচিত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে পালনীয়। এই নবভারতের অন্যতম রূপকার, ভারত জননীর এই তপপ্রদীপ্ত সন্তান, যুগবিধায়ক শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রের জন্মোৎসব প্রস্তুতির ব্যাপক ও বিরাট আয়োজন দিকে দিকে শুরু হয়ে গিয়েছে, মহা সমারোহের মধ্যে এই প্রচেষ্টা রূপ নিতে চলেছে। এই উপলক্ষে বিবেকানন্দ সম্পর্কিত ছায়াচিত্রের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনের ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হয়েছেন বলে জানা গেল, এই জীবনীচিত্রটি বিখ্যাত পরিচালক মধু বসুর পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ছবিটি মুক্তি পাবে আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সাধু সঙ্কল্প নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং প্রার্থনা করি এই ছবিটিও সর্বাঙ্গসুন্দর হোক।

মৃণাল সেনের "অবশেষে" চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি মনোরঞ্জন ঘোষের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম দিকপাল শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল চলচ্চিত্রের সেবা করে এ জগতে এক গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত হতে সমর্থ হয়েছেন। চলচ্চিত্রের উন্নয়নে তাঁর অবদান যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বিরাট। বেঙ্গল মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতির আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হ'ল তাঁর মত অভিজ্ঞজন তা সগৌরবে পালন করবেন, এ আশা আমরা রাখি।

হেমন্তকুমারের প্রযোজনায় নির্মিত "বিশ সাল বাদ" ছবিখানি দর্শক সমাজে যে কি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করছে সে বিষয়ে আশা করি কেউই অনবগত নন। এই ছবি হেমন্তকুমারকে যে সর্বের সাফল্য এনে দিয়েছে তা বাঙালীমাত্রকেই যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দিত করবে। চিত্র নির্মাণে হেমন্তকুমারের এই অভাবনীয় সাফল্য বাঙলাদেশের গর্বের বিষয়। এই বিরাট সাফল্যের স্মারক হিসেবে গীতাঞ্জলি পিকচার্সের প্রতিটি স্থায়ী কর্মীর উদ্দেশে তিন মাসের বোনাস এবং ইম্পিরিয়াল সিনেমার কর্মীদের এক মাসের বোনাস হেমন্তকুমার ঘোষণা করেছেন, তা ছাড়া এই সাফল্যের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ হেমন্তকুমার এই চিত্র সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সভ্যকে একটি করে বৈদ্যুতিক ঘড়ি উপহার দিয়েছেন।

করুণাঘন ভগবান বুদ্ধের ত্যাগোজ্জ্বল প্রেমঘন জীবনের চলচ্চিত্র রূপ দিতে আটত্রিশ বৎসর বয়স্ক মার্কিণ প্রযোজক রবার্ট ব্র্যাডফোর্ড উদ্যোগী হয়েছেন। লণ্ডন থেকে ঘোষিত হয়েছে যে আগামী জানুয়ারী মাসে তিনি ভারতে আসবেন এবং এখানকার রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে অনুমতি, সহযোগিতা এবং সুযোগ সুবিধা প্রার্থনা করবেন। সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন যে এই কাজে ভারতীয় মুদ্রায় তাঁর চার কোটি টাকা ব্যয় হবে। কয়েকজন প্রধান ভারতীয় শিল্পী এতে অংশ গ্রহণ করবেন। কয়েকজন কুশলীও এতে যুক্ত থাকবেন এবং ছবিটি সম্পূর্ণরূপে ভারতেই গ্রহণ করা হবে। চিত্রনাট্য রচনা এখন সবে শুরু হয়েছে। ভূমিকালিপি বণ্টন হয় নি। ১৯৬৩ সালের শেষ ভাগের আগে স্যুটিং শুরু করতে পারবেন বলে ব্র্যাডফোর্ডের মনে হয় না। তাঁর এই বিরাট পরিকল্পনা পরিপূর্ণরূপে সার্থকতা লাভ করে দিব্য ভারতের প্রেমের বাণী, মৈত্রীর বাণী, শান্তির বাণী এই লোভ, হিংসা আর বিদ্বেষের দিনে আবার নতুন করে বিশ্বের ঘরে ঘরে প্রচারিত হোক, এই কামনাই করি।

যে সব ছবিতে অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ভাবধারা অপমানজনক ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে সেই সব ছবির প্রদর্শন সিংহল সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বিদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখাই সিংহল সরকারের বিশেষ কাম্য। এই বন্ধুত্ব তাঁরা যথেষ্ট মূল্যবান বলে মনে করেন এবং তা তাঁরা নষ্ট করতে চান না। এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক দপ্তর ফিল্ম সেন্সরের সহযোগে। দেশে বিদেশী ছবির আমদানী তাঁরা অবশ্যই বন্ধ করবেন না তবে তাঁদের এই কীর্তি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি অবশ্যই থাকবে।

শর্মিলা ঠাকুর—গৃহকক্ষে

প্রসিদ্ধ অভিনেতা চার্লস লটন (৬৪) বর্তমানে গুরুতররূপে পীড়িত হয়ে পড়েছেন। তিনি কর্কটরোগে আক্রান্ত। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আছে। ঈশ্বর এই প্রতিভাধর শিল্পীর জীবন রক্ষা করুন।

রোম থেকে সংবাদ এসেছে যে নির্মীয়মান হাস্যরসাশ্রিত ছবি "পিঙ্ক প্যান্থার"-এ অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিতা হয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাতা অভিনেত্রী এভা গার্ডনার (৪৪) কিন্তু হঠাৎ কর্তৃপক্ষ এক নিদারুণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এভার সঙ্গে তাঁদের সমস্ত চুক্তি তাঁরা বাতিল করে দিয়েছেন, এমন কি এভার নাম এখন তাঁদের শিল্পী তালিকার মধ্যেও নেই। এভার জন্যে নির্ধারিত ভূমিকাটি দেওয়া হয়েছে সুদর্শনা অভিনেত্রী কাপুসাইনকে। এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে যে এলিজাবেথ টেলারকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলি এভা চেয়েছিলেন। নির্ধারিত বেতন ব্যতীত একটি গাড়ী, দিবারাত্রির জন্যে একজন চালক বিনা ভাড়ায় একটি ভিলা, একজন একান্ত সচিব এবং একজন কেশ পরিচর্যাকর—এভার এই চাহিদা মেটানো নির্মাতাদের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় তাঁরা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। আরও জানা গেছে বিখ্যাত শিল্পী পিটার উস্টিনোভও এই ছবিতে অভিনয়ের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু সে চুক্তিও নাকি বাতিল হয়ে গেছে।

প্যারিস থেকে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন (২৯) এবং তাঁর স্বামী বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা কার্লো পন্টি ফ্রান্সের নাগরিকত্ব গ্রহণে বিশেষ ইচ্ছুক। এই মর্মে তাঁরা যথাস্থানে আবেদন জানানোর পরিকল্পনা করছেন।

প্রখ্যাতনামা অভিনেত্রী জিনী ক্রেণ (৩৮) ইয়োরোপ থেকে প্রচুর

বিকাশ রায়—ছায়াছবির বাইরে

শ্রীমতী মঞ্জু দে—ছায়াছবির বাইরে

অভিনয়ের আমন্ত্রণ পাচ্ছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একটি আমন্ত্রণও তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না। এর কারণ প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিককে তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর স্বামী পল ব্রিক্সম্যান একজন সফল ব্যবসায়ী, ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় তিনি এখন ক্রমেই বিপুল সার্থকতা অর্জন করে চলেছেন। কাজেই এ অবস্থায় বিদেশের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা জিনীর পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না, কারণ এ সময়ে ব্রিক্সম্যান স্ত্রীর সঙ্গে বাইরে চলে গেলে তাঁর ব্যবসায়ের এই ব্যাপক জয়যাত্রা নানা ভাবে ব্যাহত হবে।

সৌখীন সমাচার

দ্বি অমর নাটক "সাজাহান" মঞ্চস্থ করলেন শিল্পীচক্রের সদস্যরা মণি গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। চরিত্রায়ণে ছিলেন গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিতোষ বসু, চন্দন চক্রবর্তী মহীতোষ মজুমদার, মনীষা রায়, রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। * * * ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের "চক্র" নাটকটি অভিনয় করলেন ইনস্পেক্টরেট এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশান ক্লাব। চরিত্রগুলির রূপদান করেন গোপাল ভট্টাচার্য, অজিত সরকার, ভবানী চট্টোপাধ্যায়, মালতী চৌধুরী, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। নির্দেশনার ভার নেন প্রণব রায়। * * * গরলগাছা ষ্টুডেন্টস ক্লাব মঞ্চস্থ করলেন অরুণকুমার দের "কার দোষে"। হারাধন মান্নার পরিচালনায় বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব নন্দী, গোপাল সেনাপতি, শঙ্করনাথ নন্দী, দেবব্রত মান্না, চণ্ডীদাস ঘোষ, সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ মান্না, জয়দেব ঘোষাল, বংশী অধিকারী, সন্তোষ পল্লে, নিমাই পান এবং হারাধন মান্না।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত আলোকচিত্রসমূহ সর্বশ্রী মোনা চৌধুরী, জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত নন্দী, শ্যাম মণ্ডল কর্তৃক বিশেষ ভাবে মাসিক বসুমতীর জন্য গৃহীত।

কার্ত্তিক, ১৩৬৯ (অক্টোবর-নভেম্বর, '৬২)

অন্তর্দেশীয়—

১লা কার্ত্তিক (১৮ই অক্টোবর) : চীনা আক্রমণজনিত সর্ব্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লীতে উচ্চপর্য্যায়ে বৈঠক—শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) স্পষ্ট ঘোষণা : যে-কোন মূল্যে ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব ও মর্য্যাদা বজায় রাখা হইবে।

২রা কার্ত্তিক (১৯শে অক্টোবর) : ভারতীয় জওয়ানদের আঘাতে ঢোলা অঞ্চল হইতে চীনা ফৌজ বিতাড়িত—লংজু হইতেও চীনাদের পশ্চাদপসরণ।

৩রা কার্ত্তিক (২০শে অক্টোবর) : সীমান্তবর্তী নেফা ও লাডাক অঞ্চলে চীনাবাহিনীর অকস্মাৎ প্রচণ্ড আক্রমণ—নেফায় ঢোলা ও খিঞ্জেমানে ঘাঁটি এবং লাডাক এলাকায় দুইটি ঘাঁটি পতনের সংবাদ।

৪ঠা কার্ত্তিক (২১শে অক্টোবর) : লাডাকে আরও দুইটি ঘাঁটির পতন—চীনা হানাদারদের ভারী ভারী কামান ও মর্টার ব্যবহার।

৫ই কার্ত্তিক (২২শে অক্টোবর) : নেফা অঞ্চলে প্রচণ্ড লড়াই—নূতন ব্যূহ সজ্জার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের কয়েকটি ঘাঁটি ত্যাগ।

৬ই কার্ত্তিক (২৩শে অক্টোবর) : তাওয়াং-এর দিকে দিকে চীনাদের হিংস্র অভিযান—ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম।

'আক্রমণ প্রত্যাহার না করিলে চীনের সহিত আলোচনা সম্ভব নহে'—রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের নিকট শ্রীনেহরুর (ভারত) লিপি।

৭ই কার্ত্তিক (২৪শে অক্টোবর) : মীমাংসা-আলোচনার নামে চীনের তিন দফা কপট প্রস্তাব ভারত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান—ভারতের সর্ত্ত : প্রথমে চীনা ফৌজকে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তারপর কথাবার্তা। ভারতীয় জওয়ানদের প্রচণ্ড লড়াইএর পর তাওয়াং ত্যাগ—লাডাকের চুসুলে চীনা আক্রমণ প্রতিহত।

৮ই কার্ত্তিক (২৫শে অক্টোবর) : প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা—নেফা অঞ্চলের সাময়িক বিপর্য্যয়ে হতাশার কারণ নাই।

৯ই কার্ত্তিক (২৬শে অক্টোবর) : রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক সমগ্র দেশে (ভারত) জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও ভারত প্রতিরক্ষা অর্ডিনান্স জারী—শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে আপৎকালীন মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন—চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা। জরুরী পরিস্থিতিতে দেশের সমস্ত উপনির্ব্বাচন বাতিল।

১০ই কার্ত্তিক (২৭শে অক্টোবর) : নেফা রণাঙ্গনে তিনটি এলাকায় চীনা হানাদার দল পর্য্যুদস্ত। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠিত।

১১ই কার্ত্তিক (২৮শে অক্টোবর) : ভারতীয় জওয়ানদের তীব্র লড়াই-এ লাডাকের কয়েক স্থানে চীনা আক্রমণ প্রতিহত।

২৪-পরগণার টাকীতে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার প্রথম মফঃস্বল বৈঠক—দেশবাসীর প্রতি শ্রীসেনের (মুখ্যমন্ত্রী) আহ্বান : জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অকাতরে অর্থ ও স্বর্ণ দান করুন।

১২ই কার্ত্তিক (২৯শে অক্টোবর) : 'ভারতের সঙ্কটে সর্ব্বভাবে সাহায্যদানে আমেরিকা প্রস্তুত'—শ্রীনেহরুর নিকট প্রেসিডেন্ট কেনেডির লিপি।

লাডাকে চীনা-হানাদার বাহিনীর প্রবল চাপ—ভারতীয় সৈন্যদের দামচক ও জারা-লা ত্যাগ।

১৩ই কার্ত্তিক (৩০শে অক্টোবর) : নেফায় জং-এর নিকট চীনা ঘাঁটির উপর ভারতীয় ফৌজের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের (৭২) জীবনাবসান।

১৪ই কার্ত্তিক (৩১শে অক্টোবর) : রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক শ্রীনেহরুর হস্তে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারার্পণ—শ্রীমেনন প্রতিরক্ষা উপকরণ উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত। ভারতে চীনাদের অবাঞ্ছিত কার্য্য বন্ধের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক নূতন অর্ডিনান্স জারী।

১৫ই কার্ত্তিক (১লা নভেম্বর) : জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর (পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল) সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার দান। কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ কর্ত্তৃক শেষ পর্যন্ত চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা—দিল্লী বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে ভারত সরকারের কার্য্য-ব্যবস্থা সমর্থন। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গের স্থানে 'বাংলা' করার সিদ্ধান্ত—কেন্দ্রের অনুমোদনের প্রতীক্ষা।

১৬ই কার্ত্তিক (২রা নভেম্বর) : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক 'ব্যাঙ্ক অব চায়নার' লাইসেন্স বাতিল।

১৭ই কার্ত্তিক (৩রা নভেম্বর) : রাষ্ট্র-বিরোধী যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্ডিনান্স জারী।

১৮ই কার্ত্তিক (৪ঠা নভেম্বর) : নেফার ওয়ালং-এর সন্নিহিত এলাকায় ভারতীয় জওয়ানদের পাল্টা আঘাত।

১৯শে কার্ত্তিক (৫ই নভেম্বর) : পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় ফৌজের দৌলতবেগ ওল্ডি ঘাঁটি (লাডাক এলাকা) ত্যাগ। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর—এই কয়টি সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যের সমর্থ ব্যক্তিদের রাইফেল-চালনা শিক্ষাদান—দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত।

২০শে কার্ত্তিক (৬ই নভেম্বর) : উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ (৩০ জন সদস্য সমন্বিত) গঠিত—চেয়ারম্যান প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু। ভারতীয় জওয়ানদের গুলীবর্ষণে ওয়ালং-এর নিকট চীনাদের পশ্চাদপসরণ দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার সক্ষম যুবকদের রাইফেল ব্যবহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

২১শে কার্ত্তিক (৭ই নভেম্বর) : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে প্রতিরক্ষা উপকরণ উৎপাদনমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের পদত্যাগ— কর্ত্তৃক পদত্যাগ-পত্র গৃহীত। 'চীনাপন্থী' কম্যুনিষ্টদের ব্যাপক ধরপাকড় সুরু—দিল্লীতে কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীরণদিভে গ্রেপ্তার।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক প্রতিরক্ষা কমিটি গঠিত।

২২শে কার্ত্তিক (৮ই নভেম্বর) : 'যা আসে আসুক, যা ঘটে ঘটুক, চীনের নগ্ন আক্রমণের চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করিলাম'—

লোকসভায় শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা। নেফায় ওয়ালং ও জং অঞ্চলে ইতস্তত: সংঘর্ষ—চীনাদের উপর ভারতীয় জওয়ানদের-প্রত্যাঘাত।

২৩শে কার্ত্তিক (৯ই নভেম্বর): বিশিষ্ট সমাজসেবী 'ভারতরত্ন' ডঃ ডি কে কার্ভের (১০৪) পুণায় জীবনদীপ নির্বাণ। লাডাক রণাঙ্গনে চুসুলের নিকট চীনাদের ট্যাঙ্ক আমদানী।

২৪শে কার্ত্তিক (১০ই নভেম্বর): জরুরী পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিরোধের ব্যবস্থা—সরকার কর্তৃক দেশব্যাপী সমবায় বিপণি ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত।

২৫শে কার্ত্তিক (১১ই নভেম্বর): অনমুমোদিত ব্যক্তিদের জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থসংগ্রহ নিষিদ্ধ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল (শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু) কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারী।

২৬শে কার্ত্তিক (১২ই নভেম্বর): 'চীনের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্ত আজ প্রতিটি ভারতবাসীকে নেতাজী'র আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও প্রস্তুত হইতে হইবে'—কলিকাতার জনসভায় জে: কারিয়াপ্পার (প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি) ঘোষণা।

ভারতীয় জওয়ানগণ কর্তৃক নেফা এলাকায় তিনটি চীনা আক্রমণ প্রতিহত।

২৭শে কার্ত্তিক (১৩ই নভেম্বর): রাজ্যসভায় ভারতভূমি হইতে চীনা হানাদার বিতাড়নের সঙ্কল্প অনুমোদন। দেশের সর্বত্র সোনার আগাম লেন-দেন নিষিদ্ধ।

২৮শে কার্ত্তিক (১৪ই নভেম্বর): শ্রীচ্যবন কেন্দ্রে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত—প্রতিরক্ষা উৎপাদনমন্ত্রীপদে শ্রী কে, হনুমন্তিয়া। শ্রীনেহরুর ৭৪তম জন্মদিনে সর্বত্র 'শিশুদিবস' পালন—প্রধান-মন্ত্রীর প্রতি দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালপদে নিযুক্ত। 'চীনা হানাদারদের হটাইতে ভারত সঙ্কল্পবদ্ধ'—লোকসভায় প্রস্তাব।

২৯শে কার্ত্তিক (১৫ই নভেম্বর): নেফার ওয়ালং এলাকায় শত্রু (চীন) কবলিত একটি ঘাঁটি পুনর্দখল।

৩০শে কার্ত্তিক (১৬ই নভেম্বর): ওয়ালং অঞ্চলে চীনা হানাদারদের ব্যাপক পুনরাক্রমণ—২০শে অক্টোবরের পর বৃহত্তম অভিযান; পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কর্তৃক চীনা আক্রমণের তীব্র নিন্দা—ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (কংগ্রেস) কর্তৃক চীনাপন্থী কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবীসম্বলিত প্রস্তাব (বেসরকারী) পেশ।

বহির্দেশীয়—

২রা কার্ত্তিক (১৯শে অক্টোবর): রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ভারত সমেত জোট-বহির্ভূত ৩০টি রাষ্ট্রের আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব পেশ।

৩রা কার্ত্তিক (২০শে অক্টোবর): কেনেডি সরকার (আমেরিকা) কর্তৃক ভারতের উপর চীনা হামলার কঠোর নিন্দা।

৫ই কার্ত্তিক (২২শে অক্টোবর): কিউবার বিরুদ্ধে আমেরিকা কর্তৃক নৌ-অবরোধের নির্দেশ—রুশ-অস্ত্রবাহী জাহাজ (কিউবামুখী) ডুবাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া সতর্কবাণী—সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতেও পাল্টা হুঁসিয়ারী।

৬ই কার্ত্তিক (২৩শে অক্টোবর): চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান কর্তৃক ভারতকে পূর্ণ সমর্থন। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের কর্তৃক শ্রীনেহরু ও চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের নিকট মধ্যস্থতার প্রস্তাব প্রেরণ।

৭ই কার্ত্তিক (২৪শে অক্টোবর): কিউবা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী বৈঠক—সঙ্কট-নিরোধে নিরপেক্ষ দেশগুলির চেষ্টা। প্রস্তাব অনুযায়ী কিউবার বিরুদ্ধে আমেরিকার নৌ-অবরোধ আরম্ভ—সমরাস্ত্রবাহী পঁচিশ খানি রুশ জাহাজের কিউবা অভিমুখে অভিযান। উ থাণ্ট (রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল) কর্তৃক ক্রুশ্চেভকে (রুশ প্রধানমন্ত্রী) কিউবায় অস্ত্র প্রেরণ এবং কেনেডিকে (মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট) অবরোধ ব্যবস্থা বন্ধ রাখার অনুরোধ জ্ঞাপন।

৮ই কার্ত্তিক (২৫শে অক্টোবর): কিউবাগামী রুশ জাহাজের গতিরোধ ও পরে যাইবার অনুমতি দান—মার্কিণ সরকারের ঘোষণা।

৯ই কার্ত্তিক (২৬শে অক্টোবর): রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে সদস্য করার প্রস্তাবে ভারতের সমর্থন জ্ঞাপন।

১১ই কার্ত্তিক (২৮শে অক্টোবর): আমেরিকার প্রস্তাব অনুযায়ী কিউবা হইতে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি অপসারণে রুশিয়ার সম্মতি—রুশিয়াকে কেনেডির আশ্বাস: আমেরিকা কিউবা আক্রমণ করিবে না।

ফ্রান্সে প্রে: দ গলের প্রত্যক্ষ ভোটে ফ্রান্সের ভাবী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন প্রস্তাবের উপর গণভোট গ্রহণ।

১২ই কার্ত্তিক (২৯শে অক্টোবর): ভারতকে বৃটেন ও আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাবে পাকিস্তানের ঈর্ষা।

১৩ই কার্ত্তিক (৩০শে অক্টোবর): চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে গ্রহণ করার প্রস্তাব (সোভিয়েট উত্থাপিত) সাধারণ পরিষদে পুনরায় বাতিল।

১৫ই কার্ত্তিক (১লা নভেম্বর): শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্ত শ্রীনেহরু (ভারত) ও মি: চৌ-এন্-লাই'র (চীন) নিকট সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র প্রেসিডেণ্ট নাসেরের আবেদন।

১৬ই কার্ত্তিক (২রা নভেম্বর): চীন কর্তৃক প্রেসিডেণ্ট নাসেরের মীমাংসা প্রস্তাব বাতিল—ভারতীয় এলাকা ছাড়িয়া ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়া যাইতে আপত্তি। মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে সোভিয়েট মহাকাশযান প্রেরিত।

২০শে কার্ত্তিক (৬ই নভেম্বর): 'ব্যাঙ্ক অব্ চায়না' বন্ধ করার বিরুদ্ধে ভারতের নিকট চীনের প্রতিবাদ।

২১শে কার্ত্তিক (৭ই নভেম্বর): শ্রীনেহরুর নিকট চীন প্রধানমন্ত্রী চৌ-এর আর এক দফা পত্র—সংঘর্ষের অবসান দাবীতে পুরাতন প্রস্তাবই নূতন ভাষায় প্রেরণ।

২৫শে কার্ত্তিক (১১ই নভেম্বর) কাটাঙ্গায় স্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি দাবীতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের চরমপত্র—আনুগত্যের শপথ স্বাক্ষর না করিলে ব্যবস্থা অবলম্বন করার হুমকী।

২৭শে কার্ত্তিক (১৩ই নভেম্বর): কিউবা সম্পর্কে উত্তেজনা প্রশমনের জন্ত সোভিয়েট ও কিউবান সরকার কর্তৃক উ-থাণ্টের (রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল) নিকট যৌথ ফরমূলা পেশ।

২৯শে কার্ত্তিক (১৫ই নভেম্বর): কিউবা হইতে জেট বোমারু বিমান অপসারণে রুশিয়ার সম্মতি।

৩০শে কার্ত্তিক (১৬ই নভেম্বর): চীন-ভারত যুদ্ধ অবসানের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় রাষ্ট্রসঙ্ঘে ৩৫টি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বৈঠক-আলোচনা।

সোনার সংসার

"কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের সতর্কবাণী সত্ত্বেও কলিকাতার সোনার বাজার বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। গত শনিবার ১২০৲ টাকা ভরি দরে কলিকাতায় সোনার বাজার বন্ধ হয়। সোমবার উহা অপেক্ষা চারি টাকা কম দরে বাজার খোলে এবং দাম আড়াই টাকা পর্য্যন্ত বাড়ে। বেসরকারী দর ছিল ১২৫৲ টাকা। ব্যবসায়ীরা বলেন, তাঁহাদের সোনার ষ্টক ছিল না, অনেক ক্রেতাই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাসে মেয়ের বিবাহের জন্য অবশ্য অনেকেই সোনা কিনিবেন সন্দেহ নাই। সোনার এই চাহিদা সত্ত্বেও যোগান কম হওয়ার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। স্বর্ণবণ্ড বিক্রয়ও আশানুরূপ হইতেছে না, একথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নিজেই বলিয়াছেন। কাজেই অকস্মাৎ সোনার এই ঘাটতি দেখা দেওয়ার কারণ কি? স্বর্ণবণ্ডই বা আশানুরূপ বিক্রয় হইতেছে না কেন? যাঁহাদের ঘরে বা ব্যাঙ্কের ভল্টে সোনা আছে, তাঁহারা কোন আশায় বসিয়া আছেন। বাজারে গুজব, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ভারত হইতে সোনার চোরাই চালান যাইতেছে। এই গুজবের প্রতিক্রিয়া সোনার দামের উপর অবশ্যই দেখা দিবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু গুজব কি নিছক গুজব মাত্র, উহার মূলে কি কোন সত্য নাই? ভারতে যদি সোনার চালান আসিতে পারে, তাহা হইলে ভারত হইতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সোনার চোরাই চালান যাইতে পারিবে না কেন? ভারত হইতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চাউলের চোরাই চালান যদি যাইতে পারে, তবে সোনার চোরাই চালানই বা যাইতে পারিবে না কেন? ভারত হইতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সোনার চোরাই চালান যদি সরকার বন্ধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে স্বর্ণবণ্ড বিক্রয় আশানুরূপ হইবে কি-না, তাহাতে সন্দেহ আছে।"

—দৈনিক বসুমতী।

ভারতীয় পণ্য বিদেশে

বিদেশে ভারতীয় পণ্যের অধিকতর পরিমাণ রপ্তানি করিয়া অধিকতর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের জন্য বোর্ড অব ট্রেড যে উদ্যমে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু ভারতে পণ্যদ্রব্যের বাজারে বর্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বোর্ডের অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধি খুবই কঠিন। বোর্ড দেশের জনসাধারণ কর্তৃক পণ্যদ্রব্য ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মধ্যে অনেক পণ্যই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হয় না। বিদেশ হইতে যে ভোগ্যপণ্য আমদানি হইত, তাহাও অনেক পূর্ব হইতে একরকম বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এজন্য দেশের সর্বত্র ভোগ্যপণ্যের অভাব দেখা দিয়াছে এবং সেইজন্য বহুরকম পণ্য কালোবাজারের দরে বিক্রয় হইতেছে। এই অবস্থায় বর্তমানে যদি রপ্তানির সুবিধার জন্য দেশে ভোগ্যপণ্যের যোগান কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশে ভোগ্যপণ্যের মূল্য আরও চড়িয়া যাইতে পারে। কাজেই বোর্ডের উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ করিতে হয় তাহা হইলে যে সব ভোগ্যপণ্য অত্যাধিক বিলাস-সামগ্রী বলিয়া গণ্য—যেমন মোটরগাড়ি, স্কুটার, সাইকেল, রেফ্রিজারেটার, শীতাতপনিয়ন্ত্রণের যন্ত্র, বৈদ্যুতিক পাখা, গ্রামোফোন, রেডিও সেট, ইস্পাতনির্মিত আসবাবপত্র, জ্যাম, জেলী, মাখন ইত্যাদির যোগান দেশে কমাইয়া দিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানি করিবার ব্যবস্থা বোর্ড করিতে পারেন। জনসাধারণের পক্ষে অপরিহার্য ও নিত্যাব্যবহার্য পণ্যের মধ্যেও এমন কোন কোন পণ্য থাকিতে পারে, যাহার দেশে যোগান কমাইয়া দিয়া উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা যাইতে পারে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যাহাতে চড়িয়া না যায়, সে-বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

দেশী কুকুর ভয়াবহ

তেজপুরের এক খবরে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে ভুরবাধায় গুপ্তচর সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে একজন চীনা ও অন্যজন ভারতীয়। গ্রেপ্তারের সময় চীনার নিকট পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং ভারতীয়ের নিকট চীন ও ভারতের কয়েকখানি মানচিত্র ধরা পড়িয়াছে। চীনা ব্যক্তি নাকি ধৃত হইবার পরে পুলিশের নিকট বলিয়াছে যে, অনেক খবর তাহার হাতে আছে, পুলিশ যেন তাহাকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেয়। কিছুকাল পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি সেতু ও স্থানের ফটো, ক্যামেরা এবং প্রচুর অর্থসহ জনৈক চীনা ধরা পড়িয়াছিল। গৌহাটীতে রহস্যজনকভাবে জামীনের ব্যবস্থা করিয়া সে পলায়ন করিয়াছে। বর্তমানে যে চীনা ধৃত হইয়াছে, তাহাকে দিল্লী পাঠানোর কথাতেও গৌহাটির সেই রহস্যজনক ব্যাপারের কথাই মনে আসিতেছে। ছল-চাতুরীতে চীনারা অদ্বিতীয়। ইহাও হয়ত তাহার আর এক চাতুরীর বা পলায়নের সুযোগ সৃষ্টির আর এক কৌশল। সে যাহাই হউক, এই চীনার সহচররূপে যে ভারতীয় ধরা পড়িয়াছে, তাহার নিকট কতকগুলি চীন ও ভারতের মানচিত্র পাওয়া গিয়াছে। ভারতের অন্তর্ঘাত মূলক কার্য ও গুপ্তচর বৃত্তি সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করা হইয়াছে। বিদেশী শত্রু অপেক্ষাও দেশী শত্রু ভয়ানক। ইহাদের ধরা এবং অতিদ্রুত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা অধিক জরুরী!

—যুগান্তর।

পৌর-প্রতিষ্ঠানের জঞ্জাল

যে কয়েকজন পুর-প্রতিনিধি যথা সময়ে সংযুক্ত নাগরিক কমিটির সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র বলিষ্ঠ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের দূরদৃষ্টি তারিফ পাওয়ার মত। কমিউনিষ্ট পার্টির চুণকামে বিভ্রান্ত সরল অসন্দিগ্ধ ভদ্রলোকরা চীনের আক্রমণে

প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতেছেন, রাজধানীর পুরসংস্থা কমিউনিষ্টদের দখলে গেলে, কিংবা পশ্চিমবাংলায় কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে বিকল্প-সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে এখন কি অবস্থা দাঁড়াইত।

কমিউনিষ্ট পার্টি পরের কাঁধে বন্দুক চাপাইয়া লড়াই করিতে ওস্তাদ। বামপন্থী মোর্চা নামে উহা ভোট সংগ্রহে লিপ্ত হয়, সংযুক্ত নাগরিক কমিটির তকমায় উহা পুর নির্বাচনের আসর মাতায়। যে সব দল উহার ক্রমোন্নতির সহায়ক, আজ তাহাদের চোখ খুলিয়াছে। যুদ্ধোত্তর পশ্চিম বাংলায় ইহা নূতন সজীবতার লক্ষণ। কলিকাতা পুর-প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত নাগরিক-সমিতির সমাধি রচিত হওয়ায় অকমিউনিষ্ট কেহ দুঃখবোধ করিবেন না। যাহারা জাতীয়তাবাদী, যাহারা জনসেবার আদর্শে বিশ্বাসী, যাহারা ক্ষমতাবানদের দলে ভিড়িয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায়ের পথকে নিতান্ত ঘৃণার চোখে দেখেন, এখন তাঁহারা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কর্তব্য পালনে অগ্রসর হইতে পারিবেন। জাতীয় সঙ্কটে পুর-সংস্থার করণীয় বা কার্যকারিতা কম নয়। —লোকসেবক।

অবাস্তব শিল্পসৃষ্টি

প্রতীকী সাহিত্য ও শিল্পের নামে ভারতীয় কমিউনিষ্টগণ আমাদের শিল্প ও সাহিত্যে যে অবক্ষয় ঘটাইয়াছেন সেই প্রকার তথাকথিত প্রতীকী প্রচেষ্টা সোভিয়েৎ রুশের অনুকরণ চৌর্যজাত, কিন্তু সোভিয়েৎ দেশের এই প্রচেষ্টা যে গ্রহণযোগ্য রসসৃষ্টি নহে ও জাতির অবক্ষয়ের কারণ, তাহা অনুভব করিয়া রুশের সর্বাধিনায়ক ক্রুশ্চেভ তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং শিল্পী ও সাহিত্যিকগণকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, জাতিকে অবক্ষয়ের পথে লইয়া না গিয়া যাহাতে মনুষ্য-চিত্ত উদ্বোধিত ও উন্নত হয়, এমন রসসৃষ্টিতেই যেন তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বনীতির কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন। ক্রুশ্চেভের এই সাবধান-বাণী আমাদের দেশের নব বাস্তববাদীদের চিত্তকে স্পর্শ করিবে কি? —জনসেবক।

চীনের যুদ্ধ-বিরতি

"যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে ভারতের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর যে যেখানে ছিল সেইখানে তাহাদের যাইতে হইবে। এই দাবি অত্যন্ত সংগত, নীতিসম্মত এবং উভয় দেশের পক্ষেই সম্মানজনক। ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত [illegible] করিয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারা মীমাংসা করিবার প্রস্তাবে উভয় দেশের সরকারই সম্মত ছিলেন। ঠিক এই অবস্থায় চীন সরকার ৮ই সেপ্টেম্বর নবপর্যায়ের এক বিরাট আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেন এবং তাহার ফলে পৃথিবীতে আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার আবশ্যক দেখা দেয়। তাহাতে হতচকিত হইয়া পৃথিবীর বহু শান্তিকামী দেশ চীনকে এই যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য করিয়াছে। এই অবস্থায় চীন সরকার যদি এখন বিজেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সন্ধির সর্ত একতরফা-ভাবে ভারতের ঘাড়ে চাপাইতে চাহেন তো চীন সরকারের অপরাধের মাত্রাই বাড়িয়া যায়। কাহারও পক্ষে কোনরূপ অসম্মানজনক সর্ত ছাড়া মীমাংসা করিতে হইলে ৮ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণাত্মক অভিযানের পূর্বেকার জায়গায় পুনরবস্থানই সংগত। তাই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবে ভারতের মিত্রস্থানীয় দেশগুলির নিকট আবেদন করা হইয়াছে যে তাঁহারা চীনকে বাধ্য করুন ভারত সরকারের যুক্তিসংগত প্রস্তাবে রাজি হইতে।" —স্বাধীনতা।

অসামরিক সরবরাহ

কম্যুনিষ্ট চীন ভারতভূমি আক্রমণ করার পর সমগ্র পূর্বাঞ্চলে অসামরিক সরবরাহের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। স্বাভাবিক সময়েও ত্রিপুরার সরবরাহ-ব্যবস্থা অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সহজ ছিল না। ভৌগোলিক অবস্থান ইহার জন্য মূলত দায়ী। ত্রিপুরার অসামরিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুচারুরূপে পরিচালনার বিষয়টি চীনা আক্রমণের পর আরও গুরুত্ব লাভ করিয়াছে একথা সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী-সমাজ ও জনসাধারণকে আজ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তাহাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা ভিন্ন একাজ যথাযথভাবে পালিত হইতে পারে না। বর্তমান জরুরী অবস্থায় অসামরিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে যে—সে যে-ই হউক—বানচাল করিবার চেষ্টা করিবে, সে-ও দেশের শত্রু এবং এই শত্রুকেও সায়েস্তা করিতে হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, একমাত্র কেরোসিন ব্যতীত অন্য কোন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। কেরোসিনের মজুত ষ্টক যথেষ্ট আছে এবং আরও আসিয়া পৌছিতেছে। একটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই কেরোসিন বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা হয় মাত্র। কেরোসিনের পারমিট, কুপন সুষ্ঠুরূপে ইস্যু না হওয়াতে জনসাধারণ অযথা হয়রাণি হইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। চিনির মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আরও অধিক পরিমাণ চিনি বাজারে ছাড়িবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এখানে দেখা যায় কিলো প্রতি চিনির মূল্য চার নঃ পঃ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকারী নিত্যপ্রয়োজনীয় তালিকায় মাত্র চার পাঁচটি আইটেম আছে। কিন্তু জীবনধারণ করিতে গেলে এই চার পাঁচটি আইটেমে সংসারযাত্রা চলে না। —সেবক (আগরতলা)।

খরচ কমাও

একটা জাতি যখন জীবনমরণ-সংগ্রামে লিপ্ত থাকে, তখন তাহাকে কৃচ্ছ সাধন করিতে হয় ত্যাগের মধ্য দিয়াই দুর্বার প্রতিরক্ষা-শক্তি গড়িয়া উঠে। ভারত সরকার কিছুকাল যাবত খরচ কমাইবার কথা বলিয়া আসিতেছেন কিন্তু কার্যত নিজেরা কিছুই করিতেছেন না। সম্ভবত "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়"—এই নীতির কথা সরকারী অভিধানে নাই। এইজন্যই দেখিতেছি যে, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তথা সংবাদপত্রগুলি মন্ত্রীসংখ্যা কমাইতে বলিলেও, একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া সে-আহ্বানে কেহ সাড়া দেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ত্রিশ জন মন্ত্রী উপমন্ত্রী আছেন; প্রত্যেক রাজ্যেই মন্ত্রীগোষ্ঠীতে মা ষষ্ঠীর কল্যাণে ভারিক্কী সংখ্যা আছে; খাস কেন্দ্রে আছে উনপঞ্চাশ। অবিভক্ত বঙ্গে ইংরাজসরকার আট জন মন্ত্রী দিয়া কাজ চালাইত। দেশভাগের পর দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভূতপূর্ব বঙ্গের মাত্র এক-তৃতীয়াংশে ত্রিশ জন মন্ত্রী-উপমন্ত্রী-সেক্রেটারীর থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। অযথা মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করিবার কোনও যৌক্তিকতা নাই। প্রত্যেক রাজ্যে কর্মদক্ষ সাত আটটি মন্ত্রীর অধিক থাকা উচিত নয়। ব্যয় সংক্ষেপের জন্য আমাদের দূতাবাসের সংখ্যাও হ্রাস করা আবশ্যক। বড় বড় দেশগুলির রাজধানীতে দূতাবাস রাখিয়া বাকী সব দূতাবাস তুলিয়া দেওয়া উচিত। —মেদিনীপুর-হিতৈষী।

একটি ছড়া

চীনারা দেশ আক্রমণ করার ফলে সব কাগজেই জাতীয় ভাবোদ্দীপক অথবা চীন-বিদ্রূপাত্মক কবিতা বের হচ্ছে—আমি কেন তা লিখছি না—জনৈক পাঠকের জিজ্ঞাসা। আমি ত মশায় কবি নই। যাঁরা লিখছেন তাঁদের প্রায় অনেকেই হুজুগের কবি, যুগের কবি নন। যাক্, চেষ্টা করছি :

হে লাল চীন তুমি কত হীন
দেখেছো কি কভু ভেবে?
পঞ্চশীল বান্দুং কবি, চু ফুঃ ফুঃ চু
নামিলে এ মহা আহবে।
চীন ও চৈনিক লড়বো দৈনিক
চাবুক হাঁকাবো শপা
চীন আর নয় চিনি চিনেছি দুষমনি
মানুষের বেশে ওরা ওঠা।

—বর্দ্ধমান বাণী

কি কর্ত্তব্য ?

"এই যুদ্ধ শুধু রণক্ষেত্রেই হইবে না। রাশিয়া ও চীনে বহুদিন হইতেই বুদ্ধিজীবিদিগকে হাত করিয়া পঞ্চম বাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের একদল জাতীয়তাবাদীদের ভূমিকা অভিনয় করিলেও তাহারা তলে তলে দেশের শত্রু। জাতীয় কম্যুনিষ্টদের পাণ্ডা মিঃ ডাঙ্গে কি না বলেন প্রত্যেক অকম্যুনিষ্ট আমেরিকার দালাল। জাতীয়তাবাদী তামিল কমরেডরা ইঙ্গ-মার্কিণ অস্ত্রদানকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। দেশী শত্রুরা শরভেদী বিভীষণের কাজ করিবে, উৎপাদনে বাধা দিবে, নানারকম মিথ্যার জাল বুনিয়া প্রতিরোধ-শক্তিকে দুর্বল করিবে। এই সব কারণে এই সমস্ত শত্রুর চরদিগকে বাদ দিয়া আমাদের অসামরিক প্রতিরোধ বাহিনী সৃষ্টি করিতে হইবে। সরকার এই সমস্ত বুঝিয়া দেশদ্রোহী কম্যুনিষ্টদের জেলে পুরিতেছে। যুদ্ধ জয়ের জন্য কি করিতে হইবে :—(১) জনগণ যাহাতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূল্য বুঝিতে পারে, এইরূপ প্রচার করা। কমুনিজমে দেশের জনসাধারণের স্বাধীনতার বিলোপ ঘটে—ইহা সকলকে অবগত করাণ চাই। (২) রাশিয়া ও চীন কিরূপে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে পরাধীন করিয়াছে, তাহা দেশবাসীকে পূর্বাহ্ণে জানাইয়া দিতে হইবে। (৩) কম্যুনিষ্ট ও সহযাত্রীদের বাদ দিয়া অসামরিক প্রতিরোধ ও হোমগাড়বাহিনী সৃষ্টি করিতে হইবে। (৪) কম্যুনিষ্ট ও তাহাদের সহযাত্রীদের মুখোশ লোকচক্ষে খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে অপাংক্তেয় করিতে হইবে। (৫) চীনের সহিত এযাবৎ যত কিছু গর্ত ও সন্ধি হইয়াছে, তাহা বাতিল করিয়া দিয়া তিব্বত-প্রশ্ন নূতন করিয়া তুলিতে হইবে। (৬) ১৯৫৪ সালের স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যে কোন শান্তি-প্রস্তাবের আলোচনা বন্ধ করিতে হইবে। মোটামুটি এই সমস্ত প্রস্তাবের ভিত্তি করিয়া দেশের হোম ফ্রন্ট ও প্রতিরোধ-ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে হইবে। তবেই আমাদের জয় অনিবার্য—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

—জনমত (ঘাটাল)

কলিকাতায় ডঃ লুবকে

সম্প্রতি ভারতে আগত মাননীয় বিদেশী অতিথিদের মধ্যে সস্ত্রীক পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপ্রধান ডঃ লুবকের নাম বিশেষ উল্লেখনীয়। গত ১৪ই কার্ত্তিক তাঁরা কলকাতায় পদার্পণ করেন। বিমানবন্দর থেকে তাঁরা সোজা জোড়াসাঁকোর ঐতিহাসিক জাতীয় তীর্থে উপনীত হন ও সেই অমৃতলোক দর্শন করেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ লুবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের গৃহদর্শন তাঁর জীবনের এক অসামান্য ও স্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় জাগরণে দ্বারকানাথ

সস্ত্রীক ডঃ লুবকে

ঠাকুরের ও সারা ভারতের জাগরণে বাঙলার অতুলনীয় অবদান তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ঐ দিন রাত্রে তিনি মহানগরী ত্যাগ করেন ও ১৬ই কার্ত্তিক সকালে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমানযোগে মাদ্রাজ যাত্রা করেন। ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নে পশ্চিম জার্মানীর পক্ষ থেকে এই উনসত্তর বছর বয়স্ক রাষ্ট্রনায়ক বিবিধ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বাঙলার ছেলে জয়ন্তনাথ

জাতির এই গভীর সঙ্কটের দিনে, চরম হতাশার মুহূর্তে, ঘোর দুর্যোগের লগ্নে যে সংবাদটি সারা বাঙালীর মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দ, আশ্বাস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে, সেটি ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে লেঃ জেঃ জয়ন্তনাথ চৌধুরীর এক দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ। সমরাধিনায়ক হিসেবে লেঃ জেঃ চৌধুরীর

কৃতিত্ব ও শক্তিমত্তা অবিদিত নয়। তাঁর এই কৃতিত্ব সারা বাঙলার ও বাঙালীর গর্ব ও গৌরবের বস্তু। একাধিকবার বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে জয়ন্তনাথের তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও অপূর্ব কর্মকৌশল সারা দেশকে নানাভাবে রক্ষা করেছে এবং তার নিরাপত্তা রক্ষা করেছে। সৈনিকের তথা সেনানায়কের পবিত্র কর্তব্য এতাবৎ জয়ন্তনাথ যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে পালন করে এসেছেন। তাঁর এই নতুন দায়িত্ব গ্রহণে তাই আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে তাঁর নির্দেশে এবং অধিনায়কতায় এবারও ভারত সর্বতোভাবে রক্ষা পাবে। ভারতের এই ঘোর সঙ্কটের অবসান ঘটবে। তাঁর সুনাম, প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি আরও বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয়ে বাংলা ও বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করবে। এ উপলক্ষে আমরা তাঁর সর্বৈব সাফল্য কামনা করি।

বাঙলার এক শ্রদ্ধেয় পরিবারে জয়ন্তনাথের জন্ম। এই পরিবারের সন্তানরা দেশের ও জাতির কল্যাণসাধনে নানাভাবে নিজেদের নিয়োজিত করে গেছেন। দেশের মঙ্গল সাধনে এঁদের অবদান অবিস্মরণীয়। পাবনা হরিপুরে এঁদের আদি নিবাস। প্রবীণতম ব্যারিষ্টার অমিয়নাথ চৌধুরী এঁর পিতৃদেব এবং জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) এঁর মাতামহ। বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী, আইনরথী যোগেশ চৌধুরী, বিখ্যাত শিকারী ব্যারিষ্টার কুমুদ চৌধুরী, বাঙলার দিকপাল সাহিত্যনায়ক বীরবল প্রমথ চৌধুরী, কর্ণেল মন্মথ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন সুহৃদ চৌধুরী প্রমুখ ভ্রাতৃবর্গ এঁর জ্যেষ্ঠতাত। শিল্পী আর্য্য চৌধুরী, শ্রীমতী দেবিকারাণী জয়ন্তনাথের পিতৃব্যপুত্র ও পিতৃব্যকন্যা।

লেঃ জেঃ জয়ন্তনাথ চৌধুরী

এই সঙ্গে মুদ্রিত আলোকচিত্রটি বি, বি, সির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শোক-সংবাদ

সুরেন্দ্রনাথ সেন

আধুনিক ভারতের ইতিহাস চেতনার অন্যতম জন্মদাতা, বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এবং ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের গত ১৩ই কার্তিক ৭৩ বছর বয়সে গৌরবোজ্জ্বল জীবনের অবসান ঘটেছে। ১৮৯০ সালের ২৯শে জুলাই সুরেন্দ্রনাথের জন্ম। ১৯২২ সালে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী পান। ১৯২৫ সালে অক্সফোর্ড থেকে বি-লিট উপাধি পান এবং দেশে ফিরে এসে আশুতোষ অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করেন (১৯৩১-৩৯)। এরপর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ইনি দিল্লীতে জাতীয় মহা-ফেজখানার অধ্যক্ষ ছিলেন; ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে সমাসীন ছিলেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানাত্মক ডি-লিট উপাধি প্রদান করেন। ১৯৫৬ সালে ইনি কলকাতার শেরিফ নিযুক্ত হন। বিদেশে বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইনি যোগ দেন ও অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। হিন্দুযুগ, মহারাষ্ট্র ও পেশোয়াদের ইতিবৃত্ত এবং পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে দেশের মূল্যবান সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন ও ভবিষ্যতের গবেষকদের যাত্রাপথ বহুলপরিমাণে সুগম করে দিয়েছেন। এই মনীষীর প্রয়াণে সারা ভারত এক অত্যুজ্জ্বল রত্নকে হারাল।

মনোরঞ্জন ঘোষ

বিশিষ্ট চলচ্চিত্রসেবী এবং ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি মনোরঞ্জন ঘোষ গত ৩০শে কার্তিক ৬৮ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ববিষয়ে এম, এ ও আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৫২ সালে 'রূপবাণী' চিত্রগৃহের প্রতিষ্ঠা করেন। এই চিত্রগৃহের এবং অরুণা ও ভারতী প্রেক্ষাগৃহ দুটিরও তিনি অন্যতম অংশীদার ছিলেন। ১৯৬২ সালে ইনি ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি নির্বাচিত হন।

ডঃ পি, সি, গুহ

ব্যাঙ্গালোরের ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের অর্গানিক কেমিষ্ট্রির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান বিশিষ্ট রসায়নবিদ ডঃ পি, সি, গুহ গত ২০শে কার্তিক ৭১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়নশাখায় ইনি সভাপতিত্ব করেন। অল ইণ্ডিয়া বোর্ড অফ টেকনিক্যাল ষ্টাডিস ইন কেমিষ্ট্রি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ড্রাগস টেকনিকাল অ্যাডভাইসার বোর্ড প্রভৃতির ইনি অন্যতম সদস্য ছিলেন।

রণদারঞ্জন চক্রবর্তী

হাওড়া নরসিং দত্ত কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম শিক্ষক রণদারঞ্জন চক্রবর্তী গত ১১শে কার্তিক ৬১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন।

ডঃ এস, সি, মুখোপাধ্যায়

জালিয়ানওয়ালাবাগ ন্যাশানাল মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের সচিব ডঃ এস, সি, মুখোপাধ্যায় গত ২৭শে কার্তিক ৯৩ বছর বয়সে অমৃতসরে পরলোকগমন করেছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
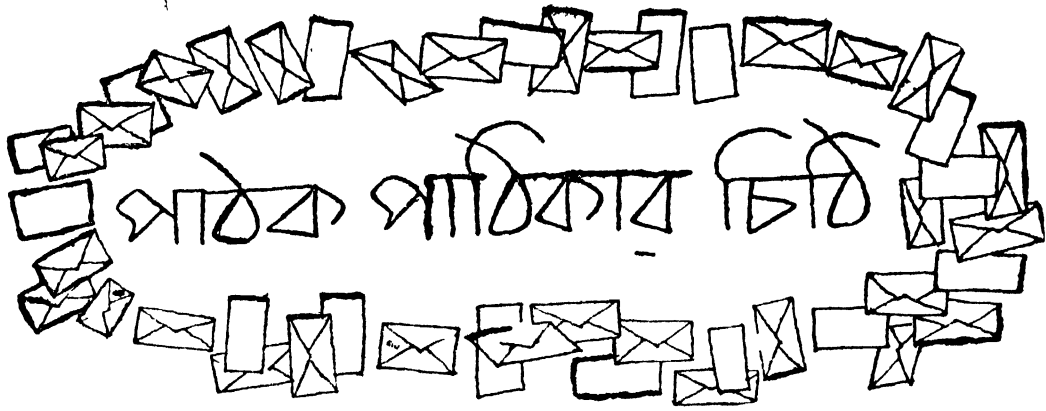
পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়,

ফাল্গুন (১৩৬৮) সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে 'শিশুদের যৌনশিক্ষা' শীর্ষক একটি যুক্তিগ্রাহ্য প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। প্রবন্ধটির লেখক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার অভিনন্দন জানাবেন। এই জাতীয় সমাজ-কল্যাণকর প্রবন্ধ ভবিষ্যতে আরও প্রকাশ করবেন আশা করি। ইতিপূর্বে পতিতাবৃত্তি নিরোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেমন ধন্যবাদভাজন হয়েছেন, শিশুদের যৌনশিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পুনরায় ধন্যবাদ ভাজন হলেন।

প্রবন্ধকার এক জায়গায় লিখেছেন 'বিভিন্ন তথ্যাদি অনুসন্ধান এবং প্রমাণের দ্বারা জানা গেছে যে, শিশুরা তাদের যৌন-চেতনাকে সুযোগ পেলে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগে দ্বিধা করে না।' খুব সত্য কথা। আজকের সমাজের সর্বস্তরে যে ধরণের যৌন বিকারের ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে, তার কারণ নির্ণয় করতে গেলে স্বভাবতই যে কথা মনে আসে তা হোল শৈশবাবস্থায় ছেলেমেয়েদের মনে যথার্থ যৌনশিক্ষাদানের অভাব।

প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'শিশুদের মনে যথেষ্ট যৌনশিক্ষা দেওয়া না হলে তাদের মন বিষাক্ত হয়ে যায়, এবং নবোদ্ভূত কামনা চরিতার্থের জন্য তারা সঙ্গোপনে অবৈধ রতিজীবন গ্রহণ করে।' এই বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। Pyramid Royal Book Agency থেকে প্রকাশিত 'The miracle of growth' পুস্তকের একাংশ—"স্কুলের ছাত্রীদের আট থেকে এগার বছরের মধ্যে এমন একজনও পাওয়া মুসকিল, যাদের বালক-ছাত্ররা বা অন্য পুরুষেরা কোন না কোন সময়ে যৌনমিলন, ওষ্ঠচুম্বন, স্তন স্পর্শ অথবা আস্বাদ দ্বারা উপভোগ করেনি। এই কারণে অতি অল্প বয়সেই আজকাল বালিকারা মাত্র এগার বছর বয়সেই ঋতুমতী হয়ে পড়ে।"

উপরোক্ত Statisticsকে সত্য বলে মনে করার অসুবিধা হত, যদি না আমাদের দেশে এত শিশু যৌন-অপরাধী দেখা যেত। সুতরাং শিশুর মনের সর্বাঙ্গে উন্নতি সাধনের জন্য যে যৌনশিক্ষা দান অপরিহার্য—শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সে বিষয়ে একমত। মাসিক বসুমতীর পাতায় ভবিষ্যতে এই লেখকের আরও রচনা পড়ার আশায় রইলাম।

আশাকরি, পত্রটি প্রকাশ করবেন। ইতি, বিনীতা—সুচরিতা সেন, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া।

মহাশয়—পত্রের প্রথমেই আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আজ একটি বিশেষ কারণে আপনার কাছে চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি বোধহয় অবগত আছেন যে, আমার বসুমতীর সাথে বন্ধুত্ব সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসরে পরিণত হ'ল। এই নূতন বৎসরে আমার প্রাণের একান্ত প্রিয় মাসিক বসুমতীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সত্যি সম্পাদক মহাশয়, আশ্চর্য আপনার হাতের সৃষ্টি। আমি অন্যান্য অনেক বাংলা পত্রিকার গ্রাহক কিন্তু একটা আশ্চর্য জিনিস কি—পূর্বের চেয়ে এখন পত্রিকাগুলি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ ক'রলেও গল্পগুলি যেন আর তত ভাল দেয়না কিন্তু বসুমতীর বেলায় ঠিক উল্টা। এ যেন আরও উন্নতি লাভ ক'রেছে। সত্যি আপনি নূতন লেখকদের এত সুযোগ দেন যে ভাবলে আশ্চর্য্য হই। এই বসুমতীর কৃপায় কত নূতন লেখক ও কবির যে সৃষ্টি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই। "জয়তু বসুমতী"। বর্তমানে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত ডাঃ নীহাররঞ্জনের "তালপাতার পুঁথি" অসম্ভব সুন্দর হচ্ছে। এই গল্পে সুলোচনার চরিত্রটি পড়লে মনে হয় যেন চোখের সামনে তাকে দেখতে পাচ্ছি। আশ্চর্য সৃষ্টি নীহাররঞ্জনের। এ ছাড়াও বসুমতীর আলোক-চিত্র বিভাগটিও আমার প্রাণের মত। বসুমতীর টাকা কয়েকদিনের মধ্যেই পাঠাচ্ছি। নূতন ক'রে বসুমতী পাঠান আরম্ভ করবেন। বসুমতী আমার প্রাণের বন্ধু, এছাড়া আমি বাঁচব না। ইতি—আপনাদের পুরাণ বন্ধু Tushar Kanti Banerji, Mujulighar Tr, Sootea, P. O. Assam.

মহাশয়,—আমি আজ পাঁচ বছর বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহিকা, বসুমতী আমার খুবই প্রিয় পত্রিকা। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের "কাল তুমি আলেয়া" উপন্যাসটি ভাল লেগেছে। আমি অনুরোধ করছি আগামী সংখ্যা থেকে রমাপদ চৌধুরী অথবা আশাপূর্ণা দেবী এবং আপনার লেখা দিতে। যে কোন একজনের লেখা পেতে চাই, এবং নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'তালপাতার পুঁথি' আরও একটু বেশী করে দেবেন। ইতি—শ্রীমতী দীপালী ব্রহ্ম। ৫।২, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০। তাং ৩১১'৬২।

বিক্রয় করিতে চাই

আমার নিকট ১৩৬৭ ও ৬৮ এই ২ সনের পুরো সেট মাসিক বসুমতী আছে, আমি প্রতি সেট ৮৲ আট টাকায় বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। শ্রীকালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ১।১১ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

গ্রন্থাগারিক, ইন্দুভূষণ পাবলিক লাইব্রেরী, অবধারক—এল, আই, সি, আই, ভট্টবাজার, পূর্ণিয়া *** শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গ্রাম ও ডাক—চক প্রাণকান্তখেলি, ২৪-পরগণা *** শ্রীমতী প্রতিমা রায়, অবধারক—হরিং ভবন, সাহেব বাজার, ডাক—জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ *** শ্রীবিভূতিভূষণ চৌধুরী, গ্রাম ও ডাক—বালামপুর, জেলা—বর্ধমান (পুশকর হয়ে) *** শ্রীমতী মনীষা দত্ত, অবধারক—শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত, ২৭/৪৫৪ ওর্লি নেবারউড এরিয়া, ওর্লি, বোম্বাই-৮ *** শ্রীমতী কৃষ্ণা পসারী, অবধারক: শ্রীঅনাথবন্ধু নন্দী, ডাক—বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া *** সত্বাধিকারী, ইণ্টারন্যাশানাল ক্লিপিং সার্ভিস, লক্ষ্মী বিল্ডিং, স্যার পি, এম, রোড, ফোর্ট, বোম্বাই-১ *** শ্রীজয়নিতাই সাহা, ৩বি গৌরীবাড়ী লেন, কলকাতা-৪ *** প্রধানশিক্ষক, কাইজুড়ী প্রধান বিদ্যালয়, ডাক—কাইজুড়ী, ২৪-পরগণা *** গ্রন্থাগারিক, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কটক-৩ *** অধ্যক্ষ, হুগলী মহিলা মহাবিদ্যালয়, গ্রাম ও ডাক—হুগলী *** সচিব, মঙ্গলহাট ওয়ার্কার্স রিক্রিয়েশন ক্লাব, মঙ্গলহাট, ডাক—তালঝারি (এস, পি) *** শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কুমার দাস, গ্রাম ও ডাক—সাতখণ্ড, সাহেবনগর, (জানকা), মেদিনীপুর *** শ্রীডি, এস, ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, হসপিটাল রোড, তুণ্ডলা (আগ্রা) উত্তরপ্রদেশ *** Mrs. Uma Basu, 4 Alexandra Place, New Castle-Upon-Tyne—1 U. K. *** শ্রীমানস দে, বাসুদেব বেড়িয়া ডাক-বরবরিয়া, মেদিনীপুর *** Sri Ajit Choudhury, I. B. M. Dept Bapco, Baharin, Arabian Gulf *** শ্রীজে,আর, থাপার, ২১৭ সন্তোষ ভবন থাপার নগর মীরাট, উত্তরপ্রদেশ *** শ্রীমতী আভা বিশ্বাস, কোয়ার্টার নং ডি-১০, বোকারো থার্মল পাওয়ার ষ্টেশন, ডাক-বোকারো, হাজারীবাগ *** শ্রীএন, সি, নন্দা তত্বাবধায়ক-বি। আর-II, এস, ডি, ও (এম, ই, এস), সাজাহানপুর (উত্তরপ্রদেশ), Mrs. S. Gupta, 507 South Fifth Station Columbia, Missouri, U. S. A. *** মহম্মদ খোদা বক্স বিশ্বাস, গ্রাম-ঈসরপুর, ডাক সার্ডা, রাজসাহী (পূর্ব পাকিস্তান) *** সচিব টাটাস ফ্রেণ্ডস ক্লাব বরগুয়ার লাইমষ্টোন কোয়েরী, ডাক বরগুয়ার জেলা-বিলাসপুর (এম, পি) *** শ্রী আর, সি, দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ডাক পণ্ডিচেরী-২ *** সচিব নেতাজীসঙ্ঘ সাধারণ গ্রন্থাগার, গ্রাম-কালিকাপুর, ডাক-মৌখীরা বর্ধমান *** শ্রী জে, এন, ঘোষাল, ম্যানেজার স্টাডিয়া কেমিক্যালস লিমিটেড, হৃষীকেশ (উত্তরপ্রদেশ) *** সচিব রামনারায়ণ পাঠাগার রঞ্জিতপুর, ডাক-রোহিণী, জেলা-মেদিনীপুর *** Sri M. K. Chakravarti, Sikkim Mining Corporation Rangpo, Sikkim *** শ্রী বি, কে, গুপ্ত, সিনিয়ার সায়েণ্টিফিক অফিসার, আই এন-এস, ভালসুরা, ডাক-জাম নগর, গুজরাট *** শ্রীমতী মঞ্জু চক্রবর্ত্তী, অবধারক-শ্রীএম, চক্রবর্ত্তী, বি, এ, (অনার্স) গ্রাম ও ডাক মন্তেশ্বর, বর্ধমান *** শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বারগাণ্ডা, ডাক-গিরিডি, গিরিডি *** অধ্যক্ষ, বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন, বড়িষা, কলিকাতা-৮ *** শ্রীমতী নীহারকণা দেবী, অবধায়ক শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় "হেমন্তিকা", চাঁদমারী, ডাক-জেলা দার্জিলিং *** Mrs. Susila Dutta, M.Sc. 170, East Norwitch, Colombus-I Ohid, U. S. A *** শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায় "ইয়ার্লি পাড়া", মুঙ্গের রোড, জামালপুর, জেলা-মুঙ্গের, বিহার *** প্রধান শিক্ষক, আনন্দপুর হাইস্কুল, ডাক-আনন্দপুর, জেলা-মেদিনীপুর *** শ্রীকুমুদরঞ্জন দত্ত, গ্রাম-সহজপুর, ডাক-মুরামেটেলি ঝাড়গ্রাম হয়ে বাঁকুড়া *** শ্রীবলাই চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাস্তাসিলা কোলিয়ারী, ডাক ধানসর, জেলা-ধানবাদ, বিহার *** শ্রীমতী আশা শীল, ৩ কেশবচন্দ্র দাস লেন (কেশব সেন ষ্ট্রীটের সামনে), কলকাতা-১ *** শ্রীসমররঞ্জন সাহা, গ্রাম ও ডাক-কোলাঘাট, জেলা-মেদিনীপুর ** শেখ সুলতান হোসেন গ্রাম-যশর, ডাক-হাতি, হুগলী।

বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠানো হইল। Saint Asram, Varanashi.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠালাম। সান্ত্বনা দাশগুপ্তা, কটক।

১৩৬৯ সালের বার্ষিক চাঁদা—শ্রীমতী সুরমাদেবী, শিউড়ি, বীরভূম।

১৩৬৯ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র অবধি ১২ মাসের জন্য মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠালাম। শ্রীরমারাণী মিত্র, দিল্লী।

আমার Subscription বৈশাখ সংখ্যা হইতে renew করিবার জন্য ১৫৲ পাঠাইলাম। Sm. Himani Sen Gupta.

I send herewith Rs. 15/- for renewal of my membership of Masik Basumati for the year 1369 B. S.—Priti Kana Gupta, Bolpur.

I am remitting herewith Rs. 7·50 being my renewal subscription of Masik Basumati from Kartick to Chaitra 1369 B. S.—Bela Sen Gupta, Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—শ্রীমতী ইরা ঘোষ, চন্দননগর।

Sending herewith Rs. 15/- being the annual subscription of Masik Basumati—Burdwan Harisava Hindu Girls High School.

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত (১৩৬৯) এক বছরের চাঁদা পাঠাইলাম—মমতা বক্সী, দেরাদুন।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদার Renewal বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—রেখা ভট্টাচার্য্য, আসাম।

Subscription of Monthly Basumati for the year 1369 B. S.—Reba Mitra, Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর জন্য নূতন বৎসরের কার্ত্তিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী নির্ম্মলা রায়, লক্ষ্ণৌ।

বৈশাখ হইতে চৈত্র অবধি মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সেবা চক্রবর্ত্তী, বারাণসী।

॥ মাসিক বসুমতী ॥
॥ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ ॥

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী

—শ্রীঅরুণ পাইন অঙ্কিত
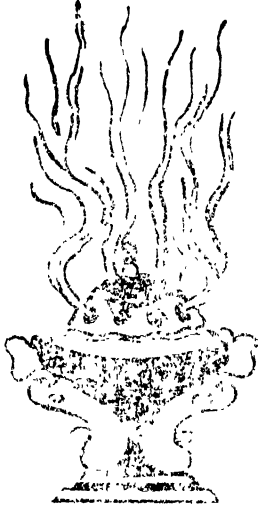
স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৪১শ বর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, [illegible]য় সংখ্যা

কথামৃত

১২ই শ্রাবণ, ১৩২৫

সন্ধ্যার পরে গিয়েছি। এখনও আরতি আরম্ভ হয়নি। মা রাস্তার ধারের বারান্দায় একটি আসন পেতে বসে জপ করছেন। ভারি গরম, কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই মা বাতাস করবার জন্য পাখাখানি হাতে দিলেন। বাতাস করছি, এমন সময় একটি বর্ষীয়সী বিধবা এসে মাকে প্রণাম করতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে এলে ?"

"দারোয়ানের সঙ্গে এসেছি"—বলে তিনি আমার কাছে পাখাখানি চাইলেন—মাকে বাতাস করবেন। আমি তখনি দিলুম।

মা বললেন, "থাক থাক ওই দিক।"

তিনি বললেন, "কেন মা, আমার হাত দিয়ে একটু হবে না ? ওরা ত দিচ্ছেই।" মা যেন একটু বিরক্ত হলেন। তিনি দু' এক মিনিট বাতাস করেই বললেন, "তবে আসি মা মহারাজের কাছে একবার যেতে হবে।" মায়ের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতেই মা মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আঃ, পায়ে কেন ? একে ত দেহ খারাপ—ঐ করে করে ত এই সব (অসুখ) হল।" তিনি চলে যাবার পরে জল দিয়ে পা ধুয়ে ফেললেন। বিধবা স্ত্রীলোকটি গোলাপমাকে একটু দেখে এসে (তাঁর খুব অসুখ) পুনরায় মায়ের কাছে বিদায় নিতে এলেন। মা বললেন, "হাঁ, হ্যাঁ, এস গে।" এর পূর্ব্বে মাকে কারও সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে আমি চক্ষে দেখিনি।

পরে মা আমাকে বললেন, "আমার আসনখানা তুলে ঘরে নিয়ে যাও আর বিছানাটা নীচে পেতে দাও।" মা এসে শয়ন করলেন এবং হাঁটুতে ঘি মালিস করে দিতে বললেন। কিছু পরে বললেন, "এখন পিঠে মরিচাদি তেল মালিস করে দাও।"

ললিতবাবুর কথা উঠল। আমি বললুম, "মা তিনি ত শুনেছি আপনার কৃপাতেই বেঁচে গেছেন।"

মা বললেন—"তার অনেক বাসনা ছিল। তার যা অবস্থা হয়েছিল মা, বালতি বালতি জল বেরুত পেট থেকে। একেবারে শেষ অবস্থাতেই দাঁড়িয়েছিল। তখন বড় কাতর হয়ে বললে, 'মা কামারপুকুরে, জয়রামবাটিতে মন্দির করব, হাসপাতাল দেবো, আমার বড় আশা ছিল, কিছুই করতে দিলিনি।' আহা ঠাকুর বাঁচিয়েছেন। ওখানে সব করবার ইচ্ছা, ওর মত আর কোন ভক্তের নেই। বেঁচেছে, এখন কাজ করুক। আমাকে একটি পাথর কিনে দিয়েছে।"

১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৫

আজ বৈকালে প্রেমানন্দ স্বামিজী দেহত্যাগ করলেন। রাত্রে মায়ের নিকট গেলুম। মা বললেন, "এসেছ মা, বস। আজ বাবুরাম আমার চলে গেল। সকাল হতে চক্ষের জল পড়ছে"—বলে কাঁদতে লাগলেন। "বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিষ ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরাম রূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত! বাবুরামের মা ছিল আঁটকুড়ো ঘরের মেয়ে, বাপের বিষয় পেয়েছিল। সে জন্যে একটু অহঙ্কার ছিল। নিজেই বলত, 'হাতে বাউটী, কোমরে সোনার চন্দ্রহার পরে মনে করতুম ধরা যেন সরা।' চারটি সন্তান রেখে সে গেছে। একটি কেবল তার পূর্ব্বে মারা গিয়েছিল।"

খানিক পরে দেখি, মায়ের ঘরের দক্ষিণের দেয়ালে ঠাকুরের যে বড় ছবি ছিল তার পায়ে মাথা রেখে করুণ স্বরে বলছেন, "ঠাকুর নিলে।"—সে কি মর্ম্মভেদী সুর! আমাদেরও বড় কান্না পেতে লাগল।

এদিকে গোলাপমার খুব অসুখ—মরণাপন্ন রক্তামাশয় চলেছে।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৫

রাত সাড়ে সাতটা। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরে বসে আছেন। গিয়ে প্রণাম করে উঠতেই বললেন, "বারান্দায় আমার আসনখানি পেতে দাও ত মা, আর তক্তপোষের পাশে মেজেয় পাতা ঐ বিছানাটা গুটিয়ে রাখ, আরতির সময় ওরা ওখানে বসে ঝাঁজ বাজাবে।" বিলাস মহারাজ আরতির আয়োজন করছিলেন। বারান্দায় আসন পেতে দিতে মা বললেন, "কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল আছে, নিয়ে এস।" গঙ্গাজলে হাত মুখ ধুয়ে জপে বসলেন এবং পাখাখানি আমার হাতে দিয়ে বাতাস করতে বললেন। একটু পরেই আরতি আরম্ভ হল। শ্রীশ্রীমা 'গুরুদেব, গুরুদেব' বলে জোড়হাতে প্রণাম করলেন এবং জপ শেষ করে আরতি দেখতে লাগলেন। আরতি হয়ে গেলে বিলাস মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে উঠে বললেন, "মা আজ ভারি গরম।"

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "একটু বাতাস করবে?"

তিনি বললেন, "কে করবে মা?"

"কেন, এই মা করবে, করতো মা।" আমি তাঁর দিকে দু' একবার বাতাস করতেই তিনি বললেন, "না মা, উনি আপনাকে বাতাস করছেন আপনাকেই করুন"—বলে বাইরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মা প্রেমানন্দ স্বামিজীর কথা তুলে বললেন, "দেখ মা, বাবুরামের দেহেতে আর কিছু ছিল না, কেবল কাঠামোখানি ছিল।" এমন সময়ে চন্দ্রবাবু উপরে এসে ঐ কথায় যোগ দিলেন ও বাবুরাম মহারাজের দেহ সংকারের জন্য কয়েকজন ভক্ত যে চন্দন কাঠ, ঘি, ধূপ, গুগ্‌গুল, ফুল ইত্যাদি অনেক টাকার জিনিস দিয়েছেন তাই বলতে লাগলেন। মা বললেন, "আহা, ওরাই টাকা সার্থক করে নিলে। ঠাকুরের ভক্তের জন্য দেওয়া। ভগবান ওদের দিয়েছেন, আরও দেবেন।" চন্দ্রবাবু প্রণাম করে উঠে গেলেন। মা বলতে লাগলেন, "শোন মা, যত বড় মহাপুরুষই হোক, দেহ ধারণ করে এলে দেহের ভোগটি সবই নিতে হয়। তবে তফাৎ এই, সাধারণ লোক যায় কাঁদতে কাঁদতে, আর ওঁরা যান হেসে হেসে—মৃত্যুটা যেন খেলা।"

"আহা, বাবুরাম আমার বালক কালে এসেছে। ঠাকুর কত রঙ্গের কথা বলতেন, আর নরেন, বাবুরাম এরা আমার হেসে কুটিপাটি হোত। একদিন কাশীপুরে আড়াই সের দুধ শুদ্ধ একটা বাটি নিয়ে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম। দুধ ত গেলই, আমার পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন, বাবুরাম এসে ধরলে। পরে পা খুব ফুলে উঠল। ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বললেন, 'তাই ত, বাবুরাম, এখন কি হবে, খাওয়ার উপায় কি হবে? কে আমায় খাওয়াবে?' তখন মণ্ড খেতেন। আমি মণ্ড তৈরী করে উপরের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতুম। আমি তখন নত পরতুম, তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠোরে বলছেন, 'ও বাবুরাম, ঐ যে ওকে তুই ঝড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস?' ঠাকুরের কথা শুনে নরেন, বাবুরাম ত হেসে খুন। এমনি রঙ্গ তিনি এদের নিয়ে করতেন। তারপর তিন দিন পরে ফোলাটা একটু কমলে ওরা আমাকে ধীরে ধীরে নিয়ে যেত—আমি খাইয়ে আসতুম। ও-কয়দিন গোলাপ না কে মণ্ড তৈরী করে দিয়েছিল, নরেন খাইয়ে দিত।

"বাবুরাম তার মাকে বলত, 'তুমি আমাকে কি ভালবাস? ঠাকুর আমাদের যেমন ভালবাসেন, তুমি তেমন ভালবাসতে জান না।' সে বলত, 'আমি মা, আমি ভালবাসি না, বলিস কিরে?' এমনি তাঁর ভালবাসা ছিল। বাবুরাম চার বছরের সময়েই বলত, 'আমি বে করব না—বে দিলে মরে যাব।' ঠাকুর যখন বলেছিলেন, 'আমি পরে সূক্ষ্ম শরীরে লক্ষ মুখে খাব', বাবুরাম বলেছিল, 'তোমার লক্ষ টক্ষ আমি চাই নে, আমি চাই তুমি এই মুখটিতে খাবে, আর আমি এই মুখটিই দেখব'।"

"অনেকগুলো ছেলেপিলে হয় যার, ঠাকুর তাকে গ্রহণ করতেন না। একটা দেহ হতে পাঁচিশটা ছেলে বেরুচ্ছে। ওরা কি মানুষ! সংযম নেই, কিছু নেই—যেন পশু।"

গোলাপমার অসুখ আজ একটু কম। কি ঔষধ দিয়ে ডুস দেওয়া হয়েছে—সরলা এসে বললেন; ডাক্তার বিপিনবাবু বলেছেন, "তিন মাস লাগবে সারতে।"

মা বললেন "রক্তামাশয় কি সোজা ব্যারাম! তা লাগবে বৈকি। ঠাকুরের অমনি আমের ধাত ছিল। দক্ষিণেশ্বরে এই সময় (বর্ষাকালে) প্রায় আমাশয় হোত। নবতের দিকের লম্বা বারান্দার ধারে একটা কাঠের বাক্স ফুটো করে নীচে সরা পেতে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শৌচে যেতেন। আমি সকালেরটা ফেলে আসতুম। বিকেলেরটা ওরা ফেলতো। সেই সময়ে একটি মেয়ে আসে, বললে কাশীতে থাকে। সে প্রদীপের শীষে আঙুল তাতিয়ে প্রত্যহ ঠিক একুশবার করে তাত দিতে মলদ্বারের ফুলো টনটনানি কমে গেল। আমি তখন ভাবতুম,—একে আমাশয়, তাতে গরম সেক, বেড়েই বা যায়। কিন্তু বাড়ল না, সেরে গেল। সেই মেয়েটিই আমাকে সে বাড়ী থেকে নবতে নিয়ে এসেছিল; বললে, 'মা, তাঁর এখন অসুখ, আর তুমি এখানে থাকবে?' আমি বললুম, 'কি করবো, ভাগ্নে-বউটি একা থাকবে, ভাগ্নে হৃদয় সেখানে ঠাকুরের কাছে রয়েছে।' মেয়েটি বললে, 'তা হোক, ওরা লোকটোক রেখে দেবে। এখন তোমার কি তাঁকে ছেড়ে দূরে থাকা চলে?' আমি তার কথা শুনে তার সঙ্গে চলে এলুম। কয়েকদিন পরে তিনি একটু সারলে সে মেয়েটি চলে গেল।" —শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে।

নটভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ

পরমহংসদেবের কৃপালাভ করিয়া যে সময় তাঁহার ভক্তবৃন্দ পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতে লাগিলেন, সেই সময় ভক্তেরা কথা-প্রসঙ্গে, কে কিরূপে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন, তাহার আলোচনা হইত। সে সকল কথা বার বার বলিয়া ও শুনিয়া পুরাতন হইত না। পরস্পর পরস্পরকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতাম ও মুগ্ধচিত্তে বক্তা বলিতেন এবং শ্রোতারা শুনিতেন। এরূপ প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের সহিত আমার অনেকবার হইয়াছিল। পরমহংসদেবের সহিত বিবেকানন্দের প্রথম মিলন কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা বার বার শুনিয়াও আমার তৃপ্তিলাভ হইত না, এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতাম। যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যেন আজ শুনিয়াছি। এইরূপ আমার স্মৃতিতে জাগরিত আছে; এবং সেই ঘটনা আমার যেরূপ মধুর বোধ হয়, আমার প্রকাশ-শক্তির অভাব সত্ত্বেও "উদ্বোধনে"র পাঠকের সে সকল কথা মধুর হইবে, এই ভরসায় প্রবন্ধ লিখিতেছি। আমার প্রকাশ শক্তির অভাব, তাহা সৌজন্য সহকারে দীনভাবে প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে বলিতে হয় বলিয়া যে বলিলাম, তাহা নহে। আমি সত্যই অভাব অনুভব করিতেছি। হৃদয়-ভাবে-উৎফুল্ল বিবেকানন্দের মুখকান্তি আমি দেখাইতে পারিব না। তাঁহার জগৎ-মুগ্ধকারী কণ্ঠস্বর—মসীচিত্রিত অক্ষরে নাই। তাঁহার বলিবার ছটার অভাব। প্রতি কথায় গুরুর প্রতি অচলা ভক্তিরসের স্রোত পাঠক পাইবেন না। তথাপি আমার ভরসা, সে মধুর ঘটনা আমার নীরস ভাষা সরস করিবে।

ভক্ত-চূড়ামণি ৺রামচন্দ্র দত্তের কথায়, রামচন্দ্র দত্তের সমভিব্যাহারে বিবেকানন্দ প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে যান। রামচন্দ্র দত্ত সুবাদে তাঁহার ভাই এবং বাল্যকালে শিক্ষক ছিলেন। বিবেকানন্দের সাংসারিক নাম নরেন্দ্র ছিল এবং বীরেশ্বর মহাদেবকে মানত করিয়া তাঁহার জন্ম হওয়ায়, তাঁহার মাতা ও নিকট আত্মীয়েরা বীরেশ্বর বলিতেন; ক্রমশঃ বীরেশ্বর নাম "বিলে" নামে পরিণত হয়। রামচন্দ্র তাঁহাকে "বিলে" বলিতেন। বিবেকানন্দের মুখে শুনিতাম, একদিন রামদাদা বলিলেন,—"বিলে, কি এদিক-ওদিক ব্রাহ্মসমাজে ঘুরে বেড়াস,—যদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করবার ইচ্ছা থাকে, দক্ষিণেশ্বরে চল। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে কিছু হবে না।"

রামবাবুর সহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। তিনি পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া, তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং বিবেকানন্দ যেন তাঁহার বহুদিনের পরিচিত, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন। বিবেকানন্দকে ধরিয়া তাঁহার ঘরের পশ্চিমদিকের চাতালে লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন,—"তোর অপেক্ষায় বসিয়াছি, তুই আসিতে এত দেরী করিলি? গৃহী লোকের সহিত কথা কহিয়া, আমার ওষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোর সহিত আলাপ করিয়া জুড়াইব।" বিবেকানন্দ বলিতেন,—"আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ! রামদাদা আমায় কার নিকট আনিল? বুদ্ধি—উন্মাদ বলিতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট! অদ্ভুত খ্যাপা—অদ্ভুত আকর্ষণ—অদ্ভুত তাঁহার প্রেম! খ্যাপাও ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম। সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা।" বিবেকানন্দ যখন বাড়ী
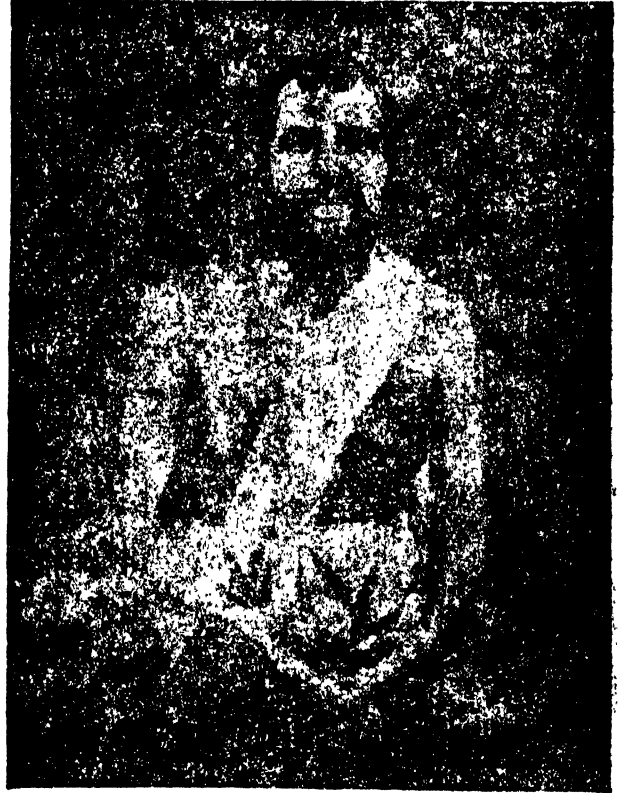
পরমহংসদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ফিরিলেন, পরমহংসদেব তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাড়ী আসিয়া বিবেকানন্দ ঐ খ্যাপার কথা ভাবেন। এ কি—এরূপ তিনি কখনই দেখেন নাই! কিছুই বুঝিতে পারেন না—অথচ আকৃষ্ট।

খ্যাপার কথা রামদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পরিচয় পাইলেন,—খ্যাপা কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী। এই পরিচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। আশৈশব তিনি কামিনী-বিদ্বেষী, শিশুকালে মৃন্ময় শ্রীরাম-মূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া খেলা করিতেন; কিন্তু যেদিন শুনিলেন, তিনি সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন, সেদিন হইতে সে পুতুল তাঁহার ভাল লাগিল না। যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল আনিলেন, একটা বড় কল্কে কিনিয়া আনিলেন, সেইটি মহাদেবের গাঁজার কলিকা হইল এবং সেই গাঁজার কলিকা লইয়া তিনি গাঁজা টানিবার ভাণ করিয়া বাল্যখেলা করিতেন। সন্ন্যাসী শিবের প্রতি বাল্যকালে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন; সেই আদর্শে তাঁহার শৈশবকাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে। পরে ইংরাজী শিক্ষার প্রতাপে যদিচ শিব উপাসনা পৌত্তলিকতা মনে করিতেন, কিন্তু যোগের প্রতি অনুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পাগল কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, তখন সেই পাগলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী পুরুষ কখনই সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁহার সহিত মতের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু এ উচ্চ ত্যাগের আদর্শ আর কোথাও নাই। স্বভাবজাত ত্যাগী বিবেকানন্দ, সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ

স্বামী বিবেকানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে না গিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। প্রেমের শৃঙ্খল দিন দিন তাঁহাকে প্রগাঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল। খ্যাপার অমানুষিক প্রেম—এ প্রেম-জগতে তিনি কোথাও পান নাই, গুরুর প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন, উপদেশের প্রতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই। পরমহংসদেব ডাকিলেন, বলিলেন,—"শোন্ না, কথা শোন্ না।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন—"কথা শুনিতে আসি নাই।" পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি করিতে আসিস?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন,—"তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে দেখিতে আসি।" ত্রস্ত পরমহংসদেব উঠিয়া বিবেকানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ স্থির রহিলেন।

এইরূপে গুরু-শিষ্যে প্রেমের লীলা চলিতে লাগিল। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক প্রায়ই হয়। বিবেকানন্দ সমাধি প্রভৃতি মানেন না। সমাধিকে বলেন,—"ও তোমার মাথার ব্যারাম।" দেব-দৃষ্টিতে পরমহংস যাহা দর্শন করেন, তাহা তার্কিক বিবেকানন্দ বলেন,—"ও তোমার মস্তিষ্কের ভ্রম! অন্ধবিশ্বাসে সাকার মূর্ত্তিমান।" বিবেকানন্দ বলিতেন,—"এইরূপে তো তর্ক-বিতর্ক করি।" একদিন পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তুই অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস?" (পরমহংসদেব অন্ধবিশ্বাসকে অন্ধের বিশ্বাস বলিতেন) বিবেকানন্দ বলিতেন, "সেই দিন বিষম দায়ে ঠেকিলাম!" বলিতেন,—"অন্ধ-বিশ্বাস বুঝাইবার চেষ্টা করা দূরে থাক, আমি স্বয়ং অন্ধ-বিশ্বাস কাহাকে বলে, যত বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখি, একটি অর্থহীন কথা ব্যবহার করি মাত্র। অন্ধবিশ্বাসের লক্ষণ যতই দেবার চেষ্টা করি, সব লক্ষণই অযৌক্তিক হয়। বিদ্যা-বুদ্ধি যত ছিল, সব নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম, অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ আর হয় না। এইরূপে শিক্ষিত বিবেকানন্দ অশিক্ষিত খ্যাপার নিকট আপনাকে পরাজিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বৈজ্ঞানিক তর্ক-যুক্তি, সিদ্ধবিশ্বাসের নিকট কোনরূপে অগ্রসর হইতে পারে না। পরাস্ত হইয়া বিবেকানন্দ গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন,—"না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া বিশ্বাস করো। আমি বলিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস করিও না।" কিরূপে দেখিয়া-শুনিয়া লইতে হয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দেখিবার শুনিবার উপায় দিন দিন গুরুর নিকট বুঝিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য গুরু দেখাইয়া দেন, নিত্য নিত্য শিষ্য দেখিতে পান যে—সমস্ত প্রত্যক্ষ। জড়-বিজ্ঞানে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক সত্যও সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়! গুরুর উপদেশ ও সাধনায় চক্ষু উন্মীলিত হইলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্রমে আভাস পাইলেন, সমাধি—মস্তিষ্কের বিকার নয়;—গুরুর নিকট সমাধি-লাভের প্রার্থী হইলেন,—বলিলেন—"আমায় পরম পদার্থ নির্ব্বিকল্প সমাধি দান করুন। আমি আপনার কৃপায় সমাধিস্থ হইয়া থাকিব।" গুরু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"এই নির্ব্বিকল্প সমাধি পাইলেই তুমি পরিতৃপ্ত?" ইহা তো পূর্ব্বে একদিন, তুমি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সময় তোমার বক্ষে হস্ত দিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তুমি ভয় পাইয়া বলিলে,—"করো কি গো, আমার

যে বাপ আছে, মা আছে!' দক্ষিণেশ্বরের এ ঘটনা কি পাঠকের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে? বিবেকানন্দের নিকট শুনিয়াছিলাম, একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার কোমল হস্ত বিবেকানন্দের বক্ষে প্রদান মাত্রই সমস্তই শূন্যাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি মহাভয়ে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"কর কি গো! আমার যে বাপ আছে—মা আছে!"

সমাধিলাভের প্রার্থী হইলে, আমরা বলিতেছিলাম, গুরু শিষ্যকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন,—"জীবের যাহা পরম বস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আস নাই। তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে—প্রার্থনা করিতেছ? সংসারে আসিয়াছ, সংসারের কার্য্য কর। জীবের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে পর, তাহার আর ফিরিবার শক্তি থাকে না। একবিংশতি দিবস গতে শরীর ত্যাগ হয়। তুমি শক্তিবান, সমাধি-লাভের পরও ফিরিবে, তোমার মহাকার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য্য সমাধা না করিয়া জগৎ ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাধি চাও, সমাধি পাইবে।"

অকস্মাৎ একদিন কাশীপুরের বাগানে বিবেকানন্দের একটি অবস্থা হইল, যে সকল ভক্তেরা তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাঁহারা মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে ভীত হইলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। গুরুর নিকট সংবাদ গেল, গুরু হাসিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দও উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন, "যাহা চাও, তাহা এই, এই নির্ব্বিকল্প সমাধি! তোমার নিমিত্তই তুলিয়া রাখিলাম, কিন্তু উপস্থিত বাক্সে আবদ্ধ রহিল, চাবি আমার নিকট থাকিবে। কার্য্য করো, কার্য্যান্তে পাইবে।"

কি কার্য্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সসাগরা পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরু কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দিহান চিত্ত,—পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন,—সম্পূর্ণ ভ্রম। এইমাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি-আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত! উভয়ের একই ভাব, কার্য্যে ভিন্ন ভাবধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান-আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদগদ—ভক্তি বিভোর মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন—তিনি হৃদয়ে অনুভব করিবেন, জ্ঞান ভক্তির পার্থক্য—লোকে অজ্ঞানবশতঃ করিয়া থাকে। জ্ঞান-ভক্তি এক, জ্ঞান বিবেকানন্দ,—ভক্তি পরমহংস অভেদ। এই অভেদ জ্ঞানলাভে তিনি বুঝিবেন, পরমহংসদেব যে বলিতেন, "ভাগবত-ভক্ত-ভগবান" তাহা সত্য।

চিকাগো বক্তৃতা : স্বামী বিবেকানন্দ

(১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)

ধর্ম্মসভার প্রথম দিবসের অধিবেশন

কার্ডিন্যাল গিবন্সের উভয় পার্শ্বে প্রাচ্য ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহের প্রতিনিধিগণ উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নানাবর্ণের বেশ উজ্জ্বলতায় কার্ডিন্যাল সাহেবের বেশের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ হইয়াছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মহম্মদ মতাবলম্বীদের মধ্যে বাগ্মিপ্রবর ভারতবর্ষীয় বিবেকানন্দ স্বামী, গৈরিকবর্ণের বেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দর্শনীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার শিরোভাগ বৃহদায়তনের পীতবর্ণ উষ্ণীষে মণ্ডিত হইয়া তদীয় মুখলাবণ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল।

অন্যান্য বাগ্মিগণের বক্তৃতা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীমদ্‌বিবেকানন্দ স্বামীকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইল। তিনি যেই শ্রোতৃগণকে "আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃমণ্ডলী" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, অমনি কয়েক মিনিট ধরিয়া সকলেই তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নিম্নোক্ত অভ্যর্থনা-সূচক বাক্যে কিছু বলিলেন :—

অভ্যর্থনা

হে আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃমণ্ডলী, অদ্য আমাদিগকে আপনারা হৃদয়ের সহিত যে প্রগাঢ় অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তৎপ্রতি-দানের জন্য আমি আজ দণ্ডায়মান হইয়াছি; এবং কি বলিব—ইহাতে আজ আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি-সমাজের মুখ-স্বরূপ হইয়া আজ আমি আপনাদিগকে সাধুবাদ দিতেছি। সর্ব্বধর্ম্মের প্রসূতি-স্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, তাহার প্রতিনিধি হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এবং কি বলিব—পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দুজাতির ও যাবতীয় হিন্দুসম্প্রদায়ের কোটী কোটী হিন্দু নরনারীর মুখস্বরূপ হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

এই সভামঞ্চে কতিপয় বক্তা এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অতি দূরদেশনিবাসী জাতি সকলের মধ্য হইতে যাঁহারা অদ্য এইখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারাও যে সর্ব্বত্র সমদর্শনের ভাব ঘোষণা করিয়া মহিমান্বিত হইতে পারেন, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যাঁহারা এইরূপ বলিলেন, আমি তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। যে ধর্ম্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ব্ববিধ মতগ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্ম্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখি, তাহা নহে সকল ধর্ম্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্ম্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায়, ইংরাজী 'একস্ক্লুসান' (অর্থাৎ হেয় বা পরিত্যাজ্য) শব্দটি কোনমতেও অনুবাদিত হইতে পারে না, আমি সেই ধর্ম্মভুক্ত। যে জাতি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম ও জাতির যাবতীয় ত্রস্ত, উপদ্রুত ও আশ্রয়লিপ্সু জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। যে বৎসর রোমকদিগের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে য়াহুদীজাতির পবিত্র দেবালয় চূর্ণীকৃত হয়, সেই বৎসর তাহাদের কিয়দংশ দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয়লাভার্থ আসিলে, এই অস্মজ্জাতীয়েরাই তাহাদিগকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ

করিয়াছিলেন :—আমি সেই জন্যও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। জোরোয়াস্তারের অনুগামী সুবৃহৎ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্ম্ম আশ্রয় দান করিয়াছিল এবং আজ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে আমি সেই ধর্ম্মভুক্ত। কোটী কোটী নরনারী যে স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন, এবং যাহা আমি অতি বাল্যাবস্থা হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি—আমি সেই শ্লোকার্দ্ধটি আজ আপনাদের নিকট বলি, যথা—"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।" অর্থাৎ হে প্রভো, ভিন্ন ভিন্ন রুচি হেতু সরল ও কুটিল প্রভৃতি নানা পথগামীদের, নদীগণের সাগরতুল্য, তুমিই একমাত্র গম্য স্থান।

এই বর্ত্তমান সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহতী ধর্ম্মসমিতি অদ্ভুত গীতাপ্রচারিত সত্যেরই পোষকতা করিতেছে। সে মতটি এই—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।" অর্থাৎ—যে যেরূপ মত আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন, মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে মন্নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা, ও উহাদের ফলস্বরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা, এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই ধর্ম্মোন্মত্ততা জগতে মহা উপদ্রব রাশি উৎপাদন করিয়াছে, কতবার ইহাকে নরশোণিতে পঙ্কিল করিয়াছে, সভ্যতার নিধনসাধন করিয়াছে ও যাবতীয় জাতিকে সময়ে সময়ে হতাশার সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে। এই ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানব সমাজ আজ পূর্ব্বাপেক্ষা কতদূর উন্নত হইত। কিন্তু ইহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে ; এবং আমি সর্ব্বতোভাবে ইহাই আশা করি যে, এই ধর্ম্মসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল, সেই ঘণ্টানিনাদই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা কুতর্কাদি দ্বারা উদ্‌ঘাটিত বহুবিধ নির্য্যাতন পরম্পরার এবং একই চরম-লক্ষ্যে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্ববিধ অসদ্ভাবের সমূলে নিধনসমাচার ঘোষণা করুক।

(পঞ্চম দিবসের অধিবেশন। ১৫ই সেপ্টেম্বর)

ভ্রাতৃভাব

(১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে ধর্ম্মসমিতির পঞ্চম দিবসীয় অধিবেশনের সময় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপাদনের জন্য বাগ্‌বিতণ্ডায় নিযুক্ত হন। অবশেষে শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামী নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি বলিয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দেন।)

আমি আপনাদিগকে একটি ক্ষুদ্র গল্প বলিব। এইমাত্র একজন সুবক্তা বলিলেন যে, "এস আমরা পরস্পরের নিন্দাবাদ হইতে বিরত হই"—ইহা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। আমাদের ভিতর এরূপ মতভেদ হইতেছে দেখিয়া বক্তা মহাশয় বড়ই দুঃখিত। আমি একটি গল্প বলিব এবং আমার বোধ হয়—তদ্বারা এই মতভেদের কারণ কি, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যথা :—

এক ভেক কোন একটি কূপে বাস করিত। সে বহুকাল তথায় বাস করে। যদিও সেই কূপেই তাহার জন্ম এবং সেইখানেই সে প্রতিপালিত, তথাপি তাহার আকার অতিশয় খর্ব্ব ছিল। অবশ্য সে সময় বর্ত্তমান কালের কোনও ক্রমবিকাশবাদী ছিলেন না বলিয়া, অন্ধকারময় কূপে চিরকাল বাস করিয়া ভেকটি দৃষ্টিশক্তি-বিরহিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয় জ্ঞাপন করিবার কেহই নাই। আমরা কিন্তু গল্পের সুবিধার জন্য ভেকটিকে চক্ষুষ্মান্ বলিয়াই ধরিয়া লইব। ভেক প্রতিদিন এরূপ উৎসাহের সহিত কূপ-মধ্যস্থ যাবতীয় কীটগুলিকে কবলিত করিয়া উহার জল এরূপ পবিষ্কৃত রাখিত যে সেরূপ উৎসাহ বর্ত্তমানকালের কীটাণুতত্ত্ব-লিপ্সু পণ্ডিতগণেরও শ্লাঘার বিষয়। সে এইরূপে ক্রমে ক্রমে কিছু স্থূলদেহ হইয়া উঠিল। একদা ঘটনাক্রমে সমুদ্রতীরবাসী কোন একটি ভেক আসিয়া সেই কূপে পতিত হইল।

কূপ-মণ্ডূক জিজ্ঞাসিল, "তুমি কোথা হইতে আসিলে ?"

সে উত্তর করিল, "আমি সমুদ্র হইতে আসিতেছি।"

"সমুদ্র ? সে কত বড় ? তাহা কি আমার কূপের মত বড় ?" এই বলিয়া কূপ-মণ্ডূক কূপের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লাফাইয়া পড়িল।

তাহাতে সাগরবাসী ভেক কহিল, "ওহে ভাই, তুমি এই ক্ষুদ্র কূপের সহিত সমুদ্রের তুলনা কিরূপে করিলে ?"

ইহা শুনিয়া কূপ-মণ্ডূক আর একবার লম্ফ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সমুদ্র কি এত বড় ?"

চিকাগো-ধর্ম্মসভায় সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে পরমপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতাবলী আমাদের এক জাতীয় সম্পদ। সমুদয় পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্মাবলম্বী সভ্যজাতিগণ একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে মহাসভায় খৃষ্টধর্মেরই জয়পতাকা সর্বোপরি উড্ডীন হবে এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতা চিরকালের জন্য প্রতিপন্ন হবে। চিকাগো বক্তৃতার বঙ্গানুবাদক তাঁর লিখিত মুখবন্ধে বলছেন যে—"কে জানিত যে একজন সামান্য বঙ্গীয় যুবক, সমুদায় পাশ্চাত্য সভ্যজাতির হৃদয় হইতে হিন্দু-ধর্মের উপর বহুবর্ষব্যাপী বদ্ধমূল ঘৃণার ভাব একটি মাত্র বক্তৃতার দ্বারাই তিরোহিত করিতে সমর্থ হইবে।"

স্বামীজীর সেই বিখ্যাত বক্তৃতার খণ্ডাংশ ও সারাংশ মধ্যে মধ্যে মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার সমীপে উপস্থাপিত হবে।—স।

"সমুদ্রের সহিত কূপের তুলনা করিয়া তুমি কি মূর্খের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছ !"

ইহাতে কূপ-মণ্ডূক কহিল, "আমার কূপের ন্যায় কিছুই বড় হইতে পারে না, ইহা অপেক্ষা কিছুই বড় থাকিতে পারে না ; এ লোকটা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, অতএব ইহাকে তাড়াইয়া দাও।"

হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু—আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি ও ইহাকেই সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন ও তাহাকেই সমগ্র জগৎ বোধ করিতেছেন ! মুসলমানও আপনার ক্ষুদ্র কূপে উপবিষ্ট আছেন ও তাহাকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন ! হে আমেরিকাবাসিগণ, আপনারা যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎগুলির অবরোধ ভাঙ্গিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিই। আশা করি, ঈশ্বর ভবিষ্যতে আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনে সহায়তা করিবেন। [ক্রমশঃ।

ভারতের নবজাগরণ

(From শ্রীঅরবিন্দের Renaissance of India)

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দে

সম্প্রতি ভারতের নবজাগরণের রব উঠেছে। চাকচিক্যময় অনেক প্রবন্ধ এ বিষয়ে বের হয়েছে। এ নবজাগরণ, ভারতের এ নবজন্ম ; তাই যদি সত্যি হয়—তবে এ হবে ভারতের এবং নিখিলের পক্ষে বহুমূল্যবান। ভারতের পক্ষে বলছি, কারণ—ভারতের সমস্ত নবাবিষ্কারের জন্যে অথবা তার অতীতদিনের শক্তির ও জাতীয় আদর্শের পরিবর্তনে, আর জগতের পক্ষে বলছি এজন্য যে, সম্ভাব্যতাময় এক মহাশক্তির আবির্ভাব বস্তুক্ষেত্রে অসম বা বিভিন্ন মানসিক ও শক্তিজগতে যা আধুনিক মানবজগতের বিকাশকে পরিচালিত করবে—খুব সম্ভব এ মহতী ভবিষ্যৎ খুব দূরে নয়। বস্তুত এই হচ্ছে, বিস্তার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রধানতম: সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগী যা, তার নিজের প্রাণ ও দেহকে গড়ে তুলবে কোন পন্থার অনুসরণে, জগতের বিচিত্র মনুষ্যজাতির এই নবজাগরণে।

প্রথম প্রশ্ন উঠছে, সত্যিই কি ভারতে নবজাগরণের সাড়া পড়েছে ? এ বহু পরিমাণে জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার উপর নির্ভরশীল ; আবার এ ভবিষ্যতের উপরও অনেকটা নির্ভর করে—বস্তুত: এই জাগরণীর বর্তমানে শৈশব অতিক্রান্ত হচ্ছে মাত্র। চিন্তাজগতকে পিছনে ঠেলে দেয় মানব মন। নবজাগরণের এই সাড়া কি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিভূ ? ইউরোপে যা হচ্ছে তা' সত্যি সত্যি নবজাগরণ নয়—খৃষ্টের মত ও ভাবধারায় গ্রীক ও লেটিন শক্তি নিজ নিজ পরাক্রমে কত না অদ্ভুত ও জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছে। এ নিশ্চয়ই নব-জাগরণের (Renaissance) সে ধরণ নয়—যা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভবপর।

আয়ারল্যাণ্ডের সম্প্রতিঘটিত ক্যাথলিক আন্দোলনের স্মৃতি মনে এনে দেয়—নবজাগ্রত জাতিশক্তির উদ্বোধনের চেষ্টা ; আত্মপ্রকাশের এক নতুন প্রেরণা যা' এক আধ্যাত্মিক পুনর্গঠনের শক্তি দেবে। আয়ারল্যাণ্ডে ইহা আবিষ্কৃত হয়েছে—এক ক্যাথলিক মতের পংকিল প্রেরণার অপস্রিয়মানতায়। ভারতে মাঝে মাঝে এই ধরণের আন্দোলন দেখা গেছে এবং বিশেষত: ইহা ১৯০৫ এর রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশের পর থেকেই বাক্ লাভ করছে। কিন্তু তবু এ থেকে জাগরণের সত্যিকার ধরণ বুঝা যায় না।

অধিকন্তু, আমরা দেখেছি, অধুনা সমস্তই যেন এক মস্ত বড় আকারহীন হ-য-র-ল-ব অবস্থা। বিরোধের প্রভাব কতকটি উজ্জ্বল গঠনমূলক নীতির মাধ্যমে এখানে সেখানে নব আত্মচেতনায় যেন জেগে উঠছে। তবে একথা বলা চলে না যে এর আকৃতি বহুল পরিমাণে জনসাধারণের মনে স্থান পেয়েছে। ইহা এক অগ্রবর্তী আন্দোলনের প্রতীক। দেবদূতের কণ্ঠধ্বনি শুনা যাচ্ছে, ইহা যেন ধার্মিকের আলোকের বর্তিকা। সর্বোপরি, যা আমরা দেখি, তা এক প্রচণ্ড দেবশক্তি—যা' নিখিলের অন্তরজুড়ি তুলেছে রণরণি, এক নতুন এবং প্রচণ্ড আবহাওয়া, তাহার সমস্ত অংগ প্রত্যঙ্গের মধ্যে আত্মহারা। এই নব চেতনা ও নব-জাগরণের দ্যোতনা এক জাগ্রত আত্মঘোষণার বাণী প্রচার করছে জগতে—আর চাইছে পৃথিবীতে তার প্রতিষ্ঠা।

সর্বদিক্ দিয়ে শুনতে পাচ্ছি—এক সংঘর্ষের মৃদু পদধ্বনি, এখানে সেখানে এক ভয়াল ক্রন্দন ও দংশনের ছোঁয়াচ। স্বাধীনতার আন্দোলন আজিও সম্পূর্ণ হয়নি ; তাই দৃষ্টি আজিও সম্পূর্ণ হয়নি ; তাই দৃষ্টি আজিও সম্পূর্ণ নির্মেঘ নয়। আত্মমুকুলের অংশবিশেষের মাত্র হয়েছে প্রকাশ। কোনো প্রবন্ধকার প্রশ্ন তুলেছেন,—তাঁর বইয়ে, জগতে সত্যিই নবজাগরণের প্রয়োজন কিনা, যেহেতু ভারত সদাজাগ্রত এবং তার আর নবজাগরণের হেতু নেই। এই কথার পিছনে সত্য রয়েছে প্রচুর। ভারতের সতেজ মন বহির্জগতের প্রাণকে অভিভূত করেছে চিরকাল। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র—ভাস্কর হয়ে ভেসে উঠবে চোখের সামনে। নিঃসন্দেহ, সে এক সময় ছিল। সে সময় সংকীর্ণ এবং আকস্মিক। তার বিষময় ফলেই ক্রমে ক্ষয়ে যাচ্ছে জীবনের মহাগ্নি রূপ। এমন কি নবজীবনের সূচনাতেও,—রাজনৈতিক চিহ্নিত মতবাদ—ইউরোপীয় চিন্তাপ্রসূত বহির্মুখী হৈ, চৈ—ভারতবর্ষের অন্তরের ধর্ম ও সাহিত্যের সৃষ্টিশক্তিকে অবচেতন করে ফেলেছে ; বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাহিত্যের দর্শনমূলকজ্ঞান সবই যেন লুকিয়ে সাধারণ পণ্ডিতইজমে রূপায়িত হচ্ছে। অহং শক্তি প্রকাশের দিকে এর ঝোঁক। এই মূঢ়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অভিযান থেকেই ভারতীয় চিন্তা এক নব বিবর্তনের পথে যাত্রা সুরু করবে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি, ধর্মের পথেই লাভ করবে নবজাগৃতি—শোভন প্রাণের দ্যোতনাময় রূপায়ণ।

বাস্তবক্ষেত্রে, আমাদিকে তিনটি বিষয়ের বিবেচনা করতে হবে—ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনের সেই মহতী অতীত—যা এই নির্জীব মুহূর্তে অহংভাবের মধ্যে এ হারিয়ে গেল, পাশ্চাত্য সংঘর্ষের প্রথম সংঘাতে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, এ যেন নষ্ট হ'তে গিয়েছিল এবং অগ্রবর্তী এক আন্দোলনের ফলে যা' বিশুদ্ধতায় আত্মপ্রকাশ করেছিল মাত্র এক বা দুই দশক আগে। প্রবন্ধকার মিঃ কাসিন্ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, যা' জাতীয় প্রাণশক্তির অপহৃতিতেও নষ্ট হয়নি। অতীত ভারতের সেই ধর্মীয় প্রাণশক্তি—ত্যাগ, সত্য ও সংযমের ভিত্তিতে যা' আজ এই অসংলগ্ন মুহূর্তেও জাগ্রত প্রহরী—বিবর্তনের এই বন্দনী থেকেই ভারতীয় নবজাগৃতির যাত্রা সুরু।

যে কোনো জাতি, এইরূপ একই সমান আঘাতে দেহ ও আত্মাকে খুইয়ে ফেলতো বহু আগেই। কিন্তু ভারতবর্ষের এই সমিধ, সৌম্য, প্রশান্ততার কাছে উচ্ছৃঙ্খলতা শুধু আহতই হয়েছে। এইভাবে ভণ্ডামীর রচিত হচ্ছে জীবন্ত সমাধি।

আজ মুক্তি এসেছে—আজ তাই জাগরণ দিয়েছে দেখা। ভারত তার পিতৃপিতামহদের থেকে প্রাপ্ত মূলগত শক্তিকে রক্ষা করবে; কিন্তু ভারতের ভৌগোলিক মূর্তিতে আসবে এক বৃহত্তর পরিবর্তন। এই নবদেহের গঠনে, নবদর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সামাজিক রূপ একই আত্মার বিভিন্ন প্রত্যংগ হবে। আমার মনে হয়, তাই হবে নবভারতীর নবায়নের ধারা—ইহা জীবন সত্যের পরস্পর বিরোধী ভাবধারার সত্যবিকাশ, কিন্তু তাই—সে সব সত্যকে প্রকাশ করবে—পরাজয়কে পূর্ণ করবে বিজয়ে।

কি সে মহাশক্তি ও অতীত ভারতবর্ষের চরিত্রগত আত্মা? ইউরোপীয় লেখকরা ভারতীয় মনের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জটিলতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন; এর ধর্মীয় প্রবল অনুভূতিতে ও ধর্মীয় আদর্শবাদে, এর ধর্মীয় প্রবলতায় ডুবে আছে অপর সকল জাগতিক সত্তা নিয়ত। অসীমের চিন্তায় বিভোর, স্বাপনিক দার্শনিক মানস সম্পন্ন, ইউরোপ ভাবে এই ভারত। জড়বাদি অহংময় ইউরোপ ভিন্নমতের সংগে লড়াই করতে ব্যস্ত। ভারতশক্তি ও সৌন্দর্য নিয়ে স্বপ্ন দেখে সুন্দরের—ধর্মভাবে সত্যম, শিবম্, সুন্দরম্ বাণীতে ভরে রাখে মানস।

ভারতের জাগরণ যখন পুরো হবে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে জগৎ—স্তম্ভিত হবে বিশ্বের মানব। আধ্যাত্মিকতাই, ভারতীয় মনের শ্রেষ্ঠ প্রবেশ পন্থা তাঁর কাছে অসীমের ধারণা জন্মগত। ভারতবর্ষ জানে, পদার্থ তার পূর্ণ বোধ পায় না, যতক্ষণ না সে তাঁর (super-physical) অতি দৈহিকতার ভিত্তিতে দাঁড়ায়, সে দেখেছে জগতের ক্রমায়মান জটিলতার নিরসন সাধারণ বুদ্ধিতে অসম্ভব। এর মূলে রয়েছে মানব অন্তরের সর্বায়বয়র সম্বন্ধে সদাজাগ্রত এক অদৃশ্য spiritual শক্তি। দেহকে জুড়ে থাকবে ধ্যানধারণা "সীমার মাঝে অসীম তুমি" মানুষ তাঁর নিজেকে পরিপূর্ণ করতে পারে। সে মানুষের মধ্যে দেবতাকে দেখেছে, দেবতার মধ্যে মানুষী শক্তি—মানবজীবন ঘিরে রয়েছে অবর্ণনীয় স্বর্গীয় প্রভা। সেই ধারা স্ফুরিত হচ্ছে, অতীতের উৎস হ'তে। কিসের জোরে—এ সম্ভব হয়েছে ভারতীয় ধর্মের বলে, চিন্তা ও আদর্শের বলে, তার যোগবলে।

মাও-এর রণকৌশল—ছলনা

চীনের বর্তমান রণচক্রান্তের পিছনে চৌ-এর (প্রধান মন্ত্রী) পাশাপাশি যে-মানুষটি সমধিক সক্রিয়, তিনি আর কেউ নন, চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান স্বয়ং মাও-সে-তুং। এই জঙ্গী নায়কের রণ-কৌশল বা যুদ্ধের হাতিয়ার কী, জানবার-বুঝবার জন্যে খুব বেশিদূর যেতে হয় না। একটু'তেই আজ চোখে পড়ে যাবে যে, মূলতঃ তা ধোঁকাবাজি বা ছলনা সর্বস্ব। ভারতের বিরুদ্ধে চীনা আক্রমণের প্রতিটি পর্যায়ে এই কৌশল প্রযুক্ত হচ্ছে—সটান নিক্ষিপ্ত হচ্ছে এই নিষ্ঠুর অস্ত্র। অকস্মাৎ একতরফা যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা এই ছলনা বা ধোঁকাবাজিরই একটি জলন্ত নিদর্শন—শুধু ভারত বা ভারতবাসী কেন, সমগ্র বিশ্বকে যুগপৎ বিভ্রান্ত ও হতচকিত করাই এর আসল লক্ষ্য। 'ছল-বল-কৌশল' অবশ্য যে-কোন কূটনীতিজ্ঞের ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়, যখন ক্ষমতালিপ্সা তাকে পেয়ে বসে। ক্ষমতা বিস্তারে লালায়িত মাও-এর কাছ থেকে অন্যরূপ আশা বৃথা। চীনা কম্যুনিষ্টদের এই মুখ্য চাই-এর রণগুরু কিন্তু সমসাময়িক কালের কেউ নয়। জানা যায়, এক্ষেত্রে তাঁর পরমারাধ্য পুরুষটি হলেন সান-জু—খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে যাঁকে দেখতে পাওয়া গেছে। ঐ চতুর সেনাধিনায়ক কেবল যুদ্ধ করাই নয়, যুদ্ধ কি করে জেতা যায়, সেই কলা-কৌশল বা ফন্দিটি পর্যন্ত ব্যক্ত করে গেছেন। অধীন সৈনিকদের প্রতি সান-জু'র প্রধান নির্দেশ বা পরামর্শ ছিল: শত্রুপক্ষকে যত ভাবে পার ধোঁকা দাও, তার চোখের সামনে যে ভাবেই সম্ভব মায়াজাল বিস্তার কর—ব্যস, আর ভাবনা নেই, মুহূর্তে সব করায়ত্ত হবে। চীনা কম্যুনিষ্ট মোড়ল মাও-এর রণধর্মও ঠিক একই ধরণের, শত্রুকে ধোঁকা দিয়ে অতর্কিতে নিজ মৎলব বা অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে এই মানুষটি বড় ওস্তাদ। সান সে যুগে যে সমস্ত রণচাতুর্য বা ছলনার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যুদ্ধে নেমে কিংবা নামবার আগে থেকে তা-ই অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে চলেছেন মাও। সান-জু'র শিক্ষা ছিল যতই সাংঘাতিক, ততই স্বতন্ত্র ধরণের। আক্রমণকারী সেনাদের তিনি সোজাসুজি বলতেন: আক্রমণ করতে যখন সক্ষম বুঝতে পারবে, তখন ভাণ ধরতে হবে অক্ষমতার। যে সময় বলপ্রয়োগ করা চাই, সেই মুহূর্তে এমন ছলনা করতে হবে যেন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। প্রতি পদে শত্রুকে ধোঁকা দাও—কী করতে হবে, ভাবার অবকাশ দিলে চলবে না। সান-এর আর একটি উপদেশও রণলিপ্সু মাও-এর অত্যন্ত প্রিয় বলে শোনা গেছে। এই সামরিক কৌশলটি হচ্ছে: পশ্চিম দিকে যখন আক্রমণ চালাতে হবে, তখন চেঁচামেচি বা হৈ-চৈ করতে হবে পূর্ব দিকে। লক্ষ্য-করলে দেখা যাবে যে এই সব কয়টি নির্দেশ বা ব্যবস্থাপত্রেরই মূল কথা ছলনা, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি। সান-জু কথিত আরও একটি রণকৌশলও মা-ও রপ্ত করতে ছাড়েননি দেখা যায়। আলোচ্য কৌশলটি হচ্ছে—যে-সৈন্যবাহিনী ফিরে চলেছে, তাকে আটক-করো না। কোন সেনাদলকে যদি বেষ্টন করো, বের হবার একটি পথ উন্মুক্ত রেখে দিও। ভেঙে পড়া সৈন্যবাহিনীর ওপর চাপ দিতে নেই—এই হলো রণনীতি। সামরিক ছলনাসর্বস্ব চিন্তাধারায় মা-ও আরও একজনের কাছে বিশেষ ঋণী বলে জানা গেছে—চীনা রণনায়কের সেই পূর্বসূরীর নাম ক্লজউইৎস। এই মানুষটিরও মূল শিক্ষা বা উপদেশ ছিল—যুদ্ধ হলো অবিরাম কূটনৈতিক খেলা খেলে যাওয়া। বলা বাহুল্য, চক্রান্তকারী চীনের ধ্বজধর জঙ্গী নেতা মাও সেই রণ-কৌশলই অবিকৃতভাবে ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে চলেছেন।

ভারতবর্ষের চিত্রশিল্প

জিতেন্দ্রকুমার নাগ

মানব সমাজের সংস্কৃতির এক অবদান, চিত্রকলা, পুণ্যভূমি ভারতে প্রাক্ ইতিহাসের যুগ থেকেই বিকশিত হয়ে আছে। ওই যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে মধ্যভারতে রায়গড়ের সিংহনপুরের আবিষ্কৃত গুহাচিত্রে, সারগুজার যোগীমারাতে, বিন্ধ্যপর্বতে মির্জাপুরের দক্ষিণে এবং হোসেঙ্গাবাদ অঞ্চলের গুহাচিত্রে। ব্রোঞ্জযুগে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনে এ চিত্রশিল্পের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে সেও পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে। ক্রমে আরও ভাল চিহ্ন আবিষ্কার হবে মনে হয়। কারণ ঐতিহাসিক যুগের গোড়া থেকেই ভারতের চিত্রকলা যে কত উন্নত ছিল, তার পরিচয় পাওয়া গেছে অজন্তার ফ্রেস্কোগুলিতে। অনুমান খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে অজন্তায় বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণ শিল্পীরা দেওয়ালে ও সীলিং-এ ফ্রেস্কো আঁকতে থাকেন, যার তুলনা সমসাময়িক হেলেনিক সংস্কৃতিতেও পাওয়া যায়নি। সারা পৃথিবীর উন্নত দেশের সুধী সমাজকে বিস্মিত করে এই ফ্রেস্কোগুলি তথাগত বুদ্ধের জীবনী, জাতকের গল্প ও রাজগণের ইতিহাস অবলম্বনে অঙ্কিত। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সমান তালে চিত্রকলার উন্নতি ঘটেছিল এখানে। সবচেয়ে সুন্দর ছবিগুলি আঁকা হয় গুপ্তযুগে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে। গুপ্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গোয়ালিয়রের বাগ গুহারও সুন্দর ফ্রেস্কোগুলি আঁকা হয়।

অজন্তা, বাগ, এলোরা প্রভৃতির দেয়ালচিত্রগুলি আবিষ্কার হয় গত শতাব্দীতে মাত্র। তথা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সীমানার মধ্যে স্থিত অজন্তার আবিষ্কার ১৮১৯ সালে। স্বল্প প্রচারেই এত তারিফ করেন সকলে যে, এর নকল দেখান হয় বিশ্বের দরবারে। ১৯০৯ সালে বিলাতের লেডি হেরিংহাম এক Coping expedition পাঠান অজন্তায়, যাতে সাহায্য করেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য শ্রীনন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সমর গুপ্ত প্রভৃতি। এঁরা ছিলেন কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের তৎকালীন ছাত্র—এঁদের কপি খুব ভাল হয়, যা পাশ্চাত্য দেশে অজন্তার গৌরবের কথা পৌঁছে দেয় চিত্রকলা-রসিকদের কাছে? অনেকগুলি ফ্রেস্কো নষ্ট হওয়ায় নিজাম সরকারের পক্ষ থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হয়।

অজন্তার চিত্রশিল্পীর প্রভাব ফুটে ওঠে অনতিদূরবর্তী এলোরাতে। এখানকার বিখ্যাত স্থপতিগুলির মধ্যে সামান্য কিছু অঙ্কিত ফ্রেস্কোতে প্রায় একই রীতি ও সৌন্দর্য লক্ষ্যণীয়। এলোরা কৈলাস গুম্ফার সিলিং-এ ও দেওয়ালে আঁকার ছবিতে অজন্তার গৌরবরশ্মির শেষ চিহ্ন বর্তমান। জৈন গুহা, ইন্দ্র সভার, নষ্ট প্রায় ফ্রেস্কো হিন্দুযুগের শেষের দিকেও আমাদের দেশের চিত্রকলার মান কত উচ্চে ছিল তার চিহ্ন বর্তমান। এলোরার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাষ্ট্রকূট রাজকৃষ্ণ। অন্ধ্র, পল্লব, চালুক্য, চোল, পাল ও রাষ্ট্রকূট বংশের রাজারা দেশের কলা, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন বিশেষ ভাবে। মধ্যযুগে তুর্ক আফগানদের রাজত্বের সময় থেকে ভারত চিত্রকলার রূপ কিন্তু ম্লান হয়ে যায়—শিল্পীর উৎসাহ হারান দেশের অবস্থার অবনতিতে। সাধারণের মধ্যে ললিতকলাক্ষেত্রে লোকচিত্র কিছুটা জীবন্ত ছিল। অবশ্য যার নিদর্শন পাওয়া যায় হিন্দুদেবদেবীর পটে, পুঁথিতে ও দেবালয়ের দেওয়াল চিত্রে। মামুদের আক্রমণের পর একাদশ শতাব্দী থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত দেশের চিত্রশিল্পীদের বিশেষ অবদান ছিল না। সুলতানরা স্থাপত্যের অনুরাগী ছিলেন মাত্র, কয়েকটি উন্নত প্রাদেশিক রাজ্যে শুধু চিত্রকলার চর্চা ছিল।

মুঘলরাজ্যে নূতন করে এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে—মুঘল আর্ট-এর উদ্ভবে। হুমায়ুনের সময় থেকে হিন্দু পারসিক অঙ্কন রীতির সমন্বয়ে ভারত চিত্রকলার এক নবরূপের পত্তন হয় যেটা মুঘল আর্ট বলে পরিচিত। হুমায়ুন শের শাহকে পরাজিত করে সিংহাসন লাভ করার পর ইরাণ থেকে কতকগুলি সুদক্ষ পারসিক চিত্রশিল্পীকে নিয়ে আসেন যাঁদের অধ্যাপনায় দেশীয় শিল্পীদের মাঝে আসে নূতন অনুপ্রেরণা।

পারসিক চিত্রকলায় কিছুটা চীনের প্রভাব ছিল, অতি কুশলী পারসিক শিল্পীদের শিক্ষায় সঞ্জীবিত হিন্দু আর্ট কিন্তু এর মিশ্রণে, মুঘল আর্টও অতি অল্প পরেই রাজপুত আর্টের অভ্যুদয় ঘটে। মুঘল বাদশাহের আনুকূল্য ও উৎসাহে ভারত চিত্রকলার রূপ বদলালেও নূতন করে শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। মুঘল চিত্রকলায় বহু হিন্দু পেণ্টার ছিলেন যাঁদের সম্বন্ধে আবুল ফজল প্রশংসা করে গেছেন। দশ্বনাথ, বসাওন, আবদুল সামাদ, মীর সৈয়দ, আবুল হাসান, ওস্তাদ মনসুর প্রভৃতি এই আর্টের হোতারা, হুমায়ুন, আকবরের দরবারে বিশেষ সম্মানিত হতেন। বাবরনামা, আকবরনামা প্রভৃতি ফার্সী গ্রন্থে এই স্কুলের ছবির ছড়াছড়ি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেণ্টিং ও প্রচুর। জাহাঙ্গীরের সময় এই চিত্রকলা সব চেয়ে উন্নত হয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সময় হতে ভারত চিত্রকলার রূপ আবার ম্লান হয়ে আসে। আলমগীর এ সব ললিতকলার বড় ধার ধারতেন না। কাজেই শিল্পীরা চলে গিয়ে একে একে আশ্রয় গ্রহণ করেন পাঞ্জাব, রাজপুতনা, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের ছোট বড় রাজ্যে।

উত্তরকালে জয়পুর হয়ে ওঠে চিত্রকলাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র, রাজস্থানের কয়েকটি রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজপুত আর্টের উন্নতি ঘটে। মুঘল স্কুলের ছবিতে রঙের জৌলুষ ছিল বেশী, রাজপুত স্কুলের

কিন্তু তার সঙ্গে ভাবের খোরাক পাওয়া গেল। উত্তরাপথে জম্মু, কাংড়া, চম্বা, নুরপুর, বাশোলি প্রভৃতি রাজ্যের কয়েকজন চিত্রশিল্পী আশ্রয় পান। এঁদের আঁকা ছবি পাহাড়ী স্কুলের বলে পরিচিত, যার মধ্যে কাংড়া আর্ট বিশেষ খ্যাতি লাভ করে—পরে আবার লাহোরে, রঞ্জিৎ সিং-এর সময়।

এর পরই গত শতাব্দী থেকে বিলাতি আর্টের প্রভাব আসে খুব বেশী, ভারত চিত্রকলায় দক্ষিণ ভারতে রবি বর্মা (জলের রং) temperaর সঙ্গে তেল রং পাশ্চাত্য রীতিতে ছবি এঁকে নাম করেন। গত শতাব্দীর শেষের দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এদেশের একদল শিল্পী বিলাতী একাডেমী চিত্রকলার ভক্ত হন। এর মুখপাত্র ছিলেন রবি বর্মা। তিনি পরিণত বয়সে বড় বড় ক্যানভাসে পৌরাণিক বিষয় নিয়ে বহু তৈলচিত্র আঁকেন, যার মধ্যে কয়েকখানা আমার দেখার সৌভাগ্য হয় মহীশূর ও তাঁর দেশ ত্রিবাঙ্কুরে। ইনি ছিলেন ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশের একজন—১৮৯৩ সালে শিকাগো ও ভিয়েনাতে এঁর ছবি প্রশংসার সঙ্গে প্রদর্শিত হয়।

অল্পকালের মধ্যে ইউরোপের ফ্লোরেন্সের মত এই মহানগরী কলকাতা ভারত চিত্রকলার এক বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সরকারী আর্ট স্কুলের উন্নতির সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে কবি রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের সময় চিত্রশিল্পের পরম বিকাশ ঘটে গগনেন্দ্রনাথ ও তদ্ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। তথাকথিত প্রাচ্য চিত্রকলার জন্ম এখানেই। গগনেন্দ্রনাথ মডার্ণ আর্টের আশ্রয়ী ছিলেন—তাঁর ছবি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বিলাতে সাফল্যের সঙ্গে দেখান হয়। ঠাকুরবাড়ীর আড্ডাতে আসতেন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল—ইনি অবনীন্দ্রনাথকে শুধু সহকারী হিসাবে পাননি—তাঁর উৎসাহে ছাত্রদের ভারতীয় ধারায় চিত্রাঙ্কনের Scope দেন। সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত ছাড়া মুকুল দে, যামিনী রায়, সুনয়নী দেবী, অতুল বসু, দেবীপ্রসাদ চৌধুরী, সারদা উকিল, ক্ষিতীন মজুমদার প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে Oriental group অজন্তার ফ্রেস্কো, পরে রাজপুত ও মুঘল আর্ট এবং জাপানী বর্ণালা মুদ্রণ প্রভৃতির ভালটা নিয়ে একটি বিশিষ্ট অঙ্কনরীতির প্রবর্ত্তনা করেন—গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে। এঁরা ক্রমে এত দক্ষতা ও যশ লাভ করেন যে সারা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষতার ভার পড়ে এঁদেরই কয়েকজনের উপর।

অবনীন্দ্রনাথের বিষয়ের নির্বাচন, রচনাশৈলী, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও শিল্পপ্রতিভা যে কত উচ্চ ছিল তা আমরা ছাত্রাবস্থায় তাঁর আঁকা ছবি দেখে উপলব্ধি করেছি—শেষ যাত্রা, সাজাহানের মৃত্যু, শিবের কনে, সতীর দেহত্যাগ প্রভৃতি তাঁর master painting আজও কলারসিকদের আনন্দ দেয়। শিল্পীর শ্রেষ্ঠ শিষ্য নন্দলাল প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য চিত্রকলার প্রসারক। এর প্রথম বিস্ময়কর ছবি সতী, ১৯১০ সালে আঁকা—তাঁর প্রতিভার উন্মেষের প্রথম ধাপ। অজন্তার expedition থেকে ফিরে এসে আঁকেন, সম্পূর্ণ প্রাচ্য ধারায় কয়েকখানির মধ্যে বিখ্যাত "পার্থসারথি"। কিছুকাল পরে নন্দলাল চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। সেখানে তাঁর Santiniketan School একটি অন্যতম বিশিষ্ট চিত্রশিল্পের কেন্দ্র। উত্তর ভারতে, লাহোরে সরকারী চিত্রকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন সমর গুপ্ত, কিন্তু তাঁর ছাত্রদের কেউ নাম করেন এখানে আবার বহমন চোগতাই এক অদ্ভুত লোক ছিল। বিশেষ করে নাম করেন সারদ উকিল। আর একদল ও সবলা সাহচর্য—বিনা সরকারী সাহায্যে।

মডার্ণ আর্টের প্রোগ্রেসিভ দলের কাজ, যাদের মধ্যে বোম্বেতেও বড় কম নয়। আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে এদিকে ঝোঁকটা বেশী দেখা যাচ্ছে। এই আন্দোলনে যোগ দেন, দক্ষিণে পানিক্কার, কলকাতায় গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, অবনী সেন, সুধীর খাস্তগীর প্রভৃতি আধুনিক চিত্রকলাবিদগণ ভারত-চিত্রশিল্পকে বিশেষ পুষ্ট করছেন। তবে এঁরা কোন স্কুলভুক্ত নন খাঁটি Impressionist, post impressionist, expressionist, cubist, fauvist formalist of symbolist কেউই নন। মডার্ণ আর্টের ভারত চিত্রকলার উন্নতির কথা পরে বলব।

বেঁচে থাকো সুখ

শেখ সিরাজুদ্দীন আমেদ

হোক চেনা, অজানা
এসে যায় নাকো।
এক পল চোখে চোখ
ফিরে যাওয়া সচকিত করুণ শশক
বেড়া দেওয়া মন
ঘুরে ফিরে একবার ক্ষণিক মদির
বসতির সুখ
মানে নেই, আঁক নেই
ভয়ে ভয়ে চোখ তোলা—পাছে দেখে ফেলে।
কতটুকু ছুটি ?
ঘুমায়িত চেতনায় জমা হয় আবেক বিভূতি।

গল্প লেখা আজো হয়,
হয়েছিল ;
তালি দেওয়া ছেঁড়া কাঁথা
কাগজে ছাপানো হয়।

—তবে তাই হোক
পলি জমে শিলা।
কিন্তু বেঁচে থাক
এক পল চোখে চোখ
একটি চোরাই সুখ
—কলমের কাঁদে।

অপরাধীদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, পরিশেষে যার অভাবেই তারা ধরা পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন, টাকা হাতে পেয়ে তখনই সে তার ঋণগুলি পরিশোধ করেনি, তার মার কামরায় এক যুবককে ভাড়াটে রাখল, দোকানের সহকর্মীটিকে বিদায় দিয়ে সব কাজ সে নিজেই করতে লাগল। লোকের মনে সে এ ধারণা জন্মাতে চেয়েছিল যে, সে খুবই মিতব্যয়ী হয়েছে। এ ছাড়া তার ব্যবসায়ের উন্নতির কথা সে প্রকাশ্যে সবাইকে বলে বেড়াল। তার মার কামরায় তালাবন্ধ দেরাজের মধ্যে যে ব্যাঙ্কনোটগুলি সে পেয়েছিল, তার একখানাও একমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে সে ভাঙ্গায়নি। এক মাস পরে পঞ্চাশ পাউণ্ডের দুখানা নোট ভাঙ্গিয়ে সে তার ধার পরিশোধ করল।

এর পরেই সে তার পূর্ব্বের স্থৈর্য্য ও চতুরতা হারিয়ে ফেলল। ধৈর্য্যহারা হয়ে আরও চারখানা পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট নিয়ে কোন স্থানীয় ব্যাঙ্কে নিজের নামে একটা আমানতী হিসাব খুলল, পাউণ্ডের পর পাউণ্ড জমা দিয়ে ক্রমশই হিসাবটাকে বেশ ফাঁপিয়ে তুলল। নিজের নিরাপত্তার জন্য বাড়ীর পিছনের বাগানে যে বস্তুটিকে সে বেশ গভীর গর্ত্ত করে পুঁতে রেখেছিল তারই জন্য সে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। এ বিষয়ে আরও নিরাপদ হবার জন্য সে এক গাড়ী পাথরের টুকরা সেখানে ফেলল, আর দিনের কাজের শেষে গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় ভাড়াটে যুবকটির সাহায্যে ঐ জমিটার উপর এক কৃত্রিম পাহাড় গড়ল। এর কিছু দিন পরে এক অভাবনীয় ঘটনাসূত্রে এই ভয়াবহ ব্যাপারটি সম্পর্কে এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হোল। কিংসক্রশ ষ্টেশনের হারান মালের গুদাম ঘরে আগুন লাগে (এইখানেই তাকে তার মার সম্পত্তির জন্য দাবী উপস্থিত করতে হোত), আর সেই আগুনে তার মার দুটি বাক্সের মধ্যে একটির খানিকটা অংশ পুড়ে যায়। কোম্পানী এ ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হয়। পোষাকের উপর তার মার নাম, সেফিল্ডের ঠিকানায় তার মার নামে লেখা একখানি চিঠির সূত্র ধরে মামুলী সরকারী নোটিশ এসে উপস্থিত হয়েছিল। তাতে জানান হয়েছিল কোম্পানী ক্ষতিপূরণের দাবী বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছে। চিঠিখানা লেখা হয়েছিল মিসেস লিংকওয়ার্থের নামে। ওটা চার্লস লিংকওয়ার্থের স্ত্রীর হাতে পড়ে।

এ দলিলটায় কারও কোন ক্ষতি হতে পারে বলে ভাবা যায়নি। কিন্তু এতেই স্বাক্ষরিত হয়ে এল লিংকওয়ার্থের মৃত্যু পরোয়ানা। কিংস ক্রশ ষ্টেশনে বাক্সগুলির এতদিন পড়ে থাকবার কোন গ্রহণযোগ্য কারণই সে দেখাতে পারে নি। সে শুধু বলল, তার মার হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে। তার মাকে খুঁজে বের করবার জন্য, আর যদি প্রমাণিত হয় যে তার মৃত্যু হয়েছে তবে যে টাকাটা ইতিপূর্ব্বেই তার মা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়েছে তার দাবীর জন্য ব্যাপারটাকে তাকে পুলিশের হাতে দিতে হয়েছিল। তার স্ত্রী আর সেই ভাড়াটে যুবকটি এ বিষয়ে তাকে চাপ দেয়। রেলওয়ে কর্ম্মচারীর চিঠিখানা তাদের সম্মুখেই পড়া হয়। চিঠিটা নিতে অস্বীকার করাও তখন সম্ভবপর ছিল না। তারপর ইংলণ্ডের আইনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিচারের কল নীরবে নিঃশব্দে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলল। ডিটেকটিভের দল স্মিথ ষ্ট্রীটের চারদিকে ধীরে শান্তভাবে ঘোরাঘুরি করতে লাগল, ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করল, ব্যবসায়ের উন্নতির গল্পের সত্যতা পরখ করে দেখল, আর নিকটবর্ত্তী একটা বাড়ী হতে লক্ষ্য করল, পিছনের বাগানের কৃত্রিম পাহাড়ের উপর ফার্ণগাছগুলি কেমন সুন্দর বেড়ে উঠেছে। তারপরেই সে ধৃত হোল। বিচার দীর্ঘকাল চলেনি। এক শনিবারে বিচারের রায় দেওয়া হয়েছিল। বড় টুপি-পরা সৌখিন নারীদের সমাবেশ, রং বেরং পোষাকের আলোয় বিচারগৃহ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই জনতার মধ্যে এমন কেহই ছিল না যে, এই সুস্থ সবল সুগঠিত দেহসম্পন্ন অপরাধীর প্রতি সামান্য একটুও সহানুভূতি অনুভব করেছিল। দর্শকদের মধ্যে অনেক বর্ষীয়সী, সম্মানযোগ্যা, সন্তানবতী নারী ছিলেন। যে অপরাধে আসামী অভিযুক্ত তা তাঁদের মাতৃত্বের উপর এক নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছে। ত্রুটিহীন সাক্ষ্যের সাহায্যে ধীরে ধীরে সত্য ঘটনার উদ্ঘাটন তাঁরা সবাই মন দিয়ে শুনেছিলেন, আর অপরাধীর যথোচিত শাস্তি তাঁরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছিলেন। যখন সেই ভীতিজনক, কতকটা হাস্যোদ্দীপক কৃষ্ণবর্ণ টুপিটা পরে বিচারক আইনসম্মত দণ্ডাদেশ উচ্চারণ করলেন, তাঁদের দেহ ও মন ঈষৎ কম্পিত হয়েছিল।

লিংকওয়ার্থকে তার ঘৃণিত অপরাধের চরমদণ্ড গ্রহণ করতে হোল। যারা সাক্ষ্যপ্রমাণাদি শুনেছিল তার অপরাধ সম্বন্ধে তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। পরবর্ত্তীকালে আপীল অগ্রাহ্য হবার সংবাদে প্রথমটায় মূর্চ্ছিত হলেও চরমদণ্ডের জন্য সে যেমন নির্ব্বিকার ভাবে প্রতীক্ষা করেছিল, বিচারকের দণ্ডাদেশও ঠিক তেমনই উদাসীন ভাবে গ্রহণ করল। জেলের ধর্ম্মযাজক তার স্বীকারোক্তি পাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে সে তার নির্দোষিতার কথাই জানিয়েছিল, যদিও এর সমর্থনে সে কোনও যুক্তি বা তর্কের অবতারণা করে নি।

সেপ্‌টেম্বরের এক উজ্জ্বল প্রভাতে এক দল লোক শোভাযাত্রার মত সারিবদ্ধ হয়ে জেলখানার প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মৃত্যুদণ্ড দেবার যন্ত্রটি যে ঘরে স্থাপিত হয়েছিল সেখানে গেল। দণ্ডাদেশ প্রতিপালিত হোল। ডাক্তার টিস্‌ডেল পরীক্ষা করে দেখলেন, ওর জীবন তখনই শেষ হয়ে গেছে। তিনি ফাঁসীর মঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। অর্গলটাকে টেনে খুলে দিতে পিঠ মোড়া করে বাঁধা টুপীতে মুখ ঢাকা ওর দেহটাকে নীচে গর্ত্তের মধ্যে ঝুলে পড়তে তিনি দেখেছিলেন। ওর দেহের ভারের অতর্কিত টানে ফাঁসীর দড়িটা যে কিচ্ কিচ্ শব্দ করেছিল তা তিনি শুনেছিলেন। ঝুলে-পড়া দেহটা যে অদ্ভুতভাবে ছটফট করছিল তাও তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। ওর ছটফটানি মাত্র দু এক সেকেণ্ড কাল ছিল। প্রাণদণ্ডের কাজ বেশ সন্তোষজনক ভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল।

এক ঘণ্টা পরে তিনি শবব্যবচ্ছেদ করলেন আর দেখতে পেলেন তাঁর অনুমানই ঠিক। ওর ঘাড়ের কাছে মেরুদণ্ডের অস্থি ভেঙ্গে গেছে, মৃত্যু নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ ঘটেছে। এটা প্রমাণ করবার জন্য যে সামান্য কাটা ছেঁড়া করতে হয়, এ ক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেননি, তবুও নিয়ম পালনের জন্য তা করলেন। এ সময়ে তাঁর মনে এক অতি অদ্ভুত, সুস্পষ্ট অনুভূতি জেগেছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল মৃতের আত্মা তাঁর পাশে অতি নিকটেই রয়েছে, ওর দেহের ভগ্ন আবাসেই যেন সে এখনও বাস করছে। কিন্তু দেহের যে মৃত্যু ঘটেছে সে বিষয়ে আদৌ কোন সন্দেহ নেই, এই এক

ঘণ্টা হোল তার মৃত্যু হয়েছে। এর পর আর একটা ঘটনা ঘটেছিল যা যদিও কৌতূহলজনক কিন্তু খুবই অকিঞ্চিৎকর। এক জেলরক্ষী প্রবেশ করে জানতে চাইল, যে দড়িটা এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ব্যবহার করা হয়েছিল, যেটা ঘাতকের উপরি পাওনা, তা ভুল করে মৃতদেহের সঙ্গে শবব্যবচ্ছেদাগারে আনা হয়েছে কি না। ওটার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ওটা যেন একেবারেই অন্তর্হিত হয়েছে। এ এক বিচিত্র ব্যাপার! ওটা এখানেও নেই, ফাঁসীর মঞ্চেও নেই। ওটা হারিয়ে যাওয়া তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ব্যাপারটা বড়ই দুর্ব্বোধ্য ঠেকছিল।

ডাক্তার টিসডেল অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর টাকা পয়সা যথেষ্ট ছিল, অপর কোন কিছুর উপর নির্ভর না করেই তাঁর দিন চলতে পারত। বেডফোর্ড স্কোয়ারে একটা বড়, সুদীর্ঘ জানালাযুক্ত বাড়ীতে তিনি থাকতেন। রূপহীনা কিন্তু রন্ধননিপুণা এক পাচিকার উপর ন্যস্ত ছিল ওঁর খাদ্যের ভার, আর তার স্বামীটি ছিল ওঁর দেহরক্ষী। ডাক্তারী ব্যবসা করবারও তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব শিক্ষার জন্যই তিনি জেলখানাতে এ কাজ নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, মনুষ্যজাতি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আচরণের যে বিধি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেছে তার লঙ্ঘনই অপরাধ। অধিকাংশ অপরাধই মস্তিষ্ক বিকৃতির বা খাদ্যাভাবের ফল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চুরির অপরাধের জন্য তিনি মস্তিষ্ককেই দায়ী করতেন। কখন কখন অভাবই যে এর মূল কারণ তা খুবই ঠিক, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের কোন অজ্ঞাত রোগের প্রভাবে মানুষ এ অপরাধে লিপ্ত হয়। সুনিরূপিত ক্ষেত্রে একে চৌর্য্যোন্মাদ বলা হয়। তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে অপরাধপ্রবণতা অভাবের তাড়নায় জন্মে না। যে অপরাধের সঙ্গে বলপ্রয়োগের কার্য্য বর্ত্তমান, সে অপরাধগুলির ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষ ভাবেই সত্য। সেই দিন বিকালবেলা বাড়ী ফিরবার সময় যে অপরাধীর শেষ সময়ে তিনি আজ সকালে উপস্থিত ছিলেন তাকে তিনি মনে মনে এই পর্য্যায়ে ফেলেছিলেন। এ আসামীর অপরাধ অতিশয় ঘৃণ্য! টাকা-পয়সার অভাব ওর তেমন গুরুতর ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডের অস্বাভাবিকতা আর ভয়াবহ ঘৃণ্যতার জন্য তিনি হত্যাকারীকে অপরাধী না বলে এক উন্মাদগ্রস্ত রোগী বলবার পক্ষপাতী ছিলেন। যতদূর জানা যায় লোকটি শান্ত, ধীর ও দয়ালু ছিল, স্ত্রীর প্রতি তার ব্যবহার ছিল বেশ বিবেচনাপূর্ণ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্বন্ধ বেশ হৃদ্যতাময়। তারপর সে একটা অপরাধ করে বসল, শুধু একটা অপরাধ যা তাকে চিরদিনের মত মনুষ্যনামের অযোগ্য প্রমাণ করল। অপরাধটা এতই ভয়ঙ্কর যে তা সকলের পক্ষেই সহনাতীত। প্রকৃতিস্থ মানুষের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হোক বা কোন পাগলের দ্বারাই হোক, এ অপরাধীকে এই গ্রহে অর্থাৎ পৃথিবীতে রাখবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু মৃত অপরাধী যদি তার অপরাধটা স্বীকার করতো, তাহলে তিনি এ বিষয়ে বিচারকের সঙ্গে একমত হতে পারতেন। নীতির দিক হতে যদিও তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে লোকটাই দোষী, তিনি ভেবেছিলেন যে জীবনের সকল আশাই যখন ওর চলে গেল অপরাধটা স্বীকার করে ও বিচারকের বিচারকে সমর্থন করবে।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি একাকীই ডিনার খেলেন। ডিনারের পর খাবারের ঘরের সংলগ্ন পড়বার ঘরে গেলেন। পড়তে ইচ্ছা না থাকায় অগ্নিকুণ্ডের বিপরীত দিকে একটা বড় লাল চেয়ারে বসলেন। তারপর মন যেখানে যেতে চায় তাকে সে দিকেই ছেড়ে দিলেন। তখনই আজকের সকালের সেই অদ্ভুত অনুভূতির কথা তার মনে হোল। তিনি অনুভব করেছিলেন, জীবন শেষ হবার এক ঘণ্টা পরেও শবব্যবচ্ছেদাগারে লিংকওয়ার্থের আত্মা উপস্থিত হয়েছিল। এই রকম অনুভূতি, বিশেষ করে হঠাৎ মৃত্যুর ক্ষেত্রে, এবারই তার প্রথম নয়, কিন্তু আজকের অনুভূতি এমনই সুস্পষ্ট যে একে মিথ্যা বলে সন্দেহ করবার কিছু নেই। তাঁর মনে হোল কোনও প্রাকৃতিক বা আত্মিক সত্যের উপরই সম্ভবতঃ এ অনুভূতি প্রতিষ্ঠিত। এখানে বলা যেতে পারে যে ডাক্তার পুনর্জন্মের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। দেহের মৃত্যুতে যে আত্মার বিনাশ ঘটে না এ তত্ত্বও তিনি বিশ্বাস করতেন। সম্ভবতঃ লিংকওয়ার্থের আত্মা তার পার্থিব দেহটাকে ছেড়ে চলে যায় নি বা যেতে অসম্মত ছিল। সম্ভবতঃ এ মর পৃথিবীতে আরও কিছুক্ষণ আবদ্ধ হয়ে থাকতে তার ইচ্ছা হয়েছিল। ডাক্তার টিসডেল অবসরকালে জীবন ও মৃত্যুর নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা করতেন। অনেক সুনিপুণ অভিজ্ঞ চিকিৎসাবিদের ন্যায় তিনি ভাল করেই জানতেন আত্মা ও দেহের বিভেদ-রেখা কত সঙ্কীর্ণ, পার্থিব বস্তুর উপর অতীন্দ্রিয়ের প্রভাব কত প্রবল; এ কথা বিশ্বাস করতে তার কোনই দ্বিধা-বোধ ছিল না যে, শান্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে দেহযুক্ত আত্মার যোগাযোগ স্থাপন সম্ভবপর।

তার চিন্তার ধারা যখন একটা সুনির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হতে চলেছিল, তখনই তিনি বাধা পেলেন। তাঁর-হাতের কাছেই ডেস্কের উপর টেলিফোনটার ঘণ্টা তখনই বেজে উঠল। শব্দটা ধাতব পদার্থ নিঃসৃত শব্দের মত খনখনে নয়, কিন্তু এত মৃদু যে মনে হচ্ছিল বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন অতি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে বা যন্ত্রটাই বিকল হয়েছে। তা যাই হোক ওটা যে বাজছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; তিনি উঠলেন, রিসিভার তুলে নিলেন, বললেন, "হাঁ, হাঁ, কে আপনি?

উত্তরে শুধু একটা ফিস্ ফিস্ শব্দ শোনা গেল, প্রায় না শোনা যাবার মতই, আর দুর্বোধ্য।

তিনি বললেন, "আপনার কথা-ত শুনতে পাচ্ছিনা।"

আবার সেই ফিস ফিস শব্দ, পূর্ব্বের চাইতে স্পষ্টতর নয়। তারপর শব্দটা একেবারেই মিলিয়ে গেল।

নূতন করে ডাকটা পাবার আশায় প্রায় আধমিনিট তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু টক টক, কোঁ কোঁ শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দই যন্ত্রটায় হচ্ছিল না। তাতে মনে হচ্ছিল, যে ডেকেছিল সে আর কোন যন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। তারপর তিনি রিসিভারটা যথাস্থানে রাখলেন। একটু পরেই এক্সচেঞ্জকে তিনি ডাকলেন, নিজের নম্বরটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আপনি কি দয়া করে বলবেন কোন নম্বর থেকে আমায় এই মাত্র ডেকেছিল?"

একটু পরেই নম্বরটা তিনি পেলেন। যে জেলখানার ডাক্তার তিনি, ওটা সেখানকার টেলিফোনেরই নম্বর।

তিনি বললেন, "আমায় দয়া করে ও নম্বরটার সঙ্গে যোগ করে দিন।" তা করা হলে তিনি রিসিভারের নলের মধ্য দিয়ে বললেন,

"এই মাত্র আমায় ডাকা হয়েছিল। আমি ডাক্তার টিসডেল। আমায় কে ডেকেছেন ? আমি তাঁর কথা তখন শুনতে পাইনি।"

উত্তর শুনতে পাওয়া গেল, স্বর বেশ স্পষ্ট ও বোধ্য।

সে বলল, "হয়ত কোন ভুল হয়েছে, সার !—আমরাও আপনাকে ডাকিনি !"

"এক্সচেঞ্জ যে বলছে, আমায় ডাকা হয়েছিল, এই তিন মিনিট পূর্ব্বে।"

সেই স্বর বলল, "এক্সচেঞ্জ ভুল করেছে, সার !"

"খুবই আশ্চর্য্যের কথা ! আচ্ছা, বিদায় ! ওয়ার্ডার ড্রেকুট নয় কি ?"

"হাঁ সার !—বিদায়, সার !"

ডাক্তার টিসডেল তাঁর বড় আরাম কেদারায় ফিরে গেলেন, পড়বার ইচ্ছা তাঁর আরও কমে গেল। কিছুক্ষণের মত তিনি তাঁর চিন্তাকে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু বার বার তাঁর মন টেলিফোনের সামান্য অথচ অদ্ভুত ব্যাপারটার দিকেই ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। এর পূর্ব্বে অনেক বারই তাঁকে টেলিফোনে ভুল করে ডাকা হয়েছে, অনেকবারই এক্সচেঞ্জ তাঁকে ভুল নম্বরের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে, কিন্তু এবারের টেলিফোন ঘণ্টার অতি মৃদু শব্দ, তারপর ওধারের দুর্বোধ্য ফিস্ ফিস্ শব্দ তাঁর মনে এক অদ্ভুত রহস্যময় ভাবের সৃষ্টি করল। একটু পরেই যখন তাঁর হুঁস হোল তিনি দেখতে পেলেন, কামরার এ প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তিনি পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন, তাঁর মন এক অলৌকিক চিন্তাজগতে বিচরণ করছে।

তিনি হঠাৎ জোরে বলে উঠলেন, "কিন্তু এ যে অসম্ভব" !

পূর্ব্বের মতই তার পরদিন প্রাতঃকালে তিনি জেলখানায় গেলেন। আবার তাঁর মনে সেই অদ্ভুত ভাব জাগল। তিনি অনুভব করলেন, এক অদৃশ্য সত্তা যেন সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইতিপূর্ব্বে আত্মিক বিষয়ে তার কতকগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাতে তিনি বুঝেছিলেন যে এ সব বিষয়ে তিনি বিশেষ "অনুভূতিসম্পন্ন" অর্থাৎ কোন কোন অবস্থায় তিনি অতীন্দ্রিয় ভাব গ্রহণে সমর্থ। আমাদের চারদিকে যে অদৃশ্য জগৎ রয়েছে তার দর্শনলাভের শক্তিও তার আছে। গত প্রাতঃকালে যাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তারই অদৃশ্য সত্তাকে তিনি আজ অনুভব করছেন ! এ অনুভূতি বিশেষ বিশেষ স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জেলখানার ছোট আঙ্গিনায় এই অনুভূতিটা খুবই তীব্র। অপরাধীকে যে ঘরটায় রাখা হয়েছিল সেখান দিয়ে যাবার সময়ও তিনি ঐ সত্তাকে বিশেষ ভাবে অনুভব করেছেন। অনুভূতিটা এতই প্রবল যে, ও লোকটা যদি সশরীরে এসে তাঁর কাছে দাঁড়াত, তা হলেও তিনি বিস্মিত হতেন না। ঐ রাস্তার শেষ প্রান্তের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তিনি ওটাকে দেখবার আশায় সত্যি সত্যি ঘুরে দাঁড়ালেন। সবক্ষণই একটা প্রচণ্ড ভয়ে তাঁর মনটা কেমন ছমছম করছিল। এক অদৃশ্য সত্তার উপস্থিতি তাঁর মানসিক স্থৈর্য্যের ব্যাঘাত ঘটাল। তিনি অনুভব করলেন, ঐ হতভাগ্য আত্মা যেন তাঁকে ওর জন্য কিছু করতে অনুরোধ জানাতে চাচ্ছে। তাঁর এ ধারণা যে একান্তই বাস্তব এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এ তাঁর কল্পনা প্রবণ মনের সৃষ্টি নয় যে লিংকওয়ার্থের প্রেতাত্মা সত্যই এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।*

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]।

অনুবাদক :—শ্রীঅংশুমান দাশগুপ্ত।

---

* ই, এফ, বেনসন রচিত The Confession of Charles Linkworth নামক একটি ইংরাজী গল্পের অনুবাদ।

বিস্মরণ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

একদিন ভাল লেগেছিল
তোমার কবিতা।
সেখানে আবির ছিল, স্বপ্ন ছিল ছায়া-মানবীর ;
প্রেমের অঞ্জন ছিল প্রেমিকার চোখের তারায়।
কটাক্ষের শরে—
যতটুকু ছল ছিল শান্তি ছিল তারো চেয়ে বেশী।

সেই ভুল ভেঙে গেছে আজ।
তোমার কবিতা শুধু সেই জগতের
যেখানে আনন্দ আছে, প্রেম আছে, ভালবাসা আছে
যেখানে বসন্ত আসে—
ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় রাত,
সুগন্ধের হিল্লোলিত তরঙ্গের নেশা
মেখে নেয় কপোত-কপোতী।
গোটা কিম্বা খণ্ড চাঁদ
সাক্ষী থাকে ঝাউ-এর আড়ালে !

সেদিন তো মরে গেছে,
তোমার কবিতা টিঁকে যাবে ?
যাদের জেনেছ তারা নেই,
কবিতা শোনার দিন শেষ।
আজ কিছু নেই,
এই পৃথিবী মরে হেজে
পচে গেছে বহুদিন আগে—
গলিত শবের গন্ধে প্রেম আজ ছন্নছাড়া কিছু।

তোমার কবিতা সব মিছে,
আজ তার কোন দাম নেই ;
যদি চাও
পৃথিবীর ভিজে সোঁদা কবরের 'পরে
মেলে দিও কবিতা তোমার—
সেই ভাল হবে !

শরৎচন্দ্র ও কাজী নজরুল

এম, আবদুর রহমান

কথা-সাহিত্যের যুগস্রষ্টা শিল্পী জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় নূতন করে প্রদান করবার প্রয়োজন নেই। সুতরাং নেই বিদ্রোহী ও বুলবুল কবি কাজী নজরুল ইসলামের নব পরিচিতির, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সেরূপ কোন আলোচনার ইচ্ছাও নেই আমাদের। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এই দুই দিকপালের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল—এবং তাঁরা একে অপরকে কোন দৃষ্টিতে দেখতেন —আমরা সংক্ষেপে সেই বিবরণী দেবার চেষ্টা করবো।

অখণ্ড ভারতের শীর্ষস্থানীয় নায়করূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের তখন অপ্রতিহত প্রভাব। হিন্দ্‌ রাষ্ট্রগগনে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মতই তিনি তখন দীপ্যমান। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সর্বাংশে তিনি তখন একমত হতে পারেন নি। আর না পারার জন্য কংগ্রেসের পতাকাতলে থেকেই তিনি গঠন করেছিলেন স্বরাজ্যদল। প্রখ্যাতনামা নেতা মতিলাল নেহেরু এই সংস্থা গঠনে সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। দেশবন্ধুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন—বীর্য্যবান তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। অতঃপর বাঙলার সকলশ্রেণীর মানুষকে, বিশেষ ক'রে ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক, কবি-সাহিত্যিক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী সমাজকে, বণিকসম্প্রদায়, তরুণ সমাজকে তিনি আহ্বান জানালেন, স্বরাজ্যদলকে শক্তিশালী ক'রে গড়ে তুলবার জন্য। নীরবকর্ম্মী ও সাহিত্য-সাধক শরৎচন্দ্রকে তিনি ঘরে ব'সে থাকতে দিলেন না। তাঁকে তিনি রাষ্ট্রনীতির মঞ্চে এনে দাঁড় করালেন। এই সময়ে তাঁর স্মরণ হ'ল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। তিনি এই নির্ভীক তরুণ চারণ কবিকে পূর্ব্বেই চিনে ছিলেন, জেনে ছিলেন বাঙলার যুব-সমাজের উপর তাঁর কি অসীম প্রভাব। নজরুলকে দেশবন্ধু অত্যন্ত স্নেহ করতেন, নারায়ণ কাগজে ছাপতেন তাঁর লেখা এবং উচ্চ সম্মান-মূল্য দিতেন কবির রচনার জন্য। দেশবন্ধুর দৌলতে দেশবন্ধুর বাড়ীতে হ'ল একদিন শরৎচন্দ্র নজরুলের মধ্যে সাক্ষাৎকার এবং আলাপ-পরিচয়। ত্যাগবৃদ্ধ চিত্তরঞ্জন দাসের আহ্বানে—আয়োজিত মজলিসে আমাদের প্রতিপাদ্য উভয় সাহিত্য-সেবকের মধ্যে যে আলাপ হয়েছিল, পরবর্তী কালে তা' স্নেহ-প্রীতিতে হয়েছিল নিবিড়। নজরুলের প্রতি শরৎচন্দ্রের স্নেহ-আকর্ষণ ছিল যেমন প্রবল, শরৎচন্দ্রের প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল তেমনি অতল গভীর। তাঁদের কথা ও কাব্যে তার পরিচয় একাধিকবার পাওয়া গেছে।

নজরুল ইসলাম ধূমকেতু নামে একখানি অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন ৩২নং কলেজ ষ্ট্রীট থেকে ইংরাজি ১৯২২ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে। এই পত্রিকা প্রকাশ করবার কালে তিনি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যেমন প্রার্থনা করেছিলেন আশীর্ব্বাণী, তেমনি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের নিকট হতেও চেয়েছিলেন শুভাশীষ। তাঁরা উভয়েই আশীর্ব্বাণী পাঠিয়েছিলেন এবং যথাবিহিত সম্মানের সহিত সেগুলি ধূমকেতুতে প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র যে আশিস্‌-লিপি পাঠিয়েছিলেন, নিম্নে সেটি উদ্‌ধৃত করছি।

পরম কল্যাণীয়বরেষু,

তোমার কাগজের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া একটিমাত্র আশীর্ব্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তারপর ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।

২৪শে শ্রাবণ, তোমার
১৩২৯। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ধূমকেতু, ধূমকেতুর মতই ভয়াবহ হয়ে উঠলো সরকারের কাছে। পত্রিকার মাধ্যমে কবি নজরুল ইসলাম অগ্নিবর্ষণ শুরু করলেন। সরকার আর সহ্য করতে পারলেন না। আনন্দময়ীর আগমনে শীর্ষক সম্পাদকীয় কবিতার জন্য নজরুলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হ'ল। এক বৎসরের জন্য হ'ল কবির কারাদণ্ড।

আলীপুর জেল হতে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হ'ল হুগলী জেলে। আলীপুর জেলে তাঁর প্রতি কিছুটা ভাল ব্যবহার করা হতো। হুগলী জেলে আসার পর সে ব্যবস্থা পাল্টে গেল। অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার পেতে লাগলেন তিনি কারাকর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। সাধারণ কয়েদীর মত ডোরাকাটা জ্যাকেট আর জাঙ্গিয়া পরতে দেওয়া হ'ল তাঁকে। খাবার দেওয়া হ'ল লপসী আর ঘ্যাঁট। শুধু তাই নয় কারা-কর্তৃপক্ষ তাঁর ও অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতে লাগল। প্রতিবাদ করায় কবিকে রাখা হ'ল সেলে অর্থাৎ কয়েদী রাখা লোহার খাঁচায়। নজরুল অনশন ধর্ম্মঘট শুরু করলেন। এক দুই করে অনেকদিন কেটে গেল। বাইরে ছড়িয়ে পড়লো এই খবর। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'ল, নজরুলের অবস্থা কাহিল—তাঁর বাঁচার আর সম্ভাবনা নেই, কবিগুরু সংবাদ পেয়ে রাঁচি হতে তার করলেন—Give up hunger strike. Our literature claims you.
দরদী শরৎচন্দ্র নিজে গেলেন হুগলী, নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে, উদ্দেশ্য কবিকে অনশন ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা। কিন্তু সরকার শরৎচন্দ্রকে নজরুলের সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিলেন না। শরৎচন্দ্র ব্যথিত চিত্তে ফিরে এলেন হুগলী থেকে। এখানে একথা প্রকাশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কবিগুরুর তারবার্ত্তাও নজরুলকে দেওয়া হয়নি।

শরৎচন্দ্রের লেখা, ঐ সময়কার একটি পত্রে নজরুলের প্রতি তাঁর

মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছিলেন···হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম উপোস করে মরমর হয়েছে। বেলা ১টার গাড়ীতে যাইতেছি, দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে সে খাইতে রাজী হয়। না হইলে তার কোন আশা দেখি না। একজন সত্যিকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধহয় এমন কেহ আর দ্বিতীয় কবি নাই।···"(১)।

নজরুলের জীবনহানি হতে পারে, এই আশঙ্কায় শরৎচন্দ্র আপনজনের মতই কাতর ও চিন্তাকুল হয়েছিলেন। যিনি সাধারণতঃ বাড়ীর বে'র হতে চাইতেন না, নজরুলকে অনশন হতে রক্ষা করবার জন্ত দুপুরে কষ্ট করে হুগলী জেলখানা পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। এথেকে কবির প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা উল্লেখযোগ্য নিশ্চয়ই।

নজরুলের মরণোন্মুখ অবস্থার সংবাদ পেয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সরকারের চণ্ডনীতির প্রতিবাদে কলকাতায় সভা-আহ্বান করেন। তাঁর ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের চাপে সরকার নজরুল ইসলাম প্রমুখ রাজবন্দীদের অভিযোগের প্রতিকার করবার প্রতিশ্রুতি দেন, অতঃপর উনচল্লিশ দিনের দিনে নজরুল তাঁর মাতৃসমা শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর হাতে লেবুর রস খেয়ে অনশন ধর্ম্মঘট ভঙ্গ করেন। শরৎচন্দ্র এই সংবাদ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। বলা বাহুল্য নজরুল অনশন ধর্ম্মঘট ভঙ্গ না করা পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলেন।

উক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পরের কথা। নজরুল তখন আরও জনপ্রিয় এবং সাহিত্যের দরবারে আরও অধিক সম্মানিত। এমন সময়ে একদা শরৎচন্দ্র-নজরুলের মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে নজরুলকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য সেকালের নজরুল বিরোধী সাহিত্য সেবকদের কয়েকজন কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। সাহিত্যের আসর গরম করবার চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু সে প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ফলবতী হয়নি।

ব্যাপারটি ঘটেছিল শরৎচন্দ্রের পথের দাবী নামক বহুল প্রচারিত উপন্যাসে প্রকাশিত একটি মন্তব্য নিয়ে। পথের দাবীর সব্যসাচী একস্থানে বলেছেন: অশিক্ষিতদের জন্য অন্নসত্র খোলা যেতে পারে, কারণ তাদের ক্ষুধাবোধ আছে। কিন্তু সাহিত্য পরিবেশন করা যাবে না। তাদের সুখ-দুঃখ বর্ণনা করবার মানেই তাদের সাহিত্য নয়। কোন দিন যদি সম্ভব হয়, তাদের সাহিত্য তারাই করে নেবে, নইলে তোমার গলায় লাঙলের গান, লাঙলধরার গীতিকাব্য হয়ে উঠবে না। এ অসম্ভব প্রয়াস তুমি করো না কবি।

বাস্, আর যায় কোথায়? তারারা মেতে উঠলেন। ভাবখানা এই যে, শরৎচন্দ্র নজরুলকে একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন সাহিত্যের মজলিস থেকে লাঙল-চষা জমির মাটিতে।

এখানে খোলসা করে বলা দরকার যে, তারারা তৎকালীন আত্মশক্তি পত্রিকার এক লেখকের ছদ্মনাম। আসল নাম শ্রীতারানাথ রায়। আত্মশক্তি ছিল কংগ্রেস কর্ম্মীসঙ্ঘের নেতা বিপ্লবী শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাগজ। ধূমকেতুর বিপ্লবী নজরুল লাঙল-গণবাণী পত্রিকা গোষ্ঠীতে গিয়ে কমরেড নজরুলে রূপান্তরিত হোন, এটা তাঁরা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। বলা বাহুল্য, ঐ সময়ে লাঙল বন্ধ হয়ে গিয়ে তার জায়গায় গণবাণী নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়েছিল, নজরুলকে করা হয়েছিল তার পরিচালক। পত্রিকাখানি ছিল বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের মুখপত্র। কমরেড জনাব মুজাফ্‌ফর আহমদ, শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, বীরভূমের শামসুদ্দীন হোসেন মরহুম এবং তাঁর ভাই কমরেড আবদুল হালিম প্রভৃতি ঐ দলে ছিলেন। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পরে সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন শ্রীগঙ্গাধর বিশ্বাস। লাঙলের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১-১-১৯২৬) বে'র হয়েছিল কৃষাণের গান। বলা বাহুল্য যে, নজরুল সাম্যবাদী বা সমাজবাদী হলেও ঠিক যাকে কমিউনিষ্ট বলে তা ছিলেন না। পুরাপুরি কমিউনিষ্ট হবার মত প্রকৃতি তাঁর ছিল না।

কবি নজরুল ইসলাম লাঙল পত্রিকায় কৃষাণের গান গাইছেন, কাজেই তারারা ধরে নিলেন শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর সব্যসাচীর কবি নিশ্চয়ই নজরুল ইসলাম! নজরুলকে ঘায়েল করবার জন্য কলম ধরলেন তাঁরা বা তারারা। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় কমরেড মুজাফফর আহমদ সাহেব, উক্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেবার পর লিখেছেন: পথের দাবীর কবি আর কবি নজরুল যে, এক ধরণের কবি নয়, তবুও অনেকে ধরে নিলেন, নজরুল ইসলাম ছাড়া শরৎচন্দ্রের কটাক্ষিত কবি আর 'কেউ নয়। কাগজে এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র নিজেও কিছু বললেন না। (২।৩)

বলা বাহুল্য যে তারারার ঝগড়ায় শরৎচন্দ্র যেমন যোগ দেননি, নজরুল নিজেও তেমনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন। এই শ্রেণীর অবাঞ্ছিত আলোচনা তাঁরা উভয়েই পছন্দ করতেন না। হিংসা বিদ্বেষ এবং অসূয়ার উর্দ্ধে ছিল তাঁদের স্থান। উন্মুক্ত এবং উদার ছিল—তাঁদের মন। তাঁরা একে অপরকে ভালভাবে জানতেন কাজেই তাঁদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য তাঁরা ঝগড়ার আসরে অবতীর্ণ হতে চাননি, ইহাই অনেকের অভিমত। তথাপি উক্ত ঘটনার পরে লিখিত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের রীতিনীতি নামক প্রবন্ধ হতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সব্যসাচীর মুখ দিয়ে যে কবির কথা বলেছেন, তিনি কাজী নজরুল ইসলাম নন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গবাণী নামক মাসিক পত্রে। শরৎচন্দ্র তাঁর উক্ত প্রবন্ধে অবশ্য খোলাখুলি ভাবে সব্যসাচীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। কিন্তু তিনি নজরুল ও কল্লোল গোষ্ঠির সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ক'রে ও উষ্মা প্রকাশ ক'রে নজরুল-বিদ্বেষী কবি মোহিতলাল মজুমদার ১৩ই আশ্বিনের (১৩৩৪) আত্মশক্তিতে লিখেছিলেন···তিনি (শরৎচন্দ্র) নজরুল-কল্লোল—কালিকলমের সাহিত্য-সৃষ্টিতে আস্থাবান—যাঁহাদের রচনায় প্রতি অক্ষরে কৃত্রিমতা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।···কবি মোহিতলাল মজুমদার প্রথম দিকে ছিলেন নজরুলের ভক্ত। মোসলেম ভারত পত্রিকায়

১। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ ২০১, এবং আজহারউদ্দীন খানের বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃঃ ৩৫।৩৬।

২-৩। মোজাফ্‌ফর আহমদ-কৃত "নজরুল প্রসঙ্গে" পৃঃ ১২৭-১৩৩, গণবাণী ২৩।৯।১৯২৬ সংখ্যা।

তিনি নজরুলের কবিতার প্রশংসা করে নিবন্ধও লিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যে কোন কারণেই হোক, তিনি নজরুলের উপরে বিরূপ হয়ে ছিলেন এবং তাঁকে বিদ্রূপ করে একাধিক কবিতা লিখেছিলেন। (৪)

১৩৩৪ সালের বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ধর্ম্ম এবং শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সাহিত্যধর্ম্মের সীমান'। আত্মশক্তিতে বের হয়েছিল কবি মোহিতলালের এবং তৎপরে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ। সাহিত্যের আদর্শ ও সীমা-সরহদ্দ নিয়ে কয়েকমাস ধ'রে বেশ বিতর্ক চলেছিল। ঢাকার মাহেনও পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ছান্দসিক কবি আবদুল কাদির সাহেব লিখেছেন: অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বিবর্ত্তনে নজরুল নিয়েছিলেন পুরোধার ভূমিকা। এ প্রবন্ধটিতে (আত্মশক্তিতে প্রকাশিত নজরুলের প্রবন্ধে) তার পরিচয় প্রোজ্জ্বল।(৫)

সুলেখক শ্রীরণজিৎকুমার সেন তাঁর কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যের নবতম দিগ্‌দর্শন প্রবন্ধে লিখেছেন: বাংলার তরুণ-মন··· এমন কাব্য অনুসন্ধান করছিল, যার মধ্যে শব্দবিন্যাস, ছন্দমাধুর্য্য কাব্যাদর্শ ও ভাব-সম্পদের একত্র সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্যে এই মণিভাণ্ডার নিয়ে এলেন নজরুল।···(৬)

নজরুল সাহিত্য সম্পর্কে এবম্বিধ বহু মন্তব্য পাওয়া যায়। বিদগ্ধ সাহিত্যিকগণের রচনার মধ্যে। কয়েক যুগ আগে ভবিষ্যৎ-দর্শী শরৎচন্দ্র নজরুল সৃষ্ট সাহিত্যকে কেন সমর্থন জানিয়েছিলেন—উক্তবিধ আলোচনা পাঠ করলে তার সারবত্তার সন্ধান পাওয়া যায়।

মশহুরনামা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রখ্যাতনামা কবি নজরুল ইসলামের যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তা কোন দিনই ক্ষুণ্ণ হয়নি। শরৎচন্দ্র এবং শরৎ-সাহিত্যের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন নজরুল। ১১৩০ কি ১১৩৩ সালের ঘটনা—যতদূর মনে পড়ে কবি তখন থাকতেন ৩৭১নং সীতানাথ রোডের একটি বাড়ীতে। সারা দেশে তাঁর তখন খুব নামডাক। প্রায় সব সময়েই ভক্ত ও প্রিয়জনের সমাগমে জমজমাট হয়ে থাকত তাঁর বাড়ী। সেদিন কয়েকজন সাহিত্য-যশঃ-প্রার্থী তরুণ বসেছিলেন তাঁকে ঘিরে, তাঁর বাড়ীর উপরতলার একটা ঘরে। কমরেড আবদুল হালিম সাহেবের সহোদর জনাব আবুল কাসেম সাহেবের সঙ্গে এই প্রবন্ধের লেখকও সেখানে গিয়ে দল ভারী করলেন। পরে এসেছিলেন প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক-সাহিত্যিক জনাব আঃ কাঃ শামসুদ্দীন (অধুনা আজাদের সম্পাদক)। কবি বলছিলেন: তোমরা যারা কবিতা লিখতে চাও, গুরুদেবের আর কবি সত্যেন দত্তের কবিতা প্রচুর পরিমাণে পড়বে।···আর যারা গল্প উপন্যাস লিখতে যাও, তারা পড়বে, বার বার পড়বে শরৎবাবুর লেখা। এই একটি মাত্র লিখিয়ে মানুষ, যাঁর জোড়া নেই—যাকে বলে বে-নজীর! শক্তিমান ঔপন্যাসিক তিনি, মানুষের প্রতি দরদও তাঁর অফুরন্ত।··· তাঁর বলার ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল তাঁদের প্রতি (রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতি) তাঁর অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাঁর এই শ্রদ্ধার নিদর্শন দেখতে পাই আমরা তাঁর একাধিক রচনার মধ্যে। মৃততারা নামক কবিতায় তিনি লিখেছেন:—

কাব্যের নীল স্বচ্ছ গগনে অকল্যাণের হেতু,
একদা শারদ নিশীথে সহসা উঠেছিনু ধূমকেতু,
যে উদার নভ-অঙ্গনে লীলা করে শত রবি চাঁদ
কেন জেগেছিল সে সভায় মোর আলো দানিবার সাধ।
কেহ হেসেছিল উদ্ধত মোর বিপুল স্পর্দ্ধা হেরি,
কেহ এসেছিল পতঙ্গসম অগ্নি-কেতন ঘেরি।

* * *

সেদিন আমারে প্রণতি জানাতে এলো কত নর-নারী
বন্দিয়া ছিল আমারে ভাবিয়া সাগ্নিক নভোচারী।
তাহাদের পানে লজ্জায় আমি চাহিতে পারি না আজ,
রবি ও শরৎচন্দ্র বিরাজে সে মহাগগন মাঝ।
আলোক দানের স্পর্দ্ধা লইয়া এসেছিনু সেই নভে
জানি না সে মহা অপরাধের যে ক্ষমা পাব আমি কবে।···

১৩৪৪ সালের সাপ্তাহিক ছন্দার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এই সুদীর্ঘ কবিতাটি। উক্ত কবিতায় তিনি নিজেকে সাহিত্য-গগনের মৃততারা এবং কবিগুরুকে সূর্য্য ও শরৎচন্দ্রকে চন্দ্র বলে তাঁদের প্রতি যে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করেছেন তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শরৎচন্দ্রের দ্বিপঞ্চাশৎ জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে কবি নজরুল তাঁকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বরচিত একটি কবিতার মাধ্যমে এবং সম্বোধন করেছেন নবযুগের নব ঋত্বিক বলে। আমরা উক্ত কবিতার কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত না করে পারলাম না:

নব ঋত্বিক নব যুগের
নমস্কার, নমস্কার
আলোকে তোমার পেনু আভায়
নও রোজের নব উষার
তুমি গো বেদনা সুন্দরের
দরদ দীল্ নীল মাণিক
তোমার তিক্ত কণ্ঠে গো
ধ্বনিল সাম বেদনা-ঋক।

* * *

পায়ে দলি পাপ সংস্কার
খুলেছিলে বীর স্বর্গদ্বার
শুনাইলে বাণী: নহে মানব
গাহি গো গান মানবতার
মনুষ্যত্ব পাপী তাপীর
হয় না লয়, রয় গোপন,
প্রেমের যাদুর স্পর্শে সে
লভে অমর নবজীবন।
উর্দ্ধে যতই কাদা ছিটায়
হিংসুকের নোংরা কর,
সে কাদা আসিয়া পড়ে সদাই
তাদেরই হীন মুখের 'পর।

৪। নজরুল প্রসঙ্গে—

৫। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনাসম্ভার," ভূমিকা।

৬। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৬১, পৃঃ ৬৮১-৬৮৭।

আজ যবে সেই পেচক দল
শুনি তোমার করে স্তব,
সেই ত তোমার শ্রেষ্ঠ জয়
নিন্দুকের শঙ্খরব।

* * *

হয় ত আসিবে মহাপ্রলয়
এ দুনিয়ার দুঃখ দিন,
সব যাবে শুধু রবে তোমার
অশ্রুজল অন্তহীন।
অথবা যেদিন পূর্ণতায়
সুন্দরের হবে বিকাশ,
সেদিনো কাঁদিয়া ফিরিবে এই
তব দুখের দীর্ঘশ্বাস।
মানুষের কবি। যদি মাটীর
এই মানুষ বাঁচিয়া রয়,
রবে প্রিয় হয়ে হৃদি ব্যথায়
সর্ব্ব লোক গাহিবে জয়।

* * *

এই কবিতাটি 'শরৎচন্দ্র' শিরোনামায় সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা 'নওরোজে' প্রকাশিত হয়েছিল। কবি উক্ত পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁর ঝড় কাব্যে উক্ত কবিতাটি সংকলিত হয়েছে।

দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে সত্যিকার সমাজ-চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র কিছু সংখ্যক লোকের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন। নজরুল-বিদ্বেষী মানুষও ছিল কিছু কিছু। কিন্তু দেখা গিয়েছে এই শ্রেণীর অনেকেই আবার তাঁদের ভক্তের দলে ভিড় জমিয়েছেন, প্রশংসা করেছেন তাঁদের। উদ্ধৃত কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম শরৎ-নিন্দুকদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন।

মানুষ হিসেবে শরৎচন্দ্র এবং নজরুল ছিলেন সরল বিশ্বাসী, পবিত্র ফুলের মত সুন্দর ছিল তাঁদের মন। হৃদয় ছিল কোমল। কারও এতটুকু ব্যথা-বেদনা দেখলে কাতর হয়ে পড়তেন তাঁরা। তাঁদের কাছে মানুষ ছিল মানুষ, শ্রদ্ধেয়, ঘৃণার্হ নয়। সমাজের পরিচালক ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ডদের কড়াকথা শুনিয়ে দিতে, তাঁদের স্বরূপ উদ্ঘাটন ক'রে দিতে তাঁরা কোন দিন ভয় পাননি। পতিত, লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত এবং উৎপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁদের সমবেদনা; নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ জাতিভেদের প্রতি বিরূপতা আর সেই সঙ্গে সমাজের গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনে তাঁদের প্রচেষ্টা কোন প্রথমশ্রেণীর নায়কের চেয়ে কম ছিল না। সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে তাঁদের ভূমিকা ও ভাষা প্রথম হলেও বক্তব্য ছিল মূলতঃ এক এবং অভিন্ন।

শরৎচন্দ্র এবং নজরুল ইসলাম উভয়েই ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যেমন তাঁর পূর্ব্বসূরীদের চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে নূতন পথ তৈরি ক'রে নিয়েছিলেন, নজরুলও তেমনি কাব্য ও সঙ্গীত রচনায় এনেছিলেন অভিনবত্ব। তিনি শুধু একতারা বাজাননি, বিউগলও বাজিয়ে ছিলেন। তাঁর একহাতে ছিল "বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে ছিল রণতূর্য্য।" এজন্য তাঁরা যত শীঘ্র যত সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিলেন, এদেশের আর কোন কবি-সাহিত্যিকের জীবনে তা' ঘটেনি। এজন্য নিঃসন্দেহে তাঁদেরকে ভাগ্যবান বলা যায়। কবি বায়রণের মত তাঁরা উভয়েই বলতে পারতেন: I woke up one morning and found myself famous.

বিদেশী বণিক সরকার বাণীর এই বরপুত্রদ্বয়ের উপরে ছিলেন অপ্রসন্ন। তাঁদের উভয়ের রচনার মধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন রাজদ্রোহের গন্ধ। এজন্য সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এনেছিলেন, নজরুলকে তো জিন্দাখানায় পুরে রেখেছিলেন এক বছর। বলা বাহুল্য, সরকার তাঁদের একাধিক বই বাজেয়াপ্ত ক'রে তাঁদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে কুণ্ঠিত হননি।

এই দুই সাহিত্য-সাধকের কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও তাঁদের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ছিল এক, তাঁদের অন্তরের নিভৃত দেশে যে ফল্গুধারা বইতো, তার সুরও ছিল এক। এজন্য তাঁদের দু'জনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ কম হ'লেও এবং সাধারণতঃ তাঁরা দূরে দূরে থাকলেও অন্তরঙ্গতার দিক দিয়ে তাঁরা উভয়েই ছিলেন এক অপরের অত্যন্ত নিকটে। শরৎচন্দ্র আজ ইহলোকে নেই, নজরুল ইসলাম আজও আমাদের মধ্যে আছেন বটে, কিন্তু আছেন মূক, মৌন ও সম্বিৎহারা হয়ে। তাঁরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন, তাঁদের কীর্ত্তি বাংলা ও বাঙালীর মানসলোকে চিরদিন অম্লান ও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

উলু খড়ের খেদ

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

কতই না বদলে গেছে কাল,—
ক্রীতদাসের কুঁজো পিঠের ছাল
ছাড়ায় না কেউ কড়া চাবুকের ঘায়ে,
চুণ খস্‌লে শিকল ওঠে না পায়ে।

বাঁচার উপায় তখন ছিল শুধুই পালানো
ভিনদেশী জনতায় বেমালুম হারানো।
মওকা মিলতো বাঁধলে পরে লড়াই,
বেসামাল হতো যখন মালিকানার বড়াই।

আজ বদলে গেছে কাল
তাই দিয়েছি ছেড়ে হাল।
বাধেই যদি লড়াই,
কোথায় বলুন পালাই?

এই কলকাতার হস্তশিল্প

আশীষ বসু

জব চার্ণক যেদিন তাঁর নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে কলকাতা নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সেদিনকার কলকাতায় কি শিল্প ছিল, তা আজ বলা শক্ত। কিন্তু শুনেছি কুমোরটুলীর পটুয়াদের বসতি নাকি দেড়শো-দু'শো বছরের পুরোনো? কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় আসতো পটুয়ারা পুজোর মরশুমে। গঙ্গার ধারে পাওয়া যেতো প্রতিমা গড়ার মাটি। সহরের রাজা-মহারাজার বাড়ীতে ছিল বায়না। দু'মাস, তিন মাস থাকতে হোত কলকাতায়। রাজবাড়ীর ঠাকুর দালানে বসে গড়তে হোত মূর্ত্তি কখনো ফরমাস মতো। রাজায় রাজায় চলতো প্রতিযোগিতা। বিজয়াদশমীর দিন বেরোত সার সার প্রতিমার মিছিল। যে প্রতিমা সব চেয়ে ভালো, বিচারে সেই প্রতিমার কারীগরের ভাগ্যে জুটতো জয়মাল্য, পুরস্কার, অর্থ। খাওয়া দাওয়া পাওয়া যেতো রাজবাড়ীতেই, থাকবার জায়গাও। কিন্তু তবু আস্তে আস্তে কুমোরটুলী গড়ে উঠলো কুমোরদের নিয়ে। তিন-চার মাসের জন্য নৌকো করে কৃষ্ণনগর থেকে সহরে না এসে পাকাপাকি ভাবে বসলো এসে কেউ কেউ। সহর বাড়লো, কাজও বাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বাড়লো পটুয়াপাড়া। ডাকের সাজ, শোলার সাজ তৈরীর লোক এসে বসে গেলো। মাটির কলসী, গ্লাস, হাঁড়ি বানানোর কুম্ভকারদের রুজি মিললো।

কুমোরটুলীর পাশের বাগবাজারে বসলো শঙ্খের কারীগর। শঙ্খকারের বসতি বসলো সারা বাগবাজার জুড়ে। আস্তে আস্তে তা ছড়িয়ে পড়লো সহরের অন্যান্য প্রান্তে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে, চেতলায়।

ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের রাজবাড়ীর সব গয়নাতেই চাই ময়ূর, তেমনি নানা প্যাটার্ণ নানা রাজপরিবারের। এক পরিবারের এক এক ঘর স্বর্ণকার, জহুরী বাঁধা। যে ডিজাইন যে পরিবারের, চুক্তি ছিল সে ডিজাইন শত সহস্র চেষ্টাতেও পাবে না অন্য পরিবারের লোকেরা।
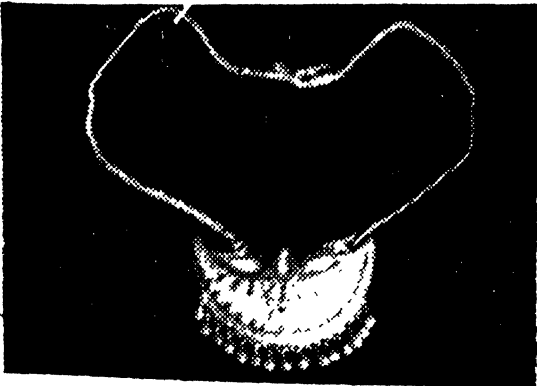
সামুদ্রিক শঙ্খের নক্সী গহনা

প্রতিমার সাজ

বিয়ে-অন্নপ্রাশন কি উপনয়নে ডাক পড়তো তার। ফরমাস যেতো নতুন গয়নার। কলকাতা বাড়লো। বাড়লো সোনারূপোর দোকানও। জহুরী বসলো নানা। সাহেব পাড়ার হ্যামিলটন-জেফারসন আরও কত কে। দেশী পাড়ায়ও। বৌবাজারের গয়নার পাড়া জাঁকিয়ে বসলো। দোকান ছড়িয়ে পড়লো হরি ঘোষ ষ্ট্রীটে, কর্ণওয়ালিশে। সহর বাড়লো দক্ষিণে। হালফ্যাসানের দোকান খুললো রাসবিহারী এভিন্যুতে, ভবানীপুরে, কালীঘাটে। বড়বাজারে সোনা-রূপার বাজার ছিল আগে থাকতেই, সেখানে লেন-দেন বাড়ালো ক্রমে।

আমাদের হস্তশিল্পগুলির প্রসারের মূলে আছে প্রয়োজনের তাগিদ, অর্থে স্বচ্ছল গৃহীর ঘর সাজানোর ইচ্ছা, শিল্পীর প্রতিভা ও সর্ব্বোপরি দেশের জমিদার এবং রাজপরিবারগুলির সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা।

রঘুনন্দন লেন ও ভবানীপুরের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে রয়েছে তেমনি পাত-রূপোর কাজ। অতি সুন্দর সুন্দর জিনিষ হয় সেখানে। ঠাকুরের যাবতীয় খাট, পালঙ্ক, বাক্স, রথ, রূপোর তৈরী সব পাওয়া যাবে সেখানে।

কালীঘাটে পাওয়া যাবে বিয়ের রূদার পিঁড়ি, কুলো। কাঠের পুতুল ইংরাজীতে যাকে বলে মামী ডলস (বর্দ্ধমানে তৈরী), বাটি, সরা, সরার ওপর চালচিত্র করা, ঘটের ওপর কাজ এমনি আরও নানা জিনিষ। বরের বিচিত্র আসন, শোলার ফুল, কদম, চাঁদমালা সব।

সবচেয়ে পুরোনো পাড়ার কথা বলতে গেলে চিৎপুর, নতুন বাজার, জোড়াসাঁকোর কথা বলতেই হয়। কথায় বলে বড়বাজার, চিৎপুরে পাওয়া যায় না এমন জিনিষ নেই। চিৎপুরে পাবেন বাজনার জিনিষ। বাজনার জিনিষ সারাবার মিস্ত্রীও সেখানে। হারমোনিয়াম, গীটার, সেতার, বাঁশী, তবলা, খোল, মৃদঙ্গ, দিলরুবা যা চান সব কিছুর জন্যই

চিৎপুর। পাথরের কাজ, থালা-বাটির কি মূর্ত্তি, কি পাথর-খোদাই সব চিৎপুরেই। গন্ধদ্রব্য, আতর, কাগজের ফুল সবই সেখানে। নতুন বাজারে পাবেন কাঁসা পেতলের জিনিষ। কলেজ ষ্ট্রীট, শিয়ালদা, ভবানীপুরে তা পাবেন। বৌবাজারে আছে ফার্ণিচারের দোকান, চলমা। ফার্ণিচারের দোকান অবশ্য হয়েছে শিয়ালদাতেও। ওয়েলেসলীতেও ফার্ণিচারের বাজার বেশ চালু।

মাদুর কাটির সঙ্গে চামড়ার কাজ করা ভ্যানিটি ব্যাগ

রথের মেলা বসে সার্কুলার রোড, শিয়ালদা, বৌবাজারে। কি না পাবেন সেখানে। বেতের ধামা-কুলো, ফানুষ, সৌখীন পুতুল, গাছ, পশুপাখী, ফার্ণিচার সব কিছুই।

কাপড়ের ওপরে ছাপার কাজ আজকের দিনে কেই বা না চায়। রাস্তায় বেরোলে নক্সী ছাপার কাজ দেখা যাবে হামেশা। এর জন্ত রাসবিহারী এ্যাভিন্যু, শ্যামবাজার, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বিখ্যাত। কলকাতার আশেপাশের মধ্যে নক্সীছাপার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান শ্রীরামপুর আর বরাহনগর।

শিয়ালদার কাছেই আছে চীনে মাটির কাপ ডিস তৈরীর কারখানা। নানা ডিজাইনের চামড়ার নক্সা কাজ, হাতব্যাগ, টাকা রাখবার ব্যাগ, বসবার মোড়া তৈরী হচ্ছে শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটে বইয়ের পাড়ার ভেতরে, শ্যামবাজারে আর কয়েকটি জায়গায় বিক্রি হ-ভাবে। বেতের কাজ কিনতে চান, চলে আসুন নিউ মার্কেটের সামনের বাস্কেট রোডে।
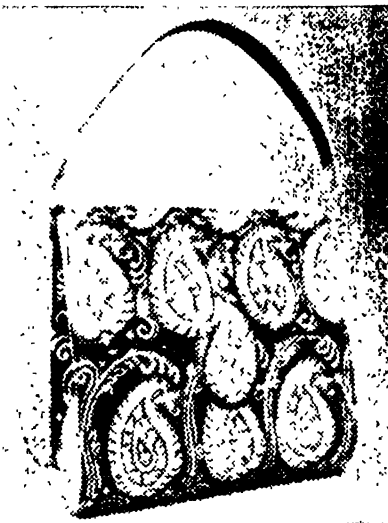
চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ

কলকাতার নানাজায়গায় পুতুল তৈরী হয়। ডেফ এ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুলের মাথানাড়ানো কাগজমণ্ডের পুতুলের নাম আছে। এখন অবশ্য আরও অনেকে এ জিনিষ করেছেন। শোলার পুতুল হয় কাশীপুরে। মাটির পুতুল কুমোরটুলীতে, আরও নানা জায়গায়।

কলকাতার যাবতীয় হস্তশিল্পগুলির সম্পর্কে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা এক কঠিন কাজ, তবু সরকারী বেসরকারী নানাস্থান থেকে সংগ্রহ করে কিছু তথ্য দিচ্ছি।

শিল্পের নাম	কারখানার সংখ্যা	কারীগরের সংখ্যা	উৎপাদন (টাকার হিসাবে)
মাটির কাজ	২৪৭	৯৯৭	১২,০৬,৪২৯
কাপড় (সূতী)	৩১১	৮৩৯	২৬,৪২,৯৯৪
ফার্নিচার তৈরী ও অন্যান্য কাঠের কাজ	৬৭৩	২০৫৫	৬৯,৯২,৩৭৭
বাঁশ ও বেতের কাজ	৩৩৬	৮৩৬	১১,৬৬,৬৭৬
দড়ি পাকানো	২৮৩	৩,১৬৯	১,০৭,০১,১৫৮
সোনা-রূপার কাজ	১০৬০	২,৪৫০	১,৫২,৯৬,৬৩০
পুতুল তৈরী	৬৩	১৬৬	১,৪২,৩৮৪
ফটো বাঁধাই	৩৯	৫৫	৭৯,৯৩৬
বাদ্যযন্ত্র তৈরী	৬৭	১৩৯	২,২৫,৭৭৮
মাদুর	১৬	৩২	৩১,৯২৬

এ হিসাব ১৯৫৪ সালের। কলকাতার আশ-পাশের শিল্পাঞ্চলের। শুধু কলকাতার হিসাবও দিচ্ছি পরে।

মার্বেল প্যালেসের ছবি দেখবার জিনিষ, কিন্তু সেই ছবির ফ্রেম তাও যেন শিল্পকাজ। ছবি বাঁধাইয়েরা আছে সারা কলকাতা ছড়িয়ে তবু চিৎপুরেই তাদের সংখ্যা বেশী। মাদুর, মসলন্দ, কি পাটি কিনতে পাবেন শেয়ালদায়, নতুনবাজারে।

১৯৫২-৫৩ সালে কলকাতায় মোটামুটি শিল্পকাজের হিসাব দিচ্ছি।

শিল্পের নাম	সংখ্যা	কারীগরের সংখ্যা	উৎপাদন
মাটির কাজ	২৩১	৪৮৫	৬,৬৪,২৮৬
ফার্নিচার ও কাচের কাজ	১,৮৭৬	৮,৪৩১	৪,২১,৬৪,৪১২
সূতীবস্ত্র	২৬	২৫৪	৪,৯৬,৪৪৭
দড়ি তৈরী	১২	১০৬	৩,৯৬,৩১৭
সোনা-রূপার কাজ	২৬২৮	৯,২৩৩	৬,৬১,৭০,১২৩
পুতুল তৈরী	২২৮	১,৫৭৩	১৭,১৫,৯০৭
ফটো বাঁধাই	১২৬	২৮১	৮,৬৭,০৮৯
বোতাম তৈরী	৮	১৫	১১,৮৩০
বাদ্যযন্ত্র তৈরী	২২২	৬২৪	৯,৫২,৫৯১
শঙ্খের কাজ	২০৬	৪০৫	৯,৭৩,২৯৮

আরও কতো কাজ আছে কলকাতায়। টিনের বাক্স তৈরী, কাঁচের শিশি তৈরী, তালা তৈরী কত কি।

জব চার্ণকের দেখা কলকাতা আর নেই!

শ্রীপাট মুলুক ঃ বৈষ্ণব সাধনার পীঠস্থান

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এক সময় বীরভূম ছিল বাংলা দেশে সাধনার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। যে কোনো সম্প্রদায়ের সাধক এখানে এসে অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে গেছেন। তন্ত্রসাধনার যে বহুল প্রয়াস হয়েছিল এক সময়, তা জানা যায় বীরভূমের স্বনামখ্যাত শাক্ত পীঠস্থানগুলির অবস্থানে। কঙ্কালীতলা, নন্দীকেশ্বর, ফুল্লরা, তারাপীঠ ইত্যাদির নাম সকলেরই জানা আছে। পরমতান্ত্রিক বামাখ্যাপার সিদ্ধস্থান তারাপীঠ এখন বাংলা দেশের তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত। জয়দেব, চণ্ডীদাস এই বীরভূমেই আবির্ভূত, এই মাটিতেই তাঁদের সিদ্ধি এবং এই মাটির সঙ্গে তাঁরা চিরদিন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধনার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণে ভারতের বহুস্থানে পরিভ্রমণ করেন। হিমালয় থেকে সাগরতট পর্যন্ত অনেক জায়গায় তিনি ঘুরেছিলেন; কিন্তু কোনো স্থান তাঁর মনোমত হয়নি। শেষে ভগবৎ প্রেরিত হয়েই যেন তিনি বোলপুরে নেমেছিলেন, আর তখনই তাঁর চোখে পড়ল বোলপুর ষ্টেশনের উত্তরস্থিত দিগন্ত প্রান্তর। এই উষরভূমিই তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকল; আর তিনি এই মরুপ্রান্তস্থিত সপ্তপর্ণীর ছায়াতলে বসে পেলেন 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' মহর্ষির সাধনপীঠ শান্তিনিকেতন আজ শুধু কেবল বীরভূম বা বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে শক্তিবাদ, বৈষ্ণববাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতির যোগসাধনে বীরভূমের মাটি অতুলনীয় গৌরবে গৌরবান্বিত।

বীরভূমের এই সব নানা গৌরবময় ঐতিহ্যের মধ্যে শ্রীপাঠ মুলুক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে বহুকাল থেকে। এই গ্রামটি বোলপুরের সন্নিকটে; গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছে বোলপুর পালিতপুরের নিচের সড়ক। প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য স্থানটিকে করে তুলেছে অতীব মনোরম। প্রাতঃস্মরণীয় রামকানাই ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের মন্দিরে শ্রীপাঠ মুলুক বিশেষভাবে প্রখ্যাত এবং বৈষ্ণব জগতে এই স্থানটি ঐতিহাসিক তীর্থরূপে স্থায়ী আসন লাভ করেছে বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

গ্রামটির নাম মুলুক কি করে হল তা সঠিক বলা কঠিন। ভাবাতত্ত্বের দিক থেকে বলা যায়, মুলুক শব্দটি আরবী 'মুলক' থেকে এসেছে, এর অর্থ দেশ বা রাজ্য। মনে হয়, পূর্বে এই স্থানটি মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। জনপ্রবাদ, এক সময় এই গ্রামে মল্লিকদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল; পরে মল্লিক থেকে মুল্লুক, বা মুলুক হয়েছে; তবে এর মধ্যে যে কষ্টকল্পনা আছে, তা স্বীকার না করে পারা যায় না; কিন্তু এ-বিষয়ে একটু ঐতিহাসিক সূত্র যে পাওয়া না যায়, তা নয়। এখানে সেই সূত্রটি উল্লিখিত হল। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের আসফ জা নিজাম উল মুলুক নামে এক সভাসদ ছিলেন। ইনি এক সময় বাংলা দেশে আসেন নবাব আলিবর্দীর কাছে তথ্যানুসন্ধানের জন্য। নবাবের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন দিল্লীর সম্রাট; শেষে সম্রাটের পারিষদ এই নিজাম উল মুলুককে উৎকোচ দিয়ে নবাব আলিবর্দী পুনরায় সম্রাটের কৃপালাভ করেন। উক্ত পারিষদের সুজলা-সুফলা বাংলায় এসে নানা-স্থানে পর্যটন করার প্রবল ইচ্ছা হওয়া অসম্ভব নয়। হয়ত সেই সূত্রেই তিনি মল্লিকপুরে রামকানাই ঠাকুরের মাহাত্ম্য কথা শুনে তাঁকে দেখতে আসেন এবং ঠাকুরের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে দেবসেবার জন্য জমির ব্যবস্থা করে যান। এঁর ঔদার্যের জন্য তাঁর নাম অনুসারে গ্রামটির নাম মুলুক হতে পারে। (দ্রষ্টব্য, History of Bengal, 2nd part, Dacca University, পৃঃ ৪৪৩) নবাব আলিবর্দী খাঁর সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ, সুতরাং বলা যায়, রামকানাই ঠাকুর এই সময়ে বর্তমান ছিলেন এবং শ্রীপাট মুলুকের খ্যাতিও প্রতিষ্ঠিত হয় উক্ত সময়েই।

বহুদিন থেকে মুলুক গ্রামটি বৈষ্ণব-অধ্যুষিত। এখানে রামকানাই ঠাকুরের আগমন ভগবানের কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের মন্দির ও অন্যান্য দেবস্থানগুলি আজিও অক্ষুন্ন। দেবসেবা, জনসেবা, ও অতিথিসেবায় গ্রামবাসীরা কখনও কার্পণ্য করে না। সন্ধ্যায় নিভৃত পল্লী শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত হয়ে ওঠে; ছেলে-বুড়ো সবাই দেবদর্শনে ছুটে যায় মন্দির প্রাঙ্গণে, আর ভুলে যায় সারাদিনের ক্লান্তিখেদ মিশ্রিত বৈচিত্র্যহীন জীবনকে। সন্ধ্যারাত্রির পর যখন তারা ঘরে ফিরে আসে, তখন তারা বুঝতেও পারে না যে তাদের মন চলে গিয়েছে বাস্তব সংসার থেকে বহু দূরে চিরশান্ত অনন্তলোকে। পূর্ণানন্দে তাদের রাত কেটে যায়; প্রভাতে ঠাকুরের নাম স্মরণ করে আবার তারা দিনের কাজে প্রবৃত্ত হয়। পল্লীর এই অনাড়ম্বর ও শান্তিময় পবিত্র জীবন অন্যত্র তেমন সুলভ নয়। যাঁর পুণ্যপাদস্পর্শে শ্রীপাট মুলুক আজ মহিমমণ্ডিত তাঁর কথা না জানলে স্থান মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বোধগম্য হবে না। এই উদ্দেশ্যে অতঃপর শ্রীরামকানাই ঠাকুরের প্রসঙ্গে প্রবেশ করা যাক।

ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পরিবারে সঞ্জয়ের বংশে যদুচৈতন্যের ঔরসে রামকানাই ঠাকুরের জন্ম। ধনঞ্জয় পণ্ডিত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক। এঁর উল্লেখ পাওয়া যায় নিত্যানন্দ প্রভু ও রঘুনাথ দাসের মিলন প্রসঙ্গে। নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করায় পথে রঘুনাথ দাস পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণদর্শন করেন। প্রভুর ইচ্ছায় রঘুনাথদাস দৈ-চিড়া ভোগোৎসবের আয়োজন

স্থলে বৈষ্ণবগণ এসে সেখানে মিলিত হন। এঁদের মধ্যে ধনঞ্জয় পণ্ডিত ছিলেন অন্যতম :—

চৌতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলীবন্ধন॥
রামদাস ঠাকুর সুন্দরানন্দদাস গঙ্গাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।
মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস॥
(চৈতন্যচরিতামৃত, ১৷৬৷৫১—৬১)

এই ধনঞ্জয় পণ্ডিত ছিলেন দ্বাদশ গোপালের অন্যতম; (ব্রজের সুদাম সখা)। নিত্যানন্দ শাখার অন্তর্ভুক্ত ইনি। এঁর আবির্ভাব গ্রামের জাড়গ্রামে। পিতা শ্রীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী দেবী। শ্রীপতি ছিলেন বিশেষ বিত্তশালী। ধনঞ্জয়ের বিবাহ হয় অপরূপ রূপবতী এক কন্যার সঙ্গে। সংসারী হবার পর ধনঞ্জয় বিলাসী হয়ে পড়েন; কিন্তু কিছুকাল পরে সংসার ত্যাগে তাঁর প্রবল বাসনা জন্মে। একদিন কাকেও না বলে তীর্থ ভ্রমণের ছলে বেরিয়ে পড়েন গৃহ থেকে। বর্ধমান জেলার শীতলগ্রামে এসে মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ করে সকলকে হরিনাম মন্ত্র দান করেন; সেখান থেকে নবদ্বীপে এসে ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হন। পরে বৃন্দাবনের পথে মেমারি ষ্টেশনের নিকট সাঁচড়া-পাচড়া গ্রামে কিছুদিন থাকেন। এখানে এক শিষ্যকে সেবাপ্রকাশের অনুমতি দিয়ে ধনঞ্জয় বৃন্দাবনে যান। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে বোলপুরের নিকট জলুন্দি গ্রামে শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করে শীতলগ্রামে ফিরে আসেন। এইখানেই হয় তাঁর তিরোভাব। (দ্রষ্টব্য রাধাগোবিন্দনাথের চৈতন্যচরিতামৃত, পরিশিষ্টভাগ, পৃ৪০৩-৪০৪) জলুন্দি বোলপুর থেকে বেশি দূরে নয়। রামকানাই ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভৃগুরাম জলুন্দিতেই সেবাকার্যে জীবনাতিপাত করেন।

সকলেরই ধারণা, সঞ্জয় হচ্ছেন ধনঞ্জয় পণ্ডিতের ভাই এবং সঞ্জয়ের পুত্র যদুচৈতন্য। রামকানাই ঠাকুর যদুচৈতন্যের কনিষ্ঠ পুত্র। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কথা চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু সঞ্জয় থেকে রামকানাই ঠাকুর পর্যন্ত তেমন কোনো ঐতিহাসিক তথ্য কোনো গ্রন্থের কাছে পাইনি; তবুও এ-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য, বহুকাল থেকে এই বৃত্তান্ত চলে আসছে, তা সহসা অস্বীকার করা ঠিক নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণার অনুসরণেই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে হল।

রামকানাই ঠাকুর ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। এঁরা চারভাই; ঠাকুর ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। অগ্রজদের নাম যথাক্রমে ভৃগুরাম, পরশুরাম ও জয়রাম। ঠাকুরের নাম ছিল কানুরাম; পিতা আদর করে ডাকতেন রামকানাই বলে; তাই থেকে কানুরাম রামকানাই নামে খ্যাত হন। চারটি ভাই-ই শিশুকাল থেকে পরম ভক্ত ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভৃগুরাম জলুন্দিতে যান সেবাকার্যে; আর পরশুরাম আসেন সিউড়ির নিকট কোমা গ্রামে; এঁর বংশধর এখনও সেখানে বাস করছেন। পরম বৈষ্ণব জয়রাম সন্ন্যাসী হয়ে নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং শেষে এই মুলুক গ্রামে এসে নিজেকে লালজি গোঁসাই বলে পরিচয় দেন। ইনি যখন মুলুকের নিকটবর্তী গয়েশপুরে ছিলেন, তখন শিলির রাজাকে বাঘের কবল থেকে মুক্ত করেন। শিলিরাজ বিমুগ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীর কাছে শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেন; কিন্তু তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকানাই ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে উপদেশ দেন; তদনুসারে শিলিরাজ রামকানাই ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হয়ে জন্ম সার্থক করেন। সিদ্ধ পুরুষ লালজি গোঁসাই সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি শয্যায় সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন; কিন্তু তাঁর শেষকৃত্য করার সময় ঐ শয্যা থেকে তাঁকে বিশ্লিষ্ট করা যায়নি; ফলে, পালঙ্কসহ তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় এবং তার উপরে দেওয়া হয় একটি খড়ের আচ্ছাদন; আজ পর্যন্ত সেই স্থানটি প্রায় অবিকৃতই আছে। সেখানে এখনও নিত্য পূজা করা হয়। প্রবাদ, গোঁসাই আম খেয়ে যে আঠি ফেলেছিলেন, তা থেকে এক আম গাছ হয় এবং ঐ আম গাছ থেকে পরে বহু আম গাছ জন্মে সেখানে একটা বড় আমবাগান হয়ে পড়ে। এখনও সেই বাগানের নাম লালজি বাগান বলা হয়; ঐ বাগানেই গোঁসাই-এর সমাধি; সেখানে এক সেবক থাকেন এবং যথারীতি সমাধির সন্ধ্যাপ্রদীপাদি দান ও রক্ষণাবেক্ষণ তিনিই করেন।

বড় ভাইয়ের মতো রামকানাই ঠাকুরও জলুন্দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় দিনাতিপাত করছিলেন। হঠাৎ তাঁর হৃদয়ে একদিন কৃষ্ণের বাঁশি বেজে উঠল। তিনি চঞ্চল হয়ে বৃন্দাবনের পথে রওনা হলেন পদব্রজে। হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ করে তিনি অনবরত ছুটছেন; এমন সময় সূর্যাস্তকালে তিনি উপস্থিত হলেন মুলুকে; ঠিক সেই সময় গোধন নিয়ে রাখালরা ফিরছিল। এই দেখে ঠাকুরের মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হয়। তিনি দেখলেন এই সেই বৃন্দাবন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাদের নিয়ে নিত্য ধেনুবৎস চরাতেন। এখন তিনি ভাবাবেশ আনন্দে নাচতে লাগলেন। সেদিন ছিল শারদ পূর্ণিমা; পূর্বদিক শশিলেখায় সমুজ্জ্বল; রামকানাই ঠাকুর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে জয়ধ্বনি করতে লাগলে রাখালবালকেরা তাঁকে এসে ঘিরে ধরল। ইনি ব্রহ্মচারী, দেবতা বা পরম বৈষ্ণব ভেবে তারা তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল; তখন ঠাকুর তাদের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গন করলেন; ধেনুবৎসও আনন্দধ্বনি করে উঠল। গোপালদের মধ্যে অষ্টম বর্ষীয় এক রাখালের হাতে বাঁশের বাঁশি দেখে তিনি হলেন আত্মবিহ্বল। তিনি মনে করলেন, এই তো বৃন্দাবন, এই তো শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। এই ভেবে ঠাকুর সে-স্থান ত্যাগ করতে চাইলেন না; তখন বালকরা তাঁকে নিয়ে গেল পরম ভক্ত গঙ্গাগোবিন্দ ঘোষের গৃহে। প্রভাতে ঠাকুর আবার শুনলেন, সেই গোপবালকদের বংশীধ্বনি। তাঁর নিশ্চিত মনে হল, এ-বংশীধ্বনি বৃন্দাবনচন্দ্রের ছাড়া আর কারোর নয় এবং গোলক ত্যাগ করে লক্ষ্মীনারায়ণ ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য এখানে এসেছেন। এই মনে করে ঠাকুর প্রভাতে উঠে গোপগণের কাছে একটু স্থান চাইলেন বাস করার জন্য। তারা সানন্দে ঠাকুরকে জায়গা পছন্দ করে নিতে বললে ঠাকুর মাত্র আড়াই কোদাল স্থান চাইলেন। তাঁর এই কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল; কেউ কেউ কানাকানি করতে লাগল। শেষে এক বৃদ্ধ গোপ বললেন, ইনি সাধারণ মানুষ নন, বিশেষতঃ ইনি ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধের কথায় গ্রামবাসী আড়াই কোদাল মাটি ঠাকুরকে দিতে স্বীকৃত হল; তখন দেখা গেল এক অলৌকিক ব্যাপার। এক কোদালে জল লায়ের নামে এক পুষ্করিণীর সৃষ্টি, আর এক কোদালে একটি দীঘিসহ ঠাকুরবাড়ী এবং শেষের আধ কোদালে সৃষ্টি হল মেলাতলা। এক রাত্রির মধ্যে এই সব ব্যাপার সংঘটিত হল দেখে পল্লীর গোপগণ চমৎকৃত হয়ে

আনন্দাশ্রুতে ঠাকুরের চরণকমল সিক্ত করল। এর পর সকলেই তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে।

মন্দির নির্মাণ ব্যাপারেও এক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। কোথা থেকে যে ইট ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এল তা কেউ বুঝতেই পারল না। ছাদের জন্য যখন কড়ির প্রয়োজন হল তখন দেখা গেল যে কড়িগুলি আধ হাত কম। মিস্ত্রীরা বসল মাথায় হাত দিয়ে। ঠাকুর সব জেনে পুজা শেষ করে এলেন তাদের কাছে আর ছিটিয়ে দিলেন ঠাকুরের চরণামৃত। পরে কড়ি লাগিয়ে দিতে বললেন ঠাকুর; তখন দেখা গেল, মাপে কড়ি বেশী হয়ে গেছে। এই ভাবে মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হলে সেখানে শালগ্রাম শিলা আর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ভোগের ব্যবস্থা হল দৈনিক বার সের চাল আর সেই পরিমাণ ব্যঞ্জনাদি। মন্দিরে নিমকাঠের তৈরী মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি আছে। কথিত আছে, রামকানাই ঠাকুর স্বপ্নাদেশে এই কাঠটি এনেছিলেন বৃন্দাবনের গোপীমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ থেকে; আর সঙ্গে এনেছিলেন তমালের একটি ডাল। সেই ডালের তমাল গাছটি আজও দেখতে পাওয়া যায় সিংহদরজার পাশে। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় খোসা কলাইয়ের ডাল কলমী শাক ভোগের সঙ্গে যুক্ত হল। রামকানাই ঠাকুরের মহিমায় শিবদুর্গার মন্দিরও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মন্দিব প্রতিষ্ঠাব মূলে নিম্নলিখিত কাহিনীটি প্রচলিত—

জলুন্দি থেকে রামকানাই একলাই এসেছিলেন মুলুকে; স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা সেইখানেই ছিল, তাদেব দুঃখের অবধি ছিল না। শেষে মহাপ্রভু স্বপ্নাদেশে সব বলে দিলে তারা মুলুকে এসে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়। তদবধি কন্যা মন্দির মার্জনা করত। একদিন দেখা গেল, কে যেন নিশিশেষে মন্দির মার্জনা করে গেছে। কন্যা বিস্মিত হয়ে পিতাকে এ-বৃত্তান্ত জানাল; পরের রাত্রে ঠাকুর জেগে দেখেন, এক বালিকা মন্দির মার্জনা করছে। ঠাকুর তাই দেখে বালিকার পরিচয় চাইলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। মা মা বলে ঠাকুর কাতরভাবে ডাকতে আরম্ভ করলে অন্তরীক্ষ থেকে জগজ্জননী অপরাজিতা বললেন, আমি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ছাড়া থাকতে পারি না; তাই প্রত্যহ এখানে আসি। এখানে তুমি আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। মায়ের কথা শুনে ঠাকুর হলেন চিন্তিত এবং মাকে স্পষ্টভাবেই বললেন, আমি বৈষ্ণব; যাগ-যজ্ঞ, ছাগ-মেষ বলিদান কিছুই জানিনা; কি করে তোমার সেবা করব? দেবী বললেন, আমি পরম বৈষ্ণবী; আতপসন্দেশ দিয়ে আমার ভোগ দিও, আর দিও শ্রীপদের পুষ্প আমার মাথায়। মায়ের কথা শুনে ভক্তিপ্লুত ঠাকুর অপরাজিতা দেবীর প্রতিষ্ঠা করলেন। শিব তো মাকে ছাড়া থাকতে পারেন না; তাই দেখা গেল পরের দিনই সকালে এক শিবলিঙ্গ মাটি ভেদ করে উঠেছে। ঠাকুব তখন শিবের মন্দির নির্মাণ করে শিব-দুর্গাকে প্রতিষ্ঠিত কবলেন। শিবের নাম হল রামেশ্বর, আর শিবরাত্রি ও চৈত্রমাসের পুজার বিশেষ ব্যবস্থা হল। এ ছাড়া সিংহদ্বারের সামনে এক বেদী নির্মিত হল; সেখানে শরৎকালে জিতাষ্টমীর পর নবমী তিথিতে অপরাজিতার কল্পারম্ভ হয় এবং বিজয়া দশমী পর্যন্ত মা সেখানে থাকেন। এই পনের দিন ধরে ষোড়শোপচারে পুজা ও চণ্ডীপাঠ হয়।

গ্রামের উত্তর দিকে ছিল গভীর জঙ্গল। রামকানাই ঠাকুর ঐ জঙ্গল পরিষ্কার করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে অনেক লোক এই কাজে লেগে গেল। ঠাকুর তাদের খেতে দিতেন মাত্র। এইভাবে জঙ্গল পরিষ্কৃত হতে লাগল। কথিত আছে, বাংলার নবাব ঠাকুরের অন্নদানের কথা শুনে পরীক্ষার জন্য এলেন গ্রামে তিনশ লোক নিয়ে; সেখানে তাঁরা থাকলেন লুকিয়ে। সেইদিন পুজা শেষ করে ঠাকুরের খাবার নিয়ে যেতে হয় দেরী। যারা জঙ্গল কাটছিল, তাদের খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ডভাবে; পরে ছোট একটা অন্নের পাত্র হাতে নিয়ে যেতে দেখে তারা আরও খেপে গিয়ে হৈ-চৈ করতে লাগল। ঠাকুর তাদের বুঝিয়ে খাওয়াতে বসিয়ে বললেন, এই অন্নেই তোমাদের পেট ভরাব। পাতে পাতে ঠাকুর অন্ন দিয়ে যেতে লাগলেন; কিন্তু পাত্রটি রইল পূর্বের মতোই পূর্ণ। সবাই পেটভরে খেল, তবুও পাত্র পূর্ণ দেখে সব লোক ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইল অনর্থক হৈ-চৈ করার জন্য। সকলে ঠাকুরকে ধন্য ধন্য করে গেলে পূর্বোক্ত নবাব ঠাকুরের কাছে এসে বললেন, তিন শত লোকসহ আমি অভুক্ত। শুনেছি, এখানে এলে কেউ আর ফিরে যায় না, তাই তোমার কাছে এসেছি। ঠাকুরের কাছে পাতা ছিল মাত্র পাঁচখানি। তিনি তাদের পাতা দিয়ে যেতে লাগলেন; কিন্তু ঐ পাতা আর ফুরোল না; এর পর ঠাকুর পরিবেশন করলেন অন্নব্যঞ্জন; কিন্তু অন্নের পাত্র পূর্ববৎ পূর্ণই রইল; তাই দেখে নবাব বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে সেবার কারণে কিছু জমি দিতে চাইলেন ঠাকুরকে; কিন্তু ঠাকুর যবনের দান নেবেন না জানালে নবাব বললেন যে, বিঘা প্রতি এক আনা হিসেবে খাজনা দিলেই হবে। ঠাকুর তা স্বীকার করে এক মুঠো ভাত ছড়িয়ে বললেন, যতদূর পর্যন্ত ভাত পড়েছে, ততদূর পর্যন্ত জমি পেলে আমি খুশি হব। দেখা গেল তিনশ ষাট বিঘা পর্যন্ত ভাত ছড়ান। সেই থেকে মাঠের নাম হল 'ভাতুরা'র মাঠ; নবাব ছাড়পত্র লিখে দিলেন। এই নবাবের নাম ছিল মুলুক খাঁ, তাঁর নামানুসারে গ্রামের নাম হল মুলুক। এই নবাবকে এবং তাঁর পরিচয় কি, তা পূর্বেই বলেছি। তবে স্মরণ রাখা ভাল যে এই সব নবাব ছিলেন জমিদারশ্রেণীর।

রামকানাই ঠাকুরের অন্তর্ধানও অলৌকিক মহিমায় পূর্ণ। একবার ঠাকুর আসানসোলে যান; সেখানে পাষণ্ডদলনের পর তিনি তাদের দীক্ষাদানে নিরত ছিলেন কিছুদিন ধরে। এদিকে মুলুকে ঠাকুরের কন্যা একদিন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকথা-স্মরণে তন্ময় হয়ে রন্ধন অবস্থায় চামচ হাতে নিয়ে বাইরে আসেন এবং এক জায়গায় মাটিতে ঐ চামচ পুঁতে অন্তর্হিত হলেন; সেই জায়গায় এক গাছ হল; সেই গাছটি এখনও নাকি দেখা যায় অপরাজিতা বেদীর পূর্ব দিকে। রামকানাই ঠাকুর আসানসোল থেকে ফিরে এসে এবং কন্যার অন্তর্ধানের কথা শুনে বড়ই কাতর হলেন; পরে মাধবীতলায় কন্যাকে খুঁজতে গিয়ে তিনিও অন্তর্হিত হলেন। তখন পুত্র গৌরচরণ 'বাবা বাবা' বলে ডাকতে থাকলে সিংহদ্বারস্থিত প্রাচীরের এক ফাঁকা জায়গায় নিজের অঙ্গুলি দেখিয়ে ঠাকুর বললেন যে আর তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না; কিন্তু তিনি এখানেই চিরদিন থাকবেন অশরীরী হয়ে। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে এখানে চিরদিন রাধাকৃষ্ণের সেবা ও নিত্য অন্নদান ব্রত চলবে।

দেববিগ্রহ বা দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার পেছনে একটা অলৌকিকত্বের প্রয়াস দেখা যায় আমাদের এই দেশে। নানা কিংবদন্তী বা প্রবাদে বিষয়টি আরও রহস্যময় বা সাধারণ জ্ঞানের অতীত করে তোলাই যেন বিষয়ের মাহাত্ম্য বেড়ে যায়, এই হল মানুষের ধারণা। সেই

কারণে দেব-দেউল স্থাপনকে কেন্দ্র করে নানা কথা প্রচারিত হয়ে থাকে। শ্রীপাট মুলুকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লালজী গোঁসাই-এর সম্বন্ধে যেটুকু অলৌকিকত্বের প্রকাশ আছে, তার বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে তাঁর তিরোধানের পর তাঁর শবাধারসহ তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়; ভুক্তাবশিষ্ট আমের আঁটি থেকে আমগাছের জন্ম এবং সেই আমগাছ থেকে পর পর আরও আমগাছের উৎপত্তি সেকালে কখনই অসম্ভব ছিল না। লালজী গোঁসাইর প্রসঙ্গে আমবাগানের সৃষ্টির ব্যাপারে এই সত্যই নিহিত। ঠাকুর রামকানাই সম্বন্ধেও তাঁকে কেন্দ্র করে আর যে সব অলৌকিক ঘটনা আছে, তার মধ্য থেকে অপ্রাকৃত অংশ বাদ দিলে সত্যাংশ নির্ণয় করা কঠিন হয় না। সুতরাং বলা যায়, সিদ্ধপুরুষ রামকানাই ঠাকুরের প্রভাবে মুলুক গ্রামটি এক সময় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গ্রামের সুযোগ্য অধিবাসীরা ঠাকুরের তিরোভাবের পর গ্রামের সেই খ্যাতিকে নষ্ট করেননি। বংশানুক্রমে তাঁরা সেই দেবপূজা জনসেবা ও অতিথিপূজা বরাবর করে আসছেন। ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে তাঁরা গোষ্ঠাষ্টমীতে সাংবাৎসরিক উৎসব পালন করে থাকেন। এই উৎসব হয় কয়েকদিন ধরে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে কীর্তনীয়া ও কথকতার দল এসে এই কটা দিন অহোরাত্র দেবতার নামকীর্তনে গ্রামকে মুখরিত করে তোলেন; নর-নারায়ণ ও অতিথিসেবায় গ্রামবাসিগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও উৎসাহ দেখে মনে হয় এখানে সৃষ্ট হয়েছে অপূর্ব এক স্বর্গরাজ্যের। প্রাতঃস্মরণীয় রামকানাই ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতিতে দেবসেবা ও এই উৎসব সমগ্র বাংলার এক গর্বের বিষয়।

বন পথ ভেঙ্গে

করুণাশংকর মজুমদার

এই নির্জন শালবীথি ধরে—
হেঁটে হেঁটে যদি দূর পাড়ি দিই
তবুও—
পিছনে পড়ে থাকে কিছু ইতিহাস।

তখনও ঝর্ণারা সুর তোলে
নুড়ি বুকে নিয়ে নীচে নেমে আসে।
হরিয়াল তিতির ডাহুক, বসন্ত বাউরী
বার বার ডেকে ডেকে অরণ্যের
এ নিস্তব্ধতাকে করবে মুখর।

এখানের চলার পথ যদিও স্বচ্ছন্দ মসৃণ নয়
বন্ধুর দুর্বার।
অনেক চড়াই উৎরাই পারাপার করে
তবে শ্যাম উপত্যকা পাওয়া যেতে পারে।
সেখানে সবুজ ধান আর
মহুয়ার গন্ধমাখা সাঁওতালি মন
অপর্যাপ্ত খুশীতে উদ্বেল।

অসূর্যস্পর্শা এই বনানীর অন্তরালে
শীত শীত অনুভব নিষ্প্রভ পাণ্ডুর
দুরারোহ প্রাণের রিক্ততা

তবুও মাঝে মাঝে এখানে হরিণীরা থমকে
দাঁড়ায়: কালো চোখে বিস্ময় জিজ্ঞাসা রেখে
মুহূর্ত কাল ভাবে।
তারপর ছুটে দৌড় দেয়।

আমরা যেহেতু পুরুষ এবং শিকারী
চিরকাল ওদের কাছে
তাই আত্ম-অবিশ্বাসী।

সেই আশ্চর্য্য সকালে

সমরেন্দ্র ঘোষাল

আমাকে ভারাক্রান্ত কোরোনা,
বিগত বেদনার ব্যথাভারে দূরে ফিরে গিয়ে।
আমাকে ছুঁয়ে থাকো তুমি প্রাজ্ঞের মতো নয়;
অজ্ঞের মতো করে শিশুর মত সরলতায় আস্থা রেখে।

নিকটবর্তী সুশীল বৃক্ষের অধোদেশে
স্তূপীকৃত বাসনাগুলো তোমার ইচ্ছামত ক্রীড়ারত;
নির্মেঘ সুনীলতা হয়ে আমি এখন ফেরারী
তোমার আকাশে আকাশে।

তোমার বাসনাগুলো আমার সুনীলতার স্পর্শে আসেনি
তোমার বাসনাগুলো সুখী নদীর
তীরে তীরে ক্রীড়ারত।
স্পর্শ সুখকর যত লাল সাদা হলুদ দিনেরা
তোমাকে সঙ্গ দিয়েছে এতকাল
আনন্দের স্পর্শের গভীরে।

তোমাকে সখ্যতা দিয়েছে
কত বিস্ময়কর সূর্য্যোদয়ের কাল।
যার স্বপ্ন আমার স্বপ্নের নিশীথে নিহিত।
আমি হব দ্বিধা নেই সেই আশ্চর্য্য সকাল
শুধু তোমার বাসনাগুলো সুশীল বৃক্ষের অধোদেশে
যদি ইচ্ছামত ক্রীড়া করে সেই আশ্চর্য্য সকালে।

॥ যৌন-সচেতন ঃঃ ডি, এইচ, লরেন্স ॥

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের ইংরাজী তথা বিশ্ব-সাহিত্যের অঙ্গনে ডি, এইচ, লরেন্স নামটি অতি পরিচিত। লেডি চ্যাটারলি এবং তাঁর সেই প্রেমিকাটির সঙ্গে এই যুগের প্রায় তিন মিলিয়ন লোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে সে লেখকটির মৃত্যু ঘটেছে, নতুন করে আজ গবেষণা সুরু হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে। প্রখ্যাত সমালোচক ভার্জিনিয়া উলফ লরেন্সের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসা করে বলেছেন—'Mr. Lawrence, of course, has moments of greatness, but hours of something very different.' —লেখকরা লেখেন তাঁদের আন্তর-স্ফূর্তিতে।

লরেন্স আধুনিক ইংরাজী উপন্যাসের পৃথিবীতে প্রকৃতই এক বিদ্রোহী শিল্পী, তাঁর উপন্যাস এক বন্দী আত্মার আবেগ-উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন। মিঃ এলিসবেন ডিভাসের মত আরও অনেক বিশিষ্ট সমালোচকের মতে লরেন্সীয় ভাবধারার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত তাঁর Rainbow women in love এবং The Captain's doll (অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থ) ও St. Mauor নামক সাহিত্যগুলি। Aaron's Red উপন্যাসে অন্তর্নিহিত ভাব এবং চরিত্রগুলিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, পড়লে মনে হবে উপন্যাসটি যেন তারে গাঁথা একটি মালা। 'Kangaroo'-র রচনাভঙ্গী আত্মজীবনীধর্মী; আর 'The plumed serpent' উপন্যাসে লরেন্সের বাণী 'The regeneration of Mexico and the world' ঘন হয়ে উঠেছ।

লরেন্সের দৃষ্টিতে কাম এক স্রোতস্বিনী প্রবাহ, লরেন্স আশা করেছেন সেই প্রবাহে অবগাহন করে বিশ্বের মানুষ সুস্থ হবে, সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই পথই ধীরে ধীরে হয়ে উঠবে সৃষ্টিধর্মী। লরেন্স দেহসর্বস্ব প্রেমকেই সব চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর Sons and Lovers গ্রন্থটিতে এই সত্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের প্রেমলীলার অংশ পাঠ করে লরেন্সের কথাই অন্যান্য পাঠকদের মনে প্রতিধ্বনিত হয়েছে—'I respond it as one responds to a gauchenie committed in public.'—

নরনারীর 'যৌন জীবন'কে বন্ধ ঘরে বন্ধ করে রাখতে চাননি লরেন্স। মিঃ ডিভাস জোর দিয়ে বলেছেন যে লরেন্সের প্রেম-সম্পর্কীয় গতিবিধি '...is a mixture of sense and non-sense.'—তাঁর এই বক্তব্য সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়! পৌরুষ এবং অতীন্দ্রিয়বাদের সন্ধানে তথা অপরিমেয় স্বাস্থ্যের খোঁজে লরেন্সকে অবশ্যই অতীতগামী হতে হয়েছে, আদিম মানবের দেহবাদ তাঁর কলমে শিহরিত হয়েছে, কণ্ঠে এসেছে তাঁর আদিম রহস্যের উচ্ছ্বাস। জীবন সম্বন্ধে তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী, তাই তিনি এক জায়গায় বলেছেন—'For a man, as for flower, beast and bird, the supreme triumph is to be most vividly alive. Whatever the unborn and the dead may know, they cannot know the beauty and the marbel of being alive in the flesh.' লরেন্সের আদর্শ দু'টি প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—জীবনের নবায়ণ ও পুনরুজ্জীবন। Dilys powell এর মতে 'Lawrence sees civization dying around him; very well, then, it must die, but shall be reborn, and so with every man and woman.' এই বিশ্বাসই তাঁর রচনাকে নৈরাশ্যে পাণ্ডুর হতে দেয়নি। আর সেই কারণেই বলা যায় এই যুগের আন্তর প্রেরণা তাঁর গ্রন্থে অত্যন্ত সত্য অর্থে পরিস্ফুট। তাঁর মন কবির এবং সেই কবি-মন নিয়ে লেখা তাঁর প্রত্যেকটি সাহিত্যেই রোমান্টিক বৃত্তি ফুটে বেরিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এককথায় সুখী ছিলেন, তাঁর জীবনে নারী এসেছে এক নিবিড় ভালবাসার প্রতীক হিসেবে। মিসেস সিড্রা রচিত স্মৃতিচারণ 'The memoirs and correspondence' গ্রন্থটিতে তাঁর স্বামী ডি এইচ-লরেন্স সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে। লরেন্সের সাহিত্যানুরাগীরা এই গ্রন্থটি পড়ে নিলে তাঁর সাহিত্যের চরিত্রগুলির অস্বাভাবিকতার মধ্যে অনেক স্বাভাবিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। লরেন্সকে 'যৌন সচেতন' লেখক বললেই সব বলা হবে না, নর-নারীর 'যৌন-জীবনে'র সহজ সম্বন্ধ বর্ণনায় লরেন্স যেখানে চরমে উঠেছেন সেখানেই তিনি শিল্পী হিসেবে সার্থক হয়েছেন। তাঁর 'Lady chatterly's Lover'—উপন্যাসে যদিও একটি সামগ্রিক বাঁধুনী নেই, ঐক্য নেই ভাবধারায়, তবুও কনি ও মেলোর এবং ক্লিফোর্ড ও তার নার্স মিসেস বোলটনের নিপুণ চরিত্র বর্ণনায় চূড়ান্ত সার্থকতায় লরেন্স আজ বিশ্বের সাহিত্যাঙ্গনের একজন বিদ্রোহী শিল্পী। এই উপন্যাসে লরেন্স যৌন সম্পর্কের আদিম সুস্থতায় স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চেয়েছেন।—

যৌন জ্বালা লরেন্সের সাহিত্যে প্রবল। সাহিত্যে তিনি 'যৌন ধর্মের' জয়গান গেয়েছেন। তিনি একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন নর-নারীর জীবনে প্রেমের সম্পর্ক সূচনা মাত্র। জীবনে প্রেম অতৃপ্ত যদি কেউ বলে থাকে, লরেন্সের মতে, লোলুপ মাংসের প্রতি সে সবচেয়ে আসক্ত। যৌন সমস্যার নীরব সমাধানের প্রতি লরেন্সের ছিল দারুণ বিরুদ্ধতা। লরেন্স বলেছেন যৌন সম্পর্ক পবিত্র গাথার মধ্যে কোন প্রতিবাদ নেই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে—'ideal, sterile innocense and similarity between a boy and a girl. we mean pure maleness in man and femaleness in a woman.'—উক্তিটি লরেন্সের যৌন-সচেতনতার বিশিষ্ট প্রমাণ নিঃসন্দেহে।
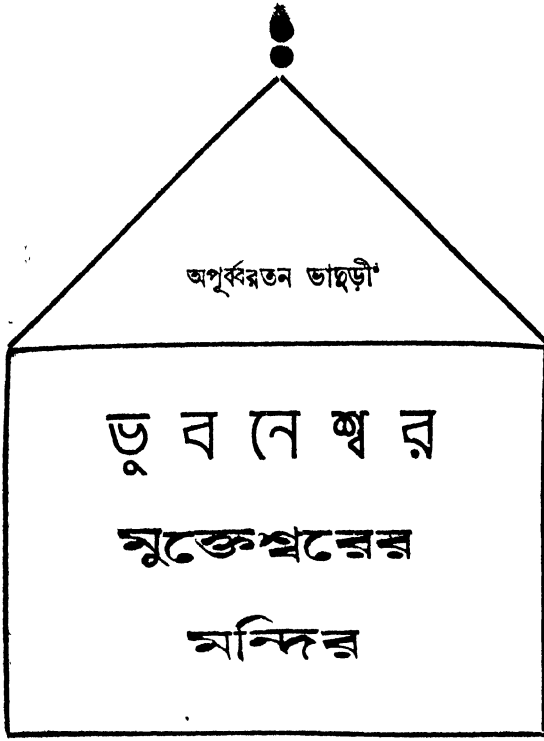
তার পরের দিন আমরা সকালে উঠে চা-পান ও সঙ্গের আনা খাবার খেয়ে মন্দির দর্শনে রওনা হই। যান আরও অনেক যাত্রী। আমরা অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে উপস্থিত হই। মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে মহাপবিত্র বিন্দু সরোবরের পূর্ব-তটে। লিঙ্গরাজের মন্দির থেকে অর্দ্ধ ফারলং দূরে।

তার অঙ্গের শিলালেখ থেকে জানা যায় বাংলার রাজা অরিবর্মার মন্ত্রী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বিশিষ্ট জ্যোতিষী ভবদেব ভট্ট এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন, প্রতিষ্ঠা করেন একটি সরোবরও। খুব সম্ভব সেই সরোবরই বিন্দু সরোবর।

অধিরোহণ করেন তিনি বিক্রমপুরের সিংহাসনে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ভবদেব ভট্টের বন্ধু ও গুণগ্রাহী বাঙ্গালী শ্রীবাচস্পতি এই শিলালেখটি উৎকীর্ণ করেন। উল্লিখিত আছে এই শিলালেখে ভবদেব ভট্ট একাম্রকাননে, পরিচিত ভুবনেশ্বর নামেও, একশত আটটি মন্দির নির্মাণ করেন। তাই মনে হয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়, এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ নির্মাণ করেন।

অপর একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের বিধবা কন্যা চন্দ্রিকাদেবী ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। রক্ষিত আছে নাকি সেই শিলালিপি ইংলণ্ডের যাদুঘরে। বৈষ্ণব মন্দির পূজিত হন এই মন্দিরের বিমানের গর্ভগৃহে অনন্ত আর বাসুদেব সঙ্গে নিয়ে ভগ্নী সুভদ্রা, জগন্নাথ, বলভদ্র আর সুভদ্রা তাঁদের সৈনী বিগ্রহ। লীলাক্ষেত্র ছিল একাম্রকানন (ভুবনেশ্বর) অনন্ত আর বাসুদেবের শিবের আগমনের পূর্বে। তাই পূজিত হন এখানে অনন্ত আর বাসুদেবও। আছে এই মন্দিরেও অন্ন ও ভোগের ব্যবস্থা অনুরূপ লিঙ্গরাজের মন্দিরের মত।

বিন্দু সরোবরের কেন্দ্রস্থলে ঘাটের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের প্রবেশ পথ। বিন্দু সরোবরের পরম পবিত্র জল স্পর্শ করে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করি। সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ভুবনেশ্বরের, সর্বাধিকখ্যাত এই বিন্দু সরোবর বিস্তৃত হয়ে আছে এক হাজার তিনশ ফুট দীর্ঘ ও সাতশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, বেষ্টিত হ'য়ে ছিল প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর আর সোপানের শ্রেণী দিয়ে।

ধ্বংসে পরিণত হয়েছে প্রাচীর, নিশ্চিহ্ন হয়েছে সোপানের শ্রেণীগুলিও, কালের নির্মম হস্তে। আবার নতুন করে নির্মিত হচ্ছে প্রাচীর, হচ্ছে সোপানের শ্রেণীও। সরোবরের কেন্দ্রস্থলে একশত দশ ফুট দীর্ঘ একশত ফুট প্রস্থ একটি প্রস্তর নির্মিত জগাত। লেখা আছে পুরাণে, সংগৃহীত হয় তীর্থবারি সমস্ত তীর্থ থেকে বিন্দু বিন্দু করে সংগ্রহ করেন দেবাদিদেব মহাদেব, তৈরী হয় একটি সরোবর। খ্যাতি লাভ করে সেই সরোবর বিন্দু সরোবর নামে। তাই মহাপবিত্র এই সরোবর। সুসজ্জিত নৌকাবিহারে, উপনীত হন এই সরোবরের কেন্দ্রস্থলে। অবস্থিত জগতিতে প্রতিদিন, লিঙ্গরাজের বিজয়বিগ্রহ, সঙ্গে নিয়ে বাসুদেব, কপিলেশ্বর ও পার্বতী দেবী, যান বাইশ দিন, করেন চন্দন স্নান। এই সরোবরের পশ্চিমে বিশ্রাম ঘাট, উত্তরে উত্তরেশ্বর, দক্ষিণে অগ্নিকোণে ত্রিশূল ও পূর্বে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের বিপরীত দিকে মণিকর্ণিকা ঘাট। মহাপবিত্র এই মণিকর্ণিকা ঘাটও সমপর্যায়ে পড়ে পবিত্রতায় আর খ্যাতিতে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের, তাই সমবেত হন এই ঘাটে প্রতিদিন শত শত তীর্থযাত্রী, করেন স্নান আর তর্পণ। এই বিন্দু সরোবরে স্নান করে পবিত্র দেহে যাত্রীদের প্রথমে অনন্ত বাসুদেবকে দর্শন করতে হয় ও তারপর লিঙ্গরাজ প্রভৃতি অষ্টমূর্তি।

বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগমন্দির। নাটমন্দির আর ভোগমন্দির নির্মিত হয় পরবর্তী কালে। তৈরী হয় একটি রসুই ঘর আর ক্ষুদ্র মন্দিরও প্রাঙ্গণের কোণে, বেষ্টিত হয় সারা প্রাঙ্গণ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে।

পঞ্চরথ দেউল এই মন্দিরের বিমানটি, একটি সুউচ্চ ভিত্তি বা পৃষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বিভক্ত সেই ভিত্তি দুই থাকে তল আর ক্ষুর পৃষ্ঠে, ষোল ফুট তার বাড়ের উচ্চতা। অপরূপ এই বিমানের অঙ্গের অলঙ্করণ, সূক্ষ্মতম।

দেখি, পূর্বদিকে, বাহুপাগের অঙ্গে, গভীর কুলুঙ্গির ভিতর, দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভূজ বামন, বিষ্ণুর অবতার। ভগ্ন তাঁর মস্তক, ধ্বংসে পরিণত তাঁর পদদ্বয় আর হস্তদ্বয়। অবশিষ্ট দুইটি হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন শঙ্খ আর চক্র। তাঁর দুই পাশে দুই পরমা রূপবতী বিবসনা নারী দাঁড়িয়ে আছেন। উর্ধ্বে মালা হস্তে উড়ন্ত অপ্সরার দল। পল্লব দিয়ে রচিত হয়েছে তাঁর মস্তকের উপরের চন্দ্রাতপ। বাজুর অঙ্গে জালির কাজ। অলঙ্কৃত কত বিভিন্ন কত ঝালরের সূক্ষ্ম কাজ দিয়েও।

অপসারিত হয়েছে পূর্বদিকের কুলুঙ্গির পার্শ্বদেবতার মূর্তি। দক্ষিণ দিকের কুলুঙ্গির ভিতর বরাহ অবতারে বিষ্ণু লঙ্ঘন করেন অনন্তকে। অনন্ত কৃতাঞ্জলিপুটে বসে আছেন, তার মস্তকে শোভা পায় শিরোভূষণ। তাদের মস্তকের উপর শোভা পায় পল্লবে রচিত চন্দ্রাতপ তার নীচে উড়ন্ত হংস। শীর্ষদেশে কীর্তিমুখ। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

দেখি নিম্ন বারান্তিতে অনর্থ পাগের অঙ্গে দিক্‌পালিকা দাঁড়িয়ে

আছেন, সঙ্গে নিয়ে বাহন। দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের পত্নীরাও, অনুরূপ বাহন সঙ্গে নিয়ে উর্ধ্ব বারাণ্ডির অঙ্গে। জগমোহনের অঙ্গেও অনুরূপ দিকপতি আর তাঁদের স্ত্রীর মূর্তি দেখি। আছেন তাঁরা সারি দেউলে আর সপ্ত মাতৃকার মন্দিরেও।

লিঙ্গরাজের মন্দিরের মত, রচিত হয় বিমানের সংলগ্ন তিনটি দ্বিতল ঘণ্টা, শ্রী, পীঢ়া দেউলও, উত্তরে, পূর্বে আর দক্ষিণে। অবশিষ্ট আছে তাদের মধ্যে শুধু দক্ষিণের আর উত্তরের দেউলের ভিত্তি।

পঞ্চরথ দেউল এই মন্দিরের জগমোহনও দাঁড়িয়ে আছে বিমানের মত তল আর ক্ষুর পৃষ্ঠের উপর। ক্ষুর পৃষ্ঠের অঙ্গে, কুলুঙ্গির ভিতর, শোভা পায় লক্ষ্মীর মূর্তি, মূর্তি বামন আর বেতালেরও। বাঢ়ের উচ্চতা বার ফুটের উপর। দেখি, উত্তর দিকে, বাহু পাগের অঙ্গে পাঁচটি ক্ষুদ্র উদগত স্তম্ভ। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি কত নর আর নারীর মূর্তি। তাদের উপরে অপরূপ ক্ষুদ্র উদ্‌গত স্তম্ভের অঙ্গে, নাগ আর নাগিনীর মূর্তি দেখি, শিরে নিয়ে আছে তারা পাঁচটি করে ফণা। দেখি অলঙ্কৃত স্তম্ভের পাগের উদ্‌গত স্তম্ভের অঙ্গ সূক্ষ্মতম লতা পল্লবে। তাদের শীর্ষদেশে, বাহুপাগের অঙ্গে হস্তী যূথ আর অশ্বের শোভা যাত্রা। বাহকেরা বহন করে নিয়ে যায় একটি পাল্‌কিও। মুগ্ধ হয়ে দেখি, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের।

সেখান থেকে, নাটমন্দিরে যাই। এই নাটমন্দিরটিও নির্মিত হয় পরবর্তীকালে। দ্বিতল এই নাটমন্দিরের পীঢ়া অংশ, বিভক্ত ও দুই থাকে, দাঁড়িয়ে আছে ছাব্বিশ ফুট পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ আর ছাব্বিশ ফুট সাত ইঞ্চি প্রস্থ পরিধি নিয়ে, বাঢ়ের উচ্চতা আট ফুট। দক্ষিণ দিকের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, কেন্দ্রস্থলের দ্বার দিয়ে, আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। রচিত হয় তিনটি কারে দরজা উত্তর আর দক্ষিণ দিকে, দেখি মেঝের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি ক্ষুদ্র গরুড় স্তম্ভ।

নাটমন্দির দেখে ভোগ মন্দিরে উপস্থিত হই। পীঢ়া দেউল এই ভোগ মণ্ডপটি, শীর্ষে নিয়ে আছে কলস আর আমলক, বুকে নিয়ে আছে পাঁচটি পীঢ়া। দাঁড়িয়ে আছে তল আর ক্ষুর পৃষ্ঠের উপর। নাই কোন শিল্পসম্ভার তাদের অঙ্গে, পীঢ়া দিয়ে অলঙ্কৃত তার বারাণ্ডি।

আছে এই ভোগমণ্ডপে দুইটি দ্বার। দেখি, পূর্বদিকের দ্বারের দুই পাশে, উদ্‌গত স্তম্ভের অঙ্গে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দুইটি বিষ্ণুমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। বামদিকেরটির আননে শোভা পায় গুম্ফ, তার এক হস্তে চক্র ও দ্বিতীয় হস্তে তিনি ধারণ করেন একটি মালা, তৃতীয় হস্তে শঙ্খ, চতুর্থ হস্তে গদা। মূল্যবান তাঁর শিরোভূষণ। তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় মুক্তার হার, বাহুতে বাজু, মণিবন্ধে কঙ্কণ, পায়ে মল। অনুরূপ দক্ষিণ পাশের মূর্তিটিও, বসনে আর ভূষণে। কিন্তু নাই তাঁর আননে গুম্ফ, হস্তে ধৃত নরমালা ও স্থাপিত তাঁর হস্ত গদার উপর। ভগ্ন দক্ষিণ দ্বারের প্রবেশপথের বাম পাশের মূর্তিটি তাঁর মস্তকে কোন শিরোভূষণও নাই। অন্যরূপ এই মূর্তিটিও পূর্বদিকের প্রবেশপথের বাম পাশের মূর্তির মালার পরিবর্তে তাঁর দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। অনুরূপ গঠনে আর ভূষণে দক্ষিণ পাশের মূর্তিটি, পদ্মের পরিবর্তে তাঁর দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় একটি পুষ্পমাল্য।

অনবদ্য এই মূর্তিগুলি দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্করের। ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, সারি দেউল অভিমুখে রওনা হই।

দাঁড়িয়ে আছে সারি দেউল নির্মিত পরবর্তী যুগে একটি অপ্রশস্ত গলির মধ্যে। লিঙ্গরাজের মন্দিরের উত্তর দিকের বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে এই গলিটি বিন্দু সরোবরে এসে যুক্ত হয়েছে। শৈবমন্দির, বিগ্রহ শিবলিঙ্গ বুকে নিয়ে আছে শুধু বিমান আর জগমোহন দুইটি সপ্তরথ দেউল। দেখি কপাটের অঙ্গে গজলক্ষ্মীর মূর্তি। রচিত হয় স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষ ও জগমোহনের উত্তর আর দক্ষিণ দিকে শোভিত তাদের অঙ্গ অপরূপ মূর্তি সম্ভার দিয়ে। সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম, কিন্তু তাদের উপরের কুলুঙ্গির অঙ্গের অলঙ্করণ, অলঙ্কৃত তাদের দুই পাশ কলস আর পুষ্পলতা দিয়ে, অতুলনীয় দক্ষিণের কুলুঙ্গির অঙ্গের মূর্তিসম্ভারের সৌন্দর্য, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

দেখি প্রকোষ্ঠের সারি দিয়ে বিভক্ত জগমোহনের পিরামিডাকৃতি অংশ দুইটি ভাগে, নিম্নাংশ বুকে নিয়ে আছে ছয়টি পীঢ়া, পাঁচটি উর্ধ্বাংশ।

দেখি তাদের সঙ্গে, সারি সারি কত জন্তুর মূর্তি, কত হংসের, কত মৃগের, কত হস্তীর। সুষ্ঠ গঠন, জীবন্ত তারা অপর্যাপ্ত। বারাণ্ডির অঙ্গে, কুলুঙ্গির ভিতর দিকপতিদের মূর্তি দেখি। সঙ্গে নিয়ে আছেন দিকপতিরা তাঁদের বাহন। তাঁদের পত্নীরাও আছেন। অনুরূপ এই মূর্তিগুলি, অনন্ত বাসুদেবের মূর্তির, পাড়ে সমপর্যায়েও গঠন সৌষ্ঠবে আর সজীবতায়। দেখি কত বিভিন্ন সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম লতাপুষ্প ও কত বিচিত্র পুষ্পলতা। অতুলনীয় তারাও। নিদর্শন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের, এক সুন্দরতম সৃষ্টির। স্থপতিকে আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, মন্দির থেকে বার হ'য়ে আসি।

বৈতাল দেউলে উপনীত হই। পরিচিত কপালিনীর মন্দির নামেও। দাঁড়িয়ে আছে বৈতাল দেউল ভুবনেশ্বর গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বুকে নিয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, পৃথক হ'য়ে আছে উড়িষ্যার অন্য সমস্ত মন্দির থেকে, অঙ্গে নিয়ে আছে দ্রাবিড়, বৌদ্ধ আর নাগর স্থাপত্যের সংমিশ্রণ। নির্মিত এই মন্দির সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে, করবংশের রাজারা নির্মাণ করেন। রচিত হয়েছে দুই থাকে তার অর্দ্ধ গোলাকৃতি শীর্ষদেশ বা মস্তক, মহাবলিপুরমের রথের অনুকরণে। নির্মাণ করেন সেই রথ দ্রাবিড় স্থানের পল্লব নৃপতিরা চতুর্থ শতাব্দীতে। শীর্ষে নিয়ে আছে মস্তক তিনটি আমলক শিরে নিয়ে কর্পূরী, কলস আর ত্রিশূল, দুইটি দুই প্রান্তে ও কেন্দ্রস্থলে একটি প্রতীক নাগর স্থাপত্যের। নির্মিত হ'য়েছে জগমোহনের ছাদের উপর মন্দিরের পূর্ব গাত্রে বিমানের সংলগ্ন একটি ত্রিকোণাগ্র চূড়া আকৃতি তার দ্রাবিড় গোপুরমের মত, বুকে নিয়ে আছে বৌদ্ধ ধর্ম মন্দিরের শ্রেষ্ঠ প্রতীক উন্নততর চৈত্য গবাক্ষ, অঙ্গে নিয়ে নারায়ণের মূর্তি, শীর্ষে নিয়ে নটরাজনের তাণ্ডব নৃত্যের দৃশ্য।

ক্ষুদ্রতর এই মন্দিরটি পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু বিস্তৃত হয়ে আছে আঠার ফুট প্রস্থ, পঁচিশ ফুট দীর্ঘ পরিধি নিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে একটি সুউচ্চ মঞ্চের উপর, বেষ্টিত হয়ে আছে নীচু প্রাচীর দিয়ে। রচিত হয়েছে একটি তোরণ, পরবর্তী কালে।

প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে, সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের চাতালে উঠে, বিমানের কাছে উপস্থিত হই। দেখি বারাণ্ডির উর্ধ্বদেশে ক্ষুদ্র কুলুঙ্গির ভিতর সারি-সারি কেশর যুক্ত জোড়া সিংহ। দেখি, একই সমতাতে অগভীর কক্ষের ভিতর জোড়া হস্তীর সারিও। সুষ্ঠ গঠন এই মূর্তিগুলির। তাদের উপরে অনেকগুলি পদক, অঙ্গে নিয়ে

সূর্যদেবতার মুখমণ্ডল, তাদের উপরে ঝালর। ঝালরের উপরে, তৃতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতর, প্রণয়াশক্ত নর ও নারীর মূর্তি, দাঁড়িয়ে আছে তারা বিভিন্ন ও বিচিত্র ভঙ্গীতে, নিবেদন করছে পরস্পরকে প্রেম। বিকশিত তাদের অন্তরের ভাষা তাদের আননে তাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত।

দেখি, বৈতালের মস্তকের নীচে শোভাযাত্রায় হস্তীপৃষ্ঠে দিগ্বিজয়ের দল। দেখি কত সূক্ষ্ম জালির কাজও।

দেখি রচিত হয়েছে পাঁচটি বৃহৎ কুলুঙ্গি বিমানের পশ্চিম গাত্রে। কেন্দ্রস্থলেরটিতে, চতুর্ভুজ হর। বিরাজ করেন, সঙ্গে নিয়ে পার্বতী। তাঁর এক হস্তে জপমালা, দ্বিতীয় হস্তে কমণ্ডলু, তৃতীয় হস্তে তিনি ধারণ করেন একটি মুকুর, চতুর্থে দণ্ড।

দেখি, উত্তরের গাত্রে কুলুঙ্গির ভিতর এক অপরূপ অষ্টভুজা, মহিষমর্দিনীর মূর্তি। হস্তে নিয়ে আছেন মহিষমর্দিনী, অসি, ত্রিশূল, ঢাল, সর্প, সড়কি, ধনুক, তীর আর খড়্গ।

দেখি, উত্তরের গাত্রে, কেন্দ্রস্থলে, কুলুঙ্গির ভিতর একটি ভৈরবীর মূর্তি, উত্তরের গাত্রে, অষ্টভুজা দুর্গার মূর্তি। অপরূপ এই মূর্তি দুইটিও, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। দেখি, উত্তরের গাত্রে, দুইটি কুলুঙ্গির ভিতরে দুইটি সুবিশাল প্রস্ফুটিত পদ্মও। সবগুলিই সুন্দরতম দান উড়িষ্যার ভাস্করের। সুন্দরতম আর প্রকৃষ্টতম কিন্তু বিমানের পূর্ব গাত্রের অলঙ্করণও, বুকে নিয়ে আছে দ্রাবিড় আর গোপুরম আর বৌদ্ধ চৈত্য গবাক্ষ, শ্রেষ্ঠ প্রতীক দ্রাবিড় আর বৌদ্ধ স্থাপত্যের, তাদের অপরূপ সুসামঞ্জস্য আর সংমিশ্রণ। অঙ্গে নিয়ে আছে চৈত্য গবাক্ষ নারায়ণের মূর্তি, শীর্ষে নিয়ে আছে নটরাজনের মূর্তি, তাণ্ডব নৃত্য করেন নটরাজ, অপরূপ তাঁর নৃত্যের ছন্দ, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, এক অমর কীর্তি। স্তব্ধ হয়ে দেখি। নাই কোন শিল্প সম্ভার, প্রবেশ পথের শীর্ষদেশে, দ্বারের বাজুতেও নাই। নাই নবগ্রহের মূর্তিও।

জগমোহনে উপনীত হই। 'অনুরূপ এই জগমোহনটি পরশুরামেশ্বরের আকৃতিতে, বুকে নিয়ে আছে চারি কোণে চারিটি রেখ দেউল। নাই এই দেউলে পরশুরামেশ্বরের জগমোহনে। অঙ্গে নিয়ে আছে জগমোহন জালির পঞ্জর। জগমোহনের সম্মুখে, পূর্বদিকে একটি ক্ষুদ্র পীঢ়া দেউল। তার ভিতরে একটি যূপ। আবদ্ধ হত এই স্তম্ভে যজ্ঞীয় পশু। পূর্বে হত এই মন্দিরে পশুবলি। গর্ভগৃহে, এই মন্দিরের বিগ্রহ কপালিনী পূজিতা। তার প্রাচীরের গাত্রে সপ্তমাতৃকা ও আরও পনেরটি তান্ত্রিক দেবীমূর্তি বিরাজ করেন। অন্যতম মূর্তি দুর্গার এই কাপালিনী সমপর্যায়ে পড়েন তন্ত্রে বর্ণিত চামুণ্ডার মূর্তির। ভীষণ দর্শনা এই মূর্তিটি, বিস্মিত হয়ে দেখি। মূর্তি দেখি অর্ধনারীশ্বরের আর সপ্তাশ্ব আরোহণে সূর্যেরও। তান্ত্রিক পীঠে পরিণত হয় ভুবনেশ্বরও। গড়ে ওঠে এই মন্দিরে, উড়িষ্যার প্রাচীনতম প্রধান তন্ত্র পীঠ। দেবীকে প্রণতি জানিয়ে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি।

বিচিত্র এই মন্দিরের পরিকল্পনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ব্যতিক্রম অন্য মন্দিরের সঙ্গে, কিন্তু বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি, উড়িষ্যার স্থপতির প্রকৃষ্টতম দান, বহু সাধনার দান উড়িষ্যার ভাস্করেরও। তাই সম-পর্যায়ে পড়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সঙ্গে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন।

স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, আমরা মোহিনী ঠাকুরাণীর মন্দির অভিমুখে রওনা হই। এই মন্দিরটিও বিন্দু সরোবরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে কর বংশের রাণীমোহিনী নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি। অন্যতম আর প্রকৃষ্টতম সেখানকার একটি পীঢ়া ও ছয়টি রেখা দেউলের।

অনুরূপ এই মন্দিরটিও পরশুরামেশ্বরের, একটি রেখা দেউল, বুকে নিয়ে আছে একটি জগমোহনও।

নিশ্চিহ্ন হয়েছে জগমোহনের ঊর্ধ্বাংশ কালের কবলে। বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি স্তম্ভ, চারিটি বৃহৎ ও দুইটি ক্ষুদ্র। পৃথক করা হয়েছে স্তম্ভ দিয়ে মন্দিরের কেন্দ্রস্থলকে চারিদিকের গলিপথ থেকে, অনুরূপ বৌদ্ধ চৈত্যের অভ্যন্তর ভাগের। নাই কোন অলঙ্করণ মন্দিরের গাত্রে, অঙ্গে নিয়ে আছে শুধু তার আভাস, শুধু রেখা।

দেখি পশ্চিমেশ্বরের মন্দির, একটি ত্রিরথ দেউল, দাঁড়িয়ে আছে সরোবরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। অনুরূপ এই মন্দিরটিও পরশু-রামেশ্বরের ; নির্মাণ পদ্ধতিতে, অঙ্গে নিয়ে আছে একটি কুম্ভ আর লতাপল্লব। নির্মিত এই মন্দিরটিও সপ্তম শতাব্দীতে।

তারপর মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দির দেখি। একটি ত্রিরথ দেউল, দাঁড়িয়ে আছে সরোবরের পশ্চিম পাড়ে, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। সঙ্গে নিয়ে আছে জগমোহন, নিশ্চিহ্ন তার উপরাংশও। এই মন্দিরটিও, পরশুরামেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত হয়। অঙ্গে নিয়ে অনুরূপ সুন্দরতম অলঙ্করণ আর মূর্তির সম্ভার। গ্রথিত তার জঙ্ঘা, বুকে নিয়ে পার্শ্বদেবতাদের মূর্তি মৃত্তিকার অন্তরালে।

কিন্তু দেখা যায় তার অঙ্গের সূক্ষ্মতম জালি, হস্তীর শ্রেণী বিস্মিত হই দেখে তার অঙ্গের অপরূপ ঝালরের কাজ।

দেখি বুকে নিয়ে আছে সরোবরের উত্তর পাড় ও কয়েকটি মন্দির, শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে উত্তরেশ্বর, একটি পঞ্চরথ রেখ দেউল, নির্মিত সপ্তম শতাব্দীতে। সঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও একটি জগমোহন, নির্মিত পরশু রামেশ্বরের জগমোহনের অনুকরণে। কিন্তু নাই কোন শিল্প সম্ভার এই রেখ দেউলের অঙ্গে, জগমোহনের অঙ্গেও নাই, বেষ্টিত হয়ে আছে সমস্ত মন্দিরটি একটি প্রাচীর দিয়ে।

দাঁড়িয়ে আছে উত্তরেশ্বরের দক্ষিণে আরও আটটি রেখ দেউল। গোত্রহীন তারা, সমৃদ্ধশালী নয় তাদের অঙ্গ কোন অলঙ্করণ দিয়েও।

সেখান থেকে চিত্রকারিণীর মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি লিঙ্গরাজের মন্দিরের উত্তর দিকে উত্তর প্রবেশ পথের পশ্চিমে। একটি সপ্তরথ দেউল, সঙ্গে নিয়ে আছে 'একটি সপ্তরথ জগমোহন, বেষ্টিত হয়ে আছে একটি প্রাচীর দিয়ে। শোভা করে আছে তার সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের চারিকোণ চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির। সুন্দর নয় তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ।

দেখি তার পশ্চিমে তিনটি রেখ দেউল, দেখি একটি অর্ধভগ্ন পঞ্চরথ রেখ দেউলও, পরিচিত যমেশ্বরের মন্দির নামে। নির্মিত পরবর্তী যুগে, বুকে নিয়ে আছে যমেশ্বরের একটি পঞ্চরথ মোহন। দেখি দুইটি লিঙ্গরাজের প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে, উত্তর প্রবেশ পথের নিকটে, পরিচিত তারা কাশীনাথ আর ভুবনেশ্বর নামে।

উপনীত হই সহস্রলিঙ্গ সরোবরের তীরে পরিচিত দেবীপধারাও নামেও, অবস্থিত এই সরোবরটি, লিঙ্গরাজের মন্দিরের পূর্বদিকে। বেষ্টিত হয়ে আছে সরোবরটি একশটি মন্দির দিয়ে, অন্তত তাদের মধ্যে

সাতাত্তরটি। অনুরূপ তাদের মধ্যে একটি রাজরাণীর মন্দিরের নির্মাণ পদ্ধতিতে ও পরিকল্পনায়।

দেখি, লিঙ্গরাজের মন্দিরের পূর্ব প্রবেশ পথেও একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মন্দির। অনুরূপ এই মন্দিরটি লিঙ্গরাজের মন্দিরের পরিকল্পনায়, নির্মাণ পদ্ধতিতে আর অঙ্গের অলঙ্করণে, নাই এই মন্দিরের কোন মোহন, বিরাজ করেন না কোন শিবলিঙ্গ ও তার গর্ভগৃহে।

দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকি। পথে পড়ে বৈদ্যনাথ, একটি সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ। দাঁড়িয়ে আছে লিঙ্গটি একটি বটবৃক্ষের পাশে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে, একটি প্রস্তরে গঠিত সুউচ্চ মঞ্চের উপর। উল্লিখিত আছে, শিবপুরাণে এই লিঙ্গটির কথা।

তার দক্ষিণে মৈত্রেশ্বরের মন্দির দেখি। একটি পঞ্চরথ দেউল, সঙ্গে নিয়ে আছে একটি পঞ্চরথ জগমোহন। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি শুধু পার্শ্বদেবতার মূর্তি।

দাঁড়িয়ে আছে তার দক্ষিণে, একাম্র ক্ষেত্রে, ভুবনেশ্বরের দক্ষিণ সীমায় কপিলেশ্বরের মন্দির বেষ্টিত হয়ে আছে প্রাচীর দিয়ে। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগমন্দির। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি উড়িষ্যার গজপতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, কপিলেশ্বর দেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে। একটি সম্পূর্ণ মন্দির উড়িষ্যার কিন্তু সমৃদ্ধশালী নয় তার অঙ্গ সুন্দরতম অলঙ্করণ দিয়ে। আছে একটি কুণ্ডও এ মন্দিরের দক্ষিণ পাশে, লেখা আছে তার কথা শিবপুরাণে। অতি নির্মল ও স্বাস্থ্যকর এই কুণ্ডের জল। সঙ্গী হন কপিলেশ্বর দেবের বিজয় বিগ্রহ লিঙ্গরাজের চন্দন যাত্রায়।

সেখান থেকে আমরা মুক্তেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে মুক্তেশ্বর উড়িষ্যার সুন্দরতম মন্দির, উজ্জ্বলতম রত্ন কলিঙ্গের ভাস্করের আর স্থপতির; তাদের অনুপম সৃষ্টি লিঙ্গরাজের মন্দিরের উত্তর পূর্ব দিকে অর্ধ মাইল দূরে, সিদ্ধারণ্যের ভিতরে, প্রকৃতির এক সুগম্ভীর পরিবেশে, এক অলৌকিক লীলা নিকেতনে। চারিদিকে ধানের ক্ষেত, বিস্তৃত তাদের সবুজ অঞ্চল দিগন্তে, দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের মাঝে মাঝে এক একটি নিঃসঙ্গ মহীরুহ, উন্নত করে শির। তাদের মাঝখানে মালভূমিতে সিদ্ধারণ্য, বুকে নিয়ে আছে ঘনবন বীথি, আর লতাগুল্ম। তাদের বক্ষ ভেদ করে, সর্পিল গতিতে, নৃত্যের ছন্দে, ছুটে চলে এক কলনাদিনী নির্ঝর। সৃষ্টি হয় কত কুণ্ড তার চলার পথে। মহাপবিত্র সেই কুণ্ডের জল। রহস্যময়, অলোকসুন্দর এই পরিবেশ। তাই মহামহিমময় এই মন্দিরটিও, বুকে নিয়ে আছে যা কিছু সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ উড়িষ্যার স্থপতির আর ভাস্করের, তাঁদের প্রকৃষ্টতম দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাঙ্ময় তার অঙ্গের প্রতিটি প্রস্তর তাঁদের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, প্রাণময় তাঁদের হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্য, অনুপম তাদের মনের সীমাহীন মাধুর্যে। সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে তাদের স্বপ্ন, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি প্রস্তরগাত্রে, পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের দরবারে। হয় বিশ্বজিৎ।

অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে কেশরী বংশের নৃপতিরা নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি। প্রায় চার ফুট উঁচু মঞ্চের উপর, পশ্চিমদিকে মুখ করে, দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি, বুকে নিয়ে বিমান আর জগমোহন। বিস্তৃত হয়ে আছে মঞ্চটি সাতাত্তর ফুট দীর্ঘ আর সাড়ে বত্রিশ ফুট পরিধি নিয়ে। বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দিরটি সওয়া চার ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে। সুন্দর এই প্রাচীরের অঙ্গের অলঙ্করণও। খোদিত হয় সারি সারি, কুলুঙ্গির অথবা কপাট, তাদের অঙ্গে বহুনী, বহুনীর শীর্ষদেশে মস্তকাবরণ, তার কেন্দ্রস্থলে সূক্ষ্ম থাকে। দেখি কুলুঙ্গির ভিতর আর কপাটের অঙ্গে, কয়েকটি অপরূপ সূক্ষ্ম গঠন মূর্তিও, বিস্ময়কর, দক্ষিণ পশ্চিম প্রবেশ পথের প্রাচীরের গাত্রে, চারিটি মূর্তি, আছে তাদের দুইটি করে মস্তক।

প্রাচীর থেকে অল্প দূরে, জগমোহনের প্রবেশদ্বারের বিপরীত দিকে উচ্চ আয়তনক্ষেত্র মঞ্চের উপর, দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের অপরূপ, সুন্দরতম পনের ফুট উঁচু তোরণটি। দুলতেন এই তোরণে, মন্দিরের বিগ্রহ দেবতা, দোলযাত্রার সময়। বুকে নিয়ে আছে তোরণটি, দুই পাশে, দুইটি স্তম্ভ। চতুষ্কোণ তাদের মূল, ষোল কোণ দণ্ড, তাদের শীর্ষদেশে শোভা পায় এক একটি আমলক শিলা, শিলার উপর অনবদ্য দল বিশিষ্ট প্রস্ফুটিত পদ্ম। তাদের শীর্ষদেশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান। খোদিত হয় উড়িষ্যার মন্দিরের প্রতীক, স্তম্ভমূলের অঙ্গে আর দণ্ডের গাত্রে, শীর্ষে নিয়ে আমলক আর কলস। অলঙ্কৃত দণ্ডের শীর্ষদেশের চারিদিক অনুপম "স্ক্রলের" আর ঝালরের কাজ দিয়েও। অলঙ্কৃত খিলানের অঙ্গও তিনটি অনুপম স্ক্রলের কাজ দিয়ে। তাদের কেন্দ্রস্থলে, আর দুই প্রান্তে, শোভা পায় মনুষ্য মস্তক। মাঝখানে দুইটি অর্দ্ধশায়িত অপরূপ বিবসনা নারী মূর্তি। রহস্যময় তাদের শয়নের ভঙ্গি। মুখ বাড়িয়ে আছে দুইটি অপরূপ দর্শন মকরও, খিলানের দুই প্রান্ত থেকে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অনুপম সুন্দরতম তোরণটি পূর্বাভাষ কোণারকের মহামহিমময় তোরণের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ তোরণ ভারতের, দেখি, তার অঙ্গের অলঙ্করণও।

প্রবেশ করি মন্দির প্রাঙ্গণে। পঞ্চরথ দেউল, নির্মিত এক বিশিষ্ট বেলে পাথর দিয়ে রাজরাণী নামে পরিচিত। দেখে বিস্মিত হই বিমানের আর জগমোহনের গাত্রের গ্রন্থি, ঝালরের আর স্ক্রলের কাজ। সুন্দরতম, সূক্ষ্মতম ও বর্ণনাতীত।

জগমোহনে উপনীত হই। ছাব্বিশ ফুট উঁচু এই জগমোহনটি, দাঁড়িয়ে আছে বিমানের সংলগ্ন হয়ে। রচিত হয় তার উত্তর আর দক্ষিণ দেওয়ালে দুইটি অপরূপ জালির গবাক্ষ। হীরকাকৃতি তাদের ছিদ্রগুলি, বেষ্টিত হ'য়ে আছে তারা তিনটি চৌকাঠ দিয়ে। অঙ্গে নিয়ে আছে প্রথম চৌকাঠ স্ক্রলের কাজ, দ্বিতীয়টি প্রস্ফুটিত পদ্মে, তৃতীয়টি লতা, তাদের বেষ্টন করে আছে উদ্গত স্তম্ভ, বুকে নিয়ে কত বানরের দৃশ্য। কোথাও বানরকে নিচের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় একটি বৃহৎ কাঁকড়া, কোথাও বিলম্বিত বানর বৃক্ষের শাখা থেকে। কোথাও আকর্ষণ করে আছে বানর অপর একটি বানরকে, রক্ষা করছে তাকে শত্রুর হাত থেকে, কোথাও বা রুদ্ধ করছে তার পতন। কোথাও বা দুইটি বানর বিরক্ত করছে একটি মকরকে, কোথাও মকরের পৃষ্ঠে উপবেশন করে আছে দুইটি বানর। কোথাও বা নিযুক্ত বানর তার সঙ্গীর মস্তকের উকুন বাছায়। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই গবাক্ষ দুটি, দেখি তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ। প্রবেশ-পথে উপনীত হই। দেখি, সুন্দরতম শিল্পসম্ভারে অলঙ্কৃত এই প্রবেশ-পথের শীর্ষদেশও। কিন্তু খোদিত হয় নাই নবগ্রহের মূর্তি, বসে আছেন শুধু মহালক্ষ্মী একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর, সঙ্গে নিয়ে তাঁর দুইটি বাহন। ঊর্দ্ধে, কার্ণিসের অঙ্গে মালা হস্তে, উড়ন্ত গন্ধর্বের মূর্তি দেখি। খোদিত দেখি দ্বারের দুই পাশে গঙ্গা, যমুনা, নন্দী আর মহাকালের মূর্তি। দেখি অনুরূপ মূর্তি বিমানের প্রবেশদ্বারের দুই পাশেও। দ্বারের দুই প্রান্ত

প্রদেশে, দুইটি উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গে, অপরূপ, সূক্ষ্মতম স্ক্রলের আর ঝালরের কাজ, দাঁড়িয়ে আছে তাদের নীচে, বৃক্ষের তলে একটি করে পরমা রূপবতী নারী। স্বল্পবসনা, যৌবনপুষ্ট পীনোন্নত তাদের বক্ষ, অপরূপ তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গীটি। ঊর্ধ্বে মন্দির উত্তোলনে নিযুক্ত কয়েকটি বামন। মুগ্ধ হই দেখে। দেখি অনুরূপ অলঙ্করণে ভূষিত উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গ আর জালির গবাক্ষের দুই পাশও। চৌকাঠের দুই পাশে কেশরযুক্ত সিংহের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট নর। দাঁড়িয়ে আছে সিংহটি একটি অবনত হস্তীর উপর। প্রবেশপথ দেখে, আমরা দেখতে থাকি, দক্ষিণ দিক থেকে জগমোহনের গাছের শিল্প-সম্পদ, তার অঙ্গের সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। দেখি বুকে নিয়ে আছে দ্বিতীয় উদ্গত স্তম্ভটি কয়েকটি ক্ষুদ্র হস্তী, তাদের শীর্ষদেশে বামনের মূর্তি, পদতলে দুইটি পরমাসুন্দরী নারীমূর্তি। দাঁড়িয়ে আছে তৃতীয় উদ্গত স্তম্ভটি একটি অগভীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ভিতর, বুকে নিয়ে আছে নারীমূর্তি, দাঁড়িয়ে আছে নারীটি একটি উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে। বুকে নিয়ে আছে পরবর্তী উদ্গত স্তম্ভ দুইটি অজানা জন্তুর মূর্তি, দাঁড়িয়ে আছে জন্তুগুলি দুইটি হস্তীর পৃষ্ঠের উপর, শূন্যে ধারণ করে আছে, হস্তী দুইটি স্তম্ভ। অঙ্গে নিয়ে আছে পঞ্চফণাযুক্ত নাগিনীর মূর্তি, বেষ্টিত নাগিনীদের পুচ্ছ স্তম্ভ দণ্ডে। দেখি, অনুরূপ সাতাশটি স্তম্ভ জগমোহনের আর বিমানের অঙ্গে। তাদের মধ্যে চৌদ্দটি অঙ্গে নিয়ে আছে অবশিষ্ট নাগিনীর মূর্তি। হস্তে নিয়ে আছে নাগেরা—কেউ মালা, কেউ প্রস্ফুটিত পদ্ম, কেউ একটি দীর্ঘ বীণা, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে কৃতাঞ্জলিপুটে। নাগিনীদের হস্তে শোভা পায় পদ্ম, ঝালর দিয়ে আবৃত আধার, শঙ্খ অথবা চামর।

ভূষিত চতুর্থ উদ্গত স্তম্ভটি দ্বিতীয়ের অনুরূপ অলঙ্করণে, পঞ্চমটি তৃতীয়ের। প্রান্তদেশের, ষষ্ঠ উদ্গত স্তম্ভটি বুকে নিয়ে আছে একটি নারীমূর্তি, মূর্তি গণেশের আর বামনের।

দক্ষিণ সম্মুখ ভাগে, অঙ্গে নিয়ে আছে সপ্তম উদ্গত স্তম্ভটি একটি নাগের মূর্তি, অষ্টমটি দ্বিতীয়ের অনুরূপ, নবমটি নাগিনীর মূর্তি, দশমটি দ্বিতীয়ের অনুরূপ একাদশটি নাগিনীর মূর্তি। বুকে নিয়ে আছে দ্বাদশ উদ্গত স্তম্ভটি ক্ষুদ্র অজানা জন্তুর মূর্তি, একটি পদ্ম খচিত ঝালর, একটি মূর্তি, একটি মৃগ, উপবিষ্ট মৃগটি একটি বৃক্ষের নীচে, আর একটি ক্ষুদ্র নারী মূর্তি। অপরূপ এই উদ্গত স্তম্ভগুলি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, কীর্তি এক মহাগৌরবময় যুগের।

বিমানে উপনীত হই। খোদিত কত মুনি ঋষির মূর্তি বিমানের অঙ্গে, কেউ ধ্যানে মগ্ন, কেউ নিযুক্ত বাণী প্রচারে। দেখি নিযুক্ত একটি মুনি লিঙ্গ স্নানে, সঙ্গে নিয়ে শিষ্যের দল। ধ্যানে মগ্ন একটি ঋষি, তাঁর শিরে শোভা পায় শিরোভূষণ। হাঁটু গেড়ে বসে আছে তাঁর সামনে কয়েকটি নারী, বালকেরা বাজনা বাজাচ্ছে। আসন পেতে দিচ্ছেন একটি মুনি তাঁর গুরুকে। অনুরূপ চতুর্থটি প্রথমটির। দেখি পাত্র থেকে জল সিঞ্চন করছেন একটি ঋষি শিবের লিঙ্গের উপর, আরও দুইটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন, হস্তে নিয়ে জল ভরতি পাত্র। দেখি একটি ঋষি নিযুক্ত লেখায়, তাঁর দুই পাশে কৃতাঞ্জলিপুটে দুই শিষ্য দাঁড়িয়ে আছেন। দেখি একটি নর অঞ্চল নিংড়ে জল দিচ্ছে একটি লিঙ্গের মস্তকের উপর। দেখি, উপাসনা করছেন শিবকে মুনি ঋষিরা, বই পড়ে শোনাচ্ছেন শিষ্যদের, শিষ্যদের শিরে শোভা পায় শিরোভূষণ। গুরুদেব শিষ্যদের নিকট বাণী প্রচার করছেন একটু দূরে এক শিষ্য অধ্যয়নে নিযুক্ত। অনবদ্য এই মূর্তিগুলিও শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্করের।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি, দক্ষিণ বাহুপাগের গাত্রে, পাগের অঙ্গে একটি মৃগয়ার দৃশ্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় মৃগরা, কারও দৃষ্টি নিবদ্ধ পশ্চাতে দণ্ডায়মান ধনুর্বাণ হস্তে শিকারীর প্রতি, কারও সম্মুখ পানে।—দেখি, উত্তরের সম্মুখ ভাগে একটি হস্তীর দৃশ্যও।

দেখি কত বিভিন্ন আর বিচিত্র স্ক্রলের কাজ, কত সুন্দরতম ঝালর আর সূক্ষ্মতম ফাঁদগ্রন্থি দিয়ে অলঙ্কৃত মন্দিরের রেথ অংশ। দেখি, কত অপরূপ গঠনোন্নত রক্ষা মূর্তিও, তারা নাগের পুচ্ছের উপর, দাঁড়িয়ে আছে, উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে। কত শার্দুলের মূর্তিও দেখি। শ্রদ্ধা নিবেদন করি স্থপতিকে আর ভাস্করকে। দেখি, মরিচি কুণ্ডও। মহাপবিত্র এই কূপের জল। অশোক অষ্টমীর পূর্বরাত্রে, এই কুণ্ডে স্নান করলে, মৃতবৎসা ও বন্ধ্যা স্ত্রীরা লাভ করেন সন্তান।

সপ্তর্ষিদের দেখে, সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছেন সপ্তর্ষিগণ, প্রস্তরের বুকে, মুক্তেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে, একটি সুউচ্চ মঞ্চের উপর, বৃক্ষের নীচে। শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে, সূর্যদেবতা, দাঁড়িয়ে আছেন পূর্বদিকে মুখ করে, সাড়ে তিন ফুট দীর্ঘ, দেড় ফুট প্রস্থ প্রস্তরের অঙ্গে। দ্বিভুজ এই মূর্তিটি, ভগ্ন তার উভয় বাহুই। নাই কোন শিরোভূষণ, রচিত হয়েছে একটি জ্যোতির চক্র তাঁর মস্তকের চতুর্দিকে। নাই তাঁর কণ্ঠে কোন হার, যজ্ঞোপবীতও নাই। অভিনব কিন্তু তাঁর বসন পরিধানের ভঙ্গিটি। তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে ঊষা, তীর নিক্ষেপে উদ্যত। পদতলে সপ্তাশ্বের মূর্তি।

সমসাময়িক মুক্তেশ্বরের দাঁড়িয়ে আছে সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরটি মুক্তেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে। একটি পঞ্চরথ দেউল এই মন্দিরটি সঙ্গে নিয়ে আছে জগমোহন। সমৃদ্ধিশালী নয় এই মন্দিরের অঙ্গ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, দাঁড়িয়ে আছে নিরাভরণ হয়ে, বুকে নিয়ে ষোল ফুট উঁচু বিমান আর চাব্বিশ ফুট উঁচু জগমোহন।

উপনীত হন দেব দিবাকর মধ্যাহ্ন গগনে, তাঁর প্রখর কিরণে উদ্ভাসিত হয় চতুর্দিক, প্রজ্বলিত হয় দিগন্ত, উড়িষ্যার মহা অভিজ্ঞ স্থপতি আর ভাস্করকে প্রণতি জানিয়ে আমরা পাণ্ডার গৃহে ফিরে আসি।

"কোন হিন্দু যদি আধ্যাত্মিকতা-পরায়ণ না হয়, তবে তাকে আমি 'হিন্দু' বলতে নারাজ। অন্যান্য দেশে মানুষ রাজনীতিকে জীবনে প্রাধান্য দিতে পারে এবং রাজনীতির দাবি মেটাবার পর ধর্মকে জীবনে একটুখানি ঠাঁই দিতে পারে; কিন্তু এখানে—এই ভারতবর্ষের মাটিতে আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা—জীবনে অন্য সব জিনিসের স্থান তার পরে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

নগাধিরাজ হিমালয়-২

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ সঙ্কলিত

দেবাত্মা হিমালয় যেন রূপকথার বিচিত্র দেশ। তার শীর্ষে শীর্ষে সে কোন তুষারময় স্বপ্নপুরী। সমতল মানুষের কাছে—অত্যুচ্চ গিরিশিখরবাসীদের কথা জানার কৌতূহল যুগ যুগ থেকে জেগে রয়েছে! কৌতূহল আছে তার প্রকৃতির মধ্যে, তার লতা-পাতা, ফল-ফুল, নর-নারীর মধ্যে; কৌতূহল আছে তার পথঘাট, ঘর-বাড়ী, নদ-নদী, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির মধ্যে। সবই নতুন। সেই নতুনকে জানার জন্যে যুগে যুগে পর্যটকগণ শত শত বাধা-বিপত্তি বরণ করেছেন। কিন্তু বাঙালীর জীবনে এই অভিযান নতুন হলেও বিস্ময়কর নয়; প্রাচীন কালে যেমন এঁদেরই পূর্বপুরুষ দুর্লঙ্ঘ্য গিরি, হিমাদ্রির শতশত কন্দর, নিবিড় বনানী, শত শত উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্র অতিক্রম করে চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম, জাভা, সুমাত্রা, প্রভৃতি দেশে গমন করেছিলেন; বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্ত রক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কুমারজীব, ধর্মচীতি, তিব্বত চীন মধ্য এশিয়ায় ধর্ম কেতন উড্ডীন করেছিলেন, যেখানে ভারতের ধর্ম, জ্ঞান, সংস্কৃতি প্রচার করে বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তেমনি আবার বাঙালী অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত রাজের আমন্ত্রণে চির তুষরাবৃত দুর্গম তিব্বত দেশে গমন করে রাজগুরুর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। একথা এ যুগের বাঙালী ভুললেও, ইতিহাস তা আজও ভোলেনি—আপন বক্ষে সযত্নে এই দুর্গম পথের যাত্রিগণের অপূর্ব সাহস ও কীর্তিকথা ধারণ করে রয়েছে। এ যুগেই কল্যাণ সিংহ, হরিরাম, নৈনসিং এভারেষ্ট অভিযান করেন। নৈনসিং ১৮৭৩-৭৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম হিমালয় অভিযান করেন। মধ্য তিব্বতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে একটি হ্রদ আবিষ্কার করেন। পণ্ডিত কিষণ সিং ১৮৭৯—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার পর্যটক। মোল্লা আতা মুহম্মদ ১৮৭৮ সালে সিন্ধুনদ ও কিনথাপ ১৮৮৩—৮৪ সালে কাম্পিয়া উপত্যকার পথ ধরে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধানে সাফল্য অর্জন করেন। রাজা রামমোহন রায় ১৬ বছর বয়সে তিব্বতে গিয়েছিলেন—তা আজও গল্প-কথা। এঁরা শুধু অভিযান করেন নি—নানা দেশ, নানা জাতির, নানা তথ্যও আবিষ্কার করেন।

শরৎচন্দ্র দাস ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশ্রেণীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে গিয়ানলুর গ্রামের কাছে তাসিচোজিং মঠে ওঠেন। সেখান থেকে তিনি নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তবর্তী প্রায় ২০,০০০ ফুট উঁচু চাংথংলা গিরিসঙ্কটে জেমু নদীর মালভূমিতে উপনীত হন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—"কোন ইউরোপীয় বা ভারতীয় আজ পর্যন্ত রামথং বা চাংথংলা গিরিপথ অতিক্রম করার সৌভাগ্য অর্জন করেন নি।"

"২৭শে জুন (১৮৮২)—....আমরা এখন তুষার রাজ্যে। দক্ষিণে এবং বামে দুটি তুষার প্রবাহ এগিয়ে গেছে সমান্তরালে। সে দুটি প্রবাহের মাঝখান দিয়ে ওপর দিকে উঠতে হচ্ছে অতি ধীরে, সন্তর্পণে। কিছুক্ষণ পরে সেই গিরিশ্রেণী দিক পরিবর্তন করলে উত্তর থেকে উত্তর পশ্চিম অংশে। সামনে বাঁকের মুখে উপত্যকার ওপর কতকগুলি বিরাট বরফের স্তূপ—দূর থেকে ভ্রম হয় মন্দিরের চূড়া বলে। তাদের মধ্যে বড়টি অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুটের কম নয়। সমগ্র দৃশ্যটিও ঢেউ খেলানো সাদা যেন সাগর-লহরীর মত। তার ওপর দিয়ে চলেছি আমরা ক'জন। পথ আর ফুরোয় না। মাইলের পর মাইল। তিন মাইল অতিক্রম করার পর এলো অবসাদ। এলো ক্লান্তি। বাতাসের অস্বাভাবিক বিরলতায় আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। কষ্ট আরও বাড়তে লাগল যখন আমরা ১৯০০০ ফুটের ওপরেও উঠতে লাগলুম। বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। এর সঙ্গে চোখ-ঝলসানো তুষার আলো। সে আলো চোখের কি কষ্টদায়ক যে সবুজ চশমা পরেও তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়নি। আমার অবস্থা তো শোচনীয় কিন্তু লামার অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়, শুধু চোখের দিক থেকে নয় তার দৈহিক স্থূলত্বের জন্য। কি করবো তা ভেবে পাইনি, হতাশ হয়ে পড়লুম; আর আধঘণ্টা মৃতবৎ সেখানে পড়ে রইলুম। অবশেষে গিয়াৎসো আমাদের গাইড ফুরচুঙকে প্রচুর বখশিস দেওয়ার লোভ দেখালে যদি সে আমাকে পরবর্তী উপযুক্ত স্থানে কাঁধে করে নিয়ে পৌঁছে দিতে পারে। ফুরচুঙ রাজি হল। তার কাঁধে চড়ে আধ মাইল দূরে এক তুষার বিরল স্থানে পৌঁছলুম। তখন সন্ধ্যা ৭টা। একটা বরফের চাই-এর ওপর বসান একটা পাথর ছিল। গাইড বললে—রাত্রে বরফ গলবে না—সুতরাং আমরা নির্ভয়ে রাত কাটাতে পারি—কিন্তু জোর

হবার আগেই আমাদের বৈকুণ্ঠে হবে—সচেৎ বরফ গলে যাবার সম্ভাবনা আছে। আমরা সেই পাথরের ওপর কম্বল বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা করলুম। ক্লান্তিতে চোখ জুড়িয়ে এল। আগের দিন কিছু খাইনি তবুও তখন খাওয়ার প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিদ্রাদেবীর অঙ্কে শায়িত করলুম।

২৮শে জুন—তুষার সমুদ্র ভেদ করে আমরা সকালেই যাত্রা করলুম। কেবল বরফ আর পাথর। উদ্ভিদের কোন চিহ্ন নেই। যদি সবুজ গাছপালা দেখা যেত তবে আমাদের অবসাদগ্রস্ত চক্ষু হয়তো কিছুটা আরামের স্বাদ পেত—তাকে অভ্যর্থনা জানাতো। আরামহীন, আনন্দহীন হলো আমাদের এই যাত্রাপথ। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে লাগল আমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপে। পদযুগল একবার তুলছি—এগিয়ে যাচ্ছি, আবার তাকে সেই আলাকর বরফের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছি—প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। অসাড়, অনড় হয়ে পড়ছে পদযুগল। দেহও। গিয়া-ৎসোকে যেন বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি? আমার হাঁটু দুটো যে অবশ হয়ে যাচ্ছে—আমার পা দুটো যে অক্ষম হয়ে পড়ছে। আমি কি চা-থংলায় (চা-থংলার পূর্ব দিকে তুষার-পাহাড়, নাম তার জমসংলা বা মৃদসোদ-সান লা, এর অর্থ হচ্ছে গুপ্ত সম্পদের পথ। জমসংলার শেষ চূড়ার উচ্চতা হচ্ছে ২৪,৩৪০ ফুট) তুষারময় ঢালু পথ পর্যন্ত এগুতে পারব? আর পারি না—ঠিক সেই সময় আমার প্রিয় অনুচর ফুরচুঙ্গ এল আমার সাহায্যের জন্যে। তার বোঝাটি সে বরফের ওপর রেখে দিলে। তার লম্বা লাঠিটা খাড়া করে তার কোমর বেষ্টনীর সঙ্গে বাঁধলে। উদ্দেশ্য সেই তুষার পথে চলতে পিছলে না পড়ে। এই অবস্থায় আমাকে পিঠে তুলে নিলে। আমি তাকে আমার চশমাটা পরতে দিলুম। আমি তখন অসাড় নিস্পন্দভাবে তার পিঠে চড়লুম। চোখ বুজে রইলুম যতক্ষণ না চা-থংলার তলদেশ থেকে এক মাইল দূরে অপর একটি তুষার প্রান্তরে এসে পৌঁছলুম। এখানকার তাজা তুষার নয় ইঞ্চির বেশী নয়। আমি কোন রকমে অতি কষ্টে চলতে লাগলুম। আমাকে নামিয়ে রেখেই ফুরচুঙ্গ তার বোঝাটা ফিরিয়ে আনতে ছুটল, বোঝাটা ততক্ষণে তুষারে চাপা পড়ে গেছে; যে সূর্য দুপুরে আমাদের পীড়াদায়ক, সেই সূর্যের অবস্থিতি এখন পাহাড়ের পশ্চিম গগনে। পাহাড়ের ঢালু পথ দুরতিক্রম্য। কিন্তু তা পার হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আমি অতি কষ্টে এগুতে লাগলুম, পা পিছলে যেতে লাগল—কখনও কখনও গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে হল। ফুরচুঙ্গ তার কুরকী দিয়ে বরফ কেটে কেটে পা ফেলার পথ করতে লাগল—আর আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। তুষার বর্ষণের বেগ বেশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমাদের আশঙ্কা হল হয় তো আমাদের এখানেই জীবন্ত সমাধি হবে। শেষ প্রার্থনার সময় এগিয়ে এল—তবুও দেহটাকে কোন রকমে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। নেহাৎ পরমায়ু আছে। তাই অপ্রত্যাশিতভাবে একটা গুহার সন্ধান পেলুম। গত রাত্রে আমরা যেখানে বাস করেছি তার তুলনায় এ যেন স্বর্গ। রাতটা আরামে কাটাবার উদ্যোগ করছি এমন সময় গাইড জানালে—এর পর আমাদের প্রস্তুত হতে হবে সর্বাপেক্ষা কষ্টকর আর বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করার জন্যে। এই পথটুকু অতিক্রম করলে আমরা বাকী পথটুকু অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে যেতে পারব। এই অবস্থায় যদি আমরা বিখ্যাত চা-থংলা পার হয়ে তিব্বতে যেতুম—তাহলে এই ভয়ঙ্কর অন্ধকের জনহীন প্রান্তরের চিত্র, নিদারুণ আতঙ্ক, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু ভয়—আর বিশ্বাসঘাতক তুষার নদীর ফাটলের হাত থেকে রক্ষা পেতুম অথবা অনন্ত তুষার সাগরের মধ্যেই আমাদের যাত্রা পথের শেষ হত। তুষার আর বরফের ভয়ঙ্কর রাজ্যে প্রতি পদে আমাদের পদস্খলনের আতঙ্ক চোখে মুখে ফুটে উঠতে লাগল। এই আতঙ্কানুভবের মাঝেই আমরা আমাদের কম্বল বিছিয়ে শিথিল দেহকে শায়িত করলুম। গুহাটি বরফের চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা। ওপরের পাথরের ফাটল দিয়ে মাঝে মাঝে জলের ফোঁটা পড়ছে—তাতে আমাদের কাপড় পর্যন্ত ভিজে গেল। জল গরম হওয়া এখানে অসম্ভব, জ্বালানি কিছুই নেই। আর আমরা কোন কাজ করার সামর্থ্যও হারিয়েছি। ও জায়গাটা চাং-কে-কুং ও জোঙ্‌-ওগ থেকে অনেক ওপরে। চা-থংলা সম্ভবতঃ জোঙ্‌ থেকে ২০০০ ফুট উঁচু আর সমুদ্রতটরেখা থেকে ২০,০০০ ফুট ওপরে।

(শরৎচন্দ্র দাসের ইংরাজি ডায়েরী থেকে মৎকর্তৃক অনূদিত)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬ই জুন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিমলা হইতে আরো উত্তর দিকে উচ্চ উচ্চ পর্বতারোহণে গমন করেন। তাঁর বিবরণ:—"এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্বতশ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোন পর্বতে নিবিড় বন, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস স্থল। কোন পর্বতের আপাদমস্তক পক্ক গোধূম-ক্ষেত্র-দ্বারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। কোন পর্বত আপাদমস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ দ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোন পর্বত একেবারে তৃণ শূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রতি পর্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে। কাহাকেও শঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজভৃত্যের ন্যায় সর্বদাই সশঙ্কিত; একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। সূর্য অস্তমিত হইল। অন্ধকার ভুবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। তখনও আমি সেই পর্বত মূলে একাকী বসিয়া আছি। দূর হইতে পর্বতের স্থানে স্থানে কেবল প্রদীপের আলোক মনুষ্যবসতির পরিচয় দিতেছে।

······হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, "পর্বতো বহ্নিমান্", পর্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও ক্রমে তত ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নিবাণের ন্যায় নক্ষত্রবেগে শত-সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদীতীর পর্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষসকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদয় স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল এবং অন্ধতিমির সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে যে দেবতা অগ্নিতে, তাঁহার মহিমা অনুভব করতে লাগিলাম। আমি পূর্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধবৃক্ষ সকল দেখিয়াছি। এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্বতের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, উন্নতি, নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল। রাত্রিতে যখনই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে তখনই তাহার আলোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইতেছে এবং উৎসব-রজনীর প্রভাতকালের অবশিষ্ট দীপালোকের ন্যায়। মধ্যে মধ্যে সর্বভুক লোলুপ অগ্নিও ম্লান ও অবসন্ন হইয়া জ্বলিত রহিয়াছে।"—(হিমাচল-ভ্রমণ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"গিরিবক্ষ হতে আজি
ঘুচুক কুজ্ঝটি-আবরণ,
নূতন প্রভাতসূর্য
এনে দিক্ নবজাগরণ।
মৌন তার ভেঙে যাক,
জ্যোতির্ময় উর্ধ্বলোক হ'তে
বাণীর নির্ঝরধারা
প্রবাহিত হোক শতস্রোতে।"
—(রবীন্দ্রনাথ)

• • •

"পাষাণে পাষাণে তব
শিখরে শিখরে
লিখেছ, হে গিরিরাজ,
অজানা অক্ষরে
কত যুগ-যুগান্তের
প্রভাতে সন্ধ্যায়
ধরিত্রীর ইতিবৃত্ত
অনন্ত-অধ্যায়।
মহান সে গ্রন্থপত্র,
তারি এক দিকে
কেবল একটি ছত্রে
রাখিবে কি লিখে—
তব শৃঙ্গ শিলাতলে
দু' দিনের খেলা,
আমাদের ক'জনের
আনন্দের মেলা।"
—(রবীন্দ্রনাথ)

• • •

"হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা
স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রি-দিন,
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে
বাক্যহীন শুভ্রতায় লীন,
সে তুষারনির্ঝরিণী—
রবিকরস্পর্শে উচ্ছসিতা
দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে
অন্তহীন আনন্দের গীতা।"
—(রবীন্দ্রনাথ)

"কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছাড়াও হিমালয়ে শত সহস্র দেব-মন্দির বিদ্যমান। এদের অধিকাংশই প্রাচীন মহিমার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। আধুনিক কালের কোনও ধনপতি হিমালয়ের কোন গহনলোকে গিয়ে দেবস্থানের প্রতিষ্ঠা করেছেন, এ দৃশ্য চোখে পড়ে না। তবে ধর্মশালা ও মন্দির সংস্কারাদি কোথাও কোথাও দেখেছি বটে। সে যাই হোক হিমালয়ে হিন্দুতীর্থই আমরা জেনে এসেছি। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনদের তীর্থ মন্দিরও যে অগণ্য। এ কথাটিও মনে রাখা দরকার। খৃষ্টানদের কিছু কীর্তি নেই। তবে প্রায় প্রত্যেক পার্বত্য সহরে একটি অথবা একাধিক গির্জা বর্তমান। মসজিদের সংখ্যা পূর্ব-হিমালয়ে একেবারেই নগণ্য, তবে পশ্চিম হিমালয়ের দিকে কোথাও কোথাও চোখে পড়েছে। মন্দিরের পথ যত দুস্তর, ততই তার আকর্ষণ: মসজিদের পথ যত সুসাধ্য, ততই তার জনপ্রিয়তা। হিমালয়ে কোন দুর্গম অঞ্চলে একটিও মসজিদ নেই।...সমগ্র হিমালয়ের নানা অঞ্চলে বহু সহস্র প্রাচীন দেব-দেউল, মন্দির ও বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হিন্দুকুশে হিন্দুরাজ পর্বতমালায়, পীর পাঞ্জালের পশ্চিম অংশে—যে সমস্ত অঞ্চল আজ পাকিস্তান ও পাঠান মুলুকের অন্তর্গত—সেখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে শত শত দেবমন্দির, মঠ ও গুম্ফা এখনও বিদ্যমান। তারা সুপ্রাচীন অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি নানা ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। সেই আদি অন্তহীন গিরিশৃঙ্গ দলের আশে পাশে যুগ-যুগান্তকাল থেকে লক্ষ লক্ষ সংসারবিরাগী সাধু, সন্ন্যাসী, জীবন বৈরাগী, বাউল, তপস্বী, জ্ঞানপিপাসু, তীর্থবাসী, সত্যসন্ধানী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মানুষ আপন আপন শান্তিনীড় রচনা করে রয়েছে,—বিরাট বনস্পতির শাখা-প্রশাখায় কোটরে জঠরে যেমন বাসা বেঁধে থাকে ছোট ছোট পাখী। এই হিমালয়ের শৃঙ্গ বিজয় অভিযানে কতবার এসেছে পৃথিবীর কত শত অভিযানকারী। কত দিনের কত মৃত্যুবরণের পর গৌরীশৃঙ্গ বিজয়ে আজ তারা সাফল্য লাভ করেছে। এই হিমালয়ের অনাবিষ্কৃত ঔষধি বনে মৃতসঞ্জীবনী আবিষ্কার করা এই শতাব্দীতে সম্ভব—বহু বিজ্ঞানী একথা মনে করেন। বীরের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়। সন্ন্যাসীর একাগ্র তপশ্চর্যায়, তীর্থযাত্রীদলের পূজা-বন্দনায়, কবি, শিল্পী, দার্শনিকের সৌন্দর্য কল্পনায়—দেবতাত্মা হিমালয় মানুষের চিরবিস্ময়।"—(দেবতাত্মা হিমালয়—প্রবোধকুমার সান্যাল)

জগজ্জননীর জনক রূপে—

"ত্বরা কর গিরিবর, দিবাকরে কর মানা।
তাহার উদয়ে আমার উমাশশী রহিবে না!
তুমি তো অচলপতি   উদয়াচলের প্রতি
আজ্ঞা দেও যেন সম্প্রতি, দিনপতিকে ছাড়ে না।
তোমার শেখরোপরি,   জলধর আছে গিরি,
তারা যদি রহে ঘেরি, তা হলেও পূরে বাসনা।
আমি তো অবলা নারী,   বল কি করিতে পারি?
কর যাহে রহে গৌরী—গৌরী গেলে বাঁচিব না।

• •

অচলরাজ তাই সচল হয়ে, আপনি কৈলাসে গিয়ে
আনলে তোরে হিমালয়ে, তুষে মৃত্যু (কত করে) তুষে মৃত্যুঞ্জয় হে।"
—(মনোমোহন বসুর আগমনী গান)।

"সম্মুখে মম মহা মেঘ সম
উদিত রূপেশ্বর,
ব্রাহ্মী উষার জ্যোতিরম্বরে
প্রণমিছে অন্তর।
একি অনুভব, নব উৎসব,
অদ্ভুত, অতুলন!
মানব-ভাষার অভিধানে তার
নাহি কোন বিশেষণ!
শৃঙ্গের কোলে শৃঙ্গ-লহরী
মিলিয়াছে নীলিমায়,

কলহংসেরা মেলিয়াছে পাখা
মহাজল-পিপাসায়।
কোথায় সুদূর "চন্দ্রতীর্থে"
কোন সে পদ্মাকরে
যাত্রা করেছে দেব-যান পথে
দুর্গম সরোবরে ?
রজতোজ্জ্বল কিরীট পরিয়া
যেথা গিরীন্দ্র-শির
রক্ষণ করে অক্ষয় শিখা
দৈবত বহ্নির।
বিবস্বত মনুর তরণী
জলপ্লাবনে ভেসে
না জানি সে কোন 'নৌ-বন্ধন'
শৃঙ্গে লেগেছে এসে !
কবে পাতালের অগ্নি প্রবাহে
বিদীর্ণ হলো ভূমি,
এই হিমালয়-ভূধরের ভ্রূণ
উঠিল আকাশ চুমি !
নয়নে তাহার কাজল পরালো
ঘননীল অঞ্জন,—
নিমিষের তরে থেমে গেল বুঝি
ধরণীর ঘূর্ণন।
দোলে শঙ্কর, ডম্বরু-নাদে
বিষ্ণুপদীর বেণী :
শোনে কল্লোল দেবদারু-বীথি,
রুদ্রাক্ষেরি শ্রেণী।
স্বর্গ-মর্ত্য-পর্বত-দিক্
ব্যাপি সহস্র ক্রোশ
সুমেরু-শিখরে শোনা যায় এই
ভাগীরথী-নির্ঘোষ
শোভে সে 'বিশাল-বদরী' বৃক্ষ
মন্ত্রে বিজয় করি
আছে দাঁড়াইয়া কালের বক্ষে
শীর্ষ উর্দ্ধে ধরি।
দেখি দূরে 'নীলকণ্ঠ' শিলায়
আলিপনা দেয় মাগে,
জপমালা সম স্থূল বসুধারা
গলিত অঙ্গরাগে।—
হোথায় তাপসী উপবাস-কৃশা
উমা রে প্রদানি' বর
রাখী বন্ধনে গৃহী হইলেন
ভোল. শ্মশানেশ্বর।
দেবতারা এল বরযাত্রা সে
প্রমথ-নৃত্য-সাথে,
চন্দ্রভাস্বর আলোর নিশান
উড়ে নন্দীর হাতে।

শুভ লগ্নের সুর-মূর্ছনা
শ্রবণে পশিছে আজি।
লীলা-সুন্দর গৌরীর করে
কঙ্কণ উঠে বাজি।
হেথায় সপ্ত-সত্যের পথ
এই একপদী দিয়া
চলিয়া গিয়াছে পাণ্ডু-সুতেরা
বনবাস ব্রত নিয়া,
অঙ্কিত তাদের চরণ-চিহ্ন
দিগ্‌ভ্রম করে দূর,
জীবনে যাহারা রূপ দেখিয়াছে
প্রেম-ঘন বন্ধুর।
জানিত কি তারা আবার আসিতে
হবে এ গহন পথে।
মহাপ্রস্থান-শঙ্খ বাজিবে
মেঘের আড়াল হতে ?
মন্দাকিনীর কূলে-কূলে তারা
চলে যাবে সেই দেশে।
ইচ্ছা-মরণ, ইচ্ছা-জীবন
যুক্ত যেখানে এসে।
মর্ত্যবাসীর পরিকল্পনা
পায় না সে সন্ধান !
কোনখানে শেষ হয়েছে অশেষ,
অসীম, অ-পরিমাণ !
এই হৃষীকেশ, এ ধ্রুব তীর্থে
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
বেদ-পাঠে পদ-বিভাগ করেন,
এই সেই তপোবন।
রাবণ-বধের পাপ ক্ষয় করি
রামলক্ষ্মণ হেথা
শুধালেন পুনঃ যে কথা যমে রে
জিজ্ঞাসে 'নচিকেতা'।
সংহার যাঁর ক্রোধের উপমা
সেই দেবতারে ডেকে
জ্বালেন এ-পারে আরতির আলো
পারের প্রদীপ থেকে।
কালপুরুষের সাক্ষাতে হেথা
আত্মবিস্মৃতির
অবগুণ্ঠন করেন মোচন
ভব ত্রাণ রঘুবীর।
ভিখারীর ঝুলি, দাও ত্যাগ করি
চল রে বাউল মন।
অন্তর-গূঢ় বেদনা-জুড়ানো
ডাকেন মন্ত্র শোন্ ;
গলে নাম-রস বহ্নিচূর্ণ বমে
মাধব ঋষির মুখে

পাষাণের লোমহর্ষণ করে
বিশ্বাস ভরে বুকে।
নাহি আরম্ভ, শেষ নাহি যাঁর
তাঁহারই উদ্বোধনী।
অভয়ের মাঝে মিলাইয়া যায়
ভয়ের প্রতিধ্বনি।
স্মরণে যাঁহার জাগে যোগবল
ভাগে পাপ-মদাসুর,
করুণায় যাঁর ভূষ্ট র'ক্তেও
জনমে নবাঙ্কুর।
শুনি ভ্রমরের গুঞ্জন-স্বনে
স্পন্দিত সাম গান,
গঙ্গার জলে ঝঙ্কারি ওঠে
ব্রহ্মেরি সন্ধান।
হেরি যারি নয়, ধামা-অদ্রী বয়
চিন্ময় দেবতার,
এই রাম মঠে মন্দির ঘাটে
নাম তরী করে পার।
ভরিয়াছে ব্যোম 'হর হর বম্,'
'জয় তার-শঙ্কর',
'জয় সীতারাম,' 'জয় রাধাশ্যাম'
অভিন্ন হরি হর।
ডুব দে রে মন এই সনাতন,
ত্রিতাপ নাশন নীরে
ছাড়িনি যে শ্বাস, নাসাপুটে তোর—
নাই যদি আর ফিরে।
না করিস যেন কুঞ্জর-সম
ব্যর্থ অবগাহন,
তীরে উঠে হায় মাটি মেখে' গায়
আবার প্রক্ষালন।
থামে বরষের রথের চক্র,
অম্বুমন্ত্রণ শুনি,
পলকে পলকে প্রকাশে আকাশ
জ্বলে বিদ্যুৎ-ধুনী।
আর বেলা নাই চল্ একেলাই
মিলিবে রাতের ডেরা,
গণ-নারায়ণ-সেবার সদনে
ফেরে নাকো পথিকেরা।
ডাক দেন তোরে চিত্ত-নন্দন,
কেন মিছে সংশয়!
মিলিবে দোসর, সেই দেবে তোর
আপনার পরিচয়।
খণ্ডিত মাঝে হেরিবি বিরাট
পাবি অখণ্ড সুখ,
এক বিনা দুই দেখবি না দুই
মিটে যাবে শেষ দুখ।
নমঃ সহস্রশীর্ষ পুরুষ,
সর্ববিভূতিমান
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রের ধ্যেয়
অচিন্ত্য ভগবান্।
চির পুরাতন, নিত্য-নূতন
তুমি বর্ধন-কর
চিরসুন্দর, ক্রমসুন্দর,
নমি তোমা লীলাময়!
জীবলোকে তব অংশ প্রকাশ,
তুমি আদি নারায়ণ,
দাও ছিঁড়ে দাও মায়া মৃত্যুর
মহাপাশ-বন্ধন।
সম্মুখে তুমি, পশ্চাতে তুমি
অচিন্ত নানা নামে।
দিব্য অবাঙ্‌মনস গোচর,
তুমি হি প্রাণের গতি;
নমো যুগধারী, বিশ্বম্ভর,
ব্রহ্মাণ্ডেরি পতি।
জাগরণে তব জাগে এ জগৎ,
হে প্রভু জগজ্জ্যোতি,
কবে তব পদে স্থির হবে মম
চঞ্চলতম মতি?

—(হৃষীকেশ—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়)।

"…হিমালয় শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া একবার চতুর্দিক দেখিলাম। প্রকৃতির মনোহারিণী মূর্তি ত জীবনে কখন দেখি নাই! এখানে বৈশাখের মধ্যাহ্ন ভাস্করও হিমে মলিন হইয়া আছেন; তাঁহার প্রখর কিরণ নাই। আমরা মন্দাকিনীর তট দিয়া আবার নামিতেছি। উচ্চ পর্বত শিখর নির্ঝর ধারা পতিত হইয়া মন্দাকিনীতে মিলিত হইতেছে। সম্মুখবর্তী পথ তুষারাচ্ছন্ন ও চতুর্দিক হইতে একটা শুভ্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে। এ স্থানে একটিও কীট পতঙ্গ পক্ষীর সমাগম নাই! এ চির হিমানীমণ্ডিত হিমালয় যেন হিমমুকুট মস্তকে পরিয়া বসিয়াছেন। এ স্থানে অসীমের সহ সসীমের মিলন! অনন্ত শুভ্র আকাশ আর শুভ্র আকাশচুম্বী হিমালয়, যেন উভয় উভয়কে আলিঙ্গন করিয়াছেন। এ রমণীয় দৃশ্য বর্ণনার ভাষা নাই। তাব এখানে স্তব্ধ।

হিমগিরির সন্নিকট আসিয়া যেন যক্ষের সেই অলকাপুরী বলিয়াই মনে হইল: ঠিক যেন কুবেরের অলকাপুরীর মত শোভা সৌন্দর্য মনে হইল! বালসূর্যের কিরণ সম্পাতে হিমালয় শিখরের কি অপূর্ব শোভাই হইয়াছে—হিমগিরি যেন রজতগিরির ন্যায় হিরণ্ময় মুকুট পরিধান করিয়া সগর্বে দাঁড়াইয়া আছেন! সেই মহাকবির বাক্য স্মরণ হইল—

"অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতং।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥"

এই হিমালয় অনন্ত রত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াও ভয়ানক [illegible] সমান হিমতুষারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন অলকাপুরীর ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। নব রবিকর কিরণে গিরিশৃঙ্গ যেন তুষার ভবনের শোভাময় হইয়াছে আর গিরিসন্নিদেশে ধবলশুভ্র লঘু মেঘখণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে। একদা রামগিরির পাদমূলে বসিয়া বিরহ যক্ষ যে কুটজকুসুম গিরিমল্লিকায় অর্ঘ সাজাইয়া মেঘকে দূতরূপে পত্নীর সংবাদবাহক করিয়া পাঠাইয়াছিল তাহা বিচিত্র নহে।…এও মনে হইল এ সেই অলকাপুরী—তবে বিরহবিধুরা যক্ষপত্নীর সন্ধানটা লওয়া হইল না।…(হিমালয় পরিভ্রমণ—হেমমালা দেবী)।

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা

৫৬

'এখন বর্ষা', বললে রামানন্দ, 'এখন যাত্রা করলে পথে আপনার অসুবিধে হবে।'

'বিজয়া দশমী আসুক, তখন যাবেন।' বললে সার্বভৌম।

কেউই ছেড়ে দিতে চায় না।

'বেশ, শারদীয় উৎসবের নবমী রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করি।' রাজী হলেন গৌররায়।

বিজয়া দশমীতে যাত্রা করলেন। সঙ্গে মার জন্যে জগন্নাথের প্রসাদ নিলেন, নিলেন শুকনো প্রসাদী চন্দন আর পট্টডোরী। ওড়িয়া ভক্ত যারা তাঁর সঙ্গ নিয়েছে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠালেন। আর নিজ অন্তরঙ্গদের নিয়ে এলেন কটক পর্যন্ত। রামানন্দ এল পালকিতে চড়ে। তার এত হাঁটবার শক্তি কোথায়?

কটকে এসে নগরের বাইরে এক বকুল গাছের তলায় আসন পাতলেন প্রভু। রাজভবনে রামানন্দ খবর দিতে ছুটল।

রাজা প্রতাপ রুদ্র ব্যাকুল হয়ে এসে প্রণাম করল প্রভুকে। প্রভু তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিছুতেই গাছতলা ছাড়তে রাজি হলেন না। বললেন, 'আমার দুই আশ্রয় জননী আর জাহ্নবীকে দেখতে চলেছি গৌড়ে।'

রাজ্যের যে যে স্থান দিয়ে প্রভু যাবেন সে-সে স্থানের শাসকদের কাছে রাজা পত্র পাঠালেন, 'প্রভুর জন্যে নতুন আবাস তৈরি করবে আর সে সব আবাস প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে পূর্ণ করে রাখবে। তোমরা নিজেরা সব তদারক করবে আর রাত্রিদিন প্রভুর সেবায় তৎপর থাকবে। দুই মহাপাত্র হরিচন্দন আর মর্দরাজকে, নতুন নৌকো মজুত রাখো, স্নানান্তে ঐ নৌকোতে প্রভু নদী পার হবেন। আর যেখানে প্রভু স্নান করবেন সেখানে স্তম্ভ পুঁতে রাখো, সে মহাতীর্থে আমি নিত্যস্নান করব।'

প্রভুর পথ রাজার আদেশে সুসজ্জিত করা হল। দু'পাশে লোক দাঁড়িয়ে গেল সার বেঁধে। রাজ-পরিবারের মেয়েরা হাতীর উপর তাঁবু খাটিয়ে বসল। প্রভুকে দেখে প্রণামের ঢেউ পড়ে গেল। শুধু প্রণামময় নয় প্রেমময় হয়ে উঠল সকলে।

'প্রভুর দর্শনে সভে হৈলা প্রেমময়।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ কহে, নেত্র অশ্রু-বরিষয়॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণ-প্রেমা হয় যার দূর দরশনে॥'

রামানন্দ আর দুই মহাপাত্র সঙ্গে চলল। আর চলল মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর হরিদাস—আরো অনেকে।

কিন্তু গদাধরের কী হল?

গদাধরও সঙ্গী হতে চেয়েছিল।

প্রভু বললেন, 'তুমি তোমার ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়বে কী করে? তুমি নীলাচলে ফিরে যাও।'

গদাধরের সঙ্কল্প ছিল যাবজ্জীবন শ্রীক্ষেত্রেই বাস করবে। তাই তার অন্যত্র গমন নিষিদ্ধ। সে কথাই মনে করিয়ে দিলেন প্রভু।

গদাধর বললে, 'যেখানে তুমি সেখানেই নীলাচল। তোমার কাছে থাকলেই আমার ক্ষেত্রসন্ন্যাস। অন্য ক্ষেত্রসন্ন্যাসে আমার দরকার নেই।'

'না, তা কেন? তুমি গোপীনাথের সেবা করো।'

'তোমার চরণ দর্শনেই আমার কোটি বিগ্রহ সেবার ফল।' গোপীনাথ পা বাড়াল।

প্রভু বললেন, 'আমার জন্যে গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করে গেলে আমারই অপরাধ হবে। বরং আমার সন্তোষই যখন তুমি চাও, আমি বলছি, তুমি এখানে, শ্রীক্ষেত্রে থেকেই গোপীনাথের সেবা করো।'

গদাধরও নাছোড়বান্দা। 'বেশ, তোমার সঙ্গে যাব না, আমি একা-একা যাব। তাহলে কোনো অপরাধ লাগবে না তোমাকে। যত অপরাধ সমস্ত আমার।'

'কিন্তু যাচ্ছ তো আমার জন্যে।'

'কে বললে? আমি যাচ্ছি আমার শচীমাতাকে দেখতে। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সব দায় আমার, আমার একলার।'

একা একা চলতে লাগলেন গদাধর। দল ছাড়া, সেবা ছাড়া, দর্শন ছাড়া।

কটকে পৌঁছে প্রভু শুনলেন গদাধরও চলে এসেছে ভিন্ন পথে। বললেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।'

গদাধর কাছে এলে প্রভু বললেন, 'তুমি যখন কটক পর্যন্ত এসেছ, তোমার দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে। এক উদ্দেশ্য ক্ষেত্র ত্যাগ আরেক উদ্দেশ্য সেবা ত্যাগ। তুমি নীলাচলও ছেড়েছ, গোপীনাথেরও সেবা করছ না। তোমার দুই ধর্মই গেছে।'

'সব যাক, তুমি থাকো।' বললে গদাধর।

প্রভু বললেন, 'তা মানেই তুমি শুধু নিজের সুখ চাও, আমার সুখ চাও না। তোমার যে দুই ধর্মই গেল তাতে আমার দুঃখের পরিমাপ কে করবে? যদি আমার সুখ চাও, তা হলে ফিরে যাও নীলাচল।' বলে আর বাক্যব্যয় না করে নৌকোতে উঠে বসলেন। 'আমার দিব্যি যদি আর কিছু বলো—'

গদাধর নদীতটে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

নৌকো থেকে প্রভু সার্বভৌমকে বললেন, 'ওকে নিয়ে যাও স্বক্ষেত্রে—শ্রীক্ষেত্রে।'

সার্বভৌম বললে, 'ওঠো। এই প্রভুর লীলা। ভক্তকৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখতে কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন।'

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে অস্ত্র ধরবেন না। আর ভীষ্মও প্রতিজ্ঞা করেছিল, অস্ত্র ধরাব কৃষ্ণকে। ভীষ্মের শরজালে অর্জুন আচ্ছন্ন হয়ে গেল, অর্জুনের আর পরিত্রাণের পথ রইল না। তখন কৃষ্ণ রথচক্র নিয়ে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হলেন। ভক্তের প্রতিজ্ঞা রাখবার জন্যে ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন।

আমার কাছে গদাধরের বিচ্ছেদ ক্লেশ অসহ্য হোক, তবু গদাধরের প্রতিজ্ঞা আমি রাখব।

যাজপুরে এসে প্রভু মর্দরাজ আর হরিচন্দনকে বিদায় দিলেন। রেমুণায় পৌঁছে রামানন্দকে বললেন, 'তুমি এবার ফিরে যাও।'

রামানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়ল। প্রভু তাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে বসলেন।

ক্রমে ক্রমে উড়িষ্যার সীমান্তে এসে উপনীত হলেন প্রভু। নদীর পরপারেই যবনরাজার অধিকার। অধিকার পিছল্দা গ্রাম পর্যন্ত।

এ প্রান্তের রাজকর্মচারীরা বললে, যবনরাজ যেমন মদ্যপ তেমনি অত্যাচারী। তার ভয়ে নদী কেউ পার হতে চায় না, পার হওয়া মানেই তার খপ্পরে গিয়ে পড়া। তবে আপনি কত দিন এখানে অপেক্ষা করুন, আমরা অপর প্রান্তের সঙ্গে কথা বলে দেখি কিছু সুবন্দোবস্ত করতে পারি কি না।

যবনরাজের এক হিন্দু চর গোপনে সব খোঁজ-খবর নিল। তারপর তার মুসলমান প্রভুকে গেল বিবরণ দিতে।

'এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী দেখে এলাম। তার সঙ্গে আরো অনেক সাধুলোক। তারা নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন করছে, নাচছে গাইছে কাঁদছে। লক্ষ লক্ষ লোক দেখতে আসছে সন্ন্যাসীকে। দেখে আর চাইছে না ফিরে যেতে। প্রেমোন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণনামে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে শুনলে বিশ্বাস হত না কিন্তু স্বচক্ষে দেখে মনে হচ্ছে এ বুঝি স্বয়ং ঈশ্বর।' বলে সেই চর নিজের থেকেই 'হরিকৃষ্ণ' বলতে লাগল। সুরু করল হাসতে, কাঁদতে, নৃত্য করতে।

নবাবের মন অন্য রকম হতে চাইল। বিশ্বস্ত এক কর্মচারীকে বললে, 'তুমি গিয়ে দেখে এস।'

সে কর্মচারীরও একই দশা। তার মুখেও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধিকে বললে, 'আমার রাজা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন না, যুদ্ধ-ভয় নেই, সন্ধি করবার জন্যেই তিনি উৎসুক। যদি অনুমতি করেন তিনি নিজে এসে পার করে নিয়ে যাবেন প্রভুকে।

উড়িষ্যার প্রতিনিধিরা তো হতবাক। দুর্মদের এই মতি পরিবর্তনের হেতু কী?

বললে, 'তাঁর ভাগ্য, তিনি নিজে এসে দর্শন করবেন প্রভুকে। যদি নিরস্ত্র হয়ে আসেন, পাঁচ সাত জনের মত ভৃত্য শুধু সঙ্গে আনেন, তবেই বিশ্বাস করা যাবে।'

তাই হবে।

হিন্দুবেশ পরে নবাব চলে এল এপার। দূর থেকে প্রভুকে দেখে সেই নবাব আভূমি প্রণাম করল।

প্রভু তাকে প্রভূত সম্মান করে বসালেন। করজোড়ে নবাব বললে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ।'

মর্দরাজ বিস্ময় মানল। কিন্তু বিস্ময়ের কী আছে? যাঁর নাম শুনলে চণ্ডাল পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায় তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করে নবাবের যে এই দশা হবে তাই তো স্বাভাবিক।

'চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনামশ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥
ইহার যে এই গতি, কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয়॥'

নবাব বললে, 'আমি প্রভুকে নদী পার করে দেবার ব্যবস্থা করছি। দশ নৌকো সৈন্য দিচ্ছি সঙ্গে, কোনো জলদস্যুই পারবে না এগুতে।'

দুই নদী মন্ত্রেশ্বর পার হয়ে গেলেন প্রভু। নবাব তাঁকে এগিয়ে দিল পিছলদা পর্যন্ত।

নৌকোযোগে একেবারে পানিহাটিতে এসে পৌঁছলেন প্রভু।

রাঘব পণ্ডিত এসে প্রভুকে তার ঘরে নিয়ে গেল। পথে সে কী জনতা! এ কে এল আবার বাঙলা দেশে!

রাঘবের ঘরের রান্না কী পরিপাটি! যা রাঁধে তাই অনির্বাচ্য সুস্বাদু। প্রভু বললেন, 'রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী।' 'প্রভু বলে রাঘবের কি সুন্দর পাক। এমত কোথাও আমি নাহি খাই লাক।'

দয়াল নিতাই আচণ্ডালে ভগবদভক্তি আর হরিনাম বিতরণ করে সমগ্র বাঙলা দেশ মাতিয়ে দিয়েছে। রাঘবের ঘরে কত বার এসে উঠেছে। একবার তো অকাল কাশ্মীর বৃক্ষে কদম্বফুল ফোটাল।

'তুমি নিত্যানন্দকে সেবা করো, তোমার মত ভাগ্যবান কে।' বললেন প্রভু, 'তোমাকে বলি এক গোপন কথা। নিত্যানন্দ ছাড়া আমার দ্বিতীয় কেউ নেই। যেই আমি সেই নিত্যানন্দ।' 'আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দদ্বারে।' 'মহাযোগেশ্বরের যাহা পাইতে দুর্লভ। নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ॥'

মকরধ্বজকর এল। 'তুমি তো রাঘবেরই শিষ্য। তুমি শুধু রাঘবেরি সেবা করো। রাঘবের প্রতি তোমার যে প্রীতি জানবে তা আমারই প্রতি প্রীতি।'

নিত্যানন্দ সঙ্গী গদাধর দাস এল। এল পুরন্দর পণ্ডিত। পরমেশ্বর দাস। রঘুনাথ বৈদ্য। প্রভু বললেন, 'গঙ্গা স্নান করলে যেমন সন্তোষ হয় সেই সন্তোষ রাঘবের আলয়ে।' 'পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া।'

এর পরে প্রভু গেলেন কুমারহট্টে, শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে। ঘরে বসে যে কৃষ্ণধ্যান করছে শ্রীবাস, আচম্বিতে সেই ধ্যানফল সামনে প্রকাশিত হল।

প্রভু বললেন, 'তুমি তো অর্থাগমের কোনোই চেষ্টা কর না। বাড়ি থেকেও যাও না কোথাও। কি করে চলবে তবে?'

'কোথাও যেতে আমার মন ওঠে না।' শ্রীবাস বললে হাসি মুখে।

'কিন্তু কত বড় তোমার পরিবার। কী করে চালাবে?'

'চালাবার যিনি চালাবেন। যার যেমন অদৃষ্ট তেমনি তার ফলভোগ।'

'তা হলে তুমি সন্ন্যাসী হয়ে যাও।'

'অসম্ভব। ও আমার আসবে না।' হাসল শ্রীবাস।

'বা, সে কী কথা? সন্ন্যাসও নেবে না, কারু ঘরে ভিক্ষে করবে না,' রুষ্ট হবার ভাব করলেন প্রভু, 'তা'হলে তোমার পরিবারের ভরণ-পোষণ হবে কী করে? উদ্যমহীনের মত বসে থাকলে চলে কার? যদি ধরো, কিছুই তোমার না জোটে, তা'হলে তুমি কী করবে? কী করতে পারো তুমি?'

শ্রীবাস হাসতে-হাসতে তিন বার হাততালি দিল। বললে, 'এক-দুই-তিন।'

'তার মানে?'

'তার মানে এক, দুই, তিন,—তিন দিন উপোস করব। তৃতীয় দিনেও যদি অন্ন না জোটে গলায় ঘট বেঁধে গঙ্গায় গিয়ে ডুবব। অন্ন না থাক, জলের তো অভাব হবে না।'

প্রভু হঠাৎ হুঙ্কার করে উঠলেন: 'যারা সর্বতে'

ভাবে আমারই চিন্তা করে, যারা সর্ব প্রকারে আমাতেই আসক্ত, তাদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি। দুয়ারে আমিই নিয়ে আসি সর্বসিদ্ধি।'

'যে যে জন চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভক্ষ্য দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে, নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্বসিদ্ধি মিলে তারে॥
সুখে শ্রীনিবাস তুমি বসি থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥'

'শোনো, বলি।' বললেন আবার প্রভু, 'কদাচিৎ যদি লক্ষ্মীও ভিক্ষে করেন তো করবেন, তুমি করবে না। তোমার ঘর পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে।' 'যদি কদাচিত বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে। তথাপি দারিদ্র্য নাহিক তোর ঘরে॥'

শ্রীবাসের ছোট ভাই রামাইকে ডাকলেন প্রভু। বললেন, 'বড় ভাইকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা করবে। এ সেবা কোনোদিন ছাড়বে না। আরেক কথা বলে যাই,' তাকালেন শ্রীবাসের দিকে: 'তোমার আর অদ্বৈতের দেহে জরা প্রবেশ করবে না।'

সেখান থেকে গেলেন শিবানন্দ সেনের বাড়িতে। সেখানে এক রাত্রি বাস করে গেলেন বাসুদেব দত্তের গৃহে। এ বাসুদেবই তো জীবলোকের সমস্ত পাপভার নিজে নিতে চেয়েছিলেন। আমার নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ হয় তো হোক, আর সকলে মুক্তি পাক।

চৈতন্যমত্ত বাসুদেবকে আলিঙ্গন করে প্রভু কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমি বাসুদেবের। আমার এ শরীর বাসুদেবের। বাসুদেব আমাকে যেখানে বেচে আমি সেইখানে বিকোই। বাসুদেবের বাতাস যার গায়ে লেগেছে তাকে কৃষ্ণ সর্বদা রক্ষা করেন।'

সেখান থেকে গেলেন সার্বভৌমের ভাই বিদ্যাবাচস্পতি মশায়ের বাড়িতে। বললেন, 'আমাকে গঙ্গাস্নান করাও। আর তুমিও এই জল-ব্রহ্মের সেবা কোরো।'

তাই হবে। কিন্তু এই জনঘট্ট সামলাই কী করে? সমস্ত অরণ্য যে লোকপদপাতে পথ হয়ে গেল। লক্ষ কণ্ঠে উঠল হরিধ্বনি।

প্রভুকে বাচস্পতি প্রচ্ছন্ন করে রাখল।

'তোমার ঘরে ভগবান শ্রীচৈতন্য এসেছেন, কেন তাঁকে গোপন করে রাখছ? তুমি মহা ভাগ্যবান, তাতে সন্দেহ কী, আর আমরা ভবকূপে পতিত পাপিষ্ঠ, কিন্তু আমাদের উদ্ধার করবেন বলেই তো তিনি তারক-কারক, আমরা পতিত বলেই তো তিনি পতিতপাবন।'

কতক্ষণ বদ্ধ করে রাখবে বাচস্পতি। করুণার সাগর গৌরসুন্দর নিজেই প্রকাশিত হলেন। হরিধ্বনি শুনে কে থাকতে পারে নিশ্চল হয়ে।

'হরি।' বলে সিংহনাদ করে উঠলেন প্রভু। আজানুলম্বিত দুই বাহু তুলে দিলেন উর্ধ্বে।

'আমাদের, পাপিষ্ঠদের ত্রাণ করুন।'

প্রভু বললেন, 'তোমাদের কৃষ্ণে মতি হোক।'

'বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ॥'

কিন্তু এ কী ব্যাপার? কেউ যে ঘরে ফিরে যেতে চায় না। এই মুখ ছেড়ে আর কী দেখব। এই পদদ্বয় ছাড়া কোথায় আর আশ্রয় আছে।

প্রভু নিজেই লুকিয়ে চলে গেলেন কুলিয়া। বাচস্পতিকেও জানালেন না।

বাচস্পতি ঘরে এসে দেখল, প্রভু নেই। ছলনা করে চলে গিয়েছেন গোপনে। উর্ধ্বমুখ হয়ে কাঁদতে বসল।

কিন্তু জনতা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। বলাবলি করতে লাগল, প্রভুকে ভিতরে লুকিয়ে রেখে বাচস্পতি বাইরে বিচ্ছেদের অভিনয় করছে। শুধু নিজেই আনন্দ লুটবে। আমাদের ছিটেফোঁটাও দেবে না। আমরা যদি উদ্ধার পাই, তা'হলে যেন ওঁর বিষম আপত্তি। প্রভু কি ওঁর একলার সম্পত্তি? এই মধুরের হিমালয় কি ওঁর একার প্রাপ্য, একার ভোগ্য?'

একে তো প্রভুর বিরহে ক্লেশ, তার উপরে এই দুর্বাক্য?

এমন সময় একজন এসে খবর দিল প্রভু কুলিয়ায়, মাধব দাসের বাড়িতে।

জনস্রোত ছুটল সেদিকে। গঙ্গার উপরে হাজার-হাজার নৌকো ভাসল। কে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করে, হাজার হাজার লোক ভেসে পড়ল জলে। সবাই পার হল, যে ডুবল সেও চৈতন্য কৃপায় পায়ে মাটি পেল। উত্তীর্ণ হতে পারল না বা দুর্ঘটনা ঘটল এমন কিছুই হল না। সব সুগম-সহজ হয়ে গেল।

'যে প্রভুর নামগুণ সকৃত যে গায়।
সে সংসার-অব্ধি তরে বৎসপদ প্রায়॥'

মাধব দাসের অঙ্গন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। দেখল সঙ্কীর্তনানন্দবিহ্বল গৌরসুন্দর নাচছেন। সুখ সিন্ধুতে ভাসতে লাগল সকলে। যারা আগে নাস্তিক ছিল তারাও প্রেমরসে বিগলিত হল। সকলের চিত্তবৃত্তি সুখময় হয়ে উঠল।

এক ব্রাহ্মণ এসে বললে, 'প্রভু আগে আগে ভক্তিবাদকে বহু নিন্দা করেছি। ব্যঙ্গ করে বলেছি, কলি যুগে কিসের বৈষ্ণব, কিসের কীর্তন। এখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি। তুমি তো সংসার-উদ্ধার-সিংহ, তুমি বলে দাও কেমন করে আমার এ পাপের খণ্ডন হবে।'

প্রভু বললেন, 'যে মুখে বিষ খাই সে মুখেই যদি আবার অমৃত খাই, তা হলে বিষও জীর্ণ হয়ে যায়। যে মুখে আগে নিন্দা করেছ সেই মুখে এখন অভিনন্দন করো, কৃষ্ণ-যশে সমস্ত নিন্দা-বিষ নষ্ট হয়ে যাবে।'

'যে মুখে করিলে তুমি বৈষ্ণবনিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণববন্দন॥'

ভক্তিতেই সর্বপাপের বিমোচন।

কুলিয়ার অপর পারেই নবদ্বীপ। নবদ্বীপ থেকেও জনসংঘট্টের অন্ত নেই।

গঙ্গাস্নানে এসেছেন শচীমাতা। সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া। পারাপারের জন্যে এত লোকের সমাগম কেন? কেন এত কোলাহল? এই হুলুস্থুল।

'মাধব দাসের বাড়িতে কে এক সন্ন্যাসী এসেছে, দেখতে চলেছি।' বললে কেউ-কেউ।

ভিড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বড় বড় বাঁশ কেটে গড় তৈরি করেছিল মাধব। সে বাঁশগড় একদিনেই চূর্ণ হয়ে গেছে। কারু সাধ্যি নেই সেই লোকঘটা নিবারণ করে। [ক্রমশঃ।

শেষে

শ্রীরাজীবকৃষ্ণ বিশ্বাস

জর্জরিতা ধরিত্রী আজ মত্ত পদভারে
কেঁপে ওঠে বারে বারে
ছন্দহীন কাতর আর্তনাদে।
আতপ্ত বক্ষাধারে অকুণ্ঠ অপরাধে
উদ্বেল নির্বাক অন্ধকার
ঢাকে চারিধার
বিকীর্ণ হিংসায়।
শ্মশানের দামামা বাজায়
সহস্র পাশব অনুচর।
দিগ্‌বধূর শুষ্ক অধর রবহীন
কাঁপে থর, থর।
বনস্পতির অতল গহ্বরে,
উন্মত্ত ঝড়ে
নগ্ন ষড়যন্ত্র যত জমে থরে, থরে,
অচীন কুটিল ইঙ্গিতে।
অন্তরের গভীর সঙ্গীতে
নিত্যদিনের সুর
বহুযুগের পারে, দিগন্তের শেষে
ত্রস্তপায়ে এসে
রয়েছে তেমনি সজল মধুর।
কেশর স্ফীত ক্ষিপ্ত সিংহের মত
গহন কালো মেঘে
ধূমকেতুর প্রবল বেগে
কল্পনীল বিস্তীর্ণ বক্ষ ছায় অবিরত।

জোনাকির কম্পিত শিখাগুলি
আত্মজ্ঞান ভুলি
মগ্ন অনুক্ষণ করুণ উপাসনায়।
সহস্র সর্পিল বাসনায়
লাস্যময় গূঢ় অট্টহাসি
ঝলকে ঝলকে ছুটে আসি
প্লাবিত করে সমস্ত হৃদয়।

চিরকালের যে নিত্য, যে নিরত্যয়
তারও বুকে বুঝি শঙ্কা
তালে তালে ওঠে নামে।
বাজে অহরহ প্রকৃষ্ট ইচ্ছের ডঙ্কা
যখন তমিস্রার নৈঃশব্দ জাগে।

প্রান্তে প্রান্তে রেশ লাগে
দুরন্ত স্রোতে,
আড়ালের ছিদ্রপথ হতে
প্রসারিয়া।
তবু তারি মাঝে মুখরিত হিয়া
গেছে বেঁকে, যেন বক্র পথ
প্রহেলিকায় অন্তরালে সত্যশিখাবৎ;

উত্তুঙ্গ অসীম প্রাঙ্গণে—
যেথা গেছে থেমে অজস্র প্রাণের শ্বাস
মহামৌন ঔদার্যে জীবন যাপনে॥

অধর-মধু

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ 'অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী'র উক্তি :

'কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল ভূজে তোমা বাঁধি', গুণনিধি !
রসিক নাগর তুমি ; ....'

এই অধর-মধুর জয়গান গেয়েছেন কবি বিদ্যাপতি :

'করে কুচ ঝাঁপয় অধর-মধু পান ।
বদনে বদন দয় বধয় পরান ।'
...   .
'নিরসি অধর মধু পিবি মাতোয়ার ।
ভুখিল ভমর কুসুম অনিবার ।'
...   .
'সহজহি সুপুরুখ ভমরা ।
মুখ কমলমধু পিয়ব হমরা ।
তৈখনে হরব মোর গেয়ানে ।'

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র-এর বর্ণনায় :

'থ'র থর ধনী আবেশে কাঁপে ।
অধীরা হইয়া অধর চাপে ।।
ঝরঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম ।
কোথায় বসন ভূষণ দাম ।।
তনু লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে ।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে ।।
অটল আছিল টলিল রসে ।
অবশ হইয়া পড়ে অলসে ।।
পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর ।
আহা মরি বলি চুম্বে অধর ।।
অবশ দু'হে মুখমধু খেয়ে ।
উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে ।।'

'বিদ্যা হ'য়ে আনন্দিত,   উর্দ্ধে বাহু প্রসারিত,
প্রেম ভ'রে দিলে আলিঙ্গন ।।
আমি আনন্দেতে বসি'   ধ'রে তার মুখশশি,
চুম্বন করিতে বারে বার ।
তবে হ'য়ে জ্ঞান হত,   সুবদনে দন্ত ক্ষত,
ওষ্ঠ দেশে চিহ্ন হৈল তার ।।'

এই অধর-মধু যুগে যুগে নবীন প্রেমিক-প্রেমিকা, বর-বধূকে করেছে লীলা-চঞ্চল, কবিকে করেছে উচ্ছ্বসিত, বিজ্ঞানীকে করেছে বিশ্লেষণ-পরায়ণ, ন্যায়নীতিপরায়ণ, আইনজ্ঞকে করেছে বাঙ্‌মুখর । 'তোমার অধরে থাক্ শান্ত হ'য়ে সারা নিশি আমার এ দুরন্ত পরান !' বলেছেন ওমর-খৈয়াম । আর এক জায়গায় তিনি বলছেন :

'বুকের ধনে জড়িয়ে বুকে
ভাবনা ভোলো নিবিড় সুখে,
চুম্বনে ত'র অধর পুটে
অমৃত-স্বাদ উঠবে ফুটে ;
ন্যায়ের বাঁধন যুক্তি-ডোর,
ছিন্ন ক'রে হওগো ভোর—
ভালবাসার স্নিগ্ধ সুরে !'
...   .
'এই যে আদর, এই যে সোহাগ,
অযাচিত পাচ্ছি তোমার,
অমর-করা এই যে চুমা—
তুলনা এর কোথায় গো আর ?'
...   .
'কে তোমারে আনলো সখি
আমার পাশে কাল্‌কে রাতে,
কে সরালো ঘোমটা তোমার
সুধার লোভে অধর পাতে ?'

'হৃদয় আজি উচ্ছ্বসিত
তোমার প্রেমে—হে প্রিয়তম,
তোমার অধর স্পর্শ করি'
ধন্য হল অধর মম !'
(ওমর খৈয়াম : অনুবাদ : নরেন্দ্র দেব)

অন্য কবিরা যাকে বলছেন সুধা বা মধু কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাকে বলছেন, বিত্ত :

'কে গো তুমি গাও গান
হে কিশোর চিত্ত !
তোমারে করিব দান
চুম্বন-বিত্ত ।' (বিদ্যুৎপর্ণা)

কবি হাফেজ-এর আকুলতা :

'শর্করা মিঠা আমারে ব'লো না, প্রিয়া ! আমি তাহা জানি,
তবু সবচেয়ে ভালবাসি ওই মধুর অধরখানি ।'
(প্রিয়া যবে পাশে : অনুবাদ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

অনামা-র উদ্দেশ্যে কবি নজরুলের অনুভূতিময় ব্যঞ্জনা :

'তোমারে যে ক'রেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে
প্রকাশ গোপন ।
যে কেহ প্রিয়ারে তার চুম্বিয়াছে ঘুম-ভাঙা রাতে,
রাত্রি-জাগা তন্দ্রা-লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে,
সকলের সাথে আমি চুমিয়াছি তোমা'
সকলের ঠোঁটে যেন, হে নিখিল-প্রিয়া প্রিয়তমা' (অনামিকা)

তেমনি রবীন্দ্রনাথ আকুলতা জানিয়েছেন মানস-সুন্দরীকে :

'............অয়ি প্রিয়া
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন একা ....' (মানস-সুন্দরী)

আবার 'স্বর্গ হইতে বিদায়'-এর ক্ষণে মর্ত্যভূমির আকর্ষণে তাঁর মন আবিল হ'য়ে ওঠে :

'.....যবে কোনো অর্দ্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি' নির্ম্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি,
গ্রন্থি সরমের ;—মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি' উঠি' গাঢ় আলিঙ্গনে,
লতাইবে বক্ষে মোর—'

এই সুধা, এই মধু সযতনে নিভৃতে সঞ্চয় ক'রে রাখবার :

'.....তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগ সুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর ?.....
তব স্পর্শ, তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব্বদেহমন
পূর্ণ করি'.....' (রবীন্দ্রনাথ : প্রেমের অভিষেক)

কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর ভাষায় এই সুধাই সংসারের সার :

'Brightest truth, purest trust in the universe—
all were for me
In the kiss of one girl (Robert Browning : Summum Bonum)

আলফ্রেড টেনিসনের কবিত্বময় অনুভূতিতে পাই এরই প্রতিধ্বনি :

'A man had given all other bliss,
And all his worldly worth for this,
To waste his whole heart in one kiss
Upon her perfect lips,'

অদ্ভুত বিচিত্র কথা বলেছেন জেমস্ টমসন :

'Singing is sweet, but be sure of this,
Lips only sing, when they cannot kiss.'
(James Thompson : Art)

এই রকম অভিনব প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই আর একজন কবির—তিনি অস্কার ওয়াইল্ড। তাঁর জীবন-দর্শনে পাই :

'Yet each man kills the thing he loves,
By each let it be heard,
Some do it with a bitter look,
Some with a flattering word.
The coward does it with a kiss,
The brave man with a sword !'
(Oscar Wilde : The ballad of Reading Gaol)

এই সোহাগ-সুধা পানে অমৃত আছে না হলাহল ? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এতে আছে অমৃতের আস্বাদ :

'দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও !—মৃণাল-পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি' উঠে মর্ম্মান্ত হরষে,—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধতনু মরি' যায় অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে !...(মানস-সুন্দরী)

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বর্ণনা ভিন্ন রকম :

'নয়ন অধর কর জঘন চরণ ।
দুহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন ।' (বিদ্যাসুন্দর)

কবি আলফ্রেড টেনিসনের কবিত্বকে উদ্বেলিত করেছে এই সুধা-প্রসঙ্গ :

'O love, O fire ! Once he drew
With one long kiss my whole soul through
My lips, as sunlight drinketh dew.'
(Alfred Tennyson : Fatima)

ফরাসী কবি তেয়োফিল গোতিয়ে বললেন :

'চুমার চাপে যে দুখ গেছে মরি,'—
অস্ত-সুখের শেষ নিশ্বাসে ভরি'—
প্রসাদপবন মোদের হবে সে ;
(সাগরে প্রেম : অনুবাদ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

আর একজন কবির কল্পনায় :

'প্রাণের স্পন্দ তনুর ছন্দ ভরবে আমার মন
সেই আনন্দে খেলব গো বিদ্যুৎ

হঠাৎ তারে চমকে দেবো—দেবো গো চুম্বন
উঠবে হেসে জোনাক পোকার যূথ।'

(এমিল ভ্যারহায়রেন : যখন লোকে প্রদীপ জ্বালে : : অনুবাদ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

'As sunlight drinketh dew'—টেনিসনের কবি-দৃষ্টি প্রকৃতির মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছে। এমনিভাবে আরও বহু কবির কল্পনাকে নাড়া দিয়েছে প্রকৃতির মধ্যে এই অপূর্ব্ব সোহাগ-লীলার সমাবেশ :

'See ! the mountains kiss high Heaven,
And the waves clasp one another ;
No sister-flower would be forgiven
If it disdaimed its brother ;
And the sunlight clasps the earth,
And the moonbeams kiss the sea :
What are all these kissings worth,
If thou kiss not me ?' (Shelly : Love's Philosophy)

এর সঙ্গে তুলনীয় কাজী নজরুলের ব্যঞ্জনা :

'চুমিল আকাশ নত হ'য়ে মুখে ধরণীর বুকে ঝাঁপিয়া।' (রাখীবন্ধন)
'যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা।' (আশা)
'নব সহকার-মঞ্জরী সহ ভ্রমরী !
চুমে ভোমরা নিপট, হিয়া মরে গুমরি' !' (ফাল্গুনী)

'নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়
চুম্বনে বিবশ করি !' (দারিদ্র্য)

আবার অন্যত্র নজরুলের কবিত্ব অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়েছে :

'ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার ?
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল ?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ ? ও কি অনুরাগ ?
জাননা কি, তাই
তরঙ্গে আছাড়ি' মর আক্রোশে বৃথাই ?
... ...
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর।
... ...
জলে জলে ঢলাঢলি চলমান বেগে,
ফুলে ফুলে চুমোচুমি—চরাচরে বেলা ওঠে জেগে !' (সিন্ধু)

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়ও যেন এই লীলারই প্রতিধ্বনি :

'নর্ম্মসখী নদীর যত অধর-সুধা হর্ষে পিয়ো।
লাস্যগতি, হাস্যরতি সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।' (সমুদ্রাষ্টক)
'পাষাণের স্নেহধারা ! তুষারের বিন্দু !
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও—অঙ্গে।
চুমা-চুমকীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দেয় ধরা তোর লাগি' ধর্ণা।
ঝর্ণা !' (ঝর্ণা)

'দেহপ্রাণ একতান গাহে গান বিশ্ব !
অমা চুমে পূর্ণিমা ! অপরূপ দৃশ্য !' (যুক্তবেণী)

'মেঘমল্লার
শত ঝিল্লি গায়
যূথী-লতায়
চুম্বন বিথার
অপ্সরার !' (বিদ্যুৎ-বিলাস)

এই বর্ণনার জুড়ি মেলে ওমর খৈয়াম-এও :

'এই যে কিশোর কোমল তৃণের সহাস শ্যামলিমা
চুম্বনে যার রোমাঞ্চিত নদীর অধর-সীমা'
(অনুবাদ : নরেন্দ্র দেব)

চুম্বনের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাও পাই বিভিন্ন কবিতায় অভিনব বৈচিত্র্যময় :

'Soul meets soul on lovers' lips.'
(Shelly , Prometheus unbound)

'গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
... ...
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।'
(রবীন্দ্রনাথ : চুম্বন)

'প্রাণে সেদিন পৌঁছালো এই বাণী—
অধর যেন অধর সাথে করছে কানাকানি।'
(ওমর খৈয়াম)

'What is a kiss ? why this, as some approve :
The sure sweet cement, glue, and lime of love.'
(Robert Herrick ; A Kiss)

রবার্ট হেরিক গন্তময় কবিত্ব ক'রে যাকে বললেন, 'the sure sweet cement, glue and lime of love,' বিশ্লেষণীর কবিত্বহীন নিরেট গন্তভাষায় তো হোল : 'the anatomical just oposition of two orbicularis oris muscles in a state of Contraction.' (Dr. Henry Gibbons, Definition of a kiss), আর এই নিছক গন্তকে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস : 'We have in the lips a highly sensitive frontier region between skin and mucous membrane, and reinforceable, moreover, by the active movements of the still more highly sensitive tongue. Close and prolonged contact of these regions, therefore, under conditions favourable to tumescence sets up a powerful current of nervous stimulation. After those contacts in which the sexual regions themselves take a direct part, there is no such channel for directing nervous force into the sexual sphere as the kiss.' (Studies in the psychology of sex)

বিজ্ঞানীরা এই চুম্বনপর্ব্ব বা 'অসকিউলেশান,' নিয়ে রীতিমত অনুধাবন ও অনুশীলন সুরু ক'রে দিয়েছেন। তাঁরা বিশ্লেষণ ক'রে দেখছেন ঠিক কি কারণে চুম্বন চিত্ত উদ্বেলিত করে, কিসের জন্যই বা

চুম্বনকারী এবং চুম্বিত উভয়েই অভিভূত হয় এবং শারীরিক এবং মানসিক কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কতকগুলি ব্যাপারের সন্ধান তাঁরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন, সেগুলি বিশেষ মজার। সংক্ষেপে তা' হোলো এই। চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ের শরীরের রাসায়নিক সংগঠনে এবং ইন্দ্রিয় কেন্দ্রে অতি দ্রুত প্রতিক্রিয়ার ঝড় ওঠে, তার ফলে, বিজ্ঞানীর ভাষায়, 'শুধু মাথাই ঘুরে যায় তা নয়।' পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড থেকে হর্মোন নির্গমন সুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে, আর এ্যাড্রিনোকরটি-কট্রোফিন বলে একরকম রাসায়নিক পদার্থ দেহাভ্যন্তরে তৈরী হয়ে চলে, এই পদার্থটি অতি দ্রুতবেগে এ্যাড্রিনাল গ্ল্যাণ্ডকে অত্যন্ত উত্তেজিত ক'রে তোলে। এই এ্যাড্রিনাল গ্ল্যাণ্ড থেকে আবার ত্বরিৎগতিতে নির্গত হ'তে থাকে আরও বহু রাসায়নিক পদার্থ এবং হর্মোন, সে সবই প্রবল গতিবেগে সঞ্চালিত হয় দেহের রক্তস্রোতের মধ্যে। তারপর থেকেই আসল আলোড়ন সুরু হয় সারা দেহ জুড়ে: শ্বেত-রক্তকোষ ক্ষিপ্রগতিতে ভেঙে ভেঙে যায়, নাড়ীঘাত ক্ষিপ্র থেকে ক্ষিপ্রতর হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন হ'তে থাকে আর প্রস্বেদনের মাত্রাও বেড়ে যায়।

চুম্বনশক্তি ঠিক বৈদ্যুতিক শক্তির মতই পরিমাপ করা চলে। এক চুম্বন থেকে অপর চুম্বন-এর আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তেমনি পার্থক্য একজনের চুম্বন ও অপরলোকের চুম্বনেও। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রিচমণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীরা একটি অভিনব যন্ত্র তৈরী করেছেন, এই যন্ত্রের ঠিক যোগ্য নামও তাঁরা দিয়েছেন, 'অসকিউলোমিটার'। এই যন্ত্রের সাহায্যে চুম্বনের 'গাঢ়ত্ব' সঠিক মাপা যায়। এটি একটি মজার যন্ত্র। পুরুষই হোক মহিলাই হোক যে কেউ এই যন্ত্রস্থ ধাতব ঠোঁটের উপর নিজের ঠোঁট রেখে চুম্বন করার সঙ্গে সঙ্গেই এই চুম্বনের আবেগ বৈদ্যুতিক মাপে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির রোধ-এর পরিমাপ মাত্রা যেমন ohm তেমনি এর হিসাবও এই ohm এতেই করা হয়। সাধারণ মেয়েদের চুম্বনাবেগের মাত্রা এই যন্ত্রে দেখা গেছে ১,০০০ ohm, উত্তেজনা যাদের সাধারণের চেয়ে কম তাদের বেলায় ৬,০০০ ohm আর যাদের প্রমত্ততা অসাধারণ তাদের বেলায় ১৪,০০০ ohm। বিজ্ঞানীরা এখনও অবধি যে প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করতে পারেন নি তা হোলো এই ohmএর মাত্রা বাড়িয়ে চুম্বন-প্রমত্ততা বৃদ্ধিতে নরনারীকে কোনো উপায় বাতলানো যায় কিনা? যাই হোক, বিজ্ঞানীদের এই অনুশীলনে আরও দেখা গেছে যে, সাধারণতঃ মেয়েরা পুরুষের চেয়ে কম আনন্দানুভূতি উপভোগ করে চুম্বন থেকে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, 'একটি চুম্বন গড়ি, দোঁহে লব ভাগ করি' তা' কিন্তু বিজ্ঞানীদের জানা অনুযায়ী হবার নয়, এবং ভাগে কমবেশী হতে বাধ্য। নজরুল খেদ করে বলেছেন, 'প্রিয়া হ'য়ে এলে প্রেমে, বধূ হ'য়ে এলে না অধরে!' নারী বধূ হ'য়ে অধরে এলেও কিন্তু এই যন্ত্রের নির্ভুল হিসেবে এই খেদ মিটতো না, কারণ, সে ক্ষেত্রে আনন্দানুভূতিটা বধূর ভাগেই বেশী পড়ত, যদি বধূর ভালোবাসার মধ্যেও উত্তাপ থাকে। সাধারণতঃ উনিশের মধ্যে বয়স যে সব মেয়ের তাদের বেলায় এই যন্ত্র বলে, 'চুম্বন-এর পূর্ণ পরিতৃপ্তি তারা পায় না, কারণ তাদের মনের গোচরে বা অগোচরে নিষেধের অঙ্গুলি উদ্যত হ'য়ে থাকে।

ফ্রান্সে প্যারী সহরে সেন্ট এ্যানে হাসপাতালে বিজ্ঞানীরা আর একটি উন্নততর যন্ত্র তৈরী করেছেন। এই যন্ত্রটিকে বলা চলে, 'চিন্তা-স্রোত অনুধাবন যন্ত্র'। বিভিন্ন ধরণের উত্তেজনা এবং প্রমত্ততার পরিমাণ এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্তচাপের তারতম্য, মানসিক আবেগ, মস্তিষ্কে প্রবাহিত চিন্তাস্রোত সবই এই যন্ত্র ব'লে দেয়।

'গালিভার্স ট্রাভেলস্'-এর লেখক জোনাথন সুইফট্ বিস্ময় বিস্ফারিত হ'য়ে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'Lord! I wonder what fool it was that first invented kissing' (Polite Conversation)। কিন্তু এই চিত্তজয়ী আবিষ্কার নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হোক বা না হোক, একবার মৃত্যুঞ্জয়ী হ'য়ে উঠেছিল একটি তরুণীর জীবনে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। জ্যাকবপন্থীদের পরাজয়ের পর উইলিয়ম ডগলাস নির্বাসিত হন স্কটল্যাণ্ড থেকে ১৭৪৫ সালে। ১০ বছর পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই তিনি নিষ্কৃতি পান, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাঁর প্রণয়িণী মার্গারেট হেস্‌কে বিয়ে করার জন্য। ফেরার পথে দেখতে পান সদ্যমৃতা মার্গারেট-এর শবযাত্রা চলেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় ডগলাস বিহ্বল হ'য়ে পড়েন। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তিনি অনুমতিলাভ করেন জীবনচিহ্ন রিক্তা দয়িতার ওষ্ঠাধরে শেষ চুম্বনের রেখা এঁকে দেবার। বেদনার্ত্ত ডগলাস সচকিত হলেন, মার্গারেট-এর ওষ্ঠাধরে তখনো লেগে রয়েছে উত্তাপ। জীবনের চিহ্ন তখনো নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি। তারপর মার্গারেটকে জীবনের পথে ফিরিয়ে আনা হোল। তাঁদের বিবাহ হোল এবং তারপর তাঁরা সুখে ঘরকন্না করলেন আরও একান্ন বছর ধ'রে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

শ্রীপ্রমীলা রায়চৌধুরী

বলার মত এমন কিছু নয়—হয়তো সব সংসারেই এই ব্যাপার ঘটে—তবুও মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

সন্ধ্যা হয় হয়—অফিস থেকে ফিরে লেটার বক্স দেখতে গিয়ে মা'র একখানা চিঠি পেলাম। মা'র চিঠিতে অনুযোগ, অভিযোগ কিছু নেই—শান্ত ভাষায় লেখা—অনেকদিন তো পূজার সময়ে আসো নাই—এবারের ছুটিতে বৌমা ও দাদুভাইকে নিয়ে এখানে এসো। কবে আছি, কবে নেই, দেখতে বড় ইচ্ছা করে।—চিঠিখানার মধ্যে মা'র মুখখানি, কথা বলার ভঙ্গিটি ভেসে উঠলো।

উপরে উঠে দেখি মিত্রা বাইরে যাওয়ার মত সেজে কপালে সিঁদুর আঁকছে। আমাকে দেখে কলকলিয়ে উঠলো—বললো, এই যে তুমি এসে গিয়েছ—ভালই হয়েছে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, তোমার চা, খাবার সব ঠিক করে রেখেছি—চেয়ে নিও। বলে ব্যস্তভাবে বড়সড় একটা হ্যাণ্ড-ব্যাগ তুলে নিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো।

এত ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলেছ ?—আমি বলি।

মনোরম ভঙ্গিমায় হাত তুলে বিদায় জানাতে জানাতে ও বললে, এসে সব বলব। এখন চলি—please !

আমাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই মিত্রা বেরিয়ে গেলো।

আমি পকেট থেকে চাবী, পেন, খুচরা পয়সা ও পার্সটি বের করে টেবিলের ওপরে রেখে, খাটের ওপর আরাম করে বসে, মা'র চিঠিখানা আবার পড়লাম। পূজোর ছুটি আসন্ন—মায়ের স্নেহ বুভুক্ষিত মনটি আমার মনের দুয়ার জুড়ে বস্‌লো।

মিত্রার নির্দেশমত, চা ও খাবার ট্রে'তে সাজিয়ে নিয়ে, চাকর এলো। তাকে শুধু 'চা'টা রেখে, আর সব ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললাম। চা খেয়ে খাটে শুয়ে রইলাম—দুটি চোখ বন্ধ—মনের আগল খুলে গেলো, ছোটবেলার মধ্যে ডুব দিলাম। হয়তো একটু তন্দ্রাই এসেছিলো কার মৃদু ঠেলায় সেটুকু ভেঙে গেল—চেয়ে দেখি, খোকা ডাকছে—বাপি—ঘুমিয়ে পড়েছ ? আলো জ্বালব ?

হাত বাড়িয়ে, তাকে কাছে টেনে নিই—বলি, না—বাবা··আলো থাক—তুমি কখন এলে ? স্কুলে আজ ক্লাসের পড়া সব পেরেছিলে তো ?

হ্যাঁ—বাপি—কেবল ওই সংস্কৃতটা ঠিক হচ্ছে না।

হুঁ। বলে চুপ করে গেলাম। এখন থেকে ঠিক মত কোচ না পেলে হয়তো ছেলেটা সংস্কৃতে ফেল করেই বসবে। মিত্রার সাথে আলোচনা করে দেখি ও কি বলে। খোকনের ক্লাসের সংস্কৃত তো মিত্রাই দেখতে পারে, ছাত্রী হিসাবে ওর সুনাম ছিলো।

একটু চুপ করে থেকে খোকন আবার বলে—জানো বাপি, মামণি বলেছে এবার পূজোয় আমরা ব্যাঙ্গালোর বেড়াতে যাব—সেখানে নাকি অনেক ভাল ভাল দেখার জিনিস আছে—তাই আর পূজোয় দামী জামা কাপড় কেনা হবে না—ট্রেণেই তো অনেক পয়সা লাগবে না বাপি ?

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, তাই নাকি ? বেশ তো তুমি আর তোমার মামণি ব্যাঙ্গালোর যেয়ো। আমি পূজোর সময়ে আমার মা'র কাছে যাব, দেশের বাড়ীতে।

আনন্দে হাততালি দিয়ে খোকন বললো—বেশ হবে বাপি, আমিও যাব তোমার সঙ্গে, কত ঠাকুর দেখব, নদীতে ভাসান দেখব, নৌকায় করে বেড়াব আর সন্ধ্যেবেলা ঠাকু'মার কাছে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প শুনব, নারকোল সন্দেশ, মুড়ির মোয়া, মুড়কী খাব—না বাপি ?

ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলাম—ঠাকুমাকে তোমার মনে পড়ে খোকা···?

আমরা যখন এইসব কথায় ব্যস্ত—মিত্রা ঘরে এলো, একি অন্ধকারে বসে তোমাদের কি কথা হচ্ছে ?

খোকা উঠে মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল—শোনো মামণি, পূজোতে আমরা ঠাকুমার কাছে যাব—বলেছে বাপি। কত বেড়াব, ঠাকুর দেখব, নৌকোয় চড়ব কি মজা। বলে সে বেরিয়ে গেলো।

মিত্রা সোজাসুজি আমার দিকে চেয়ে বললো—এ আবার কি কথা ? মিছিমিছি ওকে ওসব বলে ভোলাচ্ছ কেন ? আমি যে ব্যাঙ্গালোর যাবার সব ঠিক করে ফেলেছি—আজও সেই সব ব্যাপারেই বেরিয়ে ছিলাম। তোমাকে Pleasant surprise দেবো বলে আগে কিছু বলিনি। এখন পিছিয়ে গেলে একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে।

মৃদু দৃঢ়তার সঙ্গে আমি বলি—পিছিয়ে, বিশ্রী ব্যাপার ঘটাবার দরকার কি ? তুমি খোকাকে নিয়ে যেয়ো—আমি এবার মায়ের কাছেই যাব।

কেমন একটা বাঁকা হাসি ছুঁড়ে মিত্রা বললো—হঠাৎ এত মাতৃভক্তি ! এ রকম তো আগে দেখিনি।

আমি একটু উষ্মা দেখিয়ে বলাম—আগে দেখোনি বলে যে মোটে দেখবে না তার কোন কথা নেই। খোকন বড় হচ্ছে—তার সামনে যে আদর্শ তুলে ধরছি আমরা—তাতে করে অনুরূপ প্রাপ্য জমা হচ্ছে ওর মনে।

সমান উষ্মার সঙ্গে মিত্রা বললো—তার মানে তুমি বলতে চাও যে খোকন বড় হলে আর আমাদের পাত্তা দেবে না !

গম্ভীর গলায় আমি বললাম—সেইটাই স্বাভাবিক। আশ্চর্য্য বা অবাক হওয়ার কিছু নেই, তা' যাক—শোনো মা'র একটা চিঠি আজ—আর সেই চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে, মা'র কাছে যাওয়ার জন্য মনটা আমার খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

আরক্ত মুখে, গম্ভীর গলায় মিত্রা বললো—চিঠিটা আমি দেখতে পারি?

নিশ্চয়ই পারো—লেটার বক্সেই তো পড়েছিলো। তুমি যদি খুলতে তো তুমিই পেতে চিঠিটা। কিন্তু তোমার তো চিঠিপত্র সম্বন্ধে কোন তাগিদ নেই মনের মধ্যে। কারণ তোমার আত্মজনেরা কাছাকাছিই আছেন। আমার কেস আলাদা। আমার মা-ই যে আমার কাছে নেই—তাই চিঠির খোঁজে আমাকে নিয়মিত লেটার বক্স দেখতে হয়।

এবারে মিত্রার সজল আঁখি, জল পড়ে পড়ে! রুষ্ট কণ্ঠে বললো, তোমার এ ধরণের কথা শুনে সত্যি আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। যেন তোমার মা'কে আমি সহ্য করতে পারি না বা পারি নি। সেবার যে এসেছিলেন তোমার মা—

বাধা দিয়ে আর্তকণ্ঠে আমি বললাম—থাক্ সেবারের কথা মিতা! কথায় কথা বাড়ে। সেবারের কথা তুমিও জানো, আমিও জানি, আর মাও' যে না জেনেছেন, তা নয়। মা আমার অত্যন্ত সহিষ্ণু, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। খোকন বড় হচ্ছে, তার সামনে কোনও অসঙ্গত কথা বা আচরণ হওয়া উচিত নয়। ওর মনে তাহলে সেগুলি গেঁথে যাবে, আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই।

হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জলটা মুছে নিয়ে মিত্রা বললো—আমি জানতাম, যখনি আমার ডান চোখটা কাঁপছিলো—একটা অশুভ কিছু হবেই। হলোও তাই—শুধু শুধু অকারণ খানিকটা কথার সৃষ্টি!

বাধা দিয়ে আমি বললাম, বাঁ চোখটা কাঁপলে যখন ভাল হয় না সব সময়—তেমনি ডান চোখটা কাঁপলেও মন্দ হয় না সব সময়, তা ছাড়া কথাগুলো শুধুও নয়, অকারণও নয়। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। এখন চলো খেতে যাওয়া যাক। বলে আমিই আগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

নির্মল আকাশে, একটুকরো মেঘের সঞ্চার হলো কি?

সেইদিন থেকে মিত্রা যেন সব বিষয়েই আলগা হয়ে গেলো। কথাবার্তা নেহাৎ যা' না বললে নয় তাই বলে, আমি কারণ বুঝলেও ও নিয়ে মাথা ঘামাই না—ওর ইচ্ছামত যে আমাকে চলতে হবে, এমন বোঝাপড়া কিছু নেই তো। ওর ইচ্ছা হয়, ও আমার সাথে যেতে পারে, না ইচ্ছা হয় তো খোকনকে নিয়ে বা একাই যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। আমি তো কোনটাতেই ওর ওপর জোর খাটাচ্ছি না।

আমাদের দু'জনের মধ্যে যে সহজ সুরটুকু বাজছে না, এটা দশ বছরের ছেলে খোকনও বুঝে ফেলেছে। তাই যেন মাঝে মাঝেই সে এসে উৎসাহ দিয়ে বলে—বাপি! তোমার ছুটির আর কত দেরী? সব নৌকোগুলো ভাড়া হয়ে যাবে আমাদের আর' বেড়ানো হবে না। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করি। সন্তানস্নেহ, তার মমতা, মাধুর্য্য নিয়ে আমাকে কেবলি মনে করায়, আমার মা এইটুকু তৃপ্তি পান না বলেই বুঝি লিখেছেন মন নিংড়িয়ে—কবে আছি, কবে নেই দেখতে বড় ইচ্ছা করে।

মিত্রাও তো সন্তানের জননী, মায়ের এই যে ব্যথাটুকু কেন সে বোঝে না? বারোমাস বাইরে থাকা ছেলেকে দেখতে চাওয়া কি খুব অন্যায়? সে কেন একবারও বলে না—এবারে চলো মা'র কাছে যাই। বা কেন মা সব সময়ে দেশে একা একা থাকবেন? তুমি নিয়ে এস মাকে। না, মিত্রা সে কথা কখনো বলেনি—আমার বিশ্বাস, কখনও বলবেও না। এতটা আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে, যদি আর একটু চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌তো!

মনে আছে, খোকন হবার পরে মা'কে নিয়ে এসেছিলাম আশা ছিলো, ছোট বাচ্চার অজুহাত মা'কে আমার বাসায় ধরে রাখ্‌তে পারব—আর মিত্রাও বাচ্চার হাঙ্গামা না পোহাতে হ'লে খুসিই হবে। কিন্তু সে আশা আমার সফল হয়নি। মা আসার দিন দশেক পর থেকেই, মিত্রা কেমন আল্‌গা আল্‌গা হয়ে গেলো।

ছুটির দিন আলস্যে সকাল বেলাটা কাটাচ্ছি একখানা খবরের কাগজ নিয়ে। কানে এলো, মা বলছেন—বৌমা, আজ বাজার থেকে কচুশাক আর নারকোল আনতে দিয়ো। মহী (আমার নাম) নারকোল কোরা দিয়ে কচুশাক খুব ভালবাসে। অপিসের তাড়ায় অন্য দিন তো হওয়ার জো, নেই।

নীরস গলায় মিত্রা উত্তর দিলো—আপনার কচুশাক-টাক্ কি আর ওই হিন্দুস্থানী চাকর বুঝে আন্‌তে পারবে? হয়তো এমন গলাধরা ডাঁটা আনবে যে খাওয়াই হবে না। নারকোলও পাঁচ ছ' আনার কমে একটা হয় না তা ছাড়া আপনার ছেলে এখন বোধ হয় ও সব আর পছন্দ করে না—কখনও তো শুনি নে বলতে।

অপ্রতিভের একশেষ হয়ে মা বললেন—ও মা! তাই বুঝি! এত দাম! তা হলে থাক মা।

আমি আড়ালে থাকলেও এসব কথা শোনার কোনো অসুবিধা হলো না। আমার মনে হলো পাঁচ ছ' আনা দামের নারকোল দিয়েই তো মিত্রা মালাইকারী করে আমাদের খাইয়েছে তবে আজ সে মা'র এই সামান্য অনুরোধটুকু অগ্রাহ্য করলো কেন? কেন মাকে এই তৃপ্তিটুকু থেকে বঞ্চিত করলো? স্বামী, পুত্র, পরিজন, এদের নিজের হাতে রেঁধে খাইয়ে যে কী আনন্দ, কী তৃপ্তি পাওয়া যায় তা তো মিত্রাও জানে তবে? কেন সে নিজের মন দিয়ে মা'র মনটি বুঝলো না? এটা কি কেবল মা'কে অবহেলা করা নয়?

সেদিন খুব ইচ্ছে হয়েছিলো যে আমি নিজে বাজারে গিয়ে, মা'র ইচ্ছার জিনিসটুকু এনে, মা'র কাছে দিয়ে বলি—খুব ভাল করে রাঁধো তো মা, সেই আগে যেমন রাঁধতে! কতদিন যে এসব খাইনি।

কিন্তু পারিনি। শুধু একটা গৃহবিবাদের ভয়ে, মেরুদণ্ডহীন, অপদার্থ আমি, মায়ের কথা মনে করে কষ্টই পেয়েছি। সেদিন যদি আমি মিত্রার ব্যবহারের, ওই ভাবে নীরব প্রতিবাদ করতাম—তাহলে ও হয়তো বুঝতো, আমার মা'র আমি আছি—তাঁকে অবহেলা করা চলবে না।

আরো একদিনের কথা—খোকন মাস তিনেকের তখন। অফিস থেকে ফিরে দেখি, মিত্রা ঘরে বসে একটা বই পড়ছে। বইয়ের আড়াল ছিলো বলে, মুখটা দেখতে পাইনি। কাছে গিয়ে আদর করে, বলতে গেলাম—আজ যে বড় দয়া! আগে থেকে ঘরে এসে বসে আছ! বাচ্চা কই? মুখের ওপর থেকে বইটা সরিয়ে, ইসারায় সে মায়ের ঘরটা দেখিয়ে দিলো। মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর, বিকেলে বোধহয়, স্নানটানও করেনি, সাধারণতঃ ও এমন অগোছালো থাকে না—অন্ততঃ বিকেলের দিকে। আমি ওর মুখটা তুলে ধরে ঠাট্টার সুরে বললাম—কি ব্যাপার! এমন বৈরাগিনী বেশ কেন?

(মা খোকনকে নিয়ে শোন) কিছুক্ষণ গল্প করে, তার পরে শু'তে চলে যাই। সেদিনও, এই রকম গল্প করছি, মা বললেন, মহী, এবার তো আমি যাব, দাদাভাই সেরে উঠেছে, আর ভয় কিছু নেই। আমি বললাম—সে কি মা? তুমি কেবলই আসবে আর যাবে কেন? এখানে কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে?

পাগল ছেলে! আমার আবার অসুবিধা কি বাবা? তবে অনেক দিন—

আবদারের সুরে খোকন বলে না ঠাকুমা, তুমি যেতে পাবে না। কে আমাকে গল্প বলবে? আমি আরো সেরে উঠলে, তুমি বলেছ, আমাকে নারকোল সন্দেশ করে দেবে! তবে যে যেতে চাচ্ছ?

মিত্রা ঘরে ছিলো না—একটু পরেই সে ঘরে এলো মা'র খাবার জলের ঘটিটা নিয়ে। জানলার ওপর একটু জল ছিটিয়ে ঘটি রেখে মুখে একটা ছোট বাটি ঢাকা দিলো।—ঘরে খুচরো কিছু কাজ ছিলো—মিত্রা ক্ষিপ্রহাতে সেগুলি সারতে লাগলো। মার কোল ঘেঁসে খোকা শুয়েছিল—আমি একটা চেয়ারে বসেছিলাম, খোকা বলে উঠলো, জানো মামণি! ঠাকুমা বলছে কি, চলে যাই, কখখনো যাওয়া হবে না, যেতে পাবেই না তুমি, তুমি বলো না মামণি ঠাকুমাকে, খোকার স্বরে কান্নার আভাস পাওয়া গেলো! অসুখের পর থেকে ছেলেটা বড় ছিঁচ-কাঁদুনে হয়েছে।

মিত্রা আলনায় কাপড় জামা পাট করে রাখছিলো। খোকার কথায় ফিরে মা'র কাছে এলো, বললো, সত্যি নাকি মা খোকা যা বলছে? কিন্তু যাওয়া তো আপনার হ'তে পারে না।

না গেলে কি চলে মা? ভিটে বাড়ীতে 'সাঁঝ সন্ধ্যা' পড়বে না, ঘর দুয়োরে ঝাঁটা পড়বে না, এতো আমি ভাবতেই পারিনে।

অসহিষ্ণু গলায় মিত্রা বললে—আমি অতশত বুঝিনে মা, তবে আমার শুধু এইটুকু মনে হচ্ছে, আপনি চলে গেলে, আবার যদি খোকা অসুখে পড়ে! তা হলে? তা হ'লে আর কি ওকে সারিয়ে তুলতে পারব আমরা? না, না, যাওয়ার কথা আপনি মন থেকে একেবারে বিদায় দিন। মিত্রার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। মা কি বলেন শুনবার জন্ম কান দুটি পেতেই রেখেছি।

দেখলাম মা মিত্রার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলছেন, ষাট, ষাট, ও সব কথা মনে আনতে নেই। রোগ বালাই কার না হয়! আর হলেই কি ওই সব কুকথা মনে আনে? কত ঝাপটা খেয়ে তবে ছেলেপিলে বড় হয়।

অবুঝের মত মিত্রা বলেই চললো, আমি অত জানতে চাইনে মা। একবারের ঝাপ্টাতেই চোখে আঁধার লেগেছে—আর ঝাপ্টা সামলাবার শক্তি আমার নেই, আমি পারব না। বলতে বলতে মিত্রা আমাকে বললো, তুমি চুপ করে আছ যে! তুমি কি মা'কে যেতে দেবে?

আমি এ পর্যন্ত একটাও কথা বলিনি, এদের কথাবার্ত্তা শুনছিলাম, এখন বললাম—সত্যি মা, তুমি যাবে বলছ কি করে? তুমি থাকতে পাববে একা গিয়ে? তোমার আর দেশে গিয়ে কাজ নেই, তোমারও তো অসুখ-বিসুখ হ'তে পাবে—একা থাকার কোন দরকার নেই। যে ক'দিন পাওয়া যায় একসঙ্গে থাকা যাক।

কথার শেষে দেখি চেয়ে, মা'র চোখে জলের আভাস। আমি মুখটা ফিরিয়ে নিলাম, কারণ মা'র চোখে চাইতে গিয়ে হয়তো আমার চোখও সজল হয়ে উঠবে। ধরা গলায় বললাম, তাহলে এই-ই ঠিক রইলো মা, আর যাওয়া-যাওয়া করে ব্যস্ত হয়ো না—কেমন? বলে আমি উঠে পড়লাম। খোকা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

শোওয়ার ঘরে এসে শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হলো না। মা'র মনটি আজ যেন বড় স্বচ্ছ করে দেখতে পেলাম। মা তো আমাদের ছেড়ে থাকতে চান না—কিন্তু বার বার মা কেন চলে গিয়েছেন? মনের ব্যথা মনেই রেখেছেন, দেশের ওপর অসম্ভব মায়া-মমতা দেখিয়েছেন। দেশে এমন কি আছে, আমি সত্যিই ভেবে পাইনি—তবে কি কারণটা মিত্রা? সে কি সত্যই অসহনীয়?

আলো নিভিয়ে একটা কম পাওয়ারের টেবিল ল্যাম্প জেলে বসে এই সবই ভাবছিলাম। মিত্রার অপেক্ষাতেই বসে আছি, ওকে আজ দুটো ভাল কথা বলতে—নতুন করে ভালবাসতে ইচ্ছা হলো। এতদিন আমি ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছি।

খোকনের অসুখটায় ওর মনটা ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে উঠেছে—মিথ্যা গর্ব্ব ওর চলে গিয়েছে, ও এখন সোনার মত ঝকঝকে হয়ে উঠেছে।

মিত্রা ঘরে এলো। আমাকে বসে থাকতে দেখে, আমার কাছ বরাবর এসে বললো, এখনও শোওনি যে! মাথা ধরেছে? বলে আমার চুলের ভিতর আঙুলগুলি ডুবিয়ে দিলো।

আমি তাকে সামনে টেনে এনে বলি, যদি বলি তোমার জন্মে জেগে আছি।

মিত্রা সোজাসুজি আমার দিকে চেয়ে বললো, কথাটা শুনতে ভাল লাগছে খুব, কিন্তু বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে।

আমি বললাম—আর তো ভয় নেই, মেঘ কেটে গিয়েছে। ওই দেখ, অন্ধকার রাত্রিবক্ষে শিশুচাঁদ জন্ম নিচ্ছে, তার মৃদু আলোয় সারা আকাশ আলো হয়ে উঠছে। তোমার কি মনে হয় না আমাদের চলার পথও এবার থেকে আলোময় হবে ওই রকম।

মিত্রার চোখ দুটি করুণ হয়ে উঠলো। বললো, অনেক ভুল করেছি আমি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

আমি হেসে, আমার দুটি হাতের বাঁধনের মাঝে ওকে বন্দী করে নিলাম।

ভারতের বিভিন্ন জনসমাজ একটা বিশেষ ধরণের কৃষ্টি অথবা সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছে, যা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা অথবা কৃষ্টির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এইটিই হচ্ছে ভারতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তি। এক কথায় বলতে গেলে ভারতের বিশিষ্ট সভ্যতার নাম হচ্ছে 'হিন্দুত্ব'। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ হিন্দুদের দেশ-ব্রাহ্মণের দেশ। ব্রাহ্মণেরা তরবারির সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশের দ্বারা ভারতের আনাচে-কানাচে তাঁদের ভাবরাশি ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। —ভিনসেন্ট স্মিথ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(আলেকজাণ্ডার পুশকিনের The Captain's Daughter অবলম্বনে)

চার

কিছুদিন পরের কথা। বেলোগরস্ক দুর্গের জীবনযাত্রা প্রথমে যতটা দুঃসহ মনে হতো গ্রিনেভ-এর এখন আর ততোটা মনে হয় না। নিজেকেও অবস্থার সঙ্গে অনেকটা খাপ খাইয়ে আনতে পেরেছে।

এ দুর্গের কর্তাব্যক্তি যদিও ক্যাপটেন মিরোনোভ, কিন্তু গ্রিনেভ-এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছে কার্যত এখানকার সব কিছু, মায় সরকারী কাজকর্ম অবধি ভ্যাসিলিসাই করেন। ক্যাপটেন নিবিরোধী ভালো মানুষ। গ্রিনেভ নিজের অজানিতেই মিরোনোভ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। ইভানোভা এখন আর আগের মতো লজ্জায় দূরে সরে যায় না।

যথা সময়ে অফিসারের স্থায়ী পদ পেলো গ্রিনেভ। বেলোগরস্ক দুর্গটা দেখতে যেমন দুর্গের মতো নয়, তেমনি এর সব কিছুই যেন বেশ একটু অস্বাভাবিক। নিয়মের বালাই নেই এখানে। সৈন্যদের বাঁধাধরা ভাবে প্যারেড করতে হয় না। পাহারার কোনো বন্দোবস্ত নেই। গ্রিনেভেরও অবসর মিললো প্রচুর।

এখানকার অফিসারদের মধ্যে বিদ্যা এবং বুদ্ধিতে শাভরিন নিঃসন্দেহে সবার চাইতে চৌকস। গ্রিনেভ তাই শাভরিনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলো। শাভরিনের খানকয়েক ফরাসী সাহিত্যের বই ছিলো, গ্রিনেভ পড়তে আরম্ভ করলো সে সব। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রিনেভ ভেতরে ভেতরে একটা প্রেরণা অনুভব করতে লাগলো সাহিত্যচর্চার। মাঝে মাঝে এক আধটা কবিতা রচনা করতে লাগলো গ্রিনেভ। ফাদার গোরাসিম এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলো ও, শাভরিনের সঙ্গে তো রীতিমতো বন্ধুত্বই গড়ে উঠলো?

কিন্তু শাভরিনের একটা ব্যাপার গ্রিনেভ একদিকে যেমন বুঝে উঠতে পারে না, তেমনি পারে না সমর্থন করতে। সে হ'লো মিরোনোভ পরিবার সম্পর্কে ওর নিতান্ত হালকা মনোভাব এবং আপত্তিজনক মন্তব্য। গ্রিনেভ লক্ষ্য করেছে, অনেকদিন অনেক সময় ক্যাপটেন, তাঁর স্ত্রী এবং বিশেষ করে ইভানোভা সম্বন্ধে শাভরিন যে সমস্ত উক্তি করে ফেলতে লাগলে তার বেশির ভাগই গ্রিনেভ মানতে রাজী নয়, ওর শুনতেও ভালো লাগে না। তবু কিছুটা বাধ্য হয়েই শাভরিনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, কারণ এখানকার অফিসারদের মধ্যে ওর অন্তত কিছুটা শিক্ষা-দীক্ষা আছে।

চলছিল এই রকমই। কিন্তু হঠাৎ একদিনের একটা ব্যাপারের পর গ্রিনেভের পক্ষে শাভরিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠলো। গ্রিনেভ একদিন একটি কবিতা রচনা করে ফেললো। কবিতাটি ওর নিজের খুবই ভালো লাগলো। কাকে শোনান যায় কবিতাটি, একথাটা মনে হতেই ও বুঝতে পারলো শাভরিন ছাড়া এ দুর্গে এমন আর কেউ নেই, যে এ কবিতার মর্ম বুঝতে পারবে বা ভালোমন্দ কিছু মতামত দিতে পারবে। তাই ও এলো শাভরিনের কাছে। নিজেই প'ড়ে শোনালো কবিতাটি।

শাভরিন প্রথমটা কিছুই বললো না। কিন্তু তারপর খাতাটা গ্রিনেভের হাত থেকে টেনে নিয়ে নানা রকম ভুল ধরতে লাগলো। ভুল ধরবার জন্যে যে গ্রিনেভ বিরক্ত হলো ঠিক তা নয়, ও ব্যথিত হলো শাভরিনের বলার ধরণ দেখে। নিতান্ত হৃদয়হীন ভাবে ও বিদ্রূপ করতে লাগলো প্রেমের কবিতা লেখবার জন্যে। এ-কথা সে-কথার পর শাভরিন বললো—তা তোমার এ প্রেমের কবিতা লেখবার প্রেরণাটি কে শুনি? ইভানোভা নয় ত?

—তা'তে তোমার দরকার? বিরক্ত এবং কিছু রুষ্টভাবে বললো গ্রিনেভ।

—না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। তবে বন্ধু হিসেবে একটা কথা বলতে পারি। যদি ইভানোভাকে জয় করতে চাও, তো এ সব কবিতা ছাড়ো বরং এক জোড়া মাকড়ি পাঠিয়ে দাও ওকে।

—ইভানোভা সম্বন্ধে এ রকম হীন ধারণা করতে তোমার বাধলো না একটুও? উত্তেজিত ভাবে বললো গ্রিনেভ।

লোকটি বললো, আপনার দয়ার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না, এরপর ওদের গাড়ী ছাড়লো

—না বাধলো না, কারণ ওর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আমি জানি।

—মিথ্যেবাদী, পাজী কোথাকার।

—মুখ সামলে কথা বলবে গ্রিনেভ, শাভরিন সজোরে গ্রিনেভের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, এ কথার জন্যে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।

—বেশ, দেখা যাবে।

গ্রিনেভ আর শাভরিনের কলহের কথাটা দুর্গের অনেকের কানেই পৌঁছুল। সকলেই অনেক করে বোঝালো গ্রিনেভকে। বললো, শাভরিন নেহাৎ বদমেজাজী, ধূর্ত লোক। একাধিক খুন করেছে ও।

কিন্তু এ সব কোনো কথাতেই দমলো না ও। ইভানোভার সঙ্গেও একদিন আলোচনা হলো। ওকে কেন্দ্র করেই যে শাভরিনের সঙ্গে গ্রিনেভ কলহে প্রবৃত্ত হয়েছে, তা ও আগেই শুনেছে অন্য সকলের মতো। তাই সলজ্জ ভাবে বললো ও—আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে শাভরিন যেন উঠে পড়ে লেগেছে। আর সে আজ থেকে নয়, গত বছর তুমি এখানে আসবার মাস দুই আগে ও যখন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিল এবং আমি রাজী হয়নি তাতে—তখন থেকেই।

এতক্ষণে ইভানোভা সম্পর্কে শাভরিনের বিভিন্ন সময়ের নানা বিশ্রি উক্তির কারণ খুঁজে পেলো গ্রিনেভ। ইভানোভা শুধু যে শাভরিনকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাই নয় গ্রিনেভের প্রতি যে ও আকৃষ্ট হয়েছে এটাও নিশ্চয়ই শাভরিনের চোখ এড়ায়নি।

কিন্তু তবু শাভরিনের মতো শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কোন ভদ্রসন্তান যে কোনো মেয়ের সম্বন্ধে ঐ রকম সব আপত্তিজনক কথা বলবে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না গ্রিনেভ।

প্রথম বাক-বিতণ্ডার দিনই ঠিক হয়ে আছে যে শাভরিন গ্রিনেভের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করবে। ব্যাপারটা অল্পবিস্তর জানাজানিও হয়ে গেছে। তাই দুজনেই দু'জনকে শিক্ষা দেবার জন্যে উদগ্রীব হলেও সুযোগ সুবিধা হচ্ছিলো না।

কয়েকদিন পরের কথা। একদিন সকালবেলা গ্রিনেভ ওর নিজের ঘরে বসে নতুন একটি কবিতা রচনার চেষ্টা করছিল। একটি করুণ সঙ্গীত, এমন সময় শাভরিনের সংকেত পেলো। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই শক্তি পরীক্ষার জন্যে আহ্বান জানালো ও। কালবিলম্ব না করে কলমটা রেখে তরোয়ালখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো গ্রিনেভ।

যোদ্ধা হিসেবে শাভরিন গ্রিনেভের চাইতে অনেক বেশি অভিজ্ঞ, বয়সেও বড়ো। তাই ওর বিশ্বাস যে যুবক গ্রিনেভকে ও অনায়াসেই ঘায়েল করতে পারবে। কিন্তু নদীতীরে এসে যখন প্রকৃত লড়াই আরম্ভ হলো দেখা গেলো গ্রিনেভ তরোয়াল-যুদ্ধ বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছে, তা ছাড়া বয়স কম হবার জন্যে শারীরিক শক্তিও ওর অনেক বেশি। অনেকক্ষণ ধরে দ্বৈত-সংগ্রাম চলবার পরও কেউ কাউকে পরাস্ত করতে সক্ষম হ'লো না। কেউ কারো গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত দিতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত একসময় শাভরিন পেছু হটতে হটতে নদীর জলে পড়ে যায় আর কি, ঠিক এমনি সময় গ্রিনেভের কানে এলো ওর নাম ধরে কে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—থামাও, থামাও, ভগবানের দোহাই তোমরা লড়াই থামাও। পলকের জন্যে গ্রিনেভ ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখলো স্যাভেলিচ হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড়ের ঢালু থেকে নেমে আসছে। শাভরিন গ্রিনেভের এই মুহূর্তকাল অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে নিজের তরোয়ালের ডগাটা ওর বুকের একপাশে বিঁধিয়ে দিলো।

গ্রিনেভ সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লো।

পাঁচ

—এখন কেমন আছে? পাঁচদিন পরে জ্ঞান ফিরে আসতে প্রথমেই এই কথাটা কানে এলো গ্রিনেভের। অতি কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো গ্রিনেভ স্যাভেলিচ বিছানার কাছে বসে, ওকেই কথাটা জিজ্ঞাসা করলো ইভানোভা।

একে একে সবকথাই শুনলো গ্রিনেভ। এই পাঁচদিন ধরে ক্যাপটেনের কোয়ার্টারের একটা ঘরে আছে—ইভানোভা আহার নিদ্রা ভুলে সেবাযত্ন করছে—শাভরিনকে নিরস্ত্র করে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে—সব কিছু।

স্যাভেলিচ বারবার প্রার্থনা করতে লাগলো গ্রিনেভ যাতে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই গ্রিনেভ ইভানোভাকে বিছানার পাশে দেখে পুলকিত হয়ে উঠলো। আবেগের আতিশয্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুজনেই চুপ করে রইলো। তারপর একসময় গ্রিনেভ হঠাৎ ইভানোভার একখানা হাত নিজের মুঠির মধ্যে টেনে নিলো। ইভানোভা আবেশে নুয়ে পড়লো গ্রিনেভের বুকের ওপর।

ইভানোভা আবেশে নুয়ে পড়লো গ্রিনেভের বুকের ওপর

।—আমি বিয়ে করবো তোমাকে। রাজী তো? আবেগজড়িত কণ্ঠে বললো গ্রিনেভ।

—তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো। কোনো মতে কথা ক'টি বলে ইভানোভা বেরিয়ে গেল।

অকস্মাৎ ইভানোভাকে পাওয়ার আনন্দে গ্রিনেভ আঘাতের প্রচণ্ডতা খানিকটা ভুলে গেলো। মনটা ওর খুশীতে ভরে উঠলো। মানসিক প্রফুল্লতার জন্তে শারীরিক ক্ষতটাও দ্রুত শুকিয়ে উঠতে লাগলো।

গ্রিনেভ অনুরোধ জানালো ক্যাপটেনকে শাভরিনকে মুক্ত করবার জন্তে। মুক্তি পেয়ে শাভরিন প্রথমেই গ্রিনেভের শয্যাপাশে এসে নিজের দোষ স্বীকার করে গেল। ইভানোভার প্রত্যাখ্যানের ফলেই যে দিগভ্রান্ত হয়ে ও সবকিছু বলেছে এবং করেছে এবার তা সমস্তই অকপটে স্বীকার করলো।

ইভানোভা ও গ্রিনেভ যে পরস্পরকে ভালবাসে এখন সে কথা বেলোগরস্ক দুর্গের আর কারো অজানা রইলো না। ইভানোভাকে যে গ্রিনেভ বিয়ে করবে এ কথাও সবাই ধরে নিলো। গ্রিনেভ সম্পূর্ণ সেরে উঠবার আগেই চিঠি লিখলো বাবাকে। অনেক কিছুর সঙ্গে ইভানোভাকে বিয়ের বাসনার কথাও জানালো। ও মা-বাবার কাছে আশীর্বাদ চাইলো।

বাড়ী থেকে সাধারণত যে চিঠি আসে তা মা-ই লেখেন। বাবা কখনো সখনো এক আধ লাইন জুড়ে দেন তাতে। কিন্তু এবার চিঠি এলো বাবার নিজের হাতের লেখা। গ্রিনেভ বাবার উত্তর পেয়ে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো। উনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, ক্যাপটেনের মেয়েকে বিয়ে করবার পেছনে তাঁর আদৌ কোনো সমর্থন নেই। উপরন্তু খানিকটা ধমকেছেনও চিঠিতে এই বলে যে, আরো দূরের কোনো দুর্গে বদলী করে দেবার জন্তে উনি ওপরওয়ালাদের জানাবেন। দ্বৈত যুদ্ধ করে আহত হওয়ার সংবাদে বাড়ীর সবাই উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন জানালেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা জানাতেও দ্বিধাবোধ করেন নি যে দ্বৈত যুদ্ধের কারণটা তাঁরা কেউ মোটেই সমর্থন করেন না।

বাবার চিঠি পেয়ে গ্রিনেভ যেমন একদিকে দুঃখিত হ'লো তেমনি বিস্মিতও হ'লো কম নয়। এই দ্বৈত যুদ্ধের কথাটা তাঁরা জানলেন কি করে? স্যাভেলিচ কি জানাতে পারে? ওকে ডেকে একটা ধমক দিতে কেঁদে ফেললো বেচারা। তবে কে জানালো? ওরেনবুর্গের কেউ নিশ্চয়ই এখন পর্যন্ত জানে নি ব্যাপারটা।

ক্যাপটেন নিশ্চয়ই জানাতে পারেন না। মনে মনে বিশ্লেষণ করে গ্রিনেভ বুঝতে পারলো এ নিশ্চয়ই শাভরিনের কাজ। ও এখনো নানা ফন্দি আঁটছে তা হলে!

ক্যাপটেনের কোয়ার্টারে যাবার পথেই দেখা হলো ইভানোভার সঙ্গে। গ্রিনেভের মুখ চোখের বিবর্ণ চেহারা দেখে আঁতকে উঠলো ইভানোভা।—কি হয়েছে? তোমাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন?

গ্রিনেভ বাবার চিঠিখানা ওর হাতে দিলো। ইভানোভা চিঠিখানা পড়ে মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। চিঠিখানা পড়ে গ্রিনেভকে ফেরৎ দেবার সময় ইভানোভার হাতের আঙুলগুলি স্পষ্টতঃই কাঁপছিল। ও নিজেকে একটু সামলে নিয়ে স্থির ভাবে বললো—তোমার মা-বাবা যদি চান না আমাকে, তখন কি আর করা যাবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমাদের যে কিসে প্রকৃত ভালো হবে, আমাদের চাইতে ঈশ্বরই তা বেশি জানেন।

—ও সব কথা বলো না। উত্তেজিত ভাবে গ্রিনেভ বললো, তুমি আমাকে ভালোবাসো, তোমার জন্তে আমি সব কিছুই করতে পারি। আমার মা-বাবা অনুমতি না দেন না দেবেন, এসো আমরা তোমার মা-বাবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জীবন সুরু করি।

—তা' হতে পারে না গ্রিনেভ, ইভানোভা বললো, শুধু আমার মা-বাবার আশীর্বাদ হলেই চলবে না, তোমার মা-বাবার আশীর্বাদও চাই, তা' না হলে আমরা জীবনে সুখী হতে পারবো না। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেলো ইভানোভা। তার পর এক সময় ডুকরে কাঁদতে আরম্ভ করলো। কাঁদতে কাঁদতেই ফিরে গেলো ও।

এরপর থেকে গ্রিনেভ আর ইভানোভার জীবনের গতি অন্ত দিকে মোড় ফিরলো। দু'জনই দুজনকে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে লাগলো। কখনো দৈবাৎ সামনা সামনি দেখা হয়ে গেলেও কারো ব্যবহার দেখে এমন কথা মনে হবে না যে এরা কোনো দিন পরস্পরকে ভালো বেসেছিলো।

বেলোগরস্ক দুর্গের সমস্ত আকর্ষণই চলে গেছে গ্রিনেভের। এখন মনে হয় দূরে কোথাও বদলী হতে পারলেও মন্দ হয় না। কাব্য চর্চা ছেড়ে দিলো; লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে বললেই হয়। সারাক্ষণ নিজের কোয়ার্টারে চুপচাপ বসে কাটায়। কাজকর্মের প্রয়োজন ছাড়া ক্যাপটেনের সঙ্গেও বড়ো একটা কথা বলে না আর। তাঁর কোয়ার্টারে যাওয়া তো বন্ধই করে দিলো। ভ্যাসিলিসা মাঝে মাঝে দুঃখপ্রকাশ করেন ওদের জন্তে। এই ভাবেই কাটতে লাগলো।

ছয়

বেলোগরস্ক দুর্গের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়ে বিগত দুই যুগ ধরে চলছিল নানা উপজাতীয়দের উপদ্রব। দীর্ঘকাল যাবৎ ছোটো বড়ো বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে প্রকট হচ্ছিল ওদের অসন্তোষ। গ্রিনেভ বেলোগরস্ক দুর্গে এসে পৌঁছুবার কয়েক বছর আগেও রীতিমতো একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো। উপজাতীয়দের এই উপদ্রব দমন করবার জন্তেই এই অঞ্চলের সর্বত্র বিশ-পঁচিশ মাইল অন্তর ছোটো বড়ো দুর্গের বন্দোবস্ত করেছেন রুশ সম্রাট। বেলোগরস্কও এই ধরণেরই একটা দুর্গ। মাঝে মাঝে অবশ্য উপজাতীয়রা এমন ঠাণ্ডা হয়ে থাকতো যে সরকারী মহলের ধারণা হতো যে ওরা বশ্যতা স্বীকার করেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বংশপরম্পরা এই সমস্ত উপজাতীয় জনসমষ্টি রুশ সম্রাটের অত্যাচার অবিচারের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করে স্বাধীন হবার বাসনা পোষণ করে আসছে। এই সমস্ত উপজাতীয় উপদ্রব রুশ সরকার সাধারণত কসাক সৈন্তদের দ্বারাই দমন করে এসেছেন এতকাল। এবার সেই কসাকদের মধ্যেই দেখা দিলো বিদ্রোহের লক্ষণ।

একদিন সন্ধ্যার সময় গ্রিনেভ নিজের কোয়ার্টারে বসে ম্রিয়মাণ ভাবে শরতের আকাশে চাঁদ আর মেঘের লুকোচুরি দেখছিল। এমন সময় ক্যাপটেনের কোয়ার্টার থেকে একটি লোক এসে জানালো যে, ক্যাপটেন এখুনি ডেকে পাঠিয়েছেন।

গ্রিনেভ এসে দেখল ম্যাকসিমিচ, শাভরিন এবং আরো একজন অফিসার এর মধ্যেই এসে পড়েছে ক্যাপটেনের অফিসে। ক্যাপটেন গম্ভীর ভাবে অভিনন্দন জানিয়ে বসতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো।

ক্যাপটেন কম্পিত-কণ্ঠে জানালেন যে এইমাত্র ওরেনবুর্গের জেনারেলের কাছ থেকে চিঠি এসেছে। উনি জানিয়েছেন যে কিছুদিন হলো পুগাচেভ নামে একটি বিদ্রোহী-কসাক জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে লোকজন সংগ্রহ করে নানা ভাবে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। ইতিমধ্যেই সে কয়েকটি দুর্গ দখল করে নিয়েছে। বহু অনুগত সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করেছে। প্রচুর লুটপাট করেছে। কাজেই বেলোগরস্ক দুর্গ থেকে যেন তার যথাযোগ্য প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করা হয় এবং তার ধ্বংসের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়। জেনারেল আরো জানিয়েছেন যে পুগাচেভ নিজেকে রুশদেশের সম্রাট বলে দাবী করছে।

চিঠিখানা শেষ করে ক্যাপটেন বললেন—তোমরা বুঝতেই পারছো, অবস্থা কত গুরুতর। শয়তানটা নিশ্চয়ই বহু লোকজন জোগাড় করে ফেলেছে। আর আমরা এখানে মাত্র একশ' তিরিশজন।

ক্যাপটেন ম্যাকসিমিচকে আদেশ করলেন দুর্গের পাহারার বন্দোবস্ত করতে। ও কসাক হলেও বিশ্বস্ত। অন্য অফিসারদেরও ছেড়ে দিলেন ক্যাপটেন। খবরটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্যে বিশেষ করে বললেন।

কিন্তু দেখা গেলো কয়েক দিনের মধ্যেই খবরটা দুর্গের সবাই জেনে ফেলেছে। ভ্যাসিলিসার কাছ থেকে জেনেছেন ফাদার গেরাসিমের স্ত্রী। এবং তারপর ক্রমশ অন্য সবাই। দুর্গের কসাক সৈন্যদের দেখা গেলো আড়ালে আবডালে কানাঘুষো করে বেড়াচ্ছে। যে কসাক অফিসার ম্যাকসিমিচকে ক্যাপটেন সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সে চরম অবিশ্বাসী। কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত ভুল সংবাদ দিলো ক্যাপটেনকে—ওকে পাঠানো হয়েছিলো পুগাচেভ সম্বন্ধে আসল সংবাদ সংগ্রহ করে আনবার জন্যে। দু'দিন পরে ও এসে জানালো সে, পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে সে বা তার দলের কেউ নেই। কিন্তু পরে শোনা গেল পুগাচেভ তার দলবল নিয়ে বেলোগরস্ক দুর্গ আক্রমণের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। আরো জানা গেলো যে ম্যাকসিমিচ পুগাচেভের তাঁবুতে গিয়ে তার কাছে নিজের আনুগত্য জানিয়ে এসেছে। দুর্গে ফেরবার পর ক্যাপটেন ম্যাকসিমিচকে বন্দী করবার হুকুম দিলেন। বন্দী তাকে করাও হ'লো, কিন্তু ও শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনার ফলে বেলোগরস্ক দুর্গে উত্তেজনার সঞ্চার হ'লো। পুগাচেভের একটি গুপ্তচর ধরা পড়লো। সত্তর বছরের একটি বৃদ্ধ উপজাতীয় ইস্তাহার বিলি করছিলো এ অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে, এমন সময় ধরা পড়লো সে। আগের কোনো বিদ্রোহের সময় সরকার ওর নাক, কান এবং জিভ কেটে সাজা দিয়েছিলেন। অনেক ধমকে ওর কাছ থেকে কোনোই খবর জানা গেলো না। শুধু ইস্তাহার পাওয়া গেলো ওর কাছ থেকে। এই ইস্তাহারে পুগাচেভ সামরিক-অসামরিক সবাইকে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হতে পরামর্শ দিচ্ছে।

এই ইস্তাহারখানা সাধারণের ভেতর বিশেষ করে কসাকদের ভেতর দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগে এখন কি কর্তব্য সেই সম্পর্কেই ক্যাপটেন পরামর্শ করছিলেন তাঁর অফিসারদের সঙ্গে। এমন সময় ভ্যাসিলিসা হুড়মুড় করে এসে ঢুকলেন সেই ঘরে।

—কি ব্যাপার? বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন।

—খুব খারাপ খবর, কাঁপতে কাঁপতে ভ্যাসিলিসা বললেন, এইমাত্র ফাদার গেরাসিম-এর চাকর খবর নিয়ে এসেছে। আজ সকালেই পুগাচেভ লোয়ার লেক দুর্গ দখল করেছে। সব অফিসারদের ফাঁসী দিয়েছে ওরা, সমস্ত সেনাবহিনীকে বন্দী করেছে। শয়তানগুলো এবার আমাদের দিকে আসছে।

খবরটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলো গ্রিনেভ। লোয়ার লেক দুর্গের ক্যাপটেনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো ওর। মাত্র মাস দুই আগে ওরেনবুর্গ থেকে ফেরবার পথে উনি এখানে কাটিয়ে গেছেন একদিন। লোয়ার লেক দুর্গ এখান থেকে মাত্র বিশ-বাইশ মাইল হবে। তাই গ্রিনেভের মনে হ'লো এবার সত্যি সত্যি যে কোনো মুহূর্তে পুগাচেভ তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বেলোগরস্ক-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এই সম্ভাবনার কথা মনে হতেই গ্রিনেভ বিশেষ করে আশঙ্কিত হয়ে পড়লো ইভানোভা সম্বন্ধে।

—বলাই বাহুল্য ক্যাপটেন, গ্রিনেভ দৃঢ়ভাবে বললো, আমরা প্রত্যেকে যে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করবো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে যে সব মহিলারা আছেন তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভাবা দরকার। ওরেনবুর্গে যাবার পথ এখনো নিরাপদ আছে মনে হয়। কাজেই সেখানেই হ'ক বা দূরের অন্য কোনো দুর্গে ওঁদের পাঠানো ভালো।

—বিদ্রোহীদের ঝামেলা যে ক'দিন না মিটছে, সে কটা দিন তোমরা অন্য কোথায়ও কাটিয়ে আসবে, কি বলো? স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন বললেন।

—কি যে বলো! ভ্যাসিলিসা বললেন, বেলোগরস্ক দুর্গ কম নিরাপদ কিসে? বাইশ বছর কাটালাম আমরা এখানে। বাস্ কয়েক উপজাতীয়দের উপদ্রবও ঠাণ্ডা করলাম। পুগাচেভকেও আমরা নিশ্চয়ই দমন করতে পারবো।

—বেশ তুমি থাকতে চাও থাকো, ক্যাপটেন বললেন, কিন্তু ইভানোভা? যদি আমরা হেরেই যাই? না না, ইভানোভার কোনো মতেই থাকা চলবে না এখানে। ওকে ওরেনবুর্গে যেতে হবে।

—বেশ, তা পাঠাতে চাও পাঠাও, জড়িতকণ্ঠে বললেন ভ্যাসিলিসা কিন্তু আমাকে এখান থেকে যেতে বলো না। বললেও আমি যাবো না। এতো কাল আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি, এখন এই বুড়ো বয়সে, মরতে যদি হয়ই তো একসঙ্গে এক জায়গায় থেকেই মরবো।

ভ্যাসিলিসাকে অন্যত্র পাঠানো যাবে না বুঝতে পেরে ক্যাপটেন শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন ওঁকে বেলোগরস্ক দুর্গেই রাখবার জন্যে। কিন্তু সাব্যস্ত হলো যে, ইভানোভাকে কাল সকালেই ওরেনবুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সমস্ত অফিসারদের জন্যই সেদিন রাতে ক্যাপটেনের কোয়ার্টারে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সবাই খাবার টেবিলে যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় বসলো। একটু পরে ইভানোভাও তার জায়গায় এসে বসলো। সেদিন খাবার টেবিলে বসে কেউই আর স্বাভাবিক ভাবে

পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের
সমাধি-মন্দির
(কাশীপুর মহাশ্মশান)

আলোকচিত্র
—তারকনাথ ঘোষ
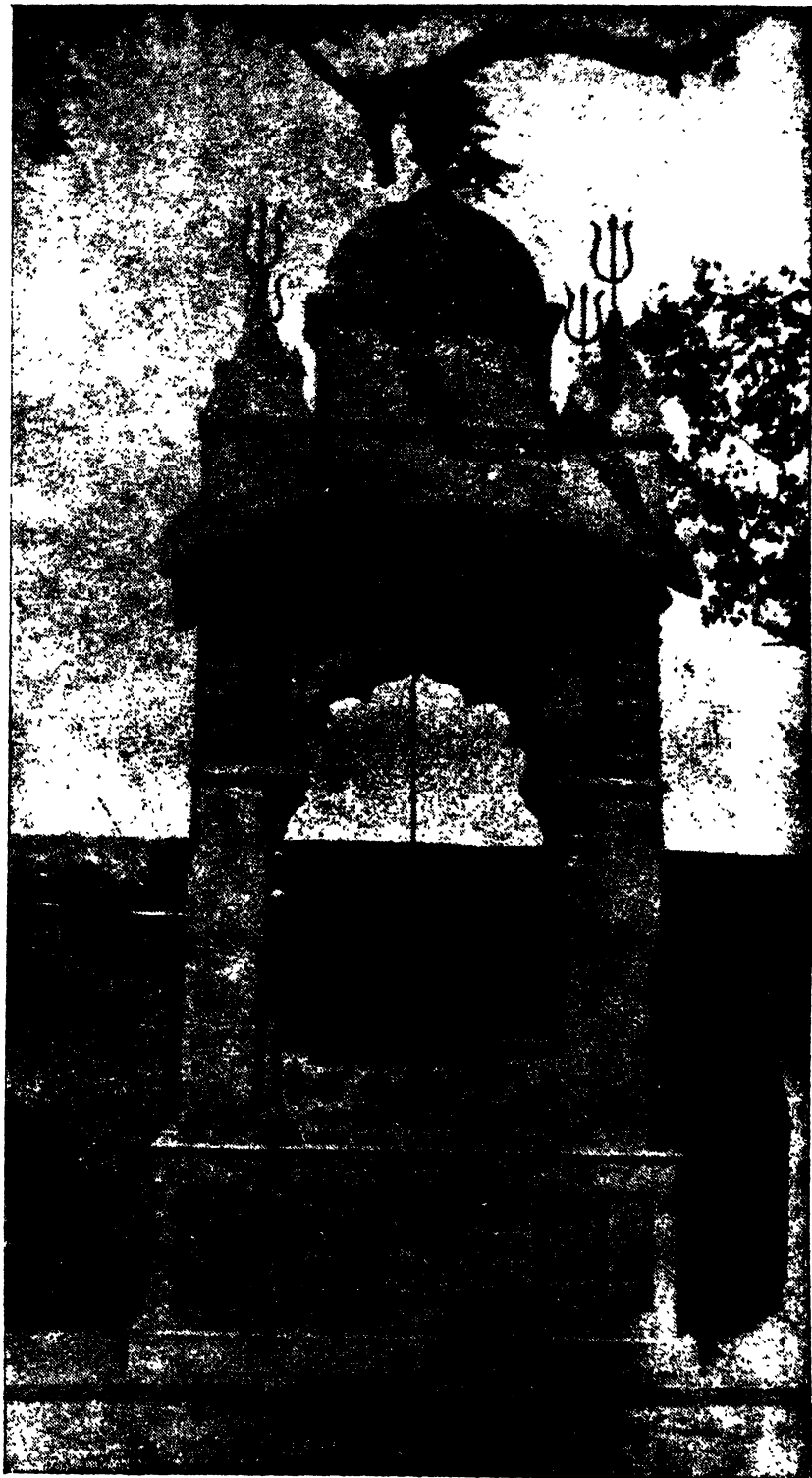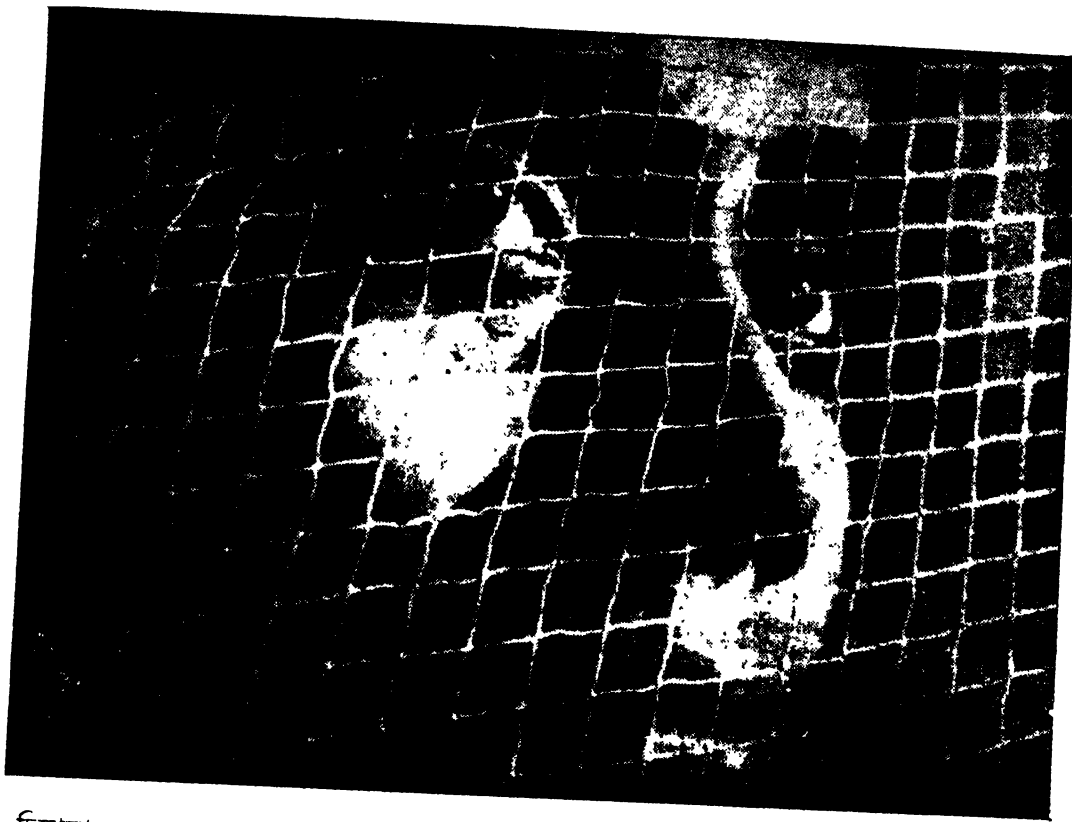
চিন্তাজাল

—কনক দত্ত

শালিমার উদ্যান (কাশ্মীর)

—সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
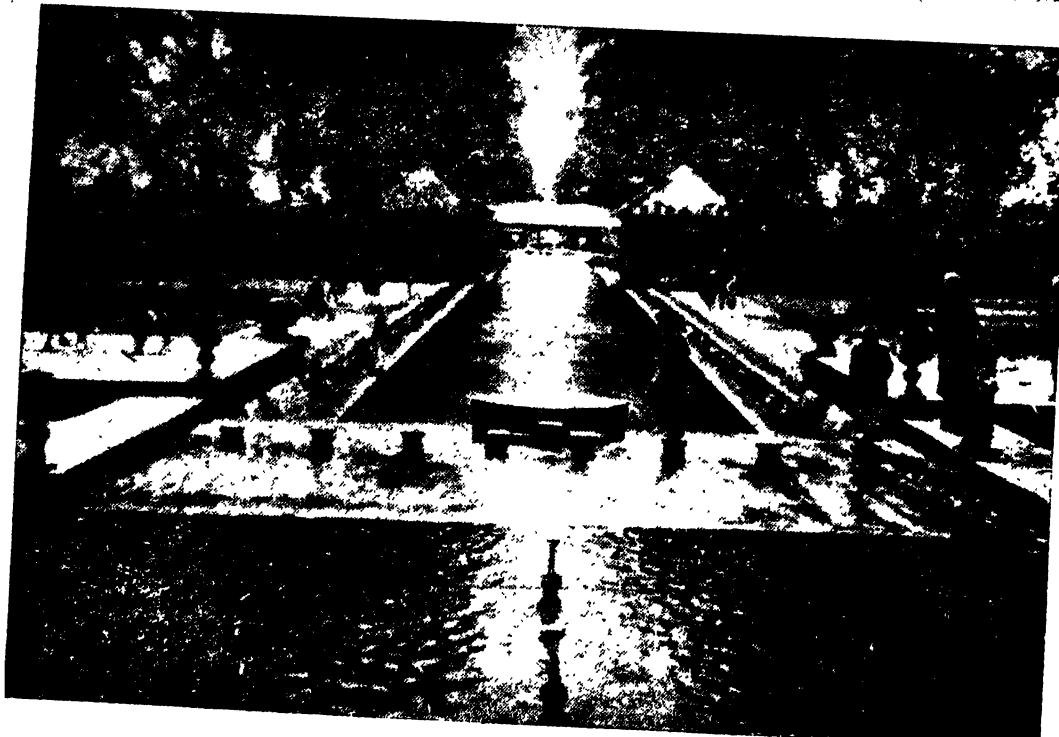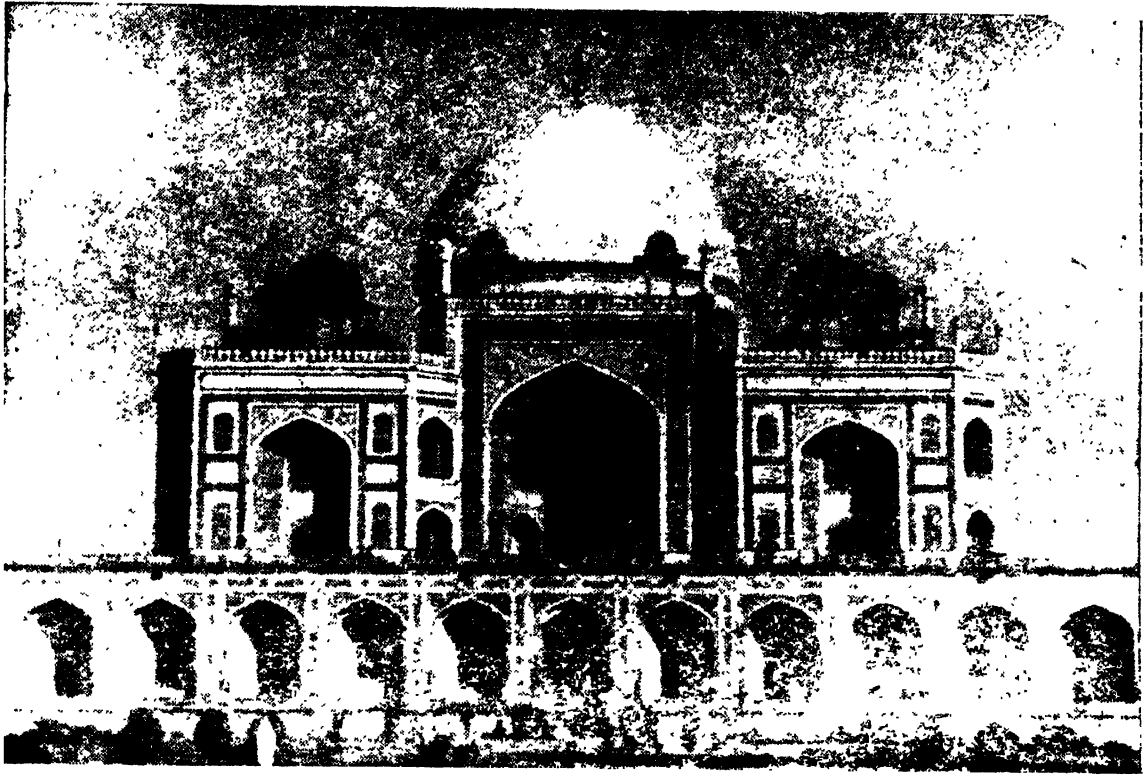
ায়ুনের সমাধি

—বিশ্বনাথ বিশ্বাস

পূজারিণী

—না। ওরেনবুর্গে যাবার আর কোনো পথ খোলা নেই। আমাদের দুর্গ পুগাচেভের দলবল ঘিরে ফেলেছে। অবস্থা খুবই খারাপ।

ইগনাটিচ আর গ্রিনেভ উঁচু ঢিবিটার ওপর এসে পৌঁছলো। দুর্গের প্রায় সকলেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সৈন্যবাহিনী রাইফেল নিয়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরী। কামানটা আগের দিনই আনা হয়েছে এখানে। সৈন্যবাহিনী বলা হয় যদিও কিন্তু মোট সংখ্যা দু'শয়েরও কম। ক্যাপ্টেন এদিক-ওদিক ঘুরে বার বার দেখলেন সব ঠিক আছে কিনা! দুর্গের সীমানার বাইরে দূরের মাঠে পুগাচেভের অশ্বারোহী সাঙ্গোপাঙ্গরা ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে। বেশীর ভাগই কসাক।

ক্যাপটেন তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আজ আমাদের সামনে সৈনিকের পবিত্র কর্তব্য পালনের মুহূর্ত উপস্থিত। মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর একান্ত অনুগত এবং বিশ্বস্ত সৈনিক আমরা, তাঁর রাজ্য এবং মর্যাদা রক্ষা করবই।

সৈন্যগণ সোল্লাসে ক্যাপটেনের কথায় সমর্থন করলো। শাভরিন গ্রিনেভের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ও দেখছিল দূরে শত্রুদের গতিবিধি। পুগাচেভের দলবল দুর্গের উঁচু ঢিবির ওপরকার ব্যাপার সব লক্ষ্য করছিল, এবং দেখলেই বোঝা যায় ওরা এই সমস্ত ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছিল।

ক্যাপটেন ইগনাটিচকে বললেন পুগাচেভের দলবল লক্ষ্য করে কামান প্রস্তুত করতে। উনি নিজেই পলতেটা ধরিয়ে দিলেন। কামানের গোলাটা পুগাচেভের অশ্বারোহীদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে গেলো ওরা।

ঠিক এই সময়েই ইভানোভাকে নিয়ে ভ্যাসিলিসা এলেন উঁচু ঢিবিটার ওপর।—যুদ্ধ কেমন চলছে? শত্রুরা কোথায়? উনি বললেন।

—শত্রুরা কাছেই আছে, ক্যাপটেন বললেন স্ত্রীকে, তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—ভয় করছে?

—না, বাবা। ঘরের মধ্যে একা একা থাকতে আমার ভয় করছিলো। কথাটা বলে গ্রিনেভের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ইভানোভা একবার চেষ্টা করলো মুখচোখে একটু হাসির ভাব আনবার।

নিজের অজ্ঞাতসারে তরোয়ালখানায় হাত ঠেকে যাওয়াতে হঠাৎ গ্রিনেভের মনে হলো যে কাল রাতে ইভানোভাই এখানা হাতে তুলে দিয়েছিলো। সে কি ওকেই রক্ষা করবার জন্যে?

আবার মাঠের মাঝখানে প্রায় আধ মাইল দূরে দেখা দিলো পুগাচেভের দলবল। এবার সংখ্যায় ওরা আগেরবারের চাইতে অনেক বেশি মনে হ'লো। বেশির ভাগই অশ্বারোহী। তরোয়াল, তীর-ধনুক আর বল্লম ওদের হাতে। এদের মাঝখানে একটি সাদা ঘোড়ার ওপর লাল পোষাক পরা পুগাচেভ নিজেও রয়েছে দেখা গেলো।

পুগাচেভ তার বাহিনী নিয়ে আর এগুলো না। কিন্তু বোঝা গেলো ওর আদেশে চারজন অশ্বারোহী তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে লাগলো দুর্গের দিকে। খানিকটা এগিয়ে আসতে চেনা গেলো ওদের। যে বিশ্বাসঘাতক কসাক সৈন্যরা গতরাতে পালিয়ে গেছে দুর্গ থেকে—এরা তাদেরই চারজন।

—গুলি করো না। সম্রাট এসেছেন। তোমরা সবাই দুর্গের বাইরে এস। কসাক চারজন দুর্গের বাইরে থেকে চীৎকার করে বললো। ওদের মধ্যে একজন একটা বল্লম ছুঁড়ে মারলো উঁচু ঢিবিটা লক্ষ্য করে। দেখা গেলো বিশ্বস্ত য়ুলাইয়ের কাটা মাথাটা বেঁধানো রয়েছে বল্লমের ডগায়।

ক্যাপটেনের আদেশে সৈন্যরা গুলি ছুঁড়লো বিদ্রোহী কসাকদের লক্ষ্য করে। একজন কসাক লুটিয়ে পড়লো ঘোড়া থেকে। অন্য তিনজন জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেলো।

সৈন্যদের গুলির আওয়াজ শুনে আর য়ুলাইয়ের কাটা মাথাটা দেখে ইভানোভা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো।

—মেয়েদের এখানে থাকা উচিত নয়, স্ত্রীকে লক্ষ্য করে ক্যাপটেন বললেন, ভ্যাসিলিসা মেয়েকে নিয়ে তুমি যাও এখান থেকে।

—হ্যাঁ, বাবো, ধরা গলায় বললেন ভ্যাসিলিসা, বাঁচা মরা এখন ভগবানের হাতে। মেয়েকে আশীর্বাদ করো তুমি।

ইভানোভা হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলো বাবাকে। ক্যাপটেন আশীর্বাদ করলেন মেয়েকে। ও কাঁদতে লাগলো। ভ্যাসিলিসাও কাঁদতে লাগলেন। তারপর চলে গেলেন মেয়েকে নিয়ে।

ওদিকে মাঠের মধ্যে দেখা গেলো পুগাচেভের দলবল অকস্মাৎ ঘোড়া থেকে নামতে আরম্ভ করলো।

ক্যাপটেন বললেন—সবাই হুঁশিয়ার। ওরা এখুনি আক্রমণ শুরু করবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বিদ্রোহীরা বিকট চীৎকার করতে করতে ছুটে আসতে লাগলো দুর্গের দিকে। একটি কামানের গোলা ওদের মাঝখান লক্ষ্য করে দাগা হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো ওরা। কিন্তু পুগাচেভকে দেখা গেলো। চীৎকার করে আবার সবাইকে এক করবার জন্যে চেষ্টা করছে। নানাভাবে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করছে পলায়নপর বিদ্রোহীদের।

—এবার দুর্গের দরজা খোলো, ড্রাম পেটাও, ক্যাপটেন সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি আগে-আগে যাচ্ছি, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো।

গ্রিনেভ আর ইগনাটিচ সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়ালো ক্যাপটেনের পেছনে। কিন্তু আর কোনো অফিসার বা সৈনিক এক চুলও নড়লো না। ক্যাপটেন উত্তেজিত হয়ে বললেন—তোমরা এগিয়ে এসো, মরতে তো আমাদের হবেই একদিন।

কিন্তু একথায়ও কোনোই সুফল হলো না। উপরন্তু সৈন্যরা সবাই অস্ত্র ত্যাগ করলো। আর ঠিক সেই সময়ই পুগাচেভের দলবল হুড়মুড় করে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো। গ্রিনেভ ধাক্কার চোটে ছিটকে পড়লো, তারপর আবার উঠে ভিড়ের মধ্যেই এগোতে লাগলো। ক্যাপটেন পড়ে গিয়ে দারুণ আঘাত পেলেন মাথায়। গ্রিনেভ ক্যাপটেনকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু একজন কসাক বেঁধে ফেললো ওকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা বেলোগরস্ক দুর্গ পুগাচেভের দখলে চলে গেলো।

ক্যাপটেনের কোয়ার্টারের সামনে ফাঁকা জায়গাটাতে পুগাচেভ তার দরবার বসালো। দলে দলে বন্দী সৈন্যরা এসে আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগলো ওর কাছে। ক্যাপটেন, ইগনাটিচ এবং গ্রিনেভকেও বেঁধে এনে দাঁড় করানো হলো। পুগাচেভের মুখখানা গ্রিনেভের চেনা মনে হলো।

—এ দুর্গের কর্মকর্তা কে? পুগাচেভ ভিড়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

বিশ্বাসঘাতক ম্যাকসিমিচ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো ক্যাপটেনকে।

—আমি তোমার সম্রাট, আমাকে তুমি বাধা দিচ্ছিলে? ক্যাপটেনকে লক্ষ্য করে পুগাচেভ বললো।

আঘাতের যন্ত্রণায় কাতর ক্যাপটেন দৃঢ়ভাবে বললেন—তুমি মোটেই সম্রাট নও, তুমি একটি সাধারণ চোর, একটি শয়তান।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুগাচেভ তার হাতের সাদা রুমালখানা একবার নাড়ালো। তারপর একদল কসাক টলতে টলতে ক্যাপটেনকে নিয়ে গেলো সদ্য তৈরী ফাঁসি কাঠের কাছে। নাক-কান হীন যে বৃদ্ধ উপজাতীয়টি এক সময় গুপ্তচর হিসেবে ধরা পড়েছিল সে-ই এসে ফাঁসের দড়িটা পরিয়ে দিলো ক্যাপটেনের গলায়। নিমেষের মধ্যে ক্যাপটেনের শরীরটা শূন্যে উঠে ঝুলতে লাগলো।

ইগনাটিচ আনুগত্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করলো। পুগাচেভের নির্দেশে তাকে ফাঁসি দেওয়া হলো।

এবার গ্রিনেভের পালা। গ্রিনেভ নির্ভয়ে চোখ তুলে দৃঢ়ভাবে একবার তাকালো পুগাচেভের দিকে। ক্যাপটেন এবং ইগনাটিচের মতো ও আনুগত্য প্রকাশে অসম্মতিসূচক কথাগুলি বলতে যাবে, ঠিক এমনি সময় অবর্ণনীয় বিস্ময়ে ও বাক্যহারা হয়ে গেলো। ও দেখলো শাভরিন পুগাচেভের পরামর্শদাতাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কসাকদের পোষাক পরেছে ও, কসাকদের কায়দায় চুল ছেঁটেছে। গ্রিনেভকে ফাঁসি কাঠের দিকে টেনে আনতেই ও চট করে পুগাচেভের কাছে গিয়ে তার কানে কানে যেন কি বললো। আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনেভকে কোনোরকম কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, এমন কি একবার ওর দিকে না দেখেই পুগাচেভ হুকুম দিলো—ওকে ঝুলিয়ে দাও।

গ্রিনেভ পবিত্র চিত্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে সুরু করলো। কাতরভাবে মিনতি জানাতে লাগলো সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্যে এবং প্রিয়জনকে রক্ষা করবার জন্যে।

ফাঁসির দড়ি ওর গলায় পরানো হলো। এমন সময় কার চীৎকারে সকলে হকচকিয়ে উঠলো,—থাম, ওরে পাপিষ্ঠরা তোরা থাম বলছি। পুগাচেভও হকচকিয়ে উঠলো।

গ্রিনেভ ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখলো স্যাভেলিচ পুগাচেভের পা জড়িয়ে ধরে অনুনয় জানাচ্ছে—আপনি দয়াময়, এই ছেলেটাকে ছেড়ে দিন, আমার মালিকদের একমাত্র সন্তান। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমি আপনাদের অনেক ধনদৌলত পাইয়ে দেবো। ওর বদলে না হয় আমাকে ঝোলাবার হুকুম দিন। আপনি দয়াময়।

পুগাচেভের ইঙ্গিতে গ্রিনেভকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ওর বাঁধন খুলে টানতে টানতে এনে হাজির করা হলো পুগাচেভের কাছে। কসাকরা বলতে লাগলো সম্রাট তোমাকে মার্জনা করলেন।

পুগাচেভ নিজের একখানা হাত বাড়িয়ে দিলো গ্রিনেভের দিকে। কসাকরা চেঁচাতে আরম্ভ করলো—সম্রাটের হাতে চুমো দাও। গ্রিনেভের মনে হলো এর চাইতে ফাঁসি ঝোলাও অনেক ভালো ছিলো।

—গোঁয়ারতুমি করো না, দাও না একটা চুমো ব্যাটার হাতে। ফিস ফিস করে স্যাভেলিচ বললো। কিন্তু গ্রিনেভ চুমো তো দিলোই না পুগাচেভের হাতে, এমন কি তার কোনও ইচ্ছেও প্রকাশ হলো না ওর হাবভাবে।

—প্রাণে বেঁচে যাওয়ার আনন্দে ও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। ছেড়ে দাও ওকে। পুগাচেভ কথাটা বলে নিজের হাত সরিয়ে নিলো।

বেলোগরস্ক দুর্গ এবং আশেপাশের অধিবাসীরা একের পর এক এসে আনুগত্য জানিয়ে যেতে লাগলো পুগাচেভের কাছে। দুর্গের সৈন্যসামন্তদের মার্জনা করে পুগাচেভ তার দলভুক্ত করে নিলো। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেলো এ সমস্ত।

পুগাচেভ এবার তার আসন থেকে উঠলো। ওর সর্দার পরামর্শদাতারাও উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পুগাচেভ ফাদার গেরাসিমকে জানালো যে আজ দুপুরে তাঁর বাড়ীতেই ও খাওয়াদাওয়া করবে। ঠিক এমনি সময়ে নারী কণ্ঠের আর্তনাদে চমকে উঠলো সবাই। পুগাচেভের দলের কয়েকটা ষণ্ডামার্কা লোক ভাসিলিসাকে টেনে হিঁচড়ে এইদিকে নিয়ে আসছে দেখা গেলো। ভ্যাসিলিসার পরিধের বসনের কিছুই নেই, চুল আলুথালু, উন্মাদ-প্রায়। দেখা গেলো ক্যাপটেনের কোয়ার্টার থেকে দলে দলে কসাকরা বেরিয়ে আসছে। কারো হাতে তোষক, কারো হাতে দামী পোষাক, কেউ বা ফুলদানীটা নিয়ে। যে যা পেয়েছে লুট করে এনেছে।

—ভদ্রমহোদয়গণ, কাঁদতে কাঁদতে কাতর ভাবে মিনতি করে বলতে লাগলেন ভাসিলিসা, আমাকে আপনারা দয়া করে শান্তিতে মরতে দিন। আমাকে দয়া করে আমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিন। কথা বলবার পরেই ভাসিলিসার নজরে এলো ক্যাপটেনের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ে রয়েছে ফাঁসিকাঠের গোড়ায়। মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে

স্বামীর নিষ্প্রাণ দেহের দিকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে উঠলেন ভ্যাসিলিসা, হত্যাকারীর দল, নরকের কীট, তোরা এ কি করেছিস? হে ভগবান! এ আমি কি দেখছি? বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন ভ্যাসিলিসা, হায় স্বামী! প্রুশিয়ার সৈন্যবাহিনীর বেয়োনেট তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তুর্কীদের গুলী তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। কশিয়ার যুদ্ধে তোমার প্রাণ যায়নি, শেষ পর্যন্ত একটা জেল-ভাঙা চোরের হাতে তোমার প্রাণ গেলো।

ভ্যাসিলিসার বিলাপে চারদিকে চঞ্চলতা দেখা দিলো। কিন্তু তখুনি হুকুম করলো পুগাচেভ—ওটাকে শেষ করো। সঙ্গে সঙ্গে পুগাচেভের দলভুক্ত একটি কসাক তার তলোয়ার দিয়ে ভ্যাসিলিসার মাথাটা দু'ভাগ করে ফেললো। ওঁর নিষ্প্রাণ দেহটা লুটিয়ে পড়লো স্বামীর বুকের।

আট

কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে বেলোগরস্ক দুর্গে যে তোলপাড় কাণ্ড ঘটে গেলো তা সব চেষ্টা করেও ঠিক ঠিক স্মরণে আনতে পারে না গ্রিনেভ। কিছুটা সত্যি, কিছুটা স্বপ্ন, আর কিছুটা নিছক কল্পনা মনে হতে লাগলো। এবং এ সবের মাঝে একটা চিন্তা ক্রমাগতই ওকে পীড়ন করতে লাগলো। সে হলো ইভানোভার চিন্তা। কি হ'লো তার? বেঁচে আছে তো? এতো সব ডামাডোলের মধ্যে সে কি কোথায়ও লুকিয়ে থাকতে পেরেছে?

এই সমস্ত ভাবতে ভাবতেই গ্রিনেভ এসে ক্যাপটেনের কোয়ার্টারে পৌঁছলো। ক্যাপটেনের কোয়ার্টার একেবারে তছনছ করে ফেলেছে শয়তানগুলো। যে যতদূর পেরেছে সে তো নিয়েই গেছে, বাদবাকী আর সব যে ইচ্ছে করেই নষ্ট করা হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়। গ্রিনেভ একে একে প্রত্যেকটি ঘরে খুঁজলো ইভানোভাকে। ইভানোভার নাম ধরে কাঁদতে লাগলো গ্রিনেভ। এমনি সময় আড়াল থেকে ক্যাপটেন পরিবারের পরিচারিকা পালাসার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—কী দুর্ভাগ্য। কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলো ও—কী সর্বনাশা দিন।

—ইভানোভা কোথায়, অধৈর্যভাবে জিজ্ঞাসা করলো গ্রিনেভ, তার কি হয়েছে?

—সে বেঁচে আছে। ফাদার গেরাসিমের বাড়ীতে লুকিয়ে আছে।

—সর্বনাশ। ভয়ে চীৎকার করে উঠলো, পুগাচেভ ব্যাটা নিজেই যে সেখানে রয়েছে।

দু'জনে ছুটতে ছুটতে ফাদার গেরাসিমের বাড়ীর কাছে এসে থামলো। ভেতরে গিয়ে ফাদার গেরাসিমের স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এলো।

ফাদার গেরাসিমের স্ত্রী বললেন—ইভানোভা এখন পর্যন্ত নিরাপদেই আছে। একবার ও আমার ঘরের ভেতরে কেঁদে উঠেছিলো তখন সবে শয়তানগুলি খেতে বসেছে। পুগাচেভ নিজেই জিজ্ঞাসা করলো কে কাঁদছে ভেতরে? আমি বললাম, আমার ভাই-ঝি আজ সাতদিন ধরে ওর অসুখ। কথাটা যখন বলছিলাম শাভারিন তখন শয়তানের মতো একবার তাকালো আমার দিকে। তবু বা হ'ক ফাঁস করে দেয়নি কিছু।

ফাদার গেরাসিমের স্ত্রীর মুখের কথা শুনে কিছুটা শান্ত হয়ে নিজের কোয়ার্টারে ফিরলো গ্রিনেভ।

দরজার কাছেই দেখা হলো স্যাভেলিচের সঙ্গে। ও বললো—কোথায় ছিলে এতক্ষণ, আমি তো ভেবে অস্থির। মনে হলো আবার যদি শয়তানগুলো ধরে তোমাকে। ব্যাটাকে চিনতে পেরেছো তো?—পুগাচেভ ব্যাটার কথা বলছি।

—না। তবে মুখটা যেন চেনা মনে হয়। ও কে?

—এরই মধ্যে ভুলে গেলে। এই সেদিন তো নতুন কোটটা দিয়েছিলে ওকে। মনে নেই, সেই যে লোকটা ঝড়ের মধ্যে আমাদের সরাইখানার পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলো? সেই হতচ্ছাড়া মাতালটাই পুগাচেভ।

গ্রিনেভ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলো।

এমনি সময় একজন কসাক এসে খবর দিলো গ্রিনেভকে, পুগাচেভ এখুনি ডাকছে।

ক্যাপটেনের কোয়ার্টার নতুন করে সাজানো হয়েছে, সেইখানেই আছে এখন পুগাচেভ। গ্রিনেভ এসে দেখলো পুগাচেভ মদে চুর হয়ে আছে।

—খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, তাই না? বেহায়ার মতো এক গাল হেসে পুগাচেভ বললো—আমার লোকজন যখন ফাঁসির দড়িটা তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলো? তোমাকে ঝুলেই পড়তে হতো, যদি না তোমার বুড়ো চাকরটা এসে পড়তো। তুমি কি ভাবতে পারো একদিন সম্রাট স্বয়ং দুর্যোগের রাতে তোমাকে সরাইখানায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। তুমি আমার যে রকম বিরোধিতা করেছো তাতে তোমাকে ঝুলিয়েই দিতাম যদি না চিনতে পারতাম তোমাকে। অসময়ে শীতের মধ্যে একটা কোট দিয়ে তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছিলে। সেইজন্যেই বাঁচতে দিলাম তোমাকে। আমার রাজত্ব ফিরে পাবার পর তোমার জন্যে আমি আরো অনেক কিছুই করবো। তোমাকে ফিল্ড-মার্শাল করে দেবো আমি। আমার সঙ্গে থেকে বিশ্বস্ত কর্মচারীর মতো চলবে তো তুমি?

পুগাচেভের কথা শুনে গ্রিনেভ চেষ্টা করেও হাসি চাপতে পারলো না।

—হাসছো যে? ধমকে উঠলো পুগাচেভ, তুমি কি বিশ্বাস করো না যে, আমি রাশিয়ার সম্রাট?

গ্রিনেভ এ কথার কোনো সরাসরি জবাব দিলো না, কিন্তু হাসিটা থামালো।

—তবে কি মনে হয় তোমার? গর্জে উঠলো পুগাচেভ, আমি কে।

—ঈশ্বর জানেন আপনি কে, গ্রিনেভ শান্ত কিন্তু স্পষ্টভাবে বললো—তবে একথা ঠিক যে আপনি খুব ভয়ঙ্কর একটা খেলা খেলছেন। আপনি যদি সত্যি আমার জন্যে কিছু করতে চান তো বলবো, আমাকে দয়া করে ওরেনবুর্গে যেতে দিন।

—বেশ তাই হবে, মেজাজের সঙ্গে বললো পুগাচেভ, আমি যাকে সাজা দেই, তাকে চরম সাজাই দেই, আর যাকে মার্জনা করি, সম্পূর্ণই মার্জনা করি। তোমার যেথানে খুশী যেতে পারো, আমার হুকুম। কেউ বাধা দেবে না। কাল সকালেই আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে, সকালবেলা দুর্গের সামনে থেকো।

কোয়ার্টারে ফিরে গ্রিনেভ নিজের সম্পূর্ণ মুক্তির কথা বললো স্যাভেলিচকে। ও উল্লসিত হয়ে উঠলো। বললো—কালকেই এখান থেকে চলে যাবো আমরা। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

অনুবাদক—সুনীলকুমার নাগ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাগ্মি দেবী

সারাটা রাত কেমন যেন একটা নেশার ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ঘুম নয়, আবার জেগেও ছিলাম না। একটা যন্ত্রণাময় সুপ্তির আবর্তের মধ্যে ডুবে ডুবে নাকানি চোবানি খাচ্ছিলো যেন আমার দৈহিক ও মানসিক সত্বাগুলো। মাঝে মাঝে কপালে আর মাথায় অনুভব করেছি, ঠাণ্ডা নরম হাতের স্পর্শ। বোধ হয় শান্তাদি হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। সকাল হতেই তিনি মহা ব্যস্ত হয়ে বললেন—এখানে কে ভালো ডাক্তার আছেন, যোগলেকার কল দাও,—আমি বড্ড ভয় পাচ্ছি যে।

খুকির নিশ্চই কোনো অসুখ করেছে। সারারাত ও যে কি ভয়ানক ছটফট করেছে। একদিনেই মেয়ের কি চেহারা হয়ে গেছে।

আমি প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললাম—না, না, শান্তাদি। কাল আমার বড্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিলো তাই। আজ আমি বেশ ভালোই আছি।

বেলা আটটায় সুব্রত জাহাজে উঠলো। আমরা গিয়েছিলাম ওকে সি অফ করতে।

বারে বারে চোখ মুছলেন শান্তাদি। সুব্রতকে অনুরোধ করলেন নিয়মিত চিঠি দেবার জন্য।

—কৈ তুমি তো কিছু বললে না রমি। আমাকে বললো সুব্রত। লজ্জা পেলাম ওর কথায়। সত্যিই এসময়ে কিছু বলা উচিত, সে খেয়ালই ছিলো না আমার।

একটু হাসির সঙ্গে বললাম: একটা কেষ্ট বিষ্টু গোছের কিছু হয়ে নিরাপদে ফিরে আসুন।

কমলেশ উচ্ছ্বসিত ভাষায় জানালো ওকে বিদায় সম্ভাষণ,—যোগলেকার জানালো দু-এক কথায়।

ধীরে ধীরে জাহাজ ছেড়ে দিলো।

হোটেলে ফিরে এসে বড় বেশী ক্লান্তি অনুভব করলাম। এক কাপ কফি খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। হৈ, চৈ, করে উঠলো কমলেশ।

—এ কি। বিদেশে এসে অমন শুয়ে বসে থাকলে শরীর খারাপ হবেই তো। উঠুন, উঠুন। চলুন আজ পেরেঙ্গেল কুঠি যাওয়া যাক। এখান থেকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হবে। কি চমৎকার। পাহাড় বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা—ড্যাম্ আছে, ঝরণা আছে, বিউটিফুল জায়গা। চালাকুঠিতে আমার এক বন্ধুকেও পাওয়া যাবে। আমাদের লাঞ্চগুলো টিফিন-কেরিয়ারে ভরে দিতে বলেছি ম্যানেজারকে, হোটেলের গাড়ীটাও পাওয়া যাবে। নিন, নিন চটপট রেডি হওয়া চাই।

হায়, হৃদয়হীনা নারী। তুমি কেমন করে বুঝবে যে, তোমারই বিষাক্ত ছোবলে মন-প্রাণ আমার কি যাতনায় জর্জরিত হয়ে আছে।

পেরেঙ্গেল কুঠি তো দূরের কথা। পৃথিবীর যে কোনো সৌন্দর্য্য, বিখ্যাত স্থান আর নিকৃষ্ট স্থান আজ আমার কাছে সমান। যোগ্‌লেকার আর কমলেশ একত্র যেখানে সেই জায়গা যে আমার কাছে বিভীষিকা।

—না, না, আমি বড় অসুস্থ সেজন্য আপনার প্রস্তাবে রাজি হতে পারছি না, ক্ষমা করবেন। আপনারা তিনজনে যান, আমি বরং খানিকটা ঘুমোবার চেষ্টা করি। শুয়ে শুয়েই জবাব দিলাম আমি।

শান্তাদি বললেন—ওকে একলা ফেলে আমিও যাবো না—আর তা ছাড়া কাল পায়ে কাঁটা ফুটে জায়গাটা বড্ড ব্যথা হয়ে আছে, সেজন্য আজকের দিনটা সম্পূর্ণ রেষ্ট নেব ঠিক করেছি। এই তো চাইছিলো কমলেশ কাপুর।

ওঘরে চেয়ারে বসে কফি খাচ্ছিল যোগ্‌লেকার। দুটি ঘরের মাঝের দরজাটি খোলাই ছিলো।

কমলেশ ছুটে গেলো ওর কাছে। ওর দুটি কাঁধে হাত রেখে আবদারের সুরে বললো—আপনি?—আপনিও কি যাবেন না মিষ্টার যোগলেকার?—ইস্—আমি যে সব ঠিক করলাম,—এই সব আয়োজন মাটি হয়ে যাবে? বড্ড খারাপ লাগবে তাহলে।—আপনারা অবশ্য দুদিন বাদে যেতে পারবেন, কিন্তু আমার তো আর মাত্র দু'দিন ছুটি আছে। আমিই বাদ পড়লাম আর কি।

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালো যোগলেকার। গম্ভীরভাবে বললো—আমি প্রস্তুত। চলুন।

তারপর এ ঘরে এসে শান্তাদিকে বললো সে;—যদি ডাক্তারের প্রয়োজন হয়, ম্যানেজারকে বললেই, ফোন করে ডাক্তারকে কল দেবে সে। কাছেই নেভাল বেসে, একজন ভালো বাঙালী ডাক্তার আছেন।

—দরকার হলে ডাকবো বৈকি। শান্তাদি জবাব দিলেন।

—আচ্ছা। আমরা তবে যাচ্ছি।

যোগলেকারের ভারী উদাস করা কণ্ঠস্বরে এবারে আমি চোখ ফেরালাম ওর দিকে। দেখলাম ওর দুটি বিষাদভরা চোখের দৃষ্টি আমারই মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে।

চোখের জল গোপন করবার জন্ত আমি তাড়াতাড়ি হাতখানা আড়াআড়ি করে চোখের ওপর চাপা দিলাম।

যোগলেকার আর কম্‌লেশ কাপুরের মিলিত জুতোর শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। শান্তাদি ঘুমছেন।

উঃ! বুকে কি দুঃসহ যাতনা! দু' হাতে বুকটা চেপে ধরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম,—গাড়ীর ভেতরের সিটে ওরা দু'জন বসেছে পাশাপাশি। ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দিলো।

ঘরে এসে দেখি যে শান্তাদি নেই। একটু পরেই ফিরে এসে বললেন তিনি,—ডাক্তারকে কল দিয়ে এলাম,—এখুনি আসছেন। আহা, শুধু কি তোরই জন্তে? আমারও পা-টা, দেখাতে হবে তো।

মিনিট পনেরো পরেই এলেন ডাক্তার, ক্যাপ্টেন তপেন হালদার।

উনি এসে আমাকে পরীক্ষা করে বললেন,—নার্ভের দুর্ব্বলতা বলেই মনে হচ্ছে, দু'দিন রেষ্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমার দিকে চেয়ে হেসে, জিজ্ঞেস করলেন তিনি,—কি ব্যাপার বলো তো মা। বাড়ীর কারুর জন্তে কি বড্ড বেশী মন কেমন করছে?

জবাব দিলেন শান্তাদি—আহা তা তো করবেই! বাপ মা'র ঐ এক সন্তান কিনা, বাপ গেছেন এখনও বছর ঘোরে নি যে।

আমি বললাম—কৈ! তোমার পা-টা দেখাও শান্তাদি।

—খুব বোকা মেয়ে। পায়ে আমার কিচ্ছু হয়নি। ও কথা মা বললে তো, তুই এতক্ষণে অনর্থ বাধাতিস্। হাসতে হাসতে বললেন শান্তাদি।

ডাক্তারটি বেশ সদালাপী মানুষ। প্রেসক্রিপসন লিখতে লিখতে, গল্প জমালেন। বললেন—তা, পনেরো ষোলো বছর কেটে গেলো আছি এখানে। পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে থাকি কিনা, মাঝে সাজে কেউ বাঙালী এলে যেন হাতে স্বর্গ পাই। বাংলা তো ছেড়েছি বহুকাল, কিন্তু বাঙালীর মায়াটা কেন যে কাটিয়ে উঠতে পারি না, তাই ভাবি।

ব্যথিত কণ্ঠে শুধোলেন শান্তাদি—বাংলায় কি আপনার আপন জন কেউ নেই? মাঝে সাজে তো যেতে পারেন সেখানে।

একটু ম্লান হাসির সঙ্গে জবাব দিলেন ডাক্তার—শুধু বাংলায় কেন, সারা দুনিয়ায় বোধহয় তেমন আপন জন আমার কেউ নেই।

গোরখপুরের ডাক্তার ছিলেন আমার বাবা, বাংলায় শ্রীরামপুরে ছিলো আমার মামার বাড়ী। খুব ছোটবেলায় গেছি মায়ের সঙ্গে—এখনও বেশ মনে আছে, বাড়ীটা।

প্রকাণ্ড চক্ মেলানো বাড়ী, বড় বড় মোটা মোটা থাম, আর বাড়ীর কার্নিশে থাকতো ঝাঁক ঝাঁক পায়রা, দিনরাত বকম বকম করে ডাকতো, আর আমার মামার ছেলে শান্তদা, রোজ ছোলা মটর ছড়িয়ে পায়রাদের খেতে দিতো। এই সব তো কবেকার কথা তবুও ভুলতে পারিনি এখনও। তারপর আমি বছর আটেকের, মা মারা গেলেন,—তারপর থেকেই মামার বাড়ী যাওয়া বন্ধ হলো আমার, কারণ হোষ্টেলে ভর্ত্তি হলাম আমি, আর বাবা আবার বিয়ে করলেন।

তারপর আমি ডাক্তারি পাশ করবার পর বাবা মারা গেলেন। সংমা অবশ্য এখনও বেঁচে আছেন, তিনি তাঁর ছেলের কাছে গোরখপুরেই থাকেন। আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম, তারপর যুদ্ধের শেষে, এখানে মেভালবেসের ডাক্তার হয়ে রইলাম। কোথাও কোনো
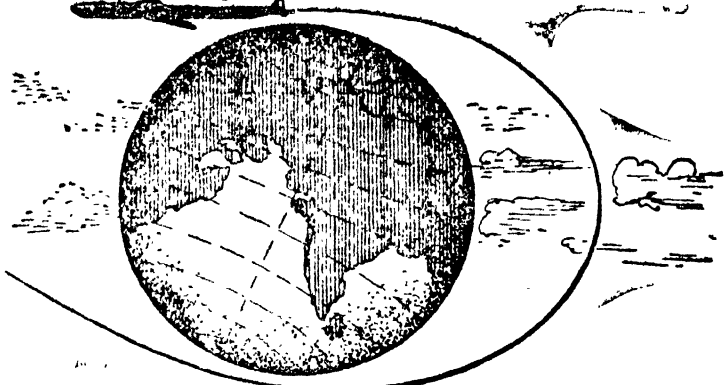
আকর্ষণ নেই, সেজন্য আর কোথাও যেতে ও ইচ্ছে হল না আর বয়সও হয়ে গিয়েছিলো, তা ছাড়া নানা কারণে বিয়ে করতেও ইচ্ছে হলনা, এখন এই পাঁচজনকে নিয়েই বেশ দিন কেটে যাচ্ছে। চুপ করলেন ডাক্তার।

শান্তাদি জিজ্ঞেস করলেন ওঁকে—শ্রীরামপুরের গাঙ্গুলী-বাড়ী আপনার মামার বাড়ী বললেন। আমি তো সেই বাড়ীরই মেয়ে আর এ হচ্ছে আমার পিসতুতো বোন। আমার বাবার নাম ছিল শান্তনু গাঙ্গুলী।

—লাফিয়ে উঠলেন যেন ক্যাপ্টেন হালদার। চোখের চশমাটা খুলে ভালো করে দেখলেন আমাদের দুজনকে, তারপর উত্তেজিত ভাবে বললেন—অ্যাঁ, বল কি! তুমি—তুমি শান্তদার মেয়ে? আর তুমি আমার সেই পুঁচকে বোন লিলির মেয়ে? মাই গড! আচ্ছা কাল রাত্রে পার্টিতে একটি বাঙালী ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো জার্মাণী যাচ্ছে বললো—নাম বোধ হয় সুব্রত চ্যাটার্জি, সে কি তোমাদের কেউ হয়। তার সঙ্গে দেখলাম, একজন মারাঠী ভদ্রলোককে, আলাপ হলো, কি যেন নামটা পদবী যোগ্‌লেকার। ভারি ভালো লাগলো ওকে•• কিন্তু নাচছিল যে মেয়েটা ওর সঙ্গে—ওর সঙ্গে কি সম্বন্ধ? মেয়েটাকে তো আগেও দু-একবার দেখেছি এই হোটেলে। সাম আয়েঙ্গার, এক মাদ্রাজী ছোক্‌রার সঙ্গে এসে থাকে এখানে মাঝে মাঝে। শুনেছি মেয়েটা নাকি ভারি বদ্।

—ওঃ! আপনিই তাহলে আমাদের সেই গোরখ্‌পুরের কাকা? বলতে বলতে শান্তাদি উঠে গিয়ে ক্যাপ্টেন হালদারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন আমিও প্রণাম করতে গেলাম, কিন্তু ডাক্তার আমাকে উঠতে দিলেন না।

শান্তাদি বললেন—সুব্রত আমার দেওর। আর যোগলেকার বল্লার শা পেপার মিলের পাওয়ার হাউসের ইঞ্জিনীয়ার। আমার স্বামী ঐ পেপার মিলেরই ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর ছুটি নেই তাই ঐ যোগলেকারের সঙ্গেই এসেছি আমরা সুব্রতকে সি অফ করতে আর বেড়াতে। পাঞ্জাবী মেয়েটি ঐ মিলেরই ডাক্তার মিষ্টার চাড্ডার শালী হয়। ওই তো, এই হোটেলে বিনা ভাড়ায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছে। অবশ্য খাই খরচা দিতে হয়।

—তবে সত্যি কথা বলতে কি কাকাবাবু; এই হোটেলে আমার একটুও ভালো লাগছে না বিশেষ করে ঐ হস্তিনী মেয়েটার সঙ্গ। তাই ভাবছি অন্য কোনো হোটেলে যদি ঘর পাই তো,—

শান্তাদিকে কথা শেষ করতে দিলেন না ক্যাপ্টেন মামা। বললেন—হোটেলে কেন মা। আমার বাড়ী রয়েছে, আপনার জনের মুখ যখন এতকাল বাদে দেখালেন ভগবান, তখন তার দাবীটুকু তো ছাড়তে পারিনে: যদিও বহুকালের ছাড়াছাড়ি তবুও রক্তের সম্পর্ক তো?

শান্তাদির হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে একটু হাসির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি—আচ্ছা মা শান্তদার মুখে কোনোদিন আমার কথা শুনেছো কি? তার কি—আর মনে আছে আমাকে এখনো?

—শুনেছি কাকাবাবু। জবাব দিলেন শান্তাদি। বাবা বলতেন, তাঁর গোরখপুরের পিসিমার কথা। আরো বলতেন পিসিমা মারা গিয়ে তপুটা আমাদের পর হয়ে গেলো। কোথায় সে থাকে, জানতেও পারি না। ভাইটা আমার হারিয়ে গেলো।

—আরো বলতেন বাবা—ভেবেছিলাম বড় হয়ে ও নিশ্চয়ই আসবে,—কিন্তু কৈ এলো না তো! আজ আপনাকে পেয়ে মনে হচ্ছে;—যে এই দেখাটা যদি বছর তিনেক আগেও হতো, তাহলে—

—কেন মা! শান্তদা কি—ক্যাপ্টেন মামা, চাইলেন শান্তাদির দিকে—

বাবা এই তিন বছর হলো মারা গেছেন। মা গেছেন বছর দেড়েক। পিসেমশাই, মানে রমলার বাবা, গেছেন মাস আটেক হয়ে গেলো। এই ক'টা বছর ধরে মরণ যেন,—আমাদের সর্বনাশ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।—এখন ঐ অত বড় আপনার মামার বাড়ীতে, মানুষ আর কোথায়? আছে শুধু এখন, আমার একটি মাত্র ভাই, আর তার বৌ, দুটি বাচ্ছা। মানুষ বিহনে খালি বাড়ীটা যেন গিলতে আসে কাকাবাবু। আমার পাঁচটা ভাই আর পাঁচ বোনের মধ্যে এখন আছে ঐ একটা। আর আছি আমি আর আমার এই একটি মাত্র বোন রমলা।—বাপ মা আমার অনেক জ্বালায় জ্বলে গেছেন। চুপ করলেন শান্তাদি। চোখের জল ঝরছে ওঁর দুটি গাল বেয়ে।

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং। ঘরের কলিং বেলটা বেজে উঠলো।

শান্তাদি উঠে বাইরে গেলেন, ফিরে এলেন একখানি টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে। মুখে ওঁর উদ্বেগের ছায়া।

টেলিগ্রামটা পড়তে পড়তে, থর থর করে কেঁপে উঠলো ওঁর হাতটা।

আমি অসহায় ভাবে চেয়ে রইলাম ওঁর দিকে। ক্যাপ্টেন মামা জিজ্ঞেস করলেন—কার টেলিগ্রাম মা?

টেলিগ্রামখানি ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন শান্তাদি।

ব্যাকুল ভাবে বললেন তিনি:—

—আপনি আমার যাবার ব্যবস্থাটা করে দেবেন কাকাবাবু? আমি এখুনি রওনা হতে চাই। যোগলেকার কখন ফিরবে তার ঠিক নেই, তার অপেক্ষা করতে গেলে, আজ আর যাওয়া যাবে না।

টেলিগ্রামটি পাঠ করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন মামা, অবশ্যই করবো। তোমাদের ট্রেন তো বেলা দু'টোয়, দু'ঘণ্টা সময় আছে। রিজার্ভেসন পাওয়া যাবে না, তবে আমি স্পেশ্যাল ভাবে বার্থ দু'টো যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করছি। আর আমার একজন বিশ্বস্ত লোকও তোমাদের সঙ্গে দেব মা। তোমরা তৈরী হও।

—রমির টিকিট হবে কলকাতার। আমার বল্লারশার। মাদ্রাজ থেকে ও কলকাতায় রওনা হয়ে যাবে। আপনি এই ঠিকানায় পিসিমাকে ষ্টেশনে লোক রাখার জন্য একটা টেলিগ্রাম করে দিন কাকাবাবু। আর বল্লারশায়ও একটা করতে হবে।

দু'টো ঠিকানা লিখে দিলেন শান্তাদি। টেলিগ্রামটা পড়ে, থর থর করে কেঁপে উঠলো আমার বুকটা।

"চ্যাটার্জি অসুস্থ। শীঘ্র এসো।" টেলিগ্রাম করছেন, কাবেরী কৃষ্ণমূর্ত্তি।

আমি বললাম—আমি এখন কলকাতায় যাবো না শান্তাদি, সঞ্জয়দাকে সুস্থ দেখে তার পর যাবো।

—না। দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন শান্তাদি। তোমার শরীর অসুস্থ, দু'টো রুগী সামলাতে আমি পারবো না।

মায়ের মমতা ও
অষ্টারমিল্কে
প্রতিপালিত

—বরং চেষ্টা করবো, তোর জামাই বাবু একটু সুস্থ হলে পর—ছুটি আদায় করে ওকে সঙ্গে নিয়ে তোদের কাছে যাব—আর সেই সময় কাকাবাবু আপনাকেও ধরে নিয়ে যাবো। এতকাল বাদে যখন খুঁজে পেয়েছি আপনাকে, তখন আর লুকিয়ে থাকতে দেব না।

—ম্লান হাসি হাসলেন ক্যাপটেন হালদার। বললেন—যাবো বৈ কি মা লক্ষ্মী। তারপর একটু চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি—আচ্ছা জামাইয়ের কি তেমন কোনো অসুখ ছিলো মা? —তা না হলে এই ক'দিনের ভেতর হঠাৎ এমন কি হতে পারে?

—না এমন কিছু তো নয়।—একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলেন শান্তাদি। তবে ওঁর ব্লাডপেশারটা কিছুদিন যাবৎ বড্ড ওঠানামা করছিলো, তারজন্য নিয়মিত ওষুধপত্তোর,—খাওয়া দাওয়ার বাছ বিচার এই সব চলছিলো। তবে ওষুধ বিশুধ, খাওয়া দাওয়া সবই তো আমার হাতে, নিজে তো কিছু গ্রাহ্যই করেন না।—তাই মনে হচ্ছে আমি চলে আসার পর বোধহয় ওষুধ বিশুধ,—নিয়মকানুন সব বাতিল করেছেন,—তা না হলে হঠাৎ এমন হবার কারণ কি,—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কাকাবাবু।

যাবার আগে শেষবার চেয়ে দেখলাম মালাবার হোটেলটিকে। মনটা আমার হাহাকার করে কেঁদে বললো—হায় মালাবার। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে আমি ফেলে গেলাম তোমার কাছে। মাত্র ছুটো দিন সময় লাগলো তোমার-আমার জীবনের অনেক আশা, আনন্দ, স্বপ্ন ও প্রেম দিয়ে গড়া দ্বীপটিকে ভেঙে চূর্ণ করে ঐ আরব সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতে। হায় অভিশপ্ত মালাবার! তোমাকে দিয়ে গেলাম আমার চোখের জল আর বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস।

ষ্টেশনে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন মামা। আমরা পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলাম।

শান্তাদি বারে বারে চোখ মুছতে মুছতে বললেন—এই বিপদের সময় ভগবানই আপনাকে এনে দিয়েছেন কাকাবাবু।

—তা বটে। তবে সেই ভদ্রলোকটি বড় একচোখো মা। আপনজনের একটু স্নেহ ভালোবাসা আমাকে দিতে উনি চিরকালই নারাজ। দেখছো না কতকাল পরে আপনজনকে কাছে পাবার জন্য যেই একটু হাত বাড়িয়েছি, অমনি কেমন কৌশল করে সরিয়ে নিলেন। বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন মামা। টেলিগ্রামটি উনি রাখলেন, যোগলেকারকে দেখাবার জন্য।

হু! হু! করে ছুটে চলেছে ট্রেন।

পথের দুধারে রমণীয় দৃশ্যগুলো, সিনেমার ছবির মতই বিচিত্র।

কত ভালো লেগেছিলো দৃশ্যগুলোকে মাত্র তিনদিন আগে, যখন প্রেম অনুরাগে ভরপুর মন নিয়ে এসেছিলাম এই পথে। আর আজ?

শূন্য, রিক্ত মনটার কাছে আকর্ষণীয় বলে বোধ হয় কিছু নেই। তাই কত পাহাড় পর্ব্বত, নিবিড় অরণ্যানী, ঝরণা, নদী, ফুল, পাখী, ওরা সবাই হাতছানি দিয়ে গেলো, কিন্তু বিষাদ ভারাক্রান্ত মনটা কিছুতেই সাড়া দিতে পারলো না ওদের ডাকে।

ট্রেনটা থামলো একটা ষ্টেশনে!

চালাকুঠি!···

ষ্টেশনের নামটা যেন বিদ্যুৎ আখরে জ্বলে উঠলো আমার চোখের সামনে। অনড় অচল মনটা হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে যেন লাফিয়ে উঠলো। পেরেঙ্গেল কুঠি যাওয়ার ষ্টেশন এই চালাকুঠি। আমার দুটি চোখের উদ্বেগ আকুল দৃষ্টি, সন্ধানী আলোক রশ্মি ফেলে ফেলে, মিছেই খুঁজে মরলো, কাকে যেন! যোগলেকার আর কমলেশ। ওরা তো এসেছে এখানেই। কিন্তু তারা তো এতক্ষণে, পাহাড়ের ওপর যেন অরণ্যের ছায়াচ্ছন্ন পথ ধরে চলেছে পেরেঙ্গেল কুঠির দিকে। ষ্টেশনে তাদের দেখা মিলবে কেন? নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায়—নিজেই লজ্জা পেলাম। ট্রেন চলতে সুরু করলো। আমি অবসন্ন ভাবে শুয়ে পড়লাম।

শান্তাদি ট্রেণে উঠেই সঞ্জয়দার জারকিনটা বার করে বুনতে সুরু করেছিলেন! বোনাটা হঠাৎ থামিয়ে বললেন তিনি—

—দেখ্ খুকি! আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? অসুখ, টসুখ ওসব কিছু নয়। আমাকে ছেড়ে থাকাতো ওঁর একেবারেই অভ্যেস নেই কি-না,—তাই ঐ অসুখ বলে টেলিগ্রাম করেছেন।

—আচ্ছা, তোর কি মনে হয় বল্ দেখি। একটু হেসে আমার দিকে চাইলেন শান্তাদি।

—আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে শান্তাদি। তুমি গিয়ে দেখবে, সঞ্জয়দা হা, হা, করে হেসে বলছেন, কেমন ঠকান, ঠকিয়েছি, এঁ্যা। আর কোথাও যাবার নামটি কখনও করবে না।

—তাই বটে। ঠিক্ বলেছিস্ তুই। মানুষটি তো সোজা নয়। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বোনায় মন দিলেন শান্তাদি।

সঞ্জয়-দার কথাই বোধ হয় ভাবছিলেন তিনি, তাই মৃদু মৃদু হাসি বার বার চমকে উঠছিলো ওঁর চাপা ঠোঁটে।

[ক্রমশঃ।

কালব্যাধি

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

এ-কোন্ কালব্যাধি আমার শরীরে আশ্রিত:
যৌবন বৃদ্ধ আমার, সন্তাপে দুঃসহ-দুঃখ,—
যদি না বাঁচি আর, ডুবে যাই ভবিতব্যে-পাঁকে
কে বাঁচাবে পুনরায়, কে দাঁড়াবে শয্যায় অসুখে।

বিমিশ্র-চিন্তার চাপে হায়, নুব্জ হয়ে গেছি
ছিন্নভিন্ন দৃঢ়তার, অঙ্গার নিভে পড়ে আছে;
আমি তো মৃত্যুর লক্ষ্য, সে আমাকে ব্যাধের মতন
অবিরাম পীড়া দেয়, হানে তীক্ষ্ণ-শাণিত-শায়ক।

শত স্মৃতি আশে পাশে, খণ্ড ছবি, স্বপ্নসাধে তুমি,
কীটদষ্ট নষ্ট হোক, শ্যাম হোক দেহ-বনভূমি।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা

শকুন্তলা সেন

পৃথিবীর বিশেষ করে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সম্পর্কে সর্বশেষ যে পরিসংখ্যান আমাদের হস্তগত হয়েছে তাতে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে। ভারতবর্ষে প্রতি বছর পাঁচ মিলিয়ন করে লোক জন্মগ্রহণ করছে এবং ঐ হারে পৃথিবীর জনসংখ্যা গত বছর পর্যান্ত হয়েছে সাতচল্লিশ মিলিয়ন এবং এ বছর সেটা বেড়ে পঞ্চাশ মিলিয়ন হবে। অর্থাৎ এটা হচ্ছে ১৯৫৯ সাল, আর ২০০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মোট কথা আগামী দুপুরুষের মধ্যে এই কাণ্ডট সংঘটিত হবে। এটা আমার কথা না, স্যার জুলিয়ান হাক্সলি তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এই আশংকা প্রকাশ করেছেন। এ বিষয় নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করলেই তাঁর বক্তব্য আমাদের কাছে সত্য বলেই প্রতীয়মান হবে।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করা যাক। কৃষির উন্নতির পূর্বে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা কয়েক কোটির বেশী ছিল না। খৃষ্টের জন্মের পূর্বে এ সংখ্যাটা ছিল প্রায় একশ মিলিয়নের মত। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যান্ত আমরা যতদূর জানতে পারি পৃথিবীর সর্ব্ব মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ছয়শত পঞ্চাশ মিলিয়ন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হতেই পৃথিবীর জনসংখ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভবপর হয়। উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম করতে না করতেই এই সংখ্যাটা একশ কোটি ছাড়িয়ে গেল এবং বিংশ শতাব্দীর ১৯৫০ সালের মধ্যে সংখ্যাটা দাঁড়াল গিয়ে দু'শ তিরিশ কোটি এবং সর্ব্ব শেষ সংখ্যা রাষ্ট্রপুঞ্জ দপ্তর হতে যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানা যায় যে তা হ'ল দু'শ চল্লিশ কোটি। তার মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী হচ্ছে মহাচীন (চৌষট্টি কোটি) মহাভারত (চল্লিশ কোটি) সোভিয়েট ইউনিয়ন (কুড়ি কোটি) আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (সতের কোটি)। প্রতি মিনিটে গড়ে পঁচাশিটি করে সন্তান প্রসব হচ্ছে। মজার কথা হচ্ছে এই যে কেবলমাত্র সংখ্যাটাই বাড়ছে না জন্মের হারও বেড়ে চলেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সন্তান জন্মের হার ছিল শতকরা একভাগের একদশমাংশ। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে সেটা হয় শতকরা একভাগ আর এখন বাড়ছে শতকরা ১·৫ ভাগ হারে, আর এটা বেড়েই চলেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবিত উন্নতির ফলে যে হারে লোক জন্মগ্রহণ করছে, মৃত্যু হচ্ছে তার চাইতে কম সুতরাং সংখ্যা বেড়েই যাবে এবং তাই হচ্ছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের অবস্থাটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সব চাইতে দরিদ্র এবং অনুন্নত দেশ। জন্মহারের দিক দিয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা সব চাইতে সংকটাপন্ন। অথচ কিছুকাল আগেও ঠিক এই অবস্থাটা ছিল না। ইতিহাসের ছায়াপথে একটু বিচার করে দেখা যায়। সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ছিল মাত্র একশ মিলিয়ন এবং ১৮৩৪ সালে এই সংখ্যা ছিল একশ তিরিশ মিলিয়ন। ১৮৭১ সালে সংখ্যাটা বেড়ে গিয়ে হয় দু'শ মিলিয়ন এবং ১৯১০ সালে হয় তিনশ মিলিয়ন। আর আজ ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার এক সপ্তমাংশ। পণ্ডিতদের মতে আগামী পঁয়তাল্লিশ বছরে আমাদের দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াবে। আমরা পরিসংখ্যানগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এইজন্য যে পরবর্ত্তী আলোচনা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে। উপরে প্রদত্ত পরিসংখ্যানের আলোকে আমরা সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের অবস্থাটা আলোচনা করব। আমরা যে পরিকল্পনাগুলো করছি যদি এই হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলতে থাকে তবে শেষ পরিস্থিতিটি কি হয়ে দাঁড়াবে তা চিন্তা করতেও ভয় পাচ্ছি।

আমাদের দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত করবার জন্য আমরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আশ্রয় নিয়েছি। পরিকল্পনাগুলোর মূল উদ্দেশ্য হল দেশ ও জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করা। জাতির আয় বর্দ্ধিত করা। জাতির আয় যদি বেড়ে যায়, তবে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি মানুষ উপকৃত হবেন। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সম্পদে তাঁরা অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হতে পারবেন। কেবল একটি দেশের আর্থিক কাঠামো সেই দেশের জাতির আয়ের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ জাতির আয় যদি বেশী হয় তবে এটা ধরে নেওয়া যায় যে সে দেশের আর্থিক কাঠামো বেশ দৃঢ়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমাদের জাতির আয় বেড়েছে শতকরা আঠারো ভাগ হারে, কিন্তু জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা এগারো ভাগ হারে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতির আয় বাড়বে শতকরা পঁচিশ ভাগ হারে আর লোক সংখ্যা বাড়বে শতকরা আঠারো ভাগ হারে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, যে হারে জাতির আয় বাড়ছে লোক সংখ্যা প্রায় সেই হারে বেড়ে যাওয়ার ফলে পরিকল্পনাগুলোর মাধ্যমে যে সম্পদ আমরা আহরণ করতে পারছি সেটা কোন কাজেই লাগছে না। যাঁরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অমানুষিক পরিশ্রম করে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁরা সেই পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারছেন না, ফল ভোগ করছে অবাঞ্ছিত আগন্তুকেরা। এই হারে যদি অবস্থা চলতে থাকে, তবে যত পরিকল্পনাই আমরা করি না কেন আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কোনদিনই শক্তিশালী হবে না। হবে কি করে? আমরা ঠিক করলাম যে, আগামী পাঁচ বছরে এত খাদ্য উৎপাদন করব, এত লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করব, এতগুলি আধুনিক শহর তৈরী করব এবং এক সংখ্যক লোকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াল। পাঁচ বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা এত বেশী বেড়ে গেল যে, যে খাদ্য উৎপাদন করেছিলাম হয়তো তিরিশ কোটির জন্য তা ভাগ করে দিতে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ কোটির মধ্যে। অর্থাৎ দুজনের প্রয়োজনীয় খাদ্য যা তার দৈনন্দিন লাগে তা তিনজনকে ভাগ করে দিতে হচ্ছে। অথচ তিনজনের কারু পেট ভরছে না। কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সেই একই সমস্যা। যেমন ধরুন দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার গোড়াতে এ দেশে কর্ম্মহীনের সংখ্যা ছিল পঞ্চান্ন লক্ষ আর তাদের মধ্যে অনেকেই চাকুরী পেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে যেদিন তৃতীয় পরিকল্পনার

গোড়াতে চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা সত্তর লক্ষ হয়ে দাঁড়াবে আর তৃতীয় পরিকল্পনার শেষেও চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথমেই চাকুরী প্রার্থীর মোট সংখ্যা একটা ভয়াবহ রূপ নেবে—এক শত চল্লিশ লক্ষ। মোট সংখ্যা হল দুই শত দশ লক্ষ। হিসেব করে দেখা গেছে যে খুব বেশী হলে আমরা এক শত পঁচিশ লক্ষ লোককে কাজ দিতে পারব অর্থাৎ পঁচাশি লক্ষ বেকার থেকেই যাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় সালের গোড়াতে যত ছিল তার চাইতে পনেরো লক্ষ বেশী। সমস্যাটা কত গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে একবার চিন্তা করে দেখুন।

পরিকল্পনা কমিশন এই সমস্যা খুব ভাল করেই জানেন এবং সেইজন্যই তাঁরা আজ পরিবার পরিকল্পনার কথা বলছেন। তাঁদের মতে "Under present conditions, an increase in manpower resources does not strengthen the economy but in fact it weakens it..It retards economic progress and units seriously the rate of extension of social services so essential for civilised existence. In planning for a rising standard of life, and for improvement in health of the nation, family planning is a vital step." পরিকল্পনা কমিশন আরও বলছেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ করতেই হবে যদি দেশ এবং জাতিকে আমরা উন্নত করতে চাই আর তা যদি হয় তবে অবিলম্বে অন্ততঃ কতকগুলো উপায় আমাদের অবলম্বন করতে হবে। যেমন (১) মেডিকেল কলেজগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণ কোর্স শেখাবার ব্যবস্থা (২) বিভিন্ন জায়গায় 'জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র' স্থাপন, এখানে বিভিন্ন উপদেশ ও সম্ভবপর হলে বিনামূল্যে ঔষধের ব্যবস্থা থাকবে (৩) সেবিকা নিয়োগ করা (৪) আইনের দ্বারা সন্তান উৎপাদন হ্রাস করে দেওয়া অর্থাৎ কোন পরিবারে সন্তানসংখ্যা যেন চারটির বেশী না হয়। (৫) আইন করে রুগ্ন, দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের সন্তান উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলিকে সফল করবার জন্য প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং ইতিমধ্যে দেশে এক শত সাতচল্লিশটি ক্লিনিক খোলা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয় চার শত সাতানব্বই লক্ষ টাকা। সারা ভারতবর্ষে আড়াই হাজার ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। প্রতি 'ক্লিনিকে'র সংগে থাকবে একটি করে মাতৃমঙ্গল সেবা প্রতিষ্ঠান ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র। এই সব কেন্দ্রগুলো হতে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্ভবপরক্ষেত্রে ঔষধ বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে দিন কালের দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটছে। কতকগুলো কুসংস্কার অথবা ধর্ম্মবিশ্বাস যেন প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। সুন্দর ও বলিষ্ঠ সমাজ গঠনের পক্ষে পরিবার পরিকল্পনা অপরিহার্য্য।

দেশী রং

শ্রীইন্দুবিকাশ দাশ

এ রং সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আর একজনের কথা এসে পড়ে। তার কথা না বললে কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায় বলায়?

তাদের বাস্তুর দক্ষিণ দিকে লাল ছাতা মাথায় দেওয়া কৃষ্ণচূড়া গাছ। তলার পরিষ্কার জায়গাটিতে একটুকরো পালিস-করা কাঠে কি যেন রং লাগাচ্ছিল সে। মাথায় ছোট ছোট কাঁচায় পাকায় মেশান চুল। মুখে দাড়ি গোঁফ কম। চোখের উপরের পাতা একটু ঝুলে পড়েছে, মুখে অসংখ্য বলিরেখায় চিহ্ন রেখে বার্দ্ধক্য খানিকটা এগিয়ে এসেছে। হাবাগোবা গোছের, ময়লা গামছা-পরা শীতলপুরের তারিণী মণ্ডলকে এতদিন পরেও বেশ মনে করতে পারছি।

বর্ষায় আকাশে, বনে জঙ্গলে কিসের যেন ব্যস্ততা পড়ে যায়, পায়ে চলা, মেঠো সরু রাস্তাকে আরও ছোট করে দেয় দুপাশের সবুজের দল, টিয়াপাখীর ঝাঁক আউশ খেতের পাশে ওড়ে। তার ছিটেবেড়া দেওয়া ঘরের সামনের দিকটাতে বসে কত কথাই না হত। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে, দূরের গাছপালা ঝাপসা দেখায়, খড়ের চাল থেকে লাইন হয়ে জল পড়ে। কুনো ব্যাঙের শব্দ আসে পাশ থেকে। বলত —বাবু, কোনো রকমে বেঁচে আছি। খাটার গতর নেই। কাঠের কাজ ভাল চলে না। গেল বন্যায় একমুঠো ঘরে তুলতে হল না। নাতিটা ক'দিনের জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। গেল বছর কানাই (মেজ ছেলে) শ্বশুরবাড়ীতে কলেরায়—বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠত সে। হাওয়া দিচ্ছে। জলের ছাটে সামনের দিক ভিজিয়ে দেয়। উঠে খানিকটা পিছিয়ে আসি। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসে। শিলারাজনগর গ্রামের ওদিকের দিগন্তটা আকাশের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়।

সবুজ মাঠের রং সোনালী হয়ে যায় কিসের যাদুমন্ত্রে, সাদা মেঘ ভেসে চলে কোন রাজ্যে কে জানে। দিনের শেষে পশ্চিম আকাশে তারাই আবার রং নিয়ে কি কাণ্ডই না করে। উঠানের লাউমাচার নীচে বসে তার কথা শুনেছি। মা, দুর্গাকে (ছোট মেয়ে) আট বছরে 'গৌরীদান' করেছিল, একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মেয়ে আর যেতে চায় না সেখানে। শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর কথা হলে পনের বছরের মেয়েটা পা ধরে কাঁদে আর বলে বাবু, তুই মেরে ফেল এখানে, সেখানে গেলে আমি মরে যাব। বলুন ত বাবু, বাপ হয়ে—আর বলতে পারত না, গলা ভারী হয়ে আসত। সেই প্রসঙ্গে বোরজ গ্রামের রণজিত রায়ের মেয়ের কথা বলত। স্বয়ং আত্মাশক্তি সেই মেয়ের নামে যে দীঘি, তাতে কেন আজও বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে জল বেড়ে ওঠে, পুণ্যার্থীর ভিড় হয় সেদিন, তার গল্প বলত। কোলের শিশুটি দাদুর চুল ধরে টানাটানি করে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। গল্পে গল্পে রাত হয়ে যায়। শিউলী ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। বাঁশঝাড়ের নীচের দিক দিয়ে শেয়াল-দম্পতি চুপি চুপি অভিসারে বেরিয়ে যায়।

দিন ছোট হয়ে আসে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে লম্বা ছায়া ফেলে পুকুরপাড়ের তালগাছের সারি। মাথায় ধানের বোঝা নিয়ে ঘরে ফেরে চাষীর দল। পাকা ধানের মিষ্টি গন্ধ। মাঠের সোনালী রংএর উপর অন্য রং-এর পোঁচ দেয় শিল্পী। আলের উপর বসে বড়দা গ্রামের জাগ্রত দেবী বিশালাক্ষী ঠাকুরের কাহিনী শুনেছি। তালগাছের সারির পেছনে সূর্য্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। তবু সেখানে এখনো আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা।

বাতাসের দিগ্‌ভ্রম হয়। উত্তরের পর একবারে উল্টোদিকে বইতে থাকে। সোন্দালফুল হাওয়ায় দোল খায়। কালো রং-এর সেই চেনা পাখীটি সুরের ঝংকার তুলে সাথীকে ডাকে। প্রভাতী রোদে খিলখিল

করে হাসে দেবদারু বন। ঝোপে ঝাড়ে রং-এর সমারোহ লেগে যায়। অজানা ফুলের গন্ধে বিহ্বল হওয়ার দিনগুলিতে, তার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে গাঁয়ের শেষে জামবনের ভেতর বাঁশের সাঁকোর উপর গিয়ে বসেছি। নীচে কাদাখোঁচা আহার অন্বেষণে ব্যস্ত। কাঠ থেকে তৈরী রং সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। কাঠের যেখানে চুড়কি ফাট থাকে বা রং-এর কমতি থাকে সেখানে পিয়াশালের রং দিয়ে মাজলে জিনিসটির খোলতাই হয় ভাল। কাঠের থেকে তৈরী রং আবার লাগাও কাঠে। কিশোর বয়সে মামাবাড়ীতে থেকে, হারাণ মিস্তিরির কাছে কাঠের কাজ শেখার সময় এ রং-এর কাজ সে শিখেছিল। কত সখ ছিল ঘাটালে একটা জুতসই কাঠের আসবাবপত্তরের কারবারের। বলত—বাবু, ঐ যে আমাদের বাখলের তৈলক্য। কেমন দোকান জাঁকিয়ে বসেছে আড়গড়ায়। ওর বাপ আমাদের বাড়ীতে মজুর খেটে দিন চালাত, দুবেলা পেটে পড়ত কম দিন, এত আমার নিজের চোক্ষে দেখা। কপাল চাপড়ে বলত—সবই ভাগ্যের খেলা বাবু।

তাই বোধ করি এ দুনিয়ার সব খেলা শেষ করে সে যে কোথায় গেছে, আজও তার পাত্তা নাই।

রং তৈরী—

ভাল পিয়াশাল কাঠ চেরাইয়ের সময় যে গুঁড়ো পাওয়া যায় তা দরকার। বেছে নিতে হবে যেন অন্য কিছু না থাকে। ঐগুলিকে পরিমাণমত ঠাণ্ডাজলে ভেজাতে হবে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ও পরে তা ছেঁকে নিতে হবে। কিছুক্ষণ ভিজিয়ে জলে সেদ্ধ করলেও রং পাওয়া যাবে। ছেঁকে নেওয়ার কয়েকঘণ্টা পরে নীচের তলানি বাদ দিয়ে, তাতে পরিমাণমত আঠা মেশাতে হবে। গঁদের আঠা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। অন্য আঠা দিয়ে কাজ করা হয় নাই। দেখা গেছে Filter-paper দিয়ে ছেঁকে নেওয়ার পর জলের রং আগের মতই থাকে।

রং—

ছেঁকে নেওয়ার পর জলটি Tin-Iodineএর মত দেখতে হয়। তুলি অথবা কলম দিয়ে কাগজে লাগালে ছেপে যায় না। প্রথম অবস্থায় রংটি Yellow ochre এর মতই হয়। শুকিয়ে একটু ঘন হলে রং হবে Yellow ochreএর সঙ্গে খুব অল্প Vandyke-brown মেশালে যেমন হয়। আরও একটু শুকিয়ে গেলে রংটির ঘনত্ব বাড়ে, তবে এতে বাদামী রং-এর (Burnt Umber) বেশ আধিক্য দেখা যায়। এই পর্য্যায়ে রংটির মধ্যে আঠাল ভাব আসে, সুতরাং অন্য আঠা ব্যবহার না করলেও চলে, রংটি বেশ উজ্জ্বল। আরও ঘন অবস্থায় রংটি মধুর মত চটচটে হয়ে যায় ও কাগজে লাগানর পর শুকোতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। শুকনো, পাকা চীনেবাদাম বীজের খোসার রং-এর মত রং হয় শেষ পর্য্যায়ে, রংগুলি শুকিয়ে যাওয়ার পর ঘসাঘসিতে ওঠে না বা আঙুলে কোন দাগ লাগে না।

রংটিকে আরও মোলায়েম করার জন্য এই কাঠের গুঁড়োর সঙ্গে অল্প পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠা, লোধের ছাল অথবা পাকা শুকনো বাবলা ফলের খোসা মিশিয়ে রং তৈরী করে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

ছেঁকে নেওয়ার পর রংটিকে তুলোয় শুষে শুকিয়ে রেখে দেওয়া যায়। শুকিয়ে কাদাকাদা মত হলে ছোট ছোট বড়ি তৈরী করে রেখে দেওয়া চলে। ঐ বড়ি জলে দিলেই রং হবে। একবারে শুকিয়ে গেলে এটি পানে-খাওয়া খয়েরের মত দেখতে হয়।

এ রং দিয়ে জলরঙা ছবি, রঙিন রেখাচিত্র ও মণ্ডন শিল্পের নক্সা কাগজে আঁকা হয়েছে। রং স্থায়ী বলে মনে হয়।

আমার আট বছরের ছোটদিমণি, আমার চেয়ে বেশী পছন্দ করে এই রংকে। একটু ঘন অবস্থায় এই রংটি, আমার কাগজে আঁকা তিজিবিজির চেয়ে তার কপালের টিপেই নাকি ভাল মানায়। আর এতে বড়দির মহল থেকে না বলে কুমকুম নিয়ে এসে ধরা পড়া বা বকুনি খাওয়ার ঝক্কি একেবারেই নেই।

শিক্ষা প্রসঙ্গে

বর্তমানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে কয়টি সমস্যা নিয়ে অত্যন্তই বিব্রত বোধ করেন, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা তার অন্যতম। আয়ের চেয়ে অধিক ব্যয় করার সমস্যা তো আজ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ হয়েই দেখা দিয়েছে এবং অন্যান্য নানা বস্তুর মত ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচা সুষ্ঠুভাবে চালানোটাও প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে দিন দিনই দুরূহ বলে বোধ হতে চলেছে। পাঠ্য পুস্তকের মূল্য ও সংখ্যা বৃদ্ধিই এই সমস্যাকে এত জটিল করে তুলেছে। ছেলে পরীক্ষায় পাশ করে নতুন ক্লাসে উঠলেই অভিভাবকের মনে দেখা দেয় যুগপৎ হর্ষ ও শঙ্কা শঙ্কিত না হয়ে উপায় কি, কারণ নতুন বছরের পাঠ্য পুস্তক তালিকায় ছাপানো অসংখ্য নামের পেছনের মূল্যমানটিতো আর নীচু শ্রেণীর নয়, ছেলের ক্রমিক জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে বা বলা উচিৎ তাকে বহু পেছনে রেখেই উন্নতি ঘটে বইয়ের দামের। সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া তাই যে কোন গৃহস্থেরই পক্ষে আজ এক রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলা বিভাগের একটি স্নাতকের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা দেখলেই উপোরোক্ত মন্তব্যের যথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সংশয়ই থাকে না, দশ, পনেরো, বিশ ইত্যাদি সংখ্যার রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হয় একেকখানি বই, বিজ্ঞান শাখার ছাত্রের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। সবরকম প্রয়োজনীয় বস্তুর সঙ্গে সমতা রেখেই বইয়েরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, পুস্তকব্যবসায়ীরা একথাই বলে থাকেন ও বলছেন, কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের ক্ষেত্রে এ নীতি সর্বথা প্রযোজ্য কি না একথাও তাঁদের ভেবে দেখার সময় এসেছে; ব্যবসায়িক লাভের দিকটা একটু খাটো করলে যদি বৃহত্তর ছাত্রসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে তবে সেটুকু দেখা কি তাঁদের কর্তব্য নয়? সমাজের কল্যাণের জন্যই পাঠ্য পুস্তকের সুলভ সংস্করণ প্রকাশনার পবিত্র দায়িত্বে এগিয়ে আসা উচিৎ তাঁদেরই, এ তো অনস্বীকার্য্য রূপেই সত্য। প্রকাশকগণের মধ্যে এ জাগরণ দেখা না দিলে শিক্ষাসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখ্য বাধা কোন দিনই অপসারিত হবে না।

সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরূপা দেবী (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উৎসবে সমস্ত পৃথিবীর লোক যোগ দিলো। কত আনন্দ আয়োজন হল, কত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হলো। রবিদাদা কিন্তু কৌতুক ক'রে বলেছিলেন "তোমরা শতবার্ষিকী করবে, সে তো মাত্র পঁচিশ টাকা অর্থাৎ শতবার সিকি খরচ।" যাই হউক তিনি জগদবরেণ্য মানুষ ছিলেন, তাঁকে সহস্র প্রণাম জানাচ্ছি।

এই উপলক্ষে তাঁর পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়স্বজন অনেকের কথা শুনলাম, আলোচনা হলো, কিন্তু এই যে একটি মানুষ কবির কাব্যে উপেক্ষিত থেকে গেলেন—তিনি হলেন রবিদাদার আর একটি দাদা সোমেন্দ্রনাথ, আমাদের সোমদাদা।* রবিদাদা ছিলেন দীপ্ত সূর্য। তাঁর রশ্মি সহস্র ধারে বিশ্ব আলোকিত করেছে, তাঁর অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ ছিলেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্র, অন্য ভাইদের মত তাঁরও হয়তো কিছু প্রতিভা ছিল, কিন্তু তা আর বিকাশ হলো না, হলো অকালে অস্তমিত। তিনি ছিলেন পাগল, কেউ কেউ বলত শুনেছি খুব বেশী পড়াশুনো করে তিনি পাগল হয়ে গেছেন। জানি না সত্য কি না।

সোমদাদা তাঁর ভাইদের মত খুব দীর্ঘদেহ স্বাস্থ্যবান ছিলেন, ধব্‌ধবে ফর্সা গায়ের রং, গোঁফ দাড়ি কামানো। মুখের মধ্যে আগে চোখে পড়তো তাঁর চওড়া কপাল, চক্‌চক্ করতো কিসের আভায় যেন। তার উপর ছোট করে ছাঁটা কাঁচা পাকা চুলে ভরা মাথাটি।

জোড়াসাঁকো ৬ নং বাড়ীর একতলাতে তাঁর থাকবার ঘর ছিল। পাগল হলেও তাঁকে বন্ধ করে রাখা হতো না দেখেছি। তাঁর পাগলামী ছিল—আপন মনে বকতেন, আর উপর দিকে হাত তুলে হাতের মুঠো খুলতেন আর বন্ধ করতেন। যখন বেশী মাথা গরম হতো তখন হয়তো তাঁকে ঘরে রাখা হতো। একবার দেখেছিলাম রবিদার বারাণ্ডায় তিনি কেবলি এদিক থেকে ওদিকে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন আর আসছেন। কারুর কথা শুনছেন না। কেউ সামনে দাঁড়াতে পারছেন না। এ তো গেল বাড়াবাড়ির কথা। কিন্তু সোমদাদা যখন ভাল থাকতেন, বেশ থাকতেন। রোজ বিকেলে তিনটের সময় আমাদের ৫নং বাড়ীর দক্ষিণের বারাণ্ডায় এসে একটি লম্বা ইজিচেয়ারে বসতেন, আপন মনে হাতের মুঠো খুলতেন আর বন্ধ করতেন, যেন কি ধরছেন আর ছেড়ে দিচ্ছেন। আমরা—ছোটরা কিন্তু তাঁকে খুব ভালবাসতুম, একটুও ভয় পেতুম না। তিনি কত ছড়া বলতেন, গান গাইতেন।

একটা গান তিনি প্রায় গাইতেন—"বলি ও আমার গোলাপবালা, তোল মুখানি তোল মুখানি, কুসুম কুঞ্জ কর আলা।" আমাদের ভারী মজা লাগতো। সাদা পাঞ্জাবী আর ঢোলা ইজের পরা লম্বা মানুষ ইজিচেয়ারে দুই পা তুলে বসে থাকতেন, আমাদের পাকা চুল তুলতে বলতেন, বলতেন "যা ছোট বৌমার কাছ থেকে দুটো পান নিয়ে আয়।" খুব পান খেতে ভালবাসতেন।

বলতুম "কি দেবে পান এনে দিলে?" বলতেন "কলের পুতুল দেবো। নাচবে, চলবে, বলবে।" পুতুলের লোভে রোজই পান এনে দিতুম, কিন্তু কলের পুতুল আস্‌বো আস্‌বো করেও আসতো না। "পুতুল কই" জিজ্ঞেস করলেই বলতেন—"আস্‌বে রে আস্‌বে, দোকানে কিনতে গেছে।"

সোমদাদা খেতেও ভালবাসতেন, আমার মা, তাঁর ছোট বৌমা তাঁকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। বিকেলবেলা প্রায় অন্দর বাড়ীতে আমার মায়ের কাছে যেতেন। মা তাঁর কাকামশাইকে প্রণাম করে থালা ভর্তি জলখাবার খাওয়াতেন। সোমদাদা কত খুসী হয়ে খেতেন, আমাদের বড় ভাল লাগতো।

সোমদাদার বিয়ে-থা হয়নি, কিন্তু তিনি বেশ বিয়ে পাগলা ছিলেন। তাঁর একটি কল্পনার বধূ ছিল, তার কথা তিনি বলতেন—নাম তার প্রভাবতী, সে ভারী রূপসী। আমাদের বাড়ীর বড় বড় ছেলে মেয়েরা মাঝে মাঝে একটি ছোট ছেলেকে দিব্য মেয়ে সাজিয়ে "প্রভাবতী" বলে তাঁকে দেখাতো, তিনি মুগ্ধ চোখে তাকে দেখতেন, হাসিমুখে কথা বলতেন। ভারী মায়া করতো।

তারপর একদিন তাঁর কি অসুখ হলো, কয়দিন পরে শুনলুম

* সোমেন্দ্রনাথ মহর্ষির অন্যতম পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী অগ্রজ। রবীন্দ্রজীবন অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনের সূচনাপর্বে তাঁর অগ্রজদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাববিস্তার যখন শুরু হয় তখন রবীন্দ্রনাথ বাল্যগণ্ড অতিক্রম করে কৈশোরে উপনীত। জন্মের পর থেকে এর পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত যে অগ্রজকে রবীন্দ্রনাথ অতি ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলেন তিনি হলেন সোমেন্দ্রনাথ। তাঁর সেই দিনগুলির দৈনন্দিন জীবনের সর্বকর্মের সাথী ছিলেন এই অগ্রজ। সুতরাং অগ্রজদের মধ্যে জীবনে সর্বপ্রথম যে অগ্রজকে বন্ধু সাথী এবং ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হিসেবে কবি পেয়েছিলেন—তিনি হ'লেন সোমেন্দ্রনাথ।

সোমদাদা মারা গেছেন। আমাদের বাড়ীর কেউ মারা গেলে ছোটদের দেখতে দেওয়া হতো না।

তাঁকে যখন নিয়ে গেল, আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলুম তাঁকে। সমস্ত দেহটি ফুলে ফুলে ঢাকা, কেবল তাঁর চওড়া কপালটি চক্‌চক্ করছিল দেখা গেল।

অনেক দিন পরে বাবা যখন জোড়াসাঁকো ছেড়ে গুপ্তনিবাসে চলে গেছেন, সেই সময় একদিন বাবা পুরানো দিনের গল্প করতে করতে বললেন, সোমকাকার তৈরী ছুটি মজার পদ্য গান মনে পড়েছে—লিখে নে।

বাবা গাইলেন, আমি লিখে নিলুম।

(বিদু)

ওগো বিদুভট্ট, রেগোনা চট্ট
তোমার একি ব্যবহার
ছেড়ে বাসা কোটরে আসা
কেন হে তোমার ?
বুঝেছি তোমার কারখানা
বাড়ীতে বানিয়েছ জেলখানা।
আছেন তোমার দু'টি গৃহিণী
তাঁরা যেন রায়বাঘিনী
শতমুখী করেন প্রহার।
মুখনাড়া দেন বারে বার
তুমি শতমুখী খেয়ে
ভয়ে জড়সড় হয়ে
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বল বারে বার।

[বিদুভট্ট - - - শ্রীহেমেন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামায়ণের অনুবাদক।]

পুঁটে ভটচাজ তোমার এখানে এসে কি দরকার ?

যাও হে শ্রাদ্ধবাড়ী
সেথা পাবে লুচি তরকারী
খেয়ে মণ্ডা পেটটি করবে ঠাণ্ডা হে।
টিকিতে ফুল গুঁজিয়ে
চটিজুতো চটপটিয়ে
ও পুঁটে যাও হে ছুটে করগে বিদায় আদায়।

মানসিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সোমেন্দ্রনাথ একজন সুনিপুণ গীতিকার ছিলেন। তাঁর দু'টি হাস্যরসাত্মক রচনা উদ্ধৃত করা হ'ল—এইবার তাঁর রচিত একটি আধ্যাত্মিক গম্ভীর রসসমৃদ্ধ গান উদ্ধৃত করে তাঁর কথা শেষ করি। এই রচনাটি তাঁর রচনাশক্তির পরিচায়ক বলা যায়।

(ললিত-আড়াঠেকা-সুর হিন্দুস্থানী)

দেখিতে তরঙ্গময় ভবপারাবার
তরঙ্গ সে কিছু নয় আতঙ্কই সার।
অসীমের ভাব যত হৃদয়ে আসিবে তত
ক্ষুদ্র তৃণটির মত দেখিবে সংসার।
কম ঝড় বয়ে যাবে হৃদয় অটল রবে
কি ভয় কি ভয় তবে ?
অতিক্রমি দুঃখশোকে অনন্ত অনন্ত লোকে
নিরখিবে অনন্তের মহিমা অপার।

একটি বক্তব্য

শ্রীমমতা লাহিড়ী

মাঘ ১৩৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'অসঙ্গত সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে' প্রবন্ধটি পড়েছি। এর আলোচিত বিষয়টি "সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কারো ব্যক্তিগত মতটাই সার্বজনীন এবং অভ্রান্ত বলে মনে করা যায় না। প্রত্যেক সমস্যারই দুটি দিক আছে। প্রথমেই বলে রাখি স্বামীহীনার কুমারীর মত সজ্জা অথবা আহার, এতে আমার নিজস্ব আপত্তি কিছু নেই। তবুও ভেবে দেখতে হবে, দেশ, কাল, সমাজ ব্যবস্থা ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে এ প্রস্তাবটা কতদূর কার্যকরী।

লেখিকা নিজেই বলছেন 'সব হারানো।' যার স্বামী সৌভাগ্যের অলঙ্কার খসে পড়ে গিয়েছে, যে রাজরাণী থেকে ভিখারিণী হয়েছে, যার বাহিরের জগৎ ও ভিতরের জগৎ শূন্য, বিবর্ণ, তার বাহিরের রঙিন অথবা শুভ্র সজ্জার কিছু পার্থক্য সত্যই কি আছে? 'সব হারানো' মনে করলে, শুভ্র বসনের পরিবর্তে বিচিত্রবসন ব্যবহার করলেই কি সেই 'সব'টা আবার ফিরে আসবে?

ব্যতিক্রম আছে, অস্বীকার করি না। সম্পদশালিনী বিধবার ওষ্ঠে লিপষ্টিক, মুখে সমস্ত প্রসাধন, মণিবন্ধে 'রিষ্টওয়াচ', অন্যহাতে অলংকার, কণ্ঠে হার, বিচিত্র পাদুকা চরণে, শুভ্র চিকনের শিল্প কাজ করা শাড়ী দেখেছি। এর ব্যতিক্রম ত দেখেছি যিনি স্বামিসৌভাগ্য বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সাধারণ সুখসুবিধাগুলিও স্বেচ্ছায় বিনা ক্লেশে ত্যাগ করেছেন। সব রকমই আছে। এই দুটি উদাহরণের মধ্যবর্তিনীদের মধ্যে অল্পবয়স্কা যাঁরা, তাঁদের প্রতি সাধ্যমত 'নির্দয়' না হবার চেষ্টা বর্তমান সমাজে চলছে; পাড়যুক্ত শাড়ী পরিয়ে, গলা ও হাত ভূষণশূন্য না করে। তরুণী বিধবা বধূ বা কন্যা, নিষ্করুণ বেশে সামনে থাকবে, এটা অভিভাবকের মনে সত্যই আঘাত করে। একজন স্বজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কথা জানি যাঁরা তরুণী বিধবা পুত্রবধূকে কুমারী কন্যাবৎ রেখেছেন।

ভারতীয় নারীসমাজে মহারাষ্ট্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের নারী সকল দিক দিয়ে অগ্রগামিনী। ভারতীয় অন্য প্রদেশীয়ার মত অবগুণ্ঠন প্রথা তাঁদের মধ্যে নাই। তাঁদের সধবা ও কুমারী অবগুণ্ঠনশূন্যা। স্বামিহীনা হওয়া মাত্র তাঁদের মাথায় আবরণ দেখা যায়। তাঁদের নিয়মে, "স্বামী স্ত্রীর মাথায় ছত্রস্বরূপ; তাই সধবার অবগুণ্ঠন নিষ্প্রয়োজন। সকল প্রদেশীয়াই স্বামিবিয়োগে কুঙ্কুম, মঙ্গলসূত্র, কাচের চুড়ি প্রভৃতি মঙ্গল-চিহ্ন ত্যাগ করেন। সরু পাড় অথবা হালকা একরঙা শাড়ী, থানও পরতে দেখেছি। তবে কোন বিচিত্রবসন পরতে দেখিনি। এ'দের বেশ সম্বন্ধে যেটুকু জানি, জানালাম।

বিধবার বহির্জগতে কাজ করতে গেলে, তাঁর কুমারী সজ্জাটা কি খুব সম্ভ্রমজ্ঞাপক হবে? বাহিরের লোকে "কৃপার চোখে" না দেখে "প্রীতিপূর্ণ চোখে" দেখলেই কি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে? বিধবার পুনর্বিবাহ সম্ভাবনার আতঙ্ক আজ কারো নেই। কিন্তু 'বিবাহের চেয়ে বড়' মতবাদযুক্ত নরনারীর সংখ্যা যে ক্রমবর্ধনশীল; আতঙ্কটা সেইখানেই। বহির্জগৎ সুখের স্থান নয়, নারীর নিজের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য তার বাহিরের সাজসজ্জার প্রয়োজন, তিনি কুমারী সধবা বা বিধবা যা হন। নার্স, পুলিশ নারী এঁদের সাদা বা খাকী 'সজ্জা'তে যদি কোন 'শারীরিক' বা 'মানসিক' অসুবিধা না হয়, পতিহীনা কর্মী নারীরই বা হবে কেন?

এবার আহার্যের কথা। বর্তমান দুর্দিনে ও মৎস্য দুর্ভিক্ষের দিনে বিধবা ব্যতীত অন্য শ্রেণীও কে কত মৎস্য বা আমিষ আহার করতে পাবেন বা পাবছেন এব হিসাব পাওয়াটা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। পূর্বেই বলেছি যেখানে অর্থবল আছে, সেখানের কথা বিভিন্ন। সেখানে সধবা বিধবার কোন প্রশ্ন নাই বা কেউ "শাসন" করবারও নাই।

দেহের উপর প্রাধান্য মনের; যার মানসিক সুখসম্পদ বিলুপ্ত হয়েছে তাকে আমিষ আহারে প্রবৃত্ত করলেই তার মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য পূর্বের মত হবে কি? লেখিকা নিজেই বলছেন "অন্য প্রদেশবাসীরা অধিকাংশ নিরামিষাশী"; তখন নিরামিষ আহারটাই কি স্বামিহীনার দুর্বলতার প্রকৃত কারণ?

একটা কথা মনে হয়। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়া সোজা। পাশ্চাত্য দেশেও প্রচুর সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী আছেন, তাঁদের পরিচ্ছদও স্বতন্ত্র। আহারের বিচার অবশ্য থাকে না তবে যতদূর জানি উপবাস আছে। আমাদের দেশেও প্রচুর সাধুসন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী। এ'দের সন্ন্যাসে ত্যাগ আছে, কিন্তু সেই সবের কর্তব্য ত্যাগও অনেক সময় আছে। আমার বিশ্বাস, সংসারে থেকে সন্ন্যাসিনী থাকাই ত্যাগের পরীক্ষা। আমরা হিন্দু, পরজন্ম বিশ্বাস করি। স্বামীর অবর্তমানে সংসারে থেকে, সকল কর্তব্য পালন করে, নিজে ত্যাগ স্বীকারের মর্যাদা ও মূল্য অবশ্যই আছে। সেজন্য আহার ও বিহারের সংযম মানসিক সংযমকে নিশ্চয়ই সাহায্য করে। নিম্নশ্রেণীর বিধবার মধ্যে আমিষের প্রচলন আছে ঠিক। কিন্তু ওর মধ্যেও স্বেচ্ছায় আমিষত্যাগিনী আছে। সাত্ত্বিক আচারের ছাপ মুখে পড়ে এটা যে কেহ লক্ষ্য করে দেখবেন। নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর পার্থক্য কিছু থাকবে। নিম্নশ্রেণীতে পুনর্বিবাহ চলছে; উচ্চশ্রেণীতে নগণ্য। শুধু এদেশে নয় সকলদেশের উচ্চ বা অভিজাত সমাজে পুনর্বিবাহ অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদ দুর্লভক্ষেত্রে দেখা যায়। এটা আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষারই অন্যতম নিয়ম।

বিধবার উপরই হিন্দুধর্ম রক্ষার ভার ন্যস্ত, এটা সত্য যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু এ কথার উত্তরে এইটুকুই আমার বক্তব্য আছে যে যুগের বহু পরিবর্তন ঘটেও, আজ প্রচুর আধুনিকতার—এমন কি স্বেচ্ছাচারও অনাচারের ঢেউ এসে হিন্দুসমাজ তথা ভারতীয় নারীসমাজকে নাড়া দিয়ে গেলেও, আজও ভারতীয় নারীর মধ্যে যে কাণ্ড আছে তা অন্য কোন নারীসমাজে নাই। একজন রাজপুত কবি বলেছেন, "রাজপুত নারী রাজপুত বীর অপেক্ষা অধিক বলে বলবতী। আমরা লৌহবর্মে সজ্জিত হয়ে শত্রু বধে যাই। রাজপুত রমণী শুক্লবস্ত্র মাত্র পরিধান করে জলন্ত অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন করে।" এর নৈতিক বলের ছন্দাংশ বজায় আছে বলেই আজও ভারত ভারত। কারো কারো হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, যে' সতীদাহ' বহুকষ্টে নিবারণ করা হয়েছে—সেই কুখ্যাত 'সতী' একজন নারী স্বেচ্ছায় মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯৫৪) হয়েছেন। অবশ্য তিনিও রাজপুত মহিলা। মানসিক বলই একমাত্র বল। একে 'ধর্মীয় উন্মত্ততাবাদ' বা যা বলুন। এই ভাবটা বিদূরিত হলে অবশ্য ভারত বিবাহ-বিচ্ছেদ, আহার-বিহার-সাম্যবাদ ও অন্যান্য নানা সমতায় নেতৃত্বগ্রহণ করতে পারবে—আশা করা যায়।

স্বামিহীনা নারীর সংযম পালন একটা বিশিষ্ট সামাজিক সত্য, সমস্তাও বলা যায়, বিভিন্ন মতে বিরাট অবিচার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এর পিছনে ভারত তথা ভারতীয় নারীর ত্যাগের আদর্শ আছে। কেউ ত্যাগ করলে তবেই অন্তে ভোগ করতে পারে। দুঃখ না থাকলে সুখ চেনা যেতো না। দুর্যোগ আছে বলেই রৌদ্রদীপ্ত দিনের সুপ্রভাত হয়। ভারতের আদর্শ ত্যাগে, ভোগে নয়। স্বামিহীনারা কুমারীরূপ ধরলে তাঁরা কি পাবেন বলতে পারি না, তবে তাঁদের সম্বন্ধে জনগণের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম কতটা বর্তমান থাকবে সে বিষয় সন্দেহ আছে। এই তুচ্ছ আহার-বিহার সমস্যার সমাধানে শক্তি অপচয় না করে তাঁদের সমাজে থাকার যোগ্য ব্যবস্থা ভরণ-পোষণের সু-উপায়, অসহায়াদের প্রতি প্রকৃত সাহায্য, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা এইগুলির সু-পরিকল্পনা করতে সামাজিক নেতা-নেত্রীরা অগ্রগামী হলে এঁদের ও সমাজের অধিকতর উপকার করা হবে বলে মনে করি।

শিশুর প্রতি কর্তব্য

শ্রীমতী আশালতা দেবী

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ার গত ২১।৭।৬২ তারিখে কলিকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের নতুন পেডিয়াট্রিক ও ক্যাজুয়ালটি ব্লকের উদ্বোধনকালে শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কে বলেন—"বর্তমান রুগ্ন শিশুদের শুধু গরীবের ঘরে নয়, ধনীর ঘরেও দেখা যায়। কারণ তাহাদের মা-বাবা অনেক ক্ষেত্রে শিশুর প্রতি যোগ্য আদর-যত্ন নেন না। মায়েরা চাকরি করেন। বাবা ক্লাব বা তাস খেলা লইয়া ব্যস্ত থাকেন। শিশুদের দেখিবার মত কেহই থাকেন না।"

কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য। কারণ অধুনা মেয়েরা একটু শিক্ষিতা হলেই বহির্জগতে চাকরীর সন্ধানে বের হয়। অতীতের মত নিজের ছোট ভাইবোনদের প্রতি যত্ন নেওয়া বা বৌদি, মা, কাকিমা ইত্যাদির কাজে সাহায্য করার আবশ্যকতা বোধ করে না এবং যেখানে একজন বেকার যুবক চাকরী পেলে একটি পরিবার রক্ষা পায় ও কন্যাদায়গ্রস্ত এক ব্যক্তি উদ্ধার হতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজেরাই চাকরীক্ষেত্রে এসে বেকার যুবকদের চাকরী প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করছে। নারীদের দেহ যে পুরুষদের মত বহির্জগতে গিয়ে কঠিন কাজের উপযোগী নয়, শারীরিক ও প্রাকৃতিক কারণে সংসারে—গৃহে থেকে যে তাদের সাংসারিক যাবতীয় কাজ-কর্ম করা বাঞ্ছনীয়, বহির্জগতে গেলে সব সময়ে পবিত্রতা বজায় রাখা যে কষ্টকর, এইটা যেন তারা আর মানতে চায় না।

অনেক বিবাহিতা মহিলাদেরও নিজেদের সন্তান প্রতিপালনের ভার চাকরের উপর দিয়া চাকরী করিতে দেখা যায়। অনেক বাড়ীতে দেখা যায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনে চাকরী করিতেছে, তাদের অবর্তমানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অল্প বয়সেই নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। হয় ত এইরূপ দম্পতির পাশের বাড়ীর কোন যুবক বেকার জীবনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দুঃখে আত্মহত্যা করছে। রাজনীতি ক্ষেত্রেও বর্তমান যুগে অনেক অবিবাহিতা ও বিবাহিতা নারীদের দেখা যায়। মহিলারা কি কর্মক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে পুরুষদের অধিক যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন? যদি না পারেন, তবে তারা পরিবারের মেরুদণ্ড যুবকদের বঞ্চিত করে চাকরী করা বা রক্তের সম্পর্কহীন পুরুষদের সঙ্গে মিশে রাজনীতি করার কি যুক্তি থাকতে পারে? নারীরা যদি বহির্জগতে না এসে নিজের ও ঘরের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেয়, তবে ঘরের ছেলেমেয়েরা ভাবী জীবনে সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান হতে পারবে এবং উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে পারবে। বিবেকানন্দ, শিবাজী, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মায়ের শিক্ষা ও যত্নে ভাবী জীবনে মহাপুরুষ হইতে পেরেছিলেন, যাঁদের ভারতবাসীরা এখন শ্রদ্ধাবনত শিরে স্মরণ করে। কিন্তু নারীরা বহির্জগতগামিনী হওয়ার পর থেকে সেরূপ একটি সুসন্তানও দেশে দেখা যাচ্ছে না, যার ফলে ভারতের মত একটি বৃহৎ দেশ দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছে। এখন যাঁদের অনেকে দেশের সুসন্তান বলে, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতের ভাবী ইতিহাসে হয়তো স্বজাতি, স্বধর্ম ও স্বদেশদ্রোহী বলেই পরিচিত হবেন। হয়তো এঁদের কাহাকেও ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান নামক শত্রুরাষ্ট্র সৃষ্টির জন্যও দায়ী করা হবে।

অবশ্য ঘরের ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষিত, চরিত্রবান ও স্বাস্থ্যবান করার ব্যাপারে পুরুষদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাঁদের কাজের ফাঁকে তাস-পাশা ইত্যাদি সর্বনাশা খেলা না করে, ক্লাব গঠন ইত্যাদি অনাবশ্যক ব্যাপারে দৌড়াদৌড়ি না করে, ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া কর্তব্য। যে সংসারে পিতা কাজের ফাঁকে নিজের ও ঘরের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখেন, মায়েরা বহির্জগতে না গিয়ে সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেন, সে ঘরের ছেলেমেয়েরা ভাবী জীবনে বিদ্বান, চরিত্রবান হয়ে দেশমাতার মুখ উজ্জ্বল করতে পারে এবং উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে। যেখানে সন্তানের প্রতি মা-বাবার কারো যত্ন নেই, সে ঘরের ছেলেমেয়েরা কেউ রোগী, কেউ দুশ্চরিত্র, কেউ স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহী, কেউ বা ডাকাত ইত্যাদি হয়ে থাকে। ১০।৮।৬২ তারিখের একখানি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ, ১৯৫৯ সালে ভারতে শিশু অপরাধীর সংখ্যা ছিল ৪৭,১২৫ জন এবং ১৯৬০ সালে ৪১,২৭৬ জন। বর্তমানে মাতা-পিতার যত্নের অভাবেই দেশে শিশু অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

মোট কথা, সন্তানদের প্রকৃত মানুষ করে তোলার ব্যাপারে মা-বাবা দু'জনেরই দায়িত্ব রয়েছে। মা যদি ঘরে থেকে নিজের সন্তানকে চরিত্রবান, সুশিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান করবার জন্য সচেষ্ট থাকেন; বাবাও যদি কাজের ফাঁকে সন্তানকে মানুষ করার ব্যাপারে মাকে সাহায্য করেন, সেক্ষেত্রে ঘরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকে। মায়েরা বহির্জগতে গিয়ে যে আনন্দ পান, বাবা তাস-পাশা ক্লাব ইত্যাদিতে মেতে যে আনন্দ পান, নিজের সন্তানকে দেশরত্ন করতে পারলে তার চেয়ে কি বেশী আনন্দ পাবেন না?

এই সমস্ত বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর (মহিলা মন্ত্রীর) সময়োচিত উপদেশ মা-বাবা গ্রহণ করলে ঘরের ছেলেমেয়েদের মঙ্গল তো হবেই, সেই সঙ্গে দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।

ক্ষুধিত পাষাণ

রমা গোস্বামী

আমি জীবনে বহুবার রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি পড়েছি। এমন কি আজও পঠন-স্পৃহার নিবৃত্তি হয়নি,

অবসর সময়ে এখনও পড়ে থাকি। গল্পকার ঐতিহাসিক পটভূমিকার অবশিষ্টাংশ হ'তে রস আহরণ করে বিস্তার করে থাকুন কিংবা যে ভাব অবলম্বন করেই কলম ধরে থাকুন না কেন, আমার কাছে কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণের' একটি দিকই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে উপভোগ্য হয়ে থাকে এক অতি মধুর অনির্বচনীয় ভাব, সেটি হ'ল নর-নারীর মধ্যে পরস্পর মিলিত হবার আকুল অভিলাষ, ব্যাকুলতা। কিন্তু আরও বিচিত্র এই যে, নর-নারীর কেবল দেহ গত বিভেদ মাত্র, আত্মার নারী-পুরুষ বলে কোনো ভেদ নেই। ঈশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া জগৎ সংসারের পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, যাতে সহজে কেউ ঐ দেহগত বিভেদের অভিমান শূন্য না হ'তে পারে। স্বয়ং ভগবান কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে দিতে বলেছেন—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।'

অতএব মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এখানে মাতার সঙ্গে পুত্রের নয়, পিতার সঙ্গে পুত্রীর নয়, ভ্রাতার সঙ্গে ভগ্নীর নয়, নারী-পুরুষের চিরন্তন অভিলাষকে অবলম্বন করে মায়াবাদের ওপরেই 'ক্ষুধিত পাষাণের' ভিত্তি স্থাপন করেছেন। বিশ্লেষণ করে ভাবতে বসলে বেশ বুঝা যায় যে, দুটি আকাঙ্খা মানবের মনে জাগ্রত রয়েছে। জ্ঞানোন্মেষের সাথে সাথেই মানব আনন্দ লাভের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠে, কেননা জীবাত্মার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবই হ'ল—অনুক্ষণ অনাবিল আনন্দ উপভোগের বাঞ্ছা করা। কারণ আনন্দময় পরমাত্মার অণু অংশ হ'ল জীবাত্মা, সুতরাং যে আনন্দ হতে তার উৎপত্তি, সেই আনন্দই সে অনুভব করতে চায়। কিন্তু মায়ার ফাঁদে পড়ে ভুল পথে ছুটে চলে, জগতের ক্ষণ-ভঙ্গুর আনন্দে তার মন ভরে না, অথচ অনন্ত সত্য আনন্দকেও সে ধরতে পারে না। তারপর যে লিপ্সার পরিণতিতে মানবের পাঞ্চভৌতিক দেহ গঠিত হয়েছে, সে লিপ্সাতে নিমগ্ন হওয়া এটিও তার প্রকৃতিগত স্বভাব। কেননা যে লিপ্সা হ'তে তার উৎপত্তি, সেই লিপ্সার আকাঙ্খা মানবের স্বভাবতঃই জাগ্রত হয়ে ওঠে। কিন্তু মায়িক জগতের এ মোহ যে নিছক মরীচিকা, সেটি মায়ামুগ্ধ জীবকে একমাত্র স্মরণ করিয়ে দিতে পারে শুধু বিবেক।

আমরা দেখতে পাই, গল্পকার মেহের আলির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'তফাৎ যাও, সব ঝুঁট হ্যায়!' কিন্তু এই সাময়িক 'তফাৎ যাও, সব ঝুঁট হ্যায়' বলায় কারও চৈতন্য হয় না। বর্ণনায় আসা যাক, যেমন—আকাঙ্খা আবহমান কাল হ'তে করে আসছে মানব, সে শুধু তার স্বভাবের বশীভূত হয়ে। কিন্তু মোহিনী মায়া সে আকাঙ্খাকে অপার্থিব আনন্দ লাভের দিকে এগোতে না দিয়ে জগতের পার্থিব মোহে নিপতিত করে, ধনে—জনে—মানে—প্রতিষ্ঠায় আর লিপ্সায়। তবু সবচেয়ে মানবকে বিমোহিত করে তোলে লিপ্সা। শুধু রবীন্দ্রনাথের তুলার মাশুল আদায়কারীই বা কেন, জগতের প্রায় সব মানবেরই এক ইতিহাস! যখনই দুর্লঙ্ঘ্য আকাঙ্খা-পর্বতের অন্তরালে জ্ঞান-সূর্য অস্তমিত হয়, তৎক্ষণাৎ চৈতন্যের নাট্যশালায় নেমে আসে মোহময় ছায়ার যবনিকা। তখন আবিলতাহীন 'স্বচ্ছতোয়া'—চিন্তা স্রোতে সহসা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাসনা-প্রাসাদ বাসিনী কত অজানিতা! অপরূপ এক পুলক জেগে ওঠে, কিন্তু এ রহস্য মানব বুঝতে পারে না। স্বচ্ছ-চিন্তা ধারা অকস্মাৎ কেন অনেকগুলি বলয় শিঞ্জিত বাহু-বিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ—এ তথ্যের আর উদ্ঘাটন হয় না। অজ্ঞাত আবেশে রোমাঞ্চিত হয়ে, এক অভূতপূর্ব আকর্ষণের টানে মানব শুধু সেই প্রহেলিকার দিকে এগিয়ে চলে এবং ক্রমশঃ স্থূল ভোগের বাসনা তার আরও বর্দ্ধিত হয়ে ওঠে। চতুরিণীমায়া তখন এ হেন মোহগ্রস্তকে শুধু ভাবমগ্ন করে রাখে না, ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে তাকে। মায়ার অমোঘ নির্দেশে এগিয়ে চলতে হয় মানবকে ঠিক যন্ত্রচালিতের মত। অদৃশ্য দূতীর ইঙ্গিতে সঙ্কট-সঙ্কুল অভিসারেও যাত্রা করে সে। রহস্যময়ী দূতী যখন বাসনা-প্রাসাদের বহু প্রকোষ্ঠে ঘুরিয়ে এনে অবশেষে এক ঘননীল পর্দার সম্মুখে থমকে দাঁড়িয়ে অঙ্গুলী নির্দেশে সঙ্কেত করে, তখন ভয়ে স্তম্ভিত হতে হয় মানবকে। কারণ, দুর্বার আকাঙ্খা বহন করে এতদূর এগিয়ে—মোহের চরম সীমায় পৌঁছে, ভীষণ-দর্শন প্রহরীকে ঘননীল পর্দার সম্মুখে উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে নিয়ে বসে থাকতে দেখে, বিশেষতঃ পুরুষের ছদ্মবেশে নারীকে অবলোকন করে তার ভীত ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হওয়া স্বাভাবিক, তারপর সে নারী যদি পরিচিতা নারী হয় তো আরও চমকপ্রদ অবস্থা!

গল্পকারের বর্ণনার ভঙ্গী দেখে মনে হয় যে ঐ প্রহরী মানবের বুদ্ধি, যার সঙ্গে তার পরিচয় নিরন্তরই রয়েছে; কেননা বুদ্ধির দ্বারাতেই সে চালিত হয়ে থাকে, সুতরাং সেই বুদ্ধিকে তরবারি হাতে ভীষণ-দর্শন পুরুষের ছদ্মবেশে ঐ প্রকোষ্ঠে অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করায়—এক অজানা শঙ্কায় অন্তর দুলে ওঠা বিচিত্র নয়। প্রহরী যদিও তন্দ্রাচ্ছন্ন, তবুও মানব ইতস্তত করতে থাকে। কিন্তু দূতী সেই বুদ্ধিকে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে মানবকে প্রোৎসাহিত করে তোলে—ভয় কিসের? ভয়ঙ্কর-দর্শন পুরুষ হলেও ও অপদার্থ—খোজা! ওর কোনো পুরুষত্ব নেই। মূলতঃ ও নারী বলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রেখেছি। নারীর চতুরতা নারী যত সহজে ধরতে পারে—পুরুষ তা পারে না। তাই সজাগবুদ্ধির কাছে মায়ার পরাজয়ই ঘটে থাকে, কারণ সজাগবুদ্ধি ঘননীল যবনিকার অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটনে পটীয়সী! অতএব আজিও ওটি ওর ছদ্মবেশ বলে বুঝতে পেরে—বাধ্য হয়েই ওকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছি, সুতরাং ভয় কি? শঙ্কান্বিত মানবকে অভয় দিয়ে, সেই ঘননীল পর্দার এক প্রান্ত তুলে ধরে মায়া, সে যেন তখন আর একা নয়—মানবের মনকে আত্মসাৎ করে দ্বৈতরূপিণী হয়ে ইঙ্গিত করে যে, পর্দার অন্তরালে রয়েছে দৈহিক ও মানসিক লিপ্সার নানা উপঢৌকন, অতিথি সমাদরের বিপুল সমারোহ! মুগ্ধ মানব তখন বিহ্বল অবস্থায় কম্পিত বক্ষে সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন বুদ্ধিকে লঙ্ঘন করতে গিয়েও যেন থেমে ওঠে। বিবেক তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে—'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। সেই শব্দে প্রহরীরও তন্দ্রা ছুটে যায়। কিন্তু এটি সাময়িক। আবার মায়ার জালে জড়িয়ে পড়ে মোহের আবর্ত্তে পাক খেতে থাকে মানব। তার বাসনা পুনরায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, সেই মূর্তবিগ্রহ ছলে, বলে, কৌশলে, অনুযোগে, অভিযোগে, অভিমানে, ক্রন্দনে মানবকে আত্মসাৎ করে নিতে চায়।

মানব বলতে যে শুধু পুরুষজাতিকেই বুঝা যায় তা নয়, নর-নারী সমূহকেই মানব জাতি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বাসনা নারী-পুরুষের মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথমে পুরুষকেই নারীর মোহে আকৃষ্ট হতে দেখিয়েছেন। তার কারণ এই যে, পুরুষ জাতি স্বভাবতই হৃদয়ের আবেগকে দমন বা ধারণ করতে অক্ষম,

নারীজাতি সে বিষয়ে দক্ষ। সুতরাং পুরুষ যখন আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে এগিয়ে আসে, তখন নারীর হৃদয়ের আবেগ নানাভাবে রূপান্তরিত হয়ে ফুটে ওঠে, এইটিই হল নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। গল্পকার কঠিনমায়া ইত্যাদি নারীর মুখ দিয়ে প্রকাশ করিয়েছেন। কঠিনমায়া বলতে যেটি বুঝায় অতি শক্ত, গভীরনিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তজনের বাহ্যচেতনা শূন্য অনুভূতি বর্জিত অবস্থা এবং 'নিষ্ফলস্বপ্ন' শব্দে অবচেতন মনের অঙ্কুরিত বাসনা যেটি নিদ্রাকালে শাখা বিস্তার করে স্বপ্নরূপে প্রতিফলিত হয়েও ফল রহিত, সেই সব অনভিলষিত গণ্ডি পার করে—ঘোটকের চেয়েও দ্রুতগামী যেমন সেই মন-তুরঙ্গে আমাকে অধিষ্ঠিত করে নিবিড়ভাবে তুমি আমাকে তোমার বুকে চেপে ধরো, তারপর তোমার গাঢ় ভাবময় ঘন-ছায়াচ্ছন্ন বনের মধ্য দিয়ে—মর্যাদারূপী পাহাড়ের ওপর দিয়ে—নিরাশা নদী পার করিয়ে হে মানব, প্রেম-সূর্যের আলোকে সমুজ্জ্বল তোমার হৃদয়-প্রকোষ্ঠে আমাকে তুলে নাও! আমার অন্তরের আকাঙ্খারূপী-ক্ষুধা নিবৃত্ত করো!

বিভ্রান্ত মানব বুঝতে পারে না যে, বাসনার প্রতিটি অংশই ক্ষুধার্ত! স্বয়ং ক্ষুধা নিবৃত্তির আশা নিয়ে অবশেষে সে নিজের আহারের আহার হয়ে বসে! নিজেকে বাসনার প্রতিটি অণুর মুখে তুলে দিয়েও কামনাসুন্দরীকে কি ভাবে পরিতৃপ্তির তীরে ওঠাতে হবে—ভেবে পায় না। এই অসহনীয়—অবর্ণনীয় ভাবের পরিসমাপ্তিও হয়তো একদিন ঘটে থাকে, যেদিন বিবেক, বাসনা অজগরের কবলের চারিদিকে এক অদ্ভুত-মোহাবিষ্ট পাখীর মত ঘুরতে-ঘুরতে নিজেকে সতর্ক করার ছলে মোহাচ্ছন্নকে জ্ঞানের আলো দেখিয়ে চিৎকার করে ওঠে—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও সব ঝুঁটা হ্যায়, সব ঝুঁটা হ্যায়!' সেদিন মানব সব ঝুঁটা হ্যায়-এর প্রকৃত অর্থ জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। আকাঙ্খার মোড় ফিরে যায়। তথ্য উদ্‌ঘাটনের আশায় তত্ত্বদর্শীর অনুসন্ধানে এগিয়ে চলে। পিছনে পড়ে থাকে মায়ার হাট! বিবেকের অনুকম্পায়—তত্ত্বদর্শীর নির্দেশে—ভক্তির সহায়তায় সচ্চিদানন্দের সন্ধান পেয়ে অমৃত লাভে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মানব, মর্ত্যের ক্ষুধার চিরতরে অবসান হয়। মায়ার হাত হতে নিষ্কৃতি মেলে।

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।' শ্রীগীতা।

মাদেমায়সেল হিউডিয়ারসের স্বামী

আর বেশীক্ষ। আমাকে এই দুঃখের বোঝা বইতে হবে না। আমার এই দীর্ঘ কুমারী জীবন কাটছিল একটি মাত্র উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে আর দীর্ঘ এবং নিঃসঙ্গ সত্ত্বেও মোটের ওপর বেশ সুখেই। এই উদ্দেশ্য এখন আর নেই, ফুরিয়ে গেছে। না, এর অস্তিত্ব কখনই ছিল না; যা ছিল তা ভ্রান্তি। এখন আছে কেবল আমার কুকুর মুসাটাসে, আমার হারমোনিয়ম, আর শেষের দিনের প্রতীক্ষায় নিজেকে প্রস্তুত রাখা। হুঁ, এ একেবারেই সম্ভব নয়। আমি যদি অল্পবয়সী একটি মেয়ে হতুম, তাহলে আমার গোপন দুঃখের কাহিনী সুন্দর ছোট্ট একটি খাতার বুকে প্রকাশ করে হয়ত বা কিছু লাঘব করতে পারতুম আমার ব্যথা; কিন্তু তেতাল্লিশ বছর বয়সে কেউ নতুন করে কিছু অভ্যাস করতে পারে না।

চোদ্দ থেকে তেতাল্লিশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ কাল বেলা আড়াইটে অবধি আমি ভালবেসেছি ও ভালবাসা পেয়েছি। প্যারিস কিম্বা লণ্ডনের নামকরা সুন্দরীরাও বোধ হয় একথা অহঙ্কার করে বলতে পারে না। আর এই উনত্রিশ বছরব্যাপী পরিপূর্ণ প্রেমের মধ্যে কোনও ঝগড়া নেই, অবিশ্বাস নেই।

এমনি করে এই ব্যাপারের সুরু। আমার বাবা একজন সামান্য রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁর সাহস ও মুরুব্বী না থাকার জন্য কোনদিনই উঁচুপদ পেতে পারেন নি। যখনই এরকম কোন পদ খালি হ'ত, তাঁর চেয়ে সাহসী ও মুরুব্বীওলা ব্যক্তি সে পদ অধিকার করে বসত। তিনি তাঁর সমস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন ছোট্ট মারখে সহরে, যেখানে তিনি তাঁর বিয়ের পর কাজে যোগ দেন ও যেখানে আমি জন্মেছিলুম ও বড় হ'য়ে উঠি।

সেখানে, গিভারীতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল 'আমার স্বামীর'। তাঁর বাবা, মা ও আমার বাবা মা এবং আমি তাকে তাই বলতুম। ছোট লুসিয়েন আসত ও তার প্রত্যেক ছুটির দুমাস কাটাত, আমাদের প্রতিবেশী তার বাবা মার সঙ্গে। তার বাবা আমদানী রপ্তানী বিভাগের একজন কর্মচারী। তাঁর আয় অল্প ও পরিবারটিও বেশ বড়। অল্প আয়ে স্ত্রী ও পাঁচটি সন্তান নিয়ে তাঁকে বেশ কষ্টেই সংসার চালাতে হ'ত। লেটেরটেসদের তুলনায় আমার বাবাকে—স্বল্প স্বাধীন জীবিকা ও একটিমাত্র মেয়ে থাকায় অনেক বেশী ধনী মনে হ'ত। সেজন্য লুসিয়েনের সঙ্গে বিয়েতে চট করে রাজী হওয়ার পিছনে আমার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তাছাড়া, আমাদের দুজনেরই বয়স চোদ্দ বছর—সে আমার চেয়ে দুমাসের বড়; ওরকম বয়সে টাকাকড়ির প্রয়োজনীয়তা খুব কমই মনে স্থান পায়।

লুসিয়েন ও আমি—দুটি ছোট্ট প্রেমিক-প্রেমিকা। সে ছিল খুব ভীরু প্রকৃতির ও শান্ত আর আমি তাকে নিয়ে আমার যা ইচ্ছে তাই করতুম। সে আমার স্বামী, এই বিশ্বাস তার মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলুম আমি—আর এই পরিস্থিতিকে সে গ্রহণও করেছিল। আমার স্বামী চোদ্দ থেকে আঠার বছর পর্যন্ত ছুটির দিনগুলো আমার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াত সমবয়সী ভাই-এর মত। আমরা পরস্পর চুমুও খেতুম কিন্তু তাতে যে আবেগ বা অনুভূতি অনুভব করতুম তার সঙ্গে কোনও পার্থক্য ছিল না আমাদের পরস্পরের ধাক্কাধাক্কি বা চড় চাপড়ের মধ্যে। আজ তেতাল্লিশ বছর পরে, আমি ভেবে দেখছি, আমি নিশ্চয়ই খুব শীতল প্রকৃতির ছিলুম। আর লুসিয়েনের দিক থেকে, আমাদের ছাড়াছাড়ি না হওয়া পর্যন্ত সে ছিল মেয়েদের মত, এমন কি আমার চেয়েও নিরীহ।

আঠার বছর বয়সে আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'ল। মিঃ লেটেরটেস মুরুব্বীর জোরে লুসিয়েনের জন্য বেশ ভাল একটা কাজের যোগাড় করলেন। সে একজন ধনী ইংরাজ ভদ্রলোকের বিদেশ ভ্রমণে সঙ্গী হল। ভদ্রলোক এতদিন সারাজীবন ধ'রে ঘুরে বেড়িয়েছেন ব্যবসার খাতিরে। এবারের পাড়ি দেবার মূলে আছে নিছক আনন্দভোগের উদ্দেশ্য। তাঁর জানা আছে ফরাসী ভাষা চিত্তাকর্ষক আমোদদায়ক, সেজন্য তিনি একজন তরুণ ফরাসীবাসীকে সঙ্গী হিসাবে নিতে চাইলেন।

আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াতে লুসিয়েনের সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশ বিদেশ দেখার কল্পনায় তাকে বেশী খুসীই মনে হচ্ছিল।···আমাদের ভবিষ্যত জীবন কি রকম ভাবে গড়ে উঠবে সে সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার কোন ভুল হয়নি। 'যখনই এই বৃদ্ধ সাবান ব্যবসায়ী' (সেই ইংরাজ ভদ্রলোক—'রবিনসনের সাবান')

আমাকে বেশ কিছু টাকা দেবেন তখনই আমি তাঁকে ছেড়ে তোমার কাছে চলে আসব।...' অনেক টাকা হতে কতদিন লাগবে? এ বিষয়ে আমাদের কোনও নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না, কিন্তু খুব বেশীদিন নিশ্চয়ই লাগবে না। মনে হল, আমাদের বিয়েটা মোটে কয়েক মাসের ব্যাপার। আমিও লুসিয়েনের উৎসাহের অংশ নিলুম। দুজনের হাসি ও চোখের জলের মধ্যে দিয়ে বিদায় অভিনন্দনের পালা শেষ হল।

এ সমস্ত ঘটেছিল পঁচিশ বছর আগে। পঁচিশ বছর! একজন সাধারণ মেয়ের জীবনে সংসারী হওয়া এমন কি সন্তানের পরবর্ত্তী পুরুষের সূচনা দেখবার পক্ষে পঁচিশ বছর যথেষ্ট। আর আমি পঁচিশ বছর কাটালুম বিয়ে ও সংসার গড়ার প্রতীক্ষায়। আমি জানি আমি যদি কাউকে একথা বলি সে বিশ্বাস করবে না। ভাববে, আমি পাগল। তা সত্ত্বেও একথা সত্য। কারণ পঁচিশ বছর ধরে যা আমার জীবনকে মধুররসে ভরে রেখেছিল তা এই যে, আমি তাকে ভালবাসি ও সে আমাকে ভালবাসে। ভাগ্য আমার উপর খুব সদয় ছিল না। আমি প্রথমে আমার বাবাকে হারালুম, তারপর মা। যা অল্প টাকাকড়ি ছিল, তা উকিলের দয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই অর্দ্ধেকে দাঁড়াল। এসব সত্ত্বেও আমি নিরুৎসাহ হইনি। ভবিষ্যতে আমি যে সুখী হব, সে বিষয়ে আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।.....এতদিন ধরে লুসিয়েনকে না দেখা সত্ত্বেও?

হাঁ, তাকে আর না দেখা সত্ত্বেও! সে যা লিখত তা অক্ষরে অক্ষরে আমি বিশ্বাস করতুম। কারণ এই পঁচিশ বছর ধরে সে আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখত। তাতে এমন কিছু থাকত না, যাতে আমাদের ভবিষ্যতের আশা ত্যাগ করার কথা ওঠে। উপরন্তু তার মধ্যে সেই একই ভালবাসার ছাপ ছিল, যা প্রকাশ পেত আমারও চিঠির মধ্যে। আমার ছোট্ট লুসিয়েন এতদিন ধরে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে: ঈজিপ্ট, উত্তর আফ্রিকা, রাশিয়া, ভারতবর্ষ, আমেরিকা। সে চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে 'রবিনসনের সাবানের' সঙ্গে।......মধ্যে মধ্যে সে ফ্রান্সের কাছ দিয়ে গেছে, কিন্তু এত শীঘ্র, এত তাড়াতাড়ি যে চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও তার হাতে ছিল না, গিভারীতে আসতে ও 'তার স্ত্রী'কে দেখতে। 'তার স্ত্রী' এই সম্বোধনে আমাকে সে সবসময় চিঠি লিখত। এবং আমিও উত্তর দিতুম 'আমার প্রিয় স্বামী।'

কাল বেলা দুটোর সময়, সামনের রবিবার গাইবার জন্য কয়েকটা গান আমি হারমোনিয়মে অভ্যাস করছিলুম; এমন সময় আমার ছোট্ট পরিচারিকা এসে আমাকে জানাল যে, একজন মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। ইনি আমার বাবা-মা'র একজন পুরনো বন্ধু। ইনি বিদ্যার্থী-সমাজে বেশ সুপরিচিত—প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের সাধারণ পরিদর্শিকা। তিনি গিভারীতে ফিরে এসে যারা তাঁকে ছোট বয়সে দেখেছে, তাদের নিজের সাফল্য দেখাতে পেরে খুব খুসী। আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে কথাবার্ত্তা বললুম, পুরনো আলাপীদের বিষয় নিয়ে। শেষকালে তিনি বললেন: 'তোমার কি মসিয়ে লেটারটেসের সঙ্গে চিঠিপত্র চলে?'

'লুসিয়েন লেটেরটেস?'

'হাঁ, যিনি ইংলণ্ডে, ডারবীশায়ারে বিয়ে করেছেন।'

আমি কোন রকমে উত্তর দিলুম: 'না, আমি তাঁকে অনেকদিন দেখিনি'......এবং আমি আরোও অনেক কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দিলেন।

বিদ্যালয় গঠন সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে কিছুদিন কারখানা অঞ্চলে কাটান। এইখানে ডারবীশায়ারে, 'রবিনসনের সাবান'এর কারখানায় তিনি দেখতে পান আমার স্বামীকে—লুসিয়েন লেটেরটেস—বৃদ্ধ রবিনসন-এর উত্তরাধিকারী, বিবাহিত ও তিনটি সন্তানের পিতা।

যখন আমি নিজেকে একাকী পেলুম বেশ খানিকটা কাঁদলুম। তারপর নিজের ওপর হাসি পেতে লাগল এই ভেবে যে, আমি এত বোকা যে কি ক'রে বিশ্বাস করেছিলুম—পঁচিশ বছর ধরে কেউ শুধু স্মৃতিকে অবলম্বন করে কাটাতে পারে। একথা সত্যি, এই স্মৃতিকেই আমি দিয়েছি আমার যৌবন ও সৌন্দর্য্য যা বোধ হয় আমাকে আমার স্বামীলাভে সাহায্য করত।......আমি লুসিয়েনকে এই সুরে চিঠি লিখছিলুম—বিশেষ করে তার মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া চিঠিগুলোর জন্য তিরস্কার করে। তারপরেই আমি ভাবতে লাগলুম—এই প্রতারণার জন্য তাকে ধন্যবাদ! কারণ এর জন্যই আমি এই পঁচিশ বছর কাটিয়েছি বেশ সুখের সঙ্গেই। পঁচিশ বছর ধরে আমি বিবাহিত জীবন যাপন করেছি। লুসিয়েন আমাকে যে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে এ না পেলে আমার এতদিন কি ভাবে কাটত? সে বোধ হয় নিজে এটা বুঝেছিল। এরই জন্য ন' বছর আগে যখন সে বিয়ে করে, বলতে দ্বিধা করেছিল: 'বেচারী এডেলী আমার, তুমি এবার আমাকে ভুলে যাও।'

অতএব সাহস চাই!—আর চোখের জল নয়। পঁচিশ বছর ধরে আমি নিজেকে বিবাহিত মনে করেছি। আজ আমি বিধবা কিম্বা পরিত্যক্তা—এই পর্য্যন্ত। তারপর......এ সম্বন্ধে আমি যখন ভাবি, তার তিনটি সন্তান......। আমি যদি মিষ্টি ক'রে স্নেহভরা চিঠি লিখি একটা তাকে এবং তাদের একটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করি, যাতে আমি তাকে মানুষ করে তুলতে পারি, যদিও ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক বেশী সাদাসিধে ভাবে কিন্তু একজন ছোট্ট ফরাসীবাসীর মত, যে কথা বলবে ফরাসী ভাষায়, যে ভাষায় তার বাবা কথা বলত আমার সঙ্গে তার ভালবাসার পুরনো দিনগুলিতে—লুসিয়েন নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করবে না, আমার এই অনুরোধ। আর এই ছোট্ট মানুষটিকে বড় ক'রে তোলার দায়িত্ব আমাকে শেষ যাত্রায় ধৈর্য্যের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার পথে সাহায্য করবে।

এই মতলব মাথায় আসতে খুব খুসী হ'য়ে উঠলুম। বোকা, বুড়ী এডেলী হিউডিয়ার, এবার এগিয়ে এস! চোখে চশমা দাও, তোমার সবচেয়ে ভাল কলমটা নাও, এবার লেখ 'রবিনসনের সাবান'-এর উত্তরাধিকারীকে। একটু সাহস ও শুভেচ্ছা ভাগ্যের সবচেয়ে কঠিন নির্ম্মমতাকে অতিক্রম করার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি হবে একজন মা—যেমন ছিলে একজন স্ত্রী—শুধু কল্পনার জগতে।

অনুবাদিকা—শ্রীরেণু চট্টোপাধ্যায়।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কপিলফলা—দ্রাক্ষাবি°।

কপিল শিংশপা—শিংশপা বৃক্ষবি°। পর্যায়—কপিলা, পীতা, সারিণী, কপিলাক্ষী, ভস্মগর্ভা, কুশিংশপা।

কপিলা—শ্যামলতা (?)।

কপিলাক্ষী—১ মৃগের্বারু, ২ কপিলশিংশপা।

কপিলোমফলা—আলকুশী।

কপিপ্পলিকা—গজপিপ্পলী।

কপিবল্লী—গজপিপ্পলী।

কপিময়না—এক প্রকার ময়না গাছ, sanguiria spinosa.

কপিশা—মাধবীলতা।

কপীকচ্ছু—আলকুশী।

কপীজ্য—ক্ষীরিকা বৃক্ষ।

কপীত—শ্বেতবুহ্না বৃক্ষ।

কপীতন—আমড়া গাছ, গর্দভাণ্ড বৃক্ষ, গান্ধি ভাট, শিরীষ, অশ্বত্থ, সুপারি গাছ, বেল গাছ।

কপীষ্ট—১ রাজাদনী বৃক্ষ, ২ কপিত্থ, কদ্‌বেল।

কপোতচরণা—ক্ষীরিকা (?)।

কপোতবঙ্কা—ব্রাহ্মী (?)।

কপোতবর্ণী—ছোট এলাইচ।

কপোতবল্লী—ব্রাহ্মী।

কপোতবেগা—ব্রাহ্মী শাক।

কফঘ্নী—আউচ বৃক্ষবিশেষ।

কফবর্ধন—পিণ্ডীতগর বৃক্ষ।

কফান্তক—বাবলা গাছ।

কফারি—শুঁঠ।

কফেলু—শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ।

কমণ্ডলু—১ অশ্বত্থ বৃক্ষ, ২ গর্দভাণ্ড, গাঁধিভাট।

কমন—অশোক বৃক্ষ।

কমল—[সং পদ্ম, উৎপল] পদ্ম, মৃণাল, নল, পঙ্কজ, nelumbium speciosum. প্রকারভেদ—(১) পুণ্ডরীক, 'শ্বেতপদ্ম', (২) সৌগন্ধিক, blue lotus,—নীলকমল, নীলপদ্ম। শাঁপলা nymphoea cyanea—(ক) ছোট নীলপদ্ম nymphoea stellata, (খ) বড় নীলপদ্ম major. (৩) রক্ত পদ্ম—'রক্তকমল,' (৪) কুমুদ (শালুক ফুল) শালুকের ফলের ভিতর সর্ষপের বীজ থাকে। তাহাকে ভাঁট বলে। ভাঁটের খইয়ের মোয়া উত্তম খাদ্য, hibiscus mutabilis plenus.

কমলক—কমল।

কমলাগুঁড়ি, কমিলা—কম্পিল্ল দ্রষ্টব্য।

কমলালেবু—[সং কমলানিম্বু, হিং অমৃতফল, সুন্তর, নারিঙ্গী, সঙ্গতর, নারেঙ্গ, নেপালী সুন্তল, গু° নারঙ্গী, পঞ্জা° সন্তর, নারঙ্গি, নারঙ্গ, বোম্বা° নারঙ্গীসন্ত্র, নাগ্গিশাল, ম° সকুনিম্ব, নারঙ্গশাল, নারিঙ্গ, তৈ° গঞ্জনিম্ম, কিত্তলি, কিচ্চিলিপন্দু, নারিঙ্গপন্দু, তা° কিচিলি, কেচু, কল্ল‌ দীপল্লম, কর্ণা° কিত্তলেপন্নু, কিত্তবেপ্পে, মালয়—মাছুর নারল্লা, কোলাঙ্গি নরকম, মহীশূর—ফেরুক, সিম ও মনিস, সিংহল—নারঙ্গকা, দোদন, আর্বী—নারঙ্গ, পার্সী—নারঙ্গ] নারেঙ্গা, কাকি, খাটজমিয়া citrus aurantium. দুই হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষে—কমলালেবু ছিল না—প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ নাই। গ্রীক জাতিরা বর্ণনা করে নাই। কমলালেবু চীন হইতে ভারতে আসিয়াছে।—de Candole. কমলালেবু প্রধানতঃ চারি প্রকার—(১) সন্তর বা মোগলাই কমলা—ছাল পরিষ্কার, পীতাভ, ত্বক বড় আলগা, (২) কেওনলা বা নারিঙ্গী, (৩) লাল কমলা malta orange, (৪) মান্দারিন। পর্যায়—নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, ত্বগ্‌গন্ধ, ত্বকসুগন্ধ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র, মুখপ্রিয়।

কমলিনী—পদ্মের গাছ বা গুল্ম।

কমলোত্তর—কুসুম্ভ ফল।

কম্পিল—কম্পি দ্র°।

কম্পিল্ল, কম্পিলক—[সং কাম্পিল্ল, বর্কশাশ্চন্দ্র, ম° কপীলা, গু° কপীলো, হিং কবীলা, কম্বিলা, ক° কম্পিলক, ফা° কম্বিলাহ, অ° কম্বীব, উ° কমলাগুড়ি] কমিলা নামক এক জাতি বৃক্ষ। সুহিকাদিবর্গের ছোট আরণ্য তরুবি°। ভারতের প্রায় সকল দেশেই জন্মায়। গাছ বড় হয় না। ডুমুরের পাতার মত পাতা। ফল ফলসার মত। পর্যায়—কম্পিল্য, কম্পীল, কম্পিলক, রক্তাঙ্গ, রেচী, রেচনক, রঞ্জক, লোহিতাঙ্গ, রক্তচূর্ণক।

কম্বুকা—অশ্বগন্ধা বৃক্ষ।

কম্বুকাষ্ঠা—অশ্বগন্ধা।

কম্বুপুষ্পী—শঙ্খপুষ্পী বৃক্ষ।

কম্বুমালিনী—শঙ্খপুষ্পী।

করভারী—গান্ডারী বৃক্ষ।

করভীর— ভুবোনামূল।

করন্ত,করেন্ত, করেন্দ—কথবেল দ্রব'।

করক—১ দাড়িম্ব বৃক্ষ, ২ করঞ্জ বৃক্ষ, ৩ পলাশ বৃক্ষ, ৪ বকুল বৃক্ষ, ৫ কোবিদার, রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ।

করকাম্ভাঃ—নারিকেল বৃক্ষ।

করঙ্ক, করঙ্কশালি—ইক্ষু-বিশেষ।

করচিমালা—বৃক্ষ বিশেষ, bridelia lancaefolia.

করচিত্র—অর্জুন গাছ pentaptera arjuna.

করচ্ছদ—সেওড়া গাছ।

করচ্ছদা—সিন্দুর পুষ্পবিশেষ।

করজ—করঞ্জ বৃক্ষ।

করজোড়ি—হাড়জোড়া গাছ।

করঞ্জ, করঞ্জা—করমচা। করঞ্জা বা করমচা প্রধানতঃ তিন প্রকারের —(১) ডহরকরঞ্জা [সং কটুকরঞ্জ, নক্তমাল, চিরবিলম্ব, হিং করঞ্জ, কটুকরঞ্জ, কিরমাল, সুখচিন, মং চাপড়া করঞ্জ, ঘাণেরা করঞ্জ, বাবঠ.ঠা, গুং চরেলকণসে, কং নাপসীয়মরণু, বারুবর্তিলিগিলু, তাং পুঙ্গম, পুঙ্গমারং, ব্রং থয়েম পিরিঞ্জু, তৈং কানুগচেট্টু, কঞ্জ, ওং কোঞ্জর, পং সুখচেন] pongamia indica. ডহরকরঞ্জা জলাশয়ের পাশেই জন্মিয়া থাকে—উচ্চতায় ৪০-৫০ ফুট। বহু শাখাবিশিষ্ট, ফুলের রং নীল, গ্রীষ্মকালে ফোটে। শিম্বাদিবর্গ। (২) নাটাকরঞ্জা—[সং পূতিকরঞ্জ, প্রকীর্য, পূতিক, হিং কাঁটকরঞ্জ, করঞ্জুবা, মং সাগরগোটা, গুং কাঁকচ, তেনাংফল কাঙ্কচিয়া, কং করঞ্জভেড্ডু, তৈং কচ.কাই, গুচ্চেপিকা, ফাং খায়, ইবলিশ, অং অক্তসক্ত, কোং নাটাচিতা, ওং কোবিপোল] পুতিকরঞ্জ, cæsalpinia bonducella, guilandina b. কাঁটাবহুল বড় লতাবিং। পুষ্করিণীর পাড়ে বা সমুদ্রের ধারে বহু পরিমাণে দেখা যায়। শিম্বাদিবর্গের কৃষ্ণচূড়াদি অম্বুবর্গের গাছ। (৩) কাঁটাকরঞ্জা, টক্‌করঞ্জা—[সং কর-মর্দক, মহাকরঞ্জ, বিষঘ্নী, হস্তিচারিণী, কাকঘ্নী, সুমনা, মদহস্তিনা, হস্তিকরঞ্জক, কাকভাণ্ডী, মধুমতী, হিং করৌন্দা, ওং করঞ্জকোলি] বহু শাখাবিশিষ্ট কণ্টকময় ক্ষুপ carissa carandas. ইহা ছাড়াও চারিপ্রকার করঞ্জা বাঙলা দেশে আছে—(ক) অম্লকরঞ্জ [সং করমর্দক], (খ) বিষকরঞ্জ [সং অঙ্গারবল্লী], (গ) মাকড়াকরঞ্জ [সং মর্কটী], (ঘ) গৈঁটেকরঞ্জ [সং বড়গ্রন্থ]। বৃহদাকার করঞ্জকে 'মহাকরঞ্জ' বলে। রীঠাকরঞ্জ, লতাকরঞ্জও আছে। করঞ্জাকে বাংলায় করমচা বলে, carisaa carandas. পর্যায়—কৃষ্ণপাকফল, অবিগ্ন, সুষেণ, পাকফল, বলালয়, করাম্ল, পাণিমর্দ ইত্যাদি।

করঞ্জক—করঞ্জ দ্রং।

করঞ্জফল,—ফলক—কপিত্থ বৃক্ষ।

করট—কুসুম্ভবৃক্ষ।

করণ্ড—শৈবালবিশেষ।

করদ্রুম—কারস্কর বৃক্ষ।

করপত্রবাণ—তালবৃক্ষ।

করপর্ণ—১ ভিণ্ডাতক বৃক্ষ, ২ রক্ত এরণ্ড।

করভকাণ্ডিকা—উষ্ট্রকাণ্ডী বৃক্ষ।

করভপ্রিয়া—ক্ষুদ্র দুরালভা।

করভবল্লভ—১ উষ্ট্রপ্রিয় পীলুবৃক্ষ, ২ কপিত্থ বৃক্ষ।

করভাদনী—ক্ষুদ্র দুরালভা।

করমট্ট—১ সুপারিগাছ, ২ পানি আমলা গাছ।

করমর্দ—করঞ্জ দ্রং।

করমর্দক—১ পানি আমলা, ২ করৌন্দা, করমচা।

করম্ভ—১ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ, ২ শতাবরী, শটী, শতমূলী।

করবী—[সং করবীর, গৌরীপুষ্প, সিদ্ধপুষ্প, হিং সফেদকনের, কনের, লালকনের, পীলীকনের, ফুলকীকনের, মং কণ্হের পাণ্ডরী, তাংবড়ী, পিংবঠঠা, গুজং কনের, ঘোলনাং ফুলরী, রাতা ফুলনী, গুলাবীফুলনী, পীলাফুলনী কং বাকনলিঙ্গে, কেলনলিঙ্গে, তেং কানেরচেট্টু, কাং খরজেহহরা, অং সুমুল, হিমারদ্‌কলী, তাং অলারি] করবী nerium odorum, তারাদিবর্গের পুষ্পবিং। ফুলের রঙভেদে চারিপ্রকার—(১) শ্বেত করবী [সং করবীর, শতকুণ্ড, অশ্বঘ্ন] (২) রক্ত করবী [সং রক্ত করবীক, চণ্ডক, লগুড়], (৩) পীত করবী (কলকে ফুল), (৪) কৃষ্ণকরবী। পদ্মকরবী বললে করবী। পর্যায়—প্রতিহাস, শতপ্রাস, চণ্ডাত, হয়মারক, হয়ারি, অশ্বমারক, শীতকুম্ভ, তুরঙ্গারি, অশ্বহা, হয়ঘ্ন, শতকুন্দ, শ্বেতপুষ্পক, নখরাহ্ব, অশ্বনাশন, স্থলকুমুদ, দিব্যপুষ্প, ইত্যাদি। শ্বেতকরবী ও রক্তকরবীর গাছ উদ্যানে রাখে। পীত করবীর গাছ প্রায় আত্মসম্ভূত। কৃষ্ণ করবীর গাছ কচিৎ দেখা যায়।

করবীরক—অর্জুন বৃক্ষ।

করবীর ভুজা, করবীর ভূষা—অড়হর।

করলা—[সং উচ্ছাসিত, কারবেল্ল, সুষবী, হিং করেলা, গুজং কারেলা, কণ্ডাবেলা, মং কারলে, ক্ষুদ্র কারলী, কং হাগল, তেং কল্লিলা, উং শলরা, কাং কারেলাহ, অং ফিস্‌সা, উলহিমার, ওং কলরা] করেলা momordica charantia, m. muricata. বড়গুলি করেলা, ছোটগুলি উচ্ছে। লতাবিং। ফল তিক্ত।

করামর্দ, করম্বুক, করাম্লক—করমচা।

করাল, করালক—কৃষ্ণ কুঠেরক, কাল তুলসী।

করালা—শারিবা, অনন্তমূল।

করিক—বিট খদির (?)।

করিকণবল্লী—চই।

করিপত্র—তালীশ পত্র।

করিপিপ্পলী—গজপিপ্পলী।

করীর—[সং করীর, হিং করীল] করীল capparis aphylla. ১ বাঁশের কোঁড়া—বংশ দ্রং। ২ কণ্ট খুপবিং। মরুভূমিতে জন্মে। C. spinosa. বরুণাদি বর্গের বৃক্ষ, কাঁটা গুড়কামাই। পর্যায়—ক্রকর, গ্রন্থিল, নিষ্পত্রিকা গূঢ়পত্র, করক, তীক্ষ্ণপত্র।

[ক্রমশঃ।

কোলে
গ্লুকোজ
বিস্কুট
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত
KOLAY
GLUCOSE
BISCUITS
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সাত

॥ খ ॥

ভাঁড়ারের সামনে দরদালানে বসে দুর্গা দেবী রাত্রির জন্য তরকারী কুটছিলেন বঁটি পেতে। পরিধানে একটা লাল চওড়া পাড় শাড়ি। কপালে একটি বড় সিঁদুরের টিপ। সিঁথিতেও ডগডগে সিঁদুর। অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কিছুটা কেশরাশি বক্ষের 'পরে নেমে এসেছে। খালি গা। হাতে শাঁখা, লোহা ও মোটা সোনার হাঙরমুখী বালা। গায়ের রঙ টকটকে গৌরবর্ণ।

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল শিবনাথ সেদিন দুর্গা দেবীর দিকে তাকিয়ে।

সত্যিই যেন মা দুর্গা।

মা—

মা ডাক শুনে তাড়াতাড়ি দুর্গা দেবী বঁটিটা রেখে উঠে দাঁড়ান, নরেন—আয় বাবা—এবং নরেন্দ্রকে সম্বোধন করতে গিয়েই তাঁর নজরে পড়ে পুত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মান শিবনাথের প্রতি।

এ ছেলেটি কে রে নরেন? দুর্গা দেবী পুত্রকে শুধাল।

আমার সহাধ্যায়ী মা—শিবনাথ লাহিড়ী—

শিবনাথ ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে দুর্গা দেবীর পদধূলি নেবার জন্য নীচু হতেই দুহাতে তাকে তাড়াতাড়ি তুলে ধরে গভীর স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, থাক—থাক বাবা—বেঁচে থাকো। তোমাদের দেশ কোথায় শিবনাথ?

হরিনাভিতে।

মা বাবা বুঝি তোমার সেখানেই থাকেন।

আজ্ঞে না—তাঁরা স্বর্গত—

আহা! দু'জনেই স্বর্গত—

পিতৃমাতৃহারা কিশোর শিবনাথের প্রতি দুর্গা দেবীর জননীর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তা ছাড়া সে তাঁর পুত্রের সহাধ্যায়ী ও বন্ধু জেনে যেন গভীর স্নেহে প্রথম দিনই শিবনাথকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

নরেন্দ্রকে দুর্গা দেবী জলখাবার খাবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং শিবনাথ ব্রাহ্মণ জেনে পুত্রের আসন থেকে কিছু দূরে আসন পেতে তার জলযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

শিবনাথ প্রতিবাদ জানিয়েছিল, দূরে দূরে আসন পেতেছেন কেন মা। পাশাপাশিই তো আমরা বসতে পারি—

তা কি হয় বাবা। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান—ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়ে গেলে তোমার খাওয়া হবে না—

নরেন্দ্র বলেছিল হাসতে হাসতে, তুমিও যেমন মা। দুদিন বাদই তো ও হিন্দু কলেজে পড়তে যাচ্ছে। ডিরোজিওর কাছে পড়বে—সে জাতধর্মই মানে না।

সে আবার কি! বিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন দুর্গা দেবী, জাতধর্ম মানে না কি? ছিঃ! ও কথা বলাও পাপ। বলতে নেই ও কথা।

নরেন্দ্রর মায়ের কথায় সে কি হাসি।

বলেছিল, অন্দরে থাক মা তুমি, বাইরের জগতে কত ওলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে খবর তো রাখ না।

ওলোট পালোট আবার কি শুনি! মানুষের জাতধর্ম—দেবতা কোন দিন মিথ্যে হতে পারে নাকি।

সেদিন বাড়ী ফেরার পথে দুর্গা দেবীর কথাগুলিই বার বার শিবনাথের মনে পড়ছিল, মানুষের জাতধর্ম ও দেবতা কোন দিন মিথ্যা হতে পারে নাকি।

জীবনকৃষ্ণ মিথ্যা বলে। কখনো ঐ সব চিরন্তন সত্য মিথ্যা হতে পারে না। তেত্রিশ কোটি দেবতাকে আমরা চোখে দেখতে পাই না বলেই কি তা মিথ্যা নাকি! এবং পথ চলতে চলতে মনে মনে শিবনাথ স্থির করে—পরের দিন স্কুলে জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হলে কথাটা সে বলবে।

কিন্তু পারে নি!

পরের দিন কেন, কোন দিনই জীবনকৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি পরবর্তী কালেও কথাগুলো শিবনাথ বলতে পারে নি।

জীবনকৃষ্ণের সেই তেজোদ্দীপ্ত চেহারা। দু চোখের সেই ক্ষুরধার শাণিত দৃষ্টির সামনে পড়লেই শিবনাথের কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যেতো।

সে রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে শিবনাথের একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল।

গৃহে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে নিজের ঘরের দিকে চলেছে বারান্দা পথে মৃন্ময়ীর কক্ষের সামনে দিয়ে, ঘরের মধ্যে মৃন্ময়ীর ডাক শোনা গেল।

শিবনাথ!

মৃন্ময়ীর ডাক শুনেই শিবনাথ বুঝতে পেরেছিল সুন্দর সাহেব তখন গৃহে নেই। নচেৎ অমন করে তাকে ডাকত না।

সুন্দরম সত্যিই গৃহে ছিল না।

মৃন্ময়ীর শরীরটা কিছুতেই সারছে না, এখনো সে কথাই বলতে পারে না—সুন্দরম তাই কানা কবিরাজের কাছে গিয়েছিল এবং সন্ধ্যার দিকে সেই যে সে গিয়েছে এখনো ফেরেনি গৃহে।

মৃন্ময়ীও সুন্দর সাহেবের সামনে কথা বলতো না বলে সুন্দর সাহেব যে সময়টা গৃহে উপস্থিত থাকত শিবনাথ মৃন্ময়ীর ধারে কাছেও যেতো না। কথা বলা তো দূরের কথা।

সুন্দর সাহেব গৃহে নেই বুঝতে পেরেই শিবনাথ মৃন্ময়ীর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। অবিশ্যি বেশীর ভাগ দিনই ঐ সময়টা সুন্দর সাহেব গৃহে বড় একটা থাকতো না। সে যে ব্যবসা করবে বলে স্থির করেছিল তারই ধান্দায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতো।

শিবনাথ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই তার নজরে পড়লো মৃন্ময়ী শয্যার 'পরে চুপটি করে বসে আছে।

অসুস্থতার ভাণ করে পড়ে থাকলেও ইদানীং মৃন্ময়ীর চেহারাটা অনেক ফিরে ছিল। রোগশীর্ণ গালে আবার রঙ ধরতে শুরু করেছিল।

আজ এত ফিরতে দেরি হলো যে তোমার শিবনাথ? শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে মৃন্ময়ী।

নরেন্দ্রর ওখানে গিয়েছিলাম, শিবনাথ জবাব দেয়।

তোমার এক বন্ধু তোমার খোঁজে এসেছিল—

কে?

জীবনকৃষ্ণ—নাম বলছিল শুনলাম—

জীবনকৃষ্ণ! কখন? কখন এসেছিল?

বিকেলের দিকে।

কিছু বলে গিয়েছে?

তা জানি না—তুমি গঙ্গাধরকে জিজ্ঞাসা করো—তার সঙ্গেই তো কথা বলছিল—

গঙ্গাধর প্রৌঢ় ভৃত্য!

তাকে এবং এক প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা দাক্ষায়ণীকে নিযুক্ত করেছিল সুন্দর সাহেব, মৃন্ময়ীকে দেখা শোনা করবার এবং তার আহার্য তৈরী করবার জন্য।

ওদের কথার মাঝখানেই দাক্ষায়ণী এসে ঘরে ঢোকে একটি পাত্রে দুধ নিয়ে মৃন্ময়ীর জন্য।

দাক্ষায়ণীর দিক থেকে মৃন্ময়ীর কোন ভয়ের কারণ ছিল না, কারণ দাক্ষায়ণী কিছুই শুনতে পেতো না দু'কানের এক কানেও। একেবারে যাকে বলে বদ্ধ কালা।

তবে দাক্ষায়ণী কানে না শুনতে পেলেও ও-বাড়ির কারোরই কোন অসুবিধা ছিল না কারণ নিজের কাজটুকু সে সময়মত গুছিয়ে করতো। দাক্ষায়ণী কালা ছিল বলেই সুন্দরম তাকে মৃন্ময়ীর দেখাশোনা ও রন্ধনের ব্যাপারে নিযুক্ত করেছিল।

আর যাই হোক মৃন্ময়ীর দিক থেকে আশঙ্কার কোন কারণ থাকবে না। মৃন্ময়ী যদি কোন দিন কথা বলতেও পারে, সে কথা আর যার কানেই যাক দাক্ষায়ণীর কানে যাবে না।

দাক্ষায়ণী ঘরে ঢুকে দুধের পাত্রটা এগিয়ে ধরে মৃন্ময়ীর দিকে, অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে, মৃন্ময়ী দুধের পাত্রটা হাতে নিয়ে এক চুমুকে খেয়ে নিঃশেষিত পাত্রটা দাক্ষায়ণীর হাতে ফিরিয়ে দিল।

দাক্ষায়ণী শূন্য পাত্রটা হাতে নিয়ে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

বোস শিবনাথ দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

শিবনাথ কিন্তু বসে না এবং না বসেই বলে, কয়েক দিন থেকে একটা কথা ভাবছিলাম মৃন্ময়ী—

কি?

রাগ করবে না-তো?

না, না—রাগ করবো কেন! বল না কি?

আমার মনে হয় এটা ঠিক হচ্ছে না মৃন্ময়ী—

মুখের দিকে তাকায় মৃন্ময়ী শিবনাথের এবং বলে, কি ঠিক হচ্ছে না শিবনাথ?

এই বলছিলাম সাহেবের কাছে তুমি যে কথা বলতে পারো ব্যাপারটা এখনো গোপন করে রাখা।

কেন?

মনে করো কোন দিন হঠাৎ কোনক্রমে যদি সে তোমাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে শোনে—ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে তাহলে দাঁড়াবে বলত। হয়তো সেদিন সাহেব তোমাকে ক্ষমা করলেও আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না—

শিবনাথ।

হাঁ, মৃন্ময়ী—আমি তার আশ্রিতই নয় শুধু, দয়া করে আমাকে আশ্রয়ের সঙ্গে আমার লেখাপড়ার সমস্ত সুবিধা সে করে দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে—

মৃন্ময়ীর চোখের কোল দুটো ছল ছল করে ওঠে। সে বলে, তবে কি হবে শিবনাথ! কিন্তু কথা না বলতেই বা তোমার ক্ষতিটা কি মৃন্ময়ী—

মৃন্ময়ী যেন আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে, না, না—সে আমি পারব না তুমি জান না আজো তার সঙ্গে কথা বলিনি—সে জানে আমি কথা বলতে পারি না সেই কারণেই আমার প্রতি এখনো কোন জোর জবরদস্তি করে নি।

মৃন্ময়ী, কি বলচো?

ঠিকই বলচি শিবনাথ। ওর চোখের দৃষ্টি থেকেই আমি বুঝেছি

কি চায় ও, কেন আমাকে এমনি করে জোর করে লুঠ করে নিয়ে এসেছে—

কিন্তু মৃন্ময়ী—সুন্দর সাহেব সতিাই তোমাকে ভালবাসে। তুমি জান না, কিন্তু আমি—

কিন্তু আমি, ওকে ঘৃণা করি। একটা দস্যু, ডাকাত—শয়তান—খুনী—

না—না—তুমি লোকটাকে তাহলে ঠিক আজো চিনতে পারনি মৃন্ময়ী—কিন্তু একটু আগে কি তুমি বললে মৃন্ময়ী, সুন্দর সাহেব তোমাকে লুঠ করে এনেছে ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ, কৃষ্ণনগরে এক রাত্রে আমাদের বাড়িতে ডাকাতি করে সে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে শিবনাথ।

কথাটা শুনে শিবনাথ যেন হঠাৎ বোবা হয়ে যায়।

কয়েকটা মুহূর্ত শিবনাথের কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ বের হয় না। ফ্যাল্ ফ্যাল করে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মৃন্ময়ীর দু'চোখের কোল বেয়ে তখন অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

মৃন্ময়ীকে সুন্দর সাহেব ডাকাতি করে নিয়ে এসেছে। মৃন্ময়ী সুন্দর সাহেবের লুণ্ঠিতা।

মৃন্ময়ী, মৃন্ময়ী—এসব কথা কি সত্যি ! তুমি যা বললে তা কি সত্যি। সুন্দর সাহেব সত্যিই তোমাকে ডাকাতি করে নিয়ে এসেছে।

হ্যাঁ—

আমাকে সব কথা খুলে বল মৃন্ময়ী—

মৃন্ময়ী সংক্ষেপে তখন তার দুঃখের কাহিনী শিবনাথের কাছে বিবৃত করে।

মৃন্ময়ীর কাহিনী শুনে শিবনাথ যেন একেবারে পাথর হয়ে যায়।

মৃন্ময়ী আবারও বলে, তুমি জান না শিবনাথ; আসল পরিচয় ওর, ও একজন পর্তুগীজ ডাকাত। মস্ত বড় নৌকা আছে—সেই নৌকায় চেপে ডাকাতি করে বেড়ায়।

শিবনাথের সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

সুন্দর সাহেব একজন পর্তুগীজ ডাকাত। জলদস্যু।

আর সে সেই দস্যুর আশ্রয়ে এসে মাথা গুঁজেছে।

ডাকাতের আশ্রয়ে, ডাকাতের অন্নে সে প্রতিপালিত হচ্ছে—ব্রাহ্মণ সন্তান।

ছিঃ ছিঃ একি সে করেছে।

না, না—নিশ্চয়ই এ সত্য নয়। সুন্দর সাহেব—অন্যের প্রতি যার এত দয়া, এত স্নেহ—এমন মধুর ব্যবহার যার, এত মিষ্টি কথাবার্তা যার সে একজন ডাকাত, একজন জঘন্য চরিত্রের জলদস্যু।

না, মৃন্ময়ী মিথ্যা বলছে।

এ হতে পারে না। এ অসম্ভব।

প্রবল ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে শিবনাথ বলে ওঠে, না, না—মৃন্ময়ী, তুমি আমাকে মিথ্যা বলচো, এ সত্য নয়—

আমি যা বলেছি তোমাকে শিবনাথ, তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়—সত্যি। সব সত্যি। সত্যি। হ্যাঁ, সত্যি। আমি যে কি ভাবে এখানে রয়েছি শিবনাথ, প্রতি মুহূর্তে যে কি যন্ত্রণা ভোগ করছি তুমি বুঝবে না—

হঠাৎ ঐ সময় বাইরে ভারী জুতোর শব্দ শোনা যায়।

ভারী জুতোর শব্দটা কানে যেতেই শিবনাথ বুঝতে পারে সেটা আর কারো নয়, সুন্দর সাহেবেরই জুতোর শব্দ। সুন্দর সাহেব ঘরে ফিরেছে, সে এদিকেই আসছে।

শিবনাথ ঠিক কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। মৃন্ময়ীর ঘর ছেড়ে চলে যাবে, না দাঁড়িয়েই থাকবে। কিন্তু ভেবে সে কিছু করবার আগেই সুন্দরম কানা কবিরাজকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই কেবল যে সুন্দরমেরই শিবনাথের প্রতি নজর পড়েছিল তাই নয়, কানা কবিরাজেরও পড়েছিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকায় শিবনাথের দিকে কানা কবিরাজ এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অদূরে মৃন্ময়ীর শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান বয়সে কিশোর হলেও বলিষ্ঠ গঠন সুশ্রী চেহারা শিবনাথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুন্দরমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, এই যুবকটি কে সাহেব। একে তো কোন দিন দেখিনি—

আজ্ঞে ও শিবনাথ—

শিবনাথ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। ঘৃত ও বহ্নি—

কিছু বলছেন ?

না। কি বললে শিবনাথ।

তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে নাকি—কথাটা সুন্দরমকে আবার প্রশ্ন করে কানা কবিরাজ অপাঙ্গে শিবনাথের প্রতিই তাকায়।

শিবনাথ মন্থর পদে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

আজ্ঞে না। সুন্দরম্ জবাব দেয়, আমার আশ্রিত, এখানে থেকে পড়াশোনা করে—

তোমার কোন তাহলে আত্মীয় নয়—

আজ্ঞে না। ও ব্রাহ্মণ—

পূর্ব পরিচয় ছিল বুঝি ?

না—

বল কি—অজ্ঞাত কুলশীল। হুঁ—বেশ—বেশ। বলতে বলতে অতঃপর কানা কবিরাজ মৃন্ময়ীর শয্যার দিকে এগিয়ে যায়।

বলা বাহুল্য এতক্ষণ বসে বসে শিবনাথের সঙ্গে কথা বললেও সুন্দরমের পদশব্দ পাওয়া মাত্রই উপাধানের 'পরে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিল মৃন্ময়ী।

এগিয়ে শয্যার কাছে ক্ষণকাল মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলে, বাঃ এতো দেখছি যৎপরোনাস্তি উন্নতি হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। মুখের রংই তো বদলে গিয়েছে—

কিন্তু ঠাকুরমশাই ওতো এখনো—

কথা বলচে না তাই না। কথাটা বলে মৃদু হাস্যসহকারে যেন কৌতুকভরা দৃষ্টিতে করালীচরণ সুন্দরমের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, মানে—

ও বোধ হয় তোর সঙ্গে কথা বলতে চায় না, তাই—

কি বলচেন ঠাকুরমশাই।

বেটা মূর্খ গাড়োল—চল বেটা চল—উঠে দাঁড়ায় করালীচরণ।

কেমন যেন বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠে সুন্দরম, পরীক্ষা করে দেখলেন না একটিবার।

পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছে চল—
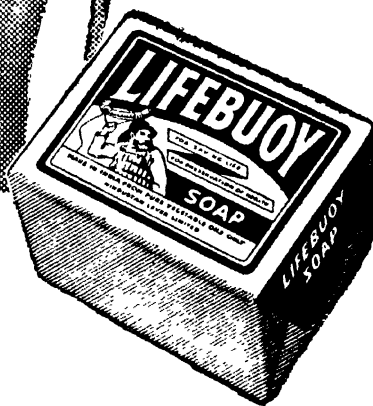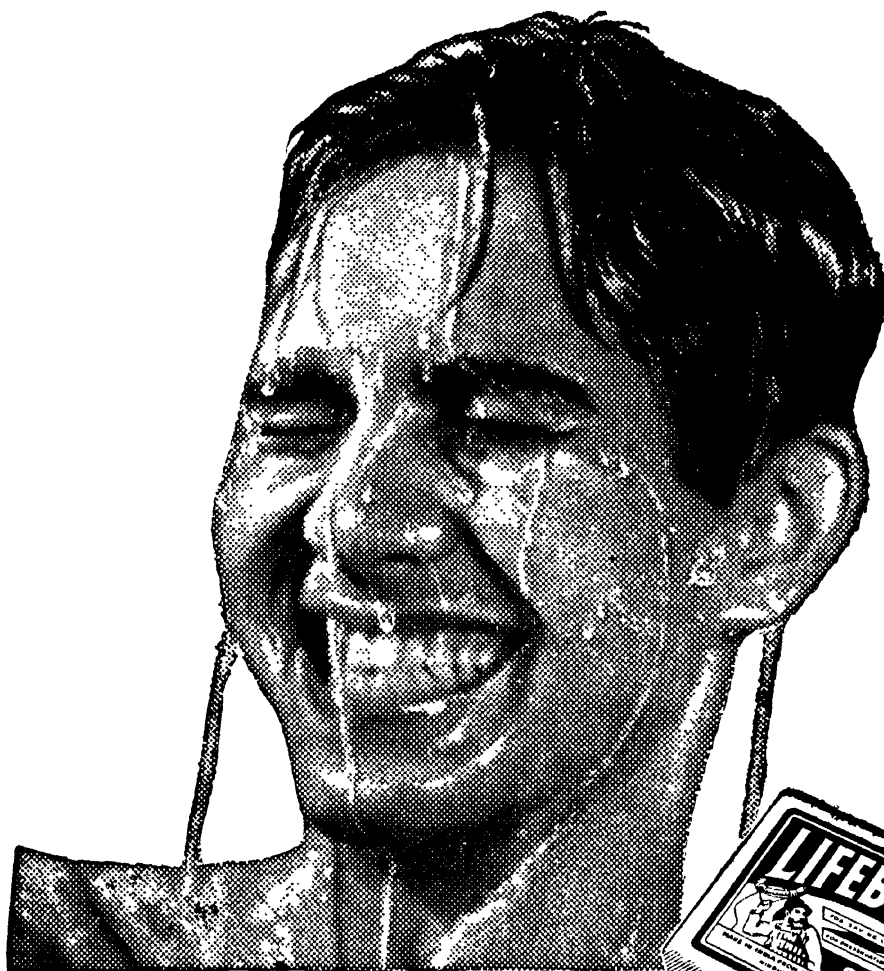
[ক্রমশঃ।
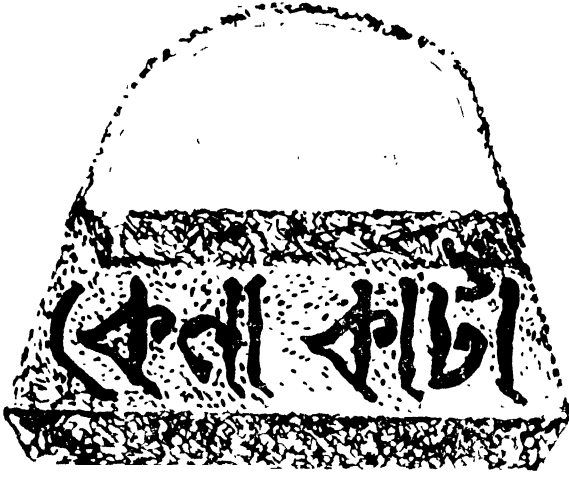
ক্ষুদ্র শিল্প—ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি

ভারত একটি কৃষি প্রধান রাষ্ট্র কিন্তু তবুও এর শিল্পায়নের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে স্বাধীন হবার পর থেকেই। একটি বিবেচনা এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। জাতীয় অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকলেও দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে কৃষিকর্মই যথেষ্ট নয়। মানুষের সমধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে হলে দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়ন ছাড়া হতে পারে না। কৃষির পাশাপাশি শিল্পোদ্যমে আত্ম-নিয়োগের দাবীটি জোরালো হয়ে উঠছে এই দিক থেকেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে—ভারী শিল্প না ক্ষুদ্র শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে অধিক মাত্রায়। ভারতবর্ষের অবস্থা ব্যবস্থা, প্রয়োজন ও জন সংখ্যার দিক বিবেচনাক্রমে কোন জিনিসটি আগে হওয়া চাই? এ-কথা ঠিক, শিল্পায়ন বলতেই সাধারণতঃ ভারী শিল্পকে বুঝায়। আর ভারী শিল্প বা বৃহৎ শিল্পের অর্থ ভারী যন্ত্রপাতি বা বৃহৎ কলকারখানা। ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির প্রশ্নটি জড়িত রয়েছে। পক্ষান্তরে এই শিল্পের জন্যে বড় কারখানার নিতান্ত দরকার নেই, সাধারণ গৃহেই এই শিল্পোদ্যম চালানো যায়।

সেদিন অবধি ভারতে বিদেশী শাসন কায়েম ছিল, পর নির্ভরতা ছিল এর সব দিক থেকে। দেশ ও দেশবাসী যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে, জীবনযাত্রার মান যাতে উন্নত হয়, এমন কোন প্রচেষ্টায় তৎকালীন সরকারের স্বতঃই সায় ছিল না। কাজেই শিল্পায়নের প্রশ্নটি ছিল সম্পূর্ণ সুদূরপরাহত। পরন্তু গ্রামশিল্প বা কুটিরশিল্প, যা ক্ষুদ্র শিল্পের পর্যায়ভুক্ত—বিজাতীয় শাসক ও শোষণ ব্যবস্থার ফলে সে সব যেটুকুও বা ছিল, তা-ও ক্রমেই ধ্বংসের পথ নেয়। স্বাধীন হবার পর জাতীয় সরকার জাতীয় জরুরী দাবীর দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্পায়নের যেমন বিরাট পরিকল্পনা নেন, সেই পরিকল্পনায় একটি মস্ত স্থান নির্ণীত করেন এই ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটির শিল্পের।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌রা ভারতের পক্ষে ক্ষুদ্র শিল্প তথা গ্রামশিল্পই যে বিশেষ উপযোগী, এর ওপর আত্যন্তিক জোর দিয়ে গেছেন। এ যুগের অর্থনীতিবিদরাও ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারছেন না, তাই প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় এর জন্যে পৃথক অর্থ বরাদ্দ হয়ে চলেছে। তাঁরা ভেবে দেখেছেন যে, ভারত যে ক্ষেত্রে একটি অনগ্রসর দেশ, এই অবস্থায় ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে তার পক্ষে কতকগুলো সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভবপর। ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটিরশিল্পে বেশি মূলধন প্রয়োজন হয় না, কাজেই যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি নেই, এমন লোকও এই দিকে উদ্যোগী হতে পারেন। এদেশে বেকারী যেমন দারুণ, তাতে ক্ষুদ্র শিল্প ব্যাপকতর হলে অনেক কর্মসংস্থান হতে পারে। জাতীয় আয় কেন্দ্রীভূত না হয়ে সমবণ্টনের পথও এতে প্রশস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

এখন কথা হলো—একেবারে শুধু হাতে কাজ হতে পারে না, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যে ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি চাই বৈ কি! ভারী যন্ত্রপাতি বৃহৎ শিল্পোদ্যোগে যেমন না হলে চলে না, এ-ও তেমনি। এ যাবৎ যে-ভাবে কুটিরশিল্প বা ক্ষুদ্রশিল্প চালানো হতো, এখনও সে ভাবে হতে পারে না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী যন্ত্রপাতির উন্নতি হয়ে চলেছে—নিত্য নতুন সরঞ্জাম উদ্ভাবিত হচ্ছে, যার মূল্য ও উপযোগিতা অনস্বীকার্য। পুরানো যন্ত্র বা চিরাচরিত পদ্ধতি নিয়ে বসে থাকলে ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে কেন, কোন শিল্পোদ্যমেই এগিয়ে যাওয়া যাবে না, সমস্যার সমাধানের যে প্রত্যাশা—জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের যে মৌল দাবী, তা অপূরণই থেকে যাবে।

সোজা কথায়, ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি চাই-ই। উৎপাদনে বৃদ্ধির লক্ষ্য থেকে শিল্প-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ যত ত্বরান্বিত হবে, সুফলও মিলবে তত তাড়াতাড়ি। জাতীয় সরকার অবশ্য এই বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। অন্তত ক্ষুদ্র শিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন তাঁরা প্রতিটি পরিকল্পনায়। প্রথম যোজনাকালে কুটির শিল্প তথা ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে চুয়াল্লিশ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে একশ'আশি কোটি টাকা। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাতেও এই বিশেষ খাতে দু'শ পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। এ হলো সরকারী উদ্যোগের বিবরণ—বেসরকারী খাতেও আলোচ্য সময় মধ্যে দু'শ পঁচাত্তোর কোটি টাকা নিয়োজিত হবার সম্ভাবনা।

জনগণের কল্যাণকল্পে গ্রাম-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের দ্রুত প্রসার ও অগ্রগতি চাই বলেই বিভিন্ন রাজ্য সরকারগণ স্বল্পসুদে নানাভাবে ঋণ দানের ব্যবস্থা করেছেন। কেন্দ্রের তরফ থেকেও এই ক্ষেত্রটিতে ঋণ-প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে কারিগরী শিক্ষাদানের জন্য কর্তৃপক্ষ বহু শিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছেন—যথাসম্ভব যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করা হচ্ছে এখানে-সেখানে। কিন্তু এটা বলতেই হবে, যতটুকু করা হয়েছে বা হচ্ছে, তা-ই যথেষ্ট নয়, ভারতের মতো বিশাল দেশের বিপুল প্রয়োজন এতেই মিটবে না।

ক্ষুদ্র শিল্প—ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি—এই দুইটিকে আজ এক পর্যায়ে রেখে ভাবতে হবে। শিল্পের ব্যাপকতা দাবী করলে যন্ত্রপাতিও চাই বহুল পরিমাণে আর সেই সব যন্ত্র হতে হবে (পূর্বেই যা ইঙ্গিত করা হলো) সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের। বাইরে থেকে এ যাবৎ কয়েক কোটি টাকার যন্ত্রপাতিই আমদানী করা হয়েছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যতিরেকে চাহিদা পূরণ হওয়া স্বতঃই কঠিন। সরকারী প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হয়েছে অবশ্য একাধিক, যার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সেদিন মাত্র হাওড়া জেলার দাশ নগরের নিকট একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি উৎপাদন কারখানা চালু হয়েছে এটা জাপ-ভারত যুগ্ম উদ্যোগিপনার ফল। সরকারী বিবরণেই জানা গেছে—এই কেন্দ্রটির জন্যে জাপ-সরকার পঁয়ত্রিশ লক্ষ

পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি এবং তিন বৎসরের জন্য কুড়ি জন সুদক্ষ কারিগর সাহায্য হিসাবে দিয়েছেন। পরিকল্পনা অনুসারে কারখানাটিতে ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদনের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, উন্নত নক্সা ও সেই সম্পর্কে গবেষণা এবং সর্বোপরি উন্নততর যন্ত্রপাতি উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার সুযোগ থাকবে। পুরাতন যন্ত্র পদ্ধতি ও নক্সা নিয়ে আজকের বৃহৎ শিল্পের যুগে ক্ষুদ্র শিল্প এগিয়ে যেতে পারে না, তাই ক্ষুদ্র শিল্পের উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও কার্যক্ষেত্রে সেই জাতীয় যন্ত্রের ব্যবহার অত্যাবশ্যক বলা যায়।

অভ্র-সম্পদ ও তার ব্যবহার

খনিগর্ভ থেকে মানুষ এযাবৎ যত সম্পদ আহরণ করেছে, অভ্র তাদের অন্যতম। শুধু অন্যতম বললেই ঠিক বলা হয় না, অভ্র একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। কয়েকটি ক্ষেত্রে আজকের দিনে তার ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, বললে অত্যুক্তি হবে না।

অভ্র অবশ্য হালের আবিষ্কার নয়, এই মূল্যবান সম্পদটি ব্যবহার হয়ে আসছে দীর্ঘকাল থেকেই। প্রাচীন ভারতে অভ্রের ব্যবহার ছিল ওষুধ হিসাবে। কেবল ভারত কেন, বহির্বিশ্বেও এর ব্যবহার কম ছিল না। জানা যায় যে, গ্রীকে ও রোমান নর-নারীরাও সে যুগে ওষুধ হিসাবেই এই সম্পদকে কাজে লাগাতো। অন্য ভাবেও যে এই জিনিষটি ব্যবহৃত হত না, এমন নয়। পরন্তু আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলে অভ্র সম্পদকে কাজে লাগানো হতো কাচ হিসাবে।

বর্তমান আমলে অভ্রের ব্যবহারিক মূল্য বেড়ে গেছে বহু গুণ, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়। সাধারণ সালসা এবং রোগ নিরাময় ও রোগ প্রতিষেধক ওষুধ হিসাবে এর ব্যবহার সেই থেকেই চলেছে কিন্তু ব্যবহারের মাত্রা বেড়েছে অন্য দিকেই বেশি। অভ্রের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়,—যেমন, অত্যধিক উত্তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা এর আছে। স্বচ্ছতার গুণে অভ্র সমৃদ্ধ আর এর অপর গুণ অভ্র বিদ্যুৎ নিরোধক। বিজ্ঞানীরা এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে গবেষণা করেই নানা ভাবে অভ্রের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করেছেন।

আজ অভ্রের মূল্য সারা বিশ্বে স্বীকৃত—শিল্প বিপ্লবের ফলে এর সমাদর ক্রমবর্ধমান। বিদ্যুৎশিল্পে, বিমান ও মোটরশিল্পে এবং বেতারযন্ত্র নির্মাণে এই সম্পদটির প্রয়োজন খুব বেশি। এ যুগে সামরিক প্রয়োজনে এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনে এর প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলেছে। চুল্লী ও বৈদ্যুতিক চিমনি নির্মাণেও অভ্রের ব্যবহার যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায় আর সেটা তার স্বচ্ছতা ও তাপনিরোধক বিশেষ গুণ থাকার জন্যেই।

অভ্রসম্পদ শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর আরও বহু অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া গেছে। আমেরিকা, কানাডা, রুশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশও অভ্রের জন্য প্রসিদ্ধ। তবে ভারতেই এই সম্পদ উৎপাদিত হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা আশি ভাগ অভ্র উৎপন্ন হয় এইখানেই। গেলো বছরের (১৯৬১) সরকারী হিসাব : ভারতে উৎপাদিত অভ্রের পরিমাণ আটাশ হাজার এক শত পঁচানব্বই মেট্রিক টন। তন্মধ্যে একমাত্র বিহারেই প্রায় চোদ্দ হাজার মেট্রিক টন অভ্র উৎপন্ন হয়। ঐ বৎসর ভারতের রাজস্থান ও অন্ধ্র প্রদেশে অভ্র উৎপাদিত হয় যথাক্রমে সাত হাজার পাঁচ শত তিরাশি মেট্রিক টন ও ছয় হাজার নয় শত তিরাশি মেট্রিক টন। মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ উড়িষ্যাতেও আলোচ্য বছরে কিছু কিছু অভ্র সম্পদ উৎপন্ন হয়েছে।

বিশ্বে অভ্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ভারত, তাই বাইরে এর চাহিদা রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। এখন অবধি অভ্রের রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতই শীর্ষস্থানীয়, তা-ও প্রসঙ্গত উল্লেখ করবার। বিগত বর্ষে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে এদেশ থেকে বাইরে অভ্র রপ্তানী হয়ে গেছে ছাব্বিশ হাজার তিন শত উনআশি মেট্রিক টন (সরকারী হিসাব), আর এই রপ্তানীকৃত সম্পদের মূল্য হচ্ছে প্রায় দশ কোটি টাকা। ভারত থেকে যে যে দেশে অভ্র চালান দেওয়া হয়ে থাকে, তার মধ্যে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মাণীর নাম প্রথম পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য। মোটের ওপর, ভারতীয় অভ্র-সম্পদ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি সুন্দর সূত্র, ভারতবাসীর নিকট এই সম্পদের মূল্য সেজন্যেই আরো অধিক।

ভারতের শিল্পসম্ভার বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ

আজ থেকে দুই বৎসর পূর্বেও ভারতের শিল্পোন্নতির যে ছবি আমাদের সামনে ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা উন্নততর অবস্থায় উদ্ভব হইয়াছে।

ন্যাশানাল প্রডাকটিভিটি কাউন্সিল (National Productivity Council) এর কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই কাউন্সিল বর্তমানে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে যে সহযোগিতা লাভ করিতেছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে শিল্পসম্ভার বৃদ্ধির মানস নূতনতর উপায় উদ্ভাবন দ্বারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিক শিল্পসম্ভার উৎপাদন করিতে সমর্থ হইতেছে।

এই বিষয়ে আরো নির্ভরযোগ্য সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শিল্পজাত দ্রব্যের গুণাগুণ নিরূপণার্থ পরিদর্শনকারী অফিসার (Inspectors for Quality Control) থাকা উচিৎ। ন্যাশানাল প্রডাকটিভিটি কাউন্সিল (National Productivity Council) ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে Quality goods এর উৎপাদনকার্যে উৎসাহ ও সহযোগ প্রদান করিতেছেন।

শিল্পসম্ভার উৎপাদনের অর্থ কেবলমাত্র শিল্পসম্ভার বৃদ্ধি করা নহে—ইহার দ্বারা উৎপন্নদ্রব্যের মূল্য হ্রাস করাও এক প্রধান দায়িত্বপূর্ণ কার্য। ইহা ব্যতীত সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের গুণবৃদ্ধির প্রয়োজন। তবে এই বিষয় কার্যকরী করিতে হইলে নূতন শিল্প-সংস্কারমূলক উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজনীয়। অবশ্য শিল্পসংস্কার (Rationalisation in Industry) এর সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের কার্যের চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে এবং ফলে কিছু লোক বেকার হইতেও পাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উন্নতি হওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িবে এবং অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন হইবে তাহাতে অধিক শ্রমিক কার্য পাইবে।

ভারতে আজ শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষা শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন অনেক কম এবং সেইজন্য শিল্পসম্ভার বৃদ্ধির সুযোগ প্রচুর রহিয়াছে। কাঁচা মালের (Raw materials) কিছু ঘাটতি থাকছে সন্দেহ নাই কিন্তু যদি আজ প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি সুলভ হয় (Industrial power) তাহা হইলে অদূরে ভারত আরো দ্রুততর

সুনীল ভঞ্জ

তেরো বছর পরে দেখা।

লতিকার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই থমকে দাঁড়াল রবীন। দুপুরের ডালহৌসী স্কোয়ার। জনসমুদ্রের মধ্যে দিয়ে ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে আসছিল রবীন। এমন সময় দেখতে পেল লতিকাকে। দু'জনেই দাঁড়ায়।

রবীনই প্রথম জিজ্ঞাসা করে, "লতিকা ?"

নিরুত্তাপ হাসি ফোটে লতিকার মুখে। সে বলে, "রবীনদা ?"

জনবহুল রাজপথে অগুন্তি মানুষের আনাগোনা। সেখানে দাঁড়িয়ে কথা জমবে না। তেরো বছর পরে দেখা, অনেক কথা জমা রয়েছে রবীনের মনে। রবীন ওকে নিয়ে পায়ে পায়ে হাজির হ'ল একটা মাঝারিগোছের রেষ্টুরেন্টে।

ছোট্ট কামরার মধ্যে সামনাসামনি বসল রবীন আর লতিকা। বয় এসে পর্দাটা টেনে দিয়ে যায়। কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। রবীনের মাঝের আঙুলের ভারী সোনার আংটিতে একটা পাথর চকচক করছে। লতিকা একদৃষ্টে লক্ষ্য করছে।

রবীন সেটা দেখেছিল। ছোট্ট একটু হেসে বলল, চকচক করলেও এটা কিন্তু হীরে নয়। দার্জিলিঙ থেকে কেনা অতি সাধারণ চার আনা দামের পাথর।

লতিকার চোখে জল এসে গিয়েছিল। অশ্রু লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টায় মাথা নীচু করে লতিকা বলে, না, এমনি।

হয়ত লতিকার মনে পড়ছে তার ফেলে-আসা জীবনের একটা পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদ। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা!

বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের মেয়ে লতিকা। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। আদর আর আতিশয্যের মাঝখানে মানুষ। লতিকার স্বপ্নে-ঘেরা বাল্যজীবন—মাতৃভূমি গ্রামের সেই রঙে-ভরা দিনগুলো।

ওদের পাশের বাড়ী ছিল রবীনদের। রবীনদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। বাবা মুহুরিগিরি করে যা আয় করতেন, তাতে তাদের দিন কাটত কষ্টে-দুঃখে।

লতিকার চেয়ে রবীন পাঁচ-ছয় বছরের বড়। ছোটবেলায় দু'জনে মিলে কত খেলা করেছে। আজ ভাবলেও হাসি পায় ওদের। লতিকার মা-বাবা অবিশ্যি এটা পছন্দ করতেন না। রবীন গরীবের ঘরের ছেলে—তার সঙ্গে মেয়ে খেলা করুক, এটা তাঁরা সুনজরে দেখতেন না।

দিন এগিয়ে চলে। ওরা বড় হয়ে ওঠে। লতিকার বয়েস তখন ষোল-সতেরো। দেহে-মনে পরিবর্তনের ছোঁয়াচ। গ্রামের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে লতিকা, আর রবীন তখন শহরে থেকে এম-এ পড়ছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে রবীন বাড়ীতে এসেছিল। আর পরীক্ষার পরে লতিকার তখন অখণ্ড অবসর।

দীর্ঘদিন পরে দেখা। দু'জনেই যেন সম্পূর্ণ নতুন চোখে দেখে পরস্পরকে। এ যেন এক আলাদা মানুষ।

ঝড় উঠেছে সেদিন বিকেলে। কিশোরী মেয়ের মত লাফাতে লাফাতে লতিকা তখন বাগানে ছুটেছে কাঁচা আম কুড়োতে। সেখানে অযাচিত দেখা রবীনের সঙ্গে। আশে পাশে কেউ কোথাও নেই, থাকার সম্ভাবনাও নেই।

লতিকা বললে, "তুমি আরো কিছুদিন থাকছো ত রবীনদা ?"

রবীনের মুখ গম্ভীর, কণ্ঠ ভারী, "না, কালকেই চলে যাবো।"

"এরই মধ্যে কেন ? এখনও ছুটি শেষ হতে তো অনেকদিন দেরী।" লতিকার কণ্ঠে যেন কিছুটা ব্যাকুলতা।

রবীন বললে, "আমি এখানেই থাকি বা কলকাতায় ফিরে যাই, তা নিয়ে তোমার আগ্রহ কেন লতিকা ?"

দু'চোখ ছলছল করে ওঠে লতিকার, রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "কেন রবীনদা, একথাটা জিজ্ঞাসা করারও অধিকার কি আমার নেই ?"

ছেলেমানুষের মত বলে বসে রবীন, "না নেই! আমি জানতে পেরেছি তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার পরেই কলকাতার এক বনেদীঘরে তোমার বিয়ে হবে। ছেলেটি নাকি বিলেত ফেরৎ।"

অত্যন্ত গম্ভীর দেখাচ্ছে লতিকাকে। কোন জবাব নেই! তাকে নিরুত্তর দেখে রবীন বলতে থাকে, "যত শীঘ্র পারো তুমি আমাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করো লতিকা!"

আর অভিনয় করতে পারে না লতিকা। হো হো করে হেসে ওঠে। সকৌতুকে বললে, "ও, এই কথা ? তাহলে শোন, যদি আমার বিয়ে কোনদিন হয়, তাহলে কলকাতার ওই বনেদীঘরে নিশ্চয়ই হবে না।"

"তার মানে ?" হতভম্বের মত প্রশ্ন করে রবীন।

"আমার অমতে বাড়ী থেকে আমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করবে, এটা আমি মেনে নেবো না। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব একটা মতামত আছে রবীনদা।"

"তাই বলে তুমি মা-বাবার অবাধ্য হবে ?"

"যদি তাঁরা আমাকে অবাধ্য হতে বাধ্য করেন, আমি তাহলে নিরুপায় রবীনদা !"

"না, না, এ তুমি ভুল করছো লতিকা। মা-বাবার মনে তুমি আমার জন্যে দুঃখ দেবে, এটা আমি চাইনা লতিকা। তার চেয়ে আমি—আমিই তোমার জীবন থেকে সরে যাবো।"

কথাটা শেষ করতে বেশ কষ্ট বোধ করেছিল রবীন। হয়ত চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল এসে পড়েছিল। বুকটার মাঝখানে হয়ত বা একটু কনকন করে উঠেছিল। মুখ নীচু করে রবীন সেখান থেকে সরে যেতে চেয়েছিল।

কিন্তু বাধা দিয়েছিল লতিকা। হঠাৎ সে একটা কাণ্ড করে বসল। রবীনের বাম হাতখানা খপ করে ধরে ফেলে মিনতি ভরা দৃষ্টি মেলেছিল রবীনের দিকে। তারপর নিজের হাত থেকে সরু সোনার আংটিটা খুলে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিয়েছিল রবীনের আঙ্গুলে।

আর কোন কথা বলতে পারেনি লতিকা। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল তার সারা দেহ এক অজ্ঞাত উত্তেজনায়। হতচকিত রবীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল তার দিকে। তারপর লতিকা অনায়াসে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল তার বাহুডোরে। নীড়হারা পাখী যেন তার নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

তার পরের দিন লতিকার মা জানতে পারলেন মেয়ের অভিলাষ। তেলেবেগুণে জ্বলে উঠলেন। ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন মেয়েকে, "দেখ লতি, ওদের পিতৃপুরুষ আমাদের বাড়ীতে খাতালেখার চাকরী করত। মরে গেলেও সেই বংশের ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।"

এতটা আশা করেনি লতিকা। তাই মায়ের কথা শুনে নিজের ঘরে এসে বিছানায় মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। এমন সময় রবীন এসেছিল ওদের বাড়ীতে। অন্যান্য দিনের মতই লতিকার মায়ের কাছে এসে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলেছিল, "মাসীমা, চা খাবো।"

লতিকার মা আর কথা বাড়ালেন না। সরাসরি তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন এবং এটাও জানিয়ে দিলেন যে, সে যেন বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার বাসনা না করে! কোন কথা বলেনি রবীন। মাথা নীচু করে চলে গিয়েছিল। সেদিন চা খাওয়া আর হয়নি।

লতিকার সঙ্গে রবীনের সেই শেষ দেখা। তারপর লতিকা শুনেছিল, রবীন ভালভাবে এম, এ, পাশ করেছে এবং একটা ভাল চাকরী পেয়ে দিল্লী চলে গেছে। বাংলা দেশের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখেনি রবীন। হয়ত বা মনের দুঃখে কিংবা রুদ্ধ অভিমানে।

এরই কিছুদিন পরে ওদের গ্রামে বাধল তাণ্ডব। পাকিস্তানের সূচনা এবং জমিদার মহেন্দ্র চৌধুরীর কলিকাতায় আগমন স্ত্রী ও কন্যা লতিকাকে সঙ্গে নিয়ে। সামান্য টাকাই সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন ওঁরা। কলসীর জল গড়িয়ে খেলে খুব বেশীদিন চলে না। একদিন ফুরিয়ে এল।

ভাগ্যবান মহেন্দ্র চৌধুরী। প্রাচুর্যের মধ্যে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন। টাকা ফুরোবার আগেই মাত্র দু'দিন রোগে ভুগে চোখ বুজলেন।

মা আর মেয়ের সংসার। প্রথমে ওরা উঠেছিল অভিজাতপল্লীর দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটে। এবার উঠে এল এক অপরিচ্ছন্ন পল্লীর একখানা অন্ধকার ছোট ঘরে। একশো টাকা থেকে কুড়ি টাকা ভাড়ায়। কিন্তু সে টাকাই বা আসে কোত্থেকে? সঞ্চিত অর্থ ফুরোল—গহনা বিক্রি শুরু হল। তারপর ক্রমে বাসনপত্রে হাত পড়ল। কিন্তু এমনভাবেই বা কতদিন চলবে।

সেবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছিল লতিকা। হয়ত বা আরো পড়াশুনা করতো। কিন্তু দেশবিভাগের পটভূমিকা এবং তার অচিন্তনীয় প্রতিক্রিয়া সব পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়।

অবশেষে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট পুঁজি করে লতিকা বেরোল চাকরীর সন্ধানে। সরকারী-বেসরকারী নানা জায়গায় ধর্ণা দিয়ে ফল বিশেষ কিছু হলো না। বেকার সমস্যা শুধু বাঙ্গালী ছেলেদেরই নয়, আপ্রাণ চেষ্টা করেও মেয়েরাও চাকরী যোগাড় করতে পারে না। যে কোন একটা চাকরীর জন্যে কত লোকের শরণাপন্ন হল লতিকা, কিন্তু চাকরী জুটলো না।

জমিদারনন্দিনী লতিকা। সুখে-ঐশ্বর্যে কেটেছে যার বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনসন্ধির দিনগুলি—আজ তার পরনের শাড়ী জীর্ণ, চোখের কোলে কালি, মুখে বিষাদের ছায়া। সর্বক্ষণের চিন্তা দিনগুজরানের।

বিপদ হয়ত একসঙ্গেই আসে। তাই এমন অবস্থার মাঝে লতিকার মা পড়লেন অসুখে। ডবল নিউমোনিয়া। ডাক্তারের রাজকীয় ব্যবস্থাপনা। ওষুধ-ইঞ্জেকশান ও পথ্য সংগ্রহে দিশাহারা হয়ে ওঠে লতিকা। শেষ কপর্দক ফুরিয়ে এল প্রায়।

তবে এর মাঝেও আছে আর একটা দিক। মেঘে ভরা আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক। আশার কথা হল, ডালহৌসী স্কোয়ারে একটা মাঝারীগোছের সওদাগরী অফিসে টাইপিষ্টের চাকরী পাবে বলে প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে। ইণ্টারভিউ হয়ে গেছে। আবার একটা চিঠি এসেছে দেখা করার জন্যে। নিশ্চয়ই সে মনোনীত হয়েছে, নইলে আবার ডাক আসবে কেন?

সকাল থেকেই তাই সেদিন খুশি খুশি ভাব লতিকার। সকাল দশটায় অফিসে পৌঁছুতে হবে চিঠির নির্দেশমত। ভোর থেকে রান্নাবান্না করে সকাল নটার মধ্যে মাকে খাইয়ে দিলে। বেরোবার আগে ওষুধের শিশিটা মায়ের শিয়রের কাছে রেখে গেল আর বারবার বলে গেল ঠিক সময়মত ওষুধ খেতে।

বেগুণে রঙের তাঁতের শাড়ী আর চকোলেট ব্লাউজখানা পরে আলমারীর আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল লতিকা। বেশ দেখাচ্ছে তাকে। নিজেকেই নিজে তারিফ করে। বয়সের কোঠা তিরিশ ছুঁই-ছুঁই। তবুও তার মুখাবয়বে শ্রী আর সুষমা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত নয়। ইণ্টারভিউয়ের পর আবার ডাক। চাকরীটা নিশ্চয়ই পাবে। তাই সাজগোজটা ঠিকঠাক করে নিতে লতিকা একটু সচেষ্ট হল। এর আগে বহুস্থানে ইণ্টারভিউ সে দিয়েছে, কিন্তু সেইখানেই সব সাঙ্গ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন খবর আসেনি, কেউ কেউ বা ভদ্রতা করে জানিয়েছে আপনাকে মনোনীত করতে পারলাম না বলে আমরা দুঃখিত। এবারেই ঘটেছে ব্যতিক্রম। তার ইণ্টারভিউতে খুশি হয়ে কর্তৃপক্ষ ডাক পাঠিয়েছেন। অল্প একটু স্নো মুখে ঘসে তার ওপর পাউডার বুলিয়ে নেয়। না, সত্যিই ভাল দেখাচ্ছে তাকে।

মনের মধ্যে অনেক আশা নিয়েই লতিকা সেদিন বাড়ী থেকে পথে পা বাড়িয়েছিল। দশটা বাজার মিনিট পাঁচেক আগেই গন্তব্যস্থলে

হাজির হয়েছে। সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করে, আগের দিন যারা ইণ্টারভিউ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে দুজন ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে। একটিমাত্র পোষ্ট—তাহলে তিনজনকে আবার ডাকা হল কেন? তিনজনের মনেই এই প্রশ্ন জেগেছিল।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ওদের তিনজনেরই ডাক পড়ল ম্যানেজারের ঘরে। ম্যানেজার জানালেন যে, আগের দিন যে পঁচিশ-জনের ইণ্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এই তিনজন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আজ তাদের মধ্যে থেকে চূড়ান্তভাবে একজনকে মনোনীত করা হবে।

সব শুনে ভারী অসহায় বোধ করে লতিকা। সে ভেবেছিল, চাকরীটা নিশ্চয়ই তার হয়ে গেছে। চাকরী পেয়ে কিছুদিন কাজ করার পরে ম্যানেজারকে বলে-কয়ে কিছু টাকা অগ্রিম চেয়ে নেবে, মনে মনে এটাও সে ভেবে নিয়েছিল। মায়ের অসুখের চিকিৎসা করতে গিয়ে ভাণ্ডার একেবারে খালি। এ চাকরী না পেলে দুদিন পরে উপবাস করে মরতে হবে ওদের।

সংবাদপত্র থেকে অংশবিশেষ ওদের তিনজনকে টাইপ করতে দেওয়া হল। দুরু দুরু বক্ষে মেসিনের সামনে গিয়ে বসেছে লতিকা। টাইপরাইটারের চাবিতে হাত দিতে যায় আর সেখানে ভেসে ওঠে তার মায়ের রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানা। বারে বারে ভুল করতে থাকে লতিকা।

লতিকা মনোনীত হল না। ফলাফল যখন জানতে পারল, তখন বেলা দুটো বেজে গেছে। মাতালের মত টলতে টলতে রাস্তায় বেরিয়ে আসে লতিকা। চোখে অন্ধকার দেখছে। স্বেচ্ছায় নয়, যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রতিক্রিয়ায় পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে ট্রাম-রাস্তার দিকে।

ঘরে একটি পয়সা নেই। অথচ কাল মায়ের ইঞ্জেকসানের দিন। ইঞ্জেকসান, ডাক্তারের ফি, আঙুর-বেদানা—এ সব কোত্থেকে মিলবে? মাথা সত্যিসত্যিই ঘুরছে তার।

এমন সময় পথের মাঝখানে সামনে এসে দাঁড়াল রবীন। সুবেশ সপ্রতিভ—স্যুট-টাইতে চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে। রবীনই জিজ্ঞাসা করলে, "লতিকা?"

লতিকার বিশ্বাস হয়নি প্রথমে। স্বপ্ন দেখছে না ত। কতদিন পরে আজ এই দেখা।

রেষ্টুরেণ্টে বসে অনেক কথা বলতে চেয়েছিল রবীন। কিন্তু বিশেষ কোন কথা বলতে পারে নি। একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচ বারেবারে তাকে বাধা দিয়েছিল। মুখে জুগিয়েছিল শুধু এলোমেলো পারম্পর্য-বিহীন কয়েকটা প্রশ্ন।

নিজের কথা শোনাল রবীন। দিল্লীতেই পাকাপাকিভাবে রয়েছে। ভালই রয়েছে চাকরী-বাকরী নিয়ে। এবারে কলকাতায় এসেছে চারদিনের জন্যে অফিসেরই কাজে।

লতিকা একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল রবীনকে।

তার দিকে চেয়ে ছোট্ট হেসে রবীন বললে, "না, না, বিয়ে-থা করিনি, মেসে থাকি—বেশ আছি।"

ম্লান হেসেছিল লতিকা। কোন জবাব দেয়নি।

রবীন প্রশ্ন করে, "কেমন আছো তোমরা?"

লতিকা ছোট্ট জবাব দেয়, "ভালই।"

লতিকার বাবা মারা গেছেন, রবীন সে খবর জানত। পাকিস্তান হওয়ার পরে ওরা কলকাতায় চলে এসেছে, সে কথাও রবীনের অজানা ছিল না। কিন্তু এর চেয়ে আর বেশী কিছু নয়।

আজো লতিকা বিয়ে করেনি। কিন্তু কেন? অনেক প্রশ্ন ঠেলে এসেছিল রবীনের মুখে। অতিকষ্টে নিজেকে দমন করেছিল।

রবীনের মাঝের আঙুলের বড় আংটিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে লতিকা। হঠাৎ সেটা লক্ষ্য করে রবীন। একটা পুরোনো ছবি ঝিলিক খেলে যায় তার মনে। আজ থেকে অনেকগুলো বছর আগে এক ঝড়ের সন্ধ্যায় সেই আমবাগানে সে আর লতিকা। লতিকা তার আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে পরিয়ে দিয়েছিল রবীনের আঙুলে। তারপর লতিকা আর কোন কথা বলতে পারেনি। নিজেকে সঁপে দিয়েছিল রবীনের বাহুডোরে।

লতিকাকে রবীন বললে, "লতিকা, তোমার দেওয়া সেই আংটি আজো আমি যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছি। যখনই আমার মন খারাপ হয়ে যায়, সেটা বার করে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি, আর তোমাকে মনে করি।"

কোন কথা বেরোয় না লতিকার কণ্ঠ হতে। সে শুধু অপলকে চেয়ে থাকে রবীনের নিষ্পাপ ব্যথাতুর মুখের দিকে। কথা বলার শক্তি বুঝি সে আজ হারিয়ে ফেলেছে।

রবীন বললে, "আচ্ছা লতিকা, আবার কি আমরা সেদিনের ভেঙে যাওয়া স্বপ্নকে রূপ দিতে পারি না?"

চমকে উঠল লতিকা।

রবীন আবার বললে, "তুমি বিশ্বাস করো লতিকা, আমি আজো তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি।"

কথাটা শেষ করেই রবীন তার মাঝের আঙুল থেকে বড় আংটিটা খুলে পরিয়ে দেয় লতিকার আঙুলে। লতিকার সরু আঙুলে মস্ত বড় হয়েছে আংটিটা। তা হোক! ঝক্‌ঝক্‌ করছে পাথরখানা! সেদিকে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে লতিকা।

রেষ্টুরেণ্টের বিল মিটিয়ে রবীন বেরিয়ে এল। লতিকাদের বাড়ীর ঠিকানা আগেই লিখে নিয়েছিল। তারপরদিনই লতিকার মাকে দেখতে যাবে—একথাটা রবীন জানিয়ে দেয়। অফিসের কাজে জরুরী দরকার না থাকলে আজই সে লতিকার সঙ্গে ওদের বাড়িতে যেত।

আবার ট্রামরাস্তার দিকে পা বাড়াল লতিকা। এবার তার মনটা অনেক হাল্কা। রবীনের দেওয়া আংটিটা বড্ড বড়—আঙুল থেকে খুলে ভ্যানিটি ব্যাগে রাখল। পাথরটা হয়ত সস্তা, তাহোক অনেকটা সোনা আছে। আগামীকালের জন্য মায়ের ওষুধ আর পথ্যের সমাধান হয়ে গেল। প্রশান্তির ছায়া লতিকার চোখেমুখে!

To his dog every man is Napoleon; hence the constant popularity of dogs. —*Aldous Huxley*

প্রশান্ত চৌধুরী

২৪

সানাইপাড়ার খোঁড়া-ওস্তাদের খাতাটা পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে সোহাগীর ঘরের মেঝেয় চট্‌চটে আঠালো হলদে রঙের ছোপই রেখে গেল না শুধু, সেই সঙ্গে ঠিক অমনি চট্‌চটে আঠালো ভাবনার ছোপ রেখে গেল এক সঙ্গে সোহাগী আর চাঁপার মনের মধ্যে।

সেই ভাবনা দু জনকে দু'রকমে ভাবিয়ে তুলল।

পোড়া খাতার ছাই নর্দমায় ফেলে দিয়ে চাঁপা আবার গিয়ে ঢুকেছে তার সেই নিজের হাতে গড়া খোপটুকুর মধ্যে। আর সোহাগী একলা ঘরে রোগশয্যায় শুয়ে আছে চুপচাপ।

অন্যদিন সোহাগী চাঁপাকে পাশে ডেকে নিয়ে গল্প করে কত। কত বড় হবার স্বপ্ন দেখায়, ভাল হবার উপদেশ দেয়, নিজের ছোটবেলার মিথ্যে গল্প বানিয়ে-বানিয়ে বলে।—আজ কিন্তু চাঁপাকে ডাকতে পারছে না সোহাগী। কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছে।

চাঁপাও যেতে পারছে না সোহাগীর কাছে। ইচ্ছে করছে না প্রতিদিনের মতো সোহাগীর বিছানার পাশে গিয়ে বসতে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে, তাকে ইস্কুলের গল্প বলতে।—কেমন যেন ভাল লাগছে না। কেমন যেন একা থাকতে ইচ্ছে করছে। সোহাগীর কাছ থেকে তফাতে থাকতে ইচ্ছে করছে।

সানাইপাড়ার খোঁড়া-ওস্তাদের খাতাটা মা আর মেয়েকে তফাতে সরিয়ে দিল আজ। দুটো মনে দুরকমের ভাবনার জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে নিজে ছাই হয়ে ভেসে গেল কোথায়।

সোহাগীর ভাবনা: সানাইপাড়ার ওস্তাদের পা-দুটো খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল বলল চাঁপা। পেয়েছিল তা হলে পাপের শাস্তি? পেয়েছিল?—কিন্তু চাঁপা কেমন করে গিয়ে পৌঁছল তার কাছে? চাঁপা কি জানতে পেরেছে কিছু? কিছু আভাস? দর্জিপাড়ার বাসা ছেড়ে দিয়ে ওস্তাদ কি তা হলে সানাইপাড়াতেই ডেরা বেঁধেছিল শেষকালে?

চাঁপার ভাবনা: খাতার প্রথম পাতা উল্টেই মা অমন করে উঠল কেন? কী ছিল খাতার প্রথম পাতায়? শুধু তো নাম। আমি দেখেছি। একটা বীণা আঁকা, আর তার তলায় খোঁড়া-ওস্তাদের নিজের নাম লেখা,—দুলালচাঁদ মল্লিক। আর তো কিছুই ছিল না। তবে মা অমন চমকে উঠল কেন?

সোহাগী ভাবে: বোধ হয় কিছু জানতে পারেনি চাঁপা। জানতে পারলে কি অমন সহজে ওস্তাদের কথাটা বলতে পারত? কিন্তু ওস্তাদ তার গানের খাতা চাঁপাকেই বা দিয়ে গেল কেন? ওস্তাদ কি চিনেছিল চাঁপাকে? চেনা দিয়েছিল চাঁপাকে?

চাঁপা ভাবে: খাতাটা হঠাৎ আমাকেই বা দিয়ে যেতে বলে গেল কেন খোঁড়া-ওস্তাদ? খাদুকে দিয়ে আমাকেই বা খুঁজেছিল কেন সে? কিছু কথা বলবার ছিল কি আমাকে?

সোহাগী ভাবে: চাঁপাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব নাকি, কেমন করে ওস্তাদের খাতা এল চাঁপার হাতে? কিন্তু এখন কিছু জিজ্ঞেস করলেই চাঁপা হয়ত সন্দেহ করে বসবে কিছু। ভুল করেছি আমি। খাতাটা এক্ষুনি অমন কাণ্ড করে পোড়াতে বলা উচিৎ হয়নি আমার। কীই বা ক্ষতি হত খাতাটা থাকলে? খাতাটা অমন করে পোড়াতে বলায় চাঁপা কি সন্দেহ করছে কিছু?

চাঁপা ভাবে,—পোড়াবার কী দরকার ছিল খাতাটাকে? মা বলল বলেই পুড়িয়ে ফেললুম? মাকে বোঝালুম না কেন, জিজ্ঞেস করলুম না কেন? কেন বললুম না, মা গো, একটা মানুষ মরবার আগে দিয়ে গেছে এটা আমাকে। পোড়ালে তার আত্মা কষ্ট পাবে হয়ত। তার চেয়ে বরং ফেরৎ দিয়ে আসি সানাইপাড়ার বুড়ো সানাইওলার কাছে!—তাহলে হয়ত মা পোড়াতে বলত না।

সোহাগী ভাবে,—খাতাটা থাকলে কী এমন ক্ষতি হতে পারত? কোথাকার কোন্ দুলালচাঁদ মল্লিকের খাতা থাকলই না হয় বাড়িতে। ক্ষতি কি? কিন্তু ঐ নামটাই যে সব উলোট-পালোট করে দিল। ঐ নামটাই যে আগুন জেলে দিল আমার মাথার মধ্যে।

চাঁপা ভাবে,—কী ছিল ঐ নামটায়। কী থাকতেই পারে ঐ

নামটার মধ্যে, যার জন্তে আমার অমন শান্তশিষ্ট মা রাক্ষুসীর মত হয়ে উঠল? কিন্তু ওস্তাদের নামের সঙ্গে মা'র কিসের সম্বন্ধ থাকতে পারে? ওস্তাদ নেশাখোর, খারাপ অসুখে ভুগছিল, কিসের ঘায়ে মাঝে মাঝে চোখের তারা বুজে গিয়ে কিছুদিনের জন্তে অন্ধ করে দিত তাকে। তার সঙ্গে মা'র কী সম্পর্কই বা থাকতে পারে? তবু কেন শিউরে উঠল মা? মা কি তবে চিনত ওস্তাদকে? চিনত? কিন্তু কেমন করে তা' সম্ভব হবে?

সোহাগী ভাবছে: চাঁপা কি সন্দেহ করছে যে, আমি চিনতুম ওস্তাদকে? বোধ হয় করছে। তা না হলে আমার কাছ থেকে এমন দূরে-দূরে রয়েছে কেন? অন্য কোনোদিন তো অমন থাকে না। ডাকব চাঁপাকে?

চাঁপা ভাবছে: মা কি আশংকা করছে কিছু? তা না হলে আমাকে ডাকছে না কেন একবারও? কেন কাছে ডেকে রোজের মতন গল্প করতে পারছে না? কেন সহজ হতে পারছে না?

সানাইপাড়ার খোঁড়া-ওস্তাদের পুরোনো একটা খাতা নিজে আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়ে সেই আগুনের জ্বালাটুকু ধরিয়ে দিয়ে গেল ছুটো বুকের মধ্যে। অথচ খাতাটাকে না পুড়িয়ে একবার যদি তার পাতাগুলোকে উল্টেপাল্টে দেখত সোহাগী,—তাহলে? আজ তাহলে, আর কিছু না হোক্, দুর্ভাগা সেই দুলালচাঁদ মল্লিকের কথা ভেবে দু' ফোঁটা চোখের জল পড়ত সোহাগীর। মানুষের সম্বন্ধে যে অশ্রদ্ধা, শংকা, আর ঘৃণা নিয়ে তিলে তিলে পুড়েছে সোহাগী, সেই ঘৃণা আর শংকা থেকে মুক্ত হতে পারত সে কিছুটা। আর, আর সবচেয়ে সান্ত্বনা পেতে পারত সে এইটুকু জানতে পেরে যে, যে-রক্তে চাঁপার জন্ম, সে-রক্তে পাপ ছিল না, নীচতা ছিল না। জানতে পারত যে,—আর যাই হোক্, চাঁপা লম্পটের মেয়ে নয়, হৃদয়হীনের মেয়ে নয়, জানোয়ারের মেয়ে নয়। ঠিক সোহাগীরই মতন সেও মানুষেরই মেয়ে;—দুর্ভাগা একটা মানুষেরই মেয়ে সে।

একথা জানতে পেরে হাহাকার করে উঠতে হত সোহাগীকে। যে-অতীতকে প্রাণপণে ভোলবার চেষ্টা করে এসেছে এতকাল, সেই অতীতের জন্তেই কাঁদতে হত সোহাগীকে। কিন্তু সেই কান্নার জলে তো এতদিনের এই অসহ্য জ্বালাটা জুড়োত।

তারপর?

তারপর খাতাটাকে সুযোগ মতো কোনো এক ফাঁকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে দিয়ে চাঁপাকে বললেই তো হত যে,—'খাতাটা কোথায় হারালো খুঁজে দ্যাখ, তো মা।'—চাঁপা খুঁজত। খুঁজে পেত না। তারপর ধীরে ধীরে খাতাটার কথা ভুলেই যেত একেবারে।

কত সহজে কত অনায়াসে সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যেতে পারত,—অথচ হল না। বিচিত্র একটা যোগাযোগের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ অজান্তে যা অমৃত হয়ে এসেছিল সোহাগীর ঘরে,—শেষ অবধি তীব্র গরল ঢেলে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেল তা'!

সন্ধ্যে পার হয়ে রাত হয়ে এল। চাঁপা তার খোপ থেকে বেরিয়ে দই দিয়ে চিঁড়ে মেখে দিয়ে খাইয়ে দিল সোহাগীকে। গলার

কাছে শুকনো গামছা জড়িয়ে দিয়ে একটু একটু করে জল ঢেলে দিল সোহাগীর মুখে। মুখ মুছিয়ে দিল। তারপর এঁটো থালা তুলে নিয়ে বাইরে যাচ্ছে যখন, সোহাগী তখন একটিবার মাত্র বলল,—তুই খাবি না?

চাঁপা বলল,—নাঃ, ক্ষিধে নেই।

আর কোনো কথা হল না।

চাঁপা হাত ধুয়ে আবার এসে দাঁড়াল তার নিজের খোপে। নিচের রাস্তা তখন ফাঁকা হয়ে এসেছে। সুবল কামারের দোকানের আগুনটাও জ্বলছে না। সুবল অসুস্থ। বিড়ির দোকানের রেডিওটায় কী একটা নাটক হচ্ছিল। কোন্ রাজা বাদশা বিকট হুঙ্কারে মস্ত বড় বড় কথায় প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে ঘায়েল করছিলেন তখন। মাঝে রাণীর তীব্র তীক্ষ্ণ অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছিল কোন্ অদৃশ্য পাপাচারীর বিরুদ্ধে। বিড়ি বাঁধতে-বাঁধতে হেঁট মুখে সেই নাটক একমনে শুনছিল বিড়ির দোকানের লোকগুলো। একটা বেওয়ারিশ বুড়ো ষাঁড় রাস্তার ধারে পা মুড়ে বসে-বসে রোমন্থন করছিল অলসভাবে। দু-তিনটে পথের কুকুর মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে উঠে কোন্ অদৃশ্য শত্রুকে তাড়া ক'রে ফিরে এসে হাঁপাচ্ছিল আবার। বেলফুলের মালী হাঁক দিল একবার। ঘুগ্‌নিওলা তার পাঁঠার ঘুগ্‌নির হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে 'পাঁ-আ-আঠাঘুগ্‌—' বলে ছোট্ট উদ্গারের মতো অস্পষ্ট একপ্রকার শব্দ তুলে এগিয়ে যেতে যেতে মোষের খাটালের ইঁট-বাঁধানো গলিটার ভেতর ঢুকে পড়ল।

চাঁপা বেরিয়ে এল নিজের খোপ্ থেকে। ওষুধের শিশিটাকে ঝাঁকিয়ে তার ভেতরকার লাল সিরাপের মতন ওষুধের এক দাগ ঢেলে দিয়ে গেল সোহাগীর মুখে। তারপর ফিরে গেল আবার নিজের খোপের মধ্যে।

এবারে একটাও কথা হল না মাতে মেয়েতে। চাঁপা যেন অচেনা একটা নার্স, নিছক্ দায়িত্বটুকু পালন করে গেল। সোহাগী যেন হাসপাতালের রুগী,—নার্সের কাছ থেকে এইটুকু ছাড়া আর কিছু পাওনা নেই তার। দুজনের মধ্যে আর যেন কোনও সম্পর্ক নেই;—কিছু না।

রাত্তিরে শ্যামাঠাকুর এল যখন, তখন চাঁপা তার খোপের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে শুয়ে। শ্যামাঠাকুর চাঁপাকে ঘরে এসে শোওয়ার জন্যে ডাকতে চেয়েছিল, কিন্তু সোহাগী ডাকতে দিল না। বলল,—থাক্, ডেকো না ওকে।

শ্যামাপদ বলল,—বই মাথায় দিয়ে মাদুরে শুয়ে থাকবে মেয়েটা গোপর রাত?

সোহাগী বলল,—মেয়ে তোমার কচি খুকী নয় যে, এক রাত্তির মাদুরে শুলে গায়ে ব্যথা হয়ে যাবে। বিছানাটা খুলে মাটিতে পেতে নিয়ে শুয়ে পড় তুমি।

আর কথা বাড়ায় না শ্যামাপদ। জামাটাকে খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়ে বসে সোহাগীর শয্যার পাশে। একটা বিড়ি ধরায়। তাকায় সোহাগীর দিকে। সোহাগী চোখ বুজে শুয়ে আছে। হ্যারিকেনটার আলোটাকে কমিয়ে দেয় শ্যামাপদ। ঘরটা কেমন থমথমে হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। বিড়ির ধোঁয়াগুলোকে আরো গাঢ় মনে হতে থাকে।

শ্যামাপদ আরেকবার তাকায় সোহাগীর দিকে। তেমনি শুয়ে আছে সোহাগী। কিন্তু এই আবছা আলোয় ওকে যেন এখন অনেক দূরে মনে হচ্ছে। চোখ বুজে আছে কি খুলে আছে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

মানুষ যতক্ষণ একেবারে কাছে গা ঘেঁষে থাকে, ততক্ষণ সে তার রক্তে-মাংসে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, কথায়-কাজে এত স্পষ্ট হয়ে থাকে যে, তার সম্বন্ধে ভাববার কিছু থাকে না আর। তখন আরেকটা মানুষের সর্বাঙ্গের সঙ্গে সে যুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যখন দূরে যায়, তফাতে যায়,—তখন সেই রক্ত-মাংস-নিশ্বাস-প্রশ্বাস কথা কাজের সেই মানুষটা সূক্ষ্ম হয়ে গিয়ে বাসা বাঁধে শুধু আরেকটা মানুষের মাথার সেই খোপের মধ্যে, যে খোপের মধ্যে মানুষের ভাবনা আর কল্পনাগুলো পায়রার মতন বক্-বকম্ করে শুধু। তখন তাকে জড়িয়ে নিজেকে ভাবতে পারে মানুষ। নিজেকে যাচাই করতে পারে।

সোহাগী আজ এত কাছে থেকেও যেন তেমনি দূরে চলে গেছে শ্যামাপদর কাছ থেকে। পাশেই যে শুয়ে আছে, এই মুহূর্তে সে যেন আর সোহাগী নয়, সোহাগীর ছবি। তাই, সোহাগীর সেই ছবির দিকে তাকিয়ে শ্যামাপদর মাথার খোপের মধ্যেকার ভাবনার পায়রাগুলো বক্-বকম্ করতে সুরু করল।

মেয়েমানুষের প্রতি লোভ ছিল শ্যামাপদর। ছিল। ছিল। নিজের কাছে একথা স্বীকার করতে আর আপত্তি কি? বিয়ে-করা বৌটার কাছ থেকে কীই বা পেয়েছিল শ্যামাপদ? থ্যাংরাকাঠির মতন রোগা খটখটে শুকনো একটা মেয়ে। শাশুড়ি বলেছিল, বিয়ের জল পড়লেই মোটা হবে। ছাই হল। তিনটে মরা ছেলে বিইয়ে শুকিয়ে গেল আরো। থ্যাংরাকাঠি থেকে খড়কেকাঠি।—তাই লুকিয়ে বাইরে রাত কাটিয়ে এসেছে শ্যামাপদ বার দুচ্চার। ফিরে এসে ধরা পড়ে গালাগাল খেয়েছে। তারপর এল সোহাগী। বৌটা মরে যাবার পর দাঁড়াল সামনে এসে। কী দেখে ভুলেছিল তার শ্যামাপদ? তার সেবায়? যত্নে?—সোহাগী তাই জানে। কিন্তু নিজের কাছে তো আর কিছু লুকোনো নেই শ্যামাপদর। সমস্ত সেবা-যত্নকে ছাপিয়ে আসল যেটা আকর্ষণ করেছিল শ্যামাপদকে, সেটা সোহাগীর দেহ, তার গোলগাল পরিপুষ্ট গড়ন-পেটন। সোহাগীর পরিচয়টাও তো আর অজানা ছিল না কিছু শ্যামাপদর কাছে।—কিন্তু কী দাঁড়াল শেষ অবধি? কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, ভোজবাজির মতন বদলে গেল সব কিছু। আসল যে-লোভে শ্যামাপদর মনে ধরেছিল সোহাগীকে,—সেই লোভটা কতটুকুই বা চরিতার্থ হয়েছিল তার? এক টাকার ক্ষিধে নিয়ে এসে দু-পয়সার শাকভাজাটুকু খেয়েই কি উঠে পড়তে হয়নি তাকে পাত ছেড়ে? কাল-ব্যাধি এসে কোথায় কেড়ে নিয়ে গেল সোহাগীর সেই লোভনীয় দেহটাকে?—কিন্তু কী আশ্চর্য! তারপরেও শ্যামাপদ সোহাগীকে ছেড়ে চলে যায়নি কেন অন্য কোথাও? বিয়ে-করা বৌকে লুকিয়ে যে শ্যামাপদ বাইরে রাত কাটাতে পেরেছে দু-চারবার, সোহাগীকে ছেড়ে যেতে পারেনি কেন সে? কী দিয়ে বেঁধেছিল সোহাগী শ্যামাপদকে? তাহলে সে কি তার দেহ দিয়ে নয়,—তার সেবা, তার যত্ন, তার স্বভাব, তার চরিত্র, তার দুঃখ দিয়েই আসলে বেঁধেছিল শ্যামাপদকে?—তাহলে শ্যামাপদ কি শুধু সোহাগীকে নয়, নিজেকে চিনতেও ভুল করেছিল আগাগোড়া? তাহলে সে কি মেয়েমানুষকে চেয়েছে শুধু দেহের জন্যে নয়,—আর কিছুর জন্যে? —তবে কি বিয়ে-করা বৌয়ের কাছ থেকে শুধু দেহই নয়, সেবা, যত্ন

প্রীতি, নির্ভরশীলতা, কিছুই পায়নি শ্যামাপদ কোনোদিন ? তাই কি তাকে ফাঁকি দিতে দ্বিধা হয়নি শ্যামাপদর। আর, সেগুলো পেয়েছে বলেই কি দেহের দিক থেকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া এই বহুভোগ্যা মেয়েটাকে ছেড়ে যাবার উপায় নেই শ্যামাপদর ?—আশ্চর্য ! অন্তলোক তো দূরের কথা, নিজেকেও মানুষ পুরোপুরি চেনে না !

—তুমি শুলে না এখনো ?

আবছা আলোর ভেতর থেকে সোহাগীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

শ্যামাপদ মুখ বাড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সোহাগীর দিকে তাকিয়ে ব'লল,—জেগে আছিস তুই ? আমি ভেবেছিলুম ঘুমিয়ে পড়েছিস বুঝি।

—ঘুম ? চাঁপার যাহোক একটা ব্যবস্থা কর।

—কিসের ব্যবস্থা ?

—ও' যেখানে-সেখানে যায়, যার-তার সঙ্গে মেশে।

—ওঃ ! মা-বেটিতে রাগারাগি হয়েছে বুঝি তাই নিয়ে ? তাই চাঁপা ও-ঘরে ঘুমোচ্ছে, চাঁপার মা এ-ঘরে গুম হয়ে রয়েছে। এতক্ষণে বুঝেছি। দাঁড়া, মেয়েটাকে ডেকে এনে ভাব করিয়ে দিচ্ছি এখনি।

—ঠাট্টার কথা নয়। ভয়ের কথা। ভাবনার কথা।—আচ্ছা, ওর বিয়ে দিয়ে অন্য কোথাও ওকে পাঠিয়ে দিতে পারা যায় না ?

—হবে। তাড়া কিসের ?

—আছে। বড্ড তাড়া।

শ্যামাপদ তার উত্তরে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষ পর্যন্ত শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল,—ওর বিয়ে দেওয়া কি কোনদিনই সম্ভব হ'বে সোহাগী ? কে নেবে ওকে ? ভেবে ভাখ।

শুনে অন্ধকার ঘরটাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল যেন !

—নেবে না ?

ঘরটা কেঁদে উঠল যেন এবার

—তুই-ই বল না। জেনে-শুনে নিতে রাজি হয় কখনো কেউ ?

অন্ধকার ঘরটা নিষ্ঠুর নিদারুণ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করছে !

—জানবে কেমন করে ?

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ক্ষীণ চাঁদের আলো !

—জানতে কতক্ষণ লাগে বল ?

চাঁদ মেঘে ঢেকে গেল আবার !

—তাহলে ?

উদ্‌গ্রীব উৎকর্ণ হয়েছে ঘরটা !

—পড়ছে এখন, পড়ুক।

—তারপর ?

—যাহোক একটা কিছু ভাবা যাবে তখন।

কী ভাবা যাবে ? তখনই বা কী ভাবা যাবে চাঁপার সম্বন্ধে ? ভেবে কোন কিনারায় পৌঁছানো যাবে ? যদি সত্যিই কিছু ভাবা যায় ;—ভেবে কূল পাওয়া যায় ;—তবে সেই ভাবনাটা আজকেই শেষ করা হোক না কেন। এই মুহূর্তেই শেষ ক'রে ফেলা যাক না কেন। সোহাগী যে আর পারছে না। আর, এমন ক'রে চাঁপার ভাবনায় তিলে তিলে দগ্ধে মরতে পারছে না।

—কী ভাববে তখন ? ভেবে কী ঠিক করবে তখন ?

অন্ধকারে নিমজ্জিত ঘরটা ডুবে তলিয়ে যেতে-যেতেও হাতড়ে-হাতড়ে আলোর তীর খোঁজবার চেষ্টা করছে !

শ্যামাঠাকুর বলল,—ছোটবেলায় গল্প শুনিসনি,—গরীব অসহায় মা-বাপ নিজেদের শিশুকে গামলায় শুইয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে নদীর স্রোতে। সেই গামলা ভাসতে ভাসতে কোন্ চড়ায় এসে লেগেছে। সেখানে নাইতে এসেছেন সন্তানহীনা রাণী-মা। তিনি বুকে তুলে নিয়েছেন সেই শিশুকে ;—মনে কর তুইও তেমনি ভাসিয়ে দিয়েছিস তোর চাঁপাকে। একদিন ঠিক চড়ায় গিয়ে লাগবে ;—একদিন ঠিক কেউ ওকে বুকে তুলে নেবে।

সোহাগী প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—রাণীমায়া আজ আর নদীতে নাইতে আসেন না যে।

সোহাগীর দীর্ঘশ্বাসে গলা মিলিয়ে শ্যামাপদ বলল,—কেমন দিন ছিল সেগুলো।

সোহাগী বলল,—সুবলসখা কিন্তু কি বলে জানো ?

—কী ?

—বলে, কিসের ভাল ? বলে, ভাসতে ভাসতে চড়ায় এসে ঠেকবার আগে কত গামলাই যে ডুবে গেছে মাঝ-নদীতে তার হিসেব কে রেখেছে। তার গল্প কে লিখেছে ?

শ্যামাপদ উত্তর খুঁজে পেল না।

সুবলসখার পুরোনো কথাটা ব'লে সোহাগীও নতুন করে ভাবতে লাগল।

ওদের সঙ্গে অন্ধকার ঘরটাও যেন বোবা হয়ে গিয়ে ভাবতে লাগল তাইতো ! কিছুক্ষণ পরে, মগজের মধ্যে ভাবনাটাকে বেশ কিছুক্ষণ থিতিয়ে নেবার পর শ্যামাপদ যেন অনেকক্ষণ ডুবে থাকার পর ভুস্ ক'রে মাথা তুলে বলল,—সুবলের কথাটাই বোধ হয় ঠিক রে।

সোহাগী যে-নৌকায় চড়ে সাগর পাড়ি দেবে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল এতকাল, এই মুহূর্তে যেন সে প্রথম টের পেল যে, সে-নৌকোর তলায় মস্ত একটা ফুটো রয়েছে! সে আর্তনাদের সুরে বলল,—ঠিক?

শ্যামাপদ বলল,—মনে হচ্ছে তাই।

—তোমারও?

—হ্যাঁ রে। কি করি বল্ দিকিনি? মনে হচ্ছে—

—কী?

—ধর, গামলাটা না হয় মাঝ-নদীতে ডুবে না গিয়ে ঠেকলও এসে চড়ায়;—কিন্তু রাণীমা এলেন না নাইতে।—এমন কত হয়েছে, কে জানে?

—এমনও হয়েছে?

—হয়েছে বৈকি। নিশ্চয়ই হয়েছে।

—সে-গল্প লেখেনি তো।

—না লিখলেও হয়েছে। ভেবে দ্যাখ্ না,—না হয়ে যায় কোথায়?

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। ঘরের অন্ধকারটা ভোররাতের আতাতলা পুকুরের জলের মতন স্থির নিস্পন্দ।—সেই স্থির অন্ধকারে আবার একটা ঢিল ছুঁড়ল শ্যামাপদ। বলল,—ধর, রাণীমাও এলেন নাইতে;—কিন্তু এগারোটি ছেলেমেয়ের মা তিনি। তখন?—এমনও তো কত হয়েছে।

এবার আর প্রশ্ন নয়, সন্দেহ নয়, স্থিরনিশ্চিত সোহাগী। বলল,—নিশ্চয়ই হয়েছে। ঠিক বলেছে সুবলসখা।—কিসের ভাল? সুবলসখা বলে,—তার চেয়ে যদি এমন হত যে, কোনো গরীব মা-বাপকে এমন করে ছেলে ভাসিয়ে দিতে হত না, তাহলে সেইটাই কি সবচেয়ে ভাল হত না?

—ঠিক তাই। কিন্তু ভাবছি,

—কী ভাবছ?

—ভাবছি, সুবল কামার এসব কথা ভাবে কখন্? ভাবে কেমন করে?

—ও কী বলে জান?

—কী?

—বলে, সারাদিনই নাকি ভাবে ও';—আর সারাদিনই পুরোনো মরচে-ধরা বাঁকা তোবড়ানো ভাবনাগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে পিটিয়ে নতুন গড়ন দেয় ও'।—আমার চাঁপাকে ও' ভালবাসে, তা জান?

—জানি বৈকি।

—চাঁপার কথাও ভাবে সুবলসখা।

—ভেবে কী বলে?

—বলে,—পড়া ওকে। পড়িয়ে যা, আর সাবধানে রাখ। তাহলেই নিজের পায়ে ঠিক দাঁড়াবে একদিন তোর চাঁপা।

—তবে? তবে ভেবে মরিস কেন?

—সাবধানে রাখার ক্ষমতা যে আমার নেই। তাই তো ভয়, তাই তো ভাবনা।

সেই ভাবনা নিয়ে লোফালুফি করতে করতে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল যখন শ্যামাপদ আর সোহাগী,—ওদিকে নিজের হাতে-গড়া সেই খুপ রি ঘরের মধ্যে চাঁপার তখন ঘুম ভেঙে গেছে। [ক্রমশঃ।

চলো যাই

স্বাতী মুখোপাধ্যায়

আমরা দু'হাত দিয়ে মরুভূমে সাগর বহাই;
এসো না দু'জনে মিলে নদী হয়ে যাই।
ঘন নীল আকাশের রঙ মুছে নিয়ে,
চলো না হাওয়ার সাথে মিতালী পাতাই।
দু'পাশে ধানের ক্ষেত: চাষী বউ হাঁস ছাড়ে জলে।
এখন কি আর থাকা চলে?
শস্য-শীর্ষে শিশিরের দ্যুতির স্ফুরণ,
জ্যোতি গানের মত দ্বারে দ্বারে করাই স্মরণ।
অথবা চলোগে শুনি পুলি পিঠে গান।
ঢেঁকি শালে বৌ, মেয়ে, কিছু আলো ধান।
নিকোনো খামারে আর চাঁদের উঠোনে;
ছোট ছোট স্বপ্নগুলি মায়া জাল বোনে।
এখানে কলের চাকা সময়ের নির্ভুল কণ্টক,
প্রতি পদে বিদ্ধ করে ঠগ—প্রবঞ্চক।
আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখে নাটকীয় ধাঁচে,
এখানে নিয়ম হেতু কোন মতে প্রাণটুকু বাঁচে?
অথচ আমরা ভাখো—মরুভূমে সাগর বহাই,
ঘরে সখি কাজ নেই—চলো আজ নদী হয়ে যাই।

বর্গী এলো দেশে

মীরা বসু

বর্গীরা হানা দিয়ে বার বার আমাদের সাজানো সংসার
ভেঙ্গে দিয়ে গেছে, লুণ্ঠিত সম্পদ বারংবার
ধন-মান-বিভব, জীবনের প্রচুর অবক্ষয়
অশান্ত হাওয়ার ঝড় এনেছে দুর্যোগ সময়।
লালসার অজগর বার বার মেরেছে ছোবল
মানুষের মুখোস পরে শক-হুন-পাঠান-মোগল।
ভারতের ইতিহাস অতীত যে আজও কথা বলে
একদা ভাসিয়ে তরী উত্তাল সাগরের জলে
আপন-ভূগোল ছেড়ে এসেছিল গাঙ্গেয় দেশে
যে নাবিক, একদিন দেখা দিল শাসকের বেশে।
'ইপ্সিত স্বাধীনতা চাই' প্রতিদিন শপথের দিন
কতদিন দিয়ে গেছে অগোচরে জন্মের ঋণ।
মিলনের রাখী এসে বেঁধে দিল বিভেদের হাত
সবশেষে মুছে গেল হিংসার সেই বিষ রাত।
উত্তুরে হাওয়ার সাথে হানা ফিরে দিয়েছে ড্রাগন
তুহিন হিমানী রাতে চঞ্চল জীবন যৌবন
শঠতাকে চিনেছি সবাই, জেনেছি বন্ধুতার ভান
আমরা দৃপ্ত সব, হাতে হাতে নিয়েছি কৃপাণ।
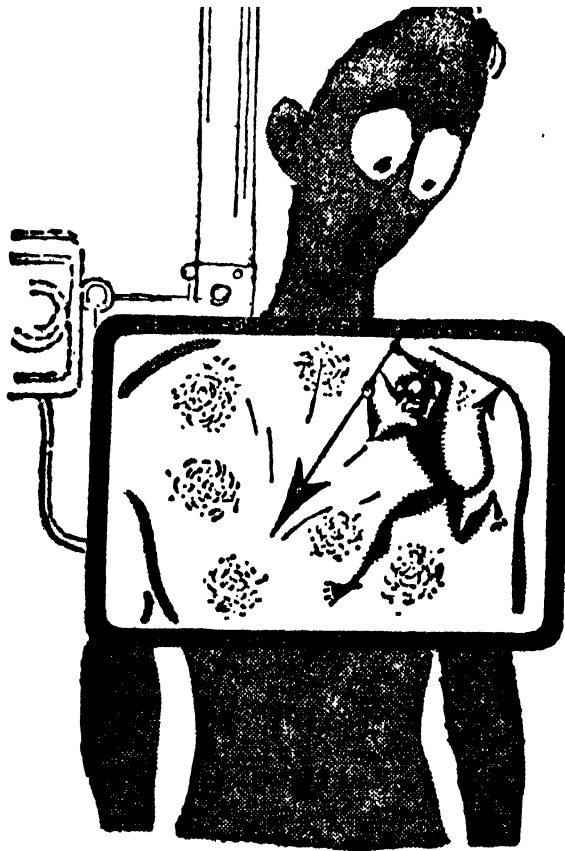
TUSSANOL
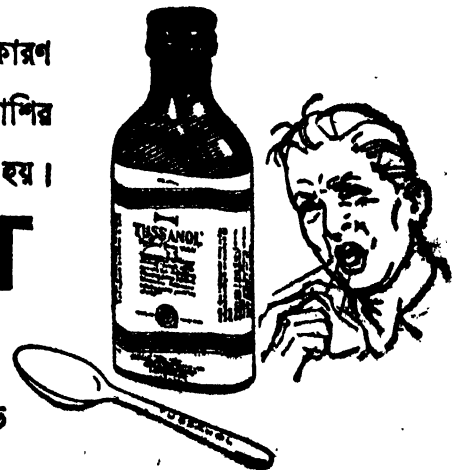
শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

মাথা নীচু করে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলুম। সামনের বাক্সটাতে কেউ হাতও দেয় নি। বেনারসী, মুর্শিদাবাদী, বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ীগুলো আমারই মতন অবাক ভাবে বোধ হয় চারিদিকে তাকাচ্ছিল।

পাড়ার মাতব্বর তারাশঙ্করবাবু টিপ্পনি কাটলেন, "বলি, রুচি বলেও তো মানুষের একটা জিনিষ আছে। মণিশঙ্কর, তুমি শেষ মেষ ঐ বেশ্যাটার কাছে যাতায়াত শুরু করলে? ছি ছি ছি। না, না, না, তোমাকে আর আমাদের সমিতিতে কোন মতেই রাখা চলবে না।"

নিশানাথ সেন সমিতির সভাপতি। আমাদের পাড়ার সবচেয়ে বড়লোক। সন্ধ্যার অন্তরালে বহু কুলনারীর সর্বনাশ করে থাকলেও পুজা কমিটির তিনিই শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তিনি যা বলবেন বেদবাক্যের মতন সবাই তাতে সায় দিতে থাকে। নিশানাথ বললেন, "বলো কি মণিশঙ্কর? এ সমিতি মানে? এ পাড়ায় ওকে আর থাকতে দেওয়া চলে? মা বোন নিয়ে সব ভদ্রপরিবার এখানে রয়েছেন না।"

পাকড়াশী মাথা নেড়ে বললে, "ঠিক বলেছেন স্যার। চাদাই উঠবে না। এ রকম লোক সমিতিতে থাকলে জনসাধারণের। এ সমিতির উপর সব শ্রদ্ধা হারাবে। এ কি আজকের সমিতি? এ বন্যা আর কি? আর কটা টাকাই বা এবার উঠছে? চাঁদা তুলেছিলুম সেই বাংলার দুর্ভিক্ষের সময়। দিল্লীর একটা রুই কাৎলা বাদ পড়েনি। সব জালে ফেলেছিলুম। তবেই না এ সমিতি দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাবা, চরিত্তির নিয়ে তুলেছে কেউ কোনো কথা? চরিত্তিরটাই হলো আসল। কি বলেন স্যার?"

পাকড়াশীকে সবাই সম্মান করে। দিল্লীর মতন শহরে তিন তিনখানা বাড়ী হাঁকানো যার তার কাজ নয়। কি করে এ বাড়ী করলো তা নিয়ে মাথা ব্যথায় কার দায় পড়েছে? সবাই তো আর ইনকাম্ ট্যাক্সের এজেন্ট নয়? সমিতির সে পাকাপোক্ত কোষাধ্যক্ষ।

নিবারণ সেন নিশানাথের কোম্পানীর কেরানী। মনিবকে খুশী করার এতবড় সুযোগটা সে হাতছাড়া করতে চাইল না। সে বলল, "আজ্ঞে স্যার আপনি বললেই একটা রিজলিউশন এনে আজই আমরা মণিশঙ্করকে এই কমিটি থেকে 'একস্পেল্' করে দিতে পারি। দেখি ওর ঘাড়ে কটা মাথা আছে?"

বেহুলা গুপ্তা কিছুদিন থেকে নিশানাথের পিছনে ছুটোছুটি করছে। তার কোম্পানীতে মাঝে মাঝে লেডি সেক্রেটারী রাখা হয়। বন্যা সাহায্য কমিটির সে কেউ নয়। তবুও একটা মন্তব্য করতে সে ছাড়ল না। "তা তো ঠিক কথাই। ঐ সব মেয়েদের দেওয়া কাপড় দিয়ে কি হবে মণিশঙ্করবাবু? ওটা বরং ফিরিয়ে দিয়েই আসুন। আপনি ওগুলো আনলেন কোন্ আক্কেলে? আমাদের তো ওগুলো ছুঁতেও ঘেন্না করত।"

পণ্ডিত তারানাথ চক্রবর্তী মন্দিরের পূজারী। কমিটিতে সে কোনদিন কোম কথাই বলে না। সামনে পুজো। দক্ষিণার রেট ও দানের ফর্দটি তার বাড়িয়ে নিতে হবে। সে বলল, "মণিবাবু আপনার সম্বন্ধে আমাদের খুব ভালো ধারণা ছিল। আপনি রাজলক্ষ্মীর পাড়ায় যাতায়াত শুরু করলে তো আর মন্দিরে আপনাকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এ মন্দির পবিত্র প্রাঙ্গণ"···

টাইপিষ্ট সতু বলল, "নিজের বয়সটার দিকেও একবার তাকিয়ে দেখুন মশাই। ঐ চেহারা, ঐ পোষাক নিয়ে রাজলক্ষ্মীর বাড়ীতে গেলে সে শাড়ী অলঙ্কার কেন, দেহ প্রাণ মন সবই দিয়ে দিতে পারে।"

সতু অন্যদিন নিশানাথের ভয়ে কোন কথাই বলে না। মণিশঙ্করই তার চাকরীটা জুটিয়েছিল কোনদিন।

আমার বলার কিছুই ছিল না। সত্যি বলতে কি আমি চাদা তোলার পক্ষেই ছিলুম না। সামান্য কয়েকটি ঘর থেকে কিছু সংগ্রহ করে বন্যায় বিধ্বস্ত পীড়িত নরনারীকে যদি একটু সাহায্য করতে পারি তাহলে তা করব না কেন? শুধু এই বিবেচনা করেই রাজলক্ষ্মীদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। নিশানাথকে বহু নিশীথে সেখানে যেতে দেখেছি। আরও বহু কর্তা ব্যক্তিকে। সেটা যে পরিত্যক্ত নিষিদ্ধ এলাকা কবে থেকে হল, কেন হল কিছুই জানতাম না। এমনিই হেঁটে চলেছিলুম। রাজলক্ষ্মী নিজেই ডাকলো, "মণি, শোন্। কোথায় যাচ্ছিস?"

ফিক করে একটু হেসে বলল, "তুইও আজকাল এ পাড়ায় ঘোরাঘুরি শুরু করেছিস নাকি? তুই তো আমাদের গাঁয়ের ভালো ছেলে বলেই জানতুম। তোর এ সর্বনাশ কবে থেকে হলো রে?"

রাজলক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারছিলুম না।

অপরূপ সুন্দর লাগছিল। মাথার সুবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশদাম যূথিকা-স্তবকে অপরূপ মানিয়েছিল। মুখখানা যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ। ঠোঁট দুটি রক্তিম, পায়ের সুন্দর আঙুলগুলো অলক্ত রাঙা। শাড়ীর অঞ্চলটা অবিন্যস্ত ছিল। আমাকে দেখেই বোধ হয় সেটা সে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছিল।

হেসে আমাকে বলল, "অমন ভাবে হাঁ করে কি দেখছিস্ রে মণি ?"

আমার মাথার ভিতরটা ঝিন্‌ঝিন্ করে উঠলো। এত রূপ আমি দেখি নি। রাজলক্ষ্মী অপরূপ সুন্দরী।

—"বললি না তো কোথায় যাচ্ছিলি ?" বললাম, "চাঁদা তুলতে। বন্যার জলে বাংলার কত জায়গা ভেসে গেছে জানো তো। তাদের জন্য চাঁদা তুলতে বেরিয়েছি। কদিন থেকেই তুলছি।"

—"কৈ আমার কাছে তো কেউ আসিস্ নি। পুজোর চাঁদা কেউ নিতে আসে না সে আলাদা কথা। বন্যার জলে যারা ভেসে যাচ্ছে আমার টাকা কি তারাও স্পর্শ করবে না ?"

"আমি বললাম তুমি যদি দিতে চাও তাহলে কেন নেব না? যে হতভাগারা বানের জলে ভেসে যাচ্ছে তাদের কাছে যা নিয়ে ধরব তারা তাই আদর করে নিয়ে নেবে। দেবে তুমি কিছু চাঁদা ?"

রাজলক্ষ্মী আমাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। বেশ সুন্দর ফুল চন্দনের গন্ধ আসছিল। আমার বেশ ভালই লাগছিল।

আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ রে মণি কিছু খাবি ? তোরা তো আবার বামুন না রে ?"

বললাম, "না থাক রাজদি'। ক্ষিদে নেই। তুমি কি চাঁদা দেবে দিয়ে দাও। চলে যাই।"

রাজলক্ষ্মী বলল, "তুই দেখছি ঘোড়ায় চড়ে এসেছিস। বোস না একটু। মন খুলে একটা কথা বলার লোক নেই। তোরা ভালো ছেলে, দেশের লোকের উপকার করিস, বন্যায় চাঁদা তুলিস, তোরা এখানে বসবি কেন ? ঠিক কথাই তো। এই নে এই বাক্সের সব কাপড়গুলো নিয়ে যা। এতে যা আছে সব। এগুলোই আমার সবচেয়ে ভালো শাড়ী। শাড়ী চিনিস ? তুই তো আবার এখনও বিয়ে করিসনি। এই নে ধর"—বলে একে একে বার করল বেনারসী, মুর্শিদাবাদী, বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ীর পাহাড়। আমি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

মনে মনে ভাবলাম মেয়েটা পাগল হয়ে যায় নি তো ?

সে কিন্তু ঠিক ধরে ফেলেছে। রাজলক্ষ্মী বলল, "কি ভাবছিস ? আমি এগুলো সত্যি সত্যি দিচ্ছি কি না ? হ্যাঁ রে সত্যি সত্যিই তোকে এই শাড়ীগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তুই নিয়ে যা। ভয়ঙ্করী বন্যা কত লোকের সর্বনাশ করেছে। তাদের কত দুঃখ। কত অসহায় তারা। তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়া। বলিস তাদের তোর হতভাগী রাজদি' এগুলো তাদের জন্য দিয়েছে।"

আমি বললাম, "এগুলো কেন দিচ্ছ রাজদি'। সাধারণ বাড়ীতে পরার জন্যে তো বা তাঁতের সাধারণ শাড়ী থাকে তো তাই দাও না। এতগুলো দামী শাড়ী নিয়ে কি করব ?"

রাজলক্ষ্মী হেসে বলল, "শোন্ তবে। তুই বোধ হয় বিশ্বাস করবি না, আমার সাধারণ শাড়ী একখানাও নেই। এইগুলোই আমার সাধারণ, এইগুলোই অসাধারণ। যা বলছি শোন্। লক্ষ্মী ছেলের মতন এগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে যা। হ্যাঁ আর একটা কথা শোন্, এ পাড়ায় আর খবরদার পা মাড়াবি নি। তোকে তো জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গেছলাম চাকরী-বাকরী করিস ?"

বললাম, "হ্যাঁ রাজদি' চাকরী একটা করি। খবরের কাগজের অফিসে।"

—"এই যে কাগজ আমরা সকাল বেলা সবাই পড়ি সেই কাগজের অপিসে ?"

—"বললাম, হ্যাঁ।"

—"তাহলে তুই বেশ পণ্ডিত হয়ে গেছিস বল্। সেখানে নিশ্চয়ই অনেক পড়াশুনো করা লোক কাজ করে ?"

বললাম, "তা করে বই কি। কাগজ চালানো তো চাট্টিখানি কথা নয়।"

রাজলক্ষ্মী বলল, "সত্যি মণিশঙ্কর তুই গাঁয়ের নাম রেখেছিস। তুই ভাই কখনও এ পাড়ায় আসিস নি।"

"এই অসময়ে কে এলো গো" বলেই গৌরাঙ্গী আয়তলোচনা চপলা একটি ষোড়শী এসে ঘরে ঢুকলো। একবার আমার দিকে আর একবার রাজলক্ষ্মীর দিকে মুখ টিপে তাকিয়ে দু'জনের দিকে তির্যক চাহনি ছুঁড়ে সে চলে যাচ্ছিল।

রাজলক্ষ্মী তাকে ডাকলো, "শ্যামা এদিকে আয়।"

একবার রাজলক্ষ্মীর দিকে একবার আমার দিকে তাকিয়ে শ্যামা বলল, "থাক্ না এখন। পরে আসব'খন দিদি। এমনি এসেছিলাম।"

রাজলক্ষ্মী বলল, "না পরে না। এখনই তোকে আসতে হবে। এঁর বেশী সময় নেই হাতে। এ হল আমাদের গাঁয়ের মণিশঙ্কর। খুব ভালো চাকরী করে খবরের কাগজে। এসেছে চাঁদা আদায় করতে। বন্যায় যাদের সর্বনাশ করেছে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দিবি তুই কিছু চাঁদা ?"

শ্যামার চটুল চাহনি বদলে গেল। সরল হাসিমুখ গম্ভীর হয়ে

গেল। আমার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করে বলল, "অন্যায় করেছি। ভুল ভেবেছিলুম। মাপ করবেন। আপনি চাঁদা তুলতে বেরিয়েছেন। যারা গরীব, যারা অসহায়, সেই সব মেয়েদের জন্য আমি নিশ্চয়ই চাঁদা দেব। রাজদি' তুমি এঁকে বসিয়ে রাখো আমি এ পাড়ার সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে আনছি। এসব হতভাগীর দল চাঁদা দেবে। বন্যায় যে তাদের সবার একদিন সর্বনাশ হয়েছিল। মনে নেই কি?"

সত্যি বলতে কি আমার একটু ভয় ভয় করছিল। মেয়েদের বা রাজদি'কে নয়। তাদের আমি জানি। তারা আমাকে দূরেই ঠেলে দেবে। কাছে টেনে নীচে ফেলে দেবে না। ভয় করছিলাম কাছের লোকদেরকেই। তবুও রাজদি'র বন্যার কাহিনীটুকু শোনার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

বললম, "আচ্ছা রাজদি' বন্যা সম্বন্ধে তখন তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে। কই বললে না তো।"

রাজলক্ষ্মী বলল, "তখন মণিশঙ্কর তোমরা অনেক ছোট। কাকামণি তখন পশ্চিমে কাজ করেন। ঠিক বন্যায় কিছুদিন আগেই তোমরাও দিল্লীতে চলে গেলে। হঠাৎ গ্রামের নদীতে বান এলো। খাল বিল নদী মাঠ সব এক হয়ে গেল। যতদূর দেখা যায় শুধু জল আর জল। কি তার ঢেউ কি তার গর্জন। গাঁয়ের ঘর দোর মাটিরই তৈরী। এক এক করে সব ধ্বসে পড়ল। আমার বয়স তখন পনেরো যোলো। এই যে শ্যামা এসেছিল তখন আমি ঠিক তার চেয়ে একটু ছোটো। কিন্তু দেখতে তার চেয়ে বড়ই ছিলাম। স্বাস্থ্যটা খুব ভালো ছিল কিনা। খুব খেটেছিলাম। দেখতে দেখতে বানের জলে সব ভেসে গেল। দিন নেই রাত নেই বাবা সেই ধানের গোলার পাশে ছুটোছুটি করছিলেন। শোভা এর ভিতর কখন মার সাথে ভেসে গেছে কেউ টেরই পেলাম না। ধানের গোলা গেল। আমাদের একটা বিলিতি গাই ছিল, নাম তার চণ্ডী। চণ্ডী ভেসে গেল। আমার বোধশক্তি তখন ধীরে ধীরে রহিত হয়ে গেল। আমি অচৈতন্য হয়ে পড়লাম।"

"কতক্ষণ ঐরকম বেহুঁস ছিলুম ঠিক জানি না। যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম আমি একটা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে। পাশে দাঁড়িয়ে ভলান্টিয়ারের ব্যাজ লাগানো আমাদের গাঁয়ের নিশানাথ সেন। গাঁয়ে অনেকবার দেখেছি তাঁকে। শহর থেকে এসেছে বন্যার সাহায্য করতে।"

আমি বললাম, "আমার বাবা কোথায়?"

নিশানাথ বলল, "কোনো চিন্তা করো না রাজলক্ষ্মী। তোমাকে দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে সবার সাথে দেখা হবে।"

"ধীরে ধীরে আমি সেরে উঠলাম। গায়ে একটু একটু বল ফিরে পেলাম। তার চেয়েও বেশী মনে। দিল্লী যাব। সবাইকে ফিরে পাবো। সেই আশায় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম।"

"সেখানে তখন নিশানাথ ছাড়া কাউকেই আমি চিনি না। তার উপর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলাম।"

"আমার কিন্তু কিরকম যেন একটু ভয় ভয় করত। নিশানাথ ছোটো ছোটো আরো কয়েকটা মেয়ের ভার নিয়েছিল। আমরা সবাই কয়েক দিনের ভিতর দিল্লী এলাম। গাঁয়ের ঐ মেয়েদের ভিতর আমি ছিলাম সব চেয়ে বড়। নিশানাথ গায়ে পড়েই যেন আমাকে একটু বেশী রকম খাতির করত। আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতাম। কিছু বলবার সাহসটুকুও ছিল না। তাছাড়া যাবই বা কোথায়? তুমি তো এখন বড় হয়েছো মণি, বুঝতেই পারছো নিশানাথ কেন আমাদের শহরে নিয়ে এসেছিল।"

"গভীর নিশীথে একদিন নিশানাথ আমার যা ছিল, তার সবটুকু নিঃশেষ করে নিয়ে নিল। লজ্জা, মান, সতীত্ব সব সে কেড়ে নিল। আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম। পরমুহূর্তে একটা অপরিচিত নারী এসে আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে কোথায় নিয়ে গেল কিছুই টের পেলাম না। গা-টা বমি বমি করছিল। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া বোধ হয় কোনো ওষুধও তারা শুঁকিয়েছিল; আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি দিন যাচ্ছে, প্রতিদিন আসছে। নতুন সূর্য উঠছে, নতুন সূর্য অস্ত যাচ্ছে—আমার জীবনে কোনো পরিবর্তন নেই। সেদিন থেকে আমি এই ঘরটুকুতে একরকম বন্দিনী।"

আমার মাথার চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছিল। ছোটবেলা থেকে রাজদিকে দেখে এসেছি। তারপর একদিন একথাও শুনেছি সে নাকি খারাপ মেয়েদের দলে যোগ দিয়েছে। তার নিজের মুখে এ কাহিনী শুনে মনের ভিতর কেমন একটা আলোড়ন খেলে গেল।

আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, "আচ্ছা রাজদি, ঐ শ্যামাও কি তোমার সাথে এসেছিল?"

রাজদি' বলল, "হ্যাঁরে সবাই একই নৌকোর যাত্রী। কেউ এসেছে দুদিন আগে, কেউ দুদিন পরে। কেউ বন্যায়, কেউ দারিদ্র্যে, কেউ অত্যাচারে।"

কোনকালে গ্রামে রাজদির ভালো ছাত্রী বলে নাম ছিল। তাকে বহুদিন দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি পাঠশালায় যাবার পথে।

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাজদি বলল, "বন্যা বটে। কি বন্যাটাই না এসেছে আজ। শুধু নদীতে নয়। আজ এদের যৌবনের বন্যাতে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেখছিস মণি এর ভিতরই শ্যামা মেয়েটার কিন্তু তোকে ভারী পছন্দ হয়ে গেছে। তুই এখনই বাড়ীতে চলে যা। সব কাপড়গুলো নিয়ে যা। সব অসহায় অবলাদের পৌঁছে দিস আমার নাম করে, দুঃখে বিপদে শোকে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াস। আর একটা কথা রাখিস ভাই। এ পাড়ায় আর কখনও পা মাড়াস নি।"

* * *

মাথা নীচু করে চুপ করে বসে এতক্ষণ শুধু একথাই ভাবছিলুম এই শাড়ীর পাহাড় নিয়ে কি করব? সামনের বাক্সটাতে কেউ হাতও দেয় নি। বেনারসী, মুর্শিদাবাদী জ্বালোর সিল্কের শাড়ীগুলো আমারই মতন অবাক ভাবে চারিদিকে তাকিয়েছিল!

Whereas maternity is a matter of fact, paternity is a matter of opinion. —*Old Roman Saying.*
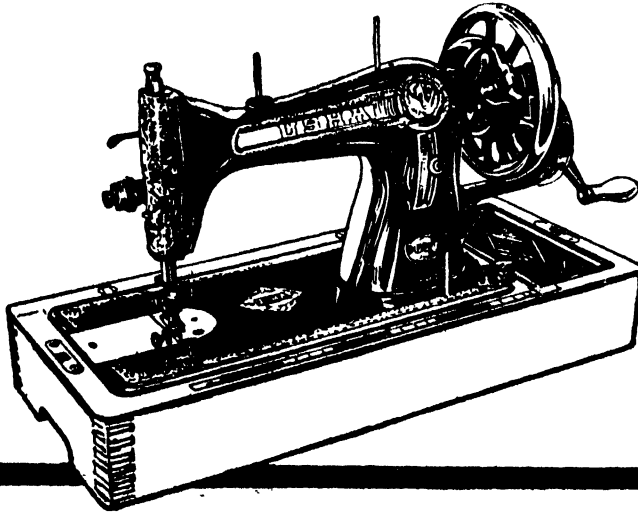
কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন
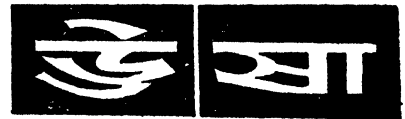
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

সপ্তদশ স্তবক

১। চতুর্মুখ-প্রধান দেবতাদের যখন সর্বদিক দিয়েই খণ্ডিত হয়ে গেল গর্ব্ব-গরিমা, লীলা-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের তখন মনে পড়ল নিজেরি একটি উক্তি,—"আগামিনী রাত্রিগুলিতে আমার সঙ্গে তোমরা খেলবে।"

[ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ ;—ভা, ১০-২২-২৭। একদা বস্ত্রহরণের সময় ব্রতচারিণীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ উচ্চারণ করেছিলেন এই প্রতিজ্ঞাবাণী।]

মনে পড়তেই তিনি প্রণিধান করলেন, চারটি বিভিন্ন কারণে তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই প্রতিজ্ঞাপালন।

১। ব্রহ্মার মদ-খণ্ডনের অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিস্মিত দেবতাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীকন্দর্প ই গর্বভরে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন,—"শৃঙ্গার-রসময় আমি কন্দর্প,···একমাত্র আমিই পারি বিশ্ব-বিমোহন করতে··· ধীর-লালিত্যে।" অতএব কন্দর্পের দর্পিত ঔদ্ধত্যের দমন তাঁকে করতে হবে।

২। নিজের মুরলিকা-সখীটির নিকট থেকে তিনি নিজে যা শিখেছিলেন, বা তাঁর নিকট থেকে ঐ সখীটি যা শিখেছেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা তাঁকে করতে হবে।

৩। যে গলদেশ সংযুক্ত করে দু'টি বাহুকে, সেই গলদেশ দিয়ে রমণীয়া একাধিকা রমণীকে যুগপৎ পরিরম্ভন তাঁকে করতে হবে।

এবং ৪। নিত্য-কাত্যায়নী-ব্রতচারিণী কুমারীদের যে নবানুরাগ-রসতরঙ্গ কাম-সম্বর্দ্ধিত না হয়েই অমৃতধারার মত ঝরে পড়ছে,···এবেটিকে স্বীকার করা উচিৎ হয়ে পড়েছে তাঁর পক্ষে,···স্বকীয় ইচ্ছাশক্তির কোনো বিশিষ্ট কৌশলে প্রথমেই তাঁকে অকাল-পরিপক্বতা বিধান করতে হবে সেইটির, এবং ততঃপর পরোঢ়া-রস-সম্ভোগাদির সমকালেই, সেটির অনুমোদনও তাঁকে করতে হবে।

অতএব কৃষ্ণভগবান, আহা, যাঁর কৃপাকটাক্ষেই রাসাদি অসংখ্য মনস্কামনার জন্ম হয়ে যায় রজনীতে, এবং যাঁর নিভৃত-নির্ম্মিতির কৌশলে একান্ত-দীর্ঘা হয় সেই রজনী, তিনি তখন তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, প্রথমেই শক্তি নিক্ষেপ করলেন তাঁর মাতা ও পিতার উপরে। তার ফলে, যশোদা ও নন্দের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে তাঁদের ছেলেটি, তাঁদের ঐ অতিলক্ষ্মী দুলালটি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিশার মতই আরামে ঘুমিয়ে রয়েছে তার মণিমন্দিরে।

অক্ষয়-আমোদে এই ঘটনাটিকে ঘটিয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবার পথ ধরলেন বন-সীমার। সীঁথির মত বন চিরে চলে গিয়েছে পথ। প্রদোষ হলেও ঘনিয়ে আসছিল রাত। চলতে চলতে হঠাৎ কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে পড়লেন পথে। দেখলেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরি সঙ্কল্পিত ব্রহ্ম-রাত্রির মত মানোজ্জ্বলা শারদ-গণরাত্রির দেবীগণ। যেন তাঁরি আজ্ঞার প্রতীক্ষায় উৎসব সাজে সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁরা। শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

"আপনারা সকলেই পূর্ণকলায় সত্য সঙ্কল্পা হয়ে বিরাজ করুন।" এবং সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ কৃষ্ণের অভিলাষ হল,···তাঁর অভিপ্রেত মিলন-বিলাস-কলার গহন রহস্যটিকে প্রকাশ করে দেবার। তাই তিনি তাঁর নিজের যোগমায়াকে নিয়োজিত করে দিলেন অখিল বিশ্ব-কার্য্যে। নিযুক্তা না হয়েও বিশ্বাভিপ্রায়-জ্ঞান যদিও ভগবতী যোগমায়ার একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম, তবুও আয়াসহীন ঐ অক্ষুণ্ণ সর্ব্বাধ্যক্ষতায় তাঁকে এখন বিশেষভাবে নিয়োগ করে দিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ বিহারে সমর্পণ করে দিলেন নিজের মন।

২। দেখতে দেখতে অপরিমেয় ও অনুপমেয় হয়ে উঠল রজনী-দেবীদের পরিবেশ। হঠাৎ যেন তাঁদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল এক উৎসব-মুখের নিবিড় সুখের তরঙ্গ। তাঁদের অঙ্গে অঙ্গে যেন এক সঙ্গে পুষ্পতরঙ্গে বিকশিত হয়ে উঠল···বসন্তের, নিদাঘের এবং শরৎকালের সুন্দরতম শোভা। তাঁরা বরণ করে নিলেন সেই তিনটি ঋতুরই অভূতপূর্ব্ব কুসুম-সমৃদ্ধি।

নিদ্রার জড়িমা ভেঙে হাই তুলে ডানা নেড়ে উঠে বসল কোকিলের দল। তারপরেই কর্ণপটহ সুখ দীর্ণ করে দিশিদিশি ছড়িয়ে পড়ল তাদের মধুমধুর কলকণ্ঠের কণ্ঠনাদ। আর সর্ব্বাঙ্গে চন্দন মেখে হো হো করে ছুটলেন সমীরণ···তাঁর মৌভরা মাধবীর গন্ধসুধা লুটতে।

আর মত্ত ভ্রমর-তরুণেরা···ঝঙ্কারের অলঙ্কার পরে, মল্লিকা-বল্লিকার অফুল্ল কুসুমরাশির উপরে বসে, প্রাণভরে মধুপান করতে করতে, যেন নিবিড় নিদাঘশ্রীর বিহার-উৎসবের বাজিয়ে দিল শঙ্খ।

এমন কি আলস্য ভুলে গেল সারসেরা,···সরসীতে সরসীতে সর্‌সর্‌ করে ভেসে বেড়াতে লাগল রসিক হংসেরা। তারা ডাকতে লাগল সহর্ষে। আর ফুটন্ত কুমুদিনীর গন্ধে গন্ধে ছুটে এসে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রেমের খেলায় মেতে উঠল চুলবুলে মত্ত ভোমরার দল।

৩। সেবার সময় আসন্ন হয়েছে ভেবে উদার-আদরে উদিত হলেন চন্দ্রদেব। উথলে পড়ল তাঁর আলো। বলিহারি তাঁর রূপ!

বনপথ ধরে শ্রীকৃষ্ণ চলতে লাগলেন চাঁদ ওঠা দেখতে দেখতে।

প্রথমেই মনে হল, চন্দ্রদেব যেন···কমলার কোপারুণ কপোলের ভিত্তিতে কনককুণ্ডল হয়ে দুলছেন।

তারপরে মনে হল, তিনি যেন···তরুণ-তরুণীদের হৃদয়পট-রাঙাবার খেলায় অনঙ্গ-রঙ্গে-ভরা বর্ণভাণ্ডটি সেজে রয়েছেন।

তারপরে চন্দ্রদেব যখন ধীরে ধীরে মাঝ গগনের দিকে চলতে লাগলেন, তখন মনে হল,···সময় অতি রসময় হয়ে উঠেছে···এই খবরটিকে সঠিক জানিয়ে দেবার জন্যেই তামার ঘড়ি ঘণ্টার মত বুঝি তিনি নভোকুণ্ডে নাচছেন।

তারপরে ধীরে ধীরে অরুণিমা ঝরে পড়ে গেল চন্দ্রদেবের মুখ থেকে। কুঙ্কুমের মত এমন এক পীতকান্তি সতেজ সৌন্দর্য্যে ভরে উঠল তাঁর মুখ, যে মনে হল ভগবৎ-দর্শনের আকাঙ্খায় উন্মুখ হয়ে বুঝি বেরিয়ে এসেছে ঐন্দ্রী দিগঙ্গনার মুখভরা অক্ষয় হর্ষ।

তারপরেই পূর্ব্বদিক্-সরোবরে যখন তিনি ভাসতে লাগলেন তখন মনে হল,···পদ্মফুলের রেণু মেখে হলদে সোনালি রঙের একটি রাজহংস ভাসছে, যেন নীলসায়রে ভাসছে।

এ কি কেবল চন্দ্রোদয়? না, না। এ-যেন সঠিক সময়টিতেই ভেসে-ওঠা কালপুরুষ—মথ্যমান আকাশ—দধি সমুদ্রের নবনীত পিণ্ডের ছবি; এ যেন কিরণের-দড়ি-দিয়ে-টানা ঋতুরাজ বসন্তের শারদীয় শুভ্র পটমণ্ডপ; যেন একটি শুভ্র পারাবত বুক ফুলিয়ে বসে পড়েছে বিশ্বমণ্ডপের আকাশ-বিটঙ্কে। কী ফুটফুটে চাঁদ! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কলঙ্কের দাস,··· দিগ্বধূদের স্ফটিক-করঙ্কের মধ্যে যেমন দেখা যায় পানের খিলির ছায়া। কিন্তু হায় কপাল, রজনী-মহোৎসবের এই সপল্লব রাজত মঙ্গল-কুম্ভের মত চাঁদটিকে দেখে কি কলঙ্কের কথা আর মনে ধরে? না, ধরে না। তখন মনে হয়,···এ যেন উত্তান বিষ্ণু-চরণের পাঞ্চজন্য শঙ্খটিকে দেখছি,···সন্ধ্যালক্ষ্মীর খোঁপায়-জড়ানো মালতী ফুলের মাল্যখানি দেখছি,···গর্ব্বতপ্ত কন্দর্পের মৃণালের বালিশটিকে দেখছি,··· যেন দেখছি হীরের কুণ্ডল দুলছে বলরামের বাম কানে,···যেন দেখছি তারার মুক্তায়-মোড়া গগন-সায়রের অতুলনীয় মহাশুক্তিটিকে,···যেন দেখছি শোভাদেবীর দর্পণটিকে, যেন দেখছি রজনীরমণীর চন্দন-তিলকটিকে, যেন দেখছি আনন্দ সরোবরের একটিমাত্র সহস্রদল শ্বেতপদ্মকে।

এ চাঁদ যেন মদনের মত রতিবর্দ্ধন,···লোকলোচনের কর্পূর-পুর,··· সৌন্দর্য্য দেবতার মাধুর্য্য-সৌধ,···আকাশগঙ্গার সৈকতবলয়।

সেই কোকিলডাকা রাত্রে তুহিন-ভরা কিরণ ছড়াতে ছড়াতে, এবং বিবেকীর মতই অবনীর মনের আঁধার হরণ করতে করতে, সুচারু মণ্ডলের পুণ্য রাজত্বে বাজমান থেকে ঐ চাঁদ যেমন উস্কিয়ে দিলেন কুমুদের আনন্দ, তেমনি আবার সমাদরের হাত বুলিয়ে শীতলও করে দিলেন শ্রীবৃন্দাবনের গা।

৪। দেখতে দেখতে মধ্যগগনে উঠে পড়লেন চাঁদ। তরুণ তরুদের চঞ্চল পল্লবের অবকাশ পথের পথিক হলেন তাঁর জ্যোৎস্না-সুন্দরীর দল। প্রত্যেক গাছের তলায় তলায় তাঁরা সই পাতালেন তাঁদেরি মতন অসংখ্য পলাশ-ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর সেই চালুনির মত আলোছায়ার সাদাকালোর খেলায় চতুর চাঁদের কাজটিও হল মন্দ নয়—··বনলক্ষ্মীদের খাটিয়ে খাটিয়ে, তিনি তৎক্ষণাৎ চমৎকার সাজিয়ে তুললেন বনতল।

৫। নীচের আকাশ থেকে চাঁদের এক রকমের শোভা, উপর থেকে কিন্তু অন্যরকমের। শ্রীকৃষ্ণের মনে হল,···নিবিড় নক্ষত্রের মুক্তাবিতানের নীচে চাঁদ যেন অমরদের হাতের একখানি বিশাল শ্বেতচামরের মত ঝুলছেন, আর কেশররাজির ভ্রম জাগিয়ে বিপুলভাবে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে তাঁর কিরণজাল;···অথবা তিনি যেন একটি শ্বেত-পট্টসূত্রে বাঁধা শ্বেতকমলের থুপী,···বেরিয়ে এসেছেন নক্ষত্রের কান্তি-কুঞ্চিত গগনের দণ্ডহীন মুক্তার ছাতার ভিতর থেকে।

৬। কী মায়া যে ঢেলে দেয় চাঁদের আলো। কী অদ্ভুত সুখ-রঞ্জনী তার জয়ীভাব।···কেমন যেন জোর করে সে টানতে চায় দিগ্বধূদের দুর্ব্বল হাত।···আনন্দে শুভ্র করে দিতে চায় ভূমণ্ডল।··· যা কিছু নিম্ন যা কিছু উন্নত, সব যেন রহিত করে দিয়ে তারায় তারায় ছড়িয়ে দিতে চায় তৃপ্তি।

প্রীতির হিতে-মোড়া সেই চাঁদটিকে দেখতে দেখতে কেমন যেন লাবণ্য পুষ্ট হয়ে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ। বাক্যহারা বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীও দেখতে লাগলেন তাঁর সেই রূপ, তাঁর সেই আচরণ।

নিখিল রমণীসমাজের যিনি সুহৃৎ, তিনি তখন বাজিয়ে দিলেন তাঁর মুরলী। উড়ে চলল মর্ম্মস্পর্শী বেণুর আহ্বান।

সকলকেই একসঙ্গে আকর্ষণ করে থাকে কৃষ্ণবেণুর ধ্বনি ; কিন্তু আজ কেবল তাঁরাই শুনতে পেলেন···যাঁদের তিনি শোনাতে চাইলেন বাঁশরী। পশু শোনে, পাখী শোনে, ধেনুর দল শোনে, অঙ্গনারা মোহিত হন, সে তো কেবল তিনিই তাদের বাঁশরীতে ডাকেন বলে। তাঁরাই শোনেন যাঁদের হৃদয়ে কেবল প্রসারিত হয় কৃষ্ণের মন।

"একটিমাত্র স্বর-পরিমল ছড়িয়ে আমাকেই কেবল ডাক দিয়ে যায় মুরলী···একদা এই প্রতীতি হয়েছিল অঙ্গনাদের ; আর সত্যিই, জাতীয় অন্য ধ্বনির সঙ্গে আর তো এঁদের পরিচয় নেই ; অতএব একমাত্র ঐ ধ্বনিতেই এঁরা চিনবেন এই মুরলীকে"···এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাজিয়ে দিলেন তাঁর মোহন-মধুর মুরলী।

৭। বাঁশী বাজল। এবার আর উঠল না তাতে সুরধারার তরঙ্গ-রঙ্গ। নিজের অপ্রাকৃত শক্তিতেই ব্যাপক হল তার মঙ্গলধ্বনি। সেই ডাক অঙ্গনাদের শ্রবণপথে পৌঁছতে···যেন শুণ্ডাঘাতে উন্মূলিত হয়ে গেল তাঁদের হৃদয়, অগস্ত্য-পান হয়ে গেল তাঁদের বুদ্ধির, করাত-চেরা হয়ে গেল ধৈর্য্যের, বাজপাখীর বিক্রমে যেন বিনষ্ট হয়ে গেল তাঁদের খঞ্জন-আঁখির দৃষ্টি।

সেই ধ্বনি থরথর এক কম্পন ছড়িয়ে দিল অঙ্গনাদের দেহে দেহে ; উন্মত্ততা এনে দিল তাঁদের ভদ্রাভদ্র নিরূপণের বুদ্ধির বৃত্তিতে বৃত্তিতে ; এবং তাঁদের স্বমার্গ-সঞ্চার-সংস্কার ছাড়া অন্য সমস্ত সংস্কারকে ধ্বংস করে দিল একেবারে।

কৃষ্ণমুরলীর সেই ধ্বনি কেবল ফিরতে লাগল বধূদের কানের কাছে ···তাঁদের ডেকে ডেকে ; প্রেমের জাল পেতে ধরতে লাগল তাঁদের মনোমীন ; সম্পূর্ণ অভিচার-মন্ত্র হয়ে উঠল তাঁদের কুল, শীল, আচার এবং অনুষ্ঠানের। কেমন যেন এ স্বতন্ত্র···ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙাই যেন তার তন্ত্র।

শ্রীভগবানের শ্রীমুরলী ঐ বাজল। কী পরিপাটি পটুতা ঐ নিনদনের! অতি মৃদু অতি মধুর শ্লক্ষ্ণ সূক্ষ্ম ঐ বাজল। কিন্তু হায় রে, একি বিরুদ্ধ হল তার আচরণ! উন্মত্ত মাতঙ্গের মত বিলোল করে দিয়ে গেল কুলপালিকাদের কমলবন।

সারাধিকা রাধিকার কানের কাছেও শ্রীমুরলী ঐ বাজলো। এমন ধ্বনি তো আগে কখনও তিনি শোনেননি। রাধার কানে তাই কেমন যেন একটু অন্য ধরণের বলে ঠেকলো।

সেই ধ্বনিটিকে যেই পান করল তাঁর কান, অমনি যেন এক মাধ্বীক-পানের উৎসব নেচে উঠল তাঁর দেহ-মঞ্চে, যেন সেখানে অভিনয় হয়ে গেল···ধৈর্য্য ধ্বংসের, বিঘূর্ণনের, প্রলপনের, ব্রীড়াস্ত এবং হী-বিভ্রমের। তবু একটি বিশেষত্বের প্রকাশ হল সেই স্থলে। ও মদিরায় রাঙা হল না রাধিকার দু'নয়ন, চোখের লালিই ধুয়ে গেল নয়ন জলের বিন্দুতে।

ব্রজধামের কন্যাদের কানের কাছেও শ্রীমুরলী ঐ বাজল। তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে হল,···ও বাঁশী তাঁকেই বুঝি ডাকছে,··· নাম ধরে ধরে ডাকছে,···শ্রীকৃষ্ণের কাছে আগে-যাবার আহ্বান জানিয়ে যেন ত্বরার ত্বরা হয়ে তাঁকে ডাকছে। চাওয়ার পথের অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল যে, সে যেন অনেক নিকটে এসে কানে কানে তাঁদের ডাকছে। একি সত্যিই ঐ বাঁশরীর ধ্বনি? না এ তাঁদের হর্ষের হর্ষ, না রহস্যের রহস্য, না উৎসবের উৎসব?

৯। একটি সুতোয় তোড়া-বাঁধা অসংখ্য গুড়িয়া পুতুলের মত ব্রজপুর থেকে বেরিয়ে পড়লেন ব্রজসুন্দরীরা। 'এস এস দ্রুত এস, কাছে এস'···বলে, বাঁশীতে তাঁদের ডেকেছে, আর কি ঘরে থাকা যায়! একই সময়ে একই কাজে এক এক করে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে। ইনি ওঁকে চেনেন না, উনি এঁকে চেনেন না, অথচ প্রত্যেকেরই অপরাহত রয়েছে মিলনের বাসনা ; ইনি জানেন না উনি কোথায় চলেছেন, উনি জানেন না ইনি কোথায় চলেছেন, অথচ প্রত্যেকেরই চলনে ফুটে উঠেছে কৃষ্ণ-গ্রহ-গ্রস্তের মত অদ্ভুত একটি ভাবনা,···ব্রজপুর থেকে বেরিয়ে এলেন সুন্দরীরা। আকাশ থেকে ধরায় নেমে-আসা নির্মেঘ বিদ্যুতের মত, প্রথমেই তাঁরা পূর্ণ-প্রবেশ করলেন নবীন প্রেমের স্থিরতায় ; তারপরেই অনুরাগের প্রবল বাতাসে যেই বিভক্ত হয়ে গেলেন, অমনি তাঁদের দেখতে হল সঞ্চারিণী কনক-লতিকাদের মত ; তারপরেই তাঁদের দশা হল স্থলকমলিনীদের মত···যাদের মথিত করে ছুটে চলে গেছে মত্ত হস্তীর মত দুর্ব্বার দীপ্তোজ্জ্বল অসমসাহসিক উৎসাহে ভরা ঐ বংশীধ্বনি। মূর্তিমতী উৎকণ্ঠাদেবীদের মত ব্রজপুর থেকে বেরিয়ে এলেন ব্রজসুন্দরীরা।

১০। একসঙ্গে সমান-তালে যে পথ তাঁরা ধরলেন, সে পথ ঐ মুরলীধ্বনিরই কমনীয় পথ। ঐ পথই তো ত্বরিতে তাঁদের নিয়ে যাবে কৃষ্ণের সকাশে। অনুরাগের তীক্ষ্ণতায় কাঁপতে লাগল তাঁদের নিন্দা ভয় যেমন চলার বেগে কাঁপতে লাগল তাঁদের কুণ্ডলের লোললাবণ্য। তাঁরা চললেন···পবনকম্পিতা কনকপ্রভার মত সোনায় মুড়ে দিয়ে পথ: সঞ্চারিণী দীপকলিকার মত মহোজ্জ্বল করে দিয়ে পথ।

১১। এই অভিসারিণীদের মধ্যে কয়েকটি কন্যা ছিলেন যাঁদের বিবাহ হয়নি তখনও? প্রসিদ্ধিতে তাঁরা সিদ্ধৌষধির মত দুষ্প্রাপনীয়া। বাপ-মায়ের আদেশমত এবং অধিকন্তু তাঁদের খুসী করতেও, রাত্রি হলেও তাঁরা তখন দুইতে ছিলেন গাই! যেই বাঁশী বাজল, সেই কোথায় পড়ে রইল তাঁদের গোদোহন··উড়ে চললেন যেন আকাশ বেয়ে।

১২। তাঁদের মত আরো কয়েকটি কন্যা, তাঁরা চুল্লীতে কড়া চাপিয়ে তাড় হাঁকড়িয়ে তখন তৈরী করেছিলেন মিষ্টান্ন। ব্যস্, কে বা নামায় কড়া, আর কে বা হাঁকায় তাড় আশ্চর্য্য, ছুটে বেরিয়ে গেলেন···অধীর হয়ে উৎকণ্ঠায়।

১৩। কয়েকটি কন্যা ব্যস্ত ছিলেন পরিবেশনে। হঠাৎ বাঁশীর ডাকে চমকিয়ে উঠে গবেষণা করতে বসে গেলেন,···গুরুজনরা খেতে বসেছেন, এখন পালাই কোন পথে! অতএব অসুখের ভান করে উঃ উঃ বলে কাতরাতে, কাতরাতে, পরিবেশন ফেলে রেখে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

১৪। শিশুদের গোরুর দুধ খাওয়াচ্ছিলেন কয়েকটি কন্যা। বংশীধ্বনি শুনে তাঁদের আর তর সইল না ; মাটিতে ছেলে ফেলে দুড়্ দুড়্ করে দৌড়ে চলে গেলেন তাঁরা। [ক্রমশঃ।

'হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেই জন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দু সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি—এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।' —রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক শোপেনহাওয়ার

শ্রীসুলতা কর

যখন শোপেনহাওয়ারকে প্র করা হয়েছিল—"আপনার সমাধি কোথায় প্রস্তুত করা হবে?" তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—"যেখানে তোমাদের ইচ্ছা। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই আমার সমাধি থাক মানবমণ্ডলী আমায় আবিষ্কার করবে।"

জার্ম্মাণীর অন্তর্গত ফ্রাঙ্কফোর্টে যে প্রস্তরখণ্ডটি তাঁর সমাধির পরিচয় দেয়, তার উপর কেবলমাত্র লেখা আছে "আর্থার শোপেন-হাওয়ার" এমন কি জন্ম-মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত তাতে নাই।

শোপেনহাওয়ারের সমাধি যেখানেই থাক, তাঁর বাণী তাঁর স্মৃতি, কালের প্রবাহ তুচ্ছ করে বিশ্ববাসীর অন্তরে চির জাগ্রত থাকবে, এই ছিল দুঃখবাদী দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। সারা জীবন নৈরাশ্য ভোগ করে, হতাশার সঙ্গে সংগ্রাম করেও এই বিশ্বাস থেকে তিনি স্খলিত হননি। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে, তাঁর এই বিশ্বাস বাস্তবে পরিণত হয়। শোপেনহাওয়ার যে একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এ-কথা পাশ্চাত্য জগৎ স্বীকার করে। পৃথিবীতে যে কয়জন দার্শনিক জীবিতকালে সব চেয়ে বেশী নিন্দা লাভ করেছেন, শোপেনহাওয়ার তাঁদেরই অন্যতম।

তাঁর দার্শনিক মতবাদের এত সমালোচনা হয়েছে এবং এত নিন্দা হয়েছে যাহা সচরাচর দুর্লভ।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আর্থার শোপেনহাওয়ার জার্ম্মাণীর এক অখ্যাত পল্লীগ্রাম, ডাঞ্জিগেতে জন্মগ্রহণ করেন। শোপেনহাওয়ারের বাবা একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। বালক শোপেনহাওয়ারকে ব্যবসা সম্বন্ধে নিপুণ করে তোলবার জন্য, হাভার নগরীতে একজন ব্যবসায়ীর কাছে পাঠালেন। সেই ব্যবসায়ীর কাছে শোপেনহাওয়ার পুরো দু'বছর ধরে ব্যবসা-বিদ্যা শিখলেন, কিন্তু মোটেই ব্যবসা-বিদ্যার উপর অনুরাগ আনতে পারলেন না।

জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক হবার জন্য যাঁর জন্ম হয়েছে সে কি কখনও বিখ্যাত ব্যবসায়ী হতে পারে? কিন্তু শোপেনহাওয়ারের বাবা এ-কথা বুঝতে চাইলেন না। ছেলে যে ব্যবসা-বিদ্যা শিখতে পারল না, এতে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন।

এই সময় এক শোচনীয় পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটল। শোপেনহাওয়ারের বাবা যে ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন, তাতে নানা কারণে প্রচুর ক্ষতি হয়। যার পরিণামে, তিনি মনে এমন আঘাত পেলেন যে আত্মহত্যা করলেন। এপ্রিল মাসের এক সকালে শোপেনহাওয়ারের বাবার মৃতদেহ বাড়ীর কাছের নদীতে ভাসতে দেখা যায়।

শোপেনহাওয়ারের বয়স এ সময় মাত্র সতের বছর হয়েছিল। তিনি এই ঘটনায় খুব বিচলিত হন। মৃত পিতার প্রতি শ্রদ্ধা চিরদিন তাঁর মনে অক্ষুণ্ণ ছিল। এই শ্রদ্ধা যে কত গভীর তাঁর একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে তাহা আমরা পাই। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"আমি যে অন্তরের গোপন শক্তির বিকাশ করতে সক্ষম হয়েছি, আমি যে আমার ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি এবং একটি মানবেরও সাহায্য না নিয়ে, সমগ্র মানবের উপকার করতে সক্ষম হয়েছি, তার জন্য হে আমার পিতঃ তোমাকে আমি ধন্যবাদ দেব। তোমার কর্ম্মনিষ্ঠা, দৃঢ় চিত্ততা, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আমাকে অসীম সম্পদ দিয়েছে। আমার মহৎ পিতা আমি তোমাকে পূজা করব।"

বাবার মৃত্যুর পর শোপেনহাওয়ার ব্যবসায় শিক্ষার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলেন। মায়ের শিক্ষায় তাঁর চরিত্র গড়ে উঠতে লাগল। শোপেনহাওয়ারের মা জোহানা অসামান্যসুন্দরী ও বিদুষী ছিলেন। সাহিত্যের প্রতি জোহানার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তাঁর গৃহে প্রায়ই সাহিত্যসভা হত। শোপেনহাওয়ারের মনে সাহিত্য প্রীতি জাগাবার জন্য তাঁর মা খুব চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যেমন তাঁর বাবা ছেলের মনে ব্যবসা প্রীতি জাগাতে পারেননি, তেমনি তাঁর মা ছেলের মনে সাহিত্য প্রীতি জাগাতে পারলেন না। মা, বাবা কেউই বোঝেন নি যে তাঁদের ছেলে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক হবার জন্য জন্ম নিয়েছে।

এই সময় গটিন্‌গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দর্শনের অধ্যাপকের সঙ্গে শোপেনহাওয়ারের পরিচয় হয়। সেই অধ্যাপকের সঙ্গে তিনি দর্শনশাস্ত্র নিয়ে বহুক্ষণ আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলে শোপেনহাওয়ার বোঝেন দর্শনশাস্ত্র কত মহান ও গভীর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করে ফেলেন যে সারাজীবন দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চাতেই কাটিয়ে দেবেন। এই অধ্যাপকের প্রভাবেই তাঁর দার্শনিক জীবনের সূত্রপাত হল। তারপর শোপেনহাওয়ার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হয়ে দর্শনবিভাগে ভর্ত্তি হলেন।

শোপেনহাওয়ারের মা জোহানা খুব দুঃখিত হলেন। সে সময়ের খ্যাতনামা দার্শনিক ভাইল্যাণ্ডকে জোহানা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন শোপেনহাওয়ারকে দর্শন চর্চ্চা থেকে বিরত করবার জন্য চেষ্টা করতে। জোহানার অনুরোধে দার্শনিক ভাইল্যাণ্ড শোপেন-হাওয়ারকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন, তাতে প্রশ্ন করেছিলেন—"কেন আপনি দর্শন চর্চ্চা করতে উৎসুক?"

ভাইল্যাণ্ডের প্রশ্নের উত্তরে শোপেনহাওয়ার লিখেছিলেন—"জীবন একটা দুরূহ সমস্যা। আমার জীবন, জীবনের চিন্তাতেই অতিবাহিত হোক, এই আমার ইচ্ছা।" ১৮১৩—১৪ থেকে শোপেনহাওয়ার সমগ্র মন প্রাণ দিয়ে দর্শন সাধনায় নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি লিখেছেন—"আমার মনে একটি গভীর চিন্তা ছায়াপাত করছে যার ফলে আমি জগতকে এক অপূর্ব্ব দান দিয়ে যাব। মানবকে যেমন চিরকাল দেহ ও আত্মা এই দুই কৃত্রিম বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে,

তেমনই দর্শনশাস্ত্রকেও চিরদিন Ethics ও Metaphysics এই দুই কৃত্রিম ভেদ স্বীকার করতে হয়েছে। আমার রচনা এই কৃত্রিম বন্ধন পাশ মোচন করে দর্শনশাস্ত্রকে প্রাণবান করবে।

ভ্রূণ যেমন মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে ও তিলে তিলে বেড়ে ওঠে, তেমনই এই বিরাট সৃষ্টি আমার মধ্যে জন্মলাভ করছে। আমি পলে পলে তার ক্রমবিকাশ অনুভব করছি, পূর্ণবিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ধরণীতে এর জন্মলাভ হবে না।

হে ভাগ্যদেবী, অনুভবময় জগতের কর্ত্রী, এই কয়বছর তুমি আমায় জীবিত রেখ। মা শিশুকে যেমন ভালবাসে আমি আমার ভাবময় রচনাকে তেমনই ভালবাসি।"

তাঁর এই বিরাট রচনা আত্মপ্রকাশ করে চারখানি বইয়ের আকারে। "the world as will & ideas" এই নামে। বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দেন।

প্রকাশক বই ছাপাতে কিছু বিলম্ব করায় তিনি তাঁকে তিরস্কার করে এক চিঠি দেন। উত্তরে প্রকাশক লেখেন—"আমি আশঙ্কা করি আপনার বই ছেঁড়া কাগজের চেয়ে বেশী মূল্যে বিক্রয় হবে না।"

শোপেনহাওয়ারের বই ছাপান হল এবং প্রমাণ হল যে প্রকাশকের আশঙ্কা মিথ্যা নয়। সমগ্র জার্মাণী এ মহা-রচনাকে বিদ্রূপ করল! তাঁর বই বিক্রয় হল না, প্রকাশক জানালেন যে তাঁর বই ছেঁড়া কাগজের মূল্যে বিক্রয় করতে হয়েছে এবং এখনও কয়েক সংখ্যা অবিক্রীত আছে। এই নিদারুণ আঘাতের মধ্যে শোপেনহাওয়ার একমাত্র সান্ত্বনা লাভ করেন মহাকবি গ্যেটের কাছ থেকে। গ্যেটের ভগ্নী তাঁকে এক চিঠিতে লিখলেন—"গ্যেটে, তোমার বই পাওয়া মাত্রেই পড়তে আরম্ভ করেন। এক প্রহর পরে তিনি আমায় বলেন যে শোপেনহাওয়ারের বই-ই জগতে একমাত্র বই যা আমি পড়বার উপযুক্ত বলে মনে করি।"

এই চিঠি পড়ে শোপেনহাওয়ারের মনে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপালেন। ভূমিকায় লিখলেন—"আমি আমার এই মহাগ্রন্থ উৎসর্গ করলাম, অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদের। এই বিশ্বাসের সঙ্গে উৎসর্গ করলাম যে তারা এর মর্য্যাদা স্বীকার করবে। যদি বহুদিন পর্য্যন্ত আমার এই রচনা অনাদৃত হয় তবু আমি ক্ষোভ করব না। যা মূল্যবান তাকে আবিষ্কার করতে জগতের সময় লাগে।

সময় যদি আমাকে আত্মপ্রত্যয়হীন করতে না পারে তবে সহানুভূতির অভাবও পারবে না। সুতরাং অনাদি অনাগত মহা-কালের হাতেই আমি আমার রচনা উৎসর্গ করলাম।"

এর পর তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তিনি যে কয়টি বক্তৃতা দেবেন স্থির করেছিলেন, শ্রোতার অভাবে তার সংখ্যাও পূর্ণ হল না। অথচ সেই একই সময় দার্শনিক হেগেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট উদ্গ্রীব জনতার সামনে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়াছেন। তিক্ত অভিজ্ঞতা এবার তাঁর মনকে পূর্ণ করল। শোপেনহাওয়ার জীবনে অবিবাহিত ছিলেন। বিবাহ সম্বন্ধে চিন্তা করে তিনি লিখেছেন—"সকল প্রকৃত দার্শনিকই কি অবিবাহিত জীবন যাপন করেন নি? স্পাইনোজা, কাণ্ট, এঁরা কি সকলেই অবিবাহিত ছিলেন না? জগতের সকল কবির বিবাহিত জীবনের কথা স্মরণ কর। সকলের জীবনই কি দুঃখময় ছিল না?"

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে শোপেনহাওয়ার ফ্রাঙ্কফোর্টে একটি ভৃত্যের সঙ্গে নির্জ্জনে বাস করতে আরম্ভ করেন। জনতা থেকে দূরে এই নির্জ্জন পল্লী ভবনে তিনি জীবনের শেষ ভাগ কাটালেন। এ সময় স্বরচিত দর্শন চিন্তায় তাঁর মন মগ্ন হয়ে থাকত। জীবনের এই অবসান মুহূর্ত্তে তাঁর দর্শনের অতি সামান্য সমাদর হয়েছিল। তাহাই সম্বল করে এই মহাপ্রাণ শেষযাত্রা করেন। একাকী নির্জ্জনে তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

চিকিৎসক তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন—সোফায় শায়িত বৃদ্ধের মুখ নিদ্রিতের মত শান্ত। মৃত্যুর কোন চিহ্নই তাতে পড়েনি। জীবনের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু মৃত্যুও তাঁর কাছে বন্ধুরূপে এসেছিল, শান্ত মৃদু পদক্ষেপে, জীবনের শ্রান্তি ক্লান্তি হরণ করে।

বুদ্ধদেবের বাল্যপাঠ

সুজিতকুমার নাগ

বুদ্ধদেবের বর্ণপরিচয় শিক্ষা।

সে আবার কি? শুনে খুব অবাক লাগছে তাই না?

তোমরা আমরা সবাই ছেলেবেলায় বিদ্যাসাগর-এর বর্ণপরিচয়ে অ-আ পড়েছি।

কিন্তু বুদ্ধদেব?

তিনিও পড়েছিলেন। কি করে?

তবে শোন বুদ্ধদেবের বাল্যশিক্ষা।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। হিমালয় পর্বতের কাছে এক রাজ্য ছিল, তার নাম কপিলাবস্তু। রাজা ছিলেন শুদ্ধোধন। তাঁরই ছেলে বুদ্ধদেব।

কিন্তু বুদ্ধদেবের জন্মের পর তাঁর মা মারা যায়। মাতৃহারা বুদ্ধদেব মানুষ হতে লাগলেন। রাজা শুদ্ধোধন সব সময় ভাবেন, কি করে ছেলেকে মানুষ করা যায়।

কিন্তু রাজার ছেলে বুদ্ধদেব, তাঁর আবার ভাবনা কি?

কিন্তু বুদ্ধদেব সব সময় যেন কি ভাবতেন। যে দেখতো সেই অবাক হয়ে যেতো তাঁর তেজঃপূর্ণ জ্যোতি দেখে, সৌম্যকান্তি দর্শনীয় মুখশ্রী দেখে।

কেউ কেউ বলেন: এ ছেলে বড় হলে রাজার মান রাখবে। আবার কেউবা বলেন: না এ ছেলে ঘরে থাকবার নয়, বড় হলে গৃহ ত্যাগ করবে।

রাজা শুদ্ধোধন চিন্তিত। তাঁর ভাবনা হল।

এ দিকে দিন যায়, রাত আসে। বুদ্ধদেব বড় হতে থাকেন।

কিন্তু তাঁর মন সব সময় যেন কি চাইত, নির্জন জায়গায় বসে এক মনে যেন কি ভাবত।

এমনি করে দেখতে দেখতে পাঁচ বছরে পা দিলেন বুদ্ধদেব।

রাজা শুদ্ধোধন ঠিক করলেন, এই তো সময়, এখন শিক্ষা দিতে হবে। রাজ্যের যত বড় বড় পণ্ডিতদের তিনি ডাকলেন, জানালেন, এখন এর শিক্ষার প্রয়োজন।

পণ্ডিতরা শুনে খুব খুশী হলেন। এই তো সময়। এখন শুভদিন দেখে বিদ্যালয়ে পাঠালেই হয়।

এবার আরম্ভ হবে বুদ্ধদেবের বাল্যশিক্ষা। বুদ্ধদেবের বর্ণপরিচয় শিক্ষা শুরু হবে।

কি ভাবে ?

শোন, সেই ঘটনাই শুনবে এখন।

এলো সেই শুভদিন। রাজার ছেলে বুদ্ধদেব, তিনি যাবেন গুরু-গৃহে, বিদ্যালয়ে। নগরে আনন্দের রোল। কি আনন্দ সকলের। সাজ, সাজ রব পড়ে গেলো। সাজানো হল। মঙ্গলঘট বসানো হল। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। যাবেন এই পথ দিয়ে বুদ্ধদেব, আলো করা পথ। রোশনাই আলোয় ভরে গেছে।

কিন্তু কে তাঁর শিক্ষাগুরু ?

সে হচ্ছেন বিশ্বামিত্র। তাঁর বিদ্যালয়ে আজ মহা আনন্দ। আজ তিনি ধন্য। ফুল দিয়ে, আম্রপল্লব দিয়ে সাজানো হয়েছে বিদ্যালয়। ছেলেরা মেয়েরা, সবাই দল বেঁধে দাঁড়িয়ে। কারও হাতে মালা, কারও হাতে শংখ। ঝলমল করছে বিদ্যালয়। আলোয় ভবে উঠেছে বিশ্বামিত্রের মন।

বিশ্বামিত্র ভাবছেন, তবে কি সত্যিই আসবেন তাঁর প্রিয় ছাত্র বুদ্ধদেব, তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন, সত্যের পথ ধরে এগিয়ে আসছেন এক কিশোর।

এমন সময় বেজে উঠল শাঁখ। আনন্দে, উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে। কে এই কিশোর ? কে এই সুচারু কুন্তল দর্শনীয় নব কিশোর ? কে তাঁর পবিত্র আলো নিয়ে এসেছেন।

পণ্ডিতরা বিস্মিত। ছেলেমেয়েরা স্তম্ভিত। আর বিশ্বামিত্রের চোখে আনন্দের বন্যা। তিনি দেখছেন বুদ্ধদেবের অঙ্গশ্রী, দেবজ্যোতি।

রাজা শুদ্ধোধন বললেন, এই নিন, এই আমার পুত্র, এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব আপনার।

বিশ্বামিত্র বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনার পুত্রের শিক্ষার ভার আমাকে দিয়ে যান। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এ পুত্র পৃথিবীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাজা শুদ্ধোধন নিশ্চিন্ত মনে চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

আর বুদ্ধদেব তাঁর সামনে সহাস্যে দাঁড়িয়ে, হাতে তাঁর লিপি।

বলুন গুরুদেব আমাকে কি লিপি দেবেন ?—কি শিক্ষা চাও তুমি ? প্রশ্ন করলেন বিশ্বামিত্র।

কোন্ শিক্ষা প্রথম দেবেন ? ব্রহ্মলিপি, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি বা মগধলিপি এর মধ্যে কোন্‌টা আমার উপযুক্ত হবে বলুন গুরুদেব ?

বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে গেলেন বুদ্ধদেবের কথা শুনে। তাঁর মনে হ'লো কে যেন আজ তাঁর সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত গর্ব ছিনিয়ে নিয়েছে। কে এই বালক ? যার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আগামী কালের ছবি।

বিশ্বামিত্র ডাকলেন কাছে।

বুদ্ধদেব উপবেশন করলেন।

প্রবাদ আছে, বুদ্ধদেব যখন যে বর্ণ বলেছিলেন, তখন আকাশ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল প্রতি লিপির পূর্ণ অর্থ।

বিশ্বামিত্র বললেন, বলতো 'অ'।

উত্তর এলো—'অ'।

আশ্চর্য আকাশে শব্দ হল 'সমস্ত সংসার অনিত্য'।

আবার বললেন, 'আ'।

উত্তর এলো 'আ।'

সঙ্গে সঙ্গে আকাশে শোনা গেলো 'আপনার ও পরের হিত কর'।

বলো 'ই'।

উত্তর এলো 'ই'।

তখনি আকাশে শব্দ হলো 'ইন্দ্রিয়দিগকে পুষ্ট করিও না'।

বিশ্বামিত্র বললেন, বলো 'ঈ'।

তখনি আবার শূন্য থেকে শোনা গেলো, 'জগতে ঈতি পরিপূর্ণ'। অর্থাৎ বিঘ্ন দ্বারা পরিপূর্ণ।

বলো 'উ'।

হেসে উত্তর দিলেন বুদ্ধদেব 'উ'।

আকাশ থেকে ধ্বনিত হলো 'জগতে উপদ্রবই অধিক'।

তারপর এমনি করে পঞ্চাশটি বর্ণের অর্থপূর্ণ ধ্বনি আকাশ থেকে শোনা গেলো।

সকলে অবাক হয়ে গেলো।

বিশ্বামিত্রের চোখ দিয়ে নয়নের ধারা বয়ে গেলো, ভাবলেন তিনি আজ ধন্য। ধন্য তাঁর জীবন। এ বালক সকলের গর্ব, পৃথিবীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বামিত্র, বুদ্ধদেবকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করলেন। আর বুদ্ধদেব স্থির নয়নে, সৌম্যশান্ত চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকেন।

এইভাবে আরম্ভ হল বুদ্ধদেবের বর্ণপরিচয় শিক্ষা। তাঁর বাল্য-পাঠ।

শুনলে তো ?

খুব অবাক লাগছে, তাই না।

তারপর ?

তারপর সে আরেক ইতিহাস, আর এক বিস্ময়কর ঘটনা। পরবর্তী জীবনে এই বালকই তাঁর জীবনের কর্মধারা, চিন্তাধারার এমন এক মহান আদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁর মহান আদর্শকে গ্রহণ করে সারা জগৎ আজ ধন্য।

সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ আলোর পথ ধরে বুদ্ধদেব চলেছিলেন তাঁর জীবনের পথে। সৌম্যশান্ত, অহিংসা প্রেমের পূজারী সেই মহামানব বুদ্ধদেবের বাল্যপাঠ, তাঁর প্রথম পরিচয় শিক্ষা শুনলে তো। এমনি কত ঘটনা তাঁর মহান জীবনে জড়িয়ে আছে যা বলে শেষ করা যায় না।

যে মাছেরা পাখী খায়

ছায়া চৌধুরী

পাখীরা কি মাছ খায় ?—বলতো কোন্ পাখী ? এ প্রশ্ন করলে তোমরা সবাই বলবে,—এতো জানা কথা—কেন, মাছরাঙা !—হাঁ, ঠিকই বলেছ। আর আমি যদি বলি পাখীরা নয়, মাছেরাই পাখীদের ধরে ধরে খায়—তাহলে কেউ বিশ্বাস করবে কি ?

কিন্তু বিশ্বাস কর আর নাই কর, কিছু কিছু মাছ, ছোট ছোট পাখীর বাচ্চা ধরে খায়। জলা কিংবা সমুদ্রের ধারে ধারে প্রায় জলের উপর দিয়ে বলা যায় জলের বুকে নিজেদের ছায়া দেখতে দেখতে নানা রঙের সব পাখী ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কি অফুরন্ত আনন্দ তাদের, আর কি চমৎকারই না তাদের গায়ের চিত্রবিচিত্র রঙ। এমনি এক সোনালী ঠোঁটওলা ছোট্ট এতটুকুন একটা পাখী—যার বিলেতী নাম

হল 'মেরিল্যাণ্ড ইয়ালো থোট', সাগরের উথাল-পাথাল ঢেউয়ের ফেনার সঙ্গে সঙ্গে খেলছিল। সাগর যেন দুহাত বাড়িয়ে তাকে আপনার করে নিতে চাইছিল।

সোনালী ঠোঁট মেরিল্যাণ্ড কিন্তু তাকে ধরা দিতে চায় না। হঠাৎ এক সময় আর সেই মেরিল্যাণ্ডকে দেখা গেল না। হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছ তোমরা। একটা বিরাট হাঁ-করা-মুখ কালোরঙের বাস (bass) মাছ তাকে ধরে গিলে ফেলেছে।

শুধু কি মেরিল্যাণ্ড—ছোট্ট ছোট্ট হাঁসের ছানারা যখন জলার শান্ত বুকের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে বেড়ায়, তখন ঠিক তাদের ছোট ছোট পান্‌সী নৌকো মনে হয়। এরা মনের আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে—তারই মাঝে হঠাৎ দুটো একটা করে করে অদৃশ্য হতে লাগলো। বিরাট-মুখ নিকস-কালো মাছটা ওদের ধরবার জন্যে জলের তলায় ওৎ পেতে বসেছিল। সুযোগ বুঝে একটা একটা করে টুপটুপ ডুবে যেতে লাগলো।

একবার এক জেলে এই সব কাণ্ড-কারখানা দেখে 'বাস' মাছগুলোকে ভালরকম শিক্ষা দেবে ঠিক করলো। বিরাট এক হাঁস তৈরী করে তারই পেছনে ছোট ছোট সব বাচ্চা হাঁসের এক ঝাঁক ছেড়ে দিল। সবগুলো হাতে তৈরী। ভিতরে বঁড়শি দেওয়া আছে। একবার গিললেই গলায় ওই হুক বিঁধে যাবে।

যা ভাবা গিয়েছিলো ঘটলোও ঠিক তাই। মাছেরা যেমন সেই হাঁসের বাচ্চা টুপ করে গিলেছে, অমনি সেই হুক গিয়ে গলায় আটকেছে! এমনি করে সেবার সেই জেলে বহু মাছ ধরেছিল।

উত্তর সাগরের পাইক (Pike) আর জ্যাক (Jack) মাছেদেরও এই 'বাস' মাছেদের মতই পাখী ধরে খাওয়ার দুর্নাম আছে। পাইক মাছগুলোর যন্ত্রণায় তো জলার বুকে হাঁসের বাচ্চাদের সাঁতরে বেড়ানো প্রায় বন্ধ হয়েই গেছে।

এখন এই সব মাছেদের খাওয়ার কথা শুনে বেশ একটা ধারণা হয় যে, এরা ছোট ছোট বাচ্চা ছাড়া বুঝি বড় পাখীদের খেতে পারে না। আসলে তা নয়। একটা চব্বিশ ইঞ্চি 'বাস' মাছ বিরাট এক কূট (Coot) পাখীকে ধরে খেতে পারে। এই 'কূট' পাখীরা লম্বায় সতেরো ইঞ্চি আর ওজনে প্রায় পৌণে এক সের হয়। তাহলেই ভেবে দেখ!

Angler মাছেরা ওজনে হয় প্রায় কুড়ি-পঁচিশ সের। এরা হরদম পাখীদের ধরে ধরে খায়। পাখীদের ওড়ার সময় পেছনের পা দুটো সোজা হয়ে চলে আর সাগরের ঢেউয়ের দোলায় দুলতে গিয়ে যেই জলের বুকে পা ছোঁয়ায়, অমনি মাছেরা গিয়ে ধরে ফেলে। নানা রঙের পাখী—কারও বা সোনালী ঠোঁট, কারও বা লালে-নীলে ছক্‌কাটা শরীর—কেউ বা ধবধবে সাদা রঙের ডানা মেলে কালো দেহের রেখা টেনে উড়ে বেড়ায়—যেন সুন্দর এক উড়ন্ত ছবি আর মাছেরা সুযোগ খুঁজতে থাকে—শিকারের আশায় ব্যাধের মত।

উত্তেজনায় তাদের কান্‌কোর মধ্য দিয়ে জল কেটে কেটে বেরিয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি আর তারা নীল জলের তলায় পথ কেটে কেটে চলে ওপরের পাখীদের ছায়া দেখে দেখে। তারপর হঠাৎ পাখীদের দল থেকে একটা-দুটো করে নিঃশেষে মিলিয়ে যেতে থাকে জলের বুকে—অন্যেরা উড়ে যাবার নেশায় তা বুঝতেও পারে না এতটুকু—শুধু জলের ওপর ডানা ঝটপটানির একটা আলোড়ন জেগে থাকে সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

যাঁদের কাছে মানুষ ঋণী

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী

লোকটা আনন্দে অধীর হয়ে রাজার কাছে রওনা হল। রাজা হায়রো রাজদরবারে বসেছিলেন। লোকটা রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললো, ইউরেকা! ইউরেকা!

অর্থাৎ আমি পেয়েছি। সন্ধান পেয়েছি!

রাজা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি পেয়েছো?

আপনি আমাকে যে মুকুটটা দিয়েছিলেন পরীক্ষা করার জন্য তাতে খাদ মেশানো হয়েছে কিনা, তা জানতে পেরেছি।

শুনে রাজা খুশী হলেন। খুশী হয়ে তাকে রাজদরবারে গণ্যমান্যদের পাশে বসতে আদেশ করলেন।

সুরু হলো পরীক্ষা। পরীক্ষা করে দেখা গেল সত্যিই মুকুটটা খাঁটি সোনার নয়, কিছু খাদ মেশানো হয়েছে। রাজা স্যাঁকরাকে ডেকে পাঠালেন। স্যাঁকরা শেষে নিজের দোষ স্বীকার করলো।

রাজা লোকটার বুদ্ধির তারিফ না করে পারলেন না। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজা হায়রো সেদিন রাজদরবারে যাকে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি কে জানো?—আর্কিমিডিস! সে যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত—বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ!

রাজা হায়রো আর্কিমিডিসকে শুধু ভালোই বাসতেন না শ্রদ্ধাও করতেন। তিনি যখনই কোনও বিপদে পড়তেন তখনই ছুটে যেতেন তাঁর কাছে, নয়তো ডেকে পাঠাতেন।

একবার রাজা খবর পেলেন রোমীয়রা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করার জন্য যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এগিয়ে আসছে। খবর পেয়ে রাজা মুষড়ে পড়লেন। ভাবলেন এবার আর রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ কি দিয়ে তিনি যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করবেন?

অনেক ভেবে চিন্তে শেষে তিনি বন্ধু আর্কিমিডিসকে ডেকে পাঠালেন। আর্কিমিডিসও রাজার ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলেন না রাজদরবারে উপস্থিত হলেন।

রাজা আর্কিমিডিসকে সামনে পেয়ে করুণ সুরে বললেন, বন্ধু, রোমের শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। অথচ দেশকে রক্ষা করতেই হবে। এজন্য তোমাকে এমন জিনিষ আবিষ্কার করতে হবে যার দ্বারা আমরা রোমীয় যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করতে পারি!

আর্কিমিডিস মহা ভাবনায় পড়লেন। শেষে অনেক গবেষণার পর আবিষ্কার করলেন অতসী কাঁচ। খুব বড় রকমের অতসী কাঁচ তৈরী করে তার ভেতরে রৌদ্র ধরে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করলেন।

বিরাট অতসী কাঁচ শেষ পর্যন্ত ভস্মলোচনের কাজ করলো! অতসী কাঁচের সাহায্যে রোমীয় যুদ্ধ জাহাজগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হলো।

রোমীয়দের আর সিসিলি আক্রমণ করা হলো না। রোমীয়দের পরাজিত করে রাজা হায়রো আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। রাজ্য জুড়ে আনন্দ উৎসব সুরু হলো। রাজা আর্কিমিডিসকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করলেন। আর্কিমিডিসের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

আর্কিমিডিসের শেষ জীবন বড়ই দুঃখের—বড়ই করুণ। সে কাহিনী না শোনাই ভালো। তবুও বলছি শোন,—

রোমীয়রা আবার রাজা হায়রোর রাজ্য সাইরাকিউস আক্রমণ করলো। এবার তারা যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এলো না। অসংখ্য পদাতিক সৈন্য হঠাৎ হায়রোর রাজ্যের চারপাশ ঘিরে ফেললো। রাজা হায়রো মহা বিপদে পড়লেন। তিনি কতো চেষ্টা করলেন—কতো বাধা দিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোমীয় সৈন্যেরা পিছু হটলো না।

দেখতে দেখতে তিন তিনটে বছর কেটে গেল। শেষে রাজ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিলো। শত্রুসেনা রাজ্যের ভেতরে ঢুকে লুটপাট আর খুনজখম সুরু করে দিলো।

খবর পেয়ে আর্কিমিডিস বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি তখনও নিশ্চিন্তে আবিষ্কার আর গণিত শাস্ত্র নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

রোমীয় সেনাপতি মার্সেলাস আর্কিমিডিসের নাম শুনেছিলেন। শুনেছিলেন তাঁর মতো বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ সে যুগে বিরল। তিনি তাই আর্কিমিডিসকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন।

তিনি সৈন্যদের বলে দিলেন, তোমরা যেন ভুলেও আর্কিমিডিসের গায়ে হাত দিও না। তাঁকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো। তাঁকে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ হবে।

রোমীয় সৈন্যেরা খুন-জখম আর লুটপাট করে চলেছে! নগরের পর নগর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে! আর্কিমিডিসের কিন্তু সে দিকে খেয়াল নেই। আর থাকবেই বা কি করে। তিনি তো আর চুপ করে বসে নেই! তিনি তখন মেঝের উপর বালি বিছিয়ে তার উপর জ্যামিতির ক্ষেত্র এঁকে চলেছেন। হঠাৎ একদল সৈন্য হৈ-হৈ করতে করতে আর্কিমিডিসের ঘরে ঢুকে পড়লো। তবুও আর্কিমিডিসের হুঁস্ হলো না।

সৈন্যেরা বৃদ্ধ আর্কিমিডিসকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। বললো, আপনার নাম কি আর্কিমিডিস?

আর্কিমিডিস তখন ক্ষেত্র বিচারে মগ্ন। তাদের কথা তিনি শুনতেও পেলেন না। তিনি তাই নীরব হয়ে রইলেন—জবাব দিলেন না।

সৈন্যেরা তরবারি নিয়ে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এলো।

আর্কিমিডিস ক্ষেত্র বিচার করতে করতে বললেন, খবরদার, মেঝের অঙ্কগুলো যেন মুছে না যায়!

সৈন্যেরা আর্কিমিডিসের কথা শুনে বিস্মিত হলো। কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলো না। তবুও তারা তাঁকে হত্যা না করে বললো, আপনি আমাদের প্রধান সেনাপতির কাছে চলুন। আর্কিমিডিস ক্ষেত্র বিচার করতে করতেই বললেন, অঙ্কের একটি জটিল সমস্যা নিয়ে আমি এখন খুবই ব্যস্ত। সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমি কোথাও যেতে পারবো না।

আর্কিমিডিসের কথা শুনে সৈন্যেরা অসম্ভব রেগে গেল। শেষে তারা তাঁকে হত্যা করে হৈ-হৈ করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

এ ভাবে সে যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীর জীবন দীপ নির্বাপিত হলো।

সেনাপতি মার্সেলাস খবর পেলেন আর্কিমিডিস বেঁচে নেই। সৈন্যেরা তাঁকে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে চিনতে না পেরে।

সংবাদ শুনে মার্সেলাস মর্মাহত হলেন!

সাধ

গৌর মোদক

দৈত্যদের দেশে যাবো পক্ষিরাজে চেপে;
আমায় দেখে তারা সবাই উঠবে ভয়ে কেঁপে।
মাথায় মুকুট থাকবে আমার, কোমরে তরোয়াল,
মারবো আমি দৈত্যদের সব হোক না তারা ভয়াল।
সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে যাবো তেপান্তরের মাঠে,
কঙ্কাবতী ঘুমায় যেথায় শুয়ে সোনার খাটে।
ব্যাঙ-ব্যাঙমাকে শুধিয়ে নেব রাস্তা ঘাটের কথা,
দৈত্যপুরীর মাঝে কঙ্কা পাচ্ছে কত ব্যথা।
ক্ষিধে পেলে নেব খেয়ে গাছের পাকা ফল,
তেষ্টা পেলে আঁচল ভরে খাবো নদীর জল।
দৈত্যদের সঙ্গে আমার হবে ভীষণ লড়াই।
একে একে মারবো সব, ওদের কি আমি ডরাই।
সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ভাঙবে কঙ্কাবতীর ঘুম।
রাজ্য জুড়ে ঘরে ঘরে পড়বে আনন্দেরি ধুম।
আনবো মা তারে তোমার কাছে পক্ষীরাজে করে,
তার রূপের ছটায় মোদের ঘর আলোয় যাবে ভরে।
তারে পৌঁছে দিয়ে তোমার কাছে হবে আমার ছুটি
মনের সুখে উজ্জ্বল হবে তার কমল-আঁখি দু'টি।

ভগীরথের শঙ্খধ্বনি

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

দীপঙ্কর বাঙ্গালীর এক প্রদীপ্ত মনীষা। তাঁর বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্য বিশ্ববিশ্রুত। বিক্রমপুরের এক রাজপরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর বাল্য নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। রাজার ছেলে হলেও ছেলেবেলাতেই তাঁর সংসারের প্রতি বিরাগ দেখা গেল। ধর্মপিপাসা, জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করবার জন্যে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। ভারতের সমস্ত বিখ্যাত বিহারগুলিতে তিনি ঘোরেন। তারপর ফিরে আসেন দেশের কাছাকাছি ওদন্তপুর বিহারে। ওদন্তপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলরক্ষিত তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান দেখে 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধিতে ভূষিত করেন। ওদন্তপুরের অধ্যাপক হন তিনি। ক্রমে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহীপাল তাঁকে বিক্রমশীল বিহারে অধ্যক্ষ পদ নিতে অনুরোধ করেন। দীপঙ্কর সে অনুরোধ রক্ষা করেন। নালান্দার পর বিক্রমশীল বিহারই সমধিক প্রসিদ্ধ হয়। দেশ-বিদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে আসতেন।

দীপঙ্করের খ্যাতি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। তিব্বতরাজ লাহ্-লামা-যে-শেস্ দূত পাঠিয়ে দীপঙ্করকে তিব্বত যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। দীপঙ্কর সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন না। এর কিছুদিন পরে প্রতিবেশী এক রাজ কারাগারে তিব্বতরাজের দেহান্ত ঘটে। তার আগে তিনি তাঁর প্রাণের একান্ত অভিপ্রায় জানিয়ে দীপঙ্করের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে রেখে যান। লামার মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র চাঙ্গুবের রাজত্ব কালে তিব্বতীয় আচার্য বিনয়ধর দীপঙ্করের কাছে আসেন এবং তাঁর হাতে লামার চিঠিটি তুলে দেন। "দীপঙ্কর

তিব্বত যেতে রাজী হন, তবে হাতে যে সব কাজ ছিল তা সারবার পর। আচার্য রত্নাকর তখন ছিলেন বিক্রমশীল বিহারের অধিনায়ক। বৌদ্ধধর্মে ভাঙন ধরেছে, তাকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন একমাত্র দীপঙ্কর। তাই রত্নাকর তাঁকে ছাড়তে চান না। এদিকে আবার যুদ্ধ বেধেছে। লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে নরপালের সন্ধিস্থাপন করে দীপঙ্কর তিব্বত যাবার জন্তে তৈরী হলেন। রত্নাকর বিনয়ধরের আত্যন্তিক অনুরোধ আর দীপঙ্করের মানসিক বাসনা দেখে তাঁকে তিন বছরের জন্ম ছাড়তে রাজী হলেন।

ওদিকে দীপঙ্কর তিব্বতে আসছেন না দেখে তিব্বতের আর এক দূত আসছিলেন। পথে একটি ঘটনা ঘটে, তা এখানে উল্লেখ। বিক্রমশীল বিহারের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে সূর্য অস্ত গেছে। যাত্রী বোঝাই নৌকা ঘাট ছেড়ে পাড়ি দিতে আরম্ভ করেছে। বিদেশী লোক। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দেখে মাঝি দিকে ডাকলেন। মাঝিরা জানাল—"ফিরে এসে নিয়ে যাবে।" রাত হয়ে আসে। দূতেরা মনে করে আর বুঝি মাঝি ফিরে আসবে না। বেশ কিছুক্ষণ পরে কিন্তু মাঝি নৌকো নিয়ে ফিরে আসে। দূত বলে মাঝিকে, "আমি তো ভেবেছিলাম আর তোমরা এত রাতে ফিরে আসবে না।" মাঝি বলে, "আমাদের দেশে ধর্ম আছে, আমি যখন কথা দিয়েছি, তার অন্তথা হবে কি করে?" মাঝি বিদেশীদিকে বলল, "এত রাতে পারাপার না করে অদূরবর্তী বিহারে সে রাতটা কাটাতে।"

তিব্বত অভিযাত্রার আগে বিনয়ধরকে রত্নাকর বললেন, "দীপঙ্কর না থাকলে ভারত অন্ধকার। তিনি না থাকলে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি শূন্ত হয়ে পড়বে। চারদিকের অবস্থা দেখে মনে হয় ভারতের দুর্দশা ঘনিয়ে আসছে। অসংখ্য তুরস্ক সৈন্ত ভারত আক্রমণ করছে, আমি খুবই চিন্তিত তাতে। তবু আশীর্বাদ করছি, তুমি অতীশ ও তোমার সঙ্গীদের নিয়ে দেশে ফিরে যাও; সব প্রাণীর কল্যাণের জন্ত অতীশের সেবা ও কর্ম নিয়োজিত হোক।" ১০৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁদের যাত্রা হোল শুরু। পথে দু'বার দস্যুদল তাঁদিকে আক্রমণ করল। নেপালে পৌছুতেই নেপালরাজ অনন্তকীর্তি তাঁর সাথে দেখা করলেন। অনন্তকীর্তির পুত্র পদ্মপ্রভকে দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করলেন। পদ্মপ্রভ তাঁদের তিব্বতযাত্রার সঙ্গী হলেন। এখান থেকে জয়পালের কাছে তিনি এক চিঠি পাঠান। অবশেষে তিব্বতে পৌছালেন তাঁরা। মহাসমারোহে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হোল। তিব্বতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে তিনি বিশুদ্ধ মহাযানের প্রচার করতে লাগলেন। অবশেষে ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নির্বাণলাভ করেন। বৌদ্ধ সাধনার ওপর লেখা তাঁর ১৬৮খানি গ্রন্থের কথা জানা গেছে। তাঁর কথা স্মরণ করি আজকের কবির কথায়,—

"বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর;
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।"

নরপালের পর তাঁর ছেলে তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজা হয়েছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের আমলে লক্ষ্মীকর্ণ আবার গৌড় আক্রমণ করলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালকে পরাজিত করে তিনি বীরভূম অঞ্চল জয় করেন। বীরভূমের পাইকোড়ে আজও লক্ষ্মীকর্ণের একটি শিলালিপি দাঁড়িয়ে আছে। জানাচ্ছে, একদা এ অঞ্চল লক্ষ্মীকর্ণ জয় করেছিলেন। তাঁকে বেশী দিন জয় করে থাকতে হয়নি। বিগ্রহপাল শক্তি সঞ্চয় করে আক্রমণ করলেন ও তাঁকে পরাজিত করলেন। তাঁদের মধ্যে সন্ধি হোল। সন্ধির পর তাঁর মেয়ে যৌবনশ্রীর সঙ্গে বিগ্রহপালের বিয়ে হয়েছিল। এভাবে তাঁদের বিরোধের সমাপ্তি হয়েছিল। পাল সাম্রাজ্যে যে ভাঙন ধরেছিল, তার বুঝি আর শেষ নেই; যতদিন না পালরাজারা বাংলার সিংহাসন ছেড়ে যাচ্ছেন। পশ্চিম বাংলায় মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নামে এক সামন্ত রাজা প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে নিজেকে স্বাধীন রাজাধিরাজ বলে ঘোষণা করলেন। এঁর রাজধানী ছিল বর্ধমান জেলায়। অজয় নদীর তীরবর্তী ত্রিষষ্ঠীগড় বা ঢেকুরগড়। ইনি পাল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গেও এ সময় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চন্দ্রবংশ ও পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী বিষ্ণুভক্ত অবাঙালী বর্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এইভাবে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ পালরাজত্বের বাইরে চলে যায়। চালুক্যরাজ ও উড়িষ্যারাজ সুযোগ বুঝে বাংলা দেশ আক্রমণ করে ও পালশক্তিকে বিধ্বস্ত করে। চালুক্যরাজের আক্রমণকালে কর্ণাট দেশ থেকে কিছু কিছু ক্ষত্রিয় সামন্ত-পরিবার এসে বাংলার বুকে থেকে যান। বিহারের পাল সাম্রাজ্যও বিধ্বস্তপ্রায়। পাল সাম্রাজ্যের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় তৃতীয় বিগ্রহপাল মারা গেলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন ছেলে—দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল, রামপাল। দ্বিতীয় মহীপাল রাজা হলেন। ঘরে-বাইরে তাঁর অবস্থা শোচনীয়। পারিবারিক কলহ ও অন্তর্বিরোধ একদিকে, অন্যদিকে সামন্তরা স্বাধীনতা প্রয়াসী। নানা ভাবে প্ররোচিত হয়ে দ্বিতীয় মহীপাল তাঁর দু'ভাইকে কারারুদ্ধ করলেন। তাঁর তিরিক্ষি মেজাজ। প্রজাদের প্রতি নেই তাঁর টান। প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করেন তিনি। অত্যাচারে জর্জরিত হয় তারা। তাঁর অত্যাচারে বরেন্দ্রভূমে কৈবর্তজাতীয় দিব্যর নেতৃত্বে প্রজাগণের অভ্যুত্থান হ'ল। তিনি বিদ্রোহ দমন করতে গেলেন। পরাজিত ও নিহত হলেন তিনি। বিজয়ী জননায়ক দিব্য বরেন্দ্রভূমে স্বাধীন রাজা হলেন।

দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল কারাগারে আবদ্ধ। কারাগার হতে কোনও রকমে নির্গত হয়ে অঙ্গে চলে যান। অঙ্গে তাঁদের মাতুল মথন রাজা। মথনের দুই পুত্র মহামাণ্ডলিক কাহ্নরদেব ও সুবর্ণদেব এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাষ্ট্রকূটমাণিক মহাপ্রতীহার শিবরাজ তাঁদের সহায় হলেন। রাঢ়ের কিয়দংশে তাঁরা নিজেদের রাজ্য রচনা করলেন। প্রথমে দ্বিতীয় শূরপাল রাজা হলেন। তিনি বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। তাঁর পর রাজা হন রামপাল। রামপালের রাজ্যের বিস্তার ছিল উত্তর বিহার ও উত্তর পশ্চিমবঙ্গ। দিব্যর ভাই রুদোকের আমলেও রামপাল কিছু করতে পারেন নি। তিনি শুধু বসে বসে ভেবেছেন কি করা যায়। রুদোকের পর তাঁর ছেলে ভীম বরেন্দ্রীর রাজা হলেন। তিনি বরেন্দ্রীকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন। রামপাল দেখলেন ভেবে ভেবে কিছু করা যাবে না, ওরা ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হচ্ছে। রামপাল বিভিন্ন রাজা ও সামন্তদের কাছে গিয়ে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সামন্তদিগকে অর্থ ও সম্পত্তির লোভ দেখালেন। ঢেক্করীর রাজা প্রতাপ সিংহ, কযঙ্গমণ্ডলের অধিপতি নরসিংহার্জুন, দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ, দেবগ্রামের বিক্রমরাজ, উচ্ছালের (বর্তমান বীরভূম অঞ্চল) রাজা ভাস্কর বা মদকল সিংহ মগধ ও পীঠির অধিপতি ভীমযশ, কৈলকম্পির রুদ্রশিখর, অপর মন্দারের নৃপতি লক্ষ্মীশূর, ইত্যাদি অনেকে তাঁর দলে যোগ দিলেন। সম্মিলিত এক বিরাট

সৈন্যবাহিনী নিয়ে রামপাল ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ভাগীরথীর দু'তীরে দু'দলের সৈন্য দাঁড়াল। তারপর ভীষণ যুদ্ধ হোল:

"তস্য মহাবাহিন্যাঃ গুপ্তায়াঃ তরণিসন্তবেনাভুৎ।
দ্বিষমগভিষেণরতো মুখরিতদিক্ কোলাহলঃ সমুত্তারঃ॥"

"শত্রুর সম্মুখীন হয়ে অগ্রসর রামপালের নৌকাবহর দ্বারা গঙ্গানদী আচ্ছন্ন হলে পর তাঁর নদী, সমুত্তরণের কোলাহল সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে মুখরিত করে তুলেছিল।" (রামচরিত)

ভীম বন্দী হলেন। পরাজিত কৈবর্তবাহিনীকে একত্র করে ভীমের বন্ধু হরি আবার যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে। রামপাল সৈন্যবাহিনীকে ও হরিকে অজস্র অর্থদান করে বশীভূত করলেন। সপরিবারে ভীম নিহত হলেন। বরেন্দ্রী উদ্ধার করে রামপাল হৃতরাজ্যের অন্যান্য অংশ উদ্ধারে মন দিলেন। বর্মণ রাজবংশ পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করছিল। জাতবর্মার পর হরিবর্মা রাজা হয়েছিলেন। হরিবর্মা রামপালের বশ্যতা স্বীকার করলেন। ক্রমে কামরূপ বিজিত হোল। উড়িষ্যার কিছু অংশও দখলে এল। রামপাল পালবংশের শেষ শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর ছিল অসামান্য দৃঢ়তা, আর ছিল তাঁর বিচক্ষণ রাষ্ট্রবুদ্ধি। সাহস আর বীরত্ব তো ছিলই। তিনি পালবংশকে উজ্জীবিত করতে শেষ চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছিল। তিনি ডুবন্তকে ভাসমান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী রাজারা হৃতশক্তি পালবংশকে গৌড়ের সিংহাসনে আর টিকিয়ে রাখতে পারলেন না। রামপাল রাজত্বকে টিকাতে গিয়ে প্রাণান্ত হননি। তিনি নূতন এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মালদহের কাছে তিনি এই রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন রামাবতী। তা ছাড়া তিনি গঙ্গা ও করতোয়ার মিলনস্থলের কাছাকাছি একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিহারটি জগদ্দল মহাবিহার নামে পরিচিত। চল্লিশ বছরের মত রাজত্ব করে রামপাল মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

রামপালের পর তাঁর ছেলে, কুমারপাল রাজা হন। তাঁর আমলে দক্ষিণবঙ্গে বিদ্রোহ হয় তাঁর প্রধান অমাত্য বৈদ্যদেব গিয়ে তাঁদিকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করেন ও বিদ্রোহ দমন করেন। পূর্বদিকে কামরূপেও বিদ্রোহ দেখা দিল; বৈদ্যদেব গেলেন। সেখানকার বিদ্রোহীদলের নেতা তিষ্যগদোকে পরাজিত করে নিজে সেখানকার রাজা হয়ে বসলেন। কুমারপালের পর রাজা হন তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল। মদনপালের রাজ্য ছিল গৌড়দেশের বাইরে মগধের কতকাংশে। মগধপালের পর গোবিন্দপালের নাম শুনতে পাওয়া যায়। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালের রাজ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। আর কোনও পাল রাজার নাম শোনা যায় না। বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজবংশের এখানেই পরিসমাপ্তি।

পালরাজারা মোট রাজত্ব করেছিলেন চারশো বছর। সাতশো পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দ থেকে এগার শ' বারটি খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চারশো বছর বর্তমান বাংলা ও বাঙ্গালীর উত্থান যুগ। বাংলার অধিবাসীরা পালরাজাদের নেতৃত্বে এক স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে অনেকদিন বাস করায়, শুধু তাই নয়, ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করাই তাদের মধ্যে একটা একজাতীয়ত্বের ভিত্তি রচিত হোল। জাতি, চরিত্র বা "একজাতি, এক প্রাণ, একতা" গঠনে একটি প্রধান উপাদান ভাষা ও সাহিত্য, জাতির প্রাণ এই ভাষা। ভাষাতে তার মুক্তির ইঙ্গিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্মাবস্থা এই পর্বেই আমরা দেখতে পাই। কোন্ ধর্ম বাঙ্গালী নেবে তাও এসময়ে বোঝা গেল আস্তে আস্তে। বাঙ্গালীর স্থিতিশীল উপজীবিকাও এসময় নির্ধারিত হয়ে গেল। এসব দিক দিয়ে বাংলার ইতিহাসের এই অধ্যায় বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এই পর্ব হোল বাংলা ও বাঙালীর উদয় শিখর। এখানে এসে আমরা পেলাম নবজীবনের আশ্বাস। পালরাজাদের রাজমহিমা বা রাজ্যবিস্তার নয়, জনগণের আত্মচেতনা ও আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা এযুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। পালরাজারা হলেন জনগণ মন অধিনায়ক।

[ক্রমশঃ।

ঝরনা

জ্যোতির্ম্ময়ী মুখোপাধ্যায়

সহস্র ধারে ঝরনা ঝরে
মুক্তা ছড়ায় রাশি রাশি।
দেখতে পেয়ে মেঘ পরীরা
হাওয়ায় ভেসে দাঁড়ায় আসি॥
দূরের ঘন বনরাজি
ভরে আছে শ্যামল শোভায়।
সকাল সাঁঝে মধুর স্বরে
কতই পাখি বন্দনা গায়॥
নর্মদারি বিশাল বুকে
ধ্যানেমগ্ন পাহাড় দু'টি।
চারি ধারে নানা রঙের
অজানা ফুল আছে ফুটি॥
নিত্য আসি বিহার করেন
ধ্যানেরই ধন শিব ও সতী।
দেশ বিদেশের সন্ত আসি
তাঁর চরণে জানায় নতি॥

রক্তের স্বাক্ষর

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

পরের দিনই মাদারের কথামত ষ্টেনোগ্রাফী ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হল সীমা।

আন্তরিক চেষ্টায় তিন মাসের মধ্যে সে একজন ভালো ষ্টেনোগ্রাফার তৈরী করে নিল নিজেকে।

আবার পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল অন্যান্য বছরের রেকর্ডকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে এ বছরের মেয়ে সীমা। মাদারদের সযত্ন শিক্ষার উপযুক্ত মূল্য আদায় করে এনেছে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছ থেকে।

সেদিন বিকেলবেলা স্কুল গ্রাউণ্ডে মেয়েরা বাস্কেটবল খেলতে নেমে বলটাকে রেখে এই কথাটাকে নিয়েই লোফালুফি করলো শুধু।

এমলি, রোজারিন, রেবা, লিলি, এদের তো কথাই নেই

কারণ সীমা ওদের সহপাঠিনী। কিন্তু এ ছাড়াও নীচের ক্লাসের অঞ্জনা, ডেজি, রমলা, ফিরোজা ওদেরও আনন্দের পরিসীমা নেই।

সীমার গরবে ওরা সবাই গরবিনী।

ওদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের ঠেলায় লজ্জা পেয়ে যায় সীমা। মৃদু ভৎর্সনায় বলে—তোরা বাপু বড্ডো হুল্লোড় করছিস। মাদাররা কি ভাববেন বল্ তো?

মাদাররা কিন্তু ওদের অপরাধ নেননি—সন্ধ্যার একটু আগে মাদার সুপিরিয়রকে প্রসন্নমুখে আসতে দেখেই তা বোঝা গেল। হাতে তাঁর কি যেন একটা কাগজ।

ওদের কাছে এসে ওদের সকলকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—মেয়েরা তোমাদের প্রায় সকলকারই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। তোমাদের আজকের আনন্দে আমিও তোমাদের কারুর চাইতে আনন্দিত কম নই। তোমাদের মধ্যে সীমার রেজাল্ট সবার চেয়ে বেশী ভালো হয়েছে, তাতেও আমরা সবাই খুশী, তাই না? আর সেইজন্যেই আমি আজ একটা প্রাইজ এনেছি সীমার জন্যে। কি সীমা। বড় যে মনমরা হয়েছিলে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে। এই দেখ, পাশ করতে না করতেই তোমার চাকরীর এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে গেছে।

সীমা মনে মনে ভাবছিল মাদার বোধ হয় কনভেন্টেই তার জন্যে একটা কাজ ঠিক করে দিয়েছেন। কিন্তু ওর পানে তাকিয়ে একটু হেসে মাদার আবার বললেন—প্রথম চিঠিটা এসেছিল প্রায় মাস তিনেক আগে। কনভেন্টের কাছে একটি সুশ্রী সংস্বভাবা মেয়ে ষ্টেনোগ্রাফার চেয়ে পাঠিয়েছিল সিমলার এক অভিজাত হোটেলের ম্যানেজার।—তাই তো আমি তোমাকে ষ্টেনোগ্রাফী শিখতে পাঠিয়েছিলাম। আর ওদের তোমার নাম বয়েস জানিয়ে বলেছিলাম—আমাদের এ বছরের সেরা মেয়েকেই আমরা পাঠাতে পারবো। এই নাও তোমার চিঠি। দু' হপ্তা পরে কাজে যোগ দিতে হবে। অবশ্য কাজটা অত্যন্ত দায়িত্বের। তবে আমি আশা করি তুমি পারবে।—আর মাইনেটা শুনবে? সপ্তাহে একশ' টাকা। কি এবার কেমন লাগছে মনটা?

মেয়েরা আবার হৈ হৈ করে আনন্দ জানায়।

সীমা এতক্ষণ একমনে শুনছিল মাদারের কথাগুলো। এ সংবাদে সেও খুশী হয়েছে। তবু কেমন ভয় করে। মনের মধ্যে দুলে ওঠে আশৈশবের আবাসভূমি ছেড়ে চলে যাবার কল্পনায়। মাদারের ওপর তার সর্বান্তঃকরণের নির্ভরতা। তাই অন্য মেয়েরা যখন তাদের সান্ধ্য সম্মেলন সাঙ্গ করে যে যার ঘরের দিকে পা বাড়ালো তখন সে ধীরে ধীরে পা বাড়ালো মাদারের ঘরের দিকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে। ঘরের সামনের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে প্রার্থনা করছিলেন মাদার। হাত দুটি বুকের কাছে ক্রুশের ভঙ্গীতে রাখা। সামনের টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে একটা। অনাবৃত সৌম্য সুন্দর মুখ

কী ভালো যে লাগলো সীমার। নীরবে সে একধারে বসে অপেক্ষা করে রইলো মাদারের আরাধনা ভঙ্গের।

কিন্তু আশ্চর্য, ওই অপেক্ষা করার মধ্যে দিয়েই কখন যেন শান্ত হয়ে গেল মনটা। যতগুলো কথা বলবার জন্যে ঠেলে উঠেছিল গলার কাছে সবকটা যেন থিতিয়ে গেল মনের মধ্যে।

খানিকক্ষণ পরে চোখ মেলে সীমাকে দেখে একটু হাসলেন মাদার, বললেন—কী এমন করে বসে আছো কেন সীমা? অতদূরে যেতে হবে বলে মন খারাপ হয়ে গেল না কী?

সীমা লজ্জা পায়, বলে—না না মাদার। মন খারাপ করবার কী আছে এতে? আমি মন খারাপ করিনি তো।

এই তো আমার লক্ষ্মীমেয়ের কথা। আমি জানি আমার সীমা অত সহজে কাতর হয় না। একটু দূর হল, তাতে কী? খুব ভালো চাকরী। ভবিষ্যতে ভালো হবে। তাছাড়া খুব নতুনত্ব। কত রকমের লোক দেখবে। নিত্য নতুন মনে হবে তখন। বছরে একবার ছুটি পাবে। তখন বেড়াতে এসো এদিকে। কেমন?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় সীমা। ক্ষণপূর্বেকার দ্বিধাগ্রস্ত মনটার কথা আর বলাই হয় না মাদারকে।

অভিবাদন জানিয়ে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে যায় সে।

ওর পানে তাকিয়ে মাদার মনে মনে বলেন—তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ সীমা। বুঝতেও পারলে না অত দূরে অত পাঁচজনের ভিড়ে কেন আমি তোমায় ঠেলে দিলাম। হোটেলের কত শত লোকের মধ্যে তোমার পরিচয় জানবার প্রয়োজন বা সুযোগ হবে না কারো। কিন্তু সাধারণ সংসারক্ষেত্রে মানুষ অনবরত তার বংশপরিচয়ের ঘাঁটি বেঁধে রেখেছে। সে পথে চলতে গেলে তারা প্রতিপদে তোমার বড়ম্বনা বাড়াবে। অজ্ঞাত পরিচয় শুনলে নির্মম হাতে দুঃখ দেবে। তার চেয়ে হোটেলই তোমার জন্যে ভালো। যেখানে মানুষ রোজ যায় রোজ আসে। অল্প পরিচয়ের অবকাশে কেউ কারো আদি অন্ত খতিয়ে দেখবার ফুরসৎ পায় না।

তাছাড়া হোটেলের কত শত আগন্তুকের মধ্যে এমন একজন মানুষকেও যদি তুমি খুঁজে পাও যে শুধু তোমার ভিতরকার মানুষটির পরিচয়েই সন্তুষ্ট হবে তোমার পূর্বপুরুষদের শুষ্ক পরিচয় টেনে তোমাকে অনর্থক বেদনা দেবে না—করুণাময়ের ইচ্ছায় সেইদিন তুমি সুখী হবে সীমা। তোমাকে পালন করা সেদিন আমার সার্থক হবে।

মাত্র পনেরদিন মেয়াদ আর কনভেন্ট জীবনের। সে তো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। যাত্রার আর দেরী কই? কিন্তু যাবে যে তা ইস্কুলের ইউনিফর্ম ছাড়া আর জামাকাপড়ই বা কই সীমার? একটা স্যুটকেস নেই, নিজস্ব একটা বিছানা পর্যন্ত নেই তার।

সে সবও জোগাড় করেন মাদার। তবে প্রায় সবই চেয়ে চিন্তে! এমেলি তার পুরানো স্যুটকেসটা সীমাকে দিয়ে দেয়। এ বছর ক্রীসমাসে তার কাকা তাকে একটা নতুন স্যুটকেস কিনে দিয়েছেন।

দু' একটা জামাকাপড়ও আসে বন্ধুদের প্রীতি উপহার হিসাবে। মাদারদেরও স্নেহ সীমা। তাঁদের কাছ থেকেও সে বঞ্চিত হয় না।

তারপর একদিন সকালে সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে সীমা রওনা হল হাওড়া ষ্টেশনের অভিমুখে। দুরু দুরু বক্ষে সজল নয়নে অনেকটা পথ বাসে করে এসে তবে সে হাওড়ায় পৌঁছালো।

কিন্তু ষ্টেশনে এসে জনারণ্যে সীমা হারিয়ে গেল প্রায়। গাড়ীতে প্রচণ্ড ভিড়—তিলধারণের স্থান নেই। স্যুটকেসটা হাতে করে সারাটা প্ল্যাটফর্ম ছুটোছুটি করে বেড়ায় সীমা। কিন্তু গাড়ীতে ওঠার কোন উপায়ই সে খুঁজে পায় না।

মুখটা লাল হয়ে ওঠে উৎকণ্ঠায়। দিশাহারা হয়ে যায় সীমা। কুয়োর ব্যাঙ সাগরে পড়ার চাইতেও বেশী সঙ্গীন অবস্থা তার।

সময়ও হয়ে গেছে। গার্ড সাহেবের হাতের নীল পতাকাটা এদিক ওদিক দুলে দুলে যাত্রা সুরুর ইসারা জানায়।

সীমা বোকার মত দাঁড়িয়ে পড়ে মধ্যিখানে। মাথাটা তার বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে। দু'চোখ ঠেলে কান্না বেরিয়ে এসেছে প্রায়।

শেষ পর্যন্ত তাকে কী ফিরে যেতে হবে কনভেন্টে? বলতে হবে ট্রেণে উঠতে পারে নি জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই ব্যর্থতার লজ্জা মাথায় তুলে নিয়ে দাঁড়াতে হবে সকলের সামনে?

হঠাৎ গার্ডসাহেবের নজর পড়ে সীমার ওপর। আ তুমি যাবে না কী এই গাড়ীতে? জায়গা পাওনি তো? কী মুস্কিল। আচ্ছা এসো—এই যে এই গাড়ীতে—এই যে এখানে—ওঠো। ফার্ষ্ট ক্লাস? হোক গে যাক, এখন তো উঠে পড়ো। পরে তখন—

ততক্ষণে সীমা কোন রকমে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে ঢুকে পড়েছে একটা কামরার ভিতর।

ঢোকামাত্র একটা ধাক্কা খেল সীমা—তবে অঙ্গস্পর্শে বা জিনিষপত্রে নয়—কেবল মাত্র বাক্যস্রোতে।

—আরে এ ছোকরী উতার যাও উতার যাও—উতারো জলদি। ইয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস রিজার্ভ কামরা হ্যায়।—আরে শোনে না দেখ। এই এই মেয়ে—

সীমা অত্যন্ত বিব্রতবোধ করে। তার ইণ্টার ক্লাস টিকিটে যে ফার্ষ্ট ক্লাস রিজার্ভ কামরায় ওঠার অধিকার নেই সেকথা সে জানে। তবু মিনতির সুরে বলে—দেখুন পরের ষ্টেশনেই আমি নেমে যাবো। ভীষণ ভিড় বলে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমি—

—সে তো দেখতেই পাচ্ছে। দুটো হাত নেড়ে বিচিত্র এক ভঙ্গিমা দেখালেন বর্ষীয়সী মহিলাটি।

তারপর ও ধারের বেঞ্চে আসীনা নিজের বইমুখী কন্যাটির দিকে ধাবমানা হলেন পূর্ণোদ্যমে।

—এই সব ঝামেলার জন্যেই মেজাজ বিগড়ে যায় আমার বুঝলি? যে যথার্থ ভদ্রলোক হয় তার কথার একটা দাম থাকে। আমাদের বলা হল আপনারা এগিয়ে যান। আমি ঠিক সময়ে ষ্টেশনে যাবো। —কেন রে বাপু একসঙ্গে এলে কী মানহানি হোত শুনি? নিজে পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েমানুষগুলোকে একলা রাস্তায় ছেড়ে দিতে ভয় করে না একটু?—এই যে ট্রেণে ওঠা, ঠিক মত জায়গা পাওয়া—তা থাকলেই বা রিজার্ভ করা, এসব কী মেয়েমানুষের কাজ? তাও না হয় [illegible] হবার তা হল আমাদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে সমস্ত ঝামেলা কাটিয়ে উনি শুধু দয়া করে একটু সঙ্গে গেলেন—তা নয় এলোই না মোটে? [illegible]টা পথ কী আমরা একা যাবো নাকী গাড়ীতে? তার ওপর [illegible]বার কোথাকার কে একটা মেয়ে রীতিমত জবরদস্তি করে উঠে পড়লো [illegible]ীতে? ও মা আমার কী হবে? নাঃ এ ভাবে চুপ করে থাকাটা [illegible] হচ্ছে না। ক [illegible]লস্ আমি চেন টানবো ভাবছি।

এতক্ষণে মেয়েটি বই থেকে চোখ তোলে। মায়ের প্রথম দিকের [illegible]াগুলো মন দিয়ে না শুনলেও শেষের দিকের কথাগুলো তার [illegible] গেছে নিশ্চয়ই। একটু ভীত চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে —ও তো বলছে মা পরের ষ্টেশনেই নেমে যাবে। না যদি তখন না নয় চেন টেনো।

মা তখনও কোন নেপথ্যবাসীর ওপর রাগে ফুলছিলেন। তাই পুরোনো কথার জের টেনেই তিনি আবার বকতে সুরু করেন—তুই নিশ্চয় জানিস এঞ্জেলা এ রকম অভদ্রতা করবার মত ছেলে আগে ছিল না কমলাক্ষ এ শুধু ঐ পিনাকী হতভাগাটার সাথে মেলামেশা করবার ফল। একটা ঝাড়াঝাপটা পুরুষ মানুষ হয়ে শেষে কী না ফেল করলো ট্রেণটা? ছি ছি গলায় দড়ি। কী বলবো অগাধ পয়সা—সাতপুরুষেও কখনও চাকরী করবার দরকার হবে না—তাই রক্ষে। তা না হলে চাকরী করে খাবার ক্ষমতা ওর জন্মেও হোত না। ওই পিনাকী হতভাগার মত—

এঞ্জেলা এবার একটু হেসে বলে—কেন মা তুমি একজনের দোষে আর একজনকে গাল পাড়ছো? এমনও তো হতে পারে যে কমলাক্ষবাবু ইচ্ছে করেই আসেন নি আমাদের সঙ্গে?

—এ্যাঁ? কী বললি? ইচ্ছে করেই সে আসে নি? কেন তেমন কিছু সে বলেছিলো বুঝি তোর কাছে? বস্তুত আচ্ছা। বলি আমরাই কী তাকে সাধছি নাকী? নেহাৎ বাপ-মা নেই—কেমন একটু মায়া পড়ে গিয়েছিল তাই বলেছিলুম—বাবা কমলাক্ষ তুমি যদি তোমার কাজের দরকারে সিমলায় যাচ্ছোই তবে চলো আমরাও জায়গাটা দেখে আসি এই সুযোগে। কিন্তু সে তার ভালো লাগবে কেন? তার চেয়ে ভালো লাগবে ওই চালচুলো না থাকা ছেলেটার সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়াতে। যাক্ যাক্ যেখানে খুশী যাক্ সে।

এঞ্জেলা একটুও রাগ করে না শুধু হাসে। বলে—তা তুমি বাপু বড্ডো রাগ করছো। জানই তো বড়লোকের ছেলে, সম্পূর্ণ স্বাধীন তার ওপর আবার একটু কবিপ্রকৃতি আছে। ওর তো একটু খেয়ালী হওয়াই স্বাভাবিক। কোথায় ছবি আঁকা, কোথায় সাহিত্য চর্চা এ ছাড়া যার কাজই নেই তার কখনও সময়ের জ্ঞান থাকে?

—ঠিক আছে মা, নিজের রকমারী খেয়াল আর যত রাজ্যের অকাজের কাজ নিয়েই থাক্ সে।

এবার প্রায় রণে ভঙ্গ দেন ভদ্রমহিলা। তারপর মুখখানাকে হেঁসেলের জামবাটির মত করে জানলার বাইরে প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুসন্ধান করতে থাকেন।

এঞ্জেলাও আবার ডুবে যায় বইয়ের পাতায়। তাড়নার দাপটে সীমা তখনও সসংকোচে দাঁড়িয়ে ছিল দরজা ঘেঁসে। পাছে শিকড় গাড়ার আভাস খুঁজে পেয়ে আবার রাগারাগি সুরু করেন ভদ্রমহিলা সেই ভয়ে নিজের স্যুটকেসটা পেতেও বসতে সাহস করে নি সে।

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে ট্রেনের অন্য কামরায় চলে যাবে মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্তই করেছিল সীমা। কিন্তু বাদ সাধলেন সেই বর্ষীয়সী মহিলাটি নিজে। প্ল্যাটফর্মে গাড়ী দাঁড়াবার প্রায় বিশ গজ আগে থাকতেই সীতাভোগ মিহিদানাওয়ালার দরশন পিয়াসে এমন ভাবে দরজাটা চেপে দাঁড়ালেন তিনি যে একটা ইঁদুরেরও সাধ্য ছিল না যে তার পাশ দিয়ে গলে যায়।

কাজে কাজেই স্যুটকেশটাকে বাগিয়ে ধরে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলো সীমা।

অবশ্য ততক্ষণে সে ঐ ভদ্রমহিলার নামটা জেনে ফেলেছে তাঁর ট্রাঙ্কের ওপরকার নামাঙ্কন দেখে।—শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা চৌধুরাণী। মহারাণী অব হাতেমনগর।

কিন্তু সে যাই হোক্ তাঁকে টপকে বা পাশ কাটিয়ে সামনে

এগিয়ে যাবার ধৃষ্টতার কথা ভাবতেই পারলো না সীমা। অতিক্ষীণ কণ্ঠে একবার 'একটু পথ দেবার' অনুরোধও করেছিল বোধহয় কিন্তু মহারাণীর জলদমন্দ্রিত কণ্ঠের কাছে সে চড়াইয়ের কিচিমিচি স্থান পায়নি।

তার ওপরে ক্ষণপ্রভা ততক্ষণে ওজন করা সীতাভোগ মিহিদানার খুঁড়িধারীকে ফেলে হারানিধি ফিরে পেয়েছেন। তাঁর এতক্ষণকার রাগবিরাগ একেবারে গলে বরফজল হয়ে গেছে।

—আরে আরে কমলাক্ষ যে? কী করে এলে তুমি? টানা ট্যাক্সীতে? এ্যাঁ? না বাপু কোনদিন একটা কাণ্ড বাধাবে তুমি। এত ডানপিটে কেন? প্রাণে ভয়ডর নেই। ট্রেণ ফেল হয়েছিল তো কী হয়েছে? পরের ট্রেণেই না হয় আসতে। আমরা তো আর জলে পড়িনি।

ততক্ষণে কমলাক্ষ কামবার ভিতর এসে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ক্ষণপ্রভার অতগুলো কথার একটারও উত্তর দেবার জন্ত তাকে ব্যগ্র দেখা গেল না।

হাতের এ্যাটাচিটা নামিয়ে এঞ্জেলাকে সম্বোধন করে সে বললে —সত্যি এঞ্জেলা আমি ভারী লজ্জিত হয়েছি ঠিক সময়ে এসে পৌঁছুতে না পারার জন্তে। কিন্তু কী করবো বলো? পিনাকী হতভাগাটা আজকাল এমন শয়তান হয়েছে তা কী জানতাম আগে? সেই হতভাগাটার জন্তেই তো দেরীটা হল আমার। আজ পাঁচদিন ধরে না খেয়ে না নেয়ে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তাকে। উঃ কোথায় যে না খুঁজেছি, সেই খিদিরপুর ডক থেকে সুরু করে দমদম এরোড্রম পর্যন্ত। যাকে বলে—একেবারে গরুখোঁজা। ওঃ ই্টুপিডটাকে একবার হাতের কাছে পাই যদি—

এঞ্জেলা বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে—তা তিনি হঠাৎ গেলেন কোথায়?

কমলাক্ষ উৎসাহের আতিশয্যে নিজের হাঁটুতে একটা প্রকাণ্ড তাল ঠুকে বলে—আরে সেইটাই তো হল আসল ব্যাপার। ওর খোঁজ না পেয়ে তো আর আমি ছাড়বো না।

আজ সকালে উঠে সোজা চলে গেলাম ফোর্ট উইলিয়মে—মানে যেখানে ওদের মিলিটারী কোয়ার্টার্সের হেড অফিস। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম আজ থেকে পাঁচ দিন আগেই সে এখান থেকে সিমলায় চলে গেছে।—মনে মনে ইচ্ছে, আমাকে একটা সারপ্রাইজ দেবে। বুঝলে না? চিরকালের ছেলেমানুষী বুদ্ধি তো। সে কি আর যাবে ওর? আর আমি এদিকে পাগলের মত—অবশ্য ওরও যে সিমলায় যাবার কথা আছে, সেকথা আগে একদিন ও আমায় বলেছিল। ওদের মিলিটারী হায়ার অফিসারদের একটা মিটিং ডাকা হয়েছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। তা বলে আমায় না বলে ও যে এমন হঠাৎ—

—দেখ বাপু অযাচিত হলেও আমি তোমাকে একটা উপদেশ দিই। কুইন ভিক্টোরিয়ার মত আত্মগরিমামণ্ডিত ভাবে কথা বলেন ক্ষণপ্রভা দেবী। বোঝা যায় ট্রেণ ছাড়বার পর দরজাটা ছাড়লেও কমলাক্ষকে তিনি এখনও ছাড়েননি।—তুমি কত বড় বংশের ছেলে—কত বড় বনেদী ঘর তোমাদের। তোমার কি শোভা পায় ঐ বাপের নাম-না-জানা একটা হতভাগা ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করা? কি আভিজাত্য আছে ওর? আজ না হয় নধরকান্তি চেহারাটার জোরে কোন এক বড়লোকের পুষ্যিপুত্তুর হয়ে বসেছেন। আর তার পয়সায় কি যেন ট্রেণিং-ফেনিং নিয়ে ভালো একটা চাকরীও বাগিয়েছে। কিন্তু তাই বলে কি ও তোমার পাশে বসবার উপযুক্ত?—আমার তো বাপু গা রিশপিশ করে যখন দেখি ঐ পিনাকীটা তোমার কাঁধে হাত রেখে বেড়ায়। তোমার সরল নিরহংকার মনের সুযোগ নিয়ে তোমার সমযোগ্য হবার চেষ্টা করে। অবশ্য তোমরা আজকালকার—

ক্ষণপ্রভা তাঁর বক্তৃতাটা বেশ গুছিয়ে এনেছিলেন—কমলাক্ষকে নীরব দেখে বেশ উৎসাহও পাচ্ছিলেন মনে মনে। বাদ সাধলো এঞ্জেলা, মাঝখানে বাধা দিয়ে সে বললে—এ তোমার ভারী অন্যায় মা, পিনাকীবাবুর অন্ত পরিচয় যাই হোক্ না কেন এমনিতে তিনি অত্যন্ত ভদ্রলোক। নিজের চেষ্টায় কত উন্নতি করেছেন মিলিটারী সার্ভিসে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো তিনি কমলাক্ষবাবুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কেন তুমি ওঁকে অকারণে অত রূঢ় কথা বলে এই ভদ্রলোককে কষ্ট দিচ্ছো?

ক্ষণপ্রভা একবার জলন্তদৃষ্টিতে তাকান এঞ্জেলার মুখপানে তারপরে তাকান কমলাক্ষের পানে। কিন্তু সেখানেও নিজের তরফের কোন সমর্থনের লক্ষণ না দেখে বাধ্য হয়েই তিনি আশা ছেড়ে দেন কমলাক্ষের ভবিষ্যৎ রক্ষার।

—তা বটে তা বটে। আমারই বা বলবার দরকার কী? যে যা ভালো বোঝো তাই করো তোমরা।—বলে নিজের নাতি হ্রস্ব বক্তৃতার ইতি করে ফেলেন মনের দুঃখে।

কমলাক্ষ এবার বিনীতভাবেই বলে—মাসিমা আমাকে আপনি সত্যি সত্যি স্নেহ করেন তাই আমার ভালোর জন্তেই এ কথা বলেছেন। আমার মা থাকলেও হয়তো আজ এই ধরণের কথাই বলতেন। কিন্তু মাসিমা পিনাকীর সম্বন্ধে আমি বড় দুর্বল। ও আমার কতটা বন্ধু তার পরিমাণ বুঝিয়ে বলবার সাধ্য আমার নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি কোন দেশে কোন মায়ের পেটের ভাইকেও কোন ভাই এর চেয়ে বেশী ভালবেসেছে বলে আমার জানা নেই। কাজেই যে বিষয়ে ওর নিজের কোন অপরাধই নেই সেই কারণে ওকে ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর অদৃষ্টের দোষে ওকে কেউ লাঞ্ছনা করবে একথা ভাবতে সত্যিই আমি ব্যথা পাই।···ওর যে কেউ নেই ও যে কখনও বাপমায়ের ভালবাসা পায়নি—এ কথা ভাবতেই আমার চোখে জল এসে যায়। এরজন্তে আপনি আমার ওপর বিরক্ত হবেন না মাসিমা আমার মুখ চেয়ে—

এবার ক্ষণপ্রভা যথেষ্ট অপ্রস্তুত মনে করেন নিজেকে—না না আমি ঠিক কিছু মনে করে বলিনি মানে আমি—

ক্ষণপ্রভার কুণ্ঠিত স্বরকে নিষ্কৃতি দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় কমলাক্ষ। সহজ গলায় বলে—আচ্ছা একটা কথা ভেবে তখন থেকে আমি অবাক হচ্ছি যে ওই মেয়েটিকে আপনারা সঙ্গে করে কেন এনেছেন? অবশ্য বাজে লোকের ভিড় এড়াতে একটা বাড়তি টিকিট আপনাদের কিনতেই হয়েছে তা আমি জানি। কিন্তু ওখানে ওই হোটেলের বিরাট খরচ দিয়ে বাড়তি লোক নিয়ে গিয়ে কী সুবিধা হবে আপনাদের? সিমলা এখন আমাদের ভারত সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী তো? তাই বুঝেই ওরা বিরাট করে হোটেল ফেঁদেছে। চার্জও নেবে বিরাট আবার সুখ সুবিধার আয়োজন বিশাল—তবে আর মিছিমিছি—বলা বাহুল্য কমলাক্ষের শেষ কথাগুলো সীমাকে লক্ষ্য করেই বলা।

তবে ক্ষণপ্রভার ক্ষণপূর্বেকার গ্লানিমোচন করতে এটা মহৌষধির কাজ

করলো বলা যায়। তিনি নব উদ্যমে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাক্যযুদ্ধে। কে বললে তোমায় ওই মেয়েটাকে আমরা সঙ্গে করে এনেছি। ও-ই তো গায়ের জোরে চড়াও হয়ে এসে উঠেছে আমাদের গাড়ীতে। কী গো বাছা তখন যে নাকীসুরে বলা হল—পরের ইষ্টিশানেই আমি নেবে চলে যাবো' তা নড়নচড়নের কোন লক্ষণই তো দেখছি না।

—ও আপনি একাই যাচ্ছেন ? কমলাক্ষ এবার সরাসরি সীমাকেই প্রশ্ন করে। তা নেমে যাবেন কোথায় আপনি ? গাড়ীতে অসম্ভব ভিড়। কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। আর যাবার দরকারই বা কী ? এঁদের তো একটা বাড়তি টিকিট কাটতেই হয়েছে—কামরা রিজার্ভ রাখবার জন্যে। কী বলো এঞ্জেলা ? উঠুন উঠুন এভাবে যাওয়া যায় কখনও ? এঞ্জেলা তোমারও কিন্তু উচিত ছিল এতক্ষণ ওঁকে বসতে বলা। তোমারই সমবয়সী একটি মেয়ের সাথে আলাপ করতে তোমার এত দেরী করা ঠিক হয়নি।

নিজেই একটানে সীমার স্যুটকেশটা অপজিট বাংকে তুলে দেয় কমলাক্ষ। অপ্রতিভ এঞ্জেলা ততক্ষণে সীমার হাত ধরে এনে পাশে বসিয়েছে।

ক্ষণপ্রভার চোখের সামনে ঝুড়ি ঝুড়ি অন্ধকার নেমে আসে। নিরুপায় দৃষ্টিতে তিনি বেলগাড়ীর সিলিং দেখতে থাকেন এক মনে। তাঁর মতে হাতেমনগরের রাজকুমারী একটা চাষার মেয়েকে পাসে বসিয়ে সাগ্রহে আলাপ করছে এ দৃশ্য দেখার চেয়ে মরণও ভালো।

আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো হল কী এ্যাঁ ? নিজেদের আভিজাত্যের মর্যাদাও রাখলে না গো ?

দিল্লীতে নেমে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল সীমা আর এঞ্জেলার মধ্যে। অবশ্য অনতিবিলম্বে যে আবার মোলাকাৎ হবে তাদের সে কথাটা তারা উভয়েই বুঝেছিল কারণ যে হোটেলে চাকরী নিয়ে সীমা সিমলায় যাচ্ছে সেই হোটেলেরই অস্থায়ী বাসিন্দা হতে চলেছেন এঁরা। এ কথাটা আলাপের মাধ্যমে সীমা আর এঞ্জেলা দু'জনকারই জানা হয়ে গেছে।

তারপর কালকা থেকে সিমলা বাসে করে যাওয়া। পথটাও মন্দ নয়। তবে ভারী সুন্দর।

সীমা এর আগে কখনও এমন পাহাড়ী জায়গায় আসে নি। সে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো দিগন্তচুম্বী পাহাড় আর তার বন্য প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের পানে। সাপের মত পথটাই কী কম আশ্চর্য তার কাছে ? সেই পথ ধরে ছুটেছে সীমাদের বাসটা আর একটু একটু করে ছুটে আসছে হিমেল বাতাসের স্পর্শ।

তারপর এক সময় বাসটা যখন গিয়ে তার নির্দিষ্ট বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালো তখন বুকটা দুরদুর করে উঠলো সীমার।—কে জানে শীতে না ভয়ে ? এবারে তার চাকরীস্থল এসে গেল যে। কী রকম পরিবেশ কী রকম অভ্যর্থনা তার জন্যে অপেক্ষা করছে কে জানে ?

বাস হতে নেমে এদিক ওদিক তাকায় সীমা। মনে মনে ভাবে একটা গাড়ী নেবে কী না। হোটেলের ঠিকানাটা সে জানে। খুঁজে নেওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব হবে না তার পক্ষে। কিন্তু বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে তার দূরত্বটা কতখানি হবে তা সে কেমন করে বুঝবে। তা ছাড়া ট্যাক্সী ছাড়া অন্য কোন যানও তো চোখে পড়ে না এখানে, যদি অনেক ঘুরতে হয় তবে সীমার স্বল্প পাথেয়ের পুঁজি থেকে তার ভাড়া মেটাতে পারবে তো সে।

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নজরে পড়লো একজন স্যুটপরা মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে।

—আপনি কী মিশনারী কনভেন্ট থেকে আসছেন ? আমার নাম মহেন্দ্র সিং। ম্যাজেষ্টিক হোটেলের ম্যানেজার আমি। আমাদের হোটেলে কাজ করবার জন্যে এই গাড়ীতে একটি মেয়ের আসবার কথা ছিল আজকে।

সীমা অকূলে কূল পায় যেন! তাড়াতাড়ি বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ আমিই সেই সীমা রায়। কনভেন্ট থেকে আসছি কাজে যোগ দিতে। আপনি যে কষ্ট করে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন সে জন্য অনেক ধন্যবাদ।

—না না এতে আর ধন্যবাদ দেবার মত কী আছে। অল্প হেসে মহেন্দ্র সিং বললেন।

—দেখুন এ দেশের পথঘাট আমি কিছুই চিনি না, তার ওপর এই সন্ধ্যার সময় ঠিকানা খুঁজে যেতে হলে আমাকে সম্ভবত অনেক হায়রাণ হতে হোত।

ভদ্রলোক অল্প একটু হেসে সমর্থন করলেন—সে তো সত্যি কথাই এই দীর্ঘপথ এসে আবার ঠিকানা খোঁজা কারুর পক্ষেই সুখকর নয়। তাই তো আমার মনিব আমায় পাঠালেন আপনাকে নিয়ে যেতে। চলুন, গাড়ী তৈরীই আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে—আপনাকে একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি। কিন্তু কাজ তো হাল্কা নয়। আপনি কী ঠিক পেরে উঠবেন এত কাজ করতে। কনভেন্টের কর্তৃপক্ষই বা কী রকম, আমরা চাইলাম একটি পূর্ণবয়স্কা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না মেয়ে আর তার বদলে ওরা আপনার মত কিশোরী মেয়েকে পাঠিয়ে দিলো ?

মহেন্দ্র সিংয়ের কথার ধরণে সীমা বিব্রত বোধ করে নিজেকে। তবু মৃদুস্বরে বলে—বয়েসটাই তো দায়িত্ব নেবার পক্ষে সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়। আমাকে কাজ করে দেখাবার সুযোগ দিয়ে দেখতে পারেন আপনারা।

—সে তো বটেই, সে তো বটেই। না না আমি অযোগ্যতার কথা বলছি না তবে তোমাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ দেখেই এ কথা বলছিলাম। তা তোমার বেশ মনের জোর আছে দেখছি। আর দেখ বয়েসে আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় তাই তোমাকে তুমি বলেই সম্বোধন করলাম। আশা করি এতে তুমি কিছু মনে করবে না।

—না না বয়সের দাবীতে আপনি নিশ্চয় আমায় তুমি বলতে পারেন।

—এর পর আর বিশেষ কিছু কথাবার্তা হয় না। সন্ধ্যার আবছা আলোয় মোটর ছুটে চলে হু হু করে। শীতের বাতাস ছুটে এসে ছুঁচ ফোটায় সর্বাঙ্গে।

তবু স্বল্প প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে সীমা জানতে পারে হোটেলের প্রোপ্রাইটর লোক খুব ভালো। কিন্তু হোটেলের কোন আবাসিক অথবা কর্মচারীর সাথে তিনি দেখা করেন না। অন্য জায়গায় বাস করে তিনি শুধু চিঠির মারফৎ নির্দেশ দেন মহেন্দ্র সিংকে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার হলে শুধু মহেন্দ্র সিংয়ের সাথেই দেখা করেন।

সুতরাং হোটেলে যে মহেন্দ্র সিংজীই সর্বেসর্বা সে কথা বুঝতে বাকী থাকে না সীমার। স্পষ্ট করে না বললেও চর্মচক্ষের সম্মুখীন মনিব বলে এঁকেই সেলাম করতে হবে, সে কথা সীমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

[ক্রমশঃ।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে

কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমাত্র যার তুলনা চলে তার নাম মহাসাগর। একমাত্র মহাসাগরই সেই বিরাট শক্তির সঙ্গে তুলনীয়। অনন্ত, অতল। গভীর, নিবিড়। ব্যাপ্ত, ব্যাপক। শাশ্বত ভারতের সনাতন আত্মার চিরঞ্জীব বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথের বিরাটত্বের মহাসাগরে যে জগতের কত প্রণম্য সন্তানদের শ্রদ্ধাঞ্জলির নদী মিলিত হয়ে এক অপূর্ব মহাভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে তার তুলনা নেই। সমগ্র জগতের রবিবন্দনার উদাত্ত মন্ত্রপাঠের ধ্বনিতরঙ্গ রসাস্বাদী ব্যক্তির চিত্তে এক পরম বৈচিত্র্যময় অপরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করে। আলোচ্য গ্রন্থটি রবিবন্দনার একটি সংকলনবিশেষ। বাঙলার বিগত যুগের বরণীয় সন্তানদের রবীন্দ্র-সম্পর্কিত গদ্য রচনার একটি অতি মূল্যবান সংকলন রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে। সংকলনটি সম্পাদন করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা, রচনারীতি, বিন্যাসরীতি, চিন্তাধারা, ভাবকল্পনা, বিরাটত্ব, প্রতিভার গভীরতার সম্যক বিশ্লেষণ এখানে ঘটেছে তাঁর সমকালীন এদেশীয় বহু বিদগ্ধ লেখক-লেখিকার রচনায়। প্রতিটি লেখক নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র প্রতিভাকে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই রবিরশ্মিতে নিজেকে স্নাত করে তার মাহাত্ম্য আপন আপন বিশিষ্টতার মাধ্যমে প্রচারে যত্নবান হয়েছেন, রবীন্দ্রমানস বিশ্লেষণে আপন আপন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছেন, মানবতার নবমন্ত্রোদ্গাতা রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য বাণী তাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন ঘরে ঘরে। সেই দিন কবির রচনাদি তাঁদের আপন আপন অভিনব ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হয়ে রবীন্দ্রচর্চার বীজ বপন করেছে, আজ যা পরিণত হয়েছে শাখা প্রশাখা সমন্বিত বিশাল মহীরুহে। এই গ্রন্থের সঙ্কলনকর্মে সংকলক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে তাঁর কুশলতা নৈপুণ্য ও আন্তরিক অধ্যবসায়ের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। একটি গ্রন্থের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের মুকুটমণিকে কেন্দ্র করে এতগুলি দিকপাল মনীষীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ও সুচিন্তিত বিশ্লেষণ, প্রভূত পাণ্ডিত্যজাত, সারগর্ভ, তথ্যবহুল আলোচনাদি পরিবেশিত হয়ে পাঠকচিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। রবীন্দ্র কৌতুক সাহিত্য ভাণ্ডারে এই গ্রন্থটিকে একটি সার্থক সংযোজন বললে অত্যুক্তি হয় না। সংকলককে এই বিরাট শ্রমসাপেক্ষ কাজে পরিপূ সফলতা লাভ করার জন্যে অভিনন্দন জানাই। প্রকাশক—এম, সি সরকার অ্যাণ্ড সান্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট দাম—দশ টাকা মাত্র।

বাঙলার ইতিহাসের দুশো বছর

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে)

বাঙলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস যেমনই গৌরবোজ্জ্বল, তেমনি ঘটনাবহুল। বাঙলাদেশের তৎকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এমন বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার পর ঘটনা বয়ে গেছে যার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য কালের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও আজও অম্লান এবং প্রদীপ্ত। শ্রীচৈতন্যের দিব্য আবির্ভাব এবং তাঁকে কেন্দ্র করে বাঙলা সাহিত্যের সার্থক রূপায়ণ বাঙলা দেশের মধ্যযুগের বিরাট অবদানগুলির মধ্যে এক বিরাট ও জাজ্বল্যমান নিদর্শন। মধ্যযুগের বাঙলাকে কেন্দ্র করে তরুণ সাহিত্যব্রতী অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠক সমাজে উপহার দিয়ে এক বিপুল সাধুবাদের অধিকারী হয়েছেন। স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর মধ্যযুগের বাঙলাকে নিয়ে এ ধরণের সারগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বাঙলার একটি বিরাট যুগের এক পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য লেখক এখানে উন্মোচিত করেছেন। সে যুগের সমাজ, জীবন, গার্হস্থ্য পরিবার, শিক্ষাদীক্ষা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অভিযান প্রমুখ এক একটি দিক অবলম্বন করে লেখক গ্রন্থটির মধ্যে সমগ্র মধ্যযুগীয় বাঙলা দেশটিকে তুলে ধরেছেন। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ এই দুশো বছরের বাঙলার ইতিহাস এই গ্রন্থের আলোচ্য। লেখক ইতিহাস অনুশীলনে প্রভূত অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও শ্রমের পরিচয় দিয়েছেন। বহু পরিশ্রমে তিনি প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করেছেন। সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর রচনা পাঠকসমাজকে তৃপ্ত করার যোগ্যতা রাখে। অতীতের ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত সমগ্র জাতির পক্ষে পরম মঙ্গলজনক। জাতির দুঃসময়ে তার অতীতের গৌরবময় ইতিহাস তাকে সর্বতোভাবে প্রেরণা যোগায়, পথ দেখায়, আলো দেয়। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন সর্বজনবরেণ্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক—শ্রীনন্দদুলাল দে, শান্তিনিকেতন। পরিবেশক—ভারতী বুক স্টল, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। দাম—তের টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

বিষের বাঁশী

বাঙলার বিগত যুগের যে দিকপাল সাহিত্য স্রষ্টাদের কবিতায় ও গানে পরাধীন জাতির মনের মধ্যে এক অভাবনীয় নতুন চেতনা, জাতীয়তা ও উদ্দীপনা অভূতপূর্ব ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম সেই তালিকায় একটি দেদীপ্যমান নাম। দেশজননীর সোনার অঙ্গ যখন বিদেশী শাসকের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেই চরম নিপীড়নের যুগে নজরুলের "বিষের বাঁশী" জাতির মনে-প্রাণে যে কি পরিমাণ সাড়া জাগিয়েছিল, তার স্মৃতি মন থেকে মুছে যাওয়ার নয়। বৃটিশ সরকার সেদিন এই পুস্তককে বাজেয়াপ্ত না করে ক্ষান্ত হননি। আনন্দের কথা, এই অনবদ্য গ্রন্থটি বর্তমানে পুনরায় প্রকাশিত হয়ে দেশবাসীকে

নতুন করে প্রেরণা জাগাচ্ছে। আজকের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে, এই দুঃখময় ঘন তামস ত্রিযাম রাত্রিতে, এই ঘোর হতাশা, নিরাশা ও শূন্যতার অশুভ লগ্নে এই জাতীয় গ্রন্থগুলি সর্বৈব দুর্যোগ অতিক্রমণের শক্তি এনে দেয়, জাতিকে এগিয়ে চলার মাভৈঃ বাণী দেয়, জাতীয় জাগরণে সহায়তা করে। নজরুলের অমর কীর্তিগুলির মধ্যে বিষের বাঁশী অন্যতম। দেশজননীর বন্দিনীদশা তরুণ কবির চিত্তে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তারই আগ্নেয় প্রকাশ এর কবিতাগুলির মধ্যে। দেশমাতার বেদনা নজরুল যে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন তারই বাঙ্ময় প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন তার কাব্যে। লেখনীর সাহায্যে দেশবাসীকে যে মাভৈঃ বাণী তিনি শুনিয়েছেন, আশার আলো দিয়েছেন, নবজীবনসংহিতার সামগান করেছেন, তার গুরুত্ব যেমনই অনস্বীকার্য তেমনি অমলিন। বিষের বাঁশীর পুনঃ প্রকাশের জন্যে প্রকাশককে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রকাশক—নবজাতক প্রকাশন, ৬, অ্যান্টনি বাগান লেন, কলকাতা—৯। দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

হরফ

স্বর্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব সংস্করণের এই উপন্যাসটি হাতে পেয়ে সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রই খুশী হয়ে উঠবেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনের সার্থক রূপায়ণই ছিল এই প্রখ্যাত কথাশিল্পীর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, আলোচ্য রচনাও সেই বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয়বাহী। ছাপাখানা ও তৎসংশ্লিষ্ট কয়েকজন মানুষের জীবন ও কর্মধারার এক বিচিত্র পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে, লেখকের মতবাদ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুকূল হলেও তাঁর অপরিসীম দক্ষতায় চরিত্রগুলি জীবন্ত ও ঘটনাবিন্যাস সুষ্ঠু, তাঁর বক্তব্য পাঠকমনে সহজেই গভীর দাগ কেটে যায়। চরিত্র সৃষ্টিতেও তাঁর অসীম নৈপুণ্য, বিশেষতঃ মুখ্য চরিত্র মানব ও তার প্রেমিকা আভি অতি উজ্জ্বল হয়েই ফুটে উঠেছে; "ছাড়তে হবে বলে সম্পোর্কটা বিচ্ছিরি করে তুলো না," আভির মুখের এই কথাটিতে তার প্রেমের বলিষ্ঠতা ও সম্ভ্রমবোধ অপরূপ হয়েই প্রকাশিত হয়েছে, জীবন সম্বন্ধে লেখকের দিগদর্শন যে কত গভীর এই ধরণের সংলাপে সেটাই পরিস্ফুট হয়। ভাবরীতির বলিষ্ঠতাও লক্ষণীয়। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—সাহিত্য জগৎ, ২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—পাঁচ টাকা।

আমার ঘরের আশে পাশে

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। স্বদেশের গাছপালা, ফুল, ফল সম্বন্ধে এক বিশদ আলোচনার মাধ্যমে লেখক তাদের গুণাগুণ, রীতি প্রকৃতি ও নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বিধৃত করেছেন। এই সব দেশজ গাছপালা যারা স্মরণাতীত যুগ ধরে আমাদের দেশকে শ্যামল শোভায় মণ্ডিত করে আসছে, আমাদের মাটির সঙ্গে যাদের পরিচয় হাজার হাজার বছরের, কি তাদের নাম? কি তাদের অন্তর সত্তা? আমাদের জাতীয় মানসে কি তাদের অবদান? পরম তথ্যনিষ্ঠায় লেখক উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজেছেন ও এই সন্ধানের পর যে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন তারই রূপ দিয়েছেন বর্তমান রচনায়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের গবেষণা যে কত মূল্যবান সে সম্বন্ধেও লেখক আলোকপাত করেছেন এই গ্রন্থে। কৃষি বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান এই উভয়ক্ষেত্রেই আলোচ্য পুস্তকটি সমাদর লাভের যোগ্য, বাংলা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক গবেষণ পুস্তকের ভাণ্ডারে এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—ডাঃ তারকমোহন দাস, প্রকাশক—গুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—পাঁচ টাকা।

ঘরে বাইরের সাহিত্য চিন্তা

আলোচ্য গ্রন্থখানি সাম্প্রতিক কালে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন, ঘরের ও বাহিরের অর্থাৎ স্বদেশের ও বিদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে লেখকের চিন্তা প্রতিফলিত এদের মাঝে। রচনাগুলি নানা পত্র-পত্রিকায় ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, এগুলি একত্র গ্রথিত করে লেখক ও প্রকাশক উভয়েই সাহিত্য রসিক পাঠক সমাজের ধন্যবাদ অর্জন করলেন। সাহিত্যের নানা বিভাগে এক নতুন আলোকপাত করেছেন লেখক আলোচ্য প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত যে কোন শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে বিষয়বস্তুর মর্মোদ্‌ঘাটনে সহায়ক, বিশেষতঃ দু' একটি রচনা যথা 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার জাতীয়জীবন,' 'সাহিত্যালোচনার ইতিহাস-চেতনা' ইত্যাদিতে তিনি যে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবধারার অনুসরণ করেছেন তা রীতিমতই উল্লেখ্য। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। প্রকাশক—সাহিত্য জগৎ, ২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম—পাঁচ টাকা।

The Life Beautiful

আলোচ্য পুস্তকখানি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। সুন্দর ও দিব্য জীবন সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ধারণা ও চিন্তার এক পরিচ্ছন্ন পরিচয় বিধৃত হয়েছে এই রচনায়। লেখক ভগবান কৃষ্ণকেই সকল মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরম উপলব্ধি বলে মত প্রকাশ করেছেন। দিব্য জীবনের সকল উপলব্ধি যাঁর মধ্যে প্রকাশিত সেই ভগবান কৃষ্ণকেই তিনি শ্রেয় ও প্রেয় বলে অভিহিত করেছেন। জীবন যে ক্ষণ চাঞ্চল্যের প্রতীকমাত্র নয়, তার যে একটা গভীরতর অর্থ আছে, সে সম্বন্ধে লেখক দ্বিধা পোষণ করেন না। তিনি বলেন যে সকল দুঃখ বেদনারই এক অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য আছে, সে তাৎপর্য্য মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলা, মানব জীবনের যা সর্বোত্তম পরিণতি। নিজের চিন্তাধারাকে লেখক বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনায়, বক্তব্যের ঋজুতায় সহজেই তিনি পাঠকের অন্তর স্পর্শ করেন। তাঁর ভাবভঙ্গীও সাবলীল, বিদেশী ভাষা ও ভাবপ্রকাশে তাই সহায়ক হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। বইটির আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—T. L. Vaswani প্রকাশক—এইচ, পি, ভাসোয়ানী, ১১ ওয়ার্ডেন রোড, বম্বে—২৬, দাম—পাঁচ টাকা।

হিমাচলম্

আলোচ্য গ্রন্থটি ভিন্ন স্বাদের এক ভ্রমণ কাহিনী। শৈলকিরীটিনী হিমালয়ের বৈচিত্র্য অপার, আজ অবধি অসংখ্য লেখক তার মহিমাকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করেছেন, তবু তা পুরানো হয় না

কারণ এ দেশের মানুষ হিমালয়কে শুধু বিশাল পর্বতমালার সমষ্টি বলেই গণ্য করে না, তার চোখে হিমালয় যেন ভারতের অধ্যাত্ম আত্মারই এক ধ্যানরূপ। হিমালয়ের এই ভাব গম্ভীর মূর্তিটিই ফুটে উঠেছে বর্ত্তমান রচনার প্রতিছত্রে। লেখক সপরিবারে তীর্থযাত্রা করেছিলেন হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত হিন্দুর পরম তীর্থ কেদার বদরীর উদ্দেশে, তীর্থপথে তাঁর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল আলোচ্য রচনা তারই ছায়াছবি। বর্ণনাভঙ্গী এতই সজীব যে পাঠক সহজেই লেখকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারেন। সাহিত্যের দরবারে লেখকের যে প্রতিষ্ঠা আছে আলোচ্য রচনা তার পরিপূরক হিসাবেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, প্রাঃ, লিঃ, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭, দাম-তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

Britain—An Official Hand Book

রেফারেন্স বা গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতি গ্রন্থের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি নানা কারণেই বিশিষ্ট, ব্রিটেন বা ইউনাইটেড কিংডাম-এর যাবতীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক প্রশাসন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যরাজি এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। স্বভাবতঃই এর মূল্যও তাই অসীম। প্রধানতঃ গ্রেটব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সামগ্রিক পরিচিতিই এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য হলেও 'ওয়েলস', 'স্কটল্যাণ্ড', ও 'উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড' সম্বন্ধেও এক তথ্যনিষ্ঠ অথচ সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিধৃত হয়েছে এর মাধ্যমে। সেণ্ট্রাল অফিস অফ ইনফরমেশন-এর পরিচিতি বিভাগ থেকেই আলোচ্য গ্রন্থের মূল তথ্যাদি গৃহীত হয়েছে, অবশ্য আরও অনেক দায়িত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও এই তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য বলা যায় নির্দ্বিধায়। সংশ্লিষ্ট পাঠকের কাছে বইটি যে সমাদৃত হবেই এ সম্বন্ধেও আমরা নিঃসন্দেহ। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। প্রকাশক—Central Office of Information, London. Price—13s. 6d.

পৃথিবী ও আকাশ

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে বর্ত্তমানে রুশ ভাষায় লিখিত যে সব গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদিত হয়েছে আলোচ্য পুস্তকটি তারই অন্যতম। আকাশের দিকে তাকিয়ে বহু যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে যে অনন্ত জিজ্ঞাসা জমে উঠেছে জ্যোতির্বিজ্ঞানে সে তারই উত্তর খুঁজেছে, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থিতি তাদের রূপ ও রীতি এসবই আজ আর মানুষের কাছে রহস্যাবৃত নেই, উত্তম ও অধ্যবসায়ের ফলে আজকের মানুষ আকাশের রহস্যকে আজ স্বচ্ছ করে ফেলেছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে মানুষের এই বিজয়বার্ত্তাকেই ঘোষণা করা হয়েছে, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি শূন্যমার্গের সর্ববিধ বস্তু সম্বন্ধেই প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে। আকাশ বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় ও প্রামাণ্য এক রচনা বলে সেজন্যই বইটিকে অভিহিত করা যায় স্বচ্ছন্দে। অনুবাদকের ভাষারীতি সহজ, ভঙ্গী সাবলীল, পাঠক অবলীলাক্রমে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ওঠেন! ছাপা বাঁধাই ও আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—আ. ভলকভ, অনুবাদক সমর সেন, প্রকাশক—বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো, পরিবেশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—তিন টাকা ছাপ্পান্ন নয়া পয়সা।

মহারাণী সুচারু দেবীর জীবনকাহিনী

বাঙলা দেশে যে সকল মহিলা সাহিত্য ও শিল্পের অনুশীলনে স্মরণীয়া হয়ে আছেন ময়ূরভঞ্জের স্বর্গতা মহারাণী সুচারু দেবী নাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কন্যা মহারাণী সুচারু দেবী কাব্যরচনায় ও চিত্রাঙ্কনে প্রভূত খ্যাতি ও যশ অর্জন করে বংশের সুনাম আরও বহুগুণ বিবর্ধিত করেছিলেন বাঙলা দেশের বহুবিধ সমাজহিতমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে ইনি নানাভাবে দেশের, কল্যাণসাধন করে গেছেন। সম্প্রতি শ্রীপ্রভা[illegible] বসু তাঁর একটি জীবনকাহিনী প্রণয়ন করেছেন। তাঁর জীবন নানা ঘটনায় আকীর্ণ, বহু তথ্যের আকর, অনেক লোকহিতকর কর্মের উৎস; সেই জীবনী প্রণয়নে লেখক যথেষ্ট নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সুচারু দেবীর জীবনীর পাঠকসাধারণ বহু ঘটনা তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হবেন যাদের সঙ্গে মহারাণীর যোগও ছিল অবিচ্ছেদ্য। গ্রন্থটি সুলিখিত, মহারাণী সুচারুর জীবনের বিভিন্ন কাহিনী সুবর্ণিত, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী প্রাঞ্জল এবং মনোরম গ্রন্থটিতে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পারিবারিক প্রতিকৃতি, মহারাণী রচনাশক্তির নিদর্শন, মহারাণী সুচারুর সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী হেমলতা ঠাকুর, অমল হোম, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুষমা সেন প্রভৃতি রচনাদি গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বর্ধন করেছে। প্রকাশক: মহারাণীর ক[illegible] রাণী জয়ন্তী দেবীর পক্ষ থেকে লেখক স্বয়ং, ই-২৩-সি, সি, আই, [illegible] বিল্ডিংস। কলকাতা—১৪। দাম—চার টাকা মাত্র।

শ্রীআলবন্দার স্তোত্র (স্তোত্র রত্ন)

(অন্বয়ার্থ ও টীকা সমেত)

বেদজ্ঞ মহাপণ্ডিত দ্রাবিড় বেদের চর্চ্চার পুনঃ প্রবর্ত্তক নাথমুনি বংশোদ্ভব মনস্বী শ্রীযামুনাচার্য্য স্বামী ভগবদ্‌ভক্তি বিষয়ক [illegible] অপূর্ব স্তোত্রমালা রচনা করেন তাই আলবন্দার স্তোত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রেম ভক্তিরসে পরিপূর্ণ এমন অপরূপ স্তোত্রমালা ধ[illegible] সাহিত্যের ভাণ্ডারেও খুব বেশী নেই। এগুলির মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মে[illegible] মূল রীতি ও প্রকৃতির পরিচয় বিধৃত হয়েছে। বেদশাস্ত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটিত এদের মাঝে, এরূপ অমূল্য সম্পদকে বাংলাভাষী পাঠক সমাজের অধিগম্যরূপে প্রকাশ করার জন্য আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদক প্রভূত ধন্যবাদের পাত্র। ভক্তজন এই মূল্যবান শাস্ত্রীয় অনুবাদ কর্ম্মে সাদরে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি; মূল লেখক—শ্রীযামুনাচার্য্য স্বামী। অনুবাদক আচার্য্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস প্রকাশক শ্রীহয়গ্রীব রামানুজ দাস (শ্রীহরিভূষণ বসু), শ্রীবলক[illegible] ধর্ম্মসোপান, খড়দহ ২৪ পরগণা, মূল্য—এক টাকা পঁচি[illegible] নয়া পয়সা।

দুরন্ত চড়াই

'দুরন্ত চড়াই' খ্যাতিমান শিল্পীর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস মননশীল কথাকার আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে একটি সাধারণ মে[illegible] ক্লান্তিকর জীবন থেকে উত্তরণের ছবি এঁকেছেন। কাহিনীর নায়ি[illegible]

বিন্নু বাংলা দেশের সেই অগণিত মেয়েদেরই একজন, কৈশোর থেকে যৌবন যাদের অতিক্রান্ত হয় বিবাহের হাটে বিক্রীত হওয়ার জন্ম অপেক্ষা করে করে। মাংসলোভী ক্রেতা আসে একের পর এক, ক্ষীয়মাণ যৌবনকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে ধরতে হয় তাদের সামনে, উদ্দেশ্ম যদি বিকোতে পারে। এই জীবনযাত্রার মাঝেই সে একদিন দেখা পেল এমন একজনের যার চোখের আলোয় খুঁজে পেলো নিজেকেই নতুন করে, যার কাছে শুধু মেয়েমানুষ বলেই নয় মানুষ হিসাবেই সে স্বীকৃত। দুরন্ত চড়াই ঠেলে ঠেলে বিকশিত হল একটি সত্ত্বা, আপন মহিমায়, বৈশিষ্ট্যে অনন্ম হয়ে। প্রেমের দাক্ষিণ্যে দূরীভূত হল জমে ওঠা সব গ্লানি সব ক্লান্তি। বলিষ্ঠ লেখনীতে রূপায়িত করেছেন লেখক জীবনের এক অনাদি জয়গাথা; তাঁর আশ্চর্য্য সুন্দর শৈলী বিষয়বস্তুকে অপরূপ ভাবেই প্রকাশ করেছে। মানব জীবনের এ এক অপরূপ রূপকথা। বইটির আঙ্গিক রুচিসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চমানের। লেখক—সমরেশ বসু, প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—পাঁচ টাকা।

উত্তররবি

আলোচ্য পুস্তকটির প্রথম পাতায় এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'অভিজাত সাহিত্য সংকলন' বলে, অবশ্য কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন দেওয়ার রেওয়াজ সব দেশেই আছে এবং একমাত্র সেই হিসাবেই বর্ত্তমান গ্রন্থের উক্ত নামকরণ সম্ভব। যে কয়টি রচনা এতে সংগৃহীত হয়েছে তার কোনটিই যে সাহিত্য পদবাচ্য নয় একথা আমরা সদুঃখে স্বীকার করতে বাধ্য, সেই সঙ্গে আছে অসংখ্য ছাপার ভুল ও বর্ণাশুদ্ধি। এ ধরণের তৃতীয় শ্রেণীর কোন সংকলন যে কোন সম্পাদকেরই চরম ব্যর্থতার নিদর্শন। ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। সম্পাদক—লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক—উত্তর-রবি, ১৩, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা, দাম—এক টাকা মাত্র।

ব্রজনাথ-গাথা

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু ধর্ম্মমূলক, বেদান্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র মন্থনে যে তত্ত্ব সাধক লেখকের মননে পরিস্ফুট হয়েছে, বর্ত্তমান রচনায় তিনি তারই ব্যাখ্যা করেছেন। শাস্ত্রাদির সুগভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে বিখ্যাত মনীষিবৃন্দ যুগে যুগে বহু আলোচনা করেছেন টীকা-টিপ্পনী সমেত, কিন্তু সাধারণতঃ সে সব বিদগ্ধজনের পক্ষেই অনুভবগম্য, সেজন্মই সাধারণের বোধগম্য ভাষায় শাস্ত্রব্যাখ্যার প্রয়োজন ও সার্থকতা সমধিক, আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা সেই সার্থকতাকে লক্ষ্য করেই যে আরব্ধ কর্ম্মে ব্রতী হয়েছেন, এটা সত্যই সুখের বিষয়। ধর্ম্ম অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাজ যে এই গ্রন্থটিকে যোগ্য সমাদরে বঞ্চিত করবেন না, এ আশা আমরা সহজেই করতে পারি। বইটির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ, প্রকাশক—শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ। শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী, মূল্য—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মাটির সুর

আলোচ্য গ্রন্থটি একখানি কাব্যপুস্তক। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে কবিরা তাঁরই ভাবধারা অনুসরণ করেও অনেকেই স্বকীয়তার পরিচয় প্রদান করতে সমর্থ হয়েছেন, বর্ত্তমান কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা তাঁদেরই অন্যতম। আধুনিক কাব্য রীতির বিচারে খানিকটা প্রাচীন পন্থী বলে প্রতীয়মান হলেও এই কবির সৃষ্টিতে একটা সহজ সুষমা আছে, কবিতাগুলি আন্তরিকতায় সত্যই মর্ম্মস্পর্শী। মোট একচল্লিশটি কবিতা গ্রথিত হয়েছে বর্ত্তমান সংকলনে, ভাষা, ভাব ও ছন্দ সবই একটা সুষম সঙ্গতির পরিচয়বাহী, সহজেই মনের তারে তারে একটা ঝঙ্কার তুলে দেয়। কবি স্বপ্ন দেখেন এক নতুন জগতের সেই স্বপ্নের মর্ম্মবাণী ধ্বনিত হতে দেখি তাঁর রচনায়, মৃত্যু দস্যু সাম্য শুধু করে না রক্তপাপ। একটি রুটির পরশ লভিতে দিতে তার শেষ দাম—ফুসফুস ছিঁড়ে হয় না বাহির রক্ত অবিশ্রাম। এই মর্ম্মকথা আজ সব দেশের মানুষেরই আপন কথা, এজন্মই কবিতাগুলির মধ্যে পাঠকমন সহজেই নিবিষ্ট হয়ে যেতে পারে। আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—আবদুল গণি খান, প্রকাশক—মতিয়া খাতুন, ১২ পীর বাহরাম রোড, বর্দ্ধমান, মূল্য—দু'টাকা।

মানস প্রতিমা

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি সংক্ষিপ্ত কাব্য সংকলন। মোট আঠারোটি কবিতা একত্র সংকলিত হয়েছে, ভাষা ভাব ও ছন্দের সারল্যে কবিতাগুলি সত্যই হৃদয়গ্রাহী। বর্ত্তমান কাব্য রূপ ও রীতির মানদণ্ডে মননশীল বলে পরিগণিত হতে না পারলেও একটা সহজ সৌন্দর্য্যে এরা পাঠক মনে রেখাপাত করে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কয়েকটি রচনার মধ্যে অতি স্পষ্ট, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এমন একটি সরল মাধুর্য্য ব্যক্ত হয়েছে যার জন্ম তারা উপভোগ্য। স্বকীয়তায় বলিষ্ঠ না হয়েও তাই রচনাগুলি আন্তরিকতায় সুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। কাব্য গ্রন্থটির আঙ্গিক অতি সাধারণ। লেখক—রাধাকান্ত সিংহ, পরিবেশক— পুস্তক, ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য দু' টাকা।

কে মরেছে? কান্না কিসের?
বেশ ক'রেছে!
দেশ বাঁচাতে আপ নারি ?
শেষ ক'রেছে!
বেশ ক'রেছে!!
শহীদ ওরাই শহীদ!
বীরের মত প্রাণ দিয়েছে
খুন ওদেরি লোহিত!
শহীদ ওরাই শহীদ!!! —নজরুল ইসলাম

॥ তামিল গল্প ॥

অখিলন্

সম্প্রতি অরিয়ালুরে ভয়ঙ্কর এবং হৃদয়বিদারক এক ট্রেণ-দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ঈশ্বর করুন, এই ধরনের ভয়ঙ্কর বিপত্তি যেন ভবিষ্যতে কোনদিন না হয়। এই ঘটনা কয়েক মাস আগে ঘটলেও আমার সেই চোখের জল শুকিয়ে গেলেও তার ছবি চোখের সামনে থেকে, স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। হাজার চেষ্টা করছি ভুলে যাওয়ার, কিন্তু পারছি না। ভেবেছিলাম দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার চাপে ওটা চাপা পড়ে যাবে, কিন্তু তা হয়নি। আজও চোখের সামনে সেই দৃশ্য জ্বল-জ্বল করছে। কানে বাজছে হাজার মানুষের আর্তনাদ। আমার এই মনের বোঝা আপনাদের কাঁধে যদি কিছুটাও এগিয়ে দিতে পারি তাহলে মন আমার সামান্য হালকা হবে। শুনবেন আপনারা? তাহলে বলি।

ভোর রাত্রি। আর কিছুক্ষণ পরেই সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে। অন্ধকার হবে দূরীভূত। সেই ভোর রাত্রের অন্ধকারের বুক চিরে ট্রেণ এগিয়ে চলেছে। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জানলাগুলো বন্ধ। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ তিরুচী পৌঁছাবে। যাত্রীরা সেখানে গরম গরম কফি খেতে পাবে। যারা গাড়ি বদল করতে চায় তারা নেমে যাবে সেই ষ্টেশনে। বহু লোক হয়ত আগন্তুকদের অপেক্ষায় ইতিমধ্যে তিরুচী ষ্টেশনে পৌঁছে গেছে। যাত্রীরাও সেই প্রতীক্ষারত মানুষের কথা চিন্তা করছে।

ভুবনেশ্বরী কোন অপেক্ষমানের কথা ভাবছে না। তার কোন ভয় নেই। সে তো আর একা নয়, ছোট ভাই রয়েছে সঙ্গে। ষ্টেশনে নেমে একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করে সোজা চলে যাবে বাপের বাড়ি। ষ্টেশন থেকে বাড়িটা এমন কোন দূরে নয়। বিজয়পুরম পৌঁছাতে আর কতক্ষণই বা লাগবে।

তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভাইবোন এককোণে বসে রয়েছে। ভুবনেশ্বরীর আশেপাশে কয়েকজন মহিলা পা-গুটিয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার ভাই দিদির পাশে বসতে না পেরে অদূরে বসে রয়েছে। প্রচণ্ড ভিড়। একজনের পায়ের কাছে আর একজনের মাথা, বাঙ্ক থেকে নিচে পর্যন্ত মানুষ এবং জিনিসপত্রে ঠাসা। বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়ায় ফলে হয়ত গরম এবং ঠাণ্ডায় মনোরম আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে ঐ কামরায়। ওরা দু'জন বাদে আর সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে। কয়েকজন তো একনাগাড়ে নাক ডাকাচ্ছে। ভাই রাত্রের গোড়ার দিকে ঘুমিয়ে ছিল এখন সে জেগে উঠেছে। সারারাত বোন চোখের পাতা এক করতে পারে নি। এখনও সে জেগে ঠায় বসে আছে।

ভুবনেশ্বরীর বয়স একুশ-বাইশ। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তির ছাপ চোখে মুখে চেহারায় সুস্পষ্ট। তার উপর সারারাত জেগে কাটানোর ফলে চেহারা আরও মলিন এবং বিমর্ষ দেখাচ্ছে। ক্লান্তিতে সে সামান্য একটু হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। ভুবনেশ্বরীর গায়ের রঙ গোলাপের পাপড়ির মত। নাক-মুখ-চোখ এক কথায় চমৎকার। উন্নত বুক, আর বসার ঢঙ দেখে বেশ বোঝা যায় ভুবনেশ্বরী গর্ভবতী। দূর থেকে দেখলে তাকে মনে হয় যেন হাতীর দাঁতে নির্মিত সুন্দর একটি মূর্তি।

ভুবনেশ্বরীর গায়ে বেশি আভরণ নেই। গলায় একটি হার। কানে কর্ণফুলী, হাতে সোনার চুড়ি। গলায় হলুদরঙের সুতোয় বাঁধা একটি মঙ্গলসূত্রও রয়েছে। পরনে গোলাপী রঙের শাড়ি আর গায়ের জামার রঙ কালো। সামগ্রিক ভাবে এই আভরণ এবং আবরণে বেশ মানিয়েছে তাকে।

বৃষ্টি একটু কমেছে। ভুবনেশ্বরী জানলা খুলে ফেলল। তার ভাইও তার কাছের জানলা খুলে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। ট্রেণ ঝক-ঝক-ঝক করে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। ট্রেণ হঠাৎ ঢুকল একটি বিরাট সেতুর উপর। ভুবনেশ্বরী জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেল সেই সেতু। হঠাৎ এক ঝলক বাতাস তার মুখে লাগল। নদীতে বান ডাকছে।

ভুবনেশ্বরী উঁকি মেরে নীচের দিকে তাকাল। নদীর জল যেন প্রচণ্ড গর্জন তুলে ধেয়ে চলেছে। জলের শুভ্র ফেনাও যেন সতেজ ও সুতীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। ভুবনেশ্বরীর কাছে সে-দৃশ্য সুন্দর না লেগে ভয়ঙ্কর মনে হল তার কাছে। আর উঁকি না মেরে নিজের জায়গায় বসল।

মুহূর্তে হাজার বৈদ্যুতিক আলো যেন জ্বলে উঠল একসঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র যেন ভেঙ্গে পড়েছে।
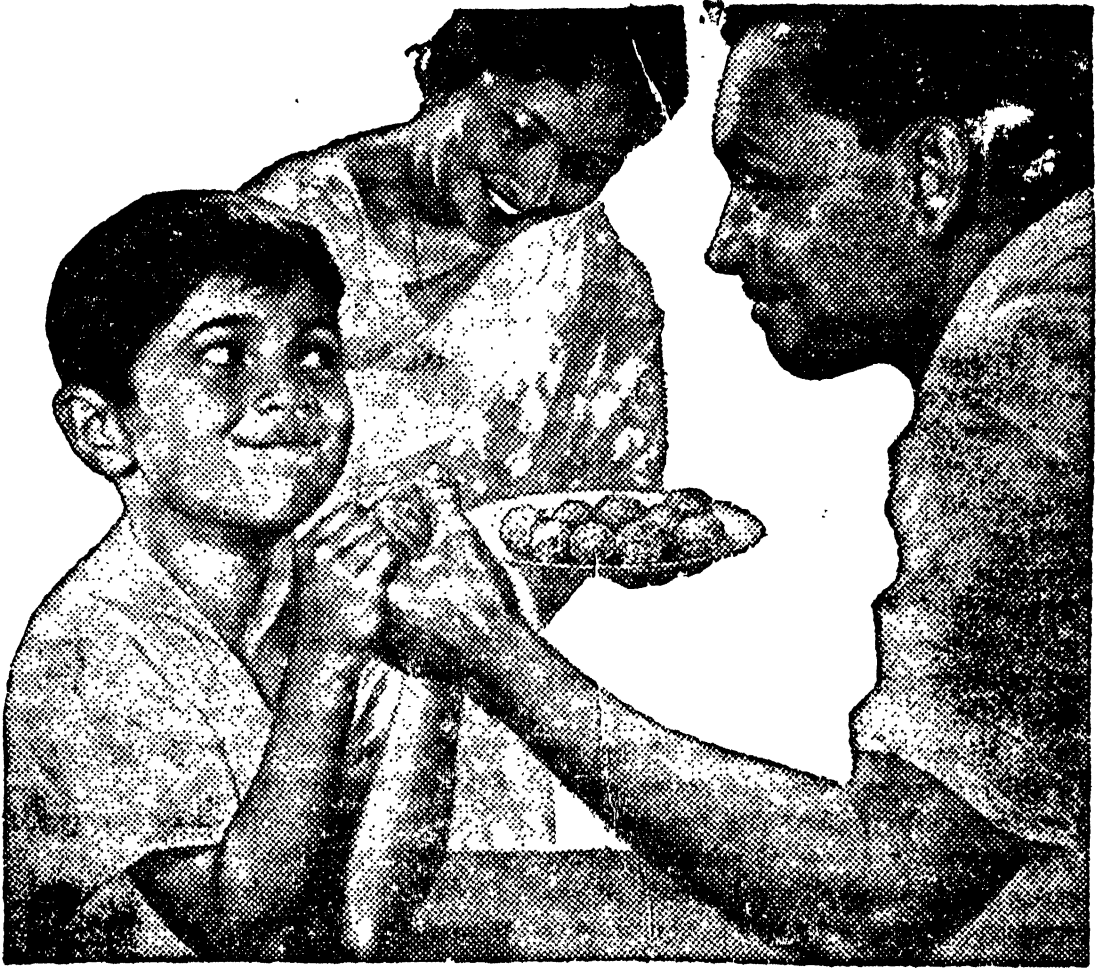
একি! বজ্রপাত কি তাহলে ট্রেণের উপর হয়েছে। ভুবনেশ্বরী

বিহ্বল হয়ে বিস্ফারিত চোখে চারদিক তাকাতে লাগল। বাঙ্কের উপর যারা শুয়েছিল তারা নিচে পড়ল, আর নিচের লোক চাপা পড়ল। জানলার কাচ ভেঙ্গে গেছে। ফ্যান ভেঙ্গে পড়ে গেছে। আলো নিভে গেছে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে ভুবনেশ্বরী যে প্রবল জলরাশিকে দেখেছে দূরে এখন সে নিজেই সেই জলপ্রবাহের মধ্যে। হাজার মানুষের আর্তনাদ, চিৎকার, বুকফাটা কান্না আবহাওয়াকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। এমন হৃদয়বিদারক মানুষের করুণ আর্তনাদ ভুবনেশ্বরী'এর আগে কোনদিন শোনেনি। ট্রেণ লাইনচ্যুত হয়ে সোজা সেই নদীতে পড়ে গেছে!

তারপর কি হল, সে জানে না। জ্ঞান হওয়ার পর দেখল, সে নদীর জলে ভাসছে। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সে চারবার ছোট ভাইকে ডেকেছিল বটে, প্রত্যুত্তরে শুনেছিল: দিদি তুমি কোথায় আছ? ভুবনেশ্বরী তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। তবু সান্ত্বনা যে ভাই বেঁচে আছে। নদীপ্রবাহ প্রতি মুহূর্তে তাকে অতল জলের গভীরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। ভুবনেশ্বরী সামান্য সাঁতার জানত, তাই রক্ষে। কিন্তু সারা শরীর তার অবশ হয়ে আসছে, আর পারছে না প্রবাহের প্রতিকূলে এমন কি অনুকূলেও নিজেকে ভাসিয়ে দিতে। পৃথিবীর মানুষ হয়ত তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

ট্রেণ ছাড়ার পূর্বক্ষণে ভুবনেশ্বরীর স্বামী বলেছিল, বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টেলিগ্রাম করো। ভুবনেশ্বরী দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে এখন ভগবানকে ডেকে বলছে, ভগবান, আমাকে মেরে ফেলো, কিন্তু আমার এই শিশুকে রক্ষা করো।

ভগবান যে শিশুকে তার গর্ভে আশ্রয় দিয়েছে, সেই শিশুর ভারে এখন ভুবনেশ্বরী যেন আরও তলিয়ে যাচ্ছে। দু' তিনবার জল খেয়েছিল। ডুবছে আর ভাসছে। হঠাৎ তার মাথা ঠেকল কিসে যেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকাল চারদিকে। হাত বাড়াল সেটা ধরার জন্যে। বটগাছের ঝুরি সে ধরতে পেরেছে। ভুবনেশ্বরী সামান্য একটু এগোনোর চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। সেই ঝুরি ধ'রে ঝুলে রয়েছে। পায়ের নিচে জলের কত গভীরতা কে জানে! ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় সেই ঝুরি ধরে থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে।

ভোর হল। সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে। আশপাশে শবদেহগুলো ভাসছে। মাঝে মাঝে কাক আর শকুনিরা এক-একটা শবদেহের উপর বসে ঠোকর মারছে। এ সব কিছু ভয়ঙ্কর লাগল ভুবনেশ্বরীর কাছে। এক একটা শবদেহের আবার তার গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, জল আর ঘন জঙ্গল। জলপ্রবাহের গতি একটু কমেছে মনে হল। কিন্তু তাতে কি! একটুও যে সে এগোতে পারছে না। কয়েকজন লোক ছুটে এল ব্যাপারটা দেখতে। ভুবনেশ্বরী চোখ বড় বড় করে জনরব শুনতে পেয়ে তাদের দিকে তাকাল। চিৎকার করে ডাকল তাদেরকে। কিন্তু তার ডাক তারা কেউ শুনতে পেল না। ভুবনেশ্বরীর মনে হল সে যত চিৎকার করে ডাকুক না কেন, তার ডাক এক গজ দূরের মানুষও শুনতে পাবে না। কণ্ঠ তার রুদ্ধ। হঠাৎ তার চোখ নিবদ্ধ হল একটি চেহারার উপর। সেটা মানুষের চেহারা বলে মনে হচ্ছে না। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, বিরাট লম্বা-চওড়া চেহারা। ছোট ছোট চোখ, হাত আর বুক লোমে ভরে আছে, তাকে দেখে বনমানুষ বলে ভুল হয়। কালো পাথরে গড়া একটি দানবমূর্তি যেন। ভুবনেশ্বরী আশপাশের শবগুলোর দিকে বিস্ফারিত চোখে আর একবার তাকাল যেন। এ সে কোথায় আছে! লোকটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভুবনেশ্বরীর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিভিন্ন শবদেহের কাছে গিয়ে তাদে গলার হার আর কানের কর্ণফুলী ছিঁড়তে লাগল। তার চোখ জ্বলছে মুখে নিষ্ঠুর হাসি লেগে রয়েছে। নাকের স্বর্ণালঙ্কারও একটানে ছিঁড়ে ফেলছে। আশপাশের শবগুলোর যা ছিল সব টেনে ছিঁ নিয়ে, এল ভুবনেশ্বরীর কাছে। ভুবনেশ্বরী গাছের ঝুরি ধরে ঝুলে এতক্ষ দেখছিল এসব। লোকটা তার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে সকাতর কণ্ঠে বলল, আমাকে কিছু করো না। আমার গায়ের সমস্ত গহনা নিজে খুলে দেবো। আমার মাত্র একটি অনুরোধ। আমাকে বাঁচাও। তোমা পুণ্য হবে।

লোকটা কোন কথা বলল না। হঠাৎ ভুবনেশ্বরীর হাত ধরে চুড়িগুলোকে টেনে বের করে ফেলল। ভুবনেশ্বরীর হাত চিরে রক্ত ঝরল। তারপর আবার অন্য হাতের চুড়িগুলো একই ভাবে টেনে নিল। ভুবনেশ্বরী সেই রক্তঝরা হাতে ঝুরি ধরে রয়েছে। তারপর তাকে টেনে নদীতীরে নিয়ে এসে তার কানের এবং গলার সমস্ত অলঙ্কার নিয়ে নিল। বলা চলে, ভুবনেশ্বরী নিজেই খুলে দিল।

তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভুবনেশ্বরীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাত দিল মঙ্গলসূত্রের উপর। ভুবনেশ্বরী জোড় হাত করে বলল, দয়া করে এটা নিয়ো না। তোমার যদি কোন ছেলেমেয়ে থাকে তাহলে তার দিব্যি দিয়ে বলছি এই মঙ্গলসূত্র নিয়ো না! কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। ওর চোখমুখ দেখে ভুবনেশ্বরীর মনে হল সে তাকে মেরে ফেলতে চায়। তাই সে করজোড়ে প্রার্থনা করল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমার জীবনের পরিবর্তে এসব গয়নাগুলো তো দিচ্ছি।

এ কথারই জবাবে প্রথম সে মুখ খুলল,'বুঝতে পেরেছি। তুমি আমাকে পুলিশে দিতে চাও।

আর সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল মদের দুর্গন্ধ। ভুবনেশ্বরী সকাতরে বলল, না-না, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কাউকে কিছু বলব না। ভাই একটি কথা। মনে রেখো আমি গর্ভবতী। গর্ভবতীকে হত্যা করলে বেশি পাপ হয়। তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে বাঁচাও। আমার এই গর্ভজাত শিশুকে বাঁচাও। ভুবনেশ্বরী তার পায়ে পড়ে মাথা কুটল, আর্তনাদ করল, প্রার্থনা করল।

কিন্তু তবুও তার মন গলল না! সমস্ত গয়নাগুলোকে কোমরে বেঁধে নিয়ে ভুবনেশ্বরীকে দুই হাতে তুলে ছুঁড়ে দিল নদীর জলে। তারপর সে চলে গেল। ফিরেও তাকাল না একবার।

ভুবনেশ্বরী চোখ খুলে দেখে সে বালিয়াড়ির উপর পড়ে রয়েছে। তার গায়ে ভেজা শাড়ি নেই; একটা ছেঁড়া তাপপি দেওয়া শাড়ি পরণে, তার মাথার কাছে বসে এক গাঁয়ের মেয়ে ভুবনেশ্বরীর চুল শুকানোর চেষ্টা করছে।

—বোন, তুমি কত সুন্দরী! একি, হাতে রক্ত ঝরছে কেন!

সহানুভূতির কথা শুনে ভুবনেশ্বরীর চোখ ফেটে জল এল। নীরবে চোখ মুছে নিল।

—দেখে মনে হচ্ছে তুমি গর্ভবতী।—মাস পূর্ণ হয়ে গেছে নাকি?

—হ্যাঁ মা।

—'মা' শব্দটি ভুবনেশ্বরীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে যেন বেরুলো। ঐ এক কথাতেই ঐ গাঁয়ের মেয়ের মনে ভুবনেশ্বরী আসন করে নেয়। সব কথা শুনে মেয়েটি বলল, হায় ভগবান, মাত্র

এটুকুর জন্যে এক গর্ভবতীকে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। ঐ পাপীকে এখনো এই পৃথিবী বহন করছে। হঠাৎ গর্ভযন্ত্রণা ওঠায় ভুবনেশ্বরী আর্তনাদ করে উঠল। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সে কয়েকজন প্রতিবেশী মহিলাকে ডাকল। ততক্ষণে ভুবনেশ্বরী মূর্চ্ছা গেল।

মেয়েটির বয়স মাঝামাঝি। নাম মরুদাই। কুঁড়েঘরের ভেতর তার ছেলেটি ঘুমিয়ে রয়েছে! তারপর সে তার পাঁচ বছরের মেয়েকে ভুবনেশ্বরীর কাছে রেখে বুড়ী দাইকে ডেকে আনার জন্য গেল। বুড়ী এসে জল গরম করল। নাড়ী কাটার ছুরি এগিয়ে দিল।

ভুবনেশ্বরী আর্তনাদ এবং ছটফট করছে। পৃথিবীতে একটি শিশুকে আনার যন্ত্রণা। একটি শিশুর জন্মযন্ত্রণা সে ভোগ করছে।

সূর্যরশ্মিতে ভরে গেছে পৃথিবী। আর সেই মুহূর্তে এই মর্ত্যভূমিতে আর একটি শিশুর আবির্ভাব ঘটল। মুঠি তুলে সদ্যোজাত শিশুটি কাঁদছে। চারদিকের বনজঙ্গলে নতুন শিশুর কান্না ছড়িয়ে পড়েছে, ভুবনেশ্বরী পাশ ফিরে তার নবজাত-শিশুকে দেখল। আনন্দে তার মন ভরে গেল।

গাঁয়ের অনেক মেয়ে ঘিরে দাঁড়াল ভুবনেশ্বরীকে। শিশুটি মায়ের মতন হয়েছে সুন্দর। চোখ-মুখ-নাক ঠিক মায়ের মত। হাত-পা ছুড়ে সে কাঁদছে।

ঠিক সেই সময় দূর থেকে কয়েকজনের চিৎকার শোনা গেল। পুলিস এসেছে।

—কিসের অত ভিড়।

মারুদাই ওদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? ঘরে ঢুকবেন না।

—আ লুট করে আনা মালের ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে। সরো, আমাকে ঘরের ভিতর যেতে দাও।

মারুদাই মুহূর্তে যেন করাল কালীমূর্তি ধারণ করে গর্জে উঠল, আপনি কি কোনদিন ভাল কিছু দেখেন না! চুরি-ডাকাতি আর লুট ছাড়া কোন কথাই নেই মুখে। অতই যদি লুটেরাকে ধরার ইচ্ছা থাকে তা হলে যে-পাপীটা এই গর্ভবতীকে আধ-মরা করে জলে ছুঁড়ে দিয়েছে তাকে ধরুন না কেন! ভাল কথায় বলছি, চলে যান এখান থেকে, ঘরে ঢুকবেন না।

পুলিস এবং পুলিসের লোক থতমত খেয়ে গেল তার কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে। কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলল। ইংরেজীতে কথা বলায় ওদের কথা বুঝতে পারল না মারুদাই। ওদের মধ্যে একজন মারুদাইকে বলল, কিছু গয়নাসহ আমি চারপাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছি।· ওদের যদি আমি এখানে আনি, তোমার ঐ মহিলাটি কি আসল লোককে চিনতে পারবে?

মারুদাই বলল, এক্ষুণি নিয়ে আসুন। আপনার ছেলেমেয়েদের মাথার দিব্যি রইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হাতকড়াপরা চারপাঁচজন লোককে নিয়ে হাজির হল সে। ওদের মধ্যে একজনের দিকে নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মারুদাই আর্তনাদ করে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের মনকে কঠিন এবং দৃঢ় করে ফেলল—

এদের মধ্যে কি সে লোকটা আছে? পুলিস অফিসার বনেশ্বরীকে জিজ্ঞেস করলেন।

ভুবনেশ্বরী ক্লান্ত চোখে এক এক করে সকলের দিকে তাকাতে তাকাতে চতুর্থ ব্যক্তির উপরে চোখ নিবদ্ধ করল। এই সেই লোক। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। সেই ক্রুরহাসি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দানবীয় চেহারা। ভুবনেশ্বরী ওর দিকে তর্জনী দেখাল এবং পরক্ষণে চোখ বুঁজে এল।

—আরে পাপী, শেষে তুই কিনা এই কাজ করলি! মারুদাই চিৎকার করে উঠল। সারা তল্লাট তার গর্জনে যেন কেঁপে উঠল।

ভুবনেশ্বরী ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা।

—বোন, এই হতচ্ছাড়াই আমার স্বামী!

—ভুবনেশ্বরীর বুক ধক্ করে উঠল। একি! সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে সকাতরে প্রার্থনা জানায় পুলিস-অফিসারকে, ঐ লোকটাকে ছেড়ে দিন। আর কেন, আমি তো বেঁচে গেছি।

অগ্নিদৃষ্টিতে মারুদাই স্বামীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ভুবনেশ্বরীকে বলল, তুমি একে ছেড়ে দিতে বলছো বোন, ওকে আর স্বামী বলে গ্রহণ করবো না। ওর মত স্বামীর বউ হয়ে আর ঘর করবো না।—ওরে পাপী, তোর যদি মন থাকে, চোখের মাথা যদি এখনো না খেয়ে থাকিস, তাহলে তাকিয়ে দেখ না বাচ্চার দিকে। এইমাত্র সে জন্মেছে! বল, ঐ বাচ্চাটা তোর এমন কি ক্ষতি করেছিল যার জন্য তুই ওদের মাঝদরিয়ায় ফেলে দিয়েছিস।···আপনারা একে ছাড়বেন না বাবু। এরমত নীচ-দুরাচারী আর নেই। তাড়ির পয়সা জোটানোর জন্যে এই সেদিন এ-আমার মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। আমি অনেকদিন সহ্য করেছি, কিন্তু আর এক মুহূর্ত নয়। একে নিয়ে যান। জেলে পুরে দিন। আমার চোখের সামনে একে আর এক মুহূর্ত রাখবেন না। আমি বাকি জীবনটা ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে কোন ভাবে কাটিয়ে দেব।

পুলিস ওকে নিয়ে চলে গেল; মারুদাই ওদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা তার নাগালের বাইরে চলে গেল কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। এতক্ষণ যে চোখের জল আটকে রেখেছিল, এখন বাঁধ যেন ভেঙে গেছে। তার দুই চোখের কোণ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগল। পরক্ষণে সে সদ্যোজাত শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। চুমোয়-চুমোয় তার গাল ভরে দিল। বাচ্চাটিও যেন প্রাণিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মারুদাইয়ের দিকে। শিশুর উজ্জ্বল চোখ আর প্রাণভরা হাসি দেখে মারুদাই যেন সব ভুলে গেছে। ভুবনেশ্বরীর মনে হল হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে এখনো মানবতা হারিয়ে যায়নি।

অনুবাদক—বোম্মানা বিশ্বনাথম্।

আলবের্তো মোরাভিয়া

সুনীলকুমার নাগ

সাধারণ মানুষের কাছে ইতালী পৃথিবীর অনেক দেশের মতই একটি দেশ মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু শিল্প সাহিত্য রসিকগণের কাছে ইতালী একটা গোটা জগৎ—একটা ভিন্ন জগৎ। সাহিত্যজগতে এই যে বিশিষ্টতা তা' ইতালীর আদি মহাকবি ভার্জিলের 'সময় থেকেই সুরু হয়েছে। সে আজ দু'হাজার বছর আগের কথা। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি শতাব্দীতে, প্রতি যুগে ইতালীর কবি, নাট্যকার, গল্পকার বা ঔপন্যাসিক প্রত্যেকেই তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে জাতীয় বৈশিষ্ট্য শুধু বজায় রেখে যান নি—তাকে সমৃদ্ধ করেও গেছেন। ভার্জিলের পর থেকে আজ পর্যন্ত ইতালীতে এ রকম অন্ততঃ দশ বারো জন সাহিত্য-স্রষ্টার আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের মধ্যে যে-কোনো একজনের সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই একটা সভ্যতা গড়ে উঠতে পারতো। কাজেই তাঁদের সমবেত সৃষ্টি যে ইতালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির মানকে কতোটা উন্নত করে দিয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, লুক্রেসিয়স, বোক্কাচিত্ত, অরিস্তস্তো, ওভিদ, পেত্রার্ক প্রভৃতির মতো সাহিত্যস্রষ্টার আবির্ভাব কোনো দেশেই খুব বেশি হয় নি।

সভ্যতার উন্মেষের দিক থেকে দেখতে গেলে ইতালীর স্থান ইয়োরোপে দ্বিতীয়—অর্থাৎ গ্রীকদের পরেই। গ্রীসের কবি, নাট্যকার, দার্শনিক এবং ইতিহাসবেত্তাগণ খৃষ্ট যুগ সুরু হবার পূর্বেই মানব সভ্যতাকে যা কিছু দেবার তা মোটামুটি ভাবে দিয়ে যান। ইতালী তার সভ্যতার আলোক সরাসরি ভাবে গ্রীকদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলো বলা চলে। কাজেই গ্রীসের জ্ঞানবিজ্ঞান এবং শিল্প-সাহিত্যের চর্চা যেখানে শেষ, ইতালীর সেখান থেকেই সুরু। মানুষের শিল্পসাহিত্যের ভাণ্ডারে ইতালীর যে দান তার সুরু হয় খৃষ্টযুগ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই—যদিও, অবশ্য ইতালীর আদি মহাকবি ভার্জিল তাঁর মহাকাব্য "এনিড" রচনা করেন খৃষ্ট যুগ সুরু হবার কিছু পূর্বে এবং খৃষ্ট পূর্ব ১৯ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার স্থান এ নয়। ইতালীর শিল্পসাহিত্য সাধনার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আমরা কিছু আলোচনা করবো, শুধুমাত্র আজকের ইতালীকে বুঝবার জন্য আমাদের যেটুকু প্রয়োজন।

ইতালী তার জ্ঞানের দীপ গ্রীকদের দীপশিখা থেকে ধরিয়ে নেবার পরে খাস গ্রীসের আলো ক্রমশ কমতে কমতে এক সময় একেবারেই নিভে গেলো। ইয়োরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় আজকের দিনেও গ্রীসের যে কথা শোনা যায় তা প্রাচীন গ্রীসের কাব্য, নাটক, দর্শন ইত্যাদি প্রসঙ্গে। বলতে গেলে দু'হাজার বছর আগে যার শেষ গ্রন্থখানির রচনাকার্য শেষ হয়েছিল। এই ব্যাপারে গ্রীসের সঙ্গে ইতালীর একটা বিরাট তফাৎ আমরা দেখতে পাই। ইতালীও গ্রীসের মতো নিজের জ্ঞান প্রদীপে অন্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে—যেমন স্পেনের, তারপরে ফ্রান্সের, ইংরেজের এবং জর্মণী বা আরো পাঁচটা দেশের। কিন্তু গ্রীসের মতো ইতালী নিজে কখনোই একেবারে নিভে যায়নি। যেমন তার গৌরবময় রাজনৈতিক যুগ তেমনি তারপরেও এবং বরাবরই শিল্পসাহিত্যের স্রষ্টাগণ ইতালীতে আপনার নিজস্বতা বজায় রেখে প্রতি যুগেই কিছু না কিছু অমর সাহিত্যের সৃষ্টি করে চলেছেন। এটা নিঃসন্দেহে একটা অসাধারণ ব্যাপার। ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করলে এ ব্যাপারে ইতালীয়গণের জীবনীশক্তি বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। রামায়ণের যুগ থেকে সুরু করে আমরা দেখতে পাই শিল্পসাহিত্যের আলোক অনেক সময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্তিমিত হয়ে রয়েছে, কখনো বা একটানা কয়েক শ' বছর একেবারেই নিভে রয়েছে।

ইয়োরোপের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ব্রিটিশ যুগে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই হয়েছে। এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য যে কী উন্নত, কতো বিরাট স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত তা' আমরা স্কুল-কলেজে মুখস্থ করতে বাধ্য হতাম। ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্য যে যে-কোনো ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্যের তুলনায় সত্যিই উন্নত বিরাট সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু ওদের এই বিরাটত্বের গোড়ার কথাটিকে ইংরেজরা বরাবরই সুকৌশলে উহ্য রেখে গেছে—অর্থাৎ ইতালীর সাহিত্যের কাছে তাদের ঋণকে সর্বদাই ছোটো করে দেখাতে চেয়েছে। কিন্তু যা সত্য তা আপনার শক্তিতেই ক্রমশ প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে, গোটা ভারতে ইংরেজী শাসন এবং শিক্ষা কায়েম হবার পরে ইংরেজী বইয়ের মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি ইতালীর কাছে ইংরেজী সাহিত্য কতটা ঋণী। ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা প্রকৃতই স্তম্ভবিশেষ, সেই চসার, স্পেন্সার, সেক্সপীয়ার, ড্রাইডেন, মিলটন প্রভৃতি ইতালীর কাব্য-সাহিত্য ও ইতিহাস থেকে মালমশলা বা ভাবধারা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এঁদের পরবর্তীকালে বায়রণ, শেলী, কীটস, ব্রাউনিং, ল্যাণ্ডর প্রভৃতি তো সশরীরেই আসতেন ইতালীতে নতুন নতুন প্রেরণা লাভের আশায়। জর্মণীর যুগস্রষ্টা মহাকবি গ্যয়টে একাধিকবার ইতালী এসেছিলেন সেখানকার আর্ট-গ্যালারী দেখবার আশায়, সাহিত্য-রসিক মহলের সঙ্গে মেলামেশার লোভে। ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালীর যোগাযোগটা ঘনিষ্ঠতর, কারণ ইংরেজী বা জার্মাণ সাহিত্য সৃষ্টিতে ইতালী সাহায্য করলেও ঐ সমস্ত দেশের কাছ থেকে ইতালী নিজে বলতে গেলে বিশেষ কিছুই নেয়নি। কিন্তু ফ্রান্সের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টিতে ইতালী প্রেরণা জোগাবার পর সে দেশের কাব্য, সাহিত্য ও শিল্প যখন মোটামুটি একটা পরিণত অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, তার পর থেকে ফ্রান্সের কাছ থেকে ইতালী নিজেও কম গ্রহণ করেনি। সব মিলিয়ে আজকের যে ইতালীয় সাহিত্য তার শিল্পনৈপুণ্য এক কথায় বিস্ময়কর।

আমাদের বর্তমান আলোচনার সুবিধার জন্য ইতালীর সাহিত্যকে দুটো যুগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথমত আদি যুগ, অর্থাৎ ভার্জিল, হোরেস এবং ওভিদের সময়। এবং দ্বিতীয়ত দান্তে, বোক্কাচিও, অরিওস্ত ও পেত্রার্ক-এর সময়। প্রথম যুগের সঙ্গে এই শেষোক্ত যুগের প্রায় বারো চৌদ্দ শ' বছরের ব্যবধান। কিন্তু তবু এই দুই সময়ের প্রধান লেখকদের রচনাতেই একটা জিনিস ফুটে বেরোয়। সে হলো একটা সুতীব্র রোমাণ্টিকতা। ভার্জিল, ওভিদ, বোক্কাচিও, অরিওস্ত প্রভৃতির রচনায় এ রকম অনেক অংশ আছে, যখন পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হয় যে যৌনাকাঙ্ক্ষা মেটানোই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। যৌনবাসনার কমবেশি পরিতৃপ্তি যে মানুষের জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য হতে পারে, সে বিষয়ে হয়তো কোনো যুগেই ভবিষ্যতেও কোনো দ্বিমত দেখা দেবে না—যেমন অতীতে দেখা যায়নি। প্রশ্নটা হচ্ছে যৌনতা—তা যে কোনো খোলস-পরানো অবস্থাতেই হক না কেন, মানুষের জীবনের কতখানি অধিকার করে থাকবে? একটা সময় ছিলো যখন সাধারণভাবে মানুষের এবং বিশেষ করে লেখকদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার পরিধি ছিলো খুবই সীমাবদ্ধ। কাব্য ও সাহিত্য রচিত হতো সমাজের ওপর তলার মানুষের অবসর বিনোদনের জন্য। সমগ্র সমাজের জনসমষ্টির তুলনায় সংখ্যায় এঁরা ছিলো খুবই কম। কিন্তু এঁদের রুচিই যে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে নিজ নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার রুচি তৈরি করবার ব্যাপারে প্রভাবিত করতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমাজের ওপর তলার ঐ মানুষেরা সাধারণত রোমান্স ধর্মী কা[illegible] এবং কাহিনী পড়তে চাইতো বলেই ঐ ধরণের জিনিসই লেখ[illegible] হতো বেশি।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই দেখা গেছে সাহিত্যে ক্রমশঃ বাস্তবে পরশ লেগেছে। নেহাৎ কল্পিত, প্রায় অসম্ভব রসালো ধরণে রোমান্সের কদর কমে এসেছে। কিন্তু অনেক দেশে এর কিছুট ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে পরিমাণে বাস্তব জীবনের সমস্যা সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত ছিলো কার্যত: তা হয়নি—রোমাণ্টিকতা[illegible] আতিশয্য রয়ে গেছে। ইতালী এই রকম একটি দেশ। ফ্রান্স ব ইংলণ্ডের তুলনায় আজকের ইতালীর সাহিত্যে জীবনের বৈচিত্র্যের খুবই অভাব। ইতালীয় সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য আজকের দিনেও রোমান্স। আমাদের বর্তমানের আলোচ্য আলবের্তো মোরাভিয়া এ কথার সাক্ষ্য দেবেন।

আলবের্তো মোরাভিয়াকে (জন্ম ২৮শে নভেম্বর, ১৯০৭) ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার সাহিত্য-সমালোচক মহল বর্তমান পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গল্প লেখকদের মধ্যে একজন বলে স্বীকার করেছেন। মোরাভিয়ার মনোযোগী পাঠক মাত্রেই বিস্মিত হয়ে যান তাঁর অনুভূতির সূক্ষ্মতা দেখে। পাঠক অনেক সময় নিজের মনেই মোরাভিয়ার কোনো কোনো কাহিনী পড়বার সময় বলে ওঠেন—এতো তুচ্ছ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিটার মধ্যে এতো রহস্যের উৎস লুকিয়ে ছিলো?

মোরাভিয়ার প্রতিটি কাহিনীই তীব্র রোমাণ্টিকতার ভারে ন্যুব্জ, কোথাও বা নরনারীর যৌন দিকটা নিয়ে এমন খোলাখুলি আলোচনা করেছেন মোরাভিয়া যে অনেক দেশের সরকার শুধু সেই কারণেই তাঁর বই তাঁদের দেশে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

যেমন সাধারণত হয়ে থাকে মোরাভিয়ার একাধিক বই কোনো দেশে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশে হু হু করে তার বইয়ের বিক্রি হতে আরম্ভ করলো। এবং এ কথা বোধহয় নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, আজকের পৃথিবীতে মোরাভিয়ার বই যতো স্বদেশে বা বিদেশে বিক্রি হয়, এতোটা আর কারোই হয় না। এর মধ্যে একটা দুঃখের জিনিস রয়েছে। যৌনতার আকর্ষণে সাধারণ পাঠক মোরাভিয়ার বই পেলে আর কিছু চান না—যৌনতা মোরাভিয়ার সব লেখাতেই রয়েছে এবং অনেক জায়গায় দেশ এবং সমাজ বিশেষের পক্ষে বেশ আপত্তিজনক ভাবেই রয়েছে; কিন্তু এইটেই সব নয়। মোরাভিয়ার শিল্পকর্মও সত্যি বিস্ময়কর। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা যে কতখানি যৌনতার ঘোলা জল থিতিয়ে না আসা পর্যন্ত সে বিষয় নিয়ে যথার্থ আলোচনা হওয়া সম্ভব নয়।

রোমের এক বিখ্যাত স্থপতির ছেলে আলবের্তো মোরাভিয়ার একেবারে বাল্যবয়স থেকেই আশা ছিলো বাবার মতো স্থপতি হবার। বাবার পরিকল্পনায় তৈরী বড় বড় প্রাসাদোপম চার তলা পাঁচ তলা বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়াতেন মোরাভিয়া, আর কল্পনায় নিজের ভবিষ্যৎ দেখবার চেষ্টা করতেন। বারো তেরো বছর বয়সের সময় স্কুল ছুটির পরে অনেক সময়ই মোরাভিয়াকে দেখা যেতো অন্যান্য সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা ধূলোয় না মেতে বাড়ীতে বাবার অফিস ঘরে বাড়ী-ঘরের প্ল্যানগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। এক সময়ে

বাড়ীতে ঘোষণাও করলেন যে মোরাভিয়াকে স্থপতির কাজেই লাগানো হবে স্কুলের পড়াশুনো শেষ করবার পরে।

তখনো দু'বছর বাকী স্কুলের শেষ পরীক্ষার। মহা উৎসাহে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে লাগলেন মোরাভিয়া। কিন্তু ঠিক এক বছরের মাথায় এক মহাসঙ্কট দেখা দিলো। প্রায়ই বিকেলের দিকে জ্বর জ্বর ভাব, ভয়ঙ্কর কাশি সর্বক্ষণ, খিদে বলতে কিছু নেই, রাতে বেশ একটু করে ঘাম হ'তে লাগলো কিছু দিন ধরে। পরপর কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করলেন মোরাভিয়ার আত্মীয় স্বজনেরা। ডাক্তারবাবুরা পরস্পর-বিরোধী কথা বলতে লাগলেন। কেউ বললেন দুর্বলতা, কেউ বললেন ব্রঙ্কাইটিস আবার কেউ সরাসরি টি· বি· হয়েছে বলে ঘোষণা করলেন।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেলো। ইতিমধ্যে স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার সময় এগিয়ে এলো। দিন দিন শীর্ণ হয়ে পড়তে লাগলেন বালক মোরাভিয়া। স্থপতি হবার বাসনা এতো দিনে দৃঢ় ভিত্তি করে ফেলেছিল ওঁর মনে। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে যাবার পর স্থপতি হিসেবে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করবার জন্য আলোচনা হতে আরম্ভ হয়েছে বাড়ীতে। এমন সময় একদিন প্রবল জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়লেন বালক মোরাভিয়া। আত্মীয়স্বজন সবাই বুঝলেন কিছু একটা ভয়ঙ্কর অসুখ রয়েছে ওর ভেতরে ভেতরে। তাই, বড় ডাক্তার এলো এবার, নগরীর সেরা দু'জন চিকিৎসক। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন ওঁরা এবং তারপর দু'জনেই একবাক্যে জানালেন যে বালকের টি-বি হয়েছে; এখন থেকে ঠিক মতো চিকিৎসা এবং রুটিন-মাফিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে পারলে জীবনের আশঙ্কা নেই, আর তা' না হলে—!

সকলেই মুষড়ে পড়লেন ডাক্তারবাবুদের কথা শুনে। ওঁরা আরো বললেন যে অবিলম্বে বালককে পরিবারের অন্য সমস্ত লোকজন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বসবাসের বন্দোবস্ত করতে হবে—তা' না হলে পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হবে রোগটা।

একথার পর মোরাভিয়ার বাবা একটা স্যানাটোরিয়ামে ওর থাকার বন্দোবস্ত করলেন। স্থাপত্যবিদ্যার ওপর কতকগুলি বই একটা বড়ো স্যুটকেশে পুরে নিয়ে একদিন স্যানাটোরিয়মের উদ্দেশে রওনা হলেন মোরাভিয়া। স্যানাটোরিয়মে আসবার পরে প্রথম কয়েকটা মাস স্থাপত্যবিদ্যার বই ছাড়া আর কিছুই পড়তেন না। কিন্তু স্যানাটোরিয়মের অন্যান্য বয়স্ক রোগীদের সঙ্গে মেলামেশার পর কিছু কিছু সাহিত্যের বইও পড়তে আরম্ভ করলেন। বিশেষ করে ইংরেজী এবং ফরাসী নভেল এবং গল্পের ইতালীয় অনুবাদ। এই ভাবে বছর খানেক কাটবার পরে মোরাভিয়া ঠিক করলেন ইংরেজী এবং ফরাসী দু'টো ভাষাই শিখে ফেলবেন। ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবুরা জানিয়েছিলেন যে পুরো দুটো বছরই কাটিয়ে যেতে হবে স্যানাটোরিয়মে। মোরাভিয়া তাই ঠিক করলেন যে স্যানাটোরিয়ম ছাড়বার আগেই ইংরেজী এবং ফরাসী, এ ভাষা দুটোতো মোটামুটি আয়ত্ত করতেই হবে, উপরন্তু এক আধটা গল্প লেখবারও চেষ্টা করতে হবে। বলাই বাহুল্য গল্প লেখবার এই যে ইচ্ছেটা এটা সাহিত্যপাঠের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হঠাৎ একটা খেয়ালই বলতে হবে; কারণ তখন পর্যন্ত পেশা হিসেবে স্থপতির কাজটাকেই মোরাভিয়া নিজের প্রকৃত লাইন বলে মনে করতেন। এবং নানাধরণের পত্রপত্রিকা যা স্যানাটোরিয়ামে রাখা হতো সে সবে স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে কোনো নিবন্ধ পেলে আগ্রহসহকারেই পড়তেন উনি।

ঠিক দু'বছর পরে স্যানাটোরিয়াম থেকে ছাড়া পেলেন মোরাভিয়া—সে সময়ে ওঁর বয়স ঠিক উনিশ বছর। ডাক্তারবাবুরা জানালেন যে ওর টি, বি, অনেকটা কমের দিকে, আরো কিছুদিন সাবধান মতো থাকতে পারলে একেবারে সেরে উঠবার আশা আছে, এ কথাও তাঁরা জানালেন। স্যানাটোরিয়াম থেকে যে ছেড়ে দেওয়া হলো তার কারণ অপরকে সংক্রামিত করবার মতো রোগের প্রকোপটা এখন আর নেই।

স্যানাটোরিয়াম থেকে ছাড়া পাবার পরেই স্থপতি হিসেবে কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশী সুরু করা যাবে মনে মনে এই রকম একটা ধারণা ছিলো মোরাভিয়ার। কিন্তু এবার যখন বুঝলেন তার সম্ভাবনা নেই তখন সত্যি মনমরা হয়ে পড়লেন। আত্মীয়স্বজন-বন্ধু-বান্ধব সবাই বোঝাতে লাগলেন, এখনো একেবারে নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। আরো কয়েকটা বছর একটু সাবধান মতো থেকে শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ করে নেবার পরে স্থপতির কাজ শেখবার পথে আর কোনো বাধা থাকবে না। সবার আগে শরীরটা ঠিক করা দরকার।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অবশ্য মোরাভিয়া নিজেকে অনেকটা সামলে নিলেন। টি, বি-র কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত যে কোনো রকম দৌড়-ঝাঁপ বা কায়িক পরিশ্রম করতে যাওয়া ঠিক হবে না—এ কথাটা বুঝবার মতো বয়স ওঁর হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত অন্তর চাইছে কিছু একটা কাজ করতে, অথচ এদিকে ডাক্তারের নির্দেশ বাড়ী থেকে বেরোনো চলবে না। এই রকম অবস্থায় একজন যুবকের মানসিক অবস্থা কী হতে পারে তা' সহজেই অনুমেয়। এই সময়ই একদিন হঠাৎ মনে পড়লো মোরাভিয়ার যে কাজ আছে, হাতের কাছেই কাজ আছে, যে কাজ করবার জন্য বাড়ীর বাইরে যেতে হবে না এবং যে কাজ করতে ডাক্তারবাবুদেরও বারণ নেই। মোরাভিয়ার মনে পড়লো স্যানাটোরিয়মে থাকতে এক সময় একটা গল্প লেখবার চেষ্টা করেছিলেন। স্যুটকেশ হাতড়ে পাণ্ডুলিপির বাণ্ডিলটা বের করলেন—বেশ বড় একটা গল্পের খানিকটা লেখা হয়ে পড়ে আছে। এবার মোরাভিয়া ঠিক করলেন লেখাটা শেষ করবেন। এতদিনে একটা যা হ'ক কাজ পাওয়া গেলো।

এক বছরের চেষ্টায় লেখাটা শেষ করলেন মোরাভিয়া। বেশ ছোট একখানা উপন্যাস। নাম করলেন 'দি ইনডিফারেণ্ট ওয়ানস,'। অনেক চেষ্টা তদ্বির করবার পর এক প্রকাশক রাজী হলেন বইখানা ছেপে বার করতে। ১৯২৯ সালে ছাপার অক্ষরে বেরুলো 'দি ইনডিফারেণ্ট ওয়ানস' এ বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী একজন হবু স্থপতিকে হারালো কিন্তু সাহিত্য জগৎ পেলো একজন সত্যিকারের স্রষ্টাকে। এ বই প্রকাশের পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে খাস ইতালীর সাহিত্য রসিক মহলে একজন তরুণ এবং উদীয়মান লেখক হিসেবে আলবের্তো মোরাভিয়ার নাম সুপরিচিত হয়ে উঠলো। মোরাভিয়ার আসল নাম হলো "পিনকারলি"—'আলবের্তো পিনকারলি'—সাহিত্যের আসরে নেমে উনি নিজের নতুন

নামকরণ করলেন 'আলবের্তো মোরাভিয়া,' এ নাম আজ বিশ্বসাহিত্যে অমরত্ব অর্জনে অভিলাষী।

১৯২৯ সালে বাইশ বছর বয়সে মোরাভিয়ার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে ১৯৬১ সাল এই বত্রিশ বছরে মোট প্রায় কুড়িখানা বই বেরিয়েছে ওঁর, যার মধ্যে অন্ততঃ বারোখানার বহুল প্রচার হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তার মধ্যে 'দি উয়োম্যান অব রোম,' 'বিটার হনিমুন,' 'কনজুগাল লাভ,' 'দি ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি,' 'এ গোষ্ট এ্যাট নুন,' 'রোমান টেলস,' 'টু উইমেন,' 'দি ওয়েওয়ার্ড ওয়াইফ,' 'টু এ্যাডলেসেন্টস,' 'দি হুইল অব ফরচুন,' 'দি কনফরমিষ্ট' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোরাভিয়ার বইগুলির চাহিদা উত্তরোত্তর এতো বেড়ে যাচ্ছে যে প্রায় প্রত্যেকখানা বই খাস ইতালীয় ভাষায় বেরোবার কয়েক মাসের মধ্যেই ইয়োরোপের সমস্ত প্রধান ভাষায় অনুবাদ তো বেরোচ্ছেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুলভ সংস্করণও বেরোচ্ছে। ইংরেজী ভাষায় মোরাভিয়ার প্রত্যেকটি সুলভ সংস্করণে লেখককে পরিচিত করানো হচ্ছে 'দি উয়োম্যান অব রোম'-এর লেখক হিসেবে। এর থেকেই বোঝা যায় যে এইখানাকেই মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি বলে বেশির ভাগ সাহিত্য-সমালোচক, প্রকাশক এবং সাধারণ পাঠক মনে করেন। আমাদেরও তাই ধারণা। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো। তার আগে অন্য কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে ব্যক্তিমানুষ বা গোষ্ঠী কিম্বা গোটা সমাজের নানা বিচিত্র অবস্থা নিয়ে যে পরীক্ষাকার্য চলছে মোরাভিয়ার রচনায় তার কোনো ছায়া পড়েনি। কোনো বিরাট পরিবেশ বা বিরাট রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা নিয়ে মোরাভিয়া তাঁর কোনো গল্প বা উপন্যাসে কোনো মতবাদ প্রচার করতে প্রয়াসী হননি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খুবই সীমাবদ্ধ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মোরাভিয়ার রচনার বিষয়বস্তু মানুষের যৌন সমস্যা বা প্রেম। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, দু'শ, তিনশ' কি চারশ' পাতার মোরাভিয়ার রচনাগুলিও গল্পমাত্র, উপন্যাস নয়। বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে জীবনের একটা সমগ্র রূপ আঁকবার যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে মোরাভিয়া সতর্ক ভাবে এড়িয়ে এসেছেন এখন পর্যন্ত। সেইজন্যই এক শ্রেণীর পাঠক এবং সমালোচক স্পষ্টই বলে থাকেন যে, মানুষের লালসাবোধে ইন্ধন জোগানোই মোরাভিয়ার উদ্দেশ্য। মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টির কথা উনি ভাবতে পারেন না। অথচ জীবন সম্পর্কে যে মোরাভিয়ার অভিজ্ঞতা কম তা' নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন মোরাভিয়া, বেশ কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছেন, বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন।

মোরাভিয়ার বিভিন্ন রচনায় নানা বয়সের চরিত্র আছে। কিন্তু সব চাইতে দক্ষতা দেখিয়েছেন উনি কিশোর এবং কিশোরীদের চরিত্র-চিত্রণে। কিশোর মানসিকতার সম্বন্ধে সাধারণত যেসব ধারণা প্রচলিত মোরাভিয়ার "টু এ্যাডলেসেন্স" বা "টু উওমেন" পড়লে তার যথার্থ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সন্দেহ জাগবে মনে। প্রসঙ্গত "টু এ্যাডলেসেন্স"র কথা বলা যেতে পারে। এর একটি কাহিনী 'এ্যাগসটিনো'তে দেখা একটি কিশোর তার মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটাবার পর কার্যত ভুলতে বসছে যে সে তার মা। কিশোরের চিন্তায় এমন অনেক মুহূর্ত দেখা যাচ্ছে যখন মা আর তাঁর স্বাভাবিক, শুদ্ধ এবং সুন্দর মর্যাদামণ্ডিত আসনে থাকছেন না, নিছক একজন নারী হিসেবে কিশোরের কাছে প্রতিভাত হচ্ছেন। 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স'কে কেন্দ্র করে এই যে কাহিনী রচনা এটা মোরাভিয়ার একেবারে কিছু নিজস্ব নয়। স্বয়ং সোফোক্লেস থেকে আরম্ভ করে অনেকেই লিখে গেছেন এ সম্পর্কে। সোফোক্লেসের ঈডিপাস শারীরিক এবং মানসিক পীড়নের মধ্য দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে কালজয়ী নিদর্শন রেখে গেছে। তার পরবর্তীগণ বেশির ভাগই সমস্যাটার অনিবার্যতা উপলব্ধি করলেও বেশ কিছুটা আদেশ, উপদেশ বা নির্দেশ দিয়ে কিশোরের মনকে সংযত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু আসলে সমস্যাটার গভীরতাটাকে বেশির ভাগ সাহিত্যস্রষ্টাই এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন কিম্বা আদৌ বুঝবার চেষ্টা করেন নি। এ ক্ষেত্রে মোরাভিয়ার একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সমস্যাটা বুঝবার চেষ্টা করেছেন। উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, নীতি-বিরুদ্ধ এবং নীতি-সঙ্গত কাজ বা চিন্তা এ সম্বন্ধে কিশোর মনে যে দ্বন্দ্ব, এবং এই দ্বন্দ্ব সমাধান না করতে পারার জন্য যে একটা অসহায় অবস্থা তা মোরাভিয়ার এই কাহিনীতে আশ্চর্যরূপে ফুটে বেরিয়েছে।

কিশোর বয়সের অনেকগুলি চরিত্রই সৃষ্টি করেছেন মোরাভিয়া। তবে সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে মনে হয় "টু উওমেন" এ রোসেটার চরিত্রটিই সবার উপরে স্থান পাবার যোগ্য। রোসেটা এক বিধবার মেয়ে। বিধবা হলেও রোসেটার মায়ের বয়স খুব বেশি নয়। রোসেটাই মায়ের প্রথম এবং একমাত্র সন্তান। রোসেটা যখন কৈশোরে পা দিলো, ওর মায়ের তখন বলতে গেলে ভরা যৌবন। এক মাত্র সন্তানকে নিয়ে সুখে দুঃখে এক ভাবে কাটছিল বিধবার। এমন সময় সুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব। সহরে বোমা পড়তে আরম্ভ হলো। মেয়ের নিরাপত্তার আশায় বিধবা সহর ছেড়ে চলে এলো দূর সহরতলীর এক গণ্ডগ্রামে। সহরে থাকতে এক দোকানদারের সঙ্গে মায়ের মেলামেশাকে ভালো চোখে দেখতো না রোসেটা। লোকটা যেন কেমন করে তাকায়, মুখে কথাটি না বললেও চোখে চোখে যেন ওরা কত কিছুই ব্যক্ত করে—সব কিছুই নজরে আসে রোসেটার। কিন্তু কিছুই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারে না।

তরুণী বিধবাটি যৌবনের তাড়নায় প্রতিমুহূর্তেই ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে মরছে তা ঠিক, কিন্তু মেয়ের সুখসুবিধা, আদর যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তার কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না। মেয়েই তার প্রাণ। জীবনে যখনই কোনো পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে রোসেটা তখনই দেখেছে ওরা নারীর দেহের প্রতি কি জঘন্যভাবে এবং কতো অনায়াসে আকৃষ্ট হয় তার মনের দিকটা ভুলে গিয়ে। স্বভাবত বুদ্ধিমতী রোসেটার মা তাই পুরুষমানুষদের কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখে। যে গ্রামে এসে আশ্রয় নিলো ওরা সেখানে আরো কয়েকজন নরনারী ইতিমধ্যেই এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। রোসেটা অবাক হয়ে যায় তার মাকে নরনারী নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সমানতালে মিশতে দেখে। এইখানেই একটি পরিবারের ছেলে মাইকেলের সঙ্গে পরিচয় হলো মা-মেয়ের। ছেলেটি বয়সে তরুণ, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, সবার উপরে কথা হলো সৎ প্রকৃতির। রোসেটার মা জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষমানুষের সাক্ষাৎ পেলো যে তার দেহের প্রতি দুর্জয়

দেয় না। কাজেই বেশ একটু আকৃষ্ট হলোও মাইকেলের দিকে। এদিকে রোসেটারও বয়স বাড়ছে। কেমন যেন একটু ভালো লাগে মাইকেলকে, অথচ ঠিক কেন যে ভালো লাগছে তা বুঝে উঠতে পারছে না। মাকে অনেক সময় অগোছালোভাবে প্রশ্ন করে বসে রোসেটা মাইকেল সম্বন্ধে। অভিজ্ঞ তরুণী বিধবা সবই বুঝতে পারে। মেয়ের কথা চিন্তা করে রোসেটার মা ক্রমশ মাইকেলের প্রতি নিজের দুর্বলতাকে দমন করতে আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে মাইকেলের প্রতি রোসেটা মনে মনে বেশ খানিকটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মাইকেল হয়ে উঠলো ওর স্বপ্নের আদর্শ পুরুষ। এদিকে যুদ্ধের মোড় ঘুরলো। ইতালী আত্মরক্ষা করতে অক্ষম প্রতিপন্ন হলো। দেশের সর্বত্র জার্মাণ সৈন্যদল টহলদারী সুরু করেছে। এই রকম একদল জার্মাণ সৈন্য একদিন মাইকেলকে ধরে নিয়ে গেলো পথ-প্রদর্শক হিসেবে, ক্রমশ গ্রামে খাদ্যাভাব দেখা দিলো। সবাই মিলে এক জায়গায় না খেয়ে মরার চাইতে যে যেদিক সম্ভব আশ্রয় এবং খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। রোসেটাকে নিয়ে ওর মাও অনির্দিষ্টভাবে পথে নামলো।

অনিশ্চিতভাবে পথে পথে ঘুরলেও রোসেটা মাইকেলের কথা ভুলতে পারে না। পথ চলতে চলতে মেয়ে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তা মায়ের চোখ এড়ায় না। হয়ত একটা ধমক দেয়, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও ভাবে যে নিশ্চয়ই মাইকেলের সঙ্গে আবার দেখা হবে, মেয়েটার মুখেও আবার হাসি ফুটবে। একদিন রাত্তের বেলা পথ চলার ফলে হতশ্রান্ত মা মেয়ে বোমায় বিধ্বস্ত একটা গির্জায় আশ্রয় নিলো। এইখানেই সর্বনাশ হলো রোসেটার। একদল সৈন্যের কবলে পড়লো ওরা। রোসেটা হলো ধর্ষিতা। মা দেখলো একটুক্ষণের ব্যবধানে মেয়ের মুখ থেকে সমস্ত পবিত্রতা লুপ্ত হয়ে গেছে। ফুলের মতো সুন্দর তার মেয়েটার সর্বাঙ্গে পুরুষের নারকীয় রিরংসার পরশ। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো দুঃখিনী জননী। প্রতিকার চাইলো মানুষের কাছে, ভগবানের কাছে। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় আবার একটা পেলো ওরা। কিন্তু জীবন ওদের অনেক বদলে গিয়েছিলো। জীবন সম্পর্কে পবিত্রতার ধারণা একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল রোসেটার। এখন ও স্বেচ্ছায় নিজের দেহ বিকোতে সুরু করলো। মা শাসন করতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। কিন্তু অভিমানে যে রোসেটা নিজেকে পঙ্কিলতার অতল জলে ডুবিয়ে দিচ্ছিলো তা ও অবশ্যই বুঝতে পেরেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় রোসেটা আবার নিজেকে নিজেই উদ্ধার করলো সংযমের পথে যেদিন জানতে পারলো যে মাইকেল আর ইহজগতে নেই। জার্মাণ সৈন্যরা মেরে ফেলেছে ওকে।

এই ছোট কাহিনীটির মধ্যে মোরাভিয়ার শিল্পনৈপুণ্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়। লালসা উদ্রেককারী রচনার প্রতি তাঁর প্রবণতা সম্বন্ধে যে অখ্যাতি আছে তা' স্বীকার করেও কৈশোর আর তারুণ্যের সন্ধিক্ষণকে যে দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন মোরাভিয়া তাও নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এ রচনাটিতে যৌনতা যতটুকু দেখা যায় তা কিছুটা স্বাভাবিক ভাবে এসেছে। শুধু মাত্র যৌনজীবনে রঙ ফলাবার জন্যই যৌনতার অবতারণা করা হয়নি। কিশোর বয়সের যৌন জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে যেটুকু বলা হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিশোর বয়সে জীবন সম্পর্কে যে পবিত্রতার ভাবটা থাকে তা সম্বন্ধে।

এবার আমরা মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি "দি উওম্যান অব রোম" সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

ইয়োরোপ-আমেরিকার সমালোচক এবং সাহিত্যরসিক মহলের বেশির ভাগই একথা স্বীকার করে থাকেন যে, মোরাভিয়ার "দি উওম্যান অব রোম" সাহিত্যশৈলীর দিক থেকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ বিষয়ে আমরাও একমত। কিন্তু এ বইয়ের বিষয়বস্তু এবং নীতিবোধের দৈন্য দেখে অনেকেই ব্যথিত হয়েছেন। রচনাটির কাহিনী ভাগ এই রকম: "একটি তরুণী মেয়ে, নাম তার আদ্রিয়ানা। সংসারে মা ছাড়া আর কেউ নেই ওর। কাজেই মা যেমন মেয়ের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট, মেয়েও প্রায় সমান আকৃষ্ট মায়ের প্রতি। আদ্রিয়ানা একেবারে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে তার মা দর্জির কাজ করে অতি কষ্টে সংসার চালায়। মায়ের কষ্ট লাঘব করবার জন্য ও সব কিছুই করতে প্রস্তুত। আদ্রিয়ানার মা মাঝে মাঝেই ওকে একটা কথা শোনায়। সে হলো: আমার যা কিছু দুঃখ কষ্ট তা তোমারই জন্য। ব্যাপারটা হ'লো—আদ্রিয়ানার মা একটা আর্টিষ্টের ষ্টুডিওতে মডেলের কাজ করতেন। সেইখানেই একটি লোকের সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয়, তারপর বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশার ফলে একদিন টের পেলো নতুন একজন আসছে তাই বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হলো লোকটিকে। যথাসময়ে জন্ম হলো আদ্রিয়ানার।

আদ্রিয়ানার বাবা ছিল রেল বিভাগের একজন কর্মচারী। বাবার মৃত্যুর পরে আদ্রিয়ানার মা-ই সংসার চালাচ্ছে। ওদের চলছে অতি কষ্টে। ষ্টুডিওতে ফিরে গিয়ে আর রোজগারের আশা নেই কারণ আদ্রিয়ানার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে এসেছে দারুণ পরিবর্তন। কাজেই দর্জির কাজ করতে হচ্ছে ওকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আদ্রিয়ানাও যাতে ভুল না করে তার মতো, সেইজন্য মায়ের চিন্তার অবধি নেই। সময় এবং সুযোগ পেলেই মেয়েকে ও মাঝে মাঝে উপদেশ দেয়: কাউকে যেন কখনো ভালোবেসে ফেলো না। বাঁচতে হলে আমাদের টাকা চাই। এবং সে টাকা তোমার দেহকে সম্বল করেই রোজগার করতে হবে। আপাততঃ তোমাকেও ষ্টুডিওর মডেল হতে হবে। আর সব সময় মনে রাখবে ভবিষ্যতে বিত্তবান লোকজনের সঙ্গে জানাশোনা এবং যোগাযোগের একটি সোপান হচ্ছে ষ্টুডিও।

মায়ের মতো জীবনে কোনো ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই, তা' ছাড়া স্বভাবতই কিছুটা সরল প্রকৃতির তরুণী আদ্রিয়ানা মায়ের প্রতিটি কথা সত্যি বুঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না। তার কারণ ওর মনটা ছেলেবেলা থেকেই একটু অন্য ধাঁচে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। নিজেদের অসীম দারিদ্র্য, উপযুক্ত পোশাকের অভাব এবং সঙ্গীসাথীর অভাবে ছেলেবেলা থেকেই বলতে গেলে আদ্রিয়ানা বাড়ীর ঘরোয়া আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। নিজের রূপের যাতে উপযুক্ত সুযোগ নিতে পারে ও সেজন্য বেশ কিছুদিন ধরেই মা ওর মন তৈরী করবার চেষ্টা করে আসছে। ওর রূপ যে সত্যি অসামান্য, এ রকম চোখ যে আর হয় না, এ রকম উন্নত বক্ষ যে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদের লক্ষণ, শরীরের—ওর গঠনের যে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে এসব কথাগুলি একেবারে কিশোরী বয়স থেকেই প্রতিনিয়ত বেশ জোরের সঙ্গে আদ্রিয়ানা শুনে আসছে ওর মায়ের কাছ থেকে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অর্থাৎ ওর মা যা চেয়ে

আসছে এতদিন ধরে ঠিক তার বিপরীত একটা মানসিকতা দেখা দিয়েছে ভেতরে ভেতরে। নিজের রূপের পুরো সুযোগ নেবার জন্য আভ্রিয়ানার অবচেতন মন ক্রমশ তৈরী হতে লাগলো। এবং তা বিত্তবান লোকদের ঠকাবার জন্য নয়—মনের মতো মানুষকে জয় করবার জন্য। ঘর বাঁধবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো আভ্রিয়ানার সমস্ত দেহ-মন। এমনি ধারা মিষ্টি মনোভাবসম্পন্ন একটি মেয়েকে পেটের জন্য এবং মায়ের পরামর্শমতো জীবন সুরু করতে হচ্ছে এক আর্টিষ্টের ষ্টুডিওতে এসে এবং এ বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই দেখা যাচ্ছে ষোড়শী আভ্রিয়ানা সম্পূর্ণ বিবসনা হয়ে একটি ষ্টুডিওতে দাঁড়িয়ে। আর ওর মা রীতিমতো বক্তৃতা সুরু করলো গোবেচারা আর্টিষ্টকে লক্ষ্য করে: দেখুন তো, দেখুন, কী বুক, কী নিতম্ব, আর পা দু'খানি? আঃ! এ রকম আর কোথায় পাবেন।

বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে এই যে নায়িকার আবরণ কেড়ে নেওয়া সুরু হলো, গোটা বইখানার ওপর, পুরো তিন শত একাশি পৃষ্ঠা জুড়ে থেকে যায় তার ছাপ। কার্যত আভ্রিয়ানাকে বিবস্ত্র করে ফেলার বর্ণনা অবশ্য যে পাতায় পাতায় হয়েছে তা' নয়—মোট হয়তো দশ-বারো বার হয়েছে, কিন্তু আগে-পরে ওর দেহসৌষ্ঠবের যে বর্ণনা মোরাভিয়া দিয়েছেন তাতে প্রায় সমস্তক্ষণই মেয়েটা যেন তার সমস্ত নগ্নতা নিয়ে পাঠকের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এটা একদিক থেকে যেমন মোরাভিয়ার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয় তেমনি তার ভাবধারার দৈন্যও প্রকাশ করে। শুধমাত্র লালসা উদ্রেক করবার জন্যই মোরাভিয়া বইখানা লিখেছিলেন তা হয়তো সরাসরি বলা যায় না, কিন্তু একথা স্বতঃই পাঠকের মনে দেখা দেয় যে এইরকম একটা শিল্পদক্ষতা কি একটা মহত্তর সৃষ্টির জন্য—একখানা লা মিসারেবল, ওয়ার এণ্ড পীস, টেল অব টু সিটিজ বা নেহাৎ এ যুগের একখানা 'টি'-এর মতো সাহিত্যসৃষ্টির জন্য নিয়োগ করা যেতো না? একেবারে প্রথম লেখা থেকেই দেখা যায় মোরাভিয়া সাহিত্যের আসরে যখন নামছেন, তখনই তিনি, এক কথায় যাকে বলে একজন finished writer. প্রচুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তাঁর পড়া শেষ হয়েছিল বলে এবং বিরাট ইতালীয় Tradition তাঁর মধ্যে সহজাত ভাবে রয়ে গেছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

মোরাভিয়া যে অতুল দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কখনো টলষ্টয়, হুগো, ডষ্টয়েভস্কি, স্তাঁদাল, ডিকেন্স বা এরেনবুর্গ কিম্বা গোর্কির সমান স্তরে এখনো উন্নীত হতে পারেননি বা কখনো পারবেন বলেও মনে হয় না তার কারণ জীবন সম্পর্কের মহত্তর এবং উচ্চতর আদর্শের অভাব। লা মিসারেবল এ হৃদয়হীন লালসা বা নিষ্ঠুর দারিদ্র্য কম নেই, সেখানে তো মেয়েটাকে দাঁত এবং চুল পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছিল পেটের দায়ে, কিন্তু তবু লেখকের আদর্শবাদ এমন কি যখন তাঁর নায়িকা নগ্ন বা প্রায়-নগ্ন হয়ে পড়ছে তখনো তার দেহের দিকে পাঠকের নজর না পড়ে মনের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। মোরাভিয়াও যে তাঁর নায়িকার মন সম্পর্কে একেবারে নির্বিকার তা নয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সে হলো দেহ-উদ্দীপিত মন। মোরাভিয়ার আভ্রিয়ানাকে দেখলে এক বাঙালী পুরুষ কবি এক সময় মেয়েদের মানসিকতা সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন সেই কথাটা মনে পড়ে: দেহ ছাড়া আর কি আছে ওদের। কোনো মহিলা এরকম উক্তি করলে বা অর্থ বা মূল্য হয়, পুরুষের উক্তি বলেই তা হয় না। আসল কথা হচ্ছে মোরাভিয়ার প্রধানতম উদ্দেশ্য গল্প বলা, নিছক গল্পই তিনি বলে যান, কোনো রকম সামাজিক বা রাজনৈতিক আদর্শের তোয়াক্কা না করে, তাই তার চরিত্রগুলি এমন কি পোশাক-আশাকে ঢাকা থাকলেও লালসার উদ্রেক করে।

যাই হক, আবার বইয়ের কথায় আসা যাক। ইতালীয় নায়িকাদের একটা ঝোঁক দেখা যায় পতঙ্গের মতো পুড়ে মরবার। আদি কবি ভার্জিলের এক নায়িকা কার্থেজের রাণী দিদোকে আমরা দেখেছি এনেসকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে সমর্পণ করতে চাইলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে সোজা চিতা সাজিয়ে আত্মাহুতি দিলো। এবার দেখুন মোরাভিয়ার আভ্রিয়ানা কি করছে।

রোজ ষ্টুডিওতে যাবার জন্য যে ট্রাম ষ্টপে ওকে অপেক্ষা করতে হয় সেখানে দাঁড়িয়ে ও রোজই দেখে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক একটা গাড়ীধোয়া মোছা করছে এবং নানা অছিলায় তাকাচ্ছে ওর দিকে। যুবকটিকে ঘিরে ক্রমশ আভ্রিয়ানার চিন্তা দানা বাঁধতে আরম্ভ করলো এবং শেষ পর্যন্ত একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেই আভ্রিয়ানা যুবকটির দিকে এগিয়ে এলো। যুবকটি গাড়ীর দরজা খুলে দিলো। ও গিয়ে বসলো ভেতরে। গাড়ী ষ্টার্ট দিলো যুবকটি। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বুই মাইল বেগে চলতে লাগলো গাড়ীটা। যুবকটির নাম গিনো। এক বড়লোকের ড্রাইভার। প্রেমে মশগুল হয়ে উঠলো আভ্রিয়ানা। মনে করতে আরম্ভ করলো ওর ঘর বাঁধবার বাসনা সত্যে পরিণত হতে চলেছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ের কথাবার্তা উঠলো। মায়ের অমত সত্ত্বেও আভ্রিয়ানা ঠিক করলো গিনোকে বিয়ে করবে। এবং একদিন আত্মদান করতেও দ্বিধা করলো না। আভ্রিয়ানার নিজের ভাষায়: "আমরা অনেকক্ষণ অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলাম। আমরা তখন পরস্পরকে চুমো দিচ্ছিলাম। এ যেন একটা শ্রান্তিহীন চুমো। আমি যতোবার থামতে চাইছিলাম, গিনো আমাকে ছাড়ছিল না। আবার গিনো ছাড়তে চাইলে আমি ছাড়ছিলাম না। তারপর গিনো আমাকে শয্যার ওপর ঠেলে দিলে···।"

আভ্রিয়ানার এই বিয়ের প্রস্তাবে ওর মায়ের প্রথম থেকেই কিছুমাত্র সমর্থন ছিলো না। কারণ, ওঁর বিশ্বাস ছিলো, গিনো শেষ পর্যন্ত প্রতারণা করবে। হ'লোও তাই শেষ পর্যন্ত। আভ্রিয়ানার ঘর বাঁধবার সুখস্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে গেলো। এরপর থেকে আভ্রিয়ানার ক্রমশ নৈতিক অধঃপতন হতে লাগলো। এবং শেষ পর্যন্ত একেবারেই সাধারণ গণিকাদের পর্যায়ে নেমে এলো। একটির পর একটি পুরুষ আসতে লাগলো ওর জীবনে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ও অন্তঃসত্বা হয়েছে এমন একজনের দ্বারা যাকে ও রীতিমতো ঘৃণা করে। অবশ্যই একজনকে যদিও বা ভালো বাসলো কিন্তু সেও আভ্রিয়ানা এবং তার সন্তানের দায়িত্ব নেবার মতো শক্ত মানুষ নয়। আভ্রিয়ানার জীবনে দেখা দিলো বিরাট শূন্যতা। সারাজীবন ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল একটি তরুণী বারবার আঘাত পেতে পেতে সমাজের সব চাইতে নীচুর ধাপে, নারীত্বের চরম অমর্যাদা মাথা পেতে নেবার পরেও আমরা দেখতে পাই সে এখনো ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল।

আভ্রিয়ানার শেষ ভালোবাসার পাত্র মিনোর আত্মহত্যার পরে দেখা যায় ওর জীবনে এবং চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে। ঘর বাঁধবার সামান্য আশাটা পূর্ণ হবার যে আর কোনো সম্ভাবনাই নেই সেটা এতোদিনে বুঝতে পারে ও। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা যায়

আদ্রিয়ানা গির্জায় এসে যীশু ক্রোড়ে এবং মেরীর প্রতিমূর্তির সামনে তার বিক্ষোভ, হতাশার যন্ত্রণা এবং নিদারুণ ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে এই বলে যে ভবিষ্যতে আর কোনদিন কোন পুরুষকে তার দেহস্পর্শ করতে দেবে না। ভালবাসার বাসনা মনে যতো স্বপ্নজাল বোনা বাঁধে, বাস্তব জীবনে তার সাফল্য যে ততোই দুর্লভ তা এতদিনে আদ্রিয়ানার মত সরল, ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ঘরোয়া-প্রকৃতির মেয়েও সে কথা বুঝতে পারে।

এতো বড় ব্যর্থতার পর আদ্রিয়ানার আত্মহত্যা করা উচিত ছিলো বলে অনেক পাঠক-বন্ধুকে বলতে শুনেছি, অনেক সমালোচকও সে রকম কথা আভাষে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় আদ্রিয়ানার আত্মহত্যার কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি-কারণ অন্ততঃ তিনটি পুরুষের কাছ থেকে সে তার ভালবাসার কিছুটা প্রতিদানও পেয়েছে। প্রথমতঃ গিনো, যদিও প্রতারণা করেছে, কারণ সে যে বিবাহিত, এমন কি একটি মেয়েও আছে তার একথা চেপে গিয়ে ও আদ্রিয়ানার সঙ্গে মেলামেশা করেছে, ওর হৃদয় জয় করেছে ভালবাসা দিয়ে এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেহও জয় করেছে। আদ্রিয়ানা দেহ বিক্রয় করেছে অনেকের কাছেই, গিনোকে ও দেহ বিক্রয় করেনি, দান করেছে। তাই আদ্রিয়ানা ক্রমে গিনোর স্ত্রী এবং কন্যার কথা জানতে পেরে যখন সরাসরি প্রশ্ন করলো গিনোকে—এরকম চাতুরী করলে কেন? গিনো স্পষ্ট এবং দ্বিধাহীন চিত্তে জোরের সঙ্গেই জবাব দিলো—"কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসতাম।" "যদি প্রকৃতই তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে," আদ্রিয়ানা বললো, "তাহলে নিশ্চয়ই তোমার চিন্তা করা উচিত ছিলো গিনো, যে সত্যি কথাটা জানাবার পর আমি কত বড় আঘাত পাবো।..." "আমি সত্যি ভালবাসতাম তোমাকে," গিনো বাধা দিয়ে সংক্ষেপে শেষ করলো, "আর সেই ভালোবাসার জন্য আমার মাথার ঠিক ছিলো না।" আদ্রিয়ানার মতো ভালোবাসা পাবার জন্য ব্যাকুল মেয়ের কাছে এরপরে আর কোনো কৈফিয়ৎ প্রয়োজন হবার কথা নয়। আর তা ছাড়া আইনের চোখে, সমাজের চোখে ব্যাপারটা চরম ভণ্ডামী এবং প্রতারণা মনে হলেও, এটা যে ভালবাসার জন্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। অস্তারিতা এবং মিনোর কাছ থেকেও আদ্রিয়ানা তার ভালবাসার কিছুটা প্রতিদান পেয়েছে। কাজেই একদিক থেকে আদ্রিয়ানার ভালবাসার ক্ষুধা কিছুটা তৃপ্ত হয়েছে। ও যে আত্মহত্যা করেনি তার প্রথম কারণ হলো এইটে। দ্বিতীয়ত, সমাজের চোখে ও পথের ধূলোর সামিল হয়ে গেলেও ও মা হতে চলেছে। কাজেই এখন নিজেকে ভুলে যাবার সময় এসে গেছে। কাজেই আদ্রিয়ানা যে আত্মঘাতিনী না হয়ে তার ভাবী সন্তানের কথা ভেবে নতুনভাবে পবিত্র জীবন সুরু করবার সিদ্ধান্ত নিতে পারলো এটা নিশ্চয়ই মোরাভিয়ার উচ্চতর মানবিকতাবোধের পরিচয় দেয়।

আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা মোরাভিয়ার "দি উওম্যান অব রোম"-এর আলোচনা বর্তমানে শেষ করবো। বিষয়টি হলো নীতির প্রশ্ন, শালীনতার প্রশ্ন এবং রুচির প্রশ্ন একদিকে; আর অন্যদিকে জিনিষটি নিশ্চয়ই যৌন-মনোদর্শনের একটা সমস্যার প্রতি বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা বহন করে। ব্যাপারটা আদ্রিয়ানার সন্তানের পিতৃত্বের সঙ্গে জড়িত। আদ্রিয়ানা জানে যে তার সন্তানের পিতা হলো রাজনৈতিক কর্মী সনজগনো—যাকে কখনোই ও ভালোবাসেনি। অথচ ও বলছে: "আজ পর্যন্ত যতো পুরুষের সংস্পর্শে এসেছি তাদের মধ্যে সনজগনো আমাকে যতটা পুরোপুরি অধিকার করতে পেরেছে, আমার সত্ত্বায় যতোটা গভীরে এবং অন্তরতম স্থলে প্রবেশ করতে পেরেছে ততোটা আর কেউই পারেনি। আমি যে তাকে মোটেই পছন্দ করতাম না এবং তাকে রীতিমতো ভয় করতাম, এবং সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার কাছে বিকোতাম এ সবই সত্যি—কিন্তু এ সব সত্ত্বেও বলতে হয় সনজগনো আমাকে যতোটা পুরোপুরি অধিকার করতে পেরেছিলো ততোটা আর কেউই পারেনি—গিনো, অস্তারিতা, এমন কি মিনোও নয়।...সেইজন্যই আমি এই রকম একটা ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি যে এক শ্রেণীর পুরুষ মানুষের প্রকৃতি হলো প্রেমে পড়ে খুশী থাকা আর এক শ্রেণীর কাজ হলো সন্তান উৎপাদন করা। কাজেই সনজগনো যে আমার সন্তানের জন্মদাতা এটা ঠিকই হয়েছে, যদিও আমি ওকে ঘৃণা করি এবং ওর কাছ থেকে পালিয়ে আসি মিনোর কাছে এবং প্রকৃতই মিনোকে ভালোবাসি।"

যৌনক্ষুধার তৃপ্তি যে মানুষের জীবনের সার্থকতার জন্য কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ সে কথা একবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন মোরাভিয়া তাঁর "কনজুগাল লাভ" উপন্যাসে। এক তরুণ উদীয়মান ঔপন্যাসিক সিলভিয়ো এবং তার স্ত্রী লেডা এ বইয়ের প্রধান চরিত্র। সিলভিয়ো বিরাট একখানা উপন্যাস লিখবে মনস্থ করেছে। স্ত্রীকে ও সত্যি ভালোবাসে। কিন্তু নিজের অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখলো যে দাম্পত্য দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে চলবার জন্য লেখার দিকে ও মোটেই এগোতে পাচ্ছে না। শরীর এবং মন দু'দিকেই ক্লান্তি দেখা দেয়। তাই ওরা স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে ঠিক করলো যে ঐ বিরাট উপন্যাসখানা লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওরা পরস্পরকে সবদিক দিয়েই এড়িয়ে চলবে। এর ফলে কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেলো লেডা তার স্বামীর এক বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে—যার হাতে প্রচুর সময় আছে ওর সঙ্গে ব্যয় করবার মতো এবং যে ওর খেয়াল মেটাতে পারে।

"এ গোষ্ট এ্যাট মুন" এবং "দি ওয়েওয়ার্ড ওয়াইফ"-এও আমরা দেখতে পাই মোরাভিয়া, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ প্রভৃতির নানা সাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষের জীবনে যৌনক্ষুধার প্রাধান্য এবং প্রবলতা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে ওঁর গল্পের বই "বিটার হনিমুন" এবং "রোমান টেলাস" কিছুটা ভিন্নধর্মী রচনা। মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা যে শুধু যৌনতৃপ্তির উপর নির্ভরশীল নয়, একাধিক গল্পের মধ্যে মোরাভিয়া সে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন।

"দি ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি" এবং "দি কনফরমিষ্ট" অন্য সমস্ত বইয়ের চাইতে একটু ভিন্ন, তথ্যের দিক থেকে এ দু'টি বইতে মোরাভিয়াকে দেখা যায় কিছুটা সমাজ-সচেতন লেখক হিসেবে। এর মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ "দি ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি"-র একটি বিশেষত্ব আছে। এক কথায় গণতন্ত্র-বিরোধীদের নিয়ে বেশ কিছুটা ব্যঙ্গ করেছেন মোরাভিয়া তাঁর এ বইতে। বইখানির প্রকাশের ব্যাপারও কিছুটা নাটকীয়। মোরাভিয়া ছিলেন ফ্যাসি-বিরোধী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের কথা, মুসোলিনী তখন ইতালীর সর্বময় কর্তা। তখন ওদেশে নিয়ম ছিলো, ছাপার অক্ষরে কিছু প্রকাশ করতে হলে আগে সরকারী দপ্তর থেকে

এ মাসের প্রচ্ছদপট

আবু পাহাড়ের 'দিলওয়ারা' মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কক্ষশীর্ষের অপূর্ব শিল্পকর্মের এক উজ্জ্বল নিদর্শনের একটি আলোকচিত্র এ সংখ্যার প্রচ্ছদে প্রকাশ করা হইল। আলোকচিত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীদেবব্রত গুপ্ত।

কোণারকের মূর্তি
—চিত্ত নন্দী

শিশুজগৎ

—দিনেশ মজুমদার

—ভবেশ ঘোষ

বিস্ময়

—ইলা সেনগুপ্ত

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে উপনীত প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এবং উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাসকে দেখা যাচ্ছে।

আলোকচিত্র—মোনা চৌধুরী

শান্তিনিকেতনে বক্তৃতারত শ্রীনেহরু

আলোকচিত্র—বসুমতী

দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু দর্শনার্থী

আলোকচিত্র—বসুমতী
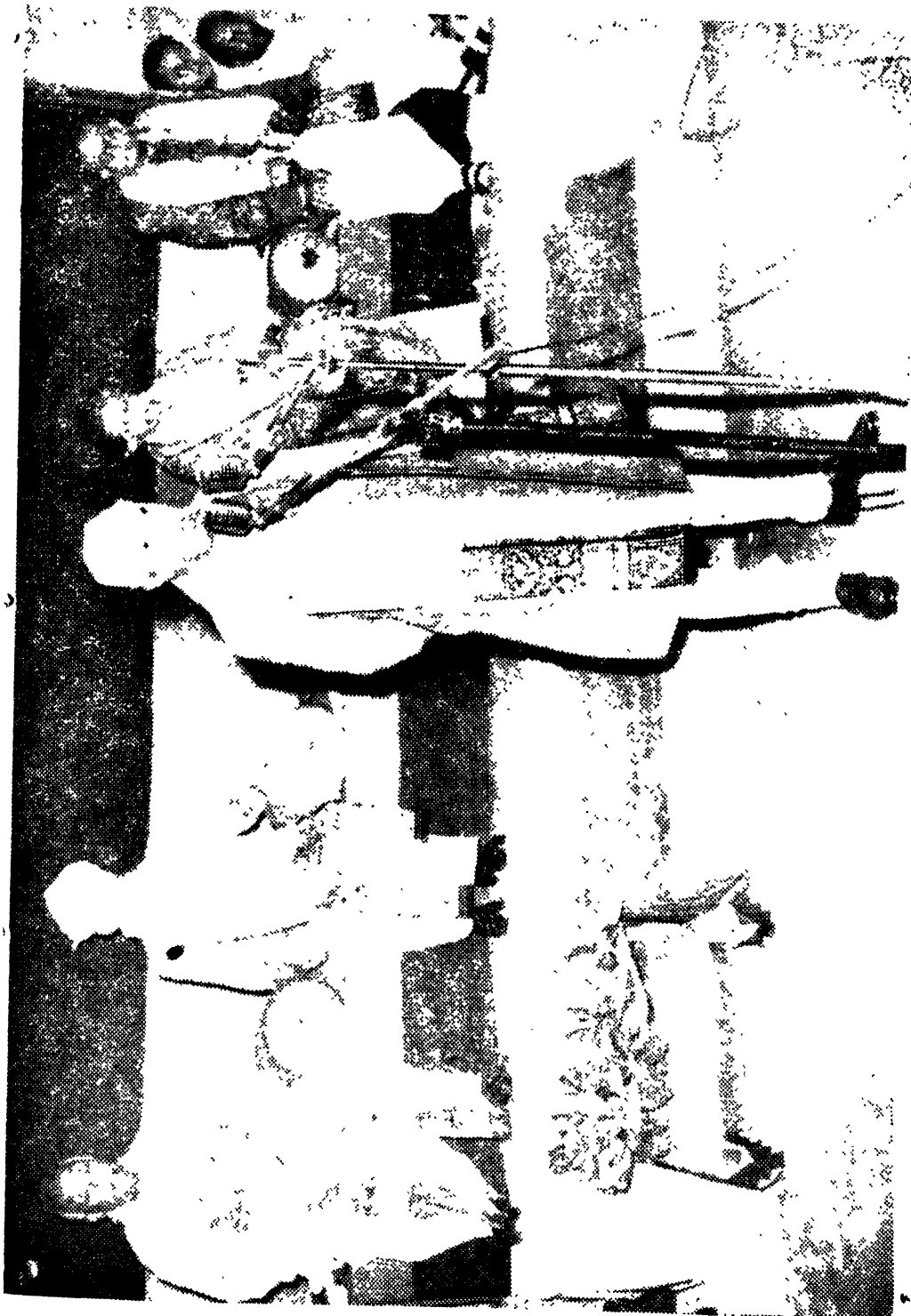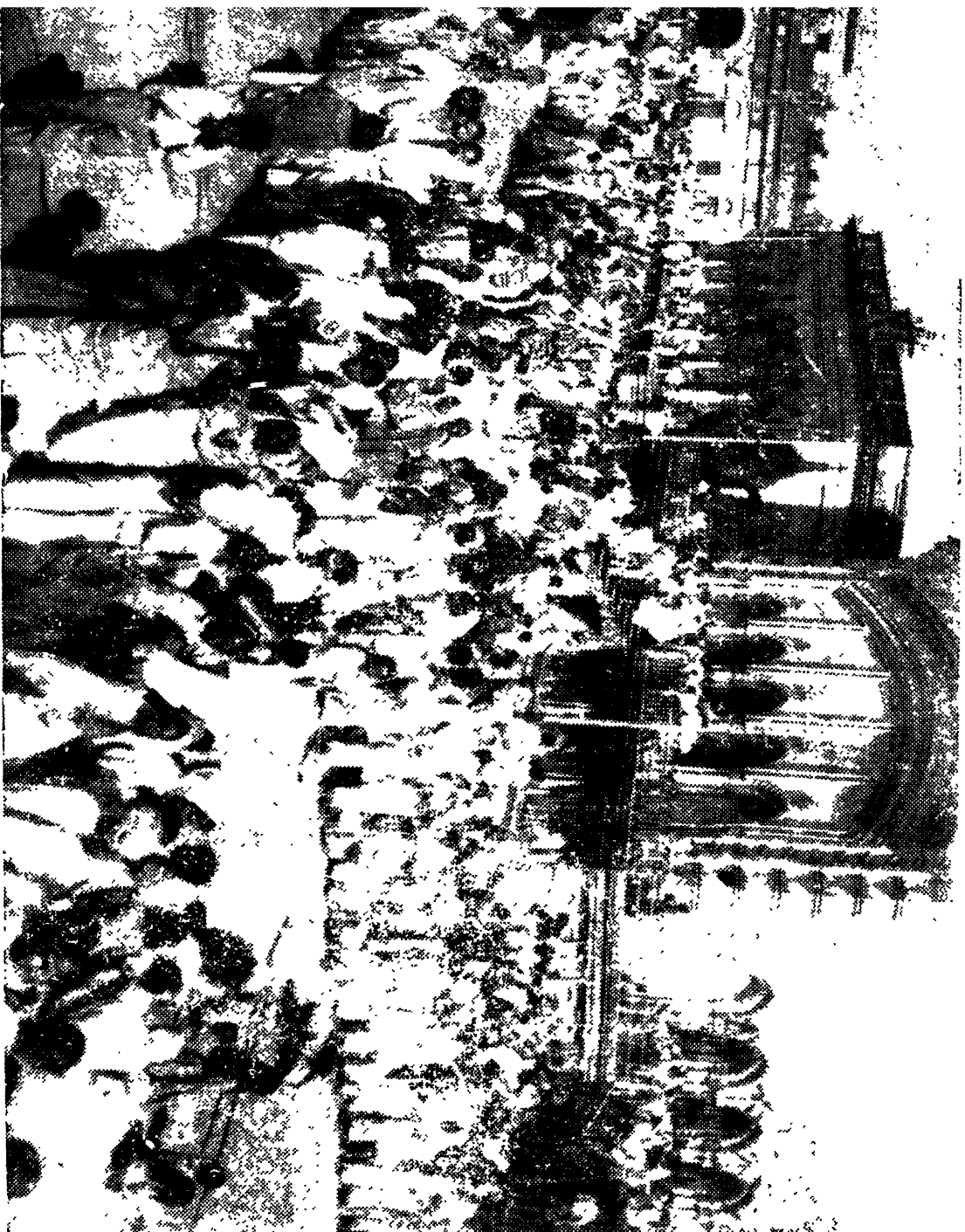
তা অনুমোদিত হওয়া চাই। তা না হ'লে কোনো প্রেস তা ছাপবে না, কোনো প্রকাশক প্রকাশ করবেন না। যথাসময়ে মোরাভিয়া তাঁর "দি ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি"-র পাণ্ডুলিপি অনুমোদনলাভের আশায় সরকারী দপ্তরখানায় পেশ করলেন। মোরাভিয়ার পাণ্ডুলিপি এসেছে শুনে আগ্রহ করে মুসোলিনি স্বয়ং পড়লেন সে পাণ্ডুলিপি। মোরাভিয়ার শিল্প-সৌষ্ঠবে মুগ্ধ হয়ে মুসোলিনি নিজেই প্রকাশের জন্ত অনুমোদন করলেন বইখানা। ছেপে বেরোবার মাসখানেকের মধ্যে হৈ চৈ সুরু হয়ে গেলো ফ্যাসিষ্ট পার্টির দপ্তরে। কী ব্যাপার?—না, মোরাভিয়া ইতালীর বর্তমান সরকারকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন তাঁর বইতে। একাধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুসোলিনীর নজরে আনলেন ব্যাপারটা। মুসোলিনী প্রথমে কান দিলেন না তাঁদের কথায়। বললেন—একটু আধটু ব্যঙ্গে কিছু যায় আসে না, বরং ফ্যাসিবাদ যে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য স্রষ্টাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এইটেই বড় কথা। কিন্তু এতে খুশী হলেন না মুসোলিনীর চেলা-চামুণ্ডারা এবং তাদের চাপেই শেষ পর্যন্ত বইখানা নিষিদ্ধ করে দিলেন মুসোলিনী সমগ্র ইতালীয় সাম্রাজ্যে।

মোরাভিয়ার ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতার কথা এতটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে মিত্রশক্তির অভিযানের আশঙ্কায় জার্মাণ-সৈন্তরা যখন ইতালীতে প্রবেশ করলো, তখন যাদের সর্বপ্রথম গ্রেপ্তার করা দরকার বলে জার্মাণ কর্তৃপক্ষ ইতালীর সরকারের কাছে লিষ্ট করে দিলেন, তাদের মধ্যে মোরাভিয়ার নামও দেখা গেলো। মোরাভিয়া নাৎসীদের কবলে পড়া উচিত মনে না করে পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে গেলেন। এবং প্রায় দশ মাস ঐখানেই আত্মগোপন করে ছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো, ইতালীর সবচাইতে জনপ্রিয় লেখকদের অন্যতম হলেন মোরাভিয়া। জাতীয় সাহিত্যে মোরাভিয়া যাঁদের তাঁর নমস্য বলে প্রকাশ্যে বলতেন, সেই ড আন্নুনৎসিও এবং পিরান্দেলোর চাইতেও মোরাভিয়ার বইয়ের চাহিদা পাঠকমহলে অনেক বেশি। এবং এই জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়ছে।

১৯৪১ সালে মোরাভিয়া বিবাহ করেন। মোরাভিয়ার স্ত্রীও ছোটো গল্প এবং উপন্যাস রচনায় কিছু সুনাম অর্জন করেছেন।

১৯৫০ সালের পর থেকে মোরাভিয়ার সাহিত্য যোগ্য সমালোচকগণ কর্তৃক বোমাঁ রোলাঁ, ডস্টয়েভস্কি এবং লরেন্সের সঙ্গেও তুলনা করা হচ্ছে। সব ভাষা মিলিয়ে "দি উওম্যান অব রোম"-এর বিক্রি সংখ্যা নাকি পঁচিশ লাখের উপর উঠে গেছে। কিন্তু তাতেও মোরাভিয়া তৃপ্ত নন। কিছুদিন আগে মোরাভিয়া বলেছেন যে নতুন এমন একখানি উপন্যাস উনি বর্তমানে লিখছেন, যা ওঁর নিজের বিশ্বাস যে এ যাবৎকাল পর্যন্ত লেখা ওঁর সমস্ত কিছুকে ম্লান করে দেবে।

মোরাভিয়া সাধারণত সকাল থেকে দুপুর অবধি লেখেন। লেখার কাজটা কেমন করে চলে এ সম্পর্কে মোরাভিয়া বলেন: কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসবার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজেও বুঝতে পারি না, কি আমি লিখবো, কিভাবে সুরু করবো। আমি প্রেরণায় বিশ্বাসী। প্রেরণা কখনো আসে, কখনো আসে না। তাই প্রেরণা-লাভের আশায় আমি লেখা বন্ধ রাখি না। রোজই আমি কিছু না কিছু লেখবার চেষ্টা করি।

আন্তরিক

এম, আতাউল্লাহ

আমার নিজস্ব এই ভালো লাগা মাঠ
আকাশ আর সাগরের জল—
অস্থির হয়ে ওঠে কোন এক স্বপ্ন উতল
চেতনায়।
তোমার চোখের দৃষ্টি মন্ত্রের মতন
ছুঁয়ে গেল হৃদয়ে আমার,
আকাশে আলোর বন্যা, বাতাসে প্রাণের
জলের হাজার ঢেউয়ে অশান্ত কামনা—
দুলে ওঠে এক সাথে, কুয়াশা-আঁধার হলো
স্মৃতির আকার।
সে ভাবনা ভেবেছি অনেক তোমাকে ঘিরে
অনেক অপেক্ষার সেই রত্নময় সাধ
মনকে ছেড়েছি আমি উন্মুক্ত অবাধ—
তবু কিছু নেই। বলো দোষ দিই কার।
জীবনের এই পথ আলোকে তিমিরে
মিশে গেছে একদিন যেন ধীরে ধীরে।
মৃত্যুর কিনার ছুঁয়ে আমি ঘুমের গভীরে
শুনেছি তোমার ওই চিরন্তন ধ্বনি
আকাঙ্খা-আচ্ছন্ন দীপ্ত মৃদু শিঞ্জিনি।

এক তারা

শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

নৈঋত দিগন্তে এক তারা,
* *
ও তারাটি যদি নিবে যায়।
মেঘে ঢেকে যায় নীলাকাশ।
রাত্রি হয়ে যায় ভোর!
শঙ্কাকুল দুর্জ্ঞেয় রহস্য মার্গে
সীমান্তের কে দেবে নির্দেশ?
সে আমার জন্মতারা,
আমাকে করেছে আকর্ষণ,
যাত্রা তারই অলংঘ্য বিধান;
কিন্তু যদি দিগন্তের পথ পার্শ্বে
মৃত্যু এসে বেসে ফেলে ভালো,
প্রশান্ত চুম্বনখানি দিয়ে
দৃষ্টি নিমীলিত ক'রে দেয়
তাহ'লে কি নৈঋত দিগন্ত ভুলে গিয়ে
জন্ম তারকার ধরা আলো
মরণের অন্ধকার প্রেমে যাবে মুছে?

নীলকণ্ঠ

তিরিশ

আলমোড়া। হিমালয়ের কোলে নিরুপম নির্জন নিঃসংগ নিস্তব্ধ ভয়ংকর সুন্দর একটি পাহাড়। তার নাম মের্তোলা। ভারতবর্ষের অনামী তীর্থ এই মের্তোলার পাহাড়। কুমায়ুনের দুর্দান্ত শীতে সূর্যোদয়ের আগে এখানে বেজে ওঠে বংশীধারীর বন্দনা। তাঁর ভোগের আয়োজন আরম্ভ হয়ে যায় দিন সুরু হবার আগেই। ঠাকুরের শয্যাত্যাগের সংগে সংগে মংগলারতি, পূজায় উদ্বোধন হয় একটি প্রসন্ন পবিত্র দিনের। সমস্ত দিন ধরে চলে তাঁর সেবা। ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, রান্না, বাসন মাজা, ঘরপরিষ্কার, কোনও কাজে গতানুগতিকতার ছন্দপতন নেই, নেই বিরক্তি। ঘড়ির কাঁটার চেয়েও নিয়মিত মের্তোলার পাহাড়ে দণ্ডায়মান এই আশ্রমের সকাল-সন্ধ্যা। ঠাকুর বিশ্রাম করতে না যাওয়া পর্যন্ত অবিশ্রাম চলেছে কর্মস্রোত।

আশ্রমের আশ্রয়দাতা পাহাড়ের বুকের ওপর রৌদ্ররুক্ষ মাটির বুকের ওপর ফসল ফলানো দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের সংগে চলেছে রীতিমতো। সেই ফসল থেকেই প্রস্তুত হয় গোপাল-ভোগ। তার থেকেই অতিথিসেবা, দরিদ্রনারায়ণের মুখে তুলে দেওয়া দুমুঠো, তারপর নিজেদের প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ। এই সেবাই এই ঠাকুরের পূজার একমাত্র প্রণাম।

ভারতবর্ষের যত তীর্থ আছে তার মধ্যে সব চেয়ে নিরহংকার সেবায় শুদ্ধ পবিত্র মের্তোলার পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম। এর কোনও বিজ্ঞাপন নেই; নেই কোনও চাঁদা অথবা প্রণামী। শুধু প্রণাম, শুধু নাম, শুধু সেবা। যুগলমূর্তির চরণে যুগলকরকমলের প্রণামে প্রতিষ্ঠিত রাধারাণী আর রাধারমণের বিগ্রহ স্থাপন করেন এখানে যশোদামাঈ। যশোদামাঈ তাঁর লীলা সাংগ করে চলে গেছেন এখান থেকে অথবা তিনি এখনও যাননি। তাঁর পুণ্য পবিত্র স্পর্শ, লেগে আছে মের্তোলার পাহাড়ে। সেই স্পর্শের পরিচয়ে যিনি প্রদীপ্ত তিনিই কৃষ্ণপ্রেম।

মের্তোলা পাহাড়ের চেয়ে বড় তীর্থক্ষেত্র, কৃষ্ণপ্রেমের চেয়েও বড় তীর্থংকর এই মুহূর্তে আমার চোখে অনুপস্থিত। আত্মসেবা নয়; আত্মার সেবা। যশ নয়; যশোদামাঈ। কৃষ্ণতত্ত্ব নয়, কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে ঘেরা মের্তোলার পাহাড়। অযুতনিযুত বৎসরের সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে অমরত্বার দাবী না করা, কোনও মোহ নিয়ে নয় দাঁড়াবো তাঁর সম্মুখে, একটি মুহূর্ত যদি কখনও আমাদের চোখে সামনে কোথাও মূর্ত হয়ে থাকে, তো তা এই মুহূর্তে কেবল এইখানেই,—যেখানে হিমালয়ের কোলে আলমোড়া, আলমোড়ার কোলে মের্তোলা পাহাড় মর্ত্য ও অমর্ত্যলোকের মাল্যবদলের মিলনরাত্রের পরমাশ্চর্য প্রদীপ হয়ে জ্বলছে।

মের্তোলা পাহাড় নয়। মের্তোলা একটি 'প্রতীক্ষা' যেখানে মানব তার তৃতীয় নেত্র একদিন মেলবে।

আকাশপথে শত্রুবিধ্বস্ত হবার মুহূর্তে বিমানের মুখ ঘুরিয়ে দেবার মুহূর্ত থেকেই রোনাল্ড নিক্‌সন হয়েছিলেন অন্তর্মুখী। নিরন্তর সেই জীবন-জিজ্ঞাসায় ক্ষতবিক্ষত রোনাল্ড নিক্‌সন মণিকা-মায়ের মধ্যে তার উত্তরের উত্তরীয় উড্ডীন দেখলেন। নিক্‌সন তখন কৃষ্ণপ্রেম হননি; মণিকা হননি যশোদামাঈ। নিক্‌সন দেখলেন পার্টিপরিবৃতা, প্রসাধিতা, বিদুষী এই মহিলার বাইরের চেহারা তাঁর আসল রূপ নয়। মণিকা যেদিন ধরা পড়লেন নিক্‌সনের কাছে, সেদিন স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে অধরা ধরা দিয়েছেন তাঁর কাছে স্বেচ্ছায়, সেদিন থেকেই তিনি তাঁর গোপালের কাছে যশোদামাঈ; নিক্‌সন সেদিন থেকেই কৃষ্ণপ্রেম।

কৃষ্ণপ্রেম সেদিন থেকে যশোদামাঈ ছাড়া আর কাউকে জানাতে যাননি; জানাতে যাননি আর কারুর কাছে জীবনের পবিত্রতম জিজ্ঞাসা।

এই জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতেই তাঁর ভারতবর্ষে আসা। এই জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে তিনি ডুব দিয়েছিলেন বৌদ্ধ-দর্শনের অতলে। এখন এই জিজ্ঞাসার জবাব পেতে তিনি তাকালেন যশোদামাঈর দর্পণে। যেখানে অপরূপের অরূপ বিশ্ব প্রতিমুহূর্তে ফুটে উঠছে যশোদা-মাঈয়েরও অজান্তে। চোখের সামনে সহসা উদ্‌ঘাটিত হয় 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিসার'; সেই অপরূপ রূপরাগ। কেন হয়, কোন্ সুকৃতির সুপুণ্যে কে জানে। নিরবধি কাল ধরে, বিপুলা পৃথ্বী জুড়ে কত মানুষ বেরুলো ঘর ছেড়ে পথে, পথ ছেড়ে দুর্গম বনে, ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরলো পরশ পাথর। দুগ্ধফেনানিভ শয্যা, রূপসীভার্যা অনিন্দ্যকান্তি তনয় ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে খ্যাতির মুকুট, পরিহার করে কীর্তির কুসুমাস্তীর্ণ পথ, সর্বস্ব পণ করে বেরুলো তারা তাঁকে খুঁজতে লোভে যাঁকে আমরা হত্যা করেছি, প্রেমে যাকে আমরা পুনর্জীবিত করব। দেখা পেল কই? কোটিকে গোটিকও সাড়া পেল কই তাঁর,—সমুদ্র যাঁর জিজ্ঞাসা, হিমালয় যার জবাবে চিরনিরুত্তর।

আর যে পেল তাঁর দেখা, সে পেয়ে গেল ঘরে বসে। অধ্যয়নে নয়, কঠোর তপস্যায় নয়, নয় কঠোরতর আত্মনির্যাতনে। হেসে খেলে গান গেয়ে পার্টি করে প্রসাধন করে সেজেগুজে সমাজের কলরব মুখরিত প্রাংগণে দাঁড়িয়ে আছে যে মধ্যমণি হয়ে, সেই মণিকা-র অন্তর অংগন জুড়ে আলো করে এসে, হেসে, ভালোবেসে দাঁড়ায় ত্রিজগতের সেই মণিকার যাঁর দ্যুতি ঠিকরে ঠিকরে পড়ে যেখানে পা পড়ে সামান্য

মানবীর সেখানেই উছলে উছলে পড়ে নীলকান্তমণি পেয়ালা থেকে উচ্ছ্বসিত মাধুরী।

কেন এমন হয় ? চাইলে যে তাঁকে, তাকে চাইলে না চোখ তুলে। না চাইতেই পাওয়া গেল তাকে,—কোন্ পুণ্যের ফলে কে বলবে। গাছ যদি জানত কেমন করে ফুল ফোটে তাহলে ফুল ফুটত কি অনাদিকাল ধরে !

যশোদামাঈয়ের কাছে পথের দিশা প্রার্থনা করলেন কৃষ্ণপ্রেমী। যশোদামাঈ জবাব দিলেন, 'আগে ভারতবর্ষকে জানো তারপর জেনো তার পরমধনকে।' যশোদামাঈর নির্দেশ মাথা পেতে নিলেন তাঁর গোপাল। ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত হলেন স্বয়ং যশোদামাঈর সাহায্যে। রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শোনালেন অনুবাদের মধ্যে দিয়ে মা। বৈষ্ণবসাধনার মধুর রসে সিক্ত হলো বিদেশের কঠিন মাটির বুক। ধর্মাসনে অভিষিক্ত হলেন ইংরাজ যুবক রোনাল্ড নিকসন্। কিন্তু নিকসনের মন নবম হলেও পরমের চরম নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি কই ? সমুদ্রে না পৌছানো পর্যন্ত নদীর ক্লান্তি কই পথ চলায়। আবার প্রার্থনা করলেন কৃষ্ণপ্রেম, দীক্ষা দাও। আমাকে উজ্জীবিত কর নবজীবন মন্ত্রে। চাতক বললে আকাশকে, কৃষ্ণবর্ণ হও তুমি তারপর ঝরে পড় অমৃতবিন্দু। আস্বাদ করতে দাও তোমার মধুর সাধনকে। কিন্তু হায়, আকাশ যে তখনও মেঘকজ্জল নয় ! কেমন করে দেবে সে নিজেকে নীরবিন্দুতে সিন্ধুর আস্বাদ অমৃত-অভিলাষী চাতককে। স্বয়ং যশোদামাঈরই যে তখনও সন্ন্যাস নেওয়া হয়নি।

নিকসনকে নিবৃত্ত করতে মণিকা বললেন : সংসারে থেকেই তো সারকে অন্বেষণ করা যায়। তুমি কেন ঘর ছাড়বে, তুমি কেন নেবে ভিক্ষার ঝুলি ? তোমার ঝুলি থেকেই তো ভিক্ষা নেবে অন্যেরা। কীর্তি আর প্রতিপত্তি, লোকসান আর পার্থিব রজতের বাঁধা পথ ছেড়ে তুমি কেন বৈরাগী হবে গোপাল ?

কৃষ্ণপ্রেম তাঁর কৃষ্ণপ্রেমে অবিচল : লোকমান নয়, দ্রৌপদীর মান রক্ষা করেছিলেন যিনি তাঁর সন্ধানব্রতই আমার জীবনের একমাত্র কর্ম ! সন্ন্যাস দাও আমাকে। তমো থেকে আমায় নিয়ে চলো মহত্তমে !

কুন্তীকে বললেন শ্রীকৃষ্ণ : বর চাও। কুন্তী বললেন : আমার জীবন থেকে দুঃখের মেঘ দূর কোরো না, কারণ তাহলেই তোমাকে ভুলে যাব !

আকাশের কালো মেঘে যে দেখে কৃষ্ণচ্ছায়া তাকে ভোলাবে কোন রঙিন মায়ায় ? সমুদ্রের ডাক পৌঁচেছে যার কানে অন্তহীন দূর সেই নদীকে কি ভয় দেখাবে ? জ্যোতিসমুদ্রের মাঝখানে যে পদ্ম বিরাজ করে তার মধুলুব্ধ যে সে মৌমাছি কোন দুঃখে লোকমানের মল-মুগ্ধ মাছি হতে চাইবে ?

দিতেই হলো সম্মতি মণিকাকে। গোপালকে দিতে হলো সন্ন্যাসসম্মতি।

তার আগে মণিকা নিজে নিলেন সন্ন্যাস। রাধারাণীর অনুমতি পেলেন মণিকা, গোপালকে দীক্ষা দেবার সানন্দ ছাড়পত্র। কিন্তু তার আগে নিজের জন্যে বাহুল্য সন্ন্যাসব্রত সমাধা করতে চললেন বৃন্দাবনে। বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর কাছে গ্রহণ করলেন বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস [যশোদামাঈ : শংকরনাথ রায়]।

এবং তারপর নিকসনকে নবজন্ম দিলেন ন্যাসদীক্ষায় ; নব নাম দিলেন। কৃষ্ণপ্রেম।

সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রাক্কালে প্রতিশ্রুত হলেন কৃষ্ণপ্রেম, যে তিনি যশোদামাঈর সাধনার পথ কখনও পরিত্যাগ করবেন না। আর অলৌকিক দর্শন বা শক্তির জন্যে কাতর হবেন না কখনও !

সেই প্রতিশ্রুতিতে আজও পরম প্রোজ্জ্বল মের্তোলার পাহাড় !

লক্ষ্ণৌ থেকে বারাণসীতে নূতন শিক্ষায়তনে যোগ দিতে এলেন যশোদামাঈর স্বামী। যশোদামাঈও এলেন কাশীতে ! এই কাশীতেই যশোদামাঈর অধ্যাত্ম-জীবন দলের পর দল মেলে বিস্ময়ের শতদল হয়ে ফুটে ওঠে। অ্যানি বেসান্ত তাঁর কাছে দীক্ষা চান। কিন্তু যশোদামাঈ তা দিতে অস্বীকার করেন। কেন করেন, তা তিনিই জানেন। সম্ভবত: যে প্রতিশ্রুতি অক্ষত থাকবার সম্ভাবনা কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে দেখেছিলেন। বেসান্তের মধ্যে তা সুদূর পরাহত ছিলো তখনও।

সন্ন্যাস নেবার পর যশোদামাঈ এলেন আলমোড়ায়। চিরকালের জন্যে। মের্তোলায় নূতন ঘর পাতলেন,—রাধারাণী আর রাধারমণের ঘর। সংগে এলেন কৃষ্ণপ্রেম এবং আরও কয়েকজন। শহর থেকে দূরে, সভ্যতা থেকে সরে গিয়ে স্বপ্ন আর সাধনার, সেবা আর আরাধনার আসন পাতলেন পাহাড় ঘেরা পথের ধুলায়। যেদিকে তাকাও শুধু পাহাড় আর আকাশ। ধূসর আর নীল। অদূরে দাঁড়িয়ে 'নন্দা দেবী'। তুষারস্নাত শুভ্র মাথা ত্রিশূলের ; তারই ওপর ধূম্রজটা বুঝি ধূর্জটির।

কৃচ্ছ্রসাধনার আহ্বান জানালেন যশোদামাঈ। কৃষ্ণপ্রেমকে বললেন : গৃহস্থের দরজায় দরজায় গিয়ে দাঁড়াও ; বলো : ভিক্ষাং দেহি মে। ভিক্ষাপাত্র ভরে আনো প্রভুর সেবার জন্যে আর আনো অহংকার ভেঙে চুরমার করতে। গৌরতনু সেই সন্ন্যাসী গিয়ে দাঁড়ায় মানুষের দরজায়। সুকান্ত, সুদীর্ঘ, সুঠাম এক ইংরেজ কালা আদমির কাছে হাত পাতার সেই দৃশ্যের স্মৃতির স্পর্শ আলমোড়ার পথে প্রান্তরে লেগে আছে আজও [যশোদামাঈ : শংকরনাথ]।

যশোদামাঈ কৃষ্ণসেবাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেম মনে করতেন।

কৃষ্ণপ্রেম নিজেও বলেছেন সেকথা ; সেবার মধ্যে দিয়েই মন অমন কৃষ্ণে মজে। মায়ের অনুগ্রহ আর বিগ্রহসেবা—এই হচ্ছে রাধারাণীর পূজা। এছাড়া আর আমি কিছু জানিনে।

আমি নয় ; স্বামী তুমিই সব,—অহংকার ভংগই, বিশ্বনাথের অংগে মানুষের শ্রেষ্ঠ অলংকার !

আরও বলেছেন কৃষ্ণপ্রেম। বলেছেন সংসার এবং সার এক সংগে হবে না। দুহাত দিয়ে না ধরলে রাধারাণী ধরা দেন না। সব দিয়ে পেতে হয় সব। অনন্যমনে যে চায় তাঁকে সে পায় শুধু। দু' নৌকায় পা দিয়ে পায় না কেউ তীরে উঠবার উপায়। এক মনে, এক চিন্তায়, এক স্বপ্নে, এক সাধনায়, এক আরাধনায় কৃষ্ণপ্রেম সম্ভব। বাসনা যার সোনা হয়ে যায়নি তার কানে শোনা যাবে না সেই মুরলীধ্বনি।

দ্রৌপদী যতক্ষণ বস্ত্রের খুঁটো চেপে ধরে আছেন ততক্ষণ দেখা নেই সুদর্শন চক্রধারীর। যে মুহূর্তে দু হাত তুলে দিয়েছেন দ্রৌপদী সব লজ্জা বিস্মৃত হয়ে তখনই দেখা দিয়েছেন সেই চারহাত ; শংখচক্র গদাপদ্মপাণি।

মের্তোলায় এই রাধারাণী আর রাধারমণের বিগ্রহের সামনে গান গাইছেন সেবার পণ্ডিচেরীর দিলীপকুমার রায়। পাশের ঘরে শয্যাত্যাগে অশক্ত শুয়ে আছেন যশোদামাঈ। গানের সুরের পাখা গুঞ্জরণ করে উঠলো মূর্তির সামনে! ছড়িয়ে গেল সুরের আলো ঘরময়। সুরের সুবাসে ভরে গেল মের্তোলার পাহাড়। ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো দৈবকণ্ঠ পাহাড়ে পাহাড়ে! সুরের ঝরনা তলায় এসে বসলো সবাই। শুধু শয্যায় খুঁজে পাওয়া গেল না উত্থানশক্তি রহিত যশোদামাঈকে। কোথায় গেলেন তিনি?

যশোদামাঈকে পাওয়া গেল মন্দিরে। ধ্যানাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে দু চোখ দিয়ে। পংগুকে যিনি চলার শক্তি দেন আজ তিনি স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছিলেন দিলীপকুমারের পেছনে। সুরের জালে সেদিন ধরা দিয়েছেন এই পৃথিবী যাঁর পরমাশ্চর্য ইন্দ্রজাল। যশোদামাঈ নিজে বলেছেন সুরের ভাস্কর দিলীপকুমারকে! লীলাময় স্বয়ং আজ তোমার সুরের ঝরনাতলায় এসেছিলেন স্নান করতে। আমি স্বচক্ষে দেখলাম।

স্বচক্ষে; তবে সকলের চোখে নয়। সেই চোখেই শুধু এ দেখা সম্ভব যে চোখের নীলমণিতে সবাই নীলমণি। মণিকার ছাড়া সে নীলমণি আর কার!

যশোদামাঈর মরদেহ মের্তোলা ছেড়ে যাবার পরেও দিব্য চেতনা দিনে দিনে দীপ্ত হয়েছে কৃষ্ণপ্রেমে। মের্তোলা আশ্রমে যাবার জন্যে সেবার ব্যাকুল হয়েছে সুনীল আর আরতি। যাবার পাথেয় নেই। আরতির হাতের বালা বিক্রি করে জোগাড় হলো টাকা। কারণ যেতেই হবে। মের্তোলা আশ্রমে পূজা সাংগ হয়েছে সবে একদিন। কৃষ্ণপ্রেমের হাতে দেখা গেল শ্রীরাধারাণীর বালা। আরতিকে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণপ্রেম: তোমার হাত খালি কেন? বালা কি করলে তোমার। মুখ নীচু করে আরতি দাঁড়িয়ে রইলো। জবাব জোগালো না তার মুখে।

প্রসন্ন বেদনায় বিচ্ছুরিত হাস্য কৃষ্ণপ্রেম বললেন: রাধারাণী তাঁর নিজের হাতের বালা পরিয়ে দিতে বলেছেন তোমার হাতে। তুমি এখানে আসবার জন্যে যা খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে, যার জন্যে করেছ এই কাজ, তিনি আজ নিজের হাত খালি করে বললেন তোমার হাত ভরে দিতে [যশোদামাঈ: শঙ্করনাথ রায়]।

এ সেই বালা যা বিক্রি করা যায় না; সে বালার কাছে যুগে যুগে আমরা সবাই বিক্রীত।

মের্তোলা পাহাড়ে যশোদামাঈর দিব্য চেতনার দূত আলোকের রাখী পরিয়ে চলেছেন পথিকজনের হাতে আজও। সমস্ত দিনের 'দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে' বিশ্বাস রিক্ত কর্মসর্বস্ব মানুষের প্রাণে আনন্দের বীণা বাজাবার ভার যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ভগবানের দূত। মানুষ যতবার বিষিয়ে দেবে এই বসুন্ধরার মধু বায়ু, আলোকে করতে চাইবে অবিশ্বাসের অন্ধকার, ততবার আসবেন ভগবানের দূতেরা। ততবার ভালোবাসবেন তাদের যারা হিংসার বদলে প্রতিহিংসা, মারের বদলে মার, বিভীষিকার উত্তরে বিভীষিকার পালা রচনা করতে আসবে পৃথিবীতে। বলবেন, 'ক্ষমা কর, ভালবাসো'।

আর কোনও আশা নয়। শুধু ভালোবাসা, ধন নয়, মান নয় একখানি ভালোবাসা। যে ভালোবাসতে পেরেছে সে পেরেছে হাসতে 'পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দরিদ্রের অত্যাচারে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে।'

মের্তোলায় যশোদামাঈর সেই ভালোবাসার নামই কৃষ্ণপ্রেম!

ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি দেবতাদের আত্মা অবিনশ্বর হিমালয়ের কোলে আলমোড়ার অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তীর্থ মের্তোলার পাহাড়। সেই পাহাড়ের দরিদ্র কুটীরে মূর্ত নারায়ণ মূর্তির অর্চনা অনলস আয়োজনে ব্যাপ্ত একটি মানুষ, যাঁকে দেখে অনুভব করা যায় প্রেমে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। তাঁর নাম কৃষ্ণপ্রেম। যোদ্ধা নয়, রাজনৈতিক নেতা নয়। লাখটাকার নয় অভিনেতা, জনপ্রিয় ব্যবহারজীবী, বাগ্মী অথবা সাহিত্যিক শিল্পী নয়; একজন সম্পূর্ণ মানুষ। মানব জীবনের পূর্ণমূল্য যিনি পেয়েছেন কৃষ্ণ-প্রেমে। কবির সেই প্রার্থনা।

আমি চাইনা হতে, নবযুগের নববংগের চালক
কোনও জন্মে পারি যদি হতে ব্রজের রাখাল বালক'

—তারই উত্তরে রোনালড, নিকসনের উত্তরীয় রাঙানো। সেই উত্তরীয়ের নামই 'কৃষ্ণপ্রেম'। যশোদামাঈ দীক্ষামুহূর্তে বলেছিলেন তাঁর মানস-সন্তানকে: এ জীবনে ঈশ্বর দর্শন হোক বা না হোক···

ঈশ্বর কে জানি না! শুধু জানি, কৃষ্ণকে দর্শন দিতেই হবে কৃষ্ণপ্রেমকে। তাঁকে আসতেই হবে মের্তোলার পাহাড়ের ওই ভালোবাসায়। ভক্তের বুক ছাড়া ভগবানের পা ফেলার জায়গা কোথায় আর এত বড় পৃথিবীতে।

মের্তোলা পাহাড় বারাণসী থেকে অনেক দূরে; কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের চেয়ে বিশ্বনাথের এত কাছাকাছি আর কে? [ক্রমশঃ।
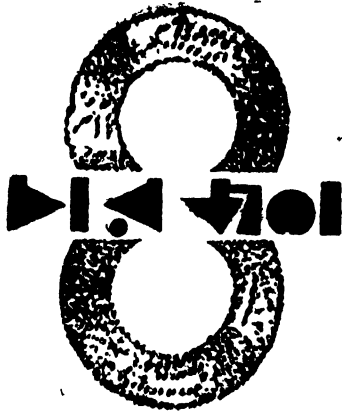
শ্রীবিবেকরঞ্জন সেন

[জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য]

অল্পবাক, সুমার্জ্জিত ব্যবহার, আইনজ্ঞের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারকের নিরপেক্ষতা—এই চতুর্বর্গের সমন্বয় দেখা যায় জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য্য ও ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীবিবেকরঞ্জন সেন মহাশয়ের মধ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কুমিরমোড়ার বাসিন্দা উপেন্দ্রনাথ সেন প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদে আসিয়া সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। পরে তিনি নাগপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হন। তাঁহার চার পুত্র—প্রথম, এ্যাডভোকেট জেনারেল ও নাগপুর হাইকোর্টের বিচারপতি পরলোকগত জ্ঞানরঞ্জন সেন। দ্বিতীয়, মধ্যপ্রদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার বিনয়রঞ্জন সেন। তৃতীয়, শ্রীবিবেকরঞ্জন ও চতুর্থ শ্রীরঞ্জন সেন। একমাত্র কন্যা স্বর্গতা ইন্দুমতী দেবী ছিলেন কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীসন্তোষকুমার বসু এম, পি-র সহধর্ম্মিণী। বিবেকরঞ্জনের মাতা ছিলেন জব্বলপুরের পুরাতন বাসিন্দা ৺ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পৌত্রী পরলোকগতা নিরুপমা দেবী।

শ্রীবিবেকরঞ্জন সেন

১৮৯৮ সালের ১৬ই আগষ্ট বিবেকরঞ্জন জব্বলপুর সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হোসেঙ্গাবাদ বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন ও এলাহাবাদ মুইর কলেজ হইতে বি, এস, সি, পাশ করিয়া আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ সালে নাগপুর জেলা কোর্টে আইন ব্যবসা সুরু করিয়া ১৯২২ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত জব্বলপুরে অবস্থান করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি পাবলিক প্রসিকিউটার ও সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি নাগপুর হাইকোর্টে যোগদান করিয়া আয়কর বিভাগে পরামর্শদাতা ও কাউন্সেল পদে কাজ করিতে থাকেন। ১৯৪৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী তিনি নাগপুর হাইকোর্টের বিচারপতি হন এবং ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের জজ্ হিসাবে জব্বলপুরে আসিয়া ১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। মধ্যে তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির কার্য্যও করেন।

শ্রীভিভিয়ান বসু Commission of Enquiry হইতে ছুটী লইলে শ্রীসেন ১৯৬০ সালের ১লা নভেম্বর উহার ভার গ্রহণ করেন। গত মে মাসে তিনি জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হিসাবে অভিষিক্ত হন।

শ্রীসেন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অফ্ দ্য ফ্যাকাল্‌টি অফ 'ল' (১৯৫২-৫৭), Master of Laws Studies এর ডিরেক্টর, সগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, বেঙ্গলী এসো: (নাগপুর)-এর ও গণ্ডোয়ানা ক্লাবের সভাপতি, জব্বলপুর রোটারী ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বা আছেন।

তিনি ১৯২৬ সালে এলাহাবাদের অধ্যাপক পরলোকগত সতীশচন্দ্র দেবের কন্যা শ্রীমতী কমলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। কন্যা শ্রীমতী ইরা মজুমদার ও পুত্র শ্রীঅরুণ সেন আই, এ, এস।

ভারতবর্ষে হাইকোর্টের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য যে দুই সহোদর শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ও শ্রীবিবেকরঞ্জন সেন মহাশয়দ্বয় ১৯৪৯ সালে নাগপুর হাইকোর্টে এক সঙ্গে বিচারপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

[অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কম্প্‌ট্রোলার এণ্ড অডিটর-জেনারেল অব ইণ্ডিয়া]

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাংলার এক অখ্যাত মহকুমা শহরের বিদ্যালয়ে সেরকষা ও মণকষার হিসাব লইয়া যে জীবন আরম্ভ হইয়াছিল পরবর্ত্তীকালে সেই জীবনই দেখা দিয়াছিল সমগ্র ভারতের হিসাবরক্ষকরূপে। ভারতের এমন কোন প্রাদেশিক সরকার নাই যাহার হিসাব-নিকাশের খাতায় শ্রীচৌধুরীর হস্তাক্ষর নাই। শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক হিসাবেও শ্রীচৌধুরীর স্থান কোন অংশে কম নহে। সাময়িক ভাবে বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য পদ লাভ এবং স্বরচিত কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ তাহার জলন্ত নিদর্শন।

পিতা স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র চৌধুরী এবং মাতা স্বর্গীয়া কান্তকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র ১৯০১ সালে শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অধীন আম্মা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার কর্ম্মস্থল করিমগঞ্জ হাইস্কুলে ক্ষিতীশচন্দ্রের বাল্যের শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৯১৭ সালে তিনি উক্ত স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি চান্দ কলেজ হইতে আই-এ এবং গৌহাটী কটন কলেজ হইতে অর্থশাস্ত্রে অনার্স-সহ বি-এ ডিগ্রি লাভ করেন, ডিগ্রি লাভ করিবার পর শ্রীচৌধুরী ঢাকা শহরে যান এবং তথায় ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্র লইয়া এম-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হন। ১৯২৩ সালে শ্রীচৌধুরী ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করিয়া এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন।

এম, এ ডিগ্রি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সর্ব্ব ভারতীয় ফাইন্যান্স সার্ভিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করেন এবং উক্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত সাফল্য লাভ করিয়া ১৯২৪ সালে সরকারী কার্য্যে যোগদান করেন। একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর কাল বিভিন্ন প্রদেশের অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল প্রমুখ উচ্চস্তরের সরকারী কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া অবশেষে ১৯৫৫ সালে ডেপুটী অডিটর জেনারেল হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার কিছুকালের মধ্যে তিনি ভারত সরকারের অনুরোধে এবং বিশ্বভারতীর আহ্বানে ১ বৎসরের জন্য তথাকার উপাচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন। সারাজীবন সরকারী চাকুরীতে জীবন কাটাইলেও সাহিত্য সেবার আগ্রহ তাঁর কোন দিনই ম্লান হয় নাই। তাঁহার রচিত "বাংলার ভূমি প্রথার ইতিহাস" "শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত" এবং "বিন্দি" প্রভৃতি পুস্তক কয়েকখানি তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার বাস্তব প্রমাণ।

শ্রীমতী রাণী চন্দ

[স্বনামধন্যা লেখিকা ও চিত্রশিল্পী]

সাহিত্য প্রেমী কোন্ বঙ্গসন্তান রাণী চন্দর নামের সাথে সুপরিচিত নন? "পূর্ণকুম্ভ," "ঘরোয়া," "জেনানা ফাটক" "হিমাদ্রি", "আলাপচারী," "রবীন্দ্রনাথ," "জোড়াসাঁকোর ধারে" বাংলা সাহিত্যের এক একটি অমূল্য রত্ন। ক'দিন আগে বেরিয়েছে তাঁর "গুরুদেব"।

এতগুলো বই লিখেছেন কিন্তু শ্রীমতী চন্দ সব চেয়ে ভালোবাসেন ছবি আঁকতে। তাঁর আঁকা ছবি দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। তা হবেই না বা কেন? বড় ভাই মুকুল দে ভারতবিখ্যাত শিল্পী। অপর ভাই মনীষী দে'ও তাই।

তাঁর নয়াদিল্লীর সোনেহ্রিবাগের বাড়ীতে বসে সেই আলোচনাই হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, আপনার কি মনে পড়ে কবে আপনি প্রথম ছবি আঁকেন? ছবি আঁকাতেই বা আপনার ঝোঁক এল কেন?"

শ্রীমতী চন্দ বললেন, "আমি তখন ছোট। দাদার (শ্রীমুকুলচন্দ্র দে) স্কেচগুলো রাখা থাকতো মায়ের একটা প্রকাণ্ড বড় বাক্সতে। বছরে একবার করে সেগুলো রোদে ছড়ানো হতো, যাতে নাকি ছবিগুলো না নষ্ট হয়ে যায়। আমাকে সেই স্কেচগুলো পাহারা দিতে হতো। ছবি পাহারা দিতে গিয়ে আমার মন চলে যেত এক অজানা জগতে। মনে মনে ভাবতাম আমিও কি এরকম ছবি আঁকতে পারব না? একখানা খাতা জোগাড় করলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে তাতে ছবি আঁকা শুরু করলাম।"

আমি বললাম, "লুকিয়ে কেন?"

"লুকিয়ে কেন জানো না? মা বলতেন মেয়েরা আবার ছবি এঁকে সময় নষ্ট করে নাকি?"

আমি বললাম, "তার পর"?

"দাদা তখন বিলেতে। বিলেত থেকে এসে আমার ছবির খাতাখানা আবিষ্কার করে তিনি মহা খুশী। আমার প্রথম ছবি হরপার্বতী বেশ বড়ো ক্যানভাসেই এঁকেছিলাম।"

১৯১২ সালের ৩০-এ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে শ্রীমতী চন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদেব স্বর্গীয় কুলচন্দ্র দে মহাশয় তখন সেখানে পুলিশ অফিসার ছিলেন। মায়ের নাম পূর্ণশশী দেবী। কর্ম্মের সূত্রে পুলিশ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কুলচন্দ্রের অবসর অতিবাহিত

শ্রীমতী রাণী চন্দ

মোত সাহিত্য সাধনায়। কবিতা রচনায় তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। শ্রীমতী চন্দ পিতৃহারা হন শৈশবে। এই সময় তাঁরা মেদিনীপুর ছেড়ে ঢাকায় চলে যান। সেখানেই তাঁর বিদ্যারম্ভ।

শ্রীমতী চন্দ ষোলো বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে যান। তার পূর্বে ক্যালকাটা স্কুল অব আর্টের প্রিন্সিপ্যালের বাড়ীতে (দাদা মুকুল দে তখন প্রিন্সিপ্যাল) থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা দেখার সুযোগ পান। গুরুদেব মাঝে মাঝে সেখানে আসতেন। তাঁর ছবি আঁকার উৎসাহে তিনিও ছবির দিকে ঝোঁক দেন। রাণী চন্দ ইংরিজী সাহিত্যের পাঠও গুরুদেবের কাছেই নিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে এসে পরিচয় হল নন্দলাল বসুর সঙ্গে। বেশ কিছুদিন তাঁর কাছে রাণী তালিম নিলেন। আর্টে তখন শান্তিনিকেতনে কোনো ডিগ্রী কোর্স ছিল না। ছাত্রদের হাজিরার ওপরও কোন জোর দেওয়া হত না। ক্লাসে কেউ না থাকলেই শিক্ষক মশাই ধরে নিতেন নিশ্চয়ই স্নাতক 'আউট ডোর' স্কেচ করতে গেছে।

ছবি আঁকার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হত যদি না তাঁর স্বামী এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতেন।

শ্রীযুত অনিল চন্দর সঙ্গে রাণীর বিবাহ হয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে। বিবাহের মন্ত্র পাঠ করান গুরুদেব স্বয়ং।

"ছবি আঁকতে ঢিলে দিলেই উনি রাগ করতেন। শান্তিনিকেতনে তখন শ্রীযুত চন্দ গুরুদেবের সেক্রেটারী। লোকজন, অতিথি অভ্যাগতর ভিড় লেগেই আছে। তাদের দেখাশুনো করে ওরই এক ফাঁকে ছবি এঁকেছি।"

রাণী সৌভাগ্যবতী। তিনি স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের সান্নিধ্য, আশীর্বাদ ও স্নেহে ধন্য হয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে তিনি রবীন্দ্রনাথের অতি নিকটে ঘনিষ্ঠভাবে আসার সুযোগ পেয়েছেন। সেই বিরাটপুরুষের প্রয়াণে ব্যথিত চিত্তে তিনি ছবি আঁকার ভিতরে ডুবে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথ তখন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। ১৯৪২ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারাবরণে ছবি আঁকা বন্ধ হয়। ছবি আঁকা বন্ধ হলে কি হবে, জেলেতেও এই কর্মসাধিকার কাজ কেউ বন্ধ রাখতে পারলো না। তিনি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। কারাবরণের দিনগুলোর বর্ণনা দিলেন "জেনানা ফাটকে।"

জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ বললেন কয়েকখানা ছবি আঁকতে। তিনি শুরু করেন, অবন ঠাকুর শেষ করেন। দুজনেই সেই এক-সেট ছবিতে যুগ্ম স্বাক্ষরে চিত্রজগতকে এক মহামূল্য সম্পদ দিলেন।

আমি বললাম, "বেড়াতেই আপনি বোধ হয় সব চেয়ে বেশী ভালবাসেন?"

শ্রীমতী চন্দ বললেন, "কে না ভালবাসে বল?"

"কোন্ দেশ বা জায়গা আপনার কাছে সব চেয়ে বেশী ভালো লেগেছে বলুন তো?"

"বিদেশের অনেক জায়গাই ভালো লেগেছে। তবে হিমালয়ের তুলনা নেই। শিখর থেকে শিখরে চড়ে যখন ধ্যানগম্ভীর সেই হিমালয়ে ধাঁটি তখন মন যেন কোন্ এক অজানা জগতে চলে যায়। তার তুলনা নেই।"

মনে মনে বললাম, এই অনুভূতি রয়েছে বলেই তো "হিমাদ্রি" বইখানা এত গভীর ভাবে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করেছে। "হিমাদ্রি" বইখানার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীমতী চন্দকে ভুবনমোহিনী পুরস্কার দেন। "পূর্ণকুম্ভ"র জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে তাঁকে দেওয়া হয় রবীন্দ্র পুরস্কার।

শ্রীযুত অনিল চন্দ ও শ্রীমতী চন্দর একটি সন্তান—অভিজিৎ। গুরুদেবই তাঁর নামকরণ করেন। অভিজিৎ অতি সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন। কিন্তু অভিজিৎ শিল্পীর জীবন পছন্দ করেন না। তুলির চেয়ে তিনি বন্দুক পছন্দ করেন। আপাতত তিনি লামডিঙের এক চা-বাগানের ম্যানেজার। চিঠি লিখেছেন মাকে, "যে কোনো সময়ে সীমান্তে চলে যেতে পারি। পা বাড়িয়ে আছি।"

আমি বললাম, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করা বাকী ছিল। আপনি লিখতে বেশী ভালোবাসেন না আঁকতে?"

তিনি বললেন, "দুটোই আমার ভালো লাগে। তবে সাহিত্য ক্ষেত্রে আমার কোনো দায়িত্ব আছে বলে মনে করি না। লিখতে ভাল লাগে তাই লিখি। আঁকাটা হচ্ছে সর্বযুগের সর্ব মানুষের ভাষা তাই বোধ হয় আঁকাটাকেই বেশী ভালবাসি।

আমি বললাম, "কোন্ ছবিখানা আপনার সবচেয়ে ভালো হয়েছে বলে মনে করেন?

শ্রীমতী চন্দ বললেন, "হরপার্বতী।" ছবিখানা শ্রীমান অভিজিৎ এর কাছে আছে। মায়ের কাছ থেকে ছবিখানা তিনি পেয়েছেন শ্রীমতী শিপ্রার সঙ্গে তাঁর পরিণয় উপলক্ষে।

সম্প্রতি যে সব ছবি এঁকেছেন তার ভিতর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি হল "জয়দেবের মেলা," "সাঁওতালি বিয়ে" ও বুদ্ধদেবের জীবনীর ওপর এক সেট ছবি।

শ্রীমতী চন্দ কখনও বিদেশী রঙ ব্যবহার করেন না। নিজেই তিনি রঙ তৈরী করে নেন। —শুভ্রা ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত।

ডাঃ ভবতোষ দত্ত

(প্রখ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের বর্তমান অধিকর্তা)

বিদ্যার সঙ্গে বিনয়ের যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক দত্ত তাঁহার অর্জিত বিদ্যায় শুধু ভারতের মাটিতেই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যে বিশেষ ভাবে সম্মানিত এবং স্বীকৃত "আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার" কমিটি কর্তৃক তাঁহাকে পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত ১৯১১ সালে পাটনা হ'তে র জন্মগ্রহণ করেন। আদি পৈত্রিক নিবাস শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার লাখাই গ্রাম হইলেও তাহার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি অল্পই। অধ্যাপক পিতার তত্ত্বাবধানে স্বর্গীয় হেমেন্দ্রকিশোর দত্তের স্বগৃহে বাল্যের শিক্ষা সমাপনান্তে প্রবেশিকা পরীক্ষার তিন বৎসর পূর্বে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন।

১৯২৬ সালে উক্ত স্কুল হইতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে ঢাকা জগন্নাথ

কলেজ হইতে আই-এ-তে প্রথম স্থান লাভ করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯৩০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া বি-এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন।

এম-এ ডিগ্রি লাভ করিবার পর বিভিন্ন বে-সরকারী কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া ১৯৪৩ সালে কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজে (মৌলানা আজাদ কলেজে) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। উক্ত কলেজে অধ্যাপনা কালেই ১৯৪৮ সালে "ষ্টাড লিভ" লইয়া ডক্টরেট লাভের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক লণ্ডনে যান এবং তথায় লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ ভর্ত্তি হন এবং গবেষণা আরম্ভ করেন। দুই বৎসর কাল তথায় গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অধ্যাপক দত্ত ১৯৫০ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

পি, এইচ, ডি ডিগ্রি লাভ করিবার সংগে সংগেই অধ্যাপক দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঘোষ ট্রেভালিং" বৃত্তি লইয়া সুইডেনে যাইয়া ষ্টকহলম বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন।

ঐ বৎসরই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে নিযুক্ত থাকাকালীন ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে অধ্যাপক দত্তকে আন্তর্জ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার কমিটিতে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অধ্যাপক দত্ত ১৯৫৪ সালে আন্তর্জ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের পূর্ব্বাঞ্চলীয় বিভাগের সভাপতি হইয়া ওয়াশিংটনে যান এবং চারি বৎসর সুনামের সহিত নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া ১৯৫৮ সালে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজে স্বীয় পদে যোগদান

ডাঃ ভবতোষ দত্ত

করেন। ১৯৬০ সালে অধ্যাপক দত্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগে অধিকর্ত্তা নিযুক্ত হন। অধ্যাপকপদ ব্যতীত অধ্যাপক দত্ত বহু অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটিতে সদস্য নিযুক্ত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর অধীন বোর্ড অব ইকনমিক এন্‌কোয়ারিস কমিটির এবং প্রাইস এন্‌কোয়ারী কমিটির চেয়ারম্যানের আসনে তিনি সমাসীন। অধ্যাপক দত্ত ভারত সরকারের প্ল্যানিং কমিশন কর্ত্তৃক গঠিত "প্যানেল অব ইকনোমিষ্টসের" অন্যতম সদস্য।

সাক্ষী

(সেসিল হেমলি—১৯১৪)

একদা শান্তির মধ্যে ছিল বাঁধা অনৈক্যের সুর,
যন্ত্রণার গুহ্য অর্থে ভরা। মম কামনা-বিধুর
উন্মত্ত আবেগে এনেছিল ঝড় প্রচণ্ড-ফুৎকার,
মনের অনীহা আর অবিশ্বাস উড়িয়ে দেবার
যত্ন। কিন্তু পারল না তো প্রশান্তি আনতে
মনের প্রচণ্ড বেগ। এখন, কি আশ্চর্য্য, বনান্তে
একটি নিষ্পত্র শাখা, দুলে-দুলে শীত-স্তব্ধতায়
আমার জ্বালার দাহ মুছে নিয়ে, মনকে ভেজায়!
এতদিন যা জেনেছে অন্তরাত্মা, তাই দেখে চোখে,
পাথরে পাতায় ছেপে রাখে এক অপূর্ব্ব আলোকে
তার অভিযান-কথা। পাতা আর পাথরে আবার
ইতিহাস খুঁজে পাই: আমার অজ্ঞাত যাত্রার
চিহ্ন-লিপি। কি পেয়েছি, কি জেনেছি যার চালনায়,
স্তব্ধতা আমাকে ডাকে এই ভাবে বোবা ইসারায়?

দূরেও নয়, গভীরেও নয়

(রবার্ট ফ্রষ্ট—১৮৭৫)

বালুকা-বেলা ধরে, চলেছে যত লোক
সবাই একই দিকে ফেরায় লাখো চোখ,
পিছনে রেখে তট, সারাটা দিনমান,
সাগর পানে চেয়ে শুনছে কলতান।
কখনো খোল-তোলা জাহাজ ভেসে যায়,
কাচের মত ভেজা মাটির আয়নায়
সিন্ধু-শকুনের কখনো উঠে আসা
পিছলে পড়ে যেন। আলোর কালো ভাষা।
হয়ত মাটি বাড়ে জলেরই করুণায়
তবুও জল এসে তটেই আছড়ায়,
তবুও লাখো লোক পারে কি ভুলতে?
সাগর থেকে চোখ পারে না তুলতে।
পারে না দূর পানে দু চোখ খেলাতে,
পারে না সুগভীরে মনকে মেলাতে।
তবু কি বাধা পায় তটের লাখো লোক
নিবিড় পাহারায় রাখতে দুই চোখ

অনুবাদক—অমিয় ভট্টাচার্য্য

অনুবাদ—রামপ্রসাদ সেন

ঋগ্‌বেদ

(মধুচ্ছন্দা)

প্রথম মণ্ডল

প্রথম সূক্ত

১। বন্দনা করি উজ্জ্বল-শিখা অগ্নি উগ্রজ্যোতি,
যজ্ঞ-পুরোধা, হোতা, ঋত্বিক, দিব্যানন্দপতি।

২। পুজিল অগ্নি অতীতে ঋষিরা, পুজিছে বর্তমান,
অগ্নি সে হোতা, সর্ব দেবতা মর্তে প্রবাহি আনে।

৩। পূত প্রজ্বল পাবক সহায়ে দিনে দিনে পলে পলে,
লভিব পুষ্টি, খ্যাতি ও বিজয় জগতে বীরবলে।

৪। বিশ্ব ঘেরিয়া যজ্ঞ তোমার হে দেব বৈশ্বানর,
সর্ব দেবতা সংকাশে গতি সর্ব শক্তিধর।

৫। হোতা হুতাশন, দিব্য-শ্রবণ, দিব্য-নয়নধারী,
লয়ে দেবগণ, উজলি গগন, আগমন হোক তাঁরি।

৬। অগ্নি তোমারে পূজে যেই জন কল্যাণ কর তার,
হে তপোদেবতা, দাও উদবারি সত্য সে আপনার।

৭। তমোঘ্ন, তব করি আরাধনা যুগ-যুগান্ত ধরি,
দুর্যোগে, সুখে, চেতনা-আলোকে তোমারে প্রণাম করি।

৮। সক্রিয় যাগে রক্ষক তুমি, হে দেব জ্যোতিষ্মান্,
ক্রমবর্ধনে ব্যাপিলে তোমার আপন প্রতিষ্ঠান।

৯। পুণ্য-পাবক, পিতৃ-তুল্য, তোমারেই যেন পাই,
তব সন্তান কল্যাণ লাগি সমীপে সর্বদাই।

দ্বিতীয় সূক্ত

১। এস হে মরুৎ, সোম প্রস্তুত, আঁখি মেলি কর পান,
দিকে দিকে তাই ঘোষিনু মোদের উৎসুক আহ্বান।

২। হে পবন, তব স্তুত সোমগণ লভিয়া দিব্যালোক,
পুজিছে তোমারে, সে মহামন্ত্রে সত্য প্রকাশ হোক।

৩। আপনারে যেবা শুক্ল করিল তারি পূর্ণতা তরে,
সোমরস পানে, প্রবল প্লাবনে পবন যাত্রা করে।

৪। রসনিবেদন করিনু রচন, মোদের শ্রেষ্ঠ দান,
এস হে ইন্দ্র, এস এস বায়ু, নিঃশেষে কর পান।

৫। এস বায়ু, তুমি এস হে বাসব, রসপানে উঠ জাগি,
বিপুল বিভবে দ্রুত এস তবে, জ্ঞানরস অনুরাগী।

৬। ইন্দ্র পবন ! সুতসোমগণ আসব অর্ঘ্য ভরি,
রাখিল সাজায়ে, এস বীরদ্বয়, হেথা এস ত্বরা করি।

৭। মিত্রে স্মরি যে সত্যদর্শী, বরুণ বৈরী-ঘাতী,
লভিনু দোঁহার পুণ্য-প্রসাদে স্বচ্ছ বুদ্ধিভাতি।

৮। মিত্র, বরুণ, সত্যধর্মে সত্যে করিয়া বৃদ্ধি,
সত্য পরশি, সাধিছে বিশ্বে, সুবৃহৎ তপে সিদ্ধি।

৯। সত্যদর্শী মিত্র বরুণ, দোঁহে বহুরূপধারী,
ব্যাপ্ত-নিবাস, নিপুণ-কর্মে পথ নির্দেশকারী।

তৃতীয় সূক্ত

১। অশ্ববাহন যুগ্ম দেবতা, কল্যাণ অধিপতি,
যজ্ঞ-প্রতিভা সম্ভোগ লাগি এস এস দ্রুতগতি।

২। তুরগ-আরোহী, হে বীরযুগল, ধীমান, জ্যোতির্ময়,
সত্য মন্ত্র ভাষণে দোঁহার পাই যেন পরিচয়

৩। এস হে দিশারী, সিদ্ধ কর্মী, দুর্দম গতিভরে,
রচিনু অর্ঘ্য সতেজ সোমের তোমা দোঁহাকার তরে।

৪। বিচিত্র জ্যোতি এস হে বাসব—নব নব রসধারা,
তব প্রাণময় শক্তি প্রভায় পবিত্র হোক তারা।

৫। প্রতিভাদীপ্ত হে দেব ইন্দ্র, জ্ঞানপথ-সঞ্চারী,
রসবান্ ভাষে সত্যমন্ত্র—অন্তরে এস তারি।

৬। তুরঙ্গ 'পরে এস বেগভরে হে দেব পুরন্দর,
সঁপিও তোমার অমৃতানন্দ রসনিবেদন পর।

৭। এস বিশ্বের সকল দেবতা রসবিতরণ স্বামী,
এস হে ত্বরিত কর বিতরিত—মোরা রস অনুগামী।

৮। সহসা যেমন তামস নাশন আলো উঠে উদভাসি,
এস দেবগণ আপন ভবন, পার হয়ে জলরাশি।

৯। চেতনাদায়ক হে দেববৃন্দ, অচ্যুত, ক্ষতহীন,
অগ্নি-বাহক, যজ্ঞে মোদের সতত থাকিও লীন।

১০। পূত, পবিত্র, ঋদ্ধিপূর্ণা হে দেবী সরস্বতী,
লভি যেন মোরা তোমার প্রসাদে সত্য আলোক জ্যোতি

১১। মননে জাগায়ে সত্যচিন্তা, ভাষণে সত্যবাক্,
মোদের যজ্ঞে বীণাপাণি তব করুণা-পরশ থাক।

১২। মধুর বীণাতে মহাসিন্ধুতে স্বরতরঙ্গ তুলি,
উর বীণাপাণি, শুদ্ধিকারিণী, প্রকাশ সত্যগুলি।

চতুর্থ সূক্ত

১। রূপস্রষ্টারে আহুতি জানাই, রসিকের প্রেয় তিনি,—
অবিচল যথা দোহনের কালে শান্ত পয়স্বিনী।

২। এস সুরেন্দ্র পরমানন্দ, আলোক-ছন্দে ভরি,
এস কর পান, রসের ভিয়ান নিমেষে ধন্য করি।

৩। এস নির্মল, চেতনা-আলোকে সকল কালিমা নাশি,
হে ধারণাতীত ! এস পরিমিত আধারে, হৃদয়বাসী।

৪। এস পার হও, পন্থা শুধাও সুরেন্দ্র মহাশূরে,
আলোক লীলায় যে দিল বিলায়ে বরণীয় বস্তুরে।

৫। মোহবন্ধনে বাঁধিয়াছে যারা উঠুক তাহারা গাহি—
"বজ্রী সহায়, রণে হবে জয় জাগো বীর উৎসাহী।"

৬। বিশ্ব জুড়িয়া ঘোষণা করুক রণজয়ী, কৃতবিদ্য,—
নন্দিত মোরা ইন্দ্র শাসনে, সর্বমানস সিদ্ধ।

৭। যজ্ঞের শোভা তীব্র আসব, বাসবেরে কর দান,—
দেব-উল্লাসে প্রিয়জনে তোষে—শক্তি সে বেগবান।

৮। উগ্র এ রস করেছিলে পান হে শতকর্মা বীর,
বৃত্রে নাশিয়া আনিলে বিশ্বে, পূর্ণতা সিদ্ধির।

৯। সেই পূর্ণতা হে শতকর্মা, দানিল মোদের ঋদ্ধি,
দেবেন্দ্র, তব প্রসাদে হউক সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি।

১০। পূর্ণ, মহান, যিনি লয়ে যান, পরপারে উত্তরি,
রসিকজনের সুহৃৎ বাসব, তাঁরি জয়গান করি।

পঞ্চম সুক্ত

১। মেলিয়া আসন, দ্বিধা-নিরাসন হয়ে একমন প্রাণ।
হে সখাবৃন্দ, পূজিয়া ইন্দ্র, গাহ সবে তাঁরি গান।

২। অনিন্দ্য শোভা, অতুল বিভব, ইন্দ্র সে রসভাগী,
রসরচনাতে মিলি এক সাথে তাঁহারি পূজার লাগি।

৩। হউক মোদের সিদ্ধির মাঝে তাঁহারি আবির্ভাব,
চেতনায়, বোধে, সুখে-সম্পদে পূর্ণতা করি লাভ।

৪। রণ-বিগ্রহে অরি নিগ্রহি যুগল অশ্বযান,—
ধায় বাধাহীন, বৈরী মলিন,—গাহ ইন্দ্রের গান।

৫। রস-প্রবাহেতে শান্ত, প্রগাঢ় জ্যোতির পরশ লাগি,
বহিয়া চলিল তাঁহাদেরি তরে যাঁরা রস অনুরাগী।

৬। লভিতে জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি কর্মীর সম্মান,
জনমি ইন্দ্র করিল তখনি অমৃত রস পান।

৭। সত্য-প্রকাশ মন্ত্রে ইন্দ্র তব আনন্দ ধ্যান,
সুধারসধারা পশিছে তোমাতে প্রকাশিয়া কল্যাণ।

৮। স্থাপিল সত্য যে মহামন্ত্র, ঘোষিল সত্যবাণী,
সকল মন্ত্রে শতকর্মীর বর্ধন দিক আনি।

৯। মহাবিশ্বের পুরুষ-শক্তি, অতি বিচিত্রগতি,—
করহ বিজয়, কল্যাণময় দেবরাজ, সুরপতি।

১০। মরণের ভয় করি যেন জয় হে দেব বজ্রপাণি,—
নন্দিত কর সত্যমন্ত্রে, নির্ভয় তব বাণী।

আনন্দ-রূপম্

জ্যোতির্ম্ময়ী রায়

দুখের দহনে দহিছে অহর্নিশ,
সুখের লাগিয়া লালায়িত তারা তাই ;
ভুলে যায় ওরা,—সুখ চাহে যেবা
'দুখ যায় তার নাই ;'

কেহ না পেয়ে অন্ন বলে ?
আঁধার আঁকড়ি ধরে ?
কাঁদিতে হাসে কি ?
হাসিতে কাঁদিয়া ফেলে ?

যা পারে করুক,
যা' খুশী ধরুক ওরা।
শান্তির স্বাদ পেতে যদি পারে,
কোনও প্রকারে—
লভুক জীবনে।

চোখ ঝল্‌সানো রোদে দাহ আছে,
মধুর চাঁদিমা চেয়ে
বাঁচুক 'মানুষ' হ'য়ে।
আনন্দের কী রূপ—আকার ?

জানা নাই ঠিক।
তবু, হে দিশারী!—প্রত্যুষের ক্ষণ,
দেখাও আমায় পুরবের দিক্—
আভার ইঙ্গিতে।

সঙ্গীতে সংবাদ

বিভিন্ন যুগের গানের মধ্যে সমসাময়িক সমাজ, শিল্প সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয়। প্রত্যেক যুগের বিশিষ্ট সঙ্গীত সে আমলের জনগণের মনের যেন প্রতিচ্ছবি। রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে গানের রূপ বদল হয়। এক কালের বিশিষ্ট চাহিদা মিটাইতে যে গান রচিত হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা মূল্যহীন নিরর্থক হইয়া পড়ে।

নীলকরদের অত্যাচার লইয়া গান লিখিয়াছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। সেকালের ঐ শ্রেণীর গানের মধ্য দিয়া যে ভাবে দেশপ্রীতি এবং ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দীনবন্ধুর নিম্নের গানটি রীতিমত বৈঠকী ঢঙে রচিত—

হে নিরদয় নীলকরগণ।
আর সহে না, সহে না প্রাণে এ নীলদাহন ॥
দাহনের সুকৌশলে শ্বেত-সমাজের বলে,
লুটেছে সকল বল কি আর আছে এখন ॥
দীনজনে দুঃখ দিতে কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি, পাষাণ সমান মন।
বুটন-স্বভাবে শেষে কালী দিলে বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধিজল পোড়াতে স্বর্ণভবন ॥

নীলকরদের অত্যাচার লইয়া দীনবন্ধুর ন্যায় আরও বহু অজ্ঞাত নামা অখ্যাত পল্লীকবিও গীত রচনা করিয়াছিলেন। যেমন—

নীলদর্পণে লঙ সাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীল নীলে সব নিলে প্রজার বলো ভাই কি রেখেছে ॥
কারো কার, তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বার-বার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে ॥

উভয়, প্রাপ্ত মহামতি, ভায়বান উভয় অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে ॥

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণের' ইংরেজি অনুবাদ করিয়া ভারতবন্ধু রেভারেণ্ড লঙ সাহেবের কারাবাস ঘটিয়াছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা প্রচার করিয়া বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন।

নববঙ্গের নবযুগের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেকালের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে গানে গানে স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে আমলের দেশপ্রেমিক বাঙালী কবির উক্তি শুনিয়া আজ বিরক্তিই বোধ হইবে। সিপাই বিদ্রোহের পর সাধারণ বাঙালীর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, আজ আর তাহা জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গানে আছে—

রাজভক্ত অনুরক্ত তোমার সব বাঙালী ছেলে।
এরা ধর্মপথে সদাই রত অধর্ম ক'রে না ম'লে।
অথবা রাজ্যপ্রাপ্তিচিন্তা কারে বলে স্বপ্নে জানি না।
কেবল ঈশ্বরের নিকট করি তোমার জয়ের বাসনা ॥

ঈশ্বর গুপ্তের সকল রচনার মধ্যেই একটা ব্যর্থমূলক বিদ্রূপ ইঙ্গিত থাকিত, এ সকল গানে তিনি ছদ্ম প্রশংসাই করিয়াছেন।

সংবাদবৈচিত্র্য লইয়া আনুষ্ঠানিক গান পাঁচালী কবিরদলের গায়করাও রচনা করিতেন। তারকেশ্বরের জনৈক মোহান্ত কুৎসিৎ মকদ্দমায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বিখ্যাত পাঁচালীকার ঠাকুরদাস দত্ত গান বাঁধিয়াছিলেন।

মোহান্তের তেল নিবি যদি আয়।
এ তেল এক কৌটা দিলে, টাক ধরে না চুলে
কানায় চোখে দেখতে পায়।
বিলাতী ঘানি নূতন আমদানি
শিবের যাঁড় জুড়েছে তেল ভোলে কামিনী—
হয়েছে ল্যাজে গোবরে বৃষ, কখন কি দায় ঘটায় ॥

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশের শ্রোতাদের রুচির সবিশেষ উন্নতি হয়। এই রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে এদেশে এক বিশিষ্ট অঙ্গের গান রচনার প্রয়াস হইল। নানা বিচিত্র ঘটনা, সামাজিক অনাচারের প্রতিবাদ, বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবন, তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি অবলম্বনে একশ্রেণীর আনুষ্ঠানিক গান রচিত হইতে লাগিল।

গত শতাব্দীতে নারীজাতির দুঃখদুর্দশায় অশ্রুপাত করিয়া অবরোধ প্রথা, বহু বিধবা, বৈধব্যদুঃখ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি লইয়া কবিরা অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। আজকাল অবশ্য ঐ সব দুঃখের অনেকগুলির অবসান হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসে ঐ সব সামাজিক গানগুলির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রমুখ কবিরা এই শ্রেণীর গান রচনা করিয়া যশস্বী হন। খাম্বাজ রাগিণীতে কুলীনকন্যার দুঃখের কাহিনী রচনা করেন কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী—

কুলীন তনয়া হয়ে অকূলে ভাসিয়া যাই।
অবলা ডুবিয়া মরি, কোন কূল নাহি পাই।
হইয়া কুলীন বালা, সহে না সহে না জ্বালা,
মরণ হইলে বাঁচি, আর কিছু নাহি চাই।

বহু নারী হয় যার, রমণী হইলে তার,
হয় সার হাহাকার, জীবন যন্ত্রণা ঠাঁই।

নারী জাতিকে জাগাইবার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছিলেন কবিরা। দ্বারকানাথ তো স্পষ্ট স্বরেই জানাইয়া দিলেন—

না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।

আনন্দচন্দ্র মিত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন কাতর কণ্ঠে—

আজি এ আনন্দ দিনে মিলে সকলে,
করি হে আনন্দ ধ্বনি হৃদয় খুলে,
বঙ্গের যতেক নারী অজ্ঞান আঁধারে,
পাশবদ্ধ পাখী প্রায় ছিল এতকাল;
চেয়ে দেখ এবে তারা পেয়ে সুসময়,
চলেছে উন্নতি পথে মন কুতূহলে।

বাংলা দেশের অন্যতম সামাজিক দুর্নীতি পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ক্ষোভের বিষয় আজও সে দুর্নীতির প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই।

এই সেদিনও অমৃতলাল বসু, বর্ধমানের কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি প্রমুখ হাস্যরসিকরা এ প্রথাকে তীব্র কশাঘাত করিয়া গান রচনা করেন। অমৃতলাল নাট্যকাররূপে সুপরিচিত, তাঁহার বহু নাটক সমাজ সংস্কারমূলক, তাঁহার গান—

বড় বেজায় দর বাড়ালে ববের বিশ্ববিদ্যালয়।
বাঙ্গালায়, কন্যাদায় যত গৃহস্থ লোকেরা মারা যায়।
না হতে এন্‌ট্রেন্স পাশ, চায় গো রূপার থালা গেলাস,
বি-এ—সোনার থালা গাড়ু, এম-এ তে সর্বস্ব চায়।
কন্যার বাপ বরকর্তাবে কহিছে মিনতি করে,
তোমার এ গাঁটকসার চাপন, ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয়।

গানটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতিও কটাক্ষ করা হইয়াছে। যে শিক্ষায় যুব সমাজের মনোবৃত্তির উন্নতি হয় না, দুর্নীতির প্রতিবাদ করিবার সৎসাহস যাহা হইতে অর্জিত করা যায় না—সেই শিক্ষা প্রণালীকেও কবি কঠিন কশাঘাত করিয়াছেন।

বর্ধমানের হাস্যার্ণব কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি রচনা করেন বাহার-খাম্বাজের মিশ্র রাগিণীতে—

পাশ করা নয় বাঙ্গালীদের নাশ করা কেবল।
পাশের জ্বালায় পাশ ফেরা দায়:
এ পাশ ধরায় কে আনলে বল?
মাইনা ছেড়ে মাইনর দিয়ে, মুক্তার সাতনর বৎস চেয়ে,
প্রবেশিকার ভয়ে চক্ষু কন্যাকর্তার আসে জল।
এলে-র (L-A) ছেলে নিতে হলে, পলাতে হয় ভিটে তুলে,
এমে-র (M-A) অর্ধনাভি জলে দিতে হয় জীবনের জলে।

ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে বাংলা দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব আসিয়াছিল। ইউরোপের শিক্ষা বিপ্লবের সঙ্গে ইহার তুলনা চলিতে পারে। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সমাজ সংস্কার শুরু হয়; সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে সে যুগের রচিত বহু গান।

আইন করিয়া যে সকল কুপ্রথা নিবারণ করা হয়, উহার মধ্যে মর্মান্তিক ছিল গঙ্গাসাগরে পুত্র ভাসানো। মায়েরা মানত রাখিতে সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতেন। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে নিম্নের গানটি—

ওরে যাদুমণি, কোন প্রাণে তোমা ধনে সঁপিব সাগরে,
এ হেন রতনে।
মায়ের অন্তরে এত কি সহে'রে, হায় না হেরিব
এ পোড়া নয়নে।
আরাধনা করে, দেবতার বরে, পেয়ে সে ধনে আমি
বঞ্চিত এখনে।
ওরে দারুণ বিধি, একি তব বিধি, দিয়ে এহেন নিধি,
ফিরিয়ে নিবি কেনে?
—জয়দেব রায়

কলম্বিয়া

(GE 25109)—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য: চেনা-চেনা মুখ সারি সারি,—ওগো সুচরিতা (আধুনিক)।

(GE 25110)—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়: কাজল ধোয়া চোখের জলে,—প্রজাপতি, প্রজাপতি রে।

(GE 25111)—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়: আহা-হা ডালিম ডালিমরূপ—এ গান রিম-ঝিম।

(GE 25112)—পান্নালাল ভট্টাচার্য: বসন পর মা,—আসার আসা ভবে আসা (শ্যামাসঙ্গীত)।

(GE 25113)—মিন্টু দাশগুপ্ত: যদি গ্রহের মিলনে,—ট্রামের লেডিস সিটের দিক (কৌতুকগীতি)।

(GE 25114)—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়: তুমি এলে অনেক দিনের পরে,—তার পর? তার আর পর নেই।

(GE 25115)—গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়: যে মোর অঙ্গের পরশ,—সখি রে, আমার এমন বান্ধব (কীর্তন)।

(GE 25116)—মৃণাল চক্রবর্তী: সাগরিকা বল না,—মন ভোমরা (আধুনিক)।

(GE 25117)—নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়: রাই জাগো গো,—আজি চিত্রপটে শিখা গো (পল্লীগীতি)।

(GE 25118)—শেফালি রাণী: অলি গুঞ্জনে একা আনমনে,—তুমি কই ঘম কই (আধুনিক)।

(GE 25119)—নির্মলা মিশ্র: চাঁদ করে ঝলমল,—তোমার গানের সুর (আধুনিক)।

(GE 25849)—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: ইলেক্‌ট্রিক গীটারে 'বিশ সাল বাদ' ও 'আরতি' চিত্রের দুটি গান।

ভারত ভূমি নৃত্যনাট্য

২০শে ডিসেম্বর, সন্ধ্যায় ১২এ সার্কাস এভিনিউতে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যকল্পে মডার্ণ স্পোর্টিং ক্লাব-এর ব্যবস্থাপনায় ও নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা "ভারত ভূমি" নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন—শ্রীশৈলেশ সেন। কণ্ঠ-সঙ্গীত, নৃত্য ও যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন—অরবিন্দু মিত্র, স্বপ্না

সেনগুপ্তা, নির্মলেন্দু বিশ্বাস, শোভা মিত্র, অনুপশঙ্কর প্রভৃতি। ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের সম্পাদক—শ্রীঅমিত চক্রবর্তী উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

আমার কথা (৯৩)

শ্রীমুকুল দাস

শুধু মাত্র বাংলা দেশেই নয় সারা ভারতে গীটার বাজিয়ে যাঁরা আপন সৃজনী প্রতিভায় বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, বাংলার বাইরেও শিল্পী হিসাবে যাঁরা যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছেন তরুণ শিল্পী মুকুল দাস তাদের অন্যতম। বাংলা দেশের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মুকুল দাস সেই পরিবারের গৌরব আরো বর্দ্ধিত করে তুলেছেন। ধাত্রী বিদ্যাবিদ্‌দের দরবারের দিক্‌পাল স্বর্গীয় ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাসের পৌত্র ও চ্যাটার্ড একাউণ্টটেণ্ট স্বর্গীয় প্রতুলচন্দ্র দাসের একমাত্র পুত্র মুকুল দাস ১৯২৭ সালে এই সহরেই জন্মগ্রহণ করেন। গীটার শিক্ষার পিছনে কোন অনুপ্রেরণা ও পরিকল্পনা ছিল না শ্রীযুত দাসের মনে। শ্রীযুত দাসের বয়স যখন বার বছর, জন্মদিনে বাবার কাছ থেকে উপহার পেলেন গীটার। ঠিক সেই সময়ই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে একজন শিল্পী বিশ্ব পরিক্রমায় বের হন। সেই সব শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে বিখ্যাত গীটার শিল্পী তাও ভি মই তখনকার মত স্থায়ীভাবে রয়ে গেলেন এ সহরে এবং গীটার শিক্ষক রূপে যোগ দিলেন অধুনালুপ্ত থি হাণ্ড্রেড ক্লাবে। বাবার দেওয়া গীটার এবং বিদেশাগত বিখ্যাত শিল্পী তাও ভি মই শ্রীযুত দাসের মনে এনে দিলো অজানা অনুপ্রেরণা। খোঁজ নিলেন শিল্পীর, দেখা করলেন তাঁর সংগে এবং বরণ করলেন শিক্ষক রূপে। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত প্রখ্যাত গীটারবিদ্‌ শিল্পী তাও ভি মইর ছাত্র শ্রীদাস। পাঁচ বছর কাটলো শিক্ষায়। বয়স উনিশ কি কুড়ি আমন্ত্রণ এলো অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। গ্রহণ করলেন আমন্ত্রণ, যোগ দিলেন রেডিওতে গীটার শিল্পী রূপে। সঙ্গীত জগতেই একমাত্র আবদ্ধ থাকে নাই শ্রীযুত দাস। সাধারণ শিক্ষার দিকেও অবহেলার লেশমা নেই কোনখানে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় অনা সহ বি. এস. সি, এবং ১৯৪৯ সালে পদার্থবিদ্যায় এম এস পাশ করেন শ্রীদাস। ১৯৫১ সালে দেশে শিক্ষা শেষ করে গেলে বিদেশে। ভর্ত্তি হলেন ইংলণ্ডের রাগবিতে পোষ্টগ্রাজুয়েট ট্রেনিং ই ইঞ্জিনিয়ারিংএ। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে হলেন চ্যাটার্ড ইঞ্জিনিয়ার তিন বৎসর সেখানে কাটিয়ে ফিরে এলেন দেশে। হলেন চ্যাটা ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) চাকুরীর জন্য বেছে নিলেন "পো কমিশনারস"। এখন তিনি ওখানকার একজন পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার।

চাকুরীতে প্রবেশ করেও গীটারের কথা ভোলেননি এক মুহূর্ত্ত, বিদে যাওয়ার জন্য রেডিও অফিস ছেড়ে দিলেও দেশে ফিরে এসে যোগ দিলো সেখানে। শ্রীদাস বিলেতে থাকা কালীনও গীটারের সম্পর্ক ছাড়েন নি এক মুহূর্ত্তও, সেখানেও তিনি ফিল হারমনিক সোসাইটী অব গীটারিষ্ট সদস্য এবং বি. বি. সিতে প্রোগ্রামও করেছেন কয়েকবার। শ্রীদা বর্ত্তমানে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রোগ্রামে একজন বিশিষ্ট বেতারশিল্পী। শ্রীযুত দাসের গীটারশিল্পী হিসা সব চেয়ে প্রতিভার পরিচয় তার স্বরচিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রথা গীটারের সুর সংযোজনা। ওরিয়েণ্ট লং মেন কর্ত্তৃক প্রকাশি বই "ষ্টীল গীটার মেথড"। শ্রীদাসের গীটার শিল্পে দ্বিতীয় অবদা বিশ্বভারতীর অনুমোদন নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রথায় গীটারে রবীন্দ্রনাথের দুইখানি গানের "এ মণিহার আমার নাহি সাজে" এব "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে" স্বরলিপির সৃষ্টি। কিছুদিন আগে ভারত সরকারের নির্দ্দেশে পাশ্চাত্য প্রথায় গীটারে ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতে ম্যাচ্চিং সুর সৃষ্টি করেছেন। শ্রীদাস তাঁর শিল্পী জীবনে যে সকল কৃতিমান শিল্পীর কাছে কৃতজ্ঞ। রবিশঙ্কর, রাইচাঁদ বড়াল, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সুজিৎ নাথ, সুরেশ চক্রবর্ত্তী এবং জে এম টাবরেস তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

গীটারবাদক মুকুল দাস

প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা

ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যান। এখানে অনেক ইতিহাস রচনা হয়েছে। এবার কোন বৈদেশিক ক্রিকেট দলের সফর না থাকলেও ইডেন উদ্যান এবারও উৎসবের সাজে সেজে উঠেছে। এবার কোন টেষ্ট খেলার ব্যবস্থা ছিলো না। কিন্তু কাতারে কাতারে দর্শক মাঠে হাজির হয়েছেন। বাঙ্গালা দেশের ক্রীড়ামোদীরা সকল সময়েই দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রধান মন্ত্রীর একাদশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের একাদশের একটি চারদিন ব্যাপী প্রদর্শনী—ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হয়। খেলায় প্রধান মন্ত্রীর একাদশ ১৯২ রাণে জয়ী হয়।

নবীন ও প্রবীণের মিলনে খেলার আকর্ষণকে অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। ভারতের যে সব কীর্ত্তিমান খেলোয়াড় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছেন যাঁদের কথা অনেক তরুণদের কাছে গল্প হয়ে আছে—তাঁদের দেখা পাওয়ার আশায় ইডেন উদ্যানও নবীন ও প্রবীণ ক্রীড়ামোদীতে ভরে উঠে। চারদিনব্যাপী এই খেলায় অতীত দিনের কীর্ত্তি ও বর্ত্তমানের তরুণ প্রতিভার সংমিশ্রণে খেলাটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। খেলার জয়-পরাজয়ের গুরুত্ব মোটেই ছিলো না। তাই খেলোয়াড়দের সঙ্গে দর্শকরাও সহজভাবে খেলাটিকে গ্রহণ

প্রতিরক্ষা ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন দিবসে রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে উভয় দলের খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রীমতী নাইডুকে লালা অমরনাথের সঙ্গে করমর্দন করতে দেখা যাচ্ছে। রাজ্যপালের বামে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পরিদৃশ্যমান

করেছেন। যাঁদের খেলা দেখার আশায় দর্শকরা মাঠে হাজির হয়েছিলেন—তাঁদের খেলা দেখে সকলের প্রাণ ভরপুর হয়ে উঠেছে।

কীর্ত্তিমান খেলোয়াড়দের কথা উল্লেখ করতে হলে প্রথমে মুস্তাক আলির কথা বলতে হয়। আজও তিনি অনন্য। তাঁর উপভোগ্য ব্যাটিং দেখে সকলে আনন্দ প্রকাশ করেন।

এই ইডেন উদ্যানেই ১৯৪৮—৪৯ সালে দর্শকদের দাবী উঠেছিলো—"নো মুস্তাক নো প্লে।" ১৯৫৩—৫২ সালে বাঙ্গালা ও হোলকারের খেলার কথা এখনও কেহই বিস্মৃত হন নি। এই খেলাটাই ইডেন উদ্যানে মুস্তাকের শেষ খেলা ছিল। দীর্ঘ নয় বছর বাদে বাঙ্গালার ক্রীড়ামোদীদের সম্মুখে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে—তিনি তাঁদের নিরাশ করেন নি। খেলোয়াড় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত। কিন্তু আজও তাঁর খেলা পুরনো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখনও তিনি অনুকরণীয়।

আর একজন কীর্ত্তিমান খেলোয়াড় এই খেলায় প্রমাণ করেছেন যে বয়সে প্রবীণ হলেও খেলায় এখনও তিনি নবীন। তিনি হলেন খ্যাতনামা খেলোয়াড় লালা অমরনাথ। তাঁর খেলায় যে স্বাচ্ছন্দ্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে—আজও তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অপর দু'জন খ্যাতনামা খেলোয়াড় বিজয় হাজারে ও ভিনু মানকড়ের খেলা বেশ কিছুদিন বাদে সকলের দেখার সুযোগ হয়েছে। যেটুকু খেলেছেন—তাতেই তাঁদের পূর্ব খেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

বর্ত্তমানের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের মধ্যে পলি উমরীগড় ও বাপু নাদকানির ব্যাটিং দেখে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে বিজয় মেহেরার ব্যাটিং প্রশংসার দাবী রাখে।

ভারতে শিক্ষাদানের জন্য আগত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের চারজন "ফাষ্ট" বোলার এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। একমাত্র গিলক্রাইষ্ট ব্যতীত কাহারও খেলা প্রশংসার যোগ্য হয় নি।

রাণ সংখ্যা

প্রধানমন্ত্রীর একাদশ—১ম ইনিংস (৬ উইঃ ডিঃ) ৪২৩ (বিজয়

লালা অমরনাথ

যশস্বী ক্রীড়াবিদ মুস্তাক আলী

মেহেরা ১২৬, বাপু নাদকার্ণি ১০৫, পলি উমরীগড় নট আউট ১০০, বি কুন্দরাম ৬৪, ওয়াটসন ৫১ রাণে ২ উইঃ ও কেমী ৪১ রাণে ২ উইঃ)।

রাজ্যপালের একাদশ—১ম ইনিংস ২৪২ (পঙ্কজ রায় ৫৫, আর বি কেনী ৪৮, ভিনু মানকড় ৩০; গিলক্রাইষ্ট ৩৪ রাণে ২ উইঃ ও ডি এস মুখার্জ্জী ৩৭ রাণে ২ উইঃ)।

প্রধানমন্ত্রীর একাদশ—২য় ইনিংস (৫ উইঃ ডিঃ) ২৯৩ (বিজয় মেহেরা ৬৮, লালা অমরনাথ নট আউট ৬৫, বি, কুন্দরাম ৫৮, পি, সি, পোদ্দার ৪৭, বিজয় হাজারে ২৬; ওয়াদেকার ৩১ রাণে ২ উইঃ)।

রাজ্যপালের একাদশ—২য় ইনিংসে ২৮২ (ওয়াদেকার ৭২, পঙ্কজ রায় ৪২; গিলক্রাইষ্ট ১৩ রাণে ৩ উইঃ ও বাপু নাদকার্ণি ৬৪ রাণে ৩ উইঃ)।

প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত

প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় টিকিট বাবদ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। ইহা ব্যতীত প্রতিরক্ষা বণ্ড ও সঞ্চয় সার্টিফিকেটে প্রায় সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা বিক্রয় হয়েছে।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার অবসান

সম্প্রতি জবলপুরে জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। গত চার বছর সার্ভিসেস দল চ্যাম্পিয়ন ও রেলওয়ে দল রাণার্স আপ লাভ করে। এ বছর দেশের জরুরী অবস্থার জন্য সার্ভিসেস দল যোগদান করেনি।

এবার রেলওয়ে দল ৩৭ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে। মধ্যপ্রদেশ ২২ পয়েণ্ট পেয়ে রাণার্স আপ লাভ করে। মহারাষ্ট্র তৃতীয় স্থান পায়।

এবারকার লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করতে হ'তে প্রথমেই রেলওয়ে দলের পার্সী খাটাউ-এর কথা বলতে হয়। তাঁর সুনাম এখনও সর্বজন বিদিত। তিনি এবারকার প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউণ্ডে

মহারাষ্ট্রের ওলিভিয়াকে যে ভাবে ভূতলশায়ী করেছেন—যাহা বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাঙ্গালার মুষ্টিযোদ্ধারা এবার বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। তবে পরাজিত মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে বাঙ্গালার নীলু গাঙ্গুলী সর্ব্বাপেক্ষা কুশলী মুষ্টিযোদ্ধার পুরস্কার লাভ করেন। রেলওয়ে দলের থাটাউ শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার পুরস্কার লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। অপর মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের অখ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা প্রশংসনীয় ভাবে লড়েন। তিনি অপ্রত্যাশিত-ভাবে রেলওয়ের মারুয়াকে দ্বিতীয় রাউণ্ডে নক আউট করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। বিহারের জে দাসের লড়াইও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর ভবিষ্যত খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ। অপর মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে বিহারের দিলীপ সরকার ও বাঙ্গালার স্কুল মুষ্টিযোদ্ধা অরুণ হালদারের লড়াই প্রশংসার যোগ্য হয়।

এবারকার প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালার মুষ্টিযোদ্ধাদের নিম্ন মানের পরিচয় পাওয়া গেছে। এই বিষয়ে বাঙ্গালার পরিচালকদের অবহিত হওয়া দরকার। নিম্নে সকল বিষয়ের ফলাফল প্রদত্ত হলো—

লাইট ফ্লাই ওয়েট—জি, কে, কুলু (মধ্যপ্রদেশ) জে, মোরকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

ফ্লাই ওয়েট—বি এস, থাপ্পা (মধ্যপ্রদেশ) এম, পি নায়েককে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

ব্যাটাম ওয়েট—এস থাটাউ (রেলওয়ে) রামালিঙ্গমকে (মধ্য-প্রদেশ) পরাজিত করেন।

ফেদার ওয়েট—এস বালারাম (রেলওয়ে) সামলাককে (অন্ধ্র) পরাজিত করেন।

লাইট ওয়েট—পি থাটাউ (রেলওয়ে) এস মিশ্রকে (মধ্য-প্রদেশ) পরাজিত করেন।

লাইট ওয়েল্টার ওয়েট—এম জে রেজ্জা (মহারাষ্ট্র) এ, রবর্টসকে (বিহার) পরাজিত করেন।

ওয়েল্টার ওয়েট—এ সিকিউরা (রেলওয়ে) রাজপত সিংকে (মধ্যপ্রদেশ) পরাজিত করেন।

লাইট মিডল ওয়েট—বাডি ডি'সুজা (রেলওয়ে) চরণ সিংকে (মধ্যপ্রদেশ) পরাজিত করেন।

মিডল ওয়েট—এ, ইরাণী (রেলওয়ে) এ, ব্রাউনকে (বাঙ্গালা) পরাজিত করেন।

লাইট হেভি ওয়েট—এফ ম্যাকমার কুইস (রেলওয়ে) বিকাশ কুণ্ডুকে পরাজিত (মধ্যপ্রদেশ) করেন।

জাকার্ত্তা গেমসের পদক ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক এক সভায় স্থির হয়েছে যে, জাকার্ত্তা এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা যে সকল পদক লাভ করেছেন—সেগুলি উদ্যোক্তাদের ফেরত দেবে। গত এশিয়ান গেমসে ভারতের শ্রী জি, ডি, সোন্ধীকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। ভারতীয় দলের অমর্য্যাদা করা হয়। ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হয়—এ অভিযোগও পাওয়া গেছে। এই কাজের জন্য উদ্যোক্তাদের দুঃখ প্রকাশ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁদের তরফ থেকে আশানুরূপ মনোভাবের পরিচয় না পাওয়া যাওয়ায় ভারতকে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।

খেলাধূলায় রাজনীতির কোন স্থান নেই। বহুদিন ধরে জাকার্ত্তা গেমস নিয়ে বিরোধ চলছে। এই প্রসঙ্গের উপর বর্ত্তমানে যবনিকা পড়া উচিত। যে প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে তা নিয়ে বিরোধ না বাড়িয়ে ক্রীড়াসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মিটিয়ে ফেলাই উচিত।
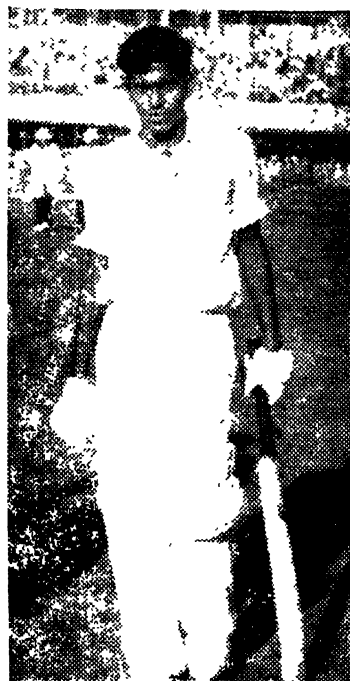
প্রতিরক্ষা উপলক্ষে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার সমাপ্তি দিবসে বোলার রমাকান্ত দেশাই ৬৫ মিনিটে ৮৪ রাণ করেন

As long as things go well with a man, his conscience is lenient and lets the ego do all kinds of things ; when some calamity befalls, he holds an inquisition within, discovers sin, heightens the standard of his conscience, imposes abstinence on himself and punishes himself with penances.

—*Freud.*

যুদ্ধ বিরতির পর—

সীমান্ত পরিস্থিতির এখনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। গত ২১শে নভেম্বরের চৈনিক ঘোষণা অনুসারে ১লা ডিসেম্বর হইতে সমগ্র সীমান্তে চীনা সৈন্যের অপসারণ করিবার কথা। পূর্ব্বাঞ্চলের কতকাংশ হইতে চীনা সৈন্য অবশ্য অপসারিত হইয়াছে, নেফার (উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সী) ক্যামেং বিভাগে বমডিলায়, লোহিত বিভাগে ওয়ালং-এ এবং আরও কয়েকটি স্থানে ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিতও হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র অঞ্চল হইতে চীনা সৈন্যের অপসারণ এখনও বাকী। লদাক্ অঞ্চলে চীনা বাহিনী কতকটা সরিয়া যাইবার কথা পিকিং হইতে প্রচারিত হইলেও উহার সমর্থক কোনও সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। সৈন্য অপসারণে চীনা কর্ত্তৃপক্ষের এই দীর্ঘসূত্রতা সন্দেহজনক। ২১শে নভেম্বর তারিখে তাঁহারা যুদ্ধ-বিরতির এক তরফা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ১লা ডিসেম্বরের পর চীনা সৈন্য ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখের "প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন রেখার" বিশ কিলোমিটার দূরে সরিয়া যাইবে। এই ঘোষণা ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছিল যে, প্রকৃতপক্ষে চীনা সৈন্য ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থানক্ষেত্র (যে পর্য্যন্ত চীনা সৈন্যের অপসারণ ভারত গভর্ণমেণ্টের দাবী) হইতেও দূরে অপসারণ করিবে। চীনের এই একতরফা ঘোষণা এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রস্তাব ভারত মানিয়া লয় নাই বটে; তবে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চীনা সৈন্যের পশ্চাদপসারণ করিবার পথে কোনও প্রতিবন্ধকও ভারত সৃষ্টি করে নাই। সুতরাং, চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত সৈন্য সরাইয়া লইয়া সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্পর্কে তাঁহাদের আন্তরিকতা অনায়াসে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন। কিন্তু সে পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করেন নাই। তাহার পরিবর্ত্তে ২১শে নভেম্বরের ঘোষণাকে তাঁহারা কূটনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছেন; বিশ্বের জনমতকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, "জঙ্গী জাতীয়তাবাদী" ও "প্রসারকামী" ভারত চীনের উদার নীতিতে সাড়া দিতেছে না। বস্তুতঃ, আন্তর্জ্জাতিক জনমতের চাপে, বিশেষতঃ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের নৈতিক প্রভাবে ভারতকে চীনের শর্ত্তে সম্মত করানোই পিকিং কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। এই জন্য এক দিকে তাঁহারা দীর্ঘসূত্রতার সহিত কিছু কিছু সৈন্য সরাইতেছেন এবং অন্য দিকে প্রবল বেগে ভারত বিরোধী প্রচার চালাইতেছেন।

কলম্বো সম্মেলন—

ভারত ও চীনের সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে মীমাংসায় সহায়তা করিবার জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার ছয়টি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বিশেষ ভাবে চেষ্টা হইয়াছিল। ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, কাম্বোডিয়া, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ও ঘানা—এই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ ভারত ও চীন, উভয়ের সহিতই মৈত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ. ইহারা ভারত ও চীনের সশস্ত্র বিরোধে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয় এবং বিরোধের মীমাংসায় সহায়তা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। পিকিং কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে এই সব রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে দুইটি মিশন প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন মৈত্রী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চীনের পক্ষে প্রবলভাবে প্রচার আরম্ভ হয়। চীনের সুকৌশলী প্রচারের ফলে কোনও কোনও মহলে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, চীনের ২১শে নভেম্বরের প্রস্তাবে কোনও কপটতা নাই। পিকিং কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছিলেন যে, ঐ প্রস্তাব অনুসারে তাঁহাদের সৈন্য প্রকৃতপক্ষে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থান ক্ষেত্র হইতেও অপসারণ করিবে: অথচ ভারতের দাবী অনুসারে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী জায়গায় সৈন্য সরাইতে তাঁহারা অসম্মত। ইহা যে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং সন্দেহজনক, তাহা চৈনিক প্রচারে চাপা পড়িয়া যায়। এই সময় ভারত সরকার বৈদেশিক বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিমণ্ডলীকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় এবং আইন মন্ত্রী অশোক সেনের নেতৃত্বাধীন অন্য একটি প্রতিনিধিমণ্ডলকে আফ্রিকা প্রেরণ করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় চীনের অনিষ্টকর প্রচারের প্রভাব অনেকটা কাটিয়া যায়; ১লা ডিসেম্বর তারিখে কলম্বোয় ষড়শক্তির মিলিত হইবার কথা ছিল, তাঁহারা সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া ১০ই ডিসেম্বর কলম্বো বৈঠক আহ্বান করেন এবং ইতিমধ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে উত্তমরূপে বিবেচনা করিবার জন্য আগ্রহী হন। ৮ই ডিসেম্বর তারিখে—অর্থাৎ কলম্বো সম্মেলন বসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের নিকট এক কঠোর লিপি প্রেরণ করেন। ভারতের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করা হয় যে, পুনঃ পুনঃ চীনের "সুস্পষ্ট প্রস্তাবের" নিরর্থক ব্যাখ্যা চাহিয়া ভারত কাল হরণ করিতেছে; এই প্রস্তাবে ভারত সম্মত কি না, তাহা সে কিছুতেই পরিষ্কার করিয়া বলিতেছে না। পিকিং কর্ত্তৃপক্ষ ইহাও জানাইয়া দেন যে, ভারতের প্রস্তাব অনুসারে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থানক্ষেত্রে সৈন্য সরাইয়া লইতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। ১০ই ডিসেম্বর তারিখেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লোকসভায় বলেন যে, চীনের ২১শে নভেম্বরের প্রস্তাব ভারত গ্রহণ না করিলেও তাহার সৈন্য অপসারণে কোনও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে নাই। অর্থাৎ যুদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থায় কার্য্যতঃ ভারত সম্মতিই জানাইয়াছে। তবে, ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থানক্ষেত্রে চীনা সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা না হইলে দুই পক্ষের সৈন্যকে পৃথক করিয়া রাখা, মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে দুই পক্ষের চৌকি স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপারে কোনও আলোচনা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, কলম্বো সম্মেলন বসিবার পূর্ব্বে আফ্রো-এশীয় ষড়রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারেন যে, বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কেহই অন্য পক্ষের প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত নহেন; এই

ব্যাপারে মীমাংসা করিতে হইলে একটি তৃতীয় পন্থা আবিষ্কার করা প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলম্বোয় তিন দিনব্যাপী সম্মেলন হয়; সম্মেলনের প্রতিনিধিরা স্থির করেন যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাহ্নে প্রকাশিত হইবে না—একজন সিংহলী মন্ত্রী ঐ সিদ্ধান্ত লইয়া দিল্লী ও পিকিং-এ যাইবেন এবং ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক স্বয়ং দিল্লী ও পিকিং-এ যাইয়া কলম্বো সিদ্ধান্তের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবেন। কলম্বোয় প্রকৃত পক্ষে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশিত হয় নাই। তবে, শোনা যাইতেছে—নিরপেক্ষ প্রতিনিধিরা কোনপক্ষকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করেন নাই; তবে, এই নীতি তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন যে, সশস্ত্র শক্তির প্রয়োগে অধিকৃত অঞ্চল কেহ অধিকার করিয়া থাকিতে পারিবে না। তাঁহাদের প্রস্তাব নাকি এইরূপ যে, চীনা সৈন্যকে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থানক্ষেত্রে সরিয়া যাইতে হইবে; এই অপসারণের ফলে সৃষ্ট মধ্যবর্ত্তী শূন্য অঞ্চল চীন ও ভারত একত্রে তদারক করিবে, অথবা ঐ অঞ্চল তদারকের ভার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির উপর প্রদত্ত হইবে—ভারত ঐ শূন্য অঞ্চল অধিকার করিবে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, নিরপেক্ষ ছয়টি রাষ্ট্র মূল সীমান্ত-বিরোধ সম্পর্কে মধ্যস্থতা করিতে চাহেন নাই—এই বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য চীন ও ভারতকে এক টেবিলে বসিতে সহায়তা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কলম্বো বৈঠকে তাঁহারা সিদ্ধান্ত লইয়াছেন যে, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা তৎপরতা চালাইয়া যাইবেন—এই ব্যাপারে কলম্বো বৈঠকই তাঁহাদের উদ্যোগের শেষ নহে।

পাক-ভারত সম্পর্ক—

পরাধীন ভারতে যে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের শত্রুতা করিয়াছিল, সেই শক্তিই পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির প্রতিষ্ঠা ভারতে। এই কারণেই পাকিস্তান তাহার জন্ম হইতে ভারতকে শত্রু মনে করিয়াছে; ভারত-বিরোধিতা তাহার সমগ্র পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির সহিত সাম্রাজ্যবাদের কখনও দ্বন্দ্ব ছিল না। তাই, রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের পর এই শক্তি ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনের জন্য নিঃসঙ্কোচে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ হইয়াছে; গোয়াকে উপলক্ষ করিয়া পর্তুগালের সহিত ভারতের যখন কলহ চলিতেছে, তখন পাকিস্তান সাগ্রহে পর্তুগালের গললগ্ন হইয়াছিল। পাকিস্তান কম্যুনিজমের ভয়ে পাশ্চাত্ত্য শক্তির সামরিক জোটে যোগ দেয় নাই—ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হইবার উদ্দেশ্যেই তাহার "সেন্টো" ও "সিয়াটোতে" যোগদান। শত্রুর যে শত্রু, তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে হইবে—এই আদিম কূটনীতি পাক্ নেতারা বিবেকহীন চিত্তে অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই নীতি অনুসারে এক দিকে ফ্যাসিস্ত সালাজার যেমন তাঁহাদের মিত্র, তেমনি অন্য দিকে কম্যুনিষ্ট চৌ এন্-লাই তাঁহাদের আপনার লোক। চীনের সহিত সীমান্ত লইয়া ভারতের কলহ আরম্ভ হইবার পর হইতেই পাকিস্তান চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে সচেষ্ট হয়; কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান আক্রমণাত্মক তৎপরতার দ্বারা অধিকার করিয়াছে, তাহার সীমান্তের

প্রশ্ন পাক্ নেতারা চীনের সহিত মিটাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহার দ্বারা এক দিকে তাঁহারা কাশ্মীরের প্রতি পাকিস্তানের দাবীর যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, অন্য দিকে সীমান্তের প্রশ্নে ভারতের মনোভাব অন্যায় ও অনমনীয় বলিয়া চীন যে প্রচার করে, তাহার সমর্থন জোগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গত অক্টোবর মাসে ভারতের বিরুদ্ধে যখন চীনের ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হয়, তখন পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী প্রচার ঢাকগুলির কর্ণপটাহ-বিদারী উচ্চ নিনাদ সুরু হয়; পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং পাক্ নেতারা ভারত-বিরোধী প্রচারে চীনকে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী অপটু প্রতিপন্ন করেন। বিভিন্ন মহল হইতে দাবী ওঠে—অবিলম্বে ভারতীয় সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করা হউক, কাশ্মীর সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করিবার জন্য ভারতকে বাধ্য করা হউক। এইরূপ মন্তব্যও কোনও মহলে শোনা যায় যে, কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ ও হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ দুই-ই বিপজ্জনক; তবে, পাকিস্তানের পক্ষে হিন্দু সাম্রাজ্যবাদই অধিকতর আশঙ্কার বিষয়। চীনের অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যখন ভারতকে অস্ত্র সাহায্য প্রেরণ করেন, তখন পাকিস্তানে একেবারে "হিষ্টিরিয়া" আরম্ভ হয়; সরকারী ও বেসরকারী পাক-নেতারা চীৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করেন যে, চীনের সহিত ভারতের যুদ্ধ শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে এবং ঐ সব অস্ত্র ব্যবহৃত হইবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সুনির্দিষ্ট ভাবে চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যই যে পাশ্চাত্য শিবির হইতে অস্ত্র দেওয়া হইয়াছে এবং এই অস্ত্র যে কখনও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না বলিয়া ভারত প্রতিশ্রুতি দিয়াছে—এই মর্ম্মে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও পাক নেতারা আশ্বস্ত হইতে চাহে না, অন্ততঃ আশ্বস্ত না হইবার ভাণ করিতে থাকেন। অবশ্য, পাক নেতাদের মানসিক গঠনে আশ্বস্ত হওয়া কতকটা দুঃসাধ্য কম্যুনিজম প্রতিরোধের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পাকিস্তান যে সব অস্ত্র পাইয়াছে, তাহা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হইবার প্রতিশ্রুতি পাক নেতারা কখনও দেন নাই। সদ্য এই অস্ত্রসাহায্যে বলীয়ান হওয়াতেই যে তাঁহাদের ভারত-বিরোধী আস্ফালন বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ইহা শ্রীনেহরু পর্য্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্য শিবির হইতে ভারতে অস্ত্র আসায় নানা ভাবে পাকিস্তানের উৎকণ্ঠা ও রোষ প্রকাশিত হইতে থাকে। কেহ কেহ বলিতে থাকেন—ভারত যদি চাহিবামাত্র পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নিকট হইতে অস্ত্র পায়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত পাকিস্তানের সামরিক জোটভুক্ত থাকিয়া অতিরিক্ত কি লাভ হইল? এই সময় এমন কথাও রটে যে, পাকিস্তান চীনের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই সম্ভাবনা পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পক্ষে আশঙ্কার বিষয়; কারণ পাকিস্তান এই অঞ্চলে একটি প্রধান কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সামরিক ঘাঁটা। দুইটি সামরিক জোটের সদস্য হিসাবে সে এই চুক্তিতে আবদ্ধ যে, ঐ দুইটি সংস্থার (সেন্টো ও সিয়াটো) অন্য কোনও সভ্যরাষ্ট্র কম্যুনিষ্টদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে পাকিস্তানও সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রের সহিত একত্রে সে আক্রমণ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবে, চীনের সহিত পাকিস্তানের অনাক্রমণ চুক্তি হইলে পূর্ব্বকার ঐ চুক্তিগুলি লঙ্ঘিত হয় এবং কার্য্যতঃ সেন্টো সিয়াটোর সহিত পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। অবস্থা যখন এতদূর গড়াইয়াছে, তখন আমেরিকার সুদূর প্রাচ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হ্যারিম্যান্ ও বৃটিশ কমনওয়েলথ্ সেক্রেটারী মিঃ স্যাণ্ডিস আসেন ভারতীয় উপমহাদেশে, এবং তাঁহারা দিল্লী ও রাওলপিণ্ডিতে যাতায়াত করিয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করেন, ২৯শে নভেম্বর দিল্লী ও রাওলপিণ্ডি হইতে এই মর্ম্মে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয় যে, কাশ্মীর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ও ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন; রাষ্ট্রপ্রধানদের আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মন্ত্রীর পর্য্যায়ে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হইবে। এই ঘোষণা অনুসারে ২৭শে ডিসেম্বর হইতে রাওলপিণ্ডিতে দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রাথমিক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃত্ব করিতেছেন ভারতের রেলওয়ে মন্ত্রী সদ্দার শরণ সিং এবং পাক প্রতিনিধিমণ্ডলের পুরোভাগে রহিয়াছেন ঐ রাষ্ট্রের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত মন্ত্রী মিঃ জেড, এ, ভুট্টো।

ইঙ্গ-মার্কিণ মনোভাব—

চীন কর্ত্তৃক ভারত অকস্মাৎ আক্রান্ত হইলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ—বিশেষতঃ বৃটেন ও আমেরিকা সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে অস্ত্র সাহায্য করিয়াছে এবং ভারতের প্রতি কোনও রাজনৈতিক সর্ত্ত আরোপ করে নাই। স্বভাবতঃ ভারতবাসী ইহাতে প্রীত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্যের মিত্রশক্তিগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। এই অস্ত্র সরবরাহে পাকিস্তানের গাত্রদাহের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া মিঃ হ্যারিম্যান দিল্লীতে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন,—

"আমাদের নীতি কি হইবে, সে সম্বন্ধে কোনও দেশের 'ডিকটেট' করিবার অধিকার নাই।" মিঃ স্যাণ্ডিস্ ভারতে আসিয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এই আশ্বাস দিয়া যান যে, চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ভারত ঋণ হিসাবে বৃটিশ অস্ত্র পাইতে পারিবে। এ সবই নিশ্চয়ই খুসীর কথা। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের এই অস্ত্র সরবরাহ ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে স্থায়ী ভাবে শক্তিশালী করিবার প্রয়াস নহে। বাহির হইতে অস্ত্র সংগ্রহের সাময়িক উপযোগিতা আছে; কিন্তু স্থায়ীভাবে এবং স্বাধীনভাবে ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সমরশিল্পের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ইহার বিকল্প পন্থা—ভারত যদি কোনও বৃহত্তর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যোগ দেয় এবং সে ব্যবস্থা যদি বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি বৃহৎ সামরিক শক্তিগুলির সহিত যুক্ত থাকে, তাহা হইলে ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে শক্তিশালী হইতে পারে। বলা বাহুল্য, ইহা ভারতের স্বাধীন প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা নহে। এতকাল ভারত এই ধরণের কোনও ব্যবস্থায় যোগ দিতে চাহে নাই; দেশে সমরশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনভাবে সে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছে। এই প্রচেষ্টা সফল হইবার পূর্ব্বে আকস্মিক ভাবে চীনের আক্রমণ আসে এবং ভারত তাহাতে বিপন্ন হয়। ইহাতে প্রতিরক্ষা সম্পর্কে ভারত কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতির অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয় নাই। যাহা হউক, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ—বিশেষতঃ বৃটিশ ও মার্কিণ গভর্ণমেন্ট ভারতের স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে চাহিতেছেন; তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে ভারত ও পাকিস্তানকে লইয়া

সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধ মিটাইবার জন্য—বিশেষত: সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কাশ্মীর সম্পর্কে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মীমাংসার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহী হইয়াছেন। ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাহামা দ্বীপের নাসাউতে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মি: ম্যাকমিলানের যে বৈঠক হয়, তাহাতে ভারতের প্রতিরক্ষার প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছিল। এই বৈঠকের পর ২১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ভারত ও পাকিস্তানকে লইয়া সম্মিলিত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়। এই বৈঠকে স্থির হয় যে, জরুরী অবস্থায় ভারতকে যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাই ইঙ্গ-মার্কিণ সাহায্যের শেষ নহে, ইহার পরও প্রয়োজনানুযায়ী সাহায্য দেওয়া হইবে; তবে, ইহা অস্ত্র সাহায্য প্রদানের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নহে। দুই রাষ্ট্র প্রধানের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সযত্নে রচিত বিজ্ঞপ্তিতে "আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য" প্রদত্ত অস্ত্রের কথাই বলা হইয়াছিল; ভারতের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে উন্নত ও আধুনিক করিবার কথা ইহাতে ছিল না। বিবৃতির এই অংশ গভীর অর্থপূর্ণ—"সমগ্র উপমহাদেশের (কেবল ভারতের নহে) প্রতিরক্ষার প্রশ্ন বিবেচনা করা হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রী আশা করেন যে, উপমহাদেশের নিরাপত্তা সম্পর্কে পাকিস্তান ও ভারতের অভিন্ন স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া পাক-ভারত বিরোধের অবসান হইয়া যাইবে।" ইহাতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এই—পাক-ভারত বিরোধের অবসান যদি ঘটে এবং দুইটি রাষ্ট্র যদি একত্রে সমগ্র উপমহাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (joint defence) গড়িয়া তুলিতে আগ্রহী হয়, তাহা হইলে এই পশ্চিমী মিত্ররা তখন দীর্ঘ মেয়াদী সাহায্যের কথা বিবেচনা করিবেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—পাক-ভারত আলোচনা আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর এই যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এই সময় ভারতকে ইহাই ইঙ্গিতে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, তাহার আশু বিপদে আমেরিকা ও বৃটেন তাহাকে সাহায্য করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে; তবে প্রতিরক্ষা সম্পর্কে কোনরূপ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ পাকিস্তান সহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিরক্ষার সমস্যা অবিভাজ্য। বিশেষ করিয়া ভারত সম্পর্কেই এই ইঙ্গিত; কারণ পাকিস্তান পাশ্চাত্য সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত এবং স্বতন্ত্রভাবে আমেরিকার সহিত সামরিক চুক্তিতেও আবদ্ধ; কাজেই, তাহার প্রতিরক্ষা সম্পর্কে পাশ্চাত্য শিবিরের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। চৈনিক আক্রমণ প্রতিরোধের আশু প্রয়োজনে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বিনা সর্ত্তে ভারতকে অস্ত্র সাহায্য প্রদান করিয়াছেন—ভারতের জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ত্যাগের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনরূপ চাপ দেওয়া হয় নাই। ভারতের পক্ষ হইতেও বলা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য শক্তির নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে ভারত স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্ররূপে তাহার আইনসঙ্গত অধিকার ব্যবহার করিয়াছে—ভারতের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি বর্জ্জনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এখন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পক্ষ হইতে ভারত ও পাকিস্তানকে একত্র করিয়া ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, ইহার পশ্চাতে ভারতকে সামরিক জোটভুক্ত করাইবার আগ্রহ সক্রিয় কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয়। পাশ্চাত্যের সামরিক জোটের সভ্য হিসাবে পাকিস্তান তাহার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য শিবিরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। সেই ব্যবস্থার সহিত যদি ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একত্র হয়, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি (যাহার সহিত স্বাধীন প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত) কি ভাবে অক্ষুন্ন থাকিতে পারে, তাহা ভাবিবার কথা।

কাশ্মীর ও পাশ্চাত্ত্য শক্তি—

রাওলপিণ্ডি বৈঠক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমেরিকার পক্ষ হইতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্তানের প্রবেশাধিকার সমর্থন করা হইয়াছে। ২০শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত এই বিবৃতিতে বলা হয় যে, ভারতের নিরাপত্তার জন্য এবং চৈনিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কাশ্মীর উপত্যকা ভারতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ; আবার পাকিস্তানেরও কাশ্মীর উপত্যকার সহিত "ঐতিহ্যগত, অর্থনীতিগত, আইনগত এবং ধর্ম্মগত" যোগ আছে। সুতরাং, কাশ্মীর সংক্রান্ত কোনপ্রকার মীমাংসায় দুই পক্ষের এই উপত্যকায় প্রবেশাধিকার থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ, সমগ্রভাবে কাশ্মীর কোন্ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে, গণভোট হইবে, কি হইবে না—এই সব জটিল প্রশ্ন না তুলিয়া এইভাবে কাশ্মীর সমস্যা মিটাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—কাশ্মীরের সামরিক গুরুত্বের প্রতি পাশ্চাত্য সামরিক জোটগুলির মনোযোগ পূর্ব্ব হইতেই; শ্রীনগরে সামরিক ঘাঁটী গাড়িবার আগ্রহ অনেক দিনের। কাশ্মীর উপত্যকায় যদি পাকিস্তানের কর্ত্তৃত্ব প্রসারিত হয়, তাহা হইলে এই আগ্রহ পূর্ণ হইতে পারে। এই উপত্যকার সহিত পাকিস্তানের "ঐতিহ্যগত, ধর্ম্মগত ও আইনগত যোগসূত্র" আবিষ্কার অর্থপূর্ণ। এই সম্পর্কে শ্রীনেহেরুর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি পাকিস্তানের মনোভাবকে সুযোগমত চাপ দিয়া সুবিধা আদায় করিবার মনোভাব অর্থাৎ ব্ল্যাকমেলের মনোভাব বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের মনোভাব পরিবর্ত্তন করাইতে সচেষ্ট না হইয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বৃহৎ আকার সামরিক সাহায্য প্রদানের ব্যাপারকে কাশ্মীর সমস্যা মীমাংসার সহিত যুক্ত করায় তাঁহারাও, হয়ত অজ্ঞাতে, ব্ল্যাকমেলেরই অংশীদার হইতেছেন।

চৈনিক আক্রমণ ও সোভিয়েট ইউনিয়ন—

ভারতের বিরুদ্ধে চীনের আকস্মিক হিংস্র আক্রমণে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এবং তাঁহাদের অনুগত প্রাচ্য শক্তিগুলি স্বভাবত: ভারতের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানাইয়াছেন। এই সব শক্তি কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে আক্রমণকামী মনে করেন এবং ভারত তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সামরিক জোটে যোগ না দেওয়ায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বুদ্ধির তাঁহারা প্রশংসা করেন নাই। চীনের ভারত আক্রমণে তাঁহাদের ধারণা সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা শ্লাঘা বোধ করিয়াছেন; ভারতের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের "বোকামির" প্রতি তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন করুণার অভিব্যক্তি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, চীনের এই

আক্রমণাত্মক তৎপরতা কম্যুনিষ্ট-জগতেও বিশেষভাবে নিন্দিত **হইয়াছে**। তেরটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র ক্ষুদ্র আলবেনিয়া ব্যতীত কেহ চীনকে ভারতের বিরুদ্ধে সমর্থন করে নাই। চীনের সমসীমান্তবর্ত্তী উত্তর ভিয়েৎনাম এবং উত্তর কোরিয়া ব্যতীত সমস্ত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র চীনের আক্রমণাত্মক তৎপরতার নিন্দা করিয়াছে। ইউরোপের অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে একমাত্র বৃটেনের নগণ্য কম্যুনিষ্ট পার্টিটি চীনের সমর্থক। অন্যান্য দেশের পার্টি—বিশেষত: ইতালী ও ফ্রান্সের বিশাল কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি চীনের দস্যু-মনোভাবের নিন্দা করিয়াছে। সর্ব্বোপরি সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনের সহিত ভারতের যুদ্ধ চলিবার সময়েও সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে এই সুস্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, ভারতকে সে তাহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এম-ই-জি জেট্ বিমান সরবরাহ করিবে। একটি কম্যুনিষ্ট দেশের সহিত যুদ্ধরত অ-কম্যুনিষ্ট দেশকে অন্য একটি কম্যুনিষ্ট দেশের সামরিক বিমান সরবরাহ অভিনব ব্যাপার। সোভিয়েটের সাহায্যে ভারতে এম-ই-জি বিমান নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন সম্পর্কিত প্রাথমিক কাজগুলি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে—চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হওয়ায় সে-কাজ বন্ধ হয় নাই। রাষ্ট্রায়াত্ত এলেকায় ভারতের শ্রমশিল্প গঠনের কাজে এবং ভারতের স্বাধীন প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার প্রয়াসে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থন সম্পূর্ণ অটুট রহিয়াছে। ভিলাইয়ের ইস্পাত কারখানার প্রসার, রাঁচি ও দুর্গাপুরে ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং তেল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎশিল্প স্থাপন সম্পর্কে ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতা কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নাই। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, শ্রমশিল্পই স্বাধীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি। এই ভিত্তি স্থাপনে সোভিয়েটের সহযোগিতা স্থায়ী ও নিশ্চিত।

উত্তর বোর্ণিওর বিদ্রোহ—

বোর্ণিও দ্বীপের উত্তরাংশে সারওয়াক্, ব্রুণি ও উত্তর বোর্ণিও বৃটিশ প্রভুত্বাধীন এলেকা। সারওয়াক্ এক জন শ্বেতাঙ্গ রাজার দ্বারা শাসিত, উত্তর বোর্ণিও বৃটিশের ক্রাউন কলোনি এবং ব্রুণি বৃটিশ প্রোটেক্টোরেট। মালয়, সিঙ্গাপুর এবং উত্তর বোর্ণিওর এই তিনটি রাজ্যকে লইয়া মালয়াসিয়া ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা হইয়াছে; ১৯৬৩ সালে আগষ্ট মাসে এই নূতন ফেডারেশন গঠিত হইবার কথা। ইতিমধ্যে প্রাথমিক আয়োজন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বৃটেনের সহিত প্রয়োজনীয় চুক্তি হইয়া গিয়াছে। সিঙ্গাপুরে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণভোটের ব্যবস্থা করিয়া সিঙ্গাপুর ও মালয়ের মিলনের সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। উত্তর বোর্ণিও ও সারওয়াকের আইন পরিষদের মনোনীত প্রতিনিধিরা মালয়াসিয়া গঠনের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। মালয়াসিয়া গঠনের এই আয়োজনের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরের সোস্যালিষ্ট দল; তাঁহারা ইহাকে বৃটিশের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ স্থায়ী করিবার প্রয়াস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তর বোর্ণিওর তিনটি রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী ইহাকে স্থায়ীভাবে মালয়ীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার কৌশল মনে করে। এখানকার দুইটি রাজ্যের আইনগত সম্মতি কৌশলে আদায় করা হইলেও ব্রুণির সম্মতি পাওয়া যায় নাই; কারণ ব্রুণির আইন পরিষদের সমস্ত নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিই রাকায়াৎ পার্টির সভ্য। এই রাকায়াৎ পার্টি এবং তাহার নেতা ইনচে আঝারি মালয়াসিয়া ফেডারেশনের ঘোর বিরোধী। গত ৮ই ডিসেম্বর উত্তর বোর্ণিও মুক্তি ফৌজ (যাহার নেতৃত্ব রাকায়াৎ পার্টির) অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া ব্রুণির বৃটিশ তৈলকেন্দ্র সেরিয়া অধিকার করিয়া লয়; বিদ্রোহ প্রসারিত হয় পার্শ্ববর্ত্তী তিনটি রাজ্যেও। ইহার অব্যবহিত পরেই সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হয় উত্তর বোর্ণিওতে। সুসজ্জিত তিন হাজার গোর্খা ও হাইল্যাণ্ডার সৈন্যের সম্মুখে বিদ্রোহীরা তিষ্ঠিতে পারে নাই। তাহারা সহরগুলি হইতে সরিয়া গিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছে। বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার সময় আঝারি ম্যানিলায় ছিলেন; তিনি বলেন যে, বিদ্রোহীদের সংখ্যা বিশ হাজার, তাহারা স্বাধীনতার জন্য শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে। এ পর্য্যন্ত বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মাত্র পাঁচ শত বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিশ হাজার বিদ্রোহী যদি বন-জঙ্গল হইতে গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়া যায়, তাহা হইলে উহা দমন করা খুবই দুঃসাধ্য হইবে। উত্তর বোর্ণিওর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ইন্দোনেশিয়া অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছে।

—"মিহির"

সাহিত্য কাকে বলে?

আধুনিক সাহিত্যের রূপ ও রীতি নিয়ে বহু মতভেদ আছে, সাধারণত: পাঠক বলতে যাঁদের বোঝায়, তাঁদের মতামত সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে, বই পড়ে যে আনন্দ এককালে তাঁরা পেয়েছেন আজ আর তা পান না, কিন্তু কেন? আজকের সাহিত্যে শক্তিমান কথাকারের অভাব নেই, সাহিত্যের দিগন্তও আজ বহুবিস্তৃত। তার ভৌগোলিক পরিধিও সুদূর প্রসারী, তবু কেন আজ মন ভরে না পাঠকের, কেন মগ্ন হয়ে যেতে পারেনা মন বইয়ের পাতায়। সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া এমন লেখার দেখা বর্তমানে বিরল যা এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ জাগাতে পাবে পাঠক মননে, অথচ আঙ্গিকের দিক দিয়ে তো বহুগুণে সমৃদ্ধ আজকের সাহিত্য পুরোনো দিনের চেয়ে। গঠন পরিপাট্য আঙ্গিক সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্যশালী ভাষা রীতি এ সমস্তের প্রসাধন পারিপাট্যে মোড়া আজকের সাহিত্য যেন সর্ব্বাভরণভূষিতা এক দেবী প্রতিমা যার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি এখনও। যে আন্তরিকতা ও সরল সৌকুমার্য্য সাহিত্যের প্রাণসত্তা তার যেন দেখাই মেলে না এই অগণ্য নানা ঢংয়ের নানা ছাঁদের গ্রন্থজগতের মধ্যে। নানাবিধ আঙ্গিকের মারপ্যাঁচ বিভিন্ন ইজম, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভারাক্রান্ত আজকের সাহিত্যে সবই আছে নেই শুধু আন্তরিকতার হৃদ্য আবেদনটুকু যার ছোঁয়ায় ভরে ওঠে মন, তৃপ্ত হয় অন্তর। পুরোনো দিনের গল্প লেখা হতো পাঠক মননে বৈশিষ্ট্যের ছাপ আঁকার তাগিদে নয়, ভাষার ঝলকে মনকে বিভ্রান্ত করার জন্য নয়, শুধু অন্তরের দাবী মেটাতেই আর সেজন্যই তার আবেদন ছিল অত গভীর। আজকের সাহিত্য যে অধিকতর মননশীল সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই কিন্তু মানুষের হৃদয়বত্তাকে তা যেন অবজ্ঞা করেই চলতে চায়, পাঠকের মন বিশেষত: সাধারণ পাঠকের মন তাই আজ প্রায়শ:ই থেকে যায় বুভুক্ষু। পূর্ব্বসূরীদের কাছ থেকে সাহিত্যের উত্তরাধিকার আজ যাঁদের হাতে এ বিষয়ে তাঁরা কি একটু অবহিত হতে পারেন না?

দেবর

মানবেন্দ্র পাল

অনন্তকে যে শুভা কী চোখে দেখেছে তা সেই জানে। আজ বলে নয়, বিয়ের দিন থেকেই যেদিন অনন্তকে শুভা প্রথম দেখল, সেদিনই যেন মুগ্ধ হয়ে গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীর সঙ্গে তার প্রথম কথাই হল ঐ অনন্তকে নিয়ে।

—তোমাদের বাড়িতে ঐ একটি মাত্র মানুষ দেখলাম যার দিকে তাকিয়ে থাকা যায়—দুদণ্ড কথা বলা যায়।

শুভার এই নিরাবরণ মন্তব্যটি অশোককে যে একেবারে স্পর্শ করে গেল না তা নয়। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে একটু হাসির আভাস ফুটিয়ে পাশ ফিরে শুতে শুতে বললে—হ্যাঁ, ও তো আমারই ভাই।

শুভা তৎক্ষণাৎ বললে—ভারী গর্ব! তাও যদি নিজের ভাই হ'ত।

—অর্থাৎ? অশোক বুকের নীচে বালিশটা টেনে নিয়ে ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

—অর্থাৎ আবার কী! নিজের ভাই নয়।

—খুড়তুতো ভাই বুঝি নিজের ভাই হয় না?—শুভা প্রবল বেগে মাথা নাড়ল।

—না, তেমন কাছের নয়।

—মাই গড্! অশোক উঠে বসল বিছানায়। একটু শ্লেষের সুরেই বললে—অভিজ্ঞতা ছিল না, এই প্রথম বুঝলাম, কেন আজকের দিনে শত চেষ্টাতেও একান্নবর্তী আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

কথাটা শেলের মতো বিঁধল শুভাকে। লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি অশোকের দুহাত চেপে ধরে বললে—ক্ষমা করো। আমি ওভাবে কথাটা বলিনি।

অশোকও ঠিক এতখানি আঘাত দিতে চায়নি। নিজেও লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি মিটমাট হয়ে গেল। ক্ষমার জন্যে যে হাত দুখানি তার হাতের মুঠোয় এগিয়ে এসেছিল—এই মুহূর্তে সেই হাত দুখানি আরও একটু গভীর ভাবে আকর্ষণ করল। শুভা বাধা দিল না।

অনন্ত অশোকের খুড়তুতো ভাই। এক জায়গায় এক পরিবারে থাকে না। অশোকের বাবা ওকালতি করেন চুঁচড়ায়। আর অনন্তর বাবা সামান্য মাইনের কেরাণী নবদ্বীপের মিউনিসিপ্যালিটিতে। ভাই, কিন্তু আকাশ পাতাল প্রভেদ। অশোকের বাবার টাকা আছে, কিন্তু আভিজাত্য নেই। টিপিক্যাল উকিল—মুখে চোখে ধূর্ততার ছাপ—সব সময়েই অসন্তোষের ভ্রূকুটি। অশোকের মাও সেই রকম। বড় উকিলের স্ত্রী—গর্বে অহংকারে পা পড়ে না। রূপ মেই ছিলও না কোনোদিন, তবু এ বয়েসেও সেজেগুজে পেন্ট পালিশ করে থাকেন সব সময়ে।

ওদিকে অনন্তর বাবারও আভিজাত্যের চিহ্ন মাত্র নেই। সে কল্পনাও নেই। অতি কষ্টে তালি মারা জামা গায়ে ছেঁড়া জুতো টানতে টানতে আপিসে যান। কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে অনন্তর মা। ঠিক যেন প্রতিমা। বয়েস হয়েছে, কিন্তু দেহে তার এতটুকু দাগ পড়েনি। অনন্ত কারও কাছ থেকেই কিছু পায়নি। সব মিশিয়ে সে মাঝামাঝি মোটামুটি রকমের চলনসই যুবক। কিন্তু শুভা যে তাকে প্রথম থেকে কী চোখেই দেখেছে!

অশোক বুদ্ধিমান ছেলে। নিজের চেহারা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। তাই বরাবর সুন্দরী মেয়েকে সে এড়িয়ে এসেছে। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধ—শুভা সুন্দরী কিনা জানে না, তবে সব মিশিয়ে সে যে কামনার ধন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যৌবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের কথা বাদ দিলেও শুভার ভেতর এমন একটা নারীত্ব ছিল যা সরল ঋজু তীক্ষ্ণ। তার থুতনির নীচেটায় কিম্বা ঠোঁটের পাশে এক এক সময় হাসির সঙ্গে এমন একটা ভঙ্গি ফুটে ওঠে যা অপূর্ব! অশোক লুব্ধ দৃষ্টিতে তাই দেখেছে কত বার।

অথচ তার এই দুর্লভ ভঙ্গিটি প্রথম আবিষ্কার করেছিল অশোক নয়, অনন্ত। সে-ই প্রথম বাহবা দিয়ে বলে উঠেছিল—চমৎকার—চমৎকার! বৌদি! এমন তো কখনো দেখিনি!

—কী! শুভা লজ্জিত হাসি হেসে না বোঝার ভাণ করে গভীর ভাবে তাকিয়েছিল অনন্তর দিকে।

—না, কিছু না। আহা যদি আর্টিস্ট হতাম, তা হলে চোখের সামনে তুলে ধরতাম। এ কী আর মুখে প্রকাশ করে বলা যায়?

—ঠাট্টা করছ?

—ঠাট্টা! না, বৌঠান, ঠাট্টা আমি করি না। ঠাট্টা করার মতো সহজ মন আমার নেই। বলতে বলতেই অনন্তর স্বর ভারী হয়ে উঠল।

—এত অল্পেই তুমি এত সিরিয়াস হয়ে যাও কেন বলো তো? ঐ দেখ, চোখ দুটো অমনি ছল ছল করে উঠেছে।

অনন্ত তাড়াতাড়ি চোখের পাতা দুটো বার কতক নাড়িয়ে সামলে নিয়ে ম্লান হেসে বললে—উঃ, তোমার সঙ্গে কথা বলাও মুশকিল !

শুভা খপ্ করে অনন্তর হাত ধরে টেনে বললে—না, কিছু মুশকিল নয়, এসো আমার ঘরে। তোমার সঙ্গে আমার অনেক গল্প করার আছে।

হ্যাঁ, গল্প চলত সারা দুপুর। তারপর কলকাতা থেকে অশোক ফিরে এলে দুজনকে একসঙ্গে খাইয়ে তবে ছেড়ে দিত।

অনন্ত থাকত কলকাতার মেসে। শুভা বার বার করে বলেছে, যে রবিবার বাড়ি যাবে না, সে রবিবার অতি অবশ্য যেন ওদের ওখানে চলে আসে।

এসেছেও। আর এলে শুভাও অমনি ছেড়ে দিত না। অন্তত একটা সিনেমা দেখা চাই। তারপর বাড়ি এসে পেট ভরে খাইয়ে আবার কবে আসবে তার সঠিক তারিখ আদায় করে তবে ছেড়ে দিত।

এ সবই অশোকের জানা। অনন্তের প্রতি শুভার যে একটি গভীর আকর্ষণ আছে তা সে বুঝত। তাতে তার কেমন একরকম সুখ হত। এও দেখেছে এত দিনের দাম্পত্য জীবনে সে তার স্ত্রীকে আর যাই যে পরিমাণেই দিক অনন্ত তাকে যা দিতে পারছে তা সে শুভাকে দিতে পারেনি—পারবেও না। গর্বিতা শুভা ঐ একটি জায়গায় গলার স্বর নিচু করে কথা বলে। চাপা স্বরে বারে বারে বলে—জান গো, তোমার ভাইটি সত্যিই ভালো—কেমন যেন মায়া কাড়তে পারে। এই বলে শুভা নিজেকে সঁপে দিয়েছে অশোকের বুকে।

অশোক আস্তে আস্তে শুভার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলেছে—তুমি ওকে খুব ভালবাস, না ?

শুভা তৎক্ষণাৎ মাথা দুলিয়ে বলেছে—হ্যাঁ, খুব।

—ও পাগলটাও তোমায় খুব ভালবাসে জানি।

সহসা শুভার মুখটা ম্লান হয়ে যায়। কাতর ভাবে বলেছে—পাগল বলছ কেন ?

অশোক হেসে বলেছে—পাগল নয় ? দেখ না ওর দু চোখে কিরকম উদাস দৃষ্টি—একটুতেই কেঁদে ফেলে—একটুতেই চমকে ওঠে—একটা বেড়াল ছানা গাড়িব নীচে পড়লে দু কানে আঙুল চেপে চোখ বুজে ছুটে পালায় !

শুভাও ম্লান হেসেছে।

—হ্যাঁ, দেখেছি বটে। তা ছাড়া যেমন সেণ্টিমেণ্টাল, তেমনি সিরিয়াস ! বেশ হাসি ঠাট্টা হচ্ছে—হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। পাগল !

বড় মিষ্টি সুরে শুভা এই শেষ কথাটি উচ্চারণ করল—পাগল !

—আচ্ছা, ও অমন কেন ?

অশোক বলেছে—ছেলেবেলা থেকেই অমনি ধারা। তার ওপর কাকার সংসারে তো নিত্য অভাব ! অথচ ও-ই হচ্ছে বড় ছেলে। সেদিন পর্যন্ত তো চাকরি ছিল না। যা জোটে—তাও সব টেম্পোরারি ! এই তো কলকাতায় মেসে রয়েছে। কাল যদি চাকরিটি যায়—আবার শূন্য হাতে ওকে ফিরে যেতে হবে নবদ্বীপে। সে যে কী বিড়ম্বনা !

—আহা ! আচ্ছা, ওকে এখানে থাকতে বল না ! কী দরকার কলকাতায় মেসে খরচ পত্তর করে থাকা।

অশোক এ প্রস্তাবের ঠিক সন্তোষজনক কোনো উত্তর দেয়নি।—সে থাকতে চাইবে না। যা আত্মসম্মান জ্ঞান ! ওর দাদামশায় এই আত্মসম্মান আত্মসম্মান করেই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন—হ্যাঁ, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন ! সে গল্প আর একদিন বলব।

এই বলে হঠাৎ যেন অশোক কার্যান্তরে চলে গেছে।

অনন্তকে এ বাড়িতে রাখার প্রস্তাব এই যে আজ শুভা খুব সহজ ভাবে করল, অশোক জানত—এটা নিতান্তই শুভার মৌখিক আবেদন নয়—এখানে তার আন্তরিকতা গভীর।

এ-কথা ঠিকই, অনন্ত হয়তো সহজে এখানে থাকতে স্বীকৃত হবে না—তার মাতামহের দৃষ্টান্ত বাদ দিলেও তার নিজের ভিতরেও একটি উচ্চ অভিমানবোধ সদা জাগ্রত, তবু অশোক যদি নিজে একটু জোর করে—কিম্বা কিছুরই দরকার হয় না যদি একটু শুভার নাম করে—তোমার বৌদির ইচ্ছা তুমি আমাদের কাছে থাকো, তা হলেই অনন্তর রাজি না হয়ে উপায়ান্তর থাকবে না। শুভার উল্লেখ মন্ত্রের মতো কাজ করে, বহুবার এ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

আর তার নিজের কথা ? অনন্ত থাকুক। বাড়িতে বেচারি শুভার সমবয়সী কেউ নেই। রাশভারী উকিল শ্বশুর আর খুঁতখুতে বাতিকগ্রস্ত শাশুড়ি ! কী কষ্টে যে সারাদিন কাটায় ! অনন্তও অবশ্য সারাদিন তাকে সঙ্গদান করতে পারবে না—তারও তো আপাতত চাকরি আছে। তবু—।

তা ছাড়া, অশোক ভালোভাবেই জানে, এ বাড়িতে কাউকেই শুভার পছন্দ নয়। সে নিজে নিতান্তই 'স্বামী' না হলে অমনি

প্রকাশ্য ভাবেই শুভার অমনোনীতের তালিকাভুক্ত হত—নিজের ফ্যামিলির প্রতি এই নিষ্ঠুর অবজ্ঞা থেকে একমাত্র মুখ রক্ষা করেছে অনন্ত। যে কোনো কারণেই হোক অনন্ত তার মন জয় করতে পেরেছে। অশোকের কাছে এ কম গৌরবের কথা নয়। শুভা যাই বলুক—তবু অনন্ত তার ভাই—নিজের ভাই—এক বংশের ছেলে। সুতরাং সে এখানে থাকলে অশোক খুশিই হয়। কিন্তু—

কিন্তু একটুখানি বাধা আছে। সে বাধা স্বয়ং তার মা।

কিছুতেই পছন্দ করতেন না—শুভা যে এত 'ঠাকুরপো, ঠাকুরপো' করে। এর জন্যে অশোক নিজে লজ্জায় মরে যেত আর প্রাণপণে চেষ্টা করত মায়ের এই মনোভাব যেন শুভা কিছুতেই টের না পায়। তা হলেই এ পরিবার সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা ষোলকলায় পূর্ণ হয় আর কি।

আশ্চর্য, শুভা মেয়ে হয়েও কি শাশুড়ির মনোভাব বুঝতে পারে না?

বুঝতে পারে না ভালোই, কিন্তু আবার যেন মনে হয়, একটু বুঝতে পারলে ভালোই হত। তা হলে অনন্তকে এ বাড়িতে রাখার কল্পনা করত না।

তাই শুভা যখনই অনন্তর এখানে থাকার বিষয়ে অশোককে কিছু বলে, তখনই অশোক এড়িয়ে যায়। এমন ভাবে তাকে এড়িয়ে যেতে হয় যেন শুভা অন্তত এটুকু না বোঝে যে, তার নিজের এতে কোনো আপত্তি আছে।

আবার একদিন শুভা ঘুরে ফিরে অনন্তের বিষয় কথা তুলল।

—ওর একটা চিঠি পেলাম। তোমাকে কাল দেখাব। কী করুণ চিঠিখানা। ও যে কি চায় কি ভাবে তার নাগাল পাই না কিছুতে। শুধু অভাব—সাংসারিক দুর্দশাই কি ওর মনের এই অবস্থার কারণ?

অশোক মাথা নাড়ল।

—না। ওর মনের গড়নটাই ঐরকম। তা ছাড়া, লক্ষ্য করছ কি না জানি না, ও যেন কেমন দিন দিন সকলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে—সকল কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া ছেড়েছে, বিশ্বভুবনে একমাত্র যোগাযোগ বোধ হয় তোমার সঙ্গে।

শুভা উত্তেজিত হয়ে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। প্রত্যেক চিঠিতে ও সেই কথাই লেখে—বৌঠান, এ জন্যে তুমিই আমার একজন যার কাছে সব কথা বলতে পারি। তুমিই একমাত্র, যে আমায় বুঝতে পারে।

কথা শেষ করেই শুভা হঠাৎ আবেগ কম্পিত স্বরে বললে—ওকে তুমি এখানেই নিয়ে এসো যেমন করে হোক। মা আপত্তি করবেন মনে করেছ। তাঁকে মত করাবার ভার আমার।

অশোক মুহূর্তমাত্র বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে—আচ্ছা, এই রবিবারে আমি যাব ওর কাছে। বুঝিয়ে বলব। আর তুমিও একটা চিঠি লিখে দিও। আমার কথা ঠেলতে পাবে—তা বলে তোমার চিঠির অমর্যাদা তো করতে পারবে না। এই বলে অন্ধকারে অশোক কেমন একরকম ভাবে হাসল।

চিঠি নিয়ে রবিবারে ঠিকই গিয়েছিল অশোক। শুভার চিঠি পড়ে অনন্ত আনন্দে চোখের জলে ভাসতে লাগল।

—তা হলে, আজই চলো আমার সঙ্গে। মেসের ডিউজ কি আছে জেনে নাও, দিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু অনন্ত এর কোনো উত্তর দিল না। চুপচাপ মাথা নিচু করে রইল।

—কি হল? নাও, গুছিয়ে নাও।

অনন্ত অকস্মাৎ খপ করে অশোকের দু হাত ধরে বললে—আমায় মাপ করো অশোকদা, আমি যেতে পারব না। তোমাদের এই দয়া আমি চিরদিন মনে রাখব।

এর পরেও অশোক অনেক বোঝাল, কিন্তু অনন্তকে রাজি করানো গেল না।

—দাদুর রক্ত যাবে কোথায়! বলে হেসে পিঠ চাপড়ে অশোক বললে—একান্তই যদি না যাও, তা হলে তোমার বৌঠানকে দু কলম লিখে দাও ভাই। নইলে যা মানুষ—হয়তো আমাকে বিশ্বাসই করবে না।

অনন্ত তখনই একটা চিঠি লিখে দিল। সে চিঠি পড়ে শুভা রাগে দুঃখে অভিমানে কেটে পড়ল। তীব্র স্বরে বলে উঠল,—পাগল উন্মাদ! না-না-লোকের কখনো ভালো করতে নেই—কারও জন্যে ভাবতে নেই। এ জগতে সব চেয়ে সুখী যে স্বার্থপর। বলতে বলতে চিঠিখানা কুচিয়ে ফেলে দিল।

পাঁচ ছ মাস কেটে গিয়েছে। এই ক'মাসের মধ্যে অনন্তর সঙ্গে শুভার নিজের কোনো যোগাযোগ নেই। ইচ্ছে করেই শুভা যোগাযোগ রাখেনি। সেই যে প্রত্যাখ্যান করেছিল তার ভিতর যতই বিনয় থাক্ তবু শুভার কাছে তা বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল। সেই থেকে আর আসতে বলেনি, চিঠিও লেখেনি। অনন্ত দুখানা চিঠি লিখেছিল, কিন্তু তার উত্তর না পেয়ে সেও লেখা বন্ধ করেছে। ফলে এই ক'মাস ধরে দু'জনের দিকেই দু'জনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

তবু এতদিন শুভা সহ্য করেছিল, কিন্তু পুজোর ছুটিতে শ্বশুর-শাশুড়ি দীর্ঘদিনের জন্যে বাইরে চলে যাবার পর শূন্য গৃহে শুভার অস্বস্তি যেন বেড়ে উঠছিল। এ অভাব বোধটা তার অমন চালাক চতুর স্বামী থাকতেও পূর্ণ হয় না। সেই যে দুটি বড়বড় সজল চোখ—সেই সুঠাম দেহ—সেই যে অকৃত্রিম স্তুতি—সেই যে সলাজ স-অভিমান সসংকোচ গতিবিধি কি জানি কেন শুভাকে বারে বারে ব্যাকুল করে তোলে। আশ্চর্য ওর সান্নিধ্যে ক্লান্তি আসে না কখনো। সেই মানুষটিকে কাছে পাবার জন্যে আর একবার শুভা চঞ্চল হয়ে উঠল। এবার তাকে এখানে রাখার বিষয়ে একটু ক্ষীণ আশাও ছিল। ইতিমধ্যে তার চাকরিটি গিয়েছে। ফিরে গিয়েছে নবদ্বীপে। দুঃখীর সংসারে বেকার বসে থাকার চেয়ে এখানে থেকে চাকরির সন্ধান করা ঢের বুদ্ধি সম্মত—এ প্রস্তাব আশা করি ও ফেরাতে পারবে না। আর একবার স্বামীকে এই কথা বলবে বলবে ভাবছে অথচ লজ্জায় পারছে না—এমনি সময় একদিন স্বামী গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরল।—পড়ো। বলে একটা চিঠি শুভার হাতে দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

চিঠিখানি লিখছে অনন্তর বাবা। অনন্তর কঠিন অসুখ। কী রোগ কেউ ধরতে পারছে না। রাত্রে ঘুমোতে পারে না, চমকে চমকে ওঠে। বুকের ভিতর ধড়ফড় করে। কারও সঙ্গে কথা বলে না। কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় তাকে কলকাতায় একবার দেখাতে হয়। এই ছেলেই আমার ভরসা বাবা! একে যদি হারাতে হয়—আমরা কী নিয়ে থাকব।

শুভা কোনো কথা না বলে চিঠিখানা স্বামীকে ফিরিয়ে দিলে।

অশোক কর্তব্যের ত্রুটি করল না। নিজেই যোগাযোগ করে বড় ডাক্তার দেখালো। সব খরচই নিজে বহন করল। কিন্তু ডাক্তারের রিপোর্ট তার মনকে একেবারে ভেঙে দিল। না জানি শেষ পর্যন্ত কী হবে! মুখে ওদের উৎসাহ দিলে—কোনো ভাবনা নেই, শিগগির সেরে যাবে। খরচ খরচার জন্যে ভাববেন না কাকাবাবু, আমি তো অনন্তর দাদা! আর, এক কাজ করুন। আপনি নবদ্বীপ চলে যান। অনন্ত কিছুদিন আমার ওখানে থাকুক। ভালোই লাগবে। তা ছাড়া ওর বৌদি রয়েছে সেবা-যত্নের অভাব হবে না কিন্তু। কি বল অনন্ত? যাবে তো?

অনেকদিন পর অনন্ত একটু হাসল। রাজি।

অনেক দিন পর ঠাকুরপো বৌদির সাক্ষাৎ হল। শুভা চমকে উঠল—এ কে! শীর্ণ বিবর্ণ চেহারা—কণ্ঠা বেরিয়ে গিয়েছে। দু' চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি—রাতজাগার অত্যাচার দু' চোখের কোণে কালি ঢেলে দিয়েছে। গলায় ঝুলান কালো সুতোয় বাঁধা মাদুলি—বাঁ হাতে গোছা গোছা মাদুলি! সে রূপ নেই—সে জৌলুস নেই—সে পৌরুষ নেই—সে মানুষের কোনো চিহ্নই আজ আর এই বিকৃত অর্ধমৃত দেহের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অনন্ত এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভাষাহারা শূন্য দৃষ্টি মরুবালুকার মতো যেন নীরস কঠিন জ্বালাময়। শুভা কোনো কথা বলতে পারল না। ছুটে পালিয়ে গেল।

রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হচ্ছিল। শুভা জিজ্ঞেস করলে—ডাক্তার কী বললে? কী রোগ?

অশোক উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।

—বলো না।

—শুনে কী হবে। ডাক্তারের ভয়, এ উন্মাদ রোগের লক্ষণ!

—উন্মাদ! চমকে উঠল শুভা।

—হ্যাঁ, এর পরের স্টেজেই উন্মাদ হয়ে যায়। খুব সাবধানে রাখতে হবে যেন কোনো শক্ না পায়। মন যেন সদা প্রফুল্ল থাকে। সেই জন্যেই তো তোমার কাছে নিয়ে এলাম।—বলে অশোক একটু হাসল।

শুভা নিরুত্তর রইল।

অশোক বললে—ডাক্তার চুপি চুপি জিজ্ঞেস করছিল—বংশে কারও উন্মাদ রোগ ছিল কি না। আমি অবশ্য ওর দাদুর কথা বলিনি। চেপে গেলাম। বললাম—না!

শুভা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এমনি সময় দরজায় প্রবল ভাবে কে কড়া নাড়ল—।

—কে? দুজনেই ধড়মড় করে উঠে বসল।

—বৌঠান—বৌঠান—

শুভা তড়িদ্বেগে উঠে যাচ্ছিল, অশোক বললে, তুমি একা কোথায় যাচ্ছ?

শুভা শুনল না। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। দেখল তারই বন্ধ দরজার সামনে অনন্ত বসে বসে কাঁদছে।

—কী হয়েছে!

অনন্ত বললে—ডাক্তার কী বলেছে, আমি জানতে চাই।

শুভা মৃদু ধমক দিয়ে বললে—তা এত রাত্তিরে কেন? কাল সকালে জিজ্ঞেস করলেই তো হত।

অনন্ত কেমন একরকম ভাবে তার দিকে তাকিয়ে ম্লান কণ্ঠে বললে—তা হত! কিন্তু রাত্রি যে কাটে না! বলে টলতে টলতে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় না শুয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন।

বাড়িতে কেউ নেই! অশোক চলে গিয়েছে আপিসে। নিজের ঘরে একা শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল শুভা। ওদিকের ঘরে ঘুমোচ্ছিল অনন্ত। হঠাৎ চমকে উঠল। কার যেন পায়ের শব্দ। সে যেন এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, ঐ যে—

—বৌঠান!

ধড়মড় করে উঠে বসল শুভা। ততক্ষণে অনন্ত ঘরে ঢুকে পড়েছে। এমনি ভাবে কিন্তু কখনো ঢোকে না ও। সে মুহূর্তে কী যে করবে শুভা ভেবে পেল না, ওদিকে এগিয়ে আসছে অনন্ত! দু চোখ রক্তবর্ণ দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। যেন এ জগতের মানুষই নয়! গায়ে জামা নেই—কংকালসার বুকের ওপরে কালো কারে বাঁধা মাদুলিটা দুলছে। এগিয়ে আসছে অনন্ত।—বৌঠান, বড় ভয় করছে একা।

বলতে বলতেই অনন্ত যেন একেবারে শুভার কাছে এসে পড়ল। শুভা সভয়ে চীৎকার করে উঠল,—চলে যাও—চলে যাও!

ঠিক যেন একটা ধাক্কা খেয়ে অনন্ত থমকে গেল।··বৌঠান!

—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও ঘর থেকে! পাগল—উন্মাদ—

—আমি পাগল? আমি উন্মাদ? বৌঠান—

শুভা কথা শেষ করতে দিল না, প্রাণভয়ে একরকম জোর করে অনন্তকে ঠেলে দিয়ে মুখের ওপর সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কিন্তু তবু সেই রুদ্ধ দরজার সামান্যতম ছিদ্রপথ দিয়ে একটি তীক্ষ্ণ মর্মান্তিক স্বর ভেসে এল—বৌ-ঠান—।

কলকাতার ডাক্তার পরীক্ষা করে বললে—sorry অশোকবাবু, আর উপায় নেই। এ রকম হবে আমি তো বলেই ছিলাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হবে তা বুঝতে পারিনি। কোনো রূঢ় আঘাত এর মধ্যে পায়নি তো?

অশোক মাথা নাড়ল। দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গেই বললে—না।

নদীর মুদ্রায় ঢেউ

বাসবী দত্ত

নক্ষত্রের আলো ধরে অন্ধকার খুলে দেয় তরী
ভোরের বাতাস এসে কড়া নাড়ে—
: খোল, দোর খোল!
বিশ্রামের যতিচিহ্ন বাচালতা
অসম্ভব প্রত্যাশায় ব'সে থাকা বরণ-ডালার মত
দিন মাস বৎসরের আবর্তন ধরে।

কত বা বয়স হোল?
নামতার সংখ্যায় চোখ রাখ'
কোলে ক'রে রাখো আশা
বাঁধের মতন জমিটারে
ছড়ার প্রজন গাও দেখবে এক ঘুমপরী আসে
দেওয়ালে পাঁচিলে শান্তি
কেউ ভাববে না
: আহা, মুদীটা হেথায় ছিল দাঁড়ি কোলে
আজ আর নেই!
আঠার ঘণ্টার আধা মুছে গেছে কি?

পোষা বাঁদরের মত জীবনটা একান্ত সুবোধ
নদীর মুদ্রায় ঢেউ গুণে চলে শ্রান্তির ক্লান্তির
সিঁদুর কোটোর ঘরে, গুড়গুড়িতে।
আমরা প্রত্যাশা করি
হয়তো বরণ করবে শ্রমান্তরে হীরেফলা-ঢেউ:
নিন্দুক নিয়তি খোলে অন্ধকারে
অবসন্ন চেতনার ঢেউ!

গঙ্গার তীরে

বিমলকৃষ্ণ ধর

চারিদিকে যেন এক ছবি··ছবির মতন
আশ্চর্য পৃথিবী এক হঠাৎ কখন
নেমে এল: হৃদয়-আকাশ···
পরিপূর্ণ জীবন-আশ্বাস!

চারিদিকে ছবির মতন···
আকাশ··নৌকা··জল কেবলি এখন
ভেসে ভেসে দূরে চলে যায়···
দূর হতে দূরতর দৃষ্টির সীমায়!

ওপার অস্পষ্ট দেখি—মৃদু আলো মৃদু অন্ধকার
ষ্টীমার··বাঁশির শব্দ··অস্পষ্ট ছায়ার
কেবল কাঁপন জাগে! চারিদিকে অন্তহীন জল
বৈশাখী-আকাশ তাই বিহ্বল চঞ্চল!

হৃদয়ে সন্ধ্যার ছায়া,—অন্য কোন সুর
রক্তের গভীরে বাজে! আরো কোন দূর
ওই জলের উচ্ছ্বাস···
পরিপূর্ণ জীবন-আশ্বাস···
হৃদয় কেবলি চায়,—পৃথিবী অধীর
এখানে সন্ধ্যা নামে: গঙ্গার তীর।
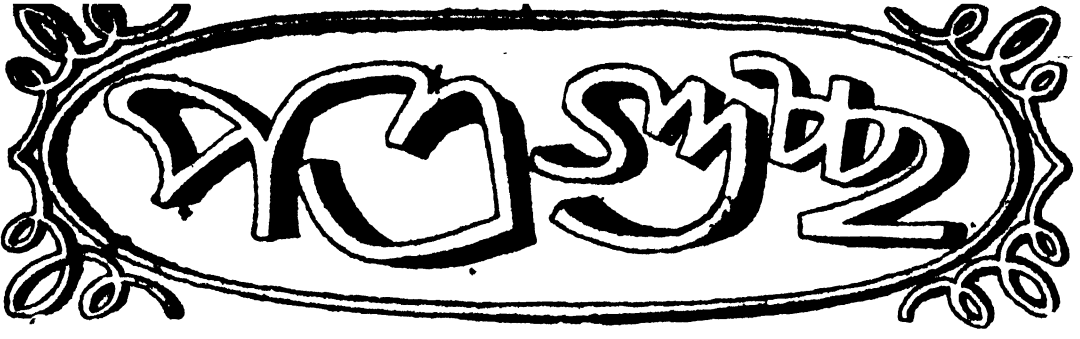
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ঃ শ্রীজওহরলাল নেহরুকে লিখিত

[ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি আজ সারা জগতের দরবারে। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক দিকপালগণের মধ্যে আজ একটি বিশেষ আসন শ্রীনেহরুর অধিকারভুক্ত। চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে জগদ্বাসীর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও বিপুল সমাদর তিনি অর্জন করেছেন। বাঙলাদেশের সঙ্গেও তাঁর এবং নেহরু পরিবারের যোগ অবিচ্ছেদ্য। শুধু রাষ্ট্রনীতিতেই নয়, বাঙলাদেশের সঙ্গে তাঁদের এক অন্য সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে ঠাকুর পরিবার ও সুভাষচন্দ্রের পরিবারবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত সপরিজন প্রধানমন্ত্রী। বিবাহসূত্রে তাঁর কনিষ্ঠা সহোদরা ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তায় আবদ্ধা। তাঁর কন্যা বহুকাল শান্তিনিকেতনে বাস ও শিক্ষালাভ করেছেন। বাঙলার এই দু'টি বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে শ্রীনেহরু ও তাঁর আত্মজনের সংযোগ যে কত প্রীতিপূর্ণ ও মধুর ছিল বর্তমান সংখ্যার পত্রগুচ্ছ বিভাগে প্রকাশিত চিঠিগুলিই তার প্রমাণ। এই পত্রগুলি 'শ্রীজওহরলাল নেহরুর পত্রগুচ্ছ' থেকে সংকলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা গ্রন্থটির প্রকাশক এম, সি সরকার এণ্ড সন্সের সৌজন্য স্বীকার করি। —স]

"উত্তরায়ণ"
শান্তিনিকেতন, বাংলা
২০ এপ্রিল, ১৯৩৫

প্রিয় জওহরলাল,

ইন্দিরাকে আমরা সবাই এক মহামূল্য সম্পদ বলে মনে করতাম ; ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাই তাকে আমাদের বিদায় জানাতে হয়েছে। খুবই ঘনিষ্ঠভাবে তাকে আমি দেখেছি ; দেখে যে-ভাবে তাকে তুমি মানুষ করে তুলেছ তার প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করেছি। শিক্ষকরা সবাই একবাক্যে তার প্রশংসা করেন, ছাত্রমহলেও সবাই তাকে খুবই ভালবাসে। আশা করি আবার সুসময় আসবে এবং ইন্দিরাও আবার শিগ্‌গিরই এখানে ফিরে এসে তার পড়াশুনোয় মন দিতে পারবে।

তোমার স্ত্রীর রোগযন্ত্রণার কথা যখন ভাবি, তখন আমার কী যে দুঃখ হয়, জানাতে পারব না। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে সমুদ্রযাত্রার ফলে এবং ইউরোপের চিকিৎসার গুণে তাঁর খুবই উপকার হবে, অচিরেই তিনি আবার তাঁর হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পাবেন।

সস্নেহ আশীর্বাদান্তে ইতি। তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন,
১ অক্টোবর, ১৯৩৫

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার স্ত্রীর অসুখের বিষয়ে খবরের জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে আমরা দৈনিক পত্রগুলি দেখে যাচ্ছি, এবং আশা করছি যে উন্নতিসূচক লক্ষণ দেখতে পাওয়া গিয়েছে বলে খবর পাওয়া যাবে। ঐকান্তিকভাবে আশা করি, জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে যে বিস্ময়কর মনোবলের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা তাঁকে সাহায্য করবে। তাঁকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিও।

প্রতি বছর শীতকালে বিশ্বভারতী আমাকে নির্মমভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তার সম্বল বড় সামান্য ; এই শীতকালেই অর্থ সংগ্রহের জন্যে নিজেকে নাড়া দিয়ে আমাকে বাইরে বেরুতে হয়। মানুষকে আনন্দ দানের ছলে এই ভিক্ষাবৃত্তি, আর নয়ত আদৌ যাঁরা উদার নন, তাঁদের ঔদার্যের কাছে আবেদন জ্ঞাপন, এ আমার এক বিতৃষ্ণাজনক অগ্নিপরীক্ষা। আদর্শের জন্যে এই দুঃখবরণ—অপমান আর ব্যর্থতার কণ্টক-মুকুট মাথায় নিয়ে বিনা প্রতিবাদে এরই মধ্যে আমাকে আনন্দলাভের চেষ্টা করতে হয়। তোমার আপন জীবন আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চাইতে যে-আদর্শকে তুমি মহত্তর বলে মনে কর, তার জন্য যে-দুঃখ তুমি বরণ করছ, সে-কথা স্মরণ করে আমার সান্ত্বনা পাওয়া উচিত নয় কি ? কিন্তু মাঝে-মাঝেই আমার মন এই প্রশ্নের দ্বারা পীড়িত হয় যে, অনুদার পৃষ্ঠপোষকদের টেবিল থেকে অনুগ্রহের মুষ্টি-ভিক্ষা কুড়িয়ে এই যে আমি আমার উদ্যমের অপচয় করছি, এই কি আমার সঙ্গত কাজ, নাকি স্তূপীকৃত হতাশার গ্লানি থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে আমার মনকে সতেজ রাখাই আমার কর্তব্য। কে জানে, অপ্রীতিজনক কাজ এড়াবার জন্য এ হয়ত আমার এক অছিলামাত্র। মহাত্মাজীকে অনুরোধ করেছি, তিনি যেন আমার হয়ে বলেন। অনুগ্রহ করে তাতে তিনি সম্মত হয়েছেন। বলাই বাহুল্য, আমার চেষ্টায় যেটুকু সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, তিনি যদি তাঁর প্রভাব প্রয়োগ

করেন, তার চাইতে অনেক বেশী সাফল্য সম্ভব হবে। সার তেজবাহাদুর সপ্রুও আমাকে সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছেন।

ইন্দিরাকে আমার কথা বল। আশা করি আবার কখনও সে আমাদের আশ্রমে আসবার, এবং যে ক'টা মাস সে এখানে থেকে আমাদের সুখী করে গিয়েছিল তার স্মৃতিতে আবার নতুন করে জাগিয়ে তুলবার সুযোগ পাবে। তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"উত্তরায়ণ"
শান্তিনিকেতন, বাংলা,
৫ এপ্রিল, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি পেলাম। আশ্রমে আমার ছাত্রদের কাছে কমলার বিষয়ে যে অল্প কয়েকটি কথা বলেছি, তুমি তাতে আশা ও শক্তি পেয়েছ জেনে সুখী হয়েছি। বিশ্বাস কর, তোমার এই বিপুল বিয়োগ-ব্যথাকে আমি অত্যন্তই আন্তরিকভাবে অনুভব করেছি।

ট্রেণে যে অল্প কয়েক মিনিটের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমি নিজেও তাতে তৃপ্ত হতে পারিনি। পথের পরিশ্রমে আমার দেহ আর মন, দুই-ই ছিল ক্লান্ত, কথা বলবার শক্তিও আমার ছিল না বললেই চলে। দিন কয়েকের জন্য তোমাকে এখানে এসে আমার সঙ্গে থাকতেই হবে। এই আশ্বাস তোমাকে দিতে পারি যে, শান্তিনিকেতনের গরম এলাহাবাদের চেয়ে বেশী নয়।

স্নেহানুসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন,
৩১শে মে, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার মহান গ্রন্থখানি সবেমাত্র পড়ে শেষ করেছি। বইটি আমার উপরে গভীর রেখাপাত করেছে। তোমার এই বিরাট কাজের জন্য আমি গৌরববোধ করি। এর খুঁটিনাটি নানা বিবরণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে মানবিকতার সেই গভীর স্রোতোধারা, তথ্যের জটিলতাকে অতিক্রম করে যা আমাদের সেই মানব-সত্তার কাছে উত্তীর্ণ করে দেয়, আপন কর্মের থেকে যে মহত্তর, পরিবেশের থেকে সত্যতর। তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন বেঙ্গল,
২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

ইন্দিরা তার চিঠিতে আমার প্রতি যে আন্তরিকতা প্রকাশ করেছে তাতে আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছি। ইন্দিরা চমৎকার মেয়ে; সে তার শিক্ষক ও সহপাঠীদের মনে একটা মধুর স্মৃতি রেখে গেছে। তোমার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আদর্শ সে পেয়েছে; এবং আত্মসুখপরায়ণ ইংরেজ সমাজের সঙ্গে যে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি এতে আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি। এর পরে তুমি যখন তার কাছে চিঠি লিখবে তাকে আমার আশীর্বাদ জানিও। আমাদের বাৎসরিক উৎসব চলছে। আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় লোকের ভিড় ও কর্ম-ব্যস্ততা অত্যন্ত পীড়াদায়ক; কিন্তু বুদ্ধিমানের মত তোমার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থার তুলনা করলাম না !!

আন্তরিক আশীর্বাদ জেনো। তোমার একান্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরায়ণ,
শান্তিনিকেতন, বঙ্গদেশ
২৮শে মার্চ, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

এইমাত্র তোমার টেলিগ্রাম পেলাম আগামী ১৪ই এপ্রিল আমাদের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তুমি আসতে পারবে জেনে আশ্বস্ত হওয়া গেল। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যে উল্লেখ করেছ, আমার ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের পক্ষে তা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য তোমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত লোক ত' আমি ভেবে পাচ্ছিনে। তুমি অবশ্যই আসবে। যদি প্রয়োজন হয় তুমি বিমানযোগেও আসতে পার, আমাদের এখানে সুন্দর বিমান অবতরণের ক্ষেত্র আছে। ইন্দিরাকে সঙ্গে আনতে ভুলো না। আশীর্বাদ জেনো।

তোমার একান্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন, বঙ্গদেশ
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

বিপদে এবং জীবনের বাঁধন যখন সহসা শিথিল হয়ে আসবে তখন তোমার প্রীতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারব জেনে আশ্বস্ত হলাম। আমি এতে সত্যি অভিভূত হয়েছি। প্রীতিশীল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন, বঙ্গদেশ
১০ই অক্টোবর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় আমি খুব আনন্দিত। তবে শান্তিনিকেতনে আসার কষ্ট থেকে তোমাকে অব্যাহতি দিলাম। আগামীকাল ১১ই অক্টোবর থেকে এ মাসের শেষ পর্যন্ত আমি কলকাতায় থাকব বলে আশা করি, সুতরাং ২৫শে তারিখ কিংবা যে কোন দিন তোমার সুবিধা হবে আমার সঙ্গে ওখানে দেখা করলে খুশি হব। আমি এখনও চিকিৎসাধীন আছি এবং কলকাতায় যদি অত্যাশ্চর্য বৈদ্যুতিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় রাজী না হই—তাহলে নাকি প্রকৃতির পক্ষ থেকে গুরুতর শাস্তি পাবার আশঙ্কা আছে। তুমি যদি সময় করতে পার তাহলে আমার সাথে একবারের জায়গায় দুবার দেখা করবে। সম্ভবত আমি সহরতলীর কোন বাগানবাড়ীতে বাস করব। তখন কৃষ্ণা কলকাতায় থাকবে এবং সেই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। ভালবাসা নিও।

প্রীতিশীল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন, বাংলা
১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

এইমাত্র কাগজে তোমার দেশে প্রত্যাবর্তনের কথা পড়লাম। সারা দেশের স্বাগত ধ্বনির সঙ্গে ত্বরান্বিত হয়ে আমার স্বর মিলিয়ে দিচ্ছি।

তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আমি বড়ই উৎসুক, তোমার সূচীতে যদি শান্তিনিকেতন ভ্রমণের কথাটা রাখ, আমি সুখী হব।

এই সেদিন ভারতীয় শ্রমশিল্পের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নিয়ে ডাঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ এবং চমৎকার এক আলোচনা হল। আমি এর গুরুত্ব সম্পর্কে স্থির-নিশ্চয়। তুমি কংগ্রেস পরিচালনার জন্য সুভাষ-গঠিত কমিটির সভাপতি হতে রাজী হয়েছে বলে, এ সম্পর্কে তোমার অভিমত জানতে চাই।

ইন্দিরাকে আমার কথা বোলো, তাকে আমার ভালবাসা জানিয়ো।

তোমার স্নেহার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন, বাংলা
২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

একজন সর্দার মজুর মানুষ হিসেবে আদর্শ না হতে পারে, কিন্তু মিস্ত্রী হিসেবে দক্ষ হলে ঢিল স্ক্রুপ আঁটো করা আর তাকে যে অংশগুলো বাধা দেবে সেগুলো করাত-কাটা করে বাতিল করে দেবার ব্যাপারে ব্যক্তিগত শক্তিতে আমি স্বয়ং বিশ্বাসী। যাহোক, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, আরো বেশি চাই তোমার কথা শুনতে, যদিও এতে কাজ কিছু নাও হতে পারে। আসল কথা এই যে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই, কিন্তু তোমার ব্যয় করার মতো সময় পাওয়া অবধি তা সবুর করতে পারে।

ইন্দিরার স্বাস্থ্যের গতিক দেখে আমি উদ্বিগ্ন। আশা করি শীতের ক'মাস ভারতবাস তার পক্ষে ভাল হবে।

তোমার প্রীত্যর্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুভাষচন্দ্রের পত্র : মোতিলাল নেহরুকে লিখিত

১ উডবার্ন পার্ক, কলিকাতা
১৮ জুলাই, ১৯২৮

প্রিয় পণ্ডিতজী,

কংগ্রেস সভাপতির পদ সম্পর্কে গতকল্য সকালে আমি আপনাকে তার করেছিলাম। কাল রাত্রে তার উত্তর পেয়েছি।

কোনও কারণে আপনি যদি কংগ্রেস-সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মত হন, সমগ্র বাংলা দেশ যে তাহলে কতখানি নিরাশ হবে, তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। যে-সমস্ত কারণে এই প্রদেশের সকলেই আপনাকে চায়, তার একটি হল এই যে, স্বরাজ্য দলের কাজ এবং নীতির সঙ্গে আপনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অন্যান্য প্রদেশের আমি উল্লেখ করব না, তবে এ-বিষয়ে আমি একরকম নিশ্চিত যে, চূড়ান্ত মনোনয়নের সময় সমগ্র ভারতবর্ষ সর্বসম্মতিক্রমে আপনাকে সমর্থন জানাবে।

দেশের অবস্থা আজ যে রকম, এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে ১৯২৯ সন যে-রকম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৎসর হবে, তাতে এমন আর কারও কথাই আমরা ভাবতে পারছি না, অবস্থা বুঝে যিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন। বিকল্প কয়েকটি নাম আমরা শুনেছি; অন্য অবস্থায় সে-সব নাম বিবেচনারও যোগ্য হত। কিন্তু বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা ঐক্যসাধন এবং সর্বসম্মতিক্রমে একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য যখন সযত্ন চেষ্টা চলছে, বিকল্প নামগুলির কোনওটিকেই তখন গ্রহণ করা যেতে পারে না। আমি কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছি না, কোনও কারণে আপনি যদি সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মত না হন, তবে এই প্রদেশের পক্ষে তার পরিণাম এতই মারাত্মক হবে যে, কংগ্রেস-অধিবেশনের সাফল্য তাতে যথেষ্টই বিঘ্নিত হবে। আমরা যখন এক গুরুতর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছি, তখন কি আমরা আশা করতে পারি না যে, জাতির আহ্বানে আপনি সাড়া দেবেন?

স্নেহানুরক্ত
সুভাষচন্দ্র বসু

পুনশ্চ : জেলা-বোর্ডগুলির ভোট সম্পর্কে যে তার আপনি পাঠিয়েছেন, তা আমি পেয়েছি। সেগুলি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছি, তবে চেষ্টা সফল হবে কিনা, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বিভিন্ন জেলার কাছ থেকে ভোটার-তালিকা পাবার পর সংখ্যাগুলিকে মিলিয়ে তুলতে যথেষ্টই সময় লাগবে।

সুভাষ

সুভাষচন্দ্র ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে লেখা মোতিলাল নেহরুর পত্র

আনন্দ ভবন,
এলাহাবাদ, ১৯ জুলাই, ১৯২৮

এইমাত্র তোমাদের চিঠি পেয়েছি, এবং এই মর্মে তোমাদের কাছে তার করে দিয়েছি যে চিঠির জবাব শিগগিরই দেব। আমার মনে হয়, অবস্থাটাকে তোমরা ভুল বুঝেছ। পিতাপুত্রের সেণ্টিমেণ্টের প্রশ্ন এটা নয়। এমনও নয় যে পিতার অনুকূলে সরে দাঁড়াবার জন্য পুত্রকে বুঝিয়ে বলবার দরকার হয়েছে। পিতা ও পুত্র, উভয়ের সামনে এখন একটিই প্রশ্ন : কী করলে দেশের সব চাইতে মঙ্গল হবে। মহাত্মাজী যাকে "মুকুট" বলেন, মুহূর্তের জন্যও জওহরের মনে তা পরবার ইচ্ছে দেখা হয়নি। অনেক দিন থেকেই তাকে সভাপতির আসনে বসাবার কথা আমি ভাবছি। জওহর যে আমার পুত্র বলে এ-কথা আমি ভাবছি, তা নয়। গত বছর ডাঃ আনসারী নির্বাচিত হবার আগে আমার ভাবনার কথা আমি মহাত্মাজীকে জানাই। ডাঃ আনসারী নিজেও চেয়েছিলেন যে মাদ্রাজ কংগ্রেসে জওহর সভাপতিত্ব করুক; কিন্তু অত্যন্তই দৃঢ়তার সঙ্গে জওহর এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করে।

আমার কমিটির অধিবেশন যখন স্থগিত ছিল, সেই সময় কংগ্রেসের আসন্ন কলকাতা-অধিবেশনের সভাপতিত্ব সম্পর্কে মহাত্মাজীর কাছ থেকে আমি এক চিঠি পাই। তাতে তিনি আমাকে জানান যে সেনগুপ্তের কাছ থেকে তিনি এক চিঠি পেয়েছেন, তাতে সভাপতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। মহাত্মাজী আমাকে আরও

জানান যে আমি তখন যে-কমিটির সভাপতিত্ব করছি তা যদি সারবান কিছু কাজ করতে পারে, তাহলে আমি যদি মুকুট পরি ত ভালই হয়। উত্তরে আমি তাঁকে জানাই, আমার কমিটি যে সর্বসম্মতিক্রমে কোনও সিদ্ধান্ত করবে এমন সম্ভাবনা বড় কম, এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যদি না-ই সম্ভব হয় ত সেক্ষেত্রে আমার বিবেচনায় দেশের জন্ম আর আমার কোনও কাজ করবার নেই। ৮ জুলাই পর্যন্ত এ-বিষয়ে আর নতুন কোনও কথা হয়নি। ঐ তারিখে কমিটি একটা মোটামুটি সমঝোতায় উপনীত হয়, এবং আবার আমি মহাত্মাজীকে চিঠি লিখি। সে-চিঠির একটা অনুলিপি নেই যে তোমাদের পাঠাব। তবে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার যা মনে আছে, জানাচ্ছি। তাতে আমি বলেছিলাম যে বর্তমান মুহূর্তে বল্লভভাই প্যাটেল সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সুতরাং সর্বাগ্রে তাঁকে সভাপতি করবার চেষ্টা করা উচিত। তাঁকে যদি না পাওয়া যায় ত পরবর্তী যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছে জওহরলাল। এর কারণ হিসেবে আমি বলেছিলাম যে আমাদের শ্রেণীর মানুষদের যুগ শেষ হয়ে এসেছে, এবারে দেশের পরিচালনভার তরুণদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। আমরা ত চিরকাল বাঁচব না; আজ হ'ক কাল হ'ক, এ-ভার তরুণদেরই নিতে হবে। আমাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আমাদের জীবদ্দশাতেই যদি তারা কাজ সুরু করে দেয় ত অনেক ভাল হয়। নিজের সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে বস্তুত আমার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, আমার দ্বারা আর কাজ চলবে বলে মনে হয় না। জওহরের নাম আমি এই কারণে সুপারিশ করেছিলাম যে আমার বিশ্বাস, তরুণদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা অর্জনের সম্ভাবনা তারই সব চাইতে বেশী। পরে দেখা গিয়েছে যে আমার ধারণা সত্য। তার আর আমার নাম যে একই সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে, এতেই সে-কথা বুঝতে পারা যায়। মহাত্মাজী তার করে আমাকে জানান যে আমার সঙ্গে তিনি একমত, এবং ইয়াং ইণ্ডিয়ায় তিনি জওহরের নাম সুপারিশ করবেন। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এ-কথা জানামাত্রই জওহর সরে দাঁড়াবে। সুতরাং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসৌরিতে তার কাছে আমি কড়া নির্দেশ পাঠাই যে আমার অনুমতি না নিয়ে কোন-কিছু ছাপতে দেবার বোকামি যেন তার না হয়। এই হল ব্যাপার। তোমাদের চিঠির অনুলিপি মহাত্মাজীকে আমি পাঠিয়েছি, এই চিঠির অনুলিপিও তাঁকে পাঠালাম। ব্যাপারটা আমি তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছি।

প্রশ্নটা জওহর আর আমার নয়। প্রশ্ন হল, এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত। তোমাদের কথার মধ্যেও যুক্তি আছে, তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমার অভিমত এই যে দেশের বর্তমান অবস্থায় এমন একটা গতিশীল দলের প্রয়োজন আপন লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে-দল সর্বরকম মূল্য দানে প্রস্তুত। আন্দোলনের পরিচালনা-ভারও এই দলের হাতেই থাকবে। স্বাধীনতার দাবি থেকে নিঃশব্দে নেমে এসে এখন যদি ডোমিনিয়ন স্টাটাস দাবি করা হয়, কংগ্রেস তাহলে হাস্যাস্পদ হবে। জগৎকে আমি দেখাতে চাই, এবং সেই সঙ্গে এ আমি অতিশয় সত্য বলে জানি যে দেশ আর এইসব ধাপ্পাবাজি সহ্য করতে প্রস্তুত নয়, এবং সর্বদলের ন্যূনতম সাধারণ দাবিকে যদি অবিলম্বে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এই ন্যূনতম দাবির যাঁরা সমর্থক, তাঁরাও সেক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী দলের পক্ষেই এসে দাঁড়াবেন। আমার বিশ্বাস, দেশের মনোভাব এখন যে-রকম, তাতে তথাকথিত সর্বসম্মত গঠনতন্ত্রটিকে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে পাশ করিয়ে নেওয়া সহজ হবে না। যদি পাশ করিয়ে নেওয়া হয়—সেটা সম্ভব—তাহলে এর সমর্থক ব্যক্তিদের জন্যই তা সম্ভব হবে, তরুণ দলের সুবিবেচিত সিদ্ধান্তের কারণে নয়।

সে যা-ই হক, দেশের সেবার জন্য পিতা আর পুত্র দুজনেই প্রস্তুত। সভাপতির আসনে যিনিই বসুন, তাতে তাঁদের কিছু আসে যায় না।

এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে এইসব চিঠিপত্র পাঠ করে মহাত্মাজী ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবেন। তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। মোতিলাল নেহরু

শ্রীনেহরুকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্র

পোস্ট লাগের্ ড, হফগাস্টাইন:
৪ অক্টোবর, ১৯৩৫

প্রিয় জওহর,

তোমার ২ ও ৩ তারিখের পত্র পেলাম।

ফ্রীবার্গের সার্জনের রিপোর্ট পড়ে খুবই খুশী হয়েছি। আশা করি তাঁর চিকিৎসা-বিজ্ঞান এমন কোনও সাহায্য দিতে পারবে, রোগিণী যাতে তাঁর ফুসফুসধরা-ঘটিত গোলযোগ কাটিয়ে উঠতে পারেন। মিসেস নেহরুকে অন্য-কোথাও স্থানান্তরিত করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করেছ কি? তোমার এই দুঃসময়ে আমার দ্বারা কোনও কাজ যদি হয়, তাহলে আমাকে ডেকে পাঠাতে দ্বিধা কর না।

আমার বইয়ে যে-সব ভুল রয়েছে, তার একটি দেখিয়ে দেবার জন্য তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানাই। তুমি জানিয়েছ তথ্যের কিছু ভুল থেকে গিয়েছে। সেটা খুবই সম্ভব। তবে আশা করি মারাত্মক কোনও ভুল নেই। দুর্ভাগ্যবশত অনেকাংশেই আমাকে আমার স্মৃতির উপরে নির্ভর করতে হয়েছে; বিশেষ করে সন-তারিখের ব্যাপারে ত আমাকে খুবই অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। ঐ সময়কার খবর যাতে পাওয়া যেতে পারে, এমন কোনও বই-পত্র আমি সংগ্রহ করতে পারিনি; হাতের কাছেও এমন কেউ ছিলেন না যাঁর সাহায্য নিতে পারি। পণ্ডিত মোতিলালজীর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে জানাই, আমার মনে পড়ে যে সঠিক তারিখটা স্মরণ করবার জন্য অনেকক্ষণ আমি মাথা ঘামিয়েছিলাম, তবু তারিখটা আমার মনে পড়েনি। ছাপার ভুলও (ছাপাখানার ভূত) তোমার চোখে পড়বে। সেটা অংশত হয়েছে প্রুফ সংশোধনের ত্রুটির জন্য। মাত্র একবার আমি প্রুফ দেখতে পেরেছিলাম, তাও ভারতে ফিরে যাবার দিন আসন্ন বলে তার কয়েকটি অংশ আমাকে অত্যন্তই তাড়াহুড়োর মধ্যে দেখে দিতে হয়। তা ছাড়া খুবই তাগাদার মধ্যে বইখানি আমাকে লিখতে হয়েছে। আমার স্বাস্থ্যও তখন ভাল ছিল না। যে-সব ভুল তুমি দেখিয়ে দিয়েছ, সেগুলিকে সযত্নে টুকে রাখব, দ্বিতীয় সংস্করণে যাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধন সম্ভব হয়।

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানকে যে চিঠি লিখেছিলাম, এই সঙ্গে তার একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দিচ্ছি। চিঠিখানি ১ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

খবরটা তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ যে আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন একমাত্র প্রশ্ন হল, এর ফলে ইংল্যাণ্ড ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধ বাধবে কি না।

স্নেহানুসক্ত
সুভাষ

কারাসঙ্গী হোতিলাল বর্ম্মণ

শ্রীসুধীরচন্দ্র দে

১৯১০ সালে হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রিবিউনাল কর্তৃক খুলনা ষড়যন্ত্র কেসে আমরা এগারো জন রাজবন্দী বিভিন্ন মেয়াদে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হই। আলীপুর সেন্‌ট্রাল জেলের ফাঁসী-কুঠিতে সকলে আবদ্ধ হই—অবশ্য পৃথক পৃথক ভাবে। ঐ সব কুঠি নাকি নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ের তৈরী। কুঠিগুলি জেলকুঠি হতে বড়ো, পাঁচীল দিয়ে পৃথক পৃথক ঘেরা। আমাদের দুই পায়ে বেড়ী, গোরা সৈন্যের পাহারা বসলো আমাদের উপরে। তখন মনে হয় মুসলমানপাড়া বোমা কেসের বিচার চলছে। সার আশুতোষ প্রধান জজ। বিচারে সকলেই মুক্তি পেয়েছিলো। কুঠির দেয়ালে দাগ কেটে কেটে কত লেখা—ফাঁসীর আসামীরা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে কত প্রার্থনা, কত দুঃখের কথা মনের প্রবল আবেগে দেওয়ালে লিখে রেখে গেছে! আজ তারা কোথায়? কত অপরিচিত যুবক মুহূর্ত্তের আবেগে অপরাধ করে চরম দণ্ড ভোগ করে দীর্ঘজীবনকে অতিক্রম করে কোন অজানা দেশে চলে গেছে? রাত্রের অন্ধকারে তাদের উপস্থিতি যেন অনুভব করতাম, নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পেতাম! ভয় পেতাম না, জীবনের অনিশ্চয়তা, অসারতার কথাই মনে আসতো। জীবন কত ক্ষণভঙ্গুর!

কিছুদিন পরে একদিন শেষরাত্রে দরজায় আঘাত করে আমাকে জাগিয়ে তুললো গোরা সিপাহী। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে লপসী খেয়ে নিয়ে তৈরী হতে বললো। বুঝলাম আজ আমাদের, "যাত্রা হবে শুরু।"

লপসী খেয়ে কম্বল, থালা, বাটী নিয়ে বাইরে এলাম। আমার মত আমাদের এগার জনই এলো বুঝলাম। অন্ধকারে ছোট কয়েদী ভ্যানে ঠেসে-ঠুসে আমাদের ঢুকান হল। এতদিন দেখা শুনা কথাবার্ত্তা বন্ধ থাকায় ভ্যানের মধ্যে মহা হৈ-চৈ আরম্ভ হল। একেবারে নরক গুলজার! সকলেই কথা বলে, কিন্তু কেউই শুনে না। চিৎকার একটু কমলে কথাবার্ত্তায় বুঝলাম কয়েকজন অবাঙ্গালী আমাদের মধ্যে আছেন ও এক সঙ্গে জাহাজে আন্দামান যাত্রা করছেন। তাদের সঙ্গে আলাপ করবার আগ্রহ সকলের। জাহাজে একসঙ্গে থেকে আলাপ করা যাবে।

অন্ধকার থাকতেই আমরা গঙ্গাতীরে কয়লাঘাটায় পৌঁছে গেলাম। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। মাতৃভূমি হতে আশু বিচ্ছেদে সকলের মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। হয়ত এই চিরবিদায় নিচ্ছি। মা, ভাই, বোন, বন্ধু, দেশ সব ছেড়ে জন্মের মত কোন অজানা দেশে চললাম। দেশকে স্বাধীন করে; দেশকে সুখী সমৃদ্ধ করে তুলবার আশা, কল্পনা সব ধূলিসাৎ হ'ল। উচ্চৈঃস্বরে অনেকে দেশকে, মাকে ডেকে বিদায় নিলেন। মায়ের পদধূলি বলে গঙ্গাতীরের মাটি নিয়ে মাথায় দিলেন।

একজন অবাঙ্গালী বলে উঠলেন, "ভাই সব, এই যে বৃষ্টি হচ্ছে—এসব বৃষ্টি নয়, আমাদের বিচ্ছেদে ভারতমাতা চোখের জল ফেলছেন।" ভারাক্রান্ত মনে গঙ্গাতীরে বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে মায়ের অশ্রুবিসর্জ্জনের কথায় সকলেই উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলে অভিভূত হয়ে কেঁদে উঠলেন! বাক্যটি বড়ই সময়োপযোগী ভাব প্রকাশক হয়েছিলো।

অদূরে আমাদের জন্য "মহারাজা" অধীর প্রতীক্ষায় ধুম উদ্‌গীরণ করছিলো। পূর্ব্বদিন অন্যান্য কয়েদীদের জাহাজে তোলা হয়েছে। শুধু আমাদেরই প্রতীক্ষায় মহারাজা দাঁড়িয়ে আছে। তখন ভোর হয়েছে। "ভোঁ" "ভোঁ" করে মহারাজা তাড়া দিলো। জেলসুপার সঙ্গে এসেছিলেন—তাড়াহুড়া করে আমাদের বোটে করে জাহাজে উঠান হ'ল। অবাঙ্গালী চার জনকে পৃথক লৌহ খাঁচায় বন্ধ করার আদেশ ছিল পরে জ্ঞাত হয়েছিলাম। কিন্তু তাড়াহুড়াতে "উল্টা বুঝিলি রাম হয়ে গেল!" আমাদের মধ্য হতে পাঁচ জনকে মোটা সোটা দেখে পাঞ্জাবী ভেবে, পৃথক খাঁচায় বন্ধ করা হ'ল আর পাঞ্জাবী ও ইউ, পির চার জনকে আমাদের মধ্যে ভুল করে দেওয়া হ'ল। ভালই হ'ল প্রাণ খুলে ওদের সব খবর নেওয়া যাবে—ভাবের আদান প্রদানও করা যাবে। সকলে একসঙ্গে যাব, এক সঙ্গেই থাকবো। নতুন দেশে নতুন পরিবেশে জীবন আনন্দেই কাটবে। আমরা যেন স্বেচ্ছায় এক নতুন দেশে ভ্রমণে চলেছি—এ ভাব মনে একটু আনন্দের প্রলেপ লেপে দিলো।

মহারাজা জাহাজে আমরা উঠামাত্রই যাত্রা শুরু করল তার গৃহাভিমুখে—আন্দামানে। পরিচয় নিয়ে জ্ঞাত হলাম অবাঙ্গালী চার জনের দুজন হচ্ছেন—বাবু নন্দগোপাল, অপরজন বাবু রামহরি। দুজনেই রাজদ্রোহমূলক লেখার জন্য "সিডিশানে" দণ্ডিত। অপর দুজন হলেন বাবু হোতিলাল বর্ম্মণ, আগরার এক স্কুলের ছেলেদের বোমা তৈয়ারী শিখাইবার সময় ধৃত হন। অপরজন রামলাল লালা।

জাহাজ ক্যানিং ছাড়িয়ে সমুদ্রে পড়তেই সামুদ্রিক পীড়ায় সকলে বমি করতে শুরু করলাম এবং শয্যাশায়ী হলাম।

রাত্রে চিঁড়া গুড় একটু তেতুল দু'একটা লঙ্কা এই সব খেতে দেওয়া হ'ল। ভাত রুটি কিছুই দেওয়া হল না। অনেকেই কিছু খেলেন না। প্রায় সকলেই সামুদ্রিক পীড়াতে শয্যাশায়ী, বমি করার বিরাম নাই। রাত্রে আবার ঐ চিঁড়ার আবির্ভাবে সকলের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। ঐ খাদ্য নিতে অস্বীকার করলাম। সকালে শৌচের ও স্নানের জন্য জাহাজের ডেকে গিয়ে দেখলাম, মুসলমান কয়েদীদের গরম গরম ভাত ও তরকারি খেতে দেওয়া হচ্ছে। ভাতের জন্য আমাদের প্রাণ উদ্বেল হয়ে উঠলো। আমরা জাহাজের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারবাবুকে

ডেকে ভাতের ব্যবস্থা করতে বলায়, তিনি বললেন যে হিন্দুরা সমুদ্র যাত্রাকালে অন্নাহার করেন না বলে হিন্দুদের ভাতের ব্যবস্থা নাই, পাচকও নাই।

হোতিলাল অগ্রণী হয়ে বলে উঠলো, "তাহলে আমরা জাহাজে উপবাস দেবো। আমরা মুসলমান পাচকের রান্নাও খেতে প্রস্তুত আছি"—এই হোতিলালই গঙ্গাতীরে বৃষ্টি দেখে বলে উঠেছিলো "বৃষ্টি নয় দেশমাতার বিদায় অশ্রু" যা হ'ক ডাক্তারবাবু হাঙ্গামা এড়াবার জন্য আমাদের ভাত খাওয়া মঞ্জুর করলেন বটে তবে পাচক ? কয়েকজন শিখশাস্ত্রী বলে উঠলো "আমরা থাকতে মুসলমানের রান্না কেন খাবেন, আমরাই রান্না করে দেবো"। বাস্, একটু পরে আমরা তৃপ্তির সঙ্গে গরম গরম ভাত ও কুমড়ার তরকারি খেলাম।

এই হোতিলালকে নিয়েই এই কাহিনীর অবতারণা। অর্দ্ধশতাব্দীর অন্ধকার স্মৃতি হতে সব কথা উদ্ধার করা সম্ভব হল না—ফলে মূলকাহিনী হতে পরিবেশই দীর্ঘ হয়ে গেল। তবে পাঠকগণ আন্দামানে নির্ব্বাসিত প্রথম দলের রাজনৈতিক বন্দীদের এক বিস্মৃতপ্রায় জীবন-মরণের এক কাহিনীর কিছুটা পরিচয় ইহাতে পাবেন। এ কাহিনী দ্রুত বিলুপ্তির পথে। এখন আর বলবারও লোক লেখক ভিন্ন আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ! হয়ত আরও দু-চার জন থাকতে পারেন। বারীনদা, হেমবাবু, উপেনবাবুর লেখা বই এখন দুষ্প্রাপ্য তাতে বিস্তৃত বিবরণও লেখা হয় নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায় চিরদিনের মত অবলুপ্ত হতে চলেছে। দেশের সাহিত্যিক ঐতিহাসিকদের কেউই অগ্রসর হয়ে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় বিবরণ আজও লিখলেন না। এটা বড়ই দুঃখের বিষয়।

তৃতীয় রাত্রি প্রভাতে জাহাজ পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছিয়ে কূল হতে বেশ দূরে নোঙ্গর ফেলল। অন্য কয়েদীদের "সেগ্রিগেশান" ক্যাম্পে নিয়ে গেল—আমাদের সরাসরি "সেলুলার" জেলে নিয়ে আসা হ'ল। জাহাজ হতে ভীষণাকৃতি পাথরকারা "সেলুলাকে" একটি দুর্গ বলেই মনে হচ্ছিল—এবার তা'র সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য পায়ে বেড়ি ও মাথায় কম্বল ও লোহার থালা বাটি নিয়ে সেই ভীষণ দর্শন কারাতে প্রবেশ করলাম।

জেলার বেরী সাহেব সকলকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে ওয়ারেন্টের সহিত, নাম ধাম, সাজা মিল করার পরে উপদেশ দিয়ে বললেন, "তোমরা এখানে আমার হুকুম মত চলবে, নতুবা নিজেরাই বিপদে পড়বে। এখানে অন্য কোন ঈশ্বর নাই আমিই এখানকার একমাত্র ঈশ্বর। এখানে আমি কি করি না করি ভারতের কেউই জানতে পারবে না, একটি কাক পক্ষীও উড়ে দেশে যেতে পারে না। তোমাদের এখানে আনা হয়েছে কেন? জানো? তোমাদিকে ধীরে ধীরে মেরে ফেলে দেওয়ার জন্য, তোমাদের হাড় দিয়ে এখানকার চা বাগিচার সার হবে।"

বক্তৃতার পর হোতিলাল নির্ব্বিকার চিত্তে বেরী সাহেবকে বলল, "আপনার মূল্যবান উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, এখন আমরা ক্লান্ত, আমাদের বিশ্রামের স্থান দিন এবং মুখ হাত ধুইবার ব্যবস্থা করে দিন।"

বেরী-ও' রাগে লাল। বললো হ্যাঁ ব্রাস টুথ পাউডার সব পাবে আর তোমাদের জন্য হিন্দু" গঙ্গাসিংকে পানিপাড়ে ঠিক করে দিয়েছি

—বিশ্রামের স্থানও ঠিক করা আছে ইত্যাদি। আমাদের নিয়ে এক ব্লকের নীচের তলায় সব কুঠুরী খালি করা ছিল—তাহাতেই তিন চার সেল বাদ এক একজন সেলে বন্ধ হলাম। কথা বলা নিষেধ হল। ভোরে একবার দশটায় একবার ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার সেল হতে বাহির করা হত, খাবার ও স্নানাদির জন্য, তখন দেখা সাক্ষাৎ হত। কথাবার্ত্তা বা ইসারা করা হলে, জেল সাজা, বেড়ী, হাতকড়ি পরতে হত। কড়া পাঠান পাহারা রাখা হল। পানিপাড়ে প্রকাশ পেল একজন আস্ত অকৃত্রিম পাঠান। বেরীকে হোতিলাল একদিন তাহার চালাকির কথা বলল, যে মুসলমানের জল খাইয়ে আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়েছে। বেরীর উত্তর হল "না, না ও ব্রাহ্মণ, পাক্কা ব্রাহ্মণ"। জেলে রাত্রদিন অন্ধকার।

জেলে আসার তিন চার দিন পরে একদিন ন'টা দশটা রাত্রে কে "মিঃ দে" বলে আমায় ডাকাডাকি করায় আমি তন্দ্রা থেকে উঠে বসলাম। লোহার দরজার কাছে এসে সাড়া দিলে হোতিলাল বললো, "আমি তোমাকে একটি জিনিষ পাঠাচ্ছি খেয়ে ফেলো কোন চিন্তা বা দ্বিধা কোরো না। তখনই দেখি আমাদের ভাণ্ডারি বা পাচক একখণ্ড কাপড়ে করে মাছের চার পাঁচ খণ্ড বড়ো বড়ো টুকরা এবং তিন চার খানা ভাল রুটি নিয়ে এল এবং আমাকে দিয়েই সে দ্রুত চলে গেল। আমি ও একেবারে অবাক্? কি কাণ্ড! হোতিলাল কি যাদু জানে? আমরা যখন ভবিষ্যৎ ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না তখন হোতিলাল কি করে অজানা, অজ্ঞাত জেল পাচককে এমন করে বাধ্য করলো যে, সে গুরুতর ঝুঁকি নিয়ে এই কাজ করলো। পাহারাদার পাঠান জমাদারকেই বা বাধ্য করে ব্লকের তালা খুললে কি করে? তাড়াতাড়ি মাছ রুটি তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিলাম। হোতিলালকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে এটা সম্ভব হ'ল! সে বললো চুপচাপ শুয়ে পড়ো। কাল বলবো।

জীবনের চলার পথে কখনও কখনও এমন দু'একটি লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাহারা দুঃখ কষ্টকে কোন আমোলই দেয় না। বিপদে আপদে ভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ে না; কোন অবস্থাতেই আত্মবিশ্বাস হারায় না। অবস্থা পরিবেশ যতই প্রতিকূল হউক না কেন তাহারা সংযতচিত্তে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে সে প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠে। হোতিলাল ছিল এই শ্রেণীর একজন। আমরা হতাশায়, অবসাদে যখন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছি তখন হোতিলাল প্রফুল্লচিত্তে আশার কথা বলে সকলকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। সে ছিল আমাদের দুঃখ, হতাশার দিনে, ধৈর্য্য, আশার উৎস। স্মৃতির মনিকোঠায় এঁরা থাকেন চির উজ্জ্বল।

১৯১০।১১ সালের মধ্যে আলীপুর বোমকেস ও আমাদের খুলনা কেসের বাইশ তেইশ জন ভিন্ন আরও অনেক রাজনৈতিক অপরাধী আসতে লাগলেন। মহারাষ্ট্রের দামোদর সভারকর পূর্ব্বে হতেই ছিলেন। এবার তাঁহার ভ্রাতা বিনায়ক সভার কর ও যোশী এলেন। (পরে হিন্দুমহাসভার সভাপতি) তিনি লণ্ডন হতে ধৃত হয়ে মার্সেলিসের বন্দরে জাহাজ থেকে পালিয়ে ফ্রান্সের ভূমিতে উঠেছিলেন এবং সেখান হতে, জাহাজী ইংরাজেরা তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে নামিয়ে এনে এপ্রসন মার্ডার কেসে দণ্ড দেয়। ঐতিহাসিক বিবরণ অনেকেরই জানা আছে। এই ব্যাপার লইয়া বিনায়কের বন্ধুরা হেগের সালিশী কোর্টে বিচার প্রার্থনা করেছিলেন, সে সব ইতিহাস দীর্ঘ। বাহুল্যবশতঃ এখানে আর লিখলাম না। এমনিতেই এ কাহিনী দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। ঢাকার পুলিন দাস এলেন। হুগলীর ননীগোপাল। পাঞ্জাবের লেখারাম, মহারাষ্ট্রের "যোশী", সকলে মিলে আমরা একত্রিশ-বত্রিশ জন হলাম।

হোতিলালের সহিত আমার ছাড়াছাড়ি হল। পাঁচ সাত দিন অন্তর আমাদের প্রত্যেকের ব্লক বদলী করা হয়। আবার কয়েকদিন পরে আমরা একই ব্লকে এসে জুটলাম, হোতিলালকে পেয়ে খুবই আনন্দ হল। আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল তবুও আমরা সুযোগ মত সাবধানে কথাবার্ত্তা বলতাম।

তখন আমাদের কঠিন কাজে দিয়াছে। আমরা উভয়েই তখন নারকোলের ছোবড়া পিটাইয়া (coirpounding) কাজে নিযুক্ত। ভোরে লপসি খেয়েই দৌড়ে গুদাম থেকে রেলওয়ে স্লিপারের মত বড়ো একখানা কাঠ কাঁধে করে এনে কুঠির মধ্যে ফেলে কাঠের একটা হাতুড়ী দিয়ে নারকোলের ছোবড়া কুঠিতে এনে, তাকে স্লিপারের উপর রেখে পিটিয়ে পিটিয়ে তার বের করতে হত। আমাদের সকলেরই হাতে ফোস্কা পড়ে গেল—সমস্ত দিন ধরে পিটিয়েও পুরা মুসাকত বা কাজ তৈয়ার করা যেত না। অন্ত কয়েদীরা ছোবড়াতে জল দিয়া ভিজাইয়া পিটাইতে পারিত এবং তাহারা সহজেই পুরা ওজনের (মনে হয় দু পাউণ্ড) তার বের করতে সক্ষম হত। আমাদের উপর বেরীর প্রতিশোধমূলক ব্যবহারের দরুণ আমাদের জল দেওয়া নিষেধ ছিল। ফলে প্রত্যহ বৈকালে কেন্দ্রের টাওয়ারে দৈনিক কাজ নিয়ে গেলে ধমকানি ও জেল সাজা (হাতকড়ি বেড়ী) খেতে হত। হোতিলালের কিন্তু প্রত্যহ পুরা মুসাকত হত। কি করে সে পুরা কাজ করতো জিজ্ঞাসা করায় সে বললো যে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কুঠি বন্ধ হবার সময় কাটোরা বা বাটি ভর্ত্তি জল এনে রাখে এবং সেই জল ছোবড়ার পরে ছিটাইয়া সহজেই তার বের করে। আমাকে ও আরও অনেককে সে তাহার পন্থা অনুসরণ করতে বললো। দিন কয়েক বেশ চললো। পরে ধরা পড়ায় একদিন বাটি ভর্ত্তি জল লওয়া নিষেধ হয়ে গেল। আবার আমাদের সকলেরই পূর্ব্বাবস্থা হল তখনও হোতিলালকে কিন্তু প্রায়ই পুরা কাজ দিতে দেখা গেল।

এরপর সে সুযোগমত বললো জল ত শরীরের মধ্যেই আছে ছেড়ে দাও ছিলকার উপর, তার বাহির হয়ে গেলে মাটিতে ঘসে নেও সব ঠিক হয়ে যাবে।" অবশ্য তাহার উপদেশ মত চলিবার প্রবৃত্তি আমার হয় নাই। এই তার দিয়া আবার হাতে নারকোলের দড়ি পাকান হয়। কয়েক দিন বাদে দড়ি পাকাবার অভ্যাসও করতে হয়েছিল। আমাদের মধ্যে অনেককে কলুতে (ঘানিতে) লাগান হল। বারীনদা, ও বীরেন সেন ছিলেন সব চেয়ে দুর্ব্বল তাহারাও ঘানি টানা হতে রেহাই পায় নাই। সকলকেই মধ্যে মধ্যে ঘানির আস্বাদ পেতে হত। আবার কয়েক মাসের জন্য আমরা বিভিন্ন ব্লকে বদলী হয়ে গেলাম। জেলের ছয়টি লম্বা ব্লক এমন ভাবে তৈরী যে একটি ব্লক অপর একটি ব্লকের ঠিক সামনে পাঁচিলের মত পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। ছয়টি ব্লক কেন্দ্রের গোল টাওয়ার হতে চাকার স্পোকের মত বাহির হয়ে গেছে এবং চক্রাকারে একটির পিছনে আর একটি সাজান;

ব্লকগুলির শেষ প্রান্তে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কেন্দ্রে দাঁড়ালেই সব ক'টি ব্লকের কয়েদীদের দেখা যায়। বিকালে বেরী এসে কেন্দ্রের টাওয়ারের মধ্যে এক পাক ঘুরলেই সব ব্লকের কয়েদীদের ব্লকের প্রাঙ্গণে সারি বেঁধে বসে থাকতে দেখতে পেতো। যা হ'ক হোতিলাল "খৈনি" (তামাক পাতার সঙ্গে চুণ) খেত. জেলের শতকরা নব্বই পঁচানব্বই জন ঐ খৈনি খায় যদিও উহা জেলে নিষিদ্ধ বস্তু, ধরা পড়লেই সাজা পেতে হয়।

আমি ও হোতিলাল একই ব্লকে। হোতিলালের তখন অনেক বন্ধু, বেশ আরামেই আছে। কিন্তু মোলাঙ্গী নামক এক সিদ্দি ওয়ার্ডার গোল বাধাল। প্রতিদিন বিকালে কয়েদীরা নীচের জেল প্রাঙ্গণে খেতে বসে, তখন কয়েদী ওয়ার্ডরা কুঠি গণনা করে এবং প্রত্যেক কুঠিতে তল্লাসী করে দেখে কোন নিষিদ্ধ বস্তু আছে কিনা। পরে কয়েদীদের কুঠিগুলি গুনতি করে জমাদারকে রিপোর্ট দেয়। জেলের খাতার সঙ্গে কুঠির সঙ্গে মিল হলেই কুঠিতে কয়েদী ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মোলাঙ্গী হোতিলালের দোতলার করিডোরের সব কুঠি তল্লাসী করত এবং হোতিলালের কুঠির লুকান তামাক প্রত্যহ চুরি করত। এ দিন হোতিলাল ও আমি কাছাকাছি লাইনে বসেছিলাম। হোতিলাল আমাকে বলল, "আজকে একটা মজা হবে। বেটা সিদ্দি বদমায়েস, ক'দিন ধরে আমার কুঠিতে লুকান তামাক চুরি করছে আজকে ওকে জব্দ করবার ব্যবস্থা করেছি উপরে চেয়ে দেখো।"

চেয়ে দেখি উপরে মোলাঙ্গী ছুটাছুটি করছে আর জমাদার তাকে ধমকাচ্ছে। কিছুতেই কয়েদীর সংখ্যার সহিত কুঠির সংখ্যার মিল হয় না—একজন কয়েদী কম হয়। তবে কি কেহ পালিয়ে গেল?

এবার দেখলাম বড়ো জমাদার মির্জা খাঁকে নিয়ে মোলাঙ্গী কয়েদী কুঠিগুলি যাহাতে কম্বল বিছানা আছে, সেই সব কুঠি গুনাইল পরে জমাদার তার খাতার সঙ্গে মিল করে দেখে করিডোরের মোট কয়েদী সংখ্যা হতে একজন কম হ'ল। মোলাঙ্গীকে গালাগালি করে চলছে এদিকে রাত্রি হয়ে গেল।

বেলা থাকতেই কয়েদীদের রাত্রের আহার শেষ করে তাদের যার যার কুঠিতে বন্ধ করা হয়। আজ রাত্র হলেও কয়েদী সংখ্যার মিল হল না। বেরি সাহেবের গর্জন শুনা গেল। ব্যাপার কি হ'ল দেখতে তিনি সরেজমিনে এলেন। এসেই তাঁর শয়তানি মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল? তিনি প্রতি কুঠির কম্বল, জাঙ্গিয়া ইত্যাদি গুনতি করে দেখতে বললেন। এবার দেখা গেল এক কুঠির দুই খানা কম্বল ও জাঙ্গিয়া কোর্তা তিন চারটা কুঠিতে ফেলে দিয়ে একটা কুঠি অতিরিক্ত খালি করা দেখান হয়েছে। বেরী সাহেব মোলাঙ্গীকে এক লাথি মেরে তার লাল পাগড়ী কেড়ে নিয়ে মাথারন কয়েদীতে ডিগ্রেড করবার হুকুম দিলেন। এবং তাহাকে কাল হতে ঘানিতে লাগাতে হুকুম দিলেন। পাথানি অর্থাৎ আমাদের কলুর বাড়ীতে যে ঘানি গরুতে ঘুরায়ে তেল বাহির করা হয়—উহা খুব কষ্টকর। উহাতে মাথাঘুরে বমি হয়। মোলাঙ্গী পুনর্মূষিকো ভব হল।

হোতিলাল বলল "কেমন জব্দ" বেটা আমার তামাক রোজ রোজ চুরি করে।" কি করে হোতিলাল ইহা সম্ভব করল, জিজ্ঞাসা করায় সে বলল যে, তাহার কোন বিশ্বাসী ওয়ার্ডার দিয়ে এক কুঠির কাপড়, কম্বল, এবং ট্রে নিয়ে কয়েদীদের এক এক কুঠিতে কুঠিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে যখন কয়েদীরা খেতে বসেছিল। অনেকেই বুঝলো এটা হোতিলালের কাণ্ড। ইহাতে মোলাঙ্গী খুব দুষ্ট প্রকৃতির বলে সকলেই বেশ খুশি হল।

এই সময় আমাদের প্রায় দুই বৎসর জেলবাস পূর্ণ হয়ে এল। আমাদের নির্বাসন দণ্ড কঠিন কারাদণ্ড নয়, সুতরাং নিয়মমত, যেমন অন্য সব শ্রেণীর নির্বাসিত কয়েদীদের এক বৎসর পরেই জেল থেকে বাইরে পাঠান হয় সেখানে তারা বাইরের তাঁবুতে বা ব্যারাকে বন্ধ থেকে বাইরে নানা কাজ অনেক স্বাধীনভাবে করতে পারে—আলো বাতাস, লোকের সঙ্গ পায়, আমরাও সেই ব্যবহার পাবার জন্য বার বার কর্তৃপক্ষকে বলেও কোন ফল হ'ল না। এদিকে প্রায়ই আমাদিগকে কঠিন কাজে দেওয়া হতে লাগলো। ঘানিতে প্রায়ই অনেকে কষ্ট পেতে লাগলাম; আমি ওজনে চার পাউণ্ড কমে গেলাম তবুও ঘানিটানা থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। উপেনদা' বারীনদা' ও বীরেন সেন ছিলেন সব চেয়ে দুর্বল—তাঁহারাও ঘানি থেকে উদ্ধার পেলেন না। আমাদের মধ্য হতে তিন চার জনকে, আবেদন নিবেদনের ফলে বহলুরের ব্যারাটাং নামক এক দ্বীপে ফরেষ্টের কাঠ বইবার কাজে দেওয়া হল। তাদের কাজ ছিল হাতীর সঙ্গে ফরেষ্টের বড়ো বড়ো কাঠ বয়ে টেনে সমুদ্রোপকূলে আনা। সেখানে পানীয় জল ও খাদ্যের অপরিসীম কষ্ট। হাতীর পায়ের গর্তের বৃষ্টির জল ও হাতীর মূত্র একত্রে মেশানো তরল পদার্থ জলরূপে খেতে হত, জলপোকার জন্য পাতায় ছিদ্র করে চেপে ধরে। ফলে তাহারা ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। অল্পদিনের মধ্যেই সকলেই জেল হাসপাতালে এলেন চিকিৎসার জন্য।
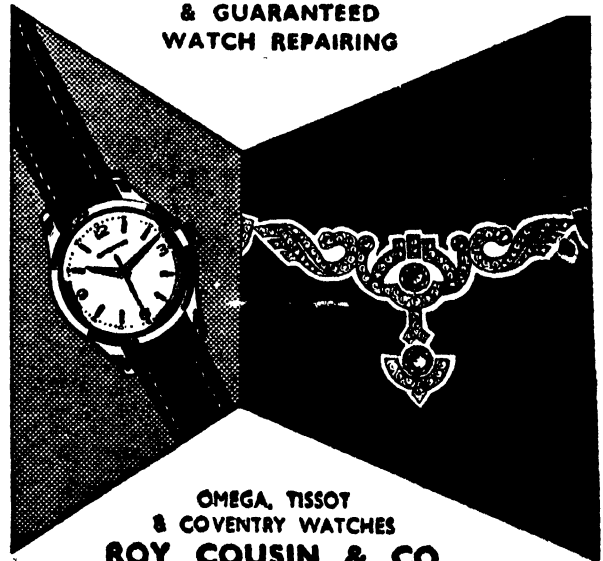
ভুগে জেল হাঁসপাতালে আসতে লাগলেন। এদিকে জেলের মধ্যে কঠিন শাসনে ও কঠোর পরিশ্রমে সকলের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। বারীনদা ও বীরেন সেন আলীপুর বম্বকেসের ছিলেন সকলের চাইতে দুর্ব্বল, ঘানিটানা থেকে তাঁদেরও অব্যাহতি দেওয়া হ'ল না। বেরী সাহেবের সেই প্রথম দিনের ধমকানির কথা মনে হ'ল "তোমাদের এখানে আনা হয়েছে ধীরে ধীরে তোমাদিগকে মেরে ফেলে দেওয়ার জন্য এবং তোমাদের হাড় গোড় দিয়ে এখানকার চা বাগিচায় সার হবে"। তাহার কথাই যেন সত্য হতে চললো। কষ্ট, গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আলীপুর কেসের ইন্দুভূষণ রায় রাত্রে সেলের মধ্যে জানালার সঙ্গে জাঙ্গিয়ার দড়ি দিয়ে ফাঁসি খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। খুলনা কেসের কালীদাস ঘোষ বারাটন ফরেষ্ট হতে অসুস্থ হয়ে এসে জেল হাঁসপাতালে মারা গেলেন (তাহার ভাগিনেয় নগেন সরকারের অনেক কাতর আবেদনেও তাহাকে কালীবাবুর মৃতদেহ দেখতে দেওয়া হ'ল না)। নগেন এই জেলেই ছিলো আমরা বেশ বুঝলাম—আমাদের ভাগ্যেও হয় ফাঁসতে না হয় ব্যাধিতে মৃত্যু অনিবার্য্য।

হোতিলালের ভক্ত বন্ধুর মধ্যে অনেকে জেলের বাহিরে জেল বাগিচায় ও জেলের ডাক্তার কর্ম্মচারীদের বাসায়, প্রত্যহ কাজ করতে যেত এবং ভারতের অনেক খবর সংগ্রহ করে হোতিলালকে বলতো আমরাও জানতে পারতাম। তখন ১৯১২ সাল শুনলাম, কালপানীর রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রতি কি রূপ ব্যাবহার করা হচ্ছে তাহা সরকারের কাছে-এসেম্ব্লীতে প্রশ্ন করা হয়েছে। ভারতের কেহই জানে না যে, আমাদের এই রূপ অমানুষিক ব্যবহার সহ্য করতে হচ্ছে এই জেলে। আমাদের প্রকৃত অবস্থা দেশে জানাবার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা সকলে গভীর ভাবে করতে লাগলুম।

বারীনদাই ছিলেন সকল দলের শ্রদ্ধার পাত্র। এই সময়ে জেলে ও বাইরে বহু লোকে আমাদের প্রতি খুব সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। হোতিলাল এই ব্যাপারে কি করে ভারতে আমাদের এই নির্য্যাতনের সংবাদ পাঠান যায় সে বিষয়ে বারীনদাকে সাহায্য করলো। কাগজের টুকরাতে কয়লা বা পেন্সিলের টুকরা দিয়ে লিখে মারকোল ছোবড়া বাহক—যারা সব ব্লকে টুকরি নিয়ে ঘোরে বা পাচক দ্বারা বারীনদাকে ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান করা হত।

জেল থেকে কিছু দূরে বাজারে অনেক ভারতীয় দোকানদার ছিলেন তাঁরা দোকানের মাল আনবার জন্য কলিকাতা, মাদ্রাজ বা রেঙ্গুন জাহাজে যাতায়াত করতেন। "মহারাজা" জাহাজ প্রতিমাসে দুবার কলিকাতায় ও একবার মাদ্রাজে ও একবার রেঙ্গুণে যেত তারা কয়েদী নয় স্বাধীন নাগরিক তাই তাদের যাতায়াত পথে কোন তল্লাসী করা হত না।

হোতিলালের সাহায্যে বারীনদা আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এই রূপ এক দোকানদারের দ্বারা আমাদের প্রকৃত অবস্থা স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জিকে জানাতে সক্ষম হলেন। কলিকাতা হতেই পত্র ডাকে দেওয়া হল তিনি তখন কলিকাতায় বেঙ্গলী কাগজের সম্পাদক। তিনি উহা পাইবা মাত্র তাঁর কাগজে বড়ো বড়ো করে আমাদের বিষয় ছাপলেন, তাঁর সবল সতেজ লেখাতে দেশময় ভয়ানক হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হল। এসেমব্লীতে আমাদের বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করা হতে লাগলো; দেশ হতে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে আমাদের অবস্থা দেখবার নিমিত্ত পাঠাবার প্রস্তাব জোরগলায় এসমব্লী থেকে ও সভা-সমিতি হতে করা হতে লাগলো। আমরা খবর পেতে লাগলাম।

শ্রদ্ধাস্পদ সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি একটি পাড়াগাঁয়ের পোষ্ট মাষ্টারের ঠিকানা দিয়ে সেই ঠিকানায় আমাদিগকে সব সংবাদ পাঠাতে লিখলেন। সেই মত আমরা সব সংবাদ পাঠাতে লাগলাম। আমরা আমাদের প্রাণ লইয়া যে দেশে ফিরতে পারিয়াছি সে একমাত্র মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির অক্লান্ত স্নেহময় সন্তানহারা পিতার চেষ্টায়। ভারতমাতার এই শ্রেষ্ঠ সন্তান রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ যে কেবল একজন শ্রেষ্ট রাজনৈতিক ছিলেন তা নয় তিনি মহানুভব, স্নেহময়, পিতার মত আমাদের সকলকেই কালাপানীর নিশাচর মৃত্যুর আবর্ত্ত হতে উদ্ধার করে মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

এদিকে বেরী তখন পাগলের মত হয়ে উঠলো। সে কিছুতেই আমাদের সংবাদ প্রেরণের উপায় ধরতে পারলো না বা বন্ধও করতে পারলো না; গভর্ণমেন্ট, চীফ কামশনার বেরীর উপর খাপ্পা হয়ে উঠলেন। আমাদিগকে নির্জ্জন কুঠিতে বন্ধ করা হল।

দেশময় আন্দোলনের ফলে তখনকার ভারতের হোম মেম্বর স্যার রেজিন্যাল্ড ক্রাডক্ (Ser Reginal Craddock) কে আমাদের অবস্থা দেখবার জন্য পাঠান হল। মাথায় মস্ত বড়ো টাক্ নিয়ে নধরকান্ত বেঁটে ধূর্ত্ত চেহারার, স্যার ক্রাডক্ এলেন, আমরা কুঠিবদ্ধ ও কড়াপাহারায় থাকলাম। সকলের কুঠির সামনে তিনি ও চীফ কামশনার কর্ণেল ব্রাউনী গিয়ে কোন নালিশ আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। বেরী সাহের শত হস্ত দূরে দূরে থাকলেন, কে কি বলে ভয়ে তাঁর আত্মারাম খাঁচা ছাড়বার মত অবস্থা। হোতিলাল গুছাইয়া কয়েক প্রস্থ নালিশ দায়ের করলেন। সে বেরী সাহেবের ব্যবহার প্রতিশোধমূলক অমানুষিক বলেছিল।

যা হক ক্রাডক্ সাহেবের জেল পরিদর্শনে আমাদের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হল না কিন্তু বেরীর প্রকৃতি যেন বদলাইয়া গেল। হোতিলাল তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করায় তিনি অনেক কান্দুনি সকলের কাছে গাইলেন জেল বাগিচা হতে ভাল কলা, পেঁপে হোতিলালকে দিতে আরম্ভ করলেন বুঝলেন হোতিলালকে সন্তুষ্ট রাখা দরকার; কি জানি কখন কি করে বসে। বেরী মনে করলেন হোতিলাল তাঁর বন্ধু হয়ে গেছে।

জেলের কঠোরতা নিষ্ঠুরতা কিন্তু কমল না। ফলে পুনরায় আমরা তাই গোপন ঠিকানায় স্যার সুরেন্দ্রনাথকে পত্র দিলাম। ক্রাডক্ সাহেবের পরিদর্শনের ফলে আমাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার কমল না, আমরা সকলেই নির্ব্বাসনে দণ্ডিত; কেউ কঠিন কারাবাসের কয়েদী নই। অথচ আমাদিগকে জেলের বাহিরে সেটেলমেন্ট রাখা হচ্ছে না, এই সব নিয়ে পুনরায় দেশে আন্দোলন খুব প্রবলভাবে সর্ব্বত্র প্রসারিত হল। ফলে এবার (Dr. Lukis) ডাঃ লিউকিস সার্জ্জন জেনারেল Surgeon General সরকার কর্ত্তৃক আমাদিকে দেখবার জন্য এলেন। বেশ লম্বা চওড়া ভদ্র চেহারা ঘুরে ঘুরে সকলের কাছে গিয়ে দেখলেন কিছু কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করলেন কিন্তু ফলে ঐ

পর্য্যন্তই শেষ, কিছুই হলনা। এবার আর কোন উপায় না দেখে আমরা সবাই পরস্পর মতামত নিয়ে সকলে মরণপন ধর্ম্মঘটকরা স্থির করলাম! এক নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে বেলের কাজ করতে অস্বীকার করলাম। জেলে হুলুস্থুল পড়ে গেল। সকলকে নির্জ্জন কুঠিতে বন্ধ করা হল। এই সময়ে আমরা খবর পেলাম একজন রাজনৈতিক কয়েদীকে জেলের বাইরে পৃথক বাড়ী গরু চাকর ইত্যাদি দিয়ে বহুদিন হতে রাখা হয়েছে তাকে কোন কাজ করতে হয় না। খবর নিয়ে জানলাম যে তিনি মনিপুর রাজার ভ্রাতা—১৮৯০ সালে আসামের চীফ কমিশনার ও অন্য দুই জন বড়ো ইংরাজ অফিসারকে মনিপুর রাজমন্দিরে বলি দিয়েছিলেন, ফলে সেনাপতি ও রাজার ব্রিটিশ কোর্টে (কোর্টমার্শালে) বিচারে ফাঁসী হয় এবং রাজার ভ্রাতা বা অন্য একজনের চিরজীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। মনে হয় ১৯১১ সালে তিনি বেঁচেছিলেন পোর্ট ব্লেয়ারে। আমাদেরও একই ধারার ১২১ (ক) ব্রিটিশ কোর্টের বিচারে দণ্ড হয়েছে। তবে আমরা তাহার মত পৃথক একটি ঘরে গৃহের মত আরামে থাকতে পারবো না কেন? এই প্রশ্ন সবার মনে হ'ল। আমরা আমরণ এই ধর্ম্মঘট চালিয়ে যাব প্রতিজ্ঞা করলাম।

জেল সুপারকে আমরা বললাম যে আমরা রাজনৈতিক অপরাধী। অন্যান্য দেশে তাদের অনেক সুবিধা ও আরামে রাখবার আইন আছে—তাদের কোন কাজ করতে হয় না। ভাল খাদ্য ভাল পোষাক পায়। আমরাও এই সব চাই। নতুবা জেলের কোন আইনই মানবো না। আমরা অন্ধকারে নির্জ্জন কুঠিতেই বন্ধ থাকলাম। কম খাদ্য (পেনাল ডায়েট) খেতে লাগলাম। ইহার কিছুদিন পরে লেঃ কর্ণেল ব্রাউনী চীফ কমিশনার আন্দামান এলেন—সকলকে ডেকে আমাদের কথা শুনলেন। তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ে আমাদিগকে দরখাস্ত করতে বললেন। বারীনদা দরখাস্ত লিখে আমাদের এক এক জনের সহি দিয়ে নিলেন। এই লড়াইয়ের ধর্ম্মঘটের ইতিহাস খুব দীর্ঘ ও করুণ। পৃথকভাবে পরে বলবার ইচ্ছা রইল। প্রায় দু মাস পরে কমিশনার সাহেব এসে জানালেন যে ভারত পরাধীন দেশ সুতরাং স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক কয়েদীদের সুবিধা তোমাদের দিতে সরকার রাজী নহেন। তবে আমি হাল্কা কাজ দিতে পারি ও জেলের বাইরে তোমাদের হাল্কা কাজে পাঠান হতে পারে। আমার পরামর্শ মত তাই তোমরা হাল্কা কাজ লইয়া বাইরে যাও বেশ আরামে থাকতে পারবে। ইহার পরে অনেক ঘটনা ঘটলো। যা'হক আমাদের অনেককে জেলের বাইরে বিভিন্ন তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে নানা কাজে রাখা হ'ল। কয়েক মাস বাইরে থাকার পর আমরা পরস্পরের সহিত মেলামেশা করিতেছি প্রকাশ পাওয়ায় প্রথমে বারীনদা ও হেমদাকে পরে আর সকলকে বাইরে থেকে আবার সেলুলার জেলে নিয়ে আসা হ'ল। আমরা আবার কুঠি বন্ধ হলাম; কিন্তু কোন কাজ আর করতে স্বীকৃত হলাম না।

এই সময়ে ননীগোপাল মুখার্জ্জি নামে একটি নিতান্ত বালক লাটসাহেব না অন্য কোন ইংরাজ অফিসারকে খুন করতে চেষ্টা করায়

অপরাধে এখানে আসে। ছেলেটি বালক হলেও অত্যন্ত তেজী ও সাহসী। পুনঃ পুনঃ জেল আইন ভঙ্গ করায় তাহাকে সমস্ত জেল সাজা পর পর দেওয়া হল। তাহাতেও যখন আইন মানলো না তখন তাকে চটের জাঙ্গিয়া কোর্তা পরাবার হুকুম হ'ল: সে তাহা পরলো না। জোর করে তাকে পরান হ'ল। সে তা খুলে ফেললো। তখন তাকে বেত মারবার হুকুম হ'ল। এই সংবাদ বিদ্যুৎ গতিতে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। সকলে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। যদি ননীকে বেত মারা হয় তবে নিশ্চয় তার রক্তপাত ঘটবে—তাহলে আমরা বেরী সাহেবেরও রক্তপাত করবো। প্রতিশোধ নেবই তা যে কোন বিপদই আসুক না কেন? আমাদের জীবনের আশা ত এমনিতেই নেই। হোতিলাল যেন সবার চাইতে বেশী চিন্তিত, বেশী সমাহিত, দৃঢ়। তখনও বেত মারা হয় নাই। বেতমারার সংবাদে যদি ননী তাহার জিদ্ ছেড়ে দেয় এই আশায় দেরী করছিল বেরী। এই সময়ে বেরী হোতিলালের কুঠির কাছে গেলে বেরীকে ডেকে হোতিলাল বলে—"শোন বেরী তুমি যদি ননীগোপালকে বেত লাগাও এবং এক ফোঁটা রক্তপাত করো তবে তোমার এক গ্যালন রক্তপাত নিশ্চয় করা হবে, তোমরা জান আমরা কেউ জীবনের মায়া করি না, বিশেষতঃ তোমার শাসনে এখানে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।" ঠিক জেনো ননীর এক ফোঁটা রক্ত পড়লে তোমাদের এক গ্যালন রক্ত পড়বে! এই কথা শুনে বেরী নাকি ভয়ে কেঁপেছিলো। বেত আর ননীকে মারা হল না। এই ঘটনার পরে আমাদিগকে সায়েস্তা করবার জন্য এই জেল হতে, রাত্রের অন্ধকারে পৃথক পৃথক ভাবে অনেককে ভারতের দূর দূর প্রদেশের জেলে নিয়ে নির্য্যাতন করা হয়। আমাকে প্রথমে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল জেলে ও পরে পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নতুন করে আবার একলা আমায় লড়াই করতে হয়। হোতিলালের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই। যেখানেই থাকুক ভগবান তাহার মঙ্গল করুন।

নিসর্গ ও নিবিড় মেঘ

দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়

সকালের সাত রং যখন মিলিয়ে যায় নিদাঘের নিস্তব্ধ দুপুরে,
সময়ের ঘণ্টা শুনে দুরারোহ রিক্ততায় শুধু এই মধ্যদিন যাপে—
দূরের গাছের সারি। বাতাসের পদধ্বনি শুনে কারা বেদনায় কাঁপে;
চাতক-প্রার্থনা করে তীব্রোজ্জ্বল সূর্য্যালোকে দিকে-দিগন্তরে মরে ঘুরে।

• • •

শূন্যে ঘুরে ওড়ে চিল, এখন নিস্তব্ধ বেলা খেলা করে নগরীর বুকে।
মধ্যাহ্নের নীলাকাশ নিসর্গের পটভূমি, বাতাসে রৌদ্রের গন্ধ আসে।
শহরতলীতে ধীরে অপরাহ্ণ বেলা নামে, কালো মেঘ ঘনায় আকাশে।
বর্ষণ-আসন্ন-মেঘ, আনে গাঢ় অন্ধকার, নিয়ে আসে ছায়াচ্ছন্নতাকে।

• • •

আকাশের চেতনায় বৃষ্টি নামে চারিধার, তেপান্তরে ঢাকে অন্ধকার।
এখন বৃষ্টির শব্দে জানালায় মুখ রাখি, ঝর ঝর ঝরে পড়ে জল।
কোন মেয়ে উন্মন, উদাস চাহনি চোখে, অতীতের স্মৃতির কাজল।
শতাব্দীর পূর্ব্বমেঘ কি সংবাদ নিয়ে আসে, উজ্জয়িনী, হেম-অলকার।

অথচ এখন দেখি, রাজপথে আলো জ্বলে, কর্ম্মব্যস্ত চলে কত লোক।
আষাঢ়ের প্রথম দিন, বৃষ্টি পড়ে রিমঝিম, মেঘবাঁকে গোধূলি আলোক।

সত্যের সন্ধানে

শ্রীলীলা ঘোষ

প্রিয়তম আজি তুমি বিশ্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া
চলিয়া গিয়াছ কোথা সে কল্পনা লোকে
তুমি দীর্ঘ বরষ করিয়াছিলে খেলা
বিশাল বিশ্বমাঝে।
আজি সহসা বন্ধু লুকাইলে কেন তিমিরে।
আমি বিস্ময় মানি মনে।
অসীম অনন্তের মাঝে, আজি ফিরিতেছ তুমি
বুঝি সত্যের সন্ধানে।
আজি পূজা করিবারে, তুমি পাতিয়াছ আসনখানি নীল অম্বরে
শত তারকা বেষ্টিত তুমি
বসিয়াছ আজি যোগাসনে।
সত্যম "শিবম" সুন্দরম ধ্যেয়ানে
বসিয়া আছ তুমি, মুদিত নয়নে
হেরিবারে পুরুষোত্তমে।
অনন্ত আঁধারে আজি পূজা তব—
চির আলোকের তরে।

জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী

অর্ণব মজুমদার

উত্তরে গারো, খাসিয়া আর জয়ন্তিয়ার ঢেউ খেলানো পাহাড়-শ্রেণী।—দক্ষিণে ঢাকা জেলার বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ। মাঝে দু'ধারে যমুনা আর কংসকে রেখে জেলা ময়মনসিংহের সমভূমির উপর দিয়ে নানা ধারায় বয়ে চলেছে ধনু, ঘোরাউৎরা, সুন্ধা, রাজেশ্বরী আর ফুলেশ্বরী।

এই ফুলেশ্বরীর কাহিনী।

আজ হতে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে কোনো এক নিশুতি রাতের অন্ধকারে একদা চমকে উঠেছিল এই খরতোয়া ফুলেশ্বরী। স্রোতমুখি ঢেউগুলো সেদিন হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে হাহাকার করে উঠেছিল পলকের জন্ম। একটি মৃতদেহকে কোলে নিয়ে ঘুম ভেঙেছিল সর্বনাশী ফুলেশ্বরীর।

না। জানতে পারেনি ঘুমন্ত ফুলেশ্বরী।—তা'র অগাধ জলের ভুহিনতায় বুকের জ্বালা নেভাবার জন্ম ছুটে আসছে একটি মৃত্যুলুব্ধ জীবন—একথা জানতে পারেনি। জানতে পারেনি সারা জীবনের জ্বালা যন্ত্রণাকে ভাসিয়ে দেবার জন্ম কখন এসে দাঁড়িয়েছে একটি পুরুষ ছায়া। কয়েকটি মুহূর্ত। তা'রপর এক ফোঁটা শব্দ আর একটুখানি ঢেউ তুলে তলিয়ে গিয়েছিল তা'র অতল জলের গভীরে।

আর সেই অশুভ নিমিত্তের অপরাধে লজ্জিতা ফুলেশ্বরী তাই বুঝি বিষণ্ণ ইতিহাসের পাপ হতে আত্মগোপন করতে "মৃত্যুদহ" হতে অনেক দূরে সরে গেছে আজ। কিন্তু নদীর গতিরেখার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়নি পাতুয়ারীর খেয়া ঘাটের ইতিহাস। আজো ময়মনসিংহ আর আসামের যাত্রীরা নীলগঞ্জ ষ্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে পাতুয়ারীর খেয়াঘাটের দিকে হাত তুলে সহযাত্রিকে বলে—ঐখানে ঐ বাঁকের কালো জলে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রেমিক জয়ানন্দ।

প্রেমিক জয়ানন্দ। আজ হতে সাড়ে তিনশ' বছর আগের সে এক মর্মান্তিক কাহিনী।

মঙ্গল কাব্যের ভাববন্যায় সারা বাংলা যখন প্লাবিত, চৈতন্ত-মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল আর মনসা মঙ্গলের পালা গানে সারা বাংলার গ্রাম জনপদ যখন মুখরিত—সেই সময় (ষোড়শ শতক) দ্বিজ বংশী দাস নামে এক সুকণ্ঠ বিষহরির ভাসান গায়কের ঘরে জন্ম নিয়েছিল একটি মেয়ে—যা'র নাম চন্দ্রাবতী।—হ্যাঁ, রামায়ণ কাব্যের অন্যতম কবি কুমারী চন্দ্রাবতী ভট্টাচার্য ?

এই চন্দ্রাবতীর কথা বলতে গেলে তা'রই সাথে সাথে ভেসে ওঠে আর একটি বিষণ্ণ মুখ—যা'র নাম জয়ানন্দ ?

এই জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর প্রথম পরিচয় নিয়ে একটি চমৎকার রোমাণ্টিক গল্প আছে। কিন্তু সে ঘটনার পিছনে কোনো যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাসের অকাট্য সাক্ষ্য নেই। এবং নেই কোনো অভিজ্ঞান বেদী যা' থেকে সেই কাহিনীর নির্যাস সংগ্রহ করা যায়।

তথাপি কবি চন্দ্রাবতীর ইতিহাস আছে। যখন দেওয়ান-ই খাসের কতিপয় ফিরদৌসি বয়মের ফলায় জীবন বন্ধক রেখে একফোঁটা [illegible]কয়ানি গুলাব আর মুঠো মুঠো আসরফির দিবাস্বপ্নে মশগুল: [illegible]র নিতাই প্রেমের ভক্তি তরঙ্গের অগাধ জলে বাংলার চরিতকারেরা [illegible]খন হাবুডুবু:—ঠিক সেই সময় বাংলার নিভৃত পল্লীতে এমন [illegible]জন কবি বেঁচে ছিলেন, যিনি মনেরতাগিদে রচনা করে [illegible]চিলেন একটি অপূর্ব গাথা কাব্য—যার নাম "চন্দ্রাবতীর [illegible]লা।"

এই গাথা কাব্য বলে,—একদা পূজার ফুল তুলতে গিয়ে সুন্ধা নদীর ধারে কোন এক বৃক্ষছায়ায় যুবক জয়ানন্দের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কুমারী চন্দ্রাবতীর এবং চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিল ঐ নদীর বালুচরে সুন্দর সুকুমার যুবকের এক জোড়া কৃষ্ণকলি চোখের গহনতায় অজান্তে কি যেন হারিয়ে এসেছে সে এবং সেই হারানো মাণিকের সন্ধানে পরদিন সেই একই সময়ে এসে দাঁড়িয়েছিল দুটি যৌবন—চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দ।

তার পর প্রতিদিন। প্রতিদিন সেই বৈঁচি পাতার আড়ালে সবুজ ঘাসের ওপর এসে বোসতো তারা। এমনি করে ভাব থেকে সম্ভাব, আর সম্ভাব থেকে অনুরাগ এবং সে অনুরাগ একদিন রূপান্তরিত হয়েছিল গভীর প্রণয়ে।

কিন্তু কেউ কাউকে পায়নি। পেয়েছিল শুধু মুঠো মুঠো যন্ত্রণা। যে যন্ত্রণা কবি চন্দ্রাবতীকে সারা জন্মের মত নিথর করে দিয়েছিল অকালে। আর প্রেমিক জয়ানন্দের ভয়ঙ্কর অপঘাতকে পথ দেখিয়ে ডেকে এনেছিল ফুলেশ্বরীর কিনারায়। এবং ডেকে এনেছিল কবি চন্দ্রাবতীকেও। কিন্তু সে কাহিনী গাঁথা নেই জেলা ময়মনসিংহের পল্লীগাথায়। সে কাহিনী বলতে ভুলে গেছে কবি নয়ান চাঁদ ঘোষ।

কিন্তু ফুলেশ্বরী জানে, একদিন গহন রাত্রির ভয়াল অন্ধকারে তার কল কল অগাধ সলিলের মৃত্যুদহের ঝাঁপ দেবার বাসনায় কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিল একটি শোকার্ত নারী মূর্তি। মরতে এসেছিল চন্দ্রাবতী। এই সুন্দর পৃথিবীর রূপ-রস গন্ধের প্রাচুর্যের মধ্যে চন্দ্রাবতীর মনে হয়েছিল সে এক বীভৎস ব্যঙ্গের সৃষ্টি ছাড়া অবাঞ্ছিত অস্তিত্ব। মনে হয়েছিল প্রেমহীন যন্ত্রণাজর্জরিত শুষ্ক কঠিন জীবনের তিল তিল অপঘাতের চেয়ে একটি নিশ্চিন্ত মৃত্যু অনেক স্বস্তির, অনেক শান্তির।

কিন্তু না, মরতে পারে নি চন্দ্রাবতী। হারিয়ে যেতে পারেনি ফুলেশ্বরীর অন্ধকার কুটিল তরঙ্গের আবর্তে। সেই ঝিল্লিমুখর স্তব্ধ পৃথিবীতে মৃত্যুর উষ্ণশ্বাস প্রেমিক কণ্ঠের কাল্পনিক আহ্বানে কেঁপে উঠেছিল আশার রোমাঞ্চে। একটি আকাঙ্খার প্রিয় সম্ভাবণ ফিরিয়ে দিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর অবৈধ কামনাকে।

ফিরে এসেছিল চন্দ্রাবতী। এবং সেই রাত্রির পর হতে প্রতিটি মুহূর্ত প্রতীক্ষার ব্যর্থ দুঃস্বপ্নের আলোড়নে নিজেকে হারিয়ে দিয়েছিল সে। উৎকর্ণমুখর চন্দ্রাবতীর পঞ্চদশ যৌবনের বিভোলতায় এক ক্ষীণ আশ্বাসের মোহ ছড়িয়ে দিয়েছিল কোন এক নিঠুরের পদধ্বনি।

কার পদধ্বনি চন্দ্রাবতী ? কিসের প্রতীক্ষা তোমার ?

নিশ্চুপ।

গতায়ু এক ব্যর্থ অভিসারের অভিধায় মননের নির্যাস ঢেলে কেন এই কৃচ্ছের উপাসনা ?—না। উত্তর দিতে পারে না চন্দ্রাবতী। শুধু এক নির্মম প্রতীক্ষার বেদনা তার স্নায়ুর ধৈর্যকে আঘাতে

আঘাতে পিষ্ট করে তোলে। তথাপি প্রতীক্ষা করে। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা। অন্ততঃ ইতিহাসের পাতায় প্রতীক্ষার এমন ভয়ানক কাহিনী আর খুঁজে পাওয়া যায় না এবং খুঁজে পাওয়া যায় না এমন দুর্লভ প্রেমের গাথা কাব্য। জেলা ময়মনসিংহের লোক কবি নয়ান চাঁদের হাতে কি অপূর্ব হয়ে উঠেছে দুঃখিনী কবি চন্দ্রাবতীর জীবন বেদনা। আশা আর নৈরাশ্যের, প্রেম আর বিরহের সে এক অপূর্ব শিল্পকৃতী।

—পাতুয়ারীর ঘাট, যেখান হতে বাঁক ফিরেছে স্বল্প সলিলা সুন্ধা: সেই ঘাটের পাশে আজকের ধানক্ষেত আর পতিত গোচরে এসে দাঁড়ালে যদিও শুনতে পাওয়া যায় না সাড়ে তিনশো বছর আগেকার কোন গুঞ্জনধ্বনি। তথাপি অনুভবের কান পাতলে পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায় কোন এক বিদেহী প্রণয়ের অনুচ্চারিত বিভোল বসন্ত বাহারের আলাপ।

—নিত্য অপরাহ্নে ছুটে আসতো জয়ানন্দ। সুন্ধা নদীর কিনারার সেই ঘন পল্লব জারুল গাছের তলে এসে বসতো চুপি চুপি। চন্দ্রাবতী আসতো কলম নিয়ে। তারপর সেই সাংকেতিক জারুল ছায়ার মায়ায় ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেত ঘাট হতে। গোপন অভিসারের উচ্ছলতায় উদ্বেল হয়ে উঠতো এক জোড়া যৌবন। তারুণ্য আর তৃষ্ণা বিধূনিত হতো সবুজ বনানীর গোপন আশ্রয়ের নির্ভরতায়।

—কিন্তু এ অভিসার গোপন থাকলো না। সমস্ত সাবধানী নির্ভরতাকে ডিঙ্গিয়ে একদিন প্রকাশ হয়ে পড়লো অনেকের কাছে।

—অসহ্য। তোমার কুমারী মেয়ের অবৈধ প্রণয়ের জন্য সমাজ তোমার বিচার করতে চায় বংশীদাস।—

সমাজপতিরা এসে দাঁড়িয়েছেন দরিদ্র বংশীদাসের অঙ্গনে।

একান্ত বিনীত ভাবে বলেন বংশীদাস—জয়ানন্দ এবং চন্দ্রাবতী উভয়ে বাগ্‌দত্তা আশীর্বাদ করুন ওদের।

বিস্ময়!

এক অবাঞ্ছিত আঘাতে আহত হয়ে ফিরে যান সমাজপতিরা। তখন সূর্য উঠেছে।

তখনো আঁধার নামেনি ধান গাছের শীষে। হেমন্তের বাতাসে নিশিগন্ধা বিচিত্র পুষ্পের সৌরভ। আকাশের নীলাম্বরীতে আগুন ধরা কুরুবক মেঘের বর্ণালী আস্তরণ।

ওরা দু'জনে চুপি চুপি এসে বসলো জারুল গাছের ছায়ায়। —একটা মীমাংসায় পৌছুবার জন্য ব্যগ্র হল চন্দ্রাবতী। জয়ানন্দকে জানালো সকালের ঘটনা। জানালো বাবার কথা। জানালো নিজের ইচ্ছাও। তারপর অনেক কথাবার্তার পর মীমাংসায় পৌছুলো ওরা।

জয়ানন্দ ডাকলো—চন্দ্রাবতী।

—বলো?

—"আজ আমাদের বিয়ে চন্দ্রা"। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বুকে টেনে নিল চন্দ্রাবতীকে। মিনতিতে বাধা দিল চন্দ্রাবতী।—না, আজ নয়।

—কেন? তুমি কি তোমার সমস্ত সত্তা আমাকে বিলিয়ে দিতে পারো না?

—পারি। তবে আজ নয়—বিয়ের পর।

—চলে গেল চন্দ্রাবতী। কিন্তু যাবার সময় দেখতে পেলো না—জয়ানন্দের চোখে এক আদিম আরণ্যক জৈব লালসা সহসা ভালবাসার সমস্ত হৃদয়কে পুড়িয়ে ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

জয়ানন্দ আর চন্দ্রাবতী!

এ কাহিনী শুধু ময়মনসিংহের আঞ্চলিক কিংবদন্তীর পত্রপুটেই নয়,—রামায়ণ কাব্যের অন্যতম কবি কুমারী চন্দ্রাবতীর জীবন গাঁথা আজ ইতিহাসের পাতায় উৎকীর্ণ। ইতিহাস জানে চিরকুমারী চন্দ্রাবতীর মর্মবেদনা। জানে তার মরুভূমি শুষ্ক জীবনের তিল তিল আর্তনাদের যন্ত্রণাকে।

কিন্তু সেই হতভাগ্য জয়ানন্দ? আজ সাড়ে তিন শ' বছর ধরে একটি মানুষেরও সহানুভূতি পায়নি সে। পেয়েছে—ঘৃণা আর অবজ্ঞা। ইতিহাস মনে রেখেছে তা'র হৃদয়হীন ছলনার কথা। কিন্তু শেষ দিনের কথা একবারও মনে হয়নি তা'র। শেষ দিনের চোখ দিয়ে একবারও দেখবার চেষ্টা করা হয়নি তা'কে। তা' যদি দেখতো তা হলে ক্ষমা সুন্দর করুণায় চোখ ছাপিয়ে এক ফোঁটাও অন্ততঃ অশ্রু গড়িয়ে পড়তো তা'র। কি দারুণ অন্তর্বেদনায় সেই ঝঞ্ঝাতাড়িত ভয়াল রাত্রির অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে ছুটে এসেছিল সে, তা' যদি মুহূর্তের জন্যও ভাবতো তা' হলে পাথর হয়ে যেতো কবি নয়ানচাঁদের পুঁথির পাতাগুলো।

না। তবু কলঙ্কী জয়ানন্দকে ক্ষমা করবে না ইতিহাস। ক্ষমা করবে না তা'র একটি আনন্দ-বিভোল রাত্রির বিষাক্ত ছলনাকে।

বধূবেশে সজ্জিতা চন্দ্রাবতীকে ঘিরে কৌতুক করছিল বান্ধবীরা। শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে উৎসবের দ্যোতনা। আলপনা আর সজ্জিত সপ্তপর্ণীতে নিবিড়তর রোমাঞ্চের ছায়া। সমস্ত গ্রামের বুকে এক উদ্বেগ খুসির ব্যঞ্জনা। স্নিগ্ধ প্রদীপের আলোতে সখি বেষ্টিতা চন্দ্রাবতী উপভোগ করছিল প্রগলভা সখীদের কপট তিরস্কারের আনন্দ। কলহাস্য মুখরিত বান্ধবীদের মাঝে বসে চন্দন চিত্রিত চন্দ্রাবতী এক নতুন জীবনের আস্বাদকে খুঁজে পাচ্ছিল প্রতিটি মুহূর্তে এবং একটি আকাংখিত মুহূর্তের জন্য উৎকণ্ঠিতা চন্দ্রাবতী মনের সমস্ত উদ্বেগকে নক্ষত্রের ঝিলিমিলিতে মিশিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল নীরবে।

আর ঠিক সেই সময়ে বাইরের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিলেন উৎকণ্ঠিত বংশীদাস। প্রথম লগ্নে সম্প্রদান। অথচ বর এসে পৌছায়নি এখনো। দ্বিতীয়ার চাঁদ ডুবছে। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে পাতুয়ারীর মাটিতে। আতঙ্কিত বৃদ্ধ বংশীদাস সংবাদ আনতে পাঠায় জয়ানন্দের বাড়িতে।

—সর্বনাশ!

বজ্রাঘাতের মত শোনা গেল খবরটা। সমস্ত উৎসবের মুখে কালি ঢেলে ছুটে এলো নিদারুণ হাহাকার।—জয়ানন্দ সন্ধ্যার অন্ধকারে কোনো এক মুসলমান যুবতীকে নিয়ে দেশ ত্যাগ করেছে।

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল উৎসব সভা। থেমে গেল সানাইয়ের মধুর মূর্চ্ছনা। সমস্ত বিয়েবাড়িটা প্রেতপুরীর একটা উৎকট ভয়ের স্তব্ধতাকে বুকে নিয়ে মূর্চ্ছা গেল যেন।

আছাড় খেয়ে পড়লেন বংশীদাস। সারা মুখে চোখে তাঁর উন্মত্ততার অভিব্যক্তি। চোখে তাঁর অশ্রুর প্লাবন।

লগ্নক্ষণ শেষ হয়ে আসে। অপস্রিয়মান লগ্নক্ষণের দিকে

াকিয়ে চরম ভাবে চমকে ওঠেন। আর একটু পরেই "ভ্রষ্টলগ্না" য়ে যাবে চন্দ্রাবতী। আর তার সিঁথিতে কোনো দিন সিঁদুর ঠবে না।—অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেন নিরুপায় বংশীদাস।

বিধান দিলেন জনৈক শিরোমণি।—"পালটি ঘরের যে কোনো কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে "কুলীন বধূ" করে নাও।"

অন্ধকার। চতুর্দিক অন্ধকারের মধ্যে দিশাহারা বংশীদাস এক বিন্দু আলো দেখতে পেলেন যেন।—ছুটে গেলেন—চন্দ্রাবতীর কাছে। উন্মথিত কান্নার আবেগ জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। বললেন,—আর দেরী নয় মা, চল।

অনেক ক্রন্দসী বিমূঢ় বান্ধবীদের মাঝে নিঃসাড় হয়ে বসেছিল চন্দ্রাবতী। চোখে তার সর্বহারা রিক্তের বেদনা। মনের মধ্যে পক্ষাঘাতের বিস্ময়। আর হৃদয়ে তার একতাল চিতা মাংসের দুর্গন্ধ, স্তব্ধ, নির্বাক।

—মা! আর দেরী করলে যে চলবে না মা; চল।—কাঁদছিলেন বংশীদাস।

—আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো চন্দ্রাবতী। বাবার হাত দুটি পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে বললো, "তা'বে হয় না বাবা!"

—না মা অভিমান করিস না। লগ্ন ভস্ম হলে গেল সর্বনাশ হয়ে যাবে মা, চল।

—বিয়ে আমি করবো না বাবা! উদগত অশ্রু স্তব্ধ হয় চন্দ্রাবতীর চোখের পাতায়।

—সে হয় না মা। মেয়ে জীবনের একমাত্র সার্থকতা—মন প্রাণ অপরকে সম্প্রদান করা।

—কিন্তু মন যে অখণ্ড বাবা। দু'জনকে তো দান করা যায় না।

চমকে ওঠেন বংশীদাস।

চন্দ্রাবতী তখন তার বুকে মাথা রেখে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে।

সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘোরে। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে চন্দ্র। আর সৌর জাগতিক আহ্নিক বার্ষিকে পুরাতন হয় চন্দ্রাবতীর যৌবন। এক একটি দিন এক একটি যন্ত্রণার পাহাড় বয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ায় চন্দ্রাবতীর আহত বুকের উপরে। আর রাত্রির অন্ধকারে ঢেলে দেয় এক একটি কান্নার সমুদ্র।

কিন্তু কাঁদতে পারে না। উপমাহীন এক ছিন্ন ভিন্ন হৃৎপিণ্ডের ব্যথায় অতিকাতর চন্দ্রাবতীর সমস্ত মানসিকতা শিলিভূত কংকালের মত নিথর হয়ে গেছে অনেকদিন আগে।

তবু—সে মর্মান্তিক যন্ত্রণাকে মুহূর্তের জন্য ভুলতে চায় চন্দ্রাবতী। ভুলতে চায় তার জীবনের করুণ ইতিহাসকে।

ছলনার এক কমনীয় প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে অতীতের সেই নিষ্ঠুর কাহিনীকে। মনকে আত্মভাবনা হতে মুক্ত করে রাখতে চায় সে সর্বদা। জপ, তপ আর পুরাণকাব্যের পুঁথি-পাঠের মধ্য দিয়ে একাগ্র হয়ে ওঠে চন্দ্রাবতী। মহাভারতের শবরী আর রামায়ণের সীতার মধ্যে তীব্র দুঃখের প্রখরতা দেখে নিজের শোক ব্যথাকে ভুলতে চেষ্টা করে।—বিদুষী চন্দ্রাবতী কাব্যের নূপুর নিক্কন দিয়ে আড়াল করে রাখতে চায় নিজের মর্মবেদনাকে। অবশেষে একদিন মনের আর্তবেদনা ছন্দময় হয়ে সান্ত্বনা দেয় চিরদুঃখিনী চন্দ্রাবতীকে।

রামায়ণ রচনা করে চন্দ্রাবতী। রামায়ণের অশ্রুমধুর কাহিনীতে ডুবিয়ে দেয় তার সমস্ত ইন্দ্রিয়সত্তা।

কিন্তু রামায়ণের সমস্ত কাণ্ড লিখতে পারে না চন্দ্রাবতী। অবচেতন মনের বেদনা ছায়া ফেলে তার কাব্যে। উল্লাসের চেয়ে ব্যথা-বেদনার কাহিনীই মূর্ত হয়ে ওঠে তার পুঁথিতে। রামায়ণের জনমদুঃখিনী সীতার সঙ্গে কখনো কখনো একাত্ম হয়ে যায় সে নিজেই।

"আমি কি জানি গো সখি কালসর্প বেশে।
এমনি করিয়া সীতায় ছলিবে রাক্ষসে।"

এমনি করে একটি পরম জীবনের রক্তাক্ত ছলনার উপলব্ধিতে সৃষ্টি হল বাংলা-সাহিত্যের এক অন্যতম অমূল্য সম্পদ—"চন্দ্রাবতী রামায়ণ।"

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। গাথা কাব্য বলে জয়ানন্দ ফিরে এসেছিল একদিন। জৈব ক্ষুধার নিশি-ডাকে আত্মহারা জয়ানন্দের মোহমুক্তি ঘটেছিল একদা সন্ধ্যায়। সেদিন ছিল এক সর্বনাশা দুর্যোগের রাত। মেঘে মেঘে বজ্রের ঝনঝনা। জল, ঝড়, বিদ্যুতের এক প্রলয়ঙ্কর সমাবেশ। সেই ভয়াল রাতের অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে ছুটে এসেছিল প্রেমিক জয়ানন্দ। চন্দ্রাবতীর বন্ধ দরজায় আঘাত করেছিল বার বার। মাথা কুটেছিল মন্দিরের রূঢ় পাষাণের গায়ে।

—দ্বার খোলো চন্দ্রাবতী।

ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল চন্দ্রাবতীর। ছুটে এসেছিল দরজার কাছে। কিন্তু অর্গল হাত দিতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছিল আহত হয়ে।

—আমাকে ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী। দ্বার খোলো।

—না। তুমি ফিরে যাও জয়ানন্দ।—রূঢ় হয় চন্দ্রাবতীর কণ্ঠ।

—একটি বিভ্রান্ত যৌবনের ভুলকে কি তুমি ক্ষমা করতে পার না চন্দ্রা?

—না।

—বেশ, তাই হোক। আমি যাচ্ছি।—যাবার আগে শুধু একটিবার তোমাকে দেখতে চাই। আমার শেষ প্রার্থনা ফিরিয়ে দিও না চন্দ্রা।

—তোমার অবৈধ কামনাকে প্রশ্রয় দেবার মত কোনো দুর্বলতাই আর আমার আমার মধ্যে বেঁচে নেই জয়ানন্দ।

ফিরে গেল জয়ানন্দ।

তারপর আর একবার মাত্র জয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল চন্দ্রাবতীর।

সেই রাত্রির পরদিন সকালে পূজার জন্য জল নিতে গিয়েছিল ফুলেশ্বরীর ঘাটে। হঠাৎ স্বল্পস্রোতা কিনারায় চোখ পড়তে পাথর হয়ে গেল চন্দ্রাবতী। খসে পড়লো তার হাতের কলস। বন্ধ হয়ে গেল হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোত। হাহাকার করে ছুটে গেল জয়ানন্দের কাছে।

জয়ানন্দের অপঘাতী দেহটা তখন তরঙ্গের দোলায় থরথর করে কাঁপছে।

[মনস্বী লোকনায়ক স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র স্বর্গত নিরঞ্জন পালের অবদানে চলচ্চিত্রজগৎ নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। স্মৃতিকথা-মূলক তাঁর একটি রচনা বর্তমান সংখ্যায় রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশ করা হল। রচনাটিতে বহু মূল্যবান তথ্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। লেখাটি পাঠক পাঠিকাকে যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ দেবে আশা রাখি।—স।]
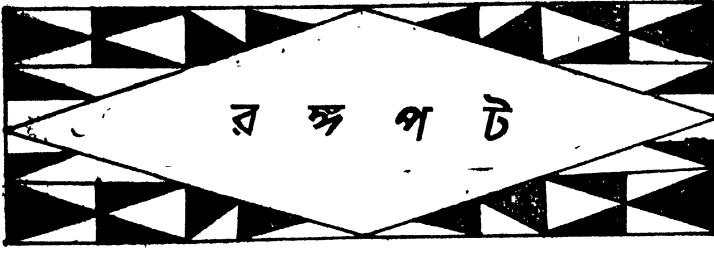
এক টুকরো স্মৃতি

স্বর্গত নিরঞ্জন পাল

আজ থেকে বহুদিনের কথা।

তখন ১৯০৬।৭ হবে। মানিকতলা বোমকেসের শ্রীঅরবিন্দ, বারীণ ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের গ্রেপ্তারের কিছু পূর্ব্বে একদিন আমি, ইন্দু ব্যানার্জ্জী ও আমার ভগ্নীপতি—এই ত্রয়ী বাড়ী ফিরছি ট্রামে—সে সময় এক সাহেবের অশোভন ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ট্রামের মধ্যেই সাহেবকে খুব দেওয়া হল উত্তম-মধ্যম। তার রিভলবার কেড়ে নিয়ে চট করে গাড়ী থেকে নেমে সোজা মাঠ পেরিয়ে বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম।

পরদিন উল্লাসকর দত্ত এসে বাড়িতে হাজির। তিনি প্রায়ই আমার পিতা ৺বিপিন চন্দ্র পালের নিকট আলাপ-আলোচনা করতে আসতেন। সাহস করে সমস্ত ঘটনাটি তাঁকে আদ্যোপান্ত বিবৃত করলাম। ভেবেছিলাম খানিকটা বকুনি জুটবে—হয়ত বাবার কানে কথাটা যাবে—কিন্তু কিছুই হল না। তিনি পিঠ চাপড়ে সেদিন আমায় বলেছিলেন—'সাবাস!' এরপর রিভলবারটি তিনি নিয়ে চলে যান। তার কিছুদিন পর উল্লাসকর দত্ত ও তাঁর দলবল পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান। তখন আমার সে মনোবেদনা কেউ বুঝতে পারবে না। ধরা পড়ে নেতা হবার বাসনা জাগল আমার মনে। ভাবলাম পুলিস আমায় কেন গ্রেপ্তার করল না। অথচ বিপ্লব কি, তার মূর্ত্তি কেমন, তখনও জানতাম না। শুনতাম এরা এ দেশকে স্বাধীন করতে চায়—পিস্তল দিয়ে, বোমা দিয়ে।

সত্যই পুলিস যখন আমায় গ্রেপ্তার করলনা, তখন বেনামে পুলিস-কমিশনারের কাছে এক উড়ো চিঠিতে জানালাম যে, বিপিন

সূর্যশিখার চিত্রগ্রহণের প্রাক্কালে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরীকে নির্দেশদানরত পরিচালক সলিল দত্ত।

পালের ছেলে নিরঞ্জন পাল সাহেবের বিভলবার ছিনিয়ে নিয়েছিল পরে সে উল্লাসকর দত্তকে প্রেরণ করে। রাজসাক্ষী হিসাবে নরেন গোঁসাইও এই একই কথা বলেছিল।

আকস্মিক বিপ্লবী হবার উত্তেজনায় বেলুনের মত ফেঁপে উঠেছিলাম। কিন্তু ছোট একটা খোঁচায় যে বেলুন ফেটে চুপসে যাবে, একথা মনে একবারও আসেনি, দেশপ্রেম বস্তুটা আর যাই হোক, ছেলে-খেলা নয়।

পুলিস চিঠি পেয়ে আমায় ধরতে আসবে—এই অপেক্ষায় দিন গুনছি—পুলিস আর এলোনা—এলেন ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস, বাবার পরম বন্ধু। আমার গোপন ব্যাপারটা বাবাকে খুলে বললেন। গোয়েন্দা-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন বিনোদ গুপ্ত, তিনি ছিলেন ডাক্তার বাবুর শ্যালক—তাঁরই মুখে খবর পেয়ে ডাক্তার কাকা এলেন আমাদের বাড়ীতে। গোপনে বাবা আমার সব তথ্য সংগ্রহ করেন অথচ মুখে কিছুই বললেন না।

খবরের কাগজের পাতায় প্রত্যহ তখন প্রকাশ হত ভয়ংকর সংবাদসমূহ। চঞ্চল হয়ে উঠেছিল দেশ তখন। ত্রিবর্ণ পতাকার আলোড়নে বাংলা দেশের বুকের তলা থেকে আত্মপ্রকাশ করল বিস্ফুবিয়াস। তখন অভিভূত দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলাম আন্দোলনের রূপটাকে। আগুন জ্বালা, রক্তঢালা এক দুর্গমের অভিসারে যুবকদের হাতছানি দিলে সেই বিপ্লবের সাল।

একদিন ভোরবেলা সহসা বিনোদ গুপ্ত এসে হাজির হলেন আমাদের বাড়ীতে। বললেন সাহেব আসামীকে সনাক্ত করতে চায়।—কিন্তু কেন জানিনা, বিনোদ গুপ্ত অপর একটা ছেলেকে নিরঞ্জন পাল বলে বেমালুম চালিয়ে দিলেন, সাহেব আসামীকে চিনতে না পারায় মামলা ফেঁসে যায়।

কিছুই বললাম না আমি, একটা গভীর বেদনা বোধে সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মনের ভেতর কি জানি যেন চুরমার হয়ে গেল কিসের একটা আচমকা আঘাতে। এরপর বাবার সংগে ইংলণ্ডে যাত্রা করলাম। ১৯০৮ সনে সেই আমি প্রথম বিলেত যাত্রা করি। কিছুদিন পর বাবা আমায় সেখানে রেখে কলকাতায় চলে আসেন।

ডাক্তারী পড়তে সুরু করলাম, কিন্তু পরিমিত অর্থের অভাবে ডাক্তারী পড়া আর আমার হোল না। অর্থের জন্য নানাস্থানে গল্প লিখে পাঠাতে থাকি। কিন্তু প্রতি জায়গা থেকে অমনোনীত হয়ে ফিরে আসে।

যে বাড়ীতে পেয়িং গেষ্ট হিসাবে থাকি, সেই গৃহকর্ত্রী টাকার জন্য বিশেষভাবে তাগাদা দিতে সুরু করলেন। অথচ বাবার কাছে এই অর্থকষ্টের কথা গোপন করলাম। হাতে পয়সা নেই, উপায়? সে সময় চলচ্চিত্রের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল—ভাবলাম এই শিল্পে যথেষ্ট অর্থ আছে।

কিনেমা কলার কোম্পানী লণ্ডনের একটা বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এরা ১৯১১ সনে বাজার দিল্লী দরবারের সংবাদ-চিত্র তুলেছিল—তাদের গৃহীত রঙ্গীন ছবি লণ্ডনে এক বছর ধরে গৌরবের সাথে চলেছিল। চার্লস আরবান ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

সর্বশ্রীমতী সুজাতা চক্রবর্তী, মানসী সোম, সুচিত্রা মিত্র ও আশা মুখোপাধ্যায়—একটি জলসায়

তিনি বিশেষ করে "নেচার সিরিজ" ছবি তুলতেন। মিঃ আরবান আমার একটা গল্প মনোনীত করে আমায় জানালেন।

সেই আমার প্রথম সূত্রপাত!

রোজ ষ্টুডিও যেতাম, স্যুটিং দেখতাম, আর কত কী ভাবতাম। এ সময় নিজের স্বার্থের খাতিরে উপযাচক হয়ে এমন কি কুলির কাজও করতাম—এতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট বা লজ্জা হত না।—এই সময় বিখ্যাত মার্কিণ চিত্র-পরিচালক মার্টিন থর্ণটনের সংস্পর্শে আসি। তিনি প্রত্যহই আমার কার্য্যকলাপ গোপনে নিরীক্ষণ করতেন।

লণ্ডনের "সার বিটনে" ছিল কিনেমা কলার কোম্পানী, বাড়ী হতে এর দূরত্ব ছিল ১৮ মাইল—ক্রমাগত ৯ মাস আমি প্রত্যহ ষ্টুডিও গিয়েছি। অনুপস্থিত একদিনের জন্যও হইনি। এই নয় মাস যে আমার কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে, আজ তা ভাবলে ভয় হয়। মার্টিন সাহেব আমার অবস্থা দেখে সব বুঝতে পারলেন,—আমিও লজ্জার মাথা খেয়েই সব আগাগোড়া আমার দুরবস্থার কথা বলে ফেললাম। এরপর তিনি হেড অফিসে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমাকে সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড দশ শিলিং করে দেওয়া হবে বলে সাহেব জানিয়ে দিলেন।

তখন বড়দিন, একদিন হেড অফিস থেকে ক্যাশিয়ার এসে আমার হাতে একটি বড়দিনের কার্ড দিলেন! হায় ভগবান! মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বাড়ীতে শুকনো মুখে এসে ভয়ে ভয়ে খামটি খুললাম। খুলতেই আমার চক্ষুস্থির! একি! এওকি সম্ভব হতে পারে— না কল্পনা করা যায়?

বড় সাহেব আমায় নয় মাসের পুরো মাহিনা দিয়েছেন—যেদিন থেকে আমি প্রথম ষ্টুডিওতে যেতে সুরু করেছিলাম। শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল।

এ ভাবেই সুরু হয় আমার নতুন যাত্রাপথ! আমারই রচিত "দি ফেথ অফ এ চাইল্ড" ইংলণ্ডের প্রথম নির্ব্বাক পূর্ণাঙ্গ ছবি। এই চিত্রের দৈর্ঘ্য ছিল ছয় হাজার ফুট। নায়িকা ছিলেন এভেলিন বুচার। নায়ক ছিলেন জেমস লাইট। জেমসলাইট এর পর হলিউড চলে যান। চিত্রটি একযোগে তিন সপ্তাহ ধরে লণ্ডনের "নিউ গ্যালারি সিনেমায়" প্রদর্শিত হয়েছিল।

১৯১৫ সনে ইংলণ্ডে আমার রচিত "এ ডে ইন অ্যান্ ইণ্ডিয়ান মিলিটারি ডিপো" নামে এক প্রামাণ্য চিত্র গৃহীত হয়।

এই সময় আমার রচিত "গডেস" নাটকটি ডিউক অব ইয়র্ক রংগালয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় অভিনেতৃবৃন্দ দ্বারা অভিনীত হয়।

বাসবী নন্দী: বিভিন্ন ভঙ্গীমায় আলোকচিত্র—মোনা চৌধুরী

অংশ গ্রহণ করেছিলেন ভূতপূর্ব্ব বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার পি-এম-জি পরেশ মুখার্জ্জী, মনোমোহন ঘোষের নাতি গীতা ঘোষ, বাসন্তী দেবীর ভাইপো সমর হালদার ও হিমাংশু রায়। পরে এই নাটক লণ্ডনের খ্যাতনামা শিল্পীদের দ্বারা নিয়মিতভাবে অভিনীত হতে থাকে। আমার রচিত "গডেসের" আত্মপ্রকাশের মূলে ছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্য-পরিচালক নিউইয়র্কের সুলিভান থিয়েটারের পরিচালক গুই ব্রাগডন। তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত নাট্য-প্রযোজক স্যার আলফ্রেড বাটকে নাটকখানি পড়তে দেন। ইতিপূর্ব্বে আমি নাটকটি আলফ্রেড সাহেবকে পড়তে দিয়েছিলাম; কিন্তু তিনি না পড়েই নাটকটি ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কেন জানিনা, স্যার আলফ্রেড নাটকটির স্বত্ব ক্রয় করলেন।—সে সময় হিমাংশু রায় লণ্ডনে ব্যারিষ্টারি পড়ছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের একাংক নাটিকা "আরাকানের মহারাণী" মঞ্চস্থ করছিলেন। উক্ত নাটকের উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার তারকনাথ পালিতের পুত্রবধূ মিসেস পালিত। লেডী মেকেনজী স্যার আলফ্রেডকে "গডেস" নাটকটি প্রথমে ভারতীয়দের দ্বারা মঞ্চস্থ করতে বলেন, তাই সর্বপ্রথম 'গডেস' ভারতীয়দের দ্বারা অভিনীত হয়। এর পর ১৯২৫ সালে আমি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

হিমাংশু রায় ইতিপূর্ব্বে লণ্ডন থেকে ফিরে ভারতে চিত্র নির্ম্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি জার্ম্মাণ চিত্র-পরিচালক ফ্রাঙ্ক ওষ্টেনকে নিয়ে চিত্র প্রযোজনা করার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি আমার লেখা চিত্রনাট্য "লাইট অফ এশিয়া" মনোনীত করলেন। হোটেল কন্টিনেণ্টাল ছিল আমাদের আড্ডা, সেখানে চারু রায় ও প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করি। এর পর দিল্লীতে সমবেত হলাম সবাই। আসল কাজ সুরু হয় জয়পুরে, হিমাংশু রায় "বুদ্ধের" ভূমিকায় অভিনয় করেন। ক্যামেরাম্যান ছিলেন ভিরসিন কেয়ার মেয়ার, শিল্প-নির্দ্দেশক ও ব্যবস্থাপক ছিলেন যথাক্রমে চারু রায় ও পি, এন, রায়। অংশগ্রহণ করেছিলেন, প্রফুল্ল রায় (দেবদত্ত), সীতাদেবী (গোপা), সারদা উকিল (গোপার পিতা), সরোজিনী নাইডুর ভগ্নী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়ও সে সময় আমাদের গোষ্ঠিভুক্ত ছিলেন। এর পর ১৯২৭ সনে আমার লেখা "থ্রো অফ ডাইস" মুক্তিলাভ করে। পরিচালনা—ফ্রানৎজ অসটিন, প্রযোজনা—হিমাংশু রায়, ক্যামেরাম্যান ছিলেন শোন্নম্যান (জার্ম্মাণ), গুড়ো ও হ্যারিস (ইংলণ্ড)। এই চিত্রে অভিনয় করেছিলেন—সীতাদেবী, হিমাংশু রায়, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, মধু বসু ও বহু ফিরিঙ্গী নরনারী ইত্যাদি। ছবিখানি জয়পুর পিছোলা হ্রদ প্রভৃতি স্থানে তোলা হয়। উদয়পুরের রাজ্য সরকার ছবিখানিকে জাঁকজমকপূর্ণ করতে সব রকম সহায়তা করেছিলেন।

ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীর ইউ-এফ-এ কোম্পানী আমার কয়েকটি রচনার স্বত্ব ক্রয় করেন, কিন্তু সবাক যুগ এসে পড়ায় তার চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এর পর আবার লণ্ডনে ফিরে যাই, আবার ফিরে আসি। লণ্ডনে গৃহীত "জেণ্টলম্যান অফ প্যারিস" প্রথম সবাক চিত্রটি আমার রচিত, এই চিত্রটি প্রযোজনা করেছিল গমোঁ বৃটিশ প্রোডাকসন। ডেম সিবিল থর্ণ ডাইক ও আর্থার ওয়ালটার চিত্রের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। চিত্রটি যখন মুক্তিলাভ করে, তখন আমি ভারতে। বোম্বেতে দুটি ছবি পরিচালনা করি। প্রথমটি হল "ট্রাবল নেভার কামস এলোন", দ্বিতীয়টির নাম "নিডিলস আই।"—এছাড়া উল্লেখযোগ্য চিত্র আমার ছিল না। দীর্ঘদিন বাদে বাংলার ছেলে বাংলায় ফিরে এলাম। এই সময় অনাদি বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। অরোরার 'পূজারী' চিত্রটি পরিচালনা করি।

ঘনশ্যামদাস চোখানী তখন "ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টসে"র মালিক। পরে অনাদি বসু এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেণ্ট নেন। পরিচালনা করি "পরদেশীয়া"। চিত্রশিল্পী ছিলেন বিভূতি দাস। এই চিত্রে আমার স্ত্রীও অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া সবিতা দেবী অভিনীত "কিং ফর এ ডে" ছবি তুলি।

আমার প্রথম সবাক বাংলা চিত্র হচ্ছে "শুকতারা"। নির্ব্বাক যুগও দেখেছি, সবাকও দেখছি। আমার মতে নির্ব্বাক-যুগই ছিল ভাল। তবে, আদিমকালের অসম্পূর্ণ সৃষ্টি অপেক্ষা বর্ত্তমান যুগ চিত্র-শিল্পকে আজ যে সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে বসিয়েছে, একথা অনস্বীকার্য্য।

ধূপছায়া

জীবনের ভাগ্যাকাশে কখনো দেখা যায় প্রসন্ন অম্লান সূর্যরশ্মি, কখনো বা দেখতে পাওয়া যায় পুঞ্জীভূত মেঘের ঘনীভূত আঁধার। ভাগ্যমার্গে এই দুয়ের কখন কোনটি আপন স্বাক্ষর রাখে, তা জানা আছে কেবলমাত্র একজনের। তাঁর নাম অন্তর্যামী। তবে, এই উজ্জ্বল আলো আর ঘন অন্ধকারের মিছিলের মধ্যেই জীবনের সারবস্তু অর্থাৎ এই আলো আঁধারির খেলার মধ্যেই জীবনের অর্থ নিহিত। মানুষের জীবনে কখনো দেখা যায় অবিচ্ছিন্ন আনন্দ, পরিপূর্ণতার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর, কখনো দেখি দুঃখের নিদারুণ আলেখ্য, শূন্যতার তীব্র হাহাকার, আবার আসে

খেলার মাঠে শ্রীমতী কানন দেবীর হাতের সংগ্রহমঞ্জুষায় অর্থদান করছেন প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

সুখ, আবার আসে দুঃখ। সুখ দুঃখের মিছিলের বিরাম নেই। চক্রাবর্তনের সঙ্গেই এর তুলনা চলে। ধূপছায়া ছবিটির মধ্যে এই সত্যটিরই প্রতিষ্ঠা দেখা গেল।

খ্যাতনামা লেখক ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত এর কাহিনীকার। চিত্ত বসু ছবিটির পরিচালক। হিমাদ্রি একটি স্বপ্ন দেখেছিল, উমাকে নিয়ে গড়তে চেয়েছিল এক শান্তির নীড়, উমাকে সে নির্জনে ধর্মপত্নী বলে গ্রহণও করেছিল। তাসের ঘরের এক ঝোড়ো দমকা হাওয়ায় তার কল্পনার মীনার ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বাবার অনুরোধে তাকে অন্যত্র বিবাহ করতে বাধ্য হল, কেন না সেই বিবাহের উপর তার (ও তার বাবারও) ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। উমাকে গৃহত্যাগ করতে হয়, হিমাদ্রির সন্তান তার কোলে এসেছে, চুপি চুপি সে নবজাত সন্তানকে রেখে যায় হিমাদ্রির বাড়ীর আঙ্গিনায় তার পরিচিতি-পত্র সহ। হিমাদ্রি তখন বিলেতে। তার দ্বিতীয়া পত্নী সপত্নী-পুত্রকে মাতৃ-স্নেহে কোলে তুলে নেয়। তারপর কালের চাকা ঘুরতে থাকে; ঘটনার আবর্তনে গুপ্তরহস্য একদিন প্রকাশিত হয়। আনন্দের চরম মুহূর্তে উমা আত্মহত্যা করে। তার ছেলে শেষ কাজ সম্পন্ন করে, বাবা আর ভাবী বধূ (এই মা-হারা মেয়েটি উমার কাছেই লালিত) কে নিয়ে পালিকা মায়ের কাছে ফিরে আসে।

এই কাহিনীকে পরিচালক যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। কাহিনীতে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই দুয়েরই সম্মেলন যত নিখুঁতভাবে যিনি ঘটাতে পারেন, প্রয়োগকর্তা হিসেবে তিনি তত দক্ষ। কাহিনী-বিন্যাসে, অধ্যায় বিভাগে, ঘটনা সংস্থাপনে, সংলাপ-রচনায় চরিত্র সৃষ্টিতে—সকল দিক দিয়েই ছবিটি উপভোগ্য এবং চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। ছবিটির মধ্যে মানবিক

তিরক্ষা তহবিলে সাহায্যার্থে চিত্রজগতের শিল্পী ও কুশলীদের ক্রিকেট খেলায় দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যাট ক্রয় করলেন শ্রীমতী সুচিত্রা সেন।

অভিনয়ে অভাবনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন দীপ্তি রায়, অনুভা গুপ্ত ও এন বিশ্বনাথন। তাঁদের অভিব্যক্তি প্রকাশভঙ্গী ও বলিষ্ঠ অভিনয় চরিত্র তিনটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। তরুণকুমারের অভিনয়ও যেমনই সার্থক, তেমনই শক্তির পরিচায়ক। অন্যান্য ভূমিকাগুলির রূপ দিয়েছেন স্বর্গত ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, বিপিন গুপ্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, ধীরাজ দাস অপর্ণা দেবী প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

সংবাদ-বিচিত্রা

কলকাতার চলচ্চিত্র-দর্শকসমাজ জেনে আনন্দিত হবেন যে, সম্প্রতি এক ব্যাপক সংস্কারের ফলে মধ্য-কলকাতার অন্যতম বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ "প্রাচী" সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। প্রেক্ষাগৃহের এবং পর্দার উভয়েরই আয়তন বাড়ানো হয়েছে, স্বভাবতই আসনগুলিরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। চিত্র-গৃহটিকে আরামদায়ক এবং উপভোগ্য করে তুলতে কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার সম্ভাব্য যত্ন নিয়েছেন এবং সেদিকে প্রখর দৃষ্টি দিয়েছেন।

ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স প্রোডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদ বর্তমানে প্রাচীর চিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সরকারও এক কমিটি গঠন করেছেন। কার্যকরী পরিষদ প্রযোজকবর্গকে এক বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানিয়েছেন যে, প্রাচীর চিত্রগুলি সাধারণ্যে প্রদর্শনের পূর্বে প্রযোজকবৃন্দ যেন সেগুলি সরকার কর্তৃক গঠিত পূর্বোক্ত কমিটির দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেন। অশোভন এবং আইনবিগর্হিত কোন প্রাচীরচিত্র যাতে সাধারণ্যে প্রদর্শিত না হয়, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

করাচীতে বর্তমানে প্রমোদকর কমানো হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশমূল্যের সঙ্গে দেয় অতিরিক্ত যে শতকরা পঁচাত্তর টাকা কর হিসেবে দিতে হোত, এখন পঁচাত্তরকে কমিয়ে পঞ্চাশে আনা হচ্ছে। পাকিস্তানের চিত্রপ্রদর্শকরা এ জন্যে দীর্ঘদিন সংগ্রাম চালিয়েছেন। বর্তমানে করাচীর নাগরিকবৃন্দও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তে স্থানীয় জনসাধারণের মনে যথেষ্ট আনন্দ জোগাবে আশা করা যায়।

রক অ্যাণ্ড রোলের পর টুইষ্ট নৃত্যও পশ্চিম থেকে উদ্ভূত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে কিশোর-কিশোরী-সমাজে যথেষ্ট উত্তেজনা ও আলোড়ন এনেছে। তবে, এই নাচ সম্বন্ধে সমালোচনা ও প্রতিকূল মনোভাবেরও অন্ত নেই। ইরাণ থেকে সংবাদ পাওয়া গেল যে, সেখানকার সরকার তাঁদের এলাকায় "টুইষ্ট"কে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন।

রহস্য-সাহিত্যের সম্রাজ্ঞী আগাথা ক্রিষ্টির বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে "মাউস ট্র্যাপ" অন্যতম। লণ্ডনের অ্যামব্যাসাডর থিয়েটারে এর অভিনয় সগৌরবে অনুষ্ঠিত হয়ে অগণিত দর্শকবৃন্দের বিপুল সাধুবাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গত ২৫এ নভেম্বর এই জনগণ-অভিনন্দিত নাটকটির অভিনয়ের দশম বৎসর পূর্ণ হল। পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ২৪এ নভেম্বর পর্যন্ত উদ্বোধন-রজনী থেকে সুরু করে নাটকটির অভিনয়-সংখ্যা চার হাজার এক শো একান্ন। এবং দর্শকসংখ্যা সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। এই উপলক্ষে এক

ভাষণদানরত চিত্রপরিচালক সত্যজিত রায়

ভোজসভার আয়োজন করা হয়। এই প্রীতি-অনুষ্ঠানে বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ডেম সিবিল থরণডাইক কেক কাটার কাজটি সম্পন্ন করেন। এই কেকটির ওজন এক হাজার পাউণ্ড।

প্রভূত জনপ্রিয়তার অধিকারিণী খ্যাতিময়ী চিত্রতারকা গ্রেস কেলী (৩৫) যখন মোনাকোর অধীশ্বরকে বিবাহ করে অভিনয়জগত থেকে বিদায় নিলেন, তখন চিত্রজগতে যে শূন্যতা সঞ্চারিত হয়েছিল, আশা করি, এই অল্পকালের মধ্যেই তার স্মৃতি দর্শকদের মন থেকে মুছে যায়নি। বিবাহের পর গ্রেস কেলীকে একাধিকবার একাধিক ব্যক্তি ও একাধিক প্রতিষ্ঠান পুনরায় অভিনয়ের জন্যে সবিনয় আমন্ত্রণ জানিয়ে অনেক চেষ্টা করেছেন তাঁকে পুনরায় দর্শকসাধারণে শিল্পী হিসেবে উপস্থিত করার। কিন্তু সেই সকল আহ্বানে সাড়া দেওয়া মোনাকোর অধীশ্বরীর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। বর্তমানে পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্রে না হলেও, জানা গেছে যে, গ্রেসকে আবার রূপালী পর্দায় দেখা যাবে। ছবিটি মোনাকো সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য চিত্র, তা'ছাড়া এতে গ্রেস একলাই অবতীর্ণ হবেন না; তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বামী ও পুত্রকন্যারও দেখা পাওয়া যাবে।

বৃটেনের স্বনামধন্য চিত্রনট অ্যাণ্ড্রু ফলড্স এবার নির্বাচনে অবতীর্ণ হচ্ছেন। অভিনেতা থেকে এবার তিনি জননেতা হতে চলেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেও তিনি পেয়েছেন এক খ্যাতিমান ব্যক্তিকে। বর্তমান যুদ্ধমন্ত্রী জন প্রোফুমোর বিরুদ্ধে তিনি নির্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। শ্রমিকদল ফলডসকে মনোনয়ন দিয়েছেন। চল্লিশ বছর বয়স্ক এই অভিনেতার নির্বাচনী এলাকাটিও যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। মহাকবি সেক্সপীয়ারের স্মৃতিধন্য আভন নদের তীরবর্তী ষ্ট্রাটফোর্ট অঞ্চলটির মহিমা ও বৈশিষ্ট্য কাল কখনও গ্রাস করতে পারে না।

এমব্যাসী পিকচার্সের প্রচার-অধিকর্তা হ্যারল্ড ব্যাণ্ড বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী চক্রে যোগদান করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের বিশ্বপ্রচারের অধিকর্তার আসনে তিনি সমাসীন হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই আসনটি নবসৃষ্টি।

ফেডারেশান অফ বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রীজ থেকে ঘোষিত হয়েছে যে, আগামী ১৯৬৪ সালে আন্তর্জাতিক শিল্প-চিত্র উৎসব যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে। কাউন্সিল অফ ইয়োরোপিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফেডারেশানের পৃষ্ঠপোষণায় ইতঃপূর্বে এ ধরণের আর চারটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের অমর রচনাবলীর মধ্যে 'ভ্রান্তিবিলাস' অন্যতম। উত্তমকুমার বর্তমানে এই কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন মানু সেন ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য্য। সুর-যোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্যামল মিত্র। চরিত্রগুলির রূপদানের ভার নিয়েছেন উত্তমকুমার, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বসু, সন্ধ্যা রায়, লীলাবতী (করালী) দেবী প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। • • •

নবভারতের অন্যতম বলিষ্ঠ রূপকার স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে চিলড্রেন্স ফিল্ম ফাউণ্ডেশান স্বামিজীর অলোকসামান্য জীবন অবলম্বনে 'বিলে-নরেন' শিরোনামায় ছোটদের উপযোগী একটি শিক্ষামূলক সারগর্ভ ছায়াছবি নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। স্বামিজীর দিব্যজীবনের বাল্য ও কৈশোরকাল এই ছবির উপজীব্য। ছবিটি পরিচালনার ভার নিয়েছেন রবি বসু ও চিত্রনাট্য রচনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শিশুসাহিত্যিক শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)।

একটি জনসমাগমে চিত্রপরিচালক : সত্যজিত রায় এবং অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে

* * * বাঙলার তথা সারা ভারতের পরম পুণ্য দেবীস্থান ঐতিহাসিক কালীঘাট। হিন্দুরা এই পবিত্রতীর্থকে কেন্দ্র করে আনন্দময়ী চিত্রপীঠ একটি ছায়াচিত্র নির্মাণে হস্তক্ষেপ করেছেন। 'মহাতীর্থ কালীঘাট' শীর্ষক এই ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। 'বধূ'খ্যাত চিত্রপরিচালক ভূপেন রায় ছবিটির পরিচালক। কীর্তনকলানিধি রথীন ঘোষ সুরযোজনা করছেন। অভিনয়াংশে আছেন অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, অমরেশ দাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, অমর মল্লিক, ঠাকুরদাস মিত্র, মণি শ্রীমানী, শিপ্রা মিত্র, শম্পা চক্রবর্ত্তী এবং বাণী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * * 'বধূ'র বিমল ঘোষ প্রোডাকসানসের আগামী অবদান 'বিজিতা' শৈলেশ দে'র কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, বিশ্বজিৎ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অমরেশ দাস, অমিত দে, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মণ, সরযূবালা দেবী, অনুভা গুপ্তা, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি। * * * 'নিশাচর' ছবিটির কাজও দ্রুতগতি এগিয়ে চলেছে। এই ছবিটিও পরিচালিত হচ্ছে ভূপেন রায়ের দ্বারা। সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করছেন কালীপদ সেন। রূপায়ণে আছেন বিকাশ রায়, শম্ভু মিত্র, দিলীপ রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায় চৌধুরী, ধীরাজ দাস, প্রীতি মজুমদার, মণি শ্রীমানী, মঞ্জু দে, সন্ধ্যা রায় ইত্যাদি।

শৌখীন সমাচার

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "নৌকাডুবি" উপন্যাসটির নাট্যরূপ অভিনীত হল সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথের জেনারেল অ্যাকাউন্টস রিক্রিয়েশান ক্লাব (গার্ডেনরীচ) এর উদ্যোগে। শক্তিমান নাট্যকার বীরু মুখোপাধ্যায় নাটকটি পরিচালনা করেন। চরিত্রগুলির রূপদান করেন—তড়িৎ ঘোষ, ধীরেন দাশগুপ্ত, জ্ঞান রায়, সমীর বিশ্বাস, শক্তি রায়, বাসুদেব দে, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা বিশ্বাস, চিত্রা মণ্ডল, মায়া রায়, মেনকা দেবী, রেণু ঘোষ প্রভৃতি। * * * অপরাজেয় সাহিত্য-স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" অবলম্বনে রচিত সুললিতমোহন গোস্বামীর "যোগবিয়োগ" নাটকটি অভিনয় করলেন, রূপ ও ছন্দ। নাট্যপরিচালনার ভারও শ্রীগোস্বামী গ্রহণ করেন। অভিনয়াংশে ছিলেন—দেবী চক্রবর্তী, ধীমান বসু, অজিত দত্ত, অজয় সিংহ, মোহনলাল ভাটিয়া, অরুণ বসু, রতিকা দাশগুপ্ত, গীতা নাগ, রাণু রায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, চিত্রিতা মণ্ডল। * * * খ্যাতনামা নাট্যকার মন্মথ রায়ের দেশাত্মবোধক নাটক "মহাপ্রেম" নাটকটি চন্দননগর ফুটবল মাঠে পথ-নাটকাকারে অভিনয় করলেন চন্দননগরের দিশারী কেন্দ্র। কার্তিক দাসের পরিচালনায় বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিলেন—সুব্রত দাস, প্রশান্ত সেন, নির্মল অধিকারী, অমিতা মুখোপাধ্যায়, শর্বাণী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * * টাটা স্বব ডিলার্স (কণ্ট্রোল ষ্টক) কলিকাতা লিমিটেড রিক্রিয়েশান ক্লাব বিখ্যাত নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের 'বিশ বছর আগে' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হলেন—রমেন দত্ত, জিতেন গুহ, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সেন, অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্বনামধন্য নট কানু বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি পরিচালনা করেন। * * * মৌসুমী নাট্য সম্প্রদায় সম্প্রতি নিবেদন করলেন—"পাশের ঘরের ভাড়াটে"। নাটকটি তরুণ নাট্যকার শচীন ভট্টাচার্য্যের লেখনীজাত। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন—প্রণব চক্রবর্তী, প্রশান্ত বিশ্বাস, জীবেন সরকার, নিতাই গৌতম, নির্মল ভট্টাচার্য, খোকা সেন, মণীন্দ্র সাহা, দীপেন দত্ত, চিত্ত দত্ত, অরুণ গুহ, রাধা দাশগুপ্ত, আলোছায়া চক্রবর্তী, কৃষ্ণা চক্রবর্তী প্রভৃতি।

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপটবিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত নন্দী এবং মোনা চৌধুরী।

॥ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল—১৮৭১ ॥

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মেধাবী রমেশচন্দ্র ১৮৭১ সনে সিভিল সার্ভিসের শেষ পরীক্ষায় ৪৮ জন নির্ব্বাচিত ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন,—ইহা কম গৌরবের কথা নহে। আমরা এই পরীক্ষার ফল ৫ই জুলাই ১৮৭১ তারিখের বিলাতী 'টাইম্‌স' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Civil Service of India :—The following are the names of the gentlemen selected in 1869 who, after two years' training in this country, have passed the final examination :—

1. Smith, Vincent Arthur, North-West Provinces, Panjab, and Oude—8,018.

2. Dutt, Romesh Chandra, Bengal (Lower Provinces).—2,955

3. Johnstone, Pierce De Lacy Henry, North-West Provinces, Panjab, and Oude—2,867

4. Gupta, Bihari Lal, Bengal (Lower Provinces)—2,828

20. Banerjea, Surendra Nath, Bengal (Lower Provinces) – 1,988

The following prizes were awarded at the different periodical examinations and at the final examination :—Mr. V. A. Smith, Indian Law, 10*l*.; Sanskrit, 10*l*.; Persian, 10*l*.; Mr. Dutt, Bengali, 10*l*. and 50*l*.; Political Economy, 10*l*.; Sanskrit, 10*l*.; Mr. Johnstone, Sanskrit, 10*l*.; Mr. Gupta, Bengali, 10*l*.

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ (নভেম্বর-ডিসেম্বর, '৬২)

অন্তর্দেশীয়—

১লা অগ্রহায়ণ (১৭ই নভেম্বর) : প্রবল লড়াই-এর পর ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ওয়ালং ত্যাগ—জং এলাকায় চারবার চীনা আক্রমণ প্রতিহত।

২রা অগ্রহায়ণ (১৮ই নভেম্বর) : সে-লা গিরিবর্ত্ম (নেফা) চীনা হানাদারদের কবলিত—সুবর্ণশ্রী এলাকায় শত্রুপক্ষের নূতন আক্রমণ।

বর্দ্ধমানে চীনা-বিরোধী মিছিল আক্রান্ত—উত্তেজিত জনতা কর্ত্তৃক কম্যুনিষ্ট পার্টির অফিস (স্থানীয়) হানা—সংঘর্ষে প্রায় ৩০ জন আহত।

৩রা অগ্রহায়ণ (১৯শে নভেম্বর) : প্রচণ্ড সংগ্রামের পর কামেং সীমান্ত বিভাগের সদর বমডি-লার পতন—চুশুল এলাকাতেও একটি ঘাঁটি শত্রু (চীনা)-কবলিত।

বেতারে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা : বিপর্য্যয় সত্ত্বেও পরিণামে জয় অনিবার্য্য—শত্রু বিতাড়িত না করিয়া নিরস্ত হইব না।

৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর) : লে: জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত।

৫ই অগ্রহায়ণ (২১শে নভেম্বর) : 'চীনা সরকার কর্ত্তৃক অকস্মাৎ ঘোষিত (২০শে নভেম্বর) যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব গভীর-ভাবে বিবেচনা করা হইবে'—পার্লামেন্টে শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

ভারতের সর্ব্বত্র চীনাপন্থী কম্যুনিষ্টদের ধরপাকড়—পশ্চিমবঙ্গে শ্রীজ্যোতি বসু (কম্যুনিষ্ট নেতা) সহ প্রায় ৬০ জন গেপ্তার।

৬ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর) : ২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি হইতেই (চীনা প্রস্তাব অনুযায়ী) নেফা ও লাডাক উভয় রণাঙ্গনেই গুলীবর্ষণের বিরতি।

ভারত প্রতিরক্ষা বিধি অনুসারে দিল্লীতে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনাম্বুদিপাদ গ্রেপ্তার।

ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক মিশনের দিল্লী উপস্থিতি—চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের সামরিক প্রয়োজন নির্দ্ধারণের উদ্যম।

৭ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর) : ভারত কর্ত্তৃক চীন সরকারের নিকট যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের কয়েকটি বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবী।

নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরুর সহিত বৃটিশ ও মার্কিণ-মিশনের (নেতা : যথাক্রমে স্যার রিচার্ড হাল ও মি: হ্যারিম্যান) বৈঠক।

৮ই অগ্রহায়ণ (২৪শে নভেম্বর) : যুদ্ধ প্রসঙ্গে (চীন-ভারত) আলোচনার জন্য বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব মি: স্যাণ্ডিসেরও দিল্লী আগমন।

৯ই অগ্রহায়ণ (২৫শে নভেম্বর) : দিল্লী জাতীয় প্রতিরক্ষা-পরিষদের প্রথম বৈঠক—সামরিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি গঠিত।

১০ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর) : নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরুর সহিত বৃটিশ মন্ত্রী মি: স্যাণ্ডিসের-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

চীনা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের দাবীকৃত ব্যাখ্যা দিল্লীতে প্রেরিত—কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক বিষয়টি বিবেচনা।

১১ই অগ্রহায়ণ (২৭শে নভেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্য-পরিষদের পুনর্গঠন—দলের সম্পাদক শ্রীভবানী সেন ও দলীয় মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী।

চীনা আক্রমণের প্রতিরোধে বৃটেন কর্ত্তৃক ভারতকে বিনামূল্যে অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা—দিল্লীতে বৃটেন-ভারত চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১২ই অগ্রহায়ণ (২৮শে নভেম্বর) : বরেণ্য শিল্পী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'র (অন্ধগায়ক—বয়স ৭০ বৎসর) লোকান্তর।

আটকাবস্থা হইতে কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীনাম্বুদিপাদের মুক্তিলাভ।

১৩ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর) : কাশ্মীর প্রশ্নে পাক্-ভারত আলোচনার সিদ্ধান্ত—বৃটিশ ও মার্কিণ মিশনের মিলিত উদ্যোগের ফল।

শ্রীনেহরুর নিকট চীনা প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ-এন-লাই'র নূতন লিপি—সর্ব্বশেষ প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা ভঙ্গের হুমকী।

১৪ই অগ্রহায়ণ (৩০শে নভেম্বর) : চীনের নিকট ভারতের নূতন চিঠি প্রেরণ—যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবী।

লে: জেনারেল মানেকশ লে: জে: কাউলের স্থলে ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের কোর কমাণ্ডার নিযুক্ত।

১৫ই অগ্রহায়ণ (১লা ডিসেম্বর) : 'চীন একতরফা সীমা স্থির করিতে পারে না'—চৌ-এর সর্ব্বশেষ নোটের উত্তরে শ্রীনেহরু।

১৬ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর) : জাকার্ত্তা হইতে ফিরিবার পথে বিমানে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের ইতিহাস বিভাগীয় অধিকর্ত্তা ডঃ এস গোপাল ছুরিকাহত—সহযাত্রী এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

১৭ই অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর) : লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি : শুধু পিছন হইতে চীনের সৈন্যাপসারণের সংবাদ—পুরোবর্ত্তী ঘাঁটিগুলিতে এখনও চীনাদের অবস্থান।

১৮ই অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর) : "ডিসেম্বর মাসেই (প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী) রাশিয়া ভারতে 'মিগ' বিমান পাঠাইবে"—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীডাঙ্গের ইউরোপ (রাশিয়া সহ) সফরে যাত্রা—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে ভারতের পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্য।

১৯শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) : গৌহাটির জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা : হানাদার চীনা বাহিনীকে ভারতভূমি হইতে হটাইতেই হইবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচাবন সহ প্রধানমন্ত্রীর তেজপুর উপস্থিতি।

২০শে অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর) : ভারত কর্ত্তৃক সাংহাই লাসাস্থ (চীন) ভারতীয় দূতাবাস বন্ধের সিদ্ধান্ত।

লোকসভায় বার্ত্তাজীবী সাংবাদিক (সংশোধন) বিল গৃহীত।

২১শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর) : সোভিয়েট সহযোগিতায় মহারাষ্ট্র ও উড়িষ্যায় দুইটি 'মিগ' বিমান-নির্ম্মাণ-কারখানা স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত।

২২শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর) : চীনা আক্রমণের বিরোধিতায় কলিকাতায় অভূতপূর্ব্ব মহিলা সমাবেশ—ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে চীনকে বিতাড়নে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবার নেতৃত্বে লক্ষ মাতৃকার শপথ গ্রহণ।

২৩শে অগ্রহায়ণ (৯ই ডিসেম্বর) : ২০শে অক্টোবরের পর চীন কর্ত্তৃক ভারতের নূতন আড়াই হাজার বর্গ মাইল ভূমি অধিকার—কেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রচারিত পুস্তিকায় তথ্য প্রকাশ।

২৪শে অগ্রহায়ণ (১০ই ডিসেম্বর) : চীন সম্পর্কে সরকারী নীতি লোক-সভায় অনুমোদিত—চীনের চরমপত্রের জবাবে শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা : আগে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেকার অবস্থানে ফিরিয়া যাও, তারপর আলোচনা।

২৫শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর) : বমডিলার পনের মাইল দক্ষিণে চীনা সৈন্য সমাবেশের সংবাদ (উদ্দেশ্য অজ্ঞাত)।

২৬শে অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর) : চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নে দিল্লীতে শ্রীনেহরুর সহিত রুশ রাষ্ট্রদূত বেনেডিকটভের দীর্ঘ আলোচনা।

রাজ্য-সভাতেও বার্ত্তাজীবী সাংবাদিক (সংশোধন) বিল গৃহীত।

২৭শে অগ্রহায়ণ (১৩ই ডিসেম্বর) : 'জরুরী অবস্থায় খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা নাই : সরকারী গুদামে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত আছে'—কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব শ্রীপাতিলের ঘোষণা।

২৮শে অগ্রহায়ণ (১৪ই ডিসেম্বর) : চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে কলিকাতায় শিক্ষক সমাজের প্রবল ধিক্কার—রাজপথে অধ্যাপক ও শিক্ষকদের বিরাট মৌন মিছিল।

নেফায় কয়েকটি স্থান হইতে চীনা সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ—বমডিলা, ওয়ালং ও মিচুকা মুক্ত।

২৯শে অগ্রহায়ণ (১৫ই ডিসেম্বর) : নেফা প্রশাসনের পুরোবর্ত্তী দলের বমডিলা (সদ্য শত্রুকবল-মুক্ত) উপস্থিত—বমডিলায় আবার ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন।

৩০শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর) : শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক বিমানে লাডাকের অগ্রবর্ত্তী অঞ্চল পরিদর্শন।

বহির্দেশীয়—

১লা অগ্রহায়ণ (১৭ই নভেম্বর) : ক্রমাগত হাঙ্গামা চলিতে থাকায় লিওপোল্ডভিলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

৩রা অগ্রহায়ণ (১৯শে নভেম্বর) : মার্কিন সরকারের নিকট ভারতের আরও অস্ত্রসাহায্য প্রার্থনা—ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সহিত রাষ্ট্রদূত শ্রী বি, কে, নেহরুর (ভারতীয়) বৈঠক।

৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর) : পিকিং সরকার কর্ত্তৃক ভারতের সহিত অকস্মাৎ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা : ২১শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি হইতে ব্যবস্থা বলবৎ—১লা ডিসেম্বর সৈন্য প্রত্যাহার সুরু।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক কিউবায় নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার।

৭ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর) : আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রনায়কদের নিকট চীনা প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এর বার্ত্তা—চীন-ভারত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় সাহায্য করার আবেদন।

৮ই অগ্রহায়ণ (২৪শে নভেম্বর) : অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য পাক্‌প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের নিকট চীনের লিপি—ভারতের বিরুদ্ধে পিকিং সরকারের ষড়যন্ত্র।

৯ই অগ্রহায়ণ (২৫শে নভেম্বর) : চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসায় সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক কর্ত্তৃক কলোম্বো-এ জোট-বহির্ভূত আফ্রো-এশীয় ছয় জাতির (সিংহল, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র ও ঘানা) সম্মেলন আহ্বান।

১০ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর) : জেনেভায় ১৭ জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন পুনরারম্ভ।

১২ই অগ্রহায়ণ (২৮শে নভেম্বর) : কায়রো-এ প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত সফররত ভারতীয় আইন-মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের বৈঠক—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ প্রশ্নে ভারতীয় বক্তব্য যথাযথ পেশ।

১৪ই অগ্রহায়ণ (৩০শে নভেম্বর) : পাঁচ বৎসরের জন্য উ থাণ্ট (ব্রহ্ম) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল নির্ব্বাচিত।

১৫ই অগ্রহায়ণ (১লা ডিসেম্বর) : আক্রায় ঘানা প্রেসিডেণ্ট নক্রুমার সহিত শ্রী এ, কে, সেনের (ভারতের আইন-মন্ত্রী) আলোচনা—আলোচ্য বিষয় : ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গ।

১৮ই অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর) : ৫০ দিন পর দুই হাজার পাকিস্তানী নাবিকের (জয়েণ্ট ষ্টীমার কোম্পানীর) ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার।

২১শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর) : মস্কো-এ ক্রুশ্চেভের (রুশ প্রধান মন্ত্রী) সহিত সফরকারী যুগোশ্লাভ প্রেসিডেণ্ট টিটোর দুই-দিবসব্যাপী আলোচনা—উভয় নেতার মধ্যে পূর্ণ বোঝাপড়ার সংবাদ।

২২শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর) : ব্রুনিতে (বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য) সশস্ত্র বিদ্রোহ—প্রতিরোধ দিবার জন্য সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ ফৌজ প্রেরিত।

২৩শে অগ্রহায়ণ (৯ই ডিসেম্বর) : ভারতের নিকট চীনা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের সুস্পষ্ট জবাব দাবী—পিকিং-এর চরম পত্র।

২৪শে অগ্রহায়ণ (১০ই ডিসেম্বর) : চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসার উপায় উদ্ভাবন কলম্বো জোটবহির্ভূত ছয়টি আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন।

২৫শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর) : চীন-ভারত বিরোধ মিটাইবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কলম্বো সম্মেলন কর্ত্তৃক ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া ও আরব প্রজাতন্ত্রকে লইয়া কমিটি গঠন।

২৬শে অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর) : কলম্বো সম্মেলনে চীন-ভারত বৈঠকের ব্যবস্থাকল্পে প্রস্তাব গৃহীত—প্রস্তাব সহ শ্রীমতী বন্দরনায়ককে (সিংহলের প্রধান মন্ত্রী) দূতরূপে পিকিং ও দিল্লী প্রেরণের ব্যবস্থা।

ব্রুনির বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত।

২৮শে অগ্রহায়ণ (১৪ই ডিসেম্বর) : শুক্রগ্রহ হইতে পৃথিবীতে প্রথম বার্ত্তা প্রেরণ—মার্কিণ মহাকাশ-যান 'ম্যারিনার—২'এর অত্যাশ্চর্য্য সাফল্য। আমেরিকা কর্ত্তৃক নূতন বার্ত্তাসহ উপগ্রহ 'রিলে' উৎক্ষেপণ।

৩০শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর) : রাজা মহেন্দ্র কর্ত্তৃক নেপালে নূতন শাসনতন্ত্র (পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে পঞ্চায়েৎ প্রথা) প্রবর্ত্তন।

অকর্মা ডেপুটি

কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন ডেপুটি-মন্ত্রী নাকি সাংবাদিকদের কাছে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের কোন কাজ নাই—ফলে তাঁহাদের সময় কাটানোই দায়। সাংবাদিকরা প্রধান মন্ত্রীর সাংবাদিক-সম্মেলনে কথাটা তাঁহার কানে তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে লাভ না লোকসান—কোন্‌টা হইয়াছে বলা কঠিন। শ্রীনেহরু (বোধ হয় রাগত স্বরেই) বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময় সব মন্ত্রীরই কাজ বাড়িবার কথা। এখন যদি কোন কোন মন্ত্রী মনে করেন তাঁহাদের কোন কাজ নাই, তবে ভদ্রলোকদের নামগুলি জানাইয়া দিন। তাঁহাদের কার্য্যভার হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু যাহাদের কাজই নাই, তাহাদের কাজের ভারই বা কেমন করিয়া থাকিবে, আর কার্য্যভার হইতে রেহাই-ই বা কেমন করিয়া দেওয়া হইবে? এ প্রশ্নের জবাব অবশ্য শ্রী নেহরু দেন নাই, কারণ দিবার কোন দরকার ছিল না। তবে আমরা ভাবিতেছি, কাজ নাই বলিয়া অনুযোগ করিতেছেন এমন বেরসিক ডেপুটি-মন্ত্রী কাহারা? আজকালকার দিনে কেবল গায়ে হাওয়া লাগাইয়া মোটা বেতন পাওয়ার সৌভাগ্য কয়জনের জোটে? এই সৌভাগ্য সম্বন্ধেও আবার অনুযোগ?

—দৈনিক বসুমতী।

আশার ছলনায়

আশা আর আশা। শুনিতে শুনিতে কানে ব্যথা হইয়া গেল। কিন্তু 'আশার ছলনে ভুলি' এ পর্যন্ত কী লাভ হইয়াছে, কতটা লাভ হইয়াছে? বাঙালীর খাদ্যে কিছুটা পুষ্টির ছোঁয়া লাগায় যে বস্তুগুলি, তাহার মধ্যে তিনটি বস্তুই অর্থাৎ দুধ-মাছ-মাখন এখনও প্রাপ্যতা ও মূল্য উভয় দিক দিয়াই সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাংলার মৎস্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন, বিহার হইতে মাছ আমদানির কথাবার্তা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। অতএব আশা করা হইয়াছে, মৎস্য-সমস্যার কিছুটা সুরাহা হইতে পারে। বেলগাছিয়ার সরকারী দুধের কারখানা চালু হইবার পর দুধের পরিমাণ বাড়িয়াছে। নূতন বৎসরে এই পরিমাণ আরও বাড়িবে বলিয়া সরকারের আশা। সরকারী দুগ্ধ-বিক্রয়কেন্দ্রগুলি হইতে গত দেড় মাস মাখন বিক্রয় বন্ধ ছিল। এ সম্বন্ধেও সরকারের আশা,—এই বৎসরের প্রথম দিক হইতেই দুগ্ধ-কেন্দ্রগুলি হইতে আবার মাখন বিক্রয় করা যাইবে। তবু ভাগ্য, নূতন বছরে কেবলা নিরাশার কথা না শুনিয়া গোটা কয়েক আশার বাণী শুনিতে পাওয়া গেল। আশার গাছে ফল ফলুক আর না ফলুক পশ্চিম-বঙ্গবাসী কয়েকটা দিন অন্তত আশায় বুক বাঁধিয়া কাটাইতে পারিবে। মাংস লইয়া আশা-নিরাশার কথা তুলিব না। মাংস পাতে পড়িবার সৌভাগ্য বছরে কয়জনেরই বা কত দিন হয়? তবু গাছের উচ্চ নাসা কিছুটা নিচু হইয়াছে বলিয়া কিছু কিছু লোক অন্তত এখন তাহা ছুঁইতে পাইতেছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

মীমাংসা কি সম্ভব?

ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে ১৯৫১ সালের চুক্তি অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে কোন পক্ষই অপর পক্ষের সম্মতি ব্যতীত একতরফা ভাবে ফেণী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করিতে পারে না।

কিন্তু পাকিস্তান এই চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া সাব্রুম মহকুমার অমরপুর গ্রামের বিপরীত দিকে ইতিমধ্যেই ১৩টি বাঁধ নির্মাণ করিয়াছে এবং কিছু আগাইয়া আরও কয়েকটি বাঁধ দিয়াছে। ত্রিপুরার প্রশাসন-কর্তৃপক্ষ যথারীতি ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং যথারীতিই পাকিস্তান যে উহাতে কর্ণপাত করিবেন না, ইহাও সহজেই অনুমেয়। কাশ্মীর ও অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক দফা আলোচনা রাওয়ালপিণ্ডিতে হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে উভয় দেশের মধ্যে যাহাতে কোন প্রকারের তিক্ততার সৃষ্টি হইতে না পারে, তৎসম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে। পাকিস্তানের চুক্তি লঙ্ঘনের এই ব্যাপারটা মীমাংসার আলোচনার মধ্যে আছে কিনা, আমরা সম্যক অবগত নহি। যদি না থাকে, তাহা হইলে ইহার মীমাংসা বা প্রতিকার কি ভাবে সম্ভব হইবে?

—যুগান্তর।

চৈনিক শঠতা

তিব্বত ও ভারতবর্ষের মধ্যভাগের সীমানায় উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশ। ইহাও প্রাকৃতিক জলবিভক্ত নদীর ধারা অনুধাবনকারী। পুরানো রাজস্ব রেকর্ডে ইহার বহু জায়গার উল্লেখ আছে, যাহাতে এই জায়গাগুলির উপরেও ভারতীয় অধিকার নিশ্চিত করে। জম্মু ও কাশ্মীরের সীমানা হইল সিংকিয়াং ও তিব্বত। দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০০ মাইল, লাদাক জেলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। সুপরিচিত এবং দীর্ঘ রীতিপুত এই সীমানা একদিকে কাশ্মীরের ও অপর দিকে দালাই লামা ও চীন সম্রাটের প্রতিনিধির দ্বারা ১৮৪২ সালে চুক্তিতেও অনুমোদিত হইয়াছিল। পরে ভারতীয় কর্মচারী দ্বারা এই জায়গা পর্যবেক্ষিত হয় এবং ভারতীয় মানচিত্রে ঠিক এই সীমানাই যথাযথভাবে দেখান হয়। আজও ভারতের সরকারী মানচিত্রে যে সীমানা দেখানো হয়—১৮৯৩, ১৯১৭ ও ১৯১৯ সালে চীন সরকারের প্রকাশিত মানচিত্রেও ঠিক সেই সীমানা দেখান হয়। কোন নীতি বা আদর্শ নহে—শুধু মাত্র সামরিক মদমত্ত চীনা ফৌজ কপট বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে ১৯৫৪ সালের পর হইতে ভারতভূমির বিস্তৃত অঞ্চল গ্রাস করিয়াছে। পররাজ্য-লোলুপ চীনা সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য আচরণ বিশ্বের ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অভিন্ন সত্তা ও শান্তিপূর্ণ সহবাস নীতি প্রযুক্ত পঞ্চশীল চুক্তির অংশীদার চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর এই বিশ্বাসঘাতকতার তুলনা বিরল।

—জনবাণী (কলিকাতা)

পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

পাটকল ও পাটচাষী—এই দুই অবস্থানের দিকে পাটকলের হাতে ব্যবসায় মুনাফার ভাল সময় আসিয়াছে দেখা যাইতেছে। কিন্তু চলতি মরশুমে পল্লীগ্রামের পাটচাষী ১২্ ১৫্ টাকায় মণদরে পাট বিক্রয় করিয়াছে। পাটের সর্ব্বনিম্ন দাম ৩০্ টাকা। পাটকলের খাতায় পাট খরিদা ৩০্ টাকা দরে লেখা হইয়াছে। সুতরাং পাটচাষী হইতে মিল পর্য্যন্ত ঘাটতি ১৮্ ১৫্ গেল কোথায়? পল্লীগ্রামের পাটচাষী হইতে মিল পর্য্যন্ত ফড়ে, দালাল, ব্যবসায়ী বহু হাত ঘুরিয়া একটা মোটা অংশ চলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ একশত টাকায় একশত টাকা মুনাফা (১০০%) যদি ফড়ে, দালাল, ব্যবসায়ীদের হাতে যায়, তবে ইহাই বুঝিতে হইবে, পাট উৎপন্ন করিয়া কৃষক যে টাকা পায়, উহার সমপরিমাণ টাকা মধ্যপথে ফড়ে, দালাল, ব্যবসায়ীরা লাভ করে। আমাদের মনে হয় এইখানে কোথায়ও হিসাবের কারচুপি আছে। মিলের কাগজ কলমের দাম ধরিয়া এই হিসাবের মিল গরমিল ধরা যাইবে না। সরকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্ট ব্যতীত কৃষকদের পাট খরিদ নিষিদ্ধ করা উচিত। দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটকালে যাহাতে পাটের উৎপাদন হ্রাস না পায়, এইরূপ জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে কৃষক-বাড়ীর কাঁচা পাট ফড়ে দালালদের হাতে ছাড়িয়া রাখা উচিত হইবে না। ইহার ফলে পাটের কাগজ কলমের দাম আর কৃষকদের হাতে প্রাপ্ত দামের এক বিরাট ব্যবধান—যাহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। —বারাসত বার্ত্তা।

অর্থ সংগ্রহ ও মেদিনীপুর

অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারেও আমরা বিশেষ ত্রুটী দেখিতে পাই। অর্থ বা সোনা যাঁহারা দান করিতেছেন, তাঁহারা শান্তিকামী দেশবাসী। কিন্তু দেশের মধ্যেই বহু বিদেশী ও দেশী ধনী আছেন—যাঁহারা এই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁহাদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহারা কিন্তু দেশের এই বিপদে প্রায়ই উন্মুক্ত হৃদয়ে আগাইয়া আসিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেশের এই দুর্দ্দিনে সহযোগিতা না করিয়াছেন দেশবাসীর সহিত, না করিয়াছেন সরকারের অনুসৃত নীতির। কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালিকা যখন মেদিনীপুর সহরে দান গ্রহণের জন্য আসেন, তখন আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি সহরের অধিকাংশ অভাবগ্রস্ত দেশবাসীই রাজ্যপালিকার ডাকে সাড়া দিয়াছেন, অবশ্য মুষ্টিমেয় ধনীজনও তাঁহাদের নাম কামাইবার ইচ্ছায় কিছু দান করিয়াছেন কিন্তু তাহা অপেক্ষা তাঁহারা আরও বেশী কিছু নিশ্চয় দিতে পারিতেন কিন্তু তাহারা তাহা দিতে কুণ্ঠিত বোধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা আশা করি, সরকার সত্বর ব্যাপক-ভাবে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিবেন ও দেশবাসীকে তাহাদের গুরু দায়িত্বের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করাইবেন। সরকারকে আমরা আরও অনুরোধ করি, সরকার যেন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর বৃদ্ধিরোধে তৎপরতা দেখান, বিলম্বে জঠরানল কুরুক্ষেত্র বাধাইতেও পারে। —মেদিনীপুর হিতৈষী।

যুদ্ধে প্রেম ও অহিংসা

মানুষ বেশী কথা বলিলেই বহু যুক্তিহীন অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা আপনি আসিয়া পড়ে। বিশ্বে জাপানী ও বৃটিশ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পভাষী এবং ভারতবাসী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কথা বলা জাতি বলিয়া পরিচিত। বেশী কথা বলিলে চিন্তার সময় কম পাওয়া যায়। গভীর চিন্তা না করিয়া কথা বলিলে সে কথা হয় হাল্কা এবং তাহা চিন্তাশীল মানুষের অন্তরে স্থান লাভ করিতে পারে না। বিশ্বের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রীই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কথা বলেন। যাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর এবং যাহার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উপলক্ষে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কিত বক্তৃতা অপেক্ষা চীনের যুদ্ধ এবং প্রেম ও অহিংসা সম্পর্কেই বেশী বলিয়াছেন। চীনের আক্রমণ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"আমরা আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব, উহার প্রতিরোধ করিব এবং উহাদিগকে বিতাড়িত করিব।" সুন্দর সংকল্পের কথা, শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ভারতবাসীর অন্তরের কথা ঐ কয়টি বাক্যের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরেই প্রধানমন্ত্রী যাহা বলিতেছেন, তাহার অর্থ ও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। —বীরভূম বাণী।

পাকিস্তানের সমস্যা

ভারতের প্রতিনিধিগণ যখন রাওয়ালপিণ্ডিতে কাশ্মীর সমস্যা মীমাংসার জন্য খোলা মন লইয়া যাত্রা করিলেন, ঠিক তখন-ই প্রকাশিত হইল,—কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান জবরদখল করিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রহিয়াছে বলিয়া নীতিগতভাবে চীন পূর্ণ সমর্থন করিয়াছে। ইহার দ্বারা চীনের সিংকিয়াং ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্যে সীমারেখা রক্ষার ভার পাকিস্তানের উপর বর্ত্তাইয়াছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী বলিয়াছেন, ইহার দ্বারা পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার রক্ষিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চীনের অধিকারও রক্ষিত হইবে। পাকিস্তান আরো বলিয়াছে, ভারত যদি এই সময় কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা না করে, তবে পাকিস্তান তাহাদের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ ভারত যদি অধিকার ছাড়িয়া না দেয়, তবে পাকিস্তান আক্রমণ করিবে। অবশ্য ইতিমধ্যে মিঃ কেনেডি আয়ুবের নিকটে পুনরায় পত্র দিয়াছেন। —জনমত (জলপাইগুড়ি)

বর্দ্ধমান রাজকলেজ প্রসঙ্গে

বর্দ্ধমান রাজকলেজের আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও পড়াশুনা সম্পর্কে সাধারণ সহরবাসীর ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। সম্প্রতি আমাদের পত্রিকায় এই বিষয়ে যে দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তা সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী। আমরা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি—ইদানীং এক বৎসরের পরীক্ষার ফলাফল আশাব্যঞ্জক। তবু উচ্ছ্বসিত হইবার মত কারণ নাই এবং অধ্যাপকগণের মধ্যে দলাদলি সন্দেহ-ভূত হইলেও, নিঃশেষিত নয়। আমাদের কাছে অবশ্য এরূপ পত্রও আসিয়াছে, যাহার বক্তব্য কোন কোন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে—যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাঠ্যপুস্তক নোটের 'ক্যানভাস' করেন এবং তাঁহাদের অধ্যাপনা নিছক ওই সমস্ত কাজের অন্যতম সুযোগ হিসাবে ব্যবহৃত। প্রতিষ্ঠানটির সুনামের স্বার্থে আমরা তাহা প্রকাশের যোগ্যতা দিই নাই—কারণ কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষকে অহেতুক হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা আমাদের নাই। বর্দ্ধমান রাজকলেজ সহরের

অন্যতম কলেজ। আজ যাঁরা স্থানীয় নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বহুলাংশ উক্ত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। অধ্যাপকগণের অবহেলা ও দলাদলির আবর্ত্ত হইতে মুক্ত হইয়া শিক্ষা, খেলাধূলা ও অন্যান্য বিষয়ে কলেজটি আদর্শ স্থানীয় হউক—ইহা সকলের কাম্য।

—নিশান (বর্দ্ধমান)

মৎস্য আমদানী

বে-আইনীভাবে চোরা পথে মৎস্য আমদানী সীমান্তের দুর্নীতি কার্য্যকলাপে সহায়তা করিতেছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। চোরাপথে মৎস্য আমদানীর সুযোগে ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রী বে-আইনীভাবে রপ্তানীরও সুযোগ পায়। চোরাপথে কারবারের ফলে পাকিস্তানী মুদ্রার প্রচলনও বন্ধ করা প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সীমান্তে চোরাপথে বে-আইনী মাল আমদানী ও রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রচেষ্টা যখন চলিতেছে, তখন আইনসঙ্গত উপায়ে নির্দ্ধারিত রুটে মৎস্য এবং অন্যান্য কাঁচা মাল আমদানীর ব্যবস্থাটিও পাকাপাকিভাবে থাকা বাঞ্ছনীয়। অসামরিক শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হইয়া এ ব্যবস্থা করিতে হইবে। আসাম কিম্বা পশ্চিমবঙ্গেও বিপুল পরিমাণ মাছ পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে প্রত্যহ রপ্তানী হইয়া থাকে। তথাকার গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের চাহিদার উপর দৃষ্টি রাখিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে মৎস্য আমদানীর ব্যাপারটিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন—যার ফলে ঐ রাজ্যের সরবরাহের বহুলাংশ শিডিউল্ড রুটেই পৌঁছে। প্রতি ছয় মাস অন্তর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আমদানী রপ্তানী চুক্তি হয় এবং ঐ চুক্তি বলে মৎস্য, ডিম ও অন্যান্য কয়েকটি দ্রব্যের ব্যবসা অপেন জেনারেল লাইসেন্স মারফতই চলার কথা। অপেন জেনারেল লাইসেন্সের সুযোগ পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারে কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সুযোগের যৎসামান্যই পাওয়া যাইতেছে। ত্রিপুরা প্রশাসন এ বিষয়ে সক্রিয় হইলে এই অবস্থার নিবৃত্তি ঘটিতে পারে। মৎস্য আমদানীকারকদের সহিত আলোচনাক্রমে জানিতে হইবে অপেন জেনারেল লাইসেন্সে মৎস্য আমদানীর অন্তরায় কোথায়। যদি আমদানীকারকদের লাইসেন্সের অভাব থাকে, তবে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগে সমর্থ আমদানীকারকও খুঁজিতে হইবে। শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতি থাকিলে যোগ্য আমদানীকারকের সংখ্যা বৃদ্ধিই হইবে।

—সেবক (ত্রিপুরা)

পাকিস্তানী সৌহার্দ্য

গত ২৯শে ডিসেম্বর মাত্র রাওয়ালপিণ্ডি বৈঠকের পর ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণ উভয় দেশের সংবাদপত্রে, সরকার ও জনসাধারণের নিকট এক যুক্ত আবেদনে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যেন উভয় দেশের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং এমন কোন মন্তব্য, বিবৃতি দান বা সংবাদাদি প্রকাশ না করেন—যাহাতে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু সেই আবেদনের কালি শুকাতেও পারে নাই—পাকিস্তান ত্রিপুরার সীমান্তে পূর্ব চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ফেণী নদীতে হানা তৈরী করিয়াছে এবং করিতেছে। ত্রিপুরা সরকার এই সম্পর্কে যথারীতি প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, যেখানে উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির আবেদন জানান হইয়াছে—সেখানে পাক কর্ত্তৃপক্ষ কি উহা নিজের দেশের সরকারী কর্মচারীদের জানান নাই? না, মনে করিয়াছেন ঐ আবেদন শুধু ভারত তথা ভারতবাসীর জন্যই, পাক-সরকার বা পাকিস্তানীদের উহা পালন না করিলেও চলিবে? না কি তাঁহারা মনে করিয়াছেন আইন ভঙ্গ করিলেও সৌহার্দ্য বজায় থাকে? আমরা এই গুরুতর ব্যাপারটির প্রতি উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের—বিশেষ করিয়া ভারত-পাক

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্ত্তন উৎসবে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এবং ডাঃ ত্রিগুণা সেনকে দেখা যাচ্ছে।

বৈঠকের প্রতিনিধিদের—আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিষয়টি সৌহার্দ্যের পরিপন্থী এবং কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য না করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, এইরূপ আচরণ দ্বারা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে না।

—গণরাজ (আগরতলা)

ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসুর স্মৃতি-উৎসব

বাংলার অন্যতম প্রথিতযশা সন্তান স্বর্গত ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসুর ৯০তম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর আমহার্স্ট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে এক মনোজ্ঞ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন ও সভায় পৌরোহিত্য করেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ-

ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসুর স্মৃতি-উৎসবে বক্তৃতারত আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষচৌধুরী। সভায় ডাঃ বসুর প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন ডাঃ সরল দত্ত, কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, বিখ্যাত শিল্পপতি ও ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবোরেটারী লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীরাধারমণ মিত্র, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত শ্রীকালীচরণ ঘোষ এবং সুসাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার দে। প্রত্যেক বক্তা তাঁদের ভাষণে বাঙলার এই বরেণ্য সন্তানের বহুমুখী প্রতিভার প্রতি আলোকপাত করেন এবং তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীর মানবত্তা সম্পর্কে উপভোগ্য, সুবিস্তৃত ও প্রাঞ্জল আলোচনা করেন।

শোক-সংবাদ

কৃষ্ণচন্দ্র দে

সুর-সরস্বতীর অন্যতম বরপুত্র, একনিষ্ঠ সুরসাধক, ভারতের প্রথিতযশা গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে গত ১২ই অগ্রহায়ণ ৭১ বছর বয়সে তিরোহিত হয়েছেন। বাঙলার গায়কগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর আসন ছিল পুরোভাগে। তাঁর ভক্তিমূলক ও কীর্তনগানগুলি বাঙালীর হৃদয় মথিত করে রেখেছে। তাঁর মধুর, উদাত্ত, অপূর্ব কণ্ঠে দরদ এবং লালিত্যভরা গানগুলি শ্রোতৃসাধারণের মনোমধ্যে যে কি প্রভাব বিস্তার করেছে এবং কি বিচিত্র ভাবানুভূতির সৃষ্টি করেছে, তা সর্বজনবিদিত। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতেও তাঁর প্রসিদ্ধি উল্লেখনীয়। সঙ্গীতজগত ছাড়া বহু নাটক এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গায়ক এবং অভিনেতারূপে তাঁর প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। শিশিরকুমারের সঙ্গে তিনি একাধিক নাটকে শিল্পী হিসেবে অবতীর্ণ হন। তাঁর তিরোধানে বাঙলার সংস্কৃতি-জগত থেকে একটি উজ্জ্বলরত্ন অন্তর্হিত হল।

কুমুদবন্ধু সেন

প্রবীণ সাহিত্যসেবী কুমুদবন্ধু সেন গত ২৮এ অগ্রহায়ণ ৮৩ বছর বয়েসে গতায়ুঃ হয়েছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তিনি প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গিরিশ লেকচারার নির্বাচিত করেন। কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের এবং বহু প্রবন্ধের রচয়িতা হিসেবে সাহিত্যজগতে তাঁর শক্তির স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন।

জিতেন্দ্রচন্দ্র গুহঠাকুরতা

বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ জিতেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা গত ১ই অগ্রহায়ণ ৭৬ বছর বয়েসে লোকান্তরযাত্রা করেছেন। বিদ্যাসাগর এবং চারুচন্দ্র কলেজের সঙ্গে ইনি বহুদিন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দেশবন্ধু গার্লস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যক্ষের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

যতীশচন্দ্র দে

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বাঙালী অধ্যক্ষ লেঃ কঃ যতীশচন্দ্র দে গত ১ই অগ্রহায়ণ ৭৫ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং আপন প্রতিভায় ও একনিষ্ঠ সাধনায় দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের মধ্যে আসনলাভ করেন।

নবদ্বীপ হালদার

বাঙলার জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা নবদ্বীপ হালদারের গত ১ই অগ্রহায়ণ ৬৪ বছর বয়েসে জীবনবিয়োগ ঘটেছে। বহুকাল যাবৎ তিনি বাঙলার চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন ও অংসখ্য চিত্র ও নাটকে কৌতুকাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে দর্শক সাধারণ্যে অফুরন্ত আনন্দরস বিতরণ করে গেছেন।

সুলেখা সান্যাল

শক্তিময়ী লেখিকা সুলেখা সান্যালের গত ১৮ই অগ্রহায়ণ মাত্র ৩৩ বছর বয়েসে অকালে জীবনাবসান হয়েছে। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার স্পর্শসমৃদ্ধ রচনাগুলি পাঠক সমাজে সমাদর ও অভিনন্দন লাভ করেছে। তিনি বসুমতীর একজন নিয়মিত লেখিকা ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
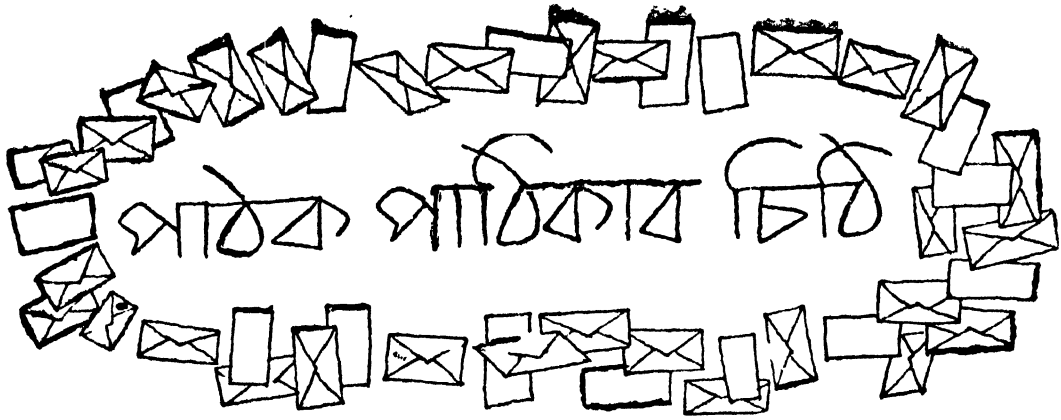
মল্ল মল্ল বড় গামা

মাননীয় মহাশয়,

আপনার বহুল-প্রচারিত 'মাসিক বসুমতী'র বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'বিশ্বজয়ী মল্ল গামা'কে দেখলাম। [ইতিপূর্বে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (৬ নভেম্বর, ১৯৬০ : রবিবার : ২০ কার্তিক, ১৩৬৭) তাঁর 'গামা বনাম বিস্কো'র কুস্তিও দেখেছিলাম। উভয় লেখা একই ধারার এবং একই ভাষায় হলেও 'আনন্দবাজার'-এর লেখা নিয়ে কিছু বলব না। আপনার কাগজে প্রকাশিত লেখাটির অগণিত ভুল সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করার রুচি বা সময় আমার নেই। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, কুস্তি-বিদ্যায় ভারতের যে চমকপ্রদ বিস্ময়কর এবং গৌরবময় ইতিহাসের যৎসামান্য উপাদান উদ্ধার করতেও আমাকে অন্তত: ৪০ বছর পরিশ্রম করতে হয়েছে, এই ভদ্রলোক রাতারাতি এবং নির্বিবাদে সেই উপাদানকে আত্মস্থ করতে উদ্যোগী হয়েছেন! শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রচেষ্টা পরশ্রম-জীবনবৃত্তির এক দৃষ্টান্ত মাত্র।]

আমি বিনা দ্বিধায় বলছি, তাঁর লেখার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ আমার বই থেকে নেওয়া; [চ্যালেঞ্জ করলে, আমি বলতে পারি, তথ্যের সমর্থন-জ্ঞাপক রেফারেন্স তিনি দিতে পারবেন না। কিন্তু সেজন্য ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত নই। কেন না, আমি আমার পরিশ্রমের ফল দেশবাসীদের দিয়েছি। অতএব আমার বইয়ের তথ্যাবলী যে-কেউ নিতে পারেন। কিন্তু আমার ভাবতে কষ্ট হয়, 'মাসিক বসুমতী'র মতো একখানা প্রথম শ্রেণীর কাগজের একজন লেখকের নিজস্ব ভাষা কিছু নেই। একথা বলার কারণ,] তাঁর ব্যবহৃত ভাষা প্রায় আমারই ভাষা,—দুই চারটি শব্দ বা পংক্তি কিংবা বাক্যমাত্র নয়, সময়ে পুরো অনুচ্ছেদ পর্যন্ত; আমি একনজরে যেটুকু দেখেছি, তাতেই বলতে পারি, দুই চারটে শব্দের সামান্যতম হেরফের করে তিনি আমার বই থেকে অন্ততঃ ১০১টি পংক্তিকে নিজের নামে ছেপেছেন! তাঁর এই বেপরোয়া কীর্তি অতিমাত্র দুঃসাহসিক, তাতে সন্দেহ নেই।

[কিন্তু শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এই অন্ধ অনুকরণ-প্রবণতার ফলে কতখানি অন্ধকারে নেমেছেন, তার দু একটি উদাহরণ দেব।]

এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'অল্-ইন কুস্তির বর্তমান নাম 'আমেরিকান ফ্রী স্টাইল' হয়েছে। [আমি স্বীকার করি], আমার বইতেও এই কথা আছে। কিন্তু [তিনি কি সাধারণ বুদ্ধি দিয়েও বুঝতে পারলেন না যে, আমার বইয়ের সব কথা শেষ কথা হতে পারে না?] আমার উল্লিখিত বই (মল্ল জগতে ভারতের স্থান) প্রকাশের পর ছয় বছর পেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে 'অল্-ইন্' কুস্তিবাজদেরও বুদ্ধি পেকেছে! [তাই নিজেদের ব্যবসা-কারবারকে আরো জাঁকিয়ে তোলার জন্য তাঁরা নতুন ফন্দী এঁটেছে, অর্থাৎ] তারা আজ 'আমেরিকান ফ্রী স্টাইল'এর সাইনবোর্ডটিকেও পাল্টিয়ে তারা সোজাসুজি পৃথিবীর সব চেয়ে জনপ্রিয় মূল 'ফ্রী-ষ্টাইল'এর নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছে! [এ বিষয়ে সম্প্রতি আমি একখানা প্রথম শ্রেণীর বাংলা মাসিকে লেখা পাঠিয়েছি; ছাপা হলে লেখক হয়তো তার মধ্যে কিছু নতুন তথ্য পাবেন।]

লেখক আর এক জায়গায় বলেছেন, ১৯১০ অব্দে গামার কাছে বিস্কো যে কুর্মাবতার কুস্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, এবং তার জন্য বিলাতী কাগজে যে বিরক্তি বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তার জের চলেছিল ১৩ বছর পর্যন্ত। আসলে, আমিও আমার বইতে এই কথা লিখেছিলাম; কিন্তু তা লিখেছিলাম একটা বিশেষ কারণে, অর্থাৎ ১৯২৩, ২৩শে মার্চ বিলাতী 'হেলথ্ অ্যাণ্ড ষ্ট্রেংথ' পত্রে প্রকাশিত মিঃ বো'র লেখা উপলক্ষে। প্রকৃত পক্ষে, সেই কুস্তির প্রত্যক্ষদর্শীরা ১৯৩২-৩৩ অব্দ পর্যন্ত ঐ একই কাগজে বিস্কোকে কটাক্ষ করে মাঝে মাঝে লেখা ছেপেছেন! লেখকের তা জানা থাকলে, নিশ্চয় তিনি ১৩ বছরের জায়গায় ২৩ বছর লিখতেন।

তারপর, পাতিয়ালায় গামা-বিস্কোর শেষ কুস্তির কথা ধরা যাক। সেদিন সেখানে চল্লিশ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল। কিন্তু আমার বইয়ে দৈবক্রমে 'কুড়ি হাজার' ছাপা হয়ে যায়। ভেবেছিলাম, পরবর্তী সংস্করণে ওটা শুধরে নেব। কিন্তু আশ্চর্য, তার আগেই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় 'কুড়ি হাজার'-এর জায়গায় 'বিশ হাজার' বলে চীৎকার সুরু করেছেন! [তাঁর এরূপ দুই-একটি শব্দ বদল করে অন্যের লেখাকে নিজের নামে চালানর প্রচেষ্টা ছেলেমানুষি হলেও অভিনব সন্দেহ নেই!]

আমি আমার বইয়ের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু আমার সম্মানিত বন্ধু কি করবেন? ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে—

বিনীত—সমর বসু।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

অধ্যক্ষ, শ্রীবালানন্দ সংস্কৃত কলেজ, ডাক—আশ্রম, করনীবাদ, (বৈদ্যনাথ-দেওঘর হয়ে), সাঁওতাল পরগণা • • • শ্রীমতী প্রভাতী দত্ত, মিত্র হাউস নং ২ (off ভগবতনারায়ণ রোড), পাটনা-৩ • • • শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব, ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি-মন্দির, গোকর্ণ, ডাক গোকর্ণ, জেলা মুর্শিদাবাদ • • • Dr. N. P. Sen, 2 Arthur Terrace, Mount Batten Road, Singapore

15 • • • অধ্যক্ষ, ডিপার্টমেণ্ট অফ রুরাল সার্ভিসেস, জামিয়া রুরাল ইনষ্টিটিউট, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, জামিয়া নগর, নয়াদিল্লী • • • শ্রীসোনাধর সামন্ত, অবধায়ক শ্রীনিত্যানন্দ মান্না, জেলা বাঘপুরা, ডাক বালিশাই, মেদিনীপুর • • • শ্রীসত্যমোহন মজুমদার জেলা ডাকমণ্ডপ, ডাক—ভাঙাজঙ্গল, জেলা—রাজশাহী, পূর্বপাকিস্তান • • • শ্রীমতী চারুবালা দাস, অবধায়ক, শ্রীঅনন্তকুমার দাস, জেলা—সাহেবনগর, ডাক—দক্ষিণ সাহেবনগর, জেলা—মেদিনীপুর • • • শ্রীকমলকুমার বাগচী, দেশবন্ধুনগর, ডাক ও জেলা—জলপাইগুড়ী, পশ্চিমবঙ্গ • • • Sm. Namita Chatterjee, C/o. Associated Engineering Co., Jail Road Jehangirabad, Bhopal.

Sending herewith the yearly subscription for Masik Basumati—H. S. V. Club—Palamau (Bihar).

আগামী বর্ষের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—শ্রীমতী মমতা ঘোষ, পাটনা।

Sending herewith yeatly subscription of Rs. 15/- from Ashrah 1369 B. S.—Siksha O Sanskriti Sadan, Cooch-Behar.

Sending herewith Rs. 15/- for annual advance of Basumati—Mrs. Kalyani Roy Choudhury, Kanpur.

এই বৎসরের ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। যথারীতি বৈশাখ সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন—শ্রীমতী বিভা মুখার্জী, দিল্লী।

I am sending herewith Rs. 15/- being the subscription of Monthly Basumati from Baisakh to Chaitra 1368 B. S. Head Master, Joharmull Jalan Institution, Asansol.

পনের টাকা মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা বাবদ পাঠাইলাম।—আর্যানগর সাধারণ পাঠাগার,—কানপুর।

Sending herewith Rs. 20/- for the Monthly Magazine Basumati i.e. from the month of Sravan '69 B.S. to Kartick 1370 B. S.—Sri P. G. Dey, Sahdol (M. P.)

শ্রাবণ থেকে পৌষ মাস পর্য্যন্ত চাঁদা পাঠালাম—নিবেদিতা রাহুত, জলপাইগুড়ি।

Please continue sending Monthly Basumati from Sravan for one year for which Rs. 15/- is being sent herewith—Head Master, B. H. School, Birbhum.

I am remitting herewith Rs. 15/- to cover my Subscription of monthly Basumati from Asarh '69 B. S. to Joistha 1370 B. S.—Balaram Chakravorty, Salanpur, (Burdwan).

মাসিক বসুমতী পত্রিকার চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—Head Master, Nalhati H. P. High School, Nalhati, Birbhum.

Herewith remitted Rs. 15/- towards my subscription for one year.—Sm. Milan Choudhuri, Agra.

I am sending herewith Rs. 15/- as my annual subscription from Paush 1369 B. S. to Agrahayan 1370 B. S. for monthly Basumati—Sm. Provarani Pahari, Midnapore.

Rs. 15/- is remitted as the annual subscription Masik Basumati—Sri Gopai Oil Mill Bankura.

Subscription of Rs. 15/- is sent herewith—Library, Lady Shri Ram College for Women. New Delhi.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী অণিমাদেবী, জয়পুর, রাজস্থান।

মাসিক বসুমতীর গ্রাহকমূল্য বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—N. N. Chatterjee, Patna.

আমার পূর্ব্বপ্রদত্ত চাঁদা আশ্বিন সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। পুনরায় মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

Please take this amount (Rs. 15/-) as subscription for the year 1962-63 from Agrahayan to Ashwin and send the Masik Basumati accordingly.—S. K. G. Labour Walefare Centre, Social Club, Ishwar Library, Po. Kandra, Dt. Singhbhum (Bihar).

ভ্রম সংশোধন

মহাশয়, আশ্বিন মাসের বসুমতী পাঠ করিলাম। "ছোটদের আসরে" শ্রীমতী ফুল্লরা রায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের অসাধারণ মেধার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু ২টি বড় রকমের ভুল করিয়াছেন। ব্রজেনবাবু কখনও Presidency কলেজে অধ্যয়ন করেন নাই—General Assembly Institute এখন যাহা Schottish Church College ও তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন Hartic not Hastings. ইতি—শ্রীসতীশচন্দ্র বসু। Late Head Assistant, Finance Department Government of Bengal.

সসম্মান নিবেদন, কার্ত্তিক মাসিক বসুমতী ১৬১ পৃষ্ঠায় জ্ঞানশংকর চক্রবর্ত্তীর স্থানে জ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী হইবে। একজন জ্ঞানশংকর চক্রবর্ত্তী Acct. General ছিলেন। আমি উক্ত ৺চক্রবর্ত্তী (Allahabad Muir Central College) মহাশয়ের ছাত্র ছিলাম ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে Muir Central College হইতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এখন বয়স ৮৬, অতিশয় জরাজীর্ণ। বিনীত—শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায়, ১১, ব্রনফেল্ড রো, কলিকাতা-২৭

।। মাসিক বসুমতী ।।

পৌষ ১৩৬১

(তৈলচিত্র)

কেশ-প্রসাধন

—বধুরাণী সুচন্দ্রা রায় অঙ্কিত

৪১শ বর্ষ—পৌষ, ১৩৬৯] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

কথামৃত

মিথ্যার কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকিলে সত্য প্রচার সহজ হয় বলিয়া যাঁহারা ধারণা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কালে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, বিষ এক ফোঁটা মিশ্রিত হইলেও সমস্ত খাদ্য দূষিত করিয়া ফেলে! যে পবিত্র ও সাহসী সেই জগতে সব করিতে পারে।

*   *   *   *

সৎসাহসে অনুষ্ঠিত সৎকার্যে বাধা পাইলে অনুষ্ঠাতাদের শক্তি আরও জাগিয়া উঠিবে। যাহাতে বাধা নাই—প্রতিকূলতা নাই, তাহাতে মানুষকে মৃত্যু পথে লইয়া যায়। Struggleই (বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন।

*   *   *   *

যতই শক্তি প্রয়োগ কর না কেন, শাসনপ্রণালীর যতই পরিবর্তন কর না কেন, আইনের যতই কড়াকড়ি কর না কেন, কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই কেবল জাতীয় অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তন করিয়া তাহাকে সৎপথে পরিচালনা করিতে পারে। কেবল আত্মার উন্নতিবিধান করিতে পারিলেই সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ঘুচিবে।

গোঁড়ামি, রক্তপাত, পাশব অত্যাচার—এ সকল যতদিন না বন্ধ হয়, ততদিন সভ্যতার বিকাশই হইতে পারে না। যতদিন না আমরা পরস্পরের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন হই, ততদিন কোনরূপ সভ্যতাই মাথা তুলিতে পারে না; আর এই মৈত্রীভাব-বিকাশের প্রথম সোপান—পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করা।

*   *   *   *

প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর। যদি কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে পার, তোমার বাক্যব্যয় করিতে হইবে না, তোমার হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে, তোমার ভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইবে। যে ব্যক্তি তোমার নিকট আসিবে, তাহারই ভিতর তোমার ধর্মভাব গিয়া লাগিবে।

*   *   *   *

সঙ্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে যেন একপ্রকার তেজ নির্গত হইতে থাকে, আর তাঁহার নিজের মন যে অবস্থায় অবস্থিত অপর ব্যক্তির মনে ঠিক সেই ভাবের উৎপাদন করে—এইরূপ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষসমূহের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর যখনই একজন শক্তিসম্পন্ন

পুরুষের শক্তিতে অনেকের ভিতর সেই একই প্রকার ভাবের উদয় হয়, তখনই আমরা শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠি।

* * * *

অন্যান্য সকল জিনিসের অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক। ইচ্ছাশক্তির সমক্ষে আর সমস্তই নিঃশক্তি হইয়া যাইবে, কারণ ঐ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সর্বশক্তিমান।

* * * *

এখন আর আমাদের কোমলভাব অবলম্বন করিবার সময় নহে। এইরূপ কোমলতার সাধন করিতে করিতে আমরা এখন জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছি—আমরা তুলারাশির ন্যায় কোমল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেশের পক্ষে এখন প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া—এমন দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হওয়া যে, কেহই যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়, যেন উহা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্য-ভেদে সমর্থ হয়।

* * * *

আমার মহাভয় ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর মন্দ নয়, তবে ঐটি all in all (সর্বস্ব) করিয়া সেই পুরান ফ্যাসনের nonsence (বাজে ব্যাপার) করিয়া ফেলিবার একটা tendency (ঝোঁক) আছে, আমার তাহাই ভয়। আমি জানি, তাহারা কেন ঐ পুরান ছেঁড়া ceremonial (অনুষ্ঠানপদ্ধতি) লইয়া ব্যস্ত। উহাদের spirit (অন্তরাত্মা) চায় work (কাজ), কোনও outlet (বাহির হইবার পথ) নাই, সেইজন্য ঘণ্টা নাড়িয়া energy (শক্তি) খরচ করে।

* * * *

যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যার দিকে যায়, তাহার কারণ এই—সে সত্যকে ধরিতে পারিতেছে না। অতএব মিথ্যাকে দূর করিবার একমাত্র উপায় এই যে, তাহাকে সত্য যাহা তাহা দিতে হইবে। তাহাকে সত্য কি তাহা জানাইয়া দাও। তাহার সহিত সে নিজ ভাবের তুলনা করুক। তুমি তাহাকে সত্য জানাইয়া দিলে—ঐখানেই তোমার কাজ শেষ হইয়া গেল।···যদি তুমি তাহাকে যথার্থ সত্য দিয়া থাক, তবে মিথ্যা অবশ্যই অন্তর্হিত হইবে; আলোক অন্ধকারকে অবশ্যই দূর করিবে; সত্য অবশ্যই তাহার ভিতরের সদ্ভাবকে প্রকাশিত করিবে।

* * * *

বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নাড়িয়া দিলে বেশী জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগিলে তবে সে ফণা ধরে, ইত্যাদি। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এই যাত্রা আলো দেখিতে পাইব না, যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর-ননী খাইয়া, তুলার উপর শুইয়া, এককোঁটা চক্ষের জল কখনও না ফেলিয়া কে কখন বড় হইয়াছে, কাহার ব্রহ্ম কখন বিকশিত হইয়াছেন? কাঁদিতে ভয় পাও কেন? কাঁদ। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে চক্ষু সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হইয়া তাহার জায়গায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।

জড়শক্তির লীলাক্ষেত্র ইউরোপ যদি নিজের ভিত্তি সরাইয়া আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে তাহার সমাজ স্থাপন না করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; উপনিষদের ধর্মই ইউরোপকে রক্ষা করিবে।

* * * *

কোন জাতির কিংবা ব্যক্তির পক্ষে বড় হইতে হইলে তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—(১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস; (২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব; (৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎকাজ করিতে সচেষ্ট তাহাদিগকে সহায়তা করা।

* * * *

মন যখন জীবনের উচ্চতম তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অসমর্থ হয়, তখন তাহাকে মস্তিষ্কদৌর্বল্যের নিশ্চিত লক্ষণ জানিতে হইবে। এই অবস্থায় মৌলিকতত্ত্ব-গবেষণায় মানুষ একেবারে অসমর্থ হয়, নিজের সমুদয় তেজ, কার্যকরী শক্তি ও চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে; আর যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর মধ্যেই তাহার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়, তাহার বাহিরে আর যাইতে পারে না।

* * * *

হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ী, ডোম, তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাহাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করিয়াছ, তাহাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দিবার জন্য কি করিয়াছ, বলিতে পার? তোমরা তাহাদের ছোঁও না, 'দূর দূর' কর। আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরিতেছেন, তাঁহারা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করিতেছেন? খালি বলিতেছেন, 'ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁয়ো না।' এমন সনাতন ধর্মকে কি করিয়া ফেলিতেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমাকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।

* * * *

ধর্ম কি?—যাহা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগে প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হইতেছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত্ত সুখ খোঁজাইতেছে, সুখের জন্য খাটাইতেছে। মোক্ষ কি?—যাহা শিক্ষা দেয় যে ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাহাই। এই প্রকৃতির নিয়মের বাহিরে ত ইহলোকও নহে, পরলোকও নহে, তবে সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোনার শিকল। তাহার পর প্রকৃতির মধ্যে বলিয়া বিনাশশীল সে সুখ থাকিবে না। অতএব মুক্ত হইতে হইবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাহিরে যাইতে হইবে, শরীর-বন্ধনের বাহিরে যাইতে হইবে, দাসত্ব হইলে চলিবে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই।

* * * *

ধর্ম লইয়া এই সকল গণ্ডগোল মারামারি বিবাদ-বিসংবাদ তখনই চলিয়া যাইবে, যখনই আমরা বুঝিব ধর্ম গ্রন্থবিশেষে বা মন্দিরবিশেষে আবদ্ধ নহে, অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারাও উহার অনুভূতি সম্ভব নহে। ইহা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অপরক্ষানুভূতি। যে ব্যক্তি বাস্তবিক ঈশ্বর ও আত্মা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক, আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি-বিহীন হইলে উচ্চতম ধর্মশাস্ত্রবিৎ, যিনি অনর্গল ধর্মবক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহার সহিত অতি সামান্য অজ্ঞ জড়বাদীর কোন প্রভেদ নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

স্বামী বিবেকানন্দ ও পুণ্যভূমি আঁটপুর

শ্রীরামকৃষ্ণের এবারের লীলা গোপনলীলা—অনাড়ম্বর লীলা। তিনি ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বাংলার এক নিভৃত পল্লীর গোপন অঞ্চলে। হুগলী জেলার তৎকালীন এক অখ্যাত গ্রাম—কামারপুকুরে।

দক্ষিণেশ্বরে সিদ্ধিলাভের পর তাঁর এমনি অবস্থা—ভক্তসঙ্গে বিলাস করার জন্য মথুরবাবুদের কুঠির ছাদের ওপরে গিয়ে ডেকে বলতেন—"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, আমি যে একলা থাকতে পাচ্ছি না।" সে আহ্বান গিয়ে পৌঁছল বাংলার কয়েকটি অনাঘ্রাত কুসুমসম নির্মল চরিত্র যুবকের অন্তরে। শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বান মন্ত্র তাঁদের হৃদয় তন্ত্রে ধৃত হল। এ নিত্যকালের ডাক, যে ডাকে সাড়া দিয়েছিল রাখাল বালক আর গোপবালাগণ। সে আহ্বানে এগিয়ে এসেছিল রক্ষপুরীর মনুষ্যত্বের প্রাণী আর অরণ্যবাসী বানরগণ। সে আকর্ষণে এগিয়ে এল মরুবাসী সাধারণ মানুষ। আর অপরবারে সাড়া দিয়েছিল দরিদ্র মেষপালগণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গদাধর চট্টোপাধ্যায় নামে আঠার বৎসরের যুবক তখনই তিনি তাঁর লীলাসহচরদের সন্ধানে যেন চঞ্চল হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কলকাতায় এবং কলকাতার আশেপাশে বহুস্থানে তাঁর চিহ্নিত সহচরদের জন্য তিনি ব্যাকুলভাবে অনুসন্ধান করে তাদের পেয়েছিলেন।

এমনি ভাবে তিনি একবার আঁটপুরেও এসেছিলেন। সেটা একশ আট বছর আগের ঘটনা। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ বাংলা ১২৬১ সালে আঁটপুরের সমৃদ্ধ মিত্র পরিবারে তিনি কৃপা করে অবস্থানও করেছিলেন। ধরা দেননি বলে সেদিন কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। তিনি হয়ত তাঁর অনাগত সহচর বাবুরামের সন্ধান নিয়েছিলেন এ ভাগ্যবান পল্লীর অঞ্চলে। এ পল্লীর বুকেই "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" মন্ত্রে নরদেহ উৎসর্গের সংকলন গ্রহণ করেছিলেন নয়জন রামকৃষ্ণ সন্তান। শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিতে পবিত্র পল্লীতে এই আঁটপুরে তাঁর শুভাগমনের সাত বৎসর পরে ১২৬৮ সালে জন্ম নিলেন বাবুরাম ঘোষ। পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ প্রেমঘন মূর্তি; শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত সেবক। আঁটপুরের মিত্র পরিবার বিত্তবান সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশ। সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাম মিত্রের বংশধর কালীপ্রসন্নের কালে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন। তাইতো পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে বলেছিলেন—"তোদের কলো ভোলের বাড়ীতে আমার যাওয়া হয়েছিল রে।"

—আঁটপুরের তারাপদ ঘোষ হলেন বাবুরামের পিতা আর মিত্র বংশের মাতঙ্গিনী দেবী হলেন তাঁর স্নেহময়ী জননী। বিবাহসূত্রে এই দুই পরিবারের মিলন। ঘোষ পরিবার মিত্র পরিবারের কাছেই বাস করতে থাকেন। ক্রমে ঘোষ পরিবারেরও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। এই শ্রীমন্ত গৃহে বাবুরামের জন্ম। যথাসময় গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে বাবুরাম কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটের শ্যামবাজার শাখায় ভর্তি হল। এখানে রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সঙ্গে তার পরিচয় হয় আর ছেলেধরা মাষ্টার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এ সময়ে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এর পরিণতি একদিন ছেলেধরা মাষ্টার ধরে নেন বাবুরামকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

একদিকে অর্থকরী বিদ্যাভাস অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পরমবিদ্যালাভ। এর চরম পরিণতি সংসারে বিরাগ।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর যুবক ভক্তগণ নিজেদের প্রথমে সর্বহারা বোধ করলেন। কিন্তু তখন থেকেই নরেন্দ্রনাথ তাদের দলপতি। অকূল ভবসাগরে সুযোগ্য কর্ণধার। নরেন্দ্রকে অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের নবরত্নের সমাবেশ হয় আঁটপুরে। তখন প্রচণ্ড শীতকাল ডিসেম্বর মাস। ঐ নবরত্নের নবতম সাধনা। ঘরছাড়া যুবকদল তাদের তরুতলে বাস; প্রজ্জ্বলিত ধুনীর সামনে সারারাত সাধন-ভজন-তপস্যা।

জ্ঞাতসারে তাঁরা যে তপস্যা ব্যাপৃত ছিলেন অজ্ঞাতসারে এসে গেল ২৪শে ডিসেম্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের তনয় যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের সান্ধ্যলগ্ন। অপরাপর যুবকদের সঙ্গে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সাক্ষাতে সংসার ত্যাগের পরম সংকল্প গ্রহণ করলেন। তাঁরই পন্থা অবলম্বনের সংকল্প নিলেন অপর যুবকগণ। আজ নবরত্নের নবজীবন লাভের নব সংকল্প। নরেন্দ্রনাথ দত্ত দলপতি। তার সঙ্গে আছেন নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ, বাবুরাম ঘোষ, তারকনাথ ঘোষাল, শশিভূষণ চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন চন্দ্র, গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় ও সারদাচরণ মিত্র।

গৃহত্যাগের সংকল্পের পর পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকার সামনে হোমানলে পূর্ণাহুতি দিয়ে সন্ন্যাসের কঠোর ব্রত গ্রহণ করে ঐ নয়জন হলেন পর্যায়ক্রমে বিবেকানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, প্রেমানন্দ, নিরানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, ত্রিগুণাতীতনন্দ। অপরাপর রামকৃষ্ণের যুবক শিষ্যগণ পরবর্তীকালে যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

এমন পবিত্র পল্লী আঁটপুর দেখবার বাসনায় গেল বছর বেরিয়ে পড়েছিলাম বাবুরাম মহারাজের শততম জন্মবর্ষ উপলক্ষে।

হাওড়া থেকে মার্টিনের ছোট লাইনের গাড়ীতে দশটা নাগাদ

পৌঁছে গেলাম আটপুরে। ষ্টেশনটা মিত্তিরদের বড় দীঘির দক্ষিণপাড়ে। এই দীঘির উত্তর দিকে পাকা রাস্তা। এই রাস্তাই রাজবলহাট থেকে আটপুর হয়ে হরিপাল পর্যন্ত যাতায়াতের পথ। আজকাল বাস চালু আছে ও পথে। রেলের পথ আটপুর থেকে গ্রাম্য পরিবেশের মাঝ দিয়ে চলে গেছে চাঁপাডাঙ্গা পর্যন্ত। চাঁপাডাঙ্গা থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত হাঁটাপথ বহুকালের। হয়তো এ পথেই শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন হয়েছিল এ অঞ্চলে।

এ দীঘি সামান্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের পাদস্পর্শ হয়ে এর জল চির নির্মল। দুপাড়ে অগণিত তরুরাজি। তারা রামকৃষ্ণের দর্শনধারী যা তাদের বাগান। তাদের শ্যামল ছায়ায় এর জলও শ্যামলিমা লাভ করেছে। উত্তর পাড়ের শিবমন্দির যেন ছায়ারূপে এখানে নিত্য অবগাহন করে।

মিত্রগৃহের সামনে সবুজ মাঠ তার পূর্ব পাশে সেই প্রাচীন রাসমঞ্চ এখনও প্রাচীন আভিজাত্যের পরিচায়ক। একটা প্রাচীন বকুলগাছ তার নীচুটা পরিচ্ছন্নভাবে বাঁধানো। বাবুরামের জন্ম হয় মাতুলালয়ে। জন্মস্থানটা চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে ভবিষ্যৎ কালের মন্দিরের জন্য। মিত্রগৃহের একটা দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমনের স্মারক প্রস্তর ফলক স্থাপনা করা হয়েছে ২৪-১২-৭০ খৃষ্টাব্দে।

মিত্রবাড়ীর গোবিন্দজীর মন্দির এটা এখানকার একটা অবশ্য দর্শনীয়। সেই নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলের মন্দির প্রায় তিনশ বছরের পুরনো বৃহৎ মন্দির। আশ্চর্যান্বিত হতে হয় এ মন্দিরের বহিরঙ্গের কারুকার্য দেখে। বাংলার মাটি পু[illegible] বাঙ্গালী কারিকর দিয়ে বাংলার স্থাপত্য নিদর্শন নিয়ে এ মন্দি[illegible] গায়ে যে সব কারুকার্য হয়েছে তার তুলনা নেই। এটা [illegible] দেশের স্থপতি বিজ্ঞানের উজ্জ্বল নিদর্শন। পোড়ামাটির অপরূ[illegible] কারুকার্য তিনশ বছরেও অম্লান। এরকম স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দে[illegible] যায় কালনা আর বিষ্ণুপুরে। মুসলমান আমলের তৈরী তা[illegible] মন্দির গায়ে ফার্সী অক্ষরে লেখাগুলিও বিচিত্র পোড়ামাটির। সেকা[illegible] থেকে গোবিন্দজী এখনও নিত্য সেবা পুজা পেয়ে থাকেন।

এরপর দর্শন করতে এসে গেলাম ঘোষ পরিবারের গৃহ[illegible] সুশোভন বিশাল গৃহ। একপাশে ঠাকুরদালান, পূজামণ্ডপ এ[illegible] সামনের উঠানে ধুনি জ্বেলে তপস্যায় সূত্রপাত করেন শ্রীরামকৃষ্[illegible] নরেন্দ্র।

একটা প্রস্তরফলকে তাঁদের গৃহস্থ নাম সন্ন্যাস নাম দুই[illegible] লেখা আছে। ঘোষ পরিবারের এ গৃহে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী সারদা দেবীও কয়েকবার আগমন করে বাস করেছিলেন। তাঁ[illegible] পদধূলিধন্য প্রকোষ্ঠটি এখন মন্দির রূপেই গণ্য হয়ে আছে ভক্তদে[illegible] কাছে।

ঘোষ পরিবারের বাড়ীর সামনে অপর একটি দীঘি ও[illegible] পাড়ে একটি শিবমন্দির। হয়তো এ দীঘিতে রামকৃষ্ণ সন্তান[illegible] সে কালে অবগাহন করেছেন। সেই স্মৃতি ধন্য দীঘির জলে অবগা[illegible] করে আজ আমিও ধন্য হলাম।

চিকাগো বক্তৃতা : স্বামী বিবেকানন্দ

(১৯শে সেপ্টেম্বর। নবম দিবসের অধিবেশন)

হিন্দুধর্ম্ম

বর্ত্তমানকালে জগতে প্রচলিত তিনটি ধর্ম্ম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল—হিন্দু, পারসীক ও য়াহুদী ধর্ম্ম। ইহারা প্রত্যেকেই মহা মহা বিপত্তিপরম্পরা সহ্য করিয়া আসিয়াছে, তথাপি ইহারা যে লুপ্ত না হইয়া এখনও জীবিত আছে, তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে—ইহাদের মধ্যে মহতী শক্তি অন্তর্নিহিত। কিন্তু, একদিকে যেমন য়াহুদী-ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্মকে আপন অঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারা ত দূরের কথা, নিজেই নিজ সর্ব্ববিজয়িনী নন্দিনী কর্ত্তৃক স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইল ; এবং অতি অল্পসংখ্যক পারসীক মাত্র এক্ষণে তাহাদের মহান ধর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে—অপরদিকে আবার ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উঠিল—বোধ হইল উহারা যেন বেদোক্ত ধর্ম্মের ভিত্তি পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া দিল ; কিন্তু মহা-ভূমিকম্পের সময় সাগরসলিল যেমন কিছু পশ্চাৎপদ হইয়া, পরে পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ প্রচণ্ড প্রতাপে সম্মুখস্থ সমুদয় পদার্থকে গ্রাস করিয়া ফেলে, সেইরূপ ইহাদের জননীস্বরূপ বেদোক্ত ধর্ম্মও প্রথমতঃ

হিন্দুধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ শক্তি

কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া বিপ্লবের কোলাহল-অবসানে সেই [illegible] সম্প্রদায়গুলিকে সর্ব্বতোভাবে কবলিত করিয়া আপনার বিরাট দে[illegible] পুষ্টিসাধন করিয়াছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের নূতনতম আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহো[illegible] ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র—সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে সামা[illegible] মূর্ত্তিপূজা ও তদানুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্য্যন্ত, এমন কি[illegible] বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ এবং জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—এই প্রত্যেকটি[illegible] হিন্দুধর্ম্মে স্থান আছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ও আপা[illegible] দৃষ্টিতে বিরোধী ভাবসমুদয়ের সাধারণ ভিত্তিমূল কোথায় ? কো[illegible] সাধারণ কেন্দ্রের আশ্রয় করিয়া ইহারা অবস্থান করিতেছে ? আ[illegible] এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিতে অদ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

হিন্দুগণ আপ্তবাক্য বেদ হইতে নিজেদের ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন তাঁহারা বেদসমুদয়কে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে তাহা শ্রোতৃমণ্ডলী হাস্যের বিষয় হইতে পারে বটে, কিন্তু "বেদ" এই শব্দদ্বারা কোন পুস্তকবিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে [illegible]

আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সকল তৎসমুদয়েরই ভাণ্ডারস্বরূপ। যেমন, আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য-সমাজ উহাদের ভুলিয়া গেলেও যেমন সে সকল বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও তদ্রূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে সকল পবিত্র ও সাধু সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সর্ব্বজনপিতা পরমাত্মার যে সমুদয় দিব্য ও বিশুদ্ধ সম্বন্ধ—তৎসমুদয় আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও ছিল এবং যদি সকলে তদ্বিষয় বিস্মৃত হয়েন, তাহা হইলেও থাকিবে।

বেদের নিত্যতা

এই সমুদয় আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম "ঋষি।" আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শী বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি। আর আমি এই শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, সেই সকল অতিশয় উন্নত ঋষিদিগের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক ঋষি ছিলেন।

ঋষি

এ স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী, নিয়ম বলিয়া অনন্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু অবশ্যই তাহাদের আদি আছে। বেদ বলেন—সৃষ্টি (সুতরাং সৃষ্টির নিয়মাবলীও) অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানশাস্ত্রও প্রমাণ করিয়াছে যে, সৃষ্টিশক্তির সমষ্টি সর্ব্বকালেই সমান। তাহা হইলেও যদি বল যে, এমন একসময় ছিল, যখন কিছুই ছিল না; তবে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল শক্তি তখন কোথায় ছিল? কেহ কেহ বলিবেন যে, ঈশ্বরেই সে সমুদয় অন্তর্নিহিত ছিল! তাহা হইলে—ঈশ্বর কখনও সক্রিয় এবং কখনও নিষ্ক্রিয়; অর্থাৎ তিনি বিকারশীল। কিন্তু যখন বিকারশীল পদার্থমাত্রই মিশ্র-পদার্থ এবং যখন মিশ্র-পদার্থমাত্রই বিনাশশীল, তখন ঈশ্বরও বিনাশশীল। ইহা কখনই হইতে পারে না। সুতরাং এমন একসময় ছিল না, যখন কিছুই (অর্থাৎ সৃষ্টি) ছিল না। কাজেই সৃষ্টি অনাদি। যদি উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া দোষাবহ না হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা, এই দুইকে অনাদি ও অনন্ত সমান্তরাল রেখার সহিত তুলনা করা যায়। ঈশ্বর নিত্য-মহাশক্তি-স্বরূপ, সর্ব্ব বিষয়ের বিধানকর্ত্তা,—তিনি প্রলয় সাগর হইতে নিত্যকাল ব্রহ্মাণ্ডসমূহ সৃজন করিতেছেন, কিছুকাল পালন করিতেছেন, পুনরায় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। এইরূপ নিত্যকাল চলিতেছে। হিন্দুসন্তান গুরুর সহিত ইহা প্রতিদিন পাঠ করিয়া থাকেন,—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্র সৃজন করিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রও ইহাই বলিতেছে।

সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত

আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করি—'আমি' 'আমি' 'আমি'—তাহা হইলে আমার কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহই আমি—এরূপ ভাবই মনে আসে। তাহা হইলে কি আমি জড়, না জড়ের সমষ্টিভূত দেহস্বরূপ? বেদ বলিতেছে "না", আমি দেহমধ্যস্থ "আত্মা"—আমি দেহ নহি। দেহ নষ্ট হইবে, কিন্তু আমি নষ্ট হইব না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি—কিন্তু যখন এই দেহ পঞ্চত্ব-লাভ করিবে, তখনও আমি বিদ্যমান থাকিব, এবং এই দেহগ্রহণের পূর্ব্বেও আমি ছিলাম। আত্মা কোন পদার্থ হইতে সৃষ্ট হন নাই; কারণ সৃষ্টি শব্দের অর্থ—ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ; এবং সেই সংযোগ ভবিষ্যতে বিয়োগাধীন। অতএব আত্মা যদি সৃষ্ট হন, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই বিনশ্বর। সুতরাং আত্মা সৃষ্ট পদার্থ নন। কেহ কেহ জন্মিয়া অবধি সুখভোগ করিতেছে, শরীর দিব্য সুস্থ ও সুন্দর, মন উৎসাহপূর্ণ, কিছুরই অভাব নাই; আবার কেহ কেহ জন্মিয়া অবধি দুঃখভোগ করিতেছে,—কাহারও হস্ত-পদ নাই, কেহ বা বুদ্ধিবিরহিত এবং অতি কষ্টে জীবন তরণী বহিয়া যাইতেছে। যখন তাহারা সকলেই এক ন্যায়বান ও দয়াময় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইল, তখন কেহ সুখী ও কেহ দুঃখী হইল কেন? ভগবান কেন এত পক্ষপাতী? যদি বল যে, যাহারা এ জন্মে দুঃখভোগ করিতেছে, পরজন্মে তাহারা সুখভোগ করিবে;—তাহাতে কি হইল? দয়াময় ও ন্যায়বানের রাজ্যে কেন একজনও দুঃখভোগ করিবে? দ্বিতীয়তঃ এতদ্বারা এই অসঙ্গতির কিছু ব্যাখ্যা হইল না; পরন্তু কোন এক সর্ব্বশক্তিমান্ স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথাই উল্লিখিত হইল। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্য সুখী বা দুঃখী হইয়া জন্মিবার পূর্ব্বে অন্যান্য বহুবিধ কারণ ছিল, যাহাতে, সে সুখী বা দুঃখী হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহই সেই সমুদয়ের কারণ। আচ্ছা, মানবের দেহ ও মন পিতৃপিতামহাদির দেহ ও মনের সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে, এরূপ বলিলে কি ইহার সমুচিত উত্তর হয় না? ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, জীবনস্রোত জড় ও চৈতন্য এই দুই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। যদি জড় ও জড়ের বিকার আত্মা, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির কার্য্য সংসাধিত করে, তাহা হইলে আর স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু জড় হইতে যে চৈতন্যশক্তি উদ্ভূত হইয়াছে—ইহা কোন মতে প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং এক জড় পদার্থ হইতে সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে স্বীকার করিতে হইলে, এক মূল চৈতন্য হইতেই সমুদয় সৃষ্টি-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে—ইহা স্বীকার করাও অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত এবং এমন কি—সকলের প্রার্থনীয়। কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই।

আত্মা

জন্মান্তরবাদ

আমরা অবশ্যই কখন অস্বীকার করিতে পারি না যে, মানবদেহে পিতৃপিতামহাদির অনেক স্বভাব সংক্রামিত হয়, কিন্তু সেই স্বভাব সর্ব্বতোভাবে দৈহিক। এতদ্ব্যতীত মানবের ব্যষ্টি আত্মারও বিশেষ বিশেষ ভাব থাকে। যে আত্মা যাদৃশ স্বভাবাপন্ন, সেই আত্মা ঠিক তাদৃশ দেহকেই আশ্রয় করিয়া তাহার স্বভাবানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু আত্মার তত্তৎস্বভাবও আবার কোন পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মজন্যই হইয়া থাকে। যে আত্মা যে বিষয়ে প্রবণ, সেই আত্মা—"যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে"—এই নিয়মানুসারে তদুপযোগী দেহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কারণ বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে—স্বভাব অভ্যাস হইতে হয়, এবং অভ্যাস পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের ফল। সুতরাং কোন নবজাত বালকের স্বভাব তাহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল। এবং যেহেতু তাহার পক্ষে বর্ত্তমান জীবনে সেই স্বভাব লাভ করা অসম্ভব, সুতরাং তাহা অবশ্যই পূর্ব্বজীবন হইতে আসিয়াছে।

বংশানুক্রমিকতা ও পুনর্জ্জন্মবাদ

ভারতীয় মহাকাব্যে নারীসমাজ

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

ভারতবর্ষে মহাকাব্য বলতে সাধারণত বোঝায় দু'টি মহাগ্রন্থকে—মহাভারত এবং রামায়ণকে—কিন্তু বিভ্রান্ত ীয় স্মৃতিকে পরিবহন করে এবং সুদীর্ঘ কালকে ব্যাপ্ত করে বিরাজ ছে মহাভারত। পণ্ডিতদের আলোচনা-গবেষণায় একথা প্রমাণিত ছে যে, মূল ভারতকাহিনী মূল রামকাহিনী থেকে অনেক প্রাচীন, বার স্মৃতি এবং ধর্মশাস্ত্র হিসাবে মহাভারতের বর্তমান রূপের পূর্বেই ায়ণ তার বর্তমান সম্পূর্ণ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। রামায়ণের উন্নতিতে মহাভারতের ছায়া প্রস্ফুট, তাই ভারতীয় মহাকাব্যের ত প্রতিনিধি হল মহাভারত। মহাকাব্যের যুগে নারীসমাজের র আলোচনায় স্বভাবতই মহাভারত প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় র রামায়ণ সহকারী এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়।

মহাভারতকে নিয়ে যে কোন আলোচনার পূর্বে মহাভারতের নকাল এবং গঠনবৈচিত্র্য সম্বন্ধে কিছু না বললে আলোচনা ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর এবং অবোধ্য হয়ে ওঠে। যদিও প্রাতঃস্মরণীয় দ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারতের স্রষ্টারূপে ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত ও মহাভারত যে বহু হস্তাবলেপে পরিপুষ্ট এ কথা অস্বীকার করে র আর কোন লাভ নেই। মহাভারতের চরিত্রের দিক দুইটি—হিনীমূলক এবং উপদেশাত্মক। এই দুই বৈশিষ্ট্যের একত্রিতরূপই ান মহাভারত। যে অংশটি কাহিনীমূলক সেটি বিভ্রান্ত যুগের আর যে অংশ উপদেশাত্মক, সে অংশ পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ দের রচনা। বীরত্বমূলক কাহিনীব পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় বেদ সংহিতায়। ঋগ্‌বেদে দাশরাজ্ঞ বা সম্মিলিত দশজন রাজার দ্ধে সুদাসের শৌর্যকাহিনী এবং সুদাসের পিতামহ দিবোদাসের জয় কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। শতপথব্রাহ্মণে প্রথম বীররসাত্মক -কাহিনীর চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে াদি সংক্রান্ত বিষয় অবলম্বন করে গান করতেন ব্রাহ্মণরা আব য় রাজন্যবর্গ যে সমস্ত গান করতেন তার বিষয়বস্তু ছিল যজ্ঞকারী ার শৌর্য-বীর্য কাহিনী—যে সমস্ত যুদ্ধ তিনি করতেন বা যে সমস্ত দের তিনি পরাজিত করতেন ইত্যাদি। এই সব শৌর্য-বীর্য হিনীর নাম বৈদিক সাহিত্যেই নারাসংসি বলে উল্লিখিত হয়েছে। বেদের এক জায়গায় নারাসংসিকে গাথা এবং রৈভীর সমগোত্রীয় বর্ণনা করা হয়েছে আবার অন্যত্র গাথা থেকে পৃথক বলে বর্ণনা হয়েছে। এই বীর কাহিনী নারাসংসি গাথা ইলিয়ডে বীর লিস কর্তৃক গীত Klea Andron-এর অনুরূপ বীর কাহিনী। বীর কাহিনীর প্রাচীনতম কাব্যরূপের পরিচয় ঋক্ সংহিতায় এবং বহুল চর্চার পরিচয় শতপথ ব্রাহ্মণে। স্বয়ং মহাভারতেও রাজন্যবর্গের স্তুতিমূলক কাহিনীর পেশাদার গায়কের পরিচয় আছে। মহাভারতের মূল কাহিনী অর্থাৎ কুরু-পাণ্ডবের বহুশ্রুত সংগ্রামের কাহিনীও এইরূপ একটি গাথা নারাসংসি। একটি লোকক্ষয়ী যুগান্তকারী মহাযুদ্ধের রোমাঞ্চকর বিবরণ হিসাবে অন্য সমস্ত সমগোত্রীয় কাহিনী অপেক্ষা এর একটা বিশেষ মর্যাদা যে নিশ্চয়ই ছিল সে কথা অনুমান করা চলে এবং নিরাপদ ভাবেই। এর এই মর্যাদা বৈশিষ্ট্যই হয়ত একে একে সুবিশাল মহাগ্রন্থের প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারপর ধীরে ধীরে গায়ক কথকদের মুখে মুখে কবিদের কল্পনার ঐশ্বর্যে এবং রাজন্যবর্গের সশ্রদ্ধ প্রশ্রয়ে ঘটেছিল এর পরিধি-বিস্তৃতি। এইসব গাথা নারাসংসিগুলো কথক গায়ক এবং কবিদের মুখে মুখে নিশ্চয়ই বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হ'ত; ব্যাপ্তিলাভ করত হয়ত বিকৃতও হ'ত কিয়দংশে কিন্তু তাদের মূল ঐতিহাসিকতা থেকে বিচ্যুত হ'ত না। প্রলেপ যা পড়ত সমস্তই সেই মূল কাহিনীকে অবলম্বন করেই—কাণ্ডকে আশ্রয় করে শাখা পত্র পুষ্পের সমারোহ-সজ্জা চলত কাণ্ডের ওপর আঘাত চলত না। মহাভারতের গঠনবৈচিত্র্য এবং তার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যের সত্যতা নির্দ্ধারিত হবে।

মহাভারতের মূল কাহিনী কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ কাহিনী বীর কাহিনী। অন্যান্য বীর কাহিনীর মত এটিও নিশ্চয়ই রাজসভায় গীত হ'ত। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে এহ কাহিনী নিশ্চয়ই কিছু স্বতন্ত্র ছিল—এবং যে ভাবেই হোক এই ভারতযুদ্ধ যুগান্তর এনেছিল—সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতের রাজন্যবর্গ এই যুদ্ধে কোন না কোন পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। উপরন্তু যে পরিবারকে অবলম্বন করে এই কাহিনী প্রচলিত সেই পরিবারের স্থান প্রাচীন ভারতের রাজকীয় ইতিহাসে বিশেষ। বীর কাহিনী গান করবার অধিকার ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের হাত থেকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাতে কি করে ধীরে ধীরে চলে গেল সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। হয়ত ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সম্মুখে রাজকীয় কার্যের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী করে দেখা দিয়েছিল যে তাঁদের পক্ষে আর পূর্ব কাহিনী গান করবার অভ্যাস রাখবার মতন সময় আর ছিল না। অথবা পূর্বকালের রথী-মহারথীদের কাহিনী গান করা ধর্মের অঙ্গ হয়ে ওঠাতে সেটা স্বভাবতই ব্রাহ্মণদের অধিকারে চলে গিয়েছিল। বস্তুত অশ্বমেধ যজ্ঞক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় রাজন্যদের বীর-কাহিনী গান করবার যে প্রথার পরিচয় শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় তাতেই এর ধর্মকার্যের অঙ্গীভূত হবার সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাভারতে এ কথা পরিষ্কার যে এই সমস্ত কাহিনীর সঙ্গীতে ব্রাহ্মণেরই একমাত্র অধিকার। মূল কাহিনী গান করছেন বৈশম্পায়ন, ভদ্রাশ্ব করছেন নল কাহিনী, মার্কণ্ডেয় করছেন রাম ও সাবিত্রী কাহিনী

এঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ। চতুর্থ পর্বে ত' পরিষ্কার বলাই হয়েছে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরাই বিশ্বজগতে এই মহাযুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করবেন। বিক্রান্তযুগের বহু কাহিনীই উপকথা রূপে মহাভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—পুরুরবা কাহিনী, যযাতি কাহিনী, নল কাহিনী, নহুষ কাহিনী, রাম কাহিনী, সাবিত্রী কাহিনী ইত্যাদি। এই রকম কাহিনী নিশ্চয়ই আরও ছিল যেগুলো মহাভারতের কোন অংশেই স্থান পায়নি তা'রা কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই আলোচনা থেকে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে আসে যে অজ্ঞাত শতাব্দী সমূহে উদ্ভূত এই সমস্ত বীর কাহিনী শ্রুতি হিসাবে গৃহীত ও গীত হয়ে আসছিল প্রথমে রাজন্যবর্গের কণ্ঠে এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দ্বারা। প্রাথমিক পর্যায়ে যা ছিল বিক্রান্ত যুগের কাহিনী পরবর্তীকালে সেইগুলোই রূপ পায় উপদেশাত্মক কাহিনীরূপে ব্রাহ্মণদের হাতে—সমাজের প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজনে, যুগের প্রয়োজনে। ব্রাহ্মণরা এইসব কাহিনীর একচ্ছত্রাধিপতি হলেও কখনও মূল কাহিনীকে বিকৃত করেন নি। হয়ত কোন ক্ষেত্রে অনাবশ্যক উপদেশাত্মক বক্তৃতার অবতারণা করেছেন বা তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে বিসদৃশ বিক্রান্ত-যুগের কোন ঘটনাকে সমর্থন করবার জন্য কোন কল্পিত কাহিনী সন্নিবেশিত করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। সভাপর্বের দ্রৌপদী—যুধিষ্ঠির ও ভীমের নীতিগত প্রশ্ন নিয়ে কথোপকথন, উদ্যোগ পর্বে ভীমের পার্থিব জ্ঞান দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা, ভীষ্মপর্বের ভগবদগীতা, শল্যপর্বের বিদুরের বক্তৃতা এর কোনটাই মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয় অন্যপক্ষে এগুলোকে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাণ্ডবরা যে পঞ্চভ্রাতা একটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন সে ঘটনা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরাও অস্বীকার করেন নি বরং তার কারণ স্বরূপ একটা কাহিনীর অবতারণা করেছেন। মূল কাহিনীর প্রতি তাঁদের দায়িত্ববোধ এতদূর ছিল যে কালক্রমে অপ্রচলিত হলেও মহাভারতের মূল কাহিনীর সঙ্গে নিয়োগপ্রথার সংযোগ পূর্ণভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে—যদিও কুন্তীর পঞ্চপুত্রকে দেব ঔরসজাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মদাতারূপে ব্যাসদেবকে উপস্থিত করা হয়েছে। সংযোজনিক পরবর্তী অধ্যায়ে আসে ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক উপদেশাত্মক এবং রাজনৈতিক আলোচনা-প্রধান অংশগুলো মহাভারত-বিদ পণ্ডিত হপকিন্স যাকে Psedo Epic আখ্যা দিয়েছেন। এই মূল কাহিনীর বিচারে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো কালক্রমে সংযোজিত হয়েছিল। শরশয্যায় শায়িত অবস্থায়, ভীষ্ম যে সব ধর্মীয়, দার্শনিক এবং রাজনৈতিক জ্ঞান-সম্বলিত উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলো একত্রিত হয়েছে শান্তিপর্বে এবং অনুশাসন পর্বে। হপকিন্স মত প্রকাশ করেছেন যে এই উপদেশাবলী উচ্চারণ করবার পূর্বেই যে পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যু হয়েছিল তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মহাভারতেই পাওয়া যাবে। পরবর্তী কালের প্রয়োজন অনুসারে এই দীর্ঘ উপদেশাবলী উচ্চারণের জন্য পিতামহের মৃত্যুকে ইচ্ছামৃত্যুরূপ দিয়ে স্থগিত রাখা হয়েছিল। অশ্বমেধপর্ব, আশ্রমিকপর্ব, এবং হরিবংশকে মূল কাহিনীর সঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে যুক্ত করা হয়েছে—এই মহাগ্রন্থের ব্যাপ্তির যুগে। শেষ পর্যন্ত মহাপ্রস্থানিকপর্ব এবং স্বর্গারোহণপর্ব আদিপর্বে উল্লিখিত তালিকায় অনুপস্থিত এমন কি আদিপর্বের একটা বৃহৎ অংশকে পরবর্তী সংযোজন বলে মনে করা হয়েছে। মহাভারতের এই গতিশীল ব্যাপ্তির যুগে এর মধ্যে অনেক দেব-কাহিনী, বীর-কাহিনী, অতিপ্রাকৃত কাহিনী ইত্যাদি কোথাও না কোথাও স্থান করে নিয়েছিল। এই দীর্ঘ সংযোজনের ফলে বীরকাহিনী হিসাবে ভারত-কথার আবেদন প্রায় নির্লিপ্ত হয়ে এসেছিল তাই মহাভারতের পরিচয় আজও প্রধানত ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি হিসাবে। উইনটারনিসে তো বলেন মহাকাব্য হিসাবে মহাভারতের বৈশিষ্ট্যই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এখন সে শুধু একটা man of literature. পণ্ডিতেরা এমন মতও প্রকাশ করেছেন যে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত মহাভারতে কিছু কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। আদিপর্বে বলা হয়েছে মহাভারতের সংস্করণ তিনটি। যথাক্রমে ৮৮০০ শ্লোক সম্বলিত, ২৪০০০ শ্লোক সম্বলিত, এবং ১০০,০০০ শ্লোক সম্বলিত। এই ক্রমবর্ধমান শ্লোকসংখ্যা হয়ত মহাভারতের কালক্রমে বর্ধমান আকারের প্রতিই ইঙ্গিত স্থাপনা করছে।

এ'ত গেল মহাভারতের গঠন-বৈচিত্র্য। এবার দেখা যাক কোন কালব্যাপ্তিকে অবলম্বন করে ভারতীকথা মহাভারতে রূপ পেল এবং পণ্ডিতরা সে সম্বন্ধে কি বলেন। এ সম্বন্ধে সাধারণত দুই প্রকার প্রমাণ গ্রাহ্য করা হয়ে থাকে; অন্তস্থিত এবং বহিস্থিত। মহাভারতের কিছু অংশে যে ছন্দরূপ ব্যবহার করা হয়েছে বৈদিক ছন্দরূপের সঙ্গে তার নৈকট্য অনস্বীকার্য। অপরপক্ষে মহাভারতই উন্নত কাব্য ছন্দরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং এই উন্নত রূপটি খৃষ্টীয় শতাব্দীসমূহের প্রাথমিক পর্যায়ের আগের নয়। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতে বেদ থেকে শুরু করে ধর্মশাস্ত্র পর্যন্ত সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, তৃতীয়তঃ মহাভারতে ভৌগোলিক জ্ঞানের যে বিস্তার দেখা যায় তাতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৈদিক যুগ গত হবার পর নিশ্চয়ই এই পরিমাণ ভৌগোলিক জ্ঞান অর্জনের জন্য দীর্ঘকাল লেগেছিল; চতুর্থতঃ বৌদ্ধ এড়ুকদের সম্বন্ধে মহাভারতে ঘৃণাসূচক উক্তি পাওয়া যায় অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের পর মহাভারতের কিয়দংশ রচিত হয়েছিল। চতুর্থতঃ পাণ্ডবরা যে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে তার কল্পনা অশোকপূর্ব যুগে করাই যায় না অন্ততঃ ইতিহাসে তেমন কোন প্রমাণ নেই। পঞ্চমতঃ মহাভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মশাস্ত্রগুলোর প্রভাব অনস্বীকার্য (মানব ধর্মশাস্ত্রের কাল খৃষ্টীয় শতাব্দীসমূহের প্রথম দিকেই ধার্য হয়েছে) ষষ্ঠতঃ মহাভারতের প্রাচীন অংশগুলোতে রোমানদের কোন প্রসঙ্গই পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তী অংশগুলোতে রোমানমুদ্রা দীনারের উল্লেখ আছে। এই রোমকমুদ্রা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছিল খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে। সুতরাং যে অংশগুলোতে দীনারের প্রসঙ্গ আছে অন্ততঃ সে অংশগুলো খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর পরের রচনা। এই সমস্ত অন্তস্থিত প্রমাণ থেকে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে মহাভারতে এমন কিছুই নেই যা থেকে বলা যায় যে বৌদ্ধধর্মের পূর্বে এর রচনা শুরু হয়েছিল এবং একথা ঠিক যে খৃষ্টীয় শতাব্দীসমূহের প্রথমদিকে এর রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। বহিস্থিত প্রমাণও এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ভারত এবং মহাভারত উভয়েরই উল্লেখ করেছেন এবং ভারত এবং মহাভারতের উল্লেখ ভারতীয় সাহিত্যে এই প্রথম। ভারত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত রূপ হতে পারে এবং সূত্র যুগে মহাভারতের উল্লেখ থেকে একথা অনুমান করা যায় মহাকাব্য হিসাবে মহাভারতের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সাংখ্য সূত্র শুধুমাত্র মহাভারতেরই উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ পতঞ্জলি

(খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) তাঁর মহাভাষ্যে মহাভারতের অনেক চরিত্রের উল্লেখ করেছেন এবং রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের মতে পতঞ্জলি যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনের প্রসঙ্গ যে ভাবে অবতারণা করেছেন তাতে এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে এই বীরদ্বয় এবং তাঁদের সংশ্লিষ্ট কাহিনী সে সময় প্রচলিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ নাসিক লিপিতে একথা প্রমাণিত যে ভীম, অর্জুন, কেশব, জনমেজয় তাঁদের শৌর্য-বীর্যের জন্য বিখ্যাত। তৃতীয়তঃ ডিও ক্রুসষ্টমস্ (খৃঃ ১০০ অব্দ) যে ভারতীয় মহাকাব্যের বর্ণনা দিয়েছেন তাতে সম্ভবত তিনি মহাভারতকেই উল্লেখ করেছেন। চতুর্থতঃ বলা যায় যে খৃঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে মহাভারত তার বর্তমান রূপ প্রায় বহুলাংশে লাভ করেছে। এই শতাব্দীদ্বয়ের কিয়ৎ পরে উৎকীর্ণ লিপিগুলোতে মহাভারতকে স্মৃতিরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ব্যবহৃত ভূমিদান পত্রে মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্ব থেকে শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে—ত্রয়োদশ পর্ব মহাভারতের শেষতম সংযোজনগুলোর অন্যতম। এই কালের লিপি থেকেই জানা যায় মহাভারত একশত সহস্র শ্লোকের সংহিতা। এই শ্লোকসংখ্যা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্বদ্বয় এবং হরিবংশকে গ্রাহ্য না করলে পূর্ণ হতে পারে না—দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্বদ্বয় এবং হরিবংশ সমস্তই পরবর্তীকালের শেষতম সংযোজন। এবার একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতকেই মহাভারত তার বর্তমান আকারে পৌঁছেছে। এই প্রমাণাবলী থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দী এই দীর্ঘকাল ব্যাপ্তিকে অবলম্বন করে মহাভারত ধীরে ধীরে গঠিত হয়েছে এবং বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। মহাভারতের গঠনকালের আলোচনায় তার গঠন বৈচিত্র্য ভালভাবে বোঝা যাবে। এই কাল সংক্রান্ত প্রশ্নে আমরা যদি খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী থেকে খৃঃ ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিপ্রবৃত্তি, বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান পতন, সামাজিক ও ধর্ম জীবনের পরিবর্তনগুলো মনে রেখে অগ্রসর হই তবে মহাভারতকে উপলব্ধি করা অনেক সহজ হয়ে আসবে।

অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে মহাভারতের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু বীরকাহিনী এবং বিক্রান্ত যুগের কাহিনী সমূহে যে তার পূর্বেও কথিত এবং গীত হত তার প্রমাণ শতপথ ব্রাহ্মণেই আছে। তাই লিখিত যেদিন থেকেই হতে শুরু করুক না কেন ভারতী কথা বা ভারত যুদ্ধের কাহিনী যে কাহিনী মহাভারতের প্রাণকেন্দ্র সেই কাহিনীর সূত্র এবং ব্রাহ্মণ যুগের পূর্বেও বর্তমান থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভারতযুদ্ধ কবে কবে সংঘটিত হয়েছিল তা নিশ্চিত করে জানবার উপায় নেই। জয়সওয়ালের মতে খৃঃ পূঃ ১৪২৪ অব্দ, পার্জিটারের মতে খৃঃ পূঃ ৯৫০ অব্দ, র‍্যাপ্সনের খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দ ইত্যাদি। যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে মূল ভারত কাহিনী এবং মহাভারতে সন্নিবেশিত অপরাপর বীর কাহিনীগুলো থেকে কিছু কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এই কাহিনীগুলোর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করা যেতে পারে। সমাজে নারীর স্থান কোথায় এবং যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা একটা বিশেষ সময়ে কি ছিল এইগুলো সেই কালব্যাপ্তির সামাজিক চিন্তার ধারা নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করে। মূল ভারত কথায় নিয়োগ প্রথা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত। পঞ্চপাণ্ডব, কর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর এঁরা সকলেই ক্ষেত্রজ সন্তান কিন্তু এই জন্ম ঘটনা তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা রাজনৈতিক অধিকারে কোন ব্যাঘাত ঘটায়নি। দ্রৌপদীর স্বামী পাঁচজন এবং তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে যুক্ত। এই ঘটনা তাঁর যুগে ঘটলে বাৎস্যায়ন নিশ্চয়ই 'নষ্টধর্মা'দের কীর্তি বলে ধিক্কার দিতেন কিন্তু একই সঙ্গে পঞ্চ ভ্রাতার পত্নী হওয়া সত্বেও দ্রৌপদীকে কোনরকম সামাজিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি এমনকি ব্রাহ্মণ কবিরাও পরবর্তীকালে দ্রৌপদীর এ নিয়ে কোন সমালোচনা করেনি। এই দুই ঘটনার কোনটিরই অনুরূপ ভারতীয় সাহিত্যে অন্য কোন উপলক্ষে ঘটেনি। ঋগবেদ হল ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম রচনা। এই সংহিতায় অজাচারের অর্থাৎ ভ্রাতায় ভগ্নীতে, পিতায় কন্যায়, মাতায় পুত্রে যৌন সম্পর্কের লক্ষণ আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যেমন যম ও যমীর আখ্যান। ভারত-কাহিনীতে কথিত এই নিয়োগ-প্রথা এবং নারীর বহুবিবাহ এবং ঋগ্‌বেদের অজাচার নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে নরনারীর যৌনসম্পর্ক কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কোন স্থিরতা তখনও আসেনি। নিয়োগ প্রথা থেকে মনে হবে যে পুত্রের প্রয়োজনীয়তা তখন এত বেশী যে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনও স্বীকৃত। পুত্রের প্রয়োজনীয়তা মনুও স্বীকার করেছেন (পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা) কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন কালক্রমে লুপ্ত হয়েছে। নারীর বহু-বিবাহ যে তার সন্তানধারণের ক্ষমতাকে হ্রস্ব করে এ কথাটা হয়ত তখনও পরিষ্কারভাবে ধরা দেয়নি। ঋগ্‌বেদে কুমারী কন্যার যথোপযুক্ত শিক্ষা দেবার বিধান আছে এবং কন্যা সে যুগে ইচ্ছামত স্বামী নির্বাচিত করতে পারত। বিক্রান্ত যুগের স্মৃতিযুক্ত ভারত কথাতে যে সমস্ত নারী চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে তাঁরা অনেকেই যে শিক্ষিতা ছিলেন এ কথা স্থির বলে ধরা চলে আর কুমারী যে ইচ্ছামত সঙ্গী নির্বাচন করতে পারত সুভদ্রা এবং সাবিত্রীর পতি নির্বাচনই তার প্রমাণ। ঋগ্‌বেদের বিশপলা ছিলেন যোদ্ধা। সুভদ্রা স্বয়ং যাদবযুদ্ধের সময় অর্জুনের রথ পরিচালনা করেছিলেন। কালক্রমে যে স্ত্রী স্বাধীনতা সংকীর্ণ হয়ে আসছিল তার প্রমাণ যেমন ঋক পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আছে তেমনি আছে মহাভারতের পরবর্তী সংযোজনের মধ্যে। মূল ভারত কাহিনী এবং অন্যান্য বিক্রান্ত যুগের কাহিনী নারীজাতির সামাজিক ও অন্যান্য অধিকারের যে ইঙ্গিত দেয় সে ঋগ্‌বেদের প্রাথমিক অংশগুলোরই অনুরূপ। বিক্রান্তযুগের স্মৃতিবহ এই কাহিনীগুলো ও ঋগ্‌বেদে পরিচিত নারী চরিত্র উভয়কে নিকটতর করে দেয়। ঋগ্‌বেদের কাল নির্ণয় হয়েছে কিন্তু অজাচার কবে থেকে কতদিন চলেছিল তার কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ঠিক তেমনি নিয়োগপ্রথা কবে থেকে কতদিন যে সমাজে প্রচলিত ছিল তার কাল নির্ণয়ও সম্ভব নয়। ঋক্ সংহিতায় উল্লিখিত অজাচার এবং ভারত কাহিনীর নিয়োগ প্রথা সমাজ বিবর্তনের এক দূরতম অধ্যায়ের স্মৃতি। কাহিনী হিসাবে শ্রুতি হিসাবে চলে এসেছে অবশেষে রূপ পেতে শুরু করেছে ঋক্ সংহিতায় আর মহাভারতে।

এ পর্যন্ত মহাভারতের প্রকৃত রূপ কি সেইটাই পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। মহাকাব্যের যুগে নারী সমাজের স্থান কোথায় সেই আলোচনা এই বিশ্লেষণ ছাড়া সম্ভব নয়। বিক্রান্তযুগের নারী চরিত্র আর পরবর্তী নীতি আলোচনায় নারীসমাজের যে স্থান নির্ধারিত হয়েছে সেই দু'টোর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কি এবং একই গ্রন্থে তাদের যথোপযুক্ত স্থলেই বা কি সে তত্ত্ব অনুধাবন এই বিশ্লেষণের আলোকেই সম্ভব। বিক্রান্ত-যুগের স্বাধীন নারী এবং সংস্কৃত সমাজের সংকুচিত অধিকার নারীসমাজ এই উভয়ের মিলনে মহাভারতের নারী সমাজের প্রকৃত পরিচয়।

বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্ব

ডাঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবান বুদ্ধগয়া হতে প্রায় ছ মাইল দক্ষিণে নৈরঞ্জনা (বর্তমান ফল্গু) নদীর তীরে উরুবেলায় (বর্তমান বুদ্ধগয়া) বটবৃক্ষের নীচে ছ' বছর কঠোর সাধনার পর বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং এ সত্য জগতের হিতের জন্য প্রচার করেন। তাঁর এ অমোঘবাণী জনসাধারণের মনে এনেছিল অপূর্ব সাড়া। ত্রিপিটক গ্রন্থে এ সত্য বা তাঁর অমোঘ শিক্ষা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ জটিল ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। কেবল উচ্চ সাধকেরাই এটি উপলব্ধি করতে পারেন। পরবর্তীকালে এ দুরধিগম্য তত্ত্বের মর্ম উপলব্ধির জন্য বহু টীকা বা ভাষ্য রচিত হয়। এ গ্রন্থগুলি বুদ্ধের চিন্তাধারাকে জনসাধারণের নিকট পরিচিত করে তুলে।

ভগবান তথাগতের চিন্তাধারার এখানে একটু আলোচনা করা হচ্ছে। বারাণসীর মৃগদাবে (বর্তমান সারনাথ) তাঁর পূর্ব পরিচিত পাঁচজন (পঞ্চবর্গীয়) ভিক্ষুদের১ তিনি যে উপদেশ দেন তা ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে সুপরিচিত। এতে চারিটি গভীর তত্ত্ব সন্নিবেশিত— দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও নিরোধগামী মার্গ। এগুলি আর্যসত্য বা শ্রেষ্ঠসত্য নামে খ্যাত। চতুরার্য সত্যে যে সাধকের জ্ঞান হয়েছে তাঁকে বলা হয় আর্য। পালিসাহিত্য হতে নির্বাণ লাভের চারিটি স্তরের কথা জানা যায় যথা—স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব। যিনি নির্বাণ লাভের জন্য সাধনার স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছেন তাঁকে বলা হয় স্রোতাপন্ন। যাকে নির্বাণ লাভের জন্য ইহজগতে একবার মাত্র জন্ম নিতে হয় তাকে সকৃদাগামী বলা হয়। যাকে নির্বাণ লাভের জন্য আর জন্ম নিতে হয় না তাকে অনাগামী বলে আখ্যা দেওয়া হয়। যিনি পরমপদ নির্বাণ লাভ করেন তিনি হন অর্হৎ। ভগবান বুদ্ধ এ চতুরার্য সত্যের ব্যাখ্যা বহু সাহিত্যে বিশদভাবে করেছেন। তিনি বলেন, জীবন দুঃখময়। জাগতিক সুখদুঃখ সবই ক্ষণস্থায়ী—সুতরাং এরা ক্লেশদায়ক। তাই বার বার তিনি বলেছেন প্রতিসন্ধি বা জন্মগ্রহণ করাই দুঃখ। পুনর্জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের উৎপত্তির কারণ। পুনর্জন্ম রোধ করলে হয় দুঃখের অবসান। সুতরাং নির্বাণ উপলব্ধি করে পুনর্জন্ম রোধই যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয় সত্য অর্থাৎ সমুদয় সত্য বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ নীতি হতে উদ্ভূত। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সবই পরিবর্তনশীল। অতএব জীবের দুঃখ কারণসম্ভূত। পূর্বেই বলা হয়েছে তথাগতের মতে বার বার পুনর্জন্মই দুঃখ। পুনর্জন্মের আবার কারণ হচ্ছে সাংসারিক জীবনের প্রতি আসক্তি। এ আসক্তি আসে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন—এ ছটি ইন্দ্রিয় হতে। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি কোন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। এ জ্ঞানের অভাবই জগতের বস্তুর প্রতি আসক্তি আনে। আসক্তির দরুণ আমাদের দৃষ্টি বিপর্যয় হয়। যাকে দর্শনে বলা হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞান। সুতরাং অবিদ্যা বা প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই দুঃখের উৎপত্তির কারণ। তৃতীয় বা নিরোধ সত্য দ্বিতীয় বা দুঃখ কারণসম্ভূত হতে অনুমান করা হয়। দুঃখ নিরোধের একমাত্র উপায় পুনর্জন্ম নিরোধ। যাকে বৌদ্ধদর্শনে বলা হয় নির্বাণ। চতুর্থ সত্য বা মার্গসত্যের জ্ঞান যখন লাভ হয় তখন দুঃখ উৎপত্তির কারণ সমূহের জ্ঞান হয়। ত্রিপিটকে এ সত্যের যথেষ্ট আলোচনা দেখা যায়। চতুর্থ আর্যসত্য মধ্যম মার্গ বলে কথিত। অসংযত ভোগ বা কঠোর তপস্যা উভয়ই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। প্রকৃত সাধক এ দুটি পন্থা পরিহার করেন। মধ্যম মার্গটি বৌদ্ধ সাহিত্যে আবার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে কথিত। আটটি অঙ্গ আছে বলে অষ্টাঙ্গিক বলা হয়। অঙ্গ অর্থ হচ্ছে কারণ, উপকরণ প্রভৃতি। এ আটটি অঙ্গ বা সাধনার উপায়, যথা— সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসঙ্কল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যকজীবিকা, সম্যকপ্রচেষ্টা, সম্যকস্মৃতি, ও সম্যকসমাধি। সম্যকদৃষ্টি হচ্ছে চতুরার্য সত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও কামগুণ পরিহার করা এবং মৈত্রীভাব ও করুণাভাব উৎপাদন করাই সম্যক সঙ্কল্প। মিথ্যাকথা, কটুবাক্য, মর্মচ্ছেদী বাক্য ও নিরর্থক আলাপ হতে বিরত থাকাই সম্যকবাক্য, জীবহত্যা, চৌর্য ও ব্যভিচার হতে বিরতি সম্যক কর্ম। অসদুপায়ে জীবনযাপন না করে সৎজীবিকার দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই সম্যক জীবিকা। অনুৎপন্ন পাপ পরিহার ও কুশলের উৎপাদন এবং উৎপন্ন কুশলের স্থিতি ও বৃদ্ধি সম্যক প্রচেষ্টা। কায় ও মনের ধর্মসমূহ বিষয়ে সর্বদা স্মরণ রাখাই সম্যক স্মৃতি। চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। সম্যক সমাধি মনের চঞ্চলতা দূর করে। প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি ভেদে এমার্গ আবার তিন ভাগে বিভক্ত। এ অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনে জীবের তৃষ্ণা ও অবিদ্যা বিদূরিত হয় এবং পরিশেষে নির্বাণ উপলব্ধি করা যায়। সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভের এটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

চতুরার্য সত্যই বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র। দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—'চতুন্নং ভিক্খবে অরিয়সচ্চানং অননুবোধা অপপটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সন্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব

১। অঞ্ঞাতকৌণ্ডিন্য, বাষ্প, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ।

তুম্হাকঞ্চ'—চারি আর্য সত্যের জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবের জন্য আমাকে ও তোমাদিগকে জন্ম হতে জন্মান্তরে ভ্রমণ করতে হয়েছে। এ সত্যের অনুপলব্ধির জন্যই জীব সংসারে বারে বারে আনাগোনা করে এবং অশেষ দুঃখ ভোগ করে। চতুরার্য সত্যের যে ব্যাখ্যা আগে দেওয়া হল—এ ব্যাখ্যাই সাধারণত বৌদ্ধশাস্ত্রে মেলে। এ সত্যের আরেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং যোগসূত্রেও আবার চতুরার্য সত্যের আভাস মেলে। রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য—এ চারিটি হচ্ছে চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলসূত্র। যোগসূত্রে আছে সংসার, সংসার হেতু মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। এ হতে বেশ বুঝা যায় চতুরার্য সত্য হচ্ছে সমস্ত পার্থিব বস্তুকে বা কোন সত্যকে চার ভাগে পরীক্ষা করার একটি ধারা মাত্র। সুতরাং দুঃখ এ কথাটির বদলে আমরা যে কোন জিনিষ নিতে পারি এবং তাকে চার ভাগে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। মোটকথা, কোন বস্তুকে চারিটি দৃষ্টিকোণ হতে পরীক্ষা করাই এ সত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ভারতের দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। গৌতমবুদ্ধই সর্বপ্রথম এ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং প্রচার করলেন অনাত্মবাদ। আত্মা নিত্য, ধ্রুব ও অপরিবর্তনশীল—ইহা অন্ধবিশ্বাস। তিনি বলেন, জীব রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পাঁচটি স্কন্ধের সমষ্টি মাত্র। যেমন রথ বলতে চক্র, ধ্বজ, রশ্মি, প্রতলি, আসন ইত্যাদির সমষ্টিকে বোঝায়। দীপশিখা বলতে বিভিন্নকালের দীপশিখার সমষ্টিকে বোঝায়। সেরূপ পাঁচটি স্কন্ধের সংমিশ্রণে আত্মবোধ উৎপন্ন হয়। উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করলে আত্মা নামে কোন সদ্‌বস্তু পাওয়া যায় না। এগুলি অনিত্য ও পরিবর্তনশীল সুতরাং সর্ববিধ ক্লেশের কারণ। ভারতের অন্যান্য ধর্মমতের প্রভেদ এই আত্মাবাদে। বুদ্ধ কর্মবাদে অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন। এ জন্মের কর্ম গত বা ভবিষ্যৎ জন্মের কর্মের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কর্ম একদিকে যেমন সৎফল প্রসব করে অন্যদিকে তেমনি জীবের ভবিষ্যৎও নির্দ্ধারণ করে। জগতের সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী—কোন বস্তুই দুই মুহূর্তের জন্য এক নহে—যে মুহূর্তেই যার উৎপত্তি পরমুহূর্তেই তার বিনাশ। মানুষ যেমন বীজ বপন করে তার ফলও পায় তেমন। মানুষের মধ্যে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সবল, কেহ দুর্বল, কেহ দুষ্প্রজ্ঞ, কেহ প্রজ্ঞাবন্ত—এই নানাবিধ ভেদের কারণ হচ্ছে ঐ কর্ম। আবার বৃক্ষাদির দিকে যদি তাকানো যায়—তাহলে দেখা যাবে—সব বৃক্ষই সমান নয়। কোনটির ফল তিক্ত কোনটির লোনা, কোনটির বা মধুর। মানুষের ভিতর যেমন কর্মবীজের ভেদ, বৃক্ষের মধ্যে তেমনি মূলবীজের ভেদ—এ সব পার্থক্যের কারণ। ভগবান বুদ্ধ কর্মের উপর জোর দিয়ে বলেন—কম্মসৃসকোম্হি, কম্মদায়দো, কম্মযোনি কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণো, সং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্‌স দায়দো ভবিস্সামি।

কর্মই আমার সুহৃৎ, কর্মই আমার উত্তরাধিকারী কর্মই আমার গতি, কর্মই আমার বন্ধু, কর্মই আমার আশ্রয়। কল্যাণ বা পাপ যে কর্মই আমি করি সেটির উত্তরাধিকারী হবো—

বৌদ্ধধর্মে কর্মের যতটা প্রাধান্য দেখা যায় ততটা আর কোথাও না।

প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণনীতি ভগবান বুদ্ধের ভারতীয় দর্শনে একটি সার্থক অবদান। প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের ধাতুগত অর্থ—একটির উপর নির্ভর করে আর একটির উৎপত্তি। পালিশাস্ত্রে ইহার অর্থ করা হয়েছে ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্‌সুপ্‌পাদা ইদং উপ্পজ্জতি। ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি। ইমস্‌স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি।২ এটা হলে এটা হয়। এটার উৎপত্তি হতে এটার উৎপত্তি। এটা না হলে এটা হয় না। এটার উৎপত্তি না হলে এটার নিরোধ হয়। ধর্মস্থিততা, ধর্মনিয়তা, তথতা, অভিতথতা ও ইদপ্রত্যয়তা বলেও ইহা খ্যাত। নাগার্জুনের মাধ্যমিকসূত্রের চন্দ্রকীর্তি বিরচিত প্রসন্নপদা নামক ভাষ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব সূক্ষ্মদার্শনিক দৃষ্টিকোণ হতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্রব্যমাত্রেই তার উৎপত্তির জন্য কতকগুলি কারণসমষ্টির উপর নির্ভর করে। উৎপন্ন দ্রব্যে যখন নিজের স্বতন্ত্র উৎপত্তির কোন ক্ষমতা থাকে না তখন তার সত্তাও থাকে না। সুতরাং ইহা অশাশ্বত ও দুঃখের কারণ। প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণনীতির আবার বারটি অঙ্গ বা পদ—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব জাতি ও জরাব্যাধি মরণ শোকাদি। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের দূরীকরণে দুঃখের সম্পূর্ণ অবসান হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদ নয়কে চক্রাকারে দেখান হয়। এই নয়ের বারটি পদের কোনটিকে আদি বা অন্ত বলা চলে না। চক্রের যে কোন পদ হতে আরম্ভ করলে এর কাজ লক্ষ্য হয়। এ নীতি আবার চারভাগে বিভক্ত—চারিটি সংক্ষেপ, ত্রিকাল, বিংশতি আকার ও ত্রিসন্ধি। চারিটি সংক্ষেপ—অবিদ্যা ও সংস্কার একটি সংক্ষেপ। বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা একটি সংক্ষেপ। তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব একটি সংক্ষেপ। জন্মমরণাদি একটি সংক্ষেপ। ত্রিকাল—অবিদ্যা ও সংস্কার অতীতকালীয়। বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব বর্তমানকালীয়। জন্ম মরণাদি ভবিষ্যৎকালীয়। বিংশতি আকার—অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব অতীত-কালীয় কর্মবর্ত। বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা বর্তমানকালীয় বিপাকবর্ত। তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, অবিদ্যা ও সংস্কার বর্তমান কর্মবর্ত। বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা ভবিষ্যৎ বিপাকবর্ত। ত্রিসন্ধি—সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন ও স্পর্শ একসন্ধি। বেদনা ও তৃষ্ণা একসন্ধি। ভব ও জন্ম একসন্ধি। সুত্তপিটকের মজ্ঝিমনিকায়ে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—যো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্‌সতি সো ধম্মং পস্‌সতি, যো ধম্মং পস্‌সতি সো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্‌সতি।—যিনি প্রতীত্যসমুৎপাদকে দেখেন তিনি ধর্মকে দেখেন। যিনি ধর্মকে দেখেন, তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদকে দেখেন। অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদের আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায়। আবার ধর্মকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে প্রতীত্য-সমুৎপাদ তত্ত্ব জানা যায়। প্রতীত্যসমুৎপাদে ও ধর্মে কোন প্রভেদ নাই। দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধ প্রদর্শনই এ নীতির বৈশিষ্ট্য। এটি বৌদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র চাবিকাটি। পরবর্তীকালে দার্শনিক প্রবর নাগার্জুনের সমগ্র দর্শনই এই নীতির উপর স্থাপিত হয়।

২। অস্মিন সতীদং ভবতি অস্যোৎপাদাৎ ইদমুৎপদ্যতে।

ফরাসী হাসি

দিলীপ মালাকার

'হিউমর'-এর বাংলা কি রসিকতা? না হাসি। প্রত্যেকটা দেশেরই 'হিউমর' বা হাসি স্বতন্ত্র। হাসি কিন্তু ভিন্ন দেশে ভিন্ন নয়। হাসি হাসিই! হাসবার মতন কোনো কথা কানে প্রবেশ করলেই রসিকজন মাত্রেই হেসে থাকেন। কাষ্ঠরসিকদের কথা বলছি না। যাঁরা হাসতে জানেন না তাঁরা কোনো রকমের 'হিউমর'-এই মজেন না। কাঠখোট্টারা 'হিউমর'এর বাইরে হলেও তাদের উপরেই কি কম 'হিউমর' চলে! তবে হাসবার মতন কথা, হাসাবার মতন কথা জানা একটা আর্ট। যিনি হাসাবার কথা বলবেন এবং যিনি হাসাবেন তাঁদের দুজনেরই হওয়া চাই একটু অন্ততঃ সূক্ষ্মানুভূতি সম্পন্ন। হাসবার কথা কখনো ভোঁতা হয়না, হয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাই আবহমান কাল ধরে হাসি জিনিষটা চৌষট্টি কলার একাংশ বলেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

তবে দেশ-কাল পাত্র বুঝে হাসবার ও হাসির বিষয়বস্তু হয়ে থাকে পৃথক। এক দেশে হাসির একটি বস্তু যেমন হাস্যকর তেমনি অন্য দেশে সে বেদনাদায়ক। বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আমো মরোয়া হাসি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছে যে, একজনের মূর্খামি বা কষ্টদায়ক দৃশ্য অন্যের করে হাসির উদ্রেক। তিনি আরও বলেছেন যে আমরা কেন চার্লি চ্যাপলিনের ছবি দেখে হাসি। কারণ চার্লি চ্যাপলিন মানুষের জীবনের এমন সব দুঃখময় দৃশ্য সুন্দরভাবে অভিনয় করেন যে সে দৃশ্য পরিচয় দেয় বোকামির এবং সে দৃশ্য দেখে আমরা না হেসে থাকতে পারি না। অর্থাৎ একজনের দুঃখময় দৃশ্য দেখে আর একজন হাসে।

আমরা বাঙ্গালীরাই কি ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোকেদের আচরণ দেখে হাসি ঠাট্টা করি না। হয়ত সেইসব প্রদেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ সভ্যতাবলে এমন কিছু করেছেন যার ফলে শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সে করে থাকে হাসির উদ্রেক। বাঙালী কি বাঙালীকে নিয়েই হাসি-তামাসা করে না।

ফ্রান্সেও ঠিক তেমনি প্যারিসের অধিবাসীরা যাঁরা পারিসিয়ান নামে স্বনামধন্য তাঁরাও হাসি ঠাট্টা করেন মার্সেই জেলার ভাষা নিয়ে। প্যারিসে কোনো পারিসিয়ানের সম্মুখে মার্সেইএর ভাষা বললেই তিনি খিল খিল করে হাসতে সুরু করবেন। কোনো কারণে সম্মুখে হাসা সম্ভব না হলে তিনি হাসবেন অন্তরালে। ফ্রান্সে মার্সেইএর কথ্য ভাষায় উচ্চারণ ও মারিউস শব্দ যত হাসির খোরাক যোগায় তত জোগায় না অন্য কিছুতে। মারিউস হল একটি নাম। যেমন আমাদের গোপাল বা রাম। মারিউসকে কেন্দ্র করে উত্তর ফ্রান্সের বিশেষ করে পারিসিয়ানরা কত গল্পই না রচনা করেছে। তার প্রতিটিই হল 'হিউমর'এ ভরা। মারিউস-এর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাই হল ফরাসীদের হাসির খোরাক। বাঙলায় যেমন জোলা পরিবারের বোকামি নিয়ে অনেক হাসির গল্প রচিত হয়েছে তেমনি গল্প প্রচলিত আছে ফ্রান্সে মারিউসএর বোকামি নিয়ে হাসির গল্প। তাছাড়া ফ্রান্সে প্রতিটি জেলায় আছে তার নিজস্ব 'হিউমর'। শহরবাসীরা গ্রামের চাষাভূষোদের নিয়ে কম হাসি-ঠাট্টার গল্প জোড়েন। সেখানেও তাই গ্রামের অল্পশিক্ষিত চাষীকে কেন্দ্র করে তার অজ্ঞতাকে নিয়ে শহুরে বাবুরা নিয়মিত 'হিউমর' রচনা করেন। গ্রামের 'হিউমর' সাধারণতঃ একটু ভোঁতা হয়ে থাকে। শহরের 'হিউমর' হয় সূক্ষ্ম।

এতো গেল ফরাসীতে ফরাসীতে হাসি ঠাট্টা, ফরাসীরা আবার ইংরেজদের উপরে কি কম হাসি ঠাট্টা করে। যেমন করে ইংরেজরা স্কচদের উপরে। ইংরেজরা নাকি ফরাসীদের হাসির উদ্রেক করে, তাই নিয়ে তো ফরাসী সাহিত্যিক ম' পিয়ের দামিনোস এক মস্ত বড় উপন্যাস লিখে ফেলেছেন। সে উপন্যাস হাসবার জন্যেই। ইংরেজ চরিত্র নিয়ে লেখা সে উপন্যাস।

কয়েকটা ফরাসী 'হিউমর'-এর নমুনা দিচ্ছি;

এক ভদ্রলোক থানায় এসে দারোগা বাবুকে বলছেন, দারোগা বাবু আমায় গ্রেপ্তার করুন। আমি আমার স্ত্রীকে গুলী করেছি।

—আপনার স্ত্রী কি মারা গেছেন?

—না, মরেনি বরং বেশ সুস্থ আছেন। কারণ ছ'টা গুলিই ব্যর্থ হয়েছে।

—তাহলে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করব কেন?

—কারণ আমার স্ত্রী এখন আমায় খুঁজছেন যে।

* * * *

আপনি শেষ পর্যন্ত আপনার মেয়েকে ওই ছোঁড়াটার সাথে বেড়াতে আদেশ দিয়েছেন?

—কেন কি হয়েছে?

—দুঃখের কথা কি বলব ওই ছোঁড়াটা পাঁচ বছর জেল খেটে এই ফিরেছে।

—এঁ্যা! ছোঁড়াটা তো বড় পাজি আমায় বললে কিনা মাত্র দু'বছর জেল খেটেছে।

* * * *

এক ভদ্রমহিলার সখ হয়েছে তিনি সাহিত্যিক হবেন। তাই বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অনুসরণ করছেন। একদিন তিনি এক সাহিত্যিককে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাল লেখা লিখতে গেলে তার শ্রেষ্ঠ পন্থাটা কি দয়া করে বলুন না?

উত্তর এল সাহিত্যিকের কাছ থেকে যেন বিদ্যুৎ চমকাবার মতন, —বাঁ ধার থেকে ডান দিকে লেখাই শ্রেষ্ঠ মাদাম।

মার্সেই-এর মারিউস কি নিয়ে হাজার কেন লক্ষ হাসির উপমা ছড়িয়ে আছে সারা ফ্রান্সময়। তারই একটা তুলে দিচ্ছি।

একদিন মারিউস গেছে আফ্রিকায় বেড়াতে, সেখানে তখন বেশ গরম। তাই মারিউস সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছে, নামামাত্র ওখানকার স্থানীয় অধিবাসী এক নিগ্রো মারিউসকে সাবধান করে দিয়ে বলে যে, এখানে নাকি প্রচুর হাঙর ঘুরে বেড়ায়। মারিউস তো এক লাফে ডাঙ্গায় উঠে আসে ভয়ে। মারিউস তাই সমুদ্র ছেড়ে গেল নদীতে স্নান করতে. সেখানে স্নানে নেমে মারিউস জিজ্ঞাসা করে ওখানকার একজনকে, 'কি হে এখানে হাঙর নেই তো?' তার উত্তরে নিগ্রোটি জানায় যে, 'না মহাশয় এখানে হাঙর আসবে কোত্থেকে কুমিরের ভয়ে কি হাঙর আসতে পারে।'

...**"marriage is a misery and a woe."**

—***Chaucer.***

কৈবল্যোপনিষদ
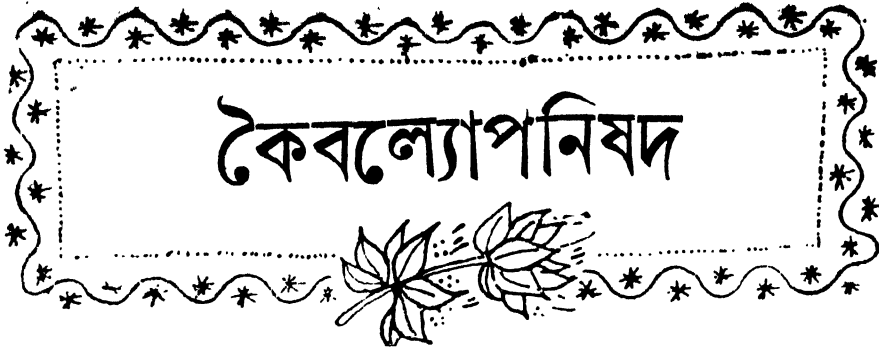
শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পটল

প্রশ্ন : ওঁ কথং বন্ধঃ, কথং মোক্ষঃ, কোঽবিদ্যা, কাবিদ্যেতি।

উত্তর : অনাত্মনো দেহাদীনাত্মত্বেনাভিমন্যতে সোঽভিমানঃ আত্মনোবন্ধঃ।

অর্থ—আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ বোধ, অনাত্ম অর্থাৎ তদ্বিপরীত, আমি ভিন্ন অপর সকলই অনাত্ম। আমরা সকলেই বলিয়া থাকি আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি সবল, আমি দুর্ব্বল, আমার শরীর, আমার বাড়ী, আমার স্ত্রীপুত্রাদি, সকলই আমার। এই সকল স্থলে, স্থূলত্ব, কৃশত্ব, ধনবত্তা, দারিদ্র্য, সবলতা, দুর্ব্বলতা এগুলি অনাত্মবস্তু। এই অনাত্ম বস্তুগুলিকে আমি ও আমার এইরূপ বোধ করিয়া থাকি। যে শক্তি প্রভাবে এইরূপ আমি ও আমার বোধ করি, অর্থাৎ স্থূলত্বাদি গুণসমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ গুণরহিত আত্মসত্তার উপর আরোপ করিয়া তদ্ভাবাপন্ন আমাকে বুঝি বা বোধ করি উহাই বন্ধ। মানুষ যখন ঐরূপ অভিমানশূন্য বা বোধশূন্য হয়, এই অভিমানশূন্যতা মোক্ষ। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মার বন্ধন বা মোক্ষ বলিয়া কিছুই নাই। আত্মা স্বয়ং প্রকাশ। যাহার প্রকাশে বিশ্বের প্রকাশ, যাহার অভাবে এই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব হারাইয়া যায়, বিশ্বের দ্রষ্টাও কেহ থাকে না। এই আত্মার কোথাও বন্ধন নাই। বন্ধন যাহার নাই মোক্ষ তাহার কোথা হইতে আসিবে। কিরূপে সম্ভব হইবে। আত্মা বোধমাত্র সত্ত্বা, তিনি যখন বিষয়াবচ্ছিন্ন হইয়া বিষয় মাত্রকে প্রকাশ করেন তখনই আমরা বিষয় আন্তর ও বাহ্য; স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার বিষয় প্রত্যক্ষ করি বা বোধ করি। আমরা বিষয়কে দর্শন করি কিন্তু বিষয়ীকে দর্শন করি না। কিন্তু বিষয়ী ভিন্ন বিষয়ের প্রত্যয় অসম্ভব। বিষয়ীকে বাদ দিয়া বিষয়ে যে আত্মবোধ উহাই বন্ধন।

কা অবিদ্যা ?

উত্তর :—যে শক্তি অনাত্মবস্তুতে আত্মবোধ করায়, ("অভিমানং কারয়তি যা সা অবিদ্যা") সেই শক্তি অবিদ্যা—অবিদ্যার অপর নাম অজ্ঞান। অজ্ঞান কথার তাৎপর্য্য আত্মাকে না জানা। আমি ও আমার মনে করি সবই, কিন্তু আমি কে তাহা জানি না, এই না জানাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞতাবশতঃ ঐরূপ অসত্য জ্ঞান হইয়া থাকে। অবিদ্যা সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষি পুনরায় বলিবেন।

কা বিদ্যা ?—"অভিমানো যয়া নিবর্ত্ততে সা বিদ্যা"।

যে জ্ঞানশক্তি প্রভাবে অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া অভিমান নিবৃত্ত হয় তাহাই বিদ্যা। নিজ স্বরূপের উপলব্ধি বিদ্যা। নিজ স্বরূপের উপলব্ধি হইলে ঐরূপ মিথ্যা অভিমান আর থাকিতে পারে না। বিদ্যার স্বল্প প্রকাশের নামই অবিদ্যা। বিদ্যার স্বরূপ প্রকাশ; প্রকাশকে বুঝিতে পারিলে অপ্রকাশ বলিয়া কিছু থাকিত পারে না।

প্রশ্ন :—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত, তুরীয়ঞ্চ কথম্ ?

উত্তর :—মনাদি চতুর্দশ করণৈঃ পুষ্কলৈরাদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যদোপলভতে তদাত্মনো জাগরণম্।

অর্থ—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, বাক, পাণি, পাদপায়ু উপস্থ এই চতুর্দশ করণ। ইহাদিগের সহায়তায় বিষয়ভোগ সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহারা করণ এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ করণের চতুর্দ্দশটি অধিদেবতা আছে। তাহাদিগের দ্বারা করণগুলি অনুগৃহীত হইয়া অর্থাৎ শক্তিলাভ করিয়া যখন জীবকে বিষয়ভোগে নিযুক্ত করে, তাহাই আত্মার জাগ্রৎ ব্যবহার। মানুষের সকল ইন্দ্রিয় যখন স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে তখন হয় জাগরণ।

মনের দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির দেবতা ব্রহ্মা, অহংকারের রুদ্র, চিত্তের বাসুদেব। আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বক্, অগ্নির সাত্ত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে রসনা, পৃথিবীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি সাত্ত্বিকাংশ হইতে মনবুদ্ধি চিত্ত অহংকার সম্ভূত হইয়াছে। যাহা হইতে যে সম্ভূত হইয়াছে সে তাহার অধিদেবতা। আকাশের রাজসাংশ হইতে বাক্, বায়ুর রাজসাংশ হইতে পাণি, অগ্নির রাজসাংশ হইতে পাদ, জলের রাজসাংস হইতে উপস্থ, পৃথিবীর রাজসাংশ হইতে পায়ু, পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি রাজসাংশ হইতে পঞ্চপ্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্যই মূলে বলা হইয়াছে পুষ্কলৈরাদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ—ঐ করণ সমূহ দ্বারা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয় জীব ভোগ করে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তন্মাত্রগুলিও পঞ্চমহাভূতের গুণ। মাত্রার তারতম্যানুসারে ঐ পঞ্চভূতেই কমবেশীরূপে অবস্থিত।

তদ্বাসনারহিতশ্চতুর্ভিঃ করণৈঃ শব্দাদ্যভাবেঽপি বাসনাময়ান শব্দাদীন্ যদোপলভতে তদাত্মনো স্বপ্নম্।

অনন্তবাসনা আমাদিগের মনে স্মরণাতীত কাল হইতেই পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমাদিগের চিত্ত কখনও বাসনাশূন্য হয় না। নিদ্রাবস্থায় আমাদিগের বাহ্যকরণ অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চল হইয়া পড়ে, কিন্তু মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারিটি অন্তঃকরণ সঞ্চিত বাসনা প্রেরিত হইয়া জাগ্রত অবস্থায় শব্দাদি বিষয় সমূহের তখন অভাব থাকিলেও কল্পিত শব্দাদি

বিষয় ভোগে ব্যাপৃত হয়, তখন আত্মার স্বপ্নাবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য ও দ্রষ্টা অভিন্ন, সকলই মনোময়।

চতুর্দ্দশ করণোপরমাদ্বিষয় বিশেষ জ্ঞানাভাবাৎ যদা, তদা আত্মনো সুষুপ্তম্।

অর্থ—নিদ্রাবস্থায় আমাদিগের যে সময় চতুর্দ্দশকরণ বিষয় গ্রহণে নিরস্ত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, কোনও প্রকার বিশেষ জ্ঞান থাকে না, আমি আছি, এইরূপ জ্ঞান বা বোধও যখন থাকে না তখন আত্মার সুষুপ্তি। এই সুষুপ্তি কালে আন্তর বাহ্য সকল প্রকার বোধ বিলীন হইলেও তমোগুণের দ্বারা আবৃত হইয়া আত্মাসুখে সুখস্বরূপ অর্থাৎ আত্মস্বরূপেই অবস্থান করিয়া থাকেন। সুখ আত্মারই স্বরূপ। শাস্ত্র বলেন "ভূমা এব সুখম্"—আত্মাই—ভূমাসুখ, ভূমা শব্দের অর্থ—অনন্ত। মানুষের আত্মবোধ—জাগ্রৎ অবস্থায়—করণ সমূহ দ্বারা বিষয়াবলম্বনে জাগ্রত থাকে, ইন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধ শূন্য হইলেই নিদ্রাকর্ষ হয়, নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

অবস্থাত্রয়াভাবাৎ ভাবসাক্ষী স্বয়ং ভাব রহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তত্ত্ব রীয়ং চৈতন্যমিত্যুচ্যতে।

অর্থ—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় বিচরণশীল চৈতন্য যখন এই অবস্থাত্রয়কে অতিক্রম করিয়া, ভাবশূন্য—আন্তর ও বাহ্য উভয় প্রকার ভাবশূন্য—অথচ ভাবসমূহের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা কেবল চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন তখন তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন। ঐ তুরীয় চৈতন্যই প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয় গ্রামের স্রষ্টা। ঐ চৈতন্যই যতক্ষণ জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের মধ্যে বিচরণ করেন ততক্ষণ তিনি জীব চৈতন্যরূপে পরিচিত হন্। তুরীয় অবস্থাপ্রাপ্ত চৈতন্য ঈশ্বর চৈতন্য নামে পরিচিত।

প্রশ্ন:—অন্নময়: প্রাণময়ো মনোময়: বিজ্ঞানময়ো আনন্দময়: কথম্?

অর্থ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কিরূপ?

উত্তর—অন্নকার্য্যাণাং ষণ্ণাং কোষাণাং সমূহোঽন্নময়: কোষ:।

অর্থ—খাদ্যদ্রব্য হইতে সঞ্চিত রসাদি দ্বারা উপচিত অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, ত্বক্ ও শোণিত এই ছয় প্রকার পদার্থ দ্বারা সংগঠিত শরীরকে বলা হয় অন্নময় কোষ। এই শরীর পঞ্চীকৃত মহাভূত কর্ত্তৃক সংগঠিত। সদসৎ কর্ম্মজন্য সুখ-দুঃখাদি ভোগায়তন, ইহা উৎপত্তি; স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণতি, ক্ষয় ও বিনাশ এই ছয় প্রকার ভাব বিকারযুক্ত। চৈতন্যবোধের আবরক বলিয়া কোষ বলা হয়।

প্রাণাদি চতুর্দ্দশ বায়ু ভেদা: যদা অন্নময়ে কোষে বর্ত্তন্তে—তদা প্রাণময়: কোষ: ইত্যুচ্যতে।

অর্থ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এবং আরও চারিটি বায়ু, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এইগুলির সমষ্টিকে বলা হয় প্রাণময় কোষ।

উহাদিগের পৃথক পৃথক পরিচয় এইরূপ—

উর্ধ্বগমনশীলো নাসাগ্রস্থায়ী বায়ু প্রাণ।

অধোগমনশীল পাশ্বাদিস্থায়ী বায়ু অপান। সর্ব্ব নাড়ী গমনশীল সমগ্র শরীর স্থায়ী বায়ু ব্যান। উর্ধ্ব উৎক্রমণশীল কণ্ঠস্থায়ী বায়ু উদান। শরীর মধ্যগত অন্নরসাদির নেতৃত্বে নিযুক্ত বায়ু সমান। প্রাণ প্রভৃতি যে চতুর্দ্দশ বায়ুর কথা বলা হইয়াছে উহা একমাত্র বায়ু। মাত্র কার্য্য ও স্থান ভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ঐ বায়ুতে প্রাণের প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান থাকায় উহা প্রাণময় নামে পরিচিত, চৈতন্যের আবরক বলিয়া কোষ বলা হয়। প্রাণ ও অপান বায়ুর সাহায্যে মানুষের ভুক্ত অন্নপানাদি পরিপাক প্রাপ্ত হয় ইহা বলাই বাহুল্য।

শাস্ত্রান্তরে—উদ্গারে নাগ: আখ্যাত:, কূর্ম্মস্তূন্মীলনে স্মৃত:, কৃকরস্তু ক্ষুধিজ্ঞেয়ো দেবদত্ত: বিজৃম্ভনে?

ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়: ইতি (গোরক্ষশতক:)

এতৎ কোষদ্বয় সংযুক্তো মনদিভিশ্চতুর্ভি: করণৈ: আত্মা শব্দাদী বিষয়ান্ সঙ্কল্পাদি ধর্ম্মান যদা করোতি তদামনোময় কোষ: ইত্যুচ্যতে।

অর্থ—উক্ত অন্নময় ও প্রাণময় কোষদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া, মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের সমষ্টি শব্দাদি অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বিষয়গুলি সঙ্কল্প বিকল্প কার্য্য করে তাহাই মনোময় কোষ। গ্রন্থান্তরে—

সত্ত্বগুণ প্রধান: মন: রজোগুণাংশেভ্য: জাতৈর্ব্বাগাদী কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈরেব সহিতং সৎ মনোময় কোষ: ভবতি। মনস: সত্ত্বোপহিত: রজোবিকারেচ্ছারূপত্বাৎ সঙ্কল্প বিকল্পাত্মকত্বেন বুদ্ধ্যাপেক্ষয়া জাড্যাধিক্যাৎ মনোময়ত্বম্, আত্মনোরাচ্ছাদকত্বাৎ কোষত্বম্। ইতি বেদান্তসার:।

আকাশাদি পঞ্চভূতের পৃথক পৃথক রজোগুণাংশ হইতে ক্রমশ: ভিন্ন ভিন্ন বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে; এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত সঙ্কল্প বিকল্প ধর্ম্ম বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তি মন এই আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহা সত্ত্বপ্রধান। আত্মার আবরক বলিয়া কোষ বলা হয়।

নিশ্চয়াত্মকাচিত্ত বৃত্তি: বুদ্ধিরিত্যুচ্যতে। চিত্তের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি বলা হয়। যে বৃত্তি দ্বারা কোনও বিষয় নিশ্চিত হয় সেই বৃত্তিকেই বুদ্ধি বলে। "অহংকারাত্মিকা চিত্তবৃত্তিরহংকার:" আমি আমি ভাবযুক্ত যে চিত্তবৃত্তি তাহার নাম অহংকার। "স্মরণাত্মিকা বৃত্তিশ্চিত্তম্"—যে বৃত্তি বলে স্মরণ করা হয়, সেই স্মরণাত্মক বৃত্তির নাম চিত্ত।

মনবুদ্ধিচিত্ত এবং অহংকার এই কয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয়। আকাশাদি পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ হইতে সঞ্জাত। এজন্য ইহারা প্রকাশাত্মক, কারণ সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ।

ইয়ং বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈ: সহিতা সতি বিজ্ঞানময় কোষো ভবতি।

অর্থ—এই বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিতে পূর্ব্বকথিত মনকে লইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। ইহাদিগের সহিত বুদ্ধি সম্মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ। বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বিষয় জ্ঞান। যদ্বারা বিষয় বিশেষের জ্ঞান হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নহে, উহা ইন্দ্রিয়ের দ্বার মাত্র। ইন্দ্রিয়গুলি মনের সহিত সংযুক্ত থাকে।

এবমেব কারণশরীরভূতাবিদ্যাস্থ মলিন সত্ত্বং প্রিয়াদিবৃত্তিসহিতং সৎ আনন্দময় কোষ:।

অর্থ—কারণ শরীর রূপ যে অবিদ্যা তাহাতে স্থিত যে মলিন সত্ত্ব তাহা আমোদ প্রমোদাদি বৃত্তি যুক্ত হইয়া আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত হয়।

অবিদ্যা কি তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। পুনরায়

সংক্ষেপে বলিতেছি, বিদ্যা অর্থাৎ সত্যজ্ঞান অনন্ত বা আত্মা। আত্মা স্বপ্রকাশ হইয়াও যেখানে বা যখন অল্প প্রকাশ হন, নিজেকে যেন কিঞ্চিৎ ভুলিয়াই যান, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই ত্রিবিধ শক্তি প্রকাশিত হয় তাহাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই মানুষের কারণ শরীর। অবিদ্যা কারণ, সৃষ্টিস্থিতি লয় তাহার কার্য্য। প্রত্যেক মানুষের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় প্রভৃতি পাঁচটি কোষ বর্ত্তমান। উহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভেদে তিনটি শরীরে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

সহজে বোধগম্য হইবার জন্যই এই বিভাগ। অত্যন্ত জড়তা নিবন্ধন বড়্ধাতু নির্ম্মিত এই স্থূল শরীরটাকেই বলা হয় অন্নময় কোষ। ইহা স্থূল অন্নের পরিণাম। এই অন্নময় কোষটিই সকলের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, অপর চারিটি কোষ ক্রমসূক্ষ্ম বলিয়া সকলের নিকট প্রত্যক্ষ নহে। কোষ শব্দের অর্থ আবরণ। এই পাঁচটি কোষ বা তিনটি শরীর দ্বারা স্বপ্রকাশ আত্মা সাধারণ লোকের নিকট অপ্রকাশ থাকেন। যদিও আত্মা ক্ষুদ্র শরীর দ্বারা আবৃত হইবার নহে, সম্ভবও নহে, তথাপি ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড দ্বারা বিরাট সূর্য্যকে যেমন আবৃত বলিয়া মনে হয় তদ্রূপ ক্ষুদ্র শরীরত্রয় দ্বারা আত্মা আবৃত থাকেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি অত্যন্ত সন্নিহিত হইয়াও দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের নিকট সর্ব্বদাই অপ্রকাশ। জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক, প্রাণপঞ্চক, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ কলা লইয়া সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কারণ বিদ্যার অভাবরূপী অথচ অভাববস্তু নহে, কিন্তু ভাবপদার্থ, সৎ বা অসৎ এইরূপ শব্দ দ্বারা অনির্ব্বাচ্য অথচ অনাদি যে অবিদ্যা, তাহাই কারণশরীর। ঐ কারণশরীরে অজ্ঞানতাবশতঃ ভেদজ্ঞানরূপ মলিনতা থাকায় প্রিয়াপ্রিয় প্রভৃতি জ্ঞান হয়। আমরা যে প্রিয় বস্তু, প্রিয় বা ইচ্ছানুরূপ বিষয়লাভে আনন্দানুভব করি, উহা আনন্দময় কোষের কার্য্য।

প্রশ্ন—কথম্ কর্ত্তাজীবঃ, ক্ষেত্রজ্ঞঃ, সাক্ষীকূটস্থঃ, অন্তর্য্যামী কথং প্রত্যগাত্মা, পরমাত্মা।

উত্তর—আত্মসন্নিধৌ নিত্যত্বেন প্রতীয়মান আত্মোপাধির্বস্ত লিঙ্গং শরীরং হৃদয়গ্রন্থিরিত্যুচ্যতে। তত্র যৎ প্রকাশতে চৈতন্যং স ক্ষেত্রজ্ঞঃ

অর্থ—আত্মার নিত্যশুদ্ধজ্ঞ স্বরূপ অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ। তাঁহার অত্যন্ত সন্নিধানে অবস্থান হেতু নিত্য বলিয়া প্রতীয়মান যাহা আত্মার উপাধিস্বরূপ লিঙ্গ শরীর অর্থাৎ সপ্তদশ অবয়বযুক্ত সূক্ষ্ম শরীর হৃদগ্রন্থি বলিয়া কথিত হন, তাহাতে যে চৈতন্য প্রকাশিত তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মা নিরুপাধিক হইলেও তিনি লীলা বিলাসবশতঃ উপাধিমৎ হয়েন। নিরবচ্ছিন্ন আত্মা সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে পরিচিত হন।

অয়ং বিজ্ঞানময় কোষঃ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্বাত্তভি—
মানিত্বেন ইহপরলোকগামী ব্যবহারিকো জীবঃ ইত্যুচ্যতে।

অর্থ—বিজ্ঞানময় কোষের বিষয় পূর্ব্বে, আলোচনা করা হইয়াছে। সেই বিজ্ঞানময় কোষ; অকর্ত্তা, অভোক্তা, নিত্যানন্দ, চৈতন্য স্বরূপ আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত পরিচ্ছিন্ন হইয়া কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি বিষয়ে, অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এইরূপ অভিমানী হইয়া ইহলোক পরলোকগামী ব্যবহারিক জীব নামে অভিহিত হয়। ব্যবহারিক জীব শব্দটির তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যাহাকে জীব বলিয়া বুঝি তাহা আমাদিগের অজ্ঞান। জীব আত্মারই রূপ—আত্মাই জীব। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন জীবঃ শিবঃ এব।

এতেষু পঞ্চসু কোষেষু বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান কর্তৃরূপঃ মনোময়ঃ ইচ্ছাশক্তিমান করণরূপঃ, প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান কার্য্যরূপঃ। যোগ্যত্বাদেবমেব বিভাগঃ। (বেদান্তসারঃ)

অর্থ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চ কোষের মধ্যে যোগ্যতানুসারে প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিমান কার্য্যরূপ, মনোময় কোষ ইচ্ছাশক্তিমান করণরূপ, বিজ্ঞানময় কোষ জ্ঞানশক্তিমান কর্তৃরূপ। এই কোষত্রয় মিলিত হইয়া সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত হয়।

অখিলং সূক্ষ্মশরীরং একবুদ্ধি বিষয়া তয়া সমষ্টিঃ,অনেকবুদ্ধি বিষয় তয়া ব্যষ্টিশ্চ ভবতি।

অর্থ—সমস্ত জীবের সূক্ষ্মশরীর এক বুদ্ধির বিষয় হইয়া একত্রে বুঝিলে সমষ্টি এবং প্রতি জীবের সূক্ষ্ম শরীর অনেক বুদ্ধির বিষয় হইয়া পৃথক পৃথক বুঝিলে—বুদ্ধিগ্রাহ্য হইলে ব্যষ্টি বলিয়া কথিত হয়। ব্যষ্টি সমষ্টিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বলা যায়। ব্যষ্টি সমষ্টি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও নহে।

স্বভাবতঃ আবির্ভাবতিরোভাব রহিতঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ সসাক্ষী ইত্যুচ্যতে।

অর্থ—স্বাভাবিক ভাবে আবির্ভাব ও তিরোভাব যাহার নাই, সর্ব্বদা সকল অবস্থায় স্বয়ং প্রকাশমান, অন্য প্রকাশক যাহার নাই এমন যে চৈতন্য তাহাই সাক্ষী। যে চৈতন্য স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরে অবস্থান করিয়া তাহার প্রকাশক, তিনিই কার্য্য করান, বিধানও তিনি করেন, পালনও করেন, অথচ সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত তিনিই সাক্ষী।

বৃহদারণ্যকশ্রুতি বলেন—যিনি নিজে দর্শনীয় নহেন, কিন্তু সকলের দ্রষ্টা, শ্রবণীয় নহেন অথচ সকলের শ্রোতা, স্বয়ং মননের অতীত সকলের মননের কর্ত্তা, যিনি বুদ্ধিরও অগম্য অথচ নিজে বিজ্ঞাতা, যাহার অতিরিক্ত কোনও দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বিজ্ঞাতা নাই, সম্পূর্ণ উদাসীন তিনি সাক্ষী।

ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্তং সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিস্ববিশিষ্ট তয়োপলভ্যমানঃ সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিস্থো যদা তদা কূটস্থঃ ইত্যুচ্যতে।

অর্থ—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর বুদ্ধিতে ব্যষ্টিরূপে অবস্থিত যে চৈতন্য তাহাই কূটস্থ চৈতন্য। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই কূটস্থ চৈতন্য। বুদ্ধিসত্ত্ব বিশুদ্ধ চৈতন্যের একান্ত সন্নিহিত বলিয়া সর্ব্বদাই বুদ্ধিতে চৈতন্য প্রতিফলিত হইয়া স্থূলসূক্ষ্ম সকল প্রকার বিষয় ভাসক হইতেছেন, যখন বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইতেছেন অথচ বুদ্ধিরও প্রকাশক। যখন মাত্র প্রকাশক তখন তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর। বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া বুদ্ধি এই উপাধি গ্রহণ করিলেন তখন কূটস্থ এই আখ্যা লাভ করিলেন কূটশব্দের অর্থ—বুদ্ধি।

কূটস্থাদ্যুপহিত ভেদানাং স্বরূপলাভ হেতুর্ভূত্বা মণিগণসূত্রমিব সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনুস্যূতত্বেন যদা প্রকাশতে আত্মা-তদা অন্তর্য্যামীত্যুচ্যতে।

অর্থ—ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমষ্টিপ্রাণীর সমষ্টি বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত, মালার সূত্রের ন্যায় সর্ব্বত্র অনুস্যূত যে অভিন্ন চৈতন্য তাহাই আত্মা অন্তর্য্যামী। প্রতি প্রাণীর বুদ্ধি ব্যষ্টিবুদ্ধি, সকল প্রাণীর বুদ্ধি সমষ্টিকে সমষ্টিবুদ্ধি অর্থাৎ অখণ্ড বুদ্ধিসত্ত্বে প্রতিফলিত যে অখণ্ড চৈতন্য তাহাই অন্তর্য্যামী।

[ক্রমশঃ।

ফরাসী ভারতবর্ষ

শ্রীবিনায়ক সেন

রাষ্ট্রের জীবনে, দেশের জীবনে এবং সকলকে মিলিয়ে মনুষ্যত্বের জীবনে আজ যা ঘটল এই মুহূর্ত্তে তা ঘটনা, নিতান্তই সংবাদ, কিন্তু কাল তা ইতিহাস। এমনি করেই মহাকাল তার অনন্ত ইতিহাস লিখে চলেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, বিরাম নেই আর তার সে লেখার। প্রায় চার শত বৎসর পূর্ব্বে তেমনি ভারতের ভাগ্যাকাশে একদিন ইউরোপীয় বিদেশী মানুষের আবির্ভাব সুরু হ'য়েছিল, সেদিন তা ছিল ঘটনা, কিন্তু আজ তা' ইতিহাস।

তারা এদেশে এসেছিল নিতান্তই পেটের দায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদে, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে নানা ঘটনা বিপর্য্যয়ের ভেতর দিয়ে অধিকার করে বসেছিল দেশের শাসকের আসন,—"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী রাজদণ্ডরূপে।" সেদিন এসেছিল অনেকেই, পর্ত্তুগীজ, স্পানিয়ার্ড, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ। এদের কেউ করেছে বেচা-কেনা, কেউ করেছে শুধু লুণ্ঠন, ডাকাতি ও অত্যাচার। সে সব অমানুষিক অত্যাচার আজকের লোকের কল্পনারও অতীত, প্রায় রূপকথার মত, দুঃস্বপ্নের মত সে সব কাহিনী। পরবর্ত্তীকালে যারা দেশের দুর্ব্বলতা বুঝতে পেরেছিল এবং দেশের শাসনভার সম্পূর্ণ ভাবে করায়ত্ত করবার চেষ্টা করেছিল তারা হচ্ছে ইংরেজ এবং ফরাসী। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়, যেখানেই একজনের সঙ্গে ভারতের কোন রাষ্ট্র বা জনসমাজের বেঁধেছে সংঘাত কিম্বা ভারতীয় কোন রাজায় রাজায় বেঁধেছে বিরোধ সেখানেই যেদিকে রয়েছে ইংরেজ, বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছে ফরাসী, কিম্বা যেদিকে রয়েছে ফরাসী, বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছে ইংরেজ। এমনি করে ভাঙ্গা-গড়ার ভেতর দিয়ে একদিন ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষ গ্রাস করে বসল, হটে গেল ফরাসী। তবু পরাজিত পক্ষেরও দু'টো-একটা ছোটখাটো উপনিবেশ রয়ে গেল এখানে-সেখানে, ভারতবর্ষের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুদ্রতম শেষ চিহ্ন।

১৪৯৭ সালে প্রথম ইউরোপীয় জলপথে ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিল, পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা। তখন থেকে একশত বৎসর ভারতবর্ষে এসেছে শুধু পর্ত্তুগীজ। তারপর ধীরে ধীরে আসতে আরম্ভ করে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরা। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি এল ইংরেজ।

একশত বৎসর এরা করল শুধুই ব্যবসা-বাণিজ্য। তারপর আর একশত বৎসর অন্ধকারাচ্ছন্ন অরাজক ভারতবর্ষ, অন্ততঃ ভারতবর্ষের একটা সুবৃহৎ অংশ শাসন করল ইংরেজের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী' যদিও নামে ছিলেন ভারতবর্ষের রাজা, মহারাজা আর নবাবরা। আর একশত বৎসর শাসন করল সরাসরি ইংরেজের সরকার, ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী—ভারতের সম্রাট। তার পর আবার নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে সুরু করল ১৯৪০ সালের কাছাকাছি বিশ্বযুদ্ধের সম-সময়ে, যা শেষ হ'লো ১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট বহু প্রতীক্ষিত ভারত-স্বাধীনতায়। যদিও কবি একদিন সান্ত্বনা দিয়ে ব'লেছিলেন যে তা শুধু কাহিনী বা স্বপ্ন নয়, "আসিবে সে দিন আসিবে" তবু তা সেদিন পর্য্যন্তও স্বপ্নই ছিল।

দীর্ঘ দুই শতাব্দী পরে বিদেশী শাসনের ভারমুক্ত হ'য়ে ভারতবর্ষে আবার আরম্ভ হ'লো স্বায়ত্ত-শাসন, সর্ব্বভুক ইংরেজ দেশ ছেড়ে গেল, কিন্তু গেল না ক্ষুদ্র ফরাসী ক্ষুদ্র পর্ত্তুগীজ। তবু দেয়ালে সেদিন যে আঙুলের লেখা পড়েছিল তাতো মোছবার নয়, তাই ফরাসীকেও শেষ পর্য্যন্ত তার ভারতবর্ষের উপনিবেশ ছাড়তে হ'লো।

চার বৎসর আগে ফরাসীরা তাদের বাংলাদেশের উপনিবেশ চন্দননগর ছেড়েছে, তিন বৎসর হ'লো ১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর ছেড়েছে দক্ষিণ ভারতের উপনিবেশ, যেখানে ছিল তাদের সর্ব্ববৃহৎ স্বার্থ। বর্ত্তমানের আমাদের কাছে আজও তা' সংবাদ কিন্তু অনাগত বংশধর একে দেখবে ইতিহাসরূপে। আমাদের ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষের কাছে যা একদিন ছিল সংবাদ, সেদিকে একবার ঐতিহাসিকের দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখা যাক।

বাংলাদেশের চন্দননগর ছাড়া ভারতবর্ষে আর চারিটি ফরাসী উপনিবেশ ছিল দক্ষিণভারতে পন্দিচেরী, কারিকল, মাহে আর ইয়ানাম। ইয়ানামই এদের মধ্যে আয়তনে সব চাইতে ছোট আর তাই বাংলার জন সমাজের সঙ্গে তার পরিচয় নিতান্তই কম।

পন্দিচেরী—পন্দিচেরীই এদের ভেতরে ছিল ফরাসীদের সব চাইতে বড় ও মূল্যবান সম্পত্তি এবং ভারতবর্ষে ফরাসী উপনিবেশের কেন্দ্রস্থল। কবে কোন ফরাসী নাগরিক এখানে প্রথম পদার্পণ করেছিল তার ঐতিহাসিক তথ্য প্রায় অনুমান ও কিম্বদন্তীর ব্যাপার। যতদূর জানা যায় তাতে বোঝা যায় ফরাসীরা এখানে এসেছিল তখনকার কাডালোরের (Cuddalore) রাজা বিক্রমলোদীর আহ্বানে। কাডালোরের বস্ত্রশিল্প সেই সময় অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল আর তা বহুল পরিমাণে রপ্তানী হ'তো নতুন খরিদ্দার ইউরোপের বাজারে। ইউরোপীয় রাজসভার সুন্দরীদের আর ধনী ইউরোপীয় রমণীদের কাছে তার মান ও চাহিদা ছিল অপরিসীম। সেই সময় অন্ধ্রদেশের সমুদ্রকূলবর্ত্তী বন্দর নগর মুসলিপত্তন (Muslipattam) ছিল সমধিক সমৃদ্ধ যেখানে নিরন্তর বৃহৎ কারবারের লেন-দেন চলত। ফরাসীদের সেখানে ছিল একটি বড় রকম আড্ডা আর তারা দিশী দালাল মারফত অংশগ্রহণ করত এই বস্ত্র-ব্যবসায়ে। সেখান থেকে তাদের সোজাসুজি এখানে এসে ব্যবসা করবার সুবিধাদান করেন কাডালোরের রাজা। তাও দু' দু'বার তারা তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ক'রে তৃতীয় আমন্ত্রণে এসে কায়েমী হ'য়ে বসে। পন্দিচেরী কাডালোরের সংলগ্ন ভূভাগ।

তারপরেও বহুবার ইংরেজ ও ফরাসীতে এই পন্দিচেরী পিং পং-এর বলের মত চালাচালি হয়েছে। ১৭৬০ সালে ইংরেজ যখন পন্দিচেরী জয় করে নেয় তখনকার মাদ্রাজের ইংরেজ শাসনকর্ত্তা লর্ড পিগটি (Pigoti) হুকুম দেন পন্দিচেরী ছারখার করে দেবার। মানুষ তাতে এমনি আতঙ্কিত হ'য়েছিল যে কয়েক দিনের ভেতরে সমস্ত বাসিন্দা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এই সন্ত্রাসের ফল স্বরূপ ইংরেজকে আর পন্দিচেরী ধ্বংস করতে হয়নি। এই ব্যাপার থেকে বোঝা যায় সেদিনকার ভারতাগত ইংরেজ আর ফরাসীর পরস্পরের প্রতি আক্রোশের মাত্রা কি চরম আকার ধারণ করেছিল। ১৮১৪ সালে ইংরেজ ও ফরাসীতে এক সন্ধির পর থেকে পন্দিচেরী এতদিন একাদিক্রমে ফরাসীদের হাতেই ছিল।

বর্ত্তমান পন্দিচেরীর গোড়া পত্তন হয় ১৮১৪ সালে। এর দু'টো অংশ—ধবল নগর (The White Town) যেখানে বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা সব দাঁড়িয়ে, আর আঁধার নগর (The Dark Town) যেখানে ছোট খপচীর মত ছোট ছোট বাড়ী। তা ব'লে তা বস্তী নয়, নাগরিকদেরই আস্তানা এবং এই দিকটাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অন্যান্য সব সহর নগরেই দেখা যায় বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রের দু'-একটা কেন্দ্র থাকলেও সারা সহরব্যাপী সব জায়গাতেই বড় ছোটর প্রায়ই একত্র সমাবেশ, কিন্তু এখানে তা নয়। আবার অন্যান্য সহরে যে দিকটা আধুনিক সে দিকটাই বৃহৎ, এখানে ঠিক তার উলটো। তা থেকে এই প্রমাণ হয় যে ফরাসীরা যখন এ নগর পত্তন করেছিল তখন তাদের যে সংস্কৃতি ও অর্থানুকূল্য ছিল পরবর্ত্তীকালে তাতে ভাঁটা প'ড়েছে। সেই আদিকালের ফরাসী স্থপতি ম'শিয়ের লিনোয়ার তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত সুদৃঢ়, সুবৃহৎ সুসমান্তরাল পথঘাটের অনেকখানিই আজও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

পন্দিচেরীকে এতক্ষণ সহর ব'লে অভিহিত করা হ'য়েছে, কিন্তু এর সবটাই সহর নয়। সহর শুধু সমুদ্রতটবর্ত্তী ক্ষুদ্র একটুকু অংশ। সমুদ্রের তীরে এই নগরকে রেখে তার আর তিনদিকে রয়েছে গ্রামময় সুবৃহৎ ভূখণ্ড, যা প্রায় ছোটখাটো একটা জেলার মত। সেসব আবাদী জমি এবং যথেষ্ট কৃষকের বসবাস রয়েছে সেখানে। তবু পন্দিচেরীতে যে চাষ-বাস হয়, তাতে তার প্রয়োজন মেটে না, তার ধান ও অন্যান্য শস্যের জন্য চিরদিন নির্ভর করতে হয়েছে ভারতবর্ষের উপরে।

বৃহৎ কারখানা বলতে এখানে আছে মাত্র তিনটি কাপড়ের কল, যেখানে হাজার দশেক লোক খাটে। পন্দিচেরীর রাষ্ট্রভাষা এতদিন ছিল ফরাসী, কিন্তু ফরাসী খুব অল্পসংখ্যক লোকই জানে। নিতান্ত ধনীজন যাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ফরাসী স্কুল-কলেজে পাঠাতে পেরেছেন তাঁরাই শুধু তাঁদের সন্তানদের কিছু ফরাসী ভাষা শিখিয়েছেন, তা নইলে এখানকার জনসাধারণের ভাষা তাদের মাতৃভাষা তামিল, এ ছাড়া আর কোন ভাষা সেখানে নেই। ইংরেজী খুব কমই ব্যবহৃত হয় এবং খুব কম লোকই তা জানে। ফরাসীরা স্থানীয় লোকের সঙ্গে খুব মেলামেশা করেনি, তাই এই পরিস্থিতি।

পন্দিচেরীর আদিযুগ থেকে আজও হিন্দু-খৃষ্টানের বিদ্বেষ অত্যন্ত বেশী এবং খৃষ্টানের সংখ্যা এখানে অতি মুষ্টিমেয়। পন্দিচেরীর সর্ব্বপ্রধান গির্জ্জার নাম 'সাম্বা' গির্জ্জা। 'সাম্বা' হিন্দু দেবতার নাম। কিম্বদন্তী বলে এক হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে সেখানে এই গির্জ্জার পত্তন করা হয়। কিন্তু দেবতাও তাদের ছাড়েননি। যারা এই নির্ম্মাণ-কার্য্যে লিপ্ত ছিল তাদের কেউ বা সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেউ কেউ পাগল হয়ে যায়। এ গির্জ্জার নির্ম্মাণকাজও বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে এগোয় এবং শেষ করতে লাগে বেশ কয়েক বছর। পন্দিচেরীর আদি বাসিন্দারা প্রায়ই নীচ জাতি হিন্দু এবং এখানকার হিন্দুর সংখ্যা অন্যান্য লোকের তুলনায় অসম্ভব রকম বেশী। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে পন্দিচেরী তামিল-মাদ্রাজের অংশ।

কারিকল—তাঞ্জোর জেলার গা ঘেঁসে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত কারিকল এলাকা আয়তনে প্রায় ৫৩ বর্গমাইল। এখানকার জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৭০ হাজার, ছয়টা মিউনিসিপ্যাল অংশে বিভক্ত এ স্থানও পন্দিচেরীর কিছু দক্ষিণে তামিল-মাদ্রাজের অংশ। তাঞ্জোরের রাজা সাহজী ৫০,০০০ চক্রের (সে কালের দক্ষিণী টাকার, স্থানীয় পরিভাষা) বিনিময়ে ফরাসীদের কাছে কারিকল বিক্রী করেন। কিন্তু পরে তিনি ফরাসীদের জমি দিতে চান নি, পরিবর্ত্তে ফিরিয়ে নিতে বলেন তাদের টাকা। কিন্তু ফরাসীরা রাজী হ'লো না। ঠিক সেই সময় কর্ণাটের নবাব দোস্ত-আলির জামাতা চন্দা সাহেব ত্রিচিনপল্লী জয় করে তাঞ্জোরের উপরে চড়াই করেছিল। তার সঙ্গে ছিল ফরাসীদের বন্ধুত্ব! তারই সাহায্যে ফরাসী গভর্ণর ডুমা (Dumas) কারিকল হস্তগত করেন। কারিকলও বহু বার ফরাসী ইংরেজে হাত বদল হয়। পন্দিচেরীর মত এও ১৮১৪ সালের প্যারিস্-চুক্তিতে ফরাসীদের হাতে আসে এবং তখন থেকে এতদিন তাদেরই হাতে থাকে।

মাহে—আরব সাগরের উপকূলে অবস্থিত উত্তর মালাবার সংলগ্ন ভূখণ্ড, আয়তনে প্রায় ২২০০ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা আঠারো লক্ষের কিছু উপর। ১৭২১ সালের ৭ই এপ্রিল মালাবার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বাড়াগাবার (Badagara) রাজা ফরাসীদের মাহে নদীর মুখে সমুদ্র উপকূলে একটি সৈন্য-ঘাঁটি রাখবার অনুমতি দেন। কিন্তু কালিকটের রাজার সঙ্গে বাড়াগারার রাজার বিরোধ বাঁধায় কিছু দিনের মত ফরাসীদের মাহে ছেড়ে যেতে হয়। ম'শিয়ে লা' বোর্ডোনাই (স) ১৭২৫ সালে আবার মাহে অধিকার করেন। বাড়াগাবার রাজার সঙ্গে সন্ধি সূত্রে ১৭২৬ সালের ৮ই নভেম্বর তাদের এই অধিকার পাকাপাকিভাবে স্বীকৃত হয়। ১৭৬১ সালে আবার ইংরেজ ফরাসীর যুদ্ধে পন্দিচেরীর পতনের পর, উক্ত সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ফরাসীদের সমর্পণ করে দিতে হয় মাহেকে ইংরেজ সেনাপতি মেজর জেনারেল মুনরোর কাছে। ১৭৬৩র ২০শে মে আবার তা ফরাসীদের হাতে আসে। ১৭৭৮ সালের অক্টোবর মাসে আবার যখন ইংরেজ ফরাসীতে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আর এক বার পতন হয় পন্দিচেরীর এবং জেনারেল মুনরোর কাছে মাহেকেও করতে হয় আর একবার আত্মসমর্পণ। ১৮১৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী আবার তা' ফরাসীদের হাতে আসে এবং তখন থেকে এই সেদিন পর্য্যন্তও তা' তাদেরই অধিকার থাকে।

ইয়ানাম—বঙ্গোপসাগরের গা ঘেঁসে অন্ধ্র দেশের পূর্ব্ব গোদাবরী জেলার লাগোয়া কাকিনাদা সহর থেকে আঠার মাইল দূরে অবস্থিত। আয়তনে মাত্র পাঁচ বর্গ মাইল জায়গা—ভারতবর্ষে এ যাবৎ ক্ষুদ্রতম বিদেশী উপনিবেশ। ১৭৩১ সালে ফরাসীরা এখানে একটি আড্ডা তৈরী করে, কিন্তু এই ভূমিখণ্ডের প্রকৃত অধিকার তাদের হাতে আসে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম মুজাফর জঙ্গের সঙ্গে চুক্তির ফল স্বরূপ। ১৯৫৪ সালের হস্তান্তরে এ স্থানও ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্গত হ'য়েছে, আরম্ভ হ'য়েছে আবার দেশের নতুন ইতিহাস। ভারতবর্ষের মাটিতে আজ আর ফরাসী ভারতবর্ষ নেই, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় সে নাম তার স্থায়ী স্থান নিয়ে থাকবে আরও বহু শতাব্দী, যত দিন না কালের গহ্বরে তা' আপনিই মুছে যাবে একেবারে।

Never doubt your wife's judgment—look who she married.
—George Noble.

চার্লস লিংকওয়ার্থের স্বীকারোক্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ই, এফ, বেনসন

তারপর জেলের ডাক্তারখানায় তিনি চলে গেলেন, প্রায় দু' ঘন্টা সেখানে কাজে ব্যাপৃত রইলেন। তাঁর সব সময়েই মনে হচ্ছিল যে ঐ অদৃশ্য সত্তা তাঁর নিকটেই উপস্থিত রয়েছে, যদিও তাঁর এখানকার অনুভূতি যে সব জায়গার সঙ্গে আসামী আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল সেখানকার অনুভূতির মত এত সুস্পষ্ট ছিল না। পরিশেষে ঐ স্থান ত্যাগ করবার পূর্ব্বে তাঁর ঐ মতবাদের সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্য তিনি ফাঁসির ঘরের ভিতরে তাকালেন। পর মুহূর্ত্তেই বিবর্ণ বদনে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে তিনি বেরিয়ে এলেন। মধ্যের সিঁড়িটার উপরে পিঠমোড়া করে বাঁধা টুপীতে মুখঢাকা এক মূর্ত্তি তিনি দেখতে পেলেন, মূর্ত্তির বাইরের রেখা যেন কুয়াসায় ঢাকা, মূর্ত্তিটাও বেশ অস্পষ্ট। কিন্তু ওটাকে যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

ডাক্তার টিসডেল বেশ সাহসী পুরুষ ছিলেন। এই সাময়িক ভীতি-বিহ্বলতার জন্য তিনি লজ্জিত হলেন, কিন্তু তখনই তাঁর ও ভাবটা কেটে গেল। যে ভয়ে তাঁর মুখখানা বিবর্ণ হয়েছিল তা তাঁর উচ্চকিত স্নায়ুর ফল, আতঙ্কিত হৃদয়ের নয়। যদিও জীবাত্মা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে তিনি খুবই কুতূহলী ছিলেন কিন্তু ওখানে ফিরে যাবার মত সাহস তাঁর ছিল না। হয়ত কিছুটা সাহস তিনি মনে এনেছিলেন, কিন্তু তাঁর মাংসপেশীগুলি কাজ করতে রাজি হয়নি। ঐ হতভাগ্য সংসারাবদ্ধ আত্মার যদি তাঁর কাছে কোন সংবাদ জানাবার থাকে, দূর থেকে খবরটা তাঁকে জানান হলেই তিনি সুখী হবেন। যতটা উনি বুঝতে পেরেছেন, ওর চলাফেরার গণ্ডী খুবই সীমাবদ্ধ। জেলখানার আঙ্গিনা, আসামীর কুঠুরী, ফাঁসির ঘর এরই মধ্যে ও ঘুরে বেড়ায়, জেলের ডাক্তারখানাতেও ওকে অতি ক্ষীণভাবে অনুভব করা যায়। তারপর আর একটা কথা মনে হতেই তিনি তাঁর কামরায় ফিরে গেলেন। গত রাত্রে টেলিফোনে যে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল, সেই ওয়ার্ডার ড্রেকুটকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ঠিক জান, গতরাত্রে টেলিফোনে আমি যখন তোমায় ডেকেছিলাম তার ঠিক পূর্ব্বে তোমাদের ওখান থেকে কেউ আমায় ডাকে নি?"

ডাক্তার লক্ষ্য করলেন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ওয়ার্ডার একটু ইতস্ততঃ করছে।

সে বলল, "এ যে কি করে সম্ভব আমি বুঝতে পারছি না স্যার! ওর আধঘন্টা পূর্ব্ব হতে আমি টেলিফোনের কাছেই বসেছিলাম, হয়ত তার পূর্ব্বেও এরই মধ্যে টেলিফোনের কাছে কেউ এলে আমি নিশ্চয়ই জানতাম।"

ডাক্তার একটু জোরে বললেন, "তাহলে তুমি কাউকেও দেখনি?" লোকটার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা আরও যেন সুস্পষ্ট হোল।

তারপর সেও সমান জোরে বলল, "না, স্যার! কাউকেও দেখিনি।"

ডাক্তার টিসডেল অন্যদিকে তাকালেন, তারপর উদাসীনভাবে বললেন, কথাটা যেন বিশেষ কিছু নয়, "হয়ত তোমার এমন একটা ধারণা হয়েছিল যে ওখানে কেউ রয়েছে।"

ওয়ার্ডারের হাবভাবে স্পষ্টই বোঝা গেল তার মনের মধ্যে কিছু কথা জমে আছে, যা সে বলতে পারছে না।

সে বলতে লাগল, "ও কথা যদি বলেন, স্যার!—তাহলে আমার কথা শুনে আপনি হয়ত বলবেন আমি কিছুটা জেগে কিছুটা ঘুমিয়ে ছিলাম, আর তা না হলে রাত্তিরের খাবারের সঙ্গে এমন কিছু খেয়েছিলাম যা আমার পেটে সয়নি।"

এ কথা শুনে ডাক্তারের উদাসীনভাবটা দূরে গেল।

তিনি বললেন, "আমি তোমায় ও রকম কিছুই বলব না, যেমন তুমি আমায় বলছ না যে টেলিফোন বেল যখন বেজে উঠেছিল গত রাত্তিরে, আমি তখন ঘুমিয়েছিলাম। শোন, ড্রেকুট! বেলটা সাধারণতঃ যেমন বাজে তেমনি বাজেনি। যদিও আমি ওটার কাছেই ছিলাম, একটা অতি ক্ষীণ শব্দ মাত্র আমার কানে এসেছিল। কিন্তু তুমি যখন কথা বললে, তোমার কথাগুলো আমি স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার বিশ্বাস তোমার ওপ্রান্তে ঐ সময়ে টেলিফোনে কেউ বা কিছু ছিল। যদিও তুমি কাউকেও দেখতে পাও নি, তুমি অনুভব করেছিলে এখানে কেউ রয়েছে।"

সে মাথা নেড়ে স্বীকার করল। সে বলল, "সহজে ভয় পাবার লোক আমি নই, আর মিথ্যা কল্পনার কারবারও আমি করি না। কিন্তু সেদিন সেখানে কিছু ছিল বলেই আমার ধারণা হয়েছিল। টেলিফোনের যন্ত্রটার চারদিকে ওটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওটা বাতাসও নয়, কারণ তখন কোথাও একটু বাতাস ছিল না, সে রাত্তিরটাও ছিল খুবই গরম। নিশ্চিত হবার জন্য জানালাটা আমি বন্ধ

একটি ভূতের গল্প

হয়েছিলাম। কিন্তু স্যার! আরও একঘণ্টার মত ওটা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। টেলিফোন বই'র পাতাগুলি ফর্ ফর্ শব্দ করে উড়ছিল। ওটা আমার কাছে এসে আমার চুলগুলিকেও উল্টে পাল্টে দিচ্ছিল। তখন ভয়ানক ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল, স্যার!"

ডাক্তার ওর মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন।

তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "গত কাল সকাল বেলায় যা ঘটেছিল সে কথা কি তখন তোমার মনে হয়েছিল?"

আবার লোকটা কথা বলতে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

অবশেষে সে বলল, "হাঁ, স্যার! খুনী আসামী চার্লস্ লিংকওয়ার্থকে।"

এ কথার সমর্থনে ডাক্তার টিসডেল মাথা নাড়লেন।

তিনি বললেন, "ঠিক বলেছ। আচ্ছা, আজ রাত্তিরে কি তোমার 'ডিউটি'?"

"হাঁ, স্যার! না থাকলেই ভাল হোত।"

"তুমি যা অনুভব করছ তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমি নিজেও ঠিক ও রকমই বোধ করছি। তা ওটা যাই হোক, আমার মনে হচ্ছে ও আমায় কিছু বলতে চাচ্ছে। আচ্ছা! কাল জেলখানায় কোন গোলমাল টের পেয়েছিলে?"

"হাঁ, স্যার! ছ'জন লোক দুঃস্বপ্ন দেখে গোঁ গোঁ শব্দ করেছিল কেউ কেউ চীৎকার করে উঠেছিল। ওরা কিন্তু এমনি বেশ শান্ত, ধীর। কখনও কখনও ফাঁসি হবার পরের রাত্রিতে জেলে এ রকম ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে। এ রকম এখানে পূর্ব্বেও ঘটেছে আমি জানি কিন্তু কাল রাত্রিতে যেমনটা ঘটেছিল তেমন আর কখনও ঘটে নি।"

"বুঝেছি, তা হলে যদি ঐ অদৃশ্য সত্তাটি আজ রাত্তিরে এসে টেলিফোনটা পেতে চায় ওকে সব রকম সুযোগ দিও। সম্ভবতঃ আজও ওটা ঠিক ঐ সময়েই আসবে। এর কারণ আমি বলতে পারব না, কিন্তু সাধারণতঃ এ রকমই ঘটে। একান্ত বাধ্যবাধকতা না থাকলে এক ঘণ্টার জন্ত ঐ টেলিফোন ঘরে তুমি যেয়ো না; এক ঘণ্টা ওর পক্ষে যথেষ্ট সময় সাড়ে ন'টা হতে সাড়ে দশটা অবধি। আমি আমার প্রান্তে প্রস্তুত হয়ে থাকব। টেলিফোনে ডাক পেলে কথা শেষ হবা'মাত্র আমি তোমায় ডাকব, নিশ্চিত ভাবে জানব সচরাচর যেমন ভাবে টেলিফোনে ডাকা হয়, তেমন ভাবেই আমায় ডাকা হয়েছিল কিনা।"

সে জিজ্ঞাসা করল, "এতে ভয় পাবার মত কিছু নেই ত, স্যার!"

আজ সকালে যে ডাক্তার নিজেই ভয় পেয়েছিলেন সে কথা তাঁর মনে হোল। কিন্তু ওকে সাহস দেবার জন্ত সরলভাবেই তিনি বললেন "আমি তোমায় সত্যি বলছি, তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই।"

সেই রাত্রে ডাক্তার টিসডেলের বাইরে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তিনি গেলেন। সাড়ে ন'টার সময় তিনি তাঁর পড়বার ঘরে একা বসেছিলেন। দেহমুক্ত আত্মার গতিবিধির আইন কানুন সম্বন্ধে মানুষের বর্ত্তমান অজ্ঞতার জন্তই তিনি ওয়ার্ডারকে বলতে পারেন নি, ওদের এই আবির্ভাব ঠিক এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটে কেন, ওরা এমন কঠোর নিয়মানুবর্ত্তী হয়ে নির্দ্দিষ্ট কাল পরে পরে আমাদের দেখা দেয় কেন? ওদের আবির্ভাব সম্বন্ধে লিখিত যে সব দৃষ্টান্ত আছে তাতে দেখা যায় যে ঐ আত্মার যদি সাহায্যের কোন প্রয়োজন থাকে, এ ক্ষেত্রে যেমন আছে বলে অনুমান করা যাচ্ছে, দিনের কিম্বা রাত্রির ঠিক একই সময়ে সে আবির্ভূত হয়েছে। এটাও দেখা গেছে, মৃত্যুর পর সামান্ত ক'টা দিন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে দেখা করবার, কথা বলবার, ওদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে অনুভূতি জাগাবার শক্তি ঐ প্রেতাত্মাদের মনে ক্রমশঃই বেড়ে চলে। তার পর পৃথিবীর বন্ধন যতই শিথিল হয় এ ক্ষমতা তাদের ততই কমতে থাকে, শেষে একেবারেই লোপ পায়। এ জন্য আজ আরও স্পষ্টতর অনুভূতির জন্ত তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। গুটি ভেঙ্গে বড় বড় প্রজাপতিগুলি যখন বাইরে আসে, তখন তারা যেমন দুর্ব্বল থাকে, দেহমুক্তির প্রথম অবস্থায় আমাদের আত্মার অবস্থাও সেই রকম হয়। হঠাৎ তখনই টেলিফোনের বেল বেজে উঠল। শব্দটা গত রাত্রির শব্দের মত ততটা অস্ফুট নয়, কিন্তু ডাকে যেন পূর্ব্বের মত তেমন তাগিদ ছিল না।

ডাক্তার টিসডেল তখনই উঠে পড়লেন, রিসিভারটা কানের কাছে তুলে ধরলেন। তিনি শুনতে পেলেন কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বুকভাঙ্গা কান্নার তীব্র আবেগে সে যেন নিজেকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলছে।

কথা বলবার পূর্ব্বে ডাক্তার টিসডেল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁর সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করবার জন্ত তিনি অতিশয় বিচলিত হয়ে উঠলেন।

অবশেষে তিনি বললেন—তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন তার গলার স্বর কাঁপছে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ডাক্তার টিসডেল। তোমার জন্ত আমি কি করতে পারি? তুমি কে?" এই শেষের প্রশ্নটা তার নিজের কাছেই অবান্তর মনে হোল।

চাপা-কান্নার স্বর মিলিয়ে গেল। তার পরিবর্ত্তে তিনি শুনতে পেলেন একটু ফিসফিসানি আর মাঝে-মাঝে সরব কান্না।

"আমি বলতে চাচ্ছি, স্যার।—আমি বলতে চাই—আমাকে বলতেই হবে—"

ডাক্তার বললেন, "হ্যাঁ, বল, তোমার কি বলবার আছে।"

"না, আপনাকে নয়, অন্ত একটি ভদ্রলোককে যিনি আমার কাছে প্রায়ই আসতেন তাঁকে। আমি যা বলছি তা যদি দয়া করে আপনি তাঁকে বলেন? আমার কথা আমি তাঁকে শোনাতে পারছি না, তিনি আমায় দেখতেও পাচ্ছেন না।"

ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

"চার্লস লিংকওয়ার্থ। আমি ভেবেছিলাম আপনি আমায় চিনেছেন। আমি বড়ই বিপন্ন, এ জেলখানা ছেড়ে আমি যেতে পারছি না! এখানে বড়ই শীত বোধ হচ্ছে। ঐ ভদ্রলোকটিকে কি আপনি ডেকে পাঠাবেন?"

ডাক্তার টিসডেল জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ধর্ম্মযাজককে চাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, তাঁকেই। কাল যখন আমি আঙ্গিনা দিয়ে যাচ্ছিলাম তিনি প্রার্থনা করছিলেন। তাকে বলতে পারলে আমার দুঃখ কষ্ট চলে যাবে।"

ডাক্তার এক মুহূর্ত্তের জন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। কাল যে আসামীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, টেলিফোনের অপরপ্রান্তে তার আত্মা এসেছে এ অদ্ভুত গল্পটা জেলের ধর্ম্মযাজক মিঃ ডকিনসকে বলতে হবে। তা যাই হোক তিনি কিন্তু নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে বিশ্বাস করেছিলেন যে, ঐ হতভাগ্য আত্মা বড়ই বিপন্ন, আর সে কিছু

বলতে চাচ্ছে। ও কি বলতে চায় তা ওকে জিজ্ঞাসা করবার কোন দরকার নেই।

অবশেষে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তাকে এখানে আসতে বলব।"

"আপনাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ, স্যার! আপনি তাকে আনবেন, তাই নয় কি?" স্বরটা ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। সে আরও বলল, "তা হলে আগামী কাল রাত্তিরে। আমি বলতে পারছি না, এখনই আমাকে দেখতে যেতে হবে। হায়, ভগবান!"

আবার সেই ফুঁপিয়ে কান্না, শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হোল।

ডাক্তার উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "কি দেখতে যেতে হবে? আমায় বল, কি ঘটেছে তোমার, তুমি এখন কি করছ?"

অতি ক্ষীণস্বরে সে বলল, আপনাকে বলতে পারব না, হয়ত বলা সম্ভব নয়। ওটা একটা অংশ—।" কথাটা শেষ হবার পূর্ব্বেই স্বরটা মিলিয়ে গেল।

ডাক্তার টিসডেল আর একটু অপেক্ষা করলেন। যন্ত্রের কোঁ, কোঁ, খচ খচ শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দই ছিল না। তিনি রিসিভারটা তার জায়গায় কাঁটার উপর রাখলেন। এতক্ষণ পরে এই প্রথম তিনি টের পেলেন যে, ভয়ে তাঁর কপালে ঠাণ্ডা ঘাম জমেছে, তাঁর কান ভোঁ-ভোঁ করছে, তাঁর বুক টিপ, টিপ, করছে, হৃৎস্পন্দন দ্রুত অথচ ক্ষীণ। নিজেকে সামলাবার জন্য তিনি বসে পড়লেন।

তিনি দু'একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কি সম্ভব যে কেউ তাঁর সঙ্গে এ ভাবে তামাসা করছে?" এ যে সম্ভব নয় তা তিনি ভাল করেই জানতেন। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে এক অতি ভয়ঙ্কর অপ্রতিবিধেয় কার্য্যের জন্য অনুতাপদগ্ধ কোন আত্মার সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। এ তাঁর ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম নয়। এই বেডফোর্ড স্কোয়ারে তাঁর বাড়ীর এক আরামদায়ক কামরায় লণ্ডন নগরীর উন্মত্ত উল্লাসধ্বনির মাঝে বসে তিনি চার্লস লিংকওয়ার্থের প্রেতাত্মার সঙ্গেই কথা বলেছেন।

ভাবনা চিন্তার তাঁর অবসর নেই, ইচ্ছাও নেই, কারণ তাঁর মন যেন কি এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভিতরে ভিতরে শিহরিত হয়ে উঠছিল।

প্রথমেই তিনি টেলিফোনে জেলখানার ওয়ার্ডারকে ডাকলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, "ওয়ার্ডার ড্রেকৃট কি?"

"হ্যাঁ, স্যার!—ডাক্তার টিসডেল কি কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ, তোমাদের ওখানে কি কিছু ঘটেছে?"

ড্রেকট দু'বার কথা বলতে চেষ্টা করল, পারল না। তৃতীয় বারের চেষ্টায় কথা বের হোল; সে বলল, "হ্যাঁ, স্যার! এখানে সে এসেছিল, আমি তাকে টেলিফোন ঘরে ঢুকতে দেখেছি।"

"তাই না কি, তুমি ওর সঙ্গে কথা বলেছিলে?"

"না, স্যার!—আমার ঘাম হচ্ছিল, আমি ভগবানের নাম করছিলাম। আজ রাত্তিরেও দু'জন লোক ঘুমের মধ্যে চীৎকার করে উঠেছিল। এখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে ও ফাঁসির ঘরে চলে গেছে।"

"তা বেশ, আমি মনে করি এখন আর কোন গোলমাল হবে না—আচ্ছা, মিঃ ডকিনসের বাড়ীর ঠিকানাটা আমায় দাও।"

ঠিকানা দেওয়া হোল। আগামীকাল রাত্রিতে এখানে ডিনার খেতে অনুরোধ জানাবার জন্য ডাক্তার টিসডেল মিঃ ডকিনসকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। তিনি হঠাৎ অনুভব করলেন যে তাঁর নিজের অভ্যস্ত ডেস্কে ঐ টেলিফোনের কাছে বসে তিনি লিখতে পারছেন না। উপরতলায় যে বসবার ঘরটা বন্ধুবান্ধবদের বিশেষ আদর আপ্যায়ন ভিন্ন কদাচিৎ ব্যবহার হোত তিনি সেখানে চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর স্নায়ুর শান্তি ও স্থৈর্য্য ফিরে পেলেন, তাঁর হাতখানার উপর তাঁর প্রভুত্ব ফিরে এল। ঐ চিঠিতে তিনি মিঃ ডকিনসকে আগামীকাল রাত্রিতে তাঁর সঙ্গে খেতে অনুরোধ করলেন, আরও জানালেন যে ঐ সময়ে তিনি তাঁকে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা বলবেন, আর ঐ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাইবেন। উপসংহারে লিখলেন, "যদি তোমার আর কোন কাজ থাকে, সে কাজ ঐ সময়ের মত স্থগিত রাখতে আমি তোমায় অনুরোধ করছি। আজ রাত্তিরে আমিও তাই করেছি। তা যদি আমি না করতাম তাহলে আমার হয়ত ভয়ানক অনুতাপ করতে হোত।"

এই চিঠি অনুসারে তার পরের রাত্রিতে ডাক্তারের খাবার ঘরে তারা দু'জন ডিনার খেতে বসেছিল। সিগারেট আর কফি পরিবেশন করা হলে ডাক্তার বললেন—"আজ যে কথা আমি তোমায় বলতে যাচ্ছি, তা শুনে তুমি আমায় পাগল মনে ক'রো না কিন্তু ডকিনস।"

মিঃ ডকিনস হেসে বললেন, "আমি সত্যি বলছি তা আমি করব না।"

"বেশ, গত রাত্রিতে ও তার পূর্ব্বের রাত্রিতে এ সময়ের একটু পরে এই চার্লস লিংকওয়ার্থ যাকে দুদিন পূর্ব্বে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তার আত্মার সঙ্গে আমি টেলিফোনে কথা বলেছি।"

এ কথা শুনে ধর্ম্মযাজক হাসলেন না, বিরক্ত হয়ে চেয়ারটা পিছন দিকে একটু ঠেলে নিয়ে বসলেন।

তিনি বললেন, "এ কথা বলবার জন্য—আমি অভদ্র হতে চাই না, এই বুজরুকি গল্প বলবার জন্যই কি তুমি আমায় এ রাত্রিতে এখানে ডেকেছ টিসডেল?"

"হ্যাঁ, তোমাকে অর্দ্ধেকও বলা হয়নি। তোমাকে এখানে আনবার জন্য গতরাত্রে সে আমায় অনুরোধ জানিয়েছে। সে তোমায় কিছু কথা বলতে চাচ্ছে। আমরা হয়ত অনুমান করতে পারছি ওর কথাগুলি কি।"

মিঃ ডকিনস আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন।

তিনি বললেন, "দয়া করে এ সব কথা আর আমায় বোলো না। মরা মানুষ কখনও ফিরে আসে না! মৃত্যুর পর তাদের কি হয়, কি অবস্থায় তারা থাকে সে সব খবর আমাদের কাছে কখনও প্রকাশিত হয়নি। বাস্তব জগতের সঙ্গে এদের কোনই সম্পর্ক নেই।"

ডাক্তার বললেন, "তোমায় আরও বলছি। গত দুই রাত্তিরে টেলিফোনে আমায় ডাকা হয়েছিল, স্বর খুবই ক্ষীণ, শুধু ফিস্ ফিস্ শব্দ মাত্র। আমি তখনই জানতে চেয়েছিলাম, ডাকটা কোথা হতে এসেছে। আমায় বলা হোল জেলখানা থেকে। আমি তখনই জেলখানার ওয়ার্ডারকে ডাকলাম। ওয়ার্ডার ড্রেকট আমায় বলল সেখান থেকে আমায় কেউ ডাকেনি, কিন্তু অশরীরী কোন একটা কিছুর উপস্থিতি সেও অনুভব করেছিল।"

মিঃ ডকিনস কর্কশস্বরে বলে উঠলেন, "ও লোকটা তো মদ খায়।"

ডাক্তার এক মুহূর্ত্ত নীরব রইলেন, তারপর বললেন, "ও কথা বলো না ভাই। আমাদের ওখানে যে ক'টি ধীর স্থির ভাল লোক আছে

তাদের মধ্যে ও একটি। ওকে যদি বল যে ও মদ খায়, তাহলে আমায়ও কেন বল না।"

ধর্ম্মযাজক আবার বসলেন।

তিনি বললেন, "ক্ষমা করো ভাই। এ সব ব্যাপারের মধ্যে আমি থাকতে চাই না। এ বিষয়ে চর্চ্চা করাও বিপদের কথা। তা ছাড়া তুমি কি ঠিক জান যে এ কারও ধাপ্পাবাজি নয়?"

ডাক্তার বললেন' "কে আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করবে? ঐ যে, শোন?"

হঠাৎ টেলিফোন বেল বেজে উঠল। ডাক্তার স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, "শুনতে পাচ্ছ না?"

"কি শুনব?"

"কেন, ঐ টেলিফোনের ঘণ্টা।"

ধর্ম্মযাজক রাগ করে বললেন, "কোন ঘণ্টাই আমি শুনতে পাচ্ছি না। কোন ঘণ্টা ত বাজছে না।"

ডাক্তার কোন উত্তর করলেন না। তিনি পড়বার ঘরে ঢুকলেন, আলো জেলে দিয়ে রিসিভারটা তুলে ধরলেন।

কম্পিত স্বরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কে?—হ্যাঁ, মিঃ ডকিন্‌স এখানেই আছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য তাঁকে আমি আজ এখানে ডেকে এনেছি।"

তিনি খাবারের কামরায় ফিরে এলেন।

ডাক্তার বললেন, "ডকিন্‌স, একটি আত্মা যাতনায় কষ্ট পাচ্ছে। আমি অনুনয় করে বলছি, দয়া করে ওর কথাটা তুমি শোন। ঈশ্বরের দোহাই, একবার এসে শোন।"

ধর্ম্মযাজক এক মুহূর্ত্তের মত সময় দ্বিধায় পড়লেন, পরে বললেন, "বেশ, যেমন তোমার ইচ্ছা।"

টেলিফোনের ঘরে গিয়ে তিনি রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললেন, "আমি ডকিনস।"

বলে তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন।

"আমি ত কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। তাই ত কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে যে! অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ ফিসফিসানি।

ডাক্তার বললেন, "কি বলছে শুনতে চেষ্টা কর—চেষ্টা কর।"

আবার ধর্ম্মযাজক শুনলেন। হঠাৎ চোখ কুঁচকিয়ে রিসিভার নামালেন, বললেন, "কিছু—কেউ—যেন বলছে আমি তাকে মেরেছি আমি স্বীকার করছি—আমি ক্ষমা চাচ্ছি।"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "বন্ধু টিসডেল। এ নিশ্চয়ই একটা "বুজরুকি। ভৌতিক ব্যাপারে তোমার বেশ অনুসন্ধিৎসা আছে জেনে কেউ এ বিশ্রী রকমের ভয়ঙ্কর তামাসা করছে। আমি এ সব একটুও বিশ্বাস করি না।

ডাক্তার টিসডেল রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললেন, "আমি ডাক্তার টিসডেল। তুমি যে সেই চার্লস লিংকওয়ার্থ তার কোন চিহ্ন তুমি কি মিঃ ডকিনসকে দেখাতে পার?"

তারপর রিসিভারটা তিনি স্বস্থানে রাখলেন ও বললেন, "ও বলছে পারে। আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

রাত্রিটা বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। যে জানালাটা দিয়ে বাড়ীর পিছনের বাঁধান আঙ্গিনাটা দেখতে পাওয়া যায় তা খোলা ছিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট কাল দু'জনে নীরবে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলেন, এর মধ্যে কিছুই ঘটল না।

তখন ধর্ম্মযাজক বললেন, 'আমার মনে হয় আমি যা বলেছি তার সত্যতা সম্বন্ধে এ চূড়ান্ত প্রমাণ।"

এ কথা বলামাত্রই খুব ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, ডেস্কের উপরের কাগজপত্রগুলি উল্টে পাল্টে দিল। ডাক্তার টিসডেল জানালার কাছে গিয়ে ওটা বন্ধ করে দিলেন।

তিনি ডকিন্‌সকে জিজ্ঞাসা করলেন, "টের পাচ্ছ কি?"

"হাঁ, বাতাসের ঝাপটা—বেশ ঠাণ্ডা।"

বন্ধ ঘরটায় কিছু যেন নড়াচড়া করছিল।

ডাক্তার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "অনুভব করতে পারছ?"

ধর্ম্মযাজক সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন। তাঁর মনে হোল তাঁর গলার কাছে বুকটায় কেউ যেন টিপ টিপ করে হাতুড়ী পিটাচ্ছে। তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, "আজকের রাত্তিরে সব বিপদ হতে ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন।"

ডাক্তার বলে উঠলেন, "কিছু একটা আসছে মনে হচ্ছে।"

বলতে বলতেই ওটা এসে উপস্থিত হোল। কামরার ঠিক মাঝখানে ওদের কাছ থেকে তিন গজ দূরেও নয় একটা মানুষের মূর্ত্তি এসে দাঁড়াল, মাথাটা তার কাঁধের উপর ঝুলে পড়েছে, তাই মুখখানা দেখা যাচ্ছে না। তারপর দু হাতে সে মাথাটা তুলে ধরল যেন একটা ভারী জিনিষ তুলছে এমন ভাবে। তারপর ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ আর জিভ স্বস্থান হতে বেরিয়ে আসছে, গলার চারদিকে একটা নীল কালো দাগ। তারপর মেজের কাঠের উপর একটা খট খট শব্দ হোল। মূর্ত্তিটা সেখানে নেই। মেজের উপর একটা নূতন দড়ি পড়ে রয়েছে দেখা গেল।

ডাক্তার বললেন, "ফাঁসীর পর এ দড়িটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।"

তারপর আবার টেলিফোন বেল বেজে উঠল। এবার আর ধর্ম্মযাজককে কারো নির্দ্দেশ দিতে হোল না। তিনি তখনই টেলিফোন ধরলেন। ঘণ্টা থেমে গেল, তিনি নীরবতার মাঝে কিছুক্ষণ শুনলেন।

অবশেষে তিনি নিজেই বলতে আরম্ভ করলেন, "চার্লস লিংকওয়ার্থ, আজ তুমি ভগবানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছ, তুমি কি তোমার কৃত পাপকার্য্যের জন্য দুঃখিত?

কিছু একটা উত্তর এল, কিন্তু ডাক্তার শুনতে পেলেন না।

ধর্ম্মযাজক চোখ বুজলেন। প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রার্থনা শুনেই ডাক্তার টিসডেল হাঁটু পেতে বসলেন।

প্রার্থনা শেষ হতেই আবার সব নিস্তব্ধ হোল। তখনই ডাক্তারের পরিচারক মদের পাত্র ও সোডার বোতল নিয়ে ভিতরে এল। যেখানে প্রেতাত্মা দাঁড়িয়েছিল সে দিকে না তাকিয়েই ডাক্তার দড়িটাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "পার্কার ঐ দড়িটা নিয়ে যাও, পুড়িয়ে ফেল।"

এক মুহূর্ত্তের জন্য আবার সব নিস্তব্ধ।

পার্কার বলে উঠল, "দড়িটা ত নেই, স্যার।"

অনুবাদক: শ্রীঅশ্রুমান দাশগুপ্ত

---

* ই, এফ, বেনসন রচিত The Confession of Charles Linkworth নামক একটি ইংরাজী গল্পের অনুবাদ।

ক্ষণ-স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ

মনের মণি-কোঠায় অনেক স্মৃতি,—কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি আলো-আঁধারি, কোনটি ম্লান, কোনটি আচ্ছন্ন। জীবনের হাজার হাজার দিনের মধ্যে এক একটি দিন অত্যুজ্জ্বল। তেমনি একটি দিন রবি-সন্দর্শনের দিন। তাঁর সঙ্গে আমার ঘটেছিল মুহূর্তের সংস্পর্শ; কিন্তু শান্তিনিকেতনের একটি দিনের স্মৃতি ও কবিগুরুকে মুহূর্তের জন্য দেখা মনে চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল হয়ে রইল।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তী উৎসব হয়েছিল কলকাতায়। এই উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের অনেক বৈজ্ঞানিকের এখানে আগমন ঘটে, আমরাও এই উপলক্ষ্যেই পুণা থেকে আসি কলকাতায়। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের পর প্রতি বৎসরই আশে-পাশের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান সকলকে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়, যাঁর যা পছন্দ বেছে নিতে পারেন। এবার শান্তিনিকেতন দ্রষ্টব্য স্থানের পর্য্যায়ে পড়ায় সানন্দে তাতে নাম দিলাম।

খুবই আনন্দ হল; আমার চার দাদা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের গোড়ার দিকের ছাত্র,—গুরুদেব বাবার বিশিষ্ট বন্ধু; শিশুকাল থেকে এখানকার কত যে গল্প শুনেছি তার অন্ত নেই। শুনেছি, গুরুদেব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম খোলার পূর্ব্বেই বাবাকে জানিয়েছিলেন তাঁর সঙ্কল্প, 'কিন্তু ছাত্র কোথায়'? বলায়, বাবা উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, বিদ্যালয় আরম্ভ করুন, আমার ছেলেদের আমি সেখানে পাঠাব। বাবা তখন আগরতলাবাসী, ত্রিপুরার দেওয়ান।

দাদাদের মুখে যখন শুনতাম,

আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন;
তার আকাশভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন!

তখন শরীর শিহরিত হত, সে স্থানটি দেখার জন্য মন আকুল হয়ে উঠত। ভাগ্য-দেবতা অল্পবয়সেই ভারতের অপর প্রান্ত বম্বে এনে এখানেই স্থিতি করে ফেলায়, বহুকাল এ বাসনা মনেই বাসা বেঁধেছিল।

কবিসম্রাট তাঁর শেষ জীবনে যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বম্বেতে অনেকদিন ধরে, তাঁর অমর লেখনী প্রসূত চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, তাসের ঘর প্রভৃতি বিখ্যাত গীতি-মুখর নৃত্য-নাট্য দেখিয়েছিলেন, তখন আমরা আবার বম্বে ছেড়ে পুণা-প্রবাসী, কাজেই তাঁকে দেখা ও তাঁর শান্তিনিকেতন দেখা এ জন্মে যে আর ঘটে উঠবে ভাবি নি।

এবার আকস্মিক ভাবে এতদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলল। স্থির হল, রাত্রি দশটায় হাওড়া থেকে স্পেশাল ট্রেণে আমাদের প্রায় পঞ্চাশ জনকে বোলপুর ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হবে। সারাদিন সেখানে সব দেখে শুনে রাত্রে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যাভিনয় দেখে রাত বারোটায় আবার সেই ট্রেণে উঠে পরদিন ভোরে হাওড়া।

বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক ও তাঁদের পত্নী নিয়ে জন পঞ্চাশেক, তার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কম, তার ভিতরে আবার বঙ্গ মহিলা, নিজেকে বাদ দিয়ে মাত্র দুজন। একজনের স্বামী বম্বে ও অন্যজনের লাহোর-প্রবাসী। চতুর্দ্দিকে সবাই অপরিচিত, যেখানে যাচ্ছি সেখানেও কিছুই জানি না, অজ্ঞাত পরিবেশে বম্বের পরিচিত মহিলাটিকে পেয়ে খুব আনন্দ হল।

প্রাতঃকালে বোলপুর ষ্টেশনের 'সাইডিং'এ রাখা হল গাড়ীখানা; আমরা ধীরে সুস্থে প্রস্তুত হয়ে বাহিরে এলাম। ষ্টেশনটি ছোট এবং অপরিষ্কার, ধূলিপূর্ণ কাঁচা রাস্তার দুপাশে কিছু দোকানপাট, তার মধ্যে মাছি ভরা খাবারের দোকানই বেশী। আমাদের জন্য কয়েকখানা মোটর বাস এসেছিল, তাতে চড়ে আধঘণ্টার মধ্যে শান্তিনিকেতন।

এখানে এসে মনে হল অন্য রাজ্যে প্রবেশ করেছি। ধূলো নেই, ময়লা নেই, দূরে দূরে কয়েকটি বাড়ী ও চতুর্দ্দিকে পরিচ্ছন্ন, সবুজ, সমতল মাঠ। মহিলাদের প্রথমেই শ্রীভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। নব-নির্ম্মিত শ্রীভবন সত্যই শ্রীমণ্ডিত। বাড়ীটি বাইরে থেকে দেখতে যেমন সুন্দর ভিতরও তেমনি; এটি এখানকার ছাত্রী-আবাস। আগন্তুক কিংবা দর্শনপ্রার্থীদের জন্য নীচের তলার একটি বেশ বড় বৈঠকখানা গোছের ঘর আছে, তার দেয়াল জুড়ে বড় বড় সুন্দর ফ্রেস্কো, এখানকার কলাভবনের বিদ্যার্থীদের হাতে আঁকা। হষ্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একজন মান্দ্রাজী মহিলা আমাদের আদর আপ্যায়ন করে উপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করতে বললেন। উপরতলায় ছাত্রীদের জন্য ছোট ছোট ঘর। প্রত্যেক মেয়ের একখানা তক্তপোষ ও তার প্রান্তে একটি টেবিল। প্রতি টেবিলেই রবীন্দ্রনাথের ছোট একখানা ফটো টাটকা ফুল অথবা মালা দিয়ে ঘেরা। মেয়েদের মধ্যে সবই প্রায় অবাঙ্গালী। বাঙ্গালী মেয়ে এত কম, যে দেখে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হলাম; আর একটি জিনিষেও বড়ই আশ্চর্য্য হই, সে এখানকার পাঞ্জাবী, গুজরাতী, মান্দ্রাজী, মারহাটি মেয়েদের অনর্গল বাংলা ভাষায় কথোপকথন। ঠিক যেন তাদের মাতৃভাষার মতই বাংলা বলে একটুও বিকৃত না করে।

খানিক বিশ্রামের পর সকলকে নিয়ে যাওয়া হয় আহার স্থানে। প্রকাণ্ড খাবারঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত,

কিন্তু বাহুল্যবর্জিত, খাদ্যদ্রব্যও সেইরূপ। ভোজ্য নিরামিষ বাহুল্য-বর্জিত, কিন্তু উপাদেয়। খাবারঘরটি তখনও ছিল কাঁচামাটির ঘর।

ছাত্র ও শিক্ষকগণ পরিবেশন করে আমাদের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করালেন, তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাধিক উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন এক অবাঙালী যুবক, নাম শুনি গুরুদয়াল মল্লিক। তিনি আমাদের হাসিয়ে, খাইয়ে, গল্প বলে পরম পরিতৃপ্ত করেন। রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত এক বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা, আমাদের বাঙ্গালী অনুমানে একটু এগিয়ে এলেন; তাঁকে বলি,—আজ বোধ হয় আপনাদের খুবই হাঙ্গামা হল, এতগুলো লোকের আহার ব্যবস্থা করতে। তিনি হেসে বলেন, এ আমাদের খুব অভ্যাস আছে; তা ছাড়া প্রতি বেলায় আমাদের দু'শো লোকের রান্না হয়, আপনাদের জন্য তার উপরে, মাত্র 'বোঝার উপর শাকের আঁটি'।

খাবার পর মহিলাদের এক ভাগে ও পুরুষদের অন্য ভাগে সমস্ত শান্তিনিকেতন পরিদর্শন। এসব ত জানা কথা। গ্রন্থাগার, চীনা-ভবন, কলা-ভবন প্রভৃতি বাস্তবিকই দর্শনীয়। কলা-ভবনে টেবিল, চেয়ার, ইজেল প্রভৃতির বালাই নেই; সারি সারি শিল্পী মাটিতে বসে, মাটিতেই কাগজ রেখে তাতে রঙের পরশ বুলিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকের পাশে একটি মৃৎপাত্রে খানিকটা জল, কী সহজ অনাড়ম্বর সাধনা! এই তুচ্ছ সরঞ্জাম দিয়ে তাঁরা কত গভীর ভাবের ব্যঞ্জনা করে যাচ্ছেন। মনে হল, অন্যরা পাশ্চাত্ত্য বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ হয়ে তার নকলে ব্যস্ত হলেও রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম; তিনি বহিরাবরণ বাদ দিয়ে শুধু আসল বস্তুটি আহরণ করেন! আমাদের মত গরীব দেশে বিপুল অর্থব্যয়ে শিক্ষার জন্য বিরাট সৌধ নির্ম্মাণের কী প্রয়োজন?

প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে অনাড়ম্বর বিদ্যা শিক্ষার আদর্শে এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গঠিত, তপস্বীর আশ্রমের মতই ইহা পবিত্র, শান্ত, গম্ভীর, আনন্দপূর্ণ। আম্রকুঞ্জে গাছের ছায়ায় বসে ছাত্রছাত্রী গুরুর নিকট পাঠ নেয়; নেই সেখানে বেত্রাস্ফালন, নেই শাস্তির ভয়, দরদী মনে শিক্ষকরা বিদ্যাদান করেন,—আনন্দের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা তা গ্রহণ করে। লেখাপড়ার সঙ্গে সমান যত্নে শেখানো হয়, গান, আবৃত্তি, অভিনয়। মুখে ভালভাবে কথা ফোটেনি এমন সব শিশুর আবৃত্তি অভিনয়ে মুগ্ধ হতে হয়।

এখানকার শিশু-বিভাগ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন দেশের, পাঁচ থেকে দশ বার বৎসরের শিশুরা এতে স্থান পেয়েছে। ঐ কচি বাচ্চারা মা-বাবাকে ছেড়ে কী মনের আনন্দেই এখানে আশ্রম-জীবন যাপন করে, দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়।

বর্ষার দিনে কি ভাবে পড়াশোনা হয় জানার ঔৎসুক্য হওয়ায় জিজ্ঞাসা করে শুনি, শান্তিনিকেতনে বর্ষা কম; তবুও বর্ষায় যদি বাহিরে ক্লাশ করা অসম্ভব হয় তবে নিকটবর্ত্তী কোন একটা বাড়ীর বারান্দায় ক্লাশ হয়।

ক্লাশ দেখার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাধিস্থান ছাতিমতলা, উপাসনা গৃহ, ভক্তিনম্র চিত্তে দেখে এসে উঠি গ্রন্থাগারের বারান্দায়। গৃহটি কাঁচা, যৎসামান্য পর্ণ কুটীর, কিন্তু ভিতরে অমূল্য ধনে পরিপূর্ণ। কত দেশের কত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ইহাতে স্থান পেয়েছে, তার বিবরণ দেবেন গুণীরা, আমরা শুধু স্তব্ধ বিস্ময়ে পরিদর্শকের সঙ্গে সমস্ত গ্রন্থাগার একবার ঘুরে এলাম।

তারপর এখানকার সব গুণী অধ্যাপকদের বাস গৃহ! বাড়ীগুলো সবই কাঁচা, মাটির বাড়ী। মাটির বাড়ী এখানকার গরমে অত্যন্ত আরামজনক। একটি বাড়ী বড় অদ্ভুত, এক প্রকাণ্ড তালগাছ কেন্দ্র করে গোলাকৃতি একটি ঘর, নাম তার 'তাল-ধ্বজ'। তারপর ডাক্তারখানা, হাসপাতাল প্রভৃতি দেখানোর পর আবার জলযোগ। তার পরই শুনি আমাদের আশ্রমের প্রাণবস্তু দেখানো হবে।

বিদ্যালয় একপাশে রেখে চওড়া রাস্তা দিয়ে এক প্রকাণ্ড ফটকের ভিতরে আসি। ফটকটি দেখে বুদ্ধগয়া অথবা সাঁচীস্তূপের বৌদ্ধফটকের অনুরূপ মনে হল, পাথরের ফটকটিতে অতি সুন্দর খোদিত কারুকার্য্য। ঐ ফটকটি এখন অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায়। ফটকের ভিতর দিয়ে অনেকটা রাস্তা পার হয়ে সোজা যে বাড়ীটিতে আসি, তার নাম 'শ্যামলী।' এটি মাটির বাড়ী, কিন্তু অতি সুন্দর মূর্ত্তি, কারু কলায় অলংকৃত। এ বাড়ীতে কবিগুরু অনেকদিন ছিলেন। পাশে আর একটি একতলা ছোট বাড়ীর নাম—'পুনশ্চ।' এই বাড়ীর বারান্দায় মহামতি এণ্ড্রুজ সাহেবকে ধুতি পরে পায়চারী করে বেড়াতে দেখি। কোট-প্যাণ্ট-পরা বাঙ্গালী ত হাজার হাজার দেখা যায়, শাড়ী-পরা মেমসাহেবও অনেক চোখে পড়ে, কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবী পরা সাহেব জীবনে এই প্রথম দেখা,—অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, উঁহাদের উগ্র গৌরবর্ণের উপরে পাড় শূন্য সাদা ধুতিটা কেমন যেন বেমানান ঠেকে।

এই বাড়ী দুটির দু'কোণে আরও দুটি ছোট বাড়ী, নাম 'উদীচী' ও 'কোনার্ক।' এই সব বাড়ীগুলিতেই কবি কিছুদিন করে থেকে গেছেন। তারপর গুরুদেবের সাবেক বাসস্থান 'উদয়ন।' এটি প্রাচ্য প্রথায় তৈরী একটি রাজ-প্রাসাদ-বিশেষ। এখানে দেখি প্রাচ্য প্রথায় সজ্জিত বৈঠকখানা। দেয়ালের ছবিগুলি সবই গুরুদেবের নিজের হাতে আঁকা কিছু বোঝা যায়, কিছু অবোধ্য, কিন্তু না বুঝলেও যেন সৌন্দর্য্যময় কিছুর আভাস পাওয়া যায়। দরজার পরদাগুলি ঢাকাই বুটিদার কাপড়ের। আসবাবপত্র সবেতেই নূতনত্ব, যা দেখি তাতেই হই বিস্মিত, প্রতিটি বস্তুতে যেন এক বিরাট ব্যক্তিত্বের ছাপ! একই হাতের ভিতরে এই পাঁচটি বাড়ীর সমষ্টির নাম,—'উত্তরায়ণ।'

শুনি এরপর যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানেই আছেন স্বয়ং কবিগুরু। তখন সন্ধ্যা—এই গোধূলি লগ্নেই হবে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ফুলে-ফুলে ভরা চমৎকার একটি বাগানের ভিতর দিয়ে আকুল আগ্রহে এবার যে গৃহের নীচে এসে দাঁড়ালাম, তেমন অদ্ভুত বাড়ী আর কখনও কোথাও দেখি নাই। প্রায় দোতলার সমান উঁচু সরু সরু কয়েকটি কংক্রিটের থামের উপরে ছোট্ট একখানা পাকা ঘর, তার সামনে একফালি একটি বারান্দা। পাড়া গাঁয়ের ক্ষেত-খামারে ফসল পাকলে, চাষীরা পাহারা দেবার জন্য যেমন উঁচু মাচানের উপরে কুটির বেঁধে চতুর্দ্দিকে নজর রেখে বাস করে, এও যেন সেই রকম। উপরের বারান্দা থেকে দিগন্ত-বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর ও মাঝে মাঝে শ্যামল, স্নিগ্ধ শস্য ক্ষেত্রের দৃশ্যে চোখ জুড়ায়। শুনি, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের বিলাসিতা মাত্র একটি, এই খামখেয়ালী ঘর বদলানো ও ছোট ছোট ঘরে বাস।

অনেকদিন যাবৎ অসুখে ভুগে গুরুদেব বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন, চলাফিরা করতে একেবারেই অক্ষম, বেশী কথাবার্ত্তা বলাও ডাক্তারের নিষেধ। তিনি ঐ ছোট বারান্দাটিতে একখানা আরাম কেদারায়

উপবিষ্ট ; আমাদের দুজন দুজন করে তাঁকে দর্শন করিয়ে তৎক্ষণাৎ নীচে নিয়ে আসা হবে। আমি দুরু দুরু বক্ষে, কম্পিতপদে, উপরে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। সেই গোধূলির ম্লান আলোতে কী জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি দর্শন করলাম। তাঁর ললাট থেকে যেন অলৌকিক আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। শিশুকাল থেকেই শুনেছি, তিনি দেখতে অতি সুন্দর, কিন্তু তা যে এত সুন্দর তা দেখার আগে কল্পনা করতে পারিনি। আটাত্তর বৎসরের রোগজীর্ণ বৃদ্ধ, তাঁহার ভিতর এত সৌন্দর্য্য কোথা থেকে এলো ? একেই কি বলে অন্তরের সৌন্দর্য্য ? বিশ্লেষণের সময় নেই, নেই আশ মিটিয়ে দেখার উপায়, পিছনে অপেক্ষমান দুজন দণ্ডায়মান। একটু কণ্ঠস্বর শোনার আশায় তাড়াতাড়ি মরিয়া হয়ে বলি, 'আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী, বহুদূর থেকে এসেছি, বহুদিনের আশা আজ সফল হল।' তিনি মাথায় হাত দিয়ে নীরব আশীর্ব্বাদের পর মৃদুস্বরে বললেন, 'আমি রোগে অশক্ত, তোমাদের বোধ হয় কিছুই আদর যত্ন হল না।'

পিছনের তাগাদায়, সম্মুখের ইঙ্গিতে, প্রতিবাদ করার আর সময় হল না, যা পেলাম তাই নিয়ে পরিপূর্ণ হৃদয়ে, নত মস্তকে তাঁর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করলাম।

সন্ধ্যার পর দিকে দিকে বিজলীবাতি উঠল জ্বলে ; পাড়াগাঁয়ে মাঠের মাঝে এমন নাগরিক সুবিধা। মনে হল, বাঙ্গালী স্বাস্থ্যান্বেষণে মধুপুর, গিরিডি, শিমুলতলা যায়, কিন্তু কলকাতার এত কাছে, এমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সকল সুবিধাযুক্ত স্বাস্থ্যকর স্থান এখানে আসে না কেন ? অন্য দেশ হলে বোধ হয় শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে এতদিনে এখানে একটি বিরাট সহর গড়ে উঠত।

মনে হল,—একটি মাত্র মানুষের কী কঠোর চেষ্টা, আত্মত্যাগ ও সাধনার ফলে এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে ; সেই মহামানব ত অমর নন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এ যেন ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, দেশবাসী যেন একে বাঁচিয়ে রেখে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, যুগ যুগ ধরে এই প্রতিষ্ঠান যেন প্রাচ্য-কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল হয়ে দেশে বিদেশে এই মহামানব-তথা-ভারতের মহিমা প্রচার করে।

চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বের লেখা এই প্রবন্ধের স্বপ্ন আজ সফলতার পথে অগ্রসর হচ্ছে। শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে এক বৃহত্তর নগর ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, তার মধ্যে নগণ্য আমরাও আজ বার্দ্ধক্যের বাণপ্রস্থে স্থান পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করি !

নৈশ-ভোজনের পর দেখানো হয় চিত্রাঙ্গদা নাটক। প্রকাণ্ড একটি মাটির ঘরে মঞ্চ সাজানো। দর্শকদের মাঝখানে গুরুদেব নীরবে উপবিষ্ট, চিত্রাঙ্গদা সেজেছিলেন, তাঁরই আদরের নাতনী নন্দিতা দেবী। সাজ-সজ্জা অতি উৎকৃষ্ট। আমরা অভূত-পূর্ব্ব এই নাটক দর্শনে অভিভূত হই। বিদেশী বন্ধুরা বারবার উৎসাহে হাততালি দিতে আরম্ভ করেই সামলে যান,—কারণ পূর্ব্বেই বলে দেওয়া হয়েছিল, অভিনয়ের মধ্যে যেন হাততালি না দেওয়া হয়, গুরুদেব এই শব্দে হন অতি বিরক্ত, সঙ্গীত ও নৃত্যাভিনয়ের মাধুর্য্য এতে হয় ব্যাহত, যদি খুব ভাল লাগে ও তা প্রকাশে ইচ্ছা হয়, তবে 'সাধু সাধু' বলাই প্রকৃষ্ট। আমাদের এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। অনেক নূতনের স্মৃতি নিয়ে, শান্তিনিকেতনের সকলকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাধুবাদ জ্ঞাপন করে, অনেক রাত্রে আবার এসে উঠি সেই ভোরের পরিত্যক্ত রেলের কামরায়।

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর সহিত শেষ কথা

শ্রাবণ মাস। বুধবার কলকাতা যাবার কথা, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-সপ্তাহ মুখরিত সিংহ-সদনের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়ে মনে হয় না থাক,—কাল চলে যাব, আজ একটু 'বিবিদি'কেই দেখে আসি।' তৎক্ষণাৎ পথ বদলে আমাদের প্রিয়তীর্থ বিবিদির (ইন্দিরা দেবী) আবাসখানিতে এলাম।

দেখি,—শনিবার আলাপনী মহিলা সমিতির তরফ থেকে রবীন্দ্র-সপ্তাহের শেষ কার্য্যক্রমের মহড়া চলছে, স্বয়ং বিবিদি তার কর্ণধার। তিনিই গান বেছে দিয়েছেন, তাঁরই অঙ্গনে মহিলারা তা রপ্ত করছে, আর তিনি ঘরে বসে মন দিয়ে শুনছেন ; দেখে মনেই হচ্ছে না তাঁর সাতাশি বৎসর বয়স, যেন একটি পরম উৎসাহী কিশোরী। একটু পরেই গান শেষ হল, মেয়েরা চলে গেলেন,—শুনলাম পরদিন সকাল দশটায় আবার মহড়া তাঁর সমক্ষে।

এবার তাঁর নৈশ আহারের সময় ; সঙ্কোচের সঙ্গে বলি, 'এখন যাই' কিন্তু তিনি এমন স্নেহ দরদ মেশানো সুরে বললেন,—'বোসো না আর একটু'—যে, আসতে পারলাম না। আহার সামান্যই, তারপর ঢালা বিছানায় গা ঢেলে দিলেন। আবার সসঙ্কোচে বলি, 'এবার যাই বিবিদি, আপনি বিশ্রাম নিন, ঘুমিয়ে পড়ুন।'

এবারও অতি কোমল সুরে বললেন, 'না,—আমি কি এত শীঘ্র ঘুমাই ? রাত্রি এগারোটার আগে কখনই নিজের শয্যায় যাই না ; এখানেই শুয়ে একটু কথাবার্ত্তা বলি,—তুমি বোসো।' তাঁর পায়ের কাছটিতে গিয়ে বসি ; তারপর প্রায় দুঘণ্টা তাঁর নিজস্ব কোমল ভঙ্গীতে কত যে কথা শোনান। তখন কি জানি, এই কথাই শেষ কথা ? এই দেখাই শেষ দেখা ? সুস্থ মানুষ, বার্দ্ধক্যজনিত সামান্য অসুবিধা ভিন্ন ভালই আছেন,—ঠিক দুদিন পরেই যে সকলকে ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাবেন, এ কথা ত সেদিন স্বপ্নেও মনে হয়নি।

শান্তিনিকেতনের প্রতি উৎসবে তাঁর স্নিগ্ধখানি আমাদের চোখে পরম অভ্যস্ত দৃশ্য। গাড়ী থেকে নামতে কষ্ট হয়, গাড়ীতে বসেই তিনি এখানকার সকল উৎসবকে সার্থক, মহিমান্বিত করে তোলেন। এবার কেন বৃক্ষরোপণে, প্রাক্তন-ছাত্র সম্মেলনে, তাঁর দেখা পেলাম না জিজ্ঞাসা করায়, মৃদু হেসে বললেন, 'সমস্ত শক্তি রেখে দিচ্ছি শেষ দিনের মহিলা সমিতির কার্য্যক্রমের জন্য। সেদিন যাব, তাই এ কয়দিন আর কোথাও যাচ্ছি না।' হায় মহিলা-সমিতি ! এমন করুণাময়ীর করুণা হতে হলে চির-বঞ্চিত !

একটু আগেই তিনি তাঁর সহজাত বিনয়ে সমিতির মহিলাদের উপস্থিতিতে বারবার একটি কথা বলেছিলেন। নিজেই দেহের দিকে অঙ্গুলি হেলন করে, বললেন,—'আমি নিজেকে বাঁচবার জন্য একটি কথা বলছি, আমার সিঁড়ি চড়া বারণ, কাজেই সমিতির কাজের দিন উচ্চ মঞ্চের উপর না বসে, বসব নীচে, সেখান থেকেই আমার উদ্বোধক-ভাষণ পড়ব। আর যাঁরা পাঠ ও আবৃত্তি করবেন, তাঁরা যেন থাকেন আমার পাশে ; যাঁরা গান গাইবেন শুধু তাঁরাই যেন মঞ্চের উপরে থাকেন,—সে খুব সুন্দর হবে,—উপর থেকে গানের আওয়াজ ও নীচে থেকে পাঠ, আবৃত্তি ভালোই লাগবে ; অবশ্য নিজেকে বাঁচাবার জন্যই আমি এ প্রস্তাব করছি।

তখন 'মাইকের' অসুবিধা হবে বলে আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু সেই

শনিবারের আগেই তিনি মরলোকের মায়া ছিন্ন করে অমৃত-লোকে চলে গেলেন।

আমাদের পূর্ব্ব কথোপকথনে ফিরে আসি। তাঁর গায়ে-পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করি, সমিতির 'ঘরোয়া' মাসিক পত্রিকাটি কেন উঠে যাচ্ছে? একে কি বাঁচিয়ে রাখা যায় না?'

দুঃখের সঙ্গেই বললেন,—'তা কি আর করা যাবে? উঠে যাচ্ছে ত যাক্। সুধা (প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী) প্রায়ই বাইরে থাকে, সে আর সম্পাদিকার কাজ করতে পারবে না বলছে; তারপর আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে। তাছাড়া এ কাগজ আমরা গ্রামের মেয়েদের উন্নতির জন্য প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু এখন আর তাদের সঙ্গে কোন সংযোগই হচ্ছে না,—কাজেই উঠে যাচ্ছে ত যাক্।'

বললাম, 'অত্যন্ত দুঃখের কথা।'

তিনি বললেন,—'ঘরোয়া উঠে গেলেও, মেয়েদের অনেক কিছু করবার আছে। গুরুদেবের সাহিত্য থেকে মেয়েরা যদি, মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি কোথায় কি লিখেছেন সব একত্র করে সংকলন করতে পারে, তবে মস্ত একটা কাজ হয়!

তারপর তুলি কবি-জায়া মৃণালিনী দেবীর প্রসঙ্গ। গত দু'তিন বৎসর শান্তিনিকেতন বাসের পর থেকেই মনে জাগে তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা; বিবিদি তাঁর সম্বন্ধে কি জানেন, জিজ্ঞাসা করায় বললেন,—তাঁর কথা আমিও বিশেষ জানি না,—কারণ তিনি থাকতেন জোড়াসাঁকোয় ও আমরা ছিলাম চৌরঙ্গী অঞ্চলে, আমি তখন লরেটোতে পড়ি ও দাদা সুরেন্দ্রনাথ সেণ্টস্ জেভিয়াসে। যাওয়া আসা কমই ছিল, তবে আমার কাছে হয়তো পুরাণো ছবি এক আধখানা থাকতে পারে। বলেই সেবিকা 'বীণাকে' ডেকে বললেন,—আমার ঘরে টেবিলের অমুক ধারে একটা ছবির প্যাকেট আছে, নিয়ে এস ত! আমি বিস্ময়ে অবাক! কী তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, অত দিনের পুরাণো ছবি, খুঁজতে হল না, হাতড়াতে হল না, মুহূর্ত্তে বীণা এনে হাজির করে, সেই পুরাণো প্যাকেট।

খুলে দেখি বহু পুরাতন কয়েকখানা ছবি; একখানা 'বিবিদি'র তের-চোদ্দ বৎসর বয়সের,—বাল্মীকি-প্রতিভায় লক্ষ্মী সেজেছিলেন,—গুরুদেব অল্পবয়সী বাল্মীকি,—কী সুন্দর ছবিখানা। দুজনেরই চোখে মুখে যেন নাটকের সেই সময়ের ভাব জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে!

আরও দু তিনখানা গুরুদেবের অল্প বয়সের সকন্যা, সপুত্র ছবি। যা চেয়েছিলাম তা পাওয়া গেল না; যেটুকু পেলাম তাতে মন ভরে গেল। করুণাময়ীর করুণা যেন সহস্রধারে বর্ষিত হতে লাগল, কত ঘরোয়া কথায়, কত অন্য কথায়,—যেন মমতাময়ী নিজেরই জননী। এমন কি আমাদের এখানকার নূতন বাড়ীর কি নাম দেওয়া হল, তা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন। কি সরল, আন্তরিকতাপূর্ণ কথাবার্ত্তা। স্বল্পপরিচিতার সঙ্গে কি উদার ব্যবহার। তাঁর নিকট যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তেমনটি হয়ত আর দেখব না, পাব না। সেই নবনীত কোমল পা দু'খানির স্পর্শসুখ এ জীবনে আর হবে না, তবুও যা পেলাম, তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করি!

অতুলপ্রসাদ সেন

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে। মনের গহনে কত ঘটনা বিস্মৃতি-সাগরে বিলুপ্ত, আবার কোনটি এমনই উজ্জ্বল যে মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা।

এমনি একটি ঘটনা সেবারের প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন। ১৯৩০ সালের শীতকালে সম্মেলনের তরফ থেকে আহ্বান এলো, সেবারের নাগপুর অধিবেশনে তদানীন্তন বম্বের কোলাবা অবজারভেটরীর ডিরেক্টার স্বামীকে বিজ্ঞান শাখায় পৌরোহিত্য করতে। খুব আনন্দের সংবাদ। অনেককাল বাঙ্গালী সংস্পর্শ শূন্য হয়ে কোলাবায় (বম্বের সহরতলী) দিন কাটাচ্ছি। তখনকার দিনের মারাঠা অধ্যুষিত বম্বে, না বুঝি সে দেশের ভাষা, না বুঝি আচার-আচরণ। সমস্ত সহর খুঁজলে আঙুলে গোণার মত বাঙ্গালী জুটবে কিনা সন্দেহ, সেই মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীও এত ছড়ানো ও নিজ নিজ কাজে এমন ব্যস্ত যে, কেউ কাউকে প্রায় চেনে না; দেখা হয়, হয়ত বৎসরে এক-আধবার। বিশেষতঃ কোলাবা বম্বের এক প্রান্তে সহর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে, এখানে বৎসরের পর বৎসর কাটে, একটি স্বদেশ-বাসীর দর্শনও ভাগ্যে ঘটে না।

এ হেন সময়ে বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের আহ্বান সত্যই আনন্দ-দায়ক, মনে-প্রাণে জাগে চাঞ্চল্য, তাই আজও এর কথা স্মৃতি-পটে উজ্জ্বল।

বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ের প্রধান ঘাঁটি নাগপুর, মধ্য-প্রদেশে অবস্থিত হলেও এখানে বিস্তর বাঙ্গালীর বাস; শীতকালে যেমন শীত, গ্রীষ্মে আবার তেমনি গরম। শুষ্ক কঠোর পাহাড়ে জায়গা বলেই স্বাস্থ্য অতি চমৎকার। সম্মেলনের তরফ থেকেই একজন বাঙ্গালী রেলওয়ে অফিসারের বাড়ী থাকার ব্যবস্থা করা ছিল। আজ আর সেই তরুণ বাঙ্গালীটির নাম মনে নেই, কিন্তু কী তাঁর আতিথেয়তা, কী আন্তরিকতাপূর্ণ আদর-আপ্যায়ন। মনের পাতায় আজও তা অমলিন। বাংলার বাহিরে গেলেই বাঙ্গালী চরিত্রের মাধুর্য্যের সন্ধান মেলে, এ আরও বহু ক্ষেত্রেই দেখা।

শীতের নাগপুর, আবহাওয়ায়, ফুলে ফলে ডগোমগো। সহর ছাড়িয়ে দূরে দূরে কমলালেবুর বাগান, সোনার রঙের ফলগুলি পেকে বাগান আলো করে আছে। মনে করেও দুঃখ হয় যে কদিন বাদেই এদের তুলে নিয়ে বস্তাবন্দী করে সারা ভারতবর্ষে চালান দেওয়া হবে। ফিরিওয়ালাদের মুখে মুখে জোর ঘোষিত হবে, 'নাগপুরী যাস্তা!' এদিকে নাগপুরের বাগানগুলি এদের বিরহে হবে অতি ম্লান।

সারি সারি রেলওয়ে কোয়ার্টারের বাগানগুলি ফুলে-ফুলময়। শীতের মরশুমী ফুলের রঙের উজ্জ্বলতায় চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। প্রকৃতির অঙ্গনে ফুল-দোল, ফুলে ফুলে রঙের হোলি খেলা। পাহাড়ে দেশের এ রূপ সমুদ্রের ধারে দেখা যায় না। চির-বসন্ত সমুদ্রতীর ছেড়ে শুষ্ক শীতের হাওয়ায় আনে শরীর-মনে পুলক শিহরণ!

বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ। মূল সভাপতি যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় এলাহাবাদের প্রধান বিচারপতি শ্রদ্ধেয় লালগোপাল মুখোপাধ্যায়,—সাহিত্য শাখার সভাপতি, লক্ষ্ণৌ-এর বরণীয় কবি, জনপ্রিয় অতুলপ্রসাদ সেন। এঁদের কেহই আজ আর ইহ জগতে নেই। অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন একাধারে লিপি-কার, সুর-কার ও গায়ক। তাঁর লেখা গানের কথা ও সুরের কী মাধুর্য্য! ঐ সভায় তাঁর মুখে, তাঁর স্বরচিত অনেক গানের মধ্যে প্রথম শুনি,—

'বল বল বল সবে, শতবীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

একটি বেসুরো পুরাণো অর্গ্যান, তার সহযোগে কী যে ভাব দিয়ে গাইলেন গানখানা,—সমস্ত প্রাণ রস যেন নিংড়ে ঢেলে দিলেন তার মধ্যে। সভা-মণ্ডপ স্তব্ধ, সুধিবৃন্দ মুগ্ধবিস্ময়ে পান করে তৃপ্ত হলেন, সে সঙ্গীত-সুধা!

অতুলপ্রসাদ গানের মাধ্যমে যা দিয়ে গেছেন বাঙ্গালী জাতিকে, তা অবিস্মরণীয়, অপূর্ব্ব, মহান! যুগে যুগে তা জাতির জীবনে আনবে নব-জাগরণ,—দিবে আত্ম-চেতনা! গান দিয়ে তিনি আমাদের করে গেছেন, চির-ঋণী।

সরোজিনী নাইডু

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাই বম্বে, ও সেখানেই কাটে জীবনের দশ এগারো বৎসর। আস্তে আস্তে পরিচিত হই ওখানকার বাঙ্গালী বাসিন্দাদের সঙ্গে। পরিচয় হয় স্থানীয় এক স্কুলের বাঙ্গালী অধিনায়িকার সঙ্গে, ভদ্রমহিলা ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই আলাপ-আলোচনায় অত্যন্ত দক্ষ। অতি বুদ্ধিমতী, মিশুক প্রকৃতির, নাম শুনি—মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়, বহুকাল বম্বে-বাসিনী মিস্ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়ে হই আনন্দিত। শুনতে পেলাম, ইনি স্বনামধন্যা সরোজিনী নাইডুর ছোটবোন। তখন থেকেই আগ্রহ জাগে, দেশ-বিদেশে বিখ্যাত বঙ্গের মনস্বিনী মহিলা সরোজিনী নাইডুকে একবার চাক্ষুষ দর্শন করবার।

অনেক দিন কাটে,—ঐ ইচ্ছা আর পূরণ হয় না। ইতিমধ্যে ঘটে তাঁর নিকট-সম্পর্কীয় আরও অনেকের সঙ্গে পরিচয়। তাঁর সর্ব্ব কনিষ্ঠা ভগ্নী সুনলিনী রাজনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হই। তিনিও অতি ভদ্র, অমায়িক ও সদালাপী। তাঁর এক ভাই বি, চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী একবার আসেন আমাদের বাড়ীতে। আর এক ভাই, হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় করেন মীরা নাটক অভিনয়, ইংরেজীর মাধ্যমে। বম্বেতে খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল, সকলের মুখেই ঐ কথা, দাক্ষিণাত্যের কন্যা কমলাদেবীর রূপগুণের খ্যাতি তখন দেশ-জোড়া। বম্বের বিখ্যাত একটি হলে,' টিকিট করে হবে ঐ প্রদর্শনী। খুব আগ্রহভরে টিকিট কিনে যাই সেখানে, মীরার গানগুলো, কে গেয়েছিলেন মনে নেই, কিন্তু হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কমলাদেবীর অভিনয় দেখে শুনে খুবই আনন্দ হয়েছিল।

সুনলিনী রাজন, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এক মাদ্রাজীর সঙ্গে, পরের জীবনে তিনিও ফিল্ম জগতে বেশ নাম করেছিলেন। সরোজিনী নাইডুর ভাইবোনদের সকলের মধ্যেই দেখি, অনর্গল কথা বলার এক সহজাত ক্ষমতা। তাঁর আত্মীয়-আত্মীয়া অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হল, কিন্তু আসল মানুষটিকে দেখার সুযোগ আর ঘটে না।

অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাত্রীদের মধ্যে একজন বোধ হয় ছিলেন, তখনকার দিনের ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাগ্রগণ্যা সরোজিনী নাইডু। একবার বম্বেতে তাঁর বার্ষিক অধিবেশনে দর্শন পাই এই মনস্বিনী মহিলার। সভার কার্য্যক্রম শেষ হওয়ার পর সকলের অনুরোধে তিনি মঞ্চে দাঁড়ান স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তির জন্য। কী নির্ভীক মূর্ত্তি, হায়দ্রাবাদে প্রতিপালিত হয়ে ভীরু বঙ্গবালার জড়তা তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও ছিল না; বুদ্ধি দীপ্ত উজ্জ্বল চোখ, চেহারায় এক দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ।

সুললিত কণ্ঠে সুরু করেন কবিতা আবৃত্তি, আবৃত্তি না বলে, গান বললেই বোধ হয় তার উপযুক্ত আখ্যা দেওয়া হয়। স্মৃতি থেকে তিনি, স্বরচিত এক বড় ইংরেজী কবিতা অনেকক্ষণ সুরের উঠা নামায় মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করে চললেন। সকলে নিঃশব্দে তাঁর ঐ কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল!

বহু বৎসর পরে, আমার প্রায় শেষ জীবনে দিল্লী বাসকালে, রেডিওর মাধ্যমে আর একবার তাঁর কণ্ঠস্বর শুনি। স্বাধীনতা লাভের পর দিল্লীতে এক বিরাট এশিয়ান-কনফারেন্স হয়, এর সভানেত্রী সরোজিনী নাইডু। তাঁর অভিভাষণে এত সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, তা যেন আজও কানে বাজে। যেমন বাচন-ভঙ্গী, তেমন কণ্ঠস্বর, তেমনি বাক্য বিন্যাস! সব মিলে যেন এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি! এই জন্যই এঁর নাম ছিল, 'নাইটিঙ্গেল-অফ-ইণ্ডিয়া।' ইউরোপ আমেরিকায় আমন্ত্রিত হয়ে তিনি কত যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তা বলা যায় না। সাগর পারের মানুষরাও তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছে আমাদেরই মত। কোকিলকণ্ঠীর কণ্ঠস্বরে ছিল যেমন মাদকতা, জ্ঞানের পরিধিও ছিল তেমনি বিস্তৃত। স্বাদেশিকতায়ও তিনি ছিলেন সর্ব্বাগ্রগণ্যা, দেশের শীর্ষস্থানে, মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

এশিয়ান কনফারেন্সে তাঁর মধুস্রাবী বক্তৃতা রেডিওতে প্রচার হবার কয়েকদিন পরেই সেই রেডিওতেই ঘোষিত হল তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ। সে সময়ে তিনি ছিলেন উত্তর প্রদেশের দায়িত্ব পূর্ণ রাজ্যপালের পদে অধিষ্ঠিতা। স্বাধীন ভারতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহিলা রাজ্যপাল!

রেডিও মাধ্যমে ঘরে বসে তাঁর শেষ বক্তৃতা শুনে আবেগ কম্পিত হৃদয়ে লিখি,—

ভারতের 'বুলবুল' তুমি সরোজিনী,
ভারত প্রতীক বঙ্গের প্রফুল্ল নলিনী;
বিকশিত শতদল সুগন্ধ বিতরি,
বিশ্ব-জন-গণ-মন নিয়ে যায় হরি।
দিকে দিকে ছুটে যায় গুণের খবর,
মধু লোভে আসি জোটে যত মধুকর;
ভারতের পদ্ম-মধু নিয়ে গেলে সাথে,
প্রদান করিলে তাহা বিশ্ব-জন পাতে।
মধু লোভে লোভী যত এশিয়ার বাসী,
আজিকে তোমার দ্বারে দাঁড়াইল আসি,—
তাহাদের করাইলে যে অমৃত পান,
সেই সুধা পান করি তৃপ্ত মন-প্রাণ।

[ক্রমশঃ।

'A nation in India must be a union of those whose hearts beat to the same spiritual tune.'

—Swami Vibekananda.
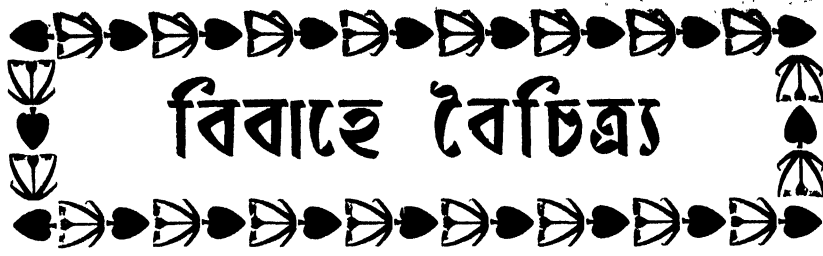
বিবাহে বৈচিত্র্য

এম, আব্দুর, রহমান

[বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি "বিবাহে বৈচিত্র্য" সিরিজের তৃতীয় কিস্তি। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে জনপ্রিয় "মাসিক বসুমতী"র গত ফাল্গুন (১৩৬৮) এবং কার্ত্তিক (১৩৬৯) সংখ্যায় এই সিরিজের ১ম ও ২য় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলি পর পর মাসিক বসুমতীর প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে পেশ করবার চেষ্টা করবো।—লেখক]

বিবাহে 'খুন'।

সিংভূমের কোন কোন এলাকায় কুর্ম্মী-কন্তমের মধ্যে পাত্র এবং পাত্রীকে আপন আপন কনিষ্ঠ অঙ্গুলির রক্ত পরস্পরের অঙ্গে লেপন করে দিতে হয়। এই রক্ত বিনিময় তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। উদ্দেশ্য প্রয়োজন হ'লে তাঁরা একে অপরের কল্যাণের জন্য জীবন দান করবে। শুভ বিবাহ-দিনের রক্তদান তারই স্মারকচিহ্ন। (১)

কনের বাবা ঘোড়া, আর বরের বাবা ঘোঁড়া।

বিলাসপুরের ভইরা-বইগা উপজাতিদের বর-কনে পছন্দ ও বিয়ের কথা স্থির হওয়ার পর, কনের বাবা পিঠে করে বরের বাবাকে নিজের বাড়ী নিয়ে যায়। খানিকক্ষণের জন্য কনের বাবা হয় ঘোড়া আর বরের বাবা হয় ঘোঁড়া। তারপর এক রাত্রি পাত্র এবং পাত্রী একত্রে বসবাস করে এবং তারা তাদের অভিভাবকদের জানায়, তারা বিয়েতে রাজি। এই রাজিনামা পেশ হলেই তারা পরস্পর বৈধ স্বামী-স্ত্রী বলে গণ্য। (২)

বিবাহে মাখন-চিহ্ন

তিব্বতের লামা-সমাজে বহুপতিত্ব প্রথা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, তবে কমে গেছে। তাদের বিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। কনের বাপ-মা বরের কপালে মাখন লাগিয়ে দিলেই তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। এটি হয় অবশ্য একটা অনুষ্ঠান ক'রে, আর তা' হয় সাধারণত: কনের বাপের বাড়ীতে। (৩)

তাড়া করে ধর তারপর বিয়ে কর

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের বিবাহের প্রথা, পরিণয়ের পূর্ব্বে পাত্রী দিবে ছুট তার পিছু-পিছু দৌড় দেবে পাত্র। ক'নে ধরা দেবে না বরকে এইরূপ দেখানো হবে প্রথমে। তারপর কনে অবশ্য বরের হাতে ধরা দেবে—শেষ এক। এইরূপ দৌড়াদৌড়ি হবে তিন বার। তারপর তাদের কাছে আসবে পাড়ার এক বুড়ো আর এক বুড়ী। বুড়ো বর-কনেকে নিয়ে যাবে এক মইয়ের (ladder) উপরে। সেখানে বুড়ী ধরবে কনের হাত। এই সময়ে বরের বাবা বা কোন নিকট আত্মীয় নারকেলের খোলের জল ঢেলে দেবে কনের গায়ে। জল ঢালা শেষ হলে, মই হতে বর-কনেকে নামিয়ে এক জায়গায় বসিয়ে বরের বাবা তাদেরকে আশীর্ব্বাদ করবে আর তাদের পরস্পরের মাথা ছোঁয়াছুয়ি করে দেবে। এই অনুষ্ঠান হয়ে গেলেই তাদের বিবাহ-পর্ব্ব সম্পন্ন হ'ল।

পারবে না বিয়ে করতে যদি কনে না পার ধরতে

তাতার দেশের আদিবাসীদের বিয়ে কিছুটা ফিলিপাইনের বাসিন্দাদের অনুরূপ। এদের বরকনের মধ্যে তাতার দেশের হয় ঘোড়-দৌড়। ক'নে ঘোড়ায় চড়ে আগে বিয়ে, ঘোড়-দৌড় ছুটিয়ে দেয় তার অশ্বটিকে। তার পিছনে ছোটে দিয়ে। বরের বাজী। এই ভাবে 'রেস' দিতে দিতে বর ধরে ফেলে কনেকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধরতে না পারবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'রেস' দিতে হবে। বেচারা বর বেকায়দায় পড়লে কনে শেষ পর্য্যন্ত ইচ্ছে করে বরের হাতে ধরা দেয়। তাতারীরা এক সময়ে বীরের জা'ত বলে সুনাম পেয়েছিল। বাঙলার কবি লিখেছিলেন—"তাতার বালক, মাতৃক্রোড় হতে চায়—সিংহ সহ করিবারে রণ।" কাজেই তাদের বিয়েতে বর-কনের মধ্যে যে ঘোড়-দৌড়ের পাল্লা হবে, তাতে তাজ্জব হবার কিছু নেই। শুধু তাদের চোখেই নয়, অনেকেরই কাছে এই প্রথাটি শোভন ও সুন্দর। (৪)

গ্রীনল্যাণ্ডের যুবক-যুবতীরা নিজেদের বিয়ে সাধারণত: নিজেরাই ঠিক করে। বিশেষ কোন কারণ না থাকলে ছেলে-মেয়ের ইচ্ছার উপরে বাপ-মা হস্তক্ষেপ করে না। সব ঠিক-ঠাক হাওয়া সত্ত্বেও বিয়ের সময়ে, কনে যেন বিবাহে ইচ্ছুক না, এইরূপ ভাব দেখিয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে এবং সেইরূপ প্রহসন চলে খানিকক্ষণ। আমাদের দেশে "নুন চাখাচাখী" বা "নুনদাড়ী" খেলার মত। অল্পের মধ্যেই এই অনুষ্ঠান শেষ হয় এবং কনেকে পালাতে না দিয়ে জোর করে ধরে এনে আসনে বসিয়ে দেয় হবু বর। কনে তখন লক্ষ্মী মেয়ের মত শান্ত হয়ে পড়ে, পালাবার নামটি করে না আর।

হাওয়াই দ্বীপে নাক ঘষে দিয়ে করতে হবে বিয়ে

হাওয়াই দ্বীপের বিবাহের একটা প্রধান প্রথা হচ্ছে, বন্ধুজনের সম্মুখে বর-কনের নাক ঘষা (Itching or Rubling)। বন্ধুদের জমায়েত মজলিসে এইরূপ করলেই, তারা সত্যিকার স্বামী-স্ত্রীরূপে গণ্য হয়। এ দেশের মালা-বদলের বিয়ের মত আর কি ? (৫)

---

(১) ভারতবর্ষ পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৫০।

(২) পঃ বঃ মুঃ অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহ থেকে।

(৩) শ্রীযুক্ত মিলতি দেবীর "লামাদের দেশ", আনন্দবাজার পত্রিকা ২।১২।৫৩

(৪, ৫) মরহুম, টী আলমের 'নারী' প্রবন্ধ-সহচর পত্রিকা মাঘ-১৩২৮।

চলতি পথের মাঝে, তারা সাজলো বিয়ের সাজে।

সান্ ফ্রান্সিস্কো হতে ট্রেণ চলেছে নিউইয়র্কের দিকে। সেই ট্রেণের এক যাত্রী সৈনিক ফ্লয়েড, অপরজনা মিস্ মেরী। পাঁচ শো' মাইল পর্য্যন্ত কারও সঙ্গে কারও কথা নেই তাদের। পরিচয় নেই কোন। রাত্রি কালে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট জায়গায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলো তারা। সকালে উঠে সপ্রতিভ হয়ে বস্‌লে ফ্লয়েড, উঠে বস্‌লে মিস্ মেরীও। এইবার কথা শুরু হ'ল। প্রথমে কথা বললো সৈনিক। বললো—তার নাম, বাড়ী, গন্তব্যস্থানের কথা। সংজ্ঞভাবে মেয়েটিও দিলো তার নাম ধামের পরিচয়। তার পর হুম করে ব'লে ফেললে ফ্লয়েড—"চলো আমরা শিকাগো গিয়ে বিয়ে ক'রে ফেলি?" মেরী প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেছিল তরুণ-সৈনিককে। প্রেমে পড়েছিল ফ্লয়েডও। মেরী ফ্লয়েডের প্রস্তাবে তক্ষুণি রাজি হয়ে গেলো, বললো—সত্যি সত্যি যদি আমাদের বিয়ে করতেই হয়, তবে অত দূর যাবার দরকার কি? পরের ষ্টেশনে নেমেই শুভকাজ সেরে ফেলা ভাল।" তাই হ'লো। নামলো তারা পরবর্ত্তী ষ্টেশনে, গেলো বিয়ে রেজিষ্ট্রারীর আফিসে। হ'য়ে গেল বিয়ে। জানা নেই, শোনা নেই, দেখামাত্রই প্রেম, আর প্রেমে পড়তেই বিয়ে। এরূপ ঘটনা কচিৎ ঘটে। (৬)

আকাশ থেকে পড়লো 'বর' বিয়ের আর সয়না তর।

ক্যালিফোর্ণিয়ার এক ধনীকৃষক, উড়ুক্কু জাহাজে চলছিলেন দক্ষিণদিকে। হঠাৎ জাহাজের কল বিগড়ে গেল। বেগতিক দেখে কৃষক মহাশয় প্যারাস্যুটে নীচে নামতে লাগলেন। প্যারাস্যুটটি তাঁকে ধীরে ধীরে এনে নামিয়ে দিলো একটা গাই গরুর পিঠে। গাই দুইছিলেন এক সুন্দরী মেয়ে। অবাক হয়ে দেখলেন তিনি প্যারাস্যুটের মানুষটিকে। দেখে ভালোই লাগলো। ধনী কৃষক সুযোগ বুঝে প্রস্তাব করলেন বিয়ের। রাজি হয়ে গেলেন যুবতী। তারপর যথারীতি সমাধা হ'ল তাঁদের শাদী-অনুষ্ঠান। (৭)

স্বর্গে হ'ল প্রেম আর মর্ত্ত্যে হ'ল বিয়ে

পেনাং মালয়ের ১লা জানুয়ারী (১৯৬৩) টাটকা খবর। কোং-শে-হার নামক একটা ছোট্টছেলে মারা গিয়েছিল উনত্রিশ বছর আগে গত ১৯৩৪ সালে। আর একটি কচি-কাঁচা মেয়ে এন্তেকাল করেছিল ১৯৩৮ সালে। লোকে ভুলেই গিয়েছিল তাদের কথা। হাল-ফিল এক চীনা সন্ন্যাসিনী—ছেলের আর মেয়ের বাপ-মায়ের কাছে খবর পাঠালো, তাদের ছেলে এবং মেয়ে স্বর্গে প্রেমে পড়েছে। তাদের বিয়ে দেওয়া দরকার। নয়তো অকল্যাণ হতে পারে। সংবাদ শুনে মর্ত্ত্যে তাদের বাপ-মা'রা শাদীর আঞ্জাম আয়োজন করলো। দু'টি পুতুল হ'ল সংগ্রহ মৃত ছেলের এবং মৃতা মেয়ের আদলে। যৌতুকও দেওয়া হ'ল যথারীতি। ফুলশয্যা হ'ল কাগজের। তারপর সেই বিছানায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল শয্যা আর পুতুল-বর-কনে। সেই সঙ্গে যৌতুকও গেল পুড়ে, তা যা'ক। অকল্যাণের হাত থেকে বাঁচলো সব্বাই, স্বর্গে ছেলেমেয়ের প্রেতাত্মা এবং মর্ত্ত্যে তাদের জীবন্ত পিতামাতা আর খেশ-বেরাদররা। চীনা কেরামতী সব জায়গাতেই এক রকম। জানি না চীনারা স্বর্গ মানে কি না। (৮)

রান্না শেখাব পর পাবে তুমি 'বব'

একটি মেয়ে নাম তার বার্‌বারা কোয়ার্ণ। এক নওজোয়ানের সঙ্গে হয় তার মহব্বৎ। সে বিয়ে করতে চায় ছেলেটিকে, মেয়ের বাপের তাতে আপত্তি। নাছোড়বান্দা মেয়ে বার্‌বারা কোর্টে আর্জি পেশ করলো। পাকা-মাথা জজসাহেব সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে দেখলেন, মেয়েটির সবই ভালো কিন্তু সে রান্না জানে না। জজ সাহেব অনেক ভেবে চিন্তে রায় দিলেন—বার্‌বারাকে ভালভাবে রান্না শিখতে হবে। স্বামীকে সারা জীবন খুশী রাখতে হলে মেয়েদের উত্তম রান্না জানা দরকার। নারীর পক্ষে ইহা একটি বড় গুণ। রূপ চিরদিন থাকে না, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপ-সৌন্দর্য্য মলিন হয়ে যায়। মোহও বেশী দিন থাকে না।। কিন্তু উত্তম রান্না জান্‌লে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে চিরকাল সন্তুষ্ট রাখা সম্ভব! মাননীয় জজ সাহেব মিষ্টি মেজাজের কথা বলেছিলেন কিনা তা' জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। আর এ খবরও পাইনি যে মিস্ বার্‌বারা, রান্না শিখে তাঁর বাঞ্ছিত পাত্রটিকে স্বামীরূপে পেয়েছিলেন কি না। তবে না পেলেও সে-মেয়ে যে আবার কোর্টে মামলা দায়ের করবে ইহা জানা কথা। (৯)

(৬-৭) দেশ, ২৯শ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা (২৭-১-৬২)

(৮) আনন্দবাজার পত্রিকা, ২।১।৬৩

(৯) আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬।২।৬২

মা আমার

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি,—মা, আমার, মা আমার।

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোট খাটো সুখ দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ, মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার।

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার।

—কামিনী রায়

প্রাচীন ভারতে লেখার উপাদান

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

আমাদের মতো আমাদের পূর্বপুরুষরাও কি কাগজে লিখতেন? লিখতেন, তবে কাগজের চাইতে অন্যান্য জিনিসেই তাঁরা লেখালিখির কাজটা বেশি সারতেন। সেই অন্যান্য জিনিসগুলি সম্পর্কে দু'-চার কথা আজ বলব।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে লেখার জিনিস ঠিক হতো। সাধারণ চিঠি বা বইপত্র লেখার জন্য খুব একটা টেঁকসই জিনিস ব্যবহার করা হতো না। কিন্তু খুব জরুরি বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সব সময়ই অধিকতর টেঁকসই জিনিসের উপর লেখা হতো।

তখনকার দিনে লেখার জন্য খুব টেঁকসই জিনিস যা ব্যবহৃত হতো তা হলো তামা, রুপো, লোহা ইত্যাদি ধাতব দ্রব্য বা পাথর। ধর্ম-সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা বাণী, রাজা-রাজড়াদের গুণাবলীর বর্ণনা, লেন-দেনের ব্যাপার রাজাদেশ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য ঐ সব জিনিস দরকার হতো।

এদের মধ্যে পাথরের ব্যবহার খুব পুরানো। সহজলভ্য এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে পাথর একেবারে গোড়া থেকেই লেখার উপকরণ হিসাবে চলে আসছে। সম্রাট অশোকের আদেশ ও বাণীগুলিও পাথরে লেখা এবং পাথরের একটি স্তম্ভলিপিতে তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি তাঁর বাণীগুলি পাথরে খোদাই করে রাখছেন যাতে তারা অনেকদিন স্থায়ী হয়।

পাথর চেঁছে মসৃণ করে, পাথরের স্তম্ভ, পাথরের মূর্তির পায়ের নিচে বা মূর্তির পিছনে, মন্দিরের গায়ে বা গুহায় সাধারণতঃ জরুরি রাজাদেশ, রাজার গুণাবলীর বিবরণ বা 'প্রশস্তি', কোন দান বা উৎসর্গ ইত্যাদি বিষয় লেখা হতো। বলা বাহুল্য, এখনো অনেক সময় পাথরের উপর দরকারী বা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লেখা হয়ে থাকে।

ইঁটের উপরও লেখার চলন ছিল সে-সময়। মেসোপটেমিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার মতো অতটা না হলেও, ইঁটের উপর লেখার কিছু কিছু নিদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে পাওয়া একটি ইঁটের উপর খোদাই-করা বৌদ্ধসূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মাটির পাত্র বা ফলকেও লেখার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ইঁট বা মাটির পাত্র ইত্যাদি আগুনে পোড়াবার আগে নরম থাকাকালীন লেখা খোদাই করে নেওয়া হতো।

ধাতু পাথরের মতো দীর্ঘস্থায়ী বলে লেখার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ধাতুর মধ্যে ছিল সোনা, রুপো, তামা, লোহা, পিতল ইত্যাদি। দামী বলে সোনার চলন খুবই অল্প ছিল। তক্ষশীলার কাছে সোনার উপর একটি লেখা পাওয়া গেছে। ব্রহ্মদেশেও সোনার উপর লেখার নিদর্শন পাওয়া গেছে। রুপোর উপর লেখার একটি সুপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে দক্ষিণ ভারতের ভট্টিপ্রোলুতে এবং অন্যটি তক্ষশীলাতে।

ধাতব দ্রব্যের মধ্যে সব চাইতে প্রচলিত ছিল তামা। তামার উপরই তখন বেশিরভাগ দরকারি বিষয় লেখা হত। লেখার বিষয়ানুসারে খোদিত তামার পাতটিকে তাম্রপট, তাম্রপত্র, তাম্রশাসন ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতো। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে ফাহিয়েন নামে এক চৈনিক পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি লিখে গেছেন যে তিনি বহু বৌদ্ধ বিহারে তামাতে খোদাই করা জমি ইত্যাদির দানপত্র দেখেছিলেন এবং এই সমস্ত দানপত্রের কয়েকটি বুদ্ধের সময়কার। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙও লেখার উপকরণ হিসাবে তামার ব্যবহারের কথা বলে গেছেন। এখনো পর্যন্ত সর্বপ্রাচীন তাম্রলেখ বা তামার উপর লেখা যা পাওয়া গেছে, তা হলো মৌর্যযুগের। উত্তর প্রদেশে সোগৌরা নামক স্থানে এই তাম্রলেখ (প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্রোঞ্জ) পাওয়া গেছে।

লেখার জন্য আলাদাভাবে পিতল খুব একটা ব্যবহৃত হতো না। পিতলের উপর যা কিছু লেখা পাওয়া গেছে তার প্রায় সবই পিতলের মূর্তির পাদদেশে বা পিছনে উৎকীর্ণ। এই সমস্ত মূর্তির মধ্যে সব চাইতে পুরানো যেগুলি, সেগুলি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর। আবু পাহাড়ে জৈন মন্দিরগুলিতে কয়েকটি পিতল-লেখ পাওয়া গেছে।

অন্যান্য ধাতুর মধ্যে ব্রোঞ্জ, লোহা ও টিনের উল্লেখ করা যায়। পিতলের মতো আলাদাভাবে ব্রোঞ্জও লেখার জন্য ব্যবহৃত হতো না। ব্রোঞ্জের উপর খুব পুরানো কোন লেখাও পাওয়া যায় নি। যুদ্ধে বা অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে লোহার খুব চল থাকলেও লেখার জন্য বিশেষ ব্যবহৃত হতো না। লোহার উপর লেখার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন হলো দিল্লীর মেহরৌলি লৌহস্তম্ভের উপর লেখা চন্দ্র নামক রাজার দিগ্বিজয় বর্ণনা। এটি গুপ্তযুগে লেখা হয়েছিল বলে অধিকাংশ পণ্ডিতের ধারণা। এই স্তম্ভলেখটি সম্পর্কে সব চাইতে বড় কথা এই যে, প্রায় দেড় হাজার বছরেও এটির উপর কোনরকম মরিচা পড়েনি। খৃষ্টীয় পনেরো ষোল শতকের কয়েকটি লৌহলেখ পাওয়া গেছে। টিন ভারতবর্ষে দুর্লভ ছিল বলে টিনের উপর লেখাও খুব দুষ্প্রাপ্য। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত টিনের উপর লেখা একটি বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপিই টিন-লেখর একমাত্র নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত। তবে কখনো কখনো অন্য ধাতুর সঙ্গে টিনের মিশ্রণ ঘটিয়ে যে মুদ্রা তৈরি হতো তার প্রমাণ পাওয়া গেছে; এই ধরণের প্রাচীন মুদ্রাগুলি লেখবিশিষ্ট।

ধাতব দ্রব্য ছাড়া তালপাতা ও ভূর্জ বৃক্ষের ভিতরকার ছাল লেখার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হতো এবং প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতে এ দুটি জিনিসই ছিল লেখার সর্ব প্রচলিত উপকরণ। হুইলির লেখা

চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙের জীবনীতে আছে, বুদ্ধের নির্বাণের পরে অনুষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বা পিটক'গুলি তালপত্র বা তাড়পত্রে লেখা হয়েছিল। সে যাই হোক, এখনো পর্যন্ত তালপাতায় লেখা প্রাচীনতম পুঁথি যা পাওয়া গেছে তা হলো আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের। কাশগড়ে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি, জাপানে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দু'টি এবং নেপালে কাঠমণ্ডুতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তালপাতার পুরানো পুঁথির বেশির ভাগ গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশে এবং ভারতবর্ষের তদ্রূপ অঞ্চলে পাওয়া গেছে। আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় পুঁথি বেশিদিন টেঁকে না বলে দক্ষিণ ভারতে পনেরো শতকের আগে কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি।

কি করে তালপাতায় লেখা হতো সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। তালপাতাগুলি প্রথমে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়ে তারপর জলে ফুটিয়ে কিংবা শুধু ভিজিয়ে নেওয়া হতো। ঐ ভিজে পাতা আবার রোদ্দুরে শুকিয়ে নেবার পর একটি মসৃণ পাথর কিংবা শাঁখ দিয়ে চেঁছে মসৃণ করে নেওয়া হতো। তার উপর লেখা হতো। লেখা হতো হয় কালি কলম দিয়ে নয় তো লৌহকীলক বা স্টাইলাস দিয়ে। যে ক্ষেত্রে স্টাইলাস ব্যবহৃত হতো, সে ক্ষেত্রে পাতাগুলি খোদাই করা হয়ে যাবার পর কাঠকয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হতো কিংবা ভুষি মাখিয়ে নেওয়া হতো, ফলে অক্ষরগুলি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতো।

তালপাতার মতো ভূর্জপত্র বা ভূর্জবৃক্ষের ভিতরকার ছাল লেখার উপকরণ হিসাবে বহুল প্রচলিত ছিল। হিমালয় অঞ্চলে ভূর্জবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে ছিল। ভূর্জপত্রে লেখার চল ঐ অঞ্চলেই প্রথম হয়েছিল এবং ক্রমে তা ভারতবর্ষের অন্যত্র এমন কি মধ্য-এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। এখানে বলা প্রয়োজন, তালগাছের প্রাচুর্য থাকায় দক্ষিণ ভারতে ভূর্জপত্র কখনো জনপ্রিয় হতে পারে নি এবং দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বলতে গেলে বরাবরই তালপাতায় লেখাপড়ার কাজ করতো।

কুইন্টাস কার্টিয়াস নামক জনৈক গ্রীক লেখকের বিবরণীতে লেখার জিনিস হিসাবে ভূর্জপত্রের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়, যদিও অন্যান্য গ্রীক লেখকদের বিবরণীতে আছে, ভারতীয়রা পুরাকালে সুতির কাপড়ে ও কাগজে লিখতো। ভারতীয় লেখকদের মধ্যে অমর রচিত অভিধান 'অমরকোষে' ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' ভূর্জপত্রের উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দীর লেখক আল-বিরুণী যিনি মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তিনিও বলে গেছেন, মধ্য-ও-উত্তর ভারতের লোকেরা ভূর্জপত্রে লিখতো।

তালপাতার মতো ভূর্জপত্রও লেখার উপযোগী করার জন্য মসৃণ করে নেওয়া হতো। তারপর তাদের উপর তেল মাখিয়ে নিয়ে বিশেষ ধরণের কালিতে শরের কলম দিয়ে লেখা হতো।

ভারতীয় ভাষা ও অক্ষরে লেখা ভূর্জপত্রের প্রাচীনতম পুঁথি খোটান থেকে পাওয়া গেছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের দিকে এ পুঁথি লেখা হয়েছিল। ভূর্জপত্রের প্রাচীন পুঁথি বলতে গেলে বেশির ভাগই পাওয়া গেছে খোটান প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার অঞ্চলগুলিতে। এবং বালি ও পাথরের তলায় চাপা থাকার এবং শুকনো আবহাওয়ার দরুণ ঐ সব জায়গা থেকে এত পুরানো পুঁথি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। পনেরো ও তার পরবর্তী সময়ের বেশির ভাগ ভূর্জপত্রের পুঁথি কাশ্মীরে পাওয়া গেছে।

এখানে উল্লেখ্য পুঁথি, পুস্তক, গ্রন্থ ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি তালপাতা বা ভূর্জপত্রের পাণ্ডুলিপি থেকেই। ভূর্জপত্র বা তালপাতাগুলি মাঝখানে, একদিকে কিংবা দু'দিকে ফুটো করে সুতোর সাহায্যে গ্রন্থিত বা বেঁধে রাখা হতো। প্রত্যেকটি পাতার যথাযথ সংখ্যা নির্দেশ করে দু'টি কাঠ বা কোন ধাতুর লম্বা টুকরোর মধ্যে পাতাগুলি শক্ত করে বেঁধে রাখা হতো।

তালপাতা ভূর্জপত্র ছাড়া কাগজ, সুতির কাপড়, কাঠের ফলক এবং চামড়াও লেখার কাজে ব্যবহৃত হতো। ভারতীয়গণ কর্তৃক কাগজ ব্যবহারের প্রাচীন উল্লেখ নিয়ার্কাস নামক আলেকজাণ্ডারের এক সহচর সেনাধ্যক্ষের বিবরণীতে পাওয়া যায়। এবং মধ্য-এশিয়ার কাশগড় ও কুজিয়ের থেকে কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপির প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে। যদিও গুপ্তযুগের লিপিতে লেখা পঞ্চম শতকের এই পাণ্ডুলিপির কাগজ যথার্থই ভারতে উৎপন্ন কি না সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। ভারতবর্ষে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন কাগজের পুঁথি হলো চোদ্দ-পনেরো শতকের। ভারতবর্ষে খুব পুরানো কাগজের পুঁথি না পাওয়ার কারণ, ভারতবর্ষের আর্দ্র জলবায়ু এবং সেই সঙ্গে কাগজের অচিরস্থায়ী ধর্ম। ভাতের বা গমের মণ্ড খুব পাতলা করে কাগজের উপর দিয়ে তা শুকিয়ে নেওয়া হতো এবং পরে শাঁখ ইত্যাদির সাহায্যে মসৃণ করে নিয়ে তাতে লেখা হতো। কালি চুপসে গিয়ে যাতে কাগজ নষ্ট করে না দেয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হতো। লেখার পর পাতাগুলি মাঝখানে ফুটো করে সুতোর সাহায্যে বেঁধে রাখা হতো।

প্রাচীন ভারতে সুতির কাপড়েও লেখা হতো এবং লক্ষ্য করে থাকবে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান পালা-পার্বণে লেখার জন্য কাপড় ব্যবহৃত হয়। লেখার জন্য ব্যবহার্য কাপড়কে বলা হতো পট, পটিকা বা কার্পাসিক-পট। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও লেখমালায় পটের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাপড়ের উপর লেখার প্রাচীন নিদর্শন হলো চোদ্দ পনেরো শতকের একটি জৈন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। শৃঙ্গেরী মঠ থেকে শ'দুই-তিন আগেকার সুতির কাপড়ে লেখার নিদর্শন পাওয়া গেছে। যশল্মীর অঞ্চলে বুহ্লার নামে এক জার্মাণ পণ্ডিত রেশমের উপর পুরানো লেখার নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। কাগজের মতো লেখার কাপড়ের উপরও ভাতের অথবা গমের মণ্ড খুব পাতলা করে ঢেলে দিয়ে কাপড়টাকে শুকিয়ে নেওয়া হতো এবং পরে তাকে মসৃণ করে লেখার উপযোগী করে নিয়ে কালো কালিতে লেখা হতো। যে কারণে খুব পুরানো কাগজের পুঁথি পাওয়া যায় নি সেই কারণেই প্রাচীন কাপড়ের পুঁথিও দুর্লভ। জলবায়ুর কারণ ছাড়া কাগজ ও কাপড় উভয়েই উইপোকার প্রিয় খাদ্য।

প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিনয়পিটক এবং জাতকে লেখার উপকরণ হিসাবে কাঠের উল্লেখ আছে। লেখার কাঠকে বলা হতো 'ফলক' এবং জাতকে আছে, তরুণ শিক্ষার্থীরা এই ফলকে অক্ষর লেখা অভ্যাস করতো। 'ললিতবিস্তর' নামে পরবর্তীকালের একটি বইতে আছে, বিদ্যালয়ে চন্দন কাঠের ফলক স্লেটের মতন ব্যবহৃত হতো। কাত্যায়ন স্মৃতি, দশকুমার চরিত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এবং প্রাচীন লেখাগুলিতে লেখার জন্য ব্যবহার্য কাষ্ঠফলকের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। আসাম থেকে পাওয়া একটি লিখিত কাষ্ঠফলক

য়ুরোপের একটি গ্রন্থাগারে রয়েছে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে লিখিত কাষ্ঠফলকে পুরানো লেখার নিদর্শন খুব কমই পাওয়া গেছে।

লেখার উদ্দেশ্যে প্রাণীচর্মের ব্যবহার প্রাচীন ভারতবর্ষে খুব কমই ছিল। এর কারণ হরিণের ও বাঘের চামড়া ছাড়া অন্যান্য সব জন্তুর চামড়াই ভারতীয়রা অপবিত্র জ্ঞান করতো; ফলে লেখার মতন পবিত্র বিষয়কে তারা চামড়ার সঙ্গে যুক্ত করতো না। হরিণের চামড়ায় লেখার প্রথার উল্লেখ 'বাসবদত্তা' নামে একটি পুরানো সংস্কৃত গ্রন্থে রয়েছে। চামড়ায় লেখা খুব পুরানো কোন পাণ্ডুলিপি আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নি। কাশগরে অবশ্য চামড়ার উপর ভারতীয় লিপিতে লেখার নিদর্শন পাওয়া গেছে; তবে তা যে ভারতবর্ষ থেকে ওখানে গিয়েছিল এমন কোন প্রমাণ নেই, কারণ কাশগর প্রভৃতি মধ্যএশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় লিপির চল ছিল।

এ তো গেল কিসের উপর লেখা হতো তার বিবরণ। এখন কি কি জিনিস দিয়ে এ-সবের উপর লেখা হতো সে-কথা বলছি। কালি আর কলম বা তজ্জাতীয় জিনিস ছাড়া লেখা সম্ভব নয়। সুতরাং ভারতীয়রা কেমন কালি আর কলম ব্যবহার করতো?

যে জিনিসের উপর লেখা হবে, তার প্রকৃতির উপর কালি ও কলমের প্রকৃতি নির্ভর করতো। পাথর ইঁট বা ধাতব দ্রব্যে লিখতে হলে খোদাই করার প্রয়োজন হতো; সুতরাং সে ক্ষেত্রে কালি বা কোনরকম রঙের প্রয়োজন হতো না। আর কলমের পরিবর্তে লৌহকীলক বা বাটালি অক্ষর খোদাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হতো। অন্যপক্ষে, ভূর্জপত্র তালপত্র কাগজ কাপড় ইত্যাদি নরম জিনিসে কলম কালি বা রঙের সাহায্যে লেখা হতো।

লেখার কালিকে তখনকার দিনে বলা হতো 'মাস' বা 'মসী'? মসী কথার অর্থ যা গুঁড়ো করা হয় এবং কালি তৈরির উপাদান-গুলিকে ভালো করে গুঁড়ো করে কালি তৈরি হতো বলে কালি 'মসী' নামে কথিত হতো। ভারতবর্ষের কোন কোন জায়গায় কালি বোঝাতে 'মেলা' কথাটার চল আছে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত গ্রীক 'মেলস' শব্দ থেকে 'মেলা'র উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন; বুহ্লার বাংলা 'ময়লা' শব্দ থেকে 'মেলা'র উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। অন্যান্য পণ্ডিতরা সংস্কৃত 'মেল' ধাতু থেকে 'মেলা' নিষ্পন্ন হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, কালি তৈরি করতে হলে অনেক জিনিস মেশাতে হয়, সুতরাং 'মেল্' ধাতু, যার অর্থ মিশ্রণ তা থেকেই মেলা'র উৎপত্তি সম্ভব। কালি অর্থে 'মেলা'র উল্লেখ 'বাসবদত্তা'য় পাওয়া যায়। কালির পাত্র বা দোয়াতকে সংস্কৃতে 'মেলনন্দ' 'মেলধ' 'মসীপাত্র,' 'মসিভাণ্ড' ইত্যাদি বলা হতো। নিয়ার্কাস, কুইণ্টাস কার্টিয়াস প্রমুখ গ্রীক লেখকদের বিবরণী পড়ে মনে হয় তখনকার দিনে লেখার জন্য কালি বা তজ্জাতীয় কোন রং ব্যবহৃত হতো; বুহ্লার অশোকের কোন কোন লেখক বৃত্তাকার গ্রন্থির পরিবর্তে বিন্দু জাতীয় দাগ দেখে অনুমান করেছেন, খোদাই করার আগে লেখার পুরো বিষয়টা কালিতে লিখে দেওয়া হতো। কালিতে লেখার প্রাচীনতম নিদর্শন আন্ধের-এর একটি স্তূপে পাওয়া গেছে, কারো কারো মতে এই স্তূপ আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর। খোটানে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পাণ্ডুলিপিতে কালির ব্যবহার দেখা গেছে। ঐ সময়কার কালিতে লেখা কয়েকটি ভূর্জপত্র ও মাটির পাত্র আফগানিস্থানেও পাওয়া গেছে। অজন্তা গুহায় কয়েকটি অঙ্কিত লেখার নিদর্শন দৃষ্ট হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন রঙের কালির মধ্যে কালো কালিই সব চাইতে বেশি প্রচলিত ছিল। কাঁচা এবং পাকা দু'রকম রঙের কালিই ব্যবহৃত হতো। আঠা, চিনি ইত্যাদি চটচটে জিনিসের সঙ্গে কাঠকয়লার গুঁড়ো জলে গুলে কাঁচা রঙের কালি তৈরি করা হতো। অন্যপক্ষে, ভুষি, সোহাগা ইত্যাদির সঙ্গে লাক্ষা জলে ফুটিয়ে পাকা কালি তৈরি করা হতো। কাশ্মীরে গোমূত্রে কাঠকয়লার গুঁড়ো ফুটিয়ে কালি তৈরি হতো এবং এই জাতীয় কালি অনেকদিন অক্ষত থাকত। দক্ষিণ ভারতে কালির চল হতে সময় লেগেছে। ভুষি বা কাঠকয়লার গুঁড়োই সেখানে কালির কাজ করতো।

কালো ছাড়া লাল রঙের কালি লেখার কাজে বহুল ব্যবহৃত হতো। অলক্তক ও হিঙ্গুল থেকে লাল কালি তৈরি হতো। কখনও কখনও সবুজ এবং হলদে রঙ-ও ব্যবহৃত হতো। অনেক জৈন লেখক সবুজ ও হলদে কালি পছন্দ করতেন এবং বইয়ের শেষ দিকটা সবুজ ও হলদে কালিতে লিখতেন। চিত্রাবলীতে লেখার উদ্দেশ্যে বা পবিত্র পাণ্ডুলিপি তৈরী করার সময় বা ধনী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য বই লিখবার সময় সোনালি এবং রূপোলি রঙের কালি প্রয়োগ করা হতো। সোনালি এবং রূপোলি কালির উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আছে বটে, কিন্তু তাতে লেখা পুঁথির যা নিদর্শন পাওয়া গেছে তার বয়স খুব বেশী নয়। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা দেখাবার জন্য অনেক লোক তাদের প্রতিজ্ঞার বিষয় স্বীয় রক্তে লিখত বলে জানা যায়। তবে সে রকম ঘটনা খুবই কম ঘটত।

এবার কলমের প্রসঙ্গে আসা যাক। সাধারণভাবে কলমকে বলা হতো 'লেখনী'। রামায়ণ মহাভারতে 'লেখনী'র উল্লেখ আছে। এখানে বলা দরকার যে, লেখার যন্ত্রমাত্রেই—তা সে বাটালি, শরের বা খাগের কলম, তুলি, পেন্সিল যাই হোক না কেন—'লেখনী' নামে অভিহিত হতো। এর কারণ লেখা বলতে তখনকার দিনের লোকেরা আজকের মতো শুধু কাগজের উপর লেখা বুঝতেন না, পাথর বা ধাতব দ্রব্যে খোদাই করাও বুঝতেন। লেখনী ছাড়া 'বর্ণক' বা 'বর্ণিকা', 'বর্ণবর্তিকা', 'তুলি' বা 'তুলিকা', 'শলাকা' প্রভৃতি ছিল কলমের অন্যান্য নাম। এখনকার মতো সে যুগেও কম্পাস ও রুলার ব্যবহৃত হতো।

> **Among all the strange things men have forgotten, the most universal and catastrophic lapse of memory is that by which they have forgotten that they are living on a star.**
>
> *G. K. Chesterton.*

ভয়ের ঔষধ ভাবনা

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

ভয়ের কারণ জীবমাত্রকেই বেষ্টন করে রয়েছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে ভয় হচ্ছে জীবনরক্ষার অনুকূল। মানুষ শুধু যে ভয় পায়, তাই নয়; মানুষের ভয়ের হেতুও বিচিত্র, যথা—রাজভয়, লোকভয়, অনাগত অমঙ্গল বা আকস্মিক বিপৎপাতের ভয় প্রভৃতি। মানুষের ভয় কোথাও সহেতুক, কোথাও বা অহেতুক। আমরা ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব প্রভৃতিকে ভয় করি; আবার ভগবানকেও ভয় করি। সকল প্রাণীর ভেতর একমাত্র মানুষই নরকের ভয় করে। অবশ্যি, নরকের ভয় করে না, এমন মানুষের সংখ্যাও একালে বড়ো কম নয়। মনুষ্যেতর বহু প্রাণীর ভেতর যে মৃত্যু-ভয় আছে, তা' মনে করার সঙ্গত কারণ আছে বটে কিন্তু মৃত্যু চিন্তা বোধ হয় একমাত্র মানুষকেই পীড়িত করে। সেক্সপীয়র বলেছেন, 'ভীরুরা মৃত্যুর আগে অনেকবার মরে।' অবশ্যি ভয় যে অনেক ক্ষেত্রে সমাজের স্থিতির মূলে, সে-কথাও তো অস্বীকার করা যায় না। পরকালে নরকের ভয়ে বা ইহকালে লোক-নিন্দা, অপবাদ বা অপযশের ভয়ে মানুষ অনেক অপকর্ম্ম থেকেও বিরত হয়। আবার, একথাও সত্যি যে, 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভয়ে মানুষ ইচ্ছা সত্বেও অনেক ভালো কাজ করতে পারে না। বাংলার মহিলা-কবি সত্যিই বলেছেন—

> 'করিতে পারিনে কাজ,
> সদা ভয়, সদা লাজ,
> সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
> পাছে লোকে কিছু বলে।'

অনেক সময়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গুরুজনের ভয়ে মিথ্যা কথা বলে। যেখানে বড়োরা ছোটদের অতিমাত্রায় তাড়না করেন, সেখানে ছোটরা প্রায়ই মিথ্যাবাদী হয়ে ওঠে। আবার রাজদণ্ড এড়াবার জন্যেও মানুষকে মিথ্যার জাল বুনতে হয়, আর সমাজের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় পয়সার বিনিময়ে সেই 'জাল বুনে দেয়।' ভূতের ভয়ে অন্ধকার নির্জ্জন রাস্তায় চলতে তো আমাদের প্রায় সকলেরই গা ছম্‌ছম্ করে। যারা মুখে ভূত মানে না, তারাও যদি শুনতে পায় অমুক স্থানে ভূতের ভয় আছে, তবে সেখানে রাত্রিবেলা একলা যেতে রাজি হয় না। অবশ্যি, মানুষের ভেতর দু'-একজন ব্যতিক্রমও আছে, তবে তাদের কথা গণনার ভেতর নয়। আমাদের দেশের জননীরা দুরন্ত শিশুকে দুধ খাওয়াবার জন্যে জুজুর ভয় দেখান, সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনে এক কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি ভেসে ওঠে। আমরা হাঁচি টিকটিকি থেকে ভয় পাই বলে আমাদের একটা দুর্নাম আছে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশেও এমন লোকের সংখ্যা বড়ো কম নয় যারা গ্রহ বিশেষের কু-দৃষ্টি থেকে ভয় পায়। বনের বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে, এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু মনের বাঘে খেয়েছে, এমন লোকের সংখ্যা তো অগণিত। ভয়ে-ভীত মানব তাই ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে অদৃশ্য শক্তির শরণ নিয়েছে এবং তার কাছে মাথা নত করেছে। কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত এমন কথা পর্য্যন্ত বলেছেন যে ভয় থেকেই সর্ব্বক্ষেত্রে মানুষের ধর্ম্ম-বুদ্ধির উদ্ভব হোয়েছে। অবশ্যি, ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্পর্কে এ রকমের একটা মতবাদ বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না।

ভয় মানুষের মনের একটি স্থায়ী ভাব। কবিরা এই স্থায়ী ভাবকে বিভাবাদির সাহায্যে ভয়ানক রসে পরিণত করেন। ভয়ানক রসও একটা রস বৈকি। যা আমাদের চিত্তে আনন্দের সঞ্চার করে, তাই আবার কাব্যে বা নাটকে সমর্পিত হোলে সহৃদয় জনের চিত্তে আহ্লাদ জন্মায়।

সংসারে যত রকমের ভয় আছে, মৃত্যু ভয় হচ্ছে সবার ওপরে। আমরা এপারের মানুষ, ওপারের কোনো বার্ত্তা তো আমাদের কাছে এসে পৌছায় না, তাই মৃত্যু ভয় হচ্ছে অজানার বিভীষিকা। মৃত্যুর যবনিকা কেউ উত্তোলন করতে পারে না। মৃত্যু তাই আমাদের চোখে একটা সীমাহীন, দুর্জ্ঞেয়, দুরধিগম্য রহস্য। হ্যামলেটের স্বগতোক্তিতেও এই ভাবটিই প্রকাশিত হয়েছে। হ্যামলেট বলেছেন—কোনো পথিকই সেই অনাবিষ্কৃত দেশ থেকে ফিরে আসে না। তাই মানুষ সেখানে যেতে ভয় পায়। মৃত্যু মানুষের চোখে ভয়ঙ্কর বলেই সাধকেরা আমাদিগকে সেই দিনের কথা স্মরণ কোরে প্রবৃত্তিকে সংযত করার উপদেশ দিয়েছেন। কোনো প্রসিদ্ধ মনীষী বলেছেন—

> 'স্মর রে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর,
> অন্য লোকে কথা কবে, তুমি রবে নিরুত্তর।।'

কিন্তু মানুষের বিশেষ গৌরব এখানে যে, সে ভয়কে জয় করার সাধনা করেছে। নীতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'সংসারে যত প্রকারের দান আছে, তার ভেতর অভয়দান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।' সংসারে যাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলি, তাঁরা সকলেই মানুষকে অভয়ের বাণী শুনিয়েছেন। 'আনন্দকে' অভয়দান করে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন,—'আত্মদীপ হোয়ে বিহার কর, অনন্য শরণ হোয়ে বিহার কর, ধর্ম্মদীপ হোয়ে বিহার কর, ধর্ম্মশরণ হোয়ে বিহার কর'। প্রত্যেক মানুষই নিজের ভাগ্যবিধাতা, বলিষ্ঠ পৌরুষের দ্বারা সর্ব্বোত্তম মঙ্গলকে লাভ করাই মানব-জীবনের লক্ষ্য, এটাই হচ্ছে ভগবান তথাগতের বাণী। পার্থ-সারথিও অর্জ্জুনকে বলেছেন—আমার দ্বারাই আত্মার উদ্ধার সাধন কোরবে, আত্মাকে কখনো অবসন্ন হোতে দেবে না, আত্মাই হচ্ছে আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই হচ্ছে আত্মার শত্রু।

সাধনার দ্বারা মানুষ মৃত্যুভয়কেও অতিক্রম কোরতে পারেন। সাধকের মুখেই আমরা শুনতে পাই—

> 'ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়,
> ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।'
>
> (সদ্ভাবশতক, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

তিনি জানেন, মৃত্যুই অমৃত-লাভের সোপান। তাই তিনি বলেন—

'যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মনো-মধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু, তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত।'
(সম্ভাবশতক, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

বাংলার শক্তিসাধকগণ। জগন্মাতার চরণে শরণ গ্রহণ করে সকল ভয়কে অতিক্রম কোরেছেন। যে শমনের ভয়ে সংসারের অতি বড়ো বীরেরও হৃদয় কম্পিত হয়, তাকে সম্বোধন করেই শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন—

'চেননা আমারে শমন, চিনলে পরে
হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি
অভয় পদের বইরে বোঝা।'

এই ভাবের আরো অনেক গান আছে, বাহুল্য ভয়ে তা উদ্‌ধৃত হোলো না।

মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন শিল্পীর দৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথের চোখে মৃত্যুর রূপ সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। কেউ কেউ আবার ব্রাউনিঙের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করেছেন। একটি প্রসিদ্ধ গানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অভয়ের বাণী শুনিয়েছেন—

'যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাহি ভয় নাহি ভয়
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয় নাহি ভয়
যদি মৃত্যু নিকট হয় নাহি ভয় নাহি ভয়।'

কিন্তু ভয়কে জয় করতে হলে যে কঠোর সাধনা বা তপস্যার প্রয়োজন, ভারতের প্রাচীন ঋষিরা তা জানতেন। জীবন জিনিষটা তো শুধু কাব্য নয়, এর অধিকাংশই নীরস গদ্য। তাই, এ কথাটা মোটেই অতিশয়োক্তি নয় যে আমরা ভীষ্মের মতো দুঃখের শর-শয্যায় শয়ন করে রয়েছি, মহাপুরুষ ঈশার মতোই দুঃখের 'ক্রুশ' বহন করে বধ্যভূমির দিকে চলেছি। কালীয়নাগের মতো বেদনার দহে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। তবু মানুষ কঠোর প্রযত্নের দ্বারা অন্ততঃ অনেক দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। দুঃখ-দৈন্যের কাছে নতি স্বীকার তো মানুষের পক্ষে চরম আত্মাবমাননা। তাই উপনিষদের ঋষি মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' বলে সম্বোধন করছেন। এত বড়ো আশার বাণী হয় তো আর কোনো দেশেই উচ্চারিত হয়নি।

—এখন প্রশ্ন হচ্ছে: ভয়কে জয় করার উপায় কি? উত্তর হচ্ছে: ভাবনাই ভয়কে জয় করার উপায়। ভাবনা বলতে দুশ্চিন্তা বোঝায় না, বোঝায় স্থির, অবিচলিত চিন্তা। বাস্তবিক, যার যেমন ভাবনা, তার তেমনি সিদ্ধি। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' বেদান্ত বলেন, যে নিজেকে সর্ব্বদা বদ্ধ বলে ভাবে, সে বদ্ধই হয়ে যায় আর যে নিজেকে সর্ব্বদা মুক্ত বলে ভাবনা করে, সে মুক্ত হয়। ইংরেজিতে যাকে বলে auto suggestion, তারও পারিভাষিক শব্দ 'ভাবনা'। যে প্রতিদিন এরূপ ভাবনা করে, 'আমি মানুষ, আমি দুঃখ-দৈন্যে বিচলিত হবো কেন, আমি অজর অমর আত্মা, আমি মৃত্যু-ভয়ে ভীত হবো কেন, রোগের যন্ত্রণায়ই বা ধৈর্য্যহীন হবো কেন, তার যে দুঃখের মাত্রা লঘু হয়ে যায়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার, অপরের প্রাণে আশার সঞ্চার কোরে বা তার মনে সুপ্ত আত্ম-প্রত্যয়কে জাগ্রত কোরে আমরা অপরের দুঃখের লাঘব ঘটাতে পারি। কিন্তু আমাদের চরম দুর্ভাগ্য বা অভিশাপ এইখানে যে, আমরা চিত্তকে জয় করার শিক্ষা কখনো পাইনি। অথচ আমাদেরই এই ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ সমগ্র জগতের বিস্ময়ের বস্তু যোগদর্শনের আবিষ্কার কোরেছিলেন। ভারতবর্ষেরই আচার্য্য শঙ্কর বলেছিলেন—'যে নিজের মনকে জয় করেছে, সেই জগৎকে জয় কোরেছে,' 'জিতং জগৎ কেন মনো হি যেন'।

আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোকগুলোর মধ্যে এমন একটি শ্লোক আছে যার অনুধ্যান কোরলে আমরা উচ্চ ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। শ্লোকটি এই—

'অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোক ভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্'।

শোক

শক্তি মুখোপাধ্যায়

শোভনের ঘন কালো চুলগুলো অবিন্যস্ত হয়ে
দুষ্ট হাওয়ার সংগে পাল্লা দিয়ে
তখনো উড়ছিল।
চোখের তারায় তার অনুজ্জ্বল আলোর শিখা
অব্যক্ত কান্নার সিঁড়িতে নেমে
পাকে পাকে জড়ানো যন্ত্রণার জালে
জড়িয়ে পড়ছিল।

যেন কোন বাহাত্তরে বুড়ো তার প্রিয় পুত্রশোকে
অনিদ্রায় অনাহারে ন্যুব্জ দেহকে
শয্যাশায়ী হবার আগে
ভয়ংকর মৃত্যুর হাতে
তুলে দিলেছিল।

নীরব যন্ত্রণাকে অস্থিরতার আড়াল দিয়ে
শোভনের দুই চক্ষু স্তিমিত হল।
আপন শোকার্ত্ত অন্তরের অতল গহ্বরে
যেন ডুব দিয়ে দেখছিল
হারানো মাণিক যদি খুঁজে পাওয়া যায়।

জীবনের সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী পাখীটা হারিয়ে
শোভন আজ শোকে মুহ্যমান।
বাটিতে দানা নিয়ে নিঃসঙ্গ দাঁড়ের শিকলে
একটা সবুজ ডানা
তখনো কাঁপছিল।
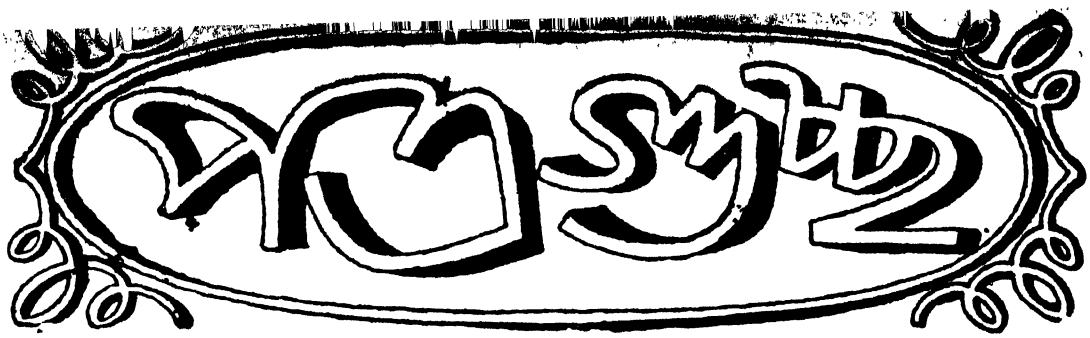
শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কয়েকটি পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramakrishna Advaita Ashrama
Laksha, Banares City
31. 1. 28

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি। জীব নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করিতে ভগবানের বিধানে জগতে আসে এবং তাঁর দেওয়া প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসাতে আবদ্ধ হয়। সে-বন্ধন বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়—তাও তাঁর কৃপায় এবং তাঁরই ইচ্ছায় ঐ বন্ধন ছেদিত (ছিন্ন) হয় ভোগান্তে। কিন্তু যখন উহা হয়, তখন মানবের ও জীবের খুবই কষ্ট হয়—এবং উহা এতই কষ্টকর, যদি তিনি উহা সহ্য করিবার ক্ষমতা বা উপায় না করিয়া দিতেন, তাহা হইলে মানব উহা সহ্য করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এবং উপায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের; যদি একটু ধীর স্থির ভাবে দেখ, বুঝিতে পারিবে। তোমার ক্ষেত্রে দেখিতেছি, সকল বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার পূর্বে তোমাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম দিয়াছেন। তাহা যদি না হইত, তোমার স্ত্রীর পক্ষে সন্তানের শোক সহ্য করা অসম্ভব হইত এবং তোমার পক্ষে তদুপরি স্ত্রীর শোক আরও অধিকতর হইত। বাবা, তিনিই একহাতে দিচ্ছেন, অপর হস্তে লইতেছেন—অলঙ্ঘ্য তাঁর নিয়ম। নাস্তিক আস্তিক যে যাহাই হও, সে নিয়ম সকলকেই মানিতে হইবে—উপায় নাই। বিদ্রোহে কোন ফল হয় না, সেখানে বিদ্রোহ টেকে না, আপত্তি চলে না। তিনি তাঁর মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলকে লইয়া যাইতেছেন; সকলেই তাঁর আশীর্বাদে একদিন না একদিন বুঝিবে এবং একদিন ভক্তি ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া তাঁর মহিমায় মহিমান্বিত হইতে হইবে। অবতার-প্রথিত মহাপুরুষরাই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহারাও এই জগতের মানুষ, কিন্তু কি তফাৎ! কিসে তাঁরা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ?—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। তাঁরই মহিমায় উজ্জ্বল। বাবা, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও, যাহাতে তিনি তোমার হৃদয়ে ধরা দেন—প্রার্থনা কর। শোক-তাপ, সংসার, কাজ অকাজ—সব সমান বোধ হইবে প্রভুর কৃপায়। কোন ভয় নাই, তাঁকে ডাক, তাঁর দোরে পড়ে থাক, তাঁকে ধরে থাক। যিনি তুমি—তাঁকে চেন। ব্যস আর কোন কিছুর দরকার হইবে না।

এইবার তোমার প্রশ্নের জবাব দিই—আশ্রমে ঠাকুরকে রাখিয়া ভালই করিয়াছ। যখন সময় ও ইচ্ছা হইবে, নেপাল(১)কে বলিয়া মাঝে মাঝে পূজা করিয়া আসিবে। মা এবং ঠাকুর কি আলাদা?—কোন দেবদেবীই (আলাদা) নয়, সবই তিনি—তাঁর যখন যে রূপ বা ভাব ভাল লাগিবে, যাহাতে মন বসিবে, তাহাই অবলম্বন করিবে—তাহাতেই মঙ্গল হইবে; যাহাই কর না কেন, মূলে ঠাকুরেরই ধ্যান হইবে, জানিবে।

মন্ত্রজপও তো বাবা, কর্ম; লোকে যে চিন্তা করে, তাহাও কর্ম। আমরা কর্ম ও ধ্যান-জপকে আলাদা করি ব'লে ঐরূপ মনে হয়। কেউ কর্মের দ্বারা তাঁকে উপাসনা করে, কেউ জ্ঞানের দ্বারা করে, সবই উপাসনা। তবে শারীরিক কর্মের সহিত মানসিকও প্রয়োজন, তবে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। চিন্তা যত শুদ্ধ হইবে, বাহ্য কর্মও তত ভাল হইবে। মানুষ মনে যা ভাবে, হাতে তাই করে। যে ভগবৎ চিন্তা করিবে, তার দ্বারা শুভ কাজই হইবে, সেইজন্য সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর চিন্তা ত্যাগ করিবে না, মন তোমার যতই অসৎ প্ররোচনা দিক না।

তাঁকে ডাকতে ডাকতে তাঁর উপর নির্ভর করতে করতে তাঁর কৃপায় ধ্যান গভীর হইবে। এতদিন সংসার নিয়ে ছিলে কিনা তাই সংসারের বিষয়ে মনটা শীঘ্রই নিবিষ্ট হয়, তাই কষ্টও হয়, এখন মন যত তাঁতে লিপ্ত হবে, যত তাঁর স্মরণ-মনন বেশী হবে, তত তাঁর দিকে মন যাইবে ও চিন্তা সহজ হইয়া আসিবে। তখন আবার দেখিবে, তিনি ছাড়া অন্য বিষয় চিন্তা করিতে কষ্ট পাইবে। তিনিই সত্য—এই ধারণা যখন বদ্ধমূল হইবে, তখন ধ্যানাবস্থাই তোমার সহজ হইবে।

তিনি তোমাদের দিয়ে তো কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তুমি কি নিজের গোলামি করিতেছ? তাঁর গোলামি করিয়াছ এবং করিবেও। যদি নিজের হইত, স্ত্রী-পুত্রও কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারত? এতেও বুঝছ না—এ জগতের মালিক কে? আমরা কার দাস—ভৃত্য? প্রভুর গর্বে গরীয়ান হও; তাঁর মহিমায় মহীয়ান হও। তিনিই তোমার মালিক জেনে যখন যা করান, যে অবস্থায় রাখেন, সে কাজ ও তাঁর স্মরণ-মনন ক'রে যাও। তাঁর কৃপায় হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ পাইবে।

১। কানপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও তদানীন্তন অধ্যক্ষ

তাঁর কৃপায় শরীর ভালই আছে এক প্রকার। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ঠাকুরের কৃপায় তোমার ভক্তিবিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, তিনি তোমার কল্যাণ করুন—ইহাই প্রার্থনা। মধ্যে মধ্যে নিশ্চয়ই পত্র দিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P. O. Belur Math
12. 4. 28

শ্রীমান্—,

ঠাকুর তোমায় আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁর দয়ায় তুমি অনেকটা সুস্থবোধ করিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি রোগশয্যায় শায়িত হইয়াও যে তাঁহাকে বিস্মরণ হও নাই—ইহা খুবই সুখের কথা। এইরূপ স্মরণ-মনন করিলেই যথেষ্ট হইবে—তিনি সব দেখিতেছেন। তুমি তজ্জন্য দুঃখিত হইও না। ঠাকুরের প্রতি তোমার ভক্তিবিশ্বাস অচল অটল হউক—তাঁকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া নিজ কর্তব্যপথে অগ্রসর হও—শান্তি এবং আনন্দ নিশ্চয়ই পাইবে। আমার শরীর আজকাল একপ্রকার মন্দ নয়। তবে বৃদ্ধ শরীর, কিছু না কিছু লাগিয়াই আছে। কেমন থাক এবং সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলে কিনা জানাইয়া সুখী করিবে। আমার স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ঠাকুর তোমাদের কল্যাণ করুন। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramkrishna Math
P. O. Belur Math
24. 5. 30

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। ঠাকুরের আশীর্বাদে তুমি তাঁর আশ্রয়েই তো এসে পড়েছ—তাঁর নাম যখন ক'রছ তখনই তো হইয়াছে। এবং তাঁর আশ্রমে রয়েছ, কাজকর্ম ধ্যান ভজন নিয়েই তো আছ। অফিসের কাজ যদি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়—নেপালের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখো। ঠাকুর তোমাকে দিয়ে নিঃস্বার্থ সেবা তো করিয়ে নিচ্ছেন। বৃদ্ধ বয়স—এখন আর সন্ন্যাসের প্রয়োজন নাই। এত দেখলে, এতেও কি তোমার ত্যাগ আসে না গা?—তা এসেছে। তোমা ঐ সবের কিছু প্রয়োজন হবে না। তুমি আশ্রমে থেকে—যেমন কাজকর্ম এবং তাঁর পূজাপাঠ নিয়ে আছ, এই ভাবেই থাক, আমার ইচ্ছা। বাবা, পুত্র-পরিবার সব ভগবদ্‌বিধানে নিজ নিজ কর্ম ক্ষয় করতে আসে—তাদের তিনি একটা অবলম্বন দেন; তুমি ছিলে তাই, তাদের কাজ শেষ হয়ে গেল—তারা চলে গেল। তুমি আছ, তোমায় তাঁর ঠাকুর দিয়েছেন—দেখ না কেমন আশ্রমে এনে ফেলেছেন। বাবা, এর অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হবে? বাবা, তুমি পূর্বের কথা সব ভুলে গিয়ে ঠাকুরের উপর বিশ্বাস ভক্তি রেখে দিনকতক যা বাকী আছে, কাটিয়ে দাও। তাঁর দর্শন করেছ যখন, তখন আর কিছু বাকী নাই। মুক্তি, ভগবদ্দর্শন সব হয়ে গেছে। তুমি মহাভাগ্যবান্, নররূপে ভগবানকে দেখা—এর চেয়ে আর কি ভাগ্য হতে পারে বলো! দেবতারাও এইরূপ ভাগ্যশালী নয়। ভগবানের সঙ্গে কথা কয়েছ, দেখেছ—আর কি চাও? সন্ন্যাসী হ'লে এর চেয়ে কি হবে? ঐ জন্যই তো সাধন-ভজন—তা তোমার তো হয়ে গেছে। তবে আর ভাবনা কি? তাঁর নাম নিয়ে শান্তিতে ও আনন্দে যেমন ভাবে তিনি রাখেন, থাকো।

আমার শরীর ভাল নয়। তবে তিনি একপ্রকার চালিয়ে নিচ্ছেন। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং নেপাল প্রভৃতি আশ্রমের সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Sri Ramkrishna Math
Belur Math.
26. 6. 30

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার কোন চিন্তা নাই, ঠাকুরের কৃপায় তোমার কল্যাণ নিশ্চয়ই হইবে; তাঁকে দেখেছ, তোমার আর কি কিছু বাকী আছে? যে কটা দিন জগতে রাখেন, তাঁর সেবা ও কাজ ক'রে কাটিয়ে দাও। আর তাঁর আশ্রয় ত্যাগ যেন না হয়। তুমি ওখানে থাকলে তোমার দ্বারা কাজ খুব হইবে। তাঁর কৃপায় তোমার ভক্তি-বিশ্বাস আছেই, আরও বৃদ্ধি পাইবে।

আমার শরীর ভাল নয়। জ্বরভাবের মতো কয়েকদিন হইল হইয়াছে। কমে যাবে, কোন চিন্তা নাই। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং নেপাল প্রভৃতি আশ্রমের সকলকে ও সকল ভক্তদের জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Belur Math P. O.
District Howrah (Bengal)
30. 5. 31

শ্রীমান্—,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। তুমি ঠাকুর স্বামীজী—এঁদের স্থূল শরীরে দেখেছ, তোমার সাদা চোখ দিয়ে আর স্পষ্টভাবে ভগবানকে কি ক'রে দেখতে চাও—বলো। ভগবানকে—জ্যোতির্ময় শরীর—অনেকে দেখে বটে; কিন্তু তাঁকে মনুষ্য-শরীরে

লেখা—অতি বিরল লোকই ইহা দেখে, যারা দেখে ও সঙ্গ পায়, তারা অতি সৌভাগ্যবান্। তাই লিখি—তোমার ভগবানের দর্শন হয়ে গেছে। ধ্যান ধারণা ক'রে তাঁদের তোমাকে দেখতে হয় না। তাঁদের কৃপাতেই হয়েছিল যদি তোমার আর কিছু থাকে, তা তাঁদের কথা ও বিষয় স্মরণ-মনন করতে এত তোমার ইচ্ছা। এও জানবে তাঁর কৃপা। তোমাকে বাবা বেশী কিছু করতে হবে না। এই যে অফিস থেকে এসে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত খাটো, কেন বলো তো? তাঁর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি আছে বলেই তো—ওতেই যে তোমার ধ্যান জপ তপস্যা হয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে বসলেই কি তাঁকে ভক্তি করা—ভালবাসা হইল? তোমাকে তিনি ঠিক নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাতেই সন্তুষ্ট থেকে তাঁর নাম করতে হয়; তবেই তিনি যার যা দরকার, তার ব্যবস্থা ক'রে দেন। নচেৎ নিজ বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি মতো চলতে গেলেই তিনি সরে দাঁড়ান। তুমি ভাবছ কেন? যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, আশ্রমের এমন অবস্থা হবে যে, তোমাকে আর চাকরি করতে হবে না, আশ্রমে থেকেই তোমার কর্তব্য সব করবার সুযোগ হবে।

যেমন ভাবে কাজকর্ম ক'রছ ও তাঁর স্মরণ-মনন যেমন ক'রছ, করবে—দেখবে এর মধ্য দিয়েই তোমার প্রেম ভালবাসা কত দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। তাঁর অভাববোধই তো তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ। প্রার্থনা করি, উহা তোমার খুব বৃদ্ধি লাভ করুক।

তুমি আমার খুব আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে।

ইতি—
সতত শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি ঃ রাজকৃষ্ণ রায়কে লেখা

আমি আপনার কৃত মহাভারতের পদ্যানুবাদ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বাঙলা ভাষায় মহাভারতের দুইখানি অনুবাদ আছে; (১) কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ, (২) কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ। ইহার মধ্যে কাশীরাম দাসের পদ্য সংস্কৃতের অনুবাদ নহে। উহা সংস্কৃত মহাভারত হইতে এত বিভিন্ন যে, উহাকে কাশীরাম দাসের মহাভারত বলিতে হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত মূলানুযায়ী বটে কিন্তু উহা সাধারণ পাঠকের উপযোগী নহে। সাধারণ লোকশিক্ষার্থ ই মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল, ইহা প্রাচীন কথা এবং যথার্থ কথাও বটে। অতএব লোকশিক্ষার্থ ইহার এমন একটা অনুবাদ চাই, যাহা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইবে। অথচ সাধারণ পাঠকের উপযোগী হইবে। আপনার কৃত পদ্যানুবাদের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অনুবাদ সকলের পক্ষে বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে। কিন্তু এই কার্য্য অতি গুরুতর। আপনার ন্যায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও কার্য্য নহে। ভরসা করি, আপনি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন এবং সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। ইতি তাং ৭ই আগষ্ট ১৮৮৮।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি ঃ মহাকবি নবীনচন্দ্রকে লেখা

হিন্দুমেলায় যখন আপনাকে প্রথম দেখি, তখন আমি অখ্যাত, অজ্ঞাত এবং আকারে আয়তনে ও বয়সে নিতান্তই ক্ষুদ্র তথাপি আমি যে আপনার লক্ষ্যপথে পড়িয়াছিলাম এবং তখনও আপনি যে আমাকে মন খুলিয়া অপর্যাপ্ত উৎসাহবাক্য বলিয়াছিলেন তাহা আমার পক্ষে বিস্মৃত হওয়া অকৃতজ্ঞতা মাত্র—কিন্তু আপনি যে সেই ক্ষুদ্র বালকের সহিত ক্ষণকালের সাক্ষাৎ আজও মনে করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। তাহার পর আজ প্রায় মাসখানেক হইল রাণাঘাটের ষ্টেশনে আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আমি মনে মনে আশা করিতেছিলাম যে আপনি আমার গাড়ীতে উঠিবেন এবং আপনাকে আমার সেই বাল্যপরিচয় স্মরণ করাইয়া দিব, কিন্তু সে দিন আপনি ধরা দিলেন না। তাহার পূর্ববর্তী রবিবারের দিনে সাহিত্য পরিষদ সভায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে আশা করিয়া গিয়াছিলাম কিন্তু সে দিনও আপনার দর্শনলাভ হইল না। সহৃদয়তাগুণে আজ আপনি নিজ হইতে পত্রযোগে ধরা দিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপন পত্রে আপনার নিম্নে আমার নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া আপনি কেন আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন? যদিও আমি বয়সে আপনার অপেক্ষা অনেক ছোট হইব, তথাপি দৈবক্রমে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার নামের নিম্নে আমারই নাম পড়িয়াছে আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ঐতিহাসিক পর্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছে। অতএব, সর্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি—আশা করি ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এই অধিকারটি রক্ষা করিতে পারিব।

মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্রাবলী

প্যারীচাঁদ মিত্রকে লিখিত

২১এ আগষ্ট ১৮৮১

প্রিয়বর বাবু প্যারীচাঁদ,

সংস্কৃত সাহিত্যে তাম্রকূট সম্বন্ধীয় উল্লেখ কেবলমাত্র একবার পাওয়া যায়। 'কুলার্ণব তন্ত্র' গ্রন্থটিতে তাম্রকূট উল্লেখিত হইয়াছে। 'তাম্রকূট' শব্দটির ব্যবহারও ঘটিয়াছে কিন্তু গ্রন্থটির সত্যতায় সন্দেহের অবকাশ থাকে। কাব্যসমূহ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কিনা সে বিষয়েও প্রমাণ করিবার মত কিছুই নাই। তাহার কোন প্রাচীন বা সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় নাই।

'হলধর' কথাটি 'হল' হইতেই উৎপন্ন। সংস্কৃত সাহিত্যে কৃষি

সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ, বিশদ আলোচনা ও স্মৃতিতে এবং তন্ত্রে কৃষি বিষয়ক বহু উল্লেখযোগ্য আলোচনা এবং বিবিধ নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ আছে।

ভবদীয়

স্বাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র

এশিয়াটিক সোসাইটির সচিবকে লিখিত

১লা নভেম্বর ১৮৮৮

শ্রীযুক্ত সচিব মহোদয়, এশিয়াটিক সোসাইটি

মহাশয়,

সম্প্রতি ক্যাপ্টেন কিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত এক অতি দুষ্প্রাপ্য ও পরম আকর্ষণীয় পাণ্ডুলিপির প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং যদি তাহা প্রাচ্য বিভাগের সপ্রশংস অনুমোদনলাভে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহা বিবলিওথেকা ইণ্ডিকায় প্রকাশ করিতে বিনয় সহকারে পরামর্শ দান করি।

আলোচ্য বস্তুটির নাম 'পলিটি অফ কামন্দকী' (কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র) ইহা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত। রচয়িতা প্রখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ্ বিষ্ণু গুপ্তের অন্যতম শিষ্য।

সমাজের অন্যতম সভ্য হিসাবে মানুষের দায়িত্ব, হিন্দু সমাজে অসামরিক সরকারের গঠন ধারা ও নীতি, রাজা ও মন্ত্রীদিগের অধিকার ও সুযোগ সুবিধাদি, সামরিক প্রতিরোধ কৌশল, প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। মোট কথা, চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক এই রাজনীতিবিদের লেখনীতে সমকালীন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক দক্ষতা সহকারে সুচিত্রিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থটি কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

মহাশয়, আপনার অনুগৃহীত

স্বাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কে লিখিত

মান্যবরেষু,

২২শে দিবসীয় আপনার পত্র গতকল্য অপরাহ্নে প্রাপ্ত হইয়াছি। মীরুকগুলির পাঠে বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম।

আমি উড়িয়া ভাষায় কোনমতে পটু নহি। অতএব আপনি যে অনুবাদ দিবেন তাহাই আপনার নাম দিয়া ছাপাইব এই মনস্থ করিয়াছি।

মহারাষ্ট্রভাষায় 'চা' শব্দটি সম্বন্ধ প্রত্যয় বটে; পরন্তু গুণ্ডিচা শব্দ প্রাচীন; উহা বোধ হয়, মহারাষ্ট্র ভাষা হইবার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে।

জগন্নাথদেবের অন্তরে যে একখানি অস্থি স্থাপিত করা হয় তাহাতে আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে কিন্তু তাহা না দেখিলে কিছুই স্থির হয় না। অনুভবে কাহারও আস্থা হইবার নহে। বৌদ্ধদন্তের উল্লেখ আমি করিয়াছি। কানিংহাম সাহেবের Geography of Ancient India গ্রন্থে উড়িষ্যার বৌদ্ধদিগের উল্লেখ আছে কিন্তু কি তাহাতে কি অন্যত্র ধারাবাহিক কিছুই লেখা নাই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের চিঠি ঃ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

২০শে জুলাই, ১৮৭৬

প্রিয় ঈশানবাবু,

যদি অপাত্রে অনুগ্রহ করিয়া পরিক্লান্ত হন তবে আমায় আর স্মরণ করিবেন না, আর যদি এই অহেতুকী শ্রদ্ধা আপনার প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি হয় তবে আশা করিতে পারি চিরদিনই এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। আপনার লেখায় কেমন একটু তান আছে তাহা আমি বড় ভালোবাসি। আপনি একবার কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনপূর্ব্বক বাস্তবে একটি দীর্ঘ কবিতা দিবেন। ঐরূপ কবিতা না হইলে আপনার সমুচিত বিকাশ হইবে না।

আপনি শিবাজীর বিষয় আপাতত লিখিবেন না। পৃথ্বিরাজের সেনাপতি বীরচূড়ামণি সমরশায়ীকে অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ এক কবিতা লিখুন। দুই তিনবারে প্রকাশ করিব। সমরশায়ীর প্রেম, সমরশায়ীর স্বদেশবাৎসল্য, উগ্রতেজ, রণনৈপুণ্য ইত্যাদি কথা ঐতিহাসিকের লেখনীতেই কবিতায় কমনীয় কান্তি লাভ করিয়াছে। কবির তুলিকায় তাহা কিরূপ চিত্রিত হইবে তা স্মরণ করিতেই আমার হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠে।

পৌষ

বিষ্ণু দত্ত

হেমন্ত চলিয়া গেছে শেষ করি কর্ম্ম আপনার।
দূর্ব্বাদল অশ্রুধারে আজো করে স্মৃতি পূজা তার।
নামিয়া এসেছে পৌষ-বিকম্পিত করি ধরাতল।
হিমানী উত্তর বায়ু তনুমন করে বিচঞ্চল।
শীতার্ত্ত মানবকুল জড়বৎ আপন-আবাসে,
তরু হতে পত্ররাজি ঝরে পড়ে নির্ম্মম বাতাসে।
তাই বুঝি আজি কারো বীণাযন্ত্রে উঠে নাই তান?
তাই বুঝি আগন্তুকে করে নাই সাদর আহ্বান?
যদ্যপি প্রাণান্তকর হিমবায়ু হয় উতরোল,
তবু আজ বয়ে যায় অভিনব শান্তির হিল্লোল।
গোলোকের লক্ষ্মী আজি অবতীর্ণ বিশ্বের প্রান্তরে,
তুলে নাও সবে তারে শির 'পরে প্রসন্ন অন্তরে।
মিটিবে সকল দুঃখ কমলার চরণ-পরশে।
ঘুচিবে নির্ব্বেদ যত, নিরাতঙ্ক রহিবে হরষে।

নগাধিরাজ হিমালয়-৩

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ সঙ্কলিত

"আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী যমুনা নর্মদা
সিন্ধু বেগবান ওই।
আরাবলি তুঙ্গ হিমগিরি, করোনা করোনা
তার অপমান।" —বাংলা গান।

* * *

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদ গিরি সিন্ধু মরু
কত না অজানা জীব কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

* * *

যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী—
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।"
—রবীন্দ্রনাথ।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এক রবিকরোজ্জ্বল সকাল।

হিমগিরির কন্দরে কন্দরে দুর্গম গিরিপথ ভেদ করে চলেছেন অভিযাত্রিক সিকিমি-কিন্থাপ দার্জিলিং থেকে ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধানে। কোথা থেকে এই নদীর উৎপত্তি। কোথা গিয়ে সে মিশেছে? তার কি জন্ম তিব্বতের পার্বতীয় প্রদেশে? সে কি তিব্বতের মহানদী ৎসাং-পোর সঙ্গে অভিন্ন? এই তখনকার অজানা মহা প্রশ্ন যাঁর মনে জেগেছিল—সেই কিন্থাপ নিজের জীবন বিপন্ন করে চলেছেন সেই রহস্যের সমাধানে। তাঁর অভিযান ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি তিব্বতীয়দের হাতে বন্দী হলেন, সঙ্গী চৈনিক লামা কর্তৃক ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হলেন, তারপর নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে অভিযান শেষ করে তাঁর সেই দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ দিলেন (Records of the Survey of India, 1879—1892)। ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁকে সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করলেন।

তবে একথাও ঠিক তাঁর আগে এবং তার পরেও কুড়ি বছরের মধ্যে কোন ভারতীয় বা বিদেশী এই অভিযানে পদক্ষেপ করেননি।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে একদিন সকালবেলা নিমসিং ও কিনথাপ অজানা পার্বত্যপথে ৎসাং-পো নদীর উৎস সন্ধানে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা দারুণ শীতের মধ্যে পার্বত্য প্রদেশে প্রায় ১২০০ ফিট উচ্চ পথ ধরে ৎসাং-পো নদীর গতিপথ ধরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের হাতে ছিল জপমালা। পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা জপের গুটিতে হাত দিতেন। এক কথায় জপের মালা গণিতে গণিতে তাঁহারা পথ চলিতেছিলেন। আমাদের এই দুইজন অভিযানকারী পথে পথে জরিপ করিতে করিতে অবশেষে গয়লা নামক একটি স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। এই জায়গাটি ছিল ঘন বনে ঢাকা। এই অধিত্যকার পর শিখর তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইখান হইতে ৎসাং-পো নদীর গতি উত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন—ৎসাং-পো নদী আসামের প্রান্তভাগ হইতে লম্বালম্বি দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিয়াছে।

* * * আবার উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিলেন—এবার সঙ্গী হলেন একজন চীন দেশীয় শ্রমণ বা লামা।·· তাঁহার পিঠে ছিল একটি থলিতে কাঠের বোঝা। তিব্বতের লোকেরা তীর্থ যাত্রীদের খুব সমাদর করে। কাজেই এ যাত্রায় তাঁহাকে কোন তিব্বতীয়ই সন্দেহের চক্ষে দেখিল না। কিন্তু এই চীনা লামাটির মনে অজানার সন্ধানের জন্য কোন আগ্রহই ছিল না। লামা কোন একটি গ্রামে গিয়া পৌছিলে বেশ ভালভাবে থাকিবার, খাইবার এবং শুইবার ব্যবস্থার জন্য ব্যাকুল হইতেন। যে গ্রামে এইরূপ ব্যবস্থা মিলিত সেই গ্রাম হইতে চৈনিক লামা এক পা-ও বাড়াইতে চাহিতেন না।

কিনথাপ ও লামা পথ চলিতে লাগিলেন। কখনও কখনও তাঁহাদের গুহার মধ্যে ঘুমাইতে হইত, কখনও ভিক্ষা করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করা হইত, কখনও কখনও অনাহারে দিন কাটিত। এইভাবে কিনথাপ ও তাঁহার সঙ্গী লামা পেম'কাই-চাং নামক একটি জায়গায় আসিলেন। লাসা ঐ স্থান হইতে ৩২০ মাইল দূর। শেষ পঁচিশ মাইল পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম—খাড়া পাহাড়। সে পাহাড়ে শিলাস্তূপের পর শিলাস্তূপ। কোন দিকে উঠিবার পথ নাই।

কোন রকমে তাঁহারা একটা খাড়া পাহাড়ের উপর উঠিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন প্রায় ৩০০০ ফিট নীচ দিয়া গভীর গর্জন করিতে করিতে ৎসাং-পো নদী দিয়া চলিয়াছে। জলের কি ভয়ঙ্কর বেগ।

পেম্‌কোই-চাংয়ে আসিয়া কিনথাপ দেখিতে পাইলেন যে ৎসাং-পো নদী এখান হইতে দুইটি শাখা বিভক্ত হইয়া চলিয়াছে। কিনথাপের বর্ণনায় জানা যায়—এই ভাবে ৎসাং-পো নদী বহিয়া যাইয়া একটি জলপ্রপাতের আকারে পড়িয়াছে। প্রপাতের নীচে একটি হ্রদের মত জলাশয় রহিয়াছে। সম্ভবতঃ জলপ্রপাতের উচ্চতা প্রায় ১৫০ ফিট হইবে।

কিনথাপের বর্ণিত ৎসাং-পো বা ব্রহ্মপুত্র নদের জলপ্রপাত—পেমাকোই চুংয়ের পর আর পথ ছিল না। এজন্য তাহাদিগকে পথ তৈরী করিয়া চলিতে হইয়াছিল। সে পথ ছিল অতি ভীষণ। দুই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী। সেই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে দিয়া ৎসাং-পো নদী ভীষণ গর্জন করিতে করিতে উন্মত্ত জলধারা বুকে লইয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাঁহারা যে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন। তাহার প্রায় ১০০০ ফিট নীচে দিয়া ৎসাং-পো নদী কল-প্রবাহে বহিয়া যাইতেছিল। এই পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন কোথায় যেন পাহাড়ের বুকে ৎসাং-পো আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেদিকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন একটি অতি সুন্দর জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাতটি পেমা-কো চুং কেন্দ্রর কাছাকাছি। এই জলপ্রপাতটি ৩০ ফিটের বেশী উঁচু নহে। কিন্তু জলপ্রপাতের শোভা অতি চমৎকার। জলপ্রপাতের উপর সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হইয়া প্রপাতের বুকে শত শত রামধনুর সৃষ্টি করিয়াছে।" (হিমালয়—অভিযান—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)।

পণ্ডিত কিষণ সিং ১৮৭১—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া অভিযান করেন। কিষণ সিংয়ের বিবরণ—

আমি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৪ এ এপ্রিল তারিখে, তিব্বত গমন করিব বলিয়া দার্জ্জিলিং ছাড়িলাম। সঙ্গে চলিল আমার ভৃত্য চাম্বেল আর একজন লোক, তার নাম গঙ্গারাম।.....

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে লাসা বা নিষিদ্ধ নগরীতে পৌঁছিলাম। এখানে আমার সঙ্গে যা কিছু পণ্যদ্রব্য ছিল সব বেচিয়া ফেলিলাম এবং মোঙ্গলিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। জীবনে যে লাসা নগরী দেখিব বলিয়া কোন দিন ভাবি নাই, আজ তাহাই দেখিলাম।.....আমি এক বৎসর লাসায় ছিলাম। সে সময়ে আমি মোঙ্গলিয়দের ভাষা শিখিতে ছিলাম। জুন, জুলাই মাসে বায়ুমান যন্ত্রের দ্বারা তিব্বতের বায়ুর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ছিলাম।

এই লাসা শহরটির বেড় প্রায় ছয় মাইল হইবে। শহরের চারিদিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তার মাঝখানে একটি প্রায় সমতল ভূমির মধ্যে লাসা শহরটি অবস্থিত। যে নদীর দক্ষিণ তীরে শহরটি অবস্থিত তার নাম "কিচু"। শহরের মাঝখানে একটি উচ্চ স্থানে মিয়ো নামে বিরাট মন্দির বিরাজিত। মন্দিরটি চতুষ্কোণ। মন্দিরের ছাদটি সোনার পাতে মোড়া। উহার ভিতর অনেক মূর্তি আছে তবে দুইটি মূর্তি প্রধান—একটির নাম শাক্যমুনি এবং আর একটির নাম পালদেন্‌লামো বা ভারতের কালীমাতা। গল্প আছে শাক্যমুনি ভারতবর্ষ হইতে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মূর্তি দুইটিরই গায়ে নানা অলঙ্কার। সোনা ও মূল্যবান প্রস্তর দ্বারা অলঙ্কার তৈরী। এই মন্দিরের কাছে বিচারালয়, থানা এবং ধনাগার। মন্দির এবং এই সব অফিস আদালতের চারিদিক বেড়িয়া একটি প্রশস্ত রাজপথ—চওড়া প্রায় ৩০ ফিট।.....শহরের পশ্চিম দিকে একটি পাহাড়ের উপর লাসার মেডিক্যাল স্কুল অবস্থিত। উহার নাম চিয়াক্‌পোরি। এখানে ৩০০ দাবা বা ছাত্রকে পড়িতে দেখিলাম।...স্কুলের উত্তর দিকে পাহাড়ের নীচে রাজার বাড়ী। রাজাকে তিব্বতীয়েরা বলে গিয়ালচো। রাজবাড়ীর উত্তর-পূর্ব দিকে একটি দুর্গ অবস্থিত। একটি স্বতন্ত্র ও উন্নত পর্বত শিখরের উপর পোটালা বা চাই নামে একটি প্রাসাদ আছে। ঘুরানো সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। এইখানে তিব্বতীয়দের সর্বপ্রধান ধর্মগুরু লামা বা কিয়াম কুংরিংবোচি লামাই হইতেছেন তিব্বতের সর্বেসর্বা। তাঁহার মৃত্যু নাই। তিনি অমর। কেবল তাঁহার আত্মা এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহ অবলম্বন করে মাত্র। অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যু অর্থে কায়া পরিবর্তন। যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তাঁহার মৃতদেহ একটা কফিনের ভিতর পুরিয়া কয়েকদিন রাখিয়া তবে সমাধি দেওয়া হয় এবং তাহার উপরে ধাতুনির্মিত একটা ফাঁপা স্তম্ভ দাঁড় করাইয়া রাখে। ঐ স্তম্ভটি সোনার পাতে মোড়া থাকে। এইরূপ স্তম্ভের নাম কুতাং, দেখিতে যেন একটি ছোটখাট চুরতান্।

একজন লামার মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর পরেই নূতন লামার আবির্ভাব হয়। তাঁহার আবির্ভাব, নানা অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনীতে পূর্ণ। যখন কোন পরিবারে বিশেষ লক্ষণযুক্ত নবীন শিশুর আবির্ভাব হয় তখন সে সংবাদ শিশুর পিতামাতা নিকটবর্তী রাজকর্মচারীকে জানাইলে খুব জোর অনুসন্ধান চলে। কর্মচারীদের অনুসন্ধানে যখন সত্য সত্যই শিশুটিকে লামার গুণবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয় তখন তাহারা সেই সংবাদ গিয়ালবো বা রাজাকে দেন। গিয়ালবো হইতেছেন লাসার বা তিব্বতের শাসন সংরক্ষণের কর্তা। তৎক্ষণাৎ মৃত লামার দাসদাসী ও কর্মচারীরা সেই বাড়ী ছুটিয়া আসেন, নানা রূপ পরীক্ষা চলিতে থাকে। তাহাদের পরীক্ষার পর যদি শিশুটি সত্য সত্যই শুভ লক্ষণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন রাজ্যের প্রধান কর্মচারীরা শিশু ও তাহার পিতামাতাকে সহরের কাছাকাছি একটি গোম্পাতে স্থানান্তরিত করেন। তারপর এক শুভদিনে বিশেষ ধুমধামের সঙ্গে পোটালো দুর্গে আনা হয়। এই শিশু লামা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার উপর রাজ্যের ধর্মসংক্রান্ত ও বিবিধ বিচার ব্যবস্থার ভার দেওয়া হয়।...লাসা সহরের উত্তরে একটি অতি বৃহৎ চুরতান আছে। এই চুরতানটির নাম গিয়াংবুংমোকি। গিয়াংবুংমোকি তিব্বতীয় বীর ছিলেন। তিনি একা (এক লক্ষ) শত্রু নিধন করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই শত্রুরা হইতেছে চীনারা। ...(ভারতীয় জরীপ বিভাগ হইতে প্রকাশিত কিষণ সিংহের অভিযান বিবরণ—অনুবাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে ছিরমুর পল্লীর অধিবাসী লালা দার্জ্জিলিং হইতে সিকিমের পথে তিব্বত যাত্রা করেন। লালা যখন কাজরা—লামালা হইতে কামপার (দুর্গের) তিন মাইল দূরে আসেন তখন একদল ঘোড়সোয়ার আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া দুর্গের অধিনায়ক

জোঙপোনের নিকট লইয়া গিয়াছিল। জোঙোপন লালাকে দুর্গের বাহিরে একটি ঘরে পনের দিন কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি কোনরূপ শারীরিক নির্যাতন না হইলেও তাঁহাকে মৌখিক নানাপ্রকার ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এখানে তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য, কোথায় সে যাইবে, কি তাঁর প্রয়োজন ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করা হইয়াছিল। সিগাৎসির শাসনকর্তা লালাকে পাঁচ মাসকাল বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর মুক্তিলাভ করিয়া আবার যাত্রাপথে অগ্রসর হন।

১৮৭৫ খৃঃ নভেম্বর মাসে লালা সিগাৎসি পরিত্যাগ করেন। সেখান হইতে ৎসাং-পো নদীর তীরে অবস্থিত জাগ্‌মা নামক গ্রামে আসেন। এখানে একটি লোহার পুল আছে। এই লোহার সেতুটি পার হইলে দেখা যায় যে দুই দিকে দুইটি পথ গিয়াছে। একটি চলিয়াছে লাসার দিকে, অপরটি চলিয়াছে চেকসামচোরি নামক স্থানে। এই স্থানে ৎসাং-পো নদীর স্রোতোধারা নানা ভাবে বিভক্ত হইয়া গভীর গর্জন করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে। জাগ্‌মা হইতে লালা দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে যাইয়া ইয়া-সিক নামক একটি হ্রদের কাছে আসেন। এই হ্রদটি সম্পর্কে তিনি অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। লালা বলেন যে, এই হ্রদটির মধ্যে একটি ছোট দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের মূল ভূভাগের সঙ্গে একটি সংযোজক সেতু রহিয়াছে। সেই পথে লোক যাতায়াত করে এবং পশুরাও বিচরণ করিয়া থাকে। এখানে চারিদিকে বনরাজিশোভিত পর্বতশ্রেণী থাকায় পাহাড়ে অধিত্যকা প্রদেশে পালে পালে পশুদের বিচরণ করিতে দেখা যায়।

লালার এই অভিযানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে—গিয়ামসেনা হ্রদের কথা। লালা এই হ্রদের তীরে বসিয়া একটি আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। প্রতি পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট অন্তর হ্রদের গর্ভ হইতে বজ্রধ্বনির ন্যায় এক শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। লালা প্রায় চারি ঘণ্টাকাল এই হ্রদের তীরে বসিয়াছিলেন। এই চারি ঘণ্টাকালই তিনি বার বার ঐরূপ ভাবে হ্রদের ভিতর হইতে বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হ্রদের বুকের সলিল রাশি কোনরূপ আবর্তন বা তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস দেখা যায় নাই। স্থানীয় একজন রক্ষী বা চৌকী লালাকে বলিয়াছিল যে, হ্রদের তলাকার জমাট বরফ স্তর ভাঙ্গিবার দরুণ উপর হইতে এইরূপ শব্দ শোনা যায়। যদি বরফ ভাঙ্গার জন্যই ঐরূপ শব্দ হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে হ্রদের উপরি ভাগে বরফকে ভাসমান অবস্থায় দেখা যাইত, কিন্তু হ্রদের জলের উপর এইরূপ কোনও বরফ কোন কালেই দেখা যায় না বলিয়াও প্রহরী লালাকে বলিয়াছিল। লালা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথম তিব্বত অভিযান শেষ করে দার্জিলিং-এ ফিরে আসেন আবার ১৮৭৭ সালে দ্বিতীয় বার তিব্বত অভিযান করেন। (লালার তিব্বত যাত্রা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)।

"কৈলাস ও মানস-সরোবর দর্শন, কতকটা ভাগ্যের যোগাযোগ এবং কতটা পুরুষার্থের সহায়ে ঘটিয়াছে, তাহাই ভাবিতেছিলাম।... এই বার অল্প দূর অগ্রসর হইয়াই মানস-সরোবরের কতকাংশ দেখিতে পাইলাম। মরি মরি, কি স্নিগ্ধ মধুর দৃশ্য,—এই শীতল প্রভাতের সঙ্গে ক্ষীণ তরল নীলিমার কি মধুর মিলন ঘটাইয়াছে। সকল মনোবৃত্তি একাগ্র হইয়া রমণীয় দৃশ্যটিকে যেন আত্মসাৎ করিয়া লইল। যে মুহূর্তে মানস-সরোবর নয়ন গোচর হইল, মনে হইল যেন আমি ইহার সঙ্গে বহু যুগযুগান্তের ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচিত আছি। গভীর স্মৃতির মধ্যে যেন আমি ইহার সঙ্গে পরিচিত। গভীর স্মৃতির মধ্যে এ দৃশ্য যেন স্পষ্ট রূপেই আঁকা; যেন কত বারই দেখিয়াছি। এই বিচিত্র মনোরম দিব্য দৃশ্যটি উপভোগ করিয়াছি। জীবনে ইহার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই, কখনও হইবে না;—এই ভাবে দ্রষ্টা ও দৃশ্য কতক্ষণ এক হইয়াই রহিল। তবে সে অবস্থা অল্পক্ষণের স্থূল শরীর গতি বিশিষ্ট চঞ্চল, তাহার উপর দলের মধ্যে আমি একজন যাহার স্বাধীনতা প্রতি পদক্ষেপেই সীমাবদ্ধ।

চতুর্দিকেই পর্বতমালা, বন বৃক্ষলতা প্রভৃতি সর্ববিধ হরিদ্বর্ণের সম্পর্কশূন্য। মরুভূমির মধ্যে যেমন পর্বতাকার বালির স্তূপ থাকে, এই নীলাভ মানস সরোবরের চারিদিকেই সেইরূপ। বালুকা স্তূপের বর্ণ পীতাভ ধূসর বলিয়া জলের বর্ণ সর্বদাই নীল। বেশী বেলায় প্রখর রৌদ্রে ঘোর নীল দেখায়। হ্রদটির পরিধি কেহ বলে পঞ্চাশ, কাহারও মতে আশী, আবার অন্য মতে এক শত মাইল কোন বিশিষ্ট ইউরোপীয় পর্যটকের মতে বর্তমানে ইহা পঞ্চাশ মাইল। সরোবরের চারিদিকে উচ্চ পর্বত গাত্রে কয়েকটি মঠ আছে। যথা—লাম হু লাং, সারলাং, কোশল বা গোসল, নিক্কুর, জু-গোম্বা প্রভৃতি। জু-গোম্বাটি উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে।

আমরা হ্রদের পশ্চিম তীর দিয়া চলিতে ছিলাম। সরোবরের শোভা এই প্রাতঃকালে কি মনোহর হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। কতক্ষণ সূর্যোদয় হইয়াছে, জলে এখন সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইতেছে। এখানে রাজহংস নাই, পদ্ম নাই, পত্র নাই, মনোরম বলিয়া কাব্য বা পুরাণ বর্ণিত যাহা কিছুই সৌন্দর্যময় উপাদান সে সকল কিছুই নাই, দুই চারিটি ক্ষুদ্র কাল কাল হাঁস,—সাধারণতঃ যাহাকে বালিহাঁস বলে—কখনও হ্রদের তীরে কখনও বা জলে যাতায়াত করিতেছে আর দু' একটি মাছধরা পাখী নিকটে জলের উপর ইতস্ততঃ ক্ষিপ্রগতিতে আহার অন্বেষণে উড়িতেছে। জল অতীব স্বচ্ছ। প্রভাতের মৃদু মন্দ সমীরণ হিল্লোল, হ্রদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া জলকে তর তর নাচাইতেছে, আর তাহার মধ্যে রজতশুভ্র সূর্য কিরণ, বিদ্যুতের মত তাহার ঝলকিত গতি। দেখিতে দেখিতে উন্মাদ আনন্দের সঙ্গে দূরস্থ গো[illegible]-গোম্পার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। (হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস সরোবর—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়)।

Make it a rule of life never to regret and never to look back. Regret is an appalling waste of energy. You can't build on it; it's only good for wallowing in.

—*Katherine Mansfield.*

॥ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৬৭তম জন্মদিবস-স্মরণে ॥

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

শিল্পী—শ্রীগোপাল ঘোষ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
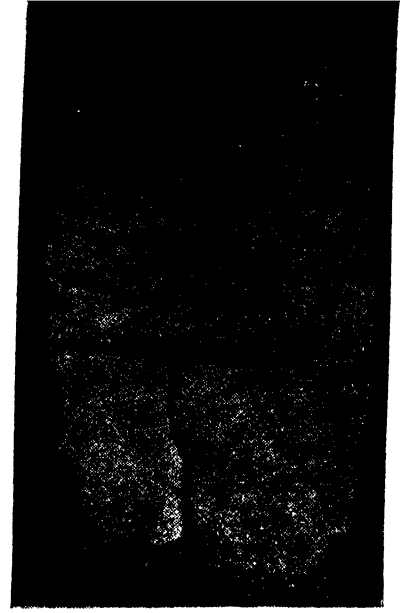
বিদেশী ভাস্কর্য্য—চুম্বন

বিশ্বের এই আদিম আবিষ্কার আর এক তরুণীকে বহু-ঈপ্সিত সৌভাগ্যের অধিকারিণী করেছিল অতি সম্প্রতি। তিনি হলেন ত্রয়োবিংশতি বর্ষীয়া ব্রিটিশ ললনারূপসী অলিভিয়া ব্লাইডেন। দন্ত-চিকিৎসকের ক্লিনিক-এ তিনি নার্সের কাজ করেন। মহাকাশ বিজয় অভিযানের অগ্রদূত কৃশ তরুণ স্বর্গ-ফেরা সপ্তবিংশতিবর্ষীয় মেজর ইয়ুরি গাগারিন পৃথিবীর বহু বহু দেশ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে যখন লণ্ডনে যান তখন একদিনের কাহিনী। গাগারিন সোভিয়েট দূতাবাস থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছেন সম্বর্দ্ধনা-সভায় যাবার জন্য তৈরী হ'য়ে এমন সময় জনতার ভীড়ে আত্মগোপন ক'রে থেকে সহসা অলিভিয়া তাঁর মৃণাল বাহু বিস্তার ক'রে গগনবাহিত এই তরুণের কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে জানালেন: গাগারিন হলেন, the most kissable man in the universe। দন্ত চিকিৎসকের ক্লিনিক-এ কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহায্য করেছিল কিনা জানি না, একখানি অনুরাগদীপ্ত সার্টিফিকেট আদম-ইভ-এর যুগ থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত কোনো প্রণয়মদির চুম্বনালসা রমণী কোনো পুরুষকে দিতে পারেন নি। অলিভিয়া আরও জানালেন, 'ওহো, অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত আর মনোরম এই চুম্বন, তাঁর (গাগারিন) সম্বন্ধে আমি অধীর-প্রমত্ত, সারা জীবন মনে থাকবে এই মধুর অভিজ্ঞতা'। কিন্তু হায়, এই অধীর অধর—'অমিয় গরল ভেল' গাগারিন-এর কাছে। এই আকস্মিক ওষ্ঠপীড়নে তিনি বিব্রত, অলিভিয়ার আবেগ থরো থরো চুম্বনের প্রতিদান তিনি দেননি। সেই অনুরাগরঞ্জিত মুহূর্ত্তে তবে কি তাঁর মনে এই কথাই উদিত হয়েছিল?

'I fear thy kisses, gentle maiden,
Thou needest not fear mine.'

(Shelly : To—I fear thy kisses.)

কিন্তু এ বরাভয় মন্ত্রও গাগারিন দেননি। তাহলে ত প্রতিদান দিতে পারতেন! এমন অযাচিত, অনাকাঙ্খিত চুম্বন ক'জন পুরুষের ভাগ্যে জোটে? আর ভয়? সে কি রাজনীতির? পুঁজিবাদী দেশের মেয়ের চুম্বন ব'লে? অথবা ইয়ুরি বিবাহিত, তাই? কিন্তু ইয়ুরির অধরে নিটোল চুম্বনরেখা অঙ্কিত ক'রে বীরাঙ্গনা অলিভিয়া হয়ত আশা করেছিলেন গাগারিন্-এর উত্তর:

'I understand thy kisses and thou mine,
And that's a feeling disputation'.

(Shakespeare : Henry 1V, part 1, Act 111. Scene 1, line 204)।

কিন্তু কোনো উত্তর আসেনি গাগারিন-এর কাছ থেকে। তিনি বোধ হয় স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি উৎসুক অগণিত চক্ষুর অন্তরালে তাঁর জন্য এক তরুণী 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে' অবস্থায় চঞ্চল অধর নিয়ে সেই নিবিড় লগ্নটির জন্য প্রতীক্ষারত। পূর্ব্ব হ'তে আমন্ত্রণ সেখানে ছিল না। তবু বিশ্বের সবচেয়ে চুম্বনার্হ ব্যক্তিটির আতপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ চিরকালের জন্য সঞ্চয় ক'রে নিয়ে গেলেন অলিভিয়া তাঁর প্রণয়পুটে, যাবার সময় প্রণয়পীড়িত হতাশায় হয়ত তিনি সেক্সপীয়রের ভাষায় বলতে বলতে গেছেন 'The kiss yon take is better than you give.' (Shakespeare ; King Richard 111, Act 1V, Scene 5, line 38)।

বিদেশী ব'লে এবং ভিন্‌দেশী মেয়ের দেওয়া ব'লে যে সম্পদ তিনি তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে চ'লে গেলেন তার জন্য স্বদেশবাসীর কাছে কিংবা শ্রীমতীর কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হোত কি না বা গাগারিন তা' দিয়েছেন কি না আমরা জানি না। আমরা যা' জানি তা'ও কল্পনার সঙ্গে মিলবে না। আমরা সহজেই কল্পনা করব এই আকাশ অভিযাত্রী স্বামীর মর্ত্ত্যের মৃত্তিকায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর গাগারিন-এর স্ত্রী শ্রীমতী ভ্যালেণ্টিনা-র মনের অবস্থা এবং ভাবভঙ্গী হ'য়ে থাকবে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতায় বর্ণিত কবিজায়ার মতই:

'কবির ললনা আধখানি বেঁকে
চোরা কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে
পতির মুখের ভাবখানা দেখে
মুখের বসন ফেলি'
উচ্চ কণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া
পড়িল তাহার বুকে ;
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া
কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া
শতবার করি' আপনি সাধিয়া
চুম্বিল তার মুখে।'

না, তা'ও নয়। বিশ্বের সব চেয়ে চুম্বনার্হ পুরুষ বাহিরের রমণীকে ব'লে এলেন বটে—

'দার খুলে দাও সখী, ওই বাহু পাশ
চুম্বন মদিরা আর করায়ো না পান।' (রবীন্দ্রনাথ : বন্দী)

ঘরের রমণীর কাছেও এরই কিছুকাল আগে তাঁকে হয়ত বলতে হয়েছে :

'কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বন তৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর!' (রবীন্দ্রনাথ : মোহ)

স্বর্গজয়ী গাগারিন্-এর মানব-দুর্লভ কীর্তির অনুরাগ পীড়িত স্বীকৃতি মেলেনি শ্রীমতী গাগারিন-এর কাছ থেকে। শ্রীমতী ভ্যালেণ্টিনা মোটে জানতেনই না স্বামীর এই মর্ত্ত্য ছেড়ে স্বর্গধামের সন্ধানে যাওয়ার কথা। আকাশের ঠিকানা খুঁজতে যাওয়ার প্রসঙ্গ মেজর তাঁর স্ত্রীকে মোটে বলেনইনি। ভ্যালেণ্টিনার ভাষায়, 'উনি এত বড় খবরটা চেপে গিয়েছিলেন তার কারণ, উনি আমাকে কঠিন উদ্বেগের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যেতে চাননি, কেন না তখন আমি যে মা হ'তে চলেছি।' কিন্তু মেজর এই অমর্ত্ত্য কৃতিত্বের আশাতীত পুরস্কার পেয়েছেন দেশপ্রধান নিকিতা ক্রুশ্চেভের কাছ থেকে, দেশবাসী অগণিত জনগণের কাছ থেকে। মর্ত্ত্যে ফেরার পর প্রথম সন্দর্শনে ক্রুশ্চেভ চুম্বনে আলিঙ্গনে ছেয়ে ফেলেছিলেন নবীন এই কলম্বাসকে। তার ফলে মেজরের চক্ষু হ'য়ে ওঠে অশ্রু সজল। শ্রীমতী গাগারিন-এর অকুণ্ঠ প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করার পর ক্রুশ্চেভ আবারও চুম্বন করলেন গাগারিন-কে। হেলিকপ্টার থেকে অবতরণকালে এবং তারপর সহাস্যবদন এই পুরুষটিকে সোহাগে চুম্বনে, আদর-অভিনন্দনে পাগল ক'রে দিলেন সমবেত সোভিয়েট জনগণ, আপামর জনসাধারণ চুম্বনে তবে বিরাগ বা বীতরাগ কই। মেজর গাগারিন? তিনি নিজেও তো দু'নম্বর আকাশ বিহারী মেজর টিটভ-এর যাত্রার প্রাক্কালে এক শুভেচ্ছা বাণীতে জানিয়েছিলেন : 'সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। পুরোনো দোস্ত, আমি তোমায় আলিঙ্গন জানাই, পাঠিয়ে দিলাম চুম্বন।' স্বদেশের পুরুষপুঙ্গবদের প্রাত্যহিকতায় ম্লান চুম্বনে যাঁর এত অনুরক্তি, ভিনদেশী মেয়ের আবেগ-স্ফুরিত ওষ্ঠপীড়নে তাঁর এই নিষ্ক্রিয়তা, এই নিঃসাড়তা কেন? এতই কি তাঁর ভেদাভেদ বা পাত্রাপাত্রজ্ঞান? অথবা বিশ্বের সবচেয়ে চুম্বনার্হ পুরুষটি নিতান্তই বেরসিক? রসিক নাগর তিনি নন মোটেই।

'Stolen kisses are always sweeter,' বলেছেন লে হান্ট (Leigh Hunt : The Indicator)। কাজী একে বলেছেন, 'চুম-চুরির অভিসার'। এই চুম-চুরির অভিসার-এর অত্যন্ত বাস্তবানুগ বর্ণনা দিয়েছেন রায়গুণাকর :

'কামিনী যামিনী মুখে, নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে,
ধীর শঠ তার মুখে, চুম্বিতে চুম্বন সুখে,
ধীরে ধীরে কর্দ্দোরফ্‌থ্।
নিদ্রা হোতে উঠে নারী, অলসে অবশ ভারি,
আরসিতে মুখ হেরি' চুম্ব চিহ্ন দৃষ্টি করি,
ভাবে ভাল কর্দ্দোরফ্‌থ্।'

কর্দ্দোরফ্‌থ্ অর্থে করিয়া গেল। কিন্তু কবি যাই বলুন না, এই 'অভিসার' সুবিশাল উচ্চতা কিংবা সুগভীর নির্জ্জনতা থেকে টেনে আনে আদালত-কক্ষে। ন্যায়নীতিদের চোখে প্রণয়ের অঞ্জন নেই। তারই পরিচয় পাই আমরা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। এই কিছুকাল আগে এমনিধারা দু'টি বিবরণ আমরা পড়েছিলাম : একটিতে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের ছয় সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কৃষ্ণনগরে বড় দোল মেলায় এরা দু'জন 'কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষ-চূড়ে' অবস্থায় নাগর-দোলায় দোল খাচ্ছিল। একে বড় দোল, তায় নাগর-দোলার দোল, মনে তখন 'দোল দোল হিন্দোল'। সেই অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাদের অসংযত বাহু এবং কিশলয় অধর অত্যন্ত নিবিড় এবং অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে। তাবা পৃথিবীর এই নিবিড় অন্তরঙ্গতা এড়ায়নি পুলিশ কনষ্টেবলের পাহারারত চোখ, সে 'চপলমতি'দের টেনে নিয়ে গেল আকাশ-প্রাঙ্গণ থেকে আদালত-প্রাঙ্গণ-এ। 'অভিসার' অবিমৃষ্যকারিতার জন্য শাস্তি পেল, যদিও এই অবিমৃষ্যকারিতা তারা দু'জনই মেনে নিয়ে আইনের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। আর একটিতে প্রণয়ীযুগলের প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা ক'রে জরিমানা অথবা অনাদায়ে উভয়েরই সশ্রম কারাদণ্ড-এর আদেশ হয়। এরা অবশ্য আক্কেলসেলামি দিয়েই অব্যাহতি পায়। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পিছনে নিভৃত নিরালায় পুষ্করিণী তীরে গোধূলির তিমির লগ্নে। নির্জ্জনতা উপভোগ করতে করতে এরা গুটিগুটি এগিয়ে চলে মন্দির-পশ্চাতে। সেখানে উভয়ে 'অধর-মধু যোগায় বিরলে সুমৃণাল ভুজে বাধি দোঁহা', কিন্তু তাদের পিছু পিছু অনুসরণ ক'রে চলেছিল এক জোড়া সতর্ক চোখ। 'অগ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে হে সোহাগে, পায় যদি সোহাগায়!' উদ্যতচক্ষু দারোয়ান ধ'রে ফেলল, তারা স্বীকার করল, কিন্তু জানাল, তারা স্বামী-স্ত্রী। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সোহাগসুধা বর্ষণের কোন স্থান-অস্থান, কালাকাল নেই এদের মতে। কিন্তু আদালত একমত হ'তে পারলেন না এদের সঙ্গে। তাই অপরাধ স্বীকৃতি সত্ত্বেও দণ্ডাদেশ হ'য়ে গেল। আদালতে অবশ্য আরও একটা স্বীকৃতি পাওয়া গেল এদের কাছ থেকে—আসলে এরা স্বামী-স্ত্রী নয়, যদিও উভয়েই বিবাহিত অর্থাৎ উভয়েরই পরকীয়া প্রেম নিকষিত হেম না হ'য়ে আক্কেলসেলামি হ'য়ে দাঁড়াল।

বিলিগ্রাহাম একবার ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ সফর ক'রে এসে বলেন, লণ্ডনের পার্কে পার্কে দম্পতীদের যে অবস্থায় দেখা গেল, তাতে মনে হোল তাঁরা যেন নিজেদের নিভৃত, নিরালা শয়নমন্দিরে অবস্থান করছেন। তাঁর নিজ দেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে বিলিগ্রাহাম নীরব। কিন্তু আমরা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তিনটি খবর দেখছি।

সেখানে বড় বড় সহরে খোলা-হাওয়ায় রোমাল-পর্ব্ব দম্পতীদের কাছে বিশেষ প্রিয়, কিন্তু এবার থেকে এই বিলাসিতার মূল্য দিতে হ'বে তাঁদের ডলার-এ, যদি তাঁরা সাধারণের ব্যবহারের জন্ম নির্দ্দিষ্ট পার্কের বেঞ্চিতে বসে চুম্বন-আলিঙ্গনাদিতে মেতে ওঠেন। শিকাগোতে পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে দম্পতীরা 'পরশে পরশে দোঁহে করি' বিনিময়, মরিব মধুর মোহে দেহের দুয়ারে' ইচ্ছা করলে কেউ তাঁদের বাধা দেবে না, কিন্তু জরিমানা দিতে হবে বেশ কিছু ডলার, এই সঞ্চিত ডলার ব্যয় করা হবে এই পার্কেরই রক্ষণাবেক্ষণের জন্ম। বিজ্ঞানী যে দেশে চুম্বনকে মেপেছেন Ohm-এর সাহায্যে, আইন সেখানে মেপেছে ডলারের সাহায্যে এই চুম্বনকে। আবার মেক্সিকো সহরের ব্যবস্থা অন্তরকম। সেখানকার বিমান-বন্দরে স্থানীয় সরকার তৈরী করিয়েছেন যাকে বলা হয় 'কিসিং রুম' বা চুম্বন-ঘর। মেক্সিকোর সরকার চুম্বনকে একটি সুপবিত্র মর্য্যাদা দিয়েছেন। বিমান ছাড়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিদায় গ্রহণকারী দম্পতী কিংবা প্রণয়ীযুগলের সোহাগসুধাপান যেন শেষ হতে চায় না। এই দীর্ঘায়িত বিলম্বিত লয়ের 'দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করা' বিমান-বন্দরে উপস্থিত অন্যান্য দর্শকের কাছে 'শিস্' দেওয়ার বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়। এই সব বিরল মুহূর্ত্তকে অব্যাহত এবং সঙ্গোপন করার জন্যই এই সুমধুর ব্যবস্থা। 'চুম-চুবির অভিসার' আবার অতর্কিত এবং অবাঞ্ছিতও হতে পারে। মার্কিন্ মুল্লুকে হয় তা হামেশাই। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে চুম্বন করার অভিযোগ আনেন এক তরুণী এক তরুণের বিরুদ্ধে। এই মামলার বিচক্ষণ বিচারক রায় দিতে গিয়ে প্রশ্ন তুললেন: 'প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা না করা পর্য্যন্ত কি ক'রে একটি ছেলে বুঝবে যে, মেয়েটির চুম্বনে অরুচি কি রুচি আছে?' আর একজন বিচারক এই প্রশ্নে সায় দিলেন। ঐ দেশেরই ডিট্রয়েট সহরে 'মিতা' ভাবাপন্ন এক অফিস-মনিব তাঁর সেক্রেটারীকে নিরালায় সঙ্গোপন সোহাগসুধা বর্ষণ করলেন। আর যায় কোথা! মহিলা সবেগে লাফিয়ে উঠে, সজোরে তাঁর পেটেপিঠে ধাক্কা মেরে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দয়, সুযোগসন্ধানী 'মনিব'-এর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলেন। বিচারে বিচারপতি দোষ দেখলেন মহিলারই, তাঁর এই কাজ মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামারই নামান্তর এবং মার্কিন্ যুক্তরাষ্ট্রে সেই প্রথম বিচারক কর্ত্তৃক স্বীকৃত হোলো সেক্রেটারীর কাছ থেকে 'মনিব'-এর চুম-চুবির অব্যাহত অধিকার। ম্যাসাচুসেটস্-এ একবার এক তরুণ তার মোটরগাড়ীতে এক তরুণীকে 'লিফ্‌ট' দেয়। গাড়ীতে তুলে নেওয়ার দরুণ সৌজন্তের প্রতিদান আশা করেছিল এই অবিবেচক তরুণ। প্রতিদান না পেয়ে প্রতিফল পেল সমুচিত। তার চুম্বন-চেষ্টার সাড়া না দিয়ে তরুণী প্রচণ্ড আঘাত হানল তার পাঁজরে, গাড়ী বানচাল হ'য়ে গড়িয়ে গেল রাস্তার ধারে। যদিও তরুণীর নিজের আঘাত তেমন গুরুতর হয়নি, তবু সে গাড়ীর চালক ঐ তরুণটির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা জুড়ে দিল। কিন্তু এ মামলায় তরুণীর অবশ্যম্ভাবী হার অনিবার্য্য হ'য়ে গেল। বিচারকের মতে, তরুণীর চুম্বন-প্রত্যাখ্যানের ফলেই এই মোটর-দুর্ঘটনা ঘটেছে। এইরকম ব্যাপারগতিক দেখেশুনেই বোধ হয় বাল্টিমুর সহরে গৃহস্থের সংসারে কাজ-করা সাধারণ দাসী-পরিচারিকারা মিলে 'ইউনাইটেড ডোমেষ্টিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' তৈরী করেছে। বহু লক্ষ্যের মধ্যে তাদের একটি ধ্রুব লক্ষ্য হোল, গৃহস্থালীতে কাজ-করা, দাসী-পরিচারিকাকে রক্ষা করা, তাকে সম্মান দেওয়া, গৌরবান্বিত করা। আর যে কাজটি সর্ব্বাগ্রে করার জন্য তারা কৃতসংকল্প তা হোল, এই 'চুম-চুবির অভিসার' স্পৃহাকে চিরদিনের জন্য নির্ম্মমভাবে দমিত ক'রে রাখা।

লণ্ডনের পার্কে পার্কে চুম্বন-বিলাস প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে আর একজন পর্য্যটকের তীব্র সমালোচনায়। তিনি হলেন ইয়ুরি ঝুকিম, মস্কোতে টেলিভিশনে তিনি ধারাবিবরণী দিয়ে থাকেন। সোভিয়েট দেশে ফিরে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'তোমাদের প্রেমার্ত্ত দম্পতীরা খোলা পার্কে পার্কে যে ব্যবহার করেন (সাধু ভাষার এই ক্রিয়াপদ ছাড়া আর উপায় কি!) তা বড়ই অসঙ্গত এবং অশোভন। কিন্তু মস্কোতে আমাদের প্রেমার্ত্ত দম্পতীদের ব্যবহার অনেক বেশী সঙ্গত এবং সংযত। এখানে আমি যে ব্যবহার দেখেছি তা' কিন্তু মস্কোর কোনো পুলিশ বরদাস্ত করত না। তা' ব'লে স্বাভাবিক কারণেই তাদের গ্রেপ্তারও করত না। প্রেমের নিগড়ে বদ্ধ কোনো অল্পবয়সী দম্পতীকে রুশদেশের কোনো পুলিশই কখনো গ্রেপ্তার করে না, করবেও না। কিন্তু পুলিশ তাদের সচেতন-সতর্ক ক'রে দিয়ে যাবে দম্পতীর অবস্থান সম্বন্ধে, হয়ত ঐখানেই ঐ দম্পতীকে স্থানাস্থান জ্ঞান দিয়েই জরিমানাও ক'রে ছাড়বে, কারণ আমাদের দেশে পুলিশের এই জরিমানা করার ক্ষমতা আছে। প্রত্যেক দম্পতীকে অন্ততঃ তিন রুবল্ ক'রে জরিমানা করবে, অর্থাৎ ব্রিটেনের প্রায় এক পাউণ্ডের মত।' এই ব্যবস্থার সঙ্গে শিকাগোর পার্কের কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সোভিয়েট দেশে এ ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা বলবৎ আছে। চুম্বন-বিরোধী অভিযানকল্পে বড় বড় পোষ্টার-এর সাহায্যে চুম্বনাতুর দম্পতী বা প্রেমিক-প্রেমিকাকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়। পোষ্টার-এর সতর্কবাণী এইরূপ: 'চুম্বনের পূর্ব্বে চিন্তা করো'। এই প্রাচীরপত্র ছাড়া একটি চুম্বন-বিরোধী সংস্থা বা 'এ্যান্টি-কিসিং লীগ'ও গঠিত আছে। এই সংস্থার শাখাকেন্দ্র আছে প্রতিটি বড় বড় সহরে, এই সংস্থার কাজ হোল শুধু নজর রাখা, যাতে পার্কে পার্কে যৌবনোচ্ছল প্রেমার্ত্তরা চুম্বনে লিপ্ত হবার পূর্ব্বে সতর্ক ও সাবধান হ'য়ে সে সুযোগ লাভ থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখে।

প্রকাশ্য স্থানে এই অধর-মধু পান ইতালীতে মাত্র চারশো বছর আগেও প্রাণদণ্ড হবার মত অপরাধ ব'লে গণ্য হত। এখন প্রাণদণ্ড হয় না বটে, তবে গুরুতর অপরাধ ব'লে পরিগণিত হয়। অথচ ইতালীয় দণ্ডবিধির কোথাও কোনো ধারাতেই 'চুম্বন' শব্দটি নেই। প্রাচীন রোমে প্রকাশ্যে এই চুম্বনকার্য্য আইনে নিন্দিত হয় প্রথম, যখন নিজ কন্যার উপস্থিতিতে পত্নীকে চুম্বনের অপরাধে ম্যান্‌লিও কলঙ্কিত হন। রোমানদের মতে, চুম্বন তিন প্রকার: 'অস্কিউলাম,' অর্থাৎ গণ্ডদেশে অধর স্পর্শ, এটি স্নেহসূচক; 'বেসিয়াম,' অর্থাৎ অধরে অধরসঙ্গম, এটি প্রণয় ব্যঞ্জক; আর 'সুয়াভিয়াম,' এটি অধরে অধরে হ'লেও আরো বেশী জোরালো, এটি ইন্দ্রিয়-উদ্দীপক। চুম্বনের এই প্রকারভেদ প্রকাশ্যে চুম্বন সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচারকদের মনোভাব নিয়ন্ত্রিত করে আজও। ফ্রান্সে রাস্তার মোড়ে কিংবা ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে 'চুম-চুবির অভিসার' হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু ইতালীর রাস্তায় বা পার্কে বা প্লাটফরমে এটি হবার জো নেই। তা হলে পুলিশ আর রক্ষে রাখবে না! এক চুম্বন তখন শত জ্বালা হ'য়ে উঠবে। কোনো কোনো সহরে চুম্বন-বিরোধী হানাদার দল অর্থাৎ 'এ্যান্টি-কিস

প্যাট্রোল' সব সময় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ছবিঘর-এ, বিভিন্ন প্রকাশ্য স্থানগুলিতে। এদের নৈশ অভিযান আরও বিভীষিকাময়। রাস্তায় কোনো মোটরগাড়ী দাঁড়িয়ে থাকলে এই টহলদারী দল তাদের নিজেদের গাড়ীর হেডলাইট জ্বালিয়ে সেই তীব্র আলো ফেলে দেখে নেয় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীতে কেউ নিষিদ্ধ অবস্থায় আছে কিনা। পার্কের বেঞ্চির ত আর কথাই নেই। এরা যেন প্রেমের মাঝারে মূর্ত্তিমান কণ্টক! এই ইতালীতেই ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে (ইতালী তখন স্পেনের শাসনাধীন ছিল) দুর্দ্ধর্ষ আইন-রচয়িতা প্রিন্স অব ভেনিস্ পিয়েত্রো দি ল্যাগো তাঁর নিজ পুত্রের প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেন এবং এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করান। এই পুত্র ছিল তাঁর পরম প্রিয়, বহু আদরের। পুত্র অপরাধ করেছিল অমার্জ্জনীয়, সে প্রকাশ্য রাস্তায় একটি যুবতী স্ত্রীলোককে চুম্বন করেছিল।

আজকের ইতালীতে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ব'সে লালসাময় চোখের সামনে চুম্বন ভরা ছায়াচিত্র দেখার ব্যাপারে কোনো বিধি নিষেধ নেই, কিন্তু চিত্রে এই চুম্বন-দর্শনের অবাধ স্বাধীনতায় উল্লসিত হ'য়ে উদগ্র কামনাকে রূপ দিতে চাইলে সাঘাতিক বিপদ অনিবার্য্য। সাধারণ পোষাক প'রে পুলিশ প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে সতর্ক পাহারায় মোতায়েন। প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকার তাদের শাণিত দৃষ্টিকে ম্লান করতে পারে না। চিত্রায়িত চুম্বনের বাস্তবে পুনরাভিনয়ের জরিমানা অতি গুরুতর, আর শুধু অর্থদণ্ডেই শাস্তির শেষ নয়, এ ছাড়া আছে শ্রীঘরে দু'এক রাত্রিবাস। একে বলা হয় ওখানে 'উত্তাপ ঠাণ্ডা করার' প্রক্রিয়া।

জাপান-এ ওষ্ঠ পীড়নপূর্ব্বক চুম্বন পর্ব্বটির প্রতি প্রধানরা এত বেশী বিরক্ত যে, পাশ্চাত্য ছায়াছবির আসল চুম্বন দৃশ্যগুলি নির্মম ভাবে ছেঁটে বাদ দেওয়ার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু তবু আমেরিকার প্রভাব বর্ত্তমানের জাপান-এ এত বেশী প্রকট যে নীতিবাগীশের উদ্যত শাসন সেখানে প্রায় অর্থহীন। প্রাক্-যুদ্ধ যুগের জাপান কিন্তু ছিল স্বাভাবিক, দুই চরম পথের মধ্যপথবর্ত্তী। তার পরিচয় পাই এক তরুণীর প্রার্থনায়, জাপানী কবি য়োনে নোগুচির 'বরভিক্ষা' কবিতায়:

"দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে,—
যে চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
ঊষার অরুণ মুখে,
চুম্বনে যার তরুণী ওহারু
নারী হবে রাতারাতি।"
ওহারুর চোখে চন্দ্রমল্লি,
চুলে চেরি-ফুল পাঁতি।" (অনুবাদ: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

ইন্দোনেশিয়ার 'স্বর্গ'-দ্বীপ বালি। এখানে সর্ব্বপ্রকার আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। প্রকাশ্য স্থানে এমনকি নিজের বাড়ীর নিভৃতেও হাতে হাত দেওয়াও প্রেমিক-প্রেমিকা বা বিবাহিত দম্পতীর পক্ষে ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ, অধরে অধরে স্থাপন ত দূরে স্থান। কিন্তু বালি-র অধিবাসীরা নিজস্ব একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি আবিষ্কার ও চালু করেছে। একজন বিদেশী পর্য্যটকের বর্ণনায়: 'দয়িত তাঁর মুখখানি নিয়ে যান সন্তর্পণে এগিয়ে তাঁর দয়িতার মুখের কাছাকাছি, উভয়ে উভয়ের সৌরভ গ্রহণ করেন নিঃশ্বাসে।' অর্থাৎ স্পর্শনে নয়, আঘ্রাণে।

পশ্চিম জার্ম্মাণীর মেয়েরা বছরে একবার ক'রে মাতোয়ারা হয়, যাকে বলা চলে, 'চুম্বন-উৎসব-এ।' একে বলা হয় 'কিসিং কার্নিভ্যাল।' সারা রাইনল্যাণ্ড জুড়ে, বিশেষ ক'রে কোলোন এবং বন সহরে নির্দ্দিষ্ট পর পর চার রাত্রি ধ'রে চলে এই অদ্ভুত উৎসব, সারারাত্রব্যাপী। ধর্ম্মীয় উৎপত্তি, এটা চলে আসছে মধ্য যুগ থেকে। দীর্ঘদিনের সুপ্রাচীন এই 'চুম্বনের অবাধ স্বাধীনতা' উপভোগে যোগ দেন সারা দেশের নরনারী, সেই সঙ্গে বিদেশ থেকে আগত বহু সংখ্যক অতিথি—অভ্যাগত জন। এই যথেচ্ছ চুম্বন-বিহারের নায়ক হতে পারেন যে কেউ, হতে পারেন নিজের স্বামী, অন্যের স্বামী, নিজের 'বালক-বন্ধু' কিংবা অপরার। পতি বা প্রণয়ী বিনিময়ে তখন বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকে না। নাম-না জানা পুরুষেই বা কিবা আসে যায়! কবি সুইনবার্ণ-এর ভাষায়:

'And the best and the worst of this is
That neither is most to blame,
If you have forgotten my kisses,
And I have forgotten your name.'
(A. C. Swinburne: An interlude.)

মেয়েদের দিক থেকে এই চুম্বন-লুঠ-এর বর্ণনাই যেন মিলে যায়। অথবা এই চুমোচুমির সঠিক বর্ণনা হোল:

'রমণী বিদ্যুৎ বেগে ছুটিয়া পড়িয়া
বন্যার তরঙ্গ সম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্ত বেশবাসে
আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘন নিশ্বাসে
সর্ব্ব অঙ্গ তার।' (রবীন্দ্রনাথ: পরিশোধ)

এই চুম্বন-আক্রমণ থেকে ঐ নির্দ্দিষ্ট চারটি দিন নিস্তার নেই কারও, রাষ্ট্র কর্ণধার আইনজীবী, বিচারক, বিজ্ঞানী, পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকর্ত্তা থেকে সাধারণ কনষ্টেবলটি পর্য্যন্ত। কালাকাল, পাত্রাপাত্র, স্থানাস্থান ভেদ নেই। সেখানে পুরুষের জন্য আছে, যাকে নজরুল বলেছেন 'চিত্ত-চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর' আবার 'চুম্বন-ভরা সরস বিম্বাধর', তা'ও আছে। আর সেই সঙ্গে উদ্দামে লুটোপুটি:

'She kissed his brow, his cheek, his chin,
And where she ends she doth anew begin'.
(Shakespeare: Venus and Adonis)

দিগ্‌ভ্রান্তা উদ্‌ভ্রান্তা চুম্বন-পিয়াসী বিলাসিনীদের পরণে আঁটসাঁট নাইলনের পোষাক, রঙীন এবং ঝলমলে। পথিমধ্যে তাদের চুম্বন-বর্ষণে বহুলোক অতিষ্ঠও হ'য়ে ওঠে, চুম্বনের আস্বাদন অধরে লেগে থাকে না, লেগে থাকে প্রচুর পরিমাণ 'ঠোঁটের সিঁদুর' অর্থাৎ লিপষ্টিক। কোলোন সহরের উত্তেজনা আরো বেশী। পথেঘাটে, অলিতে গলিতে, পানালয়ে, নাচঘরে, ক্লাবে সর্ব্বত্রই এই চুম্বন-তৃষিত অধরের মাতামাতি। পুরুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় 'চুম্বন-ভরা সরস বিম্বাধর'। পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে গেলেও পরাস্ত হয় পুরুষ। হোলির দিনে রঙ না ছোঁয়ার মতই অনিবার্য্য ব্যর্থতা জোটে এই পালিয়ে বাঁচার চেষ্টার কপালে। তা'ছাড়া কার্নিভ্যালের ক'টা দিন কোনো নারীর এই চুম্বনাদেশ অমান্য করা যে কোনো পুরুষের পক্ষেই নিতান্ত বেআইনী, এই বে-আইনী কাজের শাস্তিও চরম। নারীরা যখন চুম্বন-মৃগয়ায় বেরুবেন তখন কোনো পুরুষ পথিমধ্যে তাঁদের মৃগয়ায় বাধা দিলে অবিলম্বে তাঁকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা হবে, তা তিনি যেখানেই থাকুন, ঘরে বা বাইরে প্রকাশ্য রাস্তার মাঝখানে, আর সেদিনের তাপমাত্রা যাই হোক,

হিমাঙ্কের ২০ ডিগ্রী নীচেই থাকুক। নারীর হাতে পুরুষের প্রণয়প্রমত্ত নিগ্রহ আর কি!

লর্ড বায়রণ বলেছেন, বিবাহিত দম্পতীর চুম্বনে কোনো অন্যায় নেই অর্থাৎ নিষিদ্ধ কিছু নেই বা মাদকতা নেই:

'For no one cares for matrimonial cooings,
There's nothing wrong in a connubial kiss '
(Byron : Don Juan)

তাই তা' নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাই বোধ হয় পশ্চিম জার্ম্মাণীর এই মেয়েরা বছরের এই বহু-আকাঙ্খিত, বহু-প্রতীক্ষিত চারটি রাত্রি জুড়ে বিরল, অন্য সময়ে নিষিদ্ধ অধর-মধু পান ক'রে চলে বিরামবিহীন, 'গালে গালে চুমু গড়াগড়ি'। পশ্চিম জার্ম্মাণীর পুরুষেরা এই ক'রাত্রির জন্ম দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। 'তুমি গেলে করিতে চুম্বন, সে ফিরালো কঙ্কনের ঘায়।' তার পরিবর্ত্তে ঐসব পুরুষের কপালে ধরাবাঁধা জোটে 'অনুরাগ-বিচ্ছুরিত অজস্র চুম্বন'। ঐ ক' রাত্রিই বা মন্দ কি! কিন্তু এই উদ্দাম উৎসবেও নীতিবাগীশরা নেহাৎ চক্ষুলজ্জাতেই নৈতিকতার প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা বিধান জারি করেছেন সারারাত্রি ধ'রে স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকার দল যত খুশী যাকে খুশী যতক্ষণ খুশী চুম্বনে বিবশ ক'রে রাখুক, পরদিন সকাল সাতটা বাজলেই তাদের নিজ নিজ দয়িত-দয়িতা বা প্রণয়ী-প্রণয়িনীকে নিয়ে গৃহে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তবু এই উৎসব-এর জের চলতে থাকে দিনের বেলাতেও।

দু'টি অধরের এই মধুর মিলন'-এ ক্লান্তি নেই যেন পশ্চিম জার্ম্মাণীর এই সব মেয়েদের। কিন্তু পশ্চিম জগতের আর একটি মেয়ে চুম্বনক্লান্ত। তিনি হলেন মার্কিণ চিত্রতারকা গ্লোরিয়া গ্রাহাম। 'দি নেকেড এ্যালিবি' ছবিতে জেনে ব্যারী এবং ষ্টার্লিং হেইডেন-এর সঙ্গে প্রণয়দৃশ্যে অভিনয় ক'রে চলতে হয় তাঁকে পুরো এক সপ্তাহ ধ'রে। ছবিটির চিত্রগ্রহণকার্য্য তখন চলছিল। কড়ে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে নিজে অধর স্পর্শ ক'রে চিত্র সাংবাদিকদের কাছে একদিন তিনি বলেন, 'ক্লান্ত-ওষ্ঠাধর মেয়ে বলতে পাবেন আপনারা আমাকে। ছবিতে আমি ভারী জবরদস্ত মেয়ে আর যে বান্দা ছবিতে আমার প্রেমে মজেছে সেও খুব দুর্দ্ধর্ষ, কাজেই ছবিতে আমাদের প্রণয়পর্ব্ব প্রচণ্ড রকমের। অভিনয়কালে মহড়া নিয়ে ছাপ্পান্নটি উত্তপ্ত চুম্বন এই অধরে গ্রহণ করতে হয়েছে।···সে যাই হোক এটা মোটেই আমার অভিযোগ নয়। চিত্রদর্শকরাও আমাদের এই চুম্বন উপভোগ করেন।' হলিউডের ছবিতে বর্ত্তমান যুগে রেকর্ড হোল চিত্রনটী পাইপার লরি-র। একটিমাত্র দিনে তাঁর চুম্বনসংখ্যা হোল গুণে গুণে পাঁচশো চব্বিশ! তাঁর অংশীদার ছিলেন স্কটি বেকেট। 'লুইসা' ছবির জন্ম স্ক্রীন-টেষ্ট দিতে গিয়ে পাইপার লরি এই নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। নির্ব্বাচনী পরীক্ষায় চরম ও অক্লান্ত কৃতিত্ব সন্দেহ নেই! বিশ্বরমা বহুজনবল্লভা গ্লোরিয়া গ্রাহাম বা পাইপার লরি কিংবা অন্যান্য চিত্রনটীরা চুম্বনক্লান্ত হ'লে বিশ্বের চিত্রদর্শকদের কি গতি হোত!

নীতিবাগীশদের চেয়েও তীব্রতর সাবধান-বাণী শুনিয়েছেন সম্প্রতি মার্কিণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীরা। তাঁদের গবেষণায় ধরা পড়েছে চুম্বন-বিরোধী তথ্যসমূহ। তাঁরা বলেছেন: 'চুম্বনক্রিয়া একটি অতি বিপজ্জনক অভ্যাস এবং অতীব মারাত্মক। প্রতিটি চুম্বন দেওয়া-নেওয়ার দরুণ চুম্বিত এবং চুম্বনকারী উভয়ের আয়ু তিন মিনিট ক'রে কমে যায়! এই হিসাব থেকে নিছক গণ্ডময় যে সত্যটি উঁকি দেয় তা হোলো যে প্রতি চারশ' আশিটি চুম্বনের পরে জীবনের মেয়াদ পুরো একটি দিন কমে যায়।' বহু চিকিৎসকের মতে, অধর-মধুপান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং শীতের কয়েক মাস সবাইকে তাঁরা পরামর্শ দেন বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে চুম্বন বিনিময় করার। সাধারণ সর্দ্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং অন্যান্য এই ধরণের রোগবীজ-এর প্রসার-নিরোধক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রকৃতপক্ষে বহু বহু সংখ্যক রোগবীজ প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের ফলে স্থানান্তরিত হয়। একজন ব্যাক্টিরিয়া তত্ত্ববিদ্ বলেছেন, 'অধর-মধু অগণিত সংখ্যায় বহু প্রকারের রোগবীজবাহক। চুম্বন বিনিময়ের ফলে উভয়ের মধ্যে বহু সংখ্যক, বহু প্রকারের রোগবীজ আদান-প্রদান হয় মাত্র।' ডাক্তারেরা যা' বলেন বলুন নাকো তবু চিরকাল কবি-সাহিত্যিকেরা এই অধর-মদিরার জয়গানে মুখর হয়েছেন। সেকালে বলেছেন:

Sweet Helen, make me immortal with a kiss!
Her lips suck forth my soul : see, where it flies!
(Christopher Marlowe : Doctor Faustus)

আর একালে বলেছেন:

'নিশপিশ ঠোঁট যার, মিঠা কিস্‌মিস্,
জাফ্রাণ গালে তারি দিস চুমা দিস;
ঘুম ঘুম আঁখি সেথা রচে ঘুমবন,
কুমকুম গালে সেথা দিস চুম্বন।
আলুথালু যেথা বালা, আবেশে বিভোর,
পাঠাইয়া দিস্ সেথা-চুম্বন-চোর।
নন্দিত গন্ধিত, পুষ্পিত বন,—
তরুণীর তনু কাঁপে মন্ উন্মন্,
থম্‌কায়, চম্‌কায়, আঁচল উড়ে,
বুকের বসন খসে নয়ন ঝ'রে,
চুমকুড়ী, খুনসুড়ী, সোহাগে হানি'—
দিস্ তারে চুম্বনদ্রাক্ষা-ছানি'।
নরনারী পাঠাইয়া এই ধরাতে,
দিল বিধি ফুল এক দোঁহারি হাতে,
সৌরভে পারিজাত নহে তারি তুল,
স্বর্গের শোভা সেই চুম্বন-ফুল।
সেই ফুল আজো আছে ধূলির ধরায়,
ফোটে সে প্রেমিক-হৃদে, তনু শিহরায়!
মর্ত্ত্যেতে স্বর্গের অবলম্বন—
কিছু নাই, আছে সখা শুধু চুম্বন।'
(কাদের নওয়াজ : চুম্বন)

'মর্ত্ত্যেতে স্বর্গের অবলম্বন' একথা বুঝেই ডাক্তারেরাই আবার বলছেন, 'এই চুম্বনক্রিয়ার অস্বাস্থ্যকরতাকে অনেক পরিমাণে কমানো যায় ঠোঁট-মুখ সংক্রান্ত সাধারণ স্বাস্থ্যনীতি ভালোভাবে মেনে চললে। তার জন্ম নিয়মিত এবং রীতিমত মুখ ধোওয়া এবং টুথব্রাশ-এর সাহায্যে দাঁত মাজা দরকার।' একদা হলিউডে আইন ক'রে এই এই বিকল্প স্বাস্থ্যনীতি অবশ্য পালনীয় করার জন্ম বেশ কিছুকাল আন্দোলন চলে। আন্দোলনকারীরা বলেন, 'চিত্রগ্রহণের সময় প্রতিবার চুম্বনের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে প্রত্যেক চিত্রনট এবং

জটাকে বেশ ক'রে ঠোঁট এবং গলনালী ভিজিয়ে রোগ নিবারক তরল পদার্থের (prophylactic mouth-wash) সাহায্যে কুলকুচো করতে হবে।' কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে। প্রাক্-চুম্বন এবং চুম্বনোত্তর স্বাস্থ্যনীতির কথা ধামাচাপা পড়ে যায়।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা সবচেয়ে অবাক ক'রে দিয়েছেন মৃদু প্রতিষেধক বা এ্যান্টিসেপটিক্ হিসেবে লিপষ্টিক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে। অর্থাৎ ঠোঁটের সঙ্গে চুম্বনের সম্পর্ককে তাঁরা কিছুটা স্বাস্থ্যসম্মত ক'রে তুলেছেন 'ঠোঁটের সিঁদুর' বা লিপষ্টিক দিয়ে। কিন্তু এই লিপষ্টিকের ব্যবহার আবার কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তাই নিয়েও মতান্তর আছে বিস্তর। তবে অধর-মধু পানের পক্ষে লিপষ্টিক যে বিশেষ উদ্দীপক নয় বোধহয় এই কথাটাই ধ্বনিত হয়েছে লর্ড বায়রণের খেদোক্তিতে:

'The kiss, dear maid, thy
lips have left,
Shall never part from,
Mine
Till happier hours restore
the gift,
Untainted back to thine'.

আমেরিকাবাসীদের জীবনে মোটরগাড়ীর স্থান

আমেরিকাবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে অটোমোবিল বা মোটরগাড়ী গভীরভাবে জড়িত। আমেরিকায় আজ এক কোটিরও বেশী লোক এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। যাত্রীবাহী মোটরগাড়ী, বাস, ও ট্রাক নির্মাতাগণ, যারা এ সকল ক্রয় বিক্রয় করে, যারা এ সকল গাড়ীর ইন্ধন 'গ্যাসোলিন' তৈরী করে, গাড়ী মেরামত করে, চালায়—তাদের সকলকেই এর মধ্যে ধরা হয়েছে। আমেরিকার সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি বেড়ে গিয়েছে তা নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকেই আঁচ করা যেতে পারে। ১৯০০ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৮০০০ যাত্রীবাহী মোটরগাড়ী রেজিষ্ট্রী করা হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ কালে সেই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ১৬৬৪০০০টিতে এসে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সেই সংখ্যা প্রভূতপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তখন মোটরগাড়ীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৫০০০০০০টিতে এসে। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ৭২৬০০০টি মোটরগাড়ী বিক্রী হয়েছে। এই সংখ্যা নিয়ে ঐ সময়ে আমেরিকার রাস্তা ঘাটে, রাজপথে মোট যে মোটরগাড়ী চলাচল করে তাদের সংখ্যা ৬৫০০০০০০টিতে এসে দাঁড়ায়। যতদূর জানা যায় ১৭৬৯ সালেই প্রথম ফ্রান্সের কুঁগনো (Cugnot) নামে জনৈক ব্যক্তি মোটর চালিত গাড়ী আবিষ্কার করেন। ঘোড়ায়টানা গাড়ীর স্থলে ইঞ্জিনচালিত গাড়ীর তখনই আবির্ভাব ঘটে। তারপরের শতাব্দীতে ফ্রান্সে, জার্মাণীতে, ইংল্যাণ্ডে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এর ধীরে ধীরে উন্নতি হয়। বর্তমানে যে ধরণের মোটরগাড়ী দেখা যায় প্রায় অনেকটা সেই ধরণেরই পেট্রোল বা গ্যাসোলিন চালিত মোটরগাড়ী প্রথম নির্মিত হয় জার্মাণীতে ১৮৯৪ সালে। জার্মাণীর ক্রেবস কোম্পানী এই মোটরগাড়ী নির্মাণ করেন। তারপরে ধীরে ধীরে এর আরও উন্নতি হতে থাকে। ১৯২০ সালে হেনরী ফোর্ড তাঁর ডিট্রয়েটস্থিত কারখানায় সস্তা অথচ মজবুত, কাজের উপযোগী ছোট এক ধরণের মোটরগাড়ী নির্মাণ করেন। তখন এদের প্রত্যেকটির মূল্য ছিল প্রায় ২৬০ ডলার। তখন থেকেই খরচের দিক থেকে সাধারণ লোকের পক্ষেও মোটরগাড়ী রাখা সম্ভব হয়, মোটর উৎপাদন ও বিক্রীর পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী দশকের মধ্যে, ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর এবং আরও শক্তিশালী গাড়ী নির্মাণের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। ১৯৫৫ ও ৫৬ সালে অতি সুন্দর বিরাটকায় গাড়ী তৈরী হয়েছে, তবে ছোট ছোট গাড়ী তখনও পাওয়া যেতো। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে চাহিদার মোড় ফিরে যায়, অল্পদামের গাড়ীর চাহিদা তখন খুবই বেড়ে যায়। নির্মাতাগণ সেই চাহিদা মিটানোর জন্ত তৎপর হন। বিশেষ করে পশ্চিম ইয়োরোপ থেকে ছোট ও অল্প মূল্যের গাড়ী আমদানীই এই ধরণের গাড়ীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ১৯৬৩ সালে কি ধরণের গাড়ী তৈরী হতে পারে? ঐ সময়ে নানা আকারের, নানা মূল্যের এবং নানা ধরণের গাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সকলের চাহিদাই যাতে পূরণ হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ১৯৬৩ সালের মডেলের পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। বর্তমানে একজন সাধারণ শ্রমিক যার গড়পড়তা সাপ্তাহিক আয় ৯৭ ডলার তার পক্ষেও একটি মোটরগাড়ী কেনা আদৌ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। গাড়ী থাকলে তার যাতায়াতের খরচও কম পড়ে, কিছুটা পয়সা বাঁচে। আর ধনীদের জন্ত তো শত শত নানা ধরণের গাড়ী আছেই। ফোর্ড মোটর কোম্পানী ৪৪ ধরণের গাড়ী তৈরী করছে। অধিকাংশ গাড়ী অনেকটা প্রায় একই রকম। তবে বিভিন্ন মডেলের গাড়ীতে বিভিন্ন রকম সুখ সুবিধা রয়েছে। ফ্যালকম নামে গাড়ীর মূল্য হচ্ছে ১৮১২ ডলার, আর লিঙ্কন গাড়ীর ৬৩৪৭ ডলার। এই দুটি গাড়ীর একটির সঙ্গে আর একটির মিল নেই। জেনারেল মোটর কোম্পানীর তৈরী গাড়ী যেমন শেভ্রলেট কমপ্যাক্টের দাম ১৮২৭ ডলার, শেভ্রলেট ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাইজের ২২১৪ এবং ক্যাডিলাকের ৯১১৬ ডলার। পশ্চিম ইয়োরোপ থেকেও আমেরিকায় মোটরগাড়ী আমদানী করা হয়। গত বছর ভক্সওয়াগেন (Volks Wagen) কোম্পানীর তৈরী গাড়ীই সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়েছে। ঐ কোম্পানী ১৯৬১ সালে বিক্রী করেছে ১৭৭০০০টি গাড়ী, চলতি বছরে ২৩০০০০টি বিক্রী হবে এবং আগামী বছরে ২৫৫০০০টি বিক্রী করবে বলে কোম্পানী আশা করছে।

প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ক্রেতা ধারে মোটরগাড়ী ক্রয় করে থাকেন। প্রথমে কিছু অর্থ দিতে হয়—একশ ডলারের কম দিলে চলে না। তারপর বাকী দেয় অর্থ সাধারণত: মাসিক ত্রিশটি সমপরিমাপ কিস্তীতে পরিশোধ্য। ব্যবহৃত পুরোনো মোটর গাড়ী ১০০ ডলার মূল্যে পর্যন্ত কেনা যায়। কিন্তু ভাল পুরোনো গাড়ীর দাম সাধারণত: ৫০০ ডলার থেকে ১৫০০ ডলারের মধ্যে হয়ে থাকে। পুরোনো গাড়ীর বিক্রীর পরিমাণ নূতন গাড়ীর বিক্রীর মত দিনদিনই বেড়ে যাচ্ছে। আমেরিকায় আজ সহরবাসী জনসাধারণ ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় বড় বড় সহর থেকে উপকণ্ঠে সরে যাচ্ছে। যেখানে তারা কাজ করে সেই স্থান থেকে কেউ বা দশ, কেউ বা পঞ্চাশ মাইল এবং কেউ বা তারও বেশী দূরে বাস করে। ফলে ঐ সকল পল্লী অঞ্চল থেকে যাতায়াতের জন্ত প্রয়োজন হয় যানবাহনের, সেখানে গড়ে ওঠে, হাটবাজার, পথঘাট, ঘরবাড়ি, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি। ফলে সমগ্র অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটে। এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উচ্চহার বজায় রাখতেও সাহায্য করে।

ক্যাপটেনের মেয়ে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(আলেকজাণ্ডার পুশকিনের The Captain's Daughter অবলম্বনে)

নয়

সকাল বেলা বেলোগরস্ক দুর্গ থেকে পুগাচেভের রওনা হবার সময় পথেঘাটে চারপাশে আর লোক ধরে না। ভিড়ের মধ্যে গ্রিনেভকে দেখতে পেয়ে ইশারা করে ওকে কাছে ডাকলো পুগাচেভ। বললো—"শোনো তুমি সোজা ওরেনবুর্গ চলে যাবে। সেখানকার গভর্ণর এবং অন্যান্য সেনাপতিদের বলবে যে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমি গিয়ে পৌঁছুচ্ছি সেখানে। আমার সম্বর্ধনার যথাযোগ্য বন্দোবস্ত যেন করা হয়; তা না হলে প্রত্যেককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হবে।"

তারপর জনতার দিকে লক্ষ্য করে শাভরিনের পিঠ চাপড়ে পুগাচেভ বললো—এই বেলোগরস্ক দুর্গের অধিনায়ক। তোমরা সবাই একে মেনে চলবে।

পুগাচেভ রওনা হয়ে গেলো। গ্রিনেভ আর কালবিলম্ব না করে ফাদার গেরাসিমের বাড়ীতে এলো ইভানোভার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। কিন্তু ও এসেই শুনলো যে কাল রাত থেকে ইভানোভা জ্বরে ভুগছে। প্রচণ্ড জ্বর। এক এক সময় ভুল বকছে। গ্রিনেভ সংজ্ঞাহীনা ইভানোভার বিছানার পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। মনে হলো বেচারী আজ একেবারেই সহায় সম্বলহীনা। না আছে বর্তমান, না আছে ভবিষ্যৎ। নিজেরও এমন কোনই ক্ষমতা নেই বর্তমানে যে ইভানোভার কোনো উপকার করতে পারে। এই সমস্ত ভাবতে ভাবতেই ভারাক্রান্ত মনে ফাদার গেরাসিমের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো গ্রিনেভ।

এর কিছুক্ষণ পরেই স্যাভেলিচকে নিয়ে গ্রিনেভও ওরেনবুর্গের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

দশ

ওরেনবুর্গ পৌঁছে বেলোগরস্ক দুর্গের বর্তমান অবস্থার কথা, গত কয়েকদিন ধরে যা কিছু ঘটেছে সেখানে একে একে সব কথাই গ্রিনেভ বললো জেনারেলকে। জেনারেল দুঃখপ্রকাশ করলেন মাত্র, কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়। পুগাচেভ যে আগামী সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ওরেনবুর্গ আক্রমণ করবে বলে ঘোষণা করেছে, সে কথা শুনে জেনারেলের কোনো ভাবান্তর লক্ষ না করে কিছুটা আশ্চর্য এবং কিছুটা বিরক্ত হলো গ্রিনেভ।

দিন কয়েক পরে জেনারেল প্রকাশ করলেন যে, পুগাচেভ আক্রমণ করলে কি করা হবে। উনি স্পষ্টই জানালেন যে, সৈন্যবাহিনীর উপর মোটেই নির্ভর করা চলে না, অর্থাৎ কিনা এখানকার সৈন্যরাও বেলোগরস্ক দুর্গের সৈন্যদের মতো প্রকৃত বিপদের সময় অস্ত্র ত্যাগ করে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। তাই শহরের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে উনি ঠিক করেছেন যে পুগাচেভ আক্রমণ করবার পর, তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রতি আক্রমণ করা হবে না। তার ঝুঁকি অনেক। বরং দৃঢ়ভাবে কিন্তু রয়ে সয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া হবে, তাতে পুগাচেভের নিজের দলেই ভাঙন ধরে যাবার সম্ভাবনা।

ওরেনবুর্গ থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে বেলোগরস্ক দুর্গ মুক্ত করা বা ইভানোভাকে মুক্ত করার বাসনা সুদূর পরাহত মনে হওয়াতে গ্রিনেভ মনমরা হয়ে গেলো। ম্রিয়মাণ ভাবে দিন গুনতে লাগলো ও।

কয়েকদিন পর পুগাচেভ তার দলবল নিয়ে সত্যি সত্যি অবরোধ করলো ওরেনবুর্গ। চলতে লাগলো দিনের পর দিন দুই দলের খণ্ড যুদ্ধ। গ্রিনেভ কোনোদিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে লাগলো, কোনোদিন বা শুধু নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ে তামাসা দেখে সময় কাটাতে লাগলো।

এমনি ভাবেই পুগাচেভের এক অনুচরের হাতে গ্রিনেভ একখানা চিঠি পেলো। ইভানোভার চিঠি। দীর্ঘ চিঠি। অনেক কথার মধ্যে ও লিখেছে: নিজের বলতে পৃথিবীতে আজ তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।......ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই চিঠিখানা যেন তোমার হাতে পড়ে।......শাভরিন ফাদার গেরাসিমের বাড়ী

থেকে আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছে তার কোয়ার্টারে।······কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে আমাকে।·····বদমায়েসটা আমাকে বিয়ে করবেই বলেছে·····চিন্তা করবার জন্তে আমি তিন দিন সময় চেয়েছি।·····তোমার যদি কিছু করবার থাকে, এই তিন দিনের ভেতরে করবে। তুমিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা।

চিঠিখানা পড়ে দিশেহারা হয়ে গেলো। একটুক্ষণ স্থিরভাবে চিন্তা করবার চেষ্টা করলো। তারপর সরাসরি জেনারেলের সঙ্গে দেখা করলো। জেনারেল জানালেন যে এ ব্যাপারে কোনো রকম সাহায্য করা বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব অর্থাৎ সৈন্ত-সামন্ত গুলী-গোলা কিছুই উনি দিতে পারবেন না।

এগারো

জেনারেলের সঙ্গে আলোচনায় সময় নষ্ট না করে গ্রিনেভ সোজা নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এলো। ও একাই বেলোগরস্ক-এর উদ্দেশ্তে যাত্রা করবে ঠিক করেছিলো কিন্তু স্যাভেলিচ তাতে কিছুতেই রাজী হ'লো না। শেষ পর্যন্ত ভগবানকে ভরসা করে স্যাভেলিচকে সঙ্গে নিয়েই গ্রিনেভ বেলোগরস্ক-এর উদ্দেশ্তে রওনা হ'লো।

কয়েকটি গ্রাম পেরিয়ে আসবার পরে একটি গ্রামে পুগাচেভের সাঙ্গপাঙ্গরা ঘিরে ফেললো গ্রিনেভ এবং স্যাভেলিচকে। ওরা জানালো সম্রাটের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনোমতেই এ পথ দিয়ে অপরিচিত কাউকে যেতে দেওয়া হবে না। এবার বলপ্রয়োগ করা আর সঙ্গত মনে করলো না গ্রিনেভ। পুগাচেভের অনুচরদের অনুসরণ করতে লাগলো বিনা বাক্যব্যয়ে।

ওরেনবুর্গ থেকে অফিসার এসেছে শুনে পুগাচেভ রীতিমতো রাজকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছিল তার কুঁড়ে ঘরের প্রাসাদে। কিন্তু গ্রিনেভকে দেখবার পর ও আর কোনো ভাণ করলো না।—আরে, তুমি? আবার কি মনে করে? সহৃদয়ভাবেই বললো পুগাচেভ।

—একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে বেলোগরস্ক দুর্গে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনার লোকজনেরা আমাকে যেতে দিলো না।

—কি ব্যাপার শুনতে পারি কি? নির্ভয়ে বলো।

—একটি অসহায় মেয়েকে রক্ষা করবার জন্তে আমি বেলোগরস্ক যাচ্ছি। ওর ওপর দারুণ অত্যাচার চলছে সেখানে।

—অত্যাচার? আমার রাজ্যে অসহায় মেয়ের ওপর অত্যাচার করতে পারে এমন সাহস কার? নাম কি তার? পুগাচেভ ক্রমশ উত্তেজিত হতে লাগলো।

—শাভরিন।

—শাভরিন? পুগাচেভের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ পেলো। একটু থেমে বললো—তা' শাভরিন যার ওপর অত্যাচার করছে সে মেয়েটি কে? তোমার কি কেউ হয়।

—সে আমার বাগদত্তা।

—বাগদত্তা? এতক্ষণে পুগাচেভের কথাবার্তা হাবভাবে আবার একটা বিচিত্র গ্রাম্যভাব দেখা দিলো—সে কথা আগে বলোনি কেন? অ্যাঁ? আমরা তোমার বিয়ে দিয়ে ভোজের আয়োজন করতাম। যা হ'ক কালকেই আমি তোমাকে পৌঁছে দেবো।

বারো

বেলোগরস্ক দুর্গের সামনেই দেখা হ'লো শাভরিনের সঙ্গে। পুগাচেভকে গাড়ী থেকে নামতে সাহায্য করলো ও। তারপর গ্রিনেভের দিকে ফিরে বললো—তুমিও তা'হলে আমাদের দলে ভিড়ে পড়েছ? ভালো কথা।

গ্রিনেভ একথার কোনো জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো অন্ত দিকে।

ভেতরে এসে দুর্গের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে দু'-চার কথার পর পুগাচেভ সরাসরি প্রশ্ন করলো শাভরিনকে—শুনলাম একটি মেয়েকে তুমি বন্দী করে রেখেছো। সে কে?

—আজ্ঞে, বন্দী করিনি তো? সভয়ে বললো শাভরিন।

—আমি দেখতে চাই তাকে।

—আজ্ঞে আপনি যেতে চান যান ভেতরে, তবে অন্ত কেউ আমার স্ত্রীর ঘরে ঢুকবে, এটা আমি চাই না।

—বিয়ে হয়ে গেছে? চীৎকার করে উঠলো গ্রিনেভ।

—আঃ, পুগাচেভ বললো গ্রিনেভকে, চুপ করো না, আমি দেখছি কি ব্যাপার। তারপর শাভরিনের দিকে তাকিয়ে কঠোরভাবে বললো, কোনো রকম চালাকি করো না, আমি দেখবো মেয়েটিকে।

ইভানোভার ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওর জীর্ণ বাস, অবিন্যস্ত কেশদাম এবং আতঙ্কজর্জর মুখ-চোখ দেখে শাভরিনকে বললো পুগাচেভ—বেশ একটা হাসপাতাল খুলেছো দেখছি। এবার আমি তোমাকে মার্জনা করলাম। তারপর ইভানোভার দিকে তাকিয়ে বললো—কোনো ভয় নেই, বেরিয়ে এসো, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। আমি সম্রাট।

ইভানোভা ওর মা-বাবার মৃত্যুদূতকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে ভয়ে সংজ্ঞাহীন হবার উপক্রম হ'লো। গ্রিনেভ দৌড়ে গেলো ওর কাছে।

পুগাচেভ আর শাভরিন বাইরে বেরিয়ে এলো।

একটু পরেই সংজ্ঞা ফিরে এলো ইভানোভার।

গ্রিনেভ বাইরে আসতেই পুগাচেভের সঙ্গে দেখা হলো। বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রিনেভ বললো—আপনাকে কি বলে ধন্তবাদ দেবো জানি না। আপনার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। আমাদের এখান থেকে যাবার একটা উপায় করে দিন। সারাজীবন আমরা আপনার জন্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো।

—জানোই তো, পুগাচেভ বললে, যাকে ঝোলাবার তাকে আমি কালবিলম্ব না করে ঝুলিয়ে দিই, আর যাকে মার্জনা করি, তাকে সত্যি মার্জনা করি। তোমরা মুক্ত। তোমার বাগদত্তাকে নিয়ে তোমরা যেখানে খুশী চলে যেতে পারো, কেউ বাধা দেবে না। আমি পাশপোর্টের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। আমার রাজ্যের যে কোনো দুর্গের দরজা তোমার জন্তে খোলা থাকবে।

ইভানোভা ওর মা বাবার কবরখানায় গিয়ে প্রণাম জানিয়ে এলো। তারপর বেলোগরস্ক দুর্গ ত্যাগ করলো ওরা।

তের

গ্রিনেভ আর ইভানোভা দু'জনেই ভাগ্যের বিচিত্র খেলা দেখে বিস্মিত, অভিভূত। যেদিন দু'জনে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেদিন

শ্রীশ্রীসরস্বতী

—ভাস্কর শ্রীরমেশ পাল

মৎস্য-আধার —বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

জলকে চল —এন, রামকৃষ্ণ

জলের ধারে খেলা —সুধাংশু মণ্ডল

জলপরী —জয়দেব দত্ত

চিত্রাঙ্কন

—দীপক ঘোষ

মনে মনে আশা রাখলেও, যুক্তির সঙ্গে যখনই চিন্তা করেছে—একথা মনে করতে পারেনি যে আবার কোনোদিন দেখা হবে। একদিন ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে যেমন দু'জনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল—আজ তেমনি সৌভাগ্যের উদয় দেখে দু'জনেই বাক্যহারা হয়ে রয়েছে। দু'জনেই চলন্ত গাড়ীতে বসে পথের এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। কিন্তু কোনো কথা বলছে না। নীরবে, নিঃশব্দে সান্নিধ্য উপভোগ করতে লাগলো।

সন্ধ্যা নাগাদ গ্রিনেভের গাড়ী আটকালো কয়েকজন পাহারাওয়ালা—কে যায়।

—সম্রাটের বন্ধু আর তাঁর স্ত্রী। গাড়োয়ান হেঁকে বললো।

—সম্রাটের বন্ধু না শয়তানের বন্ধু, পাহারাওয়ালা চীৎকার করে বললো, শীগগির নামো গাড়ী থেকে।

গ্রিনেভ বুঝতে পারলে এরা সরকারী সৈন্য, তাই বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ী থেকে নেমে ওদের সঙ্গে সোজা অফিসারদের ঘরে এসে হাজির হলো। গ্রিনেভ অবাক হয়ে গেলো সিমবিরস্কের সেই অফিসার জুরিনকে দেখে।

—তুমি এখানে? জুরিন জিজ্ঞাসা করলো।

গ্রিনেভ সব কিছু সংক্ষেপে বললো, ওকে! জুরিন-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর, গ্রিনেভ ঠিক করলো আপাততঃ ইভানোভাকে মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে যুদ্ধটা শেষ করে তারপর বাড়ী ফিরবে। ইভানোভাও রাজী হলো এ কথায়। স্যাভেলিচ ওকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। গ্রিনেভ রয়ে গেলো জুরিনের ক্যাম্পে।

পর পর কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে পুগাচেভ পরাজিত হলে বটে, কিন্তু কিছুদিন পর শোনা গেলো পুগাচেভ বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মস্কোর উদ্দেশ্যে অভিযান করেছে তখনই প্রকৃতপক্ষে সরকারী তরফ থেকে পুগাচেভের বিদ্রোহকে দমন করবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হলো। দিকে দিকে বড়ো বড়ো অভিজ্ঞ সেনাপতিরা বেরিয়ে পড়লেন পুগাচেভকে শায়েস্তা করবার জন্যে। এবার পর পর কয়েকটি বড় যুদ্ধে পুগাচেভ পরাজিত হলো। ওর বেশির ভাগ সাঙ্গপাঙ্গই আত্মসমর্পণ করলো। সেনাপতি মিচেলসন খোদ পুগাচেভকে ধরবার জন্যে পরিকল্পনা করতে লাগলেন।

যুদ্ধ কার্যত শেষ হয়ে গেলো।

এবার গ্রিনেভ বাড়ী ফিরবে ঠিক করলো। রওনা হবার নির্ধারিত সময়ের একটু আগে জুরিন এলো ওর ঘরে। হাতে ওর একখানা কাগজ, মুখ চোখ বিবর্ণ। কি ব্যাপার? আশঙ্কিত ভাবে গ্রিনেভ জিজ্ঞাসা করলো—কি খবর।

—খবরটা খারাপই বলতে হয়। বলেই জুরিন কাগজখানা গ্রিনেভের হাতে দিলো—পড়ে দেখো, এইমাত্র অর্ডারটা আমার হাতে এসেছে।

একখানা চিঠি। চিঠিখানা পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো গ্রিনেভ। সামরিক বিভাগের প্রত্যেক পদস্থ ব্যক্তির কাছে সরকারের পক্ষ থেকে গোপনীয় অর্ডার একখানা। এতে বলা হয়েছে যে, গ্রিনেভকে যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থায় পেলেই যেন গ্রেপ্তার করে কাজান-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুগাচেভের বিদ্রোহ সম্পর্কে সরকার যে কমিশন বসিয়েছেন অনুসন্ধান করবার জন্যে তার কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে গ্রিনেভকে দেখা করতে হবে। তাঁরা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ওকে।

—বুঝতেই পারছো, সরকারী তরফ পুগাচেভের সঙ্গে তোমার প্রীতির সম্পর্কটা খুব ভালো চোখে দেখছে না। জুরিন বললে, যা'ই হ'ক যা সত্যি, সেই কথাই বলো কমিশনের সামনে। হতাশ হয়ো না। আমার বিশ্বাস তুমি যে নির্দোষ, পুগাচেভের সঙ্গে মিশলেও সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করো নি একথা শেষ পর্যন্ত প্রতিপন্ন হবে।

গ্রিনেভের বিবেক ছিল সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। কারণ পুগাচেভের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা একান্তই ব্যক্তিগত। এবং ওর সঙ্গে মিশলেও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু কখনো করে নি। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে বন্দী অবস্থায় ও কাজানের উদ্দেশ্যে সরকারী গাড়ীতে উঠে বসলো।

চোদ্দ

কাজান-এর রাস্তা ঘাটের অবস্থা দেখে শিউরে উঠলো গ্রিনেভ। সর্বত্র ধ্বংসস্তূপ—পুগাচেভের দুষ্কৃতি।

সরকারী দপ্তরখানার সামনে এসে থামলো গাড়ী। সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনেভের হাতে পায়ে শিকল পরানো হলো। এবং একটা স্যাঁত-সেঁতে, অন্ধকার, নিঃসঙ্গ কয়েদখানার প্রকোষ্ঠে ওর থাকবার বন্দোবস্ত করা হলো।

পরদিন-সকালে কমিশনের সামনে হাজির করা হ'লো গ্রিনেভকে। পুগাচেভের সঙ্গে প্রথম পরিচয় থেকে আরম্ভ করে একে একে সব কথাই অকপটে বলে গেলো ও। কিন্তু দেখা গেলো সদস্যরা ওর কোনো কথাই বিশ্বাস করছেন না।

একজন সদস্য বললেন—কালকের শয়তানকে একবার নিয়ে এসো আমাদের সামনে।

হাত পায়ে শিকল-বাঁধা যাকে এনে দাঁড় করানো হ'লো গ্রিনেভ অবাক হয়ে গেলো দেখে সে শাভরিন। এতক্ষণে গ্রিনেভ বুঝতে পারলো যে শাভরিনই ওকে এই ফাসাদের মধ্যে জড়িয়ে দিয়েছে। সম্মানজনকভাবে মুক্তির আশা যেন ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো গ্রিনেভের কাছে।

এদিকে গ্রিনেভের মা-বাবা ইভানোভাকে সহৃদয় ভাবেই গ্রহণ করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন তাঁরা যে ইভানোভা সত্যি ভালো মেয়ে। এ রকম একটি মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনায় ওঁরা দু'জনেই খুশী হয়ে উঠলেন। ইভানোভাও নিজের মা-বাবা হারিয়ে এখানে এসে এঁদের স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে নিজের বিগত দিনের দুর্ভাগ্যের কথা ভুলে গিয়েছিল।

এমন সময় গ্রিনেভ-পরিবারে যেন বজ্রপাত হলো। গ্রিনেভের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ যথাসময়ে দেশে পৌঁছলো। গ্রিনেভের বাবা পর পর কয়েকদিন ইভানোভা এবং স্যাভেলিচকে খুঁটে খুঁটে পুগাচেভের সঙ্গে গ্রিনেভের সমস্ত দিক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। যতটা শুনলেন তিনি ওদের মুখ থেকে তাতে দেশদ্রোহিতার কোন গন্ধ পেলেন না কিন্তু হঠাৎ আবার চিঠি গেলো সদর থেকে। এক পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জানালেন গ্রিনেভের বাবাকে যে পুগাচেভের সঙ্গে মিলে গ্রিনেভ যে দেশদ্রোহিতাজনক অনেক কিছুই করেছে এ বিষয়ে কমিশন নিঃসন্দেহ। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণ প্রাণদণ্ডই দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু ওঁর দেশসেবার কথা এবং বর্তমানের বৃদ্ধ বয়সের কথা বিবেচনা করে সম্রাজ্ঞী গ্রিনেভের জন্যে প্রাণদণ্ড না দিয়ে সাইবেরিয়াতে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ করেছেন।

এ সমস্ত খবর পেয়ে গ্রিনেভের বাবা মর্মাহত হলেন। ছেলের জন্যে তো বটেই। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশি আঘাত লাগলো তাঁর মর্যাদাবোধে। একটা অভিজাত পরিবারের ছেলে হয়ে ও কিনা শেষ পর্যন্ত একটা দস্যুর সঙ্গে মিশে দেশদ্রোহিতা করলে! হা ভগবান! গ্রিনেভের মা সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন, আর নিজে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ইভানোভা মোটামুটি অনুমান করতে পারলো যে কিসের থেকে কি হয়েছে। ক্যাপটেন মিরোনোভের মেয়ে হিসেবে ওর কিছু কিছু জানাশুনো ছিলো রাজদরবারে। তাই মনস্থ করলো ও তাঁদের সঙ্গে দেখা করে দয়া ভিক্ষা করবে!

গ্রিনেভের মা-বাবার অনুমতি নিয়ে ইভানোভা রাজধানীতে চলে এলো। এখানে বসে ঘটনাচক্রে ওর সঙ্গে আলাপ হলো এক পোষ্টমাষ্টারের স্ত্রীর। ইভানোভা সব কথা খুলে বললো তাঁকে।

মহিলাটি সব কথা শুনে বললেন যে, উনি দেখবেন রাজ দরবারে পরিচিতদের সঙ্গে কথা কয়ে যদি কোনো সুরাহা করা যায়।

পরদিন খুব ভোরে উঠে ইভানোভা পার্কে বেড়াতে এলো। কিছুক্ষণ ভারাক্রান্ত মনে বেড়াবার পর হঠাৎ একটা কুকুরের ডাকে হকচকিয়ে উঠলো।

—ভয় নেই, কামড়াবে না। ইভানোভার চোখে পড়লো সকালবেলার পোষাক-পরা একটি ভদ্রমহিলা একটা বেঞ্চিতে বসে ওর দিকে তাকিয়ে কথা বললেন।

ইভানোভা ভয়ে ভয়ে বেঞ্চিটার অপর দিকে এসে বসলো।

—তুমি কি এদিকে থাকো? ভদ্রমহিলা নরমভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আজ্ঞে না, কাল এসেছি।

মা বাবার সঙ্গে এসেছো।

—আজ্ঞে না, আমার মা বাবা নেই, আমি একাই এসেছি। একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি রাজধানীতে। সম্রাজ্ঞীর কাছে আমার একটা আবেদন পেশ করবার জন্যে।

—আমার সঙ্গে দরবারের একটু আধটু পরিচয় আছে, কি ব্যাপার বলো তো? দেখি যদি তোমার কোনো কাজ করতে পারি।

—আমি ক্যাপটেন মিরোনোভের মেয়ে। নিজের পরিচয় দিয়ে তার একে একে সব কথাই বললো ইভানোভা। গ্রিনেভের সঙ্গে ওর সম্পর্ক, পুগাচেভের সঙ্গে গ্রিনেভের প্রকৃত মেলামেশা কতখানি ছিল—সবই অকপটে বললো।

—কিন্তু গ্রিনেভের মার্জনা কি সম্ভব হবে? ভদ্রমহিলা সন্দিগ্ধভাবে বললেন।

—সত্যি সে নির্দোষ, কমিশনের সামনে বিস্তারিতভাবে সে যে পুগাচেভের সঙ্গে তার মেলামেশার পুরো কাহিনীটা বলতে পারেনি সে শুধু আমাকে বাঁচাবার জন্যে। আমি যাতে কেসে জড়িয়ে না পড়ি সেই জন্যে এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

—কোথায় আছো তুমি?

ইভানোভা নিজের ঠিকানা দিলো।

—দেখি কি করা যায় তোমার জন্যে। বলে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। ইভানোভাও বাসায় ফিরলো।

বাসায় ফেরবার কিছুক্ষণ পরেই রাজদরবার থেকে লোক এসে খবর দিলো, সম্রাজ্ঞী এখুনি ইভানোভাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। লোকটি গাড়ী নিয়েই এসেছে।

এই অভাবিত অবস্থার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না ইভানোভা। পোষ্টমাষ্টারের স্ত্রী ভরসা দিয়ে বললেন যে এবার যা হক একটা সুরাহা হবেই। ইভানোভা কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। মনে মনে ও এতই অস্থির হয়ে পড়লো যে রাজপ্রাসাদ বা তার আশপাশের অজস্র দেখবার জিনিষ কোনো দিকেই যেন ওর দৃষ্টি পড়্‌লো না। সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা করবার ভাবনায় ও বিচলিত হয়ে পড়লো। হুঁস যখন ফিরে এলো দেখলো যে একটা দরজার সামনে ও দাঁড়িয়ে আছে। একটি রক্ষী বললো—ভেতরে যান, সম্রাজ্ঞী ভেতরে আছেন।

একটু পরেই দরজাটা খুলে গেলো। সামনেই আয়নার সামনে সম্রাজ্ঞী কয়েকটি পরিচারিকার সাহায্যে প্রসাধন করছেন। ইভানোভা দেখেই চিনতে পারলো সকালবেলা পার্কে যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা হয়েছিলো, তিনিই সম্রাজ্ঞী। আশা আর আশঙ্কায় ওর পা দুখানি কাঁপতে লাগলো।

সম্রাজ্ঞী অভয় দিয়ে স্নেহের সঙ্গে ইভানোভাকে কাছে ডাকলেন। তারপর ওর হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন—আমি বিশ্বাস করেছি যে গ্রিনেভ নিরপরাধ। কাজেই সে মুক্তি পাবে। ওর বাবাকেও আমি এই চিঠিতে তা জানিয়ে দিলাম। এ চিঠিখানা তুমি তাঁকে দিও।

কম্পিত হস্তে ইভানোভা সম্রাজ্ঞীর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে ওঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো। সম্রাজ্ঞী নিজেই ওকে তুলে দাঁড় করালেন তারপর স্নেহভরে চুমো দিলেন এবং আশীর্বাদ করলেন।

সেইদিনই ইভানোভা তার ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে ফিরে এলো। সম্রাজ্ঞী নিজেই গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিলেন।

অনুবাদক—সুনীলকুমার নাগ

সমাপ্ত

রাত্রি

শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়

আদিগন্ত আকাশের অপার শূন্যতা
খাড়া মিনারের চূড়া বিঁধে নিতে চায়
গম্বুজে চাঁদের আলো,—
দুটি শুভ্র হাত
নিস্পন্দে মিলিত যেন
মূক প্রার্থনায়।

কেশ পরিচর্য্যায় ভারতীয় নারী

লক্ষ্মীবিলাস

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

(পুর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

পরদিন মাদ্রাজে এসে, আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো।

দু'জনে দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরে, চোখের জলে বিদায় নিলাম।

শান্তাদি বাড়ী পৌঁছেই সঞ্জয়দাব খবর আমাকে জানাবেন,—এই আশ্বাস দিলেন।

ক্যাপ্টেন মামার লোক শান্তাদির সঙ্গে গেলো, আমি একাই কলকাতায় রওনা হলাম।

আমার সারা মনে-প্রাণে শুধু একটি আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হতে লাগলো—হে ঈশ্বর! মালাবারের অভিশাপ,—যেন শুধু আমার ওপর দিয়েই যায়,—সে যেন শান্তাদিকে স্পর্শ না করে। তার বুকটা যেন আনন্দে ভরা থাকে।

হাওড়া ষ্টেশনে মা এসেছিলেন গাড়ী নিয়ে। মাকে দেখে তাঁর বুকে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম, সেই ছোট বেলার মত।

গাড়ীতে যেতে যেতে মা বললেন—একি চেহারা হয়েছে মা? কোনো অসুখ বিসুখ করেছিলো? কৈ কিছু জানাসনি তো!

না-মা! অসুখ নয়। তোমার জন্যে বড্ড মন কেমন করছিলো তাই।

মা'র বুকে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে ক্লান্ত সুরে জবাব দিলাম আমি।

হু! হু! করে গাড়ী ছুটে চললো, আমার চির-পরিচিত স্থানে।

বাড়ীতে গিয়ে একটু বিশ্রাম কববার পর, মা জিজ্ঞেস করলেন—

—কৈ, খুকি। সেই যোগরাজ যোগলেকার তো তোর সঙ্গে এলো না! তাকে দেখবার যে আমার ভারি ইচ্ছে ছিলো রে।

—সে আর কোন দিনই আসবে'না মা।

বলতে বলতে মা'র বুকে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলাম আমি।

পরদিন টেলিগ্রাম করলাম শান্তাদিকে—সঞ্জয়দা কেমন আছেন জানান।

তিন চার দিন কেটে গেলো বড় দুর্ভাবনার মাঝে। টেলিগ্রামের জবাব এলো না।

দিন সাতেক পরে জবাব এলো চিঠিতে। চিঠি লিখেছেন কাবেরী কৃষ্ণমূর্ত্তি।—তোমরা কোচিন রওনা হবার পর, চতুর্থ দিনে, মিষ্টার চাটার্জ্জি হাই ব্লাডপ্রেসারে ষ্ট্রোক হয়ে হঠাৎ কর্ম্মস্থলেই অজ্ঞান হয়ে যান। তখনই তোমাদের টেলিগ্রাম করা হয়। চিকিৎসাও চলতে থাকে। মিসেস চাটার্জ্জি এখানে এসে পৌঁছবার ঘণ্টা দু'য়েক আগে মিষ্টাব চাটার্জ্জি মারা যান।

তারপর মিসেস চাটার্জ্জি এসে, ওঁকে দেখে একবারও কাঁদেন নি। আমরা সকলেই ছিলাম সেখানে। উনি হঠাৎ উঠে শোবার ঘরে চলে গেলেন।

সাপ তাড়াবার জন্যে যে ওঁর ঘরে নাইট্রিক এ্যাসিড থাকতো, সে খবর আমরা কেউ জানতাম না। সেই এ্যাসিডের বোতল খালি করেছেন তিনি নিজের গলায় ঢেলে। ঘণ্টাখানেক তাঁর সাড়াশব্দ না পেয়ে আমরা তাঁর বন্ধ দরজায় অনেক ধাক্কা দিলাম,—তবুও তাঁর সাড়া না পেয়ে অনেক কষ্টে দরজা খোলবার পর, দেখা গেলো,—তাঁর মৃতদেহটি মেঝের ওপর পড়ে আছে,—আর তাঁর পাশে রয়েছে এ্যাসিডের খালি বোতলটি।

চিঠি পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা। আমি কিন্তু কাঁদিনি।

—আহা, শান্তাদি যে সঞ্জয়দাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। তাই তাঁর সঙ্গেই চলে গেছেন, যাতে আর কখনও ওঁদের ছাড়াছাড়ি না হয়।

চোখেব সামনে ভেসে উঠলো সেই ছবিখানি। শান্তাদির কোমরটা এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলছেন সঞ্জয়দা—

—ঐ পরলোক নামে দেশটায় যাবার সময় তোমাকে এমনি করে জড়িয়ে ধরে একেবারে চিরসাথী করে নিয়ে যাবো। এই তোমায় কথা দিলাম।

শান্তাদির চোখে জল—মুখে হাসি।

এর পরে মায়ের সেবা যত্ন ও আদরের আতিশয্যে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমি।

বড় বড় ডাক্তার এলো। ওষুধ, টনিক, দামী দামী আহার, আর দিন রাত বিছানায় শুয়ে, বসে, ঘুমিয়ে, নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের মাঝে কেটে গেলো কয়েকটি মাস।

—এমন অবস্থায় আরো কিছুদিন থাকলে যে আমি পাগল হয়ে যাবো মা। মাকে বললাম আমি।

—বেশ। তাহলে এবার কাজে মন দাও। জবাব দিলেন মা।

কয়েকদিনের ভেতরই সমিতির মাধ্যমে মা বাচ্ছাদের জন্যে বাড়ীতে একটি নার্শারী স্কুল খুললেন। সকাল ন'টা থেকে বারোটা। সমিতির কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে ভারি উৎসাহ নিয়ে বাচ্ছাদের কাজে মেতে উঠলাম আমি। বেশীদিন কিন্তু বইলো না আমার উৎসাহ স্রোতের জোয়ার। আর ক্রমে ক্রমে ক্লান্তির ভাঁটা এসে আমাকে আবার শুষ্ক আর বিষণ্ণ করে তুললো।

কাজে আনন্দ নেই। যেমন মোহরের থলি বহন করে গাধা আনন্দ পায় না। আমার অবস্থাও হলো তেমনি। মার সজাগ নজরে ধরা পড়লো আমার এই শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি। তিনি বললেন, খুকি তুমি আবার গানে মন দাও। ওস্তাদজীকে আমি খবর দিয়েছি তিনি আজ আসবেন। ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ সজ্জন আলি খাঁ, তাঁর কাছে আমি তিন বছর গান শেখবার পর, গান ছেড়ে দিয়েছিলাম বাবার মৃত্যুর জন্য।

লক্ষ্ণৌ ঘরাণার উত্তরসাধক আমার গুরু সজ্জন আলি খাঁ আবার সেদিন সন্ধ্যায় এলেন। আমার আবার সঙ্গীত শিক্ষার আগ্রহ দেখে খুব খুসি হয়ে আমায় আশীর্ব্বাদ জানালেন। তারপর মায়ের অনুরোধে, গান ধরলেন ওস্তাদজী।

তাঁর ভাবগম্ভীর কণ্ঠের সঙ্গীতধারা যেন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়লো, আমার অন্তর তটে। কোন্ জমাট বেদনার দুর্ব্বহ পাষাণের তলায় চাপা পড়েছিলো আমার মনটা। ওস্তাদজীর সঙ্গীতধারার খরস্রোতে যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পাথরটা। ভারমুক্ত মনটা নড়ে চড়ে, ব্যাকুল পদক্ষেপে উঠে আসছে, অতল অন্ধকার গুহাপথ বেয়ে, ঐ সুরের ঢেউএ অবগাহন করবার জন্য।

ওস্তাদজী গাইছেন জয়জয়ন্তী রাগে গানটি। 'দুখুয়া মেরে কৈ সে,—কঁহু মেরে সজনী।'

এ গান আমার অজানা নয়।

আমিও ধীরে ধীরে ওঁর সাথে গলা মিলিয়ে গাইতে লাগলাম। সুর সাগরের অতল গভীরে তলিয়ে গেলো আমার বিরহ তপ্ত আত্মা। নিভে গেছে যেন মনের অনির্ব্বাণ দাহ জ্বালাটা।

গান শেষ হলো।

গভীর স্নেহভরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ওস্তাদজী—

—এইস্যা মাফিক্ দিল্ দেনা চাহিয়ে খোকি দিদি। সঙ্গীত মে, এইস্যা দরদ হোনা চাহিয়ে। পরম শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত করলাম ওঁর পায়ের ওপর। মাথা তুলতেই নজরে পড়লো, একটু দূরে বসে আছেন মা। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে ওঁর গাল দুটো।

দিনের পর দিন, মাস, বছরের পর বছর ধরে চললো আমার সঙ্গীত সাধনা। অনেক গানের আসরে, জলসায়, গান গাইলাম। পেলাম প্রচুর সম্মান, অভিনন্দন, পুরস্কার। এলো অনেক বিমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবী। এখন প্রতি মাসেই দু'তিন দিন করে আমাদের বাড়ীতে জমজমাট গানের আসর বসে।

ওস্তাদজীর অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা আসেন। আরোও আসেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষ ও মহিলারা নিমন্ত্রিত হয়ে।

মজলিশটি যাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও আনন্দময় হয়, সেদিকে ছিলো আমার মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দরাজ হাতে খরচ করতেন তিনি। হলের দেওয়ালের ব্র্যাকেটে ব্র্যাকেটে ফ্লাওয়ার ভাসে সাজানো হতো পুষ্প স্তবক। চা, কফি, আইসক্রিম, সরবৎ, কেক, বিস্কুট, প্যাটিস্ তো আছেই, মাঝে মাঝে, সকলকার জন্য থাকতো ডিনারের আয়োজন। অনেক বিলিতি ছাপ মারা মুখার্জি, ব্যানার্জি, সিনা, বাসুর দল, ভিড় জমালো আমার আশে পাশে। এদের সঙ্গে ছিলো আমার অবাধ মেলা মেশা। হাসি, গল্প, গানে জমজম করতো আমাদের বাড়ীটা।

মায়ের এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরিপূর্ণ আয়োজন যে শুধু আমারই জন্য,—সে কথা বুঝতে, একটুও দেরী হয়নি আমার।—হায়, এ খেলা, রঙিন খেলনা দিয়ে অবোধ শিশুকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা।

কিন্তু সে চেষ্টার সার্থকতা মিললো কৈ ?—

আমার মুগ্ধ মধুকর বন্ধুরা,—ঐ বন্ধুত্বের বার মহল পেরিয়ে, অন্তরের অন্দর মহলে প্রবেশ করবার ছাড় পত্র কেউ তো পেলনা।

তার দরোজা কে যেন সবল হাতে রুদ্ধ করে রেখেছে, ওরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও পারছেনা তার অর্গল মুক্ত করতে।

সারাদিন কেটে যায় নানা গোলমালে। রাতের অন্ধকারে দিনের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আর এক নারী।

এই কোলাহলময় পরিবেশকে সে চেনে না। সে ছুটে চলে যায় বল্লারশার সেই পাওয়ার হাউস কলোনীতে।

বম্বার শার কথা, সঞ্জয়দা আর শাস্তাদির কথা, কাবেরীদির কথা, কোচিনে যাবার কথা। সব কিছু অল্প কথায় জানালাম ওকে আরো বললাম যে কাবেরীদির অনুরোধে এর্ণাকুলামে মারুতি মেননের সঙ্গে আমি অবশ্যই দেখা করবো, কথা দিয়েছিলাম তাঁকে, কিন্তু সে কথা রাখতে পারিনি সে সময় ঐ নিদারুণ দুর্ঘটনার জন্ম।

—ও,—হ্যাঁ! হ্যাঁ! মনে পড়েছে।

বছর তিনেক আগেকার কথা। কাবেরীদি বম্বার শা থেকে লিখেছিলেন আমাকে যে, তাঁর বিশেষ বন্ধু শাস্তা চ্যাটার্জ্জি গেছেন কোচিনে, তাঁর ভারি মিষ্টি বোন রমলা ও আছে সঙ্গে, আমি যেন মালাবার হোটেলে গিয়ে ওঁদের সাথে দেখা করি।—আমি চিঠি পেয়েই গিয়েছিলাম সেখানে,—কিন্তু ম্যানেজার জানালেন যে আপনারা চলে গেছেন। কাবেরীদি'র পরের চিঠিতে পেলাম ঐ দুঃসংবাদটা, মনটা ভারি খারাপ হয়ে গিয়েছিলো।

যাক বড় ইচ্ছে ছিলো আপনার সঙ্গে আলাপ করবার—এতদিন বাদে আমার সে ইচ্ছে পূর্ণ হলো, আর তার সঙ্গে আরো পেলাম।—কি অপূর্ব্ব গান যে শুনলাম, কখনও ভুলবো না।

আমার গুরুজীর সঙ্গেও ওদের পরিচয় করিয়ে দিলাম।

মারুতি বললো,—আমি উডল্যাণ্ডস হোটেলে আছি, কাল বিকেলে যদি ওখানে আপনারা আসেন, বড়ই খুসি হবো। এক সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে, কারণ এখানে তো আর কথা বলা যাবে না, এখুনি গান আরম্ভ হবে।

মারুতির নেমন্তন্ন আমি গ্রহণ করলাম।

পরদিন বিকেল পাঁচটায় আমি বাঙ্গালোর উডল্যাণ্ডস হোটেলে গেলাম।

ওখানে আয়েঙ্গার ছিলেন,—আর ছিলেন মাদ্রাজের কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ছোটখাটো ঘরোয়া চায়ের আসর। ওস্তাদজী আসেন নি। তিনি বললেন মজলিসে গেলে ঠিক সময় ফিরে ফেরা সম্ভব হবে না কারণ অধিবেশন ঠিক ছ'টায় সুরু হবে। তুই বা বেটি।

মারুতির অনুরোধে আমাকে একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে হলো, সেও গাইলো একটি রবীন্দ্রনাথের গান।

তারপর ভারি ক্ষোভের সঙ্গে বললো যে এ গান আমি খুব বেশী শেখবার সুযোগ পাইনি,—তবে এই অপূর্ব সঙ্গীতগুলো শিখতে আমার ভারি ইচ্ছে করে, আর আমার দেশবাসীকেও শেখাতে। আর কয়েকটা মাস পরেই তো আরম্ভ হবে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব। কতগুলি মেয়েকে আমি ঐ উৎসবের জন্ম তৈরী করছি, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমি তো খুব বেশী জানি না, আর ওখানে যাঁরা বাঙালি আছেন, সেখান থেকেও তেমন সাহায্য পাচ্ছি না। মানে তাঁদের ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পুঁজি ঠিক আমারই মতো আর কি।

কথা থামিয়ে আমার দিকে চাইলো মারুতি মেনন। তারপর একটু হাসির সঙ্গে বললো—আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন না,—কি-যে উপকার হয় তাহলে,—মানে, শুধু আমার নয়,—সারা দেশটার উপকার করতে পারেন।

—বেশ তো! আমি জবাব দিলাম,—আপনি আমার সঙ্গে কলকাতায় চলুন, থাকবেন আমাদের বাড়ীতেই। কথা দিচ্ছি মাত্র তিন মাসের ভেতর আপনাকে আমি গোটা তিরিশেক গান শিখিয়ে দেব। ঐ সঙ্গে নাচ দিয়ে আপনি একটি চমৎকার জলসা জমিয়ে তুলতে পারবেন!

—সে তো যাবোই!—আবার মিষ্টি করে হাসলো মারুতি মেনন! তারপর আমার একখানি হাত নিজের হাতে, তুলে নিয়ে বললো—আপনি তো প্রায় আমাদের পাড়াতেই এসে পড়েছেন, চলুন না দিন কতকের জন্যে আমার কাছে। এতে, আপনার সেদিনের প্রতিশ্রুতিটাও রক্ষে হবে, আর আমারও গান শেখা হবে।

—আপনার প্রস্তাবটি খুবই লোভনীয়, তবে কি জানেন, ঐ মালাবার কোষ্টে যেতে; আর যেন আমার মনটা চায় না! ভারি দুঃসময় স্মৃতিগুলো আমার ছড়ানো আছে সেখানে।

আমার বিষাদভরা কণ্ঠস্বরে, চোখ নিচু করলো মারুতি। মৃদুকণ্ঠে বললো—তবে থাক্। আমিই না হয় সময় করে কলকাতায় যাবো আপনার কাছে। মুস্কিল কি জানেন? ঐ মাসিক পত্রিকার কাজগুলো ফেলে যে আমার একেবারেই নড়বার সময় মেলে না। তা না হলে আমি সত্যিই, আপনার সঙ্গেই রওনা দিতাম, কারণ আমার প্রয়োজনটি যে গুরুতর।

—সব যাত্রার সমান ফল হয় না মিস মুখার্জ্জি বললো আয়েঙ্গার।

—এবারে হয়তো আগেকার যাত্রার বিপরীত ফল পেতে পারেন, অন্ততঃ আমরা তো আপ্রাণ চেষ্টা করবো আপনাকে আনন্দ দেবার জন্ম। ঠিক বলছি না মারুতি?

হাসলো মারুতি। ভারি মিষ্টি হাসিটা ওর, বার বার দেখতে ইচ্ছে করে।

ও বললো—অবশ্য রমলা দেবী যদি আমাদের ওপর আস্থা রাখেন, তবে,—আমাদের দিক থেকে যে কোন ত্রুটি হবে না, সে বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত আয়েঙ্গার।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে আমি বললাম—আপনাদের সঙ্গ সত্যিই বড় ভালো লাগছে আমার, তাই আশা করছি যে, যদি আমি আপনাদের সঙ্গে যাই, তবে নিঃসন্দেহে এ যাত্রা শুভ হবে।

—আচ্ছা, আমার গুরুজীকে একবার জিজ্ঞেস করি, উনি যদি মত দেন তো—

আমার কথা শেষ হবার আগেই মহা উল্লাসে টেবিলের গালে একটা মস্ত চড় কষিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো আয়েঙ্গার। ইউরেকা! ইউরেকা!

[ক্রমশঃ।

Humour has fashions, but fat men, thin men, stupid men, pretentious men, and garrulous women have existed since the beginning of time.

Peter Ustinov.

অভিসারিকা
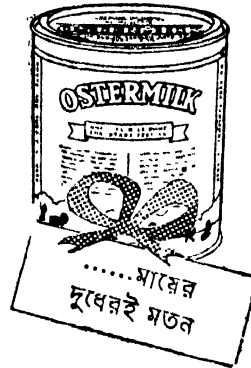
ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়ে আর বিশ্ব চরাচর অন্ধকার করে ছায়া নামে গাছপালার মাথার ওপরে, সৌরভীর মনেও বুঝি নামে ছায়া। দিনের বেলায় থাকে ভাল, রাত্রিতে তার মরণ যন্ত্রণা। দিনের বেলায় ভুলে থাকে তাকে রাত্রি হলেই চারদিককার নিস্তব্ধতা আকুল করতে চায় সৌরভীকে। এই সময় বুঝি স্মৃতির পাখায় ভার করে নেমে আসে তার সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে স্বপ্নের রাজপুত্র। কিছুতেই ভুলে থাকতে পারে না তাকে। তার হাসি, গান, চলাফেরার টুকুল ছন্দ সব যেন ছায়াছবির মত ভিড় করে সুমুখে এসে।

রাত্রি বাড়ে। গ্রাম নিশুতি হলে আরও খারাপ লাগে সৌরভীর। ঘুম আসে না। বিছানায় বালিসে কে যেন ছড়িয়ে রাখে কাঁটা। সেই একখানা সুন্দর মুখ উঁকি দেয় তার মনের দরজায়। ভুলতে পারে না তাকে একটুও। কান্না পায় থেকে থেকে। কেন সে একদিনের জন্যও তার সুমুখে হাসিমুখে এসে দাঁড়াল না। দুটো ভাল করে কথাও বলতে চায়নি সে একান্ত নির্জনে। যেন তাকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে।

তাই তো সৌরভীর ক্ষোভ। যদি তাকে এড়িয়েই চলবে তবে বাঁচালে কেন। গুণ্ডা বদমায়েসরা তাকে শেষ করে দিলেই তো ভাল ছিল। কেন নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঁচানো একটা তুচ্ছ মেয়েলোককে।

—কি করবে এখন। সহজ প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

—জানিনে তো আমি! মাথা নীচু করে জবাব দিয়েছে সৌরভী।

—আমাদের বাড়ীতেই থাক কেমন? কে আছে তোমার?

—কেউ নেই।

কেউ নেই তার জেনেও কেন তাকে আপন করে নেয়নি সে। কেন ঠাঁই দিয়েছিল। মনের কোণে এতটুকুও ভালবাসা ছিল না। ভালবাসা যদি নাই থাকে তবে সোজাসুজি দাঁড়াতে পারেনি কেন সুমুখে এসে। কেন এ ছলনা দিয়ে তার এ সর্বনাশ। সে যে তাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না এটুকুও বুঝতে পারেনি। তা যদি না বুঝতে পার, তবে কিসের পুরুষ মানুষ তুমি।

সৌরভী জানে বুঝেছিল সে সবই। তাই বুঝি পাশ কাটিয়েছে এমন করে। তাকে নিয়ে বুঝি কষ্টও পেয়েছে সে। এক একদিন তার দিকে লুকিয়ে চেয়ে থেকেছে একদৃষ্টে। বুঝি সমস্যায় ভারাক্রান্ত হয়েছে মন। দ্বন্দ্বের দোলায় দুলিয়েছে তার শিক্ষিত আর মার্জিত রুচিকে। তাই বুঝি চেয়েছিল তাকে লেখাপড়া শেখাতে।

—কি পড়াশুনা করবে নাকি? আবার সেই মুখোমুখি।

সৌরভীর হাসি পেয়েছিল। সে যেন ছোটখুকী। তার যেন পড়ার বয়স আছে।

—না!

—কেন স্কুলে পড়বে? ভালই তো!

কি গভীর আগ্রহ! তবু তো হোলো না। বুড়ো মাগী পড়বে কি? নিজের মনে প্রশ্ন করে নিজেই হেসেছে। বুঝি তার সুমুখেও হেসে উঠেছিল সৌরভী।

হতাশ মুখে ফিরে গেল খোকাটি। ভারী কষ্ট হয়েছিল সৌরভীর। তাকে আনন্দ দেবার জন্য বুঝি মনে হয়েছিল একবার সে পড়ে। কিন্তু অসম্ভব।

কিন্তু আজ মনে হয় রাখলেই হোতো তার কথা। তার যখন সাধ, কেন পুরণ করেনি সে।

তাই তো আজ কেঁদে কেঁদে মনের ভার হাল্কা করতে চায় সৌরভী। তাই তো চলে এসেছিল তাকে না জানিয়ে শুধু তার ফটোখানাকে বুকে করে। চোরের মত চলে এসেছিল চুপি চুপি তাকে দ্বন্দ্বের মাঝে না রেখে।

ভুলতে চায় সৌরভী তাকে। সেটা যেন তার কাছে এক দুঃস্বপ্ন। তবু তো পারে না। দিনের বেলায় সে ঘুরে বেড়ায়, ডুবে থাকতে চায় কাজের মধ্যে। ডুবে থাকতে চায় হাসি আর উচ্ছলতার মধ্যে। রঙ্গরসের আবরণ টেনে ব্যথার রাত্রিকে ঢেকে রাখতে চায়। এক একবার মনে হয় এর চেয়ে বুঝি মৃত্যুও ছিল ভাল।

কিন্তু সৌরভী মরে না। যখন পরিপাটী করে খোঁপা বেঁধে, তেল কুচকুচে কপালের ওপর কাঁচপোকার টিপটি দিয়ে পাড়ার মধ্যে হেলেদুলে যায়, তখন তাবৎ ছেলেগুলোর লোলুপ দৃষ্টিটা সব কিছুকে ছেড়ে ওর নিটোল যৌবনপুষ্ট দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

পাড়ার বৌ-ঝিরা কিন্তু বেজায় চটা সৌরভীর ওপরে। ও যখন পাড়ায় ঢোকে তখন অন্য মেয়ে বৌদের চোখ টাটায়। ওকে অনেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে গালাগালি দেয়—আ মরণ! গতরের মাথা খা!

সৌরভীর কানে যায় সব কথাই। সে ওদের কথায় খিল খিল করে হেসে ওঠে। তারপর সেই হাসির তুফানে তার সুঠাম দেহবল্লরীকে হিল্লোলিত করে চলে যায় ওদের সুমুখ দিয়েই।

—দেখ বাপু! ও মাগীকে তাড়াও পাড়া থেকে! বেবুশ্যে মাগীকে পাড়ায় রাখে কেউ!

সদ্য বিয়ে হওয়া মালিনী তার স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। কিন্তু কে শোনে সে কথা। দেখা যায় সীতারাম হাঁ করে চেয়ে আছে সৌরভীর চলার পথের দিকে।

—বলি অমন অজ্ঞান হ'য়ে দেকচ কি?

আচমকা বৌ-এর ঠোনা খেয়ে সম্বিৎ ফেরে সীতারামের। বলে—ঠিক বলিচিস্ মালিনী, ওকে পাড়ায় রাখাটা ঠিক নয়। তারপর একটু চুপ করে থেকেই বলে—তবে মানুষটার প্রাণ আচে। পাড়ার লোকের আপদে বিপদে কত করে বল্‌তো।

ওইখানে সকলেরই দুর্বলতা। ছেলে হবে কোন বৌ-এর, খালাস করতে ছুটে আসে সৌরভী। শক্ত অসুখ করেছে কারও, সারারাত জাগবে সৌরভী। কোন কাজকর্ম হোক সৌরভী বুক দিয়ে পড়ে করে দেবে সে কাজ। তখন এ সৌরভীকে চেনা যায় না। ওর চোখ মুখ দিয়ে তখন সেবা আর কল্যাণের সুষমা ঝরে পড়ে যেন। কার কথা ভুলতে এমন করে পরের সেবায় সঁপে দেয় নিজেকে।

পাড়ার শেষ সীমায় ওর মায়ের 'ভিটেটায় যখন এসে ঢুকল, পাড়ার ছেলেবুড়ো সাদরে গ্রহণ করেছিল তাকে। আহা বড় দুখিনীর মেয়ে। অনেক 'কষ্টে মানুষ করেছিল 'মেয়েটাকে। বড় সড় করে কোন মেলায় গিয়েছিল মেয়ে নিয়ে। সেইখানে হারিয়ে গেল সোমত্ত মেয়েটা। তারপর থেকে বুড়ী কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে এ দুয়োর ও দুয়োর। ভিক্ষে করতে গিয়েও বলেছে আমার সৌরভীর দেখা পেলে বোলোতো :তোর মা বড্ডো কাঁদে! সে যেন একবার দেখা দিয়ে যায়।

আড়ালে হেসেছে বুড়ীর কথায়। দেখা দেবার জন্যই তোমার মেয়ে গিয়েছে কিনা?

বুড়ী শেষে অনেক কষ্ট পেয়ে মরলো ঐ ভিটেতে। মরার আগেও কেবল সৌরভীর নাম করেছে বার বার। বলেছে ও যদি ফিরে আসে তবে তোমরা দেখো! এই ভিটেটায় যেন সন্ধ্যে পিদিম দেখায় রোজ।

বুড়ী মায়ের কথা ভেবেই সাদরে ঠাঁই দিয়েছিল পাড়ার লোক। সেই সৌরভী যে শেষ পর্যন্ত পাড়ার বৌ-ঝিদের এমন দৃষ্টিশূল হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানতো আর।

সৌরভী সকালে আর সকলের মত খাল বিল পুকুরে শাক পাতা তুলে বাজারে যায় বেচতে। দুপুরে বাড়ী ফেরে রান্নাবান্না করে খেয়ে ঘুম দেয় একটা। তারপর বেলা পড়লে যখন পাড়ার পুরুষেরা কাজকর্ম থেকে ফিরে এসে জটলা পাকায় বারোয়ারীতলায়, কিংবা বাড়ীতে বসে বৌ-এর সঙ্গে দুটো কথা শুরু করে সুখদুঃখের দেখা যায় সৌরভীকে তখনই। পান খেয়ে ঠোঁটটা লাল টুসটুসে করে বড় ডাগর টানা চোখ দুটোয় কাজলের রেখা টেনে কখনও খোঁপায় ফুল গুঁজে কখনও পিঠভরা কালো চুলের বোঝা এলিয়ে দিয়ে যৌবনের ভারে দুলতে দুলতে চলেছে সৌরভী।

—দাদা, ফিরচো নাকি কাজ থেকে।

দাদা এই ডাকাটার জন্যই বুঝি উন্মুখ হয়ে থাকে। বলে, আর না।

—না ভাই। যাবনা এখন। বৌ তোমার রাগ করবে

—কিরে ছিদাম কাজে যাসনি আজ।

ছিদাম জবাব দেবার বদলে হাঁ করে গিলতে চায় সৌরভীর রূপযৌবনকে।

রসময়কে দেখে বলে—বিয়ে কর সর্দার। পুরুষমানুষের [illegible] ভাল নয়।

রসময় মরমে মরে যায় তখন। ওর কাছে বুঝি বিয়ের প্রস্তাব করেছিল রসময়, তার জবাব দেয় সৌরভী এই ভাবেই সকলের সুমুখে।

সৌরভী ধরা দেয়না কারও কাছে। রাগে আর ক্ষোভে পাড়ার জোয়ানরা কতদিন ওর ঘরের পিছনে আড়ি পেতেছে ওর মনের মানুষকে পাকড়াও করার জন্য। কিন্তু কোনদিন কাউকে পায়নি। শুধু কেউ কেউ নাকি নির্জন রাত্রে ওর কান্নার শব্দ পেয়েছে ঘরের মধ্যে। কিন্তু লোক পায়নি বলেই বুঝি রাগে দুঃখে ওকে সময় সময় যা তা বলে গালাগালি দেয়। বাজারে মেয়েলোক বলে ওর নামে রটায় কুৎসা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে কেউ কোনদিন ওর ঘরে যেতে দেখেনি কাউকে। এমনকি দিনের পর দিন সারারাত পাহারা দিয়েও ধরতে পারেনি ওর মনের মানুষ একজনকেও।

তাইতো অবাক সবাই। রসময় সর্দার ত অবাকও হয়। কি করে অমন রূপযৌবন নিয়ে একা একা একটা মেয়েমানুষ থাকে। কার স্বপ্ন দেখে জীবন কাটাবে এমনভাবে জানবেই রসময়।

রসময় হাল ছাড়ে না। আবার একদিন একা পায় ওকে। বলে সৌরভী! অমন যৌবনটা নষ্ট করচিস কেনে বল? বল আমার তোর কিসের দুঃখু!

খিলখিল করে উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ে সৌরভী। এলো খোঁপাটা ওর হাসির দমকে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে মুখে হাতে দেহের এদিক ওদিক। পরে হাসি থামিয়ে বলে, তোমার ভারী কষ্ট আমার যৌবন দেখে নয় সর্দার? যাক্, তবু একটা লোকও আছে যে আমার দুঃখুকে নিজের দুঃখু বলে ভাবে।

—সত্যি সৌরভী! তুই একবার বল্ মুখ ফুটে! বল্··চুপ করে থাকতে পারে না। ওর হাতটা চেপে ধরে রসময় তার মনিশ-খাটা কর্কশ হাতে।

—ও! তোমার সবুর সইচে না বুঝি! এসো। এসো আমার রসের নাগর!

আজ আর ছাড়বে না রসময়। বহুদিন থেকে সে লেগে আছে সৌরভীর পিছনে। আজ একটা হেস্ত নেস্ত করে ছাড়বে সে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তখন। সারা বিশ্ব চরাচরকে সন্ধ্যাবধূ তার অন্ধকারের ওড়নায় দিয়েছে ঢেকে; পাখীরা ফিরে এসেছে আপন আপন কুলায়। রসিক নাগর রসময়কে নিয়ে নিঃশব্দে চলেছে বৈরিণী সৌরভী।

সমস্ত পথ রসময় তার আকুল আবেগকে কঠিন সংযমের আবরণে সংযত করে এসেছে। উতলা হলে চলবে না। অভিসারে চলেছে আজ অভিসারিকার হাত ধরে।

—বস। দরজা খুলে সৌরভী বসিয়েছে রসময়কে। প্রদীপ জ্বেলেছে ঘরে। প্রদীপের আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে একটা ধূপকাঠি।

ধূপের গন্ধে সৌরভীর কুঁড়ে ঘরখানা বাসমাতাল। রসময়কেও বুঝি মাতাল করে তোলে নির্জন ঘরের মধ্যে প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় সৌরভীর ভরা যৌবন। আলোছায়ার রহস্যে রহস্যময়ী সৌরভী বুঝি স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা।

তবু অস্থির হয় না রসময়। যখন আপনা থেকেই ধরা দিয়েছে মানিনী, ভাবনা নেই রসময়ের।

ছোট্ট ঘর সৌরভীর। সাজান গোছান। একপাশে রাখা পরম যত্নে একটা টিনের বাক্স। কাছে গিয়ে বসে তার পাশে। তারপর আস্তে সেটাকে খোলে সৌরভী। প্রদীপের আলোয় কি যেন দেখে নেয় একটুখানি। একবার বুঝি ইতস্ততঃ করে। পরমুহূর্তেই তুলে ধরে একখানা ফটো।

রসময় বসে থাকে দারুণ ঔৎসুক্যে। আর পারে না। উঠে আসে ওর কাছে। সৌরভী কাপড় দিয়ে মুছে নিয়ে ফটোখানাকে ঝুলিয়ে দেয় দেয়ালের গায়ে পেরেকে। তারপর প্রদীপটা তুলে নিয়ে ফটোখানার সুমুখে এসে দাঁড়ায়, যেন তার হাতের মঙ্গলপ্রদীপের উত্তাপ দিতে চায় ছবির মানুষটিকে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সৌরভী ফটোর দিকে। রসময়ও এগিয়ে যায় পায়ে পায়ে। চমৎকার চেহারা। কোন শিল্পীর নিপুণ তুলির আঁচড়ে আঁকা এক দেবমূর্তি।

রসময় বিরক্ত হয়। এমন সুন্দর ফটোখানাকে নোংরা করে রেখেছে সৌরভী! ফটোর নীচেটা রঙে ভরা।

—এত সিঁদূর গোলা দিয়েছ কেন?

কে সাড়া দেবে। সৌরভী তখন ডুবে গিয়েছে বুঝি কোন অতীতে। ফটোখানাকে সে দেখছে না, যেন ধ্যান করছে ফটোর ঐ মানুষটির।

রসময় একবার চায় ফটোর দিকে আবার জীবন্ত এই মানুষটির দিকে। এ সৌরভীকে সে চেনে না। এ যেন অন্য এক ধ্যানস্থ মূর্তি। যে চোখে বিলোল কটাক্ষ হানে সে চোখে নেমেছে বুঝি ছায়াঘেরা আম্রবীথির নীচে পল্লীবধূর সন্ধ্যাদীপ হাতে নিয়ে তুলসী মঞ্চের সুমুখের আবছা আলো। যেন রসময়কেও ভুলিয়ে দেয় সব কিছু।

তাই তো নড়ে ওঠে রসময়। আরও এক পা যায় এগিয়ে।

সৌরভী ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবারে। প্রদীপটা তুলে দিয়েছে ওর হাতে। তারপর ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পটাপট ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে উন্মুক্ত করে তুলে ধরেছে তার নিটোল যৌবনপুষ্ট দুটি পীনোন্নত স্তন। যার দিকে রসময়ের দুটি বিমুগ্ধ আঁখির সরস দৃষ্টি কামনার জারক রসে লালায়িত। নির্বাক রসময় বিভোর সৌন্দর্য ভাণ্ডারের এই অপরূপ লীলাচাপল্যে।

সৌরভী বুঝি থামে না তখনও। কাঁচের রঙীন চুড়িগুলোকে সংযত করে রেখেছে যে সেফ্‌টিপিনটা, খুলে নিয়েছে সেটাকে। তারপর রসময়ের চোখের সুমুখেই সেফ্‌টিপিনটা চালিয়ে দিয়েছে সজোরে যেখান থেকে স্তনরেখা শুরু হয়েছে সেই মাংসল বুকে। অনামিকার মাথায় পরিয়ে নিয়ে বুকের তাজা খুন ছবির নাগরকে সাজিয়েছে রক্ততিলকে।

বোবা রসময় এ পর্যন্ত বুঝি পাথর হয়েছিল দাঁড়িয়ে। এবারে চমকে উঠেছে হঠাৎ। কোনদিকে না চেয়েই এক ছুটে নেমে এসেছে পথে। দৌড়ালে হবে কি তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে সৌরভীর মধুঝরা সোহাগ—কই গো নাগর! বলি গেলে কোথায়?

'ভারতের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে যে যা বলে বলুক, আমি সারা জীবন ধরে কাজ ক'রে আসছি এবং সেই [অভিজ্ঞতার] জোরে আমি তোমাদিগকে বলছি যে, তোমরা যদি আধ্যাত্মিক ভাবপরায়ণ না হও তবে কিছুতেই নবজীবন আসবে না, আর তোমাদের নিজেদের জন্যেই যে এর প্রয়োজন, তা নয়, এর উপর সমগ্র জগতের কল্যাণ নির্ভর করছে। কারণ খোলাখুলিই আমি তোমাদিগকে বলছি যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি একেবারে তলদেশ পর্যন্ত নড়ে গিয়েছে। জড়বাদের শিথিল বালুকারাশির উপর যত বিশাল সৌধই নির্মিত হোক না কেন, একদিন বিপদ ঘটবেই—, একদিন না একদিন তাকে ধসে পড়তে হবেই হবে।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভূয়ো স্বাধীনতার স্বপ্ন

চাও ফু

[বর্তমানের জঙ্গীবাদী চীন নেতাদের অপকৌশলের খেলায় সমগ্র চীনা জাতির ভাগ্যাহত ললাটে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির দোষারোপ প্রায় কর্দমকলঙ্কের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সম্প্রসারণবাদী চীনা নায়কদের কার্যকলাপ বাঁশের পর্দার আড়ালে একেবারে গোপন থাকলেও চীনা জনগণের অভ্যুদয়ে মধ্যে মধ্যে চৈনিক নেতাদের কৌশলী কুকীর্তিসমূহ সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এতৎসহ আত্মবিবরণটি জনৈক চীনা নাগরিকের স্বীকারোক্তি বা জবানবন্দী—বর্তমান চীনের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তথাকথিত সাম্যবাদী মাও সে তুং এবং তাঁর সহকারীবৃন্দ চীনের অবস্থা বা হাল যে নাজেহাল করে তুলেছেন তার প্রমাণ এই জবানবন্দীর ছত্রে ছত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। চীনা হানাদার ভারত সীমান্তের আশে পাশে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। বর্তমান চীন যে কি তা জানতে হলে এই রচনাটি পাঠক পাঠিকাদের অবশ্য পঠিতব্য। চাও ফু ষ্টকহলমের চীনা কম্যুনিষ্ট দূতাবাসের একজন কর্মচারী ছিলেন, গত গ্রীষ্মকালে তিনি পশ্চিমে আসেন। এখানে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কাহিনী বলেছেন কম্যুনিজম চীন কি করেছে ও তিনি তাতে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।—সম্পাদক]

আমার নাম চাও-ফু। আমি প্রায় দু'বছর ধরে ষ্টকহলমের চীনা কম্যুনিষ্ট দূতাবাসের সহকারী এক্সিকিউটিভ অফিসার ও সিকিউরিটি অফিসার ছিলুম। এই গ্রীষ্মকালের এক রাতে আমি চূড়ান্তভাবে স্থির করলাম দূতাবাস ত্যাগ করবো, কম্যুনিষ্টদের অধীনে উৎপীড়ন ও আশাহীন জীবন যাপন না করে অন্ততঃ স্বাধীন ও সুখী হবার সুযোগ নেব। কিন্তু তার চেয়েও বেশী, আমি চীনা জনগণের প্রকৃত কল্যাণের জন্য কাজ করবার সুযোগ চাইছিলুম। এখন আমি এখানে আছি ও আপনাদের আমার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি—কেন আমি পালিয়ে এলুম। চীনের উত্তর-পূর্বাংশে মাঞ্চুরিয়ার কিরিন প্রদেশে শুয়াংগিয়াং-এর কাছে এক গ্রামে একটি সাধারণ কৃষক পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করি ১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। আমার পিতা একজন ক্ষুদ্র কৃষক ছিলেন, তিনি আমার বড় দু'ভাই ও ছোট দু'বোনসহ মোট সাত জনের এক পরিবারের কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করতেন। আমার যখন এগার বছর বয়স তখন পিতার মহামারী রোগে মৃত্যু হয়। এক কাকার কাছে বাস করবার জন্য মা আমাদের নিয়ে গেলেন, শুয়াংগিয়াং-এ পরে চ্যাংচুনে আমি স্কুলে পড়া সুরু করি।

আমার পারিবারিক ইতিহাস নিষ্কলুষ থাকায় কম্যুনিষ্ট পার্টি দল কর্তৃপক্ষ আমাকে চ্যাংচুন রিজার্ভ অফিসারদের ইমক্যাপ্ট স্কুলে স্থানান্তরিত করবার প্রস্তাব করলেন। সেই স্কুল আমার খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান প্রভৃতি সমস্ত খরচ দেবে, স্বভাবতই আমি এই সুযোগ নেবার জন্য ঝুঁকে পড়লুম। চ্যাংচুনে তিন বছর ট্রেণিং নেবার পর ১৯৫৫ সালের গ্রীষ্মকালে আমি গ্রাজুয়েট হলুম। হেইলুংচিয়াং প্রদেশে চিয়ামুসুতে পাবলিক সিকিউরিটিতে আমি তখন কাজে নিযুক্ত হই। হেইলুংচিয়াং প্রদেশ কিরিন প্রদেশের উত্তর-পূর্বে ও সোভিয়েট রাশিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। ছ'মাস কাজ করবার পর আমি পাবলিক সিকিউরিটি বাহিনীতে সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট পদে উন্নীত হই। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আমি চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির—প্রার্থী সদস্য হই এবং ১৯৫৬ সালের জুন মাসে পুরোপুরি সদস্য হই। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আমি চিয়ামুসু বন্দী শিবিরের পাবলিক সিকিউরিটি ইউনিটের প্লেন্‌টুন কমাণ্ডার হই। ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে আমি চিয়ামুসু পাবলিক সিকিউরিটি ইউনিটের ফৌজী সরবরাহ দপ্তর অফিসে বদলী হই। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার মা আমার বিয়ে দিলেন ও ১৯৬০ সালের মে মাসে আমার একটি মেয়ে হল। হারবিনে অল্পকাল ট্রেণিং নেবার পর আমাকে চিয়ামুসু পাবলিক সিকিউরিটি ইউনিটে—খাদ্য, পোষাক ও জ্বালানীর সরবরাহ অফিসার রূপে নিযুক্ত করা হল। এই ইউনিটটির ওপর হেইলুং-চিয়াং প্রদেশের হোচিয়াং বিশেষ জেলায় সৈন্য সরবরাহের দায়িত্ব ছিল। এখানে থাকবার সময় আমি কম্যুনিজমের বিরোধী হয়ে উঠতে সুরু করি বলে মনে হয়।

সেই জেলায় বহু সংখ্যক শ্রমিক সংস্কার শিবির থাকার জন্য আমি এভাবে চিন্তা করতে সুরু করি, অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও অন্যতম। প্রদেশের পাঁচটি জেলার অন্যতম একমাত্র এই জেলাতেই এই সমস্ত ক্যাম্পে তিন লক্ষের বেশী লোক ছিল। এই বন্দীদের সামান্য খাদ্য দেওয়া হত ও তারা মাটির ঘরে যতদূর সম্ভব খারাপ অবস্থায় পশুর চেয়েও হীনভাবে বাস করতো।

১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে একদিন আমাকে হেডকোয়ার্টারে তলব করা হল এবং একটি দীর্ঘ প্রশ্নাবলীর জবাব লিখতে বলা হল। পরে রাজনৈতিক বিভাগের অফিসার আমার—পল্লীভবনের বিস্তারিত ঠিকানা চেয়ে আমাকে বললেন—যে জেলায় আমার বাড়ী সেখানে তিনি খোঁজ করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমার বাড়ী খুঁজে বের করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত আমার ইউনিটের তিনজন অফিসার পিকিং-এ যাবার জন্য ও জননিরাপত্তা মন্ত্রিদপ্তরে গিয়ে দেখা করবার জন্য মনোনীত হলেন। কোন অজ্ঞাত কারণে অপর দু'জন অফিসারকে পরে ট্রেনিং নেওয়া থেকে বাতিল করা হল। জননিরাপত্তা মন্ত্রিদপ্তরে দেখা করবার পর আমাকে স্পেশাল ট্রেনিং নেবার জন্য পিকিং-এর কাছে অগ্রবর্তী সিভিল পুলিশ ক্যাডার ট্রেনিং স্কুলে পাঠান হল। এই স্কুলে বিদেশী মিশনের জন্য বিশেষত: দূতাবাস ও বাণিজ্য দূতাবাসের সিকিউরিটি অফিসারদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। আমার ক্লাশে আশি জন শিক্ষার্থী ছিল, স্কুলের অন্যান্য শ্রেণী থেকে আমার ক্লাশটিকে পৃথক করে রাখা হয়েছিল। ট্রেনিং ছয়মাস স্থায়ী হয়। প্রথম যে কর্মী দলকে বিদেশে পাঠান হয় তার একটিতে আমি ছিলুম, আমি ষ্টকহলমে কাজে নিযুক্ত হই। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে আমি সেখানে পৌঁছাই এবং সহকারী এক্সিকিউটিভ অফিসার ও সিকিউরিটি অফিসার-রূপে আমার কার্যভার গ্রহণ করি।

১৯৬০ সালের অক্টোবর থেকে এবছর গ্রীষ্মের শেষদিক পর্যন্ত আমি ষ্টকহলমে ছিলুম, এই সময় আমি চীনা কম্যুনিষ্ট দূতাবাস থেকে পলায়ন করি। অনেক নতুন বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছে কেন আমি চলে যাবার সিদ্ধান্ত করেছি। আপনারাও সম্ভবত: জানতে উৎসুক হয়েছেন, যে কম্যুনিষ্ট সরকার আমার মত একজন দরিদ্র কৃষক বালককে ট্রেনিং দান ও ইউরোপে আসবার সুযোগ দিয়েছেন তার আশ্রয় আমি ছেড়ে এলুম কেন। প্রথম কারণ হল, চীনা গণ-প্রজাতন্ত্র সরকারের অধীনে দশ বছরের বেশী সময় বাস করে আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি যে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থা চীনের সাধারণ লোককে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হয়েছে। সুইডেনে আসার আগে আমার কাজের মধ্য দিয়ে আমি প্রায়ই এটা দেখেছি। চীন থেকে যে সব লোক ষ্টকহলমে ফিরে এসেছে তাদের চীনে যাবার আগের অবস্থা থেকে কুড়ি পাউণ্ড ওজন কমে গেছে। খাদ্য ও পোষাকের দারুণ অভাবের দুঃখজনক কাহিনী তারা বলেছে। এ থেকে দেখা গেছে ভালো হওয়ার পরিবর্তে অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে পড়েছে।
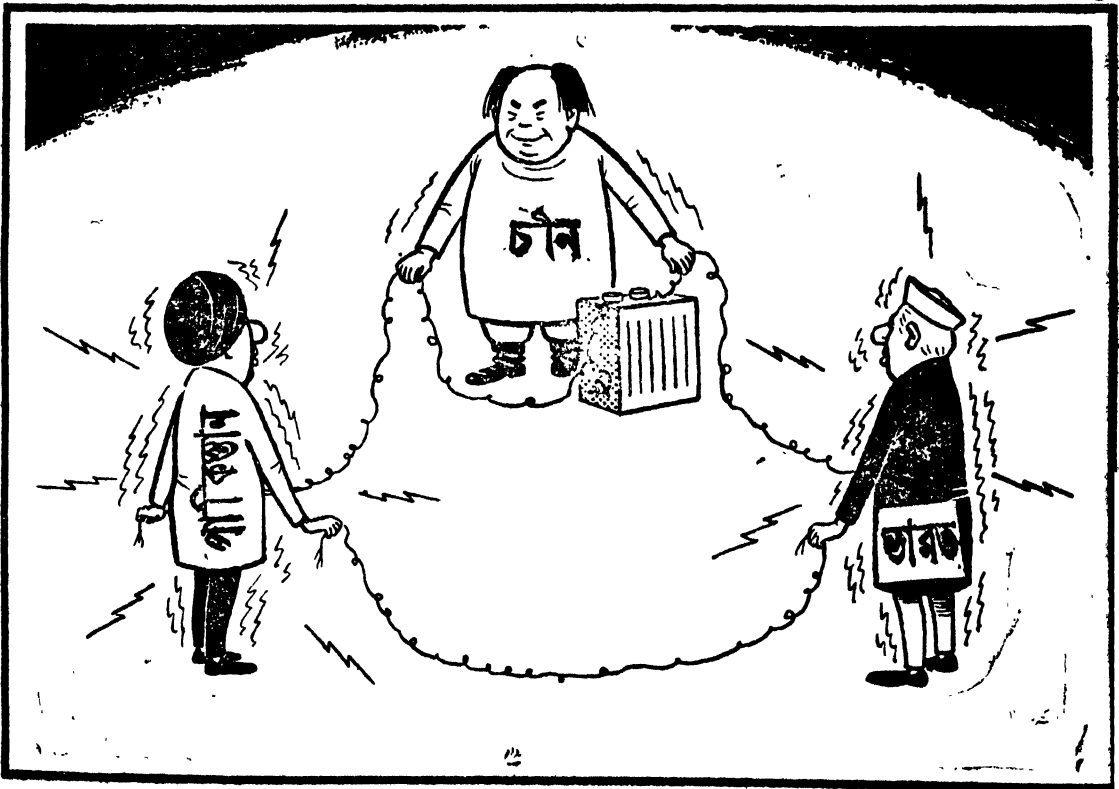
মাও সে তুং-এর ভেলকী!

চীনদেশে আমার পূর্বেকার অভিজ্ঞতা ও সুইডেনে যে সব বন্ধু ফিরে এসেছে তাদের কাছ থেকে চীনের অবস্থা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থা জনগণের কল্যাণ করতে পারছে না। খাদ্যাভাবের জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ওপর দোষ চাপানো হলেও চীন দেশে থাকার সময় আমি দেখেছি লোকে মাছ খেতে পায় না, অনাবৃষ্টি ও বন্যার ফলে সমুদ্রের মাছ নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন হয়নি। সারা দেশ থেকে কুকুরের দল অদৃশ্য হয়েছে, মাংসের অভাবে লোকে কুকুর খেতে বাধ্য হয়েছে। আমি অবাক হয়ে যাই এবং নিশ্চয়ই বলতে পারি দূতাবাসের আরও অনেকে অবাক হয়েছেন কেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুধু চীনদেশে দারুণ অভাব সৃষ্টি করেছে। সুইডেনে আমরা যা জেনেছি ও পাঠ করেছি তাতে দেখা যায় জাপান ও তাইওয়ানের মত নিকটবর্তী অঞ্চলে এরূপ কোন অভাব দেখা দেয়নি। মনে হয় এই সব অঞ্চলে আবহাওয়া একই রকমের তাতে সকলের কম ফসল উৎপন্ন হবার কথা, কিন্তু চীনদেশে বছরের পর বছর শস্যহানি হচ্ছে। সাধারণ মানুষও স্পষ্ট বুঝতে পারে আবহাওয়া অপেক্ষা কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থা চীনদেশে শস্যহানির জন্য বেশী দায়ী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি আমি যখন পিকিং থেকে ইউরোপ যাত্রা করি তখন আমার সঙ্গের যে সব ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ও খাদ্য ছিল ট্রেণে তা চুরি যায়, যদিও নতুন পিকিং ষ্টেশনের মালপত্রের ঘরে সেগুলো তল্লাসী করা হয়েছিল। আমি ভারপ্রাপ্ত পুলিস অফিসারের কাছে অভিযোগ করি, তিনি আমাকে ষ্টেশনে মাটির নীচের তলায় অফিস নিয়ে গেলেন। দেখলুম বন্দীদের বিরাট ঘর রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন প্রদেশের কয়েক শত উদ্বাস্তু ও শিশু রয়েছে, অনাহারের জ্বালায় তারা নিজ নিজ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। গ্রাম ছেড়ে চলে এসে আইনভঙ্গ করায় অথবা রেলের ভাড়া না দেওয়ায় তারা আটক হয়েছে।

সুইডেনে আমরা প্রায়ই প্রমাণ পেয়েছি যে চীনের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে পড়ছে। ১৯৬১ সালের গ্রীষ্মকালে রাষ্ট্রদূত তুং ও তার পত্নী ছুটি নিয়ে দেশে গেলেন। দূতাবাস কর্মচারীদের খাদ্য ফিরিয়ে আনার নিষেধাজ্ঞাসূচক একটি নির্দেশ সবেমাত্র দূতাবাস পাওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রদূত ভাণ করলেন যেন নির্দেশ পাওয়ার আগেই তিনি রওনা হয়ে গেছেন এবং কিছু পোষাক, জুতো ও বস্ত্র ছাড়াও আট কিলো গমের ময়দা সঙ্গে নেন। এগুলো তিনি সুইডেনে কিনেছেন। তাঁর স্ত্রী সুইডেনে ফিরে এসে অভিযোগ করেন যে একটি তালা কেনবার জন্য তাঁকে তিন ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং এক সময় তাঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়ায় অপর একজন সেটা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। দূতাবাসের হতভাগ্য পাচক সিউং চ্যাং-সুই ১৯৬১ সালের গ্রীষ্মকালে নানচ্যাং থেকে তাঁর স্ত্রীর এক চিঠি পান, তাতে তিনি লিখেছেন বন্যার জন্য তাঁর পাঁচটি শিশুর কোন খাদ্য নেই। সিউং আমাদের সকলের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লো যদিও সে জানতো যে সে কিছু করতে পারবে না। দূতাবাসের একজন সোফার ঐ সময় আন্তর্জাতিক মেলের মারফৎ তার পরিবারের কাছ থেকে একটি চিঠি পায়। তারা খাদ্যাভাবের কথা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। দূতাবাস তার চিঠি খুলেছিল এবং তার পরিবারবর্গকে আন্তর্জাতিক মেলের মারফৎ চিঠি লিখতে দেওয়ার জন্য সোফারকে তিরস্কার করেছিল—এগুলোই দূতাবাসের "সাহায্য"। আমার রুমমেট হুয়াং চিয়া-ইয়ুং দূতাবাসের ক্যাশিয়ার ও টাইপিষ্ট এই গ্রীষ্মকালে তিনি ছুটি নিয়ে চীনদেশে গিয়ে কুড়ি পাউণ্ড ওজন হারান তিনি বলেন খাদ্য পাওয়া এত কঠিন যে বুড়ো আঙুলের ডগায় ম... এক টুকরো মাংস পেলে তাকে বলা হয় মাংসের ডিস। হুয়াং তা নতুন বৌ-এর (যাকে সে সুইডেনে নিয়ে আসতে পারেনি) জন্য একটি আয়না কিনবার উদ্দেশে ৩ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু সমস্ত আয়না বিক্রী হয়ে গেছে দেখতে পায়।

আমরা সবাই জানতুম অবস্থা কঠিন কারণ এ বছর জুলাই মাসে দূতাবাস কর্মচারীদের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে হ্রাস পেয়ে তেইশ হয়েছে এবং এর আগে আমরা সুইডেনে আমাদের বেতনের অর্ধেক মাত্র পাচ্ছিলুম। বাকী টাকা স্বদেশে চীনা কম্যুনিষ্ট মুদ্রায় জমা হচ্ছিল। স্বদেশে দারুণ-কঠিন অবস্থা জানা সত্ত্বেও দূতাবাসে আমরা এমনভাবে কথাবার্তা বলতুম যেন সবকিছু সুন্দর আছে ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্বে চীনের দারুণ অগ্রগতি হচ্ছে। আমি অনুমান করছি এইটাই কম্যুনিষ্টদের পথ। অবস্থা যখন খারাপ হয় তখন তারা আরও বেশী করে গর্বের সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই সম্প্রতি জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে বলেন যে ১৯৬০ সাল থেকে প্রতি বছর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কম্যুনিষ্টরা সর্বদাই এই কথা বলে থাকে, কিন্তু আমি জানি যে জনগণের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে, চীনা কম্যুনিষ্টদের নীতি এর জন্য দায়ী।

আমি বুঝতে পারলুম যে, বিশেষ করে সুইডেনে থাকার সময়, আমাদের সংবিধানে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া সত্ত্বেও চীনদেশে কোন স্বাধীনতা নেই। সুইডেনে আমি নিজের চোখে দেখতে পেলুম যে (আমাদের দূতাবাসের অন্যান্য লোকেরাও দেখতে পেয়েছে মনে হয়) কম্যুনিষ্ট প্রচারকার্য মিথ্যা এবং সুইডেনে জনগণ ভালো খাদ্য ও পোষাকই শুধু পায় না, ইচ্ছা করলে গণতান্ত্রিক ভোটের দ্বারা তাদের সরকারের পরিবর্তন ঘটাবার স্বাধীনতাও তাদের আছে। রাত্রিবেলা আমি জেগে শুয়ে রইলুম আর চিন্তা করতে লাগলুম চীনদেশে আমাদের কি করবার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তে আমি একটাও খুঁজে পেলুম না। আমাদের কথা বলার, ভ্রমণ করার, কাজ অথবা গৃহ পরিবর্তন করার এমন কি নিজেদের চিন্তা করবারও স্বাধীনতা নেই।

অনুমান করলুম চীন ত্যাগ করবার আগেই আমি এই জিনিসগুলো চিন্তা করতে সুরু করেছিলুম, বিশেষ করে মাও প্রত্যেককে কমিউন গড়বার ও সামনে লাফ দিয়ে এগিয়ে চলবার আদেশ দেবার পর। সেই সময়ের পর থেকে অথবা ১৯৫৮ সালের গোড়া থেকে অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। আমি অবশ্য স্বীকার করবো যে পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর অফিসার রূপে ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যরূপে কৃষক ও শ্রমিকদের চেয়ে আমি সব সময় ভালভাবে বাস করতে পারতুম এবং আপনাকে যা করতে বলা হয়েছে তা যতদিন করতুম ততদিন আমার উদ্বেগের কারণ ছিল না। আমি তখন নিজেকে প্রশ্ন করলুম: জীবনের অর্থ কি? শুধু কি বেঁচে থাকা? চীনা জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু করবার চেষ্টা উচিত কি না? চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি—অবস্থা খারাপ করে তুলেছে। আমি তাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার ও কম্যুনিষ্ট শাসনে চীনের শোচনীয় অবস্থা বিশ্ববাসীকে জানাবার সিদ্ধান্ত করলুম।

দূতাবাসে আমাদের স্বাধীনতার ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ থাকায় আমি বিরক্ত হলুম। অফিসের কাজের পর আমরা বাইরে কোথায় যাচ্ছি ও কতক্ষণ যাচ্ছি তা' ফর্মে লিখে জানাতে হত। অফিসের কাজের সময়েও আমাদের ষ্টাফের একজন লোককে সঙ্গে নিতে হত। কেবল কয়েকজনকে—রাষ্ট্রদূত উপদেষ্টা ও আমাকে একা-একা বাইরে যেতে দেওয়া হত। তখন আমি চিন্তা করলুম যে আমাকে তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে। এর পরই আমার পলায়নের কাহিনী।

এই গ্রীষ্মকালের এক রাত্রে স্বাধীনতার চিন্তা আমাকে জাগিয়ে রাখলো এবং পরদিন সকালে আমি অলক্ষ্যে দূতাবাস ত্যাগ করলুম। কালো রঙের একটা ক্রাইসলার মোটর চালাবার অধিকার আমার ছিল, সেটা চালিয়ে আমি ষ্টকহলমের বাইরে এলুম, সেখানে মোটর দাঁড় করিয়ে সম্বন্ধে বিবেচনা করলুম কি করা উচিত। পালিয়ে যাব এরকম একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন নয়। কিন্তু কিভাবে? জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এক মাইল হাঁটলুম। ট্রেণে চড়ে নানা জায়গায় গেলুম, তারপর অধিক রাত্রে সোডাবতালজে ষ্টেশনে এলুম। ষ্টেশনের একজন লোক দয়া করে সকাল পর্যন্ত ওয়েটিং রুমে ঘুমুতে দিল। পরদিন একটি ট্রেণে করে ডেনমার্ক যাত্রা করলুম। চলন্ত ট্রেণে উঠে, পায়ে হেঁটে ও বন্ধুভাবাপন্ন লোকদের সাহায্যে আমি শেষ পর্যন্ত ইউরোপে এসে পৌঁচেছি। নিরাপদ বোধ করে আমি আমেরিকান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলুম। তারা দয়া করে আমার কাহিনী শুনলেন এবং আন্তরিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নেবার জন্য তারা আমাকে সাহায্য করতে সম্মত হলেন।

আমি আমেরিকা যেয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাবার আশা করছি। কি ঘটে গেল তা ভেবে এখনও আমি হতভম্ব হয়ে আছি এবং স্বাধীন হওয়ায় কি খুশী যে হয়েছি তা' ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারছি না। মনে মনে জানি আমি ঠিক পথ বেছে নিয়েছি এবং যে সমস্ত আমেরিকান আমাকে এরকম সাহায্য করেছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। যে মানুষ তার নিজের দেশ থেকে চলে যেতে চায় সে সিদ্ধান্ত তার একা-একাই করা উচিত। এটা করার পর তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তিনি খুব নিঃসঙ্গ ও অবাঞ্ছিত হয়ে যাবেন। কিন্তু তাদের সাহায্য ও বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে আমেরিকানরা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমি অবাঞ্ছিত ও নিঃসঙ্গ নই। এজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমারই আত্মাকে

স্বামী বিবেকানন্দ

ধরে থাকো আরো কিছুকাল, অটল হৃদয়!
ছিন্ন ক'রো নাকো এই আজন্ম বন্ধন,
যদিও অস্পষ্ট ক্ষীণ এই বর্তমান—ভবিষ্যৎ ঘনতমোময়!

কেটে গেছে যেন এক যুগ—তোমাতে আমাতে মিলে
যাত্রা শুরু করিলাম জীবনের উঁচু নিচু পথে,
অপূর্ব সমুদ্রে কভু ভেসে যাই শান্ত ধীর পালে;
আমি মোর যত কাছে, তার চেয়ে তুমি আরো কাছে—মাঝে মাঝে,
মনের তরঙ্গগুলি উঠিবার আগে প্রকাশিত করেছ তুমিই।

অবিকল প্রতিভাস! তোমার স্পন্দন—মেলানো আমার সাথে,
সূক্ষ্মতম চিন্তা, তবু পূর্ণরূপে ধ্বনিত তোমাতে!
হে সংস্কার, লিপিকার! এখন কি আমাদের বিদায়ের পালা?

তোমাতেই রহিয়াছে বন্ধুত্ব বিশ্বাস,
অশুভ বাসনা যবে ফেনাইয়া ওঠে, সতর্ক করেছ তুমি;
সাবধান-বাণী তব হেলায় দিয়েছি ফেলে,
তবু তুমি সত্য শুভ শক্তি মোর—পূর্বের মতন!

'To my own Soul' কবিতার অনুবাদ; রচনার স্থান কাল অজ্ঞাত। "উদ্বোধন" এর সৌজন্যে

জীবন, যৌবন ও হর্মোন

সুব্রত পাল

হর্মোন কাহিনী বিচিত্র। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে যৌনহর্মোনকথার বোধ হয় তুলনা নেই। যৌনহর্মোনগুলি ক্ষরিত হয় মূলত নারীদেহের ডিম্বকোষ (Ovary) থেকে এবং পুরুষদেহে অণ্ডকোষ বা টেস্টিস থেকে। এতদ্ভিন্ন, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকেও যৎকিঞ্চিৎ যৌনহর্মোন নিঃসৃত হয়। ওভারী-ক্ষরিত হর্মোনগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ঈস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন। টেস্টিস থেকে ক্ষরিত হয় প্রধানত টেস্টোস্টেরন। যৌনহর্মোনগুলি স্টেরয়েড জাতীয়। অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের হর্মোনের সঙ্গে এই সব হর্মোনের রাসায়নিক গঠনগত সাদৃশ্য আছে।

নারীদেহে মাসিক ঋতুচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সমতা রেখে ওভারীর গঠন এবং ক্রিয়াকলাপেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বস্তুত ওভারীর ক্ষরণক্রিয়াঘটিত পরিবর্তনই মূলত এবং মুখ্যত মাসিক ঋতুচক্রের বিচিত্র পরিবর্তনের জন্য দায়ী। মাসিক ঋতুচক্রের প্রথম পর্বে ক্ষরিত হয় ঈস্ট্রোজেন আর দ্বিতীয় পর্বে প্রোজেস্টেরন। সুতরাং নারীদেহে যৌনহর্মোনের লীলামাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রথমে ঋতুচক্রঘটিত ঘটনাটি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

কিন্তু তারও আগে জানতে হবে আরো একটি গভীরবার্তা—যৌবনের এবং নারীরূপের গোপন কথাটি। উর্বশীর অনন্তযৌবনের রহস্য আমাদের কাছে অবাঙ্মানস-গোচর এবং পুরাকল্পের ঋষিগণ জরা-পরিহার করে কি করে পুনর্যৌবন লাভ করতেন, সে রহস্যও আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু নারীদেহে যৌবনের অন্তর্গূঢ় সমাচার অর্থাৎ তার দেহতাত্ত্বিক কার্যকারণ সূত্রটি আজ বহুলাংশে জানা গেছে। এই যৌবনের পরিবর্তনের মূলে যৌনহর্মোনগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজ সর্বজনস্বীকৃত। যৌন হর্মোনগুলির ভূমিকা যৌবনকালেই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি দিয়ে দেখলে ভ্রূণ সৃষ্টির শুভলগ্ন থেকেই যৌন-হর্মোনের ক্রিয়া শুরু হয়। বহু জটিল গবেষণার ফলে জানা গেছে যে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের দেহবৃদ্ধির মূলে অন্যান্য অনেক হর্মোনের সঙ্গে যৌন-হর্মোনেরও কিছু অবদান আছে। গর্ভস্থ শিশু নারী হবে কী, পুরুষ হবে তাও সুনিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রভাবে নয়, যৌনহর্মোনেরই প্রভাবে। এবং এই লিঙ্গবিনিশ্চয় যখন সমাপ্ত হ'ল তখন থেকে শিশু দেহে শুরু হ'ল নতুন কাহিনীর। অর্থাৎ শিশু যদি নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে তাহলে তার দেহে নারীসুলভ পরিবর্তনের সূচনা হয়। তবে যৌবনাগমের পূর্বাবধি এই পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ তেমন সুপ্রকট হয় না। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে দ্রুত ভাঙাগড়া চলতে থাকে, চলতে থাকে যৌবনের প্রস্তুতি—জীবনের রঙ্গমঞ্চে পূর্ণরূপ নিয়ে আবির্ভূত হওয়ার প্রাক্-পর্ব। এই প্রস্তুতিপর্বে পিটুইটারী নামক অন্তঃক্ষরী গ্রন্থির যৌনগ্রন্থি-উদ্দীপক হর্মোন-গোষ্ঠীর অনুপ্রেরণায় ওভারী-গ্রন্থির ক্রমান্বয় বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এতৎসঙ্গে আরও অন্যান্য সহকারী যৌন-অঙ্গেরও বিবর্তন ঘটতে থাকে এবং আনুষঙ্গিক যৌন চরিত্রের বিকাশ হতে থাকে ক্রমশ-ক্রমশ। অতঃপর একদিন যৌবনের আবির্ভাব ঘটে জীবনের রঙ্গমঞ্চে। প্রথম রজঃস্রাব ঘোষণা করে সেই শুভ-আবির্ভাববার্তা। কৈশোর আর যৌবনের এই মিলন লগ্নকে বলা হয় বয়ঃসন্ধিকাল। যার বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীতে বলা হয়েছে, 'কৈশোর এসে হাত মিলালো যৌবনের সঙ্গে।' আমাদের দেশের মেয়েদের সাধারণত বারো-তেরো বছরে প্রথম রজঃস্রাব হয়ে থাকে। শীতপ্রধানদেশের মেয়েদের কিছু বিলম্বে। বয়ঃসন্ধিরেখায় পদার্পণের পর থেকে প্রত্যেক নারীর জীবনে মাসিক ঋতু পর্যায়ের চক্রবৎ আবর্তন শুরু হয়। একটি চক্র সাধারণত ২৫ থেকে ৩১ দিন ব্যাপী চলে। একে প্রধানত দুইটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম পর্বের নাম—ঈস্ট্রোজেন-পর্ব। কারণ, এই পর্বের প্রধান হোতা হ'ল ওভারী ক্ষরিত ঈস্ট্রোজেন নামক হর্মোন। এই ঈস্ট্রোজেনের মূলউৎস হ'ল ওভারীর গ্রাফিয়ান ফলিকল্ নামক অংশ আর এর প্রধান কার্যক্ষেত্র গর্ভাশয় বা জরায়ু এবং অন্যান্য সহকারী যৌন-যন্ত্র। এর প্রভাবে গর্ভাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে নানা বৈশিষ্ট্য পূর্ণ পরিবর্তনের অবতারণা হয়, গর্ভাশয়ের ঝিল্লী অপেক্ষাকৃত পুরু হয়, গ্রন্থির সংখ্যা বেড়ে যায় এবং প্রত্যেকগ্রন্থির আকার আয়তন কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ওভারীতেও নানা সমসাময়িক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তনের মূলে আছে পিটুইটারী ক্ষরিত বিভিন্ন যৌন-গ্রন্থি-উদ্দীপক হর্মোনের অবদান। এদের মধ্যে ফলিকল্—উদ্দীপক হর্মোনটি ওভারীর গ্রাফিয়ান্ ফলিকল্গুলির বৃদ্ধি ঘটায়।

এই ফলিকল-এর অভ্যন্তরে "ওভাম" বা স্ত্রীবীজ নিহিত থাকে। ঋতুচক্রের দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ দিনে গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে স্ত্রীবীজ বেরিয়ে আসে। এই ঘটনাটিকে বলা হয় "ওভুলেশন" বা স্ত্রীবীজ বহিষ্করণ। অতঃপর গ্রাফিয়ান ফলিকল-এর স্থানে গড়ে ওঠে আর একটি নতুন উপাদন—তার নাম কর্পাস লুটিয়াম। এর কাজ হল প্রোজেস্টেরন প্রস্তুত করা। অবশ্য সামান্য পরিমাণে ঈস্ট্রোজেনও সে তৈরী করে। এই প্রোজেস্টেরন আর ঈস্ট্রোজেনের দ্বৈতপ্রভাবে গর্ভাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে দ্বিতীয়পর্বের শুভসূচনা ঘটে। গ্রন্থিগুলি আকারে প্রকারে বহুগুণ বর্ধিত হয়ে এঁকে বেঁকে সর্পিল আকার ধারণ করে। ঝিল্লীর ঘনত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থিতে সক্রিয় ক্ষরণ-কার্য শুরু হয়। তাই এই দ্বিতীয় পর্বের অন্য নাম—ক্ষরণ-পর্ব। ঝিল্লীর রক্ত প্রণালীগুলি এই পর্বে রক্তে রাঙা এবং একেবারে টইটুম্বুর হয়ে ওঠে। দশ বারো দিন ধরে চলে এই পর্ব। তারপরে আসে একটা দ্বিধার প্রশ্ন। যদি বহিষ্কৃত স্ত্রীবীজটি পুংবীজ বা স্পার্ম দ্বারা নিষিক্ত হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় পর্বে ঝিল্লীতে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে তার গতি অব্যাহত থাকে এবং ঝিল্লীর ঘনত্ব অনেকাংশে বেড়ে যায়। কারণ, এইখানেই যে রচিত হবে ভাবী ভ্রূণের শয্যা—জীবন-নাটকের প্রথম অঙ্কের লীলাভূমি।

কিন্তু যদি স্ত্রীবীজের নিষেক না ঘটে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ছিন্নাংশ

গর্ভাশয়ের দেয়াল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে খসে পড়ে ; সেই সঙ্গে রক্তক্ষরণ হয় প্রভৃত। স্ত্রীবীজও ঝরে পড়ে এর সঙ্গে। এই স্ত্রীবীজ এবং খসে পড়া ঝিল্লীসহ রক্ত গর্ভাশয় থেকে যোনিপথ বেয়ে বাইরে আসে। এই রক্তপ্রবাহকেই আমরা বলি রজঃস্রাব বা ঋতুস্রাব। মহাত্মা হিপোক্রেটিস একে ভগ্ন হৃদয় গর্ভাশয়ের কান্না বলে অভিহিত করেছিলেন। একটি স্ত্রীবীজের জীবন ব্যর্থ হয়ে ঝরে গেল—নিষেক ঘটলো না ; হল না নবজীবনের অঙ্কুরোদ্গম, তাই বুঝি গর্ভাশয়ের এই রক্তাপ্লুত রোদন।

উপরের আলোচনা থেকে অন্তত একটি কথা সম্ভবত স্পষ্টরূপে বোঝা গেল যে, মাসিক ঋতুচক্রের প্রবর্তনামূলে ঈস্ট্রোজেন-প্রোজেস্টেরনের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম পর্বে ঈস্ট্রোজেন একাই গর্ভাশয়ের পরিবর্তন ঘটায় ; দ্বিতীয় পর্বে প্রোজেস্টেরন এসে যোগ দেয় তার সঙ্গে। রজঃস্রাব সংঘটনের দিনদুই পূর্বে ঈস্ট্রোজেন-প্রোজেস্টেরন উভয়ের ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায় ; উভয় হর্মোনের প্রভাব থেকে গর্ভাশয় অকস্মাৎ বঞ্চিত হয়ে পড়ে বলেই রক্তস্রাব ঘটে থাকে।

যৌবনারম্ভে নারীদেহে স্তনের বৃদ্ধি এবং ক্ষরণক্রিয়ার মূলেও ঈস্ট্রোজেন-প্রোজেস্টেরনের প্রভাব অনস্বীকার্য। বস্তুতপক্ষে কিশোরীর কাঁচা শরীরকে বিচিত্র ভাঙাগড়ার মাধ্যমে যৌবনের অনুপম মাধুর্যে মণ্ডিত করে তোলে যৌনহর্মোন সমূহই।

নারীদেহের বিবিধ হর্মোনঘটিত বিভ্রাটে বিশেষ করে মাসিক ঋতুচক্র-ঘটিত বিভিন্ন অসংগতিতে যৌনহর্মোনগুলি ব্যাপকভাবে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সব অসংগতির মধ্যে অনিয়মিত রজঃস্রাব, রজঃকষ্ট, অত্যধিক রক্তপ্রবাহ, ঋতুবন্ধ ইত্যাদি প্রধান। সাধারণত ৪৫—৫০ বৎসর বয়সে নারীদেহে শেষ ঋতুস্রাব ঘটে থাকে। এই কালকে তাই বলা হয় ঋতু সমাপ্তিকাল। এই সময় অধিকাংশ নারীই বিভিন্ন মানসিক এবং দৈহিক উপসর্গে ভুগে থাকেন। যৌনহর্মোনের সুষ্ঠু এবং যথাযথ প্রয়োগ এই সকল ক্ষেত্রে সুফলপ্রদ।

অনেক সময় দেহে যৌনহর্মোনের স্বল্পতার জন্য নারীদেহে উদ্ভিন্ন যৌবনের লক্ষণসমূহের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে না। ঈস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরনের যুক্তিযুক্ত প্রয়োগ বিলম্বিত যৌবনকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। হর্মোন প্রয়োগের ফলে গর্ভাশয় ও স্তনের দ্রুত বিকাশ ঘটে। অন্যান্য সহকারী যৌনাঙ্গসমূহ ক্রমপরিণতির পথে এগিয়ে চলে। মাসিক ঋতু-চক্রের সুমিতি ক্রমশ স্থাপিত হয়। এবং এতাবৎ অবিকশিত যৌন-চরিত্রগুলি দেহে-মনে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে।

এবার পুরুষদেহের যৌনহর্মোনগুলির কথা বলবো। বলা বাহুল্য, পুংদেহের হর্মোন কাহিনীর এত জটিলতাও নেই, লীলা-বৈচিত্র্যও নেই। প্রধান পুংযৌন হর্মোনের নাম—টেস্টোস্টেরন। এটিও স্টেরয়েড জাতীয়। টেস্টিসের এণ্ডোক্রিন বা অন্তঃক্ষরী অংশ থেকে নিঃসৃত হয় এই হর্মোনটি। যৌবনারম্ভে সহকারী যৌনযন্ত্রসমূহের বৃদ্ধি, বিকাশ এবং সুমিত ক্রিয়াকলাপের জন্য এই টেস্টোস্টেরনই মূলত দায়ী। বয়ঃসন্ধি-কালে যৌনচরিত্রের অভিব্যক্তি ঘটে এই হর্মোনটিরই দৌত্যে। এই হর্মোনের স্বল্পতা বা অপরিমিতি জীবনে নানা যৌনবিভ্রাট সৃষ্টি করে।

ঋতুর ভিতরে শ্রেষ্ঠ বসন্ত। জীবনের শ্রেষ্ঠ ঋতু হচ্ছে যৌবন। নরনারীর দেহে যৌবনের মধুর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে যৌনহর্মোনগুলি ; যৌনহর্মোনগুলির বিচিত্রমুখী লীলা-কলাপ দেখে আমার বহুকথিত উক্তিটিরই পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে :—যৌনহর্মোন কাহিনী নাটকের চেয়েও নাটকীয়, উপন্যাসের চেয়েও অভিনব।

মৃত্যুরূপা মাতা

স্বামী বিবেকানন্দ

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, পরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ।
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার, মৃত্যুর কালিমা-মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়।
করালী! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, ;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ, প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে।*

* কাশ্মীরের বিখ্যাত তীর্থ ক্ষীরভবানীতে যাত্রার সময় সমাধিস্থ অবস্থায় লিখিত।

বিলাতে কয়েক বছর

অরুণকুমার দত্ত

সে এক শেষ হেমন্তের সোনাঝরা সকাল। ওশিয়ানিয়া জাহাজটা আস্তে আস্তে মেসিনা বন্দরে নোঙ্গর ফেলল।

ইতালীয় কোম্পানী লয়েডো ট্রিয়েষ্টিনো লাইনের জাহাজে বিলেত চলেছি। কোচিন বন্দর থেকে ভারত ছেড়েছি। তারপর আরব সাগর পেরিয়ে, এডেন ছুঁয়ে, লোহিত সাগর হয়ে পোর্ট সুয়েজে পৌঁছেছি আমরা। পোর্ট সুয়েজে সকালে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে মটরে করে কায়রো সহর, পিরামিড সব চক্কর সেরে রাত্তির বেলা ফের পোর্ট সৈদে এসে জাহাজ ধরেছি। পোর্ট সৈদের পর থেকে জাহাজ এসেছে ভূমধ্যসাগর দিয়ে। তারপর আজ সকালে জাহাজটা মেসিনার তীরে ভিড়ল। মেসিনা নামটা এর আগে কোনদিনই শুনিনি। মেসিনাতে আমরা প্রথম ইউরোপের মাটি স্পর্শ করলাম। মেসিনা হচ্ছে সিসিলি দ্বীপে। ইতালীর দক্ষিণে সিসিলি। ঠিক যেমন ভারতবর্ষ ও সিংহল। সিসিলি এখন কার্য্যতঃ ইতালীর অধীনে। যদিও সিসিলিয়ানরা নিজেদের ইতালীয়ান বলে না।

ছবির মত সুন্দর ছোট সহর। সমুদ্রের জল থেকে একটা পাহাড় উঠে গেছে। আর পাহাড়ের ওপর সমস্ত সহরটা। এপারে সিসিলি ওপারে ইতালী। মাঝখানে নাতিপ্রশস্ত ভূমধ্যসাগর। মেসিনা থেকে ওপারের ইতালীর দিকে তাকালাম। সিলুয়েটের ছবির মত ইতালীকে দেখাচ্ছে।

ঘণ্টা ছয়েক সময় ছিল হাতে। ঠিক করলাম সহরটা একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে হবে। জাহাজে আমাদের একটা দল আগেই হয়ে গিয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে নামলাম। পোষ্টঅফিসে যাবার দরকার ছিল। জাহাজে আমাদের সঙ্গে নীলনয়না অষ্ট্রেলিয়ান-নিউজিল্যাণ্ডার অনেকে ছিলেন। তারাও আমাদের সঙ্গে নামলেন জাহাজ থেকে সহর দেখতে।

জাহাজ থেকে নেমেই প্রথম মুস্কিল হল ভাষা নিয়ে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহোক ইংরাজীতে কাজ চলছিল। এবারে কি বলি। সঙ্গে বালীগঞ্জের চ্যাটার্জ্জী ছিল। সে বলল আমি ফ্রেঞ্চ জানি। দেখুন না এখানে সবাই ফ্রেঞ্চ ভাষা বোঝে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল কেউই ফ্রেঞ্চ ভাষা বুঝছে না। সবাই হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ চোখে পড়ল জাহাজের চেফ (রাঁধুনে) আসছে। তাকে জিজ্ঞেস করাতে সে আমাদের পোষ্টঅফিসে যাবার রাস্তা দেখিয়ে চলে গেল।

পোষ্টঅফিসে গিয়ে আবার এক মুস্কিল। ষ্ট্যাম্প কিনব। সঙ্গে সব পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স। ওরা কিন্তু ইতালীর মুদ্রা লীরা ছাড়া নেবে না। ভাগ্যে চ্যাটার্জ্জীর কাছে পকেট ভর্ত্তি লীরা ছিল। তাই দিয়ে ষ্ট্যাম্প কিনে চিঠিগুলো পাঠালাম।

সহরে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়ল লোকগুলো সাহেব হলেও চোখ, চুল সব কাল। গায়ের রংও খুব সাদা নয়। আরও মজা লাগল যখন দেখলাম তারা আরও অবাক হয়ে আমাদের দেখছে। আস্তে আস্তে দু'চারজন অল্প ইংরাজীজানাওয়ালা লোক কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কোত্থেকে এসেছ তোমরা? ইণ্ডিয়া বলাতে খুব খুশী হয়ে বলতে লাগল ও "ইন্দিশ"! "ইন্দিশ"! আমাদের সঙ্গে জনকয়েক বাঙ্গালী মেয়েছেলে ছিলেন। তাদের শাড়ীর আর লম্বা চুলের খুব প্রশংসা করতে লাগল সকলে। বলল, তোমাদের দেশের মেয়েদের খুব সুন্দর দেখতে। কেউ কেউ ফটো তুলতে লাগল।

তখন ইতালীয়ান জাহাজে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা সবে আসতে সুরু করেছে। তার আগে এত আসত না। এরা বেশী কেউই ভারতীয় বিশেষ করে মহিলাদের দেখেনি। তাই আমাদের দেখে এরা এত আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল।

পাহাড়টার গা বেয়ে বেয়ে রাস্তাটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গেছে। আমরাও সেই রাস্তা ধরে ধরে চলেছি। বাঁ পাশে একটা স্কুল ছিল। হঠাৎ একটা ছেলে আমাদের বিরাট দলটাকে দেখে চেঁচিয়ে অন্য ছেলেপুলেকে কি বলল। সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে ক্লাশ থেকে দলে দলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো বেরিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরল। তাজ্জব ব্যাপার! মাঝ থেকে তাদের স্কুল সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। মাষ্টার, মাষ্টারনীরা স্কুলের দরজার সামনে থেকে দেখতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলাম এ দেখছি আমাদের দেশেরই শ্বেত সংস্করণ।

যাহোক ছেলেমেয়েগুলো এসে তাদের খাতা-কলম বার করে দিল। অটোগ্রাফ দাও। মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝে গেলাম আমরা ভি, আই, পি, হয়ে গেছি এদের কাছে। গায়ের রং আর চেহারার জন্যে। সকলকে বললাম, সই কর।

তাদের পেরিয়ে ক্রমশঃ সহরটার নোংরা দিকগুলোর দিকে এগোতে লাগলাম। আস্তে আস্তে লোকগুলোর দৈন্যদারিদ্র্যের ছবিটা চোখে পড়তে লাগল। ভাঙ্গা টালির ছাদের বাড়ী। কয়েকজন ভিখারী আমাদের চারপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। পয়সা দিয়ে তাদের বিদায় করলাম। বুঝলাম ইতালীর সাধারণ লোকেদের জীবনযাত্রার মান আমাদের থেকে খুব বেশী উন্নত নয়।

ঘুরে ঘুরে তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল। রাস্তার মোড়ে একটা কফি হাউস দেখে ঢুকলাম। চ্যাটার্জ্জী তার ইংরেজী ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। দেখি তার মুখটা গোল হয়ে উঠেছে কি ব্যাপার, না যদি দাঁড়িয়ে খাই তা হলে এক কাপ কফির দাম পঞ্চাশ লীরা (প্রায় পঞ্চাশ নয়া পয়সা) যদি বসে খাই সত্তর, আর যদি গার্লফ্রেণ্ড (তারাই ব্যবস্থা করে দেবে) নিয়ে খাই তা হলে নব্বুই লীরা। মাঝখান থেকে আমাদের আর কফি খাওয়া হল না।

বেরিয়ে এলাম। ছোট সহর। লোক সংখ্যা অল্প। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সহর ঘোরা হয়ে গেল। জাহাজে ফিরে এলাম। সন্ধ্যের অন্ধকারে মেসিনা থেকে বিদায় নিলাম। ফিরে এলাম। সিসিলি দ্বীপের আলোগুলো জ্বলছে আর নিভছে···নিভছে আর জ্বলছে। ক্রমশঃ দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মেসিনা।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই জাহাজ থেমে গেল। বুঝলাম জাহাজ ফের নোঙ্গর করেছে। তাড়াতাড়ি বাইরের ডেকে বেরিয়ে এলাম। নেপলসে জাহাজ ভিড়েছে। একেবারে ঘাটে। স্বদেশ কিনা তাই।

বাইরে সে এক অভিনব দৃশ্য। জাহাজের ইতালীয়ান কর্ম্মচারীগুলো সব নেমে এসেছে। ছেলে মাকে, বাপ ছেলেকে, প্রণয়ী প্রণয়িনীকে জড়িয়ে ধরেছে। কতদিন পরে দেশে ফিরে এসেছে নাবিকের দল। আবার দুদিন বাদে চলে যাবে।

আগে থেকে ব্যবস্থা করেছিলাম পম্পাই বিসুবিয়াস দেখতে যাব। পরিকল্পনা অনুযায়ী বেরিয়ে এলাম। বাসে করে পম্পাই'য়ের দিকে রওনা হলাম। মনে পড়ল ছেলেবেলায় 'রুইনস অব পম্পাইয়ের' কথা পড়েছিলাম। কেমন করে অত সমৃদ্ধশালী সহর বিসুবিয়াসের লাভাগ্নিতে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

নেপলস সহরটা নতুন আর পুরোনোয় মেশানো। অনেকটা পাটনার মত। নেপলস থেকে আঠারো মাইল দূরে পম্পাই। দূর থেকে বিসুবিয়াস দেখা গেল। ধূমল পাহাড়। শান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি। কাছে থেকে দেখতে গেলে পুরো একদিন লেগে যায়। সে জন্যে আর যাওয়া হল না। কে জানে শান্ত বিসুবিয়াস আবার কোনদিন ফেটে পড়বে কি না? রাস্তার জায়গায় জায়গায় লাভা শক্ত হয়ে জমে রয়েছে। গাইড সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অনেকদিন আগেকার বিসুবিয়াসের উদ্‌গারিত লাভা।

পম্পাইয়ে এসে বাস থেমে গেল। একটা পুরোনো সহরের ধ্বংসাবশেষ। ঠিক যেমন নালন্দার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মাটি ফুঁড়ে বার করা হয়েছে। পম্পাই পাহাড়ের ওপর একটা ছোট সহর। তার কিছুটা বার করা হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগলাম পাহাড়ের ওপরে। আমাদের আগে চলেছে গাইড। সঙ্গে জাহাজের শ্বেত, অশ্বেত যাত্রীরা। একটা তোরণ দরজার ভেতর দিয়ে ঢুকলাম। সেটা ছিল সহরের প্রধান দরজা। পুরাকালে রোমক সাম্রাজ্যের দুর্গগুলোর সদর দরজা বন্ধ করার জন্যে যাঁতার মত এক রকম কল থাকত। দরজার সঙ্গে লোহার চেন দিয়ে তার সংযোগ থাকত। সেটা ঘোরালেই লোহার দরজা ওপরে ওপরে উঠে আসত। আবার খোলবার দরকার হলে নীচে পড়ে যেত দরজা। পম্পাইয়ে আজ সেই দরজার পাল্লা নেই বটে তবে যাঁতার মত যন্ত্রটা এখনও প্রবেশ পথের এক পাশে রয়েছে।

সামনে দিয়ে চলে গেছে অপ্রশস্ত রাস্তা। পাশাপাশি তিনজনের বেশী হাঁটা যায় না। দু পাশে ফুটপাথ। তবে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। দুপাশে ইটের পাঁচিল। সরু সরু লম্বা ইট। রাস্তার ধারে ধারে জলখাবার জায়গা। জলের কল। পম্পাইয়ে রান্নার খুব সুবন্দোবস্ত ছিল। জায়গায় জায়গায় সংরক্ষিত পাথরে ঘেরা উনুন।

অবশেষে আমরা আসল জায়গায় এলাম। পম্পাই সহরে দুটো থিয়েটার ছিল। একটা ওপেন থিয়েটার। সেটার আর একনাম কমিক থিয়েটার। আর একটা ক্লোজড থিয়েটার। সেটার আর এক নাম ট্র্যাজিক থিয়েটার। কমিক থিয়েটারটার ওপর খোলা। গরমের দিনে সেখানে বসে সবাই থিয়েটার দেখত। বিরাট জায়গা। প্রায় পাঁচশ লোক একসঙ্গে বসে দেখতে পারত। নীচে অশ্বক্ষুরাকৃতি স্টেজ। সেখান থেকে ধাপে ধাপে গ্যালারি ওপরে উঠে গেছে। ঐ জায়গাটা বৃষ্টির দিনে তেরপল জাতীয় জিনিষ দিয়ে ঢাকা থাকত চারপাশে দেওয়ালের ধারে ধারে সেজন্যে প্রয়োজনীয় আংটার ব্যবস্থা ছিল।

ট্র্যাজিক থিয়েটারটা চারদিকে ঢাকা এক প্রেক্ষাগৃহ। গাইড বলল পম্পাইয়ে ধ্বংসের দিন সেখানে লোকে বসে থিয়েটার দেখছিল। দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। বিসুবিয়াসের রোষাগ্নি থেকে কেউ বাঁচেনি। প্রায় একশ লোকের বসবার ব্যবস্থা ছিল সেখানে।

পম্পাই মিউজিয়াম দেখলাম। দেওয়ালের গায়ে আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি এখনও অটুট, অবিকৃত রয়েছে। দেখলে বোঝা যায় তাদের শিল্প ও সৌন্দর্য্যবোধ কত উন্নত ছিল তখন। সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগল এক মানুষের ফসিল। বৃদ্ধ লোকটা হাঁটু মুড়ে মুখে হাত দিয়ে বসে পড়েছে। বোধ হয় শেষ চেষ্টা করেছিল বিসুবিয়াসের রোষাগ্নি থেকে বাঁচবার জন্যে, পারেনি। হঠাৎ একটা পুরোনো বাড়ীর সামনে এসে গাইড বলল, ব্যস! এখানে মেয়েছেলে যারা আছে তারা এর ভেতর ঢুকতে পারবে না। পুরুষেরা আমার সঙ্গে আসুন। ভেতরে ঢুকলাম। সেটা তখনকার দিনের পম্পাইয়ের এক পতিতালয়। পাশাপাশি ঘর। দরজার ওপর সব অশ্লীল ছবি আঁকা। খুব খারাপ লাগল। কিছুক্ষণ আগে মিউজিয়ামে দেখা সুন্দর ছবিগুলোর কথা মনে পড়ল। হয়ত একই শিল্পীর আঁকা এইসব ছবিগুলো। সহরটায়, দেওয়ালের আশে পাশে আরও কিছু কুৎসিৎ, বিকৃত রুচির ছবি রয়েছে। সেগুলো এখন কাঠের আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের দেখতে দেওয়া হয় না। ছবিগুলো দেখলে কিন্তু বোঝা যায় খুব পাকা, নিপুণ শিল্পীর আঁকা। অনেকদিন আগে দেখা কোনারকের সূর্য্যমন্দিরের কথা মনে পড়ল। ঠিক এমনি সুন্দর আর এমনি অশ্লীল কারুকার্য্য।

নেপলস ছাড়লাম সেদিন রাত্তিরে। ইতালীয়ানরা নেপলসকে বলে নেপোলী। ইংরাজী অপভ্রংশ নেপলস। পরের দিন সকালে জেনোয়া পৌছলাম। জেনোয়া পৌছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ধরতে হল। জেনোয়া বন্দরটা চুরি, বদমাইসীর জন্যে কুখ্যাত। রাস্তায় উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণের বেশ কিছু লোক চোখে পড়ল। দক্ষিণ ইতালীর লোকদের গায়ের রং খুব পরিষ্কার নয়। ব্রাউন।

জেনোয়া থেকে যেতে হবে ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরে। প্রায় কুড়ি বাইশ ঘণ্টার জার্ণি। জেনোয়া থেকে তিন চারটে রেল লাইন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভেতর দিয়ে ক্যালে পর্য্যন্ত পৌছেছে। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডের ডোভার বন্দর পর্য্যন্ত যেতে হবে ষ্টিমারে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে। আমাদের লাইনটা ইতালী, সুইৎসারল্যাণ্ড, ফ্রান্সের মধ্যে দিয়ে।

লয়েড ট্রিয়েষ্টিনোর রিজার্ভ করা বগীতে সবাই উঠলাম। মিলান ষ্টেশনে নেমে স্যাণ্ডউইচ, কেক ও কমলালেবু কেনা হল। অসম্ভব দাম। ইতালী ছেড়ে সুইৎসারল্যাণ্ডে পৌছতেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেল সারা ট্রেন। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তবু তার মধ্যে করিডোর ট্রেনের জানলা থেকে দেখতে লাগলাম। সবুজ পাহাড়ে-ঘেরা নীল লেকের জটলা। একের পর এক। ক্রমান্বয়ে চলেছে। লেকের জলে লাল, নীল, আলো জলছে হাউসবোট আর রেস্তোঁরায়।

একটা পাহাড় লাফিয়ে আর একটা পাহাড়ে ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। নীচে অতল খাদ। পাহাড়ের চুড়ো দুটো খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে শিউরে উঠলাম। এইজন্যেই সুইৎসারল্যাণ্ডের এত নাম। ট্যুরিষ্টদের স্বর্গ। বার্ণ ষ্টেশনে ট্রেনটা কিছুক্ষণের জন্যে থামল। কিছু কেনাকাটা হল। সুইৎসারল্যাণ্ডে ইতালী, ফ্রান্স, জার্মান এই তিন দেশেরই ভাষা ও মুদ্রা চলে। এটা একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

ঘুম এল। স্লিপিং-স্যুট পরে শুয়ে পড়লাম। তখন রাতের শেষ। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিষ্ঠুর শীত তার ধারালো দাঁত শরীরে বসাতে আরম্ভ করেছে। ফ্রান্সে ঢুকেছি। তাড়াতাড়ি গরম জামা পরে নিলাম।

সকাল ন'টার সময় ফ্রান্সের একটা বড় ষ্টেশনে ট্রেনটা থেমে গেল। দাশগুপ্ত বলল দাঁড়াও, চট করে ঘুরে আসি। বলেই ভোঁ করে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে দেখি যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছে।...কি ব্যাপার? কি হয়েছে? দাশগুপ্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—আরে ভাই ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা টয়লেট দেখে ঢুকলাম। রাস্তার ওপর থেকে সিঁড়িটা মাটির নীচে নেমে গেছে। সিঁড়িটার ওপরে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কি লেখা ছিল, বুঝতেও পারলাম না। নেমে দেখি নীচে সব মেমসাহেব। আমাকে দেখে অবাক হয়ে দুর্বোধ্য ফ্রেঞ্চ ভাষায় কি বলল বুঝতেও পারলাম না। খালি বুঝলাম ভুল হয়েছে। এটা লেডিজ। সঙ্গে সঙ্গে পড়ি মরি করে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।

ক্যালে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে ষ্টিমার ধরলাম। ইংলিশ চ্যানেল পেরোতে আধ ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। ডোভারে পাশপোর্ট চেক করল। সেখান থেকে ট্রেনে করে সোজা লণ্ডন।

একটি নতুন কবিতার জন্ম রাত্রি

হীরালাল দাশগুপ্ত

একটি পাতার খ'সে-পড়া-মৃত-মধ্য পথে থাম্‌লো না, কি, থাম্‌লো
বিকলাঙ্গ বধির পৃথিবী। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সহরে সন্ধ্যা নাম্‌লো—
ভাঙা মাস্তুলে ছেঁড়া পালে আর ভেজা-আলস্য মেখে।
অভ্যাস মতো পুরাতন এই পা' দুটো নিরুদ্বেগে
পরিচিত ঘরে ঢুকলো। এখানে কিংবা ওখানে কিছুই নেই—
মনের মতোন কিছুই ছিলো না। অতি পুরাতন—গতানুগতিক সেই
দুর্ব-সীসা-ছাই-মাখা দিন। আর ছেঁড়া ছেঁড়া নীল নীল
পিচ্ছিল রাত;
আর, আকাশ, নক্ষত্র, অরণ্য, সমুদ্র পর্বত, তুষার প্রপাত:
অনাবশ্যক অর্থহীনতায়। আগে পরে শূন্য এই জীবনের পরিচয় জানি;
অন্ধকার বন্ধঘরে পাথরের দেয়ালে দেয়ালে শুধু বাদুড়ের ডানা
ঝাপ্‌টানি।
অপাপি হৃদয়। হৃদয় কখনো পাণিনি মানতে চায়না!
সুতরাং, পরম লগ্নে ইতিহাসেও আর্ট খুঁজে পাওয়া যায় না।
এবং—অতএব—আকাশেও ওঠে চাঁদ। এবং উঠলো।
সকালবেলার টবের গাছের কুঁড়িগুলো সব সন্ধ্যাবেলায় ফুটলো।
রাত এলো। মনেও বুঝি হারিয়ে-যাওয়া ছন্দটা খুঁজে পেলুম!

• • • •

মনে হোলো যেনো যুগ-যুগান্ত পার হোয়ে হোয়ে এলুম—
এই আমি। এবং মন ও। এবং এই রক্ত-প্রবাহ ধমনীর।
দেয়ালে টাঙানো যামিনী রায়ের আঁকা ছবি কোন রমণীর।
টেবিলে খোলা খবর কাগজ। শেলফে বই। রেডিও। ফোন্।
আলমীরা। খাট্। সবুজ আলো। পরিচিত দুটি আঁখির কোণ
হানে কটাক্ষ পরিচিত মৃত্যুর। মনে হোলো আমি বেঁচে আছি—
এই শরীর। এবং মন ও। যদিও জানি অতি কাছাকাছি
বেঁচে নেই আর এই বেঁচে আছি—দুই নয়—এক—কম্পমান
একটি ধূলির নিশ্বাস। ধূলো হোয়ে যায় ধূলোর টানে দেহ ও প্রাণ—
পশ্চাৎ ভূমি, পাদ প্রদীপ ধূলোর মেঘ—মেঘের ধূলো!
ভাঙা বন্দর—ডোবানো জাহাজ—বাঁকানো লোহা—কপালে-কালি
নাবিকগুলো
ধূলো হোয়ে যায়। ধূলো হোতে চায় পৃথিবীটাই। হয়ত বা তাই
সেই-ধূলো-আর-ধূলো-মাখা হাতে ধূলোরই পেছনে হাত বাড়াই।
ধূলো হোতে বাকি আর শুধু এই বাকি রাতটুকু আছে।
চাঁদ চুঁয়ে চুঁয়ে টস্‌-টস্‌ কোরে আকাশ পড়ে তোমার চুলের কাছে।
মশারিটা টেনে দাও। চোখ তুলে চোখে চাও; আর,
হৃদয়ের অতল তল, হে হৃদয় ডুবে যাও!

• • • •

আরও দুধ মানে আরও বনস্পতি !

খাদ্যের উপকরণগুলি যাতে সুসম পরিমাণে পাওয়া যায় তার জন্যে পুষ্টিবিশারদেরা প্রতিদিন কমপক্ষে ২৮০ গ্রাম দুধ খাবার পরামর্শ দেন। কারণ দুধ একটি পূর্ণাঙ্গ খাদ্য। দুধে একাধারে প্রোটিন, খনিজ, ভিটামিন ও স্নেহপদার্থ আছে। নিরামিষাশীদের পক্ষে তো দুধই প্রয়োজনীয় প্রাণীজ প্রোটিন পাবার একমাত্র উপায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিদিন দুগ্ধজাত খাবার মোট ১৪০ গ্রাম মাত্র পাওয়া সম্ভব — এমন কি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষেও তা ১৪৫ গ্রামের ওপরে যাবে না।

পরিবহণ ব্যবস্থার আরো উন্নতি এবং পূর্বাপেক্ষা উন্নতধরনের ডেয়ারী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ আরো বেশী পরিমাণে দুধ পাবেন। এতে শুধু ক্রেতারা

নন, ডেয়ারী মালিকও লাভবান হবেন। কেননা, দুগ্ধজাত জিনিসের চেয়ে দুধ বিক্রি করে ডেয়ারী মালিকরা বেশী দাম পান। দুধের যত বেশী কাটতি হবে, ঘিয়ের পরিমাণও ততই কমে যাবে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও বনস্পতিই ধীরে ধীরে ঘি-জাতীয় স্নেহপদার্থের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাবে। ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডের মত যেসব দেশে প্রচুর মাখন তৈরী হয় এবং ডেয়ারী শিল্প খুবই উন্নতস্তরের সেসব দেশেও বনস্পতির মতই আধাজমাট উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ বেশীর ভাগ ব্যবহার করা হয়। পুষ্টির দিক থেকে ভিটামিনযুক্ত বনস্পতি খাঁটি দুগ্ধজাত স্নেহের সমকক্ষ। তাছাড়া সহজলভ্য উদ্ভিজ্জ তেল থেকে তৈরী বলেই বনস্পতিতে খরচ কম পড়ে।

বনস্পতি-তুল্য স্নেহপদার্থের ব্যবহার পৃথিবীর সর্বত্র !

বিস্তারিত জানতে হলে লিখুন :

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া
ইণ্ডিয়া হাউস, ফোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই

IWT-VMA 35...

কিংশুক রাগিনী

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

দীননাথ দত্তের মনে সুখ নেই।

আরম্ভটা ঠিক ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মত হল। রাজামশায়ের মনে সুখ নেই। হীরা মণিমাণিক্যের পাহাড়, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাণীশালে না রাণীশালে নয়, অন্তঃপুরে পরম গুণবতী রাণী, সৈন্য সামন্ত লোকলস্কর কিছুরই অভাব নেই। তবুও রাজামশায়ের মনে সুখ নেই। কেন না, তাঁর···

আমাদের দীননাথ দত্ত লোকে যাকে দীনু দত্ত বলে তাঁর কি যে নেই তা জানিনে। রাজা নন কাজেই হাতী ঘোড়া নেই হীরা, মণি মাণিক্যের পাহাড়ের খোঁজ করলে তাও পাওয়া যাবে না। তবে পাহাড় না হোক ছোটখাট একটা টিবি কেনবার মত টাকা যে ব্যাঙ্কে মজুত আছে একথা সবাই জানে। পরম গুণবতী স্ত্রী লোকজন এমন কি যার জন্তে রাজামশায় মনের দুঃখে আছেন সেই পরম গুণবান পুত্রও দীনু দত্তের আছে।

জেলার সব চেয়ে বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দত্ত এণ্ড কোং-এর একমাত্র মালিক তিনি। দত্ত বংশের লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ দীনু দত্তের বাবা প্রিয়নাথ দত্ত মাত্র সেদিন গত হয়েছেন। সুদীর্ঘ সত্তরটা বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে বনেদের ওপর দত্ত কোম্পানীকে তিনি দাঁড় করিয়ে গেছেন উত্তর পুরুষ যদি নিতান্ত বাউণ্ডুলে না হয় তাহলে দত্ত কোম্পানী যাবৎ চন্দ্র না হোক ভারতের ম্যাপ থেকে পশ্চিমবঙ্গ উবে না যাওয়া অবধি যে টিঁকে থাকবে এতে কোনও ভুল নেই।

চার পুরুষের ব্যবসায়ী হলেও বাপের মৃত্যুর পর প্রিয়নাথ যখন গদীতে বসতে সুরু করলেন তখন তাঁর বয়েস মাত্র চৌদ্দ। শত্রুরা বলেছিল যে এবারে যাবে, গেলও তবে দত্ত কোম্পানী নয় তাঁর শত্রুরাই। দত্তদের সপ্ত ডিঙা মধুকরে পাল খাটান ছিল বটে, কিন্তু ভাল বাতাস না থাকাতে এতদিন গুণ টানতে হচ্ছিল। প্রিয়নাথ হালে বসলেন পালে অনুকূল বাতাস এসে লাগল। প্রিয়নাথ দৃঢ় মুষ্টিতে হাল ধরে রইলেন। সপ্ত ডিঙা মধুকর তরতর করে লাভের সমুদ্রে বার বার পাড়ি জমাতে লাগল।

মফঃস্বলের ছোট্ট শহর হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলে হাঁক ডাক ছিল। দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে শহর বাড়তে লাগল। তারপর দেশ ভাগ হয়ে যখন স্বাধীনতা এল তখন মফঃস্বলের ছোট্ট শহর বলে, কলকাতা তুমি ওদিকে থাক।

দত্তদের তখন ভারী জম জমাট অবস্থা। দশ আনা ব্যবসাই ওদের দখলে। বাকী ছ' আনার কিছুটা রাহাদের, রায়েদের—আর বাকীটা হ্যাঁ, মারোয়াড়ীদের হাতে। ব্যবসা আছে অথচ ওঁরা নেই তা হতেই পা[রে] না। সত্তর বছর আগে যখন প্রিয়নাথ ব্যবসায়ে নামেন তখ[ন] ওঁরা ছিলেন।

দীনুদত্তের সংসারে স্ত্রী তরুবালা, একমাত্র ছেলে কিংশুক আ[র] বিধবা বোন দামিনী। বোনটি বিধবা বটে, কিন্তু গলগ্রহ নয়। কার[ণ] তাঁর কোল যেমন খালি হাত তেমনি ভর্ত্তি আর গতরের কথা না বলা[ই] ভাল, দশভুজার বল রাখেন দেহে। বিয়ের সাত বছরের মধ্যে মা[ত্র] বাইশ বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হয়ে নিজের ভাগের বিষ[য়] আশায় বিক্রী করে বাপের বাড়ী চলে এসে সেই যে ভাই-এর সংসা[র] মাথায় তুলে নিয়েছেন, পঞ্চাশ বছর পার হলেও এখনও সংসারের ভা[র] মাথা থেকে নামাননি। তরুবালাকে নড়ে বসতে হয় না। ছেলে মানুষ করা থেকে ঘুঁটে গুলের তদারকি সবই দামিনী করেন, তরুবাল[া] কথাটি বলেন না কাজেই ননদ ভাজে ভারী ভাব এবং দত্ত গৃহেও অখণ্ড শান্তি বিরাজমান। ছেলে কিংশুক কলেজে পড়ে। বংশের প্রথম ছেলে যে বিদ্যেপুকুরে নেমেছে। আশা আছে ডুব দিয়ে ডাঙ্গায় একদিন উঠবে অর্থাৎ শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে স্নাতকোত্তীর্ণ, তাই হবে। এদিকে সংসারে অখণ্ড শান্তি ওদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও খুব ভাল। তবু দীনু দত্তের মনে সুখ নেই।

সুখ নেই তার প্রথম কারণ, সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদি দিতে হয়। দ্বিতীয় কারণ, আইন-শৃঙ্খলা 'এনফোর্স' করার দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের ফোর্স কমাবার জন্তে মাঝে-মাঝে দীনু দত্তকে কিছু খসাতে হয়। কারণ, প্রায় বড় ব্যবসাদারদের মত ওঁরও কিছু এদিক-ওদিক চোরাগোপ্তা ব্যবসা আছে। তৃতীয় কারণ এবং এইটেই সব চেয়ে বড় কারণ, কলকাতার প্রসিদ্ধ মসলা ব্যবসায়ী দুলাল বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে ছেলে রাজী হয়নি। দুলাল বাবু নগদ বিশ হাজার, মেয়ের নামে কলকাতায় একখানা বাড়ী, তা'ছাড়া প্রচুর গহনাপত্র দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু ছেলে শুনে সেই যে বেঁকে বসেছে আর সিধে হয়নি। দীনুবাবু চেষ্টার ক্রটি করেন নি। নিজে বলেছেন, ফল পাননি। তরুবালাকে বলে জবাব পেয়েছেন, রক্ষে কর, আমি বলতে পারব না। তোমার ঐ বিদ্যের জাহাজ ছেলে আমার মত মূর্খ মা-কে যে মা বলে এই ঢের। বিয়ের কথা বলতে গেলে এর পর আর মা বলেও ডাকবে না।

দীনু বাবু এর পর গেছেন বোনের কাছে, তুই একটু বুঝিয়ে বল দামু, তোর্ই হাতে মানুষ, তুই বললে কথাটা ফেলতে পারবে না।

বোন উত্তর দিয়েছেন, দোহাই তোমার দাদা, ছেলেকে আর

গোবিন্দ গেছে। আবার এ-ও বলি, ও তোমার লেখাপড়া ছেলে আজ বাদে কাল বি-এ পাশ দেবে, জেলার সেরা ঘরের ছেলে, তুমি কিনা ওর সম্বন্ধ আনলে এক ধনে পাঁচ কোড়ন বেচা মেয়ের সঙ্গে, যে ক'অক্ষর জানে না। দেশে আর মেয়ে খুঁজে না। বলি, এ মেয়ে ওর নজরে ধরবে কেন? দোহাই তোমার নিয়ে আবার দপ করে জ্বলে উঠে ছেলেকে গাল মন্দ ক'রো না, তাহলে ফল ভাল হবে না।

এর পর কার মনে দুঃখ না হয়, এত বড় একটা সম্বন্ধ প্রায় লাখ টাকার ধাক্কা। দীনু বাবু ছেলের ওপর বিলক্ষণ চটে গেলেও মুখে সেটা প্রকাশ করলেন না, সত্যিই গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে। বেশী কথা বলে না, কিন্তু গোঁ যা ধরবে তা' না করে ছাড়বে না। কি জানি বকাবকি করলে যদি সত্যিই উধাও হয় তাহলে ইহলোকে মনঃকষ্ট এবং পরলোকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। যদিও ঘোর ব্যবসায়ী তবুও দীনু দত্ত ধর্ম্মভীরু লোক। ইহলোকটাই যে সব নয় এ জ্ঞান তাঁর টনটনে। তা'ছাড়া ইহলোকে কিছু একটা হলে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে পার পাওয়া যায় কিন্তু পরলোকে? পরলোকে পার করতে পারে একমাত্র পুত্র। কাজেই তাকে চটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সবাই বিশেষ করে সংসারী যাঁরা তাঁরা জানেন যে ওপরে পুং নামে একটি নরক কুণ্ড আছে। পুত্রাদি না হলে, অবশ্য বিবাহিতদের, দেহত্যাগের পর ঐ পুং নরকে আত্মার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। এই পুত্রের কাঁধে চেপে নরকটি পার হওয়া। ইহলোকে পুত্র পিতার কাঁধে চেপে থাকেন এবং তেমন তেমন পুত্র গন্ধমাদন তুল্য হলেও পিতার একমাত্র সান্ত্বনা থাকে যে হারামজাদাকে মরবার পর দেখে নেব। দেখি মরবার পর কেমন শ্রাদ্ধ না করে। ভূতের ভয় নেই? কিন্তু এক একটি শ্রীমান এমন হন যে ভূতে তাদের ভয় করে। তাদের কাঁধে চাপবার সুযোগই পাওয়া যায় না আবার পাওয়া গেলেও মাঝপথে পা পিছলে হড়কে পড়ে যাবার ভয় থাকে। তাই একটি পুত্র থাকলে বড় হয়ে সেটি কোন অবতার হবেন জানা না থাকায় সব বাপ মা-ই দুর্দ্দিনের সম্বল হিসেবে আরও দু'একটি হাতে রাখতে চান। দীনুবাবুরও আরও দু' একটির সাধ ছিল, কিন্তু স্ত্রী তাঁর সে সাধ পূর্ণ করেননি বলে মনে মনে ক্ষোভও ছিল। আজ ভাবলেন সে সাধ পূর্ণ না হয়ে ভালই হয়েছে। একটিকেই তিনি বাগে আনতে পারছেন না, গোটা কয়েক থাকলেই হয়েছিল আর কি! তাঁর মনে হল তাঁর চেয়ে কুঞ্জ রাহা অনেক বেশী সুখী। কারণ, ওর ছেলে নেই কেবল একটিমাত্র মেয়ে রাগিণী। রাগিণী যেই পাশ করবে অমনি তার বিয়ের জন্যে কুঞ্জ রাহা লেগে যাবে এবং এটাও ঠিক রাগিণী কিছুতেই বিয়েতে আপত্তি করবে না। মেয়েরা কখনই বিয়েতে আপত্তি করে না। ওঃ! কিংশুক যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হত। তাহলে তাঁকে আজ এত দুঃখ পেতে হত না। মনের আনন্দে তিনি মেয়ের বিয়ের জোগাড়ে মেতে উঠতেন। মেয়ে বড় জোর বায়না ধরে না হয় এ
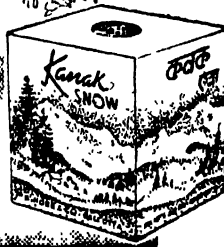
গয়নার বদলে ও গয়নাটা চাইত। তাতে হয়ত কিছু খসত। তা হোক তাঁর পয়সার অভাব নেই দু'একশ খরচ করতে তিনি পারেন। কিংশুক মেয়ে হলে আরও কি কি হত ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আর একটা কথা মাথায় আসতেই তিনি চমকে উঠলেন। দুলালবাবুকে যে কোপ তিনি বসাতে যাচ্ছিলেন কিংশুক মেয়ে হলে ঐ কোপ তাঁর ঘাড়ে পড়ত। প্রায় লাখ টাকার ধাক্কা। দীনুবাবু শিউরে উঠলেন। ভাগ্যিস কিংশুক··ওঃ। শেষকালে অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কি ছেলের বাপ কি মেয়ের বাপ সব বাপেদের মত অসহায় জীব আর নেই। "শ্মশানে আসিলে সকলেই সমানের" মত বাপ হইলেই সকলে অসহায়। ভাবনায় বাধা পড়ল, ভবতারণ ভটচাজ এলেন। ভবতারণ দীনুবাবুর বন্ধু ও কুলপুরোহিত দুই-ই বয়সে কিছু বড়, কলকাতায় সরকারী অপিসে চাকরী করতেন পেনসেন নিয়ে বাড়ীতে এসে বসেছেন। ভবতারণকে দীনুবাবু মেনে চলতেন। যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দীনুবাবু তিনবারে উত্তীর্ণ হতে পারেননি ভবতারণ তা প্রথমবারেই উৎরে ছিলেন।

—ব্যাপার কি দীনু চিন্তিত দেখছি। ভবতারণ জিজ্ঞেস করলেন।

—আর চিন্তিত। এখন যেতে পারলেই বাঁচি। উদাস সুরে দীনুবাবু জবাব দিলেন।

—তা যা বলেছ। কি হল আবার?

যা হয়েছিল তা শোনবার পর ভবতারণ বললেন, দেখ দীনু, আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। তোমার দু' পয়সা এলে আমার অদৃষ্টেও ছিটেফোঁটা জুটবে, ছেলেপুলে নিয়ে খেয়ে-পরে বাঁচব। যা' পেন্‌সন পাই, তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। কাজেই আমি চাই তোমার ছেলের একটা কেন, এক গণ্ডা বিয়ে হোক। তাই আমি যা বলি মন দিয়ে শোন কার্য্যোদ্ধার হবে। তোমার-আমার আমল নেই যে বাপ-মা যে কলটি ছেলের হাতে তুলে দেবেন সেইটেই গপ্‌ করে গিলে ফেলবে। আর সত্যি কথা বলতে কি ভেবে দেখ দেখি গিলে ফেলেও এদিক-ওদিক ছুক্‌ ছুক্‌ করতে ছাড়তুম কি। বাতাসী বোষ্টমীর কথা ভাব দেখি একবার। পুরুত-যজমান দু'জনেই—

দীনু দত্ত বাধা দিয়ে বললেন—যাক্‌গে যাক্‌গে, তা তুমি কি করতে বল?

—বলছি। বাতাসীর কথা শুনেই যে তুমি ঘেমে-নেয়ে উঠলে হে। ভয় নেই, কাছেপিঠে কেউ নেই যে শুনে ফেলবে। এখন কিন্তু বিয়ের পর আমাদের আমলের মত বাইরের নেশাটা অনেক কম। কারণ কি জান, নিজের পছন্দমত বিয়ে করা। তুমি যদি আউটসাইড অডিট করতে বের হলে তাহলে তোমার ঘরের লেজার বইটি একেবারে কোর্টের য়্যাকাউণ্টটেণ্টের কাছে হাজির হবে। এখানে আর ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বাপ-মা নেই যে, বউ পছন্দ হয়নি বলে সব দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। এ বাবা নিজের পছন্দমত বিয়ে। শেষ পর্য্যন্ত মনে ধরুক আর না ধরুক, একবার যখন হাত ধরেছ, তখন আর অন্য উপায় নেই। কাজেই যা হাওয়া তুমিও সেই দিকে চল। এখনকার ছেলেমেয়েরা নিজেরা দেখেশুনে পরখ করে তবে ঘরে তুলতে চায়। তোমার ছেলেরও সেই বাসনা।—ভবতারণের রসনা বেশ রসালো, সংস্কৃত কিছু পড়েছে কিনা।

—কিন্তু ও আজই সকালে অন্ততঃ বিশবার ওর পিসীকে বলেছে যে, ও বিয়েই করবে না।

—বল কি! বিশবার বলেছে। দীনু আর দেরী কোরো না, শ্রীমানকে এবার ঝুলিয়ে দাও। কিছু না, স্রেফ্‌ ওকে ডেকে বলে দাও যে ওকে বে' করতে হবে। ওর যা'ক পছন্দ, তাকেই বে' করুক কানা হোক খোঁড়া হোক তোমার কো ও আপত্তি নেই, তবে স্বজাতি স্বঘর হলেই ভাল হয়। হাঁ করে চেয়ে রইলে কেন? মতলবটা বুঝলে না? পছন্দ কর বললেই কি পছন্দ করা যায়। একে কাঁচা বয়েস তার ওপর নিজের বৌ পছন্দ করা এ কি সোজা কথা! বাঁশবনে ডোম কানা। এই বয়সে সব মেয়েকেই মিস ইউনিভার্স বলে মনে হয়। খুঁজতে খুঁজতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে, মেয়ে আর পছন্দ হবে না। শেষকালে যদিও বা পছন্দ হয়, আর তোমার যদি সেটিকে ছেলের বৌ করতে ইচ্ছে না থাকে তাহলে খালি একটু মাথা চুলকে বলবে, মেয়েটি মন্দ নয় ভালই। তবে কিনা··তা তোর যখন পছন্দ হয়েছে তখন··ব্যস্‌, আর দেখতে হবে না শ্রীমান পেছিয়ে আসবে। শেষকালে সেই হরেদরে হাঁটু জল। তখন বলবে তোমরা যা হয় একটা দেখেশুনে··ও কে গেল ভেতরে?

—কুঞ্জর মেয়ে গিণি।

—বেশ সুশ্রী হয়েছে তো মেয়েটা, ছেলেবেলায় বড্ড রোগা ছিল। ছুটিতে বাড়ীতে এসেছে বুঝি। ও মেম-সাহেবদের স্কুলে পড়ে না?

—হুঁ।

ভবতারণ রাগিণীর যাবার পথে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে বললেন, হ্যাঁ হে দীনু, পকেটে বিড়ি দেশলাই রয়েছে অথচ নেশার অভাবে পেট ফুলে ঢোল, তোমার যে সেই অবস্থা হল বলে মনে হচ্ছে। বলি বাবাজীর আমার রাগ-রাগিণীতে মন যায়নি ত?

—কি বলছ তুমি?

—এখনও ভাল করে বলিনি। রোস, সব খবর নিচ্ছি। বলি, গেলে তোমার আপত্তি নেই ত?

দীনু দত্ত উদাস সুরে বললেন—আমার আপত্তি কি!

কুঞ্জ রাহারও ঐ এক মেয়ে এবং সম্পত্তিও নেহাৎ কম নয়। দীনু দত্তর আপত্তি হবার কথা নয়।

২

অজ-পাড়াগাঁয়ের কাপ্তেন দুদিনের জন্যে কলকাতায় এসে কালীঘাট, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, রেসকোর্স, যাদুঘর, থিয়েটার দেখে ও রাত্তির বেলায় কলেজ গার্ল-এর সঙ্গে স্ফূর্তি করে চতুর্বর্গ ফল কুড়িয়ে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে যেমন ভয়াবহ ক্যালকেশিয়ান হয়ে ওঠে, মফঃস্বল টাউনের তরুণীরাও তেমনি স্রেফ খবরের কাগজ পড়ে সিনেমা দেখে ও চটুল মাসিক পত্রিকা উল্টে সেই রকম কলকাতার আলট্রা মডার্ণদের হার মানিয়ে আলট্রা ফিউচার গার্ল হয়।

রাগিণী মফঃস্বলী তরুণী, অবস্থাপন্ন ঘরের একমাত্র আদুরে মেয়ে সুতরাং ও যে শেষ অবধি কোন ফিউচার-এ গিয়ে পৌঁছত তা' বলা দুষ্কর। নতুন ও পুরোন দু'রকম ট্রেনিংই ও পাচ্ছিল। বাড়ীতে একপাল ঠানদিদি জাতীয়া পোষ্যা ছিলেন, তাঁরা এক একটি কেচ্ছা সরিৎসাগর। সহরের সর্ব্বত্রই তাঁদের গতায়াত ছিল এবং বাছাবাছা সব খবর গিলে বাড়ীতে এসে সেগুলি তাঁরা ওগড়াতেন। কার সামনে ওগড়াচ্ছেন তা ভেবে দেখতেন না। বরং শুনতে শুনতে কেউ চলে গেলে তার পিছু পিছু ধাওয়া করে পুরো খবরটি তাকে

শুনিয়ে তবে ছাড়তেন। বলা বাহুল্য, রাগিণী ত' বাদ যেতই না উপরন্তু সবাই চাইতেন রসের কথা গুলো আগে শুনিয়ে রাগিণীকে নিজের বশে রাখতে। সহরের বড় লাইব্রেরীটা রাহাদের বাড়ীর কাছেই ছিল এবং সেটার উন্নতির মূলে কুঞ্জ রাহার বদান্যতা থাকার দরুণ লাইব্রেরীর তরুণ পরিচালকদের রাহা বাড়ীতে সেরা সেরা বই পাঠাতে উৎসাহের অন্ত ছিল না। আর সত্যিমিথ্যা জানিনে সব লাইব্রেরীর বই-এর মত সে সব বইতে কেবলমাত্র মন্তব্যই লেখা থাকত না নীল কাগজে বেনামা হৃদয়ের আকুলি বিকুলি ও দীর্ঘনিঃশ্বাস আলপিন দিয়ে গাঁথা থাকত। এই দীর্ঘনিঃশ্বাসের ঝাপ্‌টা উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় অবধি গিয়ে পৌঁছত। দেখা যেত টিফিনের সময় গুটিকতক মেয়ে রাগিণীকে ঘিরে গোল হয়ে বসে 'নীল কাগজে' ডুব দিয়ে চোখ মুখ লাল করে ফেলছে। এই ভাবে রাগিণী যখন ক্লাস সেভেন-এ পৌঁছল তখন ঠিকুজী অনুযায়ী বয়েস ওর সতের, চলতি বয়েস তের। ঠিক এই সময়ই ওকে পাঠান হল কলকাতায়। পাঠাবার অবশ্য কারণ ঘটেছিল।

মফঃস্বল সহরে জেলাবোর্ডের ইলেকশন একটা হৈ হৈ ব্যাপার। স্থানীয় লোকের কাছে জেলাবোর্ডের মেম্বার হোম মেম্বারের চেয়ে দামী প্রাণী। কাজেই পয়সা আছে অথচ ইংরেজীতে দখল নেই এই শ্রেণীর মাতব্বরেরা ঝুঁকে পড়তেন জেলা বোর্ডের মেম্বার হবার জন্যে।

কুঞ্জ রাহার ব্যবসা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জেলা বোর্ডের মেম্বার হবার বাসনাও চাগিয়ে উঠল। কিন্তু মনের বাসনা চেপে দত্তদের হালচাল লক্ষ্য করতে লাগলেন। হাজার হোক দত্তরাই হলেন সব। দত্তরা কিন্তু রক্ত জলকরা পয়সা খরচ করে ফাঁকা নাম কুড়োবার পাত্র নন। তাঁরা জানতেন হাকিম মন্ত্রীদের সঙ্গে মাখামাখি করতে গেলেই ছুতোনাতায় কিছু খসবে সময়েরও কিছুটা অপব্যয় হবে। তার চেয়ে ঐ টাকাটা ব্যবসায়ে ঢাললে ঐ সময়টা তেলকল পাট কি চালের গুদোমে খাটালে ঢের বেশী লাভ। অন্ধকার গুদোম ঘরের ফরাসে দু'দণ্ড বসলেও মনটা ঠাণ্ডা হবে। কান খাড়া করে থাকলেও মা লক্ষ্মী না হোন তাঁর ভাই গণেশ ঠাকুরের বাহনের আনাগোনার শব্দটাও সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনার আশা জোগাবে। এখন নধরকান্তি পাঁঠা দেখলে যেমন পরম দুর্দ্ধেধসদের জিভে চল নামে তেমনি দত্ত ও রাহাদের দেখে রাজনীতির পাণ্ডাদের হাত চুলবুল করত। এমন দুটো শাঁসালো মাল রয়েছে হাতের গোড়ায় অথচ বাগে এনে দুইয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। কালেভদ্রে দু' দশ টাকা যে এটা সেটা বাদে আদায় না হয় তা নয়, কিন্তু সেটা কি ধর্ত্তব্যের মধ্যে? যারা মচ্ছবের আশায় জিভ শানাচ্ছে বত্রীর ফুটকড়াই-এ তাদের মন উঠবে কেন? পাণ্ডারা তাই মাঝে মাঝে হানা দিত, বিশেষ করে দত্তদের বাড়ীতে। যদি একটাকে বাগানো যায় তাহলে আর একটা আপনা হতেই থলির মধ্যে এসে পড়বে। পাণ্ডারা গিয়ে বলতেন, আপনাদের মত পুরোনো একটা ফ্যামিলি রয়েছে এ জেলায় কত নাম কাম আপনাদের, অথচ আপনারাই জেলা বোর্ড, কাউন্সিল এ সব দিকে নজর দিচ্ছেন না। আপনারাই দেশের সব, আপনারা পেছিয়ে থাকলে কি আর ইংরেজ এদেশ ছেড়ে নড়বে।

প্রিয়নাথ দত্ত তখন বেঁচে, তিনি রসিক পুরুষ ছিলেন হেসে

বলতেন, নাই বা নড়লো, থাকুক না বসে কতক্ষণ পারে একবার দেখে শেষে বসে বসে কোমর পা টনটন করলেই উঠে দাঁড়াতে হবে তখন এক ধাক্কায় ফেলে দেবেন।

—না না দত্ত মশাই আমাদের আর ফেরাতে পারবেন না। যুদ্ধের কল্যাণে সহর কি রকম বাড়ছে দেখছেন তো, দু' এক বছরের মধ্যেই মিউনিসিপ্যালিটি হবে। আমরা চাই আপনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হবেন। তাই আগে থেকে জেলা বোর্ডের—।

—আচ্ছা আচ্ছা সে দেখা যাবে।

—না না দেখা যাবে নয়। পাকা কথা দিন। আপনাকে ফোর ফ্রণ্টে রেখে আমরা সব সীট ক্যাপচার করে নেব—।

হেসে প্রিয়নাথ বলতেন, বেশ তো, তার আগে ভাল করে ব্যবসা করে মা লক্ষ্মীকে ক্যাপচার করি, টাকারও তো দরকার হবে। সরকার মশাই বাবুদের ফণ্ডে দশটা টাকা দাও, ভদ্রলোকেরা সব কষ্ট করে এসেছেন।

দশটা টাকা! তবু ভাল যে পান সিগারেটের খরচাটা উঠল। পাণ্ডারা কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নয়, তারা নিয়মিত ঢুঁ মারতে ছাড়তেন না। শেষে একদিন প্রিয়নাথ বললেন, কুঞ্জর কাছে যান না। ওর শুনেছি, মেম্বার হবার ইচ্ছে আছে।—বলে চোখ টিপে বললেন, ঘাবড়াবেন না। ওটিও বেশ শাঁসালো মাল, জোর ব্যবসা করছে।

কুঞ্জ রাহা মনে মনে দত্তদের হিংসে করলেও বাইরে অত্যন্ত সমীহ করে চলতেন অন্ততঃ প্রিয়নাথ দত্তের আমলে। না করেও উপায় ছিল না। ব্যবসায়ী মহলে প্রিয়নাথের খাতির ছিল গুরুঠাকুরের মত। দত্তদের সঙ্গে একটু মাখামাখি হয় এটা সকল ব্যবসায়ীই চাইতেন। কুঞ্জ রাহা প্রতিবেশী বলে তাঁর সুবিধে ছিল বেশী। দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তখন প্রায় আত্মীয়তার পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। ছেলে মেয়ে দুটো একই সঙ্গে খেলাধুলো চুলোচুলি করত, কুঞ্জ রাহার স্ত্রী শৈলজা কোনও প্রয়োজন হলেই আগে ছুটতেন তরুবালা দিদির কাছে। কুঞ্জ রাহা যে কোনও পরামর্শের জন্যে বৃদ্ধ জ্যেঠামশাই প্রিয়নাথের কাছে আসতেন যদিও বৃদ্ধের পরামর্শ মত কাজ শেষ পর্য্যন্ত করতেন না। কুঞ্জ রাহার অবস্থা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান বেড়ে গিয়েছিল তবুও দাদা দিদি সম্বোধনটা অটুট ছিল।

কুঞ্জ রাহা যেই শুনলেন যে পাণ্ডাদের তাঁর কাছে প্রিয়নাথ দত্ত পাঠিয়েছেন অমনি এক কথায় তিনি রাজী হলেন। দীনু দত্ত সে কথা শুনে মাথা চুলকে বললেন, কুঞ্জ দাঁড়াবে এখন আমরাও—

—মাথা গরম করোনা দীনু। কি হবে দাঁড়িয়ে বলতে পারো? জেলা বোর্ডই বল আর শুধু বাংলায় পৌর পিণ্ডিষ্ঠানই বল আসলে ধাঙ্গর মুদ্দোফরাস আর পানিপাঁড়েদের আপিস ছাড়া আর কিছুই নয়। পায়খানা-নদ্দমা পরিষ্কার কর, পুকুর, টিউবওয়েল কর, স্কুল, মক্তবকে, দু'পাঁচ টাকা দাও এই তো কম্ম। ওখানে মুরুব্বি সেজে লাভ? বোর্ডের আয় তো পাঁচসিকে, কি থাকবে? তা ছাড়া ধাঙ্গর মেথর নিয়ে নাচানাচি আমাদের সাজে না। কুঞ্জর পূর্ব্বপুরুষ পাঁঠা বেচত ঐ ওদের সঙ্গে নাচুক। হত কৌন্সিল টৌন্সিল না হয় দেখা যেত। ওদিকে চেয়ে মাথা গরম করো না।

কুঞ্জ রাহা দাঁড়ালেন এবং পাণ্ডারা বেশ কিছু দোহনান্তে তাঁকে বসবার জায়গা করে দিলেন। বোর্ডের মেম্বার হয়েই রাহামশাই হোম রিফর্ম-এর দিকে নজর দিলেন, বাড়ীর হাল চাল পালটে ফেললেন। মেয়েকে কলকাতায় মেমসাহেবদের স্কুলে পড়বার জন্যে মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এইটেই নাকি দেশাচার। মেম্বারের মেয়ে লোক্যাল স্কুলে পড়লে ইজ্জৎ থাকে না। বড় বড় দাদারাও তাই করেন। ভোট পেয়ে একটু হোমরা চোমরা হলেই ছেলে মেয়েদের পাড়ার স্কুল ত' দূরের কথা একেবারে দেশের বাইরে পড়বার জন্যে পাঠিয়ে দেন।

রাগিণীর মামাতো বোনেদের এক বন্ধুর বোন ওর সঙ্গে একই ক্লাসে ছিল বলে ও'কে মেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে অথৈ জলে পড়তে হয়নি। বন্ধুর বোনটি প্রকৃত গার্ল গাইড-এর কাজ করে রাগিণীকে তালিম দিয়ে তার মফঃস্বলী আলট্রা ফিউচার আউট লুক-কে প্রেসেণ্ট প্রগেসিভ-এ দাঁড় করাল। রাগিণী বুঝতে শিখল চোখের চাওয়ার ভেতর দিয়ে কে কি খেতে চায়, বেড-টী না শুধু-টী। দুটো কথা শুনেই ধরবার ক্ষমতা জন্মাল কোন তরুণ ড্যাশিং, কোনটি বা ক্রীপিং, কে ভ্রমর, আর কেইবা ভালচার। আর শুধু নিজে বুঝেই ক্ষান্ত হল না ছুটীতে বাড়ীতে এসে ওর বন্ধুদেরও বুঝিয়ে যেতে লাগল। তারপর থেকে সহরের তরুণদের বড় দুঃসময় গেছে। স্কুল-কলেজের যাতায়াতের পথে বা অন্য সময় দেখা সাক্ষাৎ হলে আগে বাঁকা চোখের কটাক্ষ একটু আধটু হাসি বৃষ্টি হত, যা সম্বল করে তরুণেরা সারারাত মনে মনে চাষ করে কল্পনার ফসল তুলত। রাগিণীর নষ্ট তালিমের ফলে তাও বন্ধ হয়ে গেল। বাঁদরের গলায় কে মুক্তোর মালা পরাবে? মফঃস্বল সহরের ছেলের পানে কে নজর দেবে?

রাগিণী প্রথম প্রথম যখন বাড়ীতে আসত তখন সহরের মেয়েরা রাহা বাড়ীতে ভেঙ্গে পড়ত। ছেলেরা বাড়ীর ভেতর ঢুকতে পেত না বলে বাড়ীর সামনের রাস্তায় ঘুর-ঘুর করত। কিংশুকের জন্যে রাহা বাড়ীর দরজা খোলা ছিল। প্রথম বার রাগিণী এলে সে সবেগে ভেতরে প্রবেশ করে, কিন্তু ভেতরে গিয়ে যা কাণ্ড ঘটে, তাতে আবার ঠিক সবেগেই প্রস্থান করতে হয়।

ঘটনাটা হয়েছিল এই রকম। কিংশুক দরজার গোড়ায় দাঁড়াতেই রাগিণী ওকে দেখে উচ্ছসিত হয়ে লঘু এক খণ্ড মেঘের মত ভেসে এসে ওর একখানা হাত ধরে বলে—ভেতরে এস, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

কিংশুক অবাক হয়ে রাগিণীকে দেখছিল, এ মেয়েটাকে আগে কোথায়ও দেখেছে বলে তার মনে পড়ছে না। কি স্মার্ট আর কি সুন্দর দেখতে হয়েছে। রাগিণী হাত ধরে টানতে টানতে ওকে ঘরের মধ্যে এনে সখীদের বললে,—না, তোরা শুকদেবদা'কে মানুষই করতে পারলি না। এমন সুন্দর ছেলেটা খোকাই থেকে গেল শেষ অবধি। ও ঠিক আগের মতই গাঁইয়া আছে—বলে আদর করে কিংশুকের গালে চড় মেরে বললে—একটু তাজা হও, বী ব্রাইট। এখনও হাবাগোবা থাকবে? কেউ যে পছন্দ করবে না।—বলে মাথা দুলিয়ে হেসে উঠল। ঘরের মধ্যে হাসির ধূম পড়ে গেল।

কিংশুক এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। অবশ্য একলা ঘরে ঘটনাটা ঘটলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু ঐ একপাল মেয়ের হাসি ওর মেজাজ বিগড়ে দিলে। সবাই কিনা ওকে লক্ষ্য করে হাসছে!

রাগিণীর কানের দু'পাশে বিনুনী দুটো গোলাকার হয়ে চাকার মত ঝুলছিল হাসির ঠেলায় দুলে উঠে চাকা দুটো দু'এক বার কিংশুকের কাঁধ ছুঁয়ে গেল। এর পর মেজাজ ঠিক রাখা আরও শক্ত। রাগিণীর একখানা হাত কিংশুকের কাঁধের ওপর ছিল সেটা সরিয়ে দেবার জন্তে ও এক ঝটকা মারল; রাগিণীর হাত সরে গেল বটে কিন্তু কিংশুকের নিজের হাতটা একটা বিনুনীর চাকার ভেতর ঢুকে গেল, ফলে চাকা ত' পাঞ্জার হয়ে ঝুলে পড়লই উপরন্তু মাথায় টান পড়াতে রাগিণীও হুমড়ি খেয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে বিনুনী ঠিক করতে করতে রাগিণী ক্রোধে অগ্নিবর্ষণ করে বললে, রাষ্টিক, ব্রুট।

সেই যে ঘর ছেড়ে পালাল তারপর আর ও-মুখো হয়নি কিংশুক। রাগিণীকে রাস্তায় আসতে দেখলে অন্ত পথ ধরেছে। ওদের বাড়ীতে রাগিণী এলে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে! এক-একবার আচমকা সামনাসামনি যে না পড়েছে এমন নয়। রাগিণীই তখন মৃদু হেসে বলেছে, কেমন আছ শুকদেবদা; তোমাকে যে দেখাই যায় না। কিংশুক শুনেও জবাব দেয়নি।

কলেজে ঢুকে কিংশুক বন্ধুদের কাছে গল্প শুনত, তাদের কাছে লেখা চিঠিগুলো পড়ত। কোন বন্ধু কি করেছে এবং কি করবে সে সব প্ল্যান কানে আসত। বয়েসটা খারাপ। তার ওপর কলেজে ঢুকেছে। বসন্ত আর দ্বারে জাগ্রত নয় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে হুটোপুটি সুরু করে দিয়েছে। কিংশুক অনেক ভেবে-চিন্তে হৃদয় বাষ্পে ভরা একখানা চিঠি লিখল রাগিণীকে। চিঠিটা আরম্ভ করল আগেকার বিনুনী কাণ্ডের জন্তে ক্ষমা চেয়ে এবং শেষ করল যে কোন কারণে রাগিণীর জন্তে আত্ম-বিসর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। মাঝখানে অবশ্য দু'এক জায়গায় নিজের গুণগান ও ছেলেবেলাকার কথাও ছিল। চিঠিটা বড় ছিল বটে কিন্তু যে তিনটি শব্দ জানাবার জন্তে চিঠি লেখার উদ্দেশ্য সে শব্দ তিনটি চিঠিতে ছিল না। চিঠির মধ্যে পাঁচবার লিখেছে 'আমি তোমায়' কিন্তু তারপর ভালবাসি কথাটা আর লিখতে পারেনি, লজ্জা করেছে। ভয়ও যে মনে মনে না ছিল তা নয়, কি জানি যদি রেগে গিয়ে চিঠিটা বাবাকে দেখায়। যা মেয়ে ও সব পারে।

'ভালবাসি' কথাটা লেখা না থাকলেও চিঠিটা যে ভালবাসা জানাবার জন্তে লেখা হয়েছে এটা বুঝতে রাগিণীর দেরী হল না। ও তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। ঐ তো ছিরি আবার চিঠি লিখে প্রেম জানান হয়েছে। পাড়াগেঁয়ে ভূত! ভালবাসা কথাটা স্পষ্ট করে লেখবার সাহস যার নেই সে কিনা···

ছুটিতে বাড়ীতে এসেই রাগিণী কিংশুককে ডেকে পাঠাল এবং ডাক শুনেই হাসি হাসি মুখে বিজয়ী বীরের মত শ্রীমান এসে দাঁড়াল।

রাগিণী বই পড়ছিল কিংশুককে দেখে বই মুড়ে বললে, এস শুকদেব বস।

কিংশুকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। শুকদেব! একেবারে নাম ধরে ডাকা। বাতাস কোন দিকে বইছে?

টেবিলের ওপর একটা য়্যালবাম পড়েছিল সেটা তুলে নিয়ে ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে য়্যালবামটা কিংশুককে দিয়ে রাগিণী বললে, 'ছবিটা দেখ।'
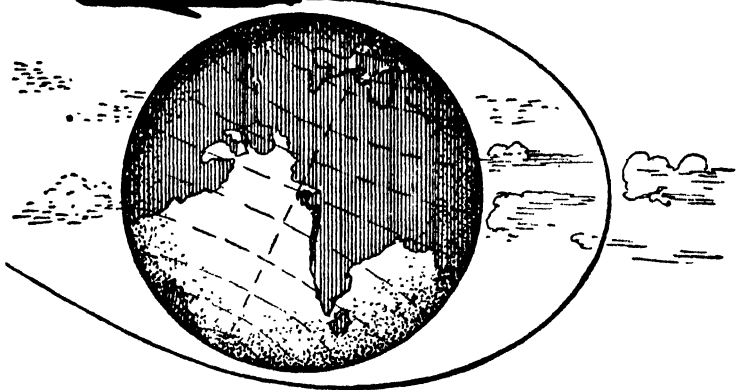
কিংশুক দেখল পোষ্টকার্ড সাইজের একটা ছবি। রাগিণীর দুপাশে দু'জন স্যুট পরা তরুণ। ছবির তলায় লেখা উই থ্রী। রাগিণী একজনকে দেখিয়ে বললে, এ হচ্ছে তরুণ সিকদার, আই-সি এস মিঃ সিকদারের ছেলে। শীঘ্রই বিলেত যাবে। আর এ হচ্ছে সুশান্ত বিশ্বাস এর বাবা ডক্টর বিশ্বাসের নাম বোধ হয় শুনে থাকবে। এও বিলেত যাবে। বলে আর একটা ছবি বার করে বললে—এটা দেখছ···

কিংশুক দেখল একপাল তরুণের মধ্যে রাগিণী ও আরও গুটি কয়েক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে, ছবির তলায় লেখা, আওয়ার গ্যাঙ্গ। রাগিণী তরুণদের পরিচয় দিতে লাগল, সব দিগ্বিজয়ী বাপের ছেলে, অনল কর, প্রলয় সেন, বিপ্লব আইচ···

—এখন তুমিই বল, এদের ধারে কাছে তুমি···

বাকীটা শোনবার আগেই কিংশুক চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় বেরিয়ে চোখাচোখা কয়েকটা বিশেষণ রাগিণীর উদ্দেশে ছেড়ে এবং কতগুলো কঠিন শপথে নিজেকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে মনের জ্বালা জুড়োল।

স্কুলে রাগিণী চারিদিক থেকে 'এক্সট্রা' জ্ঞান আহরণ করে 'মনচাক' ভরিয়ে ফেললেও ফাইন্যাল ডিসিশন কি নেবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। সকাল সন্ধ্যা সদর দরজার কড়া নড়ে উঠছে দরজা খুলবে কি খুলবে না, ঠিক করতে পারছিল না। দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করাতে তারা বলেছে যে দরজা খুললে বিপদ হতে পারে, একসঙ্গে তিন-চারজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে। তার চেয়ে সামনের দরজা বন্ধ থাকা ভাল। বন্ধ বাড়ীতে প্রাণ যখন হাঁ৹ ঐ উঠবে, তখন না হয় খিড়কি—বলে এক অদ্ভুত ধরণের হাসি হেসেছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা রাগিণীর মনঃপূত নয়। ও-বাড়ীর আহ্লাদী মেয়ে যা এ যাবৎ করেছে, তা সকলের সামনেই করেছে লুকোচুরির ধার ধারেনি। কাজেই খিড়কীর দিকেও নেই। তা ছাড়া খিড়কীর রাস্তা ত' আঁস্তাকুড়ের রাস্তা। ও-পথ মাড়াব কোন্ দুঃখে?

এই সময় ওদের স্কুলে এসে ভর্ত্তি হল বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ কে, কে, নাথের মেয়ে আকুলা। বন্ধুত্ব ঘন হবার পর রাগিণী একদিন মনের অস্থিরতার কথা আকুলাকে খুলে বললে। আকুলা শুনে মুখ টিপে হেসে গান গেয়ে উঠল। গানের অর্থ হচ্ছে, যার গুঁড়ি হবে বিরাট ও শক্ত যে হবে ইউক্যালিপ্টাস-এর মত আকাশ-স্পর্শী যাতে ফুটবে পলাশের মত ফুল গোলাপের গন্ধ নিয়ে নৌকো বেঁধো সখি সেই গাছের কোলে···।

রাগিণী এ খনার বচনের মানে বুঝতে পারল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল। আকুলা হেঁয়ালীর মানে বুঝিয়ে দিলে, গুঁড়ি হবে বিরাট ও শক্ত, মানে হল তরুণটি হবে নামকরা ঘরের এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটি হওয়া চাই মজবুত।···

আর বেশী বলতে হল না রাগিণী বললে,—বুঝলুম, এবার রূপের বর্ণনা দে, শুনি।

আকুলা অনেক ঘাটের জল খেয়েছে অনেক কিছু জানে কাজেই ওর ষ্ট্যাণ্ডার্ড একটু হাই। ওর মতে আইডিয়াল তরুণের চেহারা হবে পাঠানদের মত লম্বা, রং হবে কাশ্মীরী মেয়েদের মত, চোখ হবে সাহেবদের মত কিন্তু চোখের কোটর হওয়া চাই জাপানীদের মত, মাথাটা হবে জার্ম্মাণদের অনুরূপ, গোঁফদাড়ী চীনেদের চেয়েও কম থাকবে (একেবারে না থাকলে চলবে না। যাদের নেই তারা মাকুন্দ। মাকুন্দ পুরুষ! উহুঁ···অচল)। দাঁত আর ঘাড় হবে সাঁওতালদের মত, নিগ্রোদের মত কাঁধ পশুরাজ সিংহের মত কোমর গোরিলার মত বুক···।

শুনতে শুনতে রাগিণীর চোখ কপালে উঠেছিল এবার বললে, গোরিলার মত বুক হলে বুকে মুখ লুকোব কি করে। বড় বড় লোম নাকে মুখে ঢুকে হেঁচে মরব যে।

আকুলা বিরক্ত হয়ে বললে, লোম থাকবে কেন? সারকামফারেন্স হবে গোরিলার বুকের মত কিন্তু বুকের সারফেসটা হবে যারা মাসল পোজিং করে তাদের মত, একেবারে লোম থাকবে না। তারপর শোন, নাক হবে—

—আর শুনে দরকার নেই, যা বললি এর অর্দ্ধেক যদি আমার অদৃষ্টে জোটে তাহলেই যথেষ্ট, নাক থ্যাবড়া না হলেই হল।

বলা বাহুল্য, এই স্পেসিফিকেশন-এর মাল ভগবানের কারখানায় কালেভদ্রে তৈরী হয়। বাজার খারাপ হলে কোয়ালিটি ঠিক রেখে প্রডাকশন এর কোয়ানটিটি কমাতে হয় কিন্তু মানুষের বাজার খারাপ হলে কোয়ালিটি ছেঁটে বাদ দিয়ে নজর ছোট করতে হয়। তাই অনেক খোঁজাখুঁজির পর স্পেসিমেন অনুযায়ী মনের মত দেশোত্তম তরুণ না পেয়ে আকুলা আইডিয়াল তরুণের বেশ কয়েকটা কোয়ালিটি ছেঁটে বাদ দিয়ে বিয়ে করলে উদ্দাম পালকে। কিন্তু মাস তিনেকও গেল না দেখা গেল আকুলার উদ্যম ফুরিয়ে গেছে। ছল ছল চোখে একদিন এসে রাগিণীকে বললে, গিণি খেলা ভাঙার খেলা সুরু হয়ে গেছে। বাবার কাছে ফিরে এসেছি।

রাগিণী শুনে চোখে হাইকোর্ট দেখল, বললে—ইস! ডিভোর্স! কি বলছিস্ কুলা? গুঁড়ি কি শক্ত নয়?

—খুবই শক্ত। এত শক্ত যে ঢুঁ মেরে মেরে আমারই কপাল ভেঙে গেছে।

—ফুল ছিল? গোলাপের গন্ধ নিয়ে পলাশের মত রাঙা ফুল?

—ছিল। কিন্তু সে যে কাগজকে ফুল নয়ন মাতোয়ারা সেণ্ট মাখানো তা আগে বুঝিনি।

—কি হয়েছে আমায় খুলে বল।

—ওর কাছে আমি পুরোন হয়ে গেছি। অনুস্কাই এখন ওর সব।

আকুলা অনেকক্ষণ ধরে তার দুঃখের কথা শুনিয়ে বললে, এর চেয়ে বাবার কথা মত বিয়ে করলে তবু একটা কনসোলেশন পাওয়া যেত, সোসাইটী দুঃখ প্রকাশ করত। কিন্তু নিজে পছন্দমত বিয়ে করে ঠকেছি, সোসাইটী এখন ভেংচি কাটছে। শোন গিণি, তুই তোর বাপ মা-র ওপরেই নিজের ভাল মন্দ ছেড়ে দিস্, ভাল হবে। আর দেখ, তোর সেই কিংশুককে হাত ছাড়া করিস না।

—কিংশুক!

—হাঁ, ঠকবিনি। আর সুশান্তদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ কর, নইলে আমার মত কাঁদতে হবে। সর্ব্বস্ব দিয়ে দেউলে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। সুশান্তর সঙ্গে লিলির বিয়ে এক রকম ঠিক, আমি জানতে পেরেছি, লিলি বিলেত থেকে এলেই বিয়ে হবে। এই সময়টা একেবারে নিরিমিষ্যি যাবে তাই তোর সঙ্গে ও ভালবাসার অভিনয় করছে। মুখের কথায় ভুলে সব খুইয়ে নিজের সর্ব্বনাশ

করিস না। অনল, তরুণ প্রলয়, বিপ্লব সব সমান সাবধান। তোকে ছোট বোনের মত দেখে তাই যাবার আগে সাবধান করে দিয়ে গেলুম।

—কোথায় যাচ্ছিস্ ?

—পরশু শিলং যাচ্ছি মাসীমার কাছে। লেখাপড়ার পাট তুলে দিলুম।

—কি নিয়ে থাকবি।

—আজকাল মেয়েদের অনেক 'পায়াস্ অর্গানিজেশন' হয়েছে ভাবছি শিলং থেকে ফিরে তারই কোনও একটায় ডোনেশন্ দিয়ে সন্ন্যাসিনী হব।

আকুলার কথা রাগিণীর মনঃপুত হল না। বলে কিনা কিংশুককে ছাড়িস না। অনল, সুশান্ত, তরুণদের কাছে কিংশুক! ময়ূরের কাছে চামচিকে!

রাগিণী মনে মনে ভেবে ঠিক করেছিল যে সুশান্ত আর তরুণের মধ্যে একজন তার উপযুক্ত, কিন্তু ঠিক কোনজন তা অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারেনি। যদিও পাল্লাটা সুশান্তর দিকে ঝোঁকে বেশী তবুও তরুণকে হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করে না। এক এক সময় আবার ওকেই ভীষণ ভাল লাগে, সুশান্তর চেয়েও ভাল লাগে। ইচ্ছে করে দুজনেই ওর হোক্। কিন্তু তা হবার উপায় নেই। আবার এমনিই দুর্ভাগ্য যে দুজনের সব ভাল লাগা জিনিষগুলোও একজনের মধ্যে পাওয়া যাবে না, কাজেই একজনকে পাওয়া মানেই আধখানা কি বড় জোর থ্রী ফোর্থ পাওয়া, কি গেরো কণ্টকে গড়িল বিধি পুরুষ জাতিরে!

আকুলার কথা কিন্তু ফলতে শুরু করল। হাতে নাতে রাগিণী তরুণকে ধরে ফেলল। ব্যবসায়ী মিঃ হ্যারিস্ এর কন্যা গেল-এর প্রাণকান্ত সে। তরুণ স্বীকার করল অনেকটা নির্লজ্জের মত যে তাদের প্রণয় বহু দিনের। একটি গেল গেল-এর পেটে রইল বাকী এক। রাগিণী প্রাণপণে সুশান্তকে আঁকড়ে ধরল।

ইষ্টারের ছুটিতে ওদের একজন বন্ধু তাদের ডায়মণ্ডহারবারের বাগানবাড়ীতে 'আওয়ার গ্যাঙ'কে নেমন্তন্ন করল। রাগিণীর সঙ্গে ওর ছোট মামাতো বোন গেল, ওটা নলচে আড়াল। সময়টা ছিল পূর্ণিমার কোল ঘেঁষে মনগুলোও ছিল অন্য মনের কাছাকাছি কাজেই 'ডিনারের' পর অতিথিদের 'ষ্ট্রাটিজিক' ঝোঁপ খুঁজে পেতে বিশেষ দেরী হল না।

চারিদিক চাঁদের আলোয় হাসছে। সামনে ভরা নদী, তার তীরে ভরা মন আর ভরা দেহ নিয়ে রাগিণী ও সুশান্ত বসে আছে। ভরা মন ভরা দেহের ওপর যদি অনুকূল পরিবেশ হয় তখন স্বভাবতঃই গা এলিয়ে আসে, দু'জনেরই।

সুশান্তকে আজ আশ্চর্য রকমের সুন্দর লাগছে রাগিণীর। এত সুন্দর যে বলবার নয়। এর কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করে দেউলে হয়েও সুখ আছে। প্রাণপণে সুশান্তকে আঁকড়ে ধরল রাগিণী। সুশান্তর বুঝতে দেরী হল না, এ পথে সে নতুন নয়। পাকা খেলোয়াড়, অপেক্ষা করতে জানে। ফল হাতের মুঠোয় এলে কি করে তারিয়ে তারিয়ে খেতে হয়, সে বিদ্যায় ও পারঙ্গম।

রাগিণীর ঘাড়ে পিঠে পাঁজরের আশে পাশে সুশান্ত ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল। আবেশে রাগিণীর চোখ বুজে এল। কতক্ষণ ও চোখ বুজে ছিল জানে না। হঠাৎ শুনতে পেল সুশান্ত কানের গোড়ায় মুখ এনে বলছে—আর দেরী করলে কিন্তু রাত হয়ে যাবে, ওরা তা হলে খুঁজতে বেরোবে।—তারপর চাপা গলায় বললে, না আর দেরী করে লাভ নেই। বলে রাগিণীকে তুলে মাটিতে শুইয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক গরম নিশ্বাস লেগে রাগিণীর গাল দুটো জ্বলে গেল। রাগিণী ধড় মড় করে উঠে বসল। মাগো! মানুষের নিশ্বাসে এত আগুন থাকে! সুশান্তর মুখের দিকে তাকাল, থর থর করে সে কাঁপছে, চোখ দুটো তার জ্বলছে, চেনাই যায় না, সম্পূর্ণ এক অচেনা মানুষ। মানুষ! না, মানুষ হলে মুখে প্রার্থনার আকৃতি আঁকা থাকত, এর মুখে রয়েছে দস্যুর নৃশংসতা। রাগিণীর ভীষণ ভয় করতে লাগল, কাছে পিঠে কেউ নেই। যদি জোর করে এই দস্যুটা। ভুলে গেল এই একটু আগে একেই সে সর্বস্ব উজাড় করে ঢেলে দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল।

ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলে রাগিণী বললে, এঁা, রাত হয়ে যাচ্ছে, চল ফেরা যাক।

সুশান্ত ওর হাত দুটো ধরে ফের ওকে শুইয়ে দিলে। চাঁদের আলোতে রাগিণী দেখতে পেল সুশান্তর চোয়ালের হাড় দুটো কেমন অস্বাভাবিক আকার ধারণ করেছে। সুশান্ত এক দৃষ্টে রাগিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল বুঝতে পারল যে ও ভয় পেয়েছে।

মৃদু হেসে রাগিণীর হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে সুশান্ত বললে, শোন। বাড়ীর ভেতর থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডে গান ভেসে আসছে, না যেও না,

রজনী এখনও বাকী, আরও কিছু দিতে বাকী, বলে রাত জানা পাখী।

সুশান্ত হঠাৎ রাগিণীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললে—শুনলে? বলছে, রজনী এখনও বাকী, আরও কিছু দিতে বাকী। কিছুই তো দিলে না, আজকের রাত তো শুধু হাতে ফেরবার নয়?

কি বলে এ দস্যু? কোথায় আমি স্বেচ্ছায় দান করব আর অঞ্জলি পেতে কৃতজ্ঞচিত্তে সে দান গ্রহণ করবে তা নয় জোর খাটাতে চায়! রাগিণী নিজেকে মুক্ত করতে করতে বললে, আজ নয়, চল ফিরি, রাত অনেক হল।

—তা হোক, রাত রোজ আসবে যাবে, আজকের রাত আর আসবে না।—সুশান্তের কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর বেজে উঠ্ল।

—দিদি, তোরা কোথায়—দূর থেকে রাগিণীর মামাতো বোন রিতার গলা শোনা গেল। রাগিণী প্রাণপণে চেঁচিয়ে বললে—রি-তা-আ-আ-আ এই যে আমি—।—এত জোরে জীবনে কারুকে ডাকেনি।

এরপর কেন জানি না ভেবে ভেবে রাগিণীর আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল। একি করল সে? পুরুষ সে ত' নির্মম হবেই। দস্যুতাতেই তার পৌরষ। না যেতে হবে সুশান্তর কাছে, সেদিনকার ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইতে হবে, ক্ষমা আদায় করতে হবে। ও ছাড়া যে আমার আর গতি নেই।

আগে থেকে খবর না দিয়েই সুশান্তর বাড়ীতে দুপুরের দিকে রাগিণী হাজির হল। সুশান্তদের বাড়ী ফাঁকা, ও ছাড়া আর সবাই দার্জিলিং গেছে? দুপুরটা ও বাড়ীতেই থাকে, একা।

নীচে বেয়ারার কাছ থেকে রাগিণী জানতে পারল যে সাহেব আছেন তবে একা নয় এক মিসিবাবাও তাঁর কাছে আছে। থাকুক, তাকে সরিয়ে দেবার মত ক্ষমতা রাগিণীর আছে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে রাগিণী ওপরে উঠে সুশান্তর ঘরের সামনে দাঁড়াল তারপর জানান না দিয়েই দরজায় ধাক্কা দিলে, দরজা খুলে গেল।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রাগিণী দেখলে সোফায় গা এলিয়ে কামনা সুশান্তর বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছে, বেশবাস সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত নয়, কিন্তু ঝড় যে বয়ে গেছে এটা বোঝা যায়। কামনা এখন শান্ত বটে তবে বড় ক্লান্ত।

সুশান্ত রাগিণীকে দেখে উষ্ণস্বরে বললে, তুমি! কি চাও?

কামনা ক্লান্ত চোখ দুটো মেলে অতি কষ্টে জিজ্ঞেস করলে—কে? ওমা এ যে তোমার সেই গাঁয়ের বঁধু! বেচারা সত্যিই তোমায় ভালবাসে—বলে হাত নেড়ে মৃদু হেসে বললে—বাই য়ু আর লেট্।... 'হেথা হতে যাও পুরাতন হেথায় নতুন খেলা—'খিলখিল করে হেসে উঠ্ল।

আকুলা যা বলেছিল অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। রাগিণী ঠিক করলে আর এখানে নয়। এখানে সব মেকী সব অভিনয় আর এই অভিনয়কেই আসল ভেবে ও নিজের কি সর্বনাশটাই না করতে যাচ্ছিল! এখানে ও কেউ নয় বলতে গেলে কেউই কেউ নয়। সব সহস্রের মাঝে একজন। ওদের সেই মফঃস্বল সহরই ভাল। যে যেখানকার তাকে সেইখানেই মানায় ভাল। বইতেও তাই আছে, বন্যেরা বনে সুন্দর, কুকুরেরা শ্বেতাঙ্গিনী ক্রোড়ে।

রাগিণী আগে ছুটীতে বাড়ী আসতে চাইত না, এর পর ছুটী পেলেই বাড়ী দৌড়তে লাগল। সেবার ছুটীতে বাড়ীতে এসে বন্ধু শশী কবিরাজের মেয়ে তমুকার মুখে শুনলে যে কিংশুকের বি[য়ের] সম্বন্ধ এসেছিল কলকাতা থেকে কিন্তু ও অমত করেছে। অম[ত] করাতে কিছু যায়-আসে না। বিয়েতে অমন অমত প্রথম প্রথম স[ব] ছেলেই করে কিন্তু ভেতরের যে খবরটা জানা গেছে যার জন্যে অমত করা সেটা মারাত্মক খবর। ওদেরই সঙ্গে পড়ে বীথি, সে মুচকি হেসে বলেছে শুক তো বিয়েতে অমত করবেই। তমুকা মুখে রাজ্যের দুশ্চিন্তা এনে বললে, জানিস ওর কাছে লেখা শুকদেবদা'র চিঠি রীতি[মত] দেখেছে। চোখ দুটো একটু ঢোলা ঢোলা আর চামড়াটা একটু কট[া] বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। ও তোকে অবধি কেয়ার করে না। বলে পয়সা থাকলে অনেকেই কলকাতায় গিয়ে পড়তে পারে আমিও কলকাতায় যেতে পারতুম কিন্তু কালচার জিনিষটা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। ওর বাবা প্রফেসার বলে খুব কালচার কালচার করে তুই ভাই ওকে একটু টিট করে দিয়ে যা।

রাগিণী বাড়ীতে এলে লক্ষ্য করত যে ওর আগমনে তরুণ মহলে সাড়া পড়ে যেত। রাস্তাঘাটে সবাই ওর দিকে তাকিয়ে থাকত বার বার এটা সেটা করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করত এমন কি কিংশুকের বন্ধুরাও তাই করত, কিন্তু কিংশুক নিজে ডেড সোল[জার] দেখা দূরের কথা সামনাসামনি পড়লে যেন ভূত দেখেছে এমনি ভাবে সরে যেত। ওদের বাড়ীতে গিয়েও রাগিণী আজ অবধি ওর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারেনি। রাগিণী কিংশুকের নিস্পৃহতায় মনে মনে চটে যেত। যাবারই কথা। মাংস খাবার পর যদি খড়কে কাঠি মুখে না ওঠে তাহলে মনে হয় যেন ছানার ডালনা খেয়ে উঠলুম অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। তেমনি তরুণীরা রাস্তাঘাটে যদি লক্ষ্য করে তাকে কেউ দেখছে না তাহলে মনে মনে বেজায় চটে যায়। রাত্রের আহার নিদ্রা ঘুচে যায়। মনে বার বার প্রশ্ন জাগে, কোঽহং? সোঽহং কি? অর্থাৎ তরুণী নয় কি? তাহলে তাকায় না কেন? দেখবার মত কি আমার মধ্যে কিছুই নেই।

এমনিতে তমুকার কথা সব মেয়েই বাদসাধ দিয়ে গ্রহণ করত, রাগিণীও। কিন্তু এবার একেবারে পুরোপুরি বিশ্বাস করে দপ করে জ্বলে উঠল। এইজন্যে তাকান হয় না। বীথি! আমি ভাবি বুঝি চিঠির ব্যাপারে ছবির ব্যাপারে বাবুর অভিমান হয়েছে! তা নয়। আমাকে দেখে মুখ ফেরান হয় আর বীথিকে চিঠি লেখা! আমায় ইগনোর করা। দেখাচ্ছি মজা। অথচ ভুলে গেল যে কিছুদিন আগে চিঠি লেখার জন্যে কিংশুককে যে অপমানটা করেছে, তা তার পরেও এতটুকু আর্য্য রক্ত যার ধমনীতে প্রবাহিত সেই-ই মুখ ফেরাবে! মুখ সিধে করলেও বিপদ, মুখ ফেরালেও বিপদ। একেই বলে মেয়েদের চরিত্তির। পুরুষ জাতটা যায় কোথায়?

—জেঠি মা।

তরুবালা তাকিয়ে দেখেন রাগিণী।

—ওমা গিণি। আয় আয়। কবে এলি-রে?

তরুবালা ভারী ভালবাসেন রাগিণীকে একেবারে নিজের মেয়ের মত। তাঁর বরাবরের ইচ্ছে মেয়েটাকে তিনি ঘরে আনেন। জন্মাবধি দেখছেন, দেখতে শুনতে ভাল স্বভাব চরিত্রে খুঁত

নেই, দিব্যি মেয়ে। আজকাল যা সব হয়েছে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে, তবু ভাল মেয়ে নজরে পড়বে না। এ মেয়ের বেলায় সে ভয়টি নেই। কলকাতায় মানুষ হচ্ছে চাল চলনে একেবারে হাকিম সাহেবের মেয়েদের মত। তরুবালা জানেন বাহাদের আপত্তি নেই। আর কর্তাকে যদি এক কাঁড়ি দেয় তাহলে তাঁরও অমত হবে না। আপত্তি হবে দামিনীর। রাগিণীকে শুধু রাগিণীকে কেন বাহাদেরই তিনি দু' চক্ষে দেখতে পারেন না, বলেন পাঁঠা বেচা ঘর। তিনি রাজী হবেন না। কিংশুক আবার পিসীমার ভারী বাধ্য। সুতরাং মনের আশা চট্ করে পূর্ণ হবার নয়।

—কেমন আছ জ্যেঠিমা? তারপর শুকদেবদা'র বিয়ে নাকি ঠিক হয়ে গেছে।

—না তো। বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল ও রাজী হয়নি।

—রাজী হয়নি! শুনলুম মস্ত বড় লোকের মেয়ে, সুন্দরী তবু রাজী হল না?

তরুবালা রাগিণীর কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে হেসে বললেন—ও'র বোধহয় তোর মত সুন্দরী মেয়ে পছন্দ।

এই সামান্য ইঙ্গিতে রাগিণীর মুখ লাল হবার কথা নয়, কিন্তু কেন জানি না লজ্জা পেল। ঠিক এই সময় দামিনী ঘরে ঢুকে রাগিণীকে দেখে বললেন—ওমা এ আবার কে গা!

তরুবালা হেসে বললেন,—ঠাকুরঝি যেন কি হচ্ছে দিনকে দিন। কেন চিনতে পারছ না, এ আমাদের গিণি।

—চিনব কি করে? মুখখানাকে লাল নীল রং দিয়ে কসবীদের মত অমন চিত্তির বিচিত্তির করলে মানুষ চিনতে পারে?

এ কথায় রাগিণীর মুখের রং আগেকার মত লালই রইল বটে, কিন্তু লজ্জাটুকু চলে গেল।

কসবীদের মত! কসবী কথাটার মানে না জানলেও কথাটা যে মোটেই প্রশংসার নয় সেটা বুঝতে রাগিণীর দেরী হল না। দেখা হলেই পিসিমা এই রকম আঘাত দিয়ে কথা বলেন। লাল নীল রং। হঠাৎ মনে পড়ল তনুকার কথাটা। বীথির ব্যাপারটা যদি এখন বলে তাহলে কেমন হয়? বীথিরা খৃষ্টান। পিসিমার মতে মানুষ নয়, কাজেই তার সঙ্গে কিংশুকের ঘনিষ্ঠতায় তিনি আঘাত পাবেন খুবই। পিসীকে আঘাত হানবার এ সুযোগ রাগিণী ছাড়বে না, কিছুতেই না। কিন্তু পিসীকে আঘাত দিতে গিয়ে যে জ্যেঠিমাকেও আঘাত দেওয়া হবে এটা ভুলে গেল। রাগিণী তরুবালাকে বললে, মিথ্যে তোমরা শুকদেবদা'র জন্তে মেয়ে খুঁজে মরছ জ্যেঠিমা। শুকদেবদার যাকে পছন্দ সে হাতের গোড়াতেই আছে। তাকে ছাড়া ও আর কারুকে বিয়ে করবে না।—নামটা ঠোঁটের ডগায় এল, কি ভেবে আর বললে না।

দামিনী চোখ কপালে তুলে বললেন, ওমা, তুই কি করে জানলি লা? সে মেয়েকে?

বীথির নামটা ঠোঁটের গোড়ায় এসে গিয়েছিল হঠাৎ কি ভেবে নামটা না বলে রাগিণী বললে, সে আমি জ্যেঠিমাকে বলব? শোনবার সাধ থাকলে জ্যেঠিমার আশে পাশে থেকো তাহলেই শুনতে পাবে।

দামিনী কণ্ঠে বিষ ঢেলে বললেন, তুই নিজে নাকি লা?

তরুবালা বললেন, কি হচ্ছে ঠাকুরঝি।

রাগিণী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, যেমন গুণধর ভাইপো! তুমি কিছু মনে করোনা জ্যেঠিমা, চলি আর এক সময় এসে নামটা বলে যাব। কুঞ্জ রাহার মেয়ে অত ফ্যালনা নয় পিসী—বলে গট গট করে চলে গেল।

দামিনী গর্জ্জে উঠলেন, পাঁঠা বেচা ঘরের মেয়ের এত বড় আস্পর্দ্ধা, হারামজাদীর চোপাটা দেখলে বৌদি। দাদাকে বলছি যদি এর—।

—ঠাকুরঝি, তুমি যদি এই নিয়ে হৈ চৈ কর তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব বলে দিচ্ছি।

—ঐ এক ফোঁটা মেয়ে বাড়ী বয়ে শুকদেবকে অপমান করে যাবে আর তাই সহ্য করতে হবে?

অপমান ও অমনি করেনি।

রাগিণী কিংশুককে মজা দেখাবে বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল কিন্তু দামিনী ঠাকরুণের হাতে ছোবল খেয়ে জ্বলতে জ্বলতে তাকে বাড়ী ফিরতে হল।

[ক্রমশঃ।
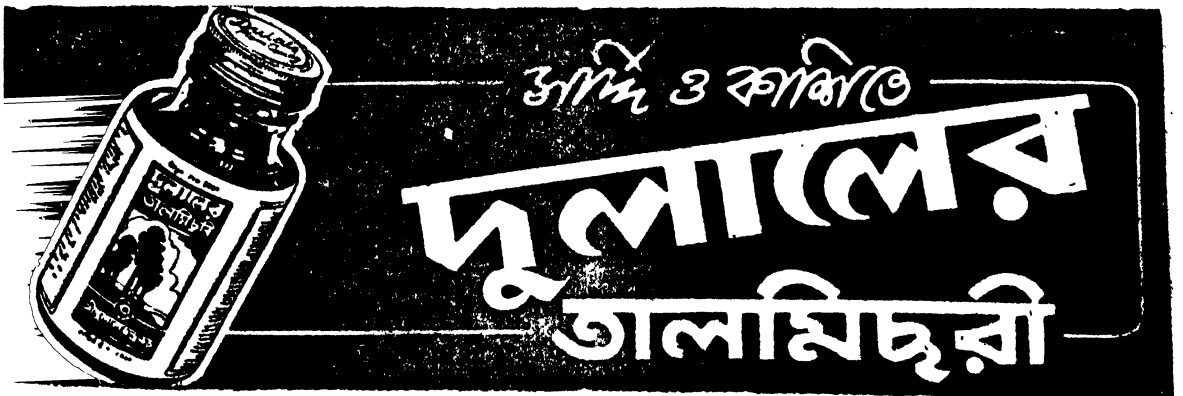
গোলাম-গামা-গোবর

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের প্রথম পরিচয় মল্লযুদ্ধে। পর পর তিনটি বিশ্বজয়ীর জয়ের মালায় ভূষিত তার কণ্ঠ। ভারতের এই প্রতিভাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে যাঁরা সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন গোলাম, গামা ও গোবর। ভারতীয় কুস্তির এই "থ্রি জি" (Three-G) তাঁদের প্রাণময় খেলায় ফরাসীবাসীর মনে প্রথম আলোড়ন তোলেন ১৯০০ সালে। তারপর সেই আলোড়নের ঢেউ এসে লাগে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার ক্রীড়াঙ্গনে—শ্বেতকায় জাতির মনের মণিকোঠায়। বিশ্ববাসী এই ত্রয়ী "গ"-কেই বিশ্বশ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেয়। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে হকি খেলায় ভারতের পরিচয় হয়েছে অনেক পরে।

১৮৯৯ সালের নভেম্বর মাসে প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। এই প্রদর্শনীতে মল্লযুদ্ধের যে ব্যবস্থা হয়, তাতে পৃথিবীর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ পালোয়ানেরাই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে মল্ল হিসেবে অমৃতসরের গোলাম পালোয়ান, কাল্লু ও রহমানও এই প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। সে-সময় তুরস্কের পালোয়ানদের খ্যাতিই ছিল সবচেয়ে বেশী। তুরস্কের বিশালকায় হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান মল্ল কুর্‌ডেরেলি বা কুর্দিআলী (মতান্তরে ম্যাডরালী বা মর্দ আলী) তখন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের হারিয়ে আন্তর্জাতিক কুস্তিতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। ১৯০০ সালে ২১শে মে গোলাম-ভায়েরা প্যারিসে উপস্থিত হলে সেদিনই পণ্ডিত মতিলাল নেহরু গোলামের পক্ষ থেকে প্রতিভূ-স্বরূপ 'ভেলো' নামক ধনাগারে পনের হাজার ফ্রাঁ জমা দিয়ে ইউরোপ ও বিশ্বের সকল মল্লের উদ্দেশ্যে এক আহ্বান ঘোষণা করলেন যে, যে-কোন পালোয়ান গোলামকে কুস্তিতে হারাতে পারলে ঐ টাকার সমস্তই তিনি পাবেন। এর ফলে দেখতে দেখতে সারা ইউরোপে এক ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং সম্ভবত: ঔৎসুক্যের সাথে সাথে পশ্চিমী পালোয়ানদের মনে কিছুটা দ্বিধা বা ত্রাসেরও সৃষ্টি হয়েছিল। নতুবা দিনের পর দিন চলে যাবার পরেও কেন সে 'চ্যালেঞ্জ' কেউ গ্রহণ করেননি ? অথচ তখন প্রখ্যাত মল্লদের মধ্যে রাশিয়ার ইভান পুড্‌বনি, জর্জেজ হাকেনস্মিথ, পোল্যাণ্ডের স্ট্যানিস্‌লস্‌ বিস্কো, জার্মাণীর ইউজেন্ স্যাণ্ডো, ফ্রান্সের পল্ পন্স, সাবেস্, তুরস্কের ইউসুফ ইস্‌মাইল, নৌরলা, কারা ওসমান্ প্রভৃতি সবাই প্যারিসে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দীর্ঘ দিনেও কেউ গোলামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগুলেন না। গোলামের নামেই পশ্চিমী পালোয়ান মহল গা ঢাকা দিয়েছিলেন। অবশ্য গোলামকে দেখার জন্যে প্রত্যহই অগণিত লোকের ভিড় হচ্ছিল এবং ছোট-বড় বহু মল্লই গোলামের আখড়ায় এসে গোলামের সাথে কুস্তির মহড়াও দিচ্ছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত জার্মাণ বলী ইউজেন স্যাণ্ডো তো একদিন গোলামের আখড়ায় এসে গোলামের সাথে এক আপোষ-কুস্তিই লড়ে গেলেন। কিন্তু অন্যান্য মল্লদের মতন স্যাণ্ডোও গোলামের কাছে পাঁচ মিনিটের বেশী দাঁড়াতে পারেননি। ব্যায়াম-বিজ্ঞান বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানী স্যাণ্ডো তখনই বুঝেছিলেন যে, কুস্তিতে ভারতীয় পালোয়ানদের কাছ থেকে বাহাদুরি নেওয়া বিদেশী পালোয়ানদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

শেষে শ্বেত-চক্রের মান বাঁচানোর জন্যে ফ্রান্সের বিশ্বখ্যাত ব্যায়াম-গুরু প্রফেসার এডমুণ্ড ডেস্‌বোনেট (এদ্‌মুনদ্ দেস্‌বোনেৎ)-এর চেষ্টায় প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষেরা স্থির করেন যে, কুরডেরেলি ও গোলাম পালোয়ানের মধ্যে যে লড়াই হবে, সেই লড়াইতে যিনি বিজয়ী হবেন, তাঁকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হবে।

'লার্ণ্ড দে লা প্রেস'—এর পরিচালক ভাইকাউণ্ট অফ চেম্বার তুর্কীমল্ল কুরডেরেলির পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ বাজি রেখে উভয়ের মধ্যে শক্তি-পরীক্ষার সুযোগ করে দেন। 'বুলভার অফ ক্লিসি' বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয়। কুচবিহারের তৎকালীন মহারাজাও ছিলেন একজন মীমাংসক।

বাঁশীর আওয়াজ হওয়া মাত্রই গোলাম তাঁর কোণ থেকে এগিয়ে এসে সেলামী নিলেন এবং কয়েক পা পিছিয়েই পুনরায় লাফিয়ে এসে কুরডেরেলির ওপর পড়লেন। কুরডেরেলি সে আক্রমণ ঠেকাবার আগেই কোন এক বিস্ময়কর প্যাঁচ লাগিয়ে কুরডেরেলির দুটি কাঁধকেই মাটিতে চেপে ধরলেন। কুস্তির সুরু থেকে শেষ—ব্যবধান মাত্র ৪২ সেকেণ্ড! কেমন করে কখন কুস্তি সুরু হল, দর্শকদের মধ্যে অনেকেই তা' লক্ষ্য করতেও পারেননি। কিন্তু কতকগুলি লোকের পক্ষপাতিত্বে ও অনেক তর্কবিতর্কের পর পুন: পরীক্ষাই স্থির হয়।

দ্বিতীয়বারেরও গোলাম ডেরেলিকে বারবার ভূপাতিত করলে ডেরেলিও প্রত্যেকবারই উঠে দাঁড়ান। এই ভাবে ৩০ মিনিট লড়াই করার পর ডেরেলি বুঝতে পারলেন যে, যথাযথ রীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চললে তাঁর পরাজয় অনিবার্য। তাই তিনি মাটি কামড়ে পড়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করে তাঁর বিরাট দেহভারকে কেন্দ্রীভূত করে এমনভাবে পড়ে রইলেন যে, গোলামের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হতে লাগল। কিছুতেই তিনি তাঁকে চিৎ করতে

পারলেন না। গোলাম কিন্তু বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শেষে প্রায় দেড়ঘণ্টা লড়াই চলার পর গোলাম কয়েকটি পদাঘাতের দ্বারা ডেরেলিকে আপ্যায়িত করে বিজয়ী বীরের মতন হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্তৃপক্ষ তখন গোলামকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। রুশমল্ল জর্জেজ হাকেন্সমিথ-এর শিক্ষাদাতা ডা: ফন ক্রাইয়েভস্কি উপস্থিত থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং গোলামের অসাধারণ শক্তির পরিচয়ে বিস্মিত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাঁচ মিনিট পর্যন্তও গোলামের সম্মুখে ভরসা করে দাঁড়াতে পারে এমন মল্ল সারা পৃথিবী অন্বেষণ করলেও পাওয়া যাবে না। "এ কথা স্বীকার করতে হবেই, হাকেন্সমিথ একজন প্রথম শ্রেণীর মল্ল, কিন্তু বিশ্বজয়ী গোলাম ছিলেন অতুলনীয়।"—বলেছিলেন ব্যায়ামাচার্য শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী। এই জয়ের ফলেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান "king of the wrestling ring" হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয় গোলাম পালোয়ানকে।

প্যারিস থেকে জগৎপূজ্য সম্মানলাভ করবার পর তিনি মাত্র সামান্য কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় মারা যান।

এরপর যিনি মল্লযুদ্ধে সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করে ভারতীয় কুস্তিকে বিশ্বের দরবারে পুন: প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তিনি হলেন লাহোরের বড় পালোয়ান বড় গামা। নিজের শক্তি ও কৌশলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের একে একে পরাজিত করে তিনি শুধু যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা নয়—পরবর্তীকালের মল্লযোদ্ধাদের বিশ্ববিজয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পুনর্জীবিতও করেছেন।

১৯১০ সালের মার্চ মাসে শরৎকুমার মিত্র ও বাংলার খ্যাতনামা মল্ল গোবরবাবুর চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে পাঞ্জাবের বড়গামা, ইমাম বখশ, মিরান বখশ, গামু পালোয়ান, বিদ্যাধর পণ্ডিত এবং গোবরবাবু নিজে লণ্ডন যান। কিন্তু সেবার কোন অনিবার্য কারণবশত: তিন মাস পরেই গোবরবাবুকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল বলে তিনি কোন লড়াইতেই যোগ দিতে পারেননি। সে সময় লণ্ডনে ভারতীয় পালোয়ানদের ম্যানেজার ছিলেন মি: বেঞ্জামিন। প্রথমটা হোটেলে বসেই দিন কেটে যায়। কোন কুস্তিগীরই এগিয়ে আসেন না লড়বার জন্যে। অবজ্ঞায় বিকৃত মুখে ইউরোপ ও আমেরিকার কুস্তিগীরেরা পরস্পর বলাবলি করে: "ওরা কুস্তির কি জানে—ওদের সাথে আমরা কি লড়বো?" শেষে বেঞ্জামিন সাহেবের চেষ্টা-ফিকিরে কিছু কিছু কুস্তির ব্যবস্থা হতে লাগল। দেখতে দেখতে ইংল্যাণ্ডে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। কেননা সে সময় ইংল্যাণ্ডে বাস্তবিকই বড় পালোয়ান কেউ ছিলেন না। তাই, তাঁদের আহ্বান গিয়ে পৌঁছল আটলাণ্টিকের পরপারে আমেরিকার দরবারে। এলেন সে দেশের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান ডক্টর বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন রোলার গামাকে ঘায়েল করবার জন্যে।

গামা ও রোলারের কুস্তি হয়েছিল 'ক্যাচ-অ্যাজ-ক্যাচ-ক্যান' (Catch-As-Catch-Can) ঢংয়ে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হতে না হতেই দেখা গেল, কোন এক বিস্ময়কর প্যাঁচে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মল্ল। মল্লযুদ্ধে আমেরিকার দীর্ঘদিনের শ্রেষ্ঠত্ব এই ভাবে এক কালা আদমীর কাছে লুণ্ঠিত হতে দিতে রাজী হন না ডা: রোলার ও তাঁর সমর্থকেরা। দ্বিতীয় বার রোলার ও গামার মধ্যে তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এবারেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রোলার-কে ভারতীয় কুস্তির উন্নত কলা-কৌশলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। শ্বেতাংগ দর্শকেরা ডক্টর রোলারের পরাজয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় পরে ধরা পড়ল, ডক্টর রোলারের দু'খানা পাঁজরের হাড় ভেংগে গেছে।

বিদেশী কুস্তিগীরেরা তখনো বড় গামাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসেবে স্বীকার করে নিতে চান না। তাই ঠিক হয়, পোল্যাণ্ডের বিশ্ববিশ্রুত মল্ল ষ্ট্যানিস্লস্ সিগনভিচ বিস্কোকে যদি বড় গামা পরাস্ত করতে পারেন, তবে বড়গামাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হবে। বড়গামা তাতেই রাজী হলেন। এ ছাড়া গামা ও বিস্কোর লড়াইতে বাজি ছিল 'জন্ বুল্ প্রাধান্য পেটি' নামে সোনার একটি কোমর বন্ধ ও নগদ দু'শ পঞ্চাশ পাউণ্ড এই দুটি জিনিষও বিজয়ীর প্রাপ্য পুরস্কার বলে স্থিরীকৃত ছিল।

লণ্ডনের আলহামব্রা টুর্ণামেণ্ট উপলক্ষে নির্মিত একটি বিরাট ষ্টেডিয়ামে ১৯১০, ১০ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে এই কুস্তি অনুষ্ঠিত হয়। কুস্তির শুরু থেকেই বড় বিস্কো আত্মরক্ষাত্মক নীতিতে লড়তে লাগলেন। ও ভাবে দু ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে লড়াই চলার পরও কোন জয়-পরাজয়ের মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হল না, অথচ দিনের আলোও ক্রমশ:ই নিষ্প্রভ হয়ে এলো। তাই কর্তৃপক্ষ সেদিনকার মতন কুস্তি বন্ধ করে পরবর্তী ১২ই সেপ্টেম্বর পুনরায় হবে বলে ঘোষণা করলেন।

১২ই সেপ্টেম্বর আসরে গামা তো উপস্থিত হলেন; কিন্তু বিস্কোকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ভারতীয় পালোয়ানের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে নিশ্চিত পরাজয় বরণ করতে হবে জেনেই বিস্কো গামার সম্মুখীন হতে সাহসী হলেন না। অগত্যা কর্তৃপক্ষ বিস্কোকে পরাজিত গণ্য করে বড় গামাকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর হিসেবে স্বীকার করে নেন এবং গামাকেই বিজয়ীর প্রাপ্য সমস্ত পুরস্কার দিয়ে দেন। কর্তৃপক্ষের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বড় গামা ইউরোপীয় মল্ল-সমিতি কর্তৃক 'বিশ্বজয়ী মল্ল' আখ্যা তো পেলেনই উপরন্তু ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ 'জন বুল বেল্ট'ও পেলেন।

'ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ' ও 'বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপ' পাবার পরই গামা ভারতে এসে এলাহাবাদে রহিম পালোয়ানকে হারিয়ে বিজয়ীর পুরস্কার হিসেবে লাভ করলেন ভারতীয় কুস্তিগীরদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গুরুজ,' আর লাভ করলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানের মর্যাদা 'রুস্তম্-ই-হিন্দ' উপাধি, যা এক সাথে আর কোন মল্লই লাভ করতে পারেননি। গামার বিষয়ে সর্বশেষ কথা এই যে, মল্ল হিসেবে তিনি জীবনে কখনো কারু কাছেই পরাজয় স্বীকার করেননি। মল্লযুদ্ধে বিজয়ীর পুরস্কার হিসেবে গামার মতন এত বেশী রূপোর গদাও আর কেউ লাভ করতে পারেননি।

মল্লযুদ্ধে বিশ্ববিজয়ীর খেতাব সহজলভ্য নয়। অর্থ ও যশের যৌথ মিলনে গড়া বিজয়ীর জয়মাল্য লাভ করতে দীর্ঘদিনের প্রাণপাত পরিশ্রমের যেমন প্রয়োজন, তেমনি নিরলস সাধনার মাধ্যমে কুস্তির নানা কৌশলও আয়ত্ত করা অপরিহার্য। কিন্তু ভারতীয় কুস্তিগীরদের মধ্যে এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি শুধু একটি চ্যাম্পিয়ানশিপ, নয়, স্কটিশ, চ্যাম্পিয়ানশিপ, বৃটিশ এম্পায়ার রেষ্টলিং চ্যাম্পিয়ানশিপ, এবং ওয়ার্লড্স্ লাইট হেভি-ওয়েট রেষ্টলিং চ্যাম্পিয়ানশিপ, এই তিনটি চ্যাম্পিয়ানশিপ আখ্যাই লাভ

করেছিলেন। মাত্র আট বছর সময়ের মধ্যে সেই অবিশ্বাস্য সম্মানের অধিকারী হয়ে সারা বিশ্বকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনটি চ্যাম্পিয়ানশিপের অধিকারী হিসেবে বড় গামা ভিন্ন আজো অন্য কোন নাম যুক্ত হয়নি তাঁর পাশে। একাগ্র ও একান্ত সাধনায় চ্যাম্পিয়ন-শিপ-এর মুকুট পরেছেন তিনি একে একে। সেই অবিস্মরণীয় প্রতিভা—মল্লের নাম গোবর পালোয়ান। বাঙালী জাতির গৌরব তিনি। যতীন্দ্রচরণ গুহ তাঁর আসল নাম।

আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে ১৯১২ সালে গোবরবাবু দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে ইউরোপ যাত্রা করেন। ১৯১৩, ২৭শে আগষ্ট স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো শহরে সেই সময়কার 'স্কটিশ চ্যাম্পিয়ান' জিমি ক্যাম্পবেলের সাথে গোবরবাবুর এক কুস্তি হয় এবং সেই কুস্তিতে তিনি জয়ী হয়ে স্কটিশ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেন। এডিনবরা শহরের 'অলিম্পিয়া ষ্টেডিয়ামে' ওরা সেপ্টেম্বর তৎকালীন অপরাজেয় স্কটিশ মল্ল জিমি এসেন্‌-কে হারিয়ে 'যুক্তরাজ্য প্রাধান্য' (Champion of the United Kingdom) আখ্যা লাভ করেন। কেউ কেউ বলেন এসেন্‌ তখন 'বৃটিশ এম্পায়ার রেষ্টলিং চ্যাম্পিয়ান্‌ অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মল্ল ছিলেন। সে হিসেবে গোবরবাবুও এসেন্‌কে হারিয়ে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের কুস্তি প্রাধান্য' লাভ করেন। এরপরই তিনি প্যারিসে দিগ্বিজয়ী জার্মাণ মল্ল কার্ল সাপট (Karl Saft)-কে পরাস্ত করে ১৯১৫ সালে দেশে ফিরে আসেন।

এর পর ১৯২১, ২৪শে আগষ্ট গোবরবাবু সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর কলোসিয়ামে পরাস্ত করেন বিশ্বখ্যাত জার্মাণ মল্ল ও বলী অ্যাড্‌-সান্টেলকে, লাভ করেন "বিশ্বের নাতি-গুরু-ওজন-মল্ল-প্রাধান্য (Light Heavy Weight Wrestling Championship of the World)। তার আগেই তিনি হারিয়েছিলেন বোহেমিয়ার 'অজেয়-মল্ল' জোসেফ, স্মাল্‌জ্‌-কে, আর হল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল টমি ড্রাক্‌-কে। তবে এই দুটো লড়াইতে জিতে কোন চ্যাম্পিয়ান্‌শিপ তিনি পাননি। ১৯২১, অক্টোবর মাসে ক্যান্‌সাস প্রদেশের উইচিটা সহরে গোবরবাবু এডওয়ার্ড 'ষ্ট্র্যাংলার' লিউস-কে হারিয়েও 'বিশ্বের গুরু-ওজন-মল্ল-প্রাধান্য' (World's Heavy Weight Wrestling Championship) পাননি, কেননা তার আগেই বিস্কো লিউইসকে হারিয়ে 'বিশ্বজয়ী' পদবী কেড়ে নিয়েছিলেন।

অলিম্পিকের ক্রীড়াঙ্গনে আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় মল্ল স্বর্ণ পদক দখল করতে না পারলেও পেশাদারী কুস্তিতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য ছিল। সরকারীভাবেই হো'ক আর বেসরকারীভাবেই হো'ক এই শতাব্দীরই প্রথম ভাগে ভারত পর পর তিনবার বিশ্ব-বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছিল। আর সমগ্র বিশ্বের ক্রীড়ারসিকরাও সানন্দ চিত্তে 'গোলাম-গামা-গোবর' ভারতীয় মল্লের এই তিনটি রত্নের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। মার্কিণ মুলুকের বিশ্ব-মল্ল-সংস্থাও কোন প্রতিবাদ না করে পরোক্ষভাবে ইউরোপীয় মল্ল-সমিতির পক্ষেই রায় দিয়েছেন। তাই তো বড়গামাকে হারিয়ে বিশ্বজয়ীর জয়ের মালা ছিনিয়ে নেবার জন্যে বৈদেশিক মল্লরা বার-বার হানা দিয়েছেন। প্রথম এলেন বড় বিস্কো ১৯২৭ সালে; ১৯২৮, ২৯শে জানুয়ারী পাতিয়ালায় গামার কাছে হেরে যান মাত্র ৯ সেকেণ্ডে। এলেন জেস পিটার্সেন, ১ মিনিট ৪২ সেকেণ্ডেই তাঁর খেল খতম হয়ে গেল। আহ্বান জানালেন বিশ্বখ্যাত ইটালিয়ান মল্ল ও মুষ্টিক প্রিমো কারণেরা, রুমানিয়ান মল্ল জর্জ ইউনেস্কো, প্রাক্তন 'জগজ্জয়ী মল্ল' লিউইস, বিশ্বখ্যাত জার্মাণ মল্ল এডমুণ্ড ফোন ক্রেমার প্রভৃতি। অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, বড় গামা কি 'বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ'? 'বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ' না হলে বড় গামার সাথে লড়াই করে নিজেকে ধন্য মনে করতে কেন ছুটে আসতেন বিশ্ববিখ্যাত মল্লবীরেরা সাগর পাড়ি দিয়ে? লিউইসএর কর্মাধ্যক্ষ মি: থার্ষ-এর মতে—"Lewis is the best wrestler in the world in the opinion of U. S. A. তাই যদি হবে, তবে লিউইস-এর মতন 'জগজ্জয়ী মল্ল', যিনি আমেরিকার মল্ল সমিতি কর্তৃক পাঁচ বার 'বিশ্বজয়ী মল্ল' আখ্যা লাভ করেছিলেন, যা আজো আর কোন মল্ল লাভ করতে পারেননি, বড়গামাকে এক হাজার পাউণ্ড সেলামী দিয়ে তাঁর সাথে কুস্তি লড়তে চেয়েছিলেন কেন? তা'ছাড়া বিশ্বমল্ল-সংস্থাও 'গোলাম-গামা-গোবর' তো 'বিশ্বজয়ী' বলে মানতে কোনদিন কোন আপত্তিই জানায়নি।

গোবরবাবু কিন্তু এত বড় দিগ্বিজয়ী মল্ল হয়েও ভারতীয় মল্লদের বরাবরই এড়িয়ে গেছেন। 'বিশ্ব-প্রাধান্য' লাভ করার পর এঁদের সাথে লড়াই করা হয়তো তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। বড়গামা যখন ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ মল্লের উদ্দেশ্যে এক 'মুক্ত আহ্বান' পত্রিকা মারফৎ ঘোষণা করেন, তখন গোবরবাবু যদিও সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: তিনি তখন দারুণ 'ডিপথিরিয়া' রোগে আক্রান্ত হওয়ায় এবং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নিজে তাঁকে লড়তে নিষেধ করায়, সে লড়াই আর সংঘটিত হয়নি। অনেকে বলেন, গোবরবাবু নিজে বড়গামাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁদের এ উক্তি কিন্তু সত্যি নয়! ১৯১৫ সালে গোবরবাবু যখন ইংল্যাণ্ড এবং কণ্টিনেণ্টকে তাঁর শক্তির পরিচয়ে তাক লাগিয়ে দেশে ফিরে এলেন, তখন মহামল্ল রহিম বখ্‌শ্‌ তাঁর সাথেও লড়তে চাইলেন। সে-বছর ডিসেম্বর মাসে তাঁদের কুস্তি হবার কথা স্থিরও হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে তা' ভেস্তে যায়। পরে কিন্তু গোবরবাবু ইচ্ছে করলেই বড় গামাকে বা রহিম বখ্‌শ্‌-কে তাঁর আহ্বান জানাতে পারতেন। বড়গামা যখন ইমাম বখ্‌শ্‌-কে তাঁর ভারত-চ্যাম্পিয়ান্‌শিপ—'রুস্তম্‌-ই-হিন্দ্‌'-আখ্যা স্বেচ্ছায় দেন, তখন বৃদ্ধ রহিম পালোয়ান প্রতিবাদ জানিয়ে ইমাম বখ্‌শ্‌-এর সাথে লড়তে চাইলেন। অবশ্য ইমাম বখ্‌শ্‌-এর কাছে তাঁকে 'টেক্‌নিক্যাল্‌ পরাজয়' মেনে নিতে হয়। তখন বা তার পরেও কিন্তু গোবরবাবু ইমাম বখ্‌শ্‌-কে হারিয়ে ভারতীয় মল্লের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান কেড়ে নিতে এগিয়ে আসতে পারতেন। যাই হোক গোবরবাবু যে তাঁর যৌবনকালে একজন দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী মল্ল ছিলেন, কুস্তি-বিদ্যায় তাঁর মতো বড় বিশেষজ্ঞ এবং হৃদয়বান পুরুষ ভারতবর্ষে আর একজনও জন্মান নি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তাঁর কয়েকটি শক্তির-কীর্তি আজো পর্যন্ত এ-দেশে অনতিক্রান্ত আছে।

গোলাম পালোয়ান ও বড় গামা পালোয়ান আজ পৃথিবীতে নেই সত্য, কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি দর্শক ও মল্লবীরের স্মৃতির মাঝে এঁরা চিরজীবী। মল্লজগতের এই 'থ্রি-জি'-এর মধ্যে গোবরবাবুই এখন একমাত্র জীবিত ব্যক্তি, যিনি এতবড় সম্মানের অধিকারী হয়েও স্বদেশে অখ্যাত ও অবজ্ঞাত হয়েই রইলেন। আজকাল আমাদের দেশে কথায় কথায় যাকে-তাকে সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন দেওয়ার রেওয়াজ সুরু হয়েছে; অথচ গোবরবাবু কি একটি 'মানপত্র' পাবারও যোগ্য

নন ? যে বড় গামাকে গোবরবাবুও সমীহ (সম্মান) করতেন, তাঁকেই বা আমরা তাঁর জীবিতকালে কি সম্মান দেখিয়েছি ?

ভারতীয় মল্লবীরদের মধ্যে তিনজন মল্ল যে 'বিশ্ব-প্রাধান্ত' লাভ করেছিলেন, তা আমাদের দেশে অনেকেই জানেন না। এমন কি, তাঁদের নাম-ধাম-ও অনেক ভারতীয় জানেন না। এর কারণ, বোধ হয়, সেই সব লোকের কুস্তির প্রতি আজন্ম অনুৎসুকতা ও অজ্ঞাত সঞ্জাত ভ্রান্ত-বিদ্বেষ। তা' ছাড়া, আমাদের দেশে আগে ইতিহাস রাখার রেওয়াজ একেবারেই ছিল না, এখনো অবশ্য নেই। এখন যাঁরা এ-বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁরাও অনেক সময় সুবিধামত ঘটনাকে অদল-বদল করে, আসল তথ্যকে বিকৃত করে প্রবন্ধ রচনা করে থাকেন। অনেকে গোলাম পালোয়ান ও গামা পালোয়ানের 'বিশ্ব-প্রাধান্ত' প্রাপ্তির ঘটনাকে রটনা বলে ব্যংগোক্তি করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। এটি যে তাঁদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ তা নয়, মাল-মসলার অভাবে অনেক সময় ঠিক ঠিক ঘটনার বিকৃত রটনা হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে এ-কথা সত্যি যে, ১১০০ সাল থেকে ১১৩৫ সাল পর্যন্ত সরকারিভাবে স্বীকৃত হোক বা না হোক, 'গোলাম—গামা—গোবর' নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, কুস্তি-জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করতে পারেন একমাত্র তাঁরাই। বিদেশীরাও মানসিক চেতনা দিয়ে অন্তরে অন্তরে ভারতীয় পালোয়ানদের এই তিনটি রত্নের 'শীর্ষস্থানাধিকার' স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

ঋতুদ্বয়

('Thomas Hardy'এর "The weather" কবিতার অনুবাদ।)

মণি দাশ

দোয়েল যেমন হাসি-খুশী আজি
এই ঋতুরে পেয়ে
বাদামের ফুল তো'ল এলোমেলো
বৃষ্টিধারায় নেয়ে।
(তাই) পাখীরা আজ পাখনা মেলেছে
আকাশ পানে ধেয়ে ॥
ধূসরবর্ণ ভারত পাখীর আনন্দ ফোয়ারা ছোটে
পথচারীরা সবাইখানায় একত্র হোয়ে জোটে।
রক্তিম-রঙিন দেশে মেয়েরা ;
প্রজাপতি সম ঘরে-ঘরে ফেরা।
সবুজ স্বপ্নে শহর বাসীর
মন হয় আনমন ;
সাগর পারের দক্ষিণ পশ্চিম
করিতে পরিভ্রমণ।

মেষ-পালকের পাগলকরা
রঙিন ঋতু এলো
গাছে গাছে শাখা প্রসারিয়া তারা
একে একে চলে গেলো।
স্নিগ্ধ-সবুজ ঘাসের কোলে
জল জমে এলোমেলো ॥
পাহাড়ী নদীর শব্দ আসে মৃদু কল্লোল গতি
প্রান্তর সীমা ভেঙ্গে দিয়ে ঢেউ হয়েছে যে মধুমতি।
জল বুদ্‌বুদ উচ্চশিরে
মুক্তোমালা জপে
নীড়ে থাকা যে বায়সের মত
প্রাণটিরে দিয়ে সঁপে।

ভারত আমার দেশ

নীহাররঞ্জন হালদার

এই ভারত আমার দেশ ;
এই ভারতে আমার জনম,
এই ভারতের মাটীতে মরণ,
এই ভারতের হৃদয়ের মাঝে
নাহি ত' হিংসা দ্বেষ।

হেথায় উদার আকাশের নীলে
রৌদ্রের খেলা—
চির-সুন্দর সবুজের বুকে
পুষ্পের মেলা ;
(হেথা) ধানভরা মাঠে, গঞ্জের হাটে
কৃষকের গুঞ্জন,
হেথায় যন্ত্র রাষ্ট্রশাসনে
আনেনি ত' বন্ধন ;

হেথা মানুষের ভাষা—
মূর্ত ক'রেছে আশা ;
হেথা ধর্মের, যতো কর্মের
নাহি ত' দ্বন্দ্ব লেশ ॥

এই ভারতের সতত প্রহরী
উত্তরে হিমালয়,—
আজ বুঝি কথা কয়,
বলে,—'গিরিপথে
এসেছে শত্রু,
কর হে যুদ্ধে শেষ ॥'
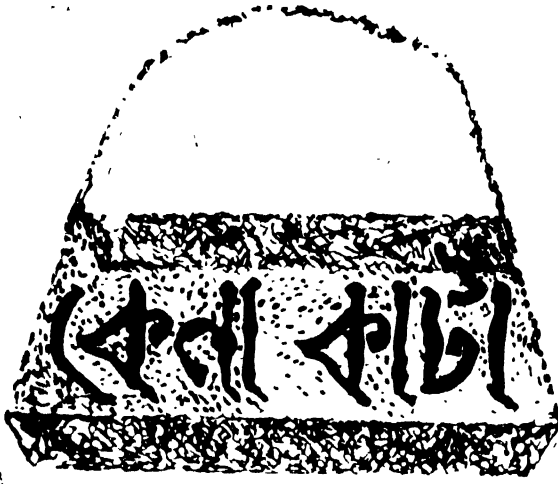
কাজের জগৎ—কয়েকটি কথা

মানুষ বেঁচে থাকতে চায় আর বাঁচবার জন্যে কোন না কোন কাজ করতেই হয় তাকে। বিলকুল বসে থেকে দিন কাটানো, ঠিক কয়জনের পক্ষে সম্ভব? সেজন্যে দেখা যায়—দুনিয়ার সর্বত্র দিনরাত কাজের চাকা ঘুরে চলেছে—বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কাজ। কল্পনার জগৎ থেকে কাজের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা—এ যতই বাস্তব, ততই বুঝি কঠিন।

কাজের জগতে কাজটিই হলো সবচেয়ে বড় কথা। যখন যে কাজটি যে-ভাবে হতে হবে, সেইটি সুসম্পন্ন করার লক্ষ্য না থাকলে নয়। সব মানুষই একই পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করবে, এমন দাবী অচল। পরন্ত সংসারে যত বিচিত্র ধরণের কাজ আছে, কর্মীও স্বভাবতঃই থাকবে সেইরূপ বিভিন্ন। কর্মক্ষেত্রে যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে পারবে, উন্নতির পথ তারই প্রশস্ত হয়, অক্ষমতা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতাকেই ডেকে আনে।

একটি জিনিস পরিষ্কার—যে কাজই করতে যাওয়া হউক, যে বৃত্তিই গ্রহণ করবার আগ্রহ থাকুক, সেই কাজের সম্যক্ উপযোগী করে তুলতে হবে নিজেকে। প্রত্যেক কর্মী মানুষের প্রধান মূলধন হওয়া চাই নিষ্ঠা ও উদ্যম। সুপারিশের জোরে ক্ষেত্র-বিশেষে কারো কারো উন্নতির সোপান খুলে যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত যোগ্যতার দাবীকে বোধ হয় দীর্ঘকাল চেপে রাখা চলে না। পুঁথিগত শিক্ষা ও হাতে-কলমে শিক্ষা—দুই-এরই গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে, আর তা অকুণ্ঠচিত্তে।

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, সুযোগ এলেও সকলের জীবনেই প্রত্যাশিত সফলতা জুটে না। অনেকে কাজ করতে যেয়েও পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়ে। কেন এমনটি হয়, এ বুঝবার-জানবার জন্যে খুব বেশিদূর যাবার প্রয়োজন হয় না। একটু নজর দিলেই দেখা যাবে, যারা ব্যর্থ হলো, অধিকাংশেরই পর্যাপ্ত যোগ্যতার অভাব। কর্মজীবনে ধাপে ধাপে সাফল্যের শীর্ষস্থানে পৌছল, সে-ও দেখতে পাওয়া যায়। যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য স্থানটি পেয়ে গেলে এমনটি হওয়া নিশ্চয়ই সহজতর। বিনা যোগ্যতায় সত্যি কতদূর আর এগিয়ে যাওয়া চলতে পারে?

উদ্যোগী পুরুষের কাছে লক্ষ্মী ধরা দিয়ে থাকে, এ একটি চলতি কথা। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য ও তাৎপর্যময়। কেন না, যার উদ্যোগ থাকবে, সাময়িক ব্যর্থতা তাকে কাবু করতে পারে না। কর্মজীবনে যেমন করেই হোক, যোগ্য স্থানটি তার খুঁজে পাওয়া চাই-ই। আর এক শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায়, যারা বেশিটা অদৃষ্টবাদী। সমাজ-ব্যবস্থাও এর জন্যে কম দায়ী নয় বটে, কিন্তু তবুও বলতে হবে, উদ্যমের অভাব হওয়া কোন ক্ষেত্রেই গ্রাহ্য নয়—এগিয়ে যাবার পক্ষে এটাই মস্ত বাধা। জীবন-সংগ্রামে সর্বরকম পরীক্ষার জন্যেই দেহ ও মনকে যথেষ্ট মজবুত রাখতে হবে।

মানুষের জীবনের লক্ষ্য সকলের ক্ষেত্রেই এক নয়। কেউ হয়তো অল্পেই তুষ্ট হলো, অনেক উঁচুতে উঠেও কারো বা থেকে গেলো অসন্তোষ। একজনের দৃষ্টিতে যেটা হয়তো সফলতা, অন্য দৃষ্টিতে তা-ই হয়তো ব্যর্থতা বলে গণ্য। মোটের ওপর, এগিয়ে যাবার দুরন্তপণা সব সময়েই থাকা দরকার আর সেই সঙ্গে বাড়িয়ে যাওয়া চাই আপন গুণ ও কর্মদক্ষতা। প্রত্যেক বৃত্তি বা পেশাতেই মানুষের বৈশিষ্ট্য দেখাবার সুযোগ থাকে। কাজেই অল্পে তুষ্ট হয়ে পড়তে হবে, এমন কোন কথা নেই কিংবা 'পারলাম না' বলে ভেঙ্গে পড়াও অবান্তর। উপযুক্ত কাজটি বাছাই করে নিয়ে যথোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে তা করতে পারলে, মূল্য মিলবেই, এই বিশ্বাস রাখা যায়।

কাজের জমিতে সর্বক্ষণ অফুরন্ত উদ্যম চাই কর্মী মানুষের। যে প্রকৃত উদ্যমশীল, শ্রান্তি কি জিনিষ, তার জানা থাকে না। এই শ্রেণীর কর্মীদের চরিত্রে আরো কয়েকটি বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। তারা বিপদে মুশড়ে পড়ে না, কাজ করার আনন্দ পেয়ে থাকে তারা ব্যর্থতার মধ্যেও; প্রাণ-শক্তি বা উদ্যম যাদের থাকলো না, তাঁদের কাছ থেকে কাজের আশা স্বতঃই বৃথা।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, নিষ্ঠা, উদ্যম ও অগ্রগণিতাই হচ্ছে মানুষের উন্নতির প্রধান সম্বল। বসে বসে শুধু-এটা-ওটা ভাবলেই আমাদের অর্থোপায় হয়ে যেতে পারে না; বাস্তব জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ, মেলামেশা ও ভালো ব্যবহার-কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্যে এ সকলও অবশ্য চাই। দায়িত্ব সম্পর্কে সব সময় সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে, পদস্থ যাঁরা থাকবেন, দোষ ক্রটি ধরবার অবকাশ যেন তাঁরা না পান। কাজের লোক বলে যাকে প্রমাণ দিতে হবে, কাজের আগ্রহটুকু থাকলেই শুধু তার চলবে না, কাজটি তৎপরতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করবার বিশেষ গুণটিও থাকতে হবে তার। কাজের জগতে এলে কর্মানুরাগ ও কর্মকুশলতারই দাম, এটা ঠিক।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কর্মসংস্থান বেড়ে গেছে বিপুল হারে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বেকার সমস্যা আর নেই। এক্ষেত্রে যে-টি বলতে যাওয়া হচ্ছে, স্কুল-কলেজ বা কারিগরী বিদ্যালয়ে শিক্ষা যেমনি শেষ হলো, কর্মপ্রার্থী যুবকের সামনে আগের তুলনায় আজ কাজের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। কতকগুলো কাজ এখনও অবশ্যি ধরাধরির ভেতর দিয়েই হতে দেখা যায়। তবে পর্যাপ্ত যোগ্যতা থাকলে, প্রথম সাক্ষাৎকারেই উৎসাহ ও তৎপরতা দেখাতে পারলে সংগ্রহকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন থাকলে কাজ না দিয়ে পারেন না। যে-কাজটি করতে যাওয়া হবে, যোগ্যতার পরিমাপ তার অধিক যদি থাকলো, আরও ভাল।

প্রত্যেক কাজেই পর্যাপ্ত দক্ষতা প্রদর্শন করতে হলে প্রাথমিক ট্রেনিং চাই। শিক্ষানবীশ থাকার ব্যবস্থাটা অপ্রয়োজনীয় বলা চলে না। কাজের প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীর সম্যক পরিচিতি থাকা দরকার। কাজটি সরলীকরণ ও বিজ্ঞানসম্মত কি ভাবে করা চলে, সে-উপায়ও খুঁজে পেতে হবে। কাজের জগতে যে-যে লাইনই গ্রহণ করুক না কেন, সেই লাইনে সাফল্য ও উন্নতির জন্যে আগ্রহ ও উদ্যমের এতটুকু অভাব ঘটলে চলবে না।

বক্তা যিনি হবেন

বক্তৃতা একটি মস্ত আর্ট বলা চলে, যার জন্যে সকলেই বক্তা হতে পারে না। বক্তা হবার জন্যে ট্রেনিং যেমন চাই, তেমনি চাই একটা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ। দেশকর্মী বা রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা নেশার মতো হয়ে যায়, শেষ অবধি নেশা পেশায় পরিণত হয়।

কিন্তু কথা হলো—সাধারণ দৃষ্টিতে বক্তা কে নয়? কথা বেচার ওপরই কতো কতো লোকের জীবিকা নির্ভব করছে। যাদুকরের যাদুর যে ভেদ্ধি, সে-ও আসলে কথার। সেলসম্যানকেও প্রধানতঃ কথা বেচেই জীবিকা অর্জন করতে হয়। শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, ব্যারিষ্টার—সকলেরই বক্তৃতা বা কথার চাতুর্যই বড় মূলধন। রাজনীতিকদের কথা গোড়াতেই বলা হলো, তাদের তো কথা না বিকালে হবেই না। পরন্তু এঁদের বলা যেতে পারে পেশাদার বক্তা।

শেষোক্ত পর্যায়ে বক্তারা আইনসভার ভিতরেও থাকতে পারেন কিংবা বাইরে। ভিতরে বাইরে বক্তৃতার ধারা একই রকম হতে পারে না, হলে চলবে না। সেজন্যে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, মেঠো বক্তৃতায় যিনি পারদর্শী, আইনসভার অভ্যন্তরে বক্তা হিসাবে তিনি ব্যর্থ। আবার, উল্টোদিক থেকেও বলা চলে—আইনসভার ভিতরকার জোরদার বক্তা বাইরের জনসভায় বক্তা হিসাবে তেমন শক্তিমান হয়ত নয়।

প্রকৃত বক্তা বা বাগ্মী যিনি হতে চাইবেন, অল্প বয়স থেকেই তাঁকে সে দিকে লক্ষ্য রেখে বক্তৃতার মহড়া দিতে হবে। ভাবী পার্লামেন্টারিয়ান বা আইনসভা সদস্য এই দিকটায় বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন, এ দাবী কিছুমাত্র অতিরিক্ত নয়। স্কুল-কলেজে থাকতেই বক্তৃতার অভ্যাস করা ভালো—বিতর্ক অনুষ্ঠানাদিতে যোগদানের মারফৎ সাহস, বলবার ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা এ সমস্ত বাড়িয়ে নেওয়া সমীচীন। মাইকের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ানোটাই প্রথম বড় জিনিস, তারপর চাই গলার জোর, সময়োপযোগী চিত্তাকর্ষক সুমিষ্ট ভাষণ। অযৌক্তিক বা অবান্তর কথা যতদূর সম্ভব বর্জন করতে হবে, নিজেকে জাহির করার মনোভাব যেন পেয়ে না বসতে চায়।

যে-জিনিসটি আগেও বলতে চাওয়া হলো—মাঠের বক্তৃতা আর সংসদের ভেতরের বক্তৃতা একই ধারায় হতে পারে না। একজন নেতা বাইরে জনগণকে মাতিয়ে ভুলতে বক্তৃতার ঝড় তুলতে পারেন, কিন্তু তিনিই যখন আইনসভায়, সে-সময় বক্তৃতায় অনেক হুঁসিয়ার, বিপক্ষকে নির্বাক করবার জন্যে যুক্তি হাজির করতে সমধিক তৎপর। মাঠে-ময়দানে অনেক সময় যদৃচ্ছা বক্তৃতা দেওয়া চলে, শ্রোতারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে না বুঝলে দীর্ঘস্থায়ী ভাষণেও আপত্তি নেই। কিন্তু আইনসভা বা সংসদে বিধি অনুযায়ী কাজ হবে—নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর বক্তৃতা বা বক্তব্য শেষ না হলেই নয়।

এমনও দেখা যায় যে, কোনকালে কোথাও বিতর্ক বক্তৃতা করেননি, নির্বাচনে জয়লাভ করে সবে হয়তো আইনসভায় ঢুকে পড়েছেন। এই শ্রেণীর জনপ্রতিনিধির প্রথমটায় কিছু পরিমাণে হলেও অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক—তাঁদের বক্তার পর্যায়ে পৌছতে একটু সময় নিতে পারে বৈ কি! আবার এ-ও অবশ্য ঠিক, দীর্ঘদিন ধরে আইনসভায় থেকেও হয়ত কতক সদস্য বক্তা পদবাচ্য হতে পারেননি। এ না হওয়ার পিছনে কারণ থাকতে পারে একাধিক। সুবক্তা হবার দাবী রাখলে পর্যাপ্ত শিক্ষা ও আইনজ্ঞান থাকাও অত্যাবশ্যক বলা চলে।

যে-কোন জনসমাবেশে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে, শ্রোতৃমণ্ডলী এক-দুইজন বক্তার বক্তৃতা শুনবার জন্য ব্যাকুল। বুঝতে হবে বক্তা হিসাবে সেই জনকতক বিশেষ ব্যক্তির দক্ষতা অর্জিত হয়েছে, বক্তৃতা করে তার মূল্য পেতে তাদের আটকাবে না। কর্মজীবনে সাফল্য ও উন্নতির জন্যে তাঁরা তাঁদের এই আর্টটি নিশ্চয়ই কাজে লাগাতে পারবেন। বলা বাহুল্য পর পর অভ্যাসের দ্বারা বক্তৃতার শক্তি বা বাগ্মিতা তুলনায় বেড়ে চলবেই।

বক্তৃতা আবার দুই ধারায় দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে—লিখিত ভাষণ আর অলিখিত ভাষণ। লিখিত ভাষণে বক্তৃতাশৈলী দেখবার অবকাশ প্রায় থাকে না, অলিখিত ভাষণ বা বক্তৃতাতেই বক্তার কৃতিত্ব ধরা পড়ে। বক্তৃতার স্বতঃস্ফূর্ততা ও সাবলীলত্বের ওপরই বক্তার সুনাম নির্ভর করে থাকে বেশিটা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাবা বা যুক্তি খুঁজে পাবার জন্যে হাতড়াতে গেলেই বিপদ—ছন্দ ও তালরক্ষা করে যেখানে জোর যতটা দেওয়া আবশ্যক জোর দিয়ে ভাষণ দিলে সকল বক্তার পরিচিতি না মিলে পারে না।

সর্বোপরি যে জিনিসটি অপরিহার্যভাবে চাই, সেটা হচ্ছে—যে বিষয়ে বলতে হবে, সেই সম্পর্কে বক্তার যতদূর সম্ভব ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কোন প্রশ্ন উঠলে সদুত্তর দিতে যেন বিলম্ব না ঘটে, সেদিকে সতর্কতা না নিলে চলবে না।

আকরিক লৌহ ও ভারত

আজকের দিনে লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে যে-দেশ যত বেশী সমৃদ্ধ, সেই অনুপাতে সে-দেশ অগ্রগামী, এমনি একটি দাবী রাখা হয়। স্বাধীনোত্তর ভারতও এদিকে এগিয়ে যাবার জন্যে তৎপরতা দেখাচ্ছে, যার জন্যে একাধিক ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছে এরই ভিতর।

উচ্চমানের খনিজ বা আকরিক লৌহের অভাব কিন্তু ভারতে নেই; বরং এখানে ঐরূপ মানসম্পন্ন লৌহ যে পরিমিত আছে বলে সন্ধান হয়েছে, বিশ্বের অন্য যে-কোন স্থানে তা বিরল। ভারতের খনিসমূহে সঞ্চিত আলোচ্য শ্রেণীর লৌহের পরিমাণই হবে দুই সহস্রাধিক কোটি টন। এ ছাড়া, অন্যান্য শ্রেণীর লৌহও জমা আছে এখানে প্রচুর।

কিন্তু, খনিগর্ভে সম্পদ জমা থাকলেই হলো না, সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে উত্তোলনই বড় কথা। আকরিক লৌহ যত অধিক উত্তোলনের ব্যবস্থা করা যাবে, আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো ছাড়াও বাইরে রপ্তানী বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে সেই অনুপাতেই। আর রপ্তানী বাড়ানো অর্থ বেশী পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বর্তমানে ভারতের যা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

ভারতীয় আকরিক বা খনিজ লৌহশিল্পের বিদেশে বরাবরই ভালো বাজার রয়েছে। জাপান, জার্মাণী, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালি, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া প্রভৃতি নানাদেশে এখান থেকে লৌহ রপ্তানী হয়ে যায়। একটি সরকারী হিসাব: ১৯৬১ সালে আকরিক লৌহ-পিণ্ড বহির্ভারতে কাটতি হয় ৩০ লক্ষ ৮৭ হাজার টন। অপর দিকে বিগতবর্ষে (১৯৬২) বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ আমদানী করেছে প্রায় ৩৫ লক্ষ টন ভারতীয় লৌহ, যার মূল্য ১৮ কোটি টাকার কম হবে না। মোটের ওপর, এই খনিজ সম্পদের রপ্তানীর পরিমাণ দিন দিন বাড়ছেই বড় ছোট এবং লৌহপিণ্ড উত্তোলন করা আর তা বহন করে নেবার সমধিক সুব্যবস্থা হলে, বাজার আরও সম্প্রসারিত হবে, এ নিশ্চয়।

শম্পার জবানবন্দি

শিপ্রা দত্ত

শম্পা নিজের ভুলের মাশুল ব'য়ে চলেছে সারা জীবন ধ'রে। যে জীবন তার হতে পারতো সরল, সুন্দর, তা হ'লো য়, অসহনীয়।

শম্পার সঙ্গে কাবেরীর পরিচয় বিদ্যালয়ের প্রথম সোপান হ'তে। ধনী, অভিজাত বংশের সরলা, চঞ্চলা বালিকা শম্পা। শম্পার ঠাকুরদা সেই যুগের বৃটিশ শাসকের একান্ত অনুগত ভৃত্য। দেবপূজার পরিবর্ত্তে তিনি ত্রিসন্ধ্যা বিদেশী কর্ত্তাদের পূজা করতেন। ঐ কারণে দেবতার কৃপাবৃষ্টির নিদর্শন স্বরূপ খেতাবও একটি পেয়েছিলেন। স্বপ্নলব্ধ আশীর্ব্বাদের মত তা তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে গেঁথে রেখেছিলেন তাঁর নামের অগ্রভাগে। নিয়তির পরিহাসের মতই সেই পরম ভক্তের গৃহে এল এক উগ্র বিপ্লবী। ইনি ছিলেন শম্পার দিদি। শম্পার দিদি ইলাহীর পূজারী। শম্পার দিদি পম্পার ইমানের একমাত্র ঈশাদী—তাদের ঠাকুরমা। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বাড়ীর সবাই জাগবার আগে, পম্পা ঠাকুরমার সঙ্গে স্নান সেরে দেবপূজা করতো। গৃহকর্ম্ম, পড়াশুনা, খেলাধূলা সব কিছুতেই পম্পা আদর্শস্থানীয়া। কিন্তু সেই পম্পার সরল মনে যে বিদ্রোহের তুষানল জ্বলছিল—এ খবর বাড়ীর কারো কাছেই পৌঁছায় নাই—যতক্ষণ না পম্পা বিদেশী শাসক হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার হলো। পম্পার বিচার হলো এবং সেই গুরুতর অপরাধে চরম দণ্ড সে পেলো। পম্পার ফাঁসি হলো। একটি সুন্দর নিষ্পাপ নবীন জীবন আতসবাজির মত দমকে জ্বলে উঠে অল্পতেই নিভে গেল। আদরের নাতনীর এতটা বিশ্বাসঘাতকতা পম্পার ঠাকুরদাও বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনিও অচিরে নাতনীর অনুগমন করলেন।

শম্পাদের সুখের সমৃদ্ধির সংসার ধ্বসে গেলো। শাসক জাতির রক্ত ক্ষালনের জন্য পম্পার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হলো না। সমস্ত পরিবারের গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগল। তাদের সমস্ত ধনদৌলত সরকার বাজেয়াপ্ত করলো—পরে একেবারে গ্রাস করে বসলো। অপার অন্ধকার নেবে এলো শম্পাদের পরিবারে। প্রচণ্ড বাত্যা-তাড়িত শুক্‌নো পাতার মত শম্পাদের পরিবারের এক একজন গৃহচ্যুত লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয়ে নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। শম্পারা ঠাঁই নিল তাদের পিসীর একটি ছোট ঘরে।

মা ষষ্ঠীর কৃপায় শম্পারা ভাইবোনে বেশ কয়জন ছিল। শম্পার বাবা সামান্য বেতনের একটা কাজ কোন রকমে জুটিয়ে নিলেন এবং অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হতে থাকলো। বনস্পতির মত ঠাকুরমার ছায়ায় রয়েছে শম্পারা। আঘাতের প্রচণ্ডাঘাতেও ঠাকুরমার পাহাড়ের মত ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গেনি। তখনও অপরিসীম ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মে আস্থা ছিল বৃদ্ধা ঠাকুরমার। দেহে ও মনে প্রচুর বল সঞ্চয় করেছিলেন তিনি। নতুবা এই হেন প্রচণ্ড ভাগ্য বিপর্য্যয় সহ্য করে—দুর্ব্বার সমুদ্রে হাল ধরে থাকা সম্ভব হ'ত না।

কাবেরী ও শম্পার মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য কিছুই ছিল না। পরন্তু কাবেরী মুখচোরা—শম্পা প্রগলভা। কাবেরী ধীর, স্থির—শম্পা হরিণ-শিশুর মত চঞ্চলা, চপলা। তবু দোঁহের মধ্যে দানা বেঁধে ছিল অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের বীজে। শরতের স্বচ্ছ মেঘখণ্ডের মত ছিল দুজনার মন। শম্পা বলতো—'ঠাকুরমা বলেন, প্রত্যেক জীবে ভগবান আছেন।' শম্পা মন প্রাণ দিয়ে এ উক্তি বিশ্বাস করতো। তাই স্কুলে যাবার পথে যত দেবালয়, পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু তার চোখে পড়তো—অজ্ঞাতেই তাদের উদ্দেশ্যে তার মাথা আপনা হতে নত হতো। আকাশে বিচরমান চিল, শকুনির প্রতিও শম্পার হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত হতো। তাছাড়া আজ ইতুপূজা, কাল মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, লক্ষ্মীপূজা, শনিপূজা বা অন্য কোন পূজা। নিত্য নূতন পূজার খেলায় কেটেছে শম্পার শৈশব ও কৈশোর। নানা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য রোজ শম্পা কাবেরীকে শোনাত। সেও নীরবে পরম আগ্রহে এই সব অলৌকিক কাহিনী শুনতে শুনতে কল্পনায় চলে যেতো কোন অমরাবতীর রাজ্যে। শম্পা শুনিয়েছে—কাবেরী শুনেছে।

শম্পার জীবনপটে তারপর দেখা দিল এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন। কাবেরীর হল টাইফয়েড। বেশ কিছুকাল শম্পার খবর পায়নি কাবেরী। তার রোগশয্যায় শম্পাকে কাছে পায়নি কাবেরী। শম্পা জীবনের উদ্দামতা নিয়ে ছুটে চলেছে। একের অভাবে তার জীবনের উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে পড়েনি। তাই রোগমুক্ত হয়ে কাবেরী দেখে শম্পা ভীড়েছে এমন একটি মেয়ের দলে—যাদের জীবন সহজ নয়—নির্ম্মল নয়। শম্পার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাবেরী শিউরে উঠেছে। যদি তার সরল মনে গরলের বাসা হয়। শম্পাকে সাবধান করে দিল কাবেরী। ভেসে যাওয়া আবর্জ্জনাকে যেমন স্রোতের বিপরীত দিকে টেনে রাখা যায় না—তেমনি শম্পাকেও ঐ ক্লেদাক্ত পরিবেশ হতে সরিয়ে আনতে পারা গেল না। বিরক্ত হয়ে কাবেরী

সরে এসেছে।—অন্তরা পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে ছিল ব্যস্ত। অন্ত সাথীরা এসে কাবেরীকে জানিয়ে যেতো—কেমন করে আপন আবর্ত্তে শম্পা আবিল হয়ে পড়েছে। জীবনযাত্রার আপাতমধুর স্রোতে যে একবার গা ঢেলে দিয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার যে মনোবল দরকার তা' শম্পার দিদি পম্পার ছিল। কিন্তু শম্পার ছিল না। তাই শম্পা ভেসে চলেছে দুর্নিবার স্রোতে। শম্পার চলেছে প্রেমের লীলা। প্রেম এ নয়। এ বয়ঃসন্ধিক্ষণের স্বাভাবিক চঞ্চলতা।

শম্পার প্রণয়ী পাড়ার ছেলে। কাবেরীর পরিচিত। তাই কাবেরী বুঝেছিল শম্পা ভুল পথে চলেছে। আঘাত খেয়ে সে অচিরেই ঘুরে আসবে। শম্পাকে ফিরতেই হলো। কিন্তু অনেক কিছু হারিয়ে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ার অপরাধে ও চারিত্রিক দোষে শম্পাকে বাধ্য হয়ে স্কুল হতে অশ্রুসিক্ত নেত্রে বিদায় নিতে হলো। এখান থেকে শম্পার জীবনের ট্রাজেডির বীজ বোনা হলো।

নতুন বন্ধুর ভীড়ে শম্পা কাবেরীর স্মৃতি হতে মুছে গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন এক সহপাঠী জানালো শম্পা হতাশ প্রেমিকা হয়ে বর্ত্তমান স্বামী পারিজাতানন্দর শিষ্যা হয়েছে। রাতদিন স্বামিজীর সেবাযত্নে মেতেছে। প্রেমের দরজায় আঘাত পেয়ে—স্বামিজীতে ভক্তি গেছে। কাবেরীর কাছে সত্যিই এ সুসংবাদ। কাবেরী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। কিন্তু এ সুসংবাদ ক্ষণস্থায়ী হলো। কারণ কাবেরী শুনতে পেলো শম্পার স্বামিজীকে পাড়া প্রতিবেশী আবিষ্কার করে ফেলেছে। ফলে তাকে "যঃ পলায়তি স জীবতি" পন্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। শম্পার জন্ত কাবেরীর দুঃখ হলো। শম্পার নরম প্রাণে চরম আঘাত লেগেছে।

কালের স্রোতে আরও কয়েকটা বছর পেরিয়ে গেল। একদিন শোনা গেল শম্পা আবার নতুন করে প্রেমের সায়রে ডুব দিয়েছে। এবারের প্রেমিক শম্পাদের প্রতিবেশী প্রশান্ত। প্রশান্ত যদিও চেহারায় শ্রীহীন কিন্তু তার শিক্ষা, সংস্কৃতি তাকে করেছিল শ্রী-যুক্ত। প্রশান্ত ছিল জাতে নীচু। কাবেরী জানে শম্পার ঠাকুরমা কখনই তাঁর জীবিতাবস্থায় এ অনাচার সহ্য করবেন না। নানাজন এসে প্রশান্তর প্রেম-সলিলে শম্পার ডুব দেওয়ার নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনায় কাবেরীকে। শুনে যায় কাবেরী। মন্তব্য করা নিরর্থক জানে। কারণ যে উচ্ছৃঙ্খলতার ঢেউ বয়ে চলেছে শম্পার জীবন-নদীতে—একটা গুরুতর আঘাত না পেলে এ উদ্দামতার অবসান হবে না। কাবেরী তখন বিদ্যালয়ের গণ্ডী ছেড়ে—মহাবিদ্যালয়ের নতুন সঙ্গী সাথী—নতুন শিক্ষা—নতুন পরিবেশে নিজেকে সাজাতে ব্যস্ত। শম্পার কাহিনী মাঝে মাঝে তার মনে বিরক্তি জন্মায়। কেন সে মূঢ়ের মত এমনি ভাবে ব্যর্থতার আবর্ত্তে জীবনটা নষ্ট করছে? কখন তার দুর্ব্বলচিত্তের জন্ত ব্যথিত হয়ে ওঠে কাবেরীর সমস্ত মন। মনে হয়—ঠিক পথের সন্ধান দিয়ে কেউ যদি গুরুমশায়ের লাঠি হাতে সারাজীবন শম্পাকে চালাতে পারতো—তবে হয়ত শম্পা পরিবারে, সমাজে, দেশের মধ্যে একটি রত্ন হয়ে উঠতে
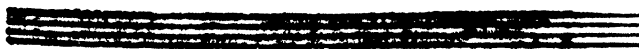
পারতো। কিন্তু সেই দৃঢ় মুষ্টির অভাবে শম্পা ভেসে চলেছে নানা ঘাটে—প্রতিহত হয়ে ফিরে যায় বারে বারে।

জীবনের অনেকগুলি অধ্যায় কাবেরীর শেষ হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন সে শুনলো শম্পা এক মুসলমান ভদ্রলোককে বিয়ে করেছে। শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল কাবেরী। নিষ্ঠাবতী, ধার্ম্মিক শম্পার এই কি পরিণতি! কেন শম্পার ভিন্ন ধর্ম্মে অভিরুচি হলো, বার বার এই প্রশ্ন করেছে নিজের মনকে কাবেরী। ভিন্নধর্ম্মে বিবাহে সুখ, শান্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় না। কারণ দুই ধর্ম্মের দৃষ্টি, আদর্শ, সংস্কৃতি এমনই বিভিন্ন। যদিও সব ধর্ম্মই এক, তবু বাহ্যিক চোখে ধর্ম্মের ভেদাভেদ একটা উচ্চ প্রাকার গড়ে তুলেছে যে, এই গগনস্পর্শী অসামঞ্জস্যের গণ্ডী অতিক্রম করে একে অন্যের কাছে একীভূত হতে পারে না। তবু লোকে ভুল করে দুঃখ পায়।

বিভালয় ত্যাগের পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে শম্পার সঙ্গে কাবেরীর আর দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি। পাঠ্যজীবনে যবনিকা টেনে কর্ম্মজীবনের তোরণে প্রবেশ করেছে কাবেরী। শৈশব, কৈশোর, যৌবনের অনেক স্মৃতি মুছে গেছে। নতুন স্মৃতিতে খোদাই হচ্ছে তার মনমুকুর। বিভালয়—মহাবিভালয়ের যে কয়েকটি ছায়া ক্ষণেকের জন্য কাবেরীর পথে আলোর রশ্মি ঢেকে দিয়েছিল—তারাও আজ মিলিয়ে গেছে। নতুন কর্ম্মজীবনে নতুন উদ্যমে নতুন উৎসাহের জোয়ারে কাবেরী তখন ভেসে বেড়াচ্ছে। আদর্শের গগনকুসুম তখনও চোখে আঁটা। ক্রুর বাস্তবের কঠিন সংঘাতে তখনও আদর্শের নবীনতা মুছে যায়নি। আদর্শের ভেলায় কর্ম্মের দাঁড় টেনে ছুটে চলেছে কাবেরী কোন উজান পথে।

অধ্যাপনা জীবনের মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নেওয়া যায় হারিয়ে যাওয়া কর্ম্মশক্তি, উৎসাহ ও উদ্যম। ছুটিতে ছুটিতে কলকাতায় আসে কাবেরী। ছুটির দিনগুলি তখন যেন পাখীর ডানায় ভর করে হাওয়ায় উড়ে যায়। এমনি এক দিনে কাবেরীর মেজদি এসে জানালেন শম্পার সঙ্গে পথে তাঁর দেখা। শম্পা পরের দিন বিকেলে স্বামী-সন্তানসহ কাবেরীর সঙ্গে দেখা করতে আসবে জানিয়েছে। কাবেরীর মন শম্পার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তাই সে বলল—"কিন্তু মেজদি, তুমি তো জান শম্পার আদর্শের সঙ্গে আমার আদর্শের সংঘাত ঘটবে। পুরাণোকে ঝালিয়ে নতুন রং না চড়ান কি শ্রেয়ঃ নয়?" ধমক দিয়ে মেজদি উত্তর দিয়েছিলেন "তোর আদর্শের সৌধ শম্পার সাময়িক সঙ্গতায় ধ্বসে পড়বে না। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে যেয়েও—যে তার আদর্শকে টিকিয়ে রাখতে পারে—সেটাই যথার্থ আদর্শ। শম্পার মন আজ কিসের আশায় তোর কাছে ছুটে আসতে চাইছে—তুই যদি বাধা দিস্—সেটাই কি তোর প্রকৃত আদর্শ রক্ষা হবে? হয়ত তার নিভৃত মনের কি ব্যথা আজ তোর কাছে ব্যক্ত করার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

এই অকাট্য যুক্তির প্রতিবাদ সম্ভব নয়। তাই সেদিনের জন্য নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করে কাবেরী। যথা সময়ে শম্পা তার স্বামী ও দু'টী সন্তান সহ এসেছিল কেতকীদের বাসায়। চিরন্তন প্রগলভা শম্পা যেন ঝর্ণার মত কলকল্ রবে দীর্ঘ বিচ্ছেদের এই ফাঁকটুকু ঢেকে দিতে মুখর হয়ে উঠেছিল। কাবেরী নীরবে অতি সংক্ষেপে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছিল। জাফর সাহেব একবার মুখ তুলে বলেছিলেন—উভয়ের প্রকৃতিগত ও চারিত্রিক বৈষম্য লক্ষ্য করে—"তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব কি করে সম্ভব হয়েছিল" কাবেরীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল "আপনার সঙ্গে যদিও দীর্ঘকাল পর শম্পার দেখা, তবু আপনার গল্প সে আমার কাছে এত করেছে যে—আপনি আর আমার অপরিচিতা নন্। শৈশবের স্মৃতি শম্পা মন হতে মুছে ফেলে দিতে পারেনি। তাই আপনাকে পেয়ে সে যেন আবার সেই হারানো শৈশবে ফিরে এসেছে।"

সত্য কি—তা বোধগম্য সেদিন হলো না। শৈশবের টুকরা স্মৃতিই কি শম্পাকে সেদিন এত প্রগলভা করেছে অথবা অন্য কিছু? শুধু কাবেরীর কাছে নয়। সবারই সঙ্গে শম্পা যেন আগের সেই সহজ সম্পর্কটা গড়ে নিতে ব্যস্ত। কিন্তু সবার মাঝখানে জাফর সাহেব যে প্রাচীর তুলেছিলেন, সেই জিজ্ঞাসা-চিহ্নের উত্তর তখনও কেও পায়নি। তাই শম্পা সম্বন্ধে তাদের যে কৌতূহল ছিল—তা যেন আরও বেড়ে গেল। যাবার সময় শম্পা বলে গেল "কাবেরী, তোর সঙ্গে আমার কোন কথাই হয়নি। কাল আবার আসবো দুপুরে।"

পরদিন বেলা দশটার সময় এলো। আজকের শম্পা ও কালকের শম্পার মধ্যে কতই না প্রভেদ। কালকের শম্পার মধ্যে যে উচ্ছাসের বন্যা বয়ে ছিল—আজ যেন সে অনেকটা স্তিমিত। দ্বিপ্রাহরিক আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শম্পা নানা হাল্কা কথায় তার সঙ্কোচ ও জড়তা কাটাতে চেষ্টা করেছিল। আহারান্তে কাবেরীই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলো—"শম্পা তুই কী সুখী হয়েছিস?"

"তোর কাছে আজ আমি কিছুই লুকাবো না বলেই এসেছি। যে জগদ্দল পাথরের বোঝা একা বইতে পারছি না—কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে বলতেও পারছি না— তা আজ তোর কাছে প্রকাশ করবো। আজ একটা কথা স্বীকার করতে আমার কোন সঙ্কোচ নেই যে—কাবেরী, তুই-ই যথার্থ আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলি। তাই আমার উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণামের আশঙ্কায় তুই শিউরে বার বার আমার মুখে বলগা পরাতে চেষ্টা করেছিলি। যখন আমাকে ফেরাতে পারলি না—তখন নিজেই আমার পথ হতে সরে দাঁড়ালি।

কুবন্ধু জুটেছিল অনেক। যাদের প্রশ্রয়ে—যাদের সঙ্গ যথার্থই আমাকে বিপথে টেনে এনেছে। যদিও তোর সব খবরাখবরই আমি দূর থেকে রেখেছি—কিন্তু লজ্জায় তোর সামনে আসতে পারিনি। কিন্তু তুই বোধ হয় আমার কোন খবরই জানিস্ না। আজ সে সব জানাতেই এসেছি।

কৃষ্ণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় দূরে সরে গিয়েছিলি। পুষ্পমাল্য ভ্রমে আমি কৃষ্ণার দাদার মত কালসাপের কবলে পড়েছিলাম। উঃ কি প্রতারক দুশ্চরিত্র ছেলে অয়ন! আজ অয়নকে বিয়ে না করে জাফরকে বিয়ে করায় আমি দুঃখিত নই। কেবল জাফর বিধর্ম্মী। নতুবা এত বছরের মধ্যে তার আর কোন দোষ ত্রুটি আমি খুঁজে পাইনি।

প্রশান্তদার খবরও বোধহয় তোর কাছে গোপন নেই। প্রশান্তদার মত ছেলে খুব কমই হয়। বেচারীর একটিমাত্র ত্রুটি ছিল—সে জাতে ছোট। এজন্য আমাদের বাড়ীতে সে নানাভাবে অপমানিত হয়েছে। নিজের পরিবারেও আমার জন্য তার গঞ্জনার শেষ ছিল না। কারণ দিদি পম্পার জন্য আমাদের পরিবারের মেয়েদের সাধারণ পরিবারের সবাই উল্কা মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল—এই উল্কা যে পরিবারে ঢুকবে—সেই পরিবারকে ছারখার করে দেবে।

প্রশান্তদা মুখ বুজে সবার সব অপমান, লাঞ্ছনা, সহ্য করেছে—বিনা প্রতিবাদে।

প্রশান্তদার সঙ্গে আন্তরিকতা যখন গভীর হয়ে উঠলো—ঠিক সেই সময়ে সুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। পরিবারের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা সবাই কলকাতায় এসে চাকরীতে ঢুকলাম, পড়াশুনার আমার তার আগেই ইতি পড়েছিল। আমাদের পাশের বাসায় থাকতেন তপনদা। তপনদার বোন মায়া আমার সঙ্গে রেশনিং অফিসে একই সেকসনে চাকরী করতো। তপনদা ডাক্তার। এখানেও মায়ার মাধ্যমে তপনদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল আমার। আমার মনে কখনও কিছু গভীরভাবে দাগ কাটে না। তারই বিষময় পরিণতিতে আজ আমি জর্জরিত। প্রশান্তদা তার মার্চেন্ট অফিসের চাকরী ছেড়ে—সংসারের সবার দায়িত্ব ছেড়ে কলকাতায় আসতে পারেনি। প্রথম প্রথম আমার চিঠি সে পেয়েছে। আস্তে আস্তে তা বন্ধ করে দিই। একদিকে প্রশান্তদা—অন্যদিকে তপনদা। দুই নৌকায় পা দিয়ে আমি দোল খাচ্ছিলাম। কিন্তু তপনদারই অবশেষে জয় হলো। তার রূপ, পেশা, তদুপরি তার সঙ্গ আমায় কি যেন এক মোহে আকৃষ্ট করেছিল। প্রশান্তদা মন হতে মুছে গেল। কিছুকাল পরে খবর পেলাম প্রশান্তদা মারা গেছেন। কিভাবে প্রশান্তদার মৃত্যু হয়—জানি না আজও। কারণ প্রশান্তদার মৃত্যুসংবাদে নিজেকেই দোষী মনে হয়েছে বারে বারে। কিন্তু এই মৃত্যুও আমাকে শোধরাতে পারেনি। এমন সময় তপনদাও চলে গেলেন যুদ্ধের ডাক্তারের পদে। কথা দিয়ে গেলেন—ফিরে এসে তিনি আমাকে বিয়ে করবেন।

তপনদার চিঠি আসে নিয়মিত। কেবল চিঠি নয়; আমার নামে তপনদা মাসে মাসে টাকা জমা দিচ্ছেন। তপনদার যদি যুদ্ধে মৃত্যু ঘটে—তবে তার অবর্ত্তমানে তার সব টাকার অধিকারী আমিই হবো। এমন ব্যবস্থা তিনি করেছেন—জানিয়েছেন। তপনদাও দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। মন আমার হাঁপিয়ে উঠলো। এমন সময় পরিচয় হয় জাফর সাহেবের সঙ্গে।

জাফর সাহেব আমার সেকসনের ইনচার্জ হয়ে আসেন। জাফর সাহেবের গাম্ভীর্য, মার্জিত রুচি, নম্র স্বভাব আমাকে আকৃষ্ট করে। আমিই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। ধর্মের প্রাচীরের কথা তিনি ভোলেননি—তাই তিনি দূরত্ব রেখে চলতে চাইতেন। কিন্তু আমিই তা হতে দিইনি। জাফর সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার মূলে ছিল আমার ছুটো জিদ্। মায়া একদিন আমাকে কটাক্ষ করে জানায় তার দাদাকে সে এই ঘনিষ্ঠতার কথা জানিয়ে দেবে। তুই তো জানিস কাবেরী, আমাকে কেও কিছু করতে বারণ করলে—জিদ্ আমার বেড়ে যেতো। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাছাড়া মাঝে মাঝে মনে হতো আমার আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহারেই বোধহয় এমন ভাবে প্রশান্তদা আঘাত পেয়ে মারা গেছেন। যদিও আজ জানি তা নয়। আমার ব্যবহারেই মর্ম্মাহত হয়ে সে চলে গেছে। তাই বাড়ীর এই মিথ্যে সংস্কার ভাঙ্গবার জন্য যেন উঠে পড়ে লাগলাম। বাবা তখন ষ্ট্রোকে শয্যাশায়ী। আমাদের ভাই-বোনের সমন্বয় আয়ে পরিবার চলছে! বল্গাহারা ঘোড়ার মত আমার যৌবনের উদ্দামতায় আমি ছুটে চলেছি।

জাফর সাহেব একদিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন বাবার কাছে। এমন কি, তিনি ধর্মান্তরিত হতেও রাজী হয়েছিলেন আমাকে গ্রহণ করতে। এই প্রস্তাবেই বোধ হয় বাবার দ্বিতীয় ষ্ট্রোক হয়। তখন আমি কি এক আবেশের ঘোরে চলেছি। সমাজ, সংসার—সবাইকে একদিকে ঠেলে—বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে চলছি। জাফর সাহেব যেদিন অপমানিত হয়ে ফিরলেন আমাদের বাড়ী থেকে, তার পরদিনই বাসায় একটা চিঠি লিখে রেখে আমি বেরিয়ে এসেছি অফিসে। আর ফিরিনি। আমরা কেউ ধর্মান্তরিত হইনি। রেজিষ্টারী মতে জাফর সাহেবকে বিয়ে করলাম। বাবা নাকি বলে ছিলেন তাঁর মরা মুখও যেন আমাকে দেখতে দেওয়া না হয়। সেই আদেশ পালন করা হয়েছিল আমাদের বাড়ীতে অক্ষরে অক্ষরে।

রাষ্ট্র বিভাগের পর জাফর সাহেব পাকিস্তানে চলে গেলেন। কিন্তু আমাকে বিয়ে করার পর হতে নিজের ধর্মের সবকিছু তিনি ত্যাগ করেছিলেন। এই অপরাধে পাক-সরকার কয়েক বছর তাঁর প্রমোশন বন্ধ করেছিল। সন্তানরা বড় হল। তারাও বাবার ধর্ম কৃষ্টি কিছুই পেলো না। সঙ্গী-সাথীদের বাড়ী যেতো। নানা ঠাট্টা বিদ্রূপ তারা করতো এই নিয়ে। স্কুলেও এই ত্রুটির জন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষের থেকে তিরস্কৃত হতে থাকে। ধর্মের ভিত্তিতে যে দেশ গড়ে উঠেছে, তারা কেন সইবে এই অনাচার? কিন্তু তবু আজ অবধি তারা কোন ধর্মকেই অনুসরণ করতে শেখেনি।

আজ জীবনের মধ্যাহ্নে এসে ভাবছি—এ আমি কি করেছি? স্বামীছাড়া শ্বশুর-বাড়ী কি তা জানিনি। কারণ, আমাকে বিয়ে করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিসর্জন দেওয়ার অপরাধে—তিনি পরিত্যক্ত হয়েছেন আত্মীয়-পরিজন হতে। জাফর সাহেবের সঙ্গে আমার বয়সেরও অনেক পার্থক্য। তপনদার সৌন্দর্যের পাশে জাফর সাহেব ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু তবু কেন এমন বিদ্রোহের পতাকা তুলেছিলাম সমাজ-সংসারের বিরুদ্ধে।

আজ আমার সব সময় ভয়—যদি আমাকে ত্যাগ করে জাফর সাহেব স্বীয় ধর্মের আর কাওকে বিয়ে করে আবার—তবে কোথায় আমার ঠাঁই? সব জায়গা হতেই তারস্বরে ঘোষণা করবে "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই।" তুই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সোপান উৎরে—অধ্যাপিকার পদে—সবার শ্রদ্ধা-সম্মান কুড়োচ্ছিস্। আর আমি? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সোপান কোন রকমে টপকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। এই সামান্য বিদ্যায় না জুটবে চাকরী, না পারবো সন্তানদের মানুষ করতে। তাদের চোখে চিরদিন আমরা অপরাধী হয়ে থাকবো। সম্বন্ধ করে সন্তানদের আমরা বিয়ে দিতে পারবো না। কারণ, আমাদের সমাজ কোনটা? মেয়েরা যদি নিজেদের পাত্র জুটিয়ে নিতে পারে, তবেই এরা সংসারী হতে পারবে। নতুবা এরা যে কোথায় ভেসে যাবে জানি না। তাই আমার একমাত্র সম্বল সৌন্দর্য—এটাকেই সযত্নে রক্ষা করতে চেষ্টা করছি। তোরা একথা শুনে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিবি। কিন্তু সত্যি কাবেরী, আজ যে আমার আর কোন পথ নেই। আমার জীবনের আয়-ব্যয়ের খাতে জমা আছে কেবল অভিশাপ।"

"শম্পা, তোর সমস্ত ইতিহাস কি জাফর সাহেব জানেন?"—প্রশ্ন করল কাবেরী।

"না—তাঁকে কিছু জানাইনি। এ কি জানাবার কাহিনী?

আমার জন্য তাঁকে তাঁর নিজের সমাজের কাছে যতটা হেয় হতে হয়েছে—তার বিনিময়ে তিনি এতটা প্রতারিত হয়েছেন। এ যদি প্রকাশ পায়, তবে তিনি আমাকে ত্যাগ করবেন। অন্যায়কে তিনি সহ্য করতে পারেন না। এইজন্য আমিই তাঁকে এক রকম জোর করে পাকিস্তানে বদলী করিয়েছিলাম—তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমার অনুতপ্ত অন্তরে সব সময় ভয়—কখন কে সব ফাঁস করে দিয়ে আমার সংসারে আগুন ধরিয়ে দেয়।"

"সত্যি কি তুই সুখী?"

"সুখের সংজ্ঞা আমি জানি না। স্বামী-সন্তানদের নিয়ে আমি নির্ঝঞ্ঝাটে আছি। কিন্তু শান্তি বা সোয়াস্তি নেই মনে। দুঃস্বপ্নের মত আমার বিগত জীবন আমার মনের আনাচে কানাচে উঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ ভাবি—কেন সেদিন তোর কথা উপেক্ষা করে—কৃষ্ণার প্রলোভনে পা দিয়ে এক পাপ হতে অন্য পাপে ছুটে যেয়ে জীবনটা গরলে পূর্ণ করেছি। অনুশোচনায় জীবনের প্রতি পরতে পরতে আমার ঘুণ ধরেছে। কিন্তু আজ আর আমার ফিরে যাবার পথ নেই। সব দ্বারই রুদ্ধ। সর্বত্র আমি পরিত্যক্তা। যারা আমাকে এ পথে ঠেলেছে—আজ তারাও আমাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে সরে যায়। তাদের কাছে আমি চরিত্রহীনা।"

শম্পার অনুতাপানলে দগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাবার ব্যর্থ চেষ্টা কাবেরী করেনি। কারণ, যথার্থই এই অনুতাপের মধ্য দিয়েই তার পুঞ্জীভূত পাপ পুড়ে ভস্ম হোক—এটাই কাবেরীর প্রার্থনা।

শম্পা বলেছিল "মনে মনে ভাবি আবার লেখাপড়া করে জীবনেকে নতুন ছাঁচে ঢালি—কিন্তু তা হয় না। আমার পাপ মনে ঢুকেছে সন্দেহের বীজ। যে বীজের সংস্পর্শে সমস্ত মন আমার আচ্ছন্ন। তাই অনুক্ষণ জাফর সাহেবকে আমার পাহারা দিতে হচ্ছে। কি জানি, আমার শেষ অবলম্বনটা যদি নিয়তি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কাবেরী, আমার মনের অস্থিরতার পরিমাণ তুই ঠিক উপলব্ধি করতে পারবি না। আজ সেই জগদ্দল পাথরের খানিকটা ভার লাঘব হলো তোর কাছে আমার রুদ্ধ মনের কপাট খুলে। কিন্তু এখনও শান্তি নেই—সোয়াস্তিও এ জীবনে হয়ত আর পাব না।"

আরও কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন কাবেরী শম্পার এক বিষাদময় চিঠি পেলো। যে চিঠিতে শম্পা জানিয়েছে—তার সাধের তাসের ঘর ভেঙ্গে গেছে। জাফর সাহেব আবার নূতনের নেশায় নীড় বেঁধেছেন স্বধর্মী উচ্চশিক্ষিতা এক মহিলাকে নিয়ে। বিধর্মী সতীন নিয়ে ঘর—শম্পার মত ভাবপ্রবণ মেয়ের দ্বারা সম্ভব নয়। সংসারে আর কোথাও তার স্থান নেই। তাই সন্তানদের সব দায়িত্ব সপত্নীর উপর রেখে সে আত্মহত্যার মধ্যে মুক্তিপথের সন্ধানে চলেছে। এ চিঠি যখন কাবেরীর হাতে পৌঁছাবে—তখন সে এই জগতে আর থাকবে না। তার জীবনের পরিণতির জন্য দায়ী শম্পা নিজে। তাই অভিযোগ কারও বিরুদ্ধে নেই শম্পার। জীবনের বেচা-কেনার হাটে—শম্পা ঠকে গেল। সবই তার ছিল—কিন্তু সব কিছুর অপপ্রয়োগে—সে ভেসে গেল আবর্জনার মত। শম্পার স্বীকারোক্তিই হয়ত তার পর-জন্মের পাপটা খানিকটা লাঘব করে দেবে।

লোক-বন্দিতা যাঁরা

বেলা দে

যুগে যুগে মানুষ স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্য—তাকে পরাধীনতার পাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য—আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অনেকে জীবন দান করেছেন। স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য এঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁরা হলেন জাতির মুক্তিদাতা। এই দেশপ্রেমের জন্য আত্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর ভেদাভেদ ছিল না। স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারী এসেছে যোদ্ধ্‌বেশে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিংশশতাব্দীতে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বহু নারী আত্মদান করেছেন, কারাবরণ করেছেন—সে সব ক্ষয়-ক্ষতির তুলনা মেলে না। তবু আজকের সমাজের নারীর পক্ষে যা সহজ করণীয়, সে যুগের নারীর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

সেই যুগে ভারতীয় নারীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন রাজরাণী, রাজমাতা বা রাজকন্যা, তাঁদের শুধুমাত্র রাজ-অন্তঃপুরে ভোগবিলাসেই দিন অতিবাহিত হোত না, শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে হোত, কূটনীতি ও রণকৌশল শিখতে হোত। প্রয়োজন হলে কোমলতাকে ত্যাগ করে কর্তব্যকর্মে পুরুষকে তাঁরা দিয়েছেন উৎসাহ। বীরধর্মে অনুপ্রাণিত করেছেন। নিজে যুদ্ধ করেছেন অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে। কোমলে কঠোরে মিশ্রিত এক আশ্চর্য চরিত্র এই ভারতীয় বীররমণীরা। এঁরা আমাদের নমস্য! এইসব বীর-রমণীরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছেন মুক্ত তরবারি হাতে, সৈন্যদের অধিনায়িকা হয়ে দেশরক্ষা করেছেন, আত্মসম্মান রক্ষা করেছেন। নানা কারণে হয়তো যেখানে জয়লাভ করা সম্ভব হয়নি, সেখানে মৃত্যুতরণ তীর্থে স্নান করে তাঁরা বিজয়িনী হয়ে আছেন।

সেই যুগের মহীয়সী বীরাঙ্গনা রাজ্যশাসন করেছেন, জমীদারীর সুব্যবস্থা করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনা করাকে তাঁরা রাজধর্ম মনে করতেন আর সেই রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার জন্য যে যুদ্ধবিগ্রহ তাদের করতে হোত, সেই যুদ্ধকেও তাঁরা ধর্মযুদ্ধ বলে মনে করতেন। জন-সেবার মহান ব্রত হিসাবে তাঁরা প্রজাপালন করতেন। প্রজাকে সন্তান মনে করতেন। তাঁরা ছিলেন একাধারে বীর্যবতী নারী ও লোকমাতা।

সেই যুগের কয়েকজন বীরাঙ্গনার কথাই স্মরণ করি। রাণী দুর্গাবতী একজন বীরাঙ্গনা ছিলেন। স্বদেশপ্রেম তাঁকে চরম সাহসী করেছে, শাসন-ব্যবস্থার প্রেরণা জুগিয়েছে। যে যুগে তিনি সিংহাসন অধিকার করলেন, সে সময়ে বড় বড় হিন্দু রাজ্যগুলি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। সকলে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে লক্ষ্য করেছিল—একহাতে সন্তানস্নেহে প্রজাপালন করেছেন, অন্য হাতে মুক্তকৃপাণে রক্ষা করেছেন তাঁদের দেশভূমিকে।

রাণী অহল্যাবাঈয়ের নাম জড়িত হয়ে আছে তাঁর বীরত্ব, প্রজা-বাৎসল্য ও দানশীলতার জন্য। তাঁর রাজনীতি তাঁকে হৃদয়হীনা হতে দেয়নি। তাঁর প্রজাবাৎসল্য জগতে অতুলনীয় হয়ে আছে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকে দুঃখে কাতর, সেই মুহূর্তে রাঘোবা তাঁকে প্রতারণা করে, তাঁর রাজ্য দখল করবার চেষ্টা করলেন। প্রজাদের রক্ষা করতে অন্তঃপুর থেকে এই পুত্রহারা

জননী রাণী বেরিয়ে এলেন নিষ্ঠুর রণক্ষেত্রে। সুযোগ্যা রাণী তিনি। তাই প্রজাদের ও দেশকে রক্ষা করলেন। আপন সন্তানকে হারালেন বটে, তবে প্রজারাই তাঁর শত পুত্রের স্থান অধিকার করলো। রাজ্ঞী অপেক্ষা এই স্নেহময়ী জননীর মূর্তিকে তাঁরা বেশী শ্রদ্ধা করলেন। এমনি করে ভারতের মাটিতে ভোগ ও ত্যাগের আদর্শ পাশাপাশি মিশে রয়েছে।

সে যুগে শৌর্যেবীর্যে ও রাজ্য পরিচালনায় বহু নারী আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আকবর বাদশাহ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশের জন্য বাংলাদেশের একজন রাজা রুদ্রনারায়ণের পত্নী রাণী ভবশঙ্করীকে 'রায় বাঘিনী' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। তখনো বাংলা দেশে পাঠান শক্তির বিলুপ্তি ঘটেনি। হুগলি জেলার খানাকুলের কাছে ভূরসুট রাজ্যের ব্রাহ্মণ রাজা রুদ্রনারায়ণ শেষ পাঠানবীর দাযুদ খাঁকে পরাজিত করতে সাহায্য করে বাদশাহের প্রীতিভাজন হন। তাঁর সহধর্মিণী ভবশঙ্করী যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি রাজ্যে যুবক-যুবতীদের নিজে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থায় প্রজাগণ সুখী ছিলেন। এই সময় ওসমানের নেতৃত্বে পাঠানরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলো। রাণী ভবশঙ্করী নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন রণক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে পুরুষ ও নারী উভয়ই ছিল। আকবর শাহ এই বীর রমণীর কাছে মানসিংহকে পাঠিয়ে তাঁর যুদ্ধ-কৌশল ও কৃতিত্বের জন্য তাঁকে 'রায় বাঘিনী' খেতাব দিয়েছিলেন।

পরবর্তী যুগে বাংলায় আর একজন বীর নারীর কথা মনে পড়ে। তিনি হলেন রাণী ভবানী, ইনি নবাব আলিবর্দির সমসাময়িক ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে বর্গী বিতাড়নে এই ভূস্বামীরাও বিশেষ সাহায্য করেন। এই সব ভূস্বামীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রামকান্ত রায়। তাঁরই সহধর্মিণী ছিলেন রাণী ভবানী। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি অসহায় হয়ে পড়েননি। শক্ত হাতে বিরাট জমিদারীর খুঁটিনাটি সবই নিজে পরিচালনা করতেন। কিন্তু ক্ষমতার মোহে মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-মমতাকে ত্যাগ করতে পারেননি। দেবসেবা ও জনসেবাকে জীবনের প্রধান ব্রত বলে মনে করতেন। তাঁরই অর্থে বিধ্বস্ত কাশীধাম পুনর্গঠিত হয়েছিল এবং বহু দেব দেবীর মন্দির ও ধর্মশালা তৈরী করেছিলেন তিনি। বাংলাদেশের বহু জায়গায় দেব-মন্দির, সংস্কৃত টোল, অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্করিণী খনন ও রাস্তা নির্মাণ উদ্দেশ্যেও তিনি বহু টাকা ব্যয় করেন। তিনি ছিলেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা। এই পর্যায়ে আর একজন মহীয়সী নারীকে মনে পড়ে। যদিও তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের বলা যেতে পারে। এই শক্তিময়ী ও দানশীলা নারী হলেন জানবাজারের রাণী রাসমণি। গরীবের মেয়ে, বিবাহ হয়েছিল ধনীর ঘরে। স্বামী যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন—পরবর্তীকালে বিরাট জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন সেই শিক্ষার গুণেই। রাসমণির প্রথম কীর্তি হলো জানবাজার থেকে গঙ্গায় আসবার পথটি পাকা করে দেওয়া। এই রাস্তাটির এখন নাম হয়েছে কর্পোরেশন ষ্ট্রীট। নিমতলার শ্মশানঘাট, আহিরীটোলা স্নানের ঘাট—এই সবই তাঁর কীর্তি। গরীব ঘরের মেয়ে হলেও ঐশ্বর্যের জাঁকজমক তাঁকে কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেয়নি। রাণী রাসমণির দানের তুলনা মেলে না। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তিনি চিরস্মরণীয়া হয়ে আছেন।

আরো অনেকের কথাই স্মরণ করা যেতে পারে। দেশ-সেবার মধ্যে দিয়ে মানব-সেবার একটা সহজ প্রেরণা এঁদের মধ্যে ছিল—তাই এঁরা আজো ইতিহাসের পাতায় আপন অধিকারে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। তাঁদের সেই আত্মদানের উৎসধারায় আমাদের মঙ্গলঘট ভরে উঠুক।

ভাগ্য

শ্রীমতী স্মৃতি ঠাকুর

রঙ তার কালো। শুধু কালো? তার ওপর চোখ ছোট, নাক থ্যাবড়া, কপাল আর গাল দুটো উঁচু হওয়ায় উনুনের তিনটে ঝিঁকের মত দেখতে লাগে; এক কথায় উনুন-মুখো, মাও ডাকেন তাই বলে 'উনুন মুখি', বলেন—"তোর কপালে কি যে আছে, একে গরীবের মেয়ে, তাতে আবার রূপে যেন লক্ষীর প্যাঁচা। কে বিয়ে করবে? তাও যদি দুপাতা বিদ্যেও শিক্ষা দিতে পারতাম তো হোত। যেমন কপাল করে জন্মেছিস।" বলতে বলতে মায়ের চোখ দুটো ছল-ছলিয়ে ওঠে—"আজ উনি বেঁচে থাকলে কি আর এমন কোরে মামার বাড়ী পড়ে থেকে মামীর ফরমাস খাটতে খাটতে দিন যেত? বিয়ে না হলেও তবুও যা হোক লেখাপড়া শিখে চাকুরী করে দিন কাটিয়ে দিতে পারতিস।"

সত্যিই ছবির ভাগ্যে কি যে আছে! ও নিজেই রাত্তে শুয়ে শুয়ে একথা ভাবে আর নিঃশব্দে দুটি চোখের জলের ধারায় ওর বালিশ ভিজতে থাকে। এর মধ্যে কতলোক ওকে দেখে গেল কিন্তু পরে জানাবো বলে অনেকেই আর কোন খবর দেয়নি। অনেকে নাচ, গান, লেখা-পড়া, বোনা-শেলাই, ঘর-কন্নার কাজ কি জানে না জানে, সব খুঁটিয়ে জিগেস করে শেষ বলে গেছে—বড় ময়লা রঙ, মুখখানাও তেমন ভাল না। কেউ বা, পণের একটা মোটা রকমের অঙ্ক দাবী করেছে। এমনি ধরণ ক'বছর ধরে চলার পর এখন কেউ দেখতে আসবে শুনলে ছবি গোঁ ধরে বসে "আমি ওদের সামনে বেরুবোনা, বিয়েতে আর আমার দরকার নেই। শুধু শুধু হয়রান করবে, কি হবে মা ওদের সামনে গিয়ে? আমাকে যে কেউ পছন্দ করবেনা, জানা কথা।"

ওর বাবা যখন মারা যান, তিন বছরের ছবিকে নিয়ে ওর মা বড় ভাইয়ের আশ্রয়ে এসে উঠেছিলেন। বড় ভাজ মোটেই প্রীতির চোখে দেখেন নি, একে নিজেরা ছা-পোষা মানুষ, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না, তার উপর আরও দুটো মুখে অন্ন যোগাতে হবে! শুধু কি অন্ন? আরও নানা খরচ তো আছে মানুষের, সে সব যোগায় কে? তাও বাপ যদি মেয়ের বিয়েটা দেবার মত টাকাও রেখে যেত, তাওনা। সবই এখন ঘাড়ে পড়লো। ছবির মা সুলেখা সে কথা বুঝেছিলেন। তাই এসেই ভাজের সংসারের সব কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং প্রাণপণে সংসারের কাজে সাহায্য করে এই অন্ন-বস্ত্রের ঋণ শোধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মামার বড় মেয়ে সবিতা ওর থেকে বছর দুয়েকের বড়। ছবি সবিতার পুরাণো জামা কাপড় পরেই মানুষ হতে লাগলো। মামী কিন্তু মোটেই নিজের ছেলে-মেয়েদের মত সমান ভাবে ছবির সঙ্গে ব্যবহার-

করেননি কখনও। এমন কি, সবিতাও ছবিকে সব কাজে এমনভাবে ফরমাস খাটাতো—যেন ছবি ওর আয়া। ওদের এই রকম ব্যবহারে মা ও মেয়ে দুজনেই মনে অত্যন্ত আঘাত পেলেও ওরা কোন কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না, নীরবে সব সহ্য করে যায়। অনেক রাতে সব কাজের পর ভাঁড়ার ঘরের ড্যাম্প মেঝেতে ছেঁড়া বিছানায় শুয়ে মা মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকেন।

এমনি ভাবেই আঠারো-উনিশ বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে সবিতার বিয়ে হয়ে গেছে। সুলেখার অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। আজকাল অবসর সময়টুকু মা ও মেয়েতে মিলে পাড়ার মেয়েদের জামা-কাপড় সেলাই করে দিয়ে দু-চার পয়সা হাত-খরচা রোজগার করে। এ-ছাড়া মানসিক অশান্তিও সুলেখার এই তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার আর একটা কারণ। ছবি তবু মাকে বেশি কিছু করতে দিতে চায়না, নিজে যতটা পারে কাজগুলো করে নেয়। ওর বিয়ে নিয়ে সুলেখা খুব ভাবনায় পড়ে গেছে। মামা বীরেনবাবু ভাগ্নির বিয়ের জন্য অল্প-বিস্তর চেষ্টা করছেন এদিক-ওদিক। দু-একটা সম্বন্ধ এলেও পছন্দ কেউ করেনি ওকে। তাই নিয়ে সুলেখা প্রায় দুঃখ করেন। বিনা পয়সায় যে ওর বিয়ে হওয়া অসম্ভব এবং ওর বিয়েতে ভাল রকমের খরচ না করলে যে দেওয়া যাবেনা বিয়ে, এটা বুঝতে পেরে ছবির উপর মামীমা আরও বিরক্ত হয়েছেন, আর ছবির প্রত্যেক কাজের খুঁত ধরে সেই রাগটা উনি ওর উপর ঝাড়তে থাকেন। তাই ওদের অশান্তি আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

এই সময় সুলেখার আবার হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে পড়লো। শীতকালের ভোর থেকে উঠে ঠাণ্ডা জল ঘেঁটে কাজ কর্ম করায় ঠাণ্ডাটা লেগেছিল, গ্রাহ্য না করে তার উপর সকালবেলা চান করায় নিউমোনিয়া দাঁড়িয়ে গেল। ছবি মায়ের সেবা করার ফাঁকে ফাঁকে সংসারের কাজও করে যায় যথাসাধ্য। পাড়ার ডাক্তার এসে সুলেখাকে দেখে, যে ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপসন দিয়ে গেলেন, সে ওষুধের অনেক দাম। বীরেনবাবুর টাকা যোগাড় করে ওষুধ কিনতে কিনতে রোগ চরম পর্য্যায়ে পৌঁছে গেল। শেষসময়ে যখন ওষুধ এলো, তখন তাতে আর কোন কাজ হোলনা। ভোরের দিকে ছবিকে নির্মম সংসারের দুঃখের ভার একাই বইবার জন্য রেখে, সুলেখা চিরদিনের মত ছুটি নিয়ে চলে গেল। ছবি যেন সেদিনটা কাঁদতেও পারলোনা, একরকম আচ্ছন্ন ভাবে পাথরের মত চুপ করে রইলো। সারাদিন কি ঘটছে না ঘটছে, ভাল করে মাথায় ঢুকলো না। রাত্রে শোবার সময় ওর মনে হোল "সত্যিই মা নেই! এবার থেকে ওকে একা শুতে হবে? একা সব দুঃখ বইতে হবে! এতদিন তবু মায়ের স্নেহের আড়ালে থেকে ওর গায়ে দুঃখের ঝাপটাগুলো তেমন ভাবে লাগেনি, এখন সে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? কপাল লোকের খারাপ হয় বটে—কিন্তু একটা অন্ততঃ কিছুতো মানুষের কপালে ভাল থাকে? ওর বরাতে কি কিছু ভাল নেই!" ছবি ভাবে আর চোখের জলে ওর বুক ভেসে যায়। "মা কি তাঁর মেয়ে সুন্দরী নয় বলে সেই সাধ পূরণ করতে আমার নাম ছবি রেখেছেন? যে নামটা আমার চেহারায় এতই বেমানান—যেন ঠাট্টার মত শোনায়? রূপ তো নেইই, বিদ্যে, বুদ্ধি কিছুই আমায় দিলেনা ভগবান। এমন কি, স্নেহ-ভালবাসা, আদর-যত্ন, কি কে বন্ধু-বান্ধব অন্য লোকেদের ভাগ্যে কিছু না কিছু থাকেই, আমা[illegible] তুমি সে সব থেকে বঞ্চিত করেছ। আমার সংসারে একমাত্র [illegible] ছিল, তাকেও তুমি কেড়ে নিলে? এখন আমার কিছুই নেই—জীব[illegible] সুধু লোকের দাসী-বৃত্তি করা ছাড়া। এমন কোরে আর আমা[illegible] বাঁচিয়ে রেখনা ভগবান!" এমনি কোরে কাঁদতে কাঁদতে কোথা দি[illegible] রাতটা কেটে গেল ওর। এরপর ওর সংসারের কাজের চাপ আ[illegible] মামীর গঞ্জনা দুই-ই বেড়ে গেল। তার উপর মনের এই অবস্থা জীবনটা যেন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো ওর।

সে দিনটা ছিল রবিবার। সকাল থেকে সবিতা আর তা[illegible] স্বামী সুনীল এসেছে। তাই ছবির আজ আরও কাজ। আগে[illegible] ওরা অনেকবার এসেছে, কিন্তু তখন সুলেখা বেঁচে ছিল, তাই ছবি[illegible] উপর এতটা ঝক্কি হয়নি। এখন সব একাই ছবিকে করতে হচ্ছে ওর মামী ওরা এ সংসারে আসার পর থেকেই শরীর খারাপ মাথাধরা, এ সব অজুহাত দিয়ে রান্না-ঘরের দিক মাড়ানো ছেড়ে দিয়েছেন।

সকালবেলার জলখাবারের পাট সেরে উনুনে ভাত চাপিয়ে ছবি তরকারী কুটছে। সবিতা অনেক দিন পর বাপের বাড়ী এসেছে, তাই পাশের বাড়ী বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। বীরেনবাবু জামাই খাবে বলে ভাল মাছ-টাছ কেনবার জন্য বাজারে গেছেন। ছবির মামী মলিনাদেবী জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন এতক্ষণ; মিনিট দশেক হোল উঠে বাথরুমে গেছেন। সুনীল আর একা চুপচাপ কি করে, তাই উঠে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে ছবির সঙ্গে ভাল করে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতে লাগলো। ছবির সুন্দর স্বাস্থ্যের উপর ওর অনেকদিন থেকেই নজর ছিল, তবে এর আগে ওর ছবির সঙ্গে কথা বলার বেশি সুযোগ হয়নি। কেননা ছবির মা ওকে সর্বদা আগলে রাখতেন সব বিষয়ে, পাছে মলিনাদেবী অসন্তুষ্ট হন ছবির কোন বিষয়ে, যদিও তাতেও ওঁর হাত থেকে ওরা রেহাই পেতনা। আর ছবিরও অপর লোকের সামনে বেরুতে লজ্জা করে। সুনীল ছবির সঙ্গে দু-চারটে রসিকতা করার চেষ্টা করে দেখলে; ছবি চুপ করেই আছে, ওর কথার উত্তর দিচ্ছেনা দেখে বললে—এক গেলাস খাবার জল দিতে পারো? ও যেই খাবার জল দিতে এসেছে, অমনি সুনীল টপ কোরে ওর হাতটা চেপে ধরে টানতে থাকে, ছবিও হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকে। এমনি সময় মলিনাদেবী বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসেন। ব্যাপারটা দেখে উনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। সুনীল ওঁর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ছবির হাতটা ছেড়ে দিয়ে চট করে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে। ছবি আবার নিজের কাজে ফিরে যায়। মলিনা দেবী জামাইয়ের স্বভাব যে বিশেষ ভাল নয় একথা সবিতার মুখে শুনেছিলেন। এখন সুনীলকে কিছু বলতে না পেরে রাগটা ওঁর ছবির উপর গিয়ে পড়ে। ওদিকে ছবিরও ভয়ে চোখে জল এসে যায়; সে জানে এরপর মামী কি কাণ্ড বাধাবেন। মলিনা দেবী রান্না ঘরে ঢুকে সুনীল যাতে শুনতে না পায় এমন অনুচ্চ কণ্ঠে ছবিকে অত্যন্ত যাচ্ছেতাই ভাবে গালাগাল দিতে লাগলেন—"ওই তো রূপের ছিরি, তার আবার রঙ্গ কত, পেটে তোর এত বদমাইসি! কাজ কর্ম্ম সব পড়ে রইলো, আর আমি যেই একটু চোখের আড় হয়েছি, অমনি তুই সকাল থেকে ইয়ার্কি মারতে

বসে গেলি! আবার এইসব গুণ বাড়ছে—পুরুষ মানুষের গায়ে পড়া! কি বেহায়া মেয়ে বাবা! কোন্‌দিন একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে আমার মুখ পুড়োবে দেখছি। হতভাগী, লক্ষ্মীছাড়ী—যা আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা, অমন মেয়ের আমি মুখ দেখতে চাইনা"—এইরকম আরও অনেক কিছু তিনি বকে চললেন আরও কিছুক্ষণ ধরে। ছবি কানে হাত চেপে মাথা নীচু করে বসে রইলো, আর নীরবে ওর দুচোখ বেয়ে জল ঝরে পড়তে লাগলো। এইরকম কথা শুনে অপমানে ওর মাথা কাটা যাচ্ছিল, তবুও কোন প্রতিবাদ করতে পারলো না, কান্নায় যেন ওর কণ্ঠ রোধ হয়ে গেছে। কেমন কোরে ও বোঝায় যে ওর কোন দোষ নেই, তাছাড়া কিছু বলতে গেলেও মামীমা শুনবে না ওর কথা, সে ও জানে। কেননা এ একটা বকবার ছুতো। মনে মনে ঠিক করে ফেলে—আজই এ বাড়ী ছেড়ে জন্মের মত চলে যাবে। ও নিজেও শান্তি পাবে, এরাও শান্তি পাবে। এ ভাবে তো আর থাকা যায় না।

এর পর ও রান্নাঘর ছেড়ে কারুর সামনে বেরুলো না। কিছু খেলোনা। রান্না বাড়া সব কাজ নীরবে করে গেল। ও যে খেলোনা তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামালো না। দুপুরে সবাই খেয়ে দেয়ে যে যার একটু বিশ্রাম করতে গেল। মলিনাদেবী ঘরে ঢুকতে বীরেন বাবু বললেন "ভাল কথ', বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ছবিকে একটু সাজিয়ে রাখতে বোলো সবিতামাকে, আজ বিকেল চারটার সময় ওকে একজন দেখতে আসবে। পাড়ার রমেশ বাবু একটা ভাল সম্বন্ধ দিয়েছেন। দাবী দাওয়া নেই। পছন্দ হলে নিজেরা মেয়েকে গহনা দিয়ে সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবে। ছেলের বাপ নেই, একমাত্র ছেলে। শাশুড়ীর যত গহনা ছেলের বৌ পাবে। বর্দ্ধমানে ওদের বাড়ী আছে। অনেক জমি আছে, চাষ আবাদ হয়। অবস্থা বেশ ভাল। শাশুড়ী একা সব কাজ পেরে ওঠেন না, তাঁর নিজের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে; তাই রূপের চেয়ে সংসারের কাজে পটু আর স্বাস্থ্য ভাল দেখে ছেলের জন্য মেয়ে খুঁজছেন। তা পাড়া-গাঁ হলেও আমাদের ছবির পক্ষে এই রকম সম্বন্ধই ভাল। দেখা যাক, যদি পছন্দ হয়। মেয়েটার যা কপাল খারাপ।"

মলিনা দেবী বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ও-পাপ বিদেয় হলেই বাঁচি। পরের মেয়ের দায় একটা আমার ঘাড়ে; বুড়ো বয়স অবধি আইবুড়ো বসে থেকে কোন্ দিন কি একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে থাকবে, তখন আমার মুখে চুণ কালি পড়বে।"

বীরেন বাবু বললেন, "কি যে বল, ছবি তেমন মেয়ে নয়।"

মলিনা দেবী বললেন, "হ্যাঁ, তোমার চোখে সবাই ভাল। ও ডুবে ডুবে জল খায়। আজকাল ওর চালচলন আমার তেমন ভাল ঠেকে না।"

বিরক্তভাবে বীরেন বাবু বলেন—"কি জানি বাবা! যাহোক, বিকেলবেলা সব বন্দোবস্ত ঠিক করে রেখো মেয়ে দেখার, সম্ভবতঃ ছেলের মাও আসবেন। এখন যাও তো।"

মলিনাদেবী বীরেন বাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে সবিতারা যে ঘরে ছিল সেই ঘরের দিকে যেতে যেতে রান্নাঘরের দিক থেকে একটা বিশ্রি পোড়া গন্ধ পেয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখেন,—রান্নাঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ; বিশ্রি গন্ধের সঙ্গে ধোঁয়াও বেরুচ্ছে দরজার ফাঁক দিয়ে। মনে হোল ভেতরে কিছু পুড়ছে। উনি চেঁচামেচি করে বাড়ীর সকলকে জড় করে ফেললেন; পাড়ার অনেক লোকও ছুটে এলো। তাড়াতাড়ি দরজা ভেঙে ফেলে দেখা গেল—ছবি কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ছে! মুখ চোখ এমন বীভৎস হয়ে গেছে যে, ছবি বলে চেনা যাচ্ছে না। তখনও মনে হোল প্রাণ আছে, তাই ট্যাক্সি ডেকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোল, কিন্তু ডাক্তার দেখে বললেন,—"'ডেথ্', মিনিট দশেক হোল প্রাণ বেরিয়ে গেছে।"

শব দাহ করে বীরেন বাবু ও সুনীলের ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। বাড়ীর সকলে উৎকণ্ঠা নিয়ে বসেছিল ওদের অপেক্ষায়। হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাওয়ায় ওরা যেন কেমন ভ্যাবাচেকা মেরে গেছে। এমন ব্যাপার কখনও ঘটতে পারে, তা কেউ ভেবে পায় নি। খবরটা শুনে ওরা খুব কান্নাকাটি করতে লাগলো। ওর সঙ্গে এতদিন ধরে কে কত দুর্ব্যবহার করেছে, তাই মনে করে সকলেরই খুব অনুশোচনা হতে লাগলো। মলিনা দেবীর মনে হোল তিনিই এই মেয়েটার আত্মহত্যার জন্য দায়ী। সত্যি বড় অবিচার করা হয়েছে ওর ওপর, আর একটু ভাল ব্যবহার করলে হয়তো মেয়েটা এমন কোরে মরতো না। ব্যাচারি একদিনের জন্যও ওঁদের কাছে ভাল ব্যবহার পায়নি। সবই ছবির ভাগ্য! বেঁচে থাকতে ওর জন্য মা ছাড়া আর কাকেও চোখের জল ফেলতে দেখেনি! বীরেন বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "জানি, মেয়েটার এমনি বরাত, ওর কপালে শুধু দুঃখুই ছিল, কখনও একটু সুখের মুখ দেখতে পেলনা। যেই একটা ভাল বিয়ের সম্বন্ধ পেলুম, অমনি চলে গেল। একেই বলে বরাত!"

অব্যক্ত

অমিতা পালিত

চম্পা! ও-চম্পা শোন, ওপরে একবার যা-তো, টেবিলের ঢাকার নীচে একটা টাকা আছে নিয়ে আয়।

কুন্তলা হাতের কাজে আবার মন দিল।

ওমা! কোথায় গেল মেয়েটা। কোন সাড়াই নেই যে!

খাবারটা শেষ করে ঢাকা দিয়ে, ঝাড়নে হাত মুছে ওপরে উঠে এল কুন্তলা। ঘরে এসে ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই—এই যা, পাঁচটা কখন বেজে গেছে—অতীশের ফিরবার সময় হয়ে গেল। চা যে ফুরিয়ে গেছে, সে কথা ভুলে গিয়েছে, না হলে অফিস যাওয়ার সময় যদি বলে দিত—ফেরার পথে অতীশ নিজেই নিয়ে আসত। ঠিকে ঝি কখন চলে গেছে, পাশেই একটা দোকান আছে, সময় অসময় চম্পা গিয়ে দু'একটা জিনিষ নিয়ে আসে কিন্তু চম্পাই বা গেল কোথায়?

জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখে—ঐতো চম্পা—সি-আই-টি পার্কে খেলা করছে। এই পার্কটি নতুন হয়েছে। কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে চারটে বাজতে না বাজতেই এসে ঢুকে পড়ে তার ঠিক নেই। দলে দলে খেলা সুরু করে দেয়। এক এক সময় কুন্তলারও মনে হয় ছুটে গিয়ে ওদের সঙ্গে খেলতে সুরু করে দেয়, ভুলে যায় বয়সের তারতম্য।

ও মা! আজকের এই পড়া তৈরী করে দিতে হবে—বলে চম্পা মায়ের দিকে বইটা এগিয়ে দেয়। কুন্তলা হাতের সেলাই একপাশে নামিয়ে রেখে বইখানা টেনে নেয়—"মানুষে মানুষে এই ব্যবধান কেন? মানুষের এই অপমান কি তার দেবতার অপমান নয়? দেখ চম্পা—মানুষ মানুষকেই নিয়ম-নীতির দ্বারা ছোট করেছে উচ্চ; নীচ—এই সমস্ত ভেদ সৃষ্টি করে। প্রতি মানুষের মধ্যে আছেন

ভগবান, সেজন্যে মানুষকে অপমান করা, ছোট করা মানে ভগবানকেই অপমান করা। এইগুলো গান্ধিজীর মনে ব্যথা দিয়েছিল।

অসমাপ্ত ফ্রকটা আবার তুলে নিয়ে সেলাই করতে থাকে। তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। কতদিন হয়ে গেল চম্পার মাসীমা চম্পাকে এই সিল্কটা কিনে দেন—কাজের চাপে এতদিন শেষ করা হয়নি। হ্যাঁ রে চম্পা, বিকেলে পার্কে যে মেয়েটির হাত ধরে বেড়াচ্ছিলি, ওদের বাড়ী কোথায়? বন্ধুর নামে চম্পার মুখটা খুসীতে ভরে উঠল।

জান মা, রীতা আমার বন্ধু, রোজ পার্কে আমরা খেলতে যাই। ঐ যে পার্কের ঠিক পাশেই একটি নতুন বাড়ী—ওই বাড়ীতে ওরা থাকে। ওর মা কি ভাল—আমায় খুব ভালবাসেন; কত আদর করেন। যখন যাই আমায় কত লজেন্স চকোলেট দেন।

চম্পা মার আরও কাছে সরে আসে, তুমি একদিন চল না মা কি সুন্দর ওদের বাড়ী সাজানো। তুমি কিন্তু সেই জামরঙের সাড়ীটা পরে যেও। ওর মা-না—কি সুন্দর সুন্দর সাড়ী পরেন।

চম্পার কথা ফুরোয় না অনর্গলভাবে বলে চলে।

হঠাৎ অতীশ এসে পড়ায় থেমে যায়।

কি গো কিসের পরামর্শ হচ্ছে শুনি, মায়ে ঝিয়ে—কোথায় যাওয়া হবে বুঝি?

দশটা বেজে গেছে, চল তোমাদের খেতে দি, বলে কুন্তলা উঠে গেল। খাওয়ার ফাঁকে কুন্তলা চম্পার বন্ধু রীতার গল্প করল। অতীশ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল—ওদের সঙ্গে কি আমাদের বন্ধুত্ব করা চলে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! অতীশ উঠে গেল হাত ধুতে।

এটা চম্পাদের বাড়ী মা। এই চম্পা আলোটা জ্বাল না-রে তোদের সিঁড়িটা বড্ড অন্ধকার।

চম্পা রীতার গলা শুনে আলোটা জেলে দিয়ে নীচে নেমে এল। ওমা দেখবে এস কারা এসেছে।

কুন্তলা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল আসুন দিদি, বসুন। সুনন্দা দেবী প্রতি-নমস্কার জানান। আজ ভাই অনেক জায়গায় যেতে হবে বসতে পারছি না—আগামী কাল রীতার জন্মদিন তাই বলতে এলাম—আপনি ও চম্পা আমাদের বাড়ীতে বিকেলে চা খাবেন।

দু'একটা কথার পর উনি বিদায় নেন। কুন্তলা যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। রাত্রে অতীশ সমস্ত কথা শুনে মন্তব্য করে, বড়লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছ, শেষ রক্ষা করতে পারবে তো?

সকাল থেকে কুন্তলা ও চম্পা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারে না কি দেওয়া যায়! শেষে চম্পা বলে, মা একটা জিনিষ খুব সুন্দর হবে, আমার জন্যে যে সিল্কের ফ্রকটা তুমি করছ সেটা তো প্রায় শেষ হয়ে গেছে—লেশগুলো কি সুন্দর বুনেছ। রীতাকে পরলে বেশ ভাল দেখাবে।

বিকেল ঠিক পাঁচটা নাগাদ ছোট্ট একটি প্যাকেট আর কিছু ফুল নিয়ে ওরা রীতাদের বাড়ী গেল।

বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে গাড়ী। ভিতরে ঢুকতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকছে।

ড্রইং রুমে বসে আছেন বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়। ওরা গিয়ে এক পাশে বসল।

রীতা নাচতে নাচতে ছুটে এল—কি সুন্দর সেজেছে ও বেশ লাগছে ওকে দেখতে।

এই—কি দেখছিস? রীতার ডাকে চম্পা লজ্জা পেয়ে গেল।

কি এনেছিস দেখি? ওমা দেখ বলে রীতা ফ্রকটা খুলে মাকে দেখায়। তুমি আজকাল বড্ড দুষ্টু হয়ে উঠেছ; ওটা প্রেজেন্টেসন টেবিলে রেখে দাও—বলেই এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে সুরু করলেন।

প্লেট ভরা খাবার ও চা খেয়ে ওরা যখন বাড়ী ফিরল তখন সাতটা বেজে গেছে! অতীশ ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিল—বলল,—কি টি-পার্টি শেষ হল?

কুন্তলার চোখে ঘুম নেই। অতীশ ও চম্পা ঘুমোচ্ছে। আজ বিকেলের দৃশ্যগুলো ছায়া-ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠছে; ওদের কথাবার্ত্তা—উচ্ছ্বল হাসি সে ভুলতে পারছে না; কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ওদের সমাজ আর কুন্তলাদের সমাজ দুটি কি সম্পূর্ণ আলাদা? কেমন যেন চাল-চলন হাব-ভাব একটু ভিন্ন ধরণের; সেখানে কুন্তলারা যেন একেবারে বেমানান। সে শুধু চুপ চাপ বসে ওদের কথাবার্ত্তা শুনছিল, রকম-সকম দেখছিল। সিনেমার গল্প, পার্টির কথা, সাজ-পোষাকের আলোচনা কোনটাতেই সে যোগ দিতে পারেনি। সিনেমায় মাঝে মাঝে কুন্তলারও যেতে ইচ্ছে করে। অনেক সময় অতীশও জোর করে বলে—জীবনের সব কিছু নিঙড়ে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলো না। অভাব আমাদের চিরকালই থাকবে। একটু আনন্দ যদি পাই, বাধা দিও না। কিন্তু কুন্তলা ভাবে কত প্রয়োজনীয় খরচ আছে। অতীশ মাসের প্রথমে মাইনের টাকাগুলি এনে ধরে দেয়—আর সারা মাস কুন্তলাকে হিমশিম খেতে হয় কোনটা কি ভাবে চালাবে। বাপ-পিতামহের আমলের ভাঙ্গা ঝর ঝরে বাড়ীখানাই যা সম্বল। কুন্তলা নিজের দীর্ঘশ্বাসে নিজেই চমকে ওঠে।

আজ ষষ্ঠী। প্রতি বছরের মত এবারও সামনের মাঠে পূজো হবে। ছেলেরা সব খেলা ভুলে পূজোর মাঠে ভিড় করেছে। চম্পা পার্কে যায়নি। বন্ধুরা সব নতুন জামা-কাপড় পরে মাঠে যেতে ব্যস্ত।

শাঁখের আওয়াজ পেয়ে চম্পা জানলার কাছে ছুটে এল। মা, দেখবে এস—প্রতিমা এসে গেছে।

মেয়ের পাশে এসে কুন্তলা মা দুর্গার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল; কুন্তলার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রাস্তায় একটা ছোট মেয়ে—দেখ চম্পা ঐ মেয়েটাকে, ঠিক তোর সেই জামাটার মত ওর জামা—না-রে?

চম্পা মার মুখের দিকে স্থির ভাবে চেয়ে থাকে—তারপর ধীরে ধীরে বলে "আমি ওকে চিনি মা—ওর মা রীতাদের বাড়ীতে কাজ করে। জান মা, রীতা আমায় বলেছে, ওই জামাটা ওর খুব পছন্দ হয়েছিল কিন্তু ওর মা বাড়ীর তৈরী জামা পরা একেবারে পছন্দ করেন না—ভাল কাট ছাট ছাড়া পরতেই দেন না। এরকম জামা পরে বাইরে বেরুতে ওদের লজ্জা করে"—চম্পা থেমে যায়।

'ওদের লজ্জা করে'—কুন্তলা যেন বোবা হয়ে যায়।

ক'দিন ধরে অতীশ ক'টা টাকার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাইনের টাকা কবে ফুরিয়ে গেছে—একটা মাত্র মেয়ে, তার জন্যেও কিছু কিনতে পারেনি। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। সামনের তেল-কলের মোটা ধোঁয়া উঠছে, যেন কোন দৈত্যের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বাস। কি যেন অব্যক্ত ব্যথায় কুন্তলার বুকটা ভরে ওঠে।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সাত

॥ গ ॥

করালীচরণের কথাটা সত্যিই বুঝতে পারেনি সুন্দরম তাই বুঝি ক্ষণপূর্বের প্রশ্নটারই আবার পুনরাবৃত্তি করে। জিজ্ঞাসা করে, পরীক্ষা করে দেখলেন না কবিরাজ মশাই ওকে?

ভিষগরত্ন পূর্ববৎ বলেন, বললাম তো পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে চল—

ভিষগরত্ন কথাটা বলে আর দাঁড়ায় না, সোজা ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়, সুন্দরম তাকে অনুসরণ করে।

বাইরের বারান্দার আধা আলো আধা অন্ধকারে ভিষগরত্নের পিছনে পিছনে চলতে চলতে সুন্দরম শুধায়, ঔষধপত্র যা চলছিল সেই চলবে ত কবিরাজ মশাই?

ঔষধ?

হ্যাঁ—

না, ঔষধের আর দরকার হবে না—

দরকার হবে না।

না—

কিন্তু ও তো এখন ভাল করে সুস্থ হলো না—

হঠাৎ যেন ভিষগরত্ন খিঁচিয়ে ওঠে, সুস্থ হলো না—সুস্থ হবার বাকীটা কি আছে?

কি বলচেন?

বলচি ঠিকই; ও যদি অসুস্থ হয় ত' তুই আমিও অসুস্থ। বেটার শুধু অসুরের মত চেহারাই—মাথায় যদি এক ফোঁটা বুদ্ধির ঘিলু থাকে—

আজ্ঞে কি বললেন?

বলতে আর কিছু হবে না সময়ে সবই বুঝবি।

কথাটা বলে হঠাৎ যেন চলার গতি অত্যন্ত দ্রুত করে দেয় ভিষগরত্ন এবং হন হন করে সদরের দিকে চলে যায়।

সুন্দরম ব্যাপারটা তখনো ঠিক যেন উপলব্ধি করতে পারে না, আবছা আলো অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে।

বুঝবেই বা কি করে সুন্দরম! মনের মধ্যে ত তার কোনদিন কোন মার প্যাঁচ ছিল না? সোজা সরল মানুষ সুন্দরম।

ভেবে চিন্তে কখনো সে কোন কাজ যেমন জীবনে করে নি তেমনি যে কাজ সে করেছে তার জন্যে কখনো পরে কোন রকম চিন্তা ভাবনাও করে নি।

কিন্তু আজ যেন ভিষগরত্নের কথায় মনের মধ্যে সুন্দরমের কোথায় একটা বুঝি খটকা লাগে।

কি বলে গেলেন ভিষগরত্ন!

সত্যিই কি তার মৃন্ময়ী সুস্থ হয়ে উঠেছে!

তাই যদি হয়ে থাকে তবে সে এখনো কথা বলতে পারচে না কেন? যে বাক্‌শক্তি তার লোপ পেয়ে গিয়েছিল সেই বাক্‌শক্তিটা বা এখনো ফিরে আসচে না কেন?

শয্যার 'পরে এখন সে মধ্যে মধ্যে উঠে বসে বটে কিন্তু কই শয্যা থেকেও কখনো মাটিতে নামে না। দুর্বলতাও ত তার এখনও সম্পূর্ণ সারে নি।

তবে মৃন্ময়ী সুস্থ হয়ে উঠলো কোথায়? আর কেনই বা তার ঔষধের আর প্রয়োজন নেই। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায় সুন্দরমের।

অন্যমনস্ক হয়ে যায় সুন্দরম এবং অন্যমনস্ক ভাবেই অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে বাগানের দিকে চলে যায়।

বাগানের মধ্যে ঝোপে ঝোপে অন্ধকার যেন স্তূপ বেঁধে আছে এখানে ওখানে। এবং সেই স্তূপ স্তূপ অন্ধকারের মধ্যে জোনাকীর আলোর চুমকি।

কোথায় যেন একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

দীর্ঘকায় সুন্দরম অন্ধকার বাগানের মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

গত মাস দুই ব্যবসার ধাক্কায় সুন্দরম এক প্রকার মৃন্ময়ীর কথা ভুলেই গিয়েছিল। বাড়ীতেও সে খুব কম সময়ই থেকেছে।

বেশীর ভাগ সময়ই তার বাইরে বাইরে কেটেছে।

এতদিন যে বেপরোয়া জীবন বেশীর ভাগ নৌকায় জলে জলেই কেটে গিয়েছে, যে জীবনের সঙ্গে সেই কিশোর বয়স থেকে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সেই জীবন থেকে হঠাৎ রাতারাতি সরে আসা যতটা সে সহজ ভেবেছিল আসলে সেটা ততটা সহজ ছিল না এবং যতদিন যাচ্ছিল ক্রমশ সেটা সে উপলব্ধি করছিল।

মনে হচ্ছিল তার কি প্রয়োজন ঐ সব ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়বার।

নির্ঝঞ্ঝাটে বেশ আরামের এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই ত আছে। কিন্তু ঐ সঙ্গেই প্রায় মনে পড়েছে মৃন্ময়ীর মুখখানা। মৃন্ময়ী ডাঙ্গার মানুষ —জলে জলে থাকতে হয়ত সে পারবে না। অথচ মৃন্ময়ীকেও আজ আর তার পক্ষে ছাড়া সম্ভবপর নয়। মৃন্ময়ীকে বাদ দিয়ে আজ জগতটাই ত' তার কাছে মিথ্যে।

দ্বিগুণ উৎসাহে মনকে বেঁধেছে সুন্দরম।

দ্বিগুণ উৎসাহে কি ব্যবসা করা যায় সেই কথা চিন্তা করেছে। মোটামুটি কিছুদিন হলো ব্যবসাও একটা সে শুরু করে দিয়েছে।

চালের ব্যবসাই সে শুরু করেছে। নিজের বিরাট ছয় মাল্লাবাহী নৌকাটা বেচে খান দুই মহাজনী নৌকা কিনেছে। সে নৌকায় এক কিস্তি চালও এসে গিয়েছে। তাই কয়দিন থেকে ভাবছিল মৃন্ময়ী আর একটু সুস্থ হলেই তাকে সে বিবাহ করবে। এবং সেই কারণেই আজ করালীচরণকে ডেকে এনেছিল। কিন্তু কবিরাজ মশাই কি বলে গেলেন। তাকে বোকা, গাড়োল বললেন কেন?

শিবনাথও অন্ধকারে বাগানের মধ্যে চুপটি করে বড় বকুল গাছটার নীচে একটা যে বড় পাথর ছিল সেই পাথরটার উপর চুপচাপ বসেছিল। সেও মৃন্ময়ীর কথাগুলোই ভাবছিল।

সুন্দর সাহেব লোকটা দস্যু—ডাকাত—শয়তান—খুনী। মৃন্ময়ীকে এক রাত্রে তাদের বাড়ি থেকে ডাকাতি করে ধরে নিয়ে এসেছে। সুন্দর সাহেব একজন পর্তুগীজ ডাকাত। জলদস্যু।

এক পর্তুগীজ জলদস্যুর আশ্রয়ে এসে সে উঠেছে। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে সে কিনা এক জলদস্যু—বিধর্মী—ডাকাতের অন্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করচে। সত্যি সত্যিই কি মৃন্ময়ী যা তাকে বললে তা সত্যি। তাহলে ত সে ধর্মচ্যুত হয়েছে। ধর্মে পতিত হয়েছে।

ধর্মে পতিত। সঙ্গে সঙ্গে জীবনকৃষ্ণর মুখখানা মনের পাতায় ভেসে ওঠে শিবনাথের। মনে পড়ে সেদিন জীবনকৃষ্ণ ডিরিজিও ছাড়াও আরো একজনের কথা বলেছিল ঐ ধর্ম আর সংস্কারের প্রসঙ্গেই। ধনী-মহাপণ্ডিত এবং মহা প্রতিপত্তিশালী লোকটি নাকি।

লোকটির নাম রামমোহন রায়। তিনি একটি সভা স্থাপন করেছেন—আত্মীয় সভা, ঐ আত্মীয় সভায় নাকি কেবল যে বেদ-উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা হয় তাই নয়, দেশের বর্তমান বহু সামাজিক সমস্যা ও কুসংস্কার কেমন করে দূর করা যেতে পারে আজকের দিনে—যেমন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বালবৈধব্য, জাতিভেদ ও সহমরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা নাকি হয়।

জীবনকৃষ্ণ আত্মীয় সভার অধিবেশনে মধ্যে মধ্যে যায়। জীবনকৃষ্ণ সেদিন ধর্ম ও সংস্কার সম্পর্কে ওদের পরস্পরের বাদ প্রতিবাদের মধ্যে যে কথাগুলো বলেছিল হঠাৎ যেন সেই কথাগুলো মনে পড়ে যায় শিবনাথের।

শুনেছি শিবনাথ, রাজা রামমোহন রায় কি বলেন জানিস ? আজকের সমাজের শাস্ত্রকার আর স্মৃতিকারের দল যতই সমাজকে তাদের নীতি আর চোখরাঙানী দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করুক না কেন আসলে এই যে সমাজের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও পৌত্তলিকতা, সহমরণ ও সতীদাহ প্রভৃতি বীভৎস ব্যাপার এগুলো আমাদের অযৌক্তিকতা ও অজ্ঞানতারই ফল। সত্যিকারের শিক্ষার অভাব। এই সব কুসংস্কার ও কুপ্রথা আমাদের সমাজ থেকে যেমন করে হোক দূর করতেই হবে—নচেৎ আমাদের মুক্তি নেই। জীবনকৃষ্ণ তবু তর্ক করবার চেষ্টা করেছিল শিবনাথ।

বলেছিল, বুঝলাম—কিন্তু এতকাল যা হয়ে এসেছে—সবাই আমরা মেনে এসেছি সেটাই মিথ্যা আর রাজা রামমোহন যা বলছেন তাই সত্যি, তাই বা মেনে নেবো কেন ?

শুধু তুই কেন শিবনাথ, জীবনকৃষ্ণ জবাব দিয়েছিল, অনেকেই মেনে নিতে চাইছে না—কিন্তু রাজা মিথ্যে কথা বলেননি এবং তিনি যে মিথ্যা কথা বলছেন না এও একদিন অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ হবে দেখে নিস, তোকে একটা রচনা দেবো পড়ে দেখিস ?

রচনা ?

হ্যাঁ—

কার রচনা ?

ভবানীচরণের লেখা। 'কলিকাতা কমলালয়' রচনার নাম। আজকের এই কলকাতা শহরের নাগরিক জীবনের একেবারে জীবন্ত চিত্র—

পড়েছিল জীবনকৃষ্ণর কাছ থেকেই নিয়ে ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' রচনাটা পরের দিন।

ভবানীচরণ যা লিখেছেন তার সার মর্মটুকু স্পষ্ট মনে আছে শিবনাথের।

ইংরেজ বনাম নবাবের সংগ্রামকালে কলকাতা মন্থন হয়েছিল, তাতে বিষাদরূপ হলাহল ও হর্ষরূপ অমৃত উভয়ই উঠেছিল, এবং তারই ফলে কলকাতা শহর ক্রমেই নিরুপম ও সর্ব দেশখ্যাত হয়ে উঠেছে। মুদ্রারূপ আলয় অগাধ জলে কলকাতার দুকূল ভরে উঠেছে ক্রমে এবং বিবিধ বিদ্যা ও বিধানরূপ রত্নের সমাগম হচ্ছে শহরে। তার মধ্যে পরনিন্দাপরায়ণ বহু হাঙ্গর এবং মূর্খরূপ ভয়ানক সব কুমীর স্বচ্ছন্দে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ শহরে সর্বদা লক্ষ্মী বিরাজ করছেন। "কমলা লক্ষ্মী তাহার আলয় এই অর্থ দ্বারা কমলালয়," অতএব "কলিকাতা কমলালয়।"

সত্যিই কি তাই।

সত্যিই কি এসব কিছু জীবনকৃষ্ণ যা বলতে চায়, তাদের আজকে অশিক্ষার কুসংস্কারই।

দোটানায় মন দুলতে থাকে শিবনাথের। এখানে সে থাকবে না চলে যাবে ?

চলে যদি যায় আজ এই সুন্দর সাহেবের আশ্রয় ছেড়ে তার পড়াশুনা ও বিদ্যালয়ে পড়ারও শেষ হবে।

যে বিদ্যার্জনের জন্য সে এত কষ্ট স্বীকার করে এসেছে সে বিদ্যার্জনের হয়ত এখানেই তার ইতি হবে।

তবে কি সে এই ম্লেচ্ছ বিধর্মী—জল দস্যুর আশ্রয়েই পড়ে থাকবে !

কিন্তু উপায়ই বা কি !

পাপের অধর্মের সে না হয় প্রায়শ্চিত্ত করবে পরে।

মনকে সান্ত্বনা দেয় শিবনাথ।

আজকের দিনে লেখাপড়া না শিখতে পারলে ত জীবনটাই বৃথা লেখাপড়া তাকে শিখতেই হবে। অবশ্য সেই সঙ্গে তার ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

মৃন্ময়ীর চোখেও সে রাত্রে ঘুম ছিল না।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে দুটি চক্ষু মেলে সে শয্যায় শুয়ে ছিল।

মৃন্ময়ী ভাবছিল সে ঐ কথাগুলো শিবনাথকে বলে ভা[illegible] করল কি মন্দ করল কে জানে ? শিবনাথ সুন্দরমের আশ্রিত তারই দয়ায় সে লেখাপড়া শিখছে। তাছাড়া তার প্র[illegible] প্রতিবাদেই ত বোঝা গেল বিশ্বাস করে নি সে তার কথাগুলো সুন্দর সাহেব সম্পর্কে। ছিঃ ছিঃ, ঝোঁকের মাথায় মৃন্ময়ী এ কি করে বসল ! সুন্দরম সম্পর্কে অত কথা কেন সে বলতে গে[illegible] শিবনাথকে ? শিবনাথের কাছে সুন্দরম ত দেবতা। এখন স[illegible] কথা যদি শিবনাথ সুন্দরমকে বলে দেয়। সুন্দরমের তখন [illegible] কিছুই জানতে আর বাকী থাকবে না। সুন্দরম জানবে সে ইচ্ছে করেই এখনো কথা বলছে না। ইচ্ছে করেই সে মূক হয়ে আছে।

সে সুস্থ আজ সম্পূর্ণ তবু অসুস্থতার ভাণ করছে। সুন্দর[illegible] সে কথা জানবার পর আর কি তার প্রতি এতটুকুও দয়া করবে।

হয়ত এবারে জোর করেই বিবাহ করবে তাকে।

কথাটা ভাবতে গিয়েও যেন শিউরে ওঠে মৃন্ময়ী। কি হবে তাহলে কি হবে !

চিন্তাটা যত মনের মধ্যে আসে ততই যেন মৃন্ময়ী অস্থির হয়ে ওঠে অন্ধকারে শয্যায় শুয়ে শুয়ে ঘামতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত মৃন্ময়ী আর শুয়ে থাকতে পারে না উঠে বসে শয্যার উপর, কি করবে এখন মৃন্ময়ী কি করবে !

অজ্ঞাত একটা বিভীষিকা যেন চারপাশ থেকে চেপে ধরতে থাকে মৃন্ময়ীকে।

সমস্ত বাড়িটা নিঝুম হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোন সাড়া পর্যন্ত নেই।

শয্যা থেকে নামল মৃন্ময়ী।

অন্ধকারে পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মৃন্ময়ী জানে শিবনাথ কোন ঘরে শোয়।

মৃন্ময়ী যে ঘরে থাকে তার দু'খানা ঘরের পরের পুবের ঘরটাতেই শিবনাথ থাকে তা জানত। মৃন্ময়ী পায়ে পায়ে অন্ধকার বারান্দা অতিক্রম করে শিবনাথের ঘরের দিকেই এগুতে থাকে।

বুকটার মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে, কারণ যে ঘরে শিবনাথ থাকে তারই পাশের ঘরটা সুন্দরমের। সে যদি কোনক্রমে জানতে পারে ব্যাপারটা, তাহলে কি যে হবে কে জানে। কিন্তু সে রাত্রে মৃন্ময়ী যেন মরীয়া হয়ে উঠেছিল।

তার ছলনাটা ধরা পড়ে গেলে সুন্দরমের কাছে কি হবে, সেই দুর্ভাবনায় মৃন্ময়ী যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছিল।

অনুমানের 'পরেই কতকটা নির্ভর করে ভেজান দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল মৃন্ময়ী।

শিবনাথের ঘরের ভিতরটাও অন্ধকার।

অতি সামান্য বাইরের ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে যা প্রবেশ করেছিল তাতে করে জানালাটার সামনে সামান্য একটু আলোছায়া ছাড়া বাকী ঘরটাই ছিল অন্ধকার।

ইতিপূর্বে কখনো ঐ ঘরে পা দেয়নি মৃন্ময়ী। ঘরটা কেমন, কি আকারের এবং ঘরের কোথায় কি, কিছুই মৃন্ময়ীর জানা নেই।

তাই বুঝি মৃন্ময়ী অন্ধকার ঘরের মধ্যে পা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায়। বুকটার মধ্যেই তখন তার শুধু কাঁপছে না—দীর্ঘ দিনের অনভ্যাস ও বেশ কিছুটা উত্তেজনা সব কিছু মিলে ঐটুকু পথ অতিক্রম করেই পা দুটোও কাঁপছে মৃন্ময়ীর।

ক্রমশঃ অন্ধকারটা চোখে সয়ে গেলে মৃন্ময়ীর চোখে পড়ল অদূরে জানালার সামনে যে আলো আঁধারী সেইখানে যেন একটা পালঙ্ক রয়েছে।

কে একজন সেই পালঙ্কের শয্যায় শুয়েও আছে মনে হলো। শুয়ে আছে একটা মানুষ বটে সত্যি কিন্তু সে শিবনাথ না হয়ে যদি অন্য কেউ হয়।

ধ্বক করে ওঠে বুকের ভিতরটা মৃন্ময়ীর।

মৃন্ময়ী পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। আর ঠিক সেই সময় শিবনাথের কণ্ঠস্বরটা তার কানে আসে।

কে! কে ওখানে?

মৃন্ময়ী কিন্তু জবাব দিতে পারে না সঙ্গে সঙ্গে। দাঁড়িয়ে থাকে।

জবাব দিচ্ছ না কেন? কে?

বলতে বলতে কথাটা শিবনাথ শয্যা থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়ায়। শিবনাথ ঘুমায়নি, জেগেই ছিল। জেগে চোখ দুটো মাত্র বুজিয়ে ছিল।

তাই মৃন্ময়ীর পদশব্দ সতর্ক ও ক্ষীণ হলেও তার কানে প্রবেশ করেছিল।

শিবনাথ শুধু উঠেই দাঁড়ায় না মৃন্ময়ীর সামনে এগিয়ে আসে, কে!

শিবনাথ!

চাপা সতর্ক কণ্ঠে সাড়া দেয় এবারে মৃন্ময়ী এবং কণ্ঠস্বরটা তার কেঁপে ওঠে।

কে! কে?

আমি—মৃন্ময়ী—

মৃন্ময়ী—শিবনাথের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না। একটা ঢোক গিলে বলে, তুমি—

হ্যাঁ—

কিন্তু এত রাত্রে?—

সহসা ঐ সময় মৃন্ময়ী দু'হাত বাড়িয়ে শিবনাথের একটা হাত চেপে ধরে এবং মৃন্ময়ীর কোমল হাতের স্পর্শ নিজের হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শিবনাথের দেহের সমস্ত রক্ত এক সঙ্গে ছলাৎ করে ওঠে।

ছলাৎ করে উঠে বুকের 'পরে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। শিবনাথের বাকশক্তি যেন সেই সঙ্গে লোপ পায়।

শরীরের সমস্ত স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন কিসের একটা অনুভূতি শির শির করে বয়ে চলেছে।

শিবনাথ, লক্ষীটি বল, সব কথা তুমি বলে দেবে না সুন্দরমকে চাপা আকুতিতে যেন মৃন্ময়ীর কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়।

বলে দেবো না, কি বলে দেবো না? ক্ষীণ কণ্ঠে শুধায় এতক্ষণে শিবনাথ।

আজ সন্ধ্যাবেলা যে সব কথা তোমাকে বলেছি—বল, বলে দেবে না? শিবনাথ, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন! বল?

শিবনাথ আবছা আলো-আঁধারে তখনো মৃন্ময়ীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আবছা আবছা মৃন্ময়ীর মুখখানা দেখা যাচ্ছে। তার গরম গরম নিঃশ্বাস শিবনাথের চোখে-মুখে এসে পড়ছে। শিবনাথের একটা হাত তখনো মৃন্ময়ীর হাতের মধ্যে ধরা আছে।

শিবনাথ চুপ।

বলবে কি সে, কোন শব্দ যেন গলা দিয়ে বেরুতেই চাইছে না।

শিবনাথ—যে হাতটা শিবনাথের তার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা ছিল, সেই হাতটা ঝাঁকিয়ে আবার ডাকল মৃন্ময়ী, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

না মৃন্ময়ী—বলবো না।

ঠিক তো?

হ্যাঁ ঠিক—যেন ফিস ফিস করে শেষের কথাগুলো বললে শিবনাথ।

মৃন্ময়ী আর দাঁড়াল না।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আর শিবনাথ।

সে তখনো অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

গভীর একটা উত্তেজনার পর সমস্ত শরীরের স্নায়ুগুলো তখন তার যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় গলা-বুক যেন সব শুকিয়ে গিয়েছে এবং ঠিক সেই সময় বারান্দায় যেন কার ভারী পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শিবনাথ টের পায় সেই ভারী পায়ের শব্দটা ক্রমশ তার ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে।

শব্দটা এসে তার ঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়ায় এবং তার পরই একটা ছায়ামূর্তি তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—রামপ্রসাদ সেন

ঋগ্‌বেদ

প্রথম মণ্ডল

ষষ্ঠ সূক্ত

১। দীপ্ত মহান রথ ধাবমান দ্যুলোকে আলোক সাজে,
সে জ্যোতি-লগনে গগনে গগনে উজল ভুবন রাজে।

২। অতি প্রিয় তাঁর যুগ্ম তুরগ, উগ্র, অরুণ-জ্যোতি,
যোজিত সে রথে,—অম্বর পথে বজ্রপাণির গতি।

৩-৪। নির্বোধে বোধ, কুরূপে কান্তি দানিল মরুদ্‌গণ,
তারি উন্মেষে নব নব বেশে ইন্দ্র প্রসূত হন।
সে মরুৎ সবে দিব্য বিভবে দিব্য সংজ্ঞা ধরি,
লভে আরবার গর্ভ-আধার স্বধর্ম অনুসরি।

৫। মরুৎ সহায় চিরপ্রভাময় দেবেন্দ্র, সন্ধানী,
দীর্ণ করিয়া সুদৃঢ় বাধায় ঘোষিল আলোক-বাণী।

৬। সত্য ভাষণে বিকশিত যিনি, দিব্য-শ্রবণ তাঁর,
যাচে দেবত্ব সে বাণী সত্য-সত্তার অধিকার।

৭। মহেন্দ্র সাথে হেরিনু তোমারে,—দীপ্ত সে নির্ভীক,
তারি আনন্দ চেতনা-প্রভায় ব্যাপিল দিগ্‌বিদিক্‌।

৮। শক্তিবৃন্দ ভূষিল ইন্দ্রে অনিন্দ জ্যোতি দানে,
পুরিল যজ্ঞ মুখরিত করি আলোক-মন্ত্র গানে।

৯। অনন্তগামী, এস এস নামি, দীপ্ত ভুবন হতে,
প্রকাশের বাণী প্রবুদ্ধ হোক তব আলোকেরই স্রোতে।

১০। যাহা কিছু যাচি দ্যুলোকে, ভূলোকে, নভতলে-অম্বরে,—
বাসবেরে যাচি সকল মন্ত্রে অতুল শ্রদ্ধাভরে।

সপ্তম সূক্ত

১। উদার ছন্দে উদ্‌গাতা গাহে সুমহান সাম-গীত,—
দীপ্ত, সত্য মন্ত্র ভাষণে সুরেন্দ্র বিভাসিত।

২। যে বাণী যোজিল যুগ্ম অশ্ব, তেজোময়, বেগবান,
বিকাশি সত্য সে মহামন্ত্র গাহে বাসবেরই গান।

৩। দূরদর্শনে দ্যুলোকে ইন্দ্র প্রকাশিল প্রভাকরে,
ভেদিয়া ভূধর জ্যোতি-নির্ঝর ঝরিল ধরণী পরে।

৪। সহস্রধারা সম্পদ মাঝে অমিত ঋদ্ধি দানে,
পালিও মোদের, দেবেন্দ্র তব তেজোময় কল্যাণে।

৫। তোমারে ইন্দ্র করে আহ্বান, ধনী দরিদ্র সনে,—
বজ্রী সহায়, তামস শক্তি বৃত্রাসুরের রণে।

৬। এস চিরদাতা, চরু-আবরণ ভাঙি কর খান খান,
হে পুরুষ-বৃষ, আপনা প্রকাশ দূর করি ব্যবধান।

৭। বজ্রী তোমার সকল মন্ত্র সতত ঊর্ধ্বগামী,
প্রতিষ্ঠাবান সে মহামন্ত্রে বঞ্চিত শুধু আমি!

৮। গোযূথে যেমন সঞ্চারে বৃষ আনন্দ অভিলষি,—
বেগভরে ধায় বাসব মহান্‌ কর্মীসত্ত্বে পশি।

৯। দেবতাবৃন্দ পূজিল ইন্দ্র, পূজিছে কর্মী সবে,
পঞ্চ লোকের পূজ্য ইন্দ্র, মহাজ্যোতি-উৎসবে।

১০। স্থাপিনু বাসবে ঊর্ধ্ব আসনে জনকল্যাণ স্মরি,
নমি বারে বারে পাই যেন তাঁরে মোদের আপন করি।

অষ্টম সূক্ত

১। যদি আন তব কল্যাণ-বিভা স্বস্তি-মন্ত্র ভাণি,
জয়-অধিকারে এস বেগভরে হে দেব বজ্রপাণি।

২। প্রাণশক্তিতে হানিয়া মুষ্টি, বৃত্রসৈন্যচয়—
নাশিব, নাশিব, নাশিব আঁধার, জিনিব সুনিশ্চয়।

৩। অশনি সহায়, নাহি কোনো ভয়, বৃত্রসূদনে বন্দি—
লভিব বিজয় সকল যুদ্ধে, উচ্ছেদি প্রতিদ্বন্দ্বী।

৪। ত্রাশিতে বৈরী, নাশিতে যতেক অসুর যুদ্ধকামী,
সশস্ত্র শূরবৃন্দ আসিল, ইন্দ্র প্রসাদে নামি।

৫-৬। দীপ্ত, মহান, বিপুল বজ্রী, ত্রিদিব আলোককারী,
প্রসারিত হোক ভুবনে ভুবনে নির্মল জ্যোতি তাঁরই
সে আলোকপাতে জাগুক ধরাতে পুরুষ শক্তিশালী,
লভুক-সিদ্ধি, বিজয়-বৃদ্ধি, চেতনা-প্রদীপ জ্বালি।

৭। আনন্দ-সুধা পূর্ণ ইন্দ্র, বিপুল জঠরধারী,
মেরু হতে যেন অবাধে ঢালিছে মহাসিন্ধুর বারি।

৮। তাঁহারি আলোক-প্রেরণা প্লাবিত নিখিল বসুন্ধরা,
ফলভারনত তরুশাখা সম সাধকে দিতেছে ধরা।

৯। ইন্দ্র তোমার সকল বিভূতি সকল স্বস্তি-বাণী,
মম সম এই দীন যাজ্ঞিকে নিঃশেষে দাও দানি।

১০। উচ্চারি তব প্রকাশ-মন্ত্র, তব প্রতিষ্ঠা গান,—
হে দেব ইন্দ্র, সত্য ভাষণে, সোমসুধা কর পান।

নবম সূক্ত

১। মোদের আহুতি পর্বে পর্বে রস অনুভূতিধারা,
তেজোময় তব পরশে ইন্দ্র, ইষ্ট লভুক তারা।

২। পূর্ণ পাত্র রস-উচ্ছল, হর আবরণ তার,
বিশ্বকর্মা দেবেন্দ্র লাগি প্রস্তুত রসভার।

৩। বহে রসধারা বিশ্বকর্মী,—ব্যাপিয়া সর্বলোক
এস মহাপ্রাণ, তাহারি মাঝারে প্রতিষ্ঠা তব হো'ক।

৪। মন্ত্র আমার মুক্ত করিনু জ্যোতির যূথের প্রায়,
বিরহিণী তারা, পুরুষশক্তি তোমারেই শুধু চায়।

৫। দেবেন্দ্র তব মহাবরেণ্য, বহুভঙ্গিম তৃপ্তি,
নামুক বহিয়া আকাশগঙ্গা প্রকাশি আলোকদীপ্তি।

৬। হর্ষিত মোরা, দর্শিও সবে সার্থক করি জয়,
ভ্রান্তিবিহীন পন্থা তোমার হে দেব জ্যোতির্ময়।

৭। সর্বব্যাপ্ত, দিব্য-শ্রবণ, হে দেব জ্যোতির্ময়,
প্রতিষ্ঠ তব প্রাণস্বরূপিণী, সম্পদ অক্ষয়।

৮। কর প্রতিষ্ঠা হে দেব ইন্দ্র, মহান, দিব্যশ্রুতি,—
তব জ্যোতি-বিভা পরশে জাগুক মোদের চেতনা-দ্যুতি।

৯। সকল বস্তু অধিকারী যিনি আলোকমন্ত্রাধার,
স্বস্তি-সক্ষ্যি, চলমান দেবে প্রণমি বারংবার।

১০। করি সোম দান, ইন্দ্র মহান, গূঢ় অন্তরবাসী,
শক্তি লভিল আর্যযোদ্ধা, তাঁহারি মন্ত্র ভাবি।

দশম সূক্ত

১। সামগায়কেরা তোমারে স্মরিয়া গাহে গায়ত্রী-গীত,
ঋক্-সংগীতে তব জ্ঞানজ্যোতি শতক্রতু প্রকাশিত।
ব্রহ্মমন্ত্র ঘোষক যাহারা, তোমারেই পূজে তারা,
সোপানে সোপানে আরোহী উর্ধ্বে আনন্দে হয় হারা।

২। উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া যে পালে আপন ধর্ম,
প্রকাশিত হবে সম্মুখে তার বহু নব নব কর্ম।
বৃষরাজ সম তখনি ইন্দ্র আলোক গোযূথ লয়ে,—
বৃত্রহন্তা দেখাবে পন্থা, আঁধারে দিশারী হয়ে।

৩। কেশর-ভূষিত যুগ্ম অশ্ব, তেজোময় পরিপুষ্ট,—
তব রথশোভা ; সত্য শ্রবণে দেবেন্দ্র হও তুষ্ট।

৪। সাড়া দিও তুমি হে সার-সত্য, নিবেশ মন্ত্র গানে,—
উপচিত করি অন্তরবাণী, যজ্ঞে ঋদ্ধি দানে।

৫। বিবর্ধমান সত্য ভাষণ ভাণিও ইন্দ্র তরে,
সখা সম তবে আসিবে বজ্রী রস নিবেদন পরে।

৬। বজ্রধারী সে, শক্তিস্বরূপ, সর্ববস্তুসার,
পূর্ণানন্দে, অমিতবীর্যে মিত্রতা যাচি তাঁর।

৭। কলঙ্কহীন, ব্যাপ্ত, উদার বজ্রী তোমার দানে,—
বিমুক্ত কর আলোক-আবাস, সন্তোষে কল্যাণে।

৮। ধাও যবে তুমি ঋজু গতিভরে স্বর্গমর্ত্যে কেহ,
পারে না রোধিতে, জ্যোতি নির্ঝরে বিতরে বিপুল স্নেহ।

৯। দেবেন্দ্র তব দিব্য শ্রবণ,—শুন আহ্বান-বাণী,
লহ অন্তরে হে সখা মোদের নিবেশ-মন্ত্রখানি।

১০। ঋদ্ধি যাঁহার করে অধিকার সহস্র কল্যাণ,
দিব্য-শ্রবণ, হয়ে এক মন গাহি তব জয়গান।

১১। কৌশিক কুলদেবতা ইন্দ্র, এস এস রসপানে,
লয়ে চল সবে পার হতে পারে অমিত সিদ্ধিদানে।

১২। তোমারেই ঘেরি উঠে মঞ্জুরি সত্যভাষণ জ্যোতি,
তব বৈভবে মোদেরি বিভব দেবেন্দ্র শচীপতি।

রাধা সঙ্গীত

[সরোজিনী নাইডুর The Song of Radha হইতে অনুবাদ]

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

মথুরার হাটে যবে দধি ল'য়ে গেনু
সুধীরে ঘুরিতেছিল বাছুর-ধেনু,
বলিতে চাহিনু "দধি কে চায়, কে চায়!
শাদা দধি যেন শাদা মেঘ ভেসে যায়।"
শ্রাবণের সমীরণ বহিছে চুপে
ছিল মোর ভরা মন তোমারি রূপে ;
সখী যত হেসে গলে শুনি অকারণে :
"গোবিন্দ, গোবিন্দ,
গোবিন্দ, গোবিন্দ !"
আনন্দে যমুনা বহে মন্দ সমীরণে।

মথুরার মন্দিরে নামানু কেঁড়ে
মাঝি তার তরী বায় মাথাটি নেড়ে,
সখীরা কহিল : "ওলো আয় আয় নাচি
রঙীন ওড়না গায় বসন্ত যাচি।
আয় ছুটে আয় তুলি কুসুম কুঁড়ি—"
মন মোর ভরছিল তোমারে জুড়ি,
হাসিয়া উঠিল তারা শুনিয়া শ্রবণে :
"গোবিন্দ, গোবিন্দ,
গোবিন্দ, গোবিন্দ !"
সুন্দর যমুনা বহে মন্দ সমীরণে।

মথুরার মন্দিরে অর্ঘ্য আনি
বেদী'পরে জ্বালা ছিল প্রদীপ খানি
করজোড়ে যেই যাবো বলিতে আমি :
"আলোময়, আলো দাও দিবস-স্বামী ;
ওই বুঝি বাজে ওই শঙ্খ কাঁসা
পাগল হিয়াটি মোর হারালো বাসা—"
কিছুতো হ'লো না বলা মন শুধু কহে :
"গোবিন্দ, গোবিন্দ,
গোবিন্দ, গোবিন্দ !"
উজ্জ্বল যমুনা সে ছল ছল বহে।

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৫৪

কুলিয়াতে দেবানন্দ পণ্ডিতকে কৃপা করলেন প্রভু।

হৃদয়ে ভক্তি নেই তবু ভাগবত পড়াত দেবানন্দ। একদিন এমনি পড়াচ্ছে, শ্রীবাস দৈবাৎ উপস্থিত হল। পাঠ শোনামাত্র প্রেমবিকার দেখা দিতেই মূর্ছা গেল শ্রীবাস। প্রেমবিকারের মর্ম না বুঝে সশিষ্য দেবানন্দ শ্রীবাসকে সরিয়ে রাখল একপাশে। এই থেকেই দেবানন্দের অপরাধ।

কিন্তু দেবানন্দের একটা সুকৃতি ছিল, সে বক্রেশ্বরকে শ্রদ্ধা করত। বক্রেশ্বর প্রভুর প্রিয় ভক্ত, কীর্তনসঙ্গী। দেবানন্দ যখন তার সঙ্গ করছে তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে দেখা দিয়েছে ভাগবতী বুদ্ধি।

ঠিক তাই। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ভক্তিহীন দেবানন্দ প্রভুর চরণে এসে পড়ল। জানাল তার দৈন্য-কাতরতা। প্রভু তাকে কৃপা করলেন, প্রকাশ করলেন ভাগবতের স্বরূপ-তত্ত্ব। প্রতিষ্ঠিত করলেন কৃষ্ণপ্রেমে। 'কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।' আর ভক্তসেবা হতেই কৃষ্ণপ্রেম।

কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়ার খবর কী?

শাশুড়ির সঙ্গে ঘাটে এসেছে স্নানের উপলক্ষ্যে। এপার-ওপার এত ভিড় কেন, কেন এত হুলুস্থুল? কে এক সন্ন্যাসী এসেছে—লোকমুখের কথা কানে আসছে দুজনের। কত তার কাহিনী, কত কীর্তন, কত নৃত্যগীত। শচীমাতার মন উচাটন হয়ে উঠল। একবার তার নাম জানতে পাই না? শাশুড়ির শাড়ীর আঁচল মুঠো করে চেপে ধরল বিষ্ণুপ্রিয়া? একবার দেখতে পাই না স্বচক্ষে?

গঙ্গার পরিসর এখন কম, ঠাহর করলে এপার থেকে ওপার বুঝি দেখা যায়। আর যে সন্ন্যাসী এসেছে তাকে যে লক্ষ লোকের মধ্যেও দেখা যায় আলাদা করে। সে যে সকলের চেয়ে দীর্ঘাঙ্গ, লক্ষলোকের মাথার উপরে তার মাথা। জীবের দর্শন যাতে সুলভ হয় তারই জন্যেই তো তিনি এত দীর্ঘাবয়ব হয়েছেন। চোখ তুলে তাকালেই আসবেন নজরে।

শচীমাতা বুঝলেন কে এ সন্ন্যাসী। কিন্তু কী করে যাবেন ওপার? যাবার অনুমতি কই? এত কাছে থেকেও এত দূর? আনন্দে-বেদনায় ভেঙে পড়লেন শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে ধরে ঘরে নিয়ে এলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধরে কে?

খবর পাঠালেন প্রভু, জননী ও জন্মভূমিকে দেখতে আসছেন তিনি নবদ্বীপ। আর কাউকে নয়? বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখ ছলছল করে উঠল। কী করে দেখবে তাকে? সে যে যুবতী স্ত্রী! যুবতী স্ত্রীর মুখ দেখে না সন্ন্যাসী।

মা'র সঙ্গে কার কথা। মাকে দেখবে বলে কি স্ত্রীকে দেখা চলে?

রাত্রে ঘুম এল না বিষ্ণুপ্রিয়ার। কে জানে তাকে তাঁর মনেই বা আছে কিনা। সেদিনের সেই ঔজ্জ্বল্য তো তার কিছুই নেই। আজ সে ম্লান, শ্রীহীন। দীন দরিদ্র বেশবাস, অঙ্গ আভরণশূন্য। আজ সে আনন্দ পূর্ণিমা নয়, আজ সে বিষাদপ্রতিমা। কী করে চিনবেন। না চিনলে অপরাধের হবে না।

চারদিকে রব পড়ে গেল, নবদ্বীপে পৌঁচেছেন প্রভু। রাত্রে আছেন শুক্লাম্বরের বাড়িতে। সকাল হলেই আসবেন মার কাছে।

সকাল হলেই গঙ্গাস্নান সেরে মিশ্র ভবনের দরজায় এসে দাঁড়ালেন প্রভু। কিন্তু যে দেখল সেই হতবাক হয়ে রইল। আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শী কারুরই কোনো বাক্যস্ফূর্তি নেই। কারুরই আর কোনো অভিযোগ নেই, অভিমান নেই। স্বয়ং শচীমাতাও স্তব্ধ। প্রসাদ পরিপূর্ণ।

এই সেই গৃহ। এই সেই বৃক্ষলতা। ঐ সব পরিচিত জিনিসপত্র। কিন্তু প্রভুর মনে এতটুকুও চাঞ্চল্য নেই কৌতূহল নেই। তার প্রশান্ত চিত্ততায় রেখা নেই এতটুকু। এসেছি, কাজ হয়ে গিয়েছে, এবার ফিরে যাই।

ফিরে যাবেন? কিন্তু কোন সাহসে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর সন্নিহিত হবেন? শত শত লোক যে ভিড় করে আছে। অন্তরালে দাঁড়িয়ে প্রভুকে যে একটু দেখবেন চোখ ভরে তারও সুবিধে নেই। তবে কি বিনা দর্শনেই চলে যেতে দেব? কোনো কথা বলব না? ভিক্ষে করে নেব না কিছু চেয়ে?

কিসের লোকাপেক্ষা? সর্বাঙ্গ বস্ত্রে ঢেকে বিষ্ণুপ্রিয়া ছুটে এসে গৌরহরির পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

'এ কে?' পিছনে দু'পা হটে গেলেন প্রভু।

এ কে তা কে বলবে? উপস্থিত সমস্ত লোক নীরবে কাঁদতে লাগল।

'ত্রিজগৎ উদ্ধার পেল, আমিই শুধু ভবকূলে পড়ে থাকব?' নতমুখে জিজ্ঞেস করল বিষ্ণুপ্রিয়া।

প্রভু সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও। তোমার নামকে সার্থক করো।'

'তাই করব। কিন্তু আমাকে কিছু দিয়ে যাও।'

'কী দেব? কী আমার দেবার আছে?' প্রভু তাকালেন চারদিকে। পরে স্নেহস্বরে বললেন, 'না, আছে। পায়ের দুখানি খড়ম আছে। এই খড়ম খানি নাও, তোমার কাছে রাখো। তোমার বিরহক্লেশের শান্তি হোক।'

চকিতের মত অন্তর্হিত হয়ে গেলেন প্রভু।

নবদ্বীপ থেকে চললেন শান্তিপুর। অদ্বৈতের বাড়ি গিয়ে উঠলেন। বললেন, 'এখানে কদিন বিশ্রাম করব। মাকে পালকি পাঠাও। মার হাত থেকে ভিক্ষে নেব এ কদিন। আবার কদিন মার সেই নিমাই হয়ে থাকব।'

নবদ্বীপে পালকি পাঠানো হল। চলে এলেন শচী মা। নিমাই খাবে, আবার আগের মত বসলেন রান্না নিয়ে। কিন্তু এ রান্নায় যা তৈরী হবে তা বুঝি অন্নের চেয়েও বেশি, তা অন্তরের নৈবেদ্য। এ ঈশ্বরকে কোন আরাধিকার নিবেদন।

আচার্যগৃহে দশদিন থাকলেন প্রভু।

বললেন, 'মা এইবার বিদায় দাও। উত্তর-পশ্চিমের তীর্থস্থান দেখে আসি, কাশী, প্রয়াগ ব্রজমণ্ডল।'

এবার বুঝি শোকে অভিভূত হবার চেষ্টা নেই শচীমার। প্রভুকে আশীর্বাদ করে শিবিকায় গিয়ে উঠলেন। ফিরে যাই নবদ্বীপ। দেখি গিয়ে নাম প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়া কী ভাবে তণ্ডুলে হরিনামের সংখ্যাপূর্ণ করছে।

সকলের থেকে বিদায় নিয়ে প্রভু আবার পরিব্রজ্যা আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলল জনতা, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, যেন নদীই বেগে-বলে বাড়তে বাড়তে চলেছে সমুদ্রের দিকে। কে এত বড় দলের খাওয়া জোটাবে? আর কে? ভগবান জোটাবেন। যে গ্রামে যখন মধ্যাহ্ন পড়বে সেই গ্রামের লোকেরাই তখন ভগবৎপ্রেরিত হবে। নিয়ে আসবে খাদ্য ভার।

সেদিন ভিক্ষান্তে হঠাৎ মুখশুদ্ধির জন্যে হাত বাড়ালেন প্রভু।

গোবিন্দ ঘোষ কাছে ছিল, সে ছুটল গ্রামের দিকে। কোত্থেকে একটা হরীতকী জোগাড় করে আনল। তার থেকে এক খণ্ড দিল প্রভুকে।

পরদিন দল অগ্রদ্বীপে এসে পৌঁচেছে। ভিক্ষান্তে প্রভু আবার মুখশুদ্ধির জন্যে গোবিন্দের কাছে হাত বাড়িয়েছেন।

গোবিন্দ তখুনি দ্বিতীয় খণ্ড হরীতকী দিল।

প্রভু বিস্ময় মানলেন। 'কাল হরীতকী জোগাড় করতে কত দেরি করেছিলে আর আজ চাওয়া মাত্রই পেয়ে গেলাম?'

'কাল যে হরীতকীটি পেয়েছিলাম তার থেকে কিছুটা আপনাকে দিয়ে বাকিটা রেখে দিয়েছিলাম।' সরলমুখে বললে গোবিন্দ, 'সেই বাকিটার থেকেই আজ দিলাম এখুনি।'

'তুমি তাহলে সঞ্চয় করেছিলে?' প্রভুর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

মুখ শুকিয়ে গেল গোবিন্দের।

'তোমার সঞ্চয়ের স্পৃহা যায়নি এখনো। ঈশ্বরে আজো তোমার সমগ্র নির্ভর। সুতরাং, প্রভু কঠিন

হলেন : 'আমার সঙ্গ ছাড়ো। তোমার পথ ত্যাগের নয়, সঞ্চয়ের, সংসারের। গোবিন্দ, তুমি গৃহস্থ হও।'

গোবিন্দ কাঁদতে লাগল। কিন্তু প্রভু তাকে সঙ্গে নিলেন না। রেখে গেলেন অগ্রদ্বীপে। প্রভু বললেন, 'তুমি কেঁদো না, তোমাকে দিয়ে অসাধ্যসাধন করাব। দেখাব ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা।'

সদলবলে প্রভু চললেন গৌড়ের দিকে। গৌড়ের কাছে 'রামকেলি' গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন।

গৌড়েশ্বর হুসেনশাহের কানে কলরব এসে পৌঁছুল। এত লোকজন কেন, কেন এত কোলাহল? দেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব দেখা দিল নাকি?

না, না, ভয় কিসের? একজন সন্ন্যাসী আর তার শিষ্য-অনুচর।

শিষ্য-অনুচর? কিন্তু অগণন কেন? তাদের স্বার্থ কী পর্যটনে? কিসের লোভে তারা পিছু নিয়েছে? 'বিনা দানে এত লোক যার কাছে হয়। সেই ত গোসাঞি—ইহা জানিহ নিশ্চয়॥' তবেই বোঝ এ সন্ন্যাসী কত বড় নেতা। নিঃস্বার্থে আকর্ষণ করেছে সবাইকে।

হুসেনশার মনে স্বস্তি নেই। সে হিন্দুমন্ত্রী কেশব ছত্রীকে খোঁজ নিতে পাঠাল।

কেশবও আগের মত সায় করল। এক ভিখিরি সন্ন্যাসী তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছে। তাকে দেখতে দু'চার জন অলস কৌতূহলী একত্র হয়েছে মাত্র। তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তাকে হিংসা করারও মানে হয় না।

কিন্তু কেশবেরও অস্বস্তি হতে লাগল। কে জানে বহু লোকজন দেখে হুসেনশা যদি হঠকারিতা করে প্রভুকে আক্রমণ করে বসে। সুতরাং নবাবকে সরিয়ে দেওয়াই ভালো। গোপনে নবাবকে খবর দিল, পালাও।

অত সহজে তটস্থ হবার পাত্র নয় হুসেনশা। আরো দুই হিন্দুমন্ত্রীকে পাঠাল আসল কথাটা কী জেনে আসতে।

দবির খাস আর সাকর মল্লিক। দাক্ষিণাত্যের রাজবংশীয় ব্রাহ্মণ, দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলায় চলে এসেছে। বিদ্যাবুদ্ধিবলে পেয়েছে মন্ত্রীপদ।

'কে এ সন্ন্যাসী?'

দবির খাস বললে, 'যিনি আপনাকে রাজ্য দিয়েছেন, যাঁর মঙ্গলেচ্ছায় আপনার সমস্ত কার্যসিদ্ধি হচ্ছে, সং জয় দেখছেন সেই ঈশ্বরই এই সন্ন্যাসী।'

'কী বলছ তুমি?' হুসেনশা আবিষ্ট চোখে তাকি রইল।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আপনার সৌভাগ্যে তি আপনার রাজ্যে প্রমূর্ত হয়েছেন।'

'সত্যি?'

'আমাকে জিগগেস করছেন কেন। নিজের অন্তরে জিগগেস করুন। আপনার যেমন অনুভব তেম প্রমাণ।' 'তোমার চিত্তে যেই লয় সেই তো প্রমাণ।'

আশ্চর্য, ক্রুদ্ধ হতে পারল না হুসেনশা। ব বিনত হল। নম্রস্বরে বললে, 'আমারও প্রাণ তা বলছে। কেন বলছে কে বলবে।' চিন্তাকুল মু নবাব অন্তঃপুরে চলে গেল।

কী মতলব নবাবের কে জানে। হয়তো মৌলিক সৌজন্য দেখাচ্ছে অন্তরের ক্রূরতার ছোরা। দরকা কী। সন্ন্যাসীকে সতর্ক করে দিয়ে আসি। দর্শন যেখানে সহজ তখন সুযোগ ছাড়ে কে?

দবির আর সাকর বেশ বদলালো। অর্ধরাত্রে চলল প্রভুর সকাশে।

এত রাতেও কেউ ঘুমোয়নি দেখছি। প্রেমের হিল্লোলে নামানন্দের কলরোল করছে।

'কে তোমরা?' জিগগেস করল হরিদাস।

'আমরা দবির খাস আর সাকর মল্লিক।'

'তোমরা রূপ আর সনাতন গোস্বামী।' এক ডাকে চিনতে পারল নিত্যানন্দ।

'একটিবার কি প্রভুর দর্শন পাই?'

দন্তে তৃণ ধরল রূপ—সনাতন। গলবস্ত্র হল। কৃষ্ণপ্রেম রসমগ্ন প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়ল। প্রভু মঙ্গলনেত্রে তাকালেন। বললেন, 'ওঠ, দৈন্য সংবরণ করো।'

'আমরা নীচসঙ্গী, নীচ কাজ করছি।' বিগলিত কণ্ঠে বলতে লাগল দুই ভাই। 'আমাদের দোষ মার্জনা করো এই প্রার্থনা করতেও আমরা লজ্জিত হচ্ছি।'

'না, না, সে কী কথা।' প্রভু সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।

'আমাদের মত পতিতাধম জগতে আর কেউ নেই। জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার তো সহজ ছিল। তারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাড়ি নবদ্বীপে, তারা নীচসেবা করেনি,

করেনি নীচের দাসত্ব। তাদের একমাত্র দোষ পাপাচার। কিন্তু তোমার নিন্দা করতে তোমার নাম করে তারা ফলবান হয়েছে। শুধু নামে কী, নাম। ভাসেও পাপ চলে যায়।' 'পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার।'

'তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ ॥'

কিন্তু আমরা? আমাদের সঙ্গম সাহচর্য গো-ব্রাহ্মণ দ্রোহীদের সঙ্গে। আমাদের ত্রাণের আর কোনো উপায় নেই। একমাত্র তুমি আছ। আমাদের উদ্ধার করে তোমার বল দেখাও।'

আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজবল।
পতিতপাবন নাম—তবে সে সফল ॥

যদি দয়ার যোগ্য পাত্র বলে কেউ থাকে তবে সে আমরাই। কবে তোমার নিত্যকিঙ্কর হব? তোমার সেবাবাঞ্ছা ছাড়া আর সব বাসনা কবে বিলুপ্ত হবে?'

প্রভু বললেন, 'তোমাদের দৈন্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। পরপুরুষে আসক্তা কুলনারী কী করে? গৃহকর্মে ব্যস্ত থেকেও মনে মনে পরপুরুষের সঙ্গে নবসঙ্গমরস আস্বাদন করে। তেমনি রাজকার্যে লিপ্ত থেকেও মন সর্বদা ভগবানে ফেলে রাখো। ভগবানে নিরবচ্ছিন্ন নিবিষ্টতাই তোমাদের সংসারাসক্তি কাটিয়ে দেবে। আর কিছুর জন্যে নয়, তোমাদের দুজনকে দেখতেই আমি এসেছি রামকেলি। ভয় নেই, ঘরে যাও, শিগগিরই তোমাদের সংসারবন্ধন ঘুচে যাবে।'

'তবে আর আমাদের কে পায়!' বললে সনাতন, 'কিন্তু প্রভু, আপনি বেশিদিন এখানে থাকবেন না। বিধর্মী রাজার কখন কী মতিগতি হয় কিছু ঠিক নেই।'

যদিও প্রভুর নিজের কোনো ভয় নেই তবু মনুষ্য-সমাজে মানুষের মত লীলা করছেন বলে মানুষের মতই ব্যবহার করছেন। 'তথাপি লৌকিক লীলা লোকচেষ্টাকর।' রামকেলি ত্যাগ করে পৌছুলেন কানাই-নাটশালায়।

সনাতন প্রভুকে চুপিচুপি বললে, 'প্রভু, তীর্থ-যাত্রায় এত সঙ্গী ভালো নয়।'

ঠিক বলেছে সনাতন। এত লোক সঙ্গে থাকলে তীর্থ দর্শনে শান্তি হবে না, রসভঙ্গ হবে। প্রভু মন স্থির করলেন। একাকী যাব, কিংবা মাত্র একজন সঙ্গী নেব। চলো এ যাত্রা সাঙ্গ করি। প্রভু ফের ফিরে এলেন শান্তিপুর। উঠলেন আচার্যের ঘরে।

আবার আনন্দের তরঙ্গ উঠল।

কিন্তু এ কে এসে দাঁড়াল দরজায়?

এ সপ্তগ্রামের রঘুনাথ গোস্বামী। সন্ন্যাসের পর প্রভু যখন প্রথম শান্তিপুরে আসেন তখনই রঘুনাথের ইচ্ছে হয় সেও সন্ন্যাসী হয়ে ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যায়। প্রভুই তাকে নিবৃত্ত করে। বলে ঘরে বসেই ভগবদ্ ভজন করো।

ঘরে বসেই ভগবদ্‌ভজন করছিল রঘুনাথ কিন্তু সর্বক্ষণ মন রয়েছে নীলাচলে। কবে কতদিনে মিলতে পারবে প্রভুর সঙ্গে। কয়েকবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্রতিবারেই ধরা পড়ে। বংশের এক মাত্র সন্তান, তার বাবা জ্যেঠা কেউই তাকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়। ধনজন-স্ত্রী কিছুই তাকে বৈরাগ্যবিরত করতে পারল না। আবার সে বেড়ি কাটল। আবার সে ধরা পড়ল। এবার তাকে ঘরে বন্দী করে রাখা হল, খাড়া করা হল দিনরাতের পাহারা।

'প্রভু শান্তিপুরে এসেছেন, আমাকে একবারটি দেখা করতে দাও।' বাপ-জ্যেঠার কাছে মিনতি করল রঘুনাথ। 'প্রভু যা বলবেন তাই করব।'

প্রথম বার দেখা করেছে, এবার দ্বিতীয় বারও দেখা করতে এল।

প্রভু বললেন, 'তোমার সংসারবিরক্তি দেখে আমি আনন্দিত। কিন্তু আমি বলছি লোক দেখানো। মর্কটবৈরাগ্য না দেখিয়ে তুমি অনাসক্ত হয়ে যথাযোগ্য বিষয়ভোগ করো। স্থির হয়ে নিষ্ঠা করো অন্তরে, বাহ্যিক ব্যবহারে প্রলুব্ধ হয়ো না। সময় এলে আমিই তোমাকে ডেকে নেব।'

'নেবেন?'

'আমি যখন উত্তর-পশ্চিমের তীর্থদর্শন সাঙ্গ করে ফের নীলাচলে ফিরব তখন তুমি চলে এস আমার কাছে।'

'সে কবে?'

'অস্থির হয়ো না। ধৈর্য ধরো। লোকে একেবারে সাধু হয় না। মুগ্ধ না হয়ে বিষয়বস্তু ভোগ করতে পারাও কঠিন।'

শান্ত হল রঘুনাথ। ঘরে ফিরে গেল। ঘুচে গেল বন্দীদশা। যে শান্ত তার আর প্রহরীর দরকার কী।

দোলায় চড়ে শচীমাতা আবার এসে উপস্থিত হলেন। প্রভু দুরে পড়লেন দণ্ডবৎ হয়ে। স্তব করতে লাগলেন:

তুমি যদি শুভদৃষ্টি করো জীব প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতিমতি॥
তুমি সে কেবল মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।
যাহা হৈতে সব হয় তুমি সেই শক্তি॥
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহূতি
তুমি পৃশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি॥
যত দেখি সব তোমা হৈতে সে উদয়।
পালহ তুমি সে তোমাতে সে লীন হয়॥

সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।
তারাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি॥
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিতে তাহা না হয় শোধন॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে।
তোমার সাদগুণ্য সে তাহার প্রতিকারে॥'

[ক্রমশঃ।

অন্বেষা

ছায়া দেবী

এই জীবনের সত্য লাগি কাহারে খুঁজিয়া ফিরি নিত্য দেশ-দেশান্তরে?
ব্যর্থ হলো আরাধনা মিথ্যা পূজা হারানো উদ্দিষ্টের পরে।
কবে সেইদিন জীবনের স্বপ্ন মাঝে সত্যেরে ভাবিনু সুন্দর!
যদিও তখন জানিতাম আমি পাড়ি দিতে হবে পথ সুদুস্তর।
হায় সেতো একা নয়, সাথী মোর পাশে ছিলো বুঝি বহুদূর পথে?
তাই করি নাই ভয়, জানি আসিবে যে জয়, আলোকের জ্যোতির্ময় রথে!
সেদিন মানস কুঞ্জবনে যত, পুষ্পিত কুসুম শত, মধু গন্ধে ছায়,
সেই ক্ষণে তোমা লাগি হায়, বাঁশী ওঠে বেজে এই শান্ত নিরালায়।
আজিকে চম্পক ঘ্রাণে মদিরার গন্ধ ভাসে, আনে বহি' সুদূরের ছায়া!
স্বপ্ন মাধুরীতে গড়া যা ছিল আলোয় ভরা, সেদিনের ভ্রান্তি ভরা মায়া।
ছিলে বিস্মৃতির কোলে কেন আজ ফিরে এলে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের
এই শান্ত ক্ষণে?
হৃদয় মাঝারে লুপ্ত হয়ে, ছিলো যাহা সুপ্তভাবে চির গোপনতা সনে;—

কেমনে জানিনা আহা, শুষ্কনদী কূলে একদিন দেখা দিলো গহন শ্রাবণ;
দুর্গম বন্ধুর পথে দগ্ধ বালুচরে অকস্মাৎ নামিল প্লাবন!
জীবন যৌবনে ভাঙ্গিয়া, আমারে নয়কে টানিয়া দুর্নিবার
স্রোতের গতিতে?
কেমনে ফিরাবো তাহা লয়ে গেলো মোর যাহা, পারি নাই আপনা রোধিতে।
আকাশ সজল ঘন জাগে যে বেদনা মম প্রলয় সুখেতে জলদ বরণ!
দুয়ার হইতে ফিরে ফাগুন পথিক ফিরে প্রাণে বাজে কার নীরব চরণ?
ব্যঙ্গের হাসিতে ভরে, চঞ্চল নির্দ্দয় হয়ে, নিদারুণ উপেক্ষায় ফিরানু যাহারে,
চাহি নাই কভু যারে, বৃথা কেন মোর দ্বারে? কে ডাকিল সেদিন
তাহারে?
চিরদিন একাকিনী জানে তাহা নিশীথিনী, আপনারে ছিনু আমি ভুলে।
যৌবনের বার্ত্তা লয়ে, অলকায় পথ বেয়ে এলে সখা হৃদয়ের উপকূলে?

ভুলি নাই সেই ডাকা করুণ মিনতি মাখা, বাজাইলে বীণা তুমি
আপনার করে,
বিস্ময় মানি যে মনে, চাহি দেখি সেই ক্ষণে, এত আকুলতা ছিলো কেন
সে মধুর স্বরে!
পলাশ আঁখিতে কার হীরকের দ্যুতি যার অনুরাগ ছিলো আঁকা
বঙ্কিম নয়নে,
সেথা দূর চন্দ্র লেখা নবীন কৌতুকে বাঁকা সেদিনের মম প্রফুল্ল নয়নে!

অস্ফুট স্বপন সম, কাহার মূরতি মম জাগে চিতে, দিন চলে যায়
আনমনে।
ধূসর জীবনে মোর জাগিল রঙের ঘোর, মম ফুলবনে তার নিত্য সঞ্চরণে।
শীর্ণ যৌবনেরে ঘিরি সাজালো রঙীন করি, জাগালো জোয়ার
সাগরের জলে।
তীব্র আবেশে ভরা, স্বপ্ন বিহ্বল ধরা, জাগে কার মুখ হৃদয় তলে?

তারপর কবে হায়, গভীর দুখের রাতে, নব পরিচয় তব মূরতির সনে!
সে রাত মধু ফাল্গুনী নয়, আঘাত জড়ানো কণ্টকময়, বেদনা দীর্ণ
জর্জর জীবনে।
আমার জীবনে তবে তোমার উদয় হবে, তাই ভুলে গেনু আপনারে।
ছিলো যাহা দূরে, কাছে এল ধীরে, মধুর প্রেমের বাণী শোনালে আমারে,
তখনো হৃদয় বীণ নির্বাক বেদনে ক্ষীণ, কেন এলে হে পথিক মোর?
বারে বারে কেন ডাকো? প্রেম দিয়ে মোরে ঢাকো, রাতি যে আঁধার
ঘন ঘোর!
স্বপন তরণী বেয়ে আসিতে যে গান গেয়ে, রচিতে সঙ্গীত নানা প্রেম
উপহারে,
প্রজাপতি-দিন সাজায়ে রঙীন সহস্র ফুলের অজস্র ক্ষণিক উপচারে।

যে মায়া জড়ালে প্রাণে, তারি লাগি এ জনমে, মোরে আমি
করে দিনু লয়,
মৃদু গুঞ্জরণে সাথী, রয়েছে আজিকে মাতি, করিতে বুঝি আমারে জয়?
কখন সংশয় মেঘে হৃদয় ছাইল বেগে! সত্য পরিচয় তোর লভিলাম ওরে?
হায় বন্ধু মোর! এত মিথ্যা প্রতারণা! কাহারে খুঁজিতে যাও
পথ 'পরে?

সহসা দেখিনু একি! নিষ্ঠুর বিধাতা ভাগ্যে দিলো লেখি, স্বর্ণ সন্ধ্যা
পলকে মিলায়!
জীবনের যাহা কিছু, মিথ্যা আলেয়ার পিছু, ভস্ম করিয়াছি দিনের চিতায়।
সত্যেরে ভুলেছ জানি, ভেঙ্গেছে মোহের ঘোর, ছিলো যাহা দু'দিনের তরে,
হিয়াতে মদির ক্ষুধা, ছাড়িলে স্বরগ সুধা, নিতে চাও সরাবের
স্বর্ণ পাত্র ভরে?
সেদিনের যত আলো আচম্বিতে নিভে গেলো, নিঃসীম শূন্যেতে সবি
হয়েছে বিলীন।
এত আশা-ভালবাসা মোর সব প্রলয়ের ঝড়ে হলো পরিক্ষীণ।

সম্রাট আকবরের হিন্দু সেনাপতি

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ সম্রাট আকবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতিমান। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের সমান চক্ষে দেখে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের বৈভব অনেকাংশে হিন্দু বীরদের উপর নির্ভরশীল ছিল। সম্রাট আকবরের সেনাপতিমণ্ডলীর মধ্যে পঞ্চান্নজন হিন্দু সেনাপতি ছিলেন। এই প্রবন্ধে তিপ্পান্নজন হিন্দু সেনাপতির বিষয় আলোচনা করা হবে।

রাজা বিহারীমল—ইনি জয়পুরের অধিপতি ছিলেন। আকবর হিন্দু রাজাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক হলে, রাজা বিহারীমলই প্রথমে নিজের কন্যা তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। কিন্তু এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে মালবের মোগল শাসনকর্ত্তা বিহারীমলকে আক্রমণ করেন। জয়পুরকে মোগল অধিকারভুক্ত করাই এই শাসনকর্ত্তার উদ্দেশ্য ছিল। আকবর এই যুদ্ধ বন্ধ করতে আদেশ দেন এবং বিহারীমলকে নিজের কাছে আহ্বান করে পাঁচ-হাজারী সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা বিহারীমল সম্রাটের গুণে মুগ্ধ হয়ে নিজের কন্যা তাঁকে অর্পণ করেছিলেন। আগ্রায় বিহারীমলের মৃত্যু হয়।

রাজা ভগবান দাস—রাজা ভগবান দাস রাজা বিহারীমলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভগবান অত্যন্ত শৌর্য্যবীর্য্যশালী ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একবার অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে সম্রাটকে রক্ষা করেছিলেন। আকবর তাঁর গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন এবং পাঁচহাজারী সেনাপতিপদে উন্নীত করেন। এই সময়ে তিনি উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন এবং অস্ত্রের দ্বারা নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করে তোলেন। অবশ্য মোগল দরবারের হাকিমদের সুচিকিৎসায় তিনি ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠেন। ৯৯৮ হিজিরীর প্রথমে লাহোরে তাঁর মৃত্যু হয়। যুবরাজ সেলিম তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

মানসিংহ—রাজা মানসিংহ ভগবানদাসের পুত্র এবং যুবরাজ সেলিমের শ্যালক। সম্রাট আকবর যে সমস্ত সেনাপতিকে গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করতেন, মানসিংহ তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর বাহুবল সম্রাটের প্রবল প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ স্বরূপ ছিল। গুণগ্রাহী আকবর তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং 'ফারজন্দ' নামে সম্বোধন করতেন। ফারজন্দ শব্দের অর্থ—পুত্র। ৯৮৪ হিজিরীতে আকবর রাণা কিকার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। মানসিংহের অধীনে এই সৈন্যদল ছিল। গোগনদে মোগলসৈন্য রাজপুতদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রবল যুদ্ধের পর রাজপুত সৈন্য বিধ্বস্ত হয়। মানসিংহের এই প্রথম যুদ্ধ। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের শৌর্য্যে যশস্বী হন। তাঁর এই প্রথম যশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে তাঁকে সম্রাট আকবরের সেনাপতিকুলের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সম্রাট তাঁকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কাবুলের অধিবাসীরা হিন্দুর শাসনে অসন্তুষ্ট হলেন। কাজেই আকবর মানসিংহকে কাবুল থেকে বিহারে স্থানান্তরিত করলেন। এই সময়ে রাজা ভগবান দাসের মৃত্যু হলে সম্রাট মানসিংহকে রাজা উপাধি ও পাঁচহাজারী সেনাপতির পদ প্রদান করেন। বিহার থেকে তিনি বাংলায় শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এখানে তাঁর জীবনের দীর্ঘ

একুশ বছর অতিবাহিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি উড়িষ্যায় পাঠানদের কঠোর হাতে দমন করেন। কোচবিহার তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে এবং রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ নিজের ভগিনীকে রাজা মানসিংহের হাতে অর্পণ করেন। এই বিবাহের অল্পদিন পরেই ঘোড়াঘাটে তিনি কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হন। পাঠানেরা সুযোগ বুঝে ঘোড়াঘাট আক্রমণ করে। কিন্তু মানসিংহের পুত্র হিম্মত সিংহ সহজেই পাঠানদের পরাস্ত করেন। সম্রাট আকবর রাজা মানসিংহের বহুবিধ কার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁকে সাতহাজারী মনসব প্রদান করেন। সাতহাজারী মনসব একমাত্র যুবরাজদেরই প্রাপ্য ছিল কিন্তু সম্রাট সে নিয়ম লঙ্ঘন করে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। ১০১৩ হিজিরী পর্য্যন্ত তিনি বাংলায় ছিলেন। তারপর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে তিনি যুবরাজ সেলিমকে অতিক্রম করে নিজের ভাগিনেয় খুসরুকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার এক চক্রান্ত করেন। কিন্তু বিচক্ষণ সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পূর্ব্বে সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে সেলিমকে সিংহাসন দান করেন। যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করার পর রাজা মানসিংহের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তাঁকে বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের নবমবর্ষে তিনি পরলোকগমন করেন। মানসিংহের পাঁচশ পত্নী ছিল। তার মধ্যে ষাট জন রাণী সহমৃতা হয়েছিলেন।

রাজা টোডরমল—রাজা টোডরমলের জন্ম লাহোরে। তিনি কেরাণীগিরির কাজ পেয়ে মোগল রাজসরকারে প্রবেশ করেন। অচিরেই তিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতার জন্যে সম্রাট আকবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন এবং ক্রমশঃ পদমর্য্যাদা লাভ করে রাজসভার অন্যতম অমাত্যের পদ লাভ করেন। পাঠানদের কাছ থেকে বাংলা দেশ কেড়ে নেবার সঙ্কল্প করে সম্রাট আকবর সেনাপতি মনাইম খাঁকে প্রেরণ করেন। রাজা টোডরমল সহকারী হিসেবে বাংলায় গিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অশান্ত অশ্বকে সংযত করতে না পেরে মনাইম খাঁ যুদ্ধস্থল থেকে সরে আসতে বাধ্য হন কিন্তু টোডরমল অটল থেকে পাঠানদের পরাজিত করেন। কিছুদিন পরে আবার বাংলায় বিদ্রোহ দেখা দিল। সেনাপতি শাহজাহা খাঁ এক বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে বাংলায় গেলেন। এবারও টোডরমল সহকারী সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধে শাহজাহা খাঁ নিহত হলেন। তবে টোডরমলের অসাধারণ যুদ্ধ

কৌশলে মোগলসৈন্য জয়লাভ করল। কিছু দিন পরে সম্রাটের রাজস্ব-বিধির প্রবর্ত্তনে বাংলায় আবার বিদ্রোহ দেখা দিল। এবার টোডরমল প্রধান সেনাপতি রূপে বাংলায় গিয়ে বিদ্রোহ দমন করে এলেন। ৯৯০ হিজিরীতে তিনি রাজস্বমন্ত্রী পদে উন্নীত হলেন। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে দেবার্চ্চনা করতেন তারপর বৈষয়িক কার্য্যে হাত দিতেন। একবার সম্রাটের সঙ্গে পাঞ্জাব যাওয়ার সময় তাঁর দেবার্চ্চনায় বিঘ্ন ঘটেছিল। এই কারণে তিনি সমস্ত দিন উপবাসী ছিলেন। সম্রাট আকবর বহু অনুরোধ-করেও তাঁর উপবাস ভঙ্গ করতে পারেননি। রাজা টোডরমল চার হাজারী মনসবদার ছিলেন।

রায় সিংহ—রায় সিংহ চার হাজারী মনসবদার ছিলেন। এঁর পিতা রায় কল্যাণ বৈরাম খাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আকবরের রাজ্য লাভের পনর বছর পরে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মোগল দরবারে আসেন। সম্রাট তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। রায় সিংহ নিয়োগ পেয়েই গুজরাট গমন করেন এবং সেখানকার বিদ্রোহ দমন করে যশস্বী হন। এরপর তিনি বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, নাসিক প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহীদের দমন করেন। আকবর রায় সিংহকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তাঁর কন্যার অকাল বৈধব্যে সম্রাট আন্তরিক মর্ম্মাহত হন এবং কন্যাটিকে সহমরণ থেকে নিবৃত্ত করেন; রায় সিংহকে পরে সুরাহাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে তিনি পাঁচহাজারী মনসবদার পদে উন্নীত হন। ১০২১ হিজিরী অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

জগন্নাথ—জগন্নাথ বিহারীমলের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রাজা ভগবান দাসের ভ্রাতা। তিনি আড়াই হাজারী মনসবদার ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা মানসিংহের অধীনে কাজ করতেন। জগন্নাথ রাণাপ্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি রণকৌশল ও সাহসিকতা প্রদর্শন করে খ্যাতিলাভ করেন। জাহাঙ্গীর এঁকে পাঁচ হাজারী মনসবদারের পদ দিয়েছিলেন।

রাজা বীরবল—এঁর প্রকৃত নাম মহেশ দাস। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে এঁর জন্ম হয়। তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও হাস্যরস পরিবেশন করার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে সম্রাট তাঁকে নিজের কাছে আহ্বান করেন। বীরবল সুন্দর হিন্দী কবিতা লিখতে পারতেন। আকবর প্রথমে তাঁকে রায় কবি ও রাজা বীরবল উপাধি প্রদান করেন। তাঁকে নাগরকোটের জায়গীর দেওয়া হয়। রাজা বীরবল সব সময় সম্রাটের কাছেই থাকতেন। সময় সময় এঁকে দৌত্যকার্য্য করতে হত। কিন্তু একবার বীরবলকে সেনাপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়। সম্রাট এঁকে দরবার থেকে স্থানান্তরিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তবে কোন বিশেষ কারণে এ বিষয়ে সম্মতি দিতে হয়। যুদ্ধে আট হাজার সৈন্যের সঙ্গে বীরবলও নিহত হন এবং এঁর মৃতদেহ শত্রুর হাতে গিয়ে পড়ে। সম্রাট বীরবলের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হন এবং রাজার মৃতদেহ শত্রুর হাতে যাওয়ায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রাজা বীরবল দু হাজারী মনসবদার ছিলেন।

রায় সুরজান হাদা—রায় সুরজান রাজপুত কুলের হাদা বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রন্থম্ভর রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমে তিনি রাণা প্রতাপের পক্ষে থেকে সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলার পর প্রতাপ পরাজিত হলে রায় সুরজান বাধ্য হয়ে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে, তাঁর যোগ দেন। সম্রাট তাঁকে গড়কন্তজের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ক[রেন]। এখানে তিনি ছয় বৎসর ছিলেন। এরপর তাঁকে চুণার দুর্গের [ভার] দেওয়া হয়। রায় সুরজান হাদা দুই হাজারী মনসবদার ছিলেন।

রায় পত্রদাস—পত্রদাস ক্ষেত্রী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। [তিনি] আকবরের হস্তীশালায় শুমারনবিশের কাজ করতেন। এই [কাজে] অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় সম্রাট তাঁকে রায় রায়ন উ[পাধি] দেন। চিতোরের যুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনি লেখনী ছেড়ে অস্ত্র [ধারণ] করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি শৌর্য্য ও সাহসিকতার পরিচয় দে[ন]। সম্রাট তাঁকে বাংলার রাজস্বমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। এরপর তি[নি] বিহার, কাবুল প্রভৃতি সুবার দেওয়ানী করেন। শেষবারের [মত] তাঁকে অস্ত্র ধরতে হয় আবুলফজলের হত্যাকারী বীরসিংহের বিরুদ্ধে। সম্রাট পত্রদাসকেই পাঠিয়েছিলেন বীরসিংহকে জীবন্ত ধরে আনব[ার] জন্যে। পত্রদাস নানা খণ্ডযুদ্ধে বীরসিংহকে পরাজিত করেন কি[ন্তু] ধরতে সমর্থ হন না। প্রথমে পত্রদাস সাতশতী মনসবদার ছিলেন তবে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করে পাঁচ হাজারী মনসবদার হন।

রাজা রামচাঁদ—রামচাঁদ ভাট রাজ্যের রাজা ছিলেন। বিখ্যা[ত] গায়ক তানসেন প্রথমে রাজা রামচাঁদের সভাসদ ছিলেন। সম্রা[ট] তানসেনের গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের দরবারে পাঠাতে আদেশ দেন। রামচাঁদের এ বিষয়ে অনিচ্ছা থাকলেও আকবরের আদেশ লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা তাঁর হয় না। তিনি দুই হাজারী মনসবদার ছিলেন।

রায় কল্যাণমল—রায় কল্যাণমল বিকানীরের অধিপতি ছিলেন। সম্রাট তাঁর ব্যবহারে প্রীত হয়ে তাঁকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং দুই হাজারী মনসবদারের পদ দেন। তাঁর পুত্র রায়সিংহ মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

রায়দুর্গা—রায়দুর্গা দেড়হাজারী সেনাপতি ছিলেন। ইনি বিখ্যাত শিশোদিয়া রাজপুত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট তাঁকে গুজরাটের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি যশোভাজন হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বছর তাঁর মৃত্যু হয়।

মধু সিংহ—মধু সিংহ ভগবান দাসের পুত্র। ইনি দেড়হাজারী মনসবদার ছিলেন। কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যে অভিযান হয় সম্রাট তাঁকে অন্যতম সেনাপতি রূপে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন।

রায়সন দরবারি—রায়সন মোগল দরবারের একজন অত্যন্ত বিশ্বাসী অমাত্য ছিলেন। তিনি হারামের কাজও দেখতেন। তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে সময় সময় দেখা যেত। তিনি সাড়ে বারশতী মনসবদার ছিলেন। একজন বাঙ্গালী রায়সনের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

রূপসি বৈরাগী—রূপসি বৈরাগী রাজা বিহারীমলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (মতান্তরে ভ্রাতুষ্পুত্র)। রূপসি আকবরের একজন একহাজারী সেনাপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ রাজা বিহারীমলের আত্মীয় বলেই তাঁর ভাগ্যে এই পদটি পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সম্বন্ধে কোন শৌর্য্যবীর্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ নেই।

উদয় সিংহ—উদয় সিংহ রাজা মালদেবের পুত্র। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। উদয় সিংহ যোধপুর রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। সম্রাট আকবরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সম্রাটের আদেশে যুবরাজ সেলিম উদয় সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলেই শাহজাহানের জন্ম হয়। এক হাজার মোগল সৈন্য তাঁর অধীনে ছিল।

সেলিম তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে জগৎ সিংহের নাম সুপরিচিত করে রেখে গেছেন।

রাজ সিংহ—রাজ সিংহ বিহারীমলের ভ্রাতুষ্পুত্র ও এক হাজারী মনসবদার ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে ছিলেন এবং সম্রাট তাঁকে গোয়ালিয়ার দুর্গের অধিপতি নিযুক্ত করেন। রাজসিংহের অন্যতম পৌত্র পুরুষোত্তম সিংহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

রায়ভোজ—রায়ভোজ সুরজান হাদার পুত্র। আকবর তাঁকে মানসিংহের অন্যতম সেনাপতি হিসেবে বাংলায় পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি জগৎ সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। যুবরাজ সেলিম এই কন্যাটির পাণিপ্রার্থী ছিলেন। রাজভোজ এই বিবাহে আপত্তি করেন এবং নিজেই কন্যাটিকে বিবাহ করেন। যুবরাজ সেলিম এই সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি রায়ভোজকে কঠিন শাস্তি দিতে উদ্যত হন। আর কোন উপায় না দেখে রায়ভোজ আত্মহত্যা করেন। ইনি এক হাজারী-মনসবদার ছিলেন।

ধরু—ধরু রাজা টোডার মলের পুত্র। তিনি অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বর প্রিয় ছিলেন। কথিত আছে, তিনি সোনা দিয়ে ঘোড়ার ক্ষুর বাঁধাতেন। সিন্ধুর-রণক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু হয়। ধরু সাতশতী মনসবদার ছিলেন।

মেদিনীরায় চৌহান—মেদিনীরায় সাতশতী মনসবদার ছিলেন। সম্রাট তাঁকে গুজরাটের যুদ্ধে নিযুক্ত করেন। তিনি সাহসিকতা ও দানশীলতার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। পরে মেদিনীরায় এক হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব করেন।

রামদাস—রামদাস প্রথমে বাংলার রাজস্ব বিভাগে রাজা টোডরমলের সহকারীরূপে কাজ করতেন। তাঁর বিশ্বস্ততা অতুলনীয় ছিল। সম্রাট আকবর মৃত্যুর পূর্বে রাজকোষ রক্ষার ভার রামদাসের উপর দিয়ে যান। তিনি সঙ্কটের সময় কৌশল ও দৃঢ়তার সঙ্গে রাজকোষ রক্ষা করতেন। তিনি পাঁচশতী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন।

রামচাঁদ (২)—বোচ্ছ নামে ছোট রাজ্যের রামচাঁদ অধিপতি ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরসিংহ আবুল ফাজালকে হত্যা করে সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করেন কিন্তু রামচাঁদ আকবরের অনুগ্রহভাজন ছিলেন। তিনি পাঁচশতী মনসবদার ছিলেন। জাহাঙ্গীরের প্ররোচনায় বীরসিংহ আবুল ফাজালকে হত্যা করেন।

অর্জ্জুন সিংহ, শিওম সিংহ, শকত সিংহ—তিনজনই রাজা মানসিংহের পুত্র এবং পাঁচশতী সেনাপতি ছিলেন। সম্রাট তাঁদের বাংলায় প্রেরণ করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মানসিংহের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন।

রাজা মুকুটমল—মুকুটমল ভাদাওয়ারের অধিপতি ছিলেন। ইনি পাঁচশতী মনসবদার ছিলেন। গুজরাটের যুদ্ধে মুকুটমল বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

দুলপত—দুলপত রায়সিংহের পুত্র। সম্রাট তাঁকে সিন্ধুদেশের যুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাঁর যোগ্যতার অভাব ছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ইনি পারসী ভাষায় কবিতা লিখতে পারতেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের একাদশ বর্ষে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজা রামচন্দ্র—ইনি উড়িষ্যার জমিদার ও সম্রাট আকবরের পাঁচশতী মনসবদার ছিলেন। উড়িষ্যা জয়ের সময় রামচন্দ্র মানসিংহকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

রামচাঁদ (৩)—রামচাঁদ সেনাপতি জগন্নাথের পুত্র এবং বিহারীমলের পৌত্র। সম্রাট তাঁকে চারশতী মনসবদারের পদ দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

কৃষ্ণদাস—আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে কৃষ্ণদাস হস্তী ও অশ্বশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। আকবর তাঁকে তিনশতী মনসবদারের পদ দেন। জাহাঙ্গীর তাঁকে একহাজার সৈন্যের সেনাপতি এবং রাজা উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

তুলসীদাস—তুলসীদাস গুজরাটের যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তিনশতী মনসবদার ছিলেন। কিন্তু তাবক্ত আকবরীর মতে তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল দু'হাজার।

কিষদাস—কিষদাস জয়মলের পুত্র। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কিষদাসের কন্যার বিবাহ হয়। ইনি তিনশতী মনসবদার ছিলেন।

বঙ্ক—বঙ্ক চারশতী মনসবদার ছিলেন। পরে সহকারী সেনাপতি রূপে সম্রাট তাঁকে কাবুলে প্রেরণ করেন।

বিল বিধর—বিল বিধর রাঠোর রাজপুত বংশীয় ছিলেন। তিনি তিনশতী মনসবদার ছিলেন।

জগমল (১)—জগমল বিহারীমলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সম্রাট আকবর এই কুটুম্বকে এক হাজারী মনসবদারের পদ দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

জগমল (২)—জগমল পাঁচশতী মনসবদার ছিলেন।

পরমানন্দ—পরমানন্দ ক্ষেত্রীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঁচশতী মনসবদার ছিলেন। সম্রাট তাঁকে স্নেহ করতেন।

রাওলভীম—রাওলভীম যশল্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পাঁচশতী মনসবদার ছিলেন।

মানসিংহ (২)—ইনি তিনশতী মনসবদার ছিলেন।

নীলকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ উড়িষ্যার জমিদার ছিলেন। সম্রাট তাঁকে তিনশতী মনসবদারের পদ দেন।

রায় রামদাস দেওয়ান—আড়াইশতী মনসবদার ছিলেন।

প্রতাপ সিংহ—রাজা ভগবান দাসের পুত্র।

শক্ত সিংহ (১)—রাজা মানসিংহের পুত্র।

শক্ত সিংহ (২)—রাণা প্রতাপসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ইনি মোগল দরবারে আসেন। সম্রাট আকবর তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে মনসবদারের পদ দেন।

মথুরাদাস ক্ষেত্রী, সুরেন্দ্রদাস (মথুরাদাসের পুত্র), **রাজা** (বীরবলের পুত্র), **সনওয়াল দাস** (সম্রাটের শরীর রক্ষক), **কেশুদাস, সঙ্গ ও সুন্দর,** এঁরা প্রত্যেকে দুইশতী মনসবদার ছিলেন। *

---

* আইন-আকবরী থেকে বিশেষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিল্ববতী রাজকন্যা

মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়

এক দেশে সাত ভাই ছিল। তাদের ছোটটির নাম লীতা। বড় ছ'ভায়ের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু লীতা বিয়ে করতে কিছুতেই রাজী ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে সে বলত, বেলবতী রাজকন্যা ছাড়া সে আর কাকেও বিয়ে করবে না। তার ভাজেরা এই কথা নিয়ে তাকে ভারি ঠাট্টা তামাসা করত। ঠাট্টা তামাসার চোটে একদিন সে কাকেও না বলে রাজকন্যার সন্ধানে চলে গেল। ঘুরতে ঘুরতে এক বনের মধ্যে সে এক মুনিকে দেখতে পেল। লীতা বেলবতী রাজকন্যার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল।

তিনি বলে দিলেন, সেখান থেকে একদিনের পথ গেলে সে আর এক মুনিকে দেখতে পাবে। তিনি সব খবর বলতে পারবেন।

লীতা একদিনের পথ হেঁটে গিয়ে আর এক মুনিকে দেখতে পেলে। তিনি তখন সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তিন মাস ধরে সে তাঁর অপেক্ষায় সেখানে থাকল। ধ্যান ভাঙ্গলে সে বেলবতী রাজকন্যার কথা জানতে চাইলে।

মুনি বলে দিলেন, সেখান থেকে আরও তিন দিনের পথ গেলে আর এক মুনিকে সে দেখতে পাবে, তিনি বেলবতী রাজকন্যার সব খবর জানেন। লীতা সেই মুনির কাছে পৌঁছে দেখলে, তিনি তখন ধ্যানে বসেছেন। ছ'মাস পরে ধ্যান ভাঙ্গবে। ততদিন সে অপেক্ষা করে রইল।

মুনির ধ্যান ভেঙ্গে গেলে সে তাঁকে রাজকন্যার কথা জিজ্ঞাসা করলে। মুনি ভারি খুসী হয়ে বললেন যে, বেলবতী রাজকন্যা একটা বেলগাছে বড় বেল ফলের মধ্যে বন্ধ হয়ে আছেন। রাক্ষসেরা সে গাছ চৌকি দেয়। যদি সে গিয়ে সব প্রথমে সেই বড় ফলটি ধরতে পারে, তা'হলে তার কোন বিপদ হবে না। আর রাজকন্যাকেও পাওয়া যাবে। কিন্তু অন্য কোন বেল ছুঁলেই রাক্ষসেরা তাকে মেরে ফেলবে।

লীতা সব কথা মনে করে রাখলে। তখন মুনি মন্ত্রবলে তাকে 'বিত্তি' পাখীতে পরিণত করে যে দিকে যেতে হবে বলে দিলেন। লীতা উড়ে উড়ে সেই গাছের কাছে এল। চারিদিকে রাক্ষসদের দেখে তার ভারি ভয় হ'ল। সে তাড়াতাড়ি একটা বেলে ঠোকর মারলে। সেটা সবচেয়ে বড় বেল নয়। রাক্ষসেরা তখুনি তাকে ধরে খেয়ে ফেললে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লীতাকে ফিরে আসতে না দেখে মুনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই লীতার কোন বিপদ হয়েছে। তখন তিনি একটা কাককে খবর কি জানতে পাঠিয়ে দিলেন। কাক ফিরে এসে বললে যে, সে লীতাকে দেখতে পেলে না। কেবল একটা বেলে ঠোকর মারার দাগ রয়েছে।

রাক্ষসেরা লীতাকে খেয়ে যে হাড়গোড় ফেলে দিয়েছে, তাই আনবার জন্য তখন মুনি কাকটাকে আবার পাঠিয়ে দিলেন। কাক হাড়গুলো নিয়ে এল। তখন তিনি লীতাকে মন্ত্রবলে আবার বাঁচিয়ে ফেললেন। মুনি লীতাকে খুব তিরস্কার করে বলে দিলেন, যদি সে সত্যই বেলবতী রাজকন্যাকে পেতে চায়, তবে যেন বড় বেলটা নিয়ে আসে।

এবার তিনি লীতাকে একটি ছোট শুকপাখীর আকার দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। লীতা এবার সর্ব্বাপেক্ষা বড় বেলটি নিয়ে উড়ে পালাতে লাগল। রাক্ষসেরা দেখতে পেয়ে তাকে তাড়া করলে। মুনি শুক পাখীকে মাছির মত ছোট করে দিলেন। রাক্ষসেরা তাকে আর দেখতে না পেয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিল। তারা চলে গেলে লীতা নিজের মূর্ত্তি ধরে মুনির কাছে গেল।

মুনি বললেন, বেলের মধ্যে রাজকন্যা আছেন। একটা কুয়ার ধারে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে বেলটাকে ভাঙ্গলে সে রাজকন্যাকে দেখতে পাবে। লীতা রাজকন্যা পাবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, মুনির উপদেশ ভুলে গিয়ে সে খুব জোরে বেলটাকে ভেঙ্গে ফেললে। তাতে এই হল যে, রাজকন্যার রূপের জ্যোতি সহ্য করতে না পেরে লীতা তখনি মরে গেল।

রাজকন্যা যখন দেখলেন, তাঁর প্রণয়পাত্র তাঁরই জন্য মরে গেছে, তখন লীতার মৃতদেহ কোলে নিয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি বসে বসে কাঁদছেন, এমন সময় এক কামারের মেয়ে সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন কাঁদছ গা?"

রাজকন্যা বললেন, "আমার স্বামী মারা গেছেন, তুমি যদি ঐ কূয়া থেকে কিছু জল এনে দাও, তা হলে এঁকে আমি বাঁচাতে পারি।"

কামারের মেয়ের মনে একটা কুমতলব হল। সে বললে, জল আমি হাতে পাব না।"

রাজকন্যা বললেন, "তবে তুমি মড়া কোলে করে বসে থাক, আমি জল নিয়ে আসি।"

সে তাতেও রাজি হল না, বললে, "হাঁ, তুমি আমার কোলে মড়া দিয়ে নিজে পালিয়ে যাবার মতলব করছ। তারপর আমি বিপদে পড়ি আর কি!"

রাজকন্যা বললেন, "তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আমার কাপড় চোপড় গয়না গাটি তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি।"

এই বলে তাঁর হীরার গয়না ও রেশমের পোষাক রেখে জল আনতে কূয়ার ধারে গেলেন। কামারের মেয়ে লুকিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে গেল। রাজকন্যা নীচু হয়ে জল তুলছেন, এমন সময় সে ধাক্কা মেরে তাঁকে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিলে। রাজকন্যা ডুবে মারা গেলেন। কামারের মেয়ে সেই কূয়া থেকে জল তুলে লীতার মুখে দিলে। জলের গুণে লীতা তখনি বেঁচে উঠল। কামারের মেয়ে রাজকন্যার গয়না ও কাপড় পরেছিল, লীতা তাকেই বেলবতী রাজকন্যা ভেবে বাড়ী নিয়ে এল। তখন দুজনের সেখানে বিয়ে হল। একদিন লীতা ও তার ভায়েরা বনে শিকার করতে গেল। লীতার ভারি পিপাসা পেলে। যে কূয়ার ধারে সে বেল ভেঙ্গেছিল, ঠিক সেই কূয়াটা সে দেখতে পেলে। জল নিতে গিয়ে সে দেখলে, একটা সুন্দর ফুল জলে ভাসছে। সে ফুলটা নিয়ে বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে দিলে। তার স্ত্রী ফুলটা দেখে ভারি অসন্তুষ্ট হল, আর তখন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। লীতার তাতে বড় কষ্টবোধ হল।

একদিন লীতা দেখলে, ছেঁড়া ফুলের পাতাগুলো যেখানে পড়েছিল, সেখানে একটা বেলগাছ হয়েছে। বেলের চারাটি নিয়ে সে বাগানে পুঁতে রাখলে।

লীতা একদিন সহিসকে তার ঘোড়াটাকে আনতে বললে। ঘোড়া লাগাম ছিঁড়ে সেই বাগানের মধ্যে ছুটে পালাল। বেলতলা দিয়ে ছুটে যাবার সময় একটা বেল ঘোড়ার জীনের উপর পড়ে সেখানেই আটকে রইল। সহিস ঘোড়াটাকে ধরবার সময় বেল

ফলটা দেখে বাড়ী নিয়ে গেল, বেলটা ভাঙ্গা হলে সহিস তার মধ্যে একটি সুন্দর মেয়ে দেখতে পেলে। সে মেয়েটিকে নিজের বাড়ীতে রেখে লালন পালন করতে লাগল।

এই সময়ে সেই কামারের মেয়ে লীতার স্ত্রীর ভারি অসুখ হল। বেলবতী রাজকন্যাকে হারাবে, এই ভাবনায় লীতা বড় কাতর হয়ে পড়লো। কামারের মেয়ে তার স্বামীকে বললে, সহিসের ঘরে যে মেয়েটা আছে, সে তাকে যাদু করেছে। মেয়েটি না মরলে সে বাঁচব না। এই কথা শুনে লীতা চারজন ঘাতককে হুকুম দিলে, বনে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে যেন কেটে ফেলা হয়। তারা তাই করলে।

মেয়েটি মরবার সময় বললে যে, তার হাত-পাগুলি যেন তার সমাধির চার পাশে পুঁতে দেওয়া হয়। ঘাতকেরা তার অনুরোধ রেখেছিল। মেয়েটির মৃত্যুর পর কামারের মেয়ে বেঁচে উঠল। আরো কিছুদিন পরে লীতা একা একদিন বনে শিকার করতে গেল। রাত্রি হলে যেখানে মেয়েটিকে মারা হয়েছিল, সেইখানে সে এসে পড়ল। লীতা দেখলে, সেখানে এক মস্ত বাড়ী। সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো, কিন্তু জনপ্রাণীকেও দেখতে পেলে না। কেবল দুটি পাখী সেখানে বসেছিল। একটা বিছানায় লীতা শুয়ে পড়ল। পাখী দুটি তার কাছে বসে বেলবতী রাজকন্যার গল্প করতে লাগল।

একটা পাখী বললে, লীতা কেমন করে বেলবতী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে, কামারের মেয়ে তাকে কেমন করে কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়, তারপর কেমন করে সে এখন লীতার স্ত্রী সেজে আছে। লীতা শুয়ে শুয়ে সব শুনে পাখীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে, আসল বেলবতী রাজকন্যাকে সে কি করে পাবে ?

পাখীরা বললে, বছরে একবার রাজকন্যা এই বাড়ীতে বেড়াতে আসেন। রাজকন্যার আসবার তখন আর ছ'মাস বাকী আছে। লীতা ছ'মাস দরজার পাশে লুকিয়ে রইল। একদিন রাত্রে রাজকন্যা এলেন। লীতা তাঁর হাত ধরলে। রাজকন্যা হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেলেন। লীতার বুক যেন ভেঙ্গে গেল। কিন্তু পাখীরা তাকে আশা দিলে।

আরও এক বৎসর লীতা অপেক্ষা করে রইল। রাজকন্যা নির্দ্দিষ্ট দিনে সেই বাড়ীতে বেড়াতে এলেন। লীতা তাড়াতাড়ি করলে না। রাজকন্যা যখন বিছানায় শুয়েছেন, সেই সময়ে লীতা তাঁকে অধিকার করলে। উভয়ের বিয়ে হয়ে গেল। খুব সুখে তাঁরা ঘর সংসার করতে লাগলেন। সেই দুষ্ট কামারের মেয়েকে লীতা মেরে ফেললে।

বিধানচন্দ্র স্মরণে

কার্তিক ঘোষ

বাংলার চির নবীন কর্মী ওগো
জন্ম দিনের হাসি উজ্জল মুখে,
মৃত্যু দিনেরে বরণ করিলে তুমি
তাইতো আঘাত লেগেছে দেশের বুকে।

'ভারত রত্ন' চির সুন্দর ব'লে
জানিগো যতনে রেখেছে অমরাবতী,
তবুও তোমার শূন্য আসন তলে
প্রতিটি মানুষ জানায় শ্রদ্ধা-নতি ॥

নূতন উপায়

কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী

তোমরাই বল না, হে, লেখাপড়া করিতে
কাহারই বা ভালো লাগে, এই সারা জগতে ?
এ বয়সে খেলিলে হবে মন শক্ত,
মা-বাবারা বুঝেন নাকো এই গূঢ় তত্ত্ব।
এই দেখ, দেখি মোরা দৌপদির জীবনে,
ম্যাট্রিক পাশ তার হ'ল না ত যৌবনে।
কালিঘাটে পূজা দিয়া ফিরিতেছি বাড়ীতে,
চড়কডাঙাতে হঠাৎ দেখা তারি সাথে।
মোরে দেখি আনন্দে দুই হাত তুলি
করিলেন শুরু জীবনের কথাকলি।
বলিলেন—"এ জীবনে সব তারই ভালো,
নানা কাজে দেখায় যে বুদ্ধির আলো।
অল্প বয়সে লেখাপড়া শুরু করিলে—
খালি ফেল করিবে, বুদ্ধি না থাকিলে।
টাকার সাথে সাথে সম্মানও যাবে,
নানা গালিগালাজে চিত্তও তিক্ত হবে !
তার চেয়ে এই দেখো—আছি বেশ সুখে,
পড়াশুনো তাই বলে দেই নিকো চুকে।
দেখিলাম, আছে মোর বুদ্ধির বল,
ভালো করি পড়িলে পাবো ভালো ফল।
অবশেষে, বুড়াকালে পরীক্ষা দিয়েছি,
ভালোভাবে ম্যাট্রিক ডিগ্রীও পেয়েছি।
তাই, তোমরাও জীবনের প্রভাতকালে,
পরীক্ষা করে নাও কাজের ছলে
বুদ্ধির দৌড় কা'র কতটা আছে
নানা খেলাধূলাতে ও গানেতে নাচে।
বুদ্ধি থাকিলে তবেই পরীক্ষা দেবে,
পাশ করবেই, সাথে সম্মানও পাবে।
বয়সের বেশীতে কিছু এসে যাবে না,
পাশ করবেই, ফলে দুঃখও পাবে না।
আর যদি দেখো, বুদ্ধি বেশী নেই—
গভীর মনোযোগ দেবে খেলাধূলাতেই।
সম্পদস্বরূপ স্বাস্থ্যও ভাল হবে, যা'তে
মা-বাবাকে সাহায্য করাও যাবে তাতে।"
আমি বলি,—"মা-বাবার কাছে বলো আজই,
এ প্রস্তাবে নিশ্চয়ই হবেন তাঁরা রাজী।"

সমুদ্রের সম্পদ

সুনীল রায়

সমুদ্র-মন্থনের গল্প তোমরা বোধ হয় শুনেছ। পুরাকালে দেবতা আর অসুররা সমুদ্র-মন্থন করে সমুদ্রের তলা থেকে পেয়েছিলেন নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী। জানি না, এ গল্প কতদূর সত্যি,

কিন্তু এ কথা সত্যি যে, সমুদ্রের তলায় আছে অফুরন্ত ঐশ্বর্য। এ যুগেও মানুষ সমুদ্র-মন্থন করে অপরিমেয় সম্পদ আহরণ করছে।

সমুদ্রের তলা থেকে আমরা কত কী যে পাই তার ইয়ত্তা নেই। প্রথমে খাওয়ার জিনিসের কথাই ধরা যাক। সমুদ্র থেকে আমরা নানারকম পুষ্টিকর মাছ ও ঝিনুক পাই। সমুদ্রে একরকম উদ্ভিদ জন্মায় যা শস্তের ফসল বাড়াবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সামুদ্রিক উদ্ভিদ এস্কিমোদের এক উপাদেয় আহার্য। নিউ ইংল্যাণ্ডের সমুদ্র তীরবর্তী পাহাড়ে এক ধরণের শৈবাল জন্মে যা দিয়ে সুস্বাদু পুডিং তৈরী হয়।

পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। বর্তমান জনসংখ্যা অনুমান তিন শ' কোটি এবং প্রতি বছর অনুমিত বৃদ্ধি পাঁচ কোটি। এই হারে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে চল্লিশ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র জমি থেকে এই বিরাট জনসমষ্টির অন্ন সংস্থান হওয়া কঠিন। কারণ এত বেশী পরিমাণ উর্বর জমি আমাদের নেই। ফলে খাদ্যাভাব ঘটার সম্ভাবনা আছে। এই খাদ্যাভাব দূর করতে পারে একমাত্র সমুদ্র। সমগ্র ধরাপৃষ্ঠের ৭১ ভাগ সমুদ্র, ২৯ ভাগ স্থল। এখন পর্যন্ত সমুদ্র থেকে মানুষ তার সমগ্র খাদ্যের মাত্র ১ ভাগ সংগ্রহ করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হলে সমুদ্রও প্রায় স্থলভূমির সমান খাদ্য মানুষকে সরবরাহ করতে পারে। তাঁদের অভিমত এই যে, সমুদ্রের উদ্ভিদ, ঝিনুক ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য ভবিষ্যতে আমাদের বেশী পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে। তবেই আগামী দিনে সকলের খাদ্য জোগান সম্ভবপর হবে।

খাওয়ার জিনিস ছাড়াও সমুদ্র থেকে আরও বহু প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস আমরা পেয়ে থাকি। দেহের কোথাও কেটে গেলে তোমরা যে আয়োডিন ব্যবহার কর, তা পাওয়া যায় সমুদ্র থেকে। ফটোগ্রাফিতে যে ব্রোমাইন ব্যবহৃত হয়, তাও আসে সমুদ্র থেকে।

তোমরা শুনে অবাক হবে যে, এক ঘন মাইল সমুদ্রজল থেকে প্রায় পঁচিশ টন আন্দাজ রূপো পাওয়া যায়। সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও ইউরেনিয়ামও পাওয়া যায়। কিন্তু সমুদ্রজল থেকে এই সব ধাতুর নিষ্কাশন পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

সমুদ্রের তলা থেকে আমরা মুক্তা সংগ্রহ করে থাকি। মুক্তা দিয়ে নানা রকম দামী অলংকার তৈরী হয়। সমুদ্রের নানা রকম ঝিনুক থেকে ছাইদানী, ধূপদানী, টেবিল-ল্যাম্প ইত্যাদি আজকাল তৈরী হচ্ছে। এ সমস্তই মানবজাতির প্রতি সম্পদশালী সমুদ্রের উপহার।

য়্যাসেজ মানে ছাই

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংলণ্ড আর অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেষ্ট ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হ'লেই আমরা শুনি য়্যাসেজের কথা, কিন্তু অন্য কোন দেশের বেলায় বলা হয় নাবার। য়্যাসেজ মানে ছাই। ক্রিকেট খেলার সংগে ছাই এর তো কোন সম্বন্ধ নেই। তাহ'লে এই য়্যাসেজ শব্দটা এলো কোথা থেকে, আর ক্রিকেট খেলার সংগে এর সম্পর্কই বা কি? য়্যাসেজ শব্দটির জন্ম কথা জানতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে অনেক দিন পিছিয়ে। সে ভারী মজার ব্যাপার! অদ্ভুত ঘটনা! সেই গল্পটাই আজ বলবো!

১৮৮২ সাল। ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেষ্ট খেলা হচ্ছে ইং ওভাল মাঠে, সেই খেলায় ইংলণ্ড পরাজিত হলো। নিজের অষ্ট্রেলিয়ার হাতে ইংলণ্ডের সেই প্রথম পরাজয়। পরের দিন লং 'স্পোর্টিং টাইমস' পত্রিকায় কালো দাগের মধ্যে শোক সংবাদ বেরু তাতে লেখা ছিলো, গত ২৯শে আগষ্ট ওভাল মাঠে ইংলণ্ড ক্রি মৃত্যু ঘটেছে। তার দেহ সংকার করা হবে আর চিতাভস্ম অষ্ট্রে দেশে নিয়ে যাবে। য়্যাসেজ কথার চলন হলো সেই দিন থেকে।

পরের বছর শীতকালে ইংলণ্ডের আইভো ব্লিগ খুব শক্তি দল নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় খেলতে গেলেন। পরাজয়ের শোধ তু যে কোরেই হোক! তিনটি টেষ্ট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড দু'টি জয়লাভ করলো। ইংলণ্ড আর অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে তৃতীয় টেষ্ট খেলা হলে, অষ্ট্রেলিয়ার ক'য়েক জন মেয়ে মাঠের মধ্যে ক্রিকেট খেলার এ ষ্টাম্প পুড়িয়ে ছাই করে ফেললেন। তারপর সেই ছাই একটা ম পাত্রে পুরে আইভো ব্লিগের হাতে দিলেন। য়্যাসেজ কথার চ আরো দৃঢ় হলো।

ব্লিগ যতদিন বেঁচেছিলেন ছাই ভরা এই পাত্র ততদিন নি কাছেই রেখেছিলেন। মৃত্যুর পর ব্লিগ উইল করে পাত্রটি এম, সি-কে দিয়ে যান। তাই ১৯২৭ সাল থেকে ছাই ভরা এই পা ইংলণ্ড এর লর্ডস গ্রাউণ্ডের প্যাভেলিয়নে সাজিয়ে রাখা আছে।

খেলায় জিতে য়্যাসেজ পাওয়া মানে কোন কাপ বা শীল্ড পা না। পাওয়া যায় শুধু সম্মান। তবে য়্যাসেজ মানে ছাই-ই।

ভগীরথের শঙ্খধ্বনি

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

আগে বলেছি, বাঙ্গালীরা সংস্কৃত ভাষাকে উচ্চারণ করতে গি বিকৃত করে বসল। সংস্কৃত তাদের মুখে নূতনরূপ পরিগ্র করল। তাকে প্রাকৃত বলা হোল। সংস্কৃত ভেঙ্গে সৃষ্টি হোল প্রাকৃতে প্রাকৃত আরও ভাঙ্গতে লাগল। ভেঙ্গে ভেঙ্গে অপভ্রংশ সৃষ্টি হোল অপভ্রংশ আরও সোজা হতে হতে লোকমুখে বদলাতে বদলাতে কো এক সময় বাংলাভাষার জন্ম দিয়ে বসল। দশম শতকেই বাংলাভাষা এভাবে জন্ম হয়েছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। আমাদে সৌভাগ্য অঙ্কুরোদ্গত বাংলাভাষার প্রাচীনতম রূপের নিদর্শন আম পেয়েছি। ভাষার এই অসমৃদ্ধ রূপকে নিয়েই একদল সাধক সাহি সৃষ্টি করলেন। আমরা একসঙ্গে অঙ্কুরোদ্গত বাংলাভাষা আ প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্য পেলাম। যাতে পেলাম সেই পুঁথিটি নাম হোল 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'। নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এটি উদ্ধার করে আনেন। এর ভাষার না দিয়েছেন তিনি, "সন্ধ্যাভাষা"। সন্ধ্যা বেলায় যেমন দিনের সারা রাতের শুরু, এ ভাষাতেও তেমনি সংস্কৃত ভাষার শিকল কেটে বাংলা ভাষার মুক্তি প্রাপ্তি। তা ছাড়া এর কথা সন্ধ্যার মত আবছায়া রহস্যময়, এ হোল—অভিপ্রায় ও অভিসন্ধি বোঝাবার ভাষা।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মানুষ সভ্যতার দিকে যখ এগোলো তখন কতক শিল্পকলা রইল ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে, কতক রইল রাজসভার সঙ্গে জড়িয়ে। প্রধানতঃ এই দুই রাস্তা ধরে শিল্পের ক্রিয়াকাণ্ড চলল সবদেশেই।" সহায়তা, রাজদরবার তার সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য ঝলমল স্থান থেকে পঙ্গু দুর্বল ভাষার দিকে তাকাতে কুণ্ঠি

সে তার পর্যায়ের উপযুক্ত ভাষাকেই অবলম্বন করে। তাই রাজদরবারে সংস্কৃত ভাষার চর্চা চলল। গুপ্ত সম্রাটদের আগে থেকেই বাংলাদেশে সংস্কৃত কাব্য ও শাস্ত্র চর্চার পত্তন হয়েছিল। ষষ্ঠ সপ্তম শতকে এদেশের রচনারীতির বিশিষ্টতা আর্যাবর্তে স্বীকৃত হয়েছিল "গৌড়ীরীতি" নামে। শব্দের আড়ম্বর ও অনুপ্রাসের প্রাচুর্য এই রীতির প্রধান লক্ষণ। ষষ্ঠ সপ্তম শতকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধ-জৈন ব্রাহ্মণ্যধর্মকে আশ্রয় করে আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার চর্চাও বাংলাদেশে সুরু হয়। ব্যাকরণের চর্চায় বাংলাদেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। চান্দ্র-ব্যাকরণ রচয়িতা চন্দ্র গোস্বামী একদা বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি অনেক বই লিখে গেছেন। আয়ুর্বেদ নিয়ে প্রাচীন বাংলাদেশে অনেক বই লেখা হয়েছিল, তার মধ্যে 'হস্তী আয়ুর্বেদ বিদ্যা' প্রসিদ্ধ। হাতীর চিকিৎসক বললেই বোঝাত বাঙ্গালী। একে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের সুনাম ছিল সারা ভারতে। পাল আমলে চক্রপাণি দত্ত কবিরাজ হিসেবে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা নিয়ে তিনি কয়েকটি বই লিখে গেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে আয়ুর্বেদ দীপিকা, শব্দ চন্দ্রিকা, দ্রব্যগুণ সংগ্রহ, চিকিৎসা সংগ্রহ বিখ্যাত। চক্রপাণির বাবা নারায়ণ নয়পালের সভাসদ ছিলেন। অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে সুরপাল ও বঙ্গ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন শিলালিপিতে যে সমস্ত সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে কাব্যোৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। দেবপালের সভাসদ অভিনন্দ রচিত "রামচরিত" হোল বাংলাদেশের প্রথম কাব্য। এর থেকে বোঝা যায় পাল আমলে রামায়ণ কাহিনী বেশ চালু ছিল। রামায়ণ নিয়ে এর পর লেখা হয়েছে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'। এই কাব্যটি এমনভাবে লেখা হয়েছে যে প্রত্যেকটি শ্লোকের দুটো করে মানে হয়—একটা মানে রামায়ণের রামচন্দ্রর নামে, অন্যমানে রামপালের জীবনকাহিনী নিয়ে। মহীপালের রাজসভায় ক্ষমীশ্বর নামে এক নাট্যকার ছিলেন। তাঁর লেখা "চণ্ডকৌশিক" নাটকে বিশ্বামিত্র-হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লেখা আছে। নীতিবর্মা নামে এক কবির "কীচকবধ" কাব্যটিও এই সময় লেখা হয়। বিভিন্ন বাঙ্গালী কবি ও কয়েকজন ভারত প্রসিদ্ধ কবিদের কবিতা নিয়ে আদি বাংলা অক্ষরে লেখা একটি কবিতা সংগ্রহ গ্রন্থ পাওয়া গেছে। তার রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। গ্রন্থটির নাম "কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়।" নির্বাচিত কবিতা সংকলন গ্রন্থ বাংলায় তথা ভারতে এই প্রথম।

বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য তিন ধর্মই বাংলাতে রয়েছে দেখতে পাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভারতের অনার্য অংশে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে এর আগেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম চলে এসেছে। তার চর্চা চলেছে। পালরাজারা বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণদিকে শ্রদ্ধা করতেন, দান করতেন, সাহায্য করতেন। জৈন ধর্ম একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তার তেমন কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বৌদ্ধধর্ম দেখা দিয়েছে প্রধান ধর্মরূপে। তার প্রবল বন্যায় বাংলাদেশ ভেসে চলেছে। বৌদ্ধধর্মের কড়াকড়ি একেবারে কমে গেছে। নাম হয়েছে মহাযান বৌদ্ধধর্ম। বুক পেতে দিয়েছে সে, "এসো হে পতিত করো অপনীত সব অপমান ভার" বলে ডাক দিয়েছে জনসাধারণকে। "স্বর্গ নেই, ঈশ্বর নেই, নরক নেই, অধর্ম নেই, ধর্ম নেই, এ জগতের সৃষ্টিকর্তা কেউ নেই, সংহারকর্তা নেই, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নেই। দেহ ভিন্ন পাপ পুণ্যাদি সমস্ত কর্মের ফলভোগী আত্মাদি নেই। এই মিথ্যাভূত অখিল সংসারে জীবগণ মোহবশে এই সমস্ত অনুভব করে আসছে।"—জনসাধারণকে তাঁরা বলতে লাগলেন "অহিংসা পরম ধর্ম। নিজের যা ভালো লাগবে তাই করবে।"—এমনি ভাবে তাঁরা সমস্ত বাধা বন্ধ তুলে দিলেন। এতে করে নানা রকম বৌদ্ধধর্ম গড়ে উঠল। মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান, আরও কত রকমের যান। এদের সবাইকে এক কথায় বলা যেতে পারে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম। তাঁরা বললেন, "হোম করলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চোখের পীড়া হয় এই মাত্র।" জৈনরা উলঙ্গ থেকে সাধনা করে তো, তাদের বিরুদ্ধে বলা হোল—"যদি উলঙ্গ হলে মুক্তি হয়, তবে শিয়াল কুকুরের মুক্তি আগে হবে।" হীন যান বৌদ্ধদের সম্বন্ধে বলা হোল—"বড় বড় স্থবির আছেন, কারও দশ শিষ্য, কারও কোটি শিষ্য, সবাই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকিয়ে খায়।" তাঁদের মতে আসল কথা হোল: "সহজ মা ভোলয়ে জোঈ"—জীবনের যা সহজ নিয়ম তা ভুলবে না। "দেহ হি বুদ্ধ বসন্ত"—দেহের দেউলেই বুদ্ধের সাধনা করো। এর জন্যে গুরুর শরণাপন্ন হতে হবে। লোক জীবনের জৈবিকধর্ম বৌদ্ধধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে কালক্রমে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি করল। ওদিকে আদ্যিকাল থেকেই শিব ঠাকুর বলে আসছিল "ধান ভানতে শিবের গীত"—এই শিবের গীত গেয়ে তখনকার মেয়েরা ধান ভানতো। এই ধান ভানা শিব তখন ছিলেন চাষের দেবতা। লোকেরা শিব ঠাকুরের গান গাইত।—

"আমার বাক্য ধর গোসাঞি, তুহ্মি চসচাস,
কখন অন্ন সত্র গোসাঞি, কখন উপবাস"—

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও লৌকিকধর্ম দুই এ মিলিয়ে হিন্দুধর্মের আজকের দেব দেবীর কালক্রমে সৃষ্টি হচ্ছিল। পাল আমলে শিব, বিষ্ণু, কালী, বিষহরি বা জাগুলী, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবীর পুজো চলছিল। শিব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা সব ধর্মেই ছিল। শিব ঠাকুরকে নিয়ে হিন্দু শৈবধর্ম গড়ে উঠেছিল, কালক্রমে তাই হিন্দু শৈব তান্ত্রিক ধর্মে পরিণত হয়। বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মে এক সময় বেশ ঝগড়া বাধে। এদের ঝগড়া আনিয়ে মিলন ঘটালো নাথ ধর্ম। এই ধর্মের নেতৃবৃন্দের উপাধি ছিল 'নাথ', তার থেকেই এই ধর্মের এই নাম হোল। নাথদিগকে সিদ্ধাচার্য বা সিদ্ধাইন্ত বলত। এঁরাই বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যিক কীর্তি "চর্যাচর্যবিনশ্চয়" রচনা করেন। চর্যাপদ নমুনা দেখ—

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বনমালী।
মোরঙ্গী পিচ্ছ পরহিন সবরী গুঞ্জরী মালী।"

(উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা, শবরীর পরণে ময়ূরের পাখা, গলায় গুঞ্জর মালা।) আসলে এগুলি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে লেখা। তবু একে সাহিত্য বলে, কেননা, এগুলি ছন্দে রচিত হয়েছে ও সুর দিয়ে গীত হয়েছে। বাঙ্গালী প্রাণের সহজ প্রকাশ হয় গানে অর্থাৎ গীতি কবিতায়, চর্যাপদ যেন গোড়া থেকেই তার সঙ্কেত দিচ্ছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সহজিয়া সাহিত্যের প্রকৃতিরও বৈষ্ণব সাহিত্যের আকৃতির পূর্বাভাষ এতে পাওয়া যায়। চর্যাপদে যা গীতাকারে বলা হয়েছে, নাথসাহিত্যে কাহিনীরূপে তাই বলা হয়েছে। গোপীচাঁদের গান আর গোরক্ষবিজয় লোকসাহিত্যের আসরে একসময় গাওয়া হোত। এইভাবে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হোল আর জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ল।

শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বৌদ্ধদের মহাযান-বজ্রযান-সহজযান

প্রভৃতিকে আশ্রয় করে এই সুবিপুল সংস্কৃত সাহিত্য গড়ে উঠে। শান্তিরক্ষিত, শান্তিদেব, কুমারচন্দ্র, চন্দ্রদাস, নাগবোধি, সরোরুহচন্দ্র, শবরীপাদ প্রমুখ বৌদ্ধাচার্যগণ অষ্টম-নবম শতকে বর্তমান ছিলেন। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে যে সমস্ত বৌদ্ধ আচার্যগণ গ্রন্থরচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রী মিত্র, অভয়াকর গুপ্ত, দিবাকরচন্দ্র, কুমারবজ্র, দানশীল, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, বিভূতিচন্দ্র, জেতারি, প্রজ্ঞাবর্মা, পুণ্ডরীক, লুইপা, কাহ্নপা, জালন্ধরীপাদ, তিলোপা, বিরূপা আর কত নাম করব? অজস্র নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কেউ পঞ্চাশটি, কেউ ত্রিশটি, কেউ কুড়িটি, কেউ পনেরটি, কেউ পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর থেকে বুঝতে পারছ বাংলাদেশে এ সময় বৌদ্ধধর্মের কি বিরাট চর্চা হোত। এত চর্চা হলেও ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ তরঙ্গে ভাঁটার টান দেখা দিল। লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতি দেশের বুকে ছিল আগে থেকেই, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বাংলাদেশের বুকে এলে পর এদের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত হোল। এই তিনের মিলনে মিশ্রণে আদানে প্রদানে এক সম্মিলিত ও সমীকৃত সংস্কৃতি দেখা দিতে লাগল, তা হোল বাঙ্গালী সংস্কৃতি। আর ধর্মের রঙ্গমঞ্চ পাল আমলের সাথে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকাও বাদ পড়ে গেল। সামনাসামনি দেখা দিল—লৌকিকধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম।

পাল আমলের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পকলা গৌরবোজ্জ্বল মহিমা লাভ করেছে। বাঙালী জাতির সেদিনের জাগরণের পালা—ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, বীরত্বে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। বিহার নির্মাণ, নানান দেবতার মূর্তি নির্মাণ করতেন সে যুগের শিল্পীরা। মাটি খুঁড়ে সে যুগের মূর্তি ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সে সব আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সে যুগের দু'জন শিল্পীর নাম জানা গেছে। ধীমান আর বীতপাল। এ দু'জনে ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় পূর্ব এশিয়ায় এক নূতন শিল্পরীতির প্রবর্তন করেন। ধীমানের শিল্পপদ্ধতিকে বলত "পূর্ব বিভাগ", বীতপালের শিল্পপদ্ধতিকে বলত "মধ্যদেশ শিল্প বিভাগ।" সে সময়ে গৌড় ও মগধের অধিকাংশ শিল্পীই বীতপালের শিষ্য ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ যে লিখেছেন—

"স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি,
শ্যাম কম্বোজে ওঙ্কারধাম মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।"

একথা মিথ্যে নয়। বাংলার শিল্পীরা চীন, জাপান, নেপাল, তিব্বত, জাভা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন সেখানকার শিল্প-কীর্তিগুলি গড়বার জন্যে।

এ যুগে বাঙ্গালী সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় হারাতে বসেছে। বহির্বাণিজ্য আর চলে না বললেই চলে। শিল্পী ব্যবসায়ী বণিকদের প্রভাব সমাজ থেকে প্রায় কমে গেছে। জমি বিলি হতে থাকে। লোকে যেন মাটি আঁকড়িয়ে বসতে থাকে। তাই কৃষিই হয়ে উঠে বাঙ্গালীর জীবিকা নির্বাহের উপায়। সামন্ততন্ত্র আর আমলাতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে উঠে। সোনার টাকা আর চলে না। রূপোর টাকা চলছে। খনা ও ডাকের বচন আর শুভঙ্করের আর্যা পাল আমলের আগে থেকেই বুঝি চলে আসছিল। ব্রতকথা আর ছেলে ভুলানো ছড়া অনেক আগে থেকেই চলে আসছে।

"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে,
ঝাঁঝ কাঁসর মৃদঙ্গ বাজে·····"

ছেলেভুলানো এই ছড়াটি বুঝি পাল আমলের কোনও যুদ্ধযাত্রা স্মৃতি নিয়েই রচিত। বাঙ্গালী সেদিন যুদ্ধে ছিল দড়। বাঙ্গা ডোমসেনা চলেছে—অগ্রবর্তী ডোমসেনা, বাগডোম বা পার্শ্বব ডোমসেনা, আর ঘোড়াডোম বা অশ্বারোহী ডোম যুদ্ধসাজে চলেছে ঝাঁঝ, কাঁসর, মৃদঙ্গ প্রভৃতি নিয়ে বাজছে যুদ্ধের বাজনা। যুদ্ধ, যু যুদ্ধ! ইতিহাসে বার বার যুদ্ধের বাজনা বেজেছে। জোর যার, মুলু তার। কমজোরী রাজাকে নেমে যেতে হয়েছে সিংহাসন থেকে শক্তিশালী রাজা দখল করেছে সিংহাসন। রাজা নয়তো কাণ্ডারী মহাকালের নদীতে দেশের তরী ভেসে চলেছে। উত্তাল, ঊর্মিমুখ মহাকালের নদী। ছোট্ট দেশের তরী। তাকে ভাসিয়ে রাখতে হবে ঠিকমত চালনা করতে হলে, হাল ধরতে হবে শক্ত হাতে, তাই চা শক্তিশালী কাণ্ডারী। সেই কাণ্ডারী হলেন রাজা। কাণ্ডারী এক কমজোর হলেই বেসামাল হবে তরী, বিপদাশঙ্কায় দুলবে। তখন এগিয়ে আসে শক্তিশালী কাণ্ডারী। হাল ধরেন শক্ত হাতে। পাল রাজারা হয়ে পড়লেন দুর্বল। বিশৃঙ্খল ও অরাজক হোল দেশ তখন—

তখনই এগিয়ে এলেন সেনেরা। ধরলেন শক্ত হাতে দেশের হাল

রক্তের স্বাক্ষর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভক্তি দেবী

হোটেলের গেটে মোটর ঢুকতেই চারিপাশে ভালো কর তাকালো সীমা। কেল্লা-ধরণের মস্ত বড় বাড়ীটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। সুমুখে বিস্তীর্ণ অঙ্গন নানা সাজে সাজানো কিছুদূরে একটা পাহাড় সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যেও সজাগ প্রহরী মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এর আগে সীমা এমন দৃ কখনও দেখেনি। তার চোখে তাই এখানকার সবই নতুন আ সুন্দর লাগছে। কিশোর মনে একটু কাব্যের দোলাও লাগছে হয়ত।

সে মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যায় জ্বলা বিজলী আলোয় উজ্জ্বল বাড়ীটির শোভ দেখতে থাকে।

কিন্তু তবু মহেন্দ্র সিংয়ের একটি কথাও তার কান এড়িয়ে যেতে পারে না। সে বিষয়ে সে যথেষ্ট সচেতন।

—এখন সম্ভবতঃ তোমার খুবই ভালো লাগছে বাড়ীটা। কিন্তু এখানকার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল রাত ন'টার পরে আর এখানে ইলেকটিক আলো জ্বলে না। তার কারণ এখানে ডায়নামো চার্জে কারেন্ট আমাদের নিজেদের তৈরী করে নিতে হয়। তাই রাত ন'টায় আমরা বন্ধ করে দিই ডায়নামোটা। শুধু প্রত্যেক করিডরে সেজের ভিতর মোমবাতি জ্বলে—আনাগোনার জন্য।

সীমা নীরবে শুনে যায়—আর এখানকার নিয়ম কানুনগুলোর সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করে।

সামনের বাড়ীটা আমাদের হোটেল আশা করি বুঝতে পারছো। নিজের হাতে গড়া হলেও বলতে আমার দ্বিধা নেই এ অঞ্চলের সবচেয়ে দামী আর সম্ভ্রান্ত হোটেল এটা। ভারতের প্রায় সব প্রদেশেরই লোক

আসেন এখানে। তবে রাজামহারাজা ধরণের লোকই বেশী। বছরে প্রায় ন'মাস খুব ভালো করেই চলে হোটেল। তার কারণ গ্রীষ্মের রাজধানী এই সিমলা। প্রায় প্রত্যেক বিত্তশালী লোকের দরকার পড়ে এখানে আসা-যাওয়া করবার—বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজে।

—কিন্তু সে যাই হোক আজ রাতের মত তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম করতে দেবার নির্দেশ আছে আমার ওপরে। চলো তোমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দিই। ঐ যে হোটেলের বড় বাড়ীটার থেকে হাত তিনেক হবে ছোট একটা বাড়ী দেখছো,—ওটাই এখানকার আউট-হাউস। ওরই উপরতলায় তোমার ঘর। কথা বলতে বলতে এগিয়ে যেতে থাকেন সিংজী, পিছনে সীমা।

—ওপরটাতে আর কেউ থাকে না। তার মানে একজন মহিলার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে অন্য কোন চাকর-বাকর ধরণের লোককে ওপরতলায় থাকতে দেওয়া হয় না।

—তা একা থাকতে তোমার ভয়টয় করবে না তো? মানে, তোমার আগে দু'তিন জন ষ্টেনোগ্রাফার ভয় পেয়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে কী না তাই জিজ্ঞাসা করছি। অবশ্য নীচের তলায় অনেক লোক থাকে। খুব ভালো একজন আয়া আছে। তোমার যাবতীয় কাজ তদ্বির-তদারক সেই করবে। তোমার যা কিছু প্রয়োজন তাকে বলে দিও। আশা করি খুশীই হবে তার কাজে।—বলতে বলতে ওঁরা উঠে আসেন দোতলার ওপরে।

—এই যে তোমার শোবার ঘর আর এই বাথরুম, সামনের বারান্দাটাও যথেষ্ট নির্জন। তুমি তোমার ইচ্ছামত ওঠাবসা করতে পারো এখানে। রাত্রে কিন্তু ভালো করে দরজা বন্ধ করে শুয়ো। কী, পারবে তো একলা থাকতে?

সীমা এবার একটু বিরক্ত হয় মনে মনে। তবু সে ভাব গোপন করেই বলে—দেখুন, জানিনা বার বার কেন আপনি আমায় ভয় পাবার কথা বলছেন। তার এইটুকু আমি আপনাকে বলতে পারি যে অত্যন্ত উদার বলিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে আমি বড় হয়েছি। অনর্থক ভয় পেয়ে চাকরী ছেড়ে চলে যাবার মত ভীরু বোধহয় আমি নই। তাছাড়া নিজের প্রয়োজন আছে বলেই আমি চাকরী করতে এতদূরে এসেছি। আমার কাছে চাকরীটা আদপেই এত সুলভ জিনিষ নয়।

মহেন্দ্র সিং খুশী হন সীমার কথা শুনে। বলেন—বেশ বেশ শুনে সুখী হলাম। আমার ধারণা ছিল বাঙালী মেয়েরা একটু ভীতু ধরণের হয়।—তাহলে আজকে রাতের মত তুমি বিশ্রাম করো। কাল সকালে ঠিক সাতটায় অফিস্ রুমে হাজির হয়ো। তোমার সারাদিনের কাজের রুটিন দিয়ে দেবো তখন। আমি বরং এখন তোমার ডিনার দিয়ে যেতে বলে যাচ্ছি।

ম্যানেজার মহেন্দ্র সিং বিদায় নিলে সীমা তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে গিয়ে ঢোকে।

সুন্দর সাজানো ঘরটি। একধারে একটা ছোট খাট ধোপদুরস্ত বেড কভারে ঢাকা। একটি ড্রেসিং টেবিল, আয়না, কাপড় রাখা আলমারী, লেখার টেবিল, টিপয়, এমন কী একটা ডেক চেয়ার পর্যন্ত মজুত আছে ঘরটিতে।

আর তাছাড়াও যে জিনিসটি দেখে সবচেয়ে আনন্দ সীমার—সেটি একটি বইয়ের আলমারী। বোধহয় লাইব্রেরী-ঘরে স্থানাভাব ঘটায় বই ভর্তি একটা বইয়ের আলমারী সীমার ঘরে স্থান পেয়েছে। আলমারীর গায়ে চাবিটা ঝুলছে। সীমার মনটা আনন্দে ভরে যায়। একে তো নিজস্ব এমন একটি সুন্দর সাজানো ঘর তার জীবনে এই প্রথম। তাতে সমস্ত দোতলাটারই প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি সীমা—এ এক অভাবিত সৌভাগ্য সীমার পক্ষে।

ঘরে ঢুকে তাই জামা জুতো ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে সীমা প্রথমেই মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করে প্রণতি জানায় আর ধন্যবাদ দেয়, তাঁর অকৃপণ হাতের দানের জন্যে। আর সেই সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জানায় কনভেন্টের মাদার সুপীরিয়রকে। যাঁর মত হিতৈষিণী এ জগতে সীমার আর কেউ নেই।

একটু পরেই মেট্রন আসে রাতের খাবার নিয়ে। সযত্নে টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়ে সীমার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে।

—আমার নাম মিস্ ডরোথি রেঞ্জার্ট। আপনার যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবেন। এই নীচের তলাতেই থাকি আমরা সব। আরও অনেক লোক থাকে। তবে যখন তখন ওপরে এসে আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না।—আসবার হুকুম নেই। যাক্গে দোতলায় এই একটি মাত্র শোবার ঘর বলে এখানে শুধু একজনের মত ব্যবস্থাই করা আছে। তা রাত্তিরটুকু আপনার হয়ত একটু অসুবিধাই হবে—নিছক একলা থাকতে। একটু সাবধানে শোবেন। তারপর ঠিক ছটায় আমি আপনাকে ডেকে দেবো। আপনার কাজ তো সাতটায়—তাহলে আপনার স্নান খাওয়া সেরে যেতে কোন অসুবিধাই হবে না।

সীমার বেশ ভালো লাগে এই বয়স্কা স্ত্রীলোকটিকে, বেশ সদালাপী মানুষটি।

সে হেসে বলে—তাই হবে মিস্ ডরোথি। সকালে তুমি আমায় জাগিয়ে দিও। যদিও সাধারণতঃ আমি ভোরেই উঠি। তবু নতুন জায়গায় বা শীতের দেশে বলে যদিই আমি ঘুমিয়ে পড়ি তবে আমায় জাগিয়ে দিও।

এরপর থালাবাসন গুছিয়ে নিয়ে রাত্তির বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে মেট্রন যখন নীচে চলে গেল তখন সীমা উঠে নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে এলো ভালো করে। তারপর ধীরে সুস্থে আজকের মত বিশ্রাম নেবার তোড়জোড় করে।

তবে খুব বেশী ক্লান্ত মনে হয় না নিজেকে।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এলেও ফার্স্ট ক্লাসে খেয়ে ঘুমিয়ে যথেষ্ট আরাম করেই এসেছে সে। শরীর প্রায় তাজাই আছে তার।

এত অল্প উত্তাপে গলে যাবার মত মোম দিয়ে গড়া তো সে নয়। এত সকালে ঘুমিয়ে পড়ার মত শ্রান্তি তাকে পেয়ে বসে নি। হাতঘড়িতে মাত্র সাড়ে আটটা বেজেছে দেখে শুয়ে পড়তেও চাইলো না মনটা। বিশেষ আজকের দিনটি সীমার কাছে এতই স্বতন্ত্র আর বৈচিত্র্যময় যে মনটা তার এখুনি এ দিনটার ইতি টানতে রাজী হচ্ছিল না।

তার ওপর আজকের দিনের পরম লাভ এই বইঠাসা আলমারীটা সীমার মনটাকে প্রলুব্ধ করছিল সবচেয়ে বেশী। তাই বইয়ের আলমারী থেকে একটা বই টেনে এনে একটু নাড়াচাড়া করবার লোভটা সীমা সংবরণ করতে পারে না। বহু সুখাদ্যের সামনে দাঁড়ালে মানুষ যেমন অন্ততঃ একটু চেখে দেখবার জন্যে লালায়িত হয় ঠিক তেমনি ভাবে একটা বই তুলে নেয় সীমা।

দীর্ঘ সময় হাতে নেই জেনেও পাতা উল্টে দেখতে চায় একটু। কিন্তু বইটার পাতা উল্টাতেই চোখে পড়লো একটা সুন্দর ফটোগ্রাফ।

বছর তিনেকের একটি ছেলের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি একখানি। কী চমৎকার যে বাচ্চাটার চেহারা—অবাক হয়ে দেখতে থাকে সীমা। দেখে যেন তার আশ মেটে না।

—কী করে বইয়ের ভিতর এলো ফটোটা? মনে মনে ভাবতে থাকে সীমা। নিশ্চয়ই কোন মা বাবা তাঁদের বাচ্চার ছবি দিয়ে বইয়ের পাতা চিহ্নিত করেছিলেন পড়বার সময়। তারপর ভুলে গেছেন ছবিটার কথা।

এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে সীমা। হঠাৎ ছবিটার ওপরে এক ফোঁটা তাজা রক্ত দেখে চমকে উঠলো সে।

সঠিক কোন কিছু বোঝবার আগেই বা সাবধান হবার আগেই ফোঁটা ফোঁটা করে বেশ কিছুটা রক্ত ঝরে পড়লো ছবিটার ওপর। কয়েক মুহূর্ত পরে সীমা বুঝতে পারে রক্তটা এসেছে ঘরের ওপরের সিলিং হতে।

হতভম্ব হয়ে যায় সীমা। আলোটাও ততক্ষণে কমতে আরম্ভ করেছে। মহেন্দ্র সিংয়ের কথা মনে পড়ে যায় সীমার, ডায়নামোর সাহায্যে আলো জ্বালা হয় এখানকার। রাত ন'টায় তাই নিভে যায় সমস্ত বাতি। দ্রুত হাতে সীমা মুছে ফেলতে চেষ্টা করে রক্তের ফোঁটাগুলো কিন্তু তবুও আর আগের মত হয় না ছবিটা। বেশ কিছুটা দাগ ধরে গেছে সেটার ওপরে।

সীমার মনটা খারাপ হয়ে যায় ছবিটা নষ্ট হওয়ায়। তাড়াতাড়ি সে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে ফেলে রক্তের চিহ্নগুলো।

অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে সমস্ত ঘরটাকে গ্রাস করছে। শুয়ে শুয়ে ভাবে সীমা নিশ্চয় ছাদের ওপর এখানে বাবুর্চিখানা আছে। রাত্রে কোন অতিথি এসে পড়ায় সেখানে মুরগী জবাই করছে খানসামারা। আর তারই রক্ত কাঠের সিলিং বয়ে ঝরে পড়েছে নীচের ঘরে। অমন সুন্দর ছবিটা নষ্ট করে দিয়েছে একেবারে। ভারী আফশোষ হয় সীমার।

তারপর কখন যে ক্লান্তি হরণী নিদ্রাদেবী তাকে কোলে তুলে নিয়ে সব চিন্তা ভাবনা থেকে ছুটি দিয়ে যান তা সে নিজেও জানতে পারে না।

মাঝ রাতে ঘুমটা আবার ভাঙলো। কী একটা অস্বস্তিকর শব্দ। মনে আছে ঘরের ভিতর অনেক লোক চলাচল করছে। অথচ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না। অনুভবে মনে হচ্ছে জুতো পরা পায়ের সন্তর্পণ আনাগোণার বিরাম নেই।

কিন্তু নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে শুয়েছে সীমা। তবু এত লোক ঘরের মধ্যে আসবেই বা কেমন করে। খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল সীমা। যদিও সে খুব সাহসী মেয়ে তবুও তার পক্ষে একেবারে নির্ভীক থাকা সম্ভব হয়নি। মনে মনে সে স্থির করে ফেলে একা একা এই অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকা আর কোন মতেই সমীচীন হবে না তার পক্ষে। মনে জোর করে বিছানায় উঠে বসলো সে।

ওকে উঠতে দেখে সমুখের একটা ছায়া মূর্তি এক লহমায় সরে গেল যেন।

দরজা খুলে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সীমা। বারান্দার দেওয়াল-গিরিতে তখনও মোমবাতি জ্বলছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সেই স্বল্প আলোর রশ্মি যখন ঘরে এসে পৌছুলো তখন সেখানে আর জন প্রাণীর চিহ্ন নেই।

তবু সে রাতে আর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুতে পারলো না সীমা। ডেকচেয়ারটা টেনে এনে বারান্দাতেই শুয়ে পড়লো কম্বল ঢেকে।

বাকী রাতটুকু শান্তিতেই কেটে গেল বারান্দায়। ঘুম ভাঙলো ভোরবেলা মেট্রনের ডাকে।

—ওঠো ওঠো দিদিমণি। একী করেছ তুমি? বাইরে এই বারান্দায় এসে শুয়ে আছো? যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়? তখন কি হবে বল তো?—নতুন জায়গা বলে রাতে ভালো ঘুম হয়নি বুঝি? এদিকে ছটাও তো বাজে। ওঠো, মুখ হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও।

ধড় মড় করে উঠে বসে সীমা। সহাস্যে সুপ্রভাত জানায় মেট্রনকে।

তারপর ত্বরিত হস্তে নিজেকে সারাদিনের জন্য তৈরী করে নিতে থাকে।

গরম জলে স্নান সেরে ডিম রুটি আর কলা দিয়ে প্রাতরাশ সারতে সারতে সীমা মেট্রনকে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা তিনতলার উপরে বুঝি তোমাদের বাবুর্চিখানা? কাল রাতের বেলা—

—না—না এ বাড়ীতে তিনতলায় কোন ঘরই নেই। ছাদে ওঠার সিঁড়িই নেই মোটে। কেন বল তো দিদি? কাল রাতে কী অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছো তুমি?

—না—না সে রকম কিছু নয়। ব্যাপারটা আর ভাঙে না সীমা। নিজের মনেই ভাবতে থাকে গতরাতের কথাগুলো।

—কোথা থেকে এলো তবে রক্তের ওই ফোঁটাগুলো? পাহাড়ে দেশ বলে সমস্ত বাড়ীগুলোরই সিলিং কাঠের। তাই কোন তরল পদার্থ ওপরতলার ফোকর দিয়ে নীচের তলায় ঝরে পড়া অবশ্য অসম্ভব নয় কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওপরের ছাদে রক্ত এলো কী করে? ভাবতে ভাবতে সীমার মনে হয়—হয়তো ভাম বা বনবিড়াল জাতীয় কোন মাংসাশী জীব পায়রা মেরে খেয়েছে ছাদের ওপর বসে।

কিন্তু মেট্রন যে বললে ছাদে যাবার কোন সিঁড়িই নেই মোটে। তাহলে ভাম বা বনবিড়ালই বা ছাদে গেল কেমন করে?

ভাবতে ভাবতে যেন দিশা পায় না সীমা। তবু তার স্থির ধারণা হয় বিড়াল জাতীয় কোন মাংসভুক জীবেরই কাজ এটা। তাই সে সিদ্ধান্ত করে এ বাড়ীর ছাদে ওঠার কোন সিঁড়ি না থাকলেও পাশের বাড়ী অর্থাৎ হোটেলের তিনতলায় উঠে সে এ বাড়ীর ছাদটা দেখবে। কোনও জীব পাখী মেরে সত্যিই যদি খেয়ে থাকে তবে তার পালকগুলো নিশ্চয় পড়ে থাকবে ছাদের ওপর।

কিন্তু এ বিষয়ে আর বেশী গবেষণা করবার সময় হাতে ছিল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সীমা তাড়াতাড়ি পা চালালো আপিসঘরের দিকে।

—আরে। এই যে তুমি এসে গেছো। সুপ্রভাত। রাত্রে ঘুম হয়েছিল আশা করি। ভয়টয় পাও নি তো?—মহেন্দ্র সিংয়ের সেই একই প্রশ্ন আবার—সীমা কতটা ভয় পেলো?

সীমারও জেদ চড়ে যায়। যত ভয়ই পেয়ে থাক সে এই

না কটার কাছে তা মানবে না কিছুতেই। তাই হেসে বলে—সুপ্রভাত। আপনি মিছিমিছি আমার জন্ত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। গত রাত্রে আমি খুব আরামেই ছিলাম। এখন বলুন ত' আমার সারাদিনের রুটিন কী? আর আপাতত: আমাকে কী কাজ করতে হবে?

মহেন্দ্র সিং হাসেন, বলেন—আরে এত তাড়াতাড়ি কী? বছর খানেক আগে পর্যন্ত তো এ কাজটা আমিই চালিয়ে নিতাম। কিছুদিন থেকে মালিকের খেয়াল হয়েছে একজন মহিলা ষ্টেনো না রাখলে হোটেলের ইজ্জত বাড়ে না। তা এই এক বছরের মধ্যেই তিনজন মেয়ে কাজ নিয়ে কাজ ছেড়ে চলে গেল। শেষের জন—মানে তোমার আগে যে কাজ করছিল আর কী—বয়েসে সে তোমার চেয়ে অনেক বড়,—আর বেশ শক্ত মেয়ে ছিল।—কী নামটা যেন—জুন এ্যালবার্ট। সে বেচারা অনেক চেষ্টা করেছিল টিকে থাকার। মালিকের কাছে আর্জি পেশ করেছিল যদি তাকে ও বাড়ীর ওই দোতলার ঘরটা ছাড়া অন্য কোন ঘরে একটু শোবার থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তবে সে কৃতজ্ঞ থাকবে।

মালিক তো শুনে রেগেই লাল। বললেন—আমার হোটেলের খরিদ্দারদের মনে ভূতের ভয় ধরাচ্ছে ও। আর সত্যিই একা একটি মহিলার থাকবার পক্ষে ওই দোতলার নিরিবিলি ঘরটা ছাড়া ঘরই বা কোথায় আর?—যা হোক তুমি আবার ডিউটি বুঝে নিতে চাইছো। এসো তোমার সারাদিনের কাজ আর কাজের ধারা বলে দিই।

সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত এই আপিস ঘরে বসেই রোজ ডাক মেলাবে তুমি। রুম নম্বর মিলিয়ে যার যার চিঠি ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দেবে বেয়ারা মারফৎ। তারপর আপিসের চিঠিগুলো খুলবে দেখবে কে কী চায়। সাধারণত: যাঁরা এই হোটেলে আসতে চান তাঁদেরই চিঠি থাকে এগুলো। কোন ঘর কবে খালি হচ্ছে না হচ্ছে আপিসের নোটবুকে তার সমস্ত কিছুই লেখা থাকে। ভালোমত বুঝে সুঝে সকলকে চিঠির উত্তর দিও। যেটা অসুবিধা হবে তার জন্তে আমি তো রইলামই।

এই চিঠির আদানপ্রদান কাজটি খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কারণ এর ওপর হোটেলের সুনাম বদনাম অনেকখানিই নির্ভর করছে। তাই আমার একান্ত অনুরোধ তুমি এ বিষয়ে সব সময় খুব সচেতন থাকবে।

রীতিমত ভালো করে তত্ত্বাবধান নিয়ে তবে খরিদ্দারদের চিঠির উত্তর দিও। প্রয়োজন বুঝলে নিজে গিয়ে ঘরের অবস্থা দেখে সঠিক সংবাদ নিয়ে তবে লিখবে। শুধু ওই খাতাখানার ওপর বা বেয়ারা দারোয়ানদের মুখের কথার ওপর নির্ভর করে থেকো না। কেমন? তারপর আটটা থেকে ন'টা তোমার ডিউটি সাত নম্বর কামরায়। মানে রাজকুমার কমলাক্ষ দেবরায়ের ঘরে। উনি অবশ্য একেবারে আধুনিক যুগের উপযুক্ত ছেলে। এতটুকুও অহংকার নেই। বরং রাজকুমার বলে কেউ সম্বোধন পর্যন্ত করলে লজ্জিত হন। বলেন, উনি একজন আধুনিক সাহিত্যিক মাত্র—রাজকুমার নন; কিন্তু সেটা ওঁর মুখের বিনয়—চালচলনটা ওঁর রাজকুমারের মতই।

যাই হোক হোটেলের কর্তৃপক্ষের কাছে উনি ওঁর লেখার কাজের জন্ত একজন সহকারী চেয়েছেন। অবশ্য দিনে মাত্র একঘণ্টার জন্ত। তাই হোটেলের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তুমি আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত ওঁর ঘরে ডিউটি করবে।

তবে একটা বিষয়ে সাবধান করে রাখি ওঁর যখন লেখার ভাব আসে উনি ঝড়ের মত তাড়াতাড়ি বলে যান। খুব কম লোকই তখন ওঁর কথা ঠিকমত অনুসরণ করতে পারে। তাই তুমি যদি এ কাজে ওঁকে খুসী করতে পারো, তবে সেটা তোমার পক্ষে খুবই প্রশংসার কাজ হবে।

—আমার তরফ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। এতক্ষণ পরে সীমা সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর দেয়।

—বেশ। তারপরে একঘণ্টা তোমার ডিউটি পড়বে জনাব হুসেন আলির ঘরে।—অর্থাৎ নয় নম্বর কামরায়। উনিও মামুদপুরের নবাবের ভাইপো। ওঁর ঘরেও ওই একই ধরণের কাজ। যদি কোন চিঠিপত্রের উত্তর দেবার থাকে দেবে। যদি না থাকে তবে উনি যা বলবেন শুনবে। হয়তো বলবেন—কোন একটা বই পড়ে শোনাও বা কোন কিছু একটা কপি করে দাও। এমনই সব ফরমাস আর কী। কেমন বুঝেছো তো?

যাই হোক সাতটা থেকে আটটা অফিস ঘরে, আটটা থেকে ন'টা সাতনম্বর রুমে, ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত নয় নম্বরে কাজ করলেই সকালবেলার মত তোমার ছুটি। তবে কথা কী জানো? সকলের মন রাখতে গিয়ে হয়তো পাঁচ সাত মিনিট করে সময় বেশী যাবে তোমার। তাই ছুটি পেতে কোনদিন যদি দশটার জায়গায় সাড়ে দশটা বাজে—আশা করি হোটেলের মুখচেয়ে তাতে তুমি কিছু মনে করবে না। এরপর একেলার মত বিশ্রাম নেবে তুমি। স্নানাহার সেরে ইচ্ছামত কাটিয়ে দিও নিজের সময়টাকে।

বিকেলবেলায় ঠিক চারটেয় চলে যাবে মনোহরপুরের মহারাণীর কাছে—অর্থাৎ সতের নম্বর কামরায়। এ ঘরের মালিকের মনোরঞ্জনের ভঙ্গীমাটা হয়ত একটু অন্য ধরণের হতে পারে। যেমন ধরো বৈকালিক পোশাক-আশাকের সম্বন্ধে একটু পরামর্শ দেওয়া অথবা বেশবিন্যাসে নতুনত্ব আনতে একটু সাহায্য করা—এই ধরণের হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া চিঠিপত্র তো আছেই।

তবে বিকেলের দিকে এই একঘণ্টাই মাত্র ডিউটি তোমার। তার পর তুমি স্বাধীন। যেখানে খুসী বেড়াতে যেতে পারো। তবে বিকেলের দিকে তুমি যদি একটু হোটেলের কম্পাউণ্ডে যাও তাতে আমি সত্যিই খুশী হবো। ভেবে দেখ, আমাদের হোটেলের প্রোপ্রাইটর তাঁর হোটেলের উন্নতির আশাতেই তো আমাদের রেখেছেন সুতরাং তুমি যদি তোমার বিকেলটা আমাদের হোটেলের গ্রাউণ্ডে একটু খেলাধুলোয় যোগ দাও, তাতে তোমারও মন ভালো থাকে আর হোটেলের বাসিন্দারাও একজন ভালো খেলার সঙ্গী পান। নয় কী?

—বেশ তো। এ আর এমন কঠিন কাজ কি! সীমা আনন্দ সহকারেই তার কাজের দিনপঞ্জিকা অনুমোদন করে নেয়। তারপর সেদিনের ডাক বিলি শুরু করে দেয় সে।

এ কাজটা করতে সীমার মিনিট পনেরোর বেশী সময় নেয় না। হাতে তখনও সামান্ত যেটুকু সময় ছিল, তাতে একটা অফিসিয়াল চিঠির উত্তরের খসড়া তৈরী করে রাখে। আগামীকাল টাইপ করে দিয়ে দেবে ডাকে। আজ আর হল না। কারণ ততক্ষণে সমুখের

অফিটা তাকে সাত নম্বর কামরায় হাজির দেবার জন্তে তাগাদা দিচ্ছে। তাই সেইদিকেই পা বাড়ায় সীমা।

কমন প্যাসেজ দিয়ে যেতে যেতে সীমা ভাবে, সত্যিই ভারী সুপরিকল্পিত এই হোটেলটা। এর বহিসজ্জাও যেমন সুন্দর আবার তেমনি প্রত্যেক ঘরের সমুখে কলিং বেলটি থেকে সুরু করে ঘরের অভ্যন্তরের স্বতন্ত্র টাইপরাইটারটি পর্যন্ত রাজসিক আড়ম্বরে গণ্যমান্য অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্য দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

সাত নম্বর রুমের দরজায় এসে দাঁড়ায় সীমা—হাত বাড়ায় দরজার কলিং বেলটির পানে।

—আসতে পারো—ভিতর থেকে ভেসে আসে পুরুষকণ্ঠ। দরজাটা ঠেলে ভারী পর্দাটা সরিয়ে ভিতরে ঢোকে সীমা। কমলাক্ষ তখন সবেমাত্র চা-পর্ব চুকিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসেছিল একলা।

সীমাকে দেখে সে অবাক হয়ে বলে—আরে তুমি, মানে আপনি। এখানে এলেন কি করে? কোন একটা দরকারে পড়েছেন নিশ্চয়? তা বলুন, চেষ্টা করে দেখি, কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।

সীমা হেসে বলে—না, আমি সাহায্য চাইতে আসিনি। বরং সাহায্য করতে এসেছি আপনাকে। মানে আপনি হোটেলের কর্তৃপক্ষের কাছে আপনার লেখার কাজের জন্য একজন সহকারী চেয়েছিলেন তাই আমাকে তাঁরা পাঠিয়েছেন।

—আরে, সে কি, এই হোটেলেই কাজ করেন আপনি? তা আগে বলতে হয়। কিন্তু হোটেলের কর্তৃপক্ষের একটা বড় ভুল হয়েছে যে, আমার একজন বেশ তৈরী লোকের দরকার। আপনার মত ছেলেমানুষ অর্থাৎ অল্পবয়সী মহিলার পক্ষে আমার কথা লিখে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ, আমার একটা মস্ত দোষ হচ্ছে আমি আরম্ভ করলে আর থামি না। চেষ্টা করলেও থামতে পারি না। একবার থামলে ভাব-টাব সব গুলিয়ে যায় আমার। আর বলা হয় না। তাই বলছিলাম—আপনি এত কমবয়সী—

—আমাকে একবার চেষ্টা করে দেখবার সুযোগ দিন। সীমা নম্রভাবে বলে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে তো বেশ কথা—এক কথায় রাজী হয়ে যায় কমলাক্ষ।

তারপর বলে—তবে পরীক্ষাটা আজই দিয়ে ফেলতে অসুবিধা কি? আজ সকাল থেকে ভারী সুন্দর একটা ভাব এসেছে মাথায়। কিন্তু টিরকেলে সেই আলসে স্বভাবটাই কিছুতে লিখতে দিচ্ছে না আমায়। এবার আমি বলতে থাকি, আপনি লিখে ফেলুন। কেমন?

দুরু দুরু বক্ষে কাগজ-কলম ধরে প্রস্তুত হয় সীমা। কমলাক্ষ দুটি চোখ বুজে বলতে সুরু করে। ঠিক বিশ মিনিট বাদে চোখ খোলে সে। সামনে আসীনা সীমাকে ঘর্মাক্ত কলেবরে দেখে বাস্তবিকই লজ্জিত হয় সে।

—সত্যি আপনাকে বড় কষ্ট দিলাম—ঐ তো আমার দোষ।

—না—না কষ্ট হবে কেন? এই তো আমার কাজ। এবার যদি বলেন তো এটা আমি টাইপ করে আনি।

—সত্যি? সমস্তটা লিখে নিতে পেরেছো তুমি? আমি তো ধারণাতেই আনতে পারি নি—এত তাড়াতাড়ি লিখতে পারবে তুমি।—বিস্ময়ের আতিশয্যে 'আপনি' আজ্ঞে ভুলে যায় কমলাক্ষ।

—আচ্ছা, বেশ বেশ, আনো দেখি টাইপ করে। লেখাটা কেমন হ'ল দেখি।

সীমা উঠে যায় ঘরের কোণায় রাখা টাইপরাইটারটার সামনে। মিনিট পনের পরে নিখুঁত সুন্দর করে লেখাটি নিয়ে যায় কমলাক্ষের সামনে।

কমলাক্ষ এবার সীমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে একেবারে।—আরে! এ যে একবারে চমৎকার হয়েছে দেখছি। তুমি যে সত্যি সত্যি তাজ্জব করে দিলে আমায়। আমি ভাবতেও পারি নি—আমার এই স্পীডে বলা তুমি ফলো করতে পারবে। আর তুমি যে শুধু ফলো করেছ তা নয়, ভাষাটিও চমৎকার করে সাজিয়ে ফেলেছ। সত্যি বলছি তোমার সাহায্য পেলে আমার কাজের খুব সুবিধা হবে। বড় ভালো মেয়ে তুমি।

ওর আন্তরিক প্রশংসায় সীমা লজ্জা পায়। একটুক্ষণ নীরব থেকে বলে—আর কী কাজ করতে হবে বলুন। কোন চিঠিপত্রের—

—না—না আজ আর কোন কাজ নেই আমার। তবে একটা কাজ করলে ভাল হয়। যদি তুমি কিছু মনে না করো আমি তোমায় একটা অনুরোধ করবো। এখন তোমার হাতে বাড়তি সময় আছে কী?

—হ্যাঁ। আপনার জন্তে যে সময় আমার নির্দিষ্ট ছিল তার সবটা এখনও শেষ হয়ে যায় নি। বলুন না কী কাজ—

—তবে শোন, আমার বন্ধু পিনাকী কাল একটা ভীষণ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। বিকেলবেলায় সে যখন বেড়িয়ে ফিরে আসছিল মোটরে, তখন রাস্তার ধার থেকে একজন লোক হঠাৎ তার গাড়ীর ওপরে লাফিয়ে উঠে পড়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলী চালায়। পিনাকীর পোষা দুটো এ্যালশেসিয়ান কুকুর চক্ষের পলকে উঠে আততায়ীকে আক্রমণ করে। ফলে গুলীটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাতে করে পিনাকীর জীবনটা বেঁচে গেলেও তার ডানহাতের তালুতে গিয়ে গুলীটা লাগে। আর সেই জন্তেই বেচারা ভারী অসুবিধায় পড়ে গেছে।

আমার অত্যন্ত প্রিয়বন্ধু সে। ক'দিন আগে সিমলায় এসেছে। আগের থেকে পাশাপাশি দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে রেখেছে। যাতে প্রবাসের ক'টা দিন আমরা আনন্দে কাটাতে পারি। একটা দামী গাড়ী পর্যন্ত রিজার্ভ নিয়েছে যাতে দু'জনে বেড়াতে পারি খুশীমত। এত সব কাণ্ড করে রেখে এই কাণ্ড। কাল সন্ধ্যায় আমি এসে দেখি হাতের যন্ত্রণায় ছটফট করছে বেচারা। তাই বলছিলাম—হাতের জন্য পিনাকী তার কোন কাজই করতে পারছে না। চিঠিপত্রের জবাব দেবার তো উপায়ই নেই। এ ক্ষেত্রে তুমি যদি তাকে একটু সহৃদয় সাহায্য করো তবে বড় ভালো হয়।

—এরজন্তে আপনি আমাকে এত বার করে বলছেন কেন? হোটেলের সবাইকার কাজ করাই তো আমার কর্তব্য। চলুন, কোথায় যেতে হবে। [ক্রমশঃ।

ভদ্রেশ্বরনাথ মন্দির

(ভদ্রেশ্বর, হুগলী)

—জয়ন্তকুমার দত্ত

●

●

নেতাজীর ব্যবহৃত শয্যা

—মোনা চৌধুরী

ঘড়িঘর (মথুরা)

—দিলীপ বসাক

●

●

গুলমার্গ (কাশ্মীর)

—সুধাবিন্দু বিশ্বাস
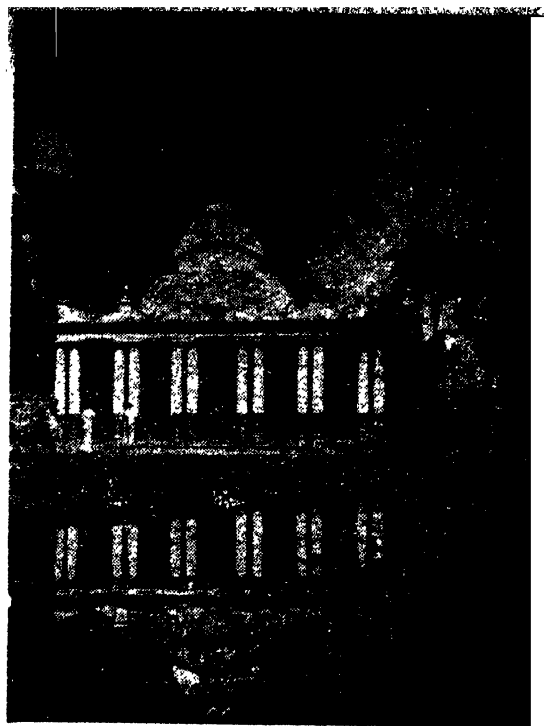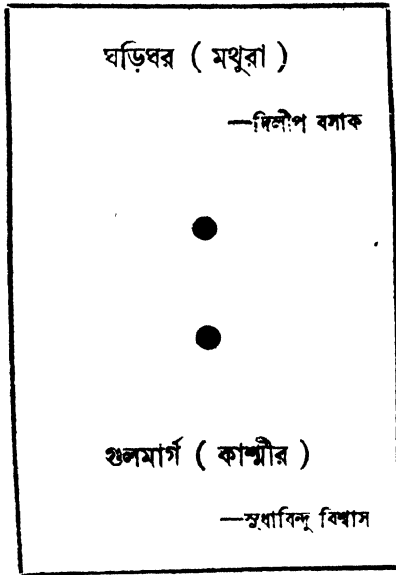
[ছবি পাঠানোর সময় ছবির পিছনে নাম, ঠিকানা ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

সেক্রেটারিয়েট ভবন (শিলং)

—দীপপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য

●

●
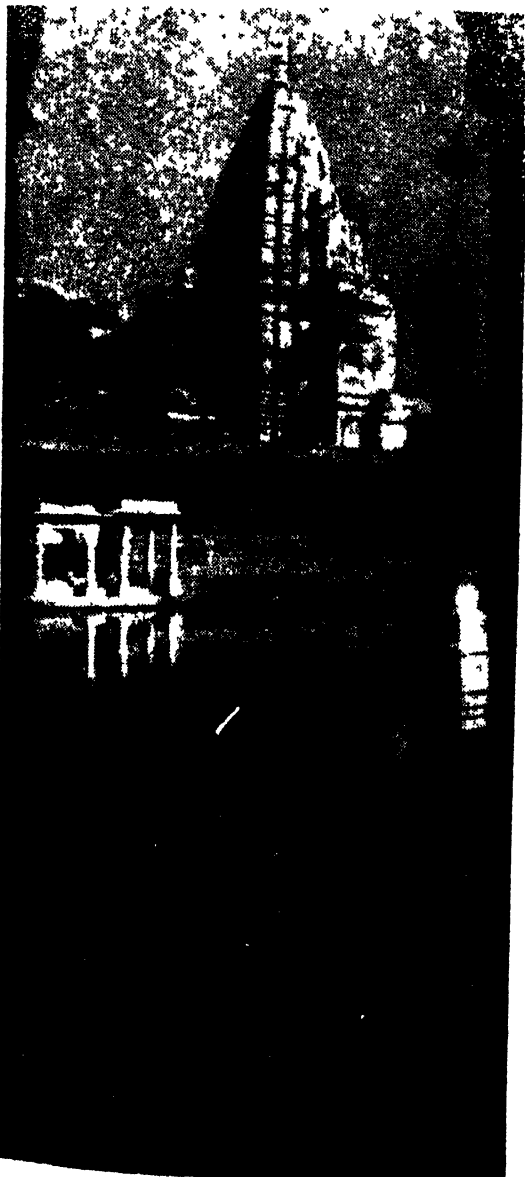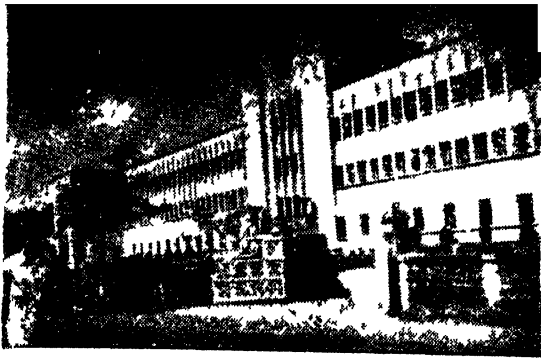
মাদার সেভিয়ার (ব্যাণ্ডেল চার্চ)

—জয়ন্তকুমার দত্ত
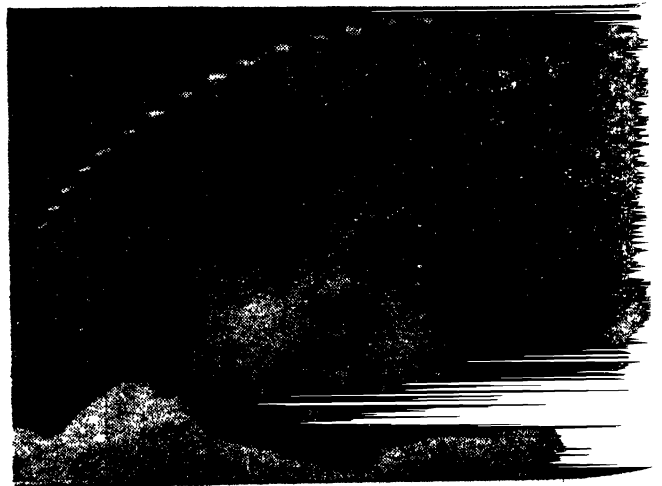
●

●

দক্ষিণের মন্দির

—সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনতারা

★

—বৈদ্যনাথ ভড়

★

—রাম বসু

★

—সমরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রশান্ত চৌধুরী

একটা আতঙ্ককর দুঃস্বপ্নের নাড়া খেয়ে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল চাঁপার।

অন্ধকার ঘর। ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে অন্ধকারে চোখদুটোকে সইয়ে নিতে অনেকক্ষণ লাগল তার। বুকের মধ্যে তখনও কেমন একটা ধড়ফড়ানি চলছে। যেন দুরন্ত একটা ছেলে তার বুকের মধ্যে ঢুকে এলোমেলো হাত-চাপড়াচ্ছে একটা ফাটা ঢোলের ওপর। আর, সেই সঙ্গে সুবল কামারের হাপোরটাকেও কে যেন এলোপাথাড়ি ফোঁস্‌ফোঁসিয়ে যাচ্ছে তার বুকের মধ্যিখানে!

উঃ! স্বপ্নটা কী ভীষণ!...

নাম-না-জানা একটা দেশ। সরু-সরু আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু তার পথ। পথটা কখনও উঠে গেছে সিঁড়ি দিয়ে, কখনও নেমে গেছে সিঁড়ি বয়ে, কখনও বা সমতলে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। ধুলো আর বালি-মাখা ছটফটে সেই পথটার দুধারে ডোরাকাটা কানাতের তলায় সব্‌জি আর ফলের দোকান। কুচ্‌কুচে কালো আঙুরের থোকার পাশে টক্‌টকে লাল তরমুজের ফালি। রঙের জেল্লায় ধেঁধে যায় চোখ। তেমনি চোখ-ধাঁধানো রঙের ডোরাদার ঢোলা পায়জামা পরা লাল দাড়ি-গোঁফওয়ালা মস্ত মস্ত মানুষ সব ঘোরাফেরা করছে এদিক-ওদিক। মাঝে-মাঝে ধুলোমাখা শুক্‌নো উট চলেছে বোঝা বয়ে নিয়ে।

যেন সেইখানে কেমন করে বুঝি গিয়ে পড়েছে চাঁপা। একা। একেবারে একা। সঙ্গে কেউ নেই। সেই অজানা দেশের আঁকাবাঁকা পথের মধ্যে হারিয়ে গেছে চাঁপা।

হঠাৎ পথের মাঝে ধুলো উড়িয়ে দমকা হাওয়া বয়ে গেল একবার। চাঁপা চোখ বন্ধ করে ফেলল। চোখ খুলে দেখল চলন্ত একটা উটের মুখের সাদা ফেনা উড়ে এসে লেগেছে তার ফ্রকের ওপর। তাড়াতাড়ি ফ্রক নাড়া দিয়ে ফেনাটাকে ঝেড়ে ফেলে চাঁপা চারিদিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে দেখল, সামনের ফলের দোকানের লাল দাড়ি-ওয়ালা বুড়ো দোকানদারটা এক লহমায় কখন্ একটা বুড়ি হয়ে গেছে। আর, বুড়িটা আর কেউ নয়, তাদের ঠান্‌দি! শ্মশানতলার দোকানঘরের ঠান্‌দিবুড়ি।

চাঁপা ছুটে গেল ঠান্‌দির কাছে। বলল,—ঠান্‌দিগো, এ আমি কোথায় এলাম?

ঠান্‌দি বলল,—তরমুজ খাবে খুকি!

চাঁপা বলল—খুকি কেন? আমি তো চাঁপা। চিনতে পারছ না আমায়?

ঠান্‌দি বলল—তরমুজ না খাও আখ্‌রোট্ খেতে পার কিংবা পেস্তা বাদাম। দামে খুব সস্তা।

চাঁপা এবার কেঁদে বলল,—আমি হারিয়ে গেছি।

ঠান্‌দি বলল,—হারিয়েই যদি গেছ, তাহলে হাতের সুতোটা ধরে টানছ না কেন?

ঠান্‌দির কথা শুনে চাঁপা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, তার হাতের মধ্যে একটা সুতোর খুঁট ধরা রয়েছে। আর, সুতোটা লম্বা-আ হয়ে আঁকা-বাঁকা পথের মোড় ঘুরে কতদূর যে চলে গেছে, তার হদিস নেই কোনও।

চাঁপা বলল,—কী হবে সুতো টানলে?

ঠান্‌দি বলল,—সুতোর অন্য খুঁটটা বাঁধা আছে তোমার আপন জনের কোমরে। সুতো টানলেই সে চলে আসবে তোমার কাছে।

চাঁপা আরো একবার বলল,—তুমি আমায় একটুও চিনতে পারছ না ঠান্‌দি?

ঠান্‌দি ঘাড় নেড়ে চকচকে বাঁকা ছুরি দিয়ে তরমুজ ফালা করতে লাগল।

চাঁপা বলল,—তুমি তো আমায় ভালবাস। তুমি তো আমায় ইস্কুলে পড়াচ্ছ। তুমি তো আমায় পুজোর সময় কাপড় কিনে দাও। তুমি তো আমায়.....

ঠান্‌দি বলল—টানো।

চাঁপা টানল।

কতক্ষণ, কতক্ষণ, কতক্ষণ কেটে গেল! চাঁপা টানছে তো টানছেই। তার মাঝে কত উট চলে গেল পথ দিয়ে, কত লোক চলে গেল,—সুতো ছেঁড়েও না, ফুরোয়ও না।

হাতে ব্যথা হয়ে গেল চাঁপার।

চাঁপা ঠান্‌দির দিকে ফিরে কী বলতে গেল, দেখল ঠান্‌দির জায়গায় কখন আবার সেই লাল দাড়ি-ওয়ালা বুড়ো দোকানদারটাই এসে গেছে। আর, কী আশ্চর্য, এতক্ষণ মনে হয়নি, ইস্কুলের দরোয়ানের মতো মুখটা তার হুবহু।

চাঁপা আবার সুতো টানতে লাগল। এবার মনে হল যেন একটু-একটু টান ধরেছে সুতোয়।

খুব উৎসাহের সঙ্গে টানতে লাগল চাঁপা। এইবার এসে পড়বে সে। এসে পড়বে তার আপনার জন। হয় শ্যামাঠাকুর, না হয় তার মা সোহাগী, না হয় সুবল কামার, না হয় সেই লোকটা; টিনচার-আইডিনের ভয়ে যে খোকার মতন চেঁচায়, সাগর যার নাম।

কিন্তু ও' কে? কার কোমরে বাঁধা তার সুতো? দেখে আঁৎকে উঠল চাঁপা!

আঁকা-বাঁকা পথের মোড়ের আড়াল থেকে চাঁপার সুতোর টানে এগিয়ে এল যে, সে শ্যামাঠাকুর নয়, সোহাগী নয়, সুবল কামার নয়, সাগরও নয়,—সে কুসুমবুড়ি।

কী কুচ্ছিত চেহারা হয়েছে তার। শনের মত সাদা রুক্ষ জট পাকানো চুল, গায়ের চামড়া ফেটে ঘায়ের মতো হয়ে রয়েছে, একটা চোখ কানা, পরণে শতচ্ছিন্ন কম্বলের পোশাক! আমের মত কী একটা ফলের আঁটি চুষছে সে। ফলের রস হাত বয়ে কনুই পর্যন্ত গড়িয়ে যাচ্ছে, আর লকলকে জিভ বের করে কনুই চাটতে চাটতে এগিয়ে আসছে রাক্ষুসীর মতন ভয়ঙ্কর একটা কুসুমবুড়ি।

হাতের সুতোটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল চাঁপা। আর, কুসুমবুড়ি পা ঘষে ঘষে এগিয়ে আসতে লাগল তেমনি।

প্রাণপণে ছুটেও চাঁপা কিছুতেই কুসুমবুড়ির নাগালের বাইরে যেতে পারছে না। কুসুম হাঁটছে, চাঁপা দৌড়চ্ছে,—তবুও! উঃ, সে কী কষ্ট! চাঁপা আর পারছে না, পারছে না, পারছে না। চোখে ধোঁয়া দেখছে চাঁপা। নাকের নিশ্বাস গরম হয়ে গিয়েছে তার। কুসুমবুড়ির কিন্তু ক্লান্তি নেই একটুও! কনুই চাটতে চাটতে তেমনি অনায়াসে পা ঘষে ঘষে এগিয়ে আসছে সে। যেন সে জানেই-জানে যে, হাজার ছুটলেও তার নাগালের বাইরে যাবার উপায় নেই চাঁপার।

প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে সামনে একটা বাড়ির দরজা দেখতে পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে দরজাটাকে দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে দরজায় ঠেস্ দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে দম নিল চাঁপা কিছুক্ষণ, তারপর চোখ খুলে ভাল করে তাকিয়ে দেখল,—সে একটা সরাইখানার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। চারি দিকে টেবিল-চেয়ার ছড়ানো, আর অনেক লোক বসে বসে খাচ্ছে আর হাসছে আর গল্প করছে আর ঝগড়া করছে। কিন্তু একটুও শব্দ নেই ঘরটায়। শীতলা পুজোর আসরে যেমন কথা-না-বলা বায়োস্কোপ এসেছিল, যেন তেমনি বায়োস্কোপ দেখছে চাঁপা।

এমন সময় ঘা পড়ল বন্ধ দরজায়।

বাইরে কুসুমবুড়ি এসে গেছে। নিশ্চয়ই কুসুমবুড়ি।

চাঁপা পিঠ দিয়ে প্রাণপণে চেপে ধরল দরজার পাল্লা। মাটিতে শক্ত করে পায়ের ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল। চিৎকার করে সবাইকে ডেকে বলল,—ওগো, তোমরা আমাকে বাঁচাও। কুসুমবুড়ি আমাকে ধরতে আসছে।

ওরা তেমনি নিঃশব্দে খেতে লাগল আর হাসতে লাগল আর গল্প করতে লাগল আর ঝগড়া করতে লাগল। আর, বাইরে থেকে আরো জোরে দরজায় ঠেলা দিতে লাগল কুসুমবুড়ি।

চাঁপা আর দরজা চেপে রাখতে পারছে না।

এবার সে দৌড়ল দরজা ছেড়ে। দূরের যে ধোঁয়া লাগা ঘরের ভিতর থেকে বাবুর্চিরা খানা নিয়ে এসে টেবিলে টেবিলে দিচ্ছিল, সেই ঘরের দিকে ছুটে গেল চাঁপা। কালো-কালো হাঁড়ি আর ডেকচি থেকে গরম ধোঁয়া উঠছিল কেবলই। মাংসের হাড় আর পেঁয়াজের খোসায় ঘরটা নোঙরা। এক পাশে স্তূপীকৃত শুক্‌নো গাছের ডাল।

চাঁপা ছুটে গিয়ে সেই শুক্‌নো কাঠের পাশে লুকোতে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল!

দু'হাতে দুটো চক্‌চকে ধারালো ছুরি নিয়ে কী একটা জন্তুর ছাল ছাড়াচ্ছে সেখানে কুসুমবুড়ি!

কুসুমবুড়ি হেসে বলল,—আয়।

চাঁপা শুক্‌নো একটা কাঠ তুলে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ধাঁই-ধাঁই করে এলোপাথাড়ি পিটতে লাগল কুসুমবুড়ির মাথায়। দু-ফাঁক হয়ে গেল কুসুমবুড়ির মাথা। তবু সে হাসছে খিল খিলিয়ে!

চাঁপা আবার আর্তনাদ করে উঠল।

তারপরেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

অন্ধকার ঘর। ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে অন্ধকারে চোখদুটোকে সইয়ে নিতে বেশ খানিকক্ষণ লাগল তার। নিজেকে সামলে নিতে আরও কিছুক্ষণ লাগল। তারপর বুঝতে পারল, সে একলা শুয়ে আছে তার নিজের হাতে গড়া ছোট্ট খুপ্‌রি-ঘরের মধ্যে।

কেন? খুপ্‌রি-ঘরে কেন? একলা কেন?

একটু-একটু করে সব মনে পড়তে লাগল চাঁপার। মনে পড়তে লাগল তার সানাইপাড়ায় যাওয়া, বরের গাড়ির প্রকাণ্ড রাজহাঁসটার পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া, খোঁড়া ওস্তাদের মৃত্যু, খোঁড়া-ওস্তাদের খাতা নিয়ে তার বাড়ি আসা, সেই খাতা দেখে তার মা সোহাগীর হঠাৎ কেমন হয়ে যাওয়া, খাতাটাকে পুড়িয়ে ফেলা, আর তারপর?

তারপর মনে মনে মা এবং মেয়েতে কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, কেমন তফাৎ হয়ে যাওয়া, কেমন আড়ি হয়ে যাওয়া।

এখন এই মুহূর্তে কিন্তু সেই মার জন্যেই মন-কেমন করতে লাগল তার। কেমন যেন বড্ড মায়া হ'তে লাগল। বড় দুঃখী বড় অসহায় মনে হতে লাগল মাকে। মনে হল, মা যেন কাঁদছে। মনে হল, এ-জগতে ঐ দুঃখী মা-টাই তার সবচেয়ে বেশি আপনারজন। সেই মাকে আর কোনও দিন কষ্ট দেবে না সে। কুসুমবুড়ির কথা শুনে মাকে অবিশ্বাস করবে না সে আর কখনও। মায়ের সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহকে আর সে ভুলেও ঠাঁই দেবে না মনে। কুসুমবুড়ি মিথ্যেবাদী, কুসুমবুড়ি পাজি, কুসুমবুড়ি অসভ্য, কুসুমবুড়ি ডাইনী, কুসুমবুড়ি রাক্ষুসী! তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই চাঁপার। সে তার কেউ না, কেউ না, কেউ না।

সেই অন্ধকার খুপ্‌রির মধ্যে একলা শুয়ে মন্ত্র জপ করার মতো চাঁপা বিড়বিড় করে বারবার ফিস্‌ফিসিয়ে বলতে লাগল,—আমার মা ভাল, আমার মা লক্ষ্মী, আমার বাবা শ্যামাঠাকুর!

তারপর উঠে পড়ল চাঁপা। নিঃশব্দে দাঁড়াল গিয়ে সোহাগীর ঘরের সামনে। দরজা বন্ধ ছিল। হাত ছোঁয়াতেই খুলে গেল। নিবুনিবু হ্যারিকেনের আলোয় ঘরটাকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে! পোড়া কেরোসিনের কেমন একটা মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে ঘরে। তক্তপোষের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে সোহাগী অকাতরে! কিছুটা দূরে মেঝের বিছানায় ঘুমোচ্ছে খ্যামাঠাকুর।

চাঁপা দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে নিজেকেই নিজে শোনাল,—আমার মা, আমার বাবা।

শুনিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত আরাম পেল সে। যেন বুকের মধ্যেকার ফোস্কার ওপর নারকেল তেলের প্রলেপ লাগিয়ে দিল কে। চাঁপা বেরিয়ে এল ঘর থেকে নিঃশব্দে। আবার নিজের সেই খুপরি-ঘরটির মধ্যে ফিরে এসে দাঁড়াল তার ঘরের ফোকরে চোখ রেখে।

নিচের পথ। তফাতে তফাতে একেকটা আলোর থাম। বড় বড় ছুঁচোরা সব নর্দমার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। ঘুমন্ত কুকুরটা মাঝে মাঝে কান খাড়া করে মুখ তুলে তাকিয়ে কিছুক্ষণ গর-গর করে ডেকে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ছে আবার। তেলে-ভাজার দোকানের ঝাঁপটা বন্ধ। কালোরঙের গোটাকতক অনেক কালের বাসি কলা ঝুলছে তখনও ঝাঁপের বাইরে। ওগুলোকে তোলবার দরকার মনে করেনি দোকানদার। সুবলের কামারশালাও বন্ধ। কামারশালার সামনে রাস্তার ধারে দড়ির খাটিয়া পেতে কে একজন শুয়ে আছে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে। নিশ্চয়ই সুবল কামারের সেই শালা, যার সঙ্গে আজ সানাইপাড়ায় গিয়েছিল চাঁপা।

বাবর্বা! লোকটার কী নাক ডাকার বহর! এতদূর থেকেও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে তার নাকের ঘড়ঘড়ানি।

হঠাৎ দূরে কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠল ঘেউ-ঘেউ করে। সেই শুনে নিচের রাস্তার ঘুমন্ত কুকুরটাও নিমেষে লাফিয়ে উঠে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে ছুটে গেল কোন অদৃশ্য শত্রুকে আক্রমণ করতে। তারপরেই পাশের কোনো একটা গলি থেকে একটা বিকট চিৎকার উঠল,—চোর, চোর, চোর। এক গলা থেকে চিৎকারটা অনেক গলায় ছড়িয়ে পড়ল। ছুটোছুটির শব্দও শুনতে পেল চাঁপা। তারপরেই আবার সব নিস্তব্ধ নিঝুম। সমস্ত পাড়াটা যেন ঘুমের ঘোরে কিছু একটার স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ল আবার। যেন নিস্তব্ধ রাত্রিরের কালো আকাশের মাঝখান দিয়ে এক ঝাঁক পাখি ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে চলে গেল কতদূরে। যেন অন্ধকার একটা গুহার মধ্যে একটা দেশলাইয়ের কাঠি ফস্ করে জ্বলে উঠেই নিবে গেল তক্ষুণি।

নিস্তব্ধতাটা আরো গাঢ় আরো ঘন হয়ে উঠল। সুবলকামারের শালার নাক ডাকার আওয়াজটাকে যেন সমস্ত ঘুমন্ত পাড়াটার নাক ডাকার শব্দ বলে মনে হতে লাগল!

গভীর রাতের সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে, কেন কে জানে, চাঁপার মনে পড়ে গেল সানাইপাড়ার সেই খোঁড়া-ওস্তাদকে।

সে এখন কোথায় চলে গেছে! কতদূরে!

কী একটা অসুখে ওর চোখের দৃষ্টি মাঝে-মাঝে লোপ পেয়ে যেত, ওর দু'টো পা-ই কাটা ছিল। ও কি পথ চিনতে পারছে? ও কি যেতে পারছে নিজে নিজে? হয়ত কিছুদূর যেতে না যেতেই পথের
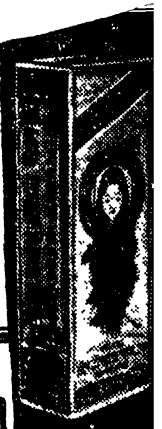
মাঝখানে পড়ে গেছে হুমড়ি খেয়ে। আহা, ও যে দেখতে পায় না, ও যে চলতে পারে না। হয়ত পথের মাঝে বসে বসেই গান গাইছে মানুষটা। যদি কেউ দয়া করে ওকে পথের শেষ অবধি পৌঁছে দেয়। ভেবেছে না কি কেউ? নিশ্চয়ই দেবে।—খাঁদু বলেছিল, মানুষটা নাকি খারাপ, নোঙরা অসুখে ভুগছে। অসুখের আবার নোঙরা পরিষ্কার কী? আর, নোঙরাই যদি বা হল,—তাহলেই বা ঘেন্না করবার কী আছে? মানুষটা যদি আর কিছুদিন বেঁচে থাকত, তাহলে রোজ তাকে টিফিনের খাবারটা দিয়ে আসত চাঁপা। আর, একদিন সুবিধে পেলে নিশ্চয়ই চাঁপা তাকে জানিয়ে দিত যে, তাকে একটুও ঘেন্না করে না চাঁপা। চাঁপা তাকে…

তাহলে কী করে চাঁপা? কী করত? ভক্তি করত? মায়া করত? ভালবাসত? দয়া করত? ভাল লাগত?

ঠিক বুঝতে পারছে না চাঁপা শুধু এইটুকু বেশ বুঝছে যে ঘেন্না তাকে সে একটুও করত না।

খোপের ফোকর দিয়ে আকাশের যেটুকু দেখা যায়, সেইটুকুর দিকে তাকাল চাঁপা। আকাশে অনেক তারা। চাঁপা অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইল সেই তারাদের দিকে। হঠাৎ একটা তারা শূন্য থেকে খসে পড়তে-পড়তে মিলিয়ে ধোঁয়া হয়ে গেল কোথায়, আর দেখতে পেল না চাঁপা। তার মনে হল, ঐ তারাটাই খোঁড়া ওস্তাদ। নিশ্চয়ই খোঁড়া ওস্তাদ।

হল না। খোঁড়া ওস্তাদের পথের শেষে পৌঁছানো হল না।

চোয়াল দুটো টনটনিয়ে উঠল চাঁপার। আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল সে আবার নিচের রাস্তার দিকে।

একটা থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল কোথা থেকে। তার চালের ওপর কোচম্যানের পাশ থেকে একটা লোক তড়াক করে নেমে চলে গেল মোষের খাটালের গলির দিকে। জরাজীর্ণ পাঁজরে হাড়ের ঘোড়াটা দুবার ঘাড় নাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। কোচম্যান কোচবক্সে ব'সে বিড়ি ধরাল একটা। কুকুর কোথা থেকে লড়াই সেরে এসে রাস্তার মধ্যিখানে গাড়ি সমেত ঘোড়াটাকে দেখে দুবার গরর্-গরর্ করে শুয়ে পড়ল আবার নিজের জায়গায়।

হঠাৎ দেখা গেল, মোষের খাটালের গলির ভেতর থেকে কারা যেন একটা মেয়েকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে ঘোড়ার গাড়িটার কাছে। মেয়েটা কেমন হাসছে আর টলছে। একপাশে তার একটা পুরুষমানুষ, অন্যপাশে মেয়েছেলে একজন।

মোষের খাটালের অন্ধকার গলি পেরিয়ে ঘোড়ার গাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতেই চাঁপা স্পষ্ট চিনতে পারল তাদের। মেয়েটা খাঁদু, মেয়েছেলেটা কুসুমবুড়ি, আর ওপাশের লোকটা হচ্ছে সেই—যে গাড়ি থেকে নেমে গেছল কিছুক্ষণ আগেই।

কুসুমবুড়ি আর সেই লোকটাতে মিলে খাঁদুকে গাড়ির মধ্যে তুলতে যেতেই খাঁদু চমকে উঠল! হাসি থেমে গেল তার। যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠল সে। আর্তনাদ করে বলল,—না-আ-আ-আ! আমি যাব না-আ-আ!

কুসুমবুড়ি এবার খাঁদুর চুলের মুঠি ধরে নাড়া দিয়ে বলল,—যাবি না মানে? তোর মা-মাগী আমার কাছে সাতাশ টাকা ধারে তা জানিস? ওঠ, পোড়ারমুখী।

খাঁদু চিৎকার করে বলল,—পুলি-ই-ই-ই-শ!

লোকটা তার মাথার টুপিটাকে খাঁদুর মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে ভাড়া-গাড়ির গাড়োয়ানটার সাহায্যে খাঁদুকে জোর করে ঠেলে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেও উঠে পড়ল তার মধ্যে। কোচম্যান চটপট গাড়ির কোচবক্সে উঠে হাঁকিয়ে দিল গাড়ি।

চলন্ত গাড়ির জানলা থেকে কাগজের কতকগুলো টাকা ছুঁড়ে দিল লোকটা। কুসুমবুড়ি সেগুলো তুলে নিয়ে ফিরে গেল আবার নিজের ডেরায়।

সমস্ত পাড়া যেমন নিস্তব্ধ ছিল, তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল আবার।

চাঁপা আর দাঁড়াল না। ছুটে ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত সোহাগীকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে।

সোহাগী ঘুম চোখে ওকে নিজের বুকের দিকে টেনে নিয়ে বলল,—কী হয়েছে রে?

চাঁপা বলল,—ভয় করছে মা।

[ক্রমশঃ।
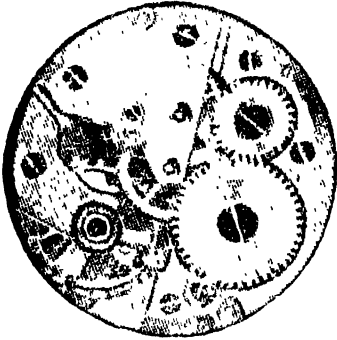
১৫। কতকগুলি ব্রজসুন্দরী···পূর্ব্বজন্মে তাঁরা মুনি ছিলেন··· রূপান্তর গ্রহণ করে গোকুলের নিরাকুলতার মধ্যে এসে, অধর্ম্মপাশ খণ্ডিয়ে লাভ করেছিলেন গোপবধূতা। পতি-মতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মতিটি কিন্তু আচ্ছন্ন ছিল কৃষ্ণপ্রেমে। বাঁশী যখন বাজলো তখন তাঁরা ব্যাপৃত ছিলেন পতিদেবতাদের সেবা-শুশ্রূষায়। শুনেই তাঁদের মুহূর্ত্তকে মনে হল বৎসর,···পড়ে রইল পতিসেবা বেরিয়ে গেলেন ঝড়ের বেগে।

১৬। *হাস্য-পরিহাসে পরস্পরের হৃদয় হরণ করতে করতে* তখন আহারে বসেছিলেন কতকগুলি ব্রজসুন্দরী। বাঁশরি বাজাও যেই, ঝট করে উঠে পড়াও সেই,···চুকোর গোল খাওয়া, ছুটলেন ধ্বনির পথ ধরে।

১৭। ক্লান্তিরূপা কতকগুলি সুন্দরী···তাঁদের একটি স্তনে সবেমাত্র সখীরা শেষ করেছে পত্রাঙ্কন—বাঁশীও শুনলেন, আর কোথায় পড়ে রইল স্তনান্তরের প্রাথমিক লেপন, উধাও হলেন হরিণ-বেগে।

১৮। কোনো কোনো সুন্দরী···নবোত্তম তাঁদের বয়স·· কঞ্চুলিকা উদ্‌ঘাটন করে সবে তাঁদের অঙ্গ সংস্কার করতে যাবেন তাঁদের সখীরা, শুনতে পেলেন বংশীধ্বনি ; ব্যাস, পড়ে রইল গা-মাজা গা-ঘসা, যেমন ছিলেন বেরিয়ে গেলেন তেমনি।

১৯। ব্রজরমণীদের মধ্যে যাঁরা নিত্যসিদ্ধা, যাঁরা সিদ্ধানুরাগা, বাঁশী শুনে তাঁদের কিন্তু বৈপরীত্য ঘটে গেল কাপড়-পরায় গয়না-পরায়। অতিব্যগ্রতায় ব্যাপারটা গ্রাম্য হয়ে পড়ল সত্য, তবুও তাঁদের কল্যাণীয় রূপের এতটুকুও ঘাটতি হল না। বরং হরিণনয়নাদের রূপ যেন আরো খুলে গেল।

হার উঠল শ্রোণিতে ; মনীন্দ্র-মেখলা গেল স্তনে। হাতের অঙ্গদ পায়ে গেল ; নূপুর চড়লো বাহুতে। খোঁপার ফুল ফুটল গিয়ে নীবিতে ; আর, নীবির মণি দুললো গিয়ে কুন্তলে।···এ অঙ্গ ও অঙ্গ করে সব অঙ্গেই যেন মেতে উঠল উৎসব—হর্ষের প্রসন্নতার।

"একটা চোখে যে কাজল পরানো হয়নি !"

"আহা, থাক্ না।"

"এক পায়ে যে আলতা পরেছিস্ !"

"আহা, থাক্ না"···

"ওমা, কুঙ্কুমের পত্রলেখা···একটি বুকে ?"

"আহা, ঐ ভাল, আমার ঐ ভাল।···ঐ তো বলে দেবে প্রেমের ফুল ফুটে ওঠে কত ব্যথায়।"

"আহা, সে তো হবে আমাদের বিশেষ লাভের।"···এই বলতে বলতে সুন্দরীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন আরো ঢলঢলে হয়ে উঠল লাবণ্যে।

হাসিও পায়, অথচ হাসাও যায় না, এমনি হল ব্রজসুন্দরীদের অবস্থা। যেমন—

ইনি ওঁর শাড়ীটিকে ওড়না-ভ্রমে গায়ে জড়ান তো উনি ওঁর ওড়নাটিকে পরে বসেন শাড়ী-ভ্রমে। এ যেন দু'অঙ্গেরই সখ্যময় সম্মানদান পরস্পরকে। তাই নয় কি ?

ঐ যাঃ, বাঁশীও শুনলেন, আর বিহ্বলার মত চলেও গেলেন একদল সুন্দরী। শ্রোণিবিম্ব থেকে খসে পড়ছে কাঞ্চনের কাঞ্চীদাম, মঞ্জীরের হীরের চূড়োয় জড়িয়ে গেছে মালার মুখ,···খেয়াল নেই, টানতে টানতে চলে গেলেন, যেমন যায় শৃঙ্খলভাঙা মাতঙ্গীরদল শৃঙ্খলের ভাঙা টুকরোগুলোকে টান্‌তে টান্‌তে।

এঁদের চলে-যাওয়াটিও যেন এক বিজয়-অভিসার। যেমন,—

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

সপ্তদশ স্তবক

চপলচরণে চলতে চলতে একটি সুন্দরীর শিথিল হয়ে পড়ল নী কমল-কুঁড়ির মত হাতখানি দিয়ে যেই ধরে ফেললেন নীবি অমনি মরিলো মরি, এক নিমেষেই যেন জয় হয়ে গেল নাভি নাভিপদ্মর শোভা-কোষ।

তাঁর বাম পায়ে সবে আলতা পরিয়েছে অনুচরী, এমন সময় বা বাঁশী, চমকে উঠলেন একটি সুন্দরী। অমনি ছুটলেন,···পথের ফুটিয়ে দিয়ে আলতা-ভেজা একটি পায়ের লাল টুকটুকে ছাপ। হ অর্দ্ধশরীর পার্ব্বতীকে মানতেই হল হার।

ওদিকে···আর এক বধূ ছুটেছেন। বাতাসে···উড়ছে ওড়ন উড়ছে শাড়ী, উড়ছে শাড়ীর আঁচলা। আশ্চর্য্য অনঙ্গের গোপন পতাকার উনিই কি সঞ্চারিণী প্রতীক্ ? নেশায় পেয়েছে বুঝি জয়ের ?

এক পায়ে সবে নূপুর বেঁধেছেন একটি সুন্দরী, এমন সময় বাজল বেণু। ছুটলেন তিনি, আর বাজতে বাজতে ছুটল তাঁর ঐ একটি পায়ের নূপুর···ঘন ঘন ঘন। মন্দ নয়, বাক্যবাগীশের সঙ্গে বোবার এই প্রতিবাদহীন সংলাপ।

বাম বাহুতে সবে বেঁধেছেন অঙ্গদ, এমন সময় বাজল বেণু, ছুটলেন আর এক সুন্দরী। এক হাতে অঙ্গদ,···শৌর্য্য, বীর্য্য, অহঙ্কার ও জয়শ্রীর লক্ষণ। কিন্তু সুন্দরীর ঐ এক অঙ্গের অঙ্গদই তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ঢেলে দিল শোভার আর সৌভাগ্যের আতিশয্য।···দিব্যৌষধির একটি শাখার দীপন যেমন দীপ্ত করে তোলে অন্য শাখাগুলিকে।

আর একটি সুন্দরী দুকান দিয়েই শুনলেন বটে কলানিধির মুরলীকাণ, তবু বাম কানটিতেই অর্ঘ্য চড়িয়ে বসলেন কাঞ্চন কুণ্ডলের। বলি এ দোষটি কার ? সুন্দরীর ? না যিনি মুরলী বাজিয়ে চর্কী ঘোরান ঘুরিয়ে দিলেন হৃদয়টাকে···তাঁর ?

২০। নিজের নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে এই ভাবে বেরিয়ে এলেন ব্রজললনারা। বেরোতেই প্রত্যেকেরি মন বললে···'বনের পথ ধরে চল'। সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গের ফুলবাণগুলির পরাক্রমও বাড়িয়ে দিল তাঁদের মানস-বিকার। তাঁদের মনে হল, চিরদিনকার কারাগার থেকে এইমাত্র যেন মুক্তি পেয়েছেন তাঁরা। উৎকণ্ঠার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে,···কণ্ঠাগত জীবন,···বনের পথ ধরে তাঁরা চললেন। মিললেন সকলেই, কিন্তু সকলেরই তখন ঐ একই সুখের দশা। আধফোটা নীলপদ্মের মত প্রত্যেকেরি চোখের যুগল পাত্তায় নেচে বেড়াচ্ছে···চপলতা আর চকিততা। পরাণ প্রিয়ের সাথে মিলন হবে, তাই যেন মহোৎসবের গোড়াতেই ওরা দুটিতে মিলে আরম্ভ করে দিয়েছে কুসুমবৃষ্টি ; আর সেই বৃষ্টিতেই যেন সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে তাঁদের অঙ্গলক্ষ্মীর নির্ব্বাধ লাবণ্যপুষ্টি।

২১। যে প্রেম বিচ্ছেদের সর্ব্বনাশ করতে চায়, সে প্রেমকে রোধ করা দুরূহ। তবুও মুনি-পূর্ব্বা ব্রজাঙ্গনারা যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, তখন তাঁদের অনুসরণ করলেন পতিরা, ব্রজপুরের বাইরে এসে নিরুদ্ধ করলেন তাঁদের গতি। কুলকন্যাদের গতিরোধ করলেন পিতৃদেবেরা আর তাঁদের প্রেম-মুগ্ধ ভ্রাতৃ-বন্ধুরা। নিবারিত হলেন শ্রুতিপূর্ব্বা ব্রজবধূরাও।

২২। কিন্তু যাঁরা অনুরাগের চরম পথে পা বাড়িয়েছেন তাঁদের ফেরানো কি এতই সহজ? ফেরাতে কেউ তাঁদের পারলেন না। ফেরা তো দূরের কথা, আরো বেশী দীপ্ত হয়ে উঠলেন তাঁরা গোবিন্দের অনুরাগে।

২৩। যাঁরা নিত্যসিদ্ধা, মহাভাবের ঘোরে এতই তাঁরা মত্তোন্মত্তা হয়ে উঠলেন যে, যাঁরা তাঁদের বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরাই শেষে ফিরে গেলেন···নিবেদন করে নমঃ।

২৪। নিরুদ্ধ হয়ে মুনিরূপা কয়েকটি মুগ্ধা ব্রজাঙ্গনা বুঝতে পারলেন,—প্রতিভা ও ঔপপত্য-ভাবনাময় ভাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এবং যেহেতু পূর্ব্ব সাধনবলে খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল তাঁদের প্রাকৃতত্ব দোষ, সেই হেতু এখন বিঘ্নজয়ী হয়ে উঠল তাঁদের মঞ্জিষ্ঠারুণ কৃষ্ণানুরাগ; ভগবানের অঙ্গ-সঙ্গ-লাভের সম্ভাবনায় সৌভাগ্য-শালিনী হয়ে উঠল তাঁদের সাধন ভক্তিযোগের সুপরিণতি। তাঁরা ভবন পরিত্যাগ করলেন এবং নির্ব্বাধ পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন বনে।

২৫। মুনিরূপাদের মধ্যে কতকগুলি ছিলেন, যাঁরা অপক্ক-কষায়। তাঁরা শীর্ণা হয়ে গেলেন সহসা। বুঝতে পারলেন, ভাবী মঙ্গলের সূচনা করেই তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে দশমী দশা,···এবং জন্মান্তর গ্রহণ না করেই যদি তাঁদের কৃষ্ণফল লাভ করতে হয়, তাহলে তারো উপস্থিত হয়ে গেছে শুভসময়। অতএব শরীরান্তরের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ তাঁরা মিলিত হয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণে।

এবার সত্যই আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন স্বামীরা। আর যাতে কেউ সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে বাড়ী ছেড়ে বাইরে পালিয়ে যেতে না পারেন, এবার সেই ব্যবস্থায় তাঁরা তৎপর হয়ে উঠলেন। রুদ্ধ করে দিলেন দ্বার।

২৬। ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে যাঁরা রুদ্ধ হয়ে পড়লেন তাঁরা তখন বেশ বুঝতে পারলেন···কৃষ্ণাভিসার তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁরা ক্ষমা করলেন স্বামীদের। তারপরে অন্তর্গৃহের বিজনতায় ধ্যান করতে বসলেন হৃদয়মন্দিরের ঈশ্বরকে। অনুভব করলেন কৃষ্ণের আবির্ভাব। অন্তরে স্ফুরিত হতে লাগল অখিল আনন্দময় ঐশ্বর্য্য। তাঁরা উপভোগ করলেন ভগবৎ-স্ফূর্ত্তির পরমসম্পদ। বনগমন নিষিদ্ধ হওয়াতে, সমস্ত তীব্রতা নিয়ে তাঁদের সত্তায় নেমে এল বিরহদুঃখ, প্রচণ্ডবেগে জীর্ণ করতে লাগল তাঁদের জীবন জ্বালা, উত্তেজিত করে তুলল ভগবৎ-উৎকণ্ঠা, ক্ষীণ করে দিল সর্ব্ববন্ধন। কৃষ্ণে তাঁদের জার-বুদ্ধি হওয়াতে, সম্পূর্ণ পরবশ হয়ে গেলেন ব্রজাঙ্গনারা। তাঁদের ঘিরে ফেলল নির্ব্বেদ। বেদ যাঁকে খুঁজে বেড়ান সেই আত্মাকে কৃষ্ণস্বরূপে একান্ত কান্তভাবে সদ্য-সদ্য পাবার আশায়, আর সঙ্গে সঙ্গে পারবন্ধ্য-দুঃখটির মূলোচ্ছেদ করবার বাসনায়, তাঁরা পরিত্যাগ করলেন প্রাকৃত সত্তাদি-গুণোপলিপ্ত দেহটিকে,···ভুজঙ্গ যেমন করে পরিত্যাগ করে নির্ম্মোক। তারপরে সেই অপ্রাকৃত-কল্যাণ গুণময় ও কৃষ্ণাপসঙ্গ-মঙ্গল অঙ্গলক্ষ্মী-সৌভাগ্যটিকে পূর্ণলাভ করে, মুনিরূপা অন্য ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে তাঁরা হাসতে হাসতে চলে গেলেন কৃষ্ণাভিসারে।

২৭। যাঁরা প্রেমময়ী, যাঁরা এই-হেন রতি-বাসনাময়ী, তাঁদে[র] পক্ষে এমন কিছুই বিচিত্র নয় এই মোক্ষাভাব। বাসনা সনাতন···তাই পরমা প্রাকৃত-গুণ-শান্তিটি বাসনার অনুরূপ হয়েই জন[্মি] হয়ে যায় নির্গুণ স্বরূপের। নীতি-শাস্ত্রের তিলকস্বরূপ যে কৃষ্ণপ্রে[ম] এইটিই তার জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভুশক্তি।

প্রেমময়ী ব্রজসুন্দরীদের বনপথ ধরে এইভাবে তাঁর কাছে চ[লে] আসতে দেখে, তাঁদের প্রিয়তম বলানুজ শ্রীনন্দনন্দনের মধ্যেও স্ফু[রিত] হয়ে উঠল ঠিক সেই রকমের একটি কলাপাণ্ডিত্য যেটির প্রয়োজ[ন] ছিল ঠিক সেই সময়টিতেই।

তিনি ছল করে সাজলেন অসরল। যেন তিনি এমন এক[টি] অতিপ্রেমী নায়ক,··যাঁর মধ্যে এতটুকুও জাগেনি অঙ্গললনা-স্পৃহা বাহিরটি যাঁর প্রতিকূল, অন্তরটি অথচ অনুকূল; পীত দুকূল দুলি[য়ে] যিনি ঘুরে বেড়ান নীল যমুনার তীরে।

কী যেন বলতে চান প্রথমে এই হেন একটি ভাব দেখিয়ে ব[লি] বলি করে শেষে বলেই ফেললেন,—

"আসুন আসুন, শুভাগমন করুন আপনারা। আশা ক[রি] আপনাদের সমস্ত কুশল। আপনাদের কোন্ প্রিয় কাজ—অথ[বা] কল্যাণময় কাজ···আমাকে করতে হবে বলুন। আশ্চর্য্য হচ্ছি দেখে, যেমনটি ঘরে ছিলেন তেমনিই এখানে চলে এসেছেন কমলনয়নারা।

২৮। এতো আপনাদের কৌতুকবিহারের বেশ নয়। না না সে বেশ তো এমন হয় না! নিছক আধা-আধি ভাব দেখছি আপনাদে[র] সাজেগোজে, প্রসাধনে-অলঙ্কারে। যাঁরা সেজেছেন, তাঁদেরও দেখছি আদর নেই সাজে। আশঙ্কা হচ্ছে, নিশ্চয় মহাভয়ের কিছু ঘটেছে! শ্রান্তাও বোধ হচ্ছে আপনাদের। তবে কি দৌড়িয়ে এসেছেন আপনারা···এখানে?

সত্যিই, ক্লিন্ন আপনাদের কর্ণোৎপল···অলকাবলি বিচিত্র হয়ে উঠেছে ঘর্ম্ম-মুক্তায়,···নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন,···নিশ্বাসের আঘাতে ম্লান হয়ে গেছে অধরের রক্তিমা, বক্ষবাস কাঁপছে।

২৯। তবে একটা কথা। অত্যাহিত যদি ঘটতো, তাহলে ব্রজের পুরুষেরাও নিশ্চয় সুখ হারিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠতেন। তা···এখন অত্যাহিত ঘটেছে, না হিত ঘটেছে,···তাই বা কেমন করে বলি?

এও তো হতে পারে, এই অর্দ্ধ-মণ্ডন আপনাদের একটি কৌতুক-বিলাস। না, তাও হতে পারে না। ঘরের দরজা ভেঙ্গে কেবল অর্দ্ধেক অলঙ্কার তো আর আপনা থেকেই পথে বেরিয়ে আসতে পারে না। এও তো হতে পারে, আপনাদের পতি বা গুরুজনেরা··· আপনারা বনবিহারে চলেছেন···এমন কথা চিন্তাই করেন নি, আর তাই আপনাদের এই স্বাতন্ত্র্য, এই বনে আসা। তাই বা হয় কেমন করে, যখন দেখা যাচ্ছে বনবিহারের সময় এটি নয়, এবং তাঁর সমস্ত ক্ষিপ্রদোষ নিয়ে নেমে এসেছেন প্রদোষ। সত্যিই, এখন গভীর হয়েছে রাত্রি, ভয়াল পশুও বিচরণ করছে বনে। আমারি কেবল ভয় নেই,···ভালও লাগে এই বিজনবন। অবলাদের না ভাল লাগবারি তো কথা। যাই হোক্, কাম্যস্থানে যখন এসেই গেছেন তখন আর ভয় পেয়েও কোন লাভ নেই। কিন্তু আমার কথা শুনুন, মঙ্গলের হয় যদি এইখানেই আপনারা দয়া করে থামেন।

৩১। খঞ্জন পাখীর মত আঁখি নিয়ে না-জানি কোন্ মদিরায় মাতাল হয়ে বন দেখতে আপনারা এসেছেন। আপনাদের অঙ্গম্ব

সৌরভে আমারো হৃদয় ভরে উঠেছে ভালবাসায়। আশা করি এতক্ষণে সফল হয়েছে আপনাদের বন-দর্শন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দেখুন ঐ দেখুন, ফুল্ল বল্লীগুলি···আপনারা ঘরে ফিরছেন দেখে,···আপনাদের সখীদের মতই মত্ত মধুপের ভাষায় প্রণয়ের ঝঙ্কার তুলে নিন্দে রটনা করছেন আপনাদের। আর ঐ দেখুন ঐ তরুশ্রেণী, পুষ্পহাস্য হেসে যেন বারণ করে বলছে, 'রসিকেরা কি এসেই বলে···ঘরে যাই।'

আর ওদিকে দেখুন, পাতার ছায়া আর চাঁদের আলো···সারা দিক থেকে মিলেছে এসে তরু-মূলে; কি ভুলটাই না করেছে রাজ্যের পাখীগুলো; ভেবেছে তিল আর তণ্ডুল; তাই আলোছায়াকেই খুঁটছে ছোট্ট ছোট্ট ঠোঁট দিয়ে।

আর এদিকে দেখুন, বাতাস বইছে ঝিরিঝিরি। উনি চন্দন বনের সুখী সমীরণ। অঙ্গে তাঁর কালিন্দীর পুলকিত লহরীর আলিঙ্গন; ফুটন্ত কহ্লার আর পদ্মবনে মর্দ্দন-গন্ধ। ঝিরঝির করে বয়ে চলেছেন···দীপল করে দিয়ে কোকিলের কুহুতান, শীতল করে দিয়ে বনতল।

তবে এ-ও আমার বলা উচিত, এ-বন ঘন-নিবিড়, এখানে অভাব নেই দ্রুম-দণ্ডের, হরেক রকমের বিচিত্র পক্ষীও এখানে ওড়ে। স্ত্রীরত্নদের পক্ষে এ-কানন দেখবার, কিন্তু থাকবার স্থান নয়। ব্রজে ফিরে যাওয়াই মঙ্গল।

৩২। আশা করি আমার এই কথাগুলি কানে নেবেন। শ্বশুর শাশুড়ি স্বামীদের পরিচর্য্যা বস্তুতঃ অনাদরণীয় নয়।" [ক্রমশঃ।

হয়ত

করুণা মজুমদার

মৃত্যুর সৈকতে এসে কেউ যদি বলত
আমি মরব—
হয়ত সহজ হত মৃত্যু তার কাছে।

কিন্তু—আশ্চর্য এই মানুষের মন
শেষ করে দিতে গিয়েও ফিরে আসে
শপথের শেষ উচ্চারণ, মুছে—
সীমা থেকে সুরু করার বিপুল প্রয়াশ
মুহূর্তেই ঘিরে ধরে;
বাঁচার অভীপ্সা নিয়ে—মৃত্যুরে সে
করে আলিংগন।

তবু—
দোটানার মাঝে প'ড়ে
জন্ম নেয় আর একটা মানুষ
সে আমি
আদিম এবং অভিন্ন।
তার সে গভীর প্রকাশ
বেদনার্ত কালো তুলির অনবদ্য টানে
মূর্ত হয়ে ওঠে।
সে বাঁচে।
মৃত্যু তুচ্ছ ক'রে চিরঞ্জয়ী মন।

জয়তু।
তোমার ওই মোম ভালবাসা
হয়ত তাই ফিরিয়ে আনে
মৃত্যু দ্বার থেকে।

প্রহরী

শ্রীদুলাল পাল

শোকছায়া-ম্লান বিভাবরী
অভিমানী তুমি!
আমি উষা—স্নেহ—কোলে শিশু রবি—
রিক্ত আবরণে থাকতে চেয়েছিলাম একা
পারিনি থাকতে স্নেহ-সিক্ত সৌন্দর্য্য ব্যাকুলতায়
কাতরা মমতা বুকের আঁচলে রেখেছিলো ঢেকে
পৃথিবীর অবগুণ্ঠনে!

আদিম সত্তার কোলে;
একটুকু আলো একটু আঁধার
স্নিগ্ধ রেশ বিভায় বিভায়—
প্রসবারত প্রসূতির চির মায়াজালে
পীযূস নিটোল স্তনে মুখ দিয়ে
কেঁদে ওঠে আরো আরো
মহশূন্যময়—বেদনা পাওয়া!

আনন্দ কল্পিত তিমিরান্তক
কিছু আভাস আড়ালে
জানতাম ভূমিষ্ঠ রাত্রির—
পৃথিবী ক্রন্দনরত মহাকাশে—
আপনার ছদ্মবেশ মায়ার কোমল অঙ্কে
চিরশায়ী শয্যা ঘুমের কাঠিন্যে—
জাগে সারারাত বিভাবরী।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই

অলংকার জিজ্ঞাসা

আলোচ্য গ্রন্থটিতে সাহিত্যের এক বিশেষ দিক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্যকে যা চারুত্ব প্রদান করে তাকেই বলে অলংকার, শব্দে সাধারণ অর্থের অতিরিক্ত যে মাধুর্য্য আরোপিত হয় সচরাচর, অলংকার তারই স্বাক্ষরবাহী। অলংকারের স্তবকে মোড়া সাধারণ শব্দার্থও এক অপরূপ ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে, সুতরাং সাহিত্যে অলংকারের ভূমিকা বড় নগণ্য নয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে লেখক এই অলংকার শাস্ত্র সম্বন্ধেই এক প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন, বিচার-মূলক অলংকারগুলির বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করতে বসে অলংকার তত্ত্বের মূল রীতি নীতি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। অলংকারের বিবিধ প্রকরণ অত্যন্ত নিষ্ঠায় বিচার করে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যটুকুকে স্পষ্ট করে উদ্‌ঘাটিত করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক আর সেজন্যই তাঁর এই রচনা সহজেই প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে, সাহিত্য বোদ্ধা পাঠক সমাজে বর্ত্তমান পুস্তকটি সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবে বলেই আমরা আশা করি। লেখকের শৈলীও আকর্ষণীয়। বইটির আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—শুদ্ধসত্ত্ব বসু, প্রকাশক—সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—পাঁচ টাকা।

সেনী রাগমালা

বর্ত্তমানে রাগ সঙ্গীতের উপর সর্ব্ব সাধারণের অনুরাগ ক্রমবর্দ্ধমান, মার্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁদের অণুমাত্র অধিকার আছে তাঁরা জানেন যে এই সঙ্গীতের সাম্রাজ্যে ঘরানা কথাটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ বিশেষ সুরজ্ঞ স্রষ্টাগণের বিশেষ গীতি রূপায়ণকেই 'ঘরানা' এই নামে অভিহিত করা হয়, এই ঘরানার ঐতিহ্য পুরাতন, সঙ্গীতজ্ঞ গানের সৃষ্ট বিশেষ বিশেষ গীত রীতি ও প্রকৃতি যখন তাঁদের শিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ দ্বারা অনুসৃত হয় তখনই তাঁদের অমুক ঘরানার উত্তরসাধক বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সেনী ঘরানা, এই সব ঘরানা কুলে বিশিষ্ট ও অনন্য, কথিত আছে সংগীত জগতের ঐন্দ্রজালিক স্রষ্টা মিঞা তানসেনই এর প্রবর্ত্তক, এই ঘরানার নিজস্ব রূপরীতি সম্পর্কে বিশদ পরিচয় বিধৃত করেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থে। তিনি স্বয়ং এই ঘরানার উত্তরসাধক, কাজেই এ সম্বন্ধে যা তিনি প্রকাশ করেছেন, তাকে প্রামাণ্য বলা অসঙ্গত নয়। সেনী পদ্ধতির বিশিষ্ট ধারাবাহী, সেনীরাগমালার শাস্ত্রীয় পরিচয় প্রদান করেছেন তিনি, এই পর্য্যায়ে যে পুস্তকাবলী প্রকাশিত হবে বর্ত্তমান গ্রন্থ তারই প্রথম ফসল। বর্ত্তমান খণ্ডে প্রায় দুই শত রাগের তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে, রাগ-সঙ্গীতের অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রই আলোচ্য রচনাটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ যথোচিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—ওস্তাদ শওকত আলি খান। প্রকাশক—সৌকত আলি খান, সংগীত প্রেস, ৬০, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—চার টাকা।

দেহ দেউল

প্রখ্যাত কথাশিল্পীর সাম্প্রতিক এই উপন্যাস, নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা এক তরুণীর মানসিক দ্বন্দ্ব, ঘাতপ্রতিঘাতকে সুন্দর ভাবেই রেখায়িত করেছেন লেখক। ভগবানের উদ্দেশে নিবেদিত দেহ মন মানুষকে দেওয়া সমুচিত কিনা এই দ্বিধাই ছিল সদ্য বিবাহিতা তরুণী রাধার প্রধানতম সমস্যা, স্বামীর প্রতি স্নেহ সহানুভূতির বিন্দুমাত্র অভাব না থাকলেও স্বামী সহবাসের চিন্তামাত্রই তার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ করে উঠত, এই অসহ অবস্থা থেকে স্বামীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ফিরে গেল সে পিত্রালয় বৃন্দাবন ধামে, আবার সুরু করল কুমারী কালের মতই আরাধ্য দেবতা কিশোরীমোহনের সেবায় মগ্ন হয়ে থাকতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উপলব্ধি হল রাধার তার পূজার দেবতা বুঝি অধরা হয়েই থাকছেন, সভয়ে অনুভব করল দেবতার মূর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করে তার সব মন জুড়ে বসছে তারই প্রত্যাখ্যাত অভাগা স্বামী সুন্দরের মূর্ত্তি, এই দোটানার মধ্যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ওঠে রাধার হৃদয়, দেবতারই চরণে অকূল আত্মসমর্পণ করে নির্দ্দেশ চায় সে সত্যপথের। দেবতার কৃপায়ই যেন চরম সত্য ধরা দেয় তার কাছে, দেবতার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষকে অবহেলা করে ব্যথা দিয়ে সরিয়ে রাখলে যে পাষাণ বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না, সমগ্র অন্তর দিয়েই যেন এ সত্য অনুভব করতে পারে রাধা, স্বামীকে কায়মনোবাক্যে ভাল বাসতে পারাতেই যে তার সমস্ত সার্থকতা, তাই ওর উপাস্য ঠাকুরের প্রকৃত পূজা এ কথা মনে প্রাণেই মেনে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হ'তে ছুটে যায় সে। দেহ দেউলে পূজার উপচার নিয়ে যাত্রা করে ও অভিসারে, অশঙ্কিত চিত্তে। সব দ্বিধা সব দ্বন্দ্বই যেন নিঃশেষে অবসিত আজ। মানসধর্ম্মী এই কাহিনীটিতে একটা সহজ স্নিগ্ধতার সুর খুঁজে পাওয়া যায়, অতি স্বচ্ছন্দ গতিতেই কাহিনীর জাল বুনে গিয়েছেন লেখক, পড়তে পড়তে পাঠকের মন একটা অপ্রত্যাশিত প্রীতি স্নিগ্ধতায় নরম হয়ে ওঠে। লেখকের শৈলী অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল হওয়ায় তাঁর বক্তব্য সহজেই পাঠক মননে রেখাপাত করে। বইটির আঙ্গিক সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রকাশক—কথাকলি, ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

অভিযাত্রী কাল

আলোচ্য গ্রন্থটি, এক ক্ষুদ্রায়তন কাব্য পুস্তক। মোট ছত্রিশটি কবিতা একত্রে গ্রথিত হয়েছে এতে। জীবন সম্বন্ধে কবির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটিরই এক অনায়াস পরিচয় বিধৃত হয়েছে এদের মাঝে। কবির মননশীলতা ও রসোপলব্ধির স্বাক্ষরে কবিতাগুলি সমুজ্জ্বল। কাব্যরসপিয়াসী সুজন পাঠক এগুলি পাঠে একটা সহজ আনন্দ লাভে সমর্থ হবেন। বইটির আঙ্গিক অতি সাধারণ, ছাপা পরিচ্ছন্ন। লেখক—জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—প্রশান্ত মিত্র পাবলিকেশনস, জি-৩ সি-আই-টি বিল্ডিংস, কলিকাতা—১৪, দাম—একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অয়নান্ত

সাহিত্যের দিগন্তে আজ যে ক'টি নাম প্রত্যাশা জাগায়, প্রতিশ্রুতিতে ভরে তোলে পাঠক-মনন, 'সমরেশ বসু' তাঁদেরই অন্যতম, শুধু অন্যতম বললেও যেন সবটা বলা হয় না, বলা উচিৎ, সন্দেহাতীত রূপেই উচিত, তাঁদের মধ্যেও বৈশিষ্ট্যে অনন্য। আলোচ্য উপন্যাসটি তাঁর সাম্প্রতিক রচনা. এক বিচিত্র কাহিনীর মাধ্যমে লেখক-জীবনের গভীরতম প্রদেশে অন্বেষণ করেছেন, সে-অন্বেষণ জীবনের মাঝে জীবনাতীতের ক্লিষ্ট ক্ষিন্ন অধঃপতিত মানবাত্মার মহিমময় উত্তরণে যার পরিসমাপ্তি। নায়ক রাজার চরিত্রের মাধ্যমে লেখক বর্ত্তমান যুগ যন্ত্রণাকেই যেন রূপায়িত করেছেন, জীবন ধাবণের জন্য যে সমস্ত মনুষ্যত্ব আজ লাঞ্ছিত, পর্যুদস্ত, তাদেরই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাকে যেন মানবিক রূপ প্রদান করেছেন লেখক রাজার মধ্যে। শুধুমাত্র দারিদ্র্যের অভিশাপে রাজা একদিন আত্মবিক্রয় করে বসেছিল পাপের লোভার্ত্ত হাতে, কিন্তু মানুষের আত্মা বুঝি মরেও মরে না, তাই চরম মুহূর্ত্তে জাগরণ দেখা দিল, সমস্ত কলুষ, সমস্ত মালিন্যকে ছাপিয়ে প্রকাশিত হল, জাগ্রত হল তার অন্তরাত্মার চিরকল্যাণ মূর্ত্তি, বেঁচে গেল রাজা, পেল মানুষ এই নাম বহন করবার সার্থক উত্তরাধিকার। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত এক মানব-হৃদয়ের ইতিহাস বড় উজ্জ্বল বড় আন্তরিক হয়েই ফুটে উঠেছে, শক্তিমান লেখকের কুশল কলমে, জীবনের গহনতম প্রদেশে অনায়াস পদসঞ্চারের অধিকার যে তাঁর করায়ত্ত, আলোচ্য রচনার ছত্রে ছত্রে তারই স্বাক্ষর অঙ্কিত। মননশীলতায় উজ্জ্বল, হৃদ্যতায় সমৃদ্ধ এই রচনা সত্যই এক অপরূপ সৃষ্টি। গ্রন্থটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। প্রকাশক—কথাকলি, ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নক্ষত্রের জাল

রম্যরচনা মূলক গ্রন্থের আসরের প্রথম সারিতেই স্থান পাওয়ার যোগ্যতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বর্ত্তমান পুস্তক। খ্যাতিমান কথাশিল্পীর কুশল কলমে ব্যক্তিগত স্মৃতির টুকরোগুলি ছোট গল্পের মতই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রমণীয়তাই যদি রম্যরচনার প্রাণসত্তা হয় তাহলে আলোচ্য রচনাগুলি যে তার সার্থক স্বাক্ষরবাহী একথা অকুণ্ঠিত চিত্তেই স্বীকার করা চলে। একটি সংবেদনশীল প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল মানসিকতার স্বাক্ষরে উজ্জ্বল আলোচ্য রচনা সমূহের প্রতিটি ছত্র, পড়তে পড়তে পাঠকমনেও তার ছোঁয়া লাগে। লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত কাহিনী একটি আছে, যা উপন্যাস বর্ণিত রোমান্সের মতই কৌতূহলোদ্দীপক। সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যে সব আলাপচারী লিপিবদ্ধ হয়েছে তা যথেষ্টই আকর্ষণীয়। বর্ণনাভঙ্গীর কৌশলে সমস্ত ঘটনা যেন ছবির মতই ফুটে ওঠে পাঠকের চোখের সামনে। লেখকের আবেগ মধুর ভাষা বর্ত্তমান রচনার অন্যতম সম্পদ। রম্যরচনার ক্ষেত্রে বর্ত্তমান গ্রন্থটি যে এক উল্লেখ্য সংযোজন একথা অনস্বীকার্য্য। বইটির আঙ্গিক রুচিসঙ্গত, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—কথাকলি, ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯, দাম—পাঁচ টাকা।

মক্কেলের নাম বেন মোজেস

রহস্য রোমাঞ্চমূলক কাহিনী রচনায় বর্ত্তমানকালে যাঁরা যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু তাঁদের অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর লেখা একটি পরম উপভোগ্য রহস্য-উপন্যাস। উপন্যাসটি সকল দিক দিয়ে তাঁর সৃজনী শক্তির পরিচয় বহন করে ও পাঠকমনে বিশেষভাবে ছায়াপাত করে। সমগ্র উপন্যাসটি পাঠকচিত্তকে এক অবর্ণনীয় কৌতূহল ও উদ্দীপনায় ভরিয়ে রাখে। সহজ সরল ভাষায় লিখিত, প্রাঞ্জল বিন্যাসে বিন্যস্ত গ্রন্থটি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত রহস্যমূলক রচনাদির এক অসামান্য সংযোজন। গ্রন্থটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে রহস্যসন্ধানীদের জগতের সাধারণ্যে অজানা একটি দিকের এক সুস্পষ্ট আলেখ্য অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে লেখক উন্মোচন করেছেন পাঠক সমাজে, রহস্যের সৃষ্টি, রহস্যের বিকাশ তার বিস্তার, তার সমাধান প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশেষ দিকটির প্রতিও লেখক এতটুকু দৃষ্টি হারাননি, এই জগতের এক অজানা দিকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটালেন তিনি। গ্রন্থটির মধ্যে পাঠক সর্বতোভাবে পরিতৃপ্তির আস্বাদ পাবেন রসসৃষ্টির ক্ষেত্রেও লেখক সফল হয়েছেন। তাঁর বলিষ্ঠ রচনাশৈলী অফুরন্ত সাধুবাদের দাবী রাখে। প্রকাশক—ন্যাশানাল পাবলিশার্স, ২০৬ বর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—চার টাকা মাত্র।

মুক্ত বিহঙ্গ

বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় নবাগত হলেও ইতিমধ্যেই খানিকটা পরিচিতি অর্জ্জন করেছেন, আলোচ্য উপন্যাস তাঁর সেই পরিচয়কে বাড়িয়ে তুলবে বলেই মনে হয়; চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নকারী এক ছাত্রের জীবন বিধৃত হয়েছে এই রচনার মাধ্যমে, সেই সঙ্গে নিপুণ কুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছাত্রদের জীবন ও পারিপার্শ্বিক, এ সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান যে সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ বইটি পড়লে পাঠক মননে তারই স্বাক্ষর এঁকে যায়। চরিত্র চিত্রণেও পারদর্শী লেখক, প্রত্যেকটি চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়েই ফুটে উঠেছে। পার্শ্বনায়িকা সোনাহাসিনীর চরিত্রটি নানা কারণেই উল্লেখ্য, নারী হৃদয়ের চিরন্তন বৈচিত্র্য এই চরিত্রটির মাধ্যমে বড় উজ্জ্বল বড় মধুর হয়েই ফুটে উঠেছে, তুলনায় নায়িকা কল্যাণী অনেকটাই ম্লান ঠেকে। ডাক্তার ও নার্স এই সম্বন্ধে যে সব বিভ্রান্তি প্রায়শঃই ঘটে থাকে তারও এক নিপুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মাধ্যমে। লেখকের লেখনী অযথা উচ্ছ্বাস বা রোমান্টিসিজমের প্রভাব মুক্ত হতে পারলে, তাঁর এই রচনা অধিকতর উপভোগ্য হতে পারত বলেই মনে হয়। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে যথোচিত

সংযম অবলম্বন করতে পারলে তাঁর ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিময় হবে বলেই আমরা আশা করি। লেখকের শৈলী সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। গ্রন্থটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বিশ্বনাথ রায়, প্রকাশক—কথাকলি, ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা—৯, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পৃথ্বীরাজ

সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের কাহিনীর সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই পরিচয় আছে, সেই বহুবিশ্রুত ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী অবলম্বনেই রচিত হয়েছে আলোচ্য নাটকখানি। বর্তমান বাংলা নাটকে যে ভাষা প্রায় অচেনা সেই মাইকেল মধুসূদন সৃষ্ট অমিত্রাক্ষরের ছন্দেই রচিত হয়েছে বর্তমান নাটক। সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে উপস্থাপিত এই রচনার সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও অপর একটি মূল্য আছে, সে মূল্য বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসকে জনমানসে পরিস্ফুটিত করে তোলার দিক দিয়ে বিচার করলে এ ধরণের নাটকের গুরুত্ব বড় কম নয়। তবে অপ্রচলিত ছন্দে লিখিত হওয়ায় এর আবেদন যে কতটা সফল সে সম্পর্কে একটা সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। নাট্যকারের আন্তরিকতায় অবশ্য সন্দেহ মাত্র হয় না এবং বর্তমান রচনার সেটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় কথা। ছাপা, বাঁধাই ও আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩। ১। ১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ দাম—দুই টাকা ৭৫ নয়া পয়সা।

আত্মবোধ

আলোচ্য গ্রন্থখানি ধর্মমূলক, নশ্বর জীবনের শেষে যে পরম জীবনে জীবমাত্রেরই শেষ উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী সেই সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করেছেন লেখক। এই উত্তরণের পথে প্রকৃষ্টতম পন্থা যে আত্মানুসন্ধান বা আত্মোপলব্ধি, লেখকের মূল বক্তব্য তাকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ক্ষুদ্র আমিত্বকে পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারাতেই যে জীবের পরমা গতি প্রাপ্তি নিহিত, এই তত্ত্বকেই নানাভাবে প্রমাণিত করতে চেয়েছেন লেখক আলোচ্য রচনার মাধ্যমে। তত্ত্ব জিজ্ঞাসু পাঠক বইটি পড়ে খুসী হবেন বলেই, আমরা আশা করি। বইটির আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—করুণাকান্ত, প্রকাশক—শ্রীশিখরেশ সরকার, টাটা ডিগুয়াড়ী কোলিয়ারী, পোঃ—জিয়াল গোড়া, জেলা—ধানবাদ, প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ দাম—দুই টাকা।

ঢেউ ভাঙ্গা মুক্তা

আধুনিক যুগের দাম্পত্য সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত আলোচ্য উপন্যাসটি নানা কারণেই উল্লেখ্য। নীতিজ্ঞানহীনতা থেকে যে ঝড় একদিন দেখা দিয়েছিল জয়ন্ত ও কৃষ্ণার যৌথ জীবনে, কি করে তার প্রকোপ প্রশমিত হল, নিপুণতার সঙ্গে তারই ছবি এঁকেছেন লেখক। জয়ন্ত ও কৃষ্ণা মুখ্য চরিত্র হলেও অর্থাৎ কাহিনীর গতি তাদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও, আরও বহু চরিত্র ও বিভিন্ন কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে, এবং তার প্রায় সবগুলিই বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত, মনে হয় লেখক সমস্যাগুলি নিয়ে সত্যই আন্তরিক চিন্তা করেছেন। এই ভাবে মূল কাহিনীর পাশে পাশেই বয়ে চলেছে রত্না-সমীর, তৃপ্তি-অনুপ প্রভৃতির জীবনের ধারা বৈচিত্র্য! চাওয়া পাওয়ার সংঘাত, ভুল বোঝাবুঝির অকূলে বিপর্যস্ত এই সব জীবনের খণ্ড চিত্রগুলি, লেখকের কুশল কলমে বড় পরিষ্কার হয়েই ফুটে উঠেছে। পাঠকের মনে কৌতূহল শেষ পর্য্যন্তই অব্যাহত থাকে। গ্রন্থ সজ্জা শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—শ্রীআদিত্যকুমার ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স, পোষ্ট বক্স ২৫৩১, কলিকাতা—১, দাম—ছয় টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

সুপ্তি সাগর

গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচিত আলোচ্য উপন্যাসখানি তাঁর অনুরাগী পাঠকবৃন্দকে খুসী করে তুলবে। হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে আবিষ্কৃত যে নরকঙ্কাল সমূহ আজও সাধারণ মানুষ ও পুরাতত্ত্ববিদগণকে নানান জল্পনা কল্পনার খোরাক জোগাচ্ছে, তারই পটভূমিতে গড়ে উঠেছে বর্তমান কাহিনীর বিষয়বস্তু। সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক না হলেও বিচিত্র কৌশলে ইতিহাসের ছোঁয়া লাগিয়েছেন লেখক তাঁর রচনায়, এবং সেজন্যই কাহিনীটি অমূলক হয়েও যেন সত্যের প্রতীতি জাগায় পাঠক মননে। চরিত্র চিত্রণও অত্যন্ত স্বাভাবিক বিশেষতঃ নায়িকা মালতীর চরিত্রটি খুবই উজ্জ্বল। ঘটনা সংস্থাপন ও বেগবান ভাষারীতির কল্যাণে রচনায় গতি অত্যন্ত ঋজু, পাঠকের কৌতূহল শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে। একটি উপভোগ্য রচনা বলেই বর্তমান উপন্যাসটি আদৃত হবে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রকাশক—কথাকলি, ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা—১, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মেজকর্তা কান পেতে সব শুনলেন।

ঘাড় গুঁজে কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন: 'আমি হিসেব করে দেখছিলাম প্রবীরদা। আজ থেকে ঠিক উনচল্লিশ বছর আগে এমনি এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল ওই বাড়িটার ছাদে। তফাৎ শুধু, আপনারা বরাত জোরে খুব পার পেয়ে এসেছেন। কিন্তু ঠাকুরদাদাদের আমলের বুড়ো দরোয়ান চক্কুলাল আর নিস্তার পায়নি সেবার। হাতের লাঠিটা তার ছিট্‌কে পড়েছিল দূরে। পাগড়ীটা খসে পড়েছিল পাশে। মুখে এক গাজলা ফেনা। অঙ্গে কোনরূপ চোট বা আঘাতের চিহ্ন ছিল না, তবু সুস্থ-সবল আস্ত মানুষটার মৃত্যু নিয়ে চাকর-বাকর আর দরোয়ান মহলে কানা-ঘুষা চলেছিল বেশ কিছুকাল।'

মেজকর্তা থামলেন। সোনা-মোড়া দামী সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট মুখে পুরলেন। একটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন: 'আমরা তখন ছোট ছিলাম। অত তলিয়ে দেখতে শিখিনি। ঠাকুরদার মুখেই শুনেছিলাম।'...

তিনি নাক দিয়ে এক রাশ ধোঁয়া ছাড়লেন। আবার বললেন: 'ঠাকুরদার মুখেই শুনেছিলাম। আমাদের ওই বাড়িখানা অনেকদিনকার, লক্ষ্য করেছেন আশা করি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ওটা ছিল নাকি কুঠিয়াল সাহেবদের ষ্টোর-ঘর। সেপাই যুদ্ধের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন, কুঠিয়াল সাহেবরা তখন বাড়িখানা দেয় বিক্রি করে। ঠাকুরদার মাতামহ ছিলেন ইংরেজ সাহেবদের নামকরা মুন্সী। বিস্তর কাঁচাপয়সার মালিক। কুঠিখানা তিনি তখন সস্তায় কিনে নেন। আর জামাইকে দিয়ে যান দান-পত্র করে।'

রূপোর ট্রে-তে করে এ সময় চা আর আনুষঙ্গিক প্রাতরাশ এসে হাজির হল। ধূমায়মান চায়ের কাপে চুমুক বসিয়ে মেজকর্তা আবার সুরু করলেন: 'ঠাকুরদার বাবা ছিলেন সৌখীন মানুষ। গান-বাজনার মস্ত সমজদার। তাঁর বৈঠকখানায় রোজই পশ্চিমা বাঈজী আর মুসলমান নাচওয়ালীদের আমদানি হোত। বন্ধু-ইয়ার নিয়ে রোজই রাত্রে পানাহারে তিনি মত্ত হোতেন। অনেক রাত অবধি চলত নাচ-গান। একদিন হয়েছে কি, রাত্রির নিথর নীরবতা চূর্ণ করে শোনা গেল হঠাৎ পিস্তলের পর-পর শব্দ। বন্ধু ইয়ারের দল তখন যে যার বাড়ি গেছে, কেউ বা হয়তো ফরাসের উপর গড়িয়ে পড়েছে বেহুঁস হয়ে। ঠাকুরদার বাবাও গাড়ি জুড়তে হুকুম করেছিলেন কোচমানকে। তারপর বুঝি ছাদে গিয়েছিলেন তিনি ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু পায়চারি করতে। তারপর কি হয়েছিল জানা নেই। চাকর-বাকর ছুটে গিয়ে দেখে কি, কর্তাবাবু ছাদের ঈশান কোণটায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন চোখে মুখে তাঁর মস্ত বিভীষিকার ছাপ। আর ধূমায়িত পিস্তলটা খসে পড়েছে বুঝি মুঠি থেকে। সেই থেকে প্রকাণ্ড ওই বাড়িখানা দীর্ঘকাল পড়েছিল অমনি গুদাম ঘর হিসেবে। আপনারাই তো প্রথম ওটাকে মেজে ঘসে এ-আর-পি অফিস বানিয়ে তুলেছেন।'

'রীতিমত ভৌতিক কাণ্ড দেখছি।' আমি বলে উঠলাম। 'আচ্ছা, ও বাড়িটায় ইতিপূর্বে কি কোন খুন-জখম হয়েছিল?'

'তা তো জানি না, প্রবীরদা।' মেজকর্তা এস-ট্রেতে সিগারেটের শেষাংশটি ছুঁড়ে ফেললেন? বললেন: 'ঠাকুরদার মুখে শুনেছিলাম, ও বাড়িটার এক অংশে কুঠিয়াল সাহেবদের প্রাইভেট কোয়ার্টারও

নিখিল সেন

নাকি ছিল। দোতলার এক ঘরে নাকি তখনকার ডাক ও তার বিভাগের এক আমলা থাকতেন। চাটগাঁ না কোত্থেকে এক পর্তুগীজ বাঈজীকে নাকি সাহেবটি আনেন বিয়ে করে। ফিরিঙ্গী বাঈজীর রূপ লাবণ্যের কথা তখনকার সারা কলকাতায় এমনি ছড়িয়ে পড়েছিল যে, উর্দ্ধতন বড় আমলার নজর গিয়ে পড়ে তার উপর। তারপর যা হয়ে থাকে। অধস্তন কর্মচারীটিকে আজ

ওখানটায় কে যেন নেচে বেড়াচ্ছে ঝুমঝুম করে।

এখানে কাল ওখানে পরশু দিন আবার সুদূর অন্য কোনখানে চাকুরি আর প্রমোশনের প্রলোভনে কাটাতে হোত বাইরে বাইরে।

বাঙলা দেশের সীমানাটাও তখনো তো আর আজকের পশ্চিম বাঙলার মত ছিল না। ছিল সারা বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা আর আসামের প্রান্ত সীমা জুড়ে। এদিকে ডাক কর্মচারীর সুন্দরী বধূটি কলকাতায় রয়ে গেল ঊর্ধ্বতন আমলাদের সুনজরে। তারপর কি ঘটেছিল সব মনে নেই। তবে ঈর্ষাপরায়ণ স্বামী তাঁর নৃত্যপটীয়সী সুন্দরী পত্নীর উপর প্রতিশোধ নিতে ভোলেননি। এক রাত্রে অতর্কিতে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন কি: তাঁর বিবাহিত স্ত্রী বৃদ্ধ এক ঊর্ধ্বতন আমলার কোলে কণ্ঠলগ্ন হয়ে বসে আছে। তারপর রাগের মাথায় ব্যর্থ প্রেমিক স্বামী পুঙ্গবটি কি করে বসেছিলেন, শুনিনি। পর দিন থেকে কিন্তু এখনকার বিবি বোজিও লেনের ফিরিঙ্গী বিবি সাহেবাকে আর দেখা যায় নি।'

মেজকর্তা উঠে পড়লেন। হাত জোড় করে বললেন: 'দাদা, এবার উঠি। ষ্টুডিওতে যেতে হবে।' আমরাও উঠলাম। প্রবীরদা এবার থামলেন।

প্রবীরদা এতক্ষণ বাঁ-হাতের তালুর উপর চুণ সহযোগে তামাক-পাতা কুচি করে ডলছিলেন। এবার ডান হাতের দু'আঙুলে তৈয়ারি করা খৈনীটা বাঁ হাতে নীচের ঠোঁট টেনে মুখের মধ্যে পুরে দিলেন। তারপর জানলায় উঠে গিয়ে সশব্দে পিচ্‌ ফেলে এলেন। তক্তপোষে পা তুলে জেঁকে বসে বললেন: 'কৈ হে, আর কত দেরী? খালি পেটে কিন্তু ভূতের গল্প জমে না ভায়া!'

'আনছে দাদা, ভেজে আনছে।' আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম।

অশোক রীতিমত উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল গল্প শুনতে। বললে: 'খৈনীটা খান কেন দাদা! ন্যাসৃটি হ্যাবিট! পান-তামাক বরং।'

'আরে ভায়া, সে কি আর বাকি আছে? ওটাও একটা নেশা।' প্রবীরদা জানলায় উঠে গিয়ে সশব্দে আবার পিচ ফেলে এলেন। বললেন: 'তোমাদের তেলেভাজা আসতে থাকুক, আমি এদিকে আমার কাহিনীর ভিত্‌টা গেঁথে নি, কি বলো?'

প্রবীরদা একটা ঢোক গিললেন। শুরু করলেন: 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম। যুদ্ধের দিন। ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন তখনো খোলা হয়নি। মিত্রপক্ষ ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের হাতে তখনো সমানে মার খেয়ে চলেছে। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনে দুর্ধর্ষ জাপ-সমর কর্তাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার পিছু হটতে শুরু করেছে। মালয়, সিঙ্গাপুর আর বর্মার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিগুলি হয়েছে বৃটেনের হস্তচ্যুত। মূল ভারতভূমির উপর হামলা করতেও কসুর করেনি বিজয়দীপ্ত জঙ্গী-জাপ সাম্রাজ্যবাদ। কোলকাতায় তখন বোমা পড়ার হিড়িক। যে যেদিকে পারছে ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে ছুটেছে কোলকাতার বাইরে। মুখর কোলকাতা তখন অনেকটা জনবিরল। খালি মিলিটারী ট্রাক আর ট্যাঙ্ক-এর ঘর্ঘর শব্দ: রাস্তা কাঁপিয়ে ফৌজী অভিযান, বিচিত্র বহু নর-নারীর আনা-গোনা আর মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের প্রথম বলি—দুঃস্থ মানবাত্মার ভুখ-মিছিল: 'একটু ফেন দে,' বলে কাতর আর্তনাদ—সব কিছু মিলে ভয়াবহ এক পরিবেশ।'

শেখরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এমন বর্ষার দিনে ভূতের গল্প শুনবে বলে পাকড়াও করেছিল প্রবীরদাকে। ভেটারেণ্ট মানুষ। হিল্লী থেকে দিল্লী সর্বত্রই তাঁর সমান গতিবিধি। সমান কদর। সংবাদপত্র অফিসেও নাকি তাঁর দ্বার অবারিত। এমন প্রবীরদা কিনা ভূতের গল্প শুনাতে গিয়ে যুদ্ধের বারমাস্যা তাদের শুনাতে বসেছেন?

প্রবীরদা তা লক্ষ্য করে বললেন: 'সবুর ভায়া, সবুর। সবুরে মেওয়া ফলে।'

সবুরে মেওয়া ফলে কিনা জানি না। তবে এ সময় ভজহরি এক ডিস তেলেভাজা নিয়ে হাজির হোল। বললে: 'বাবু, গরম গরম ভাজাটা খেতে থাকুন, আমি চা নিয়ে আসছি।'

প্রবীরদা হাত বাড়িয়ে একটা গরম তেলেভাজা তুলে নিলেন। বললেন: 'হ্যাঁ, কি বলছিলুম, আমি তখন এ-আর-পিতে সবে কাজ নিয়েছি।'

'সে কি দাদা! আপনি না সেদিন বলছিলেন, গত যুদ্ধের সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর জোয়ানদের সঙ্গে আপনি লড়াই করছিলেন কোহিমা ফ্রণ্টে?' গোপাল রায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো।

প্রবীরদা বুঝি এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একটু হকচকিয়ে বলে উঠলেন: 'ওঃ, তাই বলছিলাম বুঝি? হ্যাঁ, সেবার সত্যি নেতাজীর সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলাম বটে।' প্রবীরদা একটা ঢোক গিললেন। বললেন: 'তা হয়েছে কি শোন—'

তিনি বেগুণিটায় আস্ত একটা কামড় বসিয়ে দিলেন। বলে চললেন: 'চাকুরি তো নিলাম এ, আর, পি-তে। কিন্তু সোয়াস্তি কই? রাত নেই, দিন নেই—সব সময় খাকি পোষাক আর মাথায় ষ্টীলের শিরস্ত্রাণ এঁটে প্রস্তুত হয়ে থাক সাইরেণ বেজে ওঠার প্রতীক্ষায়। কোলকাতায় বোমা পড়ল তো সেই জাপানী খেলনার মত তিনটে ঠুনকো বোমা আর মারা গেল তাতে একটা গাইগরু, উপড়ে পড়ল গোটা কয়েক পার্কের গাছ আর স্প্লীণ্টার ছিটকে এসে খুপড়ে নিল বুঝি খানকয়েক বাড়ির প্রাচীর। কিন্তু তার জন্য বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ মহড়ার অন্ত নেই। সময় নেই, অসময় নেই; যেই বেজে ওঠে সাইরেণ—অমনি যে যেখানে পারল ছুটল ট্রেঞ্চ-এ আশ্রয় নিতে। আমাদের আর হয়রাণির শেষ নেই।'

'তা তো বুঝলাম।' কিন্তু আপনার ফিরিঙ্গী ভূত উধাও হোল কোথায় প্রবীরদা?' অশোক দত্ত ফোড়ন কাটলো।

'হয়নি কোথাও।' প্রবীরদা একটা পান মুখে পুরে দিলেন। তারপর বলে চললেন: 'বউবাজার ছানাপটির পাশে বিবি রোজিও লেনের এক বাড়িতে ছিল তখন আমাদের এ, আর, পি-র আঞ্চলিক অফিস। কোম্পানী আমলের পুরাতন বাড়িখানার চুণ-বালি সব

প্রায় খসে পড়েছিল। ইঁটগুলি দাঁত বার করে বুঝি হাসছিল। বিপুলায়তন দ্বিতল বাড়িখানা অনেকটা গোলাঘরের মত ছিল দেখতে। ঘরগুলিও ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। জানলা-দরজার বিশেষ বড় বালাই নেই। পেছনের দিকটায় পাঁচিলের খানিকটা ভেঙে গিয়ে বেশ একটা বটগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাকে আষ্টেপিষ্টে আঁকড়ে ধরে।

পুরনো বাড়িখানার নীচের তলাটা রিকুইজিসন করে টুকটাক এদিক-ওদিক সারিয়ে নিয়ে আর সামনে প্রকাণ্ড এক ব্যাফেল-ওয়াল তুলে আমাদের এ, আর, পি, অফিস বানান হয়েছিল। উপরতলাটা খালিই ছিল। আমরা ক'জন মিলে মেস করে থাকতাম।

'মেসে থাকতেন বুঝি?' শম্ভু সা' মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসলে।— 'বৌদিদের কোথায় পাঠালেন?'

প্রবীরদা যে অকৃতদার এ কথা অজানা নেই মেসের কোন সভ্যের।

'তা ভাই, বোমার হিড়িক, কোলকাতা ছেড়ে সবাই পালাচ্ছে। তোমার বৌদিদিও বেঁকে বসলেন। বাঁসার পাট তুলে দিয়ে আমিও তাই পাঠিয়ে দিলাম জলপাইগুড়ি ভাইয়ের কাছে।'

শুকনো একটু হাসলেন প্রবীরদা।

"হ্যাঁ, কি বলছিলুম! মে-জুন মাসের গরম। ঘুম আসছিল না কিছুতেই ভাই। তাই খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আর ভুবন ছাদে গিয়ে পায়চারি করছিলাম। রাত্রের ডিউটি তখনও শুরু হয় নি।

ছাদের মাঝখানটায় শান বাঁধান খানিকটা জায়গা ছিল বসবার বা বিশ্রাম করবার। আমরা দু'জন তার উপর এসে বসলাম। রোগা লম্বা কালো প্যাঁকাটির মত গড়ন ভুবনের। বুট আর খাকি পোষাক পরে আর মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ এঁটে সামরিক কায়দায় সে যখন খট্ খট্ করে চলে, কেউ যদি তখন তাকে 'তালপাতার সেপাইর' সঙ্গে তুলনা করে তবে অত্যুক্তি হবে না। ভুবন জিবে বার করে একটা পান মুখে পুরলে। বললে: 'আজকের দিনটা কিন্তু ভাল ঠেকছে না দাদা। দেখবেন, আজ নির্ঘাত জাপানীরা এসে হানা দেবে।

'কি করে বুঝলে?' আমি শুধালাম।

ভুবন প্রশ্নটা বুঝি কানেই তুলল না। আপন মনে বলে চলল: 'দেখবেন, জাপানী বোমারুর দল কালো অতিকায় শকুনীর মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে বোমা ফেলে কোলকাতাটাকে আজই দেবে ধ্বংস করে। আর্তের ক্রন্দন, দুঃস্থের—।' বুঝলাম ভুবনের পেটে আজ সন্ধ্যেয় তরল কিছু পড়েছে। ও জিনিষটা পেটে পড়লেই ভুবন তাই অমন মুখর, বাগ্ময় হয়ে ওঠে। তাই বাধা দিয়ে বললাম: 'তা দিক না, তুমি আর আমি তো রয়েছি।'

'না দাদা, ঠাট্টা নয়। দেখছেন না, চারদিকে কেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার! থম থমে ভাব চারদিকে, সারা কোলকাতাটা যেন এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে মড়ার মত।'

'তা ঠিক। ব্ল্যাক আউটের দিন—।'

'এমন সময় ওরাও কিন্তু বেরোয়, দাদা!'

'কারা ?'

'রাত্রে যাদের নাম করতে নেই।'

'মানে ভূত ?'

'হ্যাঁ।' ভুবন মাথা নাড়লে। 'অশরীরী আত্মারা সব বের হয় এমনি রাত্রেই। এমনি রাত্রেই ওরা করে আনাগোনা। বিষাক্ত তাদের দীর্ঘশ্বাস।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভুবন আবার বললে: 'আচ্ছা দাদা, বলুন তো, এমন ধারা আর কতদিন চলবে।'

প্রত্যুত্তরের আশায় ভুবন বুঝি তাকিয়েছিল আমার দিকে, আমি নিরুত্তর রইলাম। জবাব দিতে পারলাম না। কণ্ট্রোল, ব্ল্যাক-আউট আর ব্ল্যাক মার্কেটি-এর দৌলতে নাগরিক জীবন ইতিমধ্যেই দুর্বিবহ হয়ে উঠেছে। 'অন্ন দাও'—'বস্ত্র দাও' বলে হাজার হাজার শীর্ণকায় বুভুক্ষু নরনারী শিশুপুত্র কলকাতায় হানা দিতে শুরু করেছে। নজরখানা, ফুটপাত আর অলিতে-গলিতে পড়ে মরতে শুরু করেছে কত লোক কাতারে কাতারে। রাত্রির অন্ধকারে মিলিটারী ক্যাম্পের আশেপাশে মেয়ে আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকেরা মান-সম্ভ্রম আর ইজ্জত বিকিয়ে বসেছে। যুদ্ধের কলকাতায় এ তো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। মৃত্যুরই রূপান্তর। অত বিচলিত হবার কি আছে? ছোট একটা নিশ্বাস চেপে চুপ করে রইলাম।

ভুবন বুঝি খানিকটা নিরুৎসাহ হোল। অন্ধকারে ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সে একটা সিগারেট ধরালে। রাত্রির নিথর অন্ধকার তাতে বুঝি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল। গলির মোড়ে বটগাছটার পাতাগুলি কাঁপিয়ে শিরশির করে হঠাৎ দমকা একটা হাওয়া বয়ে গেল এই সময়। রাতকানা কি একটা পাখী ভয় পেয়ে বুঝি ডানা ঝাপটিয়ে আঁতকে উঠল।

কি যেন তারপর বলতে যাচ্ছিল ভুবন। হঠাৎ সে মহাবিচলিত হয়ে উঠল। তড়াক করে উঠল লাফিয়ে। ভীত অস্পষ্ট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল: 'কে! কে ওখানে?'

ভুবনের হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা কখন খসে পড়ল ছাদে। আমিও কেমন যেন অস্বাস্থ্যকর এক অতি-প্রাকৃতিক অনুভূতি অনুভব করছিলাম। আমার গাটাও ছমছম করে উঠছিল। তবু ব্যাপারটাকে হাল্কা করবার জন্ত বলে উঠলাম: 'কোথায়?'

'ওই যে ওখানটায়! ওই যে ঘুঙুর বাজিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে ওখানটায়!'

নৃত্যের তালে তালে দূরাগত নূপুরের মৃদু নিক্কনধ্বনি আমার কানেও এসে বাজছিল যেন দমকা হাওয়ায়। আমি তখন আমল দিই নি। ভেবেছিলাম, আমাদের এ, আর, পি, অফিসের আশে-পাশে বিবি রোজিও লেনের কুখ্যাত যে কয়টি বসতি যুদ্ধের দিনে দিব্যি নিজেদের পাপ-ব্যবসাটা জাঁকিয়ে বসেছে তাদের ঘর থেকে বুঝি-নৃত্যরতা কোন নর্তকীর পায়ের শব্দ ভেসে আসছে অন্ধকারে। অস্বস্তিকর পরিবেশটাকে হাল্কা করে তুলবার জন্ত বললাম: 'ওই ঘুঙুরের শব্দের কথা বলছো তো? ও তো আসছে ওখানকার ওই বস্তির কোন বাড়ি থেকে বুঝি। কোন বাঈজী হয়ত মার্কিণ সৈন্তদের তুষ্টি-বিধানের জন্ত নাচ-গান শুরু করেছে।'

আমি একটু থামলাম। তারপর বললাম: 'মার্কিণ সৈন্তদের কাণ্ড-কারখানাটা সব দেখছো, ভায়া? এ পাড়ায় এসেও কেমন হৈ-হল্লা শুরু করে দিয়েছে মদ-খেয়ে।'

'সেখানে নয়। ওই যে ওখানটায়।—'

ছাদের যেখানটায় কার্ণিশ ঘেঁষে পরগাছাটা মাথা তুলেছে সেদিকে ভুবন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রুদ্ধ আবেগে বলে উঠল: 'ওই যে শুনুন, তালে তালে পা ফেলে কে যেন নেচে বেড়াচ্ছে ওখানে।'

ভুবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। কোন নৃত্যপটীয়সীর মনোরম নৃত্যছন্দ যেন আরও নিকটতর ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। পায়ে ঘুঙুর, পরনে লাল বুটিদার মসলিন ঘাঘরা, বুকে নীল নীপিবন্ধ, সুরমা আঁকা কালো চোখ দুটিতে স্মিতহাসি। জাফরাণী রঙের ওড়না মাথায় দিয়ে তবলচি আর সারেঙ্গীর সুরমধুর বাদ্যের সুরসংযোগে কৃশাঙ্গী কোন তরুণী বাঈজী বুঝি নৃত্য করে বেড়াচ্ছে আমাদের জীর্ণ ছাদের কোণটায় মদ্যপানরত মত্ত এক শ্বেতাঙ্গের সামনে।

'না, ও কিছু নয়!' আমি সহসা বলে উঠলাম। 'সেনট্রাল এভেনিউ দিয়ে ভারী ভারী মিলিটারী ট্যাঙ্কগুলি এখন পাশ করছে কিনা, তাই ঝনঝন অমন শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে।'

আমি তারপর উঠে দাঁড়ালাম। বললাম: 'চল, নীচে যাই। রাত কম হয়নি। শেষ রাত্রে আবার ডিউটিতে বেরুতে হ'বে।'

ছাদের দরজাটা ভেজিয়ে আমরা দু'জন দোতালায় মেস ঘরে ফিরে এলাম। রুম মেট বিজন দত্ত তখনো ফেরেন নি। ডিউটি তাঁর দিনের বেলায় শেষ হয়েছে; সন্ধ্যেটা তাই ফ্রি। বুঝলাম, ফিরতে তাঁর আজ রাতই হবে। এমনি হয় হামেশা। ডিউটি সেরেই খাকী পোষাক পরিচ্ছদ ছেড়ে সুটকেশ থেকে শাদা ফিনফিনে গিলেকরা ধুতি পাঞ্জাবী বার করে দত্ত সাহেব তার পর বেরোন প্রতিদিন তাঁর সান্ধ্য অভিসারে—নিকটেই বিবি রোজিও লেনের নির্দিষ্ট এক আস্তানায়।

শোনা যায়, ভদ্রলোকের নাকি যৌনশক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছে। তবু কিন্তু জীবন শক্তির প্রাণপ্রাচুর্যে তিনি ভরপুর: কথাবার্তা, হাসি-হল্লায় জুড়ি তাঁর নেই বললেই চলে। বয়স এখনো চল্লিশ পার হয়নি। কিন্তু মাথার চুলগুলি দুপাশ থেকে পেকে কাশফুলের মত এমন শাদা হয়ে গিয়েছে যে, কে বলবে বিজন দত্তর বয়স ষাটের কোঠায় নয়। বীণার ঘর থেকে পানাহারে মসগুল হয়ে দত্ত সাহেব মেসে ফিরেই তাঁর সান্ধ্য প্রসাধনটি ছেড়ে আওয়া-ওয়ার পরে একবার ছাদে পায়চারি করে আসেন।

ঘরে ঢুকেই ভুবন ধপ করে তার তক্তপোষের উপর বসে পড়ল। অনেকক্ষণ পর এবার সে কথা পাড়ল। বলল: 'দত্ত সাহেব তো দেখছি এখনো ফেরেন নি। ফিরেই তো তিনি ছাদে যান একবার! দেখি, তিনি কি বলেন।'

'হ্যাঁ, সেই ভাল। দেখা যাক, দত্ত সাহেব কি বলেন।' আমিও সায় দিলাম। তারপর বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলাম: অ-তনুতনু বাঈজীর সেই ছন্দময় চটুল পায়ের ঘুঙুর শিঞ্জিনীর কথা। এতদিন রয়েছি বাড়িটায়, এমন ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা তো ঘটে নি কোন

দিন! রাত বিরাতে কতদিন, কত সময় না ছাদে গেছি একলা, কোনদিন তো এমন ঘুঙুরের শব্দ কি কান্না কানে আসে নি কখনো!

একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম ভুবন তখনও বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে বুঝি ছাদের কড়িকাঠ গুণছে। তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। আমারও একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। খেয়াল হল, দত্ত সাহেবের অপ্রকৃতস্থ কণ্ঠস্বরে: 'কি বাব্বা, ভূতুড়ে বাড়ি পেলে নাকি? ভরসন্ধ্যেয় সবাই যে ঘুমিয়ে পড়লে নাক ডাকিয়ে?'

তাঁর স্খলিত জুতার শব্দ ক্রমে বিলীন হতে লাগল: 'তা বাব্বা ঘুমাও; আমি ছাদ থেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। এই যাবো আর আসবো। নইলে বাবা, মৌতাতটা টুটে যাবে।'

টলতে টলতে তিনি বুঝি তারপর ছাদে উঠে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটু পরেই দেখলাম, এক সঙ্গে দুটি করে সিঁড়ির ধাপ ফেলে দত্ত সাহেব নেমে আসছেন তরতর করে। কেবল এক পায়ে তাঁর রয়েছে এক পাটি স্লিপার। অপরখানি কোথায় ফেলে এসেছেন খেয়াল নেই। ভীত সন্ত্রস্ত চোখ দুটি। মুখে মহা আতঙ্কের চিহ্ন। তখনও তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। প্রশ্ন করলাম: 'কি ব্যাপার? অমন করছেন কেনো?'

মুখ দিয়ে দত্ত সাহেবের কোন কথা বেরুলো না: তিনি কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। হাত ধরে আমি তাঁকে তক্তপোষের উপর নিয়ে বসালাম। সজোরে একটা ঝাঁকুনিও দিলাম। আবার প্রশ্ন করলাম: 'কি হয়েছে সত্যি বলুন তো?'

'হ্যাঁ।'

'অস্বাভাবিক কিছু—।'

আমার মুখের কথাটি তিনি বুঝি এবার কেড়ে নিলেন। দু'হাতে চোখ দুটি একবার কচলিয়ে নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন: 'কেন, আপনারাও কিছু দেখেছেন বুঝি?'

'দেখা নয়, খালি শোনা।' আমি মাথা নাড়লাম।

'আপনি দেখেছেন না কি?'

ভুবন তড়াক করে তক্তপোষের উপর উঠে বসল।

রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে দত্ত সাহেব তারপর যা বলে গেলেন তা অনেকটা আমাদের কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এক চুলও অমিল নেই। ছাদে এসে আর আর দিনের মত সেদিনও তিনি সান বাঁধান বসবার জায়গায় গা এলিয়ে দিয়েছিলেন মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে। আমেজের ভাবটা তখনও কাটেনি। সহসা এক রাত জাগা পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উঠতেই তিনি বুঝি সচকিত হয়ে উঠলেন। তখন তাঁর মনে হয় কার্নিশের যেখানটায় বটগাছটি প্রাচীর ফুঁড়ে মাথা তুলে আছে, ওখানটায় কে যেন নেচে বেড়াচ্ছে ঝুম্ ঝুম্ করে। তিনি প্রথমটায় আমল দেন নি ওটাকে। ভাবলেন, বীণাদের আস্তানায় বিলাতি সরাপটা একটু বেশী মাত্রায় গলাধঃকরণ করেছিলেন বলেই হয়ত এমন ভ্রম হয়ে থাকবে।

তিনি তবু উঠে বসলেন। কী আশ্চর্য, চটুল দু'টি চরণ ফেলে এক সময় কে যেন বসল তাঁর পাশে। দত্ত সাহেবের সর্বাঙ্গ বুঝি তখন শিরশির করে কাঁটা দিয়ে উঠল। তিনি দু'হাতে চোখ দুটি একবার কচলিয়ে নিলেন—না, কেউ কোথাও নেই। তবে কে?

কে ওখানে অমন করে নেচে বেড়াচ্ছে তালে তালে? এক ঝাঁক কালো বাদুড় এ সময় সশব্দে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল মেডিকেল কলেজের মর্গটির দিকে। তিনি পাশ ফিরে তাকালেন। 'কে—কে ওখানে?'

অস্ফুট কণ্ঠে তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই। শুধু বাদুড়ের ডানা ঝাপটানির একটানা শব্দ?

দত্ত সাহেব সচকিত হয়ে বসলেন। এবার তাঁর মনে হোল, পাশে বসা অতনু সেই তন্বু দেহলতাটি তাঁর দুদিকে ঠ্যাং দু'টি ঝুলিয়ে এসে বসল যেন কোলে। আর সর্পিল হিম-শীতল বাহু দু'টি দিয়ে রইল যেন তাঁর কণ্ঠ লগ্ন হয়ে। দত্ত সাহেব এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালেন। ঘেমে তিনি নেয়ে উঠলেন রীতিমত। তারপর কি হোল তাঁর মনে নেই। শুধু মনে পড়ে এক ঝটকায় তিনি উঠে দাঁড়াতেই খটাখট্ শব্দ করে কি যেন ছিটকে পড়ল দূরে। কাঁচের গ্লাশ ভেঙে পড়ার মত খিল খিল করে কে যেন হেসে উঠল অন্ধকারে। আশ-পাশের কোথা থেকে বুঝি মরা কান্নার সকরুণ শব্দ ভেসে আসতে লাগল আর সেই শব্দ রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারকে কেটে যেন থান থান করে দিল।

দত্ত সাহেব এবার একটা সিগারেট ধরালেন।

আমরা তিনজন তিনজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। কায়াহীন ছায়ার শুধু নাচ শোনা নয়, তার ভৌতিক আলিঙ্গনও! দত্ত সাহেবকে সৌভাগ্যবান বলতে হবে বৈ কি? তবে হিল্লে একটা করতে হয় এ রহস্যের।

রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে পরদিনই ছুটলাম বাড়িওয়ালার কাছে। পাড়াতেই থাকেন।

সাবেকী জমিদার। বনেদী হাল-চাল। শুনলাম, মেজবাবু তখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। উঠবেন বেলা দশটায়। দশটার পর আবার গিয়ে ধর্ণা দিলাম। খবর পাঠাতেই তিনি ডেকে পাঠালেন। খালি গা; গৌরবরণ নধরকান্তি দেহ। ঘুম জড়িত চোখে মেজকর্তা তখন চাকরের হাত থেকে একটির পর একটি করে বিশ-ত্রিশটা রিষ্ট আর পকেট ওয়াচে দম দিয়ে চলেছেন। আমায় দেখে সহাস্যে বলে উঠলেন:

'আরে, প্রবীরদা যে! এত ভোর বেলায়?'

মেজকর্তা তারপর চাকরকে চা আনতে নির্দেশ দিলেন। হেসে বললেন:

'বলুন, কি ব্যাপার? কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়: নইলে প্রবীরদার কি পদধূলি পড়ত।'

'না ভাই, তা না।' আমি তখন গত রাত্রির কাহিনীটা সবিস্তারে বলে গেলাম। দত্ত সাহেবের কাছ থেকে শোনা সেই অতনু তন্বুর খনখনে প্রেতায়িত হাসি আর মরা কান্নার ঘটনাটাও জানালাম।

* * * *

বৃষ্টিটা ধরে এসেছিল। কড় কড় করে একটা বাজ পড়তে থমথমে আকাশটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আধভেজা ছাতাখানা তুলে নিয়ে প্রবীরদা দরজার দিকে পা বাড়ালেন। মুখ ফিরিয়ে বললেন:

'অনেক রাত হয়ে গেল ভায়া, এবার উঠি। তোমাদের বৌদি আবার অপেক্ষা করে আছেন।'

জল কাদা ঠেলে ছাতা হাতে প্রবীরদা তারপর নেমে পড়লেন রাস্তায়।

সে যুগের স্বদেশী গান

প্রভাতকুমার গোস্বামী

প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে মার্গ সঙ্গীতের পাশাপাশি লোক-সঙ্গীতের ধারা চলে আসছে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রাষ্ট্রবিপ্লব, সামাজিক অত্যাচার, অনাচার, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ব্যথা-বেদনা অর্থাৎ একটা জাতির সর্বতোমুখী পরিপ্রকাশ ঘটেছে লোক সঙ্গীতের মাধ্যমে। এই লোক-সঙ্গীতের পাশে আমরা আর এক শ্রেণীর সঙ্গীত দেখতে পেলাম ইংরেজের রাজত্বকালে। এই সঙ্গীতে ভাষা পেয়েছিল মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ পরাধীন জাতির আশা ও সঙ্কল্প। তাই এই সঙ্গীতকে আমরা নাম দিয়েছি স্বদেশী-সঙ্গীত।

দু'-দশটি গান নয়, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে গীতিকারেরা স্বদেশী গানের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। এ যুগে এত গান লেখার স্বাভাবিক কারণও রয়েছে। নিজ হৃদয়ের আবেগ-প্রেরণা অপরের হৃদয়ে পৌঁছে দেবার সরল পথটি হ'ল সঙ্গীত। তাই সে যুগে অখ্যাত অসংখ্য গীতিকার গান রচনার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল এঁরা তো আছেনই এঁদের সঙ্গে নাম করা যেতে পারে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কামিনী ভট্টাচার্য, সরলা দেবী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মুকুন্দ দাস, নবীনচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাজকৃষ্ণ রায়, বরদাচরণ মিত্র। তালিকা এখানেই শেষ নয়। আজকের দিনে স্বদেশী গান রচয়িতাদের একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরী করাও মুস্কিল। কারণ বহু গানই আজ হারিয়ে গেছে।

স্বদেশী গানের কয়েকখানি সঙ্কলন গ্রন্থও সে যুগে প্রকাশিত হয়েছিল—সেগুলিও আজ দুষ্প্রাপ্য। 'স্বদেশী পল্লী-সংগীত,' 'স্বদেশ সংগীত 'বন্দেমাতরম,' 'বন্দনা,' 'হুঙ্কার,' 'স্বদেশ গান'—এই ক'টি নাম ছাড় আর সঙ্কলন গ্রন্থগুলির নামও আজ কারও স্মরণে আছে বলে মনে হয় না। সে যুগে যে গানগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরেছে, তার মধ্যে ক'টি গানই বা আজ গাওয়া হয়?

অথচ ঐ গানগুলির মধ্যে যে কাব্য-রসের উৎকর্ষতা আছে তার চিরন্তন আবেদনের দিক থেকে তো বটেই, উপরন্তু আজকের খণ্ডিত বঙ্গ-ভূমির হৃদয়াবেগের কাছেও সেগুলির আবেদন বড় কম নয়। কারণ মনে রাখতে হবে অধিকাংশ গানই রচিত হয়েছিল লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অব্যবহিত পরে। সে যুগে যাঁদের গান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) তাঁদের অন্যতম। সেদিনের বঙ্গবাসীদের সান্ত্বনা দিয়ে কালীপ্রসন্ন যে গানটি লিখেছিলেন সেটি হ'ল—

"ছিন্ন হল বঙ্গ কেন ভাব অমঙ্গল······
রাজরঙ্গে আশাভঙ্গে কেন হব হীনবল।" ইত্যাদি।

গানের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে বিশেষভাবে দেশের যুবসম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে তোলার ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন সেদিন যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। 'স্বদেশী' 'স্বরাজ' আর 'বয়কটের' মর্মবাণী কাব্যবিশারদ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

বয়কটের মর্মবাণী এই সময় আর একজনের সঙ্গীতে আবেগময়ী ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তিনি হচ্ছেন রজনীকান্ত সেন।

আসুন সে দিনের একটি দৃশ্য আমরা কল্পনা নেত্রে দর্শনের চেষ্টা করি। বাংলা ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসের একটি দিন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ঘোষণার কয়েকদিন পরে। এই কলকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরে চলেছে মিছিল করে একদল যুবক সবারই নগ্নপদ, যেন শোকযাত্রা চলেছে। কিন্তু তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের সেই বিখ্যাত গানটি—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই—"

স্বদেশী শাসনের চাপে মৃতপ্রায় দেশবাসীর মনে স্বাদেশিকতার প্রেরণা জাগিয়ে তুলবার জন্যে যাঁরা সঙ্গীত রচনা করেন তাঁদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ অন্যতম।

অতুলপ্রসাদ দুই শ্রেণীর স্বদেশী গান লিখেছেন। এক শ্রেণীর গানে দেশের ভৌগোলিক বিবরণ, দেশের অতীত মহিমার গৌরব বোধ এবং উত্তেজক ভাষার সঞ্চার; আর এক শ্রেণীর গানে তিনি জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততায় দ্বিধা শঙ্কায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এইগুলির মধ্যে যে স্বদেশিকতা আছে তা স্নিগ্ধ এবং মানবতা সমৃদ্ধ। অতুলপ্রসাদের যে আশা সঞ্চারী স্বদেশী-সঙ্গীতের আবেদন আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে সেটি হচ্ছে—

"বল বল সবে, শত বীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত স্বদেশী গান বাংলার অমূল্য সম্পদ। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ফলে সে যুগে সমাজের কাছ থেকে তিনি রূঢ় ব্যবহার পেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর দেশ প্রেমের খাতে কিছু ঘাটতি পড়েনি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড়

পরিচয়। সেই পরিচয়ের প্রকাশ তাঁর স্বদেশী গানে, যা বাংলার গানের সীমাকে এক সঙ্গে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান কোমলতা ও বলিষ্ঠতার মিশ্রণ। স্বদেশী আন্দোলনের বিক্ষোভ তাঁকে স্পর্শ করেনি, করেছিল বিচলিত। তাঁর স্বদেশী সঙ্গীত সাধারণ জনচেতনার উর্ধ্বে বিরাজিত। সেগুলি যেন স্থির নিষ্ঠার এক একটি ধ্রুবতারা। তাঁর দেশ মাতৃকার বর্ণনা যেন ধ্যান গম্ভীর মন্ত্র।

বঙ্গ ভূমির বন্দনামূলক দ্বিজেন্দ্রলালের যে আবেগময় গানটি এক সময় বাংলার বুকে উত্তেজনার জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল সে গানটি এই—

—"বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ।"

বাংলা সঙ্গীতের যে কোনও দিক আলোচনা করতে গেলে যাঁর নাম অনিবার্য ভাবেই মনে উদয় হয়—তিনি হচ্ছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গানের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্ধ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলন জড়িয়ে আছে। তিনি স্বদেশী সঙ্গীত রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন নবগোপাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলার পরিবেশ থেকে। তাঁর এই যুগের গানে স্বদেশের মাহাত্ম্য ও ভারতের অতীত গৌরবের উজ্জ্বল চিত্র আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আছে নৈরাশ্য ও বেদনার সুর।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলকাতায় বিরাট সভায় এবং সেই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,' 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ' প্রভৃতি গান গাওয়া হয়। টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় বাউল সুরে গাওয়া হয়—'আমার সোনার বাংলা।' বঙ্গ-বিভাগের সরকারী ঘোষণাকে কার্যে পরিণত করা হয় যেদিন সেই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর রাখিবন্ধন উৎসবে গাওয়া হয় তাঁর বিখ্যাত গান—"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল; এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সঙ্গীতে মাতৃভূমি, মাতৃভাষা, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ এগুলিকে সুস্পষ্টভাবে রূপ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গীতে উগ্র দেশ-প্রেম নেই। কিন্তু তবুও আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে প্রতিরোধের অনুভূতি জেগেছে। সেই অনুভূতি থেকে ধ্বনিত হয়েছে এই ধরণের গান—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান···"

পরাধীন ভারতবাসীর প্রতিরোধ অতি উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে যাঁর সঙ্গীতে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গীতের প্রকৃতি আলাদা। তাঁর অনুভূতির পরিমণ্ডল অনেক ব্যাপক। জাতীয় জীবনের নানা স্তরে পুঞ্জীভূত পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে সেই পরিমণ্ডলে। ভারত মনের ব্যথা-বেদনার উগ্ররসে তাঁর হৃদয়-পাত্রটি হয়ে উঠেছে ভরপুর।

মানুষের সুখ-দুঃখময় জীবনের গান গাইবার ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে তাঁর সঙ্গীতের দ্বারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তিনি জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছেন; অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান সমাজের গ্লানির উপরে আঘাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বীণাধ্বনির পাশে তাঁর সঙ্গীতেই আমরা প্রথম তূর্যনিনাদ শুনেছি।

নজরুলের অগ্নি-বীণায় যে সুর বেজে উঠেছিল, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং কার্তিক দাশগুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গীতে তারই অনুরণনও আছে। বঙ্গবিচ্ছেদ এবং তারই জন্য বেদনাই তাঁদের পীড়া দিয়েছিল। তার ফলে 'আজ মরিবি কে?' 'ধেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস' এই ভাবে বাংলার যুবশক্তিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরিণতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। তাই সেগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সৃষ্টি হয়ে একটা সীমিত পরিমণ্ডলেই থেকে গেল।

নজরুল এলেন যেন মশাল হস্তে, এলেন পথ প্রদর্শনকারী নেতারূপে। নিজে আন্দোলনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সবাইকে ডাক দিলেন—

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল করবে লোপাট।···

এই কবি-কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে আজ। কিন্তু যে আহ্বান তিনি সেদিন জানিয়েছিলেন সে আহ্বানে জাতি সাড়া দিয়েছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কারাগারের লৌহ-কপাট শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে গেছে।

আমার কথা (৯৪)

শ্রীমতী বেলা ভট্টাচার্য্য

[বিশিষ্টা সঙ্গীত-শিল্পী]

আদর্শ যেখানে মহৎ, ইচ্ছা যেথায় সৎ, যত বাধাই সেখানে আসুক না কেন সাধনা সেখানে সার্থক। বাংলার মাটিতে জন্মে বাংলার বাইরে বেশীদিন কাটালেও বাংলার গান ভুলতে পারেননি শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য। তাই বর্তমান বাংলার রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে যাঁদের নাম সঙ্গীত পিপাসুদের

শ্রীমতী বেলা ভট্টাচার্য্য

কাছে চিরপরিচিত শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য তাঁদের অন্যতমা। শ্রীমতী ভট্টাচার্য্যের গান শেখার পেছনে ব্যক্তিগত প্রেরণা অপেক্ষা বংশগত প্রেরণাই অনেক বেশী। বাবা মা উভয়েই গান জানতেন এবং গান ভালবাসতেন। মা বাবার গানের প্রতি এই ভালবাসার স্বাক্ষরই প্রমাণ করেছেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য। ১৯৪০ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা মিউজিক নিয়ে পাশ করে ১৯৪২ সালে কলিকাতায় এসে পাশ করলেন আই-এ, ১৯৪৪ সালে বি-এ, ১৯৪৫ সালে ইতিহাস নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েও ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন শান্তি-নিকেতনে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় দুইই হলো বদল। ইতিহাসের বদলে গান! ১৯৪৬ সালে বিশ্বভারতী থেকে মাষ্টার উপাধি নিলেন ইতিহাসে নয় গানে। বাল্য থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাংলার বাইরে উপযুক্ত গানের শিক্ষকের যে অভাব বোধ করেছিলেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য তার পূর্ণমাত্রায় সুযোগ পেলেন কলকাতায়। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার অভাব হয়নি কোথাও। আর শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য শুধু গানের শিক্ষার্থীই নন শিক্ষক ও বটেন তাও একজায়গায় নয় দুই জায়গায়। গীতবিতান ও গোখলে মেমোরিয়ালে। শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য শুধু গানের শিক্ষিকাই নন গানের রেকর্ড এবং বেতার অফিসের সঙ্গেও সম্পর্ক রেখেছেন বেশ কয়েকদিন। কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য বেতারশিল্পী ছিলেন নিয়মিতভাবে এবং ভবিষ্যতে আবার বেতারের সংগে সংযোগ রাখবেন বলেই আশা রাখেন মনে। শ্রীমতী ভট্টাচার্য্যের "কাল রাতের বেলা গান এলো মোর মনে" রেকর্ডখানা ১৯৫১ সালে জনসমাজে জনপ্রিয়তাই লাভ করেছে নিঃসন্দেহে।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতেই নয় নজরুল এবং অতুলপ্রসাদের গানেও তাঁর দক্ষতা রয়েছে প্রচুর। বিয়ের আগে বাবা মার কাছ থেকে প্রেরণা এবং উৎসাহ এবং বিয়ের পরে স্বামীর কাছ থেকে ততোধিক উৎসাহ শ্রীমতী ভট্টাচার্য্যের গান শেখার পথে কোন বাধা আনেনি আজ পর্য্যন্তও।

স্বামী শ্রীচিন্ময় ভট্টাচার্য্য স্ত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্য্যের গান শেখায় সহযোগিতা করছেন সর্ব্বান্তঃকরণে। দুইটি মেয়ে এবং স্বামী-স্ত্রী মিলে সুন্দর সংসার শ্রীমতী ভট্টাচার্য্যের। যে কয়টি গুণে মানুষকে গানে আকৃষ্ট করা যায় তার সব কয়টি গুণই শ্রীমতী ভট্টাচার্য্যের মধ্যে বর্ত্তমান। গান আর আপন সংসার দুইই সমান তালে সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য।

নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আগামী মার্চ মাসে মহাজাতি সদন হলে নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় "ভারত ভূমি" নৃত্যনাট্য ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শিল্পীদের দ্বারা প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে অনুষ্ঠিত হইবে। ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের সম্পাদক শ্রীঅসিত চক্রবর্তী। "ভারত ভূমি" নৃত্যনাট্য রচয়িতা শ্রীপ্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়।
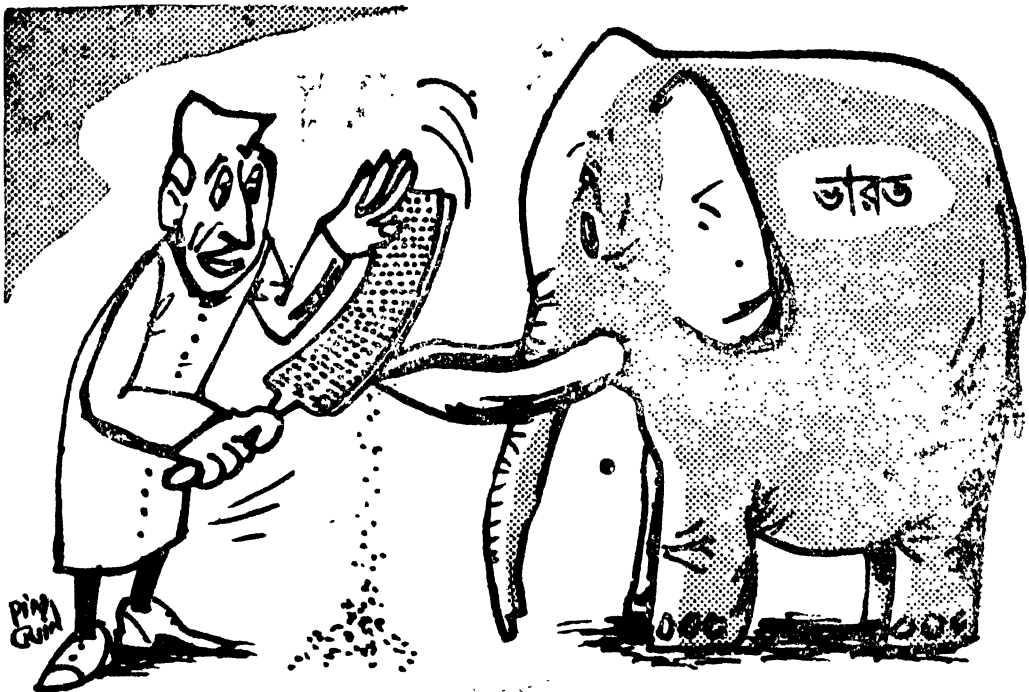
এখন থেকে দাঁত দুটোকে ধারালো করেই রাখতে হবে

মোমের পুতুল

শ্রীনন্দা কর

এর বেশী আর কিছুই তা'হলে বলতে পারো না? মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে তার শালের প্রান্ত জড় করলো। ওর দীর্ঘ তীক্ষ্ণ রক্তের মত লাল চোখ আর সাদা সরু আঙুলগুলো ঈষৎ কাঁপছিল। ভাঙ্গা তক্তপোষের উপর বসে থাকা পিঠ কুঁজো বৃদ্ধার মরা মাছের মতন সাদা সাদা ঘোলাটে চোখগুলো ওকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল। ওর অটুট স্বাস্থ্য, রূপযৌবন যেন সে লেহন করে নিচ্ছিল।

না, শুকনো ঠোঁটের উপর জিভটা বুলিয়ে নিয়ে খসখসে গলায় সে উত্তর করলো। লাল ব্যাগের বাঁধনের উপর মণিকার সরু সরু আঙুলগুলোর ইতস্তত: নড়া-চড়া লক্ষ্য করতে করতে একটু পরে আবার কি বললো।—অবিশ্যি এ ছাড়া আরো কিছু যে বলতে পারিনে তা নয়। শত্তুর ঘায়েল করার মন্ত্র আছে। সাপের বিষের মন্ত্র আছে। সাধারণত মানুষ বশ ক'রে তাকতুক আছে। মন্তর-টন্তর ঝাড়ফুঁক, সে কি এক রকম? হাজার রকম। ঠিক কি রকমটা তোমার চাই আমায় বল না? ভালবাসার মানুষ বশ করার অনেক ভাল জিনিষ আছে আমার কাছে। তবে সে সবে তো তোমার কোন দরকার নেই—না কি বল গো স্থন্দর দিদিমণি'—বুড়ি ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে হেসে উঠলো।

মণিকার ধারালো পালিশ করা নখের ফাঁকে করকরে কাগজের টুকরোটা খসখস করে উঠলো। নয়ই বা কেন? মণিকা মাথা সোজা করে বুড়ির চোখে চোখ রেখে মৃদুস্বরে বললো, এমন কিছু তুমি সত্যিই জানো, যাতে করে আমার এক শত্রু ঘায়েল হবে অথচ আমার কোন বদনাম হবে না?

বুড়ি আবার হেসে উঠলো।

মণিকার মনে হল যেন একটু বিদ্রূপ করেই।

তোমার রূপযৌবন টাকা পয়সাও যদি মনের মানুষকে কাছে না রাখতে পারে তবে বুড়ি সৌদামিনীর তাকতুকে কি করবে গো স্থন্দর দিদি? বুড়ি ফিস্ ফিস্ করে বললো।

মণিকা গম্ভীর হ'ল। সে সব কথা তো তোমায় জিগ্‌গেস করিনি। যা জানতে চাইছি তাই বল।

একটু বিরক্ত হয়েই সে বললো। মুহূর্ত্তের জন্তে বুড়ির কোটরে ঢোকা চোখ কেমন এক অদ্ভুত আলোতে চক্ চক্ করে উঠলো। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্তে। হাড় বার করা হাত বাড়িয়ে মণিকার উষ্ণ কোমল গালের উপর সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে বললো, পথের কাঁটা দূর করতে ঝাড় ফুঁকের আশ্রয় নিতে আজকাল খুব কম মানুষেরই সাহস হয়। একি সেই আগেকারের দিন। তবে হ্যাঁ,—হ'ত সেইকাল? বুড়ি সৌদামিনী দেখিয়ে দিত কিসে কি হয়! কথা বলতে বলতে বুড়ির শীর্ণ বাঁকানো আঙুলগুলো মণিকার শুভ্র নিটোল হাতের উপর চেপে বসলো সাঁড়াশীর মতন।

মণিকা তীব্র ঘৃণা আর কেমন একটা অজানা ভয় সত্ত্বে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল চুপ করে। কথার শেষে বুড়ি জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। সেটা দীর্ঘশ্বাস, কি কান্না, কি হাসি মণিকা তা বুঝলো না। অজানা একটা ভয়ে শুধু ওর গায়ে বার বার কাঁটা দিয়ে উঠলো। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই অন্ধকার নোংরা ঘরে নেমে এল এক কুৎসিত ভয়ংকর নীরবতা। ঘরের গুমোট আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠলো কোন অশরীরী প্রেতাত্মার দূষিত নিঃশ্বাসে।

এক সময়ে ঘরের নিস্তব্ধতা জোর করেই ভেঙ্গে দিয়ে মণিকা বলে উঠলো, কেমন করে করতে হয় বললে না তো? তার নিজের গলার স্বর নিজের কানেই যেন অন্তরকম শোনাল।

বুড়ি এতক্ষণ অতীতের কোন বিস্মৃতির রাজ্যে ডুবেছিল, কে জানে। ওর কথা শুনে এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর উঠে ঘসড়াতে ঘসড়াতে বারান্দায় চলে গেল। ফিরে যখন এল, তখন তার হাতে একতাল নরম মোম-এর দলা। তক্তপোষের উপর ধীরে-স্থস্থে গুছিয়ে বসে বুড়ি আস্তে আস্তে মন্ত্র পড়ার মত বলে লাগলো, শত্তুর বিনাশ করার অনেক

আয়নার মধ্য দিয়ে চোখাচোখি হয়ে গেল…

উপায় আছে—বুকে ছোরা বসাতে পার, বিষ খাওয়াতে পার, পথের মাঝখানে তুক করতে পার কিংবা এমন তাকতুক করতে পার যাতে তোমার শত্তুর দিনে দিনে একটু একটু করে শুকিয়ে যাবে। সে খেতে পারবে না ঘুমুতে পারবে না, সর্ব্ব অংগে জ্বালা ধরবে। এমনি করে একতিল একতিল করে শুকিয়ে শুকিয়ে একদিন সে মরে যাবে। কেউ জানতে পারবে না। কেউ বুঝতে পারবে না। ডাক্তার-বদ্যিও বুঝবে না কেন হল, কি হল। তবে এতো বললাম, এসব কাজে সাহস চাই। ভয় পেয়েছ একটুকুও কি নিজেও মরেছ।

কিন্তু কেমন করে তা হয়? মণিকা রুদ্ধস্বরে জিগ্গেস করলো, উপায় কি একটা?

বুড়ি বললো, অনেক উপায় আছে। হাড়বুটি খাইয়ে দিতে পার, চুল কেটে গুণ করতে পার, কিন্তু সব চাইতে ভাল উপায় মোমের পুতুলে তুক করা।

মোমের পুতুলে তুক করা? সে কেমন করে হয়? মণিকা যেন ছেলেমানুষের মতন প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ, মোমের পুতুলে তুক করা। বুড়ি উত্তর করলো। বলার সংগে সংগে বুড়ি মণিকার কোলের উপর একটা জিনিষ ছুঁড়ে দিল। মণিকা সেটা হাতে নিয়ে দেখল এক তাল নরম মোম। কিন্তু তার মধ্যেই রয়েছে যেন একটা মানুষের ক্ষীণ আকৃতি।

বুড়ি কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল তারপর আবার আস্তে আস্তে বলতে সুরু করলো, যেখানটায় এর কলজে আছে বলে মনে কর, রোজ রাত্তির ঠিক বারোটার সময় একটা সূঁচ নিয়ে সেখানে বিঁধিয়ে দেবে। অবশ্য শুধু বিঁধিয়ে দিলেই চলবে না।—একটা মন্তর বলতে হবে। আর সেই মন্তর বলার সময় যদি একটা ভুল হয় কিংবা ভয় পাও একটুকুও তাহলে কিন্তু সব্বনাশ।

কেন সর্ব্বনাশ কিসের? মণিকা বললো।

ওমা, সর্ব্বনাশ নয় বল কি গো? মন্তরে খুঁত হলে তেনারা রাগ করবেন না? আর রাগ করলে কি আর রক্ষা আছে? তুমি ঝাড়ে বংশে একেবারে নিপাত যাবে।—তাই তো বলি এসব কাজে নামতে গেলে বুকের পাটা চাই। সে বুকের পাটার জোর আজকাল ক'টা লোকের আছে বল দিকিনি?

আমার আছে। মণিকার মুখ দিয়ে নিজের অজ্ঞাত সারেই যেন কথাটা বেরিয়ে গেল।

বুড়ি কালো কালো তামাক খাওয়া দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসলো। সে হাসিটা এত কুশ্রী, এত বীভৎস যে মণিকা ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠলো।

বুড়ি সেটা লক্ষ্য করেই যেন হাসিটাকে আরো বিস্তৃত আরো প্রসারিত করলো।

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। মোমের দলাটাকে ব্যাগের ভিতর পুরে আর একখানি কাগজের কবকরে টুকরো বুড়ির হাতে দিয়ে মণিকা যখন উঠে দাঁড়াল, তখন বাইরে থেকে বিন্দু বিন্দু অন্ধকার এসে ঘরটাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। বুড়িও উঠে দাঁড়াল। নোটগুলো হাতের মুঠির মধ্যে চেপে ধরে আবার সে খ্যান্ খ্যান্ করে বলে উঠলো, মন্তর কিন্তু উলটো পালটা বলো না। শনি ঠাকুর রাগ করলে রক্ষা থাকবে না কিন্তু। আর ভয় পেয়ো না যেন। তাহলেও কিন্তু বড় বিপদ হবে।

মণিকা যেন কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর করলো ভয় পাব কেন!

পা টিপে সরু গলি ধরে এগিয়ে চলল সে। দুই আবর্জ্জনার স্তূপ, নেড়ি কুকুরের মহোৎসব। মিট মিট ক গ্যাসের বাতি। তারি ফাঁকে ফাঁকে এরি মধ্যে এসে দাঁড়ি দু'টো একটা রং করা মুখ। বড় রাস্তার মোড়ে এসে মণিকা গাড় উঠে বসলো। গাড়ী ষ্টার্ট দেবার সংগে সংগে এক ঝলক ঠা হাওয়া ওর চোখে মুখে এসে লাগলো। এতক্ষণে যেন চেতনা ফিরে এল। ওর মনে পড়ল সারাদিনের ঘটনাগুলো প্রশস্ত রাজপথ ধরে গাড়ী এগিয়ে চলল নিঃশব্দে। মণি মনের মাঝে ভীড় করে এল অনেক ভাবনা। গত কয়েক সপ্তা ঘটনা। অনেক ঈর্ষা, অনেক জ্বালা, অনেক বেদনার ইতিহা চোখের সামনে ভেসে উঠলো দেবাশীষের মুখখানা। কৃষ্ণচূড়া গা ছায়ায় হেলান দিয়ে চুপ করে সে দাঁড়িয়ে আছে শর্ম্মিষ্ঠার দি তাকিয়ে। কি সেদিন সে দেখেছিল দেবাশীষের চোখে? যা দে মণিকার সমস্ত অন্তর ঈর্ষায়, বিদ্বেষে নীল হয়ে গিয়েছিল না, না, অনেক সে সহ্য করেছে। আর সে সহ্য করবে না কিছুতেই না। দেবাশীষ তার, তাকে সে মুঠোর থেকে বাই যেতে দেবে না। কখনোই না। কিন্তু ভেবে ভেবে আশ্চ লাগছে তার—কি করে এ সম্ভব হল? কোথায় সে মণি চ্যাটার্জ্জি, সোসাইটির রথী-মহারথীরা যার এতটুকু করুণা-কিরণ লাভে আশায় অস্থির হয়ে থাকে। আর কোথায় কোন মেয়ে-স্কুলের গানে মাষ্টারনী শর্ম্মিষ্ঠা চৌধুরী! দু' মাস আগে যার নামও সে জানত না আজ সে তার জীবনের সব কিছু অধিকার করতে বসেছে। মণিকা চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। আজকের পার্টিতে দেবাশীষ তা এখানে নিয়ে আসবে শুনে সে আর স্থির থাকতে পারেনি। কক্ষচ্যু ধূমকেতুর মতন ছিটকে এসে হাজির হয়েছে শহরের এই নোংর বস্তিতে। কিসের আশায় একমাত্র সেই জানে।

দেবাশীষের সংগে তার পরিচয় আজকের নয়। একই পাড়া তাদের বাড়ী। ছেলেবেলা থেকেই তারা একসঙ্গে খেলেছে। খেলা হেরে গিয়ে একে অন্যের নামে মায়ের কাছে নালিশ করতে ছুটেছে— সে, তার দু'বছরের ছোট ভাই শংকর আর দেবাশীষ। তাদের মধ্যে বন্ধন আরো দৃঢ় হয়েছে দেবাশীষের বাবার করোনারী থ্রম্বসিসে হঠাৎ মৃত্যুতে। মণিকার মা ঠিক তার আগের বছর দীর্ঘদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করার পর পরলোকে যাত্রা করেন। মণিকার বয়স তখন তেরো, দেবাশীষ ষোলো আর শংকর এগার। তারপর একই স্কুলে, একই কলেজে তাদের লেখাপড়ার পাট সাঙ্গ হয়েছে। অনুচ্চারিত কিন্তু নির্দ্ধারিত সত্যের মত সকলেই জানত, মণিকা চ্যাটার্জ্জি বহু পুরুষের মন নিয়ে খেলা করলেও বিয়ে করবে শেষ পর্য্যন্ত দেবাশীষকেই। সেই দেবাশীষ তার প্রেম ঠেলে ফেলে ভালবাসল কোথাকার শর্ম্মিষ্ঠা চৌধুরীকে। মণিকা ষ্টিয়ারিংটা সজোরে মুঠির মধ্যে চেপে ধরলো। মোমের ধারালো ডগাগুলো হাতে বিঁধলো।

দেবাশীষকে তার চাই। সে চাক্ আর নাই চাক।—তাকে তার চাই-ই। মণিকা চ্যাটার্জ্জিকে দেবাশীষ এখনো চেনেনি। দেবাশীষ আর তার মাষ্টারনী বন্ধু।

গাড়ী এসে থামল সহরের একেবারে শেষ সীমানায়। মস্ত

বাগান ঘেরা নিঝুম এক বাড়ীতে। বাড়ীটার লোহার গেট থেকে আরম্ভ করে লাল কাঁকর দেওয়া ছোট পথ, ছোট পথের দুই পাশে ডালিয়া সূর্য্যমুখীর চারা সব কিছুকে ঘিরে আছে। সেই ধরণের শীতল আভিজাত্য সব আওতায় এসে মধ্যবিত্ত সুলভ সহজ আন্তরিকতা নিঃশ্বাস ফেলতে আপন হতেই কুণ্ঠায় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বেসরকারী কলেজ অধ্যাপকের ছোট মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠার নিঃশ্বাস তো বন্ধ হয়নি। তার নিঃশ্বাস বন্ধ করবে কে? মনিকা দরজার দিকে হাত বাড়াল। দরজা খুলে নামতেই চোখ পড়ল দেবাশীষের দিকে। দোতলার গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দীর্ঘ সবল দেহ আর অবিন্যস্ত কটাচুলের রাশের দিকে চোখ পড়তেই মণিকার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এল। ও মাথা নিচু করে যেন কতকটা ভয় পেয়েই সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

সিঁড়ির মুখেই দেখা ভাইয়ের সংগে। একগাদা ফিল্ম ম্যাগাজিন হাতে করে নামছে। ওকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল— এসে গেছিস? বাবা, ছিলি কোথায় এতক্ষণ? তারপর আর এক ধাপ নেমে এসে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে গলা নিচু করে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, দেবুদা বোধহয় আজকেই কথাবার্ত্তা ফাইনালাইজ করে ফেলল রে—বাবাকে কিসব বলছিল যেন অনেকক্ষণ ধরে। মেয়েটি কিন্তু রিয়ালি ভেরী চার্মিং—। শংকর হয়ত কি যেন বলে গেল। কিন্তু মণিকা সে কথা শুনতে পেল না। ও যেন মুহূর্ত্তের জন্তে জমে পাথর হয়ে গেল। তারপর অপরিসীম বিরক্তিতে এক ঝাঁকি দিয়ে ভাইয়ের হাতটা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে গসগস করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে যেতে হিসহিস করে উঠলো, ইডিয়ট,!

রাত্রিবেলা অনেক মুখের মাঝে দেবাশীষের প্রিয় পরিচিত মুখের পাশে শর্ম্মিষ্ঠার লাজরক্তিম মুখখানিকে যখন সে দেখল তখন সে আপনা থেকেই কেমন করে যেন বুঝতে পারল শংকর যা বলেছে তা সত্যিই। আর তখন সে সেই ছোটখাট ছিপছিপে নরম সরম মেয়েটিকে দেখল না। দেখল তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে কুশ্রী ছোট একটা মোমের তৈরী পুতুল। যাকে দুই হাতে অনায়াসে মুচড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায়! যার বুক···।

মণিকা আজ সেজেছিল খুব। তার দিকে তাকিয়ে সবার চোখ আজ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। ওকে মনে হচ্ছিল যেন জ্বলন্ত আগুনের গনগনে একটা শিখা। যাকে স্পর্শ করবে, তাকে গ্রাস করবে। ওর পাশে শর্ম্মিষ্ঠাকে যেন ছায়ার মত নিষ্প্রভ দ্যুতিহীন লাগছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলে তার কচি দোপাটিফুলের মত নরম ঠোঁট দু'খানি, গভীর কালো চোখের অসাধারণ সহজ দৃষ্টি আর দুধ সাদা ঢাকাই শাড়ীর রক্ত লাল পাড় মনে হয় অপূর্ব্ব, অনন্যা। অনেক চোখই তাকে বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সবার চোখেই যেন একই জিজ্ঞাসা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, এই মরশুমী ফুলের রং বাহারী মজলিশে শ্বেত রজনীগন্ধার এই স্তবকটি কে, কোথা থেকে এল। আর তাই দেখে মণিকার সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরেছিল অসহ্য ঈর্ষায়। ক্রমে রাত বাড়ল। পার্টি শেষ হল। পাড়া কাঁপিয়ে দু'একটা মোটর ষ্টার্ট নিল। দু'এক জন দু' এক জন করে অভ্যাগতরা বিদায় নিল। হাসি, ঠাট্টা, আর অভিনন্দন। টুকরো টুকরো শাণিত মিষ্ট কথা। ফুল আর ফরাসী সুগন্ধির অদ্ভুত সম্মিশ্রণ। তারপর কলকাকলী এক সময়ে একেবারেই শান্ত হল।

যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুতে গেল। দেবাশীষ, ওর মা আর শর্ম্মিষ্ঠা এখানেই থাকবেন আজ। শংকর দেবাশীষ এক ঘরে। ও মা আর শর্ম্মিষ্ঠা আর এক ঘরে। ওদের মৃদু গুঞ্জন। পুরুষদে চাপা হাসি সিগারেটের গন্ধও এক সময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। ওদে বাবার ঘরের আলো অনেক আগেই আজ নিভেছে। একমা ছেলে তার কিছুদিনের মধ্যেই ঘরের বাঁধন কাটিয়ে দূরদেে পাড়ী দেবে। হয়তো সেই জন্যেই ওঁর মনটা আজ থেকে থেে ভারী হয়ে উঠছিল। হয়তো সেটা ওদের অকালমৃতা মা'র কথ চিন্তা করেই। নিস্তব্ধ বাড়িতে জেগে রইলো একা মণিক ঘড়ির দিকে চোখ রেখে। চোখ দুটো তার জ্বলছে। মাথা দিে ছুটছে আগুন কিন্তু সমস্ত শরীর তার ঠাণ্ডায় জমে যেন বর হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বরফ আঙুল দিয়ে গরম গাল দুটো চে ধরলো একবার। বারোটা বাজতে দেরী কত আর? কৌতূহলী ভাবেই যেন কতকটা মোমের পুতুলটা হাতে তুলে নিল। কি

অসাবধান কথাবার্ত্তা মর্ম
শত্রু হস্তে গোপন অস্ত্র সম।

হাতে নিতেই হঠাৎ যেন মনে হল ওর হাতের মধ্যে সেই কুশ্রী নোং দলাটা সাপের মত মোচড় দিয়ে উঠলো। পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দূরে না, কিছু না। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরের সংগে মনটাও বুি তার দুর্ব্বল হয়ে আছে। দুর্ব্বল? মণিকা চ্যাটার্জ্জি দুর্ব্বলতা কা বলে জানে না দরকার হলে একটা মানুষকে সে পিঁপড়ের মং পিষে মেরে ফেলতে পারে। ঘড়িটা কি বড় আস্তে চলছে এখনো পনেরো মিনিট দেরী বারোটা বাজতে।

অস্থির ভাবে ও আয়না টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অনায়াসে অবহেলায় খুলে খুলে ফেলতে লাগলো হাতের হীরা চু সেট করা রিশলেট, আংটি, কানের কুণ্ডল। এক টানে খুলে ফেল লাল মলমলের চেলি। আগুন রঙ্গা শাড়ী। এক সময়ে কি মনে হতে ডানদিকের ড্রয়ার খুলে বার করলো ছোট সুন্দর তিব্বতী একটি ভোজালী। বেড ল্যাম্পের নরম আলোতে ও তার লাল সবুজ পুঁি বসান বাঁট আর চক্‌চকে রূপোর মত ফলা ঝলক দিয়ে উঠলো। তন্ম হয়ে দেখতে লাগলো সেটাকে। কী ভালই না হত যদি এই সুন্দ ছোরাটাকে এই সুন্দর পায়রার মত নরম সাদা বুকে বসিয়ে দেও যেত? আঃ—

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলো ও। বারোটা বে এক মিনিট। লাফ দিয়ে উঠে সুইচ অফ করলো। এক ঝল মিষ্টি ঠাণ্ডা চাঁদের আলো ঘরের এক পাশে কুণ্ঠায় লুটিয়ে পড়ল নিচের বাগান থেকে শিউলী ফুলের গন্ধ আসছে। হঠাৎ ও মনে হল বড় ঠাণ্ডা আজ। সে আজ বড় ক্লান্ত। আঃ, দেবা-

তুমি যদি আমাকে একটু ভালবাসতে তাহলে আমি এ রকম হতাম না। আমি যদি খারাপই হয়ে থাকি তবে হয়েছি সে তো তোমারি জন্যে। আজ আমি ড্রিংক করি। সোসাইটির দেশী বিদেশী এক ডজন পুরুষমানুষকে নাচাই। নিজে নাচি। কিন্তু চিরদিন কি মণিকা এই রকমই ছিল? আঃ, দেবাশীষ, দেবাশীষ? তুমি কি কোনোদিন টের পাওনি তোমার উপর মণিকার কি দুরন্ত লোভ ছিল বরাবর? তোমার এ কটা চুলের রাশ, তোমার ঠোঁট, তোমার বুক তোমার সব কিছুর উপর। মণিকার ছাব্বিশ বছরের ভরা বুকের জামা এত শীতেও ঘামে ভিজে ওঠে। একটা আলপিন হাতে নিয়ে মনে মনে বলে গেল সন্ধ্যায় শেখা অর্থহীন গ্রাম্য একটা ছড়া। তারপর আলপিনটা বসিয়ে দিল সেই মোমের দলাটার মাঝা মাঝি জায়গায়। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপল। আর সুইচ টিপতেই আয়নার মধ্যে দিয়ে চোখাচোখি হয়ে গেল এক জোড়া স্থির শীতল চোখের সংগে

একটু আওয়াজ করেছ কি একেবারে খুন করে ফেলব। হিস্‌হিস করে উঠলো সেই স্থির দৃষ্টির পিছনে একটা অন্ধকার অস্তিত্ব।—যা আছে সব দিয়ে দাও।

মণিকা চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই একটা কর্কশ হাত তার মুখের উপর এসে পড়ল। আর হাত তার গলার থেকে চিকটা খুলবার চেষ্টা করতে লাগলো।

একটুকুও আওয়াজ করেছ কি খুন করে ফেলব, লোকটা হিসহিসিয়ে উঠলো। মণিকা পাগলের মত নিজেকে ছাড়িয়ে চেষ্টা করতে লাগলো। পাশেই ওরা সকলে রয়েছে। আওয়াজ করলে ছুটে এসে পড়বে। লাল টুকটুকে বড় বড় দিয়ে লোকটার চোখে মুখে আঁচড়ে দিল।

উঃ! লোকটা বাঁ হাতে মণিকার ঘাড় ধরে এক ঝাঁকি দি আর ডান হাতে চকিতে তুলে নিল তিব্বতী ছোরাটা। মণি চোখদুটি ক্ষণিকের জন্যে বিস্ফারিত হল। তারপর ওর মাথাটা পাশে এলিয়ে পড়ল। ওদের জন্তী কুকুরটা কিছুক্ষণ ধরেই পরি চিৎকার করছিল। প্রায় তিন চার মিনিট পরে শংকর আর দেবা যখন জানলা টপকে মণিকার ঘরে ঢুকলো তখন ওর প্রাণহীন মেঝেতে লুটোচ্ছে। পাঁজরার পাশ দিয়ে বেঁধান তারই অতি সা ছোরাখানা। বাসন্তী রং এর গালচেতে অনেকখানি লালের ছো ওর মাথার কাছে পড়ে আছে ছোট্ট একটা মোমের তৈরী বে আকৃতির পুতুল। তার-বুকে বেঁধান একটা আলপিন।

সুখী হতে হলে

সুখী হতে হলে বাঁচতে জানা চাই। এখন কথা হচ্ছে এই বাঁচতে জানা যায় কি করে, এর কি কোন ধরাবাঁধা ফর্মূলা আছে? না তা নয়, বাঁচতে জানা মানে জীবনকে তার ভাল-মন্দ সবের সঙ্গে জড়িয়ে স্বীকার করতে শেখা, তার রুদ্র ও দক্ষিণ দুটো রূপকেই একান্ত সহজতায় বরণ করে নেওয়া। মনে করুন, সাগরতীরে দুটি শিশু খেলায় মগ্ন—এমন সময় এলো ঢেউয়ের পর ঢেউ, একজন ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে ছুটে পালাল তীরের দিকে। মায়ের কোল লক্ষ্য করে, আর একজন বিপর্য্যস্ত হয়েও ভয় পেল না, হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল, তীরের নিরাপদ স্থানে পৌছল সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে। জীবনও এক মহাসমুদ্রবিশেষ—দুঃখ-কষ্ট বাধা-বিপদ ঢেউয়েরই মত ছুটে আসে মানুষকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য। তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হওয়াটাকেই বলে বাঁচতে জানা, যে তা পারে সেই প্রকৃত মানুষ। এই বাঁচতে জানার কৌশল একদিনে অধিকৃত হয় না, জীবন-সংগ্রামে সাহসে ভর করে এগিয়ে যেতে পারলে তবেই এটা শিখতে পারে মানুষ, আর এজন্য চাই জীবনকে তার ভাল-মন্দ সব মিশিয়ে গ্রহণ করতে শেখা একান্ত অন্তরঙ্গতায়। এই প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সত্যপরায়ণতা, শুধু অপরের কাছে খাঁটি থাকলেই চলবে না নিজের কাছেও নিজেকে খাঁটি করে তুলতে হবে, আমাদের শাস্ত্রে বলেছে "আত্মানং বিদ্ধি" আত্মাকে জানো, নিজের সব দুর্ব্বলতা সব দ্বিধাকে অতিক্রম আমরা তখনই করতে পারি যখন আত্মশক্তি সম্বন্ধে কোন দ্বিধা কোন জড়তা থাকে না। দুঃখ, দুর্দ্দৈব হতাশ কারণ খুঁজতে বাইরে তাকানো নিরর্থক, অপরকে দোষারো করাও অনুচিত কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের নিজের মধ্যে থাকে এদের জট, তাই অপরকে দায়ী করার আগে আত্মবিশ্লেষ পথটা অনুসরণ করাই শ্রেয়তর। মনে রাখবেন সুখী হওয়া আরেক নাম সুখী করা, অপরকে জয় করার সর্ব্বোত্তম প তাকে আপনার চরিত্র মাধুর্য্যের আস্বাদ দেওয়া, তাই ঘৃণা ন প্রেমকেই বেছে নিন জীবন যুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম হাতিয়াররূপে, আমাদে কবি বলেছেন "সবারে বাস্‌ রে ভাল, নইলে মনের কালো ঘুচবে নারে। মনের মধ্যে প্রেমের দীপ জ্বেলে জীবন দেবতার আরতি করতে পারলে সব কালো সব অন্ধকার ঘুচে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আপনার চলা পথ, সুগম করে তুলবে আপনার পথ চলা। বার্দ্ধক্যের প্রতি স্বাভাবিক একটা ভীতি আছে প্রায় সকলেরই, কিন্তু সহজ চোখে দেখতে শিখলে সেটাও নিরর্থক প্রমাণিত হয়ে যায়, প্রকৃতির ছন্দে নিজেকে মিলিয়ে দিতে শিখলে এক অতি স্বাভাবিক ঋতু পরিবর্ত্তনের মতই বার্দ্ধক্য নেমে আসে জীবনের শেষ লগ্নে, তাকে ভয় করার ও যেমন কিছু নেই তার জন্য জীবনের মূল্যায়ন কমে গেল সে কথা মনে করাও নিরর্থক। বসন্তের পত্র পল্লব ও শীতের পাতা ঝরা এ দুইই তো প্রকৃতির অতি স্বাভাবিক এক নিয়ম তবে কেন আমরা অভিনন্দন জানাবো শুধু দীপ্ত যৌবনকে, গোধূলি সন্ধ্যার মন জুড়ানো ম্লান স্বর্ণাভাকে ঠেলে দিয়ে।

চতুর্থ টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত

খেলার রাজা ক্রিকেট। তাতে আবার বিশ্বের দুটো দুর্দ্ধর্ষ দল ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলায় মিলন। সারা দুনিয়ার ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে এই খেলার ফলাফল নিয়ে তোলপাড়। অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের চারটি টেষ্ট খেলা হয়ে গেল।

উভয় দলের অবস্থা সমান। প্রথম ও চতুর্থ টেষ্টটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় টেষ্টে ইংলণ্ড ও তৃতীয় টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে। বর্ত্তমানে পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট খেলার আকর্ষণ অনেকখানি বেড়ে গেছে। এই খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলে "এ্যাসেজ" অষ্ট্রেলিয়ার অনুকূলে থেকে যাবে।

বর্ত্তমানে ব্যাটিং-এর রাণ সংখ্যার গড় হিসাবে ইংলণ্ডের পক্ষে কেন ব্যারিংটন (মোট ৩৮৭ রাণ—গড়পড়তা ৬৪'৫০ রাণ) এবং অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে বি, বুথ (মোট ৩৯৩ রাণ—গড়পড়তা ৬৬'৫০ রাণ) শীর্ষস্থানে আছেন।

বোলিং-এর হিসাবে ইংলণ্ডের পক্ষে টু্ম্যান (৩৫৭ রাণে ১৮ উইকেট—গড়পড়তা ২৬'৭৭) এবং অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ্যালন ডেভিডসন (৩৪৭ রাণে ১৮ উইকেট—গড়পড়তা ১১'৮৩) প্রথম স্থান অধিকার করেন।

সম্প্রতি এডিলেডে চতুর্থ টেষ্ট খেলাটি হয়ে গেল। এই খেলার মীমাংসা হয় নি। অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক রিচি বেনড এই খেলার সরাসরি নিষ্পত্তির জন্যে কোনরূপ সক্রিয়তা দেখান নি। তিনি কোন আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং সাজাবার চেষ্টা করেন নি। খেলার শেষের দিকে অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা কোন ঝুঁকি না নিয়ে ধীরগতিতে খেলেছেন।

খেলার শেষে ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার বলেছেন যে টিটমাসের বলে বেনডের "ক্যাচ" টু্ম্যান ফেলায় তাঁদের জয়ের আশা নষ্ট হয়। এই "ক্যাচ" লুফতে পারলে প্রতিপক্ষ দলের ইনিংস তাড়াতাড়ি শেষ করা সম্ভব হতো। ডেক্সটার আরও বলেছেন যে এই টেষ্টের ফলাফল অষ্ট্রেলিয়ার স্বপক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই খেলায় ইংলণ্ড দলেরই একমাত্র জয়লাভ করা সম্ভব ছিল।

রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় উড়িষ্যার বিরুদ্ধে বাঙ্গালা দল ফিল্ডিং করতে যাচ্ছে।

বালু গুপ্তে

চতুর্থ টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং-এ নীল হার্ভে ও ও' নীল নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁরা দু'জনেই শত রাণের কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁদের বোলিং-এ ম্যাকেঞ্জি সর্ব্বাধিক সাফল্য অর্জন করেন। ইংলণ্ড দলের ব্যারিংটনের ব্যাটিং-এ সর্ব্বাধিক দৃঢ়তা দেখা যায়। তিনি শত রাণ করেন। বোলিং-এ তাঁদের ষ্ট্যাথাম ও ডেক্সটার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

রাণ সংখ্যা

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ৩৯৩ (নীল হার্ভে ১৫৪, ৩৯৩ ও'নীল ১০০, এ, ডেভিডসন ৪৬, বি, সি, বুথ ৩৪ ; ষ্ট্যাথাম ৬৬ রাণে ৩ উইকেট ও ডেক্সটার ১২ রাণে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ৩৩১ (ব্যারিংটন ৬৩, ডেক্সটার ৬১, টিটমাস নট আউট ৫১, ট্রুম্যান ৩৮, ডি, শেফার্ড ৩০ ; ম্যাকেঞ্জি ৮১ রাণে ৫ উইকেট ও ম্যাকে ৮০ রাণে ৩ উইকেট)।

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস ২৯৩ (বি, সি, বুথ ৭৭, আর সিম্পসন ৭১, আর বেনড ৪৮ ; ট্রুম্যান ৬০ রাণে ৪ উইকেট, ষ্ট্যাথম ৭১ রাণে ৩ উইকেট ও ডেক্সটার ৬৫ রাণে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস (৪ উই:) ২২৩ (ব্যারিংটন নট আউট ১৩২ গ্রেভনী নট আউট ৩৬ ও কাউড্রে ৩২)।

পশ্চিমাঞ্চলের দ্বিতীয়বার দলীপ সিংজী ট্রফি লাভ

ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যান। খেলার আসর বসে ক্রিকেট দুনিয়ার এক অবিস্মরণীয় খেলোয়াড়ের স্মৃতি বিজড়িত দলীপ সিংজী ট্রফির ফাইন্যাল। ভারতীয় ক্রিকেটের মক্কা বোম্বাই অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল পালাক্রমে ভারতের এক একটি টেষ্ট-কেন্দ্রে হওয়ার কথা। সেই হিসাবে দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা কলিকাতায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হ এইবারকার ফাইন্যালে পশ্চিমাঞ্চল দল সহজেই এক ইনিংস ও রাণে জয়ী হয়ে উপর্যুপরি দু'বার এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অ করে। দক্ষিণাঞ্চল দল মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে নি নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

পশ্চিমাঞ্চল দলের এবারকার সাফল্যের মূলে—বালু গু সুধাকর অধিকারী, পলি উম্রীগড় ও অজিত ওয়াদেকারের অব ছিল সর্ব্বাধিক। বালু গুপ্তে এই খেলায় দুই ইনিংসে ১২৭ র ১২টি উইকেট পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। অধিকারী উম্রীগড় উভয়েই ১০৩ রাণ করেন। দক্ষিণাঞ্চল দলের অধিনা জয়সীমা ব্যাটিং ও বোলিং-এ সাফল্য অর্জ্জন করেন। আব্বাস আ বেগের ব্যাটিংও প্রশংসার দাবী রাখে।

ভারতীয় ক্রিকেটে বোম্বাই যে ঐতিহ্য বজায় রেখে চলছে—ত সত্যই অনুকরণীয়। অন্যান্য রাজ্যেরও ক্রিকেটের উন্নতির জ অগ্রণী হওয়া দরকার।

রাণ-সংখ্যা

দক্ষিণাঞ্চল—১ম ইনিংস ১৩২ (পি, কে বেলিয়াপ্পা ৪৮ ; বালু গুপ্তে ৫৫ রাণে ৯ উইকেট)।

পশ্চিমাঞ্চল—১ম ইনিংস (৮ উই: ডি:) ৪১৫ (সুধাকর অধিকারী ১০৩, পলি উম্রীগড় ১০৩, অজিত ওয়াদেকার ৯৩ ; এম এল জয়সীমা ৭৬ রাণে ৫ উইকেট)।

দক্ষিণাঞ্চল—২য় ইনিংস ২৬৩ (আব্বাস আলি বেগ ৭৬, এম এল, জয়সীমা ৬১, অশোক আনন্দ, ৩১ ; বালু গুপ্তে ৭২ রাণে ৩ উইকেট)।

বাঙ্গালা রঞ্জী ট্রফির কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত

সম্প্রতি ইডেন উদ্যানে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চল লীগের শেষ খেলাটি হয়ে গেল। এই খেলায় বাঙ্গালা সহজেই এক ইনিংস ও ১৭৩ রাণে উড়িষ্যা দলকে পরাজিত

মুস্তাক আলী

করে মূল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইন্যালে হায়দ্রাবাদ দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। এই খেলাটিও কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে। বাঙ্গালা সহজেই বিহার ও উড়িষ্যা দলকে পরাজিত করে বোনাস পয়েন্ট সহ ৯ পয়েন্ট পেয়েছে।

খেলার ফলাফল থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে বাঙ্গালা মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু বাঙ্গালার কর্ত্তৃপক্ষ দল গঠন সম্পর্কে সেই চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করে আসছেন। প্রবীণ খেলোয়াড়রা কি ভাবে এখনও বাঙ্গালা দলে স্থান পাচ্ছেন তা কর্ত্তৃপক্ষরাই বলতে পারেন। পূর্ব্বাঞ্চলের খেলায় অন্ততঃ যেখানে বিশেষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হওয়ার কথা নয় সেখানে তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় দিয়ে দল গঠন করা উচিত। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ অভিহিত হলে বাঙ্গালার ক্রিকেট খেলার মান উন্নত হবে।

রাণ সংখ্যা

উড়িষ্যা—১ম ইনিংস ১৩৬

(বি. জেনা ৪৭; এস কুন্থু ৪৪ রাণে ৫ উইকেট ও ডি এস. মুখার্জ্জী ৩৮ রাণে ৪ উইকেট)।

বাঙ্গালা—১ম ইনিংস (৬ উইঃ ডিঃ) ৪৭৮

(পঙ্কজ রায় ১৩৬, কল্যাণ মিত্র ৭৪, বিকাশ চৌধুরী ৭৩, পি. সি. পোদ্দার নট আউট ৫৭, অম্বর দত্ত নট আউট ৫০, তাপস রায় ৪২; এন স্বামী ৮২ রাণে ৩ উইকেট)।

উড়িষ্যা—২য় ইনিংস ১৬৯

(সুরেশ মহাপাত্র নট আউট ৫০, বি. জেনা ৩৩, পি. পটনায়ক ২৯; এস. কুন্থু ৫৯ রাণে ৫ উইকেট ও কল্যাণ মিত্র ১৩ রাণে ৩ উইকেট)।

মুস্তাক আলি "পদ্মশ্রী" সম্মানে ভূষিত

ক্রিকেট প্রতিভার ভাস্কর এবং ক্রিকেট ইতিহাসে সর্ব্বকালের জনপ্রিয় কীর্ত্তিমান খেলোয়াড় মুস্তাক আলি প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক "পদ্মশ্রী" সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এর আগে এম. সি. সি'র সম্মানিত আজীবন সদস্য হিসাবে এম. সি. সি. তাঁকে মনোনীত করেন।

মুস্তাক ইন্দোরের অধিবাসী হলেও তিনি বাঙ্গালার বড় প্রিয় আদরের। খেলার মাঠে প্রবীণ হলেও আজও তিনি অনন্য ও অসাধারণ। মুস্তাক ১৯১৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ইন্দোরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এম. সি. সি'র বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম তাঁর খেলার সুযোগ হয়। এ পর্য্যন্ত ১১টি সরকারী ও ১৬টি বেসরকারী টেষ্ট খেলায় তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি ভারতীয় দলের হয়ে ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ড সফর করেন। এরপর ১৯৪৬ সালেও তিনি ইংলণ্ড সফরের সুযোগ পেয়েছেন। এ ছাড়া তিনি অষ্ট্রেলিয়া ও সিংহল সফর করেছেন। ভারত সরকার কীর্ত্তিমান খেলোয়াড়দের সম্মানের যে ব্যবস্থা করেছেন তা সত্যই অভিনন্দন যোগ্য।

স্কুল ও কলেজে ক্রিকেট বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত

অতীতের কীর্ত্তিমান খেলোয়াড় কর্ণেল সি. কে. নাইডু সম্প্রতি বলেছেন যে প্রত্যেকটি স্কুল ও কলেজে খেলাধূলা—বিশেষ করে ক্রিকেট খেলা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। তিনি মন্তব্য করেছেন যে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে কোন দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা রাখে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রতিভার কোন দৈন্য আছে বলে মনে হয় না। তবে সব সময়ই মনে রাখতে হবে তাঁরা নিজের দেশের জন্য যেন খেলছেন। তরুণ খেলোয়াড়রা "ফাষ্ট বল" হলে—কিছুটা সাহস হারিয়ে ফেলেন সত্য। তাই শিক্ষার্থী খেলোয়াড়দের সামনে ফাষ্ট বা মারাত্মক বলের কথা না বলাই ভাল। বর্ত্তমানে ভারতে কোন ফাষ্ট বোলার নেই। "ফাষ্ট" বোলার তৈরী করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে কর্ণেল নাইডুর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর এই সকল উক্তি হয়ত অরণ্যে রোদনের মত। তাঁর মতন খেলোয়াড়ের ভারতীয় নির্ব্বাচনী কমিটিতে স্থান নেই। তাজ্জব ভারত। ভারতীয় ক্রিকেট কর্ণধার কর্ণেল নাইডুর উপদেশ গ্রহণ করলে সত্যকারের মঙ্গল হবে।

টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ের ক্রমপর্য্যায়

বাঙ্গলা টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন চলতি মরশুমের খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায়ের তালিকা প্রকাশ করেছেন। পুরুষ বিভাগে তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় হ্যারি অ শীর্ষস্থান লাভ করেছেন। জুনিয়ার বিভাগে দীপক চ্যাটার্জ্জী ও ডি. ডি. বসু এবং মহিলা বিভাগে ঊষা আয়েঙ্গার প্রথম স্থান পেয়েছেন। নিম্নে ক্রমপর্য্যায়ের তালিকা দেওয়া হ'লো:—
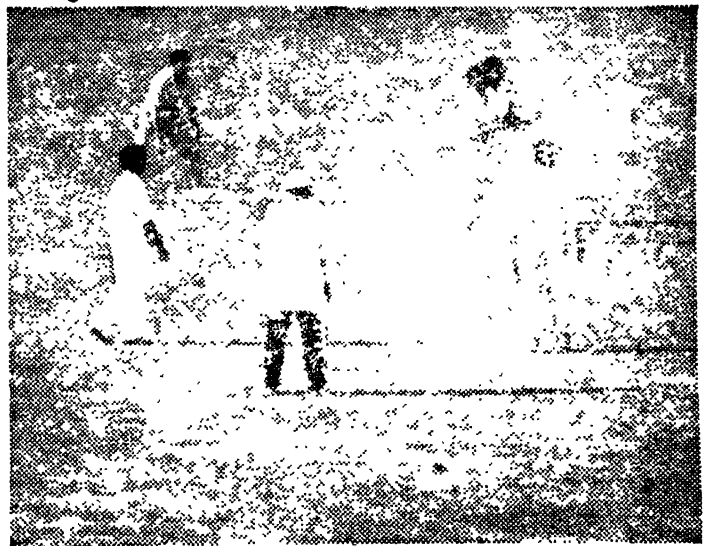
দলীপ সিংজী ট্রফির ফাইন্যালে উম্রীগড়কে বাউণ্ডারী করতে দেখা যাচ্ছে

পুরুষ বিভাগ

১ম—স্থারি অ. ২য়—দীপক ঘোষ. ৩য়—সি. এন, ইয়ং. ৪র্থ—বি. এন. লাহিড়ী ৫ম—নন্দন ভট্টাচার্য্য, ষষ্ঠ—অজিত বসু, ৭ম—সি, আর, দাশ, ৮ম—মলয় ভট্টাচার্য্য ।

জুনিয়ার বিভাগ

১ম—দীপক চ্যাটার্জ্জী ও ডি. ডি. বসু. ৩য়—প্রসাদ ব্যানার্জ্জী, ৪র্থ—প্রদীপ ব্যানার্জ্জী, ৫ম—মনোতোষ সরকার ষষ্ঠ—এ. খোসলা । ৭ম—ডি, ছাড্ডা । ৮ম—অলোক রায় ।

মহিলা বিভাগ

১ম—উষা আয়েঙ্গার । ২য়—ডা: তপতী মিত্র । ৩য়—ডি.কাপদিয়া । ৪র্থ—রবীনা রায় । ৫ম—জেড কাপদিয়া । ষষ্ঠ—বে. উকীল ।

রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে সম্প্রতি তিনদিনব্যাপী রাজ্য প্রতিযোগিতা হয়ে গেল । এই বৎসরের প্রতিযোগিতায় দর্শকদের মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা যায় : মাত্র যোগদানকারী এ্যথলীট ও কতিপয় কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।

তিনদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় মাত্র তিনটি নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনটি রেকর্ডই দ্বিতীয় দিনে ভঙ্গ হয় ।

পুরুষ বিভাগের মেটাল বক্সের পি. সি. হাউই ৪০০ মিটার হার্ডলস ৫৮.৩ সে: অতিক্রম করিয়া মোহনবাগানের ডি বীরের পুরাতন ৫১.৩ সে: রেকর্ড ভঙ্গ করেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে হাউই ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়েও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৫ পয়েণ্ট অর্জ্জন করেন এবং ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের গৌরব অর্জ্জন করেন ।

মহিলা বিভাগের মৌরিণ হকিন্স ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেন । তিনি ১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন । মৌরিণ হকিন্স অ্যানি কাটাচুকের ২০০ মিটার দৌড়ের দীর্ঘ নয় বৎসরের পুরাতন রেকর্ড ভঙ্গ করেন । অ্যানি কাটাচুবের সময় ছিল ২৭.৪ সে, মৌরিণের প্রতিষ্ঠিত নূতন রেকর্ড হইল ২৭ সে: ।

অপর রেকর্ডের অধিকারী হইলেন ইষ্টবেঙ্গলের উদীয়মান এ্যাথলেটিক তাপস রায় । তাপস রায় ২০০ মিটার দৌড়ে নদীয়াকে শাহার (২৪.১ সে:) রেকর্ড অপেক্ষা ৭ সে: পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করেন । জুনিয়র বিভাগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৭২ পয়েণ্ট পাইয়া চ্যাম্পিয়ান লাভ করেন ।

শেষ দিনে পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়ান লইয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় । রীলে রেসের পূর্ব্বে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল উভয়েই ৫৫ পয়েণ্ট লাভ করিয়াছিল । রীলেতে মোহনবাগান প্রথম স্থান অধিকার করায় মোহনবাগান ৫৫ পয়েণ্ট পাইয়া চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভে সমর্থ হন । ইষ্টবেঙ্গল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় তাহাদের পয়েণ্টের সংখ্যা হইল ৫১ ।

মহিলা বিভাগে রেঞ্জার্স ৪২ পয়েণ্ট পাইয়া চ্যাম্পিয়ানশীপের গৌরব লাভ করেন ।

এবারকার প্রতিযোগিতার মান মোটেই আশাপ্রদ নয় । কেবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা না করে বাঙ্গালার এ্যাথলেটিকসের পরিচালকদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন । তা না হ'লে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার ।

সকাল দুপুর সন্ধ্যা

শ্রীজানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পাখীদের কলরবে পৃথিবীর ঘুম ভাঙ্গলো
কি, পৃথিবীর ঘুম ভাঙ্গার পরেই পাখীরা জেগে উঠলো
ফুল ফুটলো গাছে গাছে
পূবের আকাশ রক্তিম হয়ে উঠলো
যেন এক শিশু জন্ম নিল ।

বেলা বেড়ে চলে
জন্ম মৃত্যু পাপ পুণ্যের খতিয়ান না করে
পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে
সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে
শিশু সাবালক হয়ে ওঠে ।

বেলা বেড়ে চলে
জন্ম মৃত্যু পাপ পুণ্যের হিসাব নিকাশ চুকে যায়
ফুলের পাপড়ি খসে পড়ে
পাখীরা আকাশে ডানা মেলে দেয়
আলো আর দেখা যায় না
সূর্য্য এখন কোন দিকে
জীবনের কি তবে এই সায়াহ্ন ।

অন্য আকাশ

সলিল মুখোপাধ্যায়

হাওয়ার হাত ধরে মন ছুটে গেলে
মেঘের পাহাড় ছুঁয়ে নীচে উপত্যকা ফেলে
নদী, কূল, চর পাই উধাও আকাশ—
অবারণ হারিয়ে যাবার অবকাশ ।

তখন প্রান্তরে প্রান্তরে সবুজে
অবুঝ মন খুঁজে খুঁজে
ফেরে সেই সোনার হরিণ—
যার স্বপ্নে রাত রঙিন, দিন
মেঘলা বেলার মতো উদার উদাস—
ধু-ধু আকাশ,
নদী, কূল, চর, অরণ্য ফেলে
হাওয়ার উধাও রথে মন ছুটে গেলে ।

অসম্ভবের যে প্রত্যাশা এই অসহ্য বেদনার দিন
অন্য কোনো আকাশের নীচে সেই হয় সোনার হরিণ

বিষ্ণুপুর

আজ বাংলা দেশের এমন একটি জায়গায় আমরা বেড়াতে চলেছি যেটি স্বাধীন বাংলার অতীত যুগের শুধু স্বপ্নপুরীই নয়, উৎসব-পার্ব্বণ শিল্পকলার অপূর্ব্ব মানসৈশ্বর্য্যের লীলাভূমি, সুরতীর্থ বিষ্ণুপুর।

ঘটনাচক্রে আজ যখন আমাদের দেশ চীনা দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত তখন স্বভাবতঃই এবং সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়বে বিষ্ণুপুরের ঐ ঐতিহাসিক দলমর্দ্দন বা দলমাদল কামানের দিকে। একদিন রাজদেবতা স্বয়ং মদনমোহন ঐ দলমাদল কামান চালিয়ে মারাঠা দস্যুদের বিপর্য্যস্ত করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে; বাংলা দেশের এই মল্লভূমির শত শত কামানের গর্জ্জনে সেদিন বৃটিশ সিংহও পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। যে প্রয়োজন ফুরিয়েছিল আবার সেই প্রয়োজন বোধহয় আসছে; কে জানে স্বয়ং মদনমোহন আবার জাগ্রত হয়ে তাঁর দলমাদলকে ধারণ করে চীনা দস্যুদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন কি না?

কোলকাতা থেকে ২০১ কিলোমিটার দূরে বিষ্ণুপুর মহকুমার সদর দপ্তর এই বিষ্ণুপুর। সরাসরি বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে নামতে হলে কোলকাতা থেকে দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলের ষ্টীম ইঞ্জিনে টানা ট্রেণে করে যেতে হবে, পৌঁছুতে ঘণ্টা ছয়েক লাগবে। আর একটি যাবার রুট হল হাওড়া থেকে ইলেকট্রিক ট্রেণে করে তারকেশ্বর, সেখান থেকে বাসে করে আরামবাগ; আরামবাগ থেকে বাস বদলে বিষ্ণুপুর। বদলাবদলিতে একটু হয়রাণি হয় বটে, কিন্তু এ পথে গেলে ভ্রমণে একটু বেশী আনন্দ পাওয়া যাবে ও লাভও হবে; কারণ পথে পড়বে কামারপুকুর ভগবান রামকৃষ্ণের পবিত্র জন্মস্থান এবং এর পরেই আরও মাইল তিনেক দূরে জয়রামবাটি—সারদামাতার পবিত্র জন্মস্থান ও মন্দির।

ছোট সহর এই বিষ্ণুপুর, কয়েকটি হোটেলও এখানে আছে। প্রকৃতপক্ষে এই সহরটি মাত্র দুই মাইল দীর্ঘ, কিন্তু পৌরসভার কাজের সুবিধার জন্যে আশেপাশের আরও কয়েকটি গ্রামকে পৌরসভাভুক্ত করা হয়; ফলে বিষ্ণুপুর পৌরসভার এখন মোটামুটি এলাকা হল প্রায় ৮ বর্গমাইল।

বাংলা দেশের অন্যান্য সহরের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের তুলনাই করা যায় না। বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক যদি কোন সহর এখনো থাকে সেটি হল এই বিষ্ণুপুর। শুধু বিষ্ণুপুরের দেবালয় বা লোকালয়েই নয় এখানকার মানুষের মধ্যেও সেই পরিচয় এখনও প্রাণবন্ত। বাংলা দেশে বাঙ্গালী আজও যদি কোথাও বেঁচে থাকেন তা আছে ঐ বিষ্ণুপুরেই, অর্থের আভিজাত্যে বা পাশ্চাত্ত্যের মোহে এখানকার বাঙ্গালীর রুচি আজও বিকৃত হয়নি। অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের অভিযানে বিষ্ণুপুরের মাটি কদর্য্য ইটের স্তূপে আজও কলঙ্কিত হয়নি, বড় বড় ইমারত, স্তূপীকৃত ইটের রুচিহীন অট্টালিকা বা বেমানান গৃহ বিষ্ণুপুরে খুব বেশী চোখে পড়ে না। বাংলার যে প্রাচীন ঘরের মডেল আজ আধুনিক শিল্পীদের তুলিতে স্থান পেয়েছে তা আছে এই বিষ্ণুপুরে। খড়ের বাঁকানো চালের, ইটের ও মাটির ছবির মত সুন্দর ঘরগুলির দিকে তাকিয়ে চোখ কার না জুড়িয়ে যায়।

বাংলা দেশের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সহর যখন এই বিষ্ণুপুর তখন এর ইতিহাসও মোটামুটি জেনে রাখা দরকার। অবশ্য বিষ্ণুপুরের রাজাদের সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে সে সব শুনতে গেলে মূল
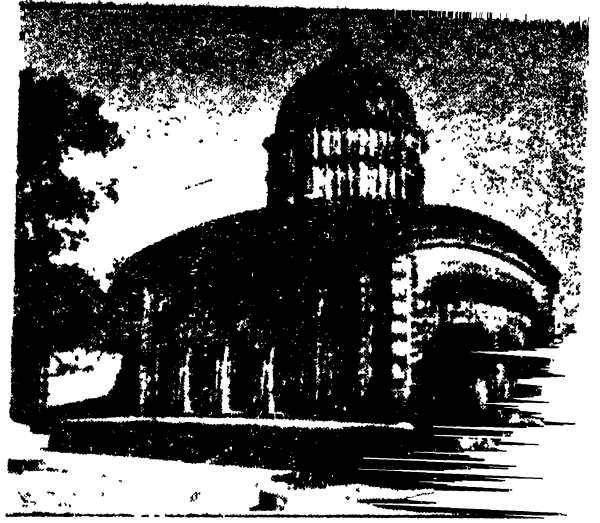
রাধাশ্যামের মন্দির

কোথায় বেড়াতে যাবেন?

সমর চট্টোপাধ্যায়

জোড়বাংলা মন্দিরের সম্মুখ ভাগ

সুবিখ্যাত রাস-মঞ্চ মন্দির

ইতিহাস আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ? তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় বিষ্ণুপুর রাজবংশ ছিল বঙ্গের হিন্দু রাজবংশাবলীর মধ্যে অতি প্রাচীন এবং এখানকার রাজারা বাঙ্গালী এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন বাঙালী সামন্ত রাজাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। ঐতিহাসিকদের মতে বিষ্ণুপুরের যিনি প্রথম মল্লরাজা তিনি হলেন রঘুনাথ সিংহ। প্রবাদ আছে বৃন্দাবনের কাছে জয়পুরের এক রাজবংশের শাখা থেকেই বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজবংশ এসেছে। রঘুনাথ সিংহের জন্ম থেকে অভিষেক পর্য্যন্ত সবই অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য ঘটনায় জড়িত। শুনা যায় জয়পুরের রাজা তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে দূর দেশে বেড়াতে যান। পুরুষোত্তমের দিকে যেতে যেতে পথে তিনি বিষ্ণুপুরে এসে পৌঁছান। এই সময় রাণীর হঠাৎ গর্ভযন্ত্রণা সুরু হয়। রাজা তাঁকে নিয়ে বিষ্ণুপুরের গভীর অরণ্যে একটি পান্থশালায় এসে ওঠেন। এই পান্থশালায় রাণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। রাজা সদ্য প্রসবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক মনে করে তাঁকে ঐখানেই রেখে চলে যান। কিছুদিন পরে রাণীও অন্তর্হিতা হন। এই ঘটনার পর শ্রীকাসমিতিয়া নামে ঐ অরণ্যবাসিনী এক বাগ্‌দী শিশুটিকে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে, সে স্নেহপরবশ হয়ে তাকে তার ঘরে নিয়ে যায় এবং সাত বছর পর্য্যন্ত মানুষ করে। একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঐ বাগ্‌দীর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ; সাত বছরের শিশুর অপরূপ রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে তাঁর গৃহে নিয়ে যান। বাগ্‌দীরা ছেলেটাকে খুব ভালবাসতো, তারা রোজই ছেলেটির জন্যে নানা খাবার ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দিয়ে আসতো। তারা আদর করে ছেলেটিকে রঘুনাথ বা প্রভু রঘু বলে ডাকতো। ব্রাহ্মণ রঘুনাথকে গরু চরানোর কাজে নিয়োগ করলেন। একদিন বনের মধ্যে গরু চরাতে এসে ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময় এক বিষধর সাপ তার দিকে এগিয়ে আসে ; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা সাপটি তাকে কামড়ায় না। ছেলেটির মাথার উপর সে ফণা তুলে রোদের তাপ নিবারণ করতে থাকে। এ'দৃশ্য শুধু ব্রাহ্মণই নয়, আরও অনেকে এসে দেখেন। কিছুক্ষণ পরে সাপটি ফণা নামিয়ে ফিরে যায়। ব্রাহ্মণ ভবিষ্যদবাণী করলেন—'ছেলেটি রাজা হবে একদিন'।

এর কিছুকাল পর ঐখানকার বড় রাজার মৃত্যু হল ; তাঁ[...] অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে নানা দেশের লোকজন ভোজনে এলে[...] ব্রাহ্মণও এলেন ঐ বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে। রাজপুরী[...] ব্রাহ্মণেরা যখন জলযোগ করছিলেন তখন এক আশ্চর্য্য ঘ[...] ঘটলো। স্বর্গত রাজার সাদা হাতিটি অকস্মাৎ তার [...] দিয়ে রঘুকে জড়িয়ে ধরে আছড়ে মারবার উপক্রম করলে[...] সকলেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলো হাতীটি বুঝি ক্ষেপে গেছে[...] কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজপুরীতে সমবেত জনমণ্ডলী বি[...] অভিভূত হয়ে দেখলো হাতিটি রঘুকে নিয়ে এক পা [...] পা করে এগিয়ে গিয়ে স্বর্গত রাজার শূন্য রাজসিংহাস[...] বসিয়ে দিলে। সকলেই আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠলো এই [...] যে বিধাতার ইচ্ছায় এই দৈব ঘটনা ঘটছে। মন্ত্রীরা [...] রঘুর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলে, রঘুনাথ সত্যই রা[...] হলেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিতের মতে রঘুনাথই বিষ্ণুপুর[...] প্রথম মল্লরাজা, এই রাজবংশ প্রায় ১১০০ বৎসর রাজ[...] করেন। রাজা রঘুনাথ বা আদিমল্ল বহু যত্নে সমৃদ্ধিশালী বিষ্ণু[...] নগর প্রতিষ্ঠা করেন। বহুকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজ্য মল্লভূমি[...] জঙ্গল মহাল বলে পরিচিত ছিল এখন সে সব জায়গা বর্দ্ধমান, বাঁকু[...] ও বীরভূম জেলার মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে। বিষ্ণুপুরের রাজারা মহা[...] বংশীয় ক্ষত্রিয় অকলঙ্ক দেব ও পুরাদেবীর সেবক। রাজাদের শৌর্য্যবীর্যে[...] কাহিনী,—স্বাধীনতা প্রীতির কাহিনী, সাংস্কৃতিক বদান্যতা, ধর্ম্মা[...] ও উদারতার কাহিনী আজ রূপকথার মত অবিশ্বাস্য মনে হলে[...] এককালে ঐতিহাসিক সত্য ছিল।

ইতিহাস এখন আর থাক, ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন এখন যে [...] পড়ে আছে আসুন সেগুলি ভাল করে দেখে বিষ্ণুপুরকে বুঝবার চে[...] করি।

দেবালয়ই বিষ্ণুপুরের একটি প্রধান আকর্ষণ। এখনও যে স[...] মন্দির বিষ্ণুপুরে রয়েছে তা দেখে বিষ্ণুপুরের প্রাচীন সভ্য[...]

ঐতিহাসিক দলমাদল কামান

কিছুটা আঁচ করা যাবে। খড় বাংলোর চণ্ডী ও দুর্গার ভাঙা মন্দিরটি ছাড়া মল্লেশ্বরের শিবমন্দিরটিই সব চেয়ে প্রাচীন মন্দির। ১৬২২ সালে বীরসিংহ এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করে যান। বিষ্ণুপুর সহরে আরও যে তিনটি বিখ্যাত মন্দির আছে সেগুলি হ'ল মদনমোহন, মুরলীমোহন ও মদনগোপাল। এই সব মন্দির বিষ্ণুপুর দুর্গের বাইরে রাজারা কেন নির্ম্মাণ করালেন তা ঐতিহাসিকদের বিবেচ্য বিষয়; দুর্গের মধ্যে রয়েছে চারটি সুন্দর মন্দির —শ্যাম রায়, জোড়বাংলো, লালজী ও রাধেশ্যাম মন্দির। আবার দুর্গের দক্ষিণদিকে লালবাঁধের কাছেও ক'টি মন্দির রয়েছে; যেমন কালাচাঁদ, রাধাগোবিন্দ ও রাধামাধবের জোড়মন্দির, নন্দলালের মন্দির।

আগে চলুন মল্লেশ্বরের মন্দির দর্শন করে যাই। 'একক চতুষ্কোণ চূড়াবিশিষ্ট' এই মন্দিরটি অন্যান্য দেবালয়ের মত বাংলার বিশিষ্টতা ও স্বকীয়তা চোখে পড়ে না। মল্লেশ্বর মন্দির শঙ্করালয়, তাই শঙ্করের বাহন বৃষভ বা নন্দী মূর্ত্তিটি সামনেই বিরাজ করছে। ভারী চমৎকার এই মূর্ত্তিটি।

এবার চলুন বিষ্ণুপুর রাজাদের দুর্গের মধ্যে কি আছে দেখে আসি। দুর্গটির চারিধারে মাটির প্রাচীর আর পরিখা দ্বারা বেষ্টন করা আছে। দুর্গে প্রবেশের প্রধান সিংহদ্বারটি মাকরামাটি বা লাল পাথরে মাটির তৈরী। দুধারে ছয়টি করে যে প্রকোষ্ঠ তা থেকে সৈন্যরা সুকৌশলে বন্দুক থেকে গুলি নিক্ষেপ করতে পারতো। এই প্রবেশদ্বারটি পাথর দরজা নামে খ্যাত। দুর্গদরজার ভিতরে দ্বিতলে দুধারের প্রকোষ্ঠে থাকতো সৈন্যদের রসদ। দ্বিতলের দহড়াটিতে অনেকগুলি খপ্পর আছে এক একটি সৈন্যর ব্যবহারের জন্য। দ্বিতলের মেঝেটি যে মাকরামাটির কড়ির উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল সেটি ভেঙ্গে গিয়েছে। দুর্গের পশ্চিমদিকে প্রাচীরের কাছে একটি অদ্ভুত ধরণের ঘর রয়েছে। ঘরটির চারদিকে জেলখানার প্রাচীরের মত ইটের শক্ত উঁচু দেওয়াল, মাথার উপর কোন ছাউনি নেই বা ঐ রহস্যময় ঘরটিতে ঢোকবার কোন দরজা বা দেখবার কোন জানালাও নেই। স্থানীয় লোকেরা বলেন, রাজাদের আমলে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হতো তাদের ঐ কারাগারের মধ্যে উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হতো এবং এইভাবে তারা অনাহারে প্রাণ হারাতো। কারাগারের সমস্ত ভূমি এবং দেওয়ালের গায় লোহার শলাকা লাগানো ছিল; যাতে অপরাধীরা সেখানে দাঁড়াতে, শুতে বা বসতেও পারতো না; অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তাদের মৃত্যুকে আরও এগিয়ে আনতো।

নানা গাছ গাছড়া দিয়ে ঘেরা দুর্গের অভ্যন্তর সত্যই স্বর্গপুরী। রাজবাড়ীর যে ধ্বংসস্তূপ এখনও পড়ে রয়েছে তা দেখে বিশ্বাসই করা যায় না যে এটি বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ী ছিল। মনে হয় যেন সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের বাড়ী এটি। বাস্তবিকই তাই ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজারা। ঐ রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাঁরা নিজেদের কোনদিন সরিয়ে রাখেন নি। তাই বসবাসের জন্য নির্ম্মিত হয়েছিল একতলা এই রাজবাড়ী। বিষ্ণুপুরের অধিবাসীদের মুখে আজও একথা শুনা যায় এখানকার রাজারা সাধারণ বাসগৃহ ছেড়ে রাজপ্রাসাদে
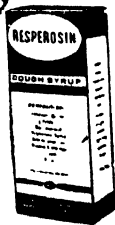
বাস করতে চান নি ; দুর্গের ভিতরে, বিষ্ণুপুর দেবালয় ছাড়িয়ে যে কোন আলয় রাজার বা প্রজার মাথা তুলে দাঁড়াক এ তাঁদের কোনদিন কাম্যও ছিল না। বাজকীয় বিলাসিতায় রাজারা নিজেদের কোনদিন ভাসিয়ে দেন নি। এবার দুর্গের দেবালয়গুলি একে একে দেখুন। বাংলার দেবালয়ের নিজস্ব গঠন বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে বিষ্ণুপুর দুর্গের দেবালয়গুলি বাঙালী স্থপতি ও সূত্রধরদের অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্য ও স্বকীয়তার নিদর্শন স্বরূপ আজও দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশ দেবালয়ই রাধাকৃষ্ণের। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কাছে মল্লরাজা বীর হাম্বীর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেই থেকেই তিনি ও তাঁর বংশধরগণ বৈষ্ণব ভক্ত হয়ে পড়েন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা নেবার আগে মল্লরাজারা প্রধানতঃ শিব ও শক্তির পূজারী ছিলেন।

সে যাক, চলুন আগে শ্যাম রায়ের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি দেখে আসি। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের পঞ্চরত্ন মন্দিরের সবচেয়ে প্রাচীন মডেল এই মন্দিরটি। বাঁকানো চালাবিশিষ্ট বাংলা চারচালাঘরের চারকোণে চারটি খর্বাকৃতি দেউল, মাঝে একটি। এই মন্দিরে ইটের কারুকার্য্যের তুলনা হয় না।

এর পরই দেখবার মত হল 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে দু'খানি দো-চালা বাংলা ঘর পাশাপাশি জুড়ে দেওয়া হয়েছে ও জোড়ের উপরে রয়েছে একটি ছোট চূড়া। মন্দিরটি ভাল করে দেখলেই মনে হবে তখনকার শিল্পীরা দেবদেবীদেরও বাঙ্গালীর মত পরম আত্মীয় মনে করে আপনজন করে নিয়েছিলেন। দেবতার সঙ্গে মানুষের, দেবালয়ের সঙ্গে মনুষ্যালয়ের এমন বিচিত্র আত্মীয়করণ আরও কোথাও হয়েছে বলে শোনা যায় না।

আর একটি জোড়বাংলা মন্দির জঙ্গলের মধ্যে আছে ; সেটি প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই মন্দিরেরও পোড়ামাটির কাজ দেখবার মত ছিল। এ ছাড়াও এখনও দেখবার মত রয়েছে রাধাশ্যামের মন্দির, কালাচাঁদের মন্দির ও মদনমোহনের মন্দির। দেবালয়গুলির মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি হ'ল ঐ মদনমোহনের মন্দিরটি। এটিকে 'সুন্দর রত্ন মন্দির'ও বলা হয়ে থাকে। এক রত্ন বিশিষ্ট বড় একটি বাংলা চারচালা ঘরের মত এই মন্দিরটি। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির চিত্র দেখবার মত। এই মন্দিরটি ১০০০ মল্লাব্দে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে রাজা দুর্জ্জন সিংহ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা রঘুনাথ সিংহ নির্ম্মাণ করান রাধাশ্যামের নবরত্ন মন্দির, কৃষ্ণরায়ের মন্দির, কালাচাঁদের মন্দির ও গিরিধর লালের নবরত্ন মন্দির। রঘুনাথ নন্দন বীরসিংহ তৈরী করান লালজীর মন্দির (১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর রাণী শিরোমণি দেবী মুরলী-মোহনের মন্দির (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ) ও মদনগোপালের মন্দির। ১০৩২ মল্লাব্দে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে রাজা গোপাল সিংহের সময় স্থাপিত হয়েছিল রাধাগোবিন্দের সৌধরত্ন মন্দির ; ১০৪০ মল্ল শকে রাজা গোপাল সিংহ স্থাপিত করেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মন্দির। বিষ্ণুপুরের শেষ রাজা শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মহিষী চূড়ামনী ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে রাধামাধবের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করে যান। ১০৪০ মল্ল শকে রাজা গোপাল সিংহ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ও ১০৬৪ মল্ল শকে রাজা চৈতন্য সিংহ রাধাশ্যামের মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। আগেই বলেছি ইটের সব চেয়ে ভাল কারুকার্য্যের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে শ্যাম রায়ের মন্দিরে আর পোড়ামাটির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'ল মদনগোপালের মন্দির।

অধিকাংশ মন্দিরই আজ দেবতাশূন্য। মদনমোহনের মন্দিরে বর্ত্তমানে যে বিগ্রহটি আছে তা নিয়েও অনেক প্রবাদ আছে। আসল মদনমোহন কোথা থেকে এলেন কোথাই বা গেলেন তা নিয়ে কাহিনী শুনা যায় তাহল এই—বিষ্ণুপুর পরগণার একটি গ্রামে থাকতেন ধরণী নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ; তাঁরই গৃহে আসল মদনমোহন বিগ্রহ পূজিত হ'তো। একদিন রাজা বীর হাম্বির শিকারে যাবার পথে ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে মূর্ত্তিটি দেখে মুগ্ধ হন এবং মূর্ত্তিটির চারদিক থেকে পদ্মের সুমিষ্ট গন্ধে তিনি মোহিত হয়ে যান। ব্রাহ্মণের কাছে তিনি মূর্ত্তিটি ভিক্ষা করেন ; কিন্তু ব্রাহ্মণ সেটি দিতে অস্বীকার করে। একদিন রাজা নিজেই মূর্ত্তিটি অপহরণ করে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। মূর্ত্তিটি হারিয়ে ব্রাহ্মণ শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং মূর্ত্তি খোঁজে একদিন গৃহত্যাগ করেন। খুঁজতে খুঁজতে তিনি উপস্থিত হন বিষ্ণুপুর রাজ্যে ; বিগ্রহটি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল কিন্তু সারা বিষ্ণুপুর তখন রাজার আদেশে হরি সংকীর্ত্তনে মত্ত। বিগ্রহটি না পাওয়া যাওয়ায় ব্রাহ্মণ ফিরে যান এবং কাছেই বিল নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার উদ্যোগ করেন। এই সময় একজন স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণকে জানিয়ে দেন বিগ্রহটি রাজার কাছেই আছে। ব্রাহ্মণ ফের রাজবাড়ীতে ফিরে আসেন এবং বিগ্রহটি রাজার কাছে ফেরৎ চান। রাজা আশ্বাস দেন কালই তাঁকে বিগ্রহটি দেখাবেন। ইতিমধ্যে সূত্রধরদের দিয়ে একরাত্রের মধ্যেই অনুরূপ আর একটি বিগ্রহ রাজা তৈরী করান এবং পরদিন সকালে ব্রাহ্মণকে তা দেখান। ব্রাহ্মণ এটি যে নকল বিগ্রহ তা বুঝতে পারেন। তখন রাজা তাঁকে আসল বিগ্রহটি দেখান। ব্রাহ্মণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান বিগ্রহটি আর কাছছাড়া করতে চান না। সেই রাত্রেই মদনমোহন স্বপ্নে ব্রাহ্মণকে দেখা দেন এবং বলেন তিনি রাজার প্রতি তুষ্ট এবং এখান থেকে আর কোথাও যেতে চান না। সেই থেকে মদনমোহন দেব বিষ্ণুপুর রাজ্যেই থেকে যান ; রাজারাও ভক্তিভাবে তাঁর পূজা করতেন। এই মদনমোহন দেব সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা ছিলেন। রাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকালে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে পরিচালিত মহারাষ্ট্রীয় সেনাদল বিষ্ণুপুর দুর্গের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করে রাজার সেনাদের পর্য্যুদস্ত করে ; কিন্তু মদনমোহন স্বয়ং দলমাদল কামানটি চালিয়ে সমস্ত বনভূমিকে কাঁপিয়ে তোলেন এবং মারাঠা সৈন্যদের বিতাড়িত করে দেন বলে প্রবাদ আছে।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দ থেকে বিষ্ণুপুর রাজ্যের ক্রমাবনতি হতে থাকে। মহারাষ্ট্র সর্দ্দারগণ উপর্য্যুপরি বিষ্ণুপুর রাজ্য লুণ্ঠন করে রাজাকে নিঃসহায় করে ফেলে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এখানে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় অধিবাসীরা বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে যায়। এইভাবে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বিষ্ণুপুর রাজ্য শ্রীহীন হয়ে পড়ে। এই সময় আবার ইংরাজ শাসনের কঠোরতা বেড়ে যায় এবং রাজ্যের আয়ের উপর বর্দ্ধিত রাজস্ব কর ধার্য্য করা হয়। রাজস্ব পরিশোধের জন্য প্রথমে [illegible] তারপর জমি একটি একটি করে বিক্রি হতে থাকে।

প্রবাদ আছে রাজা দামোদর সিংহ অর্থাভাবের দরুণ মদনমোহন বিগ্রহটি কোলকাতা নিবাসী গোকুলচন্দ্র মিত্রের কাছে একলক্ষ টাকায় বন্ধক রেখেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন ঠাকুর এইভাবে বিষ্ণুপুর রাজ্য থেকে বিদায় নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ভাগ্য বিপর্য্যয় চরমে ওঠে। হতভাগ্য রাজা অতি কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে বিগ্রহটি

ফিরিয়ে আনবার জন্যে নিজের মন্ত্রীকে পাঠান ; কিন্তু বিগ্রহটি ফিরিয়ে দেওয়া হয় নাই। সুপ্রিম কোর্টে রাজা আবেদন করেন এবং মামলায় জয়লাভ করেন। কিন্তু একটি নকল মদনমোহনের মূর্ত্তি তৈরী করে রাজাকে দেওয়া হয়। আবার অনেকে বলেন বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছ থেকে রাজা মাধব সিং টাকা ধার নিয়েছিলেন ; কিন্তু রাজা শেষ পর্যন্ত সে ঋণের টাকা শোধ করতে পারেন নি। কাজেই মদনমোহন কোলকাতাতেই থেকে যান। সাধারণের আজও বিশ্বাস কোলকাতার বাগবাজারের মদনমোহন মূর্ত্তিই বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ মদনমোহন।

বিখ্যাত মন্দিরগুলি ছাড়াও বিষ্ণুপুরে আরও অনেক মন্দির আছে, যেমন দোল-গোবিন্দর মন্দির, মায়া বুড়িয়ার মন্দির, হিজরাপাড়া মন্দির, নন্দলালের মন্দির এবং নাম নেই আরও কয়েকটি পুরাতন মন্দির।

দুর্গের ভিতরে আর একটি জিনিষ নিশ্চয়ই সকলের চোখে পড়বে সেটি হ'ল চারটি দেউল। বাংলার দেবালয় স্থাপত্যের ইতিহাসের এগুলি নীরব সাক্ষীস্বরূপ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এই দেউলগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরী, বিশেষ করে ছোট দীর্ঘ দেউল দুটি যে ঐ সময় হয়েছিল তা অনুমান করা যায়।

বিষ্ণুপুরের এই সব মন্দির ছাড়া আর একটি দেখবার জিনিষ হচ্ছে রাসমঞ্চ। এক অদ্ভুত ধরণের দেবালয় এটি, এর তুলনা বোধ হয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। পিরামিডের আকারে গৃহটি নির্ম্মিত হয়েছে। পিরামিডের পাদদেশে বাংলা দোচালা ও চার চালা ঘর সুন্দরভাবে রূপায়িত করা হয়েছে। রাসপূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে ত্রিশ ফুট উচ্চ রাসমঞ্চে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ অধিষ্ঠিত করা হতো। বর্ত্তমানে এই সুবিখ্যাত রাসমঞ্চটি ধ্বংসের দিকে। পিরামিডের ছাদের একটি অংশ ধ্বসে গিয়েছে। শুনেছি ওটি মেরামত করা শুধু প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষই নয়, এক দুরূহ ব্যাপার। এখনকার মিস্ত্রীরা বলেন, ওটি মেরামত করা আর যাবে না, ভেঙ্গে ফেলে সম্পূর্ণ নূতন করে আবার তৈরী করতে হবে।

বিষ্ণুপুর রাজ্যের অনেকগুলি কামান এখনও যত্র তত্র দেখতে পাওয়া যাবে। দলমাদল কামানটি নিশ্চয়ই একবার স্পর্শ করতে সকলের ইচ্ছে হবে। দুর্গের ভিতরে জঙ্গলাবৃত ১০½ ফুট বৃহৎ লৌহের কামানটি আজও আছে। বিষ্ণুপুরের এক রাজা দেবতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ এই কামানটি লাভ করেছিলেন। ১২ ফুট ৫½ ইঞ্চিরও আর একটি কামান রয়েছে, এর অর্দ্ধেক অংশই মাটিতে বসে গিয়েছে ; কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এতদিন হয়ে গেল একটুও মরচে পড়েনি।

দুর্গের বাইরে দুর্গপ্রাচীরের গায়ে আরও চারটি কামান এখনও রয়েছে। একটি কামানের মুখ বাঘের মুখের মত ভয়ঙ্কর রূপ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। ওরই মধ্যে দুটি কামান থেকে বছরে একদিন অর্থাৎ দুর্গাপূজার অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজার সময় এখনও তোপধ্বনি করা হয়ে থাকে।

শহরের সন্নিকটে ছবির মত সুন্দর কয়েকটি লেক বা ঝিল রয়েছে ; এগুলি হচ্ছে লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, গন্তাতবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ ও পোকাবাঁধ। রাজাদের প্রমোদকাননই বলুন আর ভ্রমণ-উদ্যানই বলুন তৈরী হয়েছিল ঐ লালবাঁধের ধারে। দেবালয়ের মত রাজাদের আর একটি সখ ছিল এই ঝিল কাটা আর বাঁধ নির্ম্মাণ। এপার ওপার করার সুবিধার জন্যে এই বাঁধগুলি তৈরী করা হয়েছিল। রাজ্যে যাতে কোনদিন জলাভাব না ঘটে বোধ হয় তারই জন্যে এসব জলাধার খনন করা হয়েছিল। অনেকগুলি ঝিল এখন ভরাট করে ফেলা হয়েছে এবং তার ওপর চাষবাস হচ্ছে। বিষ্ণুপুরে উৎসবের অন্ত নেই। সারা বছরই প্রায় কোন-না-কোন উৎসব নিয়ে বিষ্ণুপুরবাসীরা এখনও মেতে আছেন। আজও কালীপূজা, মনসাপূজা, ভৈরব পূজা, বড়মপূজা, ধর্ম্মপূজা শাস্ত্রীয় আচার আচরণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পৌষ-সংক্রান্তির দিন বাউরীদের বড়মপূজা উপলক্ষে এখনও বরাহ শিকার, বলিদান ও মদ্যপানোৎসব হয়ে থাকে। এ ছাড়া রামলীলা, ঝুলন, দোল উৎসব তো আছেই। শোনা যায় বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী দেবীর সামনে আগে নরবলি হতো। বিষ্ণুপুর রাজাদের দুর্গোৎসব ছিল এক সমারোহ ব্যাপার। ষষ্ঠীর দিন থেকে আরম্ভ করে দশমীর দিন পর্য্যন্ত যে সব বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হতো সে-ও এক বিরাট কাহিনী। যদি শোনবার আগ্রহ থাকে বিষ্ণুপুরে বয়োবৃদ্ধ যাঁরা এখনও রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সে সব কাহিনী শুনুন।

সুর-সাধনার অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে বিষ্ণুপুর ভারত বিখ্যাত হয়ে আছে। বিষ্ণুপুরের সুর-সাধনার ইতিহাস কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস! শুধু সঙ্গীতাচার্য্যদের নয় বিষ্ণুপুরের মৃদঙ্গাচার্য্যদেরও খ্যাতি দেশজোড়া। আজ এইটুকু শুধু বলা যায় বাংলার সঙ্গীত সমাজে বিষ্ণুপুরের গায়করা রীতিমত প্রভুত্ব করে এসেছেন। কোলকাতায় ঠাকুর পরিবার, বিষ্ণুপুর ও অন্যান্য রাজবংশ ও ধনী পরিবারে সঙ্গীত শিক্ষক ও আচার্য্যের পদ তাঁরাই অলঙ্কৃত করে এসেছেন। এখনও অনেক খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ সুরসাধনা ও শিক্ষার কেন্দ্র বিষ্ণুপুরে রয়েছে।

বাংলার ঐতিহাসিক পশ্চিম প্রান্তের বীর প্রহরী বিষ্ণুপুর রাজবংশের পতনের পর বাঙ্গালীর স্বাধীন জীবনের সূর্য্য অস্ত গেছে সত্য, কিন্তু বাংলার ভাস্কর, স্থপতি, সূত্রধর ও শিল্পীদের বিস্ময়কর কলাকুশলতার কীর্ত্তিনগরী সুরতীর্থ বিষ্ণুপুর যুগযুগান্তের ভাগ্য বিপর্য্যয় ও ঘটনাবর্ত্তের মধ্যে অমর হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। বাংলা ও বাঙ্গালীর গৌরব বিষ্ণুপুর—তোমায় নমস্কার জানাই।*

[আগামীবার নবদ্বীপ চলুন।

* [এই প্রবন্ধে মুদ্রিত চিত্রগুলি নির্ম্মলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত।]

বসুমতী

শ্রীবীণা কুণ্ডু

বর মাগি সদা আমি দেবতার ঠাঁই,
সুন্দরের পূজা যেন করে যেতে পাই।

মন মোর ভরে রবে পূজার আবেশে,
তীর্থ হবে সর্ব্বক্ষেত্র তাঁহার আদেশে।

প্রেমের মূল্যায়ন

'অনামী'

আগের দিনে যৌনসমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতো না কেউ, চিরকুমারীর কৌমার্য্য রক্ষা, স্বামীহীনার শূন্য শয্যাও তাই লঘু বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুরই উদ্রেক করতো না। কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষে এ বিষয়ে উদাসীন নয়, বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে বিশেষভাবেই অবহিত; তাঁদের মতে সতীত্বের পুরোনো আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকলে কখনও কখনও মেয়েদের ভীষণভাবেই তার মূল্য দিতে হতে পারে, সে মূল্য মানসিক বিপর্য্যয়। তাঁরা বলেন নিরুদ্ধ কামনার অবদমিত দাহ অনেক সময়ই ডেকে আনে শরীর মনের সম্পূর্ণ ধ্বংসকে, যার ফলে বেঁচে থেকেও জীবন্মৃতের পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েন একদল দুর্ভাগ্য জীব। এতো গেল মনোবৈজ্ঞানিকের সুচিন্তিত অভিমত, কিন্তু মেয়েরা যে স্বভাবতঃই সতীত্ব বস্তুটাকে মূল্যবান মনে করে থাকেন তারও তো প্রমাণ আছে ভূরিভূরি, এই মনোভাব কি শুধুই সংস্কারপ্রসূত না এর কোন যুক্তিসম্মত ভিত্তিও বর্ত্তমান? বোধহয় সহজাত সংস্কারের প্রভাবেই মেয়েরা বোঝেন যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারার অনুসরণ করে কখনও বাঁচার প্রকৃত আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায় না। আর তার পরিণতিও সুফলপ্রসূ হতে পারে না। আবার যৌন-সমস্যাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে চলাটাও তো নানা কারণেই অসম্ভব, তবে উপায়? বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবনতির যুগে বহু মেয়েকেই কৌমার্য্য বরণ করে নিতে বাধ্য হতে হচ্ছে, কারণ বিবাহেচ্ছু পুরুষের সংখ্যা আশঙ্কাজনকরূপেই কমে আসছে। অথচ এই সব মেয়েদের মন ও শরীর স্বাভাবিক প্রথাতেই প্রকৃতির অনুগামী, দিনের পর দিন শুষ্ক বিবর্ণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে যাওয়ার ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা দেয় নানা ধরণের বিকৃতি বা তার চেয়েও ভয়াবহ মানসিক ভারসাম্যের বিচ্যুতি। সামাজিক নিয়মের বাইরে প্রেমজীবন বা যৌনজীবন যাপন করার পন্থাও অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে অবলম্বিত হয়ে থাকে, কিন্তু সেটাও যে এ সমস্যা সমাধানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বা বাঞ্ছনীয় তাও তো নয়। মেয়েদের পক্ষেই এ ধরণের সম্পর্কে অস্বস্তি বোধ করাটা অধিকতর সম্ভব, কারণ যৌন-জীবনের যা অনিবার্য্য পরিণতি সেই সন্তানোৎপাদনের ভারটা যে তাঁদেরই উপর; অবশ্য বিজ্ঞানের দৌলতে এরও সমাধান সহজলভ্য; আর সে তথ্য আজকের দিনের নরনারীর অপরিজ্ঞাতও নয়। স্ত্রীলোক মাত্রেরই ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসা দেওয়ার এক অতি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে, প্রত্যেকটি মেয়েই যৌবনে পদারম্ভের শুভলগ্ন থেকেই কামনা করে এমন একজন মানুষের দেখা পাওয়ার; যার কাছে অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে বিনিময়ে জয় করে নেওয়া যায় তাকেই। শুধু সম্পূর্ণরূপে একজনের কাছে নিজেকে দেওয়াই নয় প্রতিদানে একজনকে নিজস্ব করে পাওয়ার কামনাতেও উদ্বেলিত হয় চিত্ত। মিলনের এই স্বাভাবিক আকাঙ্খাটাকেই সমাজবদ্ধ সভ্য মানুষ চরিতার্থ করতে চেয়েছে বিবাহ প্রথার মাধ্যমে, এ জন্যই সামাজিক মানুষের পক্ষে বিবাহ এক অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। কিন্তু বর্ত্তমানে এ সমস্যা নানা কারণেই কিছুটা জটিল, কারণ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক, কখনও বা আর কিছু, যার জন্য বিবাহ দ্বারাই এ সম[...] সমাধান করে ফেলা সর্ব্বতোভাবে সফল হচ্ছে না। অতএব [...] পুরুষের অবৈধ বা অসামাজিক সম্বন্ধকে নিন্দিত করার আগে [...] বাস্তব সত্য সম্পর্কে মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়েই চিন্তা করা প্রয়োজ[...] কোন নারী যদি এই পথে প্রকৃতির আবেদনকে তৃপ্ত করতে প্রস্[...] হন তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁকে ভেবে দেখতে হবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণ[...] কি হতে পারে। সমাজের নিন্দা ধিক্কার সবই তাঁকে অবিচলি[...] চিত্তে সহ্য করতে হবে, স্ত্রীর প্রাপ্য সম্মান বা অধিকার প্রেমিক[...] জন্য নয়, এই নিষ্ঠুর সত্যের সামনাসামনি হতে হবে তাঁকে, বা[...] জনকে সমস্ত উজাড় করে দিয়েও নিজেকে দিনের পর দিন, হয়ত চিরদিনই অন্তরালে রাখতে হবে, আর তারই সঙ্গে সংযত রাখতে হ[...] মনের সমস্ত উদ্দাম আগ্রহকে, কারণ অসংযমের উদগ্রতায় অসামাজি[...] ভীরু প্রেম আশ্রয় লাভ করতে না পেরে ঝড়ের মুখের ছোট পাখী[...] মতই বিলীন হয়ে যায়। প্রেমিকের দেহ অপেক্ষা মন ও বু[...] বৃত্তিকে বেশী প্রাধান্য দিতে না পারলে অন্ততঃ নিজের কাছে প্রেমিকার ছোট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। বাস্তব জীব[...] 'কাম গন্ধ-হীন, নিকষিত হেম' প্রায় প্রেমের দেখা মেলে না ঠি[...] আর সেজন্যই বহু বিদগ্ধজন প্রশংসিত 'প্লেটোনিক লাভ' বা দে[...] সম্পর্কহীন প্রেমেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় আজও শুধু কল্প[...] জগতেই, বাস্তবে নয়। বাস্তবকে অস্বীকার না করে তাকে যথোচি[...] সম্মান দিয়েও মহত্তর প্রেমে উত্তরণ করা অসম্ভব নয়, সংযত [...] উত্তরণের পথে প্রধানতম সোপান, দেহের মাধ্যমে যে পরিচয়, তা[...] দেহাতীত করে তোলাটা যদি বা সম্ভব না হয়, দেহ প্রধান ক[...] রাখাটাও অনুচিত, মানসিক মিলন সম্পাদিত না হলে দেহ মিল[...] যে কেবল মাত্র পশুত্বেরই আর এক রূপ একথাটা অনস্বীকার্য্য [...] সত্য, এ ধরণের মিলন সমাজ সম্মত অর্থাৎ বিবাহজ হলেও [...] অনিবার্য্য রূপেই ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপই যু[...] যুগে মানুষের অন্তরাত্মা বিদ্রোহ জানিয়েছে সমাজ নীতির বিরু[...] মন্ত্র তন্ত্র আইন কানুনকে অগ্রাহ্য করেছে, খুঁজে নিয়েছে আপ[...] সার্থকতাকে দুর্গমতার পথে অভিসার করে। কিন্তু আগেই বলে[...] এ পথ বড় কঠিন, ক্ষুরের ধারের মতই বিপদ সঙ্কুল, সংকীর্ণ, অত্য[...] বেশী মাত্রায় মানসিক শক্তির অধিকারী ব্যতীত সমাজ বহির্ভূ[...] প্রেমকে যোগ্য আশ্রয় দেওয়া সম্ভবপর হয় না, সমাজাশ্রিত প্রেমে [...] অসংযমের অধিকার আছে এক্ষেত্রে তা নেই, তাই কোন নারী য[...] বাধ্য হয়ে এ পথে সার্থকতা খোঁজেন তবে প্রথমেই তাঁ[...] আত্মানুসন্ধান করে দেখতে হবে, ছোট ছোট স্বার্থ, জাগতি[...] লাভক্ষতির উর্দ্ধে উঠতে হবে, মনে রাখতে হবে প্রিয়তমে[...] সত্তার সঙ্গে আপন সত্তাকে মিশিয়ে দিতে পারাতেই শুধু নিহি[...] রয়েছে তাঁর প্রেমের সামগ্রিক সার্থকতা। দেহ থে[...] দেহাতীতে উত্তরণের সাধনাতেই শুধু রয়েছে নিহিত তাঁর প্রেমে[...] এবং যে কোন মহৎ প্রেমের সামগ্রিক সফলতা ও সর্ব্বাঙ্গী[...] কল্যাণ।

বারানসী

নীলকণ্ঠ

একত্রিশ

ভারতবর্ষের বিস্ময় কাশী ; কাশীর বিস্ময় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ।

দর্শনের ঈশ্বর গোপীনাথ, ঈশ্বর দর্শনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছেন আজও। 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।' যদি সত্যি সত্যি কেউ ছাই-চাপা আগুনের মধ্যে পরশমণির স্পর্শ পাবার জন্যে আকাশ পাতাল করে বেড়ান আজও, তবে তিনি এই গোপীনাথ ছাড়া আর কে ? তাঁর কথা মনে হলেই আমার রবীন্দ্রনাথের সেই একটি কবিতার কথা মনে হয়। সেই যে একটি মাত্র কবিতা—যা এই মুহূর্তে একমাত্র গোপীনাথের জীবনকাব্য বলে প্রতীত হয়—'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।' পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজের মাথায় ধূলায় কাদায় কটা বৃহৎ জটা নেই ; তাঁর কলেবর ক্ষীণ নয়। চালচুলাহীন ধূসর কৌপীন সম্বল ছাইমাখা ধূলায় ঢাকা নন পণ্ডিত গোপীনাথ ;—ঠিক। কিন্তু নিবিড় অমা নিশীথে খদ্যোতের মতন তাঁর চোখ দুটোও কাকে যেন খুঁজে বেড়ায় 'নিজের আলোকে।' সোনারূপা তুচ্ছ মনে করেন ; রাজ সম্পদের জন্যে এতটুকু কাতর নন এই গোপীনাথও। তাঁর দশা দেখে সংসারী লোক আমাদের হাসি পায় না, কেবল উপহাসই পায়। পায়, কারণ 'যে ধনে হইয়া ধনী' মানুষ 'মণিকে মানে না মণি বলে', সে ধন সত্যি সত্যি কেউ বইয়ের পাতায় নয়, চোখের পাতায় দেখতে চায়, এ যে আরব্য উপন্যাসের চেয়েও অলীক, অলৌকিক। তাই 'দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়' একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর।'

পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে অবিচল গোপীনাথকে তারাই মনে করে পাথর, 'পরশ-পাথর' যাদের কাছে হাসির কথা, উপহাসির উপলক্ষ্য।

বার্ধক্যে বারাণসী ভূমিষ্ঠ হবো হবো করছে তখন। দীর্ঘ রক্তাক্ত যন্ত্রণার দিন অবসান হয়ে একটি রক্তিম সৃষ্টি প্রস্তুত হবার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। আর দেরী করবার কথা ভাবতে পারলাম না। দেব লোকের দেখা পেতে হলে সিদ্ধিদাতা গণেশের আলোকে জানাতে হয় প্রণাম। বিশ্বনাথের বার্তা জগতে অবারিত করবার পূর্বাহ্নে প্রয়োজন গোপীনাথের দর্শন। গোপীনাথ কাশী সম্পর্কে বই লিখছি শুনে জিজ্ঞেস করলেন : বইয়ের নাম কি দিয়েছেন ? বললাম : বার্ধক্যে বারাণসী। মনে আছে, কবিরাজ মশাই বলেছিলেন, নামটি তো ভালো। আরও মনে আছে আমার স্বভাবসিদ্ধ অবিনয়ের সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে কমেণ্ট করেছিলাম : শুধু নামটা কেন, বইটিও খুব ভাল হবে। তারপর প্রশ্ন করেছিলাম : কাশীতে ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারে, সত্যি সত্যি এমন জ্যোতিষী কেউ আপনার জানা আছে ? উত্তর হলো : বাঙালী টোলায় একজন ছিলেন, উত্তর প্রদেশের লোক। এখন কেউ আছেন কি না জানি না। প্রশ্নের উত্তর দেবার ভঙ্গী থেকে অনুমান করলাম জ্যোতিষে কৌতূহলী নন কবিরাজ।

কৌতূহলী না হবারই কথা। পরশ পাথরের অনুগ্রহ-অভিলাষী, গ্রহশান্তির তুচ্ছ পাথরের খবর করবে কোন্ দুঃখে ? জাহাজের কারবারী কেন হ'তে চাইবে আদার ব্যাপারী ? জীবন-সূর্য যাবার আগে জ্বলে উঠেছে যাঁর চলার পথ আলো করে, অপরূপ জ্যোতি-রাগে; সে কেন খবর করবে—টাইগার-হিলে সূর্যোদয় দেখতে হলে, ক'টার সময় প্রয়োজন হয় শয্যাত্যাগের ?

সূর্যমুখী কেন তারা গুণবে রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায়, সূর্যের আলোয় যে সুনিশ্চিত মেলবে চোখ ?

ডক্টর গোপীনাথকে আবার প্রশ্ন করেছিলাম : যে সব সাধুদের দর্শন করলে দর্শন পর্বের প্রয়োজন তুচ্ছ হয়ে যায়, তেমন মহাত্মা এখন কাশীতে কেউ আছেন বলে আপনি জানেন ? আমি তাঁদের নাম ঠিকানা জানতে চাইনি, তিনিও জানাতে চাননি তা। শুধু বলেছিলেন : আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে স্মরণের অতীতকালের একটি কণ্ঠ উচ্চারণ করলে আমার কানে : অন্ধকারের পারে আছেন একজন, যাঁকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হলে তবেই পৌঁছবে তুমি মৃত্যু থেকে অমৃতে। শুধু এ-সে-ই আছে ; আর পথ নেই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ব্যূহের মধ্যে প্রবেশের পথ অনন্ত। ব্যূহ থেকে বেরুবার পথ কেবল একটি সপ্তরথী ভেদ করে 'অভিমান'-এর বেরুবার সেই এক পথ,—যে পথে এক পার্থকেই নিয়ে যেতে পারেন এক পার্থসারথি।

সেই পথের প্রান্তে বিশ্বনাথ, যেই পথের প্রারম্ভে গোপীনাথ দুজনকেই জানাই যুক্ত করযুক্ত প্রণাম।

গোপীনাথ কবিরাজ মহাপ্রাজ্ঞ, গোপীনাথ কবিরাজ শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক গোপীনাথ কবিরাজ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। কিন্তু সবার উপরে গোপীনাথ কবিরাজ 'পরম ভাগবত',—বলেছেন পণ্ডিচেরীর দিলীপ কুমার রায়। ঠিক বলেছেন তিনি। গোপীনাথ কবিরাজ পরম ক্ষ্যাপা পুরুষ ! আমি জানি। আমি জানি যে, গোপীনাথ কবিরাজ যাঁদের কাছে পণ্ডিত বলে আদৃত, তাঁদের কাছেই ক্ষ্যাপা বলে উপহসিত। এই নিয়ম, এই হয়। কারুর বেলাতেই এর ব্যতিক্রম হবার নয়। অলডাস হাক্সলি ঈশ্বরকে ব্যঙ্গ করার জন্যে নন্দিত হয়েছিলেন যৌবনকালে। জীবনের সায়াহ্ন বেলায় ঈশ্বর-ব্যাকুলতার জন্যে আ

নিন্দিত। শ্রীঅরবিন্দ রাষ্ট্র বিপ্লবের গুরু বলে বন্দিত আজও। এই জগতের আত্মন্তকালের ইতিহাসে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক বিপ্লবের পথিকৃৎ বললে, শ্রীঅরবিন্দকে তৎক্ষণাৎ আপনার বক্তব্য হলো অন্ধ ভক্তির উচ্ছ্বাসমাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলাকার কবি—এ বললে আপত্তি নেই ; গীতাঞ্জলির কবি রবীন্দ্রনাথ বললেই বিপত্তি।

এই ভক্ত গোপীনাথ দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে লিখেছেন :

......'কি যেন একটা মহাক্ষণের প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে বসিয়া আছি—একমাত্র সেইদিকেই সচেতন লক্ষ্য রহিয়াছে। সেই মহাক্ষণ ...যে কোনো সময়ে ফুটিতে পারে। আশীর্বাদ করুন এবং ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করুন যেন সেই মহাক্ষণের প্রকাশে আমি ধন্য হইয়া যাই। ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের মহাসন্ধিরূপে সেই মহাক্ষণ পুরুষোত্তমের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।...কালের অতীত সর্বকালময় সেই মহাক্ষণেই যাত্রার অবসান ও একমাত্র বিশ্রাম।'

চিঠির শেষে আবার :

"কিন্তু সে অবসানও অবসান নয়। সেই অবসানের মধ্যেই অসীম স্পন্দনের অভিনব লীলার প্রারম্ভ—যে লীলার অবসান নাই।"

যে মুহূর্তটি জীবনে মূর্ত হবার অপেক্ষায় গোপীনাথ আছেন, সেই অনন্ত মুহূর্ত তাঁর সমস্ত বাসনাকে সোনা করে দিয়েছে। গোপীনাথ কত জানেন। কেবল এইটুকুই আজও জানেন না। মহৎ মানুষের মহত্তম ট্রাজিডিই এই। আজও তিনি ক্ষ্যাপার মতন খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই অপ্রত্যক্ষকে—যিনি প্রত্যক্ষ গোপীনাথ নিজেই! পরশপাথরের স্পর্শে বাসনার লোহা যার সোনা হয়ে গেছে, সেই মহৎ ভাগ্যবান গোপীনাথ ছাড়া আর কে? এবং সে খবর আজও যে নিজে রাখে না, সেই বৃহৎ হতভাগ্যও গোপীনাথ ছাড়া আর কে?

'সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোনার বটে
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।'

একা গোপীনাথ নন। এমনই কত ক্ষ্যাপা দেশে দেশে কালে কালে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে কত সন্ধ্যা কত সকালে বন্ধনমুক্তির পরশপাথর পেয়ে ফেলে দিয়েছে দূরে, ফেলে দিয়েছে, ছুঁড়ে :

'কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত
ঠন করে ঠেকাইত শিকলের'পর—
চেয়ে দেখিত না নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথর।'

পরশপাথর ছুঁড়ে ফেলে—পরশপাথর দূরে ফেলে—আমরা সবাই পাথরের নুড়ি বয়ে বেড়াচ্ছি আজও। এই পৃথিবী যাঁর প্রত্যক্ষ বিগ্রহ, তার অসংখ্য মানুষকে সর্বপ্রকার বন্ধনের মধ্যে রেখে মুক্তির আশায় চোখ বন্ধ করে বসেছি আমরা। চোখ চাইলে দেখতাম বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ মানুষকে অনাথ রেখে, উপবাসী রেখে বিশ্বনাথের মাথায় বেলপাতা, গংগাজল, দুধ ঢেলেছি। চোখ মেলে দেখলে আমরা দেখতাম, পবিত্রতার, ত্যাগের, বীর্যের, সুন্দরের প্রতীক 'সতী' আবার দেহত্যাগ করেছেন অপমানিত শুভ ও শিব-এর অসম্মানে। চোখ মেলে দেখলে আমরা দেখতাম, শিব আবার ধারণ করেছেন সংহারমূর্তি। জটার বাঁধন খুলে পড়েছে আবার। প্রলয়নৃত্যের সূচনায় বিশ্বের আকাশ ঝড়ের আগে থমথম করছে।

চোখ মেলে বিশ্বনাথের পূজা করেছিলেন শুধু একজন। বিশ্বনাথ-পুত্র বীরেশ্বর বিবেকানন্দ! বিলে, বীরেশ্বর, নরেন্দ্র—যাঁর পুণ্য নাম—সেই স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরের পায়ে 'দক্ষিণে' যিনি অদ্বিতীয় প্রণাম।

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ আমাকে যে বলেছিলেন, ব[...] এখনও তাঁরা আছেন—যাঁদের জন্যে ভারতবর্ষ আজও ভারতবর্ষ, এখনও কাশী, তাঁদের কারুর কারুর কথা তিনি লিখেছেন তাঁর বইতে। বইটির নাম,—'সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ'। এই বইতে কথা তিনি লিখেছেন, তাঁরা সবাই কাশীর লোক নন, কিন্তু তাঁদের সকলেরই একমাত্র লোক। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে এখনও যত মহাত্মা এসেছেন, কাশী তাঁদের সকলেরই আত্মার আলোক।

সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ডের শেষে ডক্টর গোপীনাথ আ[...] একটি অদ্ভুত বালকের কথা শুনিয়েছেন। ১১৩৭ সালের অ[...] মাসে এই অদ্ভুত বালকের কথা গোপীনাথকে তাঁর এক বন্ধু শ্রুতিগোচর করান। কাশীতে তখনই এই বালক বহু লোকে[...] কোন কোন কাগজেরও আলোচনার বিষয় হয়েছে। শোনা[...] যে, বালকটি নাকি তার স্থূল শরীর ত্যাগ করে সূক্ষ্ম দেহে [...] লোকান্তর ঘুরে এসে সব্যাখ্যা তার আশ্চর্য বর্ণনা দেয়। [...] জংগম-বাড়ীতে সেই অদ্ভুত ছেলেটির বাস। তার নাম কেদার[...] জাতি মালাবার, এবং বয়স যোল বৎসর। মা এবং বড় বোন[...] বালকের অভিভাবক ছিলো না কেউ। বাঙালী-টোলা উচ্চ বি[...] অষ্টম শ্রেণীতে তখন পাঠরত ছিলো এই অদ্ভুত বালক।

গোপীনাথ তাঁর মা ও দিদির সংগে আলাপ করে বুঝলে[...] তাঁদের এবং তাঁদের পরামর্শ-দাতাদের ধারণা বালকটিকে ভূতে [...] অথবা বায়ুর কোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। চিকিৎসায় ফল না পেয়ে, ওঝাও ডেকেছেন। তাতেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হ[...] বালকের মা তাঁর একমাত্র পুত্রের আরোগ্য কামনায় সাধ্যের [...] করেননি সর্বপ্রকার চিকিৎসার। এই অবস্থায় ডক্টর গো[...] গেলেন কেদারের কাছে। কেদারকে প্রশ্ন করতে সে তার [...] তার অপূর্ব—ইতিহাস এইভাবে ব্যক্ত করে :

'আমার কোন রোগ হয় নাই, এবং কোন প্রকার বি[...] আমাতে উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু মা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন [...] আমার চলাফেরা, কথাবার্তা ও সাধারণ ব্যবহার অন্য লোক [...] একটু পৃথক ভাবের বলিয়া উঁহারা আমাকে রোগী বলিয়া [...] করিতেছেন। কিন্তু আমি রোগী নহি। আমি যখন দেহ [...] বাহির হইয়া যাই—তখন আমার জ্ঞান থাকে, বাহিরে যাইয়া [...] স্থান দর্শন করিয়া পুনর্বার যখন নিজ দেহে ফিরিয়া আসি, ত[...] বোধ থাকে এবং পূর্বের স্মৃতি বর্তমান থাকে। শুধু তাহাই [...] সূক্ষ্ম-জগতে বিচরণ করিবার সময় একটা ক্রম ধরিয়া বিচরণ করি[...] ক্রম আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একদিনের অভিজ্ঞ[...] সহিত অন্য দিনের অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ আছে। সুতরাং আমি ই[...] বিকৃতি বলিয়া মনে করি না।' [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ১ম পৃ ১৬০-১৬১]

কাশীর জঙ্গম-বাড়ীর কেদার নামে এই অদ্ভুত বালকের পূর্ব অপূর্ব অভিজ্ঞতা এইরকম। ডক্টর গোপীনাথের সংগে সাক্ষাতের এক অথবা দেড়মাস আগে, ১১৩৭ সালের

বা সেপ্টেম্বর মাসে একটি বন্ধুর সংগে কেদার দশাশ্বমেধ বাজারে যায়। বাজারে ঢোকবার আগে একটি রক্তবর্ণ পুরুষকে কেদারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে সে। কেদারের এমনও মনে হয় যে, কেদারের শরীর স্পর্শ করবার জন্তে সে সচেষ্ট ছিলো। বাজারে যাবার সময় আগাগোড়া কেদার সেই বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে ছিলো। বাজারের মুখে বন্ধুটি বিদায় নিলে, সেই রক্তবর্ণ পুরুষ কেদারকে ছুঁয়ে দেয়। তারপর সে অদৃশ্য হয়; কেদার বাজার করে বাড়ী ফেরে; এবং একসময়ে সে ভুলে যায় এসব কথাই। রাতে তার জ্বর আসে এবং কয়েকদিন ধরে সেই জ্বর থাকে। এই জ্বরের সময়ে একদিন সে তার স্বর্গত বাবাকে দেখে; বাবার সংগে ছিলেন বাবার মৃত গুরু রসিক বাবু। তাঁরা কেদারকে দেহ থেকে বেরিয়ে তাঁদের সংগে যেতে বলেন। কেদার প্রথমে রাজি হয় না। তাছাড়া দেহ থেকে সজ্ঞানে বেরুবার উপায়ই বা সে জানবে কোথা থেকে। কিন্তু একদিন এঁদেরই প্রভাবে কেদার দেহ থেকে বেরিয়ে পড়ে। কিভাবে দেহ থেকে সূক্ষ্মদেহ বিচ্ছিন্ন হয়, তাও দেখলো এবং পরলোকগতদের অনুসরণ করে কেদার বহু লোক-লোকান্তর পরিভ্রমণ করে আসে।

এরপর কেদার রোজই একবার, কখনও কখনও একদিনে একাধিকবার সূক্ষ্ম দেহে বেরিয়ে পড়তো এবং এই সময়েই তার মা ও দিদি তাকে বিকারগ্রস্ত মনে করেছিলেন এই সময়েই কবিরাজ মশাই তাকে দেখেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সুনিশ্চিত হন যে, কেদারের দেহের বা মনের বিকার নয় ব্যাপারটা, অলৌকিক শক্তির ক্রীড়ার ফল। কেদারের মা, দিদি ও অন্যান্য হিতৈষীদেরও তা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ।

প্রথম প্রথম কেদারকে নিয়ে যেতো এবং আবার মর্ত্য শরীরের কাছে পৌছে দিত দেবদূতেরা। কেদার তার সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ করে স্থূল দেহে প্রবেশ করত নিজেই। পরে দেবদূতের প্রয়োজন হত না; সে নিজেই যেত এবং ফিরে আসতে পারত। প্রথম প্রথম তার পরিত্যক্ত স্থূল দেহ স্পর্শ করে থাকতে হত কাউকে না কাউকে। একদিন যার স্পর্শ করে থাকার কথা সে অল্পসময়ের জন্তে দেহ ছেড়ে অন্যত্র গেলে একটি দুষ্ট স্বভাবের বিদেহী জোর করে কেদারের পরিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। ভাগ্যক্রমে কেদারের সূক্ষ্ম শরীর তখনই তার স্থূল শরীরের কাছে এসে পড়ে এবং সে রক্ষা পায়।

কেদার যেসব জায়গায় যেত ওই স্তরে সে জীবিত ও পরলোকগত দুরকম অবস্থায় স্থিত আত্মাদের দেখতে পেত। কাশীর প্রসিদ্ধ উলংগ তাপস হরিহর বাবা তখন জীবিত। কিন্তু কেদার সূক্ষ্ম শরীরে ধ্রুবলোক থেকে ফিরে এসে বলে: "হরিহর বাবা আর অধিকদিন এ জগতে থাকিবেন না, কারণ ধ্রুবলোকের নিকট তাঁহার সত্তা অধিক পরিমাণে স্থিতি লাভ করিয়াছে। ঐটি তাঁহার মুক্ত আত্মার স্থিতিভূমি। তিনি ইচ্ছামৃত্যু বলিয়া ঐ উর্ধ্বস্থিত আত্মার ইচ্ছানুসারেই তাঁহার দেহাশ্রিত আত্মা আকৃষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করিয়া উর্ধ্বে চলিয়া যাইবে। এই মহাপুরুষের কর্ম কাটিয়া গিয়াছে।" [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড পৃ ১৬৫]

কেদারের স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করার সম্পর্কে ডক্টর গোপীনাথ লিখছেন:

"কেদার প্রায়ই বামচক্ষু দিয়া বাহির হইত। কখনও কখনও দক্ষিণ চক্ষু দিয়াও হইত। তিনবার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তখন বাহির হওয়ার প্রণালী জ্ঞানগোচর হয় নাই। সে বলিত—চক্ষুর রাস্তাটি শুদ্ধ—মুখের রাস্তাটি এত শুদ্ধ নহে। অন্যান্য রাস্তা আরও অধিক অশুদ্ধ। এক চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া অন্য চক্ষু দিয়া ঢোকা যায়, তাহাতে কোন বাধা হয় না। সে আরও বলিত যে, দেহে ঢুকিবার পূর্বে দেহস্থ চক্রের ক্রিয়া শিথিল হইয়া পড়িত।—ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর নিকটবর্তী চক্রটির সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে চক্রটি বেগে চলিতে থাকিত। এদিকে অন্যান্য চক্রের চলনক্রিয়াও পূর্বাপেক্ষা তীব্র হইত। এতক্ষণ ঐ সব চক্রও ধীরগতি ও স্তিমিতপ্রায় হইয়াছিল। একটি অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ জিনিষ সমস্ত দেহে ছড়াইয়া থাকে, ব্যাপ্ত থাকে, তাই সব চক্র চলে। দেহ হইতে বাহির হইবার সময় ঐ তেজোময় পদার্থটিকে গুটাইয়া কোন দ্বার দিয়া বাহির হইতে হয়। তখন দৈহিক চক্রগুলি আবার নিস্তেজ হইয়া পড়ে। [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ: ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬৪-১৬৬]

ক্রমে এমন অবস্থা হয়েছিলো কেদারের—যখন তাকে স্থূল দেহ ত্যাগ করে যেতে হত না। স্থূল দেহেই দেশগত ব্যবধান দূর করে লোক-লোকান্তরের দৃশ্য সামনে উদ্ঘাটিত হতো। এই অবস্থায় একজন সিদ্ধ পুরুষ কেদারকে বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন। সে ঘটনা চমৎকারিত্বে ব্যাখ্যা ও বুদ্ধির অনধিগম্য। এখন সে কথাই বলব।

[ক্রমশঃ।

তীর ও গান

(Lonfellow অবলম্বনে)

শ্রীবীথিকা পাল

আমি বিঁধেছিনু একটি যে তীর
　　কোথায় তা আমি জানি নাই,
পলক ফেলিতে হারাইনু তারে
　　কোথা তা স্মরণে নাই।
তারি সাথে আমি গেয়েছিনু গান
　　সে গান হাওয়ায় ভাসিল,
কে আছে এমন সঙ্গীত-প্রাণা
　　সে গান হৃদয়ে গাঁথিল?

এরপর বহুদিন কেটে গেছে
　　দেখি বেঁধা এক 'ওক' গাছে
সেদিনের সেই তীরখানি মোর
　　তখনও অটুট আছে।
বিঁধেছিলো বুঝি মরমে তাহার
　　মোর সেদিনের গানখানি
গাহিতে আবার শুনি যে আমার
　　এক বন্ধুকে সবখানি।

কলম্বো-প্রস্তাব ও চীনের ক্রূরতা—

চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধের মীমাংসায় সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে কলম্বোয় গৃহীত ছয়টি নিরপেক্ষ আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের যে প্রস্তাবাবলী গোপন রাখা হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক ডিসেম্বর মাসের শেষে প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করিবার জন্য পিকিং গিয়াছিলেন, জানুয়ারী মাসের প্রথমে তিনি আসেন দিল্লীতে। কলম্বো প্রস্তাবাবলীতে এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে যে, চীন সম্প্রতি সশস্ত্র তৎপরতায় যে অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল, তাহা চীনের অধিকারভুক্ত থাকিবে না। প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ—পূর্ব্ব-সীমান্তে দুই পক্ষ ম্যাক-ম্যাহন লাইন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিবে; তবে, কেহই লংজু ও থাগ্‌লা পর্ব্বতপৃষ্ঠ অধিকার করিবে না—এই দুইটি অঞ্চল সম্পর্কে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা উভয় পক্ষের পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। লাদাক অঞ্চলে চীনারা তাহাদের অবস্থানক্ষেত্র হইতে বিশ কিলোমিটার অপসরণ করিবে, তবে, ভারত এই অঞ্চল অধিকার করিবে না—মধ্যবর্ত্তী শূন্য অঞ্চলটিতে ভারতের ও চীনের বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। মধ্য অঞ্চলের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকবে। ভারতের দাবী ছিল চীনকে ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের অবস্থানক্ষেত্রে সরিয়া যাইতে হইবে; কলম্বো শক্তিবৃন্দের প্রস্তাবে এই দাবী পূরণ হইয়াছে; পশ্চিম অঞ্চলে সর্ব্বত্র বিশ কিলোমিটার অপসরণ করিলে চীনারা কোথাও ৮ই সেপ্টেম্বরের লাইন হইতে বেশী দূরে যাইবে এবং কোনও কোনও জায়গায় ঐ লাইনের সামান্য আগে থাকিবে। তবে মোটামুটি ভারতের দাবী অনুযায়ীই এই অঞ্চলে চীনাদের অবস্থানক্ষেত্র কলম্বো-প্রস্তাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্বভাবতঃ ভারত সরকার কলম্বো-প্রস্তাব এবং উহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার সম্মতি জানাইয়াছেন। ভারতীয় পার্লামেণ্ট তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদনও করিয়াছেন। কিন্তু চীন উল্টা সুর ধরিয়াছে। শ্রীমতী বন্দরনায়ক যখন পিকিং-এ ছিলেন, তখন চৌ-বন্দরনায়ক যুক্ত-বিবৃতিতে বলা হয় যে, চীনারা কলম্বো প্রস্তাবে 'সুনির্দ্দিষ্ট সাড়া' দিয়াছে। ইহার পর, চীনের পররাষ্ট্র-সচিব মার্শাল চেন য়ি বলেন যে, তাঁহারা কলম্বো প্রস্তাবের মূল নীতি স্বীকার করিয়াছেন। পরে, এই 'সুনির্দ্দিষ্ট সাড়া'র ও মূল নীতির ব্যাখ্যায় জানা গিয়াছে যে, চীনারা কলম্বো প্রস্তাব অনুযায়ী (তাহারা নিজেরাও ২১শে নভেম্বর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে) অপসরণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহাদের আবদার—পূর্ব্ব সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য ফুট হিলসের উত্তরে যাইতে পারিবে না, ম্যাক-ম্যাহন লাইন পর্য্যন্ত ভারতের অসামরিক কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। পশ্চিম অঞ্চলে উভয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তী শূন্য অঞ্চলে ভারতীয়দের বেসামরিক ক[illegible] প্রসারিত হইতে দিতেও চীনাদের আপত্তি, গোটা সাতেক অতির[illegible] চৌকিও তাহারা চাহে। ভারত চীনের এই অন্যায় আবদার [illegible] করিবে না বলিয়া জানানো হইয়াছে। কলম্বো প্রস্তাব এবং কলম্বো শক্তিবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাহার ব্যাখ্যা ভারত পুরাপুরি গ্রহণ করি[illegible] প্রস্তুত; চীনও যদি সেই প্রস্তুতি জানায়, একমাত্র তাহা হইলে ভারত-চীন আপোষ-আলোচনা আরম্ভ হইতে পারে। ভারত-চ[illegible] সীমান্ত-বিরোধ এবং কলম্বো শক্তিবৃন্দ কর্ত্তৃক মীমাংসার চেষ্টা বর্ত্তমা[illegible] এই পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের মনোভ[illegible] স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করা হইয়াছে: এখন চীনের অস্পষ্ট 'সুনির্দিষ্ট সা[illegible]' যদি স্পষ্ট পরিপূর্ণ সাড়ায় পরিণত হয়, তাহা হইলে ভারত ও চীনে[illegible] আপোষ-আলোচনা সম্ভব হইবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ল[illegible] করিবার বিষয়—কলম্বো-প্রস্তাবে ভারতের কূটনৈতিক বিজয় সূচি[illegible] হইয়াছে। চীন তাহার শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র ব্যবহার করিয়া নিরপেক্ষ আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলিকে তাহার দাবীর যৌক্তিক[illegible] বুঝাইতে সমর্থ হয় নাই। ভারত বরাবর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এ[illegible] আদর্শ প্রচার করিয়া আসিয়াছে যে, সশস্ত্র আক্রমণের দ্বা[illegible] পররাজ্য গ্রাস করা চলিবে না; বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে [illegible] কোন বিরোধই থাকুক না, শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা অথ[illegible] নিরপেক্ষ মধ্যস্থতার দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। কলম্বো শক্তিবৃন্দ তাঁহাদের প্রস্তাবে এই আদর্শই অনুসর[illegible] করিয়াছেন।

পাক-ভারত আলোচনা—

গত ডিসেম্বর মাসে রাওলাপিণ্ডির আলোচনার সূত্র ধরিয়া পাক্ মন্ত্রী ভুট্টো ও ভারতের মন্ত্রী সরওয়ান সিং ১৭ই জানুয়ারী হইতে ১৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত দিল্লীতে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় প্রবৃ[illegible] হইয়াছিলেন। স্থির হয় যে, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে করাচীতে তাঁহাদের তৃতীয় দফা আলোচনা হইবে। দিল্লীতে মিঃ ভুট্টো সর্ব্বাগ্রে কাশ্মীর-প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য জিদ্ ধরিয়াছিলেন যাহার ফলে প্রথম দিনেই আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয় পরে, প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর নিকট হইতে নির্দ্দেশ পাইয়া মিঃ ভুট্টো আলোচনা চালাইয়া যান। কিন্তু এই আলোচনায় মীমাংসার সম্ভাবনা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই; বরং সন্দেহ করিবার কারণ আছে যে, আলোচনা ব্যর্থ হইবার দায়িত্ব ভারতের স্কন্ধে চাপাইবার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানের পক্ষ হইতে আলোচনার সূত্রে টানিয়া চলা হইতেছে।

কঙ্গো নাটকের আড়াই বৎসর—

সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর পরে কঙ্গোয় রাজনৈতিক সংহতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ১৯৬০ সালে জুন মাসে কঙ্গো বেলজিয়ান্ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত হইবার পর এই দীর্ঘ কাল এখানে যে আন্দোলন চলিল, একমাত্র আভ্যন্তরীণ অনৈক্যই ইহার কারণ নহে। সত্য বটে, এই দুর্ভাগ্য রাজ্যে "ট্রাইব্যাল" কলহ আছে, আঞ্চলিক বিভেদ ও দ্বন্দ্ব আছে; কিন্তু বাহিরের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলি যদি কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিত, তাহা হইলে স্বাধীন কঙ্গোর রাজনৈতিক সংহতি এত সমস্যা-কণ্টকিত হইয়া উঠিত না। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কঙ্গোলী সেনাবাহিনী যখন বিদ্রোহী হয়, তখন প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা বাহির হইতে সাহায্য লইবার প্রয়োজন বোধ করেন। প্রতিবেশী আফ্রিকান রাজ্যগুলি হইতে এবং কোনও কোনও দূরবর্তী মিত্র রাষ্ট্রের নিকট হইতেও তিনি প্রয়োজনীয় সাহায্য পাইতে পারিতেন; কিন্তু বিশ্বের শান্তি যাহাতে বিঘ্নিত না হয়—আফ্রিকায় যাহাতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ প্রবেশ করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রসংঘের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই শিশু রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ অভিভাবক হিসাবে—স্বাধীন ও প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে ইহার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে এখানে আসিল না, আসিল আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া-শক্তির এজেণ্ট হিসাবে। প্যাট্রিস লুমুম্বা ও তাঁহার সহযোগিগণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া কঙ্গোকে প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতি পদে এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিল। কঙ্গোয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের তৎকালীন ভূমিকা সম্পর্কে ঘানার প্রেসিডেণ্ট নক্রুমা বলিয়াছেন, "Instead of preserving law and order the United Nations declared itself neutral between law and disorder, and refused to lend any assistance whatever to the legal Government in suppressing the mutineers who had set themselves up in power in Katanga and South Kasai." অর্থাৎ, "রাষ্ট্রসঙ্ঘ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার পরিবর্তে আইন ও বিশৃঙ্খলার মাঝখানে নিজেকে নিরপেক্ষ ঘোষণা করিল; যে সব বিদ্রোহী কাটাঙ্গায় ও দক্ষিণ কাসাইএ নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য আইনসঙ্গত গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিল।" শুধু তাহাই নহে—বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের জন্য লুমুম্বা গভর্ণমেণ্ট যখন সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট হইতে কিছু বেসামরিক বিমান ও মোটর গাড়ী সংগ্রহ করিলেন, তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোনও কোনও মহল হইতে চীৎকার উঠিল, কিন্তু বিদ্রোহীদের পক্ষে বেলজিয়ান অস্ত্র ও সৈন্য আসিতে দেখিয়াও তাঁহারা অর্থপূর্ণ নীরবতা রক্ষা করিলেন। কঙ্গোর সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল—পার্লামেণ্টের অনাস্থা-প্রস্তাব ব্যতীত প্রধান মন্ত্রীকে অপসারণ করা যাইবে না। অথচ, কাসাভুবু যখন বে-আইনীভাবে লুমুম্বাকে পদচ্যুত করিলেন, তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকাই লইল না—এই অন্যায় আচরণের পরোক্ষ সমর্থনে লুমুম্বাকে জনসাধারণের নিকট বক্তব্য জানাইবার জন্য রেডিও ব্যবহার করিতে দিল না। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহীরা যখন শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিল, এবং সম্পূর্ণ বে-আইনী গভর্ণমেণ্ট (মবতুর নেতৃত্বাধীন গভর্ণমেণ্ট) গঠন করিল, তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাহাদিগকে বাধা দিল না। কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান্ সৈন্য অপসারণের অন্যতম উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কঙ্গোয় গিয়াছিল; কিন্তু ধীরে ধীরে আবার কঙ্গোয় বেলজিয়ানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। কাটাঙ্গার বিদ্রোহী সোম্বে নির্বিঘ্নে বেলজিয়াম্ ও দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান আমদানী করিল। বস্তুতঃ, The United Nations connived at the setting up..of an independent Katanga.—রাষ্ট্রসঙ্ঘ অজ্ঞতার ভান করিয়া স্বাধীন কাটাঙ্গার প্রতিষ্ঠায় পরোক্ষে সহায়তা করিয়াছিল। দেশের আইনসঙ্গত প্রধান মন্ত্রীকে রেডিও ব্যবহার করিতে না দিবার সময় রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাহার যে নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়াছিল, সেই নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্যই হয়ত বিদ্রোহীদের দ্বারা লুমুম্বার গ্রেপ্তারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাধা দেয় নাই। কঙ্গোর বিমানঘাঁটিগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীন থাকা সত্ত্বেও কাসাভুবু-মবতু কোম্পানী লুমুম্বাকে ইহার একটি ঘাঁটি হইতে বিমানযোগেই সোম্বের নিকট পাঠাইয়াছিল—"নিরপেক্ষ" রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইহা দেখিয়াও দেখে নাই। সুতরাং, কেবল কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতার জন্যই নহে—লুমুম্বার হত্যার জন্যও তৎকালীন রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে দায়ী, ইহা মনে করা অযৌক্তিক নহে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কাটাঙ্গার কারাগারে লুমুম্বার উপর অত্যাচার হইবার সংবাদ পুনঃপুনঃ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ হইতে কোনও তদন্তের ব্যবস্থা হয় নাই। লুমুম্বাকে ধরাবদ্ধ হইতে অপসারণ করিবার পর তাহার সহকর্মীদিগকেও সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। কাসাভুবু-মবতু কোম্পানী লুমুম্বার সমর্থকদের অনেককেই দক্ষিণ-কাসাইতে প্রেরণ করে। সেখানে কালঞ্জীর নির্দেশে অন্ততঃ ষোল জন নিহত হইয়াছিল। ইহাতেও প্রতিক্রিয়া-শক্তি নিষ্কণ্টক হইল না। লুমুম্বার নিজের প্রদেশ ওরিয়েণ্টেলে নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিল। এই প্রদেশের এণ্টোনি গিজেঙ্গা ছিলেন লুমুম্বার সহকারী প্রধান মন্ত্রী—পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তিনি নির্বাচিত। লুমুম্বার মৃত্যুর পর তিনি ঘোষণা করিলেন যে, কঙ্গোর আইনসঙ্গত মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের অধিকার তাঁহারই। বাহিরের কোনও কোনও শক্তি গিজেঙ্গা গভর্ণমেণ্টকে কঙ্গোর ন্যায়সঙ্গত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এদিকে কঙ্গোয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যর্থতার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে সেক্রেটারী-জেনারেল হ্যামারশেল্ডের পদত্যাগ দাবী করা হয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠী কর্তৃক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপাপিত হইল। ১৯৬১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত এই প্রস্তাবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী কঙ্গো হইতে অবিলম্বে বেলজিয়ানদিগকে অপসারণ করিতে বলা হয়; কাঙ্গোর গৃহ যুদ্ধ নিবারণের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়; লুমুম্বার মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করিতে বলা হয় এবং যথাসম্ভব শীঘ্র পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকিয়া কঙ্গোয় আইনসঙ্গত স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব রচনায় প্রধান উদ্যোক্তা ভারত, এবং উহা

মধ্যস্থতা প্রয়োগে সহায়তা করিবার জন্ত ভারত হইতে পাঁচ হাজার যোদ্ধ্-সৈন্ত কঙ্গোয় পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল।

এই প্রস্তাব অনুসারে প্রথম ও প্রধান কাজ—ঐ বৎসরের মাঝামাঝি পার্লামেণ্ট আহ্বান করিয়া সীরিল আডুলার নেতৃত্বে নূতন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা। প্রথমে এণ্টনে গিজেঙ্গা এই নব-গঠিত গভর্ণমেণ্টে যোগ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে এই মন্ত্রিমণ্ডলে থাকা সম্ভব হইল না। পরে তিনি গ্রেপ্তার হন, বর্তমানে তিনি কারাগারে। নূতন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেও কঙ্গোর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজ বেশী দূর আগাইল না। ইহার দুইটি কারণ —প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল অধুনা গভর্ণমেণ্টকে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদীদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে চাহিল, দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক স্বার্থবান মহলের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দিল। প্রথমতঃ উল্লেখযোগ্য, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল হ্যামারশল্ড ইতিমধ্যে কঙ্গো হইতে রোডেসিয়ায় যাইবার সময় এক বিমান-দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, যে দুর্ঘটনা কতকটা সন্দেহজনক অবস্থায় ঘটে। যাহা হউক, ক্রমে সীরিল্ আডুলা সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার দিকে ঝুঁকিলেন, বেল্‌জিয়াম্ হইতে উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ আমদানী করিতে লাগিলেন—গিজেঙ্গপন্থী জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে পীড়ন-নীতি অবলম্বন করিলেন। সব দিক দিয়েই তিনি ওয়াশিংটন্ কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইলেন। সুতরাং তাঁহাদের দিক হইতে আডুলা গভর্ণমেণ্টকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ বাড়িল। কঙ্গোকে সংহত করিতে হইলে কাটাঙ্গাকে পৃথক্ থাকিতে দেওয়া কখনও চলে না, কারণ কঙ্গোর অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র কাটাঙ্গা—"Without the copper revenues of Katanga the rest of the Congolese people will starve. No State can be built in this area capable of achieving stability and giving hope to its people if the small area where considerable wealth is produced is allowed to hive off, leaving the rest of the community without resources." (John Hatch) অর্থাৎ, "কাটাঙ্গার তামার রাজস্ব না পাইলে অবশিষ্ট কঙ্গোলী জনসাধারণকে উপবাস করিতে হইবে। যে ক্ষুদ্র অঞ্চলটিতে প্রচুর সম্পদ উৎপন্ন হয়, তাহা যদি বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার পায় এবং জাতির অবশিষ্ট অংশ যদি সম্পদের উৎস হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে এখানে এমন কোনও রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়, যাহা সুসংহত হইতে পারে এবং জনগণের মনে আশার সঞ্চার করিতে পারে।" এই কারণে কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতাকামী তৎপরতা বন্ধ করিবার জন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের তৎপরতা এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ সমর্থন পাইতে আরম্ভ করিল। ইউনিয়েন মিনিয়েরে নামক যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি কাটাঙ্গার খনি-সম্পদ আহরণ করে, তাহার মালিকরা এতকাল সোম্বেকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছিল। এখন তাহাদের উপর আমেরিকার চাপ আসিতে লাগিল—খনি-রাজস্বের অন্ততঃ একটা মোটা অংশ যাহাতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়, তাহার জন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের নূতন সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্টের পরিকল্পনা আমেরিকার সমর্থন লাভ করল। আমেরিকার সমর্থন লাভের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া সোম্বের বিচ্ছিন্নতাকামী তৎপরতা অনায়াসে বন্ধ করা সম্ভব হইত। কিন্তু ইউনিয়েন মিনিয়েরের বৃটিশ ও বেলজিয়াম্ শেয়ারহোল্ডাররা সোম্বেকে সমর্থন করিতে লাগিলেন; বৃটিশ সরকার সোম্বের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রবল বিরোধিতা করিলেন। সোম্বে ইহার সুযোগ লইয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ-মীমাংসার জন্ত আলোচনার অভিনয় করিতে লাগিলেন এবং অন্তদিকে ইউনিয়েন মিনিয়েরের অর্থে সেনাবাহিনীকে উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বিমান কিনিলেন, মোটা মাহিনায় শ্বেতাঙ্গ ভাড়াটিয়া সৈন্ত সংগ্রহ করিলেন। সোম্বে লিওপোল্ডভিলে যাইয়া মীমাংসার সর্তে রাজী হন, কিন্তু এলিজাবেথভিলে ফিরিয়াই অন্ত কথা বলেন। এইজন্ত কাটাঙ্গা-সমস্যার মীমাংসার জন্ত সোম্বের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। "Repeated negotiations have failed, and it has long become clear that Mr. Tsombe will stick to no bargain, even when freely concluded by himself, unless the U. N. is in a physical position to enforce its terms."—(New Statesman) অর্থাৎ, "পুনঃপুনঃ আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে; বহু পূর্বেই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, সর্তাবলী প্রয়োগের বাস্তব অবস্থা যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘের আয়ত্তে না আসে, তাহা হইলে সোম্বে তাঁহার নিজের সম্পাদিত স্বাধীন চুক্তিও মানিয়া চলিবেন না।"

এই অবস্থায় গত ডিসেম্বর মাসের শেষে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সেনাবাহিনী কাটাঙ্গার বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা আরম্ভ করে। সোম্বে তৎক্ষণাৎ এলিজাবেথ্‌ভিল্ হইতে পলাইয়া উত্তর-রোডেসিয়ায় যান; কিন্তু সেখানে তাঁহার মিত্র রোডেসিয়া ফেডারেশনের প্রধান মন্ত্রী স্যর রয় ওয়েলেনস্কির নিকট কোনও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান না। ফিরিয়া আসিয়া তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘকে নিরস্ত করিবার জন্ত অনেক চাল চালিলেন। কখনও আল্‌জিয়ার যুদ্ধের মত দীর্ঘকাল গেরিলা যুদ্ধের হুমকী দিলেন, কখনও খনি অঞ্চল ধ্বংস করিবেন বলিয়া শাসাইলেন; মাঝে মাঝে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত আপোষ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্ত আগ্রহও প্রকাশ করিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এবারও রাষ্ট্রসঙ্ঘের শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইল। কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হইল না; আমেরিকার সমর্থনে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সামরিক তৎপরতা চলিতে লাগিল। এই সময় আমেরিকার দৃঢ়তা অবলম্বনের একটা বিশেষ কারণও ছিল। গিজেঙ্গাপন্থী জাতীয়তাবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় সীরিল আডুলার মন্ত্রিমণ্ডল বিপন্ন হইয়া ওঠে; দ্রুত কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাইতে না পারিলে আমেরিকার নির্ভরযোগ্য এই মন্ত্রিমণ্ডলকে রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তৎপরতা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে জেনারেল ট্রুম্যানের নেতৃত্বে একটি মার্কিণ সামরিক মিশন কঙ্গোয় যাইয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ-বাহিনীর প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্ধান লইয়া আসেন। যাহা হউক, সোম্বের সমস্ত চাতুরী ব্যর্থ করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেনাবাহিনী সমস্ত কাটাঙ্গায় তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; ইউনিয়েন মিনিয়েরে কোম্পানীও তাহাদের রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে দিবার জন্ত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। সোম্বে এই অবস্থায় কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সামরিক চাপে কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতার অবসান হইলেও, এখানে সমস্যার বীজ এখনও রহিয়া গেল। পশ্চিম-ইউরোপীয় শক্তিবর্গের—বিশেষত: বৃটিশের চালে সোম্বেই কাটাঙ্গা প্রদেশের প্রেসিডেণ্ট থাকিলেন। এই হীন চরিত্রের লোকটি যে ভবিষ্যতে সমস্যা সৃষ্টি করিবে, তাহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ হইতে কঙ্গোয় অবস্থিত প্রাক্তন প্রতিনিধি ডা: ও'ব্রেইন বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সামরিক তৎপরতায় কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতার অবসান হইবার পর ইউনিয়েন মিনিয়রের রাজনৈতিক সৃষ্টি মি: সোম্বেকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া বিচ্ছিন্নতার রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করা হইল। তিনি বলেন—কি রাজনৈতিক বিবেচনায়, কি আইনগত বিচারে, সোম্বেকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা অত্যন্ত কাঁচা ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যাকারীদের বিচারের ব্যবস্থা করিবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। সোম্বে এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ আছে। বস্তুত: রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি কমিশন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সোম্বে ও তাহার সহযোগীরাই হয়ত এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত নায়ক। সুতরাং সোম্বেকে বিচারাধীন বন্দীরূপে কারাগারে পাঠানোই উচিত ছিল।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গেরিলা তৎপরতা—

দক্ষিণ-ভিয়েৎনামে ভিয়েৎ কং গেরিলাদের তৎপরতা সম্প্রতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ডিয়েমের পক্ষে মার্কিণ সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় গেরিলা-তৎপরতা বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নিকটবর্ত্তী হয় নাই—বরং জনসাধারণ আরও বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ডিয়েমের সেনাবাহিনীতে মনোবল ক্রমেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি একটি যুদ্ধের পরে ডিয়েমের সৈন্য গেরিলাদের পশ্চাদ্ধাবনে অসম্মত হয়। শুধু তাহাই নহে—সরকার পক্ষে সেনাবিভাগের জন্য সংগৃহীত কৃষক যুবকরা অনেক সময় দিনের বেলায় মার্কিণ শিক্ষাদাতাদের নিকট প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে, কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ধ্বনিও তোলে; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে পলাইয়া যাইয়া গেরিলাদের সহিত মিলিত হয়। বর্ত্তমানে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আমেরিকার বার হাজার সামরিক বিভাগের লোক আছে, জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমিতে সৈন্যদের লইয়া যাইবার জন্য মার্কিণ হেলিকপ্টার আছে, বিমান আছে, ছোট বড় নানাবিধ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তো আছেই। কিন্তু গেরিলাদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাদিগকে দমন করিবার সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূরবর্ত্তী হইতেছে। উত্তর অঞ্চলে দুই হাজার গেরিলা সংখ্যায় বাড়িয়া এখন পাঁচ হাজারে পরিণত হইয়াছে এবং চল্লিশ হাজার সরকারী সৈন্যকে তাহারা হিম্ সিম্ খাওয়াইতেছে। পাহাড় হইতে নামিয়া সুরক্ষিত সরকারী ঘাঁটিতে তাহারা অকস্মাৎ আক্রমণও করিয়াছে। বর্ত্তমানে মেকং বদ্বীপে গেরিলা বাহিনীর সহিত ডিয়েমের সেনাবাহিনীর সুদীর্ঘ সংগ্রাম চলিতেছে। এই যুদ্ধে সরকার পক্ষে পঁচিশটি জন সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং আহত হইয়াছে শতাধিক। পাঁচখানি মার্কিণ হ্যালিকপটার গেরিলারা ভূপাতিত করিয়াছে; তিন জন মার্কিণ সৈন্যও নিহত হইয়াছে। কোনও কোনও সংবাদদাতা বলেন যে, ইতিপূর্ব্বে গেরিলারা গ্রামে কামারের তৈয়ারী সটগান এবং পুরাতন ফরাসী রাইফেল লইয়া উন্নত ধরণের আধুনিক মার্কিণ অস্ত্রের সম্মুখীন হইত; এখন মার্কিণ অস্ত্র হস্তগত করিয়া হ্যালিকপটার ভূপাতিত করিবার শক্তি তাহারা অর্জ্জন করিয়াছে।

সম্প্রতি ভিয়েৎ কং-এর রাজনৈতিক শাখা মুক্তি ফ্রণ্টের কয়েকজন প্রতিনিধি মস্কো, পিকিং, হ্যানই, হাভানা, কায়রো এবং জাকার্ত্তা ঘুরিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। সর্ব্বত্র তাঁহারা সাদরে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটীর কায়রোস্থিত প্রধান কেন্দ্রে এই ফ্রণ্টের একজন প্রতিনিধি গৃহীত হইয়াছেন। সাইগন হইতে সত্তর মাইল দূরে বিংলং প্রদেশে সম্প্রতি মুক্তি ফ্রণ্টের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ইহা সম্ভবত: আলজেরিয়ার অনুকরণে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার আয়োজন। এই গভর্ণমেণ্ট যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহা সঙ্গে সঙ্গে কমুনিষ্ট দেশগুলি কর্ত্তৃক এবং কতকগুলি আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্র কর্ত্তৃকও স্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের যে ভিয়েৎ কং তৎপরতাকে এতদিন বিদ্রোহীদের কাণ্ড বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা এখন রাজনৈতিক মর্য্যাদা লাভ করিবে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের জন্য বর্ত্তমানে আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছে, সে আলোচনায় দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার পথ এখন সুগম হইবে।

ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সহযোগিতার চুক্তি—

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তাহাদের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হইলেও, তাহাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট দ্বন্দ্ব আছে। কম্যুনিজম-প্রতিরোধের জন্য ন্যাটোর যোগ দিলেও—বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম-জার্ম্মাণী ও আমেরিকা সর্ব্ব ব্যাপারে এক-দিল এক-প্রাণ হইয়া যায় নাই। ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট ত্দগল ফ্রান্সকে পুনরায় ইউরোপে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করাইতে চান। এই ব্যাপারে বৃটেনকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন এবং বৃটেনের সমর্থক আমেরিকাকেও আপনার মনে করেন না। দ্য'গলের ধারণা—শ্রমশিল্পে উন্নত জার্ম্মাণীর সহিত ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিলে বৃটেন্ ও আমেরিকা দুইয়ের সঙ্গে মোকাবেলা করা ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব। জার্ম্মাণীরও ফ্রান্সের সহিত মিলিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আমেরিকার পক্ষে তাহার জাতীয় স্বার্থে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত আপোষ-মীমাংসায় ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হওয়া অসম্ভব নয়। সে অবস্থায় পশ্চিম-জার্ম্মাণীর অনমনীয়তা উপেক্ষিত হইতে পারে; সুতরাং ফ্রান্সের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া আমেরিকার উপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা পশ্চিম-জার্ম্মাণীর কম নহে। এই কূটনৈতিক মনোবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্স ও পশ্চিম-জার্ম্মাণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গত কিছুকাল যাবৎ বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতেই ছয়টি ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে লইয়া ইউরোপীয় কমন-মার্কেট গঠিত হইয়াছে—পশ্চিম-জার্ম্মাণীর শ্রমশিল্পের সহিত ফরাসী কৃষির অচ্ছেদ্য মিলন সাধন যাহার মূল উদ্দেশ্য। দ্য গল্ স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে, বৃটেন তাহার কমনওয়েলথ সাঙ্গ-পাঙ্গ লইয়া এবং আমেরিকার সহিত গাঁট-ছড়া বাঁধিয়া কমন্ মার্কেটে প্রবেশ করিতে পারিবে না—বড় জোর সে একটি এসোসিয়েটেড

যেতে পারে। পুঁজিবাদী শিবিরে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কত প্রবল এবং উহার রূপ কি, তাহা ইহাতে অনেকখানি স্পষ্ট হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, আমেরিকা সম্প্রতি বৃটেন্ ও ফ্রান্সকে পোলারিস্ মিসাইল্ দিতে চাহিয়াছিল। বৃটেন্ এ দান সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছে ; কিন্তু দ্যগল উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, ফ্রান্স স্বাধীনভাবে তাহার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে। ঠিক এই সময় ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পররাষ্ট্রীয় বিষয়, সমরায়োজন এবং সাম্প্রতিক ব্যাপারে সহযোগিতার চুক্তি হইয়াছে। গত ২১শে জানুয়ারী ডাঃ আডেনয়ার প্যারিসে আসিয়া দ্যগলের সহিত একত্রে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। সমরায়োজনে সহযোগিতার সর্ত্তগুলি এইরূপ,—সমর-শিক্ষার্থীদের বিনিময়, একত্রে কুচকাওয়াজ, উভয় দেশে অন্য পক্ষের কর্ত্তৃত্বে শিক্ষা-শিবির স্থাপন, একত্রে অস্ত্র উৎপাদন ও অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন সম্পর্কে গবেষণা। শেষোক্ত ব্যবস্থায় পারমাণবিক অস্ত্র বাদ থাকিবে বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি অনুসারে পশ্চিম-জার্ম্মাণী পারমাণবিক অস্ত্র তৈয়ারী করিতে পারে না। কিন্তু পশ্চিম-জার্ম্মাণীর প্রধান উদ্দেশ্য পারমাণবিক অস্ত্র লাভ ; এই অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে ফ্রান্সেরও পশ্চিম-জার্ম্মাণীর শ্রমশিল্প একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং জার্ম্মাণীর এই আকাঙ্খা অপূর্ণ থাকিবে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সহ-যোগিতার জন্য জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের রাষ্ট্র-প্রধানরা বছরে দুইবার পরস্পরের সহিত মিলিত হইবেন ; দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিবরা মিলিত হইবেন তিন মাস অন্তর। সাংস্কৃতিক সহযোগিতার জন্য দুই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সমান বলিয়া গণ্য হইবে ; জার্ম্মাণীতে ফরাসী ভাষা এবং ফ্রান্সে জার্ম্মাণ ভাষা পড়াইতে উৎসাহ দেওয়া হইবে।

পারমাণবিক পরীক্ষা—

১৯৬০ সালে সোভিয়েট রুশিয়ায় আমেরিকার ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান ধরা পড়িবার পর হইতে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ পারমাণবিক পরীক্ষা তদন্তের জন্য বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রবেশাধিকারের প্রবল বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাকে তাঁহারা গুপ্তচর-বৃত্তির আইনসঙ্গত অধিকার বলিয়া আসিয়াছেন। আমেরিকা জলে, স্থলে ও বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক পরীক্ষা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্তের দাবী ত্যাগ করিলেও ভূ-নিম্নের পরীক্ষা সম্পর্কে এই দাবী কিছুতেই ত্যাগ করিতে চাহে না। পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি সম্ভব করার আগ্রহে সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন বছরে তিনবার সরেজমিন তদন্তের অধিকার দিতে সম্মত হইয়াছে। আমেরিকা আটবার তদন্তের অধিকার চাহিতেছে। তবুও সোভিয়েট ইউনিয়ন সরে-জমিনে তদন্তের মূলনীতি স্বীকার করায় মনে হয়, এখন পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ রাখার ব্যাপারে আমেরিকা ও বৃটেনের সহিত রুশিয়ার মীমাংসা সম্ভব হইবে। তবে, ফ্রান্সের দ্য' গল এই মীমাংসা মানিয়া লইবেন কিনা, বলা শক্ত। তিনি সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফ্রান্স হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পারমাণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে ফ্রান্স ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। তাহাকে বাদ দিয়া পারমাণবিক পরীক্ষা-বন্ধের চুক্তি সম্পাদন কার্য্যতঃ অর্থহীন। ২৫।১।৬৩ —মিহির

ফেরারী মনের খবর

বাসবী দত্ত

অনুরাধা! সমস্যার শব পোড়ে দেখো!
এবং আমিও এই চেষ্টাহীন সুতীব্র চেতনা
কেমন কোমল-গন্ধে স্নায়বিক সতেজতা আনি!

হারিকেনে কালি পড়ে। ধুলোর মলাটে ভারি পুঁথি
অবশ্য অনেক দাম এবং বাঁধান' ;
ইতস্ততঃ—যেহেতু সেলফ নেই
(এও এক ভুয়ো বাহাদুরি)।

সমস্যার শেষ নেই। কিন্তু এক ক্লান্তির কপোত
সারাদিন ব'সে থাকে বারান্দার ছাদে—
ড্রেনের জংগল ঠেলে জল যায় ; খরস্রোত সহর ছাপান'।
অথচ আমার রক্ত উপমিত স্তব্ধতা মৃত্যুর!

হারিকেনে কালি পড়ে। ধুলো গড়ে চড়া বালিয়াড়ি।
অনুরাধা! আমার স্বাপ্নিক মন হাওয়া পথে কখন ফেরারী!

মাদকতা

(বরিশ, পাস্তের নাক্ : "ইনটক্সিকেশন")

বৃত্তায়িত আইভীলতায়
উইলো গাছের মৌন ছায়াতলে
তুফানী সেই ঝড়ো হাওয়ায়
আমরা দু'জন আশ্রয় নিলাম
তোমার আমার আকাশ ঘিরে একই উত্তরীয়।
আমার সুডোল বাহুর ছাঁদে তোমায় বাঁধি প্রিয়।

এইখানে এই কুঞ্জ গহীন
গুল্মলতা, গাছের নগ্ন শাখা
আকাশ বাতাস আবেশ রসে মাখা
চোখের ভুলে মনের ভুলে ভেবেছিলাম—মায়া
স্বপ্নমেদুর আইভীলতার
মগ্নমিথুন উইলো গাছের ছায়া!
তাই সজনী, আমার উত্তরীয়
সবুজ ছায়া বিলম্বিত ঘাসের বুকে
আজকে পেতে দিও।

অনুবাদিকা—শ্রীমতী জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

[কলিকাতার নবনির্বাচিত শেরিফ]

শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতিভা এবং অক্লান্ত কর্মশক্তি—যাহা মানুষকে সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে, শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন স্বীয় ...তায় তাহার সব কয়টিরই অধিকারী—হিসাব-নিকাশের খাতায় ...র প্রতিভার ছাপ বর্তমান, আইনের শক্ত বেড়াজাল দিয়াও যে ...কা যায় না—শ্রীসেনের জীবন তাহারই বাস্তব প্রমাণ। স্বীয় ...বেনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিভাই আজ তাঁহাকে কলিকাতার শেরিফের ...য়িত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক আসনে সমাসীন হইতে সহায়তা ...রিয়াছে।

শ্রীসেন ১৯০৭ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ...নারি গ্রামে বিশিষ্ট বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীসেনের ...তা স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ সেন তখনকার কালের একজন বিশিষ্ট ...ইনজীবী ছিলেন। শ্রীসেনের পিতামহ স্বর্গীয় শশিকুমার সেন ...দানীন্তন বৃটিশ সরকারের অধীনে মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। ...সেনের মাতামহ ৺রত্নেশ্বর সেন তাঁহার সমকালীন বিশিষ্ট আইনজীবী-...র মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

শ্রীসেন কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশানে বাল্যের শিক্ষা ...রম্ভ করিয়া ১৯২৪ সালে উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ...ত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর স্কটিশ চার্চ ...লেজ হইতে ১৯২৬ সালে আই-এস-সি এবং ১৯২৮ সালে বি-এ ...ডগ্রি লাভ করেন। ১৯৩০ সালে শ্রীসেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ...ইতে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩২ সালে ...ল, এল, বি ডিগ্রি লাভ করিবার পর শ্রীসেন স্বর্গত পিতার সহিত ...াইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিন বৎসর কাল আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত ...াকিয়া শ্রীসেন ১৯৩৪ সালে বিলাতযাত্রা করেন। ১৯৩৪ সালে ...ণ্ডন হইতে বি, কম ডিগ্রি লাভ করিয়া ১৯৩৭ সালে ইন্‌-...করপোরেটেড একাউণ্টেন্টেনসি এবং ১৯৩৮ সালে ইংলিশ ইন্‌ষ্টিটিউট ...হইতে চার্টার্ড একাউণ্টেন্টশিপ পাশ করেন এবং কিছুদিনব্যাপী সমগ্র ...উরোপ পরিভ্রমণান্তে ১৯৪০ সালের প্রথমদিকে স্বদেশে ফিরিয়া ...আসেন। দেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীসেন স্বদেশে ফিরিয়া ...স্বীয় যোগ্যতার মাপকাঠিতে যোগ্যতম কর্ম সংস্থান করিতে না ...পারিয়া, কিছুদিন কর্মবিহীন অবস্থাতেই কাটান। তখনকার দিনে ...ব্রিটিশ সওদাগরী অফিসে কোন ভারতীয়কে স্বদেশীয় লোকের সঙ্গে ...সমপর্য্যায়ে কোন পদ দেওয়া হইত না বলিয়াই শ্রীসেনের পক্ষে কোন ...চাকুরী লওয়া সম্ভব হইয়া উঠিতেছিল না। অবশেষে প্রায় বৎসর-...খানেক পর "প্রাইস ওয়াটার হাউস, পিট এণ্ড কোং" নামক বিখ্যাত অডিটফার্মে একাউণ্টাণ্ট পদে যোগদান করেন। এবং একাদিক্রমে বারো বৎসর চাকুরী করিবার পর শ্রীসেন স্বীয় মেধা এবং প্রতিভায় ১৯৫২ সালে উক্ত কোম্পানীর অংশীদার হন এবং ১৯৪০ সালে রায়-সাহেব মনোরঞ্জন সেনের কন্যা শ্রীমতী বীণা সেনকে বিবাহ করেন। আপন ঘটনাবহুল কৃতিত্বের আলোয় আলোকিত কর্মজীবনে সকল কাজের মধ্যেও শ্রীসেন শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘদিন। বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, শ্রীসেন ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এণ্ড বিজনেস্ ম্যানেজমেণ্টেরও একজন লেকচারার। ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ ওয়েলফেয়ার সার্ভিসের কোষাধ্যক্ষ। ইন্‌ষ্টিটিউট
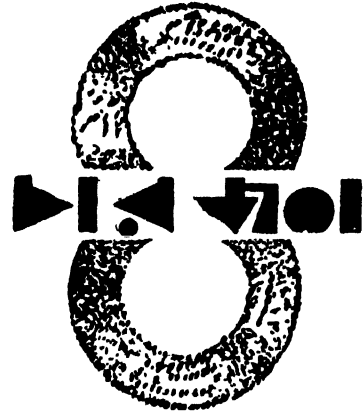
অব চাইল্ড হেল্‌থের কোষাধ্যক্ষ এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও শ্রীসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রী সেন বাংলার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষক। আরও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

মেডিকেল কলেজের ফারমোকোলজির অধ্যাপক ডাঃ কুমুদ সেন ও চার্টার্ড এ্যাকাউণ্টেণ্ট শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়।

কর্ম্মব্যপদেশে ইনি বহুবার পৃথিবী পরিভ্রমণও করিয়াছেন। ৮ম আন্তর্জাতিক এ্যাকাউণ্টেণ্টস কংগ্রেসে যোগদানার্থে নিউইয়র্ক গমনই তাঁহার আপাততঃ শেষ বিদেশযাত্রা। ১৯৬২ সালের ২০শে ডিসেম্বর শ্রী সেন কলিকাতার শেরিফ নির্ব্বাচিত হন। সমগ্র শেরিফ-নির্ব্বাচনের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার একজন চার্টার্ড একাউণ্টেণ্টকে শেরিফ পদে নির্ব্বাচন করা হইল।

আলোকচিত্র গ্রহণ এবং দেশভ্রমণে তাঁহার প্রবল আগ্রহ। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যগ্রন্থপাঠে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

[প্রধান দেশকর্ম্মী ও গান্ধীবাদী নেতা]

বাংলা দেশের যে কয়জন নিষ্ঠাবান ও নিরলস কর্ম্মী নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়ে একাগ্রভাবে দেশের গঠনমূলক যজ্ঞে নেমেছেন, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য ৭০ বৎসর বয়স্ক রতনমণিবাবু অর্দ্ধশতাব্দীকাল নিপীড়িত মানবের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করে চলেছেন। জীবনে আর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু মানুষের সেবা করে যাও—এই মন্ত্রই তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রধান লক্ষ্য; সেই কাজের মধ্যে আজও তিনি ডুবে আছেন, আর থাকবেনও যতদিন তিনি বাঁচবেন—এইটেই হল তাঁর জীবনের প্রধান আদর্শ। মানুষটিকে দেখলেই সহজে বুঝা যাবে একজন সত্যকারের ত্যাগী কর্ম্মীপুরুষ, স্বল্পভাষী, উদাস দৃষ্টিভঙ্গী, নিরহঙ্কার। এই শান্ত মানুষটিকে দেখলে চেনাই যাবেনা ইংরাজ আমলে কত বিপ্লবের বহ্নি এঁর মধ্যে প্রজ্জ্বলিত ছিল।

রতনমণিবাবু হাওড়া জেলার বালী গ্রামে ১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার কুলিয়া গ্রামে। ১৯০৯ সালে তিনি ছাত্রবৃত্তি ও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবনে পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা জাতীয় ভাবোদ্দীপক প্রবন্ধ পুস্তক পড়ার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। ১৯১১ সালে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে আর ১৯১৩ সালে দর্শনে অনার্স নিয়ে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় সারা দেশময় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বইছিল, রতনমণিবাবু পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে আন্দোলনে গা ভাসিয়ে দেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং নেতাদের নির্দ্দেশে তিনি বালীতে অনুশীলন-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার অন্যতম বিপ্লবী নায়ক সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, আশুতোষ দাস প্রমুখের সংস্পর্শে এসে তিনি বিপ্লববাদী দলে যোগ দেন। দলের নির্দ্দেশে শিক্ষকতা গ্রহণ করে তিনি বালী ও বেলুড়ের ছাত্রদের মধ্যে স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা জাগ্রত করার প্রয়াস পান। স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্দেশে নির্ভীক ও সাহসী যুবশক্তি তৈরী করার জন্য তিনি ব্যায়ামাগার ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাতীয় সাহিত্য ও মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনার মাধ্যমে যুবকদের দেহ, মন ও চরিত্রগঠনে উদ্যোগী হন। ১৯১৮ সালে তিনি আত্মগোপনকারী অগ্নি-যুগের বিপ্লবী কর্ম্মীদের কলিকাতা ও চন্দননগরের গোপন আড্ডায় নিয়মিত ভাবে যোগাযোগ রেখে চলতেন এবং বিপ্লবী কর্ম্মীদের পথের নিশানা দিতেন। এই সময় তিনি বালীতে একটি সেবাসমিতি গঠন করেন, অসহায় দুঃস্থ রোগীদের শুশ্রূষার জন্য বালীতে 'সেবা' নামক একটি দলও তিনি গঠন করেন। ১৯২০ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলন সুরু হয়; এই সময় রতনমণিবাবুর চেষ্টায় বালী বেলুড় কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয়। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের নির্দ্দেশে তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দেন এবং কোলকাতায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কারাবরণ করেন। জেল থেকে বেরিয়েই তিনি পুনরায় গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় বালীর একটি পল্লী অঞ্চলে তিনি একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করেন এবং সাধারণের কাছ থেকে অর্থভিক্ষা করে তিনি বিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন। বালীতে তৎকালীন বিখ্যাত সারস্বত উৎসব ও তৎসম্পর্কিত রবীন্দ্র নাটক অভিনয়, শ্রমশিল্প-প্রদর্শনী ও বিভিন্ন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কংগ্রেসের স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে তিনি ১৯২১, ১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৩৩ ও ১৯৪২ সালে কোলকাতা, দিল্লী, মহিষবাথান, বালী প্রভৃতি স্থানে পুলিসের হাতে ধরা পড়েন এবং দীর্ঘদিন কারাবরণ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন-অমান্য পরিষদের ডিক্টেটর ছিলেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের পর তিনি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং বালীর জনসাধারণের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি চিন্তাশীল সুলেখক। হুগলী জেলার জাতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পত্র'র তিনি অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত—আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত—"গ্রামে ও পথে"—বাংলা সাহিত্যের গান্ধীবাদ সম্পর্কে প্রথম প্রকাশিত একখানি সেরা পুস্তক। "গান্ধীজীর দিল্লী ডায়েরী" তাঁর সম্পাদনায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে সোদপুরে অবস্থানকালে গান্ধীজী রতনমণি বাবুর উপর 'হরিজন' পত্রিকার বাংলা সংস্করণের সম্পাদনার দায়িত্ব দেন। তিনি এই পত্রিকাটি নয় বৎসর কাল সম্পাদনা করেন। ১৯৬১ সালে গান্ধী-রচনাবলীর প্রথম খণ্ড তাঁহার সম্পাদনায় সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। স্বদেশী জিনিষের ব্যবহার, জাতীয় সাহিত্য পাঠ, খাদি ব্যবহার, অস্পৃশ্যতা পরিহার প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি বহুদিন যাবৎ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে প্রচার-অভিযান চালিয়েছেন। তিনি বঙ্গীয় গান্ধী সেবক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ও কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার কংগ্রেসের তিনি সভাপতি ছিলেন। আরামবাগে বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সহকর্ম্মী হিসাবে নানা গঠনমূলক কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৫২ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বালী কেন্দ্র থেকে তিনি পশ্চিম বঙ্গ বিধান-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে তিনি আর দাঁড়ান নাই। সর্ব্বোদয় সম্মেলনের সেবাপুরী, পুরী, আজমীর, সেবাগ্রাম প্রভৃতি বহু অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং উহার বিষ্ণুপুর অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

আজীবন কংগ্রেস কর্ম্মী, প্রধান দেশসেবী, অকৃতদার রতনমণিবাবু আজও কর্ম্মশক্তিতে ভরপুর।

শ্রীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুর

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী]

সাদাসিধে আড়ম্বরবিহীন পোষাকে যে মানুষটি প্রত্যহ মহানগরীর হাজার হাজার সাধারণ মানুষের মত ট্রামে বাসে ...য় বেলা ১০টায় রাইটার্স বিল্ডিংসের খাস মন্ত্রীর কামরায় সসম্মানে ...শ করিয়া প্রধান আসনটিতে অধিষ্ঠিত হন, তিনি শ্রীপ্রমথরঞ্জন ...র—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী-কল্যাণ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাঁহার আচারে বা ব্যবহারে তথাকথিত ইউরোপীয় চিহ্ন ...ঁজিয়া পাওয়া যায় না কোথাও।

শ্রীঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা ভারতে খ্যাতনামা ...নীতিবিদ্‌দের অন্যতম। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে শ্রীঠাকুর ...ন্নত শ্রেণীর নেতা বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ।

শ্রীঠাকুর ১৯০৫ সালে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার ...র্গত ওড়াকান্দি গ্রামের ঠাকুর-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই ...র-পরিবার বাংলা দেশে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের গুরু-বংশ বলিয়াই ...ধিক খ্যাত। শ্রীঠাকুরের পরলোকগত পিতা শশিভূষণ ঠাকুর ...নীন্তন বৃটিশ সরকারের অধীনে বংশের মধ্যে সর্বপ্রথম চাকুরী ...ণ করেন। শ্রীঠাকুরের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ স্বর্গীয় শ্রীশ্রীহরিঠাকুর এক ...লৌকিক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ইঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ...দেশ্যে আজিও লক্ষ লক্ষ ভক্ত শিষ্য চৈত্রমাসের বারুণী মেলার দিন ...ত্র সমবেত হইয়া যে ভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাহা এককথায় ...ভূতপূর্ব।

শ্রীঠাকুর নিজ গ্রাম্য স্কুলে বাল্যের শিক্ষা আরম্ভ করিয়া কিছু ...র গোপালগঞ্জ মহকুমা স্কুলে, কিছুদিন কলিকাতার স্কটিশচার্চ ...লজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করিয়া পরিশেষে গ্রাম্য ওড়াকান্দি হাই-...ল হইতে ১৯২০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা ...রীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীঠাকুর কলিকাতায় আসিয়া সেন্টপলস্‌ ...কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯২২ সালে আই-এ এবং ১৯২৪ সালে ...-এ ডিগ্রি লাভ করেন। ডিগ্রি লাভ করিবার পর শ্রীঠাকুর কলিকাতা ...বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পড়া শুরু করেন এবং ১৯২৬ সালে ...ম-এ ডিগ্রি লাভ করেন। এম-এ অধ্যয়নের সময় তিনি রাষ্ট্রপতি ...রাধাকৃষ্ণনের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের নিকট ...ক্ষাগ্রহণ তাঁহার সমগ্র ছাত্রজীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। এম-এ ডিগ্রি ...লাভ করিবার পর শ্রীঠাকুর কিছুদিন আইন-কলেজে পড়াশুনা ...আরম্ভ করিয়া ঐ বৎসরই ব্যারিষ্টারী পড়িবার উদ্দেশ্যে বিলাত গমন ...করেন। ১৯২৯ সালে লণ্ডনে লিঙ্কনস ইন্‌স হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ ...করিয়া আরও এক বৎসর তথায় অতিবাহিত করেন। শ্রীঠাকুর ...সময়ে ইউরোপের ইতালী, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রীস, জার্ম্মাণী, ...অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন। শ্রীঠাকুর আফ্রিকা ও ...এশিয়ার ইজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন, আরব, টার্কী প্রভৃতি দেশগুলিও পরিক্রমা ...করেন। ১৯৩০ সালের শেষে শ্রীঠাকুর স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং ...আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যোগদান ইনি ...নিজে ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করেন না বলিয়াই তিনি স্বীয় জীবনেও ...ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নাই।

১৯৩৭ সালে ফরিদপুর জেলা কেন্দ্রে সংরক্ষিত আসন হইতে

শ্রীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুর

নির্ব্বাচিত হইয়া শ্রীঠাকুর সর্ব্বপ্রথম অবিভক্ত বাংলার আইন-সভার সদস্য হন। ১৯৪৫ সালে ঐ একই আসন হইতে শ্রীঠাকুর দ্বিতীয়বার আইন-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে শ্রীঠাকুর দিল্লীতে কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লীতে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ-বিভাগের পর কয়েকটি পরিবার সহ ২৪পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমায় ...বিল ঠাকুর নগর নামে এক উপনগরী স্থাপন করেন। এই ঠাকুর নগর আজ আধুনিক যুগোপযোগী সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা লইয়া এক বিরাট উপনগরীতে পরিণত হইয়াছে। স্কুল, হাসপাতাল, রেলষ্টেশন—কোন কিছুরই আজ অভাব নাই সেখানে। ১৯৫৭ সালে শ্রীঠাকুর—হরিণঘাটা কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া পশ্চিম-বঙ্গ আইন-সভায় যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে নদীয়ার হাঁসখালি কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আইন-সভায় আসেন, এবং পশ্চিম-বঙ্গ মন্ত্রিসভার আদিবাসী-কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্র-মন্ত্রীরূপে নির্ব্বাচিত হন। পারিবারিক জীবনে শ্রীঠাকুরের অনুজ শ্রীমন্মথ নাথ ঠাকুর একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ এবং বর্ত্তমানে সিটি করোণার। শ্রীঠাকুরের স্ত্রী এবং তিন পুত্র বর্ত্তমান।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

[বিশিষ্ট প্রবাসী শিক্ষাবিদ্‌]

মধ্যপ্রদেশে যেমন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজী শিক্ষা পর্য্যায়ে কয়েকজন বাঙালী শিক্ষাব্রতীর উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে, তেমনই তথাকার মধ্যশিক্ষাস্তরে একাধিক বাঙালী শিক্ষকের কৃতিত্বও স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে জব্বলপুর-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান-শিক্ষক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। স্বর্গত রামতারণ ঘোষ ও পরলোকগতা ক্ষীরোদাবালা দেবীর প্রথম সন্তান সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ২৪ পরগণা জেলার আকনা। পিতামহ ৺কৃষ্ণমোহন ঘোষ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কর্ম্ম লইয়া ১৮৫৭ সালে সগরে বসবাস শুরু করেন। পরে পিতা কমিশনার দপ্তরের কার্য্যাধ্যক্ষ হিসাবে জব্বলপুরে আসিয়া তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে হিতকারিণী বিদ্যালয় ও পরে সগর হাইস্কুলে পড়েন। ১৯১২ সালে সরকারী মডেল স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। জব্বলপুর রবার্টসন কলেজে পড়িবার সময় পিতার মৃত্যু হয়—ফলে সমস্ত সংসার পরিচালনার ভার তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে।

তিন বৎসর পড়াশুনা বন্ধ রাখিবার পর ১৯১৯ সালে তিনি গ্রাজুয়েট হন। উক্ত বৎসরে তিনি স্থানীয় সরকারী বিদ্যালয়ে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, টি, পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখান। ১৯২৭ সালে বদলীর আদেশ পাওয়ায় শ্রীঘোষ সংসার পরিচালনের ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের দেখাশুনা করিবার অসুবিধা ঘটার সম্ভাবনায় সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করেন। কিন্তু স্থানীয় শিক্ষাবিদেরা তাঁহাকে কস্তুরচাঁদ হিতকারিণী-সভা উচ্চ বিদ্যালয়ে সাদরে গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি প্রধান-শিক্ষক হিসাবে তথা হইতে সসম্মানে অবসরপ্রাপ্ত হন। সমগ্র মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে ছাত্র ও শিক্ষকমহলে শ্রীঘোষ লিখিত কতিপয় পুস্তক পরম সমাদরেই গৃহীত হইয়াছে।

সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী শ্রীঘোষ অল্প বয়স হইতে কুস্তি, ব্যায়াম ইত্যাদিতে আগ্রহী ছিলেন। তজ্জন্য বিদ্যালয় ও জব্বলপুরের ছাত্রসম্প্রদায়কে তিনি সর্ব্বদা স্বাস্থ্যগঠনে সাহায্য করিয়া থাকেন। ছাত্রজীবনে বিদ্যালয়ে ও কলেজে তিনি সু-অভিনয় করার জন্য Mr. Picknick নামে পরিচিত ছিলেন। বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী নাটকে তিনি সমান দক্ষতা দেখাইতে সমর্থ হন।

১৯১৪-১৫ সালের নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির জব্বলপুর অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কার্য্য করার সময় তিনি লোকমান্য তিলক মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ফলে, তিনি স্বদেশী রাজনৈতিক কার্য্যে আরও ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। তখন হইতে দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা, অভাব, অসুবিধা ইত্যাদি প্রতিকারের চিন্তা তাঁহার মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। সরকারী বিদ্যালয়ে থাকাসত্ত্বেও তিনি কংগ্রেসী রাজনীতি হইতে দূরে আসিতে পারেন নাই।

১৯৩৭ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রথম জব্বলপুর পরিদর্শন করেন। সেই সময় শ্রীঘোষ অন্যান্য কয়েকজনের সহিত স্থানীয় হিতকারিণী কলেজ ও সিটি বেঙ্গলী ক্লাবে সুভাষচন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, আলাপ, আলোচনা ও সুমধুর ব্যবহারের পবিত্র স্মৃতি তাঁহাদের হৃদয়ে চিরজাগ্রত রহিয়াছে। জব্বলপুরের অনতিদূরে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে তিনি পুনরায় দেখেন।

শ্রী ঘোষের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ মধ্যপ্রদেশের অন্যতমা সমাজসেবিকা হিসাবে পরিচিতা।

একজন কেউ

(সুখ্যাত কবি Walter de la mare এর রচিত
"Some one" কবিতার বঙ্গানুবাদ)

একজন কেউ যে আজ এসেছিলো,
এবং আমার এ দীন দুয়ারে
সে তার আলতো আঘাত হেনেছিলো,
এমতে আমি ঠিক, ঠিক, ঠিক।

সে শব্দ শুনে তবে কবাট খুলেছি,
ডাঁয়ে-বাঁয়ে আমি তাকে খুঁজতে থেকেছি।
কিন্তু স্তব্ধ রাত্তে দেয়ালের গায়
গুবরে পোকাগণের পুচ্‌কে পাখায়
পাওয়া আওয়াজ, বনের পেঁচার
চাচা চীৎকার, ঝিঁঝিঁ তে ডাকায়

সুরশব্দ ও রাতের শিশির
পড়া ছাড়া, শুধু ক্ষুদে নড়ানির
চিহ্নটুকুও তখন সেখানে
পেলাম না আমি কিছু কোনোখানে।
ঘারে ঘা-দাতাকে তাইতো জানিনে,
আমিগো জানিনে, মোটেই জানিনে।

অনুবাদিকা—কুমারী চিন্তা চিন্তা

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

করিশ—গুল্মবি°, Lalbergia reniformis.

করী—নাগকেশর।

করীরকুণ—করীর শাকবি°।

করুণ, করুণা—লেবু দ্র°, citrus decumana.

করুণী—পুষ্প বৃক্ষবি°। পর্যায়—গ্রীষ্মপুষ্পী, রক্তপুষ্পী, চারিণী, রাজপ্রিয়া, রাজপুষ্পী, সূক্ষ্ম, ব্রহ্মচারিণী।

করূষক—ফলসা।

করেণু—কর্ণিকার বৃক্ষ।

করেন্দুক—ভূতৃণ, গন্ধতৃণ।

কর্ক—বৃক্ষবি° ; কাঁকড়াশৃঙ্গী।

করেলা—করলা দ্র°।

কর্কট—বৃক্ষবি°। পর্যায়—কর্ক, ক্ষুদ্রধাত্রী, ক্ষুদ্রাফলক, বর্ক ফল।

কর্কটক—[ও° কাঙ্কড়] কাঁকরোল momordica cord. কুষ্মাণ্ড-বর্গের লতাবি°। গাছ খুব লম্বা হয়। ফলের গায়ে উচ্ছের মত অর্বুদ আছে।

কর্কট-শৃঙ্গিকা, কর্কটশৃঙ্গী—[হি° কাকড়াশৃঙ্গী, ম° কাঁকরাশঙ্গী, ও° কাঁকড়াশিঙ্গী, ক° কর্কটিশৃঙ্গী, তৈ° কর্কটাশৃঙ্গী] কাঁকড়াশৃঙ্গী pistacia integorina stewast. লম্বা, কাঁপা, দুইপাশ ক্রমশঃ সরু। ঈষৎ লালবর্ণ, টিপলেই ভাঙ্গা যায়। পর্যায়—কর্কটাখ্যা, মহাঘোষা, শৃঙ্গী, কুলীর শৃঙ্গী, চক্রাঙ্গী, কুলিঙ্গী, কাসনাশিনী, ঘোষ।, বনমূর্ধজা, চক্রা, শিখরী, কর্কটাঙ্গা, কর্কটী, বিষানিকা, কৌলীরা, চন্দ্রাস্পজা, বলাঙ্গা।

কর্কটাঙ্গ—কাঁকুড়।

কর্কটাঙ্গা—কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটাহ্ব—বেলগাছ।

কর্কটাহ্বা—কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটিনী—দারুহরিদ্রা।

কর্কটির্ভিটি—সাদা ফুটি।

কর্কটী—১ শাল্মলীফল, শিমুল ফল, ২ দেবদালী লতা, ৩ কাঁকড়াশৃঙ্গী, ৪ এর্বারু, ৫ ঘোটিকবৃক্ষ, ৬ কাঁকুড়। পর্যায়—কটুদলী, ছর্দাপণিকা, পীনস, মূত্রফলা, ত্রপুষা, হস্তিপর্ণী, লোমশকাণ্ডা, মূত্রলা, বহুকন্দা, কর্কটাঙ্গ, শাস্তম্ব, টিণ্ডটা, বালুকী।

কর্কন্ধু—ক্ষুদ্র বদর ফল, শিয়াকুল।

কর্কফল—ক্ষুদ্র আমলকী।

কর্কশ—১ কমলাগুড়ী, ২ কাসমর্দ, কালকাসিন্দা, ৩ ইক্ষু।

কর্কশচ্ছদ—১ পটোল, ২ শেওড়া গাছ।

কর্কশচ্ছদা—১ কোশাতকী, ঝিঙে, ২ দগ্ধবৃক্ষ (?)।

কর্কশদল—১ পটোল, ২ শেওড়াগাছ।

কর্কারু—লাল কুমড়া।

কর্কারুক—কালিঙ্গ বৃক্ষ, থেঁড়ো।

কর্কী—কাঁকুড়।

কর্কোটক—১ বেলগাছ, ২ ইক্ষু, ৩ কাঁকরোল।

কর্কোটকী—১ পীত ঘোষা। পর্যায়—কটুফলা, মহাজালিনী, ধামার্গব, রাজকোষাতকী, ২ কাঁকুড়।

কর্ণিকার—কর্ণিয়ার বা ছোট সোনালু।

কর্পর—১ কন্দবাল, ২ আখরোট।

কর্পর—কাপাস গাছ। পর্যায়—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা।

কর্পূর—[হি° কপূর, ফা° কাপূর, অ° কাফুর ও° ভাষ্কর] কর্পূর কর্পূর সাধারণতঃ দুই প্রকার—(ক) চীন, ফরমোসা ও জাপানী কর্পূর cinnamomum, champhora। (খ) বার্ণিও ও সুমাত্রা কর্পূর dryobalanaps aromatica=অপক্ব কর্পূর ভীমসেনী কর্পূর। রাজনিঘণ্টুকার ১৪ রকম কর্পূরের উল্লেখ করছেন—(১) পোতাস, (২) ভীমসেন (বরস), (৩) সিতকর, (৪) শঙ্করাবাস, (৫) প্রাংশু, (৬) পিঞ্জ, (৭) অব্দসার, (৮) হিমযুতা, (৯) বালুকা, (১০) জুটিকা, (১১) তুষার, (১২) হিম, (১৩) শীতল, (১৪) পচ্চিকা (পক্কিকা, পচ্চিকা)। ভারতেও কর্পূর জন্মায়—উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে, নাগাই কর্পূর blumea camphora. হিমালয়ে, খাসিয়া পাহাড়ে, ও বাঙলায় lymnophila gratioloides. আবার নানা জাতীয় বৃক্ষ হতে কর্পূর হয়—(ক) তামাক পাতা চোয়াইয়া। (খ) পাচুলী গাছ "পাচুলি কর্পূর, (গ) নারেঙ্গা লেবু" "নিবোনি ক্যাম্ফ্যার"।

কর্পূরা—হরিদ্রাবি°, আমাদা।

কর্বুদার—১ কবিদার বৃক্ষ, ২ শ্বেতকাঞ্চন, ৩ নীল ঝিণ্টী।

কর্বুর—ধুস্তুর বৃক্ষ।

কর্বুরদল—সাকুরুণ্ড বৃক্ষ।

কর্বুরা—কৃষ্ণ তুলসী, পারুল, বাবুই তুলসী।

কর্বুর—১ শঠী, ২ দ্রাবিড়ক, কাঁচা হলুদ।

কর্বুরক—কাঁচা হলুদ, কাঁচি হলুদ, আমাদা।
কর্মকরী—১ মূর্বালতা, ২ বিম্বিকা লতা, তেলাকুচার লতা।
কর্মজ—বটগাছ।
কর্মফল—কামরাঙা ফল।
কর্মমূল—কুশ তৃণ।
কর্মরঙ্গ—কামরাঙ্গা দ্র'।
কর্মার—১ বাঁশ, ২ কামরাঙা :
কর্মীরক—সেওড়া গাছ।
কর্ষ—বহেড়া গাছ।
কর্ষণী—ক্ষীরিণী বৃক্ষ।
কর্ষফল—বহেড়া গাছ। পর্যায়—বিভীতত, অক্ষ, কনিদ্রুম, ভূতবাস, কলিযুপালয়
কল—১ শেয়াকুল বৃক্ষ, ২ শাল গাছ।
কলন—বেতস বৃক্ষ, বেতগাছ।
কলম্ব—ঘোলীশাক।
কলভ—ধুতরা গাছ।
কলভবল্লভ—পীলু বৃক্ষ।
কলভী—চঞ্চু বৃক্ষ।
কলম—শালিধান্য, বড়মা। ধান্যাদি বর্গের—লতানে ঘাস (দূর্বার মত, কিন্তু কিছু মোটা) বিশেষ।
কলমী—[স' কলম্বী, ও' কলম, হি' কলমী] কল্‌মী। কলকাদিবর্গের জলশাকবি' calonyction roxb. প্রকারভেদ—(১) বনকলমী ipmoea striata (২) নীলকমলী—নামান্তর কালাদানা (বীজ কাল বলিয়া) লোমশ রোহণী pharbitis mil, I mil (৩) দুধকলমী—বন্য রোহিণী c. bona-nox.
কলমোত্তম—গন্ধশালি, সুগন্ধি ধান্য।
কলম্ব—কদম্ব।
কলম্বক—ধারাকদম্ব।
কলম্বিকা—কল্‌মী শাক।
কলম্বী—কলমী শাক convolvus repens পর্যায়—কড়ম্ব, কলম্বু, কলম্বিকা।
কলজোদ্ভব—শালগাছ।
কলশি, কলশী—চাকুলে।
কলসনাড়—একপ্রকার চোঁচ ঘাস।
কলা—[স' কদলী, হি' কেরা, কেলা, ম' কেঠ,ঠ, গুজ' কেল, তৈ' অরিতি, চন্দ্রাকেলী, তা' বাঠেঠ, বল, হুগালী, অ' মেয়জ, কার মাঙ্গ, ও' বেস্তঙ্গ, মহা' কেলি, সিং' কহিকাং, ব্র' নেপিষান বা ঙ্গ-হেট, বালিদ্বীপ—বিষু, মলয়—পিস্যাং, জাপানী—গড়ং] musa sapientum. শ্রেণী বিভাগ—বাঙলায়—রামরম্ভা, musa rubra, অনুপাম, মালভোগ, অপরিমর্ত্য, মর্ত্তমান (চাটিম, শস্য খুব সাদা ও মাখমবৎ কোমল, পাকিলে বর্ণ পীতাভ হয় ও গায়ে কোঁটা দাগ হয়, পুষ্ট হইলে সুগোল ও সরল), চম্পক (চাঁপা—পাকিলে ঘোর পীতবর্ণ হয়। পুষ্ট হইলে সুগোল অথচ খর্বাকৃতি, শাঁস অম্লরসযুক্ত, সুগন্ধ, খোলা পাতলা), চিনি চাঁপা, কানাই বাঁশী (প্রায় ১ ফুট লম্বা হয়), খিয়ে, কালি বউ, কাঁঠালী (ঢাকার—কবরী কলা। মাঝে মাঝে বীজ হয়—পাকিলে ঈষৎ পীত হয়, পুষ্ট হইলে ঈষৎ বক্র, শস্য কিছু কড়া, খোসা পুরু) মদনী, মদনা, তুলসী, মহুয়া, রঙ্গবীর পোড়া রঙ্গবীর, দ'য়ে কলা (যশোহর—বীচা কলা), ভোগরে কলা, সয়াকলা, চিনি চাঁপা, সফরীকলা। আসামে—আঠিয়া, জেপা আঠিয়া, ভীমকলা, কনক-বোল, ববৎমনি, ছেনিচম্পা, মনুহর, ভোট মনুহর, শিমুল মনুহর, পুবা, মালভোগ, জাহাজি, দাঘজোয়া। মাদ্রাজে—বসথলি, গণ্ডি, পাচা, পেরেলি, সেবেল্লি বন্দে, বেঙ্গলা, যমেই, পে, ফেরবা, যোন্নপানিয়ামনে পিদিমোথে। বোম্বাই—রসবই, মুগেলি, তাম্বডি, রাজেলি, লোঘণ্ডি, সোনকেলি, বেসকেলি, করঞ্জেলি, নবসিঙ্গি। সিঙ্গাপুরে মালয়, ও ভারত সাবারীয় দীপপুঞ্জের প্রায় ৮০ রকম কলা জন্মে। মালয়দ্বীপে—musa gauca' মরিমাসে—(গোলাপী কলা) musa vosacea, পাহাড়ে কলা—m, ornata, দাক্ষিনাত্যে পর্বতজাত বুনো কলা—m, superba, নেপালী কলা—m, napalcusis, সিন্দুরে কলা বা চীনে কলা, কাবুলে কলা ইত্যাদি। পর্যায়—কদলী, বারণবুসা, রম্ভা, মোচা (মোচক দ্রস্য), অংশুমৎফলা, কদল (যাহা জলেই পুষ্টি প্রাপ্ত হয়)। কাষ্ঠিল, বারবুষা, সুফলা, সুকুমার, সকৃৎফলা (বৎসরে একবার মাত্র ফল হয়) গুচ্ছফলা, হস্তিবিষাণ, গুচ্ছদন্তিকা, নিরসারা, রাজেষ্টা, বালকপ্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী, কদলক, মোচক, রোচক, লোচক, বারণবল্লভা, চর্মন্বতী।
কলাই—কলায়, মাষকলাই।
কলাকর—দেবদারি unona longiffora
কলাঙ্গাঞ্জী—কলৌঞ্জা বৃক্ষ।
কলাপিনী—নাগরমুথা (?)।
কলাপী—অশ্বত্থ গাছ।
কলালক—কলমধান।
কলামোচা—ধানাবি' andropogori lanum
কলায়—মটর, মাষকলাই, কলায়শুঁটি। পর্যায়—সতীদল, হরেণু, খণ্ডিক, ত্রিপুট, অতিবর্তুল। বন কলায়—glycine labialis
কলায়—গণ্ডদূর্বা।
কলি—বহেড়া গাছ।
কলিকা—[স' কলৈকা, ও' কণিঅর] তগরাদি কবর্গে পুষ্পতরু! দক্ষিণ আমেরিকার গাছ, এখন ভারতে হয়।
কলিকাটা—কলেখাড়া দ্রব্য। pyasophyla spinosa
কলিকার—পূতিকরঞ্জ, কাঁটাকরঞ্জ।
কলিকার—বিষলাঙ্গলিয়া। পর্যায়—লাঙ্গলী, হলিনী, গর্ভপাটনী, দীপ্তো, বিশল্যা, অগ্নিমুখী, ব্রণহৃৎ, পুষ্পসৌরভা, স্বর্ণপুষ্পা, বহ্নিশিখা।
কলিঙ্গ—১ ইন্দ্রযব, ২ পূতিকরঞ্জ, ৩ কুটজ গাছ, ৪ শিরীষ গাছ, ৫ অশ্বত্থ গাছ।
কলিঞ্জন—বৃক্ষবি', alprinia galanga.
কলিদ্রুম—বহেড়া গাছ।
কলিন্দ—বহেড়া গাছ।
কলিপ্রিয়—বহেড়া গাছ।
কলিমারক, কলিমালক, কলিমাল্য— পূতিকরঞ্জ, কাঁটাকরঞ্জ।
কলিবৃক্ষ—বহেড়া গাছ। [ক্রমশঃ।

চিত্রজগতের অবিস্মরণীয়
জর্জ্জ ইষ্টম্যান

কোন এক সংবাদপত্রের আলোকচিত্র-শিল্পী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছবি তুলতে গিয়ে মহাবিপদে পড়েছিলেন। কবিগুরু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—"ছবি তো তুলতে এসেছো, কিন্তু বলতে পার, ছবি কাকে বলে?" তিনি তো মহাবিপদে পড়লেন। তখন প্রশ্নকর্ত্তা কবি নিজেই সেদিন তার উত্তর দিয়েছিলেন—

'আলো আর ছায়া, বুকে ধরে থাকে
ছবি বলে তাকে।'

কত সুন্দর ছোট্ট কথার মাঝে বিরাট উত্তরের পরিসমাপ্তি।

আজ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে বহু রকম আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কারের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখলে আলোকচিত্রের বিস্ময়কর আবিষ্কারও কম আশ্চর্য্যের নয়। কারণ আজ যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের তলদেশে একটা ক্যামেরা বসিয়ে, একটা টর্পেডো পরীক্ষার গতি নির্ণয় করা হবে সেই ক্যামেরার সাহায্যে, তার উত্তরে বলতে হয়, সেই প্রমাণও ক্যামেরা দিয়েছে। ক্যামেরাটা তৈরী হয়েছিল সর্বপ্রকার ধাক্কা সহ্য করতে পারে, জল নিরোধক এবং তিন হাজার খানা ছবি প্রতি সেকেণ্ডে, প্রায় নয় হাজার মাইল পর্য্যন্ত ছবি তুলতে পারা যায়, এমন এক ক্ষমতা সম্পন্ন লেন্স দিয়ে।

আরও একটা মজার পরীক্ষাও দিয়েছে ক্যামেরা ও ফিল্ম। কোন একটা তেলের খনির কোম্পানী একটা বিশেষ ক্যামেরা কোম্পানীকে এমন একটা বিশেষ ধরণের ক্যামেরা তৈরী করতে বলে যে, পৃথিবীর তলদেশে প্রায় দেড় মাইল ভেতরে যেখানে উত্তাপ হচ্ছে ৩২৫° ডিগ্রি ফারেন হিট, সেখানে তাদের ড্রিলের সাহায্যে তেল তোলার কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা তার ছবি তোলার জন্য। বিশেষ ধরণে নির্ম্মিত চলচ্চিত্র (motion picture) ও ফিল্ম সেই আশ্চর্য্যজনক কাজ করে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। আজ আর আমাদের চোখে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিতে হয় না, পাথরের সামান্য টুকরো আর লোহার সামান্য অণু-পরমাণুর পরীক্ষায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর চোখে ধরে
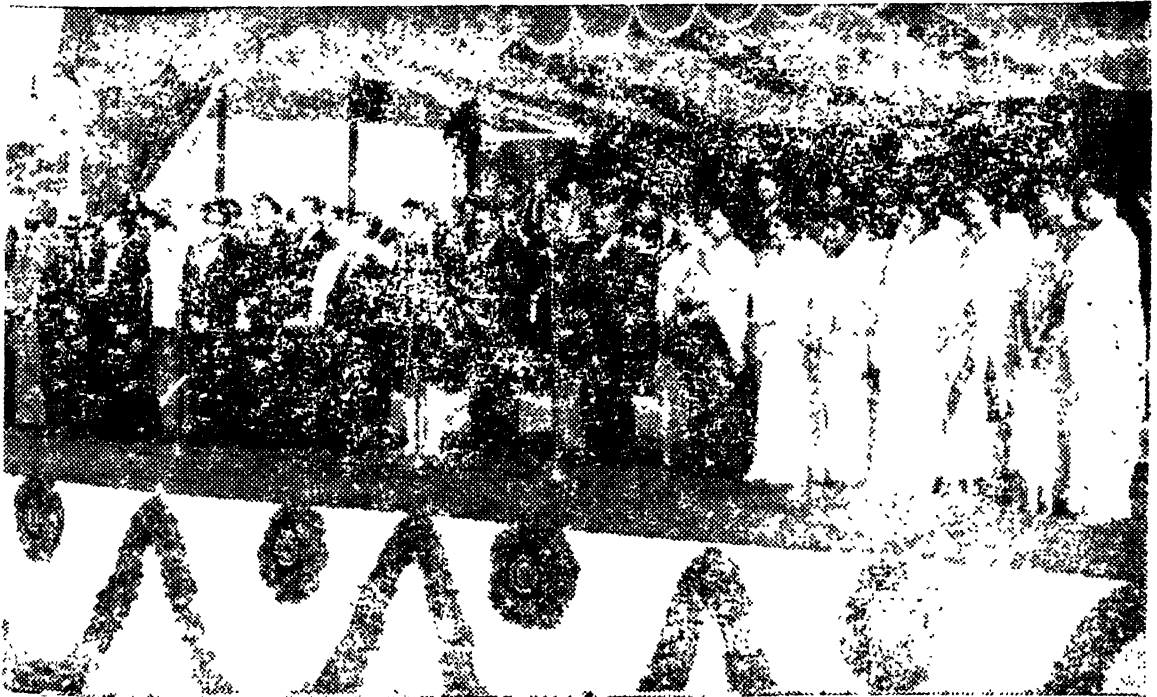
২৭শে জানুয়ারী, রবিবার ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগৎ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য দিল্লীতে ন্যাশনাল ষ্টেডিয়ামে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, সেই অনুষ্ঠানে লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখার্জ্জী, উৎপলা সেন, সুমনকল্যাণপুর, হেমন্তকুমার, মহম্মদ রফি, তালাতমামুদ, রাজকাপুর, দেব আনন্দ, দিলীপকুমার প্রমুখ ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীরা জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করিতেছেন।

রাখতে হয় না দূরবীক্ষণ যন্ত্র, লক্ষ যোজন দূরের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয়-বস্তুর আলোচনায়। তার কারণ এই ধরণের কাজ অতি সাধারণভাবেই আলোকচিত্র গ্রহণ করে নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। অবশ্য এর জন্য বিশেষ ধরণের ক্যামেরা আছে।

আলোকচিত্র-জগতের শিশু-বয়স থেকে যে পরমাশ্চর্য্য মানুষটির সাধনায় আজ এই সহজসাধ্য বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর পরিচিতি বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সেই অমর মানুষটির নাম "জর্জ্জ ইষ্টম্যান"। জন্ম নিউইয়র্কের ওয়াটারভিলেতে ১৮৫৪ সালে। তিনি যখন মাত্র ন' বছরের বালক, সেই সময় তাঁকে সপরিবারে চলে আসতে হয় রচেষ্টারে। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি জীবন-সংগ্রাম শুরু করেন, সপ্তাহে তিন ডলার মাইনেতে একটা ব্যাঙ্কের সাধারণ কেরাণী হিসাবে।

মানুষের জীবনে কোন একটা মহৎ সৃষ্টি বোধহয় হঠাৎই হয়ে থাকে। তাই ইষ্টম্যান যখন ছুটিতে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যাবেন ঠিক করেছেন, সেই সময় এক বন্ধু বলেন "কিছু ছবি তুললে কেমন হয়।" সেই সামান্য কথাই বোধহয় তাঁর জীবনের গতিপথ পরিবর্ত্তন করে দেয়। তখনকার দিনে ছবি তোলা ছিল একটা ঝামেলার বস্তু। কারণ ফটোগ্রাফারকে তার সঙ্গে রাখতে হোত একটা বিরাট ধরণের ক্যামেরা, তার ষ্ট্যাণ্ড, আর সেই সাথে একটা তাঁবু। কারণ, ছবি তোলার প্লেট ছিল বড় অদ্ভুত। তাঁবুটির ভেতর ডার্করুম করে, কাঁচের প্লেটে ছবি তোলার রাসায়নিক পদার্থ মাখিয়ে নিয়ে ক্যামেরায় ভর্ত্তি করতে হোত। আর রাসায়নিক পদার্থে প্লেট ভিজে থাকতে থাকতেই ছবি তুলতে হোত। সেদিনের সেই কৌতূহলী ব্যাঙ্কের কেরাণী, সাধারণ ছবি তোলা শেখার জন্য পাঁচ ডলার দিয়ে একজন লোক ঠিক করেছিলেন। উৎসাহ পেয়েছিলেন বহু রকম ঝামেলা সহ্য করেও জীবনের প্রথম ছবিগুলি ভাল ওঠার জন্য। তাই তিনি স্থির করেন যে, সেই বহু রকমের ঝামেলাগুলো কাটিয়ে নিয়ে এই শিল্পকে শুধু সৌখীনতার মাঝে না রেখে মানব-জীবনের কাজে লাগাতে হবে, আর একে যদি সহজ ও সরল পদ্ধতিতে নিয়ে আসা যায়, তবে নিশ্চয়ই এর প্রচলন হবে। আর এই সাধনায় তিনি নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন—মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তিনি, কোথায় ডার্করুম করেন? মায়ের রান্নাঘরই হোল তাঁর লেবরেটরী। দিনের শেষে ব্যাঙ্কের কাজের পর তিনি নিজেই ছবি তোলার প্লেটের সব কিছুর বিশ্লেষণের সাধনায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। অবশেষে একদিন সিদ্ধিলাভও করলেন। সেই আবিষ্কার হোল—যে, যদি কোন একটা মেসিনের সাহায্যে রাসায়নিক পদার্থ কাঁচের প্লেটের গায়ে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটা শুকিয়ে গেলে স্বচ্ছন্দে ছবি তুলতে পারা যাবে। সঙ্গে করে আর অন্ধকার তাঁবুর ব্যবস্থা না থাকলেও চলবে। নিজের চাকুরী-জীবনের বারো বছরের সঞ্চয় নিয়ে তিনি নামলেন সামান্য ব্যবসায়; সেটা ১৮৮১ সাল, আর বয়স সাতাশ বছর। জীবনের উদ্যম ও আশা নিয়ে ইষ্টম্যান সুরু করেন জীবনপণ সাধনা। কিন্তু হায়! শীতের দিনে তাঁর তৈরী প্লেট বেশ বিক্রী হয়; কিন্তু গ্রীষ্মে! তখন আর কেউ গরমে এই প্লেট কিনতে চায় না। গরমে ভেতরের রাসায়নিক পদার্থ শুকিয়ে গিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। তাই গ্রীষ্মের দিনে তৈরী প্লেট ফিরিয়ে নিয়ে প্রায়ই তাঁকে নতুন প্লেট দিতে হোত দোকানে দোকানে। দিনের পর দিন ব্যাবসায় লোকসান দিয়ে বাধ্য হোলেন ব্যাবসা বন্ধ করে দিতে।

তারপর তিনি চলে এলেন ইংলণ্ডে। সেখানে তিনি আবার শুরু করেন, নানারকম রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকে উন্নত করতে। ফলে সেই গ্রীষ্মের দিনে নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাল হোল আর জন্ম নিল নূতন ধরণের আর এক জিনিষ—ছোট ছোট টুকরো ফিল্ম ও কাগজের গায়ে রাসায়নিক দ্রব্য মাখিয়ে ভারি কাঁচের প্লেটের বদলে নূতন ধরণের প্লেট। তারপর ১৮৮৮ খৃঃ যখন জর্জ্জ ইষ্টম্যানের জীবনের অমর সৃষ্টি "কোডাক ক্যামেরার" জন্ম—সুরু হোল আলোকচিত্র-জগতের নবযুগ। যদিও আজকের দিনের তুলনায় সেটা ছিল অন্ধকারের যুগ, তবুও সোয়া দুই ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একশ খানা ছবি তুলতে পারা যায়—এমন ক্যামেরা-ফিল্ম দাম মাত্র পঁচিশ ডলার, আলোকচিত্র-জগতের বিস্ময়। বিজ্ঞাপন সুরু হোল—"আপনি শুধু ক্যামেরার চাবি টিপে একশ খানা ছবি তুলুন। তারপর দশ ডলার দিয়ে ক্যামেরাটা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, আমরা আবার একশ খানা ছবির ফিল্ম ভর্ত্তি করে, আগের তোলা একশ খানা ছবি তৈরী করে দিয়ে আপনাকে উপহার পাঠাব।" কিন্তু আবিষ্কারক তাতেও সন্তুষ্ট নন। তিনি চান ঐ কাঁচকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কাঁচের মত স্বচ্ছ ফিল্ম তৈরী করতে। তাতেও তিনি সাফল্যলাভ করলেন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। দিনের পর দিন সেই নীরব সাধক নানা রকম আবিষ্কারের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন, আর তারই মহৎ সাধনায় আজ এই কোডাক কোম্পানী শুধু Film নয়, ক্যামেরা, ছবির কাগজ ও নানাবিধ ক্যামেরা-দ্রব্যের পৃথিবীখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এর মাঝে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানকে জার্ম্মাণীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হোত ক্যামেরার লেন্সের জন্য। কিন্তু আজ তাঁরা নিজেরাই সেই লেন্স আবিষ্কার করেছেন—শুধু ক্যামেরার জন্যই নয়, চশমা, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ ও নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির জন্য।

অনেকেই সেদিন জর্জ্জ ইষ্টম্যানকে প্রশ্ন করেছিলেন—কেন তিনি তাঁর এই অমর কীর্ত্তির নাম রাখলেন—কোডাক। সেই প্রশ্নের উত্তরে জর্জ্জ নিজেই বলেছেন—"এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর ও পৃথিবীর যে কোন ভাষায় সহজ উচ্চারণের শব্দ খুঁজতে গিয়ে হঠাৎই পছন্দ হোল "K"। তারপর ভাবলাম কোন অন্তর্নিহিত অর্থ থাকবে না, আর ট্রেডমার্কের কোন রকম ঝামেলাই থাকবে না, অথচ শব্দটা হবে যত ছোট সম্ভব। তাই বোধ হয় 'K' দিয়ে শুরু ও K দিয়ে সমাপ্ত করে মাঝে বসিয়ে দিয়েছি "ODA." প্রতিটি আবিষ্কারকের জীবনেই দেখতে পাই, তাঁরা তাঁদের সৃষ্টির মাঝে বেঁচে থাকতে চান নিজের নামের বিজ্ঞাপন নিয়ে নয়—সৃষ্টির মাঝে, সাধনার ফলময় রূপের মাঝে; ব্যক্তিগত নাম বা মোহের মাঝে নয়। জর্জ্জের জীবন-কাহিনীও বোধ হয় তাই।

সম্প্রতি এক হিসাবে দেখা গেছে যে, ২৭,০০০,০০০ আমেরিকান পরিবার ছবি তুলে থাকেন। তার ভেতর সৌখীন আলোকচিত্র-শিল্পীর সংখ্যা হোচ্ছে ২,০০০,০০০ প্রতিবছর। আর এছাড়া তারা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ফুট চলচ্চিত্র বাড়ীর জন্য, সিনেমার জন্য তুলে থাকেন। তার সীমা-সংখ্যা নির্ণয় করতে তাদের সরকার যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েন।

আজ বিজ্ঞানের নানাবিধ পরীক্ষায়, শিল্পের নানা প্রকার প্রামাণ্য চিত্রে আলোকচিত্রের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন। পৃথিবীর নানা দেশে নানা অবস্থার মাঝে দিনের পর দিন এই শিল্পের বহু রকমারি বিশ্লেষণ আজও হোচ্ছে, আগামী দিনেও হবে। আজ আর আমরা শুধু সাদা কালো (Black & white) ছবি তুলে বা দেখেই সন্তুষ্ট নই, আজ আমরা আমাদের দৃষ্টিকে রঙিন (colour) চিত্রের দিকে নিয়ে চলেছি।

পৃথিবীতে এমন একদিন ছিল, যখন নির্বাক ছবি তৈরী হোত। এখন মানুষ সাধনার মাঝে সৃষ্টি করেছে সবাক চলচ্চিত্র। আগামী দিনের পৃথিবীকে এই নীরব সাধকের দল হয়ত উপহার দেবেন চিত্রের মাঝে দৃশ্য বস্তুর গন্ধ সৌরভে আমোদিত চিত্র-সম্ভার।

—মোনা চৌধুরী

কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কি : ১৮৬৩-১৯৩৮

নাট্যশিল্পের বিকাশে সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায় সূচনা করেন কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কি। নাট্যশিল্পে তাঁর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত অভিনয়ের ধারাটি ছিল অত্যন্ত কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক, মঞ্চশিল্প ও প্রযোজনা ছিল কতকগুলি রীতিবিধির ছকে বাঁধা। স্তানিস্লাভস্কি মঞ্চকে সেই কৃত্রিমতার বাঁধন থেকে মুক্তি দেন, অভিনয়কে স্বাভাবিক করে তোলার আন্দোলন সৃষ্টি করেন, নাট্যশিল্পকে বাস্তবানুগ ও জীবনের প্রতি অনুগত করে তোলার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এই স্তানিস্লাভস্কি-পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে মঞ্চের যে মুক্তি ঘটল, তা খুব অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের নাট্যশিল্পকে প্রভাবিত করল। একজন খ্যাতনামা ব্রিটিশ অভিনেতা তাই বলেছেন : শেক্সপীয়রের পরে স্তানিস্লাভস্কিই হলেন বিশ্ব-নাট্যশিল্পে সবচেয়ে বড়ো প্রভাব।

১৮৬৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে মস্কোর এক ব্যবসায়ী-পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর দিদিমা ভার্লি ইয়াকোভলেভনা ছিলেন তাঁর সময়ের একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্তানিস্লাভস্কির প্রতিভার বিকাশ ঘটে মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। এই বিশ্ববিখ্যাত নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা এবং অভিনেতা, পরিচালক ও প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দীর্ঘকাল তিনি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তারিখে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। শেক্সপীয়র থেকে চেখভ, ইবসেন থেকে গোর্কি, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি স্তানিস্লাভস্কির পরিচালনায় এই মস্কো আর্ট থিয়েটারে অভিনীত হয়ে নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি তথ্য : ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে স্তানিস্লাভস্কির পরিচালনায় মস্কো আর্ট থিয়েটারের শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'ডাকঘর' ও 'রাজা'—এই তিনটি নাটকের মহড়া সুরু করেন; কিন্তু ঠিক এই সময়েই রাশিয়ায় আরম্ভ হয়ে যায় গৃহযুদ্ধ—যার পরিণতি ঘটে গণবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজ স্থাপনে। সেই অস্থির দিনগুলির মধ্যে শেষ পর্যন্ত আর রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করা স্তানিস্লাভস্কির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বিশ্ব-নাট্যশিল্পকে স্তানিস্লাভস্কি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। এই বছরে তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বের সব দেশে তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে, তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন প্রতিটি দেশের অগ্রণী মঞ্চশিল্পী, নাট্যকার আর নাট্যসমালোচকরা।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অভাব

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোলকাতা শহরে মোট পাঁচটি পেশাদারী রঙ্গালয় আছে। অবশ্য ষ্টার, বিশ্বরূপা, রঙমহল এবং মিনার্ভার কথাই আমি মূলতঃ বলছি। তা ছাড়া দক্ষিণ-কোলকাতার মুক্তাঙ্গনেও নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা সম্প্রতি করা হয়েছে। সর্বসাকুল্যে কোলকাতায় এখন মোট ছ'টি পেশাদারী রঙ্গালয় আছে। অবশ্য বেহালা অঞ্চলেও একটি পেশাদারী মঞ্চ চালু হয়েছে।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এতগুলো রঙ্গালয় যে শহরের বুকে অবস্থিত, সেই শহরের লোকেরাই যে বলে পেশাদারী মঞ্চের অভাব, তা ভুল। নাট্যাভিনয়ের গৌরবময় যুগে কোলকাতায় মাত্র দু'টি পেশাদারী মঞ্চ ছিল। তখনকার চেয়ে এখন যখন মঞ্চের সংখ্যা বেড়েছে তখন আর 'আরও চাই—আরও চাই'—ধ্বনির কোন যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু এ কথাটিও সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ, এ কথা অনস্বীকার্য যে, যুগের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিরও পরিবর্তন ঘটেছে। কিছুদিন আগে যাঁদের নাটক দেখতে বলেছি, তাঁরা হেসে বলেছেন—'নাটক কি দেখব মশাই ? গতি ছাড়া কি নাটক ভাল লাগে ?' অথচ আজ তাঁরাই নাটক দেখার জন্যে কি উৎসাহী! কেননা, এতদিন যা তাঁরা কেবল চিত্রেই দেখেছেন—আজকের যুগে মঞ্চেও তার অভাব নেই। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, চলন্ত ট্রেন, বন্যা, নীল আকাশে মেঘের ঘোরাঘুরি—আজকের যুগের মঞ্চে এ সমস্তই আছে। তাই আগের চেয়ে নাটকের প্রতি মানুষের আবেদন আজ অনেক বেড়েছে! পেশাদারী মঞ্চের

চিত্রনায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

অভিনয় অনেকেই একাধিকবার দেখে থাকেন। নয়ত কোন নাটকাভিনয় পাঁচ-ছ'শ রাত্রি অতিক্রম করতে পারতো না। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে, নাট্যানুরাগীর সংখ্যা বেড়েছে। আর তারই ফলে পেশাদারী রঙ্গালয়ের চাহিদা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে!

দ্বিতীয়তঃ, কোলকাতার কোন পেশাদারী মঞ্চেই সপ্তাহের প্রতিদিন অভিনয় হয় না। বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিনেই অভিনয় হয়। সুতরাং সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলিতে নাট্যরসপিপাসুদের এক রকম নিরামিষাশী থাকতে হয়। এখানেও এক ধরণের অভাব আছে। এই অভাবের সমাধানের প্রথম পথ হল রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষগণের একটি বোঝাপড়ার মাধ্যমে তাঁরা এক এক দিন ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে অভিনয় করতে পারেন। তার ফলে সপ্তাহের প্রত্যেক দিনেই অভিনয় চালু থাকবে এবং প্রত্যেকে যেদিন সুবিধে অভিনয় দেখতে পারবেন। আর এক পথ হল, রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

তৃতীয়তঃ, দক্ষিণ-কোলকাতায় কম ক'রে আরও ছ'টো পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন। থিয়েটার সেণ্টার (ভবানীপুর) বাদে কোলকাতার প্রধান চারটি মঞ্চই উত্তর-কোলকাতায় অবস্থিত। তাই দক্ষিণ কোলকাতার পেশাদারী রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের উদ্যোগ বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থতঃ, হাওড়া, যাদবপুর, বেহালা ইত্যাদি অঞ্চলে যদি একটি করে পেশাদারী মঞ্চ স্থাপিত হয়, তাহলে উক্ত অঞ্চলের নাট্যরসিক মহল নিঃসন্দেহে আনন্দিত হবেন। উক্ত অঞ্চলগুলির জনগণের মনে এমনই একটি কামনা দীর্ঘদিন ধরে বাসা বেঁধে আছে।—আর একথাও স্বীকার করতে হবে যে, যত দিন যাবে, ততই সকলে শিল্পের কদর বুঝবে! আজ হোক, কাল হোক—একদিন না একদিন সারা বাংলার লোক নাট্যানুরাগী হয়ে উঠবে।

পঞ্চমতঃ, এবার কয়েকটি সমাধানের কথা বলছি :—

ক। রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার নানা ঝুঁকি নেবার জন্য নাট্যরসিক এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। একটি শিল্পকে সুন্দর করে তোলার জন্যে তাঁরা নিশ্চয়ই সামান্য স্বার্থ ত্যাগ করবেন।

খ। শিল্পী-সমস্যার জন্য বর্তমান রঙ্গালয়গুলির উচিত হবে এগিয়ে এসে তাঁদের উৎসাহ দেওয়া—তাতে তাঁদের সামান্য স্বার্থের কথা চিন্তার বাইরে রাখতে হবে।

গ। কোন বিখ্যাত শিল্পীর অভাব দেখা দিলে তার সমাধানের একমাত্র পথ হল স্থানীয় অপেশাদার দলগুলির সমবায়ে একটি শক্তিশালী 'টিমওয়ার্ক' করা এবং তাঁদের দ্বারা নিয়মিত অভিনয় করানো। এই প্রস্তাবটি ইতিপূর্বে নাট্যোন্নয়নে ব্রতী অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি দিয়েছেন। আশার কথা, এই প্রস্তাব কিছু কার্য্যকরী হয়েছে এবং বহু অপরিচিত শিল্পী প্রায়শঃ অভিনয়ের সুযোগ-পাচ্ছেন।

ঘ। এই উদ্যোগের প্রধান হিসেবে সরকারের যথাসাধ্য সাহায্য কাম্য। সরকারের উচিত হবে, উদ্যোক্তাদের উৎসাহ জানানো। এই সব বিষয় অনুসরণ করলে পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা খুব অসম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও তন্দ্রা বর্মণ—ছায়াছবির বাইরে

এক টুকরো আগুন

খুঁটিনাটি, মান-অভিমান, ভুল-বোঝাবুঝি দাম্পত্যজীবনে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে আনে, তা তিলে তিলে বিরাট আকার ধারণ করে এবং বিচ্ছেদের প্রাচীরকে দুর্লঙ্ঘ্য করে তোলে; কিন্তু সেইটেই শেষ কথা নয় বা জীবনের চরম পরিণতি নয়। এই প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য হ'লেও অলঙ্ঘ্য নয় এবং শেষ অবধি তা অতিক্রম করে মিলনের আনন্দলোকে উত্তরণের সম্ভাবনাও অবিদ্যমান নয় আর সেইখানেই জীবনের সার্থক পরিণতি। এই বক্তব্যটিকেই "এক টুকরো আগুন" ছবিটির মধ্যে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রোমান্টিক নায়ক শেখর হলেও গল্পের মূল নায়ক সুকান্ত, স্ত্রী মালতীর সঙ্গে আজ তার মনের মিল একেবারে নেই। এক বাড়ীতে থাকলেও মাঝখানে কাঠের পার্টিশন, এই বিভেদ ক্রমেই বিরাট থেকে বিরাটতর হয়ে ওঠে। এদিকে শেখরের ভাইঝির জীবনে শেখর স্থান নেয়, তাদের মধুমিলনের দিন সমাগত হয়, ঘটনার পরিবেশে চরম মুহূর্তে সুকান্ত আর মালতীর মধ্যে যত কিছু গরমিল, সব কিছু মিলিয়ে যায়। নতুন জীবনের স্বপ্নে তারা জীবনের অনন্ত পথে পদক্ষেপ সুরু করে।

বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্যে যে কাহিনীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, সে কাহিনী আজকের দিনের নয়, আজকের দিনের সমস্যার ছবি তার মধ্যে দেখতে পেলেও তার গঠনে, তার আঙ্গিকে, তার বিন্যাসে গতানুগতিকতার ছাপই পাওয়া যায়। এক পুরানো ফ্রেমে নতুন প্রিণ্ট করা ছবির সঙ্গে এর তুলনা চলে। আঙ্গিক গতানুগতিক। বিন্যাস দুর্বল। রোম্যাণ্টিক নায়ক-নায়িকার প্রথম পরিচয় যেভাবে ঘটানো হয়েছে, সে কৌশল ইতঃপূর্বে বিভিন্ন কাহিনীতে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সংলাপ যেমন পরম উপভোগ্য, আবার তেমনই এমন কয়েকটি সংলাপ এতে সংযোজিত হয়েছে, সেগুলি এতে অন্তর্ভুক্ত না করলেই সব চেয়ে ভাল হ'তো, হ'তো মঙ্গলজনক।

তবে, দর্শক সাধারণকে এক দিক দিয়ে এই ছবিটি ভরিয়ে দিয়েছে এক পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তিতে—সে হল অভিনয়। বস্তুতঃ কালী বন্দ্যোপাধ্যায় আর অনুভা গুপ্তের অনবদ্য অভিনয় এই ছবিটির এক বিরাট সম্পদ এবং এর অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতির পরিপূরক। তাঁদের প্রাণঢালা অভিনয় সবিশেষ উপভোগ্য। এঁদের পরেই উল্লেখযোগ্য অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন পাহাড়ী সান্যাল। বিশ্বজিৎ ও তন্দ্রা বর্মণের অভিনয় যথাযথ, তা ছাড়া সুকান্ত, মালতীর ব্যক্তিত্বে এ দুটি চরিত্রের যথাযথ বিকাশই ঘটেনি। তারই মধ্যে শিল্পীদ্বয় যথাসাধ্য অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে গেলেন। এঁরা ছাড়া অপর্ণা দেবী, রমা ঘোষাল, সন্তোষ সিংহ, মিত্রা চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রতা সেন, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী, খগেন পাঠক, অরুণ চৌধুরী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বাড়ীর কর্তা আর গৃহিণীর মধ্যে যেখানে বিবাদ প্রকট থেকে প্রকটতর রূপ নিচ্ছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে চাকরের সঙ্গে দাসীর প্রণয়ের অবতারণার দ্বারা সেই চিরাচরিত

"শেষ অঙ্ক" ছবিটির নায়িকার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুর

মামুলী রীতিরই অনুসরণ করা হয়েছে। বর্তমান যুগে ঐ রীতি অনুসরণ করে হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টায় স্বকীয়তা বা অভিনবত্বের কোন ছাপ মেলে না।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিমু বর্ধন। সুরারোপ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, সঙ্গীতাংশ সুপরিচালিত।

জন ব্যারিমুর প্রসঙ্গে

জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকেই যে ক্ষেত্রে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী একদিন প্রস্থান নিতে হয়, সে ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহের রঙ্গমঞ্চ থেকে শিল্পীকে তো নির্ধারিত সময়ে নিষ্ক্রান্ত হতেই হবে। কালের বিধান এই কথাই বলে। তবে যে শিল্পীরা পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ান মুঠো মুঠো প্রতিভা, মনীষা ও মেধার জয়পত্র নিয়ে, তাঁরা রঙ্গমঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেও মানুষের হৃদয়মঞ্চ থেকে কখনও নিষ্ক্রান্ত হন না, তাঁদের ক্ষণকালের অভিনয় সাধারণের স্মৃতির মন্দিরে তাঁদের নিত্যকালের প্রতিষ্ঠা দেয়। সাধারণের শ্রদ্ধার আলোয় সেখানে তাঁরা চির-অম্লান, চির-উজ্জ্বল, চির-প্রদীপ্ত।

জন ব্যারিমুর এঁদেরই একজন।

থিয়েটার-জগতের "রয়্যাল ফ্যামিলির" অন্যতম সদস্য জন। লায়ানেল, এথেল ও জন—তিন ভাই-বোনে সেদিন রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর এনেছিলেন। রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্তনে ব্যারিমুর পরিবারের অবদান অবিস্মরণীয়। এই তিন ভাই-বোন সেদিনকার রঙ্গ-জগতের প্রাণস্বরূপ ছিলেন বললেও বোধ হয় বিস্তৃতভাবে বলা হয় না। অথচ আশ্চর্য্য এই, যে মানুষটির সম্বন্ধে আজ এই আলোচনা, যাঁকে কেন্দ্র করে বিশ্বের দিকে দিকে অফুরন্ত জিজ্ঞাসা, রসিকমহলে

মঞ্জুলা সরকার—ছায়াছবির বাইরে

কত গল্প, কত আগ্রহ, কত কৌতূহল—সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঘটনা-বহুল জীবনের অধিকারী মানুষটি সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে করমর্দন করে এসেছি[illegible] ১৯০৬ সালে। আজকের এই এত আলোচনা, জীবনীরচনা, চরিত্র চিত্রণ, স্মৃতিকথা, শ্রদ্ধাঞ্জলি—এ সব কিছুই রূপ পেত না, যদি মৃত্যু দুয়ার তাঁর সামনে বন্ধ হয়ে না যেত। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মা[illegible] সানফ্রান্সিস্কোর সর্বনাশা ভূমিকম্প অসংখ্য বাড়ী, ঘর, প্রাণের স[illegible] পঁচিশ বছরের এই জীবন-রসিক যুবকটির দিকেও হাত বাড়িয়েছিল পারেনি। হাত তাকে গুটিয়ে নিতে হল। পরম আরামে নি[illegible] যাচ্ছেন জন—ভূমিকম্পের ধাক্কা তাঁকে ঠেলে ফেলে দিল বিছা[illegible] থেকে। ঘুম ভেঙে গেল—দেখলেন, চারদিকে ভয়ঙ্করের বিষাণ বে[illegible] উঠেছে। আকাশে-বাতাসে মৃত্যুর হাতছানি। সারাটা অঞ্চল জু[illegible] সর্বনাশের কৃষ্ণকুটিল স্বাক্ষর। বেরিয়ে পড়লেন, একজন সেনা-সা[illegible] তাঁর হাতে শাবল দিয়ে তাঁকে কাজে লাগিয়ে দিল। যে মানুষ[illegible] কেন্দ্র করে উত্তেজনা ও শিহরণের বন্যা বয়ে যাবে প্রতি [illegible] পাদ-প্রদীপের আলোয় সমুদ্ভাসিত হয়ে যে নট লক্ষ [illegible] দর্শককে বিস্ময়ে হতবাক করে দেবেন তাঁর অনন্যসাধা[illegible] অভিনয়নৈপুণ্যে, বিপুল জনপ্রিয়তার শিখরপ্রান্তে যিনি [illegible] সমাসীন, তাঁর জীবন সূচনাতেই সমাপ্ত হোক—ঈশ্বরের এ [illegible] নয়।

দিকপাল অভিনেতা জন ব্যারিমুর, এ বিষয়ে সন্দেহ নে[illegible] তা ছাড়া এ তত্ত্ব সর্ববাদিসম্মত, ইতিহাসের অঙ্গীভূত। কিন্তু দ[illegible] সাধারণের প্রতি কোনদিন তাঁর আদৌ সহানুভূতি বা সহযো[illegible] ছিল না—নেহাৎ তারা পয়সা খরচ করে আসছে তাই অত্যন্ত অ[illegible] ও উপেক্ষার সঙ্গে যেন তিনি তাদের সামনে তাঁর অভিনয়-কৃ[illegible] প্রদর্শন করছেন। এমন কি, মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে ত[illegible] প্রকাশ্যে ঠোক্কর দিতেও তিনি ছাড়তেন না। দিকপাল শিল্পী[illegible] মনোভাব পাঠক সাধারণই বিচার করুন। শুধু দর্শক নয়, তাঁর গে[illegible] বিচিত্র শিল্পীমন অন্যান্য শিল্পীকেও ব্যঙ্গ করতে দ্বিধাবোধ করে[illegible] একবার মহড়ার সময় এক অভিনেত্রীকে এমন এক অভদ্রজনো[illegible] কুৎসিত বাক্য বলে বসলেন যে, তিনি তো সোজা ঘর থেকে [illegible] গেলেন, কিন্তু তাতে জনের মধ্যে কোনপ্রকার ভাবান্তর দেখ[illegible] কি?—আদৌ না।

অর্থ তিনি প্রচুর পেয়েছেন—ব্যয়ও করেছেন নানা[illegible] লোকটি যেমনই ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু আবার তেমনই আরামপ্রি[illegible] একটি মানুষ ভোগ এবং ত্যাগ দুটির সাধনাতেই সিদ্ধ হয়ে গে[illegible] কয়েকটি প্রমোদতরী, বাড়ী, গাড়ী, বিভিন্ন সৌখীন দ্রব্য প্রভৃতি যে টাকা তিনি খরচ করতেন, তার চেয়ে ঢের বেশী খরচ তিনি [illegible] পিছনে করতেন। আবার বেশভূষার দিকে তিনি কখনও দৃ[illegible] করেননি। অতি সাধারণ পোষাকে তাঁকে বহুবার দেখা [illegible] কখনো তাঁর আঙুলে আংটির ছোঁয়া লাগে নি, তাঁর [illegible] কোন ঘড়ি ছিল না। সুসজ্জিত আলোকিত ঘরে [illegible] টেবিলে খাওয়ার থেকে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে তি[illegible] বেশী ভালবাসতেন। এইখানেই তাঁর সারল্য, তাঁর ভোগবিমুখী অত গাড়ী বাড়ী বিলাসতরী যিনি কিনতে পারেন, ঘড়ি বা আ[illegible] তিনি ইচ্ছে করলে কিনতে পারতেন না? নিজের এই শিল্পীর এক অপূর্ব ধারণা ছিল। চিরকাল দশের মধ্যে

বিশেষ বস্তুর মধ্যে তিনি এক, সকলের মধ্যে তিনি অসাধারণ—এই ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল।

এই খেয়ালী মন, বেপরোয়া ভাব, হঠাৎ জেদ, হঠাৎ সারল্য মৃত্যুকালেও (১১৪২) তিনি বিন্দুমাত্র হারান নি। তাঁর শেষ অসুস্থতার সময়কার একটি ঘটনা বিবৃত করলেই এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হবে। ব্যারিমূরের জীবন-প্রদীপ তখন ক্ষীণ হয়ে আসছে। শয্যায় শয়ান, নার্স হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তাঁকে নিয়ে—কি ব্যাপার? দাঁত মাজাতে পারছে না। মুখ কষে বন্ধ করে আছেন, নার্স খুলতে পারছে না। কি খেয়াল কে জানে? এক বন্ধু উপায় বার করলেন—কানে কানে একষট্টি বছরের বৃদ্ধ বন্ধুকে বললেন—তুমি কি হে—তুমি এত বেরসিক হয়ে গেছ তাতো জানতুম না। একজন মহিলা স্বেচ্ছায় তোমার দাঁত মাজিয়ে দিতে চাইছেন—আর তুমি এই রকম ব্যবহার করছ! বাস। ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে ফলল। নার্স হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বিভিন্ন মানুষ তাঁকে বিভিন্ন কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করছেন, এক এক জনের দৃষ্টিতে তাঁর এক একটি দিক ধরা পড়েছে। এক এক জনের ধারণায় তিনি এক এক মূর্তিতে প্রতিভাত হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসকের কাছে তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী, লক্ষ লক্ষ মহিলার দৃষ্টিতে গদ্যময় কঠিন পৃথিবীতে তিনি এক শুভ্র সুন্দর কাব্যময় প্রেম, দর্শকের কাছে তিনি এক অতুলনীয় অভিনেতা, এক বিদ্রোহী শিল্পীমন আর তীব্র জীবন পিপাসা যার মূলধন। বন্ধু এবং জীবনীকার জিন ফাউলারের চোখে তাঁর চরিত্রের এই সব কটি দিকই ধরা পড়েছে। কিন্তু সেখানেই ফাউলারের দৃষ্টি বাধা মানে নি, তাঁর দৃষ্টিপথে ধরা পড়েছে, আরও কিছু তাঁর ধারণায় ব্যারিমুর একটি বিস্ময়, দৃষ্টিতে একটি চরিত্র আর ভাষায়—সুইট প্রিন্স।

সংবাদ-বিচিত্রা

সংস্কৃতির দিক দিয়ে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তোলার মহান ভূমিকা গ্রহণ করে দেশের ঐতিহ্য ও গৌরব যাঁরা বহুগুণ বিবর্ধিত করলেন, সেই পুণ্য নামের তালিকায় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ এক অত্যুজ্জ্বল নাম। প্রতিভার জগতে অবনীন্দ্রনাথ এক ঈশ্বরপ্রেরিত বিস্ময়। সংস্কৃতির জগতে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেওয়ার অবিসম্বাদিত গৌরব তাঁর অনন্যকার্য। নব্য ভারতীয় চিত্রকলার জনক অবনীন্দ্রনাথের অসামান্য শিল্পসৃষ্টিকে উপজীব্য করে এক ছায়াচিত্র নির্মিত হচ্ছে। ভারতীয় শিল্পের যখন মৃতকল্প অবস্থা, শিল্পের অনুশীলন যখন অচলাবস্থার সম্মুখীন, তার সেই মুমূর্ষু অবস্থায় অবনীন্দ্রনাথের শুভ আবির্ভাব। তাঁর মানসচক্ষে শিল্পের এক নবরূপ ফুটে উঠেছিল, শিল্প সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ে এসেছিল এক নব অনুভূতি। তারই প্রকাশ ঘটল তাঁর তুলির টানে, রঙের খেলায়। ভারতীয় শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটল তাঁর কল্যাণে। দীপ হাতে সুস্পষ্ট নতুন পথে এগিয়ে চললেন তিনি—তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন নন্দলাল—অসিতকুমার প্রমুখ তাঁর দিকপাল শিষ্যদল। এইভাবে রচিত হল নতুন এক ইতিহাস। অতএব একটি কলাবিত্তার নবজন্মদাতা অবনীন্দ্রনাথের জীবনী আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ ইতিহাসের শব্দান্তর মাত্র। সে জন্যে এই প্রচেষ্টাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাই।

ভারত সরকার কলকাতার রেজিওনাল স্টেট এ্যাডভাইসরি ফর ফিল্ম কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়কে মনোনীত করেছেন। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাঁচজন কৃতবিদ্যকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত। পাঁচজনের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান ও বাকী চারজন সদস্য। এর পর কলাকুশলীদেরও প্রতিনিধি হিসাবে তিনজন সদস্য হিসেবে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন। আজকের দিনের বাঙালী মহিলাদের মধ্যে লেডী রাণু মুখোপাধ্যায় জনহিতকর কার্যাদিতে অগ্রণী। লোক-কল্যাণকর বহুবিধ প্রচেষ্টায় তাঁর সংযোগ বিদ্যমান। সাহিত্য, শিল্প প্রমুখ ললিতকলার নানাবিধ উন্নয়ন-পরিকল্পনা লেডী রাণুর সক্রিয় পৃষ্ঠপোষণায় ও সহযোগিতায় রূপ নিয়েছে এবং নিচ্ছে।

১৯৬২ সাল শেষ হল। নানা ঘটনার স্রোত বইয়ে চলচ্চিত্রের ইতিহাস থেকে আরও একটি বছর বিদায় নিল। এই এক বছরের হিসাব-নিকাশের পাতা উল্টালে দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে একাধিক ভাষায় গৃহীত ছবি নির্মিত হয়েছে তিনশ' বারোটি, যেখানে ১৯৬১ সালে হয়েছিল দুশ' সাতানব্বইটি। এই তিনশ' বারোর মধ্যে বোম্বাইয়ের নিবেদন—একশ' উনিশ, মাদ্রাজের উপহার—একশ' ছেচল্লিশ এবং কলকাতার অবদান—সাতচল্লিশ।

কুস্তিমঞ্চ থেকে এবার স্টুডিওর ফ্লোর। কুস্তির আখড়ার নায়ককে এবার চলচ্চিত্রেও এক প্রধান ভূমিকায় দর্শক সাধারণ দেখতে পাবেন। আলিবাবা এবং চল্লিশ চোরের গল্প অবলম্বনে শঙ্কর মুভিস এক চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন শ্রীমতী নিশি। প্রধান চরিত্রে আলিবাবার ভূমিকায় আপনাদের অভিবাদন জানাবেন প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর দারা সিং। এই সংবাদ চলচ্চিত্র মহলে এক সাড়া তুলবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি। পরিকল্পিত ছবিটির এখনো নামকরণ হয়নি।

বর্তমান বছরের ৫ই থেকে ১০ই মে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিক চিত্র সমারোহের দিন স্থির হয়েছে। এই সমারোহ ইতিপূর্বে আরও তিনবার ঘটে গেছে। ইস্রায়েলের তেল-আভিভ এই চতুর্থ আন্তর্জাতিক শ্রমিক চিত্র সমারোহটির স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

নির্মীয়মান ও মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে "ক্লিওপেট্রা" দর্শক-

ইন্দ্রাণী প্রোডাকসন্সের নির্মীয়মান ছবি "হাসি শুধু হাসি নয়" চিত্রের একটি দৃশ্যে শিপ্রা মিত্র ও কল্যাণী ঘোষ

সমাজে যে পরিমাণ সাড়া ও আলোড়ন এনেছে, সেদিক দিয়ে তার তুলনা মেলা ভার। এদিক দিয়ে তার সমকক্ষ কোন ছবির নাম আমাদের জানা নেই। দীর্ঘকাল ধরে এই ছবিটি নির্মিত হয়েছে। এই নির্মাণের অন্তরালে কত ঘটনা ঘটে গেছে তার ইয়ত্তা নেই—চিত্র-রসিক সমাজে ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে আগ্রহ, কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। কিন্তু সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের কৌতূহলী দর্শকের সমস্ত প্রতীক্ষা বিপুল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কারণ, ছবিটি সেখানে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে—এর নায়িকা বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলারের ইস্রায়েল-সমর্থক কার্যকলাপ এর কারণ স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

আজকের দিনে বৃটেনের জাতীয় জীবনে এক বিরাট সম্মানজনক অভঙ্গুর আসন যে দিকপালদের অধিকারগত—স্যার উইনস্টন চার্চিল তাঁদেরই একজন। সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি—সকলক্ষেত্রেই তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও প্রতিভায় বহুভাবে পুষ্ট হয়েছে। উননব্বই বছর বয়স্ক এই চিন্তানায়ক মনস্বীর সারা জীবন গৌরবের দ্যুতিতে ভাস্বর, কর্মের আলোয় আলোকিত। তাঁর তীক্ষ্ণ মনীষা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সারা ইংল্যাণ্ডকে যে কি বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে, সে বিষয় কেউই অনবগত নন। এই প্রতিভাদীপ্ত জীবন অবলম্বনে একটি ছায়াচিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক—এই কামনাই করি।

নিউইয়র্ক থেকে সংবাদ এসেছে যে, বৃটেনের রাজপরিবার

সম্বন্ধে টেলিভিসন-চিত্র গৃহীত হচ্ছে। মোট ছাব্বিশটি চিত্রে সিরিজটি শেষ হবে। প্রতিটি ছবির প্রদর্শন কাল হবে ত্রিশ মিনিট। বৃটেনের রাজপরিবার ছাড়াও কাইজার, জার, আবিসিনিয়ার হাইলে সেলাসি, মোনাকোর রেনোর ও তাঁর সহধর্মিণী প্রখ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী গ্রেস কেলী প্রভৃতির সম্বন্ধেও একটি চিত্র নির্মিত হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, ঘোষক হিসেবে এতে অংশগ্রহণ করবেন বৃটেনের রাজ্যত্যাগী সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড—বর্তমানের উইণ্ডসারের ডিউক (৬১)।

সংস্কৃতির সঙ্গে এবার সৌন্দর্যের সম্মিলন ঘটল। বিপুল জনপ্রিয়তার শিখরপ্রান্তে উপনীতা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রী জিনা লোলোব্রিজিডাকে (৩৫) কেন্দ্র করে যে সংবাদ আমরা পেয়েছি, তা এক কথায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্তমানে গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছেন। ফ্লোরেন্সের এক প্রাচীন প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে তিনি বহু অর্থ ঢেলেছেন। সাংস্কৃতিক রচনাদি এবং প্রণয়মূলক রসঘন গল্পাদির প্রতি তিনি বিশেষ উৎসাহী এবং এই সম্বন্ধেই তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হবে। যশস্বিনী অভিনেত্রীর মত সুদক্ষ প্রকাশিকা হিসেবেও আশা করি তিনি সুনাম ও প্রসিদ্ধি অর্জনে সমর্থা হবেন।

অভিনেতা গ্লেন ফোর্ডের ভূতপূর্ব সহধর্মিণী ইলেনার পাওয়েল আবার রঙ্গজগতে শিল্পী হিসেবে পদার্পণ করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। ১৯৪৩ সালে অর্থাৎ কুড়ি বছর আগে তিনি শিল্পীজীবন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—অল্পকাল আগে গ্লেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। একটি আঠারো বছর বয়স্ক পুত্রের তিনি জননী।

সাহিত্যিকবৃন্দের অভিনয়

গত ২রা জানুয়ারী "মহাজাতি সদন" মঞ্চে বাঙলার সাহিত্যিকবৃন্দ 'পাশাপাশি' নাটকটি সগৌরবে মঞ্চস্থ করেন। এই মঞ্চাভিনয় সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। নাটকটি হাস্যরসাত্মক। রচয়িতা স্বপনবুড়ো। এই হাস্যরসমিশ্রিত নাটকের মাধ্যমে বাঙলার লেখনীধারীরা সমবেত দর্শকসাধারণকে স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসে মাতিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। দু'ঘণ্টায় এই অনুষ্ঠানে দর্শক-সমাজকে তাঁরা মার্জিত ও উপভোগ্য আনন্দরসে পরিপ্লাবিত করে দিয়েছিলেন। এই নাটকটিকে কেন্দ্র করে প্রবীণ, নবীন, বহুখ্যাত, স্বল্পখ্যাত সাহিত্য-সেবীদের এক বিচিত্র সম্মিলন সেদিনকার অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। নাটকটি পরিচালনা করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, মন্মথ রায়, নরেন্দ্র দেব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণা বসু, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, সুকোমল দাশগুপ্ত, দিলীপ দাশগুপ্ত, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, হরেন ঘটক, বিমল রায়, ধীরেন বল, হিমালয় সিংহ, অরুপ ভট্টাচার্য, শ্যামাপ্রসাদ সরকার, অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পুষ্প সান্যাল, উমা দেবী শীল, সু'মরী দাশগুপ্ত এবং শ্রীমান প্রবীর ভাদুড়ী প্রভৃতি।

প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে ঐ নাটকটিই সাহিত্যিকবৃন্দ

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

পলাতক

ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতে ভি. শান্তারাম একটি সুপরিচিত নাম। অভিনয়ে, পরিচালনায় দর্শকচিত্তে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে যাঁরা সমর্থ হয়েছেন, শান্তারাম তাঁদেরই একজন। বর্তমানে বাঙলা দেশের চিত্র-জগতের সঙ্গে তিনি নিজেকে সংযুক্ত করেছেন। তাঁর প্রযোজনায় "পলাতক" ছবিটি গৃহীত হচ্ছে। প্রখ্যাত কথাশিল্পী মনোজ বসুর গল্প অবলম্বনে 'পলাতক'এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। তরুণ পরিচালকগোষ্ঠী "যাত্রিক"এর পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনুপকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন অসিতবরণ, গঙ্গাপদ বসু, রবি ঘোষ, জহর রায়, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্ত, ভারতী দেবী, রুমা গুহ-ঠাকুরতা, কুমারী অনুরাধা প্রভৃতি।

সংভাই

তারু মুখার্জী প্রোডাকসন্সের আগামী নিবেদন "সংভাই"! ছবিটির সুরযোজনা করছেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ। ছবিটির সঙ্গে কাহিনীকার, প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে তারু মুখোপাধ্যায় যুক্ত আছেন। রূপায়ণে আছেন অসিতবরণ, তরুণকুমার, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, মঞ্জুলা সরকার, শম্পা দেবী এবং নাসিম বানু।

আকাশ-প্রদীপ

চিত্র-প্রযোজক শ্রীশ্যামলাল জালান বর্তমানে যে ছবিটির নির্মাণ কার্যে ব্যাপৃত, সেই ছবিটির নাম "আকাশ প্রদীপ"। ছবিটি পরিচালনা করছেন কনক মুখোপাধ্যায়। ছবির কাহিনীকারও তিনিই। বিভিন্ন চরিত্র গুলির রূপদান করছেন পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, নবকুমার, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, সন্ধ্যারাণী দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী ও নবাগতা সুমিতা দেবী প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

সৌখীন সমাচার

হঠাৎ নবাব

মলেয়ারের লা বুর্জোয়া জাতিয়ুম অবলম্বনে রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "হঠাৎ নবাব" প্রহসনটি সম্প্রতি প্রান্তিক গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করলেন। প্রহসনটির নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন স্বনামধন্য অভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন শ্যামল ঘোষাল, অমল ভট্টাচার্য্য, অশোক দে, জগন্নাথ চক্রবর্তী, বিজয় দাস, অনুপ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামদুলাল কুণ্ডু, স্বরূপ ঘোষাল, প্রবীর নাগ, তৃপ্তি ঘোষ, কাজল ঘোষ, শিপ্রা গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তি দাস প্রভৃতি।

বীর সন্যাসী

বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অমল দত্ত ইউনিট গত ১৩ই জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারে বাদল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বীর সন্ন্যাসী' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। অংশ গ্রহণে ছিলেন, জ্যোতি দত্ত, বাদল চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা সরস্বতী, সুধাময়, মাণিক, শিবশঙ্কর, পরেশ, বারীণ, আশীষ প্রভৃতি। নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন অমল দত্ত। সুরারোপে ছিলেন কালীকিঙ্কর বটব্যাল। আলোক সম্পাতে ছিলেন কণিষ্ক সেন।

মেঘে ঢাকা তারা

শক্তিপদ রাজগুরুর "মেঘে ঢাকা তারা"র নাট্যরূপ দান করলেন শতমিতা গোষ্ঠী। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়,
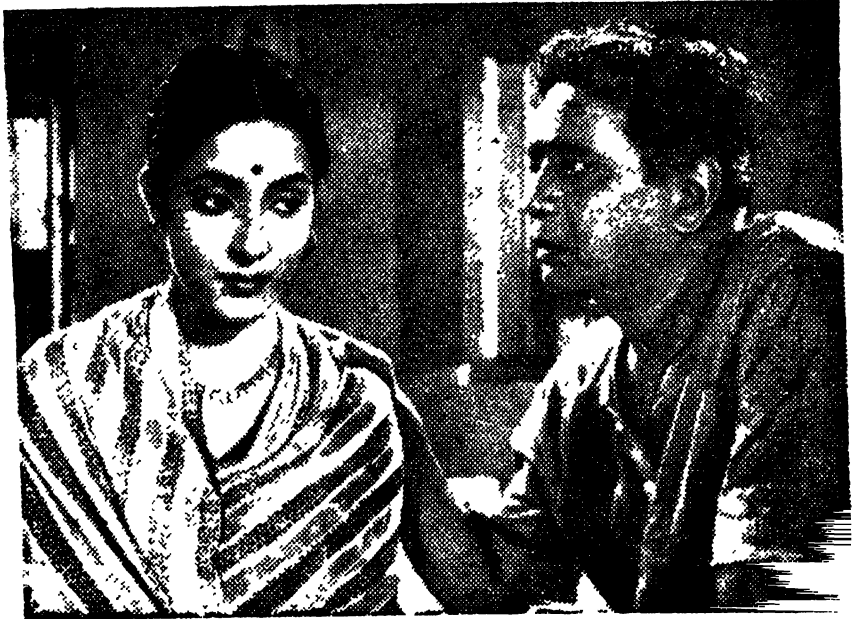
চিত্রালয় নিবেদিত "দুই বাড়ী" চিত্রের একটি দৃশ্যে জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও তন্দ্রা বর্মণ

সুব্রত সেন, দীনেন রায়, সমরকুমার, প্রণব দে, দেবগুরু ঘোষ, বামা বসাক, গীতা দে, কবিতা রায় এবং সুনীল কুণ্ডু।

গৈরিক পতাকা

পরলোকগত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জনপ্রিয় জাতীয়তা-উদ্দীপক নাটক "গৈরিক পতাকা" নিবেদন করলেন ইষ্টার্ণ রেলওয়ে হাওড়া গুডস্ ও পার্শেল বিভাগের কর্মীবৃন্দ। বিভিন্ন চরিত্রে আত্ম-প্রকাশ করেন সুবিমল সরকার, দিলীপ ভট্টাচার্য, প্রণব পাল, সুবোধ রায়চৌধুরী, তারাপদ মোদক, দেবপ্রসাদ পালধি প্রভৃতি। পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন বিমল সেন ও সুবোধ রায়চৌধুরী।

নিষ্কৃতি

সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের "নিষ্কৃতি" অভিনয় করলেন সঞ্জীবনী নাট্যগোষ্ঠী। ঝর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মীনা রায়ের পরিচালনায় বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়, অশোক রায়, চন্দনা গুপ্তা, শিবানী দে, যূথিকা রায় প্রভৃতি।

মেবার পতন

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক অমর নাটক "মেবার পতন" মঞ্চস্থ করলেন গুডস্ বিক্রিয়েশান ক্লাব। শান্তিময় দাসের পরিচালনায় এই নাটকের চরিত্রগুলির রূপদান করলেন শৈলেন বসু, সুনীল চক্রবর্তী, দীনবন্ধু দাস, নির্মল দাশশর্মা, ফণী চক্রবর্তী, শিবদাস মুখোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল দাস, সুবোধ দত্ত, বিনয় ঘোষ, দীননাথ নন্দী, দেবেশ রায়, মেনকা ভট্টাচার্য, অনিতা রায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, রাধারাণী ঘোষ প্রভৃতি।

[বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মোনা চৌধুরী ও চিত্ত নন্দী।]

এ মাসের প্রচ্ছদপট

দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারিকায় "বিবেকানন্দ রক" ভারতের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য দূরদূরান্ত থেকে সকল দেশের নরনারীকে সমানভাবে আকর্ষণ করে থাকে। জাতীয়জীবনে এই বিশেষ শিলাটির পবিত্রতা অনস্বীকার্য। এই স্থানটির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের যোগও ছিল অবিচ্ছেদ্য। এই শিলাশীর্ষে আসনগ্রহণ করে স্বামীজী সাধনায় সমাধিস্থ হন। স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে তাঁর দিব্য জীবনের আধ্যাত্মিক স্মৃতি-বিজড়িত এই তীর্থস্থানটির একটি আলোকচিত্র বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদে প্রকাশ করা হল। আলোকচিত্রটি গ্রহণ করেছেন শ্রীঅতুল দে।

ভারতপরিদর্শনরত গ্রীকরাজদম্পতি : রাণী ফ্রেডারিকাকে ভাটেরী গ্রামে একটি শিশুর স্বাগত অভিবাদন গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণে রাজা পল এবং রাজকুমারী আইরিন দণ্ডায়মানা।

পৌষ, ১৩৬৯ (ডিসেম্বর, '৬২-জানুয়ারী, ১৯৬৩)

অন্তর্দেশীয়—

১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) : নেফায় বমডিলায় অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা পুনরায় কায়েম।

শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) হস্তে দিল্লীতে আগত সিংহলী দূত কর্তৃক কলম্বো সম্মেলনের (নিরপেক্ষ ষড় জাতির) প্রস্তাব পেশ।

২রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর) : 'ভারতকে প্রদত্ত সামরিক সাহায্যের সহিত কাশ্মীর বিরোধের কোন সম্পর্ক নাই'—শ্রীনেহরুর লিখিত পত্রে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মন্তব্য।

৩রা পৌষ (১৯শে ডিসেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে বিভিন্ন পৌরসভা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা—রাজ্য সভায় বিল গৃহীত।

দিল্লীতে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের বৈঠকে শ্রীনেহরু কর্তৃক নেফা ও লাডাক সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা।

৪ঠা পৌষ (২০শে ডিসেম্বর) : কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সঙ্কটকালের জন্য খাদ্যশস্য মজুতের সিদ্ধান্ত—৩টি রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র) বিরাট গুদাম ঘর তৈয়্যারীর প্রস্তাব।

৫ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) : প্রতিরক্ষার উদ্যম জোরদার করার জন্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) কর্তৃক রাজ্যের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহযোগিতা আহ্বান—শ্রীনেহরুর নীতির প্রতি রাজ্য সরকারের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা। (বিধান সভায় ভাষণ)

৬ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর) : ভারত কর্তৃক চীনের ৮ই ডিসেম্বরের 'চরমপত্রে'র উত্তর প্রেরণ—নেফায় ঘাঁটি রাখার প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য।

ইডেন উদ্যানে (কলিকাতা) প্রধান মন্ত্রীর একাদশ বনাম রাজ্যপালের (পশ্চিমবঙ্গ) একাদশ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন—প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পিত ব্যবস্থা।

জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আইন মন্ত্রীর (শ্রীঅশোক কুমার সেন) হস্তে এটর্নি জেনারেলের কার্য্যভারও অর্পণের সিদ্ধান্ত।

৭ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর) : রেল দুর্ঘটনা নিরোধ সম্পর্কে গঠিত কুঞ্জরু কমিটি (শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরুর নেতৃত্বাধীন) কর্তৃক সরকারের নিকট প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ।

৮ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর) : জরুরী অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের জন্য বাহির হইতে বহু দ্রব্য আমদানী নিষিদ্ধ—কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যান্মাষিক আমদানী নীতি ঘোষণা।

৯ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর) : মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে সর্ব্বোদয় নেতা আচার্য্য বিনোবা ভাবের (অসুস্থ) সহিত শ্রীনেহরুর বৈঠক।

গোরক্ষপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম অধিবেশনের উদ্বোধন—মূল সভাপতি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর) : বর্ত্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে স্বর্ণ ক্রয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজ—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই'র মন্তব্য।

ভারত সরকার কর্তৃক চীনের তথাকথিত অস্ত্রসম্বরণ প্রস্তাব অগ্রাহ্য—চীনের স্মারকলিপির উত্তরে ভারতের চরম জবাব।

১১ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) : চীনা সৈন্যদের নেফার তাওয়াং হইতে ৪০ মাইল দূরে অপসরণের সংবাদ। চীন-ভারত প্রসঙ্গে ছয় জাতি কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাব অস্পষ্ট—শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

১২ই পৌষ (২৮শে ডিসেম্বর) : দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) উক্তি : চীন আবার অতর্কিতে ভারত আক্রমণ করিতে পারে—সীমান্তে শান্তির অবস্থা অনিশ্চিত।

১৩ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর) : দেশব্যাপী গ্রাম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা—দিল্লীতে ভারতের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা-সমূহের প্রতিনিধি সম্মেলনে অনুমোদিত।

১৪ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর) : সরকারের প্রতিরক্ষা উদ্যমে হিন্দুমহাসভার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন—অধ্যাপক ভি জি দেশপাণ্ডের সভাপতিত্বে কলিকাতায় মহাসভার ৪৭তম অধিবেশনের অনুষ্ঠান।

৮ই সেপ্টেম্বরের (১৯৬২) পূর্ববর্ত্তী অবস্থায় চীন না হটিলে যুদ্ধ অনিবার্য্য—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্পষ্টোক্তি।

১৫ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর) : ফেণী নদীর উপর পাকিস্তান কর্তৃক চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া বাঁধ নির্ম্মাণ—ত্রিপুরা কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ।

১৬ই পৌষ (১লা জানুয়ারী, ১৯৬৩) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাত হইতে কেন্দ্র কর্তৃক শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরিচালনভার গ্রহণ। জরুরী অবস্থায় পাঞ্জাব মন্ত্রিসভার আয়তন হ্রাস—৩১ জন সদস্যের স্থলে ৯ জনকে লইয়া মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাস।

১৭ই পৌষ (২রা জানুয়ারী) : পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নাগাভূমির উন্নয়নে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ।

১৮ই পৌষ (৩রা জানুয়ারী) : রাইটার্স বিল্ডিংস-এ (কলিকাতা) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের সহিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীর বৈঠক—বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠন প্রসঙ্গ ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা।

১৯শে পৌষ (৪ঠা জানুয়ারী) : উমেশনগর ষ্টেশনে (মুঙ্গের) কাটিহার-বারৌনি প্যাসেঞ্জার ট্রেণের সহিত অযোধ্যা-ত্রিহুত মেলের সংঘর্ষ—৪২ জন নিহত : শতাধিক ব্যক্তি আহত।

২০শে পৌষ (৫ই জানুয়ারী) : লক্ষ্ণৌ-এ প্রধান মন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) ভাষণ : চীনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধই ভারতের প্রথম জনযুদ্ধ—চীন-ভারত যুদ্ধ পাঁচ বৎসরকাল স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

২১শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী) : পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নে ১৯৬১-৭১ সালের মধ্যে দুই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব—দিল্লীর জাতীয় ফলিত অর্থ নৈতিক গবেষণা পরিষদের সুপারিশ।

২২শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী) : শ্রীনেহরু কর্তৃক রিহান্দ বাঁধের (উত্তর প্রদেশ) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

বিধান পরিষদে (পশ্চিমবঙ্গ) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের উক্তি : পশ্চিমবঙ্গের নাম 'বাংলা' করার সিদ্ধান্ত অটুট থাকিবে।

২৩শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী) : সিকিম-তিব্বত সীমান্তে চীনাদের ব্যাপক সৈন্য সমাবেশের সংবাদ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ বিলের উপর বিতর্ক আরম্ভ—বিরোধী পক্ষ কর্ত্তৃক বিলের তীব্র সমালোচনা।

বিশিষ্ট সমাজ ও সাহিত্যসেবী শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারের (৬১) লোকান্তর।

২৪শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী): কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধি জারী—স্বর্ণালঙ্কার ভিন্ন সমস্ত সোনার হিসাব পেশ করার নির্দ্দেশ—রূপার আগাম লেনদেনও বন্ধ।

শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক চীনা প্রধান মন্ত্রীর (মি: চৌ) সর্বশেষ নোট প্রত্যাখ্যাত—৮ই সেপ্টেম্বরের (১৯৬২) অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়ার দৃঢ় দাবী।

২৫শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী): পিকিং সফরান্তে সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের দিল্লী আগমন—আলোচনায় সাহায্যার্থ ঘানার বিচার মন্ত্রীরও দিল্লী উপস্থিতি।

ভারতের সর্ব্বত্র সোনা-রূপার বাজারে অচলাবস্থা—সরকারী নিয়ন্ত্রণ আদেশের জের।

২৬শে পৌষ (১১ই জানুয়ারী): কলম্বো প্রস্তাব প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুর সহিত শ্রীমতী বন্দরনায়কের আলোচনা শুরু।

২৭শে পৌষ (১২ই জানুয়ারী): দিল্লীতে কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা—ভারতীয় প্রতিনিধিদের (সরকারী) সহিত সিংহল, আরব প্রজাতন্ত্র ও ঘানা প্রতিনিধিমণ্ডলীর বৈঠক।

২৮শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী): শ্রীনেহরু শ্রীমতী বন্দরনায়ক যুক্ত ইস্তাহার প্রচার—কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের চূড়ান্ত অভিমত পার্লামেন্টে আলোচনা ক্রমে উপাপনের সিদ্ধান্ত।

২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী): গঙ্গা সাগর সঙ্গমে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে দেড় লক্ষ নর-নারীর পুণ্যস্নান—প্রয়াগ সঙ্গমেও (এলাহাবাদ) লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর অবগাহন।

বহির্দেশীয়—

১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর): সেনেগালের জাতীয় পরিষদ সৈন্ত ও পুলিশ দল কর্ত্তৃক দখল।

৩রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর): বাহামায় কেনেডি-ম্যাকমিলান (মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) বৈঠক।

৫ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর): স্কাইবোল্ট ক্ষেপণাস্ত্রের পরিবর্ত্তে আমেরিকা কর্ত্তৃক বৃটেনকে পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের চুক্তি সম্পাদিত—বাহামা বৈঠকান্তে কেনেডি-ম্যাকমিলান যৌথ বিবৃতি প্রচার—ভারতে ইঙ্গ-মার্কিণ অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা।

৬ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর): চীনা প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ-এন-লাই'র হস্তে কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাব অর্পিত।

৮ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর): কাটাঙ্গী বাহিনীর গুলিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হেলিকপ্টার জখম—এলিজাবেথভিলে কাতাঙ্গা বাহিনী (মি: শোম্বে সমর্থক) ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম।

১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর): কাশ্মীরের পাক্ অধিকৃত অঞ্চল ও চীনের মধ্যে সীমানা সম্পর্কে চীন-পাকিস্তান মতৈক্য ঘোষণা। চীন-বহির্মঙ্গোলিয়া সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১১ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর): রাওয়ালপিণ্ডিতে কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাক-ভারত বৈঠকের উদ্বোধন—ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা সর্দ্দার শরণ সিং ও পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা মি: ভুট্টো।

১২ই পৌষ (২৮শে ডিসেম্বর): ভারত-পাক্ বৈঠকে (রাওয়ালপিণ্ডি) কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা চেষ্টায় অগ্রগতির সূচনা—বৈঠকান্তে উভয় রাষ্ট্রের নেতৃদ্বয়ের (সর্দ্দার শরণ সিং ও মি: ভুট্টো) বিবৃতি—১৬ই জানুয়ারী (১৯৬৩) দিল্লীতে পরবর্ত্তী বৈঠকের ব্যবস্থা।

১৩ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর): কাটাঙ্গার দুইটি সহরে (এলিজাবেথভিল ও কলওয়েজি) রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিমান বাহিনীর গোলাবর্ষণ।

১৪ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর): রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী কর্ত্তৃক কাতাঙ্গার কিপুশি ও কামিনা সহর দখল—প্রেসিডেণ্ট শোম্বের রোডেশিয়ায় পলায়ন।

'৮ই সেপ্টেম্বরের (১৯৬২) অবস্থানে ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে—সীমান্তে এক তরফা যুদ্ধ বিরতি অনিশ্চিত'—ভারতের উদ্দেশ্যে চীনের নূতন হুমকী।

১৫ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর): কলম্বো সম্মেলনের পর শান্তির দৌত্যে শ্রীমতী বন্দরনায়কের পিকিং উপস্থিতি।

প: ইরিয়ানে ইন্দোনেশীয় পতাকা উত্তোলিত—তিন শতাব্দীর অধিককালব্যাপী ওলন্দাজ শাসনের অবলুপ্তি!

১৬ই পৌষ (১লা জানুয়ারী, ১৯৬৩): পিকিং-এ প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ-এর সহিত শ্রীমতী বন্দরনায়কের বৈঠক—ভারতের বিরুদ্ধে চীনা প্রধান মন্ত্রীর চিরাচরিত দোষারোপ।

করাচীতে মি: সুরাবর্দ্দীর বাসভবনে জাতীয় গণতন্ত্রী ফ্রণ্টের বৈঠক অনুষ্ঠান—আব্দুল গফুর খান সহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী।

১৭ই পৌষ (২রা জানুয়ারী): শ্রীমতী বন্দরনায়ক—চৌ এন্ লাই আর এক দফা আলোচনা।

১৮ই পৌষ (৩রা জানুয়ারী): রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী কর্ত্তৃক জাদোৎভিল (কাতাঙ্গার খনি শহর) দখল।

২০শে পৌষ (৫ই জানুয়ারী): করাচীতে পাক্-চীন প্রথম বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত।

২২শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী): দীর্ঘ বৈঠকান্তে মি: চৌ এন-লাই ও শ্রীমতী বন্দরনায়কের যৌথ ইস্তাহার প্রচার—বান্দুং সম্মেলনের নীতির ভিত্তিতে চীন-ভারত মীমাংসার উপর গুরুত্ব আরোপ।

২৩শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী): পলায়নকারী কাটাঙ্গা প্রেসিডেণ্ট মি: শোম্বের এলিজাবেথভিল প্রত্যাবর্ত্তন।

২৫শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী): কাটাঙ্গার কলওয়েজি সহর অভিমুখে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর অভিযান—যুদ্ধ বন্ধ করার জন্ত কাটাঙ্গী সৈন্তবাহিনীর প্রতি কাটাঙ্গা প্রেসিডেণ্ট মি: শোম্বের নির্দ্দেশ।

২৮শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী): পশ্চিম আফ্রিকার তোগো রাজ্যে (ফরাসী) সামরিক অভ্যুত্থান—মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ গ্রেপ্তার—আততায়ীর হস্তে প্রেসিডেণ্ট ডা: অলিম্পিও নিহত।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রংপুরে পুলিশের গুলিতে ৪ জন বিক্ষোভকারী নিহত ও প্রায় ৫০ জন আহত।

২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী): তোগোয় জরুরী অবস্থা ও কারফিউ জারী—বহির্বিশ্বের সহিত রাজ্যের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

বাঙলার ফ্যাসিজম

আজ ক্ষমতার দম্ভে বাংলাদেশে যে পাগলামি মাথা তুলিতে চাহিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে আমরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে চাই। কারণ, এই পাগলামি ও দম্ভের আড়ালে রহিয়াছে নয়া ফ্যাসিজম। মানুষের মধ্যে যাহা কিছু সৎ, সুন্দর ও উদার মানবতামণ্ডিত, তাহার সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করিবার জন্য এই ফ্যাসিজম নখদন্ত বিস্তার করিতে চাহিতেছে। চৈনিক কম্যুনিষ্টদের আক্রমণে ভারতবর্ষে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া এই "নিও ফ্যাসিজম" জাতীয় কংগ্রেসের এবং দেশের মধ্যে যাহা কিছু সৎ এবং উদারতাপূর্ণ, তাহার সমস্ত কিছুকেই ধ্বংস করিতে চাহিতেছে। ইহাদের শক্তিশালী বাহন হইতেছে মুনাফাখোর এবং আদর্শভ্রষ্ট এক শ্রেণীর সংবাদপত্র। —দৈনিক বসুমতী
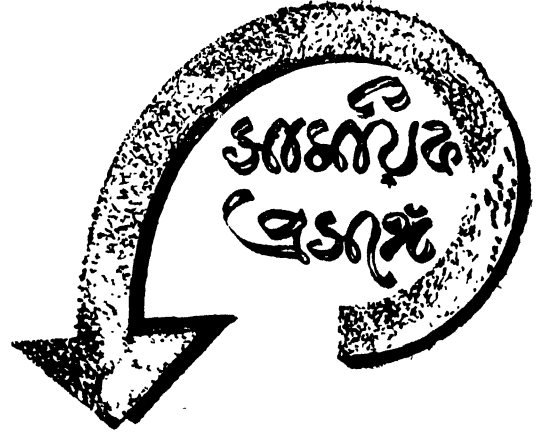
নেতাজী স্মৃতি

স্বাধীনতালাভের পর দীর্ঘ পনরো বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ভারতের অনেক স্মরণীয় ব্যক্তির স্মারক ডাকটিকিট ভারতীয় ডাক-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এইসব ডাকটিকিট প্রকাশ করিয়া সরকার ও ডাক-বিভাগ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা অকুণ্ঠভাবে বলিব। কিন্তু প্রশ্ন করিব,—এই দীর্ঘকালের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্মারক ডাক-টিকিট প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল না কেন? কাহার স্মারক ডাক-টিকিট কখন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব কাহার বা কাহাদের, তাহা আমরা জানি না। যাঁহার বা যাঁহাদের উপর সে গুরুদায়িত্ব অর্পিত, তাঁহার বা তাঁহাদের কি দেশের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় নাই? অথবা পরিচয় থাকিলেও কি তিনি বা তাঁহারা সে সম্বন্ধে উদাসীন। নচেৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামের যিনি অন্যতর মহানায়ক তাঁহার স্মারক ডাক-টিকিট প্রচারের অপরিহার্য কর্তব্যের কথা তাঁহার বা তাঁহাদের এই দীর্ঘকালের মধ্যেও স্মরণ হয় নাই কেন? ইহা কি নিছক উদাসীনতা, না স্বেচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তা? নিখিল-ভারত-হিন্দুসভার সম্পাদককে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নামে একটি বিশেষ ডাক-টিকিট প্রকাশের প্রস্তাব করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রস্তুত করিতে কিছু সময় লাগিবে। অর্থাৎ নেতাজীর সদ্যোগত জন্মদিবসেও তাহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। জানি না, হিন্দুসভা সম্পাদক স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে ভারত সরকারের এই ডাক-টিকিট প্রকাশের কথা মনে হইয়াছে কি না! প্রস্তাব যেজন্যই গৃহীত হইয়া থাকুক, এই ডাক-টিকিট যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশ করিলে, সরকার যাহা বহু পূর্বেই করা উচিত ছিল সেইরূপ অবশ্য-পালনীয় একটি কর্তব্য সম্পাদন করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইবেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বেকার সমস্যা

ভবিষ্যতে সেনাদলের সহিত থাকিয়া যুদ্ধের কাজে সাহায্যের জন্য কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি ছয় মাসের শিক্ষাদান-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কর্মকার, ছুতার-মিস্ত্রী, মোটরগাড়ীর জন্য ইলেকট্রিসিয়ান, ফিটার, তারের লাইনম্যান মেকানিক, টিনের মিস্ত্রী, তামার মিস্ত্রী, মোটর মিস্ত্রী, গ্যাস ও বিদ্যুৎ ওয়েল্ডার, প্লাম্বার, টার্ণার ইত্যাদি কারিগরী কৌশল ছয় মাসে শিখাইয়া দেওয়া হইবে। টালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট, হাওড়া হোমস, কল্যাণী, ঝাড়গ্রাম, দুর্গাপুর, কৃষ্ণনগর ও কলিকাতার শিল্প-শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হইবে। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলায় হাহাকার লাগিয়াই আছে। এই সকল কাজের জন্য সেনাদলে ভর্তি হইলে উপযুক্ত বেতন ত দেওয়া হইবেই, ইহা ছাড়াও ট্রেনিং-এর ছয় মাস তাহাদের খাওয়া-থাকা, কারখানার পোষাক ইত্যাদি এবং মাসিক ২৫ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হইবে। শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায় না, কারিগরী কাজে শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করিতে চাহিলেও কলে কারখানায় স্থান পাওয়া যায় না—আমাদের রাজ্যের এ অবস্থার জন্য অনেকেই অভিযোগ করেন! যুদ্ধের কাজে যোগদানে যাহাদের আগ্রহ আছে, কর্ম শিক্ষায় যাহাদের উৎসাহ আছে, অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিত যুবকগণ এই ট্রেনিং বা শিক্ষালাভের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই কারণেই আমাদের রাজ্যের যুবকদের নিকট ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—যুগান্তর

স্বামীজীর প্রতিমূর্তি

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকীতে নয়া দিল্লীর জনসভায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতা গুরুজী গোলওয়ালকর বলিয়াছেন,—বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা দিলে অথবা উৎসব করিলেই যথেষ্ট হইবে না, দেহের শক্তি, মনের পবিত্রতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তার উপর স্বামীজী যে ঝোঁক দিয়াছিলেন, তাহা যুবসমাজের জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। স্বামীজীর মূর্তি তাঁর অম্লান আদর্শ জাগ্রত রাখিতে সাহায্য করিবে। ঐ সভায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ডা: ভি, কে, আর, ভি, রাও ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে যে প্রস্তরখণ্ডে ধ্যানরত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভবিষ্যৎ কর্তব্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন। সেই পাথরটি এতকাল 'বিবেকানন্দ রক' নামে পরিচিত ছিল। কিছুদিন আগে খৃষ্টানরা উহার গায়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকিয়া দিয়া সেখান হইতে স্বামীজীর নাম মুছিয়া দিতে চেষ্টা করে। স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন গোলযোগের ভয়ে সরিয়া আসেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিবেকানন্দ রক পুনরুদ্ধার করিয়াছে। সঙ্ঘের কয়েকটি তরুণ সাঁতার দিয়া ঐ পাথরে যায় এবং ক্রুশ চিহ্ন মুছিয়া দেয়। খৃষ্টানেরা পুনরায় ক্রুশ আঁকিতে গেলে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট বাধা দিয়া উহাদিগকে নিবৃত্ত করেন।

অতঃপর স্থির হয় বিবেকানন্দ রকে স্বামীজীর একটি ২৫ ফিট উচ্চ ব্রোঞ্জ-মূর্তি স্থাপিত হইবে এবং কন্যাকুমারিকার সহিত একটি সেতু দ্বারা ঐ রক যুক্ত হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ছয় লক্ষ টাকা তুলিবার জন্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। দিল্লী কমিটির চেয়ারম্যান হইয়াছেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার দেওয়ান আনন্দকুমার। এ বৎসর স্বামীজীর জন্মদিবসে মূর্তির ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে; আগামী বৎসর মূর্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। গোলওয়ালকরজী কলিকাতা আসিয়াছিলেন এবং সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ভাষণ দিয়াছিলেন। অত বড় সভা ঐ স্কোয়ারে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু উহার বিবরণের স্থান সংবাদপত্রেরা অতি কষ্টে একটুখানি করিয়া দিতে পারিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কাজের জন্য বেশী আস্থা রাখিয়াছিলেন মাদ্রাজের উপর। মাদ্রাজ তাঁহার মর্যাদা রাখিয়াছে এবং মহারাষ্ট্র তাঁহাকে আপন করিয়া নিতেছে। বাঙ্গালী স্বামীজীর জন্ম তারিখের তিনদিন পরে রাষ্ট্রপতির সুবিধামত তাঁহাকে আনিয়া শতবার্ষিকী "উদ্বোধন" করাইয়াছে। —যুগবাণী (কলিকাতা)

আক্রমণকারী চীন

আক্রমণকারী চীন সম্পর্কে—বর্তমান সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে ভারতের কর্মনীতি কি হইবে এবং হওয়া উচিত—শ্রীনেহরু তাহাই সুস্পষ্ট করিয়া বলেন: চীন সম্পর্কে ভারতকে দৃশ্যত: দুইটি পরস্পর-বিরোধী নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। একটি হইল—ভারত শান্তির পথে—মীমাংসার পথে মীমাংসার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, পরস্পর শান্তিতে যেমন বসবাস করিতে চাহিবে তেমনি ভারতের অখণ্ডতার প্রতি যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকিবে—প্রতিরোধের শক্তি সমন্বিত থাকিবে সেই কারণেই ভারত প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে কখনো শিথিল হইতে দিবে না; ভারত সামরিক বলের নিকট কখনো নতি স্বীকার করিবে না। ভারত যেমন থাকিবে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত, তেমনি সর্বদাই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য প্রস্তুত থাকিবে—ইহাই ভারত রাষ্ট্রের নীতি। যাঁহারা বলেন—ভারত ভয়ে ভীত হইয়া ভারতের অমর্যাদা করিয়া মীমাংসার জন্য কলম্বো-প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে—নেহরু তাঁহাদের উক্তি নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ইহাও জানান যে, ভারতের পবিত্র ভূমি হানাদারমুক্ত করার যে অবিচল সংকল্প গত ১৪ই নভেম্বর পার্লামেন্টে গৃহীত হয়, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া নেহরু ঘোষণা করেন: পরিণামে যাহাই হউক না কেন, ভারত কখনই জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া চীনের সঙ্গে মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবে না। —জনসেবক।

দেশমাতৃকার সেবা

দেশ স্বাধীন হবার পরেও দেশের কোটী কোটী মানুষের এই নারকীয় দুর্দশা স্মরণ করিয়ে দেয় পৌরাণিক যুগের কপিল শাপে অভিশপ্ত সগর বংশের কাহিনী। অভিশপ্ত পূর্বপুরুষদের উদ্ধার-কল্পে ভগীরথ যেমন দুর্জ্জয় সাহসে, সুদুষ্কর তপস্যায় এবং দুঃসাধ্য সাধনায় বাধার হিমাচল ও পথরোধকারী আরও হাজারো অনেক কিছুর সকল প্রকার বিরোধিতা দূর করে মুক্তি গঙ্গাকে নিয়ে আসে—তেমনি তাদের কুটীল ভাগ্য কপিলের অভিশাপে অভিশপ্ত কোটী কোটী আত্মীয় স্বজনের উদ্ধার কল্পে আকুল আগ্রহে, ব্যাকুল চিত্তে মহা সাধনায় ব্রতী হবে আজ কোন ভগীরথ!—যুগ যুগান্তের পুঞ্জীভূত হতাশা-নিরাশা ও নিষ্ক্রিয়তার শুষ্ক গিরি গোবর্দ্ধনকে তুলে ধরে নিরঙ্কুশ স্বাভাবিক জীবনের প্রাণ স্পন্দন ফিরিয়ে আনবে আজ কোন সে কিশোর!—হাতে পায়ে গন্দানে বাঁধা অক্ষমতা দুর্ব্বলতা ও আত্ম-অবিশ্বাসের সুদৃঢ় নাগপাশকে জোর করে ছিঁড়ে ফেলার শক্তি মন্ত্রের সন্ধান দিবে আজ কোন্ সে মন্ত্র-দ্রষ্টা? দেশে আজ সেই ব্রতধারীর, সেই শক্তিধরের এবং সেই মন্ত্রদ্রষ্টার প্রয়োজন—দেশ চায় এই মানুষ—যে দেশের দুঃখে নীরবে কেঁদেছে—যার হৃদয়-বীণার তারে তারে শুধু একই সুর বেজে চলেছে—

"মাগো বাঁচিব তোমারি কাজে
মরিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময়
এ জীবন কেবা ধরে—"

—যুগদীপ (বিষ্ণুপুর)

আগুন! আগুন!!

ত্রিপুরায় অগ্নিকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব বহুল ও ব্যাপক—তেমনি জাতীয় সম্পদের হানিও ঘটে বিপুল পরিমাণ। কারণ ত্রিপুরার দরিদ্র জনগণ সহজলভ্য বনজ সম্পদ তথা বাঁশ ছন দ্বারাই তাহাদের মাথা গুঁজিবার আশ্রয় নির্মাণ করিয়া থাকে। ঐ সকল সহজ দাহ্য পদার্থে গৃহাদি নির্ম্মিত হয় বলিয়া ক্ষতিও হয় সমধিক। মাঘ মাসের এই প্রথমার্দ্ধেই ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইতিপূর্বে আগরতলা সহরে ২টি অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে মাছলি বাজারটি সম্পূর্ণভাবে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়—জনৈক রুগ্ন বৃদ্ধ উহাতে জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছেন। গত ২২শে জানুয়ারী মহারাজগঞ্জ বাজারের একটি বাঁশ ছন বিক্রেতার দোকান আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। গত পরশু বিশালগড় বাজারটিও পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের এখন হইতেই সাবধান হওয়া উচিৎ। নিজেদের অসাবধানতার জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিপত্তি ঘটে এবং শুধু নিজেদেরই নহে প্রতিবেশীরও সর্বনাশ সাধিত হয়। আগুন সম্পর্কে সর্বক্ষেত্রে সাবধান হওয়ার জন্য আমরা জনগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি। —গণরাজ (ত্রিপুরা)

সরকার কি নিশ্চেষ্ট?

ধান চালের দর যে কতখানি উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই 'প্রদীপে' আলোচনা করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। দেখিতেছি সরকার তাহার কোনই সুরাহা করিতে পারেন নাই। দর ক্রমেই উর্দ্ধমুখী হইয়া গরীব মধ্যবিত্তদের অসহনীয় অবস্থায় ফেলিয়াছে। সরকারে এত মজুদ অত মজুদ বলিয়া যে প্রচার করা হয়, জনসাধারণ তাহার কোন সার্থকতা দেখিতেছে না। মিলওয়ালারাই বাজারের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়াছেন।

তাহাদের ভাবে ভঙ্গীতে প্রকাশ—সরকারের মুখেই সব, কাজে কিছুই না। বিশেষ সরকার পক্ষ হইতে বেশী করিয়া গম খাইতে বলায় তাহারা সরকারের মজুদ চাল সম্বন্ধেও সন্দিহান। তাই ইচ্ছামত দর বাড়াইয়া চলিয়াছে। এমতাবস্থায় সরকার যদি এখনও নিশ্চেষ্ট থাকেন, তবে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। —প্রদীপ (তমলুক)

ভাগ্যবাদের খেলা

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যমূল্য কমিয়াছে। অথচ পশ্চিম-বাংলায় চাউলের দাম হ্রাস পাইল না। এই পরিস্থিতি অর্থনৈতিক অব্যবস্থার পরিচায়ক। শীতকালে আনাজপত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, নূতন চাউল বাজারে আসে। তাহার ফলে জীবনধারণের ব্যয়মান নিম্নগতির পরিচয় দেয়। পশ্চিম-বাংলায় এ বৎসর বর্ষা ও শরতে শাক-সব্জি অগ্নিমূল্য হইয়াছিল। শীতের মরশুমে দাম কমিতে কমিতে মাসখানেক কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু চাউলের পরিস্থিতি দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, ফাল্গুন বা চৈত্র হইতে নূতন মহার্ঘতা আত্মপ্রকাশ করিবে। কড়াকড়ির ফলে মাছের বাজার স্থিতিশীল হইয়াছে। ঘরে রাখিয়া মাছের উপর মুনাফা-লুণ্ঠন সম্ভব নয়। তরি-তরকারিও অবক্ষণীয়। কিন্তু চাউলের মজুদদারী সহজসাধ্য। শাসন-কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন, নূতন ধানের চাপে তণ্ডুল-সমস্যার সমাধান হইবে; কিন্তু তাঁহাদের বিশ্লেষণে আসল জিনিসই ধরা পড়ে নাই। সর্বব্যাপী মহার্ঘতার মধ্যে একমাত্র কৃষিজ পণ্যের দাম উঠানামা করে। ক্ষেত্রজ পণ্যের উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইলে দাম কমে। ভারতের অর্থনৈতিক বিলি-ব্যবস্থায় কৃষির প্রাধান্য অবিসংবাদী। খাদ্যমূল্য কমিবার পর বাজারের অবস্থা বছরখানেক অপরিবর্তিত থাকিলে সর্বাঙ্গীণ মহার্ঘতাও হ্রাস পাইবে। কিন্তু, এই দিক দিয়া কোনও সার্থক প্রচেষ্টার নামগন্ধ শুনা যাইতেছে না। পাঞ্জাবে গমের দাম পড়িয়াছে; সেখানে চাষীরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। পশ্চিম বাংলায় চাউলের দাম বাড়িতেছে, অথচ এখানকার কৃষকেরা ন্যায্য প্রাপ্য পায় না। মূল্য-সহায়তার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ নাকি শাসন-কর্তাদের নখদর্পণে। প্রয়োজনমত টাকার অভাব যে উহার অন্তরায়, এমন যুক্তি কি ধোপে টিকিবে? কিন্তু পাটচাষীদের দুর্দিনে যে মজ্জাগত অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় সুপরিস্ফুট, তাহার খপ্পর হইতে মুক্তি লাভের প্রশ্নই উঠে না। দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলিয়া লাভ নাই। জ্ঞানপাপীরা জাগিয়া ঘুমাইতে অভ্যস্ত। হাঙ্গামায় পড়িলে তাঁহারা হাঁক-ডাকে সক্রিয়তার পরিচয় দেন। তাহার পর? তাহার পর চলে যথানিয়ম ভাগ্যবাদের খেলা। কৃষি কৃষকের দুর্বিষহ সমস্যা নাকি এই ভাবেই মিটিবে।

—লোকসেবক।

মাভৈঃ!

আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের ভূমিকা এখনও অনির্ণীত রহিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে আমাদের যে ভুল হইয়াছিল, তাহার সংশোধনের সময় আসিয়াছে। অতীতের দিকে তাকাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভের মনোবৃত্তি হইতে স্বাধীনতা লাভের পর এক রক্ষণশীলতা আমাদের মধ্যে বাসা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হিন্দী ভাষাকে কেন্দ্রীয় সর্বভারতীয় ভাষার মর্যাদা দান, এই রক্ষণশীলতাজনিত অপরিণামদর্শিতা, যাহার অশুভ ফল হইয়াছে আঞ্চলিক বিচ্ছেদ-প্রবণতা। অকস্মাৎ অতিমাত্রায় ভারতীয়তার অভিযানে ইতিহাসকে অস্বীকার করিতে গিয়া আমরা বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ ভয়শূন্য চিত্তে যে উদার ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যে ভারতের জন্য বিধাতার নির্দয় আঘাত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই আঘাত বুঝি আজ নামিয়া আসিয়াছে। তাই বলিতে চাই—ভারতীয় মানুষ আমরা, আমাদের কর্তব্য এখন ভারতকে কবিগুরুর স্বর্গলোক সর্বমানবের তীর্থভূমিতে পরিণত করার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। সর্বভারতীয় সংহতির জন্য এক সময় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন পড়িয়াছিল। আজ সর্বজাগতিক মৈত্রীর জন্য চীনের ঔদ্ধত্যের সম্মুখীন আমাদের হইতে হইবে। ইহা ইতিহাসের অনিবার্য আহ্বান। অতীত গৌরবের রোমন্থন করিয়া যে সকল সাধুসন্তরা দিনযাপন করিতে চাহেন, লোকালয়ের সংস্পর্শ হইতে তাঁহাদিগকে এখন সরিয়া যাইতে হইবে। নবযুগের এই নূতন ভারতে তাঁহাদের স্থান আর নাই। গীতার ইহাই শাশ্বত বাণী।

ভারত আবার পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি (Call for unity) শুনিতে পাইয়াছে। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করিয়া নওজোয়ানের দল আজ অগ্রসর হও। মাভৈঃ।

—জনশক্তি (শিলচর)।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

ভারতের বৃহৎ বৃহৎ শিল্পপতিদের সম্মেলক প্রতিষ্ঠান এফ, আই, সি, সি, আই। উক্ত প্রতিষ্ঠান ১৫ই ডিসেম্বর এক প্রস্তাবে সরকারকে পূর্ণ সমর্থন, জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান, মূল্যবৃদ্ধি নিরোধের এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু উহা ত প্রকাশ্য ব্যাপার; গোপন চাল অন্যত্র চলিতেছে; ইহা যেন হাতীর দেখাইবার দাঁতজোড়া, খাইবার দাঁত অন্যত্র লুক্কায়িত; ৭ই ডিসেম্বর উক্ত প্রতিষ্ঠানই (ফেডারেশন অফ, ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ) নাকি সরকারের নিকট পূর্বাহ্নে সতর্ক করিয়া এক পত্র দেন এবং উক্ত পত্রের ভাষ্য নাকি নিম্নরূপ। এই জাতীয় দুর্দিনের দারুণ পরিস্থিতিতে তাঁহারা যে তাঁহাদের শিল্পকারখানাগুলি যুদ্ধ-বীমার অন্তর্ভুক্ত করিবেন, তাহার জন্য কিস্তিতে কিস্তিতে যে গুরু পরিমাণ প্রিমিয়াম দিতে হইবে, তাহা তাঁহারা বহন করিতে অপারগ এবং বাধ্য হইয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিয়াই

তাহা তাঁহাদের জমা দিতে হইবে এবং সরকার যেন তাঁহাদিগকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন, জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি করিয়া বা অন্যবিধ সাহায্য করিয়া; কেন না সামান্যতম মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ বড় বেশি বিচলিত হয়। ইহার ফল এই যে—সাধারণ মানুষকে দীর্ঘদিন ধরিয়া ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে বর্দ্ধিত মূল্য বহন করিয়া তাহার প্রিমিয়াম জোগাইতে হইবে। জাতীয় জরুরী পরিস্থিতিতে জনসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতে, দুঃখ বহন করিতে প্রস্তুত। তবে অবশ্যই তাহা কাহারও ব্যক্তিগত মুনাফাবৃদ্ধি বা স্বার্থরক্ষার জন্য নহে। জাতীয় কল্যাণ ও প্রতিরক্ষার জন্যই সাধারণ মানুষ অকুণ্ঠিত চিত্তে ত্যাগ স্বীকার করিবে।

—খড়গপুর সমাচার।

শোক-সংবাদ

ডঃ নিখিলরঞ্জন সেন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালী গণিতজ্ঞ, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-অনুষদের প্রধান ডঃ নিখিলরঞ্জন সেন গত ২৮শে পৌষ ৬১ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। ইনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। তাঁর গবেষণাদি সমগ্র বিজ্ঞানজগতে এক অভিনব আলোড়ন এনেছে এবং তাঁকে এক বিরাট শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ অধ্যাপক, বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ের পরিষদের সহকারী সভাপতি, যাদবপুরের ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান ফর কালটিভেশান অফ সায়েন্সের সম্মানাই অধ্যাপক প্রভৃতি সম্মানজনক আসনগুলি তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে।

স্যার শরৎকুমার ঘোষ

কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও সুদক্ষ আইনবিদ স্যার শরৎকুমার ঘোষ গত ২৩শে পৌষ ৮৪ বছর বয়েসে তিরোহিত হয়েছেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে অসাধারণ মেধাব বিকাশ ঘটে। তাঁর সমগ্র পঠদ্দশা কৃতিত্বের চিহ্নে ভরপুর। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং আইন, সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতিতে ট্রাইপস গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হন। কাশ্মীর এবং জয়পুর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি-রূপেও ইনি যথেষ্ট খ্যাতি ও যথাযথ স্বীকৃতিলাভ করেন। রিহ্যাবিলিটেশান ট্রাইব্যুনালের এবং পরে প্রিভেন্টিভ ডিটেশান এ্যাডভাইসারি বোর্ডের ইনি চেয়ারম্যান ছিলেন। সম্প্রতি স্যার জ্যোৎস্না ঘোষালের মৃত্যুর পর 'নাইট' উপাধিধারী অবশিষ্ট দু'জন বাঙালীর মধ্যে ইনি ছিলেন প্রবীণতম।

নির্ঝরিণী সরকার

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতমা নির্ভীক নেত্রী এবং সাহিত্য ও সমাজের একনিষ্ঠ সেবিকা নির্ঝরিণী সরকার গত ২৩শে পৌষ ৬১ বছর বয়েসে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বর্গত প্রফুল্ল কুমার সরকারের তিনি ছিলেন আদর্শ সহধর্মিণী। সম্প্রতি পরলোকগতা প্রখ্যাতনাম্নী কবি ও শ্রদ্ধেয়া দেশ সেবিকা সরলাবালা সরকারের তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং স্বাধীনতার চিন্তা তাঁর মনঃপ্রাণ অধিকার করে তখন থেকেই। এ বিষয়ে পত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর রীতিমত আলোচনা চলতে থাকে। ক্রমে সাহিত্যসেবায় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে নির্ঝরিণী নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত করেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে তিনি কারাবরণ করেন। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন ও শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ধর্মজীবনে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমার কাছে। ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তাঁর পাঠ শুরু, সেইখান থেকেই তাঁর সমাজ-সেবায় দীক্ষা-লাভ। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রসমূহ বিশ্বভারতী কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় বর্তমান সম্পাদক ও কর্ণধার শ্রীঅশোক কুমার সরকার তাঁর পুত্র।

অনিলা চট্টোপাধ্যায়

যশস্বিনী সমাজসেবিকা অনিলা চট্টোপাধ্যায়ের গত ২৩শে পৌষ প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। প্রচারের ঢক্কানিনাদের উপর নির্ভর না করে, নরনারায়ণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে যাঁরা বহুজনের প্রভূত কল্যাণসাধনে সমর্থ হয়েছেন, স্বর্গতা চট্টোপাধ্যায়ের স্থান তাঁদেরই মধ্যে। তাঁর সমগ্র জীবন আর্তের সেবা, শিশু পরিচর্যা ও অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের এক গৌরবময় ইতিহাস। বহু বিদ্যালয়, চিকিৎসাগার ও পরিচর্যাকেন্দ্র তাঁর নির্দেশনায় এবং প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। জনহিতকর কার্যের জন্যে বহু ত্যাগ ও কষ্ট তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। সরকার থেকে ইনি কাইজার-ই-হিন্দ এবং আরও কয়েকটি পদক লাভ করেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বর্গত জে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়।

পঞ্চানন রায়

তরুণ চিত্রশিল্পী পঞ্চানন রায়ের গত ১ই পৌষ মাত্র ৩৪ বছর বয়েসে অকালে জীবনাবসান হয়েছে। ছাত্রাবস্থা থেকেই ইনি শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই স্বীকৃতি ও যশ লাভ করেন। এঁর ছবি সাধারণ্যে সগৌরবে প্রদর্শিত হয়েছে এবং মাসিক বসুমতী ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পী হিসেবে ইনি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
[কলিকাতা ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, শ্রীসুকুমার গুহ মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]
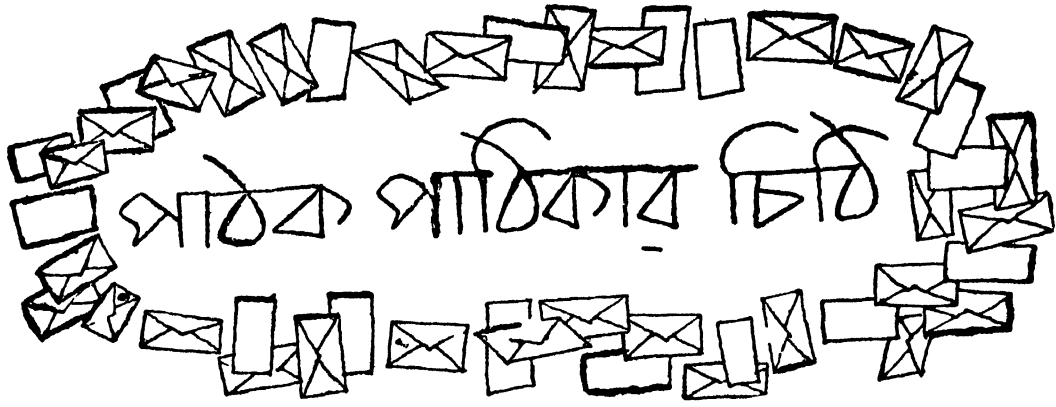
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা

ইহা নিঃসন্দেহ যে, ভারতবর্ষের ক্রমবর্দ্ধনশীল জনসংখ্যা আর্থিক ও সামাজিক প্রগতির পক্ষে বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যার প্রতিষেধক হিসাবে বর্ত্তমানে পরিবার-পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনচিত্তে অনুকূল আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচার, প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয়, এবিষয়ে মনীষীদের চিন্তাধারা প্রচারের মাধ্যমে জনসমক্ষে উপস্থিত করা প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ মার্গারেট সেঙ্গরকে লিখিত এক ঐতিহাসিক পত্রে লিখেছেন,—"অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়া কঠোর পাপ, যখন তাঁদের পূর্ণ প্রতিপালন-ক্ষমতা নাই।" একসময়ে দুর্ভিক্ষ, আকাল, মহামারী প্রভৃতির দ্বারা প্রকৃতি বিপুল ভাবে জনসংখ্যা কমাইয়া রাখিত। বিশ্ব-ইতিহাস সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত সর্বসাকুল্যে ৬০০ (ছয়শত) দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে। বাঙ্গলাদেশে ১৭৭৬ অব্দের দুর্ভিক্ষে শত-শত লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বিজাপুর, উড়িষ্যা ও বাঙ্গলাদেশে হাজারে-হাজারে লোক মরিয়াছে। যুদ্ধ, দাঙ্গা প্রভৃতিতেও বহু প্রাণহানি ঘটিয়াছে, সম্রাট অশোকের সময়ে কলিঙ্গ যুদ্ধে এক লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে এবং ইহা অপেক্ষা অনেক গুণ লোককে হত্যা করা হইয়াছে। হলদীঘাট রণক্ষেত্রে রাণাপ্রতাপের বাইশ হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র আট হাজার সৈন্য বাঁচিয়াছিল, ইতিহাসের শিক্ষায় ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে মৃত্যুর হার বর্ত্তমানে বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে আর্থিক ও সামাজিক শোষণের অবসানের জন্য গৃহীত পরিকল্পনাগুলির মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনা একটি স্তম্ভবিশেষ। শহরের তুলনায় গ্রামে প্রজননহার অনেক বেশী এমন কি, আমেরিকাতেও প্রজননহার শহরের তুলনায় গ্রামে প্রায় দ্বিগুণ বেশী। ধনিকের তুলনায় দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে জন্মহার বেশী। পণ্ডিত নেহরু 'Discovery of India" তে লিখেছেন,—"It is well known that as a rule fertility is higher among the poor than among the rich, as it is also higher in rural areas than the urban." ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীকে বুঝতে হবে যে, যাঁরা বেঁচে আছেন, আগে তাঁদের কথাই ভেবে দেখতে হবে। পরিকল্পনায় সাহায্য করাকে পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম বলে মনে করতে হবে। George Arnold এর মহান্ উক্তি স্মরণীয়, The living need charity than the dead," মানুষের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনীষী জুলিয়ান হাক্সলে বলেছেন,—"বিজ্ঞানের ভাষায় মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্চে বিশ্বের বিকাশ সাধনে যোগদান করা, অর্থাৎ মানুষকে অধিকাধিক জীবনোপলব্ধির সুযোগ দেওয়া, যাহাতে মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিক রূপে অধিক পূর্ণতার দিকে যেতে পারে এবং তা' ও এইভাবে—যাহাতে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অধিক উপলব্ধির রাস্তা না অবরুদ্ধ হয়। এই অর্থে জীবনোপলব্ধির অভিপ্রায় হচ্ছে—শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক কল্যাণ, বিবেক, আনন্দ, আশা, নিজের যোগ্যতার সন্তোষজনক প্রয়োগ, সৃজনাত্মক প্রবৃত্তি, ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ীকরণ. এবং এরূপ সামাজিকতা—যাহা এই জীবনোপলব্ধির প্রাপ্তিতে সাহায্য যোগাইতে পারে।" আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে বহুপরিবারের সদস্যের বুদ্ধি ও চেতনা কুণ্ঠাগ্রস্ত। পণ্ডিত নেহরু 'Discovery of India' তে লিখেছেন,—"Large families are often associated with inferior intelligence. Economic success is also supposed to be the opposite of biological success." ভারতে আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের বিস্ফোটক অবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছে। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে "মৌলানা আজাদ স্মারক ব্যাখ্যান মালা"তে ঐতিহাসিক টায়নবি বলেছেন,—"কল্পনা করুন যে আমরা সেই উপায়গুলির প্রয়োগ করে চলেছি, যার দ্বারা রোগ ও মৃত্যুর নিবারণ হচ্চে, আরও কল্পনা করুন যে, আমরা যুদ্ধ নিবারণ করতে সক্ষম হচ্চি এবং তারপর ইহাও কল্পনা করুন যে, আমরা, জন্ম-হারের ওপর নিয়ন্ত্রণে সফলতা লাভ করলাম এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্যোৎপাদন বাড়িয়ে ফেললাম এবং বিশ্বের জনসংখ্যা মানুষের হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল! যদি এইরূপ ঘটান যায়, তবে মানব-জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে আদর্শ আছে, তা' কার্য্যে রূপান্তরিত করার নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।" আধুনিক দৃষ্টিতে ভারতবাসীর জীবন সফল করে তোলার হাতিয়ার হিসাবে পরিবার-পরিকল্পনা সম্বন্ধে হাটে-ঘাটে-বাটে ব্যাপক ও বহুল প্রচারই সর্বাগ্রে বিধেয়।

—নরেন ঘটক, আরিয়াদহ, ২৪ পরগণা।

মহাশয়,—আমি আপনাদের মাসিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠক, গত অগ্রহায়ণ ১৩৬১ সালের মাসিক-বসুমতী সংখ্যার "বিজ্ঞান-বার্ত্তা" বিভাগে "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা"-শীর্ষক প্রবন্ধে লেখিকা শকুন্তলা সেন (পৃষ্ঠা-২৫১) যে সমস্ত বিষয়ে পরিসংখ্যান উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আমার মনে হয় লেখিকার মতামত

সম্ভবতঃ দেশের পক্ষে অহেতুক কটাক্ষপাত করিয়াছে। বর্তমানে আমরা পরপর ২টা পরিকল্পনা অতিক্রম করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রসরমান হইতে চলিয়াছি,—সুতরাং আমাদের দেশের শিল্পে, বাণিজ্যে, শিক্ষায় ও কৃষিপ্রভৃতিতে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, একথা আজ আর কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের সরকারী রিপোর্টে ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশ নয়—একথা স্বীকার করা হইয়াছে,—কারণ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে এমন অনেক দেশ আজও আছে, যাহারা আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে; এমত অবস্থায় লেখিকা কি ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে,—"ভারতবর্ষ পৃথিবীর সবচাইতে দরিদ্র ও অনুন্নত দেশ"? উপরোক্ত উক্তিতে মনে হয় লেখিকা জনসাধারণের সম্মুখে দেশকে হেয় ও অগৌরবান্বিত প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। লেখিকা—"ভারতবর্ষ পৃথিবীর সবচাইতে দরিদ্র ও অনুন্নত দেশ"—না বলিয়া শুধু "দরিদ্র ও অনুন্নত" দেশ বলিলে বোধ হয় নির্ভুল ও সময়োপযোগী হইত বলিয়া মনে হয়,—এজন্য আমি লেখিকার উল্লিখিত মত বা ধারণা সময়োপযোগী হয় নাই বলিয়া আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি। এবং এবিষয়ে যথামত অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত মতামত প্রকাশ করিবার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি—শ্রীজগদীশচন্দ্র জানা, ইন্‌-চার্জ্জ, গবর্ণমেণ্ট লেবার-ওয়েলফেয়ার সেণ্টার, মেটিয়া বুরুজ, কলিকাতা-২৪।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীবিনয়ভূষণ দেবপুরকায়স্থ, সাবডিভিশানাল এগ্রিকালচারাল অফিসার, হাফলঙ, আসাম***শ্রীএন মহাপাত্র, ১১১ এইচ। ডাক ব্রজরাজ নগর, সম্বলপুর***শ্রীঅনিল রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অবধায়ক শ্রীডি, এস, ভট্টাচার্য্য, মিশন পাড়া, ডিগবয়, আসাম***সচিব আজাদ হিন্দ লাইব্রেরী মাফ, ডাক টুলিন, জেলা পুরুলিয়া***সচিব, ভুটাম নিবারণ তরুণ লাইব্রেরী, ডাক ভুটাম, জেলা পুরুলিয়া***সচিব, পূর্ণচন্দ্র লাইব্রেরী, বারামেশিয়া, ডাক পুঞ্চা, জেলা পুরুলিয়া***সচিব, পল্লীমায়ী লাইব্রেরী পিটিডিরি, ডাক দিঘি, জেলা পুরুলিয়া***সচিব, জনশিক্ষা পাঠাগার, পেঙ্কারা, ডাক কুরার বেইদ, জেলা পুরুলিয়া ***সচিব, লক্ষ্মী সাহিত্য মন্দির, গ্রাম ও ডাক দিঘা, জেলা পুরুলিয়া ***গ্রন্থাগারিক তাভারি, লক্ষ্মীরাণী লাইব্রেরী, ডাক ভূটাম, জেলা পুরুলিয়া***শ্রীসতীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী আর, এম, ও, ইস্ট হোপ টাউন এষ্টেট, ডাক-প্রেমনগর (গামব্রিওয়েলা) জেলা দেরাদুন (উত্তর প্রদেশ) * * * শ্রীমতী চন্দনা সেন, অবধায়ক শ্রীজে, এন, সেন, ৩১ স্কুল রোড, পেরাম্বুর, মাদ্রাজ-১১ * * * শ্রীমতী জ্যোৎস্না সেন, ২৪ বেথুন রো, কলকাতা-৬ * * * সচিব, শক্তিগড় শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব, শক্তিগড়, ডাক-শিলিগুড়ি, জেলা জলপাইগুড়ি * * * শ্রীমতী কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, অবধায়ক—শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালকুঠি, ডাক-সিউড়ী, বীরভূম * * * গ্রন্থাগারিক পাটুলি পল্লীমঙ্গল ক্লাব ও রুরাল লাইব্রেরী, ডাক-পাটুলি, বর্দ্ধমান * * * শ্রীমতী সন্ধ্যা চক্রবর্তী, অবধায়ক শ্রীঅনাবিল চক্রবর্তী, এ্যাডভোকেট, বিসার ট্যাঙ্ক, ডাক-গয়া (জেলা-গয়া), বিহার * * Dr. R. P. Shaw, C/o. 56 A. P.O. 552 Spl. works coy * * * শ্রীমতী মারা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শিবানী চক্রবর্তী, অবধায়ক রাও জে, এন, রায় হাসপাতাল, ডাক-বহরমপুর (সদর) জেলা-মুর্শিদাবাদ * * * সচিব, হরিসভা পাঠমন্দির, কাঞ্চনতলা, ডাক ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ ***গ্রন্থাগারিক, হাঁসচারা এম, ডি, হাইস্কুল (সর্বার্থসাধক), ডাক হাঁসচারা, জেলা মেদিনীপুর***প্রধান শিক্ষিকা, কিষাণগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল, ডাক কিষাণগঞ্জ, পুর্ণিয়া***সচিব, গোবিন্দরাম পুর অশ্বিনীকুমার হাইস্কুল, ডাক ভুবননগর (কাকদ্বীপ হয়ে) ২৪পরগণা।

এই বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—মৈত্রেয়ী সিংহ, মজঃফরপুর।

I am remitting my annul renewal subscreption of Monthly Basumati—South West Institute, Chakradharpur.

১৩৬৯ সালের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম—শ্রীমতী রেণুকণা মুখার্জ্জী, এলাহাবাদ-২।

আশ্বিন মাস থেকে এক বৎসরের অগ্রিম চাঁদা পাঠালাম—Dr. S. Bhattacherjya, Jabalpur.

Subscription of Masik Basumati for the new Bengali year 1369.—Sushama Chakravorty, Dehra Dun, (U. P.)

১৩৬৯ সালের চাঁদা পাঠাইলাম।—অনিতা বিশ্বাস, ত্রিপুরা।

Herewith remitted Rs. 15/- as annual subscription of Masik Basumati for the year 1369 (B. S.)—Mrs. Pratima Moitra, Assam.

Remitting herewith Rs. 15/-. Please enrol me as a subscriper and send me Basumati from Baisakh.—Gouri Choudhury, Tribeni, Hooghly.

বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম—ডাঃ সুরেশচন্দ্র বেরা, বেলদা, মেদিনীপুর।

Remitting Rs. 15/- as annual Subscription of Monthly Basumati for one year commencing from Baisakh 1369 B. S.—Dr. B. Mookherjee, Amta.

বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন।—আরতি দে, কটক।

I am sending Rs. 15/- as annual subscription from Aswin to Bhadra for the next term—D. P. Gupta, Dhanbad.

Please find herewith Rs. 15/- as Subscription for one year from Sravan to Ashar for Masik Basumati—Mrs. Sudhir Ghosal, Varanashi.

বসুমতী গ্রাহকের চাঁদার ১৫৲ টাকা পাঠালাম—শ্রীমতী অঞ্জলী দে, শ্রীরামপুর।

১৩৬৯ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—শ্রীশ্বেতাঙ্গিনী গুপ্তা, কাছাড়।

Remitting herewith the Subscription of Masik Basumati for the new year—R. A. M, Club Jalpaiguri.

স্কেচ্‌
—স্বর্গতঃ আদিনাথ মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৪১শ বর্ষ—মাঘ, ১৩৬৯] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কথামৃত

বিশ্বাসই মানুষকে সিংহ করে।

যদি জড়জগতে বড় হইতে চাও, বিশ্বাস কর—তুমি বড়। আমি হয়ত একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, তুমি হয়ত পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও, অনন্ত সমুদ্র আমাদের উভয়েরই পশ্চাদ্দেশে রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই উহা হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব আপনার উপর বিশ্বাস কর।

আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে, তাহাও একান্ত অনস্তিভাবপূর্ণ—স্কুলবালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সেই শ্রদ্ধার লোপ। "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানঃ বিনশ্যতি" (গীতা)। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট।

নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আর যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হইবে। আর যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি ঈশ্বর হইয়া যাইবে—পরমানন্দস্বরূপ নির্বাণ লাভ করিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

চিকাগো বক্তৃতা : স্বামী বিবেকানন্দ

আচ্ছা, স্বীকার করা গেল যে, পূর্ব্বজন্ম আছে। কিন্তু তাহা হইলে কেন পূর্ব্ব জীবনের বিষয় আমাদের মনে থাকে না? ইহা সহজেই বুঝান যাইতে পারে। আমি এক্ষণে ইংরাজীতে কথা বলিতেছি, ইহা আমার মাতৃভাষা নয়। বাস্তবিক এখন আমার মাতৃভাষার এক অক্ষরও মনে উঠিতেছে না। কিন্তু যদি আমি মনে করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে এখনই মনে উঠিবে। এই ব্যাপারে এরূপ বুঝা যাইতেছে যে, মনঃসমুদ্রের উপরিভাগে যাহা থাকে, তাহাই আমাদের বোধগম্য হয় এবং আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানরাশি সেই সমুদ্রগর্ভে নিহিত থাকে। চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা তাহাদিগকে উপরে আনা যাইতে পারে এবং এমন কি, পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ জ্ঞানও মনে উঠিতে পারে।

পূর্ব্বজন্ম স্মরণ

পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে ইহাই সাক্ষাৎ প্রমাণ। কার্য্যক্ষেত্রে মিলাইয়া পাইলেই কোন মতবাদের সম্পূর্ণ সত্যতা প্রমাণিত হয়; এবং ঋষিগণ সমস্ত জগতে এই বাক্য ঘোষণা করিতেছেন—"স্মৃতিসাগরের গভীরতম প্রদেশ কিরূপে আলোড়িত করিতে হয়, সেই গূঢ় বিষয় আমরা আবিষ্কৃত করিয়াছি।" তাঁহাদের অনুসরণপুরঃসর সবিশেষ সাধনা কর, তোমরাও পূর্ব্বজন্মের সমুদয় কথা মনে করিতে পারিবে।

অতএব দেখা গেল, হিন্দু আপনাকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন। "সেই আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল আর্দ্র করিতে পারে না ও বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না।" সেই আত্মা এরূপ একটি বৃত্তস্বরূপ, যাহার পরিধি অনির্দ্দেশ্য, কিন্তু যাহার কেন্দ্র কোন একটি দেহমধ্যে অবস্থিত এবং সেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। আর আত্মা জড়নিয়মেরও বশীভূত নহেন, ইনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। কিন্তু কোন কারণবশতঃ জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন ও আপনাকে জড় বলিয়া মনে করিতেছেন। কেন এই বিশুদ্ধ, পূর্ণ ও বিমুক্ত আত্মা জড়ের দাসত্ব করিতেছেন এবং পূর্ণ হইয়াও আপনাকে অপূর্ণের ন্যায় মনে করিতেছেন? কেহ কেহ মনে করেন যে, হিন্দুগণ এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিতে পারিবেন না বলিয়া উহা একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। কোন কোন পণ্ডিত আত্মা ও জীব এই দুইয়ের মধ্যপ্রদেশে কতকগুলি পূর্ণকল্প সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করেন এবং তাহাদিগকে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক দীর্ঘাকার সংজ্ঞা দ্বারা আখ্যাত করেন। কিন্তু সংজ্ঞা দিলেই কি উহার কিছু মীমাংসা হইল? প্রশ্ন যেমন তেমনই রহিল। যিনি পূর্ণ, তাঁহাতে কিরূপে পূর্ণতার অণুমাত্রও লাঘব সম্ভব? যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, কিরূপে তাঁহার তৎস্বভাবের অণুমাত্রও ব্যতিক্রম হয়? হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সরল ও সত্যবাদী। তাঁহারা মিথ্যা তর্কযুক্তিদ্বারা মীমাংসার চেষ্টা পান নাই বা মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া পণ্ডিতম্মন্য হইতে চাহেন না। তাঁহারা সাহসের সহিত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং উত্তরে বলেন—"ইহা আমরা জানি না। আমরা জানিনা যে, কেমন

আত্মা দেহ-বদ্ধ কেন?

করিয়া পূর্ণ আত্মা আপনাকে অপূর্ণ ও জড়ের নিয়মাধীন বলিয়া মনে করেন।' কিন্তু ইহা সর্ব্বতোভাবে সত্য। প্রত্যেকেই আপনাকে দেহস্বরূপ বলিয়া মনে করে। আত্মা এই দেহে কেন যে আসিয়াছেন, আমরা ইহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করি না। 'ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা' বলিলে কিছুই ব্যাখ্যা করা হইল না। হিন্দুরা যে 'আমরা জানি না' বলেন, তাহা অপেক্ষা এই উত্তরের মীমাংসা কিছুই অধিক অগ্রসর হইল না।

অতএব ইহা বুঝা গেল যে, মনুষ্যের আত্মা অনাদি, অমর ও পূর্ণ; এবং দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল; এবং ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কর্ম্মের ফলস্বরূপ। আত্মা জন্ম ও মৃত্যু-চক্রে ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হইতেছেন; কিন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন আসিতেছে। যথা—প্রচণ্ড বায়ুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষদেশ আশ্রয় করে এবং পরক্ষণেই যেমন তরঙ্গদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্ন দেশে গমন করে—সেইরূপ আত্মাও কি সদসৎ কর্ম্মের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমাগত একবার ঊর্দ্ধগামী ও আবার অধোগামী হইতেছেন? আত্মা কি নিত্যপ্রবাহিত, প্রচণ্ড, ভীষণ ও গর্জ্জনশীল কার্য্য-কারণ-স্রোতে দুর্ব্বল অসহায় অবস্থায় ক্রমাগত ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছেন? আত্মা কি একটি ক্ষুদ্র কীটের মত নিয়ত পরিভ্রমণশীল কর্ম্মচক্রে স্থাপিত হইয়া আছেন, আর ঐ চক্র, সম্মুখে যাহা পাইতেছে, তাহাকেই পেষণ করিয়া ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হইতেছে—পতিশোক-বিধুরা বিধবার ক্রন্দন শুনিতেছে না, পিতৃমাতৃ-বিয়োগ-কাতর বালকের দিকেও চাহিতেছে না?

কর্ম্মবাদ

ইহা ভাবিলে হৃদয় বিহ্বল হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মই এই তবে ইহার কি কোন উপায় নাই? পরিত্রাণের কি কোন পথ নাই? মানবের হতাশ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এইরূপ করুণ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল, করুণানিধান বিশ্বপিতার সিংহাসনসমীপে উহা পৌঁছিল এবং আশা ও সান্ত্বনাবাণীরূপে তিনি এক বেদবিৎ ঋষির হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। ঐশী শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত মহর্ষি অমনি দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জগতে এই আনন্দের সমাচার ঘোষণা করিলেন—"হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যলোকনিবাসী ত্রিদশমণ্ডলী, তোমরা সকলে আসিয়া শুন—আমি সেই অনাদি, পুরাতন, মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবে, আর অন্য পথ নাই।"

মানুষ পাপী নহে—

অমৃতের পুত্র

"অমৃতের অধিকারী" এই নামটি কেমন মধুর ও কি উল্লাসবর্দ্ধক! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদের পাপী বলিতে অস্বীকার করেন।

তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র পূর্ণ। তোমরা এই মর্ত্ত্য-ভূমির দেবতা। তোমরা পাপী? ইহা অসম্ভব।

মানবকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। বিশুদ্ধ মানবাত্মায় ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ মাত্র। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সিংহস্বরূপ হইয়া আপনাদের মেষতুল্য মনে করিতেছ কেন? এই ভ্রমজ্ঞানকে দূর করিয়া দাও। তোমরা জরামরণরহিত মুক্ত ও নিত্যানন্দময় আত্মা। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।

সুতরাং বেদ এইরূপে ঘোষণা করিতেছে যে, এই সৃষ্টি-ব্যাপার কতকগুলি ভয়াবহ, নির্দ্দয় ও নির্ম্মম নিয়মাবলির প্রবাহস্বরূপ নয় বা অনন্ত কার্য্যকারণের বন্ধন নয়; কিন্তু এই সকল প্রাকৃতিক নিয়মের মূলে, প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে এমন এক মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন, 'যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে ও মৃত্যু জগতীতলে পরিভ্রমণ করিতেছে।'

সেই পুরুষের স্বরূপ কি? তিনি সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান্, সকলের উপরেই তাঁহার পূর্ণ দয়া। তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পরম প্রেমাস্পদ, তুমি সমস্ত শক্তির মূল, তুমি অগণন ভুবনের ভার ধারণ করিয়া আছ; হে প্রভো, এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করিবার শক্তি আমায় দাও,—বেদবিৎ ঋষিগণ এইরূপ গান করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে কি দিয়া পূজা করিব? প্রীতি দিয়া। তাঁহাকে প্রেমাস্পদরূপে, ঐহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয় বস্তু হইতে প্রিয়তমরূপে পূজা করিতে হইবে।

বেদ শুদ্ধ-প্রেম সম্বন্ধে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, হিন্দুগণ ভূভারহারী হরির অবতার বলিয়া যাঁহাকে বিশ্বাস করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমকে কিরূপে পূর্ণতায় আনয়ন করিয়াছেন ও তৎ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন। পদ্মপত্র জলে থাকিলেও তাহাতে যেমন জল লাগে না, মনুষ্যও এই সংসারে সেইরূপ ঈশ্বরে হৃদয় সমর্পণ করিয়া, হস্ত কর্ম্মে বিনিয়োগ করিয়া নির্লিপ্তভাবে থাকিবেন—শ্রীকৃষ্ণ এরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। ইহ ও পরকালে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালবাসা মন্দ নয়; কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিতে হয় বলিয়া ভালবাসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা উচিত যে—হে ভগবান, আমি তোমার নিকট ধন, সন্তান বা বিদ্যা—কিছুই চাহি না, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি শত শত নরকেও যাইব; কিন্তু হে প্রভো, এই কর, যেন সকল অবস্থাতেই পুরস্কার প্রত্যাশা না করিয়া নিঃস্বার্থভাবে তোমায় ভালবাসিতে পারি।

অহৈতুকী ভক্তি

তৎসাময়িক ভারতবর্ষের সম্রাট্ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যস্বরূপ ছিলেন। তিনি শত্রুকর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া রাণীর সহিত হিমালয়পাদবর্ত্তী বনপ্রদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন। তথায় রাণী একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে নাথ, আপনি এতদূর ধার্ম্মিক যে, লোকে আপনাকে ধর্ম্মরাজ আখ্যা দিয়াছে। কিন্তু আপনি এরূপ হইয়াও কেন এত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন—প্রিয়ে, দেখ দেখ, হিমালয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, আহা কেমন সুন্দর ও মহান্। আমি উহাকে বড় ভালবাসি। যদিও পর্ব্বত আমাকে কিছুই উপহার দেয় না, তথাপি সুন্দর ও মহান্ বস্তুকে ভালবাসাই আমার স্বভাব বলিয়া আমি উহাকে অতিশয় ভালবাসি। ঈশ্বরকেও আমি ঠিক এই জন্যই ভালবাসি। তিনি নিখিল সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের মূল, তিনিই ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র। তাঁহাকে ভালবাসাই আমার স্বভাব, সুতরাং ভালবাসি। আমি তাঁহার নিকট কিছুই চাই না; তাঁহার যথায় ইচ্ছা হয়, তিনি আমায় তথায় রাখুন, সর্ব্ব অবস্থাতেই আমি তাঁহাকে ভালবাসিব। আমি ভালবাসার বিনিময় চাই না, আমি ধর্ম্মবণিক নহি।

বেদ বলেন, আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ কেবলমাত্র পঞ্চভূতে বদ্ধ হইয়া আছেন। যখন তিনি এই বন্ধন হইতে মুক্ত হন, তখনই পূর্ব্ববৎ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই অবস্থার নাম মুক্তি অর্থাৎ পূর্ণতা, জন্ম-মৃত্যু-আধিব্যাধি প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি। ঈশ্বরের কৃপা হইলেই কেবল আত্মার এই বন্ধন মোচন হইতে পারে। আর পবিত্র স্বভাব লোকের উপরেই তাঁহার কৃপা হয়, অতএব পবিত্রতাই তাঁহার অনুগ্রহপ্রাপ্তির উপায়। যখন তাঁহার কৃপা হয়, তখন শুদ্ধ বা পবিত্র হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হন। সেই নির্ম্মল বিশুদ্ধ মানব ইহজীবনেই তাঁহার দর্শনলাভ করেন। 'তখনই—কেবল তখনই তাঁহার সমুদয় কুটিলতা নাশ পায়, সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হয়; তিনি কর্ম্মফলের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।' হিন্দুধর্ম্মের ইহাই লক্ষ্য, হিন্দুধর্ম্মের ইহাই আসল ভাব। হিন্দুগণ কেবলমাত্র মত বা শাস্ত্রবিচার লইয়া থাকিতে চান না। যদি অতীন্দ্রিয় সত্তা কিছু থাকে, তিনি তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে চান। জড়ের সহিত সম্বন্ধরহিত আত্মা যদি থাকেন, যদি দয়াময় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা থাকেন, তিনি তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে চান।

অপরোক্ষানুভূতি হিন্দু-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র

কারণ তাঁহাকে দর্শন না করিলে কখনও সন্দেহ দূর হয় না। অতএব, "আমি আত্মাকে দর্শন করিয়াছি, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়াছি"—ইহাই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সাধুমণ্ডলীর আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণপ্রয়োগ। এরূপ না হইলে কোনও মনুষ্য পূর্ণ হইতে পারে না। অপরোক্ষানুভূতিই উহার মূলমন্ত্র, শুধু বিশ্বাস করা নহে—জীবনে পরিণত করা।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ক্রমাগত অধ্যবসায় ও যত্নদ্বারা পূর্ণতা লাভ করা—দেবতা হওয়া, ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও তাঁহার দর্শন লাভ করাই হিন্দুদের সমুদয় সাধনপ্রণালীর লক্ষ্য। আর এইরূপে ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া, এই সর্ব্বলোকপিতা ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম্ম।

পূর্ণ হইলে মনুষ্য কিরূপ হয়েন? তিনি নিত্যানন্দ ভোগ করেন। যিনি সমুদয় লাভাপেক্ষা পরম লাভস্বরূপ, সেই পরমানন্দধাম ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দের অধিকারী হয়েন।

It is always a silly thing to give advice, but
to give good advice is absolutely fatal.

—*Oscar Wilde.*

শ্রীশ্রীমা

[ব্যক্তিগত সাক্ষাতের অপ্রকাশিত তথ্য-বিবরণ]

শ্রীঅমিয়া নাগ

সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সমুদ্রোপকূলে একা বসে আছি সীমাহীন সিন্ধুপানে চেয়ে, মন কোন্ অজানা রাজ্যে উধাও হয়ে গ্যাছে, টুকরো টুকরো স্মৃতি ও এলোমেলো চিন্তারাশি ভেসে বেড়াচ্ছে কিন্তু মগজে প্রবেশ করতে পাচ্ছে না যেন। হঠাৎ আচমকা কে যেন পেছন থেকে দুই চোখ চেপে ধরলে, চমকে গিয়ে হাত ছাড়িয়ে দেখি—নাতনিদ্বয়; বললে—এইখানে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে বসে তোমার ছোটবেলাকার গল্প শোনাও আমাদের। কি করি! মনেও করতে কিছু পাচ্ছিনা, যা মনে আসে—সব এলোমেলো, পুরোটা কোন কিছুরই মনে আসেনা; কিন্তু তা' বললে কে শোনে? নাছোড়বান্দা উভয়েই! একটু ভেবে নিয়ে বলি,—আচ্ছা, শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীকে যেমনটি দেখেছিলাম, তাঁর বিষয় যতটুকু মনে আছে, তোমাদের বলি শোন:

শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীকে তিনটিবার দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো; প্রায় ৫০ বৎসর আগের কথা, তখন আমার বালিকা বয়স, শ্রীশ্রীমা তখন থাকতেন বাগবাজারে উদ্বোধন-অফিসের উপরের তলায়। সন্ধ্যার সময় আমার মা ও মামীমার সঙ্গে একত্রে আমরা বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী উপস্থিত হয়ে দেখলাম বাইরের বারাণ্ডায় শ্রীরাখাল মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বসে থাকতে। তাঁকে প্রণাম করে আমরা উপরের তলায় যেখানে শ্রীশ্রীমা ছিলেন সেই ঘরে উপস্থিত হয়ে অনেক মহিলা ভক্তদের দেখলাম। শ্রীশ্রীমাকে দেখলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি—পুষ্প, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ পূজার উপকরণে সজ্জিত, নীরবতার মাঝে ধ্যানমগ্নাবস্থায় বসে আছেন। বড়ই ভালো লেগেছিলো। শ্রীশ্রীমা যেন কোন অজানা জগতে চলে গেছেন মনে হয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদে আমরা চলে আসতে বাধ্য হই, বিশেষ প্রয়োজনে। সেদিন আর কিছু বলার বা শুনবার সুযোগ হয়নি।

দ্বিতীয় দিন আমরা একটু রাত করেই রওনা হই শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন- আশায়। দেরী করে যাওয়ার কারণ পূজান্তে শ্রীশ্রীমায়ের মহিলা ভক্তগণের সাথে সদালোচনায় যোগদানের আশায়। আমরা উপরে উঠে দেখলাম বারাণ্ডায় শ্রীমা পা দুটি ছড়িয়ে বসে আছেন; নানারকম আলোচনা হচ্ছে সরলভাবে, কথাগুলি মনে নেই, আমরা কিছুটা দূরে শ্রীমায়ের কাছে বসে রইলাম। গোলাপ মা ও যোগিন মাকে সেই প্রথম দেখলাম। ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীরও কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন মনে হচ্ছে। গোলাপ মা ও যোগিন মা যেন শ্রীমায়ের জয়া বিজয়ার মত ছিলেন।

সেদিন আমরা শ্রীমাকে প্রণাম করে, প্রসাদ গ্রহণ ক.র চলে আসি। তখন অত ভীড়ে শ্রীমায়ের কাছে গিয়ে কিছু বলার বা শুনবার সুগোগ হয়নি।

তার পরে তৃতীয় দর্শন অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে গিয়েছিলো। আমার বাবা আমাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে পূজার ছুটিতে নিতে পাঠান। আমরা কলকাতায় মামারবাড়ী কদিন থেকে গেলাম; কারণ মামা বল্লেন "বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীকে দশন করে মঠের পূজা দেখে পূজার পরে রওনা হয়ো।" আনন্দের সাথে রাজি হয়ে গেলাম।

আমার মামার বিষয় (৺ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ) সংক্ষেপে বলি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন পরম ভক্ত ছিলেন; শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন এবং তাঁর কৃপা লাভের সৌভাগ্যও হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু মহারাজাও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি কলকাতার একজন সুবিখ্যাত ডাক্তার, পরোপকারী ও গরীবের বন্ধু ছিলেন। শেষ জীবন কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনে অতিবাহিত করেন।

মহাষ্টমীর দিন বেলা ৮টা কি ৯টা আন্দাজ সময় মামা, মামীমা ও আমি নৌকাযোগে বেলুড়াভিমুখে রওনা হলাম। পৌঁছিতে কত সময় লেগেছিলো মনে নেই। ওপারের দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরগুলির অপরূপ দৃশ্যে আনন্দে মন ভরপুর ছিল। আমাদের নৌকা বেলুড মঠের ঘাটে পৌঁছিলে মহারাজরা সাদর স্নেহ-সম্ভাষণ করে নিয়ে গেলেন আমাদের। তখনকার বেলুড়মঠ এখনকার মত সুন্দর ও সুবৃহৎ ভাবে গড়ে ওঠেনি।

শ্রীশ্রীমা যেখানে মহিলা-ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিতা হয়ে বসে আছেন, আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। দিনের বেলায় দর্শন এই প্রথম হলো। শ্রীমায়ের পরনে সরু লাল পাড় ধুতি, হাতে সোনার বালা, এলো চুলের রাশি পিঠ ছড়িয়ে পড়েছে; মায়ের শ্যাম বর্ণ, পা দুটি

ছড়িয়ে বসে আছেন যেন 'কালোরূপে ঘর আলো' করে। শান্ত কোমল করুণামাখা মুখশ্রীতে আবার যেন কত গভীর জ্ঞানের একত্র সমাবেশ! কে বলে ইনি নিরক্ষরা? যেন মনে হলো কত কালের চেনা ও কত আপনার জন। এযে অপরূপ! মনে হয়েছিল এমনটিতো দেখিনি কখনও।

ঐস্থানে ঘোরাঘুরি করতে শ্রীমায়ের ভাইঝিকে (রাধু) ও তাঁর মাকে দেখেছিলাম। এই রাধুর কত বায়না অত্যাচার শ্রীমা নীরবে সয়ে গেছেন, তা দেখে অবাক হতে হয় যে, কত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আধার তিনি ছিলেন, নাহলে দক্ষিণেশ্বরের নহবত-খানার অমন ছোট্ট খুপীতে, দিনের পর দিন মাস ও বৎসর সন্তানদের জন্ম রান্না-বান্না ইত্যাদি সব কাজ সমাধা করে কাটাতে পারতেন? শ্রীমা একটি ব্যথাতুরা মহিলাকে লক্ষ করে ধীর স্নেহকোমল কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন—বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণে যে তিনটি শ, ষ, স আছে, তার মানে সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা। যে সয় সেই রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।'

আমার ভাগ্যে যদিও এর আগে দুবার শ্রীমায়ের দর্শন লাভ ঘটেছিল কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও কাছে বসবার সুযোগ হয়নি; প্রণাম করেই চলে এসেছি। এবারে সে সুযোগ ঘটে গেল, শ্রীমায়ের কাছে গিয়ে বসলাম। শ্রীমা চরণ দুটি ছড়িয়ে বসে আছেন, বড় ইচ্ছা হ'ল চরণ সেবা করার; ইচ্ছা মাত্র কাজ সুরু করতেই অর্থাৎ চরণ দুখানি কোলের ওপর তুলে নিতেই—বোধহয় আমাকে অচেনা দেখে মহিলা ভক্তেরা একটু যেন বিরক্ত হয়ে চৈ, চৈ, করে ওঠেন। আমি তো ভয়ে হতভম্ব হয়ে শ্রীমায়ের মুখের দিকে চেয়ে আছি। শ্রীমা তখন সুমিষ্ট স্বরে বল্লেন—'আহা, কার বাছা—ওর একটু উপকার হ'ক।' মায়ের শ্রীমুখের অভয় পেয়ে আমার তখন সাহস বেড়ে গেলো, ফুলের মত কোমল চরণ দুখানির সেবা করতে পেরে জীবন সার্থক মনে হয়েছিল। চরণ ছেড়ে কালোচুলের রাশির মধ্যে থেকে কয়েকটি পাকা চুল তুলে আঁচলে বেঁধে—রেখেছিলাম লুকিয়ে!

শ্রীমা পার্শ্ববর্তী মহিলাদেয় উদ্দেশ্য করে সহজ সরলভাবে সাংসারিক খুঁটি নাটি বিষয়ে কথাচ্ছলে উপদেশ দিচ্ছিলেন। একটু যা মনে আছে বলি, "তোমরা যখন নিজেদের ঘরখানি সাজাবে, যত দূর সম্ভব সুন্দরভাবে সাজাবে—এই মনে করে যেন ভগবানের মন্দির সাজাচ্ছ। তেমনি প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি কাজের বেলায়ও সেই ভাবটি মনে জাগ্রত রাখবে যে, যা কিছু কচ্ছি ভগবানেরই জন্য।

কিছুক্ষণ বাদে ৺মহাষ্টমীর সময় উপস্থিত হলে শ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য ভক্তদের আহ্বানে শ্রীমা একগলা ঘোমটা টেনে চাদর জড়িয়ে নিয়ে লজ্জায় যেন জড় সড় হয়ে, যেখানে পুরুষ ভক্তেরা চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন।

দালানটি ফুল বেলপাতা, ধূপ ও ধূনার সুগন্ধে ভরপুর ছিল ও নীরব শান্তি চারিদিকে বিরাজমান ছিল; তার মাঝে ধীরে ধীরে শ্রীমা যখন পূজার আসনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন মনে হয়েছিল সাক্ষাৎ মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী সন্তানদের আকুল আহ্বানে না থাকতে পেরে অবতীর্ণা হলেন।

একে একে যখন মহারাজরা ও অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমায়ের চরণে মন্ত্রপাঠ ও মা, মা রবে পুষ্পাঞ্জলি দান করছিলেন, তখন অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হয়েছিল। শ্রীমা সমাধিস্থাবস্থায় দণ্ডায়মানা, জানি না তখন কোন্ জগতে ছিলেন! সকলেই কিছুক্ষণ আত্মহারা হয়ে—নীরব নির্ব্বাক, যেন কোন হুঁসই ছিল না!

কিছুক্ষণ বাদে সমবেত ভক্তগণ মঠে যেখানে দুর্গা-প্রতিমার পূজা হচ্ছিল, সেখানে প্রতিমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

এবারে প্রসাদ বিতরণের পালা, সে এক বিরাট ব্যাপার! অসংখ্য জনকে পাত পেতে খাওয়ান হচ্ছে, কেউ যেন অভুক্ত না ফিরে যায়, সেদিকে মহারাজদেব তীব্র দৃষ্টি; আর কি স্নেহ ও আন্তরিকতা দেখেছি—যেন সকলেই কত আপনার জন। কোন জিনিস যেন অপচয় না হয়, সেদিকে নজর রেখে ও সর্ব্ব বিষয়ে সুব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা দেখে অবাক হয়েছিলাম। যেন এক বিরাট অদৃশ্য শক্তিতে সব সুনিপুণ ভাবে সমাধা হয়ে যাচ্ছিল!

আমাদের বিদায়ের সময় উপস্থিত হতে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে, মহারাজ ও অন্যান্য সকলকে প্রণাম ইত্যাদি সেরে বিদায় নিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে সকলে রওনা হলাম। আমার মামীমা আমাকে বললেন,—'কেমন জীবন্ত প্রতিমার পূজা দেখলি তো?' কি বলি, মুখে ভাষা সরে না!

ঘাটে পৌঁছে আমবা নৌকায় গিয়ে বসলাম। মনে হচ্ছিল, কত আপনার হতে আপন জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলেছি!

শরতের ভরাগঙ্গা দুকূল ছাপিয়ে কুলু কুলু তানে বয়ে চলেছে আপন মনে। আমরাও চারিদিকের অপরূপ দৃশ্যে বিমোহিত হয়ে নীরবে ভেসে চলেছি আনমনা হয়ে। ধীরে, অতি ধীরে, মধুর কোমল কণ্ঠে স্বর ভেসে আসছিল,—'সহিষ্ণুতা! সহিষ্ণুতা! সহিষ্ণুতা!'

হাইকু

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

এক

অস্ত-গোধূলিতে ও কার চিতা জ্বলে!
গৌরী মেঘ এক চলেছে পশ্চিমে
সতীর মতো সহমরণে চিতানলে!

দুই

নম্র মায়াবিনী হাওয়ার কন্যারা
দীঘির কালো জলে শীতলপাটি বোনে
দিও না জলে ঢেউ, জলের বুকে সাড়া!

তিন

রাত্রি যেন অতলান্ত ঢেউ, আর
শুক্তি-মেঘে হাসে চাঁদিনী মুক্তার!

চার

নিরালা জানালায় এসেছে চাঁদ ফের
স্মৃতির নহবতে হাজার বিবাহের
সাহানা বাজে বিসমিল্লা সাহেবের!

শ্রীঅরবিন্দের কবি-প্রতিভা

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

শ্রীঅরবিন্দ ঋষি, বিপ্লবী এবং দার্শনিক বলেই বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু নিজেকে তিনি মূলতঃ কবি বলেই মনে করতেন; "I am a poet first, and everything else afterwards," কিশোর বয়স থেকে তিনি কবিতা লিখতে সুরু করেন এবং দেহরক্ষার এগার দিন পূর্বেও স্বীয় রচনার সংশোধনে নিরত হন। প্রায় ষাট বছর কালের সৃষ্টি পরিমাণে নেহাৎ কম নয়, গুণগত বৈশিষ্ট্যে অসাধারণ।

বলা বাহুল্য, শ্রীঅরবিন্দের কাব্যকৃতি সবই ইংরাজী ভাষায়। কিন্তু তিনি ইংরাজ কবি নন। তাঁর পূর্বে এবং পরে বহু বাঙ্গালী এবং ভারতীয় ইংরাজীভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছেন, তাঁদের ভাবপ্রেরণা ভারতীয়, তাঁদের সৃষ্টি কাজেই অনিবার্যভাবে ভারতীয় সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। ("Indian writers of English are Indians and their writing is part of the Indian literary tradition"—C.D. Narasimhaiah, সাধারণ সম্পাদক 'Indian writers and their work, গ্রন্থমালা)। হিন্দী, মারাঠী বা তামিল সাহিত্যের চেয়ে এ সাহিত্যের, বিশেষকরে শ্রীঅরবিন্দের লেখার মূল্য বাঙ্গালী পাঠকের কাছে কিছুমাত্র কম হতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যজীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা চলে। বিলাতে থাকাকালীন, এবং বিলাত থেকে ফিরে এসে (১৮৯৩, বয়স ২১), বরোদায় অবস্থিতি কালে যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন গুগুলোকে আদি পর্বে ফেলা যায়; আর স্বদেশী যুগের (মোটামুটি ১৯০৫-১৯১০) কবিতাকে মধ্য পর্বের, এবং আশ্রম জীবনের (১৯১০-১৯৫০) কবিতাকে অন্ত্য পর্বের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

আদি পর্বের প্রথম কাব্য গ্রন্থ Songs to Myrtilla' প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে। একগুচ্ছ গীতি-কবিতা, বিলিতি পরিবেশে রচিত। রোমান্টিক ও ক্ল্যাসিক্যাল উভয় প্রভাবই রয়েছে। রাজনৈতিক সচেতনতাও দেখা যায়। শিল্পপ্রয়াস খুবই সচেতন। নমুনা হিসাবে দুটি পংক্তি:

For there was none who loved me, no, not one.

কাঁচা বয়েসে এই সমস্ত লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে চমৎকার পরিপক্কতার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন কবিগুরু গেটে সম্পর্কে কবিতাটির প্রথম পংক্তি:

A perfect face among barbarian faces.

প্রথম বইয়ে যেমন প্রেমের কবিতা পাওয়া গেল, শ্রীঅরবিন্দের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা Savitri-তেও প্রেমের কথা। প্রেমের কবি হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে শ্লাঘ্য আর তাঁর হাতে প্রেমের বিবর্তনও লক্ষ্যণীয়।

বরোদায় বসে প্রাচীন উপাখ্যান অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে (Blank verse) কবি দুটি কাহিনী কাব্য রচনা করেন—Urvasie এবং Love and Death. মিলটনীয় ছন্দ প্রয়োগে কবির সিদ্ধির নিঃসংশয় পরিচয় পাওয়া যায় এ দুটি দীর্ঘ রচনায়। মিলহীন অমিত্র ছন্দে সঙ্গীত আনতে হলে ধ্বনির যে সূক্ষ্ম সঙ্গতিপূর্ণ বিন্যাস দরকার, তাতে ফাঁক দেখা যায় না প্রায় কোথাও। দুটিই প্রেমের কবিতা, প্রেমের বিচিত্র ভাব (mood) আর্তি, আনন্দ, বিরহ, হতাশা, সমর্পণ প্রভৃতির চমৎকার বর্ণনা রয়েছে, আর সেই সঙ্গে আছে প্রকৃতির ছবি। Urvasie-তে পার্থিব নৃপতি পুরুরবার সঙ্গে স্বর্গীয় অপ্সরা উর্বশীর প্রণয়, নিদারুণ বিরহ ও পরিশেষে অপ্সরোলোকে মিলন। মিলন-দৃশ্যের খানিকটা:

With her sweet limbs all his, feeling her breasts
Tumultuous up against his beating heart,
He kissed the glorious month of heaven's desire.
So clung they as two Shipwrecked in a surge.

শেষের পংক্তিটির মাধুর্য কার দৃষ্টি এড়াবে? আর একটি উপমা দেখুন:

And she received him in her eyes, as earth
Receives the rain.

Love and Death এর কাহিনী হল প্রেমিকার অকালমৃত্যুতে প্রেমিক রুরুর নরকে অভিযান এবং সেখান থেকে নিজের জীবনের অর্ধেকের বিনিময়ে প্রিয়ম্বদাকে পুনরুজ্জীবিত করে আনা।

...O miserable race of men,
With violent and passionate souls you come
Foredoomed upon the earth and live brief days
In fear and anguish......
...O my sweet flower,
Art thou too whelmed in this fierce wailing flood ?
Ah no ! But I will haste and deeply plunge
Into its hopeless pools and either bring
Thy old warm beauty back beneath the stars,
Or find thee out and clasp thy tortured bosom
And kiss thy sweet wrung lips and hush thy cries.

বিরহ ও মৃত্যুর উপর প্রেমের জয় শ্রীঅরবিন্দের কাব্যের একটি মূল সুর। পাত্র-পাত্রী পৌরাণিক বটে কিন্তু আমাদেরই মত জাগ্রত জীবন্ত, আমাদের হৃদয়ের স্পন্দনই এদের মধ্যে অনুভব করি।

আদি পর্বে আর একটি কাহিনী কাব্য পাই—Baji Prabhou এটিও অমিত্র ছন্দ; কিন্তু এর সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে ভালবাসা নয়, মাধুর্য নয়, বীর্যবত্তা ও যুদ্ধের ভয়াবহতা, এবং আত্মত্যাগের মহনীয় ঐতিহাসিক চিত্র। মারাঠা বীর বাজী প্রভু স্বদেশ ও রাজার সম্মান রক্ষার্থে মরণপণ সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত আত্মাহুতি দিয়েছেন। কাব্যের সূচনাতেই একেবারে যুদ্ধের রৌদ্রভাব প্রকটিত হয়ে উঠেছে।

A noon of Deccan with its tyrant glare
Oppressed the earth ; the hills stood
deep in haze,
And sweltering athirst the fields glared up
Longing for water in the courses parched
Of streams long dead,

সংগ্রামের ছবি যেমন চোখের সামনে ভেসে উঠে, তেমনি তার প্রতিধ্বনি কানে বাজে ছন্দের দোলায় ও ধ্বনিব্যঞ্জনায়। কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মনে করেন Baji Prabhou ইংরাজী গাথা কাব্যের মধ্যে অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ। বাজীর মৃত্যুদৃশ্যের খানিকটা দেখুন:

...Then suddenly
Baji stood still and sank upon the ground.
Quenched was the fiery gaze, nerveless the arm.
Baji lay dead in the unconquered gorge.

মধ্যপর্বের রচনা Poems, Nine Poems প্রভৃতি। এ সময়ে যোগাভ্যাসের ফলে কবির মনে অধ্যাত্ম অনুভূতি সব আসতে থাকে, এবং জগতের ও জীবনের রহস্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তন শুরু হয়। এ পর্যায়ের কবিতাও তাই হয়েছে মরমী ও তত্ত্বভারাক্রান্ত। কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব তত্ত্ব এমনকি অনুভূতির গভীরতায়ও নয়—তার প্রকাশের জোর ও মাধুর্যে—যাতে করে সেই তত্ত্ব ও অনুভূতি আমাদের চিত্তে সাড়া জাগায়, শুধু বুদ্ধিতে কার্যকর না হয়। এই হিসাবে এ পর্যায়ের কতকগুলো কবিতা উচু মর্যাদা দাবী করতে পারে না; কিন্তু কতকগুলো কবিতা আবার সুন্দর রসব্যঞ্জনা লাভ করেছে, যেমন Seasons, Revelation, Who, Mother of Dreams, Epiphany প্রভৃতি। একটি কবিতার খানিকটা উদ্ধার করা যাক—

All music is only the sound of His laughter,
All beauty the smile of His passionate bliss,
Our lives are His heart-beats, our rapture
the bridal
Of Radha and Krishna, our love is their kiss.
—Who.

এ শুধু তত্ত্ব নয়, এর বাণী প্রতিকূ পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে।

Nine Poems এর অন্তর্ভুক্ত Ahana নামে দীর্ঘ কবিতাটি এ পর্বের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা। এটি সমিল Hexameterএ রচিত। ভাবের উপযুক্ত মাধ্যমের জন্যে শ্রীঅরবিন্দ আজীবন ছন্দ ও ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। Hexameterএর সাধারণত: মিল থাকে না। পরবর্তীকালে তিনি মিলহীন খাঁটি ক্ল্যাসিক্যাল Hexameterও ব্যবহার করেছেন—সে কীর্তির কথা পরে বলা যাবে। Ahana হল ঊষা—'Dawn of God'; তাঁর আবির্ভাবে বিশ্বজোড়া আনন্দমুখরতা, 'Hunters of Joy', 'Seekers after Knowledge' প্রভৃতি তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছেন। Ahanaতে কবির সমগ্র বিশ্বদর্শনের প্রকাশ ঘটেছে। এটি তাই একাধারে দর্শন, পুরাণ, বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম অনুভূতি ও কাব্য। এই দীর্ঘ কবিতার আগাগোড়া সবটাই কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু বেশির ভাগই রসোত্তীর্ণ এবং স্থানে স্থানে অপূর্ব। নমুনা স্বরূপ ক্ষুদ্র দুটি অংশ উদ্ধার করা যাচ্ছে—

Deep in our being inhabits the voiceless
invisible Teacher,
Powers of his godhead we live ; the Creator
dwells in the creature

* * *

Fearless is there life's play ; I shall sport with
my Dove from his highlands,
Drinking her laughter of bliss like a God in
my Grecian islands.
Life in my limbs shall grow deathless,
flesh with the God-glory tingle,
Lusture of Paradise, light of the earth-ways
marry and mingle.

অন্ত্যপর্বের কাব্য হল Six Poems, Transformation and Other Poems, Poems Past and Present, Last Poems, Collected Poems and Plays এর পরিশিষ্টের কবিতাগুলো এবং Savitri ও Ilion. এর একটা বড় অংশ প্রকাশিত হয়েছে কবির দেহত্যাগের পরে। এই কবিতাগুলোতেই শ্রীঅরবিন্দের বিশিষ্টতা বিশেষভাবে প্রকট। এগুলো খাঁটি আধ্যাত্মিক কবিতা (Spiritual poetry)। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, শুধু অধ্যাত্ম বিষয়ই এর উপজীব্য। সংসারের তাবৎ জিনিস, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি, চেষ্টাচরিত্র, সবই কাব্যের বিষয়ীভূত হয়েছে, কেবল এগুলো দৃষ্ট হয়েছে একটি গভীর প্রজ্ঞার আলোকে। সাধারণ মানবীয় ভাব-উচ্ছ্বাস এখানে বিরল, তত্ত্ব বা চিন্তার ভারও নেই, আছে স্বচ্ছ ভাস্বর দৃষ্টি। এ কাব্যকে mystic আখ্যাও দেওয়া যায় না

কারণ ধোঁয়াটে ভাব বা আলো-ছায়া এর বিশিষ্টতা নয়, এ পরিষ্কার দিবাবুদ্ধি, যে কিছু অস্পষ্টতা, তা কেবল পাঠকের অনভ্যস্ততার দরুণ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Future Poetry গ্রন্থে কাব্যের উৎস, তাৎপর্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রাচীন ভারতে কবি ও ঋষি যে একার্থবাচক ছিল, তা খুবই সত্যমূলক, সমস্ত কবিই বস্তু বেশি পরিমাণে আর্ষ দৃষ্টির অধিকারী, এবং যে কাব্যে উচ্চতম কবিদৃষ্টি ও তার সার্থকতম প্রকাশ রয়েছে, তাই কাব্যের পরাকাষ্ঠা, তাই মন্ত্র। তিনি আরও বলতে চেয়েছেন যে, ভবিষ্যতের কাব্য এই মন্ত্র; মন্ত্র রচনার দিকেই কাব্যের গতি। অবশ্য দিব্য অনুভূতিকে মানবীয় ভাষায় রূপ দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। অস্ত্যপর্বের কবিতায় শ্রীঅরবিন্দ এই 'human difficulties' উত্তীর্ণ হয়েছেন, যা পূর্ব্ব যুগে পুরোপুরি পারেন নি; ফলে অনেক মন্ত্র আমরা পেয়েছি স্মৃতিতে গেঁথে রাখার মত। দু'একটি শ্লোক শোনান যাক্ :

All is abolished but the mute alone,
The mind from thought released, the heart from grief,
Grow inexistent now beyond belief;
There is no I, no Nature, known-unknown.
—'Nirvana'

নির্বাণের যে অভিজ্ঞতা এখানে মূর্তি পেয়েছে, তার খানিকটার আমেজ পাওয়া যে কোন ভারতীয় পাঠকের পক্ষে কঠিন না হওয়ারই কথা, তবে পড়তে হবে নিবিষ্ট হয়ে প্রশান্ত চিত্তে।

It is Thy rapture flaming through my nerves
And all my cells and atoms thrill with Thee,
My body Thy vessel is and only serves
As a living wine-cup of Thy ecstasy.

এখানে স্তব্ধতা নয়, অতিশয় আনন্দের অভিব্যক্তি।

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যে হাস্যরসের অভাব নেই :—

He said, "I am egoless, spiritual, free."
Then swore because his dinner was not ready
I asked him why. He said, "It is not me,
But the belly's hungry god who gets unsteady"
—'Self'

এখানেও দৃষ্টি ঋষির, ব্যঙ্গে তিক্ততা নেই, আছে বরং ক্ষমা ও সহানুভূতি।

কবির এবং সম্ভবতঃ এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি 'Savitri'র প্রসঙ্গে আসার পূর্বে নাটক ও অনুবাদগুলোর কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে নিতে হয়। কারণ, এগুলোর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের কবিপ্রতিভার অনেকখানি অভিব্যক্তি ঘটেছে।

কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর অনুবাদ ছাড়া মৌলিক নাটক রচনা করেন তিনি চারটি—Vasavadatta, Perseus the Deliverer, Rodogune, এবং Viziers of Bassora। এগুলোর মধ্যে Pereeus the Deliverer ই সর্বশ্রেষ্ঠ, এটিই কবির হাতে সংশোধিত হতে পেয়েছে। নাটক হিসাবে এদের মূল্য যাই হোক, সে বিচার এখানে নয়, বিভিন্ন ছন্দের, বিশেষ করে Blank verseএর বহু চমৎকার কাব্যাংশের জন্যে এগুলোর একটি বিশিষ্ট কাব্যমূল্য আছে। প্রেম বীর্য খরতা মাধুর্য সংলাপ নাটকীয়তা—সব রকম ভাবের প্রয়োজনে অমিত্র ছন্দ প্রয়োগে শ্রীঅরবিন্দ সিদ্ধ-হস্ত। শ্রেষ্ঠ কবিত্বের কষ্টিপাথর এছন্দে তাঁর চেয়ে পরিমাণে বেশি রচনা করেছেন এমন ইংরাজ কবির সংখ্যা বেশি নয়।

অনুবাদক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের সফলতা কম নয়। মূল রচনার Spirit টুকু বজায় রাখার দিকে তাঁর দৃষ্টি বরাবর সজাগ ছিল তবে যে কোন শ্রেষ্ঠ অনুবাদক নিজেকেও কতকটা প্রকাশ করে ফেলেন, শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, ফলে অনুবাদ একপ্রকারে সমৃদ্ধিলাভ করেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 'সাগর-সঙ্গীত' ও শ্রীঅরবিন্দকৃত তার অনুবাদ Songs of the Sea পাশাপাশি রেখে পড়লেই একথার সত্যতা অনুভব করা যাবে। তাঁর অনুবাদের পরিমাণও কম নয়। বাংলা 'সাগর সঙ্গীত', বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, হরুঠাকুর, নিধুবাবু প্রভৃতির কবিতা, বন্দেমাতরম, দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক 'যেদিন সুনীল জলধি' প্রভৃতির এবং সংস্কৃত-ভর্তৃহরির 'সপ্তাশতক', কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' উদ্যোগপর্বের বিদুলার উপাখ্যান, মহাকাব্যদ্বয়ের বিক্ষিপ্ত অনেক অংশ, ঋগ্বেদের বহু শ্লোক—Hymn to the Mystic Fire (৮খানি উপনিষদের অনুবাদ অবশ্য গদ্যে) ইত্যাদির অনুবাদক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজী সাহিত্যের Chapman, Pope ও Fitzgerald এর সমপর্যায়ভুক্ত।

শ্রীঅরবিন্দের কবিপ্রতিভার আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি—Ilion নামে অসমাপ্ত মহাকাব্য। ইলিয়ডের কাহিনী অবলম্বনে স্বাধীন রচনা। পরিকল্পিত দ্বাদশ সর্গের মধ্যে নয়টি মাত্র লিখে যেতে পেরেছেন এবং প্রথম সর্গের খানিকটা ছাড়া বাকী রচনা সংশোধনেরও অবকাশ হয়নি। ইংরাজী শ্বাসাঘাত (accent) ও গ্রীক লাতিন মাত্রা (quantity) মূলকতার সমন্বয়ে অনেক পরীক্ষার পরে গৃহীত Hexameterএ এ কাব্য লিখিত। তাই কাব্য-ছন্দের যে রাজকীয় গতি Ilionএ পাই, তার তুলনা ইংরাজী কাব্যে নেই। হোমরীয় ওজ বিস্তার ও দার্ঢ্য ইংরাজী খাতে তিনিই প্রথম বইয়ে দিলেন। ট্রয় দরবার, গ্রীক শিবির ও দেবসভার বাতবিতণ্ডা, বিশেষ করে একিলেস ও আমাজনরাণী পেনথিসিলিয়ার সংগ্রাম, সর্বোপরি প্রথম সর্গের উষার বর্ণনা বিশেষভাবে উপভোগ্য। তবু অসংশোধিত এই মহাকাব্য শেষ পর্য্যন্ত রয়ে গেল, "a promise that is only partly redeemed," নমুনা স্বরূপ কয়েকটি পংক্তি—পেনথিসিলিয়ার মারমূর্তি!

..She came like a wolf-hound
Call by his masters' voice and silently fell
on the quarry.
Hyrtamus fell, Admetus was wounded,
Charmidas slaughtered...
Back, everback the Hellene recoiled from the
shock of the virgin...
Storm-shed the Amazon fought and she
slew like a god unresisted.
None now dared to confront her burning, eyes,
the boldest

Shuddered back from her spear and the cry of
her tore at the heart-strings.

অতিপরিচিত সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী নিয়েই মহাকাব্য Savitri রচিত। তবে শ্রীঅরবিন্দের হাতে মহাভারতের উপাখ্যান অনেকখানি রূপান্তর লাভ করেছে। সাবিত্রী এখানে আত্মাশক্তির অবতার, মহাযোগী নৃপতি অশ্বপতির আকুল আহ্বানে মরজগতে তাঁর মানুষী জন্মপরিগ্রহ—সমগ্র মনুষ্যজাতিকে সত্য ও আলোর পথে অমরত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে। নিজের দুঃখে সাবিত্রী সমস্ত সংসারের দুঃখভার অনুভব করে, একান্ত অন্তর্মুখীনতায় স্বীয় স্বরূপ ও কর্তব্য অবহিত হয়ে চলেছেন বনে স্বামীর অনুগমন করে। যমরাজের পশ্চাদ্ধাবন করে বহু সাধ্যসাধনে সত্যবানের আত্মাকে তাঁর পরিত্যক্ত দেহে ফিরিয়ে নিয়ে এসে মনুষ্যজাতির অমরত্বের দ্বার খুলে দিলেন। অশ্বপতির সাধনা, বহুতর সূক্ষ্মজগতে তাঁর চেতনার বিস্তার, আত্মাশক্তির সাক্ষাৎলাভ, বরপ্রাপ্তি, সাবিত্রীর জন্ম, সংবৃদ্ধি, দোসর অন্বেষণ, বিবাহ, সাধনা, যমরাজের সঙ্গে সংগ্রাম ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সমগ্র সৃষ্টি স্বর্গ, মর্ত্য, নরক, মনুষ্যচেতনার বিভিন্ন স্তর, জগৎ ও জীবনের বিচিত্র জটিল সমস্যা ও সমাধানের পথ এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সমস্তই সাবিত্রীর বিরাট কলেবরে (প্রায় ২৫০০০ ছত্র) স্থান পেয়েছে। Life Divine গ্রন্থে যা দার্শনিক ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তাই এখানে কাব্যরূপ পেয়েছে। কিন্তু Savitri সর্বৈব কাব্য, এ দর্শন বা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের বই নয়। যে গভীর অন্তর্গূঢ় দৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে এখানে, তার তুলনা জগতের কাব্যসাহিত্যে বিরল। Blank verse-এর নবতর বিন্যাস ঘটিয়ে প্রতি একটি দুটি বা তিনটি পংক্তিতে উপনিষদের শ্লোকের পূর্ণতা এনে ১২ সর্গে (book) তিনি এই মহাকাব্য সমাপ্ত করেছেন। কাব্যমাত্রেই যুগ-চেতনা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। Savitri-র সঙ্গেও বর্তমান যুগের ধ্যানধারণা ও সমস্যার নিবিড় গ্রন্থিবন্ধন রয়েছে,—যদিও সাম্প্রতিক কালের কবিদের দৃষ্টি ও চেতনা শ্রীঅরবিন্দের নয়। শোনা যায়, আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে বেরোবার সময় গুরু এ্যারিষ্টটলের নিজের হাতে নোট লেখা Iliod-এর একখানি কপি সঙ্গে নিয়েছিলেন। যখন যেখানে যেতেন, নিদ্রা যাবার প্রাক্কালে ছোরার সঙ্গে এটি তাঁর বালিশের নীচে স্থান পেত। বহু আধুনিক moody কবিতার বই যখন হাতে করার mood মানুষের থাকবে না, তখনও যে বহু কর্মী, শিল্পী ও বিদগ্ধ পাঠক Savitri-র একখণ্ড সঙ্গে রাখবেন, এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। নমুনা স্বরূপ ক্ষুদ্র একটি অংশ উদ্ধার করা যাচ্ছে, কিন্তু এ কাব্যের মহৎ স্বাদ পেতে হলে মূলগ্রন্থ—অন্ততঃ তার বঙ্গানুবাদ নিবিষ্টভাবে পড়তে হবে।

সাবিত্রী সত্যবানকে আবিষ্কার করে ফিরে এসেছেন। রাজসভায় সমুপস্থিত দেবর্ষি নারদ এই নির্বাচনের অপূর্বতার কথা বলেও দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত দিলেন। রাণী কম্পিত হলেন এবং সত্যকথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করার জন্তে দেবর্ষিকে ধরে বসলেন—"To know is best, however hard to bear." দেবর্ষি সত্যবানের দেবোপম রূপ-গুণের ব্যাখ্যা করে শেষটায় বললেন:

Heaven's greatness came, but was too great to stay
Twelve swift-winged months are given to him
and her;
This day returning Satyavan must die.

রাজর্ষি অশ্বপতির যোগ্যা পত্নী হলেও সন্তানের দুর্ভাগ্যের কথায় ধৈর্য রক্ষা সম্ভব হয়নি, রাণী তীব্র তিক্ত স্বরে বলে উঠলেন:

...Vain then can be Heaven's grace!
Heaven mocks us with the brilliance of its gifts,

তিনি কন্যাকে অনুরোধ করলেন এই নির্বাচন নাকচ করতে। সাবিত্রীর শান্ত ধীর উত্তর এল: Once my heart chose and chooses not again, নাচার হয়ে মাতা অনেক যুক্তি দিলেন, মরজীবনের নশ্বরতার কথা বললেন, মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার কথা বললেন:—

Only the gods can speak what now thou speakst.
Thou who art human, think not like a god.

কিন্তু সাবিত্রী অনড়:

My will is part of the eternal will,
My fate is what my spirit's strength can make,
My fate is what my spirit's strength can bear;
My strength is not the titans, it is God's.....
For I know now why my spirit came on earth
And who I am and who he is I love.
I have looked at him from my immortal self,
I have seen God smile at me in Satyavan;
I have seen the Eternal in a human face.

সকলেই স্তব্ধ হয়ে রইলেন,

Then none could answer to her words, silent
They sat and looked into the eyes of Fate.

দুটি শিশু

[W. H. Davis হইতে অনুবাদ]

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

ওরে খোকন, করিস কিরে কাঠের কোদাল হাতে,
বালির ভেতর মরিস খুঁড়ে কেবল দিনে রাতে?
"অনেক সোনা অনেক মোহর আমার পায়ের নীচে,
বিশটা হাতী বইতে অত বড়াই করে মিছে।"

খুকুমণি, কুরুশী হাতে বুনছো কি-গো মোজা?
"পাখীর ছানার ঠাণ্ডা পায়ে পরিয়ে দেবো সোজা।"
মনের সুখে খোকনবাবু খুঁড়ছে কবর তার,
শ্মশানবাসীর চাদর খুকু বুনছে অনিবার।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুল

এম, আবদুর রহমান

"রবি দেখে পেয়েছে যে আলোক প্রথম,
তারি মাঝে লভে রবি প্রথম জনম।"—নজরুল।

বঙ্গীয় ১৩৬৮ সাল। সারা জাহান্ জুড়ে রবীন্দ্র শততম জন্ম-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হ'ল। বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে পুনর্ব্বার কবি-শ্রেষ্ঠ ঋষি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার এক নবতম অধ্যায় হ'ল সংযোজন। মহাকবির এই জন্ম-বার্ষিকী দুনিয়ার সাহিত্য-শিল্পী এবং গুণীজনের 'দীলে' দিয়ে গেল নূতন ক'রে একটা প্রচণ্ড দোলা। ভারত-মাতার প্রাণে জাগলো পুলক-শিহরণ। কিন্তু রবীন্দ্র-ভক্ত এবং রবীন্দ্র-শিষ্য বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এই মহোৎসবে কোন অংশই গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি জানতেই পারলেন না, তাঁর গুরুদেবের শত-বর্ষ-পূর্তি উৎসব আয়োজনের কথা। এমনি মূর্চ্ছাহত হয়ে আছে নজরুলের কবি-মানস। তিনি গত দু'যুগ

ধ'রে অসুস্থ, তাঁর কণ্ঠ নীরব, লেখনী তাঁর স্তব্ধ। অসুস্থ হবার সময় পর্য্যন্ত তিনি তাঁর গুরুদেব সম্পর্কে লিখেছেন বহু কবিতা এবং গান। "কিশোর রবি", "রবির জন্মতিথি", "অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি" এবং "রবিহারা" প্রভৃতি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি রচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুল যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন, আজও তা' সুরভিত করে রেখেছে বঙ্গ-ভারতীর পবিত্র বেদীমঞ্চ।

নজরুলের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন—বিশ্বকবি সম্রাট, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি, শক্তিধর নেতা, মহাপুরুষ। বিদ্রোহী কবি বলেছেন :—

"শুধু বেণু আর বীণা লয়ে তুমি আস নাই ধরা পরে—
দেখেছি শঙ্খ, চক্র, বিষাণ, বজ্র তোমার করে।

* * *

জানি জানি তব দক্ষিণ করে অনন্ত শ্রী আছে,
দক্ষিণা দাও ব'লে তাই ওরা এসেছে তোমার কাছে।

হে রবি, তোমায় নারায়ণ রূপে এ ভারত পূজা করে,
যাইবার আগে জানাইয়া তুমি যাও সেই রূপ ধরে।

... ... (কিশোর রবি)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-গগনে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত যখন ভাস্বর হয়ে উজ্জ্বল আলো বিকীরণ করছিলেন, তখন অকস্মাৎ নজরুলের আবির্ভাব—'ধূমকেতু'র মত। নজরুলের ভাষায় :—

"ধ্যান-শান্ত মৌন তব কাব্য-রবি-লোকে—
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতু সম,
রুদ্রের দুরন্ত দূত, ছিন্ন হর-জটা—
কক্ষচ্যুত উপগ্রহ।....... (অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি)

* * *

উপরি-উদ্ধৃত কবিতা লিখবার অনেক আগেকার কথা। ১৩১০ সালের ঘটনা। নজরুল তখন নবীন কিশোর। ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র। সবেমাত্র তাঁর পরিচয় শুরু হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে। পাঠ্য-পুস্তকে সঙ্কলিত কবি-গুরুর কবিতা ছাড়া তাঁর স্বল্প সংখ্যক কবিতা তখন নজরুল পাঠ করেছেন। যে কয়টি পড়েছেন, কণ্ঠস্থ করেছেন। দরিরামপুর হাই স্কুলের পরবর্ত্তীকালের প্রধান-শিক্ষক শ্রীমহিমচন্দ্র খাসনবিশ তখন সহকারী শিক্ষক হয়ে সবেমাত্র স্কুলে যোগদান করেছেন। স্কুলের ছাত্রদেরকে নিয়ে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। উক্ত অনুষ্ঠানে বিনা মহড়ায় নজরুল রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" এবং "দুই বিঘা জমি" কবিতা আবৃত্তি ক'রে শিক্ষকগণের নিকট হতে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন। কবিগুরুর কবিতা অনেক ছাত্রই আবৃত্তি করে, ইহা এমন কিছু তাজ্জবের ব্যাপার নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইহাই উল্লেখযোগ্য যে, নজরুলের আবৃত্তি শুধু সুন্দরই হয়নি! উল্লিখিত কবিতার বাক্য, ছন্দ ও সুর যেন নজরুলের কণ্ঠে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর উচ্চারণ-ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল অপরূপ মাধুর্য্য ও চমৎকারিত্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের প্রতি ছোট হতেই ছিল নজরুলের অন্তরের আকর্ষণ, যাকে বলে 'দরদ'। সেই "দরদমন্দ" (Sincere regard) পাঠক রূপেই কিশোর নজরুলের রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ শুরু।

উক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পরের কথা। নজরুল তখন শিহারসোল-রাজ হাই স্কুলের ছাত্র। বন্ধু মহলে, মজলিসে তিনি আবৃত্তি করেন—রবীন্দ্রনাথের কবিতা, মাঠে-ঘাটে গেয়ে বেড়ান কবিগুরুর গান। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় নজরুল পঞ্চমুখ। তাঁর নিন্দা শুনলে নজরুল রাগে আগুন হয়ে উঠেন, ঝগড়া করেন কবি-নিন্দুকের সঙ্গে। একদিন তাঁর এক বন্ধু খেলার মাঠে কবি-গুরুর নিন্দা করতেই নজরুল "রুখে" উঠেন। কথা কাটাকাটি হ'তে হ'তে শেষ পর্য্যন্ত হ'ল মাথা-ফাটাফাটি। নজরুল উত্তেজিত ও বেসামাল হয়ে টুকরো বাঁশ দিয়ে আঘাত করেন ছেলেটিকে। তার মাথা ও কপাল কেটে গিয়ে রক্ত পড়ে। এই নিয়ে হয়েছিল মোকর্দ্দমা বর্দ্ধমান

জেলার আসানসোল কোর্টে দণ্ড-বিধি আইনের ৩৩২ ধারায়। মামলা অবশ্য বেশীদিন চলেনি। আপোষ হয়ে গিয়েছিল। আবার ভাবও হয়েছিল ফরিয়াদীর সঙ্গে। নজরুলের কোন কোন জীবনীকার বলেছেন, বিচারে নজরুলের দণ্ড হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা আটক থাকতে হয়েছিল তাঁকে কোর্টে। এইরূপ আটক থাকা—দণ্ডকে আইনের ভাষায় Till rising of the Court সংক্ষেপে T. R. C, বলে। নজরুল-জীবনী লেখকদের লিখিত এই ঘটনা সত্য নয়। নজরুলের দূর সম্পর্কীয় মামা অধুনা মৃত উকীল আজিজুর রহমান সাহেব বলেছেন শুরুতেই উক্ত মোকদ্দমা আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। তাহাড়া দঃ বিঃ আইনের ৩৩২ ধারায় মামলা, সাধারণতঃ T. R. C. হয় না। কাজেই উকিল সাহেবর উক্তি সত্য বলে মনে হয়।

নজরুল যখন হুগলীতে বিদ্রোহী কবিরূপে খ্যাতনামা, সেই সময়ে উক্ত ভদ্রলোক হুগলীতে, নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে এসে কপালের সেই কাটা দাগ দেখিয়ে বলেছিলেন "তোর হাতের জয়টীকা এখনও আমার কপালে আছে।" "কবি নজরুল" গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এই শেষোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। (পৃঃ ৮)

* * * *

নজরুল প্রথম মহাযুদ্ধে গিয়েছিলেন—উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়ে। করাচী সৈন্য-ব্যারাকেই বেশীদিন ছিলেন তিনি। সেথানে নজরুলের সঙ্গী ছিল কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বই আর মরমী কবি হাফিজের "দীওয়ানা"। যুদ্ধশেষে যখন কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তখনও তাঁর গ্রন্থ-সম্পদের মধ্যে ছিল কবিগুরু আর হাফিজের কেতাব আর খানকতক মাসিক। নজরুল তাঁর প্রাথমিক কবি-জীবনে সঙ্গীত রচনা করতেন না, তবে গান গাইতেন, মজলিসে—বৈঠকে সেকালের খ্যাতনামা গায়ক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সে গানও ছিল বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

* * * *

নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতা বের হল সাপ্তাহিক "বিজলী"তে। কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর একই সঙ্গে তাঁর ভাগ্যে জুটলো প্রচুর প্রশংসা এবং প্রভূত নিন্দা। "বিদ্রোহী" ছাপার অক্ষরে বের হবার আগেই কবিগুরুর সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। মাঝে মাঝে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে যেতেন। "বিদ্রোহী" ছাপা হবার পর খানকতক 'বিজলী' নিয়ে তিনি গুরুদেবের কাছে গেলেন—উদ্দেশ্য কবিতাটি তাঁকে শোনানো এবং তাঁর অভিমত সংগ্রহ। সৌভাগ্যক্রম গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি গুরুদেবের সম্মুখে না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিতাটি পাঠ করলেন। গুরুদেব নজরুলের কবিতা শুনে বললেন—"আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমার কবি-প্রতিভায় জগৎ আলোকিত হোক—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।" এই কাহিনীটি বিবৃত করেছেন, তৎকালীন 'বিজলী' কর্ম্ম-সচিব শ্রদ্ধেয় অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর "পুরানো কথা"য়। (মাসিক বসুমতী ১৩৬২, কার্ত্তিক)। অপ্রত্যাশিতভাবে এই আশীর্ব্বাদ পেয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে নজরুলের হৃদয় ভরে উঠলো, প্রণাম করে তিনি ফিরে এলেন। ফিরে এলেন নূতন প্রেরণা, নবীন উৎসাহ এবং নব উদ্দীপনা নিয়ে। অনেক সময় বন্ধুদের কাছে তিনি ব্যক্ত করেছেন গুরুদেবের নিকট হ'তে পাওয়া তাঁর স্নেহসিক্ত আশীর্ব্বাদের কথা ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে। তাঁর কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে সেদিনের সেই ঘটনা।

..........বক্ষে ধরে তুমি
ললাট চুমিয়া মোরে করিলে আশিস।...(অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি)

* * *

'বিদ্রোহী' কবিতা নজরুল ইসলামকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে তুলে দিলো। সাহিত্য-রসিক জনগণের নিকট তিনি পরিচিত হলেন 'বিদ্রোহী কবি' বলে। অতঃপর গদ্য লেখার চেয়ে পদ্য লেখায় অধিকতর আগ্রহে মনঃসংযোগ করলেন তিনি।

নজরুল মনে-প্রাণে রবীন্দ্রনাথ'ক গুরুদেব ব'লে স্বীকার করেছেন এবং একখানি পত্রে (Letter) একবারের জন্য হলেও নিজেকে 'মুসলিম রবীন্দ্রনাথ' বলে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ইহা যেমন সত্য, তেমনই ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, যুগ প্রবর্ত্তক কবি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিহার করে নজরুল তাঁর কবি-প্রতিভাকে ভিন্নধারায় ভিন্নপথে পরিচালিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে তিনি কোনদিন অস্বীকার করেননি। বরঞ্চ তাঁর প্রদর্শিত পথকে শ্রেয়: ব'লে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করে

নিয়েছেন। তাই আমরা দেখি বিদ্রোহী কবির হাতে যে 'রণতূর্য্যে' অগ্নিঝঙ্কার, পাগল করা এবং রক্ত নাচানো নিনাদ ধ্বনিত হচ্ছিল, গুরুদেবের স্নেহ-স্পর্শে তাঁর 'আর হাতের বাঁশের বাঁশী' হতে অতঃপর বের হতে লাগলো মনোহারী মধুর ঝঙ্কার। নজরুল সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—বলেছেন—

"হে রসশেখর কবি, তব জন্মদিনে
আমি কয়ে যাব মোর জন্মকথা,
আনন্দ-সুন্দর তব মধুর পরশে—
অগ্নিগিরি গিরিমল্লিকার ফুলে ফুলে
ছেয়ে গেছে, জুড়ায়েছে সব জ্বালা। (অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি)

যে বিদ্রোহী কবি একদিন 'ভৃগু ভগবানবুকে' পদচিহ্ন এঁকে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, সেই কবিই রবীন্দ্র-স্নেহের স্পর্শে, শেষের দিকে সুন্দরের সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন, পরম প্রভুর চরণে নিঃশেষে নিবেদন করেছিলেন নিজেকে।

"প্রভু আলো দাও, আলো—
ঘুচুক ভয়ের ভ্রান্তি, জড়তা, ঘন নিরাশার কালো,
তুমিই শক্তি, ভক্তি ও প্রেম, জ্ঞান আনন্দ দাও—
কবুল কর এ প্রার্থনা, প্রভু কৃপাকর ফিরে চাও।"
(আর কতদিন)

* * *

আর কিছু নয় চিরপ্রেমময়
তোমারে ভিক্ষা চাই
(তোমায়ে ভিক্ষা দাও)

কবি নজরুল ইসলামের এই সকল কবিতা আমাদিগকে কবি-গুরুর "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার—চরণ ধূলার তলে' প্রভৃতি রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাজেই নজরুল-জীবনে রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ প্রভাব পড়েনি, একথা বলা যাবে না। বরঞ্চ আমরা দেখতে পাই—কবিগুরু নজরুলকে তাঁর চলা-পথের যে দিক-নির্দেশ করেছিলেন—নজরুল তা মেনে নিয়েছিলেন। বিদ্রোহী কবি বলেছেন :—

: আমি জানি তব প্রেম আমার আগুন
নিভায়ে দিয়াছে সেথা কান্তি অপরূপ।
মনে পড়ে বলেছিলে, হেসে একদিন—
"তরবারি দিয়া তুমি চাঁছিতেছ দাড়ি।"
যে জ্যোতি করিতে পারে জ্যোতির্ম্ময় ধরা—
সে জ্যোতিরে অগ্নি ক'রে জ্বলে পুচ্ছকেতু। :
(অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি)

এ হ'ল নজরুল-কবি-জীবনের শেষ পর্য্যায়ের কথা। নজরুল যখন তাঁর প্রাথমিক কবিজীবনে একদিকে নিজের চরম দারিদ্র্য এবং অপর দিকে দেশমাতৃকার পরাধীনতার নিদারুণ লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন, জনগণের নিকট যখন তিনি প্রিয়তম চারণ-কবি, সেই সময়ে তাঁর বন্ধুমহলের কেউ কেউ অনুযোগ ক'রে বলেছিলেন—"যেমন বেরোয় রবির হাতে—সেই চিরকেলে বাণী কই কবি?" নজরুল দ্বিধাহীন চিত্তে তখনই তার জবাবে বলেছিলেন—

: বর্ত্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী। :

* * *

: আমি চারণের বেশে দেশে দেশে ফিরি গান গেয়ে।

* * *

পরওয়া করিনা বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে। :
* * (আমার কৈফিয়ৎ)

চারণ-কবি নজরুল ইসলাম চেয়েছিলেন তাঁর গুরুদেব স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান, সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেশের আজাদী আন্দোলনকে তাঁর কবিতা ও গানে জোরদার করে তুলেছিলেন, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু সে আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মত ও পথ ছিল ভিন্ন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও তিনি দেশের মুক্তিসংগ্রামের আদর্শ ও নীতি নিয়ে সর্ব্বাংশে একমত হতে পারেননি। মুক্তি-আন্দোলনের মত ও পথের সঙ্গে গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর শিষ্য নজরুলের আদৌ মিল ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ নিখিল বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত ও জড়িত একটি বিরাট দেশ আর তাঁর দেশবাসী বিশ্ব-মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি মহান্ জাতি (Nation)। সকল দেশের সব মানুষের সঙ্গেই তাঁর মিতালি। কিন্তু নজরুলের স্বদেশ একান্তভাবে পরাধীন একটি নিপীড়িত দেশ, দেশবাসীরা তাঁর 'গোলামের জাত'। ভিন্ন দেশবাসীর বিশেষ ক'রে যাঁরা তাঁর দেশবাসীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছেন, সেই জাতের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব করা চলে না, আর তাঁদেরকে এদেশে ঠাঁই দিতেও তিনি নারাজ। নজরুল তাঁর দেশের চারণ কবি। আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। কবিগুরু বলেছেন :—

"আমি পৃথিবীর কবি
যেথা তার যত উঠে ধ্বনি,
আমার বাঁশীর সুরে
সাড়া তার জাগিবে তখনি।" (ঐকতান)

* * *

পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার
* *
দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে
যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।" (ভারততীর্থ)

* * *

"হে বিশ্বদেব, মোর কাছে,
তুমি দেখা দিলে কি বেশে,
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে—
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।" (স্বদেশ)

* * *

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারশিক মুসলমান খৃষ্টানী,
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে প্রেমহার হয় গাঁথা
জনগণ ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
(ভারত ভাগ্য-বিধাতা

* * *

রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের নন্, তিনি নিখিলবিশ্বের, সকল কওমে সকল মানুষের। কিন্তু নজরুল সকল শ্রেণীর সকল মানুষের ক নন, তিনি উৎপীড়িত মানুষের কবি, বঞ্চিত মানবতার ক হোক সে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ। তিনি বলেছেন :—

আমি গাহি তাহাদের গান
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
আমি নর-কবি গাহি সেই বেদে-বেদুইনদের গান—
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব অভিযান।

* * *

ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে
যাহাদের কারাবাসে—
অতীত রাতের বন্দিনী ঊষা ঘুম টুটি ঐ হাসে।
... ... (আমি গাই তারি গান)

প্রার্থনা ক'রো যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায়
তাদের সর্ব্বনাশ। (আমার কৈফিয়ৎ)

* * *

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবেনা।
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন সব শান্ত।··· (বিদ্রোহী)

* * *

গুরু এবং শিষ্য উভয় কবির জীবনাদর্শের মধ্যে ছিল ঢের ফারাক। এজন্য প্রিয় শিষ্যের আকাঙ্খা পূর্ণ করা গুরুদেবের পক্ষে নানা কারণে সম্ভবপর হয়নি। কেন হয়নি, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। তিনি বলেছেন :—

"এই স্বর-সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।

* * *

পাইনে সর্ব্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবন-যাত্রার।
··· ··· (ঐকতান)

গুরুদেব ইচ্ছা করলে এই "বেড়াগুলি" অপসারণ করতে পারেন, এরূপ ধারণা ছিল নজরুলের। আর এজন্যই ছিল কবিগুরুর উপরে বিদ্রোহী কবির অভিমান এবং অনুযোগ। 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় গুরুদেবের বিরুদ্ধে প্রবন্ধও লিখেছিলেন তিনি। পিতার উপরে পুত্রের মত তিনি "গোশাও" করেছেন। কিন্তু তাতে তাঁর ভক্তি এবং শ্রদ্ধা এতটুকু হ্রাস পায়নি কোন দিন। গুরুদেবের নিকট বিনীত কণ্ঠে বার বার প্রার্থনা জানাতে, 'আর্জি' পেশ করতে, তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। নজরুল বলেছেন,—

"ওগো ও পরম শক্তিমানের জ্যোতির্দীপ্ত রবি
সেই বিধাতার ভাণ্ডার লুটে নিয়ে যাও হেথা সবি,
যারা জড়, যারা নুড়ির মতন, নিত্য রস প্রবাহে—
ডুবিয়া থেকেও পাইল না রস, তারা তব কৃপা চাহে।
এই ক্ষুধাতুর উপবাসী চির নিপীড়িত জনগণে
ক্লৈব্য ভীতির গুহা হতে আন আনন্দ-নন্দনে।
উর্দ্ধের যারা তাহারা পাইল তোমার পরম দান—
নিম্নের যারা তাদের এবার করগো পরিত্রাণ।
মরে আছে যারা, তারা আজ তব অমৃত নাহি পায়
তোমার রুদ্র আঘাতে তাদের ঘুম যেন ভেঙে যায়।
··· ··· ··· (কিশোর রবি)

কাজি নজরুল ইসলাম "ধূমকেতু" নামে একখানি অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন ১৯২২ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে। পত্রিকা প্রকাশের সব সরঞ্জাম-আয়োজন পূর্ণ। এমন সময় স্মরণ হ'ল নজরুলের গুরুদেবকে। এ শুভ কর্ম্মে চাই তাঁর আশীর্ব্বাদ। সময় ছিল সঙ্কীর্ণ, তাই টেলিগ্রাম করলেন কবি-সম্রাটের নিকটে "শান্তিনিকেতনে।" আশা এবং আশঙ্কায় সময় গুণছেন, এমন সময় এসে পৌঁছুলো গুরুদেবের আশীর্বাণী—

কাজী নজরুল ইসলাম
কল্যাণীয়েষু—
আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গ-শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে-রে চমক মেরে
আছে যারা অর্দ্ধ-চেতন।

২৪শে শ্রাবণ
১৩২৯ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই আশীর্ব্বাণী ব্লক করে নিয়ে প্রত্যেক সংখ্যা "ধূমকেতু"তে ছাপাতে লাগলেন পত্রিকা সারথি নজরুল ইসলাম। ধূমকেতুর মাধ্যমে অগ্নিবর্ষণ শুরু করলেন তিনি। শেষ পর্য্যন্ত হ'ল তাঁর জেল। "আনন্দময়ীর আগমনে" শীর্ষক সম্পাদকীয় কবিতার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগ এনেছিলেন সরকার। উক্ত কবিতায় তিনি কাউকে ছেড়ে কথা কন নি, গুরুদেবকেও না। গুরুদেব সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—

রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে
সে কর শুধু পশল না মা, বদ্ধ কারার অন্ধকারে
গগন পথে রবি রথের শত সারথি হাঁকায় ঘোড়া
মর্ত্তে দানব মানব পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া।

প্রেসিডেন্সি জেল হতে নজরুলকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল হুগলী জেলে। সেখানে রাজবন্দীদের উপরে কারাকর্ত্তৃপক্ষ নানারূপ অত্যাচার করতেন, খাবার দিতেন নিম্নশ্রেণীর। ইহার প্রতিবাদে নজরুল অনশন ধর্ম্মঘট করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বরেণ্য নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করার পর, এবং সরকার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর উনচল্লিশ দিনে নজরুল তাঁর অনশন ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করেছিলেন। অনেক বিখ্যাত নেতার এবং আত্মীয়-বন্ধুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেও তিনি শেষপর্য্যন্ত দেশবন্ধু এবং কবিগুরুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে 'তার' করেছিলেন—Give up hunger-stike, Our literature claims you. এ তারবার্ত্তা অবশ্য সরকার নজরুলকে পেতে দেননি কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

হুগলী জেলে থাকাকালে নজরুল কবিগুরুর "তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে" গানটির প্যারডি করে গাইতেন—

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে—
আমারি এ গান তোমারি ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছ শান্ত্রী পাহারা দুয়ারে—
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয়ের ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।·····

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে" প্রভৃতি গুরুদেবের গানগুলি তিনি হুগলীজেলে গাইতেন, গাইতেন দরাজকণ্ঠে। ঐ সময়ে—'কারার ঐ লৌহ কপাট' প্রভৃতি উদ্দীপনাময় অনেক গুলি গান তিনি হুগলীজেলে থাকাকালে রচনা করে ছিলেন।

কারাগৃহের অন্ধকার "সেলে" নজরুল যেমন তাঁর গুরুদেবকে বিস্মৃত হননি, তেমনি গুরুদেবও ভুলতে পারেননি তাঁর এই প্রিয় শিষ্যটিকে। ১৩২৯ সালের ১০ই ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নাটক প্রকাশিত হলে দেখা গেল—তিনি তাঁর ঐ বইখানি উৎসর্গ করেছেন নজরুলকে।

• • • •

জেল থেকে খালাস হবার কয়েক বৎসর পরে নজরুলের কবিতা-সংকলন গ্রন্থ 'সঞ্চিতা' প্রকাশিত হয়। নজরুল তাঁর এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছিলেন গুরুদেবকে। উৎসর্গ-পত্রে লিখেছিলেন :—বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু :—

এই কয়টি কথার মধ্যে কবি কাজি নজরুল ইস্লাম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কি ভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন, তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

নাসিরুদ্দীন সাহেবের 'সওগাত' পত্রিকার তখন খুব নাম ডাক। প্রচার-সংখ্যাও ছিল তার উল্লেখযোগ্য। সেকালের 'প্রবাসী'র কাছাকাছি। নজরুল ছিলেন তখন 'সওগাতের' প্রধান লেখক। সওগাত-গোষ্ঠীর কোন এক নজরুল-ভক্ত একদিন কথায় কথায় কবিগুরুর সঙ্গে নজরুলের তুলনা করেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতে নজরুল রাগে গর্জন করে উঠেন এবং অতঃপর উক্ত-বিধ উক্তি করতে নিষেধ করেন। কবিগুরু সম্পর্কে কোনরূপ অশ্রদ্ধা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

কবি নজরুল ইসলামের পরিচালনাধীনে 'নওরোজ' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা বের হয়েছিল। উক্ত পত্রিকার প্রধান লেখকরূপে নজরুল পেতে চেয়েছিলেন গুরুদেবকে, এবং পেয়েছিলেনও। নানা কারণে পত্রিকাটি কয়েক মাসের বেশী চলেনি।

কবিগুরুর অশীতিবর্ষ জন্ম-উৎসব পালন করবার কিছু আগে হতে নজরুলের মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ সামান্য সামান্য প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলেন। এই অবস্থাতে তিনি গুরুদেবের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি' নামক একটি সুদীর্ঘ কবিতা। উক্ত কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"আমি আজি ভুলে গেছি আমি ছিনু কবি,
ফুটেছি কমল হয়ে তব করে রবি।
প্রস্ফুটিত সে কমল তব জন্মদিনে—
সমর্পিনু শ্রীচরণে লহ কৃপা করি।
জানিনা জীবনে মোর এই শুভদিন
আবার আসিবে ফিরে কবে কোন্ লোকে—:
আমি জানি মোর আগে রবি নিভিবেনা—
তার আগে ঝরে যেন যাই শতদল।"

• • •

সত্যকার কবিরা নাকি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। তাই আমরা দেখি, কবিগুরুর পরবর্ত্তী শুভজন্ম-বার্ষিকী উৎসবে সর্ব্বাঙ্গীন সুস্থ অবস্থায় যোগ দেবার সুযোগ নজরুল আর পাননি। "আমি জানি মোর আগে রবি নিভিবে না", তাঁর এ কথা প্রকারান্তরে সত্য হয়েছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের তিরোধান-কালে নজরুলের কবি-চিত্ত পূর্ব্বের মত সজাগ ও সক্রিয় ছিল না। তাঁর দেহ ও মন যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। তাঁর সৃষ্টির গোমুখী ধারার তরঙ্গ-দোলা হয়ে আসছিল ক্রমে ক্রমে স্তব্ধ। কবিগুরুর তিরোধানের দুঃসংবাদের বাত্যা কিছু সময়ের জন্য যেন আবার তাঁর সৃষ্টি-নির্ঝরের বুকে তুলেছিল একটা আলোড়ন। তাঁর লেখনী-মুখে বের হয়েছিল বাট পঙক্তির একটি কবিতা 'রবিহারা'। কলকাতা রেডিও—যোগে প্রচারিত হয়েছিল সে কবিতা। ঐ সময়ে তিনি লিখেছিলেন গুরুদেব সম্পর্কে একটি সঙ্গীতও। আমরা নিম্নে কবিতাটির অংশ বিশেষ এবং সঙ্গীতটি সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করছি। গুরুদেবের প্রতি শিষ্য নজরুলের সর্ব্বশেষ না হলেও—তাঁর সক্রিয় জীবনের শেষ-দিকের অর্ঘ্য হিসেবে তাঁর এ রচনাগুলি আমাদের নিকট অতীব মূল্যবান।

রবিহারা

দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্ত-পথের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে এলো দলে দলে—
উদাস গগন তলে।
বিশ্বের রবি ভারতের রবি
শ্যাম বাঙলার হৃদয়ের রবি,
তুমি চলে যাবে বলে।
তব ধরিত্রী-মাতার রোদন তুমি শুনেছিলে নাকি
তাই কি রোগের ছলনা করিয়া মেলিলে না আর আঁখি?
আজ বাঙলার নাড়ীতে নাড়ীতে বেদনা উঠেছে জাগি,
কাঁদিছে সাগর, নদী, অরণ্য, হে কবি তোমার লাগি।
তব রসায়িত রসনায় ছিল নিত্য যে বেদবতী।
তোমার লেখনী ধরিয়া ছিলেন যে মহা সরস্বতী,
তোমার ধ্যানের আসনে ছিলেন যে শিবসুন্দর
তোমার হৃদয়-কুঞ্জে খেলিত যে মদন-মনোহর
যেই আনন্দময়ী তব সাথে নিত্য কহিত কথা—
তাহাদের কেহ বুঝিল না এই বঞ্চিতদের ব্যথা।
কেমন করিয়া দিয়ে কেড়ে নিলে তাঁদের কৃপার দান
তুমি যে ছিলে এ বাঙলার আশা-প্রদীপ অনির্ব্বাণ।
তোমার গরবে গরব করেছি, ধরারে ভেবেছি সরা,
ভুলিয়া গিয়াছি ক্লৈব্য-দীনতা-উপবাস-ক্ষুধা-জরা।
মাথার উপরে নিত্য জ্বলিতে তুমি সূর্য্যের মত
তোমারি গরবে ভাবিতে পারিনি, আমরা ভাগ্যহত।

ভারত-ভাগ্য জ্বলিছে শ্মশানে, তব দেহ নয়, হায়
আজ বাংলার লক্ষ্মী-শ্রীর সিঁদুর মুছিয়া যায়।
আজ প্রাচ্যের কাব্য-ছন্দ, সুরের সরস্বতী
তোমার শ্মশান শিখায় দগ্ধ করিল চাঁদের জ্যোতি।
ভূভারত জুড়ে হিংসা করেছে এই বাঙলার তরে
আকাশের রবি কেমনে আসিল বাঙলার কুঁড়ে ঘরে

এত বড়, এত মহৎ—বিশ্ব-বিজয়ী মহামানব
বাঙলার দীন হীন আঙিনায় এত পরমোৎসব—
স্বপ্নেও আর পাইব কি মোরা? তাই আজি অসহায়
বাঙলার নর-নারী কবিগুরু, সান্ত্বনা নাহি পায়।
আমরা তোমারে ভেবেছি শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ,
সে আশিস্ যেন লয় নাহি করে মৃত্যুর অবসাদ।
বিদায়ের বেলা চুম্বন লয়ে যাও তব শ্রীচরণে,
যে লোকেই থাক হতভাগ্য এ জাতিরে রাখিও মনে!

* * * *

১৩৪৮ সনের ভাদ্র সংখ্যা 'সওগাতে' উক্ত কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্ধৃত কবিতার মধ্যে কবিগুরুর প্রতি কবি নজরুলের অন্তরের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা স্বতঃ উৎসারিত হয়ে ফুটে উঠেছে, আর, সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে—তাঁর দেশ ও জাতির প্রতি প্রীতি ও প্রেম। গুরুদেবের কাছে তাঁর বিদায়-ক্ষণেও বিনত শিষ্যের কাতর প্রার্থনা :—: যে লোকেই থাক হতভাগ্য এ জাতিরে রাখিও মনে।: চারণ-কবি কাজি নজরুল ইসলামের সঙ্গে আজও আমরা কবিগুরুর কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থান উপলক্ষে রচিত নজরুলের শোকগীতি :—

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে জাগায়োনা, জাগায়োনা,
সারা জীবন যে আলো দিল ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙায়োনা,
(যে) সহস্র করে রূপ-রস দিয়া
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া
তাঁহারে শান্তি-চন্দন দাও, ক্রন্দনে রাঙায়োনা—
যে তেজ, শৌর্য্য, শক্তি দিলেন আপনারে করি ক্ষয়
তাই হাত পেতে নাও,
বিদেহ রবি ও ইন্দ্র মোদের নিত্য দেবেন জয়
কবিরে ঘুমাতে দাও।
অন্তরে হের হারানো রবির জ্যোতি
সেইখানে কর নিত্য তাঁরে প্রণতি
আর কেঁদে তারে কাঁদায়োনা।

* * * *

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরমভক্ত ও শিষ্য বিদ্রোহী ও চারণ কবি নজরুল ইসলাম সম্বিতহারা না হলে, তাঁর কাছে থেকে গুরুদেব সম্পর্কে আজ অনেক নূতন কথা, নূতন কবিতা ও গান শুনতে পেতাম আমরা; তাঁকে পেতাম রবীন্দ্র-শততম-জন্ম-উৎসবের পুরোভাগে। কিন্তু সে সুযোগ আমরা পেলাম না। এজন্য আমাদের মনে একটা দুঃখ রয়ে গেল।

"রবির জন্মতিথি" শীর্ষক কবিতাটি, বোধহয় কবি নজরুল ইসলামের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচিত সর্ব্বশেষ রচনা। কবিগুরুর একাশীতম জন্ম-উৎসব উপলক্ষে নজরুল ইসলাম উক্ত কবিতাটি লিখেছিলেন বলে জানা যায়। বলা বাহুল্য যে, নজরুলের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তখন অনেকখানি অসুস্থ। আমরা উক্ত কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :—

রবির জন্মতিথি কয়জন জানে?
অঙ্ক কষিয়া পেয়েছে কি বিজ্ঞানে?
ধ্যানী যোগী দেখেছে কি? জ্ঞানী দেখিয়াছে!
ঠিকুজি আছে কি কোন জ্যোতিষীর কাছে?
নাই—নাই—! কত কোটী যুগ মহাব্যোমে—
আলো অমৃত দিয়ে ধ্রুব রবি ভ্রমে।

* * * *

রবি কি অস্ত যায়? অন্ধ মানব
রবি ডুবে গে'ল ব'লে করে কলরব।
রবি শাশ্বত, তাঁর নিত্য প্রকাশ—
রূপ ধরি পৃথিবীতে ক্ষণিক বিলাস
করিয়া চলিয়া যায় জ্যোতির্লোকে
এখনো দ্রষ্টা নেহারে তাঁর চোখে।
এই সুরভিত ফুল, রসভরা ফল
রবির গলিত প্রেম বৃষ্টির জল
কবিতা ও গান সুর-নদী হয়ে বয়।
রবি যদি মরে যায় পৃথিবী কি রয়?

* * * *

নিরক্ষর ও নিস্তেজ বাঙলায়
অক্ষর জ্ঞান যদি সকলেই পায়,
অক্ষর অব্যয় রবি সেই দিন
সহস্র করে বাজাবেন তাঁর বীণ।
সেদিন নিত্য রবির জন্মতিথি
হইবে, মানুষ দিবে তাঁরে প্রেম-প্রীতি।

* * * *

রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে, চিনতে হলে এবং বুঝতে হলে, যে-শিক্ষার প্রয়োজন, সে-শিক্ষা হতে আমাদের দেশের বিপুল জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এখনও বঞ্চিত। নজরুল সেই সত্য কথাই প্রকাশ করেছেন, প্রতিধ্বনি করেছেন কবিগুরুর 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা' উপদেশ-বাণীর। কবিগুরু ও কবিশিষ্যের উল্লিখিত বাণী এবং উপদেশ যদি আমরা জন-জীবনে রূপায়িত ক'রে তুলতে পারি, তবেই সার্থক হবে আমাদের রবীন্দ্রভক্তি।

The only man who behaves sensibly is my tailor; he takes my measure anew every time he sees me, whilst all the rest go on with their old measurement, and expect them to fit me.

—*George Bernard Shaw*,
Man and Superman (Constable)

কোহিনুরের আত্মকথা
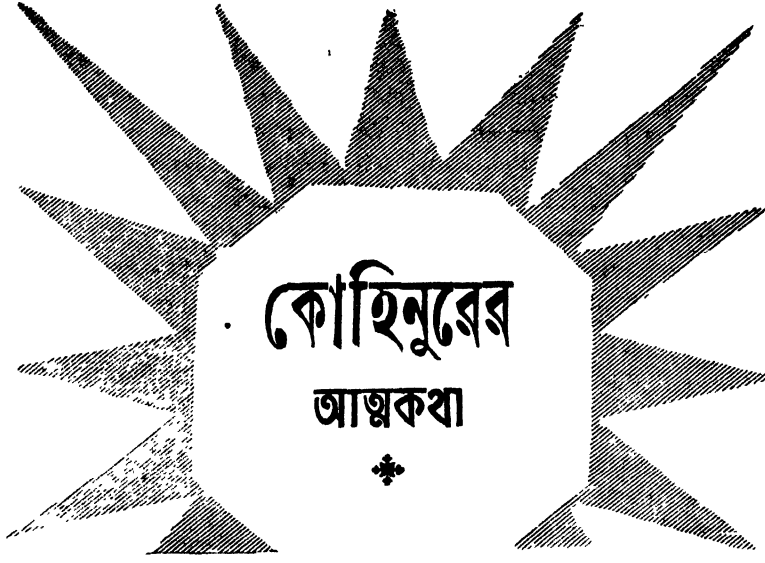
শ্রীহৃদয় রঞ্জন ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীতে আমি "কোহিনুর" নামে পরিচিত। আমার রূপে মোহিত হয়ে পারস্যের সম্রাট এই নাম দিয়েছিলেন।

আমার রূপের আগুনে অতি প্রাচীনকাল হতে কত সম্রাট ও বাদশাহ আত্মাহুতি দিয়েছেন, কত দেশে আমি সসম্মানে ভ্রমণ করেছি, তা বলে শেষ করা যায় না।

আমি অতি মূল্যবান, এত মূল্যবান যে, আমাকে কেনবার সামর্থ্য পৃথিবীর কারো নেই। মোগল সম্রাট বাবর আমাকে দেখে বলেছিলেন যে, আমাকে বিক্রী করলে পৃথিবীর সমস্ত লোকের আড়াই দিনের খোরাক হবে। এইটি অবশ্য বাবরের উক্তি। আমার যা ন্যায্য মূল্য, তার চেয়ে বাবর অনেক কম ধারণাই করেছেন।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমি চাপা ছিলাম গোদাবরী নদীর বালির তলায়। সেটি হল আমার জীবনের অন্ধকারময় যুগ এবং ঐ অন্ধকারময় যুগের অবসান হল আজ হতে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে।

এইবার শুনুন আমার জীবনের অন্ধকারময় যুগের অবসানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, সে সমস্ত ঘটনাবলী। একদিন আমি সোজা গিয়ে উঠলাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজপ্রাসাদে। বিক্রমাদিত্য আমার রূপে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন এবং সোনার মুকুট গড়িয়ে ঐ মুকুটের মাঝখানে আমাকে স্থান দিলেন। ঐ মুকুটে মণিমুক্তা প্রভৃতি অনেক মূল্যবান রত্ন ছিল। আমার প্রতি রাজার আকর্ষণ বেশী দেখে তারা হিংসা করতে লাগল। অবশ্য আমি তাদের হিংসাকে গ্রাহ্য করতাম না।

বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় কি জাঁকজমক! নবরত্নের সভা রোজ বসত। প্রত্যহ নতুন নতুন সমারোহ দেখে আমার চোখ ভরে যেতো।

কিন্তু এই সৌভাগ্য আমি বেশীদিন ভোগ করতে পারলাম না। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য মারা গেলেন, তাঁর পরলোক গমনের পর আমার স্থান হল মালবরাজের কোষাগারে। ঐ অন্ধকার ঘরে আমাকে কাটাতে হল এক বছর দু'বছর নয়, একটানা ১৩০০ বছর। ভেবে দেখুন আমার কতই কষ্ট হয়েছে। অবশেষে ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে মালবরাজের কোষাগার থেকে আমি আবার নতুন করে আবিষ্কৃত হলাম। মনটা আমার আনন্দে ভরে গেল, ভগবানকে একমনে ডাকতে লাগলাম বিক্রমাদিত্যের মত আর একজন মহারাজের মুকুটে স্থান পাবার জন্য। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হলনা। একদিন সকালে উঠে দেখি দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন মালবরাজ্য আক্রমণ করেছেন। যুদ্ধে মালবরাজ পরাস্ত হলেন, তাঁর কোষাগার লুণ্ঠিত হল এবং আমাকে বন্দী করে নেওয়া হল রাজধানী দিল্লীতে।

এর পর শোণিত-রেখায় ভারতের ইতিহাস লেখা শুরু হল। অমানুষিক অত্যাচার এবং নির্মম হত্যাকাণ্ড যেন সে সময়ে দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হল। মালববিজয়ী আলাউদ্দীন ছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অত্যাচারীদের একজন। তাঁর রাজত্বের ইতিহাস নরহত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি ঘটনাতে পূর্ণ। এই অত্যাচারী নরপতির মৃত্যু হল ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর দিল্লীর রাজকোষাগার হতে আমি আবার লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলাম।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর বিরাশী বছর পরে ইতিহাস-বিখ্যাত অত্যাচারী তৈমুরলঙ্গ সমরখন্দ থেকে বিশ্ববিজয় ও লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি খাইবার-গিরিপথ ও সিন্ধুনদ অতিক্রম করে দিল্লী অভিযান করেন। দিল্লী অবরোধের সময় তাঁর নির্দ্দেশে প্রায় এক লক্ষ নরনারীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল। এর কিছুকাল পর দিল্লী নগরীর পতন হল। দিল্লী নগরীর পতনের পর লুণ্ঠকেরা আসল সেখানকার রাজ-কোষাগার লুণ্ঠন করতে। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। তখন আমার মালিক ছিলেন নবাব নাজির শাহ। লুণ্ঠকের দল রাজকোষ লুঠ করবার আগেই তিনি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যান। ফলে

রাজকোষের অন্যান্য ধনরত্ন সমরখন্দে চলে গেলেও আমি ভারতেই থেকে গেলাম। আবার একশ' বছর আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলাম। হাত বদল হতে হতে একদিন আমি গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজা বিক্রমজিৎ-এর নিকটে পৌঁছলাম। এইভাবে গোয়ালিয়র-রাজের কোষাগার আমি কিছুদিন আলোকিত করলাম। দুর্ভাগ্য-বশতঃ সেখানে বেশীদিন থাকতে পারলাম না।

তৈমুরলঙ্গের অভিযানের একশ' বছর পরে তাঁর বংশধর বাবর ভারত অভিযানে বের হলেন। তিনি ইব্রাহিম লোদীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে দিল্লী ও আগ্রা দখল করলেন। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের পর রাজা বিক্রমজিৎ মারা যান। তখন তাঁর পরিবারের সকলে আগ্রায় ছিলেন। বাবরের পুত্র হুমায়ুন আগ্রায় এসে তাঁদের বন্দী করলেন। মুক্তিপণ হিসেবে বহু ধনরত্নের সঙ্গে আমাকেও তাঁরা হুমায়ুনের হাতে তুলে দিলেন। তাই আবার হুমায়ুনের সঙ্গে আমি দিল্লী পৌঁছলাম।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাবর পরলোকগমন করেন। তাঁর ছেলে হুমায়ুন দশবছর রাজত্ব করার পর ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। কণৌজের যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন এবং প্রাণরক্ষার জন্য অন্যত্র পালিয়ে যান। অন্যান্য ধনরত্ন উপেক্ষা করলেও আমাকে তিনি খুবই ভালবাসতেন, তাই তিনি পলায়নকালে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। কোন স্থানে সাহায্য না পেয়ে তিনি কিছুকালের জন্য পারস্য-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাজ্য হারিয়ে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে হুমায়ুনের কাল কাটতে থাকে। এইরূপ দুর্দিনেও তিনি আমাকে বরাবর করে রেখেছিলেন। এই সময়ে তিনি হামিদাকে বিয়ে করেন। সিন্ধুর অন্তর্গত অমরকোট নামক স্থানে তাঁহার পুত্র আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ খৃষ্টাব্দ)। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে পারসিক সৈন্যদের সহায়তায় হুমায়ুন কান্দাহার জয় করেন। অল্পকাল পরে তিনি ভ্রাতা কামরাণকে কাবুল হতে বিতাড়িত করেন। এবং কিছুদিন পরে তিনি লাহোর অধিকার করেন। তারপর সিকন্দর সুরকে পরাজিত করে তিনি দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন (১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ)। এইভাবে হুমায়ুনের সঙ্গে আমি স্বদেশে ফিরে আসলাম। এর পর দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে মোগল রাজত্ব চলতে থাকে, আর এই দীর্ঘকাল ধরে আমি মোগল সম্রাটদের কণ্ঠের ভূষণ হয়ে বিরাজ করলাম। এই সময়ে আমার দিনগুলি খুব আনন্দে কেটেছে।

সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর ত্রিশ বছর গত না হ'তেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি মোগলদের হস্তচ্যুত হয়ে গেল এবং তথাকথিত দিল্লী নগরী ও তার চারপাশের সামান্য ভূখণ্ডে উহা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। বাদসাহী সাম্রাজ্যের এই দুরবস্থার মধ্যে পারস্যরাজ নাদির শাহ "দিল্লীর দরবারে তাঁহার দূতেরা যথাযোগ্য মর্য্যাদা পাননি"—এই অজুহাতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দ)।

নাদির শাহ বিনা বাধায় গজনী, কাবুল ও লাহোর জয় করে দিল্লীর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হতে আরম্ভ করলেন। পানিপথের অনতিদূরে কর্ণাল নামক স্থানে বাদশাহী ফৌজ তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে পরাস্ত হল। পরাজিত মুহম্মদ শাহ বশ্যতা স্বীকার করে বিজয়ী নাদির শাহের সঙ্গে দিল্লী প্রবেশ করলেন। কয়েকদিন শান্তিতে কাটল। একদিন গুজব রটল যে, নাদির শাহ মারা গিয়েছেন, এই খবরে দিল্লীর অধিবাসীরা কয়েকশত পারসিক সৈন্যের প্রাণনাশ করল। নাদির শাহ এতে উত্তেজিত হয়ে তাঁর সৈন্যদের নির্মমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে আদেশ দেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিল্লীর দেড় লক্ষ লোকের প্রাণ গেল। সে কি মর্মান্তিক দৃশ্য, দেখলে চোখের জল রাখা যায় না। নির্মম হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য যা দেখলাম, তা আজও ভুলতে পারিনি। অতঃপর মহম্মদ শাহের অনুরোধে হত্যাকাণ্ড থামল, কিন্তু এরপর আরম্ভ হল লুণ্ঠনের পালা। অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় পনেরো কোটি নগদ টাকা এবং পঞ্চাশ কোটি টাকার মণিমাণিক্য নাদিরের হস্তগত হল। ঐ সমস্ত লুণ্ঠিত ধনরত্নের সঙ্গে আমাকে এবং সম্রাট শাহজাহানের প্রিয় ময়ূর-সিংহাসনটিও তিনি নিয়ে গেলেন। এই নাদির শাহ আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমার নাম রাখলেন "কোহিনূর"।

নাদির শাহ আমাকে সব সময়ে যত্নের সহিত কাছে রাখতেন। তিনি এত যত্ন করলেও আমি শান্তি পেতাম না, জন্মভূমি ভারতের জন্য সব সময়ে আমার প্রাণ কাঁদত।

কিছুকাল পরে নাদির শাহের মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুর পর আমি তাঁর ছেলের দখলে গেলাম। তৎপরে কাবুলপতি আহমদ শাহ উত্তরাধিকার-সূত্রে আমাকে পেলেন। ইহার পর আমি এসে পড়লাম আফগানিস্থানের রাজা শাহ সুজা দুরাণীর কাছে। তিনি আমাকে যত্ন করে হাতের মণিবন্ধে বেঁধে রাখতেন। বিদেশে থাকাকালীন আমি অনেকের অধিকারে গিয়েছি, কিন্তু কেহ আমাকে অশ্রদ্ধা করেনি।

ঠিক এই সময়ে সম্রাট নেপোলিয়ন প্রাচ্যে রাজ্য জয়ের কামনায় ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করেন। ভারতের তদানীন্তন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নেপোলিয়নের ভয়ে ভীত হয়ে শাহ সুজার সঙ্গে এক সন্ধি করলেন (১৮০১ খৃষ্টাব্দ)।

শাহ সুজা যখন সন্ধিপত্রে সই করছিলেন, সেই সময় ইংরেজ প্রতিনিধিটির নজর পড়ল আমার ওপর। ঐ ইংরেজ প্রতিনিধিটির নজরে আসায় আমার অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠল। কারণ এতদিন হয় ভারতে, না হয় ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশে আমি আসা যাওয়া করেছি, কিন্তু ইংরেজদের দখলে গেলে আমাকে যেতে হবে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ইংলণ্ডে এবং সেখান থেকে স্বদেশে ফিরে আসার সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে। আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত ঠিকই হল। অল্পকালের মধ্যে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের ফলে শাহ সুজা সিংহাসনচ্যুত হলেন।

সিংহাসন হারালেও শাহ সুজা আমাকে ছাড়েন নি। আমাকে নিয়ে তিনি কাবুল হতে পালিয়ে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রণজিৎ সিংহ তাঁহার ভরণপোষণের জন্য বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করেন এবং বিনিময়ে আমাকে গ্রহণ করলেন। ভারতীয় একজন রাজার দখলে এসে আমার মন আবার আনন্দে মেতে উঠল। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর আমি তাঁহার মহিষী ঝিন্দনা ও নাবালক পুত্র দিলীপ সিংহের অধিকারে গেলাম। তখন শিখরাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে শিখেরা ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং বিজয়ী ইংরেজ গোটা পাঞ্জাব দখল করে নেয়। অতঃপর তরুণ মহারাজ দিলীপ সিংহকে সিংহাসন

পরিত্যাগে বাধ্য করা হয়। সন্ধিপত্রের সর্ত অনুযায়ী দিলীপ সিংহ আমাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে দিতে স্বীকৃত হন।

এবার সুরু হল আমার সুদূর ইংলণ্ড যাত্রা। সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হয়ে আমি বন্দীর বেশে কিছুদিনের মধ্যে পৌঁছলাম বিলেতে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক বড় অনুষ্ঠান করে আমাকে দান করলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে। এরপর আমার স্থান হল মহারাণীর স্বর্ণমুকুটে। এখন আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে লণ্ডনের ওয়েকফিল্ড টাওয়ারে। আর আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বৃটিশ সরকার প্রত্যহ আয় করছে, আমাকে দেখবার জন্য প্রত্যেক দর্শককে দুইপেনি করে দিতে হয়।

বহুদিন হল আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছি, এখন আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসন-মুক্ত। সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য আমার প্রাণ কাঁদছে। কেহ কেহ বলেন, যেহেতু বহুদিন আমি বিলেতে আছি, আমি বৃটিশের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছি। কিন্তু এইরূপ ধারণা ভুল। ভারতের গোয়া, দিয়ু, দমন প্রভৃতি ৪০০ বছরের অধিক পর্তুগীজদের দখলে থেকেও যেমন পর্তুগীজ সম্পত্তিতে পরিণত হয়নি, ঐসমস্ত ভারতের সম্পত্তিরূপেই বিবেচিত হয় এবং ভারত কর্তৃক উহা পুনর্দখলের ব্যাপারে পৃথিবীর প্রত্যেক উদার রাষ্ট্রের সমর্থন রয়েছে, সেইরূপ আমিও বৃটিশের দখলে থাকলেও, ভারতীয় সম্পত্তিরূপেই সর্বত্র বিবেচিত হচ্ছি এবং ভারত আমাকে ফিরিয়ে নিতে দাবী জানালে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেরই ইহাতে সমর্থন থাকবে। ভারতীয়েরা কি আমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে না?

ভারতে আমেরিকার অর্থনৈতিক সাহায্য

বর্তমানে আমেরিকা ভারতকে যে সাহায্য দিচ্ছে, তা নিম্নোক্ত সংস্থার মারফত পরিচালিত হচ্ছে:

১। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন-সংস্থা: মার্কিণ অর্থনৈতিক সাহায্যকে একটি সুসংবদ্ধ সংস্থার অধীনে আনার জন্য ১৯৬১ সালের ৩রা নভেম্বর এই উন্নয়ন-সংস্থার সৃষ্টি হয়। পূর্বে আন্তর্জাতিক-সহযোগিতা-সংস্থা কর্তৃক নির্বাহিত কার্যগুলির দায়িত্ব বর্তায় এই নতুন সংস্থাটির উপর। ভারতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার কাজ চালাতো কারিগরি-সহযোগিতা-মিশন, উন্নয়ন ঋণ তহবিল ও শান্তিসহায়ক খাদ্য-পরিকল্পনা (৪৮০ নং সরকারী আইন)। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন-সংস্থা দানস্বরূপ অর্থসাহায্যও করে, আবার উন্নয়ন-ঋণও দেয়। ম্যালেরিয়া দূরীকরণ পরিকল্পনা, বসন্ত দূরীকরণ, উচ্চতর শিক্ষা, জাতীয় উৎপাদন-ক্ষমতা বর্ধক পরিষদ, কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণ, ডেয়ারী উন্নয়ন, সমাজোন্নয়ন, শস্যোৎপাদন এবং অন্যান্য অনেকগুলি পরিকল্পনার জন্য সাহায্যরূপে অর্থদান করেছে এই সংস্থা। অর্থদানের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ডলার, অর্থাৎ ১৭১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এ টাকা পরিশোধ করতে হবে না। ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এপর্যন্ত এই সংস্থা যে উন্নয়ন ঋণ দিয়েছে, তার মোট পরিমাণ হল ৪৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ডলার, বা ২২৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এই ঋণগুলি ডলারে পরিশোধ-যোগ্য। এগুলির জন্য সুদ দিতে হয় না, তবে আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ শতকরা ৭৫ নয়া পয়সা দিতে হবে। ভারতের ওপর যাতে চাপ না পড়ে এবং ভারতের অন্যান্য বৈদেশিক ঋণ ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের কথা বিবেচনা করে ঋণগুলির সর্তসমূহ দীর্ঘমেয়াদী করা হয়েছে। ঋণগুলি পরিশোধের জন্য ৪০ বছরেরও বেশি সময় দেওয়া হয়েছে, এর ওপরও আবার হাতে ১০ বছর সময় অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ, প্রথম দশ বছরের মধ্যে আসল পরিশোধ করতে হবেনা।

যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন-ঋণ-তহবিল (বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত) ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতকে ৫১ কোটি ৩৪ লক্ষ ডলার অথবা ২৪৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে। এই ঋণ টাকায় পরিশোধযোগ্য। এই টাকা অন্য মুদ্রায় পরিবর্তিত করা যাবে না।

২। ৪৮০নং সরকারী আইন (শান্তি সহায়ক খাদ্য পরিকল্পনা) ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় ভারতকে ন্যায্য দামে কৃষিপণ্য সরবরাহ কাজে ৪৮০ নং সরকারী আইন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই আইনের তিনটি ধারা আছে।

৪৮০ নং সরকারী আইনের ১নং ধারা অনুসারে প্রচুর পরিমাণ গম, চাউল, মোটা শস্য, তুলা, গুঁড়া দুধ ও তামাক সরবরাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে অনেকগুলি চুক্তি করেছে। চুক্তি অনুসারে মোট ১, ১৫৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য সরবরাহ করা হবে। সরবরাহকৃত কৃষিপণ্যের মূল্যের শতকরা ৮৭ ভাগ ব্যয়িত হবে সেচের বাঁধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, শ্রমশিল্প, শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ পরিকল্পনা এবং এদেশে অনুরূপ আরও নানা উন্নয়নমূলক কাজে।

২নং ধারায় মার্কিণ প্রেসিডেণ্টকে দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন জরুরী ত্রাণকার্য্যের জন্য অন্যদেশে আপাৎকালীন সাহায্য প্রেরণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী ভারত ৯২ লক্ষ ডলার মূল্যের কৃষি-পণ্য পেয়েছে। ৩নং ধারা অনুসারে ১৬ কোটি ১৮ লক্ষ ডলার মূল্যের গুঁড়া দুধ, গম, চাউল ভুট্টা, তুলা বীজ তৈল ও এই ধরণের অন্যান্য পণ্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের মারফত ভারতের বণ্টন করা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে সাহায্যপ্রাপ্ত কর্মসূচীর মারফত প্রায় ২৫ লক্ষ স্কুল ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে মধ্যাহ্নভোজ পাচ্ছে। ৪৮০নং সরকারী আইন অনুযায়ী ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে ৮টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তাতে কুলী সংশোধনের ধারামত ৭৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঋণস্বরূপ ভারতের বেসরকারী ব্যবসায় উদ্যোগে প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

৩। আমদানি রপ্তানি ব্যাঙ্ক: এই ব্যাঙ্ক মোট ২৭ কোটি ১৯ লক্ষ ডলার বা ১২৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ১০টি ঋণ মঞ্জুর করেছে। এই ঋণ ডলারে পরিশোধযোগ্য। প্রথম দফার ঋণস্বরূপ ১৯৫৭ সালে ভারত সরকারকে ১৫ কোটি ডলারের যে ঋণ মঞ্জুর করা হয়, তার সুদের হার হল শতকরা সাড়ে ৫ ডলার। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুরু করে ২০টি অর্ধবার্ষিক দফায় আসলটি পরিশোধ করতে হবে। গম ঋণ: ভারতে তীব্র খাদ্যাভাব মেটাবার জন্য ২০ লক্ষ টন গম ক্রয়ে অর্থসাহায্যকল্পে ভারতকে ১৮ কোটি ১৭লক্ষ ডলার বা ১০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণদানের উদ্দেশ্যে মার্কিণ কংগ্রেস ১৯৫১ সালে একটি আইন বিধিবদ্ধ করে। ঋণটি ডলারে পরিশোধযোগ্য এবং এর সুদের হার শতকরা আড়াই ডলার।

নগাধিরাজ হিমালয়-৪

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ সঙ্কলিত

জগজ্জননীর জনকরূপে গিরিরাজ হিমালয় বাঙালীর মনে-প্রাণে পুজো পেয়ে এসেছেন। শরৎ কালে যখন কাশ-ফুলে দোলা লাগে শিউলি ফুল হাসি ফোটে, পদ্মের দল পাপড়ি মেলে মাতন জাগায়, মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরির খেলায় ঝির-ঝির ধারা নামে, মাঠে মাঠে নতুন ধানের গন্ধে বাতাস উতলা হয়ে ওঠে তখনই বাঙালী মার চোখে দেখা দেয় শিউলি ফুলের মত ঝরে পড়া বিরহ-কাতর অশ্রু, বুকভরা হাহাকার—সে কার জন্যে? জগজ্জননীরূপী আদর্শ-মেয়ের শ্বশুরবাড়ী থেকে মায়ের সহিত মিলনের প্রত্যাশায়। তাই বাঙালী-জীবনের আদর্শ পিতা গিরিরাজ, মাতা মেনকা আর কন্যা উমা। গিরিরাজ হিমালয় সম্বন্ধে কত গৌরবময় কাহিনী পৌরাণিক আখ্যায়িকার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে, কত সাহিত্যে, কত কাব্যে, কত গানে।

মেনকা গিরিরাজ হিমালয়কে শিশু উমার অভিমানের কথা জানাচ্ছেন। আকাশে চাঁদ দেখে উমা তাকে এনে দেবার জন্যে মাকে আকুল করে তুললে, তখন মেনকা কোনরূপে উমাকে প্রবোধ দিতে না পেরে তাকে গিরিরাজের কাছে নিয়ে এলেন। গিরিরাজ মার আব্দারের কথা শুনে তাঁর হাতে একটি মুকুর দিলেন। সেই মুকুরে উমা নিজের প্রতিবিম্ব দেখে কোটি চন্দ্র পাওয়ার সুখ অনুভব করলেন—

"গিরিবর! আর আমি পারিনা হে প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা, ধরে দে উহারে।
আমি পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে।
কাঁদিয়া ফুলায় আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়া কর-অঙ্গুলি
আমি বলিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়?
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে বসে গিরিবর, বহু করি সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে,
আনন্দে কহিছে হাসি ধর মা, এই লও শশী,
মুকুর ধরিয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।" (রামপ্রসাদ সেন)

সেই উমা বিয়ের পরে কৈলাসে আছেন। শরৎ এসে গেল। উমা মায়ের আসার বিলম্ব দেখে মেনকা গিরিরাজকে বলতে লাগলেন—

"এই তো শরৎ ঋতু আগত হে গিরিরাজ,
আনিতে প্রাণনন্দিনী, আর কেন কাল ব্যাজ?
আশ্বাসি রেখেছ মোরে শরতে আনিবে মা'রে
সে কথায় বিশ্বাস করে, আছি হে ধরে ধৈর্য্য।
মা বাপ বলিতে যার থাকে কেহ ত্রি-সংসার
বৎসরান্তে একবার, তত্ত্ব তার ছি ছি লাজ।
এ তিন ভুবন মাঝ কে করে আর হেন কাজ?
তাই বলি হে নিলাজ। কর হে যাত্রার সাজ।"

গিরিরাজ তবুও নীরব। পাষাণ, তাই পাষাণের মত স্থির।

"শুন শুন শুন হে নিদয় হিমালয়
প্রাণ উমা বিনা মম প্রাণ বাহিরয়।
তুমি তো পাষাণরাজ কঠিনের শেষ
তোমার শরীরে তো কভু নাহি দয়ার লেশ।
স্বচ্ছন্দেতে আছ গিরি নিশ্চিন্ত হইয়া
পাগলে সঁপিয়া মোর প্রাণের তনয়া।"

* * *

"ওহে গিরি ত্বরা করি আন গিয়া প্রাণের গৌরী

কি হায় মিছার মোহে রব কার মুখ চেয়ে
সবেমাত্র উমা মেয়ে—তাহে জামাতা ভিখারী।
ঘরে আমার নানা রতন মার আমার বিভূতি ভূষণ
অম্বর বিহনে বসন বাঘাম্বর হয়েছে শুনি।
তুমি তো পাষাণরাজ লোকে মোরে দেয় লাজ
বলে, সম্বৎসরে আজো, তত্ত্ব না নিলে শেখরি।"

* * *

"এক জনে জানাইল যথা হেমগিরি।
মৈনাকে লইয়া আইল তোমার কুমারী।
গৌরী আইল হেন কথা মেনকা শুনিয়া।
আরোপিল পূর্ণ কুম্ভ দূর্বা ধান্য লইয়া।
প্রতি ঘরে আলিপন সুগন্ধি চন্দন।
সুগন্ধি বহুল ধূপে কৈল আমোদন।
ঘরের উপরে সব নেতের পতাকা।
দেখি আনন্দ বড় হইল মেনকা।
ষোড়শী বয়সী যত পর্বত-কুমারী।
থরে থরে দাঁড়াইল হইয়া সারি সারি।
কার হাতে আছে চন্দনের খুরি।
কাহার হাতেতে জ্বলে রতন-দিয়ারী।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে সুমঙ্গলধ্বনি।
রমণীমণ্ডলে সব আনন্দিত হইয়া।
নাচিয়া বেড়ায় সব আনন্দিত হইয়া।
গিরিপুরবাসী হইল আনন্দ অপার।
সংগতি লইয়া গিরি যতেক ব্রাহ্মণ।
কুলপুরোহিত আর কুলাচলগণ।

* * *

পূজা প্রকাশিতে ইচ্ছা করিলা পার্বতী।
কত কত দশভুজা হইলা পার্বতী।
(হিমালয় পর্বতে বসিয়া দশভুজা।
তথা বসি লইলেন ত্রৈলোক্যের পূজা।)"

(ভবানীপ্রসাদ রায়)

* * *

"এইমতে চলিলেন হিমের ভুবন।
নন্দী আদি ভূত সব চলে দানাগণ।
হিমালয়ে যাইয়া তবে উত্তরে শঙ্কর।
দেখিয়া পলাইল হিম নগেশ্বর।"
হেনমতে গমন করিলা মহেশ্বর।
ত্বরিত গমনে গেলা হেমন্ত নগর।
শিব দেখি গিরিরাজ কৈলা আবাহন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈলা মধুপর্ক দান।
বসিতে আনিয়া দিলা রত্ন সিংহাসন।
জিজ্ঞাসিলা গিরিরাজ কুশল বচন।
শিব বলেন গিরিরাজ সকলি কুশল।
কৈলাসেতে নাহি গৌরী এহি অমঙ্গল।
শীঘ্র করি আন গৌরী আমার গোচরে।
অবিলম্বে যাব আমি কৈলাস নগরে।
এত শুনি গিরিরাজ করিলা গমন।
মেনকার নিকটে গিয়া কৈলা বিবরণ।
মেনকা শুনিলা যদি হেমন্তের বাত।
অকস্মাৎ বিনা মেঘে যেন বজ্রাঘাত।

(ভবানীপ্রসাদ রায়)

* * *

হিমগিরির অভ্যন্তরে নানা জাতির বাস। আজও তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের জীবন কাটিয়ে চলেছে। কি তাদের সমাজ ব্যবস্থা, কোথায় তাদের শিক্ষার মান, কেমন করে তারা জীবন অতিবাহিত করে—তা সবই পর্যবেক্ষণ আর গবেষণার বস্তু হয়ে রয়েছে। কত ধর্মবিপ্লব, কত রাষ্ট্রবিপ্লব, দেশে দেশে নগরে নগরে ঘটে গেছে, তার কতটুকু আস্বাদ তারা পেয়েছে? আজও কি তারা হিমালয়ের আশ্রয়ে আত্মগোপন করে থাকবে? যুগ যুগ ধরে যে তারা শান্ত সরল জীবনযাপন করে আসছে, তার কতটুকু আমরা জানি?

"হিমালয়ে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ডোম (শূদ্র)—এই তিনটি প্রধান জাতির বাসস্থান। ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই গৌড় দেশীয় এবং সারস্বত। কান্যকুব্জী ব্রাহ্মণ অতিশয় কম। সম্প্রতি ব্যবসায় উপলক্ষে অনেক দেশীয় বৈশ্য পাহাড়ী মেয়ে বিবাহ করিয়া ২।১ পুরুষ হইতে বাস আরম্ভ করিয়াছে; পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাহাকে বলে, তাহা অনেকের ধারণাও নাই। এখনকার ক্ষত্রিয়গণ রাজপুত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। বর্তমানকালে যে সকল লোক বাস করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই পঞ্জাব ও রাজপুতনা অঞ্চলের লোক বলিয়া বোধ হয়; কারণ ব্রাহ্মণমাত্রেই গৌড় বা সারস্বত আর ক্ষত্রিয়েরা সকলেই রাজপুত এবং তাহারা ধর্মবিপ্লবের সময় দেশ হইতে পলাইয়া পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছে। ডোম হইতে কামার কুমার, মেথর, মুচি, সূত্রধর প্রভৃতি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে; হিমালয়বাসীর স্বাবলম্বন আচার-ব্যবহার, সমাজনীতি, বিবাহ-পদ্ধতি, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিলে দেখা যায়—তাহাদের স্বাবলম্বন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সকলকেই স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে বিশেষ ধনী কেহ নাই, প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত ও জমিদার বলিয়া কথিত হয়। তাহাদিগকে আপনাপন গ্রাসাচ্ছদনের জন্য অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। ইহাদের মধ্যে পুরুষগণ অপেক্ষা মেয়েরা অত্যন্ত কর্মিষ্ঠা। যাহাদের যত কাজ বেশী তাহারা কার্যনির্বাহের জন্য তত বেশী পরিমাণে বিবাহ বা জাতি নির্বিশেষে রক্ষিতা স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন। মেয়েদের সকলকেই আপন আপন জমিতে কাজ করিতে হইবে। ইহাতে ধনী দরিদ্র বাদ নাই, জাতি নির্বিশেষে সকলেরই করিতে হয়। মাঠে ধান বুনা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরে আনিয়া চাউল তৈয়ার পর্যন্ত সমস্ত কার্য স্ত্রীলোকের করিতে হইবে; কেবলমাত্র জমিতে চাষ দেওয়া, ও জলের লহরী কাটিয়া আনা পুরুষের কার্য। এখানকার ক্রিয়াকলাপ সব বৈদিক মতে সম্পন্ন হয়। বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, জাতির প্রতি তত লক্ষ্য নাই; বিশেষ লক্ষ্য কন্যাগণের দিকে। যত রকমের বিবাহ-পদ্ধতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রচলিত আছে, সব মতেই হয়। কন্যাপণ পিতার অভিরুচি মত যিনি দিতে পারিবেন তিনিই সেই

কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। এখানকার বিবাহ আদালতে রীতিমত রেজিষ্টার করা হয়। বিবাহান্তে স্ত্রী স্বামীর বা স্বামী স্ত্রীর মনোমত না হইলে পরস্পর পরস্পরকে আদালতের অনুমতি লইয়া ত্যাগ করিতে পারেন; ইচ্ছামত অন্য পতি বা পত্নী গ্রহণ করিতেও পারেন। উক্ত কার্যও যতবার ইচ্ছা ততবার হইতে পারে। টাকা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ানী, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণী গ্রহণ করিতে পারেন। তবে তাহাদের গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণবংশে প্রথমেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণীয় হইবেন না, ব্রহ্মণোচিত সকল সংস্কার-কার্যাদি হইবে, ক্রমশঃ সেই ছেলেরা তৃতীয় পুরুষে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণীয় ও সমাজে বসিয়া আহারাদি করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সকলেরই আপনাপন জাতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য আছে। এমন কি, তাহারা উপনয়ন সংস্কারের পর আপন গর্ভধারিণীর পক্কান্ন গ্রহণ করিবেন না, ফলাহারি সব জিনিষ খাইতে আপত্তি নাই। তারপর বিবাহ করিয়া সেই স্ত্রীরও পক্ক ডাল ভাত অগ্রাহ্য, মাত্র রুটি লুচি তরকারী গ্রহণীয়। অনেকে রুটিও খান না। যাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে, তাহাদের মধ্যে কয়েক ভাই মিলিয়াও এক স্ত্রী গ্রহণ করে ও জাত ছেলেগুলির মালিক সকলে হয়। পাহাড়ী মেয়েদের বৈধব্য-যন্ত্রণা ভুগিতে হয় না। বড় ভাই-এর স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভাই-এর গৃহিণী বা আপন ইচ্ছামত অন্য কাহারও গৃহিণী হইতে পারেন। এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিশেষকরে পরিলক্ষিত হয় ও স্ত্রীলোকের পরদা বা অবগুণ্ঠন-প্রথা নাই। যে স্ত্রীলোক যত স্বাধীনভাব দেখাইতে পারেন, তিনি তত গৌরব মনে করেন। মেয়েরা বেশ নাচ গানে পটু। সর্ব সাধারণ বড় অপরিষ্কার ও স্নান করা বৎসরের বিশেষ পর্বোপলক্ষে হয়। কিন্তু সকলেই দেব-দেবী-ভক্ত। হিমালয়বাসীরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও সাধু-সন্ন্যাসী-ভক্ত।······সর্বসাধারণই মেষ, ছাগল ও কুকুর পুষিয়া থাকে। প্রথমোক্ত দুইটির লোমদ্বারা তাহাদের পরিধানের ও অন্য ব্যবহার্য বস্ত্রাদি তৈয়ার হয়। এই বয়নাদি কার্যও স্ত্রীলোকেরা সম্পন্ন করে। কেবল পুরুষ লোক গুলি পাকাইয়া সূতা তৈয়ার করিয়া দেয়; আর কুকুর তাহাদের পাহারাওয়ালা। মেষ ও ছাগল গরু ইত্যাদি সব জঙ্গলে ঘাস খাইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল—তাহাদের রক্ষক ও পাহারাদার কুকুর; এমন কোন হিংস্র জন্তুর সাধ্য নাই যে, কুকুরের সামনে তাহার রক্ষিত একটা জীবের উপর অত্যাচার করে। অমনি সে তাহার প্রতিকার করিবে অর্থাৎ তাহাকে তাড়াইয়া দিবে। পাহাড়ী কুকুর এত বলবান হয় যে, দুইটা একত্র হইয়া একটা বড় বাঘ মারিয়া ফেলিতে পারে।······নাথ সম্প্রদায়, গিরি, পুরি, নম্বুরী, লিঙ্গ নামধারী হিমালয়বাসী বহু গৃহস্থ সাধুগণ এখানে আছেন।

হিমালয়বাসীর পরিধেয় বস্ত্রাদি ও বাসগৃহ সবই বিচিত্র রকমের দেখা যায়। পুরুষদের বিশেষ পোষাক—কম্বলের একটা পায়জামা, একটা গায়ের জামা, ও মাথায় কম্বলের টুপি; সাধারণ পোষাক পুরুষেরা একখানা লেংটি, গায়ে জামা ও মাথায় টুপি পরিয়া থাকে। অনেকে টুপিতে কচিপাতা বা ফুলের থোবা পরিতে ভালবাসে। সকলের হাতে একগাছি করিয়া লাঠি থাকে। বর্তমান-কালে অনেকে সূতার কাপড় পরে। মেয়েদের সাধারণ পোষাক—একটা জামা গায়ে, একখানি কম্বল জড়াইয়া বা কুচি করিয়া পরা। মাথার চুলগুলি বেশ বিনাইয়া খোঁপার অগ্রভাগে একটা উলের ফুল ও মাথায় পাগড়ি বাঁধা। তবে তাহাদের মধ্যেও অনেকে সূতার কাপড়, ঘাঘরা ইত্যাদি পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। কি পুরুষ কি স্ত্রী—দ্বিতীয় বস্ত্র কম লোকের আছে।······হিমালয়ে একতলা গৃহে কেহ বাস করে না। সকলেরই দুইটি ঘর আছে। একটি ভাণ্ডার-ঘর, অপরটি বাসের ঘর। কিন্তু দুইটিই দোতলা, কেহ কেহ একটি তেতলাও করিয়া থাকে। ভাঁড়ার ঘরের উপরের তলায় সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যাদি ও নীচে জ্বালানি কাঠ ও ঘাস রাখে, আর বাস গৃহের নীচে গো, মহিষ, মেষ, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত যে জন্তু আছে, তাহাদের স্থান। উপর তলায় রন্ধনকার্য, আহার বিহার শয়নাদি করিবে, কিন্তু কুকুরগুলি প্রায় উপর তলায় দেখা যায়। কেহ কেহ মেষ, ছাগলও উপর তলায় রাখে। তাহারা অতিথিকে আপন ঘরে বা ভাণ্ডার ঘরের বারান্দায় স্থান দেয়। বেশী লোক হইলে গ্রাম্য-দেবালয়ে স্থান করিয়া দেয়। অধিকাংশ গৃহ পাথরের দেওয়াল ও ছাউনি বিশিষ্ট। কোন কোন স্থানে কাঠের ঘরও আছে। ভাণ্ডার-ঘর সর্বত্র কাঠের দেওয়াল বিশিষ্ট। বর্তমানে স্থানে স্থানে টিন গৃহও তৈয়ার হইতেছে।" (হিমালয় ভ্রমণ—পরিব্রাজক শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী)।

"তিব্বতের পথে নেপাল সড়কের মধ্যে চোরটেন নিয়মো নদীর তীরে দি-কং গ্রাম। এই নদীটি পূর্বদিকে বিস্তৃত বৃক্ষহীন গিরি-শ্রেণীর নিম্ন ঢালু পথের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। গ্রামটি পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরটি আটফুট উঁচু আর পাথরগুলো অমসৃণ। বাড়ীগুলির ছাদও পাথরের। ছাদের প্রত্যেক কোণে একটি করে নিশান। নিশান-দণ্ডগুলি কম্বলের দড়ি দিয়ে বাঁধা। তাতে একটা করে কাগজ টাঙানো: সেগুলোতে মন্ত্র লেখা। বাড়ীর আশে পাশে ছোট ছোট তৃণ আর ফুল-গাছের ঝোপ। কিছু দূরেই দেখা যাচ্ছে বার্লির ক্ষেত। নদী থেকে সরু খাল কেটে আনা হয়েছে চাষের কাজের সুবিধের জন্য। আমাদের পেছনে পশ্চিম দিকে অনেকগুলি গ্রাম। গ্রামগুলি সার ও টি জং-এর উত্তর-পশ্চিমে। সিকিম রাজ্যের তিব্বতীয় জমীদারী ডোবতা গ্রাম।

ৎসো-মোট-যুং নামে একটা বিশাল হ্রদ গবাদি, খচ্চর প্রভৃতির পানীয়ের জন্য নির্দিষ্ট। এই হ্রদটির চার ধারে যে গ্রাম, তার নাম ডোবতা। কয়েক মাইল দূরে সারদেশের নিম্ন অংশে অরুণ আর টিংকি জং-এর সংযোগ স্থলের পথে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা ছোট নদী নেমে এসে পড়েছে এই হ্রদে। হ্রদটির জল অতি পরিষ্কার। উত্তরে তাসি-ৎমে-পা ম নামে একটি গ্রাম। এই গ্রামে উঁচু একটা কেল্লা। চারতলা ও ৬০টি জানালা আছে। একজন ধনী তিব্বতীয়ের সম্পত্তি এটা। একদিন হ্রদের ধারে পশুচারণ করতে এই তিব্বতীয়টি এক বিপুল গুপ্ত সম্পদ আবিষ্কার করে। এই হ্রদটা সম্বন্ধে এক কৌতুকময় কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এই—

পাথরের ঘেরা ছোট একটা ঝর্ণা। তাতে বাস করত পাতালের এক নাগকন্যা। মানুষ স্বামী নিয়ে মনের সুখেই থাকত সে। ঝর্ণার মুখ একটা ছোট পাথর দিয়ে ঢাকা থাকত। বিস্তীর্ণ অনুর্বর আর বন্ধুর পথ ভ্রমণে তৃষ্ণায় কাতর পথিক এসে এর সুমিষ্ট জল পান করে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করত। এটাই ছিল পথিকদের বিশ্রামস্থল। এক সময়ে কোন এক ধনী বণিক শত শত খচ্চর সমেত এখানে আশ্রয় নেয়। ঝর্ণার সুমিষ্ট জলে তারা তৃষ্ণা নিবারণ করে। ঝর্ণা

জল তোলার পর ঝর্ণার মুখে প্লেট পাথর চাপা দিতে ভুলে যায়। গুলোও তৃষ্ণার্ত। ইত্যবসরে তারা জল পান করতে শুরু করে। সঙ্গে পান করতে সমুদয় জল শুকনো হয়ে যায়। বাকী যা জল , তারা পা দিয়ে মাড়িয়ে অপবিত্র করে দেয়। নাগকন্যা এতে হয় আর অপমানিত বোধ করে। সে অভিসম্পাত দেয় যে, এই এখনি সাগরে পরিণত হবে। তার মানুষ স্বামী ভারতীয় র্ব ফা-দম-পাই তাকে এই অভিসম্পাত কার্যকরী করা থেকে বিরত ত চেষ্টা করে। কেন না, এ হলে অনেক প্রাণী ধ্বংসের মুখে ব। কিন্তু নাগকন্যা অটল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে এই টকে এক সাগরের সঙ্গে যোগ করে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে ঝর্ণাটি হ্রদে পরিণত হয়। এটা সমস্ত তিব্বতকেই ডুবিয়ে দিত, যদি ার স্বামী তৎক্ষণাৎ সেই ঝর্ণার চারিদিকে নর্দমা কেটে জলকে করে দিত। উভয় দিকের নর্দমার মুখ গিয়ে পড়েছে অরুণ মুখে। 'নাগকন্যার স্বামী মহান আচার্য এই টেংরি-জংএর তাতা। ডোবক্তা গ্রামে তার নামে এক মন্দির আছে—সেথায় তার তার নাগিনী পত্নীর প্রতিমূর্তি আছে। এই মূর্তি দেখার জন্যে যাত্রীর সমাগম হয়।

ছোট একটি নদীর দু'ধারে গ্রামটি অবস্থিত—নাম তাং-লু', এটি উপত্যকা। এই নদীটি চোরটেন নিমা গিরি শ্রেণীর পূর্বাংশে ইত। এই গ্রামে তিনশ' বাড়ী আছে। নদীর দু'ধারেই ব বার্লি ক্ষেত। গ্রামবাসীদের প্রধান সম্পদ হল চমরু গাই। র ভেড়া ও ছাগল মাঠে চরতে দেখা গেল। পাথর দিয়ে ঘেরা -পথ। সামনে দুটো বড় চৈত্য। গ্রামেতে একটা ছোট মন্দিরও আছে। ফুরচুঙ্গ তার পরিচিত একটা লোকের বাড়ীতে দের নিয়ে গেল। গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধা, অতিথিপরায়ণা। বার্লি, মদ দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলে। আপ্যায়নের ত্রুটি নেই; সঙ্গে এক কাঠের পাত্রে বার্লির সুস্বাদু খাবার। ২০ ফুট লম্বা ফুট চওড়া একটা ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। ঘরটি রের পর পাথর সাজিয়ে তৈরী, মাটি দিয়ে লেপা। পাথরের ছাদ। একটা ছোট ঘুলঘুলি। আমাদের মনে হল, এটা একটা ক্ষ দোকান। মেঝেটায় পুরু ধুলো, আর ঘরের কোণে উনুন। র চামড়ায় তৈরী একটা হাপর এই ঘরের আসবাব। টা চালাতেই ধুলোগুলো উড়তে লাগল—আর আমাদের দম বার উপক্রম।

আমরা সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। ঘর পরিষ্কার হলে সবে রে গুছিয়ে বসেছি—একদল ভিক্ষুকের আবির্ভাব। আমরা তাদের বার্লির খাবার আর তামাকপাতা দিয়ে বিদায় দিলুম। এগুলো আমরা সঙ্গেই এনেছিলুম। তিব্বতের স্ত্রীলোকের কাছে তামাক বেশ আদরণীয়। অনেক দর্শক এসে দরজার ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে উকি ঝুঁকি মারছিল। যদিও ধোঁয়া আর ধুলোয় আমরা অতিষ্ঠ, তবুও মনে আমাদের বেশ স্ফূর্তি। একজন ফেরিওয়ালা আর তার স্ত্রী আমাদের দরজার সামনে এসে নাচ-গান শুরু করলে। পুরুষটি সারেঙ্গ বাজাচ্ছিল—আর মেয়েটি তালে তালে নাচছিল। তারা উভয়েই গান গাইছিল। যাত্রা আমাদের শুভ হোক—এই কামনায় তারা তিনটি গান গেয়ে ফেললে। গানগুলি আমার খুব ভাল লাগছিল। কারণ, সেগুলি বেশ ভাল বুঝতে পারছিলুম। আমি তাদের চার আনা পয়সা ও কিছু তামাকপাতা দিই। তারা খুসী হয়ে বিদায় নেয়। এরপরে চাং-কু আসে। চাং-কু তিব্বতীয় বন্য কুকুর। তিব্বতীয় ডালকুত্তার মত বড় নয়। তাদের গায়ের রং ফিকে চেষ্টনাট বাদামের মত। এই নেকড়ে জাতীয় কুকুরটি খুব পোষা। আমাদের কাছে এসে সে খুব সেলাম করতে লাগল। কুকুরের মালিকটি দেখাতে চাইলে যে, সে কত আজ্ঞাকারী। আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরে ঢুকে পড়ল। কুকুরের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহকর্তা দারুণ রেগে গিয়ে সে ভিক্ষুককে বাড়ীর বার করে দিলে। কারণ, ওই বন্য অপবিত্র চাং-কু কুকুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে বাড়ীর পবিত্রতা নষ্ট করেছে। (শরৎচন্দ্র দাস, ১লা জুলাই ১৮৮২ সালের ডায়েরী হতে শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক অনূদিত)।

"ওই শোভে নিরমল হৃদয়ের হিমপুরী,
সেথা বিরাজেন দেব সবাকার আশা পুরি।
দরশন কর তাঁরে পাপ তাপ হবে লয়,
সার্থক জীবন হবে লভি চির বরাভয়।
বিশ্বে এক দেবালয় শোভে সেই পুরীমাঝে
যেথা যাত্রী অগণন আসে যায় কত সাজে;
সকলেই করে সেথা তাঁর নামে জয় জয়
দীপাবলী জ্বলে কিবা মন্দিরেতে জ্ঞানময়।
গাহিছে বন্দনা-গান সমস্বরে দেবগণ
প্রীতি-পুষ্পদলে সেথা পুজে যত সাধুজন;
মহাযজ্ঞ চলিয়াছে নিত্য সেথা সদাব্রত,
ঋষি মুনি ভক্তগণ বরষে আশিস্ কত;
সবাই আনন্দে ফুল্ল বুভুক্ষিত নাই কেহ;
সকলেই প্রাণ ভরে পায়গো প্রসাদ স্নেহ।"

(ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

একটু

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

একটু ছিলো জানাশোনা
একটু বা আনমনা।
কেমন করে কী পথ ধরে এলে
বুঝি না কী পেলে।

একটু যদি সময় দাও
কইতে দাও কথা
বুঝবে কেমন করে তার সইতে হয় ব্যথা।

একটু যদি হাঁটতে দাও পাশে
আনবো তারা আনবো চাঁদ
তোমার চারপাশে।

প্রথম এভারেষ্ট পরিক্রমা ঃ আকাশ পথে

কেনেথ নিয়ামে

[আকাশ-পথে বিশ্বের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট লঙ্ঘন বা প্রদক্ষিণ সেদিন অবধি অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু এই অভাবনীয় অবস্থার মুহূর্তেও পরপর দুইজন বৈমানিককে বিমানযোগে একক দুঃসাহসিক অভিযান চালাতে দেখা গেছে। তাঁদের মধ্যে প্রথম অভিযাত্রী যিনি তিনি হচ্ছেন মার্কিণ বিমান-বাহিনীর কর্ণেল আর, এল, স্কট। এই মানুষটি আকাশপথে হিমালয় পরিক্রমায় বের হয়েছিলেন ১৯৪২ সালে। দ্বিতীয় অভিযাত্রী বৈমানিকটি হচ্ছেন বৃটিশ রাজকীয় বিমান-বাহিনীর সদস্য কেনেথ নিয়ামে। আলোচ্য নিবন্ধে সেই সাহসিক বৈমানিক বিমানযোগে নিজের একক এভারেষ্ট পরিক্রমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন। তাঁর ঐ ঐতিহাসিক অভিযানের বছরটি ছিল ১৯৪৭ সাল। —স]

সবে তখন সকাল ৮টা বাজতে চলেছে—দমদম বিমান-ঘাঁটি (কলকাতা) থেকে আমি বিমানে চড়েছি। সমতল ভূমির একঘেঁয়ে তাপ আর এইখানে নেই। রাত্তিরে কি গরম গেছে—তাপমাত্রা ৮০ ডিগ্রির নিচে একটিবারও নামেনি। চলতি পথে পুঞ্জ মেঘের ভিতর যেয়ে পড়তে হয়, এই আশঙ্কা গোড়াতেই ছিল। তাইতো এতটা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়া।

আমার কর্মসূচীটি একবার ঝালিয়ে নিলাম। বিমানে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চারিপাশের তুষারাচ্ছাদিত ঢালু জায়গাগুলির আলোকচিত্র আমায় প্রথমে নিতে হবে। আর তার জন্যে আকাশ যতদূর সম্ভব পরিষ্কার থাকা চাই-ই।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করিয়ে দিয়েছিলেন—দিন যত এগিয়ে চলবে, মেঘ জমাট বাঁধবে ততই। আমিও প্রায় তা-ই ধরে নিয়েছিলাম। আমার জানা ছিল যে, কাঞ্চনজঙ্ঘার ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হচ্ছে এভারেষ্ট শৃঙ্গ। এযাবৎ বিমানে কয়জনার পক্ষে এভারেষ্ট অতিক্রম সম্ভব হয়েছে? যতদূর জানতে পেরেছি—একজন মাত্র বৈমানিকই এই পর্বত লঙ্ঘন করেছেন।

যাত্রার আগে আমার বিমানের কলকবজা ঠিক আছে কি না, দেখে নিই। স্পিট ফায়ার ১১ শ্রেণীর এই বিমানখানিতে অতিরিক্ত ১০ গ্যালন তেল ভর্তি করে নেওয়া হয়, দরকার পড়'ল দূরেও যাতে যাওয়া চলে। সরঞ্জামের ভিতর ছবি তোলার জন্য একটি বিশেষ লাইকা ক্যামেরা সঙ্গে রাখা হয়। সকালের এলোপাথাবি বাতাসের রাজ্যে আমি ততক্ষণে ঢুকে পড়েছি।

আকাশের উচ্চস্তরে আরোহণের উপযোগী সব ব্যবস্থা ঠিক-ঠাক। দূরবীণটি আমার চোখের সামনে রয়েছে। অফিস থেকে সরবরাহ পাওয়ার দিকেও আমি নজর রেখেছি। ৩৫০ মাইল দূরে ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিমুখে এগিয়ে যেতেই আমার লক্ষ্য। স্পিটফায়ার-এর মুখটি আমি সেভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছি। সোয়া ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে চলে যেতে পারব বলে আমার আশা।

রোদের জন্যে প্রথমটায় স্বভাবতঃই চোখে অস্পষ্টতা ঠেকে—মনে হলো আর বুঝি কয়েক মাইলের পথ। ১০ গ্যালন অতিরিক্ত তেল নিয়েও দ্রুত ছুটতে পারছি কৈ? তবু এ শেষ অবধি প্রায় ১২ হাজার ফুট ওপরে উঠতে পারলাম।

অস্পষ্টতার আবরণ কাটিয়ে আমি তখন মানচিত্র দেখছি—আবার সম্মুখের দিকেও রয়েছে দৃষ্টি। ঐ তো ঐ হিমালয়ের তুষারাবৃত এক একটি শৃঙ্গ—কতটা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এই নিয়ে যেন পাল্লা। কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যও চোখ ভরে দেখলাম; তারপর আরও কিছুটা ঊর্ধ্বে। এর ভিতর অনেকটা বাঁ দিকে আমি ঘুরে গেছি। আরও ছোট বড় কত শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের, সবার উপর দাঁড়িয়ে বুঝি ঐ এভারেষ্ট।

আমার বিমানখানির গতি তখনও ঊর্ধ্ব দিকে—২৮০ মাইল আবো যাওয়া চাই। হিমালয় পর্বতমালার পর্বতগুলি একটির পর একটি অতিক্রম করে চলেছি—কোনটি ডাইনে, কোনটি বাঁয়ে। কত ক্ষুদ্র না দেখাচ্ছে এদের প্রতিটিকে এখন। মানচিত্র পর্যালোচনায় আর প্রয়োজন নেই—সাদা চোখেই ঐ তো এবারে সব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

২০ হাজার ফুট উপরে যখন এসে গেলাম, অক্সিজেন ব্যবস্থা আবার ঠিক করে নিতে হলো। স্পিটফায়ার ১১ ক্রমেই ঊর্ধ্ব স্তরে উঠছে—এক্ষণে ২৫ হাজার ফুট পর্যন্ত যাওয়ার দাবী।

কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে যখন আমি এগিয়ে যাই, তখন আমার একটা ভয়মিশ্রিত আনন্দ হয়। দেখলাম প্রায় ১৩ হাজার ফুট উঁচুতে সমস্ত অঞ্চলটি ভয়ানক রকম মেঘে ঢাকা। এবারে কি ফিরে পড়তে হবে? তারপর আবার চেষ্টা চলবে একদিন? কিন্তু শঙ্কা জাগলো মনে, সে কি আর হবে?

যে ধরণের ক্যামেরা সহ আমার এই বিমানযাত্রা, জানতাম সেটা একটা অপরাধ। চাকরির ফিকিরে ভারতে যাওয়া অবধি এই ভাবনাই আমি ভেবেছি—কি করে এভারেষ্ট শীর্ষের আলোকচিত্র তোলা যায়। তিব্বতের নিষিদ্ধ এলাকার ভিতর দিয়ে আমায় যেতে হবে। আর আড়াই ঘণ্টা চলার মত তেল জমা আছে—প্রত্যাশিত শৃঙ্গটি অতিক্রম করতে হলে এখনও যাওয়া চাই এক শত মাইল। বড় ভাবনা—পর্বত-রক্ষীদের হাতে যদি ধরা পড়ে যাই কোথাও?

কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রদক্ষিণ করতে আমার আর দেরী নেই। এখন আমি চাইছি এভারেষ্টের পথে ২৮,১৪৬ ফুট উঁচু স্তরের আলোকচিত্র তুলব। প্রতিটি পর্বত-শীর্ষ এখন বড় হয়ে ধরা দিচ্ছে আমার চোখে—এভারেষ্ট শৃঙ্গরাজি ঐ বামদিকে মাথা তুলে আছে—সে-ও বেশ স্পষ্ট। এতটা উঁচুতে আর মেঘের চিহ্ন নেই—এভারেষ্ট অঞ্চলও যেন স্বাভাবিক তুষারবিহীন।

এবারে আমার ক্যামেরা হাতে তুলে নেবার পালা। কিন্তু কাজে কতকগুলি অসুবিধা ঠেকল। বিমানের ভিতর থেকে স্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব হয় না। ককপিটের ঢাকনা খুলব, সে সাহস বা কোথায়? তুষারপাত হওয়ার ভয় তো রয়েছে একটা।

বাঁ হাতে ক্যামেরা-দণ্ডটি জোর করে ধরলাম। ক্যামেরাটি যতদূর-সম্ভব শক্ত করে ধরা রয়েছে। যে-দিকে যা-কিছু চোখে মনোরম লাগছে, ক্যামেরায় ধরতে চললাম। এক একটি মুহূর্তে এ ভাবনাও হতো স্পিট ফায়ার ইঞ্জিনটি বুঝি বিগড়ে গেলো। যা হোক, উত্তরদিক থেকে এবং উপর থেকেও কাঞ্চন-জংঘার বিভিন্ন আলোকচিত্র নেওয়া হয়ে যায় আমার; এভারেষ্ট অভিমুখে যাত্রায় কিন্তু এখনও বিরতি হয় নি। ততক্ষণে আমি আমার সর্বশেষ লক্ষ্য অর্থাৎ এভারেষ্টের ২৯,০০২ ফুট) খুব কাছাকাছি এসে যাই। কিন্তু শৃঙ্গটি এখনও আমার থেকে বেশ ঊর্ধ্বস্তরে। ব্যাপার কি, বিমানের মিটার-যন্ত্রে উচ্চতার রেকর্ড রয়েছে ৩২ হাজার ফুট। পরে বুঝলাম, ক্লান্তির দরুণ আমারই মিটার পড়তে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে।

হঠাৎ মনে হলো আমার অক্সিজেন যেন ফুরিয়ে এসেছে। অথচ সরবরাহ-যন্ত্রে কোন গোলমাল নেই। মাথায় তখনও দুশ্চিন্তা—অক্সিজেন কি বেরিয়ে পড়েছে কোনভাবে? মুখের ওপর মুখোসটা একটু বেশ চেপে দিলাম। এবারে নেমে এসেছি আমি ৩১ হাজার ফুটের স্তরে। আগেকার তুলনায় সবই একটু ভালো মনে হচ্ছে। মুখোসের বাঁধনটা আবার ছেড়ে দিই—হাঁ, সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এখন।

এভারেষ্ট শৃঙ্গটি ঐ তো চোখের সামনে—বুঝি ধরতে পারা যায়। অপরূপ এর রঙ ও শোভা—প্রথম দৃষ্টিতেই অবাক হয়ে যেতে হচ্ছে। এভারেষ্টের কত আলোকচিত্র দেখেছি, দূর থেকেও কতবার এসে দেখা হয়েছে, সব সময়ই মনে হয়েছিল এই গিরিশৃঙ্গটি ধূসর বর্ণের। এখানে এর রঙ যেন আলাদা হয়ে গেছে—বালির রঙ—স্তরে স্তরে আলো-আঁধারের আবছা খেলা।

আরও আমার চোখে একটি বিভ্রান্তি ঘটলো—এভারেষ্টের যেন দুইটি চূড়া! নিচে ঐ একটা তুষার-স্রোত দেখা যাচ্ছে না? ভাবলাম ঐ হবে রং বাক গ্লেসিয়ার—এভারেষ্টের উত্তর দিকেই এটা প্রবহমান। সেই দিক থেকে এভারেষ্টের একটিমাত্র শৃঙ্গই দেখা স্বাভাবিক কিন্তু এ কি ধরণের দৃষ্টি-বিভ্রম—প্রায় সমান উচ্চতা নিয়ে দুইটি কঠিন চূড়া এখনও ঐ চোখের ওপর।

বিচার-বুদ্ধি যদি তখনও অটুট থাকত, দূরবীণ ধরেই বুঝতে পারতাম আসল ব্যাপারটি কি। হয়ত বা অক্সিজেনের অভাবের দরুণই আমার কেমন হয়ে গেছে। স্পিটফায়ার কিন্তু এতক্ষণ রংবাক গ্লেসিয়ারের ওপর ঘুরে আসেই নি—কানস্থং গ্লেসিয়ারকে ধরে নেওয়া হয়েছে রংবাক বলে। কানস্থং গ্লেসিয়ার এভারেষ্টের পূর্বদিক ধরে নেমেছে, এই পথেই রয়েছে লুৎসে (২৭, ৮৯০ ফুট) পর্বত শৃঙ্গ। এভারেষ্টের দ্বিতীয় চূড়া একেই আমি ধরে নিয়েছিলাম।

যা হোক, আর আমার কিছু করবার মেজাজ নেই, ক্ষমতাও নেই। নগরাজ হিমালয়ের প্রায় হাজার ফুট ওপরে আকাশ-পথে তখনও আমি রয়ে গেছি। বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতের আলোক-চিত্রাবলী গ্রহণ করতেই তো আমার আসা। এখনও ক্যামেরা বন্ধ করে দিই-নি—যা কিছু চোখে পড়ছে, একটি একটি করে শট্ মেরে চললাম। সৌভাগ্য যে, বেশীরভাগ ছবিই তোলা হয়ে গেছে এভারেষ্টের।

বিমানে এই একক অভিযাত্রায় বিপদ ঘটেনি কোথাও। পার্বত্য-ভূমি ঘিরে মারাত্মক বাত্যা বয়ে থাকে, এই শোনা ছিল, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এযাবৎ তেমন কিছু টের পেলাম না। কানস্থং গ্লেসিয়ারের বিপরীত দিকের রীজের ওপর আসতেই অবশ্য আমার বিমানের গায়ে কিসের প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। আমি উল্টে পড়লাম কিনা কিংবা আমার তখন কি হলো—বলতে পারছিনে। মনে হচ্ছে এটা এক বড় রকমের বাত্যারই ধাক্কা, এভারেষ্ট ও লুৎসের মধ্যবর্তী সাউথ পোলের ওপর দিয়ে এ ছুটে এসেছে। এর পরই মস্ত ভাবনা ধরে গেলে আমার।

এখন নিরাপদে নেমে পড়াই ভালো মনে করে নিলাম। যে ছবিগুলি তোলা হয়েছে, সে কম কি? হিমালয় শৃঙ্গগুলি আরও দুইবার এর ভিতর ঘুরে নিলাম—এই পরিক্রমার পথেও নতুন বেশ কয়েকটি আলোকচিত্র তোলা হয়ে গেলো। বেলা ঠিক ১১টা—যাত্রার তিন ঘণ্টা পরই আমি আবার দমদম বিমান ঘাঁটিতে। লাইকা ক্যামেরাটি তখনও কিন্তু আমার পকেটেই।

অনুবাদক: অনিল ভট্টাচার্য

Great minds discuss ideas, average minds discuss events small minds discuss people.

ক্ষণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

জওহরলাল

আজ দিনের অনেক অভিজ্ঞতা। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট, শুক্রবার, হঠাৎ বিকেল থেকে শোনা গেল—চারিদিকে দাঙ্গা। রাত্রে অতি সাবধানে থাকতে হবে, পাড়ায় পাড়ায় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সকলের রক্ষার জন্য টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। যদিও আমাদের বালীগঞ্জের পাড়ায় কোন ভয় নেই, তবু সাবধানের মার নেই। রাতটা ভালয়-ভালয় কেটে গেল, পরদিন থেকে আরম্ভ হল সমস্ত কলকাতা জুড়ে এক বীভৎস মারণ-যজ্ঞ।

উত্তাল জন-সমুদ্র যেন হঠাৎ যাদু মন্ত্রে হয় কাণ্ড-জ্ঞান-হীন পাগল, আর চতুর্দিকে শুধু মার-মার, কাট-কাট শব্দ,—শুধু মুখেই নয়, কাজেও। প্রতিবেশী, পরিচিত মানুষ যেন নৃশংসতায় ছাড়িয়ে যায় নরখাদক আদি অসভ্য মানবকেও। ট্রাম, বাস, দোকান, বাজার বন্ধ,—পৃথিবীর অন্যতম মহানগরী কলকাতা রূপ ধারণ করে এক বিশাল মহাশ্মশানের। জন-বিরল রাজপথে মৃতদেহ নিয়ে কাক, কুকুর ও শকুনী গৃধিণীতে চলে টানাটানি-ছেঁড়াছিঁড়ি।

এদিকে বালীগঞ্জ ষ্টেশন, ওদিকে পার্ক-সার্কাস, অন্যদিকে টালীগঞ্জ, ভবানীপুর,—সব দিক থেকেই বাতাসে ভেসে আসা উন্মত্ত জনতার হল্লা, দমকলের ঢং ঢং, আর থেকে থেকে বুক-কাঁপানো 'জয়হিন্দ' অথবা 'আল্লা-হো আকবর' চীৎকার! দিনরাত উদ্বেগ উৎকণ্ঠার আর সীমা-পরিসীমা নেই।

রাস্তায় দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হতে থাকল আবর্জনার স্তূপ। শব-পচা দুর্গন্ধে আকাশ-বাতাস দূষিত, গঙ্গাজল বন্ধ, বাংলার রাজধানীর অধিবাসীরা এক মহাশ্মশানে অনিদ্রায়, অর্দ্ধাহারে মৃত-প্রায় হয়ে কাটালো চার-পাঁচ দিন, তারপর আরম্ভ হয় একদিকে আর্ত্তত্রাণ, অন্যদিকে এই দুর্গন্ধ-দূষিত সহর পরিত্যাগ করে পালাবার হিড়িক! মৃত্যু-বিভীষিকা-পূর্ণ সহর ছেড়ে উপায়ক্ষম লোক এসে ভীড় জমায় হাওড়া ষ্টেশনে, নেই সেখানে তিল ধারণের স্থান। আমরা যাব দিল্লী, কিন্তু ট্রেণে স্থান পাওয়ার আশা দুরাশা, নিরাপদও বলা যায় না, অনেক ভেবে চিন্তে স্থির হয়, আকাশ পথই সব দিক দিয়ে ভালো।

সেটা এ দেশের আকাশ-পথে ওড়ার প্রথম যুগ, কটা মানুষই বা হয় তখন বিমানারূঢ়! মাটীতে দাঁড়িয়ে যতই আস্ফালন করি না কেন, মাটি ছেড়ে শূন্যে উড়তে হবে মনে করতেই ভয়ে যায় মুখ শুকিয়ে, বুকের ভিতর গুড়গুড় শব্দ। শঙ্কা, আনন্দ, উত্তেজনা,—সব মিলে পূর্ব্ব-রাত্রিটাও কাটে অনিদ্রায়। ২৬শে সকাল বেলা তাড়াতাড়ি স্নানাহার সম্পন্ন করে আসি 'ভিক্টোরিয়া-হাউসে'। এখানে বিমান-কর্ত্তৃপক্ষের নানা নিয়ম-কানুনের গণ্ডী পার হয়ে, ওদেরই সুরক্ষিত মিলিটারী ভ্যানে আসি দমদম, কারণ তখনও কলকাতার রাস্তায় চলাফেরা হয়নি সহজ অথবা নিরাপদ।

'ভিক্টোরিয়া হাউসে' দুটি মেম সাহেব দেখে ভরসা হয়েছিল,—কারণ বিদেশিনী হলেও ওরা আমারই দলের, বিপদে-আপদে দলপুষ্ট হবার ভরসা,—কিন্তু বিমান-ঘাঁটিতে তাঁদের অদর্শনে বুঝি,—বোধ হয় প্রিয়জনদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন, এ যাত্রায় যাত্রিনী তাহলে আমিই একাকিনী! বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে, মনে সাহস এনে জানালার ধারে একটি ভাল চেয়ার বেছে নিই,—পাশে স্বামী ও কিশোর পুত্র।
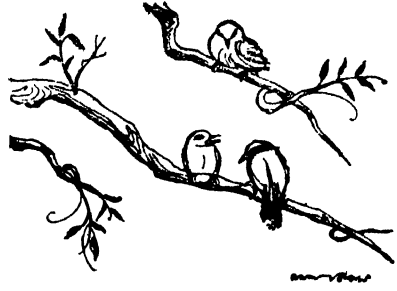
কানে তুলো গুঁজে, চেয়ারের সঙ্গে আঁটা বেল্ট কোমরে বেঁধে সকলে যেন যুদ্ধার্থ-প্রস্তুত, তটস্থ। কর্ণ-পটহ-বিদারী শব্দে প্লেন মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল,—জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি, আজন্মের পরিচিত পৃথিবী কোথায় দূরে সরে যাচ্ছে। উঁচু-উঁচু—আরও উঁচু—এবার আমরা মেঘের ওপরে—এ কোন মেঘ-লোকে আমাদের অনধিকার-প্রবেশ! ডাঙ্গার জীবের চাই জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সমান অধিকার। সেই মহাভারতের যুগ থেকে চেষ্টার অন্ত নেই, অসময়ে কত-শত প্রাণ-বলিদানেও মানুষ দমে না—চব্বিশ ঘণ্টার রাস্তা চার ঘণ্টায় পৌঁছানো চাই-ই!

কলকাতা ছেড়ে দুঘণ্টার মধ্যেই এলাহাবাদ এসে মাটি ছুঁই: বিশ্রাম-কক্ষে চা-পানের ব্যবস্থা। বিমান-ঘাঁটির ভিড়ের মধ্যে প্রথম দেখি, তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, তাঁর বোন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে। হাজারো মানুষের মধ্যে তাঁরা যেন স্বতন্ত্র, এক পলকে চিনে নেওয়া যায়। আমরা কলকাতা থেকে এসেছি দেখে এগিয়ে এলেন ওঁরা; কলকাতার খবরের কাগজ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন লাইন, সব কাজ বন্ধ; শুধু ঢিমে-তেতেলায় বিমান চলাচলেই বাহিরের সঙ্গে যা সংযোগ।

নেহেরুজী এগিয়ে এসে নানা ব্যগ্র প্রশ্ন করেন, কলকাতার খবর জানার আশায়। কী উৎকণ্ঠিত তাঁকে দেখি কলকাতার দুর্ভাগ্যে! ইতিমধ্যে নাকি সংবাদ রটে গেছে,—বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহার বালীগঞ্জের বাড়ী লুণ্ঠিত ও তিনি নিহত। দেশের সেরা ভাই-বোন দুজনেই উদগ্রীব হয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চালিয়ে গেলেন, তাঁদের

সম্বন্ধে। আমাদের নিকট তাঁদের নিরাপত্তার সংবাদ পেয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও ইন্দিরা গান্ধী,—পিসি-ভাইঝিকে দেখলে মনে হয় না, এঁরা ভারতীয়া। গাত্রবর্ণ, মুখশ্রী, ইংরাজী-উচ্চারণ প্রভৃতিতে তাঁদের যেন সাগর-পারের শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গেই বেশী সাদৃশ্য পাওয়া যায়। চোখের নিমেষে কেটে গেল বিশ্রামের ঘণ্টাখানেক সময়। আবার পরিত্যক্ত প্লেনে উঠে, কানে তুলো গুঁজে, বেল্ট বেঁধে বসি অনেকটা নির্ভাবনায়; আর ভয় কী?—আমাদের সহযাত্রী এবার দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পণ্ডিতজী স্বয়ং। ভগ্নী, কন্যা, বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে চলে যাবার পর, তিনিও এসে আমাদের মত প্রস্তুত হয়ে বসলেন অনতিদূরে।

এবারে দেখি তাঁর সহযাত্রিনী পার্শ্বে উপবিষ্টা শ্রীযুক্তা মৃদুলা সারাভাইকে। খবরের কাগজ মারফত জানা ছিল, তিনি তখন কংগ্রেস-সেক্রেটারী। হাতে এক বোঝা 'ফাইল' নিয়ে, কোটিপতি গুজরাতী ধন-কুবের-কন্যা, সুশিক্ষিতা, খদ্দর-পরিহিতা মৃদুলা-বেহেন চলেছেন, প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত নেহেরুর পাশে বসে। অতি সাধারণ বেশ তাঁর, নেই কোন উগ্র প্রসাধন, নেই শাড়ি-অলঙ্কারের বাহুল্য!

মনে হল যেন কোন রূপকথার নগরের যাত্রী আমরা; যাঁদের নাম এতদিন শুধু খবরের কাগজেই বিস্মিত-অন্তরে পড়ে এসেছি, যাঁদের ধারে কাছে যাবারও জীবনে কোন সম্ভাবনা আছে মনে করিনি, আজ কোন্ যাদু মন্ত্রে এসে পড়েছি তাঁদের এত কাছে, যেন ঘরের লোক! ইতিমধ্যে কিশোর পুত্র আব্দার জানালো, ওঁদের 'অটোগ্রাফ' চাই। চলন্ত প্লেনে দু কদম দূরে উপবিষ্ট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবদের একজনের নিকট পুত্রসহ গিয়ে তার আব্দার নিবেদন করি। ছেলের প্রসারিত হস্ত থেকে অটোগ্রাফের খাতাখানা নিয়ে হাসিমুখে দিলেন স্বাক্ষর! খাতার পাতায় ও মনের পাতায় দ্বিবিধ স্বাক্ষর আজ ষোল বৎসর পরেও এতটুকু ম্লান হয়নি।

লেডি অবলা বসু

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের একটি দিন। বম্বে আসার কিছুকাল পরেই পার্শী মহিলাদের চকচকে রং-বেরং-এর চোখ-ঝলসানো শাড়ির রূপে মুগ্ধ হয়ে কিনি একটি পার্শী পাড়। হীরার মত ঝকঝকে সাদা কাঁচকড়া ও পুঁতি বসানো অপূর্ব্ব কৌশলে নির্মিত সে পাড়। পাড়ের দ্যুতি এত বেশী যে, আবার কোন উগ্র রঙ্গীন জমিতে সে পাড় বসালে, মনে হয় এত ঝকমকে হবে যে, তা, পরতে বোধহয় লজ্জা হবে, ও সে শাড়ি হয়ত বাক্সেই পচবে; ভেবে চিন্তে একখানা সাদা সিল্ক কিনে তাতেই বসিয়ে নিই ঐ সাদা পাড়।

বম্বে ইউনিভার্সিটির তদানীন্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যার বিঠ্ঠল চান্দাভারকারের বাড়ী থেকে টেলিফোন এলো, স্যার জগদীশ ও লেডি বসু তাঁদের অতিথি হয়ে বম্বে এসেছেন। এসেই কে কে বাঙ্গালী এখানে আছেন খবর নিয়ে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র,—স্বামীর কর্ম্মস্থল কোলাবা-অবজারভেটরীতে জানায়, তাঁকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন, তৎসঙ্গে আমিও বাদ পড়িনি।

তখনও বাহিরে মেলা-মেশায় হইনি বিশেষ অভ্যস্ত, পর্দ্দার ভিতরের রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা আমি, বম্বে এসে সবেমাত্র অবগুণ্ঠন সঙ্কুচিত হচ্ছে, এহেন সময়ে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে, এমন পৃথিবী-খ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ! স্যার জগদীশ বসুর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে নাম তখন জগৎ-জোড়া, প্রতি বৎসরই প্রায় যান বিলেত—আমেরিকা লেডি বোসকে সঙ্গে নিয়ে, খবরের কাগজে পড়ি ও দেখি সে সব বিবরণ ও ছবি; স্বচক্ষে যে আবার তাঁদের দেখব, তা ছিল কল্পনার অতীত! কম্পিত চরণে অপরাহ্নে সেই সাদা পার্শী শাড়িখানাই গায়ে চড়িয়ে চলি, স্বামীর গুরু ও গুরুপত্নী সম্ভাষণে।

বম্বে ইউনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যান্সেলার ও ব্যারিষ্টার স্যার বিঠ্ঠল চান্দাভারকারের পিতা স্যার নারায়ণ চান্দাভারকার ছিলেন সেকালের বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। বনেদী বড়লোক, বম্বের সব চেয়ে অভিজাত পল্লীতে তাঁদের বিলিতি কায়দায় সাজানো চমৎকার বাড়ী, অগণিত দাস-দাসী। চাকুরী ভিন্নও তাঁদের ছিল বহু ব্যবসা, কাপড়ের কল প্রভৃতি। অসাধারণ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও চান্দাভারকার-দম্পতি ছিলেন অতি অমায়িক, অতি সজ্জন, অতি শিক্ষিত। তাঁরা ম্যাঙ্গেলোরিয়ান ও কোঙ্কনী ভাষা-ভাষী হলেও বাঙ্গালী জাতিকে দেখতেন অতি শ্রদ্ধার চক্ষে ও ভালোবাসতেন প্রাণ ভরে। দীক্ষা নিয়েছিলেন রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মে।

একটি নিরিবিলি কক্ষে যাই, গুরু-পত্নীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়ার মানসে, তাঁরই আহ্বানে। এবার আমাদের সমস্ত বাড়ী ও সন্তানাদির খবরাখবর নিয়ে বল্লেন,—'এখানে একা বাস কর, শাশুড়ী ননদ কেউ নেই কিছু বলার জন্য, তাই বলে কি এমন সাদা পোষাক পরতে আছে? এই অল্প বয়স তোমার, সধবা মানুষ, এ সাদা শাড়ি আর পরো না।' তাঁর কথা শুনে এত লজ্জা পাই যে, বাড়ী এসে তৎক্ষণাৎ সে পাড় খুলে ফেলি। সত্যই ত, এদিক দিয়ে ত এ-কথা ভাবিনি! এত দরদ দিয়ে আমার ত্রুটি সংশোধন করে দিলেন যে, মনে হল যেন নিজেরই মা, দিদির মধ্যে একজন।

তারপর তাঁদের ও তাঁদের গৃহকর্ত্তাদের এবং পরিচিত কিছু বাঙ্গালীকে ডাকি চায়ের আসরে। স্যার জগদীশ আরও নানা নিমন্ত্রণে ব্যস্ত থাকায়, ঠিক সময়ে আসতে পারবেন না বললেন, কিন্তু মমতাময়ী লেডি বোস বললেন,—অন্য নিমন্ত্রণ বাদ দিয়েও আমি যাব তোমাদের কাছে। আহার্য্য, পানীয়, প্রতিটি বস্তুতে লেডি বোসের সেদিন কি আনন্দ-প্রকাশ! তুচ্ছ, নগণ্য আমাকেও সাদরে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বিস্তৃত স্নেহের পরিধিতে।

বহু বৎসর পর আবার তাঁকে দেখি কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ীতে। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে স্বামীর 'কৃত্রিম-বারিপাত' সম্বন্ধে বক্তৃতা; বসু মহাশয় বহু পূর্ব্বেই হয়েছেন স্বর্গীয়, তাঁর স্মারক-তিথিতে এই আয়োজন। লেডি বোস তখন অতি বৃদ্ধা, তবুও বিকালে আমাদের সামনে বসে খাওয়ালেন চা জলখাবার। জিজ্ঞাসা করি, শরীর কেমন? বল্লেন,—ভাল, আমার বয়সে অন্যদের যা শরীর থাকে, তার তুলনায় অনেক ভাল। দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়া একটি তরুণীকে দেখিয়ে বললেন, এই মেয়েটি আমাকে যা যত্ন করে, আজকাল বোধ হয় নিজের ছেলে মেয়েও তা করে না, সেদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবতী।

কত অল্পে সন্তুষ্ট, এই নিঃসন্তানা স্নেহময়ীর কথায় হই মুগ্ধ। কথায় কথায় বললেন—আমাদের দিন ত প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এবার

তোমরা এগিয়ে এসে হাতে নাও বাণী-বিদ্যাপীঠ, বিধবা-আশ্রম প্রভৃতির ভার। একরাশ কাগজপত্র দিলেন পড়ে দেখার জন্ত; সমস্ত জীবন নারীজাতির কল্যাণে অনেক কিছুই করেছেন, এবার এসেছে ভাবনা, তবুও ভাবি ভালই যখন আছেন, তখন আরও অনেক দিন বেঁচে থেকে দেশের কল্যাণ করুন। এমন কল্যাণী নারী কটি দেশে জন্মায়? কাগজগুলো পড়ে আর ফিরিয়ে দিতে যেতে হলনা,—অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই হঠাৎ শুনি তিনি ছেড়ে গেলেন এই পৃথিবী!

পরশুরাম-সাক্ষাৎ

সেই ৩০।৪০ বৎসর আগেকার কথা। বাঙ্গালীবর্জ্জিত বম্বে-বাসে, দেশ থেকে স্বজাতির আগমনে হই মহা আনন্দিত। এমন সময় একবার বেড়াতে এলেন রাজশেখর বসু ও পত্নী। স্বামীর নিকট শুনি, তিনি বিদ্বান,—স্যার পি, সি, রায়ের প্রিয়ছাত্র, রসায়নবিদ, তখনকার বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার, ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে বম্বে আগমন।

অত্যন্ত স্বল্পবাক্ গম্ভীর মানুষটি, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ঠিক বিপরীত। হাসিতে, গল্পে, কথায়, সমস্তক্ষণ আমাদের মাতিয়ে রাখেন, ও তাঁর স্বামীর কথা না বলার ফাঁকটি করে দেন নিজের কথা দিয়ে পূর্ণ। মহিলাটির একমাত্র কন্যা ও দুটি শিশু নাতির গল্পে আসর জমিয়ে রাখেন।

আমার মনে ছিল একটা সন্দেহ। বিদেশের বন্ধু—ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলির নিয়মিত গ্রাহিকা ও পাঠিকা আমি। তখন 'ভারতবর্ষে' পরশুরাম লিখিত ও নারদ বিচিত্রিত বিচিত্র গল্পগুলি সবে প্রকাশিত হচ্ছে। যুগান্তকারী হাস্য-রসের গল্প, ভূষণ্ডীর মাঠে, চিকিৎসা-বিভ্রাট, বিরিঞ্চি বাবা প্রভৃতি এত রস-ঘন মনোমুগ্ধকর যে, পড়ে পড়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেলি—তাব রেলের কামরায় মেম সাহেবটির পরণে দেড় হাতি বাঁদিপোতার গামছা', 'ঠোঁটের সিন্দুর অক্ষয় হউক' প্রভৃতি বর্ণনাগুলি মনের পাতে সব সময় যেন বিদ্যুতের মত চমকায়, আর মনে হয়—কে এই পরশুরাম? আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করি আবার কবে ভারতবর্ষ পাব ও পরশুরামের গল্প পড়ব!

কানা-ঘুষায় শুনি, কে এক রাজশেখর বসু, 'পরশুরাম' ছদ্ম নামে ঐ সব গল্প লিখছেন। এই বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার বৈজ্ঞানিক রাজশেখর বসু ও অপূর্ব সাহিত্যস্রষ্টা রাজশেখর বসু—একই ব্যক্তি কি না, তার হদিস কেহই দিতে পারেননি। ম্যানেজার বাবুকে চাক্ষুস দেখে আমার কোনক্রমেই মনে হল না যে, তিনি এমন রস-সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। সন্দেহ-দোলায় দুলছি, কিন্তু এখনি না জিজ্ঞাসা করলে, পরে আর কোথায় এ সুযোগ পাব? আর হয়ত জীবনেও তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে না। ঝোঁকের মাথায় সেই গম্ভীর মানুষটিকে বলে ফেলি মনের নিদারুণ সন্দেহ! উত্তর নেই, শুধু গোঁফের ফাঁকে দেখি ঈষৎ হাসি, দুটি দাঁত একটু চিকচিক করে উঠল, পরক্ষণেই মুখ বন্ধ।

অনেকক্ষণ পরে আমায় দিলেন কয়েকটি অমূল্য উপদেশ,—যা এখনও মনে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে। বললেন, আপনি বম্বে-প্রবাসী, এখানকার পার্শী, গুজরাতী, মারহাটি জীবন নিয়ে লেখেন না কেন? আপনার ত প্রচুর সুযোগ, সময়ও আছে, সুরু করে দিন লেখা! চলে গেলেন তাঁরা, কিন্তু মনে রেখে গেলেন স্থায়ী ছাপ!

অনেকদিন পর বসুমতীর পাতায় দেখি এক নিদারুণ, প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। রাজশেখর বাবুর কন্যার ছবি ও বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'কলির সতীদাহ' অথবা সমার্থ-দ্যোতক এক শিরোনামা।

এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলি সেই বিচিত্র ঘটনা। রাজশেখরবাবুর জামাতার টাইফয়েড জ্বর, কন্যা রাত-দিন প্রাণপণে করে যাচ্ছে তার শুশ্রূষা। তখনকাব দিনে টাইফয়েডের কোন চিকিৎসাই ছিল না, দীর্ঘদিন জ্বরভোগ করতেই হ.ব। ভুগে ভুগে জামাতা এসে দাঁড়ালো জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, শুশ্রূষাকারিণী কন্যা সুস্থ,—দুটি কিশোর পুত্রের জননী। স্বামীর রুগ্নশয্যার প্রান্ত ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে চান না; এমন সময়ে একদিন ডাক্তারের মুখে অবিচলিতভাবে শোনেন চরম সংবাদ,—'রোগীর জীবন আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা!' সতী-সাধ্বী বিছানাব প্রান্ত ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ও মুহূর্ত্তে ছিন্ন-মূল তরুর ন্যায় সেখানেই পড়ে যান ও করেন দেহত্যাগ! ইচ্ছা-মৃত্যু কি এরই নাম? কোন অসুখ-বিসুখ ছাড়া এভাবে কি মানুষের প্রাণত্যাগ করা সম্ভব? দক্ষ-যজ্ঞে সতী স্বামী-নিন্দা শুনে কি এ ভাবেই দেহত্যাগ করেছিলেন? আমার মনে জাগে নানা আকুল প্রশ্ন!

তার পরের ঘটনাটি অতি সংক্ষিপ্ত,—ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই স্বামীর শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ। স্বামীর দু' ঘণ্টা আগে যে মেয়ে সিঁথির সিঁদুর নিয়ে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করলেন, তাঁকে আলতা-সিঁদুরে রাজরাণীর বেশে সাজিয়ে, স্বামীর সঙ্গে শ্মশানে নিয়ে একই চিতায় শোয়ানো হল। শ্মশান ভেঙ্গে লোক এসে বিস্মিতচিত্তে দেখল অভূতপূর্ব দৃশ্য, একই চিতায় স্বামী-স্ত্রীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হওয়া! এ যুগে এমন দৃশ্য আর কেহ দেখেছে কি?

এর পরে চিত্রটি চক্ষে না দেখেও কল্পনা-নেত্রে দেখি, পিতৃ-মাতৃহীন দুটি বালকের প্রতিপালন-ভার এসে পড়ল নিদারুণ শোকপ্রাপ্ত দিদিমা ও দাদামশাইয়ের উপর। তাঁরা মুখ বুজে, নতশিরে বিধাতার দান শিরোধার্য্য করলেন। তারপর আস্তে আস্তে সহধর্ম্মিণীও প্রিয়তমা কন্যার অনুগমন করার পর রাজশেখরবাবু বেঁচে রইলেন আরও অনেকদিন, শুধু সাহিত্যকে সম্বল করে। এতবড় ঝঞ্ঝায়ও তাঁর রস-ঘন সাহিত্য-সৃষ্টিতে এতটুকু দাগ পড়েনি,—ম্লান হয়নি তাঁর নব-নব সৃজনীশক্তি!

তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা কাগজের পূজাসংখ্যাগুলির গল্প-উপন্যাসের শিরোভাগে দেখেছি তাঁর গল্প; প্রত্যেকটি সুন্দর, প্রত্যেকটি অভিনব। এমন গল্প কি আর কারও লেখনী থেকে আমরা পাব? গড্ডালিকা, কজ্জলী প্রভৃতি গল্পের বই ছাড়াও, তিনি তাঁর 'চলন্তিকা' দিয়ে, মহাভারতের কথা দিয়ে, গীতার ব্যাখ্যা দিয়ে, দেশবাসীকে করে গেছেন অশেষ ঋণে ঋণী!

ডাঃ প্রাণজীবন মেটা

বোম্বাই-প্রবাসে পাই এক অকৃত্রিম গুজরাতী বন্ধু, নাম তাঁর ডাঃ প্রাণজীবন মেটা। বম্বের একজন প্রথম শ্রেণীর শল্য-চিকিৎসক, বিখ্যাত ডাক্তার, বাস করেন সহরের কেন্দ্রস্থলে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, এক অভাবনীয় পরিস্থিতিতে পরিচয়ের সূত্রপাত!

বম্বের সহরতলী কোলাবার কোণে, দেয়াল-ঘেরা সাধারণের নিষিদ্ধ স্থান অব্জারভেটরীর ভিতরে বাস করি, বাহিরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই কম। এক দিন ডাঃ মেটা কোনও 'অফিসিয়েল' কাজে এলেন এখানে। বিকেল বেলা, অবজারভেটরীর বিস্তৃত বাগানে দুই কিশোর পুত্রকে খেলায় নিযুক্ত দেখে, তাঁর গাড়ীতে উপবিষ্ট পুত্রটি চিৎকার করে ওঠে,—'ঐ-যে আমার স্কুলের বন্ধু!'এহেন পাণ্ডববর্জিত স্থানে সে যে সহপাঠীর দর্শন পাবে, তা বোধ হয় ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচরে। তার অতিরিক্ত আগ্রহে আকৃষ্ট হয়ে তার মা, বাবা, গাড়ী ছেড়ে এসে আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করে, আমাদের দেখতে চান। তার পর থেকে তাঁরা হলেন আমাদের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। গুজরাতীরা স্বভাবতঃই মিশুক প্রকৃতির, এঁদের সমস্ত পরিবারটির ভিতরেই আবার ঐ গুণটি ছিল অতিরিক্ত মাত্রায়। এমন সদাশয়, অমায়িক, বন্ধু-বৎসল পরিবার কমই দেখেছি।

সময় নেই, অসময় নেই, তাঁদের হ'ত ঘন-ঘন আগমন। ডাঃ মেটা বলতেন, সহরের গোলমালে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠলেই মনে হয় ছুটে আসি আপনাদের এই নির্জন আবাসের নিস্তব্ধতায়। অবজারভেটরীর একটি ঘরের ছাত খুলে রাত্রে টেলিস্কোপে তারা দেখে হয় সময় নিরূপিত, ডাঃ মেটার গভীর আগ্রহ সেই তারা দেখার। আসতেন গভীর নিশীথে; মনে হয়, ডাক্তারী বিদ্যা অপেক্ষা আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তাঁকে আকর্ষণ করত অনেক বেশী; কারণ, অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তিনি এসব পর্য্যবেক্ষণ করতেন ও বৈজ্ঞানিক স্বামীর সঙ্গে এসব আলোচনায় কাটাতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তখন আমরা বুঝি নি, কিন্তু এখন মনে হয়, এই থেকেই পেয়েছিলেন তাঁর আজকের অমূল্য কীর্ত্তির প্রেরণা, তাঁর হাতে গড়া 'জাম নগর সোলারিয়ামের' সূচনা।

ঘন ঘন করতেন তাঁর বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ। আধ ডজন, এক ডজন লোকের রূপার থালা বাটিতে অসংখ্য নিরামিষ ভোজ্য পরিবেশন করা এই 'প্রথম দেখি। তাঁদের থালা বাটি সাজাবার কায়দাটিও মনোহর। থালাখানা হয় খুব বড়, সেই অনুপাতে বাটিগুলো হয় অত্যন্ত ছোট। থালার মাঝখানে এক মুষ্টি ভাত ও খান দুই লুচি রেখে, চতুর্দ্দিকে সেই থালার উপরেই সাজিয়ে দেয় ছোট ছোট দশ বারোটি কি ততোধিক বাটি; বাটিগুলোর আকার অনেকটা প্রায় চন্দন-বাটির মত। তরকারী বাজারে যত রকম পাওয়া যায়, সব আলাদা আলাদা করে রান্না, প্রত্যেকটিরই স্বাদ বিভিন্ন, কোনটি ঝোলদার, কোনটি শুক, আলুর সঙ্গে পটল মিলাবার রেওয়াজ নেই, আমাদের মত সব ব্যঞ্জনে আলু দেওয়া হয় না। আলু ভিন্ন, মটরশুটি ভিন্ন, ঝিঙ্গা ভিন্ন, ফ্রেঞ্চবিন ভিন্ন, বেগুন ভিন্ন, কপি ভিন্ন, প্রতিটি সব্জী একক, কিন্তু স্বাদে অতুলনীয়। এমন কি, আমাদের খাদ্য-তালিকায় অপাংক্তেয় শুধু সজনে ডাঁটার ঝোল রন্ধন-গুণে কী চমৎকার! সমস্ত জিনিষ—দই, ক্ষীর, মিঠাই সব একসঙ্গে সাজিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু পরিমাণে এতই কম যে, প্রথম দিন মনে করি—একী খাওয়া? এ তো শুধু চাখা। তাহলে গুজরাতীদের আহারই বাঙ্গালীর তুলনায় অত্যন্ত কম! কিন্তু পরে শুনি, ঐটুকু প্রথমে শুধু নমুনা স্বরূপ দেওয়া হয়, তারপর যে যেটা চায়, পরিবেশক আবার যখন একে একে সব নিয়ে আসে, তখন চেয়ে নেয়। আমাদের মত, চেয়ে নেওয়ায় নেই ওঁদের কোন লজ্জা। এখন টেবিলে খেতে দেওয়া হলেও, ওঁদের প্রাচীন নিয়ম, একখানা পিঁড়িতে বসে, ও সামনে অন্য একখানা পিঁড়িতে থালা রেখে খাওয়ার। এঁদের বাড়ীতেই প্রথম আস্বাদন করি কুন্দলী নামক এক অতি উপাদেয় সব্জী: তারপর বাড়ীতে এসে আনিয়ে দেখি ,-ঠিক তেলাকুচো! আমাদের পাড়াগাঁয়ে লতায় প্রচুর জন্মায়, ছোট বেলায় খেলা ঘরে তার তরকারী রেঁধেছি মনে পড়ে, কিন্তু তখন মেয়েদের মুখে শুনি—এ বিষ, খেতে নেই, শুধু খেলা করতে হয়। সেই অনাদৃত, কিন্তু বোধ হয় ভিন্ন গোত্রের তেলাকুচো এমন রসনাতৃপ্তিকর ব্যঞ্জন। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকি।

খাওয়ার নিয়মও আমাদের বিপরীত, প্রথমেই মিষ্ট দ্রব্য, যথা ক্ষীর, পায়েস, লাড্ডু, পেড়া গুলো খেয়ে তবে নোন্তা জিনিষে হাত দিতে হয়। এঁদের এখানেই ধোকা-জাতীয় এক অতি স্বাদু শুষ্ক জিনিষ আস্বাদন করি, তার নাম স্মৃতি-পট থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। খাই, আর গুজরাতী রন্ধনের তারিফ করি। টক দই ও লবণ-মরিচের সংযোগে একটি পদ তৈরী হয়, যার নাম 'কড়ি',—ওঁদের খুব পছন্দ, বার বার চেয়ে নিয়ে সাদা তরল পদার্থটি চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করেন, কিন্তু আমার একটু খেয়েই কেমন গা গুলিয়ে ওঠে, কাজেই ওঁদের প্রিয় খাদ্যটি কায়দা করে সন্তর্পণে এড়িয়ে চলি।

স্কুলগামী দশ-বারো বৎসরের প্রথম পুত্রটি বড় রোগা, প্রায়ই জ্বর প্রভৃতিতে ভোগে। এখানকার অনেক ডাক্তারই পরামর্শ দেন টনসিল তুলে ফেলার। ডাঃ মেটা এতবড় নামকরা 'সার্জ্জন', তাঁর এতবড় হিতাকাঙ্খী বন্ধু, তাঁর পরামর্শ না নিয়ে কি কিছু করা যায়? গেলাম তাঁর নিকট পরামর্শ নিতে, ও সেই পরামর্শে হই হতবুদ্ধি!

তিনি বলেন, গড়ে আমি ৫।১০টা টনসিল অপারেশন রোজই করি। কিন্তু এতে নেই আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস! ভগবান শরীরের ভিতরে কোন ক্ষুদ্রতম অংশই বিনা প্রয়োজনে দেননি, আর টন্‌সিল ত মানুষের পরম উপকারী বন্ধু! একে হট করে, একটা অনুমানের উপর নির্ভর করে ফেলে দেওয়া কি উচিত? কখনোই না, আমার পরামর্শ চাইলে আমি বলব, তোমরা কিছুতেই পুত্রের টনসিল ফেলে দিও না। তবে যদি পেকে, পুঁজ হয়ে 'সেপটিক' হয়ে যায়, তবে সে ভিন্ন কথা, তখন ডাক্তার চিন্তা করবে কি করা উচিত। সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হবে মনে করে টন্‌সিল কেটে ফেলা মস্ত ভুল! তাঁর পরামর্শে আমরা আর ওপথ মাড়াই নি, ও মনে হয়, বোধ হয় ভালই করেছিলাম।

ছুটির দিনে, কাজ পাগলা, কুণো স্বামীটিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতেন সহরের বাহিরে নানা মনোরম স্থানে, 'পিকনিকে'। তাঁর দৌলতে দেখা হয় বম্বের আশে পাশের অনেক স্থান। তাঁর তরুণী কন্যা সাবিত্রী, কিশোর পুত্র বসন্ত, তাঁর স্ত্রী, সকলেই যেন আমাদের আত্মীয়-বান্ধবশূন্য-স্থানে, স্থান গ্রহণ করেছিলেন পরমাত্মীয়ের।

অতবড় ডাক্তারের স্ত্রী কিন্তু ছিলেন বড়ই রুগ্না। ডাঃ মেটার এলোপ্যাথিক ওষুধগুলোতে বেশী বিশ্বাস ছিল বলে মনে হয় না। স্ত্রীর শিরঃপীড়া, চোখ লাল হওয়া, অক্ষুধা, অজীর্ণতা প্রভৃতি ক্রণিক রোগের বলতেন আধুনিক এলোপ্যাথীতে কোন ঔষধ নেই। বরঞ্চ তিনি ছিলেন ভারতীয় প্রাচীন প্রথায় কবিরাজী প্রভৃতিতে সমধিক বিশ্বাসী। হঠাৎ একদিন শুনি—তাঁর স্ত্রী আরম্ভ করেছেন, ১০।১২ দিন ব্যাপী দীর্ঘ উপবাস। ওঁরা ছিলেন জৈন-ধর্মাবলম্বী। এ রকম উপবাস তাঁদের শাস্ত্র-সম্মত; তাঁদের বিশ্বাস—এ উপবাসে

হয় যেমন অখণ্ড পুণ্য, তেমনি দেহের পক্ষেও কম উপকারী নয়। টেলিফোন যোগে ডাঃ মেটা অনুরোধ জানালেন, 'বিকেলে যেতেই হবে'।

সেদিন বোধ হয় উপবাসের দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন। মিসেস্ মেটা শয্যা-শায়িনী, কপালময় চন্দনের প্রলেপ, একজন পণ্ডিত গীতা শোনাচ্ছেন। বাড়ী আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ, আর দেখি ঘরের এক পাশে এক বোঝা নূতন চক্চকে পিতলের বাসন। যিনিই তাঁর খবর নিতে আসছেন, তিনিই পাচ্ছেন কিছু পিতলের বাসন। থালা, বাটি, ঘটি, অথবা গ্লাস। তিনি নিজে শুধু জলপান করে দিন কাটাচ্ছেন। মনে হল, নিজে আহার বন্ধ করেছেন বলেই কি এই আহার-স্থালীর বিতরণ?

শুনি, অনেক সৌভাগ্যবতী না হলে এ উপবাসে কেহ সক্ষম হন না, এ যেমন ব্যয়-সাধ্য, তেমনি কষ্ট-সাধ্য। মিসেস্ মেটার কণ্ঠস্বর হয়ে এসেছে ক্ষীণ, কষ্টে দুচারটি কথা বলছেন, একেই শীর্ণা, আরও দুদিনের উপবাসেই যেন বিছানায় মিশে গেছেন, দেখে দুঃখ হয়!

আমরাও পাই কয়েক খানা বাসন, তা নিয়ে বেরুবার মুখে স্বামী ডাঃ মেটাকে জিজ্ঞাসা করেন,—আপনি এত বড় ডাক্তার হয়ে কেন একটা এমন কাজে সম্মত হলেন? দুদিনেই মিসেস্ মেটার যা অবস্থা হয়েছে, শেষপর্য্যন্ত টিঁকে থাকবেন কিনা কে জানে?

দৃঢ় বিশ্বাসে ডাঃ মেটা বললেন,—দেখবেন, কিছু হবে না। আমাদের দেশে কত কত লোক এরকম ব্রত-উপবাস করে বেশ ভালভাবেই বেঁচে থাকে, কখনোই শোনা যায়নি এতে কারু প্রাণের হানি হয়েছে। হয়ত এতে ওর স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য ভাল হয়ে যাবে। আপনারা কিন্তু এ কয়দিন রোজই একবার করে আসবেন, কারণ, আপনাদের দেখলে ও হয় আনন্দিত।

রোজই সন্ধ্যায় একবার যাই মিসেস্ মেটাকে দেখতে, রোজই থালা গ্লাস নিয়ে আসি দুঃখিত মনে। ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে তাঁর কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে এলো। আমরা ভয়ে মরি,—এমন সময় হয় কমলালেবুর রস খেয়ে ব্রত ভঙ্গ! এতেই আমাদের মনে করিয়ে দেয় মহাত্মা গান্ধীর উপবাস-ব্রতর কথা, সেই ক্ষীণজীবী মানুষটি ত আরও দীর্ঘ, ২০।২২।৪০ দিন পর্য্যন্ত এক একবার শুধু জল পান করে কাটিয়েছেন! ধন্য এঁদের মনের জোর! ধন্য এঁদের তপশ্চর্য্যার ক্ষমতা!

এরপর মিসেস্ মেটা গায়ে একটু বল পেলে করেন এক বিরাট উৎসব। নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে দেখি, পরিণত বয়সে তাঁদের যেন আবার দ্বিতীয় বিবাহোৎসব। পাশাপাশি দুখানা চিত্রিত পিঁড়িতে স্বামী স্ত্রী দুজনে, বেনারসি মহার্ঘ্য বসনাবৃত হয়ে আছেন, পুরোহিত দুজনের হাত একত্র করে মন্ত্র বলে যাচ্ছেন। অগণিত নিমন্ত্রিতরা আসর আলো করে চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট। সকলের সম্মুখেই পুরোহিতের কাজ চুকে যাওয়ার পর তাঁরা উঠে এলেন, ও অভ্যাগতরা সকলে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। তারপর ভূরি ভোজন মধুরেণ সমাপয়েৎ—থুড়ি, গুজরাতী প্রথায় মধুরেণ প্রারম্ভ!

অনেক দিনের অদর্শন, আমরা বহুদিনের আবাস বম্বে ত্যাগ করে চলে আসি পুণা, হঠাৎ জামনগর থেকে ডাঃ মেটার পাই এক চিঠি। তিনি বম্বের বিরাট প্র্যাক্‌টিস ও কাজ ছেড়ে চলে যান জামনগর; অবশ্য এসম্বন্ধে অনেক কল্পনা ও আলোচনা চলেছে আমাদের সঙ্গে বম্বে বাসকালে।

জামনগরের রাজার বদান্যতায় তিনি তাঁর কল্পিত এক সোলারিয়াম তৈরী করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—সূর্য্য প্রয়োগ-কৌশল জানা থাকলে সূর্য্যের আলোতে মানবদেহের অনেক রোগ সারানো যায়। সেই মতের বশীভূত হয়ে তিনি এমন একটি বাড়ী তৈরী করিয়েছেন, যাকে ইচ্ছামত ঘোরানো ফেরানো যায়; সূর্য্যের রশ্মিকেও ইচ্ছামত ভাগ করে ফেলা যায়। যে রোগীর যেরূপ যে পরিমাণ সূর্য্য-কিরণ প্রয়োজন, তাকে তা দিয়ে তিনি নাকি ফল পেয়েছেন অদ্ভুত! আমাদের একবার গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে শুনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে জানিয়েছেন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ!

আমার খুব আগ্রহ ছিল জানবার যে তাঁর স্ত্রীর ঐ উপবাসের ফলে কি কাজ হয়। তারও উত্তর ঐ চিঠিতেই ছিল, তাঁর স্ত্রী ভালই আছেন, আগের চেয়ে অনেক ভাল, প্রাচীন উপসর্গগুলো দেহ থেকে একেবারেই নিয়েছে বিদায়।

আমাদের কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও আর হলোনা জামনগর যাওয়া, অথবা অভিনব চিকিৎসার ফল দেখে শুনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করা!

দিলীপকুমার রায়

বম্বে-বাসের গোড়ার দিক্‌কার—প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখনকার দিনে বিলেত যাওয়া-আসার পথের শেষ মাতৃভূমি ছিল বম্বে। এখান থেকেই ছাড়ত বড় বড় নানা কোম্পানীর জাহাজগুলি। বম্বে-বন্দরের 'ব্যালার্ড-পীয়ার' ছিল সুদূরের যাত্রীদের শেষ-পায়ের নীচে অতি প্রিয় ভারত-ভূমি। বেশীর ভাগ বাঙ্গালী যাত্রীরাই কলকাতা থেকে ট্রেণে দুদিনের পথ বম্বে এসে, কয়েকটা দিন বিশ্রাম করে তবে উঠতেন জাহাজে,—অথবা ফেরার পথেও জাহাজ থেকে নেমে দু'চার দিন থেকে যেতেন এখানে। বম্বে বিলেতের প্রবেশ ও নির্গমনের দ্বার হওয়ায় এবং আমরা বহুকাল বম্বে-বাসী হওয়ায়, পরিচিত-অপরিচিত বহু বিদগ্ধ বাঙ্গালীর সাহচর্য্য পেয়েছি এখানে, পূর্ব্বোক্ত রূপে।

শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় মহাশয়ও এভাবেই একবার অভাবনীয়ভাবে এসে পড়েন আমাদের বাড়ীতে। সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত তরুণ যুবক, কী সুন্দর চেহারাই যে তাঁর দেখেছি তখন, তা বলা যায় না। সদালাপী, হাসি-খুসী, সদানন্দ মানুষটিকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হই। তার উপরে তিনি আবার ছিলেন বিত্তের জাহাজ, গানের কল্পতরু। শিশুকাল থেকেই ছিলাম গানের ভক্ত, কিন্তু বম্বে আসার পর থেকে আর বাংলা গান শোনা ভাগ্যে জুটত না,—এক রেকর্ড ছাড়া; রেকর্ড বলতে তখনকার দিনের কে, মল্লিক অথবা মানদা সুন্দরীর রেকর্ডেই হতে হত পরিতৃপ্ত; তাও আবার কলকাতা থেকে আনানো ছিল এক বিষম ব্যাপার! আজকের দিনের রেডিও ছিল সেদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কল্পনাতীত এক অলীক স্বপ্ন!

মাননীয় অতিথি বাড়ীতে,—কতদূরে বাজার, আবার সে বাজারেও পাওয়া যায় না আমাদের পছন্দ মত মাছ তরকারী—কী দিই অতিথির পাতে? সযত্নে ছানার ডালনা, পিঠে-পায়েস রেঁধে পরিবেশন করি; তিনি খেতে খেতে বলেন,—আমার একটি দিদি আছেন, আপনিও সেই দিদিটির মত খাওয়াতে বড্ড ভালোবাসেন।

একদিন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে ডাকি, উদ্দেশ্য চা-পান, জলপান, তার সঙ্গে দিলীপ বাবুর সঙ্গীত-সুধা পান। গানের আসর জমে উঠেছে, সুরেলা উচ্চ মধুর কণ্ঠ, সুরের ওঠা-নামায় বৈচিত্র্যপূর্ণ ঢংএর গায়কী; সেই প্রথম শুনি, নজরুলের—

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়কো মোয়া।'

গান শুনে যেন রক্ত গরম হয়ে ওঠে, গানের কথায় যেমন শক্তি, গায়কের কণ্ঠেও তাই। শুনি তাঁর বাবার লেখা অবিস্মরণীয় দেশাত্মবোধক গান—'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার' প্রভৃতি। কী দরদভরা গান তাঁর, শ্রোতাদের মুগ্ধ করে, স্তব্ধ করে রাখেন,—তন্ময় হয়ে গাইতে গাইতে নিজেও করেন অশ্রু-বর্ষণ! তখনকার দিনে তাঁর মুখে মীরার ভজন শুনিনি, যা পরে তাঁর মুখে খুব বেশী শোনা যায়! গানের আসরে পাঁচ বছরের দ্বিতীয় পুত্র করে এক মজার ব্যাপার!

এদিকে হচ্ছে গান, ওদিকে বছর পাঁচেকের ছোট ছেলেটি চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করে ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বড় এক বন্ধু-কন্যার সঙ্গে। বলছে,—জান দিদি, এই লোকটার কোন কাজ নেই; না পড়ে, না আপিসে যায়, সারাদিনই কেবল গান করে। দিলীপ বাবু দূর থেকে বলেন,—কী বলছ খোকা, কথা বেলো না, চুপ করে গান শোনো। কথার ঝুড়ি ছেলেটি চুপ করে থাকার পাত্রই নয়, গম্ভীর ভাবে বলে,—'আমি সব জানি।'

দিলীপ বাবু,-'এ্যাঁ, কী জান তুমি? তুমি কিছু জান না।' বাক্য-বিশারদ শিশু গম্ভীর ভাবে বলে,—জানিইত,-জানি না? যাও তুমি আপিসে? কর তুমি আপিসের কাজ? কর তুমি পড়াশুনা? সারাদিন কেবলি গান গাও, পড়ানেই কিছু নেই, কেবল গান! তাই ত দিদিকে বলছিলাম।' তার সেই ভারিক্কি চালে বিজ্ঞের মত কথা বলার ঢং দেখে সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

আপিসের আওতায় মানুষ হয়ে, জন্ম থেকে সকলকে কেবল আফিসের কাজ করতে দেখে ওরা ভাবত, মানুষ হয়ে জন্মালেই তাকে কেবল পড়াশোনা আর আপিসের কাজ করতে হবে! শিশুদের মনোভাব, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বিচিত্র!

পরে আরও অনেকবার আসেন দিলীপবাবু,—একবার এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন, বম্বের সঙ্গীত-জগতের বিশারদ ভাতখণ্ডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। তিনি ভাতখণ্ডের অনেক প্রশংসা করতেন।

অনেক পরে তাঁর মুখে শুনেছি মীরার ভজন,—তাঁর নিজস্ব বাংলা অনুবাদ, স্তোত্র প্রভৃতি গম্ভীর ভক্তি-দ্যোতক গান; শুনেছি, শুনে মুগ্ধ হয়েছি, অভিভূত হয়েছি! শত-বর্ষ পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকুন আমার গুণী ভাইটি!

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'

প্রাচীন দিল্লীর মধ্যে যে স্থানের নাম ইন্দ্রাপৎ (ইন্দ্রপ্রস্থ) তাহার অনতিদূরে একটি সভামণ্ডপের মধ্যভাগে পৃথিরাওয়ের আয়সস্তম্ভ নিখাত ছিল। পূর্ব্বে পৃথিরাওয়ের প্রার্থনাক্রমে যজ্ঞবিদ্ ব্রাহ্মণেরা ঐ শুভ স্তম্ভ নিখাত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা বাসুকির শিরোদেশ স্পর্শ করিল—ইহার উপর যে সিংহাসন অধিষ্ঠিত হইবে, তাহা চিরকাল অচল থাকিবে। আজি আর সেই স্তম্ভ দৃষ্ট হইতেছে না, ভূমি-মধ্যে আরও বসিয়া গিয়াছে, এবং তদুপরি একটি অত্যুচ্চ দিব্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। সভামণ্ডপের যে অকালজীর্ণ প্রাচীর ছিল তাহাও আর সেরূপ নাই, সমস্ত নবীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজা, নবাব, সুবাদার প্রভৃতি সকলে ঐ সভামণ্ডপে আপনাপন যোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সভার কি শোভা! রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের ময়দানব-বিনির্ম্মিত সভাগৃহ ইন্দ্রের সভা অপেক্ষাও উজ্জ্বল এবং মনোহর বলিয়া বর্ণিত। এই স্থানেই সেই সভাগৃহ ছিল—তাহাই কি এত দিন কাল-তরঙ্গে মগ্ন থাকিয়া পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠিয়াছে! সভামণ্ডপের মধ্যভাগে যে সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে, তাহার দুই দিকে দুইটি সোপান-শ্রেণী। সর্ব্বনিম্ন-সোপানে একজন গম্ভীরপ্রকৃতি মধ্য-বয়স্ক পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন—

"আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্ব্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃ-ভক্তি-পরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন।

"ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাঁদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহাঁর পালিত সন্তান।

"এক মাতারই একটী গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়—সকলের শাস্ত্রমতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষনিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়। আর আমাদিগের মধ্যে কি পূর্ব্বের মত বিবাদ চলিবে? আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপনাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত এবং অপরের উদর পূরণ করিব? (এই পর্য্যন্ত বলা হইলেই সভা হইতে "না না"—"না না"—"না না"—এই ধ্বনি উঠিল) কি অমৃতধারাই আমার কর্ণে বর্ষণ হইল—! আমার কর্ণে?—আমি কে?—ভারতভূমির কর্ণে—ঐ মৃত্যু-সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রবেশ করিল। দেখ—তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইল,—মুখমণ্ডলে হাস্যপ্রভা দেখা দিল—তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিলেন—এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাময়ী হইলেন।

"এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সকলের কর্ত্তা একজন না থাকিলেও সম্মিলন হয় না। কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের সকলের অধিনায়ক হইবেন, দৈবানুকুলতায় এ বিষয়েও আর বিচার করিবার স্থল নাই। রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের নিমিত্ত এই যে সিংহাসন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিমূল পৃথিবী ভেদ করিয়া বাসুকির শীর্ষদেশ সংলগ্ন হইয়াছে, পৃথিবী টলিলেও আর ইহা টলিবে না—আর ঐ দেখ, মহামতি সাহ আলম বাদশাহ স্বেচ্ছাতঃ রাজা রামচন্দ্রকে আপন শিরোভূষণ মুকুট প্রদান করিয়া তাঁহার হস্তে সাম্রাজ্য পালনের ভার সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন।"

—ভূদেব মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যে যৌনতা

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বিশ শতকের সাহিত্যে যৌনতার স্থান মুখ্য এবং সাহিত্য-রসের স্থান গৌণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

আজ থেকে বহু, বহুদিন পূর্বে রচিত রামায়ণ, মহাভারত এবং তৎপরবর্তী বহু সংস্কৃত সাহিত্যে যৌনতার অজস্র চিত্রের ছড়াছড়ি। রামায়ণে লক্ষ্মণ ও উর্মিলার যৌন সঙ্গমের চিত্র বর্ণনা :

'সঙ্গম রসেতে মত্ত উর্মিলা-লক্ষ্মণ,
কত ছন্দে ক্রিয়া করে না যায় বর্ণন।
দ্বাদশ বর্ষ লক্ষ্মণ, উর্মিলা দ্বাদশী,
বক্ষ ভরি শোভে স্তন, যেন পূর্ণ শশী।'...

মহাভারতে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাস, ঘটকর্পর, অশ্বঘোষ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি আরও বহু কবির রচনায় এই বিষয়টি কোন কোন ক্ষেত্রে সাহিত্য রচনায় প্রধান হয়ে উঠেছে। নারীর স্তন বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাস লিখেছেন—

কিবা অপূর্ব বহ্নি নারীর ঘন কুচমণ্ডলে।
বক্ষে লগ্ন করিলে শীতল, দূর হতে প্রাণ জ্বলে।

মিলনান্তে নারীর রূপ-বর্ণনা করে ঘটকর্পর লিখেছেন—

বহে ঘন শ্বাস, আলুথালু বাস, নিমীলিত কেন আঁখি?
সুরতের পালা শেষ, প্রণয়ের চুম্বন আছে বাকী।

কবি শ্রীহর্ষ অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে যৌন চিত্র এঁকেছেন—

আসি সঙ্কেত কুঞ্জে নায়িকা শঙ্কা-আকুল অন্তরে,
প্রণয় বিষাদ দৃষ্টিতে নারে হেরিতে আপন কান্তরে।
রসাবেশে পয়োধর না ছোঁয়ায় কণ্ঠ আলিঙ্গনচ্ছলে,
সোহাগে বাঁধিয়া রাখিলেও তারে বারে 'যাই যাই' বলে।
ভঙ্গ হলেও রস বিপরীত, এ আচরণে এ আতঙ্কে,
তবু তাদের বাধা পেয়ে রতি দুর্দম করে অনঙ্গে।

পুরাতন সুসভ্য দেশসমূহে যখন কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে অত্যাবশ্যক যৌন চিন্তার চর্চা বেড়ে গেল, তখন বাঙলা সাহিত্যে যৌন চিন্তার চর্চায় ভাঁটা পড়লো। এই সময় বিভিন্ন যৌন সাহিত্যের রূপান্তর ঘটল তুকতাক্‌, ফুঁক-ফাঁক, বশীকরণ, বাজীকরণ প্রভৃতি মুখ্যতাপূর্ণ রতিশাস্ত্রে!

এই প্রবন্ধে অত্যাধুনিক সাহিত্যে যৌনতার গতি-প্রকৃতি আলোচনা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে দেশে বিদেশে কোন কোন কবি বা ঔপন্যাসিকের রচনায় যৌন আকর্ষণ প্রধান হয়ে উঠেছে। পাশবিক ভয়াবহতার নির্মম ইঙ্গিত, নগ্ন বীভৎসতা, মাতৃত্বের প্রভাবে যৌন লালসার অবদমনের নগ্ন চিত্র অজস্র। ইংরাজী সাহিত্যে ফ্রয়েড, ওয়েষ্টার, মার্ক, অগাষ্ট ফোরেল, নর্মান হেয়ার, ডি-এইচ লরেন্স প্রভৃতিরা, মার্কিন সাহিত্যে নবকভ, ফরাসী সাহিত্যে জুলে রোঁসা, এমিল জোলা, মোপাসাঁ প্রভৃতি সাহিত্যে যৌনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত যৌনতার গণ্ডী পরিমিত ছিল, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায়, 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে, ল্যাবরেটরী ছোট গল্পে যৌনতার আভাস—এ দিক দিয়ে শুধু মাত্র 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে 'দিবাকর-কিরণময়ী' আখ্যানটি ছাড়া আর কোথাও শরচন্দ্র যৌনতার বাড়াবাড়ি দেখান নি।

বাঙলা সাহিত্যে যৌনতার বাড়াবাড়ির কথা আগে বলা হয়েছে। এখানে আরও একটি কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, কী উপন্যাসে, কী কবিতায়, কী ছোটগল্পে—সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখায় আজকাল সাহিত্য-রসের নাম দিয়ে, বাস্তবতার নাম দিয়ে—পাঠক-পাঠিকার যৌন-চেতনায় সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। এ দিক দিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বতন্ত্র ভাবে দেখা উচিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাস এবং ছোট গল্পে পাশব প্রবৃত্তির বিস্তৃত চিত্র দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বর্ণনার আন্তরিকতায় তা নগ্ন বলে মনে হয় না। এই জাতীয় লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কঠোর বাস্তবতার যে সব ছবি তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে যৌন-অশ্লীলতার ছায়া পাই, স্পর্শ অনুভূত হয় না। নারীর রূপের মধ্যে সোপেনহাওয়ার দেখেছিলেন ভীমা ভয়ঙ্করীকে, মানুষের সত্তার অপমৃত্যু দেখেছিলেন তার যৌন-বাসনার মধ্যে।

মোতিলাল সোপেনহাওয়ারকে অস্বীকার করে বললেন—

'যত ব্যথা পাই, তত গান গাই—গাঁথি যে সুরের মালা।
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল কাজলের জ্বালা।
আঁখি অনিমিখ, মেটেনা পিপাসা, এ দেহ দহিতে চাই।'—

ফরাসী সাহিত্যিক এমিল জোলার ন্যাচারালিজম্‌ এবং ইংরাজ সাহিত্যিক ডি, এইচ, লরেন্সের দেহ-দর্শন একাকার হয়ে গেছে। এমিল জোলার 'Nana' অথবা Germial'-এর সঙ্গে লরেন্সের লেডি চ্যাটারলিং সংস্কার মুক্তি, সীমান্তের পাঠান সৈন্যের বলিষ্ঠ পৌরুষের কাছে ইংরেজ কন্যার মুগ্ধ দেহদান অথবা বস্তি কিংবা ভিখারি-জীবনের আদিম লালসা—সবই তার কাছে সাহিত্যের রসায়ন হয়ে উঠেছে। একটি ক্ষেত্রে জোলার সঙ্গে আরভিং ষ্টোনের বৈপরীত্য আছে, তা হল বর্ণনার চাতুরী। জোলার ভাষা রুক্ষ, আরভিং স্টোনের মধুর। আরভিং ষ্টোনের 'Lust for life' উপন্যাসে বহুবিধ যৌনতার বর্ণনা আছে এবং মার্কিন লেখক নবকভের 'ললিটা' উপন্যাসে একটি কিশোরীর যে বিচিত্র যৌনাকাঙ্খা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা পড়লে বিস্মিত হতে হয়। উপন্যাসের নায়ক, বারো বছরের মেয়ে ললিতাকে সজ্ঞানে পাশবিক অত্যাচার করবে না ভেবে তাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ায়—কিন্তু ওষুধে কাজ হয় না; কিন্তু বারো বছরের মেয়েটি ব্যাপার বুঝতে পেরে নিজেই নায়ককে রতিক্রিয়ায় আহ্বান করে।

—'It was she who seduced me!'

অত্যাধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যৌনতার প্রাবল্য যে কী পরিমাণে দেখা দিয়েছে, কয়েকটি গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

যেমন জবানবন্দী, উপনায়িকা, মরুতীর্থ হিংলাজ, অন্তি ভাগরথী তীরে, জীবন-পিয়াসা প্রভৃতি বইগুলি পাঠেই জানা যাবে।

সাহিত্য-পাঠকের রুচিবোধের পরিবর্তনের ফল এবং ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্রমাগ্রসরতার জন্যেই যে সাহিত্য ক্রমশ উগ্র যৌনতার আরক মেশাবার চেষ্টায় লেখকরা উদ্যোগী হয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফলে অত্যাধুনিক সাহিত্য শিল্পের প্রকৃত সংজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্রমশঃই কেবলমাত্র জনমনের জৈবিক দাবী পূরণের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠছে।

ভারতীয় মহাকাব্যে নারীসমাজ

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

(২)

নারদের প্রশ্নের উত্তরে পুংশ্চলী (বারবনিতা) পঞ্চচূড়া বললেন—"দেবর্ষি, নারীদের এই দোষ যে, তারা সদ্‌বংশীয়া, রূপবতী ও সধবা হলেও সদাচার লঙ্ঘন করে। তাদের চেয়ে পাপিষ্ঠ কেউ নেই, তারা সকল দোষের মূল। ধনবান, রূপবান ও বশীভূত পতির জন্য তারা প্রতীক্ষা করতে পারে না। যে পুরুষ কাছে গিয়ে কিঞ্চিৎ চাটুবাক্য বলে, তাকেই কামনা করে। উপযাচক পুরুষের অভাবে এবং পরিজনদের ভয়েই নারীরা পতির বশে থাকে। তাদের অগম্য কেউ নেই, পুরুষের রূপ বা বয়স তারা বিচার করে না। রূপযৌবনবতী সুবেশা স্বৈরিণীকে দেখলে কুলস্ত্রীরাও সেইরূপ হতে ইচ্ছা করে। পুরুষ না পেলে তারা পরস্পরের সাহায্যে কামনা পূরণ করে। সুরূপ পুরুষ দেখলে তাদের ইন্দ্রিয়-বিকার হয়। যম, পবন, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধারা, বিষ, সর্প ও অগ্নি—এই সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান।"

অনুশাসন পর্বে নারীজাতির প্রতি এই প্রকার কটূক্তি করা হয়েছে—কিন্তু বিক্রান্তযুগের স্মৃতিবহ বীরকাহিনীগুলোতে স্ত্রীজাতির যে পরিচয় পাওয়া যাবে, সে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। বস্তুত: এই প্রকারের অসঙ্গতি মহাভারতের সর্বত্রই পাওয়া যাবে। এই অসঙ্গতির কারণ যে কি—সেটা পূর্ববর্তী আলোচনায় পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মহাভারতের সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে হপকিন্স বলেছেন—"To the H indu father daughter is not a blessing * * * woman to a Hindu is a creature of secondary impoitance—" মনে হয়, এই মন্তব্য অসাবধানতা-প্রসূত। মানব-সভ্যতার উন্মেষের প্রথমদিকে যখন কৃষি ছিল জীবিকা আর যুদ্ধ ছিল অন্যতম অবশ্যকর্ম, সেদিন কন্যা অপেক্ষা পুত্রই ছিল অধিক কাম্য। তাই হিন্দুসমাজে অন্য সমস্ত সমাজের মত পুত্র ছিল পরিবার ও গোষ্ঠীর পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয়, সুতরাং কাম্য। ঋক বেদে, অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে এবং মহাভারতে সর্বত্রই পুত্রকামনা ব্যক্ত করা হয়েছে। পুত্র কাম্য হলেও, কন্যা অনাদরণীয় নয়—অন্তত ঋক সংহিতা বা ভারত ও অন্যান্য বীরকাহিনীতে এর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। ঋকবেদ ও মহাভারতে এমন কতকগুলো সূত্র পাওয়া যায়, যা শেষ অবধি নরনারীর যৌন সম্পর্কের অস্থিরতাই প্রকাশ করে। পূর্ববর্তী আলোচনায় এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। নারীর বহু বিবাহের উদাহরণ ভারত কাহিনীতে একটিই আছে; কিন্তু এই প্রথা সম্ভবত অল্প কিছুদিন পূর্বেও প্রচলিত ছিল। দ্রৌপদীর বিবাহের পূর্বে বিতর্ক উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির নারীর বহু বিবাহের দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন—পুরাণে শুনেছি, গৌতমবংশীয় জটিলা সাতজন ঋষির পত্নী ছিলেন; মুনিকন্যা বার্ক্ষীর ছিল দশপতি। অনুশাসন পর্বে কথিত সুদর্শন-ওঘবতীর উপাখ্যানও নারীর বহুভোগ্য হবার উদাহরণ। আদি-পর্বের সম্ভব পর্বাধ্যায়ের শ্বেতকেতুর কাহিনী সমাজে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক নির্দ্ধারণের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। শ্বেতকেতু একদিন দেখলেন তাঁর পিতার সমক্ষেই এক ব্রাহ্মণ তাঁর মাতার হাত ধরে নিয়ে চলে গেল। শ্বেতকেতু প্রশ্ন করলে তাঁর পিতা উদ্দালক বললেন—"তুমি রোষ প্রকাশ কারো না; সনাতন ধর্মানুসারে সকল স্ত্রীলোকই গাভীর তুল্য।" শ্বেতকেতু বিধান স্থাপনা করে বললেন—"আজ থেকে যে নারী পরপুরুষগামিনী হবে, যে পুরুষ পতিব্রতা পত্নীকে ত্যাগ করে অন্য নারী সংসর্গ করবে এবং যে নারী পতির আজ্ঞা পেয়েও ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে আপত্তি প্রকাশ করবে, তাদের সকলেরই ভ্রূণহত্যার পাপ হবে।" এই মুনিপুত্র শ্বেতকেতু সেযুগের একজন সমাজসংস্কারক এবং মহান বিপ্লবী, তিনি নারীর বহু বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিলেও, পতির আজ্ঞায় পুত্র উৎপাদনে আপত্তি করেন নি। বংশরক্ষার জন্য স্বামীর অনুমতিতে বা স্বামীর অনুপস্থিতিতে গুরুজনদের অনুমতিতে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন মহাভারতে অনিন্দিত ভাবে গৃহীত হয়েছে। মূল ভারত-কাহিনীতে বা অন্যান্য সমগোত্রীয় বীর-কাহিনীতে একমাত্র দ্রৌপদী ছাড়া নারীর বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত আর নেই। ঘটনা স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এমনতর অনুমান করতে পারি যে, নারীর বহুবিবাহ-প্রথা তখন প্রায় বিলুপ্ত হবার মুখেই—অর্থাৎ শ্বেতকেতু প্রবর্তিত সমাজ-বিপ্লব তখন রূপ গ্রহণ করছে ধীরে ধীরে। ঋক্‌বেদের অজাচার—মহাভারতের বহুভোগ্যা নারী—ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন—শ্বেতকেতুর সমাজবিপ্লব—এগুলো হ'ল সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন এবং ক্রমায়ত স্তরবিন্যাস। ঋক্‌বেদ এবং মহাভারতের সাহায্যে আমরা এ সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করে নিতে পারি।

বিক্রান্তযুগের নারী অপরের অপেক্ষা নিজের ইচ্ছার অধীনই ছিল বেশী। ঋক্‌বেদের নারী, ভারত-কাহিনীর নারী ও অন্যান্য বীর-কাহিনীর নারী—এরা কেউই বদ্ধ জীব নয়—এমনকি, এ-যুগের নারী-স্বাধীনতা বর্তমান যুগের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। ঋক্‌বেদে

ঋণ-শোধ

(ব্যঙ্গ-রেখাচিত্র)

—রেবতীভূষণ ঘোষ অঙ্কিত

দেখা যায়—কন্যা অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে বাস করত—এদের বলা হ'ত অমাজুর। কন্যা পুত্রের মত কাম্য না হলেও, তাকে অশিক্ষিত রাখা হত না, পিতা তার শিক্ষার ভার বহন করতেন। ঋকবেদের রাজকুমারী ঘোষা, লোপামুদ্রা, অপলা, বিশ্ববারা, সূর্যা, ইন্দ্রাণী ছিলেন ঋষি, বিশ্ববারা স্বয়ং কবিতা রচনা করেছেন এবং যজ্ঞক্ষেত্রে ঋত্বিজের কর্ম নির্বাহ করেছিলেন। আবার বিশপলা মুদ্‌গলানী বা ইন্দ্রসেনা যোদ্ধা হিসাবে ঋকবেদে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ থেকেই প্রমাণ হবে ঋক্‌ যুগে মানসিক ও দৈহিক কোন শিক্ষা থেকেই নারীকে বঞ্চিত করা হ'ত না। বিক্রান্তযুগের কোন নারীই যে অশিক্ষিতা ছিলেন না, একথা নিরাপদেই অনুমান করা চলে। তাঁদের অনেকের ওপর আরোপিত বক্তৃতাবলী ছেড়ে দিলেও, তাঁদের কার্য ও ব্যবহার তাঁদের শিক্ষার পরিচয়ই বহন করে। দ্রৌপদী মহাভারতের এক অসামান্য চরিত্র। স্মরণীয়া পঞ্চকন্যাদের অন্যতমা এই অসামান্যা নারী সম্বন্ধে রাজশেখর বসু মহাশয় সত্যই বলেছেন—প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অন্য কোন নারী তাঁর তুল্য জীবন্তরূপে চিত্রিত হয়নি। এই অসহিষ্ণু, স্পষ্টবাদিনী তেজস্বিনী নারী বিপদকালে স্বপ্রকাশ করতে পশ্চাৎপদ নন। তাঁর এই চরিত্র-চিত্রণের উপাদান নিশ্চয়ই মূল কাহিনীতে নিবদ্ধ ছিল—পরবর্তী কবিরা তাঁর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো অবলম্বনই করেছেন, অতিক্রম করেননি। মূল কাহিনীর প্রতি এই আনুগত্য মহাভারতের আন্তরিক বলিষ্ঠতার লক্ষণ। দ্রৌপদীর তেজস্বিতা তাঁর স্বামীদের বহু ক্ষেত্রেই সক্রিয় করে তুলেছে। দ্রৌপদীর শিক্ষালাভ প্রসঙ্গে হপকিন্স বলেছেন—Drupada must have beeo an unusually affectionate father, কারণ তিনি দ্রৌপদীর শিক্ষালাভের সহায়ক ছিলেন। কিন্তু এই মন্তব্য অবাঞ্ছিত। শকুন্তলা, দেবযানী, দময়ন্তী, সাবিত্রী—এঁরা কেউই অশিক্ষিতের মত ব্যবহার করেননি। সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি কন্যার ওপরে তার পতি নির্বাচনের ভার অর্পণ করেছিলেন। বহুদর্শী এই নরপতি নিশ্চয়ই কোন অশিক্ষিতা কন্যার ওপরে তার পতি নির্বাচনের ভার ছেড়ে দেননি। দময়ন্তী নিজে শিক্ষিতা না হলে নলের মত একজন বিদগ্ধ নৃপতির প্রণয় দূর থেকে আকর্ষণ করতে পারতেন না। দেবযানী, শকুন্তলা—এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের স্বামীকে নিজেরাই নির্বাচিত করেছিলেন এবং তাঁদের নির্বাচনে তাঁদের পিতারা কেউই বাধা দেননি। কন্যার বিচার এবং বিবেচনার ওপর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল বলেই কন্যার নির্বাচনকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। কন্যাকে শিক্ষিত এবং সংসারের উপযোগী করে গড়ে তোলা প্রত্যেক পিতারই সম্ভবত অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এতগুলো তেজস্বিনী বাক্‌নিপুণা এবং বুদ্ধিমতী নারীচরিত্র মহাভারতে পাওয়া যায়। হপকিন্স নিজেও একবার অংশত: স্বীকার করে বলেছেন—perhaps her education was not wholly ignored. শুধু বিদ্যা চর্চাই নয়, শরীর এবং সমর-চর্চাতেও অনেকে অগ্রণী ছিলেন। যাদব যুদ্ধের সময় অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন। সুভদ্রা, আর চিত্রাঙ্গদা শস্ত্রনিপুণা; উপরন্তু স্ত্রী-শাসিত রাজ্যের ইঙ্গিতও মহাভারতে পাওয়া যায়। তিনজন মাতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়া। গান্ধারীর বিবেচনা ও জ্ঞানের ওপর ধৃতরাষ্ট্রের শ্রদ্ধা এতদূর ছিল যে, দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য তিনি গান্ধারীকে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করেছিলেন। গান্ধারী সামান্যা স্ত্রীলোকের মত অর্থলোভে বশীভূতা নন। দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করাই ছিল তাঁর ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য। চরিত্রের দৃঢ়তায়, বোধ এবং বুদ্ধির গভীরতায়, ধৃতরাষ্ট্র থেকে তিনি অনেক উঁচে। কুন্তী এবং বিদুলা পুত্রদের যুদ্ধে উত্তেজিত করবার জন্যে যে বাক্য ব্যবহার করেছিলেন, তা' সামান্যা অশিক্ষিতার অসাধ্য এবং অগম্য। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি নারী-চরিত্রই এমন অত্যাবশ্যক উপাদানে গঠিত যে, নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যতিরেকে তা' কখনই সম্ভব হত না।

মহাভারতের উপদেশাত্মক অংশে বলা হয়েছে, যৌবনোদ্ভেদের পূর্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য অর্থাৎ নগ্নিকা অবস্থায় কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। ত্রিশ বা একুশ বৎসরের পাত্র দশ বা সাত বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করবে। নগ্নিকা শব্দের অর্থ অনেকে বুঝেছেন—উলঙ্গ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নগ্নিকা শব্দের অর্থ হল,—একবস্ত্র পরিহিতা। অর্থাৎ যৌবনোদ্ভেদের পূর্বে যখন একটি মাত্র বস্ত্রখণ্ডে কন্যা স্বচ্ছন্দে আবৃতা থাকতে পারে। কিন্তু মূল ভারত-কাহিনীতে বা অন্য কোন মৌল কাহিনীতে এমন একটি উদাহরণও নেই—যেখানে উপরোক্ত বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নায়িকাই যুবতীকালে বিবাহিতা এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রণয়-ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। উপদেশাত্মক মহাভারত বলছেন—ঋতুমতী হবার পূর্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া হত না। অনুশাসন পর্ব বলেছেন—ঋতুমতী হবার পূর্বে যদি কন্যার বিবাহ না হয়, তবে অবিবাহিতা ঋতুমতী কন্যা ঋতুমতী হবার পর তিন বৎসর অপেক্ষা করে, পিতা বা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজনের অপেক্ষা না রেখে, আপন স্বামী নির্বাচন করে নিতে পারে। এই প্রকার বিবাহের সন্তান পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা লাভ করবে।

মহাভারতে পাঁচ প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে—ব্রাহ্ম, ক্ষাত্র, গান্ধর্ব, আসুর এবং রাক্ষস। স্বভাব-চরিত্র, কুল ও কার্য দেখে গুণবান পাত্রে কন্যা দিলে সে হয় ব্রাহ্ম বিবাহ। উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করে যৌতুকাদিসহ কন্যা সমর্পণের নাম ক্ষাত্র বিবাহ। পাত্র-পাত্রী পরস্পরের সম্মতিক্রমে অভিভাবকদের অজ্ঞাতে যদি বিবাহ করে, তবে সে হবে গান্ধর্ব বিবাহ। মূল্য বা শুল্ক দিয়ে কন্যা ক্রয় করে বিবাহ করলে তাকে বলা হয় আসুর বিবাহ; আর আত্মীয়বর্গকে হত্যা করে রোরুদ্যমানা কন্যাকে বিবাহ করবার নাম রাক্ষস বিবাহ। মহাভারতে উপরি-কথিত বিবাহ-পদ্ধতিগুলোর বিশুদ্ধ অনুসরণ যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে এমন সমস্ত অনুষ্ঠান—যা এগুলোর কোন একটিরই বিশুদ্ধ প্রয়োগ বলে বিবেচিত হবে না। ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদ বিশেষ নেই—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের পক্ষে এই পদ্ধতি দুটোই সবচেয়ে প্রশস্ত বলে অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন। বিরাট-রাজকন্যা উত্তরের সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ ক্ষাত্র-বিবাহের বিশুদ্ধ উদাহরণ। মাদ্রীর বিবাহ বিশুদ্ধ আসুর বিবাহ। মদ্ররাজ শল্য তাঁর ভগিনীর জন্য ভীষ্মের কাছে শুল্ক প্রার্থনা করেছিলেন। তবে বিক্রান্ত কাহিনীতে অন্য কোথাও এর বিশেষ পুনরাবৃত্তি ঘটেনি—স্বয়ং মদ্ররাজ শুল্ক প্রার্থনার কারণস্বরূপ বলেছেন যে, তাঁর বংশগত প্রথা বলেই তিনি এ দাবী করছেন, তাঁর আচরণে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গী সুস্পষ্ট। এর পরে আসে গান্ধর্ব বিবাহ। গান্ধর্ব বিবাহের উদাহরণ স্থাপনা করেছেন শকুন্তলা, তবে দেবযানী,

সাবিত্রী, সুভদ্রা, উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, হিড়িম্বা—এঁরা প্রত্যেকেই স্বনির্বাচিত পুরুষকেই বিবাহ করেছিলেন। গান্ধর্ব বিবাহের পাত্র-পাত্রী অভিভাবকের অজ্ঞাতেই বিবাহ করেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রণয়াসক্তা কন্যা নিজে পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন বা প্রণয়াস্পদকে পিতার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করবার জন্যে প্ররোচিত করে থাকেন। দেবযানী যযাতিকে বিবাহ করবার জন্য নিজে শুক্রাচার্যের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন; তপতী সংবরণকে বলেছিলেন—'আমি স্বাধীন নই। পিতা আছেন; আপনি তাঁকে প্রীত করে আমাকে প্রার্থনা করুন।' বিক্রান্তযুগের পিতারাও কন্যাকে প্রণয়াস্পদের সঙ্গে মিলনে বাধা দিতেন না। দেবযানীকে ক্ষত্রিয়ের অনুরাগিনী জেনে ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য বিবাহের অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন—প্রণয় ধর্মের অপেক্ষা রাখে না। কণ্ব শকুন্তলাকে তাঁর অজ্ঞাতে বিবাহ করবার জন্যে আশীর্বাদ করতে কুণ্ঠিত হন নি। বিভাবসু কন্যা তপতীকে সংবরণের হাতেই সমর্পণ করেছিলেন। সাবিত্রী ইচ্ছানুসারে সত্যবানকেই বিবাহ করেছিলেন। তবে অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম বলেছেন ধর্মজ্ঞরা সাবিত্রীর বিবাহের নিন্দা করে থাকেন। উপদেশাত্মক মহাভারত বলছেন—পিতার উচিত পুত্রকে সমকুলে বিবাহ দেওয়া এবং কন্যাকে সমবর্ণে বা উচ্চবর্ণে বিবাহ দেওয়া। কিন্তু গান্ধর্ব বিবাহ যে কালে প্রচলিত ছিল, সে কালে এ উপদেশ অর্থহীন। শকুন্তলা, দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, বিবাহ করেছেন ক্ষত্রিয়কে। শান্তনু ক্ষত্রিয় রাজা, কিন্তু বিবাহ করেছিলেন দাসরাজকন্যা সত্যবতীকে; ক্ষত্রিয় ভীম বিবাহ করেছেন রাক্ষসী হিড়িম্বাকে; আর ক্ষত্রিয় অর্জুন বিবাহ করেছিলেন নাগকন্যা উলূপীকে।

স্বয়ম্বর হল মহাভারত-রামায়ণের সবচেয়ে বিখ্যাত বিবাহ-পদ্ধতি। এই নিয়ম অনুসারে নিমন্ত্রিত রাজারা একত্রে সমবেত হন, তখন কন্যা তাঁদের মধ্য থেকে স্বামী নির্বাচন করেন—নির্বাচনের প্রতীক হিসাবে তার কণ্ঠে মালা পরিয়ে দেন। এই পদ্ধতিকে ক্ষাত্র আর গান্ধর্ব—এই দুই প্রথার মিশ্রণ বলা যায়। এতে পিতার অধিকারও থাকল, আবার কন্যার ইচ্ছার মূল্যও রইল—কিন্তু কোনটিই স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। এই প্রথার মাধ্যমে নারীর অধিকারের ওপর বাধা যে এসে পড়ছে, তা বোঝা যায়। এ পর্যন্ত যা বলা হল, সে হ'ল স্বয়ম্বরের বিশুদ্ধ রূপ; তবে বিশুদ্ধ স্বয়ম্বরের উদাহরণ বিরল। দ্রৌপদী ও সীতার স্বয়ম্বরে সমবেত রাজাদের মধ্যে কাউকে যে কন্যা পছন্দ করে নেবে, সে প্রশ্ন ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই কঠিন সর্ত আরোপিত ছিল—যে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে,সেই কন্যা লাভের যোগ্য; তবে কারও হয়ে অন্য কেউ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারত। কর্ণ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে দুর্যোধনের হয়ে স্বয়ম্বরে লক্ষ্য ভেদ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই প্রকার স্বয়ম্বরে সাধারণতঃ কন্যার ইচ্ছার কোন মূল্যই ছিল না; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা ব্যক্তি-বিশেষকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে বাধা দিতে পারতেন। কর্ণ লক্ষ্যভেদ করতে অগ্রসর হলে দ্রৌপদী কর্ণ নীচজাতি বলে আপত্তি করে কর্ণকে প্রতিযোগিতা থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। দময়ন্তী স্বয়ম্বরের পূর্বেই নলের প্রতি আকৃষ্টা ছিলেন এবং স্বয়ম্বর-সভায় কেবল প্রথার সম্মানে (হয়ত পিতার সম্মানে) নলের কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিতেন—যেমন দিতেন কাশীরাজার প্রথমা কন্যা অম্বা শাল্বের কণ্ঠে—যদি না ভীষ্ম তাঁকে অপর দুই ভগিনীর সঙ্গে অপহরণ করতেন।

বলপূর্বক কন্যা অপহরণ করে বিবাহ করবার দৃষ্টান্ত মহাভারতে বিরল নয়। ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য হরণ করেছিলেন; অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন; কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে অপহরণ করেছিলেন। অপহরণ স্বয়ম্বর-সভা থেকেও চলত, যেমন করেছিলেন ভীষ্ম, আবার অন্য সময়েও চলত, যেমন করেছিলেন অর্জুন। বলপ্রকাশ করে অপহরণ করতে গেলে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই কন্যার আত্মীয়বর্গের বা স্বয়ম্বরে উপস্থিত অন্যান্য রাজন্যবর্গের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হত—সে ক্ষেত্রে আপন শৌর্যে কন্যাকে রক্ষা এবং বিবাহ করতে হত। ক্ষত্রিয় এজন্য নিন্দিত হত না, বরং অপহরণ করে বিবাহ করা ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত বলে প্রশংসিত হত। কাশীরাজের তিনকন্যাকে রথে তুলে ভীষ্ম সমবেত অসন্তুষ্ট রাজন্যবর্গকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—'বহুপ্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু ধর্মবেত্তাদের মতে স্বয়ম্বরে-সভা থেকে বিপক্ষদের পরাভূত করে কন্যা অপহরণ করাই হল ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি' দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বলেছিলেন—'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব বা রাক্ষস বা দুয়ের মিশ্রিত রীতিতে বিবাহই ধর্মসঙ্গত।' মহাভারতে সম্ভাবনা থাকলেও রাক্ষস বিবাহের বিশুদ্ধ ঘটনা একটিও ঘটেনি। আত্মীয়বর্গকে হত্যা করে রোরুদ্যমানা কন্যাকে বিবাহ করাই রাক্ষস বিবাহ। কাশীরাজের তিন কন্যাকে ভীষ্ম যখন অপহরণ করেন প্রথমা অম্বা ছিলেন শাল্বের অনুরক্তা—সে ক্ষেত্রে অম্বা রোরুদ্যমান হতে পারেন, কিন্তু তাঁর স্বজনবর্গকে ভীষ্ম হত্যা করেন নি। অর্জুন সুভদ্রা হরণের সময় যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু কন্যা সে সময় মোটেই রোরুদ্যমানা ছিলেন না—তিনি স্বয়ং অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন। ভীম হিড়িম্বার ভ্রাতা হিড়িম্বকে হত্যা করেছিলেন কিন্তু হিড়িম্বা তাতে দুঃখিত হন নি, বরং তিনি ভীমকে দর্শনমাত্র, তার প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন। বিশুদ্ধ রাক্ষস-বিবাহ মহাভারতে কোথাও ঘটেনি। অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম বলেছেন—আসুর ও রাক্ষস উভয় বিবাহই নিন্দনীয়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন—রাক্ষস-বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। বলপূর্বক কন্যা অপহরণের পর বিবাহের যে পদ্ধতি মহাভারতে রয়েছে, সে রাক্ষস-বিবাহেরই বিভিন্ন রূপ—ক্ষেত্র বিশেষে সংস্কৃতি। রাক্ষস ও আসুর বিবাহ সম্বন্ধে মহাভারতে অসঙ্গতি দেখা যায়। ভীষ্ম কন্যা অপহরণ করছেন এবং তাকে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য বলছেন, কিন্তু অনুশাসন পর্বে সেই ভীষ্মই রাক্ষস বিবাহের নিন্দা করেছেন। আসুর মতে মাদ্রীকে ক্রয় ভীষ্ম করেছিলেন কিন্তু অনুশাসন পর্বে তিনিই এই প্রথার নিন্দা করেছেন এই অসঙ্গতির কারণ মহাভারতের সুদীর্ঘ গঠনবৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

মূল্য দিয়ে কন্যা ক্রয় করার পদ্ধতি অনুশাসন পর্বে নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু অনুশাসন পর্বে স্ত্রীলোকের অধিকার ইত্যাদি আলোচনায় এই প্রথার বহুল প্রচার বার বার পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে কন্যার বিবাহের সময় পাত্রপক্ষকে যৌতুক দেবার পদ্ধতি আজকের মত সেদিনও প্রচলিত ছিল। বিবাহের সময় কন্যা যদি পাত্রপক্ষের অলঙ্কার গ্রহণ করে, তবে তাকে শুল্ক হিসাবে গ্রাহ্য করা হত না। যদি পাত্র শুল্ক দিয়ে উদ্দিষ্টা কন্যাকে বিবাহ না করে, তবে কন্যার পিতা কি করেন? যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বললেন—যদি কন্যার পিতা প্রাপ্ত শুল্ক পাত্রপক্ষকে ফিরিয়ে না দেন, তবে পা

বিবাহ না করলেও কন্যা সে ক্ষেত্রে পাত্রের অধিকারে রয়েছে বুঝতে হবে; তবে কন্যা পতি না থাকা সত্ত্বেও শাস্ত্রসম্মত যে কোন উপায়ে পুত্র উৎপাদন করতে পারে। সেই কন্যা যদি পুত্রহীন পিতার কন্যা হয়, তবে পিতা তাকে রক্ষা করবেন।

মহাভারতের উপদেশাত্মক অংশেও যুবতী অবস্থায় কন্যার বিবাহের কিছু অবকাশ রয়েছে। বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে বলেছেন যে, শিশুকাল ও যুবতীকাল উভয় সময়েই বিবাহ হতে পারে। কন্যা ঋতুমতী হবার পূর্বে যদি বিবাহিতা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে ব্রাহ্ম বিবাহ-পদ্ধতিরই অনুসরণ হয়ে থাকে। তবে অনুশাসন পর্বেও কন্যার ইচ্ছাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা হয়নি। ভীষ্ম বলেছেন, মনু বলেন, অবাঞ্ছিত পতির সঙ্গে বাস করলে অগৌরব ও পাপ বৃদ্ধি পায়। যদি কন্যা একজনকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অন্যজনকে বিবাহ করে, তবে সেই কন্যাকে, সেই বিবাহে উপস্থিত সশিষ্য আচার্যগণ, ঋত্বিক্ এবং উপাধ্যায় সকলকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়; এমন কি, সেই কন্যার সন্তানরাও প্রায়শ্চিত্ত করবে। ভীষ্মের এই উক্তির নিহিত অর্থ থেকে এবং ঋতুমতী হবার পর অবিবাহিতা কন্যার স্বেচ্ছায় পাত্র নির্বাচনের অধিকার থেকে মনে হবে যে, কন্যার পাত্র নির্বাচনে অধিকার হয়ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছিল।

কন্যার কুমারীকালে সে কি মর্যাদায় পিতৃগৃহে অধিষ্ঠিত থাকবে, সে সম্বন্ধে অনুশাসন পর্ব কিছুই বলেন নি। তার কারণ বোধ হয় অনুশাসন পর্ব রচনার সময় স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন কমে এসেছিল এবং অপরপক্ষে বাল্যবিবাহের প্রচলন হয়ে চলছিল বেশী। মহাভারতের কাহিনী-অংশেও কন্যার কুমারীকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নি; বস্তুতঃ কাহিনী প্রবাহে সে প্রকার অবকাশ অল্পই আছে। বিবাহের পর বধূ ও মাতা হিসাবে নারী কি মর্যাদা লাভ করবেন, সে সম্বন্ধে অনুশাসন পর্বে নির্দেশ করেছেন এবং কাহিনী আখ্যানেও তার প্রকৃষ্ট পরিচয় মেলে। সুতরাং কুমারী কন্যার আলোচনায় কাহিনী-অংশের বিক্ষিপ্ত তথ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, আর বধূ ও মাতার আলোচনায় উভয় অংশেই আমাদের সমান নির্ভর।

রহস্যময় এক রাত

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

জীবনের এক নিষিদ্ধ প্রহরে
সিগারেটের নরম ধোঁয়ায় যুঝে যুঝে
মনে হলো—
পাড়ার লিপিকা না লিপ্তি নামের সেই মেয়ে,
নরম এই নিটোল রাতের মতই
যেন
রহস্যময় প্রবাল-দ্বীপের এক অ্যাটল।
এর
রক্তাভা মুখের বলয়
আর—
শ্যামল ঘাসের মতই সমস্ত যৌবন
যেন,
বিশ্রামহীন, উচ্ছৃঙ্খল-উদ্দাম এক আশঙ্কার ঢেউ তুলে
বারেবারে, আছড়ে পড়তে চাইছে, মনের অতৃপ্ত তটভূমিতে।

তাই
ওর ওই জোড়া ভ্রূ
আর—
গভীর অতল কালো চোখের তারা,
মদিরার মত আমার সমগ্র সুস্থ সত্তায়
ছড়ালো, অতৃপ্ত বাসনার সেই বজ্রপাতের গোপন সংকেত।

সেই সংকেত
মনের হাজারো লীগ, অতল, অদেখা, কন্দরে,
যত কামনা আর বাসনা
আগ্নেয়গিরির, যুগল লাভা-স্রোতের মতই
স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হোয়ে উঠতে লাগল
ওর বুকের ওই, দু'খণ্ড, দার্জ্জিলিং পাথরে।

তাই
সিগারেটের নরম ধোঁয়ায় যুঝে যুঝে
মনে হলো,
লিপিকা না লিপ্তি নামের সেই মেয়ে
যেন—
অঘ্রাণের, অতৃপ্ত, রহস্যময় এক রাত।

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
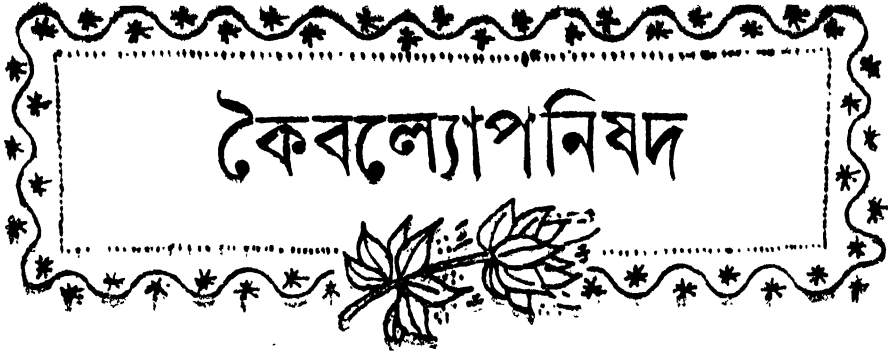
[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত-সুবর্ণবদবছিন্নোন চিন্মাত্র স্বভাবঃ
আত্মা যদাবভাসতে তদা ত্বং পদার্থ প্রত্যাগাত্মা ইত্যুচ্যতে।

অর্থ—শরীর মন বুদ্ধি প্রভৃতি কোনও প্রকার উপাধি যাঁহার নাই, ঘন সুবর্ণের ন্যায় জ্ঞানঘন চৈতন্য মাত্র স্বভাব যাঁহার, অর্থাৎ যে চৈতন্যেব, তাহাই প্রত্যাগাত্মা; তিনি ত্বংপদের লক্ষ্যার্থ। এস্থলে 'ত্বংপদের লক্ষ্যার্থ' কথার তাৎপর্য্য এইরূপ—"তৎ ত্বম অসি" এই মহাবাক্যে তৎ ও ত্বং পদদ্বয়ের মধ্যে সামান্যাধিকরণ্য, বিশেষ্য বিশেষণ ও লক্ষ্য লক্ষণ সম্বন্ধত্রয় যুক্ত হইয়া প্রত্যাক্ষ্য ও অপ্রত্যক্ষ চৈতন্যকে বুঝায়। যেমন "সেই দেবদত্ত এই" এই বাক্যে 'সেই' শব্দে পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ বা দৃষ্ট দেবদত্ত, আর 'এই' পদে অধুনা দৃশ্যমান দেবদত্তকে, ঐ একই ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। এই দুই অর্থই পরস্পর ভেদের ব্যবর্ত্তক হেতুতে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ, উভয় অর্থেরই লক্ষ্য একমাত্র দেবদত্ত নামক ব্যক্তিরূপ পরস্পর অভেদ পদার্থেই তাৎপর্য্য। আবার অতীত কালে দৃষ্ট দেবদত্ত ও অধুনা দৃশ্যমান দেবদত্তরূপ বাক্যার্থের একাংশে বিরোধ হওয়ায় অতীতকালে দৃষ্টত্ব বা অধুনা দৃশ্যমানত্বরূপ বিরুদ্ধ অংশ ত্যাগ পূর্ব্বক অবিরুদ্ধ দেবদত্ত ব্যক্তিরূপ অংশই যেমন লক্ষ্যার্থ, তদ্রূপ "তৎ ত্বম অসি" বাক্যে বা তাহার অর্থে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যের বিরুদ্ধ অপ্রত্যক্ষত্ব পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্য মাত্র অংশে লক্ষ্যার্থ হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্য এইরূপ হইল যে, তৎ পদে অপ্রত্যক্ষ এবং ত্বং পদে প্রত্যক্ষ চৈতন্যকে লক্ষ্য করিলেন। অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য বাক্য মনের অতীত। ত্বং পদ দ্বারা লক্ষ্য করা হইতেছে প্রত্যক্ষ চৈতন্যকে অর্থাৎ অহং প্রত্যয় গোচর চৈতন্য।

> সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দ-
> মেতদ্বস্তুচতুষ্টয়ং যস্য লক্ষণং দেশকাল-
> নিমিত্তেষ্বব্যভিচারী তৎ পদস্য লক্ষ্যার্থঃ
> পরমাত্মা ইত্যুচ্যতে।

অর্থ—যিনি সর্ব্বপ্রকার উপাধিমুক্ত, সত্য, জ্ঞান, আনন্ত্য ও আনন্দ—এই চারিটি লক্ষণযুক্ত, দেশকাল প্রভৃতি দ্বারা যাঁহার রূপান্তর ঘটে না অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনশীল, তৎপদের লক্ষ্যার্থ—পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন।

সত্যম্ অর্থাৎ অবিনাশী। নাম-দেশ-কাল-বস্তুনিমিত্তেষু-বিনশ্যৎসু যন্নবিনশ্যতি। অর্থাৎ যাহা নাম দেশ কাল বস্তু ও নিমিত্তের বিনাশ ঘটিলেও বিনষ্ট হয় না, তাহাই সত্য।

জ্ঞানম্—অর্থাৎ "উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে"। উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্য যে চৈতন্য, তাহাই জ্ঞান পদবাচ্য।

অনন্তম্—"অনন্তং নাম মৃত্তিকারেষু মৃদিব, সুবর্ণবিকারেষু সুবর্ণমিব, অব্যক্তাদি-সৃষ্টি-প্রপঞ্চেষু পূর্ব্বব্যাপকং চৈতন্যম্ অনন্তমিত্যুচ্যতে।

মৃত্তিকা-নির্মিত ঘটশরাবাদিব ঘট ও সরার নাম ও রূপ মাত্র, মৃত্তিকাই স্বরূপ সত্য। সেইরূপ সুবর্ণনির্মিত অলঙ্কার প্রভৃতির সুবর্ণই স্বরূপ সত্য; হার, বলয় প্রভৃতি নাম ও রূপমাত্র। সেইরূপ অব্যক্ত অর্থাৎ মূল অজ্ঞান হইতে বুদ্ধি চিত্ত মন অহংকার প্রভৃতি অন্তর্জগৎ ও পরিদৃশ্যমান নামরূপাত্মক বিচিত্র জগৎ, এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ; জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় ব্যাপ্ত হইয়া যে চৈতন্য বিরাজমান, জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত চৈতন্য। চৈতন্যের এই যে পরিব্যাপ্তি, ইহাই আনন্ত্য।

আনন্দম্—'আনন্দো নাম সুখচৈতন্যস্বরূপঃ, অপরিমিতানন্দ-সমুদ্রঃ। অবিশিষ্ট সুখ স্বরূপঞ্চ আনন্দই-ত্যুচ্যতে।

উপাধিভেদে চৈতন্যের বিভিন্ন নাম। নামরূপশূন্য কেবলানুভূতি মাত্র, বৈশিষ্ট্যশূন্য অনুভূতির অসীম সমুদ্র। সৎ-চিৎ-আনন্দ, অস্তি ভাতি প্রীতি। কেবলানন্দময় প্রকাশাত্মক অনুভূতিময় সত্তা।

প্রঃ—কা মায়া?

উঃ—অনাদিরন্তর্বত্নী প্রমাণাপ্রমাণ সাধারণা, ন সতী নাসতী স্বয়মবিকারাদ্বিকারহেতৌ নিরূপ্যমানে অসতী অনিরূপ্যমানে সতী লক্ষণশূন্যা সা মায়া ইত্যুচ্যতে।

অর্থ—অনাদি অর্থাৎ পূর্বাবধি বিধুরা, পূর্ব অবধি যাহার নাই, আদিশূন্য। অন্তর্বত্নী অর্থাৎ গর্ভিণী—কার্য্যোৎপাদনে সমর্থা, বহুত্ব সৃষ্টি করিতে সমর্থা। যাহা প্রামাণ্য আবার অপ্রামাণ্য, যাহা আছে অথচ নাই। যাহার সত্তা আছে, অথচ নাই। স্বয়ং অবিকার বস্তু হইতে বিকারের হেতু নির্ণীত হইলে যাহার সত্তা থাকে না। যতক্ষণ সৎবস্তু নিরূপিত না হয়, ততক্ষণই তাহার সত্তা প্রত্যক্ষ হয়। সৎবস্তু নিরূপিত হইলে যাহার সত্তা আর প্রত্যক্ষ হয় না। লক্ষণের দ্বারা যাহা লিখিত হয় না, তাহাই মায়া।

'মা' শব্দ নিষেধে, 'যা' শব্দ প্রাপ্তিতে, অর্থাৎ প্রাপ্তাপি সতী যা নাস্তি। অর্থাৎ অজ্ঞানকালে যাহার সত্তা লক্ষিত হয়, কিন্তু জ্ঞানকালে সত্তাহীন যাহা, তাহাই মায়া। আত্মা প্রত্যক্ষ হইলে মায়ার সত্তা থাকে না। যতক্ষণ অবিবেক বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ

মায়ার সত্তা। বেদান্ত বলেন—'সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং জ্ঞানবিরোধি-ত্রিগুণাত্মকং ভাবরূপং যৎ কিঞ্চিদিতি বদন্তি।'

সৎ কি অসৎ; সৎ অর্থাৎ সত্তাবান, অসৎ অর্থাৎ সত্তাহীন। সত্তাবান কি সত্তাহীন—এইরূপ নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। অথচ জ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞানের আবরক ত্রিগুণাত্মক ভাববিশেষ বলিয়া কথিত হয়। এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহার সত্তাই নাই, তাহা ত্রিগুণাত্মক কিরূপে হইবে?—ইহার উত্তর খুব সুস্পষ্ট। যতক্ষণ সত্য নিরূপিত বা অনুভব ও স্থিতিযোগ্য না হয়, ততক্ষণই মায়া ত্রিগুণাত্মক শক্তি নামে পরিচিত হন। সত্য নিরূপিত হইলে ত্রিগুণের সহিত মায়া মায়ীর স্বীয় অঙ্গে বিলীন হইয়া যায়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি। যতক্ষণ রজ্জু অনিরূপিত থাকে, অর্থাৎ রজ্জুজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ ভ্রান্তি—সর্পজ্ঞানের সত্তা প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। রজ্জু বা বস্তুজ্ঞান ফিরিয়া আসিলেই সর্পজ্ঞান বিদূরিত হয়। আত্মতত্ত্ব না জানা পর্য্যন্তই মায়ার সত্তা স্বীকৃত হয়। আত্মতত্ত্ব অবগত হইলে আর মায়ার সত্তা থাকে না। আত্মতত্ত্বাবগতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে মায়ার সত্তা, উহাও আত্মতত্ত্বের বহির্ভূত পৃথক কিছু নহে। উহা আত্মারই ঐরূপ ভ্রান্তিময়—অজ্ঞানময় বিকাশ। মায়ার অপর নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা কি? স্বরূপ বলিয়াছেন, উপনিষদের ঋষি—"অবিদ্যাত্মিকাহি বীজশক্তি রব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিঃ। যস্যাং স্বরূপবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ। সা চ অব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা অবিদ্যা নিষ্কলে নিরবয়বে পুরুষে পরমাত্মনি প্রলীয়তে।

বৃক্ষের বীজের ন্যায় সমগ্র জীবজগতের বীজ ধারণ শক্তি বিশিষ্টা অব্যক্ত শব্দ নির্দ্দেশ্যা, অজ্ঞানময়ী বা অজ্ঞানরূপ মহানিদ্রা পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, যাহাতে সংসারী জীবগণ আপন স্বরূপ-জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘোর নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত হইয়া থাকে, সেই অব্যক্ত শব্দদ্বারা নির্দ্দেশিতা অবিদ্যা অখণ্ড, অসীম আকাশবৎ অবয়বশূন্য বোধমাত্র স্বরূপ পুরুষে—পরমাত্মাতে লীন হইয়া থাকেন।

মায়া ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্বরজস্তমোময়ী, এই কারণে বহুত্ব সৃষ্টি-শক্তিসম্পন্না। বহুত্বসৃজনীশক্তি যে মায়াতে আছে, তাহা উপনিষদ বুঝাইয়াছেন—"অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং, বহ্বীঃপ্রজা সৃজমানা-স্বরূপা"—মায়া অজা অর্থাৎ জন্মরহিতা, জীবশরীর বা স্থূল পদার্থের ন্যায় জন্মলাভ করেন না। একা—অদ্বিতীয়া, লোহিত-রজোগুণের প্রতীক, শুক্ল-সত্ত্বগুণের প্রতীক, কৃষ্ণা তমোগুণের প্রতীক—অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিতা। স্বরূপা অর্থাৎ নিজের রূপের মত রূপ বিশিষ্টা, বা সত্ত্বাদিত্রিগুণান্বিতা, বহু প্রজা—বহুভাব, স্থূলসূক্ষ্ম বহু বিচিত্র ভাবের জননী।

এই মায়া অদ্বিতীয়া হইয়াও সদ্বিতীয়া। ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিবক্ষায় বহু। প্রত্যেক জীবে পৃথকভাবে অবস্থিত অন্তঃকরণ উপাধিভেদে বহু হইলেও, জীবসমষ্টি ধরিলে একা—অদ্বিতীয়া। এই মায়া বা অজ্ঞান আবার বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ও মলিনসত্ত্বপ্রধান বলিয়া দুইভাগে বিভক্ত। মলিন সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত চৈতন্য অসর্ব্বজ্ঞ, অনীশ্বর, জীব এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বলিয়া নিরূপিত হন। তিনি সমস্ত অজ্ঞানের প্রকাশক, এই হেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সামান্য বিশেষ সকলই অবগত হইতেছেন এজন্য তিনি অন্তর্যামী। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" এই ভগবদ্বাক্যে বুঝা যায় যে এই ত্রিগুণময়ী মায়া, দৈবী অর্থাৎ মহতীশক্তি, উহা দুরতি-ক্রমনীয়া, কেবল যাহারা আত্মার শরণাপন্ন হন, আত্মারই কৃপায় তাঁহারা মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন্।

এইক্ষণ এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, যাহাকে আমরা মায়া বা অজ্ঞান বলিয়া থাকি, উহা বস্তু বা অবস্তু কিছুই নহে, কিন্তু উহা এক প্রকার দৈবীশক্তি, জ্ঞানময় গুরুরই ঐ প্রকার প্রকাশভঙ্গি। গুরু প্রসন্ন হইলে উহাকে স্বীয় অঙ্গে মিলাইয়া লন্। উহা শুধু কথার কথা নহে, দুর্লভ না হইলেও অতি সুলভও নহে। গুরুর কৃপা না হইলে মায়ার আবরণ উন্মোচন মোটেই সম্ভব নহে। জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশন। জ্ঞান না থাকিলে অজ্ঞানেরও সত্তা থাকা সম্ভব নহে। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"—গীতাবচন।

শ্রবণ-মননাদি সাধনা দ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করিতে পারিলে তিনি স্বয়ং আশ্চর্য্যভাবেই এই অত্যাশ্চর্য অজ্ঞান আবরণ উন্মোচন করিয়া থাকেন।

এই মায়াতে আবার দুইটি শক্তি নিহিত আছে। একটি আবরণশক্তি, অপরটি বিক্ষেপশক্তি। আবরণ শক্তিবলে সত্যবস্তুকে আবৃত করে, অর্থাৎ সত্যকে দেখিতে দেয় না। বিক্ষেপশক্তি ঐ অদৃশ্য সত্যের উপর সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া অন্য বস্তুজ্ঞান আরোপ করে। যেমন শুক্তি সত্যবস্তু, আবরণ শক্তিবলে শুক্তিজ্ঞান আবৃত করে, বিক্ষেপশক্তি কল্পিত অন্য বস্তু মুক্তাজ্ঞান শুক্তির উপর আরোপ করে, অর্থাৎ শুক্তিতে মুক্তা এইরূপ ভ্রমজ্ঞান আরোপ করে। সেইরূপ সর্ব্বময় জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া কল্পিত জগৎপ্রপঞ্চ আরোপিত হয়। ইহাকেই বেদান্ত অধ্যারোপ বলিয়াছেন—"বস্তুন্য-বস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ"—এই যে জগৎ প্রপঞ্চ, ইহাই ব্রহ্ম বিবর্ত্ত। বিকার নহে। বিকার বলিতে—"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা"—অর্থাৎ তত্ত্বের সহিত অন্যরূপে পরিণতি। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি। এখানে দধিবতত্ত্ব দুগ্ধ, দধিতে দুগ্ধ তত্ত্ব নিহিত। বিবর্ত্ত বলিতে—"অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা" অর্থাৎ তত্ত্বের কোন সংস্রব থাকে না অথচ তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্ব ভিন্ন অপর কিছুর জ্ঞান হয়। যেমন তত্ত্ব রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্বভিন্ন সর্পভ্রান্তি জ্ঞান উপস্থিত হয়। এস্থলে তত্ত্ব রজ্জুর সহিত অন্যথা সর্পজ্ঞানের কোন সংস্রবই নাই। সেইরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রপঞ্চরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান প্রকাশ পায়। রজ্জুজ্ঞান উদিত হইলে সর্পভ্রান্তি বিদূরিত হয়, পুনরায় আসেনা। তদ্রূপ আত্মজ্ঞান উদিত হইলে প্রপঞ্চ ভ্রান্তির উপশম হব।

কোনও রূপ কলাকৌশলে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়না। প্রপঞ্চ যাহাতে ধৃত, প্রকাশিত, সেই মহামায়ার কৃপা হইলে প্রপঞ্চোপশম সম্ভব।

গ্রন্থান্তরে—শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে—স্তোত্রাংশে ঋষি বলিলেন—

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।"

অর্থ—হে মহামায়ে! তুমি অসীম সামর্থ্যসম্পন্না বিষ্ণুর শক্তি-বিশেষ, তুমি নিখিল বিশ্বের মূল কারণ, তুমি পরমা অর্থাৎ পরং ঈশ্বরং মাতি অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বেন বশয়তীতি পরমা, মহাশক্তিরূপা

মহামায়া, তুমি এই নিখিল বিশ্বকে সম্মোহিত করিতেছ, তুমি প্রসন্ন হইলে এই সংসার হইতে মুক্তির কারণ হও।

সাধক! যাহাকে আমরা প্রবৃত্তি, মোহ, স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, বাসনা, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি আখ্যা দিয়া থাকি, উহাই মায়ার স্বরূপ—মায়ার বহুরূপ তিনি এই মহামায়াই সমগ্র জীবজগৎ-প্রসবিনী, বিশ্বের জননী, বিশ্বের আরাধ্যা। আমরা যে বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্তিলাভ করি, উহাও তাঁহার কৃপা, তাঁহারই স্নেহ। আর একটু খুলিয়া বলি, যতদিন আমাদের বিষয়ভোগ-বাসনা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিনই মা মহামায়া উক্ত বৃত্তিসারূপ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্নেহের সন্তানগণকে পরিতৃপ্ত করিবেন। ওগো, আমরা যাহা ভালবাসি, মা যে সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকেন। আমাদিগের তো জ্ঞান বৈরাগ্য লাভের বাসনা নাই, আর তাহাতে আমরা তৃপ্তিলাভও করিনা, কাজেই মা আমাদিগকে তাহা প্রদান করেন না। অন্তরালে থাকিয়া স্নেহময় দৃষ্টিতে নিরন্তর আমাদিগের দিকেই চাহিয়া আছেন। তাঁহার স্বরূপটি পর্য্যন্ত আমাদিগকে বুঝিতে দিতেছেন না। কেন এইরূপ করেন? কারণ, তাঁহার স্বরূপ জানিতে বা বুঝিতে পারিলে আমাদিগের বিষয়-রসাস্বাদনে প্রলোভন চিরতরে বিদূরিত হইবে। মাকে একবার চিনিতে পারিলে, তাঁহার অনুগ্রহ তাঁহার স্নেহ অবশ্যই অনুভূত হইবে। তাহার ফলে তিনি প্রসন্না হইবেন। যদি কেহ মনে করেন যে, উগ্র তপস্যা, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে অথবা এমন কোন গোপনীয় উপায় আছে—যাহার অনুষ্ঠান না করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিবেন না, তবে তিনি ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন। এই চিরন্তন সত্যকে না বুঝিলে, না জানিলে, কোন সাধনাই সম্যক ফলপ্রদ হইবে না।

কৈবল্যোপনিষদে প্রথম পটল সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পটল

অধীহি ভগবন্ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাং
সদা সদ্ভিঃ সেব্যমানাং নিগূঢাম্
যয়া চিরাৎ সর্ব্ব পাপং ব্যপোহ্য
পরাৎপরং পুরুষং যাতি বিদ্বান্ ॥ ১ ॥

অর্থ—আশ্বলায়ন নামক ঋষি পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিদ্যার্থী হইয়া কৃতাঞ্জলীপুটে বলিলেন—হে ভগবন্, আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করুন; যে নিগূঢ় বিদ্যা সর্ব্বদা সাধুজন কর্ত্তৃক পরিসেবিত, যে বিদ্যাপ্রভাবে জ্ঞানিগণ অচিরে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন, সেই বিদ্যার উপদেশ করুন।

বিদ্যা দ্বিবিধা, পরা ও অপরা। ব্রহ্ম বিদ্যা ভিন্ন অপর সকল বিদ্যাই অপরা। ন পরা অপরা অর্থাৎ পরাভিন্ন। অপরা বিদ্যা কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু পরা বিদ্যা উৎপত্তি-বিনাশশূন্য, নিত্য একরূপ। পরা বিদ্যালাভ ও আত্মজ্ঞান লাভ একই কথা। ইহা অতিসূক্ষ্মতম, তাই নিগূঢ়। সর্ব্বপাপ অর্থাৎ সর্ব্বই পাপ; "সর্ব্বমেব পাপম্" অর্থাৎ আমাদিগের—সর্ব্ব বলিয়া যে জ্ঞান, আমি, তুমি, সে, ইহা, উহা, তাহা—আমা হইতে পৃথক আকাশ বাতাস—চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি বহুত্ববুদ্ধি—এই সর্ব্ববোধ পাপ। শাস্ত্র বলেন—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি যঃ নানেব পশ্যতি" যে নানাত্ব দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু লাভ করে; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা-বিদ্যার প্রভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করিলে সর্ব্বপাপমুক্ত হওয়া যায়।

তস্মৈ স হোবাচ পিতামহশ্চ
শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যান যোগাদবেহি,
ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ২ ॥

অর্থ—পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, হে বৎস, শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যান ও যোগের সাহায্যে তাঁহাকে জানিবে। কর্ম্মের দ্বারা, পুত্র কন্যা দ্বারা কিংবা বিত্তের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা কাহাকে বলে?—"গুরু-বেদান্ত-বাক্যেষু বিশ্বাস: শ্রদ্ধা"।
গুরু ও শ্রুতিবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।

বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা উপচিত বিশ্বাসের দৃঢ়তর অবস্থার নাম ভক্তি; সরল কথায় বলা যায় অত্যন্ত ভাল লাগা।

ধ্যান শব্দের সাধারণ অর্থ—চিন্তা, কিন্তু সাধারণ চিন্তাকে ধ্যান আখ্যা দেওয়া যায় না। মনের নিরুদ্ধ অবস্থা আসিলে তাহাকে—সেই অবস্থাকে—ধ্যান বলা যায়। অর্থাৎ সত্ত্বোৎকর্ষ-বশতঃ বিষয়ের নামাদির রূপান্তরিত চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক—যে বাহ্য ও আন্তর সকল প্রকার মনোবৃত্তির নিরোধ, ধ্যেয়ের সহিত মনের একতানতা, তাহাও ধ্যান। যোগ—অর্থাৎ যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অষ্টম যোগ—বা সমাধি। সমাধি হইল জ্ঞান সাধনের প্রথম সোপান। কর্ম—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় অগ্নিহোত্রাদি। সত্যজ্ঞান সমন্বিত কর্ম ভিন্ন কেবল অজ্ঞান বিজৃম্ভিত মৃত-যজ্ঞানুষ্ঠানে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ত্যাগ অর্থাৎ বিষয় ভোগ বাসনা নিবৃত্তি।

কেবল ত্যাগের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এস্থলে ত্যাগ শব্দের গভীর অর্থ অহংকার বা অহং বুদ্ধির ত্যাগ বুঝাইতেছে। ঈশাবাস্যং কর্ম না হইলে, আত্মময়, সত্যপ্রতিষ্ঠ কর্ম না হইলে, সে কর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান হইতে পারে না।

পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং
বিভ্রাজতে যদ্ যতয়ো বিশন্তি—
বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাস যোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ ॥ ৩ ॥

অর্থ—যাহা স্বর্গেরও পরপারে অবস্থিত, যাহা বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত অর্থাৎ বুদ্ধি আত্মার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম বলিয়া আত্ম-প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতেই প্রতিফলিত হয়। যাহা স্বপ্রকাশ, সে সকল সন্ন্যাসী বেদান্ত জ্ঞান দ্বারা সুনিশ্চিতার্থ হইয়াছেন অর্থাৎ নিঃসংশয় হইয়াছেন অথবা তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ সম্যকরূপে অবধারণ করিতে পারিয়াছেন। যাহারা সন্ন্যাসী ও যোগের সাহায্যে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছেন সেই সকল যতি যাহাতে প্রবেশ করেন, তাহাই ব্রহ্ম।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে
বিবিক্তদেশেচ সুখাসনস্থঃ
শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ ॥ ৪ ॥

তাঁহারা, সেই যতিগণ, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া প্রলয়কালে পরমাত্ম স্বরূপে উপনীত হইয়া এই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। নির্জন ও পবিত্র স্থানে বিশুদ্ধচিত্তে গ্রীবাদেশ, মস্তক ও শরীর সমভাবাপন্ন রাখিয়া সুখাসনে উপবিষ্ট হইবে।

অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি (অন্ত্যাশ্রমস্থঃ পাঠান্তর)
নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য
হৃৎপুণ্ডরীকে বিরজং বিশুদ্ধং
বিচিন্ত্য মধ্যে বিষদং বিশোকম্ । ৫ ।

অর্থ—অতঃপর আশ্রমোচিত যাবতীয় কর্মবিষয়ক চিন্তা হইতে কিছুকালের জন্য চিত্তকে ও ইন্দ্রিয়বর্গকে নিরুদ্ধ করিয়া, পাঠান্তরে অন্ত্যাশ্রমস্থ অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া—ইন্দ্রিয়গণকে নিরুদ্ধ করিয়া—স্বীয় গুরুকে সভক্তি প্রণাম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, রজোগুণ-রহিত, শুভ্র, নির্মল, শোকদুঃখের অতীত—এইরূপ গুরুকে হৃদয়কমলে চিন্তা করিবে।

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং
শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্
তথাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং
বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্ । ৬ ।

অর্থ—ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া ক্রমে ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হইতে সচেষ্ট হইবে। গুরুর স্বরূপটি কি, তাহা কথিত হইতেছে। যথা—তিনি অচিন্তনীয়, মনের ও বাক্যের অগোচর, অনন্ত তাঁর রূপ অর্থাৎ এমন কোন রূপ নাই—যেখানে তিনি নাই। তিনি মঙ্গলময়, শান্ত, বিক্ষেপশূন্য, তিনি অমৃত মুক্তিস্বরূপ। তাঁহার আদি মধ্য অন্ত নাই। তিনি এক—অখণ্ড, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপক, তাহা হইতে দেবতাবর্গ উদ্ভূত হইয়াছেন, চিদানন্দই তাঁহার স্বরূপ ; তিনি স্বপ্রকাশ হইয়াও অপ্রকাশ, সুতরাং অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য।

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং
সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ । ৭ ।

অর্থ—উমা যাহার সহায় অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়শক্তিসম্পন্ন, তিনি পরমেশ্বর, তিনি প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, তাঁহার নয়নত্রয় ত্রিকালদর্শী। তিনি নীলকণ্ঠ অর্থাৎ দ্বৈতবোধরূপ বিষ পান করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, দ্বৈতবোধই সকল অনর্থের মূল, অদ্বৈতবোধ সেই অনর্থের নাশন। অথচ দ্বৈত ও অদ্বৈত, উভয় বোধই তিনি। তিনি প্রশান্ত অর্থাৎ কোনওরূপ ভাববিক্রিয়া তাঁহার নাই। এইরূপ গুরুর ধ্যান করিয়া, মুনিগণ অজ্ঞানের পরপারে অবস্থিত সর্বসাক্ষী, সর্বভূতের কারণ স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ সকালোঽগ্নিঃ সচন্দ্রমাঃ । ৮ ।

অর্থ—তিনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, অক্ষর পুরুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ, স্বপ্রকাশ, তিনি বিষ্ণু, প্রাণ, কাল, অগ্নি, তিনিই চন্দ্রমা।

স এব সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্,
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে । ৯ ।

অর্থ—যাহা কিছু হইয়াছে আর যাহা কিছু হইবে, যাহা বর্ত্তমানে আছে, এই সকলই তিনি। তিনিই সনাতন পুরুষ, সনাতন অর্থাৎ নিত্য, তিনি ভিন্ন অপর সকলই অনিত্য, পুরুষ অর্থাৎ যাঁহা হইতে পর আর কিছু নাই, শ্রেষ্ঠ। জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকেও অতিক্রম করিতে পারে। এই জন্মমরণরূপ সংসারগতি হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাঁহাকে জানা ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
সম্পশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা । ১০ ।

অর্থ—যে আত্মা সর্বভূতে অবস্থিত এবং সর্বভূত যে আত্মায় অবস্থিত, তাঁহাকে সম্যক প্রকারে সাক্ষাৎ করিয়া, জীব পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত অপর কোন উপায় নাই।

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্
জ্ঞাননির্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ । ১১ ।

অর্থ—বুদ্ধিকে অরণি করিয়া এবং প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া সাধনারূপ মন্থনের অভ্যাস করিতে করিতে যে জ্ঞানরূপ অগ্নির উৎপত্তি হয়, পণ্ডিতগণ তাহা দ্বারাই সমস্ত পাপ, সংসারপাশ ভস্ম করিয়া থাকেন। (অতি প্রাচীনকালে যজ্ঞার্থে অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্য ঋষিগণ দুইখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ পরস্পর ঘর্ষণ করিতেন, যে কাষ্ঠখণ্ড নিম্নে থাকিত, তাহাকে বলা হইত অরণি, আর যে কাষ্ঠখণ্ড উপরে রাখিয়া ঘর্ষণ করা হইত, তাহাকে বলা হইত উত্তরারণি। এইরূপ মন্থন বা অভ্যাসের প্রক্রিয়া একমাত্র সত্য প্রতিষ্ঠা।)

স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্বম্
স্ত্রিয়ান্নপানাদি বিচিত্র ভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি । ১২ ।

অর্থ—সেই আত্মাই মায়া দ্বারা যেন মুগ্ধ হইয়া শরীরকে আশ্রয় করিয়া সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং স্ত্রী, অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগের দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করেন। এই অবস্থায় আত্মা জাগ্রৎ অবস্থা প্রাপ্ত হন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ে থাকিয়া আত্মা বিচিত্র ভোগ সাধন করেন।

স্বপ্নে স জীবঃ সুখ-দুঃখ-ভোক্তা স্বমায়য়া কল্পিত জীবলোকে
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোভিভূতঃ সুখরূপমেতি । ১৩ ।

অর্থ—স্বপ্নাবস্থায় সেই আত্মাই স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা জীবলোক কল্পনা করেন এবং সুখদুঃখের ভোক্তা সাজেন। আবার সুষুপ্তিকালে সর্বভাব বিলীন হইলে অজ্ঞানাভিভূত হইয়া সুখ-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। সুখ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বা আত্মা। অজ্ঞানাভিভূত কথার তাৎপর্য্য—স্বরূপ বোধশূন্য বা আত্মবোধশূন্য হইয়া আত্মাকেই প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ জন্মান্তর কর্ম্ম যোগাৎ, স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ
পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীবস্ততস্তু জাতং সকলং বিচিত্রম্।
আধার মানন্দ মখণ্ড বোধং যস্মিন্ লয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ । ১৪ ।

অর্থ—পুনরায় জন্মান্তরীয় কর্ম্মপ্রভাবে সেই আত্মাই জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থায় ভোগ করেন। এইরূপ যে আত্মা এই তিন পুরে ক্রীড়া করেন, সেই আত্মা হইতেই এই বিচিত্র বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয়, তিনি বিশ্বের আধার, তিনি স্বয়ং আনন্দময়, আনন্দই তাঁর রূপ, তিনি অখণ্ড বোধ স্বরূপ, এই পুরত্রয় তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে ঐ ত্রিপুরের লয় সাধিত হয়, তখন তিনি ত্রিপুরারি।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণিচ।
খংবায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী । ১৫ ।

অর্থ—আবার তাহা হইতেই অর্থাৎ বোধস্বরূপ আত্মা হইতে

প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বাতাস, তেজ, জল এবং বিশ্বধারিণী পৃথিবী সৃষ্ট হয়।

যৎ পরং ব্রহ্ম সর্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ,

সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ। ১৬।

অর্থ—যিনি পরং ব্রহ্ম, যিনি সকলের আত্মারূপে বিরাজিত, যিনি এই বিশ্বের একমাত্র আয়তন বা আশ্রয় অথবা আধার যিনি, যিনি মহৎ, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, যিনি সত্য, তিনি আর কেহ নহে, তাহা তুমিই তিনি—তিনিই তুমি, জীবমাত্র নহ।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে

তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে। ১৭।

অর্থ—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় যাহা প্রপঞ্চরূপে জগৎরূপে প্রকাশিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই আমি। এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেই জীব সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। জীবত্বের অবসান ঘটে, জীবশিবের ভেদজ্ঞান দূরীভূত হয়। জ্ঞানলাভ শব্দের তাৎপর্য্য সর্ব্বত্রই অনুভূতি লাভ করা, শাস্ত্রপাঠ জনিত বা গুরুমুখে শ্রবণ জনিত জ্ঞান নহে।

ত্রিষুধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তাভোগশ্চ যদ্ভবেৎ,

তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ। ১৮

অর্থ—পূর্ব্বোক্ত তিনধামে অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগরূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক সাক্ষীস্বরূপ মাত্র চৈতন্যই আমি, আমি সর্ব্বদাই মঙ্গলময়।

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্,

ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্। ১৯।

অর্থ—আমা হইতেই সকল উৎপন্ন, সকল আমাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আমাতেই সকল লয় প্রাপ্ত হয়। সেই অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ আমি।

অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্,

পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো হিরন্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি। ২০।

অর্থ—আমি অণু হইতেও অণুতর অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম। আবার আমি মহৎ হইতেও মহত্তর। এই বিচিত্র বিশ্বরূপে আমি বিরাজিত। আমিই পুরাণ পুরুষ, আমিই ঈশ্বর, আমি হিরণ্ময় পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, আমি মঙ্গলময় শিবরূপ।

অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ

পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ।

অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো

ন চাস্তিবেত্তা মমচিৎ স্বরূপম। ২১।

অর্থ—আমি হস্তপদাদিশূন্য অথচ আমি অচিন্তনীয় শক্তিসম্পন্ন, চক্ষু না থাকিলেও আমি দেখিতে পাই, কর্ণ না থাকিলেও শুনিতে পাই। আমি আমার বিবিক্তরূপ অর্থাৎ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রূপকে আমি জানি। আমার বেত্তা অর্থাৎ জ্ঞাতা কেহ নাই। আমার চিৎস্বরূপ আমিই জানি, কারণ আমি সর্ব্বদাই চিৎস্বরূপে অবস্থিত।

বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যো,

বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্,

ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো

ন জন্ম দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধিরস্তি। ২২।

অর্থ—সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য আমি, আমি বেদান্তকৃৎ অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্র প্রণয়নকারী এবং আমিই বেদবিৎ, আমাকে পাপপুণ্য কিছুই স্পর্শ করে না, আমাতে পাপপুণ্য নাই, আমার বিনাশ নাই, জন্ম নাই, দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই, বুদ্ধি নাই।

নভূমিরাপো নচ বহ্নিরস্তি, নচানিলো মেঽস্তি ন চাম্বরঞ্চ,

এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপম্ গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ম্

সমস্ত সাক্ষীং সদসদ্বিহীনং প্রযাতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপম্। ২৩।

অর্থ—ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ, এ সকল আমার কিছু নাই। এইরূপ গুহাশায়ী অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত, অংশ রহিত অদ্বিতীয়, সর্ব্বসাক্ষী, সৎ এবং অসৎ উভয়ের অতীত পরমাত্মস্বরূপকে জানিয়া জীব শুদ্ধ নির্ম্মল পরমাত্মস্বরূপকেই প্রাপ্ত হয়।

এই গ্রন্থের সপ্তদশ শ্লোকে "জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি" বাক্যে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়যুক্ত জীবই ব্রহ্মস্বরূপ। উহা না জানাই জীবত্ব এবং জানিলে ব্রহ্মত্ব। ওঁ এই একাক্ষর প্রণবটি যদিও একাক্ষর বলিয়া মনে হয়, তথাপি উহা অ, উ, ম—এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়। এই অক্ষর তিনটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ "অকারমাত্রং বিশ্বঃ স্যাদুকারস্তৈজসঃ স্মৃতঃ, প্রাজ্ঞোমকার ইত্যেবং পরিপশ্যেৎ ক্রমেণ তু।"

'অ' এই অক্ষরের অর্থ আত্মার জাগ্রৎ অবস্থা, উহার নাম বিশ্ব উকারের অর্থ—আত্মার স্বপ্নাবস্থা—উহার নাম তৈজস। তেজোময় বা প্রকাশময় বলিয়া তৈজস নাম। 'ম' কারের অর্থ প্রাজ্ঞ অর্থাৎ আত্মার সুষুপ্তি অবস্থা। এই অবস্থাত্রয়াবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, তিনি তুরীয় অবস্থার সহিত অভিন্ন। অতএব জীবকেই প্রণব বলা অসঙ্গত নহে। প্রণব ব্রহ্ম বা আত্মা, সুতরাং জীবই আত্মা বা ব্রহ্ম। উহাকে প্রপঞ্চ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উক্ত জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয় অপ্রকাশিত হয়।

কৈবল্যোপনিষৎ শব্দের তাৎপর্য্য কোনও গ্রন্থবিশেষ বলিলে নির্ভুল উত্তর হইবে না। কেবল শব্দের স্বার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয় যোগে কৈবল্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়, কেবল অর্থাৎ অখণ্ড, অদ্বিতীয়, নির্গুণ চৈতন্য। কেবল এব, কৈবল্য। উপনিষৎ অর্থাৎ সন্নিকটে অবস্থান বা স্থিতি। সম্পূর্ণ অর্থ হইল—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে চিরস্থিত আমার প্রকৃত-স্বরূপ বোধ। তাহাতে চিরস্থিতি।

আমার প্রকৃত স্বরূপ বোধ যে আমার নাই, এরূপ নহে, এরূপ হইতেও পারে না, কিন্তু কোনও কারণে ঐ স্বরূপ-বোধ বিস্মৃত হইয়াছি যে কারণে ঐ বিস্মৃতি, তাহাই অজ্ঞান বা মায়া। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখযোগ্য—যেমন আপন স্কন্ধে গামছা রাখিয়া সেই গামছার অনুসন্ধানে মানুষ নিযুক্ত হয়, গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটাছুটি করে, অস্থির হয়, আমাদিগের আত্মবোধের ভ্রান্তিও ঠিক এইরূপ। এই ভ্রান্তি সুদৃঢ়া ও অনির্ব্বচনীয়া। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। ভ্রান্তিরূপিণী মা তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে স্বরূপ বোধে প্রতিষ্ঠিত কর।

সর্ব্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-বিরাজিত-পদাম্বুজম্

বেদান্তাম্বুজ-সূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

ইতি কৈবল্যোপনিষদে দ্বিতীয় খণ্ডঃ সমাপ্ত।

যন্ত্র-মন্ত্র

—নন্দলাল ভার্গব

বিড়লা মন্দির (বারাণসী)

—অজিতকুমার দত্ত

অপরাহ্ণ —বিশ্ববন্ধু বসাক

মধ্যাহ্ন —মধুসূদন মুখোপাধ্যায়
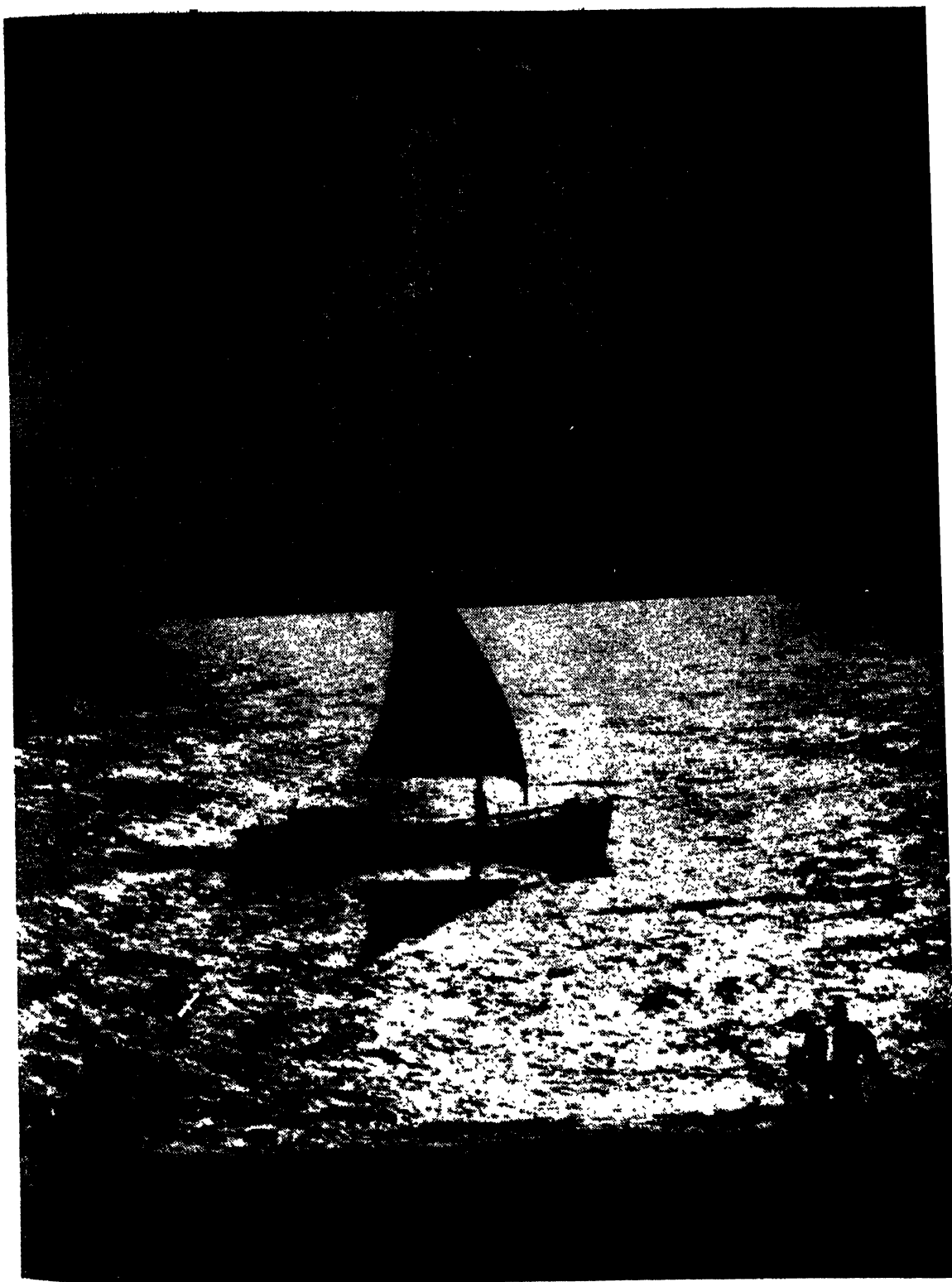
জীব ও শিব —বিশ্বরূপ সিংহ
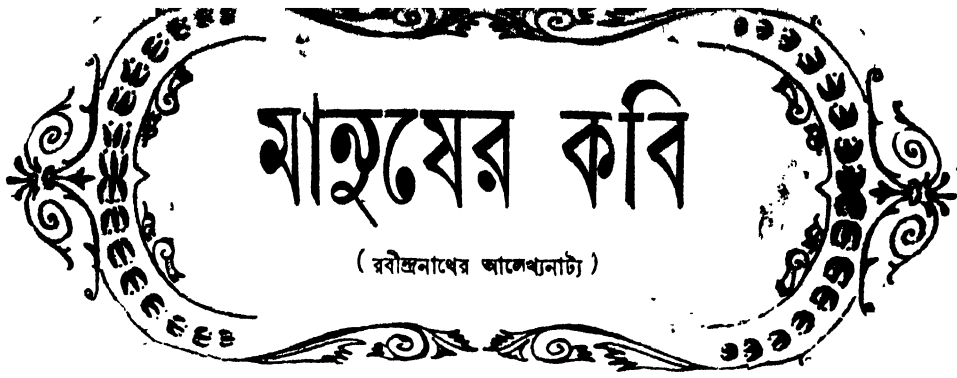
শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

[পাত্রপাত্রীগণ]

[রবীন্দ্রনাথ, জমিদারীর ম্যানেজার, পেশকার, খাজাঞ্চী, জমানবিশ, পুরোহিত, আচার্য, গ্রহাচার্য, অনঙ্গবাবু (শিলাইদহকুঠী বাড়ির Superintendent), অম্বাচরণবাবু (আমীন), লালাপাগলা, গ্রাম্য বালকগণ, শিরোমণি মশাই, বরকন্দাজগণ (বেণী সিং, আহাদালী সর্দার, মেহের সর্দার, তারণ সিং), নিতাই রায় (তহশীলদার), তপ্‌সী মাঝি, প্রজাগণ, মুরলী বৈরাগী, মাধু বিশ্বাস (প্রজা) বসন্ত মণ্ডল, ছেপাতুল্যা ঘরামী, (প্রজা), শিবু কীর্তনীয়া, রসিক দাস (বরকন্দাজ), মন্মথ বিশ্বাস (সম্ভ্রান্ত প্রজা), মৌলবী, হারি মজুমদার। সর্বখেপী, উমাঠাকুরুণ, পুণ্যাবৈষ্টমী।

বিঃ দ্রঃ—রবীন্দ্রজীবনের ১২৯৬ থেকে ১৩১৬ সাল পর্যন্ত পল্লীজীবনালেখ্য।

"আমি মানুষের কবি।
সেথা তার যত ওঠে ধ্বনি,
আমার বাঁশির সুরে—
সাড়া তার বাজিবে তখনি।"

লেখকের "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ" ও "পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ" বই-এর কাহিনী ও ছিন্নপত্রের কতিপয়ের আলেখ্য নাট্য—]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিলাইদহ সদর কাছারীর প্রাঙ্গণ। বিরাট পুণ্যাহ সভা। প্রকাণ্ড হলঘরে পত্রপুষ্পপতাকা-সজ্জিত মাঙ্গলিক পুণ্যাহ অনুষ্ঠান। নহবৎখানায় রসুন চৌকী বাজিতেছে। মাঝে মাঝে মেয়েদের হুলুধ্বনি। প্রজা ও আমলাদের আনাগোনায় কাছারী প্রাঙ্গণ মুখরিত। প্রজাদের জনতা।

১ম প্রজা। ঐ যে বাবু মশাই আসছেন পাল্কীতে (পাল্কী বেহারাদের শব্দ)।

২য় প্রজা। হ্যাঁ, ঐ আসছেন। উঃ বাপ রে পরগণা কুড়িয়ে কত পেরজা এসেছে-রে। কয় বছর ধরে পুণ্যাহ দেখছি, কিন্তু এমন ভিড় তো দেখিনি। যেন চানযাত্রার মেলা বসেছে কাছারীতে।

৩য় প্রজা। এবারে এত ভিড় কেন জানিস লটবর, এবারে নতুন বাবুমশাই পুণ্যাহ করবেন। এর আগে বড়বাবু, জ্যোতিবাবু পুণ্যাহ করেছেন, কিন্তু এমন ভিড় হয়নি। রবিবাবু মশাইকে দেখেছিস ?

২য় প্রজা। দেখেছি, দেখেছি। ছেলেমানুষ,—এই পঁচিশ ত্রিশ বছরের ফিটফাট বাবু! উঃ! কী চেহারা। গায়ের রং দুধে-আলতায়—যেন দেবপুত্তুর। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরি চুল, পটলচেরা চোখ। দু'-দণ্ড হাঁ করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। কথা বলেন যেন বাঁশির সুর।

৪র্থ প্রজা। সেবারে আমি একঝলক দেখেছিলাম। হ্যাঁ, চোখ ফেরানো যায় না। সেদিন কেয়ামদ্দির সঙ্গে কথা বলছিলেন। কেয়ামদ্দি বলছিল—হ্যাঁ বাবুর মত বাবু বটে—কী মিষ্টি কথাবার্তা।

১ম প্রজা। আরে এ্যাত গোলমাল কিসের ? সবাই চ্যাচাচ্ছে, এত ছুটোছুটি হাঁকডাক কেন ? ঐ ছাখ, বরকন্দাজ ছুটোছুটি করছে। কী হ'ল-রে ব্যাপারখানা কি ? ও মুন্সির ভাই, এত গোলমাল কিসের ?

(দ্রুতবেগে জনৈক বরকন্দাজের প্রবেশ)

৩য় প্রজা। (বরকন্দাজকে) কী হল ভাই আহাদালী সর্দার ? পুণ্যাহের মুখে এত গোলমাল ছুটোছুটি কেন ? কী হয়েছে ব'ল তো।

আহাদালী। ভয়ানক গোলমাল। বাবুমশাই চটেছেন, ভয়ানক চটেছেন।

ম্যানেজারবাবু, পেশকারবাবু, খাজাঞ্চীবাবু, জমানবিশবাবু এঁরা সবাই বাবুমশায়কে বোঝাচ্ছেন। বাবুমশাই তর্ক করছেন।

২য় প্রজা। ও-রে বাপরে। নতুন জমিদার; অল্প বয়েস তাই বুঝি চটেছেন ?

আহাদালি। কী জানি। খুব তক্কাতক্কী হলো। যাই কালী চক্কত্তিমশাইকে ডেকে আনি। (গোলমাল বাড়ছে) ওরে চ্যাচাচ্ছিস কেন ? থাম না। কয়েকজন ? কখন পুণ্যাহ হবে নারানদা ? এত দেরী হলো কেন ? (প্রস্থান)।

১ম প্রজা। চল চল, ভিড় ঠেলে, এক ঝলক দেখিগে ব্যাপার কি ! নাঃ এখানে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। (সকলের প্রস্থান)।

—দৃশ্যান্তর—

[সুসজ্জিত কাছারীর—হলঘর। ধূপদীপ জ্বলিতেছে। পুণ্যাহের চিত্রিত কলসী, সোনার মালা, ফুলের মালা, বরণডালা, নূতন কাপড় চাদর, অম্রপল্লব ও ডাবসহ চিত্রিত মঙ্গল কলস। জমিদারবাবুর জন্ম একপাশে উচ্চ মঞ্চে গালিচা, তাকিয়া ফুলদানীসহ মহার্ঘ সুদৃশ্য আসন। পাশে ম্যানেজার, খাজাঞ্চী, জমানবিশের জন্ম আসন। সম্মুখে পুরোহিত। আচার্য, গ্রহাচার্য ও পুণ্যাহপাত্রদের আসন। প্রকাণ্ড ফরাসের কিছু অংশ ধবধবে চাদর পাতা সম্ভ্রান্ত হিন্দু প্রজাদের জন্ম, সতরঞ্চ মুসলমান প্রজাদের জন্ম ও শেষে মাদুর ও চাটাই বিছানো চাষীপ্রজাদের জন্ম।]

রবীন্দ্রনাথ (৩০ বৎসরের তরুণ গরদের কাপড় চাদর পাঞ্জাবী-পরিহিত। প্রবীণ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছেন, পাশেই খাজাঞ্চী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ, আমলা, জোদ্দারগণ, চোগাচাপকান ও ফেজ পরিহিত মুসলমান প্রজাগণ ও মৌলবীগণ, সবাই উদ্বিগ্ন, বিস্মিত)

রবীন্দ্রনাথ। এ সব কী কাণ্ড করেছেন ম্যানেজারবাবু। পুণ্যাহ-সভায় এত হরেক রকম আসনের ব্যবস্থা কেন ? মানুষের বসবার জন্ম এত ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন কেন ? জমিদারের পুণ্যাহসভায় এত জাত বিচার !

ম্যানেজার। এখানে এইরকম ব্যবস্থাই তো চলে আসছে হুজুর। প্রিন্সের আমল থেকে এইরকম প্রথাই চলে আসছে যে,—আপনার জমিদারীর সদর মফঃস্বল কর্মচারী, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, শূদ্রচাষী, সদগোপ বিভিন্ন জাতির জন্ম মুসলমানদের জন্ম পৃথক পৃথক আসনের ব্যবস্থা। এদের জাতি ও সামাজিক মর্যাদা হিসাবে এই রাজসভায় পৃথক পৃথক আসনের ব্যবস্থা। এ হলো এখানকার চিরাচরিত প্রথা। নতুন কিছুই তো করা হয়নি হুজুর।

রবীন্দ্র। জমিদারীর এমন একটা শুভ উৎসবেও আমাদের মিলনে এত বাধা, এত ভেদবুদ্ধি ! জমিদারের কাছে এরা সবাই সমান, এরা সবাই জমিদারীর প্রাণ। চাষীরাই তো জমিদারের শক্তি, রক্ষক, সম্পদ। এরা এই উৎসবে বসবে ঐ মাদুরে ? এরা এতই ঘৃণ্য ? না তা হতে পারে না। সব একাসনে বসবো। তা নইলে আজকের এই উৎসব ব্যর্থ !

ম্যানেজার। এটা প্রজাদের আনুষ্ঠানিক দরবার। এখানে তো কেউ জাতধর্ম খোয়াতে আসেনি। এই রাজসভাতেই তাদের নিজ নিজ সম্ভ্রমের স্বীকৃতি। আবহমান কাল ধরে চলে আসছে ঐ রীতি।

রবীন্দ্র। আবহমানকাল ধ'রে চ'লে আসছে অনেক রীতি,—যেমন চলেছিল সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বলি, কুলীনের বহু বিবাহ, নয়-বছরে গৌরী দান, আরো কত। মানুষ সে বর্বর প্রথাগুলো সহ্য করেনি, ত্যাগ করেছে। আমরা সুসভ্য আর্যঋষির সন্তান বলে গর্ব করি না ? মানুষ মানুষকে পশুর মত অপমান করবে ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ একটা শুভ উৎসবের মধ্যে মানুষে মানুষে এত ব্যবধান সৃষ্টি ! মামুলিগিরি এযুগে অচল। এ কখনো হতে পারে না।

ম্যানেজার। কিন্তু সবাই বিনা প্রতিবাদে এগুলো সহ্য করে আসছে—কেউ তো আপত্তি করছে না ! এখানে উপনীত মানী, অমানী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান একসঙ্গে বসবে কি করে হুজুর ? এত দিনের প্রাচীন প্রথা তো বদলাতে পারবো না।

রবীন্দ্র। হাজার বছরের 'মমি',—তাইতে আপত্তি ওঠে নাই। কিন্তু ওরা মানুষ, নিতান্ত বাধ্য হয়ে এই অপমান সহ্য করছে। জমিদারের শুভ পুণ্যাহের দিনে এই সামাজিক গোঁড়ামী, আবার বিচারের ছুৎমার্গ আমরা চলতে দিতে পারবো না।

ম্যানেজার। তা হলে তো হুজুর, আমাকে চাকরী ছাড়তে হয়। ধর্মে ও সমাজে গুণের পার্থক্য মানীর মানের কোন মূল্য নেই ? মুড়ি মিছরির একদর। এত বয়স অবধি নায়েবী করে যা কখনো দেখিনি—

পেশকার। বাপঠাকুরদার আমল থেকে যে মর্যাদা পেয়ে এসেছি, তা থেকে নেমে এই চাষা-ভুষোদের সঙ্গে বসতে হবে ? অসম্ভব কথা হুজুর।

রবীন্দ্র। বস্তাপচা সামাজিক কুপ্রথার জের আজকের দিনেও টানতে হবে ? এই ভাবে মিথ্যার অবিচারের প্রশ্রয়ের ফলে দুদশ বছর পরে উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোককে কোথায় নামতে হবে জানেন ? আপনারা প্রবীণ, বহুদর্শী, বুদ্ধিমান ! এই বিধি নিষেধের মূলে রয়েছে আপনাদের অভিমান, আপনাদের অহংকার। জানবেন—এই রকম প্রকাশ্য অপমান অবিচার নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা আর বেশিদিন সহ্য করবে না। তারাও মানুষ, মানুষের মত বাঁচতে চায়, তারাও আপনাদেরি মত। তাদের বংশপরম্পরায় পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখা চলবে না। তারা সচেতন হয়েছে—ভণ্ডামী ধরে ফেলেছে।

ম্যানেজার। দেখুন তো খাজাঞ্চীবাবু, আপনি তো বৃদ্ধ হয়েছেন। হুজুরবাহাদুর জমিদারীতে নূতন প্রথা প্রবর্তন করতে চান্। একি সম্ভব ?

খাজাঞ্চী। বাবুমশাই আমাদের তরুণ যুবক। জমিদারীর হালচাল বুঝলেই তিনি শান্ত হবেন। পুণ্যাহের শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। দয়া করে বসুন হুজুর।

রবীন্দ্র। না আমি বসবো না—কিছুতেই বসবো না। এমন একটা শুভ উৎসবে এত বড় বিভেদ সৃষ্টি হতে দেব না। সাধারণ প্রজারা কি এখানে অপমান হবার জন্মে এসেছে ? তারা আমাদের জমিদারীর স্তম্ভ, আমাদের সমান আদরের। এখানে তারা ন্যায় ব্যবহারের আশা করে, এখানে সামাজিক ভেদাভেদের স্থান নেই। ন্যায়, সত্য, বিবেক,—যার উপরে সমাজ জাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে—লোকাচারের ভয়ে, অভ্যাসের বশে, অহংকারের অভ্যাসে তাদের স্বীকার করতে ভীত হলে আপনাদের মর্যাদা, বাড়বে না,—ক্ষুণ্ণ হবে, একদিন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে যাবে। আসুন সব সরিয়ে নিন। শুভ কার্যে বিলম্ব করতে চাই না।

ম্যানেজার। দেখছি জমিদার সরকারকে আর কেউ মানবে না।

রবীন্দ্র। ন্যায়ের মর্যাদা রাখুন, তা হলেই তারা মানবে, সম্মান করবে। আপনারা সম্মানভাজন হয়েছেন, তাদেরও সম্মান দিন হাত ধরে কাছে টেনে নিন, ঘৃণা করবেন না—তা হলেই সত্যিকারের সম্মান পাবেন, ওরাই আপনাদের শক্তি মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে। নইলে মনে মনে হিংসা পোষণ করবে।

(জনতার অসহিষ্ণু গুঞ্জন)

৩য় প্রজা। শুনছিস কলিমুদ্দি বাবুমশাই কী বলছেন! জমিদার প্রজার মা বাপ, এটা হক কথা। বাবুমশায়ের কথাগুলো কি মিষ্টি শুনছিস?

২য় প্রজা। সত্যিই। বাবুমশার কী ন্যায় বিচার ছাখ।

গ্রহাচার্য। হুজুর, পুণ্যাহের শুভক্ষণ উত্তীর্ণ প্রায়।

রবীন্দ্র। না—শুভক্ষণ সমাগত। আমার অনুরোধ, তোমরা সবাই এসো, কল্যাণবুদ্ধিকে জাগাও পচা মামুলী ছাড়ো। এ সমস্ত সরিয়ে একটা ঢালা ফরাস বানিয়ে দাও। পুণ্যাহ আরম্ভ হোক।

ম্যানেজার। এতে জমিদারের মান সম্ভ্রম রসাতলে যাবে, সব একাকার হয়ে যাবে।

রবীন্দ্র। জমিদারের মান সম্ভ্রম বাড়বে। জমিদার ধর্মের মর্যাদা, ন্যায়ের মর্যাদা রাখতে বদ্ধপরিকর,—শুধু মুখের কথা নয়, এই সার সত্যটা এই শুভ উৎসবের দিনে প্রজাসাধারণকে বুঝতে দিন, রাজা প্রজার মধুর সম্পর্ক ভেদ সৃষ্টি করে নষ্ট করে দেবেন না। তোমরা সবাই এসো। আমি নূতন পরগণায় এসেছি, জমিদারীর প্রজা সাধারণের সঙ্গে আমার পরিচয় হোক সেই জন্যই তো এই শুভ উৎসবের অনুষ্ঠান তোমরা এসব গালিচা চেয়ার সরিয়ে নাও, ঢালা ফরাস বিছিয়ে দাও, আমরা সবাই একাসনে বসে আলাপ করি, উৎসব করি তবেই তো উৎসবের আনন্দ সার্থকতা (হঠাৎ ভোজবাজির মত সমস্ত আসনের পরিবর্তন হয়ে গেল, উৎসব স্থান নতুন করে ফরাসে রূপান্তরিত হল)।

রবীন্দ্র। এই তো বেশ হয়েছে, চমৎকার। এসো, শাঁখ বাজাও, সবাই এসো পুণ্যাহ পাত্ররা এসো, ম্যানেজার বাবুরা আসুন। পুরুৎ ঠাকুর আরম্ভ করুন। (নিজে আসনে বসিয়া) আসুন সবাই।

পুরোহিত। (শান্তিপাঠ)

সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্বেসন্তু নিরাময়ঃ
সর্বান ভদ্রান্ পশ্যন্তি মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্‌ভবেৎ।"
ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

(শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি ও নহবৎ বাজিয়া উঠিল, পুণ্যাহপাত্রেরা সামনে এলেন)

রবীন্দ্র। আজ আমার জমিদারীর এই শুভ পুণ্যাহ উৎসবে হাজার হাজার প্রজাকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে আনন্দে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছে। আমি এসেছি নূতন, আমার ইচ্ছা,—নূতন করে আমাদের জমিদারী গড়ে তুলব। তোমাদের সুখদুঃখ, উন্নতি অবনতি অনেকটা আমাদের উপরে নির্ভর করছে। কারণ আমি তোমাদের ভূস্বামী। ভূস্বামীর দায়িত্ব আমি পালন করব। তোমরাই আমাদের শক্তি—আমাদের কল্যাণ। তোমাদের লালন পালন করা আমার প্রধান কর্তব্য; তোমরা আমায় শক্তি দাও, সহায় হও—আমি যেন তোমাদের কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারি। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাকে সেই শক্তি দিন, মনোবল দিন। আজকের এই শুভমিলন সার্থক হোক্—আনন্দময় হোক্—শুভমস্তুঃ।

(হুলুধ্বনি, শঙ্খনাদ নহবৎবাদন অন্তে আচার্যের উপদেশ)

আচার্য। "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যকজ্ঞানেন
যেনাক্রমন্ত্য ষয়োহ্যাপ্ত কামা যত্র তৎসতস্য পরমং নিধানম॥"

পরমেশ্বর আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি চান্ যে আমরা উন্নত হয়ে পুনরায় তাঁর নিকট গমন করি। তিনি আত্মাকে যেমন অবস্থায় দিয়েছেন, তাকে তার থেকেও উন্নত ও পবিত্র করে তাঁকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই সে কাজ করতে হবে। মানুষ নিজেকে বশীভূত ও শিক্ষিত করেই আপনার মহত্ব সাধন করে। সেজন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টা ও পরিশ্রম করা আবশ্যক। শরীর পোষণ, অর্থোপার্জন, বিদ্যাভ্যাস, ধর্মপালন, আত্মজ্ঞানলাভ, সকলই আমাদের নিজেদের যত্ন ও চেষ্টাসাপেক্ষ। প্রতিপদে সংগ্রাম করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ নায়মাত্মাবলহীনেন লভ্য।" বলহীনকে শক্তিহীনকে মঙ্গলময় কৃপা করেন না। ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করে কুপ্রবৃত্তিগুলো অতিক্রম করাই আমাদের স্বাধীনতা লাভের পথ। পদে পদে বাধা আছে সত্য, সেগুলো অতিক্রম করে কর্মযোগী হতে হবে? ওঁ-তৎ-সৎ-ওঁ ওঁ পিতানোহসি। (হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও নহবৎ বাদ্য—পরে পুণ্যাহের অন্যান্য অনুষ্ঠান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি। ভবনের সম্মুখে পাকা প্রাচীর বেষ্টিত প্রকাণ্ড গোলাপের বাগান, থরে থরে গোলাপ ফুটেছে। প্রাচীরের পাশেই ফলের বাগান। সামনে লোহার গেট ও দারোয়ানদের ঘর। সময়—অতি প্রত্যুষ, সূর্যোদয় হয় নাই। শারদীয় পুজার সময়, দূরে ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে। কুঠিবাড়ী নির্জন ঘুমন্ত। চারজন গ্রাম্যবালক (বয়স ১০।১২) ফুলের সাজি ঝুঁড়ি ইত্যাদি নিয়ে গেটের বাইরে বাগানের দিকে চেয়ে উকিঝুঁকি মারছে।

১ম বালক। গোলাপবাগানে ঢোকবার পথ বন্ধ। ওদিকে দারোয়ানদের ঘর। এইদিকে আয়, বাগানের এই কোণে ছোট্ট আর একটি গেট আছে, দেখতো, সেটা বন্ধ নাকি?

২য় বালক। আমি দেখছি দাঁড়া। সেই গেট দিয়েও বাগানে ঢোকবার পথ আছে। আমি জানি। (একটু ঘুরে দেখে) —হ্যাঁরে হ্যাঁ—গেটটা খোলা।

৩য় বালক। খোলা? হি-হি-হিঃ। মজা করে গোলাপ তুলবো। চলে আয়। দেখছিস—গোলাপের বাহার? টপাটপ তুলবো। (আনন্দে হাস্য)

৪র্থ বালক। অত জোরে হাসিসনি কালী, দারোয়ানরা জাগলে ধরে নিয়ে যাবে। ধরা পড়লে বড় বিপদ! চুপচাপ ঢুকে পড়।

২য় বালক। উঃ, কত গোলাপ ফুটেছে রে কী ফুর্তি। সাবধান হাবুল, গোলাপের কাঁটা সাবধান! কাপড় মালকোঁচা বাঁধ।

১ম বালক। আমাদের বরাত ভালো। কথা কোস নে। আস্তে

আস্তে গেটের দরজা খোল, শব্দ হয় না যেন। গোলাপ দিয়েই সাজি ভর্তি করব।

৪র্থ বালক। সাবধান ভুতু। আমার হাতা গুঁজে নে। আয় আমার সঙ্গে।

৩য় বালক। সাবধান কানাই, বেশী লোভ কোরো না, সূর্যি ওঠার আগেই কাজ সেরে পালাতে হবে। বাবুমশাই এখন নাই, দারোয়ানরা ঘুমুচ্ছে। এই সুযোগে বুঝলি তো—টপাটপ তুলবি।

১ম বালক। এখন পূজার ছুটি; বাবুমশাই তো নেই, তবে আর কি? কাছারীরও ছুটি। সব নাক ডাকিয়ে ঘুমোক। এদিকে আমরা কাজ সারি আয়।

২য় বালক। ধেৎ বোকা! বাবুমশাই কি ইস্কুলের ছাত্তর। ছুটি থাক বা নাই থাক, তিনি এখন এখানে থাকতেও তো পারেন। যাক! বেশী কথাবাত্রা দরকার নাই, ঢুকে পড় বেণী সিং বড় কড়া বরকন্দাজ।

৪র্থ বালক। সবাই নিঝুম মার। এই ভুতু, তুই কাসছিস? এই হয়েছে।

৩য় বালক। (কাশিতে কাশিতে কাশী বন্ধ করিয়া) না আর কাশবো না। চল চল—দেরি করছিস কেন? গেট তো খোলা পড়ে আছে। (হঠাৎ কিছু দূরেই গলা খাঁকারির শব্দ শোনা গেল) ঐ রে—হয়েছে কম্ম। শুনছিস বাবুমশায়ের গলা খাঁকারী? এখন উপায়?

১ম বালক। তবে চটপট আয় (পুনরায় গলা খঁ্যাকারীর শব্দ) ঐ রে:, বাবু মশাই তো খুব ভোরে ওঠেন। এখন ধরা পড়বার আগে পালাবো নাকি?

৩য় বালক। পালাবো? এতদূর এসে?—আচ্ছা—এদিকে আয় এই গাছগুলোর আড়ালে লুকোই। এখান থেকে পালানো সোজা কথা নয়। (এমন সময় একজন দরোয়ান ও কুঠীবাড়ীর superintendent অনঙ্গ বাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ)।

দরোয়ান। ছেলেরা ঢুকেছে তো। বেণী সিং ধরো তো—ধরো তো—

অনঙ্গবাবু। আরে, তোমরা দেখছি বাবুদের বাড়ির ছেলে। তোমরা এতদূরে, ফুল তুলতে এসেছ? গাঁয়ের মধ্যে ফুল নেই? (ছেলেরা অত্যন্ত ভীত হইল)।

রবীন্দ্র। (ছেলেদের ভীতসন্ত্রস্ত মুখের দিকে খানিক চেয়ে হো-হো করে হেসে উঠলো)। তোমরা ফুল তুলতে এসেছ এ্যাত দূরে? গ্রামের মধ্যে ফুল নেই? বুঝেছি,—এসেছ গোলাপফুলের লোভে? (ছেলেদের মাথায় হাত দিয়া) কিগো খোকারা? কথা কইছ না যে—গোলাপফুলের জন্তেই এসেছ?

(ছেলেরা নিরুত্তর আরো ভীত সন্ত্রস্ত)

অনঙ্গ। ঐ যে প্রাচীরের পাশে জবাফুল, রঙ্গনফুল, স্থলপদ্ম ফুটে রয়েছে। ঐগুলো তুলে নিয়ে যাও। তোমাদের বাড়িতে তো পুজো? অনেক ফুল হবে।

রবীন্দ্র। (ছেলেদের নিরুত্তর দেখে আবার উচ্চহাস্যে) বুঝলে না—ওদের গোলাপ ফুলের লোভ। গ্রামের মধ্যেও তো অনেক ফুল আছে। গোলাপ ফুলের লোভ কি জবাফুলে মেটে? কী বল খোকারা (ছেলেরা নিরুত্তর)।

অনঙ্গ। বাগানে ঢুকোনা খবরদার। ঐসব ফুল নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও খোকারা।

রবীন্দ্র। কী বলছ অনঙ্গ? ওরা এত ভোরে এত দূরে এসেছে? গোলাপফুল না নিয়ে কি করে ফিরবে! (ছেলেদের মাথায় হাত দিয়ে) যাও খোকারা বাগানে গিয়ে গোলাপ তোলোগে, দেখো যেন ডাল টাল ভেঙো না। (আবার উচ্চহাস্য) যাও, কোন ভয় নেই তোমাদের। গোলাপ তোলো গে। চলো অনঙ্গ। (ছেলেরা গোলাপ তুলিতে লাগিল রবীন্দ্রনাথ অগ্রসর হলেন) বা: এবারে বর্ষায় দীঘিতে বেশ জল হয়েছে তো!

অনঙ্গ। অনেক জল হয়েছে। কিছু মাছ ছেড়েছি। ভেতরের দীঘিটাতে মাছ ছেড়েছি।

রবীন্দ্র। চলো, বোটটা দেখে আসি। ও বেলা বোটে যাবো। তপসী রামগতিকে খবর দাও। (নেপথ্যে লালা পাগলার চীৎকার শোনা গেল, ভোরের আলো দেখা দিয়েছে)।

নেপথ্যে লালা পাগলা। এ্যাই, তোদের সব নেমন্তন্ন। জবর জিয়াফৎ। লুচি পোলাও সন্দেশ রসগোল্লা। পেট ভরে খাবি। চলে আয়, চলে আয় সব—!

রবীন্দ্র। চীৎকার করছে কে? সেই পাগলাটা বুঝি?

অনঙ্গ। সেই কালোকার লালা পাগলা হুজুর। আপনি এসেছেন, খবর পেয়েছে। পাগলাটা এসেই গোলমাল বাধাবে।

(লালা পাগলার প্রবেশ, কাঁধে প্রকাণ্ড আখ)

লালা। হাঁইও! সরে যা, সরে যা! দেখছিস্ না বাবুমশাই আসছেন। কানা নাকি? (দীর্ঘ সেলাম দিয়ে হাতজোড় করে) হুজুর বাহাদুর এসেছেন। আমি টেলিগেরাম পেয়েছি। তাইতে সেলাম দিতে এলাম। সেলাম হুজুর!

রবীন্দ্র। ভাল আছিস তো? চ্যাচাচ্ছিলি যে। কোথাও ভোজটোজ আছে না কি? ব্যাপার কি? ভাইরা আর মারে না তো?

লালা। মারে না? কাল ফজোরে অছিমদ্দি আমায় লাঠি পেটা করেছে হুজুর। তাই নালিশ জানাচ্ছি। আবার বলেছে, আমার হাতে পায়ে বেড়ি দেবে। হুজুর বিচার করুন! ওকে জুতো পেটা করুন। ভারী পাজী।

রবীন্দ্র। সত্যি তোকে মেরেছে? কী করেছিলি তুই?

লালা। কিছু না। কোদালটা ভেঙেছিলাম। তাইতে আমার উপর রাগ।

হুজুর, আমি আপনার মুজুর!
পাকা দাড়ি ধরে, মিথ্যা কথা কবো কেমন করে?

হিঃ হিঃ হিঃ! হুজুরকে আরো ছড়া শোনাবো। অনেকদিন শোনেন নি। (পায়ে হাত দিয়ে আবার সেলাম) শুনবেন হুজুর, মজাদার ছড়া জানি।

রবীন্দ্র। শোনা তোর ছড়া। দাড়ি রেখেছিস যে! তোর তো দাড়ি ছিল না।

লালা। দাড়ি না রেখে পারি? হুজুরের মুখে দাড়ি আছে যে—কেমন সোন্দর দাড়ি। হুজুর আমার পয়গম্বর। দেখুন না, মোল্লারা দাড়ি রাখে ছাগলা দাড়ি। হিঃ হিঃ হিঃ আমি ওদের খ্যাপাই। তাই আমার দেখলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে। ছড়া শুনুন, হুজুর।

সত্যি কথা হুজুর, আমি আপনার মুজুর,
পাকাদাড়ি ধরে মিথ্যে কথা কবো কেমন করে।
দয়াল বিনা সবাই যেতাম মরে।
আরো শুনবেন ? মজাদার ছড়া—হিঃ হিঃ হিঃ—
ভাগে আলেন হুজুর বাহাদুর
সগোল পেরজার দুঃখু হল দূর,
গোলায় উঠলো ধান। বরোজ ভরা পান
তাই খাচ্ছি মজা কর্যা মুড়ি চিড়া গুড় ॥
মরি হায়-হায় রে। (নৃত্য)।

রবীন্দ্র। বাঃ, বেশ ছড়া বেঁধেছিস তো। চমৎকার! চল্ নদীর ধারে যাই, বোট দেখে আসি।

লালা। হুজুর জিজ্ঞাসা করি, এ্যাতবড়ো রাজবাড়ি থাকতে পদ্মা গাঙে ভোটে কেন থাকেন? বাদলবৃষ্টি জল ঝড় রোদ,—কতো বিপদ! হুজুর রাজামানুষ, রাজবাড়িতে থাকবেন মজা করে তা-নয়। গাঙের মদ্দি একলা ওকলা! হুজুর বাহাদুরের এ কী খেয়াল, তা তো বুঝি না।

রবীন্দ্র। পদ্মার চর, বাদলা বৃষ্টি রোদ—আমি খুব ভালোবাসি। আমি কলকেতা ছেড়ে আমার পদ্মাকে দেখতে ছুটে আসি। পদ্মা আমার কাজ ভুলিয়ে দেয়, আমায় ডেকে আনে কোলের মধ্যে।

লালা। এবারে বুঝেছি। হুজুর মুসাফির মানুষ। তাইতেই তো এত ভালবাসি। তবু দেখুন, গাঁয়ের লোকে আমায় বলে পাগল। হাঃ হাঃ হাঃ আমি পাগোল। যারা বলে তারা হচ্ছে ছাগল।

রবীন্দ্র। ঠিক বলেছিস্। রোদে রোদে ঘুরিস নে। কাউকে মারধোর করবি নে। বুঝলি।

লালা। হুজুরের হুকুম, গোলাম তাই করবে (মাথায় গামছা বেঁধে) হুজুর বাহাদুরের সেবার জন্যে কী সোন্দর বোম্বাই কুসুর (আখ) এনেছি, ভারি মিষ্টি হুজুর; ওসমান সেখের খেতের কুসুর,—গাঁয়ের সেরা। (লাঠির মত আখ মাথায় ঘুরাইয়া) বেণী সিং নাও ভাই, হুজুর বাহাদুরকে খেতে দিও। (বেণী সিংকে আখ দিয়া) হুজুর, এ বান্দার উপর কি হুকুম হয়।

রবীন্দ্র। তুই ছড়া বাঁধবি আর আমায় শুনাবি! খবর্দার, গাঁজা খাবিনে।

লালা। জো হুকুম। আজ আমায় পায় কে! আজ আমি লালচাঁদ মালথে, কালোয়া গাঁয়ের মাতবর! সবাই আমায় সেলাম দে—সেলাম দে ব্যাটারা। দেখছিস্ না লালচাঁদ মিঞা—হেঁজিপেঁজি নয়। হুজুর, আমায় একটা বরকন্দাজি চাকরী দেবেন। আমি দুষ্ট পেরজাদের সব ঠাণ্ডা করে দেব, কালোয়া গাঁয়ের সবাই পাজীর ধাড়ি।

রবীন্দ্র। না-না কাউকে মারধোর করিস নে। কেবল তুই ছড়া বাঁধবি। তুই খুব ভালো।

লালা। হুজুর, হক্ কথা বলেছেন। লাল মিঞা ভাল লোক, খাঁটি মোছলমান। হুজুর, আমি আগের জন্মে রুমীর বাদসা ছিলাম। মরে চাষার ঘরে পয়দা হয়েছি। এবার মরে বাবু মশায়ের ছেলে হ'য়ে জন্মাবো। হুঁ হুঁ বাবা, সোজা কথা নয়। কেউ আমায় পাগল বলে ঘেন্না করলে, ঠাস্ করে গালে দেব চড় কসিয়ে—হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি। এই বলে দিচ্ছি!

রবীন্দ্র। তুই খুব ভালো। কেউ তোকে ঘেন্না করবে না। তোকে জমি দেবো। তুই বাড়ি করবি, চাষবাস করবি—জোদ্দার হবি।

লালা। হিঃ হিঃ হিঃ। হবোই তো,—হুজুরের হুকুমে গাঁয়ের মাতব্বর হব। বড় শীত হুজুর, দেখুন এই ছেঁড়া কাঁথা। একখানা কাপড়-টাপড় পেলে—হিঃ হিঃ।

রবীন্দ্র। বেণী সিং, ওরে পুরোণো র‍্যাগটা দিয়ে দিস্।

লালা। এই তো হুকুম হয়ে গেল। হ্যাঁ—বাড়িতে আমায় দুবেলা পান্তা ভাত দেয় হুজুর। আমি এখানে হুজুরের পেসাদ পাবো। এইবারে একটা গান শোনাবো—খু—ব ভালো গান—মুকুন্দ কামারও গায়—হি-হি-হি।

(গান)

আমার দয়াল জমিদার, (হায়) নাই তুলনা তার—
তার মুখখানি হয় চাঁদের নাগাল হাত দুটি সোনার।

(উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

শিলাইদহ বুনাপাড়ার রাস্তা। আমীন অম্বাচরণ মৈত্র মাঠ থেকে ফিরছেন, সঙ্গে বরকন্দাজ। অপরদিক থেকে হন্ হন করে চক্রবর্তীর প্রবেশ, তাহার মুখে বিরক্তি, বকতে বকতে—

চক্রবর্তী। কী, আমায় তাড়িয়ে দিল! বেশ, যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাবো। দেখবো তোরা কত সুখে থাকিস। যজমানগিরি করবো না তো করবো কি? তোর কোন্ বাবা আমায় ন'শো পঞ্চাশ দেবে? নাঃ, আর বাড়ি মুখো হ'চ্ছিনে। মরগে তোরা। আমার কি? যাঁহা রাত তাঁহা কাত! তোদের আর মুখদর্শন করব না।

অম্বাচরণ। কোথায় চলেছ চক্কোত্তি? অত ব'কছ কেন? বৌএর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? সত্যি, তোমার বউটা বড় দজ্জাল।

চক্রবর্তী। হেঁ—হেঁ—এই যে আমীনবাবু, দেখা হল ভোর বেলাতে। ভালই হল! দেখুন, আর তো পারিনে আমীনবাবু।

অম্বা। কেন কি হয়েছে?

চক্রবর্তী। যজমানীবৃত্তিতে তোর আর চলে না। লাউ-কুমড়ো শাকের ডাঁটা বাদে সবই কিনে খেতে হয়। একরত্তি জমাজমি নেই। যজমান বাড়ি ফুলজল ছিটিয়ে কি সংসার চলে? জমি করতে হলে তো টাকা চাই, আবার তদ্বির তাগাদাও চাই। তাও যে কিছু জানিনে আমীনবাবু, জানি শুধু গাঁয়ে গাঁয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে লক্ষ্মীপুজা ষষ্ঠী পুজোর মন্তর পড়তে, যে যা দেয় তাই নিয়ে পোঁটলা বাঁধি। সেদিন ম্যানেজারবাবুর কাছে কত কাঁদাকাটি করলাম, নায়েববাবুর পেছনে পেছনে কত ঘুরলাম। কিন্তু জমি পাবার হদিস কেউ দিতে পারলেন না। ঘোরাঘুরিই সার।

অম্বা। তাই তো হে চক্কোত্তি। গোটা কুড়ি পঁচিশ টাকার জোগাড় করতে পারতো চেষ্টা দেখতে পারি। মাদারতলার জমি মাপছি। দু'চার বিঘে হতেও পারে।

চক্রবর্তী। কু-ড়ি-প-চি-শ-টাকা। ওরে বাপরে! কুড়ি-পঁচিশটে পয়সা জমাতে পারি না। তা হলে কি করা যায় বাবু! টাকাই যদি থাকবে, তবে এমন হাড়ির হাল হবে কেন! বাবুমশাইকে ধরতে কত্তো চেষ্টা করছি। কিন্তু এ্যাত

লোকের ভিড়, তার উপরে পাগড়ী মাথায় তকমা আঁটা বরকন্দাজরা চব্বিশ ঘণ্টা বোটের কাছে মোতায়েন থাকে,—হাপিত্তেসে বোটের কাছে ঘুরি, ওরা হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসে। অনুনয় বিনয় করলে পাগল ঠাউরে ঠাট্টা করে। এখন কি করি বলুন তো।

অশ্ব। তাই তো চক্কোত্তি। খোদ মালিকের সঙ্গে দেখা করতে পারলে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হতে পারে। আমাদের হাতে তো দানখয়রাতের ক্ষমতা নেই।

চক্রবর্তী। কী করে বাবুমশাইকে ধরবো,—একটা উপদেশ দিন।

অশ্ব। তবে শোনো চক্কোত্তি। বাবুমশাই বোটে আছেন। বোট এপারে থাকলে আমলা ফয়লা পাইক পেয়াদা ডিঙিয়ে তাঁর কাছে হাজির হওয়া তোমার কর্ম নয়। সাঁতার জানো নিশ্চয়ই।

চক্রবর্তী। জানি বৈকী পদ্মাপারের লোক, সাঁতার জানিনে? কি করতে হবে বলুন।

অশ্ব। শোনো। বাবুমশাই দুপুরবেলা চরের ওপারে বোটে একা বসে নির্জনে লেখা পড়া করেন। সেই সময়ে তাঁর সামনে হাজির হতে পারবে?

চক্রবর্তী। বেশ, আমি এপার থেকে সাঁতরে চরের কাছাকাছি গিয়ে আবার সাঁতরে তাঁর বোটে হাজির হতে পারি।

অশ্ব। পারবে পদ্মা সাঁতরাতে?

চক্রবর্তী। পারতেই হবে। এত মন্তর পড়ি, ফুল জল ছিটাই। এটাও পারতে হবে।

অশ্ব। তাই কর। পদ্মা সাঁতরানো সোজা কথা নয়। সাবধান। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। (প্রস্থান)।

চক্রবর্তী। না, আর দেরী নয়? কাল দুপুরেই যাবো বাবুমশায়ের বোটে। যা থাকে কপালে। এই হলো মোক্ষম উপায়। এ বাবুদের খোসামুদী করে জাতও যাবে পেটও ভরবে না। (দূর থেকে সর্বখেপী বোষ্টমী গাইতে গাইতে যাচ্ছে)

(সর্বখেপীর গান)

অরুণ কিরণ খানি তরুণ অমৃত ছানি
কোন বিধি নিরমিল দেহা—

(হায়, এমন রূপতো দেখিনিরে—গৌর রূপে চোখ জুড়ালো)।

চক্রবর্তী। খেপী দিদি যে। খেয়া পার হয়ে আসছ বুঝি? কোথায় গেছিলে?

সর্বখেপী। গেছিলাম জাহেদপুরে শিষ্য বাড়ি। সেখানে শুনলাম,—বাবুমশাই এসেছেন, বোটে আছেন। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে এলুম। রজনীগন্ধার মালা গেঁথেছিলাম, তাঁর গলায় পরিয়ে এলুম।

চক্রবর্তী। তোমার খুব ভাগ্য খেপি দিদি—তুমি বাবুমশায়ের সঙ্গে গল্প করো, গান শোনাও। তুমি ভাগ্যবতী। তুমি যখন তখন গেলেই তাঁর দেখা পাও?

সর্বখেপী। পাই বইকি। পেরথম পেরথম ঐ বরকন্দাজের দল আমায় আটকাতো। আমি ওদের মানতুম না—পড়পড়িয়ে বাবুর কাছে চলে যেতুম। সোজা জিজ্ঞাসা করতুম—তোমার ঐ লোকেরা আমায় ঠ্যাকায় কেন? বারণ করতে পারো না? অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে বললেন—না, তোমায় ঠ্যাকাবে না। তুমি সময় পেলেই চলে এসো। আমি খুশী হব। (গুন গুন গান)—

গৌর সুন্দর মোর
নদীয়া নগরে কখন আইল আমারি সে চিতচোর।

চক্রবর্তী। হু-হুঁ! তুমি বাবুমশাইকে যাদু করেছ বোষ্টমী।

খেপী। তা হবে। বাড়ি যাই, বেলা হল।

(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

চক্রবর্তী। আমিও অমনি পড়পড়িয়ে যাবো বাবুমশায়ের কাছে, কালই। (প্রস্থান)

—দৃশ্যান্তর—

মাঝ পদ্মায় রবীন্দ্রনাথের বোট নোঙর করা। বোটের মধ্যে কবি নির্জনে লেখাপড়া করছেন। দুপুরবেলা, ঝাঁঝাঁ করছে রোদ। দূরে বরকন্দাজরা জালিবোটে বিশ্রামরত। হঠাৎ বোটখানা খুব কেঁপে উঠলো। রবীন্দ্রনাথের লেখার টেবিল নড়ে উঠল।

রবীন্দ্র। (চমকিয়া) একী হল! কে আছিস—দেখ তো। এখনো কাঁপছে বোটখানা। কে আছিস—তোরা—(বাহিরে এসে সর্বাঙ্গ জলেভেজা চক্রবর্তীকে দেখে বিস্ময়ে) কে তুমি? কি চাও? তুমি কি পদ্মা সাঁতরে এসেছ? কোন ভয় নাই বল, কি হয়েছে।

চক্রবর্তী। (হাউমাউ করে কেঁদে) আমি হুজুর, বড় গরীব। কাচারীপাড়াতেই আমার বাড়ি,—আমলাবাবুরা আমায় খুব চেনেন। আমি বড় দুঃখী হুজুর (পা ধরলেন)।

রবীন্দ্র। তুমি পদ্মা সাঁতরে এসেছ। খুব সাহস তো তোমার। কী হয়েছে বল।

চক্রবর্তী। হুজুর আমি বড় গরীব। এক ছটাক জমি নেই আমার। সংসারে পরিবার আর তিনটি ছেলেমেয়ে। খেতে পাই না। যজমানী করি কুরি আর হেলেরৈ পাড়ায়। ফুল জল ছিটাই, মন্তরও পড়ি খুব, কিন্তু ট্যাঁকে পয়সা আসে না—আসে চাল কলা নাড় বড়ি—আর ভিখিরি বিদায় দু'চার আনা দক্ষিণা। আমার জমি কেনবার মত টাকা নেই। কোথায় পাব? পেট ভরে খেতে পাই নে।

রবীন্দ্র। তুমি যজমানী কর? লেখাপড়া তো করনি, সংস্কৃতও শেখনি। তবে অত মন্ত্রতন্ত্র পড়ো কেমন করে?

চক্রবর্তী। (সদর্পে) হুজুর, দেহে ব্রহ্মরক্ত রয়েছে। মন্ত্রপড়ায় কেউ আমার সঙ্গে আঁটতে পারে না। আমি নীলমাধব পণ্ডিতের কাছে সাকরেদী করে একেবারে দশকর্মান্বিত পুরুৎ হয়েছি। এতদ্দেশের কুরি আর হেলে-রই পাড়ায় আমি সাক্ষাৎ বিশ্বামিত্র ঋষি। সে পাড়ায় আর কোনো পুরুতের কলকে পাবার জো নাই।

রবীন্দ্র। (হো-হো করে হেসে) তবে তো দেখছি তুমি পাকা পুরুৎ ঠাকুর। ব'স ব'স। তোমার কথা শুনছি। আগে একটা মন্ত্র মুখস্থ বলে শোনাও, দেখি তুমি কেমন পণ্ডিত।

চক্রবর্তী। (বসিয়া) হুজুর, এই সেবারে জোষ্ঠি মাসে মহেশ পরামানিকের মেয়ের বিয়েতে আমি বরপক্ষের পুরুৎ ছিলাম। কন্যাপক্ষের পুরুৎ,—তিনি আবার একচোখ কানা,—লম্বা টিকি নেড়ে নস্যি নিয়ে—এমন মন্তর উচ্চারণ করছিলেন যে সপ্তপুরুষ কন্যাপক্ষের নরককুণ্ডে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করছিলেন। অসহ্য হল। আমি তাঁর ক্রিয়াপদগুলোর ভুল ধরে সংশোধন করে দিলুম। আর যাবে কোথায়। ধস্তি ধস্তি রব পড়ে গেল বিয়ের আসোরে।

ললিত পণ্ডিত বসে তামাক খাচ্ছিলেন তিনি বললেন, ওহে যষ্ঠি ঠাকুর একজন দশকর্মান্বিত পুরোহিত। ওর সঙ্গে ফাটিফুটি চলবে না। ও খোলাকাটা পিণ্ডিগেলা বামুন নয়। নীলমাধব ভট্টাচার্য আমার গুরু (উদ্দেশে প্রণাম) তিনি বলতেন মন্ত্রসিদ্ধ হয় সংস্কৃত শুদ্ধ উচ্চারণে। তাই আমি তাঁর কাছে একটু আধটু মুগ্ধবোধ আউড়ে নিয়েছিলাম। কেউ আমার মুখের দাপোটে এগোয় না হুজুর।

রবীন্দ্র। উঃ, তবে তো দেখছি তুমি রীতিমত সংস্কৃতজ্ঞ পুরুৎ। এত পুজো আচ্ছা করে উপযুক্ত দক্ষিণা পাও না। দুঃখের কথা বটে।

চক্রবর্তী। ভিখিরি বিদায়, হুজুর, ভিখিরি বিদায়। কলিতে কি হিঁদুয়ানী আছে ? আমি একরাত্রে তেত্রিশখানা লক্ষ্মীপুজো সেরে রাত তিনটেয় বাড়ি ফিরেছি ? এই তো সেদিন—বনমালী হালদারের বাড়িতে কালীপুজার রাত্রে বলির পাঁঠা আটকে গেল। বনমালী তার পুরুৎ বিদেয় করে দিয়ে হাউমাউ করে আমায় জড়িয়ে ধরল। আমি কি করি! আরম্ভ করলাম মায়ের পুজো নতুন করে। বলির সময় বাছুরের মত এক পাঁঠা হাজির করল হাড়ি কাঠে। আমি মন্তর পড়লাম। আর এক কোপে,—হুজুর—খ্যাঁচ,—পাঁঠার মাথা দুকোশ দূরে ছিটকে পড়ল।

রবীন্দ্র। (হো হো করে হেসে) পাঁঠা দুখানা হয়ে গেল! তোমার মন্ত্রের খুব জোর আছে দেখছি। আচ্ছা, আমায় একখানা মন্ত্র শুনিয়ে দাও তো।

চক্রবর্তী। হুজুরের আজ্ঞা শিরোধার্য। (কেশে গলা পরিষ্কার করে) হুজুর, সব দেবতার আগে গণেশের পুজা, তিনি সিদ্ধিদাতা কিনা! তাই গণেশের ধ্যান পড়ছি—(হাত জোড় করিয়া আবৃত্তি—

ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
পঞ্চন্দমদগন্ধলুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলং।
দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দুরঃ শোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং ।।

(টিকিশুদ্ধ মাথার ঝাঁকুনী ও অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ হাসতে লাগলেন, চক্রবর্তী হাঁফাতে হাঁফাতে "সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ।")

রবীন্দ্র। বেশ, বেশ, মন্ত্রটা তুমি আওড়ালে বটে। মন্ত্রটার মানে জানো ?

চক্রবর্তী। আজ্ঞে হুজুর, মুখ্যুসুখ্যু লোক, তাই বলে এর মানে জানিনা ? এই শুনুন—

"স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং"—ইয়া শুঁড় যেন হাতি (বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে অদ্ভুত বাক্যবিন্যাসে মন্ত্রটার অর্থ বোঝাতে লাগল।

রবীন্দ্র। বাঃ বেশ! বেশ! (হাসতে হাসতে চেয়ার সরিয়ে বসলেন)।

চক্রবর্তী। (রণজয়ী বীরের মত) এসব সাকরেদী করা বিত্তা হুজুর —কোনও তর্কালঙ্কারের সাধ্য নাই যে ভুল ধরে।

রবীন্দ্র। না, তুমি পণ্ডিত-পুরুৎ। তোমার ভুল ধরে কার সাধ্য। বেশ!

চক্রবর্তী। (আত্মপ্রসাদের আতিশয্যে) এবারে বলদবাহন শিবঠাকুরের স্তোত্র—

"ওঁ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে,
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ।

হুজুর, দেহে ব্রহ্মরক্ত প্রবাহিত। শিবের সঙ্গে দুর্গার স্তব না বললে মহা অপরাধ হবে। দুর্গার মন্ত্রবলে শেষ করি—

ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।

(বিকট অঙ্গভঙ্গিসহকারে আবৃত্তি ক'রে, কাশতে কাশতে হাঁফাতে লাগলেন, চোখ রক্তবর্ণ, কাশির ধমক থামে না। অনেক কষ্টে—"জয়মা-জগদম্বা।)"

রবীন্দ্র। বেশ শুনে খুশি হলাম। তুমি দেখছি যে সে পণ্ডিত নও—একেবারে শিরোমণি মশাই। তোমাকে আজ শিরোমণি মশাই উপাধি দিলাম। দেখো শিরোমণি, মন্ত্রে যেন তোমাকে কেউ হারাতে না পাবে।

চক্রবর্তী। আমার জন্ম সার্থক। হুজুরকে খুশি করতে পেরেছি, এ আমার পরম ভাগ্য। হুজুরের উপাধি আমি মাথায় করে নিলাম। কিন্তু হুজুর, পেটে খেলে পিঠে সয়। কী খেয়ে মন্ত্রতন্ত্র আওড়াবো! হুজুর পরম দয়াল, মহাকবি—রাজা। আমার একটি পয়সা সম্বল নেই—বড় গরীব। আমাকে দয়া করে পাঁচ বিঘে জমি বিনা নজরে না দিলে আমি সগুষ্টি না খেয়ে মরে যাবো। আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করতেই হবে। (পা জড়াইয়া ধরিলেন)।

রবীন্দ্র। রোসো। তোমার খাওয়া হয়েছে ?

চক্রবর্তী। হয়নি হুজুর। হুজুরের দয়া না হলে খাওয়া-দাওয়া চুলোয় যাক।

রবীন্দ্র। আচ্ছা দাঁড়াও (একখানা কাগজে লিখলেন) নাও এই কাগজটা। এটা কালই ম্যানেজার বাবুকে দেবে, তাহলেই তুমি জমি পেয়ে যাবে। শোনো কি হুকুম লিখলাম—"শিরোমণি মশাইকে (যষ্ঠি চক্রবর্তীকে) পাঁচ বিঘা জমি বিনা নজরে দিবে। যাহাতে জমিটা এ বেচারী ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে।" এই নাও, এখন বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করো-গে। তোমার মঙ্গল হোক।

চক্রবর্তী। (সোল্লাসে) আজ থেকে আমার রাজদত্ত উপাধি—'শিরোমণি।' আমার জন্ম সার্থক। হুজুর যখন অত বড় উপাধিটা দিলেন, তখন আমিই আজ থেকে হুজুরের দ্বারপণ্ডিত হলুম।

রবীন্দ্র। দ্বারপণ্ডিত! আচ্ছা বেশ, তাই হলো। মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার সঙ্গে কথা বলে খুশি হবো। এখন বাড়ি যাও।—তপশী। শিরোমণি মশাইকে নৌকো করে ওপারে পৌঁছে দিয়ে আয়। শীগগির।

চক্রবর্তী। আজ এই খোলাকাটা বামুনের জন্ম সার্থক। হুঁ হুঁ। আজ থেকে আমি বাবু মশায়ের দ্বারপণ্ডিত—শিরোমণি। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)। হুজুর, ধর্মাবতার,—পরম দয়াল। আজ গরীব বামুনকে ময়ণের ঘর থেকে বাঁচিয়ে শিরোপা দিলেন। আজ আমার নবজন্ম। (প্রস্থান)।

(রবীন্দ্রনাথ নীরবে বসিয়াছিলেন। পাশেই এক নৌকার মাঝি গান ধরল—"আজ তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী।)

[ক্রমশঃ।

ইলিয়া এরেনবুর্গ

সুনীলকুমার নাগ

বর্তমান পৃথিবীর শিল্পসাহিত্যের আসরে এক বিস্ময়কর পুরুষ ইলিয়া এরেনবুর্গ! নিজস্ব বিশিষ্ট মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্য সমালোচনার দক্ষতা; অপরের, এমন কি বিরুদ্ধবাদীর বক্তব্য শুনবার এবং বুঝবার মতো উদার মানসিকতার জন্মে আজকের পৃথিবীতে সাহিত্যক্ষেত্রে যে সামান্য কয়েকজন মানুষ জাতি, দেশ বা রাষ্ট্রের গণ্ডীর বাইরে বিশ্বমানবের শ্রদ্ধালাভে সক্ষম হয়েছেন এরেনবুর্গ তাঁদেরই একজন।

ইলিয়া এরেনবুর্গের (জন্ম, ২৭শে জানুয়ারী, ১৮৯১) জন্ম হয় রাশিয়ার কিয়েভ সহরে এক অবস্থাপন্ন ইহুদী পরিবারে। ওঁর যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখন এরেনবুর্গ পরিবার চলে আসেন মস্কোর এক সহরতলীতে। এ অঞ্চলের অবস্থাটা যে সে সময়ে কেমন ছিলো এরেনবুর্গ পরবর্তীকালে সে সম্বন্ধে লিখেছেন: নোংরা, ভীষণ নোংরা, মদের কড়া গন্ধে সমস্ত পরিবেশটা থেকে বিশুদ্ধ বাতাস যেন একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। লোকগুলিও প্রায় সমস্ত সময় মদ খেয়ে খেয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে রাখতো, ঘর-সংসারে, খেত-খামারে, পথে-ঘাটে এবং সর্বত্র যে প্রায় এক যুগ এখানে কাটালেও আমার বিশ্বাস এদের প্রকৃত স্বভাব ও প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে খুব সম্ভব আমার কিছুই জানা সম্ভব হয়নি।

এই রকম একটা পরিবেশে এরেনবুর্গ মোট প্রায় বারো বছর কাটিয়েছেন, তার মধ্যে আটটা বছর কেটেছে একটানা। আশ্চর্যের বিষয় পরিবেশের এই বিষাক্ত আবহাওয়া ওঁকে আদৌ স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু একদিক থেকে বেয়াড়া হয়ে উঠেছিলেন এরেনবুর্গ। সে হলো দুরন্তপনায়। দুরন্ত বললে বোধ হয় কিছুই বলা হবে না। রীতিমতো ডানপিটে বেপরোয়া প্রকৃতির হয়ে উঠতে লাগলেন উনি। মা-বাবার হয়রানি চরমে উঠতো এক এক সময় বালক এরেনবুর্গের দুরন্তপনার জন্মে। ওঁরা থাকতেন একটা হোটেলে—হোটেল রয়াল কোর্ট। হোটেলের গেটকীপার থেকে কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত দিনের মধ্যে একাধিকবার বালক এরেনবুর্গের বিরুদ্ধে নালিশ করতে বাধ্য হতেন ওঁর বাবার কাছে। কখনো হয়তো অকারণে কলিং বেল টিপে বেয়ারাদের ছুটোছুটি করাতেন, কখনো বা "হারিয়ে" গিয়ে কর্তৃপক্ষকে নাজেহাল করাতেন, এই রকম সব ব্যাপার।

এই দুরন্তস্বভাবের জন্মে একাধিক শিক্ষক মহাশয় অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বালক এরেনবুর্গকে পড়াবার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন। একটা স্কুলে অবশ্য ভর্তি করা হয়েছিল ওঁকে কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কয়েকদিন পরেই যে বাড়ীতে পড়াশুনোর বিশেষ বন্দোবস্ত না করতে পারলে এই 'সম্ভাবনাপূর্ণ' ছেলেটি নষ্ট হয়ে যাবে। 'সম্ভাবনাপূর্ণ' কারণ, ওঁরা এটা লক্ষ্য করেছিলেন যে যদিও বালককে বইপত্র নিয়ে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখা যায় না কিন্তু যে সামান্য সময়টুকু ও বইপত্র নিয়ে থাকে তার মধ্যে ওর অসাধারণ মেধার পরিচয় কর্তৃপক্ষ পেয়েছিলেন। এরেনবুর্গের বাবা শেষ পর্যন্ত এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করলেন। ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর জন্মে একজন পেশাদার সম্মোহনকারী নিয়োগ করলেন উনি। উদ্দেশ্য, বালককে সম্মোহন করে বশে এনে লেখাপড়া শেখানো হবে। হলোও তাই। এই পেশাদার সম্মোহনকারীর কাছেই বালক এরেনবুর্গের অক্ষর পরিচয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে হয়েছিল।

এরেনবুর্গের যখন বয়সমাত্র তেরো বছর তখন একদিন দেখা গেলো বালক হোটেলে নেই। পাড়ার ছেলেরাও কেউ জানে না ওর হদিস। বাবা এবং হোটেলের কর্তৃপক্ষ প্রাণপণ খুঁজতে লাগলেন, পুলিশে খবর দিলেন। কিন্তু কয়েকদিন, বোধহয় দিন পাঁচেক পর্যন্ত

কোন খোঁজখবর পাওয়া গেলো না এরেনবুর্গের। কিন্তু তারপর একদিন নিজেই নিজের হদিস দিলেন। বার্লিন থেকে এক টেলিগ্রাম এলো ওঁর বাবার হোটেলে : আমি বার্লিন চলে এসেছিলাম। টাকা পয়সা যা ছিলো সব খরচ হয়ে গেছে। শীগগির কিছু পাঠাও।

মা-বাবার কাছে ফিরে আসবার পরে এবার বালক এরেনবুর্গের একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটলো। ওঁর আশঙ্কা ছিলো, বাবা ফিরে যাবার খরচটা যদিও পাঠিয়েছেন কিন্তু ফিরে যাবার পরে নিশ্চয়ই উত্তম মধ্যম পড়বে। যেমন অনেক সময়ই পড়ে থাকে। কিন্তু এবার ব্যতিক্রম ঘটলো তার। মা-বাবা মোটেই মারধোর করলেন না এরেনবুর্গকে। কোনো ধমক-টমকও দিলেন না, কেন অমনধারা অন্যায়টা করলেন তা জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলেন না। মা-বাবা শুধু নীরবে চোখের জল ফেললেন। এবং তাতেই কাজ হলো সবচাইতে বেশি। দুরন্ত বালক এরেনবুর্গ মা বাবাকে প্রকৃত ভালোবাসতেন। তাই ওঁদের চোখের জল দেখে নিজের প্রকৃতিকে নানাভাবে ধিক্কার দিতে লাগলেন এবং তারপর কয়েকদিন পরে একদিন নিজেই কান্নায় ভেঙে পড়ে মাকে জড়িয়ে ধরে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আর কোনো দিন এমন করে না বলে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাবেন না। এর পর থেকে নাবালক বয়স পর্যন্ত এরেনবুর্গ সত্যি আর কখনো পালিয়ে গিয়ে বাড়ীর মানুষদের হয়রান করেননি। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে সাবালক হবার পর ওঁকে বহুবার বহু জায়গা থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছে, পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে। কখনো জারের পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পালাতে হয়েছে ওঁকে; কখনো বা রাশিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চোখে ধূলো দিয়ে পালাতে হয়েছে, কখনো বা খাস সোভিয়েত সরকারের পীড়ন এড়াবার জন্যে পালিয়ে ফিরতে হয়েছে ওঁকে—যদিও আজকের রাশিয়ায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভাবলে স্বীকৃতিলাভ করেছেন।

১৯০৫ সালের কথা। সে সময়ে এরেনবুর্গের বয়স ঠিক চৌদ্দ। একদিন দেখা গেলো অপেক্ষাকৃত বয়স্ক তরুণদের সঙ্গে মিলে জারের পুলিশের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েছেন উনি এবং এই সময়ই স্কুল থেকে পুলিশের নির্দেশে ওঁর নাম কাটা গেলো কারণ উনি সেই বয়সেই নিয়মিত ভাবে বিপ্লবীদের ইস্তাহার বিলি করতে আরম্ভ করেছিলেন এবং ওঁদের স্কুলে একবার যখন অকস্মাৎ ধর্মঘট হলো তখন পুলিশী তদন্ত চালাবার পর প্রকাশ হয়ে পড়লো যে সে ধর্মঘট সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব নিয়েছিলেন বালক এরেনবুর্গ।

স্বভাব-অশান্ত বালকের বিরক্তিকর দুরন্তপনা এবার একটা নির্দিষ্ট পথে ক্রমশ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলো। এরেনবুর্গ এবার পুরোপুরি এবং সর্বক্ষণের জন্য সক্রিয়ভাবে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিলেন। ১৯০৮ সালে যখন ওঁর ঠিক উনিশ বছর বয়স তখন একবার গ্রেপ্তার হবার পর কারাদণ্ডের আদেশ হলো ওঁর ওপর। আটমাস রাশিয়ার বিভিন্ন জেলে অমানুষিক অবস্থার মধ্যে কাটাতে হলো ওঁকে। কোনো জেলে নিয়মিত চাবকাতো ওঁকে জারের পুলিশ, কোথাও ক্ষুধার্ত ইঁদুর ছেড়ে দেওয়া হতো ওঁর "সেল"-এর ভেতর; কোথাও বা কয়েকজনে মিলে একযোগে কিল-চড়-ঘুঁষি চালাতো। জেলে একবার উনি রক্তবমি করতে আরম্ভ করলেন। তারপর অনন্যোপায় হয়ে জেলের মধ্যেই অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন এরেনবুর্গ সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদ হিসেবে। ছয়দিন চললো অনশন। অত্যাচার উৎপীড়নের সঙ্গে এবার অনশনের ফলে ওঁর শারীরিক অবস্থা এ কয়দিনের মধ্যেই আশঙ্কাজনক হয়ে উঠলো। সাতদিনের দিন কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন ওঁকে মুক্তি দেবেন। মুক্তি দেওয়া হলো কয়েকটি শর্ত আরোপ করে। তার মধ্যে একটি শর্ত হ'লো যে বাড়ীতে তো উনি থাকতে পারবেনই না এমন কি কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গাতেও দু'এক রাত্তের বেশি কাটাতে পারবেন না। ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে হবে। এই শর্ত আরোপের সরকারী উদ্দেশ্য হলো এই যে, এরেনবুর্গ যাতে বিপ্লবীদের কোনোভাবে সাহায্য করতে না পাবেন। যার কোনো ঠিকানাই নেই তার সংগে আর অপরে যোগাযোগ স্থাপন করবে কি করে? জার-শাসিত রাশিয়ার শেষের দিকে বিপ্লবীদের "ঠাণ্ডা" করে দেবার জন্যে যতো রকম পরিকল্পনা করা হয়েছিল এ হ'লো তারই একটি। একে বলত "ট্রাভেল-পারমিট" সহ জেল থেকে মুক্তি-দেওয়া।

যাই হ'ক এরেনবুর্গের পক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা শাপে বর হয়ে যাবার সামিল হলো। মস্কোর এবং তার সহরতলীর সীমাবদ্ধ গণ্ডী ছাড়িয়ে এবার বিরাট রুশিয়ার অসংখ্য ছোটো বড়ো শহর এবং গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন এরেনবুর্গ। সঞ্চয় করতে লাগলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে নানা বিচিত্র জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা। কারখানা শ্রমিক, কৃষিজীবী, কেরাণী, দোকান কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক এবং অধ্যাপক—সবার সংগেই মিশতে আরম্ভ করলেন এবার। বলাই বাহুল্য নিজের খেয়াল খুশী মতো এই মেলামেশা চলতো না। পুলিশী ব্যবস্থা অনুসারে পূর্ব-নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে থানায় দেখা করে আসতে হতো ওঁকে। কাজেই দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মেলামেশার কাজটা বেশ সতর্কভাবেই করতে হ'তো। তবে এ সমস্ত সময়েও বিপ্লবের কাজ থেকে এরেনবুর্গ কখনোই খুব দূরে থাকেন নি, কারণ কোনো না কোনো গুপ্ত সংস্থার সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন উনি।

স্রষ্টাদের জীবনে প্রেরণা যে কখন কিভাবে আসবে তার কোনই স্থিরতা নেই দেখা যায়। কেউ হয়তো অকস্মাৎ একটি সানাইয়ের সুর শুনে কবিতা রচনার প্রেরণা লাভ করেন। কেউ বা কোনো ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ, প্রেম, হতাশার ফলে উদ্বুদ্ধ হন সাহিত্য-সাধনায়। কেউ বা প্রেরণা লাভ করেন প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং বিরাটত্ব দেখে। এরেনবুর্গের বেলায় দেখা যায়, তাঁর সাহিত্য প্রেরণার মূল কথা হলো মানুষ এবং এই প্রেরণা উনি লাভ করেন "ট্রাভেল-পারমিট" নিয়ে দণ্ডভোগের সময়েই; বিরাট রাশিয়ার নানা বিচিত্র জাতি এবং ধর্মের মানুষ, তাদের রুচির বৈচিত্র্য, ধ্যান-ধারণায় বিভিন্নতা—সব কিছুই নজরে আসতে লাগলো এরেনবুর্গের। এবং দেশের মানুষকে এইভাবে দেখতে দেখতেই এক সময় ওঁর ভেতর সাহিত্য রচনার বাসনা দানা বাঁধতে আরম্ভ করলো। এ সময়ে ওঁর বয়স কুড়ি কি একুশ। প্রথম দিকে সাধারণত যা হয়ে থাকে তাই, অর্থাৎ কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন এরেনবুর্গ। তাঁর কয়েকটি কবিতা পরবর্তীকালে কাব্যরসিক মহলে রীতিমতো প্রশংসা লাভও করেছিল।

১৯১০ সালের প্রথম দিকে এক সময় পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে এরেনবুর্গ রাশিয়ার সীমানা পার হয়ে এলেন। ইয়োরোপের

কয়েকটি দেশ ঘুরে চলে এলেন ফ্রান্সে। প্যারিসে সে সময়ে রাশিয়ার বিপ্লবীদের রীতিমতো একটা চক্র ছিলো। আর তা' ছাড়া ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের চাইতে সাংস্কৃতিক দিক থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগটাও ছিলো ঘনিষ্ঠতর। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে রাশিয়ার শাসক-গোষ্ঠি যখন মনস্থ করেছিলেন যে রাশিয়াকে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত করে সব দিক দিয়েই ইয়োরোপের প্রথম সারির দেশগুলির অন্যতম করে তুলতে হবে তখন তাঁরা প্রধানত ফরাসী শিল্পসাহিত্য এবং বিদ্বৎসমাজের সাহায্যই নিয়েছিলেন। কারণ সে সময়কার ইয়োরোপে জ্ঞানগরিমার দিক থেকে ফরাসীরাই শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

প্যারিসেই সোভিয়েত রাশিয়ার মহান স্রষ্টা লেনিনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটলো এরেনবুর্গের। লেনিন শুধু একজন বিপ্লবীই ছিলেন না। সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে পুঁথিগত বিদ্যাও তাঁর যা ছিলো তা কদাচিৎ এক ব্যক্তির করায়ত্ত হতে দেখা গেছে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে লেনিনের এ ক্ষমতা ছিলো যে একপলক দেখেই তিনি বুঝতে পারতেন কে কোন কাজের পক্ষে সব চাইতে উপযুক্ত, কে কোন কাজ করলে সে নিজে এবং বৃহত্তর দিক থেকে গোটা দেশ এবং সমাজ সব চাইতে লাভবান হবে।

একেবারে কিশোর বয়সেই প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে পড়লেও পরবর্তী কয়েক বছরে এরেনবুর্গের ভাবনা চিন্তা এবং স্বভাবচরিত্রের মধ্যে একটা যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল তা হয়তো উনি নিজে টের পান নি। কিন্তু সত্যদ্রষ্টা লেনিন স্পষ্টই বুঝতে পারলেন এই তরুণ যুবকের ভেতরে ভেতরে কী বিপ্লব প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছিল। এবং লেনিনের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলবার পর এরেনবুর্গ নিজেই বুঝতে পারলেন নিজের অবস্থাটা। ভেতরটা যেন স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো হয়ে গেলো কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে। বুঝতে পারলেন যে কোনো সময় বোমা তৈরী করা, থানা অতিক্রম করা বা সরকার বিরোধিতা করা মানুষের বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকে একটা অপরিহার্য প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সবাইকেই যে অন্য সব কাজ ফেলে রেখে ঐ একই ধরণের কাজে লিপ্ত হতে হবে তার কোনো মানে নেই। আরো অনেক কাজ আছে যা মানুষের অনেক প্রয়োজনে আসে এবং সে অনেক বেশি কঠিন কাজ, আরো বেশি মহৎ কাজ; বোমা ফাটিয়ে ফললাভের চাইতে এ কাজের যে ফললাভ তার স্থায়িত্ব অনেক বেশি। তাই প্যারিসে বসেই সিদ্ধান্ত নিলেন এরেনবুর্গ নতুন কাজের বিষয়। ঠিক করলেন কিছু লিখবেন। কবিতা লেখার অভ্যাস আগেই শুরু হয়েছিল এবার আরো বেশি উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে শুরু করলেন কাব্যচর্চা, সেই সঙ্গে ছোটো ছোটো প্রবন্ধ রচনাও করতে লাগলেন। এ সবের সঙ্গে শুরু হলো পড়াশুনো। ফরাসী সাহিত্যের বাছাই করা গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং কবিতা প্রবন্ধ ও জীবনী কিছুই বাদ দিতেন না এরেনবুর্গ। এই সময়ে অন্তত কয়েকটা বছর সব সময়ই এরেনবুর্গের হাতে কিছু-না-কিছু বই দেখা যেতো। হোটেল রেঁস্তোরায়, দোকান-পসারে, পার্কে, কোনো রেলষ্টেশনে বা রাস্তায় যেখানেই যখন যেতেন, ফুরসৎ পেলেই যাতে কিছুটা সময় পড়ে নেওয়া যায় সেইজন্য সর্বদা বই সঙ্গে রাখতেন এরেনবুর্গ।

নিজেকে তৈরী করবার জন্যে এই যে ঐকান্তিকতা, তার কিছুদিনের মধ্যেই তার ফল দেখা গেলো। কারণ ১৯১৪ সালে যখন প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু হলো তখন রাশিয়ায় তরুণ এবং উদীয়মান কবি হিসেবে এরেনবুর্গ রীতিমতো 'নাম' করেছিলেন। মহাযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এরেনবুর্গ ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানালেন ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধে যোগদানের জন্যে অনুমতি দিতে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ অনুমতি যদিও দিলেন কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। পরীক্ষকরা বললেন, শরীর অত্যন্ত দুর্বল, এ শরীর নিয়ে ও যুদ্ধ করতে পারবে না।

তেমন কোনো ভারী রোগ এরেনবুর্গের ছিলো না। শুধু দুর্বলতা। চব্বিশ বছরের একজন তরুণের শরীর এমন কি দুর্বল হতে পারে যে সে যুদ্ধে যেতে অক্ষম হয়ে পড়ে? হঠাৎ শুনলে এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে বছরের পর বছর ক্রমাগত অনিয়মিত অপ্রচুর আহার এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা জনিত মানসিক সঙ্কট খুব মারাত্মকভাবে ওঁর শরীরকে দুর্বল করে ফেলেছিল। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত প্যারিসে এরেনবুর্গ সব সময়েই নিজের খরচ নিজেই রোজগার করেছেন এবং এই ভাবেই পড়াশুনো চালিয়ে যেতেন। সে সময়ে ওঁর মতো সাধারণ লেখাপড়া জানা একজন বিদেশী ফ্রান্সের মতো জায়গায় কীই বা এমন কাজ আশা করতে পারে। টুকটাক কিছু করতেন এরেনবুর্গ, তবে লিখেও কিছু রোজগার হতো। তবে সে যৎসামান্য। যুদ্ধ শুরু হবার কয়েকমাস পরে দেখা গেলো এরেনবুর্গ বেশি পারিশ্রমিকে একটা কাজ যোগাড় করেছেন। কাজটা হলো রেল-ওয়াগনে মারাত্মক বিস্ফোরকের ভারী ভারী বাক্স বোঝাই করা। একটু হাত ফসকে গেলেই একেবারে—

যা হ'ক সৌভাগ্যবশত এরেনবুর্গের হাত কখনো ফসকায়নি এবং তাঁকে কেউ কখনো অসতর্কও দেখেনি কোনো ব্যাপারে। তখনো নয় তারপরেও নয়।

১৯১৭ সালের কথা। যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি। এদিকে রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হয়ে যাবার কথা প্যারিসে জানাজানি হওয়ার সংগে সংগেই এরেনবুর্গের মনে হলো এসময় অবশ্যই রাশিয়ায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। রাশিয়ার সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে আসতে হবে। তাই স্বদেশে চলে আসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ফ্রান্স থেকে রাশিয়া যাবার স্বাভাবিক পথ অর্থাৎ মধ্য ইয়োরোপে তখন সমর তাণ্ডব। তাই দেশে ফিরতে হলো এরেনবুর্গকে ইংলণ্ড, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড ঘুরে।

রাশিয়ায় ফিরেই সরাসরি কিয়েভ-এ চলে এলেন এরেনবুর্গ। চাষী এবং মজুরদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আরম্ভ করলেন একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে গতানুগতিক লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া এবং সেই নাচ-গান-থিয়েটার শেখাবার আয়োজনও ছিলো। কিন্তু বিপ্লবীরা তখন পর্যন্ত গোটা রাশিয়ায় পুরোপুরি সাফল্যলাভ করতে সক্ষম হয় নাই। তার ওপর দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যেও, বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে সব জায়গায় সমান ভালো ধারণা ছিলো না। দুর্ভাগ্যবশত যাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুল আরম্ভ করেছিলেন এরেনবুর্গ তারাই ওঁর পেছনে লাগলো। ওরা জারের পুলিশের কাছে খবর পাঠালো—ফলে জারের

পালাতে হলো এরেনবুর্গকে। এবার ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন মস্কোতে। এর মধ্যে খাস মস্কো এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পুরোপুরিই বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে পড়েছিল। মস্কোয় এসে যদিও প্রথমটা আশ্রয় পেলেন 'সর্বহারা লেখক সংঘে' এবং আবার মস্কোতেই শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানা সংগঠন গড়ে তুলতে মনোনিবেশ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মস্কো ছাড়তে হলো এরেনবুর্গকে। কারণ যারা নতুন ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল তাদের সব কাজকর্ম অন্ধের মতো সমর্থন করতে পারতেন না এরেনবুর্গ। প্রায় সময়ই মনে হতো ফ্রান্সের Reign of terror এর মতো একটা অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং কায়েম হতে চলেছে রাশিয়াতে। বিবেকবান এবং রুচিবান এরেনবুর্গ বন্ধু বান্ধবদের কাছে এ অবস্থার জন্যে প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু দেখলেন তাঁরা বেশির ভাগই হয় বিপ্লবীদের কঠোরতার সমর্থক আর না হয় এতোটা ভীত যে এ সম্পর্কে ওঁর সঙ্গে কথা বলতেই নারাজ।

হতাশ হয়ে আবার প্যারিসে ফিরে এলেন এরেনবুর্গ। যে প্যারিস এতোকাল দীর্ঘ সাত আট বছর আশ্রয় দিয়েছে ওঁকে, শিল্প সাহিত্যের নানা বিষয়ে অধ্যয়ন এবং চর্চার সুযোগ দিয়েছে, এবার সে প্যারিসও নারাজ হলো। প্যারিসে পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই একদিন পুলিশ এসে জানালো এখুনি চলে যেতে হবে।

কোথায়? প্যারিস ছেড়ে কোথায় যাবো?

শুধু প্যারিস ছেড়েই নয়, ফ্রান্স ছেড়েই যেতে হবে।

প্রথমটা ভেঙ্গে পড়লেও মনে মনে নিজেকে তৈরী করে নিলেন এরেনবুর্গ। এদিকে মনে মনে একখানা উপন্যাস রচনার সমস্ত পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। এমন সময় রাশিয়ায় ফিরে গিয়েও নির্বিবাদে কাটানো যাবে না, আর নির্বিবাদে না থাকতে পারলে অন্তত কিছুদিন, লেখার কাজেও এগোনো যাবে না। তাই অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন এক বন্ধুর আশ্রয় নেবেন। উনি থাকতেন বেলজিয়মে। তাই কালবিলম্ব না করে বেলজিয়ম চলে এলেন এরেনবুর্গ।

বেলজিয়ম ছোট্ট দেশ হলেও অনেক ঐতিহাসিক ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে এ দেশে। এই দেশেই মার্কস-এঙ্গেলস এর "ম্যানিফেষ্টো অব দি কমিউনিষ্ট পার্টি" প্রথম সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছিল। এই দেশে বসেই এরেনবুর্গ তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা করলেন—"দি একষ্ট্রা-অর্ডিনারী এ্যাডভেঞ্চারস অব জুলিও জুরেনিটো এণ্ড হিজ ডিসাইপলস"। এ উপন্যাস বার্লিন থেকে প্রকাশিত হলো ১৯২১ সালে। এরেনবুর্গের তখন বয়স ঠিক তিরিশ।

এই প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়োরোপের উদীয়মান ঔপন্যাসিকগণের অন্যতম হিসেবে এরেনবুর্গ স্বীকৃতি লাভ করলেন। এবং দেখা গেলো সৃজনধর্মী সাহিত্যিকের যা প্রধান গুণ তা অতি আশ্চর্যভাবে আয়ত্ত করে ফেলেছেন এরেনবুর্গ। সত্য কথা বলতে কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির চিরাচরিত অন্ধ জাতীয়তার অর্থহীনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এরেনবুর্গ, তেমনি তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের পুলিসী ব্যবস্থাকে। এ বই আজ পর্যন্ত খাস রাশিয়াতে বিক্রী হতে পারে না এবং রাশিয়ান ভাষায় এর অনুবাদও কিছু বেরোয় নি।

এর পর থেকে আরো প্রায় পঁচিশখানা বই লিখেছেন এরেনবুর্গ। বেশির ভাগই উপন্যাস, কয়েকখানা প্রবন্ধের বই এবং একখানা কবিতার বইও আছে তার মধ্যে। ওঁর বইগুলির মধ্যে সব চাইতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে 'দি লাইফষ্টোরি অব লাসিক রয়েৎস্কুয়াৎ," "দি সামার অব ১৯২৫," "এ ষ্ট্রীট ইন মস্কো," "আউট অব কেয়স", "টেন হর্স পাওয়ার" "ফল অব প্যারিস", "ষ্টর্ম," "দি থ" এবং "রাইটার এণ্ড হিজ ক্র্যাফট" প্রভৃতি। মোট পাঁচখানা বই আজ পর্যন্ত খাস রাশিয়ায় প্রকাশিত হয় নি। এর থেকেই বোঝা যায় যে একেবারে প্রথম থেকে আজ অবধি সোভিয়েৎ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এরেনবুর্গের কখনো পুরোপুরি বোঝাপড়া হয় নি। প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বার কয়েক এরেনবুর্গ রাশিয়ায় এসেছেন যদিও, কিন্তু কখনো খুব বেশি দিন থাকেন নি।

ষ্ট্যালিনের আমলে গোয়েন্দা পুলিশ কী রকম সন্ত্রাসের রাজত্ব তৈরী করে তুলেছিল সে সম্পর্কে ১৯৬২ সালের ১১শে মে মস্কোতে একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন এরেনবুর্গ। এরেনবুর্গ বলছেন যে সরকারী নির্দেশমতো যাঁরা সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম না হতেন তাঁরা সব "হাওয়ায়" মিলিয়ে যেতেন। এরেনবুর্গ বলছেন যে স্পেনের গৃহযুদ্ধের রিপোর্টারের কাজের ফাঁকে ১৯৩৭ সালের ২৪শে ডিসেম্বর যখন মস্কো এসে লেখক বন্ধুবান্ধবদের খোঁজখবর করতে লাগলাম, দেখা গেলো বেশির ভাগই পুলিশের হেপাজতে। এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন: (ইনি মস্কোতেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতেন) কারো সম্বন্ধে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, এমন কি অপর কেউ যদি আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চান, তাতে যেন ভুলেও যোগ দেবেন না। কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না জানবেন।

পরদিন "ইজভেস্তিয়া" কাগজের অফিসে গেলেন এরেনবুর্গ। সেখানে সবাই খুব ভদ্র ব্যবহার করলো বটে ওঁর সঙ্গে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কাউকেই উনি চিনতে পারলেন না, সব নতুন মুখ, একজনও দু'বছর আগের পরিচিত পাওয়া গেলো না। আর একদিন অফিসে গিয়ে লক্ষ্য করলেন কাগজখানার পদস্থ কর্মচারীদের কারো ঘরের সামনেই নেম-প্লেট নেই। একটি বেয়ারাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে নির্বিকারভাবে বললো: কি লাভ মশাই নেম-প্লেট তৈরী করে, কেউ হয়তো আজকে চেয়ারে বসছেন, তারপর কালই হাজতে চলে যাচ্ছেন (অর্থাৎ কি না নেম-প্লেট তৈরী করতে যে সময়টুকু লাগে একজন অফিসারের আয়ুষ্কাল ততটুকুও নয়)।

এই সময়কার রাশিয়ার একজন প্রখ্যাত লেখক আইজাক ব্যাবেল-এর একটি উক্তির উল্লেখ করে বললেন এরেনবুর্গ: জানেন মশাই, আজকের রাশিয়াতে কেউই নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বলে না, তা'ও রাতে বিছানায় শুয়ে এবং কম্বল মুড়ি দিয়ে।

প্যারিসের খোলা আবহাওয়ায় লালিত এরেনবুর্গের শিল্পীসত্তা কোনোমতেই সোভিয়েৎ পুলিশী ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করার কোনো ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারেনি। এমন কি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়েও নয়। আজকের দিনের রাশিয়াতে এমন কেউ নেই পশ্চিম ইয়োরোপের শিল্পসংস্কৃতি সম্বন্ধে এরেনবুর্গের চাইতে যিনি বেশি বোঝেন। এরেনবুর্গ শুধু যে বোঝেন তা নয়। আর কতকগুলি দিককে যে উনি ভালোবাসেন সে কথা প্রকাশ্যে বলেন;

য় কতকগুলি দিক যে সোভিয়েতের শিল্পাদর্শের চাইতে শ্রেষ্ঠতর এবং মহত্তর সে কথাও প্রকাশ্যে বলতে কুণ্ঠিত বা ভীত হন না। তাই সোভিয়েৎ সরকারের গোঁড়া কর্ণধাররা কখনো তাঁকে সুনজরে দেখেনি।

প্রবল জনমতের চাপে পড়ে সোভিয়েৎ সরকার দু'বার এরেনবুর্গকে ষ্টালিন পুরস্কার দিয়েছেন বটে, কিন্তু আর একদিক থেকে সোভিয়েট লেখক সংঘের কর্মকর্তাদের সর্বক্ষণই তাগিদ দিয়ে আসছেন ওঁর লেখা বা শিল্পমতের বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্যে। এই সেদিনও, ৪ঠা জানুয়ারীর খবরের কাগজে দেখা গেলো প্রাভ্‌দার একটি উক্তি: এরেনবুর্গ কলাশিল্পকে খাড়া পর্বতের ওপর থেকে ঠেলতে ঠেলতে এমন একটা অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন যে এটা অতি সহজেই সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ে চূড়ান্ত সংস্কৃতিহীনতায় ডুবে যেতে পারে। আমরা যদি এরেনবুর্গের কথা শুনতাম, তাহলে বহু পূর্বেই পশ্চিম য়ুরোপের কেতাদুরস্ততার পতাকাতলে গিয়ে দাঁড়াতাম; রাশিয়ার বাস্তবধর্মী বিশুদ্ধ রুশ কলাশিল্পের প্রতি প্রীতিশূন্য হয়ে পড়তাম এবং প্রধানত ফরাসী ধরণের বিভিন্ন 'বাদী'দের সঙ্গে প্রণয় পাশে আবদ্ধ হতাম।

ব্যাপার কিছুই নয়, মস্কোতে এরেনবুর্গের বাসায় তাঁর বন্ধু এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী পাবলো পিকাসোর অনেক ছবি সযত্নে রক্ষিত আছে এবং পিকাসো যে এ যুগের একজন অসামান্য প্রতিভা এ কথা সরকারী হুকুমনামা অগ্রাহ্য করেও এরেনবুর্গ বহুবার বলেছেন, বহু জায়গায় লিখেছেন এবং এখনো লিখে বা বলে চলেছেন।

সত্য কথা যে কতো নির্ভয়ে মানুষ বলতে পারে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরেনবুর্গের উক্তি। আমাদের দেশের কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা, এমন একটা সময় ছিল যখন "বুর্জোয়া-কবি" রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পান নি; বিশেষভাবে বলবার মতো তাঁর লেখার মধ্যে বা তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছুই পান নি। অথচ এরেনবুর্গ ভারতবর্ষে এসেছেন; শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করেছেন এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জোর গলায় বলেছেন: ভারতের যা কিছু মহৎ, যা কিছু স্থায়ী, যা কিছু প্রকৃতই বিরাট রবীন্দ্রনাথে তার সমন্বয় ঘটেছে—রবীন্দ্রনাথ এমন একটি বিস্ময় যার কাছে দাম্ভিক পশ্চিম, সাম্রাজ্যলোভী পশ্চিম সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে।

১৯৪১ সালের পর থেকে এরেনবুর্গ মোটামুটি ভাবে মস্কোতেই বাস করছেন বলা যায়। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে রিপোর্টার হিসাবে উনি যে সমস্ত চোখে-দেখা সংগ্রামের সংবাদ পাঠাতেন—রাশিয়া তথা বাইরের পৃথিবীতে তার বহুল প্রচারের ফলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে যে এরেনবুর্গকে কোনো কারণে সোভিয়েৎ কর্তৃপক্ষ আর ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছেন না—দেশের ভেতরে তাঁর আজ এতই জনপ্রিয়তা।

এরেনবুর্গের সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনার স্থান এ নয়। তবে কয়েকটা কথা বলা দরকার।

টলষ্টয়ের 'আনা কারেনিনার' সমালোচনার প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইংরেজ কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড বলেছিলেন যে উপন্যাস লেখার পদ্ধতি এবং তার দক্ষতাটা ফ্রান্স থেকে মধ্য ইয়োরোপ ডিঙিয়ে সরাসরি রাশিয়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে এ কথার যথার্থ আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করতে পাচ্ছি। রাশিয়ার সাহিত্য ইয়োরোপের অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যগুলির তুলনায় অনেক নবীন, অথচ রাশিয়াতে গত দেড় শ' বছরের মধ্যে যতোগুলি কালজয়ী গল্প লেখকের সৃষ্টি হয়েছে অন্য আর কোনো দেশে তা হয়েছে কিনা সন্দেহ। পুশকিন, গগোল, তুর্গেনিভ, ডষ্টয়েভস্কি, টলষ্টয়, গোর্কি, মেরেজকোভস্কি, চেকভ, ইভান বুনিন, এরেনবুর্গ—এঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসনলাভ করেছেন—এ কথা সন্দেহাতীত ভাবেই বলা যায়। এবং এঁদের যা খ্যাতি চেকভ এবং গগোলকে বাদ দিয়ে তা প্রধানত উপন্যাস রচয়িতা হিসেবেই।

জাত উপন্যাস কাকে বলে তার একটি নিদর্শন হলো এরেনবুর্গের "ষ্টর্ম"। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পূর্ব থেকে গোটা একটা যুগের ইতিহাস আলোচনা করেছেন এরেনবুর্গ তাঁর এই বিরাট উপন্যাসখানায়। প্রেম, দুঃখ, সুখ, ভালবাসা, স্নেহ, যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, অর্থ নৈতিক সঙ্কট—আজকের পৃথিবীর মানুষের যা কিছু সমস্যা তার প্রায় সব কিছুই স্থান পেয়েছে ষ্টর্ম-এ। হঠাৎ মনে হবে একটা কাহিনী তো নয়—যেন একটা জীবনের পরশ পেলাম, এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন।

এরেনবুর্গের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনখানা এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কেউ বলেন 'ষ্টর্ম' কেউ বলেন জুলিও জুরেনিটো, কেউ বলেন আউট অব কেয়স। কিন্তু একাধিক কারণবশতঃ আমাদের মনে হয় 'নাসিক'ই ওঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এ উপন্যাসখানাতে যেমন রয়েছে সাহিত্যরস তেমনি রয়েছে বিভিন্ন জীবন দর্শন সম্পর্কে স্বাভাবিক আলোচনা। কম্যুনিজম সম্পর্কে এরেনবুর্গের বক্তব্যগুলি খুব গোছানো ভাবে পাওয়া যায় এ উপন্যাসের মধ্যে। অনেকের ধারণা, এরেনবুর্গ তাঁর নিজের জীবনকে কেন্দ্র করেই এ উপন্যাসখানা লিখেছিলেন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

তিন দিন অধিবেশনের পর চতুর্থ দিনের ভোরে আমরা বাসে করে রওনা হলাম, মাইসোরের নব বৃন্দাবন গার্ডেনটি দেখবার জন্ত। স্থানীয় সরকার পক্ষই এই আয়োজন করেছেন আমাদের জন্ত।

চারটি বাস রওনা হলো আমাদের নিয়ে। মারুতি আর আয়েঙ্গারও আমাদের সঙ্গে চলেছে। পথের দুধারের দৃশ্য অপূর্ব্ব সুন্দর। মাঝে মাঝে কাবেরী নদীও এঁকে বেঁকে চলেছে আমাদের সঙ্গে। নদীর চারিপাশে ছোট বড় শীলা খণ্ড ছড়ানো। পাথরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে গর্জ্জন করে ছুটে চলেছে পর্ব্বতনন্দিনী কাবেরী। বাসে বসে বসে দূর থেকে আমরা শুনছি ওর উদ্দাম কলধ্বনি।

কাবেরী যেন লুকোচুরি খেলছে আমাদের সঙ্গে। কখনও আমাদের দৃষ্টিপথে ছুটে এসে হাতছানি দিয়ে ডাক দিচ্ছে, আবার কখনও আড়ালে লুকিয়ে খিলখিল শব্দে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

অর্দ্ধেকপথে বাসগুলো থামলো একটি হোটেলের সামনে। আমরা সকলে নেমে ওখানে চা ও কিছু খাদ্য গ্রহণ করবার পর আবার বাস ছাড়লো।

কয়েকটা বড় বড় প্রাচীন গেট পেরিয়ে এলাম আমরা। এক জায়গায় বাস থামলো। গাইড দেখালো এইখানে হত্যা করা হয়েছিলো টিপু সুলতানকে। একটা পাথরের ফলকে রাখা হয়েছে টিপু সুলতানের হত্যার স্বাক্ষরটি। সেখান থেকে আমরা গেলাম টিপু সুলতানের কবরখানা দেখতে। চকচকে কালো পাথরে বাঁধানো সমাধি মহলটি দেখে বিষাদে ভরে উঠলো মনটা। সুলতান ফ্যামিলীর অনেকেই আছেন এখানে। কয়েকটি ছোট ছেলে মেয়ে এসে ঘিরে ধরলো আমাদের। গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেলো,—কোনটা কার সমাধি—কিছু পয়সা পাবার আশায়। কালো টুপি ও আলখাল্লা পরা স্ফটিকের মালা হাতে এক মুসলমান দরবেশ, উর্দ্দু ভাষায় করুণ-সুরে গাইছিলো সুলতানের জীবন গাঁথা।

এর পরে বাসে করে আমরা এলাম, এক মন্দিরে। অনন্ত শয়নে শায়িত কালো পাথরের নারায়ণের পদসেবা করছেন লক্ষ্মী দেবী। মাথার কাছে সহস্র ফণা মেলে আছেন শেষ নাগ। মূর্ত্তিটি বহু প্রাচীন, আর বিরাট আকারের। মন্দিরটাও বেশ বড়।

বেলা বারোটা নাগাদ আমরা মাইসোরে পৌঁছলাম। যাত্রীরা বাস থেকে নেমে বিভিন্ন হোটেলে ছুটলেন স্নানাহারের জন্য।

আয়েঙ্গার বললো—এসব হোটেলে বড় ভীড়, আমরা চলুন ষ্টেশনে যাই, ওখানে নিরিবিলিতে স্নানাহার সারা যাবে।

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ষ্টেশনের বিশ্রামাগারগুলো। ভীড় নেই। আমরা নির্ব্বিঘ্নে স্নান সেরে খেতে বসলাম।

চমৎকার মিহি সুগন্ধি মাইসোরী চালের ভাত নানারকম সুস্বাদু তরকারী সহযোগে খেতে খেতে, আমরা আয়েঙ্গারের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলাম।

খাবার পরে আমরা আবার বাসে ফিরে এলাম। এসে দেখি, এইটুকু সময়ের মধ্যেই অনেকে বাজার থেকে কিনে এনেছেন মাইসোরী শাড়ী, চন্দনকাঠ আর হাতির দাঁতের জিনিষ। সেগুলো দেখিয়ে সকলকে অবাক করে দিলেন। ওঁরা স্নানাহারের পেছনে বৃথা সময় নষ্ট না করে দোকান থেকে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়েই বাজারে ছুটে ছিলেন। আমরা যারা, এতক্ষণ শুধু ভোজনে ব্যস্ত ছিলাম, তারা বেকুবের মত চেয়ে রইলাম, বুদ্ধিমানদের দিকে। মারুতি চুপি চুপি বললো—এমন কিছু সস্তায় জিনিষ পায়নি ওরা। প্রত্যেক জায়গাতেই, বিদেশী যাত্রীদের কাছে স্থানীয় দোকানীরা বেশী দামে জিনিষ বিক্রি করে, দুপয়সা লাভ করবেই। কোচিনে গেলে তোমায় দেখিয়ে দেব, আমরা মানে স্থানীয় লোকেরা আরো কত সস্তায় এ জিনিষগুলো পেতে পারি।

বাস ছেড়ে দিলো। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা মাইসোর সহরটিকে ভারি সুন্দর লাগছিলো দেখতে। আমরা ঘুরে ঘুরে এখানকার মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, অলকামহল আর পাহাড়ের ওপর চামুণ্ডা মন্দির দেখলাম। চামুণ্ডা মন্দিরের সামনে এক বিরাট আকারের কালো পাথরের মহিষমূর্ত্তি দেখলাম। জনশ্রুতি আছে যে, এইটা নাকি মহিষ নামে অসুরের মূর্ত্তি। যার থেকে এই জায়গার নাম হয়েছে। মহীশূর।

সব শেষে আমরা গেলাম নব বৃন্দাবনে। বাগানের প্রবেশ পথের ধারে খাঁজকাটা পাথরের ধাপ বেয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে কৃত্রিম ঝরণার জলধারা।

নদীর জলকে ওখানে বিরাট বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে, আর সেই জল থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে নববৃন্দাবনের অসংখ্য ঝরণা, জলপ্রপাত ও জলস্তম্ভ।

বাগানে নেমে আমরা হোটেলে গেলাম চায়ের জন্য।

সুদৃশ্য প্রাসাদসম হোটেলটি। তবে আগে থেকে অর্ডার দেওয়া না থাকলে খাবার নাকি ভালো পাওয়া যায় না। যা হোক হোটেলের ব্যালকনিতে অনেকগুলি টেবলের চারপাশে চেয়ার সাজানো ছিলো; আমরা সেখানে বসে চা খেতে খেতে অপূর্ব্ব বাগানটি দেখতে লাগলাম। আসল দর্শনীয় স্থানটি এখান থেকে অনেকটা নিচুতে!

কিছুক্ষণ পরেই আলো জ্বলে উঠলো। সমস্ত ঝরণা বা জলপ্রপাতগুলো রঙিন হয়ে গেলো,—ফুল পাতা সকলকারই রূপ গেলো পাল্টে। যেন কোন এক যাদুকর তার মায়াদণ্ডটি ছুঁইয়ে মুহূর্ত্তের ভেতর বাগানটির রূপান্তর ঘটিয়ে দিলো। প্রথম দর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম সেই পরমাশ্চর্য্য দৃশ্যটির দিকে। তারপর সকলে যখন হৈ চৈ শব্দ তুলে ছুটে চললো সিঁড়ির দিকে, তখন আমরাও উঠে পড়লাম ঐদিকে যাবার জন্য।

মারুতি চলে গেছে আয়েঙ্গারের সঙ্গে। যে যার প্রিয়জনের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে চলেছে, ঐ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যটি দর্শন করবার জন্য।

আমার সঙ্গে চলেছেন ওস্তাদজী। বিরাট চওড়া সিঁড়ি; আর তার মাঝে মাঝে রঙিন জলধারা গর্জ্জন করতে করতে ঝরে পড়ছে অনেকটা নীচুতে। জলের রং কখনও তাজা রক্তের মত লাল, কখনও বা বেগুনি কখনও বা সবুজ হয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে আমরা নেমে এলাম সমতল ক্ষেত্রে। সরু সরু বাঁধানো পথ, গোলক ধাঁধার মত চারিদিকে এঁকেবেঁকে ঘুরে গেছে!

পথের দুধারে অসংখ্য ফুলের ঝোপ, তার ভেতরে জ্বলছে রঙিন আলো। ছোট বড় রং বেরংএর ফোয়ারার জল ঝর ঝর করে পড়ে পথের দুধারে কুলু কুলু শব্দে ছুটে চলেছে। কোথাও বা রঙিন উদ্ধত জলস্তম্ভ অধীর আবেগে আকাশকে ছুঁতে চাইছে!

কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখি? চলতে চলতে আর এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়লো!

সরু সরু রংদার জলের ধারা একটি বিরাট গোলের চারিধার থেকে এসে মাঝে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হচ্ছে। দূর থেকে দেখাচ্ছে ঠিক রঙিন ছাতার মত।

মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে চলেছি। মনে জাগছে সেই একদিনের কথা। কোচিনে যাবার আগে বলেছিলো যোগরাজ যোগলেকার!

—দক্ষিণ ভারত দেখতে গেলে আমরা নিশ্চয়ই কোচিন থেকে প্রথমেই যাবো মাইসোরের নব বৃন্দাবনে! শুনেছি, সে এক আশ্চর্য্য মায়াপুরী,—

—কিন্তু তুমি সেখানে দিদির সঙ্গে বেড়াতে পারবে না। ওঁর সঙ্গে অন্য কারুকে দিয়ে, আমরা দুজনে বেড়াবো সেই মায়াকাননের পথে পথে। আজ কোথায় সে?

দুচোখ ভরে জল এলো আমার। চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। কে!—ও কে?

পথের পাশ দিয়ে কুলু কুলু করে চলেছে রঙিন জলস্রোত। তার ওপারে সারি সারি লাল, নীল, সবুজ-সোনালী রংএর জলস্তম্ভ! মাঝে মাঝে সরু সরু ফাঁক রয়েছে! সেই ফাঁক দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখলাম জলস্তম্ভের ওপারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে যোগরাজ যোগলেকার।

তার চারিদিকে চলেছে রংখেলার মহোৎসব! রঙিন ছায়া কাঁপছে তার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে। আমি ব্যাকুল প্রাণে ছুটে যেতে চাইলাম ওর দিকে, কিন্তু হায় কেমন করে যাবো? মাঝে যে রঙের ঝরণা আর থৈ থৈ রংদার জল পথ রোধ রেখেছে। এখন ওখানে যেতে হলে, অনেকটা পথ ঘুরে হবে।

আমি জলের ধারে এগিয়ে গিয়ে, দুহাত বাড়িয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলাম—যোগলেকার! রাজা!

কৈ কেউ তো সাড়া দিলোনা! আমার কথার প্রতিধ্বনি শুধু কেঁদে ফিরে এলো আমার কাছে!

ওস্তাদজী আমাকে দুহাতে চেপে ধরে টেনে নিয়ে বললেন—

—আরে এ কেয়া বাতরে খোকি দিদি। গির যায়গা তো বহুৎ মুস্কিল হোগা।

আমি সেই দিকে হাত বাড়িয়ে কান্নাভরা গলায় বললাম—ওস্তাদজী! যোগলেকার।

ওস্তাদজী জানতেন আমার ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী,—তাই তিনি, এগিয়ে গিয়ে উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখতে দেখতে বললেন—কাঁহারে খোকি দিদি? কই নেই তো উস তরফ?

ওস্তাদজীর কথায় আমার ব্যাকুল দৃষ্টি ফেরালাম সেই দিকে,—সত্যিই ওখানে কেউ নেই। মরীচিকা মিলিয়ে গেছে,—খালি ছু, ছু, করে ঝরছে রঙিন জলের ধারা!

আমার হাতখানা চেপে ধরে দরদভরা সুরে বললেন ওস্তাদজী—ছোড় দে দিদি। ও-সব দিলকা খেল, আঁখ্‌কা মায়া! সাঁচ্চা নেহি বহিন—বিলকুল ঝুট হ্যায়!

—কান্নাভরা গলায় বললাম আমি—আমি কি পাগোল হয়ে যাবো ওস্তাদজী? না গেছি? আমি যে দু'দিন দেখলাম ওকে! সবই কি আমার চোখের ভুল? মনের ছায়া? হয়তো সে আর এ পৃথিবীর কেউ নয়, তাই দেখছি তার ছায়া মূর্ত্তিটা, আর ধরতে গেলেই মিলিয়ে যাচ্ছে সে!

—ও সব ঝুটা বাত ছোড় দে বেটি। মায়াকা খেল খতম হো গিয়া,—চল দিদি ফিরে চল।

তাইতো, যাদুকরের মোহিনীরূপ তো আর নেই। ঝরণা, ফোয়ারা, গাছ, ফুল সব স্বাভাবিক রং ধারণ করেছে। বাগান প্রায় খালি।

ওপর থেকে বাসের ঘন ঘন হর্ণ শোনা যাচ্ছে। বিষণ্ণ চিত্তে,

জল মুছে ওস্তাদজীর সঙ্গে ফিরে চললাম। বাসে ফিরে একরাশ প্রশ্ন এক ঝাঁক মৌমাছির মত যেন তাড়া আমাকে।

—ও কি জন্ত কোনো বাসে এসেছিলো আজ মাইসোরে? তবে তাই যদি হতো তবে এতবার বাস যাত্রীরা নামা ওঠা করলো কৈ একবারও দেখিনি তাকে? হয়তো ভিড়ের মধ্যে নিজেকে গোপন করে রেখেছিলো। কিন্তু তাই বা রাখবে কেন? তবে কি সে এখন মাইসোরেই বসবাস করছে? কিন্তু কমলেশ কৈ? তাকে তো দেখলাম না ওর সঙ্গে? সে কি নব বৃন্দাবনে আজ আমার জন্তেই এসেছিলো? ঘুরছিলো আমার সঙ্গে সঙ্গে সেই সে দিনের কথা মনে করে? হায়! কে দেবে এর জবাব?

মারুতির একান্ত অনুরোধে,—আমাকে কোচিনে যাবার অনুমতি দিলেন ওস্তাদজী। বললেন তিনি—এ ভালোই হলো, মনটা তোর সুস্থ হবে খোকি দিদি। আর আমিও কিছুদিনের জন্তে হায়দ্রাবাদে নাতনীটার কাছে যাই, তারপর তোর চিঠি পেলে, কোচিনে গিয়ে নিয়ে আসবো তোকে।

যাবার আগে ব্যাঙ্গালোর সহরটা আমাদের গাড়ী করে ঘুরিয়ে দেখালো আয়েঙ্গার। ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো সহরটি। বড় বড় রাস্তার ধারে ধারে ফুলের বাগান, এ সহরকে বিশেষ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করেছে। সহরের আবহাওয়াটিও তেমনি মনোরম। অতি গরম বা অত্যধিক ঠাণ্ডা কোনটিই এখানে নেই। সকল ঋতুতেই দিনে সামান্ত গরম, আর রাত্রে সামান্ত ঠাণ্ডার আমেজ এখানকার বৈশিষ্ট্য, বললো আয়েঙ্গার। তাই স্থানীয় লোকেদের স্বাস্থ্য ভালো, আর তারা তেমনি পরিশ্রমী। বড় বড় দোকান, হোটেল সিনেমা শোভিত, আলো ঝলমলে কয়েকটি রাজপথ, আর তারই সংলগ্ন বিরাট ময়দানটা কলকাতার ময়দান আর চৌরঙ্গীকে মনে করিয়ে দেয়, লালবাগের দামী দুষ্প্রাপ্য গাছ পালা, ফুলে ভরা বিরাট বাগানটি একটি রমণীয় দর্শনীয় স্থান। ডিসেম্বরের দু'তারিখে আমরা কোচিন রওনা হলাম। ওস্তাদজী গেলেন হায়দ্রাবাদে।

এর্ণাকুলামে দরবার হল্ রোডে মারুতিদের বাড়ী। এখানকার বেশীর ভাগ বাড়ীর ছাদগুলো বিলিতি টালি আর খাপড়া দিয়ে তৈরী, ভেতরে কাঠের ছাদ।

বাড়ীর ছাদের চার কোণ গোপুরমের মত ঈষৎ বাঁকানো। কাঁচের জানলা,—মেহগিনি পালিশের দরোজা, আর বড় বড় কাঠের বারান্দাগুলো কারুকার্য্য করা। অন্ধকার অন্ধকার বড় বড় ঘর, সব কিছুর মাঝে যেন চীন, জাপান আর ব্রহ্মদেশের স্থাপত্যকলার ছাপ রয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় বিলেতের সহর তলীর পল্লী ভবনগুলোর সঙ্গে যেন ভারি মিল আছে এর্ণাকুলামের কটেজ প্যাটার্ণের বাড়ীগুলোর।

বেশীর ভাগ বাড়ীতেই আছে বাগান। বাগানে আছে অজস্র, বেঁটে আকারের নারকোল গাছ,—সোনা রং এর নারকোলের রাশ মাথায় নিয়ে।

আর আছে কলাবাগান। গাছগুলো মাথায় যেমন ছোট তার পাতাগুলো তেমন বড় আর চকচকে সবুজ রং। ওর কলাগুলোও তেমনি অপূর্ব্ব। কলার খোসা লাল রং,—আর ভেতরের শাঁসটি মাখনের মত নরম আর মিষ্টি! এত মোটা আর বড় আকারের কলাগুলো যে একটি ছাড়া খাওয়ার উপায় নেই! এ ছাড়া আছে কাজুবাদামের গাছ, আর বিচিত্র রংএর ফুলের গাছ!

নারকোলের রাজত্বে বাস করলেও আমাদের মত এরা ডাব খেতে জানে না। নারকোল ঝুনো করে পাড়া হয়। তারপর তার শাঁস থেকে তৈরী হয় নারকোল তেল। ঐ তেল দিয়ে এদেশের মানুষ রান্না করে, মাথায় গায়ে মাখে এ ছাড়াও নারকোল দিয়ে নানারকম খাবার তৈরী হয়। নারকোলের মালাগুলো ব্যবহৃত হয় নানা-প্রকার শিল্প কর্ম্মে আর ছোবড়া দিয়ে তৈরী হয় দড়ি, পাপোশ ইত্যাদি। বিদেশে চালান যায় তেল ও অন্তান্ত বস্তু। নারকোল এ দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাই ধনী বা গরীব সকলকারই বাড়ীতে কম বেশী নারকোল গাছ থাকবেই।

মারুতির বাবা, প্রফেসর মহেশ মেননকেও বড় ভালো লাগলো আমার। ওঁর ধীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আচার ব্যবহারে মনে পড়ে যায় আমার বাবাকে। ঠিক তাঁরই মত স্নেহপ্রবণ, খাঁটি মনের মানুষ মারুতির বাবা।

তিনি আমাকে পেয়ে ভারি খুসি হয়ে বললেন—কাবেরীর চিঠি পেয়েই তো সেবারে তোমাদের আনবার জন্তে মারুতিকে নিয়ে আমি নিজেই গিয়েছিলাম মা মালাবার হোটেলে—কিন্তু গিয়ে শুনলাম,—তোমরা চলে গেছো। তোমাকে তো আবার পেলাম, কিন্তু বড় দুঃখ মনে রয়ে গেলো, শান্তা মাকে আর কোন দিনই পাবো না!

—শান্তাদি,—সঞ্জয়দা! না তাদের দেখা আর কোনদিনই পাবো না।—

এই নির্ম্মম সত্যটি যে, দিনরাত আমার বুকটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ওদের কথায় আমার দুচোখ দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরতে লাগলো। আমার দুঃখে মারুতিরও চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠলো।

সে নিজের আঁচল দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললো,—আমার বাংলা শিক্ষার ক্লাব এখুনি বসবে। চলো ভাই দেখবে। মাত্র দুটি ছাত্রী থেকে সুরু করে এখন তিরিশে দাঁড়িয়েছে। ওরা শুধু বাংলা লেখা পড়াই শেখেনা, গানও আমার যা জানা আছে, শেখাই ওদের।

নাচতো ওরা ভালোই জানে, তবুও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে আর ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে নাচও তৈরী করাচ্ছি ওদের দিয়ে। সামনেই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব, সারা ভারত এমন কি বিদেশের জ্ঞানী গুণীরাও যোগ দেবেন এই মহা উৎসবে, আর শুধু মালাবারই কি পেছিয়ে থাকবে? তোমাকে এই সময়ে পেয়ে যে আমাদের কত ভালো হলো। মেয়েদের আরো বেশী গান শেখাতে পারবো,—মনে করে,—আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে!

মারুতিদের বাড়ীর নিচের তলায় একটা বড় হলে বাংলা ক্লাশ বসে। ওঁর সঙ্গে গেলাম সেখানে। ভারি আনন্দ পেলাম ওঁর শিক্ষাপদ্ধতি দেখে। মেয়েরা আমাকে শোনালো রবীন্দ্রসঙ্গীত দু'চারখানা,—নাচও দেখলাম ওদের। ভারি আশ্চর্য্য লাগলো শুনে যে মাত্র দু'মাসের শিক্ষায় ওরা এমন সুন্দর তৈরী হয়েছে।

ঠিক কথাই বলেছিলো আয়েঙ্গার। সেবারে এসে আমি মালাবার

উপকূলের এই সুন্দর দেশটির কিছুই দেখিনি। এদের শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ, ভদ্রতা, উন্নত রুচি জ্ঞান, সরলতা, অতিথি বাৎসল্য সব কিছুই এখন মুগ্ধ করেছে আমাকে।

আয়েঙ্গার উঠেছে এর্ণাকুলামে নিউ উড্‌ল্যাণ্ডস হোটেলে। ঐখানেই সে এসে বাস করে মাঝে মাঝে, জানলাম মারুতির কাছে। প্রতিদিন ভোর বেলায় আর সন্ধ্যাকালে, আমি, আয়েঙ্গার আর মারুতির সঙ্গে বেড়াতে বেরুই পায়ে হেঁটে, সুন্দর দেশটাকে প্রাণভরে দেখবার জন্য।

ভোর বেলায় একটি ভারি সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে। দলে দলে মেয়ে পুরুষ চলেছেন খালি পায়ে; পুজার দ্রব্য হাতে নিয়ে মন্দিরে। পুরুষদের কপালে আড়াআড়ি ত্রিপুণ্ড চন্দন রেখা, আর মেয়েদের কপালে, লাল, হলুদ কুলির টিপ। ওদের সদ্যস্নান করা লম্বা চকচকে কালো ভিজে চুলের রাশি ছড়ানো থাকে পিঠের ওপর। পরণে কারুর থাকে পট্টবস্ত্র, কারুর বা পরণে চেলি আর ঘাগরা বা লুঙ্গি, এটিই ওদের দেশী পরিচ্ছদ। আমিও মারুতির সঙ্গে একদিন গিয়েছিলাম মন্দিরে। মন্দিরটি বাড়ীর খুব কাছে। মন্দিরের গড়ন অনেকটা ব্রহ্মদেশের প্যাগোডার মত। কাঠের থাক্ থাক্ চূড়ার ওপর ঝক্‌ঝকে পেতলের ফলক বসানো। ভেতরে আছেন মহেশ্বর,—আর মারুতি দেবী। মূর্ত্তির চার পাশে আর সারা মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে জ্বলছে অসংখ্য তেলের প্রদীপ। ফুল, চন্দন, ধূপ ধুনোয় সুরভিত মন্দিরের আশ পাশের বাতাস। সকাল সন্ধ্যায় এখানে বাজে ডমরু, শাঁখ, ঘণ্টা, তার গুরুগম্ভীর নিনাদ বহু দূর থেকে শোনা যায়

মন্দিরের ভেতরে ছোট বড় নানা আকারের ঘণ্টা ঝুলছে পেতলের শিকলীতে। মনে বড় শান্তি পেলাম সেদিন মন্দিরে পুজো করে।

আয়েঙ্গার কয়েকদিন পরেই চলে গেছে মাদ্রাজে, কাজ সেরে শীঘ্রই ফিরে আসবে বলে গেছে।

মারুতিকে যত দেখছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি এমন অপূর্ব্ব উন্নত মনের মেয়ে আর দেখিনি আমি।

দুজনেই ভালোবেসেছি দুজনকে। মনে হচ্ছে আমাদের এ ভালোবাসা দু'দিনের নয়, বহু যুগ যুগান্তের।

মাকে লিখেছি মারুতির কথা। জবাবে মা লিখেছেন,—তুমি আসবার সময় অবশ্যই মারুতি মাকে সঙ্গে এনো, ওকে যে ইচ্ছে করছে।
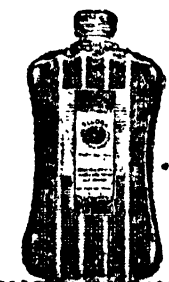
দীর্ঘ তিন বছর বাদে, কাবেরীদিকে,—চিঠি শা-র ঠিকানায়! লিখলাম,—এতদিন বাদে আমি আসতে পেরেছি কাবেরী দি! ওকে যে আমার কি ভালো লেগেছে তা আর লিখে জানাতে পারছি না!—আর বল্লার শা'র খবর জানাবেন,—ইত্যাদি। দিন বারো হল এসেছি এখানে, এর মধ্যেই মারুতি প্রায় আট-দশটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখে ফেলেছে আমার কাছে আর সেগুলো অটুট ধৈর্য্যের সঙ্গে শেখাচ্ছে ওর ছাত্রীদের। রবীন্দ্রনাথের দু'তিনটি ছোট নাটিকাও মালয়ালাম ভাষায় অনুবাদ করেছে মারুতি। মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করাবার বাসনা আছে ওর।

নেভালবেসের ডাক্তার ক্যাপ্টেন তপেন হালদার, মারুতির বাবার পুরোনো বন্ধু, জানলাম! ভারি ইচ্ছে হচ্ছিলো, একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা করবার। নেভালবেসের পাশপোর্ট ছিলো মিষ্টার মেননের, সেইটা নিয়ে একদিন মারুতির সঙ্গে গেলাম ক্যাপ্টেন মামার বাড়ী।

আমাকে আর মারুতিকে পেয়ে মহাখুসি হলেন ক্যাপ্টেন মামা।

কফি আর মাখন দিয়ে ভাজা কাজুবাদাম, পেস্তা আর নিমকি আমাদের খেতে দিলেন তিনি!

খেতে খেতে শান্তাদির কথায় উনি ক্ষোভের সঙ্গে বললেন,—তখন যদি শান্তা'মার সঙ্গে আমি যেতাম, তাহলে হয়তো মেয়েটাকে রক্ষে করতে পারতাম!—আহা হঠাৎ শক্ পেয়ে ওর মাথার ঠিক ছিলো না বোধ হয়!

—না মামা! শান্তাদি যে, সঞ্জয়দাকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারতেন না,—তাই চলে গেছেন তাঁর সঙ্গে! চোখের জল মুছে জবাব দিলাম আমি।

—ঠিক কথাই বলেছো মা! একটু অন্যমনস্ক ভাবে বললেন ক্যাপ্টেন মামা—এই দেখোনা আমার গিন্নীটি ক'দিন অসুখে ভুগছে, তাই আমারই মাথাটা ভাবনা চিন্তায় কেমন তাল গোল পাকিয়ে গেছে!

গিন্নি?—একটু চমকে উঠলাম ওঁর কথাটায়! উনি কি এই বয়সে আবার বিয়ে করেছেন নাকি? সে বারে তো শুনেছিলাম বিয়ে করেন নি! আমি অবাক চোখে চাইলাম ওঁর দিকে।

—হো! হো! হো! করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন ক্যাপ্টেন মামা।—ওঃ হো, ওঁর সঙ্গে বুঝি এখনও তোমাদের পরিচয়ই ঘটে ওঠেনি। আচ্ছা আচ্ছা সে সব পরে করে'খন, এখন আবার ওঁর তবিয়ৎটি ঠিক জুৎসই নেই কি-না। ঐ যে, ঐ দিকে শুয়ে আছেন তিনি।

ওঁর আঙুল নেড়ে দেখানো গিন্নীকে দেখে আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম?

একটু দূরে,, একটি ছোট খাটে, দামী বিলিতি কম্বলের ওপর শুয়ে আছে একটা বৃহৎ আকারের অ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুর।

ক্যাপ্টেন মামা উঠে গিয়ে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—মার্সি—ডারলিং, হাউ আর ইউ? আমার অভিমানী কাকীমাটি ওঁর দিকে একটা কটাক্ষপাত করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন!

—ছিঃ! রাগ করে না মামু! ওকে আদর করতে করতে বললেন ক্যাপ্টেন মামা,—ওরা যে তোমার আপনার লোক! এত কথাতেও মার্সি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হল না, মুখ গুঁজে শুয়ে রইলো।

আমার মনে হলো—এতে ওর দোষ কোথায়, আমরাও কি সইতে পারি? আমাদের প্রিয়জনের,—অপরের প্রতি অনুরাগ।

সন্ধ্যেবেলায় বাড়ী ফিরে দেখলাম,—আয়েঙ্গার অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

পরদিন সকালে, বোট জেটি থেকে একটি ছোট বোটে চেপে, আমি, মারুতি আর আয়েঙ্গার গেলাম বোলগ্যাটিন দ্বীপে! বোট থেকে, গাঢ় নীল জলে ঘেরা দ্বীপটাকে মনে হচ্ছিলো একটি নারকোল গাছের নিবিড় অরণ্য বলে।

দ্বীপে নেমে দেখলাম, অজস্র নারকোল গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে রঙিন ফুলে ঘেরা ছোট ছোট বাংলো।

দ্বীপের প্রায় অর্দ্ধেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেকেলে কটেজ প্যাটার্ণের বিরাট প্রাসাদ,—বোলগ্যাটিন প্যালেস। পেতলের চাকতি লাগানো মেহগ্নি পালিশের কাঠের আর লোহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এর গেট, দরোজা, আর ঝকঝকে বেলোয়ারী কাঁচের জানলাগুলো,—দৃষ্টি আকর্ষণ করে!

নানা আকারের পেতলের, ব্রোঞ্জের, কাঠের আর হাতির দাঁতের মূর্ত্তি দিয়ে সাজানো নিচের প্রকাণ্ড হলটি। কাঠের শিলিং থেকে মোটা মোটা পেতলের শেকলে ঝুলছে সাবেকি ঝাড়লণ্ঠন।

ওপরে আছে অনেক ঘর,—বিরাট চওড়া কাঠের বারান্দা!

শুনলাম আগে এটা ছিলো স্থানীয় রাজাদের প্রমোদ ভবন, এখন অবশ্য এটা গভর্ণমেন্টের সম্পত্তি। দেশ-বিদেশের মান্য গণ্য অতিথিরা, মাঝে মাঝে এসে বাস করেন এই নির্জ্জন রূপময়ী দ্বীপে। নেহেরুজী নাকি ভীষণ পছন্দ করেন এই দ্বীপটিকে।

নীচের হল পেরিয়ে এলাম আমরা বাগানে। বাগানের পরেই টলটলে নীল ব্যাকওয়াটার্স। তার ধারে চওড়া পাথরের বাঁধ দেওয়া।

ভেতরের বারান্দায় একটি বহু প্রাচীন কারুকার্য্য মণ্ডিত বৃহদাকারের ঘণ্টা ঝোলানো রয়েছে। শুনলাম আগে যখন এই ঘণ্টা বাজতো,—সমুদ্রের বহু দূর পর্য্যন্ত ভেসে যেতো এর গুরুগম্ভীর আওয়াজ;—এখন ওটা বাজে কিনা জানি না।

সমুদ্রের ধারে বাঁধের ওপর গিয়ে বসলাম আমরা। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে বড় বড় ফেনিল ঢেউ, তুলোর বস্তার মত গড়িয়ে চলেছে, ফোর্ট কোচিনের বালুকা বেলায়।

চারি ধারে রং-বেরংএর পুষ্পকুঞ্জ। উদ্দাম বাতাসে, সর সর, সাঁ, সাঁ,—নারকোল পাতার মর্ম্মর ধ্বনি। ঘন নীল আকাশের গায়ে, পাখা মেলে,—উড়ে চলেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে, সাগর বিহঙ্গরা।

উদাসী মনটা আমার ছুটে চলে গেছে তিন বছর আগেকার সেই দিনটিতে! সে কান পেতে শুনছে যোগলেকারের সেই কথাগুলো।

—কি চমৎকার বোল্‌গ্যাটিন্ দ্বীপটা রমি, তুমি যদি যেতে, ভারি ভালো লাগতো তোমার।

—ভারি গান গাইতে ইচ্ছে করছে, একটা গান ধরবে রমলা?

মারুতির ডাকে ফিরে এলো আমার পলাতক মনটা!

ধরা গলাটা, একটু কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম ওকে—বেশ তো কোন গানটা গাইব বল।

—সেই—সেই গানটা!—বড় ভালো লাগে আমার ঐ গানটা—

"জীবন যখন শুখায়ে যায়,—করুণা ধারায় এসো?"

ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললো আয়েঙ্গার। ওর দিকে চেয়ে, একটু দুষ্টু ভরা হাসির সঙ্গে বললো মারুতি—আচ্ছা। এত গান থাকতে, সব সময় তোমার ঐ গানটাই এত ভালো লাগে কেন বলো তো?—কম সে কম—বোধ হয় একশো বার গানটা শুনিয়েছি তোমায়।

—কি জানি কেন যে ঐ গানটা আমার মনে এত শান্তি আনে,

বার বার শুনতে ইচ্ছে করে গানটা। থাক না হয়, অন্য কোনো গানই এখন হোক।

—সত্যি কথাই বলেছেন আপনি, গানটি আমারও বড় ভালো লাগে। বলে আমি ধরলাম গানটা।

"জীবন যখন শুখায়ে যায়।"

মারুতিও গাইলো আমার সঙ্গে।

ছোট ছোট জেলে ডিঙি, সমুদ্রের ঢেউ ঢেউ এ ভেসে চলেছে। অনেকগুলো ডিঙিতে রয়েছে পুরুষদের সঙ্গে ধীবর কন্যারাও। ব্যাক ওয়াটার্স ছাড়িয়ে বড় ঢেউ এর দিকে চলেছে ওরা।

ধীবর রমণীদের পরণে রয়েছে লুঙ্গি আর কোর্ত্তা। চকচকে কালো গায়ের রং, আঁট সাট গড়ন ওদের, নিপুণ শিল্পীর হাতে খোদাই করা কালো পাথরের মূর্ত্তির মত দেখতে লাগছিলো।

দীঘল কালো কেশের আঁট করে, ঘাড়ের কাছে লম্বা কাগ খোঁপাগুলোও ওদের তেমনি সুন্দর। কারুর কারুর খোঁপায় ছিলো হলুদ রং এর ফুল গোঁজা। আমাদের গানের আকর্ষণে কয়েকটি মেয়ে ডিঙি বেয়ে এগিয়ে এলো দ্বীপের ধার ঘেঁসে। অবাক চোখে আমাদের দিকে চেয়ে গান শুনলো। তারপর নিজেদের ভাষায় কি সব বলাবলি করতে করতে, হি, হি, করে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে, এ' ওর গায়ে ঢলে পড়লো। ওদের শাদা ঝক ঝকে মুক্তোর মত দাঁতগুলো, সূর্য্য কিরণ লেগে, ঝিক মিক করে আলো ছড়ালো!

তারপর ওরা নিজেদের খোঁপা থেকে ফুল নিয়ে টুপ টুপ করে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, হাসির তোড়ে জল উথাল পাথাল করে, ঝুপ ঝুপ করে দাঁড় ফেলে চলে গেলো, অথৈ সাগরে রুজি রোজগারের চেষ্টায়।

আমাদের গান শেষ হল।

জেলেনীদের দেওয়া ফুলগুলো কুড়িয়ে আমাদের হাতে দিতে দিতে বললো আয়েঙ্গার,—ওরা কি বলছিলো জানেন? বলছিলো যে,—এরা বোধহয় ভিন ায়ের নাটুকে মেয়ে! এখানে এসেছে সায়েব বাবুদের গান শোনাতে! তা'সায়েব বাবুরাতো ওদের কত টাকা দেবে, ভালো ভালো খানা দেবে, আমরা আর কি দেব, ফুল দিয়ে যাই।

আমরা দুজনে হেসে উঠলাম ওর কথা শুনে। আয়েঙ্গার বললো,—এখানে ভালো হোটেল আছে, আমি যাই দুপুরের খাওয়ার অর্ডার দিয়ে আসি।

চলে গেলো আয়েঙ্গার।

—জায়গাটা তোমার কেমন লাগছে? আমাকে শুধোলো মারুতি।

—অপূর্ব্ব। জবাব দিলাম আমি।

—এ দ্বীপটাকে আমার বড্ড ভালো লাগে, কেন জানো?

আমার দিকে চেয়ে হাসলো মারুতি। আমি ওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললাম—কেন? বলবে আমায়।

—হ্যাঁ। তোমাকেই তো বলা যায় এ কথা,—বললো মারুতি।

—বছর দেড়েক আগে, এইখানেই প্রথম আয়েঙ্গারের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো আমার। প্রথম পরিচয় আমাদের কিন্তু হয়েছিলো আঘাতের মধ্য দিয়ে।

ওরা একদল ছেলে টেনিশ খেলছিলো ওদিকের মাঠে,—আর আমরা একদল মেয়ে কিছু দূরে একটা কাজু বাদামগাছের ছায়ায় বসে গল্প করছিলাম,—হঠাৎ একটা ইঁটের টুকরোর মত বল সজোরে এসে লাগলো আমার কপালে। উঃ! বলে কপালটা চেপে ধরলাম আমি। আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে, র‍্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, এসে আমার কাছে ক্ষমা চাইলো শঙ্করম্। তারপর জল এনে নিজের রুমাল ভিজিয়ে পটি দিয়ে দিলো আমার কপালে। কপালে তখন আরেকটি ছোট খাটো বল গজিয়েছে।
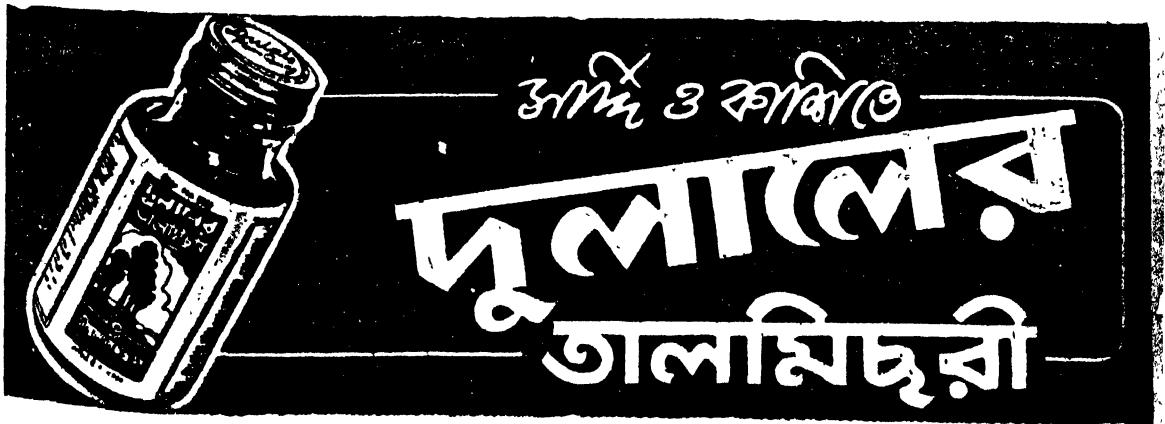
যাহোক এই হল আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত। তারপর লেখার মধ্য দিয়েই পরস্পর ঘনিষ্ঠতার পথে এগিয়ে এলাম। আমার মালাবার মাসিক পত্রিকায়, ও লিখলো গল্প, কবিতা। ওর সুন্দরম্ পাবলিকেশন মারফৎ ছাপা হলো, আমার মাদ্রাজি ভাষায় অনুবাদ করা দেশ বিদেশের কয়েকটি বিখ্যাত বই। বিশ্বকবির কয়েকটি নাটকও আছে এর মধ্যে। অনেক সুন্দর জায়গায় ঘুরেছি ওর সঙ্গে, আর খুব বেশী বেড়াতে আসি আমরা এই দ্বীপে।

—বাঃ! চমৎকার তো। ব্যথার মাঝে যার সূচনা, আনন্দের মাঝে হল তার পরিণতি। রীতিমত নাটক যে। তোমার "মালাবার" এমন রোমান্টিক গল্পটা পেয়েছে তো?

—চুপ চুপ। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মারুতি থামিয়ে দিলো আমায়। দেখলাম,—আয়েঙ্গার ফিরে আসছে। [ক্রমশঃ।

বিশ্ববিজ্ঞানে কয়েকটি স্মরণীয় নাম

জয়ন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংগে সংগে মানবজাতি জ্ঞানে-মানে-গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জন করতে পেরেছে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, আদিম যুগের মানুষ ও বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। আদিম যুগের সংকীর্ণ জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে অতিক্রান্ত হয়ে এসে মানুষ আজ সভ্যতার চরম সোপানে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এসবই সম্ভব হয়েছে মানুষের বুদ্ধির বিকাশের সংগে সংগে। বুদ্ধি থেকে প্রবৃত্তির উদ্ভব ঘটলো। বুদ্ধিমান মানুষ আর চিরকাল এক অবস্থায় থাকতে পারলো না। মানুষের বুদ্ধি ও সভ্যতা বৃদ্ধির সংগে সংগে মানুষের অভাবও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সেই অভাব পূরণের জন্য পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও গবেষণা চলতে লাগলো। বিশ্ববিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক কয়েকজন স্মরণীয় মনীষীর নামোল্লেখ করলেই আমরা বুঝতে পারবো তাঁদের অনুসন্ধান, গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে আজকের জীবনযাত্রা প্রণালীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

শত-সহস্র বছর ধরে বিশ্ববিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছিলেন—তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে। 'বিদ্যুৎ কি এবং বিদ্যুতের উদ্ভব কোথা থেকে' —এই কঠিন তত্ত্ব গবেষণায় বিশ্ববিজ্ঞানীদের গভীর জ্ঞানের অনুশীলন করতে হয়েছে। বিদ্যুৎ থেকে আমরা কত উপকার পাব, আমাদের কত উন্নতি হবে তা এঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। এই তাড়িতশক্তি থেকে মানুষ যাতে উপকার পেতে পারে তার জন্য জীবনপাত করে কঠিন গবেষণা-রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন দু'জন খ্যাতনামা ইংরেজ বিজ্ঞানী—স্যার হামফ্রী ডেভিড ও মাইকেল ফ্যারাডে। সেই সময় ডেভিডের গবেষণার অনুশীলন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং একটি হাসপাতালে তিনি ল্যাবরেটারী সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। তারপর তিনি সেখানে রসায়নের অধ্যাপক ও রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হন। ডেভিডের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হচ্ছে সেফটি-ল্যাম্প। খনিতে দাহ্য-বাষ্পের অগ্নিসংযোগ নিবারণার্থ এটি একটি তারবেষ্টিত আলোকাধার বা লণ্ঠন। খনির লোকেরা আজ কত সতর্ক হতে পেরেছে এই লণ্ঠনের সাহায্যে।

স্যার হামফ্রী ডেভিডের সহকারী মাইকেল ফ্যারাডে আবিষ্কার করলেন বৈদ্যুতিক-চুম্বক যার ফলে আজ পূর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে এবং অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। টেলিগ্রাফি এবং অন্যান্য মেসিন চালনার ব্যাপারে বৈদ্যুতিক-চুম্বকের যে কতখানি অবদান তা আমাদের আজ স্মরণ করিয়ে দেয় মাইকেল ফ্যারাডেকে।

মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত হয়ে আমেরিকায় স্যামুয়েল ফিনলী মর্স আবিষ্কার করলেন টেলিগ্রাফ। বৈদ্যুতিক-চুম্বকের সাহায্যে বহু অসাধ্য সাধিত হবে বুঝে বৈদ্যুতিক তার দ্বারা বার্তা প্রেরণের ব্যাপারে মর্স তাঁর গবেষণা-পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। বন্ধু-বান্ধব ও জ্ঞাতি-স্বজন থেকে বহুদূরে ইংলণ্ডে বাস করেছিলেন তিনি কিছুকাল। তখন তিনি ভাবতেন এই বিদেশ বিভুঁই-এ নিঃসংগতায় বাস করে চিন্তায়-দুশ্চিন্তায় থেকে দীর্ঘ চারটি মাস অপেক্ষা করতে হয় পত্রোত্তরের জন্যে। তিনি ভাবতেও পারেন নি যে তিনি টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করে দেশ-বিদেশের বার্তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সকলের সামনে পৌঁছিয়ে দিয়ে সমস্ত বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চিরকাল।

মর্স যখন প্রথম তাঁর গবেষণা-পরীক্ষা আরম্ভ করলেন তখন সকলে তা ঠাট্টাচ্ছলে উড়িয়ে দিলে। 'ডট' এবং 'ড্যাসে'র সাহায্যে মর্স এমন একটি বর্ণমালা প্রস্তুত করলেন যা সহজে বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে দেশান্তরে প্রেরণ করা যায়। তাঁর আবিষ্কারের ফলে পরবর্তী বিজ্ঞানীরা খুবই উৎসাহ পেয়েছেন কিন্তু এর জন্য মর্স সামান্য অর্থ সাহায্যও পাননি জনসাধারণের কাছ থেকে। ফলে তাঁকে অশেষ কষ্টের মধ্যে দিয়ে অভাব-অনটন-অনাহার সহ্য করে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে হয়েছে, এই টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের জন্য এবং শেষ-পর্যন্ত তাঁর জয়োল্লাসও ঘোষিত হলো দিকে দিকে। তাঁর আবিষ্কারের তিরিশ বছরের মধ্যেই সারা আমেরিকায় ২৫০,০০০ মাইল ব্যাপী এবং অন্যান্য দেশে ৬০০,০০০ মাইল ব্যাপী তারবার্তার কাজ সুরু হয়ে যায়।

মানুষ হিসাবে মর্স খুব ভগবৎ-অনুরাগী এবং ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। যখন তিনি প্রচুর টাকা উপার্জন করেছেন তখন তিনি যাহাদের অস্বচ্ছল অবস্থা দেখতেন মুক্তহস্তে দান করতেন তাদের। ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোরে প্রেরিত তাঁর প্রথম তারবার্তাতে লিখিত ছিল—'What has God wrought.' প্রকৃতির সৃষ্টির ন্যায় বিজ্ঞান সৃষ্টিতেও তিনি প্রত্যক্ষ করতেন ভগবদ্বিধান। তাঁর বিশ্বাস সকল সৃষ্টির মূলেই রয়েছে ভগবানের শাশ্বত অবদান। সেইজন্য তিনি তাঁর আবিষ্কারকে লোকহিতৈষিতার জন্য দত্ত বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে তা সারা বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ করে তুলবে।

* * * *

সুদূর অতীতে মানুষ কত কষ্ট সহ্য করে মোমবাতি বা লণ্ঠনের সাহায্যে রাত্রিকাল যাপন করতো। অতীতের মানুষকে কত কষ্ট যে সহ্য করতে হয়েছে তা আজ আমরা আর চিন্তাতেও আনতে পারি না। বিশ্ববিজ্ঞানীদের অবদান আজ আমাদের সব কষ্ট দূর করে দিয়েছে। আজ বিদ্যুতের আলোক চতুর্দিক আলোকিত করেছে, চতুর্দিকে নব জাগরণের সৃষ্টি করেছে। আজকের মানুষ আর নিজের গণ্ডীটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—নিজেকে আজ পরিব্যাপ্ত করতে পেরেছে সারা বিশ্বের মধ্যে। আজ বিশ্বের সাড়া পড়ে গেছে দ্বারে দ্বারে, শব্দ ঝংকৃত হয়ে উঠেছে তরংগে তরংগে, কণ্ঠ মুখরিত হয়ে উঠেছে সুরে সুরে, আর নয়ন স্বার্থক হচ্ছে ছবিতে ছবিতে। গ্রামোফোন, টেলিফোন, চলচ্চিত্র প্রভৃতির সৃষ্টির মূলে বিশ্ববিজ্ঞানীদের যে কত বুদ্ধি, শক্তি ও ধৈর্য ব্যয় করতে হয়েছে তা আমরা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি।

স্কটদেশীয় বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার বেল টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কার

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতেন বলে আলেকজাণ্ডার বেল বাকৃশক্তির নিয়মাবলী এবং শব্দ-স্পন্দন সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভে অনুপ্রাণিত হতে পেরেছিলেন। মানব-মনের স্বরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি সহজে পৌঁছে দেবার জন্য প্রথমে তিনি বিদ্যুৎ-সম্বন্ধে বুৎপত্তি অর্জন করলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর গবেষণা পরীক্ষা চলতে লাগলো। স্যামুয়েল মর্সের ন্যায় তাঁকেও অনেক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল : অবশেষে এই সব অন্তরায় অতিক্রম করে আলেকজাণ্ডার বেল তাঁর টেলিফোন আবিষ্কারে সাফল্যমণ্ডিত হলেন এবং প্রতিষ্ঠিত হলো 'বেল টেলিফোন কোম্পানী।' তাই আজ আলেকজাণ্ডার বেলের প্রসাদে ঘরে-ঘরে, দোকানে দোকানে, অফিসে-অফিসে টেলিফোনের সাড়া পড়ে গেছে।

আমেরিকার বিজ্ঞানী টমাস এডিশন—আবিষ্কৃত গ্রামোফোনের সাহায্যে, আমরা বহু জীবিত ও মৃত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। অবসর সময় আনন্দে অতিবাহিত করার জন্য গ্রামোফোনের যে কতখানি প্রয়োজন থাকতে পারে তা টমাস এডিশন আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। বাল্যকালে টমাস্ এডিশন আমেরিকার রেল ষ্টেশনে খবরের কাগজ বিক্রী করে বেড়াতেন। দিনের অবশিষ্ট সময় তিনি টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মরত অপারেটরদের দেখে যেতেন নিবিষ্ট চিত্তে। একদিন অকস্মাৎ এডিশন দেখলেন, সেখানের ষ্টেশন মাষ্টারের ছোট ছেলেটি ভয়াবহভাবে গাড়ী চাপা পড়ার সম্মুখীন হয়েছে। সংগে সংগে এডিশন এক লাফে ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। তাঁর এই বিরাট উপকারে মুগ্ধ হয়ে ষ্টেশন মাষ্টার টেলিগ্রাফি সম্বন্ধে তাঁকে সকল বৃত্তান্ত বললেন। অতঃপর এডিশন তাঁর গবেষণা পরীক্ষার পেছনে প্রচুর সময় ব্যয় করে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়ে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে আরামপ্রিয় মানুষের মনোরঞ্জক এই গ্রামোফোন যন্ত্রটি আবিষ্কার করলেন। অবসর সময়ে জীবন-যাপনের জন্য এই যন্ত্রটি যে এডিশনের কতবড় অবদান, তা আজ আর কারও অবিদিত নয়।

তারপর এডিশন তাঁর গবেষণা পরীক্ষা আরম্ভ করলেন ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে। তখনকার দিনে ফটোগ্রাফ কাচের প্লেটের সাহায্যে গ্রহণ করা হতো। এক রকম কৃত্রিম গজদন্তবিশিষ্ট ফিতেতে তিনি ছবি তুলতে লাগলেন এবং তারপর থেকেই বিরাট ফিল্ম ইনডাষ্ট্রীর উদ্ভব ঘটলো। তাই আজ শত শত নরনারী এই ফিল্ম জগতে প্রবেশ করে আমাদের আনন্দবর্ধন করতে পারছে। এ ছাড়াও টমাস এডিশন আবিষ্কার করেছেন ইলেকট্রিক বালব। প্রথমে জনসাধারণ এডিশনের এই গবেষণাকে উপেক্ষা করে ছিল অসম্ভব মনে করে, কিন্তু তারপর যখন তারা নতুন আলোকে আলোকিত হলো তখন তারা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে নিলে টমাস এডিশনের এই আবিষ্কারকে। জনসাধারণ যা অসম্ভব মনে করে বিশ্ববিজ্ঞানীর হাতে তাই সম্ভব হয়।

ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনির নাম চিরকাল ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফীর সংগে যুক্ত হয়ে থাকবে। তাঁর পূর্বে অনেকে ওয়্যারলেস সম্বন্ধে গবেষণা করে বায়ুমণ্ডলে ইথার জাতীয় পদার্থের যে একটা বিচিত্র আন্দোলন আছে সেইটেই উদঘাটিত করেছিলেন। কিন্তু মার্কনি দেখালেন, বিদ্যুতের সাহায্যে কি ভাবে বিচিত্র-স্পন্দনের সৃষ্টি করা যায়, দেখালেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঐকতানের সাহায্যে বিচিত্র স্পন্দন শুনে কি ভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারা যায়। মার্কনি সারাজীবন ধরে তাঁর গবেষণা-পরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছিলেন যাতে বহু দূর দেশ থেকে তারবার্তার মাধ্যমে খবর পেয়ে মানুষ উপকার পেতে পারে। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিজগৃহে বসে সুইচটি টিপে দিয়ে সুদূর অষ্ট্রেলিয়ায় আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে তিনি এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। মানবহিত সাধনব্রতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জীবনের পরিসমাপ্তিতে তিনি সমগ্র বিশ্বে সম্মানিত হয়েছিলেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মুহূর্ত মধ্যে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করে ক্রমবর্ধনশীল জ্ঞানের পরিধি কালে কালে যে কতদূর প্রসারিত হচ্ছে, তা আজ আমরা আমাদের সামনেই প্রত্যক্ষ করতে পারছি।

ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফী সম্বন্ধে পরবর্তীকালে আরও অনেক গবেষণা পরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই গবেষণা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমগ্র বিশ্বে প্রশংসার সামগ্রী হয়ে থাকবে চিরকাল। পদার্থ বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্বন্ধেও গবেষণা চালিয়ে গিয়ে বহু নতুন আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছেন তিনি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কলকাতার 'বসু-বিজ্ঞান মন্দির' তাঁরই অক্ষয় কীর্তি। বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য-রচনাতেও তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা-ও আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার সি. ভি. রমন প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটে এবং বিজ্ঞান সাধনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁরাও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। "জ্ঞান তপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়"—রবীন্দ্রনাথের এই উদাত্ত বাণীর মধ্যে দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মনীষার বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি কেবল বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক বা যশস্বী বিজ্ঞানীই ছিলেন না, সেই সাধনা সেই জ্ঞানের মুক্ত হস্ত অকৃপণ বিতরণেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান বিতরণ করেই তাঁর চিত্তের অপরিসীম পরিতৃপ্তি। ছাত্রদের তিনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন এবং নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্পূর্ণ উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্রদের জন্য। তাই বৈজ্ঞানিক-প্রবর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ মেঘনাদ সাহা, স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি পুত্রপ্রতিম ছাত্রগণই তাঁর কীর্তির দীপ প্রজ্বলিত করে রেখে তাঁর অবিনশ্বর আত্মার তৃপ্তি সাধন করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

• • • •

যতই দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে দূরের-নিকটের সকল ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের সংস্পর্শে আসছে ; কারণ মানব হিত সাধনব্রতে অবতীর্ণ হতে হলে চাই সহযোগিতা। বিশ্বহিত সাধনব্রতে অবতীর্ণ বিজ্ঞানীরা এবং আবিষ্কর্তারা কখনো বিনা সহযোগিতায় কোনো কার্যে হস্তক্ষেপ করেননি। তাঁরা বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন কালের বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও আবিষ্কারকে অনুসরণ করেছেন নিজেদের গবেষণাকে আরও দৃঢ় করবার জন্যে। পুরনো বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও আবিষ্কারের অন্তরায়ের পথে তাঁরা সংযোজিত করেছেন নতুন উদ্ভাবনা ও গবেষণার। তার ফলে আরও উন্নতি ঘটেছে

র্বের চেয়ে। স্টীম এঞ্জিনের ব্যাপারে এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুগ যুগ ধরে বিশ্ববিজ্ঞানীদের সংযোজনা ও নতুন ভাবনার ফলে স্টীম এঞ্জিন বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

প্রায় দু'হাজার কুড়ি বছর আগে আলেকজান্দ্রিয়াবাসী একজন গ্রীসীয়ের মুখে সর্বপ্রথম উদ্‌গত বাষ্পের নাম শুনতে পাওয়া যায়। বাষ্পনির্গত নলের সামনে একটি ছোটো বলকে ঝুলিয়ে রাখলে তাকে ঠেলার মতো যে অশেষ শক্তি আছে ঐ উত্তপ্ত জলবাষ্পের—এই রহস্য তিনি উদ্‌ঘাটিত করলেন। কিন্তু তাঁর পরে বহুকাল এ সম্বন্ধে কোনো গবেষণা-পরীক্ষাই চলেনি—সে এক নীরবতার যুগ। তারপর ধীরে ধীরে মানব মনে বাষ্পীয়শক্তির উদ্ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা জন্মাতে লাগলো। সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন ফরাসীয় বৈজ্ঞানিক একটি ক্ষুদ্র বাষ্পযন্ত্র তৈরি করলেন। এই যন্ত্রটির সাহায্যে ভূগর্ভ থেকে জল উত্তোলন করা যায়। এই ক্ষুদ্র বাষ্পযন্ত্রটি জেমস ওয়াটের অনুপ্রেরণারই স্বরূপ। বাল্যকালে জেমস ওয়াট অতি আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করে যেতেন উত্তপ্ত কেটলীর ঢাকনাটা ঊর্ধ্বগতিতে বাষ্পের ঠেলায় কেমন ওঠা-নামা করছে। যৌবনে জেমস ওয়াট গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রীয় যন্ত্র নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু অবসর সময়ে তিনি তাঁর গবেষণা পরীক্ষা চালিয়ে যেতেন। গরম কেটলীর ঢাকনাটা তুলবার মতো বাষ্পের যে অশেষ শক্তি আছে সেই নিয়েই তাঁর গবেষণা পরীক্ষা। ইত্যবসরে একদিন তাঁর ক্ষুদ্র পামপিং যন্ত্রটি বিগড়ে গেল। সংগে সংগে তিনি তা পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষান্তে তিনি অনায়াসেই ধরে ফেললেন যন্ত্রটির কি ব্যাঘাত ঘটেছিল। গবেষণার পর গবেষণা চালিয়ে তিনি আরও উন্নতির পথে নিয়ে এলেন এই বাষ্পীয় যন্ত্রটিকে। যখন উন্নতির শীর্ষে পৌঁছোলো তখন স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র ভূগর্ভস্থ তরল পদার্থ উত্তোলনের ব্যাপারে এই যন্ত্রটি বিস্তার লাভ করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে বাষ্পীয় এঞ্জিনের চরম বিকাশের জন্য অনেকে উৎসাহী হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার জর্জ ষ্টিফেনশনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষ্টিফেনশন অতি দুঃস্থাবস্থার মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনযাত্রা সুরু করেন। তাঁর পিতা এক খনিতে কাজ করতেন। কাজেই জীবন-ধারণের জন্য জর্জ ষ্টিফেনশনকেও অতি বাল্যাবস্থায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। প্রথমে তাঁকে কৃষিকার্যে ও পরে খনির কার্যে অবতীর্ণ হতে হয়। খনিতে কাজ করে এঞ্জিন-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি এতো দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন যে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই একটি বিরাট কয়লার খনিতে এঞ্জিন তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ালেন।

এঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণ করে তার প্রতি একটা গভীর অনুরাগ জন্মেছিল ষ্টিফেনশনের। তিনি অনুধাবন করতে পারলেন যে এঞ্জিন সম্বন্ধে সবকিছু জানতে হলে এঞ্জিন আবিষ্কর্তাদের লিখিত পুস্তক থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই এ সম্বন্ধে তিনি লেখা-পড়া সুরু করে দিলেন। যতই পড়তে লাগলেন ততই তাঁর উৎসাহ বাড়তে লাগলো। কিছুদিন অধ্যবসায়ের পরেই নতুন বাষ্পীয় এঞ্জিন উদ্ভাবনার জন্য তিনি মনঃস্থ করলেন। এই বাষ্পীয় এঞ্জিনের সাহায্যে যাতে প্রচুর ভারী জিনিস বহন করে নিয়ে যাওয়া যায় তা তিনি প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। ধনী-সম্প্রদায়ভুক্ত গমনশীল একটি বাষ্পীয় এঞ্জিন নির্মাণ করেন এবং তারপর আর একটি নির্মাণ করেন। এগুলি প্রকৃতই উন্নত ধরণের ইঞ্জিন।

ষ্টিফেনশনের এই এঞ্জিন আবিষ্কারের পর নানা ব্যক্তি নানা মত পোষণ করতে লাগলেন। কেউ কেউ বলতে লাগলেম—এই এঞ্জিনের সাহায্যে আমাদের অনেক সময় ও পরিশ্রমের লাঘব ঘটবে। আবার কেউ কেউ বলতে লাগলেন—এই ধূম উদ্‌গারিত অগ্নিময় এঞ্জিন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতো বাদানুবাদ সত্ত্বেও ষ্টিফেনশন তাঁর গবেষণা-পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। বহু খ্যাতিসম্পন্ন লোকের মধ্যে তিনি এই ধারণা জন্মিয়ে দিলেন যে রেলপথের প্রয়োজনীয়তা সকল সভ্য-দেশেরই প্রতীক। আদিমকালের এঞ্জিনের গতি এতো মন্থর ছিল যে সেইসময় 'দশ মাইল বেগে ধাবিত হতে পারে' এ রকম এঞ্জিন কেউ আবিষ্কার করতে পেরেছে কিনা দেখবার জন্য একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। তাতে ষ্টিফেনশনের 'দি রকেট' এঞ্জিনটি ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে ধাবিত হয়ে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলো। এর পরেই সারা গ্রেট-ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশে রেলপথ নির্মিত হলো।

বর্তমানকালে ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বেগে ট্রেণ চলাচল করছে অনেক দেশেই। আজকালকার ট্রেণও কত পরিবর্তিত হয়েছে আগেকার চেয়ে। আহারের ঘর, ঘুমোনোর ঘর এবং সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধাই হয়েছে এখন রেলগাড়ীতে। কত নদ-নদী, পাহাড় পর্বতের ওপর দিয়ে, কত দুর্গম অরণ্যের মধ্যে দিয়ে রেলপথ নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের অসুবিধা দূর করার জন্য। রেলযোগে ভ্রমণকে সম্ভব করার পেছনে বিশ্ববিজ্ঞানীদের দীর্ঘকালের যে অটুট ধৈর্য ব্যয়িত হয়েছে তা আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে জড়িত থাকবে।

ট্রেণ-চলাচলে স্টীম এঞ্জিনের চরম উন্নতির ফলে জাহাজ চলাচলে স্টীম এঞ্জিনের ব্যবহার প্রচলিত হলো। পূর্বে দাঁড়ের সাহায্যে অথবা পাল তুলে জাহাজ চলাচল চলতো। কিন্তু ধীর মন্থর গতিতে জাহাজ চলাচল সম্ভব হলো না। কয়েকজন বিজ্ঞানী সম্মিলিত ভাবে অগ্রাভিমুখে চালিত জাহাজ নির্মাণের জন্য স্টীম এঞ্জিন লাগিয়ে তাঁদের গবেষণা পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। তাঁরা পারস্পরিক চেষ্টা এবং সহযোগিতার উদ্যমে গবেষণা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ হলেন আমেরিকার বিজ্ঞানী রবার্ট ফুলটন। তিনি এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন। তাঁর নির্মিত জাহাজ বহুকাল হাডসন নদীর উপর দিয়ে চলাচল করেছিল। স্কটদেশীয় বিজ্ঞানী বেল-নির্মিত আর একটি জাহাজ 'কমেট' ক্লাইভ নদীর উপর দিয়ে চলাচল করেছিল।

জাহাজের ইমারত যখন আরব সাগর অতিক্রম করবার মতো দৃঢ়তর আকার ধারণ করলো তখনই তার উন্নতির সোপানে আরোহণের প্রথম পদক্ষেপ। 'গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ' ও 'সাইরিয়াস' নামে দু'টি জাহাজ ব্রিটেন থেকে প্রায় একই দিকে রওনা হলো। বাইশ দিন পরে দেখা গেলো গৌরবমণ্ডিত 'সাইরিয়াস' আমেরিকার বন্দরে চলাচল করছে। উন্নত ধরণের জাহাজ পূর্বের চেয়ে কত দ্রুত বেগে এবং কত নিরাপদে যে মহাসাগর অতিক্রম করতে পারে এইটিই তার উজ্জ্বলতম

আগেকার দিনে জাহাজ চড়াটা সকলের পক্ষে সম্ভব হতো না। মুষ্টিমেয় লোক, যাঁদের অর্থ-প্রাচুর্য ছিল তাঁদের পক্ষেই সম্ভব হতো জাহাজ চড়া। কিন্তু যতই দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে ততই জাহাজ নির্মাণের অসুবিধা রহিত হচ্ছে, অল্পমূল্যে অনায়াসে জাহাজ নির্মাণের সরঞ্জাম আসছে চতুর্দিক থেকে। বিশ্ববিজ্ঞানীদের গভীর অনুশীলনের ফলে, তাঁদের উর্বর মস্তিষ্কের উন্মেষের ফলে আজ আমরা অল্প ব্যয় করেই জাহাজের সাহায্যে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করতে পারছি ; দেশ-দেশান্তর থেকে আজ নানা সামগ্রী আমাদের দেশে প্রবেশ করছে এই জাহাজের সাহায্যে। জাহাজ নির্মাণের পেছনে সম্মিলিত বিজ্ঞানীদের যে কতখানি অবদান তা সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞানের অনন্ত প্রবাহ আজ ছুটে চলেছে প্রবল বেগে। এ অনন্ত প্রবাহ আরও প্রবলতর আকার ধারণ করবে নবজীবনের অভ্যুদয়ের সংগে সংগে। আজকের চলমান জীবন, বিজ্ঞানের আদর্শটাকেই গ্রহণ করে নিয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করে। তাই জ্ঞানের পরিধিও আজ সীমাবদ্ধ নয়, অনেক পরিমাণে প্রসার লাভ করেছে এই বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে। বিশ্ববিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক যাঁরা যাঁদের অবদান, যাঁদের নাম-কীর্তি যশ চিরকাল স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে যাঁরা বিশ্ববিজ্ঞান অনুশীলনে মৌলিক গবেষণার পথ প্রদর্শন করে সাং বিশ্বে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ দেশের শত শত নর-নারী বিজ্ঞান-চর্চায় ও মৌলিক গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করতে অগ্রসর।

জার্ম্মাণ জ্ঞানীদের মাধ্যমে ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

ভারতীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পুরাণ হইতে লওয়া হইয়াছে। পুরাণের অর্থ পুরাতন। ভারতীয়রা 'পুরাণ' অর্থে পৃথিবীর প্রাচীন দিনের পুরাতন গল্প মনে করিয়া থাকেন। অমর সিং দ্বারা লিখিত সংস্কৃত সংবিধান একবার পুরাণের এবং পঞ্চলক্ষণের অর্থ খুঁজিয়াছিলেন। এক পুরাতন গল্পে যাহাতে পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে উদ্ধৃত আছে তাহার পাঁচ প্রকার বিভিন্ন অর্থ করা যায়। এই গল্পে দেবতা ও মানুষের জন্ম উৎপত্তি ও মানুষের চৌদ্দ জন্ম এবং অবশেষে সূর্য্য ও চন্দ্রের রাজার কাহিনী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে পুরাণ সোজাসুজি ভাবে পুরাতন দিনের মনুষ্য জন্মের উপর দেবতাগণের আধিপত্য প্রমাণ করে। পুরাণে শুধুমাত্র পৃথিবীর সৃষ্টি। দেবতা ও দেবশক্তি সম্পন্ন মানুষের সম্বন্ধে কবিতাকারে উদ্ধৃত করা হয় নাই। জার্ম্মাণ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই পুরাণের অনুবাদে সত্যকারের সাহিত্য খুঁজিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। ১৭১১ সালে সুইজারল্যাণ্ডের 'জুরিকে' প্রথম পুরাণের অনুবাদ হয়। তারপরে বহুবার বিভিন্ন স্থানে জার্ম্মাণীর বহু স্থানে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। পুরাণের কিছু অংশ জার্ম্মাণীতে ভগবদ্গীতার ...য়ে ধরা হইয়াছে। আমরা "হাইনরিক জিমার" কাছে উৎকৃষ্ট অনুবাদের জন্য ঋণী। এই পুস্তকটার নাম "ভারতীয় পুরাণ," ইহা ১৯৩৬ সালে 'ষ্টুটগার্টে' সংকলিত হয় এবং ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫২ সালে 'জুরিকে' সংকলিত হয়। ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্র হিসাবে 'সুইজারল্যাণ্ডের' 'জুরিক' সহরকে ধরা হয়। এখানে অনেক জার্ম্মাণ জ্ঞানী লোকের লিখিত কার্য্যাবলী আবির্ভূত হয়। কতকগুলি পুরাণের কাহিনী কবিতা আকারে অনুবাদ করা হয়। এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যে এ, এফ, ফন, স্কাক্ ১৮৫৭ সালে বার্লিনে আবির্ভূত "গঙ্গার কর্ণধ্বনি" তাহাতে অধিকাংশই পুরাণ হইতে লওয়া হইয়াছে। প্রথম সংকলনের ২০ বৎসর পরে 'হামবুর্গে' প্রকাশিত হয় যাহাতে কবিকে "জার্ম্মাণ ভারতীয় ভগবৎপ্রবণ" বলা যাইতে পারে। সেই সময় হইতে ইহা জার্ম্মাণ ভারতীয় সাহিত্যকে এক করিয়াছে। ফ্রিডরিক রুকার্ট ১৭১১ সালের অনুবাদ লইয়া দুইটি বিভিন্ন অধ্যায় পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন যাহা এক পুস্তক, যাহা সাধারণের দ্বারা প্রশংসিত ও সাদরে গৃহীত হয়। ইহার কারণ এই পুস্তকে পৃথিবীর দেবতাগণের ও প্রাচীন মহাপুরুষগণের কথা উদ্ধৃত আছে। পুরাণের এক অংশে 'বিষ্ণু পুরাণ' যাহাতে কেবলমাত্র দেবতাগণেরই কথা উল্লিখিত। 'মিউনিকে' ১১০ সালে 'এ, পল' এই পুস্তকটি প্রকাশ করেন। উনি এই পুস্তকের নাম দেন "কৃষ্ণের পৃথিবীতে আবির্ভাব ও ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের ২০ প্রকারের প্রার্থনা।" এই পুস্তকের মাধ্যমে বিদেশী সাহিত্যের জ... তাঁহার সমস্ত মেধাশক্তি প্রয়োগ করিয়া উৎকৃষ্ট জিনিষটি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুরাণ অভিজ্ঞ ভক্তদের জন্য লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যেও এক সাহিত্য আছে যাহার বিকাশ করার চেষ্টা কর্তৃপক্ষ করিয়াছেন। এই সাহিত্য ভারতীয় জনসাধারণের চরিত্র প্রকাশ পায়। এই সাহিত্য জার্ম্মাণ জ্ঞানী ব্যক্তিমণ্ডলী কর্মক্ষমতার প্রকাশ পায়, সহজ ও সরল ভাবে লিখিত এই সাহিত্যের নাম দেওয়া হয়—শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশ পায় এবং পবিত্র জিনিষ-এর পরিপূর্ণতা ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এ... সকল দিকে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই শাস্ত্র ও ইহার সাহিত্য বোধগম্য করিতে হইলে প্রথমে "মরিস ভিনটারনিট্স" এর লিখিত "ভারতীয় সাহিত্য" পড়িতে হইবে। এই "ভারতীয় সাহিত্য" এ... সুন্দর ভাবে ভারতীয় কৃষ্টিকলার ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং ইংরাজী ভাষা লিখিত এবং ইহা ভারতীয় দ্বারা নিজেদের ভাষায় অনুবাদ ক... হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ১৯২৬ সালে জার্ম্মাণীর "লাইফজিগে" জোয়ান ইয়াকুব মেয়ার জার্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী এই পুস্তক সরকার বাহাদুর ও শাসকমণ্ডলীর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ইহাতে পুরাতন ভারতের কৃষ্টি কলার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু ইহার জন্যই জার্ম্মাণ ঐতিহাসিকবৃন্দ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই পুস্তককে জ্ঞানের ভাণ্ডার মনে করেন। তাঁহারা পুরাতন ভারতের জীবন যাপন প্রণালীও এই পুস্তক হইতে জানিতে পারেন। ইউরোপের অধিবাসীগণ ইহাতে কতখানি আগ্রহান্বিত তাহার পরিচয় পাওয়া যায় "মাতঙ্গলীলার" অনুবাদ হইতে। ইহা নীলকান্ত-এর হস্তিখেলা হইতে আমরা সমস্ত হস্তিবিজ্ঞানের ক...

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

এক একদিন ক্লান্ত হয়ে পড়ে সৌমেন। ভয় পায়, বাইরে নিঃশব্দ অন্ধকার রাত্রির রূপ দেখে। কেউ কোথাও জেগে নেই, একটি ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাকও শোনা যায় না। পথের প্রহরীগুলিও হয়তো অবসন্ন, বিশ্রামসুখমগ্ন।

বন্ধ ঘরে মাথার উপরে পাখা ঘুরছে, ক্লান্তিহীন চোখের সামনে জ্বলছে আলো।

সৌমেন কাগজ-কলম নিয়ে লিখছে। কিন্তু লেখনী যেন আর প্রসন্ন হতে চায় না।

সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে এমনি রাত জেগে-জেগে সে লিখেছে। লেখার পাহাড় জমেছে। কত বিচিত্র বিষয়ে কাহিনী রচনা করেছে। তার অনেকগুলি ছাপাতে হয়েছে ইতস্তত, অধিকাংশই রয়েছে অপ্রকাশিত। সাহিত্যের দরবারে নবাগত না হলেও পরিচিতদের একতম নয়। যৌবনের সীমা পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে পৌঁচেছে। তবু খ্যাতিমানদের স্থান দখল করতে পারেনি। অনিশ্চিত জীবন। যে-কোন মুহূর্তে তার মর্তকাবা বিনষ্ট হতে পারে। তার মৃত্যুর পর হয়তো লেখক ও পাঠকমহলে তার সম্বন্ধে এতটুকু ঔৎসুক্য জাগবে। হয়তো তার অপ্রকাশিত রচনাগুলি ক্রমশ প্রকাশিত হবে। বিদগ্ধজনের প্রশংসায় মুখর হবে ভারতীর কুঞ্জবন। মৃত শিল্পীর আত্মা তৃপ্ত হবে। চিরস্মরণীয় হবে অনাদৃত শিল্প-স্রষ্টা। কিংবা—হয়তো কেউ স্মরণই করবে না অখ্যাত সাহিত্যিককে, কোন সংবেদনা-পরায়ণ সম্পাদক সংবাদপত্রের এক কোণায় ঘোষণা করবেন তার মৃত্যু-সংবাদ। সে পৃথিবীতে এসেছিল, বেঁচেছিল—মানুষের মতো, আর দশজনের মতো প্রতিষ্ঠা কামনা করেছিল, চেষ্টা করেছিল এই ধরণীতে বেঁচে থাকার। কিন্তু তার সে আশা সফল হলো না। অথচ প্রতিভা ছিল তার, সে-প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিল সৌমেন। কিন্তু আজকাল শুধু প্রতিভাবলে অমর হতে পারে না কেউ। এখন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে তার মতো চুপ করে ঘরের কোণে বসে থাকলে চলে না। যোগাযোগ রাখতে হয় বাইরের সঙ্গে, খোসামোদ করতে হয়, তোষামোদ জানাতে হয়। তোষামোদ জানে না সৌমেন, নামের জন্য আত্মসম্মান বিসর্জন সে দিতে পারে না।

চোখের সামনে সে দেখেছে অল্পকালের মধ্যেই কত অখ্যাত লেখক খ্যাতির চরম শিখরে উঠে যাচ্ছে, রাতারাতি বড় লোক হচ্ছে, সম্পাদক মশায়রা অনবরত তাগিদ দিচ্ছেন, প্রকাশকের দল ধর্না দিচ্ছে তাদের দুয়ারে। কিন্তু সে শুধু লিখে যাচ্ছে মনের তাগিদে। হয়রাণ হচ্ছে লিখে লিখে। পাঠক নেই তার সাহিত্য ক্ষেত্রে সে প্রায়

কী হবে লিখে? রাত জেগে কী লাভ? ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক। কিন্তু মনের মধ্যে ভাব জমিয়ে রাখা কি ভালো? প্রকাশের চেয়ে, সৃষ্টির চেয়ে অধিক তৃপ্তি কোথায়? সে সৃষ্টি করে যাবে, মনের সব ভাব খাতার পাতায় লিখে রাখবে দিনের পর দিন—জীবনভোর। কেউ না পড়ুক, তবু। লেখার স্তূপ জমবে? জমুক না। ক্ষতি কি? শেষ পর্যন্ত সে লিখবে, লিখে যাবে, অভ্যাস ছাড়বে না। যদি এমনি অপরিচয়ের বেদনা নিয়ে বিদায় নিতে হয়, নেবে। কিন্তু মৃত্যুর আগে লেখাগুলি ভস্মীভূত করবে চোখের সামনে। সারা জীবন ধরে যে সৃষ্টি সে করেছে তার মধ্যে যতটুকু সারবস্তু রয়েছে, উত্তরকালের সাহিত্য-সন্ধানী যেন তা' আবিষ্কার করতে না পারে, যে এমনি অনাদরে চলে যেতে বাধ্য হলো তাকে যেন খুঁজে না পায়। মিথ্যে সমবেদনা সে চায় না। অমরত্বের বীজ বপন করে কী হবে? তার চেয়ে যে মহীরুহ সে নিজের হাতে সযত্নে লালন করে এসেছে, তার ফল যদি নিজে ভোগ করে যেতে না পারলো, তবে সে নিজের হাতে তাকে নির্মূল করে যাবে।···

আবার পূর্ণ উদ্যমে লেখনী চালায় সৌমেন। এ অভ্যাস ও প্রেরণা যে তার মজ্জাগত হয়ে রয়েছে।···

সেদিন তার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে কোন অভিজাত সাময়িক পত্রে। পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে তার কাছে এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। এবার যেন একটু আশার আলোক দেখা যাচ্ছে। খুশী হলো মন। সৌমেন প্রকাশকদের কাছে চিঠি লিখলো "আমার লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করলে বাধিত হব। আপনাদের উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম।" কিন্তু বাঙ্গালা-দেশের প্রকাশক। তাঁদের সময় নেই। লেখকের চিঠির জবাব না দেওয়াই ভদ্রতা। তবু, সৌজন্য-বোধ সকলের তো সমান নয়। দু'একটি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছে। অখ্যাত লেখকের রচনা বাজারে অচল। কয়েকদিন পরে জনৈক সহৃদয় প্রকাশক জানালেন, আমাদের নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদনের জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠাতে পারেন। আর একজন লিখলেন, আমাদের নির্বাচিত পাণ্ডুলিপিগুলি প্রকাশ করতে প্রায় দু'বছর সময় লাগবে। সুতরাং নতুন লেখা প্রকাশের দায়িত্ব নিতে আমরা অক্ষম। আশা করি নিজগুণে ত্রুটি মার্জনা করবেন।···

সম্পাদকমণ্ডলীর মনোনীত লেখাটি পুনরায় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে পাঠাতে হবে। নির্বাচক-মণ্ডলীর সদস্যদের সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ থাকলেও লেখককে তাঁদের নাম বা পরিচয় জানানো হবে না। হয়তো প্রকাশক নিজেই লেখা নির্বাচন করবেন। হয়তো অনির্দিষ্টকাল ধরে রেখে দেবেন ড্রয়ারে। সংবাদ নিতে গেলে সবিনয়ে উত্তর দেবেন, নির্বাচকমণ্ডলীর বিবেচনাধীন রয়েছে পাণ্ডুলিপি, তাগাদা করেছি, আবার করবো। জানেনই তো ওঁরা সব কাজের লোক, বড়লোক, বেশি তাগাদা করা চলে না। কী আবার মনে করে বসবেন। তা' আপনার লেখাটি অনেকদিন ধরে পড়ে রয়েছে। এবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তারপর হয়তো একদিন সকালের ডাকে লেখাটি ফিরে আসবে তার কাছে, কিংবা আসবে একটি পোষ্ট কার্ড। তাতে লেখা থাকবে—'আপনার লেখা মনোনীত হয়নি। যে-কোনদিন এসে লেখাটি ফেরৎ নিয়ে যেতে পারেন।'

কাছে। প্রকাশক উদার। তিনি জানালেন, আপনি একবার সময় করে আসুন। তখন বইটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

সুতরাং প্রকাশকের দরজায় হাজির হলো সৌমেন। সৌজন্যের ত্রুটি করলেন না ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বললেন, দেখুন, মার্কেটের অবস্থা সুবিধের নয়। তবু আপনার লেখাটি নিশ্চয় ভালো হয়েছে। আমি বলি—আপনি নিজেই বইটি ছাপুন না। আজকাল তো এই রেওয়াজ। লেখকরাই প্রকাশক, আমরা শুধু তাঁদের কমিশন-এজেন্ট। একটি বই ছাপতে আর বেশি কী খরচ পড়বে। এই দেখুন, আমি একটি খসড়া হিসেব করে রেখেছি।

সৌমেনের সামনে হিসেবটি রাখলেন প্রকাশক। তার উপর চোখ বুলিয়ে প্রমাদ গুণলো সৌমেন। ছোট একটি বই। প্রকাশকের হিসেবে এক হাজার কপি ছাপতে খরচ পড়বে ডুহাজার টাকা। বই-এর দাম আড়াই টাকার বেশি হতে পারবে না।···

চুপ করে রইলো সৌমেন।

কিন্তু প্রকাশক সৌমেনের মন বুঝলেন। বললেন, একটি বই-এর শ' পাঁচেকের বেশি থাকে না। এ লাইনে যারা রয়েছে তাদের তো আপনারা—মানে লেখকরা বিশ্বাসই করতে চান না। গাঁটের পয়সা খরচ করে ওরা চোর সেজেছে মিছিমিছি।

সৌমেন বলল, আচ্ছা, এ সম্বন্ধে আপনার সংগে পরে কথা বলবো। ···নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরলো সৌমেন। সুলেখা বলল, আমায় একটি শাড়ি কিনে দেবার কথা ছিল না তোমার ?

: হ্যাঁ ছিল। কিন্তু—

: তা' জানি—জানি। কবে তোমার লেখা বই বেরুবে, প্রকাশকের কাছ থেকে টাকা পাবে! ততদিন অপেক্ষা করতে পারবো না। সত্যি, আমি তো অবাক হয়ে যাই—তোমার কথা ভেবে। কী অসাধারণ তোমার ধৈর্য! আচ্ছা বল তো, কী হবে ওসব ছাই-ভস্ম লিখে ? পয়সা নেই, শুধু ভূতের বেগার খাটা।

: ভূতের বেগার নয়। আমি বিশ্বাস করি, কোন শ্রমই ব্যর্থ হয় না। একদিন দেখবে—অনেক টাকা হবে আমার। যা দেখেছি, যা অনুভব করেছি, জীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি—সবই তো লিখে রেখেছি। তার দাম কি হবে না কখনও? হবে—নিশ্চয় হবে।

: তুমি শুধু ঐ আশা নিয়েই থাক। যখন তোমার পয়সা হবে তখন সময় থাকবে না আর। তার চেয়ে বরং লেখা ছেড়ে দাও, শরীরটা তো সুস্থ থাকবে অন্তত। এখনও বলছি আমার পরামর্শ শোন।···

কিন্তু লেখা ছাড়তে পারে না সৌমেন। লিখে যায়, কিন্তু টাকা না। অন্যতর উপায়ে জীবিকার্জন করতে হয়।

সেদিন তার একটি বই সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন ; ...ক রচনারীতির সংগে লেখকের পরিচয় নিবিড় নয়। প্রাচীনপন্থী : তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট, মনে দাগ কাটবার মতো। কিন্তু ...ত সমালোচনায় লেখকের কিছু যায় আসে না। বিশেষ করে, ...ন যখন প্রতিষ্ঠিত লেখক নয়।·····

সেদিন ড্রয়ার খুলে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে রাত্রি জেগে যা' ...ছি, সেই পাণ্ডুলিপির দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সীমা রইল না সৌমেনের। বিচিত্র বিষয়ে বিচিত্র তার লেখা। এগুলো কি শুধু আবর্জনা, জঞ্জাল ? এর কি কোন মূল্য নেই ?

ধুলো ঝেড়ে দু'একটি লেখা তুলে নিয়ে পড়লো সৌমেন। মনে হলো, এযুগের বহু স্বনামধন্য লেখকের চেয়ে ভালো তার লেখা। আজ যারা খ্যাতিমান, তাদের অনেকেই তার কাছে দাঁড়াতে পারে না। তবু সে অখ্যাত। নিয়তির নির্মম পরিহাসই বটে।

না—কী হবে এ সব আবর্জনা জমিয়ে রেখে ? যা কখনও কোন কাজে লাগবে না তার উপর কিসের এত মমতা ? টেবিলের উপর থেকে মোমবাতি তুলে নিয়ে আলো জ্বাললো সৌমেন। স্নিগ্ধ আলোয় তার সুন্দর হস্তাক্ষরগুলি আরো সুন্দর দেখালো। লেখার স্তূপ কাছে এনে মোমবাতিটি এক কোণায় লাগালো। লেখাগুলো সে পুড়িয়ে ফেলবে। আগুন ধরলো এক কোণায়। একটু জ্বলেই নিভে গেল। পুরণো কাগজে সহজে আগুন ধরতে চায় না।

হঠাৎ কেমন যেন মায়া হলো লেখাগুলোর উপর। এই লেখাগুলির সঙ্গে তার কত নিবিড় পরিচয়। হয়তো এরই মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে তার বড়ো হবার বীজ। সুখে-দুঃখে, জীবনের ও মনের বিভিন্ন অবস্থায় এই লেখার মধ্যে সে পেয়েছে সান্ত্বনা ও আনন্দ। আজ সে এত নিষ্ঠুর হবে কেমন করে ?

মোমবাতি নিভিয়ে দিল সৌমেন। কয়েকটি লেখা বেছে নিল। সম্পাদক ও প্রকাশকের কাছে এগুলো পাঠিয়ে দেখা যাক না। তাঁদের সে অনুরোধ করবে যেন লেখাগুলো দয়া করে একবার পড়ে দেখেন।

পাশের ফ্ল্যাটের দিকে ছুটলো সুলেখা

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥
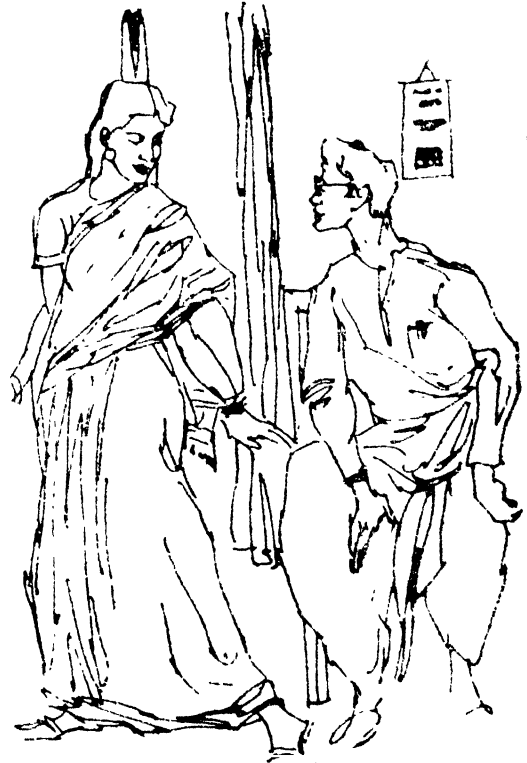
কিংশুকবাগিনী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

॥ ৩ ॥

কিংশুকের বন্ধুদের কথা কিছু বলে রাখি। ওর একপাল বন্ধু ছিল আর আড্ডাটা বসত ওরই পড়বার ঘরে। বন্ধুদের প্রায় সবাই চাকুরে শুধু কিংশুক আর মাসকেল ছাড়া কাজেই আড্ডাটা রবিবার ও সকলের ছুটির দিনেই জোর জমত, তবে নিত্য যাদের কিংশুকের পড়ার ঘরে ঢুঁ না মারলে ভাত হজম হত না তারা হল মামা, মাসকেল ও মহাবীর। এরাই হল কিংশুকের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুতরাং এদের কথা একটু বিশদভাবে বলি।

মামা জজ কোর্টের কেরাণী। ওর আসল নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় তবে সে নাম ও নিজে আর ওর বাড়ীর লোক ছাড়া আর সবাই ভুলে গেছে। কি ছোট কি বড় এমন কি বন্ধুদের গুরুজনেরা অবধি ওকে এখন মামা বলে ডাকেন। ম্যাট্রিক পাশ করে ওর নিজের এক মামার জোরে কোর্টের চাকরীটা বাগিয়েছিল, তাই প্রথম প্রথম মামা বলে ডেকে সবাই ওকে 'কনডেম' করত কিন্তু পরে যখন মামার জোরেও চাকরী বাগানো মাথায় উঠল তখন মামা ডাকটা 'কমেনডেশ্যনে' দাঁড়াল। মামা দলের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়সে এবং বুদ্ধিতে দু'দিকেই বড় ও এ আড্ডার পারমানেণ্ট কৌন্সিল, দলের কেউ যখন প্যাঁচে পড়ে, মামা তখন সে প্যাঁচ মুক্ত করে ভাগনেকে উদ্ধার করে। ভাগনেরাও প্যাঁচমুক্ত হয়ে যথাসাধ্য 'ইন কাইণ্ডস', ভেট দিয়ে মামাকে তুষ্ট করে। চাকুরীস্থলে মামার আরও একটা নাম চালু ছিল সেটা হচ্ছে ডি॰ সি॰ বা ডিহাইড্রেড ক্লার্ক। ডিহাইড্রেড মাল তা সে আলুই হোক কি দুধই হোক জল না পেলে যেমন খোলতাই হয় না, তেমনি মামার প্রসারিত বাঁ হাতে কিছু না পেলে মামা বাইরের লোকের কাছে মুখ খুলত না। কিছু না দিয়ে লোকে বুঝতেই পারত না যে লোকটা মানুষ না 'ডামী'। অভ্যেসটা শেষে এমন হল যে কি ঘরে কি বাইরে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই মামার বাঁ হাতটা এগিয়ে আসত। বন্ধুরা আর কিছু না দিক নিদেন পক্ষে আঙুল দিয়ে মামার হাতে খোঁচা দিত আর যেখানে খোঁচা খাওয়া সম্ভব হত না সেখানে মামাই নিজে নিজের হাতে খোঁচা দিয়ে নিয়ম রক্ষে করত। তবে একটা কথা মামার স্বপক্ষে বলা চলে, সেটা হচ্ছে এই যে হাঁকাই প্রচণ্ড হলেও অল্পেতেই ওর খাঁই মিটত।

মাসকেলের ভাল নাম আনন্দ কুণ্ডু, বন্ধুরা আদর করে মাসকেল বলে ডাকে। আনন্দ লম্বায় ছ' ফুটের ওপর, ছাতি সাতচল্লিশ ইঞ্চি, বাই সেপ, ফরসেপ ইত্যাদি কি সব আছে না সব মানানসই? ঐ বছর ইণ্টার কলেজিয়েট মাসল পোজিং, ও বডি বিল্ডিং-এ সোনার মেডেল পেয়েছে। সে সময়ে গলি-শ্রী বা গ্যাঁড়াতলা-শ্রী টাইটেল দেওয়ার রেওয়াজ চালু ছিল না তাই কোন শ্রীলাভ করতে পারেনি কিন্তু মহাবীর সে দুঃখ ঘুচিয়ে দিয়েছে! ও মাসল থেকে মাস[illegible] কথাটা বার করে ঐ নামে আনন্দকে ভূষিত করেছে। মাস[illegible] অত্যন্ত বিনীত লোক, গায়ে জোর আছে এটা যেন ওর [illegible] লজ্জার ব্যাপার। এত আস্তে কথা বলে যে তিন হাত দূরের [illegible] শুনতে পারে না। তবে রাগলে রক্ষা নেই। কিংশুকের সংগে [illegible] বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে আষাঢ়স্য তৃতীয় সপ্তাহে ঝুলবে।

দলের কমাণ্ডার ইনচীফ মহাবীরের পুরো নাম মহাবীর হাজ[illegible] ছেলেবেলাতেই পিতৃমাতৃহীন মাসীর কাছে মানুষ, মেসো [illegible] সিভিল সার্জেন। ওর চেহারার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে [illegible] শুধু এইটুকু বলব যে প্রথম শ্রেণীর রোগা, আজকালকার [illegible] বলা যেতে পারে কৃশ-শ্রী। অসুখ বিসুখ করলে আজ [illegible] কোনও ডাক্তার ইনজেকশ্যান দিতে রাজী হয়নি, বলে হাড়ে ছুঁচ ঠেকে যাবে। মহাবীরের গলায় জোর ছিল প্রচণ্ড যেমন [illegible] রোগা মানুষের [illegible] আর আই, এ, পাশ হলে কি হয় ইংরেজীতে দখল ছিল ভারী। বিস্তর ইংরেজী নভেল পড়েছে এবং পড়ে তাই মুখে ইংরেজীর খৈ ফুটত। ওটা মিশনারী স্কুল কলেজে পড়বার দরুণও হতে পারে। ঐ কঞ্চির মত চেহারা থেকে যখন ইংরেজীর তুবড়ী ফুটত তখন আচ্ছা আচ্ছা পালোয়ানকেও সভয়ে পেছিয়ে আসতে হত। মহাবীরের হাবভাব ছিল বেপরোয়া, মুখে কিছু আটকাত না আর মাসকেল যদি পাশে থাকত তাহলে ত কথাই নেই। ওর বাপ প্রচুর রেখে গেছে মাসীও নিঃসন্তান তাঁরও সবকিছুর মালিক হবে, তবু ছেলেটা বসে খায় না। সরকারী হাসপাতালের ষ্টোরে চাকরী করে, সেখানেও দুপয়সা কি আর হাতে আসে না নিশ্চয় আসে।

কিন্তু এত টাকা সত্ত্বেও কোনও মেয়ের বাপ নিজের মেয়ে বা বাপ মা মরা ভাইঝি ভাগ্নীর সংগে ওর বিয়ের প্রস্তাব আজ অবধি আনেন নি। ভবিষ্যতেও যে কোনও প্রস্তাব আসবে তাও মনে হয় না। মহাবীর কারণটা জানত। আয়নায় মুখ দেখে সকলের মত নিজেকে সাক্ষাৎ কন্দর্প ভাবলেও স্নান করতে গিয়ে বা অন্য কোনও সময় নিজের শরীরের ওপর দৃষ্টি পড়লে ওর নিজেরই নিজের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মাত, বুঝত এই চেহারায় চট্ করে কিছুই হবার নয়। তাই যখন দেখত যে

মায়ের মমতা ও
অষ্টারমিল্কে
প্রতিপালিত
আপনার শিশু অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত বলেই এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, সদাই হাসি খুশী। কারণ অষ্টারমিল্ক ঠিক মায়ের দুধেরই মতন। অষ্টারমিল্ক খাঁটি দুধ থেকে শিশুদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী। সেজন্য সহজেই হজম হয়। শিশুদের রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাবার জন্য অষ্টারমিল্কে লৌহ আছে। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয়েছে, ফলে আপনার শিশুর দাঁত ও হাড় মজবুত হয়ে গড়ে উঠবে।
OSTERMILK
.........মায়ের দুধেরই মতন
বিনামূল্যে অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা (ইংরেজীতে)
আধুনিক শিশু পরিচর্য্যার সবরকম তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সায় ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায় 'অষ্টারমিল্ক' পোঃ বক্স নং ২২৫৭ কোলকাতা—১
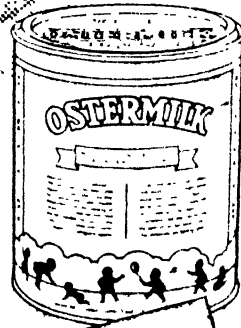
বন্ধুরাও সব একে একে বিয়ে করে ঘরে বৌ আনছে তখন ওর ভেতরটা হু হু করে উঠত। যারা আইবুড়ো তাদের ও প্রাণপণে বোঝাত যে এ লাইফ-এ বিয়েটাই একমাত্র কাম্য জিনিষ নয়। লাইফ'-এ অনেক মহৎ কিছু করবার আছে। বিয়ে করলে সব শু হয়ে যায়। মেয়ে মানুষের কাজই হচ্ছে সব ভণ্ডুল করে ওয়া। 'ওরা 'বেটার হাফ' নয় 'বীটার হাফ।' তা ছাড়া ওদের ও অনেক কম। 'পিগ্ হেড' বলে কোনও ছেলেকে গালাগাল লে কাটাকাটি অনিবার্য কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা হবে না। ওরা টাকে কমপ্লিমেণ্ট বলেই ধরে নেবে। ওরা জানোয়ারেরই অনুকরণ রে তাই ওদের শিরোভূষণ হচ্ছে হর্সটেল বিনুনী অর্থাৎ ঘোড়ার জকে মাথায় তুলে রেখেছে।

বন্ধুরা একবাক্যে মহাবীরের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিত তারপর দেখা যেত যে একদিন সুড় সুড় করে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে সেছে। এইভাবে সবাই হাতছাড়া হতে হতে শেষকালে কিংশুককে এসে ঠেকল। মহাবীর ভেবেছিল কিংশুকও ডোবাবে, কিন্তু দেখা গেল কিংশুক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল না। মহাবীর আশ্বস্ত হল। কিংশুককে একদিন রেঁস্তোরায় ভাল করে খাইয়ে দুই বন্ধুতে মিলে প্রতিজ্ঞাটাকে ঝালিয়ে নিলে, এ জীবনে শুমুখো নয়। শুধু তাই নয় কোনও অনাত্মীয়ার সংগেই কোনও সংশ্রব রাখব না। মহাবীর স্মরণ করিয়ে দিলে, ভুলো না ফ্রেণ্ড, সামান্য একটা চিঠির জন্যে রাগিণী···। কিংশুক চোখ পাকিয়ে জবাব দিলে, ফের ঐ নাম মুখে আনছিস্। মহাবীর ভারী খুশী হল। বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, তবে হ্যাঁ জীবনে যদি উর্বশী, হেলেন বা ভেনাস-এর মত মেয়ের সাক্ষাৎ পাই তখন দেখা যাবে। কিংশুকের তাতেও মত। মহাবীর ডবল খুশী হল। সেই থেকে দুটিতে ভারী জমেছে।

কিংশুকের অন্যান্য বন্ধুরাও যেমন দুলাল, মৃগাঙ্ক, কিশোরী, বলাই, তিনকড়ি ও আরো অনেকে নিয়মিত আড্ডায় আসত। বৈঠকখানার এই আড্ডাটাকে দামিনী বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন এবং এদের সব উৎপাত হাসিমুখে সহ্য করতেন। আড্ডায় দু'তিন দফা চা খাবার জোগাতেন এবং দু' চার আনা করে পয়সাও শ্রীমানদের কেউ কেউ বিশেষ করে মহাবীর নিয়মিত আদায় করত। দামিনী সবাইকে শুনিয়ে বলতেন, ওরা আমার সব গোপাল। ওরা টাটে বসে হাসি-ঠাট্টা করে বাড়ী আমার আমোদে মেতে থাকে।

কিংশুকের বন্ধুরাও সেই থেকে আড্ডার নামকরণ করেছে টাট। বলে, কাল দুপুরে কি সন্ধ্যে বেলায় টাটে আসছিস্ ত।

ভবতারণ জানতেন পালের গোদা হচ্ছে মামা তাই তিনি একদিন তার কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

—কেমন আছ মামা?

—আসুন ঠাকুরখুড়ো, কতদিন বাদে এ বাড়ীতে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। মা ঠাকুরখুড়ো এয়েচেন চা পাঠিয়ে দাও।

—আর বাবাজী তোমরা যে খোঁড়া করবার দাখিল করেছ আমি কি করে—?

চা খেয়ে তামাক টান্তে টান্তে ভবতারণ বললেন, একটা কাজ করতে হবে যে। কিছু একটা করতে হবে শুনেই অভ্যেস মত মামার বাঁ হাতটা এগিয়ে গেল। ভবতারণ হাতের ব্যাপার জানতেন না, বললেন, কি দোব?

মামা হাত টেনে নিয়ে ডান হাত দিয়ে খোঁচা মেরে বললেন, কাপটা··না থাক, পরে রাখব। বলুন কি বলছিলেন?

—বলছিলুম তোমায় একটা কাজ করতে হবে। দীনু ত' শুকদেবের হাবভাব দেখে মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে। অমন সম্বন্ধটা কেঁচে গেল। তোমাকে মামা পটিয়ে পাটিয়ে বিয়েতে মত করাতে হবে। আমি জানি এ কাজ তুমিই পারবে।

মামা হাত জোড় করে বললে, খুড়ো, আপনার অনুমতি পেলে এ বান্দা ভীষ্মদেবের বিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এ ভীষ্মদেবের ঠাকুর্দা, আমার ক্ষমতায় কুলোবে না।

ভবতারণ গলা খাটো করে বললেন, ওর কোনও মেয়েকে—মানে আজকাল যেমন সব হচ্ছে—সেই সব হয়নি ত?

—তাহলে ত' ভাবনাই ছিল না।

—তবে কি বেঁধা করবে না?

—নিশ্চয়ই করবে।

—তবে আটকাচ্ছে কোথায়? দীনু আমায় বলেছে যে ওর যাকে পছন্দ তাকেই বিয়ে করুক সে আপত্তি করবে না। তবে বুঝতেই ত' পার একমাত্র ছেলে লোকে জলের, পিণ্ডির আশা ত' করে। একেবারে যাতে অজাত বেজাত না হয় সে দিকটা দেখতে হবে।

—খুড়ো, ও যা এঁচে আছে না তা আপনার জাত বেজাতে মিলবে না। পাবিজাতের স্বপ্ন দেখছে।

—কি রকম?

—ঐ মহাবীর, ঐ হল নাটের গুরু। ও বলে মনের মত যদি কারুকে—থাকগে আপনি গুরুজন মানুষ বলাটা আপনাকে ঠিক হবে না।

—বল, বল। আমি তোমার খুড়ো হই হে কাকা নই। খুড়োরা বয়সে বড় বটে, কিন্তু ব্যবহারে বন্ধুজন। কাকাদের সংগে ঐখানে তাদের তফাৎ। তাছাড়া তোমরা ভাইপোর দল এখন রীতিমত বড় হয়েছ এখন সব চলবে। বল সব শুনি, একটা ব্যবস্থা ত' করতেই হবে।

—কি বলব খুড়ো, আমার বিদ্যের দৌড় ত' জানেনই ঘোড়ার পাতা অবধি। আপনাদের আশীর্বাদে কোনও রকমে খুঁটে খেয়ে আছি। ওদের সব কথা ভাল বুঝিই না। মহাবীরের আবার ইংরেজী খৈ ফোটে মুখে। তা বললে বিশ্বাস করবেন না বন্ধু বলে বলছি না আমাদের জজসাহেবও অমন ধারা ইংরেজী বলতে পারেন না। প্রফেসর অ্যালবার্ট মণ্ডল ত' মহাবীর বলতে অজ্ঞান। বলে, ওর মত ইংরাজী জানা ছেলে নেটিভদের মধ্যে নাকি পাওয়া যায় না। ঐ মহাবীরই কানে মন্তর দিয়ে কিং-এর, মানে শুকদেবের—আমরা ওকে কিং বলে ডাকি, মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে। রাজ্যের ইংরেজী বই পড়িয়ে মেজাজটাও ইংলিশম্যানের মত হয়ে পড়েছে এখন আর বঙ্গললনায় মন টানে না।

—তবে কি মেম বে' করতে চায়?

—খুড়ো তাও যদি চাইত তাহলেও পদে ছিল। মেমসাহেব আপনার এমন কিছু আহা মরি জিনিষ নয়। ও কি চায় জানেন? দেখবেন আবার যেন বলে দেবেন না যে আমি বলেছি, তাহলে আমায় ছিঁড়ে খাবে। কথায় আছে না। সেই মোর মনের মত যার আছে অনেক রতন। ওর রতনের ফিরিস্তি দিচ্ছি শুনলে ঘাম ছুটবে। ঐ মহাবীর মন্তর দিয়েছে। বলে, বৌ হবে সেই মেয়ে যার

র্বশীর মত চৌষট্টিকলা ভনিতা ব্যাগে মানে যাকে বলে হাতের ালে তাতে পোরা আছে। তারপর আপনার মুখের ছাঁদ হবে হেলেনের মত। গঠন হবে—।

—হেলেন? হেলেন কে?

—কেন ছেলেবেলায় জ্ঞানোদয়ে পড়েন নি? হেলেন মস্ত রূপসী ছিল যার জন্যে ট্রয় ধ্বংস হয়ে গেল। কোথাকার যেন রাণী ছিল, পাশের রাজ্যের রাজপুত্তুর তাকে দেখে মুগ্ধ হয়, তারপর তাই থেকে কুরুক্ষেত্র। হেলেনের মত অত রূপ নাকি কোন মেয়েমানুষ আজ অবধি পায়নি। ওর মুখ দেখে নাকি হাজার হাজার জাহাজ জলে ডুবে যেত।

—বল কি! সাজ্যাতিক মেয়েমানুষ ত'!

—রূপসী মানেই ত' তাই। মহাবীর বলে, জাহাজ ডোবানোর কথা বইতে লেখা আছে। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন আমি যা শুনেছি তাই আপনাকে বললুম! এখন চৌষট্টি কলা জানা মেয়ে জোটানো এমন কিছু কঠিন কম্ম নয় আজকের দিনে। বরং এখনকার মেয়েরা চৌষট্টি ছাড়া আরও এত সব কলা জানে যে উর্বশীও তাতে লজ্জা পাবে। কলার ফ্যাকড়া আপনার কাটান যাবে কিন্তু হেলেনের মত মুখ পাবেন কোথায়? আমাদের দৌড় ত' লক্ষ্মী প্রতিমের মত মুখ। ধরে নিলুম না হয় যে হেলেনের মুখ লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত কেবল মেমসাহেব বলে চোখ দুটো একটু কটা। এ অবধি না হয় তালেগোলে চালিয়ে নেওয়া গেল। কিন্তু গঠন ওরা যাকে বলে ফিগার সেটা হওয়া চাই ভেনাসের মত। এখন গোল বেঁধেছে এই ভেনাস নিয়ে।

—ভেনাস! সে আবার কে? এত সবও আছে?

—কে তা ঠিক বলতে পারব না, তবে ছবি দেখেছি। কেন আপনি ছবি দেখেন নি।

—আমি! না ত। কোথায় ছবি আছে?

—কেন, আবদুলের বিড়ির দোকানে বড়িটার ঠিক পাশে সিগারেটের বিজ্ঞাপনের বড় একটা ছবি টাঙ্গান আছে না? চার পাশে ভেনাস সিগারেটের বাক্স আর ঠিক মধ্যিখানে একজন মেয়েছেলে কোমরে এক ফালি ন্যাতা জড়ানো—

—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, দেখেছি বটে। একটু হেলে আছে মেয়েটা, হাত দুটো কাটা।

—ঐ, ঐ হল ভেনাস!

—ঐ ভেনাস! ও ত' নুলো! শুকদেবের শেষে নুলো মেয়ের ওপর ঝোঁক পড়ল! মাথা খারাপ হল নাকি হে?

—আহা নুলো মেয়ের ওপর ঝোঁক হবে কেন? ভেনাসের মূর্তিটার নাকি হাত ছিল আগে, পরে পড়ে ভেঙে যায়। এখন গোল বেঁধেছে ঐ হাত কেমন ছিল তাই নিয়ে। মহাবীর বলে হাতের বিউটী নাকি আঙুলে আর মোনা লিসার মত অমন।—

—মোনা লিসা আবার কে হল?

মামা মাথা চুলকে বললে—এই ত' বিপদে ফেললেন। তবে জেনে রাখুন যে মেয়েছেলে। ঐ মোনা লিসার আঙুল নাকি পৃথিবীর সেরা আঙুল। অতএব ভেনাসের ঐ ভাঙা হাত দুটোয় মোনা লিসার হাত জুড়লেই নাকি পাকা ফিগার হবে। কিং-এর আবার এতে আপত্তি। ও বলে মোনা লিসার হাতের গড়ন ভেনাসের দেহের গড়নের তুলনায় একটু নাকি মোটা, খাপ খাবে না। এই নিয়ে দুটোয় এখন রগড়ারগড়ি চলছে। এখন আপনিই বলুন, এ ছেলের বিয়ে দেওয়ার চাইতে ভীষ্মদেবের বিয়ে দেওয়া কি সোজা নয়।

—বাবাঃ! এই কাণ্ড! আমি ভাবলুম বুঝি কোথায়ও কিছু হয়েছে, তাই বিয়েতে অমত করেছে।

—কোথায় কিছু হবে! আপনি আছেন কোথায়? কানে মস্তর দেবার লোকটার যদ্দিন না হিল্লে হচ্ছে তদ্দিন কিছুই হবে না। পারেন ত' মহাবীরের মাসীকে বলে ওর একটা গতি করুন। কি বলব খুড়ো সেই কবে রাগিণীর সঙ্গে চিঠি লেখা নিয়ে কি এক খটাখটি হয় তার—

—চিঠি? কি চিঠি, প্রেমপত্র নাকি হে?

মামা বুঝতে পারলে যে চিঠির কথাটা বলা কাঁচা কাজ হয়েছে। মাথা নেড়ে বললে, না না এমনি একটা চিঠি, তাই নিয়ে দুজনের কথা কাটাকাটি হয়, আর কি মস্তর যে মহাবীর তখন দিলে সেই থেকে কিং তামাম মেয়ে জাতটার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে। এই ত' এত মেয়ে পথে ঘাটে বেরোয় কেউ বলুক দেখি যে কিং মুখ তুলে তাদের দিকে তাকিয়েছে। মহাবীরের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। তবে ও কিং-এর মত অতটা ঋষ্যশৃঙ্গমুনি নয়। ও তবু রোজ একবার করে প্রফেসর মণ্ডলের বাড়ী যায় কিন্তু কিং—

—প্রফেসর মণ্ডলের বাড়ীতে ত' তার মেয়ে আছে।

—তা আছে, তাইত' বলছি মহাবীর তবু যায় রোজ কিন্তু—

ভবতারণ হেসে বললেন—বাবাজী, নিজের বেলায় আঁটিসুটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি।

মামা ভবতারণের ভঙ্গীতে ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললে—মানে?

—মানে? বাবাজী মামাই হও আর যাই হও এখনও বুদ্ধি পুরো পাকেনি। মানে খুব সোজা। শুকদেবকে কাঁচকলা সেদ্ধ খাইয়ে নিজে মাংস কালিয়া ওড়াচ্ছে।

মামা ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ঢোঁক গিলে বললে—কি জানি ওদিকটা ত' ভেবে দেখিনি। আমরা জানি বই পড়বার জন্যে প্রফেসারের বাড়ী যায়। ওখানে গাদা গাদা ইংরেজী বই আছে—তা আপনি যখন বলছেন তখন হতেও পারে।

—হতে পারে নয়, হয়ে বসে আছে। শুকদেব বাবাজীরও ভেতরের অবস্থা তাই।

মামা একটু ভেবে বললে, তা হবে। সেদিন ত' এই নিয়েই এক চোট হয়ে গেল। কথায় কথায় কিং বলেছিল যে রাগিণীর ফিগারটা মন্দ নয়, মহাবীর শুনে সেই যে মুখ বেঁকিয়ে রইল আর মুখ ফেরায় না। শেষে অনেক কষ্টে হাতে পায়ে ধরে কিং ওর রাগ থামায়। তারপর থেকে আর অবশ্য রাগিণীর নাম মুখে আনে না বরং শুনলেই ভীষণ ক্ষেপে ওঠে।

ভবতারণ উৎফুল্ল হয়ে বললেন—বল কি! ভীষণ ক্ষেপে ওঠে। মামা এ কাজের ভার তোমাকেই নিতে হবে। আমি পারতুম কিন্তু ওর বাপ হল আমার বন্ধু, বাপের মাথাটা খেয়েছি আবার ছেলেরটাও খাব সেটা ভাল দেখায় না। তুমি লেগে পড়, কুঞ্জর মেয়ের সঙ্গে ওকে ভিড়িয়ে দাও।

—ভিড়িয়ে দোব কি খুড়ো! নাম শুনলে তেড়ে মারতে আসে।

—ঐটেই ত' শুভলক্ষণ। রাগ তার পরেই অনুরাগ, টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। এখন নাম শুনে মারতে আসছে এরপর নাম শুনে দু'হাত তুলে নাচতে থাকবে। লেগে পড় বাবাজী লেগে পড়। একাজ তুমিই পারবে।

—আপনি কি বলছেন ঠাকুরখুড়ো? একি খাবার জিনিষ যে জোর করে হাত পা বেঁধে মুখে ঢেলে গিলিয়ে দোব! এ হল মানে··যাকে বলে··হৃদয়ের ব্যাপার। তাও না হয় হত, কিন্তু দুজন যে দুমুখো হাঁটছে।

ভবতারণ কোনও কথা শুনলেন না, বললেন, ও সব বুঝিনা, দুটো দুমুখো হাঁটছে, তুমি একমুখে আনো তারপর দাও কলিশন্ বাঁধিয়ে যেমন তোমাদের আজকালকার সিনেমায় হয়ছে। আমি চললুম, দীনুকে বলব সে যেন আর চিন্তা না করে। মামা সব ভার নিয়েছে।

ভাত ফুটে উঠলে হাঁড়ীর ঢাকনাটা যেমন থেকে থেকে ভেতরকার বাষ্পে নাচতে থাকে বিয়ের দিন স্থির হয়ে যাবার পর থেকে মাসকেলও তেমনি ভেতরকার আনন্দে থেকে থেকে দুলে উঠতে লাগল। মুখে বিয়ের কথা ছাড়া আর কথা নেই।

জোর আড্ডা বসেছে কিন্তু অন্যান্য দিনের মত এক প্রসংগ থেকে অন্য প্রসংগে কথার মোড় ঘুরছে না। যে কথাই হোক না কেন ঘুরে ফিরে কথাটা শেষ পর্যন্ত সেই বিয়ের কথাতেই এসে দাঁড়াচ্ছে।

বলাই বললে, সবই হবে মাঝখান থেকে একটা খ্যাঁট আমাদের ফসকে গেল, কনে দেখার খ্যাঁট। মেয়ে দেখলেই পারতিস, আমরা সব দল বেঁধে যেতুম।

মাসকেল বললে—দূর, লজ্জা লাগে না! তা ছাড়া বাবা দেখে এসেছেন এর পর আমার দেখাটা ভাল দেখায় না। বাবা অবশ্য বলেছিলেন মা-কে, ও যদি দেখতে চায় তাহলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেখে আসুক। আমি সত্যবাবুকে বলে এসেছি যে ছেলে তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতে পারে। আর দেখার কি-ই বা আছে। রংটা একটু কালো। তা মায়ের আমার কি টানা টানা চোখ কি সুন্দর মুখশ্রী। আড়াই হাজার টাকা নগদ, তিরিশ ভরি সোনা, বাসন কোসন বিছানা পত্তর সবই দেবে। তা ছাড়া আমি নিজে যখন দেখেছি তখন আর ওর দেখবার দরকার কি? তবু আজকালকার হাওয়া, যদি যেতে চায় দেখে আসুক।···বল, এর পর আমার দেখতে যাওয়াটা ভাল দেখায়? রংটা একটু কালো, কিন্তু মুখ চোখ? তা আমি-ই বা কি এমন ফর্সা, বল?

মহাবীর ফোঁড়ন দিলে, তার ওপর আড়াই হাজার টাকা তিরিশ ভরি সোনা গ্লাস হ্যানা ত্যানা কত কি দেবে। এ মেয়ে খারাপ হতে পারে? সী ইজ ম্যান এক্সেল!

কিশোরী বললে, এই সঙ্গে কিং-এরও হত তাহলে কড়া জমত।

মাসকেল এক চিন্তায় বিভোর। কিশোরীর কথা তার কানে গেল না। সে বললে, শুনেছি একটু সর্দির ধাত। তা-ও সারিয়ে দেব। গোটা দুই আসন আর আর একটু ফ্রী হ্যাণ্ড করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

মৃগাঙ্ক বললে—কার কথা বলছিস? কিং-এর?

—বৌ-এর।—তারপর মনে পড়ল কিশোরী যেন কিং-এর কথা কি বলছিল। বললে, কিশোরী কি বলছিলি?

—তা তোর শুনে কাজ নেই, তুই আসন ভাব। আর দেখ ঐ সংগে বাত, ফিকব্যথা অম্বল এই সব রোগ কি কি আসন করলে যাবে তাও এখন থেকে ভেবে রাখ। বিয়ের পর মেয়েদের ওগুলো হবেই।

দুলাল বললে, আমিও যে কিং-এর বিয়ের কথা না ভেবেছি তা নয়, কিন্তু বৌ বললে তুমি একটা কী, মাথায় কিছু নেই। এক সংগে দুটো বে' হলে কোন আমোদটা হবে শুনি। কোন বে'তে বরযাত্রী যাবে? দেখলুম, বৌ ঠিক বলেছে। বৌ বললে, এখন আনন্দ ঠাকুর-পোর হচ্ছে হোক, এরপর অঘ্রাণে শুকদেব ঠাকুর-পোর বে' দাও তারপর মাঘ মাসে মহাবীর—।

—আবার আমায় টানছিস্ কেন?

মামা বললে—টানাটানির কথা নয় যা হওয়া উচিত তাই বলছে। আচ্ছা বেশ, তোর কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, তোর উপযুক্ত মেয়ে কলিযুগে মিলবে না। কিন্তু কিং করবে না কেন? তোর মুখ চেয়ে ও বিয়েতে মত দিচ্ছে না তা জানিস্?

কিংশুক বললে—আচ্ছা, তোদের কি এছাড়া আর কোনও কথা নেই। যার ইচ্ছে সে বিয়ে করবে, এর মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ির কি আছে?

মামা বললে—আছে বৈ কি। কানের গোড়ায় অনবরত যদি উর্বশী, ভেনাস আর হেলেন নাম জপতে থাকে তা হলে হেমাঙ্গিনীদের দিকে কারুর নজর যায়?

মহাবীর চটে গিয়ে বললে—মেয়ে ছাড়াও জগতে নজর দেবার

অনেক জিনিষ আছে। আর যদি নজরই দিতে হয় তাহলে সেরা জিনিষের পানেই তাকান ভাল।

—সেরা জিনিষ উর্বশী যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন নজরটা না হয় কালোশশীতেই দিক। তুই আর দয়া করে মন্তর জপিস্‌নি। দোহাই তোর।—মামা হাত জোড় করলে।

—মন্তর জপিনি, শুধু একজ্যাম্পল সেট করছি। ও যদি আর পাঁচটা চ্যাংড়া ছোঁড়াদের মত চোখ রোগা হয়, যা দেখবে তাই চোখ দিয়ে গিলবে, যে নাম পাবে তাই জপে মরবে তাহলে আমার কি। উর্বশী তেলেন মিলবে না জানি, কিন্তু মিলবে না বলেই আজকালকার ছোঁড়াদের, যাদের নাইনটি ফাইভ পার্সেণ্ট···না নাইনটি এইট পয়েণ্ট এইট পার্সেণ্ট-এর বিউটী আর কালচার সম্বন্ধে কাক কাঁকর জ্ঞান নেই তাদের মত ওকে সারা জীবনের জন্যে যা' তা' একটা জুটিয়ে নিতে বলতে পারি না। তোরাই বল না বলাটা কি বন্ধুর কাজ। সেই জন্যেই আমরা ও মুখো হাঁটতে চাই না।

ফিচেল বুদ্ধি মামার মাথায় গজিয়ে উঠল। মামা দেশলাই-এর একটা কাঠি বার করে তা দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বললে,—তাহলে তুই বলছিস্‌ যে আমাদের কারুর ত' কাক কাঁকর জ্ঞান নেই-ই এমন কি মাসকেলেরও নেই। তাই না দেখে শুনে বাবার কথায় একটা যা' তা জুটিয়ে নিচ্ছে। আমাদের না হয় ঘোড়ার পাতা অবধি বিদ্যে কাজেই আমরা অজ্ঞান মানুষ, কিন্তু মাসকেল বি-এ পড়ছে ওর বৌ-ও শুনছি ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ে। এর পরও যদি তাকে যা' তা' বলিস তাহলে অবিশ্যি আমার—।

আর বলতে হল না মাসকেল গর্জে উঠল—মহাবীর!

ব্রেন আর ব্রণ এক দেহে এক সঙ্গে বড় একটা থাকে না। মাসকেলের দেহেও ছিল না। নিজের বুদ্ধিতে কুলোয় নি কিন্তু মামা যেই ব্যাখ্যা করলে অমনি বুঝতে পারলো কি ভীষণ অপমানটাই না করা হয়েছে এবং বোঝবার সংগে সংগেই তোপ ছাড়ল।

আড্ডায় এ ভাবে মাসকেল আগে গর্জে ওঠেনি তাই সবাই চমকে উঠল মহাবীরও। হেসে বললে—কি? চেঁচাচ্ছিস কেন!

—ইউ মাষ্ট উইথড্র দ্যাট।

—কি বলেছি যে উইথড্র করব?

—কিং, মামা তোমরা সবাই আছ। একটা শুভ কাজের আগে আমি ঝগড়া বিবাদ করতে চাই না। কিন্তু আমার প্রেষ্টিজ নিয়ে কথা! কিং, তুমি ওকে বল ও যা বলেছে তা উইথড্র করবে কি না। আমার টেষ্ট নেই আমার উড বী ওয়াইফ যা তা—। সাতচল্লিশ ইঞ্চি বুক রাগে ফুলে পঞ্চাশে দাঁড়াল। অবস্থা সুবিধের নয় দেখে কিংশুক বললে—যাক্‌ গে, যাক গে অন্য কথা বল। উইক মোমেণ্টে বলে ফেলেছে···।

মামা নিস্পৃহ ভাবে বললে, তা ভাই আমরা ঘোড়ার পাতা অবধি পড়া পণ্ডিত আমরা বলতুম সে এক কথা। কিন্তু আসল পণ্ডিতেরা যদি উইক মোমেণ্টে এই কথা বলে তা হলে ষ্ট্রং মোমেণ্টে কি বলবে তাই ভাবছি!

মাসকেল চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ঠিক বলেছিস্‌।

মহাবীর বললে—আমি তোমায় মীন করে কিছু বলিনি। আমি বলেছি নাইনটি এইট্‌ পয়েণ্ট এইট্‌ পার্সেণ্ট ছোঁড়াদের কাক কাঁকর জ্ঞান নেই। অ্যাণ্ড নাউ আই সে ইট ইজ নট নাইনটি এইট্‌ পয়েণ্ট এইট বাট নাইনটি নাইন পার্সেণ্ট যাদের—।

মাসকেল বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে মহাবীরের গলায় হাত দিয়ে বললে—তবে রে নাইনটি নাইন পার্সেণ্ট। যত কিছু না বলেছি ততই তোমার বাড় বেড়ে গেছে।

মাসকেলের হাত কোথাও পড়া মানেই বাজ পড়া। কিন্তু রোগা মানুষের গলা অত সহজে কাবু হবার নয়। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। মহাবীর চেঁচিয়ে বললে—হ্যাঁ আমি বলছি নাইনটি নাইন পার্সেণ্ট··· কিন্তু মাইণ্ড ইট, সেণ্ট পার্সেণ্ট বলিনি। এক পার্সেণ্ট হাতে রেখেছি। সেই এক পার্সেণ্টের মধ্যে তোরা পড়িস তোদের শুদ্ধ গালাগাল দেবার ইচ্ছে থাকলে সেণ্ট পার্সেণ্ট বলতুম এক পার্সেণ্ট হাতে রাখতুম না।

মাসকেল গলা ছেড়ে দিয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললে—কি বললি?

মহাবীর যা বলেছিল তার পুনরাবৃত্তি করে বললে—তা হলে বুঝতে পারছিস তোদের বাদ দিয়েই বলেছি। সেণ্ট পার্সেণ্ট বললে তোদেরও গাল দেওয়া হত।···কি মাথায় ঢুকল?

ঘরের সবাই কথা শুনে হাঁ করে রইল। মহাবীর যে কথাটার এমন ভাবে ব্যাখ্যা করবে তা মামা অবধি কল্পনা করতে পারেনি। মহাবীর সবাইকে দেখে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—আমার লাইফের ট্র্যাজিডি কি জানিস ভগবান আমায় উপযুক্ত কম্পেনিয়ন দেন নি। তাই আজ এ ভাবে মার খেতে হল। আমার অপরাধ কি, না যা বলেছি তা কেউ বুঝতে পারেনি। আমিও বুঝিনি যে এই সহজ

কথাটার মানে কেউ বুঝতে পারবে না তা হলে বলতুম না।···হোয়াট এ পিটি! যা বলি তা বোঝবার মত কেউ নেই।

মামা বললে—কেন, প্রফেসর মণ্ডল আছেন। ও বাড়ীর সবাই বুঝতে পারবে। ওদের বিদ্ধেবুদ্ধি আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।

মহাবীর খোঁচাটা টের পেয়ে বললে—এক্সাটলি।···বললে ড' ফায়ার হয়ে যাবে ডেইজীর যা ব্রেইন তা অনেকেরই নেই।

মামা বললে—ডেইজী কে?

—প্রফেসর মণ্ডলের মেয়ে।

বলাই বললে—তার নাম, বীথি।

—বাইরের লোক বীথি বলেই জানে।

তিনকড়ি বললে—তুইও তো বাইরের লোক তুই জানলি কি করে?

মামার মনে পড়ে গেল ভবখুড়োর কথা। খুড়ো দেখছি এক আঁচড়েই ঠিক ধরেছেন। মামা বললে,—ও ওখানে ভেতরের লোক হয়ে গেছে।

দুলাল বললে—তাহলে কিং আর বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায় কেন, ও-ও এক জায়গায় ভেতরের লোক হয়ে পড়ুক।

মহাবীর রেগে গিয়ে বললে—তোদের সঙ্গে কথা বলাও চলে না। এরপর একটা কিছু বললেই তো আবার টুঁটি চেপে ধরবে। চলি, এ স্নেকপিট-এ আর এক সেকণ্ডও নয়।

মহাবীর উঠে দাঁড়াতেই মাসকেল তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—ওস্তাদ আমার অন্যায় হয়েছে।

মহাবীর অভিমান ভরা কণ্ঠে বললে—থাক্ ভাই খুব হয়েছে আর কেন। এ তবু অল্পের ওপর দিয়ে গেছে, গলায় হাত দিয়েছ খালি টিপে ধরনি। টিপলে কি হত খোদা মালুম। ছাড় মাসকেল আমায় যেতে দে।

মাসকেল ছেড়ে দিয়ে বললে—বেশ তুই যা, আমি কালই এ বিয়ে ভেঙে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।

মামা মাথা চুলকে বললে—এর পর আর যাসনি মহাবীর, না বুঝে করে ফেলেছে।

কিংশুক ফোড়ন দিলে—না বুঝেই এই, বুঝলে কি করত কে জানে।

মামা বললে—নিলি বটে এক হাত। নে মহাবীর ব'স, সিগারেট ধরা।

মহাবীর বসে পড়ে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। মামা বললে—ভেবে দেখ মহাবীর, কিং আমাদের বন্ধু। কাজেই ও যাতে বেঁধা করে সংসারী হয় সেদিকটা দেখা আমাদের উচিত। তাছাড়া দীনু কাকার দিকটাও দেখতে হবে ও তাঁর একমাত্র ছেলে। দীনু কাকারও তো সাধ আহ্লাদ আছে। আরও দু'একটা ছেলে থাকত তাহলে না হয় বলা চলত যে আর গুলোর বিয়ের ব্যবস্থা করুন একটা দামড়া হয়ে ঘুরে বেড়াতে চায় বেড়াক। তোর কথা আলাদা। তুই একটা মানত করে আছিস্ থাক, কিন্তু ও—।

কিংশুক বললে—অন্য কথা বলবি, না ঘর ছেড়ে পালাব তোদের জন্তে?

প্রথম ভাগের গোপালের মত সুবোধ বালক নই যে যা' পাব তাই খাব কিং-এরও ঐ একই মত। একমাত্র ছেলে ও, কাজেই পৃথিবীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ রত্নই ও ঘরে এনে বাপ মা-র চোখ জুড়াতে চায়।

বাপ মা-র চোখ জুড়োনোর আগে কিংশুকের নিজের চোখ চড়ক গাছে উঠল। মহাবীরটা বলে কি! এমন কথা আবার কবে বললুম। বিয়েই করব না তার···বললে—তুই কি বলছিস্ মহাবীর, এ কথা আমি কবে বললুম?

মহাবীর কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল তার আগেই তিনকড়ি বললে—কিন্তু ধর যদি আচ্ছা জিনিযটি না মেলে তাহলে অন্য জিনিষ চলবে না।

—নো সার্টেনলি নট।

—শাস্তোর মানবি তো! মধু না পাওয়া গেলে গুড় দিয়ে কাজ চালাবার কথা বেদ পুরাণে লেখা আছে। বাজারে মাছ পেলুম না বলে উপোস দিতে হবে নাকি? ঝিঙে পোস্ত দিয়েই না হয় এক বেলা কাজ চালিয়ে নাও। তেমনি হেলেন ভেনাস না পেলে—।

মহাবীর বাধা দিয়ে বললে,—খুব তো শাস্তোর আওড়াচ্ছিস্! বলি একথাটা তোদের শাস্তোরে বলেনি যে চাঁদবদন বার বার জন্ম-মৃত্যুর এক্জিট এনট্রান্স দিয়ে যাতায়াত করে এই পৃথিবীর স্টেজে এসে অ্যাকটিং করতে হবে অতএব হাঁকপাঁক ক'রো না। যখন জানি যে আবার মরে ফিরে আসছি তখন ঝিঙে পোস্ত খেয়ে জিভের জাত মারি কেন? একটা জন্ম না হয় বিয়ে না করে উপোস দাও ওতে আত্মা ফিট থাকবে। প্লীজ, তোদের কাছে আমার মিনতি, বিয়ে বিয়ে করে কিংকে পাগল করে দিস্নি। হেলেন ভেনাস চাইছে না আর চাইলেও এ পোড়া দেশে তা মিলবে না। তবে নেহাৎই যদি ওর বিয়ে দিতে চাস্ তবে খুঁজে পেতে অন্তত এমন মেয়ের সন্ধান কর যে ভোরবেলায়—।

কিংশুক বললে—এই আমি তোদের সাফ বলে দিচ্ছি যে বিয়ে আমি করব না।

—আমি যা বলছি তা শোন আগে, তার পর বলিস্ এমন মেয়ে অন্তত চাই যে ভোরবেলায় ফোটা ফুলের মত স্নিগ্ধ কুল্ লাইক ইভনিং ব্রীজ কিন্তু লাঞ্চ টাইম-এ মোর লাইভলি, টী টাইম-এ ভেরি স্মার্ট, সফিসটিকেটেড য়্যাট ইভনিং, রোমাণ্টিক ফ্রম হাপ পাস্ট এইট থার্টি টু কোয়ার্টার টু টেন, ফেরোসাস লাইক এ টাইগ্রেস আপটু ইলেভেন থার্টি দেন জাস্ট এ কর্পস আপটু ডন।···উর্বশী হেলেনের দরকার নেই পারিস ত এই রকম মেয়ের খোঁজ কর।

এ সবই ইংরেজী কেতাব থেকে নেওয়া। শুনে মাস্কেল ছাড়া আর সকলের বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেল। মাসকেল বললে, যা বললি আবার বলত মহাবীর ভাল করে শুনি।

মহাবীর আবার বললে, দুলালের ভেতরে ভেতরে খাবি খেয়ে যাবার দাখিল হল। 'সফিসটিকেটেড' মানে কিরে বাবা! মহাবীরকে বিশ্বাস নেই ফট করে হয়ত জিজ্ঞেস করে বসবে মানে বলত। পালাতে পারলে বাঁচতুম।—মামা বোধ হয় দুলালের মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। ও দেখলে যদি এইভাবে ঘরে বসে গুলতানি চলে তাহলে আরও কত কি যে শুনতে হতে পারে তার ঠিক নেই। হতভাগাটা

দেওয়া এ জন্মে হবে না। যে পোকা আজ মহাবীর কিং-এর মাথায় ঢুকিয়ে দিলে, তা বের হতে সময় নেবে।

মামা বললে—চল একটু ঘরে আসি, সেই দুপুর থেকে বসে বসে গ্যাজাচ্ছি কোমর পিঠ ধরে গেছে।

রাস্তা দিয়ে একদল ছোকরা চোঙা মুখে করে চেঁচাতে চেঁচাতে চলে গেল, ভোট ফর বিছেবাবু। বিছেবাবুকে ভোট দিন।

নাসকেল বললে—এই হয়েছে এক জ্বালা। কাল রাইমোহনবাবু বাবার কাছে এসে হাজির! কি না আনন্দকে বল ও তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমার হয়ে খাটুক।

কিংশুক বললে—হ্যাঁ বাবাও আমায় বলছিলেন যে রাইমোহনকে আমিই দাঁড় করিয়েছি কাজেই ও যদি হেরে যায় তাহলে কুঞ্জর কাছে মুখ দেখাতে পারব না। তোর বন্ধুবান্ধবকে রাইমোহনের হয়ে খাটতে বলিস্। বলবি রাইমোহন দাঁড়ায় নি আমি দাঁড়িয়েছে সেইভাবে যেন খাটে।

মামা বললে—হ্যাঁ রাইমোহনবাবু হারলে দীনুকাকার মুখ দেখানো ভার। কুঞ্জবাবু ত' একরকম সবার সামনেই বলে বেড়াচ্ছেন এবার রাইমোহনের দৌড়টা দেখা যাবে। সরাসরি দীনুকাকার নামটা তো আর মুখে আনতে পারে না তাই ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছে।

কিশোরী বললে—আর ঐ ছোঁড়া, বিছেবাবুর ভাইপো কাজল না সুরমা কি যেন নাম। সেটাকে দেখলে আমার গা ঘিন ঘিন করে। ছোঁড়ার কি ডাঁট। না হয় বি. এ, পাশই করেছিস হাকিমের ছেলে, তাই বলে অত দেমাক!

মহাবীর বললে—কে বললে তোদের? ভদ্রলোক রিটায়ার-এর আগে দিন কতক ডি, এম-এর পোষ্ট-এ অফিসিয়েট করেছিলেন—রিটায়ার করেছেন ডেপুটি হিসেবে।

মামা বললে—ঐ ছোকরা শুনলুম কুঞ্জ রাহার বাড়ীতে বেশ জমিয়েছে? রাগিণীকে পড়ায় আর রাগিণীও শুনলুম কাজলদা বলতে অজ্ঞান।

কিংশুক বললে—মরুক গে যাক্। ছেড়ে দে ওকথা।

মৃগাঙ্ক বললে—রাগিণী মাইরী বাঁচবে অনেকদিন। ঐ দেখ।

দেখা গেল রাগিণী কিংশুকদের বাড়ী থেকে তীর বেগে বেরিয়ে একটা চলন্ত খালি সাইকেল রিক্সা থামিয়ে তড়াক করে সেটায় উঠে পড়ে অদৃশ্য হল।

মৃগাঙ্ক বললে—কাকীমার কাছে এসেছিল বুঝি।

কিংশুক মুখ বিকৃত করে বললে—কে জানে। মামার বাড়ীতে থাকিস্ আমি তোকে ডেকে নিয়ে যাবো'খন। কিংশুক বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

মামা ভাবতে ভাবতে বাড়ীমুখো চলল। রাগিণী তাহলে এখনও আসছে। ভরখুড়ো দেখছি···। কিন্তু অমন জোরে বেরিয়ে এল কেন? ভেতরে কিছু হল নাকি?

মামার ভাবনার কারণ ছিল। দত্ত ও রাহাদের মধ্যে প্রকাশ্যে না হলেও ভেতরে ভেতরে মন কষাকষি সুরু হয়ে গেছে। কাজেই রাগিণীর আসাটা ঠিক স্বাভাবিক নয়, তেমনি স্বাভাবিক নয় অমন বেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসা। কিন্তু না এসেও রাগিণীর উপায় ছিল না? বোমা ছুঁড়ে মুহূর্তে হাওয়া হওয়াই যুদ্ধের নিয়ম। একটু খুলে বলা দরকার। [ক্রমশঃ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

মানকুমারী বসু

(১৮৬৩—১৯৪৩)

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশেষভাবে বিকশিত হবার পরেও যে-কয়জন মহিলা-কবি বাঙালী পাঠকের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্যা হচ্ছেন মানকুমারী বসু। বাংলা দেশে প্রথম হাসির-গান রচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল বিস্মিত করেছিলেন বাঙালীদের। মানকুমারী বসুর গীতি-কবিতাও বাংলা দেশে অল্প উত্তেজনার সৃষ্টি করেনি। বাঙালীদের মধ্যে কেবল প্রথম মহিলা শিশু-কবি বলেই মানকুমারী দেবীর এত নাম নয়। তাঁর রচনা-শক্তি ছিল বহুধা বিভক্ত। তিনি উপন্যাস লিখেছেন, কবিতা রচনা করেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, কাব্য-গ্রন্থও লিখেছেন, আবার ছোটগল্প রচনাতেও যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকের মতে মহিলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে ছোট-গল্প রচনায় মানকুমারীর মতন এমন দক্ষতার পরিচয় আর কেউ দিতে পারেন নি। বাংলা সাহিত্যে গত যুগের ছোট-গল্পে মানকুমারীর স্থান প্রভাতকুমারের পরেই।

বাংলা ভাষায় গীতি-কবিতা হচ্ছে তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। তাঁর আগেও এখানে গীতি-কবিতা ও শিশু-কবিতার অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু মহিলা-কবিদের মধ্যে মানকুমারীর প্রতিভাই ও-দুটি বস্তুকে উচ্চ-যে শাস্ত কোমল স্নিগ্ধ সজল ভাব দেখা যায়, বাঙালী মহিলার বিনম্র মধুরিমা, যে সলজ্জ অথচ চরিত্র-তেজোদীপ্ত মহিমা, যে স্বা দেখা যায়, অন্যত্র তা দুর্লভ। সহজ, সাবলীল ও ঘরোয়া ভা কবিতাগুলিও চিত্তগ্রাহী। এক কথায়, মানকুমারীর কবিতার ম পাই—নিজপ্রাণের কথা। তাঁর পত্র কবিতাও একদিন সারা বা মাতিয়ে তুলেছিল। তাঁর রচিত 'শীতকালের পত্র,' 'সাধের স 'ভগ্ন-হৃদয়' প্রভৃতি কবিতার তুলনা নেই। তাঁর কবিতাগুলি নূতনত্বে ও স্বকীয় বিশেষত্বে অপূর্ব। দেশপ্রেমের গান রচনাতেও তি যথেষ্ট মুন্সিয়ানা প্রকাশ করে গিয়েছেন।

তিনি ছিলেন যশোহর জেলার বিদ্যানন্দকাটী গ্রামের স্বনামধ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাসবিহারী বসু মহাশয়ের পুত্রবধূ আর তাঁর স্বা ছিলেন সাতক্ষীরার 'সুদক্ষ চিকিৎসক' বিধুশঙ্কর বসু। মহাক মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিবারে মানকুমারীর মতো সাহিত্যের নান বিভাগে এমন কৃতিত্বের পরিচয় আর কেউ দিতে পারেন নি বালিকা বয়স থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর প্রায় সার জীবনটাই কেটে গিয়েছিল সাহিত্য-সাধনার ভেতর দিয়ে।

মানকুমারীর জন্মবার্ষিকী যেমন স্মরণীয়, তেমনি তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে ১৮৬৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী, বাংলা ১২৬৯ সালের ১১ই মাঘ, রাত্রিকালে মাতুলালয়ে শ্রীধরপুরে মহিলা-কবি মানকুমারী বসুর জন্ম হয়। ২৩শে জানুয়ারী দিনটি বাংলার জাতীয় ইতিহাসের এক পরম শুভ দিন। এই দিনেই কলকাতার বসুপরিবারের আর এক রত্নকে আমরা পেয়েছিলাম। তিনি হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। মানকুমারী বসু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, কেদারনাথ, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন প্রভৃতি সমবয়সী। এঁদের সকলেরই জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। আবার মানকুমারী দেবীর মৃত্যুও হয় আশি বৎসর বয়সে ১৯৪৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর রাত্রিতে। সেদিনও বাংলার আর এক দুর্দিন। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা, আর একদিকে দুর্ভিক্ষে ও অনাহা পঞ্চাশের মন্বন্তরে এক ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জেই ২৩শে ডিসেম্বরে মধ্যে মারা গিয়েছিল প্রায় ষাট হাজার লোক। একই বছরের এক মাসে আমরা হারালাম একে একে মাখন পালিতকে, খ্যাতনামা কবি ও গীতিকার অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্যকে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জ্যে জামাতা ও প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার সুধীরচন্দ্র রায়কে আর হারালাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জননী প্রভাবতী বসুকে।

মানকুমারীর সমসাময়িক মহিলা কবিদের মধ্যে প্রধান ছিলে কামিনী রায়। তিনি মানকুমারীর চেয়ে বয়সে মাত্র ৫ বছরে ছোট ছিলেন এবং তাঁর গানের গলাও ছিল চমৎকার। কামিনী রা ও মানকুমারী বসু বাংলার এই দুই বিখ্যাত মহিলা-কবির জীবনে মাঝে একটা সুন্দর মিল পাওয়া যায়। এঁরা দু'জনেই বালবিধ ছিলেন। বাংলার মহিলা-কবিদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া কেউ দীর্ঘকাল স্বামী সঙ্গ-সুখ লাভ করতে পারেন নি। আনন্দময় গংগামণি দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায় এঁ সকলেই ভারতের পতিহীনা নারীর সংখ্যাভুক্ত। মানকুমারী বালিকাবয়সেই স্বামীহারা হয়েছিলেন। আবার অনেকের কবিপ্রতিভা স্বামীর জীবিতকালে স্ফূর্তিলাভ করেনি। পতিবিয়োগ ব্যথা নারী

অক্টোবর, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ) তাঁকে কবিযশঃগৌরবের বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিল। 'স্তব-কুসুমাঞ্জলি'-র কয়েকটি কবিতা 'শিবপূজা', 'ভাঙ্গিওনা ভূল' প্রভৃতি কবিতা সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থেরই প্রকাশক সুকবি ও সুপণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় লিখেছিলেন : "...এই সকল পত্ত ধর্ম-জগতের চূড়ান্ত কাব্য, বঙ্গ-সাহিত্যের গীতা।"

মানকুমারী কবি মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। যে বংশে মাইকেলের মতন অমর-প্রতিভাশালী মহাকবির আবির্ভাব হয়, সেই বংশে মানকুমারীর মতন কবিত্ব-প্রতিভাশালিনী মহিলার অভ্যুদয় হওয়া অসম্ভব বা বিচিত্র নয়। তাঁর পিতার নাম আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী। তিনি কবি না হলেও একজন শিক্ষিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সাহিত্যের প্রতি মানকুমারীর এই যে অনুরাগ এটি কিন্তু তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। এ কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন।

সম্ভবতঃ 'সখা' মাসিকপত্রে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়! 'সোহাগ' শীর্ষক একটি কবিতা। 'সখা'র সম্পাদক ছিলেন তখন প্রমদাচরণ সেন মহাশয়। 'বামাবোধিনী' পত্রিকাতেও তাঁর অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বনবাসিনী' প্রকাশিত হয় 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ২৫তম বর্ষ পূর্তি জুবিলী-সংখ্যায় ১৮৮৭ সালে। প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের পুরস্কার-স্বরূপ তিনি ত্রিশ টাকা পেয়েছিলেন। একই সময় তিনি 'বামাবোধিনীতে' লিখতেন গল্প-প্রবন্ধ আর 'নব্যভারতে' লিখতেন কবিতা। প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় তিনি দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৮৮১ সালে 'বিবাহিতা রমণীর কর্তব্য' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখে। এর পরেও তিনি আরো দু'বার যশোহর-খুলনা সম্মিলনীতে 'সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্তব্য' ও 'মহৎ জীবনী' নামক প্রবন্ধ রচনা করে সমস্ত প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। বামাবোধিনীর ত্রিশ বছর পূর্তি জুবিলীতেও তিনি 'বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রতিযোগিতায় প্রধান বিচারক ছিলেন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়।

বাংলা-সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনায় মানকুমারীর স্থান অনেক ওপরে। প্রবন্ধ-রচনায় এমন দরদী ভাব দুর্লভ। সুদিনে ও দুর্দিনে সাহিত্য সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য। কল্পনালোকে এমন আত্মভোলা হয়ে বিচরণ করতেন বলেই তো সমস্ত শোক ও দুঃখ ভুলতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে। এটিই তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তাঁর 'বীরকুমার বধ' কাব্যেও তিনি কম যোগ্যতার পরিচয় দেন নি। অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'বীরকুমার বধ কাব্য' রচনা করে তিনি শিল্পকুশলতারই পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে এ বিষয়ে তাঁর পিতৃব্য মাইকেল মধুসূদনের অনুকরণকারী হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সমকক্ষ বললে বেশী বলা হবে না। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে নারী-

জগৎ থেকে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলেন মানকুমারী, জাতীয় ভাবদ্যোতক কবিতা 'সাধের মরণ' কবিতাটি রচনা করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগ থেকে আমাদের দেশের লোকের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি-জাগরণের দিকে অনেক কবিতা ও গান রচিত হয়েছিল। 'সাধের মরণ' কবিতাটিকেও এই জাতীয় কবিতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। "বঙ্গীয় কবিগণের স্বদেশপ্রেমজ্ঞাপক কবিতাবলী কোনদিন সংগৃহীত হলে 'সাধের মরণ'-ও নিঃসন্দেহে একটি উচ্চস্থান লাভ করবে," বলেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়। 'উদ্বোধন-সঙ্গীতে' কবিতাতেও তিনি দেশবাসীর অন্তরে প্রেরণা দিয়েছিলেন।

মানকুমারীর কবিতার বিষয়বস্তুর গণ্ডী যদিও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ও তাঁর আন্তরিক সমবেদনার স্পর্শে, তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় এবং তাঁর সহজ সরল ভাষার মাধুর্যে অসাধারণ এবং অপরূপ হয়ে উঠেছে, এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর আঁকা বাংলার পল্লী-প্রাংগণ, তুলসীতলা, শিবপূজা প্রভৃতির মধ্যে আমরা আমাদের প্রতি দিনের দেখা ছবিই দেখতে পাই, নূতন দৃষ্টিতে, অভিনব ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপে। কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী এঁরা স্রষ্টা নারী, এঁদের লেখায় সৃষ্টা নারী বেশী নেই, যাঁরা আছেন, তাঁরা পৌরাণিকা। নারীচিত্তের কল্যাণ নির্ঝর এই তিনটি ধারাতেই সমাজে সংসারে ঢেলে দিতে কার্পণ্য হয়নি। এঁদের রচনায় বহু নারীচিত্র সুখদুঃখে শোকে সান্ত্বনায় যুঁই, বেল, বকুল, চম্পক চামেলীর মতই ফুটে উঠেছে। এঁদের মধ্যে মানকুমারীর রচনায়ই বাস্তব নারীর দেখা পাওয়া গেছে। তারা আমাদেরই ঘরকন্নার একেবারে ভিতরকার লোক। জানা ও চেনা। এককথায় বলা যায় যে, তিনিই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে পূর্বগামী লেখকদের অনুসরণ বা অনুকরণ না করে, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার থেকে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তিনিই প্রথম দেখালেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা দেশকে ও বাংলা-সাহিত্যকে উন্নত করতে হয়, তবে বাংলা দেশের কথা, বাংলার ঘরের লোকদের নিয়ে সাহিত্য গড়তে হবে। তাঁর—'নমো দেব মহাদেব নমো রাঙা পায়', 'আমি চাই শিশু হেন উলংগ পরাণ,' 'পতিতোদ্ধারিণী' প্রভৃতি কবিতা বাংলা-সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। তিনি প্রধানত মধুর ও করুণ রসের কবিতায় সাফল্য লাভ করেছেন।

মানকুমারী বঙ্গ কাব্য-জগতে যত বড় বিস্ময় হোন না কেন, তাঁর অভ্যুত্থান আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেননা, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পাশ্চাত্যশিক্ষার বিস্তার এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি সমাজের সহানুভূতি বাড়বার সাথে সাথে বহু মহিলা-লেখিকা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তখনকার প্রখ্যাতনামা মহিলা-কবিদের মধ্যে বিরাজমোহিনী দাসী, ভুবনমোহিনী দেবী, গিরীন্দ্র-মোহিনী দাসী, স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, প্রসন্নময়ী দেবী, মনোমোহিনী গুহ, নবীনকালী দেবী প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ফলত সেই যুগে, কারুর পক্ষেই সাহিত্যের সকল বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা সহজসাধ্য ছিল না। কবিতার ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যে কামিনী রায় ও মানকুমারীই অগ্রগণ্যা।

বাংলা দেশে প্রথম জাতীয় সাহিত্য 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করে প্যারীচাঁদ বিস্মিত করেছিলেন বাঙালীদের। মানকুমারী তেমনই সাহিত্যে বাস্তব নারী-চরিত্রও কম আলোড়ন তোলেনি। তাঁর রচনায় কোথাও কৃত্রিমতা ছিল না, সর্বত্রই প্রকাশ পেয়েছে লেখিকার সুমধুর নারীত্ব। এ-বিষয়েও তিনি পরবর্তীকালের মহিলা সাহিত্যিকদের পথিকৃৎ।

খুব ছোটবেলায় মাত্র দশ বছর বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু তার আগে থেকেই বাংলা-সাহিত্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। মানকুমারীর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'প্রিয় প্রসংগ' বা 'হারানো প্রণয়' (গদ্য-পদ্য)-ই প্রথম গ্রন্থ। ১৮৮৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি ধারাবাহিক ভাবে বনবাসিনী (উপন্যাস-৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮), বাঙালী রমণীদিগের গৃহধর্ম (সন্দর্ভ-১৫ জুলাই ১৮৯০), শোকোচ্ছ্বাস (কাব্য গ্রন্থ-১৮৯১) দুইটি প্রবন্ধ (রচনা-২২ ডিসেম্বর ১৮৯১), কাব্যকুসুমাঞ্জলি (কাব্যগ্রন্থ-২ অক্টোবর ১৮৯৩), কনকাঞ্জলি (কাব্য-২৯ অক্টোবর ১৮৯৬), বীরকুমার-বধ কাব্য (১০ মে ১৯০৪), শুভ সাধনা (গদ্য-পদ্য—১৯১১), বিভূতি (কাব্য-১২ এপ্রিল ১৯২৪), সোনার সাথী (কাব্য-২ মে ১৯২৭), পুরাতন ছবি (আখ্যায়িকা-২৫ জুলাই ১৯৩৬) প্রভৃতি ১২ খানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প ছড়িয়ে আছে, যা আজো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

ছোটগল্প রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কুন্তলীন-পুরস্কারের ১ম বর্ষে (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) 'রাজলক্ষ্মী', ৩য় বর্ষে (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) 'অদৃষ্ট চক্র'ও ৪র্থ বর্ষে (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) 'শোভা' গল্পটি পুরস্কার লাভ করেছিল। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে খুলনায় তাঁর জয়ন্তী-উৎসব পালিত হয়। এর আগে বাংলা দেশে আর কোন মহিলা-কবিরই জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়নি। মানকুমারী দেবীর সাহিত্য-প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তৎকালীন ইংরেজ সরকার ১৯১৯ সালের জুলাই মাস থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাসিক ত্রিশ টাকা করে, পরে তা বৃদ্ধি করে চৌত্রিশ টাকা করে দিয়ে গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩৭ সালে চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে 'কাব্য-সাহিত্য' শাখার সভানেত্রী হয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণ পদক' ও ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বাংলা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক' লাভ করেন।

সেই মানকুমারীর শেষ পুরস্কার লাভ। এর ঠিক দু'বছর পর ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ, ইংরেজী ১৯৪৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর মধ্য রাত্রে ৮৭ বছর বয়সে খুলনায় পরলোকগমন করেন। জীবনের শেষ দিনে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন 'আর কেন ?' কবিতাটির শেষ লাইনে লেখা ছিল :

"বিদায়, বিদায়, ভাই। আর কেন ডাকো !"

মিল

রেবা চট্টোপাধ্যায়

অনুরাধা দি'দির পাশে শুয়ে বই পড়ছিলো। গরমের ছুটী চলছে এখন। দারুণ গরম। ঘরের সব দরজা জানলা বন্ধ ক'রে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে অনুরাধা বইয়ে মন বসাতে চেষ্টা করছিলো। থার্ড ইয়ারে পড়ে সে। দুপুরে ঘুমুবার তার অভ্যাস নেই। দিদিটা শীতলপাটির ওপর শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মা পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছেন

বাবা অফিসে। ঠাকুমার নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে পাশের ঘর থেকে। ঝি চাকর খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে শুয়ে পড়েছে ঠাণ্ডা একটু জায়গা বেছে নিয়ে। অনুরাধার মনটা ছটফট করছিলো তেঁতুল অথবা একটু আচার খাবার জন্যে। গল্পের বইতে তার কিছুতেই মন বসছিলো না। ঠাকুমার ঘুম অন্ততঃ তিনটের সময় ভেঙ্গে যাবে। তখন তাঁর সঙ্গে বেশ মজার মজার গল্প করা যায়। কিন্তু এখন কি করবে ভেবে পেল না অনুরাধা। একবার ভাবলো নন্দাকে ডাকবে কি না।

নন্দা তাদের গ্রামেরই এক অনাথা মেয়ে। অনুরাধাদের দেশ পাকিস্তানে। দেশ পাকিস্তান হবার পর নন্দার এক দূর সম্পর্কের মামা নন্দাকে অনুরাধাদের কাছে রেখে যায়। নন্দা সেই থেকে এখানেই আছে। এখানে থাকে এবং ফাই ফরমাস খাটে। বেশ মজার মজার কথা বলে নন্দা। সিকসকে বলবে চিকস্। সেভেনকে বলবে চেবেন। অনুরাধারা ওর কথায় খুব মজা পায়। নন্দার বয়স হবে বছর আঠার। গায়ের রং কালো। চোখ বেশ বড় বড়। একরাশ চুল আছে মাথায়। ওর এখন বিয়ে দেবেন মা। তাই ওকে রোজ দুপুরে বসে হাতের লেখা করতে হয়। এখন ডাকলে কি ও আসবে?

অনুরাধা বইটা পাশে রেখে চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো। ক্যাঁচ ক'রে দোরে শব্দ হওয়াতে অনুরাধা চোখ খুলে দেখলো নন্দা এসেছে।

নন্দা বলল, "ফুলদি, ত্রিফলাদি এসেছে।"

নন্দার কথায় অনুরাধা হো হো ক'রে হেসে উঠল। তার-পর উঠে এসে বন্ধুকে ডাকলো—"আয় রে উৎপলা, ভেতরে আয়।"

উৎপলা হাসি মুখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—"কিরে রাধা, তোকে ও কি-দিদি বলে ডাকে রে?"

অনুরাধা হেসে বলল—"আর বলিস নে নন্দার কথা। ওকে এত করে বলি আমাকে ফুলদি ডাকতে, তা ও কিছুতেই পারে না। ডাকবে ফুলদি।"

উৎপলা এবার হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

অনুরাধা বলল—"এই দেখ না, তুই এসেছিস আর ও এসে বলল—ত্রিফলাদি এসেছে।"

উৎপলার হাসি আর থামতে চায় না। একটু পরে বহুকষ্টে হাসি থামিয়ে বলল—"তোদের বেশ মজা না রে রাধা? কেমন বেশ নতুন নতুন কথা শুনিস?"

নন্দা দাঁড়িয়েছিলো এতক্ষণ। এবার বলে উঠলো—"ফুলদি তো বলে আমি একটা মিচিন। আমার মিচিনে সব বালো বালো কতা তৈরী হয়।"

উৎপলা বলল—"তুমি সত্যিই একটা মেশিন নন্দা। কেমন ভালো ভালো সব কথা বলছ।"

অনুরাধা বলল—"উৎপলা, কাল না নন্দাকে দেখতে আসবে। তুই দুটো কথা শেখাতো ও কে।"

উৎপলা নন্দাকে বলল—"আচ্ছা নন্দা, ধর বরপক্ষরা তোমাকে করলো তুমি কোন ক্লাসে পড়?"—

নন্দা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—"কেন, দিদি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। বলবো—ক্লাচ চেবেনে পড়ি।"

—"ক্লাচ চেবেনে মানে?" উৎপলা জিজ্ঞেস করলো।

—"ক্লাচ চেবেনে মানে ক্লাচ চেবেন?"

অনুরাধা হেসে জিজ্ঞেস করলো—"আর যদি তোর নাম জিজ্ঞেস করে?"

—"কেন, বলবো মিচ নন্দা পল্।"

উৎপলা বলল—"মিচ নন্দা পল মানে মিস নন্দা পাল?"

খুব খুসী হ'য়ে নন্দা জানায় তাই।

অনুরাধা ও উৎপলা একসঙ্গে হেসে ওঠে।

অনুরাধা বলল, "নন্দা, এখন একটু আচার খেতে ইচ্ছে করছে।"

নন্দা বলল, "কাসে আচার?"

"হ্যা থাকে, তুই নিয়ে আয়।"

নন্দা ভাঁড়ার ঘর থেকে আচার নিয়ে এলো। উৎপলা আচার খেতে খেতে বলল, "আচ্ছা নন্দা, তোমার ফুলদি কি পড়ে?"

"কেন? আপনি জানেন না বুঝি? ফুলদি বি, এচ, চি পড়ে।"

অনুরাধা রাগত স্বরে বলল, "তুই এবার যা নন্দা। তোকে আর বেশী কথা বলতে হবে না।"

সমস্ত দিন অসহ্য গরমের পর সন্ধ্যার দিকে ফুরফুরে হাওয়া বইতে লাগলো। অনুরাধা এবং অনসূয়া খোলা বারান্দায় মাদুর পেতে পড়তে বসেছিলো। বাবা বসে পড়াচ্ছিলেন ওদের। অনসূয়ার চোখ খুব খারাপ তাই ও বেশী পড়তে পারে না। ডাক্তারের নিষেধ আছে। প্রত্যেকদিন তাই বাবার কাছে বসে ইংরাজীটা ভালো ক'রে শেখে। ডিগ্রি না থাকলেও তার জ্ঞান বুদ্ধি প্রায় এম, এ, কেও হার মানায়। একটু পরে ঠাকুমা লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে দোক্তার কৌটো হাতে করে এসে বসলেন ওদের পাশে। মা ঠাকুরকে রান্না বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এখন তিনি গা ধুতে যাবেন। অনসূয়া চেঁচিয়ে বলল, "মা আমরা একটু চা খাবো।"

নন্দা এসে মাকে বললো, "মা, আমার তো এখন কোন কাজ নেই। তোমার মাপটা তাহলে এখন দর্জিকে দিয়ে আসি?"

মা বললেন, "কি যে মাপ মাপ করিস নন্দা, আমার একটুও ভালো লাগে না। সমস্ত দিন তোর বাইরে বাইরেই থাকতে ইচ্ছে করে। দু'দিন পরে বিয়ে দেবো। যা এখন আর তোকে বাইরে যেতে হবে না। তার চেয়ে দিদিদের কাছে বসে একটু কথা শেখ গে যা।"

নন্দা একটু অভিমানের সুরে বলল, "যাব না তাহলে তোমার মাপ নিয়ে?"

মা এবার রাগত স্বরে বললেন, "না যেতে হবে না। বলিস তো সব বিশ্রি কথা। কাল তোকে দেখতে আসবে তার একটু মহড়া দিগে যা।" মা ঠাকুরকে চায়ের জল চাপাতে বললেন।

ঠাকুমা এক মুখ থুথু থুঃ করে ফেলে দিয়ে বললেন, "আমরাও পাড়াগাঁয়ের মানুষ ছিলাম। কিন্তু নন্দার মত এত মূর্খ ছিলাম না বুঝলি দিদি? ওকে তোরা এত শেখাচ্ছিস পড়াচ্ছিস, কিন্তু ও যা তাই রইলো। বিয়ের পরে কি করবে তাই আমি এক এক সময় ভাবি।"

অনুরাধা আব্দারের সুরে বলল, "তোমরা বিয়ের পরে কি করতে বল না ঠাকুমা?"

"আজ তোমাদের আর পড়া হবে না। তোমরা গল্প কর আমি একটু ছাদে যাই।" বাবা উঠে গেলেন।

বাবা চলে যাবার পর ঠাকুমা আরেক দলা দোক্তা মুখের ভেতর পুরে দিয়ে অনুরাধার থুঁতনি ধরে আদর করে বললেন, "রাধেলো, আমাদের দিন বড় আনন্দের দিন ছিলো। তোরা কি শহরে জ্যোৎস্না উপভোগ করতে পারিস? ওঃ আমাদের সময় গ্রামে"—ঠাকুমা আবেশে চোখ বুজলেন।

অনুরাধা ঠাকুমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "চট্ করে বলেই ফেল না তোমরা কি করতে?"

ঠাকুমা একটু হেসে তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "দিদি লো অধৈর্য্য হোস নে।" শুনলেই তো ফুরিয়ে যাবে। শোন, সেই একবার পূজোর সময় একাদশী কি দ্বাদশী হবে। অদ্ভুত জ্যোৎস্না। রাত তখন প্রায় দুটো হবে। তোদের দাদু আমার ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, "চল বেড়াতে।"

"সে কি এত রাত্রে?"

"তোদের দাদু বললেন, 'দিনের বেলায় যাবো কি করে? চল।' আমাকে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে এলেন দীঘির পারে। একটা নৌকোও ছিলো বাঁধা দীঘির ঘাটে। অজস্র পদ্ম ফুটে রয়েছে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে নৌকো ক'রে চলে গেলাম মাঝ দীঘিতে। তোদের দাদু অনেক পদ্ম তুলে দিয়েছিলেন আমায়। আদর করে খোঁপায় ও একটা শ্বেত পদ্ম গুঁজে দিয়েছিলেন।"

অনসূয়া বলল, "আর তোমরা বর্ষার রাত্তিরে কি করতে একটু বল না ঠাকুমা?"

নন্দা একটু দূরে বসেছিলো। ঠাকুমা তাকে ডেকে বললেন, "আয় নন্দা এদিকে।" নন্দা এগিয়ে এলো ঠাকুমার দিকে। ঠাকুমা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন "কাল তো তোকে দেখতে আসবে। সব আদব কায়দা শিখেছিস তো?"

নন্দা মাথা কাত করলো।

ঠাকুমা বললেন, "দেখ না দিদিদের পাল্লায় পরে আমাকে একবারে গাউন পরতে হয়েছিলো।" ঠাকুমার কথা শুনে ওরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

অনসূয়া নন্দাকে বলল—"বলতো নন্দা ক্লাস।"

"ক্লাচ"—

"ক্লাচ নয় ক্লাস"—

"ক্লাচ"

"আচ্ছা, বল তো ফল"—

"পল"

অনসূয়া আবার জিজ্ঞেস করলো—"বল তো গোল গোল"—

"গুল্ গুল্।"

নন্দা তারপর অনুরাধার দিকে তাকিয়ে বললো—"আচ্ছা পুলদি কাল তো আমায় চিরামপুর থেকে দেখতে আসবে না?"

"চিরামপুর থেকে নয়। বল শ্রীরামপুর।"

নন্দা আব্দারের সুরে বললো, "আমাকে দেখে চলে যাবার পর চিনেমা দেখতে যাবো। যাবে পুলদি? অনেকদিন চিনেমা দেখিনি।"

এবার অনসূয়া এক ধমক দিলো ওকে। বলল—"নে ওঠ এখান থেকে। রোজ এত করে শেখাচ্ছি তবু সেই এক কথা"—নন্দা কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠে গেলো।

দিলো—"কি হচ্ছে রাধা! তুই ওকে বড্ড আস্কারা দিস। কোথায় ওকে সব শেখাবি তা না ওর কথায় কেবল হাসবি। কত জায়গা থেকে সম্বন্ধ হলো কিন্তু কি হ'লো বলতো? মাঝখান থেকে বাবার মুখ নীচু হয়।"

"তা আমি কি করবো? তুমি তো ওকে কত শেখাচ্ছ।"

অনসূয়া বোনকে একটু আদর করে বললো, "তুইও ওকে একটু বকবি, বুঝলি?"

অনুরাধা মাথা নেড়ে বললো, "আচ্ছা"।

সেদিন রাত্রিতে নন্দা আর কারুর সঙ্গে কথা বললো না। খেয়ে দেয়ে এসে শুয়ে পড়লো। কাল কি করবে ভাবলো সারা রাত্রি। কেন যে তার কথা মনে থাকে না তা সে বুঝতে পারে না। অনেক ভাবনা চিন্তার পর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো নন্দা।

পরের দিন পাত্রের দাদা এসে পাত্রী দেখে গেলো। অনসূয়া আর অনুরাধা প্রাণপণে কালো নন্দাকে সাজিয়ে সুন্দর করে তুলেছিল। নন্দা প্রত্যেক বারের মত এবারেও সব ক'টি কথাই ভুল বললো। উচ্চারণ তার আর শত চেষ্টাতেও ঠিক হল না। পাত্রপক্ষ যাবার সময় জানিয়ে গেলো তাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে এবং দিনস্থির করতে বলে গেলো।

বাড়ীর সবাই খুসী হ'য়ে উঠলো। এতদিনে সত্যিই তাহলে নন্দার বিয়ে ঠিক হ'লো। মা বললেন, "ছোট থেকে মানুষ করেছি। মেয়েরই মত ও আমার। ছেলেকে একবার দেখবে না?"

বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন, "ভালো ঘর পাওয়া গেছে। পাত্র দূরে থাকে, এখন আবার ও-সব হাঙ্গামা করতে গেলে হয়তো সব ফেঁসে যাবে। ছেলে একবারে এসেই বিয়ে করে যাবে সেই ভালো।"

মা আর কিছু বললেন না। পরের দিন থেকে তিনি অনবরত নন্দাকে কাজ শেখাতে লাগলেন। নন্দা একটু দোকান বাজারে ঘুরতে ভালোবাসে মা তাও বন্ধ করে দিলেন। তাঁর উপদেশের আর শেষ নেই।

অনুরাধা এক সময় বললো, "মা তুমি তো নন্দাকে এত সব শেখাচ্ছ। আমাদের বিয়ে হলেও শেখাবে?"

মা হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "পাগলী"—

ঠাকুমা হেসে বললেন, "খুব শখ যে লো দিদি। হবে হবে। সব শিখিয়ে দেবো একেবারে। আর নাতজামাইয়ের কান যা মলে দেবো।"

অনুরাধা লজ্জা পেয়ে দৌড়ে চলে গেলো।

নন্দার ভালো লাগে না। বাইরে সে একদম বেড়াতে যেতে পারে না। পাড়ায় না বেড়াতে পারলে তার পেটের ভাতই হজম হয় না। দর্জ্জির দোকান থেকে সে কত ছিটের টুকরো জোগাড় করে আনে। ভুলো মাষ্টারের বাড়ী থেকে কত ডাঁসা পেয়ারা পেড়ে এনে দিদিদের খাওয়ায়। মিনিদের বাড়ীতে দোলনায় ওঠে। তার আঠার বছরের মন বরকে কিছুতেই ভালো ভাবতে পারলো না। মনে মনে সে ঠিক করলো আগে বিয়ে হোক তারপর বর ব্যাটাকে মজা দেখাবে।

বিয়ের রাত্রি। বাসরঘরে সমস্ত ক্রিয়া কার্য্য শেষ হলো। বরকে সবাই ঠাট্টা করছে কিন্তু নতুন বর এখন পর্য্যন্ত একটি কথাও বলেনি। অনেক ঠাট্টা তামাসার পরও যখন বর চুপ ক'রে রইলো তখন

ঠাকুমা এলেন এবারে লাঠি ঠুক্ ঠুক করে। নতুন নাতজামাইয়ের পাশে বসে বললেন, "তুমি আমার নাতজামাই হও। আমার সঙ্গে তোমার কথা না বললে তো চলবে না।"

বর এবার বলল, "তা ঠাকুমা, আপনার যখন আমি নাতজামাই তখন আপনার সঙ্গে তো আমায় কথা বলতেই হবে।"

ঠাকুমা হাসি চেপে বললেন, "তুমি এখন একটু কিছু খাও।"

"না"

"সে কি! খাবে না?"

"না। এখন খেতে ইচ্ছা নাই।"

ঠাকুমা হেসে বললেন, "নাতজামাই, তোমাদের ধুতিতে মানিয়েছে খুউব।" বাসর ঘর চাপা হাসিতে ভ'রে গেলো।

গভীর রাত্রি। বাসর ঘরের ভেতর অনেকেই শুয়েছে এবং গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। নন্দার কিছুতেই ঘুম আসছিলো না। বসেছিলো সে। নতুন বর তার আঁচলে একটু টান দিলো। নন্দা তার দিকে মুখ ফেরালো।

বর একটু ইতস্ততঃ করে বললো, "ও নন্দা, খাটের ওপর এসো। আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি?"

"না। আমি খাটে শুবো না।"

"খাটে না খাটে শোবে এসো। নন্দা, তোমার নামটা ভারি সুন্দর।"

"আপনি কত্তা ধরা পরার ভয়ে আমাকে দেখতে আসেন নি না?" নন্দা প্রশ্ন করলো।

"ঠিক ধরেছ। তোমার কথাতেও ডিফেক্ট আছে তাই দাদা এখানেই বিয়ে করে নিতে বললো।"

নন্দা আবার জিজ্ঞেস করলো, "কত্তার জন্য অনেক জায়গায় বিয়ে ভেঙ্গেছে বুঝি?"

"ঠিক ধরেছ। তোমারও তো তাই?"

নন্দা মাথা নাড়লো, "হ্যাঁ।"

বর বললো, "এই দেখ না, আমার দাদারা কত ভালো চাগরি করে সবাই পাশ করা। আর আমি একডি গপেট—মানে মূর্খ, বুঝলে?"

নন্দা হেসে বলল, "আমিও তাই। আমার মাথায়ও কিছু ঢোকে না।"

পরের দিন বিদায়ের সময় নন্দা খুব কাঁদলো। যাবার সময় মাকে প্রণাম করে তাঁর কানে কানে বলল—তুমি মন কারাপ করো না মা। জামাই যা এনেছ তার জুড়ি আমিই চিলাম। আমার কত্তার বুল ধরতে পারবে না।

মা চোখের জল মুছে আশীর্ব্বাদ করলেন তাকে।

নন্দা সবাইকে প্রণাম ক'রে গাড়ীতে উঠলো। যাবার সময় অনুরাধার কানের কাছে মুখ এনে বলল—পুলদি, এবার তোমার জুটো মিচিনে খুব বালো বালো কত্তা তৈরী হবে। চোখের জল ঝরে পড়লো তার। চোখের জল মুছে অনুরাধার দিকে তাকালো সে। অনুরাধার চোখও ছল্‌ছল্‌ করে উঠলো। গাড়ী ছেড়ে দিলো।

বীর সন্তান

বাসন্তী গোস্বামী

আমার দেশের বীর সন্তান,
বীর নওজোয়ান।
ভারত মায়ের দুর্নিবার, দুর্জ্জয় সন্তান।
নব ইতিহাস রচিত করেছে,
দুর্গম পথে যাত্রা করেছ,
নির্ভয়ে, নিঃশঙ্কে,
মাতৃভূমিরে রক্ষা করার, দুর্বার সঙ্কল্পে
বীর প্রসবিনী ভারত মায়ের,
ওগো বীর সন্তান,
দু পায়ে মাড়িয়ে সকল বাধা,
হও আজ আগুয়ান।
এই দেশেতে জন্ম নিয়েছে,
কত শত সন্তান।
ভারত মায়ের কোল আলো করা
তারা মহামহীয়ান,
তারা ছিল বলীয়ান।
ওরে নবীন প্রাণ, তোমরা তাঁদেরই সুযোগ্য সন্তান,
শির পাতি লও, তাদের আশীর্বাণী,
ওরে দামাল ছেলে, দৃপ্ত পদে, পুণ্য ব্রত যে নিয়ে,
এগিয়ে চল অভয় মন্ত্র, নীচ শত্রু হানি।
মাতৃভূমিরে রক্ষা করার সুকঠিন ব্রত আজ,
শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে পালিত করো সে কাজ।
ছেড়োনা মোদের জন্মভূমি, অশ্রু না করে লীন।
বিশ্বকবির অমর মন্ত্র, তব পাথেয় হক,
"জীবন মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনা হীন।"

উ থাণ্ট ঃ শিক্ষক থেকে সেক্রেটারী-জেনারেল

লতিকা দাস

রাষ্ট্রপুঞ্জের অস্থায়ী সেক্রেটারী-জেনারেল রূপে উ থাণ্টের মনোনয়ন স্বয়ং উ থাণ্টকেই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্মিত ক'রেছে। আমাদের এই উপগ্রহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে অকস্মাৎ অধিষ্ঠিত হ'য়ে উ থাণ্ট কিন্তু আত্মশ্লাঘার আতিশয্যে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েননি। বিপুল ও কঠিন কর্তব্যের আহ্বান তাঁর কাছে এসেছে এবং বিশ্বাস করা যেতে পারে, তিনি সেই আহ্বানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবেন।

এই বিনয়ী, শান্ত, অমায়িক এবং শিষ্টাচারী মানুষটি কেমন? ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সন্ধিক্ষণ থেকেই উ থাণ্ট বিপুল ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহানার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। সেক্রেটারী জেনারেলের গৌরবময় ভূমিকা তাঁর ওপর অর্পিত হওয়ার পর তাঁর স্বদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর মুখাবয়বের যতো আলোকচিত্র ছাপা

হ'য়েছে, সেগুলি এমনই সাধারণ ও মামুলি যে উ থান্টের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার কোন অস্পষ্ট চিহ্নমাত্র সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ, সমকালীন বর্মী রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি যথার্থই একজন অগ্রগণ্য নেতা।

ইরাওয়াদী ব-দ্বীপ অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারে উ থান্টের জন্ম। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর শিক্ষালাভ করার পর তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়। তাঁর পিতার সাধ্য ও সঙ্গতি যেহেতু একান্তই সীমাবদ্ধ ছিল, উ থান্ট তাই কেবলমাত্র পাশ ডিগ্রী অর্জন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো রকমে তিন বছর অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ ক'রেছিলেন। ছাত্র হিসাবে উ থান্ট অসাধারণ না হ'লেও, নিতান্ত সাধারণ ছিলেন না। ইংরেজী সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটে। পাঠক হিসাবে উ থান্ট ছিলেন অক্লান্ত এবং ডিকেন্স, শার্লক হোমস্ থেকে সুরু ক'রে অল্পখ্যাত লেখকদের রচনাও তিনি গলাধঃকরণ ক'রেছেন। তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ, পুস্তিকা, উপন্যাসের খসড়া ইত্যাদি রচনা করেছেন এবং তাঁর দেশের ছাত্রমহলে ইংরেজী গল্পের লেখকরূপে কৃতিত্ব অর্জন ক'রেছেন। সম্ভবত ছাত্রাবস্থায় তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন মাউং নু। মাউং নু-এরও সাহিত্যিক উচ্চাশা হৃদয়ে ছিলো, যদিচ তিনি তাঁর মাতৃভাষাকেই তাঁর সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

কলেজের শিক্ষা শেষ ক'রে দুই বন্ধু, উ থান্ট এবং মাউং নু একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সুরু করেন। এই বিদ্যালয়টি বর্মী জাতীয়তাবাদীরা সরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন যদিও উভয় বিদ্যালয়েরই পাঠক্রমের মধ্যে সাদৃশ্য ছিলো প্রচুর। উ থান্ট পনেরো বছর ঐ বিদ্যালয়ে কাটিয়েছেন এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন হ'য়েছেন। মাউং নু (ব্রহ্মদেশের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী) শিক্ষকতা ত্যাগ ক'রে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করেছেন এবং অল্পকালের মধ্যেই জঙ্গীবাদী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা হয়েছিলেন। উ থান্ট দীর্ঘকাল সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী থেকেছেন এবং কালক্রমে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি স্বদেশের গণ্ডী অতিক্রম ক'রেছে।

যখন উ নু-র নেতৃত্বে (মাউং নু) তাঁর ফ্যাসি-বিরোধী মুক্তি সংস্থা ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে স্বাধীনতা লাভ ক'রলো, ব্রহ্মের নব-নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী উ নু তাঁর পুরনো বন্ধু উ থান্টকে সরকারের তথ্য দপ্তর পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বিভেদ এবং বিদ্রোহে ব্রহ্মদেশ যখন প্রায় বিচ্ছিন্ন, তখন এ-কাজের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। সেই দারুণ দুঃসময়ে উ থান্ট তিন বছর সাফল্যের সঙ্গে সরকারী তথ্য দপ্তর পরিচালনা ক'রেছেন। একদিকে তিনি অবিরাম প্রচারকার্যে নিযুক্ত থেকেছেন অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাবলী বর্মী ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রেছেন। এই দায়িত্বশীল কর্মে তাঁর অভাবিত সাফল্যের জন্যই ১৯৫৪ সালে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিবের পদে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং এখানেও উ থান্ট তাঁর সাফল্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার সেক্রেটারীর পদেও তিনি নিযুক্ত হ'য়েছেন এবং ব্রহ্মের সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সূত্রগুলি তিনিই

[illegible] পার্টির হ'য়ে [illegible]।

উ নু-র ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও, ১৯৫৬—৬০ সালে দেশের সর্ববিধ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তিনি নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। ওয়াশিংটনে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করার দ্বৈত ভূমিকা দিয়ে তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয় এবং সেখানে তিনি মধ্যপন্থী ও যুক্তিবাদী পুরুষ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

তাঁর দেশবাসীর জাতীয় চরিত্রের গুণাবলীই উ থান্টের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে: সহিষ্ণুতা, রহস্যপ্রিয়তা, আনুপাতিক-বোধ এবং ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জাগ্রত চেতনা তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট। নীতি-নির্ধারণের চেয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানুষের সেবাতেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র যথোচিত আত্মপ্রকাশে সক্ষম হবে। জাতীয়, আঞ্চলিক অথবা তাঁর নিজের আদর্শের সীমারেখার ঊর্ধ্বে থেকেই তিনি তাঁর কর্তব্য পালন ক'রবেন। তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দেবেন। কিন্তু, তিনি কি দাগ হ্যামারশীল্ডের সমকক্ষতায় উত্তীর্ণ হ'তে পারবেন? সম্ভবত, না।

তবু, সাহিত্যের সেই সামান্য স্কুলশিক্ষক অনেকদূর অগ্রসর হ'য়েছেন এবং তিনি আরও অনেক দূর অগ্রসর হ'তেও পারেন।

অভাব না স্বভাব

অমিতা ঘোষাল

অপ্রিয় প্রসঙ্গ অর্থাৎ সস্তা রসিকতা নয়, গুণগান নয়, [illegible] ভুল ত্রুটির কথা। অভাব-দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে [illegible] নেই —কিছু মনে করবেন না, সবটা আমাদের অভাব দারিদ্র্যের দোষ নয়, বেশীর ভাগই স্বভাব দারিদ্র্যের পরিণাম, নিঃসন্দেহে জেনে রাখুন। ব্যাপার নিতান্ত গা সওয়া পুরোন অভ্যাসের দোষ। ধরুন ঘুম থেকে উঠে দুর্গা বলে যেই জানলার পাট [illegible] যতদূর দৃষ্টি যায় উচ্ছিষ্ট আবর্জনায় পরিপূর্ণ রাস্তা, ফুটপাথ, তারপর শুরু হলো ক্লেদ দূষিত গঙ্গাজলের ঢেউ। [illegible] পরে বস্তির যত ময়লা এপারের চারতলা ছ-তলার জানলা দরজার তলা দিয়ে জমা হোল, গাড়ি বোঝাই হবে যখন বাড়ীর খোকা খুকুরা ঘুম চোখে এসে দাঁড়াবে দরজা জানালার ধারে। অনেকে আবার বাচ্চাকাচ্ছার হাত ধরে স্বাস্থ্য রক্ষা [illegible] বের হবেন ঠিক ঐ সময়। আর যাদের উপায় নেই ছুটবেন বাজারের দিকে, তাড়ার চোটে গিন্নী পাড়া মাৎ করবেন [illegible] "সব শেষ হয়ে গেলে পরে যেও, তাই পোড়া কপালে শুকনো শাক আর পচা মাছ" ইত্যাদি ইত্যাদি। হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন তাঁরা, অনেকেই টিকে নেওয়ার সময় পাননি অফিস কামাই হবে কিম্বা একদিন স্কুল কামাই হলে ছাত্ররা কুরুক্ষেত্র বাধাবে।

—পছন্দ মত হোক আর নাই হোক বাজার কিছু [illegible] আসতেই হবে দৈনিক, তা না হলে এ বাড়ীর গিন্নী [illegible] মাসিমার কাছে মান রাখতে পারবেন না। তাই কুচো চিংড়ি যদি গলদা হয়ে যায় গল্প প্রসঙ্গে, এমন কিছু অপরাধ নয়—কি কুচোই হোক আর গলদাই হোক একই সময় দু'বাড়ির সামনে এদিক ওদিকে ছড়াতে দেখা যাবে, ঠিক যখন আগের দিনে

সঞ্চিত বিস্তর আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে নিয়ে যাবে করপোরেশনের জমাদারের দল। হাড় কাঁপানো শীত, ঝড় জল সব তুচ্ছ করে হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার দুর্ভাগা হতভাগ্যের দল হাতে পায়ে বিষাক্ত ক্ষত নিয়ে সহরবাসীর কল্যাণসাধন করবে যারা, তাদের কথা নিতান্ত অবান্তর। কিন্তু নিজেদের কথা ওরা চিন্তা করছেন ক'জন। বাঙালী পাড়ায় (মধ্যবিত্ত) বেলা ন'টা দশটার মধ্যে বেশীরভাগ বাড়ীর সামনের ফুটপাথ আবর্জনা উচ্ছিষ্টে পূর্ণ হয়ে যায় আর সেই সময়ই দলে দলে চলেন দেশের সংস্কৃতি সমাজ সেবকের দল, নবনব পরিকল্পনার চমক লাগানো মারপ্যাচ কষতে কষতে।

ফাগুনের হাওয়া দিতে না দিতেই আধুনিকাদের শুরু হয় সন্ধ্যার ছায়ার হাওয়ায় আঁচল খসিয়ে অকারণ ভীড় করে ঘুরপাক খাওয়া। তখন পাড়ায় পাড়ায় ডাষ্টবিন উপচে ফুটপাথে ছড়িয়ে আছে ময়লা জঞ্জাল কিছু বা উড়ছে উদাস হাওয়ায় এ-প্রান্ত হতে ও-প্রান্তে ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে ফুচকা খায় বখাটে ছেলে মেয়েগুলো সন্ধ্যের পর। আবার ওরাই তো শিক্ষাশিবিরে আসবে কাল, স্বাস্থ্যের তাক লাগানো কসরৎ দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে।

পাশের গলির মুখে বিয়ে বাড়ীর গেট সাজানো হয়েছে। হতভাগারা তিনদিন তিনরাত ধরে হাড় জ্বালানো উৎসব করছে সিনেমার ন্যাকামো গান শোনাচ্ছে পাড়া পড়শীকে, দুখানা ভাল গান কি বাজানো যায় না!—না যায় না, এই সব গানের সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে অনেক আবেগ মধুর স্মৃতি, নায়ক নায়িকার বিশেষ ক্ষণটি মনে করেই যে এই ধরণের গানের মান আর মানে খুঁজে পাবেন শ্রোতারা। বলাবাহুল্য এই গলি পথে তিনদিন তিনরাত্রি জঞ্জালের বোঝা শুধু জমা হতে থাকে। গান পাখি কুকুরের চিৎকারে অবর্ণনীয় পরিস্থিতি, জানালা কপাট খোলা দায় মাছির যন্ত্রণায়। যদি কেউ কিছু বলতে গেলেন, উত্তর পাবেন—"কাজের বাড়ীতে একটু বিশৃঙ্খলা হবেই মশাই, আনন্দ ছুটো দিন বই তো নয়।" হয়তো পরে দেখা গেল ডাক্তার বদ্যির ছোটা-ছুটি, পাড়াশুদ্ধ নাস্তানাবুদ অবস্থা।

—দিনান্তে ভূতের বোঝা নাবিয়ে ক্লান্ত মনে ভাবুন ইচ্ছে করলে একটু পরিবর্তন কি আনা যায় না? অভাব দারিদ্র্য সমস্যা সঙ্কট সবের মাঝে বাঁচতেই হবে যুঝতেই হবে যখন, একটু বাড়তি চিন্তা করতেই হবে যাতে করে সহজ স্বাভাবিক চেতনা ফিরিয়ে আনা যায় সমাজের বুকে।

অনেকেই জানি এই অপ্রিয় সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না যে নিতান্ত সাধারণ ছোটখাটো ভুল ত্রুটির দরুণ বড় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে—।

—কিছু মনে করুন আর নাই করুন তবু জনবাদ, সত্যি কথা বলতে গেলে আর ভাল করতে গেলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রিয় হয়ে ওঠে, বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গগুলি। সকলেই কিছু না কিছু ভুক্তভোগী তব্ সময় বিশেষে ভাল মন্দ বলতেই হয় সবাইকে এবং সেইসব প্রসঙ্গগুলি নিতান্ত আমাদেরই ভুল ত্রুটির কথা, একের অন্যায়ের জন্য সকলের লজ্জার কারণ কাজেই এই আলোচনা কারই বা ভাল লাগে, তাই—অপ্রিয়, তবু সত্য। সত্য যা গোপন না করে—সহজ আলোচনার মধ্যে সংশোধন করা মঙ্গল। দেখবেন চটে যাবেন না যেন—যদি বলি, আপনার মেয়েটিকে একটু সাবধানে রাখবেন, অতো রাত পর্য্যন্ত একা ছেড়ে দেবেন না।

আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আপনি কি ধরণের প্রতি উত্তর দিয়ে আহত করবেন, অবশ্য মার্জ্জিত হতে পারে সে ভাষা। জানবেন বিপদ একদিনই আসে। হয়তো মেয়েটি নিতান্ত ছেলেমানুষ বলে এখনো ভাবনার কথাই ওঠে না, কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্র জানেন এই ছোটর দলকে অকালে বড় করে অন্যায় করতে শেখানোর হিতৈষীরা সর্ব্বদা সচেতন। এর সঙ্গে অভিভাবকদের অন্ধ স্নেহের প্রশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে তারা একদিন যে কোন ক্ষতি করতে পারে সভ্য ভদ্র সমাজ বিরোধী, এ প্রমাণ বর্ত্তমানে প্রতি পাড়ায় (ভদ্র পাড়ায়) অশিক্ষিত পরিবারের চেয়ে শিক্ষিত পরিবারেই একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এবং মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সংখ্যা বেশী।

দেশে সর্ব্বত্র দূষিত বায়ু, বিশেষ করে মধ্যবৃত্ত সমাজ যে ঘূর্ণিপাকে বিভ্রত সহজ চিন্তা অনুভূতির বোধ শক্তির ক্রমবিলুপ্তি ঘটছে। দুজন একসঙ্গে হলেই দু'কথার পরে আসে সেই কথাটি—"অভাব" "দারিদ্র্য" "দুর্নীতি" জাতির জনকদের অন্যায় অত্যাচার ইত্যাদি। মধ্যবিত্ত পরিবারে শান্তি নেই অভাবের দরুণ বিত্তশালীদের শান্তি নেই, স্বভাবের দোষ, অর্থাৎ স্বভাব দরিদ্রদের কোন কালে কোন অবস্থায় শান্তিতে থাকতে দেখা যায় নি। মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বভাব দরিদ্রর বিকৃতি স্পষ্ট প্রকট আর বিত্তশালীদের মার্জ্জিত, গোপন রহস্যাবৃত! আসলে এক যায়গায় বিশেষ এক'জাতীয় মানুষ যে কোন অবস্থা বিশেষে সমান। এই বিশেষ শ্রেণীর মানুষ ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বকালে ছিল এবং থাকবে। যাদের ভুলের মাশুল দেবে নিরীহরা, বংশানুক্রমে ভুগবে তারাই, নিতান্ত সরল অসহায় মানুষ শুভাশুভ বিচার বোধ নিয়ে ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে তবু প্রতিবাদ করবে না, প্রতিকারের পন্থা খুঁজবে না সহজে কেউ। শুধু বাঁচতে হবেই বলে বেঁচে থাকা। মধ্যবিত্ত সমাজের বুকে অকল্যাণের ছায়া প্রকট হয়ে উঠছে তাই। এরি মধ্যে যাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন কাজের মাধ্যমে সমাজকে জড়তামুক্ত করেছেন, ন্যায় অন্যায় বিচার বোধ জাগিয়ে তোলবার অংশ গ্রহণ করেছেন তারাই প্রকৃত সম্মানের অধিকারী, কর্ম্মী প্রকৃত তারাই। অভাব দারিদ্র্য যাদের স্বভাবের মাধুর্য্য বিলুপ্ত করতে পারেনি তাদের সাহায্যে সমাজ অনুপ্রাণিত হোক।

বেনামী

(Anon's Poetry—Love not me for comedy grace)

বেসনাক ভাল মোরে শান্ত কান্তির তরে,
দেখে মোর চোখ মুখ, যা আনন্দে আছে ভরে,
বাহির সৌন্দর্য্য নয়, সুঠাম সুছন্দ নহে,
দেখনা হৃদয় যেথা সতত সততা বহে,—
ও সচল বিফল বা বিকৃতও হতে পারে
সেইক্ষণে দুইজনে চলে যাব দুই ধারে:
প্রকৃত নারীর দৃষ্টি তাই বলি রাখ সোজা,
অবিরত ভালবাস, ছাড়গো কারণ খোঁজা—
শুধু ভালবাসা তরে ভাল তুমি বাস যদি
সেই ভালবাসা মোরে দেবে সুখ নিরবধি।

অনুবাদ—মানসী বসু

রেখা বড়ুয়া

শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে একটা পাগলীকে নিশ্চয় আপনি দেখেছেন, তবে হয়ত লক্ষ্য করেন নি ভাল করে। একটু যদি নজর করেন তাহলে পাগলী হিসেবেও কিছু বৈশিষ্ট্য ওর মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন। খুঁজে পেতে কোথাও থেকে একটুকরো দড়ি পেলেই হল। তক্ষুনি তা গলায় জড়াবে আর দুদিক ধরে দুহাতে টানতে শুরু করবে। দুএকবার পথচারীরা ছাড়িয়েও দিয়েছেন। না হলে ওর জীবনলীলা হয়ত ঐখানেই শেষ হত। নানারকম পাগলই আপনি কলকাতার রাস্তায় দেখেছেন, তবু এর ব্যবহারে আপনি একটু অবাক হবেনই। যদি আপনি লেখক হন তাহলে হয়ত এর ওপর একটা গল্পের প্লট তৈরী করে ফেলবেন। কিন্তু জানতে পারবেন না যে আসল কাহিনীর সংগে আপনার গল্পের কোন মিল থাকল কিনা। কেন যে ওর এই অদ্ভুত পাগলামী তা কেউই জানে না। জানতে হয়ত আমিও পারতাম না আপনাদেরই মত, যদি না অনিমেষ আমার বন্ধু হত।

অনিমেষ আমার ছোটবেলার বন্ধু। সেই সূত্রে ওদের বাড়ী আমার যাতায়াত ছিল নিয়মিত। ছেলেবেলায় ওদের বাড়ীর একটা বড় আকর্ষণ ছিল ওর বৌদির হাতের নারকোল নাড়ু আর জিবে গজা। ক্রমে আমরা বড় হলাম, স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢুকলাম। পড়ার চাপ পড়ায় শেষের দিকে ওদের বাড়ী যাওয়াটায় একটু ভাঁটা পড়ল। তবে যখন যেতাম সুদশুদ্ধ পুষিয়ে নিতাম একদিনেই। এর আরও পরে বি-এস-সি পাশ করে আমি চলে গেলাম ঝরিয়ায়, হাতে কলমে খনিবিদ্যা শিখতে আর অনিমেষ ভর্তি হল এম-এস-সিতে। বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান আমি। আমার ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করছে দুটি অনূঢ়া বোন আর মায়ের সব আশা ভরসা। কাজেই নিজেকে তৈরীর কাজে একাগ্র হলাম আমি। ভাল ফল দেখাতে পারলে এখান থেকেই শুরু হবে ভবিষ্যতের প্রথম পদক্ষেপ। এই সময়টা বলতে গেলে ছিল আমার অজ্ঞাতবাস। নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে বন্ধুবান্ধবের খবর রাখবার অবকাশ পেতাম না। অবশ্য ছুটিছাটায় যে কলকাতায় আসতাম না তা নয়, কিন্তু তা এতই সংক্ষিপ্ত যে অবসর কমই মিলত। শেষের দিকে অবশ্য কিছুটা সময় পেতাম কিন্তু তবু অনিমেষের সঙ্গে আমি চিঠিপত্রের আদান প্রদান রাখিনি। ওর বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠিটা একটা মস্ত ঘা

তিন বছর বাদে প্রথম যেবার লম্বা ছুটিতে কলকাতা এলাম তখন অনিমেষদের খবর নেওয়াটা একটা কর্তব্য বলে মনে হল। অনিমেষের দাদার মৃত্যু সংবাদ তখন পেয়েছি আমি।

তিনটে বছরে একটা পরিবারে যে এত পরিবর্তন আসতে পারে তা অনিমেষদের বাড়ী আসবার আগে ভাবতে পারিনি। বাড়ীটার সর্বত্র কেমন একটা বিশ্রী থমথমে ভাব। সেই চঞ্চল হাসিখুসী অনিমেষ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। আমাকে দেখে হাসল একটু। নিতান্ত বিস্বাদ নিষ্প্রাণ সে হাসি। রান্নাঘরে পরিচিত ভঙ্গীতে বসে থাকতে দেখলাম সুনীতি দেবীকে অঙ্গে বিধবার বেশ, এইটুকুই শুধু নতুন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। নিতান্ত অভ্যাস বশেই বললাম, কেমন আছেন বৌদি?

—কেমন আছি? অকস্মাৎ হি হি করে হেসে উঠলেন সুনীতি।

—খুব ভাল আছি, সুখের সংসার—ঘর আলো করা বৌ এনেছি, কি আনন্দ আমার—উঃ, জ্বলে গেল মাথা আমার। হতভম্ব দৃষ্টির সামনে ডালের কড়া উল্টে হঠাৎ সমস্ত ডালটা উনোনে ঢেলে দিলেন সুনীতি। সারা ঘরে ছাইএর গুঁড়ো উড়তে লাগল, ডাল পোড়ার কটু গন্ধ ভরে গেল চারপাশ। এর মধ্যে দিয়ে তীব্রবেগে আমার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন সুনীতি। দৌড়ে এলো অনিমেষের বৌ লীলা। আমার অবস্থা অবর্ণনীয়।

—চল গোপাল সামনের পার্কটাতে গিয়ে বসি, আমার হাত ধরে টানে অনিমেষ। লীলার দিকে চেয়ে বলে, এখন ডাকাডাকি করো না, একা থাকতে দাও। ঘর থেকে যদি বেরোন তাহলে নন্দর মাকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠিও, তুমি যেও না যেন কাছে। আধঘোমটার মধ্যে মাথা নাড়ে লীলা। মুখখানি শুকিয়ে গেছে বেচারীর। অপূর্ব সুন্দরী বৌ হয়েছে অনিমেষের, এতর মধ্যেও লক্ষ্য না করে পারি না।

সেদিন সন্ধ্যায় পার্কের বেঞ্চিতে বসে এক দীর্ঘকাহিনী শোনায় অনিমেষ।

সুনীতির যখন বিয়ে হয় তখন অনিমেষের বয়স চার বছর। সেকাল হিসেবে হয়ত একটু বেশী বয়সেই বিয়ে হয়েছিল সুনীতির। মনটাও কিছুটা পরিণত হয়েছিল বয়সের সংগে সংগে। মাতৃহীন শিশু-দেবরকে দেখে তাই হয়ত মনে সহজেই স্নেহ জন্মাল তাঁর।

স্নেহের আঁচলের ছায়ায় বড় হতে লাগল ও, সন্তানহীনা সুনীতির অপত্য স্নেহ সবটুকুই পেল অনিমেষ। বয়স বাড়বার সংগে সংগে প্রকালের ধারা বদল হলেও স্নেহ রইল অটুট। দুধ না খাবার অপরাধে বকুনী বন্ধ হলেও রাত জেগে পড়বার অপরাধে নতুন করে তিরস্কৃত হল অনিমেষ। কলেজে পড়ার চাপের দোহাই দিয়েও বৌদির মন ভেজাতে পারল না ও।

দিন গড়িয়ে চলল, বছর কাটল। সুনীতি আবার নতুন স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। অনিমেষের বিয়ে হবে, ঘরে বৌ আনবে, টুকটুকে সুন্দর বৌ। অনিমেষের পাশে ঠিক যেমনটি মানায়। আশ্চর্য রকম সুপুরুষ ছিল অনিমেষ তাই ওর বৌ যে অপূর্বসুন্দরী হবে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না সুনীতির। বেছে বেছে রূপসী পাত্রীর সন্ধান করলেন তিনি। ইতিমধ্যে পাশ করে কলকাতাতেই একটা কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছে অনিমেষ। এই সময় লীলার সন্ধান পাওয়া গেল ঘটক মারফৎ। লীলাকে দেখলে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। এমন মেয়ে বাঙালীর ঘরে শ'এ একটাও মেলে না। বিজয় গর্বে ফটো নিয়ে অনিমেষকে পাকড়ালেন সুনীতি কিন্তু হায়, তরুণ অধ্যাপকের মন যে অন্যত্র বাঁধা পড়েছে এ খবর কে জানত। প্রচণ্ড বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন সুনীতি যখন জানতে পারলেন যে অনিমেষ ভালবেসেছে তাঁরই বোন মিনতিকে।

পাত্রী হিসেবে মিনতির বাজারদর যে নিতান্ত শূন্যের কোঠায় তা তার পরম মিত্রও অস্বীকার করতে পারত না। সুন্দরী ত' সে নয়ই এমন কি সুশ্রীও তাকে বলা চলত কি না সন্দেহ। কেবল তার কালো চোখে ছিল এক আশ্চর্য কোমলতা যা হয়ত আকর্ষণ করেছিল অনিমেষের ভাবালু মনকে। বিয়ে যে ওর হবার সম্ভাবনা কম তা হয়ত ও নিজেও জানত, তাই বি-এ পাশ করে ও সোজা ভর্তি হল বি-টি ক্লাসে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপায় হিসেবে। ইতিমধ্যে অনিমেষ যে কখন ওর অতি কাছে এসে পড়েছে তা ও নিজেই জানতে পারে নি। অনিমেষকে পাবার কল্পনা ওর কাছে ছিল আকাশ কুসুমের মত। সজ্ঞানে কখনও সে আশাও করেনি। কিন্তু তবু ওর মন বিশ্বাসঘাতকতা করল। যা পাবার নয় তারই জন্য আকুল হল ও। তাই অনিমেষ যখন নিজেই প্রার্থী হয়ে এল তখন তাকে ফিরিয়ে দেবার মত মনের জোর মিনতি খুঁজে পেল না। চোখের জলের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিবেদন করল ও।

মিনতির সম্মতি পেয়ে হাওয়ায় উড়ল অনিমেষ। সুনীতি যে এ প্রস্তাবে সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হবেন তা নিয়ে সন্দেহ মাত্র রইল না ওর। কিন্তু পৃথিবীতে বহু অদ্ভুত ব্যাপারও ঘটে। অনিমেষকে অবাক করে দিয়ে ওর কথার প্রবল প্রতিবাদ করে ওঠেন সুনীতি।

—এ হতে পারে না অনু, হোক আমার নিজের বোন তবু তোর পাশে সে পেত্নী। আমি কিছুতেই মত দিতে পারি না এতে। তারপর স্নেহঝরা কণ্ঠে বলেন, এ মেয়েটিকে তুই একবার দেখ অনু তারপর বলিস যা ইচ্ছে।

—কিন্তু মিনুকে কি তুমি ভালবাস না বৌদি? বিস্মিত অনিমেষ প্রশ্ন করেছিল।

—ভালবাসা না বাসার কথা নয় অনু, কথায় বলে যার সংগে যা— এই বয়েসেও তোর দাদার সংগে বেরুতে লজ্জায় মরে যাই আমি। লোকে বলবে অমুক মুখুজ্জে ঝি সংগে নিয়ে বেরিয়েছে—তা তখন ত বাপ মায়ের ওপর হাত ছিল না। আর তোর পাশে মিনুকে ত' আমি ভাবতেই পারি না, আমার কতদিনের সাধ ঘর আলো করা বৌ আনব। আমার কথা রাখ, এ মেয়েটিকে তুই একবার দেখে আয়, চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে।

কিন্তু এ প্রলোভনে ভুলল না অনিমেষ। মেয়ে দেখতে যেতে ও রাজী হল না কিছুতেই। তবু হাল ছাড়লেন না সুনীতি। তাঁর যখন বিয়ে হয় তখনও মিনতির জন্ম হয়নি। এদিকে বিয়ের পর বাপের বাড়ীর সংগে আর খুব বেশী ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে পারেন নি সুনীতি। সংসারের গৃহিণী সুনীতির সে সময় ছিল না। তাই রক্তের সম্পর্কের চেয়ে হৃদয়ের সম্পর্ক তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠল। সহোদরার প্রতি স্নেহকে ছাপিয়ে গেল দেবরের প্রতি ভালবাসা। অনিমেষকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল তাঁর নিঃসন্তান জীবনের সব স্বপ্ন আর সাধ। তাঁর সাধের অনুর বৌকে নিজে হাতে সাজিয়ে ঘরে তুলবেন এ কল্পনায় ছিল চরম সুখ। কিন্তু অনিমেষ যখন স্পষ্ট জানিয়ে দিল মিনতি ছাড়া অন্য মেয়েকে ও বিয়ে করবে না তখন যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন সুনীতি। অবিশ্রাম অনুরোধ, উপরোধ, চোখের জলে যখন ফল হল না তখন অন্য পথ ধরলেন তিনি। মিনতির কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালেন, আমার অনুকে তুই ছেড়ে দে মিনু। ভেবে দেখ ও কি তোকে চিরদিন ভালবাসবে? এ শুধু চোখের মোহ বই নয়, তার ওপর ভরসা করে দুটো জীবন তুই নষ্ট করিস না ভাই।

—আমার রূপ দেখেও যদি কারু মনে মোহ জাগে তাহলে তার ওপর কি ভরসা করা যায় না বড়দি? চোখ নামিয়ে বলেছিল মিনতি, আমাদের তুমি আশীর্বাদ কোর।

কড়া উল্টে হঠাৎ সমস্ত ডালটা উনুনে ঢেলে দিলেন সুনীতি

হ্যাঁ আশীর্বাদই করবেন প্রাণভরে—নিষ্ফল হয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে এসেছিলেন সুনীতি। লেখাপড়া শিখলে কি হবে, বুদ্ধিতে অনিমেষ এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেছে। খেয়ালের বশে কি করছে তা নিজেও বুঝছে না। যখন বুঝবে তখন আর শোধরাবার পথ থাকবে না। ওকে ফেরাতেই হবে। ওর জীবন এমন করে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবেন না সুনীতি, তার জন্যে যা করতে হয় হোক। এতে ভবিষ্যতে দুজনেরই ভাল হবে কিন্তু এখন ওরা তা বুঝবে না। দুবছর আগে কিছুদিন কালাজ্বরে শয্যাশায়ী হয়েছিল মিনতি। সেইটাকে আজ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন সুনীতি।

রাত্রের আহারের পর অত্যন্ত ধীর গম্ভীর ভাবে অনিমেষের ঘরে ঢুকলেন তিনি। খাটের ওপর গুছিয়ে বসে বললেন, আমি আজ ওবাড়ী গিয়েছিলাম অনু। একটা কথা তোকে বলি, বছর দুই আগে মিনুর একবার খুব অসুখ করেছিল মনে পড়ে তোর? কি সে অসুখ জানিস? ঘরের কথা কেউই বলে বেড়ায় না নেহাত দরকার না পড়লে তাই এতদিন তোর কাছেও বলিনি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে মিনু তোকে বলেছে যে ওর টি-বি হয়েছিল। সেই কথাই জানতে আমি আজ ওবাড়ী

গিয়েছিলাম। এত বড় কথা যে মিনু তোর কাছে গোপন করে যাবে আমি তা ভাবতেও পারিনি। সব জেনে যদি তোর এগোতে ইচ্ছে থাকে তাহলে আমি আর বাধা দেব না।

চরম অস্ত্র নিক্ষেপ করে উঠে গিয়েছিলেন সুনীতি। আর অনিমেষ? ভালবাসার আনন্দে যে মন রঙিন হয়ে উঠেছিল, অবিশ্বাসের বিষে তা হয়ে গেল রাত্রির মত কালো। এই তাহলে মিনতির স্বরূপ? এত নীচ সে? এরই কাছে এমন করে নিজের হৃদয়কে মেলে ধরেছে অনিমেষ। অকপট প্রেমের প্রতিদান পেয়েছে কপট ছলনায়?

সারারাত বিনিদ্র কাটিয়ে সকালে উঠেই সুনীতির মনোনীতাকে বিয়ে করতে সম্মতি জানাল অনিমেষ। বলল, যত শীঘ্র সম্ভব বিয়ের ব্যবস্থা করতে। এর পর প্রথম শুভলগ্নেই লীলাকে ঘরে আনল অনিমেষ। কিন্তু কেন কে জানে অত সাধের বৌ বরণ করতে গিয়েও কেমন যেন উন্মনা হয়ে যাচ্ছিলেন সুনীতি। বাপের বাড়ীর সবাই এসেছিল এক মিনতি ছাড়া। দুধে-আলতার পাথরে ফুটফুটে আলতাপরা পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়েছে বৌ এসে। খসখসে বেনারসী জড়িয়ে বরণডালা নিয়ে এগিয়ে আসেন সুনীতি। কেমন একটা কান্নার ঢেউ যে গলার কাছে ফেনিয়ে ওঠে। অতিরিক্ত আনন্দেই হয়ত। এম সময় ছুটতে ছুটতে এল বাপের বাড়ীর পুরোনো চাকর।

—ছোড়দিমণি গলায় দড়ি দিয়েছে বাবু—আছড়ে পড়ল বৃদ্ধ একটুকু বেলা থেকে কোলে পিঠে করেছি মা—ময়লা গামছার মধ্যে থেকে একটা চিঠি বার করে বলে, এটা রাত্তির বেলা আপনাকে দিতে বলেছিল, তখন কি জানি বড়দিদি—ফোঁপাতে থাকে ও।

কি লিখেছে মিনু। এত হাত কাঁপছে কেন? ঠিক পড়তে পারবেন ত' সুনীতি। অস্থির হাতে চিঠিটা মেলে ধরেন তিনি। মিনতি লিখেছে,—

বড়দি,

তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হল। কিন্তু তার জন্যে তুমি এত নীচে নামবে ভাবিনি। যদি পরজন্ম থাকে তাহলে সে জন্মে যেন তোমার মত দিদি না পাই এই আমার শেষ প্রার্থনা ভগবানের পায়ে।

মিনু

এই চিঠির সঙ্গে পিন দিয়ে আঁটা ছিল অনিমেষের চিঠিটা। যেটায় সে ধিক্কার দিয়েছে মিনতিকে মিথ্যাচারের জন্য। লিখেছে টি বি রোগকে সে ভয় করে না কিন্তু ঘৃণা করে মিথ্যাবাদিনীকে। বৌদি তাকে বাঁচিয়েছেন মিনতির প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে দিয়ে।

এই ঘটনার পর ধীরে ধীরে কেমন যেন বদলে যেতে লাগলেন সুনীতি। সংসার পাগল সুনীতির উদাসীনতা দেখা গেল সংসারে। কাজে কর্মে কথাবার্তায় অসঙ্গতিটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে পড়তে লাগল। সময় সময় অদ্ভুত ধরণের এক-একটা কাজ করে বসেন সুনীতি। বেচারী লীলা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। ওকে অনিমেষের কাছাকাছি দেখলে কেমন যেন ক্ষেপে যান তিনি। উপস্থিত অপরেশ দা মারা যাবার পর ব্যাপারটা যেন আরও দ্রুত বাড়ছে।

—এ ভাবে বেড়ে চললে শেষ যে কি হবে ভাবতে পারি না ভাই, ক্লান্তস্বরে ধীরে ধীরে বললো অনিমেষ।

এই কাহিনী শোনবার বছরখানেক বাদে আবার গিয়েছিলাম অনিমেষদের বাড়ী। সেবার আর রান্নাঘরে দেখতে পেলাম না সুনীতিকে। অনিমেষকে প্রশ্ন করায় ও বলল, ঘরে আটকে রাখতে হয়েছে ভাই, অসম্ভব হিংস্র হয়ে উঠেছে আজকাল। একদিন সুপ্ত অবস্থায় লীলাকে গলা টিপে মারতে গিয়েছিল। ঘরে আটকে রাখাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। একটু খোলা পেলেই একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সাধ্যমত চিকিৎসা অনেক করলাম কিছু হল না—এ্যাসাইলামে রাখবার মত অর্থ সামর্থ্যও আমার আর নেই—যা চিকিৎসা হয়েছে তারই ধার শোধ হয়নি এখনও। একটু চুপ করে থাকে ও, তারপর যেন নিজেকে শুনিয়েই বলে, আর পারিও না, যা হবার হোক, গলাটা বুজে আসে ওর।

এর পরের ইতিহাস আমার মত আপনিও জানেন। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে একটু নজর করলেই আপনি দেখতে পাবেন অনিমেষের বৌদি—মিনতির দিদিকে।

প্রশান্ত চৌধুরী

২৫

—রাগ করেছ ঠানদি!

ঠানদি সুপুরি কুচোচ্ছে তো কুচোচ্ছেই।

—ও ঠানদি, কথাই বল না একটা। রাগ করেছ?

—জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর। কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর।

—বাবারে বাবা! ফিরেই তাকাও না একবার।

—জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী। শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি।

—ঠানদি-ই-ই-ই।

—কৃষ্ণ নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে। বৃথাই মনুষ্যজন্ম যায় দিনে দিনে।

—ঠিক আছে। উঠলুম তবে। রাগ নিয়েই থাকো তুমি।

—থাকবই তো।

—উঠলুম তাহলে।

সাগর উঠি-উঠি করে।

—উঠতে তো আমি বলিনি কাউকে।

—বসতেই বা বলেছে কে? যাই বাবা।

এবারে উঠেই দাঁড়ায় সাগর।

—ঐখানে জলের কুঁজো আছে।

—রাস্তার কলেই বা জল কম কি? আর, ঐ হিন্দুস্থানীর পানের দোকানটায় চমৎকার পান সাজে।

—ওঃ? বাবু রাগে একেবারে মট্‌মট্ করছেন।

—আর দোকানী বুড়ি রাগে একেবারে এমন খট্‌খট্ করছেন যে, চিৎকার করে ডাকলেও সাড়া দেন না।

—রাগ হবে না! বুড়ি হয়েছি বলে তো আর গায়ের সব রক্ত জল হয়ে যায়নি কিছু। আজ দেড় মাস বাবুর টিকি দেখা নেই।

ঠানদি তার রাগের পরিমাপটা বোঝাবার জন্যে নিজের নড়বড়ে মাথাটায় প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সাগরের জন্যে পান সাজতে সুরু করে দিল।

রাস্তায় পাতা প্যাকিং বাক্সটার ওপর ব'সে সাগর বলল,—আরে বাপু, স্বীকার তো করছিই দোষ হয়েছে আমার। তবে, ব্যাপারটা হয়েছে কি জান? রোজই ভাবছি, এই বুঝি ডাক এল, গামছা কাঁধে নিয়ে ছুটতে হবে শ্মশানে। কিন্তু ডাক আর আসে না।

—ওঃ, গামছা কাঁধে না নিয়ে বুঝি এমনিতে আসতে নেই আমার কাছে! তা' আসবি কেন? কোথাকার কে একটা [illegible] বুড়ি! সম্পর্কটাই বা কিসের?

—আহা, তা নয়। মনে হয়েছিল যে, হয়ত কারুর ডাক আসবে শ্মশানে যাবার,—তখন তো ঠানদির সঙ্গে দেখা [illegible] আবার দুবার করে দোকানপাট ছেড়ে যেতে যাই কেন। শেষ অবধি যখন দেড় মাসেও ডাক এল না একটাও, তখন এই জাগে না, খাটিয়া কাঁধে না করেই দিব্যি ট্রামে-বাসে চেপেই তো আজ চলে এসেছি তোমার কাছে। তাতেও তোমার রাগ গেল না।

—এই নে, পান ধর।

—আগে বলো যে, রাগ নেই আর।

—নেই রে বাপু, নেই। হল তো?

—তাহলে আরেকটা পান দাও। আর, পানের বোঁটায় চুন একটু।

—বাড়ির খবর কি?

—ভালই।

—সেই তোর ভাই দুটো,—দামোদর আর বরাকর? কাজকর্ম করছে?

—হ্যাঁ। বরাকরটা আবার ফুটবল খেলোয়াড় হয়েছে গো ঠানদি। পাড়ার কেলাবের ক্যাপ্টেন হয়েছে। খুব গোল দেয়। আর ঐ দামোদরটা দোকানের জন্যে খুব খাটে।

—ঠিক বলেছ ঠানদি। এই আমি,—আমিই কি কম বদলে গেছি। শ্মশানে আমার ডাক আসছিল না বলে আমার বিচ্ছিরি লাগছিল এই দেড়মাস ধরে। কী কাণ্ডটা গ্যাখো ঠানদি ;—লোক মরছে না বলে আমার বিচ্ছিরি লাগছে ! এই শ্মশানে আসি, কত লোক পুড়ছে, কত লোক কাঁদছে,—বুকে তো কিচ্ছুটি দাগে না। অথচ ছোটবেলায় প্রথম যখন মানুষকে মরতে দেখেছিলুম·····

—তোর মা ?

—না ঠানদি, তারও আগে। আমরা যে বাসায় থাকতুম, তার সামনে একটা ছোট্ট দপ্তরীর দোকান ছিল। তার পাশের একটা ভাঙা রকের ওপর একটা দাড়িওলা মোটাসোটা পাগল থাকত। কখনও শুতো, কখনও বসতো, কখনও আবার কিছুক্ষণের জন্যে কোথাও চলে যেত। খুব গান গাইত সে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ; আর, মাঝে মাঝে রাস্তায় ডিগবাজী দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে বলত,—'মাদারি কা খেল।' পাড়ার এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে পাতের ভাত-টাত খবরের কাগজে করে দিয়ে যেত তার কাছে, —তাই খেত সে।—একদিন দেখা গেল, পাঁচ-বাড়ির ভাত-তরকারি সব যেমন-কে-তেমন পড়ে আছে, মাছি ভ্যান্-ভ্যান্ করছে, সে কিছু না খেয়ে চুপটি করে শুয়ে আছে ভাঙা রকের ওপর। সে উঠে বসছে না, গান গাইছে না, ঘুরে আসছে না, ডিগবাজি খাচ্ছে না,—কিছু না। তাই থেকে দুপুরবেলা সবাই বুঝতে পারল যে, সে মরে গেছে। —সেই আমি প্রথম মানুষের মরা দেখলুম। কে যে কখন তার মড়া দেহটাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, দেখিনি।

শুধু পরদিন সকালে উঠে দেখলুম, রকটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। কোথাও কিছু নেই, শুধু রকের গায়ে যে জলের পাইপ ছিল, তার খাঁজে সেই পাগলের জমানো পায়রার পালখগুলো গোঁজা ছিল তখনও। আমার খুব কান্না পেল। দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলুম। দেখলুম, বাবা ঠিক রোজের মতনই লেড়ো বিস্কুট ডুবিয়ে-ডুবিয়ে চা খাচ্ছে। খুব রাগ হল বাবার ওপর। ছুটে আবার চলে গেলুম রাস্তার ধারের দরজায়।·····পাড়ার লোকেরা অন্য দিনের মতোই কেউ বাজারে যাচ্ছে, কেউ গল্প করছে, কেউ মুচির কাছে জুতো সারাচ্ছে, কেউ গামছা পরে রাস্তার ডাস্ট্‌বিনে কুটনোর খোসা ফেলছে। খুব রাগ আর ঘেন্না হয়েছিল সেদিন সকলের ওপর। একটা মানুষ এতদিন পরে মরে গিয়ে শেষ হয়ে গেল,—অথচ পাড়ায় কারুর এতটুকু অদল-বদল হল না। রোদ্দুরটা তেমনি এসে পড়ল গলিতে, কাগজওলা তেমনি কাগজ দিয়ে গেল, মেথর তেমনি ঝাঁট দিয়ে গেল, কাকগুলো তেমনি রাস্তার নোংরা খুঁটে খেতে লাগল, বড়রা তেমনি আপিসে গেল, ছোটরা তেমনি রাস্তায় বল খেলল ;—কারও কোনও কান্না নেই। খুব রাগ হল মনে হল এ-পাড়ার মানুষগুলো, পাখিরা, রোদ্দুরটা, সব্বাই খারাপ, পাজী, রাক্কোস। দয়া মায়া কিচ্ছু নেই এখানে।—আর আজ ? মড়াকে আগুনে চাপিয়ে দিয়েই তোমার কাছে এসে চিঁড়ে-দই সাঁটি, খোসমেজাজে পান খাই, গল্প করি। কী আশ্চর্য কাণ্ড গ্যাখো ! একটু একটু করে কত বদলে যাই আমরা।

—গ্যাখ্, দিকিনি এটা খেয়ে, আমার হাতের পানটা বদলে গেছে কি না এই দেড় মাসে।

ঠানদির সাজা দ্বিতীয় পানটি মুখে দিয়ে বার কয়েক চিবিয়েই অ-হ-হ-হ করে উঠল সাগর। বলল,—বদলেছে গো, সাংঘাতিক বদলেছে। শিগ্‌গির একটা আস্ত পানের পাতা দাও ; চুন লেগে গাল পুড়েছে।

—ওমা ! কোথায় ভাবলুম জাফরানের কুচি দিয়ে পান সেজে চমকে দেব তোকে ; গল্প শুনতে শুনতে শেষ অবধি একগাদা চুন দিয়ে গাল পুড়িয়ে বসলুম তোর। হা আমার পোড়া কপাল ! তেলের বাটিতে হাত দিবি ?

—দুর ! সামান্য লেগেছে। পানের পাতাই যথেষ্ট।

—আজ খেয়ে যাবি তো ? না কি, গামছা কাঁধে নিয়ে আসিস নি বলে ভেগে যাবি তাড়াতাড়ি ?

—দায় পড়েছে ভাগতে। আজ চোপর দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি দোকান থেকে। আজ স্রেফ আড্ডা মারব। দেখা-সাক্ষেৎ করব সবার সঙ্গে।

—চাঁপাদের সঙ্গে দেখা করবি ?

—করব বৈকি। চাঁপাদের খবর নেব, বাঈধর ঠাকুরের খবর নেব,···এই মরেছে !

—কী হল রে !

—দিদির বাড়ি যেতে হবে।

—দিদি ? তোর আবার দিদি এল কোত্থেকে ?

—যেমন করে ঠানদি এল। আমার সবই অমনি করে পাওয়া। আমার দিদি কী সুন্দর গান জানে, জান ঠানদি। চারবার গেছলুম দিদির বাড়িতে। চারবারই দুপুরবেলা। দিদি আমাকে দুপুরবেলাতেই যেতে বলে দিয়েছিল কি না। সন্ধেবেলা দিদির থাকার কোনো ঠিক নেই কি না। একদিন দিদিকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। ওঃ, সে কী মজার কাণ্ড ! সে তোমাকে বলব এখন বিকেলবেলা। এখন ভাবছি, চট্ করে দিদির সঙ্গে দেখাটা করেই আসি ;—কি বল ? তোমার এখানে তো তবু দেড় মাস আসিনি, তাইতেই তুমি রেগে টং ! আর, দিদির ওখানে যাইনি

বোধহয় ছ-মাসেরও ওপর হয়ে গেল। উঠলুম ঠানদি। আসছি ঘুরে।

চলে গেল সাগর।

ঠানদি ভাবতে লাগল,—কে এই দিদি, যার কথা মনে পড়তেই এমন হন্তে হয়ে ছুটল সাগর? কই, এর আগে তো কোনোদিন সাগর বলেনি তার কথা? কত বয়েস তার? দুপুরবেলায় যেতে বলে কেন? কেন সন্ধেবেলায় যেতে বারণ করে? গান গায়, দুপুরবেলা ছাড়া দেখা করে না, এমন যে দিদি,—সে কে? ফিরে এলে জিজ্ঞেস করতে হবে সাগরকে। জানতে হবে সব কথা।

সেই দিদির সঙ্গে কিন্তু দেখা হল না সাগরের।

দিদির ফ্ল্যাটটায় থাকে এখন একজন মাদ্রাজী পরিবার। মিসেস রায়ের খবর কিছু রাখেন না তাঁরা। মিসেস রায়ের পাশের ফ্ল্যাটের সেই যে জেরিনা নামের অসভ্য গোছের মেয়েটা, যে-মেয়েটা বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি কাপড়জামা পরে বেহায়ার মতন হি-হি করে হাসত, মিসেস রায়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া করত, সাগরকে দেখলেই একটা চোখ বুজে ভেংচি কাটত,—সেই জেরিনাটা থাকলে, মান-সম্ভ্রম ঘুচিয়েও না হয় সাগর জিজ্ঞেস করে নিতে পারত মিসেস রায়ের খবর। কিন্তু সেখানেও ফক্কা! জেরিনাও থাকে না আর পাশের ফ্ল্যাটে। সেখানে এখন থাকেন যিনি, ষোলোটা জেরিনাকে এক করলে তবে তাঁর বপুর আন্দাজ পাওয়া যায়।

ফ্ল্যাটবাড়ির দরোয়ানটারও দেখা পেল না সাগর কোথাও। তাকে পেলেও হয়ত খবর পাওয়া যেত কিছু।

মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল সাগরের। মিসেস রায়ের জন্তে মন কেমন করতে লাগল তার।

হঠাৎ মনে পড়ল, শনিমন্দিরের মুরারিবাবুর কাছে গেলে হয়ত দিদির খবর পাওয়া যেতে পারে কিছু। মুরারিবাবুর মারফৎ-ই তো দিদির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল সাগরের।

সাগর ছুটে এল শনিমন্দিরে।

মুরারিমোহন মন্দিরের চাতালে ব'সে সিগারেট ফুঁকছিল একা-একা। বলল,—আরে, এসো স্যাণ্ডো। কি খবর ভাই?

সাগর বলল,—দিদির খবর জানেন কিছু?

—দিদি!

—ঐ যে, মিসেস রায়।

—ওঃ, সেই পাগলের কথা জিজ্ঞেস করছ?

—পাগল!

—পাগল ছাড়া আর কি। বদ্ধ পাগল? উন্মাদ। নইলে ঐ কাণ্ডটা করে।

ইতিমধ্যে স্টিমারের টিকিটঘরের রাজীব সরকার এসে উপস্থিত। চাকরি থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়ে এন্তার ঘুমোবে ঠিক করেছিল বেচারা, কিন্তু ঘুম আর আসছে না কিছুতেই। টো-টো করে হেথায়-হোথায় ঘুরে সময় কাটাতে হচ্ছে।

রাজীব বলল,—কে পাগল গো?

মুরারি বলল—আরে, তোমাকেও বলি-বলি করে বলা হয়নি ব্যাপারটা। আমাদের ঐ মিসেস রায়ের কাণ্ডটা তো জান না।

—আহা, সেই যে পঁচাত্তর টাকা ফী নিয়ে মাস কয়েক আ[গে] যাঁর ঘর-বন্ধন করে এসেছিলুম গো। তোমাকে তো নিয়ে গেছ[লুম] সঙ্গে।

—মনে পড়েছে। তাঁর পাশের ফ্ল্যাটে কে যেন একটা মে[য়ে] থাকত, অদ্ভুত নামটা···

—জেরিনা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঐ জেরিনাকে নিয়েই তো মিসেস রায়ের য[ত] দুশ্চিন্তা ছিল না?

—আরে, জেরিনা খদ্দের ভাঙিয়ে নিচ্ছে বলেই না মিসেস রা[য়] অতগুলো টাকা খরচ করে ঘর-বন্ধন করালেন। তার ওপর আবা[র] কি করেছিলেন জান না?

—কি?

—মারণ-কবচ নিয়েছিলেন হাতে।

—কত হাতালে কবচের নামে?

—আহা, ওসব আলতু-ফালতু কথা এখন থাক্, আসল ব্যাপারটা শোন না। মারণ-কবচ হাতে নিলেন, তারপর তোমার গি[য়ে] জেরিনার নামে পায়রা উচ্ছুগ্যু করে সেই পায়রার ঘাড় মটকালেন।

—সেটা আবার কী?

—আছে। শাস্ত্রে আছে। শত্রুর নামে উচ্ছুগ্যু করে পায়রা ঘাড় মটকে মেরে ফেললে শত্রু নিপাত হয়।

—কত কেরামতীই জান বাবা তোমরা। ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডব[ৎ] তোমাদের। আরো কতকাল এইসব বুজরুকি আর ভণ্ডামি চলা[বে] ভায়া?

—আঃ, তুমি বড্ড উল্টো দিকে যাচ্ছ। মিসেস রায়ের পাগলামি গল্পটা শুনবে, না, না?

সাগর অস্থির কণ্ঠে বলল,—এখন তিনি কোথায় আছেন যা[দি] জানেন, তাহলে সেই কথাটা বলুন আগে।

মুরারি বলল,—আরে গল্পটাই শোনো না ভাই, তাহলেই ঠিকানা বুঝতে পারবে।

রাজীব বলল,—বল হে মুরারিমোহন।

সাগর বলল,—সেই জেরিনাও তো নেই ফ্ল্যাটে।

মুরারি বলল,—থাকবে কোত্থেকে।

রাজীব হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চোখদুটো বড় বড় ক[রে] বলল,—তার মানে? গন্ ফট? মারণ-কবচে কম্ম সাবাড় হ[য়ে] গেল সত্যি?

মুরারি বলল,—মারণ-কবচ ধারণ ক'রে পায়রার ঘাড় মটকাবা[র] সাত-আটদিনের মধ্যেই জেরিনার গায়ে বের হল মায়ের দয়া, মা[নে] বসন্তের গুটি।

—অসময়ে?

—হ্যাঁ। তবে আর কবচের কেরামতীটা কি হল?

—তারপর?

—খবরটা কানে আসতেই ছুটলুম মিসেস রায়ের ফ্ল্যাটে, বললুম,—কী হল? হাতে হাতে ফল পেলেন তো? আমার বি[দ্যে] যদি সত্যি হয়, তাহলে ঐ বসন্ত পান-বসন্ত না হয়ে আসল-বসন্ত হ[য়ে] দাঁড়াবে। তারপর ঐ জেরিনার সুন্দর মুখখানায় এইস্যান্ গি[...]

মতন চেহারা হয়ে যাবে মুখপুড়ীর মুখখানা। দেখি তখন কত খদ্দের টানতে পারে। কবচটা যদি ঠিক ভক্তিভরে ধারণ করে থাকেন, তাহলে ঐ বসন্ত রোগ যাবার সময় একটা চোখও খুবলে নিয়ে যেতে পারে জেরিনার।—এই সব বলে খুব খানিকটা হেসে ভাবলুম আনন্দে ভাঙ্গ গোছের কিছু খ্যাটনের জোগাড় হয়ে যাবে হয়ত মিসেস রায়ের কাছে। ওমা! কাঁ কস্য পরিবেদনা! বললেন কি না,—'আজ আসুন মুরারিবাবু, মনটা ঠিক ভাল নেই।'—বোঝো একবার ব্যাপারটা। তুই চাস জেরিনার ক্ষতি করতে, চাস তার খদ্দের ভাগাতে, চাস তার সর্বনাশ,—তারই জন্যে ঘর-বন্ধন করালি, মারণ-কবচ করালি, পায়রার ঘাড় মটকালি। ওমা! সেই জেরিনার বসন্ত হয়েছে খবর পেয়েও কিনা হাসি নেই মুখে। বলে কি না মনটা ঠিক ভাল নেই! একে পাগল ছাড়া কী বলবে বল ভাই রাজীব?

রাজীব শুধু বলল,—তারপর?

সাগর বলল,—আমাকে তাঁর এখনকার ঠিকানাটা দিয়ে আপনারা যত খুশি গল্প করুন। আমি যে দেখা করতে চাই আমার দিদির সঙ্গে।

রাজীব সাগরের পিঠে হাত দিয়ে গভীর কণ্ঠে বলল,—ঠিকানাটা আমারও বোধ হয় দরকার হবে ভাই। দুজনে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে'খন। তোমার দিদিকে আমিও না হয় দিদি করে নেব। কিন্তু গল্পটা মুরারি শেষ করে ফেলুক আগে। তারপর?

মুরারি খুব একটা গর্বের সঙ্গে বলল,—যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই হল। একেবারে আসল বসন্তই বের হল সেই জেরিনার সর্বাঙ্গে। খবরটা শুনে ভাবলুম ঠিক আছে,—মোটা রকমের বকসিস্ আদায় করা যাবে এবার মিসেস রায়ের কাছে। ওমা! আমি যাব কি, মিসেস রায়ই একদিন এসে হাজির আমার এখানে। বলেন কি না,—'মেয়েটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। রাত্তিরে চেঁচায়। হাসপাতালে যেতে ভয় পায়। ছেলেমানুষ তো হাজার হোক্। ঐ কষ্ট কমাবার কিছু ব্যবস্থা করা যায় না?'—বোঝ একবার কাণ্ডটা রাজীব! তুই মাগী চাস্ জেরিনাকে নিপাত করতে, অথচ আবার তার রোগের যাতনাও দূর করতে চাস্।—পাগলামী না?

রাজীব বলল—অদ্ভুত পাগলামী! কিন্তু তারপর?

—মিসেস রায়ের পেড়াপিড়িতে শেষ অবধি ঐ শেতলা-মন্দিরের শ্যামাঠাকুরের সঙ্গে একটা হাফাহাফির সেটেলমেণ্ট করে তাকেই পাঠিয়ে দিলুম মিসেস রায়ের কাছে। বললুম,—মস্তবড় পণ্ডিত এবং ধার্মিক এই শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মশায় যাচ্ছেন। রোজ শেতলা-মন্দিরের চন্নামেত্তর খাইয়ে আসবেন, আর পাতাসুদ্ধ নিমগাছের ডাল গায়ে বুলিয়ে দিয়ে আসবেন,—তাইতেই আরাম পাবে রুগী। আমার মন্দিরের শনিমহারাজ যেমন জাগ্রত, ওঁর মন্দিরের মা-শীতলাও ঠিক তেমনি জাগ্রতা। কাজেই ফল একেবারে নির্ঘাৎ। তবে ভট্চাজ মশায়ের দক্ষিণাটা কিছু বেশি। দিনে একবেলা-ওবেলায় চারটি করে টাকা দিতে হবে।

—তারপর?

—ওমা! চারটাকা দিতেও রাজি মিসেস রায়! নিজের গাঁটের কড়ি খরচা ক'রে শত্রুরকে আরাম দিতে বসলেন! পাগল আর কাকে বলে। তা' মোটমাট তিনদিন ফী নিয়ে ফিরল
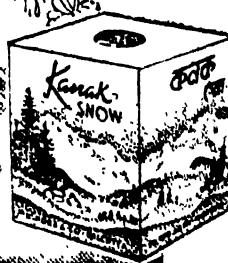
শ্যামাঠাকুর। দুটাকা আমার আর দুটাকা শ্যামাঠাকুরের থাকছিল দিব্যি। তারপর তিনি আবার এক কাণ্ড করে বসলেন।

—কি করল আবার সে?

—তাঁর বিবেক দংশাল। তিনি চতুর্থদিন হাতজোড় করে মিসেস রায়কে বলে এলেন যে,—সব মিথ্যে। তিনি আর এমন ভাবে ঠকিয়ে টাকা নিতে পারবেন না। তার চেয়ে ডাক্তার দেখান, কিংবা হাসপাতালে দিন।—বোঝো একবার কাণ্ডটা।

রাজীব বলল,—এক পাগলের গল্প শুনতে ব'সে আরেক পাগলেরও দেখা পাওয়া গেল। সংসারে পাগল তাহলে এখনো আছে। তারপর?

—ডাক্তার দেখাতে তো বলে গেল শ্যামাঠাকুর। কিন্তু দেখায় কে? কেই বা ডাক্তার ডাকে, আর কেই বা হাসপাতালে নিয়ে যায়। জেরিনার ঘরে আনন্দ করতে আসত যারা, তারা তো অনেকদিন আগেই কেটে পড়েছে। এমনকি, ছোকরা চাকরটাও। আহা, মানুষের প্রাণের ভয়টাও আছে তো।

—তা তো বটেই।

—কিন্তু পাগলদের প্রাণের ভয় নেই। তারা দিব্যিসে রাস্তার নর্দমা থেকে ভাত-তরকারি তুলে খায়। ভয়ও পায় না। অসুখও করে না।

—ঠিক।

—মিসেস রায়ও তাই করলেন। আরে ম্যান, একদিন গিয়ে দেখি কিনা, মিসেস রায় জেরিনার ফ্ল্যাটে গিয়ে তাকে প্রায় কোলে নেওয়া গোছের করে নিয়ে বসে আছেন!

—পাগল! পাগল!

—স্বীকার করছ রাজীব?

—কায়মনোবাক্যে স্বীকার করছি। অস্বীকার করবার জো আছে নাকি?

—পাগলের আরেকটা প্রমাণ ছাখো ভাই রাজীব, ডাস্টবিনের খাবার খেয়ে আমাদের অসুখ করে, কিন্তু পাগলদের করে না। যে রুগীকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন মিসেস রায়, তাতে পাগল না হলে নিশ্চয়ই তিনি রোগে পড়তেন; কিন্তু পাগল বলেই কিচ্ছুটি হল না তাঁর।

—আর সেই জেরিনা?

—সে মরল না বটে। কিন্তু সারা দেহটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল তার। চেহারা দেখলে ভয় করে, এত কুচ্ছিত! এদিকে জেরিনার সেবা করতে গিয়ে নিজের সব খদ্দেররা রাগ করে ভেগে গেছে, ওদিকে জেরিনার তো বেজেই গেছে বারোটা। কাজেই একটু ভাবনায় পড়লেন মিসেস রায়। নিজের খদ্দেরদের ফিরিয়ে আনতে হয়ত পারতেন আবার, যদি ঐ জেরিনাটা ঘাড়ের ওপর না থাকত চেপে। সব গণ্ডগোল করে দিল ঐ জেরিনা মুখপুড়ীই। একদিন আমাকে বললেন,—দেশে কোথায় বাপেরবাড়ির তরফ থেকে পাওয়া ছোটখাটো কিছু সম্পত্তি আছে তাঁর, সেইটা বেচে দেবার কিছু ব্যবস্থা করতে আমি পারি কি না। তা' আমি তো ভায়া কাগজপত্তরগুলো দেখবার জন্যে গেলুমও একদিন। ওমা! গিয়ে দেখি, ভোঁ-ভাঁ! না আছে জেরিনা, না আছেন মিসেস রায়।

মুরারি বলল,—আমার বিশ্বাস, বাপের বাড়ির তরফ থেকে পাওয়া সেই যে সম্পত্তি, সেটা না বেচে সেইখানেই বসবাস করতে চলে গেছেন বোধহয়।

সাগর বলল,—সেখানকার ঠিকানা জানা আছে নিশ্চয়ই আপনার?

মুরারিমোহন আক্ষেপের সঙ্গে বলল,—আরে না রে ভাই। ঠিকানাটাও রেখে যায়নি। সাধে কি পাগল বলছি। ঠিকানাটাও আমাকে দিয়ে গেল না হে! চুপিসাড়ে পালিয়ে গেল!

রাজীব বলল,—ঠিকানা নিয়ে করতেই বা কি তুমি?

মুরারি বলল,—আহা, আর কিছু না হোক্ এক-আধটা নমস্কারও তো জানিয়ে আসতে পারতুম মাঝেমধ্যে।

রাজীব অবাক হয়ে চেয়ে রইল মুরারিমোহনের দিকে।

সাগর আর দাঁড়াল না। ওর কান্না পাচ্ছে। কী জানি কোথায় গেল সেই দিদিটা। কী জানি কেমন আছে। পয়সার অভাব হয়ত হবে না। দুটো মানুষের পেট চলে যাবে হয়ত। কিন্তু দেখাটাও হল না একবার!

সাগর চলে গেল। রাজীব আর মুরারি তাকিয়ে রইল ওর গমনপথের দিকে। কিছুক্ষণ পর রাজীব বলল,—আমি ঠিক বলতে পারি, ছেলেটা আড়ালে গিয়ে একটু কেঁদে নেবে।

—কী করে বুঝলে?

—বাইরে থেকে দেখতে ওকে যত ষণ্ডাগুণ্ডাই মনে হোক, মনটা ওর একেবারে ছেলেমানুষ। মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

সাগর কিন্তু আড়ালে গিয়ে একটুও কাঁদেনি। কান্না-কান্না পেলেও কাঁদেনি। আর ও' ছেলেমানুষটি নেই তো। সে বড় হচ্ছে। সে বড় হয়েছে। আজ সে মুরারিমোহনের কথার ফাঁক থেকে পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে কেন মিসেস রায় তাকে সন্ধেবেলা দেখা করতে বারণ করেছিলেন। বুঝতে পেরেছে, কী ছিল ওর দিদির ব্যবসা।

কিন্তু বুঝতে পেরেও একটুও চমকে ওঠেনি সে, শিউরে ওঠেনি সে। বরং দিদিকে তার আগে যতটা ভাল লাগত, আজ তার চেয়েও অনেক বেশি ভাল লাগছে। প্রথম যেদিন মিসেস রায়ের সঙ্গে দেখা হয়, সেদিন তাঁকে তসরের শাড়িতে দেখে নিজের মায়ের কথা যতখানি মনে পড়ে গেছল সাগরের, আজ দিদির গল্প শুনে তার চেয়ে অনেক বেশি করে মনে পড়ে যাচ্ছে মায়ের কথা। দিদিটাকে আজ একশোটা পেন্নাম করবার ইচ্ছে করছে।

সাগর যে বড় হয়েছে, এই তো তার প্রমাণ।

সে হেঁটে হেঁটে ফিরে চলল ঠানদির দোকানের দিকে। যেতে যেতে একবার ভাবল,—চাঁপা নামের সেই মেয়েটা আর তার মায়ের খবরটা একবার নিলে হয় না?

কে জানে, তারাও আছে কি না। গিয়ে হয়ত দেখা যাবে, তারাও ঘর ছেড়ে চলে গেছে কোথায়, জানে না কেউ কিচ্ছুটি।—বলা যায় না কিছুই। যা সব কাণ্ড হচ্ছে চারিদিকে;—আগে থাকতে কিচ্ছুটি বোঝবার উপায় নেই।

ঠানদির দোকানের দিকে যাওয়ার পথটাকে বাঁয়ে রেখে, সাগাগী

প্রসূন পাল

সামান্য এতটুকু ছেঁড়া কাগজের টুকরো, তার জন্যে যে অবস্থা এতদূর গড়াবে তা কি কেউ সহজে ভাবতে পারে?

ভাবতে সুশান্তও পারে নি।

সওদাগরী অফিসের সওয়া দু'শো টাকা মাইনের কেরাণী সুশান্ত সান্যাল নববিবাহিত, অনুরাগে বিভোর তার মনোরাজ্য সুন্দরী তরুণী স্ত্রী শান্তিকে কেন্দ্র ক'রে। শান্তি শিক্ষিতা ও আধুনিক রুচিসম্পন্না। স্ত্রীগর্বে গর্বিত সুশান্ত। এমন স্ত্রীভাগ্য কম পুরুষেরই হ'য়ে থাকে।

বন্ধুমহলে মাঝে মাঝে দাম্পত্য কলহ নিয়ে আলোচনা হয়, সান্ধ্য আড্ডায় বন্ধুদের কেউ কেউ বলে তাদের বিড়ম্বিত জীবনের কথা। বাড়ী ফিরে স্ত্রীর কাছে গল্প করে সুশান্ত, শুনে শান্তি হাসে, হাসে সুশান্তও। সুশান্তর ধারণা, প্রকৃত শিক্ষিত দম্পতিদের মধ্যে এ রকম কলহ ঘটতে পারে না। কারণ পরস্পরকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তাদের থাকে। সুশান্তর ধারণা যেন প্রতিফলিত হয় শান্তির কথায়।

সুশান্তর বন্ধু শ্যামলের বউ নাকি তার কুমারী-জীবনের প্রণয়ী জীবনানন্দকে মুছে ফেলতে পারে নি স্মৃতি থেকে। জীবন কয়েকমাস হ'ল বদলী হয়ে এসেছিল কোলকাতায়। এর আগে থাকত দিল্লীতে। সে সময়ও নিয়মিত চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হ'ত ঠিকই, তবু জীবন যে তার বাড়ীতে আসবে নিয়মিত, এ জিনিসটা শ্যামল স্বচক্ষে দেখতে পারে না। অথচ শ্যামলের সহধর্মিণীও নাছোড়বান্দা, এর মধ্যে নাকি সে অশোভন কিছু দেখতে পায় না। ফল অবশ্যম্ভাবী, ওদের দাম্পত্যজীবনে ঘনিয়ে আসে অশান্তির ছায়া।

সুশান্ত ও শান্তি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে, শ্যামলের গোঁড়ামি সম্বন্ধে মন্তব্য করে শান্তি, হেসে হেসে জানায় সুশান্তকে তার কুমারী-জীবনের প্রেমের আখ্যান। সুশান্তর বাঁধ ধ'রে বলে শান্তি, 'জান, রমার দাদা মানব না আমাকে পাওয়ার জন্যে এক রকম পাগলই হ'য়ে গেছল। আমিও নাচাতে ছাড়তুম না। বেচারা! একেবারে বোকা বোকা লাগত মানবকে, আমার বন্ধুরা আমার ওপর দোষারোপ করত।'

সুশান্তও হেসে বলে, 'আর আমার সহপাঠিনী সীমার অসীম ধৈর্যের কথা তো জান না। সে এক বিরাট প্রহসন। সীমার জন্মদিন বোধহয় বছরে তি.-চারবার হ'ত আর বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হতুম আমি। অথচ বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাতুম না আমি। সীমার উগ্র আধুনিকতা দু'চক্ষে দেখতে পারতুম না, মুখের ওপর সমালোচনা করতুম ওর সাজপোশাক ও প্রসাধন অনুরাগের। তবু ওর ধৈর্য অবিচলিত ছিল মানে এক কথায় একনিষ্ঠ ছিল ওর অনুরাগ এই অধমের প্রতি।'

সুশান্তর কথা শেষ হ'লে হো হো ক'রে হেসে উঠল শান্তি, বললে, 'তা, তোমার সেই একনিষ্ঠ ভালবাসার পাত্রী গেল কোথায়, নাকি কাঁদতে বসল তোমাকে হারিয়ে? থাকলে কিন্তু বেশ হ'ত!'

সুশান্তও হেসে বললে, 'মেয়েরা অমন বোকা নয়। দিব্যি সুপুরুষ এক তরুণের সংসার সামলাচ্ছে এখন সীমা, আমার বিয়ের সাতদিনের মধ্যে বিয়ে করেছিল সে।'

শান্তি বললে, 'ছেলেরাও এমন কিছু আত্মহত্যা করতে যায় না। যাক, বেচারী সেই সীমার জন্যে দুঃখ হয়।'

এক মাস পরের কথা।

অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরল সেদিন সুশান্ত। ওর এক মাসীমা ওদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট-এর দু'কামরার ফ্ল্যাট ওদের। বাড়ী ফিরে দেখল সুশান্ত, শান্তি চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী আর একজন কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড, এই নিয়ে ওদের সংসার।

হেসে বললে সুশান্ত, 'এ কি, এখনও বুঝি শাড়ি বাছা হয় নি! নাকি কেউ এসেছিল?'

কোনও উত্তর পেল না সুশান্ত শান্তির কাছ থেকে; সুশান্ত আবার বললে, 'তুমি তা হ'লে তৈরী হ'য়ে নাও চটপট।'

এবার মুখ খোলে শান্তি, 'আমি যাব না।'

তারপর মেঝেতে শুয়ে পড়ল সতরঞ্চি পেতে

সুশান্ত বললে, 'কেন, শরীর খারাপ না কি ?'

'না, যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

'তোমার রাগ দেখছি ক্ষণে ক্ষণে। কি কারণে যাবে না ব'লে ফেল, দেখি, মেটাতে পারি কি না।'

রাগের সঙ্গে মন্তব্য করল শান্তি, 'কারণ শোনবার উপযুক্ত নও তুমি। এতদিন যে তোমাকে বিশ্বাস ক'রে এসেছি তা ভুল ক'রে করেছি। তোমার মত অভিনেতা আগে কখনও দেখি নি।'

'তোমার কথার মানে তো বুঝতে পারছি না। কি বলতে চাও তুমি?'

'বেশ বুঝতে পারছ', হাত থেকে একটা ছেঁড়া কাগজ দেখাল শান্তি। তারপর মেঝেতে শুয়ে পড়ল সতরঞ্চি পেতে।

• • • •

ছাত্রাবস্থায় একসময় সাহিত্যচর্চায় মন বসেছিল সুশান্তর। বহুদিন বাদে আবার হঠাৎ নেশা চাপল নবজীবনের সূত্রপাতে। তারই পাণ্ডুলিপির একটি পাতায় অংশবিশেষ সংশোধনের পর ফেলে দিয়েছিল ছিঁড়ে। উদ্ভিন্নযৌবনা নায়িকা আত্মনিবেদন করছিল দয়িতের কাছে। ভাব ও ব্যঞ্জনায় মূর্ত করতে চেয়েছিল সুশান্ত নায়িকার উচ্ছ্বসিত অন্তর। কিন্তু পাঠক মুগ্ধ হওয়ার আগে উত্তেজিত হ'ল সুশান্তর জীবননাট্যের নায়িকার ভাবা। বাক্যবাণে দিশেহারা হ'ল তরুণ নায়ক সুশান্ত অশান্ত শান্তির অমৃত ভাষণে মৃতপ্রায় সুশান্ত ঘণ্টাদুয়েক কাটিয়ে এল তার পুরণো আড্ডায়।

অবিবাহিত বন্ধু প্রদীপ ঠাট্টা করল, 'কি হে, বৌএর গাঁটছড়া কাটিয়ে এলে যে বড়, কি ব্যাপার ?'

প্রবীণ বিবাহিত-সদস্য সজ্জনদা হেসে বললেন, 'মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ভাল হে ছোকরা, নয় ত' মিলন জমবে কেন!'

সন্দিগ্ধমনা শ্যামল গম্ভীরভাবে বললে, 'তোমার সমস্যাটা খুলে বল তো হে।'

তাস খেলে বিদগ্ধচিত্তে বাড়ী ফিরল সুশান্ত। থমথমে আবহাওয়ায় খাওয়া দাওয়ার পাট চুকল। রাতে বিছানায় শুয়ে অভিমান রাগ সব ভুলে শান্তিকে বোঝাবার চেষ্টা করল সুশান্ত। ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ঝাঁজের সঙ্গে বললে শান্তি, 'নাটকের ধাপ্পা দিয়ে আর নাটক সৃষ্টি করো না।'

• • • •

পরের দিন। শান্তির বান্ধবী রমা দুপুরে বেড়াতে এল ওর কাছে। রমারও বিয়ে হয়েছে মাত্র একমাস আগে, ওর স্বামী এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। রমার মুখে অচেনা লেখক এক সুশান্ত সান্যালের 'মুক্ত বিহঙ্গী' উপন্যাসের বিষয়বস্তু শুনল শান্তি, শুনল সেই নায়িকার আত্মনিবেদন।

রমার সঙ্গে প্রাণখুলে হাসল শান্তি! রমাকে যেন আগের চেয়েও অনেক ভাল লাগল শান্তির।

তারপর ?

সেদিন দ্বিগুণ উৎসাহে প্রসাধনরতা হ'ল শান্তি। অফিস থেকে ফিরে অবাক হ'ল বেচারী সুশান্ত। শান্তি এগিয়ে এল, সুশান্তর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'নাটক।'

শান্তি সুমধুর হেসে জবাব দিল, 'নায়িকার আত্মনিবেদন!'

একটু থেমে আবার বলে শান্তি, 'সুশান্ত সান্যালের 'মুক্ত বিহঙ্গী' প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছেন 'শায়ক' পত্রিকার সম্পাদক। আর সম্পাদক-গিন্নীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুগ্ধ হয়েছে তার বান্ধবী শ্রীমতী শান্তি সান্যাল।'

সুশান্ত হাসিমুখে বললে, 'সত্যি ;'

চা-এর কাপ এগিয়ে দিয়ে শান্তি হেসে বললে, 'সত্যি।'

জোনাকী

সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায়

সেদিন ছিল অমাবস্যার তিথি।
চলার প্রতি পদক্ষেপে জাগে মনে ভীতি।
জ্যোৎস্না ধারা নেই যে সেদিন
নিবিড় ধূসর কালো।
তারি মধ্যে জেগে আছে
রাত জোনাকীর আলো।
আঁধার কেবল নিগূঢ় আঁধার মাঝে।
জোনাক তার আলো নিয়ে নাচে।
হোক সে ছোট তবু সেতো আলো।
ক্ষণেক তরে উজল হোল বিরাট অসীম কালো।
ধন্য হয় দিয়ে সে যে
সঞ্চিত তার ধন।
ধরার বুকে তার নাই বা
রইল প্রয়োজন।
কালোর মাঝে আলোর রেখা
দেখায় অনুপম।
দুখের মাঝে সুখের পরশ

ছায়াবৃত্ত পার হ'য়ে

বাসবী দত্ত

মাঝে মাঝে মনে পড়ে জীবনের সেই কটা দিন।

কত যুগ পার হোল তবু বাজে সুরের ধ্বনি
যন্ত্রণার শিখা জ্বেলে চাঁদের মশাল ছাই হয়
রক্তাক্ত স্মৃতির ক্ষতে শোক হর্ষ চন্দ্রকান্ত মণি
অন্ধকার ধরে' রাখে পলাতক নক্ষত্র নিচয়।

আমাকে করেছ' বন্দী পাতা ঝরা শীতের উত্তাপে
নদীর মুদ্রায় মন চড়া ভেঙে ছুটে যায় জলে
তুমি তো দাওনি হ'তে ছায়াবৃত্তে হরিণ শিকারী
তাই আজো ঘুঁটে তুলি সদ্যোজাত সূর্যের ফসলে।
বিপ্লবে নায়ক হবো এই ছিল একমাত্র সাধ
জয়ের গৌরব ব'য়ে পার হবো নির্মিত উল্লাস
নিরুক্ত প্রণয়ে নত
দুচোখের অগাধ অগাধ
বলিষ্ঠ আশ্বাস পাব'—শান্তির, স্নেহের আভাস।···
ভূগোলের বেড়া দাও : পৃথিবীও বার্ধক্য প্রবণ

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

সপ্তদশ স্তবক

৩৩। পতিমতীদের উদ্দেশ্যে এই বাণী বর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণ এবার সুকুমারিকাদেরও লক্ষ্য করে বললেন,—

"আমার ভারি ভাল লেগেছে আপনাদের ঐ সুন্দর দাঁতের হাসিখানি। পরিচয়ও পাচ্ছি উদার হৃদয়ের। তবু ঘরে শিশুরা কাঁদছে, ফিরে গিয়ে বাছুরদের মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানো প্রয়োজন,··· যেমন প্রয়োজন মুগ্ধ না হওয়া, আর বাছুরগুলোকে কাছে টেনে নিয়ে গাই-দোওয়া। এ কথা কি ঠিক নয়?

নিশ্চয় আপনাদের চতুর্দ্দিকে খুঁজতে বেরিয়েছেন মা-বাপ, ভাইয়েরা ছেলেরা, স্বামীরা। মুগ্ধ হবেন না, অভীষ্ট হত্যা করবেন না।

বুঝতে পারছি না, অমন কমলনয়ন নিয়ে কেনই বা আপনাদের এখানে আসা, আর কেনই বা চলে যাওয়া এই বিপিন ছেড়ে। তবে চলে যাওয়াই ভাল, বেশীক্ষণ না থাকাই সমীচীন! আমাকে দেখাই যদি উদ্দেশ্য হয়, সে তো আজ হয়েই গেল। সময়ান্তরেও সম্ভব। আপনাদের পক্ষে সেটা এমন কিছু রসাবহ নয়··নিশ্চয়।

ধ্যান, শ্রুতি বা দর্শন···এগুলির মধ্য দিয়ে আমার সঙ্গে মিলন সুখাবহ নয়। অতএব আপনারা যান। তবে, নয়নের পদ্মপাতায় আমার প্রেমটিকেই কেবল তুলে নিয়ে আপনাদের চলে যাওয়াটি কিন্তু উচিত হবে না।

৩৪। আপনারা মনোরমা; তাই বলছি, ভর্ত্তৃসেবাও মনোরম; রক্ষিত বস্তুর মত সেটিকে ত্যাগ করা সমীচীন নয়। সম্ভ্রম ও গৌরবের সেই ছবিটিকে কি আপনারা মুছে ফেলতে চান? কখনই নয়। যে ললনারা ভালবাসতে চান তাঁরা কি কখনো লিপ্ত হন অনার্য্য প্রচেষ্টায়?

৩৫। অনেক পতি রয়েছেন,···যাঁরা বধির বা বর্ষীয়ান্ বা মুমূর্ষু··· যাঁরা জড়, বা রুগী বা নির্ধন বা বিশ্ব কলঙ্কের যাঁরা সীমা। তাঁরা নিত্য বর্ষণ করেন দুঃখ-লতার চুটিফুল,···দুঃশীলতা ও দুষ্ট খলতা। এ ছাড়া আরো পতি রয়েছেন যাঁদের এসমস্ত দোষ নেই। বুদ্ধিমতী অঙ্গনারা তাঁদের অভিত্যাগ করেন না। এইটিই লৌকিকী ও বৈদিকী নীতি। উভয় নীতিরই বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে,···নিরাবিলতা; এই রাত্রির মতই নিরাবিলতা। অতএব আপনারা নিরাতঙ্ক। পর-পুরুষে অনুরাগ সর্ব্বোতোভাবে ভয়প্রদ। উভয়-লোকেই বিরুদ্ধ, অযশস্কর, পরম নিন্দিত, বিশেষ করে আপনাদের মত কমল নয়নাদের পক্ষে।

৩৬। পতি এক। এক হয়েই যিনি পর, তিনি কিন্তু দৃষ্টই হন না; আপনারাই কেবল তাঁকে দেখেছেন। আশ্চর্য্য, সেই পর-টিই পরম। কী মহোন্নতি আপনাদের মহিমার! অমেয় ভুবনে। অতএব আমার কথা শুনুন। এর চেয়েও যা পরম ও যা কল্যাণময় সেই হিতকথাগুলিকে মেনে নিয়ে এবার ঘরে ফিরে যান বনস্থল ছেড়ে।"

৩৭। নিতান্ত কৌতূহলের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে বনমালীর এই ভাষণ যখন ছড়িয়ে পড়ল ব্রজাঙ্গনা-কদম্ব-মেদুর বনতলে, তখন অসাধারণ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে বসল সেই ভাষণের কাব্যকূট। প্রথমেই মনে হল যেন এক ধ্যানগম্ভীর প্রজ্ঞা অন্তরালে বসে আরম্ভ করে দিয়েছে ভালবাসার পরীক্ষা গ্রহণ। তারপরেই মনে হল যেন এর প্রতিটি বাক্য,···শরৎ মধ্যাহ্নের রবিরশ্মি-লীন মহাহ্রদের নির্ম্মল সলিলের মত, বাইরে গরম ভিতরে হিম; কণ্টকি ফলের মত, বাইরে কাঁটা ভিতরে মিঠে; নারিকেল ফলের মত, অন্তঃসরস বহিঃকঠিন; মৌচাকের মত, মৌমাছি ঘুরছে বাইরে ভিতরে রয়েছে মধু। প্রত্যেকটি বাক্যই যেন বহির্বিজাতীয়, অথচ প্রত্যেকটি পদেই খেলা করছে··আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি।

সন্তাপ-দূরের ছলনা ফলিয়ে যেই এই বাণীগুলি কৃষ্ণমুখ ছেড়ে বেরিয়ে এল, অমনি কেমন যেন খিন্না হয়ে গেলেন ব্রজাঙ্গনারা। একেই তো অনুরাগে অন্ধ, তায় এল বিভ্রান্তি। তাঁরা অবগাহন করতে পারলেন না কৃষ্ণবাণীর ব্যঞ্জনার মাধ্বী-স্রোতে। বাস্তবের বাতাসে হঠাৎ যেন নিভে গেল রসতার দীপ। তাঁরা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। একসঙ্গে যেন তাঁদের আকাশে হঠাৎ ঘনিয়ে এল দুঃখের শতকোটি ক্রন্দন-ক্রূর মেঘ।

৩৮। সহজ নয় এই দুঃখানুভূতির ঐশ্বর্য্য-দশার ভোগ। ব্রজাঙ্গনাদের আত্মাটাকে যেন দলে দিয়ে গেল কোটি কোটি বজ্রাঘাত, কামড়ে দিয়ে গেল বিষ-বৃশ্চিক, ছোবল মারল কালভুজঙ্গ, দহন করল তুষানল, যেন টুঁটি টিপে ধরল মহাজ্বর, যেন গেঁথে দিয়ে গেল শূলে। একমুহূর্ত্তেই যেন ঘটে গেল এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ঘটনা। পরক্ষণেই তাঁদের মনে হল,···সারাদেহ বিষের ক্ষতে জ্বলছে; নিরালোক, নিঃশরণ, শূন্যানন্দ সর্ব্বলোক; সন্তাপময় দিগদিগন্ত; নীরস ধরণীতল; যেন ছাই হয়ে গেছে ত্রি-ভুবন; যেন পরলোকে প্রস্থান করেছে আত্মা। তারপরেই তাঁরা প্রত্যেকেই যেন দারু-পুত্রিকার মত আত্মশূন্যা হয়ে গেলেন। কঠিন অংশগুলি ছিল বলেই যেন চেনা যেতে লাগল তাঁদের দেহ। ধীরে ধীরে সম্বিৎ-দেবীর বিস্তীর্ণ সহায়তায় আবার যখন তাঁরা মূর্চ্ছোত্থিতার মত উঠে বসলেন, আবার যখন সচল হল তাঁদের অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন দুঃখানুভূতির ঐশ্বর্য্য দশাটি কি!

থর থর করে কাঁপতে লাগল অধর;··থামে না। গাল বেয়ে দরদর করে ঝরতে লাগল ঘাম;··থামে না। দু'চোখ থেকে টপ্-টপ্ করে পড়তে লাগল অশ্রু;··থামে না। মোচড় দিয়ে কন্‌কন্ করতে লাগল প্রাণ;··থামে না। কৃষ্ণবরণ হয়ে গেল সকলের মুখ। হায় রে! যেন অস্থিসার হয়ে গেল লাবণ্যলক্ষ্মীর তনুখানি; যেন তাঁর মৃণালের মত বাহু থেকে মণিকঙ্কন খসে গেছে।

অদ্ভুত এই শোচনীয়তার মধ্যেও, লজ্জার হাত থেকে রেহাই পেলেন না ব্রজাঙ্গনারা। প্রেমের লজ্জা যেন এগিয়ে এল তাঁদের কাছে, বললে,—"বঁধুয়ার অমন উদাসীন কথাও তোরা কানে নিলি

নিয়েও তোরা মরিস্ নি ?" হায় রে ! এ লজ্জারো কি উত্তর দেওয়া চলে ? নির্ব্বাক হয়ে থাকেন ব্রজাঙ্গনারা, কেবল তাঁদের চরণকমলের অঙ্গুষ্ঠগুলি নখর-চন্দ্রমার দীর্ঘ কিরণ দিয়ে বিলিখন করতে থাকে ক্ষিতিতল।

আর গুম্‌রোয় তাঁদের মন। সেই মন যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, "তোমরা জাতিতে নারী, তায় ভালবেসে ফেলেছ, অথচ রুক্ষ ভাষায় চঞ্চল হয়ে প্রিয়তমের উপর চটে গেছ। অত্যন্ত কোমল হয়ে গেছে তোমাদের প্রাণ। ও সব প্রাণ কি কখনো বেরোয় ?"

শুনতে শুনতে সুন্দরীদের চোখ ছেয়ে গেল কুয়াশায়। তাঁরা চেষ্টা করলেন চেঁচিয়ে কিছু বলতে, কিন্তু সেই কুয়াশাই যেন স্বয়ং রুদ্ধ করে দিলেন তাঁদের কণ্ঠ।

তারপরে যখন জমাট ভাব কেটে গেল কুয়াশার, দুচোখ দিয়ে তিনি তখন বেরিয়ে এলেন জলের মত তরল হয়ে। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অবলারা,···যেন তাঁরা ছবি···আকাশ-পটে আঁকা, অনুরাগ দিয়ে লেখা।

কালকূট বিষের মত একটি প্রচণ্ড সন্তাপ তারপরে প্রবেশ করলেন সুন্দরীদের অন্তরে। কিন্তু থাকতে পারলেন না সেখানে। অঞ্জনে রঞ্জিত অশ্রুসহরীর ভ্রান্তি জাগিয়ে তখনি তাঁকে বেরিয়ে আসতে হল নেত্রদ্বার পথে। তারপরে তপ্ত স্তনমণ্ডলগুলির উপরে যেই তিনি পড়লেন, অমনি আর তাঁকে দেখা গেল না। আশ্চর্য্য, হৃদয়ের মধ্যেই আবার কি তিনি ক্রোধে আবিষ্ট হয়ে গেলেন প্রাণ শোষণের সঙ্কল্পে ?

৩১-৪০। তাঁদের নাসা-রন্ধ্র থেকে বেরিয়ে এলেন নিঃশ্বাস-সমীরণ,···মন্দ এবং উষ্ণ। তাঁর নিষ্ঠুর আঘাতে ঐ যে বিদলিত হয়ে গেল সুন্দরীদের পাপড়িগুলি অধরের, ঐ যে ম্লান হয়ে গেল সুবাহর মধ্য-লোল বক্ষহার, হয় তো এমন কিছু বৈচিত্র্য ছিল না তাতে ; কিন্তু বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই ছিল সেই ব্যাপারটিতে, যখন দেখা গেল,—সুন্দরীদের শ্রীমুখগুলি বিসর্জ্জন দিয়েছে সংলাপ, সুখের বৈরাগ্যে মলিন হয়ে গেছে তাঁদের কমল-বয়ান, গলে ঝরে পড়ছে লাবণ্যের নবামৃত, অথচ নাসাগ্রে অদ্বিতীয় অমৃতবিন্দুর মত, লাবণ্যরসের নিটোল বীজটির মত, টলটল করছে মৌক্তিক-মণি,···আর সে মণি পড়েও না, আর সে মণিকে মলিন করতেও পারে না নয়ন-সলিলের কজ্জল-ম্লান অসংখ্য বিন্দু। 'ও আমাদের অন্ত সময়ের সম্পত্তি,'···এই কথাটিকেই যেন জানিয়ে দিতে চাইল নয়নজল।

৪১। নিখিল জীবের প্রকৃতি বিভিন্ন, তার কৃতিও বিভিন্ন। এই বৈচিত্র্যের সূত্রে নানান্ রূপ নেয় জীবের বক্তব্যের স্পৃহা ; নানান্ পরিণতি চায় জীবের প্রণয়াবেগ, বিবাদ, দৈন্য ইত্যাদি ভাবাবলী। তাই নানান বিকার ঘটে হৃদয়ের, বিকশিত হয় নানান্ শোভা। কানন-বিহারিণী ব্রজসুন্দরীদের বেলাতেও তাই ঘটল।

একদল সুন্দরী (ভদ্রা, শৈব্যা প্রভৃতি) ছিলেন, যাঁদের মুখ-সৌরভে মাতাল হয়ে পাগলের মত গুন্‌গুন্ করে উড়ে বেড়াচ্ছিল ভ্রমরের যূথ। এবার হঠাৎ সেই সুন্দরীরাই ঝঙ্কার তুলে অনুকরণ করতে লেগে গেলেন···ভ্রমর-ভাষায় সেই পাগল গান। তারপরে হঠাৎ থেমে গেলেন তাঁরা,···কাজল-ধোওয়া চোখের জলের আভা ছিটিয়ে শ্যামলবরণ করে দিলেন দশটা দিক্। আর সেই সঙ্গে তাঁদের মুখ থেকে ফুটে বেরুল রোগীর ভাষার মত করুণ সুর।

আনন-গন্ধ-বিধুর অন্ধ ভ্রমরদের নিয়ে এমন মর্ম্মরধ্বনি তুললেন যে মনে হল তাঁরা যেন গগনপ্রান্তে বিছিয়ে দিচ্ছেন গুচ্ছ গুচ্ছ তিল ও তণ্ডুল।

আর একদল (বিশাখা প্রভৃতি) সুন্দরীর মুখ থেকে কেবল নিঃসৃত হতে লাগল শুদ্ধ বাণী, স্বর-শব্দার্থ-সার্থক বিশেষ পূজ্য বাণী, অনুরাগ-রস-রঞ্জিত তুরীয় বাণী। যেন তাঁরা জিহ্বায় নাচাতে চাইছেন নাচাচ্ছেন সেই বাণীগুলিকে একমাত্র যাদের নরীনর্ত্তন চলে মৃদু-মঞ্জু-বাগীশ্বরী সরস্বতীর রসনায়।

আর একদল (রাধার সখী প্রভৃতি) সুন্দরী বাণীমুখে বর্ষণ করতে লাগলেন বিপুল ক্রোধ। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁদের সুচঞ্চল কটাক্ষর ও চারু দন্তের দাক্ষিণ্যে যথাক্রমে গগনে সৃষ্টি হয়ে যেতে লাগল নীল পদ্মের উপবন ও শতদলের শ্বেত কানন।

বহু-সখী-পরিবৃতা হয়ে এক জায়গায় বসেছিলেন (রাধা, শ্যামা, ললিতা প্রভৃতি) কয়েকটি সুন্দরী। তাঁদের মধ্যে ছিল···'কৃষ্ণ আমার কৃষ্ণ আমার'···এই মদীয়তা-ময় ভাবের প্রাচুর্য্য। ঘন-ঘর্ম্মে সিক্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁদের আনন। ভ্রূলতা বঙ্কিম করে মদারুণ কটাক্ষের দৃষ্টি হেনে, ঈষৎ হলেও সম্যক্ ভাবেই তাঁরা এখন নিন্দা করতে লাগলেন মাধবের।

আর একদল (চন্দ্রাবলী প্রভৃতি) সুন্দরী,···বিনয় অনুনয় অনুরাগ ও সৌন্দর্য্যে যাঁরা তুল্যাধিকারিণী, অথচ যাঁদের মধ্যে ছিল 'আমি তাঁর আমি তাঁর' এই তদীয়তাময় ভাব,···তাঁরা গদগদ স্বরে যা তা বকে যেতে লাগলেন মুহু মুহু ; আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সুকণ্ঠী তাঁরাও অকুণ্ঠ কণ্ঠে প্রচার করে যেতে লাগলেন তাঁদের উৎকণ্ঠা।

আর (ধন্যাদি) কুমারিকারা,···কাজল কালো নয়ন জলে সিক্ত তাঁদের তপ্ত বুক,···গদ্‌গদ গুঞ্জন ছাড়া তাঁদের আর অন্ত গতি রইল না, তাঁরা অনুসারিকা হলেন আপন আপন প্রেম ভাবের।

৪২। স্বভাবের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে দুঃখের কালকূট অঙ্গে মাখতে মাখতে, দ্বিধাহীন ভাষায় যা কিছু বলেছিলেন ব্রজসুন্দরীরা, তথা ক্রমে তার প্রতি বচন—রচনার প্রচেষ্টা এখানে করা হবে বটে, তবু আগে থাকতেই বলে রাখা ভাল যে, দেবগুরু বৃহস্পতিও শৃঙ্গার রসের-অমন কথা নিশ্চিত কখনও কইতে পারতেন না প্রাণ খুলে।

৪৩। সত্যি-ই নমস্কার আমাদের এই সাহসকে। আশা করি রসজ্ঞেরা হাসবেন না। অতি মত্ততা নিয়ে আসে রসজ্ঞান ; যার কণ্ডূতি খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই উপক্রম ; একে আশা করি অপরাধ বলা চলে না। ক্ষুদ্রও ক্ষিদেয় পাগল হয়ে, রোগে পড়লেও, দুর্লভ মিষ্টান্নটাকেই মুখে পুরতে চায়।

৪৪। প্রথমেই কয়েকটি ব্রজসুন্দরী, তাঁদের বিখ্যাত তনু-লাবণ্যের সুবিধান করতে করতে রসিক শেখরকে বলে উঠলেন,—"উঃ, হৃদয়ের ব্রণের মত কি কঠোর-ই না আপনার একটি একটি অক্ষর ! বেছে বেছে আমাদেরি কি এমন ভাবে বিষণ্ণ করাটা উচিত হল ? ছিঃ ছিঃ, কেন এমন করলেন ? তৃপ্তি দিতেই মেঘেরা আনন্দে ধারায় ধারায় ঢালেন ঘন-রস ; কই তাঁরা তো ঢালেন না বিষ।"

"সমস্ত স্বজন বান্ধব পরিত্যাগ করে,···আলো, সত্যিই হিম জলের তাঁরা যেন ইঁদারা,···এই যে আমরা ছুটে এসেছি আপনার চরণ প্রান্তে, এ কি আমরা ভুল করেছি, না এ আমাদের উচিত হয়নি ? আমরা তো জানতম, পুকুর দীঘি নদী ঝিল সাত সমুদ্রের জল ছেড়ে মেঘের জলই

৪৫। অন্য কয়েকটি ব্রজাঙ্গনা বাণীতে ফুটিয়ে তুললেন রোষের ও পরিহাসের, ও হাস্য রসের দক্ষ সৌন্দর্য্য। প্রথমটি বললেন,—

"আপনিই একদিন উপদেশ দিয়েছিলেন,···'স্বামী সন্তান সুহৃৎদের অনুবর্ত্তন করাই ধর্ম।' এখন আপনি হয়েছেন গুরু। তাই প্রার্থনা করছি আপনার উপরেই খাটাক সেই উপদেশ, আমাদের মত প্রাণীদের মন রেহাই দেয়।"

৪৬। দ্বিতীয়া বলে উঠলেন,—

"হায় গো হায় হাসিও পায়। শত্তুর কুলের হস্তাটির বাণীর বহরটা একবার দেখলি! পতি যাঁদের সঙ্গ ছাড়া তাঁদেরও আবার অপত্য! বলি ও পুরুষেশ্বর অঘয় ঘটে না···অমন তৎপুরুষে।"

তৃতীয়া বললেন,—

"অমন কথা বলিসনে সই। বলিসনে উনি পূর্ণ গুণী, লক্ষ্মী রাণী ওঁর শ্রীচরণের দাসী। ওঁর চেয়ে কি বড় পতি নারীদের কেউ আছে? মেয়েদের মনের মধ্যে যদি অন্য কোনো শত্তুর ঢোকে, তাকেও তো উনি-ই নিপাত করে ছাড়েন।

এবার একদল সুন্দরী সভক্তি বললেন,—

"হে প্রভু, তুমি যখন প্রিয়, তুমি যখন ত্রিভুবনের আত্মা, তুমি যখন নিত্য পদার্থ, তখনি তুমি হয়ে ওঠো জ্ঞানীদের, পতি পুত্র সুহৃৎদের ভক্তি-প্রীতির আধার। কিন্তু তুমি যখন ক্ষণ-বিনাশী মূর্তিতে আর্ত্তি নিয়ে এস তখন আর তোমায় ভজনা করেন না তাঁরা। (৫০)

৪৭। মাতব্বরদের কাছে, বিশেষ করে সামান্যদের কাছেও এই রীতিই প্রবল; শঠতার স্থান নেই এতে। কিন্তু হে প্রিয়, তুমিই যে এক মাত্র আমাদের হৃদয়ের, আমাদের নয়নের উৎসব। তুমিই [illegible] আমাদের স্বামী। তুমি নইলে অমৃতেও যে আমাদের ঘৃণা। তা[illegible] মিনতি করছি, প্রসন্ন হও, হরণ কর এই জীবলোকের অশেষ ক্লেশ এরা তোমার অনুগত, ছলনা জানে না, এরা উৎসাহ হারিয়েছে, এ[illegible] অবসন্ন না হয় যেন প্রভু। ছিঁড়ে ফেল না এদের আশৈশবের আশা হিমের আঘাতে কমলিনীর মত ম্লান করে দিও না আমাদের বাসনা তোমার প্রেমে আমরা বাঁচতে চাই।"

৪৮। আর একদল সুন্দরী অধীর হয়ে বলে উঠলেন,—"আপনি চুরি করলেন, আর দোষটা কি না হল আমাদের হৃদয়ের? এই ব[illegible] রাখছি, আপনার চরণ ছেড়ে একটি পাও নড়বে না আমাদের [illegible] দু খানা করে পা।

বধূদের মনের ঘরে সিঁদ দিয়েছো, নব-চোর। এ কথা সত্যি; কি[illegible] তাও বলি বেরসিক, তপ্ত কথায় মন ভেজে না, মানের ফসল শুকিয়ে যায়।

৪৯। আরো যাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা বলে উঠলেন,—

"উঃ, কী ক্লান্তিকর কী ভীষণ রুক্ষই না আপনার শিকড়[illegible] বাক্যের। কপট কৌতুকের ধূলো উড়িয়ে আর কাজ নেই। অধরে[illegible] মধু ছিটিয়ে, দয়া করে এবার তুষানল নিভিয়ে দিন সন্তপ্ত হৃদয়ের বাঁচি তাহলে।

তা না হলে, শ্রীমদনের সমস্ত উদ্দীপন··পরিতাপের আগু[illegible] ঝলসিয়ে দেহান্তরী করিয়ে ছাড়বে এই ক্ষীণ দেহগুলোকে; আ[illegible] আপনাকেও অনুভব করাবে অবলা বধের অনুতাপ। আমাদের কি[illegible] বিরহের ভয়,···দুদিক থেকেই,·· ঐ বিচ্ছেদ। [ক্রমশঃ
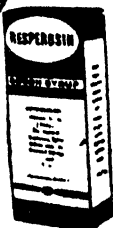
নববর্ষ

হান্স এ্যাণ্ডারসন

ভীষণ শীত পড়েছে আজ। সেই সঙ্গে বিকেল থেকে শুরু হয়েছে ভয়ানক বরফ পড়া। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। বছরের শেষ সন্ধ্যাটি প্রায় হয় হয়। কনকনে এই শীতের সন্ধ্যায় একটি অভাগা ছোট্ট মেয়ে এখনও রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, খালি পায়ে আর খোলা মাথায়। মেয়েটি যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল তখন অবিশ্যি ওর পায়ের চাইতে খুব বড় মাপের হলেও এক জোড়া জুতো ছিল তার পায়ে। জুতো জোড়া ওর নিজের নয়। আসলে ওটা ছিল তার মায়ের। নিজের কোন জুতো না থাকায় আজকের এই প্রচণ্ড শীতের সকালে ওই বড় মাপের জুতো জোড়াই পরে বেরিয়েছিল সে। দুঃখের বিষয় সে জোড়াও এখন আর তার পায়েতে নেই। রাস্তায় একবার দুটো গাড়ীকে পথ দেবার জন্য খুব জোরে দৌড়তে গিয়ে সেগুলো ওর পা থেকে খুলে পড়ে যায়। জুতোর একটা পাটি ত সে আর খুঁজেই পেল না। অন্যটাও একটা ছোট ছেলে ওর হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে গেছে। ছেলেটা নাকি ওটা দিয়ে তার পুতুলের জন্য দোলনা তৈরী করবে।

ছোট্ট মেয়েটাকে তাই সারাদিন খালি পায়েই পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ঠাণ্ডায় পা দুটো একেবারে নীল হয়ে গেছে। না জানি আরও কতক্ষণ ঘুরে বেড়াতে হবে তাকে! মেয়েটার সঙ্গে রয়েছে একগাদা দেশলাই বাক্স। এগুলোকে বিক্রী করতে বেরিয়েছে সে। একটা ছোট বাণ্ডিল রয়েছে তার হাতে, বাকীগুলো সব কোঁচড়ে বাঁধা। সারাদিনে একটা দেশলাইও বিক্রী করতে পারেনি মেয়েটা—একটা পয়সাও কেউ দেয়নি তাকে। প্রচণ্ড খিদেয় আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটা এখনও বিক্রীর আশায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেচারা ছোট্ট মেয়েটা!

তুষার-কণাগুলো ওর লম্বা লম্বা সোনালী চুলগুলোর ওপর সমানে পড়ে চলেছে। ভিজে উঠেছে ওর জামা-কাপড়। কিন্তু সে দিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই তার। কাঁধের ওপর চমৎকার কোঁকড়ান ওর সুন্দর চুলগুলোতে তুষার-কণা পড়লেই বা কী? সে না ভাবছে তার সৌন্দর্যের কথা, না ভাবছে শীতের কথা। একটা নতুন চিন্তায় পড়েছে রাস্তায়। শোনা যাচ্ছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আনন্দ কোলাহল। প্রায় প্রত্যেক বাড়ী থেকেই ভেসে আসছে চমৎকার হাঁসের মাংসের গন্ধ। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই তো নববর্ষ শুরু হবে! হ্যাঁ, এ সব কথাই সে ভাবছে এখন।

অনেকক্ষণ চলার পর আড়াআড়ি দুটো বাড়ীর পাঁচিলের মাঝে একটা কোনাচে জায়গা দেখতে পেয়ে সেখানেই বসে পড়ল মেয়েটা। সে আর চলতে পারছে না। শীতে একেবারে জমে গেছে সে। হাঁটু দুটো মুড়ে ভীষণ কুঁকড়ে বসে একটু গরম হবার চেষ্টা করল মেয়েটা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা—এতটুকু গরম হলনা হাত-পাগুলো। এদিকে বাড়ীতে যাবারও সাহস নেই তার। একটা পয়সাও সে আজ রোজগার করতে পারেনি। বাবা হয়ত মারই লাগাবে তাকে। আর সেখানে গিয়েই বা কী হবে? ওদের বাড়ীটাও তো এই রাস্তাটার মতই ঠাণ্ডা। যদিও বাড়ীটার ছাদের বড় বড় সব ফুটোগুলো খড় আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বন্ধ করা আছে তবু কোন সময়েই ঠাণ্ডা হাওয়াকে এতটুকু আটকাতে পারে না সেগুলো।

উঃ, কী শীত! হাত দুটো একেবারে জমে গেল! আচ্ছা, একটা দেশলাই কাঠি জ্বাললে কেমন হয়? হয়ত হাত দুটোকে গরম করা যাবে তাতে, অবিশ্যি ওর যদি খরচ করার সাহস থাকে! ভাবতে ভাবতে সে একটা কাঠি বার করে পাশের দেওয়ালটায় ঘষল। বাঃ কী চমৎকার! কী সুন্দর উজ্জ্বল আলো! আর কী সুন্দর এর উত্তাপ! আনন্দে হাত দুটো আলোর ওপর মেলে ধরল সে। আলোটা বেচারা মেয়েটার কাছে একটা মায়া—না না, একটা যাদুরই সৃষ্টি করল। মনে হল, একটা পেতলের সুন্দর ষ্টোভের কাছে বসে আছে সে। ঝকঝকে ষ্টোভটা থেকে উত্তপ্ত আগুন ভস্ ভস্ শব্দে বের হচ্ছে। খুশিতে মেয়েটা পা দুটোও ছড়িয়ে দিল। এই যাঃ, ঠিক সেই মুহূর্তেই নিভে গেল হাতের কাঠিটা! সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল ওর সেই সুন্দর ষ্টোভটা। চমৎকার আগুনটা শেষ হয়ে গেল। আবার আগেকার মতই পোড়া কাঠিটা হাতে ধরে ঠাণ্ডায় বসে রইল সে।

একটু পরে একটা নতুন কাঠি নিয়ে সে দ্বিতীয়বার দেওয়ালটায় ঘষল। আবার ফুটে উঠল একটা উজ্জ্বল আলো। সামনের দেওয়ালটার যতটা জায়গায় আলোটা পড়ল ততটাই হয়ে উঠল একটা স্বচ্ছ ওড়নার মত। আর এরই ভেতর দিয়ে সে দেখতে পেল একটা সুন্দর ঘরের দৃশ্য। ঘরটার ভেতর বিরাট একটা

চকগুলো সুন্দর চীনা বাসন, তার একধারে আপেল আর শুকনো াদামের মাঝে শোভা পাচ্ছে ঝলসানো আস্ত একটা হাঁস। গরম াপ্যা বেরুচ্ছে সেটা থেকে। উঃ, কী সুন্দর দেখতে লাগছে সব কিছু! ওকে আরও অবাক করে দিয়ে হাঁসটা হঠাৎ তার বুকে বিঁধানো ছুরি-কাটা সমেত একটা লাফ দিয়ে ডিস থেকে নীচে পড়ল। তারপর মেঝের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে হাঁসটা চলে এল একেবারে তারই কাছে। আর তক্ষুনি নিভে গেল হাতের আলোটা। সেই সাথে সুন্দর দৃশ্যটা অদৃশ্য হল তার সব কিছু নিয়ে। আগেকার মত কর্কশ দেওয়ালটাই শুধু ওর সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

তৃতীয়বার সে একটা নতুন কাঠি জ্বালল। এবারের আলোয় মেয়েটা দেখল, একটা সুন্দর খৃষ্টমাস গাছের নীচে বসে আছে সে। গত বছর এক ধনী ব্যবসায়ীর দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা খৃষ্টমাস গাছের চাইতে এ গাছটাকে অনেক বড় আর সুন্দর বলে মনে হল তার। কি সুন্দর সাজানো এই গাছটা! কত ভাল লাগছে এটাকে দেখতে! শত শত ছোট মোমবাতি জ্বলছে এর সবুজ ডালে ডালে। দোকানের কাঁচের আলমারীতে সাজানো যে কোন গাছের চাইতে অনেক চমৎকার এই গাছটা। আনন্দে মেয়েটা তার হাত দুটো এগিয়ে দিল গাছটার দিকে। হায় রে! আবার নিভে গেল হাতের আলোটা! অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সব কিছু। অদৃশ্য হল বিরাট খৃষ্টমাসের গাছটা। কিন্তু নিভল না তার মোমগুলো। সেগুলো আরও ওপরে উঠে আকাশের তারা হয়ে জ্বল জ্বল করতে লাগল।

একটা তারা হঠাৎ আকাশ হতে খসে পড়ল। ওটাকে তখন দেখাল একটা আগুনের লেজের মত। "নিশ্চয়ই এখুনি কেউ মারা গেল।" ভীষণ দুঃখিত হয়ে মেয়েটা মনে মনে বলল। দিদিমার কাছে সে শুনেছে, কোন তারাকে খসে পড়তে দেখলেই বুঝতে হবে, তখুনি ঈশ্বরের দেওয়া কোন একটি অবিনশ্বর আত্মা ফিরে যাচ্ছে তাঁরই কাছে। দিদিমাকে মনে পড়ল মেয়েটার। দিদিমা আজ আর বেঁচে নেই। এক মাত্র দিদিমাই খুব স্নেহ করত তাকে। দিদিমা ছাড়া আর কারও কাছে ভালবাসা পায়নি সে।

ভাবতে ভাবতে সে আবার একটা কাঠি ধরাল। আর কী আশ্চর্য! কাঠিটা জ্বলে উঠতেই এতক্ষণ যার কথা ভাবছিল সেই দিদিমাকেই দেখতে পেল সে। আলোর মাঝে দাঁড়ানো দিদিমাকে যদিও সেই আগেকার মত স্নেহময়ী এবং মিষ্টি দেখাল, কিন্তু বেঁচে থাকতে দিদিমাকে কোনদিন এত সুন্দর আর খুশি দেখেছে বলে মনে পড়ল না তার। "দিদিমা গো, তুমি আমাকে নিয়ে যাও।" মেয়েটা কেঁদে উঠল। "তোমার সাথে নিয়ে যাও আমায়। আমি জানি আলোটা ফুরোলেই তুমি চলে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয়ই চলে যাবে, যেমন চলে গেছে ষ্টোভের আগুন, নববর্ষের ভোজ আর খৃষ্টমাসের গাছটা! কিছুতেই যেতে দেব না তোমায়।" পাছে দিদিমা চলে যায় এই ভয়ে মেয়েটা তাড়াতাড়ি বাণ্ডিলটার সমস্ত কাঠি বার করে একবারে জ্বালিয়ে দিল। ফস্ করে সমস্ত কাঠিগুলো জ্বলে উঠে একটা অতি উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি করল। দিনের আলোকেও এর কাছে ম্লান বলে মনে হল তার। আর দিদিমাকেই বা কত লম্বা আর জমকালো দেখাচ্ছে এখন! কত বেশী সুন্দর আর উদার দেখাচ্ছে তাকে! একটু পরে দিদিমা তাকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন। তারপর ওকে নিয়ে আনন্দোজ্জল চিত্তে উড়ে চললেন উঁচুতে—আরও উঁচুতে।

ওকে কোলে নিয়ে দিদিমা উড়ে চললেন সেই দেশের উদ্দেশ্যে, যেখানে শীত নেই, খিদে নেই, নেই কোন যন্ত্রণা। এর সব কিছু থেকে দূরে স্বর্গরাজ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত ওরা দু'জন সমানে উড়ে চলল।

পরদিন সকালে লোকেরা ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দেওয়ালটার এক কোণায় একটা ছোট্ট মেয়েকে কুঁকড়ে পড়ে থাকতে দেখল। তারা দেখল, বছরের শেষ রাতের প্রচণ্ড শীতে জমে যাওয়া মেয়েটার গণ্ডে রয়েছে একটা উজ্জ্বল দীপ্তি আর ওষ্ঠে রয়েছে স্মিত হাসি। নববর্ষের প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়েছে কুঁকড়ে বসা মেয়েটার প্রাণহীন দেহের ওপর। তার কোলের কাছে পড়ে আছে অনেকগুলো দেশলাই বাক্স। এর মধ্যে একটা বাক্স সম্পূর্ণ পোড়ান।

"বেচারা গরীব মেয়েটা গরম হবার চেষ্টা করছিল! হতভাগ্য বাচ্চা মেয়েটা!" সকলেই অভাগা মেয়েটার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে কথাগুলো বলল। শুধু এইটুকুই বুঝল তারা। ওর সম্বন্ধে লোকেরা শুধু এইটুকুই জানল। কিন্তু তারা কেউ জানতে পারল না সেইসব সুন্দর দৃশ্যগুলোর কথা, যেগুলো মেয়েটা গতরাত্রে উপভোগ করেছে পরম সুখে। আর এও জানল না তারা, ছোট্ট মেয়েটা এখন তার দিদিমার সাথে মিলে কত সমারোহে আর কত আনন্দে পালন করছে নববর্ষের উৎসব।*

অনুবাদক :—নিতু ঘোষ দস্তিদার

* Hans Anderson-এর The Match Girl নামক গল্পের বঙ্গানুবাদ।

পুনর্মিলন

(বিদেশী গল্প)

শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস

এক মেষপালকের সুলতান নামে একটা বুড়ো কুকুর ছিল। ঐ কুকুরটা এত বুড়ো হয়ে পড়েছিল যে ওর মুখে একটাও দাঁত ছিল না। একদিন মেষপালক আর তার স্ত্রী একত্রে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে ঐ বুড়ো কুকুর সুলতানের কথায় এল। মেষপালক বলল: দেখ গিন্নী, আগামীকাল আমি ঐ হতচ্ছাড়া সুলতানটাকে গুলি করে মারব। কারণ ওটা এখন অকেজো হয়ে পড়েছে।

স্ত্রী বলল: না-গো-না। ওটাকে মেরো না। ও আমাদের অনেক কাল সেবা করেছে। এখন ওকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত এবং বাকী যে কটা দিন ও বাঁচে ততদিন আমাদের এখানেই রাখা হক।

মেষপালক বলল: ধ্যাৎ তুমি একটা বোকা! ওটাকে দিয়ে আমরা কি করব? বেটার মুখে একটা দাঁতও নেই। চোরগুলো ওকে দেখে এতটুকু ভয় পায় না! যতদিন ও কাজ করেছিল ততদিন খেতে দিয়েছি। এখন যদি থাকতে চায় তাহলে কাজকর্ম করতে হবে। আর থাকা না থাকার পরীক্ষে হবে কাল অর্থাৎ কাল ওর শেষ দিন।

বেচারা সুলতান কাছে শুয়ে শুয়ে ঘুমের ভাণ করে সব শুনছিল। ওদের দু'জনের কথোপকথন শুনে সুলতানের 'আত্মারাম খাঁচা ছাড়া' হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল। পড়েছিল মহাভাবনায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সে। তাই সন্ধ্যেবেলায় নিকটবর্তী ওর

অমিতি বন্ধু খেঁকশিয়ালের কাছে গেল পরামর্শের জন্য। সব কথা বলল ওকে।

সব শুনে খেঁকশিয়াল বলল: বন্ধু, তুমি একটা 'ষ্টুপিড'। এ তো খুব সোজা! তোমায় আমি পরামর্শ দেব। আচ্ছা এক কাজ কর। রোজ সকালে তোমার কর্তা আর গিন্নী ত মাঠে ওদের বাচ্চা ছোঁড়াটাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। না?

সুলতান: হ্যাঁ।

খেঁকশিয়াল: তুমি ঐ সময় বাচ্চাটার পাশে শুয়ে থাকবে। এই ভাণ করবে যে তুমি ওকে পাহারা দিচ্ছ। আর ঐ সময় আমি একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বাচ্চাটাকে নিয়ে মারব চোঁ দৌড়। তুমিও আমার পেছন পেছন যত তাড়াতাড়ি পার ছুটবে। তারপর আমি ওটাকে ফেলে দিয়ে পালাব। আর তুমি ওটাকে নিয়ে তোমার প্রভুদের কাছে পৌঁছে দেবে। ওরা ভাববে—যাক—সুলতান তবুও কাজকম্ম করতে পারে। তোমায় দেবে ধন্যবাদ। এবং চিরকাল ওখানে বাস করবার সম্মতি পাবে তুমি।

কুকুর ওর বন্ধুর কথা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করল।

পরদিন ঐ পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করল সে। মেষপালক এবং তার স্ত্রী বেরুল প্রাতর্ভ্রমণে। খেঁকশিয়াল ওদের বাচ্চা ছোঁড়াটাকে নিয়ে কোর কাটি মিটারে দৌড় দিল। কুকুরও ধাওয়া করল ওর পেছনে। তারপর যে কথা সেই কাজ। খেঁকশিয়াল বাচ্চাটাকে ফেলে পালাল আর সুলতান ওকে নিয়ে প্রভুদের কাছে পৌঁছে দিল।

মেষপালক সুলতানের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলল: খেঁকশিয়ালের হাত থেকে সুলতান আমার আদরের খোকাকে বাঁচিয়েছে। ওকে এখন যত্ন করতেই হবে এবং যদ্দিন বাঁচবে তদ্দিন আমার বাড়ীতে থাকবে। গিন্নী! তুমি বাড়ী যাও। ওর জন্যে আজকে খুব ভাল করে ভূরিভোজের আয়োজন কর। ও আমাদের এখানেই থাকবে।

সুতরাং এই সময় থেকে সুলতানের আর কোন ভাবনা-চিন্তা রইল না।

পরদিন ভোর না হতেই বন্ধু খেঁকশিয়াল ওকে সম্ভাষণ জানাতে এল। বলল: বন্ধু, আমার কাজ আমি করেছি। তোমাকে ভীষণ সমস্যার হাত থেকে রেহাই দিয়েছি। এবার আমায় একটু সাহায্য কর।

সুলতান: কি সাহায্য?

খেঁকশিয়াল: আমি ঐ মোটা ট্যাপ চেপে মেষটাকে ঘাড় মটকে খাব।

সুলতান: তা কি হয়! তা কি হয় বন্ধু।

খেঁকশিয়াল: কেন গো?

সুলতান: প্রভুর বিশ্বাসঘাতকতা করতে আছে?

খেঁকশিয়াল সুলতানের কথায় ভাবল: সুলতান বুঝি ওর সাথে রসিকতা করছে। সুতরাং একদিন রাত দুপুরে সে মেষপালকর বাড়ীতে এল। সুলতান ওর প্রভুকে খেঁকশিয়ালের মতলবটা ফিস্ ফিস্ করে বলে দিল। সুলতানের কথায় মেষপালক প্রস্তুত হয়ে নিল এবং যখন খেঁকশিয়াল মেষগুলোর ঘরে গিয়ে সন্তর্পণে দিয়ে খেঁকশিয়ালের পিঠে দড়াম করে একটা 'ভাদ্দর মাসের তাল' ফেলে বসল।

তারপর থেকে খেঁকশিয়াল সুলতানের ওপর রেগে আগুন হয়ে গেল। 'জোচ্চোর, বদমাস, নচ্ছার, হতচ্ছাড়া,' প্রভৃতি বলে সে সুলতানকে গালাগালি দিল। পরদিন সকালে সে ওর বন্ধু শূকরকে সুলতানের কাছে পাঠাল। বলে পাঠাল যে, সুলতানকে সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্যে 'চ্যালেঞ্জ' করছে। একবার সে যেন ওর বাগানে আসে—'দেখে নেবে সে, মাসে দিন ক'টা।'

এদিকে সুলতানের দ্বিতীয় কোন বন্ধু ছিল না একমাত্র মেষপালকের বাড়ীর 'তিন-পেয়ে' বিড়াল বন্ধুটা ছাড়া। সুতরাং পরদিন ওরা দুজন খেঁকশিয়ালের 'চ্যালেঞ্জের' উত্তর দিতে চলল।

খেঁকশিয়াল আর শূকর প্রথমে মাঠেই ছিল। বিড়ালকে লেজ সোজা করে দৌড়ে আসতে দেখে ওরা মনে করল যে সুলতানের জন্যে সে একখানা তরোয়াল নিয়ে আসছে। আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়তে দেখে মনে করল বিড়াল বুঝি ঢিল কুড়িয়ে নিচ্ছে ওদের দিকে ছোঁড়বার জন্যে। ওরা ভাবল: আমরা ঐ রকম যুদ্ধে অভ্যস্ত নই। সুতরাং পালিয়ে যাওয়াই একমাত্র পথ। সুতরাং শূকরটার কানের ভেতর একটা গাছের ডাল ঢুকে যেতেই খুব জোরে ও মাথা নাড়ল আর অমনি একটা কাঠ-বিড়ালী লাফিয়ে গাছের ওপর গর্তে পালাবার চেষ্টা করল। দূর থেকে বেড়াল মনে করল ওটা বুঝি একটা ইঁদুর, তাই সে ঝোপের মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করতেই শূকর ভাবল তাকে বুঝি এরা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তাই সে চেঁচিয়ে বলল: ও গো ওপরে। ওপরে দেখ। আসল মক্কেল ওপরে লুকিয়েছে।

ওরা ওপরে তাকিয়ে দেখে যে সত্যিই খেঁকশিয়াল চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং খেঁকশিয়ালের এই অবস্থায় থাকতে দেখে সুলতান আর বিড়াল 'কাপুরুষ' বলে অভিহিত করল খেঁকশিয়ালকে।

খেঁকশিয়াল অত্যন্ত অনুতপ্ত হল এবং তার নিজের ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জানুভব করল। নীচে নেমে এল সে এবং সুলতানের সাথে কোলাকুলি করে প্রতিজ্ঞা করে যে সুলতানের সাথে আবার তার বন্ধুত্ব হল। এদিকে শূকর আর তিনপেয়ে বিড়াল ফ্যালফ্যাল করে ওদের দিকে চেয়ে রইল।

মানুষ খেকো গাছ

শ্রীদেবব্রত ঘোষ

মানুষ খেকো গাছের নাম শুনে তোমরা অনেকেই হয়ত আতঙ্কে শিউরে উঠবে আমি জানি। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও কথাটি সত্য। এই পৃথিবীতে এমন অনেক গাছ আছে যারা মানুষ অথবা জীবজন্তুর মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের ডেভিল্‌স্ ট্রী। ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের গভীর অরণ্য অঞ্চলে এই মাংসভোজী গাছ দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী অভিযাত্রীদের মতে ডেভিল্‌স্ ট্রী দেখতে অনেকটা তালগাছের মত এবং এদের শাখা-প্রশাখাগুলি

বাহগুলি মুহূর্তে সজীব হয়ে ওঠে ও তাদের জাপটে ধরে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে। স্থানীয় বন্য অধিবাসীরা ডেভিল ট্রীকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে থাকে এবং দেবতার নৈবেদ্য-স্বরূপ সুন্দরী ও সুলক্ষণা কুমারীদের বৎসরের একটি বিশেষ দিনে এই রাক্ষুসে গাছের কবলে নিক্ষেপ করে আনন্দ পায়। কিছুদিন পূর্বে একজন ইউরোপীয় কর্পূর সংগ্রহকারী ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের গভীর অরণ্যে কর্পূর সংগ্রহ করতে গিয়ে বন্য-অধিবাসীদের রাত্রিকালীন আমোদ-প্রমোদের সময় নাকি এমনি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অবশ্য এই সংবাদটি আমাকে পরিবেশন করেছেন দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার একজন বিখ্যাত ইংরাজ সাংবাদিক।

ভারতবর্ষে আসামের বনে জঙ্গলে কলস উদ্ভিদ বা ঘটপত্রী নামে এক প্রকার পতঙ্গভোজী উদ্ভিদ দেখা যায়। এদের পাতার মধ্যশিরা লম্বা হয়ে আগার দিকে বেড়ে যায় ও সেখানে কলসের মত একটি পাত্র সৃষ্টি হয়। কলসের মুখে একটি রঙীন ঢাকনা থাকে এবং তার মধ্যে প্রায় দু পাইট পরিমাণ সুগন্ধি মিষ্টিরস থাকে। কীট-পতঙ্গ লোভে পড়ে এই সুগন্ধি রস পান করতে এসে বসা মাত্রই পিছলে কলসের মধ্যে ঢুকে যায় এবং রসে ডুবে প্রাণ হারায়। তখন উপরের ঢাকনাটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় ও কলস হতভাগ্য কীটকে হজম করে ফেলে।

বাংলা দেশের খালে-বিলে ও মজা পুকুরেও ঝাঁঝি নামে এক প্রকার পতঙ্গভোজী জলজ উদ্ভিদ আছে। এদের শিকড়ের গায়ে কীট-পতঙ্গ ধরার ফাঁদ থাকে। আমার জনৈক বোটানিষ্ট বন্ধুর পরীক্ষাগারে আমি নিজে চোখে দেখেছি কি ভাবে ঝাঁঝি তার ফাঁদের সাহায্যে শিকার ধরে গ্রাস করে। অবশ্য একটু চেষ্টা করলে যে কেউ এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। কারণ ঝাঁঝি সংগ্রহ করা এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে এই সব পতঙ্গভোজী উদ্ভিদরা কীট-পতঙ্গের দেহ থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে থাকে।

আর্জেন্টিনার বিশাল অরণ্যময় প্রদেশের ভ্যাম্পায়ার ট্রী ভয়ঙ্কর রক্তলোভী গাছ। এই গাছের পাতায় এমন মন-বিবশ করা গন্ধ আছে যে জীবজন্তু আকৃষ্ট হয়ে গাছের কাছে এলেই তাদের ভীষণ ঘুম পায়। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে রক্তলোভী ভ্যাম্পায়ার ট্রী ধীরে ধীরে তাদের রক্ত শোষণ করে নিঃশেষ করে ফেলে।

এছাড়া পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে নানা প্রকার মাংসভোজী ও পতঙ্গভোজী উদ্ভিদ দেখা যায়। সংখ্যায় এরা একেবারে নেহাৎ কম নয়। প্রায় সাড়ে চারশো। বিংশ শতকের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা অনেকে মানুষ খেকো গাছের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করলেও সম্প্রতি এমন কতকগুলি বিষাক্ত গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা মানুষ খেকো গাছের চেয়ে কোন অংশে কম মারাত্মক নয়।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল ব্রাজিলের ম্যানচিনীল গাছ। এর ফুল ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী বিষে ভরপুর। অ্যামাজন নদীর অববাহিকায় গভীর অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের কাছ থেকে শোনা যায় বসন্তকালে যখ এই গাছে ফুল ফোটে তখন যদি বাতাসের সাহায্যে কণামাত্র পরাগ কারো নাকের মধ্যে দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তবে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। আবার ভেনেজুয়েলার টাইগার ট্রী মানুষ অথবা জীবজন্তু নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই তাদের গায়ে এক রকম বিষাক্ত রস নিক্ষেপ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিষাক্ত উদ্ভিদ অ্যাডেনা-র বিষের কার্যকারিতা আর্সেনিক অথবা ষ্ট্রিকনিনের চেয়ে প্রায় কুড়ি হাজার গুণ বেশী। শুধু তাই নয়—এই বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু হলে দশ মিনিট পরে মৃতের দেহে কোনরূপ বিষের চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। তাই দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার বর্তমানে কড়া প্রহরাধীনে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অ্যাডেনা থেকে বিষ তৈরীর পদ্ধতিটি গোপন করে রেখেছেন।

আবার বিশাল ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত যবদ্বীপের উপাস গাছের পাতা থেকে এমন মারাত্মক ও বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় যে কোন জনপ্রাণী ভুলক্রমেও তার ধারে কাছে ঘেঁষে না। শোনা যায়, কাছাকাছি কোথাও নদী থাকলে সেখানে নাকি মাছ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এমন কি গাছের উপর দিয়ে কোন পাখি উড়ে গেলেও তারা বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখনো যবদ্বীপের আদিম অধিবাসীরা গৃহযুদ্ধের সময় তাদের শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করার জন্যে তীর, বল্লম, বর্শা প্রভৃতির মাথায় এই গাছের বিষ ব্যবহার করে থাকে। ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলেও বহু বিষাক্ত গাছ-গাছড়া আছে। আমাদের দেশের সাপুড়ে, ওঝা ও ফকির-বেদেদের ঝোলাঝুলি খুঁজলে হাতেনাতে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

যথার্থ সেবা

শ্রীসুলতা কর

যীশুখৃষ্ট একবার তাঁর ধর্মের উপদেশ দেবার জন্য জেরুসালেমের একটি ছোট গ্রামে এলেন। ওই গ্রামে দুই বিধবা বোন ছিল। বড় বোনের নাম মার্থা, ছোট বোনের নাম মরিয়ম। যদিও তারা গরীব ছিল, তবু সে গ্রামে তাদের মত যীশুখৃষ্টের ভক্ত আর কেউ ছিল না। যীশুখৃষ্টকে তারা ঈশ্বরের পুত্র বলে মেনে নিয়েছিল। তাঁর প্রচারিত নতুন ধর্মের বাণী তারা দিনরাত পড়ত।

যীশুখৃষ্ট ওই গ্রামে আসছেন, শোনামাত্রেই গ্রামের প্রধানেরা মার্থা ও মরিয়মের কাছে গিয়ে এই সুসংবাদ শোনাল। গ্রামের প্রধানেরা বলল—"মার্থা, মরিয়ম, আমাদের গ্রামে তোমরাই প্রভু যীশুখৃষ্টের সব চেয়ে বড় ভক্ত। সুতরাং তোমরাই তাঁকে ও তাঁর শিষ্যদের নিমন্ত্রণ করে তোমাদের বাড়ীতে আন।" গ্রামের প্রধানদের কথা শুনে দুই বোনের খুব আনন্দ হল। তারা যীশুখৃষ্টকে তাদের বাড়ীতে আসবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানাল। যীশুখৃষ্ট তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

যথাসময়ে যীশুখৃষ্ট শিষ্যদের নিয়ে সেই গ্রামে এলেন। মার্থা, মরিয়ম তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে এল। গরীবের ছোট বাড়ী মাত্র দুখানি ঘর। মার্থা, বড় ঘরটিতে তাদের যে একটিমাত্র দামী গালচে ছিল সেটি পেতে দিয়ে, যীশুখৃষ্ট ও তাঁর শিষ্যদের বসতে অনুরোধ করল। তাঁরা বসবামাত্রই সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। এই সব সম্মানীয় অতিথিদের কি করে সেবাযত্ন করবে

কি খাওয়াবে, কোথায় বিশ্রামের জন্ত বিছানা পেতে দেবে, এই সব ভেবে সে অস্থির হয়ে উঠল। ছুটাছুটি করে সব কাজ করতে লাগল। এত গরীব সে, যে তার একটিও দাসদাসী নেই। কাজের ব্যস্ততায় একবারও সে যে ঘরে যীশুখৃষ্ট বসে আছেন, সে ঘরে গিয়ে তাঁর কাছে বসবার সুযোগ পেল না, তাঁর মুখে ধর্ম্মের উপদেশও শুনল না।

ছোটবোন মরিয়ম কিন্তু মার্থার মত ব্যস্ত হয়ে উঠল না। যীশুখৃষ্ট বড় ঘরে বসামাত্রই মার্থা সযত্নে সুগন্ধি জল এনে নিজের হাতে তাঁর পা ধুইয়ে দিল, নিজের লম্বা চুল দিয়ে সেই পা মুছিয়ে দিল। তাঁর পায়ের কাছে বসে সমস্ত মন দিয়ে, তাঁর মুখ থেকে, নতুন ধর্ম্মের অমৃতবাণী শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে তার আর বাহ্যজ্ঞান রইল না। একবারও সে ঘর ছেড়ে উঠল না, বড় বোন মার্থাকে সংসারের কাজে সাহায্য করতে গেল না। এদিকে মার্থা, আর পারে না, কেবলই ভাবছে—মরিয়ম কোথায় গেল।

কাজের ব্যস্ততায় ছুটাছুটি করতে করতে মার্থা একবার বড় ঘরে উঁকি মেরে দেখল—মরিয়ম প্রভুর পায়ের কাছে চুপ করে বসে রয়েছে। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে এক মনে তাঁর কথা শুনছে। এমন ভাবে বসে রয়েছে যে দেখলেই বোঝা যায় যে তার সেখান থেকে উঠে আসবার বা কাজে মার্থাকে সাহায্য করবার কোন ইচ্ছা নাই।

তাই দেখে সে রাগে জ্বলে উঠল। তার আর হিতাহিত জ্ঞান রইল না। ছুটে বড় ঘরে গিয়ে যীশুখৃষ্টকে বলল—"প্রভু, আপনি আমার বোন মরিয়মের দিকে চেয়ে দেখুন। আপনি এ ঘরে আসা পর্য্যন্ত ও একবারও এঘর ছেড়ে গেল না, আমাকে কোন কাজে সাহায্য করল না। এটা কি ওর উচিত কাজ হল? মরিয়ম কি জানে না যে আমরা গরীব, আমাদের দাস দাসী নেই। আর আজ প্রভুর ও শিষ্যদের সেবার জন্ত সব কাজ আমাকে একা করতে হচ্ছে। এত কাজ একা করতে হচ্ছে। এত কাজ একা করার জন্ত, আমার কত কষ্ট হচ্ছে, সেটা বুঝে ওর কি আমাকে সাহায্য করার জন্ত এ ঘর থেকে উঠে আসা উচিত নয়? প্রভু, আপনি কি এ জন্ত মরিয়মকে ভৎর্সনা করবেন না?"

মার্থার কথা শুনে যীশুখৃষ্ট বললেন—"মার্থা, আমি এরকম অন্যায় কথা মরিয়মকে বলতে পারি না। কারণ মরিয়ম, তোমার চেয়ে অনেক বেশী আমার সেবা করেছে। মরিয়মের সেবাতে আমি খুব তৃপ্তি পেয়েছি।"

যীশুখৃষ্টের কথা শুনে মার্থা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। তারপর বলল—"প্রভু, আপনি এ কি আশ্চর্য্য কথা বলছেন। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আপনি এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত মরিয়ম আপনার কাছে চুপ করে বসে আছে, একবারও এ ঘর ছাড়েনি। আপনার সেবার কোন কাজে আমার সঙ্গে হাত লাগায়নি। অথচ আপনি বলছেন মরিয়ম আপনার এমন সেবা করেছে যে আপনি খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। মরিয়ম আমার চেয়ে অনেক বেশী আপনার সেবা করেছে।"

যীশুখৃষ্ট বললেন—"মার্থা, ভাল করে ভেবে দেখ আমি যা বললাম তা কতদূর সত্য। আমি তোমাদের বাড়ী আসা পর্য্যন্ত, তুমি একবারও আমার কাছে এসে বসলে না, আমার নতুন ধর্ম্মের উপদেশ শুনলে না, নিজের মনকে পবিত্র করলে না। তুমি কেবল আমার শরীরের সেবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে রইলে। আমাকে ও শিষ্যদের খাওয়া বিশ্রামের জন্ত বিছানা পাততে লাগলে। এই সব কাজে ব্যস্ত ও চঞ্চল হয়ে রইলে।

আর মরিয়ম, আমি আসতেই সুগন্ধি জল দিয়ে নিজের হাতে আমার পা ধুইয়ে দিল, নিজের লম্বা চুল দিয়ে আমার পা মুছিয়ে দিল। তারপর আমার পায়ের কাছে বসে একমনে আমার দেওয়া ধর্ম্মের উপদেশ শুনতে লাগল। তার আর বাহ্যজ্ঞান রইল না। আমি দেখলাম ধর্ম্মের বাণী শুনতে শুনতে শুনতে কেমন করে তার মনের ময়লা ধুয়ে যাচ্ছে, কেমন করে তার মন পবিত্র হয়ে উঠছে। এ ঘর ছেড়ে উঠে গিয়ে সে তোমাকে সংসারের কাজে সাহায্য করতে পারল না তাই দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। বুঝলাম মরিয়মই আমার যথার্থ সেবা করল।

মার্থা, তুমি আমার ধর্ম্মের বাণী পড়েছ, তুমি জান শরীরের চেয়ে মন বড়। দেহের সেবার চেয়ে মনের সেবা করলে, আত্মার পবিত্রতা সাধন করলে, অনেক বড় কাজ হয়।

তোমার বোন মরিয়ম আমার মনের সেবা করল, আর তুমি আমার দেহের সেবা করলে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, তোমার বোন মরিয়ম আমার যথার্থ সেবা করেছে।"

খৃষ্টের কথা শুনে লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে মার্থার মাথা হেঁট হয়ে গেল।

স্বামী বিবেকানন্দের গল্প

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

আমেরিকা। ১৮৯৩ সাল।

চিকাগো সহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ান এক তরুণ সন্ন্যাসী। যেমন দীর্ঘকায় তেমনি বলিষ্ঠ। যেমন বীর্য্যবান তেমনি তেজোদীপ্ত। প্রশস্ত নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় ললাট। বুদ্ধি দীপ্ত দীর্ঘায়ত নয়ন। মুখমণ্ডল এক ঐশ্বরিক লাবণ্যে মণ্ডিত। দেবপ্রতিম শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি।

বিচিত্র বেশ বিন্যাস সন্ন্যাসীর, পরনে গেরুয়া বসন, মাথায় গৈরিক পাগড়ী, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু।

এই শীত প্রধান দেশে এমন পোষাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ বেমানান—অনুপযুক্ত।

অদ্ভুত বেশধারী এই সন্ন্যাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক; নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে সন্ন্যাসীর দিকে। কেহ বা কৌতুকে মৃদু হাস্য করে।

সন্ন্যাসীর সে দিকে দৃষ্টি নেই; নেই কোন ভ্রূক্ষেপ। তিনি খুঁজছেন একটি ঠিকানা। ডাক্তার ব্যারোজ সাহেবের ঠিকানা। চিকাগো ধর্ম্ম মহাসম্মেলনের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা ডাক্তার ব্যারোজ।

সন্ন্যাসী এসেছেন সুদূর ভারতবর্ষ থেকে। তিনি এসেছেন বেদান্ত প্রচারের মানসে। ইচ্ছা ধর্ম্ম মহাসম্মেলনে যোগদান করেন। প্রচার করেন ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ এক সনাতন ধর্ম্ম। পৃথিবীর এক প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম।

কিন্তু পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা।

সম্পূর্ণ অনাহূত অপরিচিত। তার উপর ধর্ম্ম সম্মেলনে প্রতিনিধি গ্রহণের সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

এখন উপায়।

উপায় একটা হলো। একদিন হঠাৎ একজন অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হলো সন্ন্যাসীর। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক তিনি। যেমন বয়সে প্রবীণ তেমনি অগাধ পাণ্ডিত্য। যেমন উদার তেমনি সহৃদয়। তিনি সন্ন্যাসীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য আর মনীষায় মুগ্ধ হলেন। ততোধিক বিস্মিত হলেন ভারত আত্মার অমৃতবাণী হৃদয়ঙ্গম করে। মুগ্ধ হলেন উদার হিন্দুধর্ম্মের শাশ্বত সত্য ও প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে। এ হেন মহান ধর্ম্মের একজন প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন ধর্ম্মমহাসম্মেলনে। আর জ্ঞান ও মনীষার জীবন্ত বিগ্রহ এই সন্ন্যাসীই হলেন সেই ধর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিনিধি।

অধ্যাপক মহাশয় সন্ন্যাসীর পরিচয় দিয়ে ডাক্তার ব্যারোজ সাহেবকে একখানি পত্র লিখে দিলেন। সন্ন্যাসীকে ধর্ম্মসম্মেলনের একজন প্রতিনিধি মনোনীত করার জন্য অনুরোধ জানালেন। আর শেষে লিখলেন, এই সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য আমাদের দেশের দশজন মহাজ্ঞানী পণ্ডিতের সমান।

সেই চিঠি সম্বল করে সন্ন্যাসী বেরিয়ে পড়লেন চিকাগো অভিমুখে। উৎসাহে ভরপুর যে মন নিয়ে তিনি বোস্টন থেকে এসেছিলেন চিকাগোয়, পৌঁছিয়ে সে উত্তম আর উৎসাহ রইল না। এক নিমেষে সব অন্তর্হিত হয়ে গেল। নিভে গেল সমস্ত আশার আলো। এই অচেনা অজানা সহরে কোথায় তিনি খুঁজবেন ডাক্তার ব্যারোজ সাহেবের অফিস। এই বিরাট সহরে আজই তিনি প্রথম পদার্পণ করলেন।

দুর্ভাবনায় তাঁর মন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। কিন্তু তিনি চুপ করে বসে রইলেন না। বেরিয়ে পড়লেন ডাক্তার ব্যারোজ সাহেবের অফিসের সন্ধানে। সারা দিন পথে পথে ঘুরলেন। সারা সহরময় তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কিন্তু হায়। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। কোন সন্ধানই পেলেন না তিনি। দু' একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলেন না। তারা তাঁকে নিগ্রো মনে করে ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়।

এমনি করে সারাটা দিন কেটে গেল। দিনের শেষে ক্লান্তি নেমে এলো। ক্ষুধায় কাতর হয়ে উঠলেন। অবশেষে একটি হোটেলে গিয়ে উঠলেন। আশ্রয় আর কিছু আহার্য্য লাভের আশায়। কিন্তু সেখানে না মিলল আশ্রয়, না পাওয়া গেল আহার্য্য। হোটেলের ম্যানেজারও তাঁকে নিগ্রো মনে করে হোটেলে স্থান দিলেন না।

হোটেল থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে নেমে এলেন সন্ন্যাসী। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। শন্‌শন্ করে ঠাণ্ডা কন কনে হাওয়া বইছে। কখনও কখনও তুষারপাত হচ্ছে। সন্ন্যাসীর গায়ে এতটুকু শীত বস্ত্র নেই। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চলেছেন সন্ন্যাসী নিস্তব্ধ রাত্রির আলো আঁধারি পথ বেয়ে। কোথায় একটু মাথা গোঁজার মত আশ্রয় পাবেন, সে খোঁজে চলেছেন।

হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে রেলওয়ে গুদামের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। একটা লাইট পোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন।

দুঃখ কষ্ট আর হতাশার বেদনায় ভেঙ্গে পড়লেন সন্ন্যাসী। উষ্ণ অশ্রু নেমে এলো দু'চোখ বেয়ে। হঠাৎ এক সময় তাঁর চোখে পড়ল একটা বাক্স। প্যাকিং বাক্স। বেশ বড়। একটা মানুষ হাত পা গুটিয়ে কোন রকমে বসে থাকতে পারে।

আশার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সন্ন্যাসীর চোখ। জ্বলজ্বল করে উঠলো চোখের তারা দুটি। এরই মধ্যে কোন রকমে রাত কাটিয়ে দেবেন। হয়তো এই দুর্জ্জয় শীতের হাত থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। এই ভেবে সন্ন্যাসী সেই প্যাকিং বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বাইরে ভীষণ তুষার ঝড় বইছে। আর সন্ন্যাসী সেই প্যাকিং বাক্সের মধ্যে হাত পা গুটিয়ে অন্ধকারে বসে আছেন।

ধীরে ধীরে কালরাত্রির অবসান হলো। প্রভাত রবির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আশা আর উত্তম নিয়ে প্যাকিং বাক্স থেকে বেরিয়ে এলেন সন্ন্যাসী। অহোরাত্র অনাহারে আর অনিদ্রায় কেটেছে। ক্ষুধায় ভীষণ কাতর। দেহ ক্লান্ত—অবসন্ন। কোন প্রকারে উঠে দাঁড়ালেন।

ক্ষুধার জ্বালায় আর থাকতে পারলেন না সন্ন্যাসী। ভিক্ষায় বেরুলেন। যদি কিছু ভিক্ষা মেলে! তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু হায়। তাঁর জীর্ণ মলিন বেশভূষা আর ক্ষুধার্ত পাণ্ডুর মুখমণ্ডল দেখে কারুর এতটুকু করুণা হলো না। কেউ দয়া করে এক টুকরা রুটি ভিক্ষা দেলে না।

গভীর হতাশায় এবার ভেঙ্গে পড়লেন সন্ন্যাসী। ক্লান্ত অবসন্ন দেহের ভার আর বইতে পারলেন না। বসে পড়লেন রাজপথের উপর। বসে পড়লেন পথিপার্শ্বস্থ একটি বিরাট অট্টালিকার দ্বার দেশে। বসে বসে স্মরণ করতে লাগলেন শ্রীগুরুর নাম।

কিছুক্ষণ পর অট্টালিকার দ্বার উন্মুক্ত হলো। বেরিয়ে একজন অপরূপ সুন্দরী মহিলা। দেবদূতের মত আবির্ভূতা হলেন সন্ন্যাসীর সম্মুখে। মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? আপনার কি প্রয়োজন?

—আমি একজন সন্ন্যাসী। আমাকে দয়া করে ডাক্তার ব্যারোজ সাহেবের অফিসের ঠিকানাটা বলে দিতে পারেন।

—আপনি কি ধর্ম্মমহাসম্মেলনের একজন প্রতিনিধি?

—না। তবে প্রতিনিধি হওয়ার জন্যই ডাক্তার ব্যারোজ সাহেবের ঠিকানা খুঁজছি। এই বলে সন্ন্যাসী সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে মহিলাকে জানালেন।

—আপনাকে বড়ই পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। আপনি বিশ্রাম করুন, আপনার কোন ভাবনা নেই, আমি আপনাকে ডাক্তার ব্যারোজ সাহেবের অফিসের ঠিকানা বলে দেব।

ভদ্রমহিলা নিজের বাড়ীতে সন্ন্যাসীকে আহ্বান করলেন। পরিচর্য্যার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন দাস-দাসীকে দিয়ে। সুস্বাদু প্রাতর্ভোজনের আয়োজন করলেন। টেবিলের উপর সাজিয়ে দিলেন প্রাতরাশ। নানাবিধ উপাদেয় সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী।

ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসী গোগ্রাসে উদর পূর্ণ করলেন। গৃহকর্ত্রীর অনুরোধে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। সন্ন্যাসীর সমস্ত অবসন্নতা আর ক্লান্তি দূরীভূত হলো। তিনি নবজীবন লাভ করলেন।

সাহেবের অফিস অভিমুখে। ডাক্তার ব্যারোজ তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সকল সংবাদ অবগত হয়ে তিনি সন্ন্যাসীকে ধর্মসম্মেলনের একজন প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করলেন।

সন্ন্যাসীর মনস্কামনা পূর্ণ হলো।

কিন্তু কে এই সন্ন্যাসী? কি অদম্য তাঁর উত্তম আর অধ্যবসায়। অনির্বাণ তাঁর উৎসাহ আর উদ্দীপনা। অসীম তাঁর সাহস আর মানসিক দৃঢ়তা। বিদেশে বিভূঁয়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে পথে পথে ঘুরেছেন। অনাহারে অনিদ্রায় দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। বিদেশীর অনাদর আর অপমান সহ্য করেছেন। হাসিমুখে বরণ করেছেন সকল দুঃখ কষ্ট। তবু হার মানেন নি—পরাজয় স্বীকার করেন নি। শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি বিদেশে চিকাগো ধর্মসম্মেলনে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করে বিজয়ীর জয় মুকুট মাথায় নিয়ে বীর সন্ন্যাসী স্বদেশে ফিরে আসেন।

তিনি আর কেউ নন—বাঙলার গৌরব স্বামী বিবেকানন্দ।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সন।

বিরাট একটি হলঘরে ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্লাটফর্মের উপর বসে আছেন দেশ বিদেশের প্রতিনিধি। সকল ধর্মের আচার্যগণ। পৃথিবীর সেরা পণ্ডিতের দল। সামনে বিরাট গ্যালারী, তাতে বসে আছেন আমেরিকার ছয় সাত হাজার সুশিক্ষিত নরনারী।

একে একে সকল ধর্মের প্রতিনিধিরা এসে বক্তৃতা করে গেলেন। নিজেদের ধর্মের জয়গান গেয়ে গেলেন সকলে। তাঁরা সকলেই বললেন, তাঁদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ, আর অন্যগুলি সব ব্যর্থ—ভ্রান্ত। তাঁদের ধর্মই ঈশ্বর লাভের একমাত্র পন্থা।

এবার সন্ন্যাসীর পালা। বক্তৃতা করার পালা। সভাপতি মহাশয় বক্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সন্ন্যাসীর বুক কেঁপে উঠলো। তিনি ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। কি বিরাট জনসমাবেশ। এখানে তিনি কি বলবেন—কে শুনবে তাঁর কথা। ইতিপূর্বে যাঁরা বক্তৃতা করে গেলেন তাঁরা সবাই তাঁদের বক্তব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করে এনেছিলেন। এখানে শুধু তা পাঠ করে গেলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী! তিনি কিছুই লিখে আনেন নি। বক্তৃতা করা তাঁর তেমন অভ্যাসও নেই। বক্তৃতা করেছেনও কম।

তবে? সন্ন্যাসী কি বক্তৃতা করবেন না?

সন্ন্যাসী শ্রীগুরুর নাম স্মরণ করলেন। দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বক্তৃতামঞ্চে উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন তখনও তাঁর পা থর থর করে কাঁপছে। কি বলবেন ঠিক করতে পারছেন না। সহসা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো সেই মহাবাণী—যা সমগ্র আমেরিকাবাসীকে মুগ্ধ বিস্মিত করলো। হে আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ!

এ কি সম্ভাষণ। এমন আন্তরিক সম্বোধন কেউ কখনও করেনি। ভ্রাতৃ ও ভগ্নী সম্বোধনে সভাকক্ষ ভীষণ করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। সভার প্রতিটি নরনারীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। কথা বললেন না। বিলাস বৈভবে মদমত্ত ভোগ অহঙ্কারে আচ্ছন্ন আমেরিকাবাসী মুগ্ধ বিস্ময়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনলো।

"কোন ধর্ম বিশেষই কালে জগতের একমাত্র ধর্ম হইয়া যাইবে অথবা কোন বিশেষ ধর্মই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পন্থা এবং অন্যান্য ধর্মগুলি ভ্রান্ত, এইরূপভাব অন্তরে যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা বাস্তবিকই করুণার পাত্র। • • • খৃষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না, হিন্দু ও বৌদ্ধকেও খৃষ্টান হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পরস্পরের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ও প্রকাশের নিয়মানুগ হইয়া বিস্তারলাভ করিবে।

আধ্যাত্মিকতা, পবিত্রতা এবং দাক্ষিণ্য কোন বিশেষ ধর্মের একচেটিয়া বস্তু নহে। এবং প্রত্যেক বিশেষ ধর্মসাধনায়ই মহান চরিত্র নরনারীরা আবির্ভূত হইয়াছেন। অতঃপর প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় • • • প্রতিরোধ সত্ত্বেও লিখিত হইবে,—যুদ্ধ নহে সাহচর্য্য, ধ্বংস নহে আত্মস্থ করিয়া লওয়া, ভেদদ্বন্দ্ব নহে সামঞ্জস্য ও শান্তি।"

এমন সহজ সুন্দর হৃদয়স্পর্শী বাণী এর আগে কেউ তাদের বলে নি—কখনও শোনায় নি। আমেরিকাবাসী উদগ্রীব হয়ে শুনলো সেই মহাবাণী।

সন্ন্যাসী অতঃপর একে একে বেদান্ত ধর্মের বিশিষ্টতা, তার বহু বিচিত্র অনুভূতি আর বিরাট আদর্শের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেন। হিন্দুর বেদান্তবিহিত ধর্মকে জগতের শ্রেষ্ঠধর্মরূপে প্রমাণিত করলেন। সকল ধর্মের সমন্বয়কারী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের তপস্যালব্ধ অমৃতবাণী, পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মাচার্য্য ও আমেরিকাবাসী প্রতিটি নরনারীর হৃদয় মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিল। তাঁরা বুঝতে পারলেন ভারতের জাতীয় জীবনে এক অপূর্ব উদার আধ্যাত্মিকতা লুকিয়ে রয়েছে যা বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে বিরল।

সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শেষ হলে সকলে তাঁকে ধন্য ধন্য করে উঠলেন। মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি হতে লাগলো তাঁর নামে। সভাপতিগণ একবাক্যে সন্ন্যাসীর বিজয় ঘোষণা করলেন। সন্ন্যাসীর এই বিজয়বার্তা বিদ্যুৎগতিতে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু ইউরোপেই সীমাবদ্ধ রইল না। তাঁর জয়যাত্রা সুরু হলো দেশ থেকে দেশান্তরে। চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে ভারত সন্ন্যাসীর এই বিজয় ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

দুপুরে

শেফালি মোদক

নিঝুম দুপুর	ভাসছে মেঘ	আকাশ নীল
গড়াই শুয়ে	জমছে ঘাম	উড়ছে চিল।
কিচির মিচির	বাঁধছে বাসা	চড়ুই ছুটে।
সারাদিন	করছে জড়ো	খড়কুটো।
নির্জন পথ	পুড়ছে রোদে	নেইক কেউ
দীঘির জলে	মৃদু হাওয়া	তুলছে ঢেউ।
গাছের তলে	গরুর গাড়ী	ঘুমায় মালিক
নিমের ডালে	পাতার ফাঁকে	ঝিমায় শালিক।

ভগীরথের শঙ্খধ্বনি

দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

অকস্মাৎ ছেয়ে এলো মেঘ

আট

একাদশ শতকের শেষ হয়ে আসে। দ্বাদশ শতকের শুরু। বাংলার বুকে জেগে উঠল সেনবংশ। "রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত" সেনেরা এসেছিলেন বাংলায়। কর্ণাট দেশ থেকে সেই সুদূর দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে চালুক্য রাজের সমরাভিযানকালে।

ছোট্ট জমিদারী নিয়ে সামন্ত সেন দিন কাটিয়ে গেলেন। কোনও সুবিধে করতে পারলেন না। তাঁর ছেলে হেমন্ত সেন ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন। তিনি জানতেন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে পারিবারিক কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে। সামন্তরা বিদ্রোহ করছে। মহীপাল ছটফট করছেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। প্রজাদিকে বিরক্ত করছেন। প্রজারা তাঁর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চাচ্ছে। অরাজকতা চলছে। রাজ্যশাসন করার এই সুযোগ। রাঢ় অঞ্চলের খানিকটা দখল করে নিলেন তিনি।

হেমন্ত সেনের পর তাঁর ছেলে বিজয় সেন রাঢ়ের সেই ছোট্ট রাজ্যের হলেন সামন্তরাজ। ওদিকে রামপাল ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে সামন্তরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বিজয় সেন রামপালের দলে যোগ দিলেন। রামপালের পর পাল রাজাদের অক্ষমতার সুযোগে বিজয় সেন তাঁর রাজ্য বাড়িয়ে চলেন। প্রথম বিয়ে করলেন শূর বংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবীকে। আগে উল্লেখ করেছি পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বর্মণ-রাজবংশ পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। সে বংশের রাজারা হলেন—জাত বর্মা হরি বর্মা, সাল বর্মা ও রাজ বর্মা। বিজয় সেন ভোজ বর্মাকে পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ দখল করেন। বিজয় সেন শক্তিবৃদ্ধি করতে থাকেন। মদন পাল রাজা হন। বিজয় সেন সৈন্যদল নিয়ে মদন পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। মদন পালের রাজ্য বলতে ছিল উত্তরবঙ্গ ও মগধের পূর্ব ও মধ্যাংশ। কালিন্দী নদীর তীরে তাঁদের যুদ্ধ হয়। মদন পাল মগধে পালাতে বাধ্য হন। উত্তরবঙ্গ আসে বিজয় সেনের অধিকারে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ তাঁর হাতে আগেই চলে এসেছিল। বিজয় সেন সমগ্র বাংলাদেশের রাজা হলেন। বাংলার লোকরা ভাবল, "ও সেই কর্ণাট থেকে আসা লোক। দেশে তেমন কোনও রাজা নেই, এরাই রাজা হোক।" পাল রাজারা ছিলেন বাঙ্গালী, তাই প্রসন্নচিত্তে বাঙ্গালীরা তাঁদিকে হৃদয়ের রাজসিংহাসনে বসিয়েছিল। গেয়েছিল তাদের হৃদয়রাজার জয়গান। সেন রাজারা কিন্তু বিদেশী, তবু অগতির গতি হিসেবে তাঁদিকে অপ্রসন্ন চিত্তে তারা মেনে নিল।

বিজয় সেন দেখলেন সারা বাংলা অশান্তি আর গোলযোগে ভরা। তাই তাঁর প্রধান কাজ হোল এই সব অশান্তি আর গোলযোগ দূর করা। তাঁর সুশাসনে দেশে আবার ফিরে আসে শান্তি ও শৃঙ্খলা। সুশাসনের জন্যে তিনি দেশকে পাঁচ ভাগে ভাগ করলেন। সে পাঁচ ভাগ হোল—রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগড়ী আর মিথিলা। বিজয় সেন এবার বাংলার বাইরের দিকে তাকালেন। একে একে তিনি তীরভুক্তি (উত্তরবিহার), কামরূপ (আসাম), কলিঙ্গ ও মাদ্রাজের উত্তরাংশ জয় করলেন। হুগলীজেলার ত্রিবেণীর কাছে তিনি "বিজয়পুর" নামে একটি নতুন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন।

বিজয় সেন বিজয় করে মারা গেলেন আর সিংহাসনে বসলেন তাঁর ছেলে বল্লাল সেন। এগারশো' আটান্ন খৃষ্টাব্দে। গোবিন্দ পাল গয়ার কাছে এক ছোট রাজ্যে রাজত্ব করছিলেন, কিন্তু "গৌড়েশ্বর" বলে তিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন। বল্লাল সেন তাঁকে রাজ্য থেকে উৎখাত করলেন। বল্লাল সেন ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। একদিকে তিনি করতেন শাস্ত্র আলোচনা, অন্যদিকে তিনি করতেন রাজ্য পরিচালনা।

এগারশ উনিশ খৃষ্টাব্দ। বল্লাল সেন বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। রাজ্যভার অর্পণ করলেন তাঁর ছেলের হাতে। রাজা হলেন লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য দক্ষিণে কলিঙ্গ, আর পশ্চিমে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। রাজধানী ছিল গৌড়ে। গৌড়ের নাম দেন তিনি লক্ষ্মণাবতী। তাঁর বাপ ঠাকুর্দা ছিলেন শৈব কিন্তু তিনি হলেন বৈষ্ণব। কুড়ি বছর রাজত্ব করে তিনি ঠিক করলেন নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে শান্তিতে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু শান্তিতে বাস করতে হোল না। সুন্দরবন অঞ্চলে মহারাজাধিরাজ উপাধি নিয়ে শ্রীডোম্মন পাল এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরা রাজ্যে রণবঙ্কমল্ল হরি কালদেব স্বাধীন হয়ে উঠলেন। মেঘনার পূর্বতীরে মধুসূদনদেব স্বাধীন হয়ে উঠলেন ও রাজা আখ্যা গ্রহণ করেন। দেশ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। বারো শ' দুই খৃষ্টাব্দ, পাঠানরা এল। অতর্কিত ভাবে। নবদ্বীপে রাজা লক্ষ্মণ সেন। নবদ্বীপের চারিধারে ছিল না কোনও প্রাচীর। দুপুর বেলা আঠারো জন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খিলজী এলেন অশ্ববিক্রেতারূপে। লক্ষ্মণ সেনের সৈন্যরা অপ্রস্তুত। শহরবাসী কর্মব্যস্ত। ঘোড়া বিক্রী করতে এসেছে বলে কেউ বাধাও দেয় না। কিন্তু পিছনে ছিল সৈন্যদল। তারা এবারে শহরে প্রবেশ করে। লক্ষ্মণ সেনের সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। প্রতিরোধ ব্যবস্থা তেমন সক্রিয়ও ছিল না। তখনকার লোকদের ছিল জ্যোতিষে বিশ্বাস। জ্যোতিষীরা প্রচার করেছিল যে, পাঠানরা বাংলাদেশ জয় করবে, কেউ তাদের আটকাতে পারবে না। সুতরাং জনসাধারণের বিশ্বাস হয়েছিল যে তাদের আটকানো বৃথা। লক্ষ্মণ সেন কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি পাঠানদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করবার জন্যে প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে? ইতিহাসের অমোঘ বিধানে ঘটনাচক্রের আবর্তনে তাঁর সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থ হোল। লক্ষ্মণ সেন নৌকায় করে গঙ্গা পেরিয়ে পূর্ববঙ্গে পালালেন।

"দৌড়। দৌড়। দিলেন দৌড় গৌড় থেকে বঙ্গ।
লক্ষ্মণ সেন রাজা, তাঁর রাজ্য হলো, ভঙ্গ।"

(অন্নদাশঙ্কর রায়)

বখতিয়ার খিলজী দখল করলেন নবদ্বীপ বা নদীয়া অঞ্চল। লক্ষ্মণ সেন এরপর তিন চার বছর মাত্র বেঁচে ছিলেন। এরপর বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন উনিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পাঠানদের কয়েকবার যুদ্ধ হয়, কিন্তু পাঠানরা প্রত্যেকবারই

পরাজিত হতে থাকে। পূর্ববঙ্গের নদীনালা, খালবিল পেরিয়ে পাঠানরা এগোতে পারে না। এরপর মাধব সেন, শূর সেন, পুরুষোত্তম সেন প্রভৃতি সেনরাজাদের নাম শোনা যায়। বারো' বাট খৃষ্টাব্দের পর আর কোন সেন রাজার নাম শোনা যায় না। এরপর পূর্ববঙ্গে দেববংশের রাজাদের আধিপত্য স্বীকৃত হয়। আগে মধুসূদন দেবের নাম করেছি। তাঁরপর রাজা হন বাসুদেব, দামোদর দেব, দশরথ দেব (১২৮৩ খৃষ্টাব্দ) প্রমুখ রাজারা। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের শেষে হিন্দু রাজা রইল না আর দেশে।

পালরাজাদের আমলে বাংলাদেশ ছিল বিস্তৃত, বাংলার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদবিভেদের কোনও অস্তিত্ব ছিল না, একটা একাকারের ভাবাবস্থা ছিল। সেনরাজাদের আমলে বাংলাদেশ বিস্তৃত হয়ে উঠতে পারেনি। একটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ছিল সঙ্কীর্ণ। এই সঙ্কীর্ণতাই সেনযুগের বৈশিষ্ট্য। পাল আমলেই বাংলাদেশে বর্মণরাজবংশীয়রা বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে থাকেন। তাঁরাই প্রথম ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রবর্তন করেন। রাজা জাত বর্মার সৈন্যরা সোমপুরের বৌদ্ধবিহার পুড়িয়ে দিয়েছিল। এই রাজাদের মন্ত্রী স্মার্ত ভবদেব ভট্ট বৌদ্ধতরঙ্গকে গ্রাস করেছেন বলে গর্ব করেছেন। ভবদেব ভট্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর দশকর্ম পদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ নামে স্মৃতিগ্রন্থ দুটি আজও চলে। বর্মণ রাজাদের আমলে যার সূচনা সেন আমলে তার প্রতিষ্ঠা। সেনরাজবংশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে আস্থাবান ও তাঁরা পরম নিষ্ঠাবান ধারক ও বাহক। তাই রাষ্ট্রের সক্রিয় সচেতন হাত এবার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তৃতির সহায়করূপে দেখা দিল। বাংলার আকাশ বাতাস যাগযজ্ঞ ও পূজানুষ্ঠানের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল। সেনরাজাদের বড় কাজ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা নয়, এর চেয়ে বড় কাজ হোল ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। সমাজ সংস্থাপক হিসেবেই তাঁদের বড় পরিচয়। তাঁরা বাংলার জাতিকে ব্রাহ্মণ ভাবাদর্শে সংগঠিত করলেন। এই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটা একনায়কত্বের সূচনা হোল। এই একনায়কত্ব একটি মাত্র বর্ণের—ব্রাহ্মণের, একটি মাত্র ধর্মের—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের, একটি মাত্র সামাজিক আদর্শের—ব্রাহ্মণ্য আদর্শের। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মাথারা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আধিপত্য অর্জনের পর সবদিক থেকে বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের প্রাচীর তুলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। বল্লাল সেন বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক। তিনি করলেন কি, বাংলাদেশে যত ব্রাহ্মণ ছিল সবাইকে ঝেড়ে বেছে সমাজের সবচেয়ে উপরে বসালেন। বল্লাল সেনের পক্ষে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁদিকে তিনি সবার উপরে উঠালেন। যারা তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন তাঁদিকে তিনি নীচে নামালেন।

"বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট্ট করি নীচকে বাড়ায়।
কাহাকে কুলীনপদ দিয়া বাড়াইল।
কাহার কুলীনপদ কাড়িয়া লইল।।"

ব্রাহ্মণদিকে আবার তাদের বাসস্থান অনুযায়ী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, বৈদিক, শ্রোত্রীয় প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হোল। সমাজের একদিকে রইলেন যত সব ব্রাহ্মণ, অন্যদিকে যতো সব জাতি রইল তাদিকে বলা হোল শূদ্র। শূদ্রদিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হোল—সংশূদ্র আর অসংশূদ্র। সংশূদ্র হোল নাপিত, মোদক, তাম্বুলী, গোপ, বৈদ্য, করণ ইত্যাদি। এই সময় শ্রম ও শ্রমসাধ্য পেশা নিন্দিত হয়েছিল। তার রেশ আজকেও রয়ে গেছে। বল্লাল সেন একবার বণিকদের উপর চটে যান তাই তিনি তাদের সমাজে পতিত করেন। স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, চিত্রকর, চর্মকার, ধীবর, রজক প্রভৃতিদের সামাজিক মর্যাদা রইল না। এরা হোল অসংশূদ্র। শূদ্রদের মধ্যে স্থান পেয়েছিল—একচল্লিশটি জাত। বাংলার সমস্ত লোক কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিন্যাসে ঠাঁই পেল না। ডোম, কোল, হাড়ি, জোলা, চণ্ডাল এরা বর্ণাশ্রমের বাইরে রয়ে গেল অত্যন্ত অস্পৃশ্য হয়ে।

ব্রাহ্মণরা রাজার প্রশ্রয় পেয়ে অবিবেচক আর অত্যাচারী হয়ে উঠল। বৌদ্ধদের তারা নির্যাতন করতে লাগল। দক্ষিণার জন্যে যজমানকে জ্বালাতন করতে লাগল। ব্রাহ্মণরা সর্বেসর্বা হোল। অন্য জাতের উপর তারা জুলুম চালাতে লাগল। জাত-ভেদাভেদ দেখা দিল। কত জাতি অস্পৃশ্য ভাবেও হেয় হয়ে সমাজের বাইরে কায়ক্লেশে দিন কাটাতে লাগল। সমাজের নিয়ম কানুন কড়াকড়ি হোল। কেউ একচুল এধার ওধার গেলে শাস্তি হতে লাগল, সমাজে পতিত হতে লাগল। কথায় আছে, "বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো।" বাইরে যাগযজ্ঞ হোম ধর্মানুষ্ঠানের ঘটা চলল, ভিতরে ভিতরে চলল পাপ ও কু-কাজ। নানারকম বিকৃত বুদ্ধি অহঙ্কার, জাত্যাভিমান, বিদ্বেষ, ঘৃণা আর স্বার্থপরতা নাগরিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। নীতিবিগর্হিত ও পাপকলুষিত আচার আচরণে দেশ ভরে গিয়েছিল। দেবদাসী প্রথা এসময় চালু হয়। যে মেয়েরা মন্দিরে থাকত মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত প্রাণ হিসাবে তাদিকে বলে দেবদাসী। তারা মন্দিরের নাচনের কাজে থাকত। তাছাড়া নটীদের সংখ্যাও খুব বেড়ে যায়, নটীরা রাজসভায় বা নিজেদের বাড়িতে নাচত, বড়লোকরা সব দেখত।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার হওয়ায়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রাজদরবারে স্বীকৃতি পাওয়ায়, এসময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নিয়ে অনেক আলোচনা হয় ও অনেক বই পত্তর লেখা হয়। প্রথমেই নাম করতে হয় জীমূতবাহনের কালবিবেক, দায়ভাগ ও ব্যবহারমাতৃকা এই বিখ্যাত বই তিনটি তাঁর লেখা। বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নিয়ে পাণ্ডিত্য সুলভ অনেক আলোচনা করেছেন। 'হরলতা' ও আর একটি বই 'তিনি লিখেছেন। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রীদের মধ্যে মুখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হলায়ুধ পাঁচখানা বই লিখেছেন। ব্রাহ্মণসর্বস্ব মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব আর পণ্ডিতসর্বস্ব। সনাতন "টীকাসর্বস্ব" নামে একটি বই লেখেন। এতে অনেক বাংলা দেশী শব্দ জোগাড় করা হয়েছে। সেন আমলে অনেক নাটকও লেখা হয়। এ সময় নাচ গান নাটকে খুব কদর ছিল। কেশব সেনের রাজত্ব কালে শ্রীধর দাস "সদুক্তি কর্ণামৃত" নামে এক গ্রন্থে চারশো পঁচাশি জন সর্বভারতীয় ও বাঙ্গালী কবির রচনার নমুনা সঙ্কলিত করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় অনেক বিখ্যাত কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। জয়দেব, ধোয়ী কবিরাজ, উমাপতি ধর, গোবর্ধনাচার্য, প্রমুখের নাম সুপরিচিত জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" জগদ্বিখ্যাত।

"বাংলার কবি জয়দেব রবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে"

গোবর্ধনাচার্যের "আর্যাসপ্তশতী" ভারতবিখ্যাত। ধোয়ীর "পবনদূত" কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে লেখা। লক্ষ্মণ সেনের স্তুতিবাদ এই কাব্যের উদ্দেশ্য। স্বয়ং বল্লাল সেন "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" নামে দু'টি বই লিখেছেন। ওদিকে বাংলার লোক-সমাজে রামায়ণের কাহিনী পাল আমলেই প্রচলিত হয়েছিল। সেন আমলে লোকসমাজে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী খুব চালু হয়েছিল। জয়দেব খুব ভালো গান গাইতে পারতেন আর তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী খুব ভালো নাচতে জানতেন।

সেন আমলেও শিল্পকলার ধারাটি বেশ ভালো ভাবেই চলে আসছিল। এমন সময় পুঁথিতে ছবি আঁকবার ব্যবস্থা চালু হয়। এ সময়কার রাজপ্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণে আড়ম্বর দেখা যায়। মূর্তি নির্মাণে অলঙ্কারের প্রাচুর্য আর অসাধারণ সৌন্দর্যের উদ্ঘাটন দেখা গিয়েছিল। বিজয় সেনের আমলে সব চেয়ে বিখ্যাত শিল্পী হলেন রাণক শূলপাণি। সেন আমলের আরও অনেক শিল্পীর নাম জানা গেছে। ভোগট, সুভট, তাতট, শঙ্খদাস, মহীধর, বিষ্ণুভদ্র, শশিদেব, প্রভৃতি সেন আমলের প্রখ্যাতশিল্পী।

দেশে চলেছে "বিলাসকলাসুকুতুহলম।" জাঁকজমক আর আড়ম্বরের শেষ নেই। এই আড়ম্বর কিন্তু ছিল সমাজের উপরওয়ালাদের মধ্যে। অন্যদিকে এমনি লোকও ছিল যারা নিজেদের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, "শিশুরা ক্ষুধায় আকুল, দেহ শবের মত শীর্ণ, আত্মীয়স্বজন বিমুখ, পুরনো গাড়ুতে এক ফোঁটা মাত্র জল ধরে—এ সমস্ত আমাকে তেমন কষ্ট দেয়নি। যেমন কষ্ট দিয়েছিল গৃহিণী যখন কাতর হাসি হেসে ছেঁড়া কাপড়টুকু সেলাই করবার জন্যে বার বার রুষ্ট প্রতিবেশিনীর কাছে সূচ চাইছিল তা দেখে।" কবি গরীব গৃহিণীর কথা বলেছেন "নিরানন্দে তার দেহ ভাঙ্গা আর রোগা, পরণে তার ছেঁড়া কাপড়, ক্ষিদেয় চোখ ও পেট বসে গেছে শিশুদের, তারা ব্যাকুল হয়ে খাবার চাইছে। গরীব গৃহিণী চোখের জল গায়ে ভাসিয়ে প্রার্থনা করেছে যেন এক মান চালে একশ' দিন চলে যায়।" একদিকে নিরানন্দ—নিরন্ন গরীব লোকের হা-হুতাশ চলেছে, অন্য দিকে বিলাস কলুষিত আড়ম্বর চলেছে। দেশে দেখা দিয়েছে ভেদ-বিভেদ। একজোট হয়ে কাকেও বাধা দেবে সে ক্ষমতা নেই। অন্য দিকে লোকের শক্তিমত্তা কমে গিয়েছিল—কারও উপবাসে, কারও বিলাসে। লোকেরা হয়ে উঠেছিল গোড়া, প্রাণ দিতে রাজী, কিন্তু যুদ্ধ করতে নারাজ। এমনি দিন চলছিল সেন আমলে। স্বচ্ছল গৃহস্থের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল।

"পুত্র পাবিত্র বহুত্ত ধনাভত্তি কুটুম্বিনি সুদ্ধমনা
হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণ কো কর বব্বর সগ্‌গমনা।।"

সুপুত্র, বেশ টাকা কড়ি আছে, স্ত্রী কুটুম্বিনীরা হাসিমুখে ঘরের কাজ করছে। চাকররা হাঁক শুনে ত্রস্ত—এমনি সংসারের অবস্থা। এ-সব ছেড়ে যে স্বর্গে যেতে চায় সে নিতান্তই বর্বর।

সত্যি কথা। এমনি অবস্থা হলে কে আর তাড়াতাড়ি মরতে চায়। পৃথিবী থেকে স্বর্গে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি করে। যে এমনি করে সে নিশ্চয় মানুষ নয়। কেননা মানুষের কামনা—"মরিতে চাহিনা এ সুন্দর ভুবনে," তাই তাকে বর্বরই বলতে হবে। যা হোক, দেশের সুখী গৃহস্থেরা স্বর্গে যেতে না চাক তারা আর হি[ন্দু] রাজত্বে বাস করতে পারলো না, মুসলমান রাজত্বে তাদিকে [যে]তে করতেই হোল। বখতিয়ারের বঙ্গবিজয় তারই সূচনা। কোয়াল নবদ্বীপে বখতিয়ার উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে সৈন্যদল নিয়ে আক্রম করলেন যেন হিন্দুরাজত্বের গৌরবময় উজ্জ্বল দিনগুলির উপর অকস্মা ছেয়ে এল মেঘ।

(উপসংহার)

"বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,—
কে তুমি ?
পেল না উত্তর।"—রবীন্দ্রনাথ

ভগীরথ সেই কোন্ আদি যুগে শাঁখ বাজিয়েছিল, তার মঙ্গলশঙ্খ গঙ্গার ধারাকে সাগর-সঙ্গমে নিয়ে এসেছিল, গঙ্গামায়ের কোলে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ, আর সেই থেকে দেশের মঞ্চে কালের অবিশ্রান্ত গতিতে রাজা ও প্রজার অভিনয় চলেছে। সে অভিনয় আমরা দেখলাম। সে অভিনয়ের আজও শেষ নেই। গঙ্গা তো কতদিন আগে সমুদ্রে মিলেছে, কই আজও তো তার যাত্রা শেষ হোল না। আজও তার জলধারা অবিরাম প্রবাহে বয়ে চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, আর দেখে চলেছে তার তৈরী দেশের কত মানুষের ধারা আসছে, যাচ্ছে।

দেশের নাম বাংলা। কি ভাবে বাংলাদেশ গড়ে উঠল, আজকের এইরূপে, কত বিবর্তনের পর তার এল এই রূপ, এইরূপের নাম হোল বাংলা।

জাতির নাম বাঙ্গালী। এই দেশের বুকে যে লোকগুলো ছিল তারা কি ভাবে বাঙ্গালী হয়ে উঠল। নানারকম জাতি, কয়েক রকম ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি—এসব মিলে মিশে এক জাতি, একধর্ম ও এক ভাষা এল। সে জাতির নাম হোল বাঙ্গালী। তাদের মুখে বাঙ্গলা ভাষা চলতে লাগল। হিন্দুধর্মের একবৃন্তে আবদ্ধ হোল। জাতির বৈশিষ্ট্যে, ভাষার স্বাতন্ত্র্যে, ধর্মের ভঙ্গীতে এক নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হোল। সে হোল বাঙালী সংস্কৃতি।

একদিকে বয়ে চলেছে গঙ্গার ধারা:—

"সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা বহিছে আঁধারে আলোকে।"

অন্যদিকে কালের প্রবাহ নিরন্তর চলেছে—

"নদীর স্রোতের প্রায়
সময় বহিয়া যায়।"

গঙ্গার ধারা উন্মুক্ত হয়েছিল ভগীরথের শঙ্খধ্বনিতে। বাংলার বুকে কালের ধারা বইতে শুরু করেছিল সেই থেকে। তাহলে দুয়েরই আদি উৎস—ভগীরথের শঙ্খধ্বনি। গঙ্গা ধারার আগে থেকে থেকে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, আর কালের ধারাকে যুগ থেকে যুগান্তরে টেনে নিয়ে চলেছে। দেশের মঞ্চে রাজার ও প্রজার অভিনয় আর শেষ হচ্ছে না; কালের সাথে সাথে তারও নিত্য নতুন অভিনয়। অভিনয়ে জাতির প্রকাশ, তার বিকাশ। এক যুগের অভিনয় শেষ হোল লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ে।

সেই প্রথম দিনের কথা মনে কর। যেদিন ভগীরথের শঙ্খধ্বনিতে নতুন দেশের সৃষ্টি হয়েছিল, নতুন জাতির পত্তন হয়েছিল। সেদিন—

প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে,—
কে তুমি?
মেলে নি উত্তর।

উত্তর কি ভাবে মিলবে? সেদিনও দেশের নামকরণ হয়নি, দেশ পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। জাতির সবে আগমন ঘটেছে, জাতি গড়ে ওঠেনি, জাতির কোনও নামকরণ হয়নি। তারপর—"বৎসর বৎসর চলে গেল।"

পাল আমলে দেখলাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠল। সেন আমলে এক ধর্ম ও এক সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হোল। দেশের সীমা প্রায় ঠিক হয়ে আসছিল, কিন্তু তবু হয়নি। এক ধর্ম এক ভাষা ও এক রাজার অধীনে এক জাতি, এক প্রাণ, একতা গড়ে উঠেছিল। বাঙালী জাতির জন্মলগ্ন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেন আমলের শেষেও বাংলা দেশের দৃঢ়বদ্ধ রূপের প্রতিষ্ঠা হয়নি। বাঙলা জাতির জন্মলগ্ন ঘনিয়ে এলেও —তা আর হয়ে উঠল না। ভোরের পাখী ডেকেছিল, সূর্যোদয় হয়েছিল, কিন্তু অকস্মাৎ ছেয়ে এল মেঘ। তাই যখন—

"দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,—
কে তুমি।
পেল না উত্তর॥"

রক্তের স্বাক্ষর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভক্তি দেবী

দু'জনকার দুটো শোবার ঘরের মধ্যে একটিমাত্র কমন প্যাসেজের ব্যবধান।

কমলাক্ষের পিছু পিছু পিনাকীর ঘরে এলো সীমা। বিছানাতেই হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসেছিল পিনাকী। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কমলাক্ষ আর এক পশলা প্রশংসা বর্ষণ করলে সীমার। তারপর পিনাকীর যে দুটো একটা চিঠিপত্রের উত্তর দেবার ছিল তাও শেষ করলো সীমা।

তারপর কী যেন একটু ভেবে কমলাক্ষের পানে তাকিয়ে সে বললে—যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি। একবার ভাবছি বলবো না অথচ সে কথাটা না বলেও থাকতে পারছি না আমি।

—বেশ তো বলো না আমাদের কাছে সংকোচ করবার কোন কারণ নেই।

—দেখুন কাল রাত্রে আমি আমার এখানকার শোবার ঘরের আলমারীতে রাখা একটা বই পড়তে গিয়ে সেই বইয়ের ভিতর একটি বাচ্চা ছেলের ফটো পেয়েছি। সেই ছেলেটি অবিকল আপনার বন্ধুর মত দেখতে। আকারটা ছোট আর বড়ো এইমাত্র প্রভেদ। তা হলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ওটা ওরই ছবি।

—আরে তাই না কী! ভারী আশ্চর্য তো? তুমি বরং একবার আমাদের দেখাতে পারো সেই ছবিটা?

—আমার কোন অসুবিধা নেই ছবিটা আনতে কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে আমি যখন ছবিটা দেখছিলাম তখন ওপরের ছাদ থেকে কিসের যেন রক্ত ঝরে পড়ে বিশ্রী একটা দাগ ধরে গেছে ছবিটার ওপর। আমি অনেক চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ বাঁচাতে পারিনি ছবিটাকে।

—তা হোক ছবিটা কাল তুমি নিশ্চয় এনো। ভুলে যেও না যেন।

—আচ্ছা আমি ছবিটা কাল নিয়ে আসবো এখানে। এই বলে চলে যাবার জন্তে পা বাড়ায় সীমা। তার এখানকার ডিউটির নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হতে চলেছে।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন এঞ্জেলা আর স্বর্ণপ্রভা দেবী।

সীমাকে দেখে স্বর্ণপ্রভা চেঁচিয়ে ওঠেন প্রায়।

—আরে! এ মেয়েটা আবার এখানে এসে জুটলো কী করে? তখনই বলেছিলাম—এ ধরণের মেয়েকে প্রশ্রয় দিও না। কেমন হলো তো? বলি ও বাছা, এবার তোমার বায়নাটা কিসের?

—আপনি একেবারে ভুল করছেন মাসিমা।—কমলাক্ষ তাড়াতাড়ি বাধা দেয়।—ও মেয়েটি এই হোটেলেই কাজ করে। ও আমাদের কাছে নিজের কোন দরকারে আসেনি।

—ও: তাই বলো। তা কমলাক্ষ তোমাদের খবর কী? আমি তোমার ঘরে তোমাকে খুঁজতে গিয়ে খবর পেলাম কালকে নাকি কে পিনাকীকে গুলী করেছে। তাই ভাবলাম দেখেই আসি ব্যাপারটা কী?

কমলাক্ষ বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল পিনাকীর একটা জীবন সংশয় ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি তো ভেবেই কূল পাচ্ছি না যে কে এমন লোক আছে পিনাকীকে যে গুলী করতে পারে?

সীমা লক্ষ্য করে কমলাক্ষ আর স্বর্ণপ্রভাদেবী যে সময়টায় কথাবার্ত্তা করছিলেন তারি ফাঁকে এঞ্জেলা পিনাকীর কাছে গিয়ে যথার্থ আন্তরিকতার সাথে তার শারীরিক সমাচার জিজ্ঞাসা করছে। অবশ্য মায়ের ভয়ে খুব বেশীক্ষণ সে পিনাকীর কাছে থাকবার সাহস করলে না। স্বল্পক্ষণ কথা কয়ে শেষে এগিয়ে এসে হাসিমুখে সীমার হাত ধরলো।

এঞ্জেলাকে সত্যি সত্যিই ভালো লেগেছে সীমার। মায়ের সাথে দিনরাত কর্কশ ভাবে ঝগড়া না করে খানিকটা মায়ের মতামত মেনে নিয়েই চলে এঞ্জেলা, কিন্তু তাই বলে ভিতরের অল্পবয়সী একটি মেয়ের আনন্দ উজ্জ্বল সজীব প্রাণটা এখনও মরে যায়নি। এঞ্জেলার সাথেও দু' একটা কথা বলে সেদিনের মত ওদের ঘর থেকে বিদায় নেয় সীমা। তাড়াতাড়ি পা বাড়ায় নয় নম্বর ঘরের পানে।

দরজাটা খোলা ছিল। ভেতরটা প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। জনাব হোসেন আলি বড় একটা ভেলভেটের চেয়ারে বসে সেদিনের খবর-কাগজ পড়ছেন। মুখের সামনে খবর-কাগজটা আড়াল করে থাকায় সীমাকে প্রথমটায় তিনি দেখতে পান নি।

সীমা কিন্তু দরজার বাইরে থেকেই লক্ষ্য করে ওদে

হাতের কব্জি হতে কনুই পর্যন্ত চওড়া একটা সোনার ব্রেসলেট পরে আছেন তাঁর ডান হাতে।

সীমার হাসি পায়।

—বাবা এত ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপন দিতেও জানে এরা। পুরুষ মানুষ গায়ে গহনা পরে বসে আছে ঘরের ভেতর।

শুধু গায়ে একটা গেঞ্জি পরে বসে আছেন ভদ্রলোক তাই ঘরে ঢুকতে একটু ইতস্ততঃ করে সীমা।

গলা খ্যাঁকারি দিয়ে তার আগমনের সংবাদ জানায়, দরজা খোলা বলে কলিং বেলটা আর ব্যবহার করে না। সীমার সাড়া পেয়ে আলি সাহেব তাড়াতাড়ি তার ড্রেসিং গাউনটা গলিয়ে নেন গায়ে। তারপর সীমাকে ভিতরে আসবার অনুমতি দেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সীমা উপলব্ধি করে যে এঁর আবহটা অত্যন্ত ভুয়। সত্যিই নবাব বংশের উপযুক্ত বটে।

এ ঘরে অবশ্য কাজ প্রায় কিছুই ছিল না। ভদ্রলোকের অনুরোধে সীমা তাঁকে দু'একটি বায়রনের কবিতা অনুবাদ করে শোনায় এই মাত্র।

তারপর ছুটি। এবেলার মত বিশ্রাম।

বিকেলবেলায় ঠিক চারটের সময় মহারাণী অব মনোহরপুরের কামরায় হাজির হয়েছিল সীমা।

মহারাণী তখনও তাঁর দিবা নিদ্রার মৌজটুকু ছাড়তে পারেন নি।

মধুর আলস্যে তিনি একজন দাসীর কাছে কোমরের ব্যথার মালিস নিচ্ছিলেন।

সীমার আগমন সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছালে তিনি সীমাকে তাঁর কাছে যাবার অনুমতি দিলেন। তারপর কনে-দেখার মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে দেখে নিলেন ভালো করে। অবশেষে বললেন—আহা তোমার একটিও গহনা নেই?—নেই? না তুমি ইচ্ছা করে পরোনি?

সীমা বিনীত ভাবেই জানায় সত্যিই তার গহনা নেই।

শুনে মহারাণী বারবার দুঃখপ্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর নিশ্চিত ধারণা গহনা না থাকার চেয়ে মর্মান্তিক দুঃখ মেয়েমানুষের জীবনে আর কিছুই থাকতে পারে না।

সীমা নীরবেই লক্ষ্য করতে থাকে এই সোনার পুতুলটিকে। আর কিছু সময়েই বুঝে নেয় মহারাণীর ঐশ্বর্য্যের পরিধি সুদূর প্রসারিত। জীবনে কখনও বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয় নি তাঁকে। বোধ করি তাঁর নিজের জমিদারীতে থাকলে তিনি খুব উচ্চাঙ্গের সোসাইটি পান না অথবা তাঁর ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশকে তারিফ করবার মত সমঝদার পান না বলেই তিনি এই হোটেলে দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। মনে মনে তাঁর জীবনটাকে উপভোগ করার বাসনাটাই সুপ্রচুর। তাই সাজসজ্জায় সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে একটি সুরুচিসম্পন্না তরুণীর প্রয়োজন তাঁর।

সীমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। অতি অল্প কথায় পরিবেশ বুঝে নিয়ে মনোরঞ্জন সুরু করে দিলো সে। তার সুচারু দক্ষতায় অকৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা কমই।

অল্পসময়ের মধ্যেই এও লক্ষ্য করে সীমা যে, এ রকম উদ্দেশ্য-বিহীন ভাবে কেবলমাত্র অভিজাত সমাবেশের মধ্যে বাস করবার জন্যে এখানে কেবলমাত্র মনোহরপুরের মহারাণী আর এঞ্জেলার মা-ই এখানে নেই এ ধরণের বহু মহিলাই এখানে রয়েছেন। রাত্রে নিজের বিছানাটিতে শুয়ে মনে মনে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে সীমা কনভেন্টের বাইরে তার নবলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা। বাইরের জগতে পা বাড়াবার আগে যতটা ভয় সে পেয়েছিল বাস্তবিক পক্ষে তেমন কোন অস্বাভাবিক পরিবেশের সম্মুখীন এখনও পর্য্যন্ত হতে হয়নি তাকে। শুধু কাল রাত্রের সেই দুঃস্বপ্নের মত রক্তটা যে কোথা থেকে এলো?

আর সেই ঘরের ভিতরকার অস্বস্তিকর অনুভূতিটার কথা?⋯⋯ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে যেন কার উপস্থিতি। কাদের জুতোপরা পায়ের সদম্ভ পদক্ষেপ—একটু অনিচ্ছাকৃত মস্‌মস্‌ শব্দ।

সীমা জানে বিকেলে চোখের পরে কাপড় বেঁধে একটা মানুষকে শুইয়ে রেখে তার কপালে এক এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল ফেলবার পদ্ধতি চালু আছে। এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি যোক্ষম শাস্তির মধ্যে এটি অগ্রগণ্য। এখানকার কর্তৃপক্ষরা কী সীমার জন্যে সেই ধরণের একটা কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

কিন্তু কেন? সে তো কোন অপরাধ করে নি?

মা—না এ সব কী ভাবছে সে? এ তার মনের ভুল। এখানকার কর্তৃপক্ষ কত সজ্জন। সীমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তো কোন ত্রুটিই তাঁরা রাখেন নি।

কেন সে মিছিমিছি নিজের অন্নদাতাকে সন্দেহ করছে। নতুন জায়গায় এসে প্রথম রাত্রে সকলকারই ঘুমের ব্যাঘাত হয়। তাতেই তিক্ত স্মৃতি সারাদিনের মনমেজাজকে একটা অপ্রিয় অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে রাখে।

কিন্তু রক্তটা? সেটা তো আর মিথ্যা নয়? সমস্ত দিনের শত কাজের মধ্যেও সে ব্যাপারটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে নি সীমা।

এমন কী আজ দুপুরে টিফিনটাইমে ও বাড়ীর দোতলায় উঠে এ বাড়ীর ছাতটা খুব ভালো করেই লক্ষ্য করেছে সে। কিন্তু টালির তৈরী দু'দিকে ঢালু ছাত পরিষ্কার তকতক্ করছে। সেখানে একটা মুরগী বা পায়রার একটা পালক পর্যন্ত নজরে এলো না সীমার।

যা থেকে গত কাল রাত্রের ওই বিস্ময়কর ঘটনার একটা হদিস খুঁজে পাবে সে।

তবে? আগাগোড়া ব্যাপারটাই তবে ভৌতিক বলে মেনে নিতে হবে না কী?

কিন্তু ছবির 'পরে ওই যে স্পষ্ট দাগ। ওটা? ভূত কী এই বিংশশতকে এত স্পষ্ট নিশানা আজও রেখে যায়?

—ও ঠিক কথা তো ছবিটার কথা মনে করতে গিয়ে খুব মনে পড়েছে—কমলাক্ষকে যে কথা দিয়ে এসেছে—ছবিটা অতি অবশ্য কাল নিয়ে যাবে সে। কিন্তু কাল সকালে অপিসে পৌঁছবার তাড়াতাড়িতে ভুলে যায় যদি? তার চেয়ে ভালো আজ থেকে ব্যাগে গুছিয়ে তুলে রাখে ছবিখানাকে! তা না হলে কাল কথার খেলাপ হয়ে যাবে।⋯কাল ছবিটা হাতে পেলে ওরা কিন্তু খুব অবাক হয়ে যাবে। কারণ ওই ভদ্রলোকের সাথে ছবিটার বাচ্চাটার যে কী আশ্চর্য্য সাদৃশ্য তা চোখে না দেখে কল্পনা করাও কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। নাঃ আর দেরী নয়—ছবিটাকে এখনই ব্যাগে গুছিয়ে তুলে রাখা উচিত। ভাবতে ভাবতে আলমারীর কপাট দুটো খুলে ফেলে সীমা। কিন্তু বইটা খুঁজে পায় না কিছুতে। এই তো এইখানে

কাল নিজে হাতে বইটা রেখেছিল সীমা। গেল কোথায় বইটা ? কী আশ্চর্য্য। এ আবার কী অদ্ভুত ব্যাপার ? একটুকুও তো ভুল হয়নি সীমার। নিশ্চয় করে মনে আছে, ঠিক এইখানে আলমারীর এই সামনের তাকটায় রেখেছিল বইটা। তা হলে বইটা গেল কোথায় ? তবে কী সীমার অনুপস্থিতিতে কেউ এসেছিল এ ঘরে ? তাই বা হবে কেমন করে ? আলমারীর গায়ে চাবিটা না হয় লাগানো, কিন্তু ঘরের ডোর-লক্ কী তো সারাদিন সীমার কাছেই আছে। তবে ? ঘরের কী কোন ডুপ্লিকেট চাবি আছে ? যদিই বা থাকে তবে সে চাবি কার কাছে থাকে ? কিন্তু যদিই বা চাবি কারো কাছে থাকে তবুও একটি মহিলার নিজস্ব কামরায় মালিকের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা শুধু যে দারুণ অভদ্রতা তাই নয় নীতিগত অপরাধও তো বটে।

এমনতর শিক্ষিত সমাবেশের মাঝে এতখানি অশালীনতা কেমন করে সম্ভব হবে ? ভেবে কুল পায় না সীমা। তা ছাড়া সব চেয়ে বড় ভাবনা তার নিজের কথার খেলাপ হবে। মাত্র একদিনের পরিচয়ে কমলাক্ষ বাবুরা কী বিশ্বাস করতে পারবেন এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার কথাগুলো ? বিশ্বাস না করাই তো স্বাভাবিক। উঃ, কেন যে সাত তাড়াতাড়ি অত কথা কইতে গেল সীমা। ভদ্রলোকের সাথে ছবির বাচ্ছাটার যত সাদৃশ্যই থাকুক, তা দেখে এতটা আত্মবিস্মৃত হওয়া তার কিছুতেই উচিত হয়নি। তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু কেমন যেন উৎসাহের আতিশয্যে বেরিয়ে গেল। এখন কী হবে ? কেমন করে সে কমলাক্ষবাবু আর তার বন্ধুকে বোঝাবে সত্যিই এমনি একখানা ছবি এইখানে ছিল। এর মধ্যে এক বর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জন নেই।

আবার ওরা যদি বেশীরকম বিশ্বাস করে সীমার কথায়। যদি তদন্ত তল্লাসী সুরু করে ছবিটার জন্যে। তা হলেও তো বিপদ। মহেন্দ্র সিং নিশ্চয় সীমার এ হেন ওপরপড়া গিরিতে খুশী হতে পারবেন না। একদিনের মধ্যেই হঠাৎ সীমার ঘর থেকে বই চুরি গেছে এবং সেই চুরির খবরটা তাঁর খরিদ্দারদের কাছেও পৌঁছেছে এ খবরেও তাঁর পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাঁর সমস্ত রাগটা এসে পড়বে সীমার ওপর। এই নতুন চাকরীতে এসেই সীমার পক্ষে এই ভাবে মনিবের অপ্রীতিভাজন হওয়া কী বাঞ্ছনীয় ?

উঃ, ভাবতে ভাবতে মাথার ভিতরটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যেন। হে ঈশ্বর কী বিপদেই না তুমি আজ ফেললে সীমাকে।

কিন্তু কেমন করে সম্ভব হল এটা ? না না নিশ্চয় এইখানেই কোথায় আছে ছবিটা। অসাবধানে আলমারির আসে পাশে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে বড় জোর।

আবার নতুন করে চার পাশটা খুঁজতে থাকে সীমা। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে চারি পাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে সুরু করে দেয় সে।

কিন্তু খুব বেশী খোঁজবার অবকাশ কই ? ততক্ষণে আবার আলোটা কমতে শুরু করেছে।

সেদিন রাত্রে ভালো করেই ঘুমুলো সীমা। নির্ব্বিঘ্নেই তরে গেল রাতের আঁধার সমুদ্র।

পরদিন সকালেও খুঁজেছিল বৈ কী সীমা।

আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ছবিটাকে ফিরে পাবার। যাতে করে তাকে মুখ কালো করে গিয়ে না বলতে হয় নিজের অক্ষমতার কথা।

কিন্তু ভাগ্য যেখানে প্রতিবন্ধক,—সেখানে আর উপায় কী ?

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু নিরুপায় সীমা ম্লান মুখে নত মস্তকে একান্ত অপরাধীর মত কমলাক্ষের সকাশে স্বীকার করে নেয় সে যে ছবিখানা সঙ্গে করে আনবে বলে গতকাল অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল সেটা রাতারাতি ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হয়েছে।

ওরা অবশ্য হালকা ভাবেই নেয় কথাটাকে।

বলে—তাতে আর এমন কী ক্ষতিবৃদ্ধি হল ! সীমার অতটা লজ্জিত না হলেও চলবে। নিছক কৌতুহলবশেই ওরা দেখতে চেয়েছিল ছবিখানা। তা না হলে পিনাকীর ছবি যে এখানে থাকা অসম্ভব সে কথা কী তারা জানে না ? তাতে যদি দৈবক্রমে ছবিটা হারিয়েই গিয়ে থাকে তবে আর উপায় কী ? সীমার কৃতজ্ঞতার শেষ থাকে না।

ভদ্রলোক দু'টির সৌজন্যবোধ তাকে সত্যিই মুগ্ধ করে। ওরা যে কর্তৃপক্ষের দরবারে না গিয়ে এত সহজে মেনে নিয়েছে ব্যাপারটাকে তাইতে সীমা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

মহেন্দ্র সিং কিন্তু যথা সময়ে অর্থাৎ অপিসে যাবা মাত্র তাঁর প্রশ্নটি নিক্ষেপ করেছিলেন। উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন সীমার গত রাত্রের সুনিদ্রার সম্বন্ধে। উত্তরে সীমা বেশ দীপ্ত ভাবেই ঘোষণা করে তার নিরুপদ্রব রাত্রি যাপনের কথা।

—বেশ বেশ সে তো সুখের কথা। নিশ্চিন্ত হলাম। আর শোনো আরও একটা সুসংবাদ আছে তোমার জন্যে। কুমার সাহেব মানে কমলাক্ষবাবু খুব ভালো মন্তব্য পাঠিয়েছেন তোমার সম্বন্ধে। জনাব হোসেন আলিরও অভিমত তোমার স্বপক্ষে। বোধ হচ্ছে চাকরীটা তোমার কপালে টিকেই যাবে।

—ধন্যবাদ। বলে অপিস থেকে বাইরের দিকে পা বাড়ায় সীমা। মহেন্দ্র সিংয়ের কথার সুরটা সঠিক উপলব্ধি করতে পারে না সে।

সারাটা দিন ঘড়ির কাঁটার সাথে পা মিলিয়ে নিজের রুটিন মেনে চলে সীমা। বিকেলের দিকে মহারাণীর ডিউটিটা তার কাছে কিছুটা স্থূল মনে হলেও সকালে তাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে তাতে সে বেশ আনন্দিত। কারণ কমলাক্ষের ডিউটিটা কিছু কঠিন হলেও তার উচ্ছসিত প্রশংসাটা সীমার কাছে কম লোভের জিনিস নয়।

পিনাকীকেও সীমার ভালো লেগেছে। মিলিটারী অফিসারের গাম্ভীর্য্যময় আবরণটার মধ্যে অতি সাদাসিধে প্রাণখোলা একটি ভদ্রলোক। প্রতি কথায় তার হাসি অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এ ক'দিনে আরও কয়েকটা জিনিস লাভ করেছে সীমা। খুব সামান্য কয়টা দিন মেলামেশার মধ্যে দিয়েই পেয়েছে এঞ্জেলার সাহচর্য্য করণের সখীত্ব। আর পেয়েছে বর্ষীয়সী মেট্রনের নিছক কর্তব্য পরায়ণতার উর্দ্ধেও একটা আন্তরিক ভালবাসা।

পরের দিন হতে বিকেলের দিকে মহেন্দ্র সিংয়ের কথা রেখে বেশীর ভাগ দিনই সামনের লনে বেড়িয়ে বেড়ায় সীমা।

সমস্ত খরিদ্দারদের মনোরঞ্জনের জন্য সচেষ্ট থাকে। কারো সঙ্গে টেনিস্ খেলে একটু, কারো সঙ্গে বা নিছক খানিকটা উদ্দেশ্যবিহীন গল্প করে, আবার কারো সঙ্গে বা শুধু একটু সৌজন্যের বিনিময় করে হোটেলের প্রাঙ্গণে একটা উচ্চাঙ্গের পরিবেশ রচনা করবার সাহায্য করে।

এমনি করেই কেটে গেছে বেশ কয়েকটা দিন !··সেদিনও এমনিতর সচেতন অচেতনে ল'নে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলো সীমা। মিঃ জে, পি, কাউলের সাথে কিছুটা টেনিস খেলে কামনিকা দেবী, বিমলাবাঈ প্রভৃতি মহিলাদের সম্মিলিত চক্রব্যূহের কিছুটা কুশল সংবাদ নিয়ে এঞ্জেলার সাথে গল্প করছিল সে।

প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বসেছিল ওরা দু'জনে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ নজর পড়লো হোটেলের মেনবিল্ডিংটার দিকে। ধীরে ধীরে একটি একটি করে আলো জ্বলে উঠছে প্রতিটি ঘরে। পাহাড়ের কোলে কে যেন সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে দীপমালার আলো।

অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সারা বাড়ীটা ঝলমল করে উঠলো। শুধু একটা জায়গায় অন্ধকার! অর্থাৎ একটা ঘরে আলো জ্বলেনি।

মনে পড়ে গেল—ওটা কমলাক্ষের ঘর! আজ সকালে এখান থেকে পঁচিশ মাইল দূরে একটা সাহিত্যিক সম্মেলনে সহ সভাপতি করে তাকে নিয়ে গেছে কয়েকজন লোক।

তাই তার ঘর অন্ধকার।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো পিনাকী বেচারা আজ একেবারে একা আছে।

রোজ হোটেল শুদ্ধ লোক যখন বেড়িয়ে বেড়ায় কমলাক্ষ তখন পিনাকীর ঘরে বসে তার সঙ্গে কত রকমের গল্প করে, তার শয্যা-কণ্টকের ভার লাঘব করার চেষ্টা করে।

তাই আজ কমলাক্ষের অনুপস্থিতিতে পিনাকী যে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আছে তাতে সন্দেহ নেই!

এ ক্ষেত্রে সীমা যদি এ বেলায় একবার খেয়াল করে পিনাকীর তত্ত্বতালাস নিতে যায়, তাতে তার সুনাম অর্জনের সহায়তা হবে নিশ্চয়ই।

পিনাকীবাবু অবশ্যই ভাববেন এ মেয়েটির বিবেচনা আছে। সুতরাং এটাই সীমার আপাতকর্ত্তব্য।

এঞ্জেলার কাছে বিদায় নিয়ে পায়ে পায়ে এগোলো সীমা। হঠাৎ কাদের টুকরো কথা ভেসে এলো কানে।

আলোচনার বিষয়বস্তু সে নিজে বুঝতে পেরে এক পা পিছিয়ে পড়লো সীমা। থমকে গেল যেন।

আলোচনারত কণ্ঠগুটি মহিলার।

—ওই মেয়েটির কথা বলছিলেন না কী?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো। ওই মেয়েটাই তো নতুন ঢুকেছে এ হোটেলে।

—নাঃ ভবিষ্যতে এখানে আর আসা যাবে না দেখছি। যেখানে এত বড় বড় ঘরের লোক এসে থাকেন তার মধ্যে একটা বাজে মেয়ে এনে বসিয়ে দিলে গো? এ কী মতিচ্ছন্ন ধরলো ম্যানেজারের?

—না এ মেয়েটা এমনিতে ভালোই। স্বভাবটাও নরম সরম আছে।

—রেখে দিন আপনার নরম সরম। নরম সরম হবে না তো কী ও' মাথায় চড়ে নাচবে না কী? হোটেলের একটু ভদ্রগোছের বারোয়ারি আয়া ছাড়া কিছু নয়।—তা বেশ তো পেটের দায়ে কাজ করতে এসেছিস, মন দিয়ে তাই কর না বাপু। সারা বিকেল ময়দানে এসে হাওয়া খাবার তোর দরকার কী?

···ওগো মেয়ে শুনছো? ইদিকে একবার শুনে যাও—

বাধ্য হয়ে ফিরে দাঁড়ালো সীমা।

—কোথা থেকে আসা হয়েছে? মানে এর আগে কোনখানে চাকরী করতে তুমি?—অত্যন্ত দাম্ভিক ভাবে প্রশ্ন করেন বর্ষীয়সী।

সীমা বোঝে উনি ওকে জেরা করতে চাইছেন। অকারণে কিছুটা হেয় প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যেই। তবু মাথা ঠাণ্ডা করে সংযত ভাষায় উত্তর দেবার চেষ্টা করে সে। বলে—আজ্ঞে না। এর আগে কোনখানে আমি চাকরী করি নি।

—ওঃ 'তাই। সেইজন্যেই সহবতটাও এখনও রপ্ত হয় নি। বেশ বেশ ও তে আর কী হয়েছে। এখানে দিনকতক থাকলে কিছুটা আদবকায়দা শিখে নিতে পারবে'খন।—চলুন মিসেস বোস এবার একটু ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসা যাক্। হিম পড়তে সুরু হয়েছে। আমার আবার একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে।

গজেন্দ্রগমনে বর্ষীয়সীরা চলে যান। সীমা হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওঁদের সহবতের নমুনা দেখে। ডেকে এনে কথা বলে যাবার সময় একটা বিদায় সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করে গেলেন না ওঁরা। ওঁদের কথাবার্ত্তা ওঁদের ব্যবহারে স্পষ্টই সীমাকে ওঁরা জানিয়ে গেলেন, সীমার সাথে ওঁদের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কিছু সম্বন্ধ নেই। আর সেই জন্যেই মনিবদের সাথে এক ময়দানে সান্ধ্যভ্রমণ করাটাও সীমার পক্ষে বেয়াদপী।

মাথার ভিতরটাতে ঝিমঝিম করছে যেন। মনের ভিতরের বড় দুর্ব্বল জায়গাতে আঘাত করেছে ওরা।

আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হলে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সীমা। অথচ উপায়ই বা কী? হোটেলে কাজ নিয়েছে সে। কত শত রকমের লোক এখানে আসবে যাবে। তাদের মধ্যে দু'একজনের কথায় যদি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায় সীমা তবে মাদারই বা তাকে কী বলবেন?

না না তাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে তা ছাড়া হোটেলের সব মানুষই তো ওদের মত নয়?

হঠাৎ চিন্তার সুতোটা টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায়। সারা হোটেলটার আলো নিবে যায় একসঙ্গে। একটা আওয়াজ আর তার সঙ্গে একটা বিরাট হৈ হৈ শব্দ কানে আসে।

একটা ছুটোছুটি একটা চীৎকার সমস্ত হোটেলটা জুড়ে একটা তাণ্ডব কোলাহল সুরু হল যেন। প্রথমটায় নিজের কী করা উচিত তা ভেবে পায় না সীমা। হৈচৈটা আসছে মেন-বিল্ডিংয়ের দিক থেকে। সাধারণ ভীতু ধরণের মেয়ে হলে এসময় আর বিপদের দিকে না এগিয়ে নিজের ঘরের দিকেই ফিরতো বোধ হয়।

কিন্তু সীমা তা পারলে না।

বিশেষ করে তার মনে পড়লো পিনাকীর কথা। আগেকার মত অসুস্থ না হলেও সম্পূর্ণ সুস্থ সে এখনও নয়। আর আজ এই সন্ধ্যাটিতে সে সম্পূর্ণ একা আছে—এই কথাটা মনে হতেই পিনাকীর ঘরের দিকে পা বাড়ালো সীমা। হঠাৎ পাশ দিয়ে কে যেন ছুটে চলে গেল মাঠের দিকে।

গোলমালটাও ক্রমেই বাড়ছে।

অন্ধকারে লোকটাকে চিনতে পারলো না সীমা। [ক্রমশঃ।

পরিকল্পনা ও কাজ

যে-কোন কাজই করতে চাওয়া হোক, তার আগে কিছুটা হলেও ভাবনা চাই। এই ভাবনাটাকেই বলতে পারা যায় পরিকল্পনা। পরিকল্পনা না করে বা কাজের ছক না কেটে যদি কাজ করা হয়, সে-কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দর না হওয়াই স্বাভাবিক। প্রত্যাশিত সুফল বা সিদ্ধির দাবী রাখলে সুচিন্তিত পরিকল্পনাভিত্তিক কাজ না হলে হতে পারে না।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র-সর্বস্তরেই কাজের পরিকল্পনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বাজেট করে যেমন অর্থব্যয় করতে হবে, তেমনি কাজ করতে হবে পরিকল্পনা রচনা করে। নক্সা অঙ্কন করে সন্তুষ্ট হবার পরই ইঞ্জিনীয়ারকে কাজ করতে দেখা যায়। দেশের প্রকৃত সংগঠক বা নির্মাতা যাঁরা, অগ্রগতিসূচক কর্মসূচী প্রণয়ন করে থাকেন তাঁরা গোড়াতেই। খেয়ালখুশি মাফিক কিছু করতে গেলে অর্থের অপচয়ই মাত্র হতে পারে, কাজের কাজ হওয়ার আশা স্বতঃই সুদূরপরাহত।

এই থেকে যে জিনিষটি দাঁড়াচ্ছে—অন্ততঃ বৃহৎ কাজগুলি অর্থাৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মযজ্ঞ করতে হলে পরিকল্পনা চাই-ই। ভালরকম ছক তৈরী করে কাজে না নামলে কতটুকু এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নব ভারত গঠনের দায়িত্ব পড়েছে জাতির স্কন্ধে। তাই দেখা গেলো জাতীয় সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা (পঞ্চবার্ষিক) প্রণয়ন করে চলেছেন একটির পর একটি। এযাবৎ যতটা অগ্রগতি হয়েছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না হলে তা হতে পারতো না। শুধু ভারত কেন, যে-কোন দেশের উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠার মূলে দেখতে পাওয়া যাবে এক একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা না বললে চলবে না: শুধু পরিকল্পনা রচনাই নয়, পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যও সর্বক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও উদ্যম থাকতে হবে। বৃহৎ কর্মযজ্ঞ যেমন পরিকল্পনা ছাড়া হতে পারে না, আবার পরিকল্পনা প্রণয়ন হলেই কাজ হয়ে গেলো, এমন দাবী নিতান্ত অবান্তর। আবার, বৃহৎ ও ব্যাপক কাজের পরিকল্পনা সর্বদিক ভেবেচিন্তে না করলে কার্য্যক্ষেত্রে তার রূপায়ণ সম্ভব হয় না, রূপায়িত হলেও ত্রুটি ঘটে থাকে কোথাও না কোথাও। যে-কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে গেলেই ধন-সম্পদের প্রয়োজন পড়ে। কাজেই পরিকল্পনা রচনার আগে টাকার অঙ্কের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। বিরাট পরিকল্পনা রচিত হলেই বিরাট কাজ করা চলবে, সে আশা নিশ্চয়ই রাখা যায় না। পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য অর্থের সঙ্গে আবশ্যক লোকবলও থাকতে হবে বৈ-কি!

স্বাধীন ভারত এ যাবৎ তিনটি পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। প্রথম দুইটির পরিকল্পনাকাল শেষ হয়েছে—এক্ষণে কাজ চলেছে তৃতীয় পরিকল্পনার। দেশের সমস্ত সম্পদ, সমস্ত জনশক্তি কেন্দ্রীভূত করবার দাবী রেখেই জাতীয় সরকার কাজে নেমেছেন। কাজ করে সাফল্যও জুটেছে এর ভিতর নেহাৎ কম নয়। ব্যাপক থেকে ক্রমে ব্যাপকতর পরিকল্পনা রচনা করা হচ্ছে—উদ্দেশ্য ভারতের ধাপে ধাপে অগ্রগতি। সম্পদ বাড়ানো, স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন—পরিকল্পনাসমূহের এটাই মুখ্য লক্ষ্য। সরকারী উদ্যমের সঙ্গে বেসরকারী সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে এবং প্রয়োজনীয় অর্থের যদি অভাব না ঘটে, তা হলে এই লক্ষ্য-পূরণ অসম্ভব হবে না।

বৃহৎ পরিকল্পনা সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন হবে, এমন কোন কথা নেই বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনারই মূল্য বেশী। একটি পরিবারের অগ্রগতির দাবী রাখলেও পরিকল্পনা ভিত্তিক প্রয়াস হতে হবে। অবশ্য অর্থনৈতিক প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রেই বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়—পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের আশা সেই সব স্থলে অবাস্তব। খাপছাড়া পরিকল্পনায় খাপছাড়া কাজই হতে পারে, প্রকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি নিরবিচ্ছিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। পক্ষান্তরে পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হবে, পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য তার সদ্ব্যবহার অবশ্য চাই।

ক্ষুদ্রই হোক কি মহৎই হোক, যে কোন কাজের পরিকল্পনা প্রণয়নকালে কয়েকটি জিনিস মনে রাখতেই হবে। পরিকল্পনাটি যেন এমন কখনই না হয়, কার্য্যক্ষেত্রে যার রূপায়ণ সম্ভবপর হবে না। কাগজপত্রে ছক-কাটাই বড় কথা নয়, বড় কথা নিঃসন্দেহে কাজ। পরিকল্পনা ক্ষুদ্র আকারের হোক, ক্ষতি নেই—নির্দিষ্ট সময় মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা চাই। আর্থিক প্রশ্ন যেন পরিকল্পনার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি না করতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর না রাখলে নয়।

কৃষি-ফলন বাড়াতে হলে

প্রতিটি আদমসুমারীর হিসাবেই দেখা যায় যে, দেশের জন-সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই বাড়তির হার অবশ্য বিশ্বের সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়, এখানে সেখানে একটু রকম ফের মাত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে কৃষির উপযোগী জমির পরিমাণ ইচ্ছামাত্র বাড়ানো যাচ্ছে না, অথচ মানতে হবে যে, নির্দ্দিষ্ট জমি থেকেই সকল লোকের আ[illegible] খাদ্যশস্য উৎপাদিত হতে হবে।

সত্যি কি করে এটা সম্ভবপর—জমি একই, ফলন বেশি। বাঁচবার জন্যে মানুষকে উপায় উদ্ভাবন করতেই হবে, নিশ্চেষ্ট থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এর ভিতরই মানুষের উদ্যম অনেকটা জয়যুক্ত হয়েছে—সমপরিমাণ জমি থেকে অধিক পরিমাণ উৎপাদন নিতান্ত অসম্ভব হয়ে নেই। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চাষ বা নিবিড় চাষের কথাই এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সরকারী হিসাব অনুসারে ভারতে প্রতি একর জমিতে ধানের গড়পড়তা উৎপাদন পরিমাণ হলো মাত্র ১৩ মণ। কিন্তু একটি গ্রামে

একর পিছু ১৪০ মণ ধান্য উৎপাদিত হয়েছে, এ-ও সরকার প্রচারিতই একটি সংবাদ। উন্নততর চাষ ব্যবস্থা দ্বারা এই দেশের মাটি থেকে গমের উৎপাদনও ক্ষেত্রবিশেষে নাকি নয়-গুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। জাপানী প্রথায় চাষাবাদ করে অনেক জায়গায় অধিক ফসল ফলানোর প্রয়াস চলেছে—যা আশাপ্রদ। সুরাটগড়ের মরু অঞ্চলে সোভিয়েট সহযোগিতায় গড়ে ওঠা কৃষি খামারও একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে জানা যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হলো খাদ্যশস্য তথা কৃষি-ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হলে কি কি চাই? বড় কথা হলো—পুরাণো আমলের চাষের নিয়ম-কানুন বা সরঞ্জাম নিয়ে বসে থাকলেই চলবে না। কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যে-সব ব্যবস্থা বা সূত্র নির্ধারণ করেন, কৃষি-কর্মী বা কৃষিজীবীদের নিজ নিজ মাঠে তা সযত্নে কাজে করে করতে হবে। আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহ না করলে চলবে না, সেচ-ব্যবস্থারও ক্রমোন্নতি হওয়া চাই। প্রকৃতির ওপর পুরো নির্ভর করে থাকতে গেলে কেন হবে? প্রকৃতিকে জয় করবার দৃষ্টিকোণকেই কাব তুলতে হবে বড়। ভালো বীজ, ভালো সার, কীটঘ্ন ঔষধ, উপযুক্ত জলসেচ—এ সকলের যদি ব্যবস্থা হলে, [illegible] যদি থাকলো পর্যাপ্ত যত্ন ও দৃষ্টি, তাহলে [illegible] উৎপাদন ধাপে ধাপে বাড়বেই।

কৃষি প্রধান দেশ এই ভারতবর্ষ—এখানে কৃষিজীবীদের কৃষি সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে লব্ধ। বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল রেখে কৃষি-ফলন বাড়াতে চাইলে কৃষক-সমাজের ভিতর কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা বিস্তার হওয়া চাই। যেহেতু [illegible] জিনিস এতকাল ধরে কোন বিশেষ ধারায় চলে এসেছে, ভবিষ্যতেও তার রদবদল চলবে না, এমন মনোভাব যেন পেয়ে না বসে। জমি থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন কি ভাবে হতে পারে, সেইজন্য আগ্রহ ও ব্যাকুলতা না সৃষ্টি হলে চলবে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করতে যেয়ে ঠকতে হবে, সকল কৃষিজীবী জনতাই এ জিনিসটি মেনে নেবেন।

আশার কথা—জাতীয় সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন গোড়া থেকেই। প্রতিটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিখাতে [illegible] অর্থ বরাদ্দ হয়েছে—তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ [illegible] ১০৮০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে সরকারী উদ্যোগে দেশে [illegible] সার কারখানা স্থাপিত হয়েছে, একাধিক জলসেচ প্রকল্প [illegible] করা হয়েছে, উন্নততর শস্যবীজ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে, [illegible] সরঞ্জামাদিও যতদূর সম্ভব দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত [illegible] যথাসময়ে সুযোগ গ্রহণ করাই এক্ষণে বড় কথা। দেশের [illegible] এখনও যেসব পতিত জমি আছে, সেগুলোর [illegible] এবং উষর জমিগুলোকে উদ্ধার করে তোলবার ব্যবস্থা [illegible]। এভাবে ফসল উৎপাদন বাড়ানো নিশ্চয়ই সম্ভবপর—[illegible] জরুরী অবস্থাতে যা আরও [illegible] [illegible]।

মোটরগাড়ি—কয়েকটি কথা

দীর্ঘকাল হয়ে গেলো মোটর গাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু এর উন্নতির প্রয়াস শেষ হয়ে গেছে, এটা বলা চলে না। বিভিন্ন অগ্রসর [illegible] বেশি উন্নতিবিধান।

আজকের দিনে যে কোন মহানগরীতে মোটরচালিত অসংখ্য গাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। আকার ও ডিজাইনের দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ছে। মোটর পরিবহন এ যুগে ঠিক একটি বিলাস ব্যবস্থা নয়—সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে অনেকেরই এ চাই। প্রাইভেট গাড়ি না থাকলেও অন্ততঃ ট্যাক্সির প্রয়োজন হয় হাতের কাছে, এমন কর্মী-মানুষ পাওয়া যাবে প্রচুর। বস্তুতঃ, মোটর গাড়ির মূল্য বহুদিন থেকেই সমাজে স্বীকৃত হয়েছে।

ছোট আকারের মোটর গাড়ি ভাল কি বৃহদাকারের গাড়ি ভাল—এই প্রশ্নটি কোন কোন মহল তুলে থাকেন। কোন ধরণের গাড়ি তুলনায় নিরাপদ হতে পারে, সেটাই একটা বড় প্রশ্ন। অন্ততঃ মার্কিণ-মুলুকে যেখানকার রাজপথে রকমারি মোটর যান দেখতে পাওয়া যাবে আর তাও বিপুল সংখ্যায়, সেখানে এই প্রশ্নটি উঠেছে। গাড়ি বড় হলে, দুর্ঘটনা যদি ঘটে, তা বড় রকম হওয়াই স্বাভাবিক—ছোট আকারের গাড়ি হলে সে ভয়ের মাত্রা কিছুটা কম হবে, এমনটি আশা করা যায়। বড় গাড়ি প্রশস্ত রাস্তা পেলেই চলতে পারে, ক্ষুদ্রাকৃতি গাড়ির অলিগলিতে ঢুকতেও অসুবিধা নেই। আবার পরিবহন সামর্থ্য বাড়াতে হলে বড় গাড়িই চাই—ছোট গাড়ি ক'জন লোক বা কতটুকু মাল একসঙ্গে বইতে পারবে?

আমেরিকার ঊর্দ্ধতন মহলে মোটর যানের আয়তনের প্রশ্নটি নিয়ে বিশেষ রকম আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে কিছুকাল আগেও। সে দেশের রাজপথে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাড়ি ছুটে চলেছে অহরহ—এর পাশে ছোট ছোট মোটর যান চালাতে দেখলে মনে কতকগুলো প্রশ্ন উঠতে পারে বৈ-কি। ছোট গাড়ি দামে সস্তা, শুধু কি এই সুবিধা, না বড় মোটরের চেয়ে এই শ্রেণীর গাড়ি করে চলা সত্যি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ?

কেউ কেউ দাবী করে থাকেন—ক্ষুদ্রাকৃতি মোটর যানসমূহের পক্ষে বিপদ অতিক্রম করা সহজতর—বৃহৎ গাড়িগুলিকে জরুরী মুহূর্ত দেখা দেওয়া মাত্র ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা তুলনায় একটু কঠিন হতে পারে। শুধু আকারই কেন, সেইখানে গাড়ির ওজনের প্রশ্নটিও এসে যায়।

আবার অপর একটি শ্রেণীর অভিমত—দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। মোটর গাড়ির আকার বড় কি ছোট, তার ওপর নির্ভর করে দুর্ঘটনা ঘটে না কিংবা সেই দুর্ঘটনার আকার-প্রকার নির্ণীত হয় না। গাড়ি বড় রাখা কি ছোট রাখা এটা ব্যক্তিবিশেষের অনেকটা পছন্দের প্রশ্ন, প্রয়োজন মিটানোর প্রশ্ন। মার্কিণ নিরাপত্তা সংস্থাসমূহও কোন জাতীয় মোটর যান অধিক নিরাপদ—এ সম্পর্কে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি, সেটা লক্ষ্য করবার।

প্রকৃতপক্ষে বড় মোটর সব সময়ই ক্ষুদ্র আকারের গাড়ির চেয়ে নিরাপদ কিংবা ব্যাপারটা ঠিক এর উল্টো—সরাসরি এই অভিমত দেওয়া চলবে না। গাড়ির যান্ত্রিক ভালো-মন্দের প্রশ্ন, পথের অবস্থা এবং আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে ঐ নিরাপত্তা প্রশ্নটি সংযোজিত। চলতি পথে মোটর চালকের সাহসী মন ও দক্ষতাও মোটর আরোহীর নিরাপত্তার পক্ষে একটি মস্ত জিনিস, প্রসঙ্গতঃ এটা না বললে হবে না।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আট

॥ ক ॥

নিঃশ্বাস বন্ধ করে যেন একেবারে মরার মতই পড়ে থাকে শিবনাথ।

ছায়ামূর্তিটা তারই শয্যার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তবে কি সুন্দর সাহেব সব জেনে ফেলেছে। সুন্দর সাহেব জেনে ফেলেছে যে মৃন্ময়ী তার ঘরে এসেছিল একটু আগে।

পর্তুগীজ জলদস্যু সুন্দর সাহেব।

ব্যাপারটা জানতে পেরে থাকলে তাকে ক্ষমা করবে না। হয়ত তার ঘরে মোটা চামড়ার কোমরবন্ধটার সঙ্গে যে গুলিভর্তি গাদা পিস্তলটা ঝুলানো আছে সেই পিস্তলের একটা গুলিতেই তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।

কি করবে ঐ মুহূর্তে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এবং ভাববারও খুব একটা সময় পায় না। তার আগেই সহসা একটা ভারী চাদর ওকে চারপাশ থেকে ঢেকে দেয় এবং একটা শব্দ করবারও সময় পায় না শিবনাথ।

আততায়ী সেই ভারী চাদরে তাকে ঢেকে একটা বোঁচকার মতই অক্লেশে এক ঝাঁকুনী দিয়ে কাঁধের 'পরে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

ব্যাপারটা এত আকস্মিক ও এত দ্রুত ঘটে যায় যে, কোন রকম চিৎকার বা প্রতিবাদ করবারও কথা যেন মনে হয় না শিবনাথের। কাঁধের উপরে ফেলে হন হন করে এগিয়ে চলে।

ভয়ে উত্তেজনায় সমস্ত শরীরটা শিবনাথের তখন পাথর হয়ে গিয়েছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

বেশ খানিকটা চলবার পর আততায়ী তাকে কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতেই ওর গায়ের উপর থেকে ভারী চাদরটা ঝুপ করে মাটিতে ওর পায়ের সামনে পড়ে গেল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ রুক্ষ কণ্ঠস্বর ওর কানে এলো। কে তুই?

কণ্ঠস্বরটা কানে যেতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠেছিল শিবনাথ এক মুহূর্তে তার নিষ্ক্রিয় পঙ্গু ভাবটা কেটে যায়।

স্থানটি কৃষ্ণাচতুর্দশীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে মৃদু আলোকিত ... মৃদু আলোয় সামনে চোখ তুলে তাকাতেই শিবনাথ যেন ... হয়ে যায়। শিবনাথের সামনে দাঁড়িয়ে জগা।

গুলবাঘের মত বেঁটে খাটো এবং পেশী বহুল ঘাড় গর্দানে একটা বীভৎস জানোয়ারের মত জগার সামনে যতদিন শিবনাথ ... সরকারের গৃহে ছিল পারতপক্ষে বড় একটা ঘেঁষে নি। ... নাক, খুদে খুদে চক্ষু, নির্লোম ভ্রূ এবং কপাল ও মুখ... আব, পুরু ওষ্ঠ, নোংরা হরিদ্রাভ আঁকা বাঁকা দাঁত—মুখখানা ... তাকালেই কেমন যেন শিবনাথের ভয় ভয় করেছে।

শিবনাথের বুকের ভিতরে তখন কাঁপুনি শুরু হয়ে গি...

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে ইতিমধ্যে জগাও তাকে চিনতে পেরেছি... বলে, শিবু ঠাকুর তুমি?

জগা!—

ধেৎ তেরি! শালা দেখছি আজ বাঁয়ে শিয়াল নিয়ে যাত্রা করেছিলাম। পরিশ্রমটাই মাঠে মারা গেল—

কথাগুলো বিরক্তিসূচক কণ্ঠে বলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় জগা।

এতক্ষণে যেন পুরোপুরি সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে শিবনাথ কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়া যেমন দুর্বোধ্য তেমনি বুদ্ধির অগোচর।

ভয়ে যদিও তখন তার বুকের মধ্যে দুর দুর করছে তবু ... ক্ষীণকণ্ঠে ডাকে, জগা!—

জগা ফিরে দাঁড়ায় সে ডাকে এবং তার হলদে আঁকাবাঁকা দাঁতগুলো বের করে একটা কুশ্রী জান্তব হাসি হেসে ... এখনও দাঁড়িয়ে রইলে কেন শিবু ঠাকুর। যাও ঘরে যাও। মনে কিছু করো না ঠাকুর, মিথ্যে অন্ধকারে ঘর ঠিক না করতে পেরে তোমাকে খানিকটা কষ্ট দিলাম—

হঠাৎ কি হয় শিবনাথের বোকার মতই বলে বসে কথা... ঘর ঠিক না করতে পেরে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সুন্দর সাহেবের মাগীটার ঘরে—অন্ধকারে ভুল করে তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছি।

আচ্ছা চলি—

আর মুহূর্তও দাঁড়াল না জগা। অন্ধকারে বাগানের মধ্য দিয়ে সড়াৎ করে যেন কোন দিকে মিলিয়ে গেল।

শিবনাথ তখনো নির্বাক নিস্পন্দ একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

কি বলে গেল জগা।

প্রথমটায় জগার কথাগুলো তার মগজে ঠিক প্রবেশ করেনি। কিন্তু হঠাৎ যেন একটা কথা তার মগজে বিদ্যুৎ চমকের মতই খেলে যায়।

সুন্দর সাহেবের মাগী।

তার মানে—তার মানে কি ঐ মৃন্ময়ী!

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শিবনাথ দ্বিগুণ চম্‌কে ওঠে। ঐ শয়তান জগা তাহলে মৃন্ময়ীকে চুরি করতেই সুন্দরমের গৃহে এত রাত্রে এসেছিল। ভুল করে ঘরটা চিনতে না পেরে তার ঘরে ঢুকে পড়ে তাকে চাদর মুড়ি দিয়ে তুলে এনেছিল।

সর্বনাশ। ঐ জানোয়ারটা তাহলে ভাগ্যক্রমে ঘর না ভুল করলে এতক্ষণে মৃন্ময়ীকে এই রাত্রির অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে চলে যেত। সে বা সুন্দর সাহেব কেউ জানতে পারত না। কিন্তু কেন চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছিল মৃন্ময়ীকে জগা, আর কোথায়ই বা নিয়ে যেত। নিশ্চয় অরিন্দম সরকারের গৃহেই!

জগা নিশ্চয়ই নিজে থেকে আসেনি, অরিন্দম সরকারের পেয়ারের বিশ্বাসী অনুচর নিশ্চয়ই অরিন্দম সরকারের নির্দেশেই এসেছিল।

কিন্তু কেন! অরিন্দম সরকার মৃন্ময়ীকে চুরি করতে চায় কেন? মৃন্ময়ীকে তার কিসের প্রয়োজন। সব যেন শিবনাথের কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদ ইতিমধ্যে পশ্চিমাকাশে অনেকটা হেলে পড়েছে। চাঁদের আলো মনে হয় যেন আরো পাণ্ডুর। বাগানের গাছপালাগুলো পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় কেমন যেন স্তূপীকৃত ছায়ার মত মনে হয়।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা চারিদিকে আধো আলো আধো ছায়ায় যেন থমথম করছে। কেমন যেন শিরশির করে ওঠে শিবনাথের সমস্ত শরীর।

কর্কশ শব্দে একটা পেঁচক কোন্ অন্ধকার ডালের মধ্যে আত্মগোপন করে ডেকে ওঠে। মনে হয় শিবনাথের, মধ্যরাত্রি যেন শিউরে উঠলো হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের মনে পড়ে যায় সে একা। একা মধ্যরাত্রির নির্জন বাগানের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে।

মধ্যরাত্রির একটা হাওয়ার ঝাপটায় আশেপাশের গাছপালাগুলো মৃদু শব্দে হঠাৎ যেন ফিসফিস করে কি বলতে শুরু করে।

শিবনাথ দ্রুত পদবিক্ষেপে ভিতরের দিকে চলে যায়।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজায় অর্গল তুলে দেয়। এবং এতক্ষণে যেন নিজেকে কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে।

অন্ধকারেই শয্যার উপর এসে বসে।

ঝিম্ দিয়ে বসে আজকের রাত্রির পর পর যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল, মনে মনে সেই ঘটনাগুলো নতুন করে আবার ভাববার চেষ্টা করে।

মৃন্ময়ী তার ঘরে এসেছিল। শুধু আসেই নি। মৃন্ময়ীর সেই স্পর্শ যা তার দেহের সমস্ত শিরায় শিরায় বিচিত্র একটা উন্মাদনা জাগিয়েছিল, নতুন করেই সেই উন্মাদনাটা আবার উপভোগ করবার চেষ্টা করে।

মৃন্ময়ী।

পাশের ঘরের পরের ঘরটাতেই মৃন্ময়ী আছে। হয়ত ঘুমায় নি এখনো, জেগেই আছে। জগা এসেছিল তাকে চুরি করে নিয়ে যেতে।

কিন্তু কেন, কেন জগা এসেছিল মৃন্ময়ীকে চুরি করে নিয়ে যেতে?

মৃন্ময়ীকে সুন্দর সাহেবও চুরি করে এনেছে। তাকে জোর করে সুন্দর সাহেব বিবাহ করতে চায়। কিন্তু মৃন্ময়ী তা চায় না।

মৃন্ময়ী সুন্দর সাহেবকে ঘৃণা করে।

মৃন্ময়ীর সুন্দর মুখখানি তার তন্বী দেহবল্লরী সমস্ত দৃষ্টিটা জুড়ে শিবনাথের স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মৃন্ময়ী।

মুক্তি চায় মৃন্ময়ী। পালিয়ে যেতে চায় এখান থেকে। অরিন্দম সরকারও চায় মৃন্ময়ীকে। মৃন্ময়ী তার ঘরে এসেছিল। তার হাতটা চেপে ধরেছিল। আচ্ছা মৃন্ময়ী কি ঘুমাচ্ছে। মনের পাতায় ভেসে ওঠে মৃন্ময়ীর যৌবন ঢল ঢল দেহ-বল্লরী। মৃন্ময়ী, মৃন্ময়ী।

শিবনাথের দেহের ধমনীতে ধমনীতে বিচিত্র একটা উত্তেজনা যেন খরস্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নাভিদেশ থেকে একটা কি যেন উপরের দিকে ঠেলে উঠছে।

সে রাতটার কথা শিবনাথ অনেক দিন ভুলতে পারে নি যেমন তেমনি সেই রাতের পর অনেকদিন মৃন্ময়ীর সামনা-সামনিও যেতে পারে নি শিবনাথ।

এবং পাছে দু'জনার চোখাচোখি হয়ে যায় তাই শিবনাথ অতঃপর মৃন্ময়ীকে যেন এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করেছে।

আরো একটা কথা মধ্যে মধ্যে মনে হয়েছে শিবনাথের সে রাত্রের জগার আগমনের কথাটা সুন্দর সাহেবকে বলবে কি না। কারণ পরে সে বুঝতে পেরেছিল জগা যে মৃন্ময়ীকে সে রাত্রে চুরী করতে এসেছিল সে অরিন্দম সরকারের জন্যই।

সুন্দর সাহেবকে সাবধান করে দেওয়া উচিত তার অরিন্দম সরকার সম্পর্কে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে আর সেই সাপ যদি তাকেই ছোবল হানে।

তার চাইতে চুপ করে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু কথাটা সে সুন্দর সাহেবকে না বললেও অতঃপর রাত্রের দিকে সে সজাগ থাকারই চেষ্টা করত।

শিবনাথের সন্দেহটা কিন্তু মিথ্যা নয়।

জগাকে অরিন্দম সরকারই পাঠিয়েছিল সে রাত্রে সুন্দর সাহেবের গৃহে মৃন্ময়ীকে চুরি করে নিয়ে যাবার জন্য।

সুন্দরম যেদিন অরিন্দম সরকারের কাছে গিয়েছিল তার কুলীর বাজারের বাগান-বাড়িটা নেবার জন্য পরের দিনই সুন্দরম জানতেও পারে নি যে জগা গিয়ে তার গোপনে সমস্ত সংবাদ নিয়ে এসেছিল এবং মৃন্ময়ীকে দেখে এসে অরিন্দম সরকারকে সে সংবাদটাও দিয়েছিল।

বলেছিল, খবর খুব ভাল কর্তা।

ফরসীর নলটা হাতে ধরে সুখটান দিতে দিতে নেশাগ্রস্ত অর্ধ-নিমিলিত চক্ষু দুটি তুলে অরিন্দম সরকার কথাটা শুনেই নিঃশব্দে তাকিয়েছিল জগার মুখের দিকে।

খুপসুরৎ একটা মাগী কর্তা—

বয়স কত?

অল্প বয়েস।

হুঁ। আচ্ছা তুই যা।

বাগান-বাড়িটা ভাড়া চাওয়ায় ঐ রকমই একটা সন্দেহ হয়েছিল অরিন্দম সরকারের। শালা পর্তুগীজ দস্যু। নিশ্চয়ই ছুঁড়িটাকে সুন্দরম কোথা থেকে ডাকাতি করে নিয়ে এসেছে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে নারীমাংসলোভী দুশ্চরিত্র অরিন্দম সরকারের মনটা লালসায় হিল হিল করতে থাকে।

এবং মনে মনে হাসে অরিন্দম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু করে না। ক'টা দিন অপেক্ষা করে ভুলতেও কিন্তু পারে না জগার কথাটা অরিন্দম সরকার।

ক'টা দিন মনে মনে চিন্তা করে অবশেষে একদিন ডেকে পাঠায় অরিন্দম জগাকে।

জগা—

কর্তা।

সুন্দর সাহেবের মেয়েটাকে আমার চাই—

হলদে আঁকা-বাঁকা দাঁতগুলো বের করে জগা হাসে।

পারবি?

খুব। এ আর এমন শক্ত কি?

ঠিক আছে। কবে কাজ হাসিল করবি!

হুকুম করেন ত আজই!

ঠিক আছে— তাহলে আজ রাতেই সোজা মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে তুলবি বেলগাছিয়াতে মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িতে। বুঝেছিস?

জগার কুৎসিৎ মুখে আবার যেন জান্তব হাসি জেগে ওঠে। ঘাড় কাত করে বলে, আজ্ঞে তা আর বুঝি নি।

জগা কথাটা বলে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, অরিন্দম সরকার ফরসীর জরি জড়ানো নলটা মুখ থেকে হাতের মধ্যে নিয়ে ডাকে, এই শোন—

ঘুরে দাঁড়াল জগা।

একা যদি না পারিস ত সঙ্গে নরোত্তমকে নিবি?

এজ্ঞে নরোত্তমকে দিয়ে কি হবে? জগা বলে।

তবে! তুই একাই পারবি?

এ-আর কি এমন কাজ কত্তা। রাতারাতি ঠ্যাঙাড়ের মাঠ থেকে কত সময় দু-দুটো লাশ কাঁধে বয়ে নিয়ে কালী দীঘির পাকের নীচে পুঁতে ফেলেছি তা এতো একটা ছুঁড়ি।

তা হোক—বলা যায় না—সঙ্গে একজন থাকা ভাল।

না কত্তা। এসব কাজে দোসর না থাকাই ভাল।

অরিন্দম সরকার কি যেন মুহূর্তকাল আপন মনে ভাবে, কথাটা মিথ্যে বলেনি জগা, এসব ব্যাপারে যত জানা জানি না হয় ততই ভাল।

ঘাড় নেড়ে বলে, বেশ—যা ভাল বুঝিস কর।

জগার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল অরিন্দম সরকার। মিথ্যে বড়াই করে না জগা। একান্ত নিশ্চিন্ত মনেই তাই অরিন্দম সরকার

সেজেগুজে মহেন্দ্র সাহার বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে পাল্কী গাড়িতে চেপে গিয়ে উপস্থিত হয়।

মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িটা কিনে নিয়েছিল অরিন্দম সরকার কিছুদিন আগে।

গত কয়েক মাস ধরে মহেন্দ্র সাহার ব্যবসায় লোকসান চলছিল। সে কারণে বাজারে এবং মহাজনদের কাছে কিছু কিছু তার ধার দেনাও হয়েছিল।

তাছাড়া দীর্ঘদিনের অত্যাচারে শরীরেও ভাঙ্গন ধরেছিল। যকৃতের একটা ব্যথা মধ্যে মধ্যে উঠে প্রায়ই তাকে শয্যাশায়ী করে দিচ্ছিল।

সব দিক ভেবেই মহেন্দ্র সাহা তার বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িটা বিক্রী করে দেবার মনস্থ করেছিল। ক্ষীরোদাকে বাগানবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার সেও ছিল অন্যতম কারণ।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন কথাটা বন্ধু অরিন্দম সরকারকে বলায় অরিন্দম সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, বিক্রী করে দেবে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ি ?

হাঁ ভাল দর পেলে—দেখো তো সরকার তেমন খদ্দের যদি একটা পাও ?

খদ্দের দেখতে হবে না, যদি সত্যিই বেচো ত আমিই কিনতে পারি! অরিন্দম সরকার বলে।

তুমি! তুমি কিনবে ?

কিনবো। কত দাম চাও ?

কথাটা যখন তোমাকে খুলেই বলি সরকার। বাজারে কিছু ধার দেনা হয়ে গিয়েছে—এই বাগানবাড়ি বেচে ঋণ মুক্ত হতে চাই—

বাগানবাড়িটার উপরে অরিন্দম সরকারের বরাবরই একটা লোভ ছিল কাজেই বেশী দরদস্তুর সে করল না। মহেন্দ্র সাহা যা চেয়েছিল তাতেই বলতে গেলে রাজী হয়ে গেল এবং দিন কয়েক বাদে টাকা মিটিয়ে বাড়িটা কিনে নিল।

বৃন্দাবনকে অবিশ্যি অরিন্দম সরকার ছাড়ায় নি। বাগানবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার উপরেই রেখে দিল।

বাগানবাড়িটা ক্রয় করা অবধি অরিন্দম সরকার একদিনও আসে নি।

আজই প্রথম সে এসেছে।

বাবু আসবেন শুনে বৃন্দাবন আগে থাকতেই ঘর-দোর ঝাঁট পাট দিয়ে, ফরাস পেতে ঝাড় বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

পাল্কী গাড়ির শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি বৃন্দাবন সদরে গিয়ে দাঁড়ায়।

হাতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে পাল্কীগাড়ি থেকে নেমে অরিন্দম সরকার ভিতরে গিয়ে পা দেয়, মিহি গিলে করা শান্তিপুরী ধুতি, আদ্দির ফুলকাটা বেনিয়ান, গলায় কোঁচান ফরাসডাঙ্গার চাদর, তার উপর বেলের গোড়ের মালা।

অরিন্দম সরকার একেবারে ফুলবাবুটি সেজে এসেচে।

পাল্কীগাড়িতে করেই অরিন্দম সরকার সুরার বোতল নিয়ে এসেছিল। কোচোয়ান ঝাঁকা ভর্তি সুরার বোতল ঘরের কোণে এনে নামিয়ে রাখে।

বিস্তৃত ফরাসের উপর ঝাড়বাতির উজ্জ্বল আলোর নীচে এসে বসল অরিন্দম সরকার আরাম করে।

আদব কায়দায় বৃন্দাবন অভ্যস্ত। তাড়াতাড়ি সে বাবুর সামনে বোতল গ্লাস ইত্যাদি সাজিয়ে দেয়।

কি রে ?

এখানেই আজ আহার হবে ত'!

হাঁ—মাংস নিয়ে আয় রান্না কর—

যে আজ্ঞে—

আভূমি নত হ'য়ে ফিরিঙ্গী কায়দায় সেলাম ঠুকে বৃন্দাবন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অরিন্দম সরকার সুরাভর্তি পাত্রে চুমুক দেয় আরাম করে।

নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যায়, রাত বাড়তে থাকে তবু জগার দেখা নেই। ক্রমশঃ বিচলিত হয়ে উঠতে থাকে অরিন্দম সরকার। এবং যত বিচলিত হয় তত বেশী মদ্যপান করতে থাকে। মাথার মধ্যে সুরার আগুন জ্বলতে থাকে।

জগা এলো প্রায় রাত তৃতীয় প্রহরে।

কোন মতে বিরাট একটা তাকিয়ার উপরে ঠেস দিয়ে বসে ছিল অরিন্দম সরকার। ঢুলুঢুলু নেশাগ্রস্ত রক্তাক্ত দুটি চক্ষু। পদশব্দে নেশাগ্রস্ত দুটি আরক্ত চক্ষু মেলে তাকাল অরিন্দম সরকার, কে ?

আজ্ঞে কর্তা আমি জগা—মিন মিনে গলায় জবাব দেয় জগা।

এনেচিস ?

জগা মাথা নীচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিরে হারামজাদা, বোবা কেন ? জবাব দিচ্ছিস না কেন কথার ?

তবু নিশ্চুপ জগা।

এই হারামজাদা ? গর্জন করে ওঠে এবারে অরিন্দম সরকার, এনেছিস না—

না—

না ?

আজ্ঞে—একটু ভুলের জন্য অন্ধকারে—

শুধু হাতে ফিরে এসেচিস হারামজাদা ? জগার কথা শেষ হয় না, গর্জন করে ওঠে পুনরায় অরিন্দম সরকার এবং পর মুহূর্তেই হাতের সুরার বেলোয়ারী পাত্রটা সজোরে জগার মুখের 'পরে ছুঁড়ে মারে। একটা অস্ফুট চিৎকার শোনা যায়, ও সেই সঙ্গে বেলোয়ারী পাত্রটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ঝন ঝন শব্দ।

বেরো—বেরো এখান থেকে হারামজাদা—অপদার্থ—

জগা তখনো চেয়ে আছে অরিন্দম সরকারের মুখের দিকে, বীভৎস মুখটা তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বৃন্দাবন চেঁচামেচি শুনে হন্তদন্ত হয়ে এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ায়। [ক্রমশঃ

সাংস্কৃতিক সম্পদের আন্তর্জাতিক বিনিময়

"ভি. ও. এম. কে."—এই চারটি অক্ষর নানা দেশের প্রদর্শনী—ষ্টলে, বাণিজ্য ও শিল্পমেলার মণ্ডপে আর বাড়ির গায়ে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এই চারটি অক্ষর হল—"ভ্‌সেসোউজ্‌নোইয়ে ওব্‌শ্চেস্তভো মেজ্‌দুনারোদ্‌নাইয়া কৃনিগা"র (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক গ্রন্থ সংস্থা) আদ্যাক্ষর। নোভোস্তি প্রেস এজেন্সির একজন প্রতিনিধি এই সংস্থার উপসভাপতি বোরিস মাকারফকে মেজ্‌দুনারোদ্‌নাইয়া কৃনিগা-র কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি সেই বিষয়ে বলেছেন। "মেজ্‌দুনারোদ্‌নাইয়া কৃনিগা" হল তার নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে একমাত্র সোভিয়েত ব্যবসায়িক সংস্থা। এর কাজ হল বিদেশের সঙ্গে যাবতীয় গ্রন্থ, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, চিত্রকর্মের ও অন্যান্য চারুকলার প্রতিলিপি ও নিদর্শন, গ্রামোফোন রেকর্ড, ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড-ফিল্‌ম্‌ ও ডাকটিকিট আমদানি-রপ্তানি করা। এই সংস্থার সমস্ত কাজকর্মের মূল লক্ষ্য হল বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে ব্যাপকতর করে তোলা, বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক সম্পদগুলির পারস্পরিক বিনিময়ে সহায়তা করা। উদাহরণ হিসাবে, আমরা পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল থেকে যে সব চিঠি পাই, তার কথা বলা যেতে পারে। এইসব পত্রলেখক হলেন বিদেশের বড়ো বড়ো পুস্তকবিক্রেতা ও গ্রন্থপ্রকাশক সংস্থা, অধ্যাপক-শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি। কোনো বাছাই না করে হাতের কাছেই যে-চিঠিগুলি রয়েছে, সেগুলির কথাই ধরা যাক। ঘানার রাজধানী আক্রা থেকে একজন ছাত্র লিখেছেন: "আমি আর আমার বোন ম্যাক্‌সিম গোর্কির রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। দয়া করে গোর্কির রচনাবলীর ইংরেজি অনুবাদ পাঠাবেন।" ভারতের মাদ্রাজ শহরের "এন. এস. বি. এইচ. বুক স্টোর্স্‌" নামক একটি বইয়ের দোকান লিখেছেন: "আপনাদের প্রেরিত বিজ্ঞান ও কারিগরি সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির চাহিদা আমাদের শিক্ষক-ছাত্র ও কারিগরদের কাছে ক্রমেই বাড়ছে। এই বিষয়ের বহু সোভিয়েত গ্রন্থ আমাদের কলেজ আর কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। মাদ্রাজ টেকনিক্যাল কলেজে দোব্রোভোল্‌স্কি-র "মেশিন পার্টস" বইটি এবং এখানকার ধাতুবিদ্যা বিভাগে লাখারফের "হীট ট্রিটমেন্ট অফ মেটাল্‌স্‌" বইটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। ইস্রায়েলের হাইফা শহর থেকে দাউদ বেন-দাক একদল ছাত্রের পক্ষ থেকে চেয়ে পাঠিয়েছেন সোভিয়েত দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি আর সোভিয়েত গভর্ণমেন্টের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। সহজবোধ্য কয়েকটি বিজ্ঞানগ্রন্থ "ইন্টার-প্ল্যানেটরি ফ্লাইট্‌স্‌", "ইনভিজিবল ওয়ার্ল্‌ড্‌স", "অ্যাটমিক নিউক্লিয়স" ও "মেটিওরস" পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা থেকে ও. বি. লুবিস। ব্রেজিলের সান্তামারিয়া শহর থেকে একজন ব্যাঙ্ক-কেরাণী রোল্যাণ্ড শিলিং স্প্যানীশ ভাষায় প্রকাশিত "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র: আজ ও আগামী কাল" বইটি পড়ে খুব ভালো লেগেছে বলে জানিয়েছেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রকাশন বিভাগ থেকে প্রকাশিত পৃথিবীর বিভিন্ন লেখকদের লেখা রবীন্দ্র সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর রুশ-ভাষায় রূপায়িত একটি সঙ্কলনের প্রচ্ছদচিত্র।

নানা বিষয়ের বই

১৯৬১ সালে সোভিয়েত পুস্তক প্রকাশক সংস্থাগুলি ৪১,৫০০টি বিভিন্ন গ্রন্থ (টাইটেল) প্রকাশ করে, যার মোট কপি মুদ্রিত হয় একশত কোটিরও বেশি। বিদেশ থেকে আমাদের কাছে কি ধরণের সোভিয়েত বইয়ের অর্ডার সাধারণত আসে? সব ধরণের বইয়ের অর্ডারই আমরা পাই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে ক্লাসিক বই, রুশ সাহিত্যের চিরায়ত গ্রন্থ, সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে গবেষণাগ্রন্থ থেকে শুরু করে সহজবোধ্য সর্বজনপাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ, শিশুপাঠ্য সচিত্র বই, চারুকলা ও কারুকলার বই, অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বমূলক ও বর্ণনামূলক বই, সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেসে গৃহীত নতুন কার্যসূচী সংক্রান্ত বই, দর্শন-রাজনীতি-ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্বের বই —সব কিছুরই অর্ডার আমরা পাই ও সরবরাহ করি। বিদেশে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় সোভিয়েত শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলি। চাহিদার দিক থেকে এর পরেই সহজবোধ্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ আর সাহিত্যগ্রন্থগুলির (ক্লাসিক ও আধুনিক উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদি) স্থান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও রাজনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির এবং সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বইয়ের চাহিদা খুব বেশি। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সর্বদেশের জনসাধারণের আগ্রহ-ঔৎসুক্য যে প্রতিদিন কতো ব্যাপক হচ্ছে, তা বোঝা যায় সোভিয়েত বিজ্ঞানের, অর্থনীতির, সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা—গ্রন্থগুলির ক্রমবর্ধমান

অর্ডার থেকে। বিদেশের যে সব প্রকাশক প্রতিষ্ঠান সোভিয়েত বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করতে চান, তাঁরা বহু ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আমাদের মধ্যস্থতায় নিজ নিজ দেশে নানা ধরণের সোভিয়েত বইয়ের পুনর্মুদ্রণ অথবা অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি প্রধান প্রকাশক প্রতিষ্ঠান "মেজ্‌দুনারোদ্‌নাইয়া কৃনিগা"-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিখিল-সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বহু বিজ্ঞান গবেষণা-গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। লণ্ডনের "দি ব্রিটিশ পারগ্যামন প্রেস" প্রকাশক সংস্থা "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত তথ্য" নামক সুবৃহৎ সোভিয়েত বিশ্বকোষের ৫০তম খণ্ডটি সম্প্রতি ইংরেজি অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এই মূল গ্রন্থের পরিপূরক হিসেবে এঁরা আরও পাঁচটি পরিশিষ্টে সোভিয়েত অর্থনীতি, বিংশ পার্টি কংগ্রেস, বৈদেশিক বাণিজ্য ও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বহু তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন। "কোলেটস্" ও "সেণ্ট্রাল বুকস্" এই দুটি সুবিখ্যাত ব্রিটিশ সংস্থার সঙ্গে মেজ্‌দুনারোদ্‌নাইয়া কৃনিগা-র ব্যবসায়িক সম্পর্ক দীর্ঘকালের। সোভিয়েত প্রকাশক সংস্থাগুলি কর্তৃক কুড়িটি বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত সোভিয়েত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা এঁরা ও আরও বহু বিদেশী প্রতিষ্ঠান আমাদের মারফতে আমদানি করেন। সোভিয়েত বই ও পত্রিকার বিপুল চাহিদা দেখে বহু ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ দেশে শুধু সোভিয়েত বই ও পত্রিকা বিক্রয়ের জন্যেই বিশেষ দোকান খুলেছেন। আন্তর্জাতিক বইয়ের বাজারে আমাদের কোনোরকম বাধা-অসুবিধায় মুখোমুখী হতে হয় কি-না, এ প্রশ্নের জবাবে দুঃখের সঙ্গে "হ্যাঁ" বলতে হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে—যেমন, গ্রীসে ও পশ্চিম জার্মানিতে—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত বই সম্পর্কে বিভেদমূলক নীতি অনুসরণ করা হয়। গ্রীসের শুল্ক কর্তৃপক্ষ গ্রীক পুস্তক-সংস্থাগুলির অর্ডার অনুসারে প্রেরিত সোভিয়েত বই আটক করে থাকেন কোনো কারণ না দেখিয়ে। অনেক সময়ে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়: এঁরা প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য বই আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুরোধে প্রেরিত রুশ ভাষায় মুদ্রিত পাঠ্য বইকেও "নাশকতা-মূলক জিনিস" এর মধ্যে ধরেন।

গ্রামোফোন রেকর্ড ও সংগীত-গ্রন্থ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছরে শুধু সংগীতের গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হয় মোট প্রায় বারো কোটি। এগুলির মধ্যে থাকে ক্লাসিকাল রাশিয়ান সংগীতের ও আধুনিক সোভিয়েত সংগীতের—অপেরা, ব্যালে, সিম্ফনি, কনসার্ট, সিনেমা ইত্যাদির—যন্ত্রসংগীত ও কণ্ঠসংগীত এবং বিশিষ্ট যন্ত্রবাদক ও গায়কদের একক বাজনা ও গান। এসব গ্রামোফোন রেকর্ড বিপুল সংখ্যায় বিদেশে রপ্তানি হয়। বোল্‌শোই থিয়েটার, ষ্টেট সিম্ফনি অর্কেষ্ট্রা, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর সংগীত-নাট্য দল প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত সংগীতদলের অনুষ্ঠানের রেকর্ড, খ্যাতনামা সোভিয়েত পিয়ানোবাদক রিখতার, গিলেল্‌স্‌, ওবোরিন, বেহালাবাদক ওইস্ত্রাখ প্রভৃতির বাজনার রেকর্ড বিদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সোভিয়েত সংগীতের স্বরলিপি ও সংগীত সম্পর্কে বহু সোভিয়েত গ্রন্থও আমরা প্রচুর সংখ্যায় বিদেশে রপ্তানি করি। শোস্তাকোভিচের আর প্রোকোফিয়েভের সিম্ফনিগুলির লক্ষ লক্ষ রেকর্ড প্রতি বছরে বিদেশে রপ্তানি হয়। সোভিয়েত চিত্রকরদের আঁকা ছবির বড়ো আকারের পুনর্মুদ্রণ, ম্যাজিক লণ্ঠনের শ্লাইড ফিল্ম ও ডাক টিকিট সোভিয়েত দেশের বর্ণাঢ্য দৃশ্য-পরিবেশের ও জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সুন্দর পরিচয় বহন করে নিয়ে যায় বিদেশীর কাছে।

পবিত্র জ্ঞানের প্রতি জাগ্রত জার্মান

বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান, ধর্মীয় জ্ঞান। বেদ হইতেছে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ। ইহা অতীত যুগের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আলোকপাত করিয়াছে এবং ইহার অন্তর্নিহিত শব্দ প্রথম শতাব্দীতে অনুমোদন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পাশ্চাত্যের গুণিব্যক্তিরাও ইহা অনুমোদন করেন। আমরা যখনই বেদের কথা চিন্তা করি, তখনই ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয়েই স্মরণ করি মহাপুরুষ ম্যাক্সমূলারের কথা, যিনি তাঁর সমস্ত জীবনীশক্তি দিয়া ভারতীয় এই ধর্মগ্রন্থটিকে ইংরাজী ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। খৃষ্টাব্দ, ১৮৭৪ সালে ম্যাক্সমূলার সংকলিত ঋগবেদ আবির্ভূত হওয়ায় সম্ভবতঃ এক বৎসর পর দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য্য সমাজের স্থাপনা

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবৎসরে স্বস্তিক প্রকাশন (কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত "স্বামী বিবেকানন্দস রাউসিং কল টু হিন্দু নেশান" গ্রন্থটির প্রচ্ছদের প্রতিলিপি

মনীষী আইনষ্টাইনের জীবন বিষয়ক শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী (কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রচ্ছদ আলেখ্য।

করেন, যাহার মূল উদ্দেশ্য বৈদিক যুগে ফিরে যাওয়া ও ভারতের পূর্ব্ব ঐতিহ্যকে জগতের সামনে নিয়ে আসা। গোটেনগানে বসবাস কালে তিনি অক্সফোর্ডের গুণিদের এক মহৎ কাজ করিয়াছিলেন যাহা, বেদের ইতিহাস ও সম্পাদকের বিবৃতিকে সুন্দরভাবে সমালোচনা। ইহাতে ভারতীয় জীবন ও ভারতবর্ষের ঐশ্বরীক চিন্তা বিশ্বের কতখানি অঙ্গ জুড়িয়া আছে তাহা প্রকাশ পায়। ১৮৩৮ সালে ডা: রোসেন কর্ত্তৃক মূল বইটি অন্য অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়। অদ্যাবধি পূর্ব ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ম্যাক্সমুলারের অনুবাদটি সাদরে গৃহীত হয়। জার্ম্মানীর গুণিব্যক্তিরা বেদের উন্নতি সাধন করেন এবং ইহা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রবল ভাবে বিস্তার লাভ করে। এই ব্যাপারে বিশেষ ভাবে মনে করায় হেনরীক জিমারের "পুরাতন ভারতীয় জীবন ও বৈদিক যুগের আর্য্যদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। ইহা ১৮৭৯ সালে বার্লিন এবং ফুটে আবিষ্কৃত হয় যাহাতে ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার প্রতি হ্যারমাণ্ড ওলডেনবার্গ আলোকপাত করিয়াছেন তাঁর রচিত বেদের ধর্ম্মপুস্তকে। ইহা ১৮৯৪ সালে ষ্টুটগার্টে প্রকাশিত হয় এবং ধর্ম্মের ইতিহাসে বদ্ধপরিকর হয়, যাহা ভারতীয় পদ্ধতি হইতে বৈজ্ঞানিক ভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। সিলিসিয়ানের রাজধানী ব্রিসলাওতে আলফের্ড হিলিব্রাণ্ড ১৮৯১ সালের ৩ বৎসর পূর্ব্বে পৌরাণিক বেদের সূচনা করেন। ১৯০২ সালে ইহাকে তিনি ৩টি অংশে বর্দ্ধিত করেন। হিলিব্রাণ্ডের লেখনী হইতেছে ভারতীয় দেবতাগণের সামাজিক অভিধান। ১৯২৭ ও ১৯২৯ সালের মধ্যে পুরাণের অনুবাদ দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে পুরাতন পুস্তকাবলীও চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইসময় ১ম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই জার্ম্মানীর গুণি-ব্যক্তিরা বেদ আবিষ্কারকার্য্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৯১০ সালে হিলিব্রাণ্ডস রচিত পুরাণ ক্ষুদ্র সংস্করণে বেসলাওতে প্রকাশিত হয়, যাহার সারমর্ম্ম জার্ম্মান ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কে. এফ. গেল্ডনার তাঁহার বেদ ও ব্রাহ্মণত্ব পুস্তকে বেদের ধর্ম্মজ্ঞান বিশ্লেষণ করেন। ইহা ১৯০৮ সালে টুবলিনগেন-এ প্রকাশিত হয় যাহা ধর্ম্মীয় পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ২০ বৎসর পরে পুনর্মুদ্রণ হয়। ঐ সময় P. Th. Hoffmann তাঁর রচিত "The Wisdom of the Vedas"এ বাইবেলে ব্রাহ্মণত্বের আধ্যাত্মিক জীবনের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করেন। এই পুস্তকটি অত্যন্ত কার্য্যকরী হয় কেননা ইহা ভারতীয় ও জার্ম্মানীদের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় ঘটায়, এবং ইহা তখন প্রগাঢ়তা লাভ করে যখন বাঙালী তথা বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জার্ম্মানীতে এসেছিলেন। হ্যারমাণ অলমেল তখনও তাঁহার রচিত "The old Aryan of kind and nobility of their Gods"

এ যুগপরম্পরা বেদের সন্ধান কার্য্য চালাইতেছিলেন। ইহা ১৯৩৫ সালে ফ্রাঙ্কফোর্ট মেন এ প্রকাশিত হয়। ইহার কিছুদিন পর মহারাষ্ট্রের আর. এন. ডানডেকার একটী ছোট পুস্তক প্রকাশিত করেন যাহাতে বৈদিক যুগের মানুষ এবং ঋক ও অথর্ব্বযুগের ভারতীয়দের আত্মসন্তুষ্টি সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। আর. এন. ডানডেকার দীর্ঘকাল জার্ম্মানীতে বাস করিয়াছেন এবং তিনি একজন জার্ম্মানের মত জার্ম্মানীভাষা বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। Withelm Rau অবশেষে তাঁর সূক্ষ্ম কর্ম্মশক্তি দিয়ে বেদের সামাজিক রূপদান করেন, যাহা তিনি ব্রাহ্মপুস্তকে প্রাপ্ত অতীত ভারতের সামাজিক জীবন থেকে পেয়েছিলেন। (ভিস্বেনবাদেন ১৯৫৭)।

বেদের প্রয়োজনীয় এবং পুরাতনতম অধ্যায়গুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে 'ঋগ্‌বেদ', অতি মূল্যবান সঙ্গীতের জ্ঞান। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের জনগণের মধ্যেই ভাষার স্মৃতিস্তম্ভগুলি কেবলমাত্র সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী বলিয়াই নহে বরং পুরাতন বলিয়া সম্মানপ্রদ। ঋগ্‌বেদের সারমর্ম্ম ও ভগবানের প্রতি প্রার্থনার একটি মূল্যবান সামগ্রী। লাইপজিগে ১৮৭৮।৭৯ সালে প্রকাশিত আডলফ কায়েগী দ্বারা ঋক্‌বেদের অনুবাদ ভারতীয় সাহিত্য ঐশ্বর্য্যের এক সুন্দরতম দৃষ্টান্ত। এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার পুনঃ প্রকাশ হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লাইপজিগে ভালটার রুষ্ট ঋক্‌বেদের ইতিহাস এবং ক্রোনলজি লিখিত হইবার সময়ের সাহিত্য সমৃদ্ধির আশ্চর্য্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেন। ঋক্‌বেদের পূর্ণ অনুবাদে (লাইপজিগে ১৮৭৬।৭৭) হ্যারমান গ্রাজমেণ জার্ম্মানীতে বর্ত্তমান পাঠকদিগের জন্য দুইটী বিভিন্ন খণ্ডে প্রাচীন ভারতীয় ঐশ্বরীকতা বাদের ঐশ্বর্য্যতা প্রমাণ করেন। ১৮৭৬।৮৮ সালের মধ্যে মিঃ এ. লুধবিক প্রাগ, শহরের বিশ্ববিখ্যাত কার্ল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঋকবেদের অনুবাদ করিয়া ছয়টি বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই অনুবাদটি কোন ভাষায় পড়ানো হয় না কিন্তু ইহার সুবিধা এই যে ইহা জার্ম্মান পাঠকদিগকে সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞানের সামগ্রী জোগায়। ১৯১৩ সালে আলফ্রেড হিলিব্রাণ্ড গটিনগেনে ঋকবেদের চমৎকার অনুবাদ প্রকাশ করেন। কে, এল গেল্ডনার ঋকবেদকে মন্তব্যসহ পদ্যাকারে অনুবাদ করেন। যাহার প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৯২৩ সালে গটিনগেনে হয় এবং দ্বিতীয় খণ্ড ২৮ বৎসর পর কেমব্রিজ Massachusetts/USA ও সাথে সাথে ভিস্‌বাদেন-এ প্রকাশিত হয়।

বেদের অপর একটী অংশের নাম অথর্ব্ববেদ, যাহাকে ইংরাজীতে বলে "The knowledge of incontatious" ১৮৯৭ সালে বারাণসীতে ইংরাজ Griffith ও আমেরিকান Wrthmey কেম্ব্রিজ Massachusetts এ ১৯০৫ সালে পূর্ণ অনুবাদ করেন। জার্ম্মান ভাষায় A. Ludwig এবং Friedrich এর অবদান ভা[illegible] Friedrich Riickerts এর দ্বারা উচ্চাঙ্গের অনুবাদ, ১৯২৩ [illegible] H. Kreyenborg দ্বারা Hannover এ প্রকাশিত হয়। [illegible] দ্বিতীয়খণ্ড ১৯৩২ সালে Braulach এ প্রকাশিত হয়। Julius Grill তাঁহার কবি শক্তির দ্বারা অথর্ব্ববেদের একশত গীতের অনুবাদ করেন। যাহা ১৮৭৯ সালে প্রথমে টুবলিংগেনে এবং ১৮৮৮ সালে ষ্টুটগার্টে প্রকাশিত হয়। অবশেষে Hermann Beckh "The hymn of the earth" (ষ্টুটগার্ট ১৯৩৪) নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন যাহাতে সমস্ত বেদ বর্ত্তমান এবং জ্ঞানীদের পক্ষে অতি উচ্চাঙ্গের পুস্তক।

উপনিষদের শিক্ষার মাধ্যমে প্রচুর অন্ধ বিশ্বাস [illegible] ইহা এক অলৌকিক জগতের রচনা করে। এই উপনিষদে পৃথিবীর বিশ্লেষণ পদ্যাকারে করা হইয়াছে এবং গুণীব্যক্তিগণের দ্বারা সমস্ত কিছু সমস্যার মীমাংসা করা হইয়াছে—এই সমস্ত গুণীগণ যাঁহারা উপনিষদের জটিল সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাঁহারাই "বুদ্ধধর্ম্ম বি[illegible]" তাহার উত্তর দানে প্রচেষ্ট হইয়াছিলেন। Paul Denssen এক

মাছের আশায়

—সুমন বাগচী

●

●

●

পদ্মবন

—আশুতোষ সিন্‌হা

ভবিষ্যতের ইঞ্জিনীয়ার

গ্রীষ্মের পাখা

—মোনা চৌধুরী

বৈকালী —অমর সান্যাল

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দর্শনশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন তাঁহার নাম "উপনিষদে দর্শনশাস্ত্র এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রারম্ভতা"। এই অধ্যায়টি ১৯১৫ সালে গোটিনগানে প্রকাশিত হয় এবং তার একটি অধ্যায় ৮ বৎসর প্রকাশিত হয়। Paul Denssenই ১৮৯৭ সালে লিপজিগে "ষষ্ঠদশ উপনিষদ" নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে "বেদের গুপ্তশিক্ষা" এই অধ্যায়টি ১৯০৭ সালে লিপজিগে প্রকাশ করেন। ১৯২১ সালে ইহার ষষ্ঠ অধ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সেই বৎসরই জার্ম্মান ও ভারতীয় পাঠকবৃন্দ "ষষ্ঠদশ উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিবার সুযোগ পান। সেই বৎসরই ১৯২১ সালে মিউনিক শহরে Johannes Hertelএর দ্বারা লিখিত "উপনিষদে জ্ঞানের গভীরতা" প্রকাশ পায়। আর অন্তকিছু প্রমাণ করাইতে পারে না যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মান অধিবাসীবৃন্দ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এতখানি নিযুক্ত করিতে পারেন। ইহা আশ্চর্য্যের সঞ্চার করিতে পারে যে ১৯২১ সালে A. Hillebrandt জেনায় ভারতীয় ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় ডুসেলডর্ফ এ ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সালে A. Hillebrandt লিখিত পুস্তক" সর্ব্বসুন্দর উপনিষদ্ ও The breath of the eternal প্রকাশ পায় যাহাতে প্রাচীন ভারতের ঈশ্বর চিন্তা ও চিন্তাধারা প্রকাশ পায়, যাহা তাহার ধর্ম্মের উপর একনিষ্ঠতা প্রমাণ করে। প্রকৃত ভারতবর্ষ এ বেদান্তের নির্দ্দেশানুযায়ী দর্শন বর্ত্তমান। বেদান্তের অর্থ, বেদেই চিন্তার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। পুনরায় উপনিষদের ব্যাখ্যাকারী জার্ম্মান মিঃ Paul Denssen এর লিখিত পুস্তক "The System of Vedanta" যাহা ১৮৮৩ সালে লিপজিগে প্রকাশিত হয় তাহা জার্ম্মান জনসাধারণ কর্ত্তৃক উচ্চপ্রশংসা লাভ করে। এই সময় জার্ম্মান দর্শনশাস্ত্র উন্নতিলাভ করে নাই কারণ সকলেই তখন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বলিতে পারি যে তিনি জার্ম্মান Schopenhanser সমিতির সংগঠক এবং তিনি Schopenhanser এর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এক অধ্যায় বাহির করেন। তিনি Schopenhanser এর দর্শনশাস্ত্রে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি সত্যকারের একজন জগতের চোখে ভারতের সমালোচক ও হিন্দুধর্ম্মের ভক্ত বলা যাইতে পারে। ভগবৎ চিন্তার আদান-প্রদান বিভিন্ন দেশের মধ্যে বা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সত্যই প্রশংসনীয়। দার্শনিকবৃন্দ ঐশ্বরিক চিন্তাধারার বিশাল প্রাসাদ তৈয়ারী করেন কিন্তু নিজেরা অন্তর্জগতের চিন্তায় কাল অতিবাহিত করেন, কিন্তু অনুবাদক বা মন্তব্যকারিগণ তাঁহাদের খোরাক জোগান।

॥ সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বই ॥

স্বদেশী-সমাজ

স্বদেশকে আপন করে তোলার বিভিন্ন পন্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মত প্রকাশ করেছেন তারই এক সংকলন কম্র রূপ পরিগ্রহ করেছে আলোচ্য গ্রন্থে। স্বদেশের উন্নতি কল্পে রবীন্দ্রনাথের যা বক্তব্য তার এক পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মায়, আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পাঠে। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ যে কখনই বাহির হতে সাধিত হতে পারে না, দেশের মর্ম্মকে চিনতে হলে, জানতে হলে যে তার অন্তর প্রদেশেই প্রবেশ করতে হবে, একথা রবীন্দ্রনাথ শুধু মুখেই বারংবার বলেন নি, তাঁর জীবনব্যাপী কর্ম্মের মধ্য দিয়ে তা সপ্রমাণিতও করে গেছেন। বিশ্বভারতীর কল্পনা ও প্রতিষ্ঠাই তার সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। সেবার দ্বারা ত্যাগের দ্বারা নিজের দেশকে সত্যভাবে অধিকার করার প্রচেষ্টাই যে স্বদেশী সমাজ গঠনের সর্বোত্তম পন্থা একথাই ছিল বিশ্বকবির শেষ কথা, বর্ত্তমানে ভাঙ্গনের গতিরোধ করতে যাঁরা উৎসাহী তাঁদের পক্ষে আলোচ্য প্রবন্ধ সংকলন এক মূল্যবান সহায়ক বলেই পরিগণিত হবে। এই সংকলনের প্রকাশক হিসাবে বিশ্বভারতী অগণ্য পাঠক সাধারণের ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটির আঙ্গিক সুরুচিপূর্ণ, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭, দাম—তিন টাকা।

রবীন্দ্র-সংগীত প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থখানি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। এই সম্বন্ধে লেখা পুস্তকাবলীর পর্য্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ড এটি। বস্তুত: এটি পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রথম খণ্ডেরই পরিপূরক। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মূল ভাবধারা সম্বন্ধে লেখক যথোচিত রূপেই অবহিত, সেজন্যই তাঁর রচনা প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতে যে কথা ও সুরের সর্ব্বাঙ্গীণ সঙ্গতিই প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সে কথা লেখক স্বীকার করেন আর তাকে কেন্দ্র করেই তিনি আলোচনা চালিয়েছেন। বিভিন্ন অঙ্গের রবীন্দ্রসংগীতের পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্গের অন্তর্গত গীত মালিকারও সম্পূর্ণ সূচী প্রদান করেছেন তিনি, ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে ধারা অনুসরণ করাটা সহজতর হয়েছে। শুধু রবীন্দ্রসংগীতশিক্ষার্থীই নয়, যে কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠকও বর্ত্তমান পুস্তকটি পাঠে প্রকৃত উপকার লাভ করবেন। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। বইটির আঙ্গিক শিল্পশোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাস, ৩০, মদন চ্যাটার্জ্জি লেন, সি-আই-টি বিল্ডিং (বি-৪১), কলিকাতা-৭, দাম—পাঁচ টাকা।

ভারতীয় গল্প সংকলন

বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ শাখাটি বিশেষ ভাবেই সমৃদ্ধি লাভ করেছে, দেশী বিদেশী বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে যাঁরা ব্রতী হয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তাঁদেরই অন্যতম। এই সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ভারতেরই বিভিন্ন ভাষায় লেখা কয়েকটি সুনির্ব্বাচিত ছোট গল্প। তামিল, তেলেগু, কান্নাড়া, মালয়ালম, হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাতী, মারাঠি, কাশ্মীরি,

মৈথিলী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষার বাছাই করা গল্পের সংকলন এটি। এই অনুবাদ কর্ম্মের মধ্য দিয়ে বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতিই যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে, ভাষার অনৈক্য, জাতির বিভেদ, ধর্ম্মগত পার্থক্য এসবকে অতিক্রম করেও যে ঐক্যের সুর এদের মধ্যে সুস্পষ্ট, ভারত আত্মার মর্ম্মবাণী তাতেই নিহিত। অনুবাদকের ভাষারীতি সাবলীল, ভঙ্গী স্বচ্ছন্দ আর সেজন্যই তাঁর উত্তম সাফল্য মণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছে। অনুবাদ সাহিত্যের ভাণ্ডারে বর্ত্তমান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। বইটির আঙ্গিক যথাযথ। অনুবাদক—বোম্মানা বিশ্বনাথম, প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১৩, দাম—চার টাকা।

এ কালের কবিতা

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সংকলন। সংকলনের নাম থেকেই বোঝা যায় যে এক বিশেষ কালে রচিত কাব্য সমষ্টি থেকেই চয়িত হয়েছে এর বিষয়বস্তু। সংকলনকার নিজেও কবি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত কাজেই কাব্যরসজ্ঞ পাঠকের পিপাসা তিনি অনেকখানিই মিটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে বিষ্ণু দে পর্য্যন্ত যে পরিক্রমা, তার মধ্যে উল্লেখ্য সব কবির কবিতাই স্থান পেয়েছে, বর্ত্তমান সংকলনে। একালের কবিতার রূপ ও রীতি এই একটি মাত্র গ্রন্থের মাধ্যমেই পাঠক মনকে ছাপ দিয়ে দেয়। সুলিখিত ভূমিকাখানি পাঠ করলে কবিতাগুলির মর্ম্মে পৌছান যায় সহজেই। একালের কবিতার প্রধান উপজীব্য যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মসচেতনতা, তার ইঙ্গিতেই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে আলোচ্য কবিতাগুলি। বিভিন্ন কবির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও এই এক জায়গায় এঁরা সুসম্বদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ। মননে উজ্জ্বল, মৌলিকতায় বিশিষ্ট এই কাব্য সংকলন, সংকলন গ্রন্থের ভাণ্ডারে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। আমরা এই সংকলন কর্ম্মটি হাতে পেয়ে আশাতীত আনন্দ লাভ করেছি। আশা করি বোদ্ধা পাঠক একে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। আঙ্গিক রুচি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। সংকলয়িতা—বিষ্ণু দে, প্রকাশক—শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাঃ লিঃ, ২২ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। দাম—ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা (সুলভ সংস্করণ) আট টাকা (শোভন সংস্করণ)।

গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে এক সুষ্ঠু ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার বর্ত্তমান গ্রন্থে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ, প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ও গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম্মই বিশেষভাবে পর্য্যালোচিত করে লেখক তার এক সামগ্রিক রূপায়ণে সমর্থ হয়েছেন, পাঠকের পক্ষে যা মূল্যবান বলেই পরিগণিত হবে। অধিক বাক্যব্যয় না করেও যে আলোচ্য বিষয়কে সহজভাবে ফোটানো সম্ভব লেখকের লিপিকুশলতা তারই অঙ্গীকারে উজ্জ্বল। সাহিত্য বোদ্ধা পাঠক আলোচ্য গ্রন্থখানিকে সাদরে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি। বইখানির আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৬ দাম—সাড়ে চার টাকা।

কমলাকান্তের জল্পনা

কমলাকান্তের লেখনীর সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই পরিচয় আছে, সরস চুটকী জাতীয় রচনাই তাঁর বিশেষত্ব, আলোচ্য গ্রন্থের রচনা সমূহও সেই জাতের। এই সরস প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আরও নানা ধরণের বিষয়ের অবতারণা করেছেন লেখক। বাচনভঙ্গী এতই হাস্যোজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় যে পড়তে পড়তে পাঠক নিজের অজ্ঞাতেই মগ্ন হয়ে যান, লেখক লিখতে বসে বিভিন্ন ধরণের শৈলী ব্যবহার করেছেন, নিছক কৌতুকপরায়ণতা মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও সাহিত্য বোদ্ধা পাঠক তার মধ্য থেকে চিরকালীন সাহিত্যের রসাস্বাদন করেন। 'রিক্সাওয়ালা ও কমলাকান্ত' শীর্ষক রচনাটি কৌতুকের মাধ্যমে এক গভীর সত্যের স্বাক্ষর বহন করে, দিন নাই রাত নাই মানুষের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে একদল মানুষের ছুটে বেড়ানোর ভিতর যে প্রচ্ছন্ন আর্ত্তি নিহিত, তাই যেন রূপ পরিগ্রহ করে পাঠকের মননে। রম্যরচনা মূলক গ্রন্থের ভাণ্ডারে, আলোচ্য গ্রন্থটি সন্দেহাতীত রূপেই এক উল্লেখ্য সংযোজন। ভাষার কারুকার্য্যে, ভাবের গভীরতায়, ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনায় এ এক পরম উপভোগ্য রচনা। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আমরা কোথায় চলেছি

আলোচ্য গ্রন্থটি রম্যরচনা জাতীয়। বর্ত্তমান সমাজের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সব চিন্তার খোরাক বর্ত্তমান, গ্রন্থোক্ত রচনাগুলি তারই স্বাক্ষরবাহী। সুচিন্তিত এই রচনাবলীতে লেখক যে সব সমস্যা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন, তা পাঠকমনে সহজেই সাড়া জোগায়। আমরা অর্থাৎ প্রধানতঃ বাঙ্গালীরা কোন্ পথে চলেছি, লেখকের মূল জিজ্ঞাসা সেটাই। পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে আজ যা চোখে পড়ে, তাতে লেখকের সঙ্গে একমত না হয়ে পারবেন না কেউই। অত্যধিক সিনেমাপ্রবণতা, স্বাধীনতার নামে এই স্বেচ্ছাচার, আদর্শবাদের প্রতি সর্ব্বাঙ্গীণ উপেক্ষা, এবংবিধ বহুতর সামাজিক সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছেন লেখক, তাঁর সরস ভাষারীতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও সুপাঠ্য রম্যরচনায় পর্য্যবসিত হয়েছে। পাঠকের কৌতূহল আগাগোড়া বজায় থাকে অথচ পাঠ শেষে লেখকের মূল বক্তব্যও মনে বেশ একটা ছাপ ফেলে যায়। রীতিমত উল্লেখ্য এক রম্যরচনা রূপেই বর্ত্তমান গ্রন্থটিকে স্বীকৃতি দেওয়া চলে। আঙ্গিক যথাযথ। আমরা বইটি পড়ে সত্যই আনন্দিত হয়েছি। লেখক—সঞ্জয়। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

অন্য নগর দর্শন

আলোচ্য পুস্তকটি ভ্রমণমূলক রম্যরচনা। লেখক প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক, বিদেশ ভ্রমণে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তারই স্বাদে ভরপুর বর্ত্তমান রচনাবলী। সুন্দর সুপাঠ্য গল্পের মতই আকর্ষণীয় এই লেখাগুলি পড়তে পড়তে এক দরদী মনের সুস্পষ্ট চেহারা ধরা দেয় পাঠক মননে। লেখক শুধু বাইরের চোখ দিয়েই যে দেখেন নি, মনের চোখেও দেখে নিয়েছেন সুদূর বিদেশের জনপদ ও জনপদবাসিগণকে, এই সত্যই তাঁর রচনার প্রাণসত্তা। আর এজন্যই

তাঁর রচনা শুধু রম্য হয়েই ওঠেনি সুস্থও হয়ে উঠতে পেরেছে স্বচ্ছন্দেই। বর্ত্তমান ইউরোপের ভেতরকার চেহারার বেশ একটা পরিচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায় রচনাটির মাধ্যমে। লেখক যে জাত সাহিত্যিক তাঁর এই রচনা তারই স্বাক্ষরবাহী। শুধু দু'একটি জায়গায় এক স্বনামধন্য সাহিত্যকারের রচনা রীতির ছায়া এসে পড়াতে লেখকের মৌলিকতা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, আশা করি ভবিষ্যতে লেখক এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করবেন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অমিতাভ চৌধুরী, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ দাম—তিন টাকা।

বাঙালী

আলোচ্য গ্রন্থখানি এক প্রবন্ধ পুস্তক। বাঙালীর বর্ত্তমান যতই তমসাচ্ছন্ন হোক না কেন তার ঐতিহ্য যে কারুর চেয়েই কম নয়, বিধিবদ্ধভাবে সেই সত্যকেই প্রচার করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। মোটামুটি তিনটি পর্ব্বে বাঙালীর রাষ্ট্র ও সম্পদ, সমাজ ও সংস্কৃতি ও অপরাপর কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে সুষ্ঠু আলোচনা করা হয়েছে। জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান বলেই পরিগণিত হবে, কারণ বাঙালীর লুপ্তপ্রায় গৌরবকেই যে শুধু পুনরুদ্ধার করে সামনে ধরেছেন লেখক তা নয়, তার বর্ত্তমান বিপর্যয় যে এক অপরিমেয় দিগন্তেরই পূর্ব্বাভাস সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন। আজকের খণ্ড-বিখণ্ড হতাশাক্লিষ্ট বাঙালীর কাছে এ ধরণের আশ্বাসের বড় দরকার, ভবিষ্যৎ গঠনে অতীতের অবদান বড় কম নয় সেজন্যই নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে এক সম্যক ধারণা থাকা অতীব প্রয়োজনীয়, বাঙালীর ঐতিহাসিক দৈন্য এই গ্রন্থের কল্যাণে কিছুটা লাঘব হবে বলেই মনে হয়। গ্রন্থকারের শৈলী সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, প্রকাশক—রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—ছয় টাকা।

গুপ্তচর

আলোচ্য গ্রন্থটির বিভিন্ন রচনা ইতিমধ্যেই প্রখ্যাত সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় বিভাগে আত্মপ্রকাশ করেছে। গুপ্তচরবৃত্তি এক প্রাচীনতম পেশা, কি গত মহাযুদ্ধের বিখ্যাত নারী গুপ্তচর মাতাহারির কাহিনী তো সর্ব্বজনবিদিতই, আলোচ্য গ্রন্থে এই গুপ্তচরদের সম্বন্ধেই কৌতূহলপ্রদ তথ্যাদি বিবৃত হয়েছে। বর্ত্তমানে গুপ্তচরবৃত্তির আঙ্গিক যে অতীতের চেয়ে অনেক বেশী, পরিণত লেখক তাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন, এমন অনেক কাহিনী তিনি পরিবেশন করেছেন বিশ্ববিখ্যাত মাতাহারি কাহিনীও যার তুলনায় নিষ্প্রভ ঠেকে। এই প্রসঙ্গেই 'তিন কন্যার কাহিনী' ও 'দুমুখো সাপ' শীর্ষক রচনা দুটি বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য, যে কোন রহস্য রোমাঞ্চ জাতীয় আখ্যানের চেয়েও আলোচ্য রচনা দুটি অনেক গুণে রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলোদ্দীপক, অথচ এর কিছুই কল্পনাপ্রসূত বা অবাস্তব নয়, গত বিশ্বযুদ্ধে বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েরই সম্পূর্ণ বাস্তব ঘটনার রূপায়ণ ঘটেছে এদের মাঝে। বর্ণনাভঙ্গী চিত্তাকর্ষক, পাঠকের কৌতূহল শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত রাখার কৌশল লেখকের করায়ত্ত। আমরা বইটি পড়ে সত্যই আনন্দিত হয়েছি। আঙ্গিক সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—চিরঞ্জীব সেন, প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

নহ মাতা নহ কন্যা

আলোচ্য উপন্যাসটির লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে খুব সুপরিচিত নন, সম্ভবত: এপথে তিনি বেশীদিন পদার্পণ করেন নি, সে যাই হোক তাঁর লেখনী যে এখনও সম্পূর্ণ অপরিণত তাতে সন্দেহমাত্র নেই। অত্যন্ত অবাস্তব কাহিনী; ফেনিল উচ্ছাসের আতিশয্যে বিবর্ণ ও ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। কাহিনীর নায়ক এক সুদর্শন যুবক, এক পতিতা নারীর সঙ্গে তার প্লেটোনিক প্রেমের বিবরণই এর প্রধান উপজীব্য, লেখনীর দুর্ব্বলতায় কাহিনী দানা বেঁধে উঠতে পারেনি কোথাও, উচ্ছাসের রঙিন ফানুষ ওড়ানোটাই যেন লেখকের প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু শুধু এইটুকুর উপর নির্ভর করে যে সৎসাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়, একথা তাঁর ভেবে দেখা উচিত ছিল। ভাষা স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল, বর্ত্তমান উপন্যাসটির সপক্ষে শুধু এটুকুই বলা চলে। প্রচ্ছদ সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বিনয় চৌধুরী, প্রকাশক—জ্ঞানতীর্থ, ১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দু'টাকা।

শেষ দরবার

খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিকের অধুনাতম এই রচনা নানা কারণেই উল্লেখ্য। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যই আলোচ্য রচনার সবচেয়ে বড় সম্পদ। নায়ক বিদ্যুৎ পুরাতন দুষ্প্রাপ্য ভাস্কর্য্যের সন্ধানে একদিন এসেছিল বাস্তসিদ্ধি গ্রামে, কিন্তু বিচিত্র এই গ্রামের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রা গ্রাস করে নিল তাকে, অদ্ভুত সব মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেল যেন তার নিজের সত্তাটাই। কালীপূজার রাত্রের অন্ধকারে উৎসবমত্ত গ্রামের যে আদিম চেহারা তার চোখে পড়ল তা একাধারে ভয়াবহ ও আকর্ষণীয়, আর তারই মধ্যে দেখতে পেল সে প্রেমের নানারূপ, নানা ভঙ্গী, আবিষ্কার করল পঙ্কের মধ্য হতে পঙ্কজের, নানা মালিন্য নানা আবর্জ্জনার মধ্যেও যার মহিমময় প্রকাশ। চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের দক্ষতা অপরিসীম, 'ডোমন চক্রবর্ত্তী' 'সোনা' 'আভা' প্রভৃতি চরিত্র পাঠক মননে চিহ্নিত হয়ে থাকার উপযুক্ত। কাহিনী বৈচিত্র্যে ও ভাষার চাতুর্য্যে রচনাটি আগাগোড়া উপভোগ্য, লেখকের স্বভাবসিদ্ধ বিশ্লেষণী রীতিও রচনার ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তোলে। শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের এই অবদান, বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক উল্লেখ্য সংযোজনা হিসাবেই গৃহীত হবে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—সমরেশ বসু, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯, দাম—চার টাকা।

নয়া পত্তন (প্রথম খণ্ড)

আলোচ্য উপন্যাসটি সাম্প্রতিক যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা দ্বিখণ্ডিত বাংলাকে কেন্দ্র করেই রচিত। পূর্ব্ববাংলার বাস্তহারার দল যেদিন আপন ক্ষেত-খামার ঘরবাড়ী পেছনে ফেলে শুধু প্রাণটাকে বাঁচাবার জন্যই ছুটে এসেছিল এক অপরিচিত দেশে, আশ্রয় ভিক্ষু হয়ে সেদিনও হয়ত বা লেগেছিল তাদের মনের কোণে একটু আশা একটু বিশ্বাস, হয়ত বা ভেবেছিল তারা আবার ঘর বাঁধতে পারবে, অনুকূল পবনের ছোঁয়ায় আবার বাইতে পারবে জীবনতরী তর তর করে, কিন্তু বাস্তবে কি তাই ঘটেছে? আমরা

আশা অনেক নিরাশার ঘাত প্রতিঘাতে শ্রান্ত ক্লান্ত এই মানুষগুলির জীবন দ্বন্দ্বকেই রেখায়িত করেছেন লেখক কুশল কলমে। এই বিধ্বস্ত মানুষের আশ্চর্য্য মিছিল আজ সারা দেশ জুড়ে, সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়েও এরা ভেঙ্গে পড়েনি, ঝড়ের মাঝে এরা গেয়ে চলেছে জীবনের জয়গান, হয়ত বা আবার এদের জীবনে দেখা দেবে স্থিতি, ভগ্নস্তূপের ইট কাঠ দিয়েই গড়ে তুলবে এরা শান্তিনিকেতন যা চিরন্তন, অক্ষয় ও সুদৃঢ়। লেখকের ভাষারীতির নূতনত্ব তাঁর বিষয়বস্তুকে যথোচিত বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। লেখক—সুদীন চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—জ্ঞানতীর্থ, ১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা।

শিক্ষায়তন

বাঙালীর শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থান সমূহের এক বিশদ পরিচয় বিধৃত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। বিগত শতাব্দীতে যে সব প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, মূলতঃ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিস্তারের নীতিতে, আজও তারা সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে এই শহর কলকাতার বুকে, একমাত্র সিনেট হলটিকেই আর কোনদিনই কেউ দেখতে পাবে না কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সঙ্কুলান রীতির কুঠার তাকে অপসৃত করেছে চিরতরেই। সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে এ এক মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা। সে যাই হোক, আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে লেখক সুনিপুণ কুশলতায় এই সব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এগুলি পাঠে তৃপ্ত হবেন নিঃসন্দেহ। লেখকের শৈলী আকর্ষণীয়, কোথাও ক্লান্তিকর ঠেকে না। রম্যরচনা জাতীয় প্রবন্ধ সাহিত্যের আসরে আলোচ্য গ্রন্থ এক উল্লেখ্য অবদান রূপেই গৃহীত হওয়ার দাবী রাখে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—পরিব্রাজক, প্রকাশক—কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

তোৎলামি সারাতে হলে

ছেলেপিলেদের মধ্যে প্রায়ই তোৎলামির প্রবণতা দেখা যায়। দু'য়ের মধ্যে একজনের তো এ অভ্যাস থাকেই আবার মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরই এ রোগটা বেশী হয়, খুব সম্ভব বাক্‌পটুতা নারীজাতির স্বভাবসিদ্ধ বলেই। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটু যত্ন নিলেই এ রোগ সারানো সম্ভব। সাধারণতঃ মনস্তাত্ত্বিক কারণে এ রোগের অঙ্কুরোদ্গম হয়, এবং সেজন্য সহানুভূতির সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করলে তার কারণটাও ধরা পড়তে দেরী হয় না। সচরাচর দেখা যায় যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই মাত্র শিশুরা হঠাৎ তোৎলা হয়ে পড়ে, ভীতিবিহ্বল অবস্থা তার মধ্যে প্রধানতম। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক লোকও প্রায়শঃ বক্তৃতাদি দেওয়ার সময় তোৎলা হয়ে যান, মানসিক উত্তেজনাই এর একমাত্র কারণ। আবার সতর্ক অনুসন্ধানে এও ধরা পড়েছে যে, ন্যাটা ব্যক্তিরাই অধিকতর সংখ্যায় তোৎলা হয়ে থাকেন। ন্যাটা শিশুদের জোর করে ডান হাত ব্যবহার করবার প্রচেষ্টাই এর কারণ, এতে মনের ওপর যে চাপ পড়ে তাই প্রকাশিত হয় দ্বিধাগ্রস্ত বাচনভঙ্গী বা তোৎলামিতে। ন্যাটা শিশুদের জনক জননী বা অভিভাবক স্থানীয়েরা যেন এ কথাটা ভেবে দেখেন। তোৎলামি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মধ্যে লাজুকতা ও ভয়ার্ত্ত ভাবেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। সাত আট বছর বয়সের আগে প্রায়ই এ সব লক্ষণ দেখা দেয়না, যদিও কথা বলতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই এর উদ্ভব। অনেক ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করতে হোঁচট খায় তোৎলা ব্যক্তি, শব্দোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ মুখ বিকৃতি ঘটতেও দেখা যায়, এজন্য প্রায় প্রত্যেক তোৎলা মানুষই অসুবিধাজনক শব্দ উচ্চারণের সময় আপনা হতেই সতর্ক হতে শেখে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ধরণের তোৎলারাও অনায়াসে গান ও আবৃত্তি করতে সক্ষম হয়। প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করে অনেক সময়ই শিশু যথোপোযুক্ত শব্দের অভাবে থেমে মনের ভাব প্রকাশ করে, এর সঙ্গে তোৎলামির কোন সম্বন্ধ নেই। এই তোৎলামি উত্তরাধিকার সূত্রে আসতে পারে আবার জিভ বা বাক্‌যন্ত্রের কোন খুঁত থেকেও দেখা দিতে পারে। শারীরিক কারণের তোৎলামি সারানো অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু মানসিক কারণে জিহ্বায় জড়তা দেখা দিলে, বিশেষ সতর্ককার সঙ্গে না চললে রোগ নিরাময় না হয়ে বেড়ে যাওয়ারই সমধিক সম্ভাবনা, সেজন্য উক্ত ক্ষেত্রে রোগীর আত্মীয়স্বজন ও মাতাপিতাকে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হতে হবে, রোগীর এই বিকৃতির প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাব প্রকাশ করা উচিৎ নয় কখনই, কারণ রোগীর মনে তার প্রতিক্রিয়া খুবই অনিষ্টকর হতে পারে। এই বিদ্রূপের ভয়েই তোৎলা শিশু সচরাচর সমবয়সী সঙ্গী সাথীর সঙ্গ ত্যাগ করে একা সময় কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, শিশু মনের স্বাস্থ্যের যা একান্ত পরিপন্থী। এই তোৎলামি সারানোর জন্য যে বিশেষ বাক্‌রীতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, উক্ত রোগগ্রস্ত শিশুকে শৈশবেই তার সঙ্গে পরিচিত করা প্রয়োজন। নানা ধরণের ভিটামিন যুক্ত খাদ্য ও তোৎলামি সারানোর পক্ষে সহায়ক হয়ে থাকে, শিশুর পিতা মাতার সে সম্বন্ধে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া খুবই প্রয়োজন। যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলে তোৎলামি সারানো যে কষ্টকর নয় একথা স্মরণে রাখলে শতকরা আশীটি ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যেতে পারে। পরিশেষে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এ রোগের সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক হল রোগীর সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ মধুর ব্যবহার করা, অন্যথায় সর্ববিধ প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।
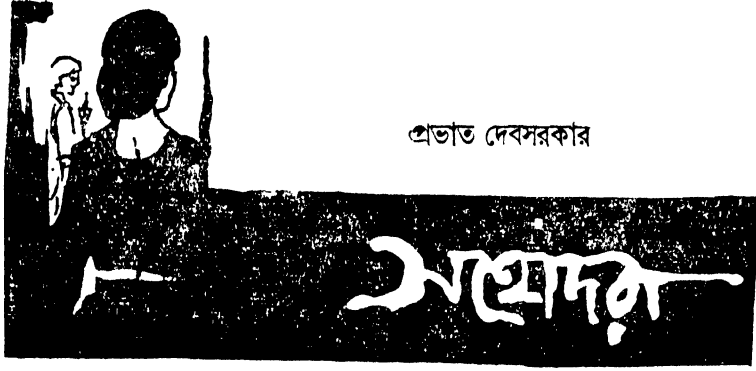
নম্বর মিলিয়ে সহজেই বাড়িটা মিললেও দরজার কড়ায় হাত দিয়ে সুধীন্দ্র খানিক ইতস্তত ক'রলে। আশপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে, আত্মসচেতনায় কেমন জড়তা বোধ ক'রলে।

তারপর কখন কড়াটা বেজে উঠেছিল, দরজাটা খুলে গিয়েছিল কিছুই বুঝি খেয়াল করে নি সুধীন্দ্র! থতমত খেয়ে বললে, 'অলকা আছে?'

'না!' উত্তরকারিণী প্রত্যুদ্গমনকারিণীর কণ্ঠস্বর কেমন নিস্তেজ, নিরুত্তাপ যেন। তেমনি ইতস্তত বোধ ক'রে হঠাৎ পিছন ফিরে কম্পিত কণ্ঠস্বরে সুধীন্দ্র বললে, 'বলবেন, তার আপিসের সুধীনবাবু এসেছিল!'

গলিপথটা সিমেণ্টে বাঁধান, মনে হয় সংকীর্ণ গলির জল এবং জলীয় পদার্থ নিষ্কাশনের জন্যে এই ব্যবস্থা: মাঝখানে খোলা ড্রেনটা নগ্নবক্ষ, উদার! সারি সারি বাড়িগুলো খেয়া-নৌকো যেন।

'আপনি বসুন, অলকা এখনি আসবে।' দ্বারোদ্ঘাটনকারিণীর গলার স্বর বেশ উত্তপ্ত আর সৌহার্দ্যপূর্ণ

থমকে দাঁড়িয়ে সুধীন্দ্র পিছন ফিরলে, আধ-খোলা দরজার মধ্যবর্তিনী নারীমূর্তি অসম্পূর্ণ ছবির মত আলো-ছায়ায় অস্পষ্ট, গলির দাতব্য আলোর রেখাটা এতদূর পর্যন্ত এগোয়নি।

'আসুন!' প্রবেশ পথ বিস্তীর্ণ হয়ে স্বরমাধুর্য ফোটে, আহ্বান স্পষ্টই বন্ধুত্বপূর্ণ, সুসৌজন্যও।

সঙ্কোচে তবুও সুধীন্দ্র ইতস্তত করে। অলকার এমনি অপ্রস্তুত করার কোন মানে হয় না, থাকবো বলে থাকলো না। আজকাল প্রায়ই কথা দিয়ে কথা রাখতে ভুলে যায় অলকা, কিছুই আর আগের মত খেয়াল থাকে না। এমন জানলে নিশ্চয়ই সুধীন্দ্র বাড়ি খুঁজে খুঁজে এতখানি পথ আসতো না।

'অলকা বলে গেছে আপনি এলে বসতে। আসুন সে এখনি ফিরবে।' সদর দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে অলকার প্রতিনিধি বেরিয়ে এসে আহ্বান করলে।

দর দেখাবার বা অসন্তোষ প্রকাশ করবার ইচ্ছে থাকলেও আপাতত তা সংবরণ করে' (বিনা সাক্ষাতে ফিরে যাওয়ার কষ্টটাও কম নয়) সুধীন্দ্র এগিয়ে এসে বললে, 'খুব কি দেরী হ'বে ফিরতে?'

'না, আপনি আসুন।' বিশেষ উৎসাহিত যেন ভদ্রমহিলা অতিথি সৎকারে।

লক্ষ্য করলেও এতক্ষণ সুধীন্দ্র খেয়াল করে নি, অলকার মত না হোক অলকারই জুড়ি মহিলাটি। অনেক তফাৎ, তবু একটা মিল কোথায় আছে উভয়ের মধ্যে! হয়তো অলকার—

'একটু সাবধানে আসবেন, জায়গাটা পিছল বড়!' গলির পরেও গলির মত সঙ্কীর্ণ পথটা পেরুতে হয় অন্ধকারে। পিছল বাঁচিয়ে পা-বাঁধা দুষ্কর!

তারপর যে-ঘরে এসে সুধীন্দ্র বসল তাকে ঘরের আখ্যা গৃহ-সমস্যার দিনে ছাড়া কেউ দেবে না। অবস্থার সঙ্গে সাধারণ মানুষ কত সহজেই যে খাপ খাওয়াতে পারে এই ঘর এবং তার আসবাবপত্র প্রমাণ! কোথাও মানুষ হাত-পা খেলিয়ে নেই, ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি সর্বত্র! ঘর বার সমান!

আরো এই ঘরে বসে কারো জন্যে অপেক্ষা করা নেহাৎ-ই উদ্বেগ-পূর্ণ, পীড়াদায়ক। কতক্ষণ বসতে হ'বে, কখন অলকা ফিরবে তার ঠিক কি! হাত-ঘড়িটা ঘুরিয়ে দেখে সুধীন্দ্রের মনে হ'ল, এর চেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা যেন ভাল ছিল, স্বস্তি পাওয়া যেত। শুধু অস্বস্তি নয়, বিরক্তি বোধ করে সুধীন্দ্র। ঘরের আলোটাও এমন কম জোর যে চোখে লাগে, মেজাজ খারাপ করে দেয়!

অলকাকে তার বাড়িতে আসবার কথা দিয়ে ভুলই করেছে সুধীন্দ্র। তাদের মেলামেশাটা এত তাড়াতাড়ি এত সহজ করা উচিত হয়নি। দূর দূরই যেন ছিল ভাল, এত নৈকট্য ভাল নয়।

আর এ ঘরের সঙ্গে কিছুই যেন মেলে না অলকার। তার ঐ চোখ, ঐ মুখ, ঐ সুঠাম দেহ কি ক'রে খাপ খায় এর মধ্যে কে জানে। বড় সঙ্কীর্ণ, হতশ্রী ঘরটা: এতটুকু ঘরে অত রূপ, অত ঐশ্বর্য্য নিয়ে দিনরাতের অধিকাংশ সময় কাটায় কি করে অলকা? আশ্চর্য্য, অলকাকে দেখে কোনদিন ঘুণাক্ষরে মনে হয়নি, তার এই কুণ্ঠিত, দীন অবস্থানের কথা ভাবেনি সুধীন্দ্র। অলকা কত উদার, কত প্রশস্ত, কত বিস্তৃত এই ঘরের বাইরে!

আবার ঘড়ি দেখল সুধীন্দ্র। ঘড়ির কাঁটা সরে না, ঐ বিবর্ণ দেওয়ালের মত, অবিন্যস্ত অকিঞ্চিৎকর আসবাবপত্রের মত অনড়। হঠাৎ মনে হয়, হাতের কব্জি ফুঁড়ে হাত-ঘড়ির শব্দ উঠছে—টিক্, টিক্, টিক্! যেন একটা অদৃশ্য টিকটিকি অনেক দূরে কোথাও থেকে তার মনের কথায় সায় দিয়ে বলছে—ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্!

হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক আক্ষেপ অনুভবের মত সুধীন্দ্র সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। ঘড়ি শুদ্ধ বাঁ-হাতটা কানের উপর চেপে ধরলে—হাত-ঘড়ি কখনো শব্দ করে, না, সে-শব্দ কানে শোনা যায়?

অলকা কতক্ষণ বসিয়ে রাখতে চায়? জানে যখন তখন ঠিক তার আসবার আগে বেরিয়ে গেল কেন? কি এমন জরুরী কাজ পড়লো? ক্ষুণ্ণমনে সুধীন্দ্র ভাবলে, সে আসবে জেনেও অলকা বেরিয়ে গেল তার আসার মুহূর্ত্তটিতে—কেন তার নির্দ্ধারিত আসাটা কি অভিপ্রেত নয়? বললেই পারতো, তুমি এসো না, আমার কাজ আছে বাড়ী থাকবো না!

নিজেকে বড় খেলো আর অনভিপ্রেত মনে হল সুধীন্দ্রর। এখনো অলকা তার সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত নয়। এতদিন যা ভেবেছে, মনে মনে কল্পনা করেছে, সবই ভুল। কারণটা কিছুতে সুধীন্দ্র বিক্ষুব্ধ মনে ঠিক করতে পারে না, অনুপস্থিত থেকে অলকা তাকে পাশ কাটাল, না সত্যিই কোন কাজের জন্যে গরহাজির হল? উল্টে ভাবলে সুধীন্দ্র, কথা দিয়ে সেও যদি না আসতো, সাক্ষাতে জরুরী কাজের অজুহাত দেখাত তা হ'লে কি তার কদর বাড়তো? এখন চলে গিয়ে যেন আপন মূল্যটা আর তেমন ক'রে উপলব্ধি করান যাবে না। অলকা ভাববে, দেখা না পেয়ে রাগ করে সুধীন্দ্র চলে গেছে, প্রকৃত মনোভাবটা কিছুতে আন্দাজ করতে পারবে না; তারপর মান-ভঞ্জনের সহজ পথে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবে। না, আর মান-অভিমানের পালা নয়, আজ খুবই সিরিয়স হয়ে এসেছে সুধীন্দ্র। একটা বোঝাপড়া করবে, স্পষ্ট জানতে চাইবে অলকার মনোভাবটা কি। বাড়ী বয়ে এসেছে যখন—

'একটু চা খান ততক্ষণ।' অলকার জুড়ি মেয়েটি এক হাতে চায়ের কাপ আর এক হাতে কয়েকটি বিস্কুটের প্লেট নিয়ে সামনে এসে স্মিতমুখে দাঁড়াল।

হঠাৎ যেন কেমন একটা দোলা অনুভব করলে সুধীন্দ্র, সেই কড়া নাড়ার সঙ্গে দরজা খুলে মুখোমুখি হবার অবস্থা। সুধীন্দ্র ইতস্ততঃ করলে।

'নিন্-ন্।' তেমনি স্মিত, উদ্ভাসিত আপ্যায়নকারিণী। সপ্রতিভও।

সঙ্কোচ বোধ করলেও হাত বাড়িয়ে অন্ততঃ চায়ের কাপটা ধরতে হয়, সুধীন্দ্র ভাবলে, দুহাত জোড়া হয়ে ভদ্রমহিলার কষ্ট হচ্ছে, কাপটা, প্লেটটা রাখবার মত কোন টিপয় বা টেবিল ঘরে নেই। পিঠ খোলা, বেহাতা এই নড়বড়ে চেয়ারটা না থাকলে বিছানার গাদা ঐ চৌকিটার ওপরই বসতে হত। ঘরে আলমারী আছে, দেরাজ আছে, একটা সিন্দুকও আছে, একটা ছোট্ট টেবিল ওর মধ্যে রাখলে কি আর এমন স্থান অকুলান হত—অন্তত অতিথি-অভ্যাগতদের এমন অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হত না! না কি, কেউ আসে না অলকাদের বাড়ি তাই টেবিল-চেয়ারের কোন পরিকল্পনা নেই? সে-ই কেবল এসেছে এবং প্রথম?

চায়ের কাপটা নিলেও সমস্যার সমাধান হয় না। বিস্কুটের প্লেটটা হাতে করে আপ্যায়নকারিণী সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সাগ্রহে।

সুধীন্দ্র অস্বস্তি বোধ করে, ব্যস্তভাবে বললে, "প্লেটটা মাটিতে রাখুন, কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন?"

হাসিটা আরো উজ্জ্বল ক'রে আপ্যায়নকারিণী বললে, 'ঠিক আছে, আপনি খেয়ে নিন!' হাত আর ওঠে না, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে ঠোঁট নড়ে না। কোনকালে চেনা-পরিচয় নেই, এমন কেউ সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে কারো হাত-পা বেরোয়?

তারপর ঝোঁকের মাথায় অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলে সুধীন্দ্র, গরম চা-টা এক চুমুকে শেষ ক'রে কাপ-ডিশটা ঠক্ করে মাটিতে নামিয়ে রেখে বললে, 'দিন্-ন্ এবার!'

মুখের হাসিটা কেমন নিভে গেল, সবিস্ময়ে মহিলাটি বললে, 'ওকি করলেন, গরম চা যে।'

অম্লানবদনে সুধীন্দ্র বললে, 'আমি গরম চা-ই খাই।'

গরম চায়ে মুখটা যেন ওরই পুড়ে গেছে, আপ্যায়নকারিণী বললে, 'বড্ড গরম যে!'

নিজেকেই সমবেদনা ক'রে যেন সুধীন্দ্র বললে, 'না, তেমন গরম নয়।'

'ঠাণ্ডাও নয়!' প্রতিবাদটা সবটুকু কৌতুককর নয়, কিছুটা অভিযোগ আছে যেন সুধীন্দ্রর এই হঠকারিতার জন্যে।

সুধীন্দ্র চেয়ে দেখলে, কুঞ্চিত মুখের রেখায় অপূর্ব্ব বাঙ্ময় সমীপবর্ত্তিনী। হাত বাড়িয়ে সুধীন্দ্র সাগ্রহে বললে, 'কই দিন!'

আর কোন কথা না বলে নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তির মত বিস্কুটের প্লেটটা সামনে ধরে অলকার জুড়ি মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল। যেন অতিথি আপ্যায়নের ত্রুটি কিছু না হয়।

এও আরো সঙ্কোচের, সুধীন্দ্র ভাবতে পারে না কি করবে, এখন পোষা পাখীর মত ঐ মেয়েটির হাত থেকে একটি-দুটি বিস্কুট নিয়ে মুখে তুলবে কি না! সেও লজ্জার। মনে মনে অলকার ওপর ভীষণ রাগ হয় সুধীন্দ্রর, কান মাথা ভোঁ-ভোঁ করে, মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে।

হঠাৎ খপ্ করে প্লেট থেকে একটা বিস্কুট তুলে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রেখে সুধীন্দ্র বললে, 'বিস্কুট আমি খাই না, নিয়ে যান।'

অলকার জুড়ি মেয়েটি কি মনে করলে, তেমনি নীরবে চায়ের কাপটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একেবারে ভাবলেশহীন।

নিজেকে সুধীন্দ্র অপরাধী করলে, আশানুরূপ ভদ্র ব্যবহার করেনি সে। এক-আধখানা বিস্কুট মুখে তুললে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যেত না। সৌজন্য প্রকাশ করতে গিয়ে সে অসৌজন্যই প্রকাশ করেছে। সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্চয়ই উনি কামড়াচ্ছিলেন না, যার জন্যে গরম চা গলাধঃকরণ করে ভদ্রমহিলার ভার লাঘব করতে হবে!

এখন আর কোনমতেই ভদ্রমহিলাকে কাছে পাওয়া যাবে না। অলকা না ফেরা পর্য্যন্ত একলা এই বদ্ধ ঘরে বসে বিরক্তিতে একশেষ হ'তে হবে। ওঁদেরও খুব অসুবিধে হবে—সুধীন্দ্র টের পায় পাশের আর একটিমাত্র ঘরে হাঁড়ি-কলসীর ঠোকাঠুকি লেগে গেছে! হয়তো ওঁরা এই সম্মানীয় অতিথির আগমন হেতু ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছেন, অলকাকে দোষারোপ করছেন—জানে—তবু বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে আনবে, বসবার দাঁড়াবার জায়গা নেই।

সুধীন্দ্র উঠে পড়ল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বার দুই গলা ঝাড়লে, আবার এসে ঘরে বসলে। মনে হ'ল তাকে বসিয়ে রেখে বাড়ি শুদ্ধ সবাই যেন বেরিয়ে গেছে। আশ্চর্য্য চুপ হ'য়ে গেছে বিষ-কৌড়ার মত এই বাড়িটা। চোর নয় তো সে, গৃহস্বামী আগে থেকেই বুঝতে পেরে পাড়ার লোকজন জড় করে আনতে গেছেন? এতক্ষণে যেন সুধীন্দ্রর খেয়াল হয়, বাড়িতে অলকার অভিভাবক কেউ নেই? সে যে স্বচ্ছন্দে এসে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলে তার জন্যে কোন অভিজ্ঞান দরকার হল না? কেউ কোন জিজ্ঞাসাবাদও করলে না? নাকি অদর্শনেও সে বিশেষ পরিচিত হ'য়ে আছে এ পরিবারের?

অন্ততঃ এঁদের ব্যবহারে তাই মনে হয়। অলকার সত্যই একান্ত পরিচিতার মতই কাছে এসেছে, আপ্যায়নের যথাসাধ্য

চেষ্টা করেছে। অলকার সঙ্গে নিশ্চয়ই এ নিয়ে কথা হ'য়েছে, বিশেষ বন্ধু ভেবেছে। তাই—

হঠাৎ সুধীন্দ্র নিজের মনে সুপ্তোত্থিতের মত চেঁচিয়ে উঠল, 'শুনছেন? শুনুন।'

ছোট্ট ঘরে নেপথ্যে চিৎকারটা ব্যঙ্গের মত শোনাল। 'শুনছেন? শুনুন।' পাগল না মাথা খারাপ।

কিন্তু এ অস্বস্তি অসহ্য। পরের ঘরে এভাবে চড়াও হওয়া পীড়াদায়ক। অলকা আশ্চর্য্য সাজা করেছে, জেনে শুনে ঠিক তার আগমন মুহূর্ত্তে বেরিয়ে গেছে তাকে অপ্রস্তুত করতে।

যেন গরজটা একা তারই, দেখা না ক'রে ফিরে গেলে সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হ'বে, পস্তাবে। যতক্ষণ না অলকা ফিরে আসে ততক্ষণ হা পিত্যেস হ'য়ে বসে থাকতে হ'বে।

'না, না, না।' আত্মমর্য্যাদায় কোথায় যেন লাগে সুধীন্দ্রর, 'না না, তার কোন গরজ নেই, সে আর কিছুতেই বসবে না, এমনি ভৃত্যের মত অপেক্ষা করবে না।'

স্বগতোক্তি ক'রলে সুধীন্দ্র। দেড়হাত পরিমাপ ঘরটা যেন তাকে জুয়ার ঘুঁটির মত সজোরে নাড়তে থাকে। দম বন্ধ হ'য়ে আসে।

'শুনছেন? শুনুন না।' পা বাড়িয়ে দরজার কাছ পর্য্যন্ত এসে ডুবন্ত ব্যক্তির কুটি আঁকড়ান আকুলতায় সুধীন্দ্র হাঁকলে। জেনে শুনেও কিছুতে যেন নিষ্ক্রামণের পথটা খুঁজে পাচ্ছে না।

আর সেই মুহূর্ত্তে প্রায় মুখোমুখি, সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে অলকা বললে, 'অমন করে কাকে ডাকচো? কে শুনবে?'

নিমজ্জিত অবস্থায় যেন এক পেট জল খেয়ে ফেলেছে সুধীন্দ্র, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। কেমন নির্জ্জীব চোখে অলকার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ঘরের মধ্যে এসে হ্যাণ্ডব্যাগটা চৌকির ওপর গাদা করা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে অলকা বললে, 'কতক্ষণ এসেছ?'

দম নিতে যেন সুধীন্দ্রর কষ্ট হ'চ্ছে। কোন উত্তর করলে না।

লক্ষ্য করে' স্মিতহাস্যে অলকা বললে, 'মনে হ'চ্ছে যেন জলে পড়েছিলে?'

তবুও সুধীন্দ্র নিরুত্তর, গাম্ভীর্য্যে নির্লিপ্ত।

অলকা হয়তো কারণটা ঠিকই অনুধাবন করতে পারে, তেমনি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলে, 'রাগ হ'য়েছে? সত্যি, বিশ্বাস কর, এত দেরী হ'বে ভাবিনি।'

নির্লিপ্ত কণ্ঠে সুধীন্দ্র বললে, 'শুধু শুধু রাগ হ'তে যাবে কেন!'

তেমনি তরলতার সঙ্গে অলকা বললে, 'তবু?'

গম্ভীর হ'য়ে সুধীন্দ্র বললে, 'না!'

তারপর নড়বড়ে চেয়ারটায় সুধীন্দ্র কাঠ হয়ে বসলে, অলকা স্থির হয়ে চৌকির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা নিঃশব্দ বোঝাপড়া যেন জল-হারা মেঘের মত উভয়কে স্পর্শ করলে।

বলতে বলতে হঠাৎ ভুলে যাওয়া কথাটা যেন আবার মনে পড়ল। অলকা শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'কই, কাকে ডাকছিলে বললে না তো?'

'কোন লাভ আছে?' তেমনি গম্ভীর স্বরে সুধীন্দ্র বললে।

'লোকসান কিছু নেই।' সহজ করে বললেও অলকার কথাটা সহজ শোনাল না, 'বলতে পার।'

সুধীন্দ্র উত্তর দেবার আগেই উদ্দিষ্ট আহূত মেয়েটি এসে দোর গোড়ায় দাঁড়াল। শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'আমায় ডাকছিলেন?'

সুধীন্দ্র কোন জবাব দিতে পারলে না, একবার মেয়েটির মুখের দিকে একবার অলকার মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন সন্ত্রস্ত বোধ করলে। অলকা রুষ্টকণ্ঠে বললে, 'তোকে ডাকবে কেন? তুই যা।'

সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল সুধীন্দ্রর, মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না। মেয়েটিকে সে-ই অপরাধী প্রমাণ করলে, ডেকে এনে অপ্রস্তুত করলে।

এর পরে আর কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল না। অলকা সহজ সুরে বললে, 'আমার দিদি, স্বাতী!'

সুধীন্দ্রও সহজ হ'য়ে বললে, 'আমিও তাই ভেবেছিলুম, তোমার বোন। তবে বড় নয় ছোট!'

আরো সহজ হ'য়ে অলকা বললে, 'সবাই তাই মনে করে, আমাকেই বড় ভাবে।'

সুধীন্দ্র এতক্ষণে পরিহাস করলে, 'সব সময় মুখখানাকে যা করে রাখ যেন কত বুড়ো হ'য়ে গেছ!'

অলকা কপট ক্রোধে বললে, 'নিজের মুখটা দেখতে পাও না তাই, তোমাকেও তোমার দাদার চেয়ে অনেক বড় দেখায়, মনে হয় জ্যেঠা!

সুধীন্দ্র হেসে বললে, 'আমার কোন দাদাই নেই!'

অলকা হার না মেনে বললে, 'থাকলে নিশ্চয়ই তাই মনে হত! তুমি ভীষণ বুড়ো-বুড়ো ভাব কর।'

হেসে সুধীন্দ্র বললে, 'আর তুমি? তোমার দিদির কথা না হয়

"কে তোকে ডিম ভাজতে বলেছিল·····যা জানিস্ না—"

বাদ দিলুম, অফিসের আর সবাই যারা তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড় তারা কেমন ছেলেমানুষ হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়! সে তুলনায়—'

বলতে বলতে সুধীন্দ্র থেমে গেল, অলকার মুখ বেশ গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। স্পষ্টই রাগ করেছে।

হঠাৎ গম্ভীর স্বরে অলকা বললে, 'যারা বয়েস ভাঁড়ায় তাদের সঙ্গে মিশতে পার!'

ভুল বোঝাটা এড়িয়ে দিতে সুধীন্দ্র তাড়াতাড়ি বললে, 'না, তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না, কি কথার কি মানে ক'রলে!'

স্বরগাম্ভীর্য বজায় রাখলেও কণ্ঠের লঘুতা অলকা চাপতে পারলে না, বললে, 'কি আবার মানে করলুম। নিজের দোষটা বেশ ঢাকচো!'

দোষ স্বীকার করে সুধীন্দ্র বললে, 'স্বীকার করছি হ'লো তো?'

আবার অলকা হাসলে, চিৎকার করে ডাকলে, 'দিদি! দিদি!'

'ওকে কেন?' সুধীন্দ্র জিজ্ঞেস করলে।

উত্তর পাবার আগেই সুধীন্দ্র দেখলে পোষা কুকুরের মত স্বাতী এসে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছে। কেমন যেন জড়সড় ভয়চকিত ভাব।

অলকার কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন কানে লাগে সুধীন্দ্রর, 'দু'কাপ চা কর'না, আর—আচ্ছা তুই যা, আমি যাচ্ছি।'

সুধীন্দ্র তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে স্বাতীর মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'চা আমি খেয়েছি! আর খাব না।'

'ও!' অলকা এমন ভাবে বললে যেন তার দিদির পক্ষে নিজে থেকে অতিথিকে চা দেওয়াটা অন্যায় হ'য়েছে। 'যা দাঁড়িয়ে আছিস কেন, আমার জন্যে কর!'

স্বাতী চলে যেতে অলকা যেন নিজেকে শুনিয়ে বললে, 'তবু ভাল তোমাকে চা করে খাইয়েছে। দিদির বুদ্ধি খুলেছে।'

সুধীন্দ্র বললে, 'চা বিস্কুট সবই দিয়েছিলেন।'

অলকা এমন ভাবে হাসলে যেন, তার প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা না করে অতিথি আপ্যায়ন একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার হয়েছে, 'আবার বিস্কুট!'

সুধীন্দ্র স্বাতীর হ'য়ে লজ্জায় মরে গেল, যেন চুরি ক'রে অপাত্রে দান গ্রহণ করেছে!

অধিকতর আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে অলকা বললে, 'তুমি তো অমলেট খেতে ভালবাস, খাওনা! বিস্কুট তো তুমি ভালবাস না!'

'না, থাক।' সুধীন্দ্র বললে।

অলকা জেদ করলে, 'না না, তুমি যেমনটি ভালবাস তেমনি করে দেব। কখন এসেছো, কি দুখানা বিস্কুট খেয়েছো, আমি বলছি তোমার খিদে পেয়েছে!'···

সুধীন্দ্র হাসলে, 'আর একদিন এসে খাব, আজ ইচ্ছে করছে না।'

অলকার মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল, বেশ রাগত কণ্ঠে বললে, 'খালি পেটে লোভে পড়ে গুচ্ছের চা-বিস্কুট খেলে কখনো আর 'কিছু খেতে ইচ্ছে করে!'

সুধীন্দ্র বললে, 'ঠিক আছে, তুমি নিয়ে এস আমি খাব।'

'না তোমাকে খেতে হ'বে না, ইচ্ছে নেই—অভিমানটা সম্পূর্ণ উচ্ছ্বসিত হবার আগে অলকা চোখে জ্বালা অনুভব করলে। এক হাতে অমলেটের প্লেট আর এক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে স্বাতী স্মিতমুখে সুধীন্দ্রর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অলকার ইচ্ছে করল ঝাঁপিয়ে পড়ে অমলেটের প্লেটটা বিপর্যস্ত করে দেয়। স্বাতীকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়, জিজ্ঞেস করে কোন সাহসে সে একজন অপরিচিত লোকের সামনে বরণডালা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে? কে তাকে অমলেট ভাজবার ফরমাস দিয়েছিল? কেন সে তার একজন বিশিষ্ট বন্ধুর সামনে খুশীমত উপস্থিত হবে?

অলকা কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'ঢঙ, করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, রেখে দে না!' রাখবার জায়গা নিয়েই সমস্যা। স্বাতী আগের মতই কাঁপরে পড়ে, সেই ভাবনা যার জন্যে আনা সে যদি হাত বাড়িয়ে না ধরে, দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি।

সুধীন্দ্র হাত বাড়িয়ে অমলেটের প্লেটটা টেনে নেয়। মনে হয়, স্বাতী সেই আগের মতই খুশী হ'য়ে উঠেছে, আপনায় আপনি সম্পূর্ণ যেন।

কিন্তু হাত দিয়ে প্লেট থেকে অমলেট মুখে তুলে কামড়াতে গিয়ে সুধীন্দ্র থেমে গেল। বুঝি জিভটাই কেটেছে দাঁত দিয়ে। অলকার দৃষ্টি প্রসন্ন নয়। সুধীন্দ্রর সব গোলমাল হ'য়ে গেল, বেচারার খেয়াল ছিল না এই একটু আগে সে অমলেট খাবার আপত্তি জানিয়েছে!

লক্ষ্য করে অলকা বললে, 'ওকি, খাও না যে? ভাল হয় নি?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুধীন্দ্র বললে, 'বড্ড ঝাল!'

অলকার মুখটা সমধিক প্রসন্ন হ'য়ে উঠলো, 'পারবে না তবু ছাড়বে না! কতদিন দিদিকে বলেচি'—

আবার সুধীন্দ্র ভাঙা অমলেটটা মুখে পোরবার চেষ্টা করতেই ক্ষিপ্র হাতে প্লেটটা টেনে নিয়ে অলকা বললে, 'থাক, ও তোমাকে খেতে হ'বে না। নতুন করে ভেজে আনছি, একটু বস!'

অলকা ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুধীন্দ্র অনড় হয়ে বসে রইল। নিজেকে শুধু নির্বোধ নয় বিশেষ অপরাধী মনে হ'ল সুধীন্দ্রর। কোন দোষ-ই ছিল না অমলেটটার—স্বাদের কোন তারতম্যও নয়। অলকার মুখের দিকে চেয়ে নিজেকে কেমন প্রতারণা করে বসল সুধীন্দ্র। যেন অলকার মন রাখতে গিয়েই এই অনিচ্ছাকৃত অপলাপ করেছে। ছি, ছি!

লজ্জায় সুধীন্দ্র মাটিতে মিশে যেতে চাইলে আরো যখন তার কানে আসতে লাগল দিদিকে অলকা গঞ্জনা দিচ্ছে— 'কে তোকে ডিম ভাজতে বলেছিল? এমন জিনিষ তৈরী করলি মুখে দেওয়া গেল না? যা জানিস না—'

একলা ঘরে সুধীন্দ্র কাঠ হ'য়ে গেল। এ অপরাধের আর কোন চারা নেই, বলেও আর বোঝান যাবে না—অলকার দিদি অখাদ্য কিছু আপ্যায়িত করার জন্যে অতিথির সামনে ধরে দেন নি। নিশ্চয়ই সে অমলেট তৈরী করতে জানে, ছোটবোনের পুরুষ বন্ধুকে কি ভাবে সমাদর করতে হয় তা ও জানে। তার জন্যে ভদ্রমহিলার আজ কি খোয়ার!···

ট্রাম লাইন পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে এক সময় অলকা বললে, 'হঠাৎ তুমি এমন গম্ভীর হয়ে গেলে যে?'

মুখ ফিরিয়ে সুধীন্দ্র বললে, 'গম্ভীর নাকি? কই আমার তো মনে হয় না।'

'তা হ'লে তো গম্ভীরই হ'তে না।' অলকা ঠিকই লক্ষ্য করেছে সুধীন্দ্রের কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় নি।

'তা হলে প্রতারণা করতে বল যা নয় তাই?' সুধীন্দ্র গম্ভীরস্বরে বললে।

দেখছেন, সার্ফে কাচা খুকুর জামা কি ধবধবে ফরসা! সার্ফে পরিষ্কার করার আশ্চর্য্য শক্তি আছে, তাই সহজেই এত ফরসা কাচা হয়। শাড়ী, ব্লাউজ, ধুতি, পাঞ্জাবী, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় সবই রোজ বাড়ীতে সার্ফে কাচুন—তফাৎটা দেখবেন!

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

SU. 25-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

'জানি না।' উত্তরটা ঠিক মত যোগাতে না পেরে অলকা রাগ দেখালে।

তবু সহজ হতে কোথায় যেন বাধে। গলায় কাঁটা বেঁধার মত বাধে। আরো বাধিয়ে দিলে অলকা দিদির কথা বলে, যেন অমলেটে ব্যাল্পের কথা এখনো সুধীন্দ্র ভাবছে, আপ্যায়নের ত্রুটী নিয়ে খুঁত খুঁত করছে।

'দিদিটা ভীষণ বোকা। সময় সময় এমন কাণ্ড করে বলবার নয়। তবু ভাল বাইরের লোক ভেবে তোমাকে দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে দেয় নি—বসিয়েছে, চা-বিস্কুট খাইয়েছে।' অলকা প্রসঙ্গান্তরের চেষ্টায় বললে।

'ফিরে গেলেই ভাল হ'ত।' তেমনি গম্ভীর হয়ে সুধীন্দ্র বললে।

অলকা সাগ্রহে বললে, 'কেন ? কেন ?'

'তা হলে ভদ্রমহিলার আর এত কষ্ট হত না।' সুধীন্দ্র দ্বিতীয় ট্রামটা ছাড়বে কি না ভাবলে।

প্রকারান্তরে অভিযোগটা যে তাকেই অলকার বুঝতে দেরী হল না। চুপ করে রইল।

সুধীন্দ্র কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে বললে, 'সত্যি আমি দুঃখিত তোমার দিদিকে বলো।'

অলকা ফেটে পড়ল, 'দুঃখটা মারফতে প্রকাশ না করে তার সামনে করলেই পারতে। অত যদি দরদ—'

কথাটা সম্পূর্ণ হল না, সুধীন্দ্র চলন্ত ট্রামটা ধরে উঠে পড়ল, পিছন ফিরলে হয়তো দেখতে পেতো অলকার মুখটা কেমন কালো আর কুটিল হয়ে উঠছে। অলকা আরো বীভৎস হতে পারে এ প্রসঙ্গের অধিক আলোচনায়।

কিন্তু তার অপরাধ কি, সুধীন্দ্র অনেকক্ষণ ভাববার চেষ্টা করলে, শুধু শুধু কেনই বা অলকা এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে, উত্তপ্ত হচ্ছে ?

আর ট্রামষ্টপে দাঁড়িয়ে অলকার মনে হল, সুধীন্দ্রর তার দিদির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া একেবারেই অসমীচীন। এ সহজ কথাটা কেন সুধীন্দ্র বুঝছে না। আরো রাগের কথা, মাঝখান থেকে দিদির উপযাচক আপ্যায়ন তাদের আলাপের অন্তরায় হয়েছে। সুধীন্দ্র বাড়ী বয়ে কেন এসেছিল মনে মনে বুঝলেও মুখে সেটা ব্যক্ত না করে ফিরে গেল, অভিমান আরো অলকার সেই কারণে—দিদির জন্তেই সুধীন্দ্রর মনোযোগটা আজ যথেষ্ট তার প্রতি পড়েনি !

অলকা কিছুতেই ভাবতে পারে না, সুধীন্দ্র আজ এত অমনোযোগী কেন হল। কিছুতে কোন অংশে দিদি তার সমকক্ষ নয়। সে শিক্ষিতা, সে স্বাবলম্বিনী, সে সুন্দরী, তার দিদি ?

এক সময় অলকার মনে হয়, কি যা-তা ভাবছে এসব। দিদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা সে করতে যাবে কোন্ দুঃখে। দিদির জন্তে সে সত্যই দুঃখিত। বেচারা লেখাপড়া শেখেনি, আধুনিকাদের আদপ-কায়দাও জানে না, সংসারে মুখ বুজিয়ে কেবল খেটে মরছে, রুগ্ন মায়ের হাতের দোসর। ভাই থেকে, বোন থেকে, মা থেকে, বাপ থেকে কেউই দিদিকে অনুষ্ঠানের ত্রুটীর জন্তে ছেড়ে কথা বলে না। আশ্চর্য্য দিদির সহগুণ, ছোট ভাই-বোন কারো কথার উত্তর করে না। অদ্ভুত নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত !

আজ অনেক কড়া কথা সে শুনিয়েছে দিদিকে, যেগুলো না শোনালে কোন ক্ষতি ছিল না। কোন অপরাধই ছিল না দিদির। ভাল ভেবেই সে তার বন্ধুকে খাতির করতে এগিয়ে গেছে। ভাল মনেই আপ্যায়ন করেছে। ছিঃ, ছিঃ, কি ছোটমনের পরিচয় দিল আজ অলকা! অনেকক্ষণ চোখে ঘুম এল না অলকার। অন্ধকার ঘরে অলকা টের পায় মেজের ওপর বিছানার কোন্ একধারে কুকুরকুণ্ডলী হ'য়ে শুয়ে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে দিদি। ছোট বোনের চড়া কথা সব হয়তো ভুলে গেছে, গায়েই মাখেনি কিছু! আবার সকালে উঠে সংসারে সকলের মুখে মুখে হাতে হাতে খাদ্য পানীয় জুগিয়ে যাবে। সারা দুপুর নিঝুম গৃহে অক্লান্ত থেকে আসন্ন সন্ধ্যায় গৃহ-প্রত্যাগতদের আরামের ব্যবস্থা করবে !

অনেকদিন দুপুর বেলায় অফিসে কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে দিদির কথা মনে হয়েছে অলকার, বেচারা! কোন ভবিষ্যতই নেই বুঝি !

সংসারে সবাই দিদির কথা ভাবা ছেড়ে দিয়েছে, দিদির জন্তে কারো কোন ভাবনা নেই। দিদির থাকাটাও কারো খেয়ালে নেই। একটা অতি প্রয়োজনীয়, অতি ব্যবহার্য্য জিনিষের মত দিদি তাদের সংসারে মিশে আছে! একবার দিদির বিয়ের কথা উঠেছিল, এক কথাতে সেকথা চাপা পড়ে গেছে—ও মেয়েকে কে বিয়ে করবে ? রূপ নেই, বিদ্যে নেই, অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা নেই, কয়ারও কোন চিন্তা নেই।

'বুদ্ধি-সুদ্ধিও কিছু নেই, রগড়ে রগড়েও একটা পাশ করতে পারলে না!' আত্মীয়-স্বজন বন্ধু অনেককে বাবা আক্ষেপ করে বলেছেন। আর একটা কথা না বললেও অলকা জানে দিদির বিয়ের জন্তে কেন কারো মাথা ব্যথা নেই। একে তারা উদ্বাস্তু তায় অন্নচিন্তা চমৎকার। বলতে গেলে অলকার রোজগার না থাকলে, আঁতুড় ঘরের মত এই বাসগৃহের ভাড়া জুগিয়ে ইন্দুবাবুর পক্ষে সংসার প্রতিপালনই দুষ্কর হ'য়ে উঠতো। অলকা উপযুক্ত ছেলের কাজ করছে। জমান পয়সা নেই, যথেষ্ট আয় নেই, দিদির বিয়ের কথা ভাববে কে ?

আজ কথাগুলো যেন কেমন উপহাস ছলে বলেছিল অলকা। নিজে হাতে অমলেট ভেজে এনে সুধীন্দ্রর সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াতে খাওয়াতে কুটিয়ে কুটিয়ে অলকা বলেছিল, 'তোমার তো অনেকের সঙ্গে জানাশোনা আর এখানকার লোক তোমরা, দেখো না একটা পাত্র যদি পাও! খুব কাজের, খুব শান্ত, মানে—'

ঝালের দিক থেকে এ অমলেট কম নয়, সুধীন্দ্র শ্বাস টেনে বললে, 'হঠাৎ পাত্রের সন্ধান করতে বলচো! কার জন্তে ?'

বিষয়টা উপহাসের না হ'লেও বক্তব্য যেন কেমন উপহসিত মনে হয়। অলকা চোখমুখ কৌতুকপূর্ণ করে বললে, 'ঐ দিদির জন্তে! বেচারী লেখাপড়া শেখেনি, চাকরি করে না, কি হ'বে কে জানে! আমরা ভেবেই মরি!'

সুধীন্দ্র কোন উত্তর করেনি।

দিদিকে তারা কোন সম্মানই করে না, বরং ছোটই করে সবার কাছে।

অলকা কিছুতে ভেবে পায় না, আজ দিদির সম্বন্ধে এ সব কথা ভাবছে কেন। কেন সে মনে মনে এত বিচলিত হ'য়েছে, যে আমার আগে দিদি তার পুরুষ বন্ধুকে যথোচিত আপ্যায়ন করেছিল বলে? দিদির সম্বন্ধে সে কি নিশ্চিন্ত নয়—সংসারের সবাই কি জানে না ও মেয়ের কোন ভবিষ্যৎ নেই, কারো মনে ধরবে না ও ?

ছি ছি, যদি বুঝতে পেরে থাকে তার সম্বন্ধে কি ভাববে সুধীন্দ্র?' অনেক ভেবেও অলকা দিদিকে সুধীন্দ্রর মনে ধরবার কোন কারণই খুঁজে পেলে না। মিছে ভাবনা!

কিন্তু সুধীন্দ্র সেদিন দিদির মধ্যে কি যেন আবিষ্কার করলে কে জানে, কয়েকদিন পরে অফিসে অলকাকে একটা আনন্দের খবর দিলে। অলকা শুনে মনে মনে বিস্ময় বোধ করলে, যে দিদিকে তারা একটা মানুষের মধ্যেই ধরে না তার জন্যে কিনা এমন লোভনীয় সম্বন্ধ!

অলকা অবিশ্বাসের সুরে বললে, 'তাদের সব কথা বলেছেন, এই আমাদের অবস্থা, দিদির বিয়ে—'

দিদির সম্বন্ধে অলকার সঙ্কোচটা সুধীন্দ্র বুঝতে পারে। স্পষ্ট করে বললে, 'সবই বলেচি, তাঁরা রাজী আছেন।'

অলকা তবু কিন্তু করে, 'সত্যি সব বলেছেন?'

'সব!' কেমন নির্বিকার প্রত্যয় দৃঢ় মনে হয় সুধীন্দ্রর কণ্ঠস্বর!

অলকা বাড়িতে কি বলেছে, কি বলেনি, এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করলে না। যেন গরজটা সুধীন্দ্রর। তবু একদিন সুধীন্দ্র মনে করিয়ে দিলে, 'কই তারপর তুমি তো কিছু বললে না? বাড়িতে জিজ্ঞেস করেছিলে?'

অলকা গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'আমাদের অত টাকা নেই?'

সুধীন্দ্র অবাক হ'য়ে বললে, 'টাকার কথা তো তাঁরা কিছু বলেন নি!'

'না বললেও বিয়েতে তো টাকার দরকার হয়।' তেমনি গম্ভীর হ'য়ে অলকা বললে।

'তা দরকার হয়, কিন্তু যেখানে দাবি কিছু নেই সেখানে ও নিয়ে দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই।' সুধীন্দ্র বেশ অবাক হ'য়েছে অলকাদের নিশ্চেষ্টতায়। ক্ষুণ্ণও বুঝি।

'সে তোমাকে বোঝাতে পারবো না, আমাদের একটিও পয়সা নেই। দয়া করে দিদিকে বিয়ে ক'রতে চাইলেও এখন আমাদের বিয়ে দেবার অবস্থা নেই।'

সুধীন্দ্র চুপ ক'রে গেল। সম্বন্ধ এনে মহা অপরাধ করেছে। তার অভিজ্ঞতায় এমনটা দেখেনি বা শোনেনি, কেউ এমন করে হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে। অথচ দিদির জন্যে একটা পাত্র খুঁজে দেবার জন্যে কি জেদ ধরেছিল সেদিন অলকা।

'বোকা-সোকা ভালমানুষ, ঐ তো দেখলে—দেখো না একটা সম্বন্ধ। কি আর রাজামহারাজা, শিক্ষিত কিছু চাই না, খেতে-পরতে পায়, ভদ্র—'

হঠাৎ দিদির জন্যে ঘটকালীতে অলকা বড় তৎপর হ'য়ে উঠেছিল। সুধীন্দ্রর মনে হয়েছিল প্রগলভতাও করেছিল অলকা। সব থেকে খারাপ লেগেছিল সুধীন্দ্রর, সেদিন কথাবার্তায় অলকা বড় বেশি আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেছিল। স্বাতি ওর চেয়ে বিদ্যে-বুদ্ধি রূপ-যৌবন সব দিক থেকেই ছোট। একটা অসহায়, পরমুখাপেক্ষীর জন্যে যেন চাকরির সুপারিশ করছে। আহা বেচারা খেয়ে পরে বাঁচুক।

তারপর অনেকবার কথা উঠুক না উঠুক, অলকা দিদির জন্যে সম্বন্ধ দেখতে বলেছে। একরকম পেড়াপিড়ী করেছে।

কিন্তু কার্য্যকালে অলকার ভিন্ন রূপ। কোন গরজই নেই। সুধীন্দ্র সম্বন্ধ করে অপ্রস্তুতের একশেষ যেন!

তাহ'লেও এ সম্বন্ধ নিয়ে সুধীন্দ্রর জেদ চেপে গেল। অলকা কিছু উদ্যোগী হোক বা না হোক, সে'নিজে থেকে যোগাযোগ করিয়ে দেবে, তারপর ইন্দুবাবু মেয়ের বিয়ের জন্যে কিছু করুন বা না করুন, সে তিনিই বুঝবেন!

উপচিকীর্ষার আতিশয্যে একদিন সন্ধ্যেবেলায় সুধীন্দ্র অলকাদের বাড়ি এসে হাজির হল। প্রথম দিনের মত সে-জড়তা আর নেই, কিন্তু সঙ্কোচ কাটল না। তেমনি কড়া নাড়বো কি নাড়বো না করতে অনেকটা সময় কেটে গেল।

সেই স্বাতী এসে দরজা খুলে দিলে। আজ যেন সে সামনে পড়ে বিশেষ অপ্রতিভ বোধ করলে। মাথা নিচু করে বললে, 'অলকা এখনো বাড়ি ফেরেনি।'

সে-খবর সুধীন্দ্র জানে, অফিসে অলকা বলেছিল সিনেমা যাবার কথা। সুধীন্দ্রকে না পেয়ে হয় সে একলা, নয় আর কোন বান্ধবীর সঙ্গে গেছে! সেই সুযোগে সুধীন্দ্র এখানে এসেছে। ইন্দুবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করতে চায়, এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কি শুনতে চায়।

সুধীন্দ্র অপেক্ষা করলে, হয়তো আশা করেছিল স্বাতী নিজে থেকে বলবে, 'আসুন বসুন। অলকা এক্ষুনি ফিরবে।'

না, স্বাতী জড়সড় হ'য়ে দরজার একধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিন চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলে সুধীন্দ্র স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারতো, চড়া সুরে বলতে পারতো, আমি জানি। তারপর যেজন্যে এসেছে সে-কাজ করে ফিরে যেত।

সুধীন্দ্র জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার বাবা আছেন?'

স্বাতী দরজার পাশে সরে গিয়ে বললে, 'হাঁ!'

সুধীন্দ্র অবাক হয়ে গিয়েছিল নিজের হঠকারিতায়—কি করে সে স্বাতীকে তুমি সম্বোধন করলে। যেন অলকার মতই পরিচিত, আপনার জন, কত জানা শোনা!

সুধীন্দ্র তাড়াতাড়ি বললে, 'চলুন, আপনার বাবার সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

সব শুনে মাথায় হাত বুলিয়ে ইন্দুবাবু ম্লান হেসে বললেন, 'আমার আর কি, এমন সম্বন্ধ আমাদের মত লোকেরা কল্পনা করতে পারে না। আমার মেয়ের গুণ তো আমি জানি, লেখাপড়া শেখেনি, বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, ঐ ভালমানুষ—'

সুধীন্দ্র বললে, 'ঐ রকম মেয়েই তাঁরা চান, লেখাপড়া-জানা, বুদ্ধিমতী, খুব চালাক-চতুর মেয়ে তাঁদের দরকার নেই!'

ইন্দুবাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন, 'তা কখনো হয়! আজকাল

মেয়েরা সব কেমন হয়ে উঠেছে, সব গুণ তাদের মধ্যে আছে। আমার ঐ একটি মেয়েই যা, আর সব যেন চালাক-চতুর! ওরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হত। অলকা, তারপর দুজন, ওরাই তো সংসার রেখেছে।'

শুনতে সুধীন্দ্রর ভাল লাগে না, এখানেও সেই গরজ! এমন অভিভাবক বিয়ের বাজারে কজন আছেন, তার জানা নেই, নিজের জন্য কে এমন হেয় করেন!

ভদ্রলোক নিজের অবস্থান্তরের কথা বলতে লাগলেন, 'এক রকম এক বস্ত্রে চলে এসেছি, কোন সম্বল ছিল না। পনের বছরে অনেক কিছু চেষ্টা করেছি সুবিধে হয়নি—এই কোন রকমে টিকে আছি। একটা টাইপরাইটিং-এর স্কুল খুলে যা হোক করে দিন চালাচ্ছি, অলকা চাকরি করছে, আর দুটি মেয়ে টিউশানি করছে, দিন যাচ্ছে।'

অর্থাৎ সংসার অচল করবার জন্যে এখন বড় মেয়ের বিয়ের কথা ভাবা উচিত হ'বে না। মনে মনে সুধীন্দ্রর বড় রাগ হ'লো। আশ্চর্য্য এঁদের মনোভাব, স্বার্থপর, অন্ধ!

সুধীন্দ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে ইন্দুবাবু বললেন, 'আমরা কি পারবো তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে? তার ওপর আমরা ইষ্টবেঙ্গলের আর ওঁনারা হ'লেন পশ্চিমবঙ্গের!'

সুধীন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললে, 'সেটা কিছু বাধা নয়! এখন ও কথার কোন মানে নেই, দেশ যখন আমাদের তখন সব দিকই আমাদের।'

ইন্দুবাবু হাসলেন। 'তা হয়তো, কিন্তু এখনো দিক নিয়ে অনেক মারামারি, রেষারেষি, মনোমালিন্য!'

'এঁরা তেমন নন।' সুধীন্দ্র বললে, 'উদার মতাবলম্বী, সহৃদয়, সজ্জন।'

ইন্দুবাবু তেমনি ম্লান হাসলেন, 'সবাই কি আর গোঁড়া হয়, ভাল লোক সবখানে থাকে; তাহ'লে আর পার্টিশন হলো কেন? পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বাধা দিলে হ'তোই না!'

সুধীন্দ্র এড়িয়ে গিয়ে বললে, 'এঁদের সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। একটি ভাল মেয়ে পেলে আর কিছু এঁরা চান না!'

ইন্দুবাবু চুপ করে রইলেন। কেমন যেন ইতস্তত করছেন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে! এঁরা কি, স্বাতীর সম্বন্ধে কেউ-ই সোৎসুক নন—যেমন অলকা, তেমনি ইন্দুবাবু! তার কি, সুধীন্দ্র ভাবলে, মেয়ের বিয়ে না দিয়ে যদি ঘরে পুষে রাখতে চায় রাখুক! কি মতলব ওঁরাই জানেন। কিন্তু তার মুখ নষ্ট হয়েছে, সুধীন্দ্র মনে মনে রুষ্ট হল—কোন দরকার ছিল না উপযাচক হয়ে ভাল করতে আসার। অলকাকে বলেছিল ফুরিয়ে গিয়েছিল, বাড়ি বয়ে বারতা জানার কোন মানে হয় না। ঠিক হ'য়েছে।

ইন্দুবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আপনাকে আমি বলে আসবো। দেখি কদ্দূর কি করতে পারি।'

কথাটা গলির শেষ সীমায় এসে সুধীন্দ্রর মনে হল, আজ এক কাপ চা দিয়েও স্বাতী অতিথি সৎকার করেনি। রাস্তার পিছল দেখিয়ে সাবধান করে দেয়নি। অথচ তার ভালর জন্যেই বাড়ি বয়ে খবরটা নিয়ে এসেছিল সুধীন্দ্র। না, ওরা বোনে বোনেই সমান। একেবারেই মেলে না স্বাভাবিক মানুষের ধ্যান ধারণার সঙ্গে। বাপও তেমনি, এমন ভাব দেখালেন যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তাই নেই। আর একটা কথা মনে হল সুধীন্দ্রর হঠাৎ তার এই আগ্রহাতিশয্যে বিপরীত কোন কথা ভাবলেন না তো অলকার বাবা? তাঁদের সংসারে এত আত্মীয়তার অর্থ—

সামান্য পরিচয় এই প্রথম না হলেও অলকার বাবার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ সুধীন্দ্রর এই প্রথম। শুরুতে ভদ্রলোক কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ করেছিলেন, যথেষ্ট সঙ্কোচও ছিল কথাবার্তায়। সুধীন্দ্র স্পষ্ট লক্ষ্য করেছিল ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা বিনয়াবনত ভাব আছে, নিষ্প্রভ চোখ, বিশুষ্ক মুখ আর জীর্ণ দেহযষ্টি দেখে অবাকই হতে হয় একে অলকার বাবা ভেবে। অনেকবার সুধীন্দ্রর মনে হয়েছে, অলকাকে এ সংসারে এ পরিবেশে একেবারেই মানায় না, শিক্ষা-দীক্ষা এবং রুচিতে সে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। এই সামান্য দুখানা ঘরে দীন আসবাবপত্রের মধ্যে অধিকারটা বেদনা-দায়ক—এক সময় সুধীন্দ্রর মনে হয়েছিল এতটা ঘনিষ্ঠতা অনুচিত হয়েছে, অতি পরিচয়ে আসল সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলছে, বাড়াবাড়ি করছে।

ভালই হল সম্বন্ধ নিয়ে আর কখনো আসতে হবে না! কথাটা নিজেকে শুনিয়ে বললেও কেমন যেন উচ্চকিত হয়ে উঠলো, কানে বাজল সুধীন্দ্রর! অপ্রস্তুতের মত আশ-পাশ চেয়ে দেখলে, ধারে কাছে কেউ আছে কিনা।

সুধীন্দ্র সঙ্কুচিত হয়ে গেল মাথায় বাড়ি খাওয়া কচ্ছপের মত। তার খোলসটা কেবল নির্লজ্জের মত অলকার সামনে পড়ে রইল। মনে হল, অনেক যুগ পরে এক নতুন পরিবেশে তাদের সাক্ষাৎ হল।

অলকা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলে, 'এখানে? এত রাত্রে।'

সুধীন্দ্র আমতা আমতা করে বললে, 'তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলুম।'

অলকা গম্ভীর হয়ে গেল। তার আর কোন প্রশ্ন করবার দরকার নেই। উদ্দেশ্য সে জানে। এইজন্যেই আজ সিনেমায় যেতে রাজী হয়নি সুধীন্দ্র কাজের অজুহাত দেখিয়ে?

সুধীন্দ্র সাগ্রহে বললে, 'তোমার বাবার সঙ্গে কথা হল।'

অলকা উত্তর দিলে না। যেন বড় বোনের সম্বন্ধে ছোট বোনের বলবার কিছু নেই।

সুধীন্দ্র বললে, 'তিনিও তোমার মত—'

হঠাৎ অলকা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেদিন যেমন করে বড় বোনের দেওয়া অমলেট প্লেটটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল: 'রাজী নয়? গ্রাহ্যই করছেন না?—না নেই?'

এ উত্তর সুধীন্দ্র আশা করেনি। হঠাৎ অলকার এত উষ্মার কারণ বুঝতে পারলে না। খুব কড়া করে উত্তর দিতে গিয়ে সুধীন্দ্র চুপ করে গেল, যেন সে চোর, পাঁচজনে তাকে এই ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ করছে। এ অপমান তার পাওনা ছিল।

অলকা আর দাঁড়ায় নি। ক্রুদ্ধ মার্জারের মত চলে গেল। সুধীন্দ্র রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবাক হ'য়ে ভাবলে, এতে অলকার এত উতলা হবার কি কারণ আছে। এমন কি অপরাধের কারণ ঘটিয়েছে সুধীন্দ্র একটি অরক্ষণীয়া মেয়ের সম্বন্ধ করে। এতদিন অলকাকে বুঝতে পারার সব নিশ্চয়তা যেন চুরমার হ'য়ে গেল।...

অলকাও আর যেন তেমন ব্যবহার ক'রছে না। সুধীন্দ্র লক্ষ্য করলে, অফিসে অলকা বেশ গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেছে। নেহাৎ কথা

না কইলে যেখানে চলে না সেখানে হাঁ-হু না করে জবাব দেয়, ঘুরতে ফিরতে দেখা হ'লে সোজাসুজি পাশ না কাটালেও এমন ভাব করে পাশ-কাটানোরই সামিল।

অবস্থা অসহ বোধ হ'লেও মুখে কিছু বলতে পারে না সুধীন্দ্র। বাধে। আরো বাধবার কারণ, ইদানীং তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে অলকা অফিসের এমন কয়েকজনের সঙ্গে মেলামেশা ক'রছে যাদের সম্পর্কে সুধীন্দ্রর বিরূপ মনোভাবের কথা বহুপূর্ব্বে অলকার জানা ছিল। অলকাও স্বীকার করেছিল মেশবার মত লোক তারা নয়। আজ তারা সহৃদয় এবং অলকার আলাপ ধন্য, নিত্য সঙ্গী।

অলকার এ মনোভাবের কোন কারণ খুঁজে পায় না সুধীন্দ্র। অলকার প্রতি অনুরাগ বশেই অলকার কথায় না সে তার দিদির সম্বন্ধ ক'রতে চেয়েছে। বেশ তো অলকার যদি মনঃপূত না হয় স্পষ্ট ক'রে বললেই পারে—দিদির বিষয়ে তার মাথা-ঘামানো অনুচিত ধৃষ্টতা।

নিজের মনকে অনেক বুঝিয়েছে সুধীন্দ্র, বিষয়টা নিজের কাছে হাল্কা করতে চেয়েছে। অলকার কাছে যাই-যাই করেও যেতে পারেনি, কেমন যেন একটা দুস্তর বাধা অতিক্রম করতে পারেনি! এর আগে উভয়ের মন নিয়ে কত ভাঙা-গড়া হয়েছে, কিন্তু আজ অকারণে ভাঙা মন যেন আর জোড়া লাগবার নয়। সুধীন্দ্র বুঝতে পারে, যারা তাদের অন্তরঙ্গ ভাবে জানে তারা আড়ালে নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করে। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন একটা বৈরিতা, শত্রুতা ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। সুধীন্দ্র জানে না এর ফল কি হবে। নিজেকে একেবারে সঙ্কুচিত করবে স্বাতীর সম্বন্ধে আর কোন সাড়া শব্দ করবে না, এই যদি তার অপরাধ হয় আর সে-অপরাধ মিথ্যে মিথ্যে বাড়াবে না। এইখানেই ছেদ পড়ুক।

কিন্তু সুধীন্দ্রর ধারণা বোধ হয় ভুল, হঠাৎ একদিন অফিসে সুধীন্দ্রকে অলকা নিজে থেকে জিজ্ঞেস করলে, 'কি হলো, সে-সম্বন্ধে তো আর কোন কথা বললে না? বাবা বলছিলেন—'

সুধীন্দ্র মনে মনে কিঞ্চিৎ শ্লাঘা বোধ করলেও, মুখে নির্লিপ্তভাব দেখিয়ে বললে, 'আর কোন খোঁজ করিনি। তোমার বাবা আসেননি, বলেছিলেন—'

ত্রুটী স্বীকার করে অলকা বললে, 'বাবা আসতে পারেননি, তাঁর খুব শরীর খারাপ হয়েছিল!'

তবুও যেন মনের মালিন্য ঘোচে না, সুধীন্দ্র তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, 'আবার খোঁজ নেব!' অলকা খুবই আগ্রহ দেখালে, 'না না, দেখো সম্বন্ধটা!'

কিন্তু তাতেও উভয়ের সম্বন্ধ পূর্ব্বের মত আর সহজ হয় না। সেই একদিন বাড়ি খুঁজে খুঁজে গন্তব্যে হাজির হওয়ার বিড়ম্বনা ঘোচে না। আজো নিজের সম্বন্ধে আসল কথাটা সুধীন্দ্র বলতে পারলে না, সাহসে কুলোল না। অলকা যেন অনেক দূরে সরে গেছে।

তবু কিছুদিন আবার উদ্যোগী হওয়া যায়, ভোলা যায়, মাতা যায়। উভয় পক্ষের হ'য়ে কথাবার্ত্তা নাড়াচাড়ায় দিন কেটে যায়। ইন্দুবাবু উৎসাহী হন।

অলকা ব্যাপারটা যেন অভিভাবকের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। প্রায়ই তাকে অনুপস্থিত দেখা যায়। যেদিনই সুধীন্দ্র আশা করে গেছে আজ নিশ্চয়ই অলকার সঙ্গে দেখা হবে, সেদিনই নিরাশ হয়েছে, বহুঘরে বসে বিয়ের কথা চালাবার উপযুক্ত লোকের আগমন অপেক্ষায় বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তারপর ইন্দুবাবু কাজকর্ম্ম সেরে গায়ে কোঁচার খুঁট জড়িয়ে যখন সামনে এসে দাঁড়ান রাগে সারা শরীর সুধীন্দ্রর জ্বলে ওঠে। পাত্রপক্ষের মুখপাত্র হিসাবে আর কোন কথা কইবার ইচ্ছে করে না সুধীন্দ্রর। ইন্দুবাবুর দীন বশম্বদ চেহারাটা দেখে মনে হয়, এ সম্বন্ধ পুনরুত্থানে সে ভাল করেনি, প্রতারণা করছে নিজের সঙ্গে। রাগ অলকার ওপরই হয়। আর যতটা সহজ মনে করেছিল কাজটা অত সহজও হ'ল না কার্য্যক্ষেত্রে। এদিকে ইন্দুবাবু যদি হাত বাড়াতে চান, ওদিকে পাত্রের পিতা দীননাথবাবু হাত সরিয়ে নেন। পাত্রের মা-মাসি, মামা-মামী অনেকে এসে বিবাহ-কথার সাগর উত্তাল করে তোলেন। সুধীন্দ্রের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। এ সময় কাউকে যদি সৎ পরামর্শের জন্যে পাওয়া যেত! ঐ অলকা—

সেদিন অলকাদের বাড়ি এসে অনেকক্ষণ সুধীন্দ্র অপেক্ষা করলে। দেনা-পাওনার একটা পাকা কথা এনেছে পাত্রপক্ষের কাছ থেকে। ইন্দুবাবু রাজী হলে মেয়ে দেখার দিন স্থির হবে। সুধীন্দ্রও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। তার দায়িত্ব শেষ হবে। অনেক হয়েছে পরের বিয়ের কথায় থেকে। আগ্রহর চেয়ে এখন লজ্জাই তার বেশী!

আর আজই অপেক্ষাটা যেন একটু বেশী করতে হয়। কারুর দেখা নেই। বাড়িতে অলকার দিদি থাকলেও কোন লাভ নেই। দরজা খুলে মূক অভ্যর্থনা করে সেই যে সে কোথায় সরে গেছে আর দেখা নেই। হয়তো লজ্জা, নিজের বিয়ের কথায় উৎসাহী হ'তে নেই কোন অরক্ষণীয়াকে! স্বাতীর ব্যবহারের পরিবর্ত্তনটা বেশ বুঝতে পারে সুধীন্দ্র, প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে একেবারে মেলে না। ও কেবল লজ্জিত নয়, কেমন যেন ভয়-চকিত হয়ে উঠেছে বিয়ের কথায়।

ছোট্ট ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থেকে থেকে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে সুধীন্দ্রর। নড়বড়ে চেয়ারটা বার কয়েক মট্‌-মট্‌ করে ওঠে। ইচ্ছে করে প্রথম দিনের মত উঠে গিয়ে ডাকে—'শুনছেন! শুনুন?'

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে অলকা ঘরে ঢুকল। হাতের ব্যাগটা আজ আর ছুঁড়ে চৌকির ওপর রাখলে না, ধীরে এগিয়ে এসে সুধীন্দ্রর পাশে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের হুকের গায়ে ঝুলিয়ে রাখলে। তারপর সরে এসে সুধীন্দ্রর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, 'অনেকক্ষণ বসে আছ বোধ হয়? বাসায় আজকাল কোন বিষয়েই খেয়াল থাকে না! তারপর?'

গরজটা যেন সুধীন্দ্রর, মনে মনে যেন রাগ হল অলকার কথার ধরণে। যেন একজন মাইনে-করা ঘটকের সঙ্গে সে কথা বলছে। সুধীন্দ্র কোন জবাব দিলে না, যা বলবার সে অলকার বাবাকেই বলবে! আজই মধ্যস্থতার ইতি করবে।

অলকা ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'আমাকে বলতে পার, কোন ডেভোলাপমেণ্ট হয়ে থাকলে।'

সুধীন্দ্র কেমন নিশ্চেষ্ট হ'ল, বললে, 'কি আর ডেভোলাপমেণ্ট হ'বে, যা চিরকাল হয় তাই হ'য়েছে!'

অলকা উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রলে, 'কি?'

অপরাধীর মত সুধীন্দ্র বললে, 'কিন্তু দাবী-দাওয়ার কথা উঠছে! মুসকিল!'

সুধীন্দ্র লক্ষ্য করলে, অলকা কেমন যেন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে আছে। মুখটা ক্লান্ত, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। অন্যমনস্কও।

শিখার শিখরে

বিমলচন্দ্র ঘোষ

"না, কোনো কথা বোলো না, অভীপ্সাকে নিবারণ কোরো না
চৈত্র-হাওয়ার অবাধ্যতায় ! না, না, না, উচ্চারণ যেন তোমার
ওষ্ঠকে শিথিল না করে। বোলো না, একটিও কথা বোলো না,
সম্মতি দেওয়ার লজ্জায় আমি মরে যাব। আমাকে তোমার
অনুচ্চারিত হৃদয়ের সহধর্মিনী করে নাও। না, না, না,
সম্মতি দেওয়ার দুঃসহ অপমান আমি সইতে পারবো না।
শিল্পী তুমি, স্রষ্টা তুমি, সুন্দর কখনো নিহত হবে না তোমার
হাতে। স্নায়ু-শিরার রক্তোচ্ছাস পুষ্পিত হোক তোমার চেতনায়।"

মধুশ্রী-মদির কণ্ঠে প্রেম-প্রলয়ের অগ্নিশিখরে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল'
নিজেকে শেষ করে ফেলার উন্মত্ততায় সুখ নেই, সুখ নেই
বিদীর্ণ অন্ধকারের রোমাঞ্চ-বিহ্বল শ্রান্তিতে। না গো, না,
অমন করে চেয়ো না। ও চাওয়ায় ঝড় ওঠে, বিদ্যুতের ঘুম
ভেঙে যায় কালো মেঘের পাঁজরে। লুণ্ঠনে মহিমা নেই,
মহিমা নেই নিরাবরণ চাওয়ার অহঙ্কারে। না-না-না
স্বপ্নঘাতী প্রেমঘাতী সম্মতি দেওয়ার দুঃসাহসিকতা আমার নেই।
সৃষ্টির মহাপারিজাতে এসে আমরা সৌরভের গৌরব জাগাই।

সেই দুর্লভ অগ্নিময়তার শিখরে অপর পক্ষ উত্তর দিয়েছিল :
"জীবনে যে কিছুই পায়নি, তার আকাঙ্ক্ষার অমিত প্রার্থনা
উচ্চারণের সমুদ্র-তরঙ্গ সৃষ্টি করে ! তা'র চাওয়ার ভীষণতা
শঙ্কিত করে পরিতৃপ্তির জগতকে। জীবন যার বসন্তরিক্ত,
সম্মতি অসম্মতির সে অপেক্ষা রাখে না। অনিবার্য তার
শেষ হয়ে যাওয়ার উন্মত্ততা। তুমি আমার অন্ধকারের
বজ্রমণি সূর্যোদয় হবে তোমারি শ্রান্ত প্রেমের দিগন্তে।"

সুধীন্দ্র অসহায় ভাবে বললে, 'আমার সঙ্গে কিন্তু আগে এসব কথা হয়নি ! বিশ্বাস কর—'

অলকা ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'অবিশ্বাস করবো কেন, আমাদের উপকারের জন্যেই তো তুমি এত ছোটাছুটি ধরাধরি করছো !'

সুরটা ক্ষীণ হলেও কোথায় যেন একটা খোঁচা আছে, সুধীন্দ্র [illegible] কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'তার মানে, কি বলতে চাও তুমি ?'

অলকার কণ্ঠস্বর বিশেষ সদয় মনে হল না, 'কি বলতে চাই তা কি বোঝোনি বিশ্বাস করতে হ'বে ?'

সুধীন্দ্র অবাক হ'য়ে অলকার মুখের দিকে চাইলে। অলকাকে কখনো তার এমন নির্মম মনে হয়নি। তার একটা অমার্জনীয় অপরাধ যেন সে কিছুতে ক্ষমা করতে পারছে না। কিন্তু অপরাধটা ঠিক কি সুধীন্দ্র আন্দাজ করতে পারছে না।

অলকা মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে বললে, 'তুমি জান এ সম্বন্ধ আকাশ-কুসুম তবু তাই নিয়ে'—

অলকাকে সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে সুধীন্দ্র বললে, 'তার মানে বলতে চাও আমি তোমাদের প্রতারণা করেছি, ভোক দিয়েছি, মিথ্যে বলেছি ?'

অলকা চৌকির কাছে সরে গিয়ে একটু দূরত্ব রেখে বললে, 'তা জানি না, কিন্তু আমার কি অপরাধ ছিল যার জন্য সেদিন থেকে তুমি আমাকে—'

রুদ্ধকণ্ঠে অলকা বক্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারলে না, ত্রস্ত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সুধীন্দ্র কিছু বুঝে ওঠবার আগে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত দরজা আটকে স্বাতী দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে চায়ের কাপ আর এক হাতে অমলেটের প্লেট।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কল্যিয়ারী—বিরলাঙ্গুলিয়া।

কল্কফল—দাড়িম গাছ।

কল্পাসিন্দা—বৃক্ষবি°।

কল্পতরু, কল্পদ্রু, কল্পদ্রুম—দেবলোকের বৃক্ষবি° (?)!

কল্পনাথ—বৃক্ষবি° justicia paniculata.

কল্পপাদপ—১ সন্তান বৃক্ষ, ২ মন্দার বৃক্ষ, ৩ পারিভদ্রবৃক্ষ, ৪ হরিচন্দন বৃক্ষ॥ বিশ্বকো°॥

কল্পবল্লী—কল্পলতা।

কল্মাষ—গন্ধশালি।

কল্যা—হরীতকী।

কল্যাণবীজ—মসূর।

কবক—ছত্রাক, বেঙের ছাতা।

কবচপত্র—ভূর্জপত্র।

কবার—পদ্ম।

কবিকা—কচুক পুষ্প।

কবেল—পদ্ম, শুঁদিফুল।

কশাড়—[স° কেশরাজ, কসেরু, ক্ষুদ্র মুস্তা, শূকরেষ্ট, গন্ধচন্দক, হি° কসেরু, চিচোড়, ম° কচরা, কুরভ্যা, ক° সেকিনগড্ডে, তে° ইঁচিকোত্তি, ও° কেসুর] কেশুর, কেশাড়, কশাড় scirpus grossus, s. kysoor. মুস্তাতিবর্গের তৃণবি°। নীচু, জলাভূমিতে জন্মে। বড় ডাঁটার মত গাছ। নীচে কন্দ থাকে, তাহাই কেশুর।

কশাত—তৃণবি°, কেষো।

কশ্মীরজ, কশ্মীর জন্ম—কুঙ্কুম দ্রি° (?)

কষায়—শোনা গাছ।

কষায় বর্গ—ন্যগ্রোধাদি, অম্বষ্ঠাদি, প্রিয়ঙ্গ্বাদি, লোধ্রাদি, ত্রিফলা, শল্লকী, জাম, আম, বকুল, তিন্দুক, ফলিনী, কতকশাক, পাষাণভেদী, বনস্পতীফল, সালসারাদি, কুরুবক, কোবিদার, জীবন্তী, চিল্লী, পানকী, সুনিষণ্ণ, নীবার, মুস্তা।

কষায়া—ক্ষুদ্র দুরালভা। পর্যায়—ক্ষায়, যবসা, দুস্পর্শ, ধন্বযাস, কুনাশক, দুরালভা, সমুদ্রান্তা, রোদিনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, হরবিগ্রহা, দুরভিগ্রহা।

কষায়ী—১ শালবৃক্ষ, ২ লকুচ বৃক্ষ, ৩ খর্জুর বৃক্ষ।

[illegible]—[illegible]।

কসন্মাৎপাটন—বাসক বৃক্ষ।

কসাগিলা—বৃক্ষবি° dolichos hexandra.

কস্তুরী—শাকবি°। দুই প্রকার—(১) কালকস্তুরী—[illegible] শাকবি° hibiscus abelmoschus. প্রায় ২ হাত উঁচু হয়। গাছের বীজে কস্তুর গন্ধ। ফুল বড়, মাঝে লাল। [illegible] পাঁচকোণা। (২) লতাকস্তুরিকা—শাকবি°। শাকে কস্তুরীর গন্ধ। আর এক জাতীয় গাছ আছে তাহা দেখিতে ভেরাণ্ডা গাছের মত, amaryllis zelanica.

কস্তুরীমল্লিকা—লতাকস্তুরী। দুই রকমের গাছ—একপ্রকার [illegible], অন্যটি ভেরাণ্ডা গাছের মত।

কস্তুরীবল্লিকা—লতাকস্তুরী।

কহ—ককুভ গাছ pentaptera glabra.

কহ্লার—শ্বেত উৎপল, শ্বেত শুঁদি, হেনা ফুল nymphœa edulis. পর্যায়—সৌগন্ধিক, কল্হণ, গন্ধক।

কাঁইবীচি (দেশজ)—বীজের শাঁষে কাইবৎ আটা থাকে, বোধ হয় [illegible] কাঁইবীচি নাম হইয়াছে। তেঁতুল।

কাঁকড়াশৃঙ্গী—কর্কটশৃঙ্গী দ্র°।

কাঁকরোল—কর্কটক দ্র°।

কাঁকুড়—[স° এর্বারু, কর্কটী, হি° ককড়ী, ম° ও [illegible] কাঁকড়ী, ক° ক্যেয়সৌত, তৈ° দোসকায়া, কা° খ্যাটুজার, [illegible]] কুষ্মাণ্ডবর্গের শশাসদৃশ প্রতানীবিশেষ cucumis utilissimus. [illegible] খরখরে, ফল লম্বা, গোল ডোরাকাটা, পাকিলে রং লাল হয়। একজাত পাকিলে ফাটিয়া 'ফুটি' (melon) হয়। [illegible]। বর্ষজীবী লতা, জমিতে লতাইয়া বৃদ্ধি পায়।

কাঁকুড়ী—কাঁকুড় দ্র°।

কাঁথরা—ঈষলাঙ্গুলা hydrolea zeylanica.

কাঁচড়াওয়াড (দেশজ)—ঘাসবিশেষ।

কাঁচড়াদাম—কেসরদাম দ্র°।

কাঁচীসিম (দেশজ)—বৃক্ষবি° dolichos lignosus.

কাঁট জাতি—basleria prionilis.

কাঁটা আলু—আলুবি° dioscorea pentaphylla.

কাঁটা কচু—কচুবি° lasia loureiri, pothos lacsia.

কাঁটাকরঞ্জা—[স° পুতিকরঞ্জ, হি° কাঠকালেজা] নাটা, কাঁটাকরঞ্জা caesalpinia bonducella করঞ্জা দ্র°।

কাঁটাকারী (দেশজ)—কণ্টকারী।

কাঁটাকলিকা—১ কোকিলাক্ষ বা কুলেখাড়া asteracanthe longifolia, hygrophila spinosa, ২ কুলবি· ruellia longifolia.

কাঁটাগড়গড়—coix barbata.

কাঁটা গুড়কামাই (দেশজ)—কাকমাটি দ্র·, capparies sepiariea, monetia barbrioides.

কাঁটাগোলাপ (দেশজ)—গোলাপবি·, rosa chinensis.

কাঁটা ঝাঁটা—[স· কুরুটক, বজ্রদন্তি] ঘন প্রশাখাবিশিষ্ট গুল্ম। harbria prionitis.

কাঁটা নটিয়া (দেশজ)—[স· মারিষ, বাষ্পক, মার্ষ] amaranthus spinosus. দুই প্রকার (১) সাদা কাঁটানটে, (২) লাল কাঁটানটে।

কাঁটাবাটনা (দেশজ)—বৃক্ষবি· quercus acuminata.

কাঁটাবাঁশ (দেশজ)—বেড় বাঁশ bambusa spinosa.

কাঁটাবাবলা (দেশজ)—বাবলাগাছ mimosa arabica.

কাঁটা মান (দেশজ)—বৃক্ষবি·, pothos heterophylla.

কাঁটাল—কাঁঠাল।

কাঁটা লাল বাটানা (দেশজ)—বৃক্ষবি· quercus armata.

কাঁটালি কলা—কলা দ্র·।

কাঁটাশিঙ্গর (দেশজ)—বৃক্ষবি· quercus armata পূর্ববঙ্গে বিস্তর জন্মে।

কাঁটাশিরীষ—শিরীষ গাছ aspecies of mimosa.

কাঁটাগুন—বৃক্ষবি· panex digitata

কাঁটাসিজ (দেশজ)—তেকাঁটা সিজ। "বড়ি ভাজা বিস্তরণ বদরীর বীজ। কলামূলা ভেজে দিল কাঁটা কাঁটা সিজ।" —শিবায়ণ।

কাঁঠাল—[স· পনস, কণ্টকি ফল, উত্তর পশ্চিমে—কঁঠাল, বোম্বাই—ফণস, তা· পিলা] artocarpus integrifolius পর্য্যায়—কণ্টকিফল, কণ্টজ, অতি বৃহৎ ফল, মহাসর্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষক, স্থূল, কণ্টফল, মূলফল, অপুষ্পফলদ, চুতফল, চম্পকোষ, চন্দ্রাম্বু, রসাল, মৃদঙ্গফল, পনস, পনসতালিকা।

কাঁঠালীকলা—কলা দ্র·।

কাঁঠালীচাঁপা—চাঁপা দ্র·।

কাঁদড়া, কাঁদলা—বৃক্ষাদি·, commelina nudiflrora.

কাওয়া—১ কাফি coffee tree. আফ্রিকাদেশের আচ্ছুকাদিবর্গের ক্ষুপবি· coffee arabica, garsinia mangostana. ভারতবর্ষের দক্ষিণে, সিংহলে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে জন্মায়। বনকাওয়া coffea bengalensis. ২ পুন্নাগ সদৃশ শ্যামপত্র দীর্ঘ তরুবি· gracinia cowa পুষ্পের পীতবর্ণ, বিহার ও চট্টগ্রামে জন্মায়।

কাওয়াঠোঁটী—গুল্মবি·, কাকজঙ্ঘা।

কাক—পাটলাদি বর্গের বন্য বৃক্ষবি·। millingtonia Rortensis (Indian cork tree)। সুন্দর দেখিতে বলিয়া বড় বড় রাস্তার ধারে রোপিত হয়। ফুল বড় বড় শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধী, শীতকালে অধিক পরিমাণে ফোটে। শুঁটী লম্বা, বীজে পাখা আছে।

কাককঙ্গু—কাকপ্রিয় কঙ্গু, ধান্যবি·।

কাককলা—কাকজঙ্ঘা।

কাকঘ্নী—মহাকরঞ্জ।

কাকচিঞ্চা, কাকচিঞ্চি, কাকচিঞ্চিক, কাকচিঞ্চী—কুঁচ, গুঞ্জা।

কাকজঙ্ঘা—১ কেওয়া ঠেঙ্গা গাছ leea aquata. গাছ ৪-৫ হাত বড়। ইহার কাণ্ড সন্ধির মধ্যভাগ উন্নত দেখিতে কাকজঙ্ঘার মত। যশোহরে বিস্তর জন্মায়। পর্য্যায়—কাকাঙ্গী, কাকঙ্ঘী, কাকনাসিকা, কৃষ্ণবল, কাকহ্বা, সুলোচনা, পারাবতপদী, দাসী, নদীকান্তা। ২ গুঞ্জা। মুদ্গপর্ণী লতা।

কাকজম্বু—ভূমিজম্বু, ক্ষুদে জাম, বনজাম।

কাকজম্বু—জলজাত জামবি· ardisia humilis, বা· কাকজাম, বনজাম, পানশিউনি। পর্য্যায়—কাকফলা, নাদেয়ী, কাকবল্লভা, ভৃঙ্গেষ্টা, কাকনীলা, ধ্মাঙ্ক্ষ্, জম্বু, ধনপ্রিয়া।

কাকডুম্বুর—[স· কাকোদুম্বরিকা] কৃষ্ণডুমুর, ক্ষুদ্রডুমুর, ডুমুর দ্র·।

কাকণ—গুঞ্জা, কুঁচ।

কাকণন্তিকা, কাকনন্তী, কাকনী—কুঁচ।

কাকতিক্তা—১ কাকজঙ্ঘা, ২ গুঞ্জা, কুঁচ।

কাকতিন্দুক—বৃক্ষবি· diospyros tomentosa মাকড়া গাব, মাড়াকেন্দু, কাকতেন্দু। পর্য্যায়—কাকেন্দু, কুলক, কাকপীলুক, কাকপীলু, কাকাণ্ড, কাকস্ফূর্জ, কাকাহ্ব, কাকবীজক।

কাকতুণ্ডিকা—গুঞ্জা।

কাকতুণ্ডফলা—কেওয়াঠোঁটা (?)।

কাকতুণ্ডী—কেওয়াঠোঁটা asclepias eurassorica, বনকাপাস। পর্য্যায়—কাদাদনী, কাকপীলু, কাকশিম্বী, রগুলা, ধ্মাঙ্ক্ষনখী, বক্রশল্যা, ত্রুর্মোহা, বায়সাদনী, ধ্মাঙ্ক্ষনখী, বায়সী, কাকদন্তিকা, ধ্মাঙ্ক্ষদণ্ডী। বহু বর্ষজীবী সবল উদ্ভিদ।

কাকদ্রুম—বৃক্ষবি·, dalbergia rimosa.

কাকনন্তী—কুঁচ।

কাকনামা—বকফুলের গাছ।

কাকনাস—বিকণ্টক, বঁইচ গাছ।

কাকনাসী—[হি· কাউয়া ঢোরী] hygrophila salicifolia.

কাকনীলা—জামবি·।

কাকপর্ণী—মুদ্গপর্ণী।

কাকপীলু—১ কাকতিন্দুক, ২ কাকতুণ্ডী, ৩ শ্বেত কুঁচ।

কাকপীলুক—মাকড়াকেন্দু।

কাকপুষ্প—গন্ধপর্ণ।

কাকফল—নিমগাছ।

কাকফলা—কাকজম্বু, বনজাম।

কাকভণ্ডী—মহাকরঞ্জ। ইহা মুখে দিলে জলস্রাব হয়।

কাকমর্দ—মহাকাল লতা, মাকাল।

কাকমাচী—গুড়কামাই দ্র·।

[ক্রমশঃ।

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৫৫

শচীমাতার কাছে প্রভু বৃন্দাবনে যাবার অনুমতি চাইলেন।

'কতবার চেষ্টা করেছি, বৃন্দাবনের নাগাল পেলাম না। মা, তুমি স্বচ্ছন্দ মনে অনুমতি দাও, আমি একবার দেখে আসি।'

মুক্ত মনে অনুমতি দিলেন শচীমাতা।

আমার বৃন্দাবন কতদূর? কোথায় সেই নিধুবন? সেই রাসমণ্ডল? কবে আমি বনস্থলীতে গড়াগড়ি দেব? কবে স্নান করব যমুনায়?

মাকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিলেন প্রভু। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার কী দশা?

'বিষ্ণুপ্রিয়া নববালা হাতে লয়ে জপমালা
রুই রুই জপে গৌরনাম।
নবীনা যোগিনী ধনী বিরহিণী কাঙ্গালিনী
প্রণময়ে নীলাচলধাম॥
সর্ব অঙ্গে মাখা ধুলা লম্বাকেশ এলোচুলা
সোনার অঙ্গ অতি দুরবল।
বলরাম দাস কয়, শুন প্রভু দয়াময়
মুছায়ে দাও দেবী-আঁখিজল॥'

অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে সর্বাগ্রে তুলসীসেবা করে ভজনমন্দিরে ঢোকে। সখীরা তুলসী আর পুষ্প-চয়ন করে রেখেছে। সাজিয়ে দিয়েছে পূজোপকরণ। কটরাভরা সুবাসিত চন্দন, নবীন তুলসীপত্র আর মঞ্জরী, মল্লিকা মালতী কুন্দ প্রভৃতি শ্বেতপুষ্প। একখানি সামান্য আসনে বসেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। সামনে শ্রীপটমূর্তির পাদপীঠে প্রাণবল্লভের খড়ম। প্রেমানন্দে অনুরাগ ভজন করছে। এ গৌরশূন্য গৌরগৃহই আমার গম্ভীরা-মন্দির।

'অন্তঃপুরে ঠাকুরাণী প্রাতঃস্নান করি
শালগ্রামে সমর্পিয়া তুলসীমঞ্জরী
মন্দিরে বসিয়া করেন হরেকৃষ্ণ নাম।
আতপ তণ্ডুল কিছু রাখেন নিজস্থান॥
ষোল নাম পূর্ণ হইলে একটি তণ্ডুল
রাখেন সরাতে অতি হইয়া ব্যাকুল॥
এইরূপে তৃতীয় প্রহর নাম লয়।
তাহাতে তণ্ডুল সব সরাতে দেখয়॥
তাহা পাক করি শালগ্রামে সমর্পিয়া
ভোজন করেন কত নির্বেদ করিয়া॥
সেবক লাগিয়া কিছু রাখেন পাত্রশেষ
ভক্ত আইসে সবে পাইয়া আদেশ॥'

এদিকে প্রভু নীলাচলে ফিরে এলেন। গৌড়ীয় ভক্তদের বলে দিলেন, 'আগামী রথযাত্রায় আপনারা কেউ আর পুরী যাবেন না। আমি বৃন্দাবন যাব।'

নীলাচলে এসেই প্রভু জগন্নাথ দর্শন করলেন। প্রভু ফিরে এসেছেন, চারদিকে আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল। ছুটে এল কাশী মিশ্র, রামানন্দ আর সার্বভৌম। ছুটে এল প্রদ্যুম্ন, গদাধর আর বাণীনাথ। এ কী প্রভু? ফিরে এলেন কেন?

'জননী আর জাহ্নবীকে দেখে বৃন্দাবনে যাব এই মনে করে গিয়েছিলাম গৌড়ে,' বললেন প্রভু, 'পথে লক্ষ-লক্ষ লোক জুটল। লোক সঙ্ঘট্টে পথ চলতে পারি না। যেখানে থাকি সে ঘরের দেয়াল ভেঙে পড়ে ভিড়ের চাপে। সনাতন বললে, যার সঙ্গে এই বিশাল জনসমুদ্র সে তীর্থে যায় কী করে? কথা শোনো, একা-

একা যাও। কিংবা বড়জোর একজন সঙ্গে নাও। বেশি লোক দেখলে সকলে ঢঙ বলবে। তাই দলবল রেখে ফিরে এসেছি চুপিচুপি। এবার নিঃসঙ্গে যাব বৃন্দাবন।'

গদাধরকে দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'গদাধরের মনে কষ্ট দিয়েছি তাই এবার বৃন্দাবন ব্যর্থ হল।'

'কী যে বলো। তার ঠিক নেই।' গদাধর বললে কুণ্ঠিত হয়ে, 'যেখানে তুমি সেখানেই বৃন্দাবন। সেখানেই গঙ্গা যমুনা সেখানেই সমুদয় তীর্থ। শুধু লোকশিক্ষার জন্যেই চলেছ তীর্থে। নইলে তোমার আর কিসের প্রয়োজন?'

'তুমি যাহাঁ যাহাঁ রহ—তাহাঁ বৃন্দাবন।
তাহাঁ যমুনা গঙ্গা সর্বতীর্থগণ ॥
তভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিখাইতে।
সেই ত করিবে তোমার যেই লয় চিতে ॥'

গৌড় নয় ঝাড়খণ্ডের বনপথ দিয়ে যাবেন ঠিক হল। বললেন একাকী যাব। রামানন্দ আর স্বরূপ দামোদর বাধা দিল। না, না, একজনকে অন্তত সঙ্গে নাও, অন্তত একজন আচরণীয় ব্রাহ্মণ। বেশ তবে বলভদ্র ভট্টাচার্য চলুক। আর বলভদ্র গেলে তার ভৃত্য ব্রাহ্মণও বিচ্ছিন্ন হয় কী করো? পথিমধ্যে সে ভিক্ষাকৃত্য করতে পারবে।

গভীর রাত্রে প্রভু গোপনে পুরী ত্যাগ করলেন।

ভক্তদল যথারীতি ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে লাগল প্রভুকে। স্বরূপ শান্ত ও নিরস্ত করল সবাইকে। প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে দাও। একক অটনই প্রভুর মনোবাঞ্ছা।

প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে প্রভু উপপথে চললেন। রাজপথ ছেড়ে গ্রাম্যপথে। কটক ডাইনে রেখে ঢুকলেন ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে। শ্বাপদসঙ্কুল লোকালয়হীন দুর্গম অরণ্যে। কী অস্ত্র তাঁর সম্বল? এক মাত্র সম্বল কৃষ্ণনাম।

'নির্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণ নাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন ॥'

নামের শক্তিতেই জাগে। প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দ জাগলে হিংসা বিদ্বেষ দূরে যায়। গোবিন্দ নামে দূরে যায় কুপ্রবৃত্তি। যার মনে হিংসার লেশ নেই তাকে কে হিংসা করবে? নরোত্তম বলছেন, 'শুনিয়া গোবিন্দরব। আপনি পালাবে সব, সিংহ রবে যথা করিগণ।' কৃষ্ণ নাম সিংহরবের চেয়েও প্রচণ্ড।

তা ছাড়া প্রভু স্বতন্ত্র ভগবান। সপ্ত বিশ্বের একক নিয়ন্তা। হিংস্র জন্তুরও নিয়ন্তা তিনিই। হিংস্রকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করবেন এ আর বেশি কথা কী।

বাঘ শুয়ে আছে, দেখেননি গৌরহরি। প্রেমাবেশে নাম করতে করতে চলেছেন, বাঘের গায়ে পা ঠেকে গেল। বলে উঠলেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

কী হল? চরণ স্পর্শে বাঘের প্রারব্ধ কর্মফল ধ্বংস হল, চলে গেল তার জিহ্বার অসামর্থ্য আর তার জীবাত্মা স্বরূপে অবস্থিত থেকে বলে উঠল কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

মত্ত হস্তি যূথেও জাগল কৃষ্ণ স্ফূর্তি। মৃগীরাও কণ্ঠ মেলাল। বাঘের সঙ্গে তারাও চলল প্রভুর আশে পাশে। যেখানে ক্রোধ লোভ নেই, হিংসা দ্বেষ নেই, সেখানে অনন্ত প্রেম যেখানে অখণ্ড মৈত্রী সেখানে স্বভাববৈরিতাও অসম্ভব। শুধু ব্যাঘ্র মৃগ ময়ূরই নাচছে না। বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত পুলক পুষ্পান্বিত হয়ে উঠেছে।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ' করি প্রভু যবে বৈল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল ॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বোল, নাচে মত্ত হঞা ॥
'হরি বোল' বলি প্রভু করে উচ্চ ধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি।"

যে গ্রাম দিয়ে যান, যেখানে থামেন, সেখানকার লোকমাত্রই প্রেমভক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয়। একবার কৃষ্ণ নাম শুনে অন্য-কথা কানে নিতে চায় না। শুধু দর্শনে শ্রবণেই সর্বদেশ বৈষ্ণব হয়ে যাচ্ছে। আদিবাসী পাহাড়ীরাও ভাসল নামপ্রেমে। লোক সঙ্ঘটের ভয়ে যদিও প্রভু প্রেম গোপন করে রাখতে চান, তবুও আপনা হতেই যেন তা দিক দিগন্তরে বিস্তৃত হয়।

বলভদ্র ভট্টাচার্য তো কাণ্ড দেখে হতবাক। তবু কী আনন্দ প্রভুর সেবা করতে। তাঁর জন্যে অন্ন দুধ সংগ্রহ করতে, রেঁধে দিতে বন্য ব্যঞ্জন। বন্য ভোজনে প্রভুর মহানন্দ। শীতের আভাস জেগেছে, নির্ঝরের উষ্ণ জলে স্নান ও সকালে সন্ধ্যায় কাঠ জ্বেলে আগুন পোহানো—এর মত সুখ আর কোথায়!

'ভট্টাচার্য, বহু দেশ আমি ঘুরেছি।' বললেন প্রভু,

'কিন্তু বনপথের মত সুখ আর কোথাও পাইনি। কৃপালু কৃষ্ণ আমাকে কী অপরিসীম কৃপা করলেন, নিয়ে এলেন বনপথে। কৃষ্ণ কৃপা ছাড়া সুখের লব-লেশ নেই। আর কে না বলবে তোমার প্রসাদেই আমার এত সুখ।'

কৃপার সমুদ্র—দীন হীনে দয়াময়।
কৃষ্ণ কৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়॥

'আমার আবার মূল্য কী!' বললে বলভদ্র, 'আমি কাক, তুমি আমাকে গরুড় বানালে।'

'বন দেখি হয় ভ্রম—এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয়—এই গোবর্ধন॥
যাহাঁ নদী দেখে তাহাঁ মানয়ে কালিন্দী।
তাহাঁ প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি॥'

সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে পৌঁছুলেন কাশী।

মণিকর্ণিকায় মধ্যাহ্ন স্নান করলেন। দেখলেন ঘাটে তপন মিত্র। তপন ঠিক কথা রেখেছে, প্রভুর আদেশে কাশীবাসী হয়েছে। প্রভুও কথা রেখেছেন, দেখা দিয়েছেন।

উল্লাসে তপন রোদন করতে লাগল। নাচতে লাগল প্রেমবিভোর হয়ে।

বিশ্বেশ্বর আর বিন্দুমাধব দর্শন করিয়ে প্রভুকে নিয়ে এল স্বগৃহে। খবর পেয়ে চন্দ্রশেখর এসে হাজির। বললে, 'প্রারব্ধদোষে কাশীতে পড়ে আছি। শুনছি কেবল মায়া-ব্রহ্ম। শুধু ষড়দর্শনের ব্যাখ্যা। প্রভু, কৃপা করে তুমি নিজের থেকেই দর্শন দিয়েছ দুর্ভাগ্যকে। কৃষ্ণ কথা শুনিয়ে তৃষিত হৃদয় শীতল করো।'

কাশীতে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্যের চর্চা চলেছে, মায়াধীন জীবকে মায়াধীশ ব্রহ্ম বলে স্থাপন করছে। ভক্তের পক্ষে এ ব্যাখ্যা মর্মদাহকর অপরাধজনক। যে শাস্ত্রের সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ নন, অভিধেয়তত্ত্ব ভক্তি নয়, প্রয়োজনতত্ত্ব প্রেম নয় সেই শাস্ত্রের আলোচনায় ভক্তের সুখ কী।'

'তুমি সর্বজ্ঞ বলেই আমাদের চিন্তাও বেদনার কথা বুঝেছ,' বললে চন্দ্রশেখর, 'তুমি এসেছ অনাহুত।'

এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হল। প্রভুর রূপ আর প্রেম দেখে চমৎকার মানল। গেল প্রকাশানন্দকে খবর দিতে।

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ শিষ্যদের বেদান্ত পড়াচ্ছেন, বিপ্র এসে বললে, 'শুদ্ধ কাঞ্চনবর্ণ এক সন্ন্যাসী দেখে এলাম। আজানুলম্বিত বাহু, কমলনেত্র, সর্ব অঙ্গে ঈশ্বরের সৎলক্ষণ। তাঁর মহিমা বর্ণনা করতে পারি এমন সাধ্য নেই। সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না ইনিই নারায়ণ। এমন অদ্ভুত, যে তাঁকে দেখে সেই কৃষ্ণকীর্তন সুরু করে।'

প্রকাশানন্দ নীরবে হাসল।

তাঁর জগৎমঙ্গল কৃষ্ণচৈতন্য নাম। বলতে লাগল বিপ্র। মহাভাগবতের সমস্ত চিহ্ন তাঁতে প্রস্ফুট।

মহাভাগবত কে?

যার চিত্ত বাসুদেবে আবিষ্ট, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর জন্যে যে লালায়িত নয়, যাতে কামকর্মবাসনা অনুপস্থিত, সংসারধর্মে যে অমুগ্ধ, যে সর্বভূতে সমদর্শী, যে শান্ত, নির্বিচল, নিমিষার্ধের জন্যেও যে ভগবান থেকে স্খলিত নয়, যার হৃদয়ে ভগবানের সর্বক্ষণের বিশ্রাম, সেই মহাভাগবত

'নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রুবহে গঙ্গাধার প্রায়॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জন॥'

প্রকাশানন্দ বললে, 'হাঁ, শুনেছি, গৌড় দেশে এক ভাবপ্রবণ সন্ন্যাসী জন্মেছে। কিন্তু আসলে সে প্রতারক। চৈতন্য নাম নিয়ে দেশে দেশে লোক নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'কেশবভারতীর শিষ্য বলে শুনেছি।'

'হবে। কিন্তু তার আসল বিদ্যা মোহনবিদ্যা।' প্রকাশানন্দ নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল: 'তারই প্রভাবে যে তাকে দেখে সেই মুগ্ধ হয়, তাকে ঈশ্বর বলে বিবেচনা করে।'

'বলেন কী। অদ্বৈত বেদান্তে মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য পর্যন্ত বশীভূত হয়েছেন। মায়াবাদ ছেড়ে ভক্তিপথ ধরেছেন।'

'সার্বভৌম পাগল হয়েছে বলে তোমার চৈতন্য মহৎ হয় না।' শাসন করে উঠল প্রকাশানন্দ: 'কাশীপুরে তার ভাবকালী বিকোবে না। শোনো, ঐ মায়াবীর কাছে যেও না আর, এখানে বসে বেদান্ত শোনো।'

বিপ্র সেখানে আর বসতে পারল না। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে উঠে পড়ল। মনে মনে আশ্বস্ত হল প্রকাশানন্দও তো চৈতন্য-চৈতন্য বলেছে।

প্রভু বললেন, 'আমার ভাবকালীর গ্রাহক যখন নেই তখন আর কী করে বিকোব? তাহলে তো ভারী বোঝা নিয়ে আমাকে দেশেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু

অল্পমূল্যও কি পাব না কারু কাছে? যদি অল্পমূল্যও পাই তা হলে সবটাই ঢেলে দি নিঃশেষ করে।'

কী সে অল্পমূল্য?

একটি প্রণতি, একটু স্বীকৃতি, একটু অভিমুখিতা।

তখন চন্দ্রশেখর আর মহারাষ্ট্রী বিপ্র—তিনজনকে কাঁদিয়ে প্রভু চলে গেলেন প্রয়াগে। ত্রিবেণীতে স্নান করলেন, দেখলেন বেণীমাধবকে। যমুনা দেখে পড়লেন ঝাঁপ দিয়ে। বলভদ্র তুলল জল থেকে।

তিনদিন থেকে চললেন মথুরায়। লোক নিস্তারণ কৃষ্ণনামপ্রেম বিতরণ করলেন পথে-পথে।

অগ্রবন বা আগ্রায় এলেন। উঠলেন জমদগ্নির আশ্রমে, পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত শিবদর্শন করলেন। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে প্রবেশ করলেন ব্রজমণ্ডলে। গোকুলে বৃক্ষতলে রাত কাটিয়ে যমুনা উত্তীর্ণ হয়ে এলেন মথুরায়।

প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়লেন ভূতলে।

বিশ্রামঘাট বা বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান করলেন। কংসবধ করে এই ঘাটেই বিশ্রাম করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। অদূরেই কংস-কারাগার, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। দেখলেন প্রেমার্দ্র দৃষ্টিতে। দেখলেন কেশববিগ্রহ।

মথুরাবাসী এক ব্রাহ্মণ এসে প্রভুর কীর্তনে যোগ দিলেন। প্রভুকে মালা পরিয়ে দিয়ে বললে, এ রূপ এ প্রেম কখনো লৌকিক নয়। নইলে যে দেখে সেই প্রেমে মত্ত হয় কেন? অবলীলায় নেয় কেন কৃষ্ণনাম? পলকে যেন হাসতে কাঁদতে শেখে? আমাকেই বা কেন নাচায়?

প্রভু বললেন, 'তুমি বৃদ্ধ সরল ব্রাহ্মণ, তুমি এই প্রেমধন কোথায় পেলে?'

'মাধবেন্দ্র পুরী মথুরায় এসেছিলেন, আমাকে নিয়েছিলেন শিষ্য করে। তাঁর থেকেই এ প্রেমোদয়।'

'বলো কী, তুমি মাধবেন্দ্রের শিষ্য? তা হলে তো তুমি আমার গুরু।'

'অমন কথা বোলো না। তবে যদিও আমরা 'সনোড়িয়া' ব্রাহ্মণ, অন্য ব্রাহ্মণের অনাচরণীয়, মাধবেন্দ্র প্রচলিত প্রথা না মেনে আমার ঘরে এসে ভিক্ষে নিয়েছিলেন। এমন কৃপায় প্রেম জাগবে না তো কী।'

'মাধবেন্দ্র যদি তোমার হাতে খেয়েছেন,' বললেন প্রভু, 'আমাকেও তবে পাক করে খাওয়াও স্বহস্তে।'

'না, তা সঙ্গত হবে না।' ব্রাহ্মণ কাতরমুখে বললে, 'পাঁচজন তোমাকে নিন্দা করবে। দুষ্টের বচন সইতে পারব না।'

'বৈষ্ণবের আবার জাতি বিচার কী।' সহাস্যমুখে বললেন প্রভু, 'আর সাধু পুরুষদের আচরণই ধর্মস্থাপনের হেতু। শাস্ত্রে যখন নানা বিতর্ক তখন সাধুই পথ-প্রদর্শক। মাধবেন্দ্র যখন খেয়েছেন তখন আমিও খাব।'

ব্রাহ্মণ আর আপত্তি করল না, প্রভুকে ভিক্ষা করাল।

যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করলেন প্রভু, দেখলেন যাবতীয় তীর্থস্থান, গোকর্ণ থেকে দীর্ঘবিষ্ণু। বন দেখতে মন হল। গেলেন মধুবনে তালবনে বহুলাবনে। একপাল ধেনু এসে ঘিরে ধরল প্রভুকে, প্রভুর অঙ্গ সস্নেহে লেহন করতে লাগল। প্রভুও ওদের গাত্র কণ্ডূয়ন করে দিলেন। গোপালকরা নিয়ে যেতে চাইলেও ইচ্ছুক নয় গাভীদল। আর যদি বা তারা গেল, প্রভুর শব্দ শুনে ছুটে এল মৃগ-মৃগী, ময়ূর-ময়ূরী। পিক ভৃঙ্গও গান ধরল পঞ্চমে। বৃক্ষলতারাও মধু অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। ফুলে ফলে নুয়ে পড়তে লাগল শাখাপ্রশাখা। কোত্থেকে ছুটো শুকসারীও এসে জুটেছে। শুক মুখে করছে কৃষ্ণগুণশ্লোক। সারিও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সে-ও শুরু করেছে রাধিকাবর্ণনা।

প্রেমাবেশে মূছিত হয়ে পড়লেন প্রভু। কৃষ্ণনাম উচ্চে বলে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনল ভট্টাচার্য। সম্বিৎ ফিরে পেয়েও প্রভু ব্রজধূলির সংস্পর্শ ছাড়েন না মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। সর্বদেহ কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। নীলাচলে যে প্রেমাবেশ ছিল। বৃন্দাবনের পথে তা শতগুণ বাড়ল আর মথুরা-দর্শনে বাড়ল সহস্রগুণ। আর বৃন্দাবনে সে পরিমাণ লক্ষগুণ। কোটিগ্রন্থেও সে প্রেমবিকারের সম্যক বর্ণনা হয় না।

'রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

রাধার সঙ্গে থাকলেই কৃষ্ণ মদনমোহন। একা থাকলে বিশ্বমোহন হয়েও কৃষ্ণ মদনমোহিত। সুতরাং রাধার প্রভাবেই মদন পরাভূত।

কৃষ্ণ হয়ে বলছেন কোথায় রাধা? রাধা হয়ে বলেছেন কোথায় কৃষ্ণ?

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—রামপ্রসাদ সেন

যজুর্বেদ

৩।৩৫

হে দেব সবিতঃ, বৈভবে তব বিস্ময় মানে প্রাণ !
আলোক ঘোষণে জাগালে চেতনা,—গাহি তব জয় গান।

৩।৫৭

রুদ্র তোমার যজ্ঞ-আহুতি সকল হব্যরাশি,
তব সহোদরা অম্বিকা সাথে গ্রহণ করিও আসি।

৩।৬০

চয়ন করিয়া গন্ধ-কুসুম সাজায়ে অর্ঘ্য-থালা,
ত্র্যম্বকে পূজি, পতি-বর মাগি আমরা অনূঢ়াবালা।

৬।১৭

প্রবাহে তোমার ধৌত করুক ঘন কলঙ্করাশি,
সঞ্চিত যত কালিমা-কলুষ, কল্লোলে যাক ভাসি।
সে বারি পরশে দূরে যাক পাপ, পুণ্য লভুক প্রাণ,
পবন প্রবল, নাশিয়া বাঁধন মুক্তি করুক দান।

৮।১৩

দূর কর পাপ দেবতাবিরোধী—হে মহামুক্তিদাতা !
দূর কর পাপ মানববিরোধী—হে মহামুক্তিদাতা !
দূর কর পাপ পিতৃবিরোধী—হে মহামুক্তিদাতা !
দূর কর পাপ আত্মবিরোধী—হে মহামুক্তিদাতা !
সর্ব কলুষ উদ্ধারকারী—হে মহামুক্তিদাতা !
জ্ঞাত, অজ্ঞাত পাপে কর ত্রাণ,—হে মহামুক্তিদাতা !

৮।৫২

আলোকে লভিনু অমৃতজীবন, উঠিনু অমর-লোকে
হেরিনু স্বর্গে সকল দেবতা, আলোক হেরিনু চোখে।

১১।৫৬

শুন শুন সবে অমর-পুত্র শুন জ্যোতি-লোকবাসী,
প্রকাশে কাহার নাশিল আঁধার উদিল আলোকরাশি।
পরিমেয় কার বিপুলা ধরণী, অসীম আকাশপথ।
সকল দেবতা ভ্রমিছে ঘেরিয়া কাহার আলোকরথ।
উজ্জ্বল সে যে আপনারি তেজে, জ্যোতিদান লভিবার,—
নন্দিত ধরা গাহিছে ছন্দে বন্দনা সবিতার।

১৩।৩৮

শুদ্ধ করিয়া চিত্ত মোদের পুণ্য করিয়া প্রাণ,—
শুভ্র, ধারায় ঘৃতাহুতি স্রোত নদী সম ধাবমান।

১৭।৩৭

দক্ষ তুমি যে নিজ শক্তিতে, সংগ্রামে সুস্থির,
[illegible]জয় হইতে জনম লভিলে, ত্রিলোক বিজয়ী বীর।
জিনিলে মানব, জিনিলে দানব তোমার প্রয়াণ পথে,
কামধেনু জয়ী,—উঠ হে ইন্দ্র তব রণজয়ী রথে !

১৮।৪৮

জাগ্রত কর দীপ্ত জ্যোতির সুতীব্র পরশনে,—
বেদ-বিস্মৃত, যজ্ঞবিরত, বিমোহিত ব্রাহ্মণে !
বীর্যবিহিত ক্ষত্রিয় যত জাগুক রুদ্ররাগে,
সে আলোকপাতে বণিকের সাথে শূদ্রও যেন জাগে।
হে জ্যোতি দেবতা ! ঘিরেছে আমারে প্রকটি বিকট দন্ত,—
বিকৃত যতেক অসুর, দানব, পিশাচ, অঘোরপন্থ !
নিলাজ-দম্ভে তর্জিছে সবে, অর্জিয়া ক্ষণ-জয়,
তব প্রচণ্ড বহ্নি ত্রিশূলে হউক ভস্মময়।

১৯। ৭

তুমি সে আলোক,—দাও হে আমারে দিব্য আলোক দান !
তুমি মহাবল,—কর হে আমারে বাহুবলে বলীয়ান্ !
তুমি সে শক্তি,—শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত কর মোরে !
তুমি উত্তম,—উৎসাহে তব চিত্ত উঠুক ভ'রে !
তুমি সে কামনা,—অন্তবিহীন কামনা জাগাও চিতে !
তুমি সে বিজয় —সর্ব-বিজয় লভি যেন ধরণীতে !

২০। ১৫, ১৬, ১৭

দিবসে নিশীথে ঘটে যদি পাপ, হে বায়ু তোমারে স্মরি,—
অতি দৃঢ় এই পাপবন্ধন দিও হে মোচন করি।
ঘুমে, জাগরণে ঘটে যদি পাপ ত্রুটি যদি কভু হয়,
সূর্য তোমারে করি যে স্মরণ, দূর কর পাপভয়।
কলুষ-করমে রত যদি হই, জনপদে, বনতলে ;—
সাধি অপকার একাকী অথবা মিলিয়া সদলবলে ;—
শূদ্র অথবা আর্যের প্রতি করি যদি পাপাচার,
মার্জনা তব মুক্ত করুক সে মহাপাপের ভার।

২২।২২

সদ্ব্রাহ্মণ লভুক জনম স্থাপিতে ধর্মরাজ্য,
লভুক জনম ক্ষত্রিয় শূর সাধিতে যুদ্ধকার্য।
বলিষ্ঠ যত বৃষভ বহুক বস্তু সে বহমান,
সবৎসা গাভী পুণ্যরাজ্যে দুগ্ধ করুক দান।
স্বস্তির বাণী দেশে দেশে ভণি-শ্রদ্ধক দৌত্যকারী,
সেবা, মমতায়, রূপে, সুষমায় কল্যাণী হোক নারী।

৩২।

তুমি সে অগ্নি, তুমি সে সূর্য, তুমি সে অমল ইন্দু,
তুমি সে ব্রহ্মা, প্রজাপতি বায়ু, তুমি সে অতল সিন্ধু !

৩২।৬

মহা অম্বরে কে দিল ছড়ায়ে সূর্য, চন্দ্র, তারা।
আকাশে আকাশে বহিছে কাহার অমিত আলোকধারা।
বাতাসে বাতাসে বাণী কার ভাসে,—ধরণী পুলকময়,—
মন্ত্র ছন্দে উদ্গীথ গাহে বিভাসি তোমারি জয়।

৪০।১

নর নারী পশু পতঙ্গ কীট উরগ উদ্ভিজ প্রাণী,
যাহা কিছু আছে বিশ্ব নিখিলে' সকলি তাঁহাতে জানি।

স্বর্ণশিল্পীর মৃত্যু
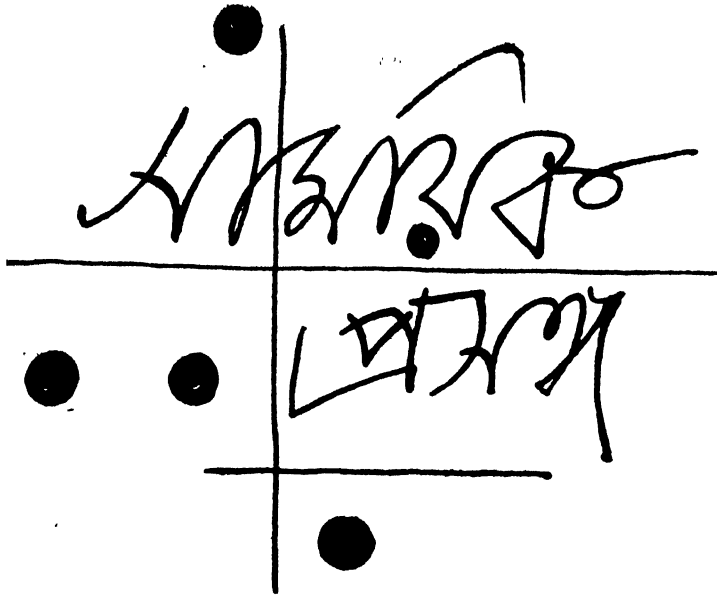
"কিন্তু কী অন্যায় বলুন তো ?—আর দুই ঘণ্টা বা দুইটা দিন দেরী করিয়া মরিলে পরেশচন্দ্রের কি পুণ্যধাম স্বর্গলোকে পৌঁছিতে কিছু অসুবিধা হইত ? অযথা আমাদের সরকারী ব্যবস্থাটাকে সে একটা বিদ্রূপের মধ্যে ফেলিয়া গেল কেন ? এটাও একটা কমিউনিষ্ট চক্রান্ত নয় তো ? '—' কিম্বা ঘরের শত্রু বিভীষণদের কারসাজি ? দেশ যখন প্রতিরক্ষায় ঘোরতর ব্যস্ত, তখন এই লোকটি নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেই না করিয়া উপবাসী রহিল এবং এভাবে হঠাৎ মরিয়া গিয়া সমাজের 'morale' নষ্ট করিয়া দিল ! সুতরাং ইহা একপ্রকারের নষ্টামি—বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে, যেখানে বিভীষণ বাহিনী তৎপর এবং সেই তৎপরতা দমনের জন্য হাল আমলে আমাদের ছোট বড় মাঝারি কত মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া এবং সভায় সভায় সোনাদানা কুড়াইয়া দিব্যি হাসিমুখে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন ? আর তারপরেই কিনা ওই হতভাগা স্বর্ণকার না খাইতে পাইয়া মরিয়া গেল ? শুনিতেছি বাকী যারা এখনও বাঁচিয়া আছে, এমন ৩০ জনের পুত্রকন্যাদিগকে চার কিলো, আর দুই কিলো করিয়া গম দেওয়া হইবে। সত্যই 'সম্রাট মহানুভব !'—কিলের বদলে কিলো দিতেছেন ! কিন্তু স্বর্ণশিল্পী পরেশচন্দ্র, যিনি উপবাসে মারা গেলেন, তিনি কি 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেটের' কথা জানিতেন না ?—যদি জানিতেন, তবে, খালি পেটে ডুগডুগি বাজাইয়া এবং দু'খানি শীর্ণবাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া বলিতে পারিতেন, "হে ওয়েলফেয়ার ষ্টেট, তোমাকে 'ফেয়ার-ওয়েল' (বিদায়) জানাই—আমার চিতার আগুনে তোমার স্বর্ণ সৌভাগ্য উজ্জ্বল হউক।" —দৈনিক বসুমতী।

একটি অভিযোগ

'নাইন আওয়ার্স টু রাম'—গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত ব্রিটিশ চলচ্চিত্রটিকে ভারতে প্রদর্শিত হইবার অনুমতি প্রদান করা উচিত হইবে না ; ভারত সরকার উক্ত চলচ্চিত্র সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। চিত্রটিতে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের রূপ ভুলভাবে প্রতিচ্ছবিত করা হইয়াছে ; এবং উহাতে কলাগত কোন সুষ্ঠুতাও ফুটিয়া উঠে নাই। ছবিটার সমগ্র বক্তব্য ভুল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। গান্ধীজীর প্রতি দেশবাসীর মনের বিপুল শ্রদ্ধার ভাবটিকে যথোচিত রূপ প্রদান করিতে এই ছবি ব্যর্থ হইয়াছে। বিদেশের যে পরিচালক এবং যে প্রতিষ্ঠান এই চিত্র নির্মাণ করিয়াছেন, তাঁদের অভিরুচির অথবা উদ্দেশ্যের সহিত কলহ করিবার স্পৃহা ভারতবাসীর নাই। ভারতের জনসাধারণ শুধু ভারত সরকারকেই প্রশ্ন করিবে, এহেন ছবিকে ভারতে তুলিতে দিতে সুযোগ প্রদান করা হইল কেন ? সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ কি চিত্রনাট্য পূর্বে অনুধাবন ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন ? ছবির বিষয় এবং বক্তব্য সম্পর্কে নিঃসংশয় না হইবার পূর্বে এই ছবিকে ভারতে তুলিতে দিয়া স্বয়ং ভারত সরকারই প্রথম গর্হিত ভুল করিয়াছেন। যদি কেহ এই অভিযোগ করেন যে, গান্ধীজীর প্রতি এই অশ্রদ্ধার চিত্র নির্মাণে ভারত সরকারও অসতর্কতার কারণে সহযোগিতা করিয়াছেন, তবে তাহা কি খুবই ভুল অভিযোগ হইবে ?" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

ভাষার দাপাদাপি

"কিন্তু ঘটনাটি শুধু আচরণবিধির অন্তর্ভুক্ত নয়। গোটা ভারতের স্থিতি ও শান্তির দিক হইতেও ইহা রীতিমতো উদ্বেগজনক। রাতারাতি ইংরেজী তাড়ানো ও হিন্দী পত্তনের জন্য মরীয়া কিছু সংখ্যক মানুষ যখন হইতে জানিয়াছেন যে, পার্লামেন্টের এই অধিবেশনেই সহযোগী সরকারী ভাষারূপে ১৯৬৫ সালের পরও ইংরেজী বহাল রাখার অনুকূলে একটি বিল আনীত হইবে, তখন হইতেই তাঁহাদের মাথা বিগড়াইয়াছে। তাঁহারা নূতন উদ্যমে ইংরেজী হঠাও আন্দোলন জুড়িয়াছেন এবং এই আন্দোলন এতদিন বাহিরে চলিতেছিল, এবার সংসদের ভিতরেও ঢুকিয়াছে। লজ্জা ও দুঃখের কথা যে আঁচ স্বয়ং রাষ্ট্রপতির গায়ে লাগিয়াছে। কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কথা যে, চীনা যুদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া গোটা ভারত যে লৌহ দৃঢ় ঐক্য দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তা এই উগ্র হিন্দী প্রেমের ধাক্কায় ধ্বংস হইতে চলিয়াছে ? বলা বাহুল্য, হিন্দী ভাষার প্রতি আমাদের কোন বিরূপতা বা বৈরিতা নাই। ধীরে ধীরে কোনদিন স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দী সর্ব ভারতীয় সরকারী ভাষারূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলে, দায়িত্বশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহাকে স্বাগত করিয়া নিবেন। কিন্তু বারো আনা ভারতবর্ষের বক্তব্য না শুনিয়া গায়ের জোরে আজই হিন্দী চালাইতে গেলে, অহিন্দী ভাষীরা মহা বিপাকে পড়িবেন। তা ছাড়া বাস্তব অসুবিধাও দেখা দিবে অনেক রকম। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগ সূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে, আন্তর্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুনিয়া হইতেও আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব। কাজেই দেশের ঐক্য ও সংহতি এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির জন্যই এখনো সুদীর্ঘকাল ইংরেজী রাখা দরকার। কিন্তু দেখিতেছি, এই মাথা গরম মানুষগুলি সমস্ত শুভ সম্ভাবনীয়তা নষ্ট করিবেন, গণতন্ত্র রসাতলে দিবেন এবং দেশকে চরম বিভ্রাটের মধ্যে ঠেলিয়া দিবেন। কাজেই আমরা চাই উগ্র হিন্দীবাদীদের দাপাদাপি যেন এখানেই শেষ হয়।" —যুগান্তর।

রেলের সমস্যা

"আর একটি ছিদ্রপথ হইল রেল হইতে তামার তার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, উপাধানের ছাউনি প্রভৃতি চুরি এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অযথা নষ্ট করিবার প্রবৃত্তি। ইহা রোধের শ্রেষ্ঠ উপায় জনগণের সহযোগিতা। যাত্রিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ব্যবস্থাও ক্রমেই উন্নত হইতেছে, তবে যাত্রী ভিড় কমাইবার জন্য যে অতিরিক্ত গাড়ীর প্রয়োজন তাহা কিছু বাড়িলেও যে অনুপাতে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার সহিত তাল রাখিতে না পারায় ভিড়জনিত কষ্টের লাঘব তো হয় নাই-ই, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এ-সব ত্রুটি সত্ত্বেও একথা স্বীকার পাইতেই হইবে যে রেলপথের বর্তমান অবস্থা জাতীয় ক্ষমতার নিরিখে বেশ সন্তোষজনক এবং যে ভাবে উহার প্রসার ঘটিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দূর হইয়া আদর্শ রেলপথে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে, আমরা সুচিন্তিত এই বাজেটের জন্য রেলমন্ত্রীকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।"

—জনসেবক।

যুদ্ধবন্দী

"চীনারা যে কয়জন বন্দী প্রত্যর্পণ করিয়াছে, আটক রাখিয়াছে তাহার সাড়ে চার গুণ। শান্তি প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা থাকিলে তাহারা সকলকেই ছাড়িয়া দিত। পূর্বোত্তর ভারতে তাহারা বস্তুগত দাক্ষিণ্য দেখাইয়াছে, অর্থাৎ, যাহা পারিয়াছে কাঁধে করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে এবং বাকী অধিকাংশ মাল কাজের অনুপযুক্ত অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে। তাহারা লুঠ করিয়াছে প্রায় কোটি টাকার সম্পদ, পেটে পুরিয়াছে শত শত চমরীগাই, ভেড়া, ছাগল, মুর্গী। সে সব প্রত্যর্পণের প্রশ্নই উঠিতেছে না। বন্দীদের দ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যবস্থা নূতন নয়। হিটলার ঐ পদ্ধতিতে কথঞ্চিৎ সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। কমিউনিষ্টদের কাছে উহা রণনীতি ও রাষ্ট্রনীতির বিশেষ অঙ্গ। মানুষকে আটক রাখিয়া মগজ ধৌতকরণের পন্থায় তাঁবেদার দৃষ্টিতে কমিউনিষ্ট পেশনযন্ত্রের অদ্ভুত দক্ষতা। উহার কায়দা-কানুন অমানুষিক। দিনের পর দিন ঘুমাইতে না দেওয়া, সুখাদ্য সামনে রাখিয়া অখাদ্য, এমন কি, মূত্রাদি গ্রহণে বাধ্য করা ইত্যাদির সঙ্গে চলে দৈহিক পীড়ন ও তিরস্কার। মাঝে মাঝে অনুসৃত হয় প্রলোভনের কায়দা। নিগ্রহ ক্লান্ত লোককে এইভাবে স্বীকারোক্তিদানে উদ্বুদ্ধ করিয়া স্তালিন শেষ পর্যন্ত পাইকারী হারে গর্দান লইতেন। যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা সহজ নয়। তাই তাহাদিগকে কাজের সাজে সাজাইবার চেষ্টা সুরু হয় প্রথমাবধি। অবর্ণনীয় অত্যাচারে মানসিক শক্তি হারাইবার পর অনেকে আত্মসমর্পণ করে এবং ক্রমে তোতাপাখীর মত সব কিছুই আওড়ায়।"

—লোকসেবক।

শক্তির আধার পাঞ্জাব ও বাঙলা

"বাঙালী ও পাঞ্জাবীদের হাতের অস্ত্রে বৃটিশ সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্জাবের মতই বাঙলা দেশ বিভক্ত হইয়াছে। তবুও আজ বাঙলা দেশ স্বাধীনতা রক্ষার ধর্মযুদ্ধে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বর্বর চীনাদের আক্রমণে ইহা আজ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে প্রত্যেক রাজ্যকে শক্তিশালী করিতে হইবে। ইংরাজ কোনদিন বাঙলা দেশকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই—বার বার বাঙলা দেশকে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করিতে চাহিয়াছে এবং বাঙালী পল্টন বা রেজিমেণ্ট পর্যন্ত গঠন করে নাই। স্বাধীনতা লাভের পর বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠনের কথা উঠিয়াছে এবং বর্তমান পরিস্থিতির ভিতরে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব তুলিয়াছেন। এই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে সময়োচিত হইয়াছে। বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠিত হইলে বীর বাঙালী আবার তাহাদের বীরত্বের ট্রেডিশন লাইনে উঠিয়া দাঁড়াইবে। বীর ভারতের দুই বাহু পাঞ্জাব আর বাঙলা। বাঙলা ও পাঞ্জাবের তরুণদের উপযুক্ত শক্তিশালী করিতে পারিলে এই শক্তি বিশ্বজয় করিতে পারিবে। বীর্য্য ও বীরত্ব ব্যতীত কোন জাতি কোনদিন বাঁচিতে পারে নাই, বাঙলা ও পাঞ্জাবের বীর্য্য ও বীরত্বের আঘাতেই ভারতবর্ষের পরাধীনতার জগদ্দল পাথর বৃটিশ শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কাজেই বাঙলা ও বাঙালী জাতিকে বীরত্বে শক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের মত প্রত্যেক পরিবারের একজন করিয়া সুস্থ সবল তরুণ-তরুণীকে সৈন্যবাহিনীতে প্রেরণ করিতে হইবে। পঞ্চ নদীর তীরে যে ত্যাগের আহ্বান বাজিয়া উঠিয়াছে, ভাগীরথীর তীরে সেই আহ্বানের সাড়া উঠিয়াছে। বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব বাঙালীর বীরত্বের প্রতিধ্বনি, ইহা নিঃসংকোচে বলা যায়।"

—বারাসাত বার্তা।

নয়া জমিদার

"সহযোগী 'ময়ূরাক্ষী' একটা সংবাদ পরিবেশন করেছেন। সংক্ষেপে সংবাদটা হচ্ছে: বীরভূম জেলার কোনো এক বি-ডি-ও তাঁর এলাকার তাবৎ অঞ্চল প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছেন, খাজনা আদায়ের জন্য তহশীলদার যখন গ্রামে যাবেন তখন অঞ্চল-প্রধান তার সমগ্র চৌকিদার বাহিনী নিয়ে যেন তহশীলদারের কাছে উপস্থিত থাকেন। সহযোগীর মতে সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ। আসলে ঐ সংবাদদাতা ধারণাটা ঠিকমত ধরতে পারেননি। তহশীলদার কারা? অধিকাংশ তহশীলদার হচ্ছেন দরপত্তনী, সে-পত্তনীর ক্ষুদে জমিদার। সেই জমিদার আজ তহশীলদার। তাই তালপুকুরে ঘটি না ডুবলেও নাম ত আছে? সুতরাং বি-ডি-ও সমীপে দরবার করে জমিদারত্বের লুপ্ত মর্য্যাদা (!) এইভাবে পুনর্দখল করার একটা সহজ ফন্দি মাত্র!" —বর্দ্ধমান বাণী।

সিমেণ্ট সংকট

"মাসের পর মাস ধরিয়া সিলেট জেলায় সিমেণ্টের অভাবে ঘরবাড়ী তৈয়ার দূরের কথা অত্যাবশ্যকীয় মেরামতের কাজ করানোও সম্ভব হইতেছে না। ফলে একদিকে যেমন জনসাধারণ নিজেদের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কাজে রূপায়ণ করিতে পারিতেছেন না, অন্যদিকে মিস্ত্রী শ্রেণীর বহু লোক বেকার হইয়া পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষরা দয়া করিয়া যে কিছু কিছু সিমেণ্টের ব্যবস্থা করেন তাহা ভাগ্যবান জোগাড়ীরাই যোগাড় করিতে সক্ষম হন। সিলেট শহরের পাঁচটি দোকানে মাসে প্রায় সাত শত টন সিমেণ্ট বিক্রয়ের জন্য বরাদ্দ আছে। যদিও ইহা প্রয়োজন মিটানোর পক্ষে নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত তথাপি এই পরিমাণ সিমেণ্ট যদি প্রত্যেক মাসে পাওয়া যাইত তাহা হইলে জনসাধারণের দুর্দশার কিয়দংশ লাঘব হইতে পারিত। কিন্তু এই পাঁচ দোকানের বরাদ্দ কমাইয়া ৭৫ টন করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে অবস্থার অনেক অবনতি ঘটিয়াছে।"

—যুগশক্তি (শ্রীহট্ট)

তদন্ত হয় না কেন ?

"২৪ পরগণা জেলার রেডক্রশের গুঁড়ো দুধ চুরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে বজবজের কংগ্রেসী নেতা অরবিন্দ দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। অরবিন্দ দাস নাকি রাজসাক্ষী হবেন বলে পুলিশকে জানান এবং গুঁড়ো দুধ চুরির ব্যাপারে আসল হোতা যারা তাদের ধরিয়ে দেবেন বলেন। সমস্ত ঠিকঠাক, কিন্তু হঠাৎ রহস্যজনকভাবে অরবিন্দ দাসের মৃত্যু হল। জানা গেল তিনি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা তাঁর আত্মহত্যার ঘটনাটির সত্যতা একবারও যাচাই হল না। তাঁর মৃতদেহের ময়না তদন্তও হল না। একজন রাজসাক্ষীর এইভাবে রহস্যজনক মৃত্যুর পিছনে যে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না, তা আমরা কি করে বিশ্বাস করব এবং পুলিশ যে এই ব্যাপারে কোন অন্যায় করেনি সে বিষয়ে জনসাধারণের মনে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে সেটি কি অন্যায় হবে? তারপর থেকে ২৪ পরগণা রেডক্রশের দুধ চুরির ফাইল চাপা পড়ে গেল কেন? দেখা গেল এই কেসটি যিনি দেখাশুনো করছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সেই এ. আই. জি. শ্রীদেবব্রত ধরের প্রমোশনও হয়ে গেল। অথচ এত বড় কেলেংকারির অভিযোগ সম্পর্কে পুলিশ চার্জসীটও দাখিল করল না এবং মহামান্য আদালতে অপরাধীদের অভিযুক্তও করা হল না।" —জনতা (কলিকাতা)

মৃত্যুর পরোয়ানা

"বাংলাদেশে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া হিন্দী প্রবেশ করাইবার অপূর্ব্ব কৌশল পূর্ব্বাঞ্চল কাউন্সিল অবলম্বন করিয়াছেন। বহু বিলম্বে হইলেও সেন গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছিলেন যে, বাংলা দেশে সরকারী চাকুরি করিতে হইলে অবশ্যই বাংলা ভাষা জানিতে হইবে। পূর্ব্বাঞ্চল কাউন্সিল বলিয়া দিয়াছেন—তার প্রয়োজন নাই, নিজের মাতৃভাষা এবং ইংরেজি ও হিন্দী জানিলেই বাংলার রাইটার্স বিলডিং-এ এবং জেলা অফিসগুলিতে যে কেহ নিযুক্ত হইতে পারিবে। সেই সঙ্গে স্কুলের সব কয়টি উপরের শ্রেণীতে হিন্দী বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়া দেখানো হইবে যে বাংলা দেশের প্রতিটি লোক হিন্দী জানে, সুতরাং রাইটার্স বিলডিং হিন্দীওয়ালায় ভর্ত্তি হইলেও বাঙালীর কোন অসুবিধা হইবে না। এই সিদ্ধান্ত অতুল্য ঘোষের সম্মতিক্রমে হইয়াছে এবং প্রফুল্ল সেন তাঁর পূর্ব্ব আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইবেন এই সন্দেহের অতিশয় সঙ্গত কারণ আছে। একটা গোটা জাতি সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক মৃত্যুর পরোয়ানা নিঃশব্দে মানিয়া নেয় এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর দেখা যায় নাই।" —যুগবাণী (কলিকাতা)

চীনা পঞ্চমবাহিনী

"এখন কম্যুনিষ্টরা দেশের সর্ব্বত্র পঞ্চমবাহিনীসুলভ প্রচারকার্য্য পূর্ণোদ্যমে সুরু করিয়াছে। আসাম ও পশ্চিম বাংলায় ইহাদের জাল সুবিস্তৃত হইয়াছে। সামরিক ও বেসামরিক গোপন তথ্য জানার জন্যই যে তাহাদের জাল বিস্তৃত তাহা নয়, জনসাধারণের মধ্যে সুকৌশলে প্রচারকার্য্য চালাইয়া মনোবল শিথিল করা এবং তাহাদের মধ্যে সন্দেহের বীজ ছড়ানো ও সরকারের প্রতি অনাস্থার ভাব সৃষ্টি করা। ইহার জন্য তাহারা অবিরাম প্রচার চালাইতেছে। তাহারা পার্ব্বত্য এলাকার উপজাতীয় ও গুর্খাদের মনে ভারত বিদ্বেষ ছড়াইতেছে এবং বলিয়া বেড়াইতেছে, সমতলভূমির লোকেরা নিজেদের দূরে রাখিয়া পার্ব্বত্য মানুষগুলিকে চীনা কামানের খোরাকরূপে ব্যবহার করিতেছে। এই সব প্রচারের ফলে আসাম ও বাংলার কোন কোন স্থানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে উভয় রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। উভয় রাজ্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে নাকি চিঠি লিখিয়াছেন, যদি সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী করার অসুবিধা থাকে, তবে অন্ততঃ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গকে রাজ্য ভিত্তিতে উহা করার সুযোগ দেওয়া হউক। দেশের ক্ষতিসাধনকারী বিদেশী শক্তির দালালদের বিরুদ্ধে অন্তহীন দুর্ব্বলতা সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতে পারে। কম্যুনিষ্ট দলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন কোন কম্যুনিষ্ট দেশের বিরূপতা অর্জ্জন করিবে, ইহা মনে করা ভুল! পৃথিবীর বহু দেশে কম্যুনিষ্ট দল বেআইনী, এজন্য রাশিয়া তাহাদের নিশ্চয়ই রক্তচক্ষু দেখাইতেছে না। ভারত আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে ঐরূপ পথ অবলম্বন করিলে তাহাতে আপত্তি উঠিবে কেন, আর ভারতই বা তাহা শুনিবে কেন?"

—হিন্দুবাণী (বাঁকুড়া)।

জরুরী অবস্থা ও ত্রিপুরা

"ত্রিপুরায় দ্রব্য মূল্য এমনিতেই বেশী এবং পরিবহন সমস্যার দরুণই যে উহা বেশী তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইহার সঙ্গে অবশ্যই কিছু সংখ্যক মুনাফা শিকারী ব্যবসায়ীও যুক্ত। তারা মওকো—বুঝিয়া দাঁও মারার ফিকিরে থাকে এবং একটা কোন অজুহাতে অনেক সময়ই দ্রব্য মূল্য বাড়াইয়া দিয়া নিজেদের উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে। তাই দেখা যায়—প্রায়শঃই বাজারে কোন কোন দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে—কিন্তু বেশী মূল্য দিলেই যে কোন পরিমাণ দ্রব্য আবার পাওয়াও যায়। উহা সত্য—কিন্তু তথাপি ইহা বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করার কারণ নাই যে, প্রায় চারিদিকে ভিন্ন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এই রাজ্যে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা—পরিবহন সমস্যা এবং এর জন্যই ত্রিপুরার দ্রব্যমূল্য অন্যান্য রাজ্য হইতে অনেক বেশী। ইহা ছাড়া পরিবহনের অনিশ্চয়তাকে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা যে একটা অজুহাতরূপে ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। আবার মুনাফাবাজরা যে যৎসামান্য সংব্যবসায়ী আছেন—তাঁহাদিগকেও কোণঠাসা করিয়া রাখিতে পারে—পরিবহন সমস্যার সুযোগ নিয়া। এই সকল কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ত্রিপুরার পরিবহন সমস্যার সমাধান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সক্রিয় করা। এতদ্‌ব্যাপারে একমাত্র সমাধান হইল—ত্রিপুরায় রেলপথের প্রসার করা এবং তাহা অবিলম্বে। ত্রিপুরার জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ ত্রিপুরায় রেলপথ প্রসারের দাবী জানাইয়া আসিতেছে। এবং সেই দাবী যে ন্যায়সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন্দ্রীয় সরকার উহার কতক স্বীকারও করিয়া নিয়াছেন এবং ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত রেলপথ প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াছেনও। কিন্তু ঐটুকু করিলেই চলিবে না—ধর্ম্মনগর-আগরতলা-সাব্রুম রেললাইন প্রসার করা একান্ত আবশ্যক এবং তাহা অবিলম্বে। ইহাই ত্রিপুরাবাসীর বাঁচার পথ এবং উহাই ত্রিপুরাবাসীর একান্ত দাবী।"

—গণরাজ (ত্রিপুরা

সরোদ শিল্পী আলী আকবর

পান্নালাল দত্ত

॥ এক ॥
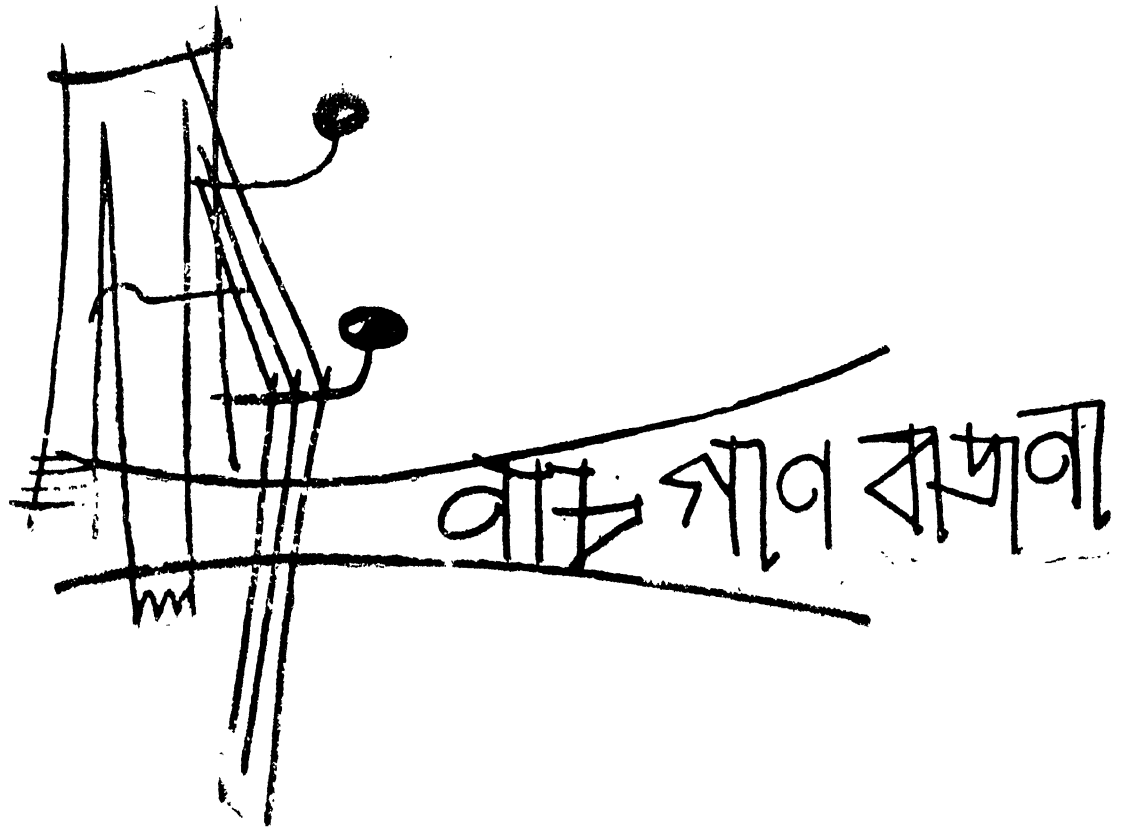
হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-জগতে একই সময়ে 'তিনপুরুষে'র যন্ত্রবাদন একটি অধ্যায় রচনা করিয়াছে। এখানে তিনপুরুষ বলিতে সুর-সম্রাট খান সাহেব আলাউদ্দিন খান পদ্মভূষণ, তদীয়পুত্র সরোদবাদক আলী আকবর খান এবং পৌত্র আশিস খানকে বুঝাইতেছে। সম্প্রতি গত ৭ই অক্টোবর, ১৯৬২ সালে মাইহারে [illegible] আলাউদ্দিন খানের জন্মশতবার্ষিকী মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপালের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে উদ্‌যাপিত হয়। সঙ্গীতনায়কের জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রাখিয়া তিনদিবসব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য।

ভারতে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন শিল্পীর মধ্যে সঙ্গীতের ঐতিহ্যগত এবং নৈষ্ঠিক রূপটির আভাস পাই, তাঁহাদের মধ্যে ওস্তাদ আলী আকবর খানের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য না হইলেও তাঁহার বাজনা মেজাজ ও আভিজাত্যে এক বিশিষ্ট আসনের দাবী রাখে। বর্ত্তমানে কিছু কিছু খ্যাতিমান শিল্পীর মতো তিনি নিজেকে কোনও কঠিন গণ্ডী বা ঘরানার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চান না। একলা চলার ডাকে ইনি বিশ্বাসী নন; —'বহুজন-সুখায় বহুজন-হিতায়' বাক্যে তিনি বিশ্বাসী। এই একই কারণে আমরা দেখিতে পাই, তিনি প্রাচীন 'গুরুকুল-পদ্ধতি'তেই নিজের পরিচয় সীমাবদ্ধ রাখেন, আধুনিক রীতি-পদ্ধতিতেও তিনি সমান দক্ষ। আসরে বসিয়া শিল্পীর মুখাবয়ব-বিকৃতির তিনি বিরোধী, তাঁহার মতে মুদ্রাদোষ রাগ-প্রকৃতির বিস্তারে স্বাভাবিকতা নষ্ট করে।

উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ বা যন্ত্রসঙ্গীত সে যাহাই হউক, পরিবেশনার একটি সূত্র আছে: সরল স্বাভাবিক স্বরে বাণীর স্পষ্ট উচ্চারণ এবং তার সঙ্গে অবিকৃত স্বর প্রয়োগ। উপরোক্ত সূত্র আলী আকবর অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাঁহার পূত জীবন-জাহ্নবীর ত্রিধারার অনুধ্যান করিতে পারি মাত্র।

....ছেলেটি খুব নাছোড়বান্দা হইয়া বলিতে লাগিল, 'দেখুন, আমি দশ বৎসর সেতার শিক্ষা করিতেছি, বহু রাগ-রাগিণীর রূপ-প্রকৃতি আমার জানা আছে, এখন আপনি আমাকে নাড়া বাঁধিয়া শিষ্য করিয়া লউন।' ওস্তাদের ভাবলেশহীন মুখ নীরব হইল। তারপর মুখ খুলিলেন, যেন অন্য কোন স্বতন্ত্র জগত হইতে এই মাত্র ধাতব জগতে নামিলেন। বলিলেন—'তোমাকে আমি কি শিক্ষা দিতে পারিব, নাড়া বাঁধিলেই তো ল্যাঠা চুকে না। আর তোমাকে

আমি কিছু গ্রহণযোগ্য দিতে পারিব কি-না।' এই সরল স্বীকার-উক্তির মধ্যে সরোদ বাদক আলী আকবর খানের সৃষ্টিশীল বিবেকের প্রকৃত পরিচয় মিলে। কলিকাতাস্থ রাসবিহারী এভিন্যুতে শিল্পীর ড্রইং রুমের একান্তে বসিয়া আমি উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম প্রবাদসিদ্ধ পুরুষের প্রবাদসিদ্ধ সন্তান, এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টি একীভূত, আত্মোপলব্ধির মহিমময় আলোকে সিঞ্চিত। এখানেই তো প্রকৃত শিল্পের আত্মা! সে যতই বাহিরের আয়োজিত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হউক না কেন, তাঁহার শিল্পের আত্মার মৃত্যু নাই। প্রকৃত শিল্পের আত্মা অমর। মৃদুভাষী সলজ্জ এই শিল্পীর মুখে অসহিষ্ণুতার বা ক্রোধের দ্যোতক কোন কথা কদাচ বাহির হইয়া থাকে। দৃষ্টি তাঁহার নিয়তই অন্তর্মুখী।

শিল্পকলার অন্যান্য শাখার ন্যায় সঙ্গীতকলার উপরও আজ বন্ধ্যাত্বের অভিযোগ আছে। এই ধারণা অমূলক নয়। বৈচিত্র্যহীন প্রচলিত একটা একঘেয়েমীর কাছে যেন শিল্পীদলের আত্মোৎসর্গ। ভারতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারক বয়সে নবীন সুরশিল্পী আলী আকবর খান প্রচলিত নিয়মের বিরোধী। ইংরাজীতে যাহাকে "Power of visualisation" বলে, তাহা তাঁহার মধ্যে আছে। রূপ-কল্পনার একটি শক্তি। সেই শক্তিতে আগে হইতে দেখিয়া লওয়া। রূপ-কল্পনার শক্তির সহিত প্রয়োগ-কৌশলের এরূপ অনবদ্য সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না।

বিংশশতাব্দীর মধ্যপাদ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে সৃষ্টির নব নব উন্মেষালোকে। স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে আলী আকবর খানের সঙ্গীতের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করি নাই—আর দশজনের মতো আমি একজন আলী আকবর ভক্ত, সেই হিসাবে একজন নিপুণ কারিগরের ভূমিকাটুকুই পরিবেশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। কষ্টসাধ্য পরিশ্রম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সুনাম তাঁর জীবন জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে পারে নাই। ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতকে মুসলমান বাদশাহদের নূপুর নিক্কণ হইতে উদ্ধার করিয়া তার মধ্যে ভাবগাম্ভীর্য্য আরোপের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় রহিয়াছে। সঙ্গীতকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার শিল্পজীবন ও কর্ম্মজীবনের মধ্যে রহিয়াছে বিরাট সাজুয্য। জাতির মনোবল রক্ষার অনেকাংশে দায়িত্ব সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পীদের; দেশের প্রবুদ্ধ আত্মা আজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে কে তার আপন, কে তার কপট বন্ধু। যন্ত্র মানুষের নির্লজ্জ শাঠ্যের আঘাত ও সাম্রাজ্য-লোলুপতা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে। সঙ্গীতকার আলী আকবর খানের বৈশিষ্ট্য তাঁর নানা শিল্প স্বভাবের মধ্যে রহিয়াছে। বাঙলার যে সব শিল্পী কালজয়ী প্রতিভার সিঞ্চনে ভারতের মানসক্ষেত্রকে সিঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আলী আকবর খানের নাম ঔদার্য্যের সঙ্গে স্মরণীয়। বাঙলা মায়ের চিন্ময়ীরূপ যাঁর মানসনেত্রে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত, সংগীতের হাটবাজারে নূতনত্বের স্বাদ আনয়নে তিনি স্মর্তব্য।

একটু আধটু শিক্ষার তিনি পক্ষপাতী নন, তাঁর জবানীতেই বলি—'যন্ত্র যদি কথাই না বলে, তবে কি হইল? সুরের গভীরে যদি প্রবেশ না-ই করা গেল তো কিসের আত্মতৃপ্তি?' তাঁহার প্রশান্তি দেখিয়াছিলাম একবার ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের একটি সারারাত্রব্যাপী অধিবেশনে। দ্বৈতযন্ত্রবাদনের দুই দিক্‌পাল—আলী আকবর ও পণ্ডিত রবি শঙ্কর। সরোদ ও সেতার। তাঁরা 'পাহাড়ী ঝিঁঝিট' রাগ ধরিলেন। রাগের বিভিন্ন পর্য্যায় যেমন আলাপ, বিস্তার, ঝালা ও গৎতোড়ায় তাঁরা শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখেন, সরোদের তারে টোকা দিতেই জমিয়া উঠিল কী লবজদার তান! অনির্ব্বচনীয় সুরের আবেশে হলবাসীর যেন চরম কাম্যে উত্তরণ! ওতে তাঁরা থামিলেন না, এর পর আরম্ভ করিলেন 'আহির ভৈরব।' রাগ প্রকৃতির দিক হইতে এটি আগেরটির চেয়ে ভিন্ন। রাগের বিভিন্ন পর্য্যায় রূপায়নের পর সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে এঁরা থামিলেন। আদিম রাগ ভৈরবী যেন একই বৃন্তে কোঁটা দুই ফুলের নৈবেদ্যে, প্রাণবন্ত। এর পর বহুবার তাঁহার যন্ত্রবাদন শুনিবার সৌভাগ্য হয় আমার। বিভিন্ন আসরের সমীক্ষা দিয়া পাঠকের সময় নষ্ট করিতে চাই না। তাঁহার বিলম্বিত লয়ে আলাপের সময় সুমিষ্ট মীড়ের সূক্ষ্ম প্রয়োগ আমাকে সেইদিন হইতে আকৃষ্ট করিয়া রাখে। 'বিলাবল ঠাটের রাগ', 'ভৈরবী,' 'দরবারী,' ও মালকোষ রাগের রূপায়নে তাঁর নিজস্ব শিল্পী-মানসের পরিচয় মেলে। এই যোগাযোগগুলি আমার মানসপটের এক অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে কোন দিনই বিদায় নেবেনা। তাঁহার হাতের আঙুলের কোমল স্পর্শে সরোদের তারগুলো গতি পাইয়া নিজেরাই যেন সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া চলে।

দরদীশিল্পী আলী আকবর খানের জীবনীর সূত্র সন্ধান তাঁর সাধনার পরিচয় বহন করে। তাঁহার পিতাকে তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজের কাছে প্রথমে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিতে হয়। পরে অবশ্য তিনি সমুচিত জবাব ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন। ধনাঢ্য পরিবেশে জন্ম না হইলেও প্রাচুর্য্যের অপ্রতুলতা ছিল না আলী আকবরের।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল আলী আকবর খান জন্মগ্রহণ করেন পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় শিবপুর গ্রামে। জ্যেষ্ঠতাত ফকির আপ্তাবুদ্দীন ও পিতা আলাউদ্দিন খাঁর নিকট তাঁহার পাঠ, এ ছাড়া তাঁহার অন্য কোন গুরু নাই। [illegible] তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন সুরের সুরধ্বনির মাঝে। ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া গুরুর খোঁজে তাঁহাকে যাইতে হয় নাই। ভারত গৌরব আলাউদ্দীনের মুখে শুনিয়াছি,—'গুরু-নিন্দা করিতে নাই, তবুও বলিতেছি, গুরুর দুয়ারে দুয়ারে সুরভিক্ষার ঝুলি কাঁধে দরজার বাইরে দিনের পর দিন কাটাইয়াছি। গুরু ফিরিয়াও তাকান নাই, শেষে এক ভরি আফিম সংগ্রহ করিলাম,—আজকে হয় গুরুর কৃপা লাভ করিব, নতুবা এ জীবন শেষ করিব। সেই দিনই ভগবান আমাকে কৃপা করিলেন, গুরু স্বীকার পাইলেন।' তিন বছরের শিশুকে পিতা বিছানায় শুয়াইয়া পাশে নিজে বসিয়া বাজনা শুনাইতেন। খেলনার পরিবর্ত্তে বাজনা। তবে ন'বছর বয়ঃক্রম না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রমসাধ্য অনুশীলন তাঁহাকে করিতে হয় নাই। এরপর দিনে আঠার ঘণ্টা রেওয়াজ করিতে হইয়াছে। পিতা সঙ্গীতগুরু আলাউদ্দিন খান প্রথমে তাঁহাকে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও তারানা শিক্ষা দিয়া শিশুপুত্রের সঙ্গীতের ভিত্তিভূমি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। সেই একই সময়ে চলিতে থাকে আপ্তাবুদ্দীন খানের নিকট তাঁহার তবলা ও পাখোয়াজ শিক্ষাক্রম। বালকের কণ্ঠ ও যন্ত্রশিক্ষা একটা পর্য্যায়ে উন্নীত না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা তাঁহাকে কোন প্রকাশ্য সঙ্গীত-সভায় বসিতে দেন না। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ইনি সর্ব্বপ্রথম

এলাহাবাদ সংগীত-সম্মেলনে সরোদ বাজনা পরিবেশন করেন ১৯৩৬ সালে। পিতার কড়া শিক্ষাব্যবস্থা, শাসন ও তার সঙ্গে কিছু সঙ্গীত-নিষ্ঠা তাঁহাকে ভারত-বিখ্যাত করিয়াছে।

আমার পরলোকগত পিতৃদেব দ্বারকানাথ দত্ত মাঝে মাঝে আলী আকবরের ছোটবেলার দুঃখকান্নার দিনগুলি আমাদের সামনে বলিতেন। একবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে বার-লাইব্রেরীর তরফ হইতে ঘরোয়াভাবে একটি সুরসভার অনুষ্ঠান হয়। পিতার সাথে বারো বৎসরের বালকপুত্রও জুড়ীদার হইয়া আসরে আসে। আলাউদ্দীন খান বলিয়া উঠিলেন—'আমার যন্ত্র আজ কথা কইবে।' কিন্তু হায়, বিস্তারের পর সুরের গভীরে প্রবেশ করার আগেই খান সাহেব বাজনা বন্ধ করিলেন। পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া তিনি অশ্রাব্য ভাষায় যা মুখে আসে তাই বলিতে লাগিলেন। ওতে তিনি থামিলেন না, পুত্রকে তিনি বেদম প্রহার করিলেন, সামান্য একটু মাত্রা ভুলের জন্য। সে যাত্রায় আমার পিতা আলী আকবরকে রান্না ঘরে লুকাইয়া তবে রক্ষা করেন। পিতা আলাউদ্দীন খান পুত্রের একবৎসর বয়সের সময় ১৯২৩ সালের কোনও এক সময়ে স্থায়িভাবে বসবাসের উদ্দেশে পরিবারসহ মাইহারে গিয়া থাকিলেন। 'এর বেশ কিছু বৎসর আগেই হারমোনিয়াম বাদক ৺শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সদিচ্ছা ও সুপারিশে মাইহার রাজদরবারে আলাউদ্দীন খানের চাকুরী হইয়া যায় এবং তার সঙ্গে কিছু আবাদযোগ্য ভূমিও লাভ করেন রাজানুকূল্য হিসাবে। মাইহারে তাঁহাদের পঞ্চান্ন বৎসরের বাস। ১৯৫৩ সালে জুলাই মাসে আমি যখন মাইহারে যাই তখন এ-ও-তা নানা কথোপকথনে বুঝিলাম পাকাপাকি ভাবে বাসের ইচ্ছা তাঁহার প্রথমে ছিল না। তিনি বলিলেন, 'দেশে মাকে হারাইয়াছি—এখানে আবার মাকে ফিরিয়া পাইয়াছি!' অর্থাৎ মাইহারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শারদাই তাঁহার মা এখন, পাঁচশত সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া তবে দেবী দর্শন মেলে। শারদাদেবীর টানেই এখানে পড়িয়া আছেন তিনি। তিনি আমাকে তাঁহার আবাসস্থল 'শান্তি কুটীর' হইতে ৩।৪ মিনিটের পথ অতিক্রম করিয়া একটী সুরক্ষিত ভূখণ্ড দেখাইলেন, এই ভূখণ্ডটি পুত্রী অন্নপূর্ণা ও জামাতা রবিশঙ্করের জন্য রাখিয়াছেন।

চৌদ্দ বৎসর বয়সের পর পিতার সহিত চলিল বালকপুত্র আলী আকবরের ভারতময় সঙ্গীত পরিক্রমা। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই আরও কত কি রাজধানী ঘুরিলেন তিনি; পিতা যেখানে আমন্ত্রণ পান, পুত্রকেও লইয়া যান সেখানে। এই সময় হইতে বিভিন্ন সঙ্গীত আসরে বাজাইয়া খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেন আলী আকবর। আলমোড়ায় 'উদয়শঙ্কর সংস্কৃতি' কেন্দ্রে যোগদানের মধ্য দিয়া তাঁহার সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমায় তাঁর প্রতিভা বিকাশের সর্ব্বপ্রথম অভাবনীয় সুযোগ আসে। তারপর কিছুকাল লক্ষ্ণৌ বেতার কেন্দ্রে লঘু ও উচ্চাঙ্গকণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সঙ্গীত পরিচালক হিসাবেও রত ছিলেন। এখানে তাঁহার সৃজনশীল প্রতিভার দান সুস্পষ্ট। আকাশবাণীতে তিনিই শাস্ত্রানুগ ঐকতান বাদনের প্রথম পথিকৃৎ।

যোধপুর-রাজের সঙ্গীতপ্রিয়তা ও রাজানুকূল্য, তার সঙ্গে কিছু উপযুক্ত পারিশ্রমিক কিছুদিন আলী আকবর খাঁকে যোধপুর রাজ-দরবারে বাঁধিয়া রাখে। রাজপুত শৌর্য্য, বীর্য্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যকলার অদ্ভুত নিদর্শন এই যোধপুর শহরটি তৈরী করা হয় ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে। ইহা রাজস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। ইহার ঐতিহাসিক দুর্গটি শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রতীকরূপে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো দাঁড়াইয়া শহরটিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যুবা বয়সের প্রারম্ভে এই নগরীর বর্ণাঢ্যরূপের আকর্ষণ তিনি এড়াইতে পারেন নাই। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে যোধপুর মহারাজের এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। তারপর স্ব-ইচ্ছায় তাঁহার পদত্যাগ। পদত্যাগের যথেষ্ট কারণ সম্পর্কে তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলে ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট না পাওয়ার দরুণ আমরা এ বিষয়ে অধিক লিখিব না। তবে একথা বলিতে ভুলিলেন না যে, যোধপুর রাজের পুরা ইচ্ছাই ছিল যোধপুরকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিবার এবং রাজদরবারে একজন সঙ্গীতকার হিসাবে তাঁহাকে রাজপুতদের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'শিরোপা'-ভূষিত করা হয় সরদার-উৎসবে।

সঙ্গীতপ্রিয় নরনারীর কাছে রাগরাগিণীর রহস্যালোকের আকর্ষণ নিতান্ত কম নয়। সঙ্গীত শুধু বাহিরের লোককে শোনাবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে না, সঙ্গীত একান্ত গোপনীয় ও নিষ্ঠার বস্তু। বাহবা নেওয়া কোন সৎসঙ্গীতের বাহকের প্রধান কাজ হইতেও পারে না। উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাহোবাতির বাড়াবাড়ি অনেক সময় সঙ্গীতের মনোময় রূপটির সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। যেমন ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ—যার এককালে খ্যাতি ছিল, এখন তাহা জনপ্রিয়তা হারাইতেছে। মেটিয়াবুরুজে ওয়াজেদ আলী শা'র দরবারে তাঁরই সাহায্যপুষ্ট সভাগায়ক আলী বক্স সাহেবের কাছে গোয়ালিয়র ঘরানার ধ্রুপদ ও খেয়াল শুনে অনেকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁরই ছাত্র
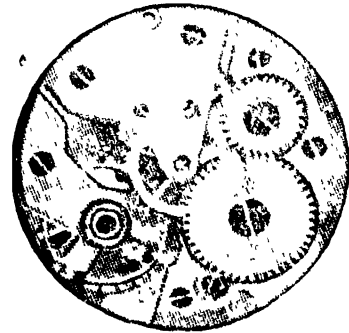
খেয়াল গায়ক ৺বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একাকালে মীড় ও গমকের বিশিষ্টতায় খেয়ালগানকে এক নূতনতর রূপ দেন। সংসঙ্গীত তাই চঞ্চলতার কারক না হইয়া চপলতার অপহারক হইয়াছিল। স্বরূপানন্দ বৈদিক যুগের ধর্মীয় রূপটির ধারক সঙ্গীত প্রসঙ্গে বলেন: 'সঙ্গীত কখনও যেন বাহবা পাইবার জন্ত ব্যবহৃত না হয়, জাপক যেমন তাঁর জপমালাকে অতি প্রযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে অথবা সাধ্বী স্ত্রী যেরূপ তাঁর স্বামীর দেওয়া গহনাকে সাবধানে বাক্সবন্ধ করিয়া রাখে, সেরূপ প্রকৃত শিল্পীরা কখনও তাদের বিদ্যার ঢাক বাজায় না।' শিল্পী আলি আকবর খাঁয়ের সাধনা প্রচার বিমুখী।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিছক মানসিক আমোদবস্তু বা লীলার বস্তু নয়। সঙ্গীত আধ্যাত্মসাধনার ধারক ও বাহক। দেহ ও আত্মাকে সমধর্মী করিয়া তোলাই যার প্রধান কাজ। শাস্ত্রে আছে, গানের চেয়ে বড় কিছু নাই। সুর সহযোগে শব্দের লীলায়িতরূপই গান। মনের একটা বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ হইতে চায় শব্দের কম্পনে—স্বরের মাধ্যমে যার উৎসার। যুগে যুগে ভারতীয় সঙ্গীত এই বিশেষ ধারার ঐতিহ্যটি বহন করিয়া আসিতেছে। দেহের মূলাধারে নাভিপদ্মে যার উৎপত্তি, হৃদয়ের হৃদপিদ্মে যার অভিনন্দন—সেই নৈবেদ্য লইয়া পরম পুরুষের কাছে মানুষ চিরকালই মাথা কুঁটিয়া মরে সদুত্তরের অপেক্ষায়। সংগীতের ব্যবহারিক ও উপপত্তিক দিক সম্বন্ধে আমি একেবারেই অজ্ঞ, সেই বিষয়ে কিছু বলার অধিকার আমার নাই, কেবল তার মনোময়তার অনুধ্যান করিতে পারি মাত্র।

সরোদ-শিল্পীর জীবন-কথা আলোচনা করিতে যাইয়া ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত প্রসঙ্গে কিছু নিবেদন করিলে তাহা পাঠকদের কাছে অপ্রয়োজনীয় নাও ঠেকিতে পারে। বৈদিক যুগ হইতেই সঙ্গীতের একটা ধারাবাহিক এবং ইতিহাসগত রূপ পাওয়া যায়। প্রাগার্যযুগেও সংগীত বিদ্যমান ছিল, এমন ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় দ্রাবিড় সভ্যতার নিদর্শন মহেঞ্জোদরো ও হরাপ্পার ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ হইতে। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে ভূমি দুন্দুভি, ধনুক যন্ত্র এইগুলির ধ্বংসাবশেষ পাঁচ হাজার বছর আগেকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা শিকারে যাইয়া গহনবনে পথ হারাইয়া গেলে ভূমি দুন্দুভি বাজাইয়া বিপদসূচক সঙ্কেত দিত। তারপর সৃষ্টি হইল ধনুকে তাঁত পরাইয়া একপ্রকার যন্ত্র। সামবেদে আমরা দেখিতে পাই বৈদিক ঋষিরা উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ যজ্ঞভূমির চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে নৃত্য করিত। এই স্তোত্রগুলিই আজিকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদিমতমরূপ। ছন্দোবদ্ধ স্তোত্র হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। 'সংগীত'—এই পরিভাষাটি কিন্তু ভারতের চারিবেদে ও নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে কোথাও পাওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত আরও পরে খৃষ্টীয় শতকে নারদ তাঁর সঙ্গীত-মকরন্দতে সঙ্গীতের সুন্দর ব্যাখ্যা দেন।—'গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।' নৃত্য-গীত-বাদ্য তিনে মিলিয়া সঙ্গীতের সৃষ্টি। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—যন্ত্রসংগীত আগে না কণ্ঠসংগীত আগে আসে? দুইটিই সমান প্রাচীন। বীরবস হইতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উদ্ভূত, ইহার প্রমাণ ভারতের নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়। মুনিপ্রবর ভরতের নাটকে যন্ত্রসঙ্গীত বিশেষ স্থান পায়।

সামবেদের সঙ্গীত প্রথমে একস্বর দুইস্বর করিয়া পরিবর্তনের ধারাপথ বাহিয়া গান্ধর্ব্ব সঙ্গীতযুগে আসিয়া সাতস্বরে সুসংবদ্ধ হইল। "সাত স্বর, একুশ মূর্চ্ছনা, তিন গ্রাম, উনপঞ্চাশ তান" এই চতুষ্টয়ের সমন্বয়ে একটি বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সঙ্গীত তার উচ্চমার্গে তাঁর চরম কৌশলটিকে আয়ত্ত করিয়াছিল। Vedic Hymn-ই হইল ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মূল উৎস বিশ্ব-সঙ্গীতের মূল উৎস বটে।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এখন দুইটি ধারায় প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। একটির সঙ্গে অপরটির মতবিরোধিতা এখন প্রকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু একথা এখন ভুলিলে চলিবে না যে, হিন্দুস্থানী ও 'কর্ণাটক' সঙ্গীত রীতি—দুইটিরই মূল উৎস সেই সামবেদের স্তোত্র। কর্ণাটক পদ্ধতি ধর্মীয় এবং নৈতিক রীতিনীতির বাহকরূপে পরিচিত আর অপর দিকে হিন্দুস্থানী পদ্ধতি পারসীয় সুরের (Persian Melody) সঙ্গে ভাব বিনিময় করিয়া অন্যতর রূপ ধারণ করে। এই দুইটি রীতি পদ্ধতিতে রূপগত ঐক্য না থাকিলেও ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান। খৃষ্টীয় চতুর্দশকে আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উপরোক্ত দুই ধারায় বিভক্ত হয়। সেই সময়ে পারসীয় কবি-গায়ক আমীর খসরু ছিল সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রবল প্রতিভা। সেতার যন্ত্রের উদ্ভাবকও তিনি।

সন্ধ্যারবি প্রশ্ন করিয়াছিল—'কে লইবে মোর কার্য্য?' কেহ সদুত্তর দিতে পারি নাই। অবশেষে মাটির প্রদীপ সহজ অথচ সুদৃঢ় জবাব দিয়াছিল, 'আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।' 'কণিকায়' এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে একটা কঠিন মনোবল লুকাইয়া আছে। সঙ্গীতকার আলীআকবর খানের প্রচেষ্টা ও দায়িত্ববোধ মাটির প্রদীপের প্রচেষ্টা। উষার দুয়ারে আঘাত হানিয়া রাঙাপ্রভাত আনয়নে ব্রতী আলী আকবর জনমানসকে স্বাভাবিকভাবে সুরসুধায় ভরিয়ে তুলিয়াছেন। সে সুধা পান করিতে সাধনার দরকার হয় না, বরং সঙ্গীতের মনোময়রূপের অমোঘ আকর্ষণে মানুষ স্বভাবতই নিরাগামী। ব্যক্তি মানুষটির ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সুরের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে। তাঁহার শিল্পকর্মকাণ্ডের উৎসমূলে এবং উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াসে 'ইজম' বা রাজনীতির অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমারা মনে করি না।

সঙ্গীত যদি সমাজমনের মুকুর হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই মুকুরে আলী আকবর খানের প্রতিফলন দেশবাসীর উদ্বেলিত চিত্তে বিশেষ স্থান পাইয়াছে। সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত আলী আকবর খান বিদেশে একাধিকবার ভারতের শুদ্ধ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন ও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রভূত অভিনন্দন পান। বিদেশে আমেরিকার দেশগুলির কিয়দংশে, দূরপ্রাচ্যে জাপানে, য়ুরোপে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে খেয়ালাঙ্গ সরোদযন্ত্রের মূর্চ্ছনায়—সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লেনদেনের পূর্বসূত্রটিকে ঘনিষ্ঠতর রূপ দানে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষের মানটি হুবহু পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন। সুরের ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘটিল পাশ্চাত্যের গভীর পরিচয়; পশ্চিমীরা অন্তরের গভীর হইতে প্রাচ্যের এই নবযুগের সঙ্গীতদূতকে জানালেন শ্রদ্ধা। কানাডার মণ্ট্রিল ও ম্যাকগ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় সুরকারের বাজনায় এতই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, স্থায়ী পাঠ্যক্রম রচনা করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতানুশীলনের পথ সুগম করিতে আগ্রহশীল। পরের ঘটনা

সরলীকৃত, তিনি বলিলেন যে, সরকারী অর্থানুকূল্যের দিকে না তাকাইয়াও তিনি নিজ ব্যয়ে মার্কিণ মুলুকে নিজে গিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। স্বাধীনোত্তর যুগের একজন সঙ্গীত প্রতিনিধির বেদনাকরুণ কথায় শিল্পসংস্থাপনে সরকারী অর্থবিনিয়োগের কার্পণ্যের কথা আর একবার মনে হইল। [আগামী বারে সমাপ্য।

আমার কথা (৯৫)

শৈলেন মুখোপাধ্যায়

পিতা ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মাতা রাজুবালা দেবীর অনুপ্রেরণায় যে তরুণ ছেলেটা একদিন সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হল, সেই ছেলেটাই আজ সঙ্গীত-জগতের একটা বিশিষ্ট নাম। নাম তার শৈলেন মুখোপাধ্যায়। আজকের দিনে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছেন যে সমস্ত শক্তিমান শিল্পী, শৈলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়কে সম্বল করে এই অল্পবয়সেই তিনি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তদুপরি তাঁর মধ্যে আছে বিনয়, বিনম্রভাব ও সৌজন্যবোধ—যে কোন শিল্পীর পক্ষেই যা অপরিহার্য। ১৯৩১ সালে কলিকাতায় শ্রী মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল ও কলেজের পাঠ সমাপ্ত করার পর সঙ্গীতই হয় তাঁর ধ্যান, জ্ঞান। তাঁর কণ্ঠস্বর এতই সুমিষ্ট ছিল যে, H. M. V. কোংতে audition দেবার পরই Record করার chance পান। তাঁর প্রথম গানটি ছিল "স্বপ্ন আমার ওগো" ও "রাতের তারা ডুবে গেলো"; অত্যধিক জনপ্রিয় হয়েছিল গান দু'খানি। এরপর একে একে বহু গানই তিনি রেকর্ড করেন। শুধু তাই নয়, সুরকার হিসেবেও শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বিশেষ খ্যাতি আছে। তাঁর দেওয়া সুরে বাঙ্গালাদেশের বহু প্রখ্যাত শিল্পীই কণ্ঠদান করেছেন। "নাগিনী কন্যার কাহিনী" ছবিতে প্রথম তিনি নেপথ্য শিল্পী হিসেবে কণ্ঠদান করেন। কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের শিল্পী হিসেবে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হয় ১৯৫৮ সালের September মাসে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তিনি গিয়েছেন সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। বর্তমানে C. L. T র তিনি একজন উৎসাহী সভ্য। সেখানকার Bullet Opera ও Puppet Music নিয়ে তিনি এখন Rescarch করছেন। এ ছাড়া Childrens Music নিয়েও তিনি বর্তমানে নানারকম Experiment করছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কাছে একটা বিশেষ প্রিয় Subject. আমার এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুখোপাধ্যায় বললেন, উচ্চাঙ্গের সুরে ও বাণী নির্ভর করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর। সঙ্গীতকে সাধনা হিসাবে গ্রহণ করলে দ্বন্দ্ব ও কলহের উর্ধ্বে উঠতে হবে। আমার অপর একটা প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুখোপাধ্যায় বললেন, শিল্পী হওয়ার প্রকৃত মূলধন হল, Sincerety and Honesty কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আজকাল এ জিনিষটার খুবই অভাব।
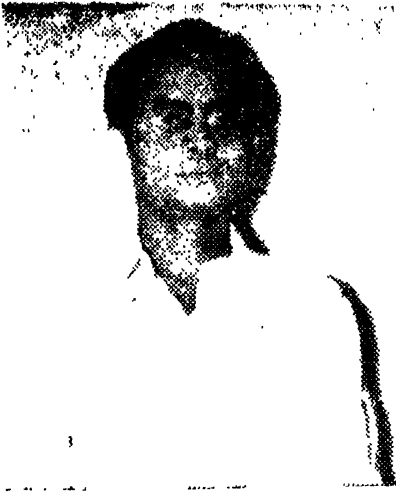
শ্রীমুখোপাধ্যায় মাত্র কয়েক বছর আগে ঠাকুর-পরিবারের মেয়ে অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি তুষ্ক নামে একটীমাত্র কন্যার পিতা।

শৈলেন মুখোপাধ্যায়

প্রার্থনা

কৃষ্ণা চক্রবর্তী

আশা যে রাখে সে মনের মাঝারে,
হে প্রভু, তুমি ফিরায়ো না তা'রে,
দিও তা'রে তুমি অশেষ প্রেরণা
চিত্তপ্রান্তে একান্ত কামনা।

বারাণসী

নীলকণ্ঠ

॥ বত্রিশ ॥

কেদার বলে ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ-কথিত সেই অদ্ভুত বালকের কাছে একদিন এক দিব্যপুরুষ এসে বললেন, মহাসিদ্ধ এক লোকোত্তর লোকের সংগে কেদারকে দেখা করতে হবে, পরেরদিন বিকেল ৪-টের একটি চিহ্নিত জায়গায়। যে দিব্যপুরুষ কেদারের কাছে এসেছিলেন, তিনি দূত মাত্র। পথ ও পরিচয়ক্ষেত্রের বিবরণ দিলেন তিনি এই রকম, 'তুমি চকের রাস্তা ধরে বিশ্বেশ্বরগঞ্জে পর্যন্ত গেলেই আর জিজ্ঞেস করবার দরকার হবে না।' পরেরদিন বিকেলে, বেলা ৪-টেয় সাইকেলে চেপে কেদার পৌঁছলো বিশ্বেশ্বরগঞ্জে; পৌঁছনমাত্র একটি ময়দান দেখতে পেলো, সে ময়দান এর আগে সেখানে কখনও দেখেনি কেদার। এসব কথা তখন তার মনে ওঠেনি। বিশ্বেশ্বরগঞ্জ থেকে একটা সোজা রাস্তা সেই ময়দানে গিয়ে মিশেছে, দুধারে চাষ ক্ষেত, ময়দানের মাঝখানে একখানা পাথর, তার ওপর বসে আছেন একজন পুরুষ, কেদার বুঝলো, ইনিই গতকাল দূত পাঠিয়ে ডেকেছেন আজকে কেদারকে।

সাইকেল থেকে নেমে কেদার তাকে সাইকেল ঠেলে হেঁটে এগুতে লাগলো পাথরের দিকে। সেই পরশ-পাথর—কত ক্ষ্যাপা যা আজও খুঁজে খুঁজে ফেরে, এই অদ্ভুত বালক তার দেখা পেয়ে গেল না চাইতেই। পূর্বজন্মের কোন পুণ্যের ফল এই অপূর্ব জন্ম কে বলবে!

ঠিক জায়গায় পৌঁছে সাইকেল রেখে, জুতো ছেড়ে, মহান সেই পুরুষের সামনে নত হলো অদ্ভুত এক বালক। প্রণত হলো। তারপর দুজনে যেকথা গোপীনাথ সেকথা আমাদের জানান নি। বলেছেন কেবল এইটুকু যে সেকথা ব্যক্তিগত, সেকথা গোপনীয়, সাধারণের অনুপযোগী। যোগীর সঙ্গে যোগীর কথা সে আর অন্যের পক্ষে উপযোগী নয়,—একথা বলবার সম্পূর্ণ উপযোগী যিনি, তিনিই বলেছেন একথা, অতএব তা শিরোধার্য। সব কথা সকলের জন্যে নয়, একথা যদি আমরা জানতাম তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে যা বলেছিলেন তা আর কাউকে কেন বলেননি, একথা আমরা জানতাম, আমরা মানতাম। ময়ূরকে যা সাজে তা দাঁড়কাকের মাথায় লাঠি বাজে, এই সহজ সত্য যেদিন আপামরের মনুষ্যত্ব উদ্বোধিত হবে সেদিন জগতের চেহারা না পালটাক, জগদ্বাসীর চেহারায় আসবে রূপান্তর। অধিকারী-অনধিকারী, এই দুই পার্থক্যে আমাদের প্রাচীন পুরুষরা এত জোর দিয়েছেন কেন সেকথা বোঝা যায় যখন ভগবান শ্রীচৈতন্য স্ত্রীলোকের কাছে ভিক্ষালব্ধতার অপরাধে একজনের ওপর রাগ করেন, আবার যখন স্ত্রীলোকের বাড়ি গেছেন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগ করেন এই বলে যে নরেন সেই আগুন সেখানে রূপ ও গুণ পুড়ে রূপাতীত ও গুণাতীতকে পায়।

রূপের মধ্যে অরূপকে যে দেখতে পায়, মায়ের অহৈতুকী কৃপায়, সেই যোগ্য আমাদের ঈর্ষ্যাযোগ্য হতে পারে; কিন্তু তাঁকে যা মানায় তা সে আমাদের পক্ষে মানা, এ সত্য স্বীকারে মনুষ্যত্বের মহিমা বাড়ে, কমে না।

দু'তিন ঘণ্টার আলাপ শেষে, সেই মোহান্ত পুরুষ একসময়ে কেদারকে বললেন: 'কেদার এবার তুমি বাড়ী যাও। তোমার মা তোমার জন্যে চিন্তিত হয়েছেন।' এই কথা বলে জাদুকরের মতো হাত নাড়লেন সিদ্ধযোগী। সংগে সংগে ব্যবধান দূর হলো। কেদার তার বাড়ীর লোকজনের দেখতে পেল, শুনতে পেল তাদের কথা। বিস্ময় বিস্ফারিত দুচোখে কেদার জানতে চাইলো, সে কোথায় আছে? উত্তর হোলো, আমরা এখন যেখানে আছি, সেখান থেকে পৃথিবীর এমন কোনও দৃশ্য নেই যা চর্মচক্ষে অদৃশ্য থাকতে পারে।

কেদার আবার জিজ্ঞেস করে, আপনি যে পাথরের ওপরে বসে আছেন, তার তলায় কি আছে। যোগীর হাতে সৃষ্টি রহস্যের যবনিকা উত্তোলিত হলো সহসা। কেদার যা দেখলো তা রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টিতে অবারিত হয়েছে অনবদ্য সঙ্গীতে:

'অতি দুর্গম সৃষ্টি শিখরে
অসীমকালের মহা কন্দরে
সতত বিশ্ব নির্ঝর ঝরে
ঝরঝর সঙ্গীতে।
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা···।'

কেদার তাকিয়ে দেখলো সেই পাথরের তলায় সংখ্যাহীন নক্ষত্রপুঞ্জে দীপ্ত এক আকাশ,—সে আকাশ আমাদের আকাশ থেকে বুঝি অনেক বড়।

আমাদের এই বুদ্ধির আকাশে উড্ডীন মানুষ এখনও সে আকাশের খবর না পেয়ে ঠাট্টা করেছে এই বলে যে, ভগবান তিন চাকা গাড়ীতে ঘুরছেন।

দর্শন দেবার সময় তাঁর হয়ে এলো। চক্রেই তিনি দেখা দেবেন আবার। সুদর্শন চক্রে যাঁর ঘোষণা সম্ভবামি যুগে যুগে।

কেদার নিজের মুখে বলেছে যে পাথরের নীচে সৃষ্টির অফুরন্ত ঐশ্ব-

বিহ্বল তার মনে হয়েছিলো যেন 'মহাপুরুষ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধস্থিত ছিদ্রের উপর আসনে উপবিষ্ট।' মহাপুরুষ দর্শনের পর প্রত্যাবর্তনের পথও রোমাঞ্চকর।

জুতো পরে সাইকেল হাতে ঠেলে যেমন এসেছিল তেমনই ফিরবে ভেবেছিলো কেদার। কিন্তু তা হয়ে উঠলো না। ময়দান থেকে বিশ্বেশ্বরগঞ্জে পৌঁছনোর রাস্তা শেষ হতে সে দেখলো, এলাহাবাদ রোডে ভক্ত কবিরের আবির্ভাব স্থান লহর তারার কাছে। বিশ্বেশ্বরগঞ্জ থেকে দূরত্ব তিন মাইল। কেদার গিয়েছিলো পূর্ব দিকে কিন্তু ফিরে এলো পশ্চিম দিক থেকে। সে রহস্যের কিছুই বুঝলো না।

ডক্টর গোপীনাথের কাছে পরেরদিন ঘটনার বিবৃতি দিতে গিয়ে কেদার বলতে পারেনি সেই সিদ্ধযোগীর পাথরের বেদী কাশীর কোন্ দিকে এবং কতদূরে। সেই একই জায়গায় কেদারের সংগে সেই মহাত্মার একাধিকবার দেখা হয়েছিলো এর পরেও। কিন্তু যাবার আর আসবার পথ কোনও বারই এক হয়নি। দূরত্বেও ব্যবধান ছিলো। এবং ক্রমশঃ কেদার বাড়ী থেকে বেরিয়ে বেশি দূর যাবার আগেই দেখতে পেত সেই ময়দান এবং ময়দানের মধ্যে সেই সিদ্ধাসন।

পণ্ডিত গোপীনাথ তাঁর অনবদ্য অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা মহৎ গ্রন্থ, সাধু দর্শন ও সৎ প্রসঙ্গ-এ এর ব্যাখ্যা করেছেন তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন :

"সিদ্ধভূমির ইহাই বৈশিষ্ট্য যে ইহা সর্বদা ও সর্বত্রই আপন ভাবে স্থিত থাকে। উহা জাগতিক বিচারে লৌকিক বলিয়া প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে অতি লৌকিক। ইহা অখণ্ড এবং অবিভাজ্য। উহার অংশ হয় না, এবং সিদ্ধ পুরুষের ইচ্ছানুসারে অংশ রূপে প্রতীত হইলেও উহা সমগ্র এবং অখণ্ডই থাকে। লৌকিক জগতে যে কোন স্থান হইতে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় যদি ঐ ভূমির অধিষ্ঠাতা পুরুষ কাহাকেও আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন অথবা দর্শন দিবার জন্য উৎসুক হন। শুধু তাহাই নহে, লৌকিক দেশ কালের সহিত ইহা এমন আশ্চর্যভাবে যুক্ত হইয়া যায় যে উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান বুঝিতে পারা যায় না। ইহা স্থূল নহে, সূক্ষ্মও নহে, অথচ একেবারে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়েই।" [সাধু দর্শন ও সৎ প্রসঙ্গ : ১ম খণ্ড : ১৬১ পৃঃ]

এর প্রমাণ ওই অদ্ভুত বালক কেদার। গোপীনাথ যাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছেন কেদার সেই ব্যাখ্যার অতীতকে জেনেছেন।

কেদার যখন মহাপুরুষ সাক্ষাতে যেতে আদিষ্ট হ'তো তখন সে স্থূল শরীরে। সাইকেল সংগে যেত। লৌকিক জগতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমরা যেভাবে যাই অবিকল সেইভাবে যেত। স্বপ্নে, ধ্যানে অথবা সূক্ষ্মদেহে নয়। ডক্টর কবিরাজের মতে সিদ্ধ স্থানটি অতি লৌকিক বলে লৌকিক জগতের যেখানে ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করতে পারে ; লৌকিক জগতের সংগে ইচ্ছামাত্রই পারে যুক্ত হতে। ইচ্ছে করলেই আবার চলে যেতে পারে স্থানান্তরে। কিন্তু লৌকিক জগতের এমন কোনও ক্ষমতা নেই যাতে জানার মাঝে অজানাকে সে সন্ধান করে বার করতে পারে তার ঠিকানা। কিন্তু পাথরের ওপর বসে সেই জ্যান্ত পুরুষ কাউকে দেখা দিতে চাইলে লৌকিক সত্তার সংগে সংযুক্ত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে পারেন আত্মপ্রকাশ করতে।

কেদার ওই মোহান্ত, ওই মোহান্ত পুরুষের অনুগ্রহেই লোক-লোকান্তর, দেশ-দেশান্তরের ব্যবধান দূরে ফেলে চোখের পলক ফেলবার আগেই যেতে পারত সেই জায়গায়।

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের সংগে কেদারের পরিচয় হবার পর কেদার মাত্র পাঁচ ছয় বছর মরলোকে ছিলো। কবিরাজ মশায়ের মতে, কেদার, 'পূর্ব জন্মেই আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিলো। কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাহাকে এইবার মর্ত্যলোকে দেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল। দেহ ধারণ করিয়াও নিজের প্রয়োজন সাধন করিয়া সে নিজের পূর্ব নির্দিষ্টস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে। জগতের কোন মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।'

এই অদ্ভুত বালকের অলৌকিক অভিজ্ঞতার ইতিহাস, কবিরাজ মশাই বলেছেন, একটি স্বতন্ত্র-স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থের উপাদান হতে পারে। সে বৃত্তান্ত আলোচনার তিনি কোনও প্রয়োজন দেখেন নি। তার পরিবর্তে কেদারের অনুভূতিলব্ধ কোনও কোনও তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করেছেন। এই দীপ্ত অনুভূতি, এই দিব্য অনুভূতি, বাক্যে বারাণসী-র পাঠক-পাঠিকার একজনকেও যদি উদ্দীপ্ত করে সেই আশায় তার কয়েকটি এখানে উদ্ধার করে দিলাম।

'মানুষ ইচ্ছা করিয়াই জন্ম নেয় অর্থাৎ সে জন্ম চায় বলিয়াই তাহার জন্ম হয়। কিন্তু সে মানুষের সব বাসনা এই দেহ থাকিতে থাকিতেই কাটিয়া যায় তাহার কোনো আকাঙ্খা জাগে না। স্মৃতি হইতে ইচ্ছা হয়, তদনুসারে জন্ম হয়। মূলে মায়া না থাকিলে কি প্রকারে জন্ম হইবে?'

'এক একটি লোক এক এক প্রকার আকার বিশিষ্ট। ইন্দ্রপুরীটি শঙ্খের মতন। চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস, স্বর্গ, ইন্দ্রলোক ও ধ্রুবলোক—এই ছয়টি লোক সমষ্টিভাবে পুচ্ছহীন হস্তীর মতন। সূর্যলোক, ভীষ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ, এই তিনটি লোক সমষ্টিভাবে মণিহীন তৃতীয় চক্ষুর মতন। চন্দ্রলোক হইতে এই তিনটি লোক এক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাকে সূর্যলোক বলা হয়, তাহা ঐ তৃতীয় চক্ষুর মণি বা তারা। পৃথকভাবে উহা বুঝা যায়। যমলোক, প্রেতলোক ও পিশাচলোক সমষ্টিভাবে মহিষের মস্তকের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। আকাশটি দেখা যায় ছত্রাকার এবং আকাশের নীচ হইতে পৃথিবীটি দেখা যায় অন্ধকার অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়।'

'চন্দ্রলোকে মনুষ্যের কর্ম সঞ্চিত হয়। এখানে যে যাহা করে সেখানে তাহার সব কিছুই জমা হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।'

'ইন্দ্রপুরীকে আনন্দধামও বলা চলে। সেখানে গেলে এখানে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না। মানুষ মৃত্যুর পর পিতৃলোকে যায়। আমি (কেদার) গো-মেষ প্রভৃতি পশুকেও ঐখানে যাইতে দেখিয়াছি। তবে পশুদের স্থান আলাদা, মনুষ্যের স্থান আলাদা। কিন্তু ছোট ছোট জীব যেমন আরশোলা, মশা, মাছি ইত্যাদি। ইহারা মরিয়া এই লোকে যায় না। এই সকল ক্ষুদ্র জীব উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত যাইতে পারে। যে স্থানে প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছে সেই পর্যন্তই ইহাদের গতি। ইহারা সেইখান হইতে নামিয়া আসে ও আবার জন্ম নেয়।'

'পিতা-মাতাদের মরণের পর অশৌচকালে শরীরে যা প্রভৃতি থাকিলে মৃতের আত্মাকে উহা লাগে। ঐ সময় মৃতের আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে।'

'জন্মগ্রহণের সময় নারায়ণ পূর্ব স্মৃতি কাড়িয়া নেন তবে তিনি উহা নিজের অধীনে রাখেন না, কুণ্ডলিনীতে চাপা দিয়া রাখিয়া দেন। কুণ্ডলিনীকে নাড়া দিতে পারিলে ঐ স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিতে পারে।'

'মনুষ্যের জন্যই শুধু চিত্রগুপ্তের খাতা। যখন তারা আসে, অর্থাৎ যখন গর্ভসঞ্চার হয়, তখনই খাতায় নাম উঠে। সঙ্গে সঙ্গে নাম লেখা হয়, ঐ নামই পরে—জন্মের পরে রাখা হয়। আয়ু শেষ অথবা সময় পূর্ণ হইলে দূতগণ নাম দেখিতে পায়। তখনই তাহারা আত্মাকে নিবার জন্য নামিয়া আসে। ইহা কালমৃত্যুর কথা। অকালমৃত্যুতে দূত আসে না, হঠাৎ মৃত্যু হইলে ঝটিকাতে অর্থাৎ ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে যেখানে সর্বদা তরঙ্গ খেলিতেছে সেখানে নাম উঠে। ঐখানে ভূত প্রেতাদি দেবযোনি অনেক থাকে। তাহারাই দূতরূপে আসিয়া আত্মাকে নিয়া পিতৃলোকাদি দর্শন করাইয়া দেয়। তখন যমদূত আসে না। তবে যদি বহু লোকের সঙ্গে অকালমৃত্যু হয়;—যেমন নৌকা বা জাহাজ ডুবিয়া—তখন ঝটিকাতে বহু নাম তরঙ্গে ভাসিয়া উঠে ও পরস্পর সংঘর্ষের ফলে একটা উত্তেজনা জন্মে, উহাতে যমরাজ চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি ক্রোধ সহকারে নিজে নামিয়া আসেন ও পাশ দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আত্মাদিগকে লইয়া যান। পোকা মাকড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব মৃত্যুর পর ঝটিকাতে যাইয়া মিশিয়া যায়; বহু ক্ষুদ্র জীব একসঙ্গে মরিলে এইখানেই বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়; ঝটিকাতে যায় না। ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে কিছুই নাই। মশা, মাছি প্রভৃতি সূর্যের তেজে ও পৃথিবী হইতে যে তেজ উঠিতেছে, তাহাতে জীবিত থাকে। লোকের শ্বাস-প্রশ্বাসে স্বভাবতঃ একটা তেজ উপরে উঠিতেছে, উহাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব জীবন ধারণ করে। পারাবত প্রভৃতির মধ্যে একটা জিনিয় আছে অতি সামান্য জিনিস; দেখিতে জলের মতন। বিশেষ কিছু না। মধ্যে ভগবান ও ব্রহ্মা আছেন, বানরের মধ্যেও একটি দেবতা আছেন। যে দেবতা ঘোড়াতে আছেন তিনি ঘোড়ার মুখে থাকেন, হৃদয়ে নহে। বানরের আত্মা লেজ দিয়া বাহির হইয়া যায়—অন্যান্য জীবের আত্মাও লেজ বা মুখ দিয়া বাহির হয়। মানুষ ভিন্ন অন্য কোন জীবের মধ্যে ঐ সাদা পাথরের জ্যোতি থাকে না।'

কর্মফলে মানুষ পশুরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও অন্য পশু হইতে তাহার পার্থক্য থাকে। পশুর চক্ষু দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ঐটি বাস্তবিক পশু বা পশুযোনিতে উদ্ভূত মানুষ। পূর্বে মানুষ অবস্থায় যে সাদা জ্যোতিটি বর্তমান ছিল পশুদেহ ধারণ করিলেও উহা থাকে। উহা চক্ষু দিয়া বাহির হয়—পশুদেহের মৃত্যুর সময় উহা অন্য পশুর ন্যায় বাহির হয় না।'

কবিরাজ মশাই গ্রন্থের শেষে উপসংহার করেছেন এই বলে যে 'আমার মনে হয় আধ্যাত্মিক সাহিত্যে ইহা সংরক্ষিত হইবার যোগ্য।'

বিদ্যা মানুষকে বিনয় দান করে। বিদ্যার এবং বিনয়ের অবতার ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ যাকে সাহিত্যে সংরক্ষণের যোগ্য মনে বলেছেন, আমি বলি, মানবজীবনে তার চেয়ে বড় সংরক্ষণের বস্তু আর কিছু নেই।

কেদারের কাহিনী আপনি অলীক বলবেন অথবা বলবেন অলৌকিক আমি জানি না। আমি শুধু জানি সব কিছু বিশ্বাস করা যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তেমনই সব কিছু অবিশ্বাস করা, আরও বড় নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আরও জানি। আরও জানি যে অবিশ্বাস করে নিজেকে, ঠকানোর চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও কম ক্ষতির কারণ হয় জীবন ও জীবিকার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই।

বিশ্বাসে কৃষ্ণ মেলে কি না বলতে পারি না। শুধু বলতে পারি শুধু অবিশ্বাসে মেলে বিষ। আমি বিষ আশ করে মরতে চাই না আমি বিশ্বাস করে চাই বাঁচতে।

[ক্রমশঃ

সেতুর ওপারে মুক্তি

মনোজ কুমার ঘোষ

এ পথ দিয়ে যেয়ো না, পথ বাঁধা
ও পথে গেলে পিছলে যাবে পা,
অবিশ্বাসী সেতুটা ভাঙাচোরা;
মাঝিরা সব মরেছে হয়তো বা।

সাঁতার জানো? ও, জানো না বুঝি!
এসো না ঐ পিছল পথে এগিয়ে চলি।
যাবে না? আহা বুঝেছি, নও রাজি,
চাও না রাঙান সাদা কাপড় ছ্যাতলা রঙের তুলি!

সেতুটা ভাঙাচোরা, তবু সেতুর পথ ধরো;
এগিয়ে চল পা টিপে টিপে এক'পা দু'পা ক'রে
উঠলে না? উঠবে না? ভয় পাচ্ছে জলে পড়ো!
ফিরেই চলো পিছন পথে কাণ্ডারীর ঘরে

সেখানে যাবে বিনীত হয়ে অনুগ্রহ নিতে;
অশিক্ষিত মাঝির সুখনিদ্রা কেড়ে নিয়ে
ফিরত দিও তোমার যত লজ্জা সংকোচে
আমায় আজ থাকতে দাও মাঝির ঘুমে মেতে।
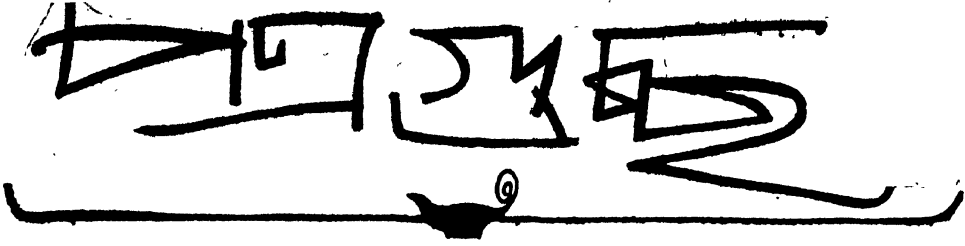
রবার্ট কিয়ার্থের লেখা চিঠি তাঁর অনাগত সন্তানকে…

[রবার্ট কিয়ার্থ একজন সাধারণ মার্কিনী সৈন্য। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এই চিঠিখানা তিনি ১৯৪২ সনে লেখেন, তাঁর স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা হওয়ার সংবাদ পেয়ে।]

প্রিয় পুত্র,

আজ, এই মুহূর্তে জানবার কোন উপায়ই নেই যে, তুমি আমার অনাগত সন্তান, ছেলে হয়েই জন্মাবে কি না। আজ তুমি ছেলের রূপ নিয়েই আমার কল্পনা জুড়ে বসেছ। হও যদি মেয়ে, তো তোমার বাবাকে ক্ষমা কোর। কল্পনার ত্রুটির জন্য স্নেহ ভালোবাসায় কার্পণ্য কখনই ঘটবে না। তোমার মার মতই তুমিও আমার জীবন জুড়ে থাকবে। আশা আছে এবং প্রার্থনাও, যে কোন একদিন, যখন তুমি বড় হবে, জীবনকে বোঝবার বয়স হবে, আর আজকের এই অশান্ত পৃথিবী সুন্দর হবে, তখন আমি নিজেই তোমায় এ চিঠিখানা প'ড়ে শোনাব। এমনও হ'তে পারে যে তা আর হবেনা। চিঠিখানা তুমি একলাই ব'সে পড়বে। জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য হল তার অনিশ্চয়তা। তাই আজ লিখে রাখছি, সামান্য কয়েকটা কথা।

আর কয়েক সপ্তাহ পরে, যে দেশ তোমাকে তার নবীনতম দেশবাসী ব'লে স্বাগতম জানাবে, তোমার সেই দেশ আজ তার বাঁচার সংগ্রামে ব্যস্ত। তোমাকে পৃথিবীতে আনবার জন্য, ঘরের মধ্যে তোমার মার অধৈর্য্য প্রতীক্ষা। সেই পৃথিবীকে সুন্দর করবার জন্য, ঘরের বাইরে, তোমার বাবার অনন্ত সংগ্রাম। বিপদের বেড়াজাল চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে। সৈন্যের পোষাক যখন পরেছি তখন সংগ্রামকে ভয় পেলে চলবে কেন? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আজ কৌতুক আর হাসি দিয়ে অদূর ভবিষ্যতের বিপদ আমরা যতই ঢাকতে চেষ্টা করিনা কেন, এ কথা আমরা সবাই স্থির বিশ্বাসে জানি যে কোন একদিন আমাদের প্রত্যেককে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবেই।

তা সত্বেও, আজ যে শান্ত মনে এবং সহজ হাসির আচ্ছাদনে সামনের দিকে তাকাতে পারছি, তার একমাত্র এবং অনন্য কারণ, ভবিষ্যতকে আমরা সার্থক ভাবে সৃষ্টি করব। করবই। সে স্থির বিশ্বাস আমাদের আছে বলেই, আশঙ্কারও ঊর্দ্ধে আছে সাহস, আছে আশা। সেই সাহস যেটা অসীম, সেই আশা যেটা অপরিসীম, সেইই হল আমাদের আদর্শের ভিত্তি। অচল। অটল।

পঁচিশ বছর আগে, আমি যখন জন্মেছিলাম, তখনও বিশ্বব্যাপী ছিল মহাযুদ্ধ। তার পরের যে অত্যন্ত সাময়িক শান্তি, তারই মধ্যে আমি মানুষ হই। কিন্তু ঐ সামান্য এবং অতীব সাময়িক শান্তির জন্য পৃথিবীকে যে কি পরিমাণ মূল্য দিতে হয়েছিল তার এতটুকু ধারণাও আমার ছিল না। সবাই তখন বলত "এই মহাযুদ্ধের প্রয়োজন ছিল পৃথিবীতে গণতন্ত্রকে কায়েমী করার জন্য।" গণতন্ত্র কথাটার সঠিক অর্থ আমি বুঝতাম না, কিন্তু হাসতাম ওদের এই কথা শুনে। ওদের ব্যঙ্গ করতাম। আমরা সবাই—আমি এবং আমার সহপাঠীরা। জোর গলায় আমি জাহির করতাম যে যুদ্ধটা বোকামীর চূড়ান্ত। বুদ্ধি থাকলে ওটা সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যেত। আসলে, মানুষ যুদ্ধ চেয়েছিল!

বুঝতেই পারছ যতখানি ছিল আমার অজ্ঞতা ততোধিক ছিল আমার অহমিকা। আমার এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি নড়ল যেদিন হঠাৎ দেখলাম একদল সভ্যতার শত্রু আমার—এবং—তোমার দেশকে ধ্বংস করার জন্য এক বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। কতটুকু সময়ের মধ্যে কতখানি জানলাম জানো? ধ্বংস করতে লাগে এক পলক, সৃষ্টি করতে লাগে জীবন ও যুগব্যাপী সাধনা। আর জানলাম স্বাধীন পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে কি পরিমাণ তার মূল্য দিতে হয়।

আমার কথা তোমার কানে গিয়ে পড়বে বহু বছরের ব্যবধানে। তোমার সমসাময়িক বহু লোক আমাদের যুগের মানুষদের এই যুদ্ধের জন্য, ব্যঙ্গ করবে, ঘৃণার চোখে দেখবে। আশা করি, তুমি সে ভুল করবে না।

আজ আমরা এই যে যুদ্ধের নামে জীবন-মৃত্যুর খেলা খেলছি, এ খেলা তোমার জন্যে, তোমাদের জন্যে; তোমরা, যারা আমাদের যুদ্ধ জয় শেষ হ'লে, জীবন আরম্ভ করবে। এ খেলায় আমরা অনেকে মরব, অনেক হারাবো। আজ আদর্শের আনন্দে সামনে তাকিয়ে আছি—নির্ভয়ে। একদিন শূন্যতার হাহাকারে পেছনে তাকাবো—বেদনায়। সান্ত্বনা যেটুকু থাকবে সেটা তোমাদের ভবিষ্যত ভেবে। আজ আমরা চ'লে এসেছি দেশের জন্যে। আশা আছে, হয়ত একদিন ফিরে যাবো, ফেলে আসা জীবনের যে সামান্যটুকু বাকি থাকবে তার মধ্যে আর যে শান্তির জন্যে আজ আমাদের এই সংগ্রাম, তারই মধ্যে নিঃশেষে বিলীন হ'য়ে যাওয়ার জন্যে।

আমি আশার আলো জ্বালিয়েছি। বাইরে, এই মুহূর্তে কত মানুষের কত আশা মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। আমি শুনছি গুলির শব্দ। ওদিকে, প্রতিটি শব্দে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে কত স্বপ্ন। সে স্বপ্ন—সুখের স্বপ্ন, বাঁচার স্বপ্ন, আবার ফেলে ।

পাতে ভয় করি না। যারা আমাদের স্বপ্ন ভাঙছে, তাদের আমরা ধ্বংস করব'। করবই। যুদ্ধ শুধু জয়ের সাধন নয়; সার্থক স্বপ্নেরও সাধনা।

আমাদের আজ সে স্বপ্ন, সেটার ওপরই আমাদের দেশের ভিত্তি। সেটা গড়ে উঠেছে যুগে, যুগে; জীবনে জীবনে, হাজার লক্ষ জীবনের ত্যাগে ও সাধনায়। আমার মত, আমার আগে তারাও চেয়েছিল এমন দেশ গড়বে যেখানে মানুষ স্বাধীন মনে শান্তিতে থাকবে। আজ যারা সংগ্রামে আমাদের সম্মুখীন, তারা চায় আমাদের শৃঙ্খলে বেঁধে সে স্বপ্নকে ধূলায় মিশিয়ে দিতে। আমরা তা হ'তে দেব না। আমাদের পিতা প্রপিতামহ যে সাধনায় আমাদের জীবনে সার্থক স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিলেন, আমরাও তাই করব তোমাদের জীবনে। তাই-ই করছি; আমাদের জীবন দিয়ে।

মহাকালের দুই জমজ সন্তান, জীবন ও মৃত্যু। মহামানবেরা বলেন মানুষের জীবনে তার চেয়ে বড় কিছু নেই। আমি বলি আছে। সেইটাই এবার বলব। সব কিছুর উর্দ্ধে উঠে, সেইটাই শুধু তুমি মনে রেখ। আমাদের সৈন্যবাহিনীতে এক দল ধর্মযাজক আছেন। তাঁদের কাজ হল, আমাদের সৈন্যদের আধ্যাত্মিক অভাব যা কিছু, প্রয়োজন যা কিছু, সব পূরণ করা। এঁরাই দিয়েছেন আমায় দুটো কথা—যার মধ্যে আছে আমার সব স্বপ্নের সাধনা, সব আশার ভিত্তি, সব আদর্শের উৎস। তারই মধ্যে আছে আমার ভবিষ্যত সৃষ্টির জন্যে সর্বস্ব ত্যাগের আরাধনা। আমি দশ হাজার কথাতেও যা বোঝাতে পারব না, তার সবটুকুই আছে দুটো কথার মধ্যে। তুমিও তাদের গ্রহণ কর, জীবনের প্রতিদিন, প্রতি কাজে, প্রত্যেকটি অবস্থায়, আচারে ব্যবহারে, সুখে, দুঃখে ও বেদনায় জীবনের যে কোন অবস্থায় যদি তাদের ব্যবহার কর' তো দেখবে, জীবন তোমার হয়েছে সুন্দর ও সার্থক। কথা দুটো হ'লে 'বিশ্বাস রাখো।' (Have Faith.)

তোমার মার কাছ থেকে দূরে—আমি আজ একা। মন জুড়ে নেমেছে নিবিড় নৈরাশ্যের বেদনা। তুমি যখন আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে তোমার প্রথম নিঃশ্বাস নেবে তখন আমি-তোমার মার কাছে থাকব না-এ অপরিসীম বেদনার অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয়নি। আমার মা, আমার বাবা-তাঁরাও আজ বৃদ্ধ, নিঃশেষে একলা এবং উন্মা পৃথিবীর ভয়ে জর্জরিত। আমি জানি, আজ যদি তাঁদের কাছে থাকতে পারতাম তো তাঁদের বেদনা লাঘব হত। চারিদিকে এত শূন্যতার হাহাকার সত্বেও আমি বেঁচে আছি। কেন? কি নিয়ে?

বিশ্বাস নিয়ে। অনন্ত বিশ্বাস। ওরই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সা[illegible] বিশ্বের সঙ্গে আমার এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন; যাদের ভালোবা[illegible] তাদের সঙ্গে আমার অন্তরের ঐকান্তিক যোগাযোগ। সে বন্ধন ছি[illegible] হবার নয়; সে যোগাযোগ হারাবার নয়। এরই মধ্যে আছে আমা[র] সকল আশার আলো, আমার সব সাহসের সঞ্চয়, আমার জীবন মরণের সার্থকতা।

আমার এই বিশ্বাসের ব্যাপ্তিতে, সামনে, অদূর ভবিষ্যতে, দেখ[ছি] যুদ্ধজয়ের পরে জীবনের জয়গান, দেখছি পরিনির্বাণীয় পূর্ণতা আমাদে[র] যৌথ জীবনে। ভগবান করুন তাই যেন হয়। কোন কারণে য[দি] বা না হয় তাহলে, আশীর্বাদ করি, তুমি দেখ আমার স্বপ্ন, [illegible] স্বপ্নকে তুমি সার্থক কর তোমার সাধনা দিয়ে, সৃষ্টি কোর' সৌন্দর্যে সৌধ, দেশে ও জীবনে-ঠিক যেমন আমি করতে চেয়েছিলাম। যা ঘটুক জীবনে, আমার আশীর্বাদ আর সর্বময় ঈশ্বর যেন তোমার জীব[ন] সার্থক করেন, সুন্দর করেন, সত্য করেন। তোমার বাবা।

অনুবাদক—প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী ঃ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা

এক্ষণে এমত সময় উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে জাতিভেদ ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যে জাতিভেদ থাকিবেক না তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে; যে হেতু নানা ঘটনা সেই জাতিভেদ ভঙ্গ বিষয়ে উন্মুখ হইয়াছে।...যাহা হউক জাতিভেদ ভঙ্গ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবুরও এই মত। তিনি বলেন যে, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্রকে দুঃখ দিয়া স্বজাতি হইতে পৃথক্ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ১৫ মাঘ ১৭৭৫ শক।

* * * *

১৩ই মাঘ, ১৭৮৪ শক

আমরা পূর্ব্বপুরুষের নির্দোষ প্রথা যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহা কিছু লোকের ভয়ে করি না, কিন্তু সেই প্রথা ভাল বলিয়াই গ্রহণ করি। পূর্ব্বপুরুষদিগের সকল প্রথাই পরিত্যাগ করিতেই হইবেক, ইহাতে যেমন আমরা সম্মত নহি, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষদিগের সকল প্রথা গ্রহণ করিতেই হইবেক, ইহাতেও আমরা সম্মত নহি। পূর্ব্বপুরুষ হইতে আবহমান প্রচলিত যদি নির্দোষ প্রথা পাই, তবে আহ্লাদপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করি। প্রচলিত প্রথাকেই পৌত্তলিক বলা যুক্তি হয় না। পিতার মৃত্যু হইলে একপ্রকার শোকচিহ্ন হইলে পাদুকাদি পরিত্যাগ করিয়া শোকচিহ্ন ধারণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে কার্য্য হয়, ইহা ত আমার মনে হয় না।

* * * *

১২ই শ্রাবণ ১৭৮৬ শ[ক]

আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় আর বড় দেখিতে পায় না, কর্ণেন্দ্রিয় আ[র] বড় শুনিতে পায় না, বাক্য আর অধিক কথা কহিতে চায় না আমার ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে অবসর লইবার জন্য আমাকে বড় ব্যস্ত করিতেছে। এ সময়ে যদি তোমাকে পাই, তবে ইহা হইতে আর অধিক আহ্লাদ আমার কিছুতেই নাই। তোমার মুখের প্রতি আমি চাহিয়া রহিয়াছি।

* * * *

প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু
মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার,

শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রতি এখনো যে আমার স্নেহ আছে তা ম্লান হয় নাই, তাহাই আমি প্রতাপ বাবুর পত্রে লিখিয়াছিলাম আমি পূর্ব্বে যখন সিমলা পর্ব্বত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত

সরলতা, নম্রতা, সাধুতা ও ধর্মভাব আমার মনকে অতিমাত্র আকৃষ্ট করিল। সেই সময়ে আমার মনের স্নেহ ও অনুরাগ যেমন তাঁহাতে অর্পণ করিলাম, অমনি তাঁহার নিকট হইতে অনুরূপ ভক্তি প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমাকে পিতৃরূপে বরণ করিলেন। তাঁহার সহিত আমার এই যে একটি ধর্মসূত্রে যোগ হইল, তাহা অদ্যাপি আমি হৃদয়ে রক্ষা করিতেছি। তিনি যখন, তখনকার নূতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন তখন তাঁহার এমনি একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতাম, তাহাতে আমার প্রেম তাঁহাতে সহজেই যাইত। এখনো তাঁহার সেই তখনকার উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার সেই নূতন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অদ্যাপি মুদ্রিত আছে, তাহা আমি বলিতে পারি না এবং সেই মূর্ত্তিটি যখন আমি অন্তরে নিরীক্ষণ করি, তখন কেন যে তাঁহার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রেম অনুভাবিত হয়, তাহার হেতু পাই না। এই কথাটি আমার মন খুলে আমি প্রতাপ বাবুকে লিখিয়াছিলাম।

প্রতাপবাবু সিমলা হইতে ১ আগষ্ট তারিখে আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে তাহার প্রত্যুত্তরে আমিও তাঁহার সদ্গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া আমার লেখনীকে তৃপ্ত করি; সেই প্রত্যুত্তরে কেশব বাবুর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় স্নেহের ভাব, তাহা অনুরাগের সহিত বর্ণনা করিয়াছিলাম। আমার এই রহস্য কথা সংবাদপত্রে যে উঠিবে এবং আমার প্রতি কৈফিয়ৎ তলব হইবে, আমি ইহা ভাবি নাই। আমার সহিত কেশব বাবুর যাহাতে পুর্ব্ববৎ সম্মিলন হয়, প্রতাপ বাবু তাঁহার পত্রের শেষে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"Only if I have any wish which I would express before you it is this that you and he should be once more reconciled into that union of perfect confidence and love which formed such a blessed spectacle in the dear old by gone days in the infinite possibilities of Divine wisdom and power. Say father is that glorious fact impossible? What could you not do if you too wished it."

এই কথার সহজ উত্তর এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের সম্ভাবনাই বা কোথায়? যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার আর নাগাল পাই না, তখন আর তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে? যখন তিনি কখনো গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনো রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্য বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জান-দি-বেপ্‌টাইস্টের দ্বারা বেপ্‌টাইস্‌ট হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুশা, যীসা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন—তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে? এই জন্যই আমি মৃদুভাবে লিখিয়াছিলাম যে "ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার নাগাল পাই না, তাঁহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়।" কিন্তু কেবল যে তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে না, এমত নহে, তাঁহার সঙ্গে নিত্য বিরোধই উপস্থিত হইতেছে। "আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদের বাক্যেই জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছি, তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মবাদিদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদিদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" এই তাঁহার অসাধারণ উদার প্রেমই সমস্ত কলহের মূল, ইহা লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এত বিবাদ। এই জন্য আমি পরে লিখিয়াছিলাম যে "ইহা অতি কষ্টকর। ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার অন্ত নাই—ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। আমার এমন যে নির্জ্জন পর্ব্বতবাস, এখানেও সে কোলাহল আসিয়া পহুঁছিয়াছে। কখনো কখনো ব্রহ্মানন্দের এই অভিনব মতের বিরোধী হইয়াও আমার কথা কহিতে হয়, তাহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। তাঁহার পক্ষ ও তাঁহার মত যদি আমি সমর্থন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কত আনন্দ যে আমি লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না।" আমার পত্রের এই অংশ মিরার পত্রে উদ্ধৃত হয় নাই, এজন্য আমার সকল অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে পার নাই। এই অংশটি গোপন করিয়া রাখা মিরার সম্পাদকের উচিত কার্য্য হয় নাই।

আমি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমাকে এইটুকু লিখিলাম। পরের দোষগুণের এত বাহুল্য চর্চ্চা আমার পোষায় না। আমার পক্ষে ইহা অতি অপ্রিয় কার্য্য। ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করুন। ইতি

হিমালয় মসুরী পর্ব্বত — নিয়ত শুভানুধ্যায়ী

২৮ ভাদ্র ৫২ — শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র ঃ পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা

ওঁ

সাদর নমস্কার নিবেদন,

আপনার ৫ ভাদ্রের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার 'ব্যাখ্যা মঞ্জরী' নিয়মিত ছেপে পত্রিকাকে প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। ইংরাজিতেই ব্যাখ্যা অনুবাদিত হউক, আর অপর পদ্যছন্দে ব্যাখ্যান প্রকাশিত হউক, আপনার 'ব্যাখ্যান মঞ্জরীর মূল্য কিছুতেই যাইবে না। আপনি তাহা পূর্ব্ববৎ উৎসাহ চিত্তে সম্পন্ন করতে থাকিবেন। "নাহি ভেব মনে যদি একা আমি। যাদের অন্তরে তব অন্তর্যামী"। তিনিই তোমার সুহৃৎ আশ্রয়। পিতা মাতা বন্ধু করেন অভয়।"এই গুণের এককারে আমার হৃদয় গাঁথিয়া গিয়াছে। যাহার কিঞ্চিৎ হৃদয় আছে,তাহার এ হৃদয় হইবেই হইবে। অলমতিবিস্তরেণ ইতি ১১ ভাদ্র '৫৪

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুহৃদ্বর—শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয় সমীপেষু—

পাথুরিয়াঘাটা

পত্রলেখক ও পত্রপ্রাপক ভিন্ন ব্যক্তি। পরস্পর বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ। মহর্ষি এঁকে 'সখা' সম্বোধন করতেন। ঠাকুর পরিবারে তাই দ্বিতীয় জন 'সখাবাবু' নামে পরিচিত।

দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা কবি দীনেশচরণ বসুর চিঠি

বিষয়: রবীন্দ্রনাথ

১৬ই বৈশাখ ১২৯৩

"পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম, বঙ্গ-সাহিত্য-জগতের উঠন্ত রবি রবি ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। বিগত কল্য তাহাই গিয়াছিলাম। ঠাকুর বাড়ীর প্রকাণ্ড পুরীতে প্রবেশ করিয়া দোতলার সিঁড়ির মুখেই রবি ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নয়ন মুগ্ধ, মন আনন্দসাগরে ডুবিল! কোন ইংরাজী পুস্তকে অমর কবি মিল্টনের নবমূর্ত্তি দেখিয়াছ কি? দেখিয়া থাকিলে সেই মূর্ত্তিতে রবিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে। দেহছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখাকৃতি দীর্ঘ, নাসা, চক্ষু, ভ্রূ, সমস্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ (Curls) স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরিধানে ধুতি। কেন বলিতে পারি না, রবি ঠাকুরের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন এই অঙ্গে গৈরিক বসন অধিক শোভা ধারণ করিত। উনবিংশ শতাব্দীর Albert ইত্যাদি কেশ রক্ষার ফ্যাসনের মধ্যে দীর্ঘ কেশ দেখিবার জিনিস বটে এবং যে তাহা রক্ষা করে তাহাকেও সাহসী পুরুষ বলিতে হইবে। সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হইল। রবি ঠাকুরের বয়স অল্প, ২৩শের অধিক হইবে না। পত্রলেখকের অনুমান। প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স পঁচিশ কিন্তু স্বভাব স্থির। কলেজে থাকিতে মিল্টনকে তাঁহার সহপাঠিগণ "Lady" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, রবি ঠাকুরকেও সেই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। স্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট, রমণী-জনোচিত! রবি ঠাকুরের গানের কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু গান শুনি নাই। তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করা হইল। সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন। গানটি এই—

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না—
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।...

......পত্নাবক্ষে তাঁহার অকাল-মৃত্যু মনে পড়িলে, সেই সঙ্গে কবি-কাহিনীর "গঙ্গাজল শব" শীর্ষক কবিতাটি স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠে। তিনি যেন স্বীয় মৃত্যুর আভাস পাইয়াই উক্ত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। "দিবা অবসান প্রায় রজনীর মুখে, কোথা ভেসে যাও শব কহ না আমায়।" আজ আমার কর্ণে বাজিতেছে। সেই কবিতাটিতে পরিজনের দুঃখ অতি করুণভাবে বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়াছিলেন, বোধ হয় নবদৃষ্ট স্বর্গের শোভায় মুগ্ধ হইয়া আত্মীয়দিগের আর্ত্তধ্বনি, মন্দসান্ধ্যহিল্লোলিনীতে "দূর বাঁশরীর রব" এবং "কৃষকের বৈতালিক তান" কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না।......

যুবতী

জনেট্ লিউস্

নম্র ও ধীর যুবতী কুমারী
ঘরের মাঝেই ঘোরাফেরা করে
গুণ গুণ গান গায়।
দূর করে যত গ্রীষ্মের জঞ্জাল
সম্মার্জ্জনীর চালনায়।

প্রকট গরমে বাতাস উর্দ্ধগামী,
পাত্‌লা গোলাপী ঠোঁটের আড়ালে চম্‌কায়
শুভ্র দাঁতের সারি।
নরম ফেনিল কেশের মাদকতায়
বিশ্রাম করে নিঃসঙ্গ কুমারী।

বসন্তবায়ু হানা দেয় তার দ্বারে,
ভীরু উঁচু বুক দ্রুত ওঠানামা করে।
দেহ ঘিরে তার আঠারো গ্রীষ্ম গান
কার ভাবনায় বারে বারে কাটে সুর,
শুভ্র নরম লাইলাক্ ফুল ফোটে—
আগামী দিনের গন্ধেতে ভরপুর।

অনুবাদক—অশ্বিনী দাশগুপ্ত
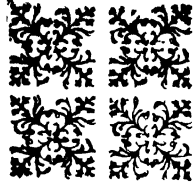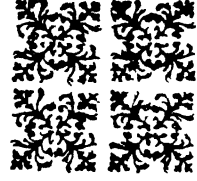
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

[প্রথিতযশা রবীন্দ্রজীবনীকার, সাহিত্যসাধক ও গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞ।]

কাব্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতির মতই জীবনীও সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গ। এই জীবনী সাহিত্যের অনুশীলনে অসাধারণত্ব প্রদর্শন করে যাঁরা সাধারণ্যে গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত, বর্ষীয়ান সাহিত্যব্রতী ও গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। প্রভাতকুমারকে জীবনীসাহিত্যের অন্যতম অনুশীলনকারী বললেই যথার্থ বলা হয় না— সংস্কৃতি-জগতে জীবনী-সাহিত্যকে কেন্দ্র করে এক নতুন ধারার প্রবর্তনের, নতুন দিক নির্ণয়ের, নতুন দিগন্তের উন্মোচনের এক বিশেষ গৌরব নিঃসন্দেহে তাঁর প্রাপ্য।

পিতৃদেব স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাণাঘাটে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন এবং স্থানীয় সমাজে এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসাবে সর্বসাধারণের যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব সেদিন সেখানে অপরিহার্য ছিল। ১৮৯২ সালের ২৭শে জুলাই (১১ই শ্রাবণ ১২৯৮) প্রভাতকুমারের জন্ম।

রাণাঘাট পালচৌধুরী বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ হয়। তারপর গিরিডি হাই স্কুল। ১৯০৭ সালের কথা। বাঙলা দেশের ইতিহাসে সে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। বাঙলা দেশ সারা ভারতবর্ষকে সেদিন স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে। পরাধীনতার জ্বালা থেকে মুক্তিলাভের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সে এক বিশেষ যুগ। জননীর বন্ধনমোচনের পবিত্র অঙ্গীকার নিয়ে দেশের ছেলেমেয়েরা দলে দলে সেদিন পুণ্য মুক্তিযজ্ঞে নিজেদের উৎসর্গ করছে। প্রভাতকুমার তখন পনেরো বছরের বালক। বিদেশী দ্রব্য বর্জন সংক্রান্ত এক সভায় যোগদানের জন্যে গিরিডি হাই স্কুলের প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি ছাত্রকে শাস্তি পেতে হল, শাস্তি গ্রহণ করলেন না একজন। ফলে বিদ্যালয় তাঁকে ত্যাগ করতে হল। তিনি প্রভাতকুমার। তারপর ভর্তি হলেন গিরিডি ন্যাশানাল স্কুলে। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন ঐ বিদ্যালয়ের সচিব ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। স্বদেশী মুক্তি-আন্দোলনের সময় গিরিডি ন্যাশানাল হাই স্কুলের মতই বহুসংখ্যক জাতীয় বিদ্যালয় শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—এই বিদ্যালয়গুলি ছিল কলকাতার জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের শেষ পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে প্রভাতকুমার দশ টাকার বৃত্তিলাভ করেন (১৯০৮)। ঐ পরীক্ষার সার্টিফিকেটখানি বাঙলার স্মরণীয় সন্তান শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রাণস্বরূপ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের আহ্বানে ও আন্তরিক প্রভাতকুমার কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কলেজে ভর্তি এই কলেজ তখন বাঙলার অন্যতম ঐতিহাসিক গৃহ ব সাহিত্য-মন্দিরের বর্তমান ভবনে অধিষ্ঠিত ছিল। ছ ছাত্র হিসাবেও প্রভাতকুমার যথেষ্ট মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শন লাগলেন। কিন্তু এখানকার জলহাওয়া তাঁর সহ্য হল তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হ'তে লাগল। গিরিডি নিবাসী শি হিমাংশুপ্রকাশ রায় মহাশয় তখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদ তাঁর মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে শান্তি টেনে নিলেন। ১৯০৯ সালের ৯ই নভেম্বর প্রভা প্রথম প্রণাম নিবেদন করলেন রবীন্দ্রনাথের ঋ চরণপ্রান্তে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বয়েস তখন আ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সেই থেকে তাঁর সংযোগ আজও এবং প্রতিটি দিনে, মাসে, বছরে সেই সংযোগ গভীর হয়ে গ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সুধীসমাজের অন্যতম তীর্থ শান্তিনি প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রভাতকুমারের সেখানে অধিষ্ঠান। বহু ঘটনা, ঐতিহাসিক বহু কাহিনী, বহু আনন্দ-বেদনার প্রভাতকুমার। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে প্রভাতকুমার নিজেই এক বিশেষ অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে সেবায়, পরিচর্যায়, প্রভূত শ্রমে, অক্লান্ত কর্মোদ্যমে এবং দক্ষতায় শান্তিনিকেতন আজ বীজ থেকে বহু শাখাসমৃদ্ধ মহীরুহে পরিণত, সেই তালিকায় প্রভাতকুমারের নাম মালিক্ষবি

১৯২৯ সালে "রবীন্দ্র পরিচয় সভা" স্থাপিত হয়। স হলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী ও সাহিত্যিক সুধীরচন্দ্র কর। স অনুরোধ জানানো হ'ল যে, সভার জন্যে কে কি কাজ করবেন, সে সভাকে লিখিতভাবে জানাতে। প্রভাতকুমার লিখে "...রবীন্দ্রনাথের জীবনী সঙ্কলন করিবার ভার গ্রহণ করি তারই ফল 'রবীন্দ্রজীবনী'। বাঙলার সাংস্কৃতিক কোষাগারের রত্ন। দিকপাল জীবনীকারের জীবনের অক্ষয় কীর্তি। ও ভবিষ্যতের রবীন্দ্র-গবেষণার পক্ষে অপরিহার্য সহায়ক। তথ্যের আকর। রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার অপূর্ব সমাধান।

অধ্যাপক সিলভাঁ লেভীর কাছে তিনি চীনাভাষা শিক্ষা (১৯২০) সর্বপ্রথম মূল চীনা ভাষা থেকে বাঙলাভাষায় প্রকাশ করেন। বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যের প্রচার ও সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে বক্তৃতাদানের জন্যে পেয়েছিলেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এঁর প্রতিভা স্বীকৃত, বাঙলা গ্রন্থের দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে

...হন যথেষ্ট সমাদৃত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এঁর প্রতিভার প্রকৃত পরিচায়ক। নিখিলভারত গ্রন্থাগার পরিষদের ইনি সহকারী সভাপতি ও নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতির আসনও তিনি অলংকৃত করেছেন।

ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণজ্ঞান সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থগুলি তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

বঙ্গীয় জাতীয়শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে হেমচন্দ্র বসুমল্লিক অধ্যাপকরূপে বক্তৃতাদানের জন্যে ইনি আহূত হন (১৯২৭-৩০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক প্রদান করেন ও লীলা লেকচারার ও গত মাসে গিরিশ লেকচারার রূপে বরণ করেন। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রভাতকুমারকে রবীন্দ্র পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৬১ সালে সাহিত্য আকাদামী কর্তৃক রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী পুরস্কারে প্রভাতকুমার বিভূষিত হন। ঐ সময় ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত অধ্যাপকরূপে নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে আমন্ত্রণ আসে, কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় সোভিয়েট আকাদামী অফ সায়েন্সের অতিথিরূপে রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন।

অভিনয় ক্ষেত্রেও তাঁর নৈপুণ্য প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন নাট্যাভিনয়ে তিনি অংশ নিয়েছেন। তাঁর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে 'বিসর্জন'এর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রভাতকুমার অবতীর্ণ হন রঘুপতি নয়, রাজসিংহের ভূমিকায় (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই ভূমিকায় একদা অবতীর্ণ হয়েছিলেন।) প্রসঙ্গক্রমে এই অভিনয়ের ভূমিকালিপি কিয়দংশ নানে উদ্ধৃত করি—রঘুপতি—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, গোবিন্দমাণিক্য—জীবনময় রায়, গুণবতী—অমল হোম প্রভৃতি।

পণ্ডিতপ্রবর সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের বিদুষী কন্যা শ্রীযুক্তা সুধামরী দেবীর সঙ্গে ১৯১৯ সালের ২৭শে মে প্রভাতকুমার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট জীবন একমাত্র যার সঙ্গে তুলনীয়, তার নাম মহাসাগর। সেই মহাসাগরের বন্দনায়, তার উর্মিমালার মর্মবিশ্লেষণে. তার সামনাদ বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দুশ্চর তপস্যায় প্রভাতকুমার আত্মমগ্ন। তিনি নমস্য।

শ্রীমতী চামেলী বসু

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালিকা]

স্বাধীন ভারতের কি সামাজিক কি রাজনৈতিক এবং এমন কি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও যে নারীর মর্য্যাদা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়—শ্রীমতী চামেলী বসু তাহার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। কলিকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারের মেয়ে শ্রীমতী বসু আজ বাংলার নারী সমাজের এক গর্বের বস্তু।

শ্রীমতী চামেলী বসু ১৯১৫ সালে কলিকাতা মহানগরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমতী বসুর স্বর্গগত পিতা ...লাল দত্ত মহাশয় এবং স্বর্গগতা মাতা রাণী দত্ত মহাশয়া উভয়েই তদানীন্তন এক রক্ষণশীল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়াই শ্রীমতী বসুকে পারিবারিক রক্ষণশীল অনুশাসনের মধ্যেই বাল্যের শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। এমন কি নিজ বাসগৃহ হইতে কয়েক গজ দূরে অবস্থিত বেথুন স্কুলে বাল্যের শিক্ষা আরম্ভ করলে শ্রীমতী বসুকে গাড়ী ছাড়া একাকী স্কুলে যাইতে অনুমতি দেওয়া হইত না। এই পারিবারিক রক্ষণশীল আবহাওয়ার মধ্যেই শ্রীমতী বসু ১৯৩১ সালে বেথুন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। ১৯৩৩ সালে শ্রীমতী বসু বেথুন কলেজ হইতে আই-এস-সি এবং ১৯৩৫ সালে ঐ কলেজ হইতে বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। ডিগ্রি অর্জ্জনের পর ১৯৩৭ সালে ডাঃ অমিয় বসুর সহিত শ্রীমতী বসুর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পদিন মধ্যেই শ্রীমতী বসু ঐ বৎসরই লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৯৩৯ সালে লণ্ডন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমতী বসু প্রথিতযশা পরিসংখ্যানবিদ্ [illegible] শিক্ষাব্রতী ডক্টর প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের [illegible] ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল

শ্রীমতী চামেলী বসু

ইন্‌ষ্টিটিউটে যোগদান করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া বিভিন্ন সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে আগত স্নাতকোত্তর ছাত্র ও অফিসারদের জন্য ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ট্রেণিং বিভাগ সংগঠন করেন।

তিনি আন্তর্জাতিক স্ট্যাটিষ্টিক্যাল এডুকেশন সেনেটের ভারতীয় শাখার লেকচারার নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ও এম-এস-সি কোর্সে আংশিক সময়ের লেকচারারের কাজ করেন, শ্রীমতী বসু ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অব কোয়ালিটি কণ্ট্রোল-এর সংগঠন করেন এবং ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত ঐ সংগঠনের সহিত সাময়িক ভাবে লেকচারার রূপে সংশ্লিষ্ট থাকেন। ইনি 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটী ফর কোয়ালিটি কণ্ট্রোল' পত্রিকাটি সম্পাদনার ভারও গ্রহণ করেন

১৯৫৭ সালে শ্রীমতী বসু পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ব্যুরোতে ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়া সরকারী কাজে যোগদান করেন।

১৩৬০ সালের মার্চ্চ হইতে মে পর্য্যন্ত শ্রীমতী বসু অস্থায়িভাবে ডাইরেক্টরের পদ গ্রহণ করেন এবং অতঃপর ১৩৬২ সালের জানুয়ারী হইতে অদ্যাবধি শ্রীমতী বসু পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ব্যুরোর ডাইরেক্টর পদে অস্থায়িভাবে সমাসীনা আছেন। শ্রীমতী বসু রয়েল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটি, (লণ্ডন) এবং কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সদস্যারূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন দীর্ঘ দিন। ১৩৪১ সাল অবধি—বাংলা সরকারের নিউট্রিশন উপদেষ্টা কমিটির ষ্টেটিসটিক্যাল উপদেষ্টা ও সভ্যা ছিলেন। "ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর কোয়ালিটি কণ্ট্রোল" কাউন্সিলের ষ্টেটিষ্টিক্যাল উপদেষ্টা ও সভ্যা ; ১৩৪১ সালে পশ্চিমবঙ্গের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউ-অব রুরাল ও আর্ব্বান প্লানিং-এর কার্য্যকরী সমিতির সভ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ইভ্যালুয়েশন উপদেষ্টা বোর্ডের সভ্যা, পশ্চিমবঙ্গের প্রাইস ইন্‌কোয়ারী কমিটির সভ্যা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষক প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ আসনগুলি ইঁহার দ্বারা অলঙ্কৃত। এবং একক ভাবেও পরিসংখ্যান বিষয়ক কণ্ট্রোল টেকনিক ডবল সেম্পলিং-এর উপর কয়েকখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

শ্রীঅশোকচন্দ্র সেন

[কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ]

প্রভূত পাণ্ডিত্য, অসাধারণ মেধা ও অক্লান্ত কর্মশক্তি যাঁদের সারল্য, বিনয়গুণ ও সহৃদয় মনোভাবকে এতটুকু নিষ্প্রভ করতে পারেনি, বরং উত্তরোত্তর আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅশোকচন্দ্র সেন তাঁহাদের অন্যতম।

অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ এবং দক্ষ বিচারক হিসাবে ইনি যথেষ্ট ন্যায়নিষ্ঠা, বিশ্লেষণীশক্তি ও কর্মোদ্যমের পরিচয় দিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীঅশোকচন্দ্র সেন ১৯০৭ সালে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদেব পরলোকগত নীরোদচন্দ্র সেন এবং মাতা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেনের সুযোগ্য পুত্র শ্রীসেন ঢাকা সহরে বাল্যের শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ঢাকা বোর্ড-অব-এডুকেশন হইতে ১৯২৪ সালে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই· এস· সি পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রে অনার্স লইয়া ডিগ্রি-ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে অর্থশাস্ত্রে অনার্স সহ ডিগ্রি লাভ করেন। ডিগ্রি লাভ করিবার পর শ্রীসেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রে এম-এ ক্লাশে ভর্তি হন। তখনকার দিনে অর্থনীতির দুইটি বিভাগেই পরীক্ষা দিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং শ্রীসেন উভয় বিভাগেই উত্তম ফল লাভ করিয়া ১৯৩১ সালে এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন। এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর শ্রীসেন আইন-কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৩২ সালে বি-এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে শ্রীসেন এম-এল পরীক্ষায়ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। আইন-পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া শ্রীসেন ১৯৩৩ সালে কলিকাতায় আইন-ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং সুনামের সহিত দীর্ঘদিন আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন।

শ্রীসেন ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত কার্তিকপুর গ্রামের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সুখেন্দুশেখর সেনের কন্যা শ্রীমতী সুপ্রভা সেনকে বিবাহ করেন।

শ্রীঅশোকচন্দ্র সেন

শ্রীসেন স্বীয় আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকাকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপনাও করিয়াছেন দীর্ঘদিন।

মার্কেন্টাইল ল-কমিটির চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রশ্নকর্ত্তা হিসাবে শ্রীসেনের নাম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীহেমেন গঙ্গোপাধ্যায়

[প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-সেবী এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ]

কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে যাঁদের প্রতিভা সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা সমান দক্ষতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন নানাভাবে, শ্রীহেমেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে, জনসেবায়, সমাজসেবায়, ব্যবসায়-জগতে, চলচ্চিত্র-শিল্পে বাঙলার এই কৃতী সন্তানের নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি রোটারি ইণ্টারন্যাশানাল ডিষ্ট্রিক্ট ৩২৫ (পূর্বভারত, পূর্বপাকিস্তান, ব্রহ্ম, নেপাল) এর বার্ষিক অধিবেশনে ১৯৬৩-৬৪ সালের গভর্ণর মনোনীত হয়ে এই তরুণ বাঙালী বহুজনের আনন্দবর্ধন করেছেন।

বাঙলার ছেলে কিন্তু নিবাস বহির্বঙ্গে—রাঁচীর এক বর্ধিষ্ণু ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হেমেন গঙ্গোপাধ্যায় ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। রায়বাহাদুর এস, এন, গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র তিনি। রাঁচী তথা সমগ্র বিহারের আজকের এই ব্যাপক

বিষয়ে রায়বাহাদুরের অবদান যেমনই বিরাট, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া লোকহিতকর বহু কার্যে তাঁর সহৃদয় পৃষ্ঠপোষণা ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় শিক্ষালাভ করেন রাঁচী ও পাটনায়। ছাত্র-জীবন তাঁর গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি অসাধারণ মেধা প্রদর্শন করেন। বি-এ-তে সংস্কৃতে অনার্স ছিল। অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইংরাজী

শ্রীহেমেন গঙ্গোপাধ্যায়

ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীব প্রথম স্থান তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য পরম আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন।

রাঁচী উইমেনস কলেজের নাম শিক্ষাজগতে আজ সুবিদিত। বিহারের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে এই মহাবিদ্যালয় এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই বিশিষ্ট শিক্ষায়তনটি শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে ১৯৪৯ সালে। তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে গত ১২ই আগষ্ট ১৯৬২ রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কনষ্টিটিউয়েণ্ট কলেজে পরিণত হওয়া পর্যন্ত তিনি এর সচিবের দায়িত্বও পালন করেছেন ১৯৬০ সালে বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইনি বিহার বিশ্বিদ্যালয়ের সেনেটের অন্যতম সদস্য ছিলেন। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার এঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সিণ্ডিক হিসেবে মনোনীত করেছেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত ইনি রাঁচী পৌরসভার অন্যতম কমিশনার ছিলেন। রাঁচী ডিষ্ট্রীক্ট কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য, রাঁচী টাউন কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সচিব, রাঁচী ডিষ্ট্রীক্ট ইয়ুথ কংগ্রেসের সভাপতির সম্মানজনক আসনগুলি এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত।

দেশীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে এঁর সংযোগ যেমনই ঘনিষ্ঠ, তেমনই নিবিড়। প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক হিসাবে সারা ভারতে তিনি ব্যাপক প্রসিদ্ধি ও বিপুল সুনাম অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের কর্ণধারদের মধ্যে আজ একটি বিশেষ আসন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের লেখনীধন্য "ক্ষুধিতপাষাণ"-এর চলচ্চিত্র রূপায়ণ প্রযোজক হিসেবে তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। ক্ষুধিতপাষাণ ছবিটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সমাদরে বিভূষিত হয়ে এবং ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত হয়ে বাঙলা ছবির মান ও সম্মান বহুগুণ উন্নত করেছে।

পৃথিবীর বহু দেশ ইনি পরিক্রমণ করেছেন। বিশ্বের নানা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বহু রোটারি মিটিং-এ ইনি যোগ দিয়েছেন। আগামী মে মাসে ইনি যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করছেন।

এই আটত্রিশ বছর বয়স্ক কৃতী বাঙালী নানাভাবে বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার প্রগাঢ়তা আজ প্রমাণিত। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করে আপন কর্মে ও কৃতিত্বে দেশের ও জাতির গৌরব আরও বিবর্ধিত করুন এবং দেশের আরও বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করুন—এই কামনা করি।

LIBERTY OF PUBLICATION

"Every good Ruler, who is convinced of the imperfection of human nature, and reverences the Eternal Governor of the world, must be concious of the great liability to error in managing the affairs of vaast empire; and therefore he wiil be anxious to afford every individual the readiest means of bringing to his notice whatever may require his interference. To secure this important object, the unrestrained Liberty of Publication, is the only effectual means that can be employed. And should it ever be abused, the established Law of the Land is very properly armed with sufficient powers to punish those who may be found guilty of misrepresenting the conduct or character of Government, which are effectually guarded by the same Laws, to which Individuals must look for protection of their reputation and good name."—Memorial to the Supreme Court.

—*Rammohun Roy*

বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০
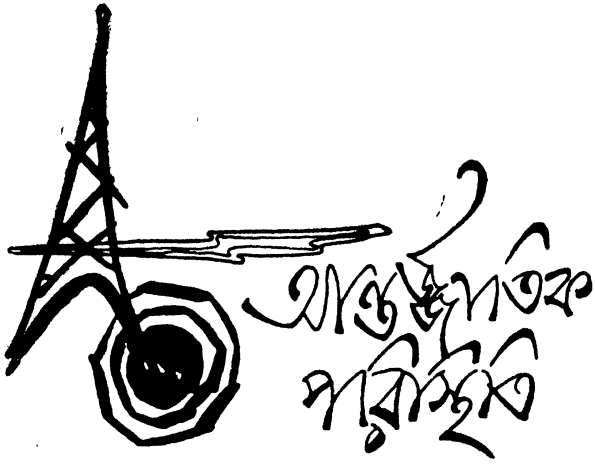
ইরাকে আবার সামরিক বিদ্রোহ—

১৯৫৮ সালের ১৪ই জুলাই মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছিল। সে ভূমিকম্পে ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল ইরাকের হাসেমাইট্ রাজতন্ত্র; নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল নুরী এস-সৈয়দের প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচার। বাগদাদ চুক্তিসংস্থা হইতে "বাগদাদ" সেদিন অপসারিত হয় অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। পাশ্চাত্ত্য শক্তি সেদিন প্রমাদ গণিয়াছিল; তরুণ সামরিক কর্ম্মচারী জেনারেল কাশেমের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক অভ্যুত্থান তখন যে প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা লইয়া মধ্য প্রাচ্যের রাজনৈতিক অঞ্চলে আবির্ভূত হয়, তাহা বাস্তবে পরিণত হইলে এই অঞ্চলে পাশ্চাত্ত্য শিবিরের সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সত্যই বিপর্য্যস্ত হইত। লণ্ডন 'টাইমস্' যেদিন লেখেন, The crisis in Iraq is the crisis of the West's position in the Middle East... If the revolt succeeds it could be a disaster for the West. Certainly that is how the world will interpret it.

অর্থাৎ, ইরাকের সঙ্কট প্রকৃতপক্ষে মধ্য-প্রাচ্যে পাশ্চাত্ত্য শক্তির সঙ্কট। বিদ্রোহ যদি সফল হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্ত্যের পক্ষে উহা বিপর্য্যয়কর হইতে পারে; সমগ্র জগৎ নিশ্চয়ই বিষয়টিকে সেইভাবে ব্যাখ্যা করবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘের (লীগ অব নেশানসের) ম্যাণ্ডেটে ইরাক বৃটেনের হাতে আসে। ১৯৩০ সাল হইতে ইরাক কিছু কিছু স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করে, এবং তখন হইতেই জেনারেল নুরী এস-সৈয়দ ইরাকের রাজনীতির সর্ব্বেসর্ব্বা। মহাযুদ্ধের সময় তথাকথিত "আরবের লরেন্সের" (প্রাব পাশা) সহিত একত্রে অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন; মধ্য প্রাচ্যে বৃটিশের এমন অকৃত্রিম মিত্র আর ছিল না। ইরাক্ সামরিক ক্যু-এর দেশ; ১৯৩৬ সালের অভ্যুত্থানে সামরিক কর্ম্মচারীরা দশ মাস ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকে; ১৯৪১ সালে ন্যাৎসীপন্থী কর্ণেলদের ক্যু-দ্য-আতাৎ চারি মাস পরে বৃটিশের আক্রমণে স্তব্ধ হয়; ১৯৪৮ সালে ইঙ্গ-ইরাক চুক্তির প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত জনতা কয়েক সপ্তাহ বাগদাদ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। এই সব ঘটিবার সময় প্রত্যেকবারই নুরী এস-সৈয়দ দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, এবং পরে বৃটিশের আশ্রয়ে বিজয়গর্ব্বে বাগদাদে ফিরিয়া আসেন। বৃটিশের ট্যাঙ্ক-কামান ও বিমানের সাহায্যে এবং শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্ম্মচারী ও সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের সহযোগে তিনি দেশ শাসন করতেন—ইহারাই পার্লামেণ্ট নামক ইরাকী প্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য করিত। সমস্ত রাজনৈতিক দল ছিল নিষিদ্ধ, সংবাদপত্রের উপর কড়া সেন্সর, দশ হাজার বন্দী কারাগারে। এই কণ্টকাসনের উপর নিজেকে কতকটা নিরাপদ মনে করিবার পর নুরী দেশ গঠনে মন দিয়াছিলেন। ১৯৫২ সালের পর হইতে তৈলের রয়্যালটির একটা বড় অংশ সেচের ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন এবং শিল্প স্থাপনে ব্যয় হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সৈয়দী প্রতিক্রিয়াশীলতা বিন্দুমাত্র কমে না। ১৯৫৫ সালে নুরী এস-সৈয়দ পাশ্চাত্ত্য শক্তির অনুচররূপে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক জোট গঠনে মনোযোগী হন। আরব জগতে একমাত্র ইরাক্ তখন তুরস্কের সহিত সামরিক চুক্তিতে (বিখ্যাত বাগদাদ চুক্তি) আবদ্ধ হয়। তুরস্ক পূর্ব্বেই উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটোর) সভ্য হইয়াছিল; তাহার সহিত সামরিক চুক্তির দ্বারা ইরাক পাশ্চাত্ত্যের সামরিক জোটের সহিত পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়। নুরী এস-সৈয়দ অন্য কোনও আরব রাষ্ট্রকে এই চুক্তিতে যোগদানে সম্মত করাইতে পারেন নাই: পরে, তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ ও পাকিস্থানকে লইয়া গড়িয়া ওঠে বাগদাদ-চুক্তি-সংস্থা। ১৯৫৮ সালে জেনারেল কাশেমের সামরিক ক্যু-দ্য-আতাতে এই চুক্তি সংস্থার প্রধান স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার পর অবশিষ্ট তিনটি সভ্য রাষ্ট্র তাহাদের সামরিক জোটকে কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা ("সেন্টো"—সেণ্ট্রল ট্রিটি অর্গানাইজেশান্) নাম দিয়াছেন।

১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে ইরাকে প্রতিক্রিয়ার বাধা সত্যই ভাঙ্গিয়াছিল। রাজতন্ত্রের অবসানে ইরাকে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইরাক জোট-নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির অনুবর্ত্তী হয়। কিন্তু এই অভ্যুত্থানে ইরাকের অভ্যন্তরে এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে যুবসমাজের মনে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কাশেম তাহা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ষড়যন্ত্রকারীরূপে এবং সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালনের ব্যাপারে তিনি খুবই দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তিনি একেবারেই অযোগ্য। রাজতন্ত্রের এবং নুরী এস সৈয়দের স্বৈরাচারের অবসান হইবার পর জনসাধারণ কাশেমতন্ত্রকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু কাশেম এই জনসমর্থনের যথাযথ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া ওঠেন। বিশেষতঃ ১৯৫৯ তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা এবং মসুলের বিদ্রোহের পর হইতে তাঁহার এই সন্দেহ-বায়ু আরও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া এবং ধূর্ত্ততার সহিত এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়া তিনি নিজেকে নিরঙ্কুশ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাথ সোস্যালিষ্ট ও ইস্তিকলাল পার্টি সংযুক্ত-আরব-সাধারণতন্ত্রের সহিত ইরাকের ঘনিষ্ঠতা চাহিতেছিল। কাশেম্ ইহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি ঐ দুইটি দলের বিরুদ্ধে উগ্র কম্যুনিষ্টদিগকে নিয়োগ করেন; ইহারা কম্যুনিষ্ট দলনকারী নাসেরের কর্ত্তৃত্ব ইরাকে বিস্তারিত হইবার একান্ত বিরোধী ছিল। ইহার পর কম্যুনিষ্টরা যখন আমূল ভূমি সংস্কারের জন্য চাপ দিতে থাকে, তখন কাশেম তাহাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী দলগুলিকে লেলাইয়া দেন। পরবর্ত্তীকালে জাতীয়তাবাদী দলগুলির মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তিনি কতকগুলি

বিবদমান উপদল সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। এক একটি দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া অন্য দলকে পঙ্গু অথবা নিশ্চিহ্ন করিবার নীতি অনুসৃত হয় অত্যন্ত ভয়ঙ্করভাবে। কাশেম্ যখন কম্যুনিষ্টদের দিকে ঝুঁকিয়া ছিলেন, তখন কম্যুনিষ্ট সন্ত্রাসবাদীদিগকে শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে নির্বিবাদে খুন-খারাপী চালাইতে দেওয়া হয়। আবার কম্যুনিষ্টদের দমন করিবার নীতি যখন গৃহীত হয়, তখন প্রকাশ্য রাজপথে কম্যুনিষ্ট যুবক-যুবতীদের খুন করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। কুর্দ দিগকে কাশেম্ সমান অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিবার প্রতিশ্রুতি শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দমননীতির রুদ্র রূপই তাহারা দেখিল, যে নীতির বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হয় এবং গত দুই বৎসর সে বিদ্রোহ চলিতেছে। কুর্দ বিদ্রোহ দমনের জন্য কাশেম্ কুর্দ অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে অগ্নিস্রাবী বোমাও বর্ষণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, গত সাড়ে চার বৎসরে কাশেম্ দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে তাঁহার শত্রু করিয়াছেন, উপজাতীয়দিগকে ক্ষেপাইয়াছেন, সহর ও গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে নিরাশ ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। ১৯৫৮ সালে যে সব ঘনিষ্ঠ মিত্র কাশেমের পাশে ছিল এবং সেই সময়কার অভ্যুত্থানে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে; তাঁহার কোপানলে পড়িয়া যাহারা ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও কম নহে।

এই কাশেম তন্ত্রের বিরুদ্ধে কর্ণেল মুস্তাফার নেতৃত্বে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী যে বিদ্রোহ হয়, তাহা সেনাবাহিনী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা ইরাকী জনগণের বিক্ষোভেরই অভিব্যক্তি। কাশেমতন্ত্রের অবসানে এবং ঘাতকের হাতে কাশেম এবং তাঁহার সহযোগী মাহদয়াই শেখ আমেদ, তাহের প্রভৃতি নিহত হওয়াতে ইরাকে কেহ অশ্রুপাত করে নাই—একমাত্র কাশেমের অনুগৃহীত কয়েকজন নিজেদের অসহায় মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া থাকিবে। অবশ্য, ৮ই ফেব্রুয়ারীর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টরা বাগদাদের সহরতলীতে, বাসরায় এবং নাজাফে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ইহা কম্যুনিষ্টদের কাশেম্-প্রীতির পরিচায়ক নহে। ৮ই ফেব্রুয়ারীর বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোক্তা বাৎ সোস্যালিষ্টদের সহিত কম্যুনিষ্টদের যে চিরন্তন বিরোধ, তাহাই কম্যুনিষ্টদের এই সশস্ত্র বিরুদ্ধতার প্রকৃত কারণ। গত সপ্তাহের বিদ্রোহের পর ইরাকে যে গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে বাৎ সোস্যালিষ্টদেরই প্রাধান্য। নূতন প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন আবাদস্ সালেম্ আরেফ্; ইনি এক সময়ে কাশেমের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং ১৯৫৮ সালের ১৪ই জুলাই-এর বিদ্রোহে তিনি বাগদাদ অধিকার করেন। নূতন মন্ত্রিমণ্ডলেরও কাশেমের অনেক সহযোগী আছেন, যাঁহারা পরে কাশেমের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া যথেষ্ট অত্যাচার সহিলেও প্রাণে বাঁচিয়া ছিলেন। নূতন গভর্ণমেন্ট যদি ইরাককে প্রকৃত গণতন্ত্র ও সোস্যালিজিমের পথে পরিচালিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই এই বিদ্রোহের সার্থকতা।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ঝড়ের আভাস—

আগামী ৩১শে আগষ্ট তারিখে মালয়, সিঙ্গাপুর, বৃটিশ বোর্ণিও, সারোয়াক ও ব্রুণি লইয়া মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠিত হইবার কথা। এই পরিকল্পনার প্রধান রচয়িতা মালয়ের প্রধান মন্ত্রী টেঙ্কু আবদুল রহমান সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে এই নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী মালয়েশিয়া প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে কি না, বলা যায় না। গত ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বপ্রধান বৃটিশ তৈল-কেন্দ্র ব্রুণিতে এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্য দুইটি রাজ্যে যে বিদ্রোহ হইয়াছিল, শক্তিশালী বৃটিশ সৈন্য নিয়োগ করিয়া তাহা দমন করা সম্ভব হইয়াছে মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহীদের তৎপরতার ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছে; বিদ্রোহীরা নগর ও লোকালয় ছাড়িয়া আশ্রয় লইয়াছে বন-জঙ্গলে এবং দীর্ঘকালব্যাপী গেরিলা-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তর বোর্ণিওর জঙ্গলে সন্নিবিষ্ট গেরিলা সৈন্যের সংখ্যা এখন বিশ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া চল্লিশ হাজারে পরিণত হইয়াছে। বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করিতেছেন ইনুচ জজাহবির রায়াকাৎ পার্টি, যে পার্টির প্রার্থীরা গত আগষ্ট মাসের নির্ব্বাচনে ব্রুণির আইন-পরিষদের সমস্ত আসন (মনোনীত প্রার্থীদের জন্য নির্দ্ধারিত আসনগুলি ছাড়া) অধিকার করিয়াছিলেন। ইন্দোনেশিয়া টেঙ্কু আবদুল রহমানের মালয়েশিয়া পরিকল্পনার বিরোধিতা করিতেছে; বিশেষতঃ বোর্ণিওর উত্তরাঞ্চলের বৃটিশ বোর্ণিও, সারোয়াক্ ও ব্রুণিকে ঐ ফেডারেশানের অন্তর্ভুক্ত করিবার সে বিরোধী—ইহাতে বোর্ণিও দ্বীপের ইন্দোনেশীয় অংশ বিপন্ন হইবে বলিয়া সে মনে করে। উত্তর বোর্ণিওর গেরিলা বাহিনীর সহিত বৃটিশ সৈন্যের এখন যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে যোগ দিবার জন্য ইন্দোনেশিয়ার স্বেচ্ছা সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হইয়াছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে; মালয়ে কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের সহিত যুদ্ধে যাহারা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদিগকে এখানে পাঠানো হইতেছে।

টেঙ্কু আবদুল রহমান একদিকে উত্তর বোর্ণির বিদ্রোহ দমনের জন্য বৃটিশ সৈন্যের উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং সিঙ্গাপুরে মালয়েশিয়া বিরোধী তৎপরতা দমনের জন্য দমন-নীতির আশ্রয় লইয়াছেন। সিঙ্গাপুরে শান্তি রক্ষার ভার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কাউন্সিলের উপর; বৃটেন, মালয় ও সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধি লইয়া কাউন্সিল গঠিত। গত ২রা ফেব্রুয়ারী এই কাউন্সিলের আদেশে সিঙ্গাপুরের শতাধিক সোস্যালিষ্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাহাদের পত্র-পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কারণ—১৯৬১ সালে প্রথম যখন মালয়েশিয়ার পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়, তখন সিঙ্গাপুরের শাসক দল—পিপ্‌লস্ য়্যাকশন্ পার্টির তের জন সদস্য লিফ্ চিন্ সিওএর নেতৃত্বে দল ছাড়িয়া সোস্যালিষ্ট ফ্রন্ট গঠন করেন। এই দলের মালয়েশিয়া-বিরোধী প্রচারকার্য্য জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করে। এইরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে ১৯৬৩ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে লী কুয়ান্ ইউর পিপল্‌স্ য়্যাকশান পার্টি হয়ত সোস্যালিষ্ট ফ্রন্টের নিকট পরাজিত হইবে। এই সময় সিঙ্গাপুরের সংবিধান সংশোধন হইবার কথা; সুতরাং নির্ব্বাচনে সোস্যালিষ্ট ফ্রন্ট জয়ী হইলে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটীর নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে। এই জন্য ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দারুণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিঙ্গাপুর-মালয়ের সংযুক্তি সম্পর্কে সিঙ্গাপুরে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণকে

বাধ্যতামূলকভাবে ভোট দিতে হইয়াছিল, না দিলে রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত হইবার বিধান; সংযুক্তির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সুযোগই ছিল না, ব্যালট বাক্সের সাদা ভোটের কাগজ এবং অনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত ভোটের কাগজ সংযুক্তির পক্ষে ভোট বলিয়া গণ্য হয়। এইভাবে গণভোটের ব্যবস্থা করিয়া সিঙ্গাপুর-মালয়ের সংযুক্তির পক্ষে জনমত আদায় করিলেও টেঙ্কু ও লী নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই—সোস্যালিষ্ট ফ্রন্ট হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া তাঁহাদের মনে আশঙ্কা ছিল। বর্ত্তমানে বোর্ণিও দ্বীপে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সর্ব্বাত্মক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময় তাঁহারা "রিয়ার" ঠিক করিয়া লইলেন।

মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের আয়োজনে এখন সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দিতেছে। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ইন্দোনেশিয়ার স্বরাষ্ট্র সচিব ডাঃ সুবান্দ্রিও স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে, বোর্ণিওর উত্তরাঞ্চল মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা তাঁহারা সহ্য করিবেন না—মালয় যদি তাহার প্রতিজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া এই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হয়, তাহা হইলে মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। ডাঃ সুবান্দ্রিও-র এই সতর্কবাণীর উত্তরে মালয়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার এই বিরোধের পরিণতি কি হইবে, তাহা পরের কথা। আপাততঃ উত্তর-বোর্ণিওর বিদ্রোহীরা ইন্দোনেশিয়ার সাহায্যে আরও শক্তিশালী হইবে এবং তাহাদের গেরিলা তৎপরতা অদম্য হইয়া উঠিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মালয়েশিয়া সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত; দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটিশের সামরিক স্বার্থ ও অর্থ নৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে এই ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা হইয়াছে—ইন্দোনেশিয়ার সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে নব-সাম্রাজ্যবাদের এই সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার আয়োজনে ইন্দোনেশীয় সরকারের উৎকণ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। এমন কি সিয়াটোর সভ্য ফিলিপাইন্সও ইন্দোনেশিয়া ফেডারেশন গঠনের আয়োজনকে সুনজরে দেখিতেছে না; ফিলিপিনো প্রেসিডেণ্ট মাকাপাগাল ইহাকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মালয়েশিয়া সম্পর্কে বৃটেনের উৎসাহের প্রকৃত কারণ এই যে, এই ব্যবস্থায় ব্রুণির তৈলক্ষেত্রে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব নিরাপদ থাকিবে বলিয়া লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিতেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ব্রুণি সর্ব্বপ্রধান তৈল অঞ্চল; এখানে প্রতি বৎসর পঞ্চাশ লক্ষ টন তৈল উৎপন্ন হয়। সন্ধান লইয়া জানা গিয়াছে যে, এখানকার ভূ-নিম্নে অন্যান্য বহুমূল্য ধাতু—এমন কি পারমাণবিক বিস্ফোরণের পদার্থও রহিয়াছে। সামরিক দিক হইতেও বৃটেন এই অঞ্চলকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সিঙ্গাপুরের বৃটিশ ঘাঁটির এখন আর পূর্ব্বের গুরুত্ব নাই। ব্রুণি ও সারওয়াকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কম্যাণ্ডের যে নৌ ও বিমান-ঘাঁটী রহিয়াছে, উহাকে উন্নত করিয়া বৃহত্তর সামরিক ঘাঁটী গড়িয়া তোলা বৃটিশ সমর বিভাগের উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গতঃ ইহাই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বোর্ণিও ও সারওয়াকে অধিবাসীর জাতিগত সম্পর্ক ইন্দোনেশীয়দের সহিতই ঘনিষ্ঠতর।

কানাডায় রাজনৈতিক সঙ্কট—

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কানাডায় কনজার্ভেটিভ (ডিফেনবেকার) মন্ত্রিমণ্ডলের পতন হইয়াছে। কনজার্ভেটিভ পার্টি ১৯৫৭ সালে কানাডার শাসনক্ষমতা হাতে পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৎসর সাধারণ নির্ব্বাচনে কনজার্ভেটিভ পার্টি বিপুল সাফল্য লাভ করে। ১৯৬২ সালে জুন মাসের নির্ব্বাচনে এই পার্টির পার্লামেণ্টে বৃহত্তম পার্টিরূপে আবির্ভূত হইলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর থাকে না। পার্লামেণ্টের দুই শত ষোলটি আসনের মধ্যে এক শত ষোলটি ডিফেনবেকারের কনজার্ভেটিভ পার্টি অধিকার করিয়াছিল। সোস্যাল ক্রেডিট পার্টির ত্রিশ জন সদস্যের সমর্থনে সংখ্যালঘু কনজার্ভেটিভ পার্টির গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি মিষ্টার পিয়ার্সনের লিবারেল পার্টি কর্ত্তৃক উত্থাপিত অনাস্থা-প্রস্তাবে সোস্যাল ক্রেডিট ডিফেনবেকার মন্ত্রিমণ্ডলকে সমর্থন করে নাই এবং তাহার ফলেই মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটিয়াছে। কানাডার পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার প্রশ্নই মন্ত্রীসঙ্কটের আশু কারণ; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই ব্যাপারে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ রাস্ক পরে ইহার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করিলেও কানাডায় রাজনীতির ক্ষত শুকায় নাই—আগামী ৮ই এপ্রিল যখন সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে, তখন মার্কিণ বিরোধিতা নির্ব্বাচনী প্রচারের বড় উপকরণ হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার সম্ভাবিত আকস্মিক পারমাণবিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে কানাডার দক্ষিণ অঞ্চলে আমেরিকার "বোমার্ক" মিসাইল সংস্থাপিত হইয়াছে এবং "ভডু" নামক পারমাণবিক অস্ত্রবাহী জঙ্গী বিমান রাখা হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত করা হয় নাই। এই ব্যাপার লইয়া কানাডার রাজনীতিক্ষেত্রে মনোমালিন্য চলিতেছিল; প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডিফেনবেকার ও তাঁহার পররাষ্ট্র সচিব মিঃ গ্রীণের মনোভাব—কানাডীয় রাজ্যে অবস্থিত পারমাণবিক অস্ত্র কানাডার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা উচিত। কিন্তু ইহা কার্য্যতঃ সম্ভব নয়, কারণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রে বৈদেশিক শক্তির কর্ত্তৃত্ব মার্কিণ আইনে নিষিদ্ধ। পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে কানাডার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যখন এইরূপ মনোমালিন্য চলিতেছিল, সেই সময় মার্কিণ পররাষ্ট্র বিভাগের প্রচারিত এক বিবৃতিতে ডিফেনবেকার মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে সমালোচনা হয় যে, তাঁহারা উত্তর আমেরিকার প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবস্থা করিতেছেন না। ইহাতে কানাডীয় রাজনীতিতে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—ব্যক্তিগত ও দলীয় বিরোধ তীব্র হইয়া উঠে। কানাডার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ হার্কনেস্, পারমাণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণে কানাডার কর্ত্তৃত্বের প্রশ্ন না তুলিয়া অবিলম্বে "বোমার্ক" মিসাইল ও "ভডু" বিমানকে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করার দাবী জানান এবং এই দাবীতে তিনি পদত্যাগও করেন। তাহার পর ডিফেনবেকার মন্ত্রীমণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এবং উহার পতন। মার্কিণ পররাষ্ট্র বিভাগের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আমেরিকায়ও সমালোচনা হইয়াছে। "নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" বলেন—

The State Department's ill-timed and ill-tempered public complaint about Canada's nuclear policy is a masterpiece of gaucherie unprecedented in our time...Our disagreement with Canada is of long standing. Washington

argues that the defence of North America is endangered unless Canada accepts nuclear weapons for the Bomarc missiles and Voodoo jet intercepters now supplied by the United States. The argument was not solely between Washington and Ottawa, however, but between Mr. Diefenbaker and his opposition as well as between factions within conservative party.

অর্থাৎ, কানাডার পারমাণবিক নীতি সম্পর্কে (মার্কিণ) পররাষ্ট্র বিভাগের অসময়োচিত ও অভদ্রোচিত প্রকাশ্য অভিযোগ বর্ত্তমান কালের চরম আহাম্মকি।...কানাডার সহিত আমাদের মতবিরোধ বহু দিনের। ওয়াশিংটনের (কর্তৃপক্ষের) যুক্তি এই যে, কানাডাকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে বোমার্ক মিসাইল ও অবরোধকারী ভুড় জেট, বিমান সরবরাহ করিয়াছে, তাহার জন্য কানাডা পারমাণবিক অস্ত্র গ্রহণ না করায় উত্তর-আমেরিকার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা বিপন্ন হইতেছে। কিন্তু এই বিতর্ক শুধু ওয়াশিংটন ও অটোয়ার (কর্তৃপক্ষের) মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—মিঃ ডিফেনবেকার ও তাঁহার বিরোধী পক্ষের মধ্যে এবং তাঁহার রক্ষণশীল দলের অভ্যন্তরেও এই বিতর্ক চলিতেছে। 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে'র এই মন্তব্যের সারমর্ম্ম—কানাডার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে যে বিতর্ক চলিতেছিল, মার্কিণ পররাষ্ট্র বিভাগ, কূটনৈতিক রীতি লঙ্ঘন করিয়া সে বিতর্কে একটি পক্ষ সমর্থন করিয়াছে।

সরোয়ান সিংহ—ভুট্টো বৈঠক—

কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে ভারতের রেলওয়ে মন্ত্রী সরোয়ান সিং ও পাকিস্থানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর মধ্যে করাচীতে তৃতীয় দফা বৈঠক হইয়া গিয়াছে ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। চতুর্থবার কলিকাতায় আলোচনা হইবে আগামী ৯ই মার্চ্চ হইতে। ভুট্টো-সরোয়ান সিং আলোচনার গতি সম্বন্ধে সরকারীভাবে কোনও সংবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে, ইহা আর অজানা নাই যে, কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কে গণ-ভোটের একমাত্র দাবী আঁকড়াইয়া না থাকিয়া পাকিস্থান এখন অন্য উপায়ে তাহার মতলব হাঁসিল করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্থানের প্রবেশাধিকারকে মূলনীতি হিসাবে মানিয়া লইবার জন্য মার্কিণ কর্তৃপক্ষ পরামর্শ দিয়াছিলেন। সেই মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া পাকিস্থানের পক্ষ হইতে দাবী করা হইতেছে যে, তাহার রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীসমূহের উৎপত্তিস্থল তাহাকে দিতে হইবে। ইহা দিতে হইলে জম্মু ও লাদাকের মধ্যবর্ত্তী একটি ফালি ব্যতীত কাশ্মীর-উপত্যকার সবই ভারতকে ছাড়িতে হয়। ভারতের পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধবিরতি-রেখা ধরিয়া পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে কাশ্মীর বিভক্ত হইতে পারে; এই ব্যবস্থার কিছু অদল-বদল ভারত বিবেচনা করিতে প্রস্তুত,—তবে বড় রকমের কোনও পরিবর্ত্তন সে মানিবে না। কলিকাতা-বৈঠকে দুই পক্ষের এই মনোভাবের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য সাধনের ব্যবস্থা হয়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য,
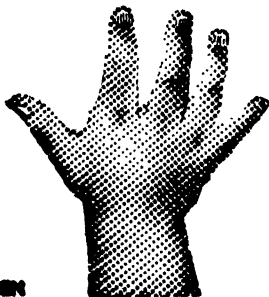
পঞ্চম টেষ্টে ইংলণ্ড দলের ব্যাটিং-এ কেন ব্যারিংটনের কৃতিত্বই সর্ব্বাধিক। তিনি প্রথম ইনিংসে ১০১ রাণ করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৪ রাণ করে মাত্র ছয় রাণের জন্য শত রাণে বঞ্চিত হন। ইংলণ্ডের বোলিং-এ টিটমাস সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাফল্য অর্জ্জন করেছেন।

অষ্ট্রেলিয়া দলের ব্যাটিং-এর কথা উল্লেখ করতে হলে—প্রথমে পটার বার্জ্জের নৈপুণ্যের কথা বলতে হয়। তিনি প্রথম ইনিংসে ১০৩ রাণে আউট হ'লেও দ্বিতীয় ইনিংসে ৫২ রাণে অপরাজিত থাকেন। তাদের ডেভিডসন ও বেনডের বোলিং বিশেষ প্রশংসনীয় হয়।

রাণ সংখ্যা

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ৩২১ (ব্যারিংটন ১০১, ই· ডেক্সটার ৪৭, ডেভিডসন ৪৩ রাণে ৩ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ৩৪৯ (পিটার বার্জ্জ ১০৩, ও· নীল ৭৩, আর বেনড ৫৭, আর সিম্পসন ৩২ ;

ইংলণ্ড ২য় ইনিংস (৮ উইঃ ডিঃ) ২৬৮ (ব্যারিংটন ৯৪, শেফার্ড ৬৮, কাউড্রে ৫৩ ; ডেভিডসন ৮০ রাণে ৩ উইঃ, বেনড ৭১ রাণে ৩ উইঃ ও ম্যাকেঞ্জি ৩২ রাণে ২ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস (৪ উইঃ) ১৫২ (পিটার বার্জ্জ নট আউট ৫২, লরি নট আউট ৪৫ ; এ্যালেন ২৬ রাণে ৩ উইঃ)।

এশীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ

সাউথ ক্লাব লনে এবার এশীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসে। টেনিস ইতিহাসে বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের এখানে মিলন ঘটেছে। এবারকার প্রতিযোগিতায় একাধিক আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়ের যোগদানের কথা ছিলো। তাঁরা না আসায় কলকাতার টেনিস রসিকদের হতাশ হতে হয়েছে। নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীসামসের সিং-এর বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলে এবারকার এশীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রায় প্রহসনে পর্য্যবসিত হয়। এশীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম। নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতির বিগত সেপ্টেম্বর মাসের বৈঠকে স্থির হয়েছিলো যে এবারকার প্রতিযোগিতা কলকাতায় হবে। সম্ভবতঃ শ্রীসামসের সিং-এর এই সিদ্ধান্ত মনঃপুত ছিল না। যার ফলে তিনি শেষ পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতা বানচাল করার চেষ্টার কোন ত্রুটী করেন নি।

এশীয় টেনিস প্রতিযোগিতার ডাবলস ফাইন্যালে জয়ী কৃষ্ণান ও নরেশ কুমার

ডেভিস কাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার ও হাঙ্গেরীর খেলোয়াড়রা হাজির হননি। বৈদেশিক খেলোয়াড়দের ভিতর ছিলেন জাপানের দু'জন ইশিগুরো ও ও· এম· ফুজি এবং ইস্রায়েলের দু'জন ডেভিডম্যান ও ডুবিড্স্কী। ডেভিডম্যান ইস্রায়েলের পয়লা নম্বর খেলোয়াড়। ইশিগুরো জাপানের এক নম্বর খেলোয়াড়ভুক্ত। বাছাই করা খেলোয়াড় হিসাবে মনোনীত হন আটজন—(১) রমানাথ কৃষ্ণান (ভারত) (২) ইশিগুরো (জাপান) (৩) জয়দীপ মুখার্জ্জী (ভারত) (৪) প্রেমজিৎ লাল (ভারত) (৫) ডেভিডম্যান (ইস্রায়েল) (৬) আখতার আলি (ভারত) (৭) পরেশকুমার (ভারত) (৮) ফুজি (জাপান)।

বৈদেশিক খেলোয়াড়রা আশানুরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে না পারায় অধিকাংশ ফাইন্যালগুলিই ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইন্যালে ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণান ৬—৪, ৬—২ ও ৬—৪ সেটে জয়দীপ মুখার্জ্জীকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার এশীয় চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৫৯ সালে ব্যারী ম্যাকেকে পরাজিত করে কৃষ্ণান প্রথম এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জ্জন করেছিলেন। পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যালে কৃষ্ণান ও নরেশ কুমার ৭—৫, ৬—১, ৩—৬, ৩—৬ ও ৬—১ সেটে জয়দীপ মুখার্জ্জী ও প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণান এবার 'ত্রিমুকুট' লাভ করেছেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যালে আখতার আলি ও রিটা সুরাইয়া ১০—৮ ও ৮—১ সেটে ডেভিডম্যান ও

গ্র্যামবার্জ্জারকে পরাজিত করেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে চেরী চিত্তিয়ানা ৬—১, ১—৬ ও ৬—৩ সেটে রতন থাডানিকে পরাজিত করেন।

এশীয় টেনিস প্রতিযোগিতা এবার যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে সকলেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। এই রকম একটা আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি যে ভাবে হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। ফলে খেলার আকর্ষণ বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। এই বিষয়ে ভারতের টেনিস কর্ণধারদের একটু সচেতন হওয়া দরকার।

জাতীয় এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার অবসান

সম্প্রতি এলাহাবাদে জাতীয় এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। ১৪টি রাজ্যের প্রায় ৫০০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। এবার মহিলা ছিলেন ১২০ জন।

নব নির্ম্মিত সুদৃশ্য ষ্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। উত্তর প্রদেশের শ্রম-মন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এই সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। সামরিক বিভাগের এ্যাথলীটরা প্রধানতঃ পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এবারের প্রতিযোগিতায় নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে মোট সাতটি। একটি রেকর্ডের সমান হয়েছে।

বাঙ্গালার প্রতিযোগীদের মধ্যে বালকদের বর্শা নিক্ষেপে এস, গাঙ্গুলী (দূরত্ব ১৫৭ ফুট), কুড়ি হাজার মিটার ভ্রমণে বিবেকানন্দ সেন (সময় ১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট ২৬০২ সেকেণ্ড) ও বালকদের পোল ভল্টে এস, ঘোষ (উচ্চতা ১১ ফুট ৩½ ইঞ্চি) এবং এম· গাঙ্গুলী (উচ্চতা ১০ ফুট ১০ ইঞ্চি) ছাড়া আর কেউ বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেন নি। বাঙ্গালার প্রাক্তন এবং বর্ত্তমানে উত্তর প্রদেশের খ্যাতনামা দৌড়বীর গুলজারা সিং ২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট ১৩·৮ সেকেণ্ডে ম্যারাথন দৌড় সম্পন্ন করে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। নিম্নে জাতীয় এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার রেকর্ডের খতিয়ান দেওয়া হ'ল।

রেকর্ডের খতিয়ান

বালকদের ৪০০ মিটার দৌড় (হিট) নোয়েল টিকি (বিহার) সময় ৫১' ২ সেঃ বালকদের হপ্, ষ্টেপ এণ্ড জাম্প—যোগেন্দ্র সিং (উত্তর প্রদেশ) দূরত্ব ৪৭ ফুঃ ১ইঃ।

বালকদের ৮০০ মিটার দৌড়ঃ—ওয়াই মুনিসালেপ্পা (মহীশূর) সময় ২ মিঃ ১' ৭ সেঃ।

বালিকাদের ২০০ মিটার দৌড়ঃ—(হিট) শীলা পল (মহীশূর) সময় ২৮, ১ সেঃ (পূর্ব রেকর্ডের সমান)

মহিলাদের ৮০০ মিটার দৌড়ঃ—ফিলোমিনা জোসেফ (কেরালা) সময়ঃ—৩৭' ৯ সেঃ।

মহিলাদের সটপাটঃ—কমলেশ চাটওয়াল (মধ্যপ্রদেশ) দূরত্ব—৩৫ ফুঃ ৭½ইঃ পুরুষদের সটপাট—দীনশা ইরাণী (মহারাষ্ট্র) দূরত্ব ৫২ফুঃ ৩½ ইঃ বালকদের ৪×১০০ মিটার রিলে রেস—দিল্লী—দূরত্ব—৪৫' ১সেঃ।

হকি লীগের উদ্বোধন

কলকাতার হকি মরশুমের সূচনা বেশী দিন হয়নি। এর মধ্যেই প্রতিযোগিতাটা বেশ জমে উঠেছে। এবার কুড়িটি দল একই গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তার মধ্যে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও বি, এন, আর দল সর্বাধিক শক্তিশালী বলে মনে হয়।

তবে একাধিক নিয়মিত খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতিতে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব পুরা শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হতে পারছে না। গোলরক্ষক কাপুর আহত। সৈয়দ ও নবাগত ওয়াহিদ পলাতক, এর জন্য ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে দল গঠনে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

এবারের হকি মরশুমের সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব ঘটনা হ'লো—হকি খেলোয়াড় চুরি'। ইলামুর রথোনের খেলিবার কথা ছিল মোহনবাগানে,—অনেক জল ঘোলা হইবার পর দেখা গেল তিনি খেলিলেন ইষ্টবেঙ্গলে। ইহার পর পরই ইষ্টবেঙ্গলের দুইজন হকি খেলোয়াড় সৈয়দ এবং ওয়াহিদ নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। বাংলা দেশের ক্রীড়ামান অতীব নিম্নাভিমুখী। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট খেলাধূলার এই প্রধান তিনটি বিভাগেই বাংলা পররাজ্যের উপর নির্ভরশীল। যে মুহূর্ত্তে, বাংলাদেশের দুই প্রধান সংগঠন মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গলের ভিতর পূর্ণ এবং সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সেই সংকটময় মুহূর্ত্তেই তাঁহারা সামান্য হকি খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে পরস্পরের বিরুদ্ধে যেরূপ লজ্জারজনক বিবাদে অবতীর্ণ হয়েছেন তাহা সকল ক্রীড়ামোদীকেই ব্যথিত করেছে। ইহার অবসান যত শীঘ্র হয়, ততই বাংলার ক্রীড়াজগতের মঙ্গল।

বহিরাগত হকি খেলোয়াড় রপ্তানীর এবার প্রধান কেন্দ্র ভূপাল। অন্যূন একডজন খেলোয়াড় আন্তঃপ্রাদেশিক ছাড়পত্র গ্রহণ করে ভূপাল থেকে। কলকাতার মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ে খেলতে এসেছেন।

ভারতের উদীয়মান খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জ্জী

এশীয় টেনিস প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিনী
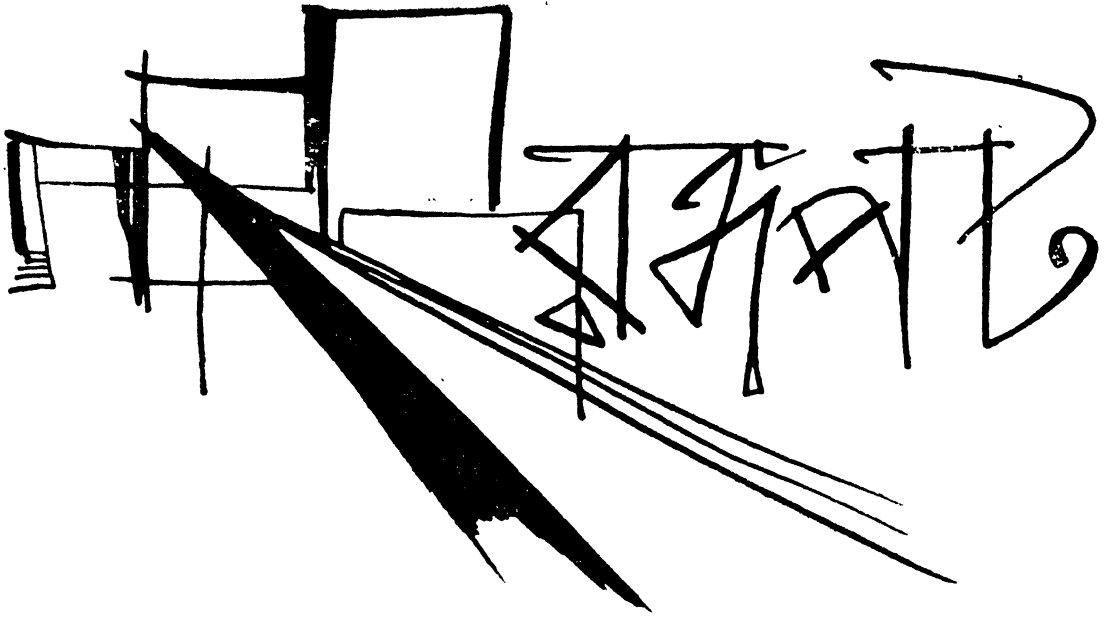
বহু বন্দিতা মিসেস ব্রিস্টো

অমল মিত্র

পলাশির যুদ্ধের পর কলকাতাকে সুদৃঢ় করে গড়ে তোলার দিকে মন দিয়েছিল ইংরেজরা। তাই সবার আগে নতুন এক কেল্লা নির্মাণের প্রয়োজন বোধ করল তারা। সতের শতকের ওলড কোর্টের অবস্থা সেদিন জরাজীর্ণ—"the walls could not bear guns." এমনি ভগ্নদশা সেটার তখন। তাই সিরাজবাহিনীর কলকাতা অবরোধকালে ইংরেজদের যুদ্ধ পরিচালনার কাজে নানা অসুবিধে দেখা দেয়। একে জীর্ণ কেল্লা, আশপাশে আবার ইংরেজদের বসত বাড়ি। সব কিছু মিলে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। তাই কলকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রাম ও তার আশপাশ জুড়ে প্রচুর অর্থব্যয়ে ইংরেজরা নতুন কেল্লা তৈরী করল। "Road to Colliegot" এর চেহারাও গেল বদলে। সে বন-জঙ্গল আর নেই, চোর ডাকাতের উপদ্রবও কমেছে। লোক চলাচল ও বসবাসের উপযোগী হয়েছে। যেখানে দুটি মাত্র বাড়ি ছিল, একে একে সেখানে অনেকগুলি বাড়ি মাথা খাড়া করে দাঁড়াল। এরই একটায় সেদিনের নামজাদা এক সিনিয়ার মার্চেণ্ট জন ব্রিস্টো ও তাঁর সহধর্মিণী এমা ব্রিস্টো থাকতেন। স্যার ফিলিপ ফ্র্যান্সিস, জেনারেল মনসন প্রভৃতির অন্তরঙ্গ ছিলেন ব্রিস্টো। কিন্তু এ সব কারণে ইতিহাস তাঁকে মনে রাখেনি। এমন অনেক সিনিয়র মার্চেণ্টই সেদিন ছিলেন, আজ যাঁরা বিস্মৃত। ব্রিস্টোকে মনে রাখার কারণ—সে যুগের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও নৃত্যকুশলিনীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের আগে এমা র‍্যাংহাম (Emma Wrangham) নামে সুপরিচিতা লাবণ্যময়ী মহিলাটির সম্বন্ধে হিকির গেজেটের পাতায় অনেক রসাল খবর পাওয়া যায়। নানা নামেই তাঁরা অভিহিত করেছেন রূপলাবণ্যময়ী এই রমণীটিকে। কখনও বলেছেন 'চিন্সুরা বেল' (Chinsura Belle)। আবার কখনও দেখি তাঁকে বা 'সেণ্ট হেলেনা ফিলি' (St. Helena Filly) বলে। 'হুকা টারবান' (Hooka Turban) নামটিও 'বেঙ্গল গেজেট'-এরই দেওয়া। কারমিংগার সেই জন্যেই বলেছিলেন—

> "Mrs. Bristow, it is now known was the Emma Wrangham of whose beauty so much is to be read in the columns of Hicky's Gazette."

কলকাতার ইংরেজ সমাজে ১৭৮১-৮২ তে প্রায়ই শোনা যেত সুন্দরী র‍্যাংহামের বিবাহের গুজব। যদিও ১৭৮২-র মে মাসের ২৭শে তাঁর বিবাহ হয়েছিল ব্রিস্টোর সঙ্গে। আশ্চর্য হইনে কিন্তু এই গুজবের সংবাদে। কারণ, সেদিনের সামাজিক উৎসব-তরঙ্গের তিনি ছিলেন সুমোহিনী অভিসারিকা এবং সেই জন্যেই দেখতে পাই হিকির গেজেটের বহু জায়গাই জুড়ে থাকত তাঁর সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা নানা খবর। তাঁর স্বাস্থ্য এবং যৌবনশ্রী, তাঁর রূপসজ্জা ও লীলাময়ী ভঙ্গিমা সব কিছুই পরিগণিত হত বিশেষ সংবাদরূপে এবং স্থান পেত তা হিকির সংবাদপত্রের পাতায়। শুধু তাই নয়, গেজেটের পাতা ওলটালে দেখা যাবে সাংবাদিকের কী অসীম উৎসাহ আর ব্যগ্রতাই না ছিল বিভ্রান্ত প্রণয়ীদের প্রতি সুন্দরী এমার সমুচ্ছল নিস্পৃহতার প্রতিটি খবর প্রকাশের জন্যে। রূপশিখাময়ী গুণবতীর চারদিকে যে প্রণয়ী পতঙ্গেরা ঘুরে বেড়াত 'বেঙ্গল গেজেট' খবর রাখত তাদের সকলেরই। কারণ তারা ছিল "Satellites who most assiduously revolved round this luminery." তাদের অনেকের জন্যেই ব্যঙ্গচ্ছলে হিকি গেজেটের পাতায় নতুন নামকরণ করেছিলেন। প্রণয়ী লিভিয়াসের নাম রেখেছিলেন 'আইডিয়া জর্জ' বা 'টাইটাস'। ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের প্রিয়পাত্র লিভিয়াস,

ব্যারিষ্টার ডেভিসকে হিকি অভিহিত করেছেন 'কাউনসেলার ফিব্‌ল' নামে। প্রণয়ী মিন্টনের ভাগ্যে অনেকগুলিই নাম জুটেছিল। যার একটি 'জ্যাক প্যারাডাইস লষ্ট'। বোর্ড অফ ট্রেডের উচ্চকর্মচারী টেলারও প্রণয়প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন। হিকির দৃষ্টি তাঁর ওপরেও পড়েছিল। গেজেটের পাতায় দেখি 'দর্জি' বা 'পিগদানী দর্জি' নামে তাঁকে পরিচিত করেছিলেন হিকি। এই প্রণয়ীদের নামের সঙ্গে সুন্দরী ব্যাংহামের নামজড়িত সংবাদ প্রকাশের নমুনা দিই—

"The celebrated beauty has again, we hear, refused idea G – It is true there is a little disparity between the parties, yet there are few ladies in her situation who would have declined the offer on that account...The truth is Counsellor Feeble has capeered her out of her senses."

নামকরা সুন্দরী আবার আইডিয়া জর্জের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। একথা ঠিক যে, দুপক্ষের মধ্যে সামান্য কিছু বৈষম্য আছে। কিন্তু শুধু এই একমাত্র কারণে বোধ হয় খুব অল্পসংখ্যক মহিলাই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। আসলে কাউনসেলার ফিব্‌ল এখন তাঁর মনের মানুষ।

গেজেটে প্রকাশিত আর একদিনের খবর পড়লে মনে হয় ব্যাংহামকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রেমিকের দ্বন্দ্ব শেষপর্যন্ত বোধ হয় হাতাহাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছিল। পাঠকদের গেজেট জানাল টারবান কনকোয়েষ্টকে তাঁর ছোট অভিভাবক পিগদানী দর্জি আরো কয়েক সপ্তাহ কাল চুঁচুড়ায় থাকবার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ ওই সময়ের মধ্যে তাঁকে নিয়ে প্যারাডাইস লষ্ট ও কাউনসেলার ফিব্‌লের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে তার একটা মীমাংসা হতে পারে।

এর এক মাস পরের খবর—

"A marriage is now much talked of between Counsellor Feeble and the Chinsura Belle."

এরও পরে ১৭৮২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে পাঠকদের এক জবর খবর দিলেন হিকি—

"On Thursday last she was united in the sacred and indissoluble tie to the elegent Jack Paradise Lost."

পরের সংখ্যাতেই অবশ্য অস্বীকৃত হয়েছিল খবরটি। এমনি বহু খবরই সেদিন হিকির গেজেটে বেরুত। ব্যাংহামের উদ্দেশ্যে প্রণয়ীদের রচিত বলে নানা কাব্যও প্রকাশিত হত। এরও একটা

শেখর রায়ের কাহিনি অবলম্বনে নির্মীয়মান বি এণ্ড বি প্রোডাকসন্সের "মৌনমুখর" ছবির একটি দৃশ্যে ভারতী রায়, তপতী ঘোষ ও বিকাশ রায়কে দেখা যাচ্ছে।

নমুনা দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না নিশ্চয়। তাঁর এক জন্মদিন উপলক্ষে গেজেটে বেরুল—

> "Ode on the birthday of Miss W—m, by J. Durgee:—
> Celestial nine assist my lay
> With all your native fire,
> To sing fair Emma's natal day
> My humble Muse inspire,
> 'Tis now just eighteen years ago,
> Since the sweet maid was born etc, etc,"

এই সুন্দরীর চারপাশে যে হতভাগ্য প্রণয়প্রার্থীর দল ভিড় করেছিল, তাদের লক্ষ্য করেই বাস্টিড লিখেছিলেন—

> "We may fancy what a crowd of suitors must have sighed to this highly favoured beauty in the Calcutta of a hundred years ago."

প্রসাদ প্রোডাকসানসের নিবেদন "হামরাহী"র এক বিশেষ দৃশ্যে শ্রীমতী বানা

মিস র‍্যাংহামের অসামান্য নৃত্যপটুতার কথা সেদিন সকল রসজ্ঞজনেরই মুখে মুখে ফিরত। কলকাতা, চুঁচড়ো এবং চন্দননগরে বড় বড় নাচের আসরে বহু অনুরাগীকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন তাঁর নাচে। আত্মবিস্মৃত বিস্ময়ে তাঁরা সাগর-পারের উর্বশীর নাচ দেখতেন। শুধু বিদেশীরা নন, এদেশের বহু বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্তজনেরাও তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। ১৭৮১-র আগষ্ট মাসে দেখি তাঁর জন্মদিনে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করছেন মহারাজা নবকৃষ্ণ আপন প্রাসাদে। এ সম্মানের যথেষ্ট দাম ছিল। কী সামাজিক কী রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই এদেশীয়দের মধ্যে মহারাজার স্থান সেদিন সবার ওপরে। অপরিসীম তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি।

বলাবাহুল্য, জমকালো আয়োজনই মহারাজা করেছিলেন। গণ্যমান্য সকলকে নিমন্ত্রণ পাঠান হয়েছিল। নির্দিষ্ট তারিখে এসে হাজিরও হয়েছিলেন তাঁরা সকলে। দীপালোকে উজ্জ্বল বিশাল নাচঘর অতগুলি বিশিষ্ট অতিথি সমাগমে জমজমিয়ে উঠেছিল। যথাসময় সে রাত্রের সম্মানিতা অতিথিও এলেন। নৈশভোজের পর শুরু হল নাচ। অ্যাপোলো ও ডাফনির যুগ্ম নাচে অংশগ্রহণ করলেন মিস র‍্যাংহাম ও লিভিয়াস। এই সেই লিভিয়াস, ব্যঙ্গচ্ছলে হিকি যাঁকে আইডিয়া জর্জ বা টাইটাস নামে কাগজে অভিহিত করেছিলেন। লিভিয়াস ও এমার অপূর্ব নাচে অভ্যাগতেরা মুগ্ধ, সম্মোহিত। অতিথিদের এদেশীয় নাচ দেখাবারও বন্দোবস্ত হয়েছিল। নৃত্যানুষ্ঠান শেষ হয়েছিল রাত তিনটেরও পরে। শেষরাত্রে মিস র‍্যাংহামের বিদায়কালে অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন, অতিথির উপস্থিতিতে বাড়িটা তাঁর ঝলমলিয়ে উঠেছিল (Echoes from Old Calcutta —H. E. Busteed)

এরই বছরখানেক পর জন ব্রিস্টোর সঙ্গে তাঁর বিবাহ।

অপ্রত্যাশিত খবরটির জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না কেউ। স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করেন নি মিল্টন যে, হিকির দেওয়া প্যারাডাইস লষ্ট নাম তাঁর এমন করে সত্য হবে। বহু আশা বুকে বেঁধে বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছিলেন প্রণয়ীরা; কত বিনিদ্র রজনীই না যাপন করেছিলেন।

যাই হোক, নাচের আসর ছেড়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন মিসেস এম্ ব্রিস্টো। চৌরঙ্গীর বাড়িতে এক রঙ্গালয় তৈরি করলেন তিনি। ছোট কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর—

> "It was not merely an apartment in a house temporarily fitted up for a single representation, but a distinct edifice completely furnished with every usual convenience and decorated with every ornament customary in familiar places of exhibition—in short a perfect theatre differing only from a public one in its dimensions and agreeing with it in the essential point of being appropriated to amusement without which we

—আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

might fear that we had tasted joy only to lament the loss of it" (Calcutta Gazette 7th May, 1789)

উদ্দেশ্য বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আনন্দে অবকাশ বিনোদন। এতদিন তাঁর নৃত্যকুশলতার পরিচয় সকলে পেয়েছিলেন। এবারে অভিনেত্রীরূপে তাঁকে দেখবার জন্যে উন্মুখ সকলে।

১৭৮৯র ১লা মে মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হওয়ার খবর কাগজে (ক্যালকাটা গেজেট, ৭ই মে, ১৭৮৯) প্রকাশিত হয়েছিল। কবছর আগে অভিনেত্রীদের মঞ্চে যোগদানে আপত্তি জানিয়েছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টাররা। সময়ের সঙ্গে তাঁদের মতেরও পরিবর্তন হয়ে থাকবে। তাই মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটারে শুধু অভিনেত্রীদের আবির্ভাব ঘটল না, মহিলা-শিল্পীরাই আবার পুরুষের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হতে লাগলেন। এঁদের অভিনয় সফল হয়েছিল। মিসেস ব্রিস্টো নিজে একাধিক পুরুষের ভূমিকায় নেমেছিলেন। পলি হানিকুম্ব-এর ভূমিকাটি তাঁর সব থেকে প্রিয় হলেও, বার্স্টডের মতে 'জুলিয়াস সিজার'এ লুসিয়াস-এর ভূমিকায় তিনি অবিস্মরণীয় ("Mrs. Bristow's triumph was in the male part of Lucius in Shakespear's 'Julius Cæsar'.")

সঙ্গীতবহুল জনপ্রিয় নাটক 'পুয়োর সোলজার' দিয়ে রঙ্গালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়েছিল। ছোট প্রেক্ষাগৃহের কোন আসনই সে-রাত্রে শূন্য ছিল না। দর্শক ব্রিস্টো-দম্পতীর বন্ধু-বান্ধবরা। অপরিসীম উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন। তাঁরা নিরাশ হন নি। কাগজ বলে—

> We venture with certain confidence to say that no one of the respectable company present has spoken of the entertainment but in terms warmly expressive of the most perfect gratification.

৭ই মে'র গেজেটে অভিনয়ের পূর্ণ বিবরণ ছাপা হয়। অভিনয়ের দীর্ঘ সমালোচনাও। রাত আটটার কিছু পরেই অভিনয় শুরু হয়। গোড়াতে এক প্রস্তাবনা আবৃত্তি করেন অভিনেত্রী মিসেস ব্রিস্টো। মঞ্চে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। তাই প্রথম আবির্ভাবের সলজ্জ দ্বিধা ও সঙ্কোচ কিছুটা পত্রিকা সমালোচকের চোখে পড়ে। তাহলেও তাঁর মন্তব্য অনুকূল হয়েছিল। ফলে সে আবৃত্তি সকলের ভাল লেগেছিল, কানে লেগে ছিল। সুন্দর ঝরঝরে ভাষায় লেখা প্রস্তাবনাটি তুলে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ হয়—

"Ere rising blushes speak poor Nora's fears,
And absent Patrick claims affection's tears,
The comic muse by me this Greeting sends—
Health, peace and joy, attend my smiling friends—
Though public Theatres confess my sway,
And laughing thousands all my nods obey,
My Throne, like Sweden's Empress, I resign,
The social bands of humbler life to join—
With me my sister Musick comes along,
And adds to hum'rous mirth, the charms of song—
New subjects, yet untaught the stage to tread,
Haste to my call, and follow where I lead.—
Thus spoke the Muse—And, if I'am not deciev'd,
Your smiles declare her message well receiv'd—
Where public scenes delight, let others room ;
No law forbids us sure to laugh at home—
To sport and sing an idle hour away
Wisdom may deign, if innocent the play—
Our efforts to no public praise pretend,
Here friends alone are summon'd to attend—
And welcome all to meet the comic muse,
The mirth she lends, our aim is to diffuse."

নাটকে নোরার ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন মিসেস ব্রিস্টো। কলকাতা মঞ্চে আগেও নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল। তখন নোরার ভূমিকায় নামতেন নামকরা শিল্পীরা। নিখুঁত সুন্দর অভিনয় করতেন তাঁরা। প্রশংসায় কাগজের পাতা ভরে যেত। কিন্তু গেজেটের মতে এই নোরা দর্শকরা আর দেখেন নি। এমনই অপূর্ব হয়েছিল মিসেস ব্রিস্টোর অভিনয়। ত্রুটি ছিল না কোথাও। আর এক অভিনেত্রীর সম্বন্ধেও অনুরূপ উচ্ছ্বসিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। কাগজে তাঁর নাম পাইনে। তবে, ক্যাথলিয়েন-এর

চিত্রনায়িকা সন্ধ্যা রায়

ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমালোচকের মতে তাঁর অভিনয়ও অনিন্দ্যসুন্দর হয়েছিল। ডারবি এবং ফাদার লিউকের ভূমিকায় শিল্পীদেরও সুখ্যাতি ছিল। ছোটখাট ভূমিকাগুলোয় যাঁরা নেমেছিলেন তাঁদের অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। দৃশ্যপট এবং অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধেও মতামত কাগজে লিপিবদ্ধ আছে। দৃশ্যপটগুলি নয়নাভিরাম, অর্কেস্ট্রা চমৎকার। বক্তব্য শেষে সমালোচকের মন্তব্য, অমন সুসম্পূর্ণ অভিনয় আগে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সকল দর্শকই খুশি হয়ে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করেছিলেন।

ঐ বছরের অক্টোবরে আবার সেখানে অভিনয় হয়। এবারও কাগজে (ক্যালকাটা গেজেট, ২৯শে অক্টোবর, ১৭৮৯) অভিনয়ের বিস্তারিত খবর ও সমালোচনা বেরিয়েছিল। 'সুলতান' ও 'প্যাডলক' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। রক্সালানা ও লিওনারার ভূমিকায় ছিলেন মিসেস ব্রিস্টো। সুলতান মিঃ পোলার্ড এবং ওসমান সেজেছিলেন মিঃ রোয়ার্থ। আগের মত এবারও এক প্রস্তাবনা দিয়ে অভিনয় শুরু হয়। একমাত্র আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যেই অভিনয়ের আয়োজন প্রস্তাবনায় মিসেস ব্রিস্টো তা জানালেন।

সে রাত্রে রক্সালানার ভূমিকায় মিসেস ব্রিস্টোর নিপুণ অভিনয় গোড়া থেকেই দর্শকদের আকৃষ্ট করে, মুগ্ধ করে। কাগজেও লিখেছিল, প্রথমবারের সঙ্কোচ আর ছিল না, অভিনেত্রীর অভিনয় সেদিন যেমন স্বাভাবিক তেমনি প্রাণবন্ত হয়েছিল। তারা লেখে—

"She went through the whole of the humerous part of the English slave in the ottoman Seraglio with a justness of conception and success of execution most admirable. Magnificiently decorated by art, and more beautifully adorned by nature, the extravagancies of the amorous Sultan seemed justified by her charms."

সুলতান ও ওসমানের অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। আর একটি অভিনেত্রীকে কাগজওয়ালারা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিল। কিন্তু এঁরও নামোল্লেখ নেই। এলমিরার ভূমিকায় নেমেছিলেন তিনি। মঞ্চে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব। তাঁর অভিনয় কালে প্রেক্ষাগৃহে মুহুর্মুহু করতাল ধ্বনি শোনা গিয়েছিল। শেষ দৃশ্যে মিসেস ব্রিস্টো তাঁর মাধুর্যভরা কণ্ঠে এক উপসংহার কবিতা আবৃত্তি করেন এবং তা শেষ করেন "with a moral tron pope"—

"Beauties in vain,
Their pretty eyes may roll,
Charms strike the sight,
But merit wins the soul."

এরপর 'প্যাডলক' এর অভিনয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ক্যালকাটা থিয়েটারে অনেক রাত এটির সুষ্ঠু ও সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় কলকাতাবাসীরা দেখেছিলেন। সেখানে লিয়োনারার স্ত্রী ভূমিকায়

পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা অবলম্বনে নির্মীয়মান উত্তমকুমার ফিল্মসের প্রথম নিবেদন "ভ্রান্তিবিলাস"এর এক দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়।

এক নিপুণ শিল্পীর অনবদ্য অভিনয়ের সাক্ষ্য আজো প্রাচীন সংবাদপত্র বহন করছে। এখানে এই ভূমিকায় নেমেছিলেন মিসেস ব্রিস্টো নিজে। অতুলনীয় প্রতিভা-সম্পন্না শিল্পী মিসেস ব্রিস্টো যথাযথ চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলোর অভিনয়ও ভাল হয়েছিল এবং তাতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সুখ্যাতি করেন পত্রিকা সমালোচক।

স্বল্পকালস্থায়ী এই শখের রঙ্গালয়ে বেশিদিন অভিনয় হয়নি। তবু মাত্র কয়েক রাত অভিনয় করেই মিসেস ব্রিস্টো কলকাতাবাসীদের—

...dazzled by her histrionic perfections, and she set so many youths throbbing by her appearances in virile guise."

১৭৯০ সালের জানুয়ারীতে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন মিসেস এমা ব্রিস্টো। অসাধারণ এক নৃত্যকুশলিনী ও শিল্পীকেই কলকাতাবাসীরা হারাল না, সে যুগের শ্রেষ্ঠ এক সুন্দরীও চোখের আড়াল হল। তাই বাস্টিড বলেছেন···—for long calcutta refused to be comforted."

শেষ অঙ্ক

ঈশ্বরের পৃথিবীতে কোন কিছু চাপা থাকে না। মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে, তার চাতুর্য দিয়ে, তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দিয়ে কোন কিছু চাপা দিতে গেলে সে সাময়িকভাবে সফল হয় কিন্তু কালে চাপা দেওয়া বস্তু সূর্যের আলোয় আত্মপ্রকাশ করবেই। পুণ্যই বলুন, পাপই বলুন, মনুষ্যশক্তির সাধ্য নেই তাকে আচ্ছাদিত করে রাখে, ক্ষণকালের সার্থকতাকে চিরকালের সার্থকতা ভেবে নিয়ে সফলতার পুলকে সে যখন আত্মহারা ঠিক সেই সময় তাকে এক চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সত্যের তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে মিথ্যার দুর্গ তখনই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সেই সর্বশক্তিমানের দুর্বোধ্য লীলার এইখানেই অসামান্য বিকাশ।

হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত "শেষ অঙ্ক" ছবিটির মধ্যে এই সত্যটিরই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নায়ক সুধাংশু মৃতদার, স্ত্রী কল্পনাকে নিয়েও সে সুখী হতে পারেনি, সোমাকে নিয়ে সে আবার নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। বিয়ের দিন সহসা এক নকল কল্পনার আবির্ভাব হয়, বিয়ে ভেঙে যায় তারপর ঘটনার স্রোত এবং সর্বশেষে এক আশ্চর্য তথ্যের উদ্ঘাটনে কাহিনীর সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাপ্তি।

পরিচালকের নিষ্ঠা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রমাণ সারা ছবিটির মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে পাওয়া যায়। রহস্যসৃষ্টিতে, রহস্যজাল বিস্তারে, কাহিনীর গতি উপযোগী যথাযথ পরিবেশ গঠনে তাঁর কুশলতার ছাপ বিদ্যমান। ধীরে ধীরে রহস্যসৃষ্টি করা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে কাহিনীর অগ্রগমনে রহস্য দানা বেঁধে ওঠে এবং দর্শকের মনে এক বিরাট কৌতূহলকে ঘনীভূত করে তোলে। তবে, ছবিটির মধ্যে অকারণে নায়ক-নায়িকার মোটরবিহার ও গান সংযোগ ছবিটির মধ্যে রসহানি ঘটিয়েছে। দর্শকের একাগ্র মনোযোগ ব্যাহত হয়েছে। রহস্যচিত্রে প্রতিটি দৃশ্যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের একটি যোগসূত্র থাকবে যাতে প্রতিটি দৃশ্য দর্শককে অশেষ আগ্রহ এবং মনোযোগ নিয়ে দেখতে হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। রহস্য এবং বিস্ময়ের ক্রমবিস্তার দর্শকের দৃষ্টি এবং মনোযোগ পুরোপুরি আকৃষ্ট করে রাখবে। বারেকের তরেও রূপালি পর্দা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে দেবে না, না হলে রহস্যকাহিনী ব্যর্থ। এখানে যে বিষয়বস্তু অবলম্বন করে কাহিনী রূপ নিয়েছে এবং যেভাবে গল্প এগিয়ে যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে গান যোগ করা
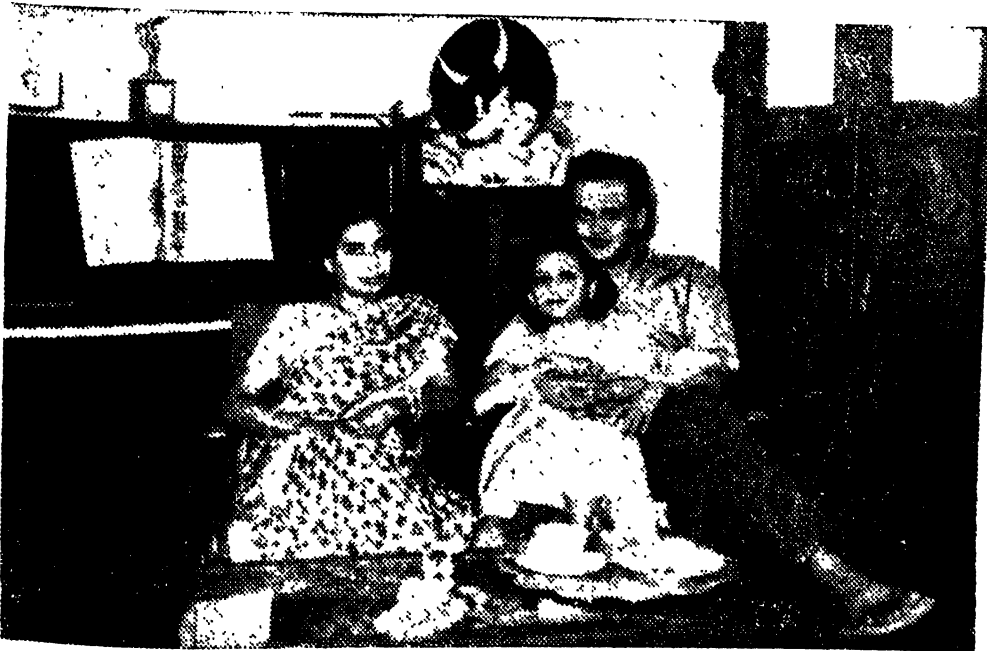
একেবারেই অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক। এই ধরণের পরিস্থিতিতে দর্শকচিত্ত গান শোনার জন্তে ব্যাকুল নয়। নায়কের বাড়ীতে একমাত্র আবদুল ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী (অর্থাৎ কর্মচারী) দেখা যাচ্ছে না। তার মত ধনী ব্যক্তির সংসারে একটি মাত্র ভৃত্য—এ চিন্তা সমর্থনযোগ্য নয়। আদালতগৃহে যে ধরণের থমথমে ও গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন, দর্শকসাধারণ ছবির মাধ্যমে এখানে তা পান নি ঐরকম একটি জটিল এবং গভীর রহস্তে আবৃত মামলা—সেখানে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ হওয়াই যুক্তিসম্মত এবং স্বাভাবিক। বিচারপতির বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও আদালতে অভব্য আচরণ কি সম্ভবপর না বুদ্ধিগ্রাহ্য ?

অভিনয়ে শিল্পিবৃন্দ সম্মিলিতভাবে এক অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয় বহুল প্রশংসার দাবী রাখে। চরিত্রচিত্রণে তাঁরা সর্বৈব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিকাশ রায়ের অভিনয় তুলনাবিহীন। এই ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শক সাধারণ ভুলতে পারবেন না। মুঠো মুঠো সাধুবাদ নিঃসন্দেহে তাঁর প্রাপ্য। পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, তরুণকুমার, শিশির বটব্যাল, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যথোচিত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন রাজকুমার মৈত্র এবং সুরযোজনা করেছেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

দুই বাড়ী

ব্যবধান শুধু একটিমাত্র সহজলঙ্ঘ্য প্রাচীরের। দু'পাশে দু'টি বাড়ী। দুই বাড়ীর মানুষদের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব। শুধু দুই কর্তার মন বোঝা ভার। দিনের মধ্যে কতবার যে তাঁদের মিলন আর কতবার যে তাঁদের বিরোধ তার হিসাব রাখা ভার। পরস্পর পরস্পরের বিপদে সর্বস্বপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েন আবার পরস্পর পরস্পরের সর্বনাশে বদ্ধপরিকর হন। দু'জনে পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন, আবার একে অন্তের পরাজয়ের আনন্দে উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হন। এমনি করেই দু'বাড়ীর মানুষদের দিন

চিত্র গ্রহণের অবসরে অসিতবরণ, শব্দযন্ত্রী দেবেশ ঘোষ, সাবিত্রী
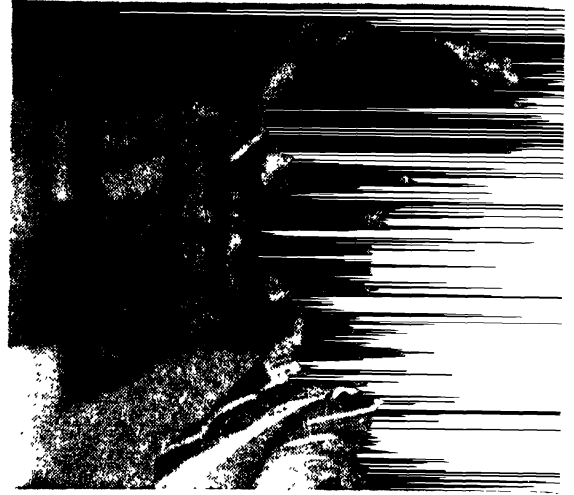
বি এ্যাণ্ড বি প্রোডাকসানসের নিবেদন "মৌনমুখর"এর নায়িকা চরিত্রে ভারতী রায়

কাটে। এইভাবে তাদের জীবন নাট্য অভিনীত হয়ে চলে। এঁদের দৈনন্দিন জীবনের হাসি কান্নার, আনন্দবেদনার একটি স্পষ্ট আলেখ্য হাস্যরসের আবরণে "দুই বাড়ী" ছবিটির মাধ্যমে সাধারণ্যে তুলে ধরা হয়েছে।

শৈলেশ দে রচিত কাহিনী অবলম্বনে অসীম পালের পরিচালনায় গৃহীত এই ছবিটি হয়েছে যেমন উপভোগ্য তেমনই রসসমৃদ্ধ। হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনা মানুষের জীবনে নিত্য সহচর। এদের বাদ দিয়ে জীবনকে কল্পনা করা যায় না। এদের স্পর্শে জীবনের ঘটে বিকাশ। এদের সম্মিলনে এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা এক সার্থক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় ও মধুময় মিলনে ও সকল বিরোধের অবসানে কাহিনীর সমাপ্তি। সমগ্র কাহিনীকে হাস্যরসের আধারে বিধৃত করা হয়েছে। সহজ, সরলভাবে পরিচালক কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন, কোথাও তিনি কৃত্রিমতার আশ্রয় নেন নি। হাস্যরস সৃষ্টি করতে কোথাও কোনপ্রকার অস্বাভাবিকতা তিনি অবলম্বন করেন নি, সাধারণতঃ এইখানেই পরিচালকরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেন, স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস যথার্থ রসসৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে, কষ্টকল্পিত হাস্যরস যা কোনমতেই করতে পারে না, ছবির কোন অংশ পরিচালকের নৈপুণ্যে একঘেয়ে বা বিরক্তিকর মনে হয় না, একাধিকবার কলহ চিত্রিত হলেও প্রতিটি অধ্যায় স্বাতন্ত্র্যে স্পর্শসমৃদ্ধ। কাহিনীর গতি শ্লথ নয়, কাহিনী বিন্যাসে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দর্শকের মন কোথাও ভারাক্রান্ত হয় না। এই ছবির মাধ্যমে এই অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তির আস্বাদ দর্শক সাধারণে মুঠো মুঠো পাবেন। আনন্দ এবং বেদনা এখানে সমান তালে তালে চলেছে, এ জন্তে পরিচালকের কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। সামগ্রিকভাবে এক সার্থক, রসোজ্জ্বল, উপভোগ্য কাহিনী-পরিবেশনে প্রভূত দক্ষতা প্রদর্শনের জন্তে অকুণ্ঠ সাধুবাদ পরিচালকের অবশ্য প্রাপ্য।

প্রধান দুটি চরিত্রে অসাধারণ শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল। তাঁদের অভিনয় প্রতিভা যে ছবিটিকে

কতখানি পুষ্ট করেছে সে বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ নেই, তাঁদের অনবদ্য অভিনয় এই সাফল্যের জন্তে যে বহুলাংশে দায়ী এ বিষয়ে আশা করি সকলেই একমত হবেন। অনিল চট্টোপাধ্যায় ও ও তন্দ্রা বর্মণের অভিনয়ও যথেষ্ট পরিমাণ উপভোগ্য ও সৌন্দর্যের এবং সফলতার স্বাক্ষরপুষ্ট। এই দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই দুই বাড়ীর মধ্যে এক পরমতম মিলন ঘটল। সেদিক দিয়ে চরিত্র দুটির গুরুত্ব, শিল্পীদেরও চরিত্রের মর্যাদা পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, স্বর্গত তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জীবেন বসু, অনুপকুমার, গীতা দে, রেণুকা রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। কালীপদ সেনের সঙ্গীত পরিচালনাও উল্লেখের দাবী রাখে।

সংবাদ-বিচিত্রা

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রথানুযায়ী ভারত সরকার গত ২৬শে জানুয়ারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য ও খ্যাতনামা ভারত সন্তানদের রাষ্ট্রীয় সম্মান বিতরণ করেছেন। অভিনয়জগতে যাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর বিদ্যমান তাঁদের মধ্যে এ বছর আটষট্টি বছর বয়স্ক বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠদক্ষ রূপশিল্পী নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং বোম্বাইয়ের বিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক মেহবুব খানের উদ্দেশে এ বছর রাষ্ট্রীয় সম্মান বর্ষিত হয়েছে। তাঁরা উভয়েই "পদ্মশ্রী" খেতাব লাভ করেছেন।

আজকের দিনে এই ব্যাপক প্রগতির যুগে অন্যান্তের মত চলচ্চিত্রের জয়রথও অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে চলেছে। প্রগতির যুগে কুশলী ও রূপকারদের প্রতিভায় ও সাধনায় বহুল উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলচ্চিত্রশিল্প জনসমাজের নানা উপকার তার নিজস্ব ধারায় করে চলেছে। জাতির জীবনগঠনে চলচ্চিত্রের অবদান উপেক্ষা করা চলে না। এবার বিজ্ঞানকে উপজীব্য করে ছায়াছবি গড়ে উঠুক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন 'অ্যামেরিকান সায়েণ্টিফিক ফিল্ম ফোরামে'র উদ্বোধনকালে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এই প্রচেষ্টা রূপ নিলে জাতীয় সামাজিক ও শিক্ষাজগতের বিরাট কল্যাণ সাধিত হবে। এই প্রচেষ্টা জাতীয় কল্যাণেরই নামান্তর মাত্র। আমাদের ধারণা শ্রীসেনের এই মূল্যবান পরামর্শ বাস্তব রূপ নিলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণের অনেক অস্পষ্টতা দূর হবে এবং বর্তমান সমাজ এক নতুন পথের সন্ধান পাবে।

• • • •

বাঙলাদেশের চলচ্চিত্রালোকে একটি বিরাট আসন যে আজ উত্তমকুমারের অধিকারগত এবং জনপ্রিয়তার শিখরপ্রান্তে তিনি আজ সগৌরবে সমাসীন এ বিষয়ে আজকের দিনে কোন প্রকার মতদ্বৈধতা থাকতে পারে না। এবার বোম্বাইয়ের চিত্ররাজ্যও তাঁর দ্বারা সমৃদ্ধ হতে চলেছে। একটি হিন্দী ছবির প্রযোজনায় তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। "ছোটী সি মুলাকাত" নামক এই ছবিতে প্রযোজক

উত্তমকুমার বলা বাহুল্য নায়কের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হবেন। তাঁর সঙ্গে নায়িকা রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন বৈজয়ন্তীমালা। বাঙলার চিত্রালোকের গৌরব উত্তমকুমারের প্রতিভা বহির্বঙ্গকেও আলোকিত করুক এই আমাদের কামনা।

• • • •

ছায়াছবির অভিধানে "ডাবিং" একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। চলচ্চিত্রের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ ডাবিং। এক ভাষায় গৃহীত ছবির সঙ্গে ভিন্ন ভাষাভাষীদের এই ডাবিংই পরিচিত করে তোলে। তা ছাড়াও চিত্র নির্মাণে ডাবিং-এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একদল দর্শক কি জানি কি কারণে হঠাৎ ডাবিং-এর বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন করে বসে আছেন। ব্যাঙ্গালোর থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরবর্তী টুমকুরে এই ঘটনা ঘটে। মালয়ালাম ভাষা থেকে কানাড়ী ভাষায় ডাব করা ছবি "ভক্ত কুচেলা"র উদ্বোধন দিবসে একদল দর্শক কেবলমাত্র "ডাব করা ছবি" বলে তাকে বর্জন করলেন এবং তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করলেন। ফলে উদ্বোধন রজনী পরিণত হ'ল অন্তিম রজনীতে।

• • • •

এ বিষয়ে আশা করি কেউ দ্বিমত হবেন না যে বর্তমানে সর্ট ফিল্মের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এই ছবিগুলি প্রযোজনা করেন ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিসান। ফিল্মস ডিভিসন ছাড়াও চুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য বেসরকারী প্রযোজকবৃন্দের দ্বারা সর্ট ফিল্ম তোলা হয়ে থাকে। বর্তমানে সরকার স্থির করেছেন যে সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় গৃহীত প্রামাণ্য ও শিক্ষামূলক ছবিগুলির বেসরকারী প্রযোজকবৃন্দকে তাঁদের কর্মকৃতিত্বের মান অনুযায়ী নগদ টাকা দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে। তাঁদের এই কার্যে যথোচিত উৎসাহ প্রদান এবং আরও আগ্রহী ও ঘনিষ্ঠ করে তোলাই এই পুরস্কার প্রবর্তনের উদ্দেশ্য।

সিংহলের সরকার দেশের চলচ্চিত্রের পরিবেশনাব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্তকরণের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন 'সিনেমা সোসাইটি অফ সিলোন' তার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের মতে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হলে চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে এবং রসপিপাসু জনসাধারণের প্রতিও যথেষ্ট পরিমাণে অবিচার করা হবে। মোট কথা এই সিদ্ধান্তে কোন মঙ্গলচিহ্ন বহন করছে না।

• • • •

বর্তমানকালে পৃথিবীর জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতাদের মধ্যে মার্লন ব্রাণ্ডো অন্যতম। জানা গেল যে কার্টিস পাবলিশিং কোম্পানীর বিরুদ্ধে তিনি এক মানহানির মামলা দায়ের করেছেন। এই মামলায় ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি দাবী করেছেন পাঁচ মিলিয়ন ডলার (দু'কোটি টাকারও বেশী)! প্রকাশ যে ১৯৬২ সালের ১৬ই জুন তারিখের স্যাটার্ডে ইভনিং পোষ্টের একটি সংখ্যায় তাঁরা মার্লনকে অযথা আক্রমণ করে তাঁর সম্পর্কে অনেক ভিত্তিহীন কাহিনী পরিবেশন করেছেন ও তাঁর উদ্দেশে বহু অশোভন, অশালীন ও অপমানকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে বেটি ডেভিস ও এলিজাবেথ টেলারও বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থার বিরুদ্ধে অনুরূপ মর্মে মামলা দায়ের করেছেন।

• • • •

লোকপ্রিয় এবং শক্তিমান অভিনেতাদের মধ্যে এরল ফ্লিন এক অনবদ্য নাম। কিছুকাল পূর্বে তাঁর অকালমৃত্যু চিত্রজগতকে যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা কারুরই অজানা নয়। আনন্দের সংবাদ তাঁর পুত্র সিন ফ্লিনও অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করছেন। 'দিলে' নামক ছবিটির মাধ্যমে অভিনেতারূপে তিনি প্রথম দর্শক সমাজে আবির্ভূত হবেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও বিপুল জনপ্রিয়তা, সুনাম ও প্রসিদ্ধির অধিকারী হোন।

খেলার মাঠে চিত্রাভিনেত্রী মঞ্জু দে প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় মুস্তাক আলী ও 'মাসিক বসুমতী'র নিজস্ব প্রতিনিধি জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা বেদনার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করছি যে হলিউডের বহুখ্যাত হল রোচ ইুডিও সম্প্রতি নীলামে বিক্রী হয়ে গেল। শোনা যাচ্ছে যাঁরা কিনলেন তাঁরা ইুডিও হিসেবে ব্যবহার না করে সম্পত্তিটিকে অন্য ভাবে ব্যবহার করবেন। অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল ধরে চিত্রজগতের সঙ্গে যে স্থানটির এক অচ্ছেদ্য বন্ধন ও অভঙ্গুর যোগ বিদ্যমান ছিল তার সঙ্গে সারা হলিউডের আজ আর কোন সম্পর্কই রইল না। রসিকসমাজেও এ সংবাদ নিদারুণ বেদনার সৃষ্টি করবে বলেই আমরা মনে করি।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

সত্যজিৎ রায়ের নির্মীয়মান ছবি "মহানগর"-এর চিত্রগ্রহণ বর্তমানে শুরু হয়েছে। কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখনী থেকে "মহানগর"-এর কাহিনী জন্ম নিয়েছে। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বও শ্রী রায় গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, জয়া ভাদুড়ী এবং ভি কি রেডউড প্রভৃতি। * * * প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্যামল মিত্র এবার চিত্র প্রযোজকরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর প্রথম প্রযোজিত ছবির নাম "দেওয়া-নেওয়া"। এর কাহিনীকার ও চিত্রনাট্য রচয়িতা বিধায়ক ভট্টাচার্য। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন কমল মিত্র, উত্তমকুমার, তরুণকুমার, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, ছায়া দেবী, লিলি চক্রবর্তী, সুচরিতা সান্যাল প্রভৃতি। এই ছবির প্রসঙ্গে ঘোষণা করার মত একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে এতে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন বোম্বাইয়ের প্রখ্যাতনাম্নী শিল্পী তনুজা। চিত্রটি পরিচালনা করছেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠশিল্পীর মত প্রযোজক হিসেবেও শ্যামল মিত্র যথেষ্ট সুনাম ও গৌরব অর্জন করুন—তাঁর শুভযাত্রাপথে এই আমাদের শুভেচ্ছা। * * * গুপ্তশ্রী প্রোডাকসানসের প্রথম নিবেদন রোমাঞ্চঘন রহস্যচিত্র "নিশাচর" ছবিটি পরিচালনা করছেন ভূপেন রায়। চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন বিকাশ রায়, শম্ভু মিত্র, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, সন্ধ্যা রায়, গীতালি রায় এবং শ্রীমতী সুচিত্রা সেন প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। সুর যোজনা করছেন কালীপদ সেন।

শৌখীন সমাচার

দুই পুরুষ

দিকপাল কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দুই পুরুষ" নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন আই, টি, আই (কলিকাতা) ষ্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাব। পরিচালনা করেন ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন বিমল মজুমদার, সুনীল মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল মুখোপাধ্যায়, নির্মল দাস, নিখিল চৌধুরী প্রভৃতি।

ফেরারী ফৌজ

ফেরারী ফৌজ নাটকটি সম্প্রতি নিবেদন করলেন মার্থেনিটা ইণ্ডিয়ান ক্লাব পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রূপায়ণে ছিলেন সুকুমার ভট্টাচার্য, সুখেন্দু মজুমদার, শৈলেশ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশ বাগচী, শেখর বিশ্বাস, উমাদাস ভট্টাচার্য, তুলসী দত্ত, কল্যাণ ঘোষ, সুনীল দাস, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন দাস, মা গঙ্গোপাধ্যায়, মঞ্জু ঘোষ, আরতি দাস, নন্দু সান্যাল প্রভৃতি।

যুদ্ধ যখন বাধল

অমিত চট্টোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত দেশাত্মবোধক নাটক "যুদ্ধ যখন বাধল" মঞ্চস্থ হল দেবীধাম সাংস্কৃতিচক্রের শিল্পিগণের দ্বারা চরিত্রগুলির রূপদান করেন নাট্যকার, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, নীলিমা দে সেবা দাস প্রভৃতি।

সূর্যের দ্বার খোল

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক 'সূর্যের দ্বার খোল' নিবেদন করলেন অগ্রগামী নাট্যপরিষদ গোষ্ঠি। অভিনয়াংশে ছিলেন শম্ভু মিত্র, রবি ঘোষ, অমর বসু, গোবা ঘোষ, সুখেন দাস, সাধু সরকার এবং চিত্রা মণ্ডল প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করেন সাধু সরকার।

আমার মাটি

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (খিদিরপুর) ষ্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যগণ কর্তৃক মনোরঞ্জন বিশ্বাসের "আমার মাটি" নাটক নিবেদিত হল। বীরেন রায়ের পরিচালনায় অনিল দত্ত, সুধাংশু মণ্ডল, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবু মজুমদার, রণেন পাল, ঝর্ণা ভট্টাচার্য স্বপ্না রায়, রেখা ঘোষ প্রমুখ শিল্পীবর্গ বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

চিত্রতারকা সুলতা চৌধুরী

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্র সমূহ মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্ত নন্দী কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

মাঘ, ১৩৬৯ বাং (জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারী'৬৩)

অন্তর্দেশীয় :—

১লা মাঘ, (১৫ই জানুয়ারী) : আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত সমগ্র ভারতে দশ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবীর হোমগার্ড বাহিনী গঠনের জন্ত সরকারী তৎপরতা—বিভিন্ন রাজ্যের নিকট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সার্কুলার।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) : কাশ্মীর-বিরোধ মীমাংসাকল্পে দিল্লীতে মন্ত্রি-পর্য্যায়ে ভারত-পাক বৈঠক আরম্ভ—ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা সর্দার শরণ সিং ও পাকিস্তানী দলের নেতা মিঃ ভুট্টো।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল ভোটাধিক্যে গৃহীত।

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) : মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের দেশব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সাড়ম্বর উদ্বোধন—কলিকাতা, বেলুড়মঠ ও অন্যান্য বহু স্থানে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) : ভারতের তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৬৩—৬৪ সালে ১৬১৪ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ—জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির অনুমোদন—কেন্দ্রীয় খাতে ৯৪৪ কোটি টাকা ও রাজ্যখাতে ৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) : স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী (পশ্চিমবঙ্গ) ডাঃ জীবনরতন ধরের (৭৪) জীবনাবসান।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারত-পাকিস্তান দিল্লী বৈঠক অমীমাংসিত—করাচীতে ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৬৩) তৃতীয় পর্য্যায়ের বৈঠক—উভয় রাষ্ট্রের যুক্ত ইস্তাহার প্রচার।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) : রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ কর্ত্তৃক দেশপ্রিয় পার্কে (কলিকাতা) বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন—জাতীকে স্বামীজীর অভীঃ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় আহ্বান।

প্রবীণ নাট্য সমালোচক ও শিক্ষাবিদ ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের (৮৪) পরলোকগমন।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) : শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক লোকসভার ব্যাখ্যা সহ কলম্বো প্রস্তাব পেশ—পূর্ব্বাঞ্চলে থাগলা ও লংজু ব্যতীত ম্যাকমোহন লাইন স্বীকৃত।

নেফা ও লাডাক রণাঙ্গনে ৩২২জন ভারতীয় নিহত, ৬৭৬জন আহত ও ৫,৪৯০ জন নিখোঁজ—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের বিবৃতি।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) : কেন্দ্রীয় সরকার (ভারত) কর্ত্তৃক কলম্বো প্রস্তাব নীতিগতভাবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৬৭তম জন্মদিবসে জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি—কলিকাতা সহ সর্ব্বত্র সভা-সমাবেশ ও

'চীন ব্যাখ্যা সমেত কলম্বো প্রস্তাব সম্পূর্ণ না মানিলে আলোচনা হইবে না'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ভাষণ। রাজ্যসভায় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের উক্তি : কলম্বো প্রস্তাবের ব্যাখ্যা ও কলম্বো প্রস্তাবে ভারতের দাবী মূলতঃ পূরণ হইয়াছে।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) : পি এস পি, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও হিন্দু মহাসভা কর্ত্তৃক কলম্বো প্রস্তাবের বিরোধিতা জ্ঞাপন।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) : লোকসভায় ব্যাখ্যাসহ কলম্বো প্রস্তাব অনুমোদন—শ্রীনেহরুর সিদ্ধান্ত বিপুলভাবে সমর্থিত।

উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক (সংস্কৃত) ডাঃ পি ভি কানে 'ভারতরত্ন' মর্য্যাদায় ভূষিত—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর (অমাদের অভিনেতা) যথাক্রমে 'পদ্মবিভূষণ' ও 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ—প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় সম্মান বিতরণ।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) : সর্ব্বত্র বিপুল উৎসাহ সহ চতুর্দ্দশ প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত—দিল্লীতে শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে অভিনব শোভাযাত্রা—রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ।

নব পর্য্যায়ে 'দৈনিক বসুমতী'র জয়যাত্রা সুরু—প্রধান সম্পাদক পদে অপরাজেয় সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) : রাজভবনের সন্নিকটে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (পশ্চিমবঙ্গ) কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্রনায়ক বাল গঙ্গাধর তিলকের (লোকমান্য) ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) : ভূপালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর উক্তি : বর্ত্তমানে চীনের সহিত যুদ্ধের কথা উঠিতে পারে না।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) : ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ সুবান্দ্রিও'র ভারতে শুভেচ্ছা সফরে আগমন।

মহানগরীতে (কলিকাতা) বসন্ত রোগ মহামারী বলিয়া ঘোষিত—অবিলম্বে টীকা লওয়ার জন্ম নাগরিকদের প্রতি দাবী।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) : দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রদ্ধানত চিত্তে শহীদ দিবস ও গান্ধী স্মৃতি দিবস উদ্‌যাপিত।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিমান বাহিনী বিশেষজ্ঞ দলের দিল্লী উপস্থিতি।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান পরিষদে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল গৃহীত—পরিষদ কর্ত্তৃক অবিলম্বে 'বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট' গঠনের দাবী।

শিলচরে সরস্বতী পূজা নিরঞ্জন উপলক্ষে দুই দলে হাঙ্গামায় ৩০ জনের অধিক হতাহত হওয়ার সংবাদ।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) : '৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৩) হইতে গিনি সোনার গহনা বিক্রয় নিষিদ্ধ—১৪ ক্যারেট স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করা চলিবে'—স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীকোটাকের ঘোষণা।

১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী) : শিলচরে হাঙ্গামার সম্প্রসারণ, ৯০ লোক গ্রেপ্তার।

'ভারত ভূমি হইতে চীনা হামলাদারদের বিতাড়নই আমাদের একমাত্র ব্রত'—কলিকাতার নেতাজী জয়ন্তী উৎসবে শ্রীঅশোককুমার সেনের (আইনমন্ত্রী) ভাষণ।

২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী) : থাগলা গিরিপৃষ্ঠ সমেত নেফা

শিলচরের গ্রামাঞ্চলে হাজামায় বিস্তৃতি—ইতস্ততঃ লুণ্ঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের সংবাদ।

২১শে মাঘ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী): গৃহ নির্ম্মাণ খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এক তৃতীয়াংশ (প্রায় ছয় কোটি টাকা) হ্রাস।

২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী): শিলচরের ঘটনাবলীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর উদ্বেগ প্রকাশ। দুই মাসের জন্য আসামে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রবেশ নিষিদ্ধ।

২৩শে মাঘ (৬ই ফেব্রুয়ারী): কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের কলিকাতা উপস্থিতি ও সম্বর্দ্ধনা লাভ।

২৪শে মাঘ (৭ই ফেব্রুয়ারী): কলিকাতায় সফরাগত প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবনের দাবী: দুশমন (চীন) আবার রুখিয়া দাঁড়াইতে পারে, মোকাবিলার জন্য অব্যাহত প্রস্তুতি চাই।

২৫শে মাঘ (৮ই ফেব্রুয়ারী): গিনি সোনার অলঙ্কার বেচা-কেনার শেষদিনে দেশের সর্ব্বত্র গহনার দোকানগুলিতে অভাবনীয় ভিড় —অলঙ্কার ভিন্ন অন্য সোনার হিসাব দাখিলের মেয়াদ ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৩) পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী): শিলং-এ পূর্ব্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠক আরম্ভ—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও নাগাভূমির মুখ্যমন্ত্রিগণের যোগদান।

সারা বাংলা স্বর্ণশিল্পী সমাবেশে (কলিকাতা ময়দান) কর্ম্মহীন স্বর্ণশিল্পীদের অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন দাবী—সভাপতি: 'বসুমতী'র প্রধান সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী): পূর্ব্বাঞ্চল পরিষদের বৈঠকে (শিলং) সভাপতি হিসাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর ঘোষণা: কলম্বো প্রস্তাবের রদবদলের প্রশ্ন অবান্তর।

২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী): সোভিয়েট 'মিগ' বিমানের প্রথম দফা চালান (৪খানি বিমান) বোম্বাই-এ হাজির।

কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ হইতে সেক্রেটারী-জেনারেল শ্রীনাম্বুদিপাদের পদত্যাগ।

২৯শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী): চীনাদের হাতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ৩৩১৯ জন এখনও আটক থাকার সংবাদ।

৩০শে মাঘ (১৩ই ফেব্রুয়ারী): ১৯৬৩ সালেই ২৫ লক্ষ ছাত্রের এন-সি-সি ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা—প্রাক্-স্নাতক ছাত্রদের (সক্ষম) তিন বৎসরব্যাপী বাধ্যতামূলক এন-সি-সি ট্রেনিং।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র দপ্তর) শ্রীবি. এন. দাতারের (৬৮) দিল্লীতে লোকান্তর।

বহির্দেশীয়—

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী): ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বৃটেনের সদস্য হওয়ার প্রশ্নে দ্য গলের (ফরাসী প্রেসিডেন্ট) আপত্তি।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী): বৃটিশ শ্রমিকদলের নেতা মিঃ হিউ গেটস্কেলের (৫৬) পরলোকগমন।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী): জোট বহির্ভূত ছয় জাতি কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাব প্রকাশ—প্রস্তাবে লাডাকে চীনা ফৌজ ২০ কিলোমিটার দূরে অপসারণের অনুরোধ—চূড়ান্ত মীমাংসা সাপেক্ষে নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চল গঠনে চীন ও ভারতের নিকট সুপারিশ।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী): বিনা বাধায় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী কর্ত্তৃক কাটাঙ্গা প্রেসিডেন্ট শোম্বের শেষ ঘাঁটি কলওয়েজি অধিকার।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী): ঢাকায় পাক্ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মহম্মদ আলির (৫২) জীবনাবসান।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী): পাক্ পররাষ্ট্র সচিব পদে মিঃ জেড-এ ভুট্টো নিযুক্ত।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী): চীন কর্ত্তৃক কলম্বো প্রস্তাব নীতিগতভাবে গ্রহণ—শ্রীমতী বন্দরনায়কের (সিংহলী প্রধানমন্ত্রী) নিকট চীনা প্রধানমন্ত্রীর (মিঃ চৌ এন-লাই'র) পত্র।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী): সিকিম-তিব্বত সীমান্তে চীনা সৈন্য সমাবেশের সংবাদ—সিকিম দরবার কর্ত্তৃক সীমান্ত সম্পূর্ণ বন্ধ।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী): স্বনামধন্য মার্কিণ কবি রবার্ট ফ্রস্টের (৮৮) জীবনদীপ নির্ব্বাণ।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বৃটেনের প্রবেশ চেষ্টা ব্যর্থ—বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী): আঙ্কারায় দুইটি বিমানের সংঘর্ষে অন্ততঃ ৮০জন নিহত ও প্রায় ৫০জন আহত।

২১শে মাঘ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী): অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নে জেনেভায় ৮৭-জাতি সম্মেলন (প্রাচ্য-প্রতীচ্য) আরম্ভ।

টাঙ্গানাইকার মোশিতে আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলন (তৃতীয়) সুরু—উদ্বোধক: টাঙ্গানাইকা প্রেসিডেন্ট মিঃ জুলিয়াস নাইয়েরি।

২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী): কানাডার ডিফনবেকার মন্ত্রিসভার (রক্ষণশীল) পতন—পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত।

২৪শে মাঘ (৭ই ফেব্রুয়ারী): আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে (টাঙ্গানাইকা) পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী চক্রান্ত—ভারতীয় প্রতিনিধিদলের প্রতিবাদস্বরূপ সম্মেলন ত্যাগ।

খেলাধূলায় রাজনীতি প্রশ্রয় দেওয়ায় অলিম্পিক ক্রীড়া হইতে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ইন্দোনেশিয়া সাসপেণ্ড।

২৫শে মাঘ (৮ই ফেব্রুয়ারী)· ইরাকে সামরিক অভ্যুত্থান —কর্ণেল মোস্তফার নেতৃত্বে বিপ্লবী পরিষদ কর্ত্তৃক ক্ষমতা দখল।

আফ্রো-এশীয় সংহতি-সম্মেলনে ভারতের পুনরায় যোগদান।

কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসা চেষ্টায় করাচীতে তৃতীয় দফা ভারত-পাকিস্তান বৈঠকের সূচনা।

২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী): ইরাকের গদীচ্যুত প্রধান মন্ত্রী কাসেমকে গুলী করিয়া হত্যা—নূতন প্রেসিডেন্ট কর্ণেল আরিফ।

গণভোট ও কাশ্মীর বিভাগের প্রশ্নে ভারত-পাক বৈঠকে (করাচী) সঙ্কট সৃষ্টি।

২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী): ভারত-পাক বৈঠকে আপাততঃ সঙ্কটের অবসান—শেষ পর্য্যন্ত মার্চ্চ মাসে পুনরায় কলিকাতায় বৈঠকের (চতুর্থ দফা) প্রস্তাব।

টাঙ্গানাইকা সম্মেলনে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণে ভারত ও চীনকে আহ্বান—ভারতের উদ্যম শেষ পর্য্যন্ত জয়যুক্ত।

৩০শে মাঘ (১৩ই ফেব্রুয়ারী): কঙ্গোলী সরকারের (কেন্দ্রীয়)

জাতীয় পক্ষী ময়ুর—জয়তু !

সুনামখ্যাত পক্ষী নীলকণ্ঠ-ময়ূর আমাদের দেশের জাতীয় পাখীর গৌরব লাভ করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে সুন্দরতম পাখী হিসাবে ময়ূর প্রাক-ইতিহাসে স্বীকৃত ও উল্লেখিত। বাফুন সাহেবের ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতে আলেকজান্দারের সময়ে ময়ূর ভারত হইতে গ্রীসরাজ্যে নীত হয়। অনন্তর গ্রীসদেশ হইতে য়ুরোপের সর্ব্বত্র ময়ূরপক্ষী প্রেরিত হয়। কোন কোন পণ্ডিত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণসহ নির্ণয় করিয়াছেন যে, পেরিক্লিসের পূর্ব্বে গ্রীসে ময়ূর আনীত হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি যুগ যুগ ধরিয়া ময়ূর এক পরম পবিত্র পক্ষীরূপে হিন্দুজাতির পূজা পাইয়া আসিতেছে। কেননা ময়ূর ভারতীয় দেবতা রণনিপুণ কার্ত্তিকেয়ের বাহন। আবার বিদেশেও ময়ূরকে ধার্ম্মিক জাতির অর্ঘ্য অর্জ্জন করিতে দেখা যায়। ময়ূর জুনোর (Juno) প্রিয় পক্ষী হিসাবে প্রসিদ্ধ। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ ময়ূরকে 'পাবোনিনি' (Pavonina) নামক পক্ষী শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। উক্ত পক্ষিবর্গের লক্ষণ ;—চঞ্চু সুকঠিন ও ন্যুব্জ এবং অগ্রভাগ বক্রাকার। গণ্ডস্থলে অন্যান্য অবয়ব অপেক্ষা পালক কম, মস্তকে শিখা বা চূড়া। ডানার পাখার মধ্যে ছয়খানি সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা পাখা। পুচ্ছের পালক আঠারোটি। লেজের পালক সমূহ অত্যন্ত প্রলম্বিত।

ময়ূরের চাকচিক্যময় দৈহিক সৌন্দর্য্য দেখিলেই আকৃষ্ট হইতে হয়। তাই কবি ও শিল্পীদের সৃষ্টিসম্ভারে ময়ূরের রূপশোভার উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের পৌরাণিক একটি কাহিনী প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয়। কাহিনীটি এইরূপ :—দুর্দ্দান্ত ও স্বেচ্ছাচারী রাবণরাজা ব্রহ্মার বরপ্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া ভূলোকের সকল ব্যক্তিকেই তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞানে কাহাকে অবমানিত; কাহাকে তিরস্কৃত, কাহাকে বা লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তাবৎ দেবতা রাবণের ভয়ে সতত ভীত ও সশঙ্কিত। ঠিক এই সময়ে মরুত্তের যজ্ঞ আরম্ভ হয়। যজ্ঞে নিমন্ত্রিত দেবগণ সকলেই হৃষ্টচিত্তে যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য সমাগত হন। বৃহস্পতির সহোদর ব্রহ্মর্ষি যজ্ঞের হোতৃপদ গ্রহণ করেন। মহা আড়ম্বরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। কিন্তু অদূরে পুষ্পকারোহণে আসিয়া রাবণ দেখা দিল। তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপ্রকা' র্ষ বিদায় লইল। তৎপরিবর্ত্তে দেখা দেয় বিষাদ ও আশঙ্কা। দেবতার দল অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহারা রাবণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকে তির্য্যগ্‌দেহে প্রবেশ করিলেন। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ময়ূর, ধর্ম্মরাজ বায়স, কুবের কৃকল এবং বরুণ হংসের রূপ ধারণ করিলেন। এই রূপে সমস্ত দেবগ দেহ পরিবর্ত্তনের দ্বারা রাবণের কোপানল হইতে রক্ষা পান। রা বিদায় লইলে ভিন্ন দেহধারী দেবতার দল আবার নিজ নিজ পরিগ্রহ করেন। রক্ষা পাইয়া যে যাহার দেহ ধারণ করিয়াছি তিনি তাহাকে এক একটি বর প্রদান করেন। এই বরদাতৃদের ম ইন্দ্র বরদানে ময়ূরকে আপ্যায়িত করিলেন। বর পাইয়া ময়ূরের গা সহস্র সহস্র বিচিত্র নেত্র উদ্ভাসিত হয়। ইহাতে সর্পভয় বিদূরিত হ ইন্দ্র যখন বর্ষণ করিতে থাকেন তখন ময়ূরের অপূর্ব্ব প্রীতির নিদ প্রকাশ পায়। নীলবর্ণে রঞ্জিত নীলকণ্ঠী ময়ূর বরলাভের পর আ গাত্রে বিবিধ চিত্র-বিচিত্রতার অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। রামায়ণে শ্লোকগুলি উদ্ধৃতির লোভ সম্বরণ করা যায় না। যথা—

> ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবৃত্তো ধর্ম্মরাজস্তু বায়সঃ।
> কৃকলাশো ধনাধ্যক্ষো হংসশ্চ বরুণোঽভবৎ ॥
> ইত্যুক্তেদাত্রবীদিন্দ্রো ময়ূরং নীলবর্হিণম্।
> প্রীতোঽস্মি তব ধর্ম্মজ্ঞ ভুজগাদ্ধি ন তে ভয়ম্ ॥
> ইদং নেত্রসহস্রস্তু যত্তদ্বর্হে ভবিষ্যতি।
> বর্ষমাণে ময়ি মুদং প্রাপ্স্যসে প্রীতিলক্ষণং ॥
>
> (রামা উঃ ১৮ সঃ)

বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অদূরে আবার এক যুদ্ধলিপ্সু রাবণ আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার নাম মাও সে তুং। পররাজ্য গ্রাস এই কূট কুটিল সর্পরূপীর এক মাত্র বাসনা। আত্মস্ফীতির দ্বারা অন্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করাই এক মাত্র উদ্দেশ্য। তাই তাহার czar-বাহিনী বার বার আসিয়া আমাদের সীমান্তে হানা দিয়াছে। আগ্নেয় মারণা প্রয়োগ করিয়া ধ্বংস ও লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নিষ্ঠুর নরহত্যা লালসায় আমাদের সীমান্তকে রক্তাপ্লুত করিয়াছে। শিশু ও নারী পাশবিক অত্যাচার হইতে রেহাই পায় নাই।

ঠিক সেই অশুভ মুহূর্ত্তে ময়ূরকে ভারতের জাতীয় পক্ষীর মর্য্যাদা দান করিয়া আমাদের জাতীয় সরকার সময়োচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। আজ আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায়কে ময়ূরবাহ কার্ত্তিকেয়কে আদর্শ রূপে স্মরণ করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতি চাই আজ, তাই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাই একমাত্র ব্রত আমাদের। পণ শত্রুনিধন। বক্ষে ধারণ করিতে হইবে জাতীয় প্রতীক "ময়ূর"। কারণ, ময়ূরই সর্পকুলের ধ্বংসকর্ত্তা। ইতিহাসের ড্রাগন আজ সর্প-আকার ধরিয়াছে। জাতীয় পক্ষী ময়ূরকে অভিনন্দন জানাই। তাহার এই পদ-মর্য্যাদা সার্থক হোক।

পিতৃমাতৃহীন বাংলা দেশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে, বাঙলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতার ন্যায় ব্যবহার ও ঔদাসীন্যের কথা। ইংরাজ শাসনের অবসানের পর এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতে এ যাবৎকাল এইরূপ অভিযোগ বহু প্রকারে ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। বর্তমান বাঙলা দেশে যথার্থ নেতা নাই বলিলেই চলে। আমরা এ স্থলে বিরোধী দলের নেতাদের কথা উল্লেখ করিতে চাই। পশ্চিম বাঙলার অতি সঙ্গত দাবী জানাইবার মত কোন রাজনৈতিক সংস্থার অস্তিত্ব আজ আর নাই। যেগুলি আছে, সেগুলি দলীয় স্বার্থকেই অধিক মূল্য দিতেছে। দেশ অপেক্ষা পার্টি আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে। পার্টিকে অধিক মূল্য দিতে হইলে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিতে হয়। সুতরাং যাহাদের ভোটের জোরে গদীলাভ হয়, পরে আর তাহাদের মনে থাকে না। আবার একটি ভোট আসিলে তখন আবার মুখে মেকী হাসি ফুটাইয়া, কণ্ঠে নকল আত্মীয়তার সুর ফুটাইয়া ভোটদাতাদের দুয়ারে দুয়ারে যুক্তকরে দাঁড়াইতে পারিলেই কার্যসিদ্ধি হইলেও হইতে পারে। আপাততঃ পার্টির ধ্বজা বহন করিয়া কোন রকমে দিনগুলি কাটাইয়া দেওয়া যাক। বিরোধী দলে বাঙালী বলিয়া পরিচিত নেতাদের মুখ খুলিবারও উপায় নাই। প্রতিবাদ জানাইবার মত ব্যক্তিত্ব কবে যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহারা নিজেরাই বোধ করি আজ আর জানেন না। তদুপরি মাথার চৈতন্য-শিখাটি দিল্লীর সহিত সংযুক্ত রাখিতে হইলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখ খুলিবার কোন উপায় থাকে না। কেবল বাঙলা পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে মধ্যে মধ্যে স্বরেণ্য প্রতিবাদের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় শাসকদের নিকট সাহিত্যপদবাচ্য প্রতিবাদের কোন মূল্যই নাই। কত ধানে যে কত চাল হয়, দিল্লী-সরকারের নিকট তাহাও অবিদিত নাই।

অথচ কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজস্ব ও আয়কর প্রভৃতি বাবদে পশ্চিম বাঙলা বছরে বছরে কত টাকা উপার্জন করিয়া দেয়, তাহার হিসাব পরিসংখ্যাতেই প্রকাশমান। অপর রাজ্যের অসঙ্গত প্রাপ্য বৃদ্ধি করিতে হয় বলিয়া পশ্চিম বাঙলাকে যথেচ্ছ ফাঁকি দিতে হয়। এই পোড়া বাংলা দেশে আবার সমস্যার অন্ত নাই। চাউলের মূল্য দ্রুতগতিতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। বাঙালীর বাসস্থানের ব্যবস্থা আজও পাকা হইল না। পাকিস্তান হইতে বাস্তুহারাদিগের আগমন আজও থামে নাই। বাঙলা দেশের বর্তমান বেকার সমস্যা এক ঐতিহাসিক পর্যায়ে আজ উন্নীত। ক্রমবর্ধমান শিল্পক্ষেত্র রক্ষার জন্য দায়িত্ব বহন করিতে হয় প্রাদেশিক সরকারকেই। চাল, পাট, চা প্রভৃতি বিদেশী মুদ্রা-উপার্জনের রসদের ফসল যোগাইতে হয় বলিয়া বাঙলা দেশের প্রায় অর্ধেক জমি অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যায় না। বিদেশী মুদ্রা উপার্জনে লাভবান হইবে ভারত সরকার, ঠকিবে বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতি। ভাগ্যের পরিহাস বলিয়া বিষয়টিকে মানিয়া লইতে পারিলে আর কোন বাধা থাকে না। পড়িয়া পড়িয়া মার খাওয়া ভিন্ন বাঙালীর উপায়ান্তর নাই। অন্য প্রদেশসমূহের প্রাপ্য বৃদ্ধি করিতে হয় বলিয়া বাঙলা দেশকে যতটা পারা যায় ঠকাইতে হইবে। আমাদের কেন্দ্রীয় সভ্য-শাসকদের এই নির্লজ্জ মনোভাব, দুষ্ট প্রবৃত্তি ও উদ্দেশ্যমূলক আচার ব্যবহার আরও কতকাল বাঙালীকে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইবে কে জানে! কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার যে এইরূপ বিমাতার ন্যায় ব্যবহার নতুন করিতেছেন তাহা সত্য নহে। ভূতপূর্ব ইংরাজ শাসকবৃন্দের পদানুসরণ করিয়াই হয়তো এই শিক্ষাই কেন্দ্র লাভ করিয়াছে। ইংরাজের একচক্ষু নীতির কারণ তবু একটা ছিল। বাঙলা দেশের ও বাঙালীজাতির বিপ্লব-আন্দোলন ইংরাজ শত চেষ্টাতেও দমন করিতে পারে নাই। তজ্জন্য বাঙালীকে হাতে মারিতে না পারিয়া ভাতে মারিবার ষড়যন্ত্র করিতে ইংরাজ বাকী রাখে নাই। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজাতীয় মনোভাবের কারণ যে কি, আমরা অনুমান করিতে পারিতেছি না। বাঙলা অভিধান হইতে তো ক্রমে ক্রমে 'প্রতিবাদ', 'বিদ্রোহ', 'বিপ্লব'
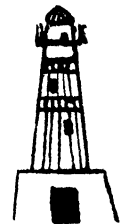
শব্দগুলি বিদায় লইতেছে। সুতরাং তবে আর কেন দিল্লী সরকার প্রতিশোধ গ্রহণের মত ও পথ অনুসরণ করিতেছেন? হাতে শক্তি পাইয়া একটা জাতির কণ্ঠরোধ করা যাইতে পারে, শক্তির বলে একটা জাতিকে তিলে তিলে হত্যাও করা যাইতে পারে, যদিও পরিণামটা সুখকর হয় না। সেই অত্যাচারিত ও নিপীড়িত জনগণ শেষ পর্যন্ত সর্বহারাদের খাতায় নাম লিখাইয়া বিদেশে-তৈরী, মার্কা-মারা কোন একটি বিশেষ 'ইজম'-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ হেন সুবর্ণ সুযোগ তখন আর ত্যাগ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না সম্প্রসারণবাদীর দল। সুযোগটা কাজে লাগাইতে বদ্ধপরিকর হয়। তখন অভাবের টানে মানুষের স্ব-ভাবটাও বিনষ্ট হইয়া যায়। সত্তা বলিতে যাহা কিছু সবই গোল্লায় যায়। অতএব, কেন্দ্রীয় সরকার সাবধান! বাঙালী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে গোটা ভারতবর্ষের ছাঁচে-ঢালা ভিতটুকু পর্যন্ত একদিন না একদিন চিড় খাইয়া নড়িয়া উঠিবে। দুঃখের বিষয়, তখন আর 'তখং' সামলানো যাইবে না।

অসি ও মসী

"আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইবে।" এই উক্তি করিয়াছেন (সাম্প্রতিক একটি রচনায়, জাতীয় দুর্দিনে, বহিঃশত্রুর আক্রমণে লেখকদের কর্তব্য-বিষয়ে) বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম কর্ণধার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তবুও যাহা হউক দেশের সঙ্কটকালে তিনি এক সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিয়াছেন। জাতীয় বিপর্যয়ে লেখক-লেখিকাদের ব্যক্তিগত কর্তব্য যে একটা আছে তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। যুদ্ধের প্রতিবাদে সাহিত্যসেবী

যুদ্ধে যোগদান না করিলে চলিবে না, তারাশঙ্করের মূল্যবান উক্তিতে ইহাই প্রমাণিত হয়। রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসিয়া শুধু মাত্র কথার জাল বুনিয়া দেশাত্মবোধক রচনা সৃষ্টি করা যায় না। বিষয়টি উপলব্ধি করিতে হইবে। পৃথিবীতে ইতিপূর্বে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হইয়াছে। যে সব দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে সেই সেই দেশের কবি, ঔপন্যাসিক ও শিল্পীদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া অস্ত্রধারণ করিতে দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সৈনিকের দলে নাম লিখাইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র না দেখিলে হয়তো কাজীসাহেব এমন জোরালো দেশ-মাতানো সঙ্গীত ও কাব্য রচনা করিতে পারিতেন না। সাম্প্রতিক যুগের আর এক উল্লেখযোগ্য নাম, মার্কিণ সাহিত্যিক আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে। তিনিও স্বয়ং যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তবেই না "ফেয়ারওয়েল টু আর্মস" এর ন্যায় মহৎসাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। বিখ্যাত লেখকদ্বয় করডওয়েল ও রলফ্যাক্স স্পেনীয় গৃহযুদ্ধেই নিহত হন। আন্দোলনে, বিপ্লবে ও দেশের কাজে সরাসরি যুক্ত না থাকিলে যে ম্যাক্সিম গর্কীর 'মা' সৃষ্ট হইত না তাহা গর্কী নিজেই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বিজাতীয় অনুকরণ প্রবৃত্তিতে দেশ যখন ডুবু ডুবু, সরকারী চাকুরীতে থাকিয়াও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের দূরবীণে দেখিয়া সেই পরপদানত ভারতবাসীর কানে কানে একটি মাত্র বীজমন্ত্র শুনাইয়াছিলেন। বন্দেমাতরম্! দেশমাতৃকার স্তুতিতে দেশ জাগিয়া উঠিয়া ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ভুলিয়া বিদেশের কুকুরকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে লিখিতে পারিতেন না—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা,
কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন
শক্তের অপরাধে,
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে—
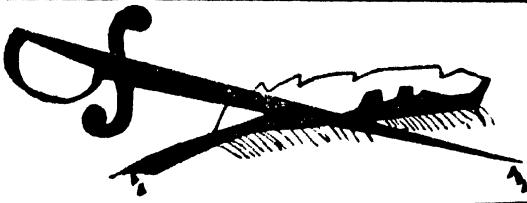
বাঙলা দেশ বিপ্লব-আন্দোলনের জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত। রাসবিহারী, কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্র বাঙলার সন্তান। রফা করিয়া, আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে কথা চালাচালি করিয়া যে সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, ইহাই ছিল এই সকল দেশনেতার বদ্ধমূল ধারণা। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বাঙলা দেশের আপোষহীন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষে ও গুপ্তভাবে যুক্ত ও জড়িত ছিলেন। 'পথের দাবীর' ইতিহাস অন্ততঃ এই কথারই সাক্ষ্য দেয়। পথের দাবী উপন্যাসে বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রস্তুতি মাত্র অঙ্কিত করিয়াছেন শরৎচন্দ্র। সংগ্রামের জন্য চাই সাধনা। দুই চারটি ইংরাজকে ইতস্তত হত্যা করিয়া দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা কখনও কার্য্যকরী হয় না। দেশকে সম্পূর্ণরূপে গঠন করিতে হইলে এক সামগ্রিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। বিদেশে বহু War Poet বা যুদ্ধের কবি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের পাশে থাকিয়া অতুলনীয় সাহিত্য রচনায় দেশকে যুদ্ধের ছবি দেখাইয়াছেন দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

অধুনা সকল প্রদেশেই ভারতীয় লেখকলেখিকা, শিল্পী, গায়ক ও অভিনেতৃবর্গ দেশের ডাকে সাড়া দিতেছেন। বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক শত্রুনিন্দায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আজ মসী অপেক্ষা অসির সক্রিয়তাই অধিক 'মূল্যবান'। তাই বোধ করি তারাশঙ্কর সক্ষোভে এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সাহিত্যিকদের কর্ত্তব্য এই মহামূল্যবান উক্তির যথার্থ মূল্য দান করা। অসি অপেক্ষা মসী যে অনেক বেশী শক্তিশালী, সকলেই স্বীকার করে। তবে কি না আমাদের

দেশটা বিদেশীর লোলুপ কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইলে সাহিত্য, কৃষ্টির মান যাচাই হইতে পারে। আপাততঃ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যোগদান করাই সকল সমর্থদের কর্ত্তব্য। সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরীদের পাশে থাকিয়া জোয়ানদের সঙ্গে থাকিয়া শত্রুবিতাড়নের শুভকাজে লাগিতে হইবে। ততঃপর কাব্য ও সাহিত্যে দেশাত্মবোধ স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই স্ফুরিত হইবে। আমাদের জনপ্রিয় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনও দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন, 'নেফায় চলো।' 'লাদাকে চলো।'

এ হেন দুঃসময়ে লেখনী শিকায় তুলিয়া রাখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া অসিধারণই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। শত্রুকে নির্মূল করিতে মসী অপেক্ষা অসি অধিক কার্য্যকরী। কিন্তু আমাদের শত্রু যে কে তাহাও জানিতে হইবে। চীনজাতি না কম্যুনিজম? উত্তরও পাওয়া যাইতেছে প্রগতিশীল এক লেখকের ক্ষুব্ধকণ্ঠে। সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলিতেছেন: "আজ দেখছি, কমিউনিজম চৈনিক পররাজ্যলোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বীজে পরিণত হয়েছে। এই কমিউনিজম আমাদের শত্রু, সমস্ত মানবতার শত্রু। আমার লেখায় তার বিরুদ্ধে ধিক্কার সহস্র কণ্ঠে ফেটে পড়ুক।"

দেশ বড় না সোনা বড়?

'আসল-সোনা' নিয়ন্ত্রণ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী স্বর্ণকার ও স্বর্ণশিল্পীদের বেকারত্ব লাভ করিতে হইল। একটা কোন বিকল্প ব্যবস্থা যে অচিরাৎ হইয়া উঠিবে, তাহাও মনে হইতেছে না। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে হইলে যে প্রচুর পরিমাণ সোনার

প্রয়োজন হয়, দুনিয়ার বাজার হইতে সমর-উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে সোনা ব্যতীত যে অন্য কোন মাধ্যম (Medium) নাই— ইহা অর্থনীতি বিষয়ক একটি সর্বৈব সত্য ঘটনা। ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে সোনার বহুল ব্যবহার বহুকাল যাবৎ চলিত আছে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই কিছু না কিছু সোনা সঞ্চয় করিয়া রাখে। সোনা যেমন নারীজাতির অঙ্গের ভূষণরূপে দেহের শোভা বৃদ্ধি করে, তেমনই আবার অভাব, অনটনে দুর্ভিক্ষে ও অকালে সোনার বিনিময়ে আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা হয়। সোনার পরিবর্তে অন্নের সংস্থান করা যায়। যে জন্য সরকার আদেশ জারী করিয়াছেন, 'চৌদ্দ ক্যারেটের বেশী সোনা ব্যবহার করা যাইবে না।' এই রীতি প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণশিল্পীদের মাথায় হাত পড়িয়াছে। কারণ চৌদ্দ ক্যারেটের অলঙ্কার ইত্যাদি তৈয়ারীর যন্ত্র ও সরঞ্জাম আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। প্রকৃত সমস্যা এইটি। অনেকে বলিতেছেন, আসল না পাইলে মিশেল সোনার অলঙ্কার গাত্রে ধারণ করিতে দেশবাসী অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে। হয়তো এই জনমত অসত্য নয়। কিন্তু দেশে একটা যুদ্ধ বাধিলে সোনা যে কোন কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় যথার্থ প্রচারের দ্বারা দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। জরুরী অবস্থার চাপে পড়িয়া স্বর্ণ সঞ্চয়ের আশায় সরকারও বেশ কিছুটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। স্বর্ণবণ্ড বস্তুটি কি তবে দেশবাসী গ্রহণ করিতে পারিতেছে না ? স্বর্ণবণ্ডের প্রচার কি তবে ব্যর্থ হইতেছে ? আবারও বলি যুদ্ধকালীন সোনার মূল্য দেশের (যে দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা অধিক) নরনারীকে উপযুক্তভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এর স্বর্ণশিল্পীর বেকারত্ব ঘুচাইবার জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্র ও সরঞ্জাম আনাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ জমিদারী প্রথা বিলোপের পর জমিদারী সেরেস্তার নায়েব-গোমস্তাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই হইবে। অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করিতে হইবে। হয়তো বা দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিতে আত্মহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই জনৈক স্বর্ণশিল্পীর ইচ্ছামৃত্যু এই নিদারুণ দুঃখের পথ দেখাইয়াছে। এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্বর্ণশিল্পীদের জন্য একটি কোন গঠনমূলক বিকল্প ব্যবস্থা সরকার যদি অবিলম্বে না করেন, উক্ত ঘটনার অনুকরণ যে হইবে না তাহাও বলা যায় না। প্রসঙ্গতঃ একটি সত্যঘটনা ব্যক্ত করি। আমাদিগের জনৈক বন্ধু রুশদেশ ভ্রমণে যাইয়া বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন। বন্ধুটির হাতের দুই আঙুলে দুইটি ভারী ওজনের স্বর্ণাঙ্গুরীয় ছিল। বন্ধুটি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'এই আঙটি দুইটি লইয়া রাশিয়ার ছেলে-মেয়েরা সোনা দেখিবার বাসনায় কাড়াকাড়ি করিয়াছে।' আসল সোনা রাশিয়াতে এতই দুর্লভ ও দুর্মূল্য।
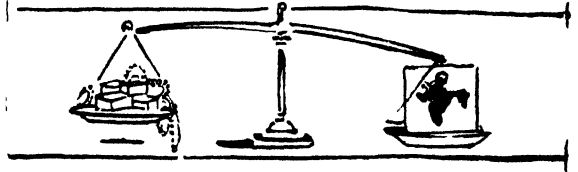
মহাযুদ্ধের সঙ্গে রাশিয়ার যথেষ্ট পরিচয় আছে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হইতে হিটলারের সঙ্গে পর্য্যন্ত রাশিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। আজও পৃথিবীর অন্যান্য জঙ্গীবাদী যুদ্ধবাজদের সায়েস্তা করিবার জন্য রাশিয়া প্রস্তুত হইয়াই আছে। বিশেষতঃ আরও একটা মহাযুদ্ধের কালো মেঘ দিগ্বিদিকে যখন তখন বিজুরী হানিতেছে। রাশিয়া জানে সোনার মূল্য ও প্রয়োজন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির বিপাকে পড়িয়া রাশিয়াকে জানিতে হইয়াছে।

তাই বলি আমাদের দেশ ও দেশবাসীর অস্তিত্বটাই যদি বিপন্ন হয়, তখন সোনার পাথরবাটিতে সুপেয় আহার্য্য ভক্ষণের সাধ হওয়া একটা এত বড় জাতির পক্ষে সুস্থতার লক্ষণ নয়। দেশকে বিদেশের হাতে সমর্পণ করিয়া বিকাইয়া দিয়া সোনা আগলাইয়া বসিয়া থাকার আশা দুরাশা মাত্র। দেশ ও জাতি বাঁচিলে আমাদের এই দেশের মাটিতে আবার সোনা ফলানো যাইবে। একেবারে যাহাকে বলে খাঁটি সোনা। তৎপূর্ব্বে বিদেশের খাদ-ভেজালের পথটা সর্ব্বাগ্রে রোধ করা প্রয়োজন। সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দেওয়া যদিও বা যায়, দেশকে জাহান্নমে পাঠাইয়া বিত্ত-বিলাস-বৈভব নৈব নৈব চ। ইহা দেশপ্রেমের পরিপন্থী।

॥ শোক সংবাদ ॥

ডাঃ জীবনরতন ধর

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবনরতন ধর গত ৫ই মাঘ ৭৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে জনদরদী হিসাবে ইনি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কর্মজীবনের সূচনায় তিনি আর্মি মেডিক্যাল সার্ভিসের কমিশণ্ড অফিসার ছিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ডাঃ ধর স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। দেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়ে ইনি একাধিকবার কারাবরণ করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য, অবিভক্ত বঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি, যশোহর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রভৃতি সম্মানাত্মক আসনসমূহ তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। চিকিৎসক ও জননেতারূপে ইনি নানাভাবে দেশ ও সমাজের সেবা করে গেছেন। ১৯৫২ সালে ইনি পশ্চিমবঙ্গের কারা ও অন্যান্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৬২ সালে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ডাঃ নীলরতন ধর ডাঃ ধরের অনুজ।

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বর্ষীয়ান নাট্য সমালোচক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত গত ৬ই মাঘ ৮৪ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দক্ষ লেখক এবং অভিজ্ঞ আইনরথী হিসাবেও ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সেনা হিসাবে তৎকালীন নেতাদের সঙ্গে ইনিও কারারুদ্ধ হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ইনি ছিলেন একান্ত সচিব। ফরোয়ার্ড এবং বঙ্গশ্রী পত্রিকার ইনি যথাক্রমে নাট্যসমালোচক ও সম্পাদক ছিলেন। দক্ষিণ কলিকাতা জেলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এঁকে নৃত্যনাটক এ্যাকাডেমী'র অন্যতম লেকচারার নিযুক্ত করেন। বহু সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির আসন এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এঁর অভিনয়দক্ষতাও সর্বজনস্বীকৃত। রোম থেকে প্রকাশিত এনসাইক্লো-পিডিয়া অফ থিয়েটার গ্রন্থে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কিত আলোচনাটি এঁর লেখনীপ্রসূত। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ, দেশবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধীয় কয়েকটি অতি মূল্যবান এবং তথ্যবহুল গ্রন্থের ইনি রচয়িতা।

মহম্মদ আলী

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী গত ৯ই মাঘ ৫৪ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেছেন। তৎকালীন বঙ্গের বিখ্যাত জননেতা ও অন্যতম মন্ত্রী নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর ইনি পৌত্র ছিলেন। সসম্মানে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে জনসেবার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই বিবিধ দায়িত্বপূর্ণ আসনসমূহ অধিকার করে পাদপ্রদীপের আলোয় সমুদ্ভাসিত হন। অবিভক্ত বাঙলায় ইনি অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৫৩ থেকে ৫৫ পর্যন্ত ইনি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর আসনে সমাসীন ছিলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, জাপান ও ব্রহ্মদেশে ইনি বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬২ সালে ইনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

হিতেন্দ্রমোহন বসু

বাঙলা দেশের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম—হিতেন্দ্রমোহন বসু গত ১৫ই মাঘ ৬৯ বছর বয়েসে লোকান্তরিত হয়েছেন। বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয়—কুন্তলীন পুরস্কারখ্যাত হেমেন্দ্র মোহন বসুর ইনি পুত্র ছিলেন। প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক নীতীন বসু এঁর ভ্রাতা। এ দেশের ক্রিকেট খেলার অনুশীলনে ও উন্নয়নে এঁর অবদান অতুলনীয়। মূল পারস্য ভাষা থেকে ওমর খৈয়ামের রুবায়াৎ বাঙলায় অনুবাদ করে ইনি সাহিত্যপ্রতিভার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রেখে গেছেন।

বিমল ঘোষ

বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক বিমল ঘোষ গত ২৮এ মাঘ মাত্র বছর বয়েসে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে গতায়ু হয়েছেন। প্রায় বছর যাবৎ বাঙলার চিত্রজগতের সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সং ছিলেন এবং তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানা ভাবে সহা করে গেছেন। তাঁর অক্লান্ত কর্মোদ্যম, সাংগঠনিক কুশলতা প্রভৃত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় চিত্রজগতের নানা ভাবে কল্যাণস করেছে। প্রথমে ইনি অগ্রদূত গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন পরবর্তীকালে বিমল ঘোষ প্রোডাকসান্স্ নামে নিজস্ব প্রা গঠন করেন ও সাধারণ্যে "বধূ" চিত্রটি উপহার দেন। পরিকল্পিত আগামী ছবিটির পরিচালক হিসাবেও তাঁর ঘোষিত হয়েছিল। ক্রীড়ামোদী হিসাবেও তিনি সুপরিচিত ছিলে মোহনবাগান ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সদস্যের তাঁর অধিকারগত ছিল।

শামসের আলা

ভারত তথা এশিয়ার বীমা জগতের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব শম আলী গত ১১এ মাঘ ৬৯ বছর বয়েসে পরলোকগত হয়েছে পৃথিবীর প্রথম দশজন বীমা এজেন্টদের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম এশিয়ার বীমা এজেন্টদের তালিকায় এঁর নামটিই ছিল প্রথম না লাইফ ইনস্যুরেন্স এজেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশানের চেয়ারম্যানের ইনি অলঙ্কৃত করেছেন। স্বর্গত সাহিত্যরথী এস, ওয়াজেদ আ ইনি অনুজ ছিলেন।

নলিনী দেবী

নবদ্বীপের মাতৃমন্দিরের ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির প্রতিষ্ঠা নলিনী দেবী গত ৪ঠা পৌষ ৮৬ বছর বয়েসে লোকান্তরিত হয়েছে নারীদরদী ও সমাজসেবিকা হিসাবে ইনি যথেষ্ট সুনাম এবং আকর্ষণে সমর্থা হয়েছিলেন। বহু অসহায় নারী এঁর কল্যাণে সা এবং আলোকিত জীবনে উপনীতা হতে পেরেছিলেন।

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

সাহিত্যিক অজিতকুমার রায়চৌধুরী গত ১৭ই মাঘ মাত্র ৪২ বয়েসে ইহলোকত্যাগ করেছেন। ১৯৪৪ সালে ইনি সসম্ম এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য সাধ ইনি ব্রতী হন ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প প্রবন্ধাদি রচনা করে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং পাঠক সমাজে বিপুল জনপ্রি লাভ করেন। তাঁর 'অকাল প্রেম' উপন্যাসটি পাঠক দরবা যথাযথ সমাদরে বিভূষিত হয়েছে। মাসিক বসুমতীর গত থেকে তাঁর অন্য উপন্যাস "কিংশুকরাগিণী" ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়,

মাসিক বসুমতীর শ্রাবণ '৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিশ্বজয়ী মল্ল গামা' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে মাসিক বসুমতীর আশ্বিন '৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত অজয় বসুর প্রতিবাদলিপি সম্পর্কে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। "এই শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারত পরপর তিনবার বিশ্ববিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছিল—"এই একটি লাইনের ওপর শ্রীবসু তাঁর বিস্তৃত প্রবন্ধে যতগুলি প্রশ্ন করেছেন, তাঁর সবগুলির উত্তরই কি উক্ত প্রবন্ধে ইতস্তত ছড়িয়ে নেই? বড়গামা যে বিশ্ব মল্ল-সমিতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিজয়ীর স্বীকৃতি পাননি, তা' কি উক্ত প্রবন্ধে অত্যন্ত দুঃখের সাথেই স্বীকার করা হয়নি?" "···বিশ্বের মল্লসমিতির কাছ থেকে 'জগজ্জয়ী' খেতাব তিনি কোনদিনই পাননি! বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'জন বুলবেল্ট'-এর অধিকারী হয়েও তিনি 'জগজ্জয়ী' উপাধি থেকে বঞ্চিতই হয়ে রইলেন।" (পৃঃ ৭৩৬)—প্রবন্ধের এই অংশটি বোধ হয় শ্রীবসুর নজরে পড়েনি। তবে আর শ্রীবসু তাঁর বিস্তৃত চিঠিতে কি এমন নতুন তথ্য পরিবেশন করলেন? গোলাম, গামা বিশ্ববিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছেন বলা হয়েছে, "লাভ করেছিলেন বিশ্ববিজয়ীর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি"—শ্রীবসুর এ-কথাটির উল্লেখ আছে কি প্রবন্ধের কোনখানে? বিশ্ব মল্ল-সমিতি কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষা না করেও ইউরোপীয় মল্ল-সমিতি যে সম্মান গোলাম, গামাকে দিয়েছিলেন, আমরা ভারতীয় হয়ে ভারতীয় মল্লের সে মর্যাদা অস্বীকার করব, এটাই বোধ হয় শ্রীবসুর অভিমত। তাই যদি হয়, তবে শ্রীবসুর ভাষাতেই বলি, "তাহলে কি ইতিহাসকে উপেক্ষা করবার মূলধন উত্তরকালের হাতে থাকে? শ্রীবসুর আর একটি মন্তব্য আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক লাগল। "গোবরবাবু গামাকে সমীহ করেই চলতেন" (পৃঃ ৭৩৫)—এই কথাটিতে শ্রদ্ধেয় গোবরবাবুকে ছোট করা হয়েছে বা গোবরবাবুর প্রতি সুবিচার করা হয়নি, শ্রীবসু এরূপ বিকৃত অর্থ করলেন কি করে? প্রবন্ধের যে স্থলে যে প্রসংগে কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে, ঠাণ্ডা মেজাজে পড়লে হয়তো শ্রীবসু এরূপ বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে পারতেন না। উক্ত প্রবন্ধেই বলা হয়েছে: "আজও কেউ হলপ্ করে বলতে পারেন না যে, 'গামা-গোবর' বা 'গামা-গোংগার' লড়াই হলে ফলাফল কি হত" (পৃঃ ৭৩৫)। শ্রদ্ধেয় গোবরবাবুকে যদি ছোট করাই উদ্দেশ্য থাকতো, তা'হলে তো এক কথাতেই বলা যেত যে, ফলাফল গামার পক্ষেই রায় দিত। যে গামার এত প্রশংসা করা হয়েছে, যে গামা মল্লজগতের এত বড় বিস্ময়, সেই গামার সাথে গোবরবাবুর (যিনি বয়সে গামার চেয়ে বারো বছরের ছোট ছিলেন) "লড়াই হলে ফলাফল কি হত" (পৃঃ ৭৩৫), "আজ কেউ হলপ্ করে বলতে পারেন না" (পৃঃ ৭৩৫)—বলার পেছ কি অর্থ থাকতে পারে, আশা করি বসুমতীর পাঠকদের কাছে আ বিস্তারিত ভাবে বলার প্রয়োজন হবে না। বড়গামার মত গোবরবাবুর প্রতি লেখক শ্রদ্ধাশীল কি না, তা জানবার জ শ্রীবসুকে আমি মাসিক বসুমতীর মাঘ '৬৮ সংখ্যায় প্রকাশি 'কুস্তিগীর শিল্পী' রচনাটি পাঠ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আ বড়গামাকে গোবরবাবু সমীহ (সম্মান) করতেন কি না, "বড়গামা সাথে কারুর তুলনাই চলে না" (পৃঃ ৭৩৫)—গোবরবাবুর এ উক্তিতে কি তা' প্রমাণিত হয় না? শ্রীবসুর আর একটি তথ্যের ওপর আমার একটু বক্তব্য আছে। তিনি তাঁর চিঠির এক অং জানিয়েছেন: "বাস্তবে গোবরবাবু বড়গামাকে 'আহ্বান' জানিয়ে ছিলেন।" শ্রীবসুর এই উক্তির আমি প্রতিবাদ জানাই। কার তাঁর কথাতেই বলি: "এই উক্তিতে ঐতিহাসিকের সততা ক্ষুণ্ণ হয়েছে ও অসত্য প্রশ্রয় পেয়েছে।" যতদূর জানি, সে-বার ভারতের সমস্ত মল্লদে উদ্দেশ্যে এক 'মুক্ত-আহ্বান' জানিয়েছিলেন বড়গামা নিজে, গোবরবা নন। গামার সে-আহ্বানে গোবরবাবু সাড়া দিয়েছিলেন। লড়াই অব হয়নি। 'আহ্বান' জানান, আর 'আহ্বানে' সাড়া দেওয়া, এই দু'য়ে মধ্যে যে পার্থক্য, তা' নিশ্চয়ই শ্রীবসুর অজানা নয়। তবে এ বিষয়ে শ্রীবসু যে তথ্য পরিবেশন করেছেন,—তার প্রামাণিক সূত্রটি তিনি যদি বসুমতীর পাঠকদের কাছে জাতির প্রয়োজনে আলোকপাত করেন তো, ভাল হয়। কারণ ভুয়া সংবাদ নিয়ে হৈ-চৈ করা কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আশা করি শ্রীবসু আমার এ অনুরোধ রক্ষা করবেন। আর শ্রীবসু যে-সব সূত্র জানতে চেয়েছেন, তার উত্তরে আমি তাঁকে শ্রীখেলোয়াড় রচিত 'বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে স্মরণীয় যাঁরা' (১ম ও ২য় খণ্ড) আর ব্যায়ামাচার্য শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী রচিত প্রবন্ধ 'মল্লজগতে ভারতের স্থান' পড়তে অনুরোধ জানাই। "গামা-গোবরে প্রকাশ্য কুস্তি হলে·····যদি মনে মনে ধরেই নেওয়া যায় যে, সে-ক্ষেত্রে বড়-গামাই বোধ হয় জয়লাভ করতে পারতেন,····উত্তরকালের হাতে থাকে?" শ্রীবসুর এ ধরণের উপদেশের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা' বুঝলাম না। 'মনে মনে ধরেই' বা তিনি এত উত্তেজি হলেন কেন বুঝতে পারলাম না। উক্ত প্রবন্ধের কোন অংশেই কে এমনভাবে 'মনে মনে ধরে' গোবরবাবুকে 'পরাস্ত' করা বা বড়-গামাকে

বিষয়ের অবান্তর আলোচনা করে তিনি বসুমতীর পাঠকদের 'বিব্রত' ও বিভ্রান্ত করেছেন বলেই আমি মনে করি। আমার এই পত্রোত্তরের উৎসও 'পাঠকের সেই বিব্রত মনোভাব।' আমার মনে হয়, শ্রীবসুর মতন অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি ভ্রান্ত-ধারণারবশে ও উত্তেজিত মনোভাব নিয়েই প্রবন্ধটির এরূপ পক্ষপাতদুষ্ট বিরূপ ও ভ্রান্তিমূলক সমালোচনা করেছেন। নমস্কারান্তে, ভবদীয়—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মিশনপাড়া, পো: বহড়া; ২৪, পরগণা।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আমি গত ১৬ বৎসর ধরিয়া মাসিক বসুমতীর গ্রাহক। বর্ত্তমানে **retire** করিয়া উপরের ঠিকানায় আছি। আমার নিকট পুরোণো বসুমতীর সেট আছে- নানা কারণে আমি সেটগুলি বিক্রয় করিয়া দিতে চাই। সেটগুলা বাঁধানো অবস্থায় আছে। সেট নিম্নলিখিত বৎসরের আছে :—

১৩৫৭ বাং কার্ত্তিক—চৈত্র	১৩৬৩ বাং কার্ত্তিক—চৈত্র
১৩৫৮ „ বৈশাখ—আশ্বিন	১৩৬৪ „ বৈশাখ—আশ্বিন
১৩৫৯ „ বৈশাখ—আশ্বিন	১৩৬৪ „ কার্ত্তিক—চৈত্র
১৩৬০ „ বৈশাখ—আশ্বিন	১৩৬৫ „ বৈশাখ—আশ্বিন
১৩৬০ „ কার্ত্তিক—চৈত্র	১৩৬৫ „ কার্ত্তিক—চৈত্র
১৩৬১ „ বৈশাখ—আশ্বিন	১৩৬৬ „ বৈশাখ—আশ্বিন
১৩৬১ „ কার্ত্তিক—চৈত্র	১৩৬৬ „ কার্ত্তিক—চৈত্র
১৩৬২ „ কার্ত্তিক—চৈত্র	১৩৬৭ „ বৈশাখ—আশ্বিন
১৩৬৩ „ বৈশাখ—আশ্বিন	১৩৬৭ „ কার্ত্তিক—চৈত্র

প্রতি ছয় মাসের সেট—৩৷৹, পুরাবৎসরের সেট—৭ টাকায় বিক্রয় করিতে পারি। আপনার পত্রিকায় ক্রয়েচ্ছু গ্রাহকদের জানাইয়া দিলে বাধিত হইব। নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—ভবদীয়—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস। পি ১৪৮ বসুনগর, পো: মধ্যম গ্রাম, চব্বিশপরগণা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী রাণী সেনগুপ্তা, অবধায়ক—শ্রী এ, এম, সেনগুপ্ত, এফ-৪০ ভগৎ সিং মার্কেট, নয়াদিল্লী * * * শ্রীমতী বনলতা হালদার, অবধায়ক—শ্রী বি, কে, বসু, টিম্বার ইয়ার্ড পাড়া, (শিলিগুড়ি), ডাক, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং * * * শ্রীমতী এস, এস, রায়, কিশোরভবন, সার্কুলার রোড, রাঁচী * * * তত্ত্বাবধায়ক, ধুবুলিয়া টি, বি, হসপিটাল (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ডাক, ধুবুলিয়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ * * * শ্রীমতী জয়লক্ষ্মী সরকার, অবধায়ক—এল, এম, আগরওয়ালা এ্যাণ্ড ব্রাদার্স, মেন রোড, ফুলবারিয়া, বারাউনি, জেলা—মুঙ্গের (বিহার)।

Rs. 15/- is sent herewith as annual subscription of Masik Basumati from Magh '69 to Pous '70 B. S.—District Library Association, Midnapur.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—Major S. K. Sen. Jodhpur, Rajasthan.

Herewith sending Rs. 15/- as yearly subscription

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হইতে চাই। এক বৎসরে টাকা একসঙ্গে ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। অরুণা ধরগুপ্তা মুঙ্গের।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। উদয়ন পল্লী পাঠাগার—দিনাজপুর।

Rs. 15/- as advance subscription for Masik Basumati for the year 1963 is sent herewith—District Central Library, Gaya.

বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। কার্ত্তিক হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—বলাইচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী, ধানবাদ।

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হবার ইচ্ছায় ৭.৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। ১৩৬৯ সালের কার্ত্তিক মাস থেকে আমাকে গ্রাহিকা হিসাবে গণ্য করে পত্রিকা পাঠালে বাধিত হব।—Mrs. Manju Chakraborty. Monteswar, Burdwan.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়তী দেবী ব্যানার্জ্জী, যোধপুর (রাজস্থান)।

Rs. 15/- is sent herewith as subscription of Masik Basumati for the year 1962-63 from Agrahayan to Aswin—S. K. G. Labour Welfare Centre, Social Club, Singhbhum (Biher).

মাসিক বসুমতীর চৈত্র '৬৮ সংখ্যা হইতে ফাল্গুন '৬৯ পর্য্যন্ত বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, মুর্শিদাবাদ।

Rs. 15/- is remitted herewith as annual subscription (Renewal) of leading Bengali Monthly Magazine "Masik Basumati" with effect from "Pous" 1369 B. S.—Promode Library, Darjeeling.

Please find herewith my subscription for 1963-64 and send the magazine in usual way—Dr. S. C. Mazumder,—24 Parganas.

I am sending herewith Rs. 15/- as subscription for monthly Basumati for one year from Baisakh to Chaitra 1369 B. S.—Anandapur High School, Midnapur.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য বাবদ (মাঘ ১৩৬৯ হইতে পৌষ ১৩৭০) ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—Ranjit Kumar Guha. Kanpur, (U. P.).

I send Rs. 15/- as yearly subscription for monthly Basumati with effect from "Magh"—Sm. Pusparani Datta. Bangalore.

আমার বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। যথারীতি মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীগীতা ভৌমিক, জলপাইগুড়ি।

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—শিক্ষানিকেতন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার,

মিলনপিয়াসী

—স্বর্গত পঞ্চানন রায় অঙ্কিত

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

PUBLIC LIBRARY ESTABLISHED 1859 UTTERPARA

মাসিক বসুমতী

৪১শ বর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৬৯] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

হিন্দুগণ আপ্তবাক্য বেদ হইতে নিজেদের ধর্মলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদ সমুদায়কে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই সমুদায় আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কর্তাগণের নাম ঋষি। আমরা তাঁহাদিগকে সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে পারদর্শী বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি। আমাদের ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশ, নাম বেদান্ত অর্থাৎ বেদের শেষভাগ—বেদের চরম লক্ষ্য। বেদজ্ঞানের এই সারভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ। আর ভারতের সকল সম্প্রদায়—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—যে কেহ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপনিষদভাগকে মানিয়া চলিতে হইবে। তাহারা উপনিষদ নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। বেদান্তের পরই স্মৃতির প্রামাণ্য। এগুলি ঋষি লিখিত গ্রন্থ, কিন্তু ইহাদের প্রামাণ্য বেদান্তের অধীন। কারণ, অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণের পক্ষে তাহাদের শাস্ত্র যেরূপ আমাদের পক্ষে স্মৃতিও তদ্রূপ। তৎপরে পুরাণ। পুরাণ পঞ্চলক্ষণ। উহাতে ইতিহাস সৃষ্টিতত্ত্ব দার্শনিকতত্ত্ব সকলের নানাবিধ রূপকের দ্বারা বিবৃত প্রভৃতি বিষয় আছে। বৈদিক ধর্ম সর্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়। ঐগুলি পণ্ডিতদিগের জন্য নহে, সাধারণ লোকের জন্য; কারণ, সাধারণ লোক দার্শনিকতত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। তারপর তন্ত্র। এইগুলি কতক কতক বিষয়ে প্রায় পুরাণের মত এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত প্রাচীন যাগযজ্ঞকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সকলগুলি হিন্দুদের শাস্ত্র। হিন্দুদিগের সকল সম্প্রদায়েরই এই মত যে, এই সৃষ্টি, এই প্রকৃতি, এই মায়া অনাদি অনন্ত। জগৎ কোন বিশেষ দিনে সৃষ্ট হয় নাই। একজন ঈশ্বর আসিয়া এই জগতকে সৃষ্টি করিলেন তাহার পর তিনি ঘুমাইতেছেন, ইহা হইতে পারে না। সৃষ্টিকারিণী শক্তি এখনও বর্তমান। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি কখনই বিশ্রাম করেন না।...জগতে এই সৃষ্টিশক্তি দিবারাত্র কার্য করিতেছে, ইহা যদি ক্ষণকালের জন্য বন্ধ থাকে, তবে এই জগৎ ধ্বংস হইয়া যায়।...সমগ্র প্রকৃতিই বিদ্যমান থাকে, কেবল প্রলয়ের সময় উহা ক্রমশ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে একেবারে অব্যক্তভাব ধারণ করে। পরে কিছুকাল যেন বিশ্রামের পর আবার কে যেন উহাকে বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়; তখন পূর্বের ন্যায় সমবায়, পূর্বের ন্যায়ই ক্রমবিকাশ, পূর্বের ন্যায়ই প্রকাশ হইতে থাকে। কে এই সৃষ্টি করিতেছেন? ঈশ্বর। ইংরেজিতে সাধারণত God শব্দে যাহা বুঝায়, আমার অভিপ্রায় তাহা নহে। সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। তিনিই এই জগৎ প্রপঞ্চের সাধারণ কারণ স্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? ব্রহ্ম নিত্য, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যজাগ্রত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, দয়াময়, সর্বব্যাপী, নিরাকার, অখণ্ড। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেন। —স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

কোন একটি বই

শ্রীমতী বাণী রায়

প্রথমেই আমার পত্নীর কথা বলতে চাই। প্রেমের অর্থ অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাস্পদের দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণের পুলক। সেই মানুষটির শুধু রূপ-দর্শনের পুলক নয়, অধিক বা অল্প যাই হোক না কেন, তার খুঁতগুলিরও অনুধাবনে আনন্দ আছে। আমাদের বিবাহিত জীবনের একেবারে প্রারম্ভ থেকে লেডার (তাই তার নাম) দিকে চেয়ে থাকাতে আমি অসীম তৃপ্তি পেতাম, তার মুখ, তার দেহের সর্ব্বভাব প্রকাশ এবং তুচ্ছতম চঞ্চল গতিভঙ্গি নিরীক্ষণেও এই তৃপ্তি ছিল। যখন বিবাহ হয় আমার স্ত্রী ঠিক ত্রিংশোর্দ্ধা ছিল, (পরে তিন সন্তানের জননী তার কোন কোন বৈশিষ্ট্য পরিবর্ত্তিত না হলেও পরিমার্জ্জিত হয়েছে)। দীর্ঘাঙ্গী না হলেও সে মাঝারি মাপের অপেক্ষা উচ্চ; নিখুঁত না হলেও তার মুখশ্রী ও গঠন উভয়ই অতি চমৎকার। তার সঙ্কীর্ণ ললাটে মুখখানি এক সুদূর, বিস্ময়াচ্ছন্ন প্রায় অপসৃত ভাবধারার বাহক, যেন কোন সাধারণ শ্রেণীর পুরাতন চিত্রে মধ্যযুগীয় দেবী মূর্তি; চিত্রখানি আবার কালের চিহ্নে আরও শিথিল. এই বিচিত্র অশরীরী রূপ যেন প্রাচীর গাত্রে সূর্য্য কিরণের মত উজ্জ্বল, কিম্বা সমুদ্রের উপর ভাসমান মেঘছায়া, যে কোন মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। নিঃসন্দেহে এই রূপছায়া তার চুল থেকে কিয়ৎ পরিমাণে জাত। চুলগুলো স্বাভাবিক দীপ্তিময়, সর্ব্বদাই শ্লথ দীর্ঘ কেশ গুচ্ছ হেতু এলোমেলো, যেন ওরা ভীতিস্পন্দিত অথবা পলায়ন তৎপর। তার নীল চোখ দুটি বিশাল ও

মোরাভিয়া ও লেখিকা

ঈষৎ তির্য্যক, নেত্রতারকা বিস্ফারিত চকচকে। চোখ থেকেও সেই রূপছায়া জাত আর টুলের মতই চোখের নিকুঞ্চ-বঙ্কিমকটাক্ষ ভীরু ও চাতুক মানসিকতা বুঝিয়ে দেয়। উন্নত-দীর্ঘ নাসিকা সুগঠিত; তার বিস্তৃত আরক্ত অধরের গঠন অতি বঙ্কিম, দেখলেই গভীর সুক্ষ্ম কামোদ্দীপক স্মরণ করায়। অধর অতি হ্রস্ব চিবুকের ঊর্ধ্বে বক্র ক্ষোদিত। মুখখানি নিখুঁত নয় বটে কিন্তু বড়ই সুন্দর। মুখের মধ্যে তার অধরা রূপব্যঞ্জনা ছিল, পূর্ব্বেই বলেছি। সেই ব্যঞ্জনা কোন কোন মুহূর্ত্তে এবং কোন কোন পারিপার্শ্বিকে যেন গলিত হ'ত, অদৃশ্য হ'ত। সে কথা পরে বলছি।

তার দেহ সম্পর্কে একই কথা খাটে। কটিদেশ থেকে ঊর্ধ্বদেশে একটি নবীনা কিশোরীর মত সে ক্ষীণ ও সুকুমার। কিন্তু তার জানু, তার নাভিদেশ, তার পদ ছিল দৃঢ়, সতেজ, পূর্ণ পরিণত, পুরবধূনোচিত শক্তি ও ভঙ্গিমা বিশিষ্ট।

দেহের এই অনিয়মিত গঠন ভঙ্গি তার মুখমণ্ডলের মত —এক সৌন্দর্য্যচ্ছায়া পরিশুদ্ধ। আপাদ-মস্তক দিব্য জ্যোতির মত সেই ছায়া অদৃশ্য প্রভাসম্পাত অথবা রহস্যময় পরিবর্ত্তন সক্ষম দ্যুতির মত উপস্থিত।

বিস্ময়ের বিষয়, কখনও কখনও ওর দিকে চেয়ে সত্যই মনে হত নির্দ্দোষ তার মুখ ও অবয়ব, যেন প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ। সেখানে সবই ছন্দোবদ্ধ, সুশোভন ও সুনিয়ন্ত্রিত। এমনই ছিল সেই রূপের মোহিনী বিস্মরণী। প্রকৃত সংজ্ঞার অভাবে আমি সেই রূপকে 'আত্মিক' বলতে বাধ্য হলাম।

কিন্তু এমন সময়ও ছিল যখন এই স্বর্ণ আবরণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। সেই সময়ে তার দেহগত খুঁতগুলো আমার সম্মুখে উন্মোচিত তো হোতই, উপরন্তু বেদনাদায়ক হ'ত ওর ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্ত্তন।

বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই এই তথ্যটি আমি আবিষ্কার করি। মুহূর্ত্তের জন্য আমি যেন প্রতারিত বোধ করেছিলাম। অর্থের আশায় কেউ যদি বিবাহ করে, পরে স্ত্রীকে নিঃস্ব দেখে তার অনুরূপ অনুভূতি হয়। কোন

কোন সময়ে আমার পত্নীর সমগ্র মুখচ্ছবি এক শুরু গম্ভীর মৌন ভ্রূকুটি বঙ্কিম হয়ে উঠত—ভীতি, যন্ত্রণা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ভ্রূকুটি ভঙ্গে প্রকাশ হ'ত ; এবং একই সঙ্গে অনিচ্ছুক কামনার আকর্ষণ দেখা যেত। এই ভ্রূকুটি ভঙ্গি তার মুখ-মণ্ডলের খুঁতগুলো চোখে ধরিয়ে দিত। বলতে গেলে তার মুখখানাই অদ্ভুতভাবে বদলে যেত। একটা বীভৎস মুখোস যেন তার মুখে পরানো হোত। কোন কোন অংশ, বিশেষ করে অধরোষ্ঠ, দু'পাশের রেখা দু'টি, নাসারন্ধ্র ও দুইচোখ যেন ইচ্ছাকৃত ভাবে বিশিষ্ট কোন হাস্যরসের হেতু বাড়িয়ে পরিস্ফুট করা হ'ত। সেই হাস্যোদ্দীপক রসটা আবার কিঞ্চিৎ অশ্লীল, কিঞ্চিৎ বেদনাদায়ক। ("কনজুগাল লাভ")

আলবার্তো মোরাভিয়ার বিখ্যাত উপন্যাস 'বিবাহিত প্রেম' (Conjugal love) থেকে উপরোক্ত অংশটি আক্ষরিক ভাবে অনুবাদ করেছি। নায়িকা, "আমার পত্নীর" পূর্ণ বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে। বইখানি প্রথমেই স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছে, এলোমেলো তার পদচারণ নয়। যাকে কেন্দ্র করে গল্পের আরম্ভ সেই নায়িকার বর্ণনা প্রথম পংক্তি থেকেই সুরু। এখানেও অহেতুক কোন চরিত্র নিয়ে এসে পাঠকের মনোযোগকে বিক্ষুব্ধ করে তোলা হয়নি। এইরূপ কেন্দ্রীভূত ভাববিন্যাস বর্তমান ইউরোপ সাহিত্যের চাবিকাঠি। অতিকায় উপন্যাসের স্বপ্ন যাঁরা দেখেন তাঁদের জানিয়ে দিতে চাই যে কেন্দ্রচ্যুতি, পাঠকের মনোযোগ বিক্ষেপিত করা, অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের সৃষ্টি, বাড়তি পরিস্থিতি, অতিরিক্ত বাক্য আধুনিক উৎকৃষ্ট সাহিত্যের লক্ষণ নয়।

অবশ্য মোরাভিয়ার 'উওম্যান অফ্ রোম' বইটি দীর্ঘ। কিন্তু নায়িকার পরিণতি হিসাবেই সেখানি লেখা হয়েছে, অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে কালক্ষেপ লেখক করেন নি।

কনজুগাল্ লাভে প্রধান ও প্রথম উপজীব্য হচ্ছে নারী, একজন রমণী, যার চারপাশে এই বইখানি (পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১৫২ Seeker and Warbury edition-এ) আবর্তিত হয়ে এক নির্দ্দিষ্ট জীবন দর্শনে শেষ হয়েছে। সেই রমণী দেবী নয়, অপ্সরাও নয়, জুপিটার মহিষী লেডা তো নয়ই, শিল্প প্রিয় সিলভিও-এর পত্নী লেডা। লেডার দৈহিক বর্ণনা চিত্রধর্ম্মী প্রণালীতে এঁকে চলেছেন নায়ক। সমগ্র বর্ণনার মধ্যে লেডার যা বিশেষত্ব তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। লেডার মধ্যে যে অন্য একটি কামমাদকবিহ্বল সত্তা আছে, অতি সুনিপুণ ব্যাখ্যায় তার প্রকাশ। শেষে কি যে হ'তে পারে, প্রারম্ভে সেটি সূচিত। এক গতিতেই লেখাটির ব্যঞ্জনা। কোথাও সে পথভ্রষ্ট হয়নি। লেডার মধ্যে বিদ্যমান দুইটি সত্তা। শিল্পীসত্তা—ও বাস্তবসত্তা, অধরা সত্তা ও স্থূল পার্থিব সত্তার সংমিশ্রণ মোরাভিয়া আদ্যন্ত দেখিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত 'দুই নারী'র চিত্র তাঁর প্রয়োজন হয়নি মোহিনী ও জননীর চিত্রণে, বর্ষাপ্লুত ও বসন্ত ঋতুর প্রতীকে। একই নারীর মধ্যে তিনি দ্বিবি রূপ দেখিয়েছেন। এমন কি, দৈহিক গঠনেও ঊর্দ্ধ নিম্নভাগের পার্থক্য চিহ্নিত করার ফলে এই বিভাগ আ উচ্চারিত। যে নারী স্বামীর সৃজনশক্তির বিকাশের জ সম্পূর্ণভাবে দেহধর্ম্মের উর্দ্ধে উঠতে পারে, সে-ই নারী আব অতি সাধারণ নরসুন্দরকে কামনা করে কেবলমাত্র ‍ জৈবিক ধর্ম্মে। প্রথমাবধি এই পরিণতি নায়িকারূপ বর্ণন সূচিত। তার দৈহিক চিত্রে মোরাভিয়া অন্তরের চি ব্যাখ্যা করেছেন। অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রচারিণী যে প্রয়োজ নিম্নগামিনী একটি ব্যক্তিত্বে এমন বিকাশ দুর্লভ। এখানে মোরাভিয়ার কৃতিত্ব।

লেখকের বিষয়ে সমালোচনার প্রধান ও প্রথম রী হওয়া উচিত উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত। শত পৃষ্ঠা সমালোচ লিখে যে ফল পাওয়া যায়, কেবলমাত্র লেখকের লেখা অনুধাবন অধিকতর ফলপ্রসু। তাই মোরাভিয়ার অবিক বাংলায় উদ্ধৃতি সাধনে আমার প্রযত্ন। সমগ্র পুস্তকে চাবিকাঠি মিলবে এখানে।

নায়ক সিলভিও শিল্পানুরাগী, তার বাসনা একখা উপন্যাস লিখে ওঠা। লেডা নামে একটি বিধবা সুন্দরী সঙ্গে তার বিবাহ হল। সুখী সিলভিও নির্জ্জনে তার লেখ সত্তাকে পরিস্ফুট করে তুলবার আশায় টাস্কানিতে গেল লেডার ওপর একান্ত নির্ভরশীল সিলভিও তার উপন্যা রচনায় মন দিল। কিন্তু প্রতি রাত্রির প্রেমলীলার ফ দিবাভাগে তার মানসিক সজাগ ভাব অদৃশ্য হত। অতএ লেডা সম্মত হওয়ার পরে উভয়ে দেহ চর্চ্চায় বিরত হল।

সিলভিওকে প্রতিদিন সকাল বেলায় আণ্টনিও নাম একজন নাপিত সংস্কার করে যেত। তার রমণীমনোহ হিসাবে খ্যাতি ছিল। সেই অতি সাধারণ নিম্ন শ্রেণী লোকটির কাছে দৈহিক প্রয়োজনে লেডা আত্মসমর্পণ করল অনিবার্য্য ভাবে এখানে ট্র্যাজেডির বীজ থাকলেও মিলনা পুস্তকখানি। সেখানেই মোরাভিয়া এক নব দিগন্তের সন্ধা দিয়েছেন।

আকর্ষণ ও কামনার বিরুদ্ধে লেডার সংগ্রাম ইত্যাদি অনেক পূর্ব্বতন লেখকের হাতে আরও পরিস্ফুট হয়েছে নূতনত্ব সেখানে নেই। শেষ আপোষের মধ্যে উপন্যাসটি যে পরিণতি আমরা দেখতে পাই, সেটাই অপূর্ব্ব। রুচি বাগীশ ভ্রূকুটি করলেও আমরা লেখককে অভিনন্দিত কর আমাদের দৃষ্টিপথে নূতন জগৎ রচনা হেতু।

"It was one more proof of my incapacity, o my feebleness, my impotence. To me, both creative art & my wife were granted only through pity"— ... Not for me the true master piece not for me the dance on the threshing-floor I was regaled for ever, to mediocrity."

কোন একটি বই

শ্রীমতী বাণী রায়

প্রথমেই আমার পত্নীর কথা বলতে চাই। প্রেমের অর্থ অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাস্পদের দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণের পুলক। সেই মানুষটির শুধু রূপ-দর্শনের পুলক নয়, অধিক বা অল্প যাই হোক না কেন, তার খুঁতগুলিরও অনুধাবনে আনন্দ আছে। আমাদের বিবাহিত জীবনের একেবারে প্রারম্ভ থেকে লেডার (তাই তার নাম) দিকে চেয়ে থাকাতে আমি অসীম তৃপ্তি পেতাম, তার মুখ, তার দেহের সর্ব্বভাব প্রকাশ এবং তুচ্ছতম চঞ্চল গতিভঙ্গি নিরীক্ষণেও এই তৃপ্তি ছিল। যখন বিবাহ হয় আমার স্ত্রী ঠিক ত্রিংশোর্দ্ধা ছিল, (পরে তিন সন্তানের জননী তার কোন কোন বৈশিষ্ট্য পরিবর্ত্তিত না হলেও পরিমার্জ্জিত হয়েছে)। দীর্ঘাঙ্গী না হলেও সে মাঝারি মাপের অপেক্ষা উচ্চ; নিখুঁত না হলেও তার মুখশ্রী ও গঠন উভয়ই অতি চমৎকার। তার সঙ্কীর্ণ ললাটে মুখখানি এক সুদূর, বিস্ময়াচ্ছন্ন প্রায় অপসৃত ভাবধারার বাহক, যেন কোন সাধারণ শ্রেণীর পুরাতন চিত্রে মধ্যযুগীয় দেবী মূর্ত্তি; চিত্রখানি আবার কালের চিহ্নে আরও শিথিল। এই বিচিত্র অশরীরী রূপ যেন প্রাচীর গাত্রে সূর্য্য কিরণের মত উজ্জ্বল, কিম্বা সমুদ্রের উপর ভাসমান মেঘছায়া, যে কোন মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। নিঃসন্দেহে এই রূপছায়া তার চুল থেকে কিয়ৎ পরিমাণে জাত। চুলগুলো ধাতব দীপ্তিময়, সর্ব্বদাই হ্রস্ব দীর্ঘ কেশ গুচ্ছ হেতু এলোমেলো, যেন ওরা ভীতিস্পন্দিত অথবা পলায়ন তৎপর। তার নীল চোখ দুটি বিশাল ও

মোরাভিয়া ও লেখিকা

ঈষৎ তির্য্যক, নেত্রতারকা বিস্ফারিত চকচকে। চোখ থেকেও সেই রূপছায়া জাত আর টুপের মতই চোখে বিক্ষুব্ধ বঙ্কিমকটাক্ষ ভীরু ও চাতুর্য্যক মানসিকতা বুঝিয়ে দেয়। উন্নত-দীর্ঘ নাসিকা সুগঠিত; তার বিস্তৃত আর অধরের গঠন অতি বঙ্কিম, দেখলেই গম্ভীর ক্ষুব্ধ কামদেব স্মরণ করায়। অধর অতি হ্রস্ব চিবুকের ঊর্দ্ধে বক্র ক্ষোদিত মুখখানি নিখুঁত নয় বটে কিন্তু বড়ই সুন্দর। মুখের মধ্যে তার অধরা রূপব্যঞ্জনা ছিল, পূর্ব্বেই বলেছি। সেই ব্যঞ্জনা কোন কোন মুহূর্ত্তে এবং কোন কোন পারিপার্শ্বিকে যেন গলিত হ'ত, অদৃশ্য হ'ত। সে কথা পরে বলছি।

তার দেহ সম্পর্কে একই কথা খাটে। কটিতট থেকে ঊর্দ্ধদেশে একটি নবীনা কিশোরীর মত সে ক্ষীণ ও সুকুমার। কিন্তু তার জানু, তার নাভিদেশ, তার পদ ছিল দৃঢ়, সতেজ, পূর্ণ পরিণত, পুরবঙ্গনোচিত শক্তি ও ভঙ্গিমা বিশিষ্ট।

দেহের এই অনিয়মিত গঠন ভঙ্গি তার মুখমণ্ডলের মত —এক সৌন্দর্য্যচ্ছায়া পরিশুদ্ধ। আপাদমস্তক দিব্য জ্যোতির মত সেই ছায়া অদৃশ্য প্রভাসম্পাতে অথবা রংয়ের পরিবর্ত্তন সক্ষম দ্যুতির মত উপস্থিত।

বিস্ময়ের বিষয়, কখনও কখনও ওর দিকে চেয়ে সত্যই মনে হত নির্দ্দোষ তার মুখ ও অবয়ব, যেন প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ। সেখানে সবই ছন্দোবদ্ধ, সুশোভন ও সুনিয়ন্ত্রিত। এমনই ছিল সেই রূপের মোহিনী বিস্মরণী। প্রকৃত সংজ্ঞার অভাবে আমি সেই রূপকে 'আত্মিক' বলতে বাধ্য হলাম।

কিন্তু এমন সময়ও ছিল যখন এই স্বর্ণ আবরণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। সেই সময়ে তার দেহগত খুঁতগুলো আমার সম্মুখে উন্মোচিত তো হোতই, উপরন্তু বেদনাদায়ক হ'ত ওর ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্ত্তন।

বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই এই ত্রুটি আমি আবিষ্কার করি। মুহূর্ত্তের জন্য আমি যেন প্রতারিত বোধ করেছিলাম। অর্থের আশায় কেউ যদি বিবাহ করে, পরে স্ত্রীকে নিঃস্ব দেখে তার অনুরূপ অনুভূতি হয়। কোন

কোন সময়ে আমার পত্নীর সমগ্র মুখচ্ছবি এক শুষ্ক গম্ভীর মৌন ভ্রূকুটি বঙ্কিম হয়ে উঠত—ভীতি, যন্ত্রণা ও উচ্ছ্বলতা ভ্রূকুটি ভঙ্গে প্রকাশ হ'ত ; এবং একই সঙ্গে অনিচ্ছুক কামনার আকর্ষণ দেখা যেত। এই ভ্রূকুটি ভঙ্গি তার মুখ-মণ্ডলের খুঁতগুলো চোখে ধরিয়ে দিত। বলতে গেলে তার মুখখানাই অদ্ভুতভাবে বদলে যেত। একটা বীভৎস মুখোস যেন তার মুখে পরানো হোত। কোন কোন অংশ, বিশেষ করে অধরোষ্ঠ, দু'পাশের রেখা দু'টি, নাসারন্ধ্র ও দুইচোখ যেন ইচ্ছাকৃত ভাবে বিশিষ্ট কোন হাস্যরসের হেতু বাড়িয়ে পরিস্ফুট করা হ'ত। সেই হাস্যোদ্দীপক রসটা আবার কিঞ্চিৎ অশ্লীল, কিঞ্চিৎ বেদনাদায়ক। ("কনজুগাল লাভ")

আলবার্তো মোরাভিয়ার বিখ্যাত উপন্যাস 'বিবাহিত প্রেম' (Conjugal love) থেকে উপরোক্ত অংশটি আক্ষরিক ভাবে অনুবাদ করেছি। নায়িকা, "আমার পত্নীর" পূর্ণ বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে। বইখানি প্রথমেই স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছে, এলোমেলো তার পদচারণ নয়। যাকে কেন্দ্র করে গল্পের আরম্ভ সেই নায়িকার বর্ণনা প্রথম পংক্তি থেকেই সুরু। এখানেও অহেতুক কোন চরিত্র নিয়ে এসে পাঠকের মনোযোগকে বিক্ষুব্ধ করে তোলা হয়নি। এইরূপ কেন্দ্রীভূত ভাববিন্যাস বর্তমান ইউরোপ সাহিত্যের চাবিকাঠি। অতিকায় উপন্যাসের স্বপ্ন যাঁরা দেখেন তাঁদের জানিয়ে দিতে চাই যে কেন্দ্রচ্যুতি, পাঠকের মনোযোগ বিক্ষেপিত করা, অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের সৃষ্টি, বাড়তি পরিস্থিতি, অতিরিক্ত বাক্য আধুনিক উৎকৃষ্ট সাহিত্যের লক্ষণ নয়।

অবশ্য মোরাভিয়ার 'উওম্যান অফ্ রোম' বইটি দীর্ঘ। কিন্তু নায়িকার পরিণতি হিসাবেই সেখানি লেখা হয়েছে, অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে কালক্ষেপ লেখক করেন নি।

কনজুগাল লাভে প্রধান ও প্রথম উপজীব্য হচ্ছে নারী, একজন রমণী, যার চারপাশে এই বইখানি (পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১৫২ Seeker and Warbury edition-এ) আবর্তিত হয়ে এক নির্দিষ্ট জীবন দর্শনে শেষ হয়েছে। সেই রমণী দেবী নয়, অপ্সরাও নয়, জুপিটার মহিষী লেডা তো নয়ই, শিল্প প্রিয় সিলভিও-এর পত্নী লেডা। লেডার দৈহিক বর্ণনা চিত্রধর্মী প্রণালীতে এঁকে চলেছেন নায়ক। সমগ্র বর্ণনায় মধ্যে লেডার যা বিশেষত্ব তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। লেডার মধ্যে যে অন্য একটি কামমাদকবিহ্বল সত্তা আছে, অতি সুনিপুণ ব্যাখ্যায় তার প্রকাশ। শেষে কি যে হ'তে পারে, প্রারম্ভে সেটি সূচিত। এক গতিতেই লেখাটির ব্যঞ্জনা। কোথাও সে পথভ্রষ্ট হয়নি। লেডার মধ্যে বিদ্যমান দুইটি সত্তা। শিল্পীসত্তা—ও বাস্তবসত্তা, অথবা সত্তা ও স্থূল পার্থিব সত্তার সংমিশ্রণ মোরাভিয়া আদ্যন্ত দেখিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত 'দুই নারী'র চিত্র তাঁর প্রয়োজন হয়নি মোহিনী ও জননীর চিত্রণে, বর্ষাপ্লুত ও বসন্ত ঋতুর প্রতীকে। একই নারীর মধ্যে তিনি বিভিন্ন রূপ দেখিয়েছেন। এমন কি, দৈহিক গঠনেও উর্ধ্ব ও নিম্নভাগের পার্থক্য চিহ্নিত করার ফলে এই বিভাগ আরও উচ্চারিত। যে নারী স্বামীর সৃজনশক্তির বিকাশের জন্য সম্পূর্ণভাবে দেহধর্মের উর্ধে উঠতে পারে, সে-ই নারী আবার অতি সাধারণ নরসুন্দরকে কামনা করে কেবলমাত্র স্থূল জৈবিক ধর্মে। প্রথমাবধি এই পরিণতি নায়িকারূপ বর্ণনায় সূচিত। তার দৈহিক চিত্রে মোরাভিয়া অন্তরের চিত্র ব্যাখ্যা করেছেন। অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রচারিণী যে প্রয়োজনে নিম্নগামিনী একটি ব্যক্তিত্বে এমন বিকাশ দুর্লভ। এখানেই মোরাভিয়ার কৃতিত্ব।

লেখকের বিষয়ে সমালোচনার প্রধান ও প্রথম রীতি হওয়া উচিত উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত। শত পৃষ্ঠা সমালোচনা লিখে যে ফল পাওয়া যায়, কেবলমাত্র লেখকের লেখায় অনুধাবন অধিকতর ফলপ্রসূ। তাই মোরাভিয়ার অবিকল বাংলায় উদ্ধৃতি সাধনে আমার প্রযত্ন। সমগ্র পুস্তকের চাবিকাঠি মিলবে এখানে।

নায়ক সিলভিও শিল্পানুরাগী, তার বাসনা একখানি উপন্যাস লিখে ওঠা। লেডা নামে একটি বিধবা সুন্দরীর সঙ্গে তার বিবাহ হল। সুখী সিলভিও নির্জনে তার লেখক সত্তাকে পরিস্ফুট করে তুলবার আশায় টাস্কানিতে গেল। লেডার ওপর একান্ত নির্ভরশীল সিলভিও তার উপন্যাস রচনায় মন দিল। কিন্তু প্রতি রাত্রির প্রেমলীলার ফলে দিবাভাগে তার মানসিক সজাগ ভাব অদৃশ্য হত। অতএব লেডা সম্মত হওয়ার পরে উভয়ে দেহ চর্চ্চায় বিরত হল।

সিলভিওকে প্রতিদিন সকাল বেলায় আণ্টনিও নামক একজন নাপিত সংস্কার করে যেত। তার রমণীমনোহর হিসাবে খ্যাতি ছিল। সেই অতি সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর লোকটির কাছে দৈহিক প্রয়োজনে লেডা আত্মসমর্পণ করল। অনিবার্য্য ভাবে এখানে ট্র্যাজেডির বীজ থাকলেও মিলনান্ত পুস্তকখানি। সেখানেই মোরাভিয়া এক নব দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন।

আকর্ষণ ও কামনার বিরুদ্ধে লেডার সংগ্রাম ইত্যাদি অনেক পূর্ব্বতন লেখকের হাতে আরও পরিস্ফুট হয়েছে। নূতনত্ব সেখানে নেই। শেষ আপোষের মধ্যে উপন্যাসটির যে পরিণতি আমরা দেখতে পাই, সেটাই অপূর্ব্ব। রুচি-বাগীশ ভ্রূকুটি করলেও আমরা লেখককে অভিনন্দিত করব আমাদের দৃষ্টিপথে নূতন জগৎ রচনা হেতু।

"It was one more proof of my incapacity, of my feebleness, my impotence. To me, both creative art & my wife were granted only through pity"—... Not for me the true master piece, not for me the dance on the threshing-floor. I was regaled for ever, to mediocrity."

কোন পুরুষের এই রকম আত্মোপলব্ধি দুর্লভ। হিতা পত্নীর ঐরূপ কাম-বিলাসকে কেবলমাত্র ক্ষমা নয় হতু নিজের দৈন্য, স্বীকার করা এমনভাবে পূর্ব্বে সাহিত্যে রূপ নেয়নি। শিল্প ও প্রেমকে তুলনা করেছেন ক একত্রে। উভয় ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা, নায়ক সে ক্ষেত্রে র অপারগতা স্বীকার করে নেন।

পত্নী অন্যকে লালসায় (lust) দেহ দান করলেও তাঁর বাসার তিলমাত্র হানি হতে পারে না, এই বার্ত্তা নির মেরুদণ্ড। এ-ছাড়া অতি প্রকট জীবনদর্শন এখানে য়া যায় :—

"When one loves someone, one loves every ct of that person—defects of all."

খন কাউকে ভালবাসা যায়, প্রেম পাত্রের প্রতিটি দিক বাসা হয়—তার দোষগুলো এবং সব কিছু।

উপরোক্ত ভাব মোরাভিয়া প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ন পথ অগ্রসর হয়ে এসেছেন। ইংরেজ কবি বলে ন :—

"I did not love dimples,
She had dimples,
And now it is my weakness."

প্রেম-পাত্রীর বাহ্য আকৃতি বিচার এখানে। কিন্তু তার চারিত্রিক এবং নৈতিক দিক থেকে এই সহনশীলতা, এমন কি বিস্মরণ, নূতন দিগন্তের দিকে প্রসারিত। আলবার্ত্তো মোরাভিয়াকে উত্তেজক লেখক বলেই অনেকে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু "রোমের নারী"র পাতার মধ্যেই উক্ত পাঠকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁরা অবশ্যই "বিবাহিত প্রেম" পড়ে দেখেন না। যাঁরা প্রকৃত মোরাভীয়ান অবদান সাহিত্যে সন্ধান করতে চান, তাঁদের উদ্দেশেই মোরাভিয়া নিশ্চয় তাঁর "বিবাহিত প্রেম" রেখেছেন।

[আলবার্ত্তো মোরাভিয়া (Alberto Moravia) এর জন্ম ২৮শে নভেম্বর, ১৯০৭ সালে রোমে হয়। ফরাসী, ইংরেজি ও জার্ম্মাণ ভাষা তিনি শৈশবেই শিক্ষা করেন। নয় বৎসর বয়স থেকে বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অস্বাস্থ্যে তিনি জর্জ্জরিত হন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাসটি লেখেন। তারপরে কিছুদিন লণ্ডন, প্যারিস ও অন্যান্য স্থানে ফরেণ করেসপণ্ডেণ্ট ছিলেন মোরাভিয়া। ফ্যাসিসিজমের সময়ে তাঁকে ছদ্মনামে লিখতে হয়েছে, কারণ তাঁর বইগুলি নিষিদ্ধ ছিল। ইটালি জার্ম্মাণেরা দখল করায় তিনি পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতেন। যে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকানেরা তাঁর মুক্তি আনে। এখন তিনি ক্যাপ্রি দ্বীপে বাস করেন। ইতালীয় আধুনিক লেখকদের মধ্যে তিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠের সম্মান পান।]

সাহিত্যে দুর্নীতি

আগেকার দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক্, র নালিশ ছিল না, ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয়নি। এসেছে হালে। তাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ই এই যে, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতি- এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানা দিক্ দিয়া এই টাই যেন মুখ্যতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হ'য়ে উঠেছে। নেহাৎ বলেন না। কিন্তু তার দুই একটা ছোটখাট কারণ থাকলেও রণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই। সমাজ কে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের , নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব-এর মধ্যে রে মিশে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা থাকার মধ্যে এর অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দ্দয় মূর্ত্তি দেখা দেয় র-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা ভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই বিধিবদ্ধ আইন হ'য়ে উঠে, এর থেকে রেহাই দিতে সমাজ চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হ'য়ে উঠেছে সাহিত্য। কিন্তু এই এক ভরসা, propaganda চালানোর কেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য-সাধনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে ত' তার কুৎসা করা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বস্তু বহু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না···পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোঙ্‌রা ক'রে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালি-গালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টাটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতিপুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে গল্পচ্ছলে যদি এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, ত' আমি বলি, সাহিত্য না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয় ত' একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত' এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?···এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশের নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে।—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ("সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি")।

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

॥ ৫৬ ॥

প্রভু এলেন আরিটগ্রামে। এইখানেই অরিষ্টাসুরকে বধ করেছিল কৃষ্ণ। বধ করে রাধিকাকে ছুঁতে এলে রাধিকা বললে, 'অরিষ্ট হলই বা না অসুর, কিন্তু যেহেতু সে বৃষের আকার ধরেছিল তাকে হত্যা করে তোমার গোবধের পাতক হয়েছে। যদি সর্বতীর্থে স্নান করতে পারো তবেই তোমার পাপক্ষালন হবে, তবেই ছুঁতে পারবে আমাকে।'

'বটে? এই কথা?' কৃষ্ণ বললে, 'তবে এইখানেই সমস্ত তীর্থ নিয়ে আসছি, স্নান করছি তীর্থোদকে।' বলে কৃষ্ণ মাটিতে লাথি মারল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা কুণ্ড হল আর তা সর্বতীর্থজলে ভরে গেল। নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে তীর্থদেবতারা কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। কৃষ্ণ স্নান করল! স্পর্শ করল রাধিকাকে।

সেই কুণ্ডের নাম অরিষ্টকুণ্ড। কেউ বা বলে শ্যামকুণ্ড।

রাধিকা পরাস্ত হবার পাত্রী নয়। সখীদের নিয়ে সে-ও কুয়ো খুঁড়তে সুরু করল। জল পাবে কোথায়? সর্বতীর্থময়ী মানসী গঙ্গার জল নিয়ে আসব। তার চেয়ে, কৃষ্ণ বললে, আমার কুণ্ডের তীর্থদের বলি, তোমার কুণ্ডও ওরা ভরে দিক। তাই হোক। তাই হল। কুণ্ডের নাম হল রাধাকুণ্ড।

সেই রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কোথায়? কেউ বলতে পারছে না। তীর্থচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে।

সর্বজ্ঞ প্রভু দেখিয়ে দিলেন। সেই দুই কুণ্ড এখন দুই ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ধান্যক্ষেত্রে অল্প-অল্প জল আছে। তাইতেই প্রভু স্নান করলেন।

এই কুণ্ডেই রাধাকৃষ্ণের জলকেলি হয়েছে, তীরে কত রাসরঙ্গ। তারই ঢেউ বুঝি প্রভুর গায়ে লাগল।

সুমনঃসরোবর বা মানস গঙ্গায় এসে পৌঁছুলেন দেখলেন গোবর্ধন। এক শিলাখণ্ড আলিঙ্গন করলেন, মনে হল কৃষ্ণ কলেবর। উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। প্রবেশ করলেন গোবর্ধন গ্রামে। দর্শন করলেন হরিদেবকে। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে ভট্টাচার্যের পাক করা ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। হরিদেবের মন্দিরেই রাত কাটালেন। মনে-মনে ভাবলেন, গোপালকে দর্শন করব কী করে? গোবর্ধনের উপর তো আমি পা রাখতে পারব না। গোবর্ধন যে কৃষ্ণতনু।

কিন্তু গোপাল যে এখন গাঁধুলিগ্রামে। গোবর্ধনে নেই।

'দিল্লির বাদশাহের তুর্কী সৈন্যরা আসছে, যাও, গোপাল নিয়ে পালাও গ্রাম ছেড়ে।' কে একজন এসে খবর দিল মন্দিরে।

আগে-আগে আরো কতবার পালিয়েছে। বনে-বনান্তরে, সুদূর গ্রামাঞ্চলে। এবারও পালাল গাঁধুলিগ্রামে, এক নিরীহ ব্রাহ্মণের ঘরে।

গোবর্ধন পরিক্রমা করতে করতে খবর পেলেন প্রভু। সন্দেহ কী, স্বয়ং গোপালই ছল উদ্ভাবন করে নিচে নেমেছেন। নইলে কই তুর্কী সৈন্য কই?

গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করে প্রভু গাঁধুলি গ্রামে গিয়ে গোপাল দর্শন করলেন। গোপালের সৌন্দর্য দেখে প্রভুর প্রেমাবেশ হল। তিনি কীর্তন-নর্তন সুরু করলেন। লোক সংঘট্ট আর কী করে রোধ করা যায়?

সেখান থেকে গেলেন কাম্যবনে। সেখান থেকে নন্দীশ্বর। শুনলেন পর্বতের উপরে গুহায় দেবমূর্তি আছে। চলো দেখে আসি। দু' পাশে নন্দ আর যশোদা, মাঝখানে গোপাল—এই ত্রিমূর্তির বিগ্রহ। গোপালের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করলেন প্রভু।

সেখান থেকে খদিরবন। খদিরবন থেকে শায়ী। পরে ভাণ্ডীর বনে এসে যমুনা পার হয়ে বন। ভদ্রবন থেকে বেলবন, লোহবন। পরে বন বা গোকুল। গোকুল দেখে পুনরায় মথুরা। া এড়াবার জন্যে থাকলেন অক্রূরঘাটে।

মাঝে মাঝে যাচ্ছেন বৃন্দাবন, দেখছেন সব লীলাতীর্থ। স্নান করলেন কালিয়হ্রদে, দেখলেন সেই পর্বত নে শীতার্ত কৃষ্ণকে তাপ দেবার জন্যে দ্বাদশ ত্য প্রকট হয়েছিল। স্নান করলেন চীরঘাটে যে ঘটেছিল বস্ত্রহরণের লীলা। তেঁতুলীতলায় বসলেন াম করতে। এই তেঁতুল গাছ কৃষ্ণের সময় থেকে ান। গাছের গোড়াটা বাঁধানো, সুন্দর মসৃণ। াটা প্রভুর খুব পছন্দ হল। সামনেই যমুনা, ার জল, আর চারদিকে বৃন্দাবনের শোভা, আর কী ল হৃদয় জুড়ানো হাওয়া। এই নিভৃতে বসে কীর্তন করি। আর, যদি কেউ আস আকৃষ্ট হয়ে, ও নামকীর্তন করো।

তাই করছেন একদিন, কেশীস্নান করে কালীদহে ার পথে তাঁকে দেখতে পেল এক রাজপুত গৃহস্থ। কৃষ্ণদাস।

'কে তুমি?' জিগগেস করলেন প্রভু।

'আমি আবার কে!' কৃষ্ণদাস বললে, 'আমি এক র গৃহস্থ।'

'কী তোমার অভিলাষ?'

'অভিলাষ আমি বৈষ্ণব কিঙ্কর হই।' বললে ঞ্চদাস, 'স্বপ্নে সেই বৈষ্ণবের আবির্ভাব হল। এখন আমলি-তলায় সেই স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করলাম।'

প্রভু তাকে আলিঙ্গন দিল। স্ত্রী পুত্র ছেড়ে কিঙ্কর গেল কৃষ্ণদাস।

দিকে-দিকে গুজব রটল বৃন্দাবনে আবার কৃষ্ণ কট হয়েছে।

'কোথায়?' উদ্‌ভ্রান্ত জনতার একজনকে জিগগেস লেন প্রভু।

'কালীদহে। কালিয়ের মাথার উপরে নাচছে।'

'বুঝলে কিসে?'

'সাপের ফণায় মণি জ্বলছে যে। তারই আলোয় ন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।' 'সাক্ষাৎ দেখিল লোক হিক সংশয়।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'তা তো ঠিকই। ন্দেহের কী আছে।'

সকলের মুখেই সেই এক কথা। কৃষ্ণ দেখলাম। কৃষ্ণ দর্শন দিলেন।

তা ছাড়া আবার কী। গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণকেই তো সকলে দেখছে। সত্য ছেড়ে অসত্যকে সত্যভ্রম করেছ।

কিন্তু সঙ্গের ব্রাহ্মণ বলভদ্রও সমান রব তুলবে এ কে জানত।

'অনুমতি দিন, কৃষ্ণ দর্শন করে আসি।' বলভদ্র মিনতি করল।

'মূর্খের বাক্যে তুমিও মূর্খ হলে?' প্রভু বিরক্তি প্রকাশ করলেন: 'কলিকালে কৃষ্ণ কেন দর্শন দেবেন? দৃষ্টির ভুলে লোকেরা কোলাহল করছে। তুমি ঘরে চুপ করে বসে থাকো, কাল দেখো কৃষ্ণ কে।'

পরদিন সকালে কয়েকজন ভব্য-বিজ্ঞ লোক এল প্রভুর কাছে। প্রভু জিগগেস করলেন, 'কালীদহে কৃষ্ণ দেখে এলেন? কেমন কৃষ্ণ?'

'এক কৈবর্ত রাত্রে মশাল জ্বেলে নৌকো করে মাছ ধরছে।' বললে বিশিষ্টেরা, 'তাতেই দৃষ্টি ভ্রম হচ্ছে সকলের। নৌকোকে ভাবছে কালিয় নাগ, মশালকে ফণার মণি আর জেলেকে কৃষ্ণ।' বলে হাসতে লাগল।

বলভদ্র লজ্জিত হল। প্রবোধ পেল অন্তরে।

'কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় লোকভ্রম!' বললে ভব্যের দল। 'কাহোঁ কৃষ্ণ দেখে কাহোঁ ভ্রমে মানে।' 'শাখা পল্লবহীন নিরাভরণ গাছ দেখে লোকে যেমন মানুষ মনে করে। কিন্তু যে যাই বলুক, বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণ এসেছেন, কৃষ্ণকে যে সবাই দেখছে তাতে আর সন্দেহ নেই।'

'সে কী? কোথায় সেই কৃষ্ণ?'

'আর কোথায়! এইখানে। তুমি, তুমিই সেই জঙ্গম-নারায়ণ। বিগ্রহ-নারায়ণ তো নিশ্চল, তুমিই চরাচরে বিচরণশীল।'

'বিষ্ণু, বিষ্ণু!' প্রভু দোষ খণ্ডন করতে চাইলেন: 'জীবকে কখনো কৃষ্ণ বলে ভেবো না। কৃষ্ণের তুলনায় জীব নিতান্ত অধম, নিতান্ত ক্ষুদ্র। 'জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিয়।' ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণ সূর্যের মতন আর জীব সেই সূর্যের ক্ষুদ্র কিরণকণা। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের বিচ্ছিন্ন এক স্ফুলিঙ্গ।" জীব আর ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম। জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥'

ভগবান চিদ্‌বস্তু, তাঁতে প্রাকৃত বা জড় বলে কিছু নেই। জীবের দেহ জড়বস্তু, তার সম্পর্ক-সম্বন্ধও

প্রাকৃত। ভগবান আনন্দময়, জীব অশেষ দুঃখের, অশেষ ক্লেশের আকর। 'সংক্লেশনিকরাকর।' ভগবান মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়ার অধীন, 'স্বাবিদ্যাসংবৃত।' সুতরাং জীবকে কখনো ঈশ্বর বলে স্পর্ধা কোরো না। 'যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম। সেই তো পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥'

শুধু কৃষ্ণভজন একভজন করো। গাছের গোড়ায় জল দিলে গাছের অংশভূত শাখাপ্রশাখা পত্রপুষ্প সমস্তই তৃপ্তি লাভ করে। তেমনি সর্বমূল কৃষ্ণের সেবাতেই আর সব দেবদেবীর সেবা হয়ে যায়। 'সর্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি।'

'অসৎক্রিয়া কুটিনাটি ছাড় অন্য পরিপাটি
অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপনা আপনা স্থানে পীরিতি সভায় টানে
ভক্তিপথে পড়ুয়ে বিগতি॥
আপন ভজন পথ তাতে হবে অনুরত
ইষ্টদেবস্থানে লীলা গান
নৈষ্ঠিক ভজন এই তোমারে কহিনু ভাই
হনুমান তাহাতে প্রমাণ॥

অনন্যভাক হও। হও যে একান্ত ভক্ত। অন্যাপেক্ষা রেখো না। তাই বলে অন্য দেবদেবীকেও অবজ্ঞা কোরো না। যে নারায়ণকে ভজনা করে শিবকে নিন্দা করে সে নরকস্থ হয়। শিবকে নারায়ণের অংশবিভূতি মনে করো।

ভব্যলোকেরা বললে, 'জীবকে নারায়ণ মনে করলে দোষ হতে পারে কিন্তু তুমি তো জীব নও, তোমাকে তা মনে করলে দোষ হবে কেন? তোমার আকৃতি প্রকৃতি কৃষ্ণকে মনে করিয়ে দেয়। তোমার শ্যামকান্তি আর পীতবস্ত্র তুমি ঢেকে রেখেছ। কিন্তু মৃগমদের গন্ধ কি বস্ত্র দিয়ে বেঁধে রাখা যায়? তাই কী করে তুমি তোমার ঈশ্বর স্বভাব লুকোবে? যাকে দেখা মাত্রই লোকে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়, চণ্ডাল-যবন পর্যন্ত হাসে কাঁদে নাচে গায়, তার অলৌকিক শক্তির ব্যাখ্যা কী? তোমার শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ দেখলেই লোকের প্রেমধন মিলে যায়, দূরে যায় রোগ শোক মালিন্য-আবিল্য। যার নাম শ্রবণেই পতিতও পবিত্র হয় তাকে স্বচক্ষে দেখে লোকের কী রকম হবে তুমিই বলো।'

প্রভু সকলকে নামপ্রসাদ দিলেন।

অক্রূরঘাটে বাড়তে লাগল জনতা। দর্শন দাও। মাথার উপরে পা রাখো। চলো আমার বাড়িতে ভিক্ষে নাও।

শুধু লোকের সঙ্ঘট্ট আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।

প্রভু যমুনায় ঝাঁপ দিলেন।

কৃষ্ণদাস চিৎকার করে উঠল। ছুটে এল বলভদ্র। তুলল প্রভুকে।

এখান থেকে কৌশল করে প্রভুকে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে, তবেই সকলের মঙ্গল। বলভদ্র কৃষ্ণদাসের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল। প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে না গিয়ে গঙ্গাতীর পথ দিয়ে নিয়ে যাই। কিন্তু ব্রজমণ্ডল ছেড়ে যাবেন তো? মকরপূর্ণিমার কথা বলি, বলি প্রয়াগস্নানের কথা। দেখি অনুরোধ রাখেন কি না।

'এ জায়গা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে।' বলভদ্র বললে প্রভুকে, 'নিত্য ভিড়, নিত্য গোলমাল, আর নিত্যই নিমন্ত্রণের তাগিদ। চলো আমরা অন্যত্র যাই।'

প্রভু তাকালেন স্নেহনেত্রে। বললেন, তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, কষ্ট তো আমারই।'

'কোথায় যাবে?'

'চলো প্রয়াগে যাই, মাঘীপূর্ণিমায় মকরস্নান করে আসি।'

'চলো।' প্রভু সম্মত হলেন।

'যাবে?' বলভদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'ভক্তবাসনা পূর্ণ করতে যাব বৈ কি।' বললেন প্রভু, 'তুমি আমাকে এনে বৃন্দাবন দেখালে, এই ঋণ শোধ হবে না কোনোদিন। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব।'

'যে তোমার ইচ্ছা আমি সেই ত করিব।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি তাঁহাই যাইব॥'

নৌকোয় যমুনা পার হলেন প্রভু। বলভদ্র আর ব্রাহ্মণ কিঙ্কর তো আছেই, রাজপুত কৃষ্ণদাস আর মাথুর ব্রাহ্মণও চলেছে সঙ্গে। এরা গঙ্গাতীরে পৌঁছুবার পথ চেনে। সেই পথে পৌঁছিয়ে দিয়ে এরা বিদায় নেবে।

পথশ্রান্তির দরুন প্রভু বসলেন বৃক্ষতলে। দেখলেন কাছেই গরু চরছে। বাঁশি বাজাচ্ছে এক গোপবালক। অমনি তাঁর প্রেমাবেশ হল। অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

দশজন অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য যাচ্ছিল পথ দিয়ে। অচেতন সন্ন্যাসীকে দেখে নেমে পড়ল। স্থির করল এই সন্ন্যাসীর কাছে নিশ্চয়ই অনেক ধনরত্ন ছিল, এই চার দস্যু ওকে ধুতুরা খাইয়ে মেরে সব লুট করে নিয়েছে। ধরো বাঁধো ডাকাতদের। পাঠান সৈন্যরা চারজনকে বেঁধে ফেলল। কোষ থেকে মুক্ত করল তলোয়ার।

কৃষ্ণদাস ভয় পেল না। বললে, 'আমরা নিরপরাধ। এ সন্ন্যাসী আমাদের গুরু, এঁকে আমরা কেন মারতে যাব?'

'তবে এ অসাড় কেন?' জিগগ্যেস করল সেনাপতি, 'কেন এর শ্বাসরুদ্ধ? কেন মুখ দিয়ে ফেনা পড়ছে?'

মাথুর ব্রাহ্মণও নির্ভয়। বললে, 'এই সন্ন্যাসীর রোগ আছে, মাঝে মাঝে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। একটু অপেক্ষা করুন, ইনি এখুনি উঠে বসবেন। তখন এঁকে জিগগ্যেস করে জানবেন আমরা সত্যিই ডাকাত কি না।'

'তোমাদের বিশ্বাস নেই।'

'বেশ, তবে আমাদের শিকদারের কাছে নিয়ে চলো।' বললে মাথুর ব্রাহ্মণ, 'আমাদের সঙ্গে একশো লোক ছিল, তোমাদের বাদশার কাছে গিয়েছে, সেখানে আমদের পরিচয় মিলবে।'

এ ছলনায় একটু বুঝি নরম হল পাঠানেরা। সেনাপতি বললে, 'তোমাদের দুজন পশ্চিমাকে তো সাধু বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ঐ বাঙালী দুটো কাঁপছে কেন? নিশ্চয়ই ওরা ঠক, বাটপাড়। কাউকে আমরা রেয়াত করব না। তলোয়ারে খণ্ড খণ্ড করব।'

'ওরা কেন বাটপাড় হতে যাবে?' কৃষ্ণদাস গর্জন করে উঠল, 'বাটপাড় তোমরা, তীর্থবাসীদের টাকা পয়সা লুট করতে এসেছ। কিন্তু সাবধান এ গ্রামে আমার বাড়ি, আমার অধীনে একশো তুর্কী সৈন্য আছে, দুশো কামান আছে। যদি আমি চেঁচিয়ে ওদের ডাকি ওরা এখুনি এসে পড়বে, তোমাদের অক্ষত ফিরে যেতে দেবে না।'

আর বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন হল না, হরি-হরি বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন প্রভু। প্রেমাবেশে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

পাঠানদের অন্তরে ভয় ঢুকল। ছেড়ে দিল বন্দীদের। প্রভুকে বললে, 'এই চারজন ঠক তোমাকে ধুতুরা খাইয়ে অজ্ঞান করেছিল, অজ্ঞান করে নিয়ে গিয়েছে তোমার ধনরত্ন। দেখ তো দেখি কত নিয়েছে।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'এরা ঠক হতে যাবে কেন? এরা আমার সঙ্গী, সেবক। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী—আমার আবার ধনরত্ন কোথায়? মৃগী-ব্যাধিতে আমি মাঝে মাঝে অচেতন হই, তখন এরাই আমার শুশ্রূষা করে।'

মৃগীব্যাধি? তা ছাড়া আবার কী। যা অন্বেষণ করা যায় তাই মৃগ। এ জীবনে অন্বেষণীয় কে? অন্বেষণীয় আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি রাধিকা। সুতরাং রাধিকাই মৃগী। আর প্রিয় বিরহে যে প্রেমজনিত বিকার তা তো ব্যাধিরই নামান্তর।

সেই পাঠানদের মধ্যে এক পরম গম্ভীর পীর ছিল। তার চিত্ত আদ্র হল। সে ঈশ্বরের কথা তুললে।

জগৎকারণ পরমেশ্বর নিরাকার অদ্বয়তত্ত্ব, যাকে বলা যায় নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাই পীর স্থাপন করতে চাইল। প্রভু বললেন, ও যুক্তি একদেশী। সেই অদ্বিতীয় বস্তুই সবিশেষ সাকাররূপে ভক্তদের কাছে প্রতিভাত। তোমাদের শাস্ত্রেও ভক্তিই শেষ কথা, ভক্তিই পুরুষার্থসার। তোমাদেরও তো কেবলই প্রার্থনা, ভক্তি ছাড়া প্রার্থনা কোথায়? আর ঈশ্বর-সেবা, ঈশ্বরপ্রীতি ছাড়া সংসারক্ষয় হবে কিসে?

পীর বললে, 'তুমি যা বলছ সব সত্য কথা। শাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু লোকে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম বোঝে কই?'

ঈশ্বরের সবিশেষত্বই স্বীকার করল পীর। অনুভব করল এই সন্ন্যাসীই ঈশ্বর। পীর কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। প্রভু তার নাম রাখলেন 'রামদাস।

আরো এক পাঠান ছিল, তার নাম বিজুলি খান। অল্প বয়স, রাজবংশের ছেলে। সে 'কৃষ্ণ' বলে পড়ল প্রভুর চরণে। প্রভু তাকে কৃপা করলেন। পরম ভাগবত হয়ে গেল বিজুলি।

শোরক্ষেত্রে এসে পৌঁছলেন প্রভু। মাথুর ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিতে চাইলেন। তারা বললে, তোমার সঙ্গে প্রয়াগ পর্যন্ত যাব। তোমার চরণসঙ্গ আর পাব কোথায়! তা ছাড়া পথে কে কোথায় উৎপাত বাধায় ঠিক কী। বলভদ্র পণ্ডিত তো কথাটি বলতে পারেন না। খালি কাঁপেন।'

প্রভু হাসলেন।' চলো তবে প্রয়াগ পর্যন্ত।

যেই প্রভুর দর্শন পাচ্ছে প্রেমে মত্ত হয়ে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন করছে। আর একের থেকে অপরে বিস্তারিত হচ্ছে কৃষ্ণকথা। সমস্ত দেশগ্রাম বৈষ্ণব হয়ে উঠছে। যেমন দক্ষিণে তেমনি পশ্চিমে। 'দক্ষিণে যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল। সেই মত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল॥'

প্রয়াগে এসে প্রভু দশ দিন মকর স্নান করলেন। বৃন্দাবনে যেমন কলরব প্রয়াগেও তেমনি। সমান লোকারণ্য।

সমান প্রেমোচ্ছ্বাস। সমান হরিধ্বনি।

'গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।

প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥' [ক্রমশঃ।

দোল-লীলার গান

[বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত ও বাঙলা ভাষায় রচিত দোললীলা বিষয়ক কয়েকটি গানের সঙ্কলন এই পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'ল। শেষের কবিতাটি ব্যতীত অন্যান্য গানগুলি প্রাচীন কবিগণের দ্বারা রচিত।—স]

"এ দৌউ খেলত হো হো হোরী।
নন্দ-নন্দন বৃষভানু-নন্দিনী
আবীর-গুলাল লিএ কর ঝোরি॥
বৃন্দাবন কী কুঞ্জগলিন মেঁ
বোলত হো হো হোরী!
পরস্পর রঙ্গ মে বোরী।
কর-কঙ্কণ কঞ্চন পিচকারী কেশব
রঙ্গ লৈ দোরী॥
ছিরকত রঙ্গ হুলস হিয়ে হরষে
নিরখ হঁসত মুখমোরী
করে চিতবন চিতচোরী॥"

"লালিনী লালন
লাল আবীরণ
সখীগণ লালহি লাল।
কুঞ্জহি লাল:
লাল নিধুবন
• যমুনা লাল সলিল॥"

"রসবতী রাই খেলত ফাগু
সখী সঙ্গে নিরুপম কানন মাঝ
শুনাইতে সখা সঙ্গে তুরিতহি সাজিয়া
আসিয়া মিলল রসরাজ॥"

"ফাগু খেলত গোরা গদাধর সঙ্গে।
কুঙ্কুম মারত দুঁহু দোঁহা অঙ্গে॥
মারে পিচকারী গুলি গুলাল।
ফাগুমে দুহুঁ তনু লালহি লাল॥
খেলে ব্রজে জনু কানু পেয়ারী।
দুহুঁ বদনে ঘন হোরি হোরি॥
চৌদিকে ভকত ফাগু যোগায়।
কোহি নাচত কোহি আনন্দে গায়॥
কৃষ্ণদাসক চিতে বহুক শেল।
হেন সুখ সময়ে জনম না ভেল॥"

"মধুর বসন্ত ঋতু মধুর বৃন্দাবন
মধুর মধুর পিক গায়।
মধুর শারি শুক মধুর মধুর অতি
মধুর ভ্রমর মাতি গায়॥
মধুর সখীগণ মধুর রাধা সুন্দরী
মধুর মধুর শ্যামচাঁদ।
মধুর ফাগু কেলি খেলত নাচত
মধুর মধুর কত ছাঁদ॥
মধুর ভকতগণ সো রসে নিমগন
হোই দেই জয়কার।
দাস অতুলকৃষ্ণ সো রস পিবি পিবি
বলিহারী যায় দোঁহাকার॥"

"ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে॥
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা গায়।
কুঙ্কুম পেচকা লেই পিছু পিছু ধায়॥
নানা যন্ত্রে সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস।
গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে যে বিলাস॥
হরি হরি বাহু তুলি নাচে হরিদাস।
বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ॥"

"আমি বৃন্দাবনী ফাগুয়া রাগে রঙিল পরাণ
দোলে বকুল বনে তমাল-স্বপনে
হোলির নিশান॥
বাজে মোহন মুরলী রস-লহরী অমিয় তুফান
হরি কোয়েলা কুহরে, তনুয়া শিহরে,
আকুল নয়ান।
ডাকে বনবিহারী—বঁধু তুহারি মিছে অভিমান—
জাগে পূজার বেলা, বরণের মালা অর্ঘ্য কর দান
পাবে পরশমণি হরষধনি—হও রে আগুয়ান
ডাক সেই লীলাময়ে—না হইতে তব
বেলা অবসান॥"

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

অথ শ্যাম্পেন কথা

'মঁসিয়ে'
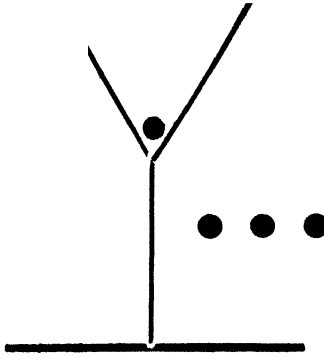
ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনে রাজা বা রাণীর অভিষেক এক বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনটির প্রভাব তাদের জীবনে অনতিক্রম্য, এই দিনটিতে সারা ইংল্যাণ্ড মেতে ওঠে এক নতুন জীবনের ছোঁয়ায়, ভরে ওঠে এক অফুরন্ত আনন্দে, এতটুকু ফাঁক রাখে না কোথাও সেই দিনটি যথাযথ পালনে। এই একটি দিনের জন্তে সারা বছর ধরে তারা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে।

উৎসব পালন নানাভাবে হয়ে থাকে, এ নিয়মের কোন দেশ কাল নেই। একটি কেন্দ্রকে বিন্দু করে নানাবিধ উৎসব তার অঙ্গবেষ্টন করে থাকে, এ নিয়মের প্রচলন সব দেশে, সব কালে। অভিষেক উৎসব পালনের একটি অভিনব পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল চেস্টারটনের দ্বারা। জীবনরসিক সাহিত্যিক গণ-জীবনে আনন্দরস আস্বাদের এক নতুন মার্গের সন্ধান রেখে গেলেন। নগরসজ্জায় শোভা হিসেবে অলঙ্করণের পশ্চাদ্‌ভূমি হিসেবে কতকগুলি ঝর্ণার সৃষ্টি হোক, যাদের মুখগহ্বর থেকে নিঃসৃত হবে মন্ত অর্থাৎ সোমরস—যে কোন উৎসবের প্রধান উপকরণ।

ঠিক তিনশো বছর আগের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করি। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের আমলে গোটা ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এক বিরাট পট পরিবর্তনের কাহিনী ইতিহাস পাঠকের কাছে অজানা নয়। রাজনৈতিক নাটকের এক নিদারুণ সঙ্ঘাতের যুগ। রাজার নিয়তি তাঁর গলায় পরিয়ে দিল ফাঁসির দড়ি। সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হল সারা ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু এই সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবন লাভ করে নি, চাকা আবার ঘুরে গিয়েছিল প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত প্রথম চার্লসের ছেলে দ্বিতীয় চার্লসের মাথায় আবার উঠল রাজমুকুট, পিতৃসিংহাসন হ'ল তাঁর আবার অধিকারগত। রাজতন্ত্রের পুনরায় হ'ল প্রতিষ্ঠা! রাজ্যলাভের পর সগৌরবে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে যখন তিনি লণ্ডনে প্রবেশ করছেন সেই মহা আনন্দের স্মারক হিসেবে লণ্ডনের পথে ঘাটে অসংখ্য পানাধারের ছড়াছড়ি দেখা গিয়েছিল। প্রত্যেকটি পানাধার পরিপূর্ণ ছিল পরম সুস্বাদু মন্তে এবং তা পরিবেশিতও হয়েছিল অফুরন্ত।

মনে করুন ট্রাফালগার স্কোয়ারের কথা। নৈশ-ভোজনের প্রাক্কাল—সময় হিসেবে ভেবে নিন। ঠিক এমনই অবসর ও আরামের মুহূর্তে ট্রাফালগার স্কোয়ারের ঝরণাগুলির মুখ থেকে টকটকে লাল এবং বেগুনী রঙের ক্ল্যারেট আর বার্গাণ্ডী, কাঁচা সোনার মত উজ্জ্বল বর্ণের শেরী সারা পথকে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে, রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে ঐ ক্লারেট, বার্গাণ্ডী আর শেরীর বন্তায়, আর সেই পোর্ট ও মেডিরা—দৃশ্যের সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ দুঃসাধ্য, তা অনুভূতি সাপেক্ষ।

মন্ত প্রসঙ্গে বহুশ্রেণীর মন্তের কথা উল্লেখ হওয়ার দাবী রাখে! মন্ত সম্বন্ধে ব্যাপক অনুশীলন করলে অনেক জাতের, অনেক নামের, এমন কি অনেক স্বাদের মন্তেরও সন্ধান মিলবে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি সাধারণ সংযোগসূত্র বিদ্যমান—সেটি উৎসবের আনন্দের উৎস, নামে, স্বাদে, জাতে বিভিন্ন হ'লেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এক। তারিখ পঞ্জীগুলিতে দেখা যায় যে বিশেষ বিশেষ দিনগুলি লালবর্ণ দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে এই লালবর্ণের দিনগুলি উদ্‌যাপনের প্রধান অঙ্গই হ'ল এই লালাভ রূপেয় বিভিন্ন জাতের মন্ত। বিভিন্ন মন্তের মধ্যে এক বিশেষ উল্লেখের দাবীদার হচ্ছে শ্যাম্পেন। শুধু উল্লেখের দাবীদার বললেই সবটা বলা হয় না, বলাটা অসমাপ্ত থেকে যায়- বিশেষ উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যেও তার অনেকখানি অধিকার। ঝর্ণার মুখ থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন মন্তের নিঃসরণের মধ্যে তাকে আপনি খুঁজে পাবেন না। হট্টমেলায় মধ্যেও তার উপস্থিতি মেলে না, ভিড় থেকে সে অনেক দূরে বহুর মধ্যে তাকে আপনি পাবেন না।

একের মহিমায় সে উজ্জ্বল ভাস্বর এবং মহিমান্বিত। ঝর্ণার সঙ্গে তার বিরোধের একটি কারণ আছে—আসলে শ্যাম্পেন এমন এক ধরণের মন্ত যা এক শক্ত ছিপি এবং সুগঠিত বোতলের আওতায় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই তার চমৎকারিত্ব—ছিপি খুলে বোতল থেকে পানীয় গ্লাসে ঢেলে আপনি পান না করে এদিক-ওদিক করলে তার গুণগুলি বিনষ্টির সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে। সেইজন্তে ঝর্ণার মুখ থেকে অন্যান্য মন্তগুলির সঙ্গে নিঃসরণ হওয়া শ্যাম্পেনের পক্ষে সম্ভবপরও নয়, শোভনীয়ও নয়। তা হলেই বুঝতে পারছেন তো এই যোগাযোগ হীনতার সূত্রটি কোথায়?

সময়ের ব্যবধান শ্যাম্পেনের চমৎকারিত্বকে ক্ষয় করতে পারে না। অনেক দিনের পুরোনো শ্যাম্পেন, দেখা গেছে, আনন্দ দানে সমান সক্ষম এমন কি তার ঔজ্জ্বল্য, তার প্রভা এতটুকু ব্যাহত হয়নি—তবে এখানে একটা কথা আছে—জিনিষটি খাঁটি হতে হবে—এই সর্বাঙ্গীণ বিশুদ্ধতার মধ্যেই দীর্ঘকাল তাজা থাকার চাবিকাঠি।

চার্লস এবং তাঁর প্রমোদপিয়াসী আনন্দময় বোদ্ধৃ-সৈনিকমহলে ঔজ্জ্বল্যযুক্ত শ্যাম্পেন পানীয় হিসেবে নিষিদ্ধ ছিল। কেবলমাত্র বোতলটির মুখ ছিপির দ্বারা বন্ধ রাখলেই শ্যাম্পেনকে তাজা এবং বিশুদ্ধ রাখা যায় এ-কথা যদি আপনি মনে করেন তাহ'লে আমরা বলব—আপনার ধারণা যথার্থ নয়, শ্যাম্পেনের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যকে যথাযথভাবে বজায় রাখা কেবলমাত্র ছিপির কাজ নয়। কৌতূহলী পাঠকের মনে এখন এ প্রশ্নের উঁকি মারা মোটেই অস্বাভাবিক নয়

যে, তা হ'লে কোন প্রক্রিয়ায় শ্যাম্পেন সমান ঝাঁঝালো থাকে সাধারণ বুদ্ধিতে বাইরের হাওয়াকে ক্ষতিকারক বোধে আটকে রাখার পক্ষে ছিপিই যথেষ্ট শক্তি—কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তার ব্যতিক্রম, তা হলে পানীয়ের মধ্যেই এমন কোন শক্তি আছে যা পানীয়ের উৎকর্ষের বিনষ্টির সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। গুপ্ত রহস্যটি হচ্ছে বস্তুটিকে বোতলের ভিতর ঢেলে দেওয়ার পর আর একবার ফুটিয়ে নিতে হয় এবং এই দ্বিতীয়বার ফুটিয়ে নেওয়ার সময়ে তাতে একটু চিনি মিশিয়ে দিতে হয়। এখানেও সমস্যা আছে. গুপ্তরহস্যের সূত্র তো উদ্ভাবিত হল কিন্তু চিন্তার বিষয় শেষ হল না কারণ প্রয়োগ পদ্ধতিটা বড় গোলমেলে। জিনিষটা বলা যতটা সহজ, তাকে কাজে পরিণত করা ঠিক ততখানি শক্ত। প্রধানত চিনির পরিমাণ সম্বন্ধে আপনাকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে যদি চিনির পরিমাণ কম হয়ে যায় তা হ'লে উজ্জ্বল বিন্দুগুলির পরিবর্তে সেখানে আগাগোড়া সর পড়ে যাবে। আবার যদি চিনি বেশী হয়ে যায় তা হলে দ্বিতীয়বার ফোটানোর ফলে কার্বলিক এ্যাসিড গ্যাসের চাপে বোতলটি সর্বৈব ফেটে যাবে তার মানেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এ ধারণা যে অমূলক নয় তার অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণই যথেষ্ট বলে মনে হয়। ১৭৪৬ সালের কথা, অর্থাৎ সাম্প্রতিককালের কথাও নয়—দু'শো বছরেরও আগেকার ঘটনা। এক উদ্যমী ব্যবসায়ী ঠিক এই ব্যাপারেই ছ' হাজার বোতলের মধ্যে মোটে এক শো কুড়িটি বোতলকে অভঙ্গুর রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ত্রিশ বছর পরে আর একজন ব্যবসায়ী এক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার বোতল নিয়ে সফলকাম হয়েছিলেন বটে কিন্তু তার পিছনে তাঁকে যে কি অস্বাভাবিক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে তা অতি সহজেই অনুমেয়।

গত শতাব্দীতে এর একটা সঠিক ও সহজ পন্থা নির্ধারিত হ'ল, নির্মাতাদের মনে প্রশ্ন জাগল যে এই রহস্যের সূত্র কোথায়? শেষে তাঁরা খুঁজে পেলেন, দেখা গেল যে অতিরিক্ত চিনিই এর জন্যে প্রধান দায়ী ফলে চাপসৃষ্টিকারী সেই অতিরিক্ত শর্করার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ল। এবং তারই ফলে সেই আপাত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ঘটল। ইংল্যাণ্ডের গত শতাব্দীর শেষ দশকে, অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে শ্যাম্পেনের যুগপৎ ব্যবসা এবং জনপ্রিয়তা চরমে উঠেছিল।

শ্যাম্পেনের বোতলগুলিও অল্প মূল্যের নয়। যেমনই সুদৃঢ়, তেমনই মূল্যবান কিন্তু মজা এই যে ঐ মহার্ঘ বস্তু একবারের বেশী দ্বার ব্যবহার করা চলে না, তার যা কিছু মূল্য, কার্যকারিতা, প্রয়োজনীয়তা ঐ একবার ব্যবহারেই শেষ। ভিতর থেকে চাপ দেওয়ার ফলে বোতলের কাঁচ স্ফীতিলাভ করে কিন্তু এই স্ফীতির স্থিতিস্থাপকতা না থাকায় বোতলটি ভঙ্গুর হয়ে থাকে ফলে তার দীর্ঘকাল টিকে থাকার উপর আস্থা রাখা চলে না।

এর সৌন্দর্যের মূলে এর চেহারার অবদান কম নয়। কল্পনায় আনুন শ্যাম্পেনের রূপ, স্বর্ণাভ তরল পদার্থ, কাঁচের মত স্বচ্ছ। শুধু খালি তার উপর জলবুদবুদই যা পরিদৃশ্যমান। মেশিন গতিকে ছিপির সঙ্গে মিলন পর্যন্ত পরিচালিত করতে পারে তলানী থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে না। তলানীটা তখন এই বোতলটিকে প্রথমে উল্টে দিতে হয় অর্থাৎ তার মুখটিকে নিম্নমুখী করে দিতে হয় ধীরে ধীরে কাৎ করিয়ে করিয়ে এই অবস্থায় আনতে হয় যতক্ষণ না পুরোপুরিভাবে বোতলটি বিপরীত অবস্থিতি লাভ করে তারপর হাতের চাপের কৌশলে তলানীটা দেখতে দেখতে নীচের দিকে নামতে থাকে (মানে, বোতলটা তখন উল্টোন আছে) অবশেষে ছিপির মুখে মিশে যায় তারপর একপ্রকার জমাট, ঘন মিশ্রিত পদার্থে বোতলের গলদেশটি ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এর অন্তর্নিহিত বস্তুটি বরফের মত জমাট হয়ে যায় এবং ছিপিটা তখন এক ফোঁটা পানীয় নষ্ট না করেও বোতলের মুখ থেকে খুলে নেওয়া সম্ভবপর হয়। আর ঠিক সেই অবকাশেই ছিপির সঙ্গে তলানীটা বার হয়ে আসে, তলানীটা তখন ঠিক জমাটবাঁধা তুষারের মত দেখতে হয়।

তলানীর হাত থেকেও শ্যাম্পেন এই ভাবে মুক্তি পেল তারপর প্রয়োজন হয় কগন্যাকের। এর রূপায়ণের শেষস্পর্শ সমাধা হয় কগন্যাকের দ্বারা। খানিকটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কগন্যাক মেশাবার পর এর রূপায়ণটি সমাধা হয়। ফরাসী উৎকৃষ্ট মদগুলির মধ্যে কগন্যাক অন্যতম। সব শেষে, সর্বপ্রকার পরিচর্যান্তে শ্যাম্পেনকে দীর্ঘকাল রেখে দিতে হয় তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ব্যবহার নিষিদ্ধ, অনেক কাল তাকে প্রস্তুত অবস্থায় ফেলে রেখে তারপর তার ব্যবহার বিধেয় এবং রীতিসম্মত। এই দীর্ঘকাল ফেলে রাখার অর্থ তার মধ্যে সন্নিবিষ্ট পদার্থগুলি পরিপূর্ণরূপে মিশ্রিত হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন সে উদ্দেশ্য অল্প সময়ে সিদ্ধ হওয়ার নয়।

যে কোন উৎসবমুখর সন্ধ্যাকে যদি আপনি প্রাণবন্ত, জীবন্ত ও রসোজ্জ্বল করে তুলতে চান তাহলে আপনার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে শ্যাম্পেন অপরিহার্য অঙ্গ। উৎসবের সন্ধ্যাকে প্রাণরসে মাতিয়ে তুলতে শ্যাম্পেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শ্যাম্পেনের পরিবর্তে অন্য পানীয় পরিবেশন করার স্বাধীনতা আপনার অবশ্যই আছে তবে শ্যাম্পেনের মাধুর্য তাদের মধ্যে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। সমাগত অতিথির অন্তরে শ্যাম্পেন যে আনন্দরসের জন্ম দেয় ঠিক সেই আনন্দরস সৃজনে অন্য পানীয় অক্ষম।

মূল্যের দিক দিয়ে শ্যাম্পেন অবশ্যই মহার্ঘ। শ্যাম্পেন নির্মাণে যে ধৈর্য এবং কৌশল প্রয়োগ করতে হয় তা আয়াসলভ্য নয়, ফলে তার মূল্যায়নের সময় এ কথা অবশ্যই চিন্তনীয়। তার নির্মাণ রীতিমত ব্যয়সাপেক্ষও, সেইজন্য তার মূল্য যে অধিক হবে তাতে কি বিস্ময় থাকতে পারে? শ্যাম্পেনের একটি প্রধান গুণ যে মনকে সে নির্মলভাবেই মাতিয়ে রাখে এই মাতানোর মধ্যে প্রগলভতা নেই, অস্বাভাবিকতা নেই, অশালীনতা নেই, অফুরন্ত আনন্দেরই সেখানে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট স্বাক্ষর।

অনুষ্ঠানাদিতে ককটেল এক অপরিহার্য উপকরণ। শ্যাম্পেনকে কখনও ককটেলে মেশানো উচিত নয়, ভিন্ন ভিন্ন মদের মিশ্রণ এক বিচিত্র আস্বাদের জন্ম দেয় কিন্তু শ্যাম্পেনের স্থান তাদের উর্ধ্বে। শ্যাম্পেনের যে নিজস্বতা, যে বৈশিষ্ট্য, যে গুণাবলী তা কখনও অন্যের সঙ্গে মিশ খায় না, মেশালে তার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, ককটেলে শ্যাম্পেন মিশিয়ে পরিবেশন করলে অনেকে তা রীতিমত অপমান বলে গণ্য করেন। অতিথি সৎকারের পক্ষেও এ অতি অনুচিত ধর্ম। শ্যাম্পেন তার নিজের মহিমায়, বৈশিষ্ট্যে ও স্বাতন্ত্র্যে। সকল দিক দিয়ে অম্লান অপরাজেয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এই পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত পাহাড় জঙ্গল সঙ্কুল একটি জেলা বাঁকুড়া। জেলাটির মৃত্তিকা রুক্ষ, ধূসর গৈরিক ও কঙ্করময়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রভৃতি প্রতি অন্যান্য অধিকাংশ জেলা হইতে অনেক কম এবং ইহা পশ্চিম বাঙ্গলার একটি ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা। বাঁকুড়া জেলার বিবরণী (Bankura District Gazetteer) হইতে জানা যায় যে, গড়ে প্রতি চারি বৎসরে—এই জেলায় দুই বৎসর অজন্মা, এক বৎসর দুর্ভিক্ষ ও এক বৎসর ভাল ফসল হইয়া থাকে।

এই জেলার মধ্যে পাহাড় ও অরণ্যসমাকীর্ণ একটি থানার নাম রাণীবান্দ। এই থানাটি যেন পৃথিবীর আদিকালে স্বয়ং প্রকৃতিদেবী তাঁহার নিজ হস্ত দিয়া অতিশয় দুর্গম ও সুরক্ষিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়ের বন-নিবদ্ধ শ্রেণীর পর শ্রেণী মাথায় জঙ্গলের নিবিড় জটাজাল ধারণ করিয়া শির উর্দ্ধে তুলিয়া আকাশ ফুঁড়িয়া বিরাজ করিতেছে। এই পাহাড়ের শ্রেণীগুলির মধ্যে মধ্যে কোথাও সংকীর্ণ ও কোথাও বা বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্য পরিপূর্ণ উচ্চাবচ—উপত্যকা এবং সেই উপত্যকাগুলির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কংসাবতী, কুমারী, ভৈরব-বাঁকী আত্মতৃপ্তি উপভোগ করিয়া থাকে।

রাণীবান্দ থানার এই সকল নিবিড় বন-জঙ্গল পূর্ণ অঞ্চল স্থানে স্থানে কাটিয়া শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়া যাহারা তথায় বসবাস করিতেছে তাহাদের অধিকাংশই সাঁওতাল, সর্দ্দার, মাল ও মাহাত জাতীয় অধিবাসী হইতেছে। ইহাদের দীর্ঘদেহ, প্রশস্ত বক্ষস্থল, স্থুল-অস্থি ও মাংসপেশী বহুল সুগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সুদৃঢ় পদক্ষেপ, বে-পরোয়া চাল-চলন ইহাদের শারীরিক ক্ষমতার, কষ্ট-সহিষ্ণুতার, সাহস ও বীর্য্যবত্তার পরিচায়ক। জঙ্গলে ও পর্ব্বতময় অঞ্চলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ, বন্য-বরাহ, অজগর ও নানারূপ বিষধর সর্প এবং খরগোস ও নানাজাতীয় পক্ষীর প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান। এমন কি হস্তীদলও মাঝে মাঝে পাহাড়ের শ্রেণীতে বিচরণ করিতে দেখা যায়।

জঙ্গল ও পাহাড় ঘেরা শস্যক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করিবার সময় অরণ্যমধ্যে কাষ্ঠ, মধু, মোম ও পত্র আহরণের সময় এবং এমন কি গৃহ-পালিত গরু ও ছাগলের পালকে চরাইবার সময় এই সকল হিংস্র ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বন্য বরাহের দল এবং বিষধর সর্পের সহিত প্রায়ই এখানকার অধিবাসীদের সহসা সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

রাণীবান্দে বাঘ শিকার

(এক যাত্রায় তিনটি ব্যাঘ্র ও একটি ভল্লুক শিকারের কাহিনী)

শ্রীজয়কৃষ্ণ দাস

প্রভৃতি নদীগুলি ও তাহাদের শাখা-প্রশাখা ও উপনদী সমূহ প্রবাহিত হইয়াছে। অগণিত পাহাড়ের শ্রেণী হইতে নির্গত অগুন্তি ঝরণার জল ঝর ঝর, কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতে নিজদিগকে মিলাইয়া দিয়াছে। বর্ষার কয়েক মাস ব্যতীত এই নদীগুলির জলধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর কলেবর হইয়া প্রায় বিলীন হইয়া যায় এবং নদী ও শাখা-নদীগুলির গর্ভ তখন বিস্তীর্ণ শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমির সদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্ষার কয়েক মাস ব্যতীত এই সকল ঝর্ণার জলই তখন এখানকার অধিবাসীদের এবং জঙ্গলের পশু-পক্ষীদের পানীয় জলের একমাত্র প্রধান উপায়।

প্রকৃতিদেবীর লীলা-নিকেতন এই পাহাড় ও জঙ্গল ঘেরা দুর্গম স্থানটি পথিক মাত্রেরই বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি স্বতঃই আকৃষ্ট করে। বৃটিশ রাজত্বকালে বিপ্লবী-বাঙ্গলার বিপ্লবী দলের এই স্থানটি ছিল একটি ঘাঁটী স্বরূপ এবং বাঙ্গলা মায়ের দামাল ছেলে বিপ্লবী বীর শ্রদ্ধেয় বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতাকামী মাতৃভক্ত পূজারীর দল এখানে একটি বোমা তৈয়ারীর কারখানা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে পাহাড়টার সুবৃহৎ গুহায় আড্ডা স্থাপন করিয়া বোমা প্রস্তুত করিতেন সেই পাহাড়টার স্থানীয় নাম ছেন্দা পাহাড়। আজিও তথাকার গ্রামবাসীরা সেই গুহাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সগর্ব্বে বাঙ্গলা মায়ের এই সকল বীর দেশভক্ত

বনের এই সকল হিংস্র প্রাণীদের সঙ্গে একরূপ যুদ্ধ করিয়াই স্থানীয় অধিবাসীদিগকে জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে হয়। কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি;
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগেরই মাথায় নাচি।"

অরণ্য ও পাহাড় বেষ্টিত দুর্গম এই যে রাণীবান্দ থানা, তাহারই একটি গ্রাম সিন্দরীআম মৌজায় একদা একটা মোকর্দ্দমা উপলক্ষে কমিশনের কার্য্যে মক্কেলদের তরফে তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত হইয়া বেশ কিছু বৎসর পূর্ব্বে আমার যাইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। সঙ্গে ছিলেন জরিপের কার্য্য ও নক্সা প্রস্তুত করিবার জন্য আদালত কর্ত্তৃক-ভারপ্রাপ্ত সার্ভে-জ্ঞান সম্পন্ন উকিল-কমিশনার এবং আমার "মাল" ও "সর্দ্দার" মক্কেলগণের তরফে নিযুক্তির উকিল স্বরূপে এই লেখক।

বাল্যকাল হইতেই আমার শিকারে খুব উৎসাহ এবং বড় হইয়া উহা একটা নেশায় ও সখে পরিণত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সময় ও সুযোগ পাইলেই বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বহুতর নানা জাতীয় স্থলজ ও জলজ পক্ষী শিকার করিয়াছি এবং কয়েকটা বন্য-শূকর ও একটা ভল্লুকও শিকার করিয়াছি কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কোন বাঘ শিকার করা আমার কপালে জুটিয়া না উঠার নিমিত্ত মনে মনে একটা ক্ষিপ্ত ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। অবশেষে সেই প্রথম বাঘ শিকার করা

আমার জীবনে কি ভাবে ঘটিয়াছিল তাহারই বর্ণনা নিম্নে করিতেছি। এই কমিশন উপলক্ষে রাণীবান্দে বাঘ শিকার করার সুযোগ আসিতে পারে ভাবিয়া আমি আমার অতিপ্রিয় ভার্য্যাণীর তৈরী উৎকৃষ্ট দো-নলা বন্দুক ও যথেষ্ট টোটা সঙ্গে লইয়াছিলাম। তখন ভাবিতে পারি নাই যে, ভাগ্যে উহা সঙ্গে লইয়া ছিলাম নচেৎ তথায় বাঘের কবলে পড়িয়া জীবন বিপন্ন হইত।

চৈত্র মাসের শেষাশেষি, প্রখর গ্রীষ্মকাল, মাথার উপর মার্ত্তণ্ডদেব অনলবৃষ্টি করিয়া মাটিকে তাপিত করিয়া তুলিতেছেন বায়ু এত শুষ্ক ও গরম যে নিঃশ্বাস লইতেও কষ্ট বোধ হয়। এইরূপ একটি দিবসের প্রাতঃকালে বাঁকুড়া সহর হইতে মটরবাসে চাপিয়া কমিশনারবাবু ও আমি সিন্দরী-আম গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া প্রায় দুপুর শেষে আমাদের অকুস্থল সিন্দরীআম মৌজার কিছু দূরে পাকা রাস্তার উপর বাস হইতে নামিলাম। ইহার পর আর বাস যায় না। মোটরবাস হইতে অবরোহণের স্থান (Stoppage Station) হইতে (তড়া) তড়া ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়া আঁকা-বাঁকা পায়ে চলা সংকীর্ণ পথে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল হাঁটিয়া সিন্দরী-আম মৌজায় পৌছাইতে হইবে। মোটর-রাস্তার ধারে নিকটেই একটি চালা দোকানঘর অবস্থিত। সেখানে আমার মক্কেল ভীম মাল, অর্জ্জুন মাল প্রভৃতিরা আমাদিগকে আগু-বাড়িয়া লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিল। এই চালাঘরে আমদের ক্ষণেক বিশ্রাম ও জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমরা সেখানে কাগজিলেবু দিয়া সরবৎ পান করিয়া কতকটা সুস্থ বোধ করিলাম। ভীম মাল আমাদিগকে জানাইল যে এই সামান্য পাঁচ-ছয় মাইল পথ হাঁটিয়া যাওয়া এমন বিশেষ কিছু কষ্টসাধ্য নহে। যদিও তাহারা গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা রাখিয়াছে তথাপি পায়ে হাঁটা পথে যাওয়াই অপেক্ষাকৃত ভাল। ইহা শুনিবামাত্র কমিশনারবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের নিকট "এই সামান্য পাঁচ-ছয় মাইল পথ" যে আমাদের নিকট অতি দীর্ঘ রাস্তা ও এই ভরা দুপুরে প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় করিয়া উহা অতিক্রম করা যে কতটা দুঃসাধ্য তাহা কড়া করিয়া জোর গলায় হাত-পা নাড়িয়া বুঝাইয়া দিলেন। ইহার উত্তরে অর্জ্জুন মাল যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, গরুর-গাড়ী করিয়া যাইতে হইলে পায়ে হাঁটা সরু পথ দিয়া যাওয়া যাইবে না, অনেকটা ঘুরে যাইতে হইবে ও গন্তব্যস্থলে পৌছাইতে সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। এই ঘুর পথে বাঘ ভালুকের ভয় আছে। এই সকল ভাবিয়া তাহারা পায়ে হাঁটার কথাই বলিয়াছিল। পদব্রজে সোজা পথে সিন্দরী-আম গ্রামে পৌছাইতে তিন ঘণ্টার বেশী লাগিবে না এবং তাহা হইলে বেলাবেলি তিনটার মধ্যেই আমরা তথায় পৌছাইতে পারিব ও খাওয়া দাওয়া করিয়া বিশ্রাম করিতে পারিব।

উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শুনিয়া আমি তাহাদের বুঝাইলাম যে, আমার সঙ্গে বন্দুক আছে এবং গরুর গাড়ী ব্যতীত আমাদের পক্ষে এই রৌদ্রে যাওয়া সাধ্যাতীত, অতএব আমরা গরুর গাড়ীতেই যাইব। এই কথা বলিয়া আমি আর সময়ক্ষেপ না করিয়া কমিশনার বাবুকে গরুর গাড়ীতে উঠিতে বলিয়া স্বয়ং গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম ও অর্জ্জুন মাল গাড়ীর দুই পাশে চলিতে লাগিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, ভীম মালের হাতে লম্বা বাঁটওয়ালা বৃহৎ টাঙ্গি ও অর্জ্জুন মালের হাতে দীর্ঘ ফলাওয়ালা সুদীর্ঘ বল্লম। গরুর গাড়ীর চালক শ্যাম সদ্দারের পার্শ্বেও দেখিলাম যে, গাড়ীতে চালকের বসিবার স্থানে বাঁশের বাতায় গোঁজা টাঙ্গি রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই ছয় ফুট অপেক্ষাও দীর্ঘ, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ যেন কাল পাথর হইতে কুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ভীম মালের কবাট বক্ষ, বৃষ-স্কন্ধ ও পেশীবহুল দেহ চাহিয়া দেখিবার মত। উহাদের বয়ঃক্রম ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের অধিক হইবে না। যাত্রার অল্পক্ষণ মধ্যেই কমিশনারবাবু গাড়ীর ভিতর শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। আমি গাড়ীর সামনের দিকে চালকের পশ্চাতে গাড়ীর ছইয়ে হেলান দিয়া পা ছড়াইয়া আয়েস করিয়া বসিয়া ভীম ও অর্জ্জুন মাল এবং চালক শ্যাম-সদ্দারের সহিত বাঘ শিকারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে চলিলাম। শিকার প্রসঙ্গে বিখ্যাত ব্যাঘ্র-শিকারী আমার বন্ধুবর রাণীবান্দ থানার রাজাকাটা গ্রামের ডাক্তার মোহন্ত চৌধুরীর বাঘ শিকার সম্বন্ধে নানা রূপ রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিলাম। ডাক্তার মোহন্ত চৌধুরী শতাধিক বাঘ, পঞ্চাশের উপর ভালুক ও ঐরূপ সমসংখ্যায় হরিণ শিকার করিয়া সেখানকার স্থানীয় অঞ্চলেও সাহসী, অব্যর্থ সন্ধানী ব্যাঘ্র-শিকারী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

উঁচু নীচু তড়া ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলা পথে গরুর গাড়ীর মধ্যে গাড়ী চলার তালে তালে ডাইনে বাঁয়ে হেলিয়া দুলিয়া হাড়ের মধ্যেও কাঁপন তুলিয়া আমাদের যাত্রা। দেখিলাম কমিশনারবাবু তাঁহার ঝোলা হইতে মধ্যে মধ্যে সন্দেশ বাহির করিয়া আমায় কিছু মাত্র লইবার অনুরোধের ভদ্রতার বালাই না করিয়া স্বয়ং খাইতে লাগিলেন। আমায় বলিলেন যে, অল্পক্ষণ অন্তর অন্তর তাঁহার ক্ষিদা পায়। কমিশনারবাবুর কার্য্য-কলাপে ও কথাবার্ত্তায় বিশেষ ভঙ্গীতে আমি অনাবিল কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলাম।

এমনি করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা অরণ্যপথে চলিবার পর আমাদের পথের সামনে একটা প্রশস্ত, নাতি-গভীর, শুষ্ক নালা বা জোড় পড়িল। এই জোড় পার হইয়া যাইতে হইবে। এইখানে জঙ্গলও বেশ ঘন। গাড়ীর চালক শ্যাম সর্দ্দার নালার সামনে আসিয়া আমাদিগকে গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে নালা পার হইতে অনুরোধ করিল। আমরা নামিলে সে কোনক্রমে খালি গাড়ী নালার পরপারে লইয়া যাইবে। গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা নালার গর্ভে নামিলে শ্যাম সদ্দার বলিল যে, কিছুদিন যাবৎ একটা বাঘ ভারি অত্যাচার করিতেছে। দিন কয়েকের ভিতর এগারটা গরু মারিয়াছে এবং আমাদের যাইবার দুইদিন আগে আমরা যেখানে নালা পার হইতে-ছিলাম, সেই নালার গর্ভে সেইস্থানে চরিবার সময় তিনটি গরুকে একত্রে একদিনে হত্যা করিয়াছে। ইহা শুনিবামাত্র কমিশনারবাবু আর নালা পার হইতে বিরত হইয়া তড়াক করিয়া নালা হইতে উপরে লাফাইয়া উঠিলেন এবং মহা-উত্তেজিত হইয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বাঘের বিচরণক্ষেত্রে কেন তাহা হইলে আমাদের আনা হইল এবং কেনই বা গাড়ী হইতে নামিতে বলা হইল—ইত্যাদি অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী সহকারে হাত পা নাড়িয়া জোর গলায় বলিয়া পুনরায় গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। বলিলেন যে, ছইয়ের মধ্যে তবুও খানিকটা নিরাপদে

[illegible] আমি শ্যাম সর্দারকে কমিশনারবাবু সহ কোন প্রকারে গাড়ীটা [illegible] পার করিতে বলিয়া গাড়ী হইতে আমার বন্দুক তুলিয়া লইয়া তাহার এক নলায় বুলেট ও অপর নলায় এল্-জি টোটা পুরিয়া গাড়ীর সামনে চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে নালা অতিক্রম করিলাম এবং পুনরায় গাড়ীতে না চাপিয়া পদব্রজেই গাড়ীর সম্মুখে থাকিয়া চলিতে লাগিলাম। বলাবাহুল্য, ভীম মাল ও অর্জ্জুন মাল আমার কার্য্যের অনুমোদন করিয়া আমার উভয় পার্শ্বে বল্লম ও টাঙ্গি উঁচাইয়া বিশ্বস্ত প্রহরীর মত অনুসরণ করিয়া চলিল। এমনি করিয়া আরো কতক্ষণ যাইবার পর আমরা ততক্ষণে অর্দ্ধেকেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। গাড়ীর বলদ-জোড়াটা বৃহদাকার ও হৃষ্টপুষ্ট এবং গাড়ী হাল্কা হওয়ায় চালকের ইঙ্গিতে ও তাড়নায় বেশ দ্রুতগতিতেই বনপথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

এমন সময়ে জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের ও বৃক্ষের শাখা-পল্লবের অন্তরালে লুক্কায়িত অবস্থায় নিজেকে গোপন করিয়া আমাদের অলক্ষ্যে কোন বাঘ দূরে দূরে থাকিয়া আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া চলিতেছে বলিয়া অর্জ্জুন মাল আমাকে সাবধান করিয়া দিল। জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাহাদের তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টিকে বাঘে ফাঁকি দিতে পারে নাই। আমি কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও দূরে দুই-একবার ঝোপঝাড় অল্প একটু হেলিয়া উঠিতে দেখা ছাড়া অপর কিছু লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। এইরূপে কিছুক্ষণ ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিবার পর জঙ্গলের মধ্যে একটু অপেক্ষাকৃত ফাঁকা স্থানে গুঁড়ি মারিয়া বাঘটিকে দ্রুত অতিক্রম করিবার সময় অর্জ্জুন মালের প্রসারিত হস্ত অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইয়া বাঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নি:সন্দেহ হইলাম। কমিশনারবাবুর ভীতি দেখিয়া বাঘের উপস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু না বলাই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সে সম্বন্ধে তখন তাঁহাকে কিছু বলিলাম না।

এদিকে বাঘের কিন্তু হঠাৎ বোধ হয় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। ইতিমধ্যে দূরে থাকিয়া অনুসরণে বিরত হইয়া বাঘ আমাদের অজ্ঞাতে কোন্ সময় নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। হঠাৎ গাড়ীও তাহার সম্মুখস্থ আমাদের কয়েক হাত সামনের দিকে বনের এক পার্শ্ব হইতে বাঘটা গর্জ্জন করিয়া লম্ফ দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াই পরক্ষণেই বিদ্যুদগতিতে অপর পার্শ্বে অন্তর্হিত হইল। এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল যে, আমি গুলী করিবার অবসর পাইলাম না। এদিকে গাড়ীর বলদ দুইটি অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়া গাড়ীর জোয়াল ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেলিয়া গলার দড়ি টানাটানি করিতে ও লাফ-ঝাঁপ দিতে আরম্ভ করিল। শ্যাম সর্দার টাঙ্গিহস্তে গাড়ী হইতে লাফাইয়া নামিয়া-পড়িয়া বলদ দুইটিকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কমিশনারবাবু কোনমতে ছই আঁকড়াইয়া ধরিয়া চক্ষু বন্ধাবৃত করিয়া গাড়ীর ভিতর কুঁকড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ভয়ে তাঁহার গলা দিয়া কোন স্বর বাহির হইতেছিল না। আমার বুকের ভিতরটায় হৃৎপিণ্ড প্রবলভাবে দাপাদাপি সুরু করিল। মনে হইল তাহার ধ্বনি বুঝি বাহিরে কানেও শুনিতে পাইতেছি। এদিকে ভীম মাল, অর্জ্জুন মাল ও শ্যাম সর্দার সমস্বরে কোলাহল করিয়া আশেপাশের জঙ্গলের ঝোপঝাড়ে ও গাছের ডালে বল্লম ও টাঙ্গির বাঁট দিয়া পিটাইতে লাগিল। উদ্দেশ্য—এইভাবে বাঘকে ভাবিতে লাগিলাম যে, ইহাদের সতর্কবাক্য গ্রাহ্য করিয়া বাঘের এলেকা হইতে দূরের পায়ে-চলা অন্য সরল পথে গমন করিলেই ভাল হইত; তাহা হইলে এমন ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইত না।

বাঘটার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, বাঘ বৃথাই অরণ্যের অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়া এতক্ষণ আমাদের অনুসরণ করে নাই। তাহার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এত সহজে তাহাকে তাহার শিকারের লুব্ধতা হইতে বিতাড়িত করা যাইবে না। বাঘ এক্ষণে দূরে দূরে না থাকিয়া সামনা-সামনি আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহারই সুযোগ খুঁজিতেছে। একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়া এক পার্শ্ব হইতে ঝম্প প্রদান ও অপর পার্শ্বে অন্তর্দ্ধানের মূলে তাহার এই ইচ্ছারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেছে। এতগুলি লোক ও তাহাদের হস্তধৃত রৌদ্রের ঝলকে আলো ঠিকরাইয়া পড়া অস্ত্র দেখিয়া বোধ হয় প্রথমেই সরাসরি আক্রমণ করে নাই। বুঝিলাম বাঘটি কৌশলী এবং এইরূপ করিয়া শিকার করা তাহার অভ্যাস আছে। এইরূপ হয়ত' দুই-চারিবার অতর্কিতে ঝম্প প্রদান ও পলায়ন পর্ব্বের খেলা দেখাইয়া সকলের মনে শঙ্কা জাগাইয়া গাড়ির বলদ জোড়াকে দড়ি ছিঁড়িয়া জঙ্গলে পলাইতে বাধ্য করিয়া হয় সেই বলদকেই শিকার করিবে অথবা কোন মানুষকেই ঝম্প দিয়া মুখে করিয়া লইয়া যাইবে।

এই সঙ্কট পূর্ণ নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজেকে ভারি অসহায় ও দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। কোথায় নিরাপদ উচ্চতার ব্যবধানে গাছের উপর মাচা বাঁধিয়া বাঘের চক্ষুর অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখিয়া বাঘের অজ্ঞাতে বাঘকে গুলী করিয়া মারা, আর কোথায় জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকা বাঘের হঠাৎ হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন ও লক্ষ্যবস্তু হওয়া! অন্তরের মানসপটে নিজগৃহে অবস্থিত স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের মুখচ্ছবি হঠাৎ ভাসিয়া উঠিল। ভাবিলাম এই অরণ্যমধ্যে ব্যাঘ্রের কবলে আমি প্রাণ হারাইলে তাহাদের দশা কি হইবে? ভগবানের নিয়োজিত আমি না! তাহাদের পালক ও রক্ষক। আমি কি নরমাংস লোলুপ এই হিংস্র ব্যাঘ্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়া তাহাদের অশেষ দুর্দ্দশার কারণ হইব? ব্যাঘ্রের তীক্ষ্ণ নখ-দন্ত অপেক্ষাও শক্তিশালী বন্দুক না আমার নিকট রহিয়াছে? এই সকল কথা যেন ফিল্মের ছবির মত সহসা আমার মনের মধ্যে উদয় হইয়া মনে সাহস ও আশার সঞ্চার করিল। আমি মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব—আত্ম-প্রত্যয় ও দৃঢ়তা অনুভব করিলাম। ভাবিলাম, না—ব্যাঘ্র যদি পুনরায় আক্রমণ করে তবে আমার পরিবর্ত্তে ব্যাঘ্রকেই মৃত্যু-বরণ করিতে হইবে। লিখিতে যতটা সময় লাগিল তদপেক্ষা অনেক অল্প সময়ের মধ্যে আমার মনের মধ্যে এই সব ভাব খেলিয়া গেল। আমি মনকে দৃঢ় করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিলাম। অনুভব করিলাম যে ভয়ের পরিবর্ত্তে আমার মনের মধ্যে তখন এক নিদারুণ ঘৃণা, দুর্জ্জয় সাহস ও ভীষণ হিংস্র-ভাবের উদয় হইয়াছে।

আমার সঙ্গীরা তখন পর্য্যন্ত সমান ভাবেই চীৎকার ও গাছকে লাঠি পেটা করিতেছিল। তাহাদের দিকে চাহিয়া একটা যেন কিরূপ উল্লাসের ভাব মনের মধ্যে অনুভব করিলাম। আমি তাহাদের নিকটে যাইয়া দৃঢ়স্বরে অভয় দিয়া হট্টগোল বন্ধ রাখিয়া বলদ দুইটিকে পুনরায় [illegible] গাড়ী চালাইবার আদেশ দিলাম। গাড়ীর

ভিতরে কমিশনারবাবু মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় একই ভাবে ভয়ে নির্জ্জীবের মত আড়ষ্ট হইয়া নিজেকে গুটাইয়া বসিয়া আছেন। আমাদের গাড়ী পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল এবং গাড়ীর সামনে আমি, ভীম মাল ও অর্জ্জুন মাল পাহারা দিয়া চলিলাম। অচিরকাল মধ্যে নিকটেই অরণ্যের অভ্যন্তর হইতে বাঘের ঘন ঘন ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম এ যেন ব্যাঘ্রের যুদ্ধের আহ্বানের ধ্বনি। এমনি করিয়া আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবার পর সামনের দিকে রাস্তা হইতে কিছু পাশে অপেক্ষাকৃত অল্প ফাঁকা জঙ্গলের ওধারে গাছপালার ফাঁকে একটা প্রকাণ্ড বড় পাথরের চাঙ্গর উপরে বাঘটাকে উপবিষ্ট অবস্থায় মুখবিকৃতিসহ লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে দেখা গেল। ভাবিলাম বাঘ কি আক্রমণের ধারার পরিবর্ত্তন করিতেছে এবং এইবার সামনে আসিয়া আক্রমণ করিবে? বাঘের দূরত্ব আমাদের নিকট হইতে অনেকটা ব্যবধানে থাকায় সেখান হইতে গুলী করিলে তাহা কোন কার্য্যকরী হইবে না বলিয়া গুলী করিতে বিরত হইলাম। অর্জ্জুন মাল বলিল যে গাঁয়ের কাছে আমরা পৌছিবার পূর্ব্বেই বাঘ নিশ্চিত আক্রমণ করিবে। আমি বলদ-জোড়াটিকে আয়ত্তে রাখিয়া—শ্যাম সর্দ্দারকে নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে বলিলাম। জানি না কেন আমার তখনকার নির্ভীক ব্যবহারে স্বভাবতঃই সাহসী ইহাদের মনেও যথেষ্ট সাহস ও যুদ্ধং দেহি জঙ্গী—মনোভাব জাগ্রত হইয়াছিল। আমরা আর একটু অগ্রসর হইতেই বাঘটা পাথরের চাঙ্গড়ার পশ্চাদ্দিকে অবতরণ করিয়া জঙ্গলের একদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বাঘকে ভয় দেখাইবার জন্য ভীম মাল, অর্জ্জুন মাল ও শ্যাম সর্দ্দার সমস্বরে ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু ভবি ভুলিবার নয়। এত সহজে শিকারলুব্ধ বাঘকে তাহার শিকারের গ্রাস হইতে দূরীভূত করা যায় না।

তাহার পরিচয় ক্ষণকাল পরেই পাওয়া গেল। পাথরের টিলা হইতে নামিয়া বাঘটা জঙ্গলের যে দিকে প্রবেশ করিয়াছিল কিছুক্ষণ পরেই ঠিক তাহার উল্টাদিকের নিকটের একটা ঘন-নিবদ্ধ বৃহৎ ঝোপ হইতে দুলিয়া উঠিল এবং তাহার মধ্যে হইতে বাঘ ছুটিয়া বাহির হইয়া গাড়ীর সম্মুখস্থ আমাদের উপর লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন করিয়া ঝম্প প্রদান করিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্দুক লম্ফনরত বাঘের প্রশস্ত বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া ব্যাঘ্র গর্জ্জনের সহিত পাল্লা দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। গুলী খাইয়া চরম আহত হইয়া বাঘটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আমাদের সামনে ধপাস করিয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু মাটিতে পড়িয়াই তৎক্ষণাৎ সে ক্রুদ্ধ মরণাহত ব্যাঘ্র রক্তোজ্জ্বল করা, পাহাড় ফাটান বজ্রধ্বনিবৎ গর্জ্জন করিয়া পুনরায় লাফাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই তদবস্থায় আমার বন্দুকের এল, জি, টোটাভরা নলটি তাহার বক্ষে খালি করিয়া দিলাম। এইবার বাঘটা যে মাটিতে ঢলিয়া পড়িল আর উঠিল না।

এদিকে বলদ দুইটি গাড়ীটাকে টানিয়া লইয়া নিকটেই একটা ঝোপে আটকাইয়া পড়িয়াছে। শ্যাম সর্দ্দার টাঙ্গি হস্তে অসহায় গরু গুলার নিকটে আমাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাঘটাকে মরিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতে ও আর উঠিতে না দেখিয়া সে আনন্দে সাবাস বলিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। অর্জ্জুন মাল তাহার ভীত সুদীর্ঘ বল্লমে করিয়া বাঘটাকে খুঁচাইয়া একেবারে মরিয়া গিয়াছে বলিবার পর আমি যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটিয়া গিয়াছে। এই ঘোরের মধ্যেই যে—কখন পুনরায় বন্দুকে টোটা পুরিয়া বাঘের শরীর লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঁচাইয়া দণ্ডায়মান ছিলাম তাহা খেয়াল হয় নাই।

বলদসহ গাড়ীটাকে ঝোপের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া শ্যাম সর্দ্দার কমিশনারবাবু সহ নিকটে আসিলে পর সকলে বাঘটাকে ঘিরিয়া নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কমিশনারবাবু আমাকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া আমার সাহস ও অব্যর্থ লক্ষ্যের ভূয়সী প্রশংসায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিলেন। ক্যামেরা না থাকায় ফটো তোলা হইল না বলিয়া তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন। শ্যাম সর্দ্দার বলিল যে অনেকগুলি গরু ও চাষের বলদ হত্যা করিয়া বাঘটা গরীব চাষীদের কয়েক হাজার টাকার ক্ষতি করিয়াছে। সদ্য শিকার করা বাঘটা একটা সুবৃহৎ পূর্ণবয়স্ক হৃষ্টপুষ্ট চিতা বাঘ। চিতা বাঘ যে এত বড় হইতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না। অর্জ্জুন মাল বলিল যে বাঘটা 'সোনা-চিতা'।' শুনিলাম এই জাতীয় চিতা বাঘ সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতই প্রায় বৃহদাকারের হইয়া থাকে।

এই আমার প্রথম বাঘ শিকার। যেরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে বাঘটাকে শিকার করিতে পারিলাম তাহা ভাবিয়া মন এক্ষণে পুলকে ভরিয়া গেল ও মনে মনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিলাম। প্রথমেই ভগবানকে তাঁহার অপার কৃপার জন্য অন্তরের সহিত ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করিলাম। কিন্তু এই এক যাত্রায় যে পরে আমার ভাগ্যে আরো বাঘ ও ভালুক শিকার আছে তখন তাহা জানিতে পারি নাই। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই অঞ্চলে আমার তিনটা বাঘ ও একটা ভালুক শিকার করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। পরে যথাস্থানে তাহা বর্ণনা করা গেল। জরীপের কার্য্য সমাধা না করিয়া তথা হইতে এই শিকার লইয়া সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপায় না থাকায় আমার প্রথম শিকার করা বাঘ গৃহে আনয়ন করিয়া সকলকে সগর্ব্বে দেখাইয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করা আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না দেখিয়া খানিকটা মনঃক্ষুন্নও হইলাম।

ভীম মাল ও অর্জ্জুন মালকে মৃত বাঘটাকে গরুর গাড়ীর নীচে ঝুলাইয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া কমিশনারবাবু বলিলেন যে তাহার প্রয়োজন নাই। বাঘটাকে গাড়ীর ভিতরেই তোলা হউক এবং তিনি এখন হইতে আমাদের সঙ্গে পদব্রজেই যাইবেন। সুতরাং বাঘটাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আমরা সকলে অবশিষ্ট পথ মহা আনন্দে বাঘের গল্প করিতে করিতে কাটাইয়া দিয়া অবশেষে প্রায় সন্ধ্যার সময় নিরাপদে আমাদের গন্তব্যস্থল সিন্দরী-আম গ্রামে পৌছাইলাম। গ্রামের মুখে গ্রামবাসীরা আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিল। গাড়ীর মধ্যে মৃত বাঘ দেখিয়া সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল। বাঘটাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া ছাল ছাড়াইবার জন্য বলিয়া দিয়া আমরা আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানের দিকে রওনা হইলাম।

গ্রামের শেষ সীমায় সিন্দরী-আম গ্রাম ও একটি সাঁওতাল পল্লীর মাঝামাঝি স্থানে একটি বিদ্যালয় গৃহে আমাদের কয়েক দিনের জন্য অস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি যে বিদ্যালয়টির মধ্যস্থলের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুঠরীটিতে আমাদের জন্য দড়ির খাটিয়া পাতিয়া শুইবার ব্যবস্থা প্রস্তুত আছে এবং স্নান করিবার [illegible]

অবস্থায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর আমরা প্রথমেই খাটিয়ায় শয়ন করিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিয়া এবং সরবৎ পান করিয়া শীঘ্র স্নান সমাপন করিয়া লইলাম। ভিন্ন গ্রাম হইতে আনীত এক ব্রাহ্মণ পাচক তালপাতার পাটির আসনে বসিবার স্থান করিয়া দিয়া আমাদের সামনে শালপাতায় করিয়া অন্নব্যঞ্জন ধরিয়া দিল। ব্যঞ্জনের মধ্যে ছিল কাঁচা পেঁপের ডালনা ও বন হইতে শিকার করা পাখীর মাংসের ঝোল। আহারের এই স্বল্প আয়োজন কমিশনারবাবুর মোটেই মনঃপূত হয় নাই। তিনি তৎসম্বন্ধে অনুযোগ করিলে ভীম মাল জোড় হস্তে নিবেদন করিল যে এইস্থানে কোন কিছুই পাওয়া না যাওয়ায় তাহারা উহার অতিরিক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, তবে তাহারা দুই বেলাই মাংস খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবে বলায় কমিশনারবাবু—কতকটা শান্ত হইলেন।

আহার সমাপ্তির পর খাটিয়ায় শয়ন করিয়া পর দিনের জরীপের কার্য্য সম্বন্ধে কমিশনারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া একটা কার্য্যক্রম ছকিয়া লইলাম। কমিশনারবাবু প্রত্যহ আট ঘণ্টা করিয়া কার্য্য করিবেন এইরূপ মত প্রকাশ করায় আমি প্রত্যহ আট ঘণ্টা হিসাবে যতদিনের কার্য্য হয় তিনি সেইভাবে তত দিনের জন্য ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার বিল করিতে পারিবেন এবং তাহাতে কাহারও আপত্তি হইবে না এইরূপ বুঝাইয়া তাঁহাকে প্রত্যহ দশ ঘণ্টা ধরিয়া জরীপের কার্য্য করিতে সম্মত করিলাম। অন্যথায় সেই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে ঐরূপ দারুণ গ্রীষ্মে আমাদের অবস্থিতি আরো দীর্ঘ হইত। তথাপি হিসাব করিয়া দেখা গেল যে ইহাতেও আমাদিগকে সেই স্থানে সাত-আট দিন অবস্থান করিতে হইবে।

যে বিদ্যালয়টিতে আমাদের থাকিবার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই বিদ্যালয়টি ইংরাজী এল (L) অক্ষরের আকারে নির্মিত। দেওয়ালগুলি মাটির ও মাথার উপরের আচ্ছাদন কাঠ, বাঁশ ও খড়ের দ্বারা নির্ম্মিত। বিদ্যালয়টির নির্ম্মাণকার্য্য তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। দরজা ও জানালাগুলির জন্য ফাঁক আছে কিন্তু তখনও দরজা ও জানালার একটিও যথাস্থানে বসান হয় নাই। খড়ের চালও যথানিয়মে ছাওয়া হয় নাই। রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খড়ের আঁটিগুলি না খুলিয়াই গোটা গোটা করিয়া ঘরের কাঠামোর উপর স্থাপিত ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের মাটির মেজের উপর তালপাতার প্রস্তুত পাটির আসনে বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়। এই জন্য প্রতিটি কুঠরীতে অনেকগুলি করিয়া আসনের আকারের তৈরী তালপাতার পাটি রক্ষিত ছিল। আমরা যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ ছিল। বিদ্যালয়টির চারিপাশে প্রাচীরের ঘেরা (Compound walls) ছিল না। কেবলমাত্র গৃহটির সংলগ্ন পশ্চাতের দিকে কয়েক হাত ও সম্মুখের দিকে বিশ হাত পরিমিত স্থান জঙ্গলমুক্ত ছিল। চতুর্দ্দিকের বাকী স্থান অরণ্যময়। শাল, কেন্দ, মহুয়া, আম, সেগুন, পলাশ ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষরাজি শোভিত অরণ্য। পশ্চিম ও দক্ষিণ উভয় দিকেই দেড়-দুই মাইলের মধ্যেই অরণ্যবেষ্টিত অবস্থায় মস্তকে জঙ্গল শোভিত দণ্ডায়মান ঢেউখেলানো পাহাড়ের শ্রেণী চোখে পড়ে। শুনিলাম যে ঐ পাহাড়ের শ্রেণী হইতে নির্গত ঝরনার জল টিনের ভারায় করিয়া আমাদের স্নান ও পানের জন্য আহরিত হইয়াছে। সিন্দরীআম গ্রাম হইতে এবং নিকটবর্ত্তী এক-দুই মাইলের মধ্যে সাঁওতাল, ভুঁইয়া, সর্দ্দার, সাহাত প্রভৃতিদের অধ্যুষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে তিন-চারটি পায়ে হাঁটা পথ বিদ্যালয় গৃহটিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সিন্দরীআম গ্রামটি অন্য গ্রামগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড়। এই গ্রামটি আবার দুইটি পল্লীতে বিভক্ত। ইহার একটি পল্লীতে মালরা এবং অপর পল্লীতে ভুঁইয়ারা বসবাস করে। নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি 'মিছরীআম', 'জন্দা-আম', 'ঢ্যাজা আম' প্রভৃতি নামে—অভিহি ত হয়। গ্রামগুলির এইরূপ বিচিত্র নামকরণ হইতে অঞ্চলটিতে আম গাছের প্রাচুর্য্য সহজেই অনুমিত হয়।

আমাদের উপস্থিতির প্রথম দিনটিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহের বাহিরে—জঙ্গল হইতে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে দেখিয়া আমি আমাদের খাটিয়া দুইটি বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পাতিতে বলিয়া কমিশনারবাবু ও আমি তাহাতে শুইয়া পড়িয়া আয়েস করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা একটু গভীর হইয়া রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিলে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক বল্লম, টাঙ্গি, তরবারি, কাঁড়া, তীরধনুক, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। আমি অবাক হইয়া তাহাদের এইরূপ আবির্ভাবের কারণ জানিতে চাহিলে তাহারা যাহা বলিল তাহাতে দেহের লোমকূপ পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। তাহাদের বক্তব্যের সারমর্ম্ম এই যে তাহারা রাত্রে আমাদিগকে পাহারা দিতে আসিয়াছে। পাহাড় জঙ্গল ঘেরা এই অঞ্চলটি ব্যাঘ্রদের একরূপ রাজত্ব বিশেষ। জঙ্গলে ও পাহাড়ে বিস্তর বাঘ থাকার নিমিত্ত এবং বিদ্যালয়টি গ্রামের বাহিরে অরণ্য মধ্যে অবস্থিত বলিয়া প্রায়ই রাত্রে এখানে বাঘের আগমন হইয়া থাকে। বাঘ এখানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় ও কখনও কখনও বিদ্যালয়ে শুইয়া থাকে। এমন কি দিনের বেলাতেও প্রায়ই আশেপাশে গ্রামবাসীদের সহিত বাঘের সাক্ষাৎ হয়। মাত্র কয়েকদিন আগে একটি স্ত্রীলোক গ্রামের অপর প্রান্তে একটি শুষ্ক প্রায় বড় পুকুরে গৃহকার্য্যের জন্য দুপুর বেলায় জল আনিতে যাইয়া একটা বাঘের সামনে পড়িয়াছিল। বাঘটা রৌদ্রের প্রখরতায় তাপিত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া পুকুরের কর্দ্দমাক্ত জলে শরীর ডুবাইয়া জলপান করিতেছিল। পুকুরের উঁচু পাহাড়ের জন্য স্ত্রীলোকটি পুকুরে নামিবার পূর্ব্বে বাঘটাকে দেখিতে পায় নাই। অন্যমনস্ক অবস্থায় জলে কলসী ডুবাইয়া হঠাৎ মাত্র কয়েকহাত দূরেই বাঘটিকে জলের মধ্যে অবগাহিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সে ভয়ে আপনা হইতেই আর্ত্ত চীৎকার করিয়া উঠে। রৌদ্রের প্রাবল্যে বাঘটার তখন বোধ হয় শিকার ধরিবার ইচ্ছা ছিল না। এইরূপ বিকট চীৎকারে বাঘ বিরক্ত হইয়া জল হইতে উঠিয়া গাত্রের জল ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করে। স্ত্রীলোকটিও কলসী ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া গিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া সকলকে এই সংবাদ জানায়। গ্রামবাসীরা অস্ত্র লইয়া দলবদ্ধ হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া বাঘটাকে আর দেখিতে পায় নাই কিন্তু জলের ধারে ভিজা মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখিতে পাইয়াছিল। আর এই সকল কারণবশতঃই আমাদের নিরাপত্তার জন্য এই পাহারার বন্দোবস্ত। তাহারা রাত্রে আমাদিগকে ঘিরিয়া আগলাইয়া থাকিবে ও পালা করিয়া কয়েকজন সারারাত্রি ধরিয়া জাগিয়া থাকিবে। বাঘ যদি আসে তবে তাহাদিগকে পার না হইয়া বাঘ আমাদের নিকট পৌঁছাইতে পারিবে না। [ক্রমশঃ।
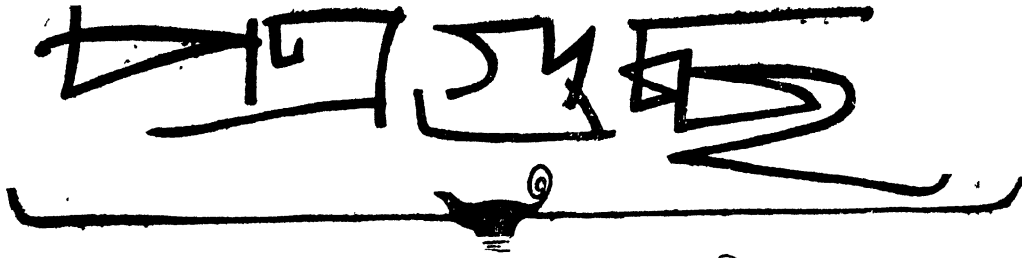
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্রাবলী

ছোটলাট স্যার উইলিয়াম গ্রেকে লেখা

১ অক্টোবর ১৮৬৭

আপনার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি এবং ব্যাপারটি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বীটন-বিদ্যালয়েই হোক বা স্বতন্ত্র ভাবেই হোক, হিন্দু-সমাজের গ্রহণোপযোগী একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারী করিবার জন্য মিস্ কার্পেণ্টার যে-উপায় অবলম্বন করিতে চান, তাহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন,—এ বিষয়ে আমার মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বস্তুতঃ, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিপন্থী; যতই ভাবিতেছি, আমার এ ধারণা ততই দৃঢ়তর হইতেছে। ইহা যে সাফল্যলাভ করিবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, সেই হেতু সরকারকে সাক্ষাৎভাবে এ কাজে নামিতে আমি কোনমতেই পরামর্শ দিতে পারি না। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা যখন অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিয়া দশ-এগার বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেয় না, তখন তাহারা বয়স্থা আত্মীয়াদের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিতে কিরূপে সম্মতি দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল অসহায়া অনাথা বিধবাদেরই এ-কার্য্যে পাওয়া যাইতে পারে। নৈতিক দিক দিয়া শিক্ষাকার্য্যে তাহারা কতদূর উপযুক্ত হইবে, সে বিচার করিতেছি না, তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অন্তঃপুর ছাড়িয়া সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে নামিয়াছে বলিয়াই তাহারা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্রী হইবে; ফলে এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভারত গভর্ণমেণ্টের পত্রখানিতে এক প্রশস্ততর পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জনসাধারণের মনোভাব বুঝিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—সাহায্যদান প্রণালীর প্রবর্ত্তন। দেশের লোক মিস্ কার্পেণ্টারের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতে ইচ্ছুক হইলে সরকার তাহাদের সাহায্যার্থ যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন। যতদূর বুঝিতেছি, হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোকই এরূপ সাহায্যের সুবিধা গ্রহণ করিবে না; তবুও যাহারা ইহার সফলতায় অতি বিশ্বাসী, সত্যই যদি তাহাদের আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায়, তাহারাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া সরকারী অর্থ-সাহায্যে এ-সম্বন্ধে ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি, তাহাদের উপর আমার আস্থা নাই। কিন্তু ভারত সরকার যে বিধি প্রচার করিয়াছেন, তদনুসারে তাহাদের অভিযোগ করিবার কিছুই থাকিবে না।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা যে কতটা অভিপ্রেত এবং প্রয়োজনীয়, তাহা আমি বিশেষ জানি,—এ কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি অলঙ্ঘনীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতাম এবং ইহাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু যখন দেখিতেছি, সাফল্যের কোনই নিশ্চয়তা নাই এবং এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সরকার অনর্থক অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িবেন, তখন কোন মতেই আমি এ ব্যাপারে পোষকতা করিতে পারি না।

বীটন বিদ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই,—এ বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। যে মানব-হিতৈষী মহাত্মার নামের সহিত বিদ্যালয়টির নাম সংযুক্ত, তিনি ভারতে নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারকল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মারকরূপেও সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ভার বহন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মফঃস্বলের বালিকা বিদ্যালয়গুলির পক্ষে আদর্শরূপে কাজ করিবে বলিয়াও এইরূপ শহরের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত এক সুব্যবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। হিন্দু সমাজের উপর এই বিদ্যালয়টির নৈতিক প্রভাব যথেষ্ট। চারিপাশের জেলা সমূহে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে ইহা পথ প্রস্তুত করিয়াছে; তাই আমার বিবেচনায় ইহার পিছনে বছরে বছরে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, তাহা সার্থক বলিতে হইবে। কিন্তু এ কথাও সত্য, ব্যয়সঙ্কোচ ও উন্নতির যথেষ্ট অবসর আছে। কার্য্যকারিতার হানি না করিয়াও বিদ্যালয়ের খরচ অর্দ্ধেক কমাইতে পারা যায়।

স্বাস্থ্যলাভের আশায় দীর্ঘকালের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইতেছি। বীটন বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন সম্বন্ধে যদি আমার মতামত জানিতে চান, তাহা হইলে কলিকাতায় আপনার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে ও সাক্ষাতে আলোচনা করিতে পারি।

ছোটলাট হ্যালিডেকে লেখা

১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮

বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, আমার পদত্যাগপত্রের যে অংশগুলি আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকিয়াছে, সঙ্গতি বা ঔচিত্যের দিক দিয়া সে অংশগুলি আমি উঠাইয়া লইতে পারি না। শারীরিক অসুস্থতা আমার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবেক-ধর্ম্মানুসারে বলিতে গেলে ইহাকে একমাত্র কারণ বলিতে পারি না। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে দীর্ঘ অবসর গ্রহণ করিয়া আমি স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারী চাকুরী করা যে আমার পক্ষে অনেক সময় অপ্রীতিকর এবং অসুবিধাজনক বোধ হইয়াছে এবং যে ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া বাংলার শিক্ষা-

সব কথা আপনাকে বহুবার বলিয়াছি। আপনি জানেন, আমি অনেক সময় কাজে বাধা পাইয়াছি। এ ছাড়া, দেখিয়াছি পদোন্নতির আর কোন আশা নাই; কারণ, আমার ন্যায্য দাবী একাধিকবার উপেক্ষিত হইয়াছে। অতএব আমি আশা করি, আপনি স্বীকার করিবেন, আমার অভিযোগের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

শিক্ষাবিভাগীয় ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ংকে লেখা

২১ আগষ্ট ১৮৫৭

আপনি তিন মাসের জন্য শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন জানিয়া আমি মনে করিলাম, সরকারী কর্ম্ম হইতে শীঘ্র অবসর গ্রহণ করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা আপনাকে জ্ঞাত করাইবার ইহাই প্রকৃত সুযোগ। এই সঙ্কল্পের মূলে যে-সকল কারণ আছে, তাহা ব্যক্তিগত—সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সেগুলি বিবৃত করিতে বিরত হইলাম।

ডিরেক্টরকে লেখা

৫ আগষ্ট ১৮৫৮

সরকারী কর্ত্তব্যপালনে অবিরত মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহাতে আমার এমন গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে যে, বাংলার ছোটলাট বাহাদুরের নিকট আমার পদত্যাগপত্র দাখিল করিতে বাধ্য হইলাম।

আমি মনে করি, আমার কর্ত্তব্যপালনে যে অবিশ্রান্ত মনোযোগের প্রয়োজন, তাহা আমি আর দিতে পারিব না। আমার বিশ্রামের দরকার। সাধারণের স্বার্থের খাতিরে এবং নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে সেই বিশ্রাম পাইতে পারি।

যে মুহূর্ত্তে স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইব, আমার ইচ্ছা, তন্মুহূর্ত্ত হইতে আমার সময় এবং চেষ্টা প্রয়োজনীয় বাংলা পুস্তক প্রণয়নে এবং সঙ্কলনে নিয়োগ করিব। স্বদেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার সম্পর্কে সরকারী কর্ম্মের সহিত আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে সত্য, তবুও আমার অবশিষ্ট জীবন এই মহৎ এবং পবিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ব্যয়িত হইবে। এ বিষয়ে আমার গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ কেবল আমার জীবনের সহিত অবসান লাভ করিতে পারে।

এরূপ গুরুতর পন্থা অবলম্বন করিবার গৌণ হেতুগুলির মধ্যে দুইটি এই,—ভবিষ্যৎ উন্নতির আর কোন আশা নাই; এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের পক্ষে যে সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত আমার সেই ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাব।

প্রথম কারণটির সম্পর্কে কথা এই,—বর্ত্তমান পদের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ অল্প শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিব। অস্বীকার করিতে পারি না, যে ব্যক্তি এতদিন পর্য্যন্ত আপন পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছাদনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে এরূপ ভাবা অন্যায় নহে। এই পরিশ্রমসাধ্য গুরু কর্ত্তব্যের সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিতে বিলম্ব করিলে ভগ্নস্বাস্থ্যবশে সেরূপ সংস্থান করাও আর চলিবে না।

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য,—আমি মনে করি, সরকারের স্কন্ধে আমার মতামত চাপাইবার অধিকার নাই। তবুও, কর্ম্মের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ নাই—যাঁহাদের চাকুরী করি, তাঁহাদের নিকট হইতে এ সত্য গোপন করিতে চাই না। এ কারণে আমার কর্ম্মকুশলতার অবশ্য হানি হইবে। বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষে সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কাজ করা এক প্রধান গুণ। এইরূপ সদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ইহা অপেক্ষা অল্পও বলিতে পারি না,—অধিক বলিতেও ইচ্ছুক নই।

আমার ক্ষুদ্রশক্তি অনুযায়ী যতদূর সম্ভব উৎসাহ সহকারে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, এই তৃপ্তি হৃদয়ে লইয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতেছি। আশা করি, সরকার চিরদিন আমার প্রতি যে অবিচ্ছিন্ন অনুগ্রহ, বিবেচনা এবং স্নেহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

ছোটলাটকে লেখা

বিষয়: সংস্কৃত কলেজ ১৭ এপ্রিল ১৮৫৯

···কাওয়েল সাহেব কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত মেলে না। আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। স্মৃতি সম্বন্ধে যে সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত আছে, সেগুলির সাহায্যে শুধু উত্তরাধিকার, পোষ্যপুত্রগ্রহণ প্রভৃতি দেওয়ানী আইন শেখান হয়। এই সকল বিষয় অধিগত করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন, অতএব এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে প্রচলিত দর্শনসমূহের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম। ইহা অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। কলেজে ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা আমি মনে করি না। এই দুইটি বিষয় এখন যে ভাবে শিখান হয়, তাহাতে ধর্ম্মগত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আমার বিনীত মত এই, এ সকলের অধ্যাপনা বন্ধ করিলে কলেজের পাঠ্য-বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ছোটলাটকে লেখা

২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯

বিলাতে এবং এদেশে এমনই একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করা হইয়াছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মন ফিরাইতে হইবে। শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্ট ও মিনিটগুলি অত্যন্ত অনুকূল ভাবের হওয়ায় বুঝা যাইতেছে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে ভিন্ন অবস্থার কথা প্রকাশ পাইবে।

একমাত্র কার্য্যকর উপায় না হইলেও, বঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারের শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ সরকার, আমার মতে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক ভাবে শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে নিজেকে বদ্ধ রাখিবেন। এক শত বালককে লিখন-পঠন এবং কিছু অঙ্ক শিখান অপেক্ষা একটিমাত্র বালককে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে প্রজাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাপ্রচারে সরকার অধিকতর সহায়তা করিবেন। সমস্ত দেশটাকে শিক্ষিত করিয়া তোলা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কোন রাজসরকার এরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অথবা সাধন করিতে পারে কি না সন্দেহ। বলা যাইতে পারে, বিলাতে সভ্যতার অবস্থা অতি উন্নত হইলেও, শিক্ষা-বিষয়ে তথাকার জনসাধারণের অবস্থা তাহাদের এদেশের ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা কোন প্রকারে ভাল নয়।

হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুয়িটি ফাণ্ডের পরিচালকবর্গকে লেখা

২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬

এই ফণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে আমি আমার সমস্ত মনোযোগ ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছিলাম। এই বৃক্ষের ফল উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া আপনারা আশান্বিত, কিন্তু আমি এইরূপ কোন আশা পোষণ করি না। আমার ধারণা, প্রত্যেকেই স্বদেশের মঙ্গল সাধন প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এ বিষয়ে আমার সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা নিয়োগ করি। নিজের স্বার্থসাধন আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এই ফণ্ড সম্পর্কে আমার প্রীতি আপনাদের সকলের অপেক্ষা অধিক, এই কথা যখন বলি—এবং এ কথা আমাকে বলিতেই হইবে—তখন সে-কথা আপনারা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না। সম্পূর্ণরূপে সেই প্রীতি বিস্মৃত হওয়ার কত দুঃখ, তাহা আমার অন্তরের অন্তস্তলই জানে। যাঁহাদের আপনারা পরিচালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না। এই ফণ্ডের সহিত আর সংযুক্ত থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই ফণ্ডের সহিত আমার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতেছি।

ডি, পি, আইকে লেখা

২ জুলাই ১৮৫৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্ব্বজনবিদিত সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত নর্মাল ক্লাসগুলির প্রধান শিক্ষক হন—ইহাই আমার অভিমত। বর্ত্তমানে প্রথম শ্রেণীর বাংলা লেখক অতি অল্পই আছেন; অক্ষয়কুমার সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকদের অন্যতম। ইংরাজীতে তাঁহার বেশ জ্ঞান আছে, এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যসমূহ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ, শিক্ষকতা-কার্য্যেও তিনি পটু। মোট কথা, তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই।···দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে আমি পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নাম উল্লেখ করি।

ডি, পি, আইকে লেখা

২৪ জুন ১৮৫৮

হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল-গৃহ তৈয়ারী করিয়া দিলে সরকার খরচপত্র চালাইবেন। ভারত সরকার কিন্তু এখন সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবর্গ গোড়া হইতে মাহিনা পান নাই, তাঁহাদের পাওনা মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি, সরকার এই ব্যয় বহন করিবেন।

সরকারী আদেশ পাইবার পূর্ব্বেই আমি অবশ্য স্কুলগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমে আপনি, অথবা বাংলা সরকার এ বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে, এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। ঐ কর্ম্মচারীবর্গ মাহিনার জন্য স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে,—বিশেষতঃ খরচ যখন সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য করা হইয়াছে।

বিলাতের রাজদরবারে ভারত সরকারের পত্র

বিষয়: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২২ ডিসেম্বর ১৮৫৮

দেখা যাইতেছে, পণ্ডিত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই এ কাজ করিয়াছেন, এবং এ কাজ করিতে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের উৎসাহ এবং সম্মতিও তিনি পাইয়াছেন। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া, এই বিদ্যালয়গুলিতে যে ৩৪৩৯/১/৫ প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে, সেই টাকার দায় হইতে সপারিষদ বড়লাট তাঁহাকে মুক্ত করিতেছেন। সরকার এ টাকা দিবেন, ইহাই তাঁহার আদেশ।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির, অথবা সেগুলির পরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত সরকারী বিদ্যালয়গুলির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কোন স্থায়ী অর্থসাহায্য করিতে কাউন্সিলের সভাপতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সমস্ত চিঠিপত্র বিবেচনার্থ সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের নিকট প্রেরিত হইবে। হুগলী, বর্দ্ধমান ও চব্বিশপরগণায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনার জন্য অনধিক এক হাজার টাকার সাহায্যের জন্যও ইহাতে অনুরোধ থাকিবে। সেই টাকার কিয়দংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির সাহায্যার্থ এবং কিয়দংশ সরকার সমর্থিত কতকগুলি মডেল স্কুলের জন্য ব্যয় করা হইবে।

ডি, পি, আইকে লেখা বাঙলা সরকারের দু'খানি পত্র

২৩ মার্চ্চ ১৮৫৫

শিক্ষা-বিভাগের নূতন ব্যবস্থাসত্ত্বেও, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত বিশিষ্টরূপ গুণবান্ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা শ্রেয়স্কর, ইহাই ছোটলাটের মত। অধ্যক্ষ হিসাবে সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তব্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধ না হয়, অথচ এ কাজে তাঁহার প্রয়োজনীয় সাহায্য কি করিয়া পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ঠিক করিতে ছোটলাট অনুরোধ করিতেছেন।

২০ এপ্রিল ১৮৫৫

ছোটলাট পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোককে ঐরূপ একটা অস্থায়ী পদে* নিযুক্ত করিবার বিরোধী। অতি অল্প দিনের কাজে পণ্ডিত কোন কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এরূপ নিয়োগ তাঁহার চরিত্র ও গুণের যোগ্য হইবে না। যে-কোন মুহূর্ত্তে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—এমন অস্থায়ী ব্যবস্থা করিলে পণ্ডিতের প্রতি সরকারের অবিচার হইবে।

ছোটলাটের মত এই, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মাকে এখনই অনুমোদিত ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করিতে নির্দেশ করা হউক। পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী তিন-চারিটি জেলা কর্ম্মক্ষেত্র-রূপে বাছিয়া লওয়া হউক। ইহাতে অন্ততঃ এই সময়টায়—পণ্ডিতের কলেজের কাজে বিশেষ বাধা জন্মিবে না।···সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বেতন ছাড়া, পণ্ডিত এই কাজ করিবার কালে মাসিক দুই শত টাকা এবং যাতায়াতের পথ-খরচা পাইবেন।

* অস্থায়ী বিদ্যালয় পরিদর্শক

চারজন
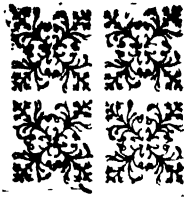
শ্রীব্রজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের সহকারী অধিকর্তা]

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং খ্যাতির দ্বারা যে সকল সরকারী কর্মচারী যথেষ্ট সুনামের ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন শ্রীব্রজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী তাঁহাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত সহদেবপুর গ্রামে ১৯০৬ সালে শ্রীব্রজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় অবনীপ্রসাদ নিয়োগী তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের অধীনে ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ ছিলেন। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পুত্র ব্রজেন্দ্রপ্রসাদকে বিভিন্ন স্থানে বাল্যের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। বাল্যকালে কিছুদিন বরিশাল সহরে শিক্ষালাভ করিয়া শ্রীনিয়োগী ঢাকা বোর্ড হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই, এস, সি পাশ করেন। আই-এস-সি পাশ করিবার পর পদার্থ বিদ্যায় তিনি অনার্স লইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া ভর্তি হন। এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য নির্দিষ্ট বৎসরে ডিগ্রি পরীক্ষায় যোগদান করিতে না পারায় ১৯২৭ সালে পদার্থ বিদ্যায় অনার্স সহ বি, এস, সি ডিগ্রি লাভ করেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী

বি, এস, সি ডিগ্রি লাভ করিয়া শ্রীনিয়োগী পদার্থ বিদ্যায় এম, এস, সি ক্লাশে ভর্তি হন এবং ১৯২৯ সালে উক্ত বিদ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এস, সি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৯ সালে এম-এস-সি ডিগ্রী লাভ করিবার পর শ্রীনিয়োগী বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিয়া ১৯৩১ সালে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হন এবং তদানীন্তন সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লইয়া সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। সরকারী চাকুরীতে যোগদান করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে খ্যাতির সঙ্গে কাজ করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসে মনোনীত হন। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগে কিছুদিন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার পর তিনি নদীয়া জেলার অতিরিক্ত জেলা-শাসক হিসাবে ১৯৫৪ সালে কৃষ্ণনগরে যান। জেলা-শাসকের পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে তিনি পুনরায় শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন। এবং অদ্যাবধি শ্রীনিয়োগী শিক্ষা দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা হিসাবে সুনামের সহিত নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীনিয়োগী ১৯৩২ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার হালারা গ্রামের স্বর্গীয় রণদাপ্রসন্ন সেনের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো প্রফেসর এবং অর্থশাস্ত্র বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ জে, পি, নিয়োগী তাঁহার অগ্রজ।

শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ

[পোর্ট কমিশনের চেয়ারম্যান]

শুধুমাত্র কর্মদক্ষতা, নৈপুণ্য ও কর্মকুতিত্বই নয় সেই সঙ্গে উদার হৃদয়, সহকর্মীদের প্রতি পরম সহানুভূতি এবং দরদভরা মনোভাব যাঁহাদের সবিশেষ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে পোর্টকমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে এক বিশেষ জন। অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ সরকারী অফিসার হিসাবে তিনি যেরূপ বিপুল প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন তেমনই দরদী উদার এবং হৃদয়বান হিসাবে তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সদালাপী নিরহঙ্কার পরোপকারব্রতী মানুষটি একজন প্রকৃত বিচক্ষণ কর্মীপুরুষ হিসাবে সরকারী মহলে এক অসাধারণ সম্পদ।

শ্রীঘোষের পৈত্রিক বাসভূমি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হইলেও তথাকার সহিত তাঁহার সংযোগ বিশেষ ছিল না। শ্রীঘোষের পিতা স্বর্গীয় শ্রীনাথ ঘোষ মহাশয় বরিশাল জেলা বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন বলিয়া বরিশাল শহরেই তাঁহার বাল্যের শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। শ্রীঘোষ ১৯২১ সালে বরিশাল বি, এম, স্কুল হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া শ্রীঘোষ কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এস, সি ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে কৃতিত্বের সহিত আই, এস, সি পাশ করিয়া রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি, এস, সি ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯২৫ সালে রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি, এস, ডিগ্রি লাভ করেন।

বি, এস সি 'ডিগ্রি লাভ করিবার পর শ্রীঘোষ রসায়ন শাস্ত্রে এম, এস, সি ক্লাশে যোগদান করেন এবং ১৯২৭ সালে প্রথম শ্রেণীতে রসায়ন শাস্ত্রে এম, এস, সি ডিগ্রি লাভ করেন। এম, এস, সি পাশ করিবার পর বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কিছুটা গবেষণার কার্যে রত থাকেন। গবেষণা কার্যে রত থাকাকালীন যে কোন কারণেই হোক সরকারী প্রশাসনিক চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে মনস্থ করেন এবং ১৯২৯ সালে ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টস সার্ভিসেস পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং অতীব সাফল্যের সহিত সর্বভারতীয় প্রার্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন। ১৯৩০ সালে শ্রীঘোষ ভারতীয় অডিট এণ্ড একাউণ্টস সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন অফিসের উচ্চ পদে যোগ্যতার সহিত প্রশাসনিক কার্য চালাইয়া শ্রীঘোষ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকেন। দিল্লীতে কিছুদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দপ্তরের সচিব পদে নিযুক্ত থাকিবার পর তিনি খাদ্যমন্ত্রী দপ্তরে ঐ একই পদে নিযুক্ত হন।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শ্রীঘোষের যোগ্যতা সরকারী এবং বেসরকারী মহলে এমন ভাবে সুপরিচিত যে যখনই কোন বিভাগে প্রশাসনিক ব্যাপারে যোগ্যতার অভাব দেখা দিয়াছে তখনই তাঁহাকে সেখানে পরম সমাদরে আহ্বান জানানো হইয়াছে। দিল্লীতে খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী পদে বহাল থাকাকালীন শ্রীঘোষের প্রশাসনিক ক্ষমতা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিপুল প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। বেশ কিছুদিন খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারীর পদে বহাল থাকার পর ১৯৬২ সালে শ্রীঘোষ সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও শ্রীঘোষ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এমন সুনাম ও খ্যাতির ছাপ রাখিয়াছেন যে, তাঁহার মত সুদক্ষ ও অক্লান্ত কর্মবীরের কর্মজীবন হইতে অবসর লইবার প্রকৃত সময় আজ পর্যন্ত আসে নাই।

শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ

শ্রীঘোষের অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্সে চেয়ারম্যান পদের জন্য একজন বিশেষ দক্ষ এবং উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় ভারত সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অবসর প্রাপ্ত যোগ্যতম অফিসার শ্রীঘোষের প্রতিই পোর্টকমিশনের দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া তাঁহাকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিয়া কলিকাতায় পাঠান। তদবধি শ্রীঘোষ কলিকাতার পোর্টকমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবেই নিযুক্ত আছেন। পোর্টকমিশনে যোগদান করিয়াই পোর্টকমিশনার্স পাইলট ধর্মঘটে শ্রীঘোষ তাঁহার সুনিপুণ হস্তক্ষেপে এক বিশৃঙ্খলার কবল হইতে পোর্টকমিশনার্সকে যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা প্রশাসনিক ব্যবস্থার ইতিহাসে বহুকাল লিপিবদ্ধ থাকিবে।

ডক্টর সত্যেশ্বর ঘোষ।

[জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ফ্যাকালটীর ডীন]

শিক্ষাদীক্ষা, আলাপ-আলোচনা এবং আচার-ব্যবহার-এ যথার্থ-ই মুগ্ধ হইতে হয়—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব এবং জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রধান অধ্যাপক (রসায়নশাস্ত্র) ডক্টর শ্রীসত্যেশ্বর ঘোষের সহিত সাক্ষাতে।

১৯০১ সালের ২০শে জুলাই ঢোলপুর সহরে (রাজস্থান) সত্যেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দেড় মাস বয়সে পিতা ঢোলপুর দেশীয় রাজ্যের তদানীন্তন অন্যতম মন্ত্রী স্বর্গত যাদবচন্দ্র ঘোষকে চিরকালের জন্য হারান। জননী পরলোকগতা শিবরাণী দেবী চার পুত্রকে লালনপালনের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খ্যাত প্রবাসী বাঙ্গালী রায়বাহাদুর স্বর্গীয় যদুনাথ হালদারের কন্যা। ঘোষ পরিবার স্বগ্রাম আমড়াডাঙ্গা (বারাসাত মহকুমা) হইতে ১৭৯৩ সালে এলাহাবাদ সহরে আগমন করেন ও বসতি স্থাপন করেন।

সত্যেশ্বরবাবু ১৯১৭ সালে এলাহাবাদ এ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুল হইতে শিক্ষা এবং স্থানীয় মুইর কলেজ হইতে আই-এস-সি, বি-এস-সি ১৯২৩ সালে এম-এস-সি পরীক্ষাগুলি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। বি-এস-সি পাশ করিবার পর তিনি ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছিলেন কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর শ্রীনীলরতন ধরের অন্যতম প্রিয় ছাত্র হওয়ায় শ্রী ঘোষ বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯২৫ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেক্‌চারার নিযুক্ত হন এবং পর বৎসর ডি-এস-সি উপাধিতে ভূষিত হন। বিদেশে অধ্যয়নের সুযোগ আসা সত্ত্বেও স্নেহময়ী জননীর জন্য তিনি উহা গ্রহণে অসমর্থ হন।

ডক্টর নীলরতন ধর অবসর গ্রহণ করিলে ডক্টর ঘোষকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞান ফ্যাকালটীর ডীন হিসাবে মনোনীত করা হয়।

১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে ডক্টর ঘোষ তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একই আসনে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করা হয়।

খেলাধূলায় বরাবর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ থাকায়, তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া-এসোসিয়েশন এবং উত্তরপ্রদেশ স্পোর্টস্ কনট্রোল বোর্ডের দায়িত্বপূর্ণ পদে বহুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি রসায়ন বিভাগের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৯-৬১ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট এবং ১৯৬০-৬২ সালে জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমীর যথাক্রমে সহ-সভাপতি ও সভাপতি ছিলেন।

রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তল্লিখিত পুস্তক ও চিন্তামূলক রচনাদি ভারতবর্ষে ও বিদেশে বহুল পরিমাণে সমাদৃত হইয়াছে। ডঃ ঘোষ বর্ত্তমানে গবেষণায় লিপ্ত রহিয়াছেন। শ্রীমতী প্রণতি ঘোষের সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। তাঁহার জীবন গঠনে স্বীয় জননীর অপরিসীম প্রভাব তিনি সর্ব্বদা স্মরণে রাখেন।

ডাক্তার শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন

সরকারী চাকুরী করেছেন—স্বদেশী-আন্দোলনের সময় পদত্যাগ করেছেন—প্লেগ-আক্রান্ত এলাকায় দিনের পর দিন রোগ দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছেন—সক্রিয় রাজনীতিতে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন—প্রয়োজনবোধে বিদেশী শাসকদের উপস্থিতিতে ইংরেজ শাসনের তীব্র-সমলোচনা করেছেন আবার ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনে অসুস্থ সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে সযত্ন সেবা করে কিছুটা নিরাময় করতে সমর্থ হয়েছেন—যে সমাজসেবী ও জনদরদী ব্যক্তি—তিনি হলেন জব্বলপুর নিবাসী প্রবাসী বাঙালী সমাজের অশেষ জনপ্রিয় বঙ্গসন্তান স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন।

৺উপেন্দ্রনাথ সেন ও ৺নিরুপমা সেনের মধ্যম পুত্র বিনয়রঞ্জন ১৮৯৫ সালের ১৭ই মার্চ্চ জব্বলপুর সহরে ভূমিষ্ঠ হন। ১৯১১ সালে নাগপুর পটবর্দ্ধন উচ্চবিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা, স্থানীয় হিস্লপ কলেজ হইতে আই· এস· সি·, এবং ১৯১৮ সালে লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম· বি· বি· এস-এ উত্তীর্ণ হন। ছাত্র-জীবনে তিনি বরাবর খেলাধূলা করিয়াছেন।

ডাক্তার সেন মধ্য প্রদেশ মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদানের পর হোসঙ্গাবাদ জেল ও পুলিশ হাসপাতালে ও পরে নাগপুর সেণ্ট্রাল জেলের চীফ মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হন। ইহার পর স্বাস্থ্যবিভাগের পক্ষ হইতে সিওনী, ছিন্দওয়ারা, অমরাবতী ইত্যাদি স্থানে সংক্রামক-জ্বর দূরীকরণের জন্য তিনি প্রেরিত হন। বহুলোকের মৃত্যু হওয়ায় তিনি উক্ত ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা করেন ও কসৌলী গবেষণাগার হইতে ডঃ সেনের নির্দ্ধারণ অনুমোদিত হয়। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের স্বরূপ বুঝিয়া তিনি চাকুরি হইতে পদত্যাগ করিয়া জব্বলপুরে ফিরিয়া আসেন। সেই সময় তথায় প্লেগ দেখা দেওয়ায় তিনি স্বরাজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু রোগীর চিকিৎসা করেন। স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠান তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অর্থ দিতে চাহিলে তিনি মানবসেবার জন্য উহা গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ইহার পর তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকেন।

তিনি ১৯২৮ সালে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে অবৈতনিক চিকিৎসক এবং রিফরমেটরী স্কুল ও এলগিন হাসপাতাল কমিটীর অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৩০-৪০ সাল পর্য্যন্ত সি, পি, মেডিক্যাল পরীক্ষা সংসদের ও ১৯৩৭-৪২ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য, ১৯২২-৩১ পর্য্যন্ত হাইস্কুল এডুকেশান বোর্ডের ও ১৯৩৬-৩৯ সালে স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচিত মেম্বারছিলেন। ১৯৪০ সালে জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্ট গঠিত হইবার জন্য আহূত সভায় গভর্ণরের উপস্থিতিতে ডঃ সেন কংগ্রেস-পক্ষ হইতে উহার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি জব্বলপুর মেডিক্যাল এসোশিয়েশন ও রোটারী ক্লাবের অন্যতম সংগঠক। বিশিষ্ট প্রবক্তা হিসাবে তাঁহার নাম শুনা যায়। বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানও এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৯ সালে জব্বলপুরের অনতিদূরে আহূত ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। ফলে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতিকে সভার অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ জানান হয়। কিন্তু উক্ত সমিতি জানান যে উহা অপরিবর্ত্তনীয়। সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসক হিসাবে ডাক্তার সেন জানান, "The constitution of the congress is man-made which can be changed but ideal with a constitution which is beyond men. Any false step will be regretted." ইহার পর অন্যান্য সদস্যরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া একদিনের জন্য অধিবেশন মুলতুবী রাখেন। হাসপাতালে প্রেরণের কথা উঠিলে অসুস্থদেহী সুভাষচন্দ্র তীব্র আপত্তি করেন।

২৪ পরগণার আড়বেলিয়া গ্রামের শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সহিত ডঃ সেন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীবিবেকরঞ্জন সেন তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা।

দ্বিতীয় আকাশ

স্বামীজীকে নিবেদিত)

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

যখনই অন্ধকার ঘন হয়, সাধকের মন
যোগভ্রষ্ট, ধরাতল ছেয়ে নামে চতুর কুয়াশা
ভয়াল ভ্রান্তির মত, আজন্মলালিত সব আশা
ভীষণ অলীক লাগে, প্রেম প্রীতি ভোলায়, তখন
অন্য আকাশের কোলে ছোট হয়ে আসা মন ভাসে—
বিবেকের বিশাল আকাশে।

হৃদয়ের দ্বারগুলি যখন রুদ্ধ সব, রণ—
পিপাসু জিঘাংসায় কালো হয় আত্মীয়ের বুক,
ক্রন্দনের রোল তোলে বাতাসেরা, সারি সারি মুখ
বড়োই অচেনা লাগে, নিজেকেও চিনি না, তখন
অন্য আকাশের কোলে ম্লান হয়ে আসা মন ভাসে—
আনন্দের অমল আকাশে।

ঘোর দুর্দিনেও জানি থাকবেই স্থির ও আকাশ
হেলায় পেরিয়ে যাবে ও আলোর সব সর্বনাশ।

ক্ষণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

স্যার সি, ভি ও লেডি রামণ

বিশ্বের বৈজ্ঞানিক জগতে আলোড়ন,—ভারতীয় চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামণ করেছেন বিজ্ঞানের এক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার। আকাশের নীলিমা ও সমুদ্রের নীলিমার সঠিক কারণটি এতদিন বৈজ্ঞানিকেরা অনেক মাথা ঘামিয়েও ঠিক বুঝতে পারেননি, এবারে ভারতের পণ্ডিত দিয়েছেন এর যথাযথ ব্যাখ্যা, গবেষণাগারে আলোর বিকিরণ পরীক্ষা করে এবং জটিল অঙ্ক-শাস্ত্রের মাধ্যমে, যার ভিতরে নেই গোঁজামিলের স্থান।

এই প্রণালী এবং আরও একটি তথ্য,—যা দিয়ে পদার্থের অণু-পরমাণুর ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়, বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করে। ইহাই রামণ-এফেক্ট নামে বৈজ্ঞানিক জগতে হয় প্রসিদ্ধ। নোবেল প্রাইজ দিয়ে তাঁকে করা হয় মহা সম্মানিত।

নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করতে তিনি যাবেন সুইডেনে, সেই বিদেশ যাত্রার পথে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে গেলেন আমাদের বম্বের আবাসে। সঙ্গে তাঁর জীবন-সঙ্গিনী লেডি রামণ। লেডি রামণ মাদ্রাজী হলেও বহুকাল কলকাতায় থেকে বাংলা শিখেছেন চমৎকার, খুব আলাপী, সদয়-হৃদয়া, বুদ্ধিমতী মহিলা। দেশে দুটি শিশুপুত্র ভগ্নীর তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছেন, তাদের জন্য সর্বক্ষণ চিন্তিত।

আমি বলি, তাহলে আপনি যাচ্ছেন কেন? না গেলেই ত' ভাল হত। তিনি বলেন, অধ্যাপকটি যা উত্তেজিত অবস্থায় আছেন, আমি না গেলে তাঁকে সামলাবে কে? মায়ের প্রাণ, পূর্ব্বেই করেছিল সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কা; পরে শুনি, তাঁদের অবর্ত্তমানে বছর পাঁচেকের ছোট পুত্রটির হয় টাইফয়েড জ্বর, ও তাতে তার একখানা পা হয়ে যায় ঈষদ্ বক্র, ফলে জন্মের মত খুঁড়িয়ে চলা। জানি না উত্তর জীবনে তার এ দোষ সংশোধন হয়েছিল কি না!

তাঁদের আহার নিদ্রার যতটা সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব আমাদের দ্বারা, তাই করি। স্যার সি, ভি, ভয়ানক খুসী, অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন, খাওয়া দাওয়ার সময় অত্যন্ত অন্যমনস্ক; এত বেশী খেয়ে যাচ্ছেন যে, লেডি রামণকে পদে পদে সাবধান করে দিতে হচ্ছে।

রাত্রে নীচের তলার অতিথি-কামরায় তাঁরা শয্যা গ্রহণ করলেন, আমরা উপরতলার শোবার ঘরে শুতে গেলাম। হঠাৎ শেষ রাত্রির দিকে শুনি এক বিকট আওয়াজ! কোন্ দিক থেকে আওয়াজ আসছে তা বুঝতে পারি না। নানা কল্পনা জল্পনায় হয় রাত্রি ভোর।

প্রাতরাশের সময় সকলে একত্র হয়েছি; আমি বলি, কাল রাত্রে এক অতি অদ্ভুত আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিসের আওয়াজ কিছুই বুঝতে পারি না, আপনারা শুনেছেন কিছু? লেডি রামণ একবার স্যার সি, ভির দিকে তাকিয়ে বলেন, ইনিই রাত্রে ও রকম আওয়াজ করেন। আমায় যে রাত-ভোর কত সতর্ক থাকতে হয়, তা বলতে পারি না। কী যে স্বপ্ন দেখেন জানি না, ঘুমের মধ্যে উঠে টলতে টলতে ঘুরে বেড়ান, ঐ জন্য ওঁকে খাটে শুতে দিতে ভয় হয়। তোমার খাটের ওপরে অত সুন্দর করে পাতা বিছানা দেখ গিয়ে, সব নীচে নামিয়ে ফেলেছি।

অবাক হয়ে স্যার সি, ভি কে জিজ্ঞাসা করি, কেন আপনার এমন হয়? এর কি কোন প্রতিকার নেই?
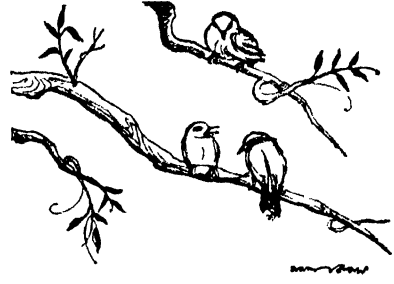
তিনি বলেন, জানি না, রোজ হয় না, মাঝে মাঝে এক একদিন হয়, তখন আমার মনে হয়, কেউ যেন বুকের ওপর বসে গলা টিপে ধরেছে, ছাড়াতে চাই, ছাড়াতে পারি না, দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসে, তখন যদি কেউ ঝাঁকানি দিয়ে ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দেয়, তবেই রক্ষা, তা নাহলে কতক্ষণ যে ও রকম চীৎকার করি তার ঠিক নেই।

এবারে বেশ বোঝা গেল, লেডি রামণ কেন এত অসুবিধা সহ্য করেও স্বামীর সহগামিনী হয়েছেন। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের রাত্রের কষ্টদায়ক স্বপ্নের কথা শুনে দুঃখে মরি! রাত্রে ইনি অসহায়, কিন্তু দিনে যখন তাঁর নিজস্ব বিষয়ে বক্তৃতা দেন, তখন কী মানসিক শক্তি, তারিফ না করে এমন মানুষ নেই। সকালের খবরের কাগজ একের পর এক আসতে লাগল, বম্বের 'টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া', 'বম্বে ক্রনিক্‌ল্', 'বোম্বাই-সমাচার', দেশী বিলিতি প্রত্যেক কাগজের প্রথম পাতায় স্যার সি, ভির কথা ও তাঁর ছবি। সঙ্কোচের সঙ্গে বলি, 'রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, এতগুলো খবরের কাগজ দেখবেন কি? সব কাগজেই আপনার কথা, আপনার ছবি।'

তিনি বলেন, নিশ্চয়ই দেখব, রোজ ত আর মানুষে নোবেল প্রাইজ পায় না—এগুলো ত দেখবই, আরও যদি কিছু কাগজ থাকে, তবে তাও আনতে দাও।

কী উৎসাহ; কী আগ্রহ, কথা বলেন আর চোখ দুটো যেন জলতে

আমাদের মাণিক

অপরাজেয় কথা-শিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য জগতে আজ আর অপরিচিত নয়। তার বাল্যকালের কয়েকটি টুকরো কথা।

জীবনের প্রথম ভাগে বঙ্গে প্রবাসের ঠিক আগে, কিছুদিনের জন্য আমি ছিলাম টাঙ্গাইলের শ্বশুর-গৃহে, মাণিক ও পিঠেপিঠি আরও তিনটি দেবর তখন স্কুল-গামী বালক। অল্প বয়স থেকেই মাণিক ছিল ভাবপ্রবণ; বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে তখন দেখি তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, মাথার চুল এলোমেলো, খাওয়া-পরায় মন নেই, সমস্তক্ষণই যেন কি এক ভাবে মগ্ন।

বাঁশী বাজাত চমৎকার, গলায় সুরও ছিল, মাঝে মাঝে গাইত প্রাণ-খোলা গান। বাঁশীটি হাতে নিয়ে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ানোতে ছিল তার মহা আনন্দ। স্কুলের পড়ায় মন নেই, ছুটী হলে কি হয়, বাঁধাধরা পড়া তার ভাল লাগত না। তবে বাড়ীতে থাকলে সমস্তক্ষণ খাতা ভরে কি সব লিখে যেত, অক্ষরগুলো এত ছোট যে আমরা কখনও চেষ্টা করিনি, এত যে কি লেখে, তা পড়ে দেখার। টাঙ্গাইল সহরটি নদীর ধারে, বর্ষাকালে ছোট নদী কাণায় কাণায় ভরে ওঠে; দেশ-বিদেশ থেকে পণ্য বোঝাই নৌকা এসে ভিড় করে নদীর ঘাটে। তখন আর মাণিককে পায় কে? সারাদিন মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, নৌ-চালনা, বিভিন্ন দেশের মানুষের বিচিত্র কলরব, তাকে আহার নিদ্রা দিত ভুলিয়ে। পরে মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, শুনেছি, দুদিন মাণিকের দেখা নেই, বাড়ীর লোক ভেবে অস্থির, সে কোন নৌকার ভিতরে লুকিয়ে বসে মাঝিদের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে। মনে হয় এই নৌকা-প্রীতিই দিয়েছিল, অনেক পরে তার 'পদ্মা নদীর মাঝি' লেখার প্রেরণা।

ছোট বাচ্চাদের সে ভালবাসত ভীষণ ভাবে। পাঁচ ছ'মাসের একটি শিশু আমার কোলে, তাকে নিয়ে যে কত ভাবে আদর করবে তা ভেবে পেত না। বৌদি বলতেও ছিল অজ্ঞান; বৌদির রান্না ভাল, সেলাই ভাল, সব কাজ ভাল, এ নিয়ে অন্যের সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়াই করতে থাকত সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কার্য্যগতিকে আমরা যখন বঙ্গে-প্রবাসী হয়ে পড়ি, অভিমান ভরা সুরে এক একখানা চিঠি আমাকে লিখত, সাত পাতা দশ পাতা। কি যে লিখত ইনিয়ে-বিনিয়ে তার অর্থ তখন বুঝতে না পারলেও পরে বুঝেছি, তার কিশোর মনের অভিমান সোজা ভাবে না বলে, পরোক্ষে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার অবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করে যেত পাতার পর পাতা ভরে।

আমি বঙ্গে আসার পর প্রায় সমবয়সী চারটি দেবরের ছেলেমানুষী কাণ্ডের কথা শুনে হই হতবুদ্ধি! ৺কালী পূজা সমাগত, ছেলেরা আশ-মিটিয়ে বাজী পোড়াবে, সেজন্য মা বাবার কাছে করেছে কিছু অর্থ-সংগ্রহ। হঠাৎ মনে হল, নিজেরা যদি তুবড়ি তৈরী করে নিই, তা হলে ত এই পয়সায় পাই দ্বিগুণ অথবা ত্রিগুণ। জানি না বুদ্ধিটা মাণিকেরই উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছিল কিনা। যেমন ভাব। তেমনি কাজ!

গোপনে গোপনে লেগে গেল সব মাল-মসলা সংগ্রহে। বোতলে বোতলে সজ্জিত হয় সব মসলাগুলি। চার ভাই গোল হয়ে বসে তার বোতলে আবদ্ধ রূপ দেখেই হয় বিমোহিত! আর কল্পনার উত্তেজনায় ফেটে পড়ে।

একদিন রাত্রে আহারাদির পর উঠানে তাদের সব বোতল-বন্দী সম্পত্তি ঘিরে চারজন নানা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত। আহারান্তে শ্বশুর মহাশয় শয্যার আশ্রয় নিয়েছেন, শ্বশ্রূমাতা রান্নাঘরে লণ্ঠনের আলোয় আহারে রত, এমন সময় ওদের উত্তেজনা ওঠে চরমে। একজন বলে, 'তুবড়ি যা হবে, দেখলে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।' অপর জন বলে, 'কিচ্ছু হবে না, বারুদ ভিজে থাকলে দেখবি মোটে জ্বলবেই না।'

সকলের ছোটটি এত বাদানুবাদে বিরক্ত হয়ে ত্বরিত গতিতে একটি দেশলাই যোগাড় করে বারুদের আর্দ্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার উদ্দেশ্যে পেট-মোটা বিরাট আকারের বোতলটির মুখে আলতো ভাবে করে অগ্নি-সংযোগ! ব্যাস্, একটি কামান দাগার শব্দ, ঘরে ঘরে বাড়ীর সবগুলো লণ্ঠন এক সঙ্গে নির্ব্বাপিত, মায়ের চীৎকার, ও মাণিক, ও নালু, কী করলি তোরা, আলো কেন নিভে গেল? আর মাণিক নালু,—তারা তখন নির্ব্বাক্ প্রস্তরীভূত!

আধ ঘণ্টা চেঁচামেচি,—আলো আন, দেশলাই আন প্রভৃতি গণ্ডগোলের মধ্যে হল আলো জ্বালানো। ততক্ষণে আশেপাশের পাড়া-প্রতিবেশীরাও এসে 'কী হল? কী হল?' করে ভিড় জমিয়েছে। আলো নিয়ে দেখা গেল বীভৎস দৃশ্য! উঠানে রক্তের ঢেউ,—তার মধ্যে চারটি ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে,—চারিদিকে শুধু কাঁচের গুঁড়ো।

'জল আন! ডাক্তার আন!' করে সেই রাত্রে মফস্বল সহরের ডাক্তার এনে যখন হাজির করা হল, তখনও ওদের শরীর থেকে হচ্ছে প্রচুর রক্তপাত! হাতে পায়ে ঢুকেছে অজস্র কাঁচের টুকরো। সমস্ত রাত ধরে চলল ছুরী চালনা করে দেহ থেকে সব কাঁচ নিষ্কাশন পর্ব্ব। কোথায় বাজী পোড়াবার আনন্দ, না তার বদলে গভীর নিরানন্দে তিন মাস ধরে অতি যত্নে, অতি কষ্টে, শ্বশ্রূমাতা তাঁর চারটি সন্তানকে ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে অগ্রসর করেন!

ভগবান যেন হাতে ধরে দিয়ে যান প্রাণ দান। এতগুলো কাঁচ শরীরে বিদ্ধ হল, কিন্তু সবই হাতে পায়ে। চোখে, মুখে, বুকে, পেটে, একটি কাঁচ ঢুকলেও কি আর রক্ষা ছিল? কে যে ওদের এমন বিপদে এভাবে রক্ষা করলেন, তা যেন এক অলৌকিক ব্যাপার!

অনেকদিন পর, একবার কলকাতায় এসে দেখি তখনও দু' এক কুচি কাঁচ কণা বেঁধে আছে মাণিকের পায়ে, তবে তাতে অসুবিধা হয় না কিছু। সেবার মাণিক বি, এস্‌, সির ছাত্র,—আমার ছেলে দুটি স্কুল-গামী। মাণিকের ছোট ঘরটিতে দুই ভাইপোকে দুপাশে শুইয়ে এমন গল্প মুখে মুখে বানিয়ে বলত যে, ওদের স্নানাহার বন্ধ হবার যোগাড়! তখনও মাণিক গল্প লেখা আরম্ভ করে নি, কিন্তু বানিয়ে গল্প বলার ও মানুষকে মুগ্ধ করার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ওর দেখেছি।

আবার যখন বহুদিনের ব্যবধানে কলকাতায় এলাম, মাণিক তখন কিছু কিছু লেখে। একদিন এসে বলে,—বৌদি, একটা সরকারী চাকুরী পাচ্ছি, নেব কি? প্রায় সাতশো টাকা মাইনে, পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টে।

বলি, এক্ষুণি নিয়ে নাও, এমন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে চিরকালই কি বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াবে ? এবার কাজ কর্ম্ম নিয়ে স্থিতি হও। আমরাও নিশ্চিন্ত হই !

মাথা চুলকে সে বলে,—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

ছুদিন বাদে এসে বলে,—না বৌদি, ও দশটা-পাঁচটা সরকারী চাকুরী আমাকে দিয়ে হবে না,—নিয়ে কি করব ? ছুদিন বাদেই আবার ছেড়ে দিতে হবে, তার চেয়ে না নেওয়াই ভালো।

অবাক হই বিস্ময়ে, এ বলে কী ? নিজের ভাল—টাকার মর্ম্ম যে পৃথিবীতে সকলেই বুঝে,—এ কী জগৎ-ছাড়া ?

নেয়নি সে চাকুরী, জগৎ-ছাড়া, ছন্ন-ছাড়া মানুষটি সমস্ত জীবন অসহ্য দারিদ্র্য বরণ করে, নিজের রক্ত, নিজের প্রাণ শক্তি নিংড়ে নিংড়ে, দেশবাসীর জন্ত রেখে গেছে এক বোবা কালীর আঁচড় !

তার দাদা বম্বে থেকে শাসন করে চিঠি দিতেন,—মন দিয়ে পড়াশোনা করো, পরীক্ষার ভাল ভাবে পাশ করো, আজে-বাজে লেখাগুলো সব ছেড়ে দাও।

সে জবাব দিত,—লেখা আমি ছাড়ব কী করে ? লেখা যে আমার প্রাণ,—দেখবেন, এই লেখা দিয়েই ভবিষ্যতে আমি সাহিত্য-জগতের শীর্ষ স্থানে স্থান করে নেব।

তার সে আশা কি সফল হয়েছে ? দেশবাসী করুন তার বিচার !

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে স্বল্প কয়েক দিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে বোম্বাই-প্রবাসে। ঐ কদিনেই তাঁর ভিতরে এত সদ্গুণের বিকাশ দেখি যে আজ চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানেও সে স্মৃতি মনের পাতে নূতনের মত অম্লান !

তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, পরোপকারিতা, স্বদেশপ্রেম, সেদিনের পরাধীন, ব্যবসা-বিমুখ, স্বজাতিকে স্বাধীন-ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার প্রেরণা দান, দেশের শিক্ষিত যুব-সমাজকে স্বাদেশিকতা ও আর্ত্ত-সেবায় উদ্বুদ্ধ করা প্রভৃতির পরিচয় দিতে যাওয়া অনধিকার-চর্চ্চা হলেও, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের বাহুল্য-বর্জ্জিত অতি সাধারণ থাকা খাওয়া, সদানন্দ ভাব, অল্পে সন্তুষ্টি, অসাধারণ কর্ম্ম-ব্যস্ত মানুষটিরও সাহিত্যানুরাগ দেখে হই মুগ্ধ, বিস্মিত।

সমস্ত দিন করেন নানা ধরণের অসংখ্য কাজ, রাত্রে বিছানায় শুয়ে, পড়েন রবীন্দ্র-কাব্য। বয়স তখন ষাটের উপরে, কিন্তু স্মৃতি-শক্তি অতি তীক্ষ্ণ, কবিতার পর কবিতা আমাদের আবৃত্তি করে শোনান। বলেন, আজকের ছেলে-মেয়েদের মুখের বুলি, 'সময় পাই না' কিন্তু আমি বলি, ইচ্ছা থাকলে কখনও কোন কাজের জন্ত সময়ের অভাব হয় না।

তিনি ছিলেন আহার-বিহার-বসন-ভূষণ সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী জিনিষের ভয়ানক পক্ষপাতী, যদিও বিলেত ঘুরে এসেছেন কতবার। প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ীতে এলেন, সময়টা ছিল বৈকালিক চা-পানের সময়। খবর না দিয়ে আকস্মিক আগমন,—আমরা সকলে খাবার ঘরে,—একেবারে আচমকা সেখানে হয় মহাপুরুষের আবির্ভাব !

স্বামী কেক-বিস্কুট অপেক্ষা চিঁড়ে-মুড়ির বেশী পক্ষপাতী, সেজন্ত কাঁচ-পাত্রে সব সময়ই থাকে, ঘি দি, চিঁড়ে ভাজা। আহার স্থানে এসে সেই পাত্রটিই করে তাঁকে সমধিক উচ্ছ্বসিত। মুখে শিশুর মত বাহা-বাহা শব্দ; বলেন, বম্বের মত সাহেবীয়ানা ও এটিকেট-দুরস্ত স্থানে তোমাদের টেবিলে স্বদেশী চিঁড়ে ভাজা দেখে যে কী খুসী লাগছে তা বলতে পারি না। সঙ্কুচিত ভাবে দিলাম তাঁকে দুটি সামান্ত চিঁড়ে-ভাজা ও এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।

হেসে বলেন, এ সময় ত আমি কিছুই খাই না, এমন সুন্দর যত্নে তৈরী জিনিষ দিয়েছ, সঙ্গে করে নিয়ে যাব ও রাত্রে খাবার সময়ে খাব, কাগজে মুড়ে দাও।

সেবার তিনি বম্বের এক লক্ষপতির বাড়ীতে মাননীয় অতিথি। পকেটে করে একটুখানি চিঁড়ে ভাজা নিয়ে গিয়ে নৈশাহারে সেখানে খাবেন,—বলেন কী ? লজ্জায় সঙ্কোচে মরে যাই, কিন্তু উপায় নেই, মুখ ফুটে বলেছেন, অবাধ্য হওয়া অসম্ভব; তিনি কিন্তু নির্ব্বিকার হাসিমুখে কাগজের মোড়কটি পকেটে রাখলেন !

তারপর আরও দু'-চারবার বম্বে এসে আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন কিছুদিন করে। প্রথমবার এসে বাড়ীর তিন দিকে সমুদ্র, অতি নির্জ্জন, গম্ভীর, প্রশান্ত ভাব দেখে, দোতলায় তাঁর জন্ত প্রস্তুত শয়নকক্ষে গিয়ে খুসীতে যেন উপচে পড়ে বলেন,—জান বৌমা, সাজাহান বাদশা যেমন দেওয়ান-ই-খাসে লিখে রেখে গেছেন, 'পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তবে এই সেই স্থান,' আমারও আজ এখানে দাঁড়িয়ে সেই কথাটিই বলতে ইচ্ছা করছে।

একদিন স্নান করে কাপড়খানা সাবান দিয়ে কেচে এনে খুলে দেখালেন, দেখ ত বৌমা, কাপড়খানা কি রকম পরিষ্কার হল ? আমি বিস্ময়ে হতবাক ! ষাট পঁয়ষট্টি বৎসরের ক্ষীণ-জীবী বৃদ্ধ—দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও নিজের কাপড় করেন সাবান-কাচা, তাও [illegible]রের পাঁচ সেরি ওজনের ধুতি ! অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করাতে, তিনি বলেন,—'তাতে হয়েছে কী ! আমি ত সর্ব্বদাই নিজের কাপড় নিজে কাচি। ও ত আমার ভালই লাগে।'

অকৃতদার, ছোট খাট, পেটরোগা মানুষটির ঝাল-মসলা বাজে আহার অতি সামান্ত; ঐ সামান্ত আহার্য্য থেকে কি করে পেতেন অত কর্ম্ম-ক্ষমতা,—নানা বিষয়ে অত মস্তিষ্ক-চালনশক্তি—সে এক পরম বিস্ময় ! একদিন বলেন, জান বৌমা, ভারতবর্ষের যেখানেই যাই, সেইখানেই আছে আমার ছেলে আর বৌমা ! বাঙ্গালোরে ঠিক তোমার মতই আছেন আর একটি বৌমা। এই বৌমারা আমায় এমন যত্ন করেন যে, নিজের পুত্রবধূরা এতটা করেন কিনা সন্দেহ ! কী প্রাণ খোলা সরল উক্তি, শুনি আর মুগ্ধ হই ! এরই নাম কি 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' -

একদিন বিকালে ফল ছাড়িয়ে দিচ্ছিলাম,—বসলেন এসে কাছটিতে, বলতে লাগলেন তাঁর সায়েন্স কলেজের ঘর-গৃহস্থালীর কথা। বললেন,—"ওখানে ইকমিক কুকারে নিজের হাতে রেঁধে খাই। মাছ মাংস জোটে না,—মাঝে মাঝে একপো-আধপো আঙুর বেদানা কিনি; তার দু' একটা খেয়ে বাকীটা পরে খাব বলে কৃপণের ধনের মত রেখে দিই, তারপর হয়ত দেখি সবগুলিই গেছে পচে,—কাজেই ফলও বিশেষ কপালে জোটে না।" বলেই শিশুর মত প্রাণখোলা হাসি ! ভাবি,—যিনি মাসে উপার্জ্জন করেন হাজার হাজার টাকা, দরিদ্র-ছাত্র-বন্ধু হয়ে গোপনে [illegible]

টাকা,—তিনি আহার করেন স্বপাক ভাতে-ভাত, পরিধান খদ্দর, একটু ভাল-মন্দ ফল-দুধও জোটে না তাঁর। ব্যথায় মন ভরে যায়।

যাবার সময় বার বার নিমন্ত্রণ করে যান, কলকাতায় গেলে, সায়েন্স কলেজে গিয়ে তাঁর গৃহস্থালী দেখে আসার। ঘরের তৈরী খাবার খেয়ে উজ্জ্বল মুখে বাহা-বাহা শব্দ করে এত আনন্দিত হচ্ছেন যে, খুব ইচ্ছা ছিল, একবার নানারকম খাবার করে দিয়ে আসব গিয়ে সায়েন্স কলেজে, আর তারই সঙ্গে দেখে আসব তাঁর বৃদ্ধ বয়সের অপটু হস্তের গৃহস্থালী,—কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই রইল, তিনি চলে গেলেন, সাধনোচিত ধামে।

ডঃ মেঘনাদ সাহা

পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা। স্বামীর পাঠ্যাবস্থার বন্ধু হওয়ায়, তাঁর সঙ্গে পরিচয় অনেক দিনের। যখনই তাঁকে দেখেছি, তখনই থাকতেন বৈজ্ঞানিক আলোচনায় নিযুক্ত, সাধারণ কথাবার্ত্তা তাঁর মুখে কমই শুনেছি। তাঁর কলকাতার বাড়ীতে গিয়ে দেখি তাঁর বিরাট লাইব্রেরী; দোতলার বড় ঘরটির চতুর্দ্দিকে ছাত পর্য্যন্ত উঁচু র‍্যাকে অগুনতি বই, এই বই রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন ডঃ সাহা। শুনি, ঐ ঘরটিই তাঁর দিবা রাত্রির আশ্রয় স্থান, সমস্ত রাত্রিই পড়েছেন, ঘুম পেলে পাশের ছোট খাটখানায় একটুখানি ঘুমিয়ে, আবার পড়তে আরম্ভ করেন।

তাঁর জ্ঞানের পরিধি শুধু গণিত-বিজ্ঞানেই আবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল জ্ঞান-বৃক্ষের শাখায়-প্রশাখায়। ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতি, সমস্ত বিষয়েই দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তাঁর ঐতিহাসিকতার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হই একবার দিল্লী-বাসকালে। আমাদের তদানীন্তন লোদী রোডের আবাসে আহারাদি করে, যাবার সময় স্কুল-গামী পুত্রটি বড় রাস্তায় এগিয়ে দিতে যায় পাশের লোদি-টুম্বের ভিতর দিয়ে সহজ রাস্তায়। যেতে যেতে পুত্রটিকে প্রশ্ন করেন, বলত খোকা, লোদীদের বিবরণ। ছেলেটির মাথা চুলকানো দেখে নিজেই আরম্ভ করেন, লোদী রাজত্বের বিবরণ। খৃষ্টাব্দ, সন, তারিখ, সমস্ত বিবরণ অনর্গল বলে যান, যেন পাঠের মুখস্থ পড়া। ছেলেটি তাঁর স্মরণ শক্তি, মেধা দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত।

একবার মাসিক পত্রিকার পাতায় তাঁর বাংলায় লেখা প্রবন্ধ পড়ে হই বিস্মিত। পদার্থ-বিদ্যার এতবড় গবেষক বৈজ্ঞানিক, পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের একজন,—ধর্ম্মশাস্ত্রের এক পণ্ডিতের সঙ্গে গীতার ব্যাখ্যা নিয়ে হয়েছিলেন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত। তাঁর জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধগুলিতে বোঝা যাচ্ছিল, এ বিষয়েও তাঁর পাণ্ডিত্য।

দেশ-বিভাগের পর শরণার্থীদের মুখপাত্র হয়ে সব সময় খবরের কাগজে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা লিখতেন, এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে লড়াই করতেও পিছপাও হতেন না।

পরিণত বয়সে তাঁর হয় 'হাই'-ব্লাড-প্রেসার' কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে রাজনীতি নিয়ে মেতে ওঠেন। সর্ব্বক্ষণ-ই দিল্লীতে আনাগোনা চলে। স্বামী সাবধান করতেন, 'অত ছুটাছুটি করবেন না এই বয়সে, [illegible] কলকাতায় স্থির হয়ে অবসর জীবন যাপন করুন এবার।' তিনি বলতেন, তা আমি পারব না; যতদিন বেঁচে থাকব, কাজ আমাকে করতেই হবে, এ আমার রক্তের সঙ্গে জড়িত, কাজের মধ্যেই ফেলব শেষ নিঃশ্বাস।

হলও তাই, কোন দরকারে দিল্লীতে গিয়েছেন একা, গন্তব্য সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, ফাইল বগলে ট্যাক্সি থেকে নেমে, ক্রম-উচ্চ রাস্তায় যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন,—উঠলেন না আর; রাস্তার মানুষ ছুটে এসে দেখে প্রাণ-হীন দেহ!

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সব কলকাতায়, সুস্থ মানুষ দিল্লীতে গেলেন দুদিনের জন্য, তাঁর বদলে তাঁর মৃত দেহ যখন কলকাতায় এলো, আত্মজনের তখনকার শোক অবর্ণনীয়!

ভিষক-শ্রেষ্ঠ বিধান রায়

কি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম, বিধান চন্দ্র রায়। কে করেছিলেন নামকরণ? তিনি কি বুঝেছিলেন—এই মানবক সমস্ত জীবন শুধু বিধান দেবেন? কি ডাক্তারী জগতে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তাঁর কি অসাধারণ পটুতা; দেহ ও দেশ তাঁর কাছে কি এক হয়ে গিয়েছিল? যেখানেই ভাঙ্গন, যেখানেই জীর্ণতা, যেখানেই অসুস্থতা, সেখানেই বসেছেন শক্ত হাতে হাল ধরে। যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে তীরে এসে তবে হাল ছেড়েছেন। 'যেখানে বিধান রায় অকৃতকার্য্য সেখানেই শেষ' একটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।

এমন মানুষটিকে দেখেছিলাম অল্প বয়সে। টাইফয়েডে ভুগে যখন কঙ্কালসার অবস্থা, তখন চিকিৎসার জন্য এলেন ডাঃ বিধান রায়। তাঁর দীর্ঘ, দৃঢ় আকৃতি দেখেই বাড়ীর লোক যেন আশার আলোক দেখতে পায়। তখন তিনি বাংলার সবচেয়ে বড় ডাক্তারদের মধ্যে অন্যতম, অসম্ভব ব্যস্ত, রোগীর ডাকে তাঁর নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হবার অবস্থা। দর্শনী অনেক,—কিন্তু তাতেও মানুষের আকুল আহ্বানের নেই বিরতি।

স্বামী তখনকার সায়েন্স কলেজের গণিতে 'স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রফেসর', বয়সে নবীন, জীবনের সবে আরম্ভ। এমনি দিনে দুজনেই এক সঙ্গে পড়ি টাইফয়েডের কবলে। মে মাস, গরমের ছুটি, ঘর ভরা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার খাতা, এমন সময়ে আকস্মিক টাইফয়েড দুজনের, শিশু-পুত্রটির বয়স তখন মাত্র দু-বৎসর।

বিনা কপর্দ্দকে বিধান রায় এসে দেখে গেলেন আমাদের। তাঁর বিধানে দুজনেই একটু ভাল হলেও, আমার রোগটি হঠাৎ ধরে বাঁকা পথ। পর পর ক'দিনই এলেন, চালাতে লাগলেন রোগ-বীজাণুর সঙ্গে শক্ত যুদ্ধ। কে হারে কে জেতে করতে করতে এক রাত্রে এলো চরমক্ষণ; বোধহয় আমার দেহের বীজাণুরই হবে জিত কিছুক্ষণের মধ্যে, এই ধারণায় বাড়ীর মানুষ নিঃশব্দ হাহাকারে স্তব্ধ হয়ে গেছে, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বড় দেবর ছুটে গেলেন অত রাত্রে নির্ভরসার ভরসা বিধান রায়ের নিকট। গম্ভীর মানুষ, সব শুনে বললেন, গিয়ে আর কি করব? এই শেষ অবস্থায় আর কি করার আছে? তবুও একটা ইঞ্জেক্শনের ওষুধ লিখে দিচ্ছি, আমার সহকারীকে নিয়ে যাও, দেখ যদি ভাগ্যে থাকে, 'হেমারেজটা' বন্ধ হয়ে যায়, তবে হয়ত বাঁচতেও পারে। আমাদের দেশে ইঞ্জেক্শনের তখন প্রথম প্রচলন, সহকারীকে ডেকে, কি ভাবে কি করতে হবে সমস্ত বুঝিয়ে দিলেন।

সেই রাত্রে হাডিড-সার শরীরের চামড়া কুঁচিয়ে পেটের দুপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে দেওয়া হল দুটো ইঞ্জেকশন, সাধারণ ইঞ্জেকশনের প্রায় দ্বিগুণ আকৃতির। হল কাজ, ধন্বন্তরীর বাহু হস্তের স্পর্শে ধীরে ধীরে হয় অর্দ্ধ মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার। ভগবৎ প্রেরিত সেই মহান প্রাণদাতাকে আজ তাঁর মৃত্যুদিবসে করি শ্রদ্ধার্ঘ্য দান!

তারপর বেঁচে আছি আরও চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু অমন ইঞ্জেকশন দিতে আর কখনও দেখিনি। কত ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরা পেটের মধ্যে অমন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, তা জানেন কি না, কিন্তু কেউ জানেন না, সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন।

কলকাতা পরিত্যাগ করে চলে আসি বম্বে প্রবাসে। এখানে একবার আসেন ডাঃ রায়। তখন আমার দ্বিতীয় পুত্রটি বছর পাঁচেকের, নূতন কথা শিখেছে, মুখে অনর্গল খই ফোটে। কাছে ডেকে আদর করে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, খোকা! বলত তুমি বড় হয়ে কি করবে? শিশুটি চটপট্ জবাব দেয়, 'আমি ডাক্তার হব।' খুব খুসী হয়ে আদর করে, পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বেশ-বেশ আমি বেঁচে থাকতে তাড়াতাড়ি পরীক্ষায় পাশ কর, তোমার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

বড় হয়েও ছেলেটির ঝোঁক বরাবর ডাক্তারী পড়ার দিকে, বম্বে ইউনিভার্সিটির ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার পর কত চেষ্টা করা হয় বম্বের মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি করার, কিন্তু ডোমিসাইলড সার্টিফিকেট না থাকার দরুণ ওখানে ভর্ত্তি করা গেল না, প্রাদেশিকতার মনোভাবে। বাধ্য হয়ে আসতে হল কলকাতায়, তখন কলেজে-কলেজে ভর্ত্তি প্রায় শেষ, অনেক কষ্টে স্থান পেল বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে, যেখানে অধ্যাপক ও সর্ব্বেসর্ব্বা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। কি আশ্চর্য্য যোগাযোগ!

তারই মুখে শুনি ডাঃ রায়ের ব্যক্তিত্বের কথা। কলেজে ঘণ্টা দুটো, একটা বড়, একটা ছোট। বড় ডাক্তার বিধানবাবুর আগমনে বড় ঘণ্টাটা সজোরে বাজিয়ে দেওয়া হয়, আর অত বড় কলেজের প্রত্যেকটি মানুষ কম্পিত পদে স্ব স্ব স্থানে এসে অখণ্ড মনোযোগে নিজের কাজে মন দেন। এর থেকে অধ্যাপক, ছাত্র, চাপরাশী, মেথর, ডোম, কেউ বাদ যায় না। প্রত্যেকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে যত, ভয় করে ততোধিক! এমন ব্যক্তিত্ব না হলে কি একটা দেশের কর্ণধার হয়ে এতদিনের এত দুর্দ্দৈবের ভিতর দিয়ে তা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

তারপর দেশ-বিভাগের পর আসেন রাজনৈতিক জগতে বাংলার প্রধানমন্ত্রী রূপে। অবশ্য ভারতীয় কংগ্রেসের একজন সক্ষম সক্রিয় কর্ম্মীর স্থান নিয়ে ছিলেন বহু পূর্ব্বেই, মহাত্মা গান্ধীর সাহায্যকারী হয়ে।

তিনি চিকিৎসা-জগৎ প্রায় ছেড়ে আসায় হয়ত আমাদের মত আরও অনেকেরই হয়েছিল মহা দুঃখ, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রেই কি তাঁর কৃতিত্ব, কর্ম্ম-ক্ষমতা কম? বৃদ্ধ বয়সে যে অমানুষিক পরিশ্রম তিনি করেছেন, একটি তরুণ যুবকেরও তা করা অসম্ভব।

ডাক্তারীতে তাঁর রোগ-নিরূপণ-ক্ষমতা ছিল ভগবান-দত্ত অদ্ভুত! শুনেছি রোগী এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেই অভ্রান্তভাবে বলে দিতেন, তার কি রোগ হয়েছে। অভিজ্ঞতার এমনই চরম শিখরে উঠেছিলেন যে, মানুষের বহিরাকৃতি দেখেই বলতে পারতেন, তার শরীরের অভ্যন্তরে কোথায় কি হয়েছে। দেশী বিদেশী সব ওষুধেরই সুষ্ঠু প্রয়োগে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অতি কঠিন রোগে রোগী রক্ত-বমন করছে, বড় বড় ডাক্তার কিছুতেই তা নিবারণ করতে পারছে না, জীবনী শক্তি হয়ে আসছে ক্ষীণ, বিধান রায় এসে সকলকে স্তব্ধ করে, বিধান দিলেন, 'আয়াপানের রস।' তাতেই রোগী ধীরে ধীরে হয় রোগমুক্ত—এ আমাদের চক্ষে দেখা।

তাঁর কথার কি শেষ আছে? বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর অবদানের পরিমাপ করা এখনও সম্ভব নয়, আর কিছু না করে, শুধু যদি সহরের খাঁটি দুধ সরবরাহের ব্যবস্থাটাই করতেন তাহলেও চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করে তিনি হতেন আমাদের নিকট অবিস্মরণীয়। এরূপ আরও অগণিত উপকার তিনি দেশের লোকের করে গেছেন—ডাক্তার ও প্রধানমন্ত্রী রূপে। তাই ত আজ দেশের শত সহস্র লোক এই অকৃতদার সন্তানহীন মানুষটির আকস্মিক পরলোকগমনে সন্তানের স্থান গ্রহণ করে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জনেও এ নিদারুণ শোক নিবারণের উপায় খুঁজে পাচ্ছে না।

মহামানব মহাত্মা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের শৈশবকাল; তখন থেকেই শুনি মহাত্মা গান্ধীর কথা। তিনি ছিলেন সত্যের প্রতীক, ধর্ম্মগুরু, রাষ্ট্রগুরু, দেশের সর্ব্বাধিক প্রিয় জননায়ক। তাঁর অসহযোগ-আন্দোলন, লবণ-সত্যাগ্রহ, ইংরেজ শাসন কর্ত্তার সঙ্গে কঠিন অহিংস যুদ্ধ, দেশের প্রত্যেকটি মানুষের মনকে আন্দোলিত করে তীব্রভাবে। বিদেশী পণ্যবর্জ্জন-যজ্ঞে আলোড়ন জাগে প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের মনে। তাঁর হরিজন-আন্দোলন, হিন্দু-মুস্লিম একতার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা, সর্ব্বোপরি তাঁর আত্মনিপীড়ন,—স্বদেশের উন্নতিকল্পে, এক একবার দশ বিশ ত্রিশ দিন যাবৎ অনশন গ্রহণ মনে জাগায় এক পরম বিস্ময় ও করুণ সমবেদনা।

এমনি এক দুঃখের দিনে তাঁর সঙ্গে হয় ক্ষণিকের সাক্ষাৎ। আমরা বহুদিন যাবৎ পুণা-প্রবাসী,—কাগজে দেখি হিন্দু-মুস্লিম একতার জন্য এখানকার 'পর্ণ-কুটীরে' তিনি আরম্ভ করেছেন এক দীর্ঘ উপবাস। তখন তাঁর বয়স অনেক; ক্ষুদ্র, ক্ষীণজীবী মানুষটির জীবনীশক্তি ধুকধুক করলেও মনে অসীম বল। দেশের লোকের শত অনুরোধেও উপবাস ভঙ্গ করেন নি। তাঁর গাড়ীর চাকায় নিষ্পিষ্ট হয়ে কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রাণদানের কথা খবরের কাগজে পড়ি,—এমন মহাপুরুষ-দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে মনে। বম্বের ধনকুবের থ্যাকারসের, পুণার ছোট একটি নদীর পাশে ছোট টিলার উপরে অবস্থিত বিরাট প্রাসাদ ঐ 'পর্ণ-কুটীর'। যেন কাণা পুত্রের নাম পদ্মলোচন! অনেকটা চড়াই, ঘোরানো পথ পার হয়ে এক অপরাহ্নে এখানে আসি মহাত্মা দর্শনে।

ছাদের উপরে এক খাটিয়ায় শয্যার সঙ্গে মিশে শুয়ে আছেন ছোট মানুষটি। অল্প কয়েকজন লোকের সম্মেলনে হয় সান্ধ্যপ্রার্থনা ও ভজন। তিনি অনড় অবস্থায় যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ে থাকেন ঐ

সময়টুকু। তারপর আমরা লব্যায় নিকটে গিয়ে করযোড়ে প্রণাম করায়, করলেন প্রতি নমস্কার, সামান্ত আশীর্ব্বাণী যা উচ্চারণ করেন অতি ক্ষীণকণ্ঠে, তা বুঝতে না পারলেও মন স্পর্শ করে।

বহুদিন পর আমাদের কলকাতা বাসকালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বিধ্বস্ত কলকাতা সহরে এসে অবস্থান করছেন বেলেঘাটায়। সমস্ত দাঙ্গাকারীদের এক নিদারুণ করুণ আবেদন জানান, যার কাছে যা আগ্নেয়াস্ত্র আছে, তা তাঁকে সমর্পণ করার। তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণীর কী শক্তি, যেন যাদু মন্ত্রে বশীভূত হয়ে ডাকাত, গুণ্ডারা তাদের আগ্নেয়াস্ত্র একে একে এসে নিবেদন করে তাঁর পায়। এতদিন কিন্তু সরকারের শত চেষ্টায়ও, পুলিশ-বাহিনী, ফৌজ-বাহিনী একত্র করেও সম্ভব হয়নি একাজ।

কিন্তু তরুণ অল্পমতি যুবক হয় মহাত্মার প্রতি অসন্তুষ্ট। তারা নিক্ষেপ করে তাঁর প্রতি ইষ্টক, লগুড়। কাগজে পড়ে ব্যথিত চিত্তে লিখি,—

> হে মহামানব, তুমি করিও ক্ষমা, বাচালতা বালকের,—
> দুঃখ, দৈন্ত ও কষ্টে, অপমানে নিপীড়নে ভুলিয়াছে তারা
> তুমি কে ?
> ছুঁড়িয়াছে তব পানে ইষ্টক-খণ্ড, তুলেছে লগুড়,—
> এ কি কম দুঃখের ?
> তুমি যে জাতির পিতা, তুমি জান সে বারতা !
> অবোধ দুরন্ত শিশু পিতৃ-পৃষ্ঠে করিলে আঘাত,—
> পিতা হাসি কোলে নিতে তারে বাড়াইয়া দেন দুই হাত,
> সেইমত সকলেরে লহ তুমি কোলে,—
> ক্ষমা কর অবোধেরে সব যাও ভুলে !

সত্যই সব ভুলে তিনি আবার ছুটে গিয়েছিলেন, নোয়াখালীর বিধ্বস্ত প্রাঙ্গণে, যেখানে জ্বলে উঠেছিল দাবানলের মত সাম্প্রদায়িক বহ্নি, যে অনলে আহুতি দিয়েছিল সেখানকার শত শত অমূল্য প্রাণ, প্রাণের চেয়েও প্রিয় সতী নারীর সতীত্ব ! তাঁর গমনে শত শত ভীত অর্দ্ধমৃতপ্রাণে জেগেছিল আবার আশার আলোক, আবার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা !

তারপর আর একবার দেখি তাঁকে কংগ্রেস রাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর সোদপুরের এক বিরাট অধিবেশনে। একটি দেশাত্মবোধ রবীন্দ্র-সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ হয় সভার অধিবেশন, অগণিত পুরুষ নারীর এক বিশাল জন-সমুদ্র। গৃহাঙ্গনে আবদ্ধ ভারতীয় নারীকেও তিনি তাচ্ছিল্য ভরে দূরে সরিয়ে রাখেননি ডাক দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে হাত মিলাতে রাজনৈতিক অহিংস সংগ্রামে। অন্তঃপুরিকারাও সে আহ্বানে দলে দলে অন্তঃপুর ছেড়ে তাঁর দৃষ্টান্তে স্থান নেয় অসীম সাহসে সরকারী জেলে। তিনি যেন রূপকথার যাদুকর,-বাঁশীতে একবার ফুঁ দিলে, সাধ্য ছিল না কারো গৃহ-কোণে শুধু আপনাকে নিয়ে লুকিয়ে থাকে।

সোদপুর-সম্মেলনে দেখি অগণিত নারী, শিক্ষিতা—অশিক্ষিতা-নিরক্ষরা। কোলে তাঁদের ছোট শিশু, বাড়ীতে দেখার মানুষ নেই, ক্ষুদ্র শিশুটিকে নিয়েই এসেছেন মহাত্মার আহ্বানে, তাঁর দেশজোড়া রাষ্ট্র-সভার প্রাঙ্গণে একফালি স্থান গ্রহণের আশায়। ভজন, প্রার্থনা ও মহাত্মার প্রার্থনান্তিক ভাষণের পর আরম্ভ হয় রামধুন। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত-পাবন সীতারাম'।

অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি এসে পড়ে তাঁর অনাবৃত দেহে,—দূর থেকে দেখি যে দিব্য-দেহের অপূর্ব্ব জ্যোতি-স্ফুরণ! করযোড়ে সে মহামানব সকলকে অনুরোধ জানান, এই অগণিত জন-সমুদ্রের প্রত্যেককে মৃদু-কণ্ঠে রামধুন যোগ দিতে, যদি কেহ তাতে অক্ষম হন তবে শুধু, হাতে তালি দিয়ে সহযোগ করতে। আমরা পরম আগ্রহে সেই মহামানবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাই রামধুন, মনে হয় যেন এক পবিত্র সরোবরে অবগাহন করে দেহ মন হয় পরম পবিত্র !

সমস্ত জীবন পরার্থে উৎসর্গীকৃত এই শুচি-শুভ্র, মহৎ, রাম-ভক্ত অমূল্য প্রাণ, রাম নাম মুখে নিয়ে পবিত্র প্রার্থনা সভায় আততায়ীর গুলি বিদ্ধ হয়ে চিরদিনের মত অদৃশ্য হলেন, আমাদের দৃষ্টি পথ হতে। শ্রীরামচন্দ্র যেন হাত বাড়িয়ে তাঁকে টেনে নিলেন স্বীয় ক্রোড়ে! অবিস্মরণীয় 'জাতির জনকে'র উদ্দেশে গভীর দুঃখে প্রদান করি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

নাটকীয়

দুর্গাদাস সরকার

নটীকে শুধায় নট : [মৃদুমুষ্টি, কম্পমান স্বরে]
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী আমি তোরে
দিয়েছি উজাড় করে। আজো কি অপূর্ণ তবু সাধ ?
সত্যের গভীরে তোর গড়েছি গানের বনিয়াদ।
যে রাগ-রাগিণী শুনে দেশে দেশে রাত্রি হয় ভোর
সেই রাগে ঘর পূর্ণ তোর।

নটী বলে : [রুদ্ধ কণ্ঠে] যদি হোল স্বেচ্ছা স্বয়ম্বর
বুকের কাঁকন কুঁড়ি, বলো, কেন শুকিয়ে পাথর।
তুমি শুধু মূর্ত্ত হও ধ্যানীর মূর্ত্তিতে
রাগ-রাগিণীতে।
নতুন নায়ক-স্পর্শে কুঁড়ি যদি মূর্ত্ত হয় প্রাণে
দেহ সত্য যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত গানে।

স্তব্ধ হোল নটী। তার নীরব কিঙ্কিণী
ভেসে আসে নেপথ্যের করুণ রাগিণী।
যদিও আসেনি মঞ্চে নতুন নায়ক,
যুবক দর্শক
নটীকে পরাল জয়-মালা
সাঙ্গ হোল পালা।

[হবিবপুর—ক্ষুদিরাম ভূমিষ্ঠ হন এই বাড়ীতে]

অগ্নি-শিশুর খেলা

অমিয় ভট্টাচার্য্য

এক

মেদিনীপুর সহরের গোলকুয়ার চকে বাসাটা চিনতে খুব বেশি কষ্ট করতে হল না। পাড়ার সবাই চেনে। দেখিয়ে দিতেই রিক্সা থেকে নেমে পড়লাম।

দু'ভাই দাঁড়িয়ে আছেন আমাকে অভ্যর্থনা করতে। ললিত-মোহন রায়, ভীমাচরণ রায়। শহীদ ক্ষুদিরামের দুই ভাগিনেয়। ললিতবাবু বয়সের ভারে রুগ্ন। ভীমাচরণবাবু কিন্তু ষাটের কোঠাতেও সুস্থ, সবল। ললিতবাবু স্থির, সৌম্য, গম্ভীর। ভীমাচরণবাবু প্রাণ-বন্যায় এখনো উজ্জ্বল। দু'জনকে দেখেই মনে কেমন এক শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। অবনত মস্তকে নমস্কার জানালাম।

ললিতবাবু বললেন,—'আজ ১৮ই এপ্রিল। এই দিনটিতে আপনাকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসার একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এই স্মরণীয় দিনটিতেই মামা চিরকালের জন্য মেদিনীপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। অগ্নিশিশু আগুনের শেষ খেলা খেলতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। এখনো মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। ১৯০৮ সালের ১৮ই এপ্রিল। আমার বড় বোন শিবরাণীর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। বাড়ীতে তোড়-জোড়, ব্যস্ততা। এরই মধ্যে মামার নামে ডাকে এক চিঠি এলো। অদ্ভূত চিঠি। কতগুলি সংখ্যা, ১, ২, ৩, ৪, ইত্যাদির গায়ে আকার, ইকার, উকার ইত্যাদি লাগিয়ে বাক্য রচনা করা হয়েছে। সংকেত না জানলে পাঠোদ্ধার করা মোটেই সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য মামাই মাত্র সে সংকেত জানতো। চিঠি পড়তে পড়তে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, হাত হল মুষ্টিবদ্ধ। হঠাৎ চার বছরের শিশু ভীমা'কে কোলে তুলে নিয়ে চুমো দিয়ে বলল মামা,—'দাগ রেখে যাই!' তারপর মাকে বলল, —'আমি বিশেষ কাজে কলকাতায় যুগান্তর অফিসে যাচ্ছি দিদি, ফিরে এসে শিবরাণীর বিয়ের কেনা-কাটা সেরে দেবো।' তারপরই ঝড়ের বেগে উধাও। দিনের পর দিন মাতৃসমা দিদির প্রতীক্ষা ব্যর্থ হল। মহাভিনিষ্ক্রমণে যে বীর গৃহত্যাগ করেছে, সে আর ফিরবে কেন?'

কিছুক্ষণ থেমে দম নিয়ে ললিতবাবু আবার বলতে লাগলেন, জানেন, মামার কথা বলতে গিয়ে, এই দিনটিতে বিশেষ ক'রে মনে পড়ে আমার মায়ের কথা, তিন মুঠি তণ্ডুল দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন তিনি ক্ষুদিরামকে সূতিকাগৃহে। সেই তণ্ডুল ছিল মাতৃস্নেহে সিক্ত। তাই যখন উপর্য্যুপরি মাতার মৃত্যু, দিদিমার মৃত্যু, পিতার পুনরায় বিবাহ ও মৃত্যু, সব সহ্য করেও, ভগ্নী ননীবালার সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যবধানের পর,—মা দেখতে পেলেন ঝাঁকড়া-চুলো, সোনার তেঁতুল পাতা নাকে ঝোলানো, পায়ে সরু লোহার বেড়ি পরা শীর্ণদেহ ক্ষুদিরামকে,—মাতৃস্নেহেরই আকুল আবেগে বুকে তুললেন তাকে। কিন্তু এই অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহও অগ্নিশিশু ক্ষুদিরামকে নিবৃত্ত করতে পারলো না—। পারবে কেমন করে? দেশমাতার আহ্বান শুনে পালিকা মাতার স্নেহ-ক্রোড়ে বীরশিশু কি থাকতে পারে? অথচ ক্ষুদিরাম তো জানে না, নীরবে নিভৃতে আমার মা তারই জন্য অন্তর্দ্বন্দের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও একদিনের জন্য তাকে সাংসারিক কোনো কষ্ট পেতে দেন নি? স্বামী সরকারী চাকুরে, বাড়ীর উপরে পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি, প্রতিবেশীরা বাক্যালাপ করতে ভয় পায়, তবুও মা ক্ষুদিরামকে একদিনের জন্যও তাঁর অন্তর্জ্বালা বুঝতে দেন নি! হাসি মুখে, স্বামীর কাছেও তার গতিবিধি গোপন করে রেখেছিলেন। যে ক্ষুদ দিয়ে ক্ষুদিরামকে কিনেছিলেন তিনি, তার সম্মান তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করে গেছেন।

হঠাৎ ভীমাচরণ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন 'আর আমি? আমি তো মামার সেই চুম্বনের দাগের মর্য্যাদা রাখতে পারি নি? দুঃখ হয়, লজ্জা হয়, চির বিদায় নেবার আগে মামা আমার মুখে যে দাগ এঁকে গেলেন, সে দাগ তো ধরে রাখতে পারলাম না। কি করলাম জীবনে? পরের গোলামীই করে গেলাম। অবসর নিয়ে পেন্সনের টাকায় কায়ক্লেশে জীবন যাপন করছি। শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি!' একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন,—তাঁর সবল বাহু বার বার উত্তোলিত হল অধীর উত্তেজনায়, 'তবু বোধ হয়, মামার সেই চুম্বনের আশীর্ব্বাদেই চাকরীর আমলে বিপ্লবের দু'একটি অগ্ন্যুৎপাত আমার জীবনেও ঘটেছিল। মেদিনীপুরে আগষ্ট আন্দোলনের সময় যখন আমার সাহেব আমাকে ভয় দেখালেন, বলেছিলাম, "যদি ভয় দেখান, তবে আমি কাজ ছেড়ে দেবো, কিন্তু জেলে গেলে দ্বিতীয় ক্ষুদিরামই জন্মাবে আমার মধ্যে। আপনাদের জীবন হবে বিপন্ন। আর, যদি বিশ্বাস করেন আমাকে, গোলামী দাসখতের মর্য্যাদা রাখতে কোন ত্রুটি করবো না। মামাকে যখন ভুলেছি; চাকরীর মধ্যে একেবারেই ভুলতে দিন।" সাহেব বুদ্ধিমান, আমার সেই নির্ভীক জবাবে, আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করেন নি।

ললিতবাবু বললেন, 'ভীমা ঠিকই বলেছে। দেশবাসীর সামনে আমরা মামার আদর্শ তুলে ধরতে পারি নি। এ লজ্জা আমাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকবে। কিন্তু একথাও মনে রাখবেন। ব্রিটিশ আমলে স্বাধীনতার আন্দোলনে যে নির্য্যাতন আমাদের ভোগ করতে
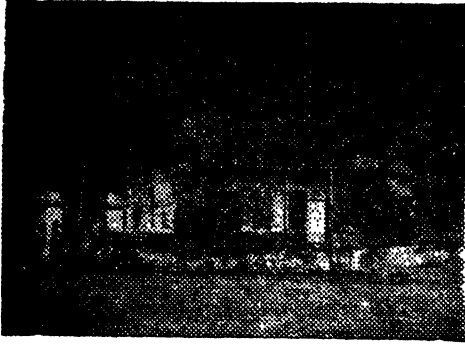
শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির—হবিবপুর

হয়েছে, যে কঠিন আক্রোশে বাবার মাথার উপর রাজরোষ ডিমাহিনিসের খাঁড়ার মতন ঝুলেছে অহরহ ভয়ে ভয়ে, অসহায় অবস্থায় দেশবাসীর মুখ চেয়ে যে কঠিন দিনগুলি আমাদের কাটাতে হয়েছে,—সেই সব ভয়ঙ্কর পরিবেশে আমাদের প্রতি যোগ্য অনুকম্পা কি দেখিয়েছে দেশবাসী? আদর্শ রক্ষা করবার উপযুক্ত অবকাশ কি পেয়েছি আমরা?···আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পিছনের দিকে তাকিয়ে শুধু মনে হয়, মামা দেশে আগুন জেলে গিয়েছিলেন, দেশ জাগলো, স্বাধীনতা এলো, কিন্তু আমরা জেগেও প্রাণ ধারণের কঠিন তাগিদে ঘলে উঠতে পারলাম না। এবার কোন্ দিন নিবে যাবো, কেউ জানবে না।'

বুঝলাম, ছুটি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপশিখাকে সামনে নিয়ে বসে আছি। মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে যে শিখা, তার দীপ্তি আছে, তেজ নেই, আবেগ আছে, বেগ নেই। অনুতাপ, উষ্মা, অনুযোগ, প্রতিবাদ, বিচিত্র অনেক অনুভূতির ধোঁয়ায় সে শিখা কাঁপছে।

বললাম,—'যাক্ ও সব কথা। একটা কথা অনেকেই বলেন, ক্ষুদিরাম সম্পর্কে। যদি অভয় দেন, তো বলি।'

দুজনেই হেসে উঠলেন,—'বলবেনই তো! অভয় চেয়ে লজ্জা দেবেন না। মামা তো এখন ইতিহাসের বস্তু। সমালোচনারই বিষয়।'

বললাম,—'অনেকে বলেন, ক্ষুদিরামের নিজস্ব কোনো প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব কিছু ছিল না। সে ছিল একটি যন্ত্র বিশেষ। তার ভেতরে উন্মাদনার একটা ব্যাটারী চার্জ করে দিয়ে নেতারা পিছিয়ে গিয়েছিলেন। সেই বৈদ্যুতিক উন্মাদনাই সব কিছু করেছে, নেতাদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, যেমন করেছিল, টেনিসনের 'চার্জ অব দি লাইট ব্রিগেডের' সেই সৈন্যদল। এবং তাঁরা আরো বলেন, ক্ষুদিরামের বয়সটাকেই নেতারা সুকৌশলে এক্সপ্লয়েট করেছিলেন।

ভীমাচরণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ললিতবাবু তাঁকে থামিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন,—যাঁরা ওরকম সমালোচনা করেন, তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে অভ্রান্ত। কেন না, তাঁরা জেনেছেন, ঐ অপরিপক্ক বয়সে কারো পক্ষে নেতার আদেশ পালন করা ছাড়া, নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনায় বা আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু করা অস্বাভাবিক। কিন্তু আমি তো জানি, ক্ষুদিরামের অনুপ্রেরণার উৎস কোথায়। যতদিন মেদিনীপুরে সে ছিল, আমি ছিলাম তার নিত্য সঙ্গী,—অন্ততঃ যতক্ষণ সে গৃহ সন্নিধির বাইরে থাকতো।—আমি জানি, তাই অন্তরের গভীরতম প্রদেশে কি ভাবে এক অপূর্ব্ব দেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো, নেতাদের আদেশ সে তার বিবেকের অনুশাসনেই পালন করেছিল, তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই বিপ্লবের এক নতুন আদর্শ সে রচনা করেছিল। নিজেকে যন্ত্ররূপে কারো কাছেই সে সমর্পণ করেনি। অগ্নিশিশুর অন্তর্লোক, তার মানসলীলা একান্তই তার নিজস্ব।···আমি জানি, অতি অল্প বয়স থেকেই, তার দুর্ভাগা দেশের জন্য, দেশের নির্য্যাতিত মানুষ, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গের জন্য কী তার বেদনা, কী তার মর্ম্মদাহ, আবার পীড়ক, অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে কী তার দ্বিধাহীন তেজস্বী গর্জ্জন! এ সব অনুভূতি ও প্রবৃত্তি কারো আদেশে তার অন্তরে জাগেনি। এ সবই ছিল তার সহজাত। মেদিনীপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরীর ভৈরব-দুলাল ক্ষুদিরাম, মায়ের অগ্নিপ্রসাদ বুকে নিয়েই জন্মেছিল, তাই অগ্নি-শিশুকে কারো কাছ থেকে আগুন ধার করতে হয়নি। নেতারা শুধু দিয়েছেন ইন্ধন।'

অবাক্ হয়ে ললিতবাবুর কথা শুনছিলাম। খেয়ালই ছিল না, কথা বলতে বলতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ঘন ঘন দম নিতে হচ্ছে তাঁকে। নিজেকে অপরাধী মনে হল,—এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে এতক্ষণ কষ্ট দিয়েছি একটা রূঢ় প্রশ্ন ক'রে। বললাম,—'আমাকে মার্জ্জনা করবেন ললিতবাবু। আপনার বার্দ্ধক্যের উপর অযথা নিপীড়ন চালিয়েছি। আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে।'

—'না-না-না।' মাথা দুলিয়ে প্রশান্ত হাসি হেসে বললেন ললিতবাবু—'মামার সম্বন্ধে কেউ জানতে চাইলে খুব খুসী হই। আপনার মত এমনি করে আমাদের কেউ প্রশ্ন করেনি; কেউ জানতে চায়নি ক্ষুদিরামের জীবন-রহস্য। হয়ত সবাই ভেবেছে ক্ষুদিরাম শুধু আগুনের একটা ফুলকি, ফুলকির আবার ইতিহাস কি? কিন্তু আমি বলবো—আগুনের উৎস সে—তাকে জানতে হলে উৎসকেই জানতে হবে।

বিনীতভাবে অনুরোধ জানালাম 'যদি কষ্ট না হয়, বলুন না ক্ষুদিরামের বাল্যের কাহিনী—ক্ষুদিরামকে যা থেকে জানতে পারব।'

—বলছি। তবে স্মৃতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। জরার কবলে প'ড়ে বলবার শক্তিও বেশী নেই। সব গুছিয়ে বলতে পারি না। আপনি গুছিয়ে লিখবেন, যদি কখনো লেখেন।

দুই

আজ থেকে ষাট বছর আগে।

তমলুকের একটি পাঠশালা। পণ্ডিতমশাই পড়াচ্ছেন বর্ণ পরিচয়: 'সদা সত্য কথা কহিবে। কদাচ মিথ্যা বলিবে না।'

ছাত্রেরা সুর করে পড়ছে। এমন সময় পণ্ডিত মশায়ের কাছে একটা লোক এসে বলল,—'আমার সেই মামলাটার দিন তো এসে গেল। সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিন।'

পণ্ডিতমশাই শিক্ষকতা ছাড়াও মামলার তদ্বির তদারক করেন। মামলায় জিতিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মক্কেলের কাছ থেকে বেশ দু' পয়সা রোজগারও করেন।

লোকটাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে তাকে বোঝাতে লাগলেন।

পড়ুয়ারা সেই কথাবার্তার কিছু শুনতে পেল।

পণ্ডিতমশাই বলছিলেন,—'সত্যি বললেই তো ডুবে গেলে

তুমি। এখানে তোমাকে মিথ্যে বলতেই হবে। মামলায় অমন মিথ্যে বলতে হয়।'

পড়ুয়াদের মধ্যে ছিল ক্ষুদিরাম। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। তারপর ত্বরিতপদে পাঠশালা ছেড়ে একেবারে তার বাসায়। দিদি অপরূপাদেবীকে জড়িয়ে ধরে বলল,—"দিদি, তুমি এই বর্ণপরিচয়খানা তুলে রেখে দাও। ও আমি পড়বো না।'

—'কেন রে, কি হল?' দিদির বিস্মিত প্রশ্ন।

—'ওতে লেখা আছে, "সদা সত্য কথা কহিবে। কদাচ মিথ্যা বলবে না।" কিন্তু আমার গুরুমশাই বললেন, মামলাতে মিথ্যে বলতে হয়। তা' হলেই ওই বইয়ে ভুল লেখা আছে। আমি ও বই পড়বো না।'

শিশু ক্ষুদিরামের এই বলিষ্ঠ প্রস্তাবে, যুগপৎ গুরুমশাই ও সত্যের প্রতি তার অটুট শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে অপরূপাদেবী অপরূপ হর্ষ অনুভব করলেন।

তিন

ওই তমলুকেই আর এক কাণ্ড।

১৯০৩ সাল। তমলুকে আমেরিকান ব্যাপ্টিষ্ট মিশনে দুজন মহিলা—মিস্ ময়ার ও মিস্ ব্লেয়ারের অধীনে প্রচার ছিলেন লক্ষ্মণবাবু।

তিনি একদিন বাজারে খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তিনি হিন্দু দেব-দেবীর নিন্দা সুরু করলেন—কেষ্ট আবার ঠাকুর, তিনি চোর, ননী চুরি করে খান, গোপিনীদের নিয়ে বিশ্রী কাণ্ড করেন, কালী আবার ঠাকুর, ন্যাংটো হয়ে নেচে বেড়ান, ইত্যাদি। বক্তৃতার শেষে খৃষ্টধর্মের গুণগানে ভরা কাগজ লক্ষ্মণবাবু বিলি করতে লাগলেন।

সবাই একখানা করে কাগজ নিয়ে বিদেয় হচ্ছে। এমন সময় ঝড়ের মত উপস্থিত হল ক্ষুদিরাম। সে বক্তৃতা—কেচ্ছা সবই শুনেছে। হাত বাড়িয়ে লক্ষ্মণবাবুকে বলল,—'আমাকে দুখানা কাগজ দিন তো!' লক্ষ্মণবাবু উল্লসিত। বললেন,—'বেশ! বেশ! তা খোকন, তুমি দুখানা কাগজ নিয়ে করবে কি?'

ক্ষুদিরাম কাগজ দুখানা বগলে নিয়ে নির্ভীক গম্ভীর কণ্ঠে বলল—'একখানা কাগজে তামাক নিয়ে যাবো। আর একখানায় নিয়ে যাবো টিকে। তারপর দুখানা কাগজই টিকের সঙ্গে পুড়িয়ে রায়মশাইকে তামাক সেজে দেবো। (রায়মশাই—অপরূপা দেবীর স্বামী অমৃতলাল রায়)

লক্ষ্মণবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে ক্ষুদিরামের অভিভাবক রায়মশাইয়ের কাছে নালিশ জানালেন। ক্ষুদিরামকে ডাকতেই নির্ভীক নিষ্কম্প-স্বরে সে জবাব দিল,—'যে কাগজে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা থাকে, তা অপবিত্র। তা পুড়িয়ে ফেলাতেই মঙ্গল। উনি ওঁর নিজের ধর্মের প্রচার করুন, কে নিষেধ করছে? কিন্তু তাই বলে আমার মা কালী, আমার কৃষ্ণকে নিন্দা করবেন কেন?'

ক্ষুদিরামের এই অকপট, নির্ভীক ভাষণে অমৃতবাবু স্তব্ধ—নির্বাক।

চার

বয়স বাড়ছে ক্ষুদিরামের। তার চেয়েও বেশি বাড়ছে তার তেজ। বাস্তবতঃ নিরীহ, সরল শিশু। কিন্তু যেখানেই অন্যায়, যেখানেই নির্যাতন—হঠাৎ সিংহগর্জনে লাফিয়ে ওঠে বয়স্ক পালোয়ানের মত। তখন বয়স্কেরাও তাকে সমীহ করে চলে। আবার দুঃখ-দুর্দশা দেখলে, নারীর মত কেঁদে উঠতো ক্ষুদিরাম। আক্রোশে, অভিমানে ফুলে ফুলে কাঁদতো। এই রকম উচ্ছ্বাসময় মুহূর্তে তার মুখ থেকে নিঃসৃত হত যে সব উক্তি, তা শুনে ক্ষুদিরামের শিশু-সঙ্গীরা স্তব্ধ-বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে থাকতো। মনে হত, কোনো প্রবীণ অভিজ্ঞ নেতা বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে ভাষণ দিচ্ছেন আর তাতেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে শ্রোতৃবৃন্দ।

একদিন কথা প্রসঙ্গে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কথা উঠলো। 'শিশু-মাঝে যেমন মণ্ডল' ক্ষুদিরাম বলতে লাগল,—"সকালে আমরা 'দুর্গা, দুর্গা' বলে মা দুর্গাকে স্মরণ করে শয্যাত্যাগ করি। মা দুর্গার দশ হাতে দশটা অস্ত্র, কিন্তু আমাদের দেশে সকালে উঠে দেখি, মা দুর্গার অংশ আমাদের মেয়েদের হাতে অস্ত্রের বদলে রাঁধবার-হাতা, বেড়ী, খুন্তী। খুব বড় গলা করে তাদেরই বলি আমরা 'মা অন্নপূর্ণা'। কিন্তু তাদের রেখে দিই রান্নাঘরে আটকে। দেশে অন্নই নেই, জাহাজভরা চাল বিদেশে চলে যাচ্ছে, ম্যানচেষ্টারে কাপড়ে মাড় দেবার জন্য, তবে আর মেয়েদের 'অন্নপূর্ণা' নামের সার্থকতা কি?—শোন্ তবে, এখন চণ্ডীরূপে মায়ের জাতকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ভারতের পুরুষদের খোজা সাজিয়ে, আর মেয়েদের হিজড়ে সাজিয়ে,—সবাইকে ফিঙ্গিভেজা বানিয়ে বিদেশী বণিকের দল ভারতের বুকে বসে লুট পুটে খাচ্ছে। তবু ঐ মাছকাটা বঁটি নিয়েই যদি আমাদের মায়েদের দল ফিরিঙ্গীগুলোর পিছু পিছু ধাওয়া করে, তা হলে আমি বলতে পারি,—ওরা দুদিনে দেশ ছেড়ে পালাবে।"

হতভম্ব সঙ্গী একজন প্রশ্ন করল—"এ সব কথা তুই শিখলি কোথা থেকে?"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ক্ষুদিরাম মাথার চুলগুলি ঝাঁকিয়ে বুকে হাত দিয়ে বললে,—'এখান থেকে।'

পাঁচ

মেদিনীপুর কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের সম্মুখে, মাঠের এক প্রান্তে এক বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় আজও। এটি একটি পরিত্যক্ত জেলখানা। হিন্দু, পাঠান, মোগল যুগে ও ইংরেজ যুগেরও অনেকদিন পর্যন্ত এটি ছিল দুর্গ। তারপরে রূপান্তরিত হয় জেলে। অবশেষে ১৮৬৬ সালে জেলখানা এখান থেকে উঠে অন্যত্র যায়। তদবধি এই বিরাট ভবন এক বিরাট শূন্যতা বুকে নিয়ে নীরব সাক্ষীর মত সহরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল।

আবার এর বুকে কলরব জেগে উঠলো ১৯০৬ সালে। এক বিরাট কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল এই বাড়ীতে। এর ফটকে দাঁড়াল শান্ত্রীর দল সঙ্গীন উঁচিয়ে,—এর অভ্যন্তরে উঠলো হাজার হাজার দর্শকের কলগুঞ্জন। প্রাণচাঞ্চল্যে টলমল, সম্মুখের প্রান্তর।

প্রদর্শনীর শেষ দিন—২৮শে ফেব্রুয়ারী। জেলখানার পশ্চিম ফটকে দেখা গেল কিশোর ক্ষুদিরামকে। সে তখন পুরোপুরি বিপ্লবী। শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রে দীক্ষিত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু, সত্যেন্দ্র বসুর যোগ্য শিষ্য ক্ষুদিরাম।

বিপ্লবীদলের মুখপত্র 'সোনার বাংলা' বিতরণ করছে ক্ষুদিরাম দর্শকদের মধ্যে। সত্যেন বসু নির্দেশ দিয়ে দর্শকদের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছেন।

একজন পুলিশ কনষ্টেবল ক্ষুদিরামকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল। কণ্ঠে রূঢ় প্রশ্ন—'কি হচ্ছে এখানে?' এগিয়ে এলো দুই কঠিন হাত ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করতে।

চোখের নিমেষে ক্ষুদিরাম সেপাইয়ের নাকে বসিয়ে দিল এক ঘুষি। পরক্ষণেই ভীড়ের মধ্যে অন্তর্ধান।

কয়েকজন সেপাই অবশ্য দেখতে পেয়েই পিছু পিছু ধাওয়া করল, চীৎকার, হট্টগোলে মুখরিত হয়ে উঠল প্রান্তর।

হঠাৎ সত্যেন বসু ভীড়ের মধ্য থেকে সেপাইদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো—"আরে ভাই, উও তো ডেপুটিকা লেড়কা হ্যায়।"

সঙ্গে সঙ্গে সেপাইরা পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হল। ক্ষুদিরামও অবকাশ পেলো পালাবার। সত্যেন বসুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই তাকে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিল।

পালিয়ে অবশ্য খুব বেশিদিন থাকতে পারেনি ক্ষুদিরাম। সেপাইয়ের নাকে ঘুষি,—ব্যুরোক্র্যাসির উপরে ঘুষি। ব্রিটিশ সিংহের কেশর ফুলে উঠলো। সুরু হল গর্জ্জন, আর তাড়না।

৩১শে মার্চ্চ তারিখে ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল অলিগঞ্জের এক তাঁতশালায়। রাজদ্রোহের অপরাধে সুরু হল বিচার। মেদিনীপুরের সেশন জজ এইচ, ই, র‍্যানসমের কোর্টে তিনদিন মামলা চলবার পর সরকার পক্ষের প্রসিকিউটার বিপিনবিহারী গুপ্ত ১৬।৫।১৯০৬ তারিখে মামলা তুলে নিলেন।

ঐ দিনটি মেদিনীপুরবাসীর কাছে একটি স্মরণীয় দিন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এক বিপুল উল্লাসে মেতে উঠেছিল,—ক্ষুদিরাম তথা বিপ্লবের জয়ধ্বনিতে। ব্যারিষ্টার কে, বি, দত্তের ফিটন গাড়ীতে ক্ষুদিরামকে বসিয়ে সারা সহর প্রদক্ষিণ করেছিল এক বিরাট মিছিল। রবীন্দ্রনাথের "মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" ও "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক"—গাইতে গাইতে সহরের এই অভূতপূর্ব জাগরণে সারা দেশই অনুভব করেছিলো এক অপূর্ব স্পন্দন। প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশ শাসক শঙ্কিত হয়েছিলেন কিশোর ক্ষুদিরামের ব্যক্তিত্বে ও জনপ্রিয়তায়।

ছয়

সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদিরাম সত্যরক্ষা করতে ছিল পণবদ্ধ। নিজের বিবেকের নির্দ্দেশ পালন করতে সে কারো ভ্রূকুটি, শাসন গ্রাহ্য করতো না। দেশকে অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত করাই ছিল তার কাছে একমাত্র সত্যধর্ম্ম, আর সেই ধর্ম্মরক্ষার জন্য যদি কিছুটা অধর্ম্মের আশ্রয়ও নিতে হত, তবে তাকে সে সত্য-রক্ষারই সোপান মাত্র মনে করত। তার এই নীতিই সে ব্যাখ্যা করছিল একদিন—তার ভাগিনেয় ললিতের কাছে, সেপাই মারা মামলার বিচারের কয়দিন পর।

ললিত বলছিল, "সেদিন জজের এজলাসে সকলের সামনে তুমি বললে, "সোনার বাংলা" পত্রিকা তুমি নিজে বিলি করনি, একজন দাড়িওয়ালা লোক তোমায় দিয়েছিল। এটা স্রেফ মিথ্যা কথা। আমি জানি, সত্যেন বসু তোমাকে ঐ পত্রিকা বিলি করতে দিয়েছিলেন, এবং তুমি নিজেই বিলি করছিলে।·····তোমরা না গীতা পড়? এ সব মিথ্যে কথা বলতে তোমাদের বাধে না?"

হো হো ক'রে হেসে উঠলো ক্ষুদিরাম,—'ওঃ, এই কথা। এতেই তুই আমাকে অধার্ম্মিক মনে করলি?' তারপর হঠাৎ তার মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন হল। সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে জমা হল। চোখে ভ্রূকুটি। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল,—'আর যারা আমাদের এই ধর্ম্মের দেশে এসে, অধর্ম্মের ডংকা বাজিয়ে শাসন কায়েম করল, তারা বুঝি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির? ক্লাইভ, হেষ্টিংস কি রকম ধাপ্পাবাজী করে, গৃহবিবাদ ঘটিয়ে, নন্দকুমারকে জালিয়াৎ সাজিয়ে, তাঁর গলায় ফাঁসির দড়ী ঝুলিয়ে, সিরাজদ্দৌলাকে হৃদয়হীন পশু সাজিয়ে, এই দেশটাকে একটু একটু করে দখল করেছিলো, তা জানিস্ না? নিজেদের দেশে ব্যবসা চালাবার জন্যে এ দেশের তাঁতীদের আঙুল কেটে, কি রকম জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলো, সে খবর রাখিস্ না? আমার ডোস্ক সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' আছে। বইখানা পড়িস্ ওই সব বিদেশী জালিয়াৎদের হাত থেকে আমাদের দেশকে উদ্ধার করতে তাদের দরবারে মিথ্যে যদি বলি,—কিছু যায় আসে না।···আর গীতার কথা বলছিস্? গীতার যিনি প্রবক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেই দুষ্ট কংসকে বঞ্চনা করবার জন্যে সত্যব্রত বসুদেবকে মিথ্যাচার করবার উপদেশ দেননি? জানিস্ তো, বসুদেব কংসের কাছে সত্যবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর যতগুলি সন্তান জন্মাবে, সবগুলিকেই তিনি কংসের হাতে তুলে দেবেন, সেই সত্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জন্মাবার সময় তিনি সে সত্য পালন করেন নি, এ তো নিশ্চয়ই সেই শ্রীকৃষ্ণেরই অদৃশ্য ইঙ্গিতে? দ্রোণ বধের সময় যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যে বলতে হয়েছিলো,—সেও তো শ্রীকৃষ্ণেরই স্পষ্ট নির্দ্দেশ।"

ললিত অবাক হয়ে শুনছিল উত্তেজিত ক্ষুদিরামের বজ্রগর্ভ কথা, হঠাৎ সে অন্য খাতে তর্কের স্রোত সরিয়ে দিলো—'আচ্ছা, অতর্কিত ভাবে, আক্রমণ করে মানুষকে হত্যা করা, এও কি তোমাদের ধর্ম্ম?'

ক্ষুদিরাম দৃপ্ত কণ্ঠে থেমে থেমে বলল,—'হাঁ, সেও আমাদের ধর্ম্ম। অত্যাচারী ইংরেজ কর্ম্মচারীরা আমাদের দেশের শত্রু। শত্রুকে যেন তেন প্রকারেণ, ছলে বলে কৌশলে নিপাত করে দেশকে উদ্ধার করাই আমাদের সত্যধর্ম্ম। এতে আমাদের নিজেদের কোন স্বার্থ নেই। কর্ণকে যে বধ করা হয়েছিলো, সে কি ন্যায় যুদ্ধে? বালিকে যে রাম বধ করেছিলেন, সে কি ন্যায় ধর্ম্মের অনুশাসনে? ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই ওই সব অবৈধ কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। এতে হত্যাকারীকে সত্যভ্রষ্ট বলা যায় না। আমরাও সত্যভ্রষ্ট নই।'

সাত

ক্ষুদিরাম কৈশোরের প্রারম্ভেই বুঝেছিল, যে পথ সে বেছে নিয়েছে, তাতে ফুল নেই, শুধুই কাঁটা। আর, পদে পদে বিপদ। ফাঁসির দড়ী তাকে সেই পথে অনেকদিন আগে থেকেই টানতো।

নেতাদের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় সে ছিল না। সে ছিল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সংশপ্তক সৈনিক—একমাত্র লক্ষ্য তার দেশোদ্ধার।

একদিনের ঘটনা।

পূর্ব্ববর্ণিত সেপাইকে ঘুষিমারা-মামলায় জয়লাভ করে ক্ষুদিরাম যখন অভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করলো, তখন যে সব যুবক 'স্বদেশী' সেজে ওই রকম সম্মান লাভ করবার জন্ম উদ্বুদ্ধ হল, ললিতও ছিল তাদের অন্যতম। আকাঙ্ক্ষা যখন দুর্দ্দম হয়ে উঠলো,—ললিত স্কুল পালাতে শুরু করল। অবশেষে মাতুল ক্ষুদিরামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একদিন সকলের অজ্ঞাতে সে গৃহত্যাগই করে বসলো।

ক্ষুদিরাম বাড়ী এসে সংবাদ শুনেই ললিতের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। খুঁজতে খুঁজতে খড়গপুর ষ্টেশনে এসে দেখতে পেলো, ললিত প্ল্যাটফরমের এক কোণে সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে শুয়ে আছে।

ধাক্কা দিয়ে তুলে ক্ষুদিরাম বলল—'কি হচ্ছে এখানে? কোথায় পালাচ্ছিস বল শীগগির।'

কাঁদ-কাঁদ হয়ে ললিত বলল—'মামা, তুমি কাউকে কিছু বোলো না। স্বদেশী হলে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে লোকে কত সম্মান দেখায়, যেমন তোমাকে দেখিয়েছে। তুমি, মামা, সত্যেন বোসকে বলে আমাকেও তোমাদের দলে ভর্তি করে নাও। আমি আর পড়াশোনা করবো না।' কেঁদে ফেলল ললিত—'না—না—কিছুতেই আর ঘরে যাবো না।'

এইবার ক্ষুদিরাম অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো—'ও, এই কথা। ফুলের মালা গলায় পরবার লোভে স্বদেশী হতে যাচ্ছিস্? বেশ, বেশ, খুব ভালো।'

তারপর ললিতের পিঠ চাপড়ে সস্নেহে বললো,—'কিন্তু এই সম্মানের জন্যে কি দাম দিতে হবে জানিস্? সেদিন দেশের লোকেরা আমার গলায় ফুলের মালা জড়িয়ে দিয়ে সম্মান দেখিয়েছিলো, কিন্তু আবার কোন্‌দিন দেখবি বিদেশী ফিরিঙ্গীরা আমার গলায় ফাঁসির দড়ী জড়িয়ে দিয়ে আমায় সম্মান দেখাবে। আমি তো তার জন্মে প্রস্তুত। কিন্তু তুই সেই সম্মানের ভার বইতে পারবি? সইতে পারবি তো?'

তারপরই ক্ষুদিরামের অন্য এক মূর্ত্তি। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে, বার বার আন্দোলিত করে, উপরের দিকে চেয়ে কঠিন ব্যক্তিত্বে মুখর হয়ে উঠলো—'দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে প্রাণ-দেবার পণ করে গুপ্তচক্র আনন্দমঠের সন্তান হয়েছি। এখন তোরা আমাদের কেউ নয়, আমাদের ঘর নেই, মা নেই, বাবা নেই, ভাই-বোন্ কেউ নেই, আছেন কেবল দীক্ষাগুরু আর আমাদের বিবেক; তাঁরা যা বলবেন, তাই আমাদের করতে হবে। এপথ বড় কঠিন। না—না—না, এ পথ তোর জন্যে নয়, তুই ঘরে ফিরে যা হাবুল।'

সুড় সুড় করে ঘরের ছেলে ললিত ঘরে ফিরে এলো। যেন আগুন দেখে পালিয়ে আসছে।

আট

নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ। তাঁর প্রজাবাৎসল্য, পরহিতৈষণা বঙ্গপ্রসিদ্ধ।

তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, সতেরো বছরের তরুণ ক্ষুদিরাম, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি, আলু থালু বেশ।

রাজা বলছিলেন—'তোমার বাবা শুধু কর্ম্মচারী হিসাবেই আমাদের রাজ-সেরেস্তায় কাজ করেন নি, তিনি ছিলেন আমাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টা। তাঁকে আমাদের সংসারে সকলেই সম্মানের চোখে দেখতো। তাঁর কাছে রাজ ষ্টেটের প্রায় তিন হাজার টাকা পাওনা ছিল। তিনি হঠাৎ মারা যান্‌। তাঁর সিন্দুক থেকে ঐ টাকা চুরি যায়। এ ষ্টেটের ম্যানেজারের কৌশলে তোমার স্বর্গীয় পিতার অনেক জমি জমা আদালতের সাহায্যে নীলাম করিয়ে এ ষ্টেটের ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে। এ সব ব্যাপার অনেক পরে আমার গোচরে আসে। আমি বড় মর্ম্মাহত হয়েছি, ক্ষুদিরাম। তাই, আমার জমিদারীর কিছু জমিজমা লেখাপড়া করে দিতে চাই তোমাকে। তোমাকে আমাদের রাজ-সংসারে রেখে যতদূর তুমি পড়তে চাও, ততদূর তোমায় পড়াতে চাই। এরকম ছন্নছাড়া, লক্ষ্যহীন হয়ে তোমাকে ঘুরতে দেবো না'।

একটু থেমে, রাজা সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন—'তোমার মত কি, বল!' দ্বিধাহীন কণ্ঠে ক্ষুদিরাম জবাব দিল,—'প্রথমেই আপনাকে বলি, লক্ষ্যহীন হয়ে আমি ঘুরি না। লক্ষ্য আমার ঠিকই আছে। এবং লক্ষ্য ঠিক আছে বলেই আমাকে সংসার ছেড়ে ছন্নছাড়ার মত ঘুরতে হচ্ছে। অর্থাৎ, আমার লক্ষ্যই আমাকে ছন্নছাড়া করেছে।'

তারপর হাসতে হাসতে বলল,—'আপনার মহানুভবতায় আমি ধন্য, কৃতজ্ঞ। কিন্তু পিতৃঋণের জন্য আমার বাবার যে জমি-জমা বিক্রী হয়ে গেছে, তার বিনিময়ে আমি আপনার কাছে কোন জমি চাই না,—চাইতে পারিও না। এখনও বাবার যে জমিজমা আছে, তাতেই আমার একরকম চলে যাবে। আর, আপনি আমায় রাজ-সংসারে রেখে পড়াতে চাইছেন,—কিন্তু আমি তো তা চাই না, আমি পড়াশোনা সব ছেড়ে দিয়েছি। আমার লক্ষ্য দেশোদ্ধার। সেই লক্ষ্যই আমাকে ঘরছাড়া, স্কুল-ছাড়া করেছে দেশ পরাধীন, প্রাণ দিয়ে দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার শপথ নিয়েছি। আপনাদের রাজ-সংসারে থাকলে আমি বাবু হয়ে যাবো, আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হব। আমায় মাপ করবেন রাজা বাহাদুর—"

গুণগ্রাহী রাজা নরেন্দ্র লাল বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ উদ্ধত ক্ষুদিরামের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—'বেশ, ক্ষুদিরাম। তোমার এই অবস্থায়ই বা আমি তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি বল'।

ক্ষুদিরাম এবার প্রণত ভঙ্গীতে বলল—'আমি ধন্য রাজাবাহাদুর' মেদিনীপুর সহরে বড় বাজারে আমরা একটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান খুলেছি, তার নাম 'ছাত্রভাণ্ডার'। এর মূলধন খুব কম। যদি এই ভাণ্ডারের জন্য আপনি কিছু টাকা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন, তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হবো। অবশ্য, ঐ টাকার জন্য আপনার লভ্যাংশ যা হবে, তা আপনি পাবেন।'

এক সর্বত্যাগী তরুণ, এক অমিত-বিত্ত নৃপতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করল। এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

রাজা বললেন, 'আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্যে টাকা অবশ্যই দেবো। কিন্তু লভ্যাংশ আমি এক কপর্দ্দকও চাই না।'

ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, সেই সহৃদয় রাজা, শুধু সেই ছাত্রভাণ্ডারেই নয়, দেশের বহু প্রতিষ্ঠানে অকাতরে, নির্বিচারে, অর্থ সাহায্য

ষড়যন্ত্রের মামলায়, তাঁকে অনর্থক জড়িয়েছিল বৃটিশ শাসক। শুধু তাই নয়, ১৯০৮ সালের ২৮শে আগষ্ট থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল-হাজতে বিনা জামিনে বন্দী অবস্থায় তাঁকে থাকতে হয়েছিল।

নয়

১৯০৫ সাল।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন মেদিনীপুর সহরকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। নেতাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের জন্ম পথে পথে সকাল সন্ধ্যায় পিকেটিং সুরু করেছে। ঐ পিকেটিং-এর ফলে, ম্যানচেষ্টারের কাপড়, লিভারপুলের লবণ, বিলাতী চুড়ী, বিদেশী চিনি, সিগারেট প্রভৃতি দ্রব্য বর্জনের ধূম পড়ে গেল।

যখন সহরের প্রায় সমস্ত মন্দিরে বিদেশী চিনির ব্যবহার বন্ধ হয়ে দেশী গুড়ের প্রচলন শুরু হল, তখন বড়বাজারের বিখ্যাত ৺শীতলা দেবীর মন্দিরের মালিক রাধাশ্যাম শুকুল হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন,—'না, আমি আমাদের চিরাচরিত প্রথা ভেঙ্গে মন্দিরে গুড়ের ব্যবহার চালু করতে পারবো না। আমার মন্দিরে বিদেশী চিনিই চলবে।'

ছাত্রদলের সঙ্গে ক্ষুদিরাম রাধাশ্যামের পায়ে পড়ে মিনতি করল, "শুকুল মশাই, দেশবাসী সবাই পণ নিয়েছে, বিদেশী চিনি একেবারে বর্জন করবে, আপনি কেন আলাদা হয়ে স্বদেশীর গৌরব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছেন? দেশ-মা ডাকছেন সবাইকে, আপনি সাড়া না দিলে যে তাঁরই অসম্মান!'

'আমি ও সব বুঝিনা। আমি ঐতিহ্য ভাঙতে পারবো না। তোমাদের অনুরোধে, নিত্যপুজায় যদিও বা আমি গুড়ের ব্যবহার অনুমোদন করতে পারি, বিদেশ থেকে যে সব যাত্রী আসে, তাদের দেওয়া বিদেশী চিনি আমি কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারবো না।'

রাধাশ্যামের এই কঠিন জেদের কাছে পিকেটারদের অহিংস প্রতিরোধ হার মানল।

গর্জাতে গর্জাতে ক্ষুদিরামের প্রতিবেশী নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় বলল,—'কলিতে দেবতারা সব ঘুমিয়ে থাকেন, নইলে এই সব অপবিত্র জিনিষ দিয়ে কি দেব পূজা চলে?'

ক্ষুদিরাম বলল,—'হ্যাঁ মানুষ যখন ঘুমোয়, দেবতারাও তখন ঘুমোয়। মানুষ জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবতারাও জেগে ওঠেন।'

হঠাৎ ক্ষুদিরামের ভাবান্তর উপস্থিত হল। নতজানু হয়ে যুক্ত করে দেবীমূর্তির দিকে সজল নয়নে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'মা! যত কিছু বিপদ আছে, সব তুমি আমার মাথায় চাপিয়ে দাও, তার বিনিময়ে তুমি আমার দেশকে বিদেশী ফিরিঙ্গী বণিকের কবল থেকে মুক্ত কর। আমার দেশের তাঁতী কামার কুমোরেরা দুবেলা পেট ভ'রে যেন খেতে পায়। মা, আমি সব মূর্ত্তির মধ্যেই দেশমাতাকেই দেখতে পাই। তোমার মধ্যেও তাঁকেই দেখছি। তোমার মান তুমিই রক্ষা কর মা।'

সবাই স্তম্ভিত, নির্বাক। একি আকুল প্রার্থনা। ক্ষুদিরামের সমস্ত হৃদয় যেন তার প্রার্থনায় গলে পড়েছে। বুঝি পাষাণও গলে যাবে, এই আকুল আবেদনে।

কঠিন-হৃদয় রাধাশ্যাম শুকুলও মুহূর্ত্তের জন্ম এক অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলেন।

এর দু'দিন পরেই ঘটল সেই অলৌকিক ঘটনা—যা আজও মেদিনীপুরবাসী সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে।

ঐদিন অপরাহ্ণে বড়বাজারের পথে ছাত্রদল পিকেট করে বেড়াচ্ছিল। ক্ষুদিরামের নেতৃত্বে পিকেটাররা প্রতি দোকানে গিয়ে তাদের আবেদন জানাচ্ছিল,—বিদেশী পণ্য বর্জন করতে, ও স্বদেশী দ্রব্য বাজারে চালু করতে। দোকানদাররাও উৎসাহিত। আবেদনে বেশ সাড়া জেগে উঠেছে।

শরৎকাল। হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল বেগে শুরু হল বর্ষণ। ক্ষুদিরাম ও ললিত সারদাপ্রসাদ নাগের দোকানে আশ্রয় নিল। আর সব পিকেটার, যে দোকান সামনে পেল, তার মধ্যেই ঢুকে পড়লো। ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি, বর্ষণ, সে এক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড।

হঠাৎ একটা নীলাভ আলোকে গোটা বড়বাজার ঝলসে উঠলো। সবার চোখ যেন কিছুক্ষণের জন্ম আচ্ছন্ন হয়ে গেল এক অলৌকিক চেতনায়...ভীষণ এক বজ্রপাত!

কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল, বড়বাজারের শীতলা-মন্দিরে বজ্রপাত হয়েছে। সবাই মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেখলো, একি! মন্দিরের মালিক রাধাশ্যাম শুকুলের বালিকা কন্যা বজ্রদগ্ধ—দেহে প্রাণ নেই। আর মন্দিরের পূজক ভগবতী ভট্টাচার্য্য সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, মন্দিরের চাতালে শয়ান!

মেদিনীপুর সহর ভেঙ্গে পড়ল শীতলা-মন্দিরের প্রাঙ্গণে। তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। শুকুল মশাই অতঃপর দেবী-মন্দিরে দেশী গুড় ব্যতীত চিনির ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করে দিলেন। ক্ষুদিরামের শীতলা-রূপিণী দেশ-জননী নিজের মান এই ভাবেই রক্ষা করলেন।

—দশ—

সেদিন ললিতবাবুর মুখ থেকে ক্ষুদিরাম-সম্পর্কিত এইসব খণ্ড খণ্ড কাহিনী শুনে যখন বাসায় পৌঁছলাম, রাত্রি তখন গভীর। পল্লী নিস্তব্ধ। মনে হল, ঠিক সেই সময়টিতে আমার চারপাশে আর কেউ নেই, শুধু রয়েছে চির দীপ্যমান এক বহ্নি-শিখা, আমাকে বলয়ের মত বেষ্টন করে। আর সেই বহ্নি-শিখা বিচ্ছুরিত হচ্ছে অগ্নিশিশু ক্ষুদিরামের মূর্ত্তি থেকে। বুঝলাম, গোটা-মানুষ ক্ষুদিরামকে আজ সম্পূর্ণভাবে জেনেছি,—যে আগুন সে ছড়িয়েছিল দেশে, সে আগুন ছিল তার বুকে, ধার করতে হয় নি তাকে। সেই আগুনের খেলা শেষ করে, বিপ্লব-তীর্থে সে আত্মাহুতি দিয়েছে।...মনে হল, আমার যে প্রশ্ন ললিতবাবুকে করেছিলাম, তার সম্পূর্ণ সমাধান, ঐ কাহিনীগুলির মধ্যেই পেয়েছি।

দুই কর যুক্ত হল। মাথা নত হল।

স্ত্রী বললেন, 'কাকে প্রণাম করছ, এই অসময়ে?'

বললাম, 'চির অনির্বাণ বহ্নি-শিখাকে।'

ভারতীয় মহাকাব্যে নারীসমাজ

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

(৩)

উপদেশাত্মক মহাভারত বলছেন স্ত্রীলোক কখনও স্বাধীন নয়—বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে সে পুত্রের অধীন। এই মন্তব্য মোটামুটি সমগ্র মহাভারত সম্পর্কেই প্রযোজ্য। বিক্রান্ত কাহিনীগুলোতে স্ত্রী-স্বাধীনতা যথেষ্ট থাকলেও কেউই সম্পূর্ণ স্বাধীন নন; সর্বোপরি অভিভাবক প্রত্যেকেরই রয়েছে। যে নায়িকা প্রণয়-আকৃষ্টা, তিনিও বিবাহের পূর্বে পিতার অনুমতির অপেক্ষা রাখেন। বিবাহের পর কন্যা স্বামিগৃহে আসেন স্বামিগৃহে তাঁর আসন নির্দিষ্ট করে। উপদেশাত্মক মহাভারত বলছেন—স্ত্রী সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হবেন এবং সদয় ব্যবহারে তাঁকে তুষ্ট রাখা উচিত; কারণ স্ত্রী সর্বদাই পূজনীয়া। নারী যে গৃহে পূজিতা, দেবতারা সেখানে বাস করেন। যদি কুলবালার অন্তরে কোন দুর্ব্যবহারের আঘাত এসে লাগে, তবে সে গৃহের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়। * * * নারীর পতিই ধর্ম, অন্য ধর্মাচরণে তার প্রয়োজন নেই। অনুশাসন পর্বের এই বিবৃতি থেকে পতিগৃহে নারীর স্থান সম্বন্ধে সাধারণ একটা ধারণা সৃষ্টি করা চলে। বিক্রান্ত কাহিনীতে নারীসমাজের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাও এই বিবৃতির মোটামুটি সমর্থক। বিক্রান্ত যুগের কাহিনী এবং উপদেশাত্মক এই বিবৃতির সামঞ্জস্য একটা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছে। যে কোন সমাজে ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষাই নারীর স্বাধীনতার মূল। শিক্ষা এঁরা সকলেই পেতেন আর ব্যক্তিত্বও অনেকেরই ছিল। ব্যক্তিত্ব প্রভাবে গান্ধারী, কুন্তী, বিদুলা, দ্রৌপদী—এঁরা ভারত কাহিনীকে অনেকাংশে উজ্জ্বল করে তুলেছেন; নিষ্ক্রিয় স্বামী পুত্রকে বহুক্ষেত্রে উদ্দীপিত করে তুলেছেন। পঞ্চ স্বামী যে তাঁর অনুগত, এ ঘটনা দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা, গঙ্গা—এঁদের সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু জানি না; কিন্তু এই সামান্য পরিচয়েই তাঁদের বিশিষ্টতা ধরা পড়ে। অপর পক্ষে দুর্যোধনের স্ত্রীর কোন উল্লেখ ভারত কাহিনীতে বিশেষ স্থান পায় নি—তার কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাব।

ক্ষত্রিয় রাজারা প্রায় সকলেই ছিলেন বহু বিবাহকারী। একমাত্র রাম ও জনমেজয় ছাড়া শক্তিশালী কোন রাজাই একপত্নীতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রত্যেক নারীকেই তাই পতিগৃহে সপত্নীদের মেনে নিতে হ'ত। এক্ষেত্রে ঈর্ষার প্রশ্ন এসে পড়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে। দ্রৌপদীও সুভদ্রাকে প্রথমে ঈর্ষার দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। বিবাহিতা পত্নী ছাড়া দাসী বা উপপত্নী অনেকেই পোষণ করতেন এবং দাসীগর্ভে সন্তান উৎপাদনও করতেন। ধৃতরাষ্ট্রের দাসীগর্ভে উৎপাদিত সন্তান ছিলেন যুযুৎসু—বিদুরও দাসীগর্ভে ব্যাসদেবের সন্তান। পুরুষের বহু বিবাহের সঙ্গে এসে পড়ে নারীর বহু বিবাহের প্রশ্ন। অথর্ববেদে নারীর বহু বিবাহের উল্লেখ আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী বিখ্যাত, যুধিষ্ঠির পুরাকাহিনী হিসেবে বহু বিবাহকারী নারীর উল্লেখ করেছিলেন। পাণ্ডু কুন্তীকে বলেছিলেন—'পুরাকালে নারীরা স্বাধীন ছিল, তারা স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিচরণ করত, তাতে দোষ হত না, কারণ প্রাচীন ধর্মই এই প্রকার। উত্তরকুরু দেশবাসী এখনও সেই ধর্মানুসারে চলে। এদেশেও এই প্রথা অধিককাল রহিত হয়নি'—এই প্রথা রহিত করেছিলেন উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু। মহাভারতে দেখা যায়—স্বামী যদি পুত্র উৎপাদনে অসমর্থ হন বা পুত্র উৎপাদনের পূর্বেই দেহত্যাগ করেন, স্ত্রী স্বামীর বা অন্য গুরুজনদের আদেশ নিয়ে অন্য পুরুষের ঔরসে সন্তানের জন্ম দিতে পারেন—একে বলা হয়েছে নিয়োগ প্রথা। অনেকের মতে নিয়োগ প্রথা বহু বিবাহেরই একটা রূপ। নিয়োগ প্রথা বিক্রান্তযুগের নারী-সমাজের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই প্রথার প্রচলন হয়ত এই কথাই প্রমাণ করে যে, সন্তান উৎপাদনই হল বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য। পতির অনুমতিতে অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সন্তান পঞ্চপাণ্ডব, আর পতির মৃত্যুর পর গুরুজনের আদেশে অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সন্তান পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র। নিয়োগ প্রথা থেকে পুত্রের প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কার হলেও, ভারত কাহিনীতে একমাত্র সন্তানের জন্য বিবাহ—এই মতের সমর্থন সর্বত্র পাওয়া যায় না; কারণ তা'হলে সন্তান-গৌরব ভিন্ন অন্য কোন গৌরবে তাঁরা অধিষ্ঠিত হতে পারতেন না। বিবাহের পর নারী পত্নীরূপে স্বামীর ধর্মজীবন ও সমাজজীবনে সম অংশী, আবার জায়ারূপে দাম্পত্য অধিকারে তার প্রতিষ্ঠা—সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থাতে স্ত্রী স্বামীর পার্শ্ববর্তিনী। পাণ্ডব স্বামীদের সঙ্গে দ্রৌপদী বনে গিয়েছিলেন; সীতা রামের সঙ্গে বনগমন করেছিলেন—সাবিত্রী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে স্বামীর কুটীরে বাস করতে পশ্চাৎপদ হননি। পত্নী ছাড়া ধর্মজীবনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। মহাভারত

বলেন—পত্নী ভিন্ন গৃহ শূন্য, পত্নীই গৃহের দীপ্তি—আনন্দস্বরূপ। পত্নীর মত বন্ধু কেউ নেই। পরবর্তী সংহিতা এবং ব্রাহ্মণসমূহ এই মতের পরিপোষক। শতপথ ব্রাহ্মণ তো বলেন—পত্নী ভিন্ন কেউই পূর্ণ নয়।

বিক্রান্ত যুগের নারী অবলা নন—স্ত্রী ও মাতারূপে তাঁর সবল কণ্ঠ বার বার আমরা শুনতে পাই। বীর নারী দ্রৌপদী এক অসামান্যা চরিত্র। আপন ব্যক্তিত্ব প্রভাবে স্বামীদের কাছে তিনি সমাদর ও শ্রদ্ধার পাত্রী। যুধিষ্ঠির বিরাটপর্বে বলেছেন—আমাদের এই ভার্যা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় রক্ষনীয়া। অসহিষ্ণু তেজস্বিনী এই নারী তীক্ষ্ণ বাক্যে নিষ্ক্রিয় পুরুষকে বার বার উত্তেজিত করেছেন। শুধু বাক্য নয়, প্রয়োজন হলে শারীরিক বলও তিনি প্রকাশ করেছেন—জয়দ্রথ ও কীচক তার পরিচয় পেয়েছিলেন। মাতা হিসাবে কুন্তী, বিদুলা এবং গান্ধারী যে বল প্রকাশ করেছেন তা সর্বযুগেই দুর্লভ। কুন্তী উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'কেশব তুমি যুধিষ্ঠিরকে আমার এই কথা বলো' পুত্র, তুমি মন্দমতি; শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় কেবল শাস্ত্র আলোচনা করে তোমার বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে * * * ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা নির্দিষ্ট করেছেন, তুমি তার দিকে মন দাও * * * দুর্বল ও অহিংসা পরায়ণ রাজা প্রজাপালন করতে পারেন না।' পরাজিত নিশ্চেষ্ট পুত্রকে উদ্দেশ্য করে বিদুলা বলেছিলেন—'তুমি আমার পুত্র নও—তুমি ক্রোধহীন ক্লীবতুল্য * * * তুমি নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় কেবল ধূমায়িত হয়ো না মুহূর্তকালের জন্যেও জ্বলে ওঠ শত্রুকে আক্রমণ কর।' আর একটি অসামান্যা চরিত্র গান্ধারী, এই সত্যনিষ্ঠ দৃঢ়চেতা নারী এক বিশাল ট্রাজেডী; বুদ্ধি ও বিবেচনার জন্য তিনি শ্রদ্ধার পাত্রী—এমন কি উপদেশ দেবার জন্য রাজসভাতে তাঁকে আহ্বান করা হয়। উদ্ধত অন্যায়-নিষ্ঠ পুত্ররা কখনও তাঁর কথা শোনেনি—পুত্রস্নেহে তিনি কখনও স্বামীর মত পুত্রদের আচরণ সমর্থন করেন নি। শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র প্রভাবে এই মনস্বিনী নারী তাঁর স্বামী-পুত্রের জগৎ থেকে বহুদূরে বাস করেন। সমস্ত উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তিনি প্রতিকার করতে পারেন না—শুধু অসহায় দীর্ঘশ্বাসই তাঁর জীবনের সম্বল। গান্ধারী উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—'মহারাজ, তুমিই দোষী। পুত্রদের দুষ্ট প্রবৃত্তি জেনেও স্নেহবশে তার (দুর্যোধনের) মতে চলেছ। অশিষ্ট, অবিনীত, ধর্মনাশক লোকের রাজ্য পাওয়া উচিত নয়; তবুও সে পেয়েছে। মূঢ় দুরাত্মা লোভী কুসঙ্গী পুত্রকে রাজ্য দিয়ে এখন তার ফল ভোগ করছ।' কৌরব পক্ষ অধর্মাশ্রিত জেনেও তিনি শেষ অবধি বলেছেন—যথা ধর্ম তথা জয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর শতপুত্রের মৃত্যুতে পাণ্ডবদের উপর তাঁর স্বাভাবিক বিদ্বেষ এসেছিল, কিন্তু সে বেশীক্ষণ টিকিতে পারে নি।

মহাভারতের নায়িকা দ্রৌপদী আর রামায়ণের নায়িকা সীতা—দুইজনে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী, সীতা বিক্রান্ত যুগের নায়িকা নন। দ্রৌপদী ও সীতা উভয়েই স্নেহশীলা পতিপ্রাণা, কিন্তু যে তেজস্বিতা দ্রৌপদী চরিত্রের মুখ্য উপাদান, সে সীতা চরিত্রে কোথাও নেই। বনপর্বে সপ্তম পরিচ্ছেদে যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী বলেছিলেন—'মহারাজ বিধাতা প্রাণীগণকে পিতামাতার দৃষ্টিতে দেখেন না, তিনি রুষ্ট ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করেন।, সীতা জীবনে অনেক দুঃখ ভোগ করেছিলেন কিন্তু দ্রৌপদীর মত এই তীব্র ধিক্কার তাঁর মুখে কখনও শোনা যাবে না। সীতা ধৈর্য, সত্য, স্নেহ প্রেমের প্রতীক! শত্রুর অত্যাচার উভয়েই ভোগ করেছেন কিন্তু স্বামীর অবিশ্বাস ও দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন দ্রৌপদীকে কখনও হতে হয় নি। সীতা নিজেকে নিপীড়িত হতে দিয়েছেন কিন্তু কখনও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নি, প্রতিহিংসার কথা চিন্তা করেন নি। মাত্র একবার ছাড়া কখনও কটুবাক্য উচ্চারণ করেন নি। বিশ্বসংসারের সমস্ত অপরাধই তিনি অন্তরের প্রশান্তি ও ত্যাগ শক্তির বলে বার বার ক্ষমা করেছেন। মহাভারতের পরবর্তী-অংশে মানব ধর্মশাস্ত্রে, বিষ্ণুসংহিতায় ও অন্যান্য পুরাণ ইত্যাদিতে নারীর যে আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে, তার সমস্তই একত্রে রূপ পেয়েছে সীতা-চরিত্রে। সীতা চরিত্র ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ। বিবেকানন্দ সীতা চরিত্রের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—Sita is the name in India for everything that is good, pure and holy; everything that in woman we call woman * * * Sita—the patience all-suffering ever-faithful ever-pure wife! though all the suffering she had there was not one harsh word aginst Rama she never returned injury. Be Sita.

মাতার আসন মহাকাব্যের সর্বত্রই উচ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলা হয়েছে মাতা পিতা অপেক্ষাও মহান্। কিন্তু কাহিনী অংশে পরশুরাম পিতার আদেশে মাতাকে হত্যা করেছিলেন, মাতা সর্বদাই শ্রদ্ধেয়া এবং মাতার বাক্য সর্বদাই পালনীয়, শাস্ত্রবাক্যের মত অলঙ্ঘনীয়। যে পুত্র বিধবা মাতাকে পালন করে না, সে অগৌরবে কলঙ্কিত হয়। পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের মাতার প্রতি বিশ্বস্ত এবং শ্রদ্ধাশীল, কুন্তী নিজের এবং মাদ্রীপুত্রদের মধ্যে কখনও বিভেদ করেন নি—এ তাঁর মাতৃত্বের মহত্ত্ব।

মহাকাব্যের আদি যুগে অর্থাৎ বিক্রান্ত যুগে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। দ্রৌপদী, শকুন্তলা, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, উলুপী এঁরা কেউই অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকতেন না। গান্ধারীকে প্রকাশ্য সভায় পরামর্শের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল—যদি কুলস্ত্রীরা কঠোরভাবে অবরোধের অন্তরালে বাস করতেন, তবে হয়ত এটা সম্ভব হত না। অন্যপক্ষে দ্যূত সভায় দ্রৌপদীর উক্তি থেকে মনে হবে তিনি প্রকৃত অর্থে অন্তঃপুর-বাসিনী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মৃত পতিদের দেখবার জন্য যখন তাঁদের স্ত্রীরা বাহির হলেন, তখন তাঁদের অসূর্যম্পশ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ অসঙ্গতির মূলে রয়েছে বিভিন্ন কালের ও কবির স্পর্শ। পরবর্তী কালে এই প্রথার প্রচলন নিশ্চিতভাবে বহুল হয়ে উঠেছিল অর্থাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতা বিশেষ ভাবেই খর্ব করা হয়েছিল। তবে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই আবরণ উন্মোচন করা হত; যেমন স্বয়ম্বর-সভার অনুষ্ঠান ইত্যাদি। উপদেশাত্মক মহাভারত পড়ে মনে হবে স্ত্রী-স্বাধীনতা এতদূর খর্ব করা হয়েছিল যে, নারীর ধর্মীয় শিক্ষার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। বেদ পাঠের অধিকার থেকে স্ত্রীলোককে বঞ্চিত করে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকে বেদ পাঠ করলে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়। অনুশাসন পর্বে বলা হয়েছে পতির প্রতি আনুগত্যই নারীর ধর্ম, ব্রত, উপবাস, যাগযজ্ঞ, অন্য সবকিছুই তার নিষ্প্রয়োজন। কাহিনী অংশে কিন্তু বিপরীত

উদাহরণ দেখা যায়—কাশীরাজ কন্যা অম্বা ভীষ্মকে বধ করবার উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করেছিলেন বলে কথিত আছে।

ক্ষত্রিয় রাজাদের একাধিক পত্নী ছাড়া বহু দাসী বা উপপত্নী যে থাকত, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—এই দাসীদের দান বিক্রয় করা চলত। সালংকারা যুবতী দাসী দান করবার ঘটনা বহুবারই ঘটেছে। কৃষ্ণ কৌরব-সভায় দৌত্যে এলে ধৃতরাষ্ট্র অন্যান্য উপহারের সঙ্গে সন্তান হয়নি এমন একশত সুন্দরী দাসী দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। স্ত্রীলোক ক্রয় বিক্রয় প্রথার নিন্দা করা হলেও এর প্রচলন বন্ধ করা যায়নি। এ ছাড়া ছিল রাজানুগৃহীত বারবনিতা—এরা শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করত এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকত।

বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মহাভারতে নেই ; তবে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা সম্ভব ছিল, এ ঠিক। পুত্রলাভ যে বিবাহের উদ্দেশ্য, এ কথা সবাই স্বীকার করেন মনু পর্যন্ত। তাই যে নারী সন্তানধারণে অক্ষম তার সামাজিক মর্যাদা স্বভাবতই হ্রাস পেত। ধর্মশাস্ত্রকার বৌধায়ন এবং মনু স্ত্রী পরিত্যাগ সম্বন্ধে বলেছেন—দশম বর্ষে বন্ধ্যা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা উচিত, শুধু মাত্র কন্যা জন্ম যে দেয় দ্বাদশ বৎসরে তাকে পরিত্যাগ করা উচিত, মৃতবৎসা স্ত্রীকে পঞ্চদশ বর্ষে এবং কলহপরায়ণা পাপ-স্পৃষ্টাকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করা উচিত। বশিষ্ঠের মতানুযায়ী স্ত্রী সকল অবস্থাতেই অপরিত্যাজ্যা ; প্রায়শ্চিত্তে তার সর্বপ্রকার অপরাধের স্খালন হতে পারে। আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র অন্যায়ভাবে স্ত্রী পরিত্যাগকারীর জন্য কঠোর দণ্ড বিধান করেছেন। পুরুষ যদি বর্ণচ্যুত হয় তবে সে বিবাহের অধিকার হারায় আর নারী বর্ণচ্যুত হলেও বিনা পণে এমন কি দ্বিজের সঙ্গেও বিবাহিত হতে পারে। ধর্মশাস্ত্র এবং গৃহ্যসূত্রগুলোর রচনা-কাল মহাভারতের দীর্ঘ গঠনকালের একটা অন্তঃস্থিত অংশ। এদের বিভিন্ন বিরুদ্ধ উদ্ধৃতি থেকে নারী সমাজের অবস্থার ক্রমাবনতির একটা ধারা পাওয়া যাবে। বিক্রান্তযুগের স্বাধীন নারী ও অনুশাসন পর্বের সম্পূর্ণ পরাধীন এবং ধিকৃত নারী সমাজের মধ্যে এরাই একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

অনুশাসন পর্বে যুধিষ্ঠিরের বর্ণ সংকরের উৎপত্তি ও কর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলেন—'পিতা যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে ব্রাহ্মণীর পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ার পুত্র মূর্ধাভিষিক্ত, বৈশ্যার পুত্র অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রার পুত্র পারশব নামে উক্ত হয়। পিতা যদি ক্ষত্রিয় হয় তবে ক্ষত্রিয়ার পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যার পুত্র মাহিষ্য, শূদ্রার পুত্র উগ্র নামে কথিত হয়। পিতা বৈশ্য হলে বৈশ্যার পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্রার পুত্রকে করণ বলা হয়। শূদ্র-শূদ্রার পুত্র শূদ্রই হয়। নিম্ন বর্ণের পিতা ও উচ্চবর্ণের মাতার সন্তান নিন্দনীয় হয়। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণীর পুত্র সূত, তাদের কর্ম রাজাদের স্তুতিপাঠ। বৈশ্য-ব্রাহ্মণীর পুত্র বৈদেহক বা মৌদগল্য তাদের কর্ম অন্তঃপুর রক্ষা, তাদের উপনয়নাদি সংস্কার নেই। শূদ্র-ব্রাহ্মণীর পুত্র চণ্ডাল, তারা কুলের কলঙ্ক, গ্রামের বহির্দেশে বাস করে এবং ঘাতকের কর্ম করে। বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ার পুত্র মৎসজীবি নিষাদ। শূদ্র-বৈশ্যার পুত্র আয়োগব (সূত্রধর)। শাস্ত্রে কেবল চতুর্বর্ণের ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, বর্ণসংকর জাতির ধর্মের বিধান নেই। তাদের সংখ্যারও ইয়ত্তা নেই। * * * ঔরসজাত পুত্র আত্মস্বরূপ। পতির অনুমতিতে অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সন্তানের নাম নিরুক্তজ (ক্ষেত্রজ), বিনা অনুমতিতে সন্তান হলে তার নাম প্রসৃতিজ। বিনামূল্যে প্রাপ্ত অপরের পুত্র দত্তকপুত্র, মূল্য দ্বারা প্রাপ্ত কৃতকপুত্র। গর্ভবতী স্ত্রীর বিবাহের পর যে পুত্র হয়, তার নাম অধ্যোঢ়। অবিবাহিত কুমারীর পুত্র কানীন।' এই বিবৃতি থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণ চারটি, ক্ষত্রিয় তিনটি, বৈশ্য দুইটি এবং শূদ্র মাত্র একটি বিবাহ বিধিসঙ্গতভাবে করতে পারে। উচ্চবর্ণের কন্যা এবং নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহের নিন্দা করা হয়েছে, কিন্তু রোধ করা যায়নি। সমগ্র মহাভারতে আমরা যে সমাজচিত্র পাই তা বহুলাংশে উচ্চ ক্ষত্রিয় রাজন্যশ্রেণীর বা ব্রাহ্মণশ্রেণীর। লোক সাধারণ সমাজের যে অংশ তার সম্বন্ধে আমরা সামান্য ধারণাই করতে পারি —ওপরের এই উদ্ধৃতি থেকে সেই সামান্য ধারণা সৃষ্টির কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

বৈধব্যের পর নারীর জীবনের অধিকার পরবর্তী হিন্দু-সমাজ অস্বীকার করেছিল। কিন্তু সতী প্রথার প্রচলন বিক্রান্ত যুগের সমাজে ছিল না বললে ভুল হবে না। উপদেশাত্মক মহাভারত বলছেন সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন-ধারণে ইচ্ছা করেন না। মাদ্রী স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হয়েছিলেন এবং যুদ্ধের পর কুরু বীরদের বিধবা পত্নীরা ভাগীরথীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও সতীপ্রথার বিরুদ্ধে মহাভারতে প্রমাণ প্রবলতর। কুন্তী, বিদুলা, সুভদ্রা—এঁরা প্রত্যেকেই বৈধব্যের পর পুত্র পৌত্রদের সঙ্গে বাস করেছিলেন। মহাভারতে যুদ্ধে মৃত বীরদের পত্নীদের বৃত্তি যে বিধান রয়েছে সে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রমাণ। ধর্মসূত্রে স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার স্বীকৃত—সুতরাং সতীপ্রথার বহুল প্রচলন যে ছিল না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে—তবে বিক্ষিপ্ত দু' একটা ঘটনা যে ঘটত না, এমন কথাও জোর দিয়ে বলা চলে না। বিধবার পুনর্বিবাহের কোন দৃষ্টান্ত মহাভারতে নেই। নিয়োগ প্রথাকে অনেকে পুনর্বিবাহ বলে ধরতে চান কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। যদি কোন বিধবা অন্য পুরুষের সাহায্যে সন্তান উৎপাদন করেন তবে সেই পুরুষ মৃত স্বামীর প্রতিনিধি হিসাবে গৃহীত হন এবং সেই সন্তান মৃত স্বামীর বংশধর বলেই গ্রাহ্য হয়। মহাভারতে বিধবার পুনর্বিবাহের নিন্দা করা হয়েছে। বশিষ্ঠ তাঁর ধর্মসূত্রে বিধবার পুনর্বিবাহের বিধান দিয়েছেন—তবে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। পুনর্বিবাহিত বিধবার সন্তানকে তাঁর ধর্মসূত্রে স্বীকৃত বার প্রকার সন্তানের অন্যতম বলে ধরা হয়েছে।

মহাভারতের কাহিনী অংশে স্ত্রীলোকের স্বকীয় সম্পত্তির কোন অবকাশ নেই। বরং দ্যূতসভায় দ্রৌপদীকে পণ রাখার ঘটনা থেকে এই অনুমানই হবে যে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির মধ্যেই গণ্য। পরবর্তী সংযোজনে সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের অধিকার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি অপুত্রক অবস্থায় মারা যান তাঁর বিত্ত কন্যা পেতে পারেন কারণ দুহিতা পুত্রেরই সমান। তবে এ ক্ষেত্রে দুহিতার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্রও মাতামহের বিত্তের অধিকারী হতে পারেন—কারণ দৌহিত্রের অধিকার পুত্রের মতই। দৌহিত্র পিত্রাধিকারী। পুত্র থাক বা না থাক, মাতার যৌতুক ধনে কন্যারই অধিকার। বিবাহকালে প্রদত্ত যৌতুকেও কন্যার অধিকার। পুত্রহীন অবস্থায় যদি কারও মৃত্যু হয় তবে ক্ষেত্র বিশেষে তার স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত বিষয় লাভ করতে পারে—স্বামীর পরিত্যক্ত

ধনে তার ভোগ বিক্রয়ণের অধিকার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর মৃত্যু হলে তার যে কন্যা সর্বোচ্চ বর্ণে অধিষ্ঠিতা সেই মাতার বিত্ত লাভ করবে। কোন স্ত্রীলোক যদি অরক্ষিতা হয়ে পড়ে তবে তার বিত্ত রাজা বাজেয়াপ্ত নাও করতে পারেন। পুত্রহীন পিতা কন্যাকে পুত্রাধিকারে স্বীকার করে নেবার পর যদি পুত্র লাভ করেন তবে তাঁর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত বিষয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত হবে। কন্যা পাবে দুই ভাগ আর পুত্র পাবে তিন ভাগ। আবার কন্যাকে পুত্রাধিকারে স্বীকার করে নেবার পর কোন পুত্রহীন পিতা যদি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন বা কৃতকপুত্র ক্রয় করেন সে ক্ষেত্রে পাঁচ ভাগে বিভক্ত পিতৃ সম্পত্তির তিন ভাগ পাবে কন্যা দুই ভাগ পুত্র। বিক্রীত কন্যা বা সেই কন্যার পুত্ররা কোনক্রমেই পিতার বা মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না। কারণ বিক্রীত কন্যা পিতৃগৃহের সঙ্গে কোনক্রমেই সংশ্লিষ্ট থাকে না বা থাকতে পারে না।

সাধারণভাবে বলা হয়েছে স্ত্রীলোক অবধ্য কিন্তু ভীষণতর আইনের বিধানে 'বধ' এই শব্দে যে পরিমাণ ভয়াবহতা বোধগম্য হয় তার চেয়ে বহুগুণ নিষ্ঠুর উপায়ে সাবালিকা অপরাধীকে বধ করা উচিত।

বিপুল-প্রসর মহাভারত রামায়ণে দীর্ঘকালের ছায়া এসে পড়েছে তাই কাল থেকে কালান্তরের সামাজিক বিবর্তনের চিত্র ভারতের মহাকাব্যে অঙ্কিত রয়েছে। ঋগ্বেদে যে স্বাধীন সুখী নারী সমাজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় সেই সমাজেরই চিত্র ভারত কাহিনী ও অন্যান্য বীর কাহিনীতে ফুটে উঠেছে। উভয় ক্ষেত্রেই নারী এক মুক্ত অধিকারী। কালে বিভিন্ন কারণে বন্ধন এসে পড়তে লাগল ধীরে ধীরে তার কর্মে বাক্যে শিক্ষায় ধর্মে স্বাধীনতা লোপ পেতে সুরু করল—অবশেষে অনুশাসন-পর্বে নারী সমাজের প্রতি যে বিধি বিধান প্রয়োগ করা হ'ল সেই হল তার অধীনতার শেষ পর্যায়। রামের বনবাসকালে কৌশল্যা সীতাকে বলেছিলেন: যে নারী প্রিয়জনের আদর ভাজন হয়েও স্বামীর সেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত। কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসনভূষণের বশীভূত নয়। ধর্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে এবং দোষ দেখিয়ে দিলে অস্বীকার করে যারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের কুলমর্যাদা পালন করে, যারা সত্যবাদী এবং শুদ্ধ স্বভাবা সেই সব সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্য সাধন জ্ঞান করে। আমার রাম যদিও বনে নির্বাসিত হচ্ছে তুমি তাকে কখনও অনাদর কোরো না। সে দরিদ্র বা সম্পন্ন বা হোক তুমি তাকে দেবতুল্য বিবেচনা করবে।' রামায়ণের এ উক্তি অনুশাসন পর্বেরই প্রতিধ্বনি। নারীর এই সঙ্কুচিত জীবনের পেছনে কি কি অর্থনৈতিক সামাজিক বা রাজনৈতিক যুক্তি আছে, তা' আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় এবং মহাকাব্যের কোথাও তেমন কোন কারণ নির্দেশ করা হয় নি, কিন্তু ক্রমাবনতির ধারাটা মহাকাব্য এবং বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ থেকে পরিস্ফুট হয়ে আসে। পুত্র কামনা কেন স্বাভাবিক সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে—পুত্র কামনা ঋগ্বেদেও ব্যক্ত হয়েছে। কন্যার জন্ম কাম্য না হলেও কন্যা অনাদরণীয়ও নয়। পরবর্তী সংহিতাসমূহ এবং ব্রাহ্মণ যুগে নারী তার বৃহত্তর জীবনের ব্যাপ্তি থেকে অনেক সরে এসেছে—রাজনৈতিক অধিকারে সে বঞ্চিত। কোন কোন গৃহ্যসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্র নারী সমাজের প্রতি উদার মনোভাব অবলম্বন করলেও সাধারণ ভাবে গৃহ্যসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের যুগেও নারী সমাজকে বিবিধ বন্ধনে বেঁধে ফেলা হয়েছে। বলা হয়েছে নারী কখনও স্বাধীন নয়—পুরুষেরাই তার অভিভাবক। অনুশাসন পর্বে যে বিধিবিধান আরোপিত হয়েছে তাতে বহির্জগতের সর্বপ্রকার আলোক থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে এ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। রামায়ণ এবং মহাভারত উভয়ত্রই নারী জাতির চরিত্রের প্রতি, তার মানসিকতার প্রতি তার সততার প্রতি তীব্রতম কটাক্ষ করা হয়েছে—রাজার শক্তি ক্ষমতায়, ব্রাহ্মণের শক্তি পবিত্রতায় আর স্ত্রীলোকের শক্তি তার রূপ এবং যৌবনে, স্ত্রীলোকের লালসার অন্ত নেই। নারী বিদ্বেষের আতিশয্যে এক জায়গায় এমনতর বলা হয়েছে—জন্মই সকল দুঃখের কারণ আর নারী হল জন্মের কারণ সুতরাং নারীই হল সর্ব দুঃখের মূল। এই প্রকার কটাক্ষ বহু জায়গাতেই করা হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত মন্তব্য সাধারণভাবেই করা হয়েছে। গৃহে কিন্তু নারীর স্থান সুউচ্চ সম্মানের। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর আসনে তার অধিষ্ঠান। বধূ হিসাবে নারী সম্মানীয়া, মাতা হিসাবে পূজনীয়া। পরবর্তী সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ সমূহে নারী জাতির প্রতি প্রচুর স্তুতি বর্ষণ করা হয়েছে যেমন হয়েছে মহাভারতে। মহাভারত বার বার বলছেন নারী রক্ষণীয়া, পূজনীয়া, শ্রদ্ধেয়া। ভারতে নারীত্বের যে আদর্শ মধ্যযুগে স্বীকৃতি পেয়েছিল তার তত্ত্বমূলক প্রকাশ পূর্ণরূপে ঘটেছে মহাভারতের অনুশাসন পর্বে। পাতিব্রাত্যই নারীর ধর্ম—নারীর শক্তিই তার বাধ্যতায়। যে নারীর স্তুতি করা হয়েছে সে ধৈর্য সহ বিনয় ও ত্যাগের সমন্বয়ে গঠিতা নারী আর সেইখানেই সে মহৎ। বিধি বিধানে যে কল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে সে রূপ পেয়েছে সীতা চরিত্রে। ধরিত্রীকন্যা সর্বংসহা এই নারী ভারতীয় নারীত্বের চূড়ান্ত আদর্শ আজও কন্যাকে আশীর্বাদের সময় সীতা সাবিত্রীর নাম করা হয়ে থাকে। ভারত কাহিনীর জন্ম থেকে ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিরূপে মহাভারতের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ব্যাপ্ত করে সমাজ বিবর্তনের একটা জীবন্ত ধারা নারীর সামাজিক অবস্থার আলোকে অনেকাংশে পরিস্ফুট হয়ে আসে। আর এইখানেই নিহিত রয়েছে এই আলোচনার প্রকৃত অর্থ এবং গুরুত্ব।

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সে কালের বাঙ্গালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্মস্থলে কখন কোন্ স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে কয়টা জাতি এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে? যাহারা এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের লজ্জিত হইতে হইবে না।...

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
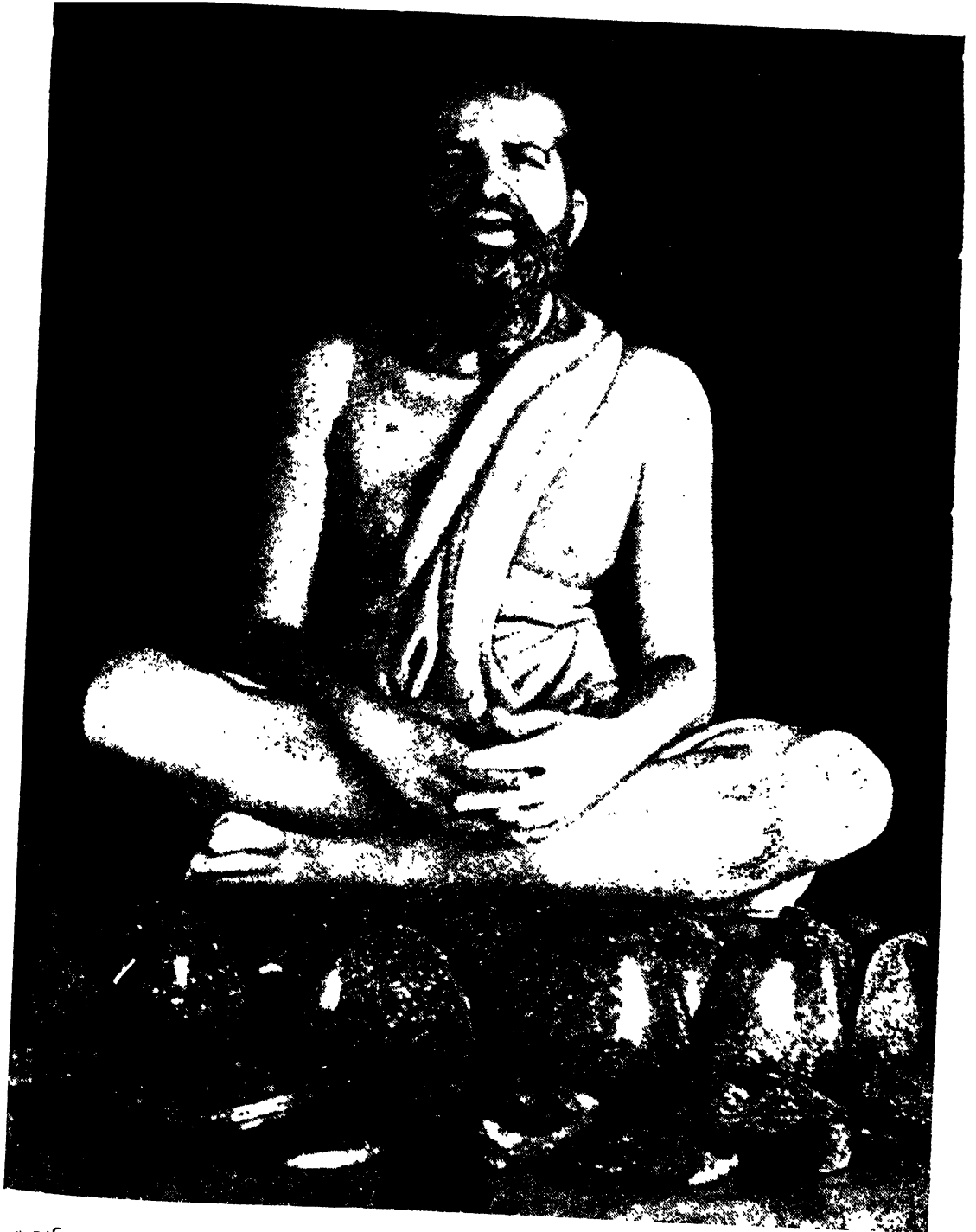
। ফাল্গুন, ১৩৬১ ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

(বাঁকুড়া আশ্রমের মূর্ত্তি)

—রামকিঙ্কর সিংহ
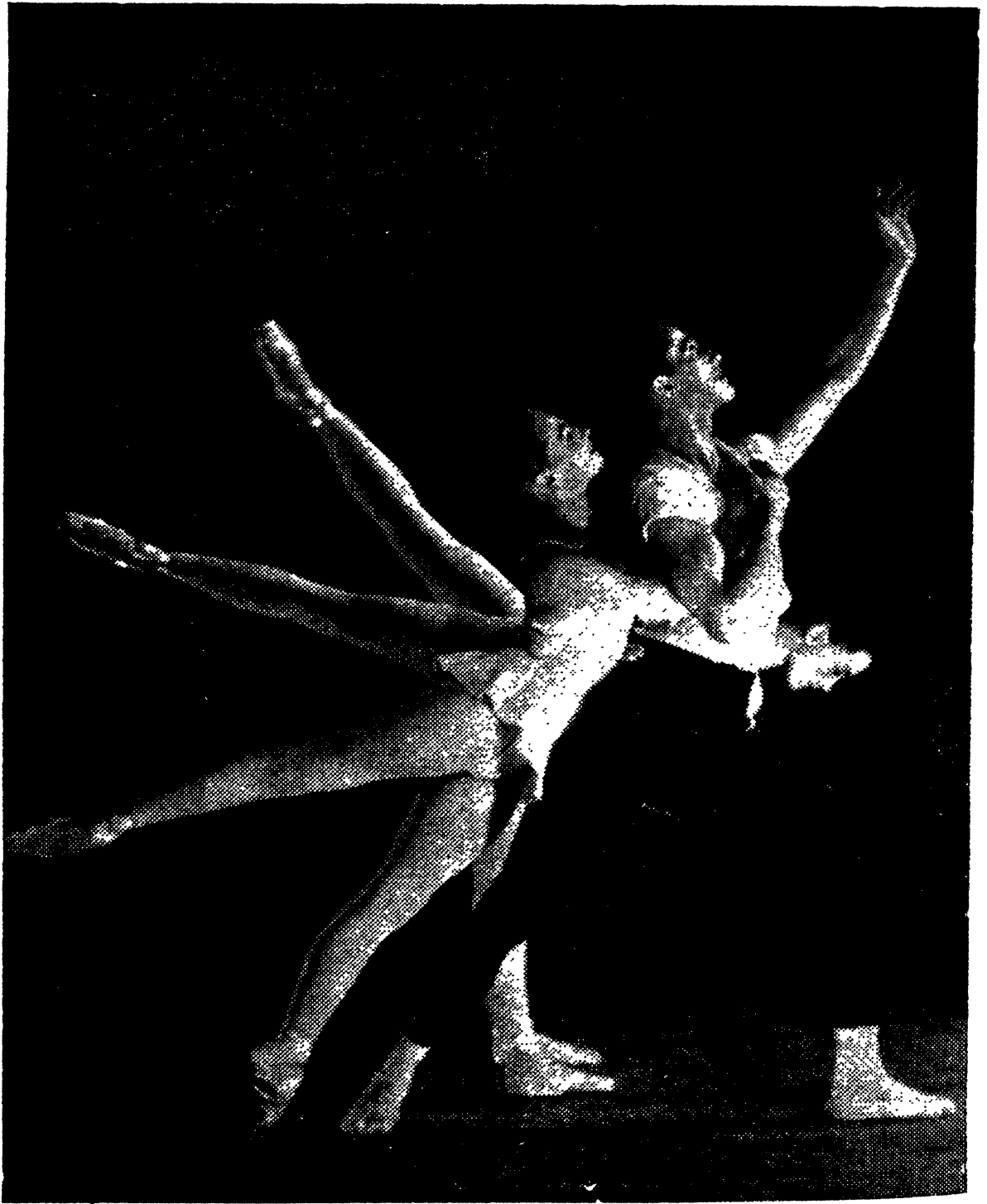
স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ব্যালে নৃত্য

—তাস নিউজ

জাপানী মেয়ে নয় জাপানী পোষাকে
বাঙালী দুহিতা এলা মুখোপাধ্যায়
—রমাদাস বসু

সিকিমের নববধূরাণী
শ্রীমতী হোপ কুকের এক বিশেষ ভঙ্গিমা
আলোকচিত্র—বসুমতী

[মনে রাখবেন যে, ছবি গ্লসি কাগজে ছাপা (print) হলে ছাপার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধে হয়।]

নর্ত্তকী

॥ মাসিক বসুমতী ॥

। ফাল্গুন, ১৩৬১ ।

শিল্পী—মনীষী দে

পূজারিণী

শিল্পী মনীষী দের আলোকচিত্র

মানুষের কবি

(রবীন্দ্রনাথের আলেখ্যনাট্য)

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

চতুর্থ দৃশ্য

[শিলাইদহ পদ্মাতীরে হানিফের ঘাট, রবীন্দ্রনাথের বজরা বাঁধা। কবি বোটের মধ্যে লেখাপড়ায় নিবিষ্ট। বোটের বাহিরে বরকন্দাজরা গল্পগুজবে মত্ত। কাছে স্নানের ঘাট। স্নানার্থীদের আনাগোনা। দেখা গেল, উমা বৈষ্ণবী ধূলোকাদা মেখে আলুথালুবেশে বকতে বকতে হন্ হন্ করে বোটের দিকে আসছে। তার পিছনে পুণ্যা বোষ্টমী, তারও ঐ বেশ, তার পিছনে একদল মেয়ে পুরুষ]

উমা। এ্যাঁ, এত বড় আস্পর্দা! জানিস বাবুমশাই আছেন। আমি তোকে একবার দেখে নেবো। তোর খেঁতোমুখ ভোঁতা করে দেব—দাঁড়া—

মেহের বরকন্দাজ। তোমরা কোথায় চলেছ গো। চ্যাচাচ্ছ কেন? কী হয়েছে।

উমা। আমি যাচ্ছি খোদ বাবুমশায়ের কাছে নালিশবন্দী হতে। ভাখোতো—

মেহের। দাঁড়াও, দাঁড়াও। নালিশ করলেই তো হয় না। দরখাস্ত কৈ? বাদী বিবাদী কে? সাক্ষী কে? দরখাস্ত দাও। তবে তো মামলা হবে।

উমা। লেখাপড়া জানা লোক পাইনি বাবা। দরখাস্ত নাই। আমি বাবুমশায়ের কাছে নালিশ করব। ঐ দজ্জাল চোকখাগী জমাদারণী মাগী আমায় মেরেছে। দেখছো না—পা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। আমায় খুন করে ফেলেছে।

মেহের। আচ্ছা দাঁড়াও, খবর দিই। চেঁচামেচি কোরো না। বাবুমশাই লেখাপড়া করছেন।

রবীন্দ্র। (বোটের বাহিরে এসে) ওরা কারা মেহের? এদের তো দেখছি নালিশ করতে এসেছে বুঝি। পাঠিয়ে দে ওদের ভেতরে।

(উমা ও পুণ্যা বোষ্টমী বোটের মধ্যে কবির নিকট হাজির হল)

কী গো, তোমাদের আবার কি হল? তোমরা যুদ্ধ যুদ্ধে গিয়েছিলে না কি! কী ব্যাপার বল দেখি। কিসের নালিশ?

উমা। (প্রণাম করিয়া) হুজুর ধর্মাবতার! আমাদের বাড়ি ঐ ঘোষপাড়ায়, কালাচাদ বৈরাগীর পাড়ায়। আমার বাড়ি আর এই পুণ্যা বোষ্টমীর বাড়ি পাশাপাশি। দু'বাড়ির মাঝখানে আমার সীমানায় আমি কয়েক ঝাড় আনারস গাছ পুঁতেছিলাম। আমার গাছে এবারে গোটাপাঁচেক আনারস ধরেছে। আমি আনারস তুলতে গেলে এই পুণ্যা বোষ্টমী ছুটে এসে বলল—কার গাছের ফল তুলছিস্। আমি বললুম—আমারই গাছ, আমারই ফল, আমিই তুলবো। পুণ্যা তখনি দাবী করল—ঐ ঝাড় তার নিজের, আনারসগুলো তার। আমি তো অবাক। পুণ্যা তখুনই হুজুর, আমায় যায়-বেজায় যাচ্ছেতাই গালাগালি করতে লাগল,—আমায় তেড়ে মারতে এল। আমি একখানা লাঠি নিয়ে দাঁড়ালাম। তাই দেখে ঐ খাণ্ডারণী পাড়া কুঁদুলে আগুন হ'য়ে ছুটে এল, একখানা কাস্তে দিয়ে আমার পা জখম করে দিয়েছে হুজুর। দেখুন হুজুর—আমার পা কেটে রক্ত গঙ্গা। হুজুর—সুবিচার করুন। ওর জ্বালায় এ পাড়ায় বাস করা অসম্ভব। অমন দুঁদে ঝগড়াটি, রণরঙ্গিনী ভূ-ভারতে নেই। গায়ের জোরে আবার গাছের ফলফুল তোলে। বলতে গেলে, দা, কুড়ুল, কাস্তে যা পায় নিয়ে মারতে আসে ঐ দরজ্জাল, শতেক খোয়ারী, শয়তানী—

রবীন্দ্র। শুনলাম তোমার কথা। তুমি পুণ্যা বোষ্টমী? তোমার কী বলবার আছে বল। সত্যি কথা বলবে।

পুণ্যা। (প্রণাম করে) ওর সব কথা মিথ্যা হুজুর। আমার বাড়ির ঐ দো-সীমানায় আমি ভালো ভালো কটি আনারসের চারা পুঁতে ছিলাম, জল ঢেলে কত কষ্টে এ্যাত বড় ঝাড় করেছিলাম। ঐ আনারসগুলো আমারই ঝাড়ে হয়েছিল হুজুর। তাই দেখে ঐ দজ্জাল বুড়ির জিভ লক্লক্ করত। আজ সকালে আমি রাঁধছি, এই ফসকালে ও ঐ ঝাড় থেকে পাঁচটি আনারস কেটে নেয়। মড় মড় শব্দ শুনেই আমি এই চুরি ধরে ফেলি—বললাম,—চোখের মাথা খেয়ে আমার আনারস তুলবে কেন? তার জবাবে বলে—আমার গাছ, আমার ফল আমি তুলবো, যা করতে পারিস করগে হারামজাদী। আমি মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করলুম। তাই কি শোনে? ও আমায় বাঁশের আগা নিয়ে তেড়ে মারতে এলো, যায় বেজায় অকথ্য গাল পাড়তে লাগল। এই দেখুন, হুজুর ধর্মাবতার, আমার হাত মুখ ছড়ে গেছে, রক্ত ঝরছে। ঐ বাঁশের আগা কাড়তে গিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড—চেঁচিয়ে পাড়া মাথায়

করে তুলল। পাড়ার সবাই ছুটে এল। তা নইলে ঐ দজ্জাল বুড়ি আমায় খুন করে ফেলত।

রবীন্দ্র। তোমার সাক্ষী কে কে? তারা এখানে আছে?

উমা। বিলকুল মিথ্যা বলছে হুজুর। কাস্তে ফেলে আমার পা কেটেছে, সে কথা গোপন করছে। আমার সাক্ষী আমারই পাড়ার বসন্ত মণ্ডল আর হেপাতুল্যা এখানে হাজির আছে হুজুর। তারা সত্যি কথা বলবে।

রবীন্দ্র। তোমার সাক্ষী কে পুণ্যা?

পুণ্যা। আমি ও বসন্ত মণ্ডল আর হেপাতুল্যা ধরামীকে সাক্ষী মান্‌ছি হুজুর।

রবীন্দ্র। ডাকো বসন্ত মণ্ডলকে। (বসন্ত হাজির হল) বল, তুমি কি দেখেছ।

বসন্ত। (প্রণাম করে) হুজুর ধর্মাবতার। এদিকে পুণ্যাবোষ্টমীর আর ওদিকে উমাদিদির বাড়ি। ঐ আনারসের ঝাড়গুলো হয়েছে দুই বাড়ির মধ্যে দো-সীমানায়। উমাদিদিই গাছ পুঁতেছিল আমি জানি। তার থেকে গোটাকতক চারা নিয়ে পুণ্যাও ঐখানেই কয়েকটা গাছ বানিয়েছিল, জল ঢেলে ঢেলে বেশ ডাগর করে তুলেছিল। ঐ আনারসক'টি কার গাছের তা বলা কঠিন, কারণ ঐ দো-সীমানায় দু'জনেরই গাছ। উমা ঠাকরুণই আনারস তুলেছিল।

রবীন্দ্র। যখন ঝগড়া মারামারি হয়, তখন তুমি সেখানে ছিলে? কী দেখেছ?

বসন্ত। আমি ঝগড়া শুনে ছুটে এসে দেখি, দু'জনেই বকাবকি করছে। উমাদি রেগে একটা বাঁশের আগা দিয়ে পুণ্যার গায়ে ঘা বসিয়ে দেয়। পুণ্যা পেছন ফিরে দাওয়া থেকে কাস্তে নিয়ে উমাঠাকরুণের গায়ে ছুড়ে মারে—তাইতেই উমাদির পা কেটে গেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

রবীন্দ্র। হেপাতুল্যা, তুমি কি দেখেছ বল। কিছু গোপন করবে না।

হেপাতুল্যা। মণ্ডলদা যা বলল,—সব ঠিক হুজুর। ঝগড়া ঐ দো-সীমানায় গাছের ঝাড় নিয়ে। আনারস খুলেছিল উমা-ঠাকরুণ, মুরলীর মা। তার পর যা হয়েছে—বসন্ত মণ্ডল যা বলেছে সব ঠিক হুজুর। আমি দেখেছি।

রবীন্দ্র। হুঁ! তোমাদের বাড়ির মালিক কোন জোতদার? কাকে খাজনা দাও?

উমা। আজ্ঞে, হুজুরের তশীলদার নিতাই রায়কে আমরা দু'জনেই খাজনা দিই।

রবীন্দ্র। একজন বরকন্দাজ এখুনি কাছারীতে গিয়ে নিতাই রায় মশায়কে এখানে ডেকে আনো,—আর ঐ পাঁচটি আনারস দড়ি বেঁধে আমার এখানে নিয়ে এসো। (কৃত্রিম রাগে) তোমরা দুজনে পাড়াটা গরম রাখো—তোমাদের ঝগড়াঝাটি চরম সীমায় উঠেছে। তোমাদের জরিমানা করব।

উমা। আর করবো না হুজুর। বাড়ির সীমানা ঠিক হয়ে গেলে আর ঝগড়া হবে না।

রবীন্দ্র। তার ব্যবস্থা হবে (দড়িতে বাঁধা পাঁচটা আনারস হাজির হল, তা দেখে) বাঃ। এগুলো দেখছি পেকেছে—এই একটার গায়ে কাস্তের কোপের দাগ! এমন মিষ্টি,—এমন সুগন্ধ জিনিষ, এর জন্তে কিনা ঝগড়া মারামারি! তোমরা ভয়ঙ্কর কুঁদুলে। তোমাদের শাস্তি দেব!

পুণ্যা। (পায়ে ধরিয়া) ধর্মাবতার হুজুর! এজন্মে আমি ওর সঙ্গে কথা কইবো না। জরিমানা করবেন না হুজুর। আমি গরীব, ভিক্ষে করে খাই।

রবীন্দ্র। হ্যাঁ, জানি, তুমি গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াও। শোনো, —মুরলী কে?

পুণ্যা। হুজুর, মুরলী ঐ দজ্জাল বুড়ির পুশ্যি্যি ব্যাটা। মুরলী খুব ভালো ছেলে। ও আমায় মাসী বলে ডাকে, আমি ওকে খুব ভালোবাসি হুজুর। ওর কোনো অপরাধ নেই। মুরলী আমায় মাসী বলতে অজ্ঞান।

রবীন্দ্র। (হাসিয়া) বটে! ডাকো মুরলীকে (বরকন্দাজ মুরলীকে হাজির করিল, সুন্দরকান্তি কিশোর বালক এসে কবিকে প্রণাম করল।)

মুরলী। আমি এ-সব কিছুই জানিনে হুজুর। আমি আমবাগানে বসে বাঁশের বাঁশী বানাচ্ছিলুম। ঝগড়াঝাটি দেখিনি।

রবীন্দ্র। বাঁশের বাঁশী বানাচ্ছিলি! বেশ করছিলি! বল্ উমা বোষ্টমী তোর কে হয়?

মুরলী। আমার মা হয়।

রবীন্দ্র। (হাসিয়া) আর পুণ্যা বোষ্টমী তোর কে হয়?

মুরলী। আমার মাসি হয় হুজুর?

রবীন্দ্র। মায়ে-মাসীতে ঝগড়া! তুই ঠ্যাকাতে পারিস্ নে খোকা ছেলে? কেবল বাঁশীই বাজাস্। এখন কি করবি মুরলী? ব'ল্—তুই মায়ের পক্ষে না মাসীর পক্ষে?

মুরলী। হুজুর, মা আমায় খুব ভালবাসে,—মাসিও। তবু ঝগড়া করে।

রবীন্দ্র। (উচ্চহাস্য) তবে তো ভারি মজা। মায়ে-মাসীতে খুনোখুনী হলে তুই বাপু, থাকবি কোথায়? তুই ঝগড়া বন্ধ করতে পারিস নে?

মুরলী। আমার কথা ওরা শোনে না-যে।

রবীন্দ্র। শোনে না! এত বড় আস্পর্দা! তোর কথা শুনতেই হবে ওদের! আলবৎ শুনবে। তুই এক্ষুনি পুণ্যার কাছে গিয়ে তাকে মাসি বলে ডাকতো। মাসীর কাছে যা।

পুণ্যা। (হঠাৎ আবেগে মুরলীকে বুকে জড়িয়ে ধরে) ওরে হারামজাদা! এতদিন আমায় গাল পেড়েছিস? মায়ের আদর বড় না মাসীর আদর বড় রে—হাড়হাভাতে? তোর মায়ের ভয়ে আমার ঘরে লক্ষ্মীপুজোর ভুজো খেতে আসিস নি! তোকে আমি দু'চোখে দেখতে পারিনে ওই ডাইনী বুড়ির জন্য। আজ তুই দুটি চোখ জলে ভাসিয়ে আমায় মাসি ব'লে ডাকলি মুখপোড়া! (অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মুরলীকে সজোরে বুকে চেপে ধরল)। তুই-ই আজ আমায় জব্দ করলি এতগুলো মানুষের সামনে।

রবীন্দ্র। (আনন্দে হো-হো করে হেসে) তুই ডাক—মাসী বলে ডাক—আমার হুকুম।

মুরলী। (লজ্জাবনত) মাসী—মাসী।

রবীন্দ্র। (আনন্দে হেসে) যা তোদের মামলা আমি ডিস্‌মিস্ করে দিলাম। আর কখনো ঝগড়াঝাটি হবে না। ঝগড়া হলে দায়ী হবে মুরলী। বুঝলি তো মুরলী? এক কাজ করতো। ঐ আনারস কটা নিয়ে আয় (মুরলীর তথাকরণ), ওর মধ্যে যেটা কান্তের কোপওয়ালা, সেটা তোর মাসী পুণ্যাকে দে। বাকিগুলো তুই বাড়ি গিয়ে কেটে খেয়ে ফেলবি। মাসী মায়ের বোন্ জানিস্ তো! (মুরলী, পুণ্যা ও উমা হাসিয়া উঠিল)।

মুরলী। আজ্ঞে হুজুর। দুজনকেই ভালোবাস্‌বো। মা-ও ভালো, মাসীও ভালো। ওরা আর কখ্‌খনো ঝগড়াঝাটি মারামারি করবে না হুজুর।

রবীন্দ্র। এই তো মামলার বিচার হয়ে গেল। মুরলী, তুই ভালো ছেলে। শোন, তুই আজই ঐ জমিতে যতগুলি আনারসের ঝাড় আছে, উপড়িয়ে ফেলে অৰ্দ্ধেক তোর মায়ের আর অর্দ্ধেক তোর মাসীর ঘরের পাশে বুনে দিবি। বুঝলি? (নিতাই রায়ের প্রবেশ) শোনো নিতাই, এই উমা আর পুণ্যা তোমার প্রজা।

নিতাই। আজ্ঞে হুজুর, এরা দুজনেই আমার প্রজা।

রবীন্দ্র। তুমি কালই এদের বাড়ির সীমানা মেপে ঠিক করে দেবে।

নিতাই। যে আজ্ঞে ধর্মাবতার।

রবীন্দ্র। তোমরা শুনলে তো? জমির সীমানা ঠিক হয়ে যাবে কালই। কিন্তু এখনো বিচার শেষ হয়নি। এই মামলার জরিমানাস্বরূপ পুণ্যা, তুমি একখানা গৌরাঙ্গের গান শুনিয়ে দাও। উমাবোষ্টমী আজ থেকে তোমার বড় বোন, ওকে ভক্তিশ্রদ্ধা কোরো। তোমাদের সব বিবাদ মিটিয়ে দিলাম। গাও।

পুণ্যা। হাসিয়া মাথাটি দুলিয়ে গান—

"নব নটবর গোরা তপত কাঞ্চন কায়
ভাবে অঙ্গ গদগদ শ্রীনবদ্বীপে উদয়।
তপ্ত হেম বর্ণ-জিনি, তরুণ তপন প্রায়
মুখে হরি হরি ধ্বনি, সুরধুনী কূলে ধায়।
যারে পায় দেয় কোল, মুখে হরিহরি বোল,
নয়নে বহিছে বারি, প্রেমেতে ধূলায়-লুটায়।

(গান শেষে কবিকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে) হুজুর, বাড়ি-বাড়ি গান গেয়ে ভিক্ষে করে খাই। জীবনে আমার গলায় এমন সুন্দর করে আর কখনো গাইনি। আমার গান সার্থক। আশীর্বাদ করুন হুজুর।

রবীন্দ্র। আশীর্বাদ করছি। শ্রীগৌরাঙ্গ পদে মতি হোক। মাঝে মাঝে আমায় গান শুনিয়ে যেও—মুরলীকে মানুষ কোরো। আমি খুশি হবো। [রবীন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান। (ডাকিলেন)—তপসী, বাইরে ও কে তামাক টানছে রে?

তপসী। আজ্ঞে মাধু বিশ্বাস হুজুর। অনেকক্ষণ এসেছে। আপনাকে কি যেন বলবে।

রবীন্দ্র: বুঝেছি। ডেকে আন ওকে। (তপসী ইঙ্গিত করতেই একটা প্রকাণ্ড তরমুজ মাথায় মাধু বিশ্বাসের প্রবেশ ও সেলাম, বলিষ্ঠ, উন্নতদেহ, গায়ের রং ফরসা, মাথায় টাক, মাধু তরমুজ নাবাল)

মাধু। আমার খেতের তরমুজ হুজুর। চরের সেরা তরমুজ। হুজুরের সেবার জন্ত এনেছি।

রবীন্দ্র। আমায় খেতে দিলি? বেশ, খাবো। তারপর?

মাধু। হুজুর, টাকার জোগাড় তো করতে পারছি নে।

রবীন্দ্র। কত টাকা লাগবে? বেশী লাগবে—না। সামান্ত ক'টি টাকা।

মাধু। কাল জমির তরমুজ কাঁকুড় বেচে এক বিশ টাকা পেয়েছি। তাতে তো হবে না, দিন দশেক পরে আবার কিছু বেচবো। তখন হাতে টাকা হবে। ততদিন কি জমি থাকবে?

রবীন্দ্র। অত টাকা কি হবে? শোন, জমিগুলো সব চরচা বন্দোবস্ত হবে, আমি হুকুম দিয়েছি। তোকে দিতে হবে ঐ চরচার খাজনা মাত্র। তুই পাঁচ বিঘে নে। পাঁচ দেড়ে সাড়ে সাত টাকা, আর সেরেস্তার ডৌল খরচা আট আনা। এই আটটি টাকা, আমিনকে দিলেই মাদার তলার গ্রামে জমি পেয়ে যাবি। এই কটা টাকা দিতে পারবিনে?

মাধু। খুব পারবো হুজুর। মাত্র আটটি টাকা তো? কালই দিয়ে দেব।

রবীন্দ্র। জমিটা পাবি এক বছরের জন্ম। টাকাটা দিয়ে দে। এ বছর জমিটার ঝাউ বোনাজ মেরে যত্ন করে রবি খন্দ দে। আসছে বছর জমিটা সরেস জমি হয়ে উঠবে বর্ষার পরে। তখন কলাই ছিটিয়ে দিস। কলাইতে ভাল টাকা পেয়ে যাবি। আসছে বছর আসিস, তোর ঐ জমিই আমি কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়ে দেব। বুঝলি? হাল লাঙল পরে করিস, আগে হাতে কিছু টাকা জমিয়ে নে।

মাধু। হুজুরের দয়া। হুজুর আমার মা বাপ (প্রণাম)।

রবীন্দ্র। আচ্ছা এখন বাড়ী যা। (মাধুর প্রস্থান) সন্ধে হয়ে এলো। তারণ সিং, আলো আন। লেখা পড়া করতে হবে। "সাধনা"র লেখা অনেক বাকী পড়েছে। শেষ করতেই পারছি না, পরশু যেতে হবে চরপীরপুর। (তারণ সিং সেজ জালিয়ে আনলো; কবি কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনলেন) ওরে কোথায় যেন গান হলো, কীর্ত্তন? রাখীবন্ধনের মণ্ডড়া চলছে বুঝি?

তারণ। হুজুর, এটা কার্তিক মাস, পুণ্য মাস। গ্রামে নগর, সংকীর্তন বেরিয়েছে। স্বদেশী গান গাইছে মুকুন্দ কর্মকার। আসবে আপনার কাছে।

রবীন্দ্র। ও, বুঝেছি। (চুপ করে বসে দূরাগত কীর্ত্তন শুনতে লাগলেন)।

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক, মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলী,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশ কোটী কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে, রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটী ছেলে মায়েরে ঘেরিলে, দশদিক সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন, নূতন জীবন করিবে বপন,
এনহে কাহিনী এনহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।"

(কবি ধ্যানমগ্ন ভাবে বসে রইলেন, পরে গুন গুন করে গাইলেন)

"সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে।
জানিনে তোর ধনরতন আছে কি না রাণীর মতন,
জানি শুধু আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল।
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ, এমন হাসি হেসে।"

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পদ্মাতীরে বোটে রবীন্দ্রনাথ নিবিষ্টমনে লিখছেন। মাঝি, বরকন্দাজরা বোটের বাইরে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। এমন সময়ে মৌলবী (মৌলবী কামাল উদ্দিন) এর প্রবেশ।]

মৌলবী। সেলাম আলেকুম হুজুর।

রবীন্দ্র। আবার কি জন্যে? কাল তো তোমার সে বিষয় মীমাংসা করে দিয়েছি।

মৌলবী। দোঠো কথা হুজুর, দোঠো কথা। এই পাঁচ মিনিট! কবিরাজবাবু এখন কী করবেন? তাঁকে আজ থেকেই সেরেস্তায় বসতে হবে তো?

রবীন্দ্র। সে কি! কবিরাজ আবার সেরেস্তায় বসবে কেন? রুগীদের চিকিৎসা করবে কে?

মৌলবী। কাল তো হুজুর সব জানিয়েছি। কবিরাজ দুটো রুগীর পিলে টিপলেন, নাড়ি দেখলেন, বড়ি দিলেন, তামাক খেলেন আর সারা দুপুর তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঝিমুলেন। কবিরাজকে যাতে ধরলে সারাবে কে? কারো বাড়ি রুগী দেখতে হলে—

রবীন্দ্র। সে সব বিষয় ম্যানেজার দেখবেন। এসব দেখাশোনা তাঁর কাজ। তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তুমি যা করছ, তাই করে যাও।

মৌলবী। আমি ষ্টেটের মঙ্গলের জন্যেই ঐ প্রস্তাব করেছিলুম—

রবীন্দ্র। সে-কাজগুলো ম্যানেজারবাবুর কর্তব্য। তুমি এখন যাও, আমার কাজ আছে—

মৌলবী। (খানিক চুপ করে থেকে) জো হুকুম হুজুর। [প্রস্থান।

(নেপথ্যে গোলমাল—বরকন্দাজ—"এখন বোটে যাবেন না পণ্ডিত মশাই, বাবুমশাই"—ব্রাহ্মণ—(উচ্চকণ্ঠে) আমি আজ তিন দিন ধরে অপেক্ষা করছি, হুজুর বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে। আমি ব্রাহ্মণ, কলিযুগে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ। আমায় বাধা দিও না। হুজুর আর কাল চলে যাবেন—(চীৎকার)।

রবীন্দ্র। কে? তারণ সিং, ওকে আসতে দাও।

নেপথ্যে দ্বারী মজুমদার। মহারাজ, আজ এক সপ্তাহকাল দর্শনপ্রার্থী হয়ে আছি। শুনলুম, হুজুর কালই কলকাতা প্রত্যাগমন করবেন। দেখুন, দৌবারিকগণ নিষেধ করছে। আমি মহারাজের পরম অনুগত দরিদ্র প্রজা।

রবীন্দ্র। আচ্ছা, তুমি এসো।

(গেরুয়া বসন, তিলকধারী, দীর্ঘশ্মশ্রু, বিরলকেশ, প্রশান্ত মূর্তি ব্রাহ্মণের প্রবেশ ও সাষ্টাঙ্গে জমিদারকে প্রণাম ও প্রকাণ্ড পুঁটুলী খুলিতে ব্যস্ত) কী বলবে বল। কোথায় তোমার বাড়ি?

দ্বারী। আমার নিবাস মহারাজের রাজ্যের এলাকায় কয়া গ্রামে। আমার নাম শ্রীদ্বারিকানাথ মজুমদার দেবশর্মণঃ। পেশা—পৌরোহিত্যসহ জোতদারী।

রবীন্দ্র। বেশ। আমার সময় বড় কম। কি বলবে বল।

দ্বারী। জানি। মহারাজের সময় মহামূল্যবান। মহারাজ একাধারে প্রবল প্রতাপান্বিত ধর্মাবতার, বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর; অপর দিকে কবি-শিরোমণি,—প্রাচীন উজ্জয়িনীর কালিদাসতুল্য মহাকবি, পুণ্যশ্লোক, প্রজাহিতব্রতী। তাই জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-প্রজার সর্ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ এই অকিঞ্চিৎকর শ্লোকগাথায় মহারাজের পাদপদ্ম বন্দনা করব। মহারাজ কৃপাপূর্বক অবধান করুন। (কবিতা পাঠ)

আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি
অজ্ঞান অধমাধম মূঢ় দ্বিজাধম,
উর মাগো সরস্বতী দয়াময়ী ভগবতী
দেব গুণগানে যেন হই মা সক্ষম।
ইন্দ্রের অমরাপুরী মর্ত্যে শিলাইদহপুরী
মহারাজ দেবেন্দ্রনাথ যথা রাজ্যেশ্বর,
স্বর্গে বসে দেবগণ মর্ত্যে শোভে প্রজাগণ
সুবিশাল রাজ্য যাঁর বিরাহিমপুর।
ধর্মে কর্মে অনুপম মহর্ষি দেবেন্দ্র নাম
স্বর্গের দেবেন্দ্র তিনি ধরায় অবতার,
প্রজানুরঞ্জনে রত সদা প্রজা হিতব্রত
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নামে খ্যাতি যাঁর।

রবীন্দ্র। বেশ, তোমার শ্লোক সুন্দর হয়েছে। এখন যাও। তোমার কোনো দরকার থাকলে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে বিকালে এসো। আমার এখন কাজ আছে।

দ্বারী। মহারাজ, এখনো শ্লোক সম্পূর্ণ হয়নি। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবার মত দুঃসাহস নেই। হুজুর, আপনার কাজ আপনি করে যান, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আপনার মুখচন্দ্রিমা নিরীক্ষণ করি। হুজুর, কন্দর্পকান্তি দেবতা; আমি দাঁড়িয়ে আপনার রূপসুধা পান করি।

(একদৃষ্টে বিহ্বল দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

রবীন্দ্র। (আড়ষ্ট ভাবে লজ্জিত হইয়া) হয়েছে, এখন যাও। আমার জরুরী কাজ আছে।

দ্বারী। মহারাজ-অধিরাজ আপনি। আপনার গুণগান তো করা হয় নাই। তাই দয়া করে আর একটু শুনতে হবে। মহেশ্বর পঞ্চমুখে গান করে যাঁর অন্ত পান নি, আমি মূর্খ, একটু স্তুতিগান—

রবীন্দ্র। তোমার শ্লোক শুনে খুশি হয়েছি। বাকিটা আর একদিন শুনবো।

দ্বারী। মহারাজ অনুগত রাজভক্ত ব্রাহ্মণপ্রার্থী প্রজাকে কি দিতে ইচ্ছা করেন, এই কাগজে লিখে দিন, আমি নায়েব মশায়ের কাছে নিয়ে যাব, তাঁকেও শুনিয়ে আসি।

রবীন্দ্র। হবে, হবে। ব্রাহ্মণ বিদায় পাবে। এখন যাও—জিরোও গে।

দ্বারী। যাচ্ছি হুজুর। আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি। শুনুন মহারাজ, পুরাকালে যুধিষ্ঠিরের হিষ্টিরিয়া পাঠ করে অনেকেই অবিশ্বাস করে থাকেন। তাঁরা বলেন—অতদূর কি কখনো সম্ভব হতে পারে? কিন্তু এতকাল পরে আপনাকে চাক্ষুষ দেখে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কীর্তিকলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহ-ভঞ্জন হয়েছে। আহা! এ যে চাক্ষুষ দর্শন!

রবীন্দ্র। বেশ, এখন থাক্। এখন তুমি কাছারীতে গিয়ে বিশ্রাম করো গে।

হারি। আজ আর আমার বিশ্রাম কিসের? আহা, কী সৌভাগ্য আমার (ক্রন্দন)। আজ এতদিন পরে হুজুরের দর্শন পেয়েছি, আজ প্রায় সাত-আট-ন' মাস অপেক্ষা করে অবশেষে পদ্মাবক্ষে হুজুরের দর্শন পেয়েছি। আহা, দেখতে যে পাবো সে আশা কি আর ছিল! নিরাশ হৃদয়ে আজ আশার সঞ্চার হয়েছে। (কম্পিত স্বরে কথা বলে চাদরে চোখের জল মুছতে লাগল) আহা, আপনার জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাজ বাহাদুর কতবার আমায় তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর অপার্থিব স্নেহ, প্রজাবাৎসল্য ভারতবর্ষের হিষ্টিরিয়াতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আর হুজুর, আপনি তো মহারাজ, রাজাধিরাজ!

রবীন্দ্র। শুনেছি। বেলা হয়েছে অনেক। তোমার তো খিদে-তেষ্টা আছে! এখন যাও, কাছারীতে ম্যানেজারবাবু তোমার আহারাদির ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমার শ্লোক পরে নিরিবিলি বসে শোনা যাবে।

তারণ সিং। হুজুর, আরো একজন প্রজা কুঠে থেকে এসে অনেকক্ষণ বসে আছে। তার যেন কি দরবার আছে। সে অনেকক্ষণ এসেছে।

হারি। নিরিবিলিতে মহারাজের স্তুতিগান করবো,—তার কত বাধা! হতভাগা প্রজারা 'দেহি-দেহি' রবে মহারাজের বিরক্তি উৎপাদন করে। হায়, অসার সংসারে এই সমস্ত বিষয়কীট কতো আছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবে, মহারাজ, এখন আসি! (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রস্থান, আবার ফিরিয়া) মহারাজ, কাল প্রাতঃকালে এসে বাকী শ্লোকটা শুনিয়ে যাবো। (প্রস্থান)

(জনৈক ভদ্রপ্রজার প্রবেশ ও প্রণাম)

রবীন্দ্র। দরখাস্ত এনেছ? বোসো।

প্রজা। এনেছি হুজুর (দরখাস্ত দিল) আমার উপর অত্যন্ত অন্যায় করা হয়েছে।

রবীন্দ্র। (দরখাস্ত পাঠ শেষ করে) তোমার দরখাস্ত পড়লুম। তুমি বড় আমীনবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছ। আমি আমীনের কৈফিয়ৎ তলব করে হুকুম দিলুম। তাঁর কি বলবার আছে সেটা না জেনে তো হুকুম দেওয়া যাবে না। বুঝতে পারছ তো? দরখাস্ত আমি পাঠিয়ে দেব। তাঁর মন্তব্য এলে তুমি আসছে হপ্তায় এসো।

প্রজা। হুজুর ধর্মাবতার। হুজুরের সুবিচার পেয়ে প্রজারা সুখী হয়েছে। আমি যেন সুবিচার পাই।

রবীন্দ্র। নিশ্চয় পাবে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এখন বাড়ি যাও। (প্রজার প্রস্থান)' তপসী, আজ বিকালে বড় নদীর ঐ রাধাকান্তপুর চরের কোলে নিয়ে বাঁধবি। সবাইকে বলে দিবি, কাল পরশু দুদিন আমার ছুটি, জমিদারির কোন কাজ করব না। আমার নিজের লেখাপড়ার কাজ অনেক জমে গেছে। সবাইকে বলে দিস্। (সাহিত্যসাধনার মনোনিবেশ করলেন)

আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদলো নয়ন শেষে।

(পদ্মা তীরে সন্ধ্যা নামিল, আকাশে তারায় আলো)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন
(১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন)
দৃশ্য

শিলাইদহে রাখীবন্ধন উৎসব। পদ্মা তীরে বিরাট গানের দল
পল্লীর যুবকগণ ও অধিবাসীরা সমস্বরে
"ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই
বন্দেমাতরম্। বন্দেমাতরম্। বন্দেমাতরম্।"
গান
বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ইত্যাদি
বন্দেমাতরম্।
(খোল করতাল সহ কীর্তনের দল আসিতে লাগিল)

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[শিলাইদহ কুঠীবাড়ি, রবীন্দ্রনাথের আপিস কক্ষ। কাল প্রভাত। রবীন্দ্রনাথ মনোযোগ দিয়ে একখানা বড় কাগজ দেখছিলেন। পার্শ্বে ম্যানেজার বামাচরণবাবু ও পেশকার শরৎ সরকার।]

ম্যানেজার। মণ্ডলী বিভাগের যে নিয়মাবলী করে দিয়েছেন, সেই অনুসারে এই বিবরণী তৈরী করেছি। অনেক পুরোনো প্রথায় ওলট পালট হয়ে গেছে। মফঃস্বল কাছারীর কাজই মুখ্য হবে।

রবীন্দ্র। তাই তো চাই। এখন সদর অফিসের কাজ দাঁড়াবে,— ছয়টি বিভাগীয় মণ্ডলীর কাজ নিয়মিত করা, আর পরিদর্শন করা। মনে কোরো না, সদর আপিসের ক্ষমতা হ্রাস করছি। সদরের কাজ হবে যে সব নিকাশী কাগজ মালিকের মঞ্জুরী নিতে হবে সেগুলি সংকলন করা, প্রয়োজন মত সংশোধন করা আর সাধারণ ভাবে শাসন সংরক্ষণ করা। এগুলি বাদে—আদায় তহশীল, জমা খারিজ, জরিপ জমাবন্দী, বন্দোবস্ত, শিকস্তী পয়স্তী, মকর্দমা, সবই মণ্ডলী আপিস থেকে করতে হবে। তার ফলে মহালে মহালে প্রজারা ঘনিষ্ঠ ভাবে নিজ এলাকার মণ্ডলী আপিসে মিশতে পারবে। তারা সরাসরি অতি সহজে তাদের কাজ মণ্ডলী আপিস থেকে করিয়ে নিতে পারবে। দূর থেকে সদরে ঘোরাঘুরির হাংগামা বন্ধ হবে, অসৎ আমলাদের অন্যায় অত্যাচার বন্ধ হবে। সব বিষয়ে চন্দ্রময়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়মাবলীটা খাড়া কর। সে উকীল মানুষ, আইনের মারপ্যাচ সে বুঝে সুঝে প্ল্যানটা নির্ভুল করে দেবে।

ম্যানেজার। সরঞ্জামী খরচ বেশি কিছু বেড়ে যাবে। নতুন লোক নিয়ে কাজ চালু করতে সময় লাগবে। দু'টি মণ্ডলীতে দু'জন ভাল নায়েব বেছে নিতে হবে, পুরোনো লোক পারবে বলে তো মনে হয় না।

রবীন্দ্র। আমি সে জন্যই তো চন্দ্রময়, শৈলেশ, ভূপেশ এদের নিযুক্ত করেছি, দরকার হলে আরো নূতন সুশিক্ষিত দু'একজন নেবো। আমীন সতীশকে চর বিভাগের মণ্ডলীর ভার দেওয়া যেতে পারে। সরঞ্জামী খরচ বাবদে [illegible]

অনর্থক ঘোরাঘুরি অনেক কমে যাবে। প্রথম দু'এক বছর কাজের অসুবিধা হবে বৈ কি। এতে প্রজাদের বেশ উৎসাহ ও সাহায্য পাওয়া যাবে! তারা জমিদারের কাজকে আপনার কাজ বলে মনে করবে। তোমার তো আজ সকালেই জানিপুর যেতে হবে। তুমি বেরিয়ে পড়! আমি শরতের সঙ্গে কাজটা শেষ করি।

ম্যানেজার। আমি তবে চললুম। জানিপুর বাজারের নকসাটা সেখান থেকেই করে এনে আপনাকে দেখাবো। (প্রস্থান)

রবীন্দ্র। বুঝতে পেরেছ শরৎ! তোমাদের সদর সেরেস্তার রাশভারি ব্যবস্থাটা দেখতে শুনতে জমকালো, কিন্তু এতে সত্যিকারের কাজ হবে না, সেই মামুলী টানাপোড়েন আর কাজের পাঁয়তারা। ওসব আর চলতে পারে না। আর মনে রেখো, জমিদারীর কাজ কেবল খাজনা আদায় আর মামলা মোকর্দমা নয়। জমিদারের দায়িত্ব এই গরীব দেশে খুব বেশী। আমি ঐ গদীয়ান জমিদার হয়ে বসতে চাই না, প্রজাদের উন্নতি করতে চাই।

পেশকার। বুঝতে পেরেছি হুজুর। তবে আমার মনে হয়, আপাততঃ ছয়টির জায়গায় চারটি মণ্ডলী গঠন করা যাক—চরমহান, জানিপুর, কুমারখালী, কয়া কালোয়া পরীক্ষামূলক ভাবে।

[illegible]। বেশ, চারটি মণ্ডলীর কাজই চালু হোক। এর পরে আবার ধরো, মার্টিন কোম্পানীর ধোবড়াকোল মহাল কেনা হলে, সে কোম্পানীর বিলিতি ধরণের ম্যানেজমেন্ট। সেখানেও প্রথম মণ্ডলী চাই। তোমাদের জলকর মহালেরও অসুবিধাগুলোও ভাবতে হবে।

পেশকার। তাই করা যাবে হুজুর। দেখছি, মামুলী কাজ জানা কয়েকজনকে ট্রেণিং দিতে হবে এখন থেকেই। আদায় তৌশিলটা ওরা ভাল বোঝে।

রবীন্দ্র। ঠিক বলেছ। তবে একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখবে শরৎ। জমিদারের দুর্নামে দেশময় ঢি ঢি পড়ে গেছিল। আমি ঐ সব দুর্নাম কোন মতেই সহ্য করবো না। অসাধু ঘুষখোর আমলা আমাদের পাপে মজিয়েছে। জমিদারকে লোকে যাতে ঘৃণার চোখে না দেখে, তার উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে। আমি চাই জমিদারের মামুলীর আমূল সংস্কার। রাজা-প্রজার সম্বন্ধ উন্নত না হলে কোন ভাল কাজে হাত দেওয়া চলবে না।

পেশকার। এখন যে ভাবে কাজ চলছে, তাতে ঠাকুর-এষ্টেটের সুনাম খুব বেড়ে গেছে হুজুর, সেদিন মহকুমা-হাকিম বলছিলেন।

রবীন্দ্র। আমি জানি, অশিক্ষিত প্রজাদের উপর অত্যাচার বন্ধ হলেই জমিদারের উপর প্রজার শ্রদ্ধা বাড়বে। আরো একটা কথা শোন—আমি তোমাদের ঢোলখরচা, বারবরদারী, কল্যাণবৃত্তি—এ সব বিষয়ে যে নিয়ম করে দিয়েছি, তাতে তোমাদের উপার্জন ন্যায়সঙ্গতভাবে বাড়বে। তার উপরেও আমি তোমাদের জন্য পৃথকভাবে চর মহালে আমলান ছায় করে, তোমাদের সংসার-যাত্রা নির্বাহের জন্য সম্ভব মত জমি দেবার জন্য অঘাচরণকে হুকুম দিয়েছি। আমি বুঝি, তোমাদের আয়বৃদ্ধি না হলে তোমাদের অসাধুতা দূর হবে না। এ সত্ত্বেও যদি কোন আমলা প্রজাপীড়ন করে, তবে তাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না, জেনো।

পেশকার। আমি সবাইকে বুঝিয়ে বলেছি। হুজুরের উদ্দেশ্য সবাই বুঝতেও পেরেছে। সেরেস্তায় কাজকর্মের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। মামলা মোকর্দমার সংখ্যা অনেক কমেছে। তামাদি [illegible] প্রজাদের মনে ভয় ধরে গেছে। বাকী খাজনার তামাদির মামলা অর্ধেকেরও কম।

রবীন্দ্র। তোমাদের রাশভারী সদরের গলদ এখন বুঝতে পেরেছ ত? মামলা মোকর্দ্দমায় কী খরচটাই না হত! আমি বুঝি না প্রজার নামে মামলা করতে হবে কেন? যেখানে বাকী খাজনার মামলা হবে, বুঝতে হবে সেখানে যথেষ্ট গলদ রয়েছে।

(জানিপুরের কীর্ত্তনীয়া শিবুসাহা জমিদারকে প্রণাম করিলেন)

শিবনাথ এসেছ? বেশ। বোসো। কী মনে করে হঠাৎ?

শিবনাথ। হুজুরের চরণদর্শনের আশায় এলুম। আমার একটা বিশেষ দরবার আছে হুজুর—শুনতে হবে।

রবীন্দ্র। (হাসিয়া) তোমার আবার দরবার কিসের? তুমি ভক্ত মানুষ! দরবার টরবার কি তোমার সাজে? রসিক মানুষ, তোমার তো রসের কারবার হে।

শিবু। মনে বড় দুঃখু পেয়েছি হুজুর। হুজুর সব মহালেই পায়ের ধুলো দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের জানিপুরে একবারও শুভাগমন করেননি। আমি জানিপুরবাসী। এতে বড় দুঃখু পেয়েছি তাই এই দরবার নিয়ে এলাম, একবার জানিপুর পরিদর্শনে যেতে হবে।

রবীন্দ্র। সত্যি, ওটা ভুল হয়ে গেছে কাজের তাড়ায়। যাবো। তোমার দরবার নিশ্চয় মঞ্জুর করবো! (হাসিয়া) তুমি তো আমায় বেঁধে নিয়ে যেতে পার শিবনাথ! আজ যে তোমাকে এখানে পেলাম, সেটাও আমার সৌভাগ্য।

শিবু। রাধে, রাধে। আমায় আর অপরাধী করবেন না হুজুর। আপনাকে অভিনন্দন দিতে চায় জানিপুরবাসী। আপনার শুভাগমন হলে কমলাপুর হরিসভার উদ্বোধন করবো হুজুরের হাতে, আনন্দোৎসব তো হবেই।

রবীন্দ্র। (হো হো ক'রে হেসে) তোমরা দেখছি কুমারখালির প্রজাদেরও ছাড়িয়ে যেতে চাও! বেশ, আমি যাবো। শুধু হরিসভা নয়; আমি ওখানকার তাঁতী-জোলাদের সঙ্গেও আলোচনা করতে চাই। এখানকার তাঁতের কারখানার জন্য তাদের বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে।

শিবু। বেশ, স্বদেশীর সভাও হবে। ম্যানেজারবাবুকে বলেছি। তিনি হুজুরকে এই প্রার্থনা জানাতে বলেছেন।

রবীন্দ্র। বেশ, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর। মাঘের শেষ, ২৬শে ২৭শে যাবো। বেশী হৈ-হাঙ্গামা কোরো না। সভায় নড়াইলের আমলা আর প্রজাদেরও ডেকো। শোনো, তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে আমার একটু দরকার পড়েছে। ক'দিন থেকে বৈষ্ণব কবিতার রসে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তোমার দর্শন পেয়ে গেলাম শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই। শরৎ, তুমি কাগজটা সম্পূর্ণ করে আজ সন্ধ্যায় এখানে এসো। [পেশকারের প্রস্থান।

শিবু। আমার কী সৌভাগ্য! সবই রাধারাণীর ইচ্ছা। (প্রণাম)

রবীন্দ্র। তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও।

শিবু। আমি কাছারী থেকে জলযোগ সেরে বিশ্রাম করেই আসছি হুজুর।

রবীন্দ্র। তবে বোসো এইখানে। তোমার মুখে রামানন্দের 'পহিলহি রাগ' পদটা একবার শুনবো। পূর্বরাগের ঐ পদটি অতি চমৎকার। তোমার আজকের দিনটা এইখানেই থাকতে হবে। ছুটি পাবে কাল সকালে।

শিবু। হুজুরের আদেশ শিরোধার্য। আজ আমার বড় শুভদিন। আমি নিরিবিলি বসে হুজুরকে কীর্তন শোনাবার সুযোগ পাই নাই। আমার সে আকাঙ্খা আজ মিটবে শ্রীরাধারাণীর ইচ্ছায়।

রবীন্দ্র। তপ্‌শী। এখানে সতরঞ্চটা বিছিয়ে দে। তোরা গোল করিস নে। এসো শিবনাথ, বোসো। (দুইজনে মুখোমুখি বসিলেন)।

শিবু। জয়রাধে শ্রীরাধে! (গুন গুন করিয়া) হুজুর, এমন রসোল্লাস গাইবার আগে একটু প্রার্থনা করে নিই। বিদ্যাপতির প্রার্থনা—ভক্তের আকুতি—গান—

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুত-মিত-রমণী সমাজে
তোঁহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিল অবমঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব হম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন-দয়াময় অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥
কত চতুরানন মরি-মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত সাগরলহরী সমানা ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়, তোয়া বিনা গতি নাহি আরা,
আদি অনাদিক নাথ কহয়সি, অবতারণ ভার তোহারা ॥

রবীন্দ্র। আঃ, বেশ গেয়েছ শিবু—"তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত, সাগর লহরী সমানা।" চমৎকার! উপনিষদের সেই বাণীই বৈষ্ণবকবি বলেছেন। গাও—শ্রীরাধার সেই ভাবটি!

শিবু। শ্রীরাধার আকুতি, আহা, শ্যামচাঁদে তন্ময় রাধারাণী সখাকে বলছেন—

গান

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল, অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল,
নাসো রমণ, না হাম রমণী, দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি,
এ-সখি, সো সব প্রেমকাহিনী কানুঠামে কহবি বিছুরহজনি,
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলু আন, দুঁহুক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ,
অবসো বিরাগে তুঁহুঁ ভেলি দূতী, সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি ॥

রবীন্দ্র। চমৎকার। চমৎকার গেয়েছ শিবনাথ। এই পদটি আমি কবি নবীন সেনকে শুনিয়েছিলাম। প্রথমে চোখ, তার পরে মন তাঁর রূপে আকৃষ্ট হল। আহা, পরে সব বিভেদ ছাড়িয়ে তাঁতে আমাতে এক হয়ে গেলাম। চমৎকার পদটি।

শিবু। রাধে রাধে। কী আনন্দ,—আহা-হা—দু'জনে এক হয়ে গেলেন। তখন যে ভাবটি দাঁড়ালো, সে-বিষয়ে চণ্ডীদাস ঠাকুর বলেছেন বড় সুন্দর কথা। গুহ্যতত্ত্ব কথা—অপূর্ব। শুনুন, বৈষ্ণব-সাধনার গূঢ় সাধনার কথা! গান—

"মরম না জানে ধরম বাখানে—এমন আছয়ে যারা,
কাজ নাই সখি, তাদের কথায় বাহিরে রহুন তারা ॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা
তোরা নিসাড় হইয়া আয়লো সজনি, আঁধার পেরিয়ে আলা ॥
আবার শুনুন,—আলার ভিতরে কালাটি আছে; চৌকি রয়েছে তথা,
সে-দেশের কথা এদেশে কহিলে লাগিবে মরমে ব্যথা ॥
(তোরা) পরপতি সনে শয়নে-স্বপনে, সতত করিবি লেহা।
(তোরা) সিনান্ করিবি নীর না ছুঁইবি, ভাবিনী ভাবের দেহা।
কহে চণ্ডীদাস—এমতি হইলে তবে ত' পীরিতি সাজে।
(তোরা) না হইবি সতী, না হইবি অসতী, থাকিবি ধরণী মাঝে ॥

রবীন্দ্র। (শিবুকে আলিঙ্গন করিয়া) ওঃ, কী গভীর তত্ত্ব! হৃদয়ে জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব হলে এই রকম মহাভাবের উদয় হয়। এই পদটি যেন সমস্ত বৈষ্ণব তত্ত্বের সার। এর উপরে আর কিছু নেই—বৈষ্ণব রসসাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব।

(উভয়ে ভাব-বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ঠাকুরবাবুদের ধোবড়া লাল কুঠির কাছারী (১৩১৪ সালের পর) কাছারীবাড়িতে সাজ সাজ রব—আজ স্বয়ং জমিদার রবীন্দ্রনাথ কাছারী পরিদর্শনে আসছেন। বড় আমলারা জমিদারকে বোট থেকে অভ্যর্থনা করে আনতে গেছেন। একজন আমলা ও বরকন্দাজ রসিক দাস কাছারীর দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে (রসিক দাসের মাথায় লম্বা চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে তাগা, পরণে গেরুয়া, চোখ দুটি লাল, ভৈরবের বেশ।)]

আমলা। রসকে, ঐ কাল-ভৈরবের বেশে দাঁড়ালি? বরকন্দাজের পোষাক পর, নইলে বাবুমশাই চটবেন। মালা টালা ছাড়।

রসিক। না বাবু, আমি ঐ খোট্টাই দারোয়ানী পোষাক পরতে পারবো না। আমি বাবা তেলনাথের সাধক। আমার এই ভৈরব বেশই ভালো।

আমলা। তাহলে তুই এবারে বাজার মাৎ করলি দেখছি। তোকে দেখে বাবুমশাই মহাদেবের অবতার ভেবে আদর করবেন।

রসিক। ঠাট্টা করবেন না চৌধুরীমশাই, ঠাট্টা করবেন না। রসিক দাসকে আপনারা চিনলেন না। বাবুমশাই এলে, তিনি চিনবেন। দেখে নেবেন।

আমলা। তবে আর তোকে পায় কে? তোর মাইনে বেড়ে যাবে। হয়তো সদরে বদলী করে বাবুমশাই তোকে খাস বরকন্দাজ করে নেবেন। (বাবুমশায়ের প্রবেশ; সঙ্গে বিভাগীয় ম্যানেজার ও সম্ভ্রান্ত প্রজাগণ। রসিক দাস একদৃষ্টে হাঁ করে কবির দিকে চেয়ে আছে, তিনিও এই অদ্ভুত লোকটার দিকে চেয়ে আছেন)।

ম্যানেজার। বাবুমশাই এখন বিশ্রাম করবেন। আপনারা এখন বাড়ি যান। বিকাল চারটেয় দরবার হবে, তখন আসবেন।

(প্রজারা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল; রবীন্দ্রনাথ বসিলেন, একজন পেয়াদা পাখার বাতাস করিতে লাগিল)।

রসিক। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে হাত জোড় করে) বাবা মহাদেব, বাবা ভোলানাথ!

রবীন্দ্র। তোমার নাম কি? কী কর এখানে?

রসিক। আজ্ঞে আমার নাম রসিকদাস। আমি হুজুরের এই কাছারীতে প্যাদাগিরি করি। আমি আজ পেরায় এক বছর হুজুর ইষ্টাটে কাজ করছি। আমার বাড়ি ম্যানেজারবাবুদের গাঁয়ে।

রবীন্দ্র। বেশ। তোমার এ সন্ন্যাসীর বেশ কেন? সন্ন্যাসীরা কি কখনো পেয়াদাগিরি করে?

রসিক। আজ্ঞে হুজুর, আমি বাবা ত্রৈলোক্যনাথের স্তাবক (যুক্ত করে ত্রিলোকনাথের উদ্দেশে প্রণাম) হুজুরকে দর্শন ক'রে কেরম্ভ'কেতাখ হয়েছি। এমন রূপ আমি দেখি নি।

রবীন্দ্র। তুমি কি কি কাজ কর?

রসিক। হুজুর, মহালের পেয়াদাটেরজা ডাকি। চালান নিয়ে শিলেদা যাই, চিঠিপত্র ঘাঁটি, আর বাবুদের জন্ত রাঁধি। সময় পেলে বাবা ত্রৈলোথকে ডাকি—বাবা আমার ভববন্ধন মোচন করে দাও।

রবীন্দ্র। তুমি বরকন্দাজী কর কেমন করে? তুমি তো দেখছি সাদাসিদে সরল সন্ন্যাসী মানুষ। প্রজারা তোমায় মানে?

রসিক। হুজুর, আমাকে কেউ মানে কি না জানিনে, ভয় করে কি না তাও জানিনে—তবে সবাই আমায় ভালোবাসে। দাদা বলে ডাকে আর আমার গান শুনতে ভালোবাসে। আমি তো কারুর মনে কষ্ট দিই না।

রবীন্দ্র। বেশ, বেশ, খুব খুশি হলাম তোমার কথায়। তুমি জোর না খাটিয়ে ভালোবাসা দিয়ে কাজ কর, এতে সন্তুষ্ট হলাম। এই তো সন্ন্যাসীর কাজ। তোমার বাড়িতে কে আছে, ছেলেপিলে আছে?

রসিক। হুজুর বাহাদুর সাক্ষাৎ ভাবতা। তা নইলে আমার মত পাগোল-ছাগোলের সাথে এমন মিষ্টি কথা কন্! হুজুর, আমি অধম কীটাণুকীট জাতিতে আমি নমঃশূদ্র। ভাগে চাষবাস আছে। একটা পোলা আছে। বাপঠাউদ্দার ব্যাবসা ছিল ডাকাতি। তাঁরা ট্যাহাপয়সাও জমিয়েছিলেন অনেক। কিছু টিকলো না। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ধরা পড়ে কোজ-দারীতে বাবার হল আট বছরের জেল। জেল থেকে ফিরেই তিনি মারা গেলেন। আমি তখন নাবালক, চাষবাস করি, ঘাস কাটি, ধর্মপথে থাকি। ডাকাতি ঘেন্না করি। বাবা আমার কথা শুনতো না। বাবা ত্রৈলোথের পূজো করে হত্যা দিয়ে মা আমায় প্যাটে ধরেন। তাই আমি ছিলাম সকলের নয়নের মণি। খেলা করে বেড়াই। একদিন হল কি! নিশি নিষুন্দর রাত্তির, ঘোর অমাবস্যা। আকাশে মেঘের গরজন। আমি চ্যাটাই পেড়ে শুয়ে আছি। আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলছে। আর ঐ বিজলীর ঝিলিক থেকে বেরুলো এক সন্ন্যাসী, মাথা থেকে পা পর্যন্ত জটা, বুক সমান পাকা দাড়ি, আগুনের ভাঁটার মত দুই চোখ, হাতীর মত দেহ, পরনে বাঘের ছাল—হাতে এ্যাত্ত বড় ত্রিশূল। সন্ন্যাসী আমার মাথায় পা দিয়ে ডাকল—রসকে, শীগগির আয়। উঃ! সে যেন ম্যাঘের গরজন।

রবীন্দ্র। সেই বুঝি তোর গুরু? গুরু কি বললেন?

রসিক। তাঁর সঙ্গে গেলাম এক বিন্ধাচল জঙ্গলে ঐ নিশিনিষুন্দ রাত্রে—গিয়ে দেখি, আগুনের কুণ্ডু দুই রশি ভুঁই জুড়ে। আর সেই আগুনের মধ্যে ধেই ধেই নাচতেছে ভূত-পেত্নীরা—আমি তো অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

রবীন্দ্র। উঃ, ভয়ানক ব্যাপার! জ্ঞান হয়ে কি দেখলে?

রসিক। পরের দিন ভোরে জ্ঞান হয়ে দেখি—কোথায় সেই বন, কোথায় সেই আগুন, কোথায় ভূত পেত্নী। এক খোঁড়া সন্ন্যাসী বসে আছেন, সিদ্ধি খাচ্ছেন, শিষ্যেরা তাঁকে ঘিরে কলকে সাজছে। সন্ন্যাসী আমার মাথার উপর পা দিয়ে ডাকল—তুই বাবা ত্রৈলোথের বরে জন্মেছিস—তুই আমার শিষ্য, সে আমার পেসাদ পা।

রবীন্দ্র। তুমি গ্যাঁজার পেসাদ পেলে? বেশ! যাও, এখন কাজকর্ম করগে। আমি সময় পেলে তোমার গল্প শুনবো। (প্রণাম করে রসিক চলে গেল)।

(রবীন্দ্র কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ কাটলো)।

বরকন্দাজ। হুজুর, দ্বারী বিশ্বাসের ছেলে মন্মথ বিশ্বাস এসেছেন। বসে আছেন দরবারের জন্তে।

রবীন্দ্র। বোয়াইলদহের দ্বারী বিশ্বাসের ছেলে? ডাক তাকে। দ্বারী বিশ্বাস তো বেঁচে নাই—তার ছেলে এসেছে।

(মন্মথ বিশ্বাস তরুণ সুপুরুষ যুবক, এসেই বাবু মশায়ের পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে পড়ল। ম্যানেজার বাবুর প্রবেশ)

মন্মথ। হুজুর, ধনে-প্রাণে মারা গেছি। (ক্রন্দন) আমাদের বাঁচান হুজুর।

রবীন্দ্র। তুমি দ্বারী বিশ্বাসের ছেলে? জানো—দ্বারী বিশ্বাস আমাদের কি ছিল! তার ছেলে হয়ে তুমি মৃত্যুপণ করে বাপের নাম ডুবোবে?

মন্মথ। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে হুজুর। বোয়ালদহের স্বর্তের মোকর্দমা বাবাই দায়ের করেছিলেন। সেই মামলা চলছে আজ দু'বছর। আমরা মামলায় সর্বস্বান্ত হয়েছি হুজুর। বাবা স্বর্গে গেছেন। আমরা একেবারে ডুবেছি।

রবীন্দ্র। মামলা যখন তোমাদের বাড়িতে ঢুকেছে, তখন তোমাদের পথে না বসিয়ে তো যাবে না বাপু। বুঝতে পেরেছি, তোমার বাবাই ভুল করেছিল, সেই ভুলের জের এতদূর গড়িয়েছে। বোয়ালের হাঁ, তার মধ্যে ঢুকলে কি পুঁটি খলসে বাঁচে।

মন্মথ। সে মামলায় তো সর্বস্বান্ত হয়েছি হুজুর। কিন্তু আমাদের বোয়ালদহের পৈত্রিক জোতটা খাস করে নিয়ে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছেন হুজুর। (ক্রন্দন) আমরা একেবারে ধনেপ্রাণে মারা গেছি হুজুর।

রবীন্দ্র। বৈষয়িক শত্রুতা চরমে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পেরেছি। তোমাদের বোয়ালদহের জোতটা কী করে গেল?

মন্মথ। বোয়ালদহের পশ্চিম দিকের প্রায় সিকি অংশ আমাদের পৈত্রিক জোত। হুজুরই মালিক। ম্যানেজার বাবু ঐ অংশটাও তাঁদের সামিল করে মোকর্দমা করেছেন। আইনের প্যাঁচ আমরা বুঝতে পারিনি, সে মামলায় আবার হেরে গেছি হুজুর। আর সঙ্গে সঙ্গে জোতটা আপনারা খাসে এনেছেন হুজুর। ম্যানেজার বাবুর একটু দয়ামায়া নেই, আমাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছেন।

ম্যানেজার। মন্মথবাবু, বোয়ালদহের স্বর্তের মোকর্দমা চালাচ্ছিলেন, বেশ কথা। আইনের বিচারে তার মীমাংসা হবেই। আপনাদের দুর্বুদ্ধি কতখানি, আপনারা শুকদেবপুরের লাগোয়া ঐ মৌজার বত্রিশ বিঘে জমি গোপনে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভোগ দখল করছিলেন। আমাদের আইনদ্দি আমীনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। চালাকিটা ধরা পড়ল মৌজাটা জরিপ করবার পর। আপনারা বেড়ান ডালে ডালে, আমরা বেড়াই পাতায় পাতায়। এখন মনিবকে ফাঁকি দেবার মজাটা টের পাচ্ছেন তো?

মন্মথ। আমাদের ঘাড়ে শনি চেপেছিল হুজুর। এ অবস্থায় হুজুরের দয়া চাইবারও মুখ নেই আমাদের। হুজুরের দয়া না হলে আমরা সগুষ্টি মারা পড়বো। এই মামলায় রাজার সঙ্গে লড়ে যে অপরাধ হয়েছে, তার শাস্তি চূড়ান্ত ভাবেই দেওয়া হবে হুজুর (ক্রন্দন)।

ম্যানেজার। আমরা আইনের বিধান মতই মামলা করেছি মন্মথবাবু, আদালত তো খোলা আছে। আপনারা প্রজা হয়ে জমিদারের শত্রুতা করেছেন। আপনাদের দমন না করতে পারলে জমিদারের জমিদারী রক্ষা হবে না, আমি আমার কর্তব্য করেছি।

রবীন্দ্র। (মিনতির স্বরে) তুমি কি দ্বারী বিশ্বাসকে জানতে? দ্বারী বিশ্বাস কেমন খাসা লোক ছিল তা দেখনি, তাই তার ছেলেদের ওপর অমন নির্দয় হচ্ছো। তার ছেলেরা কি না খেয়ে মরবে? আমার বনেদী প্রজাদের ঘর ভেঙে দেবে? তাদের অপরাধগুলোও ক্ষমার চক্ষে না দেখলে কি চলে?

ম্যানেজার। এদের ক্ষমা করলে আদর্শ খারাপ হয়ে যায় হুজুর। এদের স্পর্ধা বেড়ে যায়।

রবীন্দ্র। আহা-হা-তাই বলে এমন নির্দয় হতে হবে? না-না বোয়ালদহের ঐ জোতটা এই ছোকরাকে ফিরিয়ে দাও—এরা নাবালক অসহায়। না দিলে আমাদের অধর্ম হবে।

ম্যানেজার। আমি সে জোতটা সাত আট জন প্রজার সাথে বন্দোবস্ত ক'রে অনেকগুলি টাকা নিয়েছি হুজুর। তারা সে জমিতে ধান বুনেছে। তাদের কী হবে? তারা কি এখন সে জমি ছেড়ে দেবে?

রবীন্দ্র। সেই সব প্রজাদের ডাকো। আমি তাদের বুঝিয়ে বলব। মন্মথ, তা হলে বোয়ালদহের মামলা কি চলবে?

মন্মথ। (হাত জোড় করে) না হুজুর, আমি কালই সে সর্বনেশে মামলা তুলে নেব। এ মামলায় আমাদের বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না।

রবীন্দ্র। (দাঁড়িয়ে) সেই সব বন্দোবস্তী প্রজারা কি এসেছে? (কতকগুলি প্রজা সামনে দাঁড়াল) ওরে শোন্, তোরা একজন ধার্মিক লোকের নাবালক ছেলের জমিগুলো আইনের ফাঁকে চষে ফেলবি? একবার চেয়ে দ্যাখ, দ্বারী বিশ্বাসের ছেলের মুখের দিকে। চেয়ে দ্যাখ। তার বাড়া ভাত কেড়ে খাবি! তোরা তো নজর দিয়ে সে জমি নিয়েছিস—চাষ করেছিস?

প্রজাগণ। হুজুর, নজর দিয়েছি, ধান বুনেছি।

রবীন্দ্র! বেশ, তোদের সে টাকা আমি ফিরিয়ে দেব। আমি হুকুম দিচ্ছি। এই ছেলেটার জমি তো ফিরিয়ে দে বাপু, না বুঝে অন্যায় করে ফেলেছে। ছেলে মানুষ! এর মুখের গ্রাস কেড়ে খাস নে। জমিটা বেচারাকে ছেড়ে দে।

একজন প্রজা। হুজুরের হুকুম আমরা মাথা পেতে নেব। তবে বড় কষ্ট করে ধান বুনে ফেলেছি হুজুর। আমরাই বিশ্বাস মশায়ের বর্গাৎ হতে চাই সেই হুকুমটা দিন হুজুর। আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

মন্মথ। আমি তাতেই রাজী, তোমরাই আমার বর্গা চলো। বাবু মশায়ের হুকুম আজ থেকে আমার কাছে ভগবানের আদেশ। যা পাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্র। জানো মন্মথ! মা লক্ষ্মীকে তাড়াহুড়ো করো না। তিনি বড় চঞ্চলা। বাপ ঠাকুর্দার বিষয়-সম্পত্তি ধর্ম পথে থেকে ভোগ কর। তা হলেই দ্বারী বিশ্বাসের নাবালকরা সাবালক হয়ে উঠবে।

ম্যানেজার। তা হলে মন্মথবাবু। সব গোল তো বাবুমশায়ের দয়ায় মিটলো। দরখাস্তটা দিন। হুকুম করিয়ে নিই। কাল পর্যন্ত সদর কাছারীতে যাবেন। সব বিষয়েরই মীমাংসা করে দেব। (প্রজাদের) তোমরাও ওঁর সঙ্গে দেখা করো গিয়ে।

(সকলের প্রণাম করিয়া প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য

(খোরড়া খোল কুঠীর কাছারীর বারান্দা। রবীন্দ্রনাথ পদ্মার দিকে চেয়ে বসেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে মৃদুস্বরের গুঞ্জন। রসিকের প্রবেশ ও প্রণাম)

রসিক। হুজুর বাহাদুর আজ চলে যাবেন। এ ক'দিন এখানে চাঁদের হাট বসেছিল। উঃ! কতো পেরজা, কী আনন্দ! হুজুর! আজ তেরনাথের গান শোনাবো।

রবীন্দ্র। বেশ শোনাও।

রসিক। (গান) ত্রিনাথের মাহাত্ম্য গান—

"আমার ঠাকুর তেন্‌নাথ কিছু নয়রে খায়
এক পয়সার ত্যাল দিয়ে তিন বাতি জ্বালায়।
আমার ঠাকুর তেন্‌নাথে যে করিবে হেলা,
হাত পাও শুকাইয়ে যাবে, বয় হইবে কালা ।।
কলিতে তেন্নাথের মেলা!
খোঁড়ায় নাচে, কানায় ভাখে, বোবায় বলে বোম্‌ভোলা ।।
সাধুরে ভাই, দিন গেলে তেন্‌নাথের নাম লইও।
সুখে দুখে তাঁর নাম বদনভরে কইও।—
ও ভাই তেন্নাথের জয় ।।
ত্যাল খায় ব্রহ্মারে ভাই, বিষ্টু খায় রে পান,
মহাদেবের সিদ্ধি খাইলে শীতল হয় রে প্রাণ ।।
বাবা তেন্নাথের জয় ।।

(বাবু মশায়ের গলায় মালা দিয়ে প্রণাম)

রসিক। পাগোল ছাগোলের গান। এ গান কি শুনবার মতো? তবু সাহস করে হুজুরকে শোনাতে পারলাম, সে বাবা তেন্নাথের কেরপা।

রবীন্দ্র। তুমি সংসারত্যাগী কেন? তোমার তো শুনলাম সবাই আছে।

রসিক। আমার সবাই আছে হুজুর, কিন্তু বাবা তেন্নাথ ছাড়া আমার কেউ নেই এহকালে। পরকালে তাঁর চরণ পাবো কি না কে জানে? আমার কপাল!

রবীন্দ্র। তোমার গান শুনে আনন্দ পেলাম।

রসিক। হুজুর, এই ভাগ আমার খুব ভালো লেগেছে। এইখানেই আমি থাকবো, একটা আখড়া বানাবো। বাবা তেন্নাথের গান গেয়ে জীবন কাটাবো। যদি আমায় খানিকটে জমি দয়া করে দেন, তবে আমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

রবীন্দ্র। (হেসে) আখড়া বানাবে? খাবে কি? তেন্নাথকে খাওয়াবে কি?

রসিক। হবে বৈকি। তাইতেই তো বাবা তেন্নাথের কেরপায় হুজুর বাহাদুরকে এত কাছে পেয়েছি। আমার কপালের জোর। হুজুর মহাদেবের অবতার।

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যানেজার। হুজুরের যাবার সময় হল। বোট তৈরী। রসিক যাও তো। ঐ কাগজপত্র-বাঁধা বাক্সটা বোটে দিয়ে এসো।

[রসিকের প্রস্থান।

রবীন্দ্র। তোমাদের এই লোকটা বেশ। খুব নেশা টেশা করে না কি?

ম্যানেজার। হুজুরকে খুব আপনার করে নিয়েছে রসিক। লোকটি গেঁজেল, খেয়ালী। তবে বিশ্বাসী, সরল, ভালো লোক। কোন গোলমাল নেই। চোতপুজোয় গাজনের সন্ন্যাসী হয়ে খুব নেচে-কুঁদে গেয়ে বেড়ায়। বেশ আমুদে লোক।

রবীন্দ্র। ঐ রকম সরল আপনভোলা খেয়ালী লোক আমার ভালো লাগে। ওকে বিঘে পাঁচেক অস্থায়ী জমি দিও—ও আখড়া বানাতে চায়। (বাহিরে প্রজাদের ভিড়) তোমরা এসো। আমি আবার আগামী আশ্বিন মাসে আসবো তোমাদের মহালে। তোমাদের মঙ্গল হোক (পুনরায় রসিকের প্রবেশ ও বাবুমশায়ের হাতে ফুলের তোড়া প্রদান)।

রসিক। (প্রণামান্তে) ধোবড়াকোণ-কুঠীর ফুল হুজুর। হুজুর স্বয়ং মহাদেব। তাই তো এই পাগলের পাগলামী ভোলানাথের ভাল লাগলো। রসিক দাসের জন্ম আজ সার্থক।

রবীন্দ্র। রসিক, ম্যানেজারবাবুকে বলে গেলাম তোমার আখড়ার জন্ম তিনি তোমায় কিছু জমি দেবেন। আমি যাচ্ছি। তোমার মঙ্গল হোক। [রবীন্দ্রনাথ সদলবলে চলে গেলেন।

রসিক। (হতাশভাবে বসে পড়ল) আজ আনন্দের হাট ভাংলো—

জনৈক আমলা। হাঁরে রস'কে, বাবুমশায়কে বেশ একহাত নিয়েছিস। (হাস্য)

রসিক। চুপ করুন বাবু, ফ্যাচ ফ্যাচ করবেন না। বাবুমশায় মহাদেবের অংশ। তাঁকে চিনতে পারেন সাধুরা—(ঘর ঝাঁট দিতে লাগল) কিছু ভালো লাগছে না।

(চিন্তিতভাবে ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যানেজার। বাবুমশাই চলে গেলেন রসিক। কিন্তু আজ না গেলেই ভাল হত। আকাশের কোথায় কোথায় ঠাসা মেঘ। বারণ করলুম। শুনলেন না।

রসিক। তাই তো—আঁধার লাগছে যেন। জল-ঝড় হতে পারে (আকাশের দিকে দেখিয়া) তাই তো। তাঁর বোট ছাড়তে দিলেন কেন বাবু?

ম্যানেজার। আমি কত বললুম। আজ যাবেন না, আজ তেরোস্পর্শ আকাশের অবস্থাও থমথমে। আমায় তাড়া দিয়ে বললেন— আমি ওসব মানি না। আমি আবার অনুরোধ করলাম—পদ্মায় এতটা দূর যেতে হবে। বিকেলে রওনা হবেন। তা বললে কি জানিস, ঝড়-বৃষ্টি সকাল-সন্ধ্যা সব সময়েই হতে পারে!

রসিক। বাবুমশাই বড় একগুঁয়ে বাবু। শিলেদ যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে। এই ম্যাগের মদ্দি বোট ছাড়া ঠিক হয়নি। কি করা যায়?

ম্যানেজার। ভাবছি, কিয়ামদ্দিকে পাঠাই একখানা ডিঙ্গি নিয়ে সে গাঙের ধারে ধারে বাবুমশায়ের বোট লক্ষ্য করে যাবে।

রসিক। ঠিক বলেছেন হুজুর, তাই করুন। দেরী করবেন না এই রকম ম্যাগের মদ্দি—পদ্মাগাঙ্গে! বিপদ এক মুহূর্তে আসতে পারে। আর ভাববেন না,—কেয়ামদ্দিকে এখুনি পাঠান আমিও তার সঙ্গে যাই। কতক্ষণ বোট ছেড়েছে?

ম্যানেজার। এই মিনিট দশ-পনেরো হবে।

রসিক। তবে চলুন হুজুর, গাঙের কূলে যাই। আকাশের অবস্থা সত্যিই ভাল নয়। এই দুর্যোগে বাবুমশাই ভরা পদ্মায়— বোটে···! নাঃ। চলুন শীগ্‌গির।

(বাহিরে বৃষ্টির শব্দ ও ঝোড়ো হাওয়া

ম্যানেজার। ঐ যে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝোড়ো বাতাসও বইছে—

(বেগে জনৈক বরকন্দাজের প্রবেশ)

বরকন্দাজ। হুজুর, পূবদিক খোলসা হয়ে গেছে, মেঘ কেটে যাচ্ছে।

রসিক। জয় বাবা তেন্নাথ! দেখুন বাবু, হুজুর বাহাদুর স্বয় মহাদেবের অংশ। তিনি পদ্মায় নেমেছেন কি আকাশ পরিষ্কা হয়ে গেছে। বাবুমশাই কি মানুষ—তিনি দেবতা।

(সত্যই আকাশ পরিষ্কার দেখা গেল

রসিক। (গাহিয়া সোল্লাসে) জয় বাবা তেন্নাথ! ঐ তো সব ফর্সা হয়ে গেছে। হুজুর বাহাদুরের জয়!

যবনিকা

যা আজো জানে না বর্তমান

অমরনাথ চক্রবর্তী

মনে মনে উঠিল যে ঢেউ
জানিল না তাহা আর কেউ।
জানিল না সে উচ্ছ্বাস
রেখে গেল কাহার আশ্বাস,
জানিল না কোন দোলা লেগে
উঠিল সে জেগে,
সবাকার অগোচরে রহি
গেল মোরে কোন কথা কহি।

তবু সেই ঢেউ,
নাই-বা জানিল তারে কেউ,
রেখে গেল আমার মনেতে
রহস্য সঙ্কেতে
তাহার সন্ধান
যা আজো জানে না বর্তমান—
যে স্বরূপ ব্যক্ত হয় নাই,
যে অবলুপ্তির মাঝে

শেষাংশ ···পৃষ্ঠায় পাঁ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

পরদিন বিকেলে লনে বসেছিলাম আমরা। মিষ্টার মেনন এসে বসলেন আমাদের কাছে। উনি মাঝে মাঝে এসে গল্প করেন আমাদের সঙ্গে। নানা কথার ফাঁকে আমি বললাম—কাকাবাবু, মায়ের বড় ইচ্ছা যে মারুতিকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আরো লিখেছেন মা—যদি আপনিও যান আমাদের সঙ্গে, তা'হলে তিনি সবচেয়ে বেশী সুখী হবেন।

—আমার তো এখন ছুটি নেই মা, তবে মারুতি যাবে বৈকি। তারপর প্রশান্ত হাসির সঙ্গে বললেন মিষ্টার মেনন—তবে এখন গেলে তো ওর বেশীদিন থাকা চলবে না মা। কারণ ওদের বিয়েটা আমি খুব শীগ্‌গিরই দিতে চাইছি। আর সেই সময় তোমাকে আর তোমার মাকে তো আসতেই হবে, তোমরা না এলে তো বিয়েই হবে না।

—ওর জন্যে এত তাড়া কিসের বাবা? লজ্জায় রাঙা হয়ে বললো মারুতি।

—না মা, তাড়া নয়। তবে বয়েস হয়েছে আমার, তাই শুভ কাজটা যতশীঘ্র সম্ভব শেষ করতেই মনটা চাইছে। কাঁকরের রাস্তায় জুতোর শব্দ শুনে আমরা চাইলাম সেই দিকে। আয়েঙ্গার আসছে।

—এই যে, এসো, এসো। ওকে সাদরে ডেকে নিজের পাশের চেয়ারটিতে বসালেন মিষ্টার মেনন। বেয়ারা কফি দিয়ে গেলো।

গল্প আমাদের যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন হঠাৎ এলেন ক্যাপ্টেন মামা।

আমি আর মারুতি উঠে গিয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলাম।

মিষ্টার মেনন বললেন—কি সৌভাগ্য আমার! ভাগ্যিস ভাগ্নীর টানে এসে পড়েছেন, তাই তো দেখা পেলাম বহুকাল পরে। আমিও অবশ্য নানা ঝামেলায় অনেক দিন যেতে পারিনি ওদিকে।

—ডাক্তার মানুষদের ঝামেলা কি কিছু কম না কি? ইচ্ছে তো করে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মাঝে মাঝে দুটো গাল-গল্প করি, কিন্তু তা আর হয় কই!—বলতে বলতে চেয়ারে বসলেন ক্যাপ্টেন মামা। তারপর হঠাৎ আয়েঙ্গারের দিকে নজর পড়তেই তিনি যেন একটু অবাক চোখে কয়েক মুহূর্ত্ত ওর দিকে চেয়ে থেকে বললেন—মিষ্টার আয়েঙ্গার না? তা···তা, এখন বুঝি আপনি আর মালাবার হোটেলে আসেন না, অনেকদিন তো দেখিনি আপনাকে?

—না, আমি এখন এদিকে এলে উডল্যাণ্ডস্‌-এ থাকি।

শুষ্কগলায় জবাব দিলো আয়েঙ্গার। ওকে যেন হঠাৎ বড় বিব্রত বলে মনে হলো।

—তোমার সঙ্গে দেখি সারা দুনিয়াটারই আলাপ আছে ডাক্তার।

সহাস্যে ওঁকে বললেন মিষ্টার মেনন,—ওঁর আরেকটি পরিচয়ও তোমাকে আজ জানাই—তাহলে। তুমি শুনে নিশ্চয়ই খুসি হবে। ইনি হচ্ছেন আমার ভাবী জামাতা। কথা শেষ করে মিষ্টার মেনন সস্নেহে আয়েঙ্গারের পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

—ও, তাই নাকি? তা বেশ, বেশ। গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন মামা। আমার হঠাৎ মনে পড়লো ওঁর সেই তিন বছর আগেকার কথাগুলো।

—আয়েঙ্গার,—কমলেশ—মালাবার হোটেল। একটা তিক্ত ঘটনা যেন শকুনির মত অশুভ ছায়া বিস্তার করে এগিয়ে আসছে। মনটা আমার সেই কল্পনায় শিউরে উঠলো। কথার মোড় ঘোরাবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বললাম,—মামা! আমাদের মার্সি মামী কেমন আছে? কৈ তাঁকে আনেন নি তো?

আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন মামা, তারপর বললেন—তাকে যে বাড়ী পাহারার কাজে রেখে আসতে হ'ল, মা।

আয়েঙ্গার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আমার একটু কাজ আছে, সেজন্য আজ আর বসতে পারছি না। চলি। বলে সে অস্থির পায়ে চলে গেলো, কারুর কথার অপেক্ষা না করেই!

একটা অস্বস্তিকর গুমোট ভাব যেন ঝড়ের সঙ্কেত জানাচ্ছে।

মিষ্টার মেনন বিস্মিতভাবে বললেন,—শঙ্কর হঠাৎ অমন করে চলে গেলো কেন? তুমি কিছু অনুমান করতে পারো মা রমলা?

—ব্যাপার তোমরা কেউই অনুমান করতে পারবে না,—যদি না আমি তোমাদের সব খুলে বলি। তবে—ভাবছি যে,—এসব কথা এখন বলা উচিৎ হবে কি না।

—অবশ্যই হবে। একটু উত্তেজিত ভাবে বললেন মিষ্টার মেনন। —সে রকম কিছু তোমার জানা থাকলে বলবে বৈ কি। সে অধিকার তোমার আছে।

—হ্যাঁ। সেই কারণেই, মনে হয় তোমাদের কথাগুলো আমার বলা উচিৎ। তা না হলে পরে, বিবেকের কাছে আমাকে অপরাধী হতে হবে। কারণ মারুতি মা তো, আমারও মেয়ের সমান।

মারুতির বিস্ফারিত দৃষ্টি ক্যাপ্টেনমামার দিকে প্রসারিত। সে চোখে ছিলো বিস্ময়, কৌতূহল, আর বেদনা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে, একটু চিন্তা করে বললেন ক্যাপ্টেনমামা —বছর তিন, কিম্বা সাড়ে তিন এর আগেকার কথা বলছি। মানে ঐ রমলা মায়েরা যখন এসেছিলো মালাবার হোটেলে, ঠিক তার বোধ হয় পাঁচ ছ' মাস আগে,—ফোনে মালাবার হোটেল থেকে এক জরুরি কল পেয়ে আমি গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখলাম এই আয়েঙ্গার শুয়ে আছে আর তার পাশে বসে আছে একটি পাঞ্জাবী মহিলা। তখন অবশ্য মেয়েটির নাম আমি জানতাম না, পরে শান্তামায়ের কাছে ওর নাম জেনেছিলাম কমলেশ কাপুর। আয়েঙ্গারের হঠাৎ বার কয়েক বমি আর দাস্ত হওয়াতে বেশ ঘায়েল হয়ে পড়েছিলো ও। যাহোক আমি ওষুধের ব্যবস্থা করে পরদিন অবস্থা জানাবার কথা বলে চলে এলাম।

পরদিন ওদের কল পেয়ে আবার গিয়ে দেখলাম যে, আয়েঙ্গার ভালো আছে—তবে খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে! ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে, ওকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলে এলাম। এই হ'ল,—ওদের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত।

তারপর মাঝে সাঝে পথে ওদের একসঙ্গে বেড়াতে দেখেছি,—আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, হাত তুলে নমস্কার জানিয়েছে ওরা। তবে কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু বলেনি। পরে ঐ মালাবার-হোটেলের কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির কাছে শুনেছিলাম যে, আয়েঙ্গার ছেলেটি নাকি মাদ্রাজের এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে, পড়েছে ঐ দুশ্চরিত্রা পাঞ্জাবী মেয়েটার পাল্লায়। মালাবার হোটেলের পাশাপাশি দুটি ঘর নাকি, ওদের বারোমাসের জন্তই ভাড়া করা আছে! ওরা প্রায়ই এসে থাকে ওখানে!

তারপর,—ক'মাস পরে ঐ ঘরে আবার আমাকে যেতে হয়েছিলো, রমলা মাকে দেখতে! আমার খুব আশ্চর্য্য লেগেছিলো ঐ খারাপ মেয়েটির সঙ্গে দুটি সম্ভ্রান্ত চেহারার বাঙালী মেয়েকে দেখে! তখন অবশ্য আমি এদের পরিচয় জানতাম না। শান্তা মার কাছে সেই দিনই কথায় কথায় জানতে পারলাম—এরা আমার আপন জন! তখন আমি. ওদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, ঐ পাঞ্জাবী মেয়েটা ওদের সঙ্গে কেন? আর ঐ মেয়েটার সম্বন্ধে যা শুনেছি বা দেখেছি, তাও ওদের বলে, সাবধান করে দিয়েছিলাম, যেন ওরা এই অসৎ মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা না করে। শান্তা মায়েরও খুব খারাপ লাগছিলো ওখানে, তাই ঠিক করেছিলাম ওদের নিয়ে আসবো আমার বাড়ীতে। তারপর,—তারপর তো সব শেষ হয়ে গেলো।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিজের বক্তব্য শেষ করে, আমার দিকে ফিরে বললেন তিনি,—

—সেদিনের কথা, তোমারও হয়তো মনে আছে মা।

কি জবাব দেব আমি? সেদিনের দুঃস্বপ্নের মর্ম্মান্তিক স্মৃতিটাকে আবার স্মরণ করা আমার পক্ষে কি সহজ কথা? তার ওপর নতুন এক দুর্বিপাকের আশঙ্কায়, বুকটা আবার থরথর করে কাঁপতে সুরু করেছে!—তাই আমি দিশেহারা চোখে, চেয়ে রইলাম,—ক্যাপ্টেনমামার মুখের দিকে।

—তুমি এ বিষয়ে যা জানো,—আমাকে বলবে মা রমলা?

অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে মিষ্টার মেনন অনুরোধ করলে আমাকে।

—আমি? ভয়ার্ত্ত ভাবে ওঁর দিকে চেয়ে জবাব দিলাম আমি—

—আমি তো মিষ্টার আয়েঙ্গারকে আগে কখনও দেখিনি কাকাবাবু! তবে কমলেশ কাপুরের কথা যা জানি, বলছি।

—বল্লারশা'য় কমলেশের সঙ্গে পরিচয়ের ব্যাপার,—আর তার একান্ত অনুরোধে, আর উদ্যোগে, আমাদের মালাবার হোটেলে আসা কথা,—তারপর হঠাৎ কাবেরীদির টেলিগ্রাম পেয়ে আমাদের ফিরে যাওয়া আর পরে সঞ্জয়দা আর শান্তাদির মৃত্যুর কথা,—অল্প দু'চার কথায় বলবার পর, শেষে আমি বললাম—সেদিন ক্যাপ্টেন মামা বলেছিলেন বটে যে, ঐ কমলেশ মেয়েটি ভারি খারাপ,—একটা মাদ্রাজী ছেলে, সাম আয়েঙ্গার,—তার সঙ্গে হোটেলের এই ঘরে প্রায়ই এসে থাকে।

—দেখছো না? ছেলেটি আমাকে দেখে কি রকম বিব্রত ভাবে পালিয়ে গেলো। ভয় হলো, পাছে আমি আর কিছু, মানে কমলেশের কথা জিজ্ঞেস করি।

অবশ্য বছর দুই বা আড়াই হলো ওদের আর দেখিনি ওখানে।

আমি যা দেখেছি বা শুনেছি, কর্ত্তব্যবোধে তাই তোমায় জানালাম,—মেনন,—অবশ্য এ-কথাও বলছি যে, শুধু আমার কথাতেই চরম কিছু করে বোসোনা যেন, ভালো রকম খোঁজ নিয়ে নিজের কর্ত্তব্য স্থির কোরো! বললেন ক্যাপ্টেন মামা।

—আমি বললাম—আয়েঙ্গারকে কিন্তু কিছুতেই আমার খারাপ লোক বলে মনে হয় না কাকাবাবু! এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু ভুল আছে।

—এ-সব কথা এখন থাক বাবা! আর্ত্তকণ্ঠে বললো মারুতি

—মানুষের ভুল ত্রুটি থাকবেই, সেইটাই তার সব চেয়ে বড় পরিচয় হতে পারে না বাবা!—তা কখনই হতে পারে না। বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মারুতি, তারপর প্রায় ছুটে চলে গেলো বাড়ীর ভেতর।

নিজেকে হঠাৎ যেন আমার খুনী আসামী বলে মনে হলো।

সারারাত ভালো ঘুম এলো না চোখে। পরদিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠিনি আমি। এলোমেলো চিন্তা, মনটাকে আমার বিক্ষিপ্ত করে তুলেছে।

—হায় মালাবার উপকূল! তুমি তো আমাকে শান্তি দেবে না জানতাম, তবে কেন আবার এলাম তোমার কাছে? ভুল! ভুল করেছি এসে। ফিরে যাবো, আজই আমি পালিয়ে যাবো এখান থেকে। দিনের আলোয় এ মুখ, আমি মারুতিকে দেখাতে আর কিছুতেই পারবো না।

টুক্, টুক্, টুক্। দরোজায় আওয়াজ শুনে, উঠে গিয়ে দরজা খুলেই, চমকে উঠলাম। জোছনায় ধোয়া একরাশ শুভ্র ফুলের মত সুন্দর প্রশান্ত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেনন।

—কি ভাই, শরীর খারাপ নাকি? এখনও ওঠোনি দেখে ভারি ভয় করছিলো আমার। বলতে বলতে সে এসে বসলো পাশে। ঠোঁটে তার সেই চির পরিচিত মিষ্টি হাসি।

—না, না, ভালোই আছি আমি! তবে কাল রাতে, ঘুমটা ভালো হয়নি। সঙ্কুচিত ভাবে বললাম আমি।

—তা তো হবেই! যা হিজিবিজি খবর নিয়ে মাথা ঘামাও তুমি। হাসতে হাসতে বললো মারুতি,—কাল রাতে, খাবার টেবিলে, তুমি যে রকম গম্ভীর মুখে বসে ছিলে, আমার তো তোমায় দেখে রীতিমত ভয় ধরে গিয়েছিলো। যাক্, এবারে ওঠো তো লক্ষ্মী মেয়ে। কখন থেকে যে চা-তেষ্টা পেয়েছে।

আমার দুচোখ ছাপিয়ে ঝর ঝর করে জল নেমে এলো, ওকে দেখে। আমি দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম—আমাকে ক্ষমা কর মারুতি। আমি বড্ড যন্ত্রণা পাচ্ছি, কাল সন্ধ্যায় ঐ বাজে কথাগুলো বলে।

—তোমার দোষ কোথায় ভাই, যে ক্ষমা করবো? বরং আমিই এসেছি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে। কারণ, কাল ঐ ভাবে উঠে যাওয়া আমার পক্ষে খুবই অন্যায় হয়েছিলো।

—এই তো ঠিক হয়ে গেছে। এসো দুজন দুজনকে ক্ষমা করে ফেলি।

একটু হাসির সঙ্গে জবাব দিলাম আমি!

একটু পরে উডল্যাণ্ডস্ থেকে বেয়ারা একটি ছোট্ট চিঠি নিয়ে এলো! মারুতিকে লিখেছে আয়েঙ্গার:

—বিশেষ প্রয়োজনে মাদ্রাজ ফিরে যেতে হচ্ছে, দেখা করতে সময় পেলাম না। ক্ষমা কোরো। ফিরে এসে সব কিছু বলবো।

চিঠিটা পড়ে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললো মারুতি—আজ ভেবেছিলাম ক্যাপ্টেন হালদারের মজার গল্পটা ওকে শুনিয়ে, খুব একচোট হাসবো,—কিন্তু ভদ্রলোক সে সুযোগটা দিলেননা দেখছি। যাক্, ক'টা দিন তার জন্য অপেক্ষাই করতে হবে।

আমার মনে চট করে উঁকি মেরে গেলো একটি প্রশ্ন—উড্-ল্যাণ্ডস্-এ তো ফোন ছিলো,—তবে ফোনে কথা না বলে, আয়েঙ্গার চিঠি পাঠালো কেন?

প্রিয়জনের প্রতি মারুতির এমন সরল সুদৃঢ় বিশ্বাস, আর ভালোবাসার আশ্চর্য নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে, নিজেকে হঠাৎ ওর তুলনায় বড় ছোট মনে হল।

আরো তিন চার দিন কেটে গেলো। আজ সতেরো দিন হ'ল এসেছি এখানে। প্রায় কুড়িটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত এপর্যন্ত শিখেছে মারুতি আমার কাছে,—আর তার থেকে অনেকগুলি গান নির্বাচন করে, ও, শিখিয়েছে ওর ছাত্রীদের। ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারে ওর অসাধারণ ধৈর্য্য আর নিষ্ঠা দেখে, বিস্ময় জাগে আমার মনে। সকল গুণে সমৃদ্ধা অনন্যা এই মেয়েটির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসে।

কাল ক্রেসমাস ডে।

ক্রিশ্চান-প্রধান দেশ কেরলরাজ্য,—তাই এই বিশেষ উৎসবটি এখানে মহা সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ব্রডওয়ের দোকানগুলো, নানাবিধ পণ্য-সম্ভারে, রঙিন কাগজের ফুলে, আলোর মালায় সজ্জিত হয়ে, ক্রেতার ভিড়ে, বিক্রেতার বাক্যচ্ছটায় গম গম করছে।

প্রত্যেক বাড়ীই ঝলমল করছে আলোক-সজ্জায়, আর বড় বড় আলোর ষ্টারের দীপ্ত ছটায়।

সমুদ্রের ধারে সুভাষ-পার্কে প্রায়ই বিকেলে বেড়াতে গেছি আমরা আর সেখানকার হেড্‌মালি-দম্পতি, সাবেষ্টিন আর কায়রণের সঙ্গে দিনে দিনে, পূর্ব্বের সামান্য পরিচয়টুকু বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে।

আমার বড় ভালোলাগে এই সৎ চরিত্রের খৃষ্টান দম্পতিকে। ওরা শুধু যে বাগান আর ফুল নিয়েই থাকে, তা নয়, রীতিমত জ্ঞানের চর্চ্চাও করে। সারা পৃথিবীর খবর রাখে। আবার নিত্য নতুন ফুলে, মূল্যবান দেশ-বিদেশের গাছ-গাছড়ায়, কৃত্রিম হ্রদে সামুদ্রিক রঙিন মাছের বাহারে, পার্কটিকে কেমন করে মনোমুগ্ধকর সাজে সাজানো যায়, সে বিষয় নিয়ে রীতিমত গবেষণা করে। ওদের কাজে ফাঁকি নেই, তাই দেখি কেরলের পার্কের ফোয়ারার জলে ফুটে আছে বাংলার পদ্মফুল; প্রতিটি গাছ যেমন সতেজ সুন্দর, তেমনি অজস্র বর্ণাঢ্য ফুলের সমারোহ সেখানে। অতি সন্ধানী নজরেও ধরা পড়বে না, কোথাও সামান্য একটু অপরিচ্ছন্নতা। এসব দেখে, যখন মনে পড়ে পৃথিবীর সেরা মহানগরীর অন্যতম মহানগরী কলকাতার বড় বড় পার্কগুলোর নিদারুণ অবহেলিত হতশ্রী রূপগুলো, তখন, অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠ বুকটা।

ক্রেসমাসের আগের দিন বিকেলে আমাদের শুভেচ্ছা ও নিমন্ত্রণ জানাতে এলো সাবেষ্টিন আর কায়রণ। একটি রঙিন ট্রেতে কেক আর অপর একটি ট্রেতে ফুলের স্তবক আর প্রত্যেকের জন্য সুদৃশ্য ক্রেসমাসকার্ড নিয়ে এসেছে ওরা।

মারুতিও বাড়ীতে কেক, পুডিং, প্যাসট্রি তৈরী করেছে। আমি বাংলার কিছু খাবার—সন্দেশ, পান্তুয়া, নিমকি তৈরী করেছি ওর সঙ্গে। সেগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে রেফ্রিজেটরে; কারণ এখন, ক্রেসমাস উপলক্ষ্যে বাড়ীতে ক'দিন অতিথি-অভ্যাগত'র আনাগোনা চলবে। সাবেষ্টিন আর কায়রণের সঙ্গে হাসি-গল্পে, চমৎকার কাটলো বিকেলটা।

মিষ্টার মেননও যোগ দিয়েছিলেন আজ আমাদের গল্পের আসরে। এই কটা দিন মনটা ওর বড় বিষণ্ণ বলে মনে হচ্ছিলো, ক্যাপ্টেনমামার কথায় কিন্তু আজ যেন ওর স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আবার ফিরে এসেছে। ক্যাপ্টেনমামার কথার ধাক্কায়, আয়েঙ্গারের প্রতি মারুতির বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিতে একটুও চিড় খায়নি দেখে, উনি বোধ হয় কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন।

জলযোগের পর, শুভেচ্ছা জানিয়ে, চলে গেলো সাবেষ্টিন আর কায়রণ। একটু পরেই একজন বেয়ারা এলো ক্যাপ্টেনমামার চিঠি নিয়ে। তিনি মিষ্টার মেননকে, মারুতিকে, আর আমাকে আসছে কাল রাত্রে মালাবার হোটেলে ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পত্রে।

মালাবার হোটেল! হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিকের শক লাগলো যেন আমার মর্মস্থলে।

না,—না, সেখানে আর নয়। আমি যেতে পারবোনা ঐ অভিশপ্ত মালাবার হোটেলে। মনের অস্থিরতা গোপন করে, স্বাভাবিকভাবেই বললাম আমি মারুতিকে—এ নেমন্তন্নটা ক্যানসেল

আমিও গেলাম ওর পেছনে। মনে হলো ওর মনের নিদারুণ ব্যথা যেন আমার কাছে গোপন করতে চাইছে ও। তাই ছুটে চলে গেলো আমার আগেই। গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন মামা। তিনি বললেন—চলো তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি। আমরা গাড়ীতে উঠে বসলাম।

গাড়ীর ভেতর থেকে হঠাৎ নজরে পড়লো, সিঁড়ির ওপরে ব্যালকনির একপাশে, দুটি হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে বেঁধে রেখে, আবছা অন্ধকারে, নিষ্প্রাণ পাথরের স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে আয়েঙ্গার। ওর চোখের দৃষ্টি ছিলো এই দিকেই, শুধু আমাদের দেখতে পেয়েও ও এগিয়ে এল না,—আর আমরাও গেলাম না ওর কাছে।

একটা বিরাট ব্যবধানের খাদ যেন আজ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, ওর আর আমাদের মাঝখানে।

গাড়ীতে যেতে যেতে ক্যাপ্টেন মামা বললেন—আজ অনেক দিন বাদে আবার ঐ জঘন্য মেয়েটাকে দেখলাম আয়েঙ্গারের সঙ্গে।

ছোকরা বোধ হয় ভাবতেই পারেনি, যে ওখানে আপনাদের সঙ্গে আজ দেখা হয়ে যেতে পারে। তাই দেখলেন না, এদিকে নজর পড়তেই কেমন যেন চুপসে গেলো। এদিকে মোটে আসতেই পারলো না?

পিল্লাই বললেন,—ওদের সঙ্গে ট্রেনে আজ এক কামরাতেই তো আমিও এসেছি! হোটেলে আমার পাশের ঘরেই আছে ওরা। ঐ পাঞ্জাবী মেয়েটা মশাই সাক্ষাৎ নরক! মাদ্রাজে ওর ভারি বদনাম! একজন আধাবুড়ো রত্নব্যবসায়ী ধনী সিন্ধিকে বিয়ে করেছে, তার পয়সায় নবাবী করা আর যতো ভালো ভালো ছেলের মাথা খাওয়া এই ওর কাজ! সারাটা দিন মদ খেয়ে হুল্লোড় করছে ওরা ঐ ঘরে।

—মানুষ বড় আশ্চর্য্য জীব। ওকে কোন দিনই চেনা যায় না—একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললেন, মিষ্টার মেনন।

রাত হয়েছে গভীর—তাই রাস্তার ভিড় এখন কমে গেছে। উৎসবমুখর রাজপথগুলো এখন খাঁ খাঁ করছে শূন্যতায়। শুধু হাজার হাজার আলোর ছটা বিচিত্র রং ছড়াচ্ছে। উৎসবের পর পরিত্যক্ত শূন্যবাসরে জ্বলছে রঙিন স্মৃতির দীপালি। সেই দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে নির্ব্বাক হয়ে বসেছিলো মারুতি।

ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে আমার মনটা।

—কেন গিয়েছিলাম? কেন আবার গেলাম ঐ অভিশপ্ত জায়গাটায়?

হায় মালাবার হোটেল! সীমাহীন নিষ্ঠুরতায় তুমি চিরস্মরণীয় হয়ে রইলে আমার মনে।

বাড়ীতে ফিরে আমরা তিনজন নিঃশব্দে যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাতে মোটেই ঘুম এলো না চোখে। এ-পাশ ও-পাশ করে এক অস্বস্তির মাঝে রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে ভোর হতেই নেমে এলাম বাগানে।

ধিকি ধিকি আগুনের ফুলকি তখনও জ্বলছে মনের চুল্লিতে।

ভোরের স্নিগ্ধ নরম আলোয় শিশির ভেজা ফুলগুলো দেখে মনে পড়ে গেলো মায়ের স্নেহ ঢলো ঢলো মুখখানা।

মসৃণ কলাপাতার চকচকে সবুজ রঙের ওপর মণিমুক্তোর মত জ্বলছে শিশিরবিন্দু।

গাছের কোটর থেকে সর সর করে নেমে আসছে কাঠবিড়ালী পরিবার। ওরা নিঃশঙ্ক চিত্তে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। এক ঝাঁক টিয়াপাখি পাইন গাছে পাতার আড়ালে বসে সুখ দুঃখের গল্প করছে। জনবিরল পথে চলেছে পূজারীর দল। ওদের কপালে চন্দন,-কুঙ্কুম, হাতে মাঙ্গলিক দ্রব্য।

মন্দিরে ঢং ঢং করে বাজছে ঘণ্টা। শান্ত সুন্দর প্রভাত তার উদার প্রীতিধারা ঢেলে মনের আগুনটা ধীরে ধীরে নিভিয়ে দিচ্ছে।

মারুতি বোধ হয় এখনও ওঠেনি।

আহা, ঘুমুক ও।

আমি গেট খুলে বার হলাম সমুদ্রের ধারে যাবার জন্য। দু' চার পা গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম মারুতিকে দেখে।

মন্দিরের পুজো শেষ করে ফিরে আসছে ও! পরণে ওর লালপাড় ব্যাঙ্গালোর শাদা সিল্কের শাড়ী! কপালে চন্দন, হাতে শূন্য সাজি। ওর লম্বা চক্চকে ভিজে চুলের রাশ দোল খাচ্ছে হাঁটুর ওপর।

আমাকে দেখে হাসিমুখে বললো মারুতি—আরে! এত ভোরে উঠে পড়েছো? চলেছো কোথায়?

—আমিও তো তোমাকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি বন্ধু। পুজো শেষ করে এত ভোরে ফিরে এলে?—আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এখনও ঘুম থেকেই ওঠোনি, তাই একা একাই চলেছি সমুদ্রের ধারে। ঘুমটা কাল রাতে মোটে এলোই না আমার কাছে। জবাব দিলাম আমি।

—বাঃ রে। তুমি জানতে না বুঝি? আমি তো রোজ এই সময়ই পুজো করে ফিরে আসি। রোজ শেষ রাতে উঠে বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে মন্দিরে শিব পুজো করতে আমার ভারি ভালো লাগে। বাবার কাছে শুনেছি যে—আমার মাও রোজ বাগানের ফুল তুলে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে পুজো করতেন। মিষ্টি হাসির সঙ্গে বললো মারুতি।

ওর ঐ শুচি শুভ্র পূজারিণী রূপের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলাম আমি।

—চলো সমুদ্রের দিকে যাবে না কি? না, আমার মুখখানা দেখবে পথে দাঁড়িয়ে? আমার হাতটা ধরে টান দিলো মারুতি।

আমার ধারণা ছিলো কাল রাতে নিদারুণ ঝড়ে বিপর্য্যস্ত মানুষটিকে দেখবো আজ সকালে বিবর্ণ বিধ্বস্ত। আর সেই দেখার ভয়েই পালিয়ে যাচ্ছিলাম আমি।

—কিন্তু এ কি? ওর শিশির ধোঁয়া ফুলের মত সুন্দর পবিত্র মুখে তো বিন্দুমাত্রও যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। পৃথিবীর কোনো সুখ দুঃখই বুঝি ওর অন্তরকে আলোড়িত করতে পারে না। ও যেন জাগতিক সুখ দুঃখের অনেক উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে দেখছে নিস্পৃহ চিত্তে সংসার সমুদ্রের সুখ দুঃখের ঢেউগুলো। [ক্রমশঃ

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥
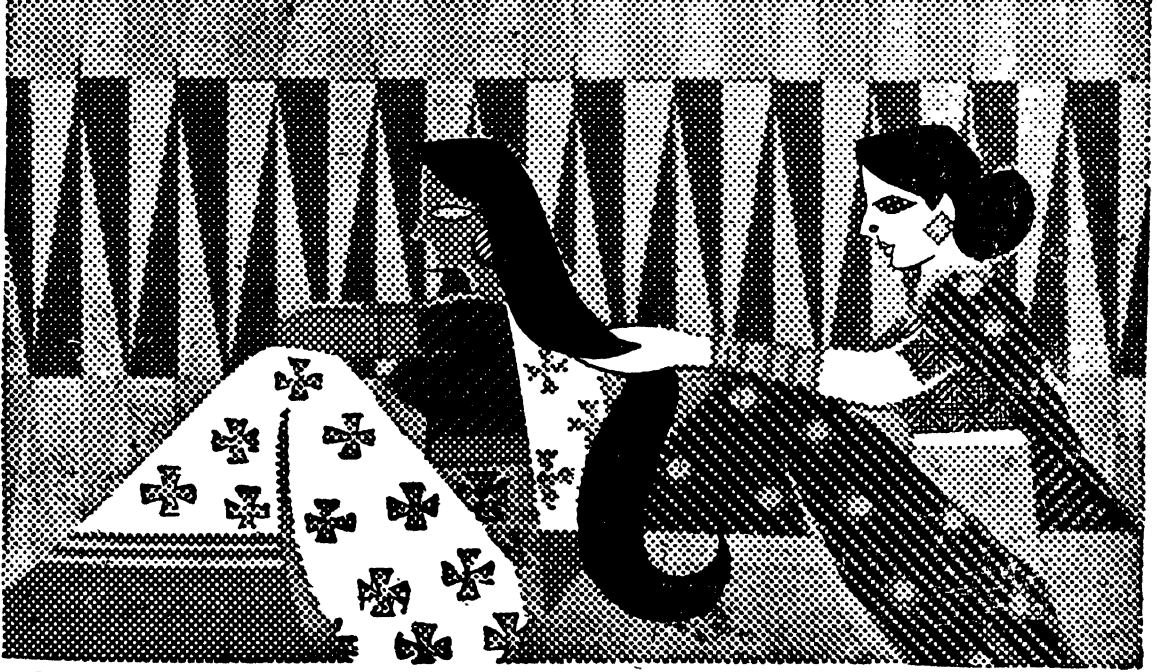
কিংশুকরাগিনী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

॥ ৪ ॥

প্রিয়নাথ দত্তের জীবিতকালেই সহর চলে গেল মিউনিসিপ্যালিটির হাতে। কুঞ্জ রাহাও পুকুর-টিউবওয়েল থেকে পাইপ ওয়াটার-এর রাজ্যে চলে এলেন, হলেন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। দীননাথ বাপকে মাথা চুলকে বললেন—এর পর কি আর কুঞ্জের দাপটে মাথা তুলে হাঁটা যাবে।

প্রিয়নাথ হেসে বললেন—অত অধীর হলে চলে না বাবা। ওসব পালিয়ে যাচ্ছে না। আজকের বাজার দর জেনেছ।

—না।

—সেইটে আগে জান, তাহলে মাথা না থাকলেও হাঁটা যাবে। দর বাড়ছে আরও বাড়বে কাজেই এটা হচ্ছে গোটাবার সময়, এদিকে নজর দাও। আজই মাল ধরতে হবে। কিন্তু কুঞ্জকে এ ভাবে আস্কারা দিলে—

—আস্কারা কে দিচ্ছে, আগে দু'একটা বছর কি লাভ-লোকসান হয় দেখই না। এই ত' সবে মিউনিসিপ্যালিটি হল এখনও দেওয়ালের চার কোণে পা'নর পিক জমেনি এই সময় কমিশনার হয়ে লাভ? আগে লাভ-লোকসানটা খতিয়ে দেখতে হবে ত' না কি।

মোট কথা হচ্ছে ফাঁকা কারবারে প্রিয়নাথ দত্ত নেই। ইলেকশনে দাঁড়ালেই দু'এক হাজার খসবে, এখন দু'এক হাজার খসিয়ে যদি দু'দশ হাজার না কামানো গেল তাহলে অমন মেম্বর হয়ে লাভ! কিন্তু চোখ ফুটিয়ে দিলে বেণী দাস ওরফে চটি জুতো। মেম্বার হয়েই টিউবওয়েল আর হাসপাতালের বাড়ী বানাবার কন্‌ট্রাক্ট নিয়ে মোটা টাকা কামিয়ে নিলে। এরপর প্রিয়নাথ স্থির থাকতে পারেন না, ছেলেকে বললেন, 'তৈরী হও সামনে ইলেকশন।'

খবরটা রাজনীতির পাণ্ডাদের কাছে যেতেই ডাইনে বাঁয়ের দু'দলই উল্লাসে লাফিয়ে উঠে বললে, মার কৈলাস। একই ওয়ার্ড থেকে দুই ক্যাণ্ডাকে দাঁড়াতে হবে। কাজেই একটা না একটা ঠিক খপ্পরে আসবে।

কানাঘুষোয় কথাটা প্রিয়নাথ দত্তের কানে গিয়ে পৌঁছতে তিনি সঙ্গীদের বললেন, 'দশচক্রে ভগবান ভূত হয় কাজেই কোনও চক্রে দত্তরা মাথা গলাবে না। দীনু আমার ইনডিপেনডেণ্ট দাঁড়াবে। আমি বেঁচে থাকতে ওকে আর কারুর ডিপেনডেণ্ট হয়ে কাজ নেই। এখন তোমরা উঠে পড়ে লাগ। পাড়ার ছোঁড়াদের খবর দাও, তাদের ক্লাবের সেক্রেটারীদের হাত কর।' ওরে দামিনী—বিকেলে দুধ দিতে এলে ঘোষকে বলবি কাল থেকে আরও তিন সের করে দুধ যেন বেশী দেয়।

—আর দুধ দিয়ে কি হবে?—দামিনী জিজ্ঞেস করলেন।

—কতকগুলো কালসাপ পুষবো।

খবরটা কুঞ্জ রাহার কানে পৌঁছল এবং তিনিও দক্ষিণ ও বাম উভয়পন্থীকেও পথ দেখিয়ে দিলেন। দীননাথ নিজের পায়ে দাঁড়াবেন আর কুঞ্জ রাহা 'ক্র্যাচ' নেবেন এ হতেই পারে না। দু'দলই মোটা দাঁই মারবার তালে ছিল কিন্তু ব্যর্থ হওয়াতে দু'দলই দু'জনের ওপর ভীষণ রেগে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সন্ধি করে ফেললে। তারপরই দেখা গেল দীননাথ ও কুঞ্জ-র সঙ্গে আরও একজন প্রার্থী আছেন, তিনি হচ্ছেন শক্তি গোস্বামী এবং তিনি উভয়পন্থী কর্তৃক সমর্থিত।

দীননাথ মহা উৎসাহে খাটতে লাগলেন। কিন্তু বিধি বাম। ইলেকশানের আগে হঠাৎ প্রিয়নাথ চোখ বুজলেন এবং মনের দুঃখে দীননাথ নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন।

এরপর দীনু দত্ত আর ও মুখো হননি, ব্যবসায়ে মন ডুবিয়ে দিলেন। কিন্তু শেষ অবধি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিন নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার বন্ধুবর ফটিক ঘোষ ফট করে চোখ বুজতেই দত্ত মশাইর মনে কমিশনার হবার সাধ আবার উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল। দু'একজনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মনের কথাটা বললেন—ফটিকের জায়গায় দাঁড়ালে কেমন হয় বল দেখি।

খবরটা কুঞ্জ রাহার কানে গেল তিনি দীনু দত্তর কাছে এলেন। এসে তিনিই প্রস্তাব করলেন, 'আমাদের সবারই ইচ্ছে দীনুদা—যে আপনি এবার কমিশনার হন। তিন নম্বর ওয়ার্ডের সীটটা খালি হয়েছে আপনি ঐখান থেকে দাঁড়ান।'

—মাঝে মাঝে ইচ্ছে ত' করে একটু পাবলিক ওয়ার্ক করি। বয়েস হল, কবে আছি কবে নেই। চোখ বুজলে লোকে বলবে দীনু দত্ত খালি পয়সা কামাই করেই গেছে, পাবলিক ওয়ার্ক করে নি। কিন্তু কথা কি জান, আমি তিন নম্বর ওয়ার্ড থেকে দাঁড়ালুম দেখাদেখি আবার আর একজন ঐখান থেকে দাঁড়াল, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি। যে হারবে তাঁরই কষ্ট হবে। কাজেই—

—না দীনুদা, আপনি দাঁড়ালে আর কেউ দাঁড়াবে না, সে ভার আমি নিচ্ছি।

—আমাদের রাইমোহনও বলছিল, দীনুদা দাঁড়াব না কি, তুমি কি বল?

—না দাদা, আপনি থাকতে রাইমোহন কেন। আমাদের

বিছে উকীলও বলছিল যে দাঁড়াবে। আমি বললুম যে, আমাদের ইচ্ছে দীনুদা কমিশনার হন তবে তিনি যদি রাজী না হন তাহলে অন্যকথা।···তা হলে ঐ কথাই রইল দাদা, আপনি দাঁড়াবেন আর যদি না দাঁড়ান তাহলে বিছে উকীল দাঁড়াবে। তবে আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি আসুন, কাজকর্ম বুঝে নেন, চেয়ারম্যান হন, সরে গিয়েও নির্ভাবনায় থাকতে পারব—না দীনুদা আছেন।

—কেন, তুমি কোথায় যাবে?

—আপনাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে এবার ইচ্ছে ত' আছে যে য়্যাসেম্বলীর ইলেকশনে দাঁড়াই। অনেকদিন ত মিউনিসিপ্যালিটিতে রগড়ালুম। তাহলে ঐ কথাই রইল।

—আসুক ভবতারণ, কথাবার্ত্তা বলে দেখি। মেয়ের অসুখ, দেখতে গেছে সোমবার আসবে। বুধবার নাগাদ যা হয় একটা স্থির করব'খন।

ভবতারণ এসে সব শুনে বললেন,—'কিছু মনে করো না দীনু, আমি চাল-কলাখেগো বামুন, তবে বন্ধু বলে মানো আর পালা-পার্ব্বণে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর বলেই বলছি, নেহাত বরাত জোরেই পয়সা আয় করছ, বুদ্ধির জোরে নয়। বলি, তোমার কি দায় পড়েছে ঐ ওয়ার্ড থেকে দাঁড়াবার, তাও আবার মরা মানুষের জায়গায়! ওয়ার্ড তিন নম্বর হলে কি হবে, জায়গাটা পুরোন বাজার। সাতশো ভোটারের চারশো হচ্ছে বাড়ীউলী আর তাদের ভাবের মাগীগুলো। এত বড় পট্টি কলকাতার পর সারা বাংলা দেশে নেই। ঐ খাণ্ডার ওয়ার্ডে ফিচেল বদমাসের অন্ত নেই। একটা কিছু হবে আর কুঞ্জ রাহা ফড়ে-বদমাসদের দিয়ে মাগীদের লেলিয়ে দেবে, যা তোদের ওয়ার্ডের মেম্বারের কাছে। একপাল মাগী যখন বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বাড়ীতে ঢুকবে তখন সামলাতে পারবে? তা ছাড়া ঐ মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে অত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, সে খেয়াল আছে?'—বলে ভবতারণ থামলেন।

দেখা গেল অত বড় কাণ্ডর কথাটা ভবতারণের মনে থাকলেও দীনু দত্ত ভুলে মেরে দিয়েছেন। তিনি বললেন—কি, কি কাণ্ড ঘটলো?

—বাঃ! কর্ত্তা চলে গেলেন না। শুরু নিপাত চাট্টিখানি কথা। তিনিই তোমায় দাঁড়াতে বলেছিলেন, তাঁর কত সাধ ছিল বল দেখি। তুমি ঐ মিউনিসিপ্যালিটি নামও মুখে এনো না। ও জায়গা তোমার জন্যে নয়। আরও ভেবে দেখ, ফটিক ঘোষ গোটা আস্ত একটা পাঁঠা খেয়ে হজম করতো। কমিশনার হবার পর কি হাল হ'ল। দু'টো কাঁঠালবীচি ভাজা খেয়ে পেট ছেড়ে ম'ল। ও বড় অপয়া জায়গা। তারপর দোষ লাগা আছে। ফটিকের সাধ ছিল কিন্তু তার আগেই চলে যেতে হল, বলি আত্মা-টাত্মা তো আছে না কি নেই?

দীনু দত্ত দমে গেলেন, ওদিকটা তিনি ভেবে দেখেননি। বললেন—কিন্তু বয়েস ত' হল, কিছু পাবলিক ওয়ার্ক করা দরকার।

—নিশ্চয়ই। বলি কুঞ্জর প্যাঁচটা বুঝতে পেরেছো। দীনুদা'র জন্যে ত' তার ঘুম নেই। আসল কথা তোমাকে এইখানে ভিড়িয়ে উনি এম-এল-এ হয়ে তোমার ওপর টেক্কা নেবেন।

—তা তুমি কি করতে বল।

—আমাদের রাইমোহন দাঁড়াতে চাইছে দাঁড়াক—

—কিন্তু আমি যে কুঞ্জকে এক রকম পাকা কথাই দিয়েছি, হয় আমি দাঁড়াব, না হয় বিছে উকীল দাঁড়াবে। বিছে উকীল কিন্তু তোমার রাইমোহনের চেয়ে ঢের করিৎকর্ম্মা লোক, তা ছাড়া হাকিমের ভাই।

—রেখে দাও তোমার হাকিম। মরা বাঘ আর রিটায়ার্ড হাকিম ও দুই-ই যাদুঘরের মাল। তুমি কুঞ্জর মতলবটা এখনও বোঝনি। বিছে উকীলকে কমিশনার দাঁড় করিয়ে হাকিমের কাছে সুনাম কিনতে চায়। নজরটা অবশ্য আরও ওপরে। হাকিমের ছেলেটাকে দেখেছ ত' ওটি হচ্ছেন কুঞ্জর হবু জামাই। হাকিম শুনলুম স্পষ্টই বলেছেন, আপনার মেয়েকে পুত্রবধূ করতে আপত্তি নেই কিন্তু আপনাকে সোসাইটীতে আরও উঠতে হবে। তাই কুঞ্জ য়্যাসেম্বলীতে চড়তে চাইছে। এখন এস বাবা তুমি। কি জানি কুঞ্জ এম-এল-এ হবার জন্যে দাঁড়াচ্ছে দেখে যদি তোমারও এম-এল-এ, হবার বাই চাপে তাই পটিয়ে পাটিয়ে তোমাকে এখানেই আটকে রাখতে চায়।

—তুমি এত কথা জানলে কি করে?

—কানখাড়া করে থাকলে অনেক কিছুই জানা যায়। রাইমোহনই দাঁড়াক, কুঞ্জ যদি চায় বিছে উকীলকে দাঁড় করাক, ও রাইমোহন ঠিক মাগীদের দিয়ে উকীলকে ঘায়েল করবে।'

দীননাথ বললেন—'তা যেন হল 'কিন্তু আমি? মানে—অনেক বয়েস হল পাবলিক—'।

—নিশ্চয়ই। তুমি হবে বাবু শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত এম-এল-এ, ব্যাঙ্কার, ল্যাণ্ডলর্ড য়্যাণ্ড মার্চ্চেণ্ট।

—এম-এল-এ হব?

—আঁৎকে উঠলে যে?

—না আঁৎকে ওঠবার কি আছে। তবে···।

—কি তবে?

—মানে—তুমি বন্ধুলোক—তোমাকে বলতে বাধা নেই, ও এম-এল-এ হতে পারব না।

—কেন, ভোটে হেরে যাবে?

—হার-জিত তো আছেই, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

—তবে?

—মানে, তুমি তো জান' আমি ইংরিজী ভাল জানি না। বার-তিনেক রগড়ারগড়ি করেও ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারলুম না, ফিবারেই আটকে গেল ঐ ইংরিজীতে। এম-এল-এ'দের আবার ইংরিজীতেই সব করতে হয়, কথাবার্ত্তা খাওয়া-দাওয়া সব। যদিও সবাই মুখে বাংলা বাংলা করে আসলে চায় ইংরেজী! বক্তৃতাও দেয় ইংরেজীতে, না হয় ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে।

—হাসালে ফিবোজা। বলি ক'টা লোক ইংরেজী জানে বলতে পার? ইংরেজী জানে তো দু'টি লোক। এক নেস্‌ফিল্ড সাহেব যাঁর গ্রামার আর এক প্যারী সরকার মশাই যাঁর ফার্ষ্ট বুক, অন্য সবাই তো ওঁদের জিনিষ নিয়েই নাড়াচাড়া করে। ঐ শিবকালী ভট্‌চাজ কত বড় নাটাকার ভাব দেখি, সতের বচ্ছর এম-এল-এ ছিল ইংরেজ বাহাদুরদের নমিনেশনে। য়্যাসেম্বলীতে কেউ কথা বলতে শোনেনি। ভোটের সময় সরকারের দিকে হাত তুলতো, কেউ কোনও কথা জিজ্ঞেস করলে মুচকি মুচকি হাসতো। সাহেবরা বলত, এ গ্রেট ম্যান। একবার বুঝি একজন বেয়ারাকে ভটচাজ বলেছিল, এক গ্লাস ড্রিঙ্কিং জল দাও। তাইতেই অন্য মেম্বাররা বুঝলেন লোকটাকে তাঁরা যা

ভেবেছিলেন তা তিনি নন, কথা বলতে পারেন। তুমিও তাই করবে, ন'মাসে ছ'মাসে ফুটকাটবে।

—শিবকালী ভটচাজের নাম ডাক ছিল কিন্তু আমার ?

—তুমি কম কিসে ? তোমার ব্যাঙ্কের বই-এর অঙ্কগুলো দেখে অনেক শালার হার্টফেল হবে। তাছাড়া আড়ালে আবডালে যা রেখেছো তাও একটা রাজার সম্পত্তি—আহা কাছে পিঠে কেউ নেই যে শুনে ফেলবে। বলি, তুমি কম কিসে ? আজকাল সত্যিকারের নাম করা লোক ছাড়া নতুন যারা মেম্বার হচ্ছে তারা হয় পয়সাওলা লোক না হয় ত্যাদোড় লোক, ইংরেজী লাগছে কোনখানটায় ? বলি, আমাদের নটবর পালের কথাটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে। তার পয়সা ছাড়া আর কি ছিল। অনারারী হাকিম হয়েছে শুনে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে কমিশনার সাহেবকে বললে, হুজুর আপনার অশেষ দয়া। কিন্তু আমি ইংজিরী জানি না অনাহারী হাকিম হ'ব কি করে—

কমিশনার নটবরের পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন, 'ডরো মৎ নট্‌টুবরো বাবু, কুর্শী পর বৈঠ যাও কাম্ আপসে চলা যায়েগা।'

আমিও ঐ কথাই বলব দীনু, 'ইংরেজীর জন্যে ঠেকবে না বিল আওসে পাশ হোগা। আর দোমনা করো না।'

কুঞ্জ রাহার কানে কথাটা গেল এবং তিনি দীনুবাবুর সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলে গম্ভীর মুখে ফিরে গেলেন।

দত্ত ও রাহাদের মধ্যে মন-কষাকষি সুরু হল।

ভবতারণের কথাটা মিথ্যে নয়। কুঞ্জ রাহার স্ত্রী শৈলজার আগে নজর ছিল কিংশুকের ওপর। বেশ ছেলেটি। রাগিণীর সঙ্গে ছেলে বেলা থেকে মানুষ দুটিতে সুন্দর মানাবে! তারপর মেয়ে পড়তে গেল কলকাতায়। ছুটীতে বাড়ীতে এলে মেয়ের চালচলন দেখে, কথাবার্ত্তা শুনে শৈলজা মনে মনে বলতেন, নিজের মেয়ে বলে বলছি না মা কালী, এমন মেয়ে জজ ব্যারেষ্টারের ঘরেই মানায়। কিংশুককে তখন আর আগের মত সুপাত্র বলে মনে হয় না। কর্ত্তা চেয়ারম্যান হলেন, আলাদা বৈঠকখানা হল, গদীওলা চেয়ার, গোল শ্বেত পাথরের টেবিল এল, তকমা আঁটা বেয়ারা চাপরাশী 'সাব' বলে সেলাম দিয়ে দাঁড়াতে লাগল, ঠানদিদিরা হেসে বললেন, কর্ত্তা যখন 'সাব' তখন তুমি ম্যাম, সাহেবের মাগ ম্যামই হয়। 'কাজেই ম্যামের মেয়ের উপযুক্ত জামাই চাই। শৈলজা মা কালীকে অষ্টপ্রহর ডাকতে লাগলেন। ডাকাডাকিতে কাজ হল। খবর পাওয়া গেল পাশের বাড়ীর বিন্তে উকীলের দাদা যিনি হাকিম ছিলেন তিনি রিটায়ার করে ফিরে বসবাস করবার জন্য আসছেন। আর সব চেয়ে বড় কথা হল তাঁর একমাত্র ছেলেটিও নাকি গতবারে বি-এ পাশ করেছে এবং এখনও তার বিয়ে হয়নি। কথাটা শুনে উত্তেজনায় শৈলজার দিন কয়েক রাত্রে ঘুম হল না। হাকিমের বেয়ান হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

হাকিম সাহেব সস্ত্রীক এলেন। বিন্তে বাবুর স্ত্রী কুমুদিনীর সঙ্গে শৈলজার আলাপ ছিল, কুমুদিনীই জা'-এর সঙ্গে শৈলজার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

—আমাদের শৈলজাদি চেয়ারম্যান কুঞ্জবাবুর স্ত্রী, বিরাট ব্যবসা এদের।

—আই সী! তা কি রকম ব্যবসা? কত আয় হয় বছরে?

কুমুদিনী বললেন—তা অনেক আয়। বছরে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা তো বটেই।

হাকিম গিন্নীর চোখ কপালে উঠল। ত্রিশ চল্লিশ হাজার। তাড়াতাড়ি বললেন—'আহা! দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভাই। দেখ ত' কথায় কথায় বসতে বলতেই ভুলে গেছি। দেখেছ কাণ্ড আমার। আবার কিনা তুমি বলে ফেললুম। তা ভাই তুমি আমার ছোট বোনের মত। আমার কুমুও যা তুমিও তাই কিছু মনে করো না।'

এরপর ভাব গাঢ় হতে মোটেই দেরী হল না। তারপরই দেখা যেতে লাগল রাহা বাড়ী থেকে দীঘির মাছ, বাগানের কলা, ঘরে তৈরী সর বাটা ঘি হাকিম বাড়ী নিয়মিত যাচ্ছে। হাকিম গিন্নী এখন শৈলজা বলতে অজ্ঞান।

শৈলজাও হাকিম দিদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ দিদি, কাজল কবে আসবে। তাকে ভারী দেখতে ইচ্ছে করছে।

দিদি সান্ত্বনা দেন, এল বলে। ক্ষ্যাপা ছেলে ওর কি আসা যাওয়ার কোনও ঠিক আছে। আমার রাগিণী কবে আসবে বল দেখি।

রাগিণী এল। হাকিম গিন্নী তাকে দেখে বললেন, 'ওমা, এই রাগিণী। এ যে বিউটি। যাকে বলে বেদিং বিউটি। সাহেবদের স্কুলের গুণই ঐ বিউটিফাই করে তোলে।'

আসবার আগে রাগিণীর মনে ভয় ছিল। হাজার হোক হাকিম গিন্নী পাঁচ জায়গার জল পেটে আছে বহু রকমের লোকের সঙ্গে মিশেছেন মেমসাহেবদের সঙ্গেও নিশ্চয়ই আলাপ আছে। এখন দেখে ও কথা শুনে বুঝলে কোন অবতার।

হাকিম গিন্নী বললেন—কোন ক্লাশে পড় ?

শৈলজা তাড়াতাড়ি বললেন—এইবার কেমব্রিক দেবে।

—কেমব্রিক!

রাগিণী বললে—কেমব্রিজ, এইবার সিনিয়ার কেমব্রিজ দেব।

কথাটা আগেও বার কয়েক হাকিম গিন্নী শুনেছেন কিন্তু জিনিষটা কি তা জানা না থাকাতে আর উচ্চ বাচ্য করলেন না।

শৈলজা বললেন, পড়াশুনোর বেজায় চাপ তাই কলকাতা ছেড়ে আসতেই চায় না। বলে বাড়ীতে গেলে কে আমায় দেখিয়ে দেবে। শেষে যখন লিখলুম যে এই ছুটীতে অবশ্যই এসো হাকিম দিদি দেখতে চায় তবে মেয়ে এলো।

অভয় দিয়ে হাকিম গিন্নী বললেন, 'ভেবো না মা, আমার কাজল সামনের সপ্তাহেই আসছে। সে তোমায় পড়াবে। নিজের ছেলে বলে বলছি না, বি, এ, পাশ তো হাজার গণ্ডা ছেলে করে কিন্তু ওর মত ইংরাজী কটা ছেলে জানে। ওর মাষ্টাররা বলে কাজল তোমার মত ইংরাজী আমরাও জানি না। তোমার কোনও ভয় নেই, ও ভেরি গুড কোচ বয়। তা ছাড়া কত বড় কোডি ও। সব কফি হাউসে ওর চেয়ার রিজার্ভ করা আছে আর কারুর সে চেয়ারে বসবার জো নেই।

রাগিণী এবার মুখর হল। চোখ বড় বড় করে বললে—কোডি কি মাসীমা ?

হাকিম গিন্নী রাগিণীর অজ্ঞতায় বিরক্ত হয়ে বললেন—কোডি কাকে বলে জানো না ?

রাগিণীও সমান তালে চোখ বড় করে মাথা নেড়ে বললে—না তো।

মায়ের মমতা ও
অষ্টারমিল্কে
প্রতিপালিত
OSTERMILK
আপনার শিশু অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত বলেই
এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, সদাই হাসি খুশী। কারণ
অষ্টারমিল্ক ঠিক মায়ের দুধেরই মতন। অষ্টারমিল্ক
খাঁটি দুধ থেকে শিশুদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে
তৈরী। সেজন্য সহজেই হজম হয়। শিশুদের
রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাবার জন্য অষ্টারমিল্কে লৌহ
আছে। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয়েছে,
ফলে আপনার শিশুর দাঁত ও হাড়
মজবুত হয়ে গড়ে উঠবে।
........মায়ের
দুধেরই মতন
বিনামূল্যে অষ্টারমিল্ক
পুস্তিকা (ইংরেজীতে)
আধুনিক শিশু পরিচর্য্যার সবরকম
তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের
জন্য ৫০ নয়া পয়সায় ডাক টিকিট
পাঠান—এই ঠিকানায়
'অষ্টারমিল্ক' পোঃ বক্স নং ২২৫৭
কোলকাতা—১

OS.8-X51-C. BG

—বাল্লা বই লেখে, তবে গল্পের বই নয়।

—তবে কি বই ? প্রবন্ধের ?

—না, পোইট্রি বই লেখে।

—পোইট্রি বই যারা লেখে তাদের তো কবি বলে।

—সে অন্য জিনিষ। সে হল পন্ত যারা লেখে তাদের বলে কবি। কোডিরা লেখে পোইট্রি, কোডিতা।

শৈলজা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, কাজল বই লেখে, কাজল আমাদের কবি ঠাকুর।

হাকিমগিন্নী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—'কবি ঠাকুর নয় কোডি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ কোডি। আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ আমার কি ছাই মনে থাকে। তা কি লিখেছে একটু বলুন না দিদি।

হাকিমগিন্নী প্রসন্ন হয়ে বললেন, আমারও কি ছাই মনে আছে। ছেলেত' আসছে এলে তাকেই জিজ্ঞেস করো। একখানা বই তো আগেই বেরিয়েছে আর একখানা আণ্ডার প্রিণ্টিং।

রাগিনী বাড়ীতে এসে হেসে আর বাঁচে না। শৈলজা বিরক্ত হয়ে মেয়েকে ধমক দিলেন—হাসছিস কেন ?

—হাসবো না। আমি ভেবেছিলুম যে যখন হাকিমগিন্নী তখন ঠিক আমাদের মিসেস আগুার টেকারের মত ইংরিজী বলবে, কি ভয়ই ছিল। ও মা, এ যে দেখছি কিছুই জানে না, বলে কিনা কোচ বয়, কোচম্যান যে বলেনি এই ভাগ্যি। একবার ভাবলুম জিজ্ঞেস করি যে হ্যাঁ মাসীমা, কোচ বয় কাকে বলে, করলুম না পাছে তুমি রেগে যাও।

—হয়েছে হয়েছে। তুমি একেবারে বিদ্যের জাহাজ। শোন, কাজল এলে তার কাছ থেকে সব পড়াশুনো ভাল করে বুঝে নেবে। আর ঐ কিংশুক টিংশুকের সঙ্গে যেন দেখা হলে কথা বলো না সুসাইটিতে তাহলে নিন্দে হবে।

রাগিনী মার কথায় বিস্মিত হয়ে বললে—কি বললে মা ?

শৈলজা অপ্রস্তুত হলেন, ভুল বললাম নাকি। বললেন, 'বললুম, যার তার সঙ্গে মিশলে সুসাইটিতে নিন্দে হবে। আমি ম্যানেজ করতে পারবো না।'

রাগিনী মা-কে জড়িয়ে ধরে বললে—সুসাইটি ! ম্যানেজ ! ও মাদার ডার্লিং তুমি ইংরিজী শিখে গেছ !

—ছাড়, ছাড় পড়ে যাব যে। হ্যাঁ রে, ঐ কথাটার মানে কি ?

—কোন কথাটা ?

—ঐ যে বললি মাদার দালিম্।

রাগিনী খিল খিল করে হেসে বললে, দালিম্ নয়, ডার্লিং।

—ঐ হ'ল। ওর মানে কি ?

কোডিতা জিনিষটা কি তা খুলে বলা দরকার। কবিতা কাকে বলে তা আমরা জানি। কবি কল্পনা ভিয়েন তা' দিয়ে যে মাল পরদা করেন তাকেই বলে কবিতা। এই কবিতা জিনিসটা বাল্মীকির আমল থেকে চলে আসছে কাজেই এ অত্যন্ত পুরোন জিনিষ যাকে বলে ব্যাকডেটেড, আজকালকার স্পুটনিক যুগে এ মাল অচল। আধুনিকেরা তাই কবিতার বদলে নতুন জিনিষ চালু করেছেন যাকে বলা হয় কোডিতা। কথাটা এসেছে ইংরেজী 'কোড' থেকে। কোড-এ লেখা চিঠি যেমন ডি-কোডেড্, না হলে মানে বোঝাবার উপায় নেই তেমনি মন যদি কোডি মন অর্থাৎ আধুনিক মন না হয় তাহলে কোডিতাও বোঝা যাবে না; ছোট্ট একটা উদাহরণ দি।'

আমাদের হবিবুল্লার জন্ম-গন্ধ পাকিস্তানে অথচ লোকটাকে পেটের জন্যে থাকতে হয় এখানে ওর ভাষায় যেটা হচ্ছে। নেহেরুস্থান। বছরে একবার করে বাড়ী যায় রোজগারের অর্থও সেই সঙ্গে যায় কি করে। না, ঐ কোডের মারফৎ। এখানে ছাতাওয়ালা গলিতে ওর জানা ব্যবসায়ী ওসমান আছে তাকে টাকা দিয়ে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ নেয় যাতে লেখা থাকে ব্যবসা ভাল নয় গরমে গত মাসে পাঁচশো আণ্ডা নষ্ট হয়ে গেছে। ওসমানের ভাই থাকে পাকিস্তানে সে কাগজ পড়ে কোড দিয়ে আণ্ডা ফাটিয়ে বুঝতে পারে যে ভাইটি এর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা পেয়েছে। সে হবিবুল্লাকে তিনশো সাতাশী টাকা দেয়। কোডিতাও ঠিক এইরকম। তবে সব সময় এর কোনও ধরা বাঁধা কোড নেই।

আমাদের কাজল ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লিখত। ওর সে সব কবিতা পড়ে মাষ্টার মশাইরা মনে মনে বখাটে বলে ওর মুণ্ডপাত করতে থাকলেও হাকিমের ছেলেকে প্রকাশ্যে চপেটাঘাত করতে সাহস করতেন না। মাষ্টার মশাইদের দোষ নেই, তাঁরা নিরীহ গোবেচারা সাত্বিক ধরণের মানুষ কিন্তু কাজলের কবিতা তার বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এমন ভীষণভাবে দেহবাদী হয়ে উঠতে লাগল যে, মাষ্টার মশাইরা পর্য্যন্ত তা পড়ে না কি মাথা ঠিক রাখতে পারতে না। তবে তাঁদের মহাভাগ্য বলতে হবে যে কয়েক বছর পরেই হাকিম সাহেব অন্যত্র বদলী হয়ে যেতেন এবং যাবার সময় তাঁর 'ওন্লি সান' খবরের কাগজে ভুল করে যা 'মাঝে মাঝে 'ওনলি সিন্' বলে ছাপায় সেটিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

কাজল ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় পড়তে এল। কলকাতায় এসে শ্রীমানের প্রচুর উন্নতি হল। বহু বন্ধুবান্ধব জুটে গেল, তারা ওর কবিতা পড়ে ওরই পয়সায় চা সিগারেট ফুঁকে ওর তারিফ করতে লাগল। বন্ধুদের সঙ্গে এখানে ওখানে নানা সাহিত্য সভা সমিতিতে গিয়ে শ্রীমান বুঝলেন যে, কবিতা আর চলবে না, এবার লিখতে হবে কোডিতা, হতে হবে কোডি। হলেনও তাই, নাম হল কা. ব। কোডিদের পুরো নাম লিখতে নেই। বন্ধুরা ওর প্রথম প্রথম কোডিতা পড়ে এমন তারিফ করলে যে মারামারি হচ্ছে মনে করে রেস্তোরাঁর ভেতরে পুলিশই ঢুকে পড়ল। উৎফুল্ল হৃদয়ে শ্রীমান সেদিন বাপের প্রেরিত মাসের সমস্ত টাকা দিয়ে রেস্তোরাঁর বিল শোধ করল। বন্ধুরা বললে, 'এই হচ্ছে চিরকালের সাহিত্য। এ কোডিতা অনায়াসে অন্য প্ল্যানেটেও পাঠান চলে, লিখে যাও। আমাদের খিদে মেটাও।' বন্ধুদের উৎসাহ ও বান্ধবীদের উত্তাপে কাজলের কলম দিয়ে এ বেলা ও বেলা কোডিতা বের হতে লাগল এবং সেই সঙ্গে সর্বত্র দেনাও বাড়তে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই একটি কোডিতা সঙ্কলন বাজারে বেরুল নাম ডিমের কান্না।

কাজল আই, এ, টা উৎরে গেল। বাপের কাছে ছেলের পাশের খবর ও পাওনাদারদের পাওনার কথা একই সঙ্গে পৌঁছল। পাশের সংবাদে খুশী হয়ে হাকিম সাহেব ছেলের সব দেনা এক কথাতেই শোধ করে দিলেন। বন্ধুরা আবার রেস্তোরাঁয় গুলতানী করতে করতে কাজলের প্রশংসা করে প্যাকেটের পর

প্যাকেট সিগারেট ফুঁকতে লাগল, দেনাও বাড়তে লাগল। বি, এ-টা পাশ করা আর কাজলের ভাগ্যে হয়ে উঠল না, দু'বার পরীক্ষা দিলে, তৃতীয়বারে ফীর টাকা দিয়ে দেনার কিছুটা মিটিয়ে যথা সময়ে বাড়ীতে মাকে জানালে সে এবারেও··· হাকিম সাহেব রেগে গিয়ে টাকা পাঠান বন্ধ করলেন, কাজল মামার বাড়ীতে গিয়ে উঠল। সেখানেও তার থাকা অসম্ভব হয়ে উঠছিল, এমন সময় মা'র চিঠি পেল—মনের মত একটি পাত্রীর সন্ধান পাইয়াছি আমার একান্ত ইচ্ছা··· কাজল চিঠি পেয়েই রওনা হল। রওনা না হয়েও আর উপায় ছিল না, বন্ধুরা এখন আর কোডি বলে ওকে আমলই দিতে চায় না, বলে এ কবিতা হচ্ছে, এ চলবে না। এর ওপর উকো ঘষতে হবে। চা-সিগারেট পেলে বলে, কর্ম্মটা দেখছি আবার ফিরে আসছে, লিখে যা এই লাইনে।

ওর 'ডিমের কান্না' বই থেকে একটা নরম দেখে কোডিতা তুলে দিচ্ছি।

···তুমি···আমি···মনও···Cupid

Singular......

···চন্দ্র···সূর্য্য···চন্দ্র···হাসপাতাল···ওডা ওডা···যেন

পৃথিবী···চন্দ্র।

চন্দ্র···সূর্য্য···

বন্‌বন্‌······।

সানাই···সূর্য্য···

খঃখঃখঃ······বল হরি হরি বোল···ভারমুক্ত···

···পঞ্চম্যাং তিথৌ···

···ওঁ শান্তি···নেড়া ব্যাটন্‌।

এটা উকো ঘষার আগের অবস্থা। যদি বলেন যে কিছুই বুঝতে পারছি না, তাহলে কোডিরা বলবে বুঝবেন কি করে, মনের বারোটা যে রবিঠাকুর কবিতা গিলিয়ে বাজিয়ে দিয়ে বসে আছেন! এই সোজা কোডিতাটাও বুঝতে পারলেন না। শুনুন,—তুমি আর আমি আগে আলাদা ছিলুম, তাই আমাদের ছিল মনও, দুটো মন। কিউপিড আমাদের দুজনকে এক করলেন। চন্দ্র সূর্য্য—চন্দ্র হচ্ছে সময় বয়ে যাচ্ছে। এখন সময় যখন পার হল, তখন তার হাসপাতালে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। ওডা ওডা কথাটার মানে না বললেও চলবে। যেন পৃথিবী···চন্দ্র কথাটার অর্থ হচ্ছে পৃথিবী থেকে যেমন চাঁদের জন্ম হয়েছে, তেমনি তার থেকে ওডা ওডার জন্ম হল। কিন্তু ওডা ওডাটি কি ছেলে না মেয়ে, সেটা সুবিধেমত জায়গায় বোঝা যাবে। চন্দ্র···সূর্য্য···বন্‌বন্‌ মানে অনেকগুলো বছর কেটে গেল, কাজেই ওডা ওডা বড় হয়েছে সুতরাং সানাই বাজল। এখন ছেলে বা মেয়ে বড় হলে তার বাপ অর্থাৎ আপনি খোকাটি থাকবেন না, বুড়োতে সুরু করবেন। খঃ খঃ খঃ হচ্ছে সেই বুড়োমির সিগন্যাল। তারপর বলহরি ভারমুক্ত হয়ে কাঁধে চেপে রওনা হলেন।

কাঁধে চাপবার পরের ষ্টেজ হচ্ছে পিণ্ডি গেলা। পঞ্চমী তিথিতে ভারমুক্ত হয়েছিলেন তাই নেড়া ব্যাটন আপনাকে পিণ্ডি গেলাচ্ছে। অর্থাৎ ওডা ওডাটি হচ্ছে ছেলে। ছেলে বলেই বাপের শ্রাদ্ধের সময় মাথা নেড়া করেছে, মেয়ে হলে মাথা নেড়া করত না। ব্যাটন কথাটার মানে হল ছেলে বা মেয়ে। ওটা রীলে রেস্‌ থেকে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবী হচ্ছে রেসকোর্স, আমি এসে কর্ম্ম দৌড় সুরু করলুম তারপর দম ফুরিয়ে কাঁধে চাপবার সময় ব্যাটনটি ছেলের হাতে দিয়ে গেলুম সে আবার দৌড়োতে লাগল। এই হল এই কোডিতার মানে। বুঝলেন? বুঝুন ঠেলা, উকো ঘষার আগেই এই, ঘষার পর যে গুঁড়োটুকু থাকবে তা স্রেফ য়্যাটম বোমা।

এখানে আসবার আগে হাকিম-গিন্নীর ভারী ভাবনা ছিল। শেষ জীবনটা কি শেষকালে অজ পাড়াগাঁয়েই কাটাতে হবে। পাড়াগাঁ না তো কি? কলকাতা ছাড়া বাংলা দেশে আর বাস করবার মত জায়গা আছে কি? কিন্তু এসে দেখলেন যা ভেবেছিলেন তা নয়। মফঃস্বল সহর হলে কি হবে ট্রাম ছাড়া আর সবই আছে। এমন কি রাস্তায় রোমিওদের হাওয়াই-সার্ট-এর বুক পকেটে ধর্ম্মঘটীদের ভুঁখা ব্যাজ-এর মত প্রেট হার্টস ব্যাজও আঁটা থাকে। ব্যাজটা হচ্ছে হৃৎপিণ্ড বা ইস্কাপনের লেজ ছবির মত, ওপরে লেখা টুলেট, খালি আছে অর্থাৎ মনটা এখনও কারুর দখলে যায় নি। মোটের ওপর হালচাল কলকাতার সমান সমান না হলেও নিন্দের নয়। তাছাড়া মেরামত করবার পর বাড়ীটা ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে, এতবড় বাড়ী কলকাতায় দু'লাখেও মিলতো না। লোকজনের ঝামেলা নেই এক দেওর ও জা, নিঃসন্তান ওরা। জা ত' দিদি বলতে অজ্ঞান। সবাইকে ডেকে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে। কি ভয়ে ভয়েই না সবাই কথা বলছে! ওদিকে বাইরের ঘরে সহরের সবাই ওঁর কাছে আসছে, সেলাম ঠুকছে। এমনটি কলকাতায় হ'ত না। শুধু একটা কাঁটা খচখচ করে বিঁধছে, কাজলের বিয়ে। সমান ঘরে যাবার উপায় নেই, সবাই জানে। আর যারা জানে না তারাও ভাল করে খোঁজখবর না নিয়ে নামবে না। ভেতরে ভেতরে হাকিম-গিন্নী মনমরা হয়েছিলেন। তারপর আলাপ হল শৈলজার সঙ্গে। হাকিম-গিন্নী শৈলজার সঙ্গে আলাপ করেই চাঙ্গা হলেন, দেখলেন রাগিণীকে, তারপর চিঠি লিখলেন ছেলেকে, পত্র পাঠ চলিয়া আইস। মনের মত একটি পাত্রীর সন্ধান পাইয়াছি। অবস্থাপন্ন ঘরের একমাত্র মেয়ে। মেয়ের বাপ মা-র খুবই ইচ্ছা যে এ সম্বন্ধ হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা যে মেয়েটিকে তুমি একবার···।

প্রাচীনেরা বলেন লেখাপড়া শিখে আজকালকার ছেলেমেয়েরা একেবারে বেহেড্‌ হয়ে পড়েছে। গুরুজনের কথা মানে না, কোনও দায়িত্ব নিতে চায় না, বিয়ের কথা বললেই ফোঁস করে ওঠে। হ্যাঁ, বিয়ে করি আর ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটা ফেঁসে যাক্‌। কোথায় পপুলেশন না বাড়ে তার জন্যে সকলকে উঠে পড়ে লাগতে হবে তা নয় এখন বলছে বিয়ে কর! বুড়ো হাবড়াগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না। এদিক থেকে প্রাচীনদের মনের মতন ছেলে হচ্ছে লেখাপড়া খুব কম জানা বা একেবারেই নয় জানা। এরা আঠার উনিশ বছর কি তারও আগে থেকে দায়িত্ব নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজল বলতে গেলে রীতিমত লেখাপড়া জানা ছেলে কিন্তু দেখা গেল ও প্রাচীনদের মনের মতন, মা-র এক চিঠিতেই এসে হাজির হল।

বিকেলে শৈলজা এলে হাকিম-গিন্নী বললেন: তোমার কাজল এসেছে ভাই।

—তাই নাকি! কখন এল?

—এইত' চারটের ট্রেণে। রাগিণীকে আনলে না কেন, আলাপ হত। পড়াশুনোর কথাও হত।

—আর পড়াশুনো! এই হট্টগোলের মধ্যে কি আর পড়াশুনো হয়? যা ভোট লেগেছে!

কাজল এল। পরনে পাৎলুন, গায়ে পাঞ্জাবী, মাথা সযতনে আঁচড়ানো, গলায় ও ঘাড়ে প্রচুর পাউডার। হাকিমগিন্নী বললেন—প্রণাম কর বাবা, তোমার মাসীমা। এই নাও ভাই, কাজল কাজল করছিলে—এই তোমার কাজল।

—থাক থাক বাবা, বেঁচে থাকো, দশজনের একজন হও। শৈলজা আশীর্ব্বাদ করলেন।

কাজল বললে—আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে। কতকাল মাসী ডাক মুখে আনিনি। মাসী মাসী করে তোমায় পাগল করে তুলব। তখন কিন্তু রাগ করতে পারবে না, হ্যাঁ।

হাকিম-গিন্নীর স্নেহ উথলে উঠল; বললেন,—শোন ছেলের কথা। কে বলবে যে এই ছেলে বি-এ—হ্যাঁরে এমনধারা ছেলেমানুষী করলে লোকে যে বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে, তুই বি-এ। বলবে ওতো এখনও বাচ্চা। শৈল'র কথা অবশ্য আলাদা, ও বলতে গেলে ঘরের লোক।

কাজল বললে,—তোমার ঐ এক কথা। আমি তোমায় কতবার বলেছি যে, আমি ঐ পাশ টাশে বিশ্বাস করি না। কি হবে কতকগুলো কাগজ জড় করে? ওতে খালি অহঙ্কার বাড়ে, আমি এই পাশ, আমি ওর চেয়ে বিদ্বান, আমি ওর চেয়ে বড়। যে বি-এ নয়, সেও যেমন মানুষ—যে বি-এ, সেও তেমনি মানুষ। তুমি পাশ করোনি, মাসীমা করেনি, কাকীমা করেনি—তাই বলে কি তোমরা আমার মা, মাসী, কাকী নও? আমি সব সার্টিফিকেটের কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছি।

—য়্যাঁ! সে কি রে!—হাকিম-গিন্নী আর্ত্তনাদ করলেন। দেখ ভাই শৈল, কি ক্যাপা ছেলে!

কাজল মাকে জড়িয়ে ধরে বললে—আমি তোমার ছেলে, সেই আমার সব চেয়ে বড় ডিগ্রী মা।

শৈলজা বললেন—বেঁচে থাক বাবা, এই ত মানুষের মত কথা। গুচ্ছের পাশ করলেই কি মানুষ হওয়া যায়? তা যায় না। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক।

কাজল তাড়াতাড়ি শৈলজাকে প্রণাম করলে। শৈলজা মনে মনে বললেন—কি ছেলে! অতগুলো পাশ, তবু মনে এতটুকু দেমাক নেই। মনে হয় যেন দুধের ছেলে! মাকে কি ভালই না বাসে, ভক্তি করে। মাতৃভক্ত ছেলেকে যমেও ভয় করে। এমন ছেলে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন মা কালী কৃপা করে চার হাত এক করে দেন, তবেই না।

কাজলকে দেখবার জন্যে রাগিণীর মনে কৌতূহলের অবধি ছিল না। হাকিমের ছেলে। নিশ্চয়ই সুন্দর চেহারা। বি-এ পাশ, তার ওপর বই লিখেছে—তা হলেই বা পোইট্রি, বই ত। এতগুণ তরুণ, সুশান্ত, অনল, বিপ্লব, কার ছিল? ছিল না বলেই ঈশ্বর তাদের কাছে এনেও দূরে সরিয়ে দিলেন। ও ঈশ্বর! তুমি কি সুন্দর! তুমি কি দয়ালু!

কিন্তু ঈশ্বরের সুন্দরত্বে সন্দেহ জাগল হাকিম-গিন্নীর সঙ্গে আলাপ করে। এই মায়েরই ত সন্তান, যদি এই রকম হয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তারপর আলাপ হল হাকিম সাহেবের সঙ্গে। হাকিম সাহেবের শান্ত-সৌম্য-মূর্ত্তি দর্শনে আবার মনে বল এল। মা যাই হোক, ছেলেরা কখনো মা-র মত হয় না। লোকে বলে যেমন বাপ, তেমনি ছেলে; যেমন মা, তেমনি মেয়ে। ছেলেরা বাপের মত হয়।

বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, কুচভি নেহি তবভী থোড়া থোড়া। কাজলও যদি বাপের 'থোড়া' গুণ পায়, তাহলে দশটা তরুণ, সুশান্ত, বিশটা কিংশুকের সমান। কিংশুক! এবার বাড়ী এসে অবধি খালি ঐ নামটা মনে আসছে।

অবশেষে কাজলের সঙ্গে আলাপ হল এবং এক কথাতেই রাগিণী চিনে ফেলল। এই মরেছে! এটা দেখছি বাঁদর হনুমানও নয়, একটা মর্কট।

ঠানদি'র কথা মনে পড়ল,—ওগো বাঁদর হনুকে ঠেকান যায় কিন্তু মাকড়ে বড় জ্বালায়। নারকোল খাবার সাধ আছে কিন্তু ভাঙবার খ্যামতা নেই। লাই দিস না নাতনা, চড় চাপড় তুলবি, তা হলেই পালাবে। নইলে নিজেই কুড়োবি কিন্তু পেট ভরবে না।

তিন দিনও গেল না, ঠানদির কথা ফলে গেল! মাকড়ের নারকোল খাবার সাধ হল। রাগিণীর কাঁধে একখানা হাত রেখে গদ গদ কণ্ঠে বললে,—রাণু রাণু আমার।

এই নতুন নামকরণে কিছু মাত্র উল্লাস প্রকাশ না করে গম্ভীর ভাবে রাগিণী বললে,—'হাতটা সরিয়ে নিন। নইলে আপনার ঐ প্যাকাটির মত হাত দু'টুকরো হয়ে যাবে।'

কাজল তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়ে বললে,—পড়বে না?

—নিশ্চয় পড়ব। না পড়লে এই সরভাজা ক্ষীরের পুলি খাবেন কি ক'রে?

মর্কট এ কথা গায়ে মাখলে না, বললে,—কি পড়বে, প্রোজ না পোইট্রি?

—এই ডিক্সনারীটা পড়ে আগে মানেগুলো রপ্ত করে নিন, তারপর পড়াবেন। খেপী—খেপী।

খেপী বাড়ীর পুরোন ঝি, কাছেই ছিল, সবই সে দেখেছে, কাজেই একটু দেরী করে হাজির হল।

—কোথায় থাকিস? ডেকে ডেকে গলা ভাঙলেও তোদের সাড়া মেলে না। এই বারান্দায় বসে থাক, ইনি যদি কিছু চান তো এনে দিবি।

খেপী গায়ে পিঠে ভাল করে কাপড় জড়িয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে বললে, 'তুমি থাকবে নি?'

—না।

—ও মা!

—কেন, উনি কি তোকে খেয়ে ফেলবেন? বসে থাক।

কাজল রাগিণীর মনে শুধু বিতৃষ্ণারই সৃষ্টি করল না, উপরন্তু বেচারার আহার নিদ্রা কেড়ে নিলে। এ কি হল? শেষ অবধি একটাও মানুষ চোখে পড়ল না, সব মানুষের মুখোস পরা মর্কট। প্রথম প্রথম মানুষ বলে কারুকে কারুকে মনে হয় কিন্তু তার পরই আসল রূপ ধরা পড়ে। মনে পড়ল আকুলার কথা, ইউক্যালিপটাসে কাজ নাই বেগুন গাছই ভাল। তুই কিংশুককে ছাড়িস না। কিংশুক। এক গোঁফ দাড়ী চীনাদের মত ছাড়া আর কিছুই ফন্দ অনুযায়ী নয়। মন বললে,—আকুলা তো বর্ব্বর গলাতেই মালা দিয়েছিল তবে তুমিও গেল না কেন?

পরীক্ষার আর দেরী নেই। পড়াশুনো ভাল হবে বলেই রাগিণী বাড়ী এসেছিল কিন্তু বই খুললেই চোখের সামনে বেগুন গাছ ভেসে ওঠে। রাগিণী ঠিক করল—না, কলকাতাতেই চলে যাব। আবার নিজেকে ধমক দিলে, কেন যাব। কিংশুকের জন্যে? ও আমার কে? আবার আকুলার কথা মনে এল। মনে হল,

সত্যিই ছেলেটা এমন কিছু খারাপ নয়। কাজলের চেয়ে ভাল ত' বটেই সুশান্ত তরুণদের চেয়েও একদিক থেকে অনেক ভাল। নাঃ, এ কি সব যা তা' ভাবছি। ঐ ত' একটা মফঃস্বল টাউনের গোবেচারা ছেলে ওর কথা এত ভাবছি! এ আমার কি অধঃপতন! মা-কে বললে, মা এখানে পড়াশুনা হবে না, এখানে থাকলে ঠিক ফেল করবো। ক'লকাতায় যাব। শৈলজা সব দোষ চাপালেন ভোটের ওপর, মেয়ের কথা মেনে নিলেন।

কলকাতায় যাবার আগে খেয়াল হল একবার জ্যেঠিমার সঙ্গে দেখা করে আসি। অনেক দিন যাইনি। মন বললে, অনেক দিন যাওনি মানে এই ত' সেদিন গেছলে। আসল কথা হচ্ছে··· 'না সবাই মিলে দেখছি পাগল করে দেবে। রাগিণী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, ওর সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেবে যেমন ও নেয়। মন বললে, পারবে? ক্ষেপীকে ডেকে রাগিণী বললে—চল, আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবি।

—কোত্থাবে গো দিদিমণি?

কাপড় পরতে পরতে রাগিণী বললে—শ্বশুরবাড়ী যাব।

ক্ষেপী হি-হি করে হেসে উঠল।

—হাসছিস যে।

—এখনও বে' হলনি তবু বলচ শ্বশুরবাড়ী যাবে, হাসব নি।

রাগিণী বুঝলে কথাটা বেফাঁস হয়ে গেছে, চেঁচিয়ে বললে, 'তোর শ্বশুরবাড়ী যাব রে, রাক্ষুসী, আমার নয়।'

আবার বেগুন গাছের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। কি জ্বালা!

পশুর মা তরুবালার পিঠের ঘামাচি মেরে দিচ্ছিল। রাগিণীকে দেখে হেসে বললে, 'ওমা, এ-যে গিনী দিদিমণি, পথ ভুলে না কি গো।'

ক্ষেপীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হচ্ছে পশুর মা, 'মিশি সই'! এক কৌটো থেকে দুজনে দাঁতে মিশি দেয়। পশুর মা ক্ষেপীর মুখে 'মাকড়ের' কাণ্ড ত শুনেছিলই উপরন্তু যা ঘটেনি তা-ও কল্পনা করে নিয়েছিল। আর এত বড় একটা সংবাদ পেটের মধ্যে চেপে রাখলে অনিদ্রা সুনিশ্চিত তাই পশুর মা অনিদ্রার হাত এড়াবার জন্তে দামিনী ঠাকরুণকেও ঘটনাটা শুনিয়েছিল।

তরুবালা বললেন, 'আয় মা ব'স। আর বলিস কেন, এই এক জ্বালা হয়েছে। আগে তবু হাতের গোড়ায় হাতপাখা থাকতো। চুলকুলে পাখার ডাট দিয়ে চুলকোনো যেত। লাইট হয়ে হয়েছে এক জ্বালা, হয় কারুকে ডাকো না হয় দেয়ালে পিঠ ঘষো। আর কি ঘামাচি, এত ঘামাচি আমার জীবনে হয়নি।'

পশুর-মা তরুবালার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে—তা'যা বলেছ মা। পিঠ তো নয় যেন কাঁঠালের গা, হাত বুলোলে কাঁটার মত ঠেক্‌ছে!

রাগিণী বললে—ঘামাচির আর অপরাধ কি। কি গরমটাই পড়েছে।

পশুর-মা বললো—'তা' যা বলেচ দিদি। কাল বামুনদি'কে দেখতে গেছনু। একে এই গরম তায় ভরা পোয়াতি। গিয়ে দেখি দাওয়ায় গড়াচ্ছে। আমায় দেখে বললে—আয় পশুর-মা।'

বলনু—কেমন আছ গা বামুনদি। তা বলে—আর থাকা থাকি। একি জ্বালা বল দেখি। ভাবলুম সব চুকে বুকে গেছে, ওমা দশ বছর বাদে আবার এই জ্বালা। কি গরম। দাঁতে কুটোটি কাটিনা তবু ঘনঘন ঢেকুর উঠছে, তাতে মাংসের গন্ধ। পেটেরটা বোধ হয় গরমে সেদ্ধ হয়ে রয়েছে নইলে ঢেকুরে গন্ধ হবে কেন বল? এখন খালাস হতে পারলে বাঁচি!

তা হ্যাঁ দিদিমণি, বিছে উকীলের বাড়ীতে যে হাকিম-গিন্নী এয়েচে সে না কি ঠাণ্ডা বানাবার কল আনিয়েচে?

—তা আমি কি জানি।

—না, তোমাদের তো খুব ভাব সাব, যাতায়াত আছে জানলেও জানতে পার। শুনে ইস্তিক ভাবছি গিনীদিদি একবার এলে হয় তাকে ধরে হাকিম-গিন্নীর ঠাণ্ডা বানাবার কলটা দেখে আসব।

তরুবালা পশুর-মাকে নীচে পাঠিয়ে দিয়ে রাগিণীকে বললেন—ব'স ভাল করে··হাকিমগিন্নী তোকে খুব ভালবাসে, না?

রাগিণী জবাব দিলে না।

—ঐ ছেলেটা কেমন রে?

—কার কথা বলছ।

—হাকিমবাবুর ছেলের কথা বলছি!

—মর্কট একটা। কি জ্বালাতনই যে করে। রোজ সন্ধ্যেবেলায় ওর কাছে পড়তে হবে না পড়লে মা বাড়ী মাথায় করে নেয়! মা-র ধারণা ওর মত ইংরিজী বুঝি পৃথিবীতে কেউ জানে না। কিছু, জানে না জ্যেঠিমা, কিচ্ছু জানে না।

—তবে যে শুনলুম পদ্য লেখে।

—ছাই লেখে। অমন পদ্য আটমাসের ছেলেও লিখতে পারে। আগে সন্ধ্যাবেলায় আসত আধঘণ্টা বাদেই তাড়িয়ে দিতুম। এখন সে পথও বন্ধ। ভোটের জন্তে দিনরাত আমাদের বাড়ীতেই থাকে। ভোটে দাঁড়িয়েছেন বিছে উকীল কিন্তু তাঁর বাড়ীতে লোকজনের যাবার উপায় নেই। ঝামেলাতে না কি হাকিম-গিন্নীর অম্বল হয়, বুক ধড়ফড় করে। তাই যত আপদ আমাদের বাড়ী জুটেছে। বাবার যে কি হয়েছে তা আর বলবার নয়। দাঁড়িয়েছে তো বিছে উকীল আর রাইমোহন বাবু, তারা বুঝুক না, তোমার কি।

—শুনলুম, এই ভোট ভোট করে নাকি কুঞ্জ ঠাকুরপোর সঙ্গে ওঁর মন কষাকষি চলছে।

—বাবার মাথার ঠিক নেই। আমি পরশু কলকাতায় যাচ্ছি, শীগ্‌গির আর আসছিনে।

দামিনী ঘরে এলেন এবং তাঁকে দেখেই রাগিণীর মেজাজটা বিগড়ে গেল। বাড়ীতে অভিধান না থাকায় রাগিণী দিন দুই বড় অস্বস্তিতে কাটিয়েছিল। তারপর কি খেয়াল হতে চুপি চুপি ঠানদিকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা ঠানদি, কসবী কি?'

ঠানদি শুনে হেসে বলেছিলেন, 'ও মা, তাও জানিস্ নে! খান্‌কী লো খান্‌কী। খান্‌কী মাগীদের কসবী বলে।'

মানেটা শুনে সমস্ত রক্ত রাগিণীর মাথায় উঠে গিয়েছিল। এত বড় একটা কথা দামিনীপিসী বললে, আর সে কি না তাকে ছেড়ে দিয়ে এল? কিন্তু তখন উপায় নেই। পরদিন রাগে জ্বলতে জ্বলতে রাগিণীকে কলকাতায় চলে যেতে হয়েছিল। কলকাতায় গিয়েও কিছুদিন জ্বালা ছিল, তারপর একদিন জ্বালা দূর হল এবং কথাটাও রাগিণী ভুলে গেল। আজ দামিনীপিসীকে দেখে হঠাৎ কথাটা আবার মনে উদয় হল।

দামিনী ঘরে ঢুকে রাগিণীকে দেখে জ্বলে উঠে বললেন, 'বলি জ্বালা, তোর বাপের কি এটা ঠিক হল, ধম্মে সইবে? রাইমোহনদা'

ভোটে দাঁড়িয়েছে, তাতে তোর বাপের কোন পাকা ধানে মই পড়েছে যে, সে সাত তাড়াতাড়ি বিছে উকীলকে দাঁড় করালে? বিছে উকীল তোদের কে লা?'

তরুবালা বললেন,—'তা ও কি করে জানবে ঠাকুরঝি?'

—'ও জানে না ভাবছো? বাড়ীতে যে রাসলীলা চলছে। ওর মা-র যে হাকিমের বেয়ান হবার সাধ হয়েছে। হাকিমের ঐ ছোঁড়াটা আর বাড়ী যায় না, ভোটের নাম করে এখন থেকেই দিন-রাত ও-বাড়ীতে পড়ে আছে।

—'পিসী!'—রাগিণী গর্জ্জে উঠল।

—'তা বাছা চোখ গরম করলে কি হবে? তোমাদের বাড়ীর লোকের মুখেই শোনা, নইলে আমার দায় পড়েছে তোমাদের ব্যাপারে থাকবার। কাঁধে হাত দিয়ে রাণু রাণু আমার, আরও কত কি। বলি, এসব কি? ছিঃ ছিঃ, কি ঘেন্না! কোথাকার কে এক হুমদো ছোঁড়া—সে কি না—মাগো মা, কালে কালে কতই দেখবো।'

—শোন পিসী, সত্যিই যদি ফট্ করে না মরে যাও, তাহলে আরও অনেক কিছু তোমায় দেখতে হবে। তুমি না জেনে যা বললে, এ শুধু তোমার পক্ষেই বলা সম্ভব। আর যদি এ সত্যিই হয়, তাতেই বা দোষ কি? হাকিমের ছেলে কিছু ফ্যালনা নয়, অন্ততঃ দত্তবাড়ীর ছেলের চেয়ে নয়। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। স্বজাতি স্বঘর সব দিক দিয়েই মনের মত। তা ছাড়া বিয়ের আগে এমন মেলামেশা আজকাল সব জায়গাতেই হয়। কিন্তু তোমার নিজের সংসারে যা দেখবে, তাতে তোমার চোখে ছানি পড়বে। তোমার ভাইপোর তো শুনলুম প্রফেসর মণ্ডলের মেয়ে বীথির ওপরে ভারী টান। বন্ধুরা তো বলে, ওকে ছাড়া তোমার ভাইপো আর কারুকেই বিয়ে করবে না।

তরুবালা স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলেন; বললেন—রাগিণী! কি বলছিস?

—আমার মোটেই বলবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু পিসীই খুঁচিয়ে ঘা করলে।

—এ কথা কি সত্যি?

—তা কি করে জানবো? আমি কি এখানে থাকি? তবে এই রকম কথা এখানে এসে শুনেছি, তাই বললুম; নিজে থেকে বানিয়ে কিছু বলছি না।

—'কার কাছে শুনেছিস?

—'তার নাম আমি বলব না। আমায় মাপ করো। তবে বলো তো কথাটা ঠিক কি না বার করতে পারি। পিসী যেমন যা শুনেছেন তাই বললেন; আমিও তেমনি যা শুনেছি তাই বললুম। পিসী, বীথির রং মাথা দেখেছো তো? সেটা কাদের মত হবে ভেবে রেখে এক সময় বলো।' বলে গট গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় নেমে একটা চলন্ত রিক্সা থামিয়ে এক রকম লাফ মেরেই তাতে উঠে বসল। মৃগাঙ্কর চোখে পড়াতে সেই বন্ধুদের বললে।

এমনভাবে রাগিণীর কাছ থেকে শুনতে হবে এটা দামিনী কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিংশুক ঘরে ঢুকে মা ও পিসীমাকে ঐভাবে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে বললে,—কি হল? এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছ যে পিসীমা?

দামিনী এ কথা শুনে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বললেন,—শুকদেব রে তোর মনে এই ছিল। তুই শেষকালে এমনি করে বুকে শেল দিলি। তোর অনাথ পিসী যে বড় আশা করে তোকে মানুষ করেছিল। তোর মা রাজরাণী হয়েও যে আজ অভাগিনী হল। যাকে বলে মড়াকান্না, তাই।

কিংশুক মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—'কি হয়েছে মা?'

—'কি হয়েছে?' শুকদেব রে তোকে যে তুক করেছে, তাও কি তুই বুঝতে পারছিস না? বাবা তুমি কোথায় আছ? তোমার আদরের নাতির আজ কি অবস্থা দেখ। দামিনীর কান্না আর থামে না।

তরুবালা এবার ধমক দিয়ে উঠলেন,—চুপ কর ঠাকুরঝি। এক্ষুনি সবাই ছুটে আসবে।

—চুপ করি কি করে? বুকের মধ্যে যে শেল বিঁধে গেছে জ্বলে যাচ্ছে।

কিংশুক রেগে গিয়ে বললে,—তা হলে জ্বলেই মর, আমি চললুম।

তরুবালা কঠিনস্বরে বললেন,—দাঁড়া। আমরা জ্বলে পুড়ে মরে গেলেই তো তোর সুবিধে হয়। খিষ্টান বৌ নিয়ে ঘর করতে আর কোন বাধাই থাকে না।

—খৃষ্টান বৌ! তুমি কি বলছ মা? কি ব্যাপার বল দেখি। খৃষ্টান বৌ পেলে কোথায়?

দামিনী বললেন—ঐ ছুঁড়ীটা যে বলে গেল তুই নাকি খিষ্টান মোড়লের মেয়ে বীথিকে ছাড়া আর কারুকে বে করবিনি। কিন্তু ওরা যে বাবা খিষ্টান। শেষকালে তোর—

—কে বলে গেল? রাহাদের বাড়ীর ঐ মেয়েটা এসেছিল না।

—সেই তো ইনিয়ে বিনিয়ে বলে গেল। পই পই করে বৌদিকে বলি ওসব ছোট জাতের মেয়েদের বাড়ীতে ঢুকতে দিও না, ওরা হল দুর্মুখের জাত, কি না কি বিত্তান্ত এসে শোনাবে, জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। হ্যাঁ বাবা, এ কথা কি সত্যি?

—রাগিণী এই কথা বলে গেল! বড্ড বাড় বেড়েছে। এত বড় আস্পদ্ধা। দেখাচ্ছি মজা। এ আর কিছু নয়, বাবা রাইকাকাকে দাঁড় করিয়েছে তাই ভোটের আগে যা' তা রটিয়ে আমাদের লোকের কাছে অপদস্থ করার মতলব। আর কি বললে বল।—রাগে ফুলতে ফুলতে কিংশুক জিজ্ঞেস করল।

তরুবালা ছেলেকে চিনতেন, বুঝলেন বীথির কথাটা সত্যি নয়। সত্যি যে এমন কথা অবশ্য রাগিণী ত' বলেনি, সে বলেছে এসে শুনেছে তাই বলছে। তা ছাড়া ঠাকুরঝি অমন যদি খারাপ একটা ইঙ্গিত দিয়ে কথা না বলতেন, তা'হলে রাগিণীও যে এ কথা বলত না, তা ঠিক। ছেলেমানুষ রাগের মাথায় বলে ফেলেছে। এখন ছেলেকে সামলান দরকার, সে না আবার কিছু একটা করে বসে। বললেন, আর কিছু বলেনি, তুই ব'স। কথাটা সে শুনেছে,—তাই বলছিল।

দামিনী এবার লকলকিয়ে উঠলেন,—শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না বৌদি। বলি ঐ ছুঁড়ীর ওপর তোমার এত দরদ কেন বল দেখি, যে নিজের পেটের ছেলের এত বড় অপমানটাকেও তুমি উড়িয়ে দিচ্ছ।

কিংশুক বললে,—কার কাছে শুনেছে বললে। কারুকে ছাড়বো না আমি, এই বলে দিচ্ছি।

দামিনী বললেন,—'কিসের জন্যে ছাড়বি? হারামজাদীর চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আয় আমার কাছে, তারপর থানা পুলিশ যা করতে হয় দেখা যাবে। মাগো-মা, কি বজ্জাত মেয়ে। কি বুকের পাটা!

[ক্রমশঃ।

ব্রহ্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

'ব্রহ্ম' কথার অর্থ হোল চেতনার বৃহত্ব। নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করাই এই সাধনার লক্ষ্য। কঠিন, তরল, বায়বীয়, জৈব ও অজৈব, স্থূল ও সূক্ষ্ম—সকলের সমন্বয়েই ব্রহ্ম। ব্রহ্মে কেউ বাদ নেই; বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন সত্তায় ব্রহ্ম বিরাজমান; তা সে দৃশ্যই হোক আর অদৃশ্যই হোক। ব্রহ্ম শুধু জগতেই সীমাবদ্ধ নহে, অসীম নীলাকাশের অন্তরালে (যেখানে আজও বৈজ্ঞানিকের দূরবীণ-দৃষ্টি পৌঁছায় নাই) সেই একই সত্তা বিরাজমান। খণ্ড রূপেও তিনি, আবার অখণ্ড রূপেও তিনি। দেশে বিদেশে যেমন তাঁর ব্যাপ্তি, দেশাতীত রূপেও তাঁরই ব্যাপ্তি! সর্ব্বলোকের চেতনা রূপে যেমন তিনি, আবার লোকাতীত চেতনা রূপেও তিনি। ব্রহ্ম এক অখণ্ড চেতনা, এই অখণ্ড রূপ চেতনাতেই জগৎ এবং জীব-চেতনার সামঞ্জস্য ঘটেছে। নামরূপেও যেমন তিনি অভিব্যক্ত, আবার নামাতীত রূপেও তিনি অব্যক্ত। ব্রহ্ম একাধারে সগুণ ও নির্গুণ। ব্রহ্মের এই উভয় সত্তাই সমভাবে সত্য।

বিজ্ঞান কি? বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত। সত্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের পর্য্যবেক্ষণ ও শ্রেণী বিভাগ করে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিভাগের সৃষ্টি। জড়বিজ্ঞান স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ পরীক্ষার সাহায্যে দীর্ঘকাল ধরে কঠোর সাধনা ও তপস্যার ফলে প্রভূত উন্নতি লাভে সমর্থ হয়েছে। এই সাধনায় মানবজাতির যে সিদ্ধিলাভ, তাহা বিস্ময়াবহ। ব্রহ্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানে কোনই বিরোধ নেই; উভয়ই একই পথের পথিক। অর্থাৎ সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয়। প্রাচীন ঋষিগণ বিজ্ঞানসমূহকে অপরাবিদ্যা নামে অভিহিত করেছেন; কিন্তু উহার চর্চা নিষেধ করেন নাই, বরং উৎসাহিত করেছেন। অনেক বৈদিক ঋষির মতবাদ এরূপ যে, অপরাবিদ্যার অনুশীলন না করলে পরাবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে চার্ব্বাক এই অপরাবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই মতের নাম চার্ব্বাক-মত বা নাস্তিক মত। এই মতই বর্ত্তমান কালের জড়বাদ, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, ইহ-সর্ব্বস্ববাদ। কিন্তু অপরাবিদ্যা অর্থাৎ বিজ্ঞান সাধনা অজ্ঞেয়তাবাদ কিংবা নাস্তিকতাবাদ নহে; উহা ব্রহ্মজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা মাত্র। অসীম সমুদ্রে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসমূহকে অতিক্রম করতে হয়, তদ্রূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পথেই বিজ্ঞানের অবস্থান। চার্ব্বাকের মতবাদ বা সাধনা কিছুমাত্র অজ্ঞানীর সাধনা নহে; বরং ব্রহ্মজ্ঞানেরই একটি শাখার সাধনা। মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও বৃক্ষাদির চৈতন্য, জ্ঞান বা প্রাণ জড় পরমাণুর সন্নিবেশ-বৈচিত্র্য হতেই জন্মেছে। পরমাণু কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিকগণ এখন এমন জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছেন, যেখানে বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান হাত-ধরাধরি করে চলতে সমর্থ। বৈজ্ঞানিকের পরমাণু ব্যাখ্যায় শেষ অবদান হোল—**শক্তি প্রবাহের বিভিন্নমুখী গতির সংঘাতের নামই পরমাণ।** পরমাণু ভেঙ্গে গেছে, এখন আয়ন, ইলেকট্রন প্রভৃতির কথা শুনতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান এখানে জড় বা স্থূলের সীমা সম্পূর্ণ অতিক্রম করে সূক্ষ্ম চৈতন্যের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং পরলোকের প্রাচীরে আঘাত দিতে সমর্থ হয়েছে। বৈজ্ঞানিকের শেষ অবদান—ধাতু প্রস্তরেরও প্রাণ আছে, জীবন মরণ আছে—**Response in living and 'Non-living'.** উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্রী আছে, সুখ-দুঃখের অনুভব আছে। এখন প্রশ্ন জাগে,—'আমি' নামরূপধারী মনুষ্য যে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও নানা প্রকার অনুভূতির (সুখ, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি) অধিকারী, এতদিন কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিলাম এবং ঐ সব অধিকারের অধিকারী হতে 'আমাকে' কত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে? আমি—মনুষ্যরূপধারী—এক জন্মেই কিংবা সৃষ্টির আদিতেই মনুষ্যজন্ম লাভে সমর্থ হই নাই, বহু জন্মজন্মান্তরের পুণ্যকর্ম এবং পুণ্য চিন্তার ফলস্বরূপই মনুষ্যজন্ম লাভে সমর্থ হয়েছি? সৃষ্টি-পর্ব্ব হতে আরম্ভ করে বহুপর্ব্বই 'আমাকে' অতিক্রম করতে হয়েছে। 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ (তৎ + ত্বম্ + অসি) তুমিই সে—ব্রহ্মের অখণ্ড, অবিভাজ্য সত্তার একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশস্বরূপ, ঠিক যেমন পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও বৃক্ষাদি। সৃষ্টির সেই আদি রহস্যে আসা যাক।

সৃষ্টির আদিতে এই পৃথিবীতে মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও বৃক্ষাদি ছিল না; এমন কি, বর্ত্তমানের অজৈব পদার্থ মাটি, জল, পাথর, পাহাড়ও সৃষ্ট হয় নাই। সৃষ্টির আদিতে এই পৃথিবীতে ছিল কেবলমাত্র অতি উত্তপ্ত বাষ্প। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ও ষ্টীমের বাষ্পসমূহ বিদ্যমান ছিল—তরল ও কঠিন পদার্থের অস্তিত্ব তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। সেই বাষ্পযুগেরও পূর্ব্বে কেবলমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর অতি উত্তপ্ত পারমাণবিক বায়ু পৃথিবী-বক্ষে ব্যাপ্ত ছিল। পরমাণু হতে অণুর উদ্ভব হয়, অর্থাৎ হাইড্রোজেনজনিত অতি উত্তপ্ত বায়বীয় অবস্থা ক্রমবিকাশের ধারায় হিলিয়াম্, কার্ব্বন, ক্লোরিণ ও অক্সিজেন সংযোগে পরমাণু যুগ অতিক্রম করে পৃথিবী আণবিকযুগে আবির্ভূত হয়। ফলস্বরূপ পৃথিবীতে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস, ষ্টীম প্রভৃতি বাষ্পের আবির্ভাব হয়। তৎপরে হাইড্রো-কার্ব্বন যুগ আবির্ভূত হয়। এই হাইড্রো-কার্ব্বন যুগেই কতিপয় বৃক্ষশ্রেণীর আবির্ভাব হয়—যেমন মস্, শ্যাওলা, পাইন, ফার্ণ প্রভৃতি। তারপর আসে বাঁশ, ঘাস, ইক্ষু, নারিকেল, তাল, খেজুর ইত্যাদি। প্রথমে যে বৃক্ষটি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, তা নিঃসন্দেহে ছিল—জলজ; যেমন শ্যাওলা এবং এতৎ-জাতীয় বৃক্ষ। প্রথমে যে প্রাণীটি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, তাহা নিঃসন্দেহে ছিল—জলজ; যেমন স্পঞ্জ, কোরাল প্রভৃতি। সৃষ্টির এক অদ্ভুত রহস্য এই যে, প্রথম জলজ উদ্ভিদটি ছিল সচল; যেমন শ্যাওলা। প্রথম জলজ প্রাণীটি ছিল অচল এবং সে আজও অচল। শ্যাওলা বৃক্ষ হয়েও সচল ছিল, কারণ, উদ্ভিদের

প্রয়োজনীয় যে দশটি উপাদান, তার মধ্যে সেই হাইড্রো-কার্ব্বন যুগে যুক্ত নাইট্রোজেন ও এমোনিয়া বাদে সব কয়টি উপাদানে বৃক্ষদেহের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা সমাধানে সমর্থ ছিল। যুক্ত নাইট্রোজেন ও এমোনিয়া তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং তৎপরে সালফিউরিক এসিডের সঙ্গে পুরাতন ধাতুসমূহ যেমন লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও দস্তার অক্সাইড সংযোগে প্রথম জল ও লবণের আবির্ভাব হয়। ফলস্বরূপ কতিপয় বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত জলাশয়ের সৃষ্টি হয়—পৃথিবী-বক্ষে ; কারণ তখনও পাহাড় পর্ব্বতাদি সৃষ্ট হয় নাই। ইক্ষু, নারিকেল, তাল, খেজুর ইত্যাদি সেই আদি হাইড্রো-কার্ব্বন যুগের বৃক্ষ। ইহাদের দেহে প্রচুর হাইড্রো-কার্ব্বনের অস্তিত্বহেতু বহু সবুজ পত্র ও শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট নহে ; কারণ, হাইড্রো-কার্ব্বন যুগের অকিঞ্চিৎ সূর্য্যালোকই উহাদের দেহগঠনে সমর্থ ছিল। উহাদের ফলেও প্রচুর ফ্যাট ও প্রোটিন আছে—যাহা বৃক্ষদেহের-পুষ্টির জন্য অপরিহার্য্য। শুধু তাহাই নহে, উহাদের ফল ও ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য প্রচুর বৃক্ষ-খাদ্য সংগৃহীত রাখতে সমর্থ। ঐ সব বৃক্ষের মূল বট, অশ্বত্থ, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারার ন্যায় নহে ; ঝাঁকড়া, ঝাঁকড়া অর্থাৎ গুচ্ছমূলও বলতে পারেন—সুবিন্যস্ত নহে। কারণ, মূলের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন, এমোনিয়া এবং উহাদের সংমিশ্রণের লবণ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। মূলজাতীয় বৃক্ষের আমরা উদ্ভব দেখি হাইড্রো-কার্ব্বন যুগের শেষ পর্ব্বে অর্থাৎ সালফিউরিক এসিড, ব্রোমিন ও লাল ফসফরাস্ যুগে। উহারাই (ঐ উপাদানগুলিই) হাইড্রো-কার্ব্বন যুগের সমাপ্তি-পর্ব্ব আনয়ন করে। লাল আলু (মিঠা আলু), শালগম, মূলা, আদা, বীট, পেঁয়াজ এবং সম্ভবতঃ সাদা আলু (যাহা আমরা খাই) সুষ্ঠু, সুন্দর মূলযুগের আদিপর্ব্ব এবং ঐ সব উপাদানের সংস্পর্শে আসায় উহাদের রংও লাল।

কালের বিরাট ব্যবধানে কেহ কেহ লাল রং পরিহার করেছে। আজ যে ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহদ্বয়ের ক্রোড়ে লাল রং দেখা যায় (Band Spectrum), তাহা ঐ সালফিউরিক এসিড, লাল ফসফরাস ও ব্রোমিনের অস্তিত্বই বহন করে। সালফিউরিক এসিড ঐ সব বৃক্ষের শিকড় হতে প্রচুর জল সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল, কারণ পৃথিবীতে তখন জল শুধুমাত্র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত জলাশয়েই আবদ্ধ ছিল। সালফিউরিক এসিডের বাষ্প-শোষকতার ইহাই কারণ। বর্ত্তমানে ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহদ্বয়ে ঠিক ঐ অবস্থা বিরাজমান। তারপর একদিন ক্যালসিয়াম-কার্ব্বনেট ও ক্যালসিয়াম-ফসফেটের প্রাচুর্য্যহেতু পৃথিবীর জলাশয়ে সৃষ্ট হোল শঙ্খ, ঝিনুক ইত্যাদি।

হাইড্রো-কার্ব্বন যুগের সমাপ্তি-পর্ব্বে এমোনিয়া যুগ পৃথিবীতে আবির্ভূত হোল। উহা একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় যুগ। সৌরজগতে বৃহস্পতি ও শনি গ্রহদ্বয়ে বর্ত্তমানে এমোনিয়া যুগ চলছে। প্রত্যেক গ্রহেই ইহা প্রযোজ্য। তুহিন-শীতল এমোনিয়া-যুগে তুহিন গ্যাসের সঙ্গে পৃথিবীর ধাতুসমূহের সংযোগে (যেমন ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ, দস্তা, লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম) প্রচুর স্বাভাবিক বিদ্যুৎ পৃথিবীর বক্ষে স্থাপিত হোল এবং তুহিনশীতলতার সাহায্যে স্বল্প চম্বকীয় ধাতুসমূহ যেমন প্লাটিনাম, শক্ত অক্সিজেন, প্যালাডিয়ামও লৌহজাত লবণের সাহায্যে প্রচুর চুম্বকও পৃথিবীবক্ষে স্থাপিত হোল। সেই সময় হতেই আমাদের পৃথিবী বিশেষভাবে তড়িৎ-চুম্বকীয় রূপ পরিগ্রহ করে। এখন প্রশ্ন জাগে—তুহিন শীতল এমোনিয়া-যুগে কি হাইড্রো-কার্ব্বন যুগের বৃক্ষ ও প্রাণীর জীবনধারণ সম্ভব ছিল? উত্তরে বলা চলে যে, ঐ সব বৃক্ষও প্রাণীদেহের ধ্বংসাবশেষ মাটির নীচে প্রোথিত হয়ে বর্ত্তমানের কয়লা ও পেট্রোল উৎপাদনে ব্যাপৃত আছে। তারপর পৃথিবীতে এলো ওজন-গ্যাস পর্ব্ব। ওজন-গ্যাস পর্ব্ব এক কথায় বলা চলে, পৃথিবীর জল ও বায়ুর বিশুদ্ধিকরণ পর্ব্ব। কারণ, নানাপ্রকার বিষাক্ত এসিড ও গ্যাস দ্বারা কলুষিত পৃথিবীর বায়ু ও জল বিশুদ্ধিকরণ তখন অপরিহার্য্য ছিল।

ওজন গ্যাস পর্ব্ব হতেই পৃথিবীর জলজ জীব যেমন মৎস্য, কচ্ছপ, কুমীরের আবির্ভাব হয়। মৎস্য আজও সেই আদি পুতিগন্ধযুক্ত ওজন গ্যাসের গন্ধ বহন করে চলেছে। কচ্ছপ জলজ প্রাণী হয়ে আজও কেন স্থলে ডিম পাড়ে? কারণ, কচ্ছপের জন্মসময়ে স্থলপ্রাণীর বিশেষ আবির্ভাব ঘটে নাই, সুতরাং কচ্ছপ জল অপেক্ষা স্থলকেই অধিক নিরাপদ মনে করে স্থলেই ডিম পাড়ার উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করেছিল। কচ্ছপ আজও সেই পুরাতন অভ্যাস পরিহারে অসমর্থ। অনুরূপভাবে কুমীরও গভীর ও স্রোতপূর্ণ জলাশয় পরিত্যাগ করে অগভীর স্রোতহীন জলে ডিম পাড়া অধিক নিরাপদ মনে করে। সেই কচ্ছপ ও কুমীররা আদিযুগে জল ও স্থলকে সমভাবে উপভোগ করতে সমর্থ ছিল এবং উভয়ক্ষেত্রই তাদের নিকট নিরাপদ ছিল। তারপর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় অক্সি-নাইট্রোজেন যুগ ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড যুগ। এই উভয় যুগেই সূর্য্যালোক গ্রহের ক্রোড়ে কদাচ দৃষ্ট হয়েছে, কারণ উক্ত গ্যাসদ্বয়ের প্রাবল্যে ও চাপে সূর্য্যরশ্মির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল—গ্রহের ক্রোড়ে। সূর্য্যালোকের অবর্ত্তমানে ফসফরাস, সোডিয়াম এবং বিশেষতঃ ম্যাগনেসিয়াম সক্রিয় নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন্-ডাই-অক্সাইডের সংযোগে বৃক্ষাদি ও জল-প্রাণীর পক্ষে প্রয়োজনীয় আলোক বিতরণে সমর্থ ছিল। সেই যুগের বহু বৃক্ষাদির মধ্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাতাবাহারের গাছ, যাহার রং সবুজও নয় (নানা বর্ণের) এবং ফুল ও ফলদানে অসমর্থ। সূর্য্যরশ্মি ব্যতীত বৃক্ষের জীবনধারণ সম্ভব—ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড-রূপ আলোকের সাহায্যে ; কিন্তু তাহারা ফুল ও ফলদানে অসমর্থ। বৃক্ষদেহে যে ক্লোরোফিল আছে, তাহাতে অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে যেমন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বনের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়ামের (ধাতুর) অস্তিত্বের ইহাই একমাত্র কারণ যে, দীর্ঘ দিন ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের আলোকে বৃক্ষদেহ বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হওয়ায় উক্ত ধাতু বৃক্ষদেহে অচ্ছেদ্য অবিভক্তভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড যুগের শেষ পর্ব্বে উক্ত গ্যাস তুহিন শীতল আবহাওয়ায় গ্যাসীয় অবস্থা পরিহার করে বহুলাংশে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং আবহাওয়া পরিষ্কার থাকায় বৃক্ষজগতে সূর্য্যালোক নব আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আবির্ভূত হোল। শুক্রগ্রহে বর্ত্তমানে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পর্ব্ব চলছে (উহা জীবসৃষ্টি পর্ব্বের নিকটতম অধ্যায়। আমার বর্ণিত ১৩৬৭ সালের ৪ঠা বৈশাখ রবিবারের সংখ্যায় 'সৌরজগতে' সব গ্রহ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা আছে)। বৃক্ষরাজি কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড

বাতাসে মুক্তি দেবে। ফলস্বরূপ প্রাণীজগতের আবির্ভাব হবে। তখন পৃথিবীতে একের পর এক প্রাণীর আবির্ভাব হবে, যদিও ভেক, সর্প, সর্পজাতীয় নানা প্রাণী, টিকটিকি, গিরগিটি ও কেঁচো ওজন পর্বের প্রারম্ভে কিংবা সমাপ্তিতে আবির্ভূত হ'য়েছে। নানা প্রকার পশুপক্ষী ও কীট পতঙ্গের সমাপ্তি পর্বে মানুষের আবির্ভাব ঘটে—এই পৃথিবীতে। মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব। তজ্জন্য সর্বশেষে তার আবির্ভাব, অর্থাৎ পশুত্ব পরিহার করে দেবত্বের দিকে অগ্রসর।

৩

এখন প্রশ্ন জাগে—'আমি' মনুষ্যরূপধারী প্রাণীটি এতকাল কোথায় ছিলাম? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, পৃথিবী যেরূপ সূক্ষ্ম বায়বীয় অবস্থা (অতি উত্তপ্ত আবহাওয়ায় হাইড্রোজেনের পারমাণবিক যুগ) হতে স্থূল বায়বীয় যুগ (ক্লোরিন ও অক্সিজেন সংযোগে হাইড্রোজেনর সংমিশ্রণে বাষ্পযুগ) এবং তৎপর তরল পদার্থসমূহের (লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, দস্তা, তাম্র ইত্যাদি) তরলীকৃত অবস্থান্তর যুগ এবং সর্বশেষে কঠিন ধাতব, প্রস্তর ও মৃত্তিকা যুগ প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের অধিকাংশ আত্মা পারমাণবিক যুগে হয়তো অতি উত্তপ্ত পরমাণুতেই নিহিত ছিল, তারপর আণবিকযুগে আমাদের সেই আত্মা হয় তো পৃথিবীর মুক্ত আবহাওয়ায় অণুতে নিবদ্ধ ছিল। ক্রমবিকাশের ধারায় পৃথিবী যেরূপ ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে আরম্ভ করলো, আমাদের আত্মাও (অধিকাংশ আত্মা) সেই সঙ্গে সঙ্গে কখনও জলজউদ্ভিদ্, কখনও জলজপ্রাণী, কখনও স্থলপ্রাণী যেমন, পশুপক্ষীরূপে পৃথিবী গ্রহের অবস্থান্তর ও রূপান্তরের সঙ্গে পট পরিবর্তনের ক্রিয়া শুরু করে দিল। তারপর সর্বশেষে কোন পশুস্তর হতে মনুষ্য জন্মলাভে সমর্থ হয়েছে। পশুজন্মে কিরূপ পুণ্যকর্ম্ম বা পুণ্যচিন্তার ফলস্বরূপ মনুষ্য জন্মলাভ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক মতবাদে যেমন ক্রমবিকাশের ধারায় সর্বশেষ জীব মনুষ্য, আধ্যাত্মিক মতবাদ অনুযায়ী মানুষই প্রাণীর মধ্যে ভগবানের নিকটতম: অর্থাৎ মানুষই তার সাধনা ও নিষ্ঠা দ্বারা ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ এবং ভগবদ্দর্শন সহজলভ্য না হলেও ভগবৎ প্রসাদ সহজলভ্য। একজন্মে কেহই মনুষ্য জন্মলাভে সমর্থ নহে। বহু জন্ম—কীট-পতঙ্গ-পশু পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণের পরই মনুষ্য জন্ম লাভ সম্ভব। কোন মানুষই একবার মনুষ্য জন্ম লাভ করে এম-এ পাশ কিংবা ডি-ফিল হয় না, হতে পারে না, কিংবা সঙ্গীত-বিশারদ, আইন-বিশারদ হতে পারে না। এক জন্মে কোন মানুষই ধ্যানী, ঋষি, যোগী হতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়—কোন ছেলে বাল্যকালেই অতিশয় মেধাবী হয় কিংবা বাল্যকালেই সঙ্গীতে কিংবা শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে। উহা আর কিছুই নহে, ঐ সকল প্রাণীর পূর্বজন্মের সাধনা-লব্ধ ফল। যে সব মহাপুরুষ নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেছেন বলে অনুমান করা চলে, যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইত্যাদি—ইঁহারা কেহই একবার মাত্র মনুষ্য জন্ম লাভ করেই নির্বাণ লাভে সমর্থ হন নাই। বহুবার মনুষ্য-জন্ম লাভ করে এমন এক অবস্থায় তাঁরা পৌঁছেছিলেন যে, নির্বাণ তাঁদের প্রায় হাতের মুঠোয় এসে পড়েছিল; শুধু সামান্য ধ্যান-তপস্যার দ্বারা পূর্ণ সিদ্ধি লাভ বাকী ছিল। সেইটুকুই সম্পন্ন করেছেন। একটি সাইকেল কিংবা মোটরগাড়ী কিংবা রেলগাড়ী হাওড়া ষ্টেশন হতে রওনা হয়ে যদি দিল্লী পৌঁছতে চায়, সেটা যেমন একবার চাকা ঘোরালেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছান সম্ভব নহে, অন্ততঃ এক লক্ষবার চাকা ঘোরালেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছান সম্ভব, ঠিক তদ্রূপ একবার মনুষ্য-জন্ম লাভেই নির্বাণ বা মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। আবার ধরুন, যে ট্রেনটি হাওড়া হতে দিল্লীর পথে কাশী কিংবা পাটনা পৌঁছে গেছে, সে ক্ষেত্রে যে ট্রেনটি এইমাত্র হাওড়া ষ্টেশন হতে রওনা হোল, তার পক্ষে দিল্লীগামী প্রথম ট্রেনটিকে অতিক্রম করা কোন মতেই সম্ভব নয়। সুতরাং সাহিত্য-বিশারদ, সঙ্গীত-বিশারদ, শাস্ত্র-বিশারদ কিংবা জ্ঞান-বিশারদ হওয়া একবার মনুষ্য-জন্মলাভে সম্ভব নয়। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার এবং আসক্তি পরবর্তী জন্মে মানুষকে প্রভাবিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, একজন মানুষের নানা প্রকার অবস্থা-বিপর্যয় অতিক্রম করে অর্থ কিংবা বিদ্যার জন্য সারাজীবন ক্ষোভ নিয়ে সত্তর (৭০) বৎসর বয়েসে দেহান্তর ঘটলো। তখন তার পুনর্জন্ম হবে। মানুষের জীবাত্মা যে দেহে সত্তর বৎসর বাস করলো, তার একটা সূক্ষ্ম সংস্কার ওকে মৃত্যুর পর সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। যেমন একটা ঔষধের শিশিতে দীর্ঘ দিন ঔষধ রাখার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেও ঔষধের গন্ধ শিশিতে থেকে যায়। আমাদের আত্মারও ঠিক তদ্রূপ অবস্থা:—দেহরূপী আধারের স্পর্শ দোষে সে দুষ্ট হয়। সেই দোষ সহজে খণ্ডিত হয় না। এখানে কতকগুলি তথ্য ও সত্যের আলোচনা প্রয়োজন।

আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের রাজা মন। মন ইন্দ্রিয়সমূহকে খেয়াল-খুসীমত পরিচালনা করে। অতএব সকল ইন্দ্রিয় হতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি বা বিবেক হতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ। জীবাত্মা হতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। মন কোন অন্যায় কার্য্যে উদ্যত হলে বুদ্ধি বা বিবেক তাকে আঘাত করে। এই দ্বন্দ্ব স্থলে মনের শক্তি যদি প্রবল হয়, তাহলে বুদ্ধিকে পরাজিত করে মানুষ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। আবার এই দ্বন্দ্বে যদি বুদ্ধি বা বিবেক জয়লাভ করে তাহলে মানুষ অন্যায় কার্য্যে নিবৃত্ত হয়। মানুষের অন্তরে অবিরতই এই যুদ্ধ চলেছে এবং ন্যায় অন্যায় এই ভাবেই সে সমাধান করে। পরমাত্মা কিন্তু কেবল মাত্র সাক্ষীস্বরূপ। জীবে পরমাত্মার অবর্ত্তমানে কোনদিনই ঊর্দ্ধগতি লাভ সম্ভব হয় নাই। মানুষ যে কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী হতে মনুষ্য-জন্মলাভে সমর্থ হয়, তার সুকৃতির জন্য—তার একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ সাক্ষী পরমাত্মা। সে শুধু মনুষ্য-দেহেই অবস্থান করে না, প্রতিটি দেহীর দেহে অবস্থান করে অর্থাৎ প্রতিটি কীট পতঙ্গ পশু পক্ষীর দেহে পরমাত্মা সমভাবে বিরাজমান। নিদ্রিত ও জাগ্রত সর্ব্ব অবস্থায় সে দেহীর দেহে সজাগ সাক্ষী। সেখানে কিছুমাত্র ফাঁকি চলে না। পাপকার্য্য না করলেও দেহীর দেহে সে পাপচিন্তার সাক্ষী; পুণ্যকার্য্য বা পরের হিতচিন্তারও সে একমাত্র সাক্ষী। অনুকূল পরিবেশের অভাবে কিংবা শিক্ষা দীক্ষা-জনিত সংস্কারবশতঃ মানুষের পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার মত দুঃসাহস থাকে না, কিন্তু পাপচিন্তা বা জঘন্যতম চিন্তায় প্রবৃত্ত হওয়া স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে পরমাত্মাই সাক্ষী। প্রত্যেক মানুষের সৎকর্ম্ম, অসৎকর্ম্ম, সৎপ্রবৃত্তি ও

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই দেহ হতে মুক্ত হয়। জীবাত্মা কিন্তু দেহধারীর সংস্কার নিয়ে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে—পুনর্জন্মের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। পরমাত্মা সুখ দুঃখের কিছুমাত্র অধীন নহে। জীবাত্মাই সুখ দুঃখের অধীন। মানবের শরীর পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত হলেও, চৈতন্যময় পরমাত্মা এই দেহেই অবস্থান করেন। কিন্তু দেহই সর্ব্বাত্মক নহে; দেহ সর্ব্বাত্মক হলে সুষুপ্তি ও মৃত্যুর সমতুল্য হোত। সুষুপ্তিতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না; কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অবিরত চলতে থাকে। সে কারণে স্বপ্ন সত্য বলে প্রতিভাত হয়। জাগ্রত অবস্থায় বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের কাজ এক সঙ্গে চলে। এই পরমাত্মাই ব্রহ্মের অংশ। পরমাত্মা দেহীর দেহে অবস্থান করে বলেই "তত্ত্বমসি" (তৎ + ত্বম + অসি = তুমিই সেই) ও "সোঽহং" (সঃ + অহম্ = সেই আমি) অর্থাৎ তুমি বা আমিই সেই মহাসমুদ্ররূপ অখণ্ড, অবিভক্ত, অবিভাজ্য ব্রহ্মসত্তার একটি ক্ষুদ্র জলকণা বা অংশ স্বরূপ। এখানে খণ্ডতা বা বিভাগের কোন প্রশ্নই জাগে না; শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গিতেই খণ্ডতা। একই অবিভক্ত, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য ব্রহ্মসত্তায় মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষাদি এবং সর্ব্বোপরি পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, ব্রহ্মসত্তায় নিহিত। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন ও বৌদ্ধের প্রশ্ন জাগে না। বহু জলধারা সমুদ্রে পতিত হয়, সমুদ্রে পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের স্বীয় সত্তা লোপ পায়, তখন এ প্রশ্ন জাগে না যে, কে গঙ্গা, কে পদ্মা, কে মেঘনা, কে মহানদী বা কে কাবেরী। সর্ব্বধর্ম্মে যে অহিংসা পরম ধর্ম্মের বাণী রয়েছে, তাহাও ব্রহ্মসত্তায় নিহিত। আমি সকলের, সকলেই আমাতে।

'নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম'।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের বাহিরেও একই ব্রহ্মসত্তা। মানুষের অন্তর যখন ধ্যান ও তপস্যা দ্বারা ভূমি (পৃথিবীর বা ইহলোকের) পরিত্যাগ করে ভূমার (সত্যালোকের), দিকে অগ্রসর হয় তখনই নির্গুণ ব্রহ্মের সত্তা তার অনুভূতিতে জাগে। সে তখন ব্রহ্মানন্দ বা পরমানন্দ ভোগ করে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিন নিয়েই ব্রহ্ম-সত্তা, সৎ অর্থে যার অস্তিত্ব আছে, চিৎ অর্থে জ্ঞান বুঝায়; তা সে সগুণ বা নির্গুণ উভয়ই হতে পারে। আনন্দের আন্দোলনেই সৃষ্টির উদ্ভব। অতএব তিনি আনন্দস্বরূপ। নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগের ফলে জগতের প্রতি আসে উপেক্ষা। উহা সম্যক ব্রহ্ম-জ্ঞান নহে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-অনুভূতির একটি দিক মাত্র। উহার আরও বিভিন্ন দিক আছে। একমুখী চেতনায় সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। সগুণ এবং নির্গুণ ভাব এক অখণ্ড অনুভূতি বা সত্তার মধ্যেই বিধৃত; উহারা পরস্পর-বিরোধী নহে; একে অন্যের পরিপূরক। জ্ঞান বা বিজ্ঞানের বিকাশে দেখা যায় এক ব্রহ্মচেতনাবোধ নানাভাবে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। পূর্ণব্রহ্মের মধ্যে হয়েছে সর্ববোধের অপূর্ব্ব মিলন। আমরা এই পৃথিবীতে কখনও পরমাণুরূপে (পারমাণবিক যুগে) কখনও বায়ুরূপে (বায়ুযুগে), কখনও কীট পতঙ্গ, কখনও পশু-পক্ষীরূপে, কখনও মনুষ্যরূপে পরিণামে সেই অখণ্ড ব্রহ্মেই মিলিত হবো। সর্ব্বদেহীর দেহে পরমাত্মার অস্তিত্ব হেতু দেবত্বও বিরাজমান। মানুষের সঙ্গে কীটপতঙ্গের দেবত্বে প্রভেদ এই যে, কীটপতঙ্গে এই দেবত্ব বহুলাংশে অস্বচ্ছ, কিন্তু মানুষে উহা বহুলাংশে স্বচ্ছ, কারণ মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব অর্থাৎ ভগবানের ইঙ্গিত বা ইসারা বহুলাংশে মানুষের নিকট বোধগম্য। অতি অল্প ধ্যান বা সাধনাতেই মানুষ সে অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা অর্জ্জনে কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয় না। অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেই (অন্যান্য ধর্ম্মে হয় তো অজ্ঞাতসারে) সর্ব্বধর্ম্মে অহিংসার বাণী মূর্ত্তিমতী হয়েছে। একটি স্বচ্ছ কাঁচের উপর আপনার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট ও পরিষ্কার দেখা যায়, কিন্তু একটি অস্বচ্ছ কাঁচের উপর কিংবা জলের উপর আপনার প্রতিবিম্ব তদ্রূপ স্পষ্ট দেখা যায় না। মানুষের দেবত্ব বা পরমাত্মার অস্তিত্ব যেরূপ সহজবোধ্য ও সুগম, ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। (**According to Swami Vivekananda.—'Divinity in man is somewhat transparent while divinity in lower animals is overshadowed. But there is divinity.**) জল ও কাঁচ উভয়ই আপনার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করে কিন্তু এখানে স্বচ্ছতার পার্থক্য। পরমাত্মারূপী সূক্ষ্ম শক্তিধরের বিনাশ নেই; শুধু অবস্থান্তরে রূপান্তর বা বং বদলানো আছে। জলের তিনটি অবস্থা আছে—(১) বাষ্প, (২) জল ও (৩) বরফ অর্থাৎ বায়বীয়, তরল ও কঠিন; কিন্তু তিন অবস্থাতেই উহাদের স্বীয় সম্পত্তি (অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণ) ঠিকই থাকে। বিভিন্ন আবহাওয়ায় উহা রূপান্তর গ্রহণ করে, মূল পদার্থ এক। আমাদের পরমাত্মাও সর্ব্ব অবস্থায় (বায়বীয়, তরল ও কঠিন) দেহীর দেহে বিরাজমান; দেহের রূপ পরিবর্ত্তিত হতে পারে, মূল উপাদান বা সত্তা ঠিকই থাকে।

উপসংহার।

পরমাত্মার কোন বিনাশ নেই, কারণ তার সৃষ্টি হয় নাই; অর্থাৎ পরমাত্মা পরম ব্রহ্মেরই একটি অবিভক্ত, অচ্ছেদ্য ও অখণ্ড অংশস্বরূপ এবং সৃষ্টির আদি হতেই তাঁর অস্তিত্ব আছে। যার সৃষ্টি হয়েছে, তারই বিনাশ আছে। মানুষ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষাদি, মৃত্তিকা, প্রস্তর, পাহাড়, পর্ব্বত, সাগর, মহাসাগর, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র এমন কি সমগ্র বিশ্বেরও বিনাশ আছে, কিন্তু নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ পরমাত্মার কোন বিনাশ নেই। মঙ্গল গ্রহ আজ মৃত বা অর্দ্ধমৃত। এর জন্য দায়ী কে? এর একমাত্র উত্তর এবং সদুত্তর—'কাল' বা 'মহাকাল'। কালের অমোঘ নীতির নিকট কাহারও ক্ষমা নেই। 'মহাকাল' নিরপেক্ষ ও নির্ব্বিকার গতিতে তাঁর রথচক্র চালিয়ে যাচ্ছেন। মঙ্গলগ্রহ আজ সেই 'মহাকালের' রথচক্রে নিষ্পেষিত। মঙ্গলের পাহাড়, পর্ব্বতাদি আজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমভূমিতে পরিণত, সাগর, নদনদী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শুধু কতকগুলি বালুকাময় (খাদে) নিম্নভূমিতে পরিণত হয়েছে। উক্ত গ্রহে আজ মানুষ তো দূরের কথা, এমন কি, কুকুর, বিড়াল, পশুপক্ষীও খুঁজে পাওয়া যাবে না (মেরু প্রদেশের নিকটতম স্থানে জলে শঙ্খ, শামুক থাকা অসম্ভব নহে)। উক্ত গ্রহের দুটি উপগ্রহ আজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্ষুদ্র কলেবরে গ্রহের অতি নিকটে অবিরত ঘুরছে—অদূর ভবিষ্যতে গ্রহের ক্রোড়ে মিলিত হওয়ার আশায়। সর্ব্বোপরি গ্রহের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় বায়বীয় পর্দ্দা শূন্যে বিলীন হয়ে শূন্য সংখ্যার দিকে ধাবিত।

(১)

পপলারের পাতা কাঁপছে সর সর ক'রে। উত্তুরে হাওয়ার এলোমেলো শব্দ ঠিক যেন 'পছিয়া'র মত শন শন ক'রছে। সাঁওতাল পরগণার পছিয়া। তবু আস তো না মনে সেদিনের কথা।

প্যাডিংটনের ওপর দিয়ে ট্রেণটা বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে গেল—আমার মনের ওপর যে পলিমাটি পড়েছে, তার বেশ কয়েকটা স্তর ধুয়ে গেল তার আবর্তে। ঠিক তো এমনি বাঁশি বাজাতে বাজাতে রাত ন'টা পঞ্চান্নর ট্রেণ 'ইন' করতো সকৃরিগলি ষ্টেশনে। আমার তখন ওঠার সময় হোত—বাড়ী ফেরার সময়। ভাগবত পাঠ শেষ তার আগেই হয়ে যেত কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর। আর সোমা আসতো এক বাটি গরম দুধ হাতে নিয়ে। সোমার মত একজনকে কয়েক দিন আগে যেন 'এজওয়ার রোডে'র বাজারে বাজার ক'রতে দেখেছি। কিন্তু তাও কি সম্ভব?

আট বছর আগের কথা। তখন আমার বয়স ছিল উনিশ। সোমারও হয়ত ঐ রকম হবে, অথবা দু-এক বছর কম-বেশী। সকৃরিগলিতে সোমার মামার বাড়ী—আর সকৃরিগলিতে আমি গিয়েছিলাম বেড়াতে বি-এ পরীক্ষার পর। রেজাল্ট বেরুতে আড়াই মাস। আড়াই মাসের পর অনিশ্চিত জীবনের আগের মধুচন্দ্র—একক জীবনের মধুচন্দ্র যাপন ইচ্ছায়। সকৃরিগলিতে প্রথম যখন আসি, আমার তখন বয়স ছিল দু-বছর। আর দু-বছর থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত আমার জীবন কেটেছে এখানে—যার আবছা আবছা ধোঁয়াটে স্মৃতি মনে আজও আছে। তবু উত্তরকালে আমার জীবনের সংগে কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল—তার ভিত্তি হয়েছিল সেই পাঁচ বছরেই। কিন্তু কীই বা লাভ হোল তাতে? লোকসান—তাও বোধ হয় নয়।

কাকীমা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমার দু-বছর যখন বয়স। খুড়ো মহাশয়—সত্যই মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন—তাই সংসারের ওপরে কোন টানই তাঁর ছিলো না। স্ত্রীর ওপর তো নয়-ই। কোনকালেই তিনি সুবোধ ছিলেন না, তবে ঠাকুমা ভেবেছিলেন ছেলের বিয়ে দিলে বোধ হয় মতি-গতি ফিরবে—তাই সকাল সকালই বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর। কিন্তু সেটা খুব কাজের হয়নি। খুড়ো মহাশয়ের গলা ছিল বড় মিষ্টি—কোকিলের মত। গানের মহলে তার বিরাট কদর। পরভৃত যে—সে নিজের বাসা কখনই ভালবাসে না—পরের বাসা খোঁজে। তাই পরভৃৎ, পিতৃব্য একদিন সহসা উধাও হয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। আমরা তখন অনেকগুলি ভাই-বোন—অথচ কাকীমার কোলে একটিও নেই। তাই কাকীমা হলেন আমার দ্বিতীয় মা—পালয়িত্রী। তাই কাকীমা আমাকে সংগে ক'রে নিয়ে এলেন সকৃরিগলিতে—তাঁর বাপের বাড়ী।

সকৃরিগলির কৃষ্ণানন্দ বাবাজী কিন্তু তখন কৃষ্ণানন্দ বাবাজী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কাকীমার দূর সম্পর্কের মামা, পয়সাওয়ালা সার্কল অফিসার রবি চৌধুরী। সকৃরিগলির ওপরে সকৃরিঘাট থেকে একটু দূরে গংগার ধারে তাঁর বিরাট বাড়ী। নিঃসন্তান রবি চৌধুরী আমাকে প্রচুর স্নেহ করতেন। প্রায় ছেলের মতই ভালবাসতেন। আজ এখন বিশপস ব্রীজ রোডের ঘরে বসে এসব হয়ত আমাকে ভাবতেও হতো না, যদি না বাদ সাধতেন খুড়ো মহাশয়।

সকৃরিগলিতে তখন আমার পাঁচ বছর থাকা হয়ে গেছে—লালাজীর পাঠশালায় আমি যেতাম তখন। কাকীমাও বাপের বাড়ীতে বেশ থিতিয়ে ব'সে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মত কোথা থেকে খুড়ো মহাশয় শ্বশুরবাড়ী এসে হাজির। পাঁচ সাল পরে অনেক নীড়ে কাল কাটিয়ে আবার নিজের নীড়ের কথা বোধ হয় মনে এসেছিল তাঁর। কি হোল আমার মনে নেই—তবে কাকীমা বাপের বাড়ী ছেড়ে আবার এলেন শ্বশুরবাড়ী।

দাদার এই ছেলেটাকে খোট্টার দেশে রাখার তো কোন মানে হয় না। ওকে ওর মা-বাপের কাছে দিয়ে এস'—এই হোল আমার সম্বন্ধে রায়। লালাজীর পাঠশালা—সকৃরিগলির গংগা—রবিদাদু—সব পাট চুকিয়ে চলে এলাম কোলকাতায় নিজের বাড়ীতে। বাড়ীকে বাড়ী মনে হোল না, মনে হোল পরবাস।

লণ্ডনেও পরবাস। পরবাসেই বোধ হয় জীবন কাটবে। ঘড়ির কাঁটার দিকে হঠাৎ নজর পড়াতে খেয়াল হোল বেরুতে হবে। সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ব'সে পপলারের শনশনানি শোনা আমার কপালে

স্পেনসার সুব্রত দত্ত
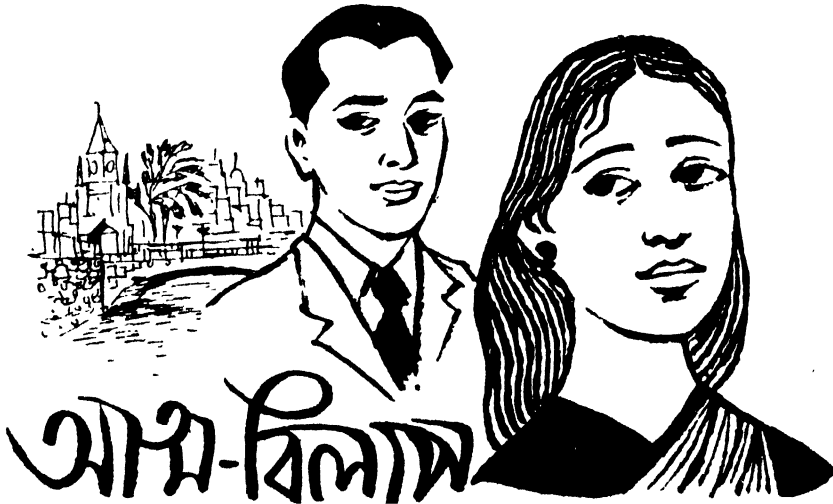
নেই—আমার রুম-মেট গোপবন্ধু আসবে তার বান্ধবী ইনাকে নিয়ে। গোপবন্ধু ওড়িয়া হ'লেও মেয়েদের ব্যাপারে Extra smart; ওর বান্ধবী এলেই আমাকে বাইরে যেতে হয়। ডাবল্‌-বেডেড ঘরে থাকার খেসারত। উঠে জ্যাকেটটা গায়ে গলিয়ে দরজায় চাবি দেবার মুখেই দেখি গোপবন্ধু এসে হাজির—তবে একলা, ওর 'ডাচ' বান্ধবী নেই।

"তোকে আর বাইরে যেতে হবে না—আয় ঘরে এসে বসি। ইনা আজ আসবে না, তোর জেল খাটা নেই",—ও বললে।

ইনা ঘরে এলে আমি অনেক সময়ে বাইরে যাই ওদের একলা থাকতে দিয়ে। এদেশে জেল খাটাকে বলে—Serving time। আমাকে যখন দু-তিন ঘণ্টার জন্য বাইরে যেতে হোত, তখন বলতাম যাই জেল খেটে আসি।

'জেল খাটা তাহ'লে আজকে নেই—কেন, ইনার কি হয়েছে?' —বললাম।

'ওর আজ নাইট-ডিউটি পড়েছে হাসপাতালে। আমার খেয়াল ছিলো না তোকে বলতে। তুই কি করলি সারা সন্ধ্যে?'

ইচ্ছে হোল ওকে সোমার গল্প বলি। কিন্তু গোপবন্ধু তা বুঝবে না, আমার ধাত আর ওর ধাত সম্পূর্ণ আলাদা। তাই ওকে মিথ্যে কথা বললাম। বললাম—Income Tax Law পড়ছিলাম। আর একটা পরীক্ষা দেব ভাবছি—

"যা ভাল বুঝবি তাই করবি—আর একটা বেশী পরীক্ষা দিলে যদি লাভ হয় তো দিয়ে দে"—ও বললে।

জানতাম গোপবন্ধু ঠিক এই ধরণের উত্তর দেবে। বেশী জানবার চেষ্টা নেই, জানাবারও চেষ্টা নেই। ওর নিজের সমস্যা ও কাউকে বলবে না। যখন ও বেশ কিছুদিন বেকার ছিল, ধার ক'রে দিন কাটাতো তখনও অবধি ওর সমস্যা আলোচনা করেনি আমার সংগে। ওর ধারা এমনই, তাই কিছু বললাম না। জ্যাকেটটা খুলে রাখলাম তারপর টেবল্‌-ল্যাম্পটা জেলে দিয়ে বই নিয়ে বসে রইলাম।

(২)

এদেশেও মড়ক লাগে। তবে ওলাবিবির নয়, ইনফ্লুয়েঞ্জার। এরা বলবে ফ্লু। আবার নতুন ফ্লু জুটেছে, এশিয়াটিক ফ্লু। ছোঁয়াচ লাগা বিচিত্র নয়। বিশেষ টিউব-ট্রেণে বন্ধ কামরায় টিনে-ভরা সার্ডিন মাছের মত যখন কেরাণী বাবুরা অফিস যায় তখন আমারও 'ফ্লু' হোল। গোপবন্ধু তখন 'হলিডে' ক'রতে গেছে Lake district এ। একলা নয়, সংগে ইনা। যাবার আগে ওকে বলেছিলাম—দু'জনের খরচ ম্যানেজ করবি কি করে? কাপ্তেনী হাসি হেসে ও বলেছিল—"হবে-রে ম্যানেজ হবে। তবে জানিস আমার পরিচিত লোকেরা যদি শোনে যে আমার এই আয়ে হলিডে করছি কি বলবে?

"কি বলবে?"—বললাম।

"বলবে মা ধানকুটী—পুত্র নাগরথ"—

"তার মানে কি?"

"মানে হোল—মা ধান ভানে, আর ছেলে কাপ্তেন, জানিস তো আমার তেমন টাকা পয়সা নেই। অথচ মেয়ে-বন্ধু নিয়ে হলিডে ক'রছি। ঐ প্রবাদটা আমার মতন লোকের প্রতি কটাক্ষপাত।"

ভাগ্যিস লোকেদের কটাক্ষপাতে ওর ক্ষতিবৃদ্ধি ছিলো না—নয়ত ও লণ্ডনে থাকলে নিশ্চয় ওরও ছোঁয়াচ লাগতো। ফ্লু কিন্তু আমার কিছু বেশী রকমের হয়নি। বিশপস ব্রিজের বাড়ীতে যতজন

ভারতীয় ছিল—কম বেশী সকলেরই ফ্লু হ'য়েছিল। এ ঘরের এ আজ সেরে ওঠে—তো ও ঘরের ও রোগে পড়ে। আমার কপাল ভাল—তাই অসুখটা চেপে হয়নি। অসুখ হোলেই কাকীমাকে মনে পড়তো—মাকে নয়। কাকীমা বোধ হয় আমি অন্যের ছেলে বলে আমার ওপর বেশী যত্ন নিতেন—যার মধ্যে স্নেহের চেয়ে কর্তব্য ছিল বেশী। আর মনে পড়ে সোমার কথা। বি-এ পরীক্ষার পর যখন সকরিগলিতে গিয়েছিলাম—তখন আমার হঠাৎ অসুখ হয়। জ্বরটা ঠিক তখন সোজা পথে চলছিল না—একবার ছেড়ে গিয়ে আবার ধরেছিলাম। সোমাও তখন বি-এ পরীক্ষা দিয়ে এসেছিল সকরিগলিতে রবিদাদুর বাড়ীতে।

রবি চৌধুরী ওর বাবার গুরুভাই—আর অনেকদিনের বন্ধু। তার বেশ কিছুদিন আগে তিনি চাকরী-বাকরী ছেড়ে দিয়ে ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাকতেন। সোমার মা আর বাবা—তখন সকরিঘাটের বাড়ীতে থাকতেন। যা ভাবছিলাম। আমার অসুখ আর সোমার কথা। প্রতিদিন সকালবেলায় কিশোর-গোপালের চরণোদক নিয়ে আসতো সে আমার জন্য। রবি চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ কিশোর-গোপাল। রবি চৌধুরী তখন কিন্তু রবি চৌধুরী ছিলেন না—তখন তাঁর নাম কৃষ্ণানন্দ বাবাজী। জুন মাসের সেটা প্রচণ্ড গরম। 'পছিয়া' বইতে সুরু করতো—একটু বেলা হ'লেই। গংগার ঘাটে যাবার পথ ধূলোয় ধূলোয় আঁধার হোত কখনও সখনও। সেই পথ দিয়ে পাদোদক রূপোর বাটীতে আমার জন্য কৃষ্ণানন্দ পাঠাতেন প্রসাদী। আর সোমা তা প্রতিদিন নিয়ে আসতো—আমাদের বাড়ীতে।

"আপনার প্রসাদী এনেছি"—শুধু এই কথাটা সে বলতো প্রতিদিন। বিছানার পাশে রাখা কাঠের চেয়ারের ওপরে ও সেই রূপোর বাটীটা নামিয়ে রাখতো। আমাকে নিজে হাতে সেটা নিয়ে পান করতে হোত। তুলসী পাতা, শ্বেতচন্দন আর গংগাজল। তারী ভালো লাগতো সে গন্ধ। আমার এক একবার ইচ্ছে হোয়ত—ও কেন আমার মুখে প্রসাদী ঢেলে দেয় না, আমার কপালে হাত দিয়ে দেখে না কেন আমার জ্বর আছে কি নেই! ও কিন্তু তা কোনদিনও করেনি। কদাচ এক-আধবার প্রশ্ন করেছে—"আজ কেমন আছেন?" অথচ এই একই সোমাকে আমি কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর ওখানে আমার সংগে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈষ্ণব পদাবলীর গোষ্ঠলীলার অধ্যায় আলোচনা ক'রতে দেখেছি—তখন ও কত সহজ, কত নিকটে এসেছে। কিন্তু যত জড়তা সংকোচ আর অপরিচয়ের মুখোস পরে ও আসতো সকালবেলায় তখন।

আমার ঘরে বেশীক্ষণ থাকতো না—কাকীমার রান্নাঘরে চলে যেত। খুড়ো মশায়, তার কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। কাকীমা তাই সকরিগলিতে চলে এসেছিলেন—বাপের বাড়ী, তিনটি ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে। বিশপস্ ব্রিজের বাড়ীতে শুয়ে শুয়ে এসব কথা ভাবছিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে কারা যেন উঠছে—পায়ের শব্দ শোনা গেল, এ বাড়ীর সিঁড়িতে কার্পেট নেই—তিনতলায়, একতলা আর দোতলায় আছে। আমাদের ঘরটা তিনতলায়, তিনতলায় আরো দুটো ঘর আছে—একটা ঘর এই ঘরেরই মত ডাবল—বেড, একটি ঘরে পাকিস্তানী দিনও নয় যে আমার বা হায়দারের ঘরে কেউ আসবে। হায়দার গেছে চাকরী করতে। এ বোধ হয় চৌধুরীদের অতিথি হবে।

অনুমান অভ্রান্ত নয়, শুনলাম—টোকা পড়লো পাশের ঘরের দরজায়, ঘরটা চৌধুরীদের, মিঃ চৌধুরী কোথায় যেন কাজ করেন—সকালবেলায় প্রায় আমার সাথে বেরোন। মিসেস চৌধুরী ঘর গেরস্তালী দেখেন, হাট-বাজার করেন। এ অঞ্চলের ভারতীয় গৃহিণীদের বাজার করার সময় আর পাঁচজন গৃহিণীর সংগে আলাপ হয়ে থাকে। এঁরা সময় থাকলে দুপুর বেলায় এ-ওর বাড়ী ও তার বাড়ী গিয়ে গল্পগুজব করেন। চৌধুরী গিন্নী তাদের শিরোমণি, তার সখীদের সংখ্যা অনেক। তাই ভাবলাম—চৌধুরী গিন্নীর একজন সখী বোধ হয় দুপুরবেলায় মজলিসে এসেছেন। দরজায় আবার টোকা পড়লো। কোন উত্তর নেই। বুঝলাম চৌধুরী গিন্নী নিশ্চয়ই ঘরে নেই। যে দরজায় টোকা মারছিল' সেও বুঝলো তাই—কারণ এবার শুনলাম টোকা পড়লো হায়দারের ঘরে। এবারে আমার পালা। দরজা খোলার মোটেই ইচ্ছে ছিলো না—ঘরটা অত্যন্ত অ-গোছালো একে, তার ওপরে আমি দুদিন দাড়ি কামাইনি। কিন্তু উপায় ছিল না। হায়দারের পরেই আমার দরজায় টোকা পড়লো।

'just a minute please'—বলে উঠে দরজা খুললাম। আশ্চর্য ব্যাপার। সোমা দাঁড়িয়ে। একা নয়, সংগে বছর দুই আড়াই-এর একটি ছেলে।

'তোমার কথাই ভাবছিলাম সোমা—এসো ঘরে এসো'। ওকে বললাম।

জীবনে এই প্রথম ওকে তুমি বললাম। আর সেটা এত স্বাভাবিক যে, সোমা একটুও অবাক হোল না।

'তুমি অমরনাথ?' ও বললে, আশ্চর্য—তাই না? জানতাম তুমি লণ্ডনে আছ—কিন্তু বিশপস ব্রিজের বাড়ীতে যে থাক তা জানতাম না। নিশ্চয় এ বাড়ীতে বেশীদিন আস'নি। তাহ'লে অন্তত এজওয়ার রোডের বাজারে নিশ্চয়ই দেখা হোত, আমি এসেছিলাম মিসেস চৌধুরীর সংগে দেখা করতে, উনি তো নেই দেখছি। আর এ আমার ছেলে—নবদ্বীপ চন্দ্র। ওকে নদের চাঁদ বলি।'

'নদের চাঁদ কেন ছেলের নাম রেখেছ সোমা?' (ও যে আমাকে তুমি বলছে তা নজর করেছিলাম)। আজকালকার ছেলেদের অমন নাম কি মানায়? বড় হ'লে ওর বন্ধুরা যে ওকে জ্বালিয়ে মারবে। বেচারা নদের চাঁদ।'

'নামটা আমি দিইনি অমরনাথ, দিয়েছেন কৃষ্ণানন্দ বাবাজী। তাঁর বিশেষ অনুরোধ ছিল যে, আমার ছেলের নাম যেন হয় নবদ্বীপচন্দ্র। তাঁর অনুরোধ তো ফেলতে পারি না। বিশেষ এখন। তুমি বোধ হয় জানো না যে ওঁর দেহরক্ষার পরে ওঁর সম্পত্তির ট্রাষ্টী হয়েছি আমরা। আর টাকার অংকটা খুব সামান্য নয়।

চুপ করে গেলাম। কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর সম্পত্তির ট্রাষ্টী হয়েছে সোমা—আর বোধ হয় ওর স্বামী। সোমার কোথায় বিয়ে হয়েছে জানি না। লণ্ডনে প্রায় পাঁচ বছর আছি। আমার আসার মাস তিন চার পরে কাকীমা মারা যান—তাই সকরিগলির বিশেষ খবর পেতাম না। বি-এ পরীক্ষার পর যখন কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর বাড়ীতে আমি প্রতিদিন যেতাম তখন আমি দিনের পর দিন উপলব্ধি করেছি

খুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিশোর-গোপালের যা গল্প ক'রতেন, আমার বোধ হয় তা আর কারুর কাছে ক'রতেন না? আমিই যে তাঁর অবর্তমানে তাঁর সম্পত্তির ট্রাষ্টী হবো—এমন কথাও যে কানাঘুসো হয়নি তা নয়। আমারও কেমন একটা ধারণা হয়েছিল যে কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর সম্পত্তির ওয়ারিশ আমিই হবো।

কিন্তু শেষ অবধি তা যেন কেন হয়ে ওঠেনি—তা আমার শুধু একলার জানা ছিলো। অন্য কারুর নয়। সোমা আমাকে কথা ব'লে থেমে গিয়েছিলো, এবারে উত্তর দিলাম একটু পরে।

"না সোমা, কি করে ওসব খবর জানবো বলো। তা ছাড়া তোমাদের তো কোন খবরই জানার উপায় নেই; কাকীমা মারা যাবার পরে কার কাছে বা খবর পাই; তোমার যে বিয়ে হয়েছে, তাও জানতাম না। তোমার স্বামীর নাম কি? থাকেন কোথায়? কি করেন?"

"সবগুলোর জবাব দেব'খন। কিন্তু তার আগে তুমি একটা কথার জবাব দাওতো? আমি যখন প্রথম তোমাকে দেখলাম এই ছ'সাত বছর পরে, তুমি তখন প্রথম কথা বললে—'এসো সোমা, তোমার কথাই ভাবছিলাম।' কি ভাবছিলে তুমি আমার কথা? আর হঠাৎ এতদিন পরে আমার কথা ভাবতে গেলে বা কেন? এটা কি খুব আশ্চর্য নয়?"

"তোমার কথা কেন ভাবছিলাম? সোমা, তোমাকে আমি আজ প্রথম দেখলাম না, এটা আমার দ্বিতীয় দেখা। প্রথম দেখেছি সপ্তাহ দুই আগে এডওয়্যার রোডে বাজার করতে। একটু দূর থেকে দেখা, খুব কাছের থেকে নয়। আর এখন তো আমার ফ্লু হয়েছে—তোমার মনে আছে তো সেই সরুরিগলির বাড়ীতে আমার অসুখের সময় তুমি কিশোর গোপালের চরণামৃত আনতে, তাই তোমার কথা ভাবছিলাম। এই দুই কারণে তোমাকে মনে পড়ছিল। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দেবে তো?"

"না অমরনাথ" ও হাসলো, 'জানতো পতির নাম নাহি ধরে নারী। আর বিশেষণে সবিশেষ আমি বলতে পারবো না। তুমি তার চেয়ে একদিন আমাদের বাড়ীতে এসো না? এই আমার ঠিকানা'—বলে সোমা ওর ঠিকানা লিখে দিলে। ঠিকানা দেখলাম আমার বাড়ী থেকে বেশী দূরের নয়, পাঁচ সাত মিনিটের পথ।

'যাব অখন ফ্লু সেরে গেলে' বললাম। 'তোমার আর এখানে বেশীক্ষণ না থাকাই ভালো। ফ্লু বড় ছোঁয়াচে। আর নদের চাঁদের পক্ষে আরো খারাপ। তুমি আজ বাড়ী যাও। আর বলবো নাকি চৌধুরীদের তোমার কথা?"

"থাক অমরনাথ। তুমি বোধ হয় মেয়েদের ঠিক জানো না। বিশেষ মিসেস চৌধুরীকে। ওর যে এত জিজ্ঞাসা—তা বলার নয়। ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমাকে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে। থাক আপাততঃ জানান"।

৩

গোপবন্ধুর মন মেজাজ ভাল নেই, ইনা চলে গেছে। কপালে ছেলোটার বেশীদিন কোন মেয়েই টিঁকবে না। আমার সংগে থাকা কালীন ও আরো দুটো মেয়ের সংগে বেরিয়েছে—কিন্তু কেন জানি না, কোন মেয়েই বেশীদিন থাকতো না। এবারে ইনার ব্যাপারটা দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম

দুজনে মিলে এক সংগে Lake district এ যায়? ছিলও নি-এক হোটেলে। হয়ত একই ঘরে। আমার কাছে ও কোনদিন কোন কথা বলতো না। অতএব আমার জানার সুযোগও ঘটেনি যে ওর গলদ কোথায়। Lake district থেকে আসার পরে ইনা মাত্র এসেছিল একবার। আর আসেনি। ইনার আসার দিনক্ষণ আমার সবই জানা ছিলো, তাই মঙ্গলবার সন্ধ্যাতে (ইনা প্রতি মংগলে আসতো) যখন বেরিয়ে যাচ্ছি, গোপবন্ধু বললো যে, আমাকে আর বাইরে যেতে হবে না।

"কেন, ইনার কি মংগলবারে নাইট-ডিউটি পড়েছে, হাসপাতালে। রুটিন পালটেছে?" বললাম।

"ইনা আর কোন দিনও আসবে না—" গোপবন্ধু বললে।

"ঝগড়া হয়েছে বুঝি।" বললাম।

কপালে হাত দিয়ে ও বললে—"কপাল রে কপাল। বুঝলি—কপাল,

"এমন্ত ভুঁই চাকুণ্ডা পোত্তিলে উঠই নাই।
বাছি বাছি করি দেলে পাত্তিয়া, আষাঢ় মাসেরে ভাংগে নড়িয়া।"

"তার মানে কি? তোর উড়ে ছড়ার?" বললাম।

এমন্ত ভুঁই মানে এমন জমি যে, চাকুণ্ডা মানে আগাছা পুঁতলেও মরে যায়। বেছে বেছে পরিয়া মানে পতিত জমি ছিলো। আর তা এমন শুকনো, যে আষাঢ় মাসে তাতে নারকোল পড়লে ভেঙে যায়। বুঝলি?"

"তোর জমি হোল তুই—আর ইনা আগাছা, তোর খটখটে জমিতে আগাছাও গজায় না। এই তো?"—

"ঠিক বলেছিস সড়া বংগালী, তোদের বুদ্ধি আছে"—ও বলল।

"হ্যাঁ, বুদ্ধি কিছুটা আছে বটে, তবে তোরা উড়েরা যত কৌশল করিস। তা কি কৌশল করলি মেয়েটার সংগে?"

"মেয়েটা বলে বিয়ে করতে হবে। ওসব ঝামেলায় গোপবন্ধু মিশ্র নেই।"

"তা বিয়ে তো একদিন করতেই হবে—মেয়ে যদি ভাল হয় তো আপত্তি কি?"

"তুই বুঝবি না অমরনাথ, বিয়ে কোরব কুষ্ঠী-ঠিকুজী মিলিয়ে—আর স্বজাতের ব্রাহ্মণীকে, এ সব ঘরণীতে—

"তবে মন খারাপ করে এমন্ত ভুঁই-টুঁই বলছিল কেন? ভুঁই এমন্ত তো—নয়ই বরং পয়মন্ত"।

"হাতের মেয়ে চলে গেলে মন খারাপ হবে না? তুই তো মেয়ে

"তুই কি করে জানলি যে, আমি মেয়েমানুষ জানি না? তুই আমার কতটুকুই বা জানিস বল। দেশেও তো চিনতিস না।"

"ও তোর বুঝি দেশে কেউ আছে—তা তো বলিস নি কখনও?"

"নারে, আমাকে দেখে বুঝতে পারিস না? একেবারে গো-বেচারা, নিরামিষ। তাছাড়া ও সব বিলাসের আমার সময়ও নেই পয়সাও নেই।"

"আমারও পয়সা আছে? যা বলেছিস। এসব বিলাস না ক'রলেই ভাল হোত, কি বাপের কি ছেলে হয়েছি।" গোপবন্ধু বললো।

"তোর বাবা কি করেন তা তো জানি না। কি বাপের কি ছেলে হয়েছিস—কেন বললি? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।"

"ঠিক Londonerএর মত কথা বলতে শিখেছিস তুই অমরনাথ। আপত্তি আবার কিসে? বাবা তো চোরাবাজারের কারবারী নয় যে, বলতে আপত্তি হবে? শোন্ তবে। পিতামহাশয় কটকের কলেজে সংস্কৃত পড়ান। অতি নিষ্ঠাবান আচারপরায়ণ হিন্দু। ইহকালের চেয়ে পরকালের দিকে নজর বেশী। আমি এদেশে আসি—কোনদিনই চাইতেন না। তবে জানিস—আমার এক মামা আছে—আমি নাকি ঠিক তার ধারা পেয়েছি। আর তার চেষ্টাতেই আমার আসা হয়েছে। বাবার একটুও ইচ্ছে ছিল না যে, আমি আসি। বললাম না তোকে—ইহকালের চেয়ে পরকালের দিকে নজর বেশী তাঁর? ইহকালের কোন কর্ম পরকালের যাত্রাপথে ব্যাঘাত ঘটাবে—আর ইহকালের কোন কর্ম পরকালের যাত্রাপথ সুগম ক'রবে, পিতৃযান মার্গে না গিয়ে দেবযান-মার্গে নিয়ে যাবে, এই নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন সর্বদা। জানিস তো আমার দেশ বোধ হয় ভারতবর্ষের সব চেয়ে গরীব দেশ। উড়িষ্যার দারিদ্র্য তুই জানিস না। সেখানে কি আজ দেবযানমার্গ পিতৃযানমার্গ নিয়ে থাকলে চলে?"

"তুই এখানে কি মার্গ নিয়ে আছিস? তোর বাবার জীবনধারার তো সমালোচনা ক'রছিস—কিন্তু কেউ যদি তোর জীবনধারার সমালোচনা করে, তো কি পাবে? আজ 'ইনা' আসেনি বলে তুই upset হয়ে ব'সে আছিস, গতবারের পরীক্ষার আগে ঐ জার্মাণ মেয়েটার জন্য তুই পরীক্ষায় বসলি না—কি পাচ্ছিস তুই এতে?"

"কি পাচ্ছি—জিগ্যেস করছিস অমরনাথ? ভেবে দেখিনি তো কি পাচ্ছি? তা ছাড়া আমার এখন বয়স কম, অনেক সময় আছে। চব্বিশে কি আর অত ভাবলে চলে? তুই ব'লতে পারিস আমার বাবা বা ঐ শ্রেণীর লোকেরা জীবনের কাছে কি পেয়েছে? আত্ম-তৃপ্তি? সুখ? মোক্ষ? বোধ হয় তাই হবে। এই দেখ না কিছুক্ষণ আগে তোকে বলছিলাম যে, বিয়ে করব ব্রাহ্মণীকে—কুষ্ঠী ঠিকুজী মিলিয়ে। কথাটা তোকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলাম—কিন্তু বোধ হয় সব কথাটা ঠাট্টা নয়, জানি না কিছু। এখনও একটা সোজা পথ পেলাম না—যে পথ দিয়ে চললে পথের শেষে এসে পৌছুবো। তুই তো সে পথ পেয়েছিস মনে হয়। তোর পড়াশুনো শেষ ক'রে ভাল চাকরী ক'রছিস। তবু এখানে কেন আছিস বুঝতে পারি না। আর পাঁচ জনের মত এখানকার জীবন-স্রোতে যদি গা ভাসাতিস তা হ'লে বুঝতাম। বাড়ী যাস না কেন?"

"যাব রে গোপবন্ধু—আর দু' এক বছর পরে। তুই বোধ হয় জানিস না যে আমার ঘাড়ে দুটো সংসার চাপান। একটা হোল আমার কাকার সংসার আর একটা হোল নিজের মা আর দুই ভাই বোনের সংসার। আমার যখন দু' বছর বয়স তখন আমার কাকীমা আমাকে পালবেন ব'লে নিয়েছিলেন। আমার কাকা তখন বেশ কয়েক বছর কোথায় ডুব মেরেছিলেন। আমার মনে হয়—That old boy had a jolly good time, তারপর পাঁচ বছর বাদে হঠাৎ সংসারে ফিরে এলেন আর প্রবীণ বয়সে অলৌকিক ঘটনার মত দু'টি মেয়ের জন্ম দিয়ে মারা গেলেন। আমার মাথায় পড়লো—তাঁর দুই মেয়ের খরচ চালান'র ভার। আর আমার বাবার অবস্থাও ভাল নয়—অতএব সেদিকটাও দেখতে হয়। এ দেশে আর কিছু থাক বা না থাক পয়সা দেয় ভাল। তাই ভাবছি—কিছু পয়সা জমিয়ে বছর দুই বাদে বাড়ী যাব।"

"এতে কিন্তু তোর সুখ নেই অমরনাথ—হয় তো আত্ম-তৃপ্তি আছে! আমার বাবার জীবনেও সুখ নেই। আত্ম-তৃপ্তি আছে। আমি কিন্তু চাই ভোগী হ'তে—আত্ম-তৃপ্তি নয়, ভোগ করতে চাই। যত পাবো—তত চাইবো। আরো চাইবো—আরো আরো। এতেই আমার সুখ, তুই কি কখনও সুখ চাইবি না? চিরকাল আত্ম-তৃপ্তির ধ্বজা উড়োবি? তোর বয়স তো দাঁড়িয়ে থাকবে না।"

"থাক গোপবন্ধু, তবু তোর মত হ'তে চাই না আমি। চাইলেও হ'তে পারবো না। কারণ আমি অমরনাথ আর তুই গোপবন্ধু দু'টো আলাদা জিনিষ দিয়ে গড়া। এতেই আমাদের পার্থক্য। সুখে আমার কাজ নেই। আর থাক ও কথা। আয় এখন উঠি—আমাদের দু' সপ্তাহের রসদ আনতে হবে।"

(৪)

গোপবন্ধুর কথা ভাবছিলাম কয়েকদিন পরে। ওর নজরও এড়ায় নি আমার নিজেকে বঞ্চনা করা। আমি কি নিজেকে বঞ্চনা করি? মনে তো হয় না। কিসের বঞ্চনা? দেশে ফিরে, বিয়ে করে গার্হস্থ্য জীবনযাপন না করা, আর পাঁচ জনের মত? ভালবাসায় বঞ্চনা করেছি নিজেকে? না তা করিনি। কিন্তু তাই বা বলি কি ক'রে?

আজও কেন আমার সোমার কথা মনে পড়ে? এজওয়ার রোডের মোড়ে ওকে যেদিন বাজার ক'রতে দেখেছিলাম আমার কেন সেদিন এত মানসিক চাঞ্চল্য এসেছিল? সোমা সুন্দরী তো নয়ই। এমন কি সাহিত্যিকরা যে মেয়ে সুন্দর নয়, তার বর্ণনা দেবার সময় একটা কিছু বিশেষত্ব খুঁজে পায়—কেউ পায় চোখে, কেউ দেহযষ্টিতে, কেউ দেহের লাবণিমায়—এমনও একটা কিছু অনেক খুঁজে পেতেও সোমার জন্য আমি জোগাড় ক'রতে পারিনি। সোমা অতি সাধারণ মেয়ে এই তার পরিচয়, তবু এই অতি সাধারণ মেয়েও আমার কাছে অতি সাধারণ কোন দিনও ছিল'না। কেনই বা থাকবে? আমি নিজেও যে অতি সাধারণ। সোমা সেদিন আমার ঘরে যখন এসেছিল, তখন ওর সংগে ওর ছেলেকে দেখে নিশ্চয়ই খুব খুসী হইনি। সোমার তা হ'লে বিয়ে হয়ে গেছে। ওর স্বামী কি করে জানা হয়নি। সোমা যেন এড়িয়ে গেল, কেন সোজাসুজি স্বামী কি করে জানালে কি ক্ষতি হোত?

আমি অবশ্য ওর প্রেমে কোনদিনও পড়িনি। তবে সকালগুলিতে ওর সাহচর্যে দিনগুলো বড় ভাল কাটতো। বি, এ ক্লাসের মেয়ের সংগে আলাপ করার মধ্যে যেন কি একটা ছিল। অথচ ওরও যে

আমাকে ভাল লাগতো তা আমি ভাল করে বুঝতাম, কিন্তু অসম্ভব রকমের চাপা মেয়ে সোমা। বিয়ের পরে বোধ হয় একটু মুখরা হয়েছে। তার ওপরে দায়িত্ব এসেছে কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর ট্রাষ্টী হ'য়ে। আমার অসুখের সময় ওর কথা আমার সারাদিন মনে হোত। সারাটা সকাল ওর পথ চেয়ে বসে থাকতাম, ও কখন আসবে চরণামৃত নিয়ে। সেই মুহূর্তটুকু আমার কাছে অনেকখানি ছিলো। সোমা কিন্তু একটুও থাকতো না আমার ঘরে। শুধু রূপোর বাটিটা নামিয়ে রেখে বলতো "আজকে কেমন আছেন ?"—আর কিছু নয়।

অসুখ সেরে যাবার পরে যেদিন কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর কাছে যাই সেদিন সোমা বলেছিল—"আজকের দিনটার জন্য আমি পথ চেয়ে ব'সেছিলাম।"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম—"কেন ?"

"গোষ্ঠলীলার অধ্যায় বাবাজী রোজ পড়ে শোনান। কিন্তু আমার যেন মনে হোত কোথায় যেন ফাঁক আছে বাবাজীর পাঠে। বাবাজীর পাঠের মধ্যে সেই আবেগ নেই। তার কারণ হোল—আপনার অনুপস্থিতি।"

"এ আপনার ভুল ধারণা।" (সোমা দেবী টেবী তখন ওকে বলতাম না। সোমাও আমাকে কিছু ব'লে সম্বোধন ক'রতো না তখন) আমি বাবাজীকে অনেকদিন ধরে চিনি। উনি আমাকে স্নেহ করেন তা জানি। কিন্তু ওঁর কোনও মায়ার বাঁধন নেই। উনি মুক্ত পুরুষ। ওঁর পৃথিবীতে শুধু কিশোরগোপাল আছে। আর কেউ নয়। আমার অসুখের সময় যদি ওঁকে বিচলিত দেখে থাকেন—তা হ'লে তা ওঁর জীবের প্রতি যা মমতা আছে—সেটা তারই অভিব্যক্তি। আর বেশী কিছু নয়। সেদিন আর একটা কথা ওকে বলার ইচ্ছে ছিল—সাহস ছিলো না। "শুধু কি কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর গোষ্ঠলীলার পাঠের জন্য তুমি আমার উপস্থিতি চাইতে সোমা ? তার বেশী নয় ?"

গোপবন্ধু ওর বাবার কথা বলছিল। ওর বাবা ইহকালের চেয়ে পরকালের কথা বেশী ভাবেন। পিতৃযান মার্গে গমন না ক'রে যদি দেবযান মার্গে যাওয়া হয়—তা হ'লে অখণ্ড-আবর্ত। কৃষ্ণানন্দ বাবাজীও আমাকে এই কথা ব'লতেন দিনের পর দিন। প্রতিটি দিন। আমার তখন মাত্র উনিশ বছর বয়স। মাথায় অনেক চিন্তা—জীবনে দাঁড়াতে হবে, ভাল চাকরী ক'রতে হবে। দেবযান মার্গ-বা পিতৃযান মার্গ নিয়ে থাকলে আমার চলতো না। তবু প্রতিটি বিকেল হ'লেই কে আমাকে আকর্ষণ ক'রতো তা জানি না! কুলিপাড়ার উঁচু নীচু ধূলি মলিন পথ পেরিয়ে গংগার দিকে পা টানতো, রেলওয়ে সাইডিং-এর ধার দিয়ে প্রতিটি বিকেল হাজির হতাম কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর কাছে। মধ্যে শুধু একবার থামতাম গংগার ধারে। এক পাশে ধূ ধূ ক'রছে ধানক্ষেত যত দূর চাও শুধু ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত—যতক্ষণ না দৃষ্টি এসে পৌঁছায় পাহাড়তলীতে। আর একদিকে শ্মশান ঘাট। কোন কোন সন্ধ্যায় হয় তো দেখেছি গংগার ধারে চিতা জ্বলছে ধূ ধূ করে, কোন কোনদিন শুনেছি শ্মশান বন্ধুরা যাচ্ছে 'রাম নাম সৎ হ্যায়' ব'লে। পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়েছি আর ভেবেছি যে শ্মশান যাবার এই পথটায় আর কোনদিনও আসবো না। তবু এসেছি প্রতিদিনই। সে আকর্ষণ কি ঐহিক ছিল—না তা ছিল পারত্রিক ?

বাবাজীও বোধ হয় আমাকে প্রত্যাশা ক'রতেন। তাঁর কম। তা ছাড়া সাংসারিক জীবনে তিনি নাকি ছিলেন—অতি দাম্ভিক। দম্ভ ছিল তাঁর অর্থ আর পদমর্যাদার। এজন্য কোন আত্মীয় তাঁকে বরদাস্ত করতে পারেনি। কাকীমাও রবি চৌধুরীকে বিশেষ পছন্দ ক'রতেন ব'লে মনে হয় না। তবে রবি চৌধুরী আর কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর মধ্যে কোন মিল ছিলো না, আর আমার কথা ছিল স্বতন্ত্র। ছেলেবেলা থেকে আমি তাঁর স্নেহ পেয়েছি, আর সে স্নেহে বোধহয় কোন খাদ ছিল না। সাত বছর বয়সে আমি যবে আমার বাবার সংসারে ফেরং এসেছিলাম তখন তিনি নাকি চোখের জল ফেলেছিলেন আমার জন্য। তাই বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে আবার যখন সকরিগলিতে এসে প্রতিদিন তাঁর কাছে হাজিরা দিতাম—সে হাজিরার মধ্যে হয়তো কিছুটা অতীতের বাঁধনের জের ছিল।

"কী এত জপ করেন আপনি সারাদিন ? সারাদিনে কত হাজার জপ করেন ?" প্রশ্ন করতাম। বাবাজী সহসা উত্তর দিতেন না। জপ শেষ ক'রে বলতেন—"বড় কঠিন জপ করা অমরনাথ—বড় কঠিন। এতে কত পরিশ্রম হয় জা'ন ? তোমার ঐ সামনের জমিটা কোদাল দিয়ে কোপাতে যত পরিশ্রম হবে—আমার এই হাতের জপমালা এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে ঠিক ততটা পরিশ্রম হয়। তবু কত আনন্দ এতে !"

"আনন্দ যে এতে আছে তা বুঝি। যাকে ভালবাসি এ তো তার নাম বারে বারে বলা নিজের কাছে। নিজের কানে কানে নিজে কথা বলার যে আনন্দ—এ আনন্দ বোধহয় তাই।"

"তিনি তোমার মধ্যে আছেন, তিনি আমার মধ্যে আছেন। আমি আর তিনি—এর কোনও তফাৎ নেই! এ উপলব্ধি কথা কঠিন নয়। জান' অমরনাথ—শুধু অভ্যাস—অভ্যাস ফলেই তা জানা যায়। আর জপ করলে তোমার মন দৃঢ় হয়, শক্ত হয়, মনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অমরনাথ, আমি কয়েকদিন ধরে একটা কথা ভাবছিলাম তোমাকে বলবো—কিন্তু তার সুযোগ ঘটেনি। আমার সন্ন্যাস জীবনেও বাধা আছে—আমার দেহে। এই নিত্যক্ষয়ী দেহ আমার মুমুক্ষুমনের প্রতিবন্ধক হ'য়েছে। আমার শরীর গত কয়েক বছর ধরে বড় খারাপ যাচ্ছে—ক্রমশ বেশী খারাপ হ'চ্ছে—(ইচ্ছে হয়েছিল বলতে যে, আমি আপনাকে অনেক বছর পরে দেখছি—আমার তা বোঝার নয়। আর আপনার ছিয়াত্তর বছর বয়সের পক্ষে শরীর ভালই আছে। কিন্তু কিছু বলিনি) আমার তদারক আপাতত সোমার মা বাবা ক'রছে। সোমার বাবা আমার গুরু-ভাই হোলেও আমার পৃথিবী আর ওর পৃথিবী এক নয়। আমার বিষয়-সম্পত্তি যা আছে তার একটা খসড়া করে রেখেছি—তোমাকে দেখাবো; আর তোমাকে—"

"বিষয়-সম্পত্তির কথা থাক বাবাজী"—আমি গভীর লজ্জায় অভিভূত হয়ে ব'লেছিলাম। লজ্জা পাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, আমার পক্ষে। লোকে যা কানাকানি ক'রছে, তাই কি সত্যি হ'তে চললো ? আমার যৌবনের উত্তেজনায় সেদিন বাবাজীকে তাঁর কথা শেষ ক'রতে দিইনি।

"ভাল কথা অমরনাথ, তুমি আজ একথা শুনতে চাওনা। না শুনে হয়তো ভালই করেছ আজ। তবে আমি তোমাকে সেইদিন

"দীক্ষা ?—অবাক হয়ে ব'লেছিলাম—'আমার কি দীক্ষা নেবার প্রয়োজন আছে ?"

"আছে অমরনাথ—আছে। তোমার জানবার যা ইচ্ছা—এই জিজ্ঞাসু মনকে সংযত করে ঠিক পথে চালনা করার জন্ত তোমার দরকার জপমন্ত্র। এই জপমন্ত্র তোমাকে শুভপথে চালনা করবে।"

"বাবাজী, আপনি বীজ বপন করার জন্ত ক্ষেত্র চেয়েছেন ; কিন্তু ক্ষেত্র যদি অমুর্বর হয়—হয় বৃক্ষ-শিশুর জন্ম হবে না—না হ'লে তা সবল হবে না। সে কোনদিনও বনস্পতি হবে না—ক্ষেত্র যে অমুর্বর এখনও—"

"আমার মনে হয়—তোমার মনে অজ্ঞান রূপ মায়া আছে সাময়িক ভাবে। নিত্য কর্মশুদ্ধির। প্রয়োজন তোমার—"

নিত্য কর্মশুদ্ধির আর বেশী আলোচনা হয়নি সেদিন। রাত ভারি হ'য়ে এসেছিল। নটা পঞ্চান্নর ট্রেণ ইন করলো বাঁশি বাজাতে বাজাতে সকম্বিগলি জংসনে। আর সোমা এলো ঘরে, হাতে বাবাজীর জন্য গরম দুধের বাটী। সন্ধ্যেবেলায় বাবাজী কিশোর গোপালের পূজা আর আরতি নিজে করার পরে—গোষ্ঠলীলা পাঠ করতেন আধঘণ্টা। সেই সময়ে সোমা এসে বসতো আর ঠিক আধঘণ্টা পরে উঠে যেত'। আবার আসতো—রাত নটা পঞ্চান্নয়। যখন আমি চলে আসতাম।

ফিরে আসতাম সেই গংগার পাশের পথ দিয়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম—কি আছে ঐ অনন্ত শূন্যে ? কোথায় বাবাজীর সপ্তলোক ? ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই সাত লোক পেরিয়ে ব্রহ্মলোক। কোথায় সেই বিদ্যুৎ-লোক—যেখানে অমানব পুরুষের স্থিতি—যে এসে বিদ্যুৎ-লোকের উপাসককে নিয়ে যায় ব্রহ্মলোকে, আর সেই উপাসকদের পুনর্জন্ম হয় না !

"আমার মধ্যে তিনি আছেন—মহাকাশের মধ্যে মেঘ থেকে মহাকাশকে অনেক অংশে বিভক্ত করে। কিন্তু অজ্ঞানরূপ সেই মেঘ অপসৃত হ'লে মহাকাশ অনন্ত এক হ'য়ে যায়। আমার মধ্যের সেই মহাকাশ অবিদ্যারূপ মায়ায় ঢাকা। এই অবিদ্যার অভাবে—তুমি আমি এক।" পথ চলতে

চলতে বাবাজীর এই কথাগুলো ভাবতাম। ছায়া-পথের দি চোখ পড়তো—দেখতাম আলোর রেখা। না—তা আলো রেখা নয়—আলোর অদৃশ্য ঢেউ। ঐ পথে আত্মা যায় বুঝি সপ্তলোক পার হ'য়ে ? সেই সনাতন মার্গ—পিতৃযান আ দেবযান। পিতৃযানে যেতে হ'লে—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ আ দক্ষিণায়নের ছয়মাস পথ অতিক্রম ক'রে চন্দ্রলোকে যাও— তারপর কর্মফল ভোগান্তে পুনর্জন্ম হবে। চন্দ্রলোকে গমন— তাই মুমুক্ষুরা চায় না—বাবাজী চান না। বাবাজী চান—তাঁর গ হোক দেবযানে।

গোপবন্ধুর বাবাও দেবযানের কথা ভাবেন। গোপবন্ধু ওস বোঝে না—আমিও বুঝতাম না। গোপবন্ধুর বোধহয় আজও সন্দ
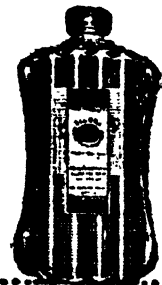
আছে। ওর বয়স আমার চেয়ে বেশ কম, তাই ও হয়ত এখন ভাবছে যে, যে কাজ ও এখন করছে সময়কে উপভোগ করে—অনন্ত অসীমকে অগ্রাহ্য ক'রে—তাই ভাল, না ওর বাবার পথে চলা ভাল'। তাই দেখি ও যেন মাঝে মাঝে বোবা হয়ে যায়। কথাবার্তা একদম বলে না, মেয়ে বন্ধুদের সংগে দেখা করে না, আমার সংগে কেমন যেন ব্যবহার করে। আর আমার মনে হয়—ও যেন আমাকে বিচার ক'রতে চায়!

দরজায় ধাক্কা শুনছি। গোপবন্ধুর গলা—ও আমার ওষুধ কিনে এনেছে।

৫

সোমার সংগে আবার দেখা হোল—এক শুক্রবারের বিকেলের দিকে। আমি লাইব্রেরী যাচ্ছিলাম বই বদলাতে। সোমা Super market থেকে বাজার করে ফিরছিলো। সংগে নবদ্বীপচন্দ্র।

"কই অমরনাথ, তুমি তো এলে না আমাদের বাড়ীতে, বলেছিলে যে আসবে?"

"পাঁচ ধান্দায় হয়ে ওঠেনি সোমা। আসব এখন একদিম নিশ্চয়ই।"

"না, আজকেই চলো। ও এখন এখানে আছে—সব সময়ে ও থাকে না, ব্যবসার কাজে এদিকে সেদিকে যেতে হয়। এখনই চলো।"

নিজের পোষাকের দিকে তাকালাম। এ স্যুটটা আমার সবচেয়ে পুর'ণো, চার বছর আগে করান। লণ্ডনে প্রথম আসার পরে করান। জুতোটাতেও খুব পালিশ নেই, সার্টের কলারটায় একটু ময়লার দাগ আছে—আজ শুক্রবার, কালকে সকালেই এটা লণ্ডীতে দেবার কথা। মানে, কোন দিক থেকেই আমার কোন লোকের সংগে দেখা করার মত বেশ বাস ছিল না। ভাবছিলাম—যাব কি এই বেশে?

"অমরনাথ, তুমি কি এত ভাব? একটা সহজ প্রশ্ন করেছি—জবাব না দিয়ে কি এত ভাবছ?"

'কিছু না সোমা। চল—আজই যাই। লাইব্রেরী না হয় পরে যাব।'

কুইনস সিনেমা অবধি হেঁটে—পাশের রাস্তা ধরলাম—অরসেট টেরাস—এই রাস্তায় ওরা থাকে। পথে হাঁটতে হাঁটতে সোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম।

"তোমার স্বামী ব্যবসায়ী বললে—কিসের ব্যবসা করেন। আর যে লোক লণ্ডনে ব্যবসা করে তার নিশ্চয়ই অনেক পয়সা। তুমি যে বড় মানুষ তাতে সন্দেহ নেই। ভাল কথা—তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?"

"কালীঘাটে—হালদার পাড়া লেনে।"

"হালদার পাড়া লেন? সেখানে তো বাবাজীর একটা ছোট্ট বাড়ী আছে—যেখানে উনি চোখ অপারেশনের সময় এসেছিলেন। দক্ষিণ কোলকাতা আমি ভাল করে চিনি না বটে—কিন্তু বাবাজীর অসুস্থতার সময় কয়েকবার ঐ বাড়ীতে গিয়েছি—একজন নার্স ছিল তখন—আর তোমার বাবা সব তদারক করতেন, তুমি সে বাড়ী চেন সোমা নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ অমরনাথ চিনি। বাবাজীর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ট্রাষ্টী হয়েছি—সব খবরই রাখি।"

একবার ইচ্ছে হোল ওকে জিজ্ঞেস করি সে সম্পত্তির মূল্য কত। একদিন বাবাজী স্বেচ্ছায় তাঁর বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে চেয়েছিলেন। আর কি ব্যবস্থা করবেন তাই জানাতে চেয়েছিলেন। সেদিন লজ্জায় আমি অধোবদন ছিলাম। তার পর আর কি এত বেশী বছর কেটেছে—বড় জোর ছয় বা সাত বছর। তবু আজ যেন সারা পৃথিবীর কৌতূহল এলো আমার মনে—মনে হোল জিগ্যেস করি সেই সে সম্পত্তির মূল্য কত—কিন্তু ক'রলাম না।

"এই বাড়ীটা আমাদের। তিরিশ নম্বরের বাড়ী। এর চারতলায় আমরা থাকি। তোমাকে কিন্তু অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হবে।"

"সিঁড়ি ভাঙা আমার অভ্যেস আছে" বলে নদের চাঁদকে কোলে তুলে নিলাম। বড় শান্ত ছেলে—নবদ্বীপচন্দ্র। দেখতেও ঠিক হয়েছে মায়ের মত, স্বভাবও বোধ হয় তাই। আমার কোলে চুপ করে উঠে এলো—একটু অপরিচয়ের ভাব নেই তাতে। চারতলার ঘরের সামনে এসে সোমা রিং করলো দরজায়। একবার—দু' বার বহুবার। কেউ দরজা খুললো না।

"ও বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও বেরিয়েছে।"—বলে সোমা নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকলো। সুন্দর ঘর। সুন্দর এর কার্পেট। আসবাবপত্রও আধুনিক। সামনের ছোট্ট ফুলদানীতে ফুল দেখলাম—আইরিস আর লিলি অব দি ভ্যালি। এক কোণে একটা প্রকাণ্ড রেডিওগ্রাম। আর একটা টেবলে—টেপ রেকর্ডার বসান।

"তুমি একটু ব'সো অমরনাথ আমি চা ক'রে আনছি"—বলে সোমা নদের চাঁদের হাত ধরে চলে গেল। আমি জ্যাকেটটা খুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

চা ক'রতে সোমার খুব বেশী হয়নি—আমার কিন্তু ব'সে থাকতে ভাল লাগছিল না। উঠে এলাম, এসে টেবলে রাখা বইগুলো দেখতে শুরু করলাম, বই দেখতে গিয়ে—টেবলেরই এক কোণে কতগুলো বই এর আড়ালে রাখা একটা ফটো ফ্রেমের দিকে আমার হঠাৎ নজর পড়লো। সোমার ছবি—আর পাশে ও কে? ও মুখ যে আমি চিনি।

ত্রস্তে একবার দরজার দিকে তাকালাম। সোমার গলা শুনছি পাশের ঘরে। গুনগুন করে ও যেন কি গাইছে। ও বোধ হয় চা ক'রতে ব্যস্ত আছে। ফ্রেমটা তুলে ধরলাম, আলোর কাছে এলাম জানলার ধারে। অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করলাম, না কোন সন্দেহ নেই। এ অংশুময়। দ্রুত ফটো ফ্রেমটা আমার টেবলের ওপরে বই-এর আড়ালে এর স্বস্থানে রেখে দিয়ে এসে বসলাম চেয়ারে।

অংশুময় ঘোষ। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি আমার তা পরিষ্কার মনে আছে—কৃষ্ণানন্দ বাবাজীর হালদার পাড়া লেনের বাড়ীতে। আষাঢ় মাসের সন্ধ্যে—বড় গুমোট সেদিন। বাবাজী কলকাতায় এসেছিলেন চোখের ছানি কাটাতে। আমার বাড়ী ছিল, উত্তর কোলকাতায় রামকান্ত মিস্ত্রী লেনে। সেখান থেকে উজিয়ে আসা প্রতিদিন সম্ভব হোত না। তবু আসতাম। হালদার-পাড়া লেনে বাবাজীর বাড়ীতে আমার অবাধ গতি ছিল। বাড়ীটা ছিল একতলা—আর সামনের ঘরটাতেই বাবাজী থাকতেন। ঘরে ঢোকার দুদিক দিয়ে দুটো দরজা। একটা ঘরের সামনের

চাতাল দিয়ে ঢুকতে পারো অন্য দরজার সামনে ছোট একটু চলন পথের মত আছে—তা দিয়ে পেছনের ঘরে যাওয়া যায়। কোলকাতার এক নার্সিংহোমে বাবাজী ছানি কাটিয়ে কিছুদিন এই বাড়ীতে থেকে সকরিগলিতে ফিরবেন—এই ছিল ব্যবস্থা। বাবাজীর ঘরের দুই দরজার সামনে নীল রং-এর ভারি পর্দা—আর ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র অতি সামান্য। নিজের শোবার খাট একটা ছোট—একটা বসবার চেয়ার, আর ছোট্ট এক সিংহাসন, তার ওপরে কিশোরগোপালের ছবি কিশোরগোপালের অষ্টধাতুর মূর্তি ছিল সকরিগলিতে, তা উনি কোলকাতায় নিয়ে আসেন নি—তাই সংগে এসেছিল তার প্রতিচ্ছবি। এই পটের পূজো উনি কোরতেন কোলকাতায়, আর সকরিগলিতে এক পুরোহিত তখন পূজো করতেন অষ্টধাতু বিগ্রহের। সাধারণতঃ আমি জানান না দিয়ে বাবাজীর ঘরে ঢুকতাম আর ঢুকতাম চাতালের দরজা দিয়ে। সেদিন কেন আমি যে চলন-পথের দরজার দিকে গিয়েছিলাম তা জানিনা। পর্দাটা দরজার সব অংশ ঢাকতে পারেনি—একটা অংশ দিয়ে ঘরের কিছুটা দেখা যাচ্ছিলো। আষাঢ় মাসের সন্ধ্যে। আকাশে মেঘের ঘন-ঘটা, অন্ধকার করে আসছিল চতুর্দিক। ঘরে মৃৎ-প্রদীপ ছাড়া জ্বলছিল একটা বড় মোমবাতি। বিজলী-বাতির আলোয় কিশোরগোপালকে, মানায় না, তাই কিশোরগোপালের ঘরে কখনও বিজলী বাতি জ্বলতো না। সেই আবছা আলো আর আবছা আঁধারে এ মুখ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। বাইরের জগতের আর কেউ যে বাবাজীর কাছে আসে তা জানা

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্—বাবাজী বললেন এ প্রশ্নের উত্তর তো মহাভারতে যুধিষ্ঠির দিয়ে গেছেন। প্রতিদিন জীবের মৃত্যু হচ্ছে অথচ জীব তা স্মরণও করে না—এর চেয়ে আর কি আশ্চর্য হতে পারে।"

"আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় সবচেয়ে আশ্চর্য বস্তু হোল—সময়। সময় কি? এর সৃষ্টি কবে? কোথায় এর আরম্ভ, কোথায় বা এর শেষ, এর শেষ কি আছে?—আমরা কেউ তা জানি না। আমার মতে, সময় হোল সবচেয়ে আশ্চর্য বস্তু। সময়কে আমরা ইচ্ছে মত ভাগ করেছি—ঘণ্টায়, মিনিটে, পলে, অনুপলে তবু একে আমরা জানি না। একে যদি আমরা জানতে পারি তো একে জয় করা আমাদের কঠিন হবে না।"—সেই অচেনা মুখ বলেছিল।

আস্তে আস্তে চোরের মত চলে এসেছিলাম—বাবাজীর ঘরের সামনে থেকে। আমার ভাগীদার হয়ে একজন এসেছে মনে হোল। মোমবাতির আলোয় দেখলেও ঐ মুখ ভোলার নয়। এই ছিল আমার প্রথম দেখা। দ্বিতীয় দেখা হওয়াও বিচিত্র। বাবাজী তখন সকরিগলিতে ফিরে যাবেন ব'লে গিয়েছিলাম দেখা ক'রতে। হালদার

পাড়া লেনের বাড়ীর দরজায় দেখলাম তালা লাগান। বুঝলাম যে, উনি Specialist-এর কাছে শেষবারের মত গেছেন। এতটা পথ এসে তখনই ফেরৎ গেলাম না। ভাবলাম, সামনের রেস্তোরাঁয় এক কাপ চা নিয়ে সময় কাটাতে পারি। এই রেস্তোরাঁয় আবার ওকে দেখলাম। নজর অবশ্য আসতো না—এলো ওর এক বিশ্রী অভ্যাস-এর জন্য।

সামনের টেব্‌ল ও ব'সে নাক খুঁটছিল আর বল পাকাচ্ছিল হাতে করে। রেস্তোরাঁয় লোকে খেতে আসে, সেখানে যে খরিদ্দার এমন জঘন্য আচরণ করে সে সকলেরই নজরে পড়বে।

"তোর পাগার বুড়োর খবর কি?"—ওর একজন সংগী ওকে প্রশ্ন করল। ওর মুখ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। এখন এই প্রশ্নের পর আমার আর কোন সন্দেহ রইল না—উদগ্র শ্রবণে ব'সে রইলাম।

"বুড়োর ভীমরথী হয়েছে রে"—ও বললে—"তার তাতেই আমার সুবিধে।" ওরা দুজনে কিছু খাওয়া শেষ করে তখনই বেরিয়ে গেল, তাই আমার আর কিছু শোনা হয়নি।

"তোমার জন্য পাঁপর ভাজছিলাম অমরনাথ, তাই দেরী হোল—" চেয়ে দেখি সোমা ছোট্ট এক ট্রলীতে চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম এনেছে আর একটা প্লেট অনেকগুলো পাঁপরভাজা।

"অনেকদিন পাঁপর খাইনি, খেতে ভালই লাগবে"—ব'লে একটা পাঁপর তুলে নিলাম।

"কি আজকাল অত তুমি ভাব অমরনাথ?" সোমা বললে,—"ঘরে এসে দেখি, আকাশপানে তাকিয়ে আছ।"

"কই, কিছু তো ভাবিনি, এমনি ব'সেছিলাম"—বললাম।

"এই বয়সে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁ ক'রে বসে থাকার একটাই মানে হয়। হয় তুমি প্রেমে পড়েছ—নয় তো তোমার বিয়ে দেওয়া দরকার। বিয়ে করার বয়সও তো হয়েছে, বিয়ে কবে করবে?"

"কেতকী আর করবীকে আগে পার করি, মেয়ে তো মাথায় মাথায় হোল—তার ওপর রূপ নেই। রূপেয়ার ব্যবস্থা তো করতে হবে। (কেতকী আর করবী আমার কাকার দুই মেয়ে। এরা বর্তমানে আমাদের সংসারে আছে) তারপর আছে সজলদা'র স্যানাটোরিয়ামের খরচা। ডাইনে চাইলে বাঁয়ে কাণা। বাঁয়ে চাইলে ডাইনে। আমার কি ওসব এখন দেখার সময় আছে সোমা। মাথায় যে অনেক দায়।"

"কিন্তু তোমার তো নিজেরও একটা দিক আছে অমরনাথ?"

"আছে বৈকি, কিন্তু সেটা মুখ্য নয়। আমার এখন দরকার শুধু টাকার। টাকা পেলে সব পাব বলে মনে হয়।"

"টাকা পেলে কি সব পাওয়া যায় অমরনাথ? যায় না অমরনাথ, টাকা কিছু নয়, কিচ্ছু নয়। আর যদি টাকাকেই এত বড় দেখছ, যা তোমার হাতে এসেছিল তা পেয়ে ঠেলে দিয়েছ কেন? আজ কি এই সম্পত্তির ট্রাষ্টী হবার কথা আমাদের? একে দেখাশুনো করার জন্য প্রতি মাসে তিনশ' পঞ্চাশ টাকা পাচ্ছি, সেটা খুব কম নয়। কেন তুমি ট্রাষ্টী হলে না অমরনাথ? কেন?"

"আমি হ'লে তোমার কি কোনও সুবিধে হোত সোমা? আর আমারই বা কি এমন হোত। তিনশ' পঞ্চাশ টাকা মাস গেলে দেশের তুলনায় অনেকই। কিন্তু আজ এদেশে এসে বুঝেছি যে, ঐ টাকায় সন্তুষ্ট থাকা মূর্খতা। আমার অনেক চাই, অনেক। আমার যে দায় অনেক। আর তুমি? তুমি ধনী ব্যবসায়ীর গৃহিণী হয়েছ, তোমার মা-বাবা ধনবান জামাই পেয়ে খুসী হয়েছেন। সব দিক দিয়েই ভাল হয়েছে, আর তা ছাড়া ট্রাষ্টী হওয়াতে আমার বিশেষ হাতও ছিল না। তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে যে বাবাজীকে আমি শেষের কয়েকদিন এড়িয়ে চলছিলাম।"

"কেন এড়িয়ে গেছ অমরনাথ? আমি তা বুঝেও বুঝে উঠতে পারিনি। বি-এ পরীক্ষার পর তুমি ছিলে একরকম। আবার যখন এম-এ পরীক্ষার পর সর্ব্বিগ্যালতে এলে, তখনই বুঝলাম তুমি বাবাজীকে যেন এড়িয়ে যাচ্ছ।"

"আচ্ছা সোমা, তোমার কি মনে হয় যে বাবাজী তখন মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন?"

"সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন অমরনাথ, অন্ততঃ আমার তা মনে হয়। তবে শরীর একদম ভেঙে গিয়েছিল।"

"জানি না, তোমরা কি করে তাঁকে সুস্থ বলতে। আমার কাছে তা মনে হয়নি। আমার একদিনের কথা মনে আছে—বাবাজী তখন চোখের জন্য পাঠ ক'রতেন না, শুধু জপ নিয়ে থাকতেন। ওঁর শরীর তখন এত খারাপ হয়েছিল যে, আমি ভাবতাম আর বেশী দিন উনি নেই। বাবাজীর কিন্তু তখন ধারণা হয়েছিল যে ওঁর শরীর ক্রমশঃ ভাল হচ্ছে। 'আমার প্রতি বৎসর এক বছর করে বয়স কমবে, আর আমার দেহের বল বাড়বে—কিশোর-গোপাল আমাকে একথা বলেছে'—উনি একদিন আমাকে তা বললেন। কথাটা খুব স্বাভাবিক ছিল না, কারণ প্রতি বছর লোকের বয়স বাড়ে—কমে না, আর বয়স হ'লে শরীরের বল কমে, বাড়ে না। সাধারণ ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। তবু আমি কিছু বলিনি। সেই সময়টায় বাবাজী আমাকে খুব জেদ ক'রতেন দীক্ষা দেবার জন্য। বি-এ পরীক্ষার পরও দীক্ষার কথা বলেছিলেন কিন্তু এবারে যেন আরো জেদ করতেন। একদিনের কথা আমি ভুলবো না। তোমরা সেদিন গিয়েছিলে দুর্গাতলায় থিয়েটার দেখতে—আমি গিয়েছিলাম ওঁর কাছে। সন্ধ্যারতির পরে বাবাজী আমাকে প্রসাদ দিলেন—তারপর বললেন, 'অমরনাথ, আমার জীবনের অলৌকিক ঘটনা তোমাকে দেখাব'—যা আমি প্রতি রাত্রে দেখি। আর আমি ঘরে থাকবো না, তবে আমার দেখা এই কাহিনী তুমি লিখে প্রকাশ কোরো। তার ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।' তোমাকে এই অবধি বলে আমি থামলাম।"

"থামলে কেন অমরনাথ? কি দেখেছ সেদিন?"—আগ্রহের সঙ্গে সোমা বললে।

"বলছি শোন, বাবাজী তাঁর আসনে ব'সেছিলেন—আমি ছিলাম একটু দূরে। হঠাৎ বাবাজী আমাকে বললেন 'অমরনাথ, আমার কাছে এসো।' গলার স্বর শুনলাম অস্বাভাবিক উত্তেজনায় চাপা অথচ গুরুগম্ভীর। চেয়ারে বসেছিলাম, উঠে দাঁড়ালাম। বাবাজী বললেন—'আমার খুব কাছে এসো অমরনাথ। এসে আমার বুকে হাত দাও।' কিছুটা ভয়ে, কিছু বিস্ময়ে এগিয়ে এসে বাবাজীর বুকে হাত দিলাম। পাথরের মত হিম। এত হিম-শীতল যে বলা যায় না। আমার হাত বোধ হয় একটু একটু কাঁপছিল। অনুভব করলাম হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি—ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্।"

"কি দেখছ সামনে?" বাবাজী আমাকে প্রশ্ন করলেন।

"সামনে আপনার আয়না আছে আর তাতে আপনার নিজের গেরুয়া—তাই দেখছি।"

"আয়নার ওপরে যে দেয়াল আছে—তাতে কি লেখা আছে পড়তে পারো ?"

"দেওয়ালে তো আমি কোন লেখা দেখছি না বাবাজী"—ভয়ে ভয়ে বললাম।

"চোখ বুজে আমার কথা একমনে ভাব। আমার মনের সংগে তোমার মনের সংযোগ করার চেষ্টা কর—তাহ'লেই বুঝবে।"

"পারছি না বাবাজী। পারছি না"—আর্তস্বরে বলেছিলাম।

"থাক অমরনাথ—থাক আজকের মত। ভেবেছিলাম, আমাকে স্পর্শ করে তুমি তাদের দেখবে, যাদের আমি দেখি প্রতি রাত্রে। তাদের আকৃতি মানুষের মত—কিন্তু তারা সব মাথায় ছোট—বালখিল্য শিশু। তারা আমার কিশোর-গোপালের সংগে খেলাধুলো করে, ছুটোছুটি করে, আমাকে কাতুকুতু দিয়ে হাসায়, ওরা আসে—রোজ রাতে আসে। আমি চুপ করেছিলাম। বাবাজী হঠাৎ আবার কেমন যেন হ'য়ে গেলেন, বললেন—"ও বুঝেছি—তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না, বিশ্বাস করো না। অবিশ্বাসী তুমি, কেন তাহ'লে আমাকে স্পর্শ করে দেখতে পেলে না, আমি যা দেখি—"

আমি সেদিন বুঝেছিলাম যে ওঁকে তুষ্ট করতে হবেই। তাই বলেছিলাম—"বাবাজী আমি কি কোনদিনও আপনাকে বলেছি যে, আমি আপনাকে অবিশ্বাস করি ? আপনি কেন আমার ওপর অবিচার ক'রছেন। আমার মন এখনও অবিদ্যার প্রভাব কাটাতে পারেনি তাই এ সংশয়। যা আপনার কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, আমার কাছে তা মোহময়। জানি না, বাবাজী সেদিন আমার কথায় প্রবোধ মেনেছিলেন কি না, কিন্তু আমি বুঝেছিলাম যে তিনি আর সাধারণ জগতে নেই। তা ঐশ্বরিক কি আধিদৈবিক, কি অপ্রকৃতিস্থতা—আমার জানা ছিলো না। এর কয়েকদিন পরেই কেতকী আর কয়বীকে নিয়ে কোলকাতায় চলে আসি।"

"এর পরের অংশ তোমার জানা নেই অমরনাথ—" সোমা বললে [illegible] আমার জানা আছে।" তুমি চলে যাবার পর উনি যে কতখানি [illegible] হয়েছিলেন তা আমি বুঝতাম। ভাবতাম—এ কি মায়ার [illegible] ? যে রবি চৌধুরী নিজে নিজের শ্রাদ্ধ ক'রে সন্ন্যাস নিয়েছেন—[illegible] আবার মায়ার বাঁধন কেন ? ভরতরাজা[illegible] [illegible] হরিণ-শিশুর গল্প পড়েছিলাম। এ যেন [illegible] দেখলাম। আমার বাবাও খুব [illegible] হয়েছিলেন, কারণ বাবাজীর সম্পত্তির [illegible] বন্দোবস্ত করার খুবই দরকার হয়ে [illegible] অথচ উনি মুখ ফুটে কিছু ব'লতে [illegible] না, কারণ এর অভাবক উনিই [illegible] ওঁর স্বার্থ যে এতে আছে তা [illegible] দেখাতে চাইতেন না মোটেই। [illegible] বাবাজীর শরীর যত খারাপ [illegible] লাগলো—সমস্যা যেন তত বড় [illegible] লাগলো। শেষ কালে বাবাজীকে [illegible] জন্ত আমরা নিয়ে এলাম [illegible] কোলকাতায়। সেখানে সব সমস্যার সমাধান ক'রলে—আর খুব তাড়াতাড়ি, কে জান ?" বলে সোমা থামলো।

"কে সমস্যার সমাধান ক'রলে সোমা" ? আমি বললাম।

"আমার স্বামী—অংশুময় ঘোষ। নাম সেদিন ইচ্ছে ক'রে ব'লিনি। আজ ব'লছি। আমার ব্যবসায়ী স্বামী। তুমি কি তাঁকে দেখেছ অমরনাথ বা তাঁর নাম শুনেছ বাবাজীর কাছে ? বাবাজী কিন্তু তোমার অনেক কথা ওঁকে বলেছেন। আমার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের সন্তান আমি। আমার স্বামী আমার বাবার প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ীর দূর সম্পর্কের কে যেন হ'তেন।"

সোমা এই বলে চুপ ক'রে গেল। ও বলেছিল যে ওর স্বামী সব সমস্যার সমাধান করেছিল, কিন্তু কি করে তা করেছিল—তা বললে না। আমি আর তা জিগেস ক'রতে পারলাম না।

"কোলকাতায় তুমি বাবাজীর সংগে দেখা ক'রতে না কেন অমরনাথ ? সে কি একই কারণ ?"—ও আবার বললে।

"হ্যাঁ সোমা একই কারণ। বাবাজীর জীবনের শেষ চার পাঁচ সপ্তাহ আমার মনে আছে, উনি দেহরক্ষা করার পনের ষোল দিন আগে আমি ওঁর কাছে যাওয়া বন্ধ করি। কিছুটা ভয়ে আর কিছুটা ওঁর নিষেধের জন্ত। তুমি তো তখন ছিলে না হালদারপাড়া লেনের বাড়ীতে। তোমার বাবা ছিলেন। আমি দেখতাম বাবাজীর শরীর কি ভীষণ ভাবে ভেঙে গেছে আর ওঁর কি প্রচণ্ড ইচ্ছে বেঁচে থাকার, আজও বুঝি না তা। সেই সময়ে আমি প্রায়ই যেতাম সন্ধ্যের দিকে। একদিন বাবাজী আমাকে কি বললেন জান' ? বললেন—"অমরনাথ তুমি দেব-তরুদের কথা জান ?" পারিজাতকে দেবতরু বলে, তাই বললাম যে আপনি কি পারিজাতের কথা বলছেন ?

"শুধু পারিজাত নয় অমরনাথ। শোন, অমরকোষে কি বলেছে—" পঞ্চৈতে দেবতরবঃ মন্দার পারিজাতকঃ, সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনঃ"। এই কথা আবৃত্তি করলেন বাবাজী, বললেন—"এ হোল অমরকোষের দেবতরু। আমি কিন্তু যা খুঁজছি তা এ দেবতরুদের চেয়ে অনেক বেশী। মুচকুন্দ ফুল তুমি জান কি ? এনে দেবে আমায় ?"

মুচকুন্দ ফুল কি তা জানতাম না, বললাম—জানি না তো বাবাজী মুচকুন্দ ফুল। তবে আপনি যদি বলেন তো খোঁজ করি।"

"আমি মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ পাই—জানি কি তা।" বলে বাবাজী হাসতে লাগলেন ছোট ছেলের মত। কিছু না বুঝে চুপ করে রইলাম। হঠাৎ বাবাজী ফিসফিসিয়ে বললেন—"অমরনাথ তোমার ক্যামেরা আছে? জান তো ছাপোষা গেরস্থ বাড়ীর ছেলে আমি, কোথায় আমার ক্যামেরা? বললাম—"আমার তো ক্যামেরা নেই বাবাজী, তবে আমার এক বন্ধুর ক্যামেরা আছে। চেয়ে দেখতে পারি, কিন্তু কেন বাবাজী? কার ছবি তুলতে হবে?"—

বাবাজীর গলার স্বর আরো অস্পষ্ট হয়ে এলো। ফিসফিসিয়ে বললেন—"অমরনাথ, আমার কাছে সে আসে, প্রতিটি রাত্রে আসে, আমি তার চলার শব্দ শুনি—পায়ে তার নূপুর বাজে, কটিতে কিংকিণী, তার গায়ের গন্ধ পাই আমি, যেন কোটী কোটী মুচকুন্দ ফুলের সুবাস। আমি জানি সে আসে, সে আসে। আমি এবারে তাকে ধরে রাখবো, আমার ক্যামেরার মধ্যে ধরে রাখবো—আমি দেখবো কে সে?—"

"আপনি চব্বিশ ঘণ্টা তার ধ্যান করেন এ আপনার মনোবিকার" আমি বললাম।

"না না এ মনোবিকার নয়, মনোবিকার নয়, বাবাজী সিংহনাদ করে উঠলেন। আমি যে তাকে চাক্ষুষ দেখি প্রতি রাতে, যদি সে আমার কাছে আসা বন্ধ করে তো আমি গলায় দড়ি দেব—"

ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম সোমা। কারণ বহির্জগতের আমিই কেবল তখন তার কাছে যাতায়াত করতাম। যদি উনি একটা কিছু ক'রে বসেন তো সব ঝামেলা পড়বে আমার ঘাড়ে তাই আমি জোর করে ওঁকে বুঝোতে চাইলাম যে—এ ওঁর মনোবিকার আর কিছু নয়।

সোমা আমাকে বাধা দিল'। 'তোমার ধারণা ভুল অমরনাথ, তুমি ছাড়া আর একজন তখন প্রতিদিন ওঁর কাছে যাতায়াত ক'রতো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আর তার উদ্দেশ্য সফলও হয়েছে। সে এখন বাবাজীর সম্পত্তির ট্রাষ্টী—"

"তোমার স্বামী অংশুময়"—

"হ্যাঁ অমরনাথ আমার স্বামী।"

"থাক সে কথা এখন, শোন বাবাজী আমাকে কি বললেন। আমার আচরণে অত্যন্ত আহত হয়ে তিনি বললেন—অমরনাথ তোমাকে আমি স্নেহ করতাম। ভাবতাম—আমার ওপর তোমার আস্থা আছে, কিন্তু তুমি ঘোরতর অবিশ্বাসী। আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন ক'রতে চাও—ভেবেছিলাম তোমার হাতে কিশোর গোপালের ভার দেব, কিন্তু তোমার অবিশ্বাস ভরা নারকী মন। তুমি আর কোনদিনও আমার কাছে এসো না। তুমি এলে আমার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে।"

সেই শেষ দেখা সোমা। তারপর যে রাতে বাবাজী দেহরক্ষা করলেন সেই রাতে কালীঘাট থেকে আমার খোঁজে কারা এসেছিল। আমি জানি না কেমন করে আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম।

রাত তখন প্রায় বারোটা বাজে। ঘুমোচ্ছিলাম তখন। ঘুম ভাঙলো—ন'দার ডাকে। "অমরনাথ, ওঠ, কারা যেন তোর খোঁজ করছে।" বললাম—"বুঝেছি ওরা কারা। তুমি আগে ওদের বলে দাও যে, আমি বাড়ী নেই, মামার বাড়ী গেছি, পরে জিগেস কোর—কেন, কি দরকার।' বুঝতে পেরেছিলাম—বাবাজী দেহরক্ষা করেছেন দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে—অমরনাথ এখানে নেই, সে তার মামার বাড়ীতে গেছে, দু' একদিন পরে ফিরবে,—কেন; কি দরকার তাকে? উত্তর শুনলাম,—বাবাজী দেহরক্ষা করেছেন, আর তাঁর ইচ্ছা ছিল যে আমি মুখাগ্নি করি।"

"কেন এলে না অমরনাথ—হাতের আগুনটুকু"—সোমা বললে।

"যে নিজের শ্রাদ্ধ করে সন্ন্যাস নিয়েছে, তার মুখাগ্নির প্রয়োজন নেই সোমা। মুখাগ্নি তো সে নিজের করে গেছে নিজের গার্হস্থ্য-জীবনের কুশপুত্তলিকা দাহ করে, তার আর প্রয়োজন কি?"

দুজনে চুপ করে ব'সে রইলাম। আমাদের দুজনের জীবনের সংগে বাবাজীর জীবন যেন এক সুরে বাঁধা ছিল। প্রথম যৌবনের নবারুণ রাগ, অর্ধস্ফুট কাকলী, তারপর কোথায় কে চলে গেল।

"তোমার স্বামীকে তুমি যথেষ্ট ভালবাস বলে মনে হয় না সোমা"—হঠাৎ বলে ফেললাম।

"তোমার কি একটুও বাধলো না এই অপমানকর কথা বলতে অমরনাথ? তুমি তো তাকে জানও না। আর তোমার কি মনে হয় যে, লণ্ডনে এসে আমি এদেশী হয়ে গেছি?"

'রাগ কোর না সোমা। অংশুময়কে যথেষ্ট ভালবাসলে তুমি আজকে এত কথা আমাকে বলতে না। আর লক্ষ্য করেছ বোধ হয় যে, আমি যথেষ্ট বলে একটা শব্দ ব্যবহার করেছি।"

'অমরনাথ—আমি ভারতীয় মেয়ে। আমার বিয়ে হয়েছে আমার মা বাবার ইচ্ছায়, বাবাজীর যোগ-সাজসে। আমার স্বামীকে ভালবাসা আমার ধর্ম। কিন্তু থাক ও কথা, আর তুমি কি জানতে চাও যে, আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম কিনা? বেসেছিলাম অমরনাথ—বেসেছিলাম। আমি সাধারণ মেয়ে আর তুমি সাধারণ ছেলে; এরাই তো পরস্পরের প্রেমে পড়ে। তবে আজ আর ভালবাসি না—একটুও নয়। আমার ভালবাসা কেউ নিলো না অমরনাথ—আমার ভালবাসা কেউ বুঝলো না।"

'কেন অংশুময়? তোমার স্বামী?"

হাসতে সুরু করলো সোমা। প্রথমে একটু আস্তে, তারপর জোরে, আরও জোরে। চোখ দিয়ে জল বেয়ে এলো দরদর করে। তারপর একটু সামলে নিয়ে ও বললো—"অমরনাথ, আজ তুমি যাও। ও বাড়ীতে নেই। যাও অমরনাথ। দোহাই তোমার।"

আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

৬

বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে মায়ের। কেতকীর বিয়ে প্রায় ঠিক। এক জায়গায় কথা অনেকটা এগিয়েছে। খাঁই বেশী। বুঝলাম মা কি বলতে চাইছেন। প্রতি মাসে যে মোটা টাকা পাঠাই, তাতে চলে না, এবারে পণের টাকা পাঠাতে হবে। কিছু বলায় নেই। কারণ কেতকী আর করবীকে ওদের মামার বাড়ী থেকে আমিই নিয়ে এসেছিলাম। দায়-দায়িত্ব সব আমার।

আমাদের দেশের মেয়ের বিয়ে হয়, এরা করে। সোমার বিয়ে হয়েছে অংশুময়ের সংগে, সোমার মা বাবার আর বাবাজীর ইচ্ছায়, সোমার সুখ তাতে হোল কি না হোল ভাববার কথা নয়। আর মা বাবা তো সব বিচার করে মেয়েকে সম্প্রদান করেন। ঘর, বর,

য়েরের বা পরিচয় আমি 'খগেন-কেবিনে' চা খেতে খেতে শুনেছি, তা প্রীতিকর নয়। ওর সেই উক্তি মনে পড়ে "শালার বুড়োর রথী হয়েছে আর তাতে আমারই সুবিধে"। বাবাজীর শেষ সময়ে য় প্রতিদিন হাজিরা দিত ওর কাছে। আর যে উদ্দেশ্য নিয়ে রা দিত, তা সফল হয়েছে, সোমা একথা বলেছে, উদ্দেশ্য কি, তা বোঝা কঠিন নয়।

দাম্পত্যজীবনে কি সোমা খুব সুখী নয়? আমিই তো ওকে যা ইংগিত করেছি, আর সাত আট বছর পরে দেখা কোনও বন্ধুকে হঠাৎ কোন মেয়ে মুখ ফুটে বলে না, আমি তোমাকে বেসেছিলাম, যদি না এর কোন কারণ থাকে। ছাই ভালবাসার ছিল কি? হাত ধরাধরি? কই তাও তো নয়? কদাচ তা ওর হাতের ছোঁওয়া লেগেছিল, কখনও হয়তো ওর শাড়ীর লের একটু পরশ, মাথার চুলের আলতো গন্ধ। মন যে আমার ত চঞ্চল হোতনা তা বলি না। কিন্তু সেই কি ছিল ভালবাসা? তেও আজ হাসি পায়। অংশুময় কি কোনও সাদা মেয়ের প্রেমে ছে এখানে? তাই বোধ হয় হবে। যার জন্য সোমার ইংগিত লজ্জা নেই যে সে তার স্বামীকে ভালবাসে না।

আজই মায়ের চিঠির উত্তর না দিলে, ওতে কেতকীর বিয়ের খাঁই-এর আছে। আজ জবাব না দিলে ওরা আবার সাত পাঁচ ভাববে। বাক্সে দেখলাম একটাও Air letter নেই। গোপবন্ধু এখনও ছে। ও অনেক রাত করে বাড়ী ফেরে। ঘুমোয় অনেক বেলা ই। হয়ত ওর কাছে Air letter আছে। চেয়ে দেখি।

"এই গোপবন্ধু" ওর গায়ে ধাক্কা দিলাম, মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে য়োচ্ছে।

"সড়া বংগালি, জ্বালাচ্ছিস কেন? ঘুমোতেও কি দিবিনে একটু? জলে।

"একটা Air letter চিঠি তোর থেকে? একটু উঠে দেখনা কিনা, আমার বড় দরকার"—বললাম। ধড়মড়িয়ে ও উঠে লা।

"ভাগ্যিস ঘুম থেকে তুললি আমাকে, একটা জরুরী চিঠি লিখতে আজই। আর কাগজ বোধ হয় একটাই আছে"—ও বললে।

"তোর তো পরে লিখলেও চলবে, লিখিস না তো সাতজন্ম চিঠি টাকা আসা বন্ধ হবার পরে। কি এমন রাজকার্য তোর ছে?"

"না মাইরী, আজই লিখতে হবে। নয়তো আমার নিজের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। আজই লিখে পোষ্ট করে তবে ন্ত হবো। শোন অমরনাথ" ও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো, "আজ ইনার সংগে এনগেজড হবো, আর সেটা বাড়ীতে জানাবার জন্য লিখবো, জানিস তো, আর পাঁচজনে বিয়ে করেও জানায় না। বন্ধু মিশ্র এনগেজড হবার আগেই জানাবে। আজ সন্ধ্যেতে দের এখানে একটা পার্টি থাকবে। আমার এক ওড়িয়া বন্ধু আর তুই"—

"তুই কবে আবার ওর সংগে মিটিয়ে ফেলেছিস? ও তো ঘরেও না আজকাল, দেখা করতিস কোথা? আমাকে বলিসনি?"

"মিটিয়ে অনেকদিন ফেলেছি যে। আর ওকে ঘরে কেন আনিনা জিগেস করছিস? চিরদিনের মত ঘরে আনবো বলে ঘরে আনিনি। জানিস অমরনাথ, অনেক মেয়েই দেখলাম, দেখলাম ওরা সকলেই ঘর বাঁধতে চায়। আর এ মেয়েটার সংগে সাতদিন এক হোটেলে একঘরে কাটিয়ে দেখেছি আমাদের কতটা মিল আর কতটা অমিল। তা ছাড়া তুই তো বলেছিলি যে, বিয়ে তো একদিন করতেই হবে—ভাল মেয়ে পেলে না করার যুক্তি কি?"

"তোর মা বাবা খুব দুঃখ পাবেন এতে, তাই না?"

"হ্যাঁ পাবেন—আবার ভুলেও যাবেন। ওরা তো আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না, যা তোর কাছে তোর বাড়ীর লোক করে। তুই এদেশে বিয়ে করলে ওদের অনেক ক্ষতি। সব চেয়ে বড় ক্ষতি—আর্থিক ক্ষতি। তার চোট তোলা বড় কষ্ট। তবু তুই আর কতদিন এমন ক'রে কাটাবি? বয়স তো হচ্ছে—"

"আমার জন্য মাথা ব্যথা করিস কেন গোপবন্ধু? তোকে বলেছি তো আমার জীবনের ধারা তোর চেয়ে অনেক তফাৎ। যাক তুই তা'হলে এতদিন পরে সত্যিই বিয়ে ক'রছিস। congratulation—ইনাকেও congratulation জানাস।"

রাত আটটা নাগাদ ইনা এলো আমাদের ঘরে। ঘরটা আমার একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছিলাম। টেবিলে দুটো প্লাষ্টিকের নতুন টেবলক্লথ—মিসেস চৌধুরীর কাছ থেকে ধরে-করে দুটো নতুন বেড-কভার এনেছিলাম। ফুলদানীতে ফুল—একটা সেরী, কয়েকটা বেবী-শ্যাম আর ভাল স্যাণ্ড উইচের ব্যবস্থা হয়েছিল। গোপবন্ধু একটা আংটিও কিনেছিল।

রাত যখন প্রায় এগারোটা তখন শুনলাম—নীচে টেলিফোন বাজছে। এত রাতে টেলিফোন আসা খুব স্বাভাবিক নয়—সাধারণ লোকে খুব দরকার না থাকলে করে না এত রাতে। রিং শুনলাম—দু'টো। ল্যাণ্ডলেডীর কাছে টেলিফোন আসে—তারপর সে সেটা পাঠিয়ে দেয়—বিভিন্ন ঘরে। দুটো রিং হ'লে—আমার বা গোপ-বন্ধুর, তিনটে হায়দারের, চারটে চৌধুরীদের। গা জ্বালা করতে লাগল।' এত রাতে নিশ্চয় গোপবন্ধুর কোন বন্ধু ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। বলিহারী যাই।

"তুই মাইরী টেলিফোন ধরগে যা'—গোপবন্ধু আমাকে বললে। ও তখন ইনাকে চুমু খেতে ব্যস্ত। নীচে নেমে এলাম।

Could I speak with Mr Sarkar please?"—শুনলাম সোমা আমাকে খুঁজছে।

"আমি অমরনাথ বলছি—"বললাম। সোমা এত রাত্রে কেন?"

"অমরনাথ তুমি এক্ষুনি একবার আমার বাড়ীতে আসবে কি? আমার বড় বিপদ। দোহাই তোমায়—শীগ্‌গির এসো শীগ্‌গির—"

"কি বিপদ তোমার? এখুনি আসছি—আমি, কিন্তু অংশুময় কোথায়?"

"ও এখানেই। কিন্তু বড় অসুস্থ—আমি বুঝতে পারছি না কি করি?" তুমি এসো অমরনাথ।"

"কি অসুখ ওর? ডাক্তার ডেকেছে তো?"

"ডেকেছি অমরনাথ। তবু তুমি শীগ্‌গির এসো অমরনাথ, তুমি ছাড়া আর তেমন কেউ নেই আমার যাকে এখন ডাকি।"

"আসছি সোমা—এখুনি।" টেলিফোন নামিয়ে ওপরে এলাম। গোপবন্ধুকে বললাম—"একটু বাইরে যাচ্ছি। এসে তোকে সব বলবো।"

অবশেষে টেরাস—বিশপস ব্রিজ থেকে বেশী দূর নয়, দ্রুত পা চালিয়ে এলাম। সোমা ওপরের জানলার ধারে ছিল। আমাকে দেখে নীচে এসে দরজা খুলে দিল। 'ওপরে এসো অমরনাথ'—বলে দ্রুত ও আমাকে ওপরে নিয়ে এলো। বসার ঘরে কার্পেটে দেখলাম—অংশুময় শুয়ে। জ্ঞান আছে কি বোঝা যায় না। সারাটা মেঝে বমিতে ভরে গেছে, সারাটা ঘরে বীয়ার আর বমির একটা অসহ্য ঝাঁঝালো গন্ধ. মাথায় ওর চোট লেগেছে—ব্যাণ্ডেজের মত কি বাঁধা, সোমাই বোধ হয় বেঁধেছে সে ব্যাণ্ডেজ। রক্তে সেটা লাল হয়ে আছে।

"অংশুময় কোথায় ছিল। কখন এসেছে—কাদের সংগে এসেছে?"

"যাদের সংগে এসেছে তাদের আমি চিনি না। ওকে দু'জন এদেশী লোক পাঁজাকোলা করে ঘরে দিয়ে গেছে—কিছুক্ষণ আগে।" (পরে ব্যাপারটা শুনেছিলাম অংশুময় 'পাবে' মাতাল হয়ে আর একজনের মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেবার ফলে এই ব্যাপার হয়।)

"ডাক্তার কখন আসবে বলেছে। ওর তো জ্ঞান নেই দেখছি"—

"ডাক্তার ডাকিনি অমরনাথ। ভয় পেয়েছি ডাকতে! তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম, তুমি ডাক্তার ডাক'।"

"না ডাক্তার নয়—এ্যাম্বুলেন্স ডাকি। ওকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।" এ্যাম্বুলেন্স এসে একটু পরেই ওকে নিয়ে গেল। সোমা ঘর পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলো তখন।

"ও কি খুব বেশী মদ খায়?—না কখন-সখন?" সোমাকে প্রশ্ন করলাম।

"রোজই খায় অমরনাথ। ইদানীং ও প্রায় মাতাল হয়ে আসতো। কুইনসওয়ের কাছে Prince Alfred বলে যে পার্ক আছে, সেখানে ও রোজ যায়। সেখানে একজন 'বার-মেড' আছে তার সংগে ওর খুব ঘনিষ্ঠতা—এ-কথা মিসেস চৌধুরীর কাছে শুনেছি। সেখানেই বোধ হয় এই ব্যাপার হয়েছে। যারা ওকে দিয়ে গে- তারা—ওর পকেটে কার্ড দেখে ঠিকানা পেয়েছে। পয়সা-কড়ি কিছুই নেয়নি। সব আছে—"

সোমার বসার ঘরের ঘড়িতে একটা বাজলো। আমার এ- যেতে হবে। বললাম—"সোমা আমি যাচ্ছি। ভাববার কি- নেই। হাসপাতালে কাল সকালে আমি খবর নেব, তুমি- নিও।"
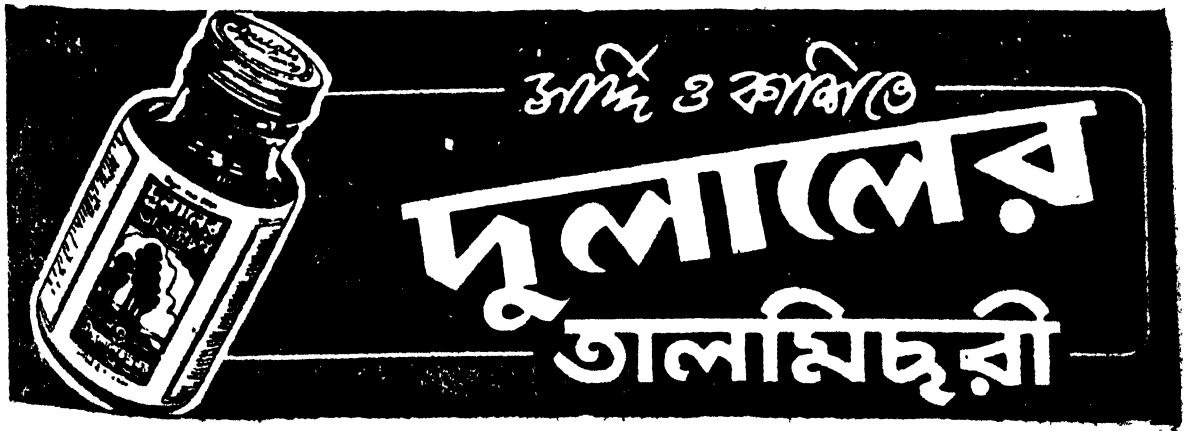
"অমরনাথ, আমার কি হবে? আমার কি হবে? আমি করবো?"—ও বললে।

জবাব না দিয়ে চলে এলাম। পথে গাড়ীর কোলাহল নেই- নিস্তব্ধ পথ। আকাশের দিকে তাকালাম আবার—অনেক দিন প- দেখলাম পরিষ্কার আকাশ—আর ছায়াপথের রেখা। কোথায় গে- ঐ পথ? ঐ পথে কি বাবাজী গেছেন—পিতৃযানে না দেবযানে ধূম, রাত্রি আর কৃষ্ণপক্ষ—আর দক্ষিণায়নের ছয় মাস পথ পার হ- যেতে হয় চন্দ্রলোকে। আর মনে এল অংশুময়ের জিজ্ঞাসা। দু- প্রদীপের আলোর জিজ্ঞাসা—"কিমাশ্চর্যম্"। সোমার প্রশ্নে- জবাব দিইনি আমি। সোমার অসহায় প্রশ্ন। "অমরনাথ আমা- কি হবে? আমার কি হবে? আমি কি করবো?"

আমি জানি সোমা, তুমি কি করবে। তা আমি বলিনি তুমি ঘর করবে অংশুময়ের সংগে। তুমি মানিয়ে চল- চেষ্টা করবে। তোমার নবদ্বীপচন্দ্র আছে—আবার ভগবা- তোমাকে বৃন্দাবনচন্দ্র দেবে। হয়ত অচিরেই—হাসপাতাল থে- ফিরেই।

আর অমরনাথ· তুমি কি করবে? তুমি সজ্জনদার তানাটোমি- রামের খরচা আর কেতকী করবীর বিয়ের পণের টাকা তার ব্যব- ক'রবে। গোপবন্ধুকে উপদেশ দেবে—সুখ সুখ করিসনে গোপবন্ধু সংসারে আত্মসুখ সব চেয়ে বড় নয়। তবু নিজে ভাববে—সু- কাকে বলে? কে তা বলে দেবে? কোন পথে গেলে সু- পাব?"

এলোমেলো বাতাস বইছে। পপলারের পাতা সর সর কে- কাঁপছে, দমকা বাতাসটা অনেকটা যেন সাঁওতাল পরগণায় 'পছিয়া'- ম-। সময় ব'য়ে যাচ্ছে।

লণ্ডনে দোকান সাজানো

শ্রীমতী মীনাক্ষী ঘোষাল

লণ্ডনে পা দিয়েই দু'চোখ ধেঁধে গিয়েছিল যা দেখে, তা হ'ল এখানকার দোকানে দোকানে জানলা-জোড়া অপরূপ সজ্জা। টি বড় মাঝারি প্রতিটি দোকানেই বিক্রয়যোগ্য জিনিষগুলি সুন্দর র সাজানো থাকে কাঁচের জানলায়—এমন কি দামটি পর্যন্ত ঝলমল র লেখা প্রতিটি জিনিষের গায়ে। বারোমাসে, দিনে রাতে এ া থাকে অম্লান। যখন খুশী, যেখানে খুশী দাঁড়িয়ে পড়ে নিবিষ্ট র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা চলে জিনিষপত্র। ঘর সাজানোর আসবাব কে শুরু করে বাগান কোপানোর কোদাল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কে বোনার উল কাঁটা পর্যন্ত। লণ্ডনের "West End"এর াকার বড় বড় দোকানগুলিতে এই সাজের ঘটা বিশেষ করে দেখবার ই। প্রত্যেকটি জানলায় পাল্লা দিয়ে দিয়ে চলে সৌন্দর্যচর্চা। লক্ষ মানুষকে অদৃশ্য চুম্বকের টানে টেনে আনে জানলার সামনে। নেই অসময় নেই এই window shopping-এ লণ্ডনবাসীর নও ক্লান্তি আসে না।

"Window display' বা দোকানের এই অঙ্গসজ্জা আজকের উরোপের বিশেষ করে ইংলণ্ডের একটি সযত্নপুষ্ট শিল্প। মহাযুদ্ধের াগে পর্যন্ত কিন্তু এ শিল্পটি ব্যবসায়ী সমাজে তত কদর পায়নি। যুদ্ধোত্তর যুগে প্রতিযোগিতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেল, আর বিজ্ঞাপনের অন্যতম সফল া হিসেবে আদর পেল 'window dressing.' বলা বাহুল্য, সজ্জা উদ্দেশ্যবিহীন প্রদর্শন নয়। দোকানের বিক্রী বাড়ানোই র চরম লক্ষ্য—আধুনিক ব্যবসা জগতের শ্রেষ্ঠ অভিযান—"Sales Promotion"-এর অন্তরালে রয়েছে শিল্পীর শিল্পকৌশল ও পরিকল্পনা, ব্যবসায়ীর ব্যবহারিক বুদ্ধি, পরিচালকের নিপুণ ব্যবস্থাপনা—এই তিনের সযত্ন সমন্বয়। অর্থব্যয়ের তো কথাই নেই। দোকানের আয় ও আয়তন অনুযায়ী বেশ মোটারকমের অর্থ বরাদ্দ থাকে এই সাজসজ্জার জন্য। Selfridges, Harods, Peter & Simpson, Thomas, Wallis ইত্যাদি সুবিখ্যাত দোকান-গুলিতে আলাদা কর্মবিভাগই আছে। আছেন Display Manager এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর দল! লণ্ডনের দোকানগুলি বছরে গড়ে ৩০ বার সাজবদল করে; এক সজ্জা ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যেই হয় অচল। ঋতুর সংগে, কালের সংগে, ক্রেতার মনের তালের সংগে তাল মিলিয়ে রঙ রূপ ভাব বদল করে। দর্শকের চোখে এই সজ্জা বদলের অন্তর্নিহিত প্রয়াসটি ঝট্ করে ধরা পড়ে না। বসন্তের হাল্কা হলুদ কখন গাঢ় হতে হতে শীতের নীরেট বাদামী এসে ঠেকল, বড়দিনের আগে লোভনীয় খেলনা আর টুকিটাকি উপহারগুলি কখন এসে নিঃশব্দে ঠাইবদল করে নিল, এসব ঠিক তলিয়ে বিচার করে না দর্শকের মন। পরিচালকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু সদাজাগ্রত। কখন কোন বিশেষ বস্তুটির প্রদর্শনের পালা আসছে, কাকে একটু সামনে ঠাঁই দিতে হবে, কোন পুরোনো stockকে ঝেড়ে মুছে নতুন রঙে জাহির করতে'হবে কার আধপেনী দাম কমানোর জোর খবর নিঃশব্দে পৌঁছে দিতে হবে ক্রেতার কানে। এসব ভেবে ভেবে বারোমাস তিনি হিমসিম খাচ্ছেন। এর জন্য রীতিমত পড়াশুনা করে পরীক্ষা পাশ করতে হয় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, অনুশীলন করে করে বাড়িয়ে যেতে হয় জ্ঞানের পরিধি। আজকাল লণ্ডনের বহু নৈশবিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে window display.

এই সজ্জার উপকরণ হিসেবে দামী পুতুল, বৈদ্যুতিক রঙীন আলো থেকে শুরু করে পুরোনো ভাঙ্গা চেয়ার, টুকরো কাঁচ, ইলেকট্রিক তার, খড়-দড়ি ইত্যাদি সব কিছুর ব্যবহৃত হয়। তবে সবই নির্ভর করে পরিচালক দর্শককে কিসের ফাঁদে ফেলতে চান তার ওপর। সস্তা চটকে, না বনেদী আড়ম্বরে—রঙের জৌলুসে না বস্তুর কৌলীন্যে।

আর সেজন্যই দর্শকের মনস্তুষ্টি নখদর্পণে রাখতে হবে। একই জানলায় এক গাদা জিনিষ ঠেলে দিলে দর্শকের চোখ দেখেও দেখবে না। তাই বিরাট লম্বা একটি শো-কেস না রেখে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এক একটি জানলায় এক এক বিষয়বস্তু। রঙের সমাবেশ সন্নিবেশের মৌলিক মান, বস্তুটির আকারের সমতা ইত্যাদি মিলিয়ে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করা যে দেখামাত্রই চোখ আটকে থাকবে, মন চুলবুল করে উঠবে কেনার জন্য, অজ্ঞানেই হাত চলবে পকেটের দিকে। এই কৃত্রিম পরিবেশের প্রভাবই ক্রেতার মনে সবচেয়ে বেশী। যেমন ধরুন, evening dress-এর শো-কেসটিতে অবতারণা করা হয়েছে চমৎকার এক শান্ত পরিচালনায়। মানুষ প্রমাণ পুতুলগুলো পোষাকের রং কারুকার্য ও কাটছাটের জীবন্ত বিজ্ঞাপন; মেঝের কার্পেট, দেওয়ালের রং, আলোর শেডটি পর্যন্ত সযত্নে বাছাই করা পোষাকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে। যেখানে যতদূরেই যান না কেন, party dress বললেই ঐ বিশেষ দোকানের বিশেষ কাঁচঘরটি আপনাকে হাতছানি দেবে। আসবাবপত্র যে জানলায় আছে,

দূর থেকে তাকে আপনার সুসজ্জিত drawing room কিংবা শোবার ঘর ছাড়া কিছুই মনে হবে না—এমনই জীবন্ত তার সজ্জা। আপনি হয়তো এসেছিলেন একটা বিছানার চাদর কিনতে, শো-কেসে ঘরের পর্দা, টেবিলের ঢাকা ও চাদরের রং মেলানো setটি দেখে ক্ষেপে গেলেন। মনে হল ওর যে কোনও একটি বাদ দিলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে গৃহসজ্জা। অতএব—জয় হ'ল পরিচালকের কূটবুদ্ধির।

শুধু এই-ই নয়। আপনার চলার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা শো-কেসগুলো কি আশ্চর্যভাবেই চাহিদার সৃষ্টি করে। যে জিনিষের অভাব আপনি কস্মিনকালেও অনুভব করেননি, সেটির অভাবে হঠাৎ দিনচলাই দায় হবে। তেকোণা কফি-টেবিলটি জানলায় দেখে অবধি আপনার ঘরখানা ফাঁকাফাঁকা ঠেকবে। ষ্টিলের সুদৃশ্য বুক-কেসটি বিনা বইগুলোই লাগবে বেমানান, নতুন ছাঁটের ওভারকোটটি দেখে পর্যন্ত গা রি-রি করবে আগের কেনাটার অসংখ্য গলদের কথা ভেবে। Summer sale-এর লোভনীয় ছিটগুলো স্রেফ দিগ্‌বিদিকশূন্য যদি কিনে ফেলবেন। তারপর চুপসানো পয়সার থলিটি অনুভব করে সখেদে বলবেন—window shopping-এ ফের হ'ল ছাই। কিন্তু যেতে আপনাকে হ'বেই হবে। কেন? সেই কথাই তো ভাবছেন বসে Display Manager আর তাঁর অনুগত সাঙ্গোপাঙ্গ। [লণ্ডন বি বি সি বেতার-বিচিত্রার সৌজন্যে]

স্বামী বিবেকানন্দ

বাসন্তী গোস্বামী

শিমুলিয়ার দত্ত পরিবারে,
কোন এক শুভ লগনে,
এসেছিলে এক মহামানব, পুণ্য মধুর ভূমিতে,
সেদিন পারিজাত ফুল মালা হয়ে দুলেছিল তব গলেতে,
সে ত' ভগবানেরই দান।
তোমার মাঝেই তাঁর অনুভূতি হয়তো বা দিতে চান।
পারিজাত ফুল বিলায়ে দিয়াছ বিশ্বজনের মাঝে,
সেই সুরভি মধুর, গন্ধবিধুর জ্ঞানের আলোক-বাণী,
এই মর্ত্যভূমিতে রচনা করেছ স্বর্গভূমি যে তুমি,
তোমার জীবনকাহিনী জাগায় সুপ্ত হৃদয়েরে,
তোমার তেজোদীপ্ত গাথা চঞ্চলে সবারে,
নব ভারতের জনক তুমি,
তুমি যে পূজ্য, তোমারে নমি,
ত্যাগ, তেজ, ধর্ম সিক্ত,
জ্ঞান আলো রাশি হে প্রদীপ্ত,
সৌম্য সন্ন্যাসী,
মোরা গর্ব্বিত শুধু এইটুকু জেনে তুমি বাঙালী ভারতবাসী।
বাঙালী কণ্ঠে তুমি মণিহার,
ভাস্বর, ভাস্বর,
বঙ্গ মায়ের আদরের ধন,
তুমি দেবতার বর।
বিশ্বমাঝে ভারতের বাণী প্রচার করিলে তুমি,
তুমি যে পূজ্য, তুমি প্রণম্য, তাই ত' তোমারে নমি।
বিশাল, উদার, মুক্ত আকাশে বিশাল উদার প্রাণ,
মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছ তুমি নবজাগরণ গান।
নব ভারতের নব স্রষ্টা,
তুমি মহা মহীয়ান
নতশিরে মাগি দাও—দাও কিছু,
দাও কিছু দাও দান।
আজি পুণ্য জন্মশতবার্ষিকীতে,
শ্রদ্ধা অর্ঘ্য সাজাই আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে,
প্রণতি জানাই তোমারে আজিকে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে।

দেবী অহল্যা

রেবা দেবী

গোধূলির মায়া স্পর্শে ধরণী হয়ে উঠেছে মোহময়ী; অস্তমিত ভাস্করের স্বর্ণজ্যোতি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে মহাতপা পুণ্যব্রত মহর্ষি গৌতমের তপোবন-ভূমি ভূষিতা হয়েছে এক অপরূপ শোভায়, ঘন শ্যামল বনানীর পত্র পুষ্পে দিগন্তের সোনা যেন শ্যামাঙ্গী যৌবনবতীর অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার শোভার মতই মনোহারী; চতুর্দিকে বিরাজমান এক অক্ষুণ্ণ শান্তি, অমলিন পবিত্রতা।

শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনির সাথে ভেসে আসে ধর্ম্মজ্ঞ তপস্বিবৃন্দের কণ্ঠে উদাত্ত বেদগান ধূপ-ধুনা গুগগুলের মধুর সুরভিতে আশ্রম প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ।

নব ফাগুনের এক মাধবী সন্ধ্যা কিন্তু হায় এই পরিপূর্ণ শান্তির রাজ্যেও তৃপ্ত থাকে না একটি চিত্ত, মহর্ষি গৌতমের ধর্ম্মপত্নী দেবী অহল্যার ব্যাকুল হৃদয় তৃষিত হয়ে থাকে যেন কার প্রতীক্ষায়, প্রহর গোণে যেন কোন অজানার পদধ্বনির আশায়।

বৃদ্ধ গৌতমের সহধর্ম্মিণী দেবী অহল্যা, প্রগাঢ় রূপযৌবনা অপরূপা এক নারী যেন রূপে রসে রূপে পূর্ণ প্রস্ফুটিত এক রস শতদল, জরাজীর্ণ প্রৌঢ় ভর্ত্তার নীরস সঙ্গ তৃপ্ত করতে পারে না অহল্যাকে, ব্যর্থ যৌবনের জ্বালায় সতত ক্ষুধিত অহল্যার নারী চিত্ত।

আজও সন্ধ্যা বন্দনায় গৃহবধূর কল্যাণ ধর্ম সমাধা না করেই একান্ত অন্য মনে কুটির প্রাঙ্গণের মাধবী কুঞ্জের সান্নিধ্যে শিলাসনে উপবিষ্টা ছিলেন তিনি। "সুন্দরী" অকস্মাৎ কর্ণমূলে প্রবেশ করে মধুপ গুঞ্জনেরই ন্যায় মিষ্ট মধুর সুরের এক আহ্বান সচকিতা অহল্যা ত্বরিৎ দৃষ্টিক্ষেপ করেন শব্দানুসরণে।

পূর্ণ যৌবন এক সুন্দর পুরুষের আবেগ বিহ্বল নয়নের সাথে মিলিত হয় তাঁর আপন নয়ন যুগল, চকিত বিস্ময় খেলে যায় অহল্যার আঁখি প্রান্তে, "কে তুমি" মনে মনেই প্রশ্ন করেন যেন তিনি।

কন্দর্পজয়ী রূপ সে অজানা আগন্তুকের, সর্ব্বাঙ্গে তাঁর ইন্দ্রধনুর মায়া-মদির ঈষৎ রক্তাভ নয়নে, হাস্য প্রফুল্ল বঙ্কিম অধরের ভঙ্গীতে, গর্ব্বিত দেহ সুষমায় আঁকা রয়েছে যেন তাঁর পরিচয়, সে পরিচয়

বিমূঢ়া বেপথুমতী অহল্যার মনে উচ্চকিত হয়ে ওঠে এই জিজ্ঞাসা।

"সুন্দরী আমি স্বর্গাধিপতি বাসব" অহল্যার অকথিত প্রশ্নেরই যেন উত্তর দেন মন্মথ দর্পহারী সেই অপূর্ব্ব দর্শন পুরুষ, "দেবী তোমার রূপ স্বর্গেরও গম্য তাই আজ মর্ত্ত্যের ধূলিতে অবতরণ করেছে স্বর্গরাজ ইন্দ্র; অহল্যা তোমার রূপ ভিখারী আমি, মনোবাসনা পূর্ণ কর দেবী।"

বেতসলতার মতই কম্পিত হয়ে ওঠে অহল্যার বরতনু, সরমে রাঙা হয়ে চারুমুখী অস্ফুট ভাবে বলে ওঠেন—"দেবেন্দ্র আজ এ সামান্যা নারীর জীবন ধন্য হল, অহল্যার উপবাসী হিয়া যে এতদিন তোমারই প্রতীক্ষায় ছিল প্রভু।"

প্রথম প্রেমের মধুর আবেশে ভরে ওঠে সুন্দরী অহল্যার জীবন, বজ্রায়ুধ সুররাজ ইন্দ্র কলা-নিপুণ-চতুর-প্রেমিক, অনভিজ্ঞা তরুণী তাপসীর হৃদয় জয় করতে বিলম্ব হয় না তাঁর; দিনের পর দিন চলে তাঁর গোপন অভিসার প্রিয়তমের প্রেমালিঙ্গনে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন আত্মহারা অহল্যা, বিবশা অবোধ নারীর চোখে পৃথিবী হয়ে ওঠে স্বপ্নের মায়াপুরী।

কিন্তু কি নিদারুণ ভ্রম, সরলা ঋষিবধূ কি জানতেন রামধনুর রঙীন শোভা সুনীল গগনের বুকে যেমন করে ক্ষণিক দীপ্তি বিকিরণ করেই মিলিয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবেই একদিন তাঁর জগৎ হতে প্রেম বিদায় নেবে চিরতরেই; পেছনে রেখে যাবে শুধু হতাশা, শুধু আকুল মর্ম্মবেদনা? বহুভোগী দেবরাজ বাসব, নারী তাঁর ভোগ্যবস্তু মাত্র, উপাসনা করেন তিনি শুধু কামেরই প্রেমের নয়, তাই বাসনার অবসানে অকম্পিত পদেই ফিরে যান তিনি তাঁর স্বর্ণসিংহাসনে সুরলোকে। আর এক মাধবী সন্ধ্যার লগ্নে, কুসুম ভূষণে সজ্জিতা হয়েছিলেন গৌতমী, যত্নে সুরভিত নিবিড় কুন্তলে ধারণ করেছিলেন নবমল্লিকার মালা, কানে ছিল তাঁর অস্ফুট দুটি কুরুবক কলিকা ঘন মেঘের শ্যামশ্রীই যেন জড়িয়ে ধরেছিল সে অপরূপ দেহলতাকে নীল বসনের সহায়; অভিসারিকা প্রতীক্ষায় ছিলেন প্রিয়তমের। নির্দ্দিষ্টক্ষণেই দেখা দিলেন দেব-পুরন্দর কিন্তু একি কেন এ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবান্তর তাঁর? কোথায় তাঁর নয়নে সে অনুরাগ বিহ্বল কটাক্ষ? কোথায় সে সব মধুর প্রণয়ভাষণ?

বিস্মিতা নায়িকা ছুটে গেলেন দয়িতের সান্নিধ্যে, আশ্রয় চাইলেন প্রিয়তমের বক্ষে ভীরু কপোতীর আকুল প্রত্যাশায়; অহল্যার ব্যগ্র ব্যাকুল বাহুকে প্রত্যাখ্যান করে অকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন বজ্রায়ুধ বাসব—"দেবী এবার এসেছে বিদায়লগ্ন, বিদায় দাও আমাকে, আমি ফিরে যাই স্বর্গে।"

"সেকি প্রভু! একি অসম্ভব কথা তোমাকে বিদায় দেব, তবে অভাগিনী অহল্যার জীবনে আর অবশিষ্ট থাকবে কি? না না প্রিয়তম বল এ তুমি শুধু পরিহাস করেছ?" আর্ত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেন গৌতমী।

"পরিহাস নয় অহল্যা, আমি সত্যই বিদায় প্রার্থী, স্বর্গের সিংহাসন আমায় আহ্বান করছে মর্ত্ত্যের খেলা শেষে সেখানেই তো আমাকে ফিরে যেতে হবে দেবী, অহল্যা তোমার রূপ আমাকে আকর্ষণ করে এনেছিল একদিন, বাসনা তৃপ্তি ঘটেছে আজ আমাকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করতে হবে, জান না কি সুন্দরী দেবরাজ ইন্দ্র পরিচালিত হন শুধু বাসনারই দ্বারা প্রেমে সে বিশ্বাসী নয়?"

দৃপ্তপদে অপসৃত হন বজ্রায়ুধ সহস্রাক্ষ বাসব, সুরলোকে গমন করেন সুরপতি ইন্দ্র। দু'দিনের ক্রীড়নক পড়ে থাকে পথের প্রান্তে সেদিকে দৃষ্টিপাত করার অবসর নেই আর তাঁর। আর অহল্যা? প্রতারিতা অভাগিনীর রক্তাক্ত হৃদয় থেকে ঝরে পড়ে শোণিতবিন্দু অবিরাম তার বিরাম কি ঘটেছে আজও? আজও আকাশে বাতাসে কি স্পন্দিত হচ্ছে না অহল্যার হৃদয়বেদনা? প্রতারিতা প্রবঞ্চিতা রমণীহৃদয়েই যে এখনও আসন পাতা রয়েছে ক্রন্দসী অহল্যার।

রোটাং গিরি সঙ্কটে

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

হিমালয়ের বক্ষ-রন্ধ্রে দুর্গম দুর্ভেদ্য একটি স্নায়ুকেন্দ্র, উত্তঙ্গ হিমশৃঙ্গে বিস্তৃত করেছে তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। তুষারে তুষারে জমাট বেঁধে রয়েছে তার তারুণ্যের তুহিনারুণ তারল্য; অখণ্ড নৈঃশব্দের মধ্যে বাঙ্ময় হয়ে ফিরছে সেই অনাদিকালের অতলান্তিক প্রশ্ন "আমি কে?"

সমস্ত মানুষের মনের অতলে এই চিরন্তনী প্রশ্নটি ঘুমিয়ে থাকে সাংসারিক কোলাহলের মধ্যে। কিন্তু হিমালয়ের কি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি, তার হিমঘন তুষারশ্রীতে মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হয়ে যায় মনের সমস্ত চাঞ্চল্য। বৈরাগ্য নয়, বিতৃষ্ণাও নয়, শুধু বিমুগ্ধ বিহ্বলতায় সমস্ত মন সেই মহাপ্রশ্নের প্রত্যয়তার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিশোরী বিপাশার তীরে, দেওদার অরণ্যের গভীরে, আকাশের ইন্দ্রকান্ত নীলে, আর সদ্য ঘুমভাঙা বন্য পাখীদের কলগুঞ্জনায় ছড়িয়ে থাকে সেই প্রশ্ন গভীর মমতা মধুর মনোময়তায়।

মানালি থেকে ভোর ছটায় আমরা রওয়ানা হলুম রোটাং পাসের পথে। একটি জীপে আমরা ছিলুম চৌদ্দজন যাত্রী। গরম পোষাকে সকলেই আড়ষ্ট হয়ে আছে। তবু কনকনে ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে। মানালির জনপদ ছেড়ে বিপাশার তীরে তীরে দুর্গম বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে আমরা চলেছি ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর পথে। সঙ্গীদের মধ্যে থেকে শিল্পী হিমাংশুবাবু হঠাৎ গান ধরলেন "আমাদের যাত্রা হোল শুরু এখন ওগো কর্ণধার; তোমারে করি নমস্কার।"

কিন্তু শীতের প্রচণ্ড তাড়নায় তাঁর গান আর জমল না। একসময় ইঞ্জিনীয়ার প্রণববাবু দেখিয়ে দিলেন পথের ডানদিকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট নীচে গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে প্রবল বেগে নেমে আসছে বিপাশা নির্ঝরিণী। ক্ষীণাঙ্গী জলধারারার সে কি উন্মাদ গতি। উন্মত্ত গর্জন। কঠিন পাষাণের সঙ্গে কোমল জলরাশির সে কি সুনিপুণ রণশৈলী? উত্তর আমেরিকার বিখ্যাত Rocky পর্ব্বতমালার গিরিখাতের (Grand Caniyon) মধ্যে দিয়ে Colorodo নদীও ঠিক এইরকম ভাবে প্রবাহিত হয়েছে। দেখতে দেখতে পর্ব্বতের অন্তরালে হারিয়ে গেল বিপাশার সেই রুদ্র-নৃত্য। সকলের মনে এঁকে দিয়ে তাঁর রঙীন রেশ।

প্রায় দেড়ঘণ্টার মধ্যে আমরা এসে পৌঁছোলুম "রাহালা"। এখান থেকে শুরু হবে আমাদের পর্ব্বতারোহণ পর্ব। সমতল ভূমি

থেকে রাহালার উচ্চতা সাড়ে আট হাজার ফুট। রোটাং পাস সাড়ে তেরো হাজার থেকে চৌদ্দ হাজার ফুট। এই সুদীর্ঘ ছয় হাজার ফুট নিদারুণ বন্ধুর খাড়াই পথে আমাদের উপরে উঠতে হবে। জীপ থেকে নামতেই মনে হোল আমরা যেন একটা বরফের কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছি। কি প্রচণ্ড হিমঝঞ্ঝা প্রবাহিত হচ্ছে পাষাণে পাষাণে আর্তনাদ করে। কি অসম্ভব ঠাণ্ডা। কোথায় স্বর্ণ সোনালী আকাশ, কোথায়ই বা অরণ্য সবুজ মাটি? কিছুই দেখা যায় না। চারিদিকে শুধু পর্বত প্রাচীরদুর্গের মত বেষ্টন করে রয়েছে মহাশূন্যকে। মহামৌনতার সে এক নিঃসীম নিরন্ধ্র অবস্থিতি। জীবনাতীতের মত রহস্যময়। মানালি থেকে রাহালা এগারো মাইল পথ। আরও দীর্ঘ সাত মাইল পথ অতিক্রম করে আমাদের পৌঁছোতে হবে রোটাং পাসে গীফাং গিরি শৃঙ্গের সান্নিধ্যে। কাজেই সময় এখানে মহামূল্যবান। প্রতিটি অনু ও পল শ্রমের মূল্যে ক্রয় করতে হবে। ধীরে ধীরে সেই সঙ্কট সঙ্কুল চড়াইয়ের পথে আমরা আরোহণ শুরু করলুম।

প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস তুষার-ঝাপ্টায় আমাদের গতিপথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে; নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কে যেন সজোরে ধাক্কা মেরে আমাদের পিছনে ফেলে দিচ্ছে। ঠিক যেন হিমরাজ্যের অদৃশ্য প্রহরী কঠিন বেষ্টনীতে পথরোধ করে বলছে, "তোমরা কে? কেন এসেছ এই শিবলোকে?" মন কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার সুমিষ্ট গানে সে বিমর্ষতা কেটে যায়। হাস্যময়ী বিপাশা পাইনারণ্যের সবুজে; বন্যপুষ্পের বর্ণাঢ্য পেলবে, মনের মাধুরী ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে নেমে আসছে। তার চলার ছন্দ কিরিয়ে নিয়ে আসে আমাদের দ্রুত গতিবেগ। পথের বামদিকে গিরিশিরে গহীন বনস্থলী। দক্ষিণে আকাশ-জুড়ে তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ। জনহীন নিস্তব্ধ পথ। পথে ছড়ানো রয়েছে রাশি রাশি শিলাখণ্ড। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, মাঝারি, শুধু পাথর। এই পাথরের মধ্যে পথ চলা এক কঠিন পরীক্ষা। কে জানে, এই পাথরই হয়ত হিমালয়ের মনের অতলান্ত প্রেম? তা না হ'লে মানুষ কেন ছুটে আসে এই পাথরে পাথরে ঘূর্ণী খেয়ে চোখের জলে তার অভিষেক করা দুরূহ পথে?

রাহালা থেকে তিন মাইল দূরে মারি। আমাদের বিশ্রাম-কেন্দ্র স্থাপন হবে সেখানে। সামান্য একটু সমতল ক্ষেত্র। সেই স্থানটুকু তাঁবু টাঙিয়ে ঘিরে নিয়ে পাহাড়ীরা একটি সাময়িক চায়ের দোকান করেছে রোটাং পাস যাত্রীদের জন্য। অকূল সমুদ্রের মধ্যে শান্ত দ্বীপের মত এই তাঁবুটি শ্রান্ত যাত্রীদের আশ্রয় দিল সস্নেহে। আমরা অনেকটা পিছনে ছিলুম। সোজা চড়াইপথে ওঠার জন্য একটু হেঁটে, একটু বিশ্রাম করে পথ চলাই এই পিছিয়ে পড়ার কারণ। ক্লান্তস্বরে ছন্দা বার বার বলছে—"আমাকে কোনও রকম অজ্ঞান করে দাও। আমি আর পারছি না।" সদা হাসিমুখ রমাপ্রসাদবাবু পাথরে বসে পড়ে তখনি তাকে Brandy খাইয়ে সুস্থ করে আবার চলায় যোগ দিচ্ছেন। পর্বত অভিযানের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী এঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন। এঁরা সঙ্গে না থাকলে হিমালয়ের এই রহস্যজাল ভেদ করে দুর্গম রোটাং গিরিসঙ্কটে আরোহণ করা আমাদের পক্ষে কোনও ক্রমেই সম্ভব হোত না। ওঁদের এই স্নেহ-মধুর সহযোগিতা দেখে আমার বার বার শুধু মনে হচ্ছিল কবির কথা—

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে
আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই,
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই,
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।"

এমন সময় দূর থেকে চোখের সামনে ভেসে উঠল পাপড়ীর হাসিমুখ। প্রণববাবুর রঙীন চশমা চোখে দিয়ে সে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অপেক্ষায় আর সকলের সংগে। আমরা পৌঁছোতেই ওরা সকলে আবার এগিয়ে গেল দ্বিগুণ উৎসাহে।

সেই প্রচণ্ড হিমঝঞ্ঝা তখনও বইছে প্রবলবেগে। দারুণ আক্রোশে তাঁবুর কাপড় নিয়ে টানাটানি করছে। মনে হচ্ছে শূন্যে যেন কারা যুদ্ধ করছে। দোকানের মালিক বললে, বেলা প্রায় ১টার সময় ঝড়ের বেগ কমে গিয়ে প্রকৃতি শান্ত হবে। সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে কাঠের ঝরঝরে তক্তার উপর বসে মনে হোল যেন দিল্লীর রাজতক্তে বসেছি। গরম চায়ের গেলাসটা আমাদের পুনর্জন্ম দান করল। এই পাহাড়ী দোকানদারদের অসংখ্য ধন্যবাদ। জন্ম-জন্মান্তর তারা অবশ্যই পুণ্যলাভে ধন্য হবে। চা পাঁউরুটী খেয়ে ছন্দার উৎসাহ আবার প্রবলতর হয়ে উঠল। হাঁটুর ব্যথা ভুলে দোকান থেকে একটা পাহাড়ী লাঠি নিয়ে সে-ও হাসিমুখে আমাদের আগে চলে গেল। হিমালয়ের কি অদ্ভুত টান। ওদের অগ্রগতি দেখে আমার ভারী আনন্দ হোল।

এই দুরূহ পথশ্রমের মধ্যেও মনের আনন্দটুকু কিন্তু সকলেরই অক্ষুণ্ণ ছিল। হিমাংশু বাবুর ক্যামেরায় সেই আনন্দময় মুহূর্তের চলিষ্ণু ছন্দগুলি এক বিশেষ বর্ণাঢ্য ভঙ্গিমার মধ্যে চিরতরে বন্দী হয়ে রইল। প্রণববাবুর ক্যামেরাও যেন কথা কইছে এই দুর্গম হিমরাজের চিন্ময় পাষাণ সৌন্দর্যে। হিমালয়ের নিবিড় বক্ষ-রন্ধ্র দিয়ে আমরা পথ চলেছি। ডান ধারে উত্তুঙ্গ তুষারশৃঙ্গগুলি আকাশের নীলে গভীর দরদ ঢেলে আমাদের পথ নির্দেশ করছে ইঙ্গিতে। সেই নির্জন পথে মাঝে মাঝে যাতায়াত করছে দল বেঁধে মালবাহী খচ্চরের সারি। প্রকাণ্ড

লেখিকার সঙ্গে অন্যান্য যাত্রী

সারি। সর্পিল গতিভঙ্গির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে টং টং করে বাজছে তাদের গলার ঘণ্টা। সেই ঘণ্টাধ্বনি পাষাণে প্রতিহত হয়ে পথিকের কানে এসে বাজছে ঠিক জলতরঙ্গের মত। সচকিত পথিক তাদের পথ দিয়ে সরে দাঁড়ায়। কুলু-কাংড়া উপত্যকা থেকে কেরোসিন তেল, কাপড় প্রভৃতি নিয়ে তারা যায় লাহুল ও স্পিটিতে। আবার ওদিক থেকে ভেড়ার লোম ঔষধি কাঠ প্রভৃতি নিয়ে নেমে আসে। চলতে চলতে অবোধ জীবগুলি বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে তাদের পার্বত্য প্রভুরাও। ভাতুড়ীর প্রশ্নের উত্তরে ডানদিকে তুষারাবৃত গীফাং গিরি চূড়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে, "ওই রোতাং, কাফি দূর হ্যায়"—

মারীর পর থেকে সেই সাংঘাতিক তুহিনঝঞ্ঝার বেগ ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে এলেও সঙ্গে সঙ্গে পথের সঙ্কুলতা দ্বিগুণ ভাবে বৃদ্ধি পেল। এবার শুধু খাড়া চড়াইয়ের পথ। ছোট ছোট বাঁক ঘুরে কেবল উপরে ওঠা। প্রতি মুহূর্তে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। হাঁটু ভেঙ্গে যায়। চোখের সামনে সব অস্পষ্ট সাদা হয়ে যায়। দস্তানা-শূন্য হাত ফুলে শক্ত হয়ে গেল। সমস্ত রক্ত এসে নখের ডগায় জমে লাল হয়ে উঠল। নাক থেকে বার বার করে জল ঝরছে।

জিভে লাগছে নোনা স্বাদ। মনে হোল রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। ভয়ে ভয়ে হাত দিয়ে দেখি না রক্ত নয় জল। রমাপ্রসাদবাবুর নাক কেটে রক্ত বেরুতে লাগল। ঝড়ের প্রহারে তাঁর মাথার হ্যাট উড়ে পড়ে গেল আধফুট নীচের এক গহ্বরে। বেচারীর ছুটে নিয়ে আসতে প্রাণান্ত। পাকদণ্ডীর দুরূহতাকে তুচ্ছ করে আমাদের সঙ্গীরা এগিয়ে গেছেন অনেক আগে। পাকদণ্ডী পথের দূরত্ব হ্রাস করে ঠিক, কিন্তু সে পথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এক জায়গায় দেখলাম সেই বিপদসঙ্কুল পাকদণ্ডীর পথে শিবপ্রসাদবাবু পাপড়ীকে হাত ধরে টেনে তুলছেন। এ দৃশ্য দেখে নিজেদের কষ্টকে তখন অনেক তুচ্ছ বলে মনে হোল।

এর মধ্যে ভেড়ার দলের যাত্রা আমাদের গতিছন্দে কিছুক্ষণের জন্য ছেদ টেনে দেয়। অসংখ্য ভেড়ার পাল কাতারে কাতারে উপর থেকে নেমে আসছে তাদের রক্ষকদের প্রহরায়। নরম পালকের মত কোমল লোমবিশিষ্ট পশুগুলি সত্যি দেখতে ভারী সুন্দর। ওদের পরিচিত পথে অপরিচিতদের দেখে ভয়ে ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিকে নেবে ওদিকে উঠে যেতে লাগল। কি ভীরু। গায়ে হাত দিলে কিছু বলে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওদের গায়ের সুন্দর লোমগুলো দিয়েই তৈরী হয় আমাদের আরামের শীতবস্ত্র। এবং ওদের এই নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়াও হচ্ছে সেই কারণে পণ্যশালায়। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। জীবনের কত বিচিত্র গতি, কত বিচিত্রায়িত তার রূপ। কি রহস্যময়তায় আবৃত এই রূপাতীতের লীলা। তাঁর দুটী চোখে জীবন আর মৃত্যু পাশাপাশি কি মোহ বিস্তার করে রেখেছে সৃষ্টির প্রতিটি অধ্যায়ে। আনন্দের অশ্রু অস্তিত্বকে তার স্থিতিশীলতার কি মনোময় মনোগ্রাহিতা। বৈরাগ্যের বন্ধনহীন বিলুপ্তি।

পথের একটি বাঁক ঘুরতেই চোখের সামনে খুলে গেল হিমালয়ের চিররহস্যাবৃত রত্নমহলের একটি গুপ্ত দ্বার। সে শুধু বরফের রাজ্য। আকাশের বরফ পথের পাশে তার আসন পেতেছে কণ্টক শিলায়। তারও পরে সুরু হোল গ্লেসিয়ার। পথের বাঁ দিকে গিরিগাত্রে তুষার রাজ্যের সেই অপরূপ ঐশ্বর্য আমাদের পাশে অজানী হয়ে নেমে এল মধুর মমতায়। কত যে যুগ যুগান্তর সঞ্চিত তুষার পুঞ্জীভূত হয়ে এখানে গ্লেসিয়ারে পরিণত হয়েছে তা কে জানে? যদি কোনও দিন তরল হয়ে গলতে সুরু করে এই তুষার তখনকার অবস্থা কল্পনা করতেও ভয় করে। মন্ত্রমুগ্ধের মত আমরা দাঁড়িয়ে আছি তরঙ্গায়িত সেই গ্লেসিয়ারের রজত শিলার সামনে। গিরিগাত্র থেকে নেমে এসেছে শঙ্খ শুভ্র শিলা কঠিন জটা। তারও নীচে স্তূপাকারে জমাট বেঁধে রয়েছে তুষারপুঞ্জ। ঠিক যেন নৈবেদ্য সাজানো রয়েছে থরে থরে। তুষারাত্মার মধ্যে ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে রয়েছেন নগাধিরাজ হিমালয় অনন্তের নৈর্ব্যক্তিক সত্তায়। কি অদ্ভুত সুন্দর সেই বিলম্বিত জটাজুট বিন্যাসের হিমঘন বিভাস? অনন্তের পদপ্রান্তে সুন্দরের আত্মনিবেদনের কি মনোময় প্রত্যয়ানুভূতি। সুস্বচ্ছ প্রকাশ?

গ্লেসিয়ারের নিম্নভাগে রয়েছে একটি কুণ্ড। স্ফটিক জলধারায় পূর্ণ। তার মধ্যে মুক্তার মত ঝলমল করছে সুন্দর সুন্দর পাথর কুঁচি। নিঃশব্দ নির্জন সেই বরফের রাজ্য গভীর স্তব্ধতায় থম থম করছে। কথা বলতে গলায় স্বর আটকে যায়। একটা অব্যক্ত পুলক শিহরণে শরীর মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

অবাক বিস্ময়ে মন প্রশ্ন করে, "এ আমরা কোথায় এসেছি"? মহাশূন্যের এই নিঃসীম হৈমকঠিন শুভ্রতায় এ কার বিভূতি বিভাসের বিচ্ছুরণ বাঙ্ময় হয়ে ফিরছে তুষারে তুষারে? সেই প্রশ্নাতীত প্রশ্নের পায়ে প্রাণের প্রণাম রেখে ধীরে ধীরে আমরা আবার অগ্রসর হই। গগনচুম্বি তুষারাবৃত গীফাং গিরিশৃংগ ক্রমশ আমাদের নিকটবর্তী হয়ে আসতে লাগল। অর্থাৎ রোটাং পাস আর বেশী দূরে নেই। যে হিমশৃঙ্গগুলি এতক্ষণ পথের দক্ষিণ পাশে ছিল এখন সেগুলি একেবারে আমাদের সম্মুখভাগে প্রায় সমক্ষেত্রে এসে গেছে। বাঁ দিকে পথের পাশে স্তূপাকৃতি হয়ে জমে রয়েছে বরফ। তার উপর শৈবালের স্নিগ্ধ প্রলেপ। আনন্দে মন উল্লসিত হয়ে উঠল। রোটাং পাস তাহলে আর দূরে নয়। এই দুর্গম কষ্টসঙ্কটে হিমগিরি অভিযানের এবার তাহলে অবসান ঘটবে?

হঠাৎ আকাশ পথে শন শন শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি একটি প্রকাণ্ড ঈগল পাখী নেমে এসে বরফের উপর ডানা ছড়িয়ে বসল। সাদা রং-এর মস্ত বড় পাখী তার মাথা, ঠোঁট আর ডানার প্রান্তভাগটুকু কৃষ্ণাভ। এই বরফের মধ্যে তার যে কি আহার্যবস্তু আছে সেই জানে। এখানে আর এক জাতের পাখী দেখলুম ঠিক কোকিলের মত মসৃণ, কৃষ্ণাভ তার রূপ ও গঠন। শুধু লম্বা ঠোঁট, গোল চক্ষু ও পা দুটি ডালিমের মত টুকটুকে লাল। ভারী সুন্দর দেখতে। নির্ভয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে হিমশিলার কন্দরে কন্দরে। নীচে দেখেছি ভূর্জবৃক্ষের বন্য বিন্যাস। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে নাকি রোটাং গিরিবক্ষ পুষ্পোৎসবের আনন্দে পূর্ণ থাকে।

আমরা চলেছি বাঁশের লাঠি সম্বল করে অনভ্যস্ত পায়ে কঠিন বন্ধুর চড়াইয়ের পথে। একটু হেঁটেই অবসন্নের মত বসে পড়ি পার্শ্বপার্শ্বস্থ শিলাখণ্ডের উপর। তখনি ক্লান্ত চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন হিমঘন গিরিরাজ। আকাশ ভরা তাঁর দুটী অগাধ নীল চোখে কি অপরিসীম স্নেহ, কি গভীর আশ্বাস? সুদূর প্রসারী প্রসন্ন হিমবাহু বিস্তার করে তিনি যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছেন আমাদের নিকট হতে

নিকটতরে। প্রাণে প্রাণে স্পষ্ট উপলব্ধি করি তাঁকে। অসীম উৎসাহে আবার সুরু হয় চলা।

আমাদের সঙ্গীরা এগিয়ে গেছেন অনেকদূর। ছন্দা পাপড়ীও গেছে সেই সংগে। এঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতার কথা আমাদের চিরদিন মনে থাকবে। কত মানুষের সংগে আমাদের আলাপ হয় প্রত্যহ কত কাজে ও অকাজে। কিন্তু সে পরিচয়ের মধ্যে যে এমন মণি মাণিক্য ছড়ানো থাকে তার এমন অকপট প্রকাশ এই জনহীন বন্ধুর তুষার রাজ্যের অভ্যন্তরে এসে সম ব্যথায় ব্যথী না হলে বোধ হয় অজ্ঞাতই থেকে যায় সমস্ত মানুষের কাছে। তাই মনে হয় এ বোধ হয় হিমালয়ের দান। শ্রেষ্ঠ দান। বিশেষ করে রোটাং পাস থেকে উত্তরণের কালে, মাঢ়ীর পরে আমাদের শ্লথ গতির জন্য যখন কৃষ্ণা রাত্রির অন্ধকার নেমে এল, গীফাং গিরিচূড়ায়; আর সমস্ত দিগন্ত ছেয়ে। চতুর্দিকে কৃষ্ণকায় পর্বতপ্রাচীর ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কানে শুধু শোনা যায় নির্ঝরিণী বিপাশার উচ্ছল কলস্রোত। অন্ধকারে তার গতিপথ তিমিরাবৃত পথের বাঁক ঘোরার সময় দিগ্‌ভ্রম হলে আর রক্ষা নেই। সংগে সংগে লোকচক্ষুর অন্তরালে জীবনান্ত। সেই ত্রাস সঙ্কট অন্ধকারের মধ্যে প্রণববাবু আর শিবপ্রসাদবাবু নিজেদের সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য করে আমাদের পথ চলায় যে সাহায্য করেছেন কি অদ্ভুত আন্তরিক সহনশীলতায়—এমনটি আর কোথাও দেখিনি। এর মধ্যে নানা রকম গল্প করে সকলের শ্রান্ত মনকে সজীব রেখেছিলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। গায়ক সুমিতবাবুর সুমিষ্ট কণ্ঠের গান সব কটি মনকে বেঁধে রেখেছিল একটি মধুর একতার সূত্রে।

তারপর রাহলায় পৌঁছে জীপের চালক যখন নিজের অসুস্থতার নজীরে সরোষে ঘোষণা করল, এত অধিক রাত্রিকালে এই দুর্গম পার্বত্য পথে সে এত যাত্রী নিয়ে কোনও মতেই মানালিতে ফিরে যেতে পারবে না। তারও উপর সেই অন্ধকার পথে ট্রাফিক পুলিশ যখন জীপ থামিয়ে টর্চ জেলে, আমাদের গুপ্তচর সন্দেহে গাড়ীর মধ্যে শ্যেনদৃষ্টিতে অনুসন্ধান করছিল; সেই সব দারুণ বিপদ কুহেলীর মধ্যে এঁরা পাশে না থাকলে ভয়ে আতঙ্কে আমরা বোধ হয় সেখানেই বরফ হয়ে জমে থাকতুম। তাই মনে হয় পথের দুর্লভ পাওয়ার কোনও মূল্যমান নেই। এ পাথেয় পরমাত্মীয়ের পূর্ণতম দান।

এবার সুরু হোল প্রস্তরাকীর্ণ জলসঙ্কুল পথ। এ পথ চলা আরও কষ্টসাধ্য। পথের উপর দিয়ে নেমে আসছে উচ্ছল ধারা জলপ্রপাত। সেই প্রস্তরময় জলস্রোতের মধ্যে দিয়ে আমরা অতি সন্তর্পণে পথ চলেছি। হীরক খণ্ডের মত ঝকমক করছে তুহিন জলকণা। এই রকম বিপদসঙ্কুল জলপ্রপাত পর পর দুটি অতিক্রম করে আবার পথের পাশে দেখা গেল গ্লেসিয়ার। পর্বতের ধূমে অংগে কে যেন এঁকে দিয়েছে শ্বেত চন্দনের স্নিগ্ধ প্রলেপ। এইখানে উন্মুক্ত হোল রোটাং গিরিসঙ্কটের পূর্বদ্বার। পথের আশে পাশে জমে রয়েছে বরফের শিলাস্তূপ। তারপর আবার সুরু হোল সেই দারুণ জলপথ। এইখানে এসেই যাত্রীদের সমস্ত শ্রম, সমস্ত শক্তি, সমস্ত আনন্দ, উৎসাহ যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। অবসন্ন দেহ মন, একটু জল ও একটু বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে বিশ্রামের স্থান কোথায়? একটু অসতর্ক পদচারণার ফলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই হিমরাজ্যে বাতাসও অনুপস্থিত। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকিয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। অংগে শীত বস্ত্রগুলি মনে হচ্ছে শত্রুর আক্রমণ। চোখ দিয়ে নেমে আসে অঝোর ধারায় জল। এ উৎস কি আনন্দের না কষ্টের, সে বোধ শক্তিটুকুও হিমালয়ের শ্রীপাদপদ্মে অর্ঘ্যস্বরূপ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথচ মাত্র তার সামান্য দূরেই আমাদের বহু স্বপ্নের মায়াময় রোটাং পাস তুষার ক্ষেত্র। সুদূর বিস্তৃত পড়ে রয়েছে তার হিম শয়ণী আমাদের মনোবাসনা সফলায়নের সার্থক প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এই দুস্তর জলপথ পার হলেই উন্মুক্ত হোল তার সিংহতোরণ। সম্মুখেই দেখা যাচ্ছে রোটাং-এর গম্বুজাকৃতি কাঞ্চননিভ গীফাং হিমশৃংগ। এত কষ্টের মধ্যেও মন আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে। ওই ত সামনেই ইন্দ্রপুরী, মাঝখানের পথটুকু পেরুলেই হয়।

শুধু বরফ আর বরফ। বৈরাগ্যের বিমুক্ত বল্কলান্তরালে বিশ্ব বসুধা নিঃসীম স্তব্ধতায় শান্ত সমাহিত। এই রোটাং গিরিসঙ্কট। এই তুষার ক্ষেত্রের প্রায় মাইলখানেকের মধ্যে রয়েছে বিপাশার জন্মস্থান। একটা হিমকুণ্ড থেকে উৎসারিত হয়েছে পঞ্চনদীর অন্যতমা বিপাশা। এই উৎসমুখের নাম "বিয়াসকুণ্ড" সমস্ত কুলু ও কাংড়া উপত্যকায় বিপাশার মর্ত্যে অবতারণার অশ্রু আহুতি, পর্বতের শিলায় শিলায় কত না নৃত্যময় ছন্দ সৃষ্টি করে চলেছে। বিয়াসকুণ্ডের আরও একটু দূরে আছে চন্দ্রভাগার জন্মস্থান আর একটি হিমকুণ্ড। তার নাম চেণাব কুণ্ড। তার অনতিদূরে বিশিষ্ট জনপদ লাহুল আর স্পিটী লাহুলের সীমানার ওপারেই তিব্বত। সীমান্ত রক্ষার জন্য লাহুলে পাঞ্জাব সরকারের শাসন বিভাগ অতি তৎপরতার সংগে সমাজ কল্যাণ মূলক কাজ করছেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ বেশ প্রশংসাজনক। লাহুল শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রদের আমরা দেখেছি কুলুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কাইরণের সমীপে কুলু মেলা প্রাঙ্গণে। তাদের দেখে কে বলবে যে এরা বন্য পাহাড়ী? রাস্তা ও সড়ক নির্মাণের কাজে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছে তিব্বতী বাস্তুহারার দল। মাত্র কিছুদিন আগে স্পিটীতে সড়ক নির্মাণ কালে প্রায় দুইশত বাস্তুহারা তিব্বতীর প্রচণ্ড হিমবাহ দুর্ঘটনায় জীবনান্ত ঘটেছে। কুলু ও কাংড়া উপত্যকায় নদীবক্ষে সেতু নির্মাণ, ও পথ-সংস্কারের কাজে তিব্বতীদের দেখেছি কঠিন পরিশ্রম করতে। এদের দারিদ্র্য-মলিন করুণ মুখগুলি দেখে আমার বার বার মনে পড়েছে, আমাদের বাংলার বাস্তুহারাদের অনুরূপ চিত্রগুলির কথা। মাটী ও মানুষ বিভিন্ন রীতি ও প্রকৃতি সত্বেও মনগুলি সব একই সুরে বাঁধা। তাই তার মিল ছড়িয়ে রয়েছে, প্রকৃতির প্রাণ মনুষ্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে। কেউ দেখে, কেউ দেখে না।

রোটাং গিরিবর্ত্মে এই প্রাণৈশ্বর্যময়ী প্রকৃতি অনবগুণ্ঠনরূপে চির রহস্যাবৃতা। এ এক অদ্ভুত সৌন্দর্যময় নিসর্গপুরী। সামনে, পিছনে, পাশে, নীচে শুধু শঙ্খ-শুভ্র তুষারের তরঙ্গায়িত বিস্তারণ। গ্লেসিয়ারের কোহিনূর কেয়ূর। মাথার উপর ইন্দ্রনীল আকাশ নীলকান্ত মণির মত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান। মনে হয় শরতের অপরাজিতা বনের সমস্ত নীল মাধুরী নিংড়ে এনে কে বুঝি রাঙ্গিয়ে দিয়েছে রোটাং-এর এই নিঃসীম নভোপট। সেই নীলের নীচে এই অনন্ত বিস্তারী তুষার স্বপ্ন যেন আকাশ ও মাটীর মর্মকথনী সযত্নে ধারণ করে রেখেছে মহাশূন্যের স্নেহাঙ্কে। এর কোনও সার্থক প্রকাশ নেই।

...নন্দের মহার্ঘ ঐশ্বর্য। গভীর প্রেমের সকরুণ আর্তি। ব্যাকুল ...ভ্রান্ত মন। আনন্দে দিশাহারা। তুষারে তুষারে তড়িতাহত হয়ে ...রে তার আকুল উদ্‌ভ্রান্তি। মহাশূন্যের অতলান্ত অন্তরীক্ষে ...বলবেগে আবর্তিত হয় সেই সূর্যসঙ্কাশ প্রশ্ন গভীর স্তব্ধতায়; এই ...ষারক্ষেত্র, কোন বিরহীর অনন্তকালের সঞ্চিত অশ্রুরাশির ব্যথা ...রূপ সমাধি? আকাশের চোখের নীল সীমান্তে পুঞ্জিত তুষারস্তূপে ...োট বেঁধে রয়েছে কি জানি এ কার সংগোপন বেদনার ...স্মৃতাঞ্জ?

গৌড়ের পথে

অপরাজিতা ঘোষ

শুধু লোক আর লোক। যেন সাতরাজ্যের লোক এসে জড়ো হয়েছে রাজমহলের এই কর্মব্যস্ততাময় পারঘাটটায়। সকলেরই চোখ ঐ অপেক্ষমান লঞ্চের ওপর—ভিড় ঠেলে লঞ্চে উঠবার ...কত চেষ্টাই না করছে সব।

কিন্তু উঠবে কি করে। লঞ্চও যে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে ...েছে মানুষে। কোথাও স্থান নেই, না একতলায় না দোতলায়।

দোতলার ফাষ্ট ক্লাশে বসে চিত্রভানু এই দৃশ্য দেখছিল আনমনা ...বে।

একটু যেন চমকিয়ে উঠল একটি নারীকণ্ঠে, দয়া করে আমাদের ...কটু বসবার জায়গা করে দিতে পারেন?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখে তারই ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে আর ...র পাশে একটি যুবক। ভিড় ঠেলে দোতলায় উঠে এসে ওরা দুজন ...তিমত হাঁপাচ্ছে। মিনতিভরা চোখে আবার মেয়েটি বলল, ...মাদের দুজনের শুধু একটু বসবার জায়গা করে দিন দয়া ...রে—

জায়গা? জায়গা কোথায়? এ...র মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে। ...ু ভদ্রতা রাখতে গিয়ে মনে মনে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়ে নিজে সরে ...লের দুজনকে একটু সরিয়ে ওদের বসবার জায়গা করে দিল চিত্রভানু।

খুব খুশী ওরা দুজন একটু বসবার জায়গা পেয়ে—আশা ত ...কেবারে ছেড়েই দিয়েছিল।

রক্তরাঙা বসনপরিবৃতা ছিপছিপে লম্বা অনিন্দ্যসুন্দর মেয়েটি ...স্থিত সকলকে বেশ একটু সচকিত করে তুলল। কতই বা আর ...স হবে জীবনের বসন্তে সবে পা দিয়েছে। যুবকটিও বেশ দেখতে, ...সে মেয়েটির থেকে কিছু বড়ই হবে।

চিত্রভানুর সঙ্গে আলাপ জমে উঠতে বেশী সময় লাগল না। ...েয়েটিই এ বিষয়ে অগ্রণী। তিনজনের প্রাণখোলা হাসি আর গল্প ...খে পাশের যাত্রীরা অবাক হয়ে ভাবে এদের কি আগে থেকেই ...ালাপ পরিচয় ছিল।

এরা ত জানে না যে বেথুন কলেজের ফাষ্ট ইয়ার আর্টস ক্লাশের ...খ্যাত বন্দনা বসু এখানে স্বয়ং উপস্থিত। যে একদিন কলেজে না ...ল গোটা ক্লাশটাই কেমন যেন গোমড়ামুখো হয়ে যায়, লজিকের ...ফেসর এল. ডি. যার নাম রেখেছেন 'গল্পবাগীশ' ক্লাশের মেয়েরা ...কে বলে 'প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা বন্দনা' যে ভারতীর মত হাসতে না জানা ...েরকেও হাসিয়ে পেটে খিল ধরিয়ে দেয়—সেই বন্দনা যে আজ এখানে উপস্থিত। গল্প, হাসি যে তার সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে চলে।

ইতিহাসের গবেষক চিত্রভানু হাসতে হাসতে এক সময়ে বলে ওঠে দয়া করে আপনি এবার একটু চুপ করুন। আর যে পারি না। এখনই যদি সব হাসি হেসে নেই, সব গল্প শেষ হয়ে যায়, তাহলে গৌড়ে গিয়ে কি করব? গৌড়ের গাম্ভীর্যময় পরিবেশে গিয়ে কি গম্ভীরই হয়ে যেতে হবে?

—মোটেই না। কলকলিয়ে ওঠে বন্দনা,—আমি আছি কি করতে? কত হাসি চান, কত গল্প চান ওখানে গিয়ে দেখা যাবে। আমার ষ্টক কোনদিনও ফুরবে না।

গৌড়ের পথেরযাত্রী এরা তিনজন—বন্দনা আর তার দাদা সুরেশ, আর চিত্রভানু।

প্রথম পক্ষ চলেছে ডিসেম্বর মাসের শীতের আমেজ লাগান দিনটাকে রাঙিয়ে তুলতে আর দ্বিতীয়পক্ষ অর্থাৎ চিত্রভানু চলেছে তার গবেষণার কিছু সাহায্য লাভের আশায়।

চিত্রভানু কিন্তু তার গবেষণার কথা গোপন করে বলল, একই পথের পথিক আমরা। উদ্দেশ্য আমাদের একই। বন্দনা এবং সুরেশ দুজনেই বারবার নামটা জানতে চাইলেও নামটা কিছুতেই বলল না চিত্রভানু। একটু হাসল শুধু।

আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছিয়ে গেল লঞ্চ মাণিকচক ঘাটে অর্থাৎ মালদহ জেলায়।

নদীর পাড় ভেঙ্গে ওপরে উঠতে উঠতে চিত্রভানু বলল, কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পাদস্পর্শে পবিত্র বড় গোস্বামী দুইজন চৈতন্যপার্ষদ শ্রীরূপ সনাতনের কর্মক্ষেত্র, বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠিত কীর্তিখ্যাত গৌড়ের স্মৃতিজড়িত উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম সহর এই মালদহ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ঐতিহ্যময় এক ঐতিহাসিক তীর্থ সন্দর্শনে আমরা চলেছি।

বন্দনা একটু যেন অবাক হয়েই তাকাল চিত্রভানুর মুখের দিকে সুরেশও।

—বাঃ, আপনি ত বেশ সুন্দর বলতে পারেন। খুব বুঝি পড়াশুনা করে এসেছেন? আমি দাদা কিন্তু একেবারেই কিছু জানি না। ডাগর ডাগর চোখ দুটো চিত্রভানুর মুখের ওপর মেলে ধরে আবার বলে বন্দনা, বলুন না আর যা জানেন মালদহ সম্বন্ধে, গৌড় সম্বন্ধে।

এবার যেন একটু লজ্জাই পেল চিত্রভানু। একটু হেসে বলল, দূর, আমি আর কি জানি। বইটই পড়ে একটু-আধটু আর কি।

—যতটুকু জানেন তাই বলুন। শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব বন্দনা।

এখান থেকে পঁচিশ মাইল দূরে মালদহ সহরে যাবার বাসে উঠে বলতে শুরু করল চিত্রভানু, ঐতিহাসিকদের মতে বহু প্রাচীন যুগে বঙ্গদেশে আর্য সভ্যতার প্রসার ঘটে এই মালদহের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে।

মালদহ খ্যাত তার গৌড়ের জন্যই বিশেষ করে। ঐতিহাসিক আলেকজাণ্ডার কানিংহাম বলেন যে, বল্লাল সেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌড় নগরের প্রতিষ্ঠাতা। বল্লাল সেন এবং তাঁর পরবর্তী রাজারা নিজেদের 'লক্ষ্মণ গৌড়েশ্বর' বলে অভিহিত করতেন। এই গৌড় নগরী আবার হিন্দুশাসন আমলের শেষ ভাগে 'গৌড় লক্ষ্মণাবতী' নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক মিনহাজের বিবরণীতে জানতে পারা যায়

যে, ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী 'লক্ষ্মণাবতী'তে রাজধানী স্থাপন করেন।

আজ কিন্তু বল্লাল সেনের সেই স্বপ্নের গৌড় আর নেই—আজ গৌড় কণ্টকগুল্মের অন্তরালে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়ে অবক্ষয়ের পথে। তা হোক, অতীতের স্বাক্ষর হিসাবে এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে, দেখলে নাকি বিস্মিত হতে হয়।

শুনতে শুনতে বন্দনা তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। সুরেশ দুটো সীট আগে বসেছিল বলে এদিকে তার কান যায়নি।

হঠাৎ বাসটা বিকট এক আওয়াজ করে থেমে গেল। কণ্ডাক্টর চীৎকার করে জানিয়ে দিল, মালদহ সহরে আমরা এসে গেছি।

ঠায় এক ঘণ্টার ওপর বসে তিনজনেরই মাজা পিঠ টন্‌টন্‌ করতে শুরু করেছে। দাঁড়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। বন্দনা একটু অসহিষ্ণু হয়েই জিজ্ঞেস করে দাদাকে, আর কত দূর দাদা?

একগাল হেসে সুরেশ বোনকে বলে, কি রে, এর মধ্যেই যে নেতিয়ে পড়লি! এখনও বারো মাইল টাঙ্গায় যেতে হবে।

টাঙ্গার কথা শুনে বন্দনার মুখে হাসি দেখা দিল অর্থাৎ ভাবটা এই যে বেশ মজা করে টাঙ্গায় চেপে যাওয়া যাবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে হোটেলে গিয়ে খেয়ে, টিফিন-কেরিয়ার ভর্ত্তি খাবার, ফ্লাস্ক ভর্তি গরম চা নিয়ে তিনজনে ফিরে এল।

তারপর টাঙ্গাযাত্রা।

টাঙ্গায় চেপে বন্দনার সে কি আনন্দ! টাঙ্গাওয়ালার হাত থেকে লাগামটা কেড়ে নিয়ে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

একটু ভীত হয়ে টাঙ্গাওয়ালা ওর হাত থেকে লাগামটা কেড়ে নিতে গেল। পারবেন না দিদিমণি, আমাকে দিন।

বন্দনা কি দেবার মেয়ে! ঝাঁঝিয়ে উঠল টাঙ্গাওয়ালাকে,—তুমি থাম ত' বাপু! কে বলেছে পারব না? জানো, আমি আসল আর্‌বি ঘোড়া ছুটিয়েছি—

—আর্‌বি ঘোড়া ছুটিয়েছেন? বেশ একটু অবাক হয়েই বলল চিত্রভানু।

খিল খিল করে হেসে উঠল বন্দনা। বলল, বাবা যখন ভাগলপুরের জজ ছিলেন, তখন আমি দুবেলা সমানে ঘোড়া ছুটাতাম। সে কি তেজীয়ান ঘোড়া—দেখলেই ভয় লাগে। সেই ঘোড়াকে আমি শায়েস্তা করেছি আর এই হাড্ডিসার অস্থচর্মাবৃত জীবটি আমার অবাধ্য হবে?

কিছুতেই দিল না লাগামটা টাঙ্গাওয়ালার হাতে। চাবুক মেরে আরও জোরে ছোটাতে লাগল ঘোড়া।

টাঙ্গাওয়ালা আরও ভয় পেয়ে যায়। আমাকে দিন, বাস আসছে। এখুনি ধাক্কা লেগে যাবে।

বন্দনার অবাধ্যতা দেখে সুরেশ ধমকিয়ে উঠল, কি হচ্ছে বন্দনা? লাগামটা দিয়ে দে না ওর হাতে? শেষে একটা এ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে গেলে—

বন্দনা পেছন ফিরে দাদার দিকে একবার তাকিয়ে লাগামটা টাঙ্গাওয়ালার হাতে দিয়ে উঠে এসে বসল চিত্রভানুর পাশে। বেশ একটু গম্ভীর। দাদা তার এই আনন্দটুকু নষ্ট করে দিল বলেই বুঝি।

মাইলের পর মাইল এগিয়ে চলেছে টাঙ্গা। যতই এগিয়ে চলেছে, বন্দনা ততই যেন অধীর হয়ে উঠছে।

—এই ত এসে গেছি। বাঁ হাতে পড়বে পিয়াসবাড়ি!

—পিয়াসবাড়ি? সেটা আবার কি? কথাটা বন্দনার কাছে খুব আশ্চর্য লাগছে।

সুরেশ এবং চিত্রভানুও তাকিয়ে রয়েছে টাঙ্গাওয়ালার মুখের দিকে পিয়াসবাড়ির ইতিবৃত্ত শুনবার জন্ত।

একটু হেসে টাঙ্গাওয়ালা বলল, কেন যে জায়গাটার নাম পিয়াসবাড়ি, ঠিক বলতে পারব না বাবু। ওখানে একটা বড় দীঘি আছে। লোকে বলে, ঐ দীঘির জল খেয়ে নাকি কোন বাদশাহ পিপাসা মিটিয়েছিলেন—তাই জায়গাটার নাম হয়েছে পিয়াসবাড়ি। ঐ দীঘির সামনে সম্প্রতি একটা ডাকবাংলো তৈরী হয়েছে। তারপরেই ত চলল 'সেরিকালচারের' বিঘার পর বিঘা জমি নিয়ে বিরাট ফার্ম। এখানে তুঁতগাছের চাষ হয়, রেশম কীট পালন করা হয়। বহু লোক খাটছে এর পিছনে। এই ফার্ম ছাড়িয়ে মাইল দেড়েক গেলেই গৌড়।

টাঙ্গা 'ডাকবাংলোর' সামনে দিয়ে চলছে। আর একটু এগিয়ে সেরিকালচারের ফার্মের গেট চোখে পড়ল।

আর মাত্র দেড় মাইল পরেই গৌড়! বন্দনা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

টাঙ্গার গতি একটু কমিয়ে টাঙ্গাওয়ালা বলল, একেবারে শেষ থেকে দেখতে দেখতে এগিয়ে আসা যাবে, কি বলেন?

—সেই ভাল। তিনজনেই সমস্বরে বলল।

আবার পূর্ণবেগে ছুটে চলল টাঙ্গা পিচঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে। একেবারে হিন্দুস্থান পাকিস্তান বর্ডারের কাছে গিয়ে থামল।

দেখে যেন কেমন লাগে। ওপাশে পাকিস্তানের পতাকা আর এপাশে ভারতের জাতীয় পতাকা পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে—মাঝখানে ছোট ছোট পিলার দিয়ে বর্ডার লাইন। দেখে মনে হয়, এ যেন একই অন্নে পুষ্ট, একই জলহাওয়ায় গড়ে ওঠা দু'টি ভাই পৃথক হয়ে গিয়েছে। আজ আর কেউ কাউকে চেনে না। একই বাড়ির মাঝ বরাবর একটা দেওয়াল দেখলে মনটা যেমন আপনা থেকেই কেমন করে ওঠে, এই বর্ডার লাইনটাও দেখলে ঠিক তেমনি মনটা কেমন করে ওঠে।

বর্ডারের পাশেই রয়েছে সেদিনের জমজমাট গৌড় দুর্গে যাবার একটা প্রবেশ পথ—কোতয়ালী দরওয়াজা (১২৩৫—১৩১৫ খৃঃ)। ৩০ ফুট উঁচু আর ১৭ ফুট চওড়া বিশাল খিলানযুক্ত এই প্রবেশ পথটি সম্ভবত আলাউদ্দিন খিলিজির মৃত্যুকালে (১৩১৫ খৃঃ) ও গৌড়ে যে প্রাচীনতম শিলালিপি (১২৩৫ খৃঃ) পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যবর্তী কালে দিল্লীর স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল।

চিত্রভানু এবং বন্দনা দুজনেই ফটো নিল এই দরওয়াজার।

টাঙ্গা ফিরে চলল যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই। প্রায় মাইলখানেক আসবার পর লোটন মসজিদের (১৪৭৫ খৃঃ) সামনে থামল। কিংবদন্তী অনুসারে এক গম্বুজাকৃতি চতুষ্কোণ কক্ষযুক্ত এই মসজিদটি নাকি এক রাজ গণিকার দ্বারা নির্মিত হয়। সম্ভবত সুলতান ইউসুফ শাহই এই মসজিদটা তৈরী করেন। কোন সময়ে এই মসজিদের দেওয়ালটি সম্পূর্ণ রঙ্গীন ইটের দ্বারা আবৃত ছিল। আজও দু'একটা চোখে পড়ে। এর চারিদিকে দশটা গম্বুজ আছে

চিত্রভানু গোটা মসজিদটা প্রদক্ষিণ করে দেখতে লাগল এর বৈশিষ্ট্য—বন্দনাও রয়েছে পাশে-পাশে।

আলোর অভাবে ফটো নেওয়া সম্ভব হ'ল না। সেজন্ত তারা একটু মনঃক্ষুন্ন।

আবার টাঙ্গা ছুটে চলল আর একটা মসজিদের দিকে—তাঁতিপাড়া মসজিদ (১৪৮০ খৃঃ)। তাঁতিপাড়ায় অবস্থিত বলে বোধ হয় এর নাম হয়েছে তাঁতিপাড়া মসজিদ। সম্ভবত জীরসাদ খাঁ এই মসজিদটা নির্মাণ করেন। এককালে এর দশটা গম্বুজ ছিল, আজ অবশ্য সবগুলোই পড়ে গিয়েছে। কিন্তু এই মসজিদের প্রাচীরগাত্রে পঞ্চদশ শতাব্দীর খোদিত লতাপাতায় চিত্র আজও দৃষ্ট হয়।

চিত্রভানু পেন্সিল দিয়ে কাগজে কয়েকটা চিত্র এঁকে নিল। তারপর সুন্দর ভঙ্গীতে মসজিদের একটা ছবি তুলল—বন্দনাও।

বন্দনা এবার প্রস্তাব করল তিনজনে মিলে এখানে একটা গ্রুপ ফটো তোলার। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রভানু হাতজোড় করে বলে উঠল, মাফ করবেন। আমাকে আর এর মধ্যে টানবেন না।

—কেন ?

—না, ফটো আমি তুলি না।

—তুলি না বলে তুলবেন না এ কি রকমের কথা। এখন ভাল মানুষটির মত দাঁড়ান ত দেখি। খুব ভাল লাইট পাওয়া গেছে। কথাটা শেষ করেই বন্দনা টাঙ্গাওয়ালাকে ডেকে ক্যামেরার সুইচটা সে কেমন করে টিপে দেবে তাই বোঝাতে লাগল।

বোঝান শেষ করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে চিত্রভানু একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বন্দনা ডাকল। চিত্রভানু সেই আগের মতই হাতজোড় করে আপত্তি জানায়।

কাছে এসে চিত্রভানুর চোখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, কেন আপনি আপত্তি করছেন আমি ত বুঝতে পারছি না। পরিচয়টা গোপন করেছেন বলে কি চেহারাটাও গোপন করতে চান ? এসব যে কি ঢঙ বুঝি না। কপট অভিমানে ছেয়ে গেল বন্দনার সুন্দর মুখখানা।

কেমন যেন ব্যথিত কণ্ঠে বলল চিত্রভানু, আমার চেহারটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন ত। এই রকমের কুৎসিৎ চেহারা নিয়ে—না না তা হয় না। জানেন, আয়নায় নিজের রূপের দিকে তাকিয়ে নিজেকে আমার ঘেন্না লাগে। ভগবানকে বলি, তুমি ত আমায় সবই দিয়েছ শুধু চেহারাটা কেন আর পাঁচটা মানুষের মত দিলে না ?

জানেন, আমার এই রূপের জন্ত কারো কাছে বড় একটা সুব্যবহার পাইনি, এমন কি আমার অতি নিকট আত্মীয়রাও আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে ছাড়েনি। আপনারও লজ্জা লাগবে এই ফটো আর পাঁচজনকে দেখাতে গিয়ে। সুতরাং কি লাভ। ফটো আমি তুলিনি কখনও আজও পারব না। আমায় মাফ করবেন।

—রূপ ? রূপ কি মানুষের নিজের সৃষ্টি ? বন্দনা দীপ্তকণ্ঠে বলে ওঠে। গুণটাই মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিষ। রূপ নিয়ে কেন যে মানুষ ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বুঝতে পারি না। মানুষের রূপের সমালোচনা করার চেয়ে ঘৃণ্য কাজ আর নেই।

এবার মিনতিভরা চোখে বলল, আমার অনুরোধে আপনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান। না করবেন না, তাহলে বড় ব্যথা পাব।

সুরেশও ওই একই অনুরোধ করল।

ওদের অনুরোধ ঠেলতে পারল না চিত্রভানু, বিশেষ করে বন্দনার। ফটো তোলা হয়ে গেলে সে কি তৃপ্তির ছাপ বন্দনার চোখে মুখে।

লজেন্স চুষতে চুষতে আবার তিনজনে টাঙ্গায় চেপে বসল। এগিয়ে চলল টাঙ্গা চামকাটি মসজিদের দিকে। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এই ছোট মসজিদটি সম্ভবত সুলতান সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ ১৪৭৫ খৃঃ নির্মাণ করেন। এর মীনা করা ইটের কাজ দেখবার মত। এই মসজিদের সঙ্গে চর্মব্যবসায়ী মুসলমানদের সংস্রব থাকায় সম্ভবত এর নাম 'চামকাটি' হয়—অবশ্য এটা একটা জনশ্রুতি।

দুজনের ক্যামেরা ঠিক আগের মতই এই মসজিদের প্রতিচ্ছবিকে ধরে রাখল।

এবার চলুন লুকোচুরি দরওয়াজা দেখতে, বলে টাঙ্গাওয়ালা টাঙ্গা ঘুরাল।

বন্দনা একটু ভেংচি কেটে টাঙ্গাওয়ালাকে বলল, কেবল তোমাদের মসজিদ আর দরওয়াজা। হিন্দুদের কিছু নেই ? বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন এঁরা ত সব হিন্দু ছিলেন, এঁদের সেই সব কীর্তি কোথায় গেল ?

—একমাত্র গৌড়দুর্গের প্রাচীর ছাড়া হিন্দুদের আর ত কিছুই নেই দিদিমণি। হিন্দুদের পরে মুসলমানরা রাজত্ব করেছিল—এই সব তাদেরই কীর্তি। হিন্দুদের কীর্তি সব ধ্বংস হয়ে গেছে। মাটি খুঁড়ে কিছু কিছু দেবদেবীর মূর্তি অবশ্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলো মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। লোকে বলে হিন্দুদের মন্দিরগুলো নাকি ভেঙ্গে ফেলে তার ওপর মুসলমানরা তাদের মসজিদগুলো গড়েছিল।

—আচ্ছা রামকেলী, যেখানে রূপ সাগর রয়েছে সেটা কোথায় ?

—রামকেলী সব শেষে যাব দিদিমণি।

খানিকটা গিয়ে টাঙ্গা ডানদিকের রাস্তায় ঢুকে ছুটতে লাগল। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে লুকোচুরি দরওয়াজা। উঃ কি উঁচু। সামনে গিয়ে ঘাড় উঁচু করে চূড়োর দিকে তাকাতে হয়। সাহসুজা এই দ্বিতল গৃহটি গৌড়দুর্গের পূবদিকের রাজকীয় প্রবেশ পথের জন্ত ১৬৫৫ খৃঃ নির্মাণ করেন। এর দ্বিতল অংশ নহবতখানা রূপে তখন ব্যবহার করা হত।

লুকোচুরি দরওয়াজা পার হয়ে গিয়ে ডান হাতে পড়ল কদম রসুল মসজিদ (১৫৩১ খৃঃ)। চতুষ্কোণ এক গম্বুজ বিশিষ্ট এই গৃহটি সুলতান নসরত শাহের দ্বারা নির্মিত হয়। এই মসজিদে পাথরের ওপর হজরত মহম্মদের পায়ের ছাপ রক্ষিত আছে।

একজন লোক দক্ষিণার বিনিময়ে ওদেরকে দেখান সেই পায়ের ছাপ।

এখানে ফতে খাঁরও সমাধি রয়েছে। সম্রাট আউরঙ্গজেবের সেনাপতি দিলওয়ার খাঁয়ের পুত্র ফতে খাঁকে, সুলতান সুজাকে বিদ্রোহ করতে পরামর্শ দানের অপরাধে পীর সাহ নিয়ামতুল্লাকে হত্যা করার জন্ত সম্রাট পাঠিয়েছিলেন। কথিত আছে গৌড়ে পৌঁছিয়ে ফতে খাঁ রক্ত বমি করে নাকি মারা যান।

সেদিনের সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের দুর্ধর্ষ মনেশ্বীর সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটা নত হয়ে যায়। এ বোধ হয় মৃতের প্রতি জীবিত মানবের চিরন্তন শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি! সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে বন্দনা আস্তে আস্তে সংযত কণ্ঠে বলে, জীবনের সমাপ্তির রেখা কেন এমনি ভাবে নিয়তি টেনে দিয়ে যায়। ভাবলে কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় না, কত হাসি, কত গান, কত গল্প, কত কান্না, কত রাগ বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানি একটা জীবনের যা কিছু সব একদিন শেষ হয়ে যায় এমনি করে ধূলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে। কেন এত নিষ্ঠুর নিয়তি।

—না,, মোটেও ত' নয়। দর্শন, সাহিত্য এমন কি বিজ্ঞান কেউ স্বীকার করে না। চিত্রভানু বাধা দিয়ে বলে ওঠে। 'শেষ' বলে কোন কিছুই নেই সবই অশেষ। শুধু রূপ পালটায় বহুরূপীর মত।

তত্ত্বের কথা ছেড়ে দিন। তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের মত অতি সাধারণ মানুষের কতটুকুই বা আছে। আমরা মৃত্যুকেই ত' জীবনের সমাপ্তি বলে ঘোষণা করি।

—তা ঠিকই। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন ত' রাত্রি যেমন দিনের আগমনবার্তা ঘোষণা করে, ঠিক তেমনি মৃত্যুও ত' আর একটি জীবন সূচনার ইঙ্গিত জানায়। তাই নয় কি? জন্মান্তর-বাদকে কেউ ত' বড় একটা অস্বীকার করে না। আমার ত' মনে হয় যিনি যীশু, তিনিই বুদ্ধ, তিনিই চৈতন্য, তিনিই ত' গান্ধীজি শুধু রূপ পালটিয়ে যুগে যুগে এসে দেখা দিয়েছেন পৃথিবীকে পাপমুক্ত করবার জন্য।

ডাক্তারীর ছাত্র সুরেশের এসব তত্ত্ব আলোচনা মোটেও ভাল লাগছিল না। তাই বারে বারে হাত ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। একটু অধৈর্য হয়েই শেষটায় বলে ফেলল, বারটা বাজে। এখনও অনেক জিনিস দেখবার আছে।

সুরেশের কথায় আলোচনায় এইখানেই ছেদ পড়ল।

পঞ্চদশ শতকের বিস্মৃত বাংলার ধূলিধূসরিত পথের ওপর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কয়েকটি প্রাণী এগিয়ে চলল ফেলে আসা শতাব্দীর আর একটি ঐতিহাসিক তীর্থ সন্দর্শনে। চিকা বা চামকান মসজিদের (১৪৫০ খৃঃ) দোর গোড়ায় গিয়ে টাঙ্গা থামল। নামটা শুনে খুব খানিকটা হেসে নিল বন্দনা। এক গম্বুজওয়ালা এই গৃহটাকে মসজিদ বললেও এটা সম্ভবত কোন সমাধিস্থল। কথিত আছে সুলতান হুসেন শাহ এটা কারাগার রূপে ব্যবহার করতেন। এই মসজিদে হিন্দুমন্দির থেকে আনীত বহু কারুকার্য করা পাথর ও মীনা করা ইট ব্যবহৃত হয়েছে। একই দেওয়ালে হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত ভাস্কর্যশিল্প দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

কি অন্ধকার ভেতরটা! টর্চ জেলে দেখতে হয় দেওয়ালের গায়ে ঐ অপরূপ ভাস্কর্য।

চিত্রভানু বেশ একটু ব্যথিত হ'ল। অন্ধকারের জন্য না পারল ফটো নিতে, না পারল ঠিক মত ছবি এঁকে নিতে। অথচ এই চিত্রাবলী তার গবেষণার পক্ষে বেশ প্রয়োজনীয়।

বন্দনা বর্ষাস্নাত এক ঝাড় রজনীগন্ধার মত স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলল, তাতে আর কি হয়েছে। একটা ছবি না হয় বাদই পড়ল, তাতে অ্যালবামের পাতা ত' আর খালি যাবে না।

সদ্য কলেজে ঢোকা বন্দনা কি করে বুঝবে চিত্রভানুর মনের ব্যথা। বন্ধুদের কাছে বাহবা পাবার জন্য বন্দনার কাছে একটা ছবি শুধু ছবিই, আর চিত্রভানুর কাছে একটা ছবি একটা তথ্য।

এই চিকা মসজিদের পাশেই রয়েছে গুমটি দরওয়াজা। এক গম্বুজবিশিষ্ট এই দরওয়াজা (১৫২২ খৃঃ) হুসেন শাহের দ্বারা নির্মিত হয়। এটা গৌড় দুর্গের অভ্যন্তরে যাবার একটা গোপন পথ ছিল বলেই মনে হয়। এর গায়ে এনামেল করা ইটের কাজ এখনও কিছু কিছু পরিদৃষ্ট হয়।

এই গুমটি দরওয়াজায় রয়েছে সরকারের সংগ্রহশালা।

সংগৃহীত শিল্পকীর্তিগুলোর ওপর চিত্রভানু তার সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিল। অফিস থেকে পরিচয় লিপি চেয়ে নিয়ে এসে প্রত্যেকটি প্রাপ্ত প্রাচীনকীর্তির সঙ্গে পরিচয় লিপি থেকে পরিচয় মিলিয়ে দেখছে আর নোট-বুকে টুকে নিচ্ছে।

কি অপরিসীম আনন্দের ভাব তার চোখে মুখে!

হিন্দু রাজাদের আমলের যা কিছু প্রাচীনকীর্তি খনন কার্যের দ্বারা পাওয়া গিয়াছে, বলতে গেলে সবই এখানে যত্নের সঙ্গে রাখা হয়েছে। কত শতাব্দী আগেকার কষ্টি পাথরের ওপর খোদাই করা শিল্পীর নিখুঁত সৃষ্টি আজও এতটুকু ম্লান হয়ে যায় নি, যদিও এর ওপর দিয়ে কত ঝড়-ঝাপ্টাই না বয়ে গেছে। হিন্দু দেবদেবীর পাথরের মূর্তি, আর গৌতম বুদ্ধ মূর্তির সংখ্যাই বেশী। আর রয়েছে কষ্টি পাথরে ওপর অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্ররেখা। মুসলমান ভাস্কর্য শিল্পের ও স্বাক্ষর বয়ে আনে পাথরের ওপর খোদাই করা অতুলনীয় কারুকার্য এবং আরবীভাষার কয়েকটি লিপি।

চিত্রভানুর অর্ধেক দেখার আগেই বন্দনা এবং সুরেশের দেখা শেষ হয়ে গিয়েছে। বন্দনা অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চিত্রভানুর দিকে তাকিয়ে রইল। কি এত দেখছে লোকটা?

তারপর ধীরে ধীরে চিত্রভানুর অজান্তে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বাইরে অপেক্ষা করছি বলে সুরেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। বন্দনা বারে বারে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে আর অধৈর্য হয়ে পড়ছে। আর কতক্ষণ! পা হাত ধরে গেল! তবুও কিন্তু চিত্রভানুকে তার ধ্যান থেকে জাগাল না,—ছায়ার মত তার পাশে পাশে চলতে লাগল একটা থেকে আর একটা শিল্প-কীর্তির কাছে।

ভাবছে বন্দনা, মানুষের এত ধৈর্যও থাকে! ও নিশ্চয়ই আমাদের মত সাধারণ মানুষ নয়—নইলে শুধু চোখে দেখেই ত' তৃপ্তি পেত। কিন্তু লোকটা কে, কি করে! ও ত' ওর সম্বন্ধে কোন কথাই বলল না।—শুধু হাসল একটু। ওর বাহ্যিক পরিচয় থাকলই বা গোপন—মনের পরিচয়? সেটা ত' পেয়েছি। আজই ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, হয়ত বা শেষ দেখাও—পথের আলাপ হয়ত পথেই সাঙ্গ হবে—তবুও ভুলতে ত' পারব না ওকে কোনদিনও! বড় ভাল লাগে ওকে, চিরদিনের জন্য যদি ওকে—। না না, তা হয় না। এসব লোককে শ্রদ্ধা করা যায়, ভালবাসা যায় না। ছায়ার মত পাশে পাশে চলা যায়, হাত ধরে যাওয়া যায় না।

চিত্রভানুর মুখের দিকে একবার তাকায় বন্দনা। সত্যি—ওর চেহারাটার দিকে তাকালে বড় দুঃখ হয়। ওর ওপর ভগবানের কেন এত কার্পণ্য—শুধু একটু রূপ দেবার বেলায়! মানুষ বিতায়,

বুদ্ধিতে, অর্থে যত এগিয়েই যাক না কেন, তার রূপটাই সবার আগে চোখে পড়ে। সুন্দর মুখের জয় আজও সর্বত্র।

পুরো দেড় ঘণ্টা পরে চিত্রভানু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, পাশে বন্দনাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। আরে আপনি? কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার জন্য?

কোন কথা না বলে বন্দনা ওর নোট বইটা বন্ধ করে পরিচয় লিপিটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিয়ে এল। তারপর কেমন যেন স্নেহার্দ্র ভর্ৎসনার সুরে বলল, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। দেড় ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। ধন্যি আপনি।

তারপর চিত্রভানুর হাতটা টানতে টানতে বাইরে বেরিয়ে এল। যেন কতদিনের ঘনিষ্ঠতা চিত্রভানুর সঙ্গে ওর!

বাইরে এসে দেখে সুরেশ শুয়ে দিব্যি আরামে ঘুমচ্ছে।

এই ত জগত। কেউ আরামে ঘুমোয়, কেউ পারে না তার মনের খিদের জন্য। কেউ পেটের ভাতের জন্য দিনরাত্রি কি পরিশ্রমই না করছে? আবার কেউ পায়ের ওপর পা তুলে চাকর দিয়ে গায়ে তৈলমর্দন করছে।

সুরেশকে ডেকে তুলে বন্দনা গ্লাসে ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢালতে লাগল। চা বিস্কুট খাওয়ার পর তিনজনে আবার টাঙ্গায় চেপে বসল।

রাঙা ধূলো উড়িয়ে গাছের ছায়ায় ঢাকা সরু পথের ওপর দিয়ে টাঙ্গা ছুটতে লাগল।

পথের ধারে বেতঝাড়গুলো দেখে খুসীতে উপচে পড়ে বন্দনা। মৃদু ঠেলা দিয়ে চিত্রভানুকে বলে দেখুন দেখুন কি সুন্দর! হাজার হাজার পদ্মে ছেয়ে থাকা পুকুরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, অপূর্ব। পথের ধারে ফুটে থাকা নাম-না-জানা বন ফুলগুলো দেখে হাত বাড়িয়ে তুলতে যায়। নাগাল না পেয়ে তার আফশোসের অন্ত থাকে না।

টাঙ্গাওয়ালা ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছে। সামনেই বিখ্যাত ফিরোজ মিনার। এই পাঁচতল বিশিষ্ট মিনারটি নির্মাণ করেছিলেন আবিসিনিয়া দেশীয় সেনাপতি মালিক আণ্ডিল। এটা তৈরী হ'তে ১৪৮৬—১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ৩ বছর লেগেছিল। এই মালিক আণ্ডিল ক্রীতদাস বারবক শাহকে হত্যা করে সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ নামধারণ করে রাজত্ব করেছিলেন। সেই জন্যই মিনারটির নাম ফিরোজ মিনার। ৮০ ফিট উঁচু এই মিনারের ওপর উঠবার ৭৩টি ধাপের একটা ঘোরান সিঁড়ি আছে।

তিনজনেই তর তর করে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে গেল। এখান থেকে গোটা গৌড় অঞ্চলটাকে দেখা যায়। সেদিনের সে দুর্ভেদ্য প্রাচীর যা গৌড় দুর্গকে বেষ্টন করে তাকে নিঃশঙ্ক করেছিল আজও স্পষ্টই চোখে পড়ে। এই বিশাল প্রাচীরের দিকে বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয় বৈ কি! প্রাচীর গাত্রে মাটির প্রলেপ পড়ায় জঙ্গলের সৃষ্টি হয়ে বাঘ লুকিয়ে থাকবার আস্তানা হয়েছে এখন। কতক কতক জায়গায় জঙ্গল সাফ করে চাষবাসও করা হচ্ছে অবশ্য। আর এই মিনারশীর্ষ থেকে দেখা যায় কত মজা-দীঘি—যেগুলো সেদিন কাকচক্ষু জলে টল টল করত। হয়ত সেদিন এই সব দীঘির ঘাট কুলবধূদের গালগল্পে মুখর হয়ে উঠত। হয়ত সেদিন এই সব দীঘিরই একটা ঘাটে কোন নববধূকে তার সখীরা ঘিরে ধরেছিল সত্যকোটা ফুলের মত তার প্রথম প্রেমের গল্প শোনার জন্য। লজ্জা পেয়ে বধূ দীঘির জলে মুখ লুকিয়ে ছিল। আবার হয়ত এই রকমেরই কোন এক নববধূ শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দীঘির জলে ঝাঁপ দিয়ে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছে।

এই দীঘি-মঞ্চে এইরকমের কত জীবননাট্যই না অভিনীত হয়েছে,—কে জানে!

স্মৃতিকে ধরে রাখবার জন্য দু'জনের ক্যামেরা একই সঙ্গে ক্লিক করে উঠল। যত রকমের ছবিই উঠুক না কেন আর যাই হ'ক তাতে প্রাণের সাড়া মিলবে না। ছ'বি ছবিই। সত্যিকারের প্রাণের সাড়া পেতে হ'লে ঠিক এই পরিবেশের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে—এই প্রাণ, এই মন নিয়ে দেখতে হবে।

নীচে এসে গোটা ফিরোজ মিনারের একটা ফটো নিল চিত্রভানু—বন্দনাও।

দাখীল বা সেলামী দরওয়াজা। এত তাড়াতাড়ি যে এসে পড়বে তিনজনের কেউই ভাবতে পারে নি। না নেমে টাঙ্গায় বসে বসেই দেখতে লাগল সেলামী দরওয়াজাকে। এই চমৎকার দরওয়াজাটি সম্ভবত বারবক শাহর দ্বারা ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এটা ছিল গৌড় দুর্গের অভ্যন্তরে যাবার উত্তর দিকের প্রধান প্রবেশ পথ। এখান থেকে গোলাবর্ষণের দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করা হ'ত, তাই বুঝি এর নাম 'সেলামী দরওয়াজা।' গৌড় দুর্গের সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর এখান থেকে বেশ ভাল ভাবেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

দেখা হয়ে গেলে উর্দ্ধশ্বাসে টাঙ্গা ছুটে চলল বারদোয়ারী বা বড় সোনা মসজিদের দিকে। দূর থেকে গাছের আড়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে গৌড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় মুসলমান কীর্তি এই বড় সোনা মসজিদকে।

সুলতান নসরত শাহের অক্ষয় কীর্তি এই বড় সোনা মসজিদ। এটা নির্মিত হয় ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে।

খিলানের কাজের দ্বারা মণ্ডিত এই মসজিদের চারিধারের বারান্দাগুলো দেখতে দেখতে বিস্ময়তার ঘোরে চোখের পাতা স্থির হয়ে গিয়েছে এদের। বিমুগ্ধ বন্দনা বলে ওঠে, আমাদেরই মত মানুষের দ্বারা কি করে সম্ভব হ'ল পাথর দিয়ে এত উঁচু এবং এত সুন্দর সৌধ নির্মাণ করা। ইস, কত বড় বড় শিল্পীই না এঁরা ছিলেন। একটা বড় দুঃখ, এঁদের নাম কেউ জানলে না, জানতে চাইলেও না। চিরদিন এঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেল। অথচ যিনি অর্থব্যয় করলেন শুধুমাত্র, তিনিই নির্মাণকর্তা হিসেবে স্বীকৃত হলেন।

এই মসজিদে প্রবেশ করবার বারটা দ্বারপথ ছিল, এখন মাত্র এগারটা প্রবেশ পথ পরিদৃষ্ট হয়। তিন খিলানযুক্ত প্রবেশ পথগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র পূর্বদিকেরটা নির্মাণ কালের পুরাতন সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আজও বিরাজ করছে।

মসজিদের মাঝের পরিসরটা বর্তমানে গম্বুজরহিত। এককালে এই গম্বুজের ওপরটা সোনালী কাজের দ্বারা মণ্ডিত ছিল। সেজন্য এর নাম হয় 'বড় সোনা মসজিদ।' এর উত্তর ভাগে মহিলাদের জন্য একটা বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায় এবং দক্ষিণপূর্ব ভাগে একটা উঁচু পীঠের ব্যবস্থাও চোখে পড়ে। সম্ভবত এটা মুয়াজ্জিন মুসলমানদের নামাজের আহ্বানের সময় ব্যবহার করতেন।

বেলা দু'টো অনেকক্ষণ বেজে গিয়েছে। সবাই খুবই ক্লান্ত—গোটা শরীর যেন টলছে। এদিকে খিদেও পেয়েছে খুব—মুখ চোখ সকলেরই শুকিয়ে যেন আমচুর হয়ে গেছে।

এখন কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম না নিলেই নয়।

আর ত' মাত্র দেখবার একটা জিনিষ বাকী রয়েছে। সে রামকেলী,—যেখানে শ্রীরূপ সনাতনের বাস ছিল, শ্রীচৈতন্যের পাদস্পর্শে পবিত্র যেখানকার মাটি—

ঘণ্টাখানেক এখানে বিশ্রাম করার পর রামকেলী দেখে বাড়ির পথ ধরা যাবে—সবাই ঠিক করল।

সে এক দৃশ্য। শ্রান্ত পথিকের একটু বিশ্রাম একটু আরামের যেন এক পরম নির্ভরযোগ্য স্থান। দেখতে দেখতে এক পান্থশালার রূপ নিল এই বড় সোনা মসজিদ।

মসজিদের দেওয়ালের ছায়ায় তিনজনে বসেছে গোল হয়ে। বন্দনা টিফিন কেরিয়ার থেকে খাবার ভাগ করছে। অদূরে টাঙ্গাওয়ালা ঘোড়াটাকে তার কয়েদ থেকে মুক্ত করে তার সামনে মেলে ধরেছে তার পরিমিত খাদ্য। আর নিজে সে খানিকটা চিঁড়ে ভিজিয়ে তাতে আখের গুড় মাখতে ব্যস্ত।

খাওয়া শেষ হলে বন্দনারা গল্পে মেতে উঠল। আর এ পক্ষ অর্থাৎ টাঙ্গাওয়ালা একটা বিড়ি ধরিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মগ্ন।

আবার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রাণপ্রাচুর্য ফিরে পেয়েছে বন্দনা। আবার চির অশান্ত ঝর্ণার মত হয়ে উঠল সে। ওর রসিকতায় হাসতে হাসতে চিত্রভানুর চোখে জল এসে যাচ্ছে। সুরেশ কিন্তু বোনের অতটা হাস্য-পরিহাস ঠিক বরদাস্ত করতে পারছে না। তাই সে মাঝে মাঝে ফাজিল মেয়ে আর ফাজলামি করতে হবে না, বলে ধমক দিয়ে বোনকে থামাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু দাদার ধমক যে কত অসার, বন্দনা বেশ ভাল করেই জানে,—তাই—সধর্ম থেকে এতটুকু বিচ্যুত হচ্ছে না।

আশ্চর্য! হাসতে হাসতে পরিস্থিতি যে হঠাৎ অন্য মোড় নেবে তিনজনের কেউ কি ঘূণাক্ষরে জানতে পেরেছিল! কোথাও কিছু নেই। দিব্যি সোনালী রোদের আমেজ লাগান বিকেল। হঠাৎ কোথা থেকে এক সর্বনেশে ঝড় এসে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল যেন।

এক সময়ে বলে উঠল বন্দনা, হাউ লাভলি ইউ আর! সত্যি আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়া খুবই ভাগ্যের কথা। বহুদিন মনে থাকবে আপনাকে।

এর প্রত্যুত্তরে চিত্রভানু কি বলতে যাচ্ছিল, সুরেশ তাকে থামিয়ে দিয়ে আন্তরিকতার সুরে বলে উঠল, এ শুধু বন্দনার কথা নয়, আমাদেরও মনের কথা। আজ থেকে আপনি আমাদের পরম বন্ধু।

তারপর বন্দনার দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কি একটা ইশারা রহস্যময় করে একগাল হেসে সুরেশ আবার বলল, আসছে তেরই বন্দনার বিয়ে। আপনার নিমন্ত্রণ রইল সেদিন। আসা চাই কিন্তু।

বন্দনা লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ফেরায়। যত আধুনিকাই হ'ক না কেন, আজও বাংলাদেশের মেয়ে নিজের বিয়ের কথা শুনলে বেশ একটু লজ্জা পায় বৈ কি। বন্দনার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানায় কে যেন খানিকটা আবিরের ছোপ লাগিয়ে দিল।

তার স্বভাব সুলভ হাসি হেসে চিত্রভানু বলল, খুব আনন্দের কথা। নিশ্চয়ই যাব সেদিন। তারপর বন্দনাকে উদ্দেশ্য করে বলল, কলকাতাতেই থাকবেন না অন্য কোথাও।

বোধ হয় লজ্জার রেশ এখনও কাটি য় উঠতে পারে নি। তাই উত্তর দিল না,—তেমনি ভাবেই মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

বন্দনার হয়ে সুরেশ বলল, হ্যাঁ তা কলকাতাতেই বলতে পারেন—বেহালায়। তারপর ভাবী ভগ্নীপতির পরিচয়টাও বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই বলে গেল নিজে থেকেই, বুঝলেন ছেলেটি খুব ভাল। ইতিহাসে ফার্ষ্ট ক্লাশ নিয়ে এখন গবেষণা করছে। অবস্থা অবশ্য তেমন কিছু নয়, ভাড়া বাড়িতে বাস করে—তা সত্ত্বেও ছেলেটির শুধু লেখাপড়ার পরিচয় পেয়ে বাবা এককথায় বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। একমাত্র বাবা ছাড়া তাকে আমরা কেউ এখনও চোখে দেখি নি। শুধু তার নামটা জানি চিত্রভানু রায়। থাকগে, সেদিন আমাদের ৪৭ নং বিডন ষ্ট্রীটের বাড়িতে আসা চাই কিন্তু আপনার—।

একটুখানি চুপ করে থেকে চিত্রভানু বন্দনার দিকে একবার চোরা চাউনি হেনে ঠোঁট টি.প একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলল, আসব সেদিন, তবে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে নয়,—স্বয়ং বর হয়ে।

মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। বন্দনা একবার চমকিয়ে ফিরে তাকাল চিত্রভানুর দিকে। কোথায় হারিয়ে গেল তার লজ্জা রাঙা মুখ,—দেখতে দেখতে ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল। তার প্রেমিকা সুলভ চোখের কোণে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল।

সুরেশ হতভম্ব। চিত্রভানুর কথাই ত' বিস্ময় জাগায়—তার ওপর বন্দনার এ কি মূর্তি! বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়।

সদাহাস্যময়ী বন্দনার ঐ রূপ দেখে চিত্রভানুও থমকে গেছে রীতিমত। সে কি অন্যায় করে ফেলল কথাটা বলে ফেলে? কিন্তু—

সুরেশকে জোর করেই বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে তাকেই যে মধ্যস্থ হতে হবে।

বন্দনাকে বার বার করে জিগ্যেস করছে, কি হয়েছে তোর বল না? তোর এই কাণ্ড দেখে চিত্রভানুবাবু কি ভাবছেন বল ত'?

বন্দনা একটি কথাও বলছে না। পাহাড়ের মত তেমনি গম্ভীর, তেমনি অটল।

অনেক সাধ্য সাধনার পর বন্দনা মুখ খুলল, দাদা, এ বিয়ে আমি করতে পারব না। এ বিয়ে ভেঙ্গে দাও।

—কি বলছিস তুই?

—ঠিকই বলছি দাদা। আমার পক্ষে এ বিয়ে করা সম্ভব নয়। ঐ রকম একজন কুৎসিত লোককে বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না। কিছুতেই না। রাগে উত্তেজনায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে বন্দনা।

সুরেশ স্তম্ভিত।

বন্দনা আবার বলে চলে, আমি ত' তোমাদের সঙ্গে কোন শত্রুতা করিনি। তবে কেন তোমরা আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা করলে? কেন আমার একটা মত নিলে না? না, না দাদা, এ হয় না। অত কুৎসিত লোককে—। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল ঠেলে

সুরেশের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়। চিত্রভানুর দিকে তাকাতে পারছে না। খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে থাকার পর বোনকে বলল ভর্ৎসনার সুরে—ছিঃ, কি সব আজে বাজে কথা বলছিস। পাশে যে একজন ভদ্রলোক বসে রয়েছেন, সে খেয়াল কি তোর নেই? শালীনতা বলে একটা জিনিষ আছে ত!

তারপর বন্দনার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলল, জানিস, উনি বড় বিদ্বান; দু'দিন পরে ইতিহাসে ডক্টরেট হয়ে বেরুবেন। যেদিন তিনি ডক্টরেট হয়ে বেরুবেন, সেইদিনটার কথা একবার ভাব ত'! সেদিন শুধু চিত্রভানুবাবুর একার গর্ব নয়—স্ত্রী হিসাবে তোরও।

আঁচলে মুখ-ঢাকা অবস্থায় কান্না-জড়ানো গলায় বন্দনা বলল, জানি আমি, উনি খুব বিদ্বান। কিন্তু তাতে আমার কি হবে। আমার বন্ধু-বান্ধবদের সামনে আমি ওঁকে নিয়ে দাঁড়াব কি করে। তারা যে—। বন্দনা এবার রীতিমত ফোঁপাচ্ছে।

খুব আশ্চর্য হয়ে চিত্রভানু বন্দনার ঢাকা মুখের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এ যে বিশ্বাসই করতে পারা যায় না, সকাল বেলায় ফটো তোলার সময় যে কি না দীপ্তকণ্ঠে বলে, রূপ কি মানুষের নিজের সৃষ্টি? গুণটাই মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিষ।···মানুষের রূপের সমালোচনা করার চেয়ে ঘৃণ্য কাজ আর নেই। তারই কাছে কি না রূপটা এখন বড় হয়ে দেখা দিল। আশ্চর্য!

সব স্বার্থ। আজকের মানুষ স্বার্থ ছাড়া এক পা-ও চলতে পারে না। যখনই স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত দেখা দেয়, তখনই বেঁকে দাঁড়ায়। আজকের এই সভ্যতা মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, শুধু অভিনয় করে যাও—জীবনভোর শুধু অভিনয় করে যাও যদি সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চাও। রাজনীতি, সমাজচিন্তা যেদিকে তাকাও না কেন, দেখবে শুধু এই ব্যাপার। এ অন্যায়, এ ঘৃণ্য, এ পাশবিক বলে চীৎকার করতে করতে হয়ত তাদের হাতের কাছে টেবিলটা ভেঙ্গে যাবে চাপড়ানির চোটে, মাইকও হয়ত' ফেটে যাবে গলাবাজিতে,—কিছু লিখতে দাও, দেখবে পাতার পর পাতা লিখে যাবে তারা বঞ্চিত, নির্যাতিতদের সমবেদনা জানিয়ে কত কি গরম গরম বুলি—এদের জন্যে দুঃখে তাদের প্রাণ ফেটে যাচ্ছে!

এ শুধু কুমীরের কান্না। বুঝলে, শুধু কুমীরের কান্না।

যেই স্বার্থ এসে উঁকি দেবে, অমনি দেখবে এদের। বক্তৃতার তুফান থেমে যাবে, কলমও আর এগোবে না।

হাসি পেয়ে যায় চিত্রভানুর।

পরিস্থিতির মোড়টা ঘুরিয়ে দেবার জন্য চিত্রভানু হঠাৎ খুব শশব্যস্ত হয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। আর কি, এবার ওঠা যাক্।

সুরেশ করুণ দৃষ্টিতে একবার চিত্রভানুর দিকে একবার বন্দনার দিকে তাকাচ্ছে। বন্দনাকে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কি জানি আবার যদি পাগলামী শুরু করে! লজ্জার ওপরে আরও লজ্জা!

বন্দনা স্থাণুর মত বসে রয়েছে।

ঠোঁটের কাঁকে ক্ষীণ হাসির রেখা টেনে চিত্রভানু বন্দনাকে বলল, অত দুঃখ করার কি আছে? আপনার মত নেই, বিয়ে করবেন না, এ ত' সোজা কথা। আমার অবশ্য মোটেও ইচ্ছে ছিল না এখন বিয়ে করবার। দাদা-ই শা উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। যাকগে।

বন্দনা সুরেশ দু'জনেই বেশ একটু অবাক হয়ে চিত্রভানুর মুখের দিকে তাকায়। চিত্রভানু যে এত সহজেই বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে পারবে এ তারা ভাবতেও পারেনি।

তারপর চিত্রভানু থেমে থেমে বলে যেতে লাগল স্বগতোক্তির মত আমি জানতাম। চোখে দেখে কোন মেয়ে যে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না, এ আমি জানতাম। কিন্তু বিপাশা? আমাদের গ্রামের মেয়ে বিপাশা,—সে কেন আমাকে অত ভালবেসেছিল? সে কেন আমায় নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখত? সে ত রূপে গুণে প্রথম শ্রেণীর মেয়ে ছিল। তবে কেন সে চেয়েছিল আমাকে!

বলতাম, বিপাশা তুমি ভুল করছ। পরে তোমার আফশোসের শেষ থাকবে না।

—না গো না। ভুল আমি একটুও করছি না। বলে আমার বুকে মুখ লুকাত সে।

বিপাশা শুধু স্বপ্নই দেখে গেল। তার ঘর আর বাঁধা হ'ল না। একদিন পুকুরে স্নান করতে গিয়ে আর উঠে এল না।

ঝাপসা চোখ দু'টো ধুতির খুঁট দিয়ে মুছে নিল বার কয়েক। তারপর বন্দনার দিকে তাকিয়ে বলল চিত্রভানু, আমার বাইরেটা যত কুৎসিতই হ'ক, ভেতরটা কিন্তু মোটেই নয়। এবার ঠোঁটের কাঁকে একটু বিদ্রূপের হাসির রেখা টেনে বলল, সত্যিই ত কুৎসিত স্বামীকে কি বন্ধুদের সামনে বার করা যায়! সে যে বড় লজ্জার ব্যাপার।

কথাটা যেন বন্দনার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে থেকে বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠল বন্দনা, আমি চাই রূপ। যেখানে রূপ নেই সেখানে আমার অন্তরের কোন যোগও নেই।

সঙ্গে সঙ্গে কাঠ কাঠ জবাব দিল চিত্রভানু, আপনার অন্তরের যদি কোন যোগ নাই থাকে তাহলে সেই অ-রূপকে নিয়ে তখন অত বড় বড় কথা বলছিলেন কেন? একটা কথা শুনে রাখুন বন্দনা দেবী, যা জানেন না, যা বোঝেন না—তাতে কখনও নাক গলাবার চেষ্টা করবেন না। প্রথমটা বাহাদুরী লাভ করা গেলেও পরে কিন্তু চরম হাস্যাস্পদই হতে হয়।

বন্দনা একেবারে চুপ। আর কি সে মুখ খুলতে পারে!

একটু পরেই আবার চিত্রভানু আগের মত সহজ হয়ে যায়। এইটাই তার স্বভাব। ঠিক যেন সেই দিনটার মত। আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা—কয়েক পশলা বৃষ্টিও হ'ল। কিছুক্ষণ পরে কোথায় সাতরাজ্যের মেঘ পালিয়ে গেল। নির্মল আকাশে আবার ঝিকমিকিয়ে উঠল সূর্য।

আগের মত সেই লাজুক লাজুক ভাব চোখে মুখে, সেই ঠোঁট টিপে স্বভাব সিদ্ধ হাসি। বলল, চারটে পনেরো যে হয়ে গেল। এবার যে না উঠলেই নয়। ওদিকে টাঙ্গাওয়ালা টাঙ্গা নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

বড় সোনা মসজিদকে শেষ বারের মত দেখে নিয়ে টাঙ্গায় উঠে বসল তিনজন।

ঘোড়ার খুরের তালে তালে এগিয়ে চলেছে টাঙ্গা।

কারো মুখে কোন কথা নেই। বন্দনা মাথা নীচু করে বসে।

চিত্রভানু বাইরের দিকে তাকিয়ে। সুরেশ আর কি করে। বেচারা একটা সিগারেট ধরিয়ে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকাচ্ছে।

রামকেলীর মধ্য দিয়ে টাঙ্গা ছুটছে। এই গোটা অঞ্চলটাকে রামকেলী বলে। বৈষ্ণব-তীর্থ। বহু বৈষ্ণবের বাস এখানে। খানিকটা যাবার পর টাঙ্গাওয়ালা টাঙ্গার গতি কমিয়ে ডান দিকে হাত তুলে দেখাল, ঐ যে রূপসাগর।

টাঙ্গায় বসে বসে বেশ দেখা যাচ্ছে। টলটলে জলে পূর্ণ রূপসাগর। ঠিক যেন পূর্ণ যৌবনা যুবতী,—নিজের যৌবনপুষ্ট দেহের দিকে তাকিয়ে আত্মগর্বে গর্বিতা। কে জানে হয়ত' আজও কোন গোধূলি লগ্নে ঐ রূপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর মনে প্রথম প্রেমের পরশ জাগে।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীরূপ গোস্বামী এই রূপসাগর খনন করান।

চিত্রভানু আর সুরেশ আগ্রহভরে মুখ বাড়িয়ে দেখল। বন্দনা কিন্তু আষাঢ়ের মেঘের মত মুখ করে তেমনি ভাবেই বসে রইল। দেখবার একটু কৌতূহলও হ'ল না তার।

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে টাঙ্গা থামল। ঐ যে বটগাছটার নীচে ছোট্ট মন্দির—ওইখানে রয়েছে কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পায়ের ছাপ। এই স্থানে তিনি উপবেশন করেছিলেন এবং রূপ সনাতনের সঙ্গে তাঁর এখানে সম্মিলন হয়।

চিত্রভানু আর সুরেশ নেমে পড়ল টাঙ্গা থেকে। নামল না বন্দনা। আপনারা দেখে আসুন। আমি গাড়িতে বসে রয়েছি বলে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

চিত্রভানু আন্তরিকতার সুরে বলল, তা কি হয়! আমরা দেখব আর আপনি টাঙ্গায় মনমরা হয়ে বসে থাকবেন! না, না, সে হয় না। নেমে আসুন।

বন্দনা নামবে না টাঙ্গা থেকে। তার নাকি দেখবার ইচ্ছে নেই। আসলে সে খুব লজ্জা পেয়েছে চিত্রভানুর সামনে ঐ রকমের একটা নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য। তখন রাগের মাথায় নিজের দৈন্য প্রকাশ করে ফেলায় এখন লজ্জায় মরে যাচ্ছে সে। তাই সে চিত্রভানুকে এড়িয়ে চলতে চাইছে।

সুরেশ একটু মৃদু ধমকের সুরে বলল, কি ছেলেমানুষি করছিস। নেমে আয়—।

ঘাড় ফিরিয়ে থাকা অবস্থাতেই বন্দনা মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করে।

এবার চিত্রভানু সোজা কাছে গিয়ে বন্দনার হাত ধরে তাকে টে নামিয়ে নিয়ে আসে। বলে, রাগ, দুঃখ অভিমান করার স অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু এই ক্ষণটুকু আর ফিরে পাও যাবে না।

বন্দনার জেদ কোথায় চলে গেল। ফ্যাল ফ্যালিয়ে তাকি রইল এই আশ্চর্য মানুষটার দিকে।

মহাপ্রভুর পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে চিত্রভানু আবার ব উঠল বন্দনাকে, আসুন আজকের এই শুভলগ্নে প্রেমের ঠাকু পদচিহ্নকে স্পর্শ করে আমরা আমাদের সমস্ত রাগ, দুঃখ, অভিমা বিসর্জন দিয়ে দিই। প্রার্থনা করি, বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী জীবনে বাকি দিনগুলো যেন প্রেমের পরশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এতে আ কিছু না হ'ক শান্তি ত' পাব, তৃপ্তি ত' পাব!

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বন্দনা চিত্রভানুর মুখের দিকে প্রশান্তির ছাপে তার সুন্দর মুখখানা অপরূপ হয়ে উঠেছে।

চিত্রভানুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে চোখদু'টো নামিয়ে নিল না সুলভ লজ্জায়। ঠোঁটের ফাঁকে একটু স্মিতহাসির রেখাও খেলে গে বৈ কি!

পাশেই মদনমোহনের মন্দির। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রা বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে এক বিরাট মেলা বসে গোটা রামকে জুড়ে। এই মেলাতে বাইরে থেকে কত লোকই না আসে।

ইদানীং নাকি মেলার জৌলুষ অনেকখানি কমে গিয়েছে আগে তুলনায়।

পাঁচটা বেজে গেল। সামনে বট, অশ্বত্থ গাছগুলোর ও অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলোর শেষ আলিঙ্গন মনটাকে ঘরমু করে তোলে বৈ কি!

কুলায়—ফিরে—আসতে—থাকা পাখীগুলোর মত ঘরের মা এবার ঘরে ফিরে যাবে।

টাঙ্গায় উঠে বসল সকলে। টাঙ্গাওয়ালা টাঙ্গা ছাড়তে যাবে।

দাঁড়াও, বলে বন্দনা এক লাফে টাঙ্গাওয়ালার পাশে গিয়ে বস তারপর চিত্রভানুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে এ ঠোঁট টিপে হেসে, লাগামটায় একবার হ্যাঁচকা টান দিয়ে তীব্রবে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল টাঙ্গা ডানদিকে বাঁকের মুখে।

পড়ে রইল শুধু ধুলো আর ধুলো—রাঙা ধুলোর কুণ্ডলী।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একটানা কুয়াশা কাটিয়ে উঠে প্যারির বিমান বন্দরে যখন নামলাম, তখন কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা করল 'আজি মধুর মূরতি হেরিনু।'

এয়ার পোর্ট টাওয়ারের ঠিক মাথার ওপর এখন সকাল ...ার স্বাস্থ্যবান সূর্য। মুঠো মুঠো সোনালী রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে ...ওয়ের বিস্তীর্ণ চত্বরে। যাত্রীরা উচ্ছ্বাসে হাততালি দিয়ে উঠছে, ... তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। সোনালী সূর্যের প্রতিবিম্ব ... সকল মানুষের চোখে মুখে।

ইওরোপের সূর্য দরিদ্রের গৃহিণীর মুখের হাসির মতই দুর্লভ। ...তো আজ পর পর সাতদিন লণ্ডনে আমরা সূর্যের মুখ দেখিনি কেউ। ...নী নায়িকার মত আকাশের মুখ ছিল ভার। এতদিন পরে ...রাপের সূর্য তাই খুশীর রঙ ধরাল সবার মনে।

কে যেন বলেছিল: 'ইংলণ্ডের মত মহাদেশের সূর্য না কি ...ানি অকরুণ নয়। ইংলিশ চ্যানেলের এপারে উইন্টারও আছে। ...ওয়েদারও আছে। তবে তারাই মানুষকে প্রভাবিত করে না ...নী মায়ায়—যেমন করে চ্যানেলের ওপারে ইংলণ্ডে।'

'মর্নিং সোজ দি ডে' এই প্রবচনটি ইংরাজেরা কি করে লিখেছিলেন ভাবলে আশ্চর্য লাগে। কারণ প্রভাতে উঠিয়া সূর্যের মুখ দেখে ...দিন যাবে ভাল বলে ইংলণ্ডের পথে রেইন কোট না নিয়ে ...হন না, তাঁরা সিক্ত বস্ত্রে পরে অনুতাপ করেন—কী ফল ...। আবার সিক্তবস্ত্র শুকোতে না শুকোতেই সূর্যদেব যখন ... বর্ষণ করতে সুরু করে দেন তখন রেইন কোটকে ...সি জীর্ণানি বলেই মনে হয়।

'ভ্রমণ মানেই মুক্তি' ভারতীয় রেলপথের এই বহু বিঘোষিত ...নটি বোধ হয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় ভ্রমণের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ ...রীর ওপর এখানে প্রতি পদে পদে বহুবিধ কানুনের অনুশাসন। ...পার্ট দেখাও, ভিসার ওপরে শীলমোহর লাগাও, হেল্‌থ সার্টিফিকেট ...—আরবসাগরের ওপার থেকে কলেরা ও বসন্তের বীজ যে চুপি ...নিয়ে আসছ কি না তার কি প্রমাণ'। ফরেন এক্সচেঞ্জের পারমিট ...—সবার ওপরে আছে কাস্টমস।

শ্যেনপক্ষীর মত বিস্ফারিত দুটি নেত্র মেলে কাস্টমস অফিসার শুধোলেন: ওনলি ওয়ান স্যুটকেশ?

বললাম: আজ্ঞে হ্যাঁ। আই ট্রাভেল লাইট।

: এনিথিং টু ডিক্লেয়ার?

শোনা যায় কাস্টমস অফিসারের এই প্রশ্নের উত্তরে একদা অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন: নাথিং বাট মাই জিনিয়াস।

আমি বললাম: নাথিং স্যর।

খড়ির দাগ এসে পড়ল স্যুটকেশের ওপর।

সিটি টার্মিনাসে নামতেই দেখি আমার জন্য যিনি অপেক্ষা করে আছেন, তিনি সাংবাদিক কমলেশ ব্যানার্জী। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন: কোন কষ্ট হয়নি তো পথে?

বললাম: কষ্ট পাবার মত সুযোগই দিল না কেউ।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ—শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ যেতে আমার একঘণ্টা সময় লাগে।

: যেমন করে বললেন, তাতে কষ্ট না পাওয়ায় নিরাশ হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে?

: নিরাশ তো হবারই কথা। ভ্রমণকাহিনী লিখতে গেলে অ্যাডভেঞ্চারটা এসেনসিয়াল। পথ যত দুর্গম হবে বই তত বিক্রি হবে।

কমলেশবাবু বললেন: তাহলে প্যারিতে এসে ভুল করেছেন। প্যারিতে রোমান্স আছে, থ্রিল নেই।

বললাম: তাই হোক। থ্রিল তোলা রইল ভবিষ্যতের ভ্রমণ কাহিনীর জন্য। আপাতত রোমান্সই পান করি। কিন্তু সবচেয়ে আগে দরকার একটি আস্তানা। যেখানে কমফর্ট না থাকুক সেফটি আছে।

নতুন দেশে এসে কর্তব্যরত সাংবাদিক আগে অনুসন্ধান করে ডাকঘরের, নাবিক অনুসন্ধান করে পতিতালয়ের, আমাদের মত লঘু পকেট বিশিষ্ট ট্যুরিস্টরা সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করে সস্তা বাসস্থানের।

কমলেশবাবুর সঙ্গে ঘুরেও এ হেন একটি সস্তা বাসস্থান খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল। উদ্বেগ কাটল আরও কিছু পরে। ল্যাটিন কোয়ার্টার্সের একটি পেঁসিয়ঁর দরজায় ধাক্কা দিতে একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন।

ফরাসী ভাষণে কমলেশবাবুর দক্ষতা যে কোন ফরাসীর মতই। তাঁদের মধ্যে কয়েক মিনিট ধরে যে সংলাপ হল, তার যথার্থ বুঝতে পেরে আশান্বিত হলাম। ঘর খালি আছে।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ততোধিক অন্ধকার একখানা ঘরে ল্যাণ্ডলেডি আমাকে নিয়ে এলেন। যার কার্পেট জীর্ণ, জানালার পর্দা শতছিন্ন। তবু সিজনের গৃহসমস্যা কণ্টকিত প্যারিতে রাত কাটাবার পক্ষে এই ঘরটিই বা মন্দ কি যদি তার ভাড়া মাত্র দৈনিক দশ নিউফ্রাঁর মত হয়।

: ঘর পছন্দ হয়েছে ? কমলেশবাবুর প্রশ্ন।

: ঘর পছন্দ হয়েছে কিন্তু ঘরণী নয়। এই বৃদ্ধার ইংরাজীর দৌড় কি আমার ফরাসী জ্ঞানের চেয়ে যথেষ্ট নয় ?

: আপনার অশেষ ভাগ্য যে, ল্যাণ্ডলেডি অন্তত কয়েকটি ইংরাজী শব্দ জানেন।

মনে মনে নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে পুলকিত হলাম। কিন্তু তখন বুঝিনি সে শুধু অকারণ পুলক।

লণ্ডন এয়ারপোর্টে নেমে কোন ভারতীয় মনে করে সে বুঝি দিল্লী থেকে এল সিমলায়। কোন দিক দিয়েই ইংলণ্ডকে বিদেশ বলে মনে হতে পারে না কুলদীপ সিং বা ডায়না নাইডুর কাছে! কারণ কুলদীপ ইংরাজী শিখেছে নার্সারি স্কুলে। সাহেবী এটিকেট শিখেছে উত্তরাধিকারসূত্রে, তার ড্যাডি ও ম্যামী ডাকে শিহরিত হয়েছে তার পিতৃকুল আর মাতৃকুল। ডায়না নাইডু বিলিতী ম্যাগাজিনের আর বিলিতী ছবির কল্যাণে নিজেকে পরিণত করেছেন বিলেতের সুলভ সংস্করণে। শুধু ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজকেই দোষ দিই কেন, শ্যামবাজারের রামধন মিত্র লেনের কেরাণীর যে ছেলেটি বিলেত যাবার স্বপ্ন দেখে, ইংলণ্ডের ইতিহাস ছিল তার অবশ্য পাঠ্য। ইংরাজেরা তাদের কাছে অদৃষ্টপূর্ব জীব বিশেষ নয়। ইংরেজের সংস্কৃতি তার পরিচিত, ইংরেজের ভাষা তার অধিগত।

শুধু ভারতে বসে কেন, ইংলণ্ডে বসেও ভারতীয়েরা মনে করে ইংরাজের ভাষা বুঝি আন্তর্জাতিক ভাষা।

কিন্তু ভুল ভাঙে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের পর। ফ্রান্সের উপকূলে প্রথম ধাক্কা খায় পর্যটক। ইংরেজী কারেন্সীর সঙ্গে সঙ্গে আর ইংরেজের যে বস্তুটি তামাদি হয়ে গেল, তা হল ইংরাজী ভাষা। ফ্রান্সেই সে প্রায় প্রথম বিদেশকে। প্রথম অপরিচিত জগৎকে।

আমাদের এক কবি বন্ধু লিখেছিলেন অন্ধের রাজ্যে চক্ষুষ্মান হবার মত যন্ত্রণা আর নেই। এ কথাটিকে পরিবর্তিত করে বলা যায় ফরাসী দেশে শুধু ইংরাজী জানার মত যন্ত্রণা আর নেই। এই যে পথে পথে এত মানুষ দেখছি, প্রত্যেকের পরণে প্যাণ্ট-কোট নয় স্কার্ট বা ফ্রক, গায়ের রঙ আর চুলের বর্ণে তাদের ইংরাজদের থেকে তফাৎ করতে পারেন শুধু নৃতত্ত্বের ছাত্র। অথচ আপনি কি ইংরাজী জানেন ? এই প্রশ্ন করলে সকলেই তাকিয়ে থাকবেন ফ্যাল ফ্যাল করে

ইংলিশ চ্যানেল পার হবার সময় মাঝপথে সাঁতারুর অসহ অবস্থার বর্ণনা শুনেছিলাম আরতির কাছে। এখন দেখলাম ফরাসী না জানা টুরিষ্টের অবস্থা ফ্রান্সের মাটিতেও এমনি অসহায়।

তবু অকূলেও কূল আছে। গভীর সমুদ্রে আছে লাইট হাউস। টুরিষ্টেরও হাতে আছে ম্যাপ, আছে গাইড বুক।

সেই ম্যাপ দেখে যখন অপেরা স্কোয়ারের কাছে পৌঁছলাম তখন সূর্য মধ্য গগনে।

অপেরা স্কোয়ারের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রতীক্ষা করছি কোন কপালকুণ্ডলার—যে বলবে: পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ ? এমন সময় দেখা মিলল একজন ভারতীয়ের।

জলের বদলে বেলও যে অনেকক্ষেত্রে তৃষ্ণা মেটায় তার প্রমাণ হতে দেরী হল না। একা অর্থে বোকা। দু'জন মানেই বাংলা বহুবচন। ভদ্রলোক বললেন: আপনি কি ভারতীয় ?

বললাম: আলবৎ।

: কোন প্রদেশের ?

হায় রে এখনও প্রাদেশিকতা গেল না। বললাম: পশ্চিমবঙ্গের।

এই কথা শুনেই ভদ্রলোক এমন আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন যেন তিনি ডার্বি বিজয়ের সংবাদ পেয়েছেন।

এরপর শুনলাম, আন্তর্জাতিক পোষাকের আড়াল থেকে পরিষ্কার বাংলা ভাষা ধ্বনিত হচ্ছে: আ: বাঁচালেন মশায়, আজ সকালে প্যারি আগমন, এসে পর্যন্ত পদে পদে হোঁচট খাচ্ছি। কোথায় যে এসে পড়েছি তাও জানি না।

বললাম: মা ভৈষী। মামনুসর।

পথে যেতে যেতে কথা। ভদ্রলোক বয়সে তরুণ ? নাম শ্রীঅশোক সেন। নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে সবিনয়ে জানালেন, তিনি কলকাতার উত্তর পশ্চিম লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী নন। যদিও ঐ কেন্দ্রেই তাঁর পৈত্রিক আবাস। আইন পড়তে বিলাতে এসেছিলেন। জরুরী তলবে পাঠ অসমাপ্ত রেখেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছেন।

সেন বললেন: আমি কিন্তু প্যারিতে এসে এ পর্যন্ত বাংলাতে কথা বলেছি। এদের কাছে ইংরাজী বাংলা আর সোহেলী সবই সমান, তবে মাতৃভাষা ছাড়ব কেন ?

সেনের ভাষা প্রীতি যে, যে কোন বঙ্গ-সন্তানের গর্বের বস্তু তার প্রমাণ পেতে দেরী হ'ল না। সামনের ট্রাফিক পুলিশটির কাছে গিয়ে তিনি পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন: দাদু সাঁজালিজে যাব কোন পথে ?

পিতামহ সম্বোধনেও ট্রাফিক পুলিশের মনে দেখা গেল না অকারণ পুলক। সে শুধু দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত করে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল ফরাসী ভাষায়।

সেন বললে: উঁহু, মানে বুঝেচি, ডানদিকে যেতে হবে। তারপর বললে: মেরসি। এই দুটি ফরাসী শব্দ সেনের একমাত্র সম্বল ছিল।

কাজ না থাকলে খই ভাজার পরামর্শ যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁরা খই ভাজা ছাড়া আরও অনেক কিছু করেন। শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন পড়েন, কড়িকাঠের সাহায্যে অধীত গণিত বিদ্যার পরীক্ষা করেন, ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌ল করেন, কেউ বা ফুটপাথের শো-উইণ্ডো দেখে কালক্ষেপ করেন।

ফুটপাথে ঘুরে ঘুরে কালক্ষেপের আদর্শ জায়গা হল প্যারি। লণ্ডনের ফুটপাথে দাঁড়ালে বড় জোর শো-উইণ্ডোয় রক্ষিত পণ্যদ্রব্যের মূল্যতালিকা দেখে জানা যায় দেশের অর্থনীতি, কিন্তু প্যারির ফুটপাথে ঘুরলে পরিচয় পাওয়া যায় ফরাসী জাতির সংস্কৃতির। কারণ ফুটপাথের ওপরেই কাফে, ফুটপাথের ওপরেই জুয়োর আড্ডা, ফুটপাথের ওপরে কেকের দোকান, তপ্ত কড়াইতে বালি দিয়ে ভাজা হচ্ছে আখরোটের মত ফল, যা ফরাসীদের প্রিয় খাদ্য। ফুটপাথের ওপর পণ্য সাজিয়ে বসেছে হরেক দোকানী। কলকাতার ফুটপাথে ফেরিওয়ালা উচ্ছেদের জন্য নিত্য আছে পুলিশী অভিযানের প্রহসন, কিন্তু ষাঁড় বা ক্ষত কুকুরের দল ফুটপাথ অবরোধ করে থাকলে পুলিশ তখন দোহাই পাড়ে ধর্ম নিরপেক্ষতার।

প্যারির সঙ্গে লণ্ডনের আর একটি তফাৎ লণ্ডনের গৌরব করার মত একটিও সাঁজালিজে নেই। রাজপথের অর্থ যদি হয় পথের রাজা, তাহলে সাঁজালিজে নিঃসন্দেহে অর্জন করবে বিশ্বজনীন গৌরব মুকুট।

এভিন্যু দ্য সাঁজালিজের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পারাপার করতে গেলে পার হতে হয় ছোট ছোট কয়েকটি পথ। যেন গোটা কয়েক সাদার্ণ এভিন্যু রাখা পাশাপাশি। আর সাঁজালিজের প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন ফুটপাথ লজ্জা দেবে অনেক দেশের পথকে।

সাঁজালিজের প্রান্ত দেশে আর্ট দি ট্রায়াম্ফের নীচে কাউন্টারে গিয়ে সেন দুটো আঙুল তুলে বললেন: মাসীমা দু'টো টিকিট দিন তো।

ঘটাং করে দু'টো টিকিট বেরিয়ে এল।

সেন বললে: বাঙলা কেমন আন্তর্জাতিক ভাষা দেখলেন তো! 'আ মরি' বলে কবি কেন গর্ব করেছিলেন, আজ তা বুঝতে পারছি।

আর্চ দি ট্রায়াম্ফের ওপর থেকে শান্তি, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দেশ প্যারিকে দেখা যায় বৈমানিকদের দৃষ্টিতে। মহাযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই বিরাট তোরণের পাদদেশে এসে মিলিত হয়েছে বারোটি রাজপথ।

দেখা যায় অদূরের অ্যাফিয়েল টাওয়ারের উন্নত শীর্ষ, যা আধুনিক ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, দূরে শীর্ণতোয়া সেইনের পারে নতরদাম গীর্জায় ঘণ্টাধ্বনি বাজে। সেই কুৎসিত কুব্জপ্রেমিক ঘণ্টাবাদকটিকে হয়ত আর দেখা যাবে না প্রাচীর শীর্ষে, তবু নতরদামের সে ঘণ্টাধ্বনি এখনও বিরাম বিহীন।

বিকালে বিদায় নিলেন সেন। বললেন: পথের দু'ধারে আমার দেবালয় নেই আমার তীর্থপথের প্রান্তে। জানলাম: তাঁর কলকাতা যাবার প্ল্যান আজ সন্ধ্যাতেই।

বঙ্গ-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যাঁরা, তাঁদের কল্যাণে ইদানীং আমরা একটি নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি—তা হ'ল রন্ধন সংস্কৃতি। রন্ধন যদি সংস্কৃতির অঙ্গ হয়, তা'হলে বিনা দ্বিধায় বলব, ইওরোপের মাঝে ফরাসীরাই সে সংস্কৃতির অধিকারী। তারপরে স্থান ইতালির।

ইংরেজের কাছে রন্ধন হ'ল বিজ্ঞান আর ফরাসীর কাছে তা হ'ল শিল্প। ফরাসীরা রাঁধে এবং চুলও বাঁধে। কিন্তু ইংরাজদের কাছে চুল বাঁধতে এত সময় চলে যায় যে, রান্নার জন্য বরাদ্দ সময়ে ঘাটতি পড়ে।

স্বীকার করি দুনিয়ার সব দেশের মেয়েদেরই সাত পাকে বাঁধা পড়বার আগে শিখতে হয় পাকপ্রণালী। কিন্তু ইংরেজ-গৃহিণীর তা পাকাপাকি আয়ত্ত করতে না পারলেও ক্ষতি নেই। কারণ ইংরাজের আহার্য-তালিকা দীর্ঘ নয় এবং সেদ্ধ করতে জানা ও টিন খুলতে জানা এই দু'টো পেপারেই পাশ করলে সেখানে রন্ধনশিল্পে ডিপ্লোমা মেলে। টমাস ডেলোনি একদা বন্ধু মিলটনের কাছে ইংরাজী খানা সম্পর্কে নাকি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন: গড সেণ্ডস মিট, অ্যাণ্ড ডেভিল সেণ্ডস কুক।

দীর্ঘদিন ইংরাজের খাদ্যে রসনাকে বিড়ম্বিত করার পর প্যারির রেস্তোরাঁয় ঢুকে মনে হল এলেম নতুন দেশে।' সেলফ সার্ভিস রেষ্টরেণ্টে একটা সুবিধা আছে, খাদ্যগুলি থাকে সামনে। নাম না জানা লাড্ডু খেয়ে পরিশেষে পস্তাতে হয় না। টেবিলের ওপর বহুবিধ খাদ্য সাজানো এবং দামেও সস্তা। তবে জল কিনতে হ'ল আলাদা। জল যে মূল্যবান ফরাসীরা তা জানে।

খাবার টেবিলে যে লোকটিকে দেখলাম, তিনি আর কেউই নন মিঃ মিটেল। আমরা যুগপৎ পরস্পরকে দেখে প্রথমে বিস্মিত ও পরে আনন্দিত হলাম।

আমি বললাম: তাহলে আপনিও অবশেষে—

মিঃ মিটেল হেসে বললেন: এর দ্বারা পৃথিবীর গোলত্ব নতুন করে প্রমাণিত হ'ল।

মিঃ মিটেল একদা ইংলণ্ডে আমার প্রতিবেশী ছিলেন। উলভার হ্যাম্পটনে তাঁর বাসায় আমি প্রায়শই আড্ডা দিতে যেতাম। পরিচয় করিয়ে দেবার ভাষায় বলতে হ'লে বলতে হয় মিঃ মিটেল (যাঁর সার নেম ছাড়া অন্য নামটি জানার অবকাশ হয়নি) উত্তর প্রদেশের একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী। বৃহত্তর জ্ঞানার্জনের জন্য সরকার তাঁকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। একদা তাঁর ঘরে বসে আমরা দু'জনে ইওরোপ ভ্রমণের পরিকল্পনা করতাম।

মিঃ মিটেল বললেন: আপনি শেষ পর্যন্ত একাই বেরিয়ে পড়লেন।

অগত্যা বললাম: জন মেলে তো মন মেলে না। দল বেঁধে পিকনিক করতে যাওয়া যেতে পারে দেশ ভ্রমণে নয়। আপনি ক'দিন আছেন?

মিঃ মিটেল বললেন: আগামী পরশু চলে যাব দিল্লী। কাল একটা কোচটুর পেয়েছি।

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

মিঃ মিটেল আবার বিশ্ব-নিরামিশাষী কংগ্রেসের সদস্য। কাজেই তিনি কিছু অতিকায় La ficelle ও La baguette ও সেই সঙ্গে কিছু সালাড নিয়ে এলেন।

এই রুটিগুলি ফরাসীদের প্রিয় খাদ্য।

মিঃ মিটেল বললেন: La ficelle মানে হল সুতো! রুটির আকৃতির দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে বললাম: এর অর্থ কাছি হওয়াই বোধ হয় সঙ্গত ছিল।

মিঃ মিটেল বললেন: ফরাসীরা ঠাট্টা করে বলে, মোটরে করে যাবার সময় কোনদিকে ঘোরবার দরকার হ'লে একটি La ficelle জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিলেই ট্রাফিক পুলিশ নাকি বুঝতে পারে। আর এই দেখুন না baguette এর মানে হল ছড়ি। রাইফেলের মত কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়। বসের সঙ্গে দেখা হলে কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে প্রেজেন্ট আর্মও করা যেতে পারে।

আমি বললাম: তবে ফরাসীদের আর এক রকম রুটি La batard সম্পর্কে গল্প শুনেছিলাম: রাজনৈতিক বিক্ষোভ হ'লে নাকি বিক্ষোভকারীরা পুলিশের বিরুদ্ধে সেগুলি নিক্ষেপ করে। এই গত কয়েক দিন আগে হাজার হাজার La batard বিক্রি হয়েছে জানেন?

মিটেল বললেন: কেন? কোন উৎসব ছিল নাকি?

বললাম: না। একটা ছাত্র বিক্ষোভ ছিল। দু'জনেই হেসে উঠলাম।

মিটেল বললেন: এদের খানা কেমন লাগছে? বললাম: ইংরেজদের খানা খাবার পর সব খাদ্যই ভাল লাগা উচিত। তবে প্রিন্স অব ওয়েলসের পরে যিনি সপ্তম এডওয়ার্ড হন, তিনি কি বলেছিলেন জানেন?

: কি?

ফরাসী পদ্ধতিতে রান্না হবে, রাঁধবে আমেরিক্যানরা আর ইংরাজী মতে পরিবেশন হ'বে, তবেই সেটা নাকি খানদানী খানা।

মিঃ মিটেলকে যখন বিদায় দিলাম তখন সূর্য মধ্যগগনে।

রাতের প্যারির নিয়ন আলোতে আছে মদিরার নেশা, বাতাসে আছে কামনার হিমেল পরশ। রাতের প্যারি বধূ নয়—মাতা নয়, সে নহে, নহে কন্যা। তার কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল। তার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে। আর মধুমত্ত মানুষের দল মাথা খোঁড়ে তার দ্বারদেশে।

প্যারি রাতের মোহিনী। ল্যুভর মিউজিয়ামের ভেনিস ডি মিলো পবিত্রতায় উজ্জ্বল, শান্ত সৌন্দর্যে ভাস্বর। কিন্তু সে শুধু দিনের আলোর প্রখরতায়। রাতের ভেনিস ডি মিলোরা উঠে আসে আপন গৃহকোণ ছেড়ে, জড় হয় মমার্ত্রে।

ফলিগ বর্জারে, মুলাঁ র‍্যাজে। রাতের মনলিসা হাসির চাবুক মারে সাঁজালিজের রাজপথে। মৌন নদী-তীরের নির্জন কুঞ্জছায়ায়।

মানুষ আর মানুষ। সন্ধ্যার পর ইংলণ্ডের পথে মানুষ তত কমে, প্যারিতে যত রাত, ফুটপাথে তত জনতা। ফরাসীরা সন্ধ্যার পর টেলিভিসন দিয়ে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে না পৃথিবী থেকে। কারার প্লেসের সামনে বসে দুয়ারে দেয় না অর্গল। দিনের প্যারি তো কাজের। বিকেলের প্যারি ক্লান্তির। কিন্তু রাতের প্যারি, তা শুধু আনন্দের। সে আনন্দ বাঙালীর রবিবাসরীয় আড্ডার তাসখেলার আনন্দ নয়, বিসর্জনের দিনের নৈমিত্তিক আনন্দ নয়। ফরাসীরা জানে জীবন আছে দুয়ার হতে অদূরে। আছে সেইন নদীর কলধ্বনিতে, আছে কফি হাউসের বান্ধবীর সাথে বিশ্রম্ভালাপে. আছে বিয়ারের পাত্রে।

দার্শনিক সার্ত্রার তাই অবসর যাপন করেন না, যোগ-ব্যায়াম চর্চায় অথবা সানডে স্কুলের বক্তৃতা শ্রবণে তিনি আসেন কফি হাউসে, বোঁনজুর ত্রিয়ন্তের লেখিকা নিজের জীবনের বিষাদ কাটিয়ে ওঠেন দ্রুত মোটর চালনায়।

আনন্দের রঙ পার্থিব। কিন্তু মরচে পড়া জীবনকে শাণিত দীপ্তিতে ভরে তুলতে পারে আনন্দের এই পার্থিবতা।

বায়রণের ডন জুয়ানের মত ফরাসীরাই বোধ হয় একমাত্র বলতে পারে—প্লেজার ইজ এ সিন অ্যাণ্ড সামটাইমস সিন ইজ এ প্লেজার।

'See Paris and die'—এই প্রবচনটির যথার্থ রক্ষা করবার জন্য অনেকে মরার আগে প্যারি দেখে যান—এবং প্যারি দেখা শেষ করার আগে দেখে যান প্যারির নাইট ক্লাব। কিন্তু এই সহজ সত্যটি অনেকের মনোবেদনার কারণ হবে যে একমাত্র স্থানমাহাত্ম্য ছাড়া প্যারির নৈশ-ক্লাবের নেই কোন নূতন আকর্ষণ। নগ্ননৃত্য আসরের পাদপ্রদীপ প্যারিতে এখনও উজ্জ্বল কিন্তু লণ্ডনে তা উজ্জ্বলতর। শুধু প্যারি বা লণ্ডন কেন বিশ শতকের এই ষষ্ঠদশকে প্যারির নৈশ জীবন দেখে কেউ বলতে পারেন না সোচ্চারে যে, যা নেই প্যারিতে তা নেই পৃথিবীতে।

ওরা বলে নাইট লাইফ। ট্রাভেল এজেন্সীগুলোর অফিসে বড় বড় করে ঝোলে বিজ্ঞাপন: প্যারিস বাই নাইট। পঁচাত্তর ফ্রাঁর মত দিলে রাতের প্যারিস দেখিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ট্যুরিষ্টকে নিয়ে আসা হয় নৈশ-ক্লাবের দ্বার দেশে। সেখানে যে সাকীরা ক্লান্ত পথিকের হাতে পানপাত্র তুলে দেয়, তার মনের কালিমা আঁখির কাজলে ঢাকা। মঞ্চের নিয়ন আলোতে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে ইভেরা। তারা দর্শকের মনে জাগায় আদিম যুগের দুঃসাহস।

এ জীবন তো শুধু প্যারির নয়। এ জীবন তো শুধু বিশেষ কালের আবিষ্কার নয়। এ প্রবর্তন নয়, বিবর্তন। দিন শুধু কর্মের আর ঘর্মের। আর রাত তা শুধু অনাবিল আনন্দের। উপনিষদের সেই আনন্দ ব্রহ্মেতি নয়—প্লেজার ইজ এ সিন অ্যাণ্ড সামটাইমস সিন ইজ এ প্লেজার।

আর যে ব্যবসায়ে অর্জিত হয় লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা, দেশের প্রগতির জন্য চাই সে ব্যবসায়ের উপযুক্ত প্রটেকশন। তাই রাতের লাল আলো এমনি ভাবে রইবে অনির্বাণ—সে প্যারিতে শুধু নয়, কলকাতা থেকে নিউইয়র্কে, লণ্ডন থেকে হামবুর্গে।

ব্যক্তিগত জীবনে কয়েক ধরণের আপাতবিরোধের দৃশ্য আমার সাধারণত হাস্যোদ্রেক করে থাকে। প্রথমে বলে রাখা ভাল যে মনোধর্মে আমি পিউরিটান নই; কিন্তু বজ্র আঁটুনির সঙ্গে ফস্কা গেরোর অসঙ্গতি আমার চক্ষুকে বড় পীড়া দেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, যদিও ঘোমটা নাচ বস্তুটি আমার কদাচ দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তবু কোন তরুণীকে যদি নৃত্যরতা দেখি তা'হলে তাকে দেব না অভিসম্পাত, কিন্তু যদি তার মুখে দেখি অবগুণ্ঠন তাহলে প্রশংসা করতে পারব না তার সততার।

তেমনি আদিম রিপু চরিতার্থতার জন্য যদি কেউ স্ট্রীপটিশ শোতে যান এবং তা স্বীকার করার যদি থাকে সংসাহস তাহলে তাঁকে আর যাই বলি, বলব না হিপোক্র্যাট, কিন্তু যিনি বলেন প্যারিসের নগ্ননৃত্যের মধ্যে আছে মহত্তম আর্ট এবং আর্টপ্রেমিকের শুচিস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তিনি যান নৈশক্লাবে, তাহলে বেন জনসনের ভাষায় সেই হতভাগ্যের উদ্দেশ্যে বলব এঁরা গৃহের ভিতরের অবাধে পাপাচার চাপা দেবার জন্যই গৃহের বাহিরে ক্রুশ টাঙান।

ল্যাটিন কোয়ার্টার্সের সেন্ট মাইকেলের এক কফি খানায় কমলেশবাবু দেখা করতে বলেছিলেন। সময় রাত দশটা।

কলকাতার ট্রামে বাসে সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সমান ভিড় দেখে আমি একদা অনুমান করেছিলাম, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আছেন যাঁরা ট্রামে বাসেই বসবাস করে থাকেন। প্যারির কফিখানা সম্পর্কেও এই ধারণার সমর্থন মিলল। সকাল ন'টার সময় দেখে গেছি শহরের কফি হাউস জম-জমাট। রাত্রি দশটার সময় এসে দেখি ভিড় কমেনি এতটুকুও।

আমার মনে হয় ফরাসীদের জাতীয় জীবনে কাফের প্রভাব—এ সম্পর্কে কেউ যদি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা করেন, তা হ'লে সমাজ বিজ্ঞানের একটি নূতন দিক উন্মোচিত হবারই সম্ভাবনা।

ফ্রান্সের বহু গৃহে বৈঠকখানা হয়ত' আছে, কিন্তু বৈঠক নেই। সে বৈঠক কাফেতে। কারুর সঙ্গে দেখা করতে হবে এস কাফেতে, নতুন প্রেমিকার সাথে প্রথম ডেট সে নহে পার্কের কুঞ্জছায়ায়, এস যে কোন কাফেতে, প্রবীণ অধ্যাপকের কাছ থেকে রিলেটিভিটির তত্ত্ব বুঝতে হবে, তার পক্ষে গ্রন্থাগারের চেয়ে কাফেই প্রশস্ততর।

আর প্যারির এমন একটি রাজপথ নেই যেখানে কাফে নেই, এমন কাফে নেই যেখানে নেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নর-নারীর ভিড় আর এমন নর-নারী নেই যিনি কফির পাত্রে না তোলেন সাহারার মরা ঝড়।

কমলেশবাবু সোল্লাসে জানালেন অভ্যর্থনা। বললেন: প্যারি দেখা শেষ হ'ল আপনার?

বললাম: এখনও অনেক রয়েছে বাকী। আর ট্যুরিস্টের দেখা নয় তো তা গোগ্রাসে গেলা। তাতে খাদ্যের স্বাদ হয়ত পাওয়া যায় কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না।

তবু যা দেখে ট্যুরিস্টরাই দেখে। প্রায় দশ বছর রয়েছি প্যারিতে এখনও অনেক কিছুই দেখিনি।

কমলেশবাবুর কথায় মনে পড়ল লণ্ডনে আমার এক ইংরাজ বন্ধুকে। তিনি টাওয়ার অব লণ্ডন দেখেছেন ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেণ্ট থেকে। লণ্ডন জু দেখেছেন ছবিতে। আর কলকাতার দর্শনীয় বস্তু একজন মার্কিণ ট্যুরিস্টের তুলনায় আমরা ক'জনই বা দেখেছি? আমার নিজের কথাই বলতে পারি আমি লণ্ডনের রাসেল স্কোয়ার চিনি কিন্তু কলকাতার রাসেল স্ট্রীটের ঠিকানা অন্বেষণে আমাকে হাতড়াতে হবে পথানির্দেশিকা। হাইড পার্কে আমার কেটেছে অনেক সন্ধ্যা-সকাল, কিন্তু কলকাতার রিজেণ্ট পার্কে আমি হ'ব নবীন আগন্তুক।

...ধু এর জীবনে এটিই সত্য নয়। গীর্জার নিকটে যার আবাস, ঈশ্বরের সঙ্গে দূরত্ব, তারই সর্বাধিক।

আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতা যেখানে গেছে সে সর্বাপেক্ষা নিয়ে গেছে দুই বস্তু। ক্রুশ আর মদ। ইওরোপীয়ান কলোনীতে আবাস ভবনের অতিরিক্ত প্রথম যে বাড়িটা হয়েছে তা হ'ল গীর্জা, আর দ্বিতীয় যে বাড়িটা হয়েছে তা শুঁড়িখানা।

শুনেছি সুরাসক্তদের মধ্যেও নাকি কৌলিন্য প্রথা আছে। পাকা সিঁদেল চোরের কাছে সামান্য গরু চোরের যে সঙ্কোচ, এক বোতলের কাছে এক পেগের লজ্জা তারই অনুরূপ। প্রচুর পরিমাণ পানের পরও যিনি স্বাবলম্বী অর্থাৎ নিজের পায়েই দাঁড়াতে সক্ষম, তিনি মাতাল সমাজে সর্বত্র পূজ্যতে।

ইওরোপের সুরাসক্ত সমাজে ফরাসীদের প্রতি সকলের তাই অচলাভক্তি। ইওরোপে সংখ্যার অনুপাতে এমন কোন দেশ আছে কি-না তা অজানা, যেখানে প্রতি বছর দেড়শ' মিলিয়ন গ্যালন মদ বিক্রি হয়। ফরাসী দেশে বিশ লক্ষ ব্যক্তি প্রত্যহ দুইবারের অধিক মদ্যপান করে থাকেন।

১৯৫৭ সালের হিসাব জানি। ফ্রান্সে ছয় হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে মদ্যপানের অমিতচারিতায়। এগার হাজার ব্যক্তি ভুগছেন লিভারের তাড়নায়।

কাফেতে কফির সঙ্গে চলছে বিয়ার পরিবেশন। বহু ফরাসী রেষ্টুরেন্টে এই কথাটি লেখা থাকে—A meal without wine is like a day without a sun-এর দ্বারা মদ্যপানের প্রতি সরকারী নেকনজরই হয় প্রমাণিত, যা ইংলণ্ডে বহুবিধ বাধা নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কমলেশবাবুকে বললাম: কাফেতেও বিয়ারের পরিবেশন। রক্ত-গোলাপ রঙীন সুরা এদের কাছে সমান প্রিয়।

কমলেশবাবু মৃদু হেসে বললেন: সদ্যোজাত শিশুর মুখে মধুর পরিবর্তে যারা যোগায় শ্যাম্পেন, তারা যে সুরারসিক শুধু নয় সুরসিক এ বিষয়ে সন্দেহ কি!

প্যারিতে যে ক'দিন ছিলাম, তারপর থেকেই সময় পেলেই এসে বসেছি কাফেতে। প্যারির কাফে নয় কলকাতার কফি হাউস। তা নহে, উদিপরা আর্দালির রোষকষায়িত নেত্র দ্বারা প্রপীড়িত, তা অতিক্রমনের জন্য আরোহণেরও প্রয়োজন নেই অ্যালবার্ট হলের সোপান শ্রেণীর। কলকাতার কফি হাউসে প্রবেশের আগে জ্ঞানবাবুর চায়ের দোকানের প্রস্তুতি চাই। উচ্চ-শিক্ষার্থী বিদেশ যাত্রী যেমন বিলাত পাড়ি দেবার পূর্বে সহবৎ শিক্ষা করেন গ্রাণ্ড হোটেলের ডাইনিং হলে।

কিন্তু প্যারির কাফেতে সকলেরই সম অধিকার। কারণ সে কাফে ফুটপাথের ওপরেই। যাতায়াতের পথের ধারে। প্যারি শহরে প্রতি একশত তিয়াত্তর জন পিছু একটি করে কাফে, আর প্রতিটি কাফেতে অন্তত কমপক্ষে পঞ্চাশ জনের আসন। অর্থাৎ প্রায় প্রতি তিনজন প্যারিবাসীর জন্য একটি করে চেয়ার সেখানে সর্বত্র সংরক্ষিত। সংখ্যাতত্ত্ব হ'তে পারে তৃতীয় শ্রেণীর মিথ্যা কিন্তু এ তত্ত্ব পেশাদারী পরিসংখ্যানবিদের কাছ থেকে ধার করা নয়।

পথের ধারে যে দেবালয় সেখানকার দেবতা গণদেবতা। রাজ-বাড়ীর অন্দরে যে মন্দির, প্রাসাদের অভ্যন্তরে যে চ্যাপেল, সেখানে থাক না দেবতার স্বর্ণভূষণ, থাকুন না উচ্চবেতনভোগী পুরোহিত, সেখানে দেবমন্দির ঐশ্বর্যেরই অহঙ্কার।

প্যারির পথের ধারে তাই সাধারণ মানুষ মিলেছে অসাধারণের সাথে। পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র পেঙ্গুইন আর পেলিক্যানের ঢাল-তলোয়ার নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতি অবজ্ঞার ধোঁয়া ছাড়তে পারেনি অ্যালবার্ট হলের জানালা থেকে। প্যারিতে যে তথাকথিত অ্যারিস্টোক্র্যাসি আর অাঁতেলেক চ্যুয়ালিজমের উন্নাসিকতা নেই তা বলছি না। তবে প্যারির প্রতিষ্ঠাবান বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের মাঝে স্থাপিত হয়নি চীনের প্রাচীর। যা আমাদের হয়েছে।

ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল একদা এই কাফে থেকে, বুদ্ধিজীবীদের সেই বাণীকে ইতিহাসে পরিণত করেছিল সাধারণ মানুষেরাই। ফরাসী বিপ্লবের সফলতার প্রশ্ন তুলব না, সর্বাত্মক বিপ্লব এসেছিল এটিই বড় সত্য এবং প্রায় দু'শ বছর ধরে চেষ্টা করেও ভারতের বুদ্ধিজীবীরা সে বিপ্লব আনতে পারেন নি এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। ফ্রান্স ও ভারত এ দু'টি দেশবাসীর জাতীয় চরিত্রে এত মিল থাকা সত্ত্বেও এখানেই এ দুই দেশের মধ্যে রয়ে গেল পার্থক্য।

ওয়েস্টেন খ্যাত প্রাবন্ধিক থোরো তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন, যাঁরা সংবাদপত্র পড়েন না, তাঁরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পান। আমার বহু সাংবাদিক বন্ধু'কে জানি, যাঁরা থোরোর ভাষায় ঈশ্বরের আশীর্বাদপুত্র।

কিন্তু সংকোচের সঙ্গে আমার একথা স্বীকার করতে হয় যে, প্রভাতে উঠিয়া আমি দিন ভাল যাবার জন্য যে মুখটি দেখতে সদা অভ্যস্ত তা'হল সংবাদপত্রের। বলা বাহুল্য বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার যতখানি মাথা ব্যথা তার চেয়েও বেশী কৌতুহল। এ কৌতূহলের অনেকখানি যে বৃত্তির খাতিরে সেটি বলে রাখি চুপি চুপি।

প্যারিতে এসে ব্যস্ততার চাপে কয়েকদিন সংবাদপত্র দেখতে পারি নি। সপ্তাহের সংবাদ ক্ষুধা মেটাবার জন্য কিনলাম একটি অবজারভার। দাম নিল দ্বিগুণ। চ্যানেল অতিক্রমের মাশুল। সংবাদপত্রের ষ্টলের চারপাশ ঘিরে বেশ ভিড়। এরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে ষ্টলের কাগজ থেকে ব্যানার হেড লাইন গিলছে। অতি সাহসী দু'একজন ষ্টলে রক্ষিত সংবাদপত্রের অন্য পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য সংবাদগুলি স্বল্প ফাঁক করে পড়ে নেবার চেষ্টায় নিরত। পয়সা দিয়ে কিনে পড়বার চেয়ে ফোকোটিয়া পড়ে নেবার লোকের সংখ্যাই অধিক। আমাদের সঙ্গে ফরাসীদের এ বিষয়ে মিল দেখে আনন্দিত হলাম।

এতগুলো ফালতুর মাঝখানে নগদ খদ্দের আমাকে দেখে ষ্টলের বৃদ্ধা খুব খাতির করে অবজারভারখানি এগিয়ে দিলেন। তার মুখের ভাষা গেল না বোঝা, চোখের ভাষা জানাল: তিনি আনন্দিত।

সামনের এক কাফেতে বসে সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বুলোতেই দেখা গেল গত কয়েকদিন আগে আলজেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থনে বামপন্থী ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে পুলিশের, তার জের চলছে এখনও। ফরাসী সংবাদপত্রের আজ প্রথম খবর হল আলজেরিয়া।

* * * *

উষর মরুর দেশ আলজিয়ার্স। উত্তরে ভূমধ্যসাগরের অতলান্ত নীলাম্বুরাশি, পশ্চিমে মরক্কো, পুবদিকে লিবিয়া আর দক্ষিণে মালি, ঘানা আর নাইজেরিয়ার কিছু অংশ।

প্রায় ১৫ লক্ষ জন অধ্যুষিত আলজেরিয়ার শতকরা প্রায় একজন মানুষ ইওরোপীয়ান। সংখ্যাতাত্ত্বিকেরা বলেন: আলজেরিয়ার মৃত্তিকার সন্তান মুসলমানদের দ্রুত বংশবৃদ্ধির হার তাঁদের মনে বিস্ময় জাগিয়েছে। বছরে দু'লক্ষ নতুন মানুষের জন্ম দিচ্ছেন আলজেরিয়ার আরব মায়েরা।

আলজেরিয়াতে ফরাসীদের জমিদারীটি পাওয়া উত্তরাধিকার সূত্রে। এ জমি বাপের নয় দাপের। দিগ্বিজয় পর্বটি সমাধা করেছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। সেটি ১৮৬৫ সালের কথা। সেই থেকে আলজেরিয়ার মহালে প্যারির নায়েব বহাল আছেন তাঁর নাম গভর্ণর জেনারেল। জমিদারী তদারকের ভার তাঁর ওপর। প্যারিতে আছে ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি—ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ। আলজেরিয়ার ডেপুটিরা সেখানে বসেন।

আলজেরিয়ার জমিদারীতে দলে দলে এসে জড় হতে লাগল ইওরোপের সাদা মানুষ। আলজেরিয়ার মরুপ্রান্তরে নাকি সোনা ফলে তার নীচেও অনুপম রত্নসম্ভার। ফরাসী সরকার বিজ্ঞাপন দিলেন: সাদা মানুষেরা আলজেরিয়াতে এলেই জমি পাবে, সব রকম সুবিধা পাবে। আলজেরিয়ার আরবদের হাত থেকে অতিরিক্ত জমি হল বাজেয়াপ্ত। সে জমি তুলে দেওয়া হল সাদা মানুষদের। আলজেরিয়ার চাষযোগ্য জমির তিনভাগের এক ভাগই চলে গেল সাদা মানুষদের হাতে। আলজেরিয়ার গম, মদ, সব্জি চালান হয়ে যেতে লাগল ফ্রান্সে। আলজেরিয়ার সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ করে পুষ্ট হতে লাগল সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার দেশ ফ্রান্স।

এদিকে কম খরচে অধিক মুনাফার মোহে আলজেরিয়ার শস্যক্ষেত্রে ইওরোপীয় জমির মালিকেরা আমদানী করেছে ট্রাক্টর।

কৃষি নির্ভর আলজেরিয়ার গরীব কৃষি শ্রমিকেরা রুজি হারাল। প্রতি পাঁচজন কর্মক্ষমের মধ্যে একজন করে বেকার হ'ল। আরও প্রায় পাঁচলক্ষ আংশিক সময়ের শ্রমিকের কাজ গেল।

বিক্ষোভের আগুন জ্বলতে লাগল ধিকি ধিকি।

১৯৪৭ সালে ফরাসী সরকার আলজেরিয়ার আইন সভার প্রতিষ্ঠা করলেন। এক ধরণের ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস। তথাকথিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন ফরাসী সরকার? আইন সভার অধিকার ছিল সীমিত এবং নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করত শ্বেতাঙ্গরাই। আইনসভা ক্রমশ পরিণত হল তাদের বৈঠকখানায়?

আরব জাতীয়তাবাদীরা বয়কট করল আইনসভা। জাতীয়তাবাদের মন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকল আলজিয়ার্সের মর। প্রান্তর থেকে জনপদে। প্রাসাদ থেকে গৃহকোণে।

ফরাসী সরকার ঘোষণা করলেন: জাতীয়তাবাদ প্রচার করার অর্থ এখন থেকে হবে দেশদ্রোহিতা। আর দেশদ্রোহীর শাস্তি—

কিন্তু সে রক্তচক্ষু প্রশমিত করতে পারল না স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্খা। শাসনের ফুৎকার নেভাতে পারল না জাতীয়তাবাদের আগুন। বরং এতদিন যা জ্বলছিল ধিকিধিকি, দাবানল হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ল আলজেরিয়ার প্রায় সাড়ে আটলক্ষ বর্গমাইল জুড়ে।

সেদিন ১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বর।

তরুণ ফরাসী স্কুলশিক্ষক গাই মনেরট ও তাঁর একুশ বছরের স্ত্রী আলজেরিয়ার পার্বত্য শহর তিফেলা ফেলে এসেছেন ছুটি কাটাতে। এই শহরে মনেরটের জন্ম। নব পরিণীতা স্ত্রীকে সঙ্গে করে স্কুলশিক্ষ এসেছেন অবসর বিনোদনে।

১লা নভেম্বর। এটি ফরাসীদের উৎসবের দিন। অল সেন্টস ডে শিক্ষক দম্পতি ঠিক করলেন তাঁরা যাবেন পাশের শহর আরিসে উদ্দেশ্য ভ্রমণ।

রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে গেল বাস। কি ব্যাপার? অসহি যাত্রীদের কণ্ঠে উত্তাপের সুর হল পরিস্ফুট।

পনেরজন সশস্ত্র মুসলমান ততক্ষণে বাস ঘিরে ফেলেছে। একজ চিৎকার করে উঠল: বাসের ভেতর ফরাসী যারা আছে তারা বেরি এস।

তবু একজন মুসলমান সহযাত্রী বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন গা মনেরট ও তাঁর একুশ বছরের নব পরিণীতা স্ত্রীকে।

কিন্তু পারা গেল না। মেশিনগানের গুলীর আঘাতে লুটি পড়লেন তরুণ শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রী। তাঁর পাশে সেই মুসলমানটিও।

আলজেরিয়ার রুক্ষ পার্বত্য ভূমি রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠল।

সেই প্রথম সূত্রপাত। সেই প্রথম রক্তপাত। আলজেরিয়া যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এ পর্যন্ত বিশ লক্ষেরও অধিক মানুষের জীব নিয়েছে—সে সংগ্রামের অবতরণিকা এমনই রক্ত অক্ষরে লেখা হ ছিল আরিসের উপল-বন্ধুর পথে।

এর পরের অভ্যুত্থান ফিলিপেভিল নামে এক শহরে। এখা জাতীয়তাবাদীরা হত্যা করল শতাধিক শ্বেতাঙ্গকে। জাতীয়তাবাদীদে সংগঠনের নাম 'ফ্রন্ট অব লিবারেশন ন্যাশনালি'—সংক্ষেপে এফ, এল এন। ফরাসী সরকার চার লক্ষ ফৌজ পাঠালেন এফ, এল, এন,-কে

দমন করার জন্ত। কিন্তু হঠে গেল ফরাসী ফৌজ, ওরাল আর কনষ্টানটাইনে কায়েম হল জাতীয়তাবাদীদের অধিকার। তিউনিসিয়া আর মরক্কো থেকে তারা পেল অস্ত্র আর প্রয়োজনীয় সাহায্য। অস্ত্র এল ইস্রায়েল থেকে। চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে। লিবিয়া পার হয়ে ত্রিপলির মধ্য দিয়ে কায়রো থেকে আসা সাহায্য এসে পৌঁছল।

১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে পূর্ব আলজেরিয়ার সৌউমাম উপত্যকার জাতীয়বাদী নেতারা হলেন মিলিত। আলজেরিয়ার স্বাধীন জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠার সংকল্প হল ঘোষিত। দু'বছর পরে ১৯৫৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হল এই অস্থায়ী সরকার। তার হেডকোয়ার্টার—কায়রো। নেতারা বললেন: আলজেরিয়া আলজেরিয়াবাসীর। মাটির সন্তানদের। আমরা মানি না প্যারির প্রভুত্ব।

সমান্তরাল সরকারের অধীনে তখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে স্কুল, হাসপাতাল। নতুন সরকার ট্যাক্স আদায় করছেন। তিউনিসিয়া আর মরক্কো সে সরকারকে স্বীকার করেছেন। কাজেই সে সরকারের একটি প্রতিনিধির আসন হল জাতিসংঘে।

আলজেরিয়া ততদিনে ফ্রান্সের প্রবলেম চাইল্ড। এর আগে ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মেন্দেস ফ্রাঁসের মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। তার কারণও আলজেরিয়া। ফ্রাঁসের পশ্চিম আফ্রিকার নীতিগুলি প্যারির জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের মনঃপুত হয়নি।

কিন্তু সমস্যার তাতে সমাধান হল না।

আলজেরিয়ার বিরাট ফৌজি ব্যয় মেটাতে করের বোঝা চাপাতে হল ফ্রান্সের মানুষের ওপর। হিসাব করে দেখা গেল বছরে এর জন্তে খরচ পড়ছে ৭০ কোটি পাউণ্ড।

আলজেরিয়ার প্রশাসন ভার বেসামরিক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকটে হল হস্তান্তরিত। সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্বিচারে হত্যা সুরু করে দিলেন। আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্য করে তাঁরা বোমা বর্ষণ করলেন তিউনিসিয়ার গ্রামে। নিরীহ গ্রামবাসীদের রক্তে প্লাবন বহে গেল। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতি কটাক্ষ করল এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও।

ফরাসী জাতীয় পরিষদের সদস্যরা বললেন: অমন ভাবে নির্বিচারে হত্যা করে নয়। এফ· এল· এন· এর কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বন্ধ করতে হবে এ সংগ্রাম।

কারণ এ পর্যন্ত দু'লক্ষ দশহাজারের মত আলজেরিয়ার মুসলমান ততদিনে প্রাণ দিয়েছে। দেড় লক্ষের মত শ্বেতাঙ্গ নিহত হয়েছে। তিন লক্ষের মত আলজেরিয়ার মুসলমান পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে। মোট জনসংখ্যার শতকরা দশভাগ বিধ্বস্ত এলাকাগুলি ছেড়ে নিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়।

১৯৫৮ সালের মে মাসে প্যারির মন্ত্রিসভার আবার পরিবর্তন হল। এবার প্রধান মন্ত্রী হলেন জেনারেল দ্য গল। ১৯৪৪ সালে জার্মাণীর কবল থেকে সদ্য মুক্ত ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকারের প্রধান মন্ত্রীও ছিলেন দ্য গল।

মুমূর্ষু আলজেরিয়ার তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। আলজেরিয়াতে ফ্রান্সের সামরিক শাসনের অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল সালান। আলজেরিয়ার ফরাসী বসবাসকারীদের সমর্থনপুষ্ট জেনারেল সালান অকস্মাৎ ঘোষণা করলেন: আলজেরিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফরাসী সরকারের এখন থেকে আর কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা মানেন না প্যারির শাসন। আলজেরিয়ার ফরাসীদের জমিদারীটা এখন থেকে তাঁরা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি হিসাবেই ভোগ করবেন। তারিখটা ১৩ই মে। ১৯৬০ সালের ১৩ই।

আনলাকি থার্টিন।

ফ্রান্সের এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের দিনে আবার আবির্ভাব হয়েছিল দ্য গলের। ১৫ই জুন দ্য গ্যল জাতির উদ্দেশ্যে বললেন: তিনি ফ্রান্সের এই দুঃসময়ে জীর্ণতরীর কর্ণধার হতে রাজি আছেন। ১লা জুন জাতীয় পরিষদ দ্য গলের প্রধান মন্ত্রিত্ব অনুমোদন করল। যদিও তাঁর স্বপক্ষে ৩২৯টি ভোট পড়লেও, বিপক্ষে পড়েছিল ২২৪টি ভোট। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে ১৪৭ জন নাকি ছিলেন কম্যুনিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট-অনুগামী। ছ'মাসের জন্ত জাতীয় পরিষদ ফ্রান্সের সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দিলেন দ্য গলের হাতে।

আলজেরিয়ার ক্যুপ হল দমিত। সালান নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে।

আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্যে দ্য-গল বললেন: যুদ্ধ বন্ধ কর। আমি তোমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেব।

আলজেরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্তে দ্য গলের সামনে তিনটি পথ ছিল খোলা! প্রথমটি হল, আলজেরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা, দ্বিতীয়টি শুধু মাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধিকার, আর তৃতীয়টি হল ফ্রান্সের সঙ্গে আলজেরিয়ার বিলুপ্তি।

দ্য গলের পক্ষে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ আলজেরিয়াকে ফরাসী হাঁবেতে রাখার সমর্থনে ইতিমধ্যে ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী জনমতের সক্রিয়তা ছিল ক্রমবর্ধমান।

দক্ষিণপন্থীরা বলেছিল: আলজেরিয়া হারানো মানেই ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবনের অবক্ষয়ের সুরু। উদাহরণ দিয়ে তারা বলেছিল, আলজেরিয়া হাত ছাড়া হ'বার এক হপ্তার মধ্যেই রেনাল্টে আমাদের বিরাট মোটর কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। তেল, কয়লা আর লোহার খনিসমৃদ্ধ আলজেরিয়ার ওপরই আজ নির্ভর করছে ফরাসী জাতির ভবিষ্যৎ।

দ্য গলের এই সর্তে রাজি হতে পারেনি এফ, এল, এন। ১৯৬০ সালের ১৪ই জুন আবার তাদের আহ্বান জানালেন দ্য গল। তিনি বললেন: আলজেরিয়ার ধীরে ধীরে স্বাধীনতা অর্জনের পথে এই আত্মনিয়ন্ত্রণই হবে প্রথম পদক্ষেপ। তবে তার আগে যুদ্ধ থামাও। এফ, এল, এন-এর হেডকোয়ার্টার্স থেকে উত্তর এল: 'নো'।

তবু আর ক'দিন পরে ২৪শে জুন আর একটি আশার আলো যেন হল উদ্ভাসিত। শোনা গেল, এফ, এল, এন-এর দু'জন মানুষের এক প্রতিনিধিদল প্যারিতে আসছেন আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে। তাদের একজন হলেন ফেরহাড আব্বাস। আলজিয়ার্সের অস্থায়ী সরকারের প্রধান ব্যক্তি। প্যারিসের কাছে মেলুনে বসল গোপন বৈঠক।

কিন্তু না। বৈঠকের শেষে প্রতীক্ষারত সাংবাদিকদের কাছে প্রতিনিধিদের ঘোষণা করলেন: বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয় আমাদের সঙ্গে বন্দীদের মত ব্যবহার করা হয়েছে।

তার কয়েকমাস পরেই প্যারির পথে বামপন্থী ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের এই সংঘর্ষ। শুনলাম : আলজেরিয়ার স্বাধীনতার সমর্থনে আন্দোলনে নেমে পড়েছেন বুদ্ধিজীবীরাও। তাঁদের মধ্যে প্রধান—জাঁ পল সার্ত্র।*

যে শহরে ভূগর্ভস্থ রেলপথ আছে সেই শহরে আর যাই হোক পথিকের পথ হারাবার ভয় থাকে না। সন্ধ্যার আধা আলো আধা অন্ধকারে সেইন নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে কতদূরে যে চলে গিয়েছিলাম তা খেয়াল ছিল না। সম্বিৎ ভাঙল একটি মেট্রো দেখে। তৎক্ষণাৎ দ্বিধাগ্রস্ত ধরণীর জঠরে করলাম আত্মসমর্পণ।

নীচে নেমে দেখলাম প্যারির যান-বাহনগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য শুধু বহন করাই—যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য দান নয়, নয়নের তৃপ্তিদান তো নয়ই। তা না হলে প্যারির বাসগুলিকে দেখে একাব পরিবর্ধিত সংস্করণ বলে মনে হবে কেন। কেনই বা লণ্ডনের টিউবট্রেণগুলির প্যারির টিউবের ওপর করুণা হবে?

তবে প্যারির টিউবট্রেণ লণ্ডনের মত জনতা এক্সপ্রেস নয়। এখানে পুরোপুরি ক্লাশ সিষ্টেম। দুটি ক্লাশ—প্রথম ও দ্বিতীয়।

তবে চলন্ত ট্রেণে উঠে যাঁরা সিভালরি দেখাতে চান তাঁদের পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে লণ্ডন, কিন্তু প্যারিস নয়। কারণ প্যারির টিউব ষ্টেশনে ট্রেণ আসা মাত্রই ষ্টেশনে প্রবেশের দ্বার আপনা আপনি যায় বন্ধ হয়ে। প্ল্যাটফর্মে যাঁরা এসেছেন তাঁদের নিয়েই ছাড়ে ট্রেণ।

ট্রেণে উঠে আবার সংবাদপত্রখানি মেলে ধরলুম চোখের সম্মুখে। আশে পাশে অনেক সহযাত্রীর হাতেই সান্ধ্য দৈনিক। তাতে প্রথম পৃষ্ঠাতেই তিন কলমের যে ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে সে ছবি আমার অত্যন্ত পরিচিত। তা জেনারেল দ্য গলের। সেই দিনই আলজেরিয়ার ওপর তাঁর সবচেয়ে বলিষ্ঠ বিবৃতি সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। জেনারেল দ্য গল নাকি বলেছেন, তিনি অদূর ভবিষ্যতে নিজে রাজি আছেন আলজেরিয়া সফরে যেতে।

কিছুদিন আগে প্যারির শীর্ষ সম্মেলনে ক্রুশ্চভের চাঞ্চল্যকারী বক্তৃতার পর দ্য গলের এই সাম্প্রতিক ঘোষণা প্যারির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। দেখলাম আলাপচারী ফরাসী জাতি গল্প বন্ধ রেখে ঝুঁকে পড়েছে সংবাদপত্রের ওপর। কারণ তাদের নেতার ওপর তাদের ভরসা আছে।

প্যারির আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য সম্পর্কে একটি কৌতুক প্রচলিত আছে। চন্দ্রলোক থেকে একদা এক ব্যক্তি প্যারিতে অবতরণ করে প্রথম যে ফরাসীর সাক্ষাৎ পেলেন, তাকে বললেন: তোমাদের নেতার সঙ্গে পরে আলাপ করব, আমাকে আগে নিয়ে চল ব্রিগেট বারদত-এর কাছে।

কিন্তু শপথ করে বলতে পারি চন্দ্রলোকের সেই যাত্রীটির যদি ইদানীং প্যারি আগমন ঘটত, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, তোমাদের নেতার কাছে আমাকে আগে নিয়ে চল। পরে দেখা করব ব্রিগেট বারদতের সঙ্গে। কারণ ফরাসী জাতির নেতার নাম এখন দ্য গল। আর দ্য গলই ফ্রান্স।

কথাটি দ্য গল একদা নিজেই বলেছিলেন। প্রথমবার যখন ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন সে সময় তাঁর পুরণো দিনের একটি ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন: এটি হচ্ছে সে সময়ের ঘটনা, যখন আমিই ছিলেম ফ্রান্স। আর একবার ১৯৬১ সালের গণভোটে দ্য গলের আলজেরিয়া নীতির জয়লাভে আনন্দিত হয়ে দ্য গলের এক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন: জনসাধারণকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

বিস্মিত দ্য গল বলেছিলেন: হাউ ক্যান ফ্রান্স থ্যাঙ্ক ফ্রান্স? তবু আলজেরিয়া সংকটের ঝটিকাবিক্ষুব্ধ দিনে তাঁর দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আবির্ভাবের পর তাঁকে স্বাগত জানিয়ে ফরাসীরা যে চিঠি লিখেছিল, তার সংখ্যা পাঁচ সহস্র। দ্য গল উত্তর দিয়েছিলেন প্রতিটি পত্রের। এবং শুধু তাই নয় প্রতিটি পত্রদাতাই যে উত্তর পেয়েছিল তা দ্য গলের স্বহস্ত লিখিত।

দ্য গলের অহঙ্কারই তাঁর আত্মবিশ্বাস। আন্তর্জাতিক ঠাণ্ডা যুদ্ধের সরোবরে পরমানন্দে সাঁতার কাটার কোন স্পৃহাই তাঁর দেখা যায়নি। তাঁর কাছে ফ্রান্সের সমস্যা শুধু বড় সমস্যা নয়—একমাত্র সমস্যা। কারণ দ্য গল এই ফরাসী শব্দটির ইংরাজী অর্থ হল 'সব ফ্রান্স'। আর সেজন্যই বোধ হয় দর্শনের অধ্যাপকের ছেলে হয়ে দ্য গল ভর্তি হয়েছিলেন মিলিটারি আকাদামিতে। কারণ তিনি ভেবেছিলেন দেশকে সবচেয়ে বেশী যে ভাবে ভালবাসা যেতে পারে তা হল সৈনিকের আকুতি দিয়ে।

কিন্তু সৈনিক হলেও দ্য গল বিশ্বাস করেন তরবারির চেয়ে যা শক্তিশালী তা রাইফেল নয়, লেখনী। কাজেই চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দ্য গলের যে ভাবনা তা তিনি লিপিবদ্ধ করলেন। সবাই বলল: দি আর্মি অব দি ফিউচার বইয়ে দ্য গল নিজেকে শুধু প্রমাণিত করেননি একজন কুশলী সামরিক অফিসার বলে তিনি প্রমাণিত করেছেন।

কূটনীতিতে তাঁর জ্ঞান প্রগাঢ় ও সুদূর প্রসারী। ১৯৪০ সালের ১৮ই জুন প্যারির পতন হল। দ্য গল তখন জেনারেল। ফ্রান্সের তরুণতম জেনারেল নাজি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নিশ্চিন্ত পরিণতিকে পারলেন না মেনে নিতে। কাজেই কপর্দকশূন্য অবস্থায় একাকী তিনি প্যারি[illegible]

* এই গ্রন্থ লেখার সময় আলজেরিয়া সমস্যার সমাধান প্রায় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। ১৮ই মার্চ ১৯৬২ রাত্রিতে এভিয়ানে ফরাসী সরকার ও আলজেরিয়ার অস্থায়ী সরকার তথা জাতীয়তাবাদীদের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির ফলে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে। ঠিক হয়েছে, আলজেরিয়া ফ্রান্সের অংশ বলে স্বীকৃত হবে বটে, তবে আলজেরিয়ার নিজস্ব মুদ্রা ও বাণিজ্যের অধিকার থাকবে। এ ছাড়া আলজেরিয়ার সার্বভৌমত্বও এই চুক্তিতে স্বীকৃত হয়েছে। দ্য-গলের এই আলজেরিয়ার নীতিটি গণভোট মারফৎ ফরাসী জনসাধারণের সমর্থন অর্জন করেছে? কিন্তু আলজিয়ার্সে প্রাক্তন শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের লুপ্ত সংগঠন ও, এ, এস যারা আলজেরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রনের বিরোধী তাদের সঙ্গে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের সংবাদ এখনও শোনা যাচ্ছে—লেখক।

কিন্তু দ্য গল জানেন সুপ্ত সিংহের মুখের ভেতর মৃগেরা কোনদিনই আসে না স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। তিনি বললেন, ফ্রান্স হ্যাড লস্ট এ ব্যাটেল, নট এ ওয়ার। ফরাসী সৈন্যদের মুক্তিযুদ্ধের অবিরাম অনুপ্রেরণা এল লণ্ডনের দ্বৈপায়ন থেকে। ১৯৪৪ সালে দ্য গল আবার যখন প্যারিতে এলেন বিজয়গর্বে—তখন তাঁর আগের কথাই হয়েছে প্রমাণিত। খণ্ডযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি গেছে মুছে। আসল যুদ্ধে জয় হয়েছে ফ্রান্সেরই।

কাজেই ফ্রান্সের ফোর্থ রিপাবলিকের প্রথম কর্ণধার হলেন জেনারেল দ্য গলই সেই প্রথমবার মাত্র দু'বছরের জন্যে। দু'বছরের পর দ্য গল দেখলেন ফ্রান্সে পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানছে ফ্রান্সের অসংখ্য ছোট ছোট রাজনৈতিক দল। বিরক্ত দ্য গল নিজের দল বাড়ালেন। কিন্তু তাঁর দল অর্জন করতে পারল না সংখ্যা গরিষ্ঠতা।

দ্য গল তাই রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে সাহিত্যচর্চায় নিজেকে করলেন নিয়োজিত। দ্য গল হারিয়ে গেলেন ফ্রান্সের জনারণ্যে।

কিন্তু হারাননি মানুষের মন থেকে, ফরাসীদের হৃদয় থেকে। ১৯৫৮ সালের মে মাসে দ্য গলের আবার ডাক পড়ল। এ আহ্বান ফ্রান্সের জন্য। কাজেই কলোম্বের নির্জন আবাস ভবন থেকে জনারণ্য প্যারির পথে আবার যাত্রা করতে হয়েছিল আটষট্টি বছরের এই যুবককে, কারণ সৈনিক দ্য গল মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন—এ ম্যান ইজ অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ হি ফিলস।

মনে আছে প্যারি ছাড়ার আগের দিন রাত্রে আমার এক নবলব্ধ ফরাসী সাংবাদিক বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলাম, : দ্য গল কি চান?

বন্ধুটি উত্তর দিয়েছিলেন : শুধু সময়। প্যারি থেকে বিদায় নেবার দিন সেইন নদীর তীর দিয়ে যেতে যেতে ভেবেছিলাম, এই নদী শুধু জলস্রোতই হয়নি প্রবাহিত, সেই সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে ইতিহাস। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ফার্স্ট রিপাবলিকের প্যারি, ১৮৪৮ সালের সেকেণ্ড রিপাবলিকের প্যারি, তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের পর থার্ড রিপাবলিক—আজ দ্য গলের ফোর্থ রিপাবলিক, সেইনের জলস্রোত পতন-অভ্যুদয়ের চিত্তাকর্ষক ইতিহাসকে করেছে প্রত্যক্ষ।

বিমান বন্দরগামী বাসে চড়ে সহযাত্রী সেই আমেরিকান মহিলা টুরিস্টটি জনান্তিকে বলেছিলেন : প্যারি দেখা শেষ হয়েছে এই বার মরতে পারি।

বললাম : কী কী দেখেছেন?

তিনি বললেন : দিনের প্যারি দেখেছি, দেখেছি প্যারিস বাই নাইট। দু'দিন ধরে কোচট্যুর নিয়েছিলাম। এমন কি গিয়েছি ভার্সাই।

বললাম : দ্য গলের ফিফথ রিপাবলিক দেখেছেন? মহিলাটি অংকিত ভ্রূযুগ্ম মুক্ত করলেন বটে কিন্তু কথা বললেন না।

বললাম : তাহলে এখন মরবেন না। বাস ততক্ষণে বিমান বন্দরের কাছে এসে পড়েছে। [ক্রমশঃ।

একটি সন্ধ্যা

চিত্রিতা ঘোষ

দুপুরের পড়ন্ত রোদের মাঝে চলেছি
মিষ্টি রোদ্দুর, হাল্কা ঘুম জড়ানো রোদ্দুর
বাস টারমিনাসের কাছে এসে থেমে পড়লেম
চাকার ঘর্ঘর শব্দ আমার মনের আমেজ নষ্ট করে দিল
মিষ্টি রোদ্দুর আর বাসের ঘর্ঘর শব্দ
দু'টো যেন এন্টিথিসিস—
আমি উঠলেম না—পা চক্র চালালেম
ঐ যে দূরে ফিরপোর আলোগুলো না—
সন্ধ্যার আগমনী সঙ্কেত করে একে একে জ্বলে উঠছে—
হ্যাঁ ওখানেই ত' দেখা করবার কথা
হয়ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছে—,
আমি তাড়াতাড়ি চললেম।
তখন চৌরঙ্গীর বুকে চোখ ঝলসানো সন্ধ্যা নামছে
গ্রাম্যবধূর স্নিগ্ধ দৃষ্টি সে জানে না
সাজানো ড্রইং রুমে বসা পালিশ করা মেয়ের মতন
শাড়ি আর প্রসাধনের প্রাবল্যে অবলুপ্ত করেছে স্বাভাবিক সৌন্দর্য
এ কি এই তো ফিরপো না
কিন্তু সে কই?
একদল প্রজাপতির ঝাঁকের মাঝে মিশে আছে
হাসি আর টুকরো কথা কানে এলো
নিজের পানে চাইলেম—বিশ্রী বেমানান,

ডাক

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

ওগো মা, তোমার সুমন গেছে চলে সেই ঝঞ্ঝা-মুখর রাতে
ঘরে ঘরে যবে মগ্ন সকলে নিদ্রিত শয্যাতে;
ভেরী তার কানে বেজেছে কখন—
শুনিনিক' আমি ঘুমে অচেতন,
রক্ত-তিলক ভৈরব এঁকে দিয়ে গেছে তার ভালে:
শোক কোরো না মা, জাতকের এই পুণ্য জন্মকালে।

মারের সাগর সে-যে দিল পাড়ি বিষম ঝড়ের বায়ে,
কূল ছেড়ে গেল সাত-রঙা পালে ভয়-ভাঙা তার নায়ে;
বজ্র গ'ড়ে সে পাঁজরের হাড়ে
চূর্ণ করেছে বিপুল বাধারে
ঘুম ভেঙে আমি শুনেছি তো সেই ঝন ঝন্ ঝঙ্কার
মা, তুমি গর্বে মুখ তুলে চাও, শোক কোরোনাক' আর।

ওগো মা, তোমার সুমন গেছে চলে সেই ঝঞ্ঝা-মুখর রাতে;
লক্ষ সুমন ফিরবে তোমার জয়মালা নিয়ে হাতে।
দুঃখিনী, তুমি চেয়ে থেকো পথে,
আসবেই তারা ভোরের আলোতে,
একটি মশালে দিয়ে গেছে জেলে হাজার মশাল শিখা,
ললাটে সে বল [illegible], বরাভয়—রাজটীকা।

আ
লো
ক
চি
ত্র

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

—অলক সান্যাল
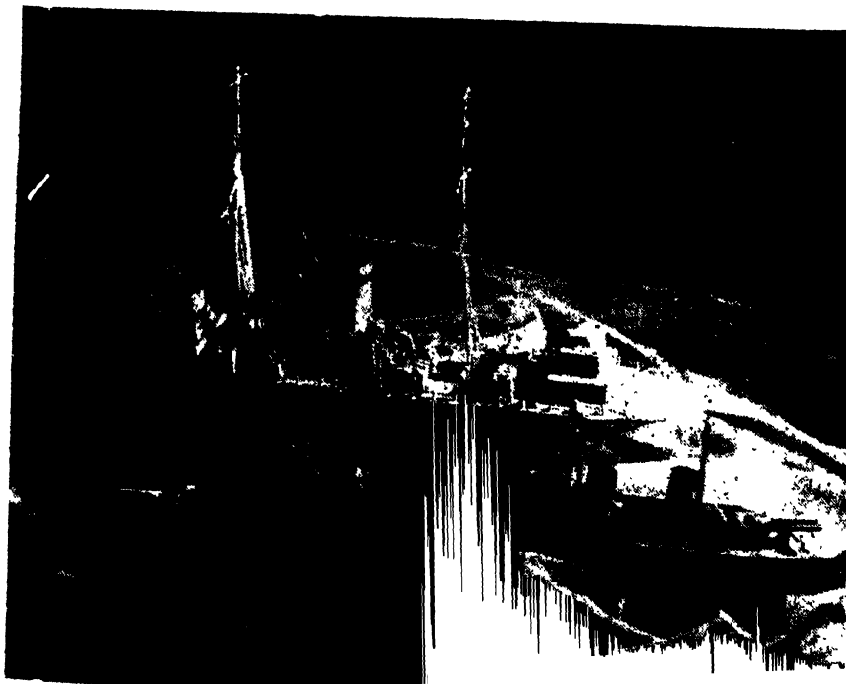
জলযান

—নীরেন অধিকারী

কেশবতী

—ষষ্ঠীরাম দাসমোদক

—আশুতোষ সিনহা

যাত্রা শুরু

—পি. সাহানা

লাক্ষা শিল্প ও ভারত

ভারত বহু সম্পদে সমৃদ্ধ আর লাক্ষা নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। আজকের দিনে এর ব্যবহারিক মূল্য অনেকখানি—ভারতীয় লাক্ষা সর্বত্র সুপরিচিত।

এই লাক্ষা জিনিসটি আসলে কি? একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কীটের দেহ নিঃসৃত রস থেকেই লাক্ষা তৈরী হয়ে থাকে। নানা গাছে এই শ্রেণীর কীটের চাষ হতে দেখা যায়—যেমন বট, কুল, বাবলা, পলাশ, অড়হর প্রভৃতি। গাছের ছালের মধ্য থেকে ঐ কীট যে খাদ্য চুষে নেয়, তার অবশেষটুকু রাসায়নিক রূপান্তরের পর নির্গত হয়। সেই আঠালো রসই ক্রমে লাক্ষা হয়ে দাঁড়ায় আর তখনই তা মানুষের কাজে লাগে।

লাক্ষার ব্যবহার অতীত দিনের তুলনায় এক্ষণে বহুল পরিমাণে বেড়েছে, এ নিশ্চয়। দীর্ঘকাল আগে রং ও ফনোগ্রাফ রেকর্ড তৈরীর কাজে লাক্ষার ব্যবহার ছিল। আজকাল এই লাক্ষা কত প্রয়োজন মিটাচ্ছে, ভাবলে অবাক হতে হয়। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত অনেক জিনিস নির্মাণের কাজে এ না হলে হয় না। কাচের সঙ্গে কাচ, কাচের সঙ্গে ধাতু জুড়ে দিতে হলে লাক্ষাই উত্তম। আলোর বাল্‌ব, বেতার ও টেলিভিশন টিউব, পিয়ানো, ছাপার কাগজ—নানা ব্যাপারে এর ব্যবহার চলতি।

শুধু এই কেন, আরো কত কত কাজে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়ে চলেছে, বুঝি হিসাব নেই। এর একটা বৈশিষ্ট্য অ্যালকহল ছাড়া আর কোন দ্রাবকের মধ্যে এ দ্রবীভূত হয় না—এমন কি, পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদিতেও নয়। বৈদ্যুতিকশক্তির পক্ষে এই সম্পদের ব্যবহার হয় ইনস্যুলেটর রূপে। গ্যাসোফিনের প্রতিক্রিয়া থেকে তৈলবাহী জাহাজকে রক্ষার জন্য জাহাজের ভিতরের দিকে একটি লাল রঙ মাখানো হয়। এই মূল্যবান রঙটিও কিন্তু তৈরী হয়ে থাকে আয়রণ অক্সাইডের সাথে লাক্ষা মিশিয়েই।

সত্যি একটি আশ্চর্য জিনিস এই লাক্ষা, যার প্রয়োজন দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না। অফিস আদালতে এমন কি বহু গৃহ ও কারখানায় কোন না কোনভাবে এর ব্যবহার চোখে পড়ে। তৈল-শিল্পে ও ভেষজ শিল্পেও লাক্ষা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এক ধরণের মুদ্রণ কাগজের ন্যায় ক্যাপসুল তৈরীতে প্রলেপরূপেও লাক্ষার ব্যবহার প্রচলিত। এই জিনিসটি শুকিয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি আর এমনি বিশেষ গুণ থাকার দরুণ ছাপার কালিতেও এ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুদ্রণযন্ত্রের নির্মাণে লাক্ষার যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার, তারও কারণ একই। বিভিন্ন ধরণের খেলনা, কালি, কাঠের আসবাব এ সকল তৈরীর ব্যাপারেও লাক্ষা একটি প্রয়োজনীয় সম্পদরূপে স্বীকৃত হয়েছে। ফটো এনগ্রেভারগন কালার প্লেটের উৎপাদনেও লাক্ষার ব্যবহার করে থাকেন। বৈদ্যুতিক মোটরের রক্ষার ব্যাপারেও এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

একটি মস্ত শিল্প। বলা বাহুল্য, লাক্ষার অন্যতম বৃহত্তম উৎপাদনকেন্দ্র ভারত। এই দেশে বছরে অন্ততঃ ৫০ হাজার টন লাক্ষা উৎপাদিত হয়ে থাকে—বিদেশে রপ্তানী হয় যার একটা মোটা অংশ। এই থেকে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে এবং রপ্তানী যত বৃদ্ধি পাবে ঐ মুদ্রা অর্জিত হবে স্বভাবতঃই তত বেশি।

লাক্ষার উৎপাদন বাড়াবার জন্যে ভারতের অব্যাহত প্রয়াস রয়েছে। রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াতে চাইলেই উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে সমধিক মনোযোগ নিবদ্ধ না করলে চলবে না। এই ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতায় হস্ত সম্প্রসারিত রাখতেই হবে। যতদূর জানতে পারা যায়—ভারতীয় লাক্ষার সবচেয়ে বড় গ্রাহক হচ্ছে আমেরিকা। একমাত্র ১৯৬১ সালেই প্রায় ১০ হাজার টন লাক্ষা ভারত থেকে ঐ দেশে রপ্তানী হয়ে গেছে—যার মূল্য প্রায় ৪৫ লক্ষ ডলার বা ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। লাক্ষার ব্যবহার যাতে করে অধিকতর ব্যাপক করা যায়, সেজন্য গবেষণা-আলোচনা চালাবার অবকাশ নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যায় নি।

খাদ্য সংরক্ষণ—কয়েকটি কথা

শুধু উৎপাদনই বড় কথা নহে—উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ প্রশ্নটিও বেশ গুরুত্ববহুল। সমস্ত মাঠের খাদ্যশস্য এক-দু-দিনেই খাওয়া হয়ে যেতে পারে না, সেজন্যে উপযুক্ত সংরক্ষণ ভাণ্ডার চাই-ই। তা-ছাড়া দেশবিদেশে আমদানী-রপ্তানীর প্রশ্ন আছে, তার জন্যেও খাদ্যশস্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। খাদ্যসামগ্রী ভালভাবে সংরক্ষিত না হলে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার বরাবর আশঙ্কা থেকে যায়।

ঘাটতি এলাকার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এবং পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণাধীন রাখবার জন্যে সরকারকে অনেক সময় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে রাখতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেশের বিভিন্ন স্থলে প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য মজুত-ভাণ্ডার না খুললে চলতে পারে না। ব্যবসায়ীদেরও খাদ্যশস্য মজুতকরণের জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণাগার না পেলে নয় এবং তা প্রচুর সংখ্যায় চাই। এমন কতকগুলো জিনিস আছে, যেমন—আলু, বছরের একটি মরশুমে যা উৎপাদিত হয়, অথচ সারা বছরই এর সমান পরিমাণ চাহিদা থাকে। এই শ্রেণীর পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো হতে হবে, এ বলবার অপেক্ষা রাখে না।

অনেক খাদ্য-সামগ্রীই বাড়ি-ঘরে রেখে ঢেকে খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, অসময়ের জন্যেও মজুত রাখতে হয় অত্যাবশ্যক নানা জিনিস। খাদ্য যাতে অযথা বিনষ্ট বা অপচয় না হতে পারে, উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি যেন ঘাটতি পূরণে কাজে লাগানো যায়, সে-দিকে নজর রাখতে হবে আর তা করতে যাওয়ার অর্থই খাদ্যসংরক্ষণের সুব্যবস্থা করা। এই কর্মসূচীতে অনেকক্ষেত্রেই বেসরকারী উদ্যমের সঙ্গে সরকারী

একথা ঠিক—স্বাধীনোত্তর ভারতে কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার বেশ কতকগুলো খাদ্যশস্য ভাণ্ডার খুলেছেন। গুদাম ঘর কর্পোরেশনের উদ্যোগে দেশে গুদাম ঘরও স্থাপিত হয়েছে একাধিক। ১৯৬১-৬২ সালের হিসাব অনুসারে নতুন গুদাম ঘর নির্মাণ করা হয়েছে ২৩টি। অপরদিকে ১৯৬২ সালের ৩১শে মার্চ কেন্দ্রীয় গুদাম ঘর কর্পোরেশানের অধীনে মোট ৬০টি গুদাম ঘর চালু ছিল। ঐ সময় খাদ্য শস্য মজুতের পরিমাণ ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। গুদামজাত পণ্য যখন যতটা প্রয়োজন সে ভাবে ছাড়া হয়ে আসছে।

কেন্দ্রীয় গুদাম ঘর কর্পোরেশানকে যেমন সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন রাজ্যের গুদাম ঘর কর্পোরেশানগুলোও অনেকখানি তৎপর। ১৯৬১-৬২ সালের কথাই ধরা যাক ঐ বছরে তাঁদের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় ৮৩টি নতুন গুদাম ঘর নির্মিত হয়েছে। রাজ্য সমূহের এই গুদাম ঘরগুলোতে মজুত খাদ্য শস্যের পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ ৬১ হাজার টন। ১৯৬২ সালের ৩১শে মার্চ গুদাম ঘরের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩২। কৃষক সমাজের নিকট এই সকল খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ভাণ্ডারের মূল্য খুব বেশি—খাদ্য কোথায় মজুত রাখতে হবে, গুদাম ঘর কাছে পেলে এই চিন্তাটি তাদের করতে হয় না।

সম্পন্ন মহলে এমন অনেক বাড়ি আছে, যেখানে রিফ্রিজারেটরে তৈরী খাদ্য রেখে দেওয়া হয়। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এই ব্যবস্থার অত্যধিক প্রচলন। খাবার জিনিস ঠাণ্ডা কক্ষে সংরক্ষিত থাকলে চট্ করে নষ্ট হতে পারে না। মহানগরীতে নামকরা খাবারের দোকানগুলোতে আজকাল রিফ্রিজারেটর দেখতে পাওয়া যায় পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি। বড় বড় ওষুধের দোকানেও ওষুধ-পত্র ঠাণ্ডা কক্ষে রাখবার ব্যবস্থা চালু হয়েছে, যা লক্ষণীয়।

মৎস্যাদি সংরক্ষণে বরফের ব্যবহার আজ থেকে নয়, বহুকাল থেকে এ প্রচলিত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থারও উন্নতি হচ্ছে, সন্দেহ নেই। একই লক্ষ্য থেকে বর্তমানে হিমঘর স্থাপনের উদ্যোগ চলেছে বহির্দেশের ন্যায় এই দেশেও। হিমকক্ষে মজুত রাখা আলু বাজারে বছরের একটি সময়ে ঢেলে বিক্রী হয়। বাঁধাকপি, ফুলকপি—এ সমস্তও অসময়ের জন্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা চলেছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ পণ্যাগার কর্পোরেশান একটি সুবৃহৎ হিমঘর প্রতিষ্ঠা করেছেন—কৃষক ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে যার সুযোগ গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে। রাজ্য পণ্যাগার কর্পোরেশান তৃতীয় পাঁচ-শালা পরিকল্পনাকে আরও দুইটি বৃহৎ হিমঘর স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যাদের প্রত্যেকটির মাল ধারণের সামর্থ্য থাকবে অন্তত: ৫ শত টন। পূর্বে যে হিমকক্ষটি স্থাপিত হয়েছে, সেইটিতে ১·৩ শতাধিক টন মাল বোঝাই করা যায়। আলু সংরক্ষণের জন্যেই এই হিমঘরটি বিশেষভাবে কাজে লাগছে। পাট, ধান ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্য মজুত করণের জন্য কাছাকাছি একটি গুদামঘর তৈরীর বিষয়ও কর্পোরেশন বিশেষভাবে ভাবছেন।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী সংরক্ষণেরও বিভিন্ন ব্যবস্থা চালু আছে। সমৃদ্ধ ও অগ্রসর দেশগুলোতে এই দিকে প্রচেষ্টার অন্ত নেই। এই দেশেও সেই দিক থেকে নানা চেষ্টা চলেছে। মোটের ওপর, খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা যত উন্নততর হবে,

এদেশের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প

বিদেশী আমলে বলতে গেলে ভারত সবদিক থেকেই পর-মুখাপেক্ষী ছিল। অন্যান্য অনেক-শিল্প সামগ্রীর ন্যায় ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির ব্যাপারেও বাইরের ওপর তাকে নির্ভর করতে হতো—যা মোটেই অগ্রগতির লক্ষণ নয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সে অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে—এক্ষণে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ক্ষেত্রেও ভারত একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

নব ভারত গঠনের জন্য প্রচুর সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার চাই, এই দাবীটি বেশ স্পষ্ট। ভারতের প্রধান মন্ত্রী (শ্রীনেহরু) থেকে সুরু করে নেতৃস্থানীয় অনেকেই এর ওপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন সেই লক্ষ্য থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন করে কয়েকটি ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাকেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু কথা হলো—দলে দলে ইঞ্জিনীয়ার ও দক্ষ কারিগর সৃষ্টি হলেই কি সকল সমস্যা মিটে গেলো? ইঞ্জিনীয়ারের কার্য-পরিচালনার জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতিও নিশ্চয়ই পেতে হবে। হাতিয়ার ছাড়া কারিগর কি কাজ করবেন? শুধু নক্সা অঙ্কনই নয়, নক্সার বাস্তব রূপদান সম্ভবপর না হলে কিছুই হলো না।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সামগ্রীর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় উৎপাদনের জাতীয় সরকার তারই জন্যে সমধিক জোর দিয়ে চলেছেন। ক্ষুদ্র মাঝারী ও ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানাও ক্রমে গড়ে তোলবার উদ্যম চলেছে। ইতোমধ্যেই। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প যতটা উন্নতিলাভ করেছে, তাতে যথেষ্ট আশা রাখা যায়। এই শিল্পের উন্নয়ন বিধানের দাবী থেকেই জাতীয় পরিকল্পনাতেও এর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মোট কথা ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে আজকের ভারত আদৌ পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। এখানে পর্যাপ্ত কাঁচামাল রয়েছে, যাতে করে বহু রকমারী শিল্পসম্পদ সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষভাবে প্রয়োজন যেটি—ঐ কাঁচামাল চাহিদা অনুযায়ী সংগ্রহ ও তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার। আর একটি দিকে লক্ষ্য না রাখলে শিল্পের নিশ্চিত অগ্রগতি হয়ে ওঠা কঠিন। দেশীয় কল-কারখানাগুলোতে যতদূরসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পদ্রব্য ব্যবহৃত হওয়া চাই। আর সব ব্যাপারে যে কথাটি বলা চলে, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের বেলাতেও তা প্রযোজ্য। আমদানীর পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে হবে, বাড়াতে হবে রপ্তানী। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় যে শিল্পসামগ্রী তৈরী হবে, তার মান যেন বিদেশী শিল্প বা যন্ত্রপাতির চেয়ে নিচু না হয়ে যায়।

লক্ষ্য করবার যে, ভারতে উৎপাদিত ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যসামগ্রী বাইরে এরই ভিতর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সাইকেল, সেলাই কল, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ডিজেল ইঞ্জিন, মোটর ও রেলওয়ে সরঞ্জাম, টাইপরাইটারস, বস্ত্রকল প্রভৃতির রপ্তানী ব্যাপারে ভারত আজ বেশ অগ্রণী। একটি নির্ভরযোগ্য হিসাব অনুসারে ১৯৬১ সালে এই দেশ থেকে প্রায় ৭ কোটি নয় লক্ষ টাকার ইঞ্জিনীয়ারিংশিল্প রপ্তানী হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত উল্লিখিত শিল্পদ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল প্রায় পাঁচ কোটি টাকার মতো। ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী রপ্তানীর ব্যাপারে ভারত ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগও তার স্বভাবত:ই বাড়ছে। ইঞ্জিনীয়ারিংশিল্পে ভারতের এই অগ্রগতি সরকারী প্রযত্ন ও সহযোগিতায়

দু'দিন সমানে ঽ চলেছে; আজ সন্ধ্যায় আর বাড়ী থেকে বেরুবার উপায় নেই। যা কিছু অবশ্য-কর্তব্য কাজ ছিল—যেমন বাজার করা, পাঁউরুটি আনা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া এবং বড়ি আর মিকশ্চার আনা—সব সেরে, কাপড়-জামা ছেড়ে, বিভাস যখন নড়বড়ে চেয়ারে পা দু'টি তুলে উবু হ'য়ে বসল তখন পাশের চৌকিতে এ পাশে একজন আর ও পাশে একজন অসুস্থ ছেলেমেয়েকে আপাতত ঘুম পাড়িয়ে বিভাসের স্ত্রী চামেলি বসে পড়ল চৌকির এক কোণে। বিভাস চোখ বুজে বসেছিল। চামেলিকে বিবক্ষু বুঝেও সে কথা শুরু করল না। নিরুপায় চামেলি তখন নিতান্ত বিরক্তিতেই বলে উঠল: 'এই ঘরে ছেলেমেয়েরা কখনই ভালো থাকবে না।'

বিভাস নিরুত্তর।

'একখানা ভালো ঘর খোঁজ না।'

বিভাস নিরুত্তর।

'না হয় কিছু সেলামিই দেওয়া যাবে।'

বিভাস চোখ মেলে তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে।

'ঐ ত' মিনতিরা উঠে গেল বেলেঘাটায় নতুন ঘরে।'

সে কথা বিভাস জানে; অতএব উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

'তোমার পাল্লায় পড়ে আমার বি-এ পরীক্ষাটাও দেওয়া হল না।'

উত্তর নেই।

'তাহলেও একটা মাস্টারি পেতে পারতুম।'

সেই লুপ্ত সম্ভাবনাতেও বিভাসের ভাব-বৈলক্ষণ্য ঘটল না।

'অবিশ্যি বোবার শত্রু নেই।'

সিতাংশু মৈত্র

চামেলি বলল, 'না উঠলে ত' ওষুধ খাওয়ানো যাবে না।'

বিভাস খাটের ওপাশে গিয়ে মেয়ের কপালের তাত অনুভব ক'রে আবার এসে বসল চেয়ারে।

চামেলি এগিয়ে এসে তার পিঠে হাত রেখে অতি কোমল কণ্ঠে আশ্বাস দিল: 'ছেলেপিলের অসুখ-বিসুখ ত' আছেই। তা নিয়ে এত উতলা হয়ো না।'

বিভাস ধীরে ধীরে বলে, 'উতলা হই অনুতাপে। ঐ শিশুরা যে এত ভুগছে সে ত' আর ওদের দোষ নয়। আমরা ওদের জগতে নাও আনতে পারতুম; আনতে চাইও নি। ওরা এসেছে অনাহূত: এসে কষ্ট পাচ্ছে। এ কষ্ট ওদের পাবার কি দরকার ছিল? স্বাগত না হয়েও ওরা এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে কেন?'

'এইজন্যেই মানুষ কপাল মানে। না মেনে উপায় নেই।···· তুমি একখানা ভালো ঘর দেখ।'

বিভাস ফ্যাল ফ্যাল করে চামেলির সস্নেহ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ; তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে দুই হাত মুঠো করে চিবুকের তলায় ন্যস্ত করে চোখ দু'টি বুজল। চামেলি তার কাঁধে হাত দিয়ে ডেকে শুধোল, 'অত ভাবছ কি?'

'একখানা ঘর।'

'ভাবলে কি ঘর পাওয়া যায়?'

'ঘর পাওয়াটা আমার হাতে নয় কিন্তু ভাবনাটা আমার হাতে।'

'তাহলে ভাব। বানুন ত'। ঋষি-টিশি ব'নে গিয়ে মন্ত্রের জোরে একখানা বাড়ী তুলে ফেল রাতারাতি।'

চামেলি চলে গেল ঘর ছেড়ে। তার যাওয়ার ভঙ্গীতে ব্যঙ্গ আর অবজ্ঞা। অথচ একটু আগেই সে সহানুভূতিতে গায়ে হাত বুলিয়েছিল। সে ভালো করেই জানে বিভাসের সামর্থ্য নেই এর চেয়ে ভালো ঘরে যাবার; সামর্থ্য নেই ছেলে বউকে এর চেয়ে বেশী সুখে রাখবার। তবে কি জেনে শুনে ও ন্যাকামি করে, না আপনাকে সান্ত্বনা দেয়।

* * * *

বিভাস উঠে ভিজে কাপড়টা দড়িতে মেলে দিয়ে ফের এসে বসল চেয়ারে; 'উল্টোরথ' পত্রিকার পাতা উল্টে উল্টে সিনেমার অভিনেত্রীদের নানা ভঙ্গীর ছবি দেখতে লাগল। গা জ্বলে গেল চামেলির। সেও কি বিভাসকে বিয়ে করার মত আহাম্মকি না করলে, ফিল্মে অভিনয় ক'রে আজ ঐ উল্টোরথের পটে চিত্রিত হয়ে, শুধু বিভাসের মত স্কুল-মাস্টারের কেন, মাষ্টারদের কর্তাদেরও মনোহরণ করতে পারত না?

বিভাসের দিকে, খাটের এক পাশে শায়িত অসুস্থ ছেলে পাশ ফিরতে গিয়ে কেঁদে উঠল। চকিতে ছেলের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল তার মুখের ওপর বিভাস; হাত বুলিয়ে দিল তার কপালে মাথায়।

* * * *

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে একটু বিরক্ত হ'য়ে ছেলেমেয়ের মাথায় বাতাস করতে থাকে বিভাস। হয়ত' পাড়ার কোন ছাত্র এত রাত্রে অঙ্ক বুঝতে এসেছে। কাল থেকে নির্বাচনী পরীক্ষা শুরু হবে যে।

নিবৃত্তি করেছে এই স্কুল-মাষ্টারির। শিক্ষকতা হল গিয়ে মহৎ বৃত্তি—কত মানুষ গ'ড়ে দিতে হচ্ছে এই হাড়-বের-করা, শির-উঁচু হাত দু'টি দিয়ে। বাতাস করতে করতে নিজের হাতের দিকে তাকায় বিভাস। হ্যাঁ, এই হাত দিয়েই সব দেশনায়ক, শাসক, মনীষী বেরুচ্ছে—পিল পিল ক'রে বেরুচ্ছে আর সে কাঁকড়ার মত বাচ্চার জন্ম দিয়ে সগ্‌গপানে ঠ্যাং উঁচু ক'রে মরতে বসেছে।

ঘরে এসে ঢোকে বিভাসের শ্যালিকা সোমলতা। সে নিজের গাড়ীতেই এসেছে, তাই একটুও ভেজে নি। তবু হাতে ঝুলছে উজ্জ্বল সবুজ রং-এর ওয়াটার প্রুফ।

তার পেছনে তার দিদি চামেলি—যেন জোনাকির পেছনে গুবরেপোকা। মোটরগাড়ি এবং গয়নার সঙ্গে বিয়ে হ'লে চামেলি আর সোমলতায় কোনো পার্থক্যই থাকত না অবশ্য। তা হয়নি কেন না চামেলি ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী হবার প্রথম উচ্ছ্বাসে প্রেম ক'রে বিয়ে করেছিল বাপ-মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও। ফলে এখন চামেলীর চোখে ক্ষোভ, মুখে বোনের তারিফ। এত বড়লোক বোন এত রাতে তার এত গরীব দিদির অসুস্থ ছেলেমেয়েকে দেখতে এসেছে।

এরচেয়ে অঙ্ক কষার জন্যে ছাত্র এলেও যে ভালো ছিল, ভাবলে বিভাস।

বিভাস আপ্যায়িত করে, 'এস।'

সোমলতা বললে, 'তোমাকে কতবার বলেছি বিভাস-দা এই বাসাটা বদলাও। এখানে মানুষের অসুখ করবেই।'

হাতের ফলের চুপড়ি রাখে সোমলতা টেবিলে। এত বেমানান লাগে দামী চুপড়িটা নড়বড়ে পাইন কাঠের টেবিলখানার ওপর।

বিভাস লক্ষ্য করে চামেলি একদৃষ্টে দেখছে সোমলতার কানের দুলের হীরের ঝকমকানি। দয়া হয় তার চামেলি মেয়েটার জন্যে; নিজের জন্যেও বটে। তার নিজের আর চামেলির নিঃশ্বাসের উত্তাপে সোমলতার কানের হীরে বাষ্পীভূত না হয়ে যায়। আচ্ছা, পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশের দারিদ্র্যের বিষ-নিঃশ্বাসে ঐশ্বর্যবানদের সুবিন্যস্ত চুলের একগাছিও এতটুকু যদি স্থানচ্যুত না হয় তাহলে শুধু শুধু বড়লোকদের গালমন্দ, শাপমন্যি করা কেন? এই যে সোমলতা এসেছে, হাজার ঈর্ষা সত্ত্বেও চামেলি সত্যিই কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; কিছুক্ষণের জন্যেও ঘর আর অসুস্থ ছেলের কথা ভুলেছে। বিভাস নিজেও কেমন যেন চাইছে সোমলতা কিছুক্ষণ বসুক।

'বিভাস-দা, দিদিকে একটু গাড়ীতে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব? সারা দিনই রোগীর কাছে বসে আছে ত'।'

চামেলি বললে, 'সে হয় না সুমি। দু'জনেই যদি একসঙ্গে জেগে ওঠে উনি একা সামলাতে পারবেন না।'

বিভাস বললে, 'উঠলেই আমি ওষুধ খাওয়াব; তুমি ঘুরে এস একটু।'

'তাহলে চ' সুমি।'

'কাপড়টা বদলাবি না।'

'নাঃ। যাচ্ছি না ত' কারও বাড়ী।'

'আয়, চুলটা একটু ঠিক ক'রে দি'।'

'না, না, থাক। আয় তুই।'

চামেলিরা চ'লে যেতেই ঘরে শুধু রইল টাইমপিসের টিকটিক আর রুগ্ন শিশুদের দীর্ঘায়িত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।

বিভাস বোঝে নিজের খিদে পেয়েছে। সোমলতার আনা চুপড়ি খুলে দেখে তাতে আপেল, আঙুর, মোজাম্বিক, নাশপাতি—অনেক—ছেলেরা সব খেয়ে ওঠার আগেই পচতে আরম্ভ করবে। কিন্তু আঙুর আর একটা আপেল নিয়ে বসে বটে কিন্তু কামড়াতে গিয়ে দ্বিধায় রেখে দেয় আবার। ওরা খাবার আগেই সে খাবে কেমন করে? চামেলি যখন এসে জিজ্ঞাসা করবে কে খেল তখন তাকে নির্লজ্জ হয়ে স্বীকার করতে হবে। চামেলি মুখ টিপে হাসবে; ভাববে, "ঐ সব ফল অনেক কাল চোখে দেখেনি, তাই সামলাতে পারেনি নিজেকে। স্যাক লাগলে মাও ছেলে পেতে বসে—বাপ ত বসবেই।" কথাটা চামেলি বলবে না মুখ ফুটে, মনে করিয়ে দেবে ঠোঁট উল্টে। সে যে লক্ষ্মীছাড়া এই সত্যটা চামেলি অনুক্ষণ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কি আনন্দ পায় এই স্বামী-পীড়নে? আনন্দ যে ঠিক পায় তা নয়, নিজের ক্ষোভকে চেপে রাখে অপরকে দোষ দিয়ে; নইলে দৈনন্দিন জীবনের নিরবকাশ নিরানন্দে বাঁচে কি করে? জীবনটা যে ঠিক এমনি করে মুখ থুবড়ে পড়ে আর দাঁড়িয়ে উঠবে না এ কথা কি তাদের কেউ ভাবতে পেরেছিল।

চমকে উঠে কাঁদতে থাকে একজন বিছানায়। গায়ের তাত বেড়েছে আরও।

'জল খাবে শোভন?'

'খাব।'

ওষুধ এবং জল খেয়ে পাশ ফিরে শুল সে।

ছেলের মাথা টিপে দিতে থাকে বিভাস। রগ দু'টো দপ্‌ দপ্‌ করছে আক্ষেপে। ঠাণ্ডা জলের পটি যে দেবে তাও সাহস পাচ্ছে না বিভাস। একটা আইসব্যাগ থাকলে হ'ত। চামেলি ফিরে এলে খোঁজ করতে পাঠাবে পাশের ভাড়াটাদের ঘরে। সে ঘরের ভদ্রমহিলা এখন একবার শোভনদের দেখতে এলেও আসতে পারেন। তাহলে সুবিধাই হয়। কিন্তু সুবিধা হয় বলেই এখন হয়ত' তিনি আসবেন না, আবার চামেলি ফিরে এলে তিনবার আসবেন।

'মাথা ব্যথা করছে বড্ড?'

'হ্যাঁ। গরম লাগছে।'

সিকিখানা কোডোপাইরিন খাইয়ে দিয়ে মাথায় বাতাস করতে করতে বিভাস একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে দরজার পানে। দরজার ওপরে দেওয়ালে টিকটিকিতে তেলাপোকা ধরেছে একটা। বৃথাই ছিল ওর পাখা। একটু অসতর্ক হয়েছে আর অমনি ওৎ-পেতে থাকা মৃত্যু ধরেছে ওকে গ্যাঁক ক'রে। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর অবিরাম লুকোচুরি, খেলা নয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা; অবশেষে জীবনের পরাজয়। কিন্তু জয় করে যাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এই ধূলো-মাটি-জল-আলো-ফুলের অঞ্চল থেকে, সে কি মৃত্যু চাইছে ব'লেই এই সব একেবারে পরিত্যাগ করতে পারে? জীবন যদি সত্য হয় তাহলে মৃত্যু মিথ্যা। কিন্তু কি হিসেবে মিথ্যা? তেলাপোকার একখানা পাখা খ'সে পড়ল নীচে। বিভাস করুণায় চোখ নামিয়ে আনল নীচে, মেঝেতে। দরজার পাশ থেকে কে যেন স'রে গেল—ছায়াটা দেখা গেল একটু। ও ঘরের বৌদি এসো ত' এমন ক'রে চলে যেতেন না। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে বিভাসের! ছেলেমেয়ে দু'টির গায়ে নিজের দুই হাত দিয়ে রেখে সে আবার তাকায় দরজার দিকে। শেষে অস্বস্তিতে উঠে দরজার কাছে গিয়ে

মুখ বাড়িয়ে দেখতে যাবে, থপ করে টিকটিকিটা পড়ল মাটিতে তার সামনে। বিভাসের মনে হ'ল এ যেন কোনো উদ্দেশ্যমূলক বাধা—তাকে দেরী করিয়ে দেওয়া।

ভূতে সে বিশ্বাস করে কি না ভেবে দেখে নি কোনোদিন। দেখার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু কলকাতার প্রাচীনতম এক গলিতে কত তার চেয়েও দরিদ্র, ভাড়া-না-দিতে-পারা, হয়ত' উদ্বাস্তু গৃহস্থের কত সন্তানের মৃত্যু হয়েছে এই প্রকাণ্ড ঐশ্বর্যের কঙ্কালমরীচিকাময় শতাব্দীর স্মৃতিজরাগ্রস্ত গৃহের ঘরে ঘরে। কর্পোরেশনের আইন অনুযায়ী বাড়ীখানি condemned, কিন্তু কর্পোরেশনেরই বলবত্তর অলিখিত আইনে এ বাড়ীর চুণ বালি টিকটিকিতে খসালেও মানুষে বা মিস্ত্রীতে খসাতে পারবে না। তিরিশ টাকা ক'রে এক একখানি ঘর। কত ঘর যে বাড়ীখানায় আছে তা বিভাস কখনও গুনে দেখে উঠতে পারেনি কারণ গুনতে হলে কক্ষীভূত বহু বারান্দায় অনধিকার প্রবেশ করতে হয়। ঐ সব ঘরে, বারান্দায়, কোণে, খুপচিতে কত তাদের মত স্বামী-স্ত্রী ঘর বেঁধে, আবার এই বাড়ীখানিরই মত চুণ-বালি খসা দাম্পত্যজীবন নিয়ে চোখের সম্মুখ থেকে স'রে গিয়েছে; যাবার সময় রেখে গিয়েছে কত মৃত সন্তানের, মৃত আশার কঙ্কালগুলোকে বাড়ীময়। সত্যি মানুষ এই যে সুখের আশায় ইঁট কাঠ দিয়ে স্থায়ী আবাস বানায়, ভেবে দেখে না যে কি প্রেতের আবাসের সে পত্তন করে। শুধু কি বাড়ী। এই যে পালংকে তার সন্তানেরা শুয়ে রয়েছে, এই পালংকেরও ইতিহাস মৃত্যুর, জন্মের নয়। এই পালংকের ওপরে কেউ কখনও জন্মায়নি; কিন্তু পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত এই যে পালংকটিকে, ঘষে মেজে পালিশ করে বিয়ের সময় তাকে যৌতুক দেওয়া হয়েছিল, এটির ওপর কত বৃদ্ধের, কত শিশুর জীবনাবসান হয়েছে। যারা মরেছে তারা এরি ওপর ছটফট করেছে এতটুকু হাওয়ার জন্যে—হাঁ ক'রে ক'রে খাবি খেয়েছে—নাভিকুণ্ড থেকে শেষ নিঃশ্বাসটুকু টানবার চেষ্টায় প্রাণটুকু তাদের বেরিয়ে গিয়েছে। এই পালংকের ওপর, ঐ যেখানে তার শিশু দু'টি শুয়ে রয়েছে সেইখানেই একদিকে মাথা আর একদিকে পা ছিল সেই মুমূর্ষুদের। ছেলেদের নাকের কাছে আলগোছে আঙুল ধরে ধ'রে দেখে একটু আশ্বস্ত হ'ল বিভাস। মৃত্যুর ঐতিহ্যবাহী এই জীবনের সব কিছু—কেবলই বলছে মরবে, মরবে, মরবে। তাই কি শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যখন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন তখন সৃষ্টি বা পালনের রূপ না দেখিয়ে শুধু দেখিয়েছিলেন সংহারের রূপ:

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।

এর মধ্যে জীবনের আশা করাই যে বাতুলতা। এই ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে নিউমোনিয়া যে কোন মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে; ইনফ্লুয়েঞ্জাতেই হার্টকে দিতে পারে স্তব্ধ করে।

ছেলে আর মেয়ের বুকে কান পেতে শোনে বিভাস তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি।

এই এতটুকু প্রাণ। কি আকুল তার প্রয়াস মৃত্যুর শক্তিকে পরাজিত করবার জন্যে আর মৃত্যুর কি তীব্র বিদ্বেষ জীবনের ওপর। একটি দেহের অগণ্য জীবকোষ সামূহিক চেষ্টায় ঐ মৃত্যুবীজকে বিতাড়িত করার অক্লান্ত আগ্রহে দেহকে উত্তেজিত করছে—তাপ সৃষ্টি ক'রে তাকে চাচ্ছে বিমর্দিত করতে। মৃত্যুর কিঙ্কর দেহের মাটি কামড়ে প'ড়ে আছে। সহজে সে ছাড়ে না; যদি বা একটু ক'রে দাঁড়ায় শাসায় যে সময় হ'লে আবার আসবে। সে নিশ্চিত। জন্মের চেয়েও মৃত্যু নিশ্চিত। কত ভ্রূণ সৃষ্টি হয় তার ক'টি ভূমিষ্ঠ হয় আর ভূমিষ্ঠদেরও ক'জন বাঁচে? জীবেমঃ শরদঃ শতং, পশ্যেমঃ শরদঃ শতং। এই মানুষের যুগযুগান্তের আকুতি। তবু মৃত্যুই নিশ্চিত, জীবন নয়। মানুষের চেয়ে মানুষের প্রেতই বেশী সত্যি। এইটুকু জীবনের অসংখ্য অতৃপ্ত বাসনারাই, অকিঞ্চিৎকর মুষ্টিমেয় প্রাপ্তিকে ছাড়িয়ে, সারা ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে আছে। তাদের যদি কোনো মূল্য, কোনো সত্য থেকে থাকে তা হ'লে তারা প্রেত হয়েও আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রাখবে, ঘুরে বেড়াবেই একটি দেহের কামনায়। জীবিত দেহের চেয়ে দেহহীন প্রাণের আকুলতাই ত' চরাচর ব্যাপ্ত করে থাকবার কথা। এই বৃষ্টি এত বৃষ্টি এ যেন তাদেরই দুষ্প্রকাশ্য আর্তির অবিরাম উচ্ছ্বাস।

এখনও এল না চামেলি। ঐ যে আসছে—পায়ের শব্দ। না ত'। কারা চ'লে গেল তার দরজা পার হয়ে। এমন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে কারা এতবার আসে যায়। বিভাসের ভয় হয় বাড়ীখানা ভেঙে পড়বে না ত'।

মেয়ে ভয় পেয়ে ককিয়ে উঠল ঘুমের ঘোরে। ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিতে না নিতেই ঘরের, বাইরের সব ইলেকট্রিক আলো নিবে গেল হঠাৎ।

সেই অন্ধকারেই মেয়ে চীৎকার করে উঠল, "ও কে, বাবা!"

"কই মা!"

মেয়ের আর কোনো উত্তর নেই। সে একেবারে চুপ হয়ে গেল বাপের কোলের মধ্যে।

সারা দেহে কেমন কাঁপুনি ধ'রে গেল বিভাসের। ভয়, ভয় পেয়েছে সে। অন্ধকারে কোন ছায়া প্রতীক্ষা করছে বহু দিনের মৃত্যুপুরীর এই ঘরে? কার জন্যে? কাকে ওরা চায়? প্রচণ্ড উদ্বেগ ঠেলে আসে গলার কাছে বিভাসের। মেয়েকে ছেলের পাশেই শুইয়ে বাহু দিয়ে আগলে রাখে; অন্ধকার ভেদ ক'রে দেখবার চেষ্টা করে সে।

আলো জ্বলে ওঠে।

বাড়ীওয়ালা রাত্রি ১টার পর আলো দেয় না। ১টা বাজতে ৫ মিনিট থাকতে একবার সতর্ক ক'রে দেয়; তারপরেই দেয় একেবারে নিবিয়ে। এ সেই সতর্কীকরণ।

সারা গা বিভাসের ভিজে গিয়েছে ঘামে। আলো জ্বলে উঠলেও সে সামলে উঠতে পারে না। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, বিমূঢ় আবেগে সে কেঁদে ফেলে। হঠাৎ মনে হয় এখুনি আবার আলো নিববে।

উঠে হ্যারিকেন লণ্ঠন দু'টো জ্বালতে গিয়ে দেশলাই খুঁজে পায় না কোনোখানে। কোথায় রেখেছে চামেলি। তাহলে আবার ঐ অন্ধকারে থাকতে হবে। এ সবই যেন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ঘটছে বলে মনে হয় বিভাসের। নইলে এমনি ক'রে সব অশুভ অস্বাভাবিকতার মিলন কেন ঘটছে? টর্চ একটা কিনবে ভেবেছিল; তাও হয়ে ওঠে নি। এদের ফেলে দেশলাই বা কিনতে যায় কেমন ক'রে? পাশের বাড়ী থেকে চেয়ে আনবে?

সদর দরজার কাছে মোটর গাড়ি থামার শব্দ হতেই সে আশান্বিত হ'য়ে ওঠে। নিজের এই আকস্মিক আতঙ্কে আর আশায় নিজেরই তার হাসি পায়। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতা সহরের কেন্দ্রে ব'সে, বিজলীবাতি নিবে যাবার ভয়ে সে সন্ত্রস্ত। ত্রস্ত হচ্ছে ছেলেমেয়েদের জন্যে, নিজের জন্যে ত' আর নয়।

নিজে সে অন্ধকারেই থাকে ভালো। ঐ নিয়েই রাতে চামেলির সঙ্গে তার রোজ খিটিমিটি বাধে। একটুতেই বৌ আলো জ্বালে আর বিভাস দেয় ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে।

আলো গেল নিবে; চামেলি ফিরে এল না। আলো নিবতেই বুকটা ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠল। আফশোস হচ্ছে তার একটাও বিড়ি-সিগারেট জীবনে না খাবার জন্যে। একটা নেশা—তাও কি না সে জীবনে ক'রে উঠতে পারে নি। কেবল নিজেকে সব কিছু থেকে রুখে রুখে এই ক্ষীণ প্রাণটুকুকে কোনোমতে বাঁচিয়ে রেখেছে সে—শুধু কি প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে? সে উদ্দেশ্য ত' সিদ্ধ। এখন এদের বাঁচাবার দায়িত্ব তার নয়। যে তাকে দিয়ে তার সচেতন যুক্তিশীলতার বিরুদ্ধে জীবসৃষ্টি করিয়েছে আর এই অপরিমেয় বিশ্বের তৃণ থেকে আরম্ভ ক'রে নক্ষত্র পর্যন্ত সৃষ্টির অবিরাম অর্থহীন ধারা রক্ষা ক'রে চলেছে, সেই দায়ী।

কারণ মানুষ জীবসৃষ্টি করতে চায় না, চায় ভাব সৃষ্টি করতে। শিশুকে যেমন খেলনার লোভ দেখিয়ে কটুকষায় ভক্ষণ করানো হয় তেমনি পুরুষ আর নারীকে স্রেফ দেহের শিহরণে ভুলিয়ে এই জীবোৎপাদনে বাধ্য করা হয়। এটা open secret তবু এখনও এতেই কাজ চলছে। যে মেয়েটির গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে আরও কাছে পেতে চাই তার সঙ্গীত বৈভবে ভরা মনটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হবার জন্যে, সে মেয়ের গান ত' তার দেহের যৌন আবেদন-সর্বস্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নেই। পুরুষের যে ঔদার্যে, যে সরল ঔদাসীন্যে নারী ঘনিষ্ঠ হতে চায়, তার সঙ্গে শিশ্ন-পরায়ণ পুরুষ দেহ'র কি সম্পর্ক? অথচ ঐখানে গিয়েই সেই প্রাথমিক সুকুমার দেহাতিশায়ী ভাবটি মুখ থুবড়ে পড়ে। স্থূল দেহ, রাক্ষসের মত, সেই উপচীয়মান দেবত্বটুকু পরম লালসায় গ্রাস করে—এতটুকু আর অবশিষ্ট থাকে না। চামেলি ফুলশয্যার প্রদোষান্ধকারে, নির্বাণকল্প দীপের আলোয় অতি সন্তর্পণে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি দেখে আপনি আমাকে ভালোবাসলেন?"

রাত্রের প্রথম দিকের কোনো কথার উত্তর চামেলি দেয় নি; তার স্নেহপ্রকাশে সঙ্কুচিত হয়েছে; আদরে দূরে সরে গিয়েছে। এখন শেষ রাত্রে সে আচমকা এই অদ্ভুত কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বসল।

পাশ ফিরে, চামেলির ঘৃতকুমারীর শাঁসের মত নরম স্থিতিস্থাপক হাতের তালুটি ধ'রে তার চন্দনতিলকের ঘের-দেওয়া মুখের পানে তাকিয়ে রইল বিভাস।

সে মুখ সুন্দর।

সে মুখে প্রথম মিলনের অনাস্বাদিত আনন্দের মর্ত্য-ক্লেদ-হীন প্রতীক্ষা। চোখ নিমীলিয়মান। মৃদু আলোয় নীলাভ পক্ষ্মরাজি চোখের স্ফুট দৃষ্টিকে আবেশে ঢেকে দিতে চায়। দু'খানি ঠোঁট একটু খোলা। ও কি আশা করছে একটি চুমো।

'তুমি কি সুন্দর!'

'আর তুমি!'

তখন ভোরের হাওয়া দিচ্ছে। চামেলির কপালের কাছের চূর্ণ কুন্তল দুলছে, কাঁপছে। চামেলি বিভাসের চুল আলগোছে ছোঁয়: 'তোমার চুল কি চাচর!'

বিচিত্র সম্ভারে আর বিভাসের মনের গূঢ় উন্মাদনায় রচিত হয় যে আকুল আনন্দলোক, তা মানুষকে দান করে অপার্থিবত্ব—ভুলিয়ে দেয় যে তার দেহের কিনারা আছে, শেষ আছে। বিভাস উঠে খুলে-রাখা ফুলের মুকুটখানি পরিয়ে দেয় চামেলির মাথায়। সম্পূর্ণ হয় রূপারোপ।

চামেলি উঠে বিভাসকে প্রণাম করে।

কম্পিত তার দেহখানি তুলে ধ'রে পালংকে বসিয়ে দেয় বিভাস। চিবুক ধ'রে মুখখানি তুলে দেখতে থাকে একদৃষ্টে চামেলির অপার্থিব মুখের পানে। এ মুখে সেই অমরাবতীর মায়া। সে কি আজকের। সে কি গতযুগের। সে চিরকালের নববধূর মধ্যে স্বর্গের ব্যঞ্জনা। সে চিরায়মান রাধা, অমোচন বিরহে অতি বেপথুমতী; কার বক্ষলগ্ন হ'বার আশায় দুই প্রয়াসক্ষীণ বাহুতে ঐ আকুলতা।

বিভাস চামেলির অমর্ত্য সত্তাকে আলিঙ্গন ক'রে চুমো খেতে যায়।

• • • •

অন্ধকার আর শূন্যতা। হাতড়াচ্ছে বিভাস চামেলির মুখ। আলো-নেবা ঘরে, প্রত্যুষের স্ফুটমান ক্ষীণ আলো, ছায়াই গাঢ়। ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার হাত থেকে ওকে। একে একে ছায়ামূর্তিরা আসতে থাকে, ঘর ভ'রে যায়। তাদের দ্রুত প্রবেশের অবিরাম খস খস শব্দ, আঘাতে আঘাতে, ঘষে ঘষে মুছে দিচ্ছে চামেলি-বিভাসের নতুন গড়া আনন্দলোক, নতুন গড়া জীবন। সত্তবিছানো ফুলশয্যা টেনে গুটিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সব কেন ছায়া ছায়া হয়ে পরিণত হচ্ছে ঐ অসংখ্য ছায়ামূর্তিতে। তাদের লম্বা শীর্ণ, কম্পমান লোলুপ হাত চামেলিকে ধরল চেপে সবলে—হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। চীৎকার ক'রে প্রত্যাঘাত করতে গেল সে। শক্ত, অলক্ষ্য, সংখ্যাতীত দড়ি দিয়ে অলক্ষিতেই তাঁকে বেঁধে রেখে দিয়েছে কখন! সে বাঁধন ছেঁড়া অসম্ভব। মুখ, চোখ, নাক কিছু দৃশ্যমান নয় ঐ ছায়ামূর্তিগুলোর। শুধু অক্টোপাসের মত হাতগুলো চারিদিকে ঘুরছে। চামেলির আর্তনাদ কানে আসে—দূরে ঐ দেখা যায় তার লাল চেলির রক্তের বর্ণালি। সে দুই হাত এগিয়ে দিয়েছে বিভাসের দিকে, শেষ মিনতিতে। তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরতর অন্ধকারে। তার উজ্জ্বল নববধূর বেশ গলে গলে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে—দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে সে। কিছু করবার নেই বিভাসের। তার দেহ একেবারে অসাড় হয়ে এসেছে—তার চোখ শুধু দেখছে জীবনের ঐ অশরীরী প্রেতেরা কেমন করে চামেলিকে গিলছে। লাল চেলির শেষ চিহ্নটুকু নিঃশেষ হয়ে গেল। রইল শুধু অন্ধকারের ক্ষিদে।

জোরে গোঙাতে গোঙাতে জেগে উঠল বিভাস।

ঘরে আলো জ্বলছে। চামেলি তাকে ঠেলে ঠেলে জাগাচ্ছে।

বিভাসের সারা দেহ আঠাল ঘামে ভরে গিয়েছে।

'এ কি! অমন করছ কেন? আলো কেন জ্বাল নি?'

বিভাস চোখ মেলে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ মূঢ়ের মত। তারপর সে উঠে ব'সে বলে, "তুমি···"

'আমি ফিরে এসেছি।'

বিভাস বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চামেলির মুখের পানে তাকিয়ে থাকে, ধীরে ধীরে বলে, 'ফিরে এসেছ।···তা হবে।'

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

সপ্তদশ স্তবক

৫০-৫২। শিখরে যাঁর শিখীশিখণ্ড, তাঁকে নমস্কার করে আর একদল ব্রজসুন্দরী এবার বলে উঠলেন।—"পদ্মের মত···উৎসবের আনন্দ···তোমার ঐ দু'খানি চরণ, যে মুহূর্ত্তে আমরা ছুঁয়েছি সেই মুহূর্ত্ত থেকে আর সবই আমাদের পর। আর কি আমরা পারব সামনে দাঁড়াতে পারবো। পারবো না বন্ধু পারবো না। তাই আমাদের প্রার্থনা,···স্বীকার করে নাও এই নব-নারীদের মাধুর্য্য। তোমার অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের মতই অদ্ভুত সুন্দর এই মাধুর্য্য, অপরের বিবেচনারও এ বাইরে। লৌকিকতার ওপারে চলে গেছেন এঁরা, আনন্দে উন্মাদিনী হয়ে আছেন এঁরা। আর তুমি স্বজন-প্রতিপালক হয়ে, বৃন্দাবনের প্রিয় হয়ে, ছিঃ ছিঃ, এঁদের কি না দান করছ অবহেলা?"

৫৩-৫৪। শ্রুতিরূপা ব্রজসুন্দরীরা (যাঁরা ঐশ্বর্য্য-সংস্কারবতী দাসিরতা) তখন নিতান্ত দীনভাবে বলে উঠলেন,—"তোমার বুকে থেকেও স্পর্দ্ধায় তুলসী দিয়েই তোমার উপাসনা করেন কমলা। আর হে প্রিয়, আজ আমরা এসেছি এখানে ব্রজবধূরা,···তোমার ঐ চরণ-পদ্ম-পরাগের ভিখারিণী হয়ে। শরণ নিয়েছি তোমার চরণের। হে দুঃখহরণ, ত্যাগ কোরো না আমাদের।"

৫৫-৫৬। মুনিরূপা ব্রজসুন্দরীরা বলে উঠলেন—"না জানি কি গুণ জানে ঐ চরণকমল। ওর পাপড়িতে পাপড়িতে ঝরে বিলাস, আর বিলাসে বিলাসে জাগে রসাস্বাদনের আনন্দ। হে করুণাময়, ঐ আনন্দের মদগর্ব্বে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে আমাদের বুদ্ধি। আমরা ছেড়ে এসেছি ঘর, আমরা ফেলে এসেছি সব···আমরা মিলেছি এসে তোমার মোহানায়। হে সুন্দর, প্রসন্ন হও। আমাদের মোহ ভেঙে দাও, তোমার করুণারুণ কটাক্ষের উৎসব দিয়ে সবল করে তোলো আমাদের দুর্ব্বল মন। তোমার তরুণারুণ অধরের শিখরে···ঝরাও কুন্দহাসির শুভ্রতা আর আমাদের কিনে নাও। তোমার ঐ আদরভরা বচনের অমৃত দিয়ে আমাদের খরিদ করে নাও, দাসী কর চিরদিনের, উদাসীন হোয়ো না প্রভু।"

৫৭-৫৮। মুনিরূপাদের মতই যাঁরা বাসনাময়ী, তাঁরা এবার বলে উঠলেন,—

"যেদিন থেকে আমরা দেখেছি তোমার চন্দ্র-জয়ী মুখ,···যুগল বরুণা দেখেছি মর্ম-হাসির মাধুর্য্যে, সেদিন থেকেই আমরা দাসী হয়ে গিয়েছি তোমার ঐ রাতুল দু'টি চরণের।

তোমার ঐ ভুজ-দণ্ড-যুগ,···ভয়েরও ভয়,···নির্ভয় করেছে আমাদের। তোমার দাসীরা ভিক্ষা চায় কেবল ঐ হাসিটির অমিয়া; মরা প্রাণ বেঁচে উঠবে। দাস্যোচিত প্রেমে পূর্ণ হয়ে তোমার দাসীদের গ্রহণ কর প্রভু, বিলম্ব কোরো না।"

৫৯। নিত্য-সিদ্ধারা এবার বলে উঠলেন—"তুমি ভগবান, তুমি যেখানে পৌরুষের নৃত্য-মন্দির, সেখানে ওঁদের দূষণ হবে কি করে? আর তার উপর তুমি আর্য্য, সাধুপুরুষ, মনোহর মুরলী বাজিয়ে চুরি করে নিয়েছ ওঁদের মন। তুমিই বল, ওঁদের মধ্যে এমন কোন মহিলা থাকতে পারেন যিনি এখন না ভাসিয়ে দেবেন কুল শীল লজ্জা সরম, না ছেড়ে দেবেন আর্য্যপন্থা? আর তার উপর তোমার ঐ সৌন্দর্য্যের সীমানা হারানো রূপ···ভুবনলক্ষ্মীর সমস্ত সৌভাগ্যের ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় ঐ রূপ। ত্রিলোকের নয়ন-ভোলান বিস্ময়। পরমাসুন্দরীদেরও অনায়াসলভ্য নয় ঐ রূপ। ঐ রূপ দেখে, ঐ দেখ, অতি স্নেহাতুর হয়ে পড়েছেন ওঁরা আর এই পৃথিবীর পশু পাখী মৃগ···ওরাও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে সুবিপুল পুলকে।"

৬০-৬১। পুনর্ব্বার বলে উঠলেন শ্রুতিরূপারা, "হে বিভু, বিশ্বভুবনে সকলেই জানে, ব্রজভূমির তুমি আর্ত্তিহর। অমর রক্ষক আদিপুরুষের মতই এ বিষয়ে প্রসিদ্ধি রয়েছে তোমার। তোমার যোগ্য নয়, এই হেন রজনীতে বিসর্জ্জন দেওয়া আমাদের। আর্ত্তের তুমি বন্ধু নির্ব্বান্ধব কোরো না আমাদের আশ্রয়। হে করুণানিধি, তপ্ত আমাদের হৃদয়, সন্তপ্ত আমাদের মস্তিষ্ক, তোমার প্রেমারুণ অমল-কোমল অতিশীতল করক-কমলের পরামর্শে জুড়িয়ে দাও আমাদের বুক আমাদের মুখ, দূর করে দাও আমাদের আত্মময়ী প্রজ্ঞার উত্তাপ। এমন করে রচনা কর তোমার কিঙ্করীদের, যাতে আর তাদের হৃদয় পাত্র থেকে উছলে না পড়ে অশ্রু-বিষ। আমরা বিকল; জয়ধ্বনি কর, সকল কলায় পূর্ণ করে রাঙিয়ে দাও আমাদের মন।"

৬২-৬৩। রাধার সখীদের মধ্যে এবার হঠাৎ একটি সখী ঝঙ্কার দিয়ে বলে ফেললেন,—

"বংশীধ্বনি তো নয়, যেন একখানি খাসা সত্ত্ব-গুণের সুতোয় বাঁধা বঁড়শী।···'জলের শফরী আহার করিতে বঁড়শী বিন্ধিল মুখে।'··· বঁড়শীটিতে আবার আমিষ গাঁথা টোপ। আমাদের মত মাছগুলোকে গেঁথে, টেনে তুলে, গুরুবাক্যের শিকে বিঁধিয়ে, মহাপুরুষ এখন ঝলসাতে চলেছেন উপেক্ষার আগুনে। ধন্য প্রেমের রসিকতা।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

"আমি তো কেবল নিজের আমোদের জন্যে, নিজের আনন্দেই বাঁশী বাজিয়ে চলেছি। এতে তো অনুদার ভাবের কোনো প্রকাশ থাকতে পারে না। আপনারা সকলেই কলা শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা। এঁর ধ্বনির উদারতায় যদি বিকল হয়ে পড়েন তাতে আমার দোষটা হল কোথায়? কেমন করেই বা হল।"

দ্বিতীয়া সখী উত্তর দিলেন,—

"আপনার ঐ এক-পাবের সহজ মুরলী,···ওঁর বংশ ভাল, উনি কুটিল নন, উনি সারাম্বিতা,···নিশ্চয় দোষটা ওঁর নয়। ওঁর কলধ্বনি দিয়েই তো আপনি আমাদের প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে ডাকছেন,

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বললেন,—

"আমি বাজাচ্ছি বলেই মুরলী দেবী বাজছেন না, মকরন্দ-দেবের আভিমুখ্য আছে বলেই ধ্বনিময়ী হয়েছেন মুরলী। তাঁর ইচ্ছা হয়েছে, তাই স্বয়ং তিনি আহ্বান করছেন আপনাদের···সকলেরি প্রকাশ্য নাম ধরে ধরে।"

তৃতীয়া সখী এবার বলে বসলেন,—

"তা হলেও সব দোষ আপনারি। আপনার মত একটি মহৎ ব্যক্তির আদরেই উচিত হয়নি অসাধুর সঙ্গে অতটা মাখামাখি। দেখুন, ঐ মুরলী-দেবীটি কঠোর-গাত্রী অনেকগুলি ছিদ্রও রয়েছে তাঁর। ভিতর ফাঁপা, অথচ মুখ-সর্বস্ব। এমন কিছু মহৎ বংশেও ওঁর জন্ম নয়। পরের কুলের পঙ্ক তুলে কলঙ্ক লেপার বড় গিন্নী। সত্যিই এ ক্ষেত্রে প্রশংসা করা চলে না আপনার বংশীটির।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—

"অহো, নাদ-ব্রহ্মোপনিষদের মত এই ভগবতী বংশীদেবী নবছিদ্র মূর্ত্তি গ্রহণ করে আমার প্রতি প্রণয়-পরবশ হয়ে স্বয়ং উপাগতা হয়েছেন এখানে। ইনি চিন্ময়ী, ইনি আনন্দময়ী। যশোহংসীর মত ইনি বিচরণ করছেন মদীয় যুগল করপদ্মে। এই বংশীদেবীকে উপহাস করছেন আপনারা? আশ্চর্য্য, আপনাদের সাহস তো বড় কম নয়।"

৬৪। রাধিকার সহচরীদের সঙ্গে বিদগ্ধ-শেখরের কথা কাটাকাটি! আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন ব্রজের গোপীরা। কী অদ্ভুত চাতুরী এই যুদ্ধে! তা-ও আবার তুরীয় দশায় উঠেছে। পরমাশ্চর্য্য বোধ করলেন গোপীরা। এই চাতুরীর খর-বন্যায় তাহলে কি ভেসে গেল প্রিয়তমের উপেক্ষা? তাঁদের মন বললে···'হ্যাঁ, ভেসেই তো গেল।' তাই পুষ্পসম বিকশিত হয়ে উঠল তাঁদের মুখ। মুখিয়ে উঠল উৎকণ্ঠার অনুচরী হল রসিকতা। তারপর যা হয়,···রস-নিষ্ঠার পর্য্যবসান ঘটল রাঙা রাঙা অধরের প্রান্তে মুচকি হাসির সাদা রেখায়, আর বাঁকা টানে।

কৃষ্ণও হেসে ফেললেন তাঁর মুচকি হাসিখানি। এবং হাসির শুভ্রতার রাজপথ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল তাঁর উৎসবী বাণী। ব্রজগোপীদের প্রতি এত সম্মান ঝরিয়ে দিল সেই বাণী, এবং সেই বাণীর রসিকতায় তাঁদের সকলকেই আনন্দের এত তুঙ্গ চূড়ায় চড়িয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ, যে তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রখর বুদ্ধিমতী, তাঁরাও তর্কাতীত ভাবে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন আনন্দে; এবং কি আশ্চর্য্য, সেই মত্ততাও যেন তর্ক জুড়ে দিল,···'এ আবার কোন অকূল সুখের বিপুল খেলায় মেতে উঠতে চান শ্রীকৃষ্ণ'?

আর শ্রীভগবান শ্রীহরি, যিনি কোটি কন্দর্পের দর্পহারী, তিনি তখন স্বীয় আত্মার আধারে পরমানন্দের খেলা খেলতে খেলতে উন্নততমা রমণীদের সঙ্গে আরম্ভ করে দিলেন তাঁর প্রেম-বিহার। ব্রজরমণীদের প্রেমসাগরের উত্তমাধম দুই কূলেরই মাঝখান দিয়ে তিনি চলতে লাগলেন, এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন···হস্তীর মত কাম।

চতুর্দ্দিকে জয় দিয়ে উঠল আনন্দ। ডানা নাড়তে নাড়তে আনন্দ গান গেয়ে উঠল পাখীরা।

ফুলের হাসি নিয়ে দুলে উঠল বল্লরী। পুলকে রোমাঞ্চিত হল ক্ষিতিরুহ, দল পাকাল হরিণ-বধূরা, আর ঘর্ম্মাক্ত হয়ে গেলেন ধরণী··· ঝম ঝুম ঝম পুষ্পমধু-র ধরণে।

শ্রীনন্দনন্দনের এই বিহার-বাসনা কিন্তু জানতো না···কতটা প্রেম-সৌন্দর্য্যের কতটা শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের অধিকারিণী ছিলেন এই ব্রজাঙ্গনারা,···ঐ যাঁরা মদনযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সম-রসিকা, ঐ যাঁরা চিন্তামণি-স্বরূপিণী কৃষ্ণের। তাই সেই বিহার বাসনাও চমৎকৃত হয়ে উঠল, যখন কল্যাণময়ী ঈর্ষ্যাহীনা হৃদয়বতীদের মধ্যে সমকালীন আবির্ভবন দেখতে পেল সমতুল বিহারবাসনার। সঙ্গে সঙ্গে, কি আশ্চর্য্য, বনদেবতারাও যেন জেগে উঠলেন, বনচর পশু পাখী তরুলতারাও যেন জেগে উঠলেন মূর্চ্ছা থেকে; যেন সদ্য জন্ম নিলেন তাঁরা, যেন নূতন দেহ পেলেন তাঁরা, যেন সবে স্নান সেরে উঠে এলেন অমৃতের সাগর থেকে।

ব্রজসুন্দরীদের চন্দ্রমুখে ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে, স্মিত-মাধুর্য্যের মুগ্ধ লাবণ্য। তাঁরা সকলেই মিলিত হয়েছেন, ঘিরে ফেলেছেন নিথর দামিনী-সমবায়ের মত চতুর্দ্দিক থেকে আবৃত করে ফেলেছেন শ্রীকৃষ্ণকে। কৃষ্ণ যেন তাঁদের কাছে একটি ধরার পাত্রে-ধরা নবীন জলধরের কল্পনা। তাঁদের সকলেরি সঙ্গে বিহারে মত্ত হয়ে উঠলেন শ্রীহরি। বন্যা ডেকে গেল আনন্দের···বৃন্দারণ্যের শ্যামলে নীলে পীতে।

প্রেমের আবেশে কৃষ্ণমঙ্গল গান গেয়ে উঠলেন সুধাকণ্ঠীরা।

কখনও কণ্ঠে কখনও বেণুতে কৃষ্ণও তুললেন অস্ফুট-মধুর গীতধ্বনি। তারপরে ধীরে ধীরে গাইতে গাইতে···চরণ ছুঁয়ে এলিয়ে পড়েছে বনফুলের বিনোদমালা···ভ্রমণ করতে লাগলেন দামোদর। যেন তিনি ভ্রমরদের ও পক্ষীদের একমাত্র প্রতিনিধি,···উনপঞ্চাশ পবনে দুলতে দুলতে বসছেন গিয়ে প্রত্যেক লতায় কাননের।

৬৬। এবং ঠিক সেই সময়ে সকলের অলক্ষিতে আশ্চর্য্যভাবে ঘটে গেল আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা। কেউ বুঝতে পারলেন না, কখন সেখানে উপস্থিত হয়েছেন প্রেমামৃত-সিক্তা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া, কখনি বা তিনি তাঁর দুর্জ্ঞেয় কল্যাণ-নীতির প্রভাবে, রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছেন গৃহ-পরিত্যাগিনী প্রেমরণ রঙ্গিণীদের আলুথালু বেশভূষায়। ঘর বসতি ফেলে রেখে, যেমন ছিলেন তেমনি ছুটে এসেছিলেন যে সব ব্রজকামিনীরা, কোথায় যেন তাঁদের বিলীন হয়ে গেল অর্দ্ধ প্রসাধন, শিথিল মণ্ডল; তার বদলে হঠাৎ যেন তাঁদের দেহে আবির্ভূত হল···রাকা রজনীতে বন-বিহারের উপযোগী ষোড়শ প্রকারের সাজ, দ্বাদশ প্রকারের অলঙ্কার। এই ঘটনাটি জ্ঞানগম্যও হল না কোনো ব্রজকামিনীর। আশ্চর্য্য, এইটিই এর রহস্য।

৬৭। বসুধাকে সুধায়মান করে চতুর্দ্দিকে তখন ছড়িয়ে পড়েছে চন্দ্রালোক। রূপোর জলে যেন গা ধুয়ে উঠেছে সারা বন। শ্রীহরি পরমানন্দে ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে মেতে উঠলেন···বিহরণরণ রঙ্গে। মান অভিমান দোহন করতে করতে, তিনি তাঁদের প্রথমেই দেখিয়া দিলেন নিজের নিষ্পাপ শিক্ষা-নৈপুণ্য।

গাছের চিত্র বিচিত্র পাতা ছিঁড়ে, নখে বিদলিত করে, কারো বুকে কারো গলায় তিনি এঁকে দিলেন পত্রলেখা; নিজের হাতে নানান রঙের ফুল তুলে ওঃ হোঃ সেই ফুল দিয়েই, গায়ের মাপে তৈরী করে দিলেন কঞ্চুলী; লতার কুঁচিগুলো থাক্ থাক্ করে সাজিয়ে, গড়ে দিলেন অঙ্গদ, গড়ে দিলেন কঙ্কন; ফুলের ধূলো ছড়িয়ে কারোর বা অলকে এনে দিলেন লালিত্য।

এততেও কিন্তু শানালো না; নতুন করে আবার তিনি তখন তাঁদের দেখিয়ে দিলেন···কোন্ কায়দায় হার গড়তে হয় মল্লিকার, সিঁথির সীমায় কোন্ ভঙ্গিমায় দোলাতে হয় কদম্ব, খোঁপায় গুঁজতে হয় স্থলকমল, কোন্ ছন্দে বাঁধতে হয় বকুল ফুলের মেখলা, কুন্দকলির কণ্ঠাভরণ।

৬৮। বনবিহারিণীরাও পরাস্তা হবার পাত্রী নন। তাঁদের মধ্যে একজন তখনি কৃষ্ণের যুগল কর্ণে দুলিয়ে দিলেন বকুল ফুলের ঝুমকো। একজন কেশে পরিয়ে দিলেন পরাগভরা কেতকী। অন্য একটি অমনি মল্লীবিতান থেকে তুলে নিয়ে এলেন ফুল, কৃষ্ণকে দেখিয়ে দেখিয়ে হার গড়লেন অতিমোহন, বুকে দুলিয়ে দিয়েই উষ্ণীষে পরিয়ে দিলেন কিংকিরাও; আর যিনি শ্রেষ্ঠা, তিনি যুঁই ফুলের গোড়ে দিয়ে গড়ে ফেললেন অঙ্গদ, গড়লেন কঙ্কন, আর বকুল ফুলের মালা দিয়ে কটিহার।

৬৯। এই থেকেই আরম্ভ হয়ে গেল শ্রীহরির অভীপ্সিত রাস-বিহার, তার নানান্ ভাবান্তর, তার নানান প্রকারান্তর নিয়ে। রস-হিসাবে এর চারটি অঙ্গ শ্রেষ্ঠ,···বনবিহার, রত্নোৎসব, নৃত্যকলা ও জলবিহার।

৭০। যেই আরম্ভ হয়ে গেল শ্রীহরির নিরাবিল বনবিলাস, অমনি দিগদিগন্ত মাধুর্য্যে মাতাল করে দিয়ে রুণ্ রুণ্ করে রণিত হয়ে উঠল কোকিল-কণ্ঠের নিরাবরণ কুহুতান, সুদীর্ঘ হয়ে উঠল ভৃঙ্গ-সঙ্ঘের অমিত ঝঙ্কার; এবং মদন-মত্ততায় সঙ্গে সঙ্গে আনম্র হয়ে গেল ব্রজ-যুবতীদের ধী-শক্তি। কৃষ্ণ-রতি ছাড়া আর কিছুই যেন সইতে চাইল না, বইতে চাইল না তাঁদের মতি, বুদ্ধি ও জ্ঞান।

প্রথমেই যূথে যূথে ছুটে এলেন যুবতীরা। ভৃঙ্গের আর ভয় নেই তাঁদের। পুন্নাগ থেকে চয়ন করলেন সোনার রঙের রেণু। আর তারপরে অকালের এই মদন-যুদ্ধে, উড়ল রেণু, তাঁদের মুষ্টি থেকে রেণু। রেণুর সোনায় স্নান হয়ে গেল জ্যোৎস্নার ফুটফুটে রূপোলী সোহাগ। বালায় বালায় ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝঙ্কার তুলে তাঁরা যেন পুষ্প-রেণুর চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন তাঁদের পরাণ-প্রিয়কে।

মারমুখী হয়ে উঠলেন কৃষ্ণও। পরাগের আঘাত সইতে সইতে তিনিও তৎক্ষণাৎ নিজের হাতে চয়ন করে নিলেন নানান্ রঙের ফুল; তারপর ফুলের গোলা বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভহীন আঘাত হানলেন বধূদের যূথপাদের যূথের উপর। যেই তিনি বিজয়ী হয়েছেন অমনি কৃষ্ণপক্ষীয় শুকপক্ষীদের সে কি উল্লাস! বুক ফুলিয়ে গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠল···'জয় জয়'।

ফুলের গোলা ছুঁড়ে সখীবৃন্দকে হারিয়ে দিয়ে, যেন উপচে পড়ল কৃষ্ণের দর্প। তাঁর ঝোঁক চাপল···স্বপরিজন রাধিকাকেও জিতে নেবেন। যেই চেষ্টা, অমনি ওপক্ষ থেকে ছুটে এল বাঁকা ভুরুর নীচে রাঙা আঁখির কটাক্ষবাণ। আর অমনি···হার! আর অমনি হী হী করে সে কি হাসি রাধাপক্ষীয় সারীদের। তারাও চীৎকার দিয়ে উঠল···'জয় জয়'।

৭১। ক্ষণে ক্ষণে নতুন থেকে আরো নতুন হয়ে উঠতে লাগল পরম রমণীয় সেই কৌতুক। তারি মধ্যে এক সময়ে কৃষ্ণ দেখতে পেলেন···রাধা সংগ্রহ করছেন গন্ধে-ভুরভুরে ফুলের ভিতরকার কেশরগুলো; আর ঐ রে···তাঁকে আক্রমণ করেছে ভোমরা। দেখতে পেলেন···রাধার শঙ্কিত চোখে ভৃঙ্গ-বাধার নাট্য। কি মিষ্টি তাঁর পাণিপদ্মের থরথর কম্পন। দেখেই হাসতে হাসতে ছুটে এলেন, বললেন,—"পুন্নাগ তুলছ, ভালই করছ,···ও তুমিই পার।"

(পুন্নাগ। ১ পুরুষনাগ কৃষ্ণ, ২ পুষ্প বিশেষ।)

শ্লেষের বিস্ময়ে হাসির ঝিলিকে, হেসে ফেললেন শ্রীরাধা; কিন্তু লজ্জায় নীচু হয়ে গেল তাঁর মুখ। শ্লেষেও এত আশ্লেষ থাকে। ছিঃ।

৭২। ফুলের গয়না পরাবেন প্রীতমকে, তাই অন্ত নেই সমস্ত কলাবতীদের পুষ্পাহরণের; আহরণ-পথে তাই পুষ্প-প্রহরণের; প্রহরণের পথে তাই প্রণয়-কটাক্ষের নিশিত শর বর্ষণের। উতরোল হয়ে উঠেছে যখন মদবিহ্বল কলরোল, অনন্ত পথ ধরেই ছুটে চলেছে যখন তাঁদের ইনি ওঁকে উনি তাঁকে টেক্কা দেওয়ার চপল প্রবণতা, তখন হঠাৎ তাঁরা লজ্জার মাথা খেয়ে দেখতে পেলেন,—

রাধা কি যেন একটা···কোথায় যেন একটা উঁচু ডালের ফুল তোলবার চেষ্টা করছিলেন; সত্যিই তো ওমা, কী অতুলনীয় ফুল গো। পায়ের ডগায় ভর দিয়ে যেই দুবাহু উঁচুতে তুলে, ডিঙ্গি মেরে, লাফিয়ে ধরতে গেছেন ফুল, অমনি খসে গেছে নীবির বাঁধন। হকচকিয়ে তিনিও মুখ ফিরিয়েছেন, আর পিঠের দিক থেকে তাঁকে দুবাহু দিয়ে তুলে ধরেছেন প্রিয়তম। অন্তহীন লজ্জায় কি মিষ্টি শ্রীরাধিকার সেই মুয়ে পড়াটি!

১৩। চতুর্দ্দিকে ফুল, ফুলের সে কি গন্ধ, গন্ধে গন্ধে ছুটে এসে ভালবাসায় অন্ধ হয়ে ভৃঙ্গের দল বসে পড়ল ফুলে ফুলে। দুচোখ দিয়ে প্রণয়ের এই রীতি দেখে আমোদে ঢলে পড়লেন ব্রজসুন্দরীরা। ওলো সই—কি সৌভাগ্যই না ফুলকুমারীদের। আনন্দে তাঁরা সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন ভ্রমর-বসা ফুল। সে ফুল দেখিয়ে দেখিয়ে পরিতোষের হাসি ফোটানোর বিশেষ খেলা তাঁরা খেলতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের সঙ্গে সঙ্গে।

আর ঐ দেখ সই, কাণ্ডখানা দেখেছিস। কত ছলই না রূপসীটি জানেন। চোখে ফুলের রেণু পড়েছে, ওমা তাই বুঝি ভয়ে উনি হরিণী হয়ে গেলেন? দুহাতে কঙ্কন বাজিয়ে, হা হা করে তাই বুঝি চীৎকার দিয়ে উঠলেন? চোখ রগড়াবার ঢঙ দেখে আর বাঁচিনে।

ওমা কি হবে সই, কি হবে!···প্রাণকান্তটি পৌঁছে গেছেন নিমেষে। 'দেখি দেখি, কই কি হয়েছে'···বলে, শ্রীমুখে পদ্ম দিয়ে আবার বাতাস করছেন বারম্বার; ছল করে ঐ চুম্বন দিচ্ছেন নয়নে? উঃ, কতক্ষণ।

১৪। সেই বিরাট পুষ্প-মহোৎসবের আনন্দ-রস আকুল করে তুললো ব্রজমহিলাদের। তাঁদের নিভৃত বেদনার অলক্ষ্য মূর্ত্তিগুলি যেন স্বৈরমাধুর্য্যে গা এলিয়ে দিল মালঞ্চে মালঞ্চে পুষ্পের। আনন্দে চক্ষুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন মূর্ত্তিমান সময়। একদিকে তিনি দেখলেন, ঠোঁটের হাসির চোখের হাসির আঘাত দিয়ে শ্রীহরি একলাই লহরী তুলছেন নায়িকাদের সোহাগ-সাগরে; অন্যদিকে তিনি দেখলেন, রমণীয়তার কুসুম ছড়িয়ে চারদিক থেকে নায়িকারাই দলে দলে ছুটেছেন সেই এককটির নিকটে। এই দর্শনেই, তাঁর মনে হল, তিনি যেন পেয়ে গেলেন তাঁর রতোৎসবের বহুমাঙ্গল্য। অতএব স্ফূর্ত্তিতে স্ফীত হয়ে সময় হয়ে পড়লেন রসময়।

তারপরেই তিনি বিরামহীন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখতে পেলেন···যে ফুলন্ত গাছগুলির ফুলদল শ্রীরাধিকার হাতের নাগালের ছিল বাইরে, যাদের ফুলগুলিকে চেষ্টা করেও তুলতে পারেন নি শ্রীরাধিকা, সেই গাছগুলিও যেন এখন ভয় পেয়ে গেছে রাধিকার অতিপ্রণয়ের, সখী-সখী-ভাব নিয়ে নিজেরাই নুইয়ে দিচ্ছে নিজেদের ফুলে ভরা শাখা, তাঁর পাণিলগ্ন করে দিচ্ছে নিজেদের পুষ্প-প্রণয়।

১৫। দেখতে দেখতে সাঙ্গ হয়ে গেল বনবিহার। এর সুচিরতা, এর রুচিরতা, আনন্দ-ক্রীড়াটিকে উজিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল তরল-তরঙ্গিণী রঙ্গিণী ভঙ্গিনী সূর্য্য-নন্দিনী শ্রীযমুনার পুলিনে।

পুলিনটিকে তৎক্ষণাৎ পরিপাটিভাবে মাজ্জিত করে দিয়ে গেলেন··· জলে-ভাসা-পদ্ম-কহ্লারের সৌরভ-প্রণয়ী সমীরণ। লহরী-হস্তের অনুশীলন দিয়ে পুলিনটিকে বিশুদ্ধ করে দিয়ে গেলেন কালিন্দী। কর্পূর-ধূলির মত শুভ্রতা ছড়িয়ে, পুলিনময় জ্যোৎস্নানুলেপন করে দিয়ে গেলেন পূর্ণচন্দ্র।

যমুনার পুলিনে এসে দাঁড়ালেন দামোদর। এ পুলিন তাঁর বড় প্রিয়, বড় প্রিয় এর অনাবিল সৌরভময় পরিবেশ। পুলিনের হেথায় সেথায় খেলে বেড়াতে লাগলেন যূথপতি, সঙ্গে নিয়ে তাঁর রমণী-যূথ।

১৬। শুভ্র আকাশ, শুভ্র পুলিন,···বিধার সৌন্দর্য্যের মাঝখানে বেড়াতে বেড়াতে ···

কোনো এক অদ্বিতীয় একেরই রূপলাবণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করে চলেছেন; যেন নিজেদের ছায়া দেখে, তবে তাঁদের চিনতে হচ্ছে··· এ কোন্ সৈকত। দিশেহারা এই শুভ্রতার রাজত্বে। আপন হতেই তাঁদের কণ্ঠ থেকে জ্যোৎস্নাধারার মত বিরামহীন মাধুর্যে নিঃসৃত হতে লাগল অস্ফুট মধুর মঙ্গলগান। সেই গানে নৃত্য করে উঠল কৃষ্ণমানসের উল্লাস। তিনি পুলিন ছেড়ে পুনর্ব্বার প্রবেশ করলেন তট-কাননে, ফুলফোটা পাখী ডাকা তার মঞ্জুল কুঞ্জবনে। আপন আনন্দে যিনি আপনি মাতাল, তাঁর কি কখনও আতঙ্ক থাকে শ্রীমদনের মদিরার মত্ততার হর্ষের? কুঞ্জবনে তাই, নিরানন্দ-রতিমানকে পেয়ে, রতোৎসব আরম্ভ করে দিলেন উত্তমসমর্থারা। রমণী-মানীন্দ্রদের যাঁরা মাথার মণি, তাঁদের শ্রীঅঙ্গলতা তাই একসঙ্গে পরিশীলন লাভ করল পঙ্কজপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের।

এই পরিশীলনের মূলে ছিল শ্রীকৃষ্ণেরি নিজস্ব প্রার্থনা, নখদন্ত লেখনের কৌশল-মাধ্যমে যিনি পরিচিতি-প্রার্থনা করেছিলেন নিবিড় স্তনপীড়নের। তাই উত্তম-সমর্থাদের প্রেম অতিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, শ্রীকৃষ্ণ কেবল ঐ তাঁদেরই অনুরঞ্জিত করে দিলেন মদনরাগ-রসের অনন্ত বর্ণে।

১৭। প্রকৃতি ও বয়সের ভেদ অনুসারে, নানান আকার ধারণ করে রস-পাণ্ডিত্যের ভেদ। এই রস-পাণ্ডিত্যই এবার অতি চমৎকার ভাবে হর্ষ সৃষ্টি করতে করতে দামোদরকেও করে তুলল হর্ষ-বিধাতা।

এরি কৃপায়,—ব্রজ-বরাঙ্গনাদের মনের গভীরতায় জাগল যেমন অতি সুমহান অভিলাষ, তেমনি আবার তাঁদের মুখের প্রসন্নতায় ফুটে উঠল না-না-না বাণীর প্রতিষেধ। রতি-বিধি এবং প্রতিষেধ, এই দুটিকেই যে তাঁরা বুদ্ধি দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন, এমন কথা কিন্তু বলা চলে না।

'আমি লজ্জাবতী'—এই কথাটি জানিয়ে একটি হাত রোধ করল আর একটি হাতকে; চোখ বললে—'আমি রেগে গেছি'···অথচ রাঙা হল না কটাক্ষ; কাঁদছেন, অথচ চোখে নেই জল···বধূদের এই সব রস-পাণ্ডিত্য পরম প্রিয় বলে মনে হতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের।

সুন্দরীরা ভর্ৎসনা করলেন, অথচ প্রতিটি বর্ণ যেন স্নান করল সুধায়; তাঁরা হাত নাড়লেন, কিন্তু কই, বারণের ইঙ্গিত কোথায় সেখানে? ভ্রুকুটি কুটিল হল, কিন্তু কোপ নেই কেন বক্রতায়? সমস্তই যেন কিছুই না বলে শেষ কথাটি বলে চলে গেল অনুরাগের।

চুম্বন দিতে গেলেন কৃষ্ণ, অবলারা ফিরিয়ে নিলেন মুখ; অধরের

পাপড়িটিকে ঢেকে ফেললেন তর্জ্জনী দিয়ে; পালিয়ে গেলেন বাঁধন কেটে আলিঙ্গনের।···এই পাশকাটানোটিও বড় মধুর লাগল শ্রীকৃষ্ণের।

লীলানিধি তখন ঝড়ের বেগে, প্রত্যেককেই জড়িয়ে ধরলেন তাঁর ভুজঙ্গমগুলের দৃঢ় বেষ্টনীতে, তার অতি নিবিড়তায় তাঁর অতি কোমলতায়। ধীরে ধীরে তাঁদের যেন প্রবেশ করিয়ে নিতে চাইলেন অন্তরে।

বাম পাণি-কমলে প্রত্যেকেরই বেণী ধারণ করে, তিনি অন্য হাতে তুলে ধরলেন চিবুকের ডগাটি; তারপরে মুখের নয়ন-মুকুলন দেখতে দেখতে তিনি প্রত্যেকেরি পান করলেন মাধ্বীক-মুগ্ধ মধুরাধর।

৭৮। পদ্মিনী শ্রেণীর দক্ষিণ নায়ক একক ভ্রমর যেমন নির্ব্বাধে মধুপান করতে করতে প্রচুরতম ভাবে মাতাল হয়ে ওঠে, তেমনি মদন মদের সৌরভে আয়ত্তে এসে অপ্রতিহত গতিতে প্রমত্ত হয়ে উঠল রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের মানসোৎসব।

পরিরম্ভ ও অধরপানের পর, তিনি নখর-চিহ্নের শোভায় সমুজ্জ্বল করে দিলেন প্রত্যেক সুন্দরীর যুগল স্তন-কমল মুকুল; এবং তাঁদের হৃদয়ে হৃদয়ে ব্যথিয়ে উঠছিল যে শিহরিত অনুরাগ, কণ্ডুয়ন ছলে পুনর্ব্বার প্রকট করে দিলেন তার যাতনা। আতাম্র কম্র দ্যুতিতে জ্বল জ্বল করে উঠল নখর চিহ্নগুলি; বুকের নীচে যে অনুরাগের বীজগুলি গোপন ছিল, বুকের উপরে অঙ্কুরের মত হঠাৎ তাদের হল যেন বহিঃ প্রকাশ।

৭৯। সিদ্ধৌষধির মনোহারী পল্লবের মত শ্রীহরির করকমলের মঙ্গল-স্পর্শরসে, ব্রজকামিনীদের প্রতি অঙ্গ থেকে কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেল সমগ্র সন্তাপ। যেন কোন এক নবীন সরসতায় কাণায় কাণায় ভরে উঠল তাঁদের প্রত্যেকের দেহ। সৌভাগ্যের গরবে গরবিনী হয়ে তাঁরা সকলেই অনুভব করলেন,—

ও তো শ্রীকৃষ্ণের হাতখানি নয়,···ও যেন সত্যই একটি জীবন্ত নীলকমল···স্ফীত হয়ে রয়েছে স্তনমণ্ডলের কেন্দ্রটিতে; তারপরে অতি ঘন দীর্ঘ কেশের কুঞ্চন বেয়ে উপর থেকে নামছে নীচে; ভ্রমণ ক্লান্তিতে সঙ্কুচিত হয়ে ক্ষণকাল জিরিয়ে নিল শ্রোণীর আঙিনায়; তারপরে কি আশ্চর্য্য, নাভি হ্রদে পৌঁছেই ভিজে তিম্‌তিমে হয়ে গেল যেন সুখাবেশে।

৮০। মদন-মদিরার তপ্ত বাতাসে ঝলসে গিয়ে, হঠাৎ যেন পাতা ঝরে গেল তাঁদের লজ্জাবতী লতিকার। যেন কোন জন্ম জন্মান্তরের অনুরাগে টলমল্ করে উঠল হৃদয়। ভেসে গেল মনের স্বাধীনতা। মনের মণি-চত্বরে একমাত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল হৃদয়নাথের মনোরথ। তারপরেই তাঁদের মনে হল, কূলহারা কোন লাবণ্যের তরঙ্গিণীতে রঙ্গিণী হয়ে তাঁরা ভাসছেন। চমকে উঠলেন নিরীক্ষণ করে নিজেদের বাহু বল্লরী। কৃষ্ণের আলিঙ্গন পেয়ে কী রসবিধুর, কী পবিত্র, কী অম্লান আশ্চর্য্য সুন্দর হয়ে উঠেছে সে বল্লরী। অসম্ভব হল সুস্থির হয়ে বসে থাকা; কঙ্কনের ঝঙ্কার তুলে, এক এক করে তাঁরা প্রত্যেকেই আলিঙ্গন করলেন কৃষ্ণকে।

অঙ্গী যেখানে শুদ্ধপ্রেম, এবং প্রেমরসের নিজাঙ্গ যেখানে শৃঙ্গার, সেখানে বিভাবাদি বৈরূপ্যের অভাব-বশতঃ শুদ্ধ হয়েই থেকে যায় সমস্ত সামগ্রী। তাই, যে শৃঙ্গার সময়ে উভয় পক্ষই আস্বাদন করেন সম-রস, সেই হেন সময়েই নিজেদের সমাহিতা করে দিলেন ব্রজোত্তমারা। মধু হাসির মৃদু মাধুর্য্যে পদ্ম ফুটিয়ে তাঁরা চুম্বন করলেন কৃষ্ণকে। গভীর আবেগে ফুর ফুর করে কাঁপতে লাগল তাঁদের অধর কিশলয়। সে কিশলয়গুলিকেও যেন ঢেউ দিয়ে ধুইয়ে দিল দশনের লাবণ্য জাল। তাঁরা পান করতে লাগলেন কৃষ্ণাধর,···চকোরীরা যেমন ক'রে পান করে ধরণীতে ঢলে পড়া অমৃতের কিরণ।

ললিত বাহুর কত শাখাই না জড়িয়ে ধরল কৃষ্ণকে,···
পীবর স্তনের কত স্তবকই না সম্মর্দ্দিত করল লীলাকিশোরকে,···
খর নখের কত কণ্টকই না ক্ষত বিক্ষত করল নন্দদুলালকে।
অন্ত নেই, তার অন্ত নেই। আহা তার অন্ত নেই।

আর সেই রমণী-মণির লতায় লতায় চমক লাগা কুঞ্জবনে, মন-মদিরায় মাতাল হয়ে তিনি খেলতে লাগলেন,···খেলতে খেলতে বিভোর হলেন···কৃষ্ণ-মধুপ,···যিনি শ্রীমান,···যিনি একক। সৌভাগ্যের যিনি ঘনরস, তাঁর প্রসন্ন সঙ্গ-সুখটিকে সানন্দে বহন করে নিয়ে এল এই অনঙ্গ-সমর; এবং আশ্চর্য্য, সেই সুখেই যেন কল্যাণবতী হয়ে উঠলেন আ-ত্রিলোক রমণীমণি-সমাজ। এবং সেই সুখটিকে নিয়ে আসবার জন্যে যেন পথ করে দিয়েই, ব্রজবধূরা আশ্রয় নিলেন অহঙ্কৃত উচ্ছৃঙ্খলতায়, ও পীবর দাম্ভিকতায়।

৮১। প্রেমের সেই সৌভাগ্য-মদন-স্ফীত মহা প্রবাহের কাম-কুম্ভীর ঘোর অথৈ জলে অতঃপর যেন তরী ভেঙ্গে ডুবতে বসলেন ব্রজবধূরা। কৃষ্ণ তাঁদের তীরে তুলে, দূর করবার চেষ্টা করলেন অন্তর্গত দম্ভজাল; কিন্তু বৃথা।

নিজের দুর্ল্লীলতার লতাচক্রে চড়িয়ে দিয়ে, ঘুরপাক খাইয়ে গর্ব্ব টলাতে একবার চেষ্টাও করলেন তিনি; কিন্তু সব ভেস্তে গেল তাঁদের শুভ্র হাসির ঝিলিকে।

অপূর্ব্ব হয়ে উঠল ব্রজবধূদের রূপ। সৌভাগ্য-মদিরার অতিরিক্ত রসাবেশে, ব্যাধির মত তাতে প্রকট হল উল্লাসভরা এক আলস্য। চিকিৎসকের মত কৃষ্ণ চেষ্টা করলেন সে উপদ্রব দূর করে দিতে। কিন্তু কে চায় নিদান?

এবার কৃষ্ণ নিলেন অন্য পথ। গরবিনীদের গরব ভাঙ্গাতে হলে, তার রূপান্তর ঘটাতে হলে রঙ বদলাতে হবে তাঁদের সহজাত প্রেমের শুভ্রতার। লোধ্রফুলের রেণু দিয়ে নিকপট সাদা কাপড় যেমন রঙীন করে তোলে কাপড় ছুপিয়েরা, কৃষ্ণও তেমনি বিপ্রলম্ভ দিয়ে বদলাতে চাইলেন ব্রজবধূদের গর্ব্বিত সম্ভোগের আনন্দবর্ণ।

তাই এবার তিনি যা করলেন তাতে আর রা ফুটল না ব্রজবধূদের মুখে। দুঃখের প্রচণ্ড তামসিকতায় কালিবরণ হয়ে গেল আনন্দের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না; অমৃতের সায়রে হঠাৎ যেন জন্ম নিয়ে গেল কালকূট বিষ; কে যেন আগুন ছড়িয়ে গেল কুঙ্কুমের গন্ধ-ক্ষেত্রে। এ যেন নির্ম্মেঘ বজ্রপাত, এ যেন নিভুজঙ্গ বিষবর্ষণ। এ যে হতে পারে, তা কেউ ভাবতেও পারে না।

ব্রজবধূরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বিলাসে ঝলমল করছে কুঞ্জবন, রসে থৈ থৈ করছে হৃদয়, সবই প্রস্তুত, সবই রয়েছে,··· কেবল ঠিক সেইখানটিতেই নেই তিনি,···অন্তর্ধান করেছেন তিনি··· যিনি নিখিল কলাকলাপের স্রষ্টা,···যিনি ব্রজবধূদের কৃষ্ণ-মধুপ।

ইতি রাসবিলাসে তিরোধানো নাম সপ্তদশ স্তবকঃ।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কাকমাচী—[কাকাহ্বা, বায়সী, হিং মকোয়, কবৈয়া, মং লঘকাবঠ.টী, কামেনি, গুজ্‌ং পীলুডী, কং কাবইকাকে, কাং বোবাতরীথ, অং এনবুস্‌সালব্‌] কণিস্তাশাক, গুড়কামাই solanum rubrum, s. nigram. ফলপাকাণ্ড ক্ষুপবিং। গাছে কাঁটা নাই। ফুল সাদা দেখিতে প্রায় লঙ্কাফুলের ন্যায়। ফল বৃহতীর মত, কটু। পাকা ফলের রং বেগুনে, মধুর স্বাদ, বালকে খায়। কোচবিহারে বহুল পরিমাণে জন্মায়। ছাপড়া জেলায় ইহাকে ভঁটকুঁয়া বলে! (১) কাঁটাশূন্য কাকমাচী—গুড়কামাই। ফল ছোট গোল। ফুল সাদা গোছা গোছা। কাঁটা নেই, ব্যঞ্জনাদিবর্গের বর্ষায়ু বন্য শাক। পাতা অণ্ডাকার। (২) কাঁটা গুড়কামাই—কাঁটা কুনিকা capparis sepiaria, ইহার গায়ে ছোট ছোট কাঁটা। বরুণাদিবর্গের ক্ষুপবিং। পুষ্করিণীর পাড়ে, বনে জঙ্গলে জন্মে। ফুল সাদা ও সুগন্ধী। পর্যায়—কাকদানী, বায়সাহ্বা, সর্বতিক্তা, বহুফলা, কটফলা, রসায়নী, কাকমাতা, স্বাদুপাকা, সুন্দরী, তিক্তিকা, বহুতিক্তা, গৃধ্রনখী।

কাকমাতা—কাকমাচী।

কাকমারি—গুরুচ্যাদিবর্গের লতাবিং। পাতা পানের মত। ফুলে দল নাই। ফল বাঁকা গোলাকার ও বিষাক্ত।

কাকমুদ্গা—মুঘাপর্ণী গাছ।

কাকরুহা—বন্দাবৃক্ষ, পরগাছা (?)।

কাকলীদ্রাক্ষা—কিসমিসাদি। পর্যায়—জম্বুকা, ফলোত্তমা, লঘুদ্রাক্ষা, নির্বীজা, সুবৃত্তা, রসাধিকা।

কাকবল্লভা—কাকজম্বু, বনজাম।

কাকবল্লরী—স্বর্ণবল্লী।

কাকশিম্বী—কাকতুণ্ডী, বেওয়াঠোঁটা গাছ।

কাকশীর্ষ—বকফুলের গাছ।

কাকস্ত্রী—বকফুলের গাছ।

কাকস্ফূর্জ—কাকতিন্দুক বৃক্ষ।

কাকা—১ কাকনাসা লতা, ২ কাকোলী গাছ, ৩ কাকজঙ্ঘা, ৪ রক্তিকা লতা, ৫ মলপূ গাছ, ৬ কাকমাচী। মেং।

কাকাঙ্গা, কাকাঙ্গী, কাকাঙ্কী—কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাকাণ্ড—১ মহানিম্ব, ২ কাকতিন্দুক, কোলশিম্বী।

কাকাণ্ডী—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

কাকাণ্ডোলা—কোলশিম্বী।

কাকাদনী—১ কুঁচ, ২ শ্বেতকুঁচ।

কাকায়ু—স্বর্ণবল্লী লতা।

কাকিনী—কুঁচ।

কাকুড়—কাঁকুড়।

কাকতিন্দুক—মাকড়াগাব। কেন্দু দ্রং।

কাকেক্ষু—নলখাগড়া।

কাকেন্দু—কুলিক বৃক্ষ, মাকড়াকেন্দু গাছ।

কাকেষ্ট—নিম গাছ।

কাকোডুম্বর—কাকডুমুর।

কাকোডুম্বরিকা—[হিং খোপসা পঞ্জাং ধুরা দেগর] খোসা ডুমুর, ডুমুরী fiscus oppositifolia. পর্যায়—ফল্গু, মলপু, জঘনেফলা, মলয়ু, ফল্গুফলা, পত্রজী, রাজিকা, ফুদ্রোদুম্বরিকা, ফল্গুবটিকা, ফাল্গুনী, কাকোডুম্বর, ফলবাটিকা, বহুফলা, কুষ্ঠঘ্নী, অজাজী, চিত্রভেষজা, ধ্বাঙ্ক্ষ নাম্নী, কাকোদুম্বরিকা।

কাক্ষী—অড়হর।

কাক্ষীবক—সজিনা গাছ।

কাখড়া—শটি দ্রং curcuma zedoaria, c. zarumbet.

কাজিলেবু—লেবু দ্রং।

কাঙ্কা—কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাঙ্কাম্য (দেশজ)—তৃণবিং cyperus jalmotha (?)

কাঙ্কুরা—[আসামে রিহা] boehmeria nivea, জালের শক্ত সূতা হয়।

কাঙ্গনি, কাঙ্গুক—কাঙ্গধান।

কাচ, কাচ গড়গড়—গড়গড়ে দ্রং, coix lachryma jobi.

কাচড়াদাম—জলজবিং, jussioea repans

কাচনার—কাঞ্চনফুল bauhimia variegata.

কাচস্থলী—পারুল গাছ bignonia suaveolens. পর্যায়—পাটলি, পাটকা, অমোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থানী, অগ্নিবল্লভা, তাম্রপুষ্পী।

কাচিম—[সং ভঞ্জক] দেবকুলোৎপন্ন বৃক্ষ (?)।

কাজলগোরী (দেশজ)—বৃক্ষ বিং lacca integrifolia. বরাহীকন্দ দ্রং।

কাজলবদি (দেশজ)—বৃক্ষবিং alpinia banglium buch.

অষ্ট্রেলিয়া ও মালয় উপদ্বীপে জন্মায়। ইহার পাতা হইতে তেল হয়, m. leucodendron.

কাকড়া—[সং কক্কট, ও০ কনাসিরি] কাঁচড়া, ঢোলাপাতা, commelyna bengalensis. আরণ্য লতানিয়া শাকবিং। ঘাসের মধ্যে বর্ষাকালে বহুল পরিমাণে জন্মায়। পাতা অণ্ডাকার, পাতার বোঁটায় নল থাকে। ফুল ছোট ও নীল রঙের। পানীকাঙ্কড়া—কাঁচড়া গাছের মত। ডাঁটা সরু ও লম্বা, c. salicifolia.

কাঞ্চন—[সং যুগ্মপত্রক] পুষ্পক্ষুপ বিশেষ। পর্য্যায়—কোবিদার, চমরিক, কুদ্দাল, কাঞ্চনার, কণকারক, কান্তপুষ্প, করক, কান্তার, [illegible], কাঞ্চনাল, তাম্রপুষ্প, কুদ্দার, বিদল, কাঞ্চনক, গণ্ডারি, শোণপুষ্পক। তিন প্রকার (১) শ্বেত কাঞ্চন, সাদা বড় বড় ফুল, বারমাস ফোটে, bauhinia acuminatal, (২) রক্তকাঞ্চন—[সং কাঞ্চনার, কোবিদার] b. variegata (৩) দেবকাঞ্চন—ফুল পাটলবর্ণ, হেমন্তকালে ফোটে, b. purpurea.

কাঞ্চনক—১ ধান্যবিং, ২ কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনকদলী—চাঁপাকলা।

কাঞ্চনকারিণী—শতমূলী।

কাঞ্চনক্ষীরী—ক্ষীরিণী লতা।

কাঞ্চনপুষ্পক—আহল্যা গাছ।

কাঞ্চনপুষ্পী—গণিয়ারী গাছ।

কাঞ্চনবুড়া (দেশজ)—ফুলগাছবিং kocmpferia angustifolia. ফল বড়, রং শাদা, আর বেগুনে।

কাঞ্চনার—কাঞ্চন ফুলের গাছ।

কাঞ্চনাল, কাঞ্চনারক—কাঞ্চন গাছ।

কাঞ্চনাহ্বয়—নাগকেশর।

কাঞ্চনী—১ হরিদ্রা (?), ২ স্বর্ণক্ষীরী গাছ।

কাঞ্চী—কুঁচ।

কাঞ্জীকা—১ জীবন্তী লতা, ২ পলাশীলতা।

কাঞ্জী—মহাদ্রোণী।

কাটক—বৃক্ষবিং, strychnos potatorum.

কাটিহারা (দেশজ)—বৃক্ষবিং, ardisia cathiara buch,

কাট চাঁপা—গরুড় চাঁপা দ্রং।

কাট ছাতা (দেশজ)—ব্যাঙের ছাতা।

কাঠ আলু—[সং কাষ্ঠালুক]।

কাঠ গোলাব—গোলাব দ্রং, rosa indica.

কাঠছাতিয়া (দেশজ)—বেঙের ছাতা।

কাঠজাম—জাম বিং eugenia operculata.

কাঠটগর (দেশজ)—ফুল বিং tabaraemontana coronaria.

কাঠডুমুর (দেশজ)—উড়ুম্বর বিং ficus offisitifolia.

কাঠবিব—আতিব দ্রং।

কাঠবেল (দেশজ)—ফুল বিং jasminum multiflorum.

কাঠমল্লিকা—মল্লিকা দ্রং।

কাঠমূলী (দেশজ)—বৃক্ষ বিং canthium angustifolium.

কাঠরাজা (দেশজ)—এক জাতীয় বড় গাছ ehretia levis.

কাঠশালুক („)—কন্দবিং nymphoea pubescans.

কাঠশিম („)—শিম দ্রং।

কাঠশোনা—গাছবিং aeschyaomene palubosa

কাঠিয়া রামরাম (দেশজ)—বৃক্ষবিং orchis uniflora.

কাঠিন—খেজুর।

কাঠিন্য ফল—কদবেল গাছ।

কাণ্ড—১ শর গাছ, ২ অক্ষোট বৃক্ষ।

কাণ্ডকটুক—করলা।

কাণ্ডকাণ্ডক—কাশতৃণ।

কাণ্ডগুণ্ড—গুণ্ডনামক তৃণবিং;

কাণ্ডণী—রামদূতী নামক লতাবিং;

কাণ্ডতিক্ত, কাণ্ডতিক্তক—চিরতা।

কাণ্ডনীল—লোধ।

কাণ্ডপুষ্পা—১ শরপুষ্পা গাছ ২ দ্রোণ পুষ্প।

কাণ্ডরুহা—কটুকী, কট্‌কী।

কাণ্ডহীন—মুথাবিং, ভদ্রমুণ্ডক।

কাণ্ডিকা—১ লঙ্কানামক ধান্যবিং, ২ বালুকা নামক কাঁকুড়।

কাণ্ডীরা, কাণ্ডীরী—মঞ্জিষ্ঠা।

কাণ্ডেক্ষু—১ কুলেখাড়া গাছ, ২ কাশতৃণ;

কাণ্ডেরী—নাগদন্তীবৃক্ষ।

কাতৃণ—রোহিষ নামক তৃণবিং।

কাদম্ব—১ কদমগাছ, ২ ইক্ষু।

কাদম্বর্য—কদম্ব বৃক্ষ।

কাদম্বা—কদম্বপুষ্পী লতা, মুণ্ডিরী লতা।

কানক—জয়পাল বীজ।

কানকুর (দেশজ)—কাঁকুড়, cucumis utilissimus.

কানছিড়ে (দেশজ)—[সং কানচটা, হিং কানছিরে] লতানে গাছ commelina bengalensis বাংলাদেশের সর্বত্র ছায়াময় স্থানে অথবা জলের ধারে জন্মায়।

কাননারি—শমী বৃক্ষ।

কানরাজ—উদ্ভিদ বিং bauhinia candida.

কানালা—শ্বেত হুড়হুড়িয়া, gynandropsis pentaphylla

কানীবৃক্ষ—ইন্দুর কানিপানা দ্রং, salvania cucullala.

কান্দুড় (দেশজ)—কান্দুর crinun toxieariun, c. asiaticum.

কান্ত—১ কুঙ্কুম, ২ হিজল গাছ।

কান্তপুষ্প—রক্তকাঞ্চন গাছ।

কান্তলক—নন্দীবৃক্ষ, কুঁদ গাছ।

কান্তা—১ প্রিয়ঙ্গু, ২ বড় এলাইচ, ৩ নাগরমুথা।

কান্তাঙ্ঘ্রি দোহদ—অশোক গাছ।

কান্তচরণ দোহদ—অশোক গাছ।

কান্তার—১ পদ্মবি, ২ কাজলি আক, ৩ কোবিদারবৃক্ষ, ৪ বাঁশ।

কান্তারক, কান্তারী—কাজলি আক।

কান্তীর—অপাঙ্গ দ্রং।

কান্দলি—উদ্ভিদবিং ancilcna nudiflorum.

কান্দুলি (দেশজ)—কেলে কোঁড়া গাছ commelina nudiflora.

কাপাল—কেলেকোঁড়া গাছ।

[ক্রমশঃ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা

(তুর্ক আগমন থেকে—সিপাহী বিদ্রোহ)

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১

সাত রাজার ধন মানিক রতন হল স্বাধীনতা। হৃদি কন্দরে মনের মণিকোঠায়, অন্তরের অন্তস্তলে তাকে সযত্নে রাখতে হয়। কেউ কি পারে পরের হাতে তুলে দিতে? তবুও দিতে হয়। তাই তো চিরদিন মানুষ করে আসছে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম; যুগে যুগে, দেশে দেশে।

যেদিন ঘোর দেশাধিপতি মহম্মদ ঘোরী, চৌহান পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দুস্থানের অপরাপর স্থানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন সেইদিনই ভারতের অধীনতার সুরু হল। আর্যাবর্তে বড় বড় রাজপুত রাজ্যগুলি একে একে তুর্কীর পদানত হয়। ধীরে ধীরে বিজেতা তুর্কশক্তি যুক্তপ্রদেশ দখল করে মগধের দ্বারে এসে উপস্থিত হল।

বিদেশী তুর্কশক্তি যখন ভারতের মাটিতে পা দেন গৌড় বাংলার অধীশ্বর তখন রাজা লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্মণ সেনের বয়স তখন প্রায় আশী। দীর্ঘ বিংশতি বছর প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করে নদীয়ায় বাস করতে থাকেন। রাজা বৃদ্ধ, দেশে বিশৃঙ্খলা, সুযোগ পেয়ে সুন্দরবন এলাকায় ডোম্মন পাল বিদ্রোহী। আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন মোটেই ভাল নয়। এই রকম যখন অবস্থা তখন, গৌড় বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনকে আকস্মিক যুদ্ধে পরাস্ত করে বখতিয়ার নদীয়া অধিকার করেন। কিন্তু বঙ্গদেশের অন্য অংশ তখনই তাঁর অধিকারে আসেনি। সেন রাজারা বহুদিন পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু সারা গৌড় বাংলার শেষ স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি লক্ষ্মণ সেন। (অবশ্য কেউ কেউ বলেন বখতিয়ার সেন রাজ্যের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করেন, কেহ বলেন এই রাজা লক্ষ্মণ সেন পুত্র মাধব সেন। লক্ষ্মণ সেন তখন জীবিতই ছিলেন না।) যাহা হউক বাংলার স্বাধীনতা লক্ষ্মী হলেন পরপদানত। সেন বংশের পতনের পরই বাংলা তার স্বাধীনতা হারায়।

বাংলা দেশে সম্পূর্ণ ভাবে তুর্ক প্রভাব বিস্তার করিতে অনেক সময় লেগেছিল। হিন্দুরা কখনই বিনা দ্বিধায় তুর্ক শাসন মেনে নেয়নি। মাঝে মাঝে তাঁরা চেষ্টা করেছেন লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের। কখনও বিক্ষিপ্ত, কখনও ব্যাপক ভাবে। তুর্ক নায়কদের মধ্যেও ছিল আত্ম-কলহ। এই সুযোগেই দশরথদেব গৌড়ের কিছু অংশ দখল করে কিছুকাল রাজত্ব করেন। সেন রাজারাও কেহ কেহ স্থানে স্থানে রাজত্ব করেছেন। আপন অধিকার ফিরে পাওয়ার বা স্বাধীনতা লাভের এই সকল চেষ্টা কখনও কখনও আংশিক ভাবে সফলতাও লাভ করেছিল।

অনেকে বলেন বাবা আদমসাহীর বিক্রমপুর জয়ের পরই বাংলার স্বাধীনতা সূর্যের অবশিষ্টটুকুও অস্তমিত হয়! কেহ কেহ আবার অপর সেন বংশের বল্লাল সেনের সহিত আদমের যুদ্ধ কাহিনীকে স্বীকার করেন না।

খুব সহজে বাংলার একচ্ছত্রাধিপতি হতে তুর্কশক্তি পারেনি এটা সকলেই স্বীকার করেন। মোগল বাদশাহরাও একেবারে একচ্ছত্রাধিপতি হ'তে পারেনি। বাংলা দেশকে বলা হত বিদ্রোহের দেশ। যুদ্ধ-বিগ্রহ, স্বাধীনতা সংগ্রাম লেগেই ছিল। এরই দুই একটি খণ্ড সংগ্রাম, সাফল্য-অসাফল্যের পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

* * * *

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তর বাংলায় ভাতুরিয়া পরগণায় জমিদার ছিলেন ব্রাহ্মণ গণেশনারায়ণ। বাংলা দেশে তখন ইলিয়াসশাহী আমল। রাজশক্তি বিচ্ছেদ, আত্মকলহে দুর্বল। এটা গণেশ ভাল করেই লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেন। গণেশনারায়ণ সামসুদ্দিনকে পরাস্ত করে সাত বছর বাংলায় রাজত্ব করে তাঁর স্বপ্নকে তিনি সফল করেছিলেন। তাঁর মধ্যে এক স্বাধীন চেতনা বিকাশ লাভ করে। তাই তাঁকে বলা যায় শেষ বাঙালী হিন্দু রাজা। কিন্তু যে শক্তি তিনি দু'শ বছর পরে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তাঁর পুত্র যদু তা রক্ষা করতে পারলেন না। মহেন্দ্রদেব নাম নিয়ে যদু সিংহাসনে বসেছিলেন কিন্তু অল্পদিন পরে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে জালালুদ্দিন নাম নেন।

* * * *

মোগল-পাঠান উভয়কেই বাংলায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। বাংলার ভুঁইয়ারা বীর বিক্রমে বিদেশী শক্তিকে বাধা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন স্বতন্ত্র স্বাধীন ভুঁইয়া। চাঁদ, কেদার, প্রতাপ, মুকুন্দ, কন্দর্প রায় প্রভৃতি বাংলার বারোজন ভুঁইয়ারা সকলেই ছিলেন প্রকৃত বীর। মোগল শক্তি এঁদের আয়ত্তে আনতে পারেনি।

কেদার রায় ছিলেন শ্রীপুরের জমিদার বা ভূঁইয়া। ভাটির জমিদারদের মধ্যে তিনি ঐক্য আনতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু পারেন নি। কেদার মোগলের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। যুদ্ধে কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

দোষ গুণে বিচিত্র মানুষ ছিলেন প্রতাপ। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু নীচু শ্রেণীর লোকেরা ছিল তাঁর অনুগামী। এদের সহায়তায় তিনি প্রভূত শক্তি অর্জন করেছিলেন: তাঁকে তাই বলা হত, "সোদর বনের বাঘ।" শেষ যুদ্ধে তিনিও পরাজিত ও বন্দী হয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুরের হাম্বির মল্ল ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। প্রত্যক্ষ ভাবে খুব একটা না হলেও পরোক্ষ ভাবে বাংলার অপর ভূঁইয়াদের সঙ্গে যোগ ছিল। প্রকৃত পক্ষে বন বিষ্ণুপুরে ছিলেন তিনি স্বাধীন রাজা। বাংলার বারভূঁইয়ারা সকলেই বীর ছিলেন। তাঁদের ছিল সৈন্য, সেনাপতি, কামান-বন্দুক, হাতী ঘোড়া; যুদ্ধ-সরঞ্জামের অভাব ছিল না। অভাব যার ছিল—তা হল একতা। বাংলার বারভূঁইয়াদের মধ্যে যদি ঐক্য থাকিত তাহলে অবশ্য কি হত এখন আর ভেবে লাভ নেই।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দেশময় এল বিশৃঙ্খলা। মুর্শিদকুলী খাঁর অত্যাচারে বাংলার ভূঁইয়ারা সকলেই ক্ষুব্ধ। সেই সময় এক সমৃদ্ধ শহর-দেশ গঠন করে সীতারাম রায় মোগল রাজশক্তিকে কর দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। শেষ যুদ্ধে অবশ্য তিনিও জয়ী হতে পারেন নি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলিম আগমনের পর থেকেই বাংলা দেশ তার স্বাধিকার লাভের জন্য সচেষ্ট। অবশ্য রাজা গণেশ ছাড়া সাফল্যজনক অভ্যুত্থান আর ঘটে নি। গৌড় বাংলা জুড়ে এক সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্নও আর বড় কেউ দেখেন নি। আর একতা তো ছিলও না। তবু সংগ্রামের শেষ ছিল।

২

একটা বড় গোলমেলে কথা আমরা দীর্ঘকাল ধরে শুনে আসছি বাঙালীর কাছ থেকে ইংরাজ বাংলার স্বাধীনতা-লক্ষ্মীকে হরণ করে নিয়েছেন। কথাটি আদপেই ঠিক নহে। সিরাজের নবাবী লাভের কয়েক শত বৎসর পূর্বে বাঙলা ও বাঙালী পরাধীন হয়েছে। আর সিরাজ কোন কালেই কোন পুরুষেই বাঙালী নয়। বিশ্বাসঘাতক আমীরচাঁদ বা উমিচাঁদ, দুর্লভরাম বা জগৎ শেঠ, মীরজাফর কেহই বাঙালী নহে। বাঙালী মোহনলাল যুদ্ধ করেছিলেন প্রাণপণে। অবশ্য অপ্রধানদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙালী ছিলেন। ইংরাজ এলো; বাঙলার সংগ্রাম যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল ছোট ছোট বা খণ্ড খণ্ড ভাবে। এখানে ওখানে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ লেগেই ছিল। উত্তর বাংলার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, চোয়ার বিদ্রোহ এমনি খণ্ড বিপ্লব। ১৭৬০ ও '৬৩ সালে সন্ন্যাসীরা বিপুল ভাবে বেড়ে উঠেছিলেন। রাজসাহী, রঙপুর, গোঁওখালি, পাটনা জুড়ে চলেছিল সন্ন্যাসী অভ্যুত্থান। দীর্ঘ দিন ধরে এঁরা ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে অবলম্বন করেই বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেছিলেন তাঁর "আনন্দমঠ"। রেজা খাঁ সেতাব রায়ের অত্যাচারের কথা, '৭৬-এর মন্বন্তরের বীভৎস চিত্র সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। "টাকা লইবার ভার ইংরাজের আর প্রাণ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার মীরজাফরের।"—এই তখনকার অবস্থা। ক্লাইভ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করল, কিন্তু দৃঢ় হতে লাগল চল্লিশ বছর।

ইংরাজ আমলের আরম্ভে ছিল অরাজকতার যুগ। পুরাতন নিচ্ছিল বিদায়, নূতনের পদধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছিল।

ইংরাজী সাহিত্য আর ইংরাজের সঙ্গে গভীর ভাবে মিশেছিলেন রামমোহন আর তাইতেই বুঝেছিলেন দেশের শক্তিহীনতার কারণগুলো দূর করতে হবে। হিন্দুর কুসংস্কার, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও খৃষ্টান পাদ্রীদের মিথ্যা অপপ্রচারের সতেজ প্রতিবাদ করলেন। আজকের এই জাতীয় চেতনা, দেশাত্মবোধ, সকল কিছুরই মূল রামমোহন। নব ভাবতের পথপ্রদর্শক রামমোহন। পাদ্রীদের অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করলেন তত্ত্ববোধিনী সভা, প্রচার করলেন স্বদেশী চিন্তা—দেশাত্মবোধের কথা। বাঙালীর উচ্চাদর্শ তুলে ধরলেন, বললেন আত্মস্থ হতে। ইংরাজী শিক্ষায় মানুষ যেমন একদিকে পেল জাতীয়তাবোধের শিক্ষা অপরদিকে তাদের অন্ধ অনুকরণে মত্ত হল। ইংরাজ বাঙালী মিলন প্রচেষ্টা চলল। দেশময় আসতে সুরু করল উচ্ছৃঙ্খলতা। বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য-ক্ষুণ্ন হতে সুরু করল। এই পরিণতি লক্ষ্য করে ঋষি রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠা করলেন "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা।" ১৮৬৭ সালে ১২ই আগষ্ট নবগোপাল মিত্র প্রমুখ মনীষী প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুমেলা' ডাক দিল জাতীয়তার। পরনির্ভরতা, পরানুচিকীর্ষা দূর করতে হবে। আত্মনির্ভর হতে হবে। বাঙালী সাড়া দিল, প্রাণ খুলে গাইল দেশের গান। রামমোহনের উদাত্ত আহ্বান আর আন্দোলনে সতীদাহ প্রথা রদ হয়েছিল কিন্তু পুরাণো হিন্দু সমাজ গিয়েছিল ক্ষেপে। এই সমাজের নেতা ছিলেন রাধাকান্ত দেব। এই কুপ্রথা রদ হয় ১৮২৯ সালে।

তার আগেই ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয়েছে হিন্দু কলেজ। ডিরজিওর শিক্ষা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এনেছে এক বিপ্লব। ইংরাজী চর্চা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা চর্চাও চলতে লাগল। ১৮৫২ সালে মেডিকেল কলেজে বাংলা শ্রেণী খোলা হল। নব যুগের পুরোধা হয়ে এল ইয়ং বেঙ্গল। ইয়ং বেঙ্গলের ছিল দু'টি হাতিয়ার—সভা-সমিতি ও পত্রিকা। চিন্তার, মত প্রকাশের, মেলামেশার স্বাধীনতা চাই। (Freedom of Thought, freedom of Expresson, freedom of Association) একটি দু'টি করে পত্রিকা প্রকাশিত হল। এই যুগের অবসান ও নবযুগের আবির্ভাব লগ্নে, বিদ্যুতের মত গতি, ব্যাঘ্রের মত তেজ ও সাহস নিয়ে এলেন বাণীর বরপুত্র বিদ্যাসাগর। বললেন,—"ভারতবর্ষের এমন রাজা মহারাজা নেই যাহার নাকে এই চটি জুতো শুদ্ধ পায়ে টক করিয়া লাথি না মারিতে পারি।"

নতুন ভাব এল দেশে। বহু বিবাহ প্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ আইন আর সেই সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠন। বিদ্যাসাগর মশাই নিজেই একটি যুগ।

একই যুগে এত মহাপুরুষের আবির্ভাব বোধ হয় আর হয়নি। সাহিত্যে, দেশ-প্রেমে, ধর্ম সমাজ-সংস্কারে, সঙ্গীতে এই যুগ যেন মেতে উঠেছিল।

১৮৫৭ সালে ভারত জুড়ে এক মহাবিপ্লব সংঘটিত হল। দেশের

যাবৎ সিপাহী, প্রাক্তন রাজা জমিদার ও করদ রাজারা এর মূলে ছিলেন। দত্তক প্রথা রদ, রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফের প্রচলন, পাদ্রীদের অন্যায় ভাবে হিন্দুদের খৃষ্টান করার চেষ্টা, সর্বশেষে এল সর্বনাশা টোটা। দেশ জ্বলে উঠল। কিন্তু এই জ্বলার পিছনে আরও কিছু ছিল। ছিল পুরাতন নবাব-বাদশা পেশয়া রাজা মহারাজাদের গদীর মোহ। তাই সর্বাঙ্গীণ ঐক্যও ছিল না। নিজের নিজের এলাকা এঁরা মনে মনে ভাগ করছিলেন। অবশ্য নামে বাদশাহকে সামনে দাঁড় করানো হয়েছিল। নিখিল ভারত গঠনের স্বপ্ন বড় একটা কারও ছিল না। অবশ্য এই আন্দোলন ভারতময় নবপ্রেরণা, দেশ জুড়ে জাতীয়তাবোধ এনে দিয়েছিল। এবং ইংরাজ শক্তির প্রতি মোহও ভেঙে দিয়েছিল। বাংলা থেকে এই আন্দোলন-এর সুরু হয়েছিল এবং বেঙ্গলি রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছিল ঠিক কিন্তু বাংলার জন জীবনের উপর এর প্রভাব খুব একটা পড়েনি। তার অনেক কারণের মধ্যে, সিপাহীদের মধ্যে অধিক বাঙ্গালী না থাকা ও বাঙলার শক্তিশালী স্বাধীন বা করদ রাজার অভাব হয়তো দুটি কারণ।

• • •

সিপাহী বিদ্রোহে ভারতে তুর্কশক্তির শেষ রশ্মিটুকুও নিভে গেল। এর পর ভারতময় স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হল নবপর্যায়ে। সে বৃত্তান্ত ভবিষ্যতে বিবৃত করার ইচ্ছা রইল।

হোলির দিনে

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

ফাগুনে আজ হোলির খেলায়
আয় রে তোরা আয় ছুটে,
তোদের ডাকে শিমুল-পলাশ
উল্লাসে ওই যায় ফুটে।
নতুন খুশীর জোয়ার নিয়ে
আয় রে ছুটে ভাই-বোনে,
গোমড়া মুখে থাকিস্‌নে কেউ
একলা বসে ঘর-কোণে।
একটি বছর পরে আবার
আবীর রাঙা দিন এলো,
নিটোল হাসির ছন্দে কি তাই
এই ধরণী প্রাণ পেলো?
কোথায় গেলি বাবলা-হাবুল
কোথায় রে তুই বন্দনা,
নানান রঙে সাজতে তো আজ
লাগছে মোটেই মন্দ না।
হোলির দিবস ডাক দিয়েছে
সকল বেদন যা ভুলে
সবার সুরেই সুর মিলিয়ে
গাইতে হবে দিল খুলে।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

সুজিতকুমার নাগ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শোনে নি এমন লোক কেউ নেই বাংলা দেশে। শুধু বাংলা দেশে কেন সারা জগৎ জুড়ে তাঁর নাম লেখা আছে। তাঁর আসল পরিচয় হ'লো তিনি শিল্পী। শুধু তাই নয়, তিনিই হলেন আধুনিক ভারতের শিল্পিগুরু। এক কথায় তাঁকে যদি আমরা 'ফাদার অব ইণ্ডিয়ান আর্ট' বলে সম্মান দিই তাতে দ্বিমত করার কোন কারণ থাকবে না।

আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পকলার মধ্যে যে সত্যিকারের সৌন্দর্য আছে তা আমরা প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। যদি অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সত্যকারের রূপ আমাদের কাছে তুলে না ধরতেন, তা হলে কোথায় থাকত ভারতের সেই প্রধান শিল্পের সৌন্দর্যবোধ। অবনীন্দ্রনাথ তুলে ধরলেন সেই হারিয়ে যাওয়া বিস্মৃতির স্মৃতি। যাতে যুগে যুগে অমর হয়ে থাকবে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী জীবনের সুরুতেই এলো বাধা আর বিপত্তি। নিন্দা আর সমালোচনা। কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত যখন তাঁর অপূর্ব চিত্রকলা কাগজে প্রকাশ হতে লাগল, একের পর এক, তখন বিস্ময়ে সবাই দেখলে, এও কি সম্ভব? আবার আরেকদল বললে, একি ছবি? কিন্তু শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলার রাজ্য থেকে নিজেকে হারালেন না। নিজের ধ্যানে তিনি তখন নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন, তাঁর চোখে যে মাধুর্য, সেটা হচ্ছে প্রাচীন ভারতের সত্য রূপ।

দেখতে দেখতে তাঁর অনুরাগী শিল্পীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে গেল। শুধু বাংলা দেশে নয় সারা ভারতে তার আলোড়ন পড়ল, দিক থেকে দিগন্তে, দেশে বিদেশে এমন কি সাগর পারেও সে ঢেউ এসে দেখা দিল। শুধু কি তাই! অবনীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে হলেন অন্যতম। আপন বৈচিত্র্যে রমণীয়।

উৎস সন্ধান করলে হয়ত দেখা যাবে তাঁর শিল্প-জীবনের প্রেরণা এল কোথা থেকে? কী করে পেলেন? অবনীন্দ্রনাথ খুব ছোটবেলা থেকেই খুব ছবি দেখতেন, আর মনে মনে তাই ভাবতেন, আর ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা সুরু। আপন খেয়ালে মনের আবেগে তিনি ছবি দেখতেন আর দেখেই তা আঁকতেন। খুশী হয়ে তাঁর ছবি দেখে, ছোট পিসেমশাই তাঁকে একখানা হাঁসের ছবি উপহার দিয়েছিলেন। তাঁরই উৎসাহে তিনি সেটাকে কপি করেছিলেন। লাল, নীল পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকতেন। সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় তাঁর এক বন্ধু তাঁকে লক্ষ্মী সরস্বতীর ছবি আঁকতে শিখিয়েছিলেন, অনুকূল নামে তাঁর সেই সতীর্থ ছিল তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু।

লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, ঠাকুরবাড়ীর সকলেই ছিলেন শিল্প-কলার পূজারী। অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথও ছবি আঁকতেন। তাঁর দাদা জ্ঞানেন্দ্রনাথও একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে সম্মান পেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ছবি আঁকতেন, আর রবীন্দ্রনাথের ছবি ত' পৃথিবীর লোকের কাছে এক বিস্ময়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছেন প্রতিভার আলো। বলতে গেলে গোটা ঠাকুরবাড়ীটাই যেন শিল্পকলার মন্দির।

ছেলেবেলা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের প্রখর দৃষ্টি ছিল, যেখানে যত ছবি আছে তাকে দেখা, শুধু দেখা নয় তাকে নিয়ে চিন্তা করা। সেই ছেলেবেলায়, তাঁর যখন ন'দশ বছর বয়স, সেই বয়সে কলকাতা থেকে পনের মাইল দূরে গঙ্গাতীরের এক বাগানবাড়ীতে তাঁর চোখে বিস্ময় জাগল! ঘুমিয়ে পড়া রাজপুত্র জেগে উঠলেন অচিন রাজকন্যার পরশ পেয়ে। তিনি প্রাণ ভরে দেখলেন বাগানবাড়ী, তার পাশে পাশে সাজানো রয়েছে ফুলের মেলা, আর ফলের গাছ! দেখলেন হরিণ আর ময়ূরের খেলা। এই সমস্ত দেখতে দেখতে আঁকতে সুরু করলেন—কাগজ কলম তুলি নিয়ে বসে যেতেন। এই ভাবে আপন খেয়ালে নিজে নিজেই ছবি আঁকা শিখলেন। আর ভাবলেন, কবে সত্যিকারের ছবি আঁকা শিখবেন। এবার শেখার পালা। বয়সে তরুণ। পঁচিশ বছরে পা দিতেই ভর্তি হলেন গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে। তখন আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন এক ইটালিয়ান শিল্পী, নাম গিলার্ডি সাহেব। তাঁর কাছ থেকে পেলেন ভালবাসা, প্রেরণা, উৎসাহ। গিলার্ডি সাহেব তাঁকে নিজের বাড়ীতে শেখাতে সুরু করলেন। কী ভাবে লাইন ড্রইং আঁকতে হয়, প্যাসটাল থেকে সুরু করে তেল রঙের ছবি আঁকাও শেখালেন বিদেশী কায়দায়।

তখনকার সময়ে রবি বর্মা ছিলেন একজন নাম-করা শিল্পী। সারা জগতে তাঁর নাম। তিনি একদিন ঠাকুরবাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথের ষ্টুডিও দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হন। বিপুল বিস্ময়ে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন, তিনি বললেন—'তুমি একদিন বড় শিল্পী হয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবে।' তাঁর সেই অভয় বাণী ফলে গেল কয়েক বছরের মধ্যে। তখন ইংলণ্ড থেকে এসেছেন সি, এল, পামার নাম করা শিল্পী। অবনীন্দ্রনাথ এই সুযোগে তাঁর কাছ থেকে ভাল রঙের কাজ শিখে নিলেন। শুধু কি তাই? অয়েল পেণ্টিংও। পামার সাহেব অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের নিষ্ঠায় খুশী হয়ে বললেন: 'এবার তোমার পালা, যা শেখাবার শিখিয়েছি—এইবার মানুষের এ্যানাটমি অর্থাৎ শরীরের খুঁটিনাটি তোমাকে শিখতে হবে।

কী করে?

পামার সাহেব হাসলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলেন এক মড়ার মাথা।

অবনীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে গেলেন। বললেন: আমার দ্বারা হবে না।

কিন্তু পামার সাহেব বললেন, আঁকতেই হবে।

পামার সাহেবের নির্দেশে অবনীন্দ্রনাথ এঁকে বাড়ী ফিরলেন।

বাড়ীতে ফিরে এসে তিনি জ্বরে পড়লেন আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন: কিছুতেই তিনি আর পামার সাহেবের কাছে যাবেন না। সত্যি কি তাই? না! আবার গেলেন। পামার সাহেবের মনে খুশী, তিনি বললেন: সত্যিকারের শিল্পী তুমি।

প্রকৃতির ছবি আঁকতে আঁকতে তন্ময় হয়ে গেলেন। কলকাতা থেকে মুঙ্গের। সেখানে প্রকৃতির দৃশ্যপট নদীতীরে বসে প্রাণভরে দেখলেন আর তাকে জীবন্ত করে তুললেন তুলির রেখায়, তাঁর শিল্পমন দিয়ে। এমনি করে তাঁর দিন কেটে যায়।

ভাবছেন, কি হবে এই ইউরোপীয় শিল্পচর্চা করে? এতে তৃপ্তি পেলাম কই? মনের এই দ্বৈত বিরোধের মধ্যে হঠাৎ একদিন পেয়ে গেলেন একখানা প্রাচীন পুঁথি—তাঁর প্রপিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের গ্রন্থশালায়।

কী পেলেন তিনি? মোগল যুগের প্রাচীন চিত্রের পুঁথি সে খানা। দেখেন আর ভাবেন। আবার তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন শিল্পচর্চায়। ভাবলেন, এতদিন পর পেয়েছি আমার সত্যিকারের রূপ। আবার তিনি নতুন করে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ঠিক সেই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে দিল্লী থেকে একখানা পার্শিয়ান ছবির বই পেয়ে গেলেন, পাঠিয়েছেন তাঁর ভগ্নীপতি শেষেন্দু। আর মিসেস মার্টিন ভেল তাঁকে একখানা কাব্যগ্রন্থ ইলিউমিনেট করে পাঠালেন। ইলিউমিনেট হচ্ছে বইয়ের পাতাকে নক্সা করে সুন্দর করে আঁকার পদ্ধতি।

অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের লুপ্ত গৌরবকে ফিরিয়ে আনলেন, আনলেন ভারতীয় শিল্পের অপূর্ব চিত্র গাথাকে। তাঁর বেশীর ভাগ প্রসিদ্ধ ছবিই হচ্ছে মোগল যুগের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে আঁকা। যেমন—শাহাজানের মৃত্যু। আলমগীর ও দারার ছিন্নমুণ্ড। তাঁর অশোক মহিষী বা তিষ্যরক্ষিতা ছবিখানি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন এ দেশে আসেন, তখন কুইন মেরী অবনীন্দ্রনাথের এই ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আজও লণ্ডনে এ ছবি আছে।

দেশে দেশে—সারা পৃথিবীতে অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছড়িয়ে আছে। তাঁর ছবির পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। সারা জীবন ধরে তিনি যে রূপ দিয়েছেন, তা পেয়ে আজ পৃথিবী ধন্য।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সুরেশ কর, মুকুল দে প্রভৃতি নাম করা শিল্পীরা।

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথই ছিলেন গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের কর্ণধার। বাংলার বাইরে থেকেও এসেছিল গুণগ্রাহী ছাত্রদল, মহীশূর, লক্ষ্ণৌ, লঙ্কা দ্বীপ, যুক্ত প্রদেশ থেকে দলে দলে অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিত্র বিদ্যা শিখতে।

শুধু কি তাই?

ভাবছেন, কি হবে এই ইউরোপীয় শিল্পচর্চা করে? এতে তৃপ্তি পেলাম কই?

তারপর?

জাপান থেকে শিল্পী টাইকান আর হিসিদা এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকে ভারতীয় শিল্প বিদ্যা শিখে নিতে। ভারত ছেড়ে তিনি বাইরে যান নি, কিন্তু তাঁর অমর প্রতিভার সমাদর হয়েছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। দেশ বিদেশের শিল্পীরা নিজেরা এসে দেখে গেছেন অবনীন্দ্রনাথের অনুপম চিত্রবিদ্যা। যেমন জাপান থেকে প্রসিদ্ধ শিল্পী ওকাকুরা, বিলেত থেকে অধ্যাপক ও শিল্পী রোদেন ষ্টাইন, রাশিয়া থেকে এসেছেন সুবিখ্যাত মনীষী শিল্পী নিকোলাস্ রোরিক।

আর এ আসার পেছনে ছিল বিদেশী শিল্পীদের ভারতীয় শিল্পের সাথে পরিচিত হওয়া। এসেছিলেন প্যারিস থেকে বিদুষী শিল্পী মাদাম কারপ্লেস, আর নরওয়ে থেকে এসেছেন শিল্পী মাডসেন। সবাই এসে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর ছবি দেখে।

১৯০৭ সালে অবনীন্দ্রনাথ ও শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ দু'জনে মিলে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস স্থাপন করেন। ভারতের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক মর্যাদার জন্যে ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'বাগীশ্বরী' অধ্যাপক রূপে সম্মান দান করেন।

পৃথিবীর সব দেশেই শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি আছে। বিশ্ব দরবারে তাঁর স্থান আজ সবার মধ্যে।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় শিল্পবিস্তার পথ-প্রদর্শক, যা আজ ও আগামী কালে স্বাক্ষর দেবে সংস্কৃতি ও শিল্প মাধুর্যের।

এল ফাল্গুন

গৌর মোদক

মৌমাছি গুনগুন,
এল ঐ ফাল্গুন।
ঝরে সোনা রোদ্দুর,
চোখ যায় যদ্দূর।
প্রজাপতি আনন্দে,
ওড়ে মধুর ছন্দে।
আজ কোকিলের কণ্ঠ,
ডাক দেয় অনন্ত।
আর আমের মুকুল,
গন্ধে হলো আকুল।
শিমুল ও পলাশ,
আনন্দে দেয় উল্লাস।
খুসী রাঙা দিগন্ত,
আনে আজ বসন্ত।
মন আজ যায় ভেসে,
রূপ কথারই কোন দেশে।

যাঁদের কাছে মানুষ ঋণী

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী

গ্রীক পণ্ডিত এ্যারিস্টোটেলের মতে যে জিনিষ যতো বেশী ভারী সে জিনিষ উপর থেকে ততো তাড়াতাড়ি নীচে এসে পড়ে।

গ্যালিলিও এ কথা মানতে রাজী হলেন না। বললেন, আমি এ কথা বিশ্বাস করি না।

শুনে প্রাচীনপন্থীরা ক্ষেপে উঠলেন। বললেন, যতো বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা! পণ্ডিত এ্যারিস্টোটেলের ভুল ধরা!

গ্যালিলিও গম্ভীর হয়ে বললেন, বেশ, মিথ্যে কথা কি-না তা পরীক্ষা করে দেখা হোক! শেষে তাই ঠিক হ'লো। ঠিক হ'লো পরীক্ষা করে দেখা হবে।

গ্যালিলিও কয়েকজন অধ্যাপককে সংগে নিয়ে পিসানগরীর সু-উচ্চ টাওয়ারের উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর সেখান থেকে একই ধাতুর তৈরী বিভিন্ন ওজনের দু'টি গোলক নীচে ফেলে দিলেন।

গোলক দু'টি একই সময়ে নীচে এসে পড়লো!

প্রাচীনপন্থীরা তবুও বিশ্বাস করতে পারলেন না। ভাবলেন, গ্যালিলিও নিশ্চয়ই তাঁদের যাদুবিদ্যা দেখিয়ে বিস্মিত করার চেষ্টা করেছেন!

তাঁরা বিশ্বাস না করলেও শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানে এই সত্য প্রমাণিত হ'লো! শুধু কি এই। এ ছাড়া গ্যালিলিও সে যুগে আরো অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন।

সে যুগের লোকের ধারণা ছিলো সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।

গ্যালিলিও-র আগে কোপারনিকাস নামে একজন বিজ্ঞানী বললেন, এ কথা মিথ্যে! তিনি বললেন, সূর্য কখনোই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে পারে না। সূর্যের পরিবর্তে পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

কোপারনিকাসের কথা সে যুগের শিক্ষিত সমাজ বিশ্বাস করতে রাজী হলেন না। তাঁরা একবাক্যে এই মতবাদকে হেসে উড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু গ্যালিলিও?

গ্যালিলিও পরবর্তী যুগে এই মতবাদকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি তাঁর টেলিস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে বললেন, কোপারনিকাস যা বলেছেন তা সত্য। সত্যি সত্যিই পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

এ কথা শুনে প্রাচীনপন্থীরা মোটেই খুশী হলেন না। তাঁরা গ্যালিলিও-র বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। বললেন, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যে। কারণ বাইবেল এ কথা বলে না। শেষে গীর্জার পুরোহিতরা গ্যালিলিও-র বিরুদ্ধে রাজার কাছে নালিশ করলেন। বললেন, গ্যালিলিও বাইবেল বিশ্বাস করে না।

গ্যালিলিও তবুও শান্ত হলেন না। তিনি রাজার কাছে একখানা চিঠি লিখে জানালেন, বাইবেলের কাজ ধর্ম পথের নির্দেশ দেওয়া, মুক্তির পথ দেখানো। কিন্তু বাইবেল বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নয়।

এ ছাড়া তিনি আরো অনেক যুক্তি খাড়া করলেন। কিন্তু কোনটাই ধোপে টিকলো না—প্রাচীনপন্থীরা মানতে রাজী হলেন না। শেষে রাজার আদেশে তাঁকে বন্দী করা হ'লো!

বিচার হ'লো।

বিচারক রায় দিলেন। বললেন, গ্যালিলিও যদি তাঁর এই নতুন মতবাদ ত্যাগ করেন তবেই তিনি মুক্তি পাবেন। নতুবা তাঁকে বন্দী অবস্থায় দিন কাটাতে হবে।

গ্যালিলিও মহা মুশকিলে পড়লেন! শেষে তিনি তাঁর নতুন মতবাদ ত্যাগ করার ভাণ দেখালেন। মুক্তিও পেলেন। মুক্তি পাবার পর তিনি আবার তাঁর মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। ফলে সত্তর বছর বয়সে তাঁকে আবার বন্দী করা হলো! দীর্ঘ কয়েক বছর কারাবাসের পর আটাত্তোর বছর বয়সে কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হলো!

রক্তের স্বাক্ষর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভক্তি দেবী

পিনাকীর ঘরের দরজাটা হু'হাট করে খোলা। একটা কে যেন মাটিতে পড়ে আছে। বোধ হয় আহত একটা কুকুর। তারই কাতর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

সীমা ভয় পেয়ে ডাকে—পিনাকীবাবু আপনি কোথায়? অন্ধকারে আমি এখানকার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

খাটের পায়ার কাছ থেকে জবাব আসে—আমি আছি। এখানে একটা ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে। আপনি মিস্ রায়? আসুন, ওই সামনের টেবিলে রাতের জন্ত মোমবাতি আর দেশলাই আছে আনতে পারবেন কী? এই যে এইদিকে যান।

সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে আলোটা জ্বালায় সীমা। ঘরের বিজলীবাতিও জ্বলে ওঠে কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

দিগ্‌ভ্রান্ত কৌতূহলীরা অর্থাৎ অন্ধকারে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে যাঁরা এতক্ষণ অনর্থক শুধুই চীৎকার আর ছুটোছুটি করছিলেন তাঁরা সজ্ঞবদ্ধ হতে আরম্ভ করেন পিনাকীর ঘরের মধ্যে। পিনাকী দাঁড়িয়েছিল খাটের একটা বাজু ধরে। বোধ হয় আজকের ঘটনার ফলেই প্রথম সম্পূর্ণ একা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে বাধ্য হয়েছে সে। আলোটা জ্বলে ওঠা মাত্র সে এগিয়ে যায় মাটির ওপর পড়ে থাকা কুকুর দু'টোর পানে। কিন্তু দু'টোর একটা তখন মৃত আর একটা মৃতপ্রায়। সমস্ত ঘরটা ওদের রক্তে ভেসে গেছে।

সীমা ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে ওর দিকে। বলে—মিঃ চৌধুরী আপনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন। এ ভাবে আপনাকে উঠা নামা করবার অনুমতি ডাক্তার এখনও দেন নি।

সীমা হয় তো আরও কিছু বলতো। কিন্তু পিনাকীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার আর কথা বেরোয় না। অতবড় মিলিটারী অফিসার হয়েও পিনাকী তখন আর নিজেকে সংবরণ করতে পারে নি। ডান হাতটা তার তখনও গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে বাঁধা তাই শুধু বাঁ হাত দিয়ে সে আহত কুকুরটাকে সিধে করে শোয়াবার চেষ্টা করছে। গালের পরে তার বড় বড় কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ছে।

হোটেলের অনেকেই তখন এসে পৌঁছে গেছেন পিনাকীর ঘরে। বিভিন্ন কণ্ঠে প্রশ্ন ওঠে—কী ব্যাপার বলুন ত'?

—কী হয়েছে কী?

—আলো নেভার পরেই কী যেন একটা হল?

—না না আলো নেভার পর কেন? আগে হতেই—

—চোর এসেছিল?

—কিছু নিয়ে যায় নি ত'?

—এ কী কুকুর দু'টোকেই মেরে ফেলেছে?

—উঃ কী ভয়ানক।

এমনিতর নানান্ জিজ্ঞাসা আর মন্তব্যের মাঝে ঘরে এসে দাঁড়ায় সিংজী। বলেন—কী ব্যাপার বলুন ত'? আপনারা সকলে এখানে? পিনাকীবাবুর কী আবার শরীর খারাপ হয়েছে? এ কী পিনাকী বাবু আপনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছেন? আপনার কুকুর দু'টো, —ইস্ এ যে দেখছি। ঠিক আছে আমি এখনই ডাক্তারের ব্যবস্থা করছি।

—তার আর দরকার হবে না সিংজী। ভারী গলায় পিনাকী উত্তর দেয়। ওরা আর ডাক্তারের জন্ত প্রতীক্ষা করবে না।

—ইস্ ভারী দুঃখের বিষয়। কিন্তু কী করে এমন হোল?

কৌতূহলী অতিথিদের পানে তাকিয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে পিনাকী বলে—আলোটা নেভার সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক আমার ঘরে ঢোকে। আর আমাকে লক্ষ্য করে গুলী চালায়। কিন্তু অতি অল্পের জন্ত গুলীটা আমার গায়ে না লেগে—লাগে আমার মাথার বালিশে। কিন্তু এবার ওদের জন্তে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল সে। ওদিকে সে গুলী করে। সম্ভবত তার রিভলবারে সাইলেন্সার লাগানো ছিল তাই গুলীর আওয়াজ বাইরে শোনা যায়নি।

বাধা দিয়ে মহেন্দ্র সিং জিজ্ঞাসা করেন—তা আপনিও গুলী করেছিলেন না কী?

—নিশ্চয়। সুস্থ থাকলে তাকে আজ আমি ফিরে যেতে দিতাম? বাঁ হাতে আমি তাকে গুলী করেছি। হয় তো লাগেনি। তবে আমায় গুলী করতে দেখেই সে পালিয়েছে।

—বাঃ বাঃ আপনার বীরত্ব সত্যিই প্রশংসা পাবার মত। নিজে আপনি এখনও বিছানা ছাড়তে পারেন নি কিন্তু নিজে হাতে শত্রুদমন করেছেন? সত্যি এ কথা গর্ব করে বলার মত।

—সে আমার শত্রু কী কে তা আমি জানি না মিঃ সিং। তবে এ কথা সত্যি যে এই অধম প্রাণটার ওপর তার সদয় দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু জীবনে কখনও আমি কারো সঙ্গে শত্রুতা করিনি।

···সত্যি কথা বলতে কী লোকটার ওপর রাগের চেয়ে বেশী আমার কৌতূহল। মনে হয় কী জন্তে কী আক্রোশে সে বারবার আমার ওপর এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সোজাসুজি দেখা হলে সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করতাম।

ঘরের কোণ থেকে হেমপ্রভা দেবী এবার এগিয়ে আসেন, বলেন—সত্যি বাপু, এটা একটা চিন্তা করার মত কথা বটে। পিনাকীকে আমি বহুকাল থেকে জানি তার যে কেউ এ রকম শত্রু থাকতে পারে তা ভাবাই যায় না।

ঘরের সকলেই এ কথার সমর্থন করেন। একজন বলেন—আচ্ছা হঠাৎ তখন আলোটা অমন নিভে গেল কেন সে বিষয়ে আমাদের একটা অনুসন্ধান করা উচিত নয় কী।

মহেন্দ্র সিং এ কথার পূর্ণ সমর্থন করেন—বলেন অবশ্যই এ বিষয়ে আমরা রীতিমত এনকোয়ারী করবো। তবে একটা কথা অবশ্য আমাদের সকলেরই জানা আছে পাহাড়ের এ সীমানায় এখনও ইলেকট্রিক আসে নি বলে এখানে এখনও আমাদের ইলেকট্রিসিটি তৈরী করে নিতে হয় তাই সাপ্লাইটা কিছু দুর্বল। যে জন্তে রাত ন'টার পর বিজলী আলো আমাদের বন্ধ রাখতে হয়। তাই আমার মনে হয় হঠাৎ কোন যান্ত্রিক গোলযোগে সাপ্লাই ফেল করা ছাড়া আর কোন কারণ এর নেই। আর এই দুরাত্মাটি সেই অন্ধকারের সুযোগটুকু ভালো করেই কাজে লাগিয়েছে।

ঘরের অনেকেই এ কথা স্বীকার করে নেয়। শুধু পিনাকীই কোন উত্তর দেয় না। সে সম্ভবত তখন নিবিষ্ট-চিত্তে এই কথাই ভাবছিল যে অন্ধকারের সুযোগে আক্রমণ না আক্রমণের সুযোগের জন্ত অন্ধকার?

ঘরের ভিতরের ভিড় ততক্ষণে পাতলা হতে সুরু করেছে। মহেন্দ্র সিং সকলকে লক্ষ্য করে বলেন—যে কারণেই হোক্ অসময়ে আলো নিবে যাওয়ার জন্তে আমার হোটেলের খরিদ্দারদের যে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, যে সব কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে তার জন্তে আমি আমার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ভবিষ্যতে যাতে আর কখনও এ রকম না হয়।

ম্যানেজারকে। বলে যান—আলো নেভাটা খুব বড় কথা নয় সিংজী। কিন্তু হোটেলের মাঝখানে এ রকম প্রাণঘাতী আক্রমণ—এটা তো তুচ্ছ কথা নয়। পিনাকীবাবুর উচিত কাল সকালেই পুলিশে খবর দিয়ে আপনার হোটেল তল্লাসী করানো। রীতিমত কড়া হাতে সাবধানতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। ভবিষ্যতে এখানে এসে আর বসবাস করার তো কথাই ওঠে না।

মহেন্দ্র সিং এবার বিবর্ণ হয়ে যান। তিনি সকলকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। ইথে আমাদের কী অপরাধ বাবুজি? দুষ্ট বদমাইস লোক তো সব জায়গাতেই থাকে। আপনারা মেহেরবান লোক এর জন্মে আমাদের ওপর নারাজ হবেন না।

এইসব নানান কথার মাঝখানে সহসা শশব্যস্ত হয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ায় কমলাক্ষ। পিনাকীকে অক্ষত দেখে সে আনন্দের আতিশয্যে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে। ছেলেমানুষের মত বলতে থাকে—তোকে ছেড়ে আর এক বেলার জন্মেও কোথাও যাবো না আমি। উঃ! আর একটু হলেই কী সর্বনাশ হয়ে যেতো রে।

পিনাকী বরং ওকে সান্ত্বনা দেয়। বলে—না রে কমল না। অত সহজে মরবার জন্মে আমি এ পৃথিবীতে আসিনি।

সীমা সরে আসে। ওদের দুই বন্ধুর এই অকৃত্রিম প্রীতি বিনিময়ের দৃশ্যের দর্শক হিসাবে সে যত আনন্দই পাক্ নিজের অধিকারের সীমা সে ভোলেনি।

বিশেষ করে ওর যেন মনে হয় এর মধ্যে ওকে দেখতে পেলে সিংজী আদপেই সন্তুষ্ট হবেন না। সিংজী কিন্তু ওকে ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন। অত লোকের সামনে ওর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মত গুরুত্ব ওকে না দিলেও রাত্রে একবার বেড়াতে বেড়াতে চলে আসেন সীমার শোবার ঘরের দরজার সামনে।

সীমা তখন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে একটা চিঠি লিখছিল মাদার সুপিরিয়রকে।

এ ক'দিনের মধ্যে মাদারকে সে যতগুলো চিঠি লিখেছে, তাতে এখানকার নূতন পরিবেশ, নূতন পরিচয় সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা লিখলেও কোন জটিলতা বা ভিতরের কথা সে লেখেনি।

কিন্তু আজকের ঘটনা সে মাদারকে না লিখে আর স্থির থাকতে পারছে না। সে উপদেশ চায়—এখানে এই যে গুরুতর সমস্ত ব্যাপারগুলো চোখের সামনে ঘটতে সুরু করেছে তাতে সেগুলোর সম্বন্ধে তার কী ধরণের মনোভাব অবলম্বন করা উচিত? একেবারে নির্লিপ্ত থাকা না অনুসন্ধানী চোখে এর সম্বন্ধে সচেতন থাকা? যদিও অনুসন্ধান করে সে বিশেষ কিছু ফল পাবে এমন আশা তার নেই। তবু এ ব্যাপারে প্রতিপদে নিজের অধিকারের গণ্ডি বুঝে মেপে চলা মেপে কথা বলা ভারী কষ্টসাধ্য নয় কী? তাই নানান কথা ভেবে আজ সে প্রথম মাদারকে এখানকার সব কিছু কথা খুলে লিখতে বসেছিল সমস্ত কাজের অবকাশে। লিখতে লিখতে এত নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল সীমা যে, মিঃ সিং যে কখন এসে তার ঘরের দরজার সুমুখে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছেন তা'সে আদপেই বুঝতে পারেনি।

হঠাৎ ওর লেখার পাতার ওপর কার যেন ছায়া পড়ায় ওর চমক ভাঙলো। অন্য কেউ হলে সম্ভবত বিরক্তি প্রকাশ করতো সীমা। তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কোন লোক তাকে তার শয়নকক্ষে লক্ষ্য করছে—এতটা স্পর্ধার কথা সে ভাবতেই পারে না। কিন্তু সিংজী তার থেকে বয়েসে আর সম্মানে এতই বড় যে মনে মনে বিরক্ত হলেও বাইরে সে তা প্রকাশ করতে পারলো না। চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে বলে ভিতরে আসুন।

ওর সহজ সম্বর্ধনায় মহেন্দ্র সিং প্রীত হলেন। বললেন—কী খবর সীমা। আজকের ব্যাপারটাতে ঘাবড়ে যাওনি তো? আমি একবার এদিকে এসেছিলাম তাই দেখে গেলাম তোমাকে।

সীমা সপ্রতিভ ভাবেই বলে—না না ওতে আমার ঘাবড়াবার কী কারণ আছে। তবে ব্যাপারটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক, এই পর্যন্ত।

—হ্যাঁ আমিও তাই অনুমান করেছিলাম এই বিষয়টায় তুমি একটু বেশী কৌতূহলী হয়ে পড়েছো। অবশ্য তোমার বয়সের কথা বিবেচনা করলে সেটা খুব অস্বাভাবিকও নয়। তবে কী জানো? একটা কোন বিষয়ে মাথা ঘামাবার আগে বিষয়টার সম্বন্ধে নিজের গুরুত্ব আর নিজের সম্বন্ধে বিষয়টার গুরুত্বের কথা চিন্তা করে খতিয়ে দেখা ভাল। তাই নয় কি? তা না হলে শুধু শুধু মাথা ঘামাবার পরিশ্রমটাই সার হয় কি বলো?

সীমা সংযত কণ্ঠে জবাব দেয়—আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে।

—না না এটাকে তুমি একটা গুরুতর উপদেশ বলে মনে কোরো না। এটা তোমার হিতৈষীর পরামর্শ মাত্র। আর একটা কথা, একটু আগে তোমায় খুব নিবিষ্ট চিত্তে একটা চিঠি লিখতে দেখলাম। সে চিঠি তুমি কাকে লিখছো সে বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করা নিশ্চয় আমার অনধিকার চর্চা হবে তা আমি জানি। কিন্তু একটা অনুরোধ, আজকের ঘটনা সম্বন্ধে তুমি কাউকে কিছু লিখ না। কারণ বুঝতেই তো পারছো আজকের ঘটনার কথা বাইরে ছড়ালে আমাদের হোটেলের বদনাম। আমি জানি তুমি বলবে আমরা না লিখলেও এ কথা বাইরে যাবেই। হয় তো অনেক শাখা পল্লব সহকারেই যাবে। তবু আমরা যারা এই হোটেলের অন্নদাস অন্তত তাদের উচিত নয় এ কথা বাইরে ছড়ানো। আমাদের মনিব যিনি আমাদের এত সুখে রেখেছেন অন্তত তাঁর যাতে ক্ষতি হয় সে কাজ কখনই করা উচিত নয় আমাদের। তোমার কি অভিমত?

এবার সীমা নত মুখে বলে—আপনার এ নির্দেশও আমি ভুলবো না।

—ওঃ, সীমা এই তোমার বড় দোষ। সব সময় তুমি এত দূর থেকে কথা বলো যে তোমার সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করা যায় না। এখন আমি তোমাকে আদেশ উপদেশ নির্দেশ কিছুই দিচ্ছি না। এখন আমরা দু'জনেই এই হোটেলের কর্মচারী। সুতরাং দু'জন বন্ধু। কেন তুমি আমার সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলতে পারো না? আমি কি তোমার সঙ্গে কোনদিন রূঢ় ব্যবহার করেছি?

—না, না, তা কেন? আমিও তো সহজ ভাবেই কথা বলি। তবে বয়সের সম্মানে—

—তা হোক। যখন অপিসে থাকবো তখন আমি তোমার ওপরওয়ালা সত্যি। কিন্তু অপিসের বাইরে আজ থেকে আমরা বন্ধু। কেমন?—ডান হাতখানি সীমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অনুমোদন প্রার্থনা করেন মহেন্দ্র সিং।

সীমাও সাগ্রহে হাত বাড়ায়।

তারপর রাত্রির শুভেচ্ছা রেখে মিঃ সিং যখন বিদায় নেন তখন সে সহজ ভাবেই মাদারকে সারা সন্ধ্যা ধরে লেখা চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয় বাজে কাগজের ঝুড়িতে। বোধ হয় সেই সঙ্গেই কুচি কুচি হয়ে ছিঁড়ে যায় তার এতদিনকার ধারণাগুলো।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিজেকে কঠিন হাতে বিচার করতে থাকে সীমা। বারবার নিজেকে লাঞ্ছনা করতে থাকে কেন সে নিজের এত ভালো মনিব সম্বন্ধে আরও আগে থেকে কৃতজ্ঞ থাকে নি? এত সহৃদয় ওপরওয়ালাকে বারবার সন্দেহ-দৃষ্টিতে দেখেছে। এতখানি অধঃপতন তার কেমন করে হ'ল? কারুর সম্বন্ধে ছোট করে ভাববার শিক্ষা তো সে কখনও পায় নি। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হওয়ায় বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করলো সীমা। তারপর কখন এক সময় ঢুলে পড়লো নিদ্রার কোমল আলিংগনে।

······হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যায়! নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কার অতি সন্তর্পণ পায়ের আওয়াজ ভেসে আসে। প্রথমটায় ভয়ে আর উদ্বেগে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকে সীমা। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করে। সবচেয়ে ওর বেশী অস্বস্তি হয় ও যেন অনুভব করে ওর মাথার দিক থেকে কে একজন ওকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে।

মাথার বালিশের পাশে টর্চটা রাখা ছিল। পরিবেশ বুঝে আগের চেয়ে সাবধান হয়েছে সীমা। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সেটাকে সে টেনে আনে। উঠে বসে সেটাকে জেলে মাথার দিকটায় আলো ফেললো সীমা।

চক্ষের পলকে কী যেন একটা ঘটে গেল ঘরের মধ্যে। মাথার কাছ থেকে কে যেন সরে গেল···মিশে গেল দেওয়ালের গায়ে। বইয়ের আলমারিটার গায়ে ধাক্কা লাগলো প্রচণ্ড ভাবে।

সমস্ত ঘরখানাই যেন ভূমিকম্পের মত দুলে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত নিশ্চিহ্ন।

তবু সে রাত্রে আর বিছানা থেকে নামতে পারলো না সীমা। প্রচণ্ড উত্তেজনায় মাথাটা ওর গুলিয়ে গেছে। সারা গাটা ছমছম করছে যেন। কিন্তু তবু···তবু যেন কী একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে মনে মনে।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বিছানা ছাড়লো সীমা। বাকী রাতটা খুব ভালো করে ঘুমুনো সম্ভব হয় নি তার পক্ষে. নানান ধরণের ভাবনা তার মনটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

—কে এই লোকটা?

—কী চায় ও?

—ও মানুষ না অন্য কিছু?

—পিনাকীর ওপর যে ধরণের আক্রমণ হয়েছে ওই লোকটা কী সুযোগ পেলে সীমার ওপরেও তেমনি আক্রমণ চালাতো?

—তাতে ওর লাভ কী?

—পিনাকী না হয় বড়লোক, ওর জীবনের অনেক দাম কিন্তু সীমা তো তা নয়? তবে?

আর সবচেয়ে বড় কথা লোকটা গেল কোথায়?

এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই বিছানা ছাড়লো সীমা। শীতের দিন হলেও উত্তেজনার আতিশয্যে একটুও শীত লাগে না ওর গায়ে। হাতড়ে হাতড়ে সমস্ত দেওয়ালের গা', দরজার আশেপাশে নিরীক্ষণ করে দেখে সীমা। এই তো ঠিক এইখানটা দিয়ে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। নিজের চোখকে তো সীমা অবিশ্বাস করতে পারে না। এতটুকু ঘুমের জড়তা বা দৃষ্টির ভ্রম ছিল না ওর দেখার মধ্যে। অন্ধকার হলেও হাতের টর্চের আলোয় স্পষ্টই দেখেছে সীমা—একটা লোক তারই ঘরের মধ্যে থেকে তার চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই এ ঘরে যাবার আসবার একটা কোন গুপ্ত দরজা আছে। সেই জন্যেই এ ঘরের আলমারি থেকে বই সরে যায় সীমার অনুপস্থিতিতে। অর্ধেক দিন রাত্রে ঘরের মধ্যে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের পদধ্বনি শোনে সীমা।

কিন্তু কই দেওয়ালের কোনখানে তো ফাঁক নেই? দরজারও কোন আভাস বা সংকেত নেই কোথাও। তবে?

আরে বইয়ের আলমারিটা এমন করে বেঁকে গেল কেমন করে?

এই তো ওর পিছন থেকে একটু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

তবে কী? তবে কী ঐ বইয়ের আলমারিটাকে কেন্দ্র করেই এমনতর রহস্যের ঘনঘটা সীমার চারিপাশ ঘিরে? অপরিসীম বিস্ময় আর অনন্ত কৌতূহল একসাথে নিয়ে আলমারিটার সম্বন্ধে অনুসন্ধান সুরু করে সীমা। আলমারিটাকে দেখে পর্যন্ত এতদিন সে তার ভিতরের বইগুলি সম্বন্ধেই কৌতূহলী হয়েছে—তার সমস্ত আগ্রহে আলমারিটার আভ্যন্তরীণ ঐশ্বর্যের পানেই মোহগ্রস্ত করে তুলেছে তাকে। আজ প্রথম সে ওই আলমারির ভিতরের সম্পদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শুধু ওটার বাহ্যিক অবস্থিতির দিকেই নজর দিলে। এক ইঞ্চি একটা তক্তার ওপর বসানো আলমারিটা একটু যেন বেঁকে বসে আছে আজকে।

আর তার পাশের থেকে সরু একটা আলোর রেখা তির্যগভাবে এসে পড়েছে ঘরে।

এই ফাঁকটুকু আগে তো ছিল না?

আলমারিটাকে আরও একটু বাঁকালো সীমা।

আরে। পিছনটা যে একেবারে ফাঁকা। সরু মত ঘোরানো একটা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে পাশের দিকে। [ক্রমশঃ।

বিবর্তন

(J. B. Table)

প্রদোষকালের ছায়ার মধ্যে
হঠাৎ আলোর বাণ।
এবং মেঘের স্তব্ধতাতে
ভয়ত পাখীর গান।

আর হৃদয়ের সব আনন্দে
স্পর্শ যন্ত্রণার।
মৃতের মধ্যে, শীতল ভস্ম,
জীবন পুনর্বার।

অনুবাদ—সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

তালপাতার পুঁথি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আট

খ ।

অভাবনীয় এবং আ৲ স্মক আঘাতটা মুহূর্তের জন্য বুঝি জগাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। শুধু বিমূঢ়ই নয় অতর্কিত আঘাতের নিদারুণ বেদনায় মাথাটা যেন ঘুরে ওঠে জগার। চোখে অন্ধকার দেখে। টলে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নিজেকে সামলে নেয়। আর তার ঠিক পরমুহূর্তেই ক্ষতস্থান থেকে নিঃশব্দ প্রবাহিত তাজা রক্তের ধারাটা ওষ্ঠের প্রান্ত দিয়ে মুখের মধ্যে প্রবেশ করে একটা নোনা স্বাদে তার সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে তোলে।

বহুকালের খুনী ঠ্যাঙ্গাড়ের যে নেশাটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা পরিবেশে এতকাল মনের কোণে এক নিভৃতে শান্ত হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়েছিল সেই নেশাটাই যেন অকস্মাৎ ফণা বিস্তার করে জেগে উঠলো।

জগার দু'টো পিঙ্গল চোখের তারা যেন হিংস্র শ্বাপদের চোখের মত জল জল করে উঠলো। রক্তাক্ত বীভৎস মুখের রেখাগু'লা কঠিন হয়ে উঠলো। দৈত্যাকৃতি চেহারার পেশীগুলো সজাগ হয়ে উঠলো। অরিন্দম সরকার আবার চিৎকার করে ওঠে, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে হারামজাদা—কিন্তু এবার আর অরিন্দম সরকারের মুখের কথা শেষ হ'লো না, তার আগেই একটা হিংস্র বাঘের মতই ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল জগা উপবিষ্ট অরিন্দম সরকারের উপর।

এবং লোহার মত শক্ত দু'টো হাতে জগা অরিন্দম সরকারের গলাটা টিপে ধরল। শক্তিতে অরিন্দম সরকারও কম যায় না। এবং জগার চাইতে তার দেহে শক্তি কম ছিল না কিন্তু নেশায় শিথিল বিবশ দেহ এবং অতর্কিত আক্রমণে অরিন্দম সরকার এমন বিহ্বল হয়ে পড়ে যে চেষ্টা করেও জগার সেই লৌহমুষ্টির পেষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

অবশ ভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা করবার পরই নিজেকে এলিয়ে দেয়।

আর জগা তখন হিংস্র এবং ক্রুদ্ধ আক্রোশে দু'হাতে অরিন্দম সরকারের গলাটা টিপে ধরে প্রবল ভাবে ঝাঁকাতে থাকে।

অরিন্দম সরকারের গলা দিয়ে একটা চাপা গোঁ-গোঁ আর্তনাদ বেরুতে থাকে। চোখের তারা দু'টো কপালে উঠে যায় সেই নিষ্ঠুর পেষণে অরিন্দমের।

বৃন্দাবন এতক্ষণ বিহ্বল হয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু সে যখন দেখলে জগার হাতে অরিন্দম সরকার প্রায় শেষ হয়ে আসবার উপক্রম সে চকিতে এদিক-ওদিক তাকায়।

বৃন্দাবনের দেহে এত শক্তি ছিল না যে জগার হাত থেকে তার নতুন মনিবকে সে রক্ষা করতে পারে। অথচ এও বুঝতে পারছিল আর কিছুক্ষণ ঐ ভাবে চললে শ্বাস রোধ হয়ে অরিন্দম সরকারের মৃত্যু অনিবার্য।

বিহ্বল হতচকিত বৃন্দাবন বুঝে উঠতে পারে না ঐ মুহূর্তে যে সে ঠিক কি করবে?

এবং এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতেই সহসা ঘরের কোণে একটা বিরাট সুদৃশ্য ফল রাখার বেলোয়ারী পাত্র চোখে পড়ে।

বৃন্দাবন ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে সেই পাত্রটা দু'হাতে তুলে নিয়ে জগার মাথার উপর আঘাত করে।

ঝন ঝন একটা শব্দে বেলোয়ারী পাত্রটা ভেঙ্গে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে এক পাশে টলে পড়ে জগা জ্ঞান হারিয়ে ফরাসের উপর।

রক্তে ফরাসটা লাল হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় বৃন্দাবন তখনো রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

এক পাশে পড়ে আছে রক্তাক্ত জ্ঞানহীন জগার নিঃসাড় দেহটা। অন্য পাশে পড়ে অরিন্দম সরকারের জ্ঞানহীন দেহটা।

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাইরে থেকে একটা ঘটিতে করে ঠাণ্ডা জল এনে বৃন্দাবন জ্ঞানহীন অরিন্দম সরকারের চোখে মুখে ছিটুতে থাকে।

ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে, কর্তা—কর্তা—হুজুর—।

অনেকক্ষণ চোখে-মুখে জল দেবার পর ধীরে ধীরে এক সময় অরিন্দম সরকার চোখ মেলে তাকায়।

কর্তা, হুজুর—ঐ

কে?

আমি—আমি—বৃন্দাবন হুজুর—

বৃন্দাবন ?

অরিন্দমের তখনো সব কিছু ঝাপসা। সমস্ত বোধ শক্তি তখনো ক্ষীণ। কেবল কণ্ঠের পেশীতে ও মাথার মধ্যে পেষণে রক্তচাপাধিক্যের দরুণ একটা বোবা যন্ত্রণা বোধ।

বৃন্দাবন আবার বলে, হ্যাঁ, হুজুর—বৃন্দাবন। এখন কেমন বোধ করচেন হুজুর ?

একটু জল। ক্ষীণকণ্ঠে কোন মতে আবার কথাটা উচ্চারণ করে অরিন্দম সরকার।

এদিক ওদিক তাকায় বৃন্দাবন কিন্তু জলের পাত্র তখন নিঃশেষ। কি করে, হঠাৎ ঐ সময় নজরে পড়ে অর্ধেক শূন্য একটা সুরার বোতল। হাত বাড়িয়ে সেটাই তুলে নিয়ে সেই বোতলের তরল পদার্থ খানিকটা অরিন্দম সরকারের মুখবিবরে ঢেলে দেয়। তরল অগ্নি—সেই নির্জলা সুরা পেটে পড়তেই কাজ হয়। উত্তেজক সেই তরল পদার্থের ক্রিয়ায় অরিন্দমের শিথিল ঝিমিয়ে পড়া সমস্ত দেহটা যেন চন্ চন্ করে ওঠে। ধীরে ধীরে অরিন্দম সরকার এবারে নিজেই উঠে বসে। মাথাটা ঘুরে ওঠে কিন্তু সামনের একটা তাকিয়া ধরে নিজেকে সামলে নেয় অরিন্দম সরকার। এবং সেই সময়ই নজরে পড়ে রক্তাক্ত তখনো চেতনাহীন জগার ফরাসের উপর প্রসারিত দেহটার প্রতি। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে যায় অরিন্দম সরকারের এতক্ষণে বুঝি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে অরিন্দম সরকার।

কিন্তু বৃন্দাবন বাধা দেয়। উঠবেন না, উঠবেন না হুজুর—একটু শুয়ে থাকুন বা বসে থাকুন—

জগা—হারামজাদা—

ভয় নেই হুজুর, ওকে এমন আঘাত করেছি যে সহজে উঠতে হবে না—ঐ দেখুন না কেমন করে পড়ে আছে এখনো।

আর ঠিক সেই সময়ই খোলা দরজার গোড়ায় একটা পদশব্দ শুনে প্রভু ভৃত্য দু'জনাই চমকে তাকায় সেই দিকে, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বাঈজী কস্তুরী। সর্বাঙ্গে নর্তকীর বেশ এবং একটা আকাশ-নীল রঙের রেশমী ওড়না জড়ানো। কস্তুরীও ঘরের দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

সমস্ত ফরাসটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে, একপাশে পড়ে আছে রক্তাক্ত জগার চেতনাহীন দৈত্যের মত চেহারাটা।

অরিন্দম সরকার বসে এবং সামনে তার দাঁড়িয়ে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন !

বাঈজী সাহেবা ?

বিস্ময়াভূত বৃন্দাবনের কণ্ঠ হতে অস্ফুটে কথা দু'টো উচ্চারিত হ'লো। ক্ষীরোদা কোথায় বৃন্দাবন ?

ক্ষীরোদা মা ?

হ্যাঁ, কোথায় সে ? তাকে ত' কোথারও দেখলাম না ?

বিহ্বল বৃন্দাবন একবার অরিন্দম সরকারের মুখের দিকে তাকাল তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বললে, মা তো এখানে নেই বাঈজী সাহেবা।

নেই ! কোথায় সে ? মহেন্দ্র সাহা তাকে তা হ'লে শেষ পর্যন্ত তাড়িয়েই দিয়াছে ?

হ্যাঁ—চলুন বাঈজী সাহেবা পাশের ঘরে।

এগিয়ে গেল বৃন্দাবন দরজার দিকে।

সে তখন কস্তুরীকে ঐ ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উদগ্রীব। বলে আবার, চলুন—

কিন্তু কস্তুরী নড়ে না। পথও ছাড়ে না। ঘরের দরজা জুড়ে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। এবং প্রশ্ন করে, ওখানে ফরাসের উপর পড়ে কে ?

কস্তুরী ঘরের সামনে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দম সরকার মুখ নীচু করেছিল। এবং আগাগোড়া বৃন্দাবন অরিন্দম সরকারকে কতকটা ইচ্ছা করেই আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকায় কস্তুরী তাকে ঠিক চিনে উঠতে পারে নি।

কস্তুরীর শেষের কথায় অরিন্দম মুখ তুলে তাকাতেই এতক্ষণে কস্তুরীর অরিন্দম সরকারের প্রতি ভাল করে নজর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কস্তুরী তাকে চিনতে পারে।

বিস্ময়াভূত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, কে ! সরকার মশাই না ?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কস্তুরী দু' পা বাড়িয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়।

অরিন্দম কোন সাড়া দেয় না কস্তুরীর ডাকে, কেবল অসহায় বোবা দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে অদূরে কয়েক হাত ব্যবধানে দণ্ডায়মান কস্তুরীর মুখের দিকে।

চিন্তা কথা ও কাজ
দেশের তরেতে আজ।

ঘরের আলো কস্তুরীর অঙ্গের বেশ ভূষা ও অলংকারের উপর প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করছে। সুর্মা টানা কস্তুরীর দুটি চোখের দৃষ্টি অরিন্দমের প্রতি স্থির নিবদ্ধ। অরিন্দমের দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে কস্তুরীই এগিয়ে গিয়ে পায়ে পায়ে ফরাসের উপর শায়িত রক্তাক্ত চেতনাহীন জগার দেহটার সামনে দাঁড়ায়।

কে এই লোকটা সরকার মশাই ? মনে হচ্ছে মরে গেছে ?

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে অরিন্দম সরকার।

উঠে দাঁড়িয়ে কস্তুরীর দিকে তাকিয়ে ডাকে, বাঈজী।

হ্যাঁ—ফিরে তাকাল সেই ডাকে কস্তুরী অরিন্দমের মুখের দিকে। বললে, এ লোকটা কে সরকার মশাই।

ওকে তোমার জানবার প্রয়োজন নেই বাঈজী, কঠিন কণ্ঠে বলে অরিন্দম, এ গৃহও এখন মহেন্দ্র সাহার নয়—

তবে কার ?

আমার। আমি তার কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছি—

বলেন কি। সত্যি ?

হ্যাঁ—এবং এই মুহূর্তে এখান থেকে তুমি চলে গেলেই আমি

কথাটা বলে ফিরে তাকাল অরিন্দম সরকার বৃন্দাবনের দিকে। বৃন্দাবন, ওকে সদর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আয়—

মৃদু হাসিতে কস্তুরীর ওষ্ঠ যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং সে স্মিত কণ্ঠে বলে, আপনি হয় ত' জানেন না সরকার মশাই, এ বাড়ির সব কিছুই আমার অত্যন্ত পরিচিত—বাইরে যাবার রাস্তা আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে না, আমি জানি।

কথাটা বলতে বলতে আড় চোখে একবার কস্তুরী ভূপতিত তখনো অচেতন জগার রক্তাক্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে পুনরায় স্থির দৃষ্টিতে তাকাল অরিন্দম সরকারের দিকে। তাছাড়া আমিও ত' আপনার অপরিচিত নই সরকার মশাই—

বৃন্দাবন।

তীক্ষ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় ডেকে ওঠে অরিন্দম সরকার।

বৃন্দাবন রীতিমত বিব্রত বোধ করে এবং অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যায় এই আশংকায় কস্তুরীর দিকে তাকিয়ে বলে, চলুন বাঈজী সাহেবা—

হ্যাঁ, চল বৃন্দাবন।

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না কস্তুরী, সোজা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বৃন্দাবনও তাকে অনুসরণ করে।

বারান্দায় দু'জনে আগে পিছে বের হয়ে আসে। একটি মাত্র দেওয়ালগিরীর আলোয় বারান্দায় একটা আলোছায়ার লুকোচুরি।

নিঃশব্দে বারান্দাটা অতিক্রম করে সদর বরাবর এসে কস্তুরী আবার ঘুরে দাঁড়াল, বৃন্দাবন ?

বাঈজী সাহেবা ?

শীরো কোথায় ?

আজ নয় বাঈজী সাহেবা, সে অনেক কথা। আজ আপনি যান পরে আপনার সঙ্গে দেখা করে সব আমি বলব ?

বেশ তাই বোলো। একটা কথা শুধু বল ? সে বেঁচে আছে কি না ?

জানি না—

জানো না ?

না। কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না, যান—

এ রাক্ষিটা সত্যিই তাহলে মহেন্দ্র সাহা বেচে দিয়েছেন ?

হাঁ।

বাইরে দরজার কাছেই অন্ধকারে বাঈজীর পাল্কী অপেক্ষা করছিল, কস্তুরী সোজা গিয়ে পাল্কীতে উঠে বসল।

কাহাররা পাল্কী কাঁধে তুলে রওনা'হয়।

হুমরো—হুমরো—

কাহারদের মিলিত ঐকতান ক্রমশ অন্ধকারে পথের অপর প্রান্তে মিলিয়ে যায়।

বৃন্দাবন যখন আবার পূর্বের হলঘরে ফিরে এলো অরিন্দম সরকার পাত্রে সুরা ঢেলে মুখের কাছে তুলে পান করছে।

বৃন্দাবন ঘরে এসে ঢুকতেই হস্তধৃত পাত্রের বাকী সমস্ত সুরা এক চুমুকে নিঃশেষে পান করে হাতের পাত্রটা পাশেই নামিয়ে রাখতে রাখতে অরিন্দম সরকার বলে, বৃন্দাবন, আগে দেখ জগা বেঁচে আছে না শেষ হয়ে গিয়েছে—

বৃন্দাবন আর কস্তুরী ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পরই ভূপতিত তখনো চেতনাহীন জগার দিকে এগিয়ে গিয়ে জানবার চেষ্টা করেছিল অরিন্দম, জগা মরেছে না বেঁচে আছে ?

অমনি করে সেই তখন থেকে অসাড়ে পড়ে থাকতে দেখে কেমন যেন তার মনের মধ্যে সন্দেহ হয়ে ছিল হয়ত' জগা বেঁচে নেই।

কিন্তু ভূপতিত জগার সামনে গিয়ে তার ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত মাথা ও মুখটার দিকে তাকাতেই একটা অজানিত আশংকায় বুকের ভিতরটা কেমন যেন হঠাৎ শির শিরিয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি চোখ বুজে দু' পা পিছিয়ে আসে।

মাথাটার মধ্যে কেমন যেন আবার পূর্বের মত ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

সত্যি সত্যিই বেটা মরে গেল না কি শেষ পর্যন্ত।

লোকটা শুধু অনুগতই নয়, বিশ্বাসীও ছিল এবং অনেক দুরূহ কাজ ইতিপূর্বে অনায়াসেই শেষ করেছে। খুন, গায়েব কোন কিছুতেই কখনো পেছপাও হয়নি।

অনেক গোপন কাজের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল লোকটা।

ঘরের মধ্যে একা একা থাকতেও যেন কেমন ভয় ভয় করে। সব কিছু যেন হঠাৎ কেমন খালি খালি মনে হয় অরিন্দমের।

আকণ্ঠ একটা পিপাসায় গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

শুষ্ক জিহ্বাটা ভিতরের দিকে টানছে যেন।

এদিকে ওদিকে তাকায় অরিন্দম সরকার এবং নজরে পড়ে বোতলটা এখনো শূন্য হয়ে যায় নি।

কোনমতে এগিয়ে গিয়ে গ্লাসটা তুলে নিয়ে বোতলটা উপুড় করে অনেকটা ঢালে তারপরই সেটা মুখের সামনে তুলে ধরে চুমুক দেয়।

আর ঠিক সেই সময় বৃন্দাবন এসে ঘরে ঢোকে।

বৃন্দাবন, আগে দেখ জগা বেঁচে আছে না শেষ হয়ে গিয়েছে।

বৃন্দাবন একবার অরিন্দমের মুখের দিকে তাকাল তারপর এগিয়ে গেল ভূপতিত জগার সামনে।

সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জগার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিল, জগা—এই জগা—

কিন্তু মুখের কথাটা বৃন্দাবনের শেষ হয় না, চকিতে হাতটা সরিয়ে নেয় সে। জগার দেহটা বরফের মত ঠাণ্ডা।

জগার কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকায় বৃন্দাবন অরিন্দম সরকারের দিকে এবং ক্ষীণকণ্ঠে ডাকে, হুজুর—

কি রে ?

শূন্য গ্লাসটায় আবার বোতল থেকে ঢালছিল অরিন্দম, বৃন্দাবনের ডাকে ওর দিকে তাকাল।

কি রে ? বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে—

হ্যাঁ, শেষ হয়ে গিয়েছে ?

হাত থেকে অরিন্দম সরকারের গ্লাসটা ফরাসের উপর পড়ে যায়।

কি হবে হুজুর ? আতংকে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে বৃন্দাবন।

জগা যে তারই আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে সেটা ত' বৃন্দাবন বুঝতেই পারছে।

উত্তেজনায় মাথায় মুগুর কষে মেরে বসেছিল জগাকে কিন্তু সেই আঘাতেই শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই যে জগার প্রাণটা বের হয়ে যাবে তা কি বেচারী বৃন্দাবন স্বপ্নেও ভেবেছে।

হুজুর। কি হবে হুজুর—হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বৃন্দাবন।

কিন্তু অরিন্দম সরকার ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে ওঠে, থাম্ বেটা, কাঁদিস নে।

হুজুর?—

আবার কাঁদে? যা—চট করে সদরটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

বাঈজী সাহেবা দেখে গিয়েছেন হুজুর—এখন যদি তিনি থানায় গিয়ে খবর দেন—আমাকে বাঁচান হুজুর—ছুটে এসে বৃন্দাবন অরিন্দমের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে।

এই বৃন্দাবন, ওঠ—ওঠ—

গরীব মানুষ হুজুর, কেবল আপনাকে বাঁচাবার জন্যই ওর মাথায় আমি আঘাত করেছি হুজুর—কি হবে হুজুর।

অরিন্দমেরও তখন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সে নিজেও কিছু ভাবতে পারছে না।

কিন্তু লাশ সরিয়ে ফেলতে হবে।

এবং রাতারাতিই সরিয়ে ফেলতে হবে।

কিন্তু কোথায় সরাবে লাশ।

হঠাৎ একটা মতলব চকিতে অরিন্দম সরকারের মাথার মধ্যে খেলে যায়।

অরিন্দম ডাকে, বৃন্দাবন—

হুজুর।

এ-বাড়ির পিছনে খানিকটা খোলা জমি আছে না?

আজ্ঞে—

এক কাজ কর! বাড়িতে শাবল আছে?

আছে—

শাবলটা আর একটা আলো নিয়ে আয়

শাবল দিয়ে কি হবে হুজুর?

যা বলচি তাই শোন একটা আলো আর শাবলটা নিয়ে আয়।

বৃন্দাবন চোখের জল মুছতে মুছতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং একটু পরেই লোহার একটা শাবল ও একটা আলো নিয়ে এলো।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরিশ্রম করে দু'জনে মিলে বাড়ির পিছনে যে খালি জমিটা পড়ে ছিল সেখানে একটা রূপসী কামিনী গাছের নীচে গর্ত খুঁড়ে ফেলে।

তারপর দু'জনে ধরাধরি করে জগার মৃত দেহটা এনে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে যখন দাঁড়িয়েছে—রাতের আকাশে ভোরের প্রথম আলোর ইসারা জেগে ওঠে। কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে অরিন্দম সরকার বৃন্দাবনের মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকে, বৃন্দাবন!

আজ্ঞে—

তুই সকাল হ'লেই কিছুদিনের জন্য বাড়ি চলে যা।

বাড়ি চলে যাবো?

হ্যাঁ, যা—তোর কোন ভয় নেই যা করবার এদিকে আমি করবো।

কিন্তু হুজুর বাঈজী সাহেবা?

সে জন্যও তোর ভয় নেই। সে ব্যবস্থাও আমি করব।

মুখে বলে বটে অরিন্দম কস্তুরীর ব্যবস্থা সে করবে কিন্তু ভেবে পায় না সে কি করবে। কস্তুরী বাঈজীকে অরিন্দম খুব ভাল করেই চেনে। কিন্তু যতই হোক, সামান্য এক নর্তকী। পারবে না কি অরিন্দম তাকে অর্থ দিয়ে বশ করতে।

অর্থে বশ কে না এ-দুনিয়ায়।

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, বৃন্দাবন?

হুজুর?

তা হ'লে তুই এখুনি বের হয়ে পড়।

এখুনি?

হ্যাঁ—আর দেরি করিস না। সঙ্গে টাকা আছে ত'?

আজ্ঞে—

ঠিক আছে, এই নে—বলে জামার জেব থেকে কিছু টাকা বের করে ছুঁড়ে দিল অরিন্দম সরকার বৃন্দাবনের দিকে

বৃন্দাবন টাকাগুলো তুলে নেয়।

মনে থাকে যেন এক মাসের এদিকে এ শহরে পা দিবি না। যা—

বৃন্দাবন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

একটু পরে অরিন্দম সরকারও উঠে দাঁড়াল।

অরিন্দম সরকার যখন তার গৃহের সামনে এসে পাল্কী গাড়ী থেকে নামল, প্রথম ভোরের আলো চারিদিকে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

[ক্রমশঃ]

অপেক্ষমান

জসীম উদ্‌দীন

গুবাক তরুর সারী,
কি গান শুনায় শূন্যের বুকে শাখা পাখাগুলি নাড়ি।
নারিকেল গাছ এপাশে ওপাশে ডাবের কলসী কাঁখে
লইয়া গাঁয়ের বধূরা চলেছে আকাশ গাঙের বাঁকে।
পাতায় পাতায় ফিস্ ফিস্ কথা কহিছে এ ওর কানে
বাতাসে ভাসিছে কি এক সুষমা নারিকেল ফুল-ঘ্রাণে।
পাখিরা উড়িছে এ ডালে ও ডালে ঘোষি সে গোপন কথা,
মাটির উপর সবুজ বিছানা পেতেছে বনের লতা।
হলদে পাখিরা শূন্যের বুকে হলুদ নক্সা আঁকি,

এমন সময় তুমি কি যাবে না জল-ভরণের তরে,
শূন্য দীঘি যে আরসী মেলিয়া আছে অপেক্ষা ক'রে।
বউ কথা কও ডাকি বউ-পাখী বলে বলে হয়রান,
এ পথ-বীণা যে শত তারে তব বাজাবে নূপুর গান।
যুড়াইতে ঘট বাঁকা পথে আল বাঁকাইয়া দেহখানি,
তুমি না চলিলে শ্যামা লতা লবে কাহার আঁচল টানি।
আঁধার হইয়া আসিল ধরণী, আশার হইল শেষ;

বৃন্দাবন, ওকে সদর পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আয়—

মৃদু হাসিতে কস্তুরীর ওষ্ঠ যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং সে স্মিত কণ্ঠে বলে, আপনি হয় ত' জানেন না সরকার মশাই, এ বাড়ির সব কিছুই আমার অত্যন্ত পরিচিত—বাইরে যাবার রাস্তা আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে না, আমি জানি।

কথাটা বলতে বলতে আড় চোখে একবার কস্তুরী ভূপতিত তাকালো। অচেতন জগার রক্তাক্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে পুনরায় স্থির দৃষ্টিতে তাকাল অরিন্দম সরকারের দিকে। তাছাড়া আমিও ত' আপনার অপরিচিত নই সরকার মশাই—

বৃন্দাবন!

তীক্ষ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় ডেকে ওঠে অরিন্দম সরকার।

বৃন্দাবন রীতিমত বিব্রত বোধ করে এবং অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যায় এই আশংকায় কস্তুরীর দিকে তাকিয়ে বলে, চলুন বাঈজী সাহেবা—

হ্যাঁ, চল বৃন্দাবন।

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না কস্তুরী, সোজা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বৃন্দাবনও তাকে অনুসরণ করে।

বারান্দায় দু'জনে আগে পিছে বের হয়ে আসে। একটি মাত্র দেওয়ালগিরীর আলোয় বারান্দায় একটা আলোছায়ার লুকোচুরি।

নিঃশব্দে বারান্দাটা অতিক্রম করে সদর বরাবর এসে কস্তুরী আবার ঘুরে দাঁড়াল, বৃন্দাবন?

বাঈজী সাহেবা?

ক্ষীরোদা কোথায়?

আজ নয় বাঈজী সাহেবা, সে অনেক কথা। আজ আপনি যান পরে আপনার সঙ্গে দেখা করে সব আমি বলব?

বেশ তাই বোলো। একটা কথা শুধু বল? সে বেঁচে আছে কি না?

জানি না—

জানো না?

না। কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না, যান—

এ বাড়িটা সত্যিই তাহলে মহেন্দ্র সাহা বেচে দিয়েছেন?

হ্যাঁ।

বাইরে দরজার কাছেই অন্ধকারে বাঈজীর পাল্কী অপেক্ষা করছিল, কস্তুরী সোজা গিয়ে পাল্কীতে উঠে বসল।

কাহাররা পাল্কী কাঁধে তুলে রওনা হয়।

হুমরো—হুমরো—

কাহারদের মিলিত ঐকতান ক্রমশ অন্ধকারে পথের অপর প্রান্তে মিলিয়ে যায়।

বৃন্দাবন যখন আবার পূর্বের ঘরে ফিরে এলো অরিন্দম সরকার পাত্রে সুরা ঢেলে মুখের কাছে তুলে পান করছে।

বৃন্দাবন ঘরে এসে ঢুকতেই হস্তধৃত পাত্রের বাকী সমস্ত সুরা এক চুমুকে নিঃশেষে পান করে হাতের পাত্রটা পাশেই নামিয়ে রাখতে রাখতে অরিন্দম সরকার বলে, বৃন্দাবন, আগে দেখ জগা বেঁচে আছে না শেষ হয়ে গিয়েছে—

তখনো চেতনাহীন জগার দিকে এগিয়ে গিয়ে জানবার চেষ্টা করেছিল অরিন্দম, জগা মরেছে না বেঁচে আছে?

অমনি করে সেই তখন থেকে অসাড়ে পড়ে থাকতে দেখে কেমন যেন তার মনের মধ্যে সন্দেহ হয়ে ছিল হয়ত' জগা বেঁচে নেই।

কিন্তু ভূপতিত জগার সামনে গিয়ে তার ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত মাথা ও মুখটার দিকে তাকাতেই একটা অজানিত আশংকায় বুকের ভিতরটা কেমন যেন হঠাৎ শির শিরিয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি চোখ বুজে দু' পা পিছিয়ে আসে।

মাথাটার মধ্যে কেমন যেন আবার পূর্বের মত ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

সত্যি সত্যিই বেটা মরে গেল না কি শেষ পর্যন্ত।

লোকটা শুধু অনুগতই নয়, বিশ্বাসীও ছিল এবং অনেক দুরূহ কাজ ইতিপূর্বে অনায়াসেই শেষ করেছে। খুন, গায়েব কোন কিছুতেই কখনো পেছপাও হয়নি।

অনেক গোপন কাজের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল লোকটা।

ঘরের মধ্যে একা একা থাকতেও যেন কেমন ভয় ভয় করে।

সব কিছু যেন হঠাৎ কেমন খালি খালি মনে হয় অরিন্দমের।

আকণ্ঠ একটা পিপাসায় গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

শুষ্ক জিহ্বাটা ভিতরের দিকে টানছে যেন।

এদিকে ওদিকে তাকায় অরিন্দম সরকার এবং নজরে পড়ে বোতলটা এখনো শূন্য হয়ে যায় নি।

কোনমতে এগিয়ে গিয়ে গ্লাসটা তুলে নিয়ে বোতলটা উপুড় করে অনেকটা ঢালে তারপরই সেটা মুখের সামনে তুলে ধরে চুমুক দেয়।

আর ঠিক সেই সময় বৃন্দাবন এসে ঘরে ঢোকে।

বৃন্দাবন, আগে দেখ জগা বেঁচে আছে না শেষ হয়ে গিয়েছে।

বৃন্দাবন একবার অরিন্দমের মুখের দিকে তাকাল তারপর এগিয়ে গেল ভূপতিত জগার সামনে।

সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জগার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিল, জগা—এই জগা—

কিন্তু মুখের কথাটা বৃন্দাবনের শেষ হয় না, চকিতে হাতটা সরিয়ে নেয় সে। জগার দেহটা বরফের মত ঠাণ্ডা।

জগার কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকায় বৃন্দাবন অরিন্দম সরকারের দিকে এবং ক্ষীণকণ্ঠে ডাকে, হুজুর—

কি রে?

শূন্য গ্লাসটায় আবার বোতল থেকে ঢালছিল অরিন্দম, বৃন্দাবনের ডাকে ওর দিকে তাকাল।

কি রে? বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে—

হ্যাঁ, শেষ হয়ে গিয়েছে?

হাত থেকে অরিন্দম সরকারের গ্লাসটা ফরাসের উপর পড়ে যায়।

কি হবে হুজুর? আতংকে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে বৃন্দাবন।

জগা যে তারই আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে সেটা ত' বৃন্দাবন বুঝতেই পারছে।

উত্তেজনার মাথায় দুম্ করে মেরে বসেছিল জগাকে কিন্তু সেই আঘাতেই শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই যে জগার প্রাণটা বের হয়ে যাবে তা কি বেচারী বৃন্দাবন স্বপ্নেও ভেবেছে।

হুজুর। কি হবে হুজুর—হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বৃন্দাবন।

কিন্তু অরিন্দম সরকার ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে ওঠে, থাম্ বেটা, কাঁদিস নে।

হুজুর ?—

আবার কাঁদে ? যা—চট করে সদরটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

বাঈজী সাহেবা দেখে গিয়েছেন হুজুর—এখন যদি তিনি থানায় গিয়ে খবর দেন—আমাকে বাঁচান হুজুর—ছুটে এসে বৃন্দাবন অরিন্দমের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে।

এই বৃন্দাবন, ওঠ—ওঠ—

গরীব মানুষ হুজুর, কেবল আপনাকে বাঁচাবার জন্যই ওর মাথায় আমি আঘাত করেছি হুজুর—কি হবে হুজুর।

অরিন্দমেরও তখন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সে নিজেও কিছু ভাবতে পারছে না।

কিন্তু লাশ সরিয়ে ফেলতে হবে।

এবং রাতারাতিই সরিয়ে ফেলতে হবে।

কিন্তু কোথায় সরাবে লাশ।

হঠাৎ একটা মতলব চকিতে অরিন্দম সরকারের মাথার মধ্যে খেলে যায়।

অরিন্দম ডাকে, বৃন্দাবন—

হুজুর।

এ-বাড়ির পিছনে খানিকটা খোলা জমি আছে না ?

আজ্ঞে—

এক কাজ কর! বাড়িতে শাবল আছে

আছে—

শাবলটা আর একটা আলো নিয়ে আয়

শাবল দিয়ে কি হবে হুজুর ?

যা বলচি তাই শোন, একটা আলো আর শাবলটা নিয়ে আয়।

বৃন্দাবন চোখের জল মুছতে মুছতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং একটু পরেই লোহার একটা শাবল ও একটা আলো নিয়ে এলো।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরিশ্রম করে দু'জনে মিলে বাড়ির পিছনে যে খালি জমিটা পড়ে ছিল সেখানে একটা রূপসী কামিনী গাছের নীচে গর্ত খুঁড়ে ফেলে।

তারপর দু'জনে ধরাধরি করে জগার মৃত দেহটা এনে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে যখন দাঁড়িয়েছে—রাতের আকাশে ভোরের প্রথম আলোর ইসারা জেগে ওঠে। কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে অরিন্দম সরকার বৃন্দাবনের মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকে, বৃন্দাবন!

আজ্ঞে—

তুই সকাল হ'লেই কিছুদিনের জন্য বাড়ি চলে যা।

বাড়ি চলে যাবো ?

হ্যাঁ, যা—তোর কোন ভয় নেই যা করবার এদিকে আমি করবো।

কিন্তু হুজুর বাঈজী সাহেবা ?

সে জন্যও তোর ভয় নেই। সে ব্যবস্থাও আমি করব।

মুখে বলে বটে অরিন্দম কস্তুরীর ব্যবস্থা সে করবে কিন্তু ভেবে পায় না সে কি করবে। কস্তুরী বাঈজীকে অরিন্দম খুব ভাল করেই চেনে! কিন্তু যতই হোক, সামান্য এক নর্তকী। পারবে না কি অরিন্দম তাকে অর্থ দিয়ে বশ করতে।

অর্থে বশ কে না এ-দুনিয়ায়।

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, বৃন্দাবন ?

হুজুর ?

তা হ'লে তুই এখুনি বের হয়ে পড়।

এখুনি ?

হ্যাঁ—আর দেরি করিস না। সঙ্গে টাকা আছে ত' ?

আজ্ঞে—

ঠিক আছে, এই নে—বলে জামার জেব থেকে কিছু টাকা বের করে ছুঁড়ে দিল অরিন্দম সরকার বৃন্দাবনের দিকে

বৃন্দাবন টাকাগুলো তুলে নেয়।

মনে থাকে যেন এক মাসের এদিকে এ শহরে পা দিবি না। যা—

বৃন্দাবন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

একটু পরে অরিন্দম সরকারও উঠে দাঁড়াল।

অরিন্দম সরকার যখন তার গৃহের সামনে এসে পাল্কী গাড়ী থেকে নামল, প্রথম ভোরের আলো চারিদিকে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

[ক্রমশঃ]

অপেক্ষমান

জসীম উদ্দীন

গুবাক তরুর সারী,
কি গান শুনায় শূন্যের বুকে শাখা পাখাগুলি নাড়ি।
নারিকেল গাছ এপাশে ওপাশে ডাবের কলসী কাঁখে
লইয়া গাঁয়ের বধূরা চলেছে আকাশ গাঙের বাঁকে।
পাতায় পাতায় ফিস্ ফিস্ কথা কহিছে এ ওর কানে
বাতাসে ভাসিছে কি এক সুষমা নারিকেল ফুল-ঘ্রাণে।
পাখিরা উড়িছে এ ডালে ও ডালে ঘোষি সে গোপন কথা,
মাটির উপর সবুজ বিছানা পেতেছে বনের লতা।
হলদে পাখিরা শূন্যের বুকে হলুদ নক্সা আঁকি,
সারা বন ভরি অতি মিহি সুরে ফিরিতেছে কারে ডাকি।

এমন সময় তুমি কি যাবে না জল-ভরণের তরে,
শূন্য দীঘি যে আরসী মেলিয়া আছে অপেক্ষা ক'রে!
বউ কথা কও ডাকি বউ-পাখী বলে বলে হয়রান,
এ পথ-বীণা যে শত তারে তব বাজাবে নূপুর গান।
জুড়াইতে ঘট বাঁকা পথে আজ বাঁকাইয়া দেহখানি,
তুমি না চলিলে শ্যামা লতা লবে কাহার আঁচল টানি।
আঁধার হইয়া আসিল ধরণী, আশার হইল শেষ ;
ঝিঁ ঝিঁর কাঁদনে রহিয়া রহিয়া কাঁদায় সকল দেশ।

নিউইয়র্কে ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্যানফ্রান্সিসকোর সংবাদ—দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে ঐ সকল দেশের শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে, নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করা হইতেছে এবং বক্তৃতা ও বেতার ভাষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ সকল দেশের প্রখ্যাত লেখকবর্গের বহু পুস্তকও ইতিমধ্যে সেখানে প্রকাশিত হইয়াছে। শীতকালের এই সময়ই হইতেছে শিল্পকলা পরিবেশনের পুরা মরশুম। আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব গ্রাফিক আর্টস-এ ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল সহ সাতটি রাষ্ট্রের মুদ্রণশিল্প এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ১৫ই মার্চ পর্যন্ত চলিবে। এখানকার মেলজার শিল্পশালায় সপ্তম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় ভাস্কর্য ও ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাও আগামী ৩০শে মার্চ পর্যন্ত চলিবে। টাগোর সোসাইটি লিটারেরী কমিটির উদ্যোগে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা সম্পর্কে এখানে যে ১৩টি বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার ষষ্ঠ বক্তৃতাটি দেন ডাঃ পি. লাল। গত ৫ই মার্চ নিউ ইণ্ডিয়া হাউসে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ডাঃ লাল একজন বিশিষ্ট ভারতীয় কবি ও সমালোচক। তিনি বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় ভিজিটিং প্রফেসার হিসাবে কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। 'এ মাসেই নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ার নৃত্য ও নাটক সম্পর্কে ভাষণ দিবেন মিঃ ফবিয়ান বাওয়ার্স। মিঃ বাওয়ার্স 'দি ড্যান্স ইন ইণ্ডিয়া' এবং 'থিয়েটার ইন দি ইষ্ট' এই দুইটি পুস্তকের রচয়িতা। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভারতীয় নৃত্যশিল্পী ভাস্কর নৃত্য প্রদর্শন করিবেন। এশিয়া হাউস লাইব্রেরীতে প্রতি সোমবার অপরাহ্ণে 'সোসাইটি ফর এশিয়ান মিউজিক' নামে সংস্থা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া আসিতেছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাহারা রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছেন। যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে ছিল সেতার, বীণা ও সুশীল মুখার্জির বংশীবাদন। মার্চ মাসে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁয়ের সরোদ, রবিশংকরের সেতার, বালচন্দ্রমের বীণা, চতুরলালের তবলা এবং ভারতীয় লোকসঙ্গীত পরিবেশন করা হইবে। গত বছর মিসেস কেনেডির ভারত ও পাকিস্তান সফরের একটি চলচ্চিত্র গৃহীত হয়। বিগত ৫ই মার্চ এশিয়া হাউসে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। নিউইয়র্ক সহরের মিউনিসিপ্যালিটি একটি বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করিয়া থাকে। এই কেন্দ্র হইতে ভারতীয় সংবাদপত্রের মতামত সম্পর্কে প্রতি সপ্তাহে আধ ঘণ্টার একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হইয়া থাকে। এশিয়া সোসাইটির একটি সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বহু লেখকের পুস্তক সম্প্রতি আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ওয়াতুমল ফাউণ্ডেশান শ্রেষ্ঠ পুস্তকের জন্য একটি পুরস্কার দিয়া থাকেন। বৃটিশ অ্যাটিচুড টুয়ার্ডস ইণ্ডিয়ার রচয়িতা জর্জ বিয়াস এবং তিলক এ্যাণ্ড গোখেল শীর্ষক পুস্তকের রচয়িতা স্ট্যানলি ওলাপার্ট এই দুইজন লেখককে এই পুরস্কারটি ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষের রবীন্দ্র পুরস্কার

সাহিত্য-জগতের আধুনিককালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি আশা করি অনুসন্ধিৎসুদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে দু'খানি গ্রন্থকে এ বছর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করলেন—সেই দু'টি গ্রন্থ, আশ্চর্যের বিষয় একই প্রকাশকের দপ্তর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙলায় পাঠকসমাজে আপন উৎকর্ষে, বৈশিষ্ট্যে এক অভিনবত্বের খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুবোধকুমার চক্রবর্তীর "রম্যাণি বীক্ষ্য" এবং বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "স্মৃতিপাত্রে বাঙালী" গ্রন্থ দু'টি বিপুল সমাদরে বিভূষিত। এই বহুজন পঠিত জনপ্রিয় গ্রন্থ দু'টির রচয়িতা হিসাবে পূর্বোল্লিখিত লেখক দ্বয়কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান বর্ষে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করে তাঁদের সাহিত্যকীর্তিকে সম্মানিত করেছেন। গ্রন্থ দু'টি প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত প্রকাশন—প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।

প্রথিতযশা সাহিত্যসেবী বুদ্ধদেব বসুর সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ "সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থের প্রচ্ছদ আলেখ্য। এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স গ্রন্থটির প্রকাশক। প্রচ্ছদ শিল্পী—
সুব্রত ত্রিপাঠী।

বর্তমান বর্ষের আকাদামী পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ 'জাপানের প্রচ্ছদচিত্র। প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সান্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রচ্ছদশিল্পী—

ধ্রুবজ্যোতি সেন।

প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান-গ্রন্থের রুশ অনুবাদ

সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত আর্মেনীয় বিজ্ঞানী আনানি শিরাকাৎসি রচিত "ব্রহ্মাণ্ডবিবরণ" গ্রন্থটি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আর্মেনীয়ার বিখ্যাত মাতেনাদারান মুহাফিজখানায় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। শিরাকাৎসি-র এই 'ব্রহ্মাণ্ডবিবরণ'কেই পণ্ডিতরা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীনতম কোষগ্রন্থ বলে মনে করেন। এই গ্রন্থে শিরাকাৎসি সে যুগের পক্ষে আশ্চর্য রকম বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় দিয়েছেন: গ্রহ-তারকাগুলিকে পৌরাণিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যুক্ত করার দিকে গ্রীক বিজ্ঞানীদের যে-প্রবণতা ছিল, সেটাকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন এবং বলেছেন যে ও গুলো হচ্ছে আসলে "আলোক-বিকীর্ণকারী বস্তু বিশেষ।" শিরাকাৎসি-র সময় থেকেই আর্মেনীয়ায় প্রকৃতি-বিজ্ঞান চর্চা এক নতুন স্তরে উত্তীর্ণ হয়।

মহাকবি সাইয়াৎ নোভার ২৫০তম জন্মবার্ষিকী

এই বৎসর অক্টোবর মাসে আর্মেনীয়ার মহাকবি সাইয়াৎ নোভার সার্ধ-দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পালন করার জন্য বিশ্বশান্তি পরিষদ যে আহ্বান জানাইয়াছেন সেই অনুযায়ী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুতি চলিয়াছে। সপ্তদশ শতকের কবি সাইয়াৎ নোভা আর্মেনীয়, জর্জীয় ও আজেরবাইজানী ভাষায় কাব্য রচনা করেন এবং সেইজন্য এই তিনটি জাতি তাঁহাকে তাহাদের 'জাতীয় কবি' বলিয়া গণ্য করে। তিনি এই তিনটি প্রজাতন্ত্রেরই সুহৃদ ছিলেন এবং ইহাদের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী কামনা করেন। তাঁহার ২৫০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আর্মেনীয়া, জর্জিয়া ও আজের—বাইজানের সাহিত্যসংস্থাগুলি যুক্তভাবে আলোচনা বৈঠক ও গ্রন্থাদির প্রকাশ প্রভৃতির এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে।

Swami Vivekananda's Rousing Call to Hindu Nation

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত এই গ্রন্থ নানা দিক দিয়েই বিশিষ্ট। স্বামীজীর উদ্দীপ্ত বাণী কয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল, মূলতঃ সেই সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ-যাবৎ যে রচনাদি প্রকাশিত হয়েছে তার বেশীর ভাগই বাংলা ভাষায় রচিত হওয়ায় ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষীদের পক্ষে আগ্রহ সত্ত্বেও সে সমুদয়ের সম্যক পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু আলোচ্য রচনা তাঁদের সে সুযোগ প্রদানে সমর্থ, কারণ এর আদ্যোপান্ত ইংরাজী ভাষায় রচিত। প্রধানতঃ বিবেকানন্দের বাণীই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু, জাতির উদ্দেশে স্বামীজী বিভিন্ন সময়ে যে বাণী প্রদান করেছেন, রচনাকার তারই ভাষ্য টিকা-টিপ্পনি সমেত ধরে দিয়েছেন পাঠকের সামনে। বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মধারারও এক প্রামাণ্য পরিচয় বিধৃত হয়েছে, যাতে অনুসন্ধিৎসু মননও তৃপ্ত হতে পারে। স্বামীজীর তেজোদৃপ্ত আহ্বান একদিন মুমূর্ষু জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল; বীর্যের মন্ত্রে, ত্যাগের দীক্ষায় জেগে উঠেছিল শতসহস্র প্রাণ; আজ আবার বড় প্রয়োজন সেই আহ্বানের, স্বামীজীর মরদেহ আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই কিন্তু তাঁর আহ্বান অমর কালজয়ী; দেশের মর্মে মর্মে আজ তা ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থের গুরুত্বও তাই এত বেশী। লেখকের ভঙ্গী আন্তরিক, ভাষা সহজ ও সাবলীল। আমরা বর্তমান গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—একনাথ রাণাডে (Ekanath Ranade) প্রকাশক—স্বস্তিক প্রকাশন, ২৭।১বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—দুই টাকা।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য

আলোচ্য পুস্তকটি প্রাবন্ধিক সাহিত্যের আসরে এক উল্লেখ্য সংযোজন হিসাবে গণ্য হওয়ার দাবী রাখে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এক প্রামাণ্য ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। কয়েকটি বিভিন্ন প্রবন্ধে যেমন, 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি', 'বৈদিক যুগে যজ্ঞ প্রথা', 'বৈদিক যুগে শিক্ষার ধারা', 'মহাকাব্য যুগে শিক্ষার ধারা' 'বৈদিক যুগের শিল্প', 'বৈদিক যুগের শিল্পশিক্ষা, 'প্রাচীন যুগের অলঙ্কার, প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য সমিতি,' 'প্রাচীন ভারতে পুঁথি ও পুঁথিশালা', 'সংস্কৃতি ও সাহিত্য' ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে অঙ্গাঙ্গী ভাবেই অবস্থিত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলার উৎসব' গ্রন্থটির প্রচ্ছদচিত্র। যেমন তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী। শিল্পী—শৈল চক্রবর্তী।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে পাশাপাশি রাখলে তা প্রমাণিত হয়। আবার ভারতীয় সংস্কৃতি যে মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক তাতে সন্দেহ নাস্তি, আলোচ্য রচনাবলীর মাধ্যমে লেখক এই সত্যকেই তুলে ধরেছেন, ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির আসল রূপটি তাই সহজেই ধরা দেয় পাঠক মননে। গবেষক সাহিত্যের ভাণ্ডারে বর্তমান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রকাশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দুই টাকা।

প্রখ্যাতনামা কবি বিষ্ণু দে সম্পাদিত বাংলা কাব্যের সঙ্কলন গ্রন্থ "একালের কবিতা" গ্রন্থের প্রচ্ছদপট প্রকাশক। সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিঃ ; প্রচ্ছদশিল্পী—সত্যজিৎ রায়।

দণ্ডক-শবরী

আলোচ্য গ্রন্থখানি এক প্রামাণ্য ইতিহাস বলেই মর্য্যাদা পাওয়ার অধিকারী যদিও মূলতঃ এটি উপন্যাস। লেখক ভারত সরকারের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত থাকা কালীন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তারই নিখুঁত রূপায়ণ করেছেন বর্তমান রচনার মাধ্যমে। পুনর্ব্বাসন সক্রান্ত কাজে দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলেন তিনি, সেখানে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা তাঁর মনে জাগে তারই উত্তর খুঁজতে সন্ধানী হয়ে ওঠে তাঁর মন। দণ্ডকারণ্যের আদিবাসীদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই উভয়বিধ অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন তিনি ; আলোচ্য উপন্যাসের প্রতিটি ছত্র সেই আন্তরিক অন্বেষণের উজ্জ্বল স্বাক্ষরে চিহ্নিত। কি বিচিত্র জীবনযাত্রা ঐ আদিবাসীদের, কালের গতি যেন সেখানে মূক, নিশ্চল ; যুগাতীত কাল ধরে তারা যে ঐতিহ্যের ধারা বহন করে আসছে আজও তা রয়ে গেছে অপরিবর্ত্তিত, আধুনিক যুগের মানুষ তাই সে ঐতিহ্যের মুখোমুখি হয়ে থমকে দাঁড়ায়, গ্রহণ করতে না পারলেও তার বৈচিত্র্য তার মহিমা উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়। আদিবাসী সংস্কৃতির পক্ষে এটাই লেখকের মূল বক্তব্য। মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ লেখনীর মাধ্যমে ছবির পর ছবি এঁকে গিয়েছেন মরমী লেখক, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেন কৌশলী তুলির টানে টানে আঁকা বর্ণাঢ্যচিত্র, আদিবাসী তরুণ চয়ন সিরদার ও তার বাগ্‌দত্তা বধূ মালকো, গুপ্তেজী, ডাঃ পিল্লাই প্রভৃতি যেন জীবন্ত মানুষের চেহারা নিয়েই ধরা দেয় পাঠক-মননে। তাদের সুখ দুঃখ হাসি কান্নায় তাই সহজেই আলোড়িত হয় চিত্ত, উদ্বেল হয়ে ওঠে হৃদয়। মূল কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে উদ্ধৃত হয়েছে কয়েকটি পৌরাণিক আখ্যান, যারা প্রক্ষিপ্ত হলেও আবেদনে অনন্য। আদিবাসীদের এই অপূর্ব্ব জীবনায়ন লেখকের আন্তরিকতায় শুধু হৃদ্যই নয়, উপভোগ্যতায়ও রমণীয় হয়ে উঠেছে, বইটি পড়তে পড়তে পাঠক যেন নিজেকেই হারিয়ে ফেলেন। অচিন্ত্য ও অনবদ্য এক রম্যরচনা বলেই স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য এই গ্রন্থ, আমরা এর সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রুচি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—নারায়ণ সান্যাল। (বিকর্ণ) প্রকাশক—ময়ূখ বসু। গ্রন্থপ্রকাশ, ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দাম—নয় টাকা।

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড (কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত সুলতা করের 'ছোটদের বৌদ্ধগয়া' গ্রন্থের প্রচ্ছদের প্রতিলিপি প্রচ্ছদশিল্পী—পূর্ণ রায়।

স্বামী বিবেকানন্দ (শতবর্ষ জয়ন্তী প্রকাশন)

স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতার নাগরিক সাধারণ যে সংস্থা গঠন করেন, তাঁরা এক নির্দ্ধারিত কর্ম্মসূচী অনুসারে জয়ন্তী উৎসব পালনার্থে অগ্রসর হন। স্বামীজীর জীবন ও কর্ম্মধারা কয়েকটি ধারাবাহিক গ্রন্থ রচনাও এই কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত ছিল, আলোচ্য গ্রন্থখানি তারই অন্যতম ফসল। ঐ পর্য্যায়ের গ্রন্থমালিকার তৃতীয় অবদান এটি। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে, সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিচয়ও বিধৃত হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দ্দেশসমূহও যথাযথ ভাবে প্রদত্ত পাশ্চাত্ত্য জগতে বিবেকানন্দের বাণী ও তার প্রতিক্রিয়া এরও এক প্রামাণ্য পরিচয় দেওয়া হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। আমাদের দেশের যুবসমাজ আজ যে ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়েছে তাতে এই ধরণের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় ; স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মধারা এতদুভয়েরই স্পর্শ আজ এই ক্ষয়িষ্ণু অধঃপতিত মানসতার বড় প্রয়োজন। গ্রন্থকারের ভাষারীতি আধুনিক না হলেও সহজ ও সাবলীল। পাঠক সহজেই রচনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে সক্ষম হন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, প্রকাশক—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সেক্রেটারী 'স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী,' ১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪, দাম—

গরলামৃত

প্রবীণ ঔপন্যাসিকের এই সাম্প্রতিক রচনা নানা কারণেই উল্লেখ্য। এক গ্রাম্য যুবকের জীবনকাহিনী বিধৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। বাল্যে পিতৃহীন আশুকে পালন করেছিল তার বাল্য-বিধবা পিতৃস্বসা ও মাতা, এই দু'টি নারীর অগাধ স্নেহে প্রশ্রয় প্রাপ্ত বালক ক্রমেই হয়ে উঠতে থাকে দুর্দম বেপরোয়া প্রকৃতির, পাঠশালা তার ভাল লাগে না। ভাল লাগে না বাঁধা ধরা পথের শত সহস্র বাধা নিষেধ। সুরের প্রতি সঙ্গীতের প্রতি সহজ অনুরাগে বাল্যেই এক যাত্রাদলে যোগ দেয় সে, কিন্তু সেখানেই হল জীবনের বিকৃতির সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়, ঐ দলের পৃষ্ঠপোষক ধনী লম্পট জমিদার বাবুর কার্য্যকলাপে আশুর কিশোর চিত্ত ভয়ানক ভাবে নাড়া খায়, ফিরে আসে সে আবার নিজের গাঁয়ে মা, পিসীর স্নেহচ্ছায়ায়। যথা সময়ে ল্যাণী বধূ এল ঘরে নীড় রচনার সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে আশু, কিন্তু প্রথম যৌবনের ভুলে ঝড় ঘনিয়ে এল ওদের জীবনে। স্বামীর পর অভিমানে বধূ উমাকালী পথে বেরিয়ে পড়ে, অবশেষে কি ভাবে ই দু'টি অবসন্ন প্রাণ আবার খুঁজে পায় পরস্পরকে তার ইঙ্গিত দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখক। সরল সবল হাতে সাধারণ মানুষের এক সুন্দর জীবন আলেখ্য এঁকেছেন লেখক, আন্তরিকতায় উজ্জ্বল এই রচনা সহজেই পাঠকের মনকে স্পর্শ করে। তাঁর বাচনরীতিও বিষয়োচিত। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—রামপদ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—পূর্ব্বাচল পাবলিশার্স ২ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭ দাম—চার টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র জন্মশতবার্ষিকীর পুণ্য লগ্নে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত তাঁর বন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছে? এই শুভমুহূর্তকে কেন্দ্র করে সাহিত্য জগতও যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বামীজী সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে রাণা বসু লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দ" অন্যতম। এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থটি রচনায় লেখক যথেষ্ট শক্তি ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সরল প্রাঞ্জল ভাষায় "এই" দিব্যপুরুষের অমরজীবন অতীব দক্ষতার সঙ্গে লেখক চিত্রিত করেছেন। তাঁর আলোময় জীবনের সমগ্র কাহিনী বর্ণণ ঘটনাদি লেখক যথোচিত যত্ন সহকারে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন। বালক-বালিকারা এই তথ্যবহুল জীবনীপাঠে নানা ভাবে উপকৃত হবেন। লেখকের রচনার প্রসঙ্গগুণে ভাষার মিষ্টতায় এবং প্রচুর অধ্যবসায়ে বইটি পাঠকের অন্তর স্পর্শ করবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো। দাম এক টাকা মাত্র।

নেপথ্য দর্শন

বহুখ্যাত সাংবাদিক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী বা শ্রীনিরপেক্ষর এই রচনা সংকলন নানা কারণেই উল্লেখ্য। সাম্প্রতিক বাংলা সাংবাদিকতার এক নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে এই গ্রন্থে। সকলেই অবগত আছেন যে, গ্রন্থকার কিছুকাল পূর্ব্বে সাংবাদিকতার বিশিষ্ট পুরস্কার 'ম্যাগসেসাই পুরস্কার' লাভ করেছেন, যে সব রচনার জন্য এই সম্মান লাভে তিনি সমর্থ হয়েছেন তার অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে আলোচ্য সংকলনে। দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক এই উভয়বিধ পরিস্থিতির উপরই আলোকপাত করেছেন লেখক, প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে, যেখানে যা কিছু অন্যায় ও দুর্নীতি ধরা পড়েছে সাধারণের মুখপাত্র হয়ে সে সবেরই অবগুণ্ঠন মোচন করে লেখক তাদের তুলে ধরেছেন লোকচক্ষে। প্রকৃতপক্ষে এই রচনা বিক্ষুব্ধ যুগ-মনের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। গত চোদ্দ বছর ধরে বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাধারণ ভাবে যে মানসিকতায় আচ্ছন্ন, তাই প্রতিফলিত হয়েছে বর্ত্তমান গ্রন্থে, লেখক এখানে তার ভাষ্যকার মাত্র। আলোচ্য পুস্তকটি প্রামাণ্যও হয়ে উঠতে পেরেছে তারই জোরে। আমরা গ্রন্থটির সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শিল্পোত্তীর্ণ, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চমানের। লেখক—শ্রীনিরপেক্ষ প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—১। দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ছোটদের বিবেকানন্দ (শতবর্ষ জয়ন্তী প্রকাশন)

স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মোৎসব পালনার্থে কলকাতার নাগরিকবৃন্দ যে আয়োজন করেন, স্বামীজীর জীবন ও কর্মধারা সম্বন্ধীয় পুস্তিকা প্রকাশ করাটাও তার অন্তর্গত, আলোচ্য পুস্তিকাটিতে শিশুদের উপযোগী করে স্বামীজীর জীবন ও কর্ম্মের এক প্রামাণ্য পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। অতি সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় লিখিত এই পুস্তিকাটিতে বিবেকানন্দের যে পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে তা বালক-বালিকার মনকে এক উন্নত আদর্শের প্রতি জিজ্ঞাসু করে তুলবে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে কিশোর চিত্ত একসঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষালাভের উত্তম সুযোগ পাবে বলেই আমাদের আশা। শিশু সাহিত্যের ভাণ্ডারে বর্ত্তমান পুস্তকটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—স্বামী নিরাময়ানন্দ, প্রকাশক—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সেক্রেটারী, 'স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী, ১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪, দাম—পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর বহুজন সমাদৃত দেশাত্মবোধক নাটক "সৈনিক" এর প্রচ্ছদের প্রতিচ্ছবি, নাটকটির প্রকাশক বাক-সাহিত্য। প্রচ্ছদ-শিল্পী—

সুধাময় দাশগুপ্ত
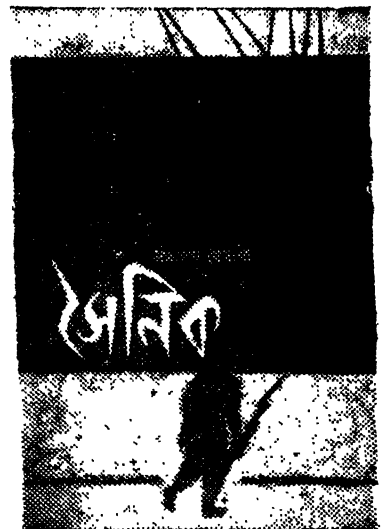
কাছেই জানালা

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সঙ্কলন। কবি দীর্ঘদিন ধরে যা লিখেছেন তারই মধ্যে থেকে বেছে বেছে কিছু সঞ্চয় করেছেন বর্ত্তমান সংকলনে, কবিতাগুলি প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত 'ছন্দ কবিতা' ও 'গদ্য কবিতা', মোট কবিতা সংখ্যা সাতষট্টি। দুভাগে বিভক্ত হলেও এদের মাঝে একটা ঐক্য সংহত হয়েছে, সে ঐক্য ভাবব্যঞ্জনায়, সহজ সরল এক সুষমাই আলোচ্য কবিতাগুলির প্রধান সম্পদ। মননশীলতায় উজ্জ্বল না হয়ে তাই এরা আন্তরিকতায় স্নাত, সংবেদনশীল মননের ছাপে মনোরম। সংকলনটির নামায়নও এই কারণেই সার্থক, কারণে অকারণে কাছের জানালাটির মধ্যে দিয়ে মানুষ তাকায় বাইরে, একটু আকাশ, দু'একটি নতুন মুখ, ক্ষণিক বাতাসের দোলা এ সবই তখন তাকে স্পর্শ করে ক্ষণেকের তরে, অবসন্ন মন চকিত হয়ে ওঠে যেন কোন অজানার ছোঁয়ায়, আলোচ্য কবিতাগুলিও সেই সহজ আনন্দের ছোঁয়ায় স্পন্দিত, এগুলি পড়তে পড়তে পাঠক মননেও ছাপ পড়ে এক ক্ষণিক প্রশান্তির। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী। পরিবেশক—দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম ২২/১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ দাম—তিন টাকা।

আদিম সমাজের ইতিহাস

মানব সমাজের আদিম বিকাশ কি ভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে এক ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে বর্ত্তমান গ্রন্থে। আদিম মানুষের সৃষ্টি, গোষ্ঠীর উদ্ভব ও তার ব্যাপ্তি, তৎকালীন ভাবধারা ও সংস্কৃতি এ সবেরই উপর আলোকপাত করেছেন লেখক সুষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে; আদিম যুগের যে সব ভাবধারা আজও আমরা বহন করে চলেছি সেগুলির উৎস ও অনুসন্ধান করেছেন রচনাকার। জনমানসের এই সব অর্থহীন কুসংস্কারকে দূরীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমাজবোধকে জাগ্রত করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন লেখক, আপোষহীন শ্রেণী সংগ্রামকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি, তাঁর মতে জড়তা ও অজ্ঞতাকে সমষ্টিগত ভাবে জয় করতে হলে এটাই সর্ব্বোত্তম পন্থা। আদিম সমাজের রূপ ও রেখা সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী, অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রাচীন সামাজিক প্রথার সঙ্গে তিনি পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছেন, আবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সেগুলিকে বিচার করেও দেখিয়েছেন; জিজ্ঞাসু ও শিক্ষার্থী এই উভয়বিধ পাঠকই বর্ত্তমান গ্রন্থটিকে সমাদর করবেন। গবেষক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য রচনা মূল্যবান বলেই পরিগণিত হবে। গ্রন্থকারের ভাষারীতি বলিষ্ঠ ও সাবলীল, পাঠক সহজেই রচনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে সক্ষম হন। আঙ্গিক রুচি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চমানের। লেখক—মনোরঞ্জন রায়, পরিবেশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—পাঁচ টাকা।

India's struggle for Freedom

ভারতের দীর্ঘকালব্যাপী মুক্তি সংগ্রাম, যুক্তিবাদী লেখকের কলমে নিখুঁত ভাবেই রূপায়িত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। প্রায় দেড়শো বছর ধরে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারত যে ভাবে সংগ্রাম চালিয়েছে তার সম্পূর্ণ ইতিহাস বিধৃত করেছেন রচয়িতা। যদিও এই সংগ্রামের ইতিহাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই ভূমিকা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তবু এ বিষয়ে ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাও অবহেলিত হয়নি, মুক্তি সংগ্রামের ক্ষুদ্রতম সৈনিকও লেখকের নিকট যথাযোগ্য সম্মান লাভের উপযুক্ত। বৃটিশ শাসনের পটভূমিকায় ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্রমাবনতির মূল অনুসন্ধান করে তিনি তার উপর সুস্পষ্ট আলোকপাত করেছেন; ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি যে কখনই পরমুখাপেক্ষী ছিল না এই সত্যকে অনস্বীকার্য্য রূপেই প্রকাশ করেছেন তিনি। দীর্ঘকালব্যাপী মুক্তিসংগ্রামে ভারতের জনসাধারণ যে জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষেই যোগ দিয়েছিল, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতিই যে স্বদেশের মুক্তিব্রতে এক দিন মরণপণ করেই এগিয়ে এসেছিল এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন লেখক। ধর্ম্মবৈষম্যের ধূয়ো যে কেবলমাত্র কুচক্রী বিদেশী শাসক শ্রেণীরই সৃষ্ট বিষফল এ সত্যকে উদ্ঘাটিত করতেও দ্বিধাগ্রস্ত নন তিনি। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে যে বিভক্ত স্বাধীনতা আজ আমাদের করায়ত্ত, তাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে হলে একাগ্র ও অকপট কার্য্যধারা অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত লেখক, তাঁর রচনা সামগ্রিক ভাবে এই দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের এই ইতিহাস, জাতির প্রামাণ্য দলিল রূপেই পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। এরূপ মূল্যবান একখানি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য লেখকের সঙ্গে প্রকাশকও আমাদের ধন্যবাদার্হ। লেখক—হীরেন মুখার্জ্জী, প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—আট টাকা।

॥ মনীষী-মেলার নির্দ্দেশ-চিত্র ॥

১। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ২। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ৩। শ্রীনরেশ মিত্র ৪। শ্রীহেমন্তকুমার বসু ৫। শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। শ্রীহুমায়ুন কবীর ৭। শ্রীঅশোককুমার সরকার ৮। শ্রীপদ্মজা নাইডু ৯। শ্রীঅতুল বসু ১০। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ১১। শ্রীনন্দলাল বসু ১২। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ১৩। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪। শ্রীপরিমল গোস্বামী ১৫। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙালী মনীষী-মেলা—পঞ্চাশোর্দ্ধে-(২) [পূর্ব্ব-পৃষ্ঠায় নির্দ্দেশ-চিত্র দ্রষ্টব্য]

—রেবতীভূষণ ঘোষ অঙ্কিত
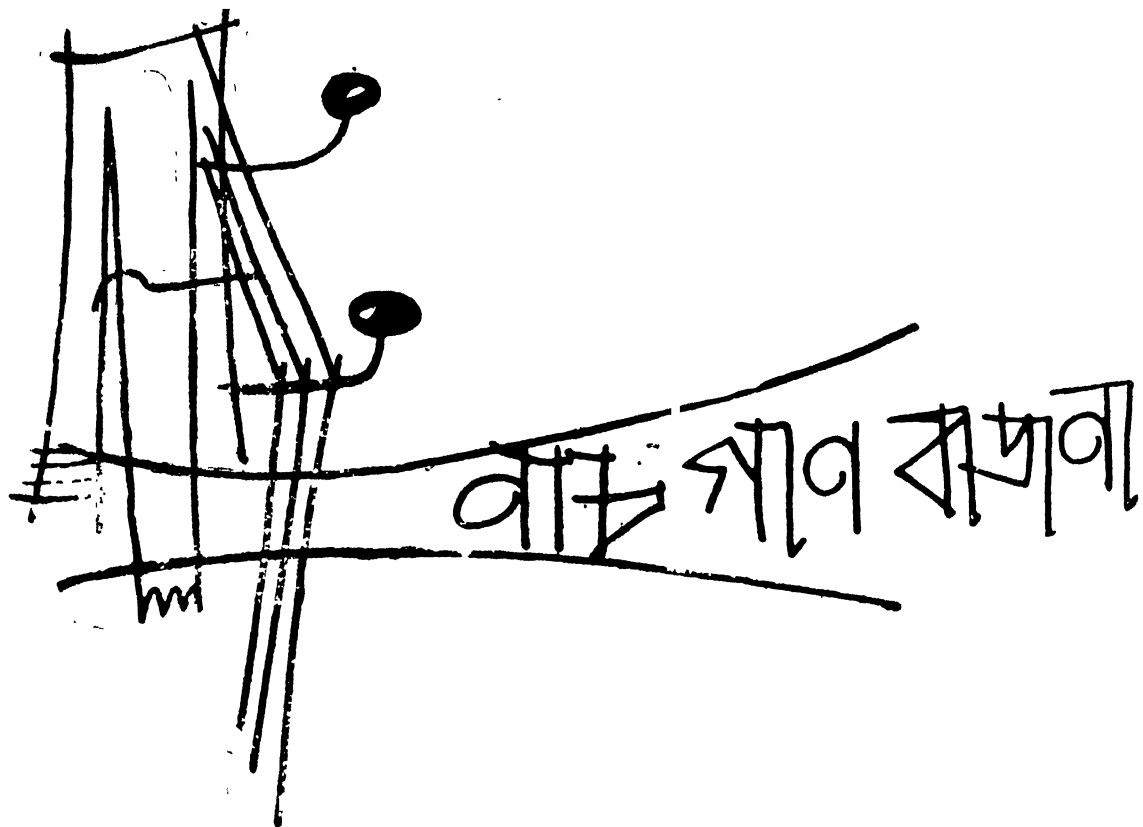
সরোদ শিল্পী আলী আকবর

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পান্নালাল দত্ত

ভারতীয় সঙ্গীতের সুসম্বদ্ধরূপ সম্বন্ধে প্রতীচ্য বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সচেতন ছিল। তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের ভারতীয় একজন বংশী-বাদকের কথা একজন ইটালিয়ান নৌ-চালকের রোজ নামচায় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য ভূমিজ্ঞানী ষ্ট্রাবো খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে প্রশংসা করিয়াছেন। অর্দ্ধ পৃথিবীশ্বর গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সময়ে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গ্রীসের সহিত ভারতের সংস্কৃতির ভাববিনিময় হওয়ায় ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে গ্রীস ওয়াকিবহাল হয়, তাই বলিয়া গ্রীসের সঙ্গীতের উপর ভারতীয় প্রভাবও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব ইতিহাসের সূত্রটিকে অবলম্বন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাঙ্গিতিক সম্পর্কের ধারা আজ গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে, এই সম্পর্ককে যাঁহারা দৃঢ়তর করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নব্যযুগের প্রচারকরূপে আলী আকবর খাঁর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ভারতের কিছু সংখ্যক মহান শিল্পী পাশ্চাত্ত্য-ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে তার প্রভাব কতটুকু আছে তারও মূল্যায়ন করিতেছেন। পাশ্চাত্ত্য শিল্পধারা সম্বন্ধে শিল্পী আলী আকবর যথেষ্ট উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন এবং পাশ্চাত্ত্য শিল্পীদলের প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতের উপর সুফলদায়ক হইবে বলিয়াই তাঁহার মত? ম্যুৎসার্ট, বিটোবেন প্রভৃতি সংগীতকারের নাম শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করিয়া থাকেন। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সম্ভাবনাময় রূপ সম্বন্ধে মার্কিণীদের সচেতনতা কিরূপ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সোল্লাসে বলিলেন-'কানাডায় আমার শিল্পকর্ম্মের রেকর্ডগুলি সেখানকার সংগীতামোদীরা অতি প্রযত্নে রক্ষা করে আর IV-র মাধ্যমেও আমি অধিক সংখ্যক অধিবাসীর কাছে পরিচিত হয়েছি।' আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে সুবিধা এই শিল্পী ও শ্রোতার মধ্যে সহজ প্রীতির ভাবটি শিল্পসংগ্রহশাগার মাধ্যমে গড়িয়া উঠে; আর শিল্প-ব্যবসায়ী শ্রেণীও দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রতি ঘরে ঘরে শিল্পীকে যথাযথ পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম, কারণ এতে শিল্প ব্যবসায়িগণের অর্থোপার্জ্জনও হয়। আমাদের দেশে অনুরূপ কোন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী না থাকায় ব সংস্কৃতিক্ষেত্রে সুষ্ঠুমনের অপ্রতুলতার জন্যই হোক আমাদের সহজ হাল্কা গান বাজনায় নজর চলিয়া গিয়াছে?

ওস্তাদ আলী আকবর সর্ব্বপ্রথম সুরের মাধ্যমে ভারতের

[স]ঙ্গী লইয়া ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে আফগানিস্থান যাত্রা [ক]রেন। ইহার অব্যবহিত পর ফোর্ডফাউণ্ডেসনের আনুকূল্যে ও [আ]মেরিকার প্রখ্যাত বেহালাবাদক ইহুদী মেনুহীনের ব্যক্তিগত [স]হযোগিতায় প্রধান প্রধান পশ্চিমী রাজ্যগুলিতে ভারতের সুর [ভ্র]মণ করিয়া লইয়া যান। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি ইহুদী মেনুহীনকে [প]রম বন্ধুরূপে পাইয়াছেন।

লণ্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ক্রসেলস্, প্যারিস প্রভৃতি আরও [ক]ত কী সহর সঙ্গীত পরিক্রমা করিলেন। এই সময়ে ১৯৫৫ সালে [নি]উইয়র্কে এঞ্জেল রেকর্ড কোম্পানী সর্বপ্রথম এই ভারতীয় শিল্পীর [বা]দ্যবাদন তাঁহাদের দীর্ঘস্থায়ী 'ডিস্ক রেকর্ডে' ধরিয়া রাখেন (ইহুদী [মে]নুহীনের মুখবন্ধ সম্বলিত)।

১৯৫৯ সালে তিনি আবার পূর্ব্ব-আফ্রিকা, জার্মানী, হল্যাণ্ড, [...]থ প্রভৃতি দেশে সঙ্গীতসফর চালনা করেন। এবং সেই সব দেশের [পত্]র-পত্রিকায় তাঁহাকে বেশ ফলাও করিয়াই প্রকাশ করা হয়। [এ]বে শিল্পী পাইলেন জনগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা। সেই সব দেশের [সং]বাদ-সংস্থাগুলি তাঁহাকে 'সরোদের যাদুকর' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। [১৯]৬০ সালে শিল্পী দূরপ্রাচ্যের আহ্বানে জাপানের টোকিও-তে তিনিধিস্বরূপ গিয়াছিলেন। সেই সংগীত পরিক্রমাই বোধ করি [তা]হাকে সাফল্যের চরমে পৌঁছাইয়াছিল। জাপানী আবাল-বৃদ্ধ-[বনি]তা তাঁহাকে দেখিবার আশায় ভীড় জমাইয়াছিল। ভারতীয় [স]ংগীতের যাদুকরী স্পর্শে, সরোদের সুরঝঙ্কারে তাঁহারা নূতন [সৌন্দ]র্যের সন্ধান পান। জাপানে একটি ভারতীয় সঙ্গীতানুশীলনের [কে]ন্দ্র সংস্থাপন বিষয়ে তিনি চিন্তা করেন। ১৯৬২ সালের আগষ্ট[ে] কানাডার মন্ট্রিল ও ম্যাকগ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ আমন্ত্রণ[ে] তাঁহার প্রায় আড়াই মাস কাল সফরসূচীর সূত্রপাত করেন। এই [সম]য়ে সাক্রকও ভ্রমণ করেন তিনি। বিভিন্ন সময়ের বিদেশ কর্ম্ম-[সূচী]তে সাথসঙ্গতকারী হিসাবে তবলাবাদক চতুরলাল, মহাপুরুষ মিশ্র [ও] উদীয়মান তবলাবাদক শঙ্কর ঘোষকে তিনি তালিকাভুক্ত [ক]রিয়াছিলেন।

একজন ভারতীয় সঙ্গীতের ধারককে পাইয়া পাশ্চাত্ত্য অধিবাসীরা [তাঁ]কে আত্মার চেয়েও আত্মীয় ভাবিয়াছেন। তাঁহার শিল্পকৃতি [দ্বা]রাই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিলেন না, তাঁহার আদর্শ ও মহৎ সঙ্কল্পকেও [তাঁ]হারা স্বীকৃতি দিয়াছেন। সাংস্কৃতিক লেনদেনের মাধ্যমে দুই [দেশে]র মধ্যে বোঝাপড়া ও মৈত্রীবন্ধনের শক্তি যে হিংসা ও পরসাম্রাজ্য-[লোভ]ী মনোভাব হইতে অধিক শক্তিশালী এ-কথা পাশ্চাত্ত্য দেশকে [তি]নি বুঝাইতে পারিয়াছেন। নীচে বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় [প্রকা]শিত শিল্পী সম্বন্ধে ধারণাগুলির ছাপার অংশবিশেষ দেওয়া গেল:

দি টাইমস (২২শে জুন, ১৯৫৯ খৃ:) বলেন—

"Mr. Ali Akbar Khan left an impression of [int]ense concentration on his art by a string player [of] great talent.—"

নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান (২০শে জুন, ১৯৫৯ সাল)-র মন্তব্য—

'During his improvisation one seemed some-[tim]es to be hearing an Indian Bach at work. [Ba]ch was the greatest composer of the 17th [cen]tury like Mian Tansen.'

ইষ্ট আফ্রিকান ষ্ট্যাণ্ডার্ড যন্ত্র ও যন্ত্রী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন—

'The tremendous rythmic subtlety of the music and the wonderfully delicate fingering required by this instrument of 32 strings call for the greatest technique accomplishment.'

কেমাস্ স্পোর্ট অব্ ইষ্ট আফ্রিকার সংযোজন—

'A characteristic of Indian music is that far from badenig the intellect it actually liberates the mind. He is ever aware of the great responsibility vested in the artist in breaking up the barriers of nationality, religion, race and colour.'

এশিয়ান মিউজিক সার্কেলের সভাপতি মি: ইহুদী মেনুহীন—

'A new image of beauty is born before our ears and eyes and we glimpse the remote and mysterious ways, the ideals which could evoke so lovely and tender a blossom.

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)।

সাম্প্রতিক রেকর্ড

'হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস' ও কলম্বিয়ার নতুন রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:—

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

এন্ ৮২৯১১ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল রচিত দু'খানি দেশাত্মবোধক গান—'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' ও 'উর্দ্ধগগনে বাজে মাদল'—বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠের অনবদ্য প্রকাশন।

এন্ ৮৩০০০ শিল্পী মিণ্টু দাশগুপ্তের কৌতুক গীতি—"তারপর? তার আর পর নেই" এবং "গুল্ সবই গুল্" দু'খানি জনপ্রিয় গানের ব্যঙ্গ অভিব্যক্তি।

এন্ ৮৭৫৭৫ 'জৌনপুরী' ও 'আভোগী-কানাড়া'র সুরকে বেহালার মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেহালা শিল্পী শিশিরকণা ধরচৌধুরী।

কলম্বিয়া

জীঈ ২৫১২৪ বাংলার বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীদের গাওয়া দু'খানি দেশাত্মবোধক গান—'সাজো সাজো রে ভাই' ও 'শোন শোন ভাই জোয়ান' সময়োপযোগী অর্ঘ্য।

জীঈ ২৫১২৫ গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠের দু'খানি দেশাত্মবোধক গান—'চোখের জলে পুজব না আর' এবং "রাজেন্দ্রাণী মা তুই আমার"—ঘরে ঘরে রাখবার মত একখানি রেকর্ড।

আমার কথা (৯৬)

এ. কানন

এ. কানন, বাংলার সঙ্গীতানুরাগী মাত্রই আজ এ নামের সঙ্গে পরিচিত, অবশ্য শুধু বাংলা বললে ভুল হবে, বিশ বৎসরের অক্লান্ত সাধনায় সমগ্র ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছে

তাঁর খ্যাতি, তবু তিনি বিশেষ ভাবেই বাংলা দেশের নিজস্ব শিল্পী; বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহরেই তাঁর বাস। বাংলার মেয়ের সঙ্গে পারণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বাংলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধনকে আরও অটুট ও সুদৃঢ় করেছেন।

এক সম্ভ্রান্ত দক্ষিণ ভারতীয় পরিবারের সন্তান এ, কানন, হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। হায়দ্রাবাদ ষ্টেট রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তাঁর বাবা, শিক্ষা শেষে কাননও ওই সংস্থাতেই যোগদান করেন।

বাল্যকাল থেকেই ছিল সঙ্গীতের উপর এক স্বাভাবিক অনুরাগ, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এই জগতের দ্বার উন্মোচন করেন কানন, গ্রামোফোন রেডিওতে শোনা গান তুলতেন তিনি নিজের গলায় অনায়াসেই, এই ভাবেই দিন কাটছিল কিন্তু ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠতে থাকেন তিনি, মনে হয় গানই যেন তাঁর পরম ঈপ্সিত; সুরের হাত ছানিতে উদাস হয়ে ওঠে ছক বাঁধা জীবনের চাকায় ঘোরা এক তরুণ চিত্ত।

কর্মোপলক্ষে কলকাতায় এলেন কানন একবার, একাধিক সাঙ্গীতিক জলসায় যোগদান করেন বন্ধুবান্ধবগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে, সংগীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় শুনলেন তাঁর গান, উচ্ছ্বসিত আবেগে তরুণ শিল্পীকে বুকে টেনে নিলেন প্রবীণ সংগীতজ্ঞ, বললেন, "গানই তোমার পথ, তোমার জীবন, গান ছেড়ো না তোমার হবে"।

এরপর মন স্থির করতে বেশী দেরী হল না কাননের, সংগীতকেই বেছে নিলেন তিনি গতানুগতিক জীবিকার মোহ ত্যাগ করে, অব্যাহত হল তাঁর সাধনা, এই সময়গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর সাগ্রহ সহায়তা লাভ করেন তিনি, যা আজও তাঁর কাছে পরম মূল্যবান সম্পদ বলেই বিবেচিত হয়।

ঠিক আনুষ্ঠানিক ভাবে কারুর কাছেই সংগীত শিক্ষা করেন নি এ, কানন, তবে শিক্ষার প্রথমাবস্থায় 'লাখনু বাপু রাও' ও পরে ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে কিছু কিছু সাঙ্গীতিক তালিম গ্রহণ করেন তিনি।

আজকের প্রখ্যাত সুরস্রষ্টা জনপ্রিয় শিল্পী এ কানন প্রধানতঃ তাঁর নিজের সৃষ্টি, অদম্য সঙ্গীতানুরাগ, স্বাভাবিক প্রবণতা, জন্মগত সঙ্গীতবোধই আজ তাঁকে সার্থক শিল্পী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। মধুর উদাত্তকণ্ঠ কাননের, সাঙ্গীতিক প্রতিষ্ঠার পথে এই কণ্ঠও তাঁর পক্ষে কম সহায়ক হয়নি।

বহু মিউজিক কনফারেন্সে যোগদান করেছেন; বহুদিনাবধি কলকাতা বেতারের তিনি নিয়মিত শিল্পী।

এ ছাড়া দিল্লীর ন্যাশনাল প্রোগ্রামেও অংশ গ্রহণ করেছেন কানন একাধিকবার, বর্তমানে ভারতের নানা প্রদেশেরই বেতার মারফৎ সঙ্গীত পরিবেশন করেন তিনি যদিও কলকাতাই তাঁর নিয়মিত কর্মস্থল।

প্রখ্যাতনাম্নী সঙ্গীত শিল্পী কুমারী মালবিকা রায়কে বিবাহ করেছেন কানন; শিল্পী মালবিকা কাননও আজ সঙ্গীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিতা এবং যথেষ্ট খ্যাতি ও যশের অধিকারিণী। ভবানীপুরের বকুলবাগান রোডে অবস্থিত এই শিল্পীদম্পতির সুপরিসর ফ্ল্যাটটি সর্বদাই সুরের মূর্চ্ছনায় ভরা; প্রশস্ত বসবার ঘরটিতে পা দিয়েই যে কোন মানুষ বলে দিতে পারবেন যে এই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'সঙ্গীত', মেঝেয় চিত্রিত সুন্দর আচ্ছাদনীতে আবৃত ঢালা ফরাস, তার একপাশে সুদৃশ্য কাঠের আধারে দাঁড় করানো সার সার তানপুরা, অপর পাশে রক্ষিত তিনজোড়া বাঁয়া তবলা; ইতস্ততঃ সাজানো রয়েছে কয়েকটি আধুনিক ধরণের বেতের চৌকী, আর রয়েছে ফুল, গুচ্ছ গুচ্ছ বর্ণাঢ্য কুসুমের বিচিত্র বর্ণে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ঘরের পরিবেশ।

এ, কানন

বহু ছায়াচিত্রে কণ্ঠদান করেছেন কানন। তার মধ্যে 'ঢুলি', 'বসন্ত বাহার', 'যদুভট্ট', 'হার-জিত' প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু বৎসরের সাধনায় আজ যে সাবলীলতা গায়ক এ, কাননের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে, তার মূলে রয়েছে তাঁর সুতীক্ষ্ণ শ্রুতিশক্তি, এই শ্রুতিই প্রকৃতপক্ষে তাঁর সঙ্গীতাচার্য্য। ব্যক্তিগত ভাবে ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের উপর তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম, এঁর কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করলেন তিনি। সুরের জগতে এ, কানন আজ এক সুপরিচিত নাম, তাঁর ভবিষ্যৎও বিশেষ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে।

বার্ধক্যে বারানসী

নীলকণ্ঠ

তেত্রিশ

আরেকটী আশ্চর্যতর জীবনের আমরণ উন্মোচন করেছেন ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার দিনপঞ্জীর পাতা থেকে। এই পরমাশ্চর্য পবিত্র পুণ্যজীবনের শতদল পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে বিস্ময়কর বিকশিত একটি মহৎ গ্রন্থের প্রারম্ভেই, কবিরাজ মশায়ের কলমে সে গ্রন্থের পরিচয় হয়েছে, সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ [১ম খণ্ড]। যাঁর কথা দিয়ে ডক্টর গোপীনাথের অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্তের সূচনা, তাঁর আসল নামে তাঁকে উপস্থিত না করে, ছদ্মনামে হাজির করেছেন লেখক। 'মহাত্মা জ্যোতিজী' শিরোনামায় যাঁর জীবনবৃত্তান্ত কবিরাজ মশায় আরম্ভেই উপহার দিয়েছেন, তাঁর সংগে সাক্ষাতের আগেই তাঁর কথা একাধিকবার কানে এসেছে তাঁর। এবং প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে ডক্টর গোপীনাথের, যে, মহাত্মা জ্যোতির সংগে যেন তাঁর একবার দেখা হয়। সব আকুল আন্তরিক প্রার্থনাই যে এক-জনের পায়ে গিয়ে পৌঁছায় তার প্রমাণ পেতে খুব বেশি দূর যেতে হয়নি কবিরাজ মশায়কে, মহাত্মা জ্যোতিজীর বেলায়। দর্শনের দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, ঈশ্বরদর্শনের জন্যে ব্যাকুল গোপীনাথের জীবনের দরজায় কড়া ধরে নিজে থেকে কত বার নাড়া দিয়েছেন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষরা তার সংখ্যা কে বলবে।

ভক্তের জীবনে ভগবানের দূতেরা এমনই করে নিয়ে আসেন হতাশায় হিংস্রতম তমসায় ভগবৎচিন্তায় বিভোর জীবনের প্রথম পরমাশ্চর্য "ভোর"। কখনও অনেক ডাকেও আসেন না, কখনও না ডাকতেই আসেন। আসেন ছদ্মবেশে। কখনও পাগল, কখনও পিশাচ। কখনও শিশুর বেশে, কখনও ছদ্মবেশে জড়ভরতের। ছাই চাপা তাঁদের আগুনের আঁচ পেতে পেতেই তাঁরা চলে যান নটরাজের আহ্বানে কালের কোন্ নূতন নৃত্যমঞ্চে! যাবার আগে ঈশ্বরক্ষ্যাপা পরশপাথর সোনা করে দিয়ে যায় জীবনের শতেক তুচ্ছ বাসনাকে। ধন নয়, মান নয়, নয় দেহসুখ অথবা চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়র দুরন্ত সম্ভোগ। তাঁরা জাগিয়ে দিয়ে যান চরমের পরম পিপাসা। যে পিপাসায় জীবন বৈশাখের মতো ধূ ধূ করে জ্বলে না উঠলে আষাঢ়ের কালো চোখে নামে না করুণার কান্না! ক্রুশে বিদ্ধ, কলসীর কানার আঘাতে রক্তাক্ত, বিষের পাত্র হাতে মৃত্যুদীপ্ত এই সাধক, এই প্রেমিক এই পাগল, এরা কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে ধরায় আসে, কবির এই জিজ্ঞাসা কালে কালে; নটরাজের নৃত্যের তালে তালে তাঁর উত্তর উচ্চারিত অনাদিকাল থেকে: তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে—।

ভগবান স্বয়ং আসেন দুঃখের দীপে আনন্দের আলো নিজের হাতে জ্বেলে দিতে। যখন 'পাওয়া'-র জন্যে উন্মুখ হয় ভক্ত তখন নয়। যখন মনে হয়, পাওয়ার সময় গেছে পার হয়ে, বেদনায় ভরে গেছে জীবনের পেয়ালা, তখন ঝড়ের রাতে পরাণ-সখা বন্ধুর সময় হয় অভিসারের। সকাল বেলার আলোয় হতাশায় ব্যর্থতায় বেদনায় গ্লানিতে মুদিত আলোয় কমলকলিকা চোখ মেলে। চেয়ে দেখে ঘরভরা শূন্যতার বুকের ওপরে দাঁড়িয়েছে এসে সেই পরিপূর্ণ! শূকরী-বিষ্ঠার সংগে তুলনীয় লোকসান পাওয়া নয় সেই 'পাওয়া'। নারীদেহ ভোগের যযাতি-চাওয়া নয় সেই 'চাওয়া।' অপরিমিত অর্থের, দেব-দানব-মানবকুলের ঈর্ষ্যাযোগ্য সামর্থ্যের অনেক ঊর্ধ্বে চোখ তুলে চাওয়ার ভাগ্য না হ'লে কারুর ভগবান হন না ভক্তের কাম্য। ভগবানকে পাওয়ার জন্য ভক্তের চাওয়া, সূর্যের জন্যে সূর্যমুখীর চোখ খুলে 'চাওয়া' হওয়া চাই?

ডক্টর গোপীনাথের, সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ সেই 'চাওয়া-পাওয়া'র অনবদ্য হাসি-কান্নার হীরা-পান্না। কাশীরাম দাস বলেছেন, মহাভারতের কথা অমৃত সমান কথা যে শোনে, সে পুণ্যবান। আমি বলি, গোপীনাথের এই ভগবান-কথায় যে একবারও কান দেয়, সে ভাগ্যবান।

এই গ্রন্থের মধ্যমণি, মহাত্মা জ্যোতিজীর আখ্যান। এই 'জ্যোতি'-র সমুদ্রে যে শতদল পদ্ম বিরাজিত, গোপীনাথ তার বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের দলগুলি মেলে ধরেছেন নিরাসক্ত চিত্তে। তাই এই একটি ঐশী লেখনীকেই জানাই একটি অক্ষম ঐহিক কলসে কোটী কোটি প্রণাম।

১৯২৫ সালের কথা বলছেন গোপীনাথ। তাঁর মা তখন সবে মারা গেছেন। গোপীনাথ বিষণ্ণ চিত্তে বসে আছেন তাঁর পড়ার ঘরে। এমন সময় এক সৌম্যমূর্তি যুবক এসে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি গোপীনাথ কবিরাজের বাড়ি? সম্মতিসূচক উত্তরে যুবক তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন। কবিরাজ মশাই বুঝলেন, যুবকই জ্যোতিজী। বুঝতে পারার কারণ, জ্যোতিজীর অনেক অবাক-কাণ্ড এর আগেই তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে শুনেছেন।

জ্যোতিজী বাঙলা দেশ ছেড়ে তখন কাশীতে গেছেন। কাশীতে তাঁর থাকবার জায়গা হ'লো তখনকার মতো গোপীনাথের বাড়িতেই। পরে কাশীর অন্যত্র উঠে গেলেও গোপীনাথের সংগে তাঁর যোগাযোগ ছিলো বরাবর।

জ্যোতিজী গৃহস্থ, অত্যন্ত বিনয়ী এবং তাঁর অলৌকিক ঐশ্বর্য

সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনতা অবলম্বন করতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই বলতেন: 'আমি কি জানি! আপনারা সাধু মহাজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তো সাধু নহি।' [সাধুদর্শন ও সংপ্রসঙ্গ ১ম খণ্ড]

জ্যোতিজীর জীবনে করুণাধারা নেমেছে খুব কম বয়সে। শ্রীহট্টের মৌলবী বাজারে বাস তখন তাঁর। কালীবাড়ীতে গৈরিক কাপড়ের বেশ ভূষায় এক সন্ন্যাসী বেলা শেষের আলোয় ঈশ্বর ভজনা করেন; সুরের অঞ্জলি দিয়ে সারা হয় দিন। কাছ থেকে আসে, দূর থেকে আসে কত মানুষ সেই গানের সুরের আসরের এক পাশে বসতে। জ্যোতিজীর বয়স তখনও তের পার হয়নি। সন্ন্যাসীর সেই সুরে সুর মেলাতে আসতেন সাঁঝ বেলায় কিশোর জ্যোতিজী। প্রথম আসার দিনে গান শেষ হয়ে গেলে সবাই যখন ফিরে গেল নিজের কুলায় তখনও সেই কিশোরকে বসে থাকতে দেখে সন্ন্যাসী বললেন: 'বালক, তুমি গেলে না যে'।

যাবার সময় হয়েছে বোঝে কিশোর। তবু যেতে চায় কই তার পা। ক্ষণে ক্ষণে জন্ম জন্মান্তরের ওপারে থেকে ঘুরে ঘুরে একটি কথাই কেবল বুকে বাজে। এ সন্ন্যাসী তার অন্তরের মানুষ। এর সংগে তার আলাপ আজকের নয়। কে এ সাধু মহৎ পুরুষ!

মনের কথা মুখে প্রকাশ না করে কিশোর কেবল বলে: যেতে

থেকে ইচ্ছে করেছে কবে পাখীর অন্ধকার নীড়ে ফিরে আসতে? সব পাখীর নয়, সেই পাখীর, পড়তে পড়তে যার ডিম ফেটে ছানা বেরিয়েই ডানা মেলে উড়ে যেতে চায় আবার আকাশে। যেতে ইচ্ছে করেছে কবে, ফিরে যেতে ইচ্ছে করেছে কবে সেই ঢেউয়ের, সে ঢেউ সিন্ধুর নয়, সে ঢেউ কৃপাসিন্ধুর। যে ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বুদ্ধ-শংকর-বিবেকানন্দকে অতল অন্ধকার থেকে অকূল আলোতে!

সন্ন্যাসী কিশোর জ্যোতির কথা শুনে হাসেন: আজ এই মুহূর্তে আমার সংগ কেন তোমার এত ভালো লাগছে তা বুঝছ না বটে, কিন্তু তা না বুঝে তোমার মুক্তি নেই—। তুমি কাল আবার এসো।

পূর্ব স্মৃতি। অপূর্ব এক স্মৃতি-বিস্মৃত বালকের জন্যেই সেই সন্ন্যাসী আসন পেতেছিলেন যেন মৌলবী বাজারে। ধর্ম সংস্থাপনের জন্য, গ্লানি মুক্ত করতে ভারতকে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। কে না স্বীকার করবে সে কথা! কিন্তু তবুও অস্বীকার করবে কে, যে ঠাকুর বিশেষ করে এসেছিলেন অসংখ্য নরের মধ্যে এক নরেন্দ্রকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে। পার্থকে দিয়ে যেমন এসেছিলেন একদিন পার্থসারথি অন্যায়ের অক্ষৌহিণীকে নিশ্চিহ্ন করে প্রতিষ্ঠা করতে ধর্ম রাজ্যের।

পথের ধারে বোধি গাছ সকলকেই ছায়া দেবে। কেবল সিদ্ধার্থকে কবে দেবে বুদ্ধ!

পর, সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন: তুমি ঈশ্বর আছেন

জ্যোতিজী বললেন : মানি। দেবতা বলে আমরা যাঁদের পূজা করি, শুনেছি তাঁরা সেই 'এক'-এরই অনেক রূপ। এর বেশি জানি না আমি।

সন্ন্যাসী খুসি হলেন না কিশোরের উত্তরে। বললেন, চেয়ে দেখো, তুমিই ঈশ্বর!

একটি অপার্থিব আশ্চর্য আলো এসে মিশে গেলো কিশোর জ্যোতিজীর সত্তায়। ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব আনন্দের স্রোতে ভেসে গেল একূল ওকূল। তারই মধ্যে ডুবে গেল এতকাল কিশোর যাকে 'আমি' বলে জান তো, 'সে'? নূতন আমির জন্ম হলো সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত জুড়ে। যেদিকে তাকায় কিশোর দেখে, 'সে'-ই যেন সব কিছু হয়ে আছে। দেখলেন এক 'আমি' জগতের সব 'আমি'-র মূলে। পশু-পক্ষী লতা-পাতা আর কিশোর জ্যোতি সব সেই এক 'আমি' থেকে উৎসারিত। নিজেকেই বালক সব বলে দেখতে পেল। আনন্দে ভরে গেল জীবনের পেয়ালা।

একটি বেড়াল এসেছিলো দুধ খেতে। জ্যোতিজী অনুভব করলো, 'আমিই বেড়াল।'

প্রথমে মনে হলো মাথার বিকার। বেড়ালটাকে ধরতে গিয়ে কিশোর দেখলো বেড়াল নেই। সে নিজেই বেড়াল। গোপীনাথের ভাষায় :

"তখন তাঁহার মনুষ্য দেহের সংস্কার কিয়ৎকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—মানবীয় দেহের সহিত জড়িত যাবতীয় ভাব তখন বিস্মরণের জন্য ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিড়াল দেহের বাসনা ও সংস্কার এবং প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তাঁহার ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছিল। অথবা সত্যসত্যই তিনি বিড়াল হইয়া গিয়াছিলেন...।"

এই অপূর্ব ভাব কেটে গিয়ে জ্যোতিজীর পূর্বভাব অর্থাৎ বারো বছরের একটি ছেলে এক সন্ন্যাসীর গান শুনতে এসেছেন সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে,—এই স্মৃতির তলায় 'আত্মদর্শন-'এর মুহূর্তটি মিলিয়ে গেল বুদ্বুদের মতোই। সন্ন্যাসীর মুখে স্বর্গীয় হাসি। 'ঈশ্বরদর্শন বলে একেই। ঈশ্বরদর্শন মানে আত্মদর্শন, সকল বস্তুর মধ্যেই নিজেকে দেখিতে পাওয়া অর্থাৎ আমিই সব, এই ভাবে সর্বত্র আত্মাকে দর্শন করা, ইহাই ঈশ্বর দর্শনের সোপান। 'আমি'কে বাদ দিয়া ঈশ্বর সত্তার কোন অস্তিত্ব নাই।'—জ্যোতিজীকে বললেন সেই সন্ন্যাসী। [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : মহাত্মা জ্যোতিজী : ১ম খণ্ড]

জ্যোতিজীকে আরেকদিন এই সন্ন্যাসীই বললেন : 'চল, আমার সঙ্গে চল।'

সুরু হয়ে গেল চলা। আকাশপথে সূক্ষ্মশরীরে সুরু হলো যাত্রা। স্থূল শরীর পরিত্যক্ত খোলসের মতো পড়ে রইলো মন্দিরে। মানবজীবনের মূলে পৌঁছাবার পথে স্মৃতিভ্রষ্ট পূর্বজন্মের অপূর্ব অপূর্ণ সাধনার তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছলেন জ্যোতিজী সন্ন্যাসীর সংগে। সেখানে যাত্রার বিরাম,—সে জায়গা হিমালয়ের গহন কোণ ও অভ্যন্তর, সেখানে মন্দিরে মা কালীর মূর্তি বিরাজিত। পার্বত্য গুহার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খুব ছোটো পাহাড়ী নদী। জনবহুল সভ্যতার ভয়ংকরী ব্যস্ততা থেকে অনেক দূরে নিঃশব্দ শান্ত সেই তপোবন জ্যোতিজীর স্মৃতিতে পূর্বজন্মের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে একেবারে মুখোমুখী এনে হাজির করলো জাদুকরের মতো। মরুভূমির শুকনো বুক সরে গিয়ে দেখা দিলো যেন অপূর্ব কোন আশ্চর্য সরোবর।

সেই সরোবরের স্বচ্ছ দর্পণে জ্যোতিজী স্পষ্ট তাঁর পূর্ব জীবনের প্রতিচ্ছবি জাগতে দেখলেন। বিস্মৃতির নদীতল থেকে উঠে এলো স্মৃতির একটুকরো চর। জ্যোতিজীর মনে পড়ল সব। তাঁর সংগে এই জায়গার সম্পর্ক কি? এই সন্ন্যাসী কে। সাধনার অবস্থায় পূর্বজন্মে এক সন্ন্যাসীর প্রতি অসদ্ব্যবহারের অপরাধে তাঁকে ফিরে জন্ম নিতে হয় লোকালয়ে। এবং তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যেই আহত সন্ন্যাসীও সংগে সংগে নেমে এসেছেন লোকালয়ে। কালী মন্দিরের এই সন্ন্যাসীই যে সেই সন্ন্যাসী তা বুঝতে পারলেন জ্যোতিজী,—যাঁর প্রতি তিনি অন্যায় করেছিলেন একদা তাঁরই দয়ায়।

ভূতপূর্ব জীবনের অভূতপূর্ব দর্শন সাংগ হলে কালী মন্দিরে ফেলে যাওয়া স্থূল শরীরে ফিরে এলেন জ্যোতিজী। সন্ন্যাসী এর বাইরে তাঁর আর কোনও পরিচয় দিলেন না, বললেন : 'আমি যেখানেই থাকি তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখন তোমার প্রয়োজন হবে তখনই আমার দর্শন পাইবে।'

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের কথায় জ্যোতিজীকে তাঁর পূর্বজীবনের সংগী, এ জীবনের সহায় সেই সন্ন্যাসী কোনও মুদ্রা বা মন্ত্র কিংবা কোনও যোগক্রিয়া দিয়ে যাননি। যাবার আগে শুধু বলেছিলেন : "সত্যের অন্বেষণ কর, নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন কর, নিজে দ্রষ্টা হইয়া অবস্থান করিবার জন্য চেষ্টা কর, এবং প্রকৃত

পরিব্রাজকের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া এই বিরাট বিশ্বরচনার সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার চেষ্টা কর। তোমার যোগাভ্যাসের প্রয়োজন হইবে না, যে কোন সময় তুমি দেহ হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা করিবে, আমাকে স্মরণ করিলেই আমার শক্তি তোমার মধ্যে কার্য করিবে [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ১ম খণ্ড : মহাত্মা জ্যোতিজী]।

১৫-১৬ বছর বয়সে জ্যোতিজীর সন্ন্যাসজীবন যাপনের বাসনা দুর্নিবার হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যেই তাঁর সূক্ষ্মশরীরে লোক-লোকান্তর ভ্রমণের অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু জ্যোতিজী নিজে এতে তৃপ্তি লাভ করেন নি। ক্ষণিক আত্মদর্শনের সেই সৌভাগ্যকে চিরস্থায়ী করবার সাধনাই তাঁর স্থূলদেহের সাধ হয়ে উঠলো। সাধের সংগে সাধ্যের দুর্লভ সাক্ষাতের মুহূর্তটির জন্তে তাঁর অপেক্ষা আর ধৈর্য মানতে চায় না। মনের এই অবস্থায় তাঁর ধারণা হলো ভগবানকে দেখাই যদি মানব জীবনের সব হয়, আর সব হয় শুধু শব, তবে শব দিয়েই এই সব পেতে হবে। সন্ন্যাসজীবন যাপন না করলে বাসনা কি করে সোনা হবে তাঁর ?

মৌলবীবাজার থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে এক বন্ধুকে জানালেন সন্ন্যাস বাসনা। বন্ধুটি তাঁকে বললো : 'আমি প্রথমে তারকেশ্বরে যাইব।···আমি সেখানে পৌঁছিয়া পত্র দ্বারা তোমাকে সংবাদ দিব এবং তুমি আমার পত্র পাওয়া মাত্র বাড়ী হইতে রওনা হইবে ও তারকেশ্বরে আমার সহিত দেখা করিবে।'

সেই বহু প্রতীক্ষিত পত্র এলো জ্যোতিজীর জীবনে। তিনি বাড়ি ছেড়ে এই প্রথম বিরাট শহর কলকাতার দিকে পা বাড়ালেন একা। সংগে হরিণের একটি চামড়া, একখানি ভগবদগীতা। হাওড়া ষ্টেশানে তিনি বিপন্ন হয়ে পড়েন। তবুও শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন তারকেশ্বরে। সেখানে গিয়ে শুনলেন বন্ধুটির যে ঠিকানায় থাকার কথা সে ঠিকানায় বন্ধুটি নেই। জ্যোতিজী সেই সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় সম্পূর্ণ নিঃসংগ অবস্থায় ঈশ্বরের পায়ে আত্মসমর্পণ করলেন। করতে বাধ্য হলেন তিনি বিপদে উত্তীর্ণ হতে, ভগবানের পদেই ভরসা করতে। একজন পাণ্ডা ভগবদ্ করুণার উপলক্ষ্য হলো। তারকেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছে জ্যোতিজী লিংগমূর্তির বদলে দেখলেন বেনারসী শাড়ি পরা এক মহিলা ; তার অদূরে শিবের ছায়ামূর্তি। এই চিন্ময় ভগবতী মূর্তি দর্শনের কোন মূল্য দেন নি মহাত্মা জ্যোতিজী পরবর্তী জীবনে। তিনি বলেছেন : 'সেখানে সাধকের ব্যক্তিত্ব থাকে না, যেখানে তাহার আমিত্ব বোধ অন্যের উপর নির্ভর করে, যেখানে বিবেক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, সেখানে বুঝিতে হইবে ইহা মনের ফাঁকি অথবা মস্তিষ্কের বিকার।' [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ১ম খণ্ড : মহাত্মা জ্যোতিজী]

তারকেশ্বরে তিনি মহাপুরুষ প্রদত্ত শক্তিতে বুঝলেন বন্ধুটি ত্রিবেণীতে। জ্যোতিজীও ত্রিবেণীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে জানলেন তাঁর বন্ধু সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প ত্যাগ করে কলকাতায় চলে গেছেন। জ্যোতিজী আবার নিরাশ্রয় নির্বান্ধব অবস্থায় দু'পয়সার মুড়ি খেয়ে ওইখানেই একটি খাটিয়া ভাড়া করে দু'রাত কাটালেন। তৃতীয় রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বে লাল রংএর শাড়ি পরা এক মহিলা, হাতে সোনার রেকাবি ও থালা, লাবণ্যময়ী মূর্তিতে দেখা দিলেন। সমস্ত অন্ধকার দিব্য তীব্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে যিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর দিকে তাকানো যায় না।

করুণা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁর জ্যোতিজীকে জিজ্ঞেস করলো : 'গঙ্গায় স্নান করবে না ?'

জ্যোতিজী বললেন : 'তিল, হরীতকী, ধূপ কোথায় পাবো ? এ না হলে তো গঙ্গাস্নান হয় না—'।

কথা শেষ হবার আগেই জ্যোতিজী দেখলেন সেই জ্যোতির্ময়ীর হাতে ধরা সোনার থালায় তিল, হরীতকী, ধূপ।

ভুবনমনোমোহিনী হাসিতে অপরূপা বললেন : তুমি এখানে কেন ? আমি সবার মধ্যেই তো আছি। জ্যোতিজীর কানে তখন একটি বীণার শব্দ বাজছিলো : মহিলা তাঁকে 'হাঁ' করতে বললেন। জ্যোতিজী হাঁ করতেই দেখলেন তাঁর মুখ ও কানের ভেতর দিয়ে উঠছে সেই শব্দ। মহিলা আবার বলেন : 'ওই শব্দের পেছনে আলো হয়ে আছি আমি। সেই আলোর পেছনে রয়েছি—সর্ব সাক্ষীরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে এই আমি।'

গংগা তীরবর্তী শ্মশানে গেলেন দু'জনে। সেখানে সেই 'আলো' আবার আশীর্বাদ করলো জ্যোতিজীকে : 'বাড়ি ফিরে যাও। তোমার বাড়িতে মন্দিরে থাকব আমি। তোমার দুঃখে তোমার গর্ভধারিণী মা উন্মাদপ্রায়—।'

জ্যোতিজী সেই মুহূর্তে ত্রিবেণীতে বসেই দেখতে পেলেন তাঁর মাকে। বললেন : 'আমি কাশী যাব'।

উত্তর হলো : কাশীতে কি পাবি ? কত লোক তো কাশী গেলো,—কিছু পেলো তারা ? [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ১ম খণ্ড : মহাত্মা জ্যোতিজী]।

'কাশীতে কি পাবি' ? সত্যিই, কাশীতে গেলেও কিছু পাওয়া যাবে না। কাশীতে মরলেও মিলবে না বৈকুণ্ঠ। গংগায় ডুব দিলেই হবে না পাপমোচন। দুর্লভ তিথিতেও হলেও গংগায় অতিথি, হবে না তুমি মুক্ত। কারণ তুমি কি চাও তারই ওপর নির্ভর করে তুমি কি পাও তার হিসাব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঈশ্বর অন্বেষণে কাশী কাঞ্চী গোদাবরী করেননি। নিজের মা-কে ভালোবেসেছিলেন। দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণের চেয়ে যিনি বড়, সেবা করেছিলেন তাঁকে। বিধবার দুঃখে মান-সম্মান-অর্থ-সামর্থ্য কিছুরই করেন নি খেয়াল। সমস্ত দিনের দুঃখধান্দার পর, একাদশীর অকৃপায় ন'বছরের বিধবা, বিয়ে যে কি তাই বোঝে না, সারাদিন এক ফোঁটা জল মুখে না দিয়ে বাপের জন্তে চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়র আয়োজন করে যে হাসিমুখে তার কান্না যার বুকে বেজেছে ঈশ্বর তার কাছে নিজে থেকে এসেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর। বলেছিলেন, সাগরে এসে পড়লাম।

কাসিতে মারা যাবে যে তার মুক্তি নেই। কাশীতে মারা যাবে তার আছে। কাশী কেবল উত্তর ভারতের একটি প্রদেশ নয়। কাশী সকলের দেশ। বিশ্বের যত অনাথ যতক্ষণ পর্যন্ত অভুক্ত থাকছে ততক্ষণ পর্যন্ত যার ভোগ থাকছে অসম্পূর্ণ,—কাশী সেই বিশ্বনাথের বাসভূমি।

সেই কাশীকে প্রত্যক্ষ কর বিশ্বের যতেক অনাথের মুখে অন্ন দেবার সেবার মধ্যে ; তারই মধ্যে কর অন্নপূর্ণার অন্নরিক্ত স্বামী বিশ্বনাথকে পূজা।

এ পূজাই যিনি কেবল গ্রহণ করেন তিনিই শিব। যে লোকে এ পূজা সম্পন্ন হয় তাই শিবলোক।

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বর্ণশিল্পীর অকাল যবনিকা

"মানুষের সমাজ-ব্যবস্থার বজ্জাতিই মানুষকে উপবাসে, দারিদ্র্যে ও বেকারির দিকে ঠেলিয়া দেয়। একজই সুনীল কর্মকারের মত অনেক হতভাগাকে বিষপানে আত্মহত্যা করিতে হয়। কিন্তু সমাজে যদি এত বৈষম্য না থাকিত, যদি প্রত্যেকটি মানুষ অর্থনৈতিক সুবিচারের অংশীদার হইতে পারিত, তবে, সুনীলের জীবনেও স্বর্ণশিল্পের সৌন্দর্য্য বিকশিত হইত। এই জীবন ফুলের মত ফুটিয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু না, সুনীলের দলকে বিষপান করিতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে আরেক দলের বাবুয়ানা টিকে না! কিন্তু এমন কি কেহ নাই, যিনি বিষপানের বদলে বিষজর্জ্জর এই সমাজের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন? ভারতের কল্যাণ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা যদি তা ঘটাইতে পারে তবেই তাহা সার্থক হইবে।"

—দৈনিক বসুমতী।

অতঃ কিম্

"পররাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অবশ্য চীন-ভারত-বিরোধ এবং চৈনিক কম্যুনিষ্ট আক্রমণ সম্পর্কে। পিকিংয়ের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রনায়করা কলম্বো-প্রস্তাব কার্যত পুরাপুরি অগ্রাহ্য করিয়াছেন; এক তরফা যুদ্ধবিরতির ঠাটটাও যে-কোন সময়ে খসিয়া পড়িতে পারে সে-রকম হুমকিও তাঁহারা দিতেছেন। কাজেই সকলেরই এক প্রশ্ন, "অতঃ কিম্?"—ইহার পর কী হইবে? প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, ভারতের উপর অন্যায় আক্রমণ চালাইবার জন্য কম্যুনিষ্ট চীনই "কোণঠাসা" হইয়া পড়িয়াছে, বিশ্বজনমতের বিচারে নিন্দিত অপদস্থ হইয়াছে। চৈনিক কম্যুনিষ্টদের জঙ্গী মনোভাব এবং যুদ্ধ চালাইবার জন্য তোড়জোড় দেখিয়া কিন্তু মনে হয় না তাহাদের মতিগতি ও মতলবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হইয়াছে। মস্কো এবং পিকিংয়ের মধ্যে যে মতান্তর চলিতেছে তাহার ফলাফলের উপর খুব বেশী ভরসা করাও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা হইতে পারে না। মস্কো এবং পিকিংয়ে যাহাই ঘটুক না কেন, চৈনিক কম্যুনিষ্ট আক্রমণের সহিত মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবনিষ্ঠ ভিত্তিতে পরিচালিত করিতে হইবে।"

—আনন্দবাজার।

ডাকবিভাগের দুর্নীতি

"ডাক ও তার বিভাগে ১৯৬১-৬২ সালে তহবিল তছরুপের ফলে ১২.১১ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। মোট ১৩৩২টি ঘটনার মধ্যে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৩১২টি ঘটনার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। উহাতে ক্ষতির পরিমাণ ২.৭৭ লক্ষ টাকা। ডাক বিভাগের কর্মনৈপুণ্য, বিশ্বস্ততা ও শৃঙ্খলা ছিল এককালে আদর্শস্থানীয়। এখন সেকালের পরিবর্তন হইয়াছে এবং ডাক বিভাগেও তহবিল তছরুপ, প্রতারণা ইত্যাদির সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। শুধু ডাক বিভাগের নহে, যে কোন বিভাগেই নৈতিক মনের এই অধোগতি উদ্বেগের বিষয় হইয়া আছে। প্রতারণা দুর্নীতির ব্যাপারে তদন্ত হয়, বিভাগীয় কিংবা আদালতের শাস্তির ব্যবস্থা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, দুর্নীতি অনাচারের সংখ্যা হ্রাস না পাইয়া ক্রমাগত বাড়িতেই থাকে। কি বিচিত্র এই দেশ!"
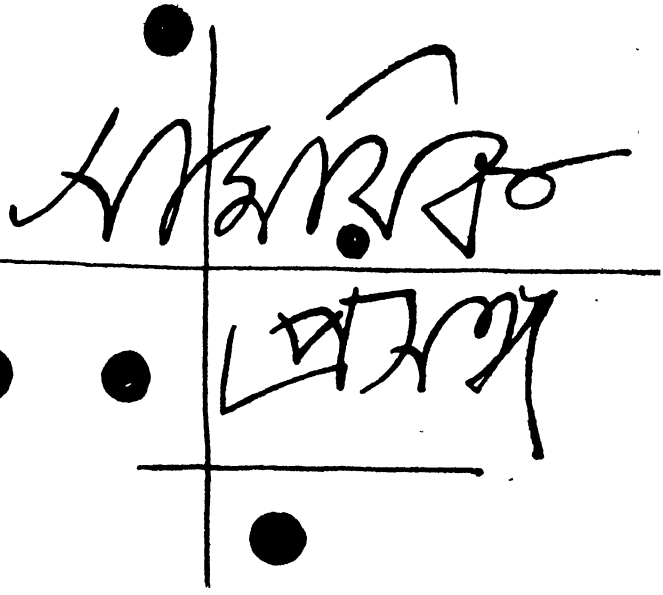
—যুগান্তর।

পৌরকীর্তি : কেবল ফাঁকি

"সমগ্র ভারতে অর্থাভাবের রেওয়াজ চলিতেছে। কলিকাতার পুর-সংস্থায়ও তাই চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের কথা ঘোষিত হয় বৎসরের পর বৎসর। অধিকাংশ পুর-প্রতিনিধি দীর্ঘকাল স্বপদে বহাল আছেন। ভালভাবে যাচাই করিলে দেখা যাইবে, তাঁহারা বাজেট-বক্তৃতায় একই অভিজ্ঞতা ঝালাইয়া আসিতেছেন। উষ্মার গুণে তাঁহারা করদাতাদের মন ভিজাইতে চেষ্টা করেন। তবে ফলাফল লইয়া কেহ দুশ্চিন্তার ধার ধারেন কি না সন্দেহ। পুর-প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক হিসাব তৈয়ারী হয় না। খাতাপত্রের জমাখরচ আপ-টু-ডেট করার জন্য নাকি বিপুল চেষ্টা চলিতেছে। পুরাতনের তাড়াহুড়ায় নূতন হিসাব নিঃসন্দেহে বকেয়া হইয়া দাঁড়াইবে। পুর-প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য আদায় করিতে পারে না। উহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফাঁকির আবহাওয়া। কর বাকী পড়ে, তামাদি হয়। ট্রামওয়ে কোম্পানী এবং ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের দেয় টাকা ভদ্রলোকের এক কথায় পর্যবসিত। জাহাজে জল-সরবরাহের প্রাপ্য বৃদ্ধি পায় না। সিনেমা থিয়েটারের সমস্ত ঝামেলা পোহাইয়া, রাস্তা-ঘাটের মেরামত-খরচ যোগাইয়া পুর-প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় সংগৃহীত প্রমোদ-করে হাত দিতে পারে না ও মোটরযান-করের ন্যায্য অংশ পায় না অথচ, রাজ্যের শাসক-সম্প্রদায় এবং পৌরক্ষমতাধীশেরা সকলেই একদলভুক্ত।"

—লোকসেবক।

পাকিস্তান—পূর্ব বনাম পশ্চিম

"গত ১৭ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় পল্টন ময়দানে ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্টের উদ্যোগে আহূত এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভায় বর্তমান আয়ুবশাহী সংবিধানকে (যাহাকে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ মৌলিক

ডেমোক্রেসী বলেন) গণতন্ত্র বিরোধী বলিয়া আখ্যাত করা হয় এবং পূর্ণ বয়স্কের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্রসম্মত সংবিধান দাবী করা হয়। শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁকে একটি খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ দিয়া বলেন— তাঁহার এই বর্ত্তমান সংবিধান পাকিস্তানের জনমত সমর্থন করেন না, তাহা যাচাই করিতে একটি গণভোট গৃহীত হউক। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর সংবিধানের পক্ষে যদি শতকরা দশজনও ভোট দেয়; তাহা হইলে তাঁহারা (শেখ মুজিবর রহমন প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃবর্গ) আর কখনো গণতন্ত্রসম্মত সংবিধানের কথা বলিবেন না, আয়ুব খানের সংবিধানই মানিয়া লইবেন। কাশ্মীরের বেলায় গণভোটের একান্ত বিশ্বাসী ও দাবীদার প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ শেখ মুজিবর রহমানের এই চ্যালেঞ্জ স্বীকার করিয়া স্বগৃহে গণভোটের প্রতি আস্থা প্রমাণ করিবার সুযোগ গ্রহণ করুন। বিশেষ করিয়া শতকরা মাত্র দশটি ভোটের ব্যাপার।" —জনসেবক।

আয়ুব খানের বিবৃতির প্রতিবাদ

"সেদিন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে মুসলীম লীগ সদস্য মহম্মদ ইসমাইল আয়ুব খানের এই উক্তিটির উল্লেখ করে যথার্থই বলেছেন যে, এই উক্তি আন্তর্জাতিক ভদ্রতা ও সৌজন্যের বিরোধী। মহম্মদ ইসমাইলকে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। কারণ আজ যদি ভারতের কোন সরকারী নেতা বলেন যে, সীমান্ত গান্ধী খান, আবদুল গফুর খান বা বেলুচ গান্ধী খান, আবদুল সামাদ খান অথবা রাজা গজনফর আলী বা শহীদ সুরাবর্দি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন, তবে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খুব ভাল হ'তো এবং চীনের সঙ্গে পাকিস্তান চুক্তি করতো না তা হলে আয়ুব খান ও পাকিস্তানের লোকেরা কি ভাবে ঐ উক্তি গ্রহণ করতেন বা হজম করতেন? কূটনৈতিক প্রতিবাদের কি ঝড় বয়ে যেতো না? বাড়িয়ে কি পাকিস্তান প্রচার করতো না যে, ভারতের নেতারা পাকিস্তানের জনসাধারণকে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন? আসলে এ ধরণের উক্তি ঐ তাৎপর্যই বহন করে। ঐ তাৎপর্য বহন করে বলেই কোন রাষ্ট্র প্রধান অন্য রাষ্ট্রের পরিচালকদের সম্বন্ধে ঐ ধরণের কথা বলেন না। আমরা যদি ধরে নিই যে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু একটা অপদার্থ লোক ও তাঁকে দিয়ে ভারতের কোন কাজ হবে না, তা হ'লেও এই উক্তি বরদাস্ত করা যায় না। কারণ আয়ুব খান সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের বুদ্ধি, বিবেচনা ও নেতা নির্বাচনের রীতির উপর কটাক্ষ করেছেন। তাঁর এই কটাক্ষকে বিনা উত্তরে যেতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ এটা কেবল প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর অপমান নয়, এটা জাতি হিসাবে ভারতের প্রতিটি মানুষের অপমান।"

—জনতা (কলিকাতা)

বাজেট না বিভীষিকা ?

"দিনের পর দিন মানুষের আয়ের পরিমাণের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণের হার এত ঊর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিতেছে, যে জন্য মানুষ আজ বাজেটের নাম শুনিলে যেন কেমন নিরাশ হইয়া পড়ে। নিদারুণ করভারে জর্জরিত হইয়া আজ ভারতের জনগণ তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেন কেমন একরূপ হতাশ হইয়া উঠিতেছে। প্রতি বৎসর অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় তাহাদের সম্মুখে এক উজ্জ্বল ও রঙীন ভবিষ্যতের কথা ফলাও করিয়া প্রচার করা হয় বটে কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাহার একবিন্দুও উজ্জ্বলতা বা রঙীনতা প্রকাশ পায় না। বরং তাহাদের অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে। এই হিসাবেই ভারতের জনগণ বাজেটকে আর প্রসন্নভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। নিত্য নূতনভাবে কর ধার্য্য করিয়া জনসাধারণের পকেট হইতে অর্থ টানিয়া লইয়া তাহাদের আর্থিক দুর্গতির একশেষ হইতেছে। কেন্দ্র কিংবা রাজ্যের বর্ত্তমানে ঘাটতি বাজেট এক প্রকার যেন স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনার নাম দিয়া কোটি কোটি টাকা তোলা হইতেছে বটে কিন্তু বিনিময়ে যাহা কার্য্য হয় তাহা জলে ফেলা কার্য্যের মতই এক প্রকার জনসাধারণ ধরিয়া লইতেছে। যে পরিমাণ অর্থ এই সমস্ত কর ধার্য্যের বিষয়ে সরকারের তহবিলে আসে সেই পরিমাণ উপযোগিতা জনসাধারণের চক্ষে ধরা পড়ে না। তাই এই কর ধার্য্যের প্রস্তাবকে জনসাধারণ আদৌ ভাল চক্ষে দেখতে পারে না। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী কেরোসিন, সাবান, ডাকস্ট্যাম্প ইত্যাদির উপর নূতন ভাবে কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এইরূপ কর ধার্য্যের ফলে বাড়তি টাকা উঠিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণের উপর ইহার কি প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা একবার কর্ণধারগণ স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এই সমস্ত করের বোঝা কি ভাবে বহন করিতে পারিবেন তাহাই হইল বিষম চিন্তার বিষয়। কর বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না সাধারণ মানুষের তাহা বহন করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। কারণ ভারতবর্ষের মানুষের জন্যই ত' ভারতবর্ষের বাজেটে ভারতবাসী ভারতবর্ষের উন্নতি চাহে ইহাতে কোনও দ্বিমত নাই কিংবা ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হউক ইহা প্রত্যেক ভারতবাসীর কাম্য। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষকে মানুষের মত বাঁচিতে দিয়া তাহার উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে রূপ দিতে হইবে। নতুবা কে এই প্রকল্পের ফল ভোগ করিবে। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে সাংসারিক অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর উপর করবৃদ্ধিকে কোনরূপে যুক্তিযুক্ত বলা যায় না। বিলাসদ্রব্য বা আয় ইত্যাদির উপর করবৃদ্ধির যৌক্তিকতা থাকিলেও অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীগুলিকে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা উচিত নতুবা সাধারণ মানুষ ইহাতে বিপর্য্যস্ত হইবে সন্দেহ নাই।"

—জনমত (ঘাটাল)।

বাঙ্গালী ঘরমুখো হও

"যাহারা সামর্থ্যের অভাবে,—সুযোগের অভাবে বা ছিন্ন পুরুষের ভিটে মাটির মায়ায়,—কিংবা হিন্দুস্থানে আসিয়া অনাহারে মরিবার ভয়ে—পাকিস্তান—তথা পূর্ববঙ্গে রহিয়া গেল—তাহাদের কি হইল! বাঁচিল কি মরিল,—কি সুখে সম্পদে পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিল—তাহা ভাবিবার বাঙালীর সময় নাই। কারণ সে এখন আত্ম সমালোচনায় মত্ত। রাজনীতির আলেয়ার পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে 'মসগুল' অথবা বিশ্বমানবতাবাদের বুলি আওড়াইতে ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বমানবের গান গাহিয়াছেন। তবে তিনি প্রথম বঙ্গ জননীর গান আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর বর্ত্তমান বঙ্গ জননীর বেশীর ভাগ শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা মস্কো, নিউইয়র্ক, লণ্ডনের গান গাহিতে ভাল বাসেন। কেহ কেহ আবার 'ইণ্ডিয়া ইনং প্যারিস'

এর গল্পে আসর মাৎ করেন ! তাহা না হইলে জাতে উঠা যাইবে না। সাধনা বিফল হইবে। সংকীর্ণ মনের বদনাম কুড়াইতে হইবে। সুতরাং জাতে উঠিতে হইলে মানবতার পূজা করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে। বিশ্বজনীন গান গাহিতে হইবে। কলিকাতার অর্দ্ধেক বিক্রয় হইয়া গেলেও—তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কেননা,—মানুষ মরণশীল, জাতিও মানুষের সমষ্টি—অতএব জাতি মরণশীল—এই নতুন যুক্তি দেখাইতেছে কি না জানা গেল না। কালিয়াং— শিলিগুড়ি—জলপাইগুড়ি হইতে ক্রমে বাঙ্গালী হঠিতে আরম্ভ করিয়াছে —তাহাতে তাহার কিছু যায় আসে না ? বাংলার গর্ব্ব—দার্জ্জিলিং এর লোক বাংলা বলিতে ভুলুক—তাহাতেও কিছু ক্ষতি নাই। বাংলার আরও খানিকটা অংশ উপহার রূপে কাহাকেও প্রদত্ত হইলেও ক্ষতি কী ? আমি ত' শ্রেষ্ঠ সন্তান—মরণশীল মানুষ 'এক বিশ্ব এক জাতির' কল্পনা করিতেছি !"

—মনোদূত (বেলঘরিয়া)

ত্রিপুরার কম্যুনিষ্ট

"আমার কথা, কম্যুনিষ্ট সম্পর্কে জনসাধারণ ক্রমশঃই সচেতন হইতেছে। ত্রিপুরার তথা সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে এই পার্টির অস্তিত্ব বুছিয়া যাইতে হইবে। চীনের ভারত আক্রমণের পর কম্যুনিষ্ট পার্টি হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছে। ভারতের সহিত এই পার্টির কোন সংশ্রব নাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি দেশদ্রোহী দলকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে সরকারী আইনেরও কোন প্রয়োজন পড়ে না, যদি জনসাধারণ নিজেই আগাইয়া আসে। কম্যুনিষ্টরা দাবী করে ত্রিপুরা নাকি কম্যুনিষ্টদের একটা প্রধান ঘাঁটি। কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখোস খুলিয়া পড়ার পর এই ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রমাণ দিতে হইবে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি নাগরিক ভারতবাসী। ঐক্য ও সংহতি এবং মনোবল অক্ষুন্ন রাখিয়া ভারতকে পররাজ্য লিপ্সুদের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে কোন সৎ নাগরিক এমন একটি সর্ব্বনাশা দলকে সমর্থন করিতে পারে না।"

—সেবক (আগরতলা)

সাবধান

"আমার বন্ধু ভবিষ্যতে আমার শত্রু হইতে পারে এরূপ কাল্পনিক দ্বিধা সঙ্কোচ ও ভয়কে অন্তরে স্থান দেওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত কিছুই নয়। কোন দুর্ব্বল ভীরু দ্বিধাগ্রস্ত অপরিণামদর্শী অবাস্তববাদী কি বলিবে বা কি মনে করিবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কিছুই নাই। দেশ আমাদের। দেশের জন্ম আমাদের বংশধরগণকে প্রাণ দিতে হইবে। আমাদিগকে রক্ত দিতে অর্থ দিতে শ্রম দিতে ও কষ্ট বরণ করিতে হইবে। সুতরাং আমাদিগকে বাস্তব পথ বাছিয়া লইয়া রণক্ষেত্রে শক্তি অর্জ্জনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি আমরা এ সত্য উপলব্ধি করিতে পারি তবেই আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করার কথা বলা ও প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজ করা সার্থক। মনে রাখিতে হইবে চীনের অতি সামান্ত আঘাতে আমরা যে কত অপ্রস্তুত কত অবাস্তববাদী কত দুর্ব্বল তাহা ধরা পড়িয়াছে সুতরাং এই আঘাতকে আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া আমাদের সব ত্রুটি সব দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।"

—বীরভূম বাণী।

খাগড়াঘাট রোড ষ্টেশনে অব্যবস্থা

"ভাগীরথীর পূর্ব পারে বহরমপুর কোর্ট রেল ষ্টেশনের ন্যায় পশ্চিম পারে খাগড়া ঘাট রোড রেল ষ্টেশন যাত্রী ও মাল চলাচলে কর্মচঞ্চল। উভয় ষ্টেশনেই দৈনিক আয় এক হাজার টাকার কম নয়। খাগড়াঘাটে দিবাকালে টিকিট বিভাগের জন্ত একটি কর্মচারী ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে প্রত্যহ তিনখানি আপ ও দুইখানি ডাউন যাত্রীগাড়ি (শনিবারের অতিরিক্তি গাড়ী ছাড়া) সামলাইবার জন্ত ঐরূপ কর্মচারী নাই। যদিও বহরমপুরে আছে, কেবল সহকারী ষ্টেশনমাষ্টারকে একাই টিকিট সরবরাহ ও যাত্রী আসিলে ব্রেকের মাল পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি করিতে হয়। বিনা টিকিটে যাত্রী বাহির হইয়া গেলে তাহা ধরিবার কোন উপায় নাই এবং গাড়ী প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমান থাকাকালীন কোন টিকিট বিক্রয়ের লোক না থাকায় অনেকে বিনা টিকিটেই গাড়ী চাপিয়া বসেন—এইভাবে দৈনিক কয়েক ঘণ্টাতেই ঐ ষ্টেশনে অন্তত ৫০।৬০ টাকা সরকারের লোকসান। এই অবাঞ্ছিত অবস্থার আশু প্রতিকারের জন্ত বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ১টা পর্যন্ত কাজের জন্ত একটি কর্মচারী নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ঐ ষ্টেশনে টাউন টেলিফোনের সংযোগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ একান্ত প্রয়োজনীয়।"

—জনমত (মুর্শিদাবাদ)।

পথ দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে

এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না, যে দিনটিতে একটি প্রাণও জি, টি, রোডের বুকে বলি প্রদত্ত না হয়। আসানসোল হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত জি, টি, রোডের বুকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫টি মোটর দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটিয়া থাকে জনবহুল শহর এলাকার মধ্যে। আসানসোল শহরে গত সপ্তাহের মধ্যে ১২টি মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং এই দুর্ঘটনায় একটি শিশু-প্রাণ বলি হইয়াছে। এই মোটর দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমরা বহু বার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু এই সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ কোন কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করেন নাই। দিনের পর দিন এই শহরের জি, টি রোড এলাকাটি জনাকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ভীড়নিয়ন্ত্রণ বা মোটর যান নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষ করেন নাই। প্রায় প্রতি সময়েই যাত্রী বোঝাই বাসগুলি জি, টি রোডের মধ্যে দাঁড় করাইয়া যাত্রী তুলিয়া লয়। এইভাবে জি, টি রোডের মধ্যে বাস দাঁড় করাইবার ফলে অনেক সময় অত্যধিক পরিমাণে অজস্র গাড়ীর গতি থামিয়া গিয়া সাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মাল বোঝাই লরীগুলিকে জি, টি, রোডের মধ্যে যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া মাল খালাস করিতে দেখা যায়। বাজার এলাকায় প্রাইভেট গাড়ী ও বে-আইনী ট্যাক্সীগুলি এমন ভাবে পার্ক করিয়া থাকে যাহার ফলে সাধারণের পথ চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এই সমস্ত গাড়ীর মালিকরা কখনও চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, তাহার সুবিধার জন্ত সাধারণকে কতখানি কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। আমরা মনে করি আসানসোলের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং যাহার ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

—আসানসোল ট্রিবিউন।

শান্তি ও শৃঙ্খলা

"আভ্যন্তরিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে প্রশাসনিক দায়িত্ব কঠোর ভাবেই পালন করিতে হইবে। আমাদের সরকার যদি এখনও তাহা উপলব্ধি করিতে না পারেন, তবে তাহা দেশে চরম বিপর্যয় ডাকিয়া আনিতে পারে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। কাছাড় জেলায় যাহা এখন ঘটিতেছে তাহাতে আমাদের মতে আদালতের বিচারের জন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দুষ্কৃতকারীদের গ্রামে অবিলম্বে পিউনিটিভ ট্যাক্স বা দমনমূলক যৌথ জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দণ্ড যেখানে অনিবার্য সেখানে তোষণ নীতিতে দেশের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতে পারে এই সত্য উপলব্ধি করার সময় আসিয়াছে। শাসনদণ্ড যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের মানসিক দুর্বলতা পরিহার করিয়া জাতি ও দেশের স্বার্থে ইতস্তত না করিয়া তৎপরতার সহিতই কঠোর সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। আমরা আশা করি প্রশাসকগণ অবিলম্বে এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান ঘটাইবেন।" —জনশক্তি (শিলচর)

শ্রীসঞ্জীবায়ার প্রতি

"নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীডি, সঞ্জীবায়া জলপাইগুড়ি আসিলেন। চীন কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত জেলা জলপাইগুড়ি দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শাসকদলের প্রধান আজ স্বচক্ষে দেখিলেন প্রতিরক্ষার অবস্থা কি? তিনি কি জানিতে পারিয়াছেন গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তের জন্ত আজও সকল সমর্থ মানুষের জন্ত সামরিক শিক্ষার অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কিছুই আজও করা হয় নাই। তিনি কি জানিয়াছেন বহু সৎ ও উৎসাহী যুবককে সিভিল ডিফেন্সেও গ্রহণ করা হয় নাই। শ্রীসঞ্জীবায়া যদি জানিয়া থাকেন যে এই সীমান্তের এক মাত্র যোগাযোগের রেলপথ বর্ষায় বিপজ্জনক থাকে; তবে তিনি কি তাঁহার দলের কাছে দ্বিতীয় যোগাযোগের ব্যবস্থার জন্ত সুপারিশ করিবেন। বহুদিনের প্রয়োজনীয় তিস্তার পুলের জন্ত তিনি কি তাঁহার দলের নেতৃবৃন্দের কাছে আর্জি পেশ করিবেন? জানি না তাঁহার এই উত্তর সীমান্তের জেলা সফর কি ফল প্রসব করিবে। তবে শ্রীসঞ্জীবায়ার কাছে এই কথা নিবেদন করিতে চাই যে আপনার নিকট আমরা সাধারণ মানুষ অনেক প্রত্যাশা করি। আপনার এই শুভাগমন সেই প্রত্যাশাকে পরিপূর্ণ করুক।"

—জনমত (জলপাইগুড়ি)।

গরীব কৃষকের হায়রাণি

"বর্দ্ধমান সদর থানার অধীন কুড়মুন গ্রামের গরীব ভাগচাষী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র লিখিতেছেন যে, দেবগ্রাম মৌজার ৩৭নং খতিয়ানভুক্ত ১৪০৬নং প্লটের অন্তর্ভুক্ত ডি-ভি-সি খালের উত্তরদিকের ২০ শতক পরিমাণ জমির মালিক তিনি। ঐ ২০ শতকের মধ্যে ১৬ শতক ডি-ভি-সি কর্ত্তৃপক্ষ নোটিশমতে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ একই প্লটের খালের দক্ষিণ তীরের ২২ শতক জমির মালিক শ্রীসরোজিনী দাসীকে এক বছর পূর্ব্বেই ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বহু আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও তিনি এ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণের টাকা পান নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, কোনরূপ তদন্ত না করিয়াই Special Land Acquisition Collector (D. V. P.) বর্দ্ধমান জানাইয়া দিয়াছেন যে ক্ষতিপূরণের টাকা ইতিপূর্ব্বেই উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কৃষক উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার চাহিয়াছেন।" —বর্দ্ধমানের ডাক।

কলিকাতার নিউ আলীপুর অঞ্চলে বাজারের সংলগ্ন কো-অপারেটিভ ষ্টোর্সের উদ্বোধন করছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন। শ্রীসেনের পার্শ্বে পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিপণিটিতে সাময়িক পত্র ও নানাবিষয়ক পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোকচিত্র—বসুমতী

ফুটবল খেলোয়াড়দের ছাড়পত্রে স্বাক্ষর পর্ব্ব শেষ

সেই স্মরণীয় দিন। যে দিনটার জন্য কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা চিরদিনই উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করেন। ১৫ই মার্চ। আই এফ, এ-র বিধি অনুসারে এইদিনই ফুটবল খেলোয়াড়দের ছাড়পত্রে স্বাক্ষরের শেষ দিন। প্রতি বছরই ১৫ই ফেব্রুয়ারী এই ছাড়পত্রে স্বাক্ষর পর্ব্বের উদ্বোধন হয়। এইদিনে যে …টকের সূত্রপাত হয় ১৫ই মার্চ তার যবনিকা পাত হয়? আই …ফ এ কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ এক মাস ধরে দোকান খুলে বসে থাকেন। আর …াব কর্তৃপক্ষরা রুই-কাতলা ধরার জন্য জাল পেতে অপেক্ষা করেন। …তিদিনই আই এফ এ অফিসে আনাগোনা হয়ে থাকে। যতই দিন …য় ততই নাটক জমে উঠে। শেষের দিকে দু'একটা অপ্রীতিকর …টনারও অভাব হয় না। এবার ৫৪৮ জন খেলোয়াড় পুরনো দিনের …রা কাটিয়ে নতুন দলে ভিড়ে পড়েছেন এখনও সকলেই লাভ-…াকসানের খতিয়ান নিয়ে আলোচনাতেই মসগুল হয়ে আছেন।

আমাদের দেশে ফুটবলে অপেশাদারীখেলার ছদ্মবেশে খেলোয়াড়দের মধ্যে যে পেশাদারী বৃত্তির সংক্রমণ হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—প্রতি বছর খেলোয়াড়দের দল পরিবর্ত্তনের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে। স্থানীয় ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আই এফ এ এই বিষয়ে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা আজও গ্রহণ করে নি। ফলে প্রতি বছরই ফুটবল খেলোয়াড় দলত্যাগীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পেশাদারী ফুটবল খেলার প্রবর্ত্তন হলে বলার কিছু নেই; কিন্তু অপেশাদারী খেলোয়াড়ের মুখোস পরে খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রতিবছরই যে ফাটকাবাজি চলে আসছে সেটা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

কিছুদিন আগে আই এফ এ-র কার্য্যকরী সমিতির জনৈক সভ্য প্রস্তাব এনেছিলেন যে, কোন খেলোয়াড় তিন বছরের আগে দল পরিবর্ত্তন করতে পারবেন না। বলাই বাহুল্য যে উক্ত প্রস্তাব পাশ হয় নি। অনুরূপ কোন আইন যদি আই এফ এ চালু করতে পারে—তাহলে হয়ত ছদ্মবেশী পেশাদারী প্রথার অবসান হতে পারে।

ভবানীপুর দলের গোলরক্ষক এস, পালিতকে মোহনবাগানের রাইট ইন্ যোগীন্দার সিং-এর নিকট হইতে একটি অব্যর্থ গোল রক্ষা করিতে দেখা যাইতেছে।

এবার খ্যাতনামা দলগুলির লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। এবার লাভের ঘরে বেশী জমা পড়েছে বি এন আর দলের। তারা অলিম্পিক খ্যাত বলরাম ও অরুণ ঘোষকে পেয়ে দলীয় শক্তি বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করেছে।

মোহনবাগান দলের অমিয় ব্যানার্জ্জী, বি চ্যাটার্জ্জী, সনৎ শেঠ, আর, গুহ ও সুভাশীষ গুহ দলত্যাগ করেছেন। ইষ্টবেঙ্গলের সুনীল নন্দী, মহমেডান দলের অলিম্পিক খ্যাত গোলরক্ষক থঙ্গরাজ, রহমৎউল্লা মোহনবাগান দলে যোগ দিয়েছেন। তা ছাড়া হায়দ্রাবাদের হাকিম ও পাঞ্জাবের হরবেগ সিং এবার তাদের পক্ষে খেলবেন বলে জানা গিয়াছে।

ইষ্টবেঙ্গল দলের লাভের চেয়ে ক্ষতির মাত্রাই অধিক। অরুণ ঘোষ ও বলরামের অভাব দলের পক্ষে অপূরণীয়। তারা অবশ্য ঈর্ষ্ট টেলিগ্রাফের কমল সরকার, চন্দন ব্যানার্জ্জী। মোহনবাগানের অমিয় ব্যানার্জ্জী, ও বিমু চ্যাটার্জ্জী এবং এরিয়ানের এ, মৌলিক ও দলভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। বাইরের কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়েরও তাদের দলভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মহমেডান দল তাদের প্রাক্তন খেলোয়াড় শেখ আলিকে ফিরিয়ে পেয়েছেন। তা ছাড়া তারা বাইরের কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের কয়েকজন নাম করা খেলোয়াড়ের তাদের হয়ে খেলার সম্ভাবনা আছে। এই প্রচেষ্টার সাফল্যের উপর তাদের দলীয় শক্তি নির্ভর করছে। প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের অন্যান্য দলগুলি জুনিয়ার খেলোয়াড়দের নিয়ে শক্তিবৃদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করবে। ফুটবল মরশুমকে স্বাগত জানিয়ে এইখানেই বক্তব্য শেষ করা যাক।

ক্রিকেট ইতিহাসে বোম্বাইয়ের নূতন অধ্যায় রচনা

ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে বোম্বাই-এর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাদের ক্রিকেট খেলার অবদানের কথা সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে ভারতের অবিস্মরণীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজি সিংজীর স্মৃতি রক্ষার জন্য রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন হয়। এর মধ্যে বোম্বাই ১৫ বার ফাইন্যালে খেলে ১৪ বার জয়ী হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এবার বোম্বাই তাদের গৌরবময় ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। কারণ এবার তারা উপর্য্যুপরি পাঁচবার রঞ্জী ক্রিকেট কাপ বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে।

বোম্বাই এবারকার রঞ্জী ক্রিকেট [illegible]

রামচাঁদ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা হইতে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

১১ রাণে রাজস্থানকে পরাজিত করে। রাজস্থান উপর্য্যুপরি তিন বার বোম্বাইয়ের সম্মুখীন হয়ে পরাজয় বরণ করেছে।

এই খেলায় বোম্বাইয়ের চৌকস খেলোয়াড় বাপু নাদকার্ণি, রামকান্ত দেশাই ও জি· এস· রামচাঁদের প্রশংসনীয় ব্যাটিং বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নাদকার্ণি ২১১ রাণ ও দেশাই ১০৭ রাণ করে আউট হলেও রামচাঁদ ১০২ রাণ করে অপরাজিত থাকেন। রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে রাজস্থানের বিরুদ্ধে রামচাঁদের ইহা উপর্য্যুপরি তৃতীয় সেঞ্চুরী। আর নাদকার্ণির জীবনের তৃতীয় ডাবল সেঞ্চুরী। ১৯৬০-৬১ সালে এই রাজস্থানের বিরুদ্ধেই নাদকার্ণি ২৮৩ রাণ করে অপরাজিত ছিলেন। এই বছর তিনি মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৫১ রাণের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

ভারতে শিক্ষাদানের জন্য আগত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খ্যাতনামা ফাষ্ট বোলার চার্লি গ্রৈফিথ বোম্বাই দলের হয়ে খেলে মারাত্মক বোলিং করেন। তিনি মাত্র ৩৬ রাণে ৬টি উইকেট পেয়ে বোলিং-এ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

রাজস্থান দলের ব্যাটিং-এ মাঞ্জরেকার, কে· গুপ্তা ও হনুমন্ত সিং দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় ইনিংসে মাঞ্জরেকার অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করে ১৭৩ রাণ করেন। রাজস্থান প্রথম ইনিংসে বিশেষ সুবিধে করতে না পারলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের ব্যাটিং-এ অপূর্ব্ব দৃঢ়তা দেখা যায়।

রাণ সংখ্যা

বোম্বাই—১ম ইনিংস (৬ উইঃ) ৫৫১ (বাপু নাদকার্ণি ২১১, রমাকান্ত দেশাই ১০৭, জি· রামচাঁদ নট আউট ১০২, পলি উম্রীগড় ৬৩, ভি· পরাঞ্জপে ২৬ ; সুন্দরম ৭৩ রাণে ৩ উইঃ)।

রাজস্থান—১ম ইনিংস ১১৬ (কে· গুপ্তা ৬৪, হনুমন্ত সিং ৬২ ; সি· গ্রৈফিথ ৩৬ রাণে ৬ উইঃ ও বাপু নাদকার্ণি ৩২ রাণে ২ উইঃ)।

রাজস্থান—২য় ইনিংস ৩৩৬ (বিজয় মাঞ্জরেকার ১০৮, কে, গুপ্তা ৮০, জি· সুন্দরম ৫২, হনুমন্ত সিং ৫০ ; সি· গ্রৈফিথ ৮৫ রাণে ৩ উইঃ, জি· রামচাঁদ ৩৫ রাণে ২ উইঃ, বাপু নাদকার্ণি ৬০ রাণে ২ উইঃ)।

ট্রুম্যানের বিশ্ব রেকর্ড

টেষ্ট খেলার ইতিহাসে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান, সর্ব্বাধিক সংখ্যক উইকেট (২৫০) পাইয়া রেকর্ড স্থাপন করেন এর আগে ইংলণ্ডের অপর ফাষ্ট বোলার জে, বি, ষ্ট্যাথাম ২৪২টি উইকেট পেয়ে রেকর্ড করেছিলেন। ট্রুম্যান সম্প্রতি নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে মোট ৯টি উইকেট পেয়ে তাঁর বিশ্ব রেকর্ড পূর্ণ করেন।

ইনামুর রহমান

টেষ্ট পর্য্যায়ে খেলায় মাত্র ছয়জন বোলার এ পর্য্যন্ত দু'শতের অধিক উইকেট পেয়েছেন। নিম্নে ছয়জন বোলারের টেষ্ট উইকেটের খতিয়ান প্রদত্ত হ'লো :—

নাম	টেষ্ট	রাণ	উইঃ	গড়
এফ ট্রুম্যান (ইংলণ্ড)				
জে, বি, ষ্টেথাম (ইংলণ্ড)	৬৭	৫৮৬৫	২৪২	২৪'২৫
এ, বেডসার (ইংলণ্ড)	৫১	৫৮৭৬	২৩৬	২৪'৮৯
আর, বেনড (অষ্ট্রেলিয়া)	৫১	৬২৫৫	২৩৬	২৬'৩০
আর, লিণ্ডওয়াল (অষ্ট্রেলিয়া)	৬১	৫২৫৭	২২৮	২৩'০৫
সি, গ্রিমেট (অষ্ট্রেলিয়া)	৩৭	৫২৩১	২১৬	২৪'২১

এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার এইচ জেটেফিল্ড ৩৭টি টেষ্টে ১৭০ উইঃ, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কে, টি রামাধিন ৪৩টি টেষ্টে ১৫৮ উইঃ, ভারতের ভিনু মানকড় ৪৪টি টেষ্টে ১৬২ উইঃ এবং পাকিস্তানের ফজল মামুদ ৩৪টি টেষ্টে ১৩৯ উইকেট পেয়েছেন।

ট্রুম্যানের এই সাফল্য অভিনন্দনযোগ্য।

অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে সকলেরই যোগদানের সুযোগ থাকিবে

১৯৬৮ সালের অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের অধিকার সম্পর্কে সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এক নির্দেশ জারি করেছেন। উক্ত নির্দ্দেশে বলা হয়েছে যে প্রতিটি দেশের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের অধিকার থাকবে।

যে সকল দেশ আগামী অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনার জন্য আবেদন করেছেন—আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক কমিটি সেই সকল দেশের নিকট লিখিত পত্রে জানিয়ে দিয়েছেন যে অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের অধিকার লাভের জন্য সেই সকল দেশকে এই বছর ১লা অক্টোবরের মধ্যে নিজ নিজ সরকারের নিকট থেকে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি পত্র পাঠিয়ে দিতে হবে যে অলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদানের জন্য সকল অনুমোদিত ক্রীড়া প্রতিনিধি দল সংশ্লিষ্ট দেশে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পারবে। নির্দ্ধারিত তারিখের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক কমিটির হস্তগত না হলে আগামী অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশের আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে না। নিম্নে আগামী অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে সকল দেশ আবেদন করেছেন তার নাম দেওয়া হ'লো :—

গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক ক্রীড়া—বুয়েনস আয়ার্স, ডেট্রয়েট (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র) লিয় (ফ্রান্স) ও মেক্সিকো সিটি।

শীতকালীন অলিম্পিক ক্রীড়া—গ্রেনোবল (ফ্রান্স), লাহটি (ফিনল্যাণ্ড), লেক প্লেসড (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র) ও ক্যানগারি (কানাডা)।

আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সাম্প্রতিক নির্দ্দেশ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

জাকার্ত্তায় এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের দুঃখজনক পরিস্থিতির আর যাতে পুনরনুষ্ঠিত না হয়—সেই দিকে দৃষ্টি দিয়েই আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক এই নির্দ্দেশ জারি করেছেন—সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা করা যায় যে, সকল দেশ এই বিষয়ে অলিম্পিক কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

পরলোকে মহম্মদ নিসার

সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন টেষ্ট খেলোয়াড় ও ফাষ্ট বোলার মহম্মদ নিসার অকস্মাৎ হৃদরোগে মারা গেছেন। তিনি পাকিস্তানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে ভারতের প্রতিটি ক্রীড়ামোদী দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর খেলোয়াড়

কমল ভট্টাচার্য্য

জীবনের প্রতিষ্ঠা এই ভারতের মাটিতে। তিনি একজন উঁচুদরের ফাষ্ট বোলার ছিলেন। বিশ্বের ক্রিকেট আসরেও তাঁর সমাদর ছিল। অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের মতে তখনকার খ্যাতনামা ফাষ্ট বোলার ইংলণ্ডের হ্যারোল্ড লারুড অপেক্ষাও নিসারের প্রথম কয়েক ওভার বলের গতি অধিকতর তীব্র ছিল।

নিসারের খেলোয়াড় জীবন সত্যই গৌরবময়। তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ছয়টি টেষ্ট খেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালে তিনি ইংলণ্ড সফর করেছেন। নিসার ছয়টি টেষ্টে যোগদান করে ২৫টি উইকেট পেয়েছেন। তাঁর বোলিং-এর গড়পড়তা থাকে ২৪´২৮। আগেকার দিনে কোয়াড্রাঙ্গুলার ও পেটাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। নিসার ছিলেন মুসলিম দলের অন্যতম স্তম্ভ।

১৯৩২ সালে তাঁর খেলোয়াড় জীবনের গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হয়। এই বছর তিনি ভারতীয় দলের হয়ে ইংলণ্ড সফর করেন। তাঁর সরকারী টেষ্ট খেলার প্রথম সুযোগ হয়। লর্ডস মাঠে তাঁর বোলিং সম্পর্কে ইংরাজ সাংবাদিকরা যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তিনি ইংলণ্ডের ক্রীড়ামোদীর কাছে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ান। এই ইংলণ্ড সফরে নিসার ৯৭টি উইকেট পেয়েছিলেন। তাঁর বোলিং-এর গড়পড়তা থাকে ১৪´০০।

এর পরের অধ্যায় আরও গৌরবময়। ১৯৩৩—৩৪ সালে ডগলাস জার্ডিনের এম সি সি দল ভারত সফরে আসে। সমগ্র সফরে তাঁরা মাত্র একটা খেলায় পরাজিত হয়েছিল। আর সেই খেলায় নিসারের অবদান ছিল সর্বাধিক। এই খেলাটি বারাণসীতে। বিজয়নগরের মহারাজার দলের হয়ে খেলে তিনি মোট ১১৭ রাণে ৯টি উইকেট পেয়েছিলেন।

কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের স্মৃতিপটেও তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর আজও ম্লান হয়ে যায় নি। ১৯৩৫—৩৬ সালে ইডেন উদ্যানে জ্যাক রাইডারের অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে বে-সরকারী টেষ্টে নিসার মারাত্মক বোলিং আজও কেউ ভোলেন নি। তিনি ৩৫ রাণে ৬টি উইকেট পেয়েছিলেন। এই বছরই তিনি মাদ্রাজের টেষ্টে মোট ৯৭ রাণে ১১টি উইকেট পেয়েছিলেন। এর পর আসে শেষের অধ্যায়। ১৯৩৭—৩৮ সালে নিসার কলকাতার ইডেন উদ্যানে লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে ৭৯ রাণে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিলেন।

বহু কৃতিত্বের অধিকারী নিসারের খেলোয়াড় জীবনের ইতিবৃত্তের শেষ হবে না। তাই এইরূপ কীর্তিমান খেলোয়াড়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি।

১৯৬২ সালের অর্জ্জুন পুরস্কার

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও ভারতের সেরা খেলোয়াড়দের সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে ভারত সরকার ১৯৬২ সালের জন্য নয় জন মহিলা ও পুরুষ স্পোর্টসম্যানকে "অর্জ্জুন" পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ফুটবলে কলকাতার জনপ্রিয় খেলোয়াড় বলরাম এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তবে ভারতের নয় জন ক্রীড়াবিদই অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। নিয়ে এই সম্মানে ভূষিত স্পোর্টসম্যানদের নাম দেওয়া হ'লো:—(১) তারলোক সিং (এ্যাথলেটিকস) (২) উইলসন জোন্স (বিলিয়ার্ডস) (৩) মিস্ মীনা শা (ব্যাডমিণ্টন) (৪) পদম বাহাদুর মল (মল্লযুদ্ধ) (৫) টি বলরাম (ফুটবল) (৬) নরেশ কুমার (লন টেনিস) (৭) নৃপজিৎ সিং (ভলিবল) (৮) লক্ষীকান্ত দাশ (ভারোত্তোলন) (৯) মালওয়া (কুস্তি)।

নিখিল ভারত এ্যাথলেটিক স্পোর্টস

দিল্লীর নর্দান ষ্টেডিয়ামে সর্বপ্রথম নিখিল ভারত এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দুইদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়দিনে সার্ভিসের বালকৃষ্ণ ম্যারাথন দৌড়ে নূতন এশীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ২ ঘণ্টা ৩১ মিনিট ৪৭·৪ সেকেণ্ডে নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করেন। এই বিষয়ে পূর্ব্বে এল· সি· হনের (কোরিয়া) ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ৫৫ সে: রেকর্ড ছিল। ২৫ বৎসর বয়স্ক বালকৃষ্ণ এই সর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়াই বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জনে সমর্থ হন।

২০০ মিটার দৌড়ে মহীশূরের কে· এল· পাওয়েল ২১·৬ সেকেণ্ডে নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করিয়া এশীয় রেকর্ড স্পর্শ করেন। ইহা ব্যতীত মহারাষ্ট্রের দীনশা ইরানী এবং পুলিসের গুরুবচন সিং বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইরানী ডিসকাস ও সটপাটে উভয় বিষয়েই প্রথম স্থান লাভ করেন এবং সটপাটে জাতীয় রেকর্ড ম্লান করেন। গুরুবচন প্রথম দিন হাইজ্যাম্প ও লংজ্যাম্পে এবং দ্বিতীয় দিনে ১১০ মিটার হার্ডলসে প্রথম স্থান লাভ করেন।

রূপ রচনায় অপরাজেয়
AFGHAN SNOW
AFGHAN SNOW
আফগান স্নো
সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক প্রসাধন
ই, এস, পাটানওয়ালা, বম্বে—৭৭ (ভারতবর্ষ)

সিরিয়ায় নাসেরপন্থী অভ্যুত্থান—

ইরাকে নাসেরপন্থীরা প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই সিরিয়াতেও নাসেরপন্থীরা ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। গত ৮ই মার্চ্চ তরুণ সামরিক কর্মচারীদের বিদ্রোহে সিরিয়ার খালিদ এল্ আজেম মন্ত্রিমণ্ডলের পতন হইয়াছে; শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়াছেন বা-দিস্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির নাসেরপন্থীরা, প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন সালে বিতার। ১৯৫৬ সালে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইস্রাইল যখন সুয়েজ আক্রমণ করে, তখন সিরিয়া ও মিশর একত্রে সে আক্রমণ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার পর সঙ্গত কারণেই ১৯৫৮ সালে সিরিয়া ও মিশর পরস্পরের সহিত যুক্ত হয় এবং গঠিত হয় সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র বা ইউনিয়ন অব আরব রিপাবলিক। স্বভাবতঃ মিশরে প্রবর্ত্তিত ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা, শিল্প নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্র বিরোধী ব্যবস্থা—সবই ধীরে ধীরে সিরিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। ইহাতে অসন্তোষ দেখা দেয় এক দিকে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে এবং অন্য দিকে কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য বামপন্থীদের মধ্যেও। এই অসন্তোষের ফলে ১৯৬১ সালে সিরিয়ায় দক্ষিণপন্থীদের অভ্যুত্থান ঘটে, যাহা সমর্থন করে উগ্র বামপন্থীরা। এই অভ্যুত্থানে মিশরের সহিত সিরিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই বিচ্ছেদে প্রেসিডেণ্ট নাসের ক্ষুব্ধ হইলেও জোর করিয়া সিরিয়াকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। এই সংযমে আরব জগতে তাঁহার মর্য্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল কারণ ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নাসের আরব ঐক্যের পক্ষপাতী হইলেও আরব জাতির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত একতাই তাঁহার কাম্য। যাহা হউক, সিরিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও ১৯৫৮ সালের রাষ্ট্রীয় নামকরণ পরিবর্ত্তিত হয় না—সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র নামেই মিশর পরিচিত হইতে থাকে। মিশর-সিরিয়া সংযুক্তি দিবস, তথা সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিবস এখনও পালিত হয়। এদিকে সিরিয়া প্রতিক্রিয়াপন্থী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নাসেরের প্রবর্ত্তিত সংস্কারমূলক ব্যবস্থাগুলির অবসানে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা অসন্তুষ্ট হয়, জর্ডানের সহিত শাসকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠতা তাহারা অপছন্দ করে। ক্রমবর্দ্ধমান এই বিক্ষোভ ১৯৬২ সালে মার্চ্চ মাসে বিদ্রোহের আকার ধারণ করে এবং তৎকালীন জোরালচি গভর্ণমেণ্টের পতন ঘটে। এই সময় নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন মধ্যপন্থী মিঃ খালিদ এল্ আজেম। গত ৮ই মার্চ্চের সামরিক অভ্যুত্থানের পর ইনি দামাস্কাসে তুর্কি দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ইরাকে সামরিক বিপ্লব হইবার পর সেখানকার একটি প্রতিনিধিমণ্ডল মিশর-সিরিয়া সংযুক্তি দিবসের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য কায়রোয় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমক্ষে এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করিবার সময় প্রেসিডেণ্ট নাসের বলেন, "...U. A. R. no longer believed in the unity of ranks"; all that it wanted was the unity of objectives. If the liberated Arab Governments would only co-ordinate their policies, that would be enough to rally people throughout the Arab world and sweep out the reactionary monarchs, feudalists and capitalists. অর্থাৎ, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র আর একই আদর্শে অনুপ্রাণিতদের ঐক্যে বিশ্বাসী নহে—সে শুধু উদ্দেশ্যের ঐক্য চাহে। মুক্ত আরব গভর্ণমেণ্টগুলি যদি তাহাদের সমন্বয় সাধনে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই সমগ্র আরব জগতে জনগণ সন্নিবিষ্ট হইবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল নৃপতি সামন্ততন্ত্রী ও পুঁজিবাদীদের উচ্ছেদ ঘটাইবে। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের এই উক্তি হইতে মনে হইয়াছিল যে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের সংযুক্তি সাধন করিয়া বিপুল আরব ফেডারেশন গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা নাসের পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে, ইরাকে ও সিরিয়ায় তাঁহার অনুরক্তরা ক্ষমতা লাভ করিবার পর আবার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী চলিবার আয়োজন হইতেছে। গত ১৫ই মার্চ্চ সিরিয়ার নূতন প্রধান মন্ত্রী সালে বিতার ঘোষণা করিয়াছেন যে, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, সিরিয়া ও ইরাককে লইয়া ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট গঠনের একটি খসড়া চুক্তি অনুমোদনের জন্য ঐ তিনটি রাষ্ট্রে গণভোট গৃহীত হইবে। ইতিমধ্যে ঐ তিনটি রাষ্ট্রের ঐক্যের ভিত্তি রচনার জন্য ইরাক ও সিরিয়ার প্রতিনিধিমণ্ডল কায়রোয় আসিয়াছেন। ইয়েমেন ও আল্জেরিয়া যাহাতে এই 'সংহতিমূলক ব্যবস্থায়' অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে যে আরব জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে, উহার ধারা এখন পর্য্যন্ত প্রগতিশীল। উহা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততান্ত্রিকতা-বিরোধী এবং কতক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় সোস্যালিজমের অনুবর্ত্তী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে মধ্যপ্রাচ্যে দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীকে ও সামন্ততান্ত্রিক নৃপতিবৃন্দকে আশ্রয় করিয়া পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদ তাহার তৈল-স্বার্থ ও সামরিক স্বার্থ রক্ষা করিতেছিল। ইহাদের ক্ষমতালোলুপতায়, পারস্পরিক বিরোধে এবং মধ্যে মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হুমকিতে ও তোষণে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এখানে নিরাপদ ছিল। জাগ্রত আরব সাম্রাজ্যবাদ স্বভাবতঃ বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে চাহিল এবং সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় অনুচরদের বিরুদ্ধেও রুখিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সংগ্রামের প্রথম সাফল্য ১৯৫২ সালে মিশরে; তাহার পর ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেন পর্য্যন্ত এই সাফল্য বিস্তৃত হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকার ফরাসী ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তিউনিস ও মরক্কোর মুক্তিসংগ্রাম এবং আলজেরিয়ার দীর্ঘতম ও প্রকাণ্ডতম মুক্তিযুদ্ধ আরব জাগরণেরই

পরোক্ষ ফল। দেশীয় ও বিদেশীয় প্রতিক্রিয়া শক্তির কবল হইতে মুক্ত আরব রাষ্ট্রগুলি স্বভাবত: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল শিবিরকে শক্তিশালী করিয়াছে, শান্তি-প্রচেষ্টার সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদের কতকগুলি বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য আছে; প্রথমতঃ, ইহার রূপ সাম্প্রদায়িক—রাজনৈতিক গণতন্ত্র বা অর্থনৈতিক সাম্যবাদ ইহার লক্ষ্য নহে, গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ আবার গৌরবোজ্জ্বল করিয়া তোলাই আরব নেতাদের উদ্দেশ্য। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—আরব জাতীয়তাবাদ ইহুদী-বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ, সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা আরব জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজিতেছে—জাতীয় আরব আন্দোলন গণ-ভিত্তিক নহে। তৃতীয়তঃ, সাফল্যজনক সামরিক বিপ্লবের পর কোথাও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। এই সব লক্ষণ উপেক্ষনীয় নহে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মুক্তিকামী প্রগতিশীল ভাব ধারা বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের মধ্যেই প্রথম প্রবেশ করে। ক্রমে উহার অনুপ্রবেশ ঘটে সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জনগণের মধ্যে। এই জনগণকে ভিত্তি করিয়া যদি মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা হইলেই সে আন্দোলনের সাফল্যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা সৃষ্ট হইতে পারে। পক্ষান্তরে, যে আন্দোলন মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং যাহার প্রতি জনগণের সমর্থন আদায় করা হয় সাম্প্রদায়িকতার বা জাত্যাভিমানের শ্লোগান শুনাইয়া, সে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক হইয়া ওঠা সম্ভব। নাৎসী নেতারা জার্মাণ জাতিকে নর্ডিক কৌলীন্যের কথা শুনাইয়াছিলেন; ইহুদী বিদ্বেষ তাঁহারা প্রবলভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, যাহার ফল ক্রমে বীভৎস আকার ধারণ করে। আরব জাতীয়তাবাদের মুক্তি আন্দোলন যদি ক্রমে গণ-ভিত্তি লাভ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে পূর্ণ গণতন্ত্রের এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে সাম্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহা ফ্যাসিস্ত রূপ লওয়া অসম্ভব নহে, তবে এই আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ও সামন্ততান্ত্রিকতা-বিরোধিতার যে আদর্শ রহিয়াছে, তাহা হয়ত ইহার নৈতিক মেরুদণ্ডকে সোজা রাখিবে।
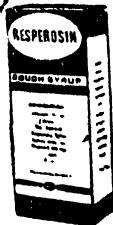
সোভিয়েট-চীন বিরোধ—

সোভিয়েট রুশিয়া ও চীনের তত্ত্বগত বিরোধের অবসানের জন্য গত ২১শে ফেব্রুয়ারী মস্কো হইতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবে পিকিং কর্তৃপক্ষ সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে চীনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলির তাঁহারা উত্তর দিতে চান। ইহার পর ২৭শে ফেব্রুয়ারী পিকিং-এর 'পিপলস ডেলী' পত্রিকায় তিন হাজার শব্দ সম্বলিত এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; শিরোনামা—"বিরোধ কোথা হইতে?" পরে "রেড ফ্লাগ" পত্রিকায় এক লক্ষ সত্তর হাজার শব্দ সম্বলিত আর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। প্রথম প্রবন্ধটি ফরাসী কম্যুনিষ্ট নেতা মরিস্ থোরেকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধেই উহাতে বিষোদ্গার করা হয়। অবশ্য, 'পিপলস ডেলীর' প্রবন্ধের যে মর্ম আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কথা বলা যায় যে, প্রবন্ধটির সুর আক্রমণাত্মক হইলেও উহাতে সোভিয়েট নীতিকে কতকটা যুক্তির সহিত আক্রমণের চেষ্টা হয়। উহার দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে: They reduced peaceful co-existence to merely ideological struggle and economic competition and thus abandoned international class-struggle. They spread the illusion that general disarmament will make it possible for Western countries to give increased economic help to the under-developed countries and thus forsook the basic Leninist principle that the nature of imperialism is always to plunder the people. They negated the difference between jnst and unjust wars by saying that any war in modern conditions can turn into a world-war.

There erroneous ideas would be tantamount to believing that the nature of imperialism has changed, that its internal contradictions have been eliminated, that Marxism, Leninism has become outmoded....

অর্থাৎ তাহারা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ব্যাপারটিকে আদর্শগত সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পরিণত করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রাম বর্জ্জন করিয়াছে। তাহারা এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে যে, বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ হইলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি অনুন্নত দেশসমূহকে অধিকতর অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে পারিবে; এইভাবে তাহারা লেনিনের এই মূলনীতি বর্জ্জন করিয়াছে যে, জনগণকে লুণ্ঠন করাই সাম্রাজ্যবাদের চিরন্তন প্রকৃতি। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে কোনও যুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে—এই কথা বলিয়া তাহারা সঙ্গত যুদ্ধ ও অসঙ্গত যুদ্ধের পার্থক্য অস্বীকার করিয়াছে।···এই সব ভ্রান্ত ধারণা এই বিশ্বাসেরই সমতুল যে, সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বদলাইয়াছে, ইহার আভ্যন্তরীণ বিরোধের অবসান হইয়াছে, মার্ক্স লেনিনবাদ সেকেলে হইয়া গিয়াছে। 'পিপ্‌ল্‌স্ ডেলী'র প্রবন্ধে এই ধরণের দীর্ঘ সমালোচনার পর বলা হইয়াছে—"তাহাদেরই ভুল সংশোধনের প্রয়োজন, চীনের নহে; যাহারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।" যুগোস্লোভিয়াকে যে কিছুতেই জাতে তোলা হইবে না, ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, 'পিপলস্ ডেলী'র মতে ১৯৫৯ সালে ক্যাম্প ডোভডে ক্রুশ্চেভ-আইসেনহাওয়ার আলোচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে সোভিয়েটের এক সরকারী বিবৃতিতে ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধকে 'বেদনাদায়ক' বলাতেই নাকি সোভিয়েট-চীন বিরোধের সূত্রপাত। একটি সোস্যালিষ্ট দেশের পক্ষে অন্ত একটি সোস্যালিষ্ট দেশের আচরণ অন্ধের মত সমর্থন না করাতেই নাকি মার্ক্সীয় মহাভারত অশুদ্ধ হয়। "রেড ফ্লাগের" প্রবন্ধে যুক্তি অপেক্ষা গালিগালাজই বেশী। প্রবীণ ইতালীয় কম্যুনিষ্ট নেতা তোগলিয়াত্তির উদ্দেশ্যে লিখিত এই প্রবন্ধে সোভিয়েট নীতির সমর্থক ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে আক্রমণ করা হয়। মার্ক্স লেনিনবাদের বিশুদ্ধ চৈনিক ভাষ্য শুনিয়া তাহারা না কি ভয় পাইয়া গিয়াছে—cowardly as mice, they are scared to death (ইঁদুরের মত ভীরুর দল ভয়ে মরিতেছে)। The modern revisionists, Togliatti and his like, are trying to abolish Marxism Leninism at one stroke, liquidate the liberation struggles of the oppressed people and nations and save imperialism and the reactionaries of various countries from their doom. অর্থাৎ, তোগলিয়াত্তি এবং তাঁহার মত আধুনিক শোষণবাদীরা এক কলমের খোঁচায় মার্কসবাদ-লেলিনবাদের অবসান ঘটাইতে চাহিতেছে, নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি-সংগ্রাম উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদিগকে চূড়ান্ত ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

এই সব উগ্র প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর গত ৯ই মার্চ চৈনিক কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে ক্রুশ্চেভকে মীমাংসার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। ক্রুশ্চেভ ও শীর্ষস্থানীয় সোভিয়েট নেতারা যদি পিকিং-এ আসিতে না পারেন, তাহা হইলে চৈনিক নেতৃবৃন্দ মস্কোয় যাইতে পারেন। কিন্তু 'পিপলস্ ডেলী' ও 'রেড ফ্লাগের' প্রবন্ধে দুইটি দেশের বিরোধের যে রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মারাত্মক; এই প্রবল মূলগত বিরোধের কোনও মীমাংসা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। রুশ কম্যুনিষ্ট ও চৈনিক কম্যুনিষ্ট উভয়েই মার্ক্স ও লেনিনের নীতির অনুবর্ত্তী বলিয়া দাবী করিলেও দুই পক্ষের বিরোধ অত্যন্ত গভীর এবং মূলগত। সোভিয়েট ইউনিয়নের ধারণা—পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পর আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির সনাতন চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ অচ্ছেদ্য হইলেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এখন সহজে যুদ্ধ বাধাইতে সাহসী হইবে না।

ইহার প্রথম কারণ—যুদ্ধের দ্বারা কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে আর সিদ্ধ হইতে পারে না তাহা আজ সুস্পষ্ট; যুদ্ধে দুই পক্ষেরই পারমাণবিক বিপর্য্যয় অনিবার্য্য। দ্বিতীয়তঃ সোশ্যালিষ্ট শিবির শক্তিশালী হওয়ায় যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে এবং তাহাদের নিজ নিজ দেশে যুদ্ধের বিরোধী জনমত শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় জগতে কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মিঃ ক্রুশ্চেভ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা বলেন এবং কম্যুনিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া এবং অনুন্নত দেশগুলির উন্নতিতে সহায়তা করিয়া আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিজমের নৈতিক বিজয় অর্জ্জনের উপদেশ দেন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ হইতে মুক্ত দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়া তাহাদিগকে পুঁজিবাদী শিবিরের বাহিরে রাখিবার এবং এই শিবিরের প্রভাবাধীন দেশগুলিকে অর্থনৈতিক বন্ধন ছিন্ন করিতে সাহায্য করিবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁহার যুক্তি

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ যদি না বাধে এবং পুঁজিবাদী শিবিরের অর্থ নৈতিক প্রতিপত্তির ক্ষেত্র যদি সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে থাকে, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদ তাহার আভ্যন্তরীণ বিরোধেই ধ্বংসের দিকে যাইবে।

ক্রুশ্চেভ তথা সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং বহু ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিও এই নীতির বিরুদ্ধে চৈনিক নেতৃবৃন্দের প্রবল আপত্তি। তাঁহারা বলেন—ক্রুশ্চেভ পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়ে ব্যক্তিগত ভাবে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেছেন এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে শক্তিহীন করিতেছেন; যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক প্রাক পারমাণবিক যুগে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা নিবারণের জন্য চৈনিক নেতারা সোসালিষ্ট শিবিরের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে সর্ব্বতোভাবে শক্তিশালী করিবার পক্ষপাতী। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সহিত শান্তির আলোচনাকে পণ্ডশ্রম এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে সোস্যালিষ্ট শিবিরের অর্থ নৈতিক সাহায্যদান উহার শক্তির অন্যায় অপব্যবহার বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

বস্তুতঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষের অন্যতম অভিযোগ এই যে, চীনকে দুর্ব্বল রাখিয়া সে ভারতকে সাহায্য দিতেছে, ও ভারত সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের প্রচ্ছন্ন অনুচর (?)। বস্তুতঃ ভারত তথা সমস্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্বন্ধে চীনের ধারণা—ইহারা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেরই প্রচ্ছন্ন সঙ্গী—সোস্যালিষ্ট শিবিরের সহিত সাম্রাজ্যবাদীদের চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষায় ইহাদের স্থান সোস্যালিষ্ট বিরোধী শিবিরে। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের চিন্তায় তাহাদের অনুসৃত নীতিতে এবং চৈনিক কম্যুনিষ্টদের চিন্তা ও নীতিতে এই যে পার্থক্য উহা দূর হইবার কোনও সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। চৈনিক কম্যুনিষ্ট নেতারাও দুই পক্ষে মীমাংসার সম্ভাবনায় বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না। তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ণেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহারা অভ্রান্ত—ভুল সংশোধনের কোনও প্রয়োজন তাঁহাদের নাই; যুগোশ্লোভিয়াকে কিছুতেই জাতিতে তোলা হইবে না, ইহাও তাঁহারা শুনাইয়াছেন।

পাক-চীন সীমান্ত-চুক্তি—

গত ৩রা মার্চ্চ পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জুলফিকার আলি ভুট্টো পিকিং-এ যাইয়া পাক্-চীন সীমান্ত-চুক্তির—বরং বলা উচিত কাশ্মীর-চীন সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া আসিয়াছেন। ১৯৪৭ সালে ইংরাজ চলিয়া যাইবার পর ভারতীয় উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা যখন থিতায় নাই, তখন অকস্মাৎ সশস্ত্র আক্রমণ চালাইয়া পাকিস্থান কাশ্মীরের উত্তরাংশে ত্রিশ হাজার বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সুযোগে সে গত পনর বৎসর বিনা উপদ্রবে কাশ্মীরে টিকিয়া রহিয়াছে। অন্যায় ভাবে অধিকৃত এই ভারতীয় এলেকার দুই হাজার বর্গমাইল স্থান চীনকে উপঢৌকন দিয়া পাক নেতৃবৃন্দ পাক-চীন সীমান্ত-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে সাড়ে তিন হাজার বর্গমাইল স্থান সম্পর্কে পাকিস্থান ও চীনের বিপরীত দাবী ছিল।

ইহার মধ্যে দেড় হাজার বর্গমাইলের কিছু কম (যাহার সাতশত

বর্গমাইল এখনও চীনের দখলে) পাকিস্থানে যাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে ; অবশিষ্ট দুই হাজার বর্গমাইলের অধিক স্থান চীনের কবলিত হইবে। স্বভাবতঃ ভারতীয় এলেকা সম্পর্কে চীনের সহিত এই অন্যায় চুক্তির বিরুদ্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে অভিযোগও উত্থাপন করিয়াছেন। প্রথমতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, সমগ্র কাশ্মীরের উপর ন্যায়সঙ্গত সার্ব্বভৌমত্ব যে ভারতেরই, ইহা রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ; কাশ্মীরে গণ-ভোট গ্রহণ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে পাকিস্থানকে সেখান হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে—এই অভিমত রাষ্ট্রসঙ্ঘে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

গত ১৯৬১ সালে প্রথম পাক-চীন সীমান্ত চুক্তির কথা ওঠে ; কিন্তু বিষয়টি এত দিন চাপা ছিল। সম্প্রতি চীন এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়। এই চুক্তি হইবার পূর্ব্বে—গত ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্থানের সহিত চীনের বাণিজ্য চুক্তিও হইয়াছে পাকিস্থানের সহিত ঘনিষ্ঠতার জন্য চীনের আগ্রহাতিশয্যের কারণ সহজবোধ্য। পাকিস্থান যে আধা সামন্ততান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র এবং কম্যুনিষ্ট বিরোধী (চীন-বিরোধীও) সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত, তাহাতে কোনও গুরুত্ব না দিয়া ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক প্রয়োজনে চীন এই চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী হইয়াছিল। এই চুক্তিতে চীনের ত্রিবিধ সুবিধা হইল—প্রথমতঃ ব্রহ্মদেশ ও নেপালের সহিত সীমান্ত-বিরোধ মিটাইবার পর পাকিস্থানের সহিত মীমাংসা হওয়াতে সে তাহার আপোষকামী মনোভাব ও সঙ্গত দাবীর কথা এখন আরও উচ্চকণ্ঠে জাহির করিতে পারিবে। ভারতের সহিত বিরোধে ইহা তাহার মস্ত বড় কূটনৈতিক লাভ। দ্বিতীয়তঃ, এই সীমান্ত চুক্তির ফলে পাকিস্থানের সহিত চীনের ঘনিষ্ঠতা যে ভাবে বৰ্দ্ধিত হইল, তাহাতে ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য পাক-ভারত মিলিত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গঠিত হইবার কোনও সম্ভাবনাই আর রহিল না। চীন এখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া ভারতের বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী সশস্ত্র আক্রমণের কথা চিন্তা করিতে পারিবে। সে আক্রমণের সময় পাকিস্থানের মিত্র চীনের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের এক অংশের সক্রিয় সহযোগিতা ভারত সরকারের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে বলিয়া চৈনিক নেতারা সঙ্গত ভাবেই মনে করিয়া থাকিবেন। তৃতীয়তঃ, চীনের মতলব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, প্রকৃত পক্ষে পশ্চিম অঞ্চলেই চীন প্রচার করিতেছে : এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরোক্ষ কারণেই পূর্ব্ব সীমান্তে চাপ সৃষ্টি করিয়াছিল। পাক নেতাদের "উদারতায়" চীন তাহার আকাঙ্ক্ষিত পশ্চিম অঞ্চলের দুই হাজার বর্গমাইল স্থান উপঢৌকন পাইল।

পাকিস্থানের মনোভাব দুর্ব্বোধ্য ; আরও দুর্ব্বোধ্য তাহার পাশ্চাত্ত্য মিত্রদের মনোভাব। পাক-চীন সীমান্ত চুক্তির কথা প্রথম ঘোষিত হয় গত ডিসেম্বর মাসে রাওলপিণ্ডিতে কাশ্মীর সম্পর্কে পাক-ভারত আলোচনা আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে। মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় চতুর্থ পর্য্যায়ে এই আলোচনা আরম্ভ হইবার আগে মিঃ ভুট্টো পিকিং এ যাইয়া এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া আসেন। চীনের প্রতি ভারতের জনমত যখন অত্যন্ত বিরূপ, ঠিক সেই সময় চীনের সহিত ভারতীয় এলাকা সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া আসিয়া ভারতের সহিত আপোষ আলোচনায় বসাটা শুধু বিসদৃশ নহে ইহা চরম ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক ; ভারতীয় জনমতের প্রতি ইহা চূড়ান্ত অবমাননা। পাক নেতাদের এই ঔদ্ধত্য সম্ভব হইয়াছে এই কারণে যে, কাশ্মীর সমস্যা মিটাইবার জন্য ভারতের উপর পশ্চিমী শিবিরের চাপ আসিতেছে ; চৈনিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এই শিবিরের প্রতি ভারত এখন বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। চীনের সহিত পাকিস্থানের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য মিলিত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা যে অসম্ভব, ইহা জানিয়াও ভারত গভর্ণমেণ্ট পাশ্চাত্ত্য শক্তির চাপে পাকিস্থানকে তোষণ করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া পাক্ নেতারা মনে করিতেছেন। বিস্ময়ের বিষয়, কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতি পাকিস্থানের এই আকর্ষণ সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য শিবিরে কোনও উদ্বেগ নাই ; তাঁহারা এখনও কাশ্মীর উপত্যকার একটা বড় অংশ পাকিস্থানকে দেওয়ার জন্য ওকালতি করিতেছেন। ইহা হইতে কি এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত নহে যে, পাকিস্থান তাহার পাশ্চাত্ত্য মিত্রদের সম্মতিতেই ভারতের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চীনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে, অন্ততঃ মিত্রতার ভাণ করিতেছে ? চীনের সহিত পাকিস্থান বাণিজ্য ও সীমান্ত চুক্তি করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে অনাক্রমণ চুক্তি হইবার সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই। তবু কি পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ সামরিক জোটের সভ্য হিসাবে পাকিস্থানকে নির্ভরযোগ্য মনে করিতেছেন এবং পাকিস্থানের সমগ্র অঞ্চল তাহাদের সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে পারিবে বলিয়া ভাবিতেছেন ? এই কারণেই কি কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্থানের প্রবেশাধিকার একান্ত প্রয়োজন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন ? কিন্তু পাকিস্থানের আচরণ লক্ষ্য করিয়া ভারতের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন হইয়াছে। স্মরণ রাখা আবশ্যক—পাকিস্থানের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া চীন তাহার সম্ভাবিত পরবর্ত্তী ভারত-বিরোধী অভিযানের সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে ; কাশ্মীরের অভ্যন্তরে পাকিস্থানী এলাকা যে পরিমাণে প্রসারিত হইবে, সেই অনুপাতে চীনের এই নিশ্চিন্ততা বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, পাকিস্থান ভারতের সহিত সদ্ভাব চায় না (ভারতীয় জনমতের প্রতি তাহার অবমাননায় ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে)—ভারতের বিপদের সুযোগ লইয়া যে কাশ্মীর সম্পর্কে তাহার দাবী আদায় করিতে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং কাশ্মীর সম্পর্কে একটা মিটমাট যদি হয়ও, তাহা হইলেও ঐ অঞ্চল হইতে ভারতীয় সৈন্য সরানো বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না, কারণ সম্ভাবিত ভবিষ্যৎ চৈনিক আক্রমণের সময় পাকিস্থান যে সমস্ত কাশ্মীর কুক্ষিগত করতে প্রয়াসী হইবে না, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই।

—"মিহির"

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।

বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশ-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
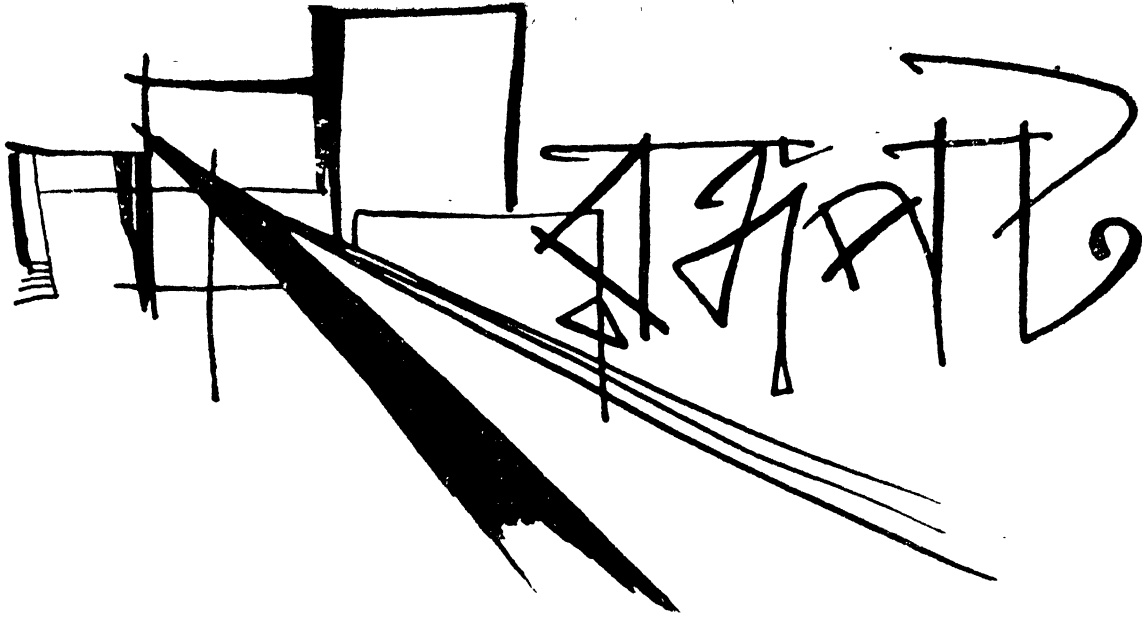
আঠারো শতকের এক রঙ্গালয়

অমল মিত্র

১৭৫৬ সাল।

নবাব আলিবর্দীর মসনদে সমাসীন ইতিহাস অধ্যুষিত নবাব সিরাজউদ্দৌলা। রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়ায় এবং অন্যান্য আরো অনেক কারণে ইংরেজরা তাঁর বিরক্তি ভাজন হয়েছে। কাশিম বাজারের কুঠি আক্রমণ ও অধিকার করে ক্রুদ্ধ নবাব প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ১৬ই জুন নবাববাহিনী চিৎপুর অঞ্চলে এসে পৌছল। ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল ইংরেজরা। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল না। মুষ্টিমেয় ইংরেজ সেনা প্রাণপণ চেষ্টা করল ধ্বংসোন্মত্ত নবাবকে বাধা দিতে। জীর্ণ কেল্লা ছাড়াও গভর্ণর ড্রেক, আয়ার প্রভৃতি বহু লোকের গৃহ সেনাবাহিনীর ছাউনিতে পরিণত হ'ল। কলকাতার প্রথম রঙ্গালয় গৃহ বা 'ওল্ড প্লে হাউস'ও বাদ পড়ল না। কিন্তু অচিরে এটি নবাববাহিনী কবলিত হল। তারা সেখানে কামান বসিয়ে অদূরের কেল্লায় মুহুর্মুহুঃ অগ্নিবর্ষণ করেছিল। জুন মাসের ২০শে তারিখে সন্ধ্যের পর বিজয়ী নবাবের পালকি ইংরেজের দুর্গে প্রবেশ করল। নবাবের দখলে এল কলকাতা। মানিকচাঁদকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যৌবনোদ্দীপ্ত সিরাজ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করলেন। তারপর অনেক কিছুই ঘটে গেল যার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত নানা ঝড় ঝাপ্টা কাটিয়ে ইংরেজ আবার ফিরে পেল তাদের কলকাতা। কিন্তু সেই যুগের সেই প্রথম নাট্যশালার পাদপ্রদীপের আলো নিভে গেল।

বেশ কিছুকাল কেটে গেল এর পর। শহর কলকাতা প্রায় দীর্ঘ বিশ বছর রঙ্গালয় শূন্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এল দ্রুত পরিবর্তন। প্রাচ্যের বুকে ক্রমশ নিরঙ্কুশ হতে লাগল ইংরেজ আধিপত্য।

প্রবল প্রতাপ ওয়ারেণ হেস্টিংসের যুগ সেটা। 'ভেতু মাষ্টার' নামে

সুবিখ্যাত রূপশিল্পী রাজকাপুর

পরিচিত নীলামাধ্যক্ষ জর্জ উইলিয়ামসন কলকাতায় দ্বিতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করলেন (১৭৭৫)। রাইটার্স বিল্ডিং-এর পিছনে লায়েন্স রেঞ্জের উত্তর পশ্চিম কোণে। আজ সেখানে ফিনলের অফিস। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই এর অভ্যুদয় ঘটল। নাম 'ক্যালকাটা থিয়েটার' অথবা 'দি নিউ প্লে হাউস।' সেদিনের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরই শুভেচ্ছা ছিল এর পিছনে। চাঁদা দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই। বিনিময়ে তাঁরা রঙ্গালয়ের অংশীদার হয়েছিলেন। শেয়ারের দাম ছিল হাজার টাকা করে। বছরে শত করা বারো টাকা সুদের এমনি এক শ' শেয়ার বিলি করা হয়। রঙ্গালয়টির জন্যে খরচাও হয়েছিল প্রায় লক্ষ টাকা। তখন কার দিনের লক্ষ টাকা। চাঁদার খাতা ওল্টালে দেখা যাবে পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন হেস্টিংস, মনসন, রিচার্ড, বারওয়েল, স্যার এলিজা ইম্পে, হাইড, চেম্বার্স এবং আরো অনেকে। একে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলবার অদম্য আগ্রহে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা ওদেশের প্রখ্যাত শিল্পী ডেভিড গ্যারিকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন আঠারো শতকের নাট্যযুগের অবিস্মরণীয় শিল্পী পুরুষ ডেভিড গ্যারিক। প্রতিভা যাঁর নাট্যজগতে অত্যুচ্চ প্রতিভার গৌরবে পরিগণিত। শিল্পী বার্ণার্ড মেসিঙ্ককে গ্যারিক পাঠালেন। সঙ্গে তাঁরই নির্দেশে আঁকা বহু দৃশ্যপটও এল।

মিস সোফিয়া গোল্ডবোর্ণ এর 'হার্টলি হাউস ক্যালকাটা'য় সুপরিকল্পিত ও সুসজ্জিত-প্রেক্ষাগৃহের আসন, আলোকসম্পাত ব্যবস্থা প্রভৃতির খবর পাওয়া যায়।

'দি অরিজিন্যাল লেটারস্ ফ্রম ইণ্ডিয়া'র অমর লেখিকা মিসেস এলিজা ফের এক পত্রেও এর উল্লেখ পাই। রঙ্গালয় গৃহটির প্রশংসা করে তিনি লেখেন—
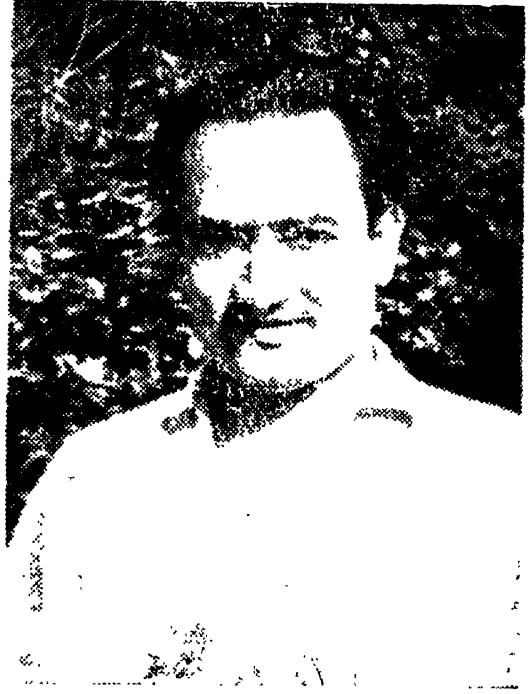
বসন্ত চৌধুরী—ছায়াছবির বাইরে

"It is very neatly fitted up, and the scenery and decorations quite equal to what could be expected here."

(Letter, dated 26-3-1781)

গৃহ-সংলগ্ন সুপরিসর একস্থানে গাড়ি বা পাল্কি রাখার ব্যবস্থা ছিল। আজ বিজ্ঞানের যুগে প্রেক্ষাগৃহের সামনে কাতারে কাতারে এসে দাঁড়ায় মোটরগাড়ি। সেদিন কিন্তু লায়েন্স রেঞ্জের থিয়েটার-গৃহের সামনে এসে দাঁড়াত বিহার গাড়ি, বগী বা পাল্কি। রাতের অন্ধকারে তাদের পথ দেখাত মশালচিরা। তাদের হাতে থাকত জলন্ত মশাল। আঁধার বিদারণের সে এক অপরূপ দৃশ্য।

গাড়ির চালক বা পাল্কির বেহারাদের সাজসজ্জা ছিল তেমনি জমকালো। গাড়ি বা পাল্কি থেকে নামতেন কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী ও সেদিনের বিশিষ্ট ইংরেজ বণিকেরা। বলাবাহুল্য, তাঁরা একলা আসতেন না। তাঁদের সঙ্গে থাকতেন বিচিত্র সাজসজ্জার বিচিত্ররূপিণী সহচরীরাও।

প্রবেশপত্রের মূল্য ছিল বক্সের জন্য এক সোনার মোহর ও 'পিট্' সীটের জন্য আট সিক্কা টাকা। এই চড়া মাশুল সত্ত্বেও রসপিপাসু দর্শকের কোনদিন অভাব হ'ত না। ভাল নাটক অভিনয়ের রাত্রিতে তো কথাই নেই, সব আসনই ভরে যেত। বহু নিরাশ দর্শকের পাল্কি বা গাড়ি যেত ফিরে। উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁরা পরবর্তী অভিনয়ের জন্যে অপেক্ষা করতেন। নাম করা নাট্যকারদের কোন নাটক মঞ্চস্থ হ'চ্ছে কি না, সে কৌতূহলও কম ছিল না। কাগজের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই 'দি নিউ প্লে হাউস' বা ক্যালকাটা

বিশ্বজিত—ছায়াছবির বাইরে

শুধু এ্যামেচার অভিনেতারাই একমাত্র শিল্পী তখন। কারণও ছিল। "ইন্ দি ডেক্স অফ দি কোম্পানী"র রচয়িতা ডগলাস ড্যুয়্যার বলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মালিকরা পেশাদার শিল্পী আনা পছন্দ করতেন না। তাই, বেশ কিছুকাল এদেশে তাঁদের আবির্ভাব প্রতিহত ছিল। এ্যামেচাররাই ভরসা। সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁরা সকলেই। একটু মুস্কিলও দেখা দিয়েছিল তাঁদের নিয়ে। অর্থের বিনিময়ে তাঁদের বিচিত্র দাবিদাওয়ার ফলে সময় সময় রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষরা বেশ বিড়ম্বিত হতেন। প্রতিটি চরিত্র রূপায়ণের জন্য তাঁদের নতুন পোষাক চাই। আবার রিহার্সালের পর ভাল রকম পান-ভোজনের ব্যবস্থা না থাকলে তাঁদের মেজাজ যেত বিগড়ে। অভিনয়-রাত্রে বন্ধুবান্ধবদের জন্তে বিনা মাশুলে প্রবেশপত্রের দাবি তো ছিলই ("East India Vade Mecum")।

পেশাদারদের নিয়ে এসব ঝঞ্ঝাট থাকে না। নানান দাবিদাওয়া মেটাতে প্রায়ই ব্যয়ের মাত্রা আয়কে ছাপিয়ে যেত। উপায়ান্তর ছিল না। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে আর এক সমস্যা দেখা দিল। হেষ্টিংসের আমলে এবং পরেও সরকারী কর্মচারীরা অভিনয় করতেন। কিন্তু কেন জানি না লর্ড কর্ণওয়ালিসের তা ভাল লাগেনি। সরকারী কর্মচারীর অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করাটা তিনি পছন্দ করতেন না বোধ করি। ফলে অবস্থা এমন যে, শিল্পীর অভাবে রঙ্গালয়ের দরজা প্রায় বন্ধ হওয়ার দাখিল।

এ্যামেচার হ'লেও শিল্পী হিসেবে কিন্তু অনেকে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সুনাম অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন কল্, লেফ্‌টেন্যাণ্ট নোরফার এবং আরো অনেকে। দূর সমুদ্রপারেও তাঁদের অভিনয়নৈপুণ্যের সংবাদ পৌঁছেছিল। সতেরো শতকের নাম করা নাট্যকার টমাস অট্‌ওয়ের লেখা নাটক 'ভেনিস প্রিজার্ভড'-এর অভিনয় দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ মিসেস ফে স্বদেশে লেখা এক পত্রে (২৬শে মার্চ ১৭৮১) লিখলেন—

"The parts are entirely represented by amateurs in the drama, no hired persons being allowed to act. I assure you I have seen characters supported in a manner that would not disgrace any European stage. 'Venice Preserv'd' was exhibited by Captain Call (of the Army), Mr. Droz (a member of the Board of Trade) and Lieutenant Norfar, in Jaffier, Pierre and Belvidera shewed very superior theatrical talents."

সঙ্গে কিন্তু প্রবেশমূল্যের প্রসঙ্গে খোঁচাও একটু ছিল—

"For my own part, I think such a mode of passing an evening highly rational, and were I not debarred by the expense, should seldom miss a representation; but a gold mohur is really too much to bestow on such a temporary gratification."

এ ভাবে সান্ধ্য অবকাশ বিনোদন খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে তিনি মনে করেছিলেন। খরচার কথা না উঠলে কোন অভিনয় বাদও দিতেন না। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী পরিতৃপ্তির জন্তে এক মোহর মাশুল সত্যিই বড় বেশী বলে তাঁর মনে হয়।

ঐ অভিনয় সম্বন্ধে 'বেঙ্গল গেজেট'এরও মতামত দেখি হুবহু মিলে যায় মিসেস কের সমালোচনার সঙ্গে। তারা লিখলে, ক্যাপ্টেন কলের অভিনয় অপূর্ব হয়েছে। প্রাচ্যের গ্যারিক নামে তাঁকে অভিহিত করা চলে। আর বেলভিডেরার ভূমিকায় নোরফারের অভিনয়ে যে করতালধ্বনি শোনা গেল সারা প্রেক্ষাগৃহে তা যথাযোগ্য। 'হার্টলি হাউস'-এ মিস গোল্ডবোর্ণও এখানকার এক অভিনয় দেখে উচ্ছসিত হয়ে লিখে গেছেন—

"As for myself, my attention was so engaged by the piece, that my heart several times asked if it could be possible I was at the distance of 4000 miles from the British metropolis."

এঁদের অনেকেই লণ্ডন মঞ্চে অভিনয় করলে অনায়াসে সেখানকার দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়োতে পারতেন, তাও বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই আর একজন (ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন) মন্তব্য করে গেছেন। তিনি বলেন—

"With respect to the merits of the gentlemen performers, much may be said: there certainly were among them some who might have appeared before a London audience without any fear of disappointment. The names of Fleet wood, Messink, Norfar, Golding, Bigger, Call, Keasberry, Robinson, etc etc, will long be remembered by the lovers of the drama; nor will they be easily effaced from the memory of those in whose hearts their merits as members of society, were deeply impressed."("East India Vade Mecum.")

কণিকা মজুমদার— ছায়াছবির বাইরে

লণ্ডন মঞ্চে অনেক আগেই অভিনেত্রীদের আবির্ভাব ঘটলেও, এখানে গোড়ায় স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকা পুরুষরাই গ্রহণ করতেন। অভিনেত্রীদের মঞ্চে যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। এও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টারদের অপছন্দের কারণে। খুবই স্বাভাবিক। পেশাদার অভিনেতাদের ডাকায় যাঁদের আপত্তি, অভিনেত্রীদের আনায় তাঁরা বাধা দেবেন জানা কথাই। এই নিষেধের পিছনে একটা কারণ যে ছিল না তা নয়। আজ সেটা অদ্ভুত বা হাস্যকর বলে মনে হলেও, তখন তা নিছক অর্থহীন ছিল না। সেটা যে স্যার ফিলিপ ফ্র্যান্সিসদের যুগ তা ভুললে চলবে না। সেদিন এখানে ইংরেজ রমণীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক কম। সুন্দরী অভিনেত্রী সমাগমে তাই সামাজিক আবহাওয়া পাছে দূষিত হয়, তাদের কেন্দ্র করে কোম্পানীর ছোটখাট কর্মচারীদের মধ্যে মন কষাকষির সৃষ্টি হয় এই ছিল কোর্ট অফ ডাইরেক্টারদের ভয়। সুদূর প্রবাসে দেশবাসীদের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে, তাতে কোন কলঙ্কের ছাপ না লাগে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। প্রসঙ্গত ড্যুয়্যারের মন্তব্য—

"দীপের নাম টিয়ারঙ"এর নায়িকার রূপসজ্জায় সন্ধ্যা রায়

"...The Court of Directors...feared that handsome actresses in India might arouse a spirit of intrigue among the junior servants of the Company; and, doubtless in those days, when Englishwomen were so scarce, the advent of actresses would have created a great stir and possibly have led to scandal."
("In the Days of the Company.")

পুরুষ অভিনীত স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকা কিন্তু নিখুঁত সুন্দর হ'ত। এমনই যে স্বদেশেও ঐ প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হলে খুশি হবেন বলে মত প্রকাশ করলেন মিস সোফিয়া গোল্ডবোর্ণ। অন্তত নৈতিক কারণে তা হওয়া উচিত তাও বলতে ভুললেন না। তাঁর সে ইচ্ছা কোনদিন পূর্ণ হয় নি, অসম্ভব বলেই। কয়েক বছরের মধ্যে বরং এখানেও দেখি অভিনেত্রীরা মঞ্চে দেখা দিলেন। সরে গেল সকল বাধা নিষেধ। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

নিশীথে

রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী-নিঃসৃত যে সকল মণিমাণিক্য বাঙলা সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে, "নিশীথে" তাদেরই অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ছোট গল্পের মধ্যে আটষট্টি বছর আগে লেখা এই গল্পটি এক বিশেষ স্বীকৃতির দাবী রাখে। "নিশীথে" গল্পটিতে চৌত্রিশ বছর বয়স্ক যুবক রবীন্দ্রনাথ মানবমনের এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। অনন্ত রহস্য ঘেরা মানবচিত্তের একটি দিগন্তের দ্বার এখানে উন্মোচিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববন্দিত লেখনীর এক একটি সূক্ষ্ম আঁচড়ে। গল্পটি ভিন্ন জাতের, ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন শৈলীর। স্বভাবতই গল্পটিকে বাঁধা হয়েছে অত্যন্ত চড়া সুরে, সেই ভাবেই তাকে অলংকৃত করা হয়েছে, সেই সুরের ঝঙ্কার ধ্বনিত করতে হয়েছে গল্পটির মধ্যে।

"নিশীথে"র চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছেন অগ্রগামী গোষ্ঠী। চিত্রটি মুক্তি পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনেকেরই আশঙ্কা ছিল—এই দুরূহ গল্পটির চলচ্চিত্রায়ণের কঠিন পরীক্ষায় পরিচালকগোষ্ঠী সার্থকভাবে উত্তীর্ণ হতে পারবেন কি না। মুক্তিলাভের পর দেখা গেল—ছবিটির মাধ্যমে অগ্রগামী অসাধারণ দক্ষতা ও কুশলতার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন। কাহিনীর বক্তব্যকে রূপালী পর্দায় প্রকাশ করতে প্রভূত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে নিরুপমা—একটি ফুলের মত মেয়ে, কিন্তু আজ তার জীবনে নিরাশা বেদনা আর অন্ধকারের স্বাক্ষর; অন্যদিকে মনোরমা—আশা প্রাণপ্রাচুর্য আর সম্ভাবনার মূর্তিময়ী প্রতিশ্রুতি, মধ্যে অপরাধবোধের এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি দক্ষিণাচরণ—যার জীবনের একদিকে গভীর পত্নীপ্রেম, অন্যদিকে নতুন আলোর ইশারা, এরই আবর্তে যার জীবন বিপর্যস্ত, দিশাহারা এবং পথভ্রষ্ট। এই তিনটি চরিত্রকে উপজীব্য করেই কাহিনী রূপ নিয়েছে সূক্ষ্মরসের অপূর্ব প্রয়োগের, শিল্পায়নকর্মের এবং উপস্থাপন পদ্ধতির দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ছবিটি অফুরন্ত প্রশংসার দাবী অনায়াসে করতে পারে। রহস্য রোমাঞ্চের শ্বাসরুদ্ধকারী আবহাওয়া অন্যদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের সমারোহ ছবিটিকে এক বিশেষ সৌন্দর্যে বিভূষিত করে তুলেছে।

অভিনয় এ ছবির এক অনবদ্য সম্পদ। দক্ষ শিল্পীদের বলিষ্ঠ অভিনয় দুরূহ চরিত্রগুলিকে রূপালী পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছে। দক্ষিণাচরণের ভূমিকায় উত্তমকুমার, নিরুপমার চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী, মনোরমার চরিত্রে নন্দিতা বসু অনন্যসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনটি পৃথকধর্মী চরিত্র তিন বলিষ্ঠ শিল্পীর দ্বারা নিখুঁত-ভাবে রূপায়িত হয়েছে। ডাক্তারের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্যের অভিনয়ও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে শিশির বটব্যাল, শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়, ছায়া দেবী প্রভৃতি শিল্পীরা আত্মপ্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত দুটি সুগীত। সুধীন দাশগুপ্তের সুরযোজনা ও রামানন্দ সেনগুপ্তের চিত্রগ্রহণ সাধুবাদার্হ।

এই পরম উপভোগ্য, সুন্দর ও সার্থকতার স্পর্শসমৃদ্ধ ছায়াছবিটির মধ্যে দু'টি অসংগতি পরিদৃষ্ট হয়। দক্ষিণাচরণের ভদ্রাসনের ঠাকুর-দালানের সামনে দিয়ে নিরুপমাকে যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে। বর্ধিষ্ণু সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলারা ঠাকুরদালানে যাতায়াত করেন

রুমা গুহঠাকুরতা—[illegible]

অন্দরমহল দিয়ে। প্রত্যেক ঠাকুরদালানের অভ্যন্তরভাগে দু'দিকে একটি করে দরজা থাকে, সেই দরজা দিয়েই তাঁরা প্রবেশ ও প্রস্থান করেন, সামনের দিকে অর্থাৎ উঠানের দিকে তাঁরা পদার্পণই করেন না (অবশ্য আজকাল এ প্রথা অবলুপ্ত বললেই চলে)। মনোরমাকে যে জামা পরানো হয়েছে, তখনকার দিনে ঐ ধরণের ব্লাউজের প্রচলন ছিল কি? এই দিকগুলির প্রতি পরিচালকবর্গ দৃষ্টি দিলে ছবিটি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিবিমুক্ত হোত।

সংবাদ-বিচিত্রা

ক'লকাতার সুবিখ্যাত অভিনেতৃসঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশন গত ৫ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই অধিবেশনে বর্তমান বৎসরের কর্মকর্তা নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়ে নিম্নলিখিত কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে—সভানেত্রী: সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়। সহকারী সভাপতি: কানন দেবী, মলিনা দেবী, মিহির ভট্টাচার্য। সম্পাদক: বীরেশ্বর সেন। সহকারী সম্পাদক: সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুশীল দে। কোষাধ্যক্ষ: শ্যাম লাহা। কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ: অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ ঘোষাল, বাসবী নন্দী, জয়শ্রী সেন ও অসীম সরকার।

বাঙলা চলচ্চিত্রজগতের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বিখ্যাত শব্দযন্ত্রী দেবেশ ঘোষের সঙ্গে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আমরা নবদম্পতির উদ্দেশ্যে শুভকামনা জানাই এবং তাঁদের মিলিত সেবায় বাঙলাদেশে ছবির রাজ্য আরও লাভবান হোক—এই কামনা করি।

* * * *

১৯১৩ সালে যে ভারতীয় ছায়াছবির জন্ম, বর্তমান বৎসরটি তার সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষ। সমগ্র ছায়াচিত্ররাজ্যে এই সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব নানাভাবে পালন করার আয়োজন চলছে। এই উপলক্ষে জাতীয় জীবনে ছবি ও ছবির নির্মাতাদের অমূল্য অবদান সম্পর্কে একটি ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পিত ছবিটি গৃহীত হয়ে মুক্তিলাভ করলে বিপুল জনপ্রিয়তায় বিভূষিত হবে, এ আশা আমরা রাখি এবং এই তথ্যবহুল চিত্রটি অতীতের বহু মূল্যবান ঘটনার প্রতি নতুন করে আলোকপাত করবে।

* * * *

একই সময়ে একাধিক চিত্রে শিল্পীরা অভিনয় করে থাকেন, এ ব্যবস্থা চিত্রজগতে প্রচলিত। বর্তমানে এই নিয়মের পরিবর্তন হ'তে পারে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে শিল্পীদের একযোগে একাধিক চিত্রে অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সম্বন্ধে বিবেচনা করছেন। কোন কোন শিল্পী এই একাধিক চিত্রে অভিনয় করায় অভিজ্ঞমহলের মতে চিত্রগুলি উৎকর্ষলাভ করতে পারে না এবং সফলতা অর্জনের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সামগ্রিক ভাবে তার গুণসমূহ নষ্ট হয়, সেইজন্যেই কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরিকল্পনা করছেন।

* * * *

প্রেস নোটের মাধ্যমে জানা গেছে যে পুণার ফিল্ম ইনষ্টিটিউটে আগামী ১লা জুলাই থেকে চলচ্চিত্র সম্পর্কে নিয়মিত শিক্ষাদান শুরু হবে। এই ইনষ্টিটিউট চলচ্চিত্র বিদ্যা সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম প্রণয়ণ করেছেন।

* * * *

পুণ্যভূমি ভারতের অসংখ্য অবশ্য দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে কোনারকের সুপ্রসিদ্ধ সূর্যমন্দির একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। এই সূর্যমন্দিরের প্রতিটি ধূলিকণা আধ্যাত্মিকতা এবং ইতিহাসের স্পর্শে ভরপুর। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত অগণিত নরনারী এই সূর্যমন্দির দর্শন করে মন্দিরময় ভারতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। বর্তমানে শিল্প পরিচালক ঈশ্বরলাল এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটি ছায়াচিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। বলরাজ সাহনী ও নিরূপা রায় এই হিন্দী ছবিটির মুখ্য দু'টি চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন। ঈশ্বরলালের উদ্যোগের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

* * * *

দেশীয় চলচ্চিত্র আজ নানাপ্রকার সঙ্কটের সম্মুখীন। বর্তমান বৎসরের প্রস্তাবিত নতুন করসমূহ চলচ্চিত্র জগতে এক দুরতিক্রম্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই প্রস্তাব কার্যকরী হ'লে ছবির নির্মাণব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে যার ফলে চিত্রজগত নিদারুণ ক্ষতির ভারে জর্জরিত হয়ে পড়বে। অতএব, দেশের একটি বিরাট শিল্প যাতে সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা না পায় এবং আর্থিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় সেদিকে যত্নবান হতে এবং দৃষ্টিদান করতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে বাঙলার চলচ্চিত্র জগতের দিকপাল শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় অনুরোধ জানিয়েছেন।

রহস্যঘন রোমাঞ্চচিত্র "নিশাচর"এর একটি দৃশ্যে বিকাশ রায় ও সুচিত্রা সেন

অভিনেত্রী থেকে জননেত্রীর আসন একদিন অলঙ্কৃত করেছিলেন এভা পেরণ (১৯১৯—১৯৫২) আর আজ জননেত্রী থেকে অভিনেত্রীর জীবন বরণ করতে চলেছেন সোরায়া (১৯৩২)। ইরাণের ভূতপূর্ব সম্রাজ্ঞীর এই সিদ্ধান্ত আজ সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কয়েক বছর আগে বন্ধ্যাত্বের অপরাধে স্বামীর নির্বাসনদণ্ড তাঁকে গ্রহণ করতে হয় এবং রাজকীয় মর্য্যাদাও তাঁকে বিবাহবিচ্ছেদের পরেও পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখে চলার জন্য নানাভাবে চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু একটি উপাধি এবং কিঞ্চিৎ মাসোহারাই নারীজীবনের একমাত্র কাম্য নয়, খেতাব ও অর্থই কেবলমাত্র একটি নারীর জীবনকে ভরিয়ে তুলতে পারে না। আনতে পারে না তাতে সার্থকতার স্বাক্ষর। তাই উপাধি প্রত্যাহার ও মাসোহারা বন্ধের হুমকীতে সোরায়া বিচলিত নন। ইরাণী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর শাসনতর্জনীর কোন মূল্যই তাঁর কাছে আজ নেই। চিত্রামোদীর দল শুনে আনন্দলাভ করবেন যে সোরায়া প্রখ্যাত ইতালীয় প্রযোজক দিনো দ' লরেন্তিস'র আগামী একটি চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন। এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় চুক্তিপত্রও স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। অতীতের বেদনাময় হতাশা এবং করুণ-জীবনের স্মৃতির দুঃসহ ভারে জর্জরিতা হয়ে প্রহর অতিবাহিত করতে তাঁর মন সায় দেয় না, ভবিষ্যতের অফুরন্ত সম্ভাবনায় প্রদীপ্ত আলোকোজ্জ্বল জীবনের সঙ্গে হাত মেলাতেই তাঁর সমগ্র সত্তা উন্মুখ।

সোভিয়েত মঞ্চে ভারত সম্পর্কে নতুন নতুন নাটক ও নৃত্যনাট্য

তাসের সংবাদে প্রকাশ যে—উনবিংশ শতকের আজেরবাইজানের খ্যাতনামা পর্যটক জেইনাল আবদীন শিরওয়ানী-র ভারতভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত "বিদায় ভারত" নামে একটি নূতন নাটক গত ৫ই মে তারিখ থেকে বাকুর রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। বাকুর সাংবাদিক গেইবুল্লা রসুলফ রচিত এই নাটকটির বিষয় হ'ল ভারতীয় ও আজেরবাইজানী জনগণের মধ্যে দীর্ঘকালের মৈত্রীবন্ধন।

আজেরবাইজানের বিখ্যাত সুরকার নিয়াজী —যিনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত ক'রে প্রথম সোভিয়েত মঞ্চে উপস্থিত করেন—তিনি বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি রচনা অবলম্বনে নতুন একটি নৃত্যনাট্য রচনার কাজে রত আছেন। এই নূতন নৃত্যনাট্যটির নাম "জীবন ও আশা।" নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা কুইবিশেফ অপেরা থিয়েটার কর্তৃক বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

আজেরবাইজানের আরেকজন সুরকার তোফিক কুলিয়েফ রচিত "ইণ্ডিয়ান র্যাপসডি" শীঘ্রই সংগীতরসিক সাধারণের সামনে উপস্থিত করা হবে। সুরকার কুলিয়েফ তাঁর ভারত-সফরকালে ভারতের লোকসংগীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন। ভারতীয় লোকসংগীতের ভিত্তিতেই এই বড়ো সিম্ফনিটি রচিত।

আঙ্গীক মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যান অবলম্বনে একটি নৃত্যনাট্য রচনার কাজে রত আছেন।

দেরাদুনে সোভিয়েত চলচ্চিত্র-উৎসব ও পুস্তক প্রদর্শনী

দেরাদুন।—গত ১২ই মার্চ তারিখে স্থানীয় দিগ্বিজয় সিনেমা গৃহে একটি সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসব এবং পুস্তক ও ফটোচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত বেনেদিক্তফকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া, সুদীর্ঘকালের ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া বলেন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা বড় সাফল্য হইল' বৈষয়িক সম্পদ বা পদমর্যাদা নির্বিশেষে সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তির সমান স্থান। শান্তি ও সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল সেই স্বল্প-সংখ্যক দেশগুলির অন্যতম। যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্য লইয়া ব্যাপক অনুশীলন চলিয়াছে।

প্রথম দিনের উৎসবে প্রদর্শিত কতকগুলি সোভিয়েত প্রামাণ্যচিত্র—বিশেষ করিয়া, মস্কোয় বিমান প্যারেড সম্পর্কে 'মাইটি উইংস্', লুমুম্বা মৈত্রী—বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে 'দি ষ্টাডি ইন মস্কো', সোভিয়েত যুগল মহাকাশচারী নিকোলায়েভ ও পোপোভিচের যৌথ মহাশূন্য পরিক্রমা সম্পর্কে 'স্পেস টুইনস্' ও কতকগুলি কার্টুন চিত্র দর্শকগণ কর্তৃক বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠান সেই দিব্য পুরুষের উদ্দেশে প্রণতি জানাচ্ছেন "বীরেশ্বর বিবেকানন্দ" ছবিটির মাধ্যমে। প্রবীণ চিত্র পরিচালক মধু বসুর তত্ত্বাবধানে এর চিত্র গ্রহণ কার্য এগিয়ে চলেছে। দিকপাল সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এর কাহিনীকার। নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন অমরেশকুমার। অন্যান্য চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, মল্লিনা দেবী প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। *** মানব সমাজ থেকে

অজ্ঞানতা, অন্ধকার ও কুশ্রীতা দূর করে তাকে পুণ্য, ধন্য, পবিত্র করে তুলতে ঈশ্বরের মানসপুত্রেরা যুগে যুগে আবির্ভূত হন। পুণ্য ভারত-ভূমির পবিত্র মৃত্তিকায় স্মরণাতীত যুগ থেকে যুগে যুগে কালে কালে আবির্ভূত হন সেই ঈশ্বরের বরপুত্রের দল, তাঁদের আবির্ভাব দূর করে মোহ, অজ্ঞানতা, অন্ধকার, এনে দেয় জ্ঞান, আলো, পবিত্রতা। ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁদেরই অন্যতম। হাজার বছর আগে ভারত ভূমিতে তাঁর আবির্ভাব যেমনই তাৎপর্যপূর্ণ তেমনই বহু প্রতীক্ষিত, সেই সময়ে জাতিকে তিনি এক নতুন মার্গের সন্ধান দিয়ে তাকে মুক্তি দিয়ে গেলেন অস্পষ্টতার কবল থেকে। এই পুণ্য পুরুষের জীবনালেখ্য চলচ্চিত্রে রূপায়িত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন ক্যালকাটা সিনেটোন। প্রবীণ পরিচালক হরি ভঞ্জ এর পরিচালন ভার গ্রহণ করেছেন। প্রখ্যাত শিল্পীরা বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। আমরা পরে বিস্তারিত শিল্পিতালিকা প্রকাশ করব। এই উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হোক এই কামনা করি। * * * অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত "এতটুকু আশা"র চিত্রগ্রহণ কার্য সমাপ্ত প্রায়। বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, ভারতী দেবী, বাসবী নন্দী, সুব্রতা সেন, আরতি দাস প্রভৃতি।

শৌখীন সমাচার

রেমিংটন র‍্যাণ্ড প্রমোদ বিভাগ সম্প্রতি "প্রফুল্ল" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। পরিচালনা করেন প্রভাত গৌতম। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন সমীরণ রায়চৌধুরী, দীপক সেনগুপ্ত, সমীর ঘোষ, জগন্নাথ চক্রবর্তী, প্রদীপ সেনগুপ্ত, শক্তি ভট্টাচার্য, গণেশ মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল সাহা, সুনীল নন্দী, অলোক মুখোপাধ্যায়, মানসী বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা ভাদুড়ী, কমলা বসু, সীমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * * ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার শ্যামবাজার শাখার প্রমোদ বিভাগের শিল্পীরা দর্শক সমাজে "ক্ষুধা" নাটকটি নিবেদন করলেন। চরিত্রায়ণে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, সলিল বিশ্বাস, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, নিমাই গুপ্ত, যামিনী মিত্র, প্রভাত গৌতম, গঙ্গাধর মণ্ডল, অমর চক্রবর্তী, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন সোম, নিমাই ভট্টাচার্য, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, ঋতা বসু, কল্যাণী দাশগুপ্তা, অলকা গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * * পলাশী শিল্পীচক্র তাপস দত্তের "দু'টি কথা" নাটকটি নিবেদন করলেন সম্প্রতি। রূপায়ণে ছিলেন জিতেন মণ্ডল, অমর জোয়ার্দার, মহম্মদ হোসেন, রবি বিশ্বাস, সুখেন চৌধুরী, নারায়ণ মণ্ডল, কমলা দেবী প্রভৃতি। * * * মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে "ভবিষ্যৎ ভারত" নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন উমা এ্যাণ্ড শঙ্কর রিক্রিয়েশান ক্লাব। শঙ্করদাস বাগচী রচিত নাটকটির বিভিন্ন চরিত্র রূপায়িত করলেন চাঁদকুমার, ভূপেন গুপ্ত, পঞ্চু দে, সদানন্দ, কল্যাণ ঘোষ, কিশোর ভড়, বিশ্বনাথ বারিক, সলিল চট্টোপাধ্যায়, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * * তরুণ সূর্য নাট্যগোষ্ঠী চিত্ত ঘোষালের "ঝুমঝুমি" নাটকটি নিবেদন করলেন। শ্যামল মুখোপাধ্যায়, সুখেন্দু দাশগুপ্ত, সমীর সান্যাল, সুকোমল দত্ত, নিমাই বেরা, হরিপ্রসাদ মৈত্র প্রভৃতি শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন।

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত ৪র্থ, ৫ম, ৮ম এবং ৯ম সংখ্যক ব্যতীত অন্যান্য আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত নন্দী এবং তারাপদ দাস কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

ফাল্গুন, ১৩৬৯ (ফেব্রুয়ারী—মার্চ, '৬৩)

অন্তর্দেশীয়—

১লা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী): কেন্দ্র কর্তৃক চোরাকারবার নিরোধ এবং আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আরও কড়াকড়ি ব্যবস্থা—ভারত প্রতিরক্ষা আইন অনুযায়ী নূতন বিধান প্রবর্তন।

মহানন্দা নদীর উপর ২০৯৭ ফুট দীর্ঘ সেতুর (পূর্ণিয়ার সন্নিহিত) উদ্বোধন—উদ্বোধক: কেন্দ্রীয় পরিবহন সচিব শ্রীজগজ্জীবন রাম।

২রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী): বোম্বাই-এ স্বর্ণ আইনে বিপন্ন স্বর্ণকারদের অনশন ও হরতাল। মহানগরীতে বসন্তের টিকাদান অভিযানে রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ও মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের অংশ গ্রহণ।

৩রা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী): এটর্নি-জেনারেল ও কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর পদ দুইটি একত্র করার প্রস্তাব আপাততঃ বাতিল।

ডিহরী-অন-শোণে এশিয়ার দীর্ঘতম সেতুর (দুই মাইল) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন—অনুষ্ঠানের সভাপতি: কেন্দ্রীয় সচিব শ্রীজগজ্জীবন রাম।

৪ঠা ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী): 'একচেটিয়া মালিকানা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে'—দিল্লীতে সংবাদপত্র বিষয়ক সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দেশের স্থগিত উপনির্বাচনসমূহ (ছয়টি লোকসভা ও ২৮টি বিধান সভা আসনের জন্য) শীঘ্র অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত।

৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী): পার্লামেণ্টের বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির (ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ) উদ্বোধনী ভাষণ: 'সামরিক জবরদস্তির নিকট ভারত নতি স্বীকার করিবে না—চীনা আক্রমণ (ভারতের বিরুদ্ধে) চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

দেশের প্রতিরক্ষা প্রয়োজনে অতিরিক্ত কর ভার বহনের জন্য রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু কর্তৃক আহ্বান—পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ।

৬ই ফাল্গুন (১৯শে ফেব্রুয়ারী): লোকসভায় রেল সচিব সর্দার শরণ সিং কর্তৃক ১৯৬৩-৬৪ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ—যাত্রী ভাড়া অপরিবর্তিত: মালের মাশুল বৃদ্ধি।

৭ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী): পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অর্থসচিব শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী কর্তৃক ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেট পেশ—প্রায় দশ কোটি টাকা ঘাটতি—সাড়ে তিন কোটি টাকা নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব—বিভিন্ন মহলে বাজেটের প্রতিক্রিয়া।

৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী): দেশের স্বর্ণ শিল্পীদের সমস্যা (স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বিধিজনিত) সমাধানের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটী গঠনের সিদ্ধান্ত।

৯ই ফাল্গুন (২২শে ফেব্রুয়ারী): লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা: মালয়েশিয়া গঠন প্রচেষ্টাকে ভারত স্বাগত জানাইবে।

'চাউলের দর খুবই বাড়িয়াছে, তবে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যায় নাই'—বিধান পরিষদে (পশ্চিমবঙ্গ) বিরোধীদের সমালোচনার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের বিবৃতি।

১০ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী): আগামী বর্ষের (১৯৬৪) নাগাদ আসামে সূক্ষ্ম তরঙ্গের (মাইক্রোওয়েভ) টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা।

ত্রিপুরা রাজ্যে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির সংবাদ।

১১ই ফাল্গুন (২৪শে ফেব্রুয়ারী): বিশিষ্ট সাহিত্যকর্মের জন্য শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের আকাদেমী পুরস্কার (১৯৬২) লাভ।

১২ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুয়ারী): কলিকাতা পুলিশের নূতন পোষাক চালু—লাল পাগড়ির স্থলে মাথায় নীল টুপির ব্যবস্থা।

১৩ই ফাল্গুন (২৬শে ফেব্রুয়ারী): 'বর্তমান সঙ্কটে চাই কম কথা ও বেশী কাজ'—কলিকাতার সভায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের দাবী।

১৪ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী): প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের উক্তি: বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

রপ্তানীযোগ্য বহু পণ্যের রেল মাশুল হ্রাস—পার্লামেণ্টে রেলওয়ে মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং কর্তৃক নূতন তালিকা পেশ।

১৫ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী): ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের (ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি) পাটনায় সদাকত আশ্রমে লোকান্তর—জাতীয় নেতার তিরোধানে সর্বত্র শোকচ্ছায়া।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কর্তৃক লোকসভায় ১৯৬৩-৬৪ সালের সাধারণ বাজেট পেশ—রাজস্ব খাতে ২৬৬-৬৭ কোটি টাকা ঘাটতি—সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ ৪৫৪ কোটি টাকা—দেশরক্ষার খাতে ৮৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ—২৭৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব।

১৬ই ফাল্গুন (১লা মার্চ): পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পাটনার গঙ্গা তীরে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন—শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি—পরলোকগত মহান নেতার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পার্লামেণ্ট ও বিধানসভাসমূহের অধিবেশন মুলতুবী এবং সর্বত্র অফিস আদালত ও স্কুল কলেজ বন্ধ।

রাজঘাট (দিল্লীস্থ গান্ধীজীর সমাধিস্থল) হইতে পিকিং মৈত্রী পদযাত্রা সুরু—১৮ জন বিশ্বশান্তিবাদীর অভিযানে অংশ গ্রহণ।

১৭ই ফাল্গুন (২রা মার্চ): ভারত কর্তৃক পিকিং-এ অনুষ্ঠিত পাক-চীন সীমান্ত চুক্তির প্রতিবাদ—চীনের নিকট নোট প্রেরণ।

১৮ই ফাল্গুন (৩রা মার্চ): 'পল্লীতে পল্লীতে মানুষের মনোবল দৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে'—বরানগরে আপৎকালীন শিক্ষা শিবিরে আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের ভাষণ।

১৯শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ): কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনারকে (শ্রীএস বি রায়) অপসারণে কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের দলবদ্ধ চেষ্টা—উভয় পক্ষে দ্বন্দ্ব ঘনীভূত।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণকে (রাষ্ট্রপতি) আমেরিকা সফরের জন্য মার্কিণ [illegible]

২০শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ): 'পাকিস্তান কর্তৃক ১৩ হাজার বর্গ মাইলের বেশী জমি চীনকে খয়রাত'—পাক-চীন সীমান্ত চুক্তির সমালোচনাকালে লোকসভায় শ্রীনেহরুর উক্তি।

২১শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ): 'সীমান্ত চুক্তিতে (চীনের সহিত) কি অপরাধ হইয়াছে জানি না'—পিকিং হইতে করাচীর পথে দমদম বিমান-ঘাঁটিতে পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী মি: ভুট্টোর মন্তব্য—চীনের সহিত মিতালির জোর সাফাই।

২২শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ): 'ভারতীয় অঞ্চল চীনকে প্রত্যর্পণের ক্ষমতা পাকিস্তানের নাই'—পিকিং-এ সদ্য স্বাক্ষরিত পাক-চীন সীমান্ত চুক্তির বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ।

২৩শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ): লোকসভায় রেলওয়ের জন্য ১১৭৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরীর দাবী গৃহীত।

২৪শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ): পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় স্বায়ত্ত-শাসন মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখার্জীর ঘোষণা: কলিকাতা পৌরসভাকে বাতিল করার মতো অবস্থা হয় নাই।

২৫শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ): কলিকাতায় সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব মহোৎসব পালন—মহানগরীতে দোলযাত্রা ও রঙ খেলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন! /

দালাই লামা (ভারতে অবস্থানকারী) তিব্বতের (চীনা অধিকৃত) জন্য নূতন সংবিধান ঘোষণা—তিব্বত স্বাধীন হইলে সংবিধান বলবৎ হওয়ার নির্দেশ।

২৬শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ): মহানগরীতে অপরাহ্ন বেলায় অকস্মাৎ প্রবল শিলাবৃষ্টি—আকাশে বাতাসে কালবৈশাখীর প্রতিচ্ছবি।

২৭শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ): কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসায় কলিকাতায় চতুর্থ পর্যায়ে ভারত-পাকিস্তান কাশ্মীর আলোচনা আরম্ভ—ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা সর্দার শরণ সিং ও পাক প্রতিনিধি দলের নেতা মি: ভুট্টো।

পার্লামেণ্টে চৌ-নেহরু পত্রাবলীর (সাম্প্রতিক) বিবরণ পেশ—চীনা প্রধান মন্ত্রীর নিকট শ্রীনেহরুর সাফ কথা: কলম্বো প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করিলে তবেই সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে আলোচনা।

কলিকাতা পৌরসভার কাউন্সিলার-কমিশনার দ্বন্দ্বের আপাতত অবসান—স্থিতাবস্থা বহাল রাখার বন্দোবস্ত।

২৮শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ): কলিকাতায় ভারত-পাক বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী ব্যর্থ আলোচনা।

২৯শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ) কলিকাতা বৈঠকে (ভারত-পাক) কাশ্মীর প্রশ্ন অমীমাংসিত—২১শে এপ্রিল (১৯৬৩) করাচীতে পুনরায় বৈঠকের সিদ্ধান্ত।

বহির্দেশীয়—

১লা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী): মহাশূন্যে আমেরিকা কর্তৃক রকেট যোগে 'স্থির' উপগ্রহ (দৃশ্যত পৃথিবীর গতির সমান) উৎক্ষিপ্ত বিশ্বব্যাপী সুলভে সংবাদ আদান প্রদানের নূতন সম্ভাবনা।

২রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী): ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্য গলকে হত্যার নূতন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ—ছয়জন পদস্থ অফিসার সমেত অনেকে গ্রেপ্তার।

৩রা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী): প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বার্তা সহ পররাষ্ট্র বিভাগীয় সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীআর কে নেহরুর কায়রো

৬ই ফাল্গুন (১৯শে ফেব্রুয়ারী): পাকিস্তানে মার্কিন-রাষ্ট্রদূতের (মি: ম্যাকনার্ট) বিরুদ্ধে সর্বমহলে জেহাদ—পূর্ব পাকিস্তানের সহিত স্বতন্ত্র সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাবে ক্ষোভ।

৭ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী): ফ্লোরিডার দরিয়ায় মার্কিণ মাছ ধরা জাহাজের উপর কিউবাস্থ মিগ বিমানের (রুশ নির্মিত) রকেটবর্ষণের অভিযোগ।

৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী): লিবিয়ায় বার্স শহরে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ৫ শতাধিক নর-নারী নিহত—সমগ্র এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার সংবাদ।

১০ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী): ব্রহ্মে দেশী ও বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত—বিপ্লবী পরিষদ প্রধান (জে: নে উইন) কর্তৃক আদেশ জারী। জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে (সপ্তদশ জাতি) পুনরায় অনিশ্চয়তা।

১১ই ফাল্গুন (২৪শে ফেব্রুয়ারী): পাক-চীন সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য মি: ভুট্টোর (পাকিস্তানী পররাষ্ট্র মন্ত্রী) পিকিং যাত্রা।

১২ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুয়ারী): আমেরিকা কর্তৃক মহাকাশে পাড়ি দিবার উপযোগী এম-২ মহাকাশ যানের আবরণ উন্মোচন।

১৬ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী): পিকিং কর্তৃপক্ষের সহিত কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স সিহানুকের বৈঠক শেষে যুক্ত ইস্তাহার প্রচার—চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্ন আলোচিত—সিহানুক কর্তৃক সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্পর্কে আশা প্রকাশ।

১৬ই ফাল্গুন (১লা মার্চ): লাহোর জেলে খান আব্দুল গফুর খানের অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন ধর্মঘট।

১৭ই ফাল্গুন (২রা মার্চ): প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পিকিং-এ পাক-চীন সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত—কম্যুনিষ্ট চীনকে পাকিস্তানের ২০৫০ বর্গ মাইল এলাকা উপঢৌকন—চুক্তির বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন মহল ও ইঙ্গ-মার্কিণ মহলে প্রবল অসন্তোষ।

কাটমাণ্ডুতে নেপালরাজ মহেন্দ্রের সহিত ভারতীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর বৈঠক।

১৮ই ফাল্গুন (৩রা মার্চ): পেরুতে প্রচণ্ড ধ্বস নামিবার ফলে চার শতাধিক নর-নারীর প্রাণহানি।

২১শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ): সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মি: ক্রুশ্চেভ সুপ্রীম সোভিয়েটে পুনর্নির্বাচিত।

২৩শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ): সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান—নাসের পন্থী (আরব প্রজাতন্ত্র প্রেসিডেণ্ট নাসের সমর্থক) অফিসারগণ ক্ষমতা দখল।

ঢাকায় পাক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন সুরু।

২৪শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ): সিরিয়ার নূতন প্রধানমন্ত্রী পদে সালাহ উদ্দীন অল বিতার—ক্ষমতা দখলকারী বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত।

২৬শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ): সোমালি-বৃটেন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন—সোমালি সরকারের সিদ্ধান্ত।

২৮শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ): এশীয় সাধারণ বাজার গঠনের পরিকল্পনা—'ইকাফে'র (এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য অর্থ-নৈতিক কমিশন) অধিবেশনে (ম্যানিলা) প্রস্তাব গৃহীত।

ওঁ শান্তি !

ভারত রাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুপরিচিত 'বাবু' রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর ইহলোকে নাই। বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও আত্মশিক্ষা, কায়িকশ্রম, নিষ্ঠার সহিত দেশ ও দশের সেবার ফলে যশোগৌরবের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সমগ্র জীবনে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া তিনি পরিশেষে সুখ ও শান্তি লাভ করেন। কঠিন কায়ক্লেশের মধ্যে থাকিয়া যে কৃতিত্বের চরম শিখরে পৌঁছানো যায়, দারিদ্র্য বরণ করিয়া যে নিষ্ঠা ও সেবাব্রত পালন করা যায়, অটুট সংকল্প থাকিলে যে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, সংগ্রামের দ্বারা যে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিচিত্র জীবনই তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়াছে। ছাত্র হিসাবে তিনি কৃতী ছিলেন। ছাত্রকালেই তিনি জাগ্রত বিহারের নবনায়করূপে "বিহার ছাত্র সমিতির" প্রতিষ্ঠা করেন। মহামতি গোখ্‌লের "সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি"-র সেবা-আদর্শ ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কোন মোহে তিনি কখনও আকৃষ্ট হন নাই। ক্ষমতা লাভ করিয়া শক্তির প্রয়োগে যে চিরস্থায়ী শান্তি আনয়ন করিতে পারে না তিনি তাহা অনুধাবন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু যে সকল গুণ থাকিলে দেশের সর্ব্বময়ত্ব লাভ করা যায় তাহার প্রত্যেকটির অধিকারী হইয়াও তিনি যথার্থ সংযম পালন করিয়াছেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন ধীমান ও জ্ঞানী অথচ নিরভিমান। দেশের নেতৃত্ব পাইয়া অনেকে আত্মজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। সহনশীল রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন ইহার বিপরীত। নির্ব্বিরোধী মানুষটি চূড়ান্ত ক্ষমতালাভের পরেও সহৃদয় নম্রতা রক্ষা করিয়াছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার না করিয়াও অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থ প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর যথার্থ শিষ্যের ইহাই সম্যক পরিচয়। আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতির জীবন-সাফল্যের মধ্যে বাঙালীর গর্ব্বের বিষয়—তিনি এই বাঙলা দেশেই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের গঠনকালের অনেকটা সময় বাঙলা দেশে অতিবাহিত হইয়াছে। বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহার প্রদত্ত ভাষণে বাঙলা ভাষার সাবলীল ব্যবহার বাঙালী চিরকাল স্মরণ করিবে।

যুগে যুগে মহজ্জনের আবির্ভাব হয় অতি অল্প। সেই সংখ্যা-লঘুদের এক অন্যতম প্রতিভূ আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি। তাঁহার অনুসৃত জীবন-বেদ যথারূপে প্রচারিত হোক। আমরা তাঁহার আত্মার চির শান্তি প্রার্থনা করি। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

পণ্য-মালের মাশুল

ভারতীয় রেলপথ যেন এক গোপন সুড়ঙ্গরূপে ক্রমেই দেশবাসীর পকেটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রতি বৎসরেই কেন্দ্রীয় বাজেটে রেলপথের আয়বৃদ্ধির জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা বরাদ্দ করা হইতেছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কেবলমাত্র আয়ের রাস্তা উন্মুক্ত হোক। বর্ত্তমান বৎসরে যাত্রীদের গতানুগতিক ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত রাখিয়া মালের মাশুল বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাকে Root Taxএর অন্তর্গত করিলে ভুল হইবে না। অর্থাৎ যাহাকে বলে মূলে কুঠারাঘাত। এই ধরণের মৌলিক করবৃদ্ধির ফলে সরকার জানেন যে, প্রায় অধিকাংশ দ্রব্য মূল্য স্বতঃই বৃদ্ধি পাইবে। দেশবাসীকে পরোক্ষ মাশুল গণিতে হইবে, অথচ সরকার অপ্রিয় হইবে না। জনসাধারণের চোখে ধুলা দিয়া, সরকারী আয়ের পথ সুগম করিয়া অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই সরকারের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিবেন। দেশবাসীর মাথায় হাত বুলাইয়া দেশাইজী বাহবা পাইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ক্রমাগত অধিক পরিমাণে গাঁটের কড়ি খরচ করিয়াও রেলযাত্রীদের দুরবস্থার আজও পর্য্যন্ত একটা সুষ্ঠু কিনারা হইল না। স্বাচ্ছন্দ্য দূরের কথা, আমাদের দেশে ট্রেনের বগী ও কামরা পয়দা হইলেও রেলগাড়ীতে স্থানাভাব পূর্ব্ববৎ যেমনকার তেমনই আছে। যথা মূল্যের টিকিট কাটিয়া যাত্রীদের অধিকাংশকেই ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া হ্যাণ্ডেলের আশ্রয় লইতে হইতেছে। এমন দৃশ্য সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ইহার আলোকচিত্র ছাপাইয়া কোন ফলোদয় হইতেছে না। সরকারের দৃষ্টিগোচর করিয়াও কোন লাভ নাই। মধ্যে মধ্যে দুর্ঘটনা ও সজ্ঘর্ষজনিত কিছু সংখ্যক লোকক্ষয় একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হিসাবে ধরিয়া লওয়া

হইয়াছে। ভারতবর্ষের অগণিত জনসংখ্যা যাহাতে হ্রাস পায় তজ্জন্য সরকার মনুষ্য-নিধনের এই বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন কি না কেহ বলিতে পারে না। পরিবার পরিকল্পনা যখন তেমন কার্য্যকরী

হইতেছে না, জন্মহার দিন দিন যখন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে তখন নরহত্যার কিছু কিছু বন্দোবস্ত না করিলেও চলে না। এখন সরকার নিয়ন্ত্রিত জীবন-বীমায় প্রতি দেশবাসী মৃত্যুভয়ে আবৃষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি!

ট্রেন-যাত্রা তাই আজ আর বিলাস বা সুখের নয়। যেন এক দুঃস্বপ্ন। সরকারের পক্ষ হইতে প্রতিকারের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। স্বাধীন ভারতবর্ষের এই লজ্জাকর অব্যবস্থার সমাধান কবে হইবে কেহ বলিতে পারে না। যতদিন না হয় ততদিন যাত্রীদের অন্তহীন দুর্ভোগ ললাটলিখন বলিতে হইবে। আপাততঃ সরকারের আংবুদ্ধির যূপকাষ্ঠে দেশের লোককে বলি দেওয়া হোক।

চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে

সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একমাত্র শত্রু ইংরাজ!

ব্রিটিশ সিংহের নিদ্রাভঙ্গ যাহাতে হয়, সেই কারণে এই সেদিনও ভারতবর্ষের আকাশ বাতাস মুখরিত ও প্রকম্পিত করিয়াছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর আবেগ ব্যাকুল অন্তরের সোচ্চারিত আহ্বান-বাণী—কুইট ইণ্ডিয়া! আমাদের সেই চিরস্মরণীয় দেশের ডাক 'ভারত ছাড়ো' দেশের ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইংরাজের শাসন-যন্ত্র হস্তান্তরের উদ্যোগ পর্ব্ব চলিতে থাকে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ইংরাজের সহিত সশস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত হইলেও এই দেশ হইতে ইংরাজ বিতাড়নের কাজে প্রভূত সাহায্য করে। ভারতের সেই শেষ স্বাধীন নবাব বাহাদুর শাহের বর্ম্মা দেশে নির্ব্বাসন দণ্ডভোগের কাল হইতে মহাত্মা গান্ধীর যুগ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের একমাত্র শত্রু হিসাবে ব্রিটিশ সরকারকেই দায়ী করিয়াছি। বিদেশী শাসনের অবসানে ভারতবাসী কিঞ্চিৎ স্বস্তির শ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইবে, অনেকেই এইরূপ ধারণা করিয়াছিলেন। এমন কি স্বাধীন ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্বদেশে ও বিদেশের কুখ্যাত ভারতীয় মেনন- (জাইটিশ) আমাদের অস্ত্রনির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে সেজের বাতি, রান্নার উনান ইত্যাদি গৃহস্থালীর উপকারী দ্রব্যাদি তৈয়ারীতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রুর দেশ ভারতবর্ষের শত্রু থাকিতে পারে না এই কল্পনায় আমাদের প্রতিরোধ পরিকল্পনা প্রায় যখন বানচাল হইবার উপক্রম হয়

ঠিক তখনই বুদ্ধভক্তের দেশ চীনের জঙ্গীবাদী চেঙ্গিশ খাঁর বংশধর মাও সে তুং-এর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে ভারতবর্ষের দিকে।

বান্দুং সম্মেলনের পঞ্চশীলের সহাবস্থানের নীতির মুখে পদাঘাত করিয়া মাও সে তুং আজ সারা এশিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্বলাভের দুঃস্বপ্নে মশগুল! তাই হয় তো ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু অগ্রগতিতে মাও অসহিষ্ণু। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে মাও আজ আক্রমণকারী। এই দুরভিসন্ধিমূলক সম্প্রসারণ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে হইবে সামরিক প্রস্তুতির সাহায্যে। মনে হইতে পারে মাও যখন অস্ত্র-সম্বরণের নির্দেশ দিয়াছে তখন আর আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া। কিন্তু চীনা ইস্তাহারে স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই যুদ্ধ-বিরতি স্থিতিশীল (Static) নহে। অর্থাৎ যে-কোন মুহূর্ত্তে পুনরাক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিও।

এ হেন ঘোরালো, কুয়াশাচ্ছন্ন ও জটিল পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিরোধের আয়োজন ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই এই আয়োজন কার্য্যকরী করা যাইবে। যে-দেশে দমদম বুলেটের ন্যায় পৃথিবী বিখ্যাত কার্ত্তুজের জন্ম সম্ভব হইয়াছে সেই দেশে অন্যান্য অস্ত্রের নির্ম্মাণ ও প্রয়োগ অসম্ভব হইবে না। এই বাবদে বিদেশী সাহায্য লইতে কুণ্ঠার কারণ থাকিতে পারে না। দেশ আক্রান্ত হইলে একান্ত বিরুদ্ধ মতবাদীর নিকট সাহায্য প্রার্থনার নজীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়া দেখাইয়াছে। হিটলারের বিধ্বংসী আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি তখন একা রাশিয়ার ছিল না। আমেরিকার বিখ্যাত সমর-বিশারদ, (যিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন চীনা আক্রমণের সময়ে) মিঃ হ্যারিমানকে রুশ দেশে সমর-উপদেষ্টা রূপে লইয়া যাওয়া হয়। আজ আর বলিতে বাধা নাই, হ্যারিমানের উপদেশে ও আমেরিকার সাহায্যে রাশিয়া হিটলারের কবল হইতে

সেই যাত্রায় রক্ষা পাইয়া যায়। সুতরাং ভারতবর্ষ বিদেশী সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ করে নাই।

কিন্তু আমাদের দেশের কতিপয় চীনপন্থী অন্য সুর গাহিতে শুরু করিয়াছেন। ইহা অতীব স্বাভাবিক। কেন না 'পিপলস ওয়ার' বলিতে চীনপন্থীর দল সর্ব্বদাই উল্টা অর্থ বুঝিয়া থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহার প্রমাণ ভারতবাসী পাইয়াছে। সুভাষচন্দ্রকে 'কুইশলিং' আখ্যা দান আর এক উজ্জ্বল অবিস্মরণীয় প্রমাণ।

চীনপন্থীদের বিভ্রান্তি সৃষ্টি

প্রসঙ্গত: সদ্য প্রকাশিত 'পরিচয়' নামক সাময়িক পত্রিকার একটি সংখ্যা দেখিতে দেখিতে পত্রিকার ১১৮ পৃষ্ঠা সংখ্যায় বড় বড় অক্ষরের হেডিং "ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প" চোখে পড়িতেই আমাদের চক্ষুস্থির হইয়া যায়। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই। জনৈক সুনীল সেন ভারতের প্রতিরোধ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ গবেষণা পাঠকদের উপহার দান করিয়া Duponts, Krupps, Vickers, Schneider প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। গবেষণায় যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন। ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, পরিসংখ্যা ইত্যাদি কিছুরই অভাব নাই। ভারতের প্রতিরোধ শিল্পের কথা বলিতে যাইয়া লেনিন এবং নেহরুর উক্তি বাদ যায় নাই। অধিকন্তু মেননের পক্ষে ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া দস্তুরমত সাফাই গাহিয়াছেন পরিচয়ের লেখক। রচনা শেষ হইয়াছে লেখকের ভাষায় "বহুনিন্দিত" কৃষ্ণ মেননের 'লিঙ্ক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অংশবিশেষের উদ্ধৃতিতে। মেনন না কি বলিয়াছেন :

'We have to tell our people, without timidity, that defence, even into goods, are less available from its own resources to a nation and that external resources are less patent in serviceability if we are not pogressive in production and development." (লিঙ্ক, ২৭শে জানুয়ারী)।

'প্রগ্রেস' এবং 'সার্ভিস' এর যে নমুনা মেনন সাহেব দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক দুষ্কীর্ত্তি হিসাবে দেশবাসী স্মরণে রাখিবে। পরিচয়ের লেখক বলিতেছেন "বিশেষ মহলের অবিশ্রান্ত প্রচারের প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য বোঝা কঠিন নয়।" লেখক যে কি বুঝাইতে চাহিলেন লক্ষ্য করিয়াও অনুধাবন করা যায় না। ভারতবর্ষের Defence সম্পর্কে এই দুর্ম্মূল্য থিসিসের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষের শত্রু যে কে বা কাহারা। কেনই বা ভারতের প্রতিরোধ শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে? কাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ হইবে প্রতিরোধের আয়োজন?

এই সকল বিষয়ে পরিচয়ের লেখকটি রহস্যজনক ভাবে নির্ব্বাক ও নিরুত্তর। মাও সে তুং-এর নামটুকু থাকিলেই দেশের পাঠক খুশী হইয়া লেখককে কিছু না হোক একটা ডি, ফিল উপাধিতে (বর্ত্তমানে এই উপাধি নাকি অতীব সুলভ) ভূষিত করিতে পারিত। আমরা জানি, স্বয়ং হিটলার অস্ত্র বিদ্যার রসদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন ভারতীয় অস্ত্রশাস্ত্রের ইতিহাস মন্থনে। অমৃতের আস্বাদ যেমন আছে ভারতীয় পুরাণে, হলাহলের সন্ধানও তেমনই পাওয়া যায় ভারতীয় শাস্ত্রে। প্রয়োজন সর্ব্বাধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পরূপায়ণের। ভারতের আত্মরক্ষার মন্ত্র ও অস্ত্র ভারতবর্ষই দান করিয়াছে। ভবিষ্যতেও করিবে। অতীতের ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয়।

চীন-পন্থীদের পঞ্চম বাহিনী সুলভ বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস কার্য্যকরী হইবে না। ভারত অচিরাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিবে দেশের মানুষের মৃত্যুপণ উদ্যোগে।

কলিকাতা পৌরসভার জঞ্জাল

জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা সাফ করিবার কাজ করিতে করিতে কলিকাতা পৌরসভা কেলেঙ্কারী ও আবর্জ্জনার ডিপো হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায় এই উক্তি কতটা পরিমাণে সত্য। মাছের হাটেও বোধ করি এইরূপ হৈ হট্টগোল শুনা যায় না। সেই সেকেলে কাউন্সিলরী চক্রান্ত আজও পৌরসভাকে অধিকার করিয়া আছে। ফল ভোগ করিতে হইতেছে নাগরিকদের—যাহাদের প্রদত্ত অর্থে পৌরসভার অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হইতেছে। আজ কলিকাতা যাহা চিন্তা করে আগামী কাল সমগ্র বাঙলা দেশ সেই চিন্তায় মগ্ন হয়। কলিকাতা পৌরসভার যখন এই অবস্থা তখন মফঃস্বলের পৌরসভাগুলি যে একই বাঁধাধরা পথে চলিবে, তাহাতে কোন ভুল নাই। স্বার্থ লইয়া দলাদলি কোন্দল হাতাহাতি পৌরসভার প্রতিনিধিদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। অবৈধ কাজ, ঘুষ গ্রহণ ইত্যাদি অপকর্ম্মের প্রতিযোগিতায় পৌরসভা হয়তো এখনও কতকাল প্রথম স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। 'সভা'র পিওন বেয়ারা হইতে শুরু করিয়া উপরওয়ালা পর্য্যন্ত একই পথের পথিক। এক যাত্রায় পৃথক ফল ভাল নয়। তাই বাম হাতে কিছু দাদন দান না করিলে কর্ম্মীদের ডান হাত কাজ করিতে সক্ষম হয় না। যেমন আমাদের আদালত সমূহে পেশকারদের দেখা যায়, বিচারকের সম্মুখেই তাহারা উপরি রোজগার করিতেছে। তেমনই উপরওয়ালাদের যোগসাজসে পৌরসভার সাধারণ কর্ম্মীরাও

অসাধ্যে অর্থ উপার্জন করিতেছে। সাধারণ লোক ধরিয়া লইয়াছে, ঘুষ না দিলে পৌরসভার কাহারও টনক নড়ে না। ঘুষের টাকা হাতে হাতে না দিলে কোন কাজ হয় না। শুনা যায়, সরকারের **anti-corruption** নামক একটি বিভাগ আছে। এই বিভাগের গতিবিধি পৌরসভাতেও অব্যাহত আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চোর ধরা পড়ে না, ঘুষ বন্ধ হয় না। এক্ষেত্রে যাহারা ঘুষ দেয় তাহাদের দোষ দিয়া লাভ নাই। কেন না বিনা ঘুষে কাজই হইবে না। ঘুষি খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে।

আধা-সরকারী পৌরসভার কাউন্সিলরবর্গ ধরিয়া লইয়াছেন, পৌরসভা অর্থে জমিদারী। ইহাদের একচেটিয়া প্রতিনিধিত্ব আইন মারফৎ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ভূতের মুখে 'রাম'নাম কদাচিৎ শুনা যায়। ওঝা এবং ভূতের একই সঙ্গে সহাবস্থান এক ভৌতিক ব্যাপারই বটে। তাই সরকার নিয়োজিত কমিশনারকে আমাদের কাউন্সিলররা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না। কমিশনারকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা চলিতেছে পদে পদে। কথায় বলে, রাম নামে যখন কাজ হয় না, ওঝার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, তখন ভূত তাড়াইতে কোন এক বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে চলে না। মূর্খের ঔষধ লাঠি, ভূতের মহৌষধি? হয়তো বা কমিশনার।

গণতন্ত্রের নমুনা

পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশ সমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি বিশেষ উল্লেখের অধিকারী এই উক্তি বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট নহে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে প্রবর্তিত গণতন্ত্রনীতি মাত্র এত অল্পকালের মধ্যে যে ভাবে জনসমাজে বিপুল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে তাহার তুলনা মেলা ভার। সুদীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের শোষণ যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্তি লাভের পর নব প্রবর্তিত গণতন্ত্রনীতি এক অনবদ্য স্বস্তির জগতে উপনীত করিয়া তুলিয়াছিল। বিদেশী শাসননীতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ মুক্তিস্নানে স্নাত হইয়া আলোকের সন্ধান পাইল, আপন ন্যায়সঙ্গত অধিকারের আশ্বাস পাইল, আপন ব্যক্তিত্বের সম্মান লাভ করিল ভারতসরকার অনুসৃত গণতান্ত্রিক ভাবধারায়। তথাপি কোন কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বিশেষ ইহার সমালোচনায় পঞ্চমুখ, ইহার ত্রুটি সন্ধানে বদ্ধপরিকর। তাঁহাদের এই সদাবিরোধী মনোভাবের প্রত্যুত্তরে আমরা লোক সভায় অনুষ্ঠিত একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। দেশের সাম্প্রতিক দুর্যোগের ঘনঘোর কৃষ্ণ মুহূর্তে যাঁহারা শত্রুকে পৃষ্ঠপোষণ করিয়া দেশের চরম সর্বনাশ ঘটাইয়া আপন স্বার্থসিদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর সেই সকল দেশদ্রোহীদের বন্দী করিয়া ভারত-সরকার দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য এক অভিনন্দনীয় নীতির পরিচয় দিয়াছেন। লোক সভার সাম্প্রতিক অধিবেশনে শ্রীভূপেশ গুপ্তের কোন প্রশ্নের উত্তর কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন ভারত সরকারের পক্ষ হইতে জানাইয়াছেন যে আগামী নির্বাচনে যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহেন তাঁহাদের মধ্যে বর্তমানে যাঁহারা প্রতিরক্ষা আইন অনুসারে বন্দী রহিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এ বিষয় কোন প্রকার বাধা আরোপিত হইবে না। এই দৃঢ়, স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ঘোষণায় ভারতের গণতন্ত্রনীতির আলোকোজ্জ্বল দিক কি প্রকটিত হয় না?

॥ শোক সংবাদ ॥

ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভূতপূর্ব সদস্য ও সরকারের চীফ হুইপ প্রসিদ্ধ শিল্পপতি ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ৬ই ফাল্গুন ৬৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ইনি উত্তরপাড়ার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইনি পরিচালক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের রাজনীতি ও ব্যবসায়ী জগতে একটি বিরাট আসন শূন্য হ'ল।

অবনীনাথ রায়

প্রবীণ সাহিত্যসেবী অবনীনাথ রায় গত মাঘে ৬৮ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। একদা গল্পলেখক হিসেবে বাঙলা-সাহিত্যের পাঠকসমাজে ইনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হন।

হরিকুমার চক্রবর্তী

বর্ষীয়ান বিপ্লবনায়ক ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য হরিকুমার চক্রবর্তী গত ২৭শে ফাল্গুন ৮০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। ১৯৫২ সালে ইনি কংগ্রেস মনোনয়নে রাজ্যবিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিপ্লবী নেতা ডক্টর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য গত ফাল্গুনে ৭৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি কিছুকাল 'লিবার্টি পত্রিকা'র ম্যানেজার পদে সমাসীন ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ সেন

শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ সেন ৬৯ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। উক্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসনে বাঙালীদের মধ্যে ইনিই প্রথম (এবং ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয়) অধিষ্ঠিত হন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]
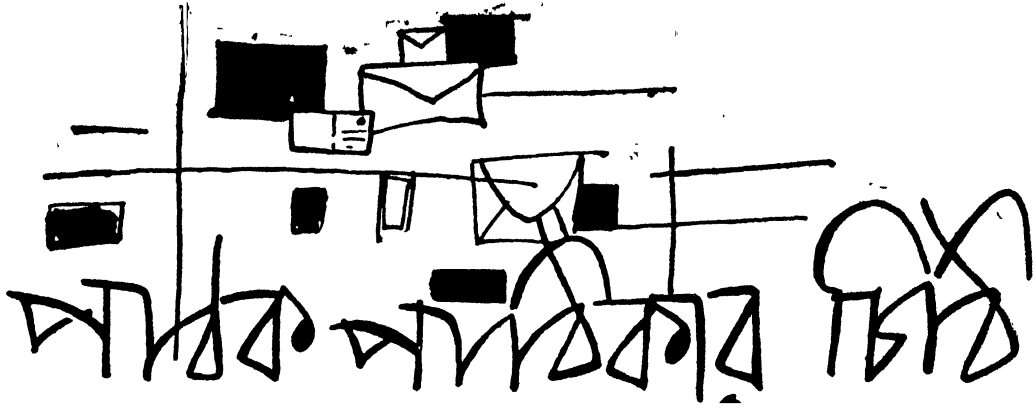
পত্রিকা সমালোচনা

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, মাসিক বসুমতী একটি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা, মাসিক বসুমতীর আমিও একজন অনেক দিনের পাঠিকা, আমি মাসিক বসুমতীকে ভালবাসি, তাই যখন একটি ভুল তথ্য দেখেছি, তার সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করি। মাঘ মাসের "চারজন" বিভাগে আপনারা চামেলী বসুর যে জীবনী পরিবেশন করেছেন, তাতে তথ্যগত একটা ভুল চোখে পড়ল, আপনারা লিখেছেন উনি বেথুন কলেজ থেকে বি-এস-সি পাশ করেন, সনটা বোধ হয় ১৯৩৫ বা অন্য কিছু, কিন্তু বেথুন কলেজে বছর ৫ ৬ হ'ল, বি-এস-সি কোর্স চালু হয়েছে। নমস্কারান্তে, সুপ্রীতি নান, ২৪, বেথুন রো, কলিকাতা-৬।

মহাশয়, বিগত পৌষ মাসের মাসিক বসুমতী আজ দিন কয়েক হল আমি প্রাপ্ত হয়েছি। ইহার ৪৮২ পৃষ্ঠায় "ভগীরথের শঙ্খধ্বনি" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দিলীপ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আয়ুর্বেবেদাচার্য্য চক্রপাণি দত্ত মহোদয় সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমি কিছু লিখিতেছি।

চক্রপাণি তৎপ্রণীত "চক্রদত্ত" গ্রন্থের যে শ্লোকে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"গৌড়াধিনাথ রসবত্যাধিকারী পাত্র—
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিত লোধ বলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী॥"

উপরোক্ত শ্লোকে চক্রপাণি আপনাকে গৌড়াধিপতির বাকসালার অধ্যক্ষ ও রাজমন্ত্রী নারায়ণের পুত্র অন্তরঙ্গ ভানুর অনুজ, প্রখ্যাত লোধ্রবলীকুলীন ও নীতিমান বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় মহাশয় চক্রপাণির পিতা নারায়ণ দত্ত মহোদয়কে মহারাজ নরপাল দেবের সভাসদ আখ্যায় পরিচয় দিয়েছেন।

অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী "বসুমতী" পত্রিকায় তাঁর ভ্রমপ্রমাদ দূর করিয়া আমার লিখিত উপরোক্ত বিবৃতি ছাপিয়ে জনসাধারণের নিকট উপস্থিতক্রমে বাধিত করিবেন।

আমি চক্রপাণি দত্ত মহোদয়ের ২২নং অধীনস্থ সন্তান। প্রয়োজন মনে করিলে চক্রপাণি দত্ত সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু আপনাকে আনন্দের সহিত প্রদান করিতে পারিব। ইতি—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, কালীনগর চা বাগান পোঃ—রামকৃষ্ণনগর (কাছাড়)।

মহাশয়, আমি বহুদিন যাবৎ মাসিক বসুমতী পড়িয়া থাকি। যখন আমি ভারত সরকারের চাকরী প্রসঙ্গে বিদেশে থাকিতাম, তখন আমি গ্রাহক ছিলাম, ডাকযোগে বই পাইতাম। বর্ত্তমানে চাকুরী হইতে অবসর লইয়া দেশে আসিয়াছি, এক্ষণে গ্রাহক নই—নিয়মিত খরিদ করিয়া থাকি। 'মাসিক বসুমতী'র প্রবন্ধগুলি আমি আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি। এই মাসে (১৩৬১ মাঘ সংখ্যায়) 'চারজন' বিশিষ্ট বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রীঅশোকচন্দ্র সেনের জীবনী পাঠ করিলাম। তিনি ঢাকা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এস-সি ক্লাসে ভর্ত্তি হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পরে অর্থশাস্ত্রে অনার্স লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন। শ্রীসেনের পাঠ্য-জীবন সম্বন্ধে আমার এইরূপ ধারণা, কারণ আমিও ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে অন্য শ্রেণীতে পড়িতাম। যদিও ইহাতে কিছু যায় আসে না, তথাপি আমার যাহা ধারণা, তাহা জানাইলাম। ইতি—শ্রীনিখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গুর এভিনিউ, পাতিপুকুর, কলিকাতা-২৮।

বেচতে চাই

মাসিক বসুমতী ১৩৬৪ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ বাদে সমস্ত। মাসিক বসুমতী ১৩৬৫ সালের ভাদ্র—পৌষ। কৃষ্ণা বসু, ১৬৮/ডি আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার, কলকাতা-৩।

সম্পাদক মহাশয়, প্রথমেই আপনি ও আপনার সহকর্ম্মিবৃন্দ আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি আপনাদের পত্রিকার গ্রাহকনা হলেও একজন নগণ্য পাঠক। 'মাসিক বসুমতী'-র সাথে আমার পরিচয় গত পাঁচ বছর যাবৎ। সেজন্যে মাসিক বসুমতীর প্রতি যেন একটা অলিখিত দাবী রয়ে গেছে। সে দাবীতেই আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। গত কয়েক মাস থেকে দেখছি মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা দু'টিতে দাঁড়িয়েছে। এই সংখ্যা কি বাড়ান যায় না? যদিও দুটো উপন্যাসই 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত উপন্যাসের মান ঠিক রেখেছে। আপনার বলিষ্ঠ সম্পাদনায় 'মাসিক বসুমতী' অনেক ভাল ভাল উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছে। 'মাসিক বসুমতী'কে ভালবাসি। তাই আশা করবো আপনি আরো দু'একটি উপন্যাস 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করবেন। আচ্ছা, অনুবাদিত বিদেশী সাহিত্যের Detective উপন্যাস কি মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ করা যায় না? কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক

কৌতুকী" খুব ভাল লেগেছে। এ ধরণের লেখা পেলে খুব খুশী হই। "পায়ে পায়ে কাদা" প্রশান্ত চৌধুরীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। "বার্দ্ধক্যে বারাণসীতে" নীলকণ্ঠ তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। ওঁনাদের দু'জনকে নমস্কার ও ধন্যবাদ জানাবেন। আরো একটি অনুরোধ, মাঝে মাঝে বিজ্ঞান জগতের নিত্য নূতন দু'একটি আবিষ্কারের সাথে যদি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন তবে খুব উপকার হয় তাতে পত্রিকার আকর্ষণও বৃদ্ধি পায়। আপনার প্রশংসা করা বাতুলতা। তবুও বলবো ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা মাসিক পত্রিকার মধ্যে আপনার সম্পাদনায় "মাসিক বসুমতী" তার আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল দেদীপ্যমান। পরিশেষে মাসিক বসুমতীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির ও সাফল্যের কামনা জানিয়ে শেষ করছি। নমস্কারান্তে—বিমলকুমার দত্ত—ফাইনান্স ও অ্যাকাউন্টস্ ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর ষ্টীল প্রজেক্ট। দুর্গাপুর-৩।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী গীতা সাহা, অবধায়ক—শ্রীপ্রিয়ব্রত সাহা, "উজ্জয়িনী" ডাক—গড়িয়া, জেলা—২৪ পরগণা * * * লেফটেনেণ্ট নিত্য লাল নাথ এল, এম, এফ ন্যাশানাল মেডিক্যাল ষ্টোরস, ডাক—সন্দীপ, চট্টগ্রাম, পূর্ব্ব পাকিস্তান * * * The Information Officer, State Information Centre, Govt. of Orissa, New Capital, Bhubaneswar (Orissa). * * * শ্রীমতী সতী সিং। "পুরী বিল্ডিং", ব্লক নং ১৪। 14th এ রোড, খার বোম্বাই ৫২, * * * শ্রীমতী গীতারাণী চক্রবর্ত্তী, অবধায়ক—ডাঃ কে, সি, চক্রবর্ত্তী এ, এম, ও, সেন্ট্রাল জেল, বেরিলি * * * শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভদ্র, গ্রাম—সাজবাবাত, ডাক—ঘামজিয়া, জেলা—ফরিদপুর (পূর্ব্ব-পাকিস্তান) * * * শ্রীএস কে চক্রবর্ত্তী, গ্রাম, ডাক—খাগরাবাড়ী, (আত্তারী ঘাট হয়ে) জেলা—দারং, আসাম * * * ডাঃ কে, এল, চ্যাটার্জ্জী এম, বি, মেডিক্যাল অফিসার সি, ও, ডি, জব্বলপুর (মধ্যপ্রদেশ) * * * শ্রীএন• চৌধুরী। গ্রন্থাগারিক, "মিলনী" ১১০।১৫৮ রামকৃষ্ণনগর, কানপুর * * * শ্রীসঙ্কর্ষণ দাস, Agent, English News Papers. P. O. Kendrapara (Cuttock) * * * শ্রীহিরণ্ময় দত্ত, Officer of the S. D. O. (P. W. D.) * * * J. B. R. C. Sub-Division, P. O. Khleihriat, Dist. U. K & G. Hills * * * "Somenath" C/o Dr. Hari Har Sengupta, Digultacrrang, T. E, P. O. Doom Dooma, Assam. * * * সচিব, বৈরামজী এফ• সি• ক্লাব, পোঃ—গরুমহিষানী, (টাটানগর হয়ে) ময়ূরভঞ্জ, উড়িষ্যা। Mrs. M. Dutta, 143—A fellows road. Garden Flat, London. N. W. 3 U, K. * * * শ্রীমতী মীনারাণী সাহা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড মেডিক্যাল হল, আজমগড়, উত্তরপ্রদেশ * * * শ্রীমতী হেমলতা সেনগুপ্ত, অবধায়ক—শ্রীএন, সেনগুপ্ত, কাঁটালবাগান, ষ্টাফ কোয়ার্টার, ধুবুলিয়া, নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

মণি অর্ডার যোগে ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। ১৩৬১ সালের বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—নিরুপমা ত্রিপাঠী, ভুবনেশ্বর।

১৩৬৯ সালের বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—শ্রীমতী রাণী সোম, বেগুসরাই, মুঙ্গের।

Annual subscription for Basumati—Kotulpur

মাসিক বসুমতীর জন্য বাৎসরিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—Maya Das, Bombay.

Herewith remitting Rs. 15/- for renewal till Ashar 1370 B. S.—Mrs, Ashima Ghose Dastidar, Lucknow, U. P.

১৫৲ টাকা গ্রাহক মূল্য বাবদ পাঠাইলাম—K. K. Vidya Mondir Inter College, Varanashi.

এই বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—শ্রীমতী আশালতা মিত্র, কলিকাতা।

মাসিক বসুমতীর অগ্রিম বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—শ্রীমতী অরুণা বসু, পুরুলিয়া।

Remitting herewith annual subscription for Masik Basumati.—Railway Institute Haflong, Assam.

Sending herewith Rs. 15/- for the payment of the Patrika 'Basumati' from Magh to next Pous. —Sevayatan Silpa Vidyalaya ; Midnapore.

মাসিক বসুমতীর জন্য ৬ মাসের ৭'৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম—শ্রীমতী ভারতী মুখার্জ্জী, শোলাপুর।

বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—ঝর্ণা দাশগুপ্ত, জলপাইগুড়ি।

This remittance of Rs. 7·50 is to meet my half-yearly subscription of Masik Basumati from Kartic to Chaitra of current B. S.—Sm. Geeta Rani Naug. Golgram, Midnapur.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক গ্রাহক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। —Dr. B. Mookherjee, Ranchi.

Sending a sum of Rs. 15/- as a subscription of Monthly Basumati for the year 1963-64—Paranpur Higher Secondary Multipurpose School, Malda.

Remitting annual subscription for the next year—Mrs. Maya Mittra, Dist. Kheri. (U. P.)

কার্ত্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ষান্মাসিক চাঁদা ৭'৫০ নয়া পয়সা মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠাইলাম—শ্রীমতী সতী দেবী, চম্পারন।

I am sending herewith subscription of Rs. 15/- for the magazine "Basumati" for a year (Falgoon to Magh)—Lady Principal, Govt. Girl's Multipurpose School, Chapra, Saran.

A sum of Rs. 15/- is remitted herewith to cover subscription for one year—Dr. B. Mazumder, Protapgarh.

Annual subscription of Rs. 15/- is sent herewith—Susama Devi. Raipur, (M. P.)

Subscription for one year from Magh 1369 to Pous 1370—Government Primery Training School, Krishnagar, Nadia.

Rs. 15/- is sent herewith as the annual subscription of Masik Basumati—Govt. Girl's H. S. & Multipurpose School, Krishnagar.

মাসিক বসুমতী
।। চৈত্র, ১৩৬১ ।।

(রেখাচিত্র

গাঁয়ের মে
—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

মাসিক বসুমতী

৪১শ বর্ষ—চৈত্র ১৩৬৯]　　॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥　　[২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জ্ঞান অর্থে সদৃশ বস্তুর সহিত মিলন।··· কোন নূতন সংস্কার আসিলে যদি তোমাদের মনে উহার সদৃশ সংস্কার সকল পূর্ব হইতেই বর্তমান থাকে, তবেই তোমরা তৃপ্ত হও, আর মিলন বা সংযোগকেই জ্ঞান বলে। অতএব জ্ঞান অর্থে পূর্ব হইতে আমাদের যে অনুভূতি-সমষ্টি রহিয়াছে, তাহাদের সহিত আর একটি অনুভূতিকে এক খোপে পোরা। আর তোমাদের পূর্ব হইতেই একটি জ্ঞানভাণ্ডার না থাকিলে যে নূতন কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, ইহাই তাহার অন্যতম প্রবল প্রমাণ।···কারণ, জ্ঞান অর্থেই পূর্ব হইতেই যে সংস্কারসমষ্টি অবস্থিত, তাহার সহিত তুলনা করিয়া নূতনের গ্রহণ মাত্র।···মনে কর, একটি শিশু এই জগতে জন্মগ্রহণ করিল, যাহার এই জ্ঞানভাণ্ডার নাই; তাহা হইলে তাহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করা একেবারে অসম্ভব; অতএব শিশু পূর্বজ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কারণ কার্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, উহা সূক্ষ্মাকারে আসিয়া পরে বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা। রসায়ন-তত্ত্বান্বেষী নিজের পরীক্ষাগারে গিয়া, নিজের মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি যে সকল বস্তু বিশ্লেষণ করিতেছেন, তাহাদের উপর প্রয়োগ করেন এবং এইরূপে তাহাদের রহস্য অবগত হন। জ্যোতির্বিদ্ নিজের মনের সমুদয় শক্তিগুলি একত্রিত করিয়া তাহাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া আকাশে প্রক্ষেপ করেন, আর অমনি সূর্য, চন্দ্র, তারা ইহারা সকলেই আপন আপন রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করে। আমি যে বিষয়ের কথা কহিতেছি সে বিষয়ে আমি যতই মনোনিবেশ করিতে পারিব, ততই সেই বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারিব। তোমরা আমার কথা শুনিতেছ; তোমরাও যতই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে, ততই আমার কথা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিবে।

মনের একাগ্রতাশক্তি ব্যতিরেকে আর কিরূপে জগতে এই সকল জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে? প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত প্রদান করিতে জানিলে—তথায় যেরূপ ধাক্কা দেওয়া প্রয়োজন, তাহা দিতে জানিলে প্রকৃতি তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন এবং সেই আঘাতের শক্তি ও তেজ একাগ্রতা হইতেই আসে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই; উহা যতই একাগ্র হয়, ততই উহার শক্তি এক লক্ষ্যের উপর আসে এবং ইহাই রহস্য।

নিকৃষ্ট মানুষ হইতে সর্বোচ্চ যোগী পর্যন্ত সকলকেই জ্ঞানলাভের জন্য এই একই উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

চিকাগো বক্তৃতা : স্বামী বিবেকানন্দ

সুতরাং হিন্দুর পক্ষে সমস্ত ধর্মজগৎটা নানারুচিবিশিষ্ট নর-নারীর, নানা অবস্থার মধ্য দিয়া সেই একমাত্র ঈশ্বরোপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মনুষ্যকে ব্রহ্মে পরিণত করিতে নিযুক্ত এবং সেই এক ঈশ্বরই সকল ধর্মপথ প্রকাশ করিয়াছেন; তবে ধর্মগুলি পরস্পর এত বিরুদ্ধভাবাপন্ন কেন? হিন্দু বলেন—আপাতদৃষ্টিতে ওরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে;—ভিন্নাবস্থাপন্ন বিভিন্নপ্রকৃতি লোকের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই এরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে।

হিন্দুধর্মের উদারতা

একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্য দিয়া আসিতেছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেখাইতেছে। প্রত্যেক স্বভাবের উপযোগী হইবে বলিয়া এই সকল বিভিন্নতা আবশ্যক। কিন্তু সকলেরই অন্তস্তলে—প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই সেই এক সত্য রাজত্ব করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণাবতারে ঈশ্বর বলিয়াছেন, "মণিগণ যেমন সূত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সমস্ত ধর্মই সেইরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে।" "যাহা কিছু অতিশয় প্রভাবশালী বা অতিশয় সুন্দর ও পবিত্র, তাহা আমার শক্তিসম্ভূত বলিয়া জানিবে।" এই শিক্ষার ফল কি? আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে—হিন্দুই একমাত্র মুক্তির অধিকারী, আর কেহ নহে, এরূপ ভাব কেহ দেখাইতে পারিবে না। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বলিতেছেন, "ভিন্নজাতীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই।"

হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সমন্বয়

আর এক কথা! কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সর্বতোভাবে আস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট হিন্দুগণ অজ্ঞেয়-বাদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বরবাদী জৈনদিগের মতে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন? বৌদ্ধ ও জৈনেরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন না সত্য, কিন্তু মনুষ্যের ভিতর দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব আনয়ন করাই তাঁহাদের ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। উঁহারা স্বতন্ত্র ভগবান্ মানুন বা না-ই মানুন, আপনাকে দেবতা করাই উঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সকল ধর্মের উদ্দেশ্যও তাহাই। তাঁহার জগৎপিতা জগদীশ্বরকে দেখেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রস্বরূপ আদর্শ মনুষ্য বুদ্ধদেব বা জিনকে দেখিয়াছেন এবং পুত্রকে দেখিলেই পিতাকে দেখা হইল।

সার্বভৌমিক ধর্ম

ভ্রাতৃগণ, হিন্দুধর্মের সংক্ষিপ্ত ভাব এই আমি তোমাদের নিকট বিবৃত করিলাম। হিন্দুগণ আপনাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া অনেক বিষয়ে হয় তো সফলকাম হয়েন নাই, কিন্তু যদি কখনও এক সর্ববাদিসম্মত ধর্মের উদ্ভব হয়, তাহা কখনও দেশ-কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইবে না; যে অনন্ত ভগবানের বিষয় উপদেশ করিবে, তদ্রূপ অনন্ত হইবে; সেই ধর্মসূর্য্য কৃষ্ণভক্ত বা খৃষ্টভক্ত, সাধু বা অসাধু সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম বা খৃষ্টিয়ান ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম হইবে না। পরন্তু সকলের সমষ্টিস্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির অনন্ত পথ মুক্ত থাকিবে; সেই ধর্ম এতদূর সার্বভৌমিক হইবে যে, তাহা অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে; যাহাদের বুদ্ধি পশুতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এরূপ মনুষ্য হইতে যাঁহারা স্ব স্ব হৃদয়-মনের উৎকৃষ্ট গুণরাশি দ্বারা সমস্ত মানবজাতির উপরে স্থান পাইয়াছেন সমাজ যাঁহাদিগকে সাধারণ মনুষ্য বলিতে সাহস না করিয়া দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন, সেই সমুদয় নরপুঙ্গবগণ পর্য্যন্ত সকলেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দান করিবে। সেই ধর্ম এইরূপ হইবে যে উহাতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না, প্রত্যেক নরনারীকে দেবস্বভাব বলিয়া স্বীকার করিবে এবং উহার সমুদয় শক্তি সমস্ত মনুষ্যজাতিকে স্ব স্ব দেবস্বভাবোপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে।

এইরূপ সার্বভৌমিক ধর্ম দান কর, সমস্ত জাতিই তোমার অনুবর্ত্তী হইবে। অশোকের ধর্মসভা কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের জন্য হইয়াছিল। আকবরের ধর্মসভায় যদিও সকল ধর্মের স্থান ছিল কিন্তু উহা একটি ক্ষুদ্র গৃহেই সীমাবদ্ধ ছিল। "প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর আছেন"—সমস্ত জগতে ইহা ঘোষণা করিবার ভার আমেরিকার জন্যই ছিল।

যিনি হিন্দুদিগের ব্রহ্ম, পারসীকদিগের অহুর মজ্দা, বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, মুসলমানদিগের আল্লা, য়াহুদীদিগের জিহোবা, খৃষ্টিয়ানদিগের স্বর্গস্থ পিতা, তিনি তোমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করুন। পূর্বগগনে নক্ষত্র উদিত হইল, কখনও উজ্জ্বল কখনও হীনপ্রভ হইয়া ধীরে ধীরে পশ্চিমগগনে গমন করিল। ক্রমে সমস্ত জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া সহস্রগুণ উজ্জ্বলভাবে পুনরায় পূর্বগগনে উদিত হইতেছে। স্বাধীনতার মাতৃভূমি দেবি কলম্বিয়া,* তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ হস্তকে কলঙ্কিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহরণ করিয়া আপনি সহজে ধনশালিনী হইবার চেষ্টাও পাও নাই। সুতরাং তুমিই সভ্য জগতের পুরোভাগে গমন করিয়া শান্তিপতাকা উড়াইবার অধিকারিণী।

(২০শে সেপ্টেম্বর। দশম দিবসের অধিবেশন)

"দরিদ্র পৌত্তলিক"

খৃষ্টিয়ানগণের সর্বদাই সৎ সমালোচনার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত এবং আমার বোধ হয় যে, যদি আমি তোমাদের কোনও ভ্রম-প্রমাদ দর্শাইয়া দিই, তোমরা তাহাতে কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইবে না। হে খৃষ্টিয়ানগণ, তোমরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের নিকট ধর্মপ্রচারক পাঠাইতে ব্যস্ত, কিন্তু বল দেখি, অনাহারে হস্ত হইতে তাহাদের দেহ উদ্ধারের জন্য কোনরূপ যত্ন কর না কেন ভারতবর্ষের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী ক্ষুধা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু হে খৃষ্টিয়ানগণ, তোমরা তদ্বিষয়ে কোন মনোযোগ কর না। তোমরা সমুদয় ভারতবর্ষে ধর্মমন্দির নির্মাণে

* কলম্বস্ দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া আমেরিকার অন্য এক নাম—কলম্বিয়া।

জন্য ব্যস্ত; কিন্তু ভারতবাসীদের ধর্ম প্রচুর পরিমাণে আছে। তাহারা শুষ্ককণ্ঠে কেবলমাত্র অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, আমরা তাহাদিগকে প্রস্তরখণ্ড দিতেছি। ক্ষুধার্ত্ত লোকদিগকে ধর্ম্মের কথা বলা বা তাহাদিগকে দর্শনশাস্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ভারতবর্ষে যদি কোন ধর্ম্মপ্রচারক পারিশ্রমিক লইয়া ধর্মপ্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিচ্যুত ও সর্ব্বতোভাবে ঘৃণিত হইতে হয়। আমি আমার গ্রাসাচ্ছাদনহীন স্বদেশীয়গণের জন্য তোমাদের নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি; কিন্তু খৃষ্টিয়ানমণ্ডলীর নিকট পৌত্তলিকদের জন্য সাহায্য লাভ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছি।

[ইহার পর সনাতন ধর্ম্মের পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া তিনি বক্তৃতা শেষ করিলেন]।

(২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার দ্বাদশ দিবসের অধিবেশনে হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ই অধিক বলা হইয়াছিল। সে দিবস স্বামী বিবেকানন্দ সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছিলেন। নানা মতাবলম্বী নরনারীগণ তাঁহাকে আগ্রহাতিশয় সহকারে শত শত ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনিও তখনই অতি নিপুণতার সহিত সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছিলেন। তিনি সে দিবস তাঁহাদের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এতদূর কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে আর এক দিবস অপূর্ব্ব বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন, তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হয়েন)।

(২৬শে সেপ্টেম্বর ষোড়শ দিবসের অধিবেশন)

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ

সভাপতি মহাশয়, ভ্রাতৃমণ্ডলী ও উৎসাহদাতৃগণ, আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন যে আমি বৌদ্ধ নহি, কিন্তু আমি বৌদ্ধ, ইহা বলিলেও দোষ হয় না। চীন, জাপান ও সিংহল সেই লোকগুরু বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করিতে পারেন, কিন্তু ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করেন। আপনারা ইতিপূর্ব্বে শুনিলেন যে আমি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু তাহার অর্থ দোষ দর্শান নহে; যাঁহাকে আমি ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করি, তাঁহার দোষ দর্শান আমার অভিপ্রায়ই নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। য়াহুদীধর্ম্মের সহিত খৃষ্টিয়ানধর্ম্মের যে সম্বন্ধ, হিন্দুধর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান কালের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। যীশুখৃষ্ট য়াহুদীজাতীয় ও শাক্যমুনি হিন্দুজাতীয় ছিলেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, য়াহুদীগণ যীশুকে পরিত্যাগ করিলেন এবং এমন কি ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন, হিন্দুগণ কিন্তু শাক্যমুনিকে ঈশ্বরের উচ্চাসন দিয়া এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বুদ্ধদেবের যথার্থ শিক্ষার পার্থক্য আমরা প্রধানতঃ এই দেখাইতে চাই যে, শাক্যমুনি কোন নূতন মত প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর ন্যায় তিনিও পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন নাই। প্রভেদ এইটুকু যে, প্রাচীন য়াহুদীগণই নূতন ধর্ম্মপুস্তককে প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকের পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কিন্তু এদিকে বুদ্ধদেবের শিষ্যগণই বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মস্থ সত্যসমূহেরই পরিণতি, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নহে; হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি, স্বাভাবিক বিকাশ হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড; সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিয়া থাকেন। জ্ঞানকাণ্ডে জাতিভেদ নাই। অতি উচ্চবর্ণের লোকের সন্ন্যাসে যেরূপ অধিকার অতি হীনবর্ণের লোকেরও সেই রূপ অধিকার—সন্ন্যাস হইলে উভয়েই সমান। যথার্থ ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই; জাতিভেদ কেবল সামাজিক অবস্থানুসারে হইয়া থাকে। শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন এবং বেদে যে সমুদয় সত্য সুগুপ্ত ছিল, তাঁহার উদার হৃদয় সেই সমুদয় সত্যকে পৃথিবীর যাবতীয় জনসাধারণের গোচর করিয়া দিয়াছিল। জগতে কার্য্যতঃ ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে তিনিই সকলের আদিগুরু, তিনিই প্রথমে অন্য ধর্ম্ম হইতে স্বীয় ধর্ম্মে বহু লোক আনয়ন করিয়া লোকদিগকে ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে আনিবার পথ দেখাইয়াছেন।

সকলের প্রতি, বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিদ্রগণের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতিতেই তাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত। কতিপয় ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য ছিলেন; যে সময়ে বুদ্ধ স্বীয় মত প্রচার করিতেন সে সময় সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষে কথিত হইত না? ইহা সে সময়ে পণ্ডিতদের পুস্তকেই দেখা যাইত। বুদ্ধদেবের কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁহার উপদেশসকলকে সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করিতে চাহিলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, "আমি দরিদ্রের জন্য ও জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি। আমি চলিত ভাষায় উপদেশ দিব।" এবং আজ পর্য্যন্তও তাঁহার অধিকাংশ উপদেশাবলী সেই সময়কার চলিত ভাষায় লিখিত।

দর্শনশাস্ত্র যত উচ্চ আসন গ্রহণ করুক ও যাহাই বলুক না কেন, যতদিন জগতে মৃত্যু বলিয়া কোন ব্যাপার থাকিবে, যতদিন মানবহৃদয়ে দুর্ব্বলতা বলিয়া কোন এক ভাব থাকিবে, যতদিন মানব স্বীয় দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি উত্থিত করিবে, ততদিন ঈশ্বরেও বিশ্বাস থাকিবে। দর্শনশাস্ত্রের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সেই লোকগুরু বুদ্ধের শিষ্যগণ বেদরূপ সনাতন অচলের উপর বহুবেগে আক্রমণ করিলেন কিন্তু তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অপর দিক্ দিয়া দেখিলে, সমুদয় নরনারী যে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সাদরে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই সনাতন পুরুষকে সমগ্র জাতির নিকট হইতে অপহরণ করিলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষে উক্ত ধর্ম্মের মৃত্যুই স্বাভাবিক হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান কালে সেই বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমি ভারতে এমন একটিও পুরুষ বা স্ত্রী নাই, যিনি আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেন।

আর এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহাতে হিন্দুধর্ম্মও কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেই সমাজসংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূর্ব্ব সহানুভূতি ও দয়া, সর্ব্বসাধারণের ভিতর পার্থক্যভাব ঘুচাইয়া দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সকলের ভিতর যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, যাহা ভারতবর্ষীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান্ করিয়াছিল যে, কোন গ্রীসদেশীয় পুরাতত্ত্বলেখক তদানীন্তন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিবার সময় বলিয়াছেন, কোনও হিন্দু মিথ্যা কহেন না এবং কোনও হিন্দুরমণী অসতী নহেন। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানে হিন্দুগণ এইগুলি হারাইলেন।

যায়। এই দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; পরে হিন্দুধর্মের অবনতি ও বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে সুক্ষেশ্বরী দুর্গার স্থান অধিকার করেন ; পরে বৌদ্ধধর্মের বিলোপে পুনরায় দশভুজার পূজানুষ্ঠানের চেষ্টা হয় নি এই মনে করে যে বৌদ্ধদের স্পর্শে দেবী অপবিত্রা হয়েছেন ; সুতরাং অবহেলায় তিনি পড়ে আছেন সুক্ষেশ্বরীর পার্শ্বে। পূজাদির ব্যবস্থা এখন নামমাত্র। শারদীয়া দুর্গোৎসবের দিন কয়টি এখানে বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হয় ; বলিদান-সহ বিশেষ পুজোর রীতি এখনও চলে আসছে। বলি প্রদত্ত হয় সুক্ষেশ্বরীর উদ্দেশ্যেই। কারও কারও ধারণা দশভুজাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইছাই ঘোষ।

ইছাই ও লাউসেনের কাহিনী ধর্মমঙ্গল থেকে জানা যায়,—স্বর্গের অপ্সরা অম্বুবতী শাপভ্রষ্টা হয়ে গৌড়ের মহিন্তাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কন্যার পিতামাতার নাম যথাক্রমে বেণুরায় ও মন্থরা ; রঞ্জাবতী ছিল কন্যার নাম। গৌড়েশ্বরের শ্যালক মন্ত্রী মহামদা অত্যাচারী ছিল ; রাজকর না দেওয়ার ফলে মহামদা সোমঘোষ নামে এক গোপকে কারারুদ্ধ করেন ; কিন্তু গৌড়েশ্বরের অনুগ্রহে সোমঘোষ মুক্ত হয়ে রাজার বিশেষ বিশ্বাসভাজন হন এবং ত্রিষষ্টির গড়াধিপতি কর্ণসেনের রাজ্যে গিয়ে খাজনা আদায় করার ভার গ্রহণ করেন, তখন পুত্র ইছাই ঘোষ শিশুমাত্র। শিশু-অবস্থা থেকেই ইছাই ছিলেন ভবানীর ভক্ত। দীক্ষান্তে শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ইছাই বিশেষ শক্তিমান হন। পিতার উপর মহামদের অত্যাচার ইছাই ভুলতে পারেন নি। উপরন্তু গৌড়াধিপতির উপরও তাঁর ক্রোধ ছিল। গৌড়ের সামন্তরাজ কর্ণসেনকে রাজ্য থেকে তাড়াতে পারলে গৌড়েশ্বর তথা মহামদার উপর খানিকটা প্রতিশোধ নেওয়া যায় এই মনে করে নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারা এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে তার সাহায্যে ইছাই কর্ণসেনকে তাড়িয়ে দেন গড় থেকে।

এর পর ইছাই তাঁর উপাস্য দেবতা শ্যামারূপাকে গড়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর গড়ের নাম দিলেন অজয় ঢেকুর। এদিকে বিতাড়িত কর্ণসেন ছয় পুত্রসহ গৌড়েশ্বরের নিকট সমস্ত নিবেদন করলেন। প্রথমে মহামদা পরওয়ানাসহ এক ভাটকে পাঠিয়ে দিলেন ইছাই-এর কাছে। ইছাই ভাটকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দেন ; তখন অনেক সৈন্য দিয়ে পুত্রসহ কর্ণসেনকে পাঠান হল ইছাইকে দমন করার জন্য, কিন্তু সেই যুদ্ধে কর্ণসেনের সব ছেলেই মারা যায়। কর্ণসেন-পত্নী এই সংবাদে শোকে দেহত্যাগ করলেন। তখন কর্ণসেন সন্ন্যাস গ্রহণ করলে গৌড়াধীশ্বর তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দেন এবং যৌতুকস্বরূপ ময়নাগড় পরগণা দান করেন। রঞ্জাবতীকে ভালবাসত মহামদা ; কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে কিছু না করতে পেরে তিনি চটে গেলেন কর্ণসেনের উপর। এদিকে ধর্ম উপাসনা করে রঞ্জাবতী লাউসেনকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

লাউসেনের উপর মহামদার অনেক অত্যাচার চলল ; কিন্তু ধর্মের বরে লাউসেনের কোনো ক্ষতি হয় নি। লাউসেন পরম ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয় ও শক্তিমান বীর হয়ে উঠলে মহামদা এক চক্রান্ত করলেন ; তিনি লাউসেনকে আদেশ দিলেন ঢেকুরে ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযান করতে ; তাঁর আশা, ইছাই-এর হাতে লাউসেনের মৃত্যু নিশ্চিত ; কিন্তু ফল হল বিপরীত। লাউসেন যুদ্ধে ইছাইকে নিহত করে ঢেকুরগড়ের অধিকার গ্রহণ করলেন। লাউসেন পত্নী কানাড়াকে বিয়ে করেন শ্বশুরকে যুদ্ধে পরাজিত করে। কানাড়ার গর্ভে চিত্রসেন নামে লাউসেনের এক পুত্র হয়। লাউসেন কামরূপের রাজা কর্পূরধবলকে পরাজিত করেন।

হাণ্টার সাহেব লাউসেন ও ইছাই ঘোষের কথা তাঁর গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। লাউসেনের কাহিনী তিব্বতীয় তারানাথের গ্রন্থে আছে ; খালিমপুরের তাম্রশাসন থেকে এই সত্যতা ধরা পড়ে। নানা কারণে মনে হয়, ইছাই ঘোষ ঢেকুরের অধীশ্বর ছিলেন নবম বা দশম শতকের প্রথমের দিকে। লাউসেনকেও ঐ সময়ের লোক বলা যেতে পারে। সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেন রাঢ়দেশ অধিকার করলেও তাঁর পুত্র বল্লাল সেনের সময়েই সমগ্র রাঢ় অধিকৃত হয়। এই সময় ঢেকুরগড়ও তাঁর অধিকারে আসে মনে হয়। ঢেকুরগড়ের অন্য নাম শ্যামারূপার গড় ; ইছাই ঘোষ এই গড় অধিকার করে তাঁর উপাস্য দেবতা শ্যামারূপাকে ঐ গড়ে প্রতিষ্ঠিত করেন ; সেই থেকে এখন পর্যন্ত এই স্থানটি শ্যামারূপার গড় নামেই অভিহিত হয়ে আসছে। আজও ইছাই ঘোষের দেউল বা বিজয়স্তম্ভ চোখে পড়লে আপনা থেকেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে যদি গড়টি খুঁড়ে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয়, তবে হয়ত কত ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে বাংলার ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্ট হবে। এখানে যে বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস লুকোনো আছে তার সাক্ষ্য বহন করছে ইছাই-এর বিজয়স্তম্ভ, সেনপাহাড় ও শ্যামারূপার গড়।

মুশাফিরী প্রেম

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

বন্ধুর বন্ধানে স্বপ্ন-প্রতিম সেই গ্রামে
মেঘের অরণ্যে তখন দাবাগ্নি সন্ধ্যা নামে।
মর্মরিত পাইনের বনে
পথ হারিয়ে আমরা দু' জনে
বেঁধেছিলাম ক্ষণ-মিতালীর গ্রন্থি,
দু'টি হৃদয়ের সর্তবিহীন সন্ধি :

সাতটি দিনের ক্লান্তিবিহীন প্রণয় খেলা,
সাতটি ঊষায় চারি নয়নের বিস্ময় চোখ মেলা।
সাতটি দিনের দু'টি হৃদয়ের নিঃসীম ব্যাকুলতা,
সাতটি রাতির দু'টি তনিমার উন্মাদ আকুলতা।
হে নীলাঞ্জনা !
ভুলেছ কি সবি নবাগত কোন অনুরাগে,
তব দেহসৌরভ মোর অঙ্গে মেলাবার আগে ?

বৌদ্ধধর্মের পটভূমিকা

ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবান বুদ্ধ 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'রই এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। খৃষ্টপূর্ব ছয় শতকে জাতীয় জীবনের এক বিশেষ যুগে এই দীপ্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হয়। প্রাচীন ইতিহাসে এই যুগ উজ্জ্বল ও গৌরবময়। ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি অবস্থাই বৌদ্ধধর্মের পটভূমিকা। এখানে এ সবের একটু আলোচনা করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক অবস্থা: এই মহাপ্রাণ পুরুষ গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শুধু তাই-ই নয় এই রাজ্যের অধিপতিগণ পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকায় কেউ-ই বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হন নি। তখন অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বৃজি, মল্ল, চেদী, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার, কম্বোজ এই ষোলটি রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল। এগুলোই বৌদ্ধ সাহিত্যের ষোড়শ মহাজনপদ। এদের অধিকাংশই রাজতন্ত্র এবং কয়েকটিতে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজতান্ত্রিক মগধ, কোশল, বৎস, অবন্তী প্রভৃতি বিশেষ পরাক্রমশালী রাজ্যের রাজাদের অন্য রাজ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিরোধ, বিদ্রোহ লেগেই থাকত। গণতন্ত্রশাসিত রাজ্যগুলোর মধ্যে বৃজি, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক প্রভৃতি গোষ্ঠীর মিলিত রূপ—বৃজি রাজ্যই ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বৈশালী। কিন্তু কোন রাজা না থাকায় এই রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার থাকত একটি সমিতির উপর। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বৃজি রাষ্ট্র ছাড়া আরও কয়েকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সামাজিক অবস্থা: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ বিভাগ ছিল এই যুগের এক বৈশিষ্ট্য এবং পরবর্তীকালে এই প্রথাই কঠোর জাতিভেদের আকার ধারণ করে। এযুগে ব্রাহ্মণেরা সমাজের উচ্চকোঠায় বসে একদিকে যেমন প্রবল আধিপত্যে সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন, অন্যদিকে তেমনই শাস্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ ও পৌরোহিত্য করতেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ-ব্যবসা ও রাজ্যশাসন করতেন, বৈশ্যরা করতেন কৃষিকাজ, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য আর শূদ্ররা সমাজের নীচু কোঠায় থেকে করতো সমাজের দাসত্ব। তাই এই শূদ্রের ভাগ্যেই জুটত যত অবহেলা, অপমান ও লাঞ্ছনা। জাতিভেদ প্রথা এই সময় জন্মগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় একদিকে ব্রাহ্মণেরা যেমন অহংকারী ও আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন অন্যদিকে বৈশ্যরাও তেমনই বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করে হয়ে উঠেছিলেন ব্যয়বিলাসী ও সুখভোগী। স্ত্রীলোকের অবস্থা বেশ ভাল ছিল না কারণ তারা গার্হস্থ্য সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত। আবার সমাজে বহুবিবাহের যেমন প্রচলন ছিল তেমনই অসবর্ণ বিবাহেরও অভাব ছিল না। উচ্চ তিন শ্রেণীর পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাও অতি স্বল্পভাবে।

আর্থিক অবস্থা: এ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য অজ্ঞাত ছিল না। সমুদ্রপথে বণিকেরা দেশে-বিদেশে পণ্যদ্রব্য বিক্রী করে যে, বেশ বিত্তশালী হয়ে উঠত সে কথার নিদর্শন আমরা বৌদ্ধ ও জৈনসাহিত্য হতে পেয়ে থাকি। দেশের মধ্যে শকটে করে এবং নদীতীরবর্তী দেশ সমূহে নৌকাতে মাল আদান প্রদান করে বহুসংখ্যক লোক প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। এছাড়া অনেক প্রকার শিল্পকলারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সূত্রধর, কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় চর্মকার প্রভৃতির জীবিকানির্বাহের হাতিয়ার ছিল তাদের শিল্পকর্মই। রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন তখনও হয় নি। আবার ব্যাঙ্কের প্রচলন না থাকায় মাটির নীচেই সোনাদানা পুঁতে রাখা হত। উচ্চস্তরের লোকের আর্থিক অবস্থা উন্নতই ছিল কিন্তু নিম্নশ্রেণীরা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই—তাদের না ছিল সম্মান, না ছিল সম্পদ।

ধর্মগত অবস্থা: এ যুগে কয়েকটি দেশেই ধর্মজগতে এসেছিল চিন্তার এক বিরাট আলোড়ন। গ্রীসে পারমেনেডেস (Parmenides) ও এমপোডেকিলস্ (Empedocles) ইরাণে জোরোসথ্রিয়া (Zorathustra) চীনে লাও-সে (Lao-tse) ও কনফুসিয়াস (Confucius) এবং ভারতের মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ—এঁদের আবির্ভাবই এনেছিল এই জোয়ার।

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারতের ধর্মসাধনায় চলেছিল এক বিপ্লবের স্রোত। বৈদিক রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপে দেশ আচ্ছাদিত আবার যজ্ঞানুষ্ঠানের নামে ভারতভূমি পশুরক্তে প্লাবিত—দেশের যখন এইরূপ অবস্থা ঠিক তখনই আবার চলে ব্রাহ্মণের প্রচার—শুধু বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমেই হবে ধনাগম, আসবে অটুট স্বাস্থ্য, লাভ হবে একদিকে বিশুদ্ধ বস্তু অন্যদিকে ইহজগতে ও পরজগতে অপার সুখ ও শান্তি। যজ্ঞই মানবের কল্যাণের একমাত্র পথ—এই-ই ছিল তাঁদের মূল প্রচার্য। মানে এ হ'ল—

"কর্মেরে করেছে পংগু নিরর্থ আচারে।
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্র কারাগারে।"

কিন্তু বৈদিক এই ক্রিয়াকাণ্ড, যার উপর দেওয়া হত এত প্রাধান্য, তা মানুষের মনে কখনও প্রকৃত সুখ ও শান্তি দিতে পারেনি। এতে মানুষ হয় তো বা ক্ষণিকের সুখ পেতো কিন্তু বুঝতে পারতো না যে যজ্ঞানুষ্ঠান মানবের চিরস্থায়ী কল্যাণ আনতে পারে না—বুঝতো না যে দুঃখ-দুর্দশার নিষ্করুণ হাত হতে এড়ানোর স্থায়ী উপায় এতে নাই। এইভাবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব সমাজ-জীবনে শিথিল হতে থাকে। মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে মানব-জীবনের চরম সত্যে উপনীত হওয়া

ও পরমপথ লাভ করা, আরাম হ'তে ছিন্ন হয়ে সেই গভীরে ডুব দেওয়া যেখানে অশান্তির অন্তরেও থাকবে সুমহান শান্তি। তাই সত্যসন্ধী চিন্তানায়কগণ এ মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ও বীতরাগ জানিয়ে আগিয়ে যেতে চাইলেন পরম পুরুষার্থলাভের সাধন পথে। তাঁদের এই গভীর জীবন প্রেরণায় উদ্ভব হ'লো এক নূতন জীবন-প্রণালীর। এ জীবন ত্যাগের জীবন—ক্ষুদ্র তুচ্ছ ভোগ-বিলাসের জীবন নয়। এইভাবে উৎপত্তি হল চারিটি আশ্রমের, যেখানে প্রবেশলাভের জন্যে কবির কথায় আজও আমরা বলি,—

'মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।'

এই চারিটি আশ্রম বলতে বোঝায় জীবনেরই চারিটি অবস্থা—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রথম অবস্থায় প্রত্যেককে উপনয়ন গ্রহণ করে গুরুগৃহে পবিত্রভাবে শাস্ত্রাধ্যয়নে ছাত্রজীবন যাপন করতে হতো। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করে বিবাহ প্রভৃতির দ্বারা সংসারধর্ম পালন করতেন এবং প্রৌঢ় বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে সংসারমুক্ত হয়ে অরণ্যে কুটির বেঁধে ধর্মচিন্তায় কালযাপন করতেন। অবশেষে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে সাংসারিক সকল মায়াবন্ধন ছিন্ন করে লোকালয়ের বাইরে পরমার্থ চিন্তায় জীবন কাটানোই ছিল শেষ লক্ষ্য। তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমে—বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসে ধ্যান, সমাধি, সম্যগ্ জ্ঞান ও চরম শান্তিলাভের বিশেষ উপযোগী। তাই মানুষের চিন্তাধারা ও মননশক্তি ক্রমশ এসব কর্মকাণ্ডের অন্ধবিশ্বাস হতে মুক্তিলাভ করে হ'ল যুক্তি ও বিচারমুখী। তারা বুঝতে পারল জ্ঞানই চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভের প্রশস্ত উপায়—

"সেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি,
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি"—

বৈদিক কর্মকাণ্ডের নয়। উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারা হতে জানা যায়···মোক্ষ বা মুক্তি ও অপার শান্তি লাভের জন্য মানুষের কি দুর্বার আকুতি। অধিকাংশ গ্রন্থেই ব্রহ্ম, আত্মা, জন্মবাদ, কর্মবাদ প্রভৃতির তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নেই, এই হচ্ছে সার কথা। ব্রহ্মপ্রাপ্তি জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব এই-ই জীবের চরম লক্ষ্য। তাই সমাজের উচ্চস্তরে লোকের মনে ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে দেখা দিল এক চেতনার বিপ্লব। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পড়ল সাড়া। সম্যগ্ জ্ঞানার্জনের অনুশীলনে ফিরল চিন্তাধারা। কিন্তু জনসাধারণ তখনও যেই-তিমিরে সেই তিমিরেই। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ হতে তখন মুক্তি পায়নি তারা—আত্মার স্বরূপ ও অবস্থান সম্বন্ধে তখনও তাদের নানারূপ অন্ধ ধারণা। তারা বিশ্বাস করত আত্মা মানুষ, জন্তু, কীট পতঙ্গ, গাছ, উদ্ভিদ প্রভৃতির দেহে বাস করে। আর তখনকার গাছ, সাপ, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতির পূজার রীতি দেখে তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল সর্বপ্রাণবাদে (animism)।

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মনীষিগণ ও অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাধারা

বৌদ্ধশাস্ত্রে সেই সময়কার ছ'জন শাস্তার ও তাঁদের মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা একদিকে যেমন তীর্থংকর বলে পরিচিত ছিলেন অন্যদিকে জনসমাজে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। এঁরা অনেকেই গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক। তাই আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য এইসব আচার্যদের মতবাদের সাথে কিছুটা পরিচয় থাকা দরকার। আমরা এখানে ঐ ছ'জন ধর্মোপদেষ্টার নাম ও তাঁদের মতবাদের এক আলোচনা করছি।

(১) পূরণকাশ্যপ—ইনি মগধরাজ বিম্বিসারের সমসাময়িক একজন বয়স্ক বিচক্ষণ আচার্য। তাঁর অনেক শিষ্যও ছিল। কথিত আছে তিনি ষোল বছরের সময় জলে ডুবে মারা যান। অক্রিয়বাদ—এই মত তিনি পোষণ করতেন! দোল, যজ্ঞ প্রভৃতি সৎকর্মে যেমন পুণ্য হয় না, প্রাণী হত্যা, চুরি, মিথ্যা বলা প্রভৃতি অসৎকর্মেও তেমন মানুষের পাপ হয় না। কারণ দেহই কাজ করে আত্মা অক্রিয় মানুষ ভাল মন্দ যে কাজই করুক না কেন আত্মা এ-দ্বারা লিপ্ত হয় না—দেহই ভোগ করে কর্মের ফল। প্রসিদ্ধ জৈন ভাষ্যকার (শীলঙ্কর) এ মতবাদকে অকারকবাদ আখ্যা দিয়াছেন। সা[illegible] মতের সাথে এর বেশ সাদৃশ্য আছে বলে জানা যায়। কিন্তু আ[illegible] ও দেহের ভেদ ও অভেদ বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করে না।

(২) মস্করী-গোশাল—বুদ্ধের সমসাময়িক একজন প্রখ্যাত আচার্য। কথিত আছে জৈন তীর্থংকর মহাবীরের ধর্মপ্রচারে ছ' বছরের সময় তিনি তাঁর শিষ্যত্ব ত্যাগ করেন। তিনি মহাবীরের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। গোশালের মতে সকল জীবই পুনর্বা জীবন গ্রহণ করতে সক্ষম। আজীবিক সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা নিয়তি-সংগতিভাব—এই মত তিনি পোষণ করতেন। নিয়তি জীবকে পরিচালনা করে—জীবের কোন বল নাই—নাই সামর্থ্য। জীবের সুখ ও দুঃখে অন্য কোন কারণ থাকতে পারে তা তিনি বিশ্বাসই করতেন না। কাজেই কর্মস্থলে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। সংসারগতি এইমত তিনি প্রচার করতেন। মোক্ষলাভের জন্য জীবকে বহুজন্ম বহন করতে হয়—সত্তার বিভিন্ন স্তর আছে এবং প্রত্যেক সত্তাই অনন্ত। রাজা অশোকের পরবর্তীকালে এই সম্প্রদা[illegible] রাজকীয় অনুগ্রহ ও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে।

(৩) অজিত কেশ কম্বলী—বুদ্ধের সমসাময়িক হিসাবে ইনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতবাদ ছিল জড়বাদ—তিনি না ছিলেন কর্মফলে বিশ্বাসী, না ছিলেন সৎ বা অসৎকর্মে বিশ্বাসী। তাঁর মতে মৃত্যুর পর জীবনের আর কোন অস্তিত্বই থাকে না। জীব পঞ্চভূতের সমষ্টিমাত্র—সেগুলো ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। মৃত্যুর পর স্কন্দগুলো অনুরূপ স্কন্দে লীন হয়। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় মিশে যায় ব্যোমে। লোকায়ত বা চার্বাক মতবাদের সাথে এর বে[illegible] সাদৃশ্য আছে। এটিই বৌদ্ধধর্মে উচ্ছেদবাদ বলে পরিচিত।

(৪) পকুধ কাত্যায়ন—ইনিও বুদ্ধের সমসাময়িক একজন আচার্য। এঁর মতে জীব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, সুখ, দুঃ[illegible] এবং জীব এই সাতটি ভূতের সমষ্টি মাত্র। ভূতগুলি শাশ্বত ও অব্যয়। এগুলো একদিকে অজাত অন্যদিকে নতুন কিছু সৃষ্টিতে অপারগ, শুধু পর্বতচূড়ার ন্যায় দৃঢ়। কাত্যায়নের মতে ঘাতক, শ্রোতা ও উপদেষ্টার কিছুই নেই। জীবহত্যা অর্থ—জীবের ভূতসমষ্টি পৃথক করা মাত্র। বৌদ্ধধর্মে এই মতবাদ শাশ্বতবাদ বলে অভিহিত।

(৫) সঞ্জয় বেলঠী পুত্র—ইনিও বুদ্ধদেবের একজন জ্যে[illegible] সমসাময়িক। এক স্বতন্ত্র মতবাদের প্রবর্তক এবং সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর মতবাদ ছিল অজ্ঞানবাদ। কোন বি[illegible]

প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে দ্ব্যর্থক বাক্য প্রয়োগ করাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। উত্তর এড়ানোর অভ্যাস যেমন তাঁর ছিল, তেমনি ছিল তাঁর অধিবিদ্যা (metaphysical) পরিহার করার অভ্যাসও। বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায় বুদ্ধদেব এইরূপ আলোচনা মানব জাতির কল্যাণকর নয় বলে পরিহার করতেন এবং শিষ্যদের এ ধরণের প্রশ্ন উত্থাপনেও নীরব থাকতেন। অমরাবিক্ষেপিক মতবাদের সাথে সঞ্জয়ের মতবাদের বেশ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয় শারিপুত্র ও মোগ্গাল্লায়ন প্রথমে সঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন এবং পরে অজিতের উপদেশে মুগ্ধ হয়ে বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন। এতে সাড়া পড়ে যায় সঞ্জয়ের আশ্রমে এবং আরো আড়াইশ পড়ুয়াশিষ্য বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে ওঠে; কিন্তু অচিরেই রক্তবমি করে সঞ্জয় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(৬) নির্গন্থনাথ পুত্র—ইনিও বুদ্ধের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক অন্যতম আচার্যদের মধ্যেই একজন। ইনিই হচ্ছেন স্বনামধন্য মহাবীর। কথিত আছে ইনি প্রথমে ভগবান পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ের দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই পার্শ্বনাথের নির্বাণলাভ হয় মহাবীরের নির্বাণলাভেরও দু'শো পঞ্চাশ বছর আগে। তাই তাঁর উপদেশাবলীর দ্বারা যে তিনি প্রভাবান্বিত তা সহজেই অনুমেয়। নাথপুত্রের মতবাদের সাথে পার্শ্বনাথের মতবাদের বেশ সাদৃশ্যও আছে। অবশ্য পার্শ্বনাথ ও তাঁর শিষ্যগণ যেখানে নগ্নাবস্থায় থাকতেন ইনি সেখানে থাকতেন সাদা বস্ত্র পরিহিত হয়ে। ইনি ক্রিয়াবাদের প্রবল প্রচারক হিসাবে কর্মের ফলাফলের উপর বেশী জোর দিতেন। কেউই পাপকর্মের ফল হতে কাকেও রক্ষা করতে পারে না—প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুখদুঃখের নির্মাতা ও ভোক্তা। আত্মা, জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ, নরক প্রভৃতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি জানতেন জ্ঞান ও সদাচারের মাধ্যমেই হয় মোক্ষলাভ আর সং ও অসং কর্মের দরুণ হয় আত্মার জন্মান্তর। পালি দীঘনিকায়ের সামঞ্ঞফলসুত্ত পাঠে জানা যায় নিগ্রন্থেরা চতুর্যামসংবর পালন করেন। অহিংসবাদের উপরই আবার এরা জোর বেশী দেন। স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ জৈনদর্শনে বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই মতবাদ অনুসারে বস্তুর প্রকৃতস্বরূপ নানা দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অবলোকন করা ব্যতীত জানা যায় না। কৃচ্ছ্রসাধনের উপর জোর বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা জৈনধর্মেই বেশী।

সেকালে এই ছ'জন ধর্মোপদেষ্টা ছাড়াও বহুসংখ্যক খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ আচার্য ও পরিব্রাজকের বিষয় জানা যায়। ব্রাহ্মণ আচার্যরা বৈদিক ঐতিহ্য রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও যজ্ঞের পৌরোহিত্য করে যেমন জীবনযাপন করতেন তেমনি পেতেন রাজানুগ্রহ ও সমাজের সহানুভূতি ও ভালবাসা।

দীঘনিকায়ের কূটদন্তসুত্ত হতে জানা যায় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই আহূত হতেন যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য। পরিব্রাজকেরা ছিলেন বিচরণকারী শিক্ষক। তাঁরা কোন নির্দিষ্টস্থানে বাস না করে বছরের বেশীর ভাগ সময়ই ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন স্থানের ধর্মোপদেষ্টাদের সহিত নীতিবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা এবং আলোচনার সুবিধার জন্য সহর বা গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্থানে বাসস্থান ছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরজনও পরিব্রাজক জীবনযাপন করতে পারতেন। এমন কি নারীদের পরিব্রাজিকা হওয়াও আশ্চর্য ছিল না। প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের উপর এই পরিব্রাজকদের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসুত্তে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় আত্মা ও জগং সম্বন্ধে ৬২ প্রকার মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। এ মতবাদগুলিকে নিম্নোক্তরূপে ভাগ করা যায়:—

(ক) চার প্রকার শাশ্বতবাদ—আত্মা ও জগং শাশ্বত, অক্ষয় প্রভৃতি স্বীকার করা শাশ্বতবাদ।

(খ) চার প্রকার একচ্চশাশ্বতবাদ—আত্মা আর জগং কতক শাশ্বত কতকটা অশাশ্বত—এরূপ স্বীকার করাই একচ্চশাশ্বতবাদ।

(গ) চার প্রকার অন্তানন্তিকবাদ—লোক বা জগং অন্তবান বা সসীম অথবা অনন্তবান বা অসীম—স্বীকার করা অন্তানন্তিকবাদ।

(ঘ) চার প্রকার অমরাবিক্ষেপবাদ—সং ও অসং সম্বন্ধে দ্ব্যর্থবাক্য ব্যবহার করা অমরাবিক্ষেপবাদ।

(ঙ) দু'প্রকার অধীত্যসমুৎপন্নিকবাদ—আত্মা আর লোকের উৎপত্তি হয় বিনা কারণে—এই বাদের নাম অধীত্যসমুৎপন্নিকবাদ।

(চ) ষোল প্রকার উর্দ্ধমাঘাতনিক সংজ্ঞাবাদ—মৃত্যুর পর আত্মার চেতনার বিশ্বাস—উর্দ্ধমাঘাতনিক সংজ্ঞাবাদ।

(ছ) আট প্রকার উর্দ্ধমাঘাতনিক অসংজ্ঞাবাদ—মৃত্যুর পর আত্মার অচেতনার বিশ্বাস—উর্দ্ধমাঘাতনিক অসংজ্ঞাবাদ।

(জ) আট প্রকার উর্দ্ধমাঘাতনিক নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞাবাদ—মৃত্যুর পর আত্মার চেতনা বা অচেতনা কিছুই থাকে না—এ মতে বিশ্বাস।

(ঝ) সাত প্রকার উচ্ছেদবাদ—মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশে বিশ্বাস হচ্ছে উচ্ছেদবাদ।

(ঞ) পাঁচ প্রকার দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদ—এ জীবনে নির্বাণলাভ করা যায়—এ মতে বিশ্বাসই দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদ।

নারায়ণ স্তবঃ

ওঁ তৎসৎ পদবাচ্যায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
নরোত্তমায় ভক্তায় বাঞ্ছিতার্থ প্রদায়িনে ॥
মোক্ষমূলায় সূক্ষ্মায় সর্ব্বভূতনিবাসিনে।
নামরূপবিহীনায় মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপিণে ॥

রাগদ্বেষবিমুক্তায় ধর্ম্মস্থাপনকারিণে।
যমিনাং ধ্যানগম্যায় সর্ব্বলোকহিতৈষিণে ॥
নারায়ণায় জগতাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে।
যজ্ঞেশ্বরায় নিত্যায় চিদ্‌ঘনায় নমোনমঃ ॥

কুরু স্তবকং বিপথে ব্রজন্তম্।
নাথে বিরক্তং বিষয়ে প্রসক্তম্ ॥
দয়াময় ক্রোড়গতং বিধায়।
করগ্রহং নো পতনং যথা স্যাৎ ॥

রচয়িতা কাশীবাসী—শ্রীকুরুনাথ ন্যায়তীর্থঃ

উঠেছে সে বিষয়ে নানা লেখা ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি নাড়াচাড়া করলে মুগ্ধ-বিস্ময়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, এমন আমেরিকান বহু সংখ্যায় ছিলেন ও এখনও আছেন যাঁরা ভারতীয় দর্শন ও ধর্মচর্চায় প্রভূত আগ্রহের প্রমাণ দিয়েছেন এবং এ সমস্ত বিষয় নিয়ে বেশ অনুশীলন ও গবেষণা করেছেন। আশ্চর্যের কথা নিউ ইংল্যাণ্ডের পার্বত্য ভূমিতেই এই সব আমেরিকানের ভারতপ্রেমের মূল নিহিত ছিল এবং এই পাহাড়ী মাটিতেই তাঁদের সেই ভাবধারা লালিত ও পুষ্ট হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের নিউ হ্যাম্পশায়ার, ভারমণ্ট, মেন, ম্যাসাচুসেট্‌স, রোড আইল্যাণ্ড ও কানেটিকাট অঙ্গরাজ্যগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নিউ ইংল্যাণ্ড। দু'একটি ব্যতিক্রম থাকলেও ঐতিহাসিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপশ্চিম, দক্ষিণ ও দূরপশ্চিম অঞ্চলগুলিতে যে সকল মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সাধারণত জাতীয় বিষয়বস্তুর বাইরে কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামান নি। এই অঞ্চলগুলি যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

এই বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। অতীন্দ্রিয়বাদী নিউ ইংল্যাণ্ডের ভাবধারা সংহত রূপ লাভ করেছিল এমার্সন ও থোরোর মধ্যে। তাঁরা যে ভারতের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন তা স্পষ্টত বোঝা যায়।

কবি ও প্রাবন্ধিক রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো এমার্সন (১৮০৩—১৮৮২) জন্মগ্রহণ করেছিলেন ম্যাসাচুসেটসের বষ্টনে। তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদী
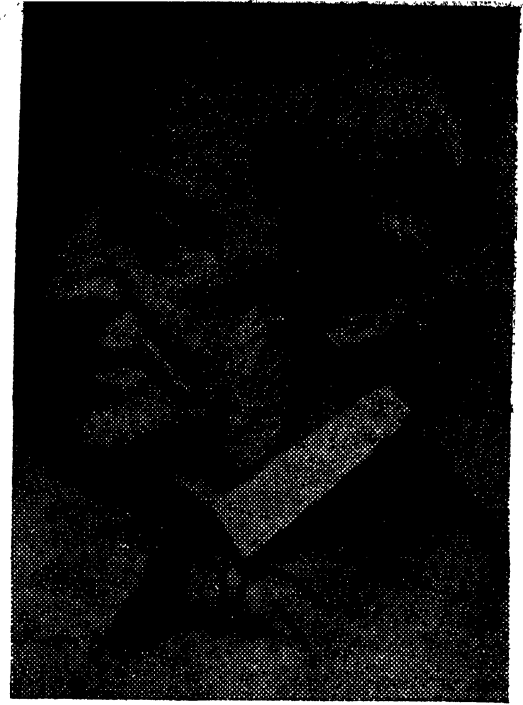
রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো এমার্সন

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে আমেরিকার দীক্ষা

'সন্ধানী'

দর্শনের সারমর্ম পাওয়া যায় তাঁর লেখা "নেচার" বইখানিতে। এইটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এর প্রকাশকাল ১৮৩৬। তাঁর এই দর্শনের মূলকথা হল, এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ তা আধ্যাত্মিক জীবনেরই একটা প্রতীক মাত্র। মানুষের আত্মাই মুখ্য বস্তু। এই আত্মার মধ্য দিয়েই ভগবানকে জানা যেতে পারে প্রত্যক্ষভাবে। তবে মানুষের আত্মা নির্ভরশীল প্রকৃতির ওপর। অতীন্দ্রিয়বাদীরা স্বজ্ঞা (intuition) ও মানুষের ত্রুটিহীনতায় বিশ্বাসী। তাই তাঁরা ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাসের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই আধ্যাত্মিক মার্কিন দার্শনিকেরা তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন ভারতের কাছ থেকে।

এমার্সনকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক অতীন্দ্রিয়বাদী গোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে ছিলেন হেনরী ডেভিড থোরো, আমস্ ব্রনসন অ্যালকট প্রমুখ ব্যক্তি। জীবনের বেশ কয়েকটা বছর থোরো (১৮১৭—১৮৬২) প্রকৃতির অনুধ্যানে কাটিয়েছেন। প্রকৃতিসন্ধান থেকে এসেছে আত্মানুসন্ধানের প্রেরণা। এমার্সনের মত থোরোও বিশ্বাস করেন যে, আত্মার উন্নতিতে সব দিক থেকেই মঙ্গল হয়। নিজেকে জানাই জীবনের লক্ষ্য, বলেছেন এমার্সন। একেবারে খাঁটি ভারতীয় আদর্শ।

চার্লস রকওয়েল ল্যানম্যান
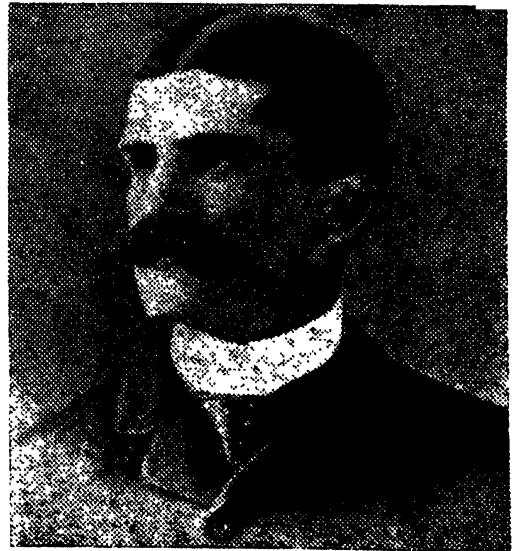
এ যুগের অন্যান্য যে সকল অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিভাবান মনীষী যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতীয় দর্শনের ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অ্যালকট, জেমস ফ্রীম্যান ক্লার্ক, হুইটিয়ার ও অন্যান্য কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার প্রথম বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ এডোয়ার্ড স্যালিসবেরী এবং উইলিয়াম ডোয়াইট হুইটনী গোঁড়া নিউ ইংল্যাণ্ডবাসী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে চার্লস রকওয়েল ল্যানম্যানও উল্লেখযোগ্য।

হুইটনী (১৮২৭—১৮৯৪) সংস্কৃত অধ্যয়ন এবং ইংরেজী ভাষাভাষীদের সংস্কৃত শিক্ষাদানের অগ্রণীদের একজন। সংস্কৃত ও ভাষাতত্ত্বে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা করতেন। তিনিই প্রথম 'অথর্ববেদ সংহিতা' প্রকাশ করেছিলেন ১৮৫৬ সালে। হুইটনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম হল ১৮৭৯ সালে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনাও প্রকাশ। শব্দকোষ সঙ্কলকরূপেও তাঁর খ্যাতি অবিসংবাদিত।

সংস্কৃত শিক্ষায় হুইটনীর গুরু ছিলেন এডোয়ার্ড এলব্রিজ স্যালিসবেরী। হুইটনীর ভাষায় "স্যালিসবেরী ছিলেন আমেরিকায় সংস্কৃত চর্চার ব্যাপারে অগ্রণী ও পৃষ্ঠপোষক।" প্রাচ্যবিদ্যা বিশেষজ্ঞ স্যালিসবেরী ১৮৩২ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বিশেষ করে হিব্রু ও সমগোত্রীয় অন্যান্য ভাষা নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। অতঃপর তিনি ইউরোপে যান এবং প্রায় চার বছর ধরে সংস্কৃত ও আরবী চর্চা করেন। ১৮৪১ সালে তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে
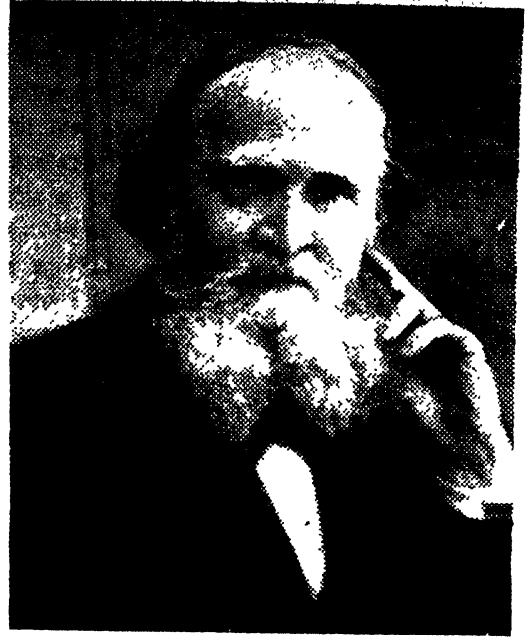
উইলিয়াম ডোয়াইট হুইটনী

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও আরবী ভাষার অধ্যাপকপদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি এ পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তিনি আবার গেলেন ইউরোপে। বন ও প্যারিসে আরও এক বছর সংস্কৃত অধ্যয়ন ও গবেষণা করে ফিরে এলেন আমেরিকায়।

১৮৪৩ সালে যখন তিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপনার কাজ সুরু করলেন, তখন আমেরিকায় এই ভাষায় পণ্ডিতব্যক্তি একজনই মাত্র ছিলেন। তিনি হলেন এডোয়ার্ড স্যালিসবেরী। আমেরিকায় প্রাচ্যবিদ্যা প্রসার ও মহৎ সাহিত্যে আমেরিকানদের আগ্রহ জাগাবার ভার দেওয়া হয়েছিল স্যালিসবেরীর ওপর। তিনি ছিলেন আমেরিকার প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলন সমিতির (আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি) অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বিশেষ। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৪২ সালে। সমিতির মুখপত্রে তিনি সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

ল্যানম্যান (১৮৫০—১৯৪১) ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতব্যক্তি। ১৮৮০ সাল থেকে তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। জন হপকিন্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অধ্যাপনা করেছেন। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি আমেরিকার প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলন সমিতির সভাপতি ছিলেন। রাজশেখরের 'কর্পূর মঞ্জরী' অনুবাদ তাঁর এক অক্ষয়কীর্তি। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে তিনি গ্রন্থরচনা করেছেন, আর গ্রন্থরচনা করেছেন ভারতীয় সর্বেশ্বরবাদ দর্শনের ওপর।

আরও অনেকেরই নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র এডোয়ার্ড ওয়াশবার্ণ হপকিন্‌সের নাম করলেই যথেষ্ট হবে। নিউ ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা ভারত সম্পর্কিত বিষয়সমূহে অনুশীলন ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের অগ্রগণ্যদের

হেনরী ডেভিড থোরো

মধ্যে এই নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকপদে ইনি হুইটনীর উত্তরাধিকারী। ইনি ১৮৫৭ সালে ম্যাসাচুসেটসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি একটি বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ পরিবারের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। এই পরিবারটি ১৭৩৪ সালে ম্যাসাচুসেটসের কেম্ব্রিজে বসতি স্থাপন করেছিল। মিঃ হপকিন্‌সের মাতা ও পিতা উভয়দিক থেকেই নিউ ইংল্যাণ্ডে তাঁর এমন অনেক আত্মীয় আছেন যাঁরা খ্যাতিমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর্মতত্ত্ববিদ্‌ জোনাথান এডোয়ার্ডস ও স্যামুয়েল হপকিন্‌সের নাম করা যেতে পারে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্লিন ও লিপজিগে অধ্যয়নের পর এডোয়ার্ড হপকিন্‌স সংস্কৃতে পি, এইচ, ডি উপাধি লাভ করেন এবং প্রথমে ব্রিন মার কলেজে ও পরে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় তাঁর দান অসামান্য। কিন্তু ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের ছাত্র ও ব্যাখ্যাতারূপেই তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর লেখা বই "দি রিলিজিয়নস অব ইণ্ডিয়া" (ভারতের ধর্মসমূহ) প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। দীর্ঘকাল যাবৎ আমেরিকানদের কাছে এই গ্রন্থটিই একমাত্র প্রামাণ্য পুস্তক ছিল। ধর্মবিষয়ে তিনি আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন ১৯২৪ সালে। এ বইখানির জন্য তিনি যে নিছক প্রশংসা লাভ করেছিলেন তা নয়, এজন্য কিছু কিছু সমালোচনাও জুটেছিল তাঁর ভাগ্যে। কিন্তু ১৯২৩ সালে "অরিজিন এণ্ড ইভল্যুশন অব রিলিজিয়ন" (ধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তন) নামে যে বইটি তিনি লিখেছিলেন তা সাধারণের কাছে প্রচুর সমাদর লাভ করেছিল এবং বিক্রীত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯৩২ সালে হপকিন্‌সের মৃত্যু হয়।

হপকিন্‌স এবং তাঁর পূর্ববর্তী নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীদের মধ্যে অনেকে যে ভারতের প্রতি এতখানি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা খুবই বিস্ময়ের কথা। এর একটা কারণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীনকালে নিউ ইংল্যাণ্ড ও ভারতের বন্দরসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান প্রদান ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ। বাণিজ্য চালাতে গিয়ে শিক্ষিত ও একনিষ্ঠ নৌ কাপ্তেনেরা যে ভারত থেকে শুধু কাপড় আর মসলাপাতিই নিয়ে এসেছিলেন তা নয়, তাঁরা ভারতীয় ভাবধারারও আমদানি করেছিলেন স্বদেশে।

দ্বিতীয়ত, নিউ ইংল্যাণ্ড কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ধর্মের দেশ ছিল। প্রোটেস্ট্যাণ্ট রিফরমেশন থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন গোঁড়া ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক খুব বেশি সংখ্যায় এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা ভুট্টা উৎপাদনে এবং মাছধরা ও নৌকা চালনায় যতখানি আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়েছিল, ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় তার চেয়ে কিছুমাত্র কম আগ্রহ দেখায় নি। ধর্মতত্ত্বের আলোচনা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে অন্য সব কিছুর মতই ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। কাজেই ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যে নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীরা আগ্রহশীল হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

সবশেষে তাদের ধর্মের মধ্যে বেশ কঠোরতা আছে। কাজেই হিন্দুধর্মের দর্শন ও তত্ত্ব তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে সহজেই অনুরণন তুলেছিল। সত্যানুসন্ধানের ইচ্ছা সকল দেশে সকল কালেই সৎ মানুষের মনকে অধিকার করে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

মায়েরা বেশীদিন বাঁচেন

চিকিৎসাশাস্ত্রে আশ্চর্যজনক উন্নতি হওয়ার ফলে প্রসূতির মৃত্যুর হার অনেক কমে গিয়েছে। এখন মনে হয় মা না হওয়ার চেয়ে মা হওয়া ঢের নিরাপদ। কথাটি খুবই অদ্ভুত মনে হয়—তাই না? কিন্তু সত্য আছে বৈকি এর পেছনে। প্রথম এবং সবচেয়ে বড় কথা বোধ হয় এই যে, মাতৃত্বের প্রতি আমাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯০০ সালের আগে কি হত? কোন নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে এ খবরটি সন্তান প্রসবের মাত্র কিছুদিন আগে পরিবারের চিকিৎসকের কাছে জানানো হত—তা-ও সলজ্জে! হাসপাতালে প্রসূতির জন্যে প্রথম বেড স্থাপিত হয় এডিনবার্গে···১৯০১ সালে। অতি সামান্য সেই সূত্রপাত থেকে প্রসূতি পরিচর্যার বিরাট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে—আজ যা এদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে গৌরবের বিষয়। সারা দেশে এই ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়তে সময় লেগেছিল। আর সময় লেগেছিল মেয়েদের এই ব্যবস্থা গ্রহণে প্রবৃত্ত করতে। ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করতেও কম সময় লাগেনি। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত প্রসূতির মৃত্যুর হারের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। গত বিশ বছরে প্রসূতির মৃত্যুর হার আগের চেয়ে এক চতুর্থাংশের বেশী কমেছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এ বিষয়ে এক্স-রে চিকিৎসকদের সহায় হয়েছে। অস্ত্র-চিকিৎসার, বিশেষ করে সিজারিয়ান অপারেশনের প্রণালীর উন্নতি হয়েছে। প্রসূতির পথ্যেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রসবের সময় ক্লোরোফরমের পরিবর্তে আজ ট্রাইলিন ব্যবহার করা হচ্ছে। মৃতসন্তান জন্মের হিসাব পাওয়া যায় মাত্র বিশ বছরের। ১৯২৮ সালে ১০০০ এর মধ্যে ৭০টি মৃতসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল—আজকের মৃতসন্তান জন্মের সংখ্যা হাজারে চল্লিশটিরও কম। আজ প্রসূতি নিরাপদ—প্রসব ব্যবস্থাও নিরাপদ। এবারে শিশুমৃত্যুর কথা ধরা যাক। ১৯০০ সালে প্রতি হাজারে ১৫৬টি শিশু মারা যায়। আজ এই সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। শিশুদের 'মৃত্যু রোগ' আজ প্রায় অদৃশ্য হয়েছে বা হতে চলেছে। ১৯০০ সালে হাম ১৩,০০০ শিশুর মৃত্যু ঘটিয়েছিল। হুপিং কাসি, ডিপথিরিয়া ও স্কার্লেট ফিবারে প্রতি বছর প্রায় ৩৫,০০০ লোকের মৃত্যু ঘটত—এর অধিকাংশই শিশু। আজ এই চারটি রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ১০০০এর সামান্য বেশী। জন্মের পর শিশুর পরিচর্যা কম বড় কথা নয়। এক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। ১৯০০ সালে পাঁচ বছর বয়স হবার আগেই ২৫০টি শিশুর মৃত্যু হয়—আজ সেখানে মৃত্যুর হার পঞ্চাশেরও কম। পঞ্চাশ বছর আগে লোকে কল্পনাও করতে পারেনি যে, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর ভিত্তি করে একটা স্বাস্থ্যবান জাতি গড়ে তোলার সুযোগ সবচেয়ে বেশী চিকিৎসা-শাস্ত্রেরই আছে।

হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান লিষ্টন

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধুলার মধ্যে কোন বিভাগেই বিশ্ববিজয়ী সম্মান লাভ সহজসাধ্য নয়। বিশেষ করে মুষ্টিযুদ্ধে এ সম্মান লাভ সবচেয়ে শক্ত। একসাথে অর্থ ও যশ-এর যৌথমিলন আর কোন প্রতিযোগিতাতেই নেই। তাই এমন দুর্লভ সম্মান লাভ করতে দীর্ঘদিনের নিরলস সাধনা ও পরিশ্রম একান্ত প্রয়োজন। একাগ্র সাধনায় ও অপ্রত্যাশিতভাবে যাঁর নাম খুব তাড়াতাড়ি আমেরিকার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি হলেন 'কিং অব দি রিং' প্যাটারসন্। ফ্লয়েড প্যাটারসন্ (Floyd Patterson) তাঁর আসল নাম।

১৯৩৭ সালের ২২শে জুন 'ব্রাউন্ বম্বার' জো লুই তৎকালীন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান ব্রডকক্-কে হারিয়ে মাত্র ২৩ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে বিশ্বজয়ের সম্মান লাভ করে যে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, সে রেকর্ডও ম্লান করে দিয়েছেন তাঁরই ছাত্র ফ্লয়েড প্যাটারসন্ মাত্র ২১ বছর বয়সে মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্বপ্রাধান্য লাভ করে। মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্বপ্রাধান্য লাভ করাটাই যে-কোন মুষ্টিযোদ্ধার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা। তা সে যে-কোন ওজনের চ্যাম্পিয়ানশিপই হোক না কেন। কিন্তু হেভিওয়েট বিভাগে বিশ্বপ্রাধান্যের কাছে অন্য সব ওজনের চ্যাম্পিয়ানদের মর্যাদা যেন অতি তুচ্ছ। তবে 'চেষ্টা করলে কি না হয়'। যদিও কথাটা বলা খুবই সহজ কিন্তু কার্যকালে তা প্রয়োগ করতে খুব কম লোকেই পারে। বিশেষ করে ধনকুবেরের দেশ আমেরিকার একটি নির্ধন বহুপোষ্য নিগ্রো পরিবারের একটি ছেলের পক্ষে, এগারোটি ভাই-বোনের মধ্যে যে হয়েছে তৃতীয়, সংসারে দু'বেলা দু'টুকরো রুটিও যাদের নিয়মিতভাবে জুটত না, ম্যানহাটানের মতন শহরতলীর নীচু তলায় যাঁদের বাস। খেলার জগতে এই রকম অবস্থায় পড়েও নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান, বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এই রকম উদাহরণের অভাব নেই। তবে সে ধরণের মুষ্টিকের সংখ্যাও খুবই কম।

বহু বিতর্কের বহু আলোচনার এতদিনে অবসান হলো। 'গুড বয়' না 'ব্যাড বয়'—বক্সিং দুনিয়ার একচ্ছত্র অধীশ্বর কে? এতদিনে এ প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর মিলেছে। অর্থাৎ কিং অব বক্সিং রিং ফয়েড প্যাটারসন বড়, না সনি লিষ্টন বড়। মুষ্টিজগতে মুষ্টিযুদ্ধের 'ব্যাড বয়' নামে যার পরিচিতি। ব্যাডবয়ই বটে, সেন্ট লুই-এর পুলিসের কাছে লিষ্টন সংশোধনের অতীত এক দাঙ্গাবাজ। একজন বলেছেন: আগাগোড়াই লিষ্টন ভয়ঙ্কর। ক্রীড়া-সাংবাদিকদের কেউ কেউ বলেছেন: এ রকম নিকৃষ্ট জীবকে লড়বার অনুমতি দেওয়াই উচিত নয়। নিউইয়র্ক ডেইলী নিউজ তো স্পষ্টই বলেছে: পৃথিবীতে এখন উচ্চপদে বড় বেশী গুণ্ডা দেখা যাচ্ছে। যেমন এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।

লিষ্টনের নামে পুলিস রিপোর্টে অনেক কথাই লেখা আছে। অর্ধশিক্ষিত, অবিনয়ী, সন্দেহপরায়ণ। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬২ সাল এই ১২ বছরের মধ্যে ১৯বার আইনভঙ্গের অপরাধে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। হাজতবাস করতে হয় দু'বার—সশস্ত্র রাহাজানি ও এক পুলিস অফিসারকে আহত করার অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড হয় তিন বছর। একসময় সেন্ট লুই-এর বিখ্যাত গুণ্ডাদের নামের তালিকায়ও লিষ্টনের নাম ছিল। ভাড়াটে গুণ্ডামীই ছিল তখন তাঁর পেশা। এ হেন ব্যাডবয়কে তাই তো নিউইয়র্কের অ্যাথলেটিক কমিশন জনসাধারণের ও পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের স্বার্থ ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্যে নিউইয়র্ক রাজ্য থেকেই লিষ্টনকে নক-আউট করে দিলেন; তিনি যে 'ব্যাডবয়' খারাপ ছেলে। তাঁর অতীত ইতিহাস যে কলঙ্কময়। রেষ্টুরেন্টে রাহাজানি করতে গিয়ে তিনি যে ধরা পড়ে জেল খেটেছেন। তিনি যে বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থাতেই মারপিট করতেন আর জুয়া খেলতেন। খারাপ ছেলে বলেই তো তাঁর বাবা তাঁকে রোজ চাবকাতেন! লিষ্টনকে বেত মারতে কোনদিন ভুল হলে লিষ্টনকেই তা' স্মরণ করিয়ে দিতে হত।

তবে তাঁর মার জন্যেই নাকি সব। একবার এক সাংবাদিককে লিষ্টন নিজেই বলেছেন: আমার মার জন্যেই সব। লিষ্টনের মার নাকি সাধ ছিল যে, তাঁদের পঁচিশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে যদি কেউ জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করত, কি লেখাপড়ায়, কি খেলায়, যে-কোন বিভাগে তবেই নাকি তিনি খুব সুখী হতেন। বাপ-মার আদর-যত্ন তিনি কোনদিনই পান নি সত্য, তবে মায়ের মনের এই বাসনাই নাকি লিষ্টন তাঁর দশ বছরের মুষ্টিক-জীবনে স্বপ্ন দেখে এসেছেন তাঁর চ্যালেঞ্জারের স্বপ্ন। একদিন হয় তো চ্যাম্পিয়ানকে তিনি কোণঠাসা করতে পারবেন দড়ি ধরে, বাঁ হাতের লৌহ-মুষ্টির একটি আঘাতে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে বিশ্বজয়ীর খেতাব—তাঁর দুঃখিনী মায়ের মুখে ফুটে উঠবে জয়ের হাসি।

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে নিগ্রো চ্যাম্পিয়ান জ্যাক (লিল্ আর্থার) জনসন্ (Jack Johnson)-এর পর লিষ্টনের মতন আর কোন মুষ্টিকই এত সোরগোল তুলতে পারেন নি। ছেলেবেলা থেকেই লিষ্টনের মুষ্টিযুদ্ধের ওপর তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়। ১৯৩৩ সালে যে বছর জো লুই (Joe Louis) লাইট হেভিওয়েট বিভাগে সেমি-ফাইন্যালে ম্যাক্সমায়েকের কাছে পরাস্ত হন, সে-বছরেই ফিলাডেলফিয়ার (Philadelphia, Pa) আরকানসাস্ তুলা শ্রমিকের এক অশিক্ষিত দরিদ্র নিগ্রো পরিবারে লিষ্টন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম চার্লস্ সনি লিষ্টন (Charles Sonny Liston)। মুষ্টিযুদ্ধের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও পয়সার অভাবে কোন গুরুর কাছে তিনি শিক্ষা নিতে পারেন নি। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে হাজতবাস কালে এক যাজক অযাচিতভাবে তাঁকে মুষ্টিযুদ্ধে উৎসাহিত করেন। তাঁরই চেষ্টায় লিষ্টন জো-লুই রচিত 'মাই লাইফ ষ্টোরী' বইটি সংগ্রহ করে জেলে বসে মুষ্টিযুদ্ধের কলা-কৌশল নিজের চেষ্টায় ও যত্নে অনুশীলন করতে থাকেন। ভগবানদত্ত সুগঠিত দেহ ও বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যই তাঁর একমাত্র সম্বল—আর সম্বল তাঁর স্নেহময়ী মায়ের আশীর্বাদ। অল্পদিনেই জেলখানার কয়েদীদের মধ্যে 'সর্বজয়ী' আখ্যা লাভ করে জেলখানায় চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেন। ব্যাডবয়ের ভাগ্যে প্রথম পুরস্কার জুটল কয়েদখানাতেই। জেল থেকে মুক্ত হবার পর অল্পদিনের মধ্যেই ১৯৫৩ সালে তিনি গোল্ডেন গ্লোভস্ হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানশিপও কেড়ে নেন তাঁর কংক্রীটের মত

শক্ত মুষ্টির জোরে। এ পর্যন্ত লিষ্টন ৩৪টি প্রথম শ্রেণীর লড়াই-এর মধ্যে ৩৩টিতেই জিতেছেন, ২৩টি লড়াইয়ে নক আউটে ও বাকি ১০টি লড়াইয়ে পয়েন্টে বিজয়ী হন। মাত্র ১টিতে তিনি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন, তাও পয়েন্টের হিসেবে মার্টি মার্শালের কাছে। মার্টি-মার্শালের সাথে লড়াই-এর মাঝ পথে মার্শালের একটি মুষ্ট্যাঘাতে লিষ্টনের একটি চোয়াল ভেঙ্গে যায়। কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু লিষ্টন তার পরেও শেষ ৪ রাউণ্ড সমান তালে মার্শালের সাথে লড়াই করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। লিষ্টনের ট্রেনার উইলি রেডিস্-ও লিষ্টনের সহ্য-শক্তির ও অফুরন্ত দমের খুব প্রশংসা করেছেন।

অনেকের মতে তুলনামূলক বিচারে প্যাটারসন্ লিষ্টনের অনেক ওপরে। মুষ্টিজগতের ইতিহাসের কয়েকটি নতুন ও বিস্ময়কর অধ্যায়ের স্রষ্টা বটে প্যাটারসন্। আজ পর্যন্ত কোন মুষ্টিক যে অসাধ্য সাধন করতে পারেন নি শত চেষ্টা করেও, অর্থাৎ বিশ্বপ্রাধান্য লাভের পর একবার হেরে আবার তা' কেড়ে নেওয়া, প্যাটারসন্ তাও সম্ভব করেছেন। যে আর্চি মুর (Archie Moore)-এর বিরুদ্ধে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা আর্জেণ্টিনার আলেজান্দ্র লাভোরান্তি গত ৩০শে মার্চ '৬২ লস্ এঞ্জেলসে দশ রাউণ্ডের এক লড়াইয়ে আহত হয়ে ষ্ট্রেচারে করে হাসপাতালে যেতে বাধ্য হয়েছেন, সেই আর্চি মুরকেই ১৯৫৬ সালে ৫ম রাউণ্ডে নক আউট করে প্যাটারসন্ মুষ্টিযুদ্ধে হেভিওয়েট বিভাগে বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করেছিলেন। গত ২৫শে সেপ্টেম্বরের এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ে লিষ্টনের প্রধান উপদেষ্টাও ছিলেন আর্চি মুর নিজে।

দেহের বাঁধন দেখলেই মনে হবে এ-ছেলে রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মায় নি। দীর্ঘ-দেহী, মজবুত গড়ন, সারা শরীরে শক্তির জ্যোতি, বাহুতে অমিত বলের আভাস। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এক নওজোয়ান। ছয় ফুট উঁচু দেহের সাথে ১৮৯ পাউণ্ড ওজন যেন নিক্তির কাঁটার হিসেবের সাথে মিলে গেছে। অবয়ব দেখলে মোটেই বুঝতে বেগ পেতে হবে না যে, এ ছেলে একজন পাকা খেলোয়াড়। ক্রীড়ানুষ্ঠান থেকে আহরিত শ' খানেক কাপ, মেডেল, অজস্র প্রশংসাপত্র, বাড়ী, গাড়ী ও ব্যাঙ্কের মজুত ডলারের মধ্যেই বক্সিং খেলায় প্যাটারসনের কৃতিত্বের পরিচয় মেলে।

যখন অপেশাদার ছিলেন, তখন প্যাটারসন্‌কে নিয়ে গর্ব করেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ছেলে-মেয়েরা। খেলাধুলায় তাদের বেষ্ট বয়। প্যাটারসনের বয়স যখন মাত্র চোদ্দ বছর তখন ঘটনাচক্রে একদিন প্যাটারসন্ এসে হাজির হন কাস্ ডি আমটোর ইষ্টসাইড জিমন্যাসিয়ামে। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ হয় স্বয়ং কাস্ ডি আমটোর সাথে। তিনি দূরদর্শী ব্যক্তি, প্রথম দর্শনেই তিনি জহর চিনে ফেলেছেন। সে চেনা তাঁর ভুল হয়নি। মাত্র তিন বছরের শিক্ষায় প্যাটারসন্ ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে মিডল ওয়েট বিভাগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে অপেশাদার মুষ্টিজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অলিম্পিক স্বর্ণপদক লাভ করেন। চিত্তাকর্ষক ক্রীড়াশৈলী (Impressive Style)-র জন্যেও তিনি একটি বিশেষ পুরস্কার পেয়েছিলেন। দেশে ফিরে সে-বছরেই প্যাটারসন্ ঐ একই গুরুর তত্ত্বাবধানে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে দীক্ষা নেন।

১৯৫৬ সালের 'কিং অব বক্সিং রিং' আখ্যা কিন্তু তিনি একটানা আয়ত্তে রাখতে পারেননি। ১৯৫৯ সালের ২৬শে জুন সুইডিস মুষ্টিক ইন্‌জেমার জোহান্‌সন্ (Ingemar Johanson) এর কাছে নক আউটে পরাস্ত হয়ে সাময়িকভাবে মুকুট হাতছাড়া হলেও পরবর্তী লড়াইয়ে ১৯৬০ সালের ২০শে জুন তিনি তা' কেড়ে নেন মাত্র ৫রাউণ্ড লড়াই করে জোহান্‌সনকে নক আউটে পরাস্ত করে। কিন্তু ভাগ্যদেবী যাঁর প্রতি অপ্রসন্না, তাঁর ভাগ্যে সুনাম ও কাঁচা সোনায় গড়া এমন সাম্রাজ্য সইবে কেন? প্যাটারসনের সবচেয়ে বড় শত্রু জোহান্‌সনও ভাবতে পারেননি যে, প্যাটারসনের ভাগ্যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয়ের কালো যবনিকা নেমে আসবে। যে প্যাটারসনের মুষ্ট্যাঘাতে জোহানসন সেদিন চোখে সর্ষে ফুল দেখেছিলেন, সেই ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন ও দক্ষ মুষ্টিক একটি মাত্র আঘাত হানবার আগেই প্রতিদ্বন্দ্বী লিষ্টনের ডান হাত ও বাঁ' হাতের একটি করে মাত্র ২টি মুষ্ট্যাঘাতে আর সবচেয়ে কম সময়ে প্রথম রাউণ্ডেই মাত্র ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে রিং-এর মধ্যে লুটিয়ে পড়বেন, এ যে কল্পনারও অতীত। কিন্তু মনোবল অটুট থাকলে ও সঙ্কল্প সুদৃঢ় থাকলে অনেক সময় অসম্ভবও সম্ভব করা যায়। ব্যাড বয় লিষ্টন সেদিন অক্ষরে অক্ষরে তা' প্রমাণ করে দিয়েছেন। প্রমাণ করেছেন ঠিক ঠিকভাবে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে সহজেই বাজি মাৎ করা যায়।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমেরিকার নানা প্রান্ত থেকে সহস্র সহস্র মুষ্টিযুদ্ধপ্রিয় দর্শক, খ্যাত-অখ্যাত বহু মুষ্টিক, এমন কি বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিক জো-লুই, ওয়ালকট, আর্চিমুর, জোহানসন প্রভৃতিও প্যাটারসন্ লিষ্টনের এই ঐতিহাসিক মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে চিকাগোর কমিস্কি বেসবল পার্কে সমবেত হয়েছিলেন। এর আগে কোন খেলাতেই নাকি এত টাকার টিকিট বিক্রী হয়নি। প্যাটারসন্ হেরেও এ খেলায় ১১,৮৫, ২৫৩ ডলার উপায় করেছেন। এত বেশী টাকাও এর আগে আর কোন মুষ্টিক একটি মাত্র লড়াইতে উপায় করতে পারেন নি। অথচ প্যাটারসন বিজয়ী লিষ্টন পেয়েছেন মাত্র ২,৮২,০১৫ ডলার।

লড়াই শুরু হয়েছিল রাত সাড়ে আটটায় (ভারতীয় সময় সকাল নটা, ২৬শে সেপ্টেম্বর '৬২) সুন্দর পরিবেশে। মধ্যস্থের বাঁশির আওয়াজ হওয়া মাত্র লিষ্টন তাঁর প্রান্ত থেকে ঝড়ের বেগে প্যাটারসনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যে কোন উপায়ে প্যাটারসনকে রিং-এ নক আউট করবেন, এই ছিল তাঁর পণ। প্যাটারসন্‌ও যে এজন্যে অপ্রস্তুত ছিলেন, তা নয়। তবে তিনি এতটা ধারণা করতে পারেন নি। ভেবেছিলেন আত্মরক্ষাত্মক-নীতিতে রাউণ্ডের পর রাউণ্ড খেলিয়ে দৈত্যাকৃতি লিষ্টনের দমের ও শক্তির ভাণ্ডার উজাড় করে ওস্তাদের মার শেষ রাতে মেরে বাজি মাৎ করবেন। কিন্তু লিষ্টনের অপ্রত্যাশিত ডান হাতের ঘুঁসিটি তাঁর চোয়ালে লাগাতেই প্যাটারসন বেসামাল হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে লিষ্টন তাঁর বাম হাতের মোক্ষম অস্ত্রটি প্যাটারসনের মাথায় লাগান। সাথে সাথে প্যাটারসন্ লুটিয়ে পড়েন রিং-এর ওপর। লড়াই-এর সুরু থেকে শেষ—ব্যবধান মাত্র ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ড। 'কিং অব দি বক্সিং রিং' ক্লয়েড প্যাটারসন পরাজিত হলেন, আর বিশ্বের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধার আখ্যা লাভ করেন 'বেয়াড়া ছেলে' সনি লিষ্টন।

কখন কেমন করে মুষ্টিযুদ্ধ সুরু হল, কেমন করেই বা তা' শেষ হল, দর্শকদের মধ্যে অনেকেই তা' ভাল করে লক্ষ্য করতে পারেন নি। কিন্তু হঠাৎ রিং-এর ওপর প্যাটারসন্‌কে নক-আউট হতে দেখে সকলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান। প্রথমটা লিষ্টন তাঁর এই জয়ের অভিনন্দন

দর্শকদের কাছ থেকে সামান্ত একটি হাততালিও পান নি। অনেকের ধারণা ছিল—গত বছর প্যাটারসন্ জোহান্সন্ লড়াই ৬ রাউণ্ড ধরে চলেছিল, সুতরাং এবারের লড়াই আরো বেশী জোরালো ও প্রতিযোগিতামূলক হবে। কিন্তু তখন সকলের মনেই আফশোষ — এত আশা নিয়ে লড়াই দেখতে এসে একি অপ্রত্যাশিত ফলাফল। আরাম করে বসতে না বসতেই মাত্র ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে প্যাটারসনের খেল্ খতম হয়ে গেল। যুদ্ধের হার-জিত নির্ধারিত হয়ে গেল। চিকাগোর এই ঐতিহাসিক লড়াইতে প্রমাণিত হল যে, 'কিং অব বক্সিং' আর প্যাটারসন্ নন, লিষ্টন। ওজনে ও বয়সেই তিনি প্যাটারসনের চেয়ে বড় নন, কৌশলে ও দৈহিক শক্তিতেও লিষ্টনই শ্রেষ্ঠতর।

রিং-এর মধ্যে লিষ্টনের পদক্ষেপ এত ক্ষিপ্র ও তাঁর দেহের ভঙ্গিমা এত সাবলীল যে, ২১২ পাউণ্ড ওজনের দৈত্যাকৃতি মুষ্টিককে দেখে কেউ ধারণাই করতে পারবে না। বিপক্ষের রক্ষা-ব্যূহ যতই কঠিন ও সুদৃঢ় হোক না কেন—বিপক্ষের মুষ্ট্যাঘাত যত জোরেই আসুক না কেন, লিষ্টন নিখুঁতভাবে সে আক্রমণ রোধ করে বিপক্ষকে পাল্টা আক্রমণে কাবু করতে পারেন। 'আক্রমণই সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষণ'—খেলার এই আপ্তবাক্যে লিষ্টন অতিবিশ্বাসী। তাই বোধ হয় তাঁর খেলার মাঝে এই দুর্বার আক্রমণের অভিব্যক্তি। প্রয়োজনবোধে অবশ্য রক্ষণমূলক খেলাতেও তিনি অপটু নন। তবে প্যাটারসনও কমতি ছিলেন না। ১৯৫৬ সালে টম্‌জ্যাক্‌সন্ এবং ১৯৫৯ সালে জোহানসন্ ছাড়া গত সাত বছরে সব কয়টি লড়াইতেই তিনি জয়ী হয়েছিলেন। প্যাটারসনের এটি তৃতীয় পরাজয়।

প্যাটারসনের ওপর তাঁর পূর্ব-প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাক্তন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধা জোহানসনও অনেক আশা পোষণ করেছিলেন। তিনি ২২শে সেপ্টেম্বর চিকাগোতে তাঁর ত্রিংশতম জন্মবার্ষিকীতে উপস্থিত বন্ধু-বান্ধব ও সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন : "Patterson will be too fast" কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ঠিক তার উল্টো। প্যাটারসনকে আঘাত হানবার বা আঘাত প্রতিহত করার কোন সুযোগ না দিয়েই লিষ্টন তাঁকে নক-আউটে পরাস্ত করেছেন মাত্র ২মিঃ ৬ সেকেণ্ডে। অবশ্য পূর্ব চুক্তি অনুসারে প্যাটারসন ইচ্ছে করলেই এক বছরের মধ্যে আবার ফিরতি লড়াইয়ে লিষ্টনের সম্মুখীন হতে পারবেন। ২৬শে সেপ্টেম্বরও প্রতিযোগিতা শেষে প্যাটারস বলেছিলেন : "আমি আবার লড়তে চাই। হয় তো তিন মাসের মধ্যেই এই লড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারে ;" সেদিনের 'বেয়াড়া ছেলে' আজ বিশ্বজয়ীর খেতাব পেয়ে ভালভাবে জীবনযাপন করতে চলেছেন।

সম্প্রতি ফ্লোরিডার মিয়ামি বিচ্ (Miami Beach) থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, শীঘ্রই লিষ্টন-প্যাটারসনের পাল্টা লড়াই সুরু হবে। উভয়ের মধ্যে চুক্তি-পত্রও স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। লিষ্টন এখন থেকেই অনুশীলন সুরু করে দিয়েছেন। দেখা যাক্ প্যাটারসন্ আবার তাঁর হৃত-গৌরব ফিরিয়ে এনে মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে এক নতুন নজীর রাখতে পারেন কি না।

বসন্ত-জিজ্ঞাসা-চিত্র-কাব্যম্

হীরালাল দাশগুপ্ত

শীর্ণ দেহ ব্যাঘ্রের দ্রুত পদক্ষেপে গ্রীষ্ম এলো
বৃক্ষহীন অরণ্যের লোহার খাঁচায়। এলো-মেলো
ধুলো-ধোঁয়া-খড়-কুটো-শালিক-চড়াই এবং মনও।
বাড়ী, গাড়ী, প্রেম আর কলোম্বো প্রস্তাবগুলো। এই কিছুক্ষণও।
আগে সব ধূসর-বিবর্ণ ছিলো। মুহূর্তে স্বপ্নাভ-সবুজ মনে হয়।
শুধু ঐ গরুটার নিচেকার ঘাসগুলো গ্রীষ্মের পরিচয়
এখনো পেলো না। কবরের তলা থেকে মাটি মাখা মুখে উঠে উঠে আসে
ভুলে-যাওয়া স্বপ্নের বাদামী ছায়ারা। ঘরের দেয়ালগুলো ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসে
কেঁপে-কেঁপে ওঠে। এবং তথাপি, মানুষের শব শ্মশানে নিতে প্রতিদিন বেঁচে থাকে
মানুষেরা। সুতরাং, শীতও বারে বারে গ্রীষ্মকে ডাকে।
অতএব, গ্রীষ্ম এলো। হয় তো এখনি একটা মূর্খ ভ্রমর ঘরে ঢুকবে।
আর, গুন্-গুন্ কোরে উড়ে উড়ে তোমার চুলের গন্ধ শুঁকবে।
ঘরে তো অনেক থাকা হোলো, এইবার চলো যাই দুইজনে পাশা-পাশি বসি
ঐ নীল ঘোড়াটায়। কাঁধে ধনু, পিঠে তূণ, বুকে বর্ম, হাতে তীক্ষ্ণ অসি
না-ই-বা থাকলো। ধুলো-ধোঁয়া-কালি—ও পথে নয়—পচা হৃদয়ের গন্ধ পাই।
ঐ পথে চলো—যে-পথে পায়ের চিহ্ন নাই—যে-পথে নাই
পথের কোনো ইতিহাস। হয় তো পেছনে পেছনে ঘেউ ঘেউ কোরে ডাকবে
হাড়-বের করা কুকুরগুলো ; কিন্তু সামনে, দূরে-দূরে নিশ্চয়ই থাকবে
পালিয়ে-যাওয়া হলুদ রংয়ের আশ্চর্য হরিণেরা। কিংবা, চলো যাই গভীর অরণ্যে
যেখানের অন্ধকারে মৃত্যুর প্রবেশ নিষেধ। কেমন কোরে আর কী জন্যে
বসন্ত আসে, আর, সূর্যদেব উত্তাপ ; চলো যাই শুনে আসি সেই কৌতুককর কাহিনীটা।
তুমি ধরবে গলা জড়িয়ে সিংহটার, আর, আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাঘিনীটা।

কাছের মানুষ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

শুভ্রা ভট্টাচার্য

সেদিন বোধ হয় তারিখ ছিল ৫ই জুলাই ১১৫৮ সাল। ক'দিন থেকে শুনছিলাম বিশ্ববন্দিত দার্শনিক ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আমাদের বাড়ী আসবেন। মনে আনন্দ ছিল চিন্তা ছিল তার চেয়েও বেশী। এত বড় বিদগ্ধ সুধীজনের সাথে আমি কি নিয়ে আলোচনা করব? বহুবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, বহু প্রবন্ধ বহু রচনা পড়েছি। কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝিনি। কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি। এবার সাক্ষাৎ পরিচয়ের একটা সুযোগ পেয়েছি এবং অতি নিকট থেকে কিন্তু আলোচনার বিষয় খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ এলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত ছিলেন। নানা বিষয়ে আলোচনা হ'ল। আমার বিশ্ববিদ্যালয় (গোরক্ষপুর) সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার এই বিদগ্ধ মনীষী এতদূর থেকেও পুংখানুপুংখ ভাবে কি করে জানলেন ভেবে সেদিন অবাক হয়েছি। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ডিপ্লোম্যাট কিন্তু তাঁর ব্যবহারটা কতই না সরল! তাঁর উপস্থিতিতে মুহূর্তের ভিতর আমার সমস্ত চিন্তা কোথায় ভেসে গেল। মনে হ'ল যেন বহুদিনের পরিচিত আমারই কলেজের একজন অধ্যাপকের সাথে প্রতিদিনের সাধারণ আলোচনা করছি। তারপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও তাঁর আবুলকালাম আজাদ রোডের উপরাষ্ট্রপতির প্রাসাদে অনেকবার ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। মানুষকে দূরে বসেও এত কাছের করে নেওয়ার তাঁর একটা অসাধারণ শক্তি রয়েছে।

সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা শোক শান্তি নিয়ে মানুষের জীবন। জীবনের এই বিভিন্ন অবস্থায় মানুষ চায় সহানুভূতি, চায় সামান্য সমবেদনা। বিশ্বের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হ'ল তাঁর মানবপ্রীতি। দুঃখীর প্রতি সমবেদনা, শোকার্তকে সান্ত্বনা, বেদনাহতের পার্শ্বে দাঁড়ানো তাঁর জীবনের ব্রত। নিকট থেকে দেখেছি মানুষের দুঃখে এই বিশ্ব দার্শনিককে শিশুর মতন অভিভূত হতে। দেখেছি সদ্যবিধবাকে সান্ত্বনা দিতে, দেখেছি পুত্রহারাকে প্রবোধ দিতে। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সর্বোপরি মানব প্রেমী তারপরে দার্শনিক, রাজনীতিক, তারপরে রাষ্ট্রপতি। যে ভারতবর্ষের কবি একদিন গেয়েছিলেন 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' সে দেশের পক্ষে এ দার্শনিক মানবপ্রেমী নেতৃত্ব কম গৌরবের কথা নয়।

শৈশব

মাদ্রাজ শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত তিরুয়ানি গ্রামে ১৮৮৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ জন্মগ্রহণ করেন। তিরুয়ানি গ্রামটি হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। তিরুয়ানি ও পার্শ্ববর্তী তিরুপাটি গ্রাম বহু তীর্থযাত্রীর পদধূলিতে পবিত্র।

ছোটবেলা থেকেই সর্বপল্লীর মন একটা অন্য জগতে ঘুরে বেড়াতো। কে জানে শিশু দার্শনিক সেদিন থেকেই বিশ্বের দর্শন সভার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সুরু করেছিলেন কি না? এ বিষয়ে সর্বপল্লী পরবর্তী জীবনে বলেছেন, 'কেন জানি না, জ্ঞানাবধি জীবনপ্রবাহে আমি এক অদৃশ্য জগতের উপস্থিতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, জ্ঞানেন্দ্রিয় যে জগতের নাগাল পায় না, কেবল মাত্র পবিত্র অন্তঃকরণে বিশ্বাসীই যাঁর বন্দনার অধিকারী।'

এই 'অদৃশ্যশক্তি' তাঁর জীবনে পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থায় পথ প্রদর্শক। এই 'অদৃশ্যশক্তি' তাঁর জীবনকে চালিয়েছে সত্য সুন্দর ও মানব প্রীতির প্রকৃত পথে। তিনি বহুবার বলেছেন, 'জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের পরম বিপদ সঙ্কুল মুহূর্তেও এই না দেখা জগতের প্রতি আমার আস্থা রয়েছে অটল।' এই অটল বিশ্বাসই তাঁর জীবনের সফলতার মূল মন্ত্র। তিনি বলেন, 'এই না দেখা জগতের সত্য সন্ধানেই বোধ হয় আমার মনটা থাকতে চায় সমাহিত। তাই শান্ত বিজন একাকিত্ব আমার কাছে এত প্রিয়।'

এই না দেখা শক্তির উপর অটল বিশ্বাসে দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। সাধারণ মানুষ আমরা। স্বভাবতই মনে মনে ভাবি লোকটা জীবনে এত সফল হল। তাঁর কি ভাগ্য? এ বিষয়ে রাধাকৃষ্ণণ নিজে বলেন, আমার ভাগ্য আছে। আমার অদৃষ্ট ভাল। সেই অদৃষ্টই আমাকে এতদিন পরিপালন করছে। প্রায়ই অনুভব করি কোনো না জানা কর্ণধার যেন অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আমার জীবনতরী চালিয়ে চলেছেন। আমি জানি, বহু তরী সেখানে জলমগ্ন হয়েছে। জীবনে এই শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ পেয়ে আমি ধন্য।

তাঁর জীবনের দৃষ্টি প্রদীপ আদর্শবাদী দৃষ্টিপাতে তিনি এই অবস্থ শক্তির বর্ণনা করে একে বলেছেন 'দৃষ্টি প্রদীপ' (ইন্‌টিউশন)। আমি অনুভব করি আমার জীবনের সিদ্ধান্ত একটা নির্ধারিত পরিকল্পনা থেকেই নেওয়া হয়েছে। মনোনয়ন করার সময়ে আমি অনুভব করেছি যেন একটা অদৃষ্ট শক্তি জীবন পথে আমাকে পথ নির্দেশ দিচ্ছে। তাই বলে আমি এ কথা বলতে চাই না যে আমার পথ নির্দেশের জন্য বিধাতা কোন স্বতন্ত্র যত্ন নিচ্ছেন। বিধাতা কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য স্বতন্ত্র যত্ন নেন বা ব্যক্তি বিশেষকে অন্তরঙ্গ বলে

আশীর্বাদ করেন এই চিন্তাও সম্পূর্ণ বিবেক রহিত। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। (আত্মজীবনী)

রাধাকৃষ্ণণের সান্নিধ্যে যাঁদের আসবার সুযোগ হয়েছে কেবলমাত্র তাঁরাই জানেন এই বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক সামাজিক অনুষ্ঠানে বা পারিবারিক ঘরোয়া বৈঠকে কি রকম হাসির ফোয়ারাও ছুটোতে পারেন? তিনি অত্যন্ত মিশুক যদিও অন্তর থেকে তিনি চান 'নিভৃত নিরালা।'

পঠন স্পৃহা

তাঁর নিজের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি বই পড়াতে কাটান। এ বিষয়ে ষ্টালিনের একটা মন্তব্য মনে পড়ে। রুশে ভারতের রাষ্ট্রদূত রাধাকৃষ্ণণকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে (একমাত্র রাধাকৃষ্ণণকে বিদেশীয় রাষ্ট্রদূত যাঁকে ষ্টালিন নিজে এসে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন) তিনি বলেছিলেন আজ আমি সৌভাগ্যবান। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক—যিনি দিনের ২৪টি ঘণ্টা বই পড়েই কাটান—রাধাকৃষ্ণণকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

স্তূপাকৃত বইয়ের ভিতরই তিনি সর্বদা ডুবে থাকতে ভালবাসেন। তাঁর পড়ার ঘর ছাড়াও বিশ্রামাগারেও তাই তাঁর নিত্য সহচর পুস্তকরাশি একটা অতি প্রিয় স্থান পেয়েছে। রাধাকৃষ্ণণ নিজে বলছেন বই; জীবনপ্রভাত থেকেই বই আমার বিশ্বস্ত প্রিয় বন্ধু, আমার শাশ্বত সহচর; জীবনের কত দিকই না তারা আমাদের সামনে খুলে ধরে; আমাদের কত সুপ্ত স্বপ্নকে জাগিয়ে তোলে।

(আমার সত্য সন্ধান: ভাবান্তর লেখিকা)

বাংলাদেশ ও রাধাকৃষ্ণণ

বাংলার সাথে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের কর্মজীবনের একটা বিশিষ্ট যোগ আছে। ১৯২১ সালে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ দর্শনে ভারতের শ্রেষ্ঠ আসন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কিং জর্জ দি ফিপথ,' চেয়ার অব্ মেণ্টাল মরাল সাইন্‌স পদে নিযুক্ত হন।

শৈশব থেকে যে সকল মনীষী তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছেন তাঁদের ভিতর সর্বপ্রথমে আসে স্বামী বিবেকানন্দের নাম। তাঁর স্কুল ও কলেজ জীবন খৃষ্টান মিশনারী বিদ্যামন্দিরে অতিবাহিত হলেও বাড়ীতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও তাঁর ভাষণ পড়বার সুযোগ পেয়েছেন। স্বামীজীর ভাষণ পাঠ করে হিন্দুধর্মের প্রতি বিদেশী মিশনারীদের কটাক্ষে শিশু রাধাকৃষ্ণণের মন বেদনাহত হয়েছে। স্বামীজীর ভাষণ পাঠ করে তাঁর মনে একটা অপরিসীম বল এসেছে। তিনি বলছেন, সত্যি বলতে কি স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদীপ্ত ভাষণাদিতে তখন হিন্দু হিসেবে আমার মনে গর্বের ভাব জাগ্রত হয়েছিল, হিন্দু ধর্মের প্রতি মিশনারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারে তা গভীর বেদনায় আহত হয়েছে। কল্পনা করতেও আমার কষ্ট হত যে যুগ যুগ ধরে যে সকল যোগী ঋষি ভারতের শাশ্বত কৃষ্টি অব্যাহত গতিতে রক্ষা করে এসেছেন তাঁরা প্রকৃত ধার্মিক ছিলেন না। তখন আমার মনে হত আরামপ্রিয় ভাগ্যান্বেষণকারী দিগ্‌গজগুলোর চেয়ে বোধ হয় আমার দেশের দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা পৃথিবীর আধ্যাত্মিক রহস্য সম্বন্ধে অনেক বেশী খবর রাখে। তাদের যে একটা পুরোণো ঘরোয়া নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। তাঁরা যে সনাতন সত্যের সাথে পরিচিত সে সত্য যুগ যুগ ধরে মানুষ যে পরমার্থের অনুসন্ধান করে এসেছে তারই প্রতিফলন:

রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণণ

বাংলার যে অন্য মনীষীর চিন্তাধারা সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে তিনি ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় আমি হিন্দু নীতি শাস্ত্র এবং মায়া তত্ত্বের উপর আমার মতের অনেকখানি সমর্থন পেয়েছি। ইংরেজী অনুবাদ থেকে গুরুদেবের লেখা অধ্যয়নের ফলাফল ১৯১৮ সালে ম্যাকমিলন (লণ্ডন) কর্তৃক প্রকাশিত ডা: রাধাকৃষ্ণণের একখানা পুস্তকে সংগৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দর্শন সম্বন্ধে এইখানাই সর্বপ্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ। বইখানা বিদেশে বিশেষ সমাদৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন বইখানা বহুদিন পরে আবার মুদ্রিত হয়েছে।

বইখানা পড়ে (১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ডা: রাধাকৃষ্ণণকে লিখেছিলেন, 'যদিও আমার সম্বন্ধে লিখিত বইখানার উপর আমার সমালোচনা কেউ বিশেষ গ্রাহ্য করবে বলে মনে হয় না, তবুও আমি নিশ্চয়ই বলব বইখানা আমার আশাতীত ভালো লেগেছে। আপনার আগ্রহান্বিত প্রয়াস ও বৈদগ্ধে আমি হতবাক্ হয়েছি। সহজ সরলভাবে লালিত্যপূর্ণ ছন্দে আপনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সেটা আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

গুরুদেব একাধিকবার ডা: রাধাকৃষ্ণণকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন। গুরুদেবের দেহত্যাগের ঠিক এক বছর পূর্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে যে বিশেষ অনুষ্ঠানে ডক্টরেট উপাধিতে গুরুদেবকে সম্মানিত করে তাতে ডা: রাধাকৃষ্ণণই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাছাড়া ১৯২৫ সালে ডা: রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় দার্শনিকদের যে মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন তার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে তিনি গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ জানান।

মহামানবের গান

মহামানবের মিলন তীর্থ ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে মানব প্রীতির মিলন হার গেঁথে এসেছে। এটা অবিচিত্র কিছুই নয় যে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তাঁর চিন্তায় ও কর্মে মানুষে মানুষে প্রীতির ও মৈত্রীর বন্ধনের জয়গান গাইবেন।

ভাগবতের একটা শ্লোক উদ্ধৃত করে ডা: রাধাকৃষ্ণণ তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি রাজ্যও চাই না, স্বর্গও চাই না, পুনর্জন্মও চাই না। আমি যেন শুধু দুঃখতপ্ত বেদনাহত প্রাণীদের দুঃখ নাশ করেই যেতে পারি।'

মহামানবের মিলন যাঁরা জানেন তাঁরাই মহাপুরুষ। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁরা মহামানবের মিলনবাণী এনেছিলেন ডা: রাধাকৃষ্ণণ বলেন, 'নিরাশার অন্ধকারে যাঁরা আশার আলো প্রজ্বালিত করেন, পৃথিবীতে তাঁরাই প্রকৃত মহাপুরুষ। আমরা প্রায়ই তাঁদের প্রেম প্রীতিতে স্বতঃস্ফূর্ত বলেই গ্রহণ করে থাকি। আমরা ঠিক ধারণা করতে পারি না তাদের কাছে আমরা কতখানি

ধনী, যদিও স্নেহশীলতা, সমবেদনা ও কৃতজ্ঞতার কোন প্রতিদান দেওয়া যায় না। এতে কোন পুরস্কার বা প্রতিদানের প্রশ্ন ওঠে না। যেখানে প্রকৃত প্রেম আছে সেখানে মানুষ দিতেই চায়, বিনিময়ে কিছু চায় না।'

মানুষের জীবনটা একটা কান্না-হাসির দোলা। সুখ দুঃখ নিয়েই জীবন। দুঃখই বেশী। দুঃখীদের সান্ত্বনা দিয়েই বোধ হয় কবিগুরু গীতাঞ্জলিতে গেয়েছেন 'আঘাত সে যে পরশ তব সেই তো পুরস্কার। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ দুঃখতপ্ত মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছেন 'দুঃখের ভিতরই আমরা সব কিছু উপলব্ধি করতে পারি। যন্ত্রণা ভোগ ও নিরালা তিতিক্ষাই মনুষ্য জীবনের প্রকৃত রীতি। বহির্জগতের সাথে কোন সম্বন্ধ না রেখে যাঁরা অন্তর্মুখী জীবন যাপন করেন তাঁরাই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পান।' এই বিশ্ব দার্শনিকের মতে পৃথিবীতে মানুষ যে যন্ত্রণা ভোগ করে সেটা তার শাস্তি নয় সেটা বরং অনুশাসন দুঃখ ভোগের ভিতরই প্রকৃত শিক্ষা হয়। দুঃখ ভোগ উন্নতির সোপান হয়ে দাঁড়ায়। জীবনে একবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দাঁড়াতে পারলে সেটাই হয় এই দুঃখ ভোগের সুখময় পুরস্কার। দুঃখকে ভয় করার পরিবর্তে দুঃখকে সহ্য করার সাহস আসে।

মহামানবের মিলন ঘটাতে সর্বোপরি প্রয়োজন হ'ল ত্যাগ। ভারতীয় দর্শন অনুসারে এই ত্যাগ থেকেই আসে সুখ। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ বলেন, 'মানুষের বিচার হবে তার জীবন আর চরিত্র দিয়ে। সকল সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এক হয়। সকল ধার্মিকতার সার হ'ল আত্মার মহত্ব, যে মহত্ব মহাদুর্বিপাকের মধ্যেও অপরাজেয় থাকে।' এই আত্মার মহত্ব থেকেই আসবে বিশ্বের শান্তি। আসবে বিশ্বের ত্রাণ।

পথপ্রান্ত

পূর্ণেন্দু গুপ্ত অঙ্কিত
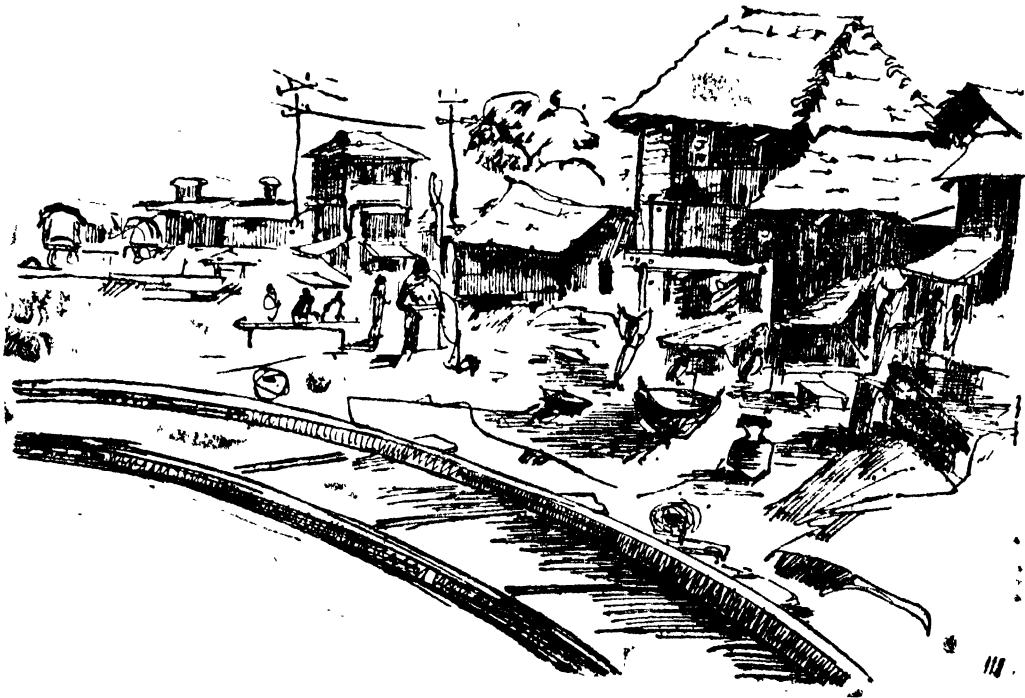
সুবোধকুমার চক্রবর্তী

এক

আপনি অস্বীকার করেন? পারেন আপনি অস্বীকার করতে? আপনি আমার স্বামীকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন—

উদ্গত কান্নায় দময়ন্তী ভেঙ্গে পড়ল। আর তার সামনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল অভিযুক্ত কাঠুরে চৌধুরী।

অন্ধকারে দিগন্ত যখন পরিব্যাপ্ত, অরণ্য স্তব্ধ হয়ে আছে। বাতাস নেই, শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি এখন শোনা যাবে না। শুধু একটা আতঙ্ক চারিদিক আবিষ্ট করে আছে। দিনের বেলায় সূর্যের আলো থাকে, উত্তাপ থাকে রৌদ্রের। পাখি ডাকে, প্রাণের স্পন্দন থাকে চারিদিকে। তাই অরণ্যের আতঙ্ক থাকে না। দিনের আলোয় সাহসী মানুষ অরণ্যের সৌন্দর্য করে উপভোগ। আর এখন?

দু'হাতে মুখ ঢেকে দময়ন্তী কাঁদছে। কাঠুরে চৌধুরীর বদলে তার স্বামী সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে নিশ্চয়ই কাঁদত না। দময়ন্তী তো অরণ্যের ভয়ে কাঁদছে না, অরণ্যে ভয়ের কথা এখন তার মনেও আসছে না। নিজের প্রাণের জন্য নারী নির্ভয়, স্বামী ও সন্তানের জন্য তার সমস্ত দুর্ভাবনা সারাক্ষণ আবর্তিত হয়। দময়ন্তী তার স্বামীর জন্য কাঁদছে।

কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী কোন উত্তর দিল না। কোন প্রতিবাদ জানাল না। অভিযোগ শোনার অভ্যাস তার আছে, কিন্তু প্রতিবাদের অভ্যাস নাই। এই ব্যাপারে তার কাঠের মতো বর্ম। আঘাত সয় কিন্তু আঘাত দেয় না। কাঠুরে চৌধুরী নিঃশব্দে থেকে দময়ন্তীর অভিযোগ যেন মেনে নিল।

পরে যখন মুখ তুলল, তখন তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। বলল উত্তর দিলেন না যে?

কাঠুরে চৌধুরী সরে এসে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল সংক্ষেপে উত্তর দিল: তর্কের শেষ নেই।

তর্ক নয়, আমি আপনার অপরাধ স্বীকার করতে বলছি।

তাহলেই কি সমস্ত মিটে যাবে?

দময়ন্তী ফোঁস করে উঠল: সে কথা আমি বুঝব।

কিন্তু কাঠুরে চৌধুরীর ব্যবহারে কোন উষ্মা প্রকাশ পেল না স্থির গম্ভীর গলায় বলল: সব দোষ আমার।

দোষ নয়, অপরাধ। বলুন, হত্যার অপরাধ। আপনি আমা স্বামীকে খুন করতে চেয়েছিলেন।

কাঠুরে চৌধুরীর মুখখানা বিকৃত হল। সে হাসছে, না বিদ্র করছে। বলল: সে ইচ্ছা থাকলে এতদিন অপেক্ষা করতুম না।

দময়ন্তী চিৎকার করে উঠল: কী বললেন?

এখন ধৈর্যের দরকার, উত্তেজনা ভাল নয়। আমার অপরাধে বিচার পরে করলেও ক্ষতি হবে না। তার অনেক সময় পাও যাবে, সুযোগও আসবে।

কাঠুরে চৌধুরীর মুখের চুরুট নিবে গিয়েছিল। এইবারে সেটা ধরাল।

দময়ন্তী দূরে সরে গেল। এই জায়গাটায় বেশ একটু বে আলো। বারান্দায় টাঙানো লণ্ঠনটার সবটুকু আলো যেন এইখা এসে পড়েছে। দময়ন্তীর একটু অবকাশ চাই, অবকাশ তার ভা- লাগছে।

কাঠুরে চৌধুরী একখানা বেতের চেয়ার এনে পাশে রেখে গেল

সে নিজে এসে নিকটে বসল। সে বসল আলোর নিচে। এই অরণ্যে অন্ধকারের মধ্যে সে অনেক রাত্রি যাপন করেছে। অনেক ত্রাসার্ত বীভৎস রাত্রি। সে সব রাত্রির ইতিহাস সহসা শেষ হয়ে গেছে। আজ থেকে তার বারান্দায় আলো জ্বলবে। আর সে বসে থাকবে আলোর নিচে। কাঠুরে চৌধুরী এই আলো কিছুতেই নিবতে দেবে না। এই আলো নিবলে লোকে তাকে আরও বেশি ভুল বুঝবে।

দময়ন্তী আর দাঁড়াতে পারছিল না। ক্লান্তিতে সমস্ত দেহ ভেঙে পড়ছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে। মনের মতো দেহও এখন অবসন্ন। দময়ন্তী বসে পড়ল। শরীরটা এগিয়ে দিয়ে খানিকটা আরাম পেল।

কী কুক্ষণেই আজ তারা বেড়াতে বেরিয়েছিল। পঞ্জিকায় কি যাত্রা নাস্তি ছিল, না মঘা বা অশ্লেষা কিংবা ছিল ত্র্যহস্পর্শ। দময়ন্তীরা এসব কোনদিন মানে নি, কুসংস্কার বলে চিরদিন ঘৃণা করেছে। তবে আজ কেন এইসব কথা মনে আসছে! মনে আসছে আরও অনেক কথা। তার শৈশবের কথা, তার যৌবনের কথা। তার জীবনের স্রোত মসৃণ উপলের উপর দিয়ে তরতর করে বয়ে যাচ্ছিল। আজ একটা বড় পাথরে এসে প্রবল ধাক্কা খেয়েছে। জানে না এ স্রোত এই পাথরেই আটকে গেল কি না।

দময়ন্তী ঘামছে। হেমন্তের এই শীতল রাত্রেও তার গরম বোধ হচ্ছে। এই উত্তাপ যে আবহাওয়ার নয়, দময়ন্তী তা জানে। তবু সে মনকে সংযত করতে পারছে না। এ মন এখন সংযত করা সম্ভব নয়।

দময়ন্তী উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভিতরে তার স্বামীকে একবার দেখে এল। এখন সে অজ্ঞান নয়, মরফিয়ার ঘোরে অচেতন হয়ে আছে। ডাক্তার বলে গেছেন, সারারাত্রি সে এমনই অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকবে। জীবনের আশা আছে কি না কাল সকালে তা বোঝা যাবে। প্রাণটা থাকলে দেহের ভাবনা। ভবিষ্যৎ একেবারে অনিশ্চিত।

দুর্ঘটনার কথা মনে পড়তেই দময়ন্তী শিউরে উঠল। কী সাংঘাতিক সেই দৃশ্য। টৌবির জলপ্রপাত দেখে তারা ফিরছিল। তার স্বামী তাদের নূতন গাড়টা চালাচ্ছে। সংকীর্ণ পথ, তাও অসমতল। গরুর গাড়ির চাকায় এমন গভীর গর্ত হয়েছে যে অত্যন্ত সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। দময়ন্তী তার স্বামীর পাশে বসে পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। সামনে থেকে হঠাৎ এল একটা জীপ গাড়ি। তার বেপরোয়া চালক। এই দুর্গম পথকে যেন বাঁধানো রাস্তা ভাবছে, শহরের প্রশস্ত রাস্তা। দময়ন্তী চেঁচিয়ে উঠেছিল, তার স্বামী ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য। তার পরের কথা আর তার মনে নেই।

কয়েক মিনিট পরে সে চোখ মেলেছিল। এই কাঠুরে চৌধুরী তখন তাকে গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বার করছে। গাড়িটা রাস্তার উপর থেকে গড়িয়ে নিচের ক্ষেতে পড়েছে আর তার স্বামী ষ্টিয়ারিংয়ের কাঁদে দলা পাকিয়ে আছে। দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে দেখল, তার নিজের শরীরে মারাত্মক আঘাত কিছু নেই, দু' এক জায়গায় কেটেছে, আর ব্যথা করছে কয়েক জায়গায়। সামান্য একটু সাহায্য পেতেই সে বেরিয়ে এল। কাঠুরে চৌধুরীর হাত ধরে উঠল রাস্তার উপর। জীপখানা যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

দময়ন্তীর পা কাঁপছিল। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। পথের উপরেই সে বসে পড়েছিল। আর দেখছিল কাঠুরে চৌধুরীকে। সেই বিশাল মানুষটা একটা কথাও বলে নি, একটা মুহূর্তও নষ্ট করে নি। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে, অনেক যত্নে সে তার স্বামীর অচেতন দেহটা গাড়ির ভিতর থেকে মুক্ত করে বার করেছিল। দু'হাতের উপর অবলীলায় বহন করে জীপের পিছনে শুইয়ে দিয়েছিল। তারপর তাকে উঠতে বলেছিল। নিজের পাশে বসিয়ে দু'জনকেই তার বাড়িতে এনে তুলেছে। কয়েক মাইল দূর থেকে ডাক্তার এনেছে ডেকে। কোন ব্যবস্থার ত্রুটি করেনি। এমনকি রাতেও যাতে ডাক্তার থাকেন, তার ব্যবস্থা করেছে। কাঠুরে চৌধুরীর জীপে চেপে ডাক্তার বাড়ি গেছেন, খেয়ে দেয়ে আবার তিনি ফিরে আসবেন।

এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল সায়াহ্নের পূর্বে। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু রাত্রি গভীর হয়নি। আরণ্য পরিবেশের জন্য প্রহরের হিসাব রাখা যাচ্ছে না। কোন হিসাব রাখার প্রয়োজনও আর নেই। দময়ন্তীর মনে হচ্ছিল যে, কোন হিসাব রাখার প্রয়োজনই হয় তো আর হবে না।

কিন্তু অদ্ভুত লোক এই কাঠুরে চৌধুরী। সবদিকে তার সমান নজর। দময়ন্তীর জামাকাপড়ে রক্তের দাগ সেই দেখেছিল। ডাক্তার যখন তার স্বামীকে ইনজেকসন দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কাঠুরে চৌধুরী তখন তাকে দময়ন্তীকে পরীক্ষা করতে বললেন। আঘাত তারও লেগেছে, কিন্তু সে কথা তার মনে ছিল না। নিজের দিকে সে একবারও তাকায় নি। তার সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধি তার স্বামীর উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। কাঠুরে চৌধুরীর কথায় সে তাই আশ্চর্য হয়েছিল। বলেছিল: আমাকে দেখবেন? আমার তো কিছু হয় নি।

উত্তরে ডাক্তার শুধু হেসেছিলেন।

তারপরে দময়ন্তী আরও বিস্মিত হল। তার জামাকাপড় রক্তে রাঙা। দু' এক জায়গায় কেটে গেছে। কিন্তু কোথায় কেটেছে তা দেখতে পাচ্ছে না। দময়ন্তীর বড় দুর্বল বোধ হল। মনে হল, সে আর দাঁড়াতে পারবে না, পড়ে যাবে। কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী তাকে ধরে ফেলে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। ডাক্তার তাকেও ইনজেকসন দিলেন, তারও ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে বেঁধে দিলেন। খানিকটা গরম দুধ খেয়ে দময়ন্তী সুস্থ বোধ করল।

কাঠুরে চৌধুরীর জীপখানা যে এতক্ষণ বাড়িতে ছিল না, দময়ন্তী লক্ষ্য করেনি। এইবারে সশব্দে সেটি সামনে এসে দাঁড়াল। দময়ন্তী দেখল যে জীপের ড্রাইভার তাদের সুটকেশ ও টুকিটাকি জিনিষপত্র বারান্দায় এনে রাখল।

ডাক্তার বললেন: আপনারা এবারে বিশ্রাম করুন, আমি যাই।

কাঠুরে চৌধুরী তাঁর হাত চেপে ধরল: একটু বসুন ডাক্তার সেন।

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বললেন: আর কিছু বাকি আছে?

না।

তবে?

আজ রাতে আপনাকে এখানে থাকতে হবে। আপনি কথা দিয়ে যান।

ডাক্তার সেন বিহ্বল চোখে তাকালেন কাঠুরে চৌধুরীর দিকে।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: এখানে আপনার কোন কষ্ট হবে না, কোন অসুবিধাও হতে দেব না। অথচ আমাদের অনেক উপকার হবে।

তার কোন দরকার দেখি না।

আমরা সাহস চাই।

ডাক্তার সেন তবু আপত্তি করলেন। বললেন: সামান্য ভয় পেলেই না হয় আমার কাছে গাড়ি পাঠাবেন।

দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন: আপনারও ঘুমের দরকার।

কাঠুরে চৌধুরী আর একবার ডাক্তার সেনের হাত চেপে ধরল, বলল: আমি আপনার সময়ের পুরো ক্ষতিপূরণ করব।

লজ্জিত ভাবে ডাক্তার সেন বললেন: আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন। যাই হোক, রাতে আমি থাকব। তবে এখন আমাকে যেতে হবে।

আমাকে ক্ষমা করবেন। ওঝা—

ওঝা ড্রাইভারের নাম। জীপের সামনেই সে অপেক্ষা করছিল। বারান্দায় উঠে এল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: ওদিকের ব্যবস্থা হয়েছে?

জী।

তবে ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে যাও। আর মনে আছে? ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে ফিরবে।

ডাক্তার সেন বললেন: আমি খেয়ে দেয়ে একটু দেরিতে আসব। মানে সাড়ে দশটা এগারটা। আমার জন্যে আপনারা অপেক্ষা করবেন না।

ডাক্তার তাঁর ওষুধের ব্যাগ প্রভৃতি নিয়ে বিদায় নিলেন।

দময়ন্তী তখনও নিঃশব্দে বসে ছিল। এবারে তার দিকে চেয়ে কাঠুরে চৌধুরী বলল: ভিজে কাপড়জামা এখন বদলানো দরকার।

তার ভৃত্য লবাট্‌কে ডেকে বলল: জিনিষগুলো ঘরের ভিতরে দিয়ে আয়।

দময়ন্তী উঠল না।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: আমি সাহায্য করব?

না।

তবে লবাট্ সাহায্য করুক।

দময়ন্তী উঠে বলল: কারও সাহায্য আমায় চাইনে। বলে অন্তরালে চলে গেল।

কাঠুরে চৌধুরী একটা চুরুট ধরিয়ে চেয়ারে বসল। আকাশ পাতাল ভাবল, ভাবল দময়ন্তীর কথাও। কিন্তু দময়ন্তীর উষ্মার কারণ কিছুতেই ভেবে পেলনা। দময়ন্তী কেন এই দুর্ঘটনার জন্য তাকে অপরাধী করছে? তার কী দোষ? নিজের কাজ সেরে সে ফিরছিল। ওরা যে আজ এদিকে এসেছে, তাও সে জানত না। সে তার নিজের অভ্যাস মতোই ফিরছিল। হয়তো একটু বেপরোয়া গাড়ি চালিয়েছে। রোজই তো এমনই চালায়। সবেও গিয়েছিল সময় মতো। কিন্তু—

এই কিন্তু বড় সাংঘাতিক হল। তার জন্যে পথ ছেড়ে দিতে গিয়ে দময়ন্তীরা পথের পাশে গড়িয়ে পড়ল। গাড়ি চালাতে অত ভয় যদি তো দাঁড়ালেই তো পারত, সে বেরিয়ে গেলে আবার চালাত।

বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য হয়ে দেখল যে, দময়ন্তী ভ[illegible] জামা কাপড় বদলে এসেছে, মুছে ফেলেছে রক্তের দাগ। দু' তিন ক্ষতস্থান তুলো দিয়ে বাঁধা আছে।

আস্তে আস্তে কাঠুরে চৌধুরী তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি[illegible] ভেবেছিল, কোন ভাল কথা বলবে। কিন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল ন[illegible]

দময়ন্তী তার চোখের দিকে চেয়েই ক্ষেপে উঠল: আপনি অস্বীক[ার] করেন? পারেন আপনি অস্বীকার করতে? আপনি আম[ার] স্বামীকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন—

কাঠুরে চৌধুরীর দুরাভিসন্ধির কথা দময়ন্তীর সন্দেহ হয়ে[ছে] কিন্তু মুখে বলতে পারে নি। মুখে সে অভিযোগ বুঝি জানা[তে] যায়না। সে বড় কদর্য অভিযোগ। সে কথা মনে হতেই দময়[ন্তী] শিউরে উঠল।

ডাক্তার কখন ফিরবে! রাত সাড়ে দশটা কি এখনও বাজেনি[?] তবে এখনই কেন মধ্যরাত্রির মতো অন্ধকার।

দুই

দময়ন্তীর মনে পড়ল তার বন্ধু ইন্দুর কথা। তার বিবাহের পু[র্বে] একদিন সে পরিহাস করে জিজ্ঞাসা করেছিল: তোমার নলের খ[বর] কী?

প্রথমটায় সে বুঝতে পারেনি, তার পরে বুঝেছিল কিন্তু উত[্তর] দেয়নি।

কিগো, কিছুই যে বুঝতে পারছ না!

হেঁয়ালি আমি বুঝিনে।

তুমি দময়ন্তী, তোমার নলের কথা জানতে চাইছি। রাজহং[স] এবারে নতুন কী খবর এনেছে? ইন্দু রাজহাস কাকে বলেছি[ল] দময়ন্তী সেদিন বুঝতে পারেনি। পরে বুঝেছিল। সে অন্য গল্প[।] তারপরে তাকে নলের গল্প অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে।

নলদময়ন্তী মহাভারতের গল্প, ছোট নয়, সে বিরাট কাহিনী[।] মহাভারতে এই রকমের অনেক গল্প আছে। এক একটা কাহি[নী] নিয়ে এক একখানা উপন্যাস রচনা সম্ভব। অনেক খুঁটিনাটি, অনে[ক] বিস্তার, একটা দেশের, একটা কালের সমগ্র ইতিহাস। তাইতে[ই] নাম মহাভারত। কিন্তু মহাভারত আমরা প্রাপ্ত বয়সে পড়ি না[।] মহাভারত পড়ি শৈশবে। বিগত যুগে বৃদ্ধ বয়সেও পঠিত হত[।] অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে মহাভারত পাঠ এখনও কিছু প্রচলিত আছে[।] এই যে কিছুদিন পূর্বে এক প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত তাঁর সারাজীবনে[র] সাধনায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত মূল সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করলে[ন,] কজন শিক্ষিত বাঙালী তার একখণ্ড পড়ে দেখেছেন! মহা[ত্মা] কালীপ্রসন্ন সিংহ যে অনুবাদ করেছিলেন, এ যুগের কজন তা পড়েছে[?] কাজেই দময়ন্তী আবার মহাভারত পড়ল। সে বাঙলা অনুবাদ ন[য়,] গুজরাতী অনুবাদ। গুজরাতী দময়ন্তীর মাতৃভাষা। দময়ন্তীর বা[বা] নরোত্তম খেমলানি গুজরাতী কন্যা বিবাহ করেছিলেন।

নলদময়ন্তীর কাহিনীর প্রথম দিকটা তার খুব ভালো লেগেছিল[।] সে যুগের পক্ষে খুবই রোমান্টিক। যে যুগে ঘোড়ায় গাড়ি ছাড়া আর কোন দ্রুতগামী যানবাহন ছিল না, মোটর ট্রেন বা বিমানে[র] স্বপ্ন দেখেনি সেদিনের মানুষ। দেশে পোষ্ট অফিস ছিল না যে, মানুষে

নল, বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তী। উভয়ে উভয়ের সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনেছে লোকের মুখে। নলের মতো রূপবান রাজা তখন ভারতে আর দ্বিতীয় নেই, স্বর্গের অশ্বিনীকুমারদের চেয়েও বোধ হয় বেশি রূপবান। এদিকে দময়ন্তীরও সেই অবস্থা, রূপে অনির্বচনীয়। তাই লোকে বলাবলি করে নলদময়ন্তীর কথা। বিবাহ হয়নি, বিবাহ হবে কিনা তাও জানা নেই, কোন সম্বন্ধও হয়নি। এমনি সময় দময়ন্তীর মায়ের কাছে জগদীশ মেহতার খবর এল। সুপুরুষ যুবক, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সরকারী চাকরি নিয়েছে। একই জায়গার লোক। দেশ স্বাধীন হবার আগে তারা এক জায়গায় ছিল। উদ্বাস্তু হয়ে খেমলানিরা সিন্ধুদেশ থেকে গুজরাতে এসেছে। ব্যবসার খাতিরে থাকে এই পালামৌ জেলায়। লাক্ষার ব্যবসা। এই অঞ্চলে থেকে লাক্ষা কলকাতায় পাঠাত। সেখান থেকে জাহাজ ভর্তি হয়ে দেশ বিদেশে যেত। দময়ন্তী মানুষ হয়েছে কলকাতায়। ছুটিতে বাপের কাছে এসে বন-জঙ্গল দেখেছে। আর শুনেছে জগদীশ মেহতার কথা। জগদীশ তখন সরকারী চাকরি নিয়ে রাঁচীতে এসেছে।

দময়ন্তী বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বাপ-মায়ের কাছে ফিরে এসেছিল। তার এম-এ পড়বার সংকল্প। গ্রীষ্মটা এই বনের ভিতরে কাটাবে, বর্ষায়ও কিছুটা। তারপর কলেজ খুললে কলকাতায় ফিরবে, এখানে তার বাপ-মা ছাড়া আর কোন সঙ্গী নেই। তাই সময় কাটাচ্ছিল বই পড়ে।

নরোত্তমবাবু সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলেন। বাইরের বারান্দায় স্ত্রীর সঙ্গে চা খেতে বসলেন। মেয়েও নিকটে ছিল। কিন্তু তার হাতে বই ছিল, আর চোখ ছিল বই-এর পাতায়।

নরোত্তমবাবু স্ত্রীকে বললেন: এবারে ফসল ভাল হল না।

লীলাবতী চা ঢালছিলেন; বললেন: ফুলও ভাল ফুটল না।

নরোত্তমবাবু কিছু বিমর্ষ হলেন। বিমর্ষ হবারই কথা। ফুলের সঙ্গে ফসলের তুলনা! ফুল ভাল না ফুটলে কার ক্ষতি হচ্ছে! কিন্তু ফসল! ওর সঙ্গে যে জীবন-মরণের সমস্যা। কুলি মজুর চাষী থেকে ব্যবসাদার মহাজন জাহাজের কোম্পানী পর্যন্ত এই ফসলের মুখ চেয়ে আছে। তাই তিনি নীরবে স্ত্রীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা সংগ্রহ করলেন, কোন কথা কইলেন না।

লীলাবতী মেয়েকেও এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিয়ে নিজেও নিলেন। তারপরে বললেন: দেখ না বাগানের অবস্থা! সারাদিন গরম হাওয়া বইছে, অথচ কার্নেসন এখনও ফুটল না।

নরোত্তমবাবু হতাশ ভাবে বাগানের দিকে তাকালেন। সত্যিই সব ফুল শুকিয়ে গেছে। চন্দ্রমল্লিকার চিহ্ন নেই, অ্যাষ্টর ও ডালিয়া শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন, সেই সঙ্গে পপি প্যান্সি ও সুইটপি। পিঙ্ক অ্যান্টিরিনাম, সুইট উইলিয়াম একটা-দুটো ফুটছে, আর লতিয়ে দোল দিচ্ছে ক্লান্ত পিটুনিয়া আর নাষ্টারসিয়াম। প্রচুর জল ঢেলেও আর তাদের সজীব রাখা যাচ্ছে না। নরোত্তমবাবুর মনে হল, শুধু তাঁর বাগান নয়, সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। আগের মতো রসের সন্ধান আর পাওয়া যাচ্ছে না। দু' হাতে পয়সা খরচ করেও লাক্ষা-বোঝাই গাড়িগুলো আগের মতো তাড়াতাড়ি কলকাতার বন্দরে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। মাল খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আশানুরূপ দাম পাওয়া যাচ্ছে না বিদেশের কাছে। ভাল পথ থাকলে খানকয়েক ট্রাক কিনে রেলে মাল পাঠানোটা বর্জন করা চলত। কবে যে এদেশের উন্নতি হবে, তা ভগবানই জানেন। কি পথঘাটের উন্নতি হলেই বা কী! সিন্থেটিক ল্যাকে যে দেশ ছেয়ে গেল! এই নকলের সঙ্গে কি পেরে ওঠা যাবে! এ যুগে নকল যে আসলকে গলা টিপে মারছে!

চায়ে চুমুক দিতে দিতে লীলাবতী বললেন: আজ একটা সুখবর পাওয়া গেছে।

সুখবর!

নরোত্তমবাবু চমকে সোজা হয়ে বসলেন।

লীলাবতী দেখলেন, দময়ন্তীও চোখ তুলে তাকিয়েছে। খুশী হয়ে বললেন: জগদীশ রাঁচীতে বদলি হয়ে এসেছে।

জগদীশ কে?

লীলাবতী আড় চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সে মুখ নামিয়ে নিয়েছে। জগদীশ সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহল নেই। থাকবার কথা নয়, কোথাও এ নামের লোকটির সঙ্গে আজও তার পরিচয় হয়নি। তবু তিনি স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন সস্নেহে: জগদীশকে ভুলে গেলে?

নরোত্তমবাবু হ্যাঁ বললেন না, নাও বললেন না। নীরবে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জগদীশের পরিচয় পাবার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

লীলাবতী বললেন: মেহতাদের ছেলে জগদীশ। মনে নেই?

নরোত্তমবাবুর মনে পড়ল। বললেন: যে ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেই জগদীশের কথা বলছি। অমন সুন্দর ছেলে আর একটা দেখেছ?

নরোত্তমবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন: বেচারা!

লীলাবতী চমকে উঠলেন: বেচারা মানে?

ছেলেটা শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারল না!

দময়ন্তীও তখন মুখ তুলে তাকিয়েছে।

নরোত্তমবাবু বললেন: ভেবেছিলাম সে ভাল কিছু করতে পারবে, এখন দেখছি চাকরি নিয়েছে। চাকরিতে পয়সা কোথায়? সারাজীবন কষ্ট পাবে।

লীলাবতী বিচলিত হলেন। বললেন: তুমি কি পাগল হয়েছ? চাকরি করে কি লোকে খায় না, না সবাই তোমার মতো সারাদিন টাকা টাকা করে!

নরোত্তমবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন: টাকা না থাকলে তার মর্ম বুঝতে।

দময়ন্তী আবার তার বই-এর পাতায় মনোনিবেশ করল। এই জগদীশ মেহতার কথা দময়ন্তী অনেক শুনেছে। শুনেছে তার মার কাছেই। আর কারও কাছে শোনেনি। জগদীশ তার মামাবাড়ির দেশের লোক। জুনাগড় শহরে তাদের বাড়ি। কিন্তু সেখানে তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। দময়ন্তীরা এই দেশে আছে আর জগদীশ লেখাপড়া করেছে সেই দেশে। কিছুদিন আগে একবার তারা মামাবাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু জগদীশ তখন দেশে ছিল না। আজ মামা তার মাকে এই ছেলের সংবাদ দিয়েছে, বলেছে যে, দময়ন্তীর সঙ্গে মানাবে এমন ছেলে নাকি দেশে ঐ একটাই আছে। দময়ন্তী সেই থেকে তার মায়ের কাছে জগদীশের গল্প শুনেছে।

লীলাবতী হার মানবার পাত্রী নন। বললেন: দুনিয়ায় টাকাই সব নয়।

নরোত্তমবাবু বললেন: এ তো পুরনো কথা, শাস্ত্রের কথা। আজকের মানুষ কি এ কথা মানে!

মানা উচিত।

তর্ক থাক। তোমার আমার ইচ্ছায় দুনিয়া চলবে না। তার চেয়ে যা বলতে চাইছিলে বল। জগদীশকে তুমি কি নিমন্ত্রণ করেছ?

লীলাবতী যেন অপার্থিব সুখ পেলেন, বললেন: সত্যিই তুমি বুদ্ধির গর্ব করতে পার। জুনাগড় থেকে দাদা জগদীশের ঠিকানা পাঠিয়েছিলেন।

চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করে নরোত্তমবাবু তা নামিয়ে রাখছিলেন। গম্ভীর মুখে বললেন: কবে আসতে বলেছ?

ওধার থেকে দময়ন্তীও মুখ তুলে তাকিয়েছিল। মেয়ের এই আগ্রহ লক্ষ্য করে মা বললেন: সামনের রবিবারের কথাই লিখেছি।

রবিবার।

হ্যাঁ রবিবার। তুমি কি থাকবে না সেদিন?

নরোত্তমবাবু ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন: কাজের জন্যে আমি আর একজনকে আসতে বলেছিলাম।

কাকে?

কাঠুরে চৌধুরীকে।

লীলাবতী যেন আঁৎকে উঠলেন: ঐ দৈত্যটাকে। না না, তুমি বারণ করে দাও। ওকে সেদিন একদম মানাবে না।

নরোত্তমবাবু আপত্তি করলেন না, কিন্তু বললেন: কাজের জন্যে দরকার ছিল। বাধা দিয়ে লীলাবতী বললেন: ওকে তুমি আর একদিন আসতে বল।

নরোত্তমবাবু উত্তর দিচ্ছিলেন না দেখে লীলাবতী আবার বললেন: অত শত ভাবছ কী।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরোত্তমবাবু বললেন: তোমাদের কথাই ভাবছি।

লীলাবতী বুঝলেন যে তাঁর স্বামী চিরাচরিত প্রথায় তাঁর ভাবনার কথাটা এড়িয়ে গেলেন। তাই বললেন: ঐ দৈত্যটাকে আমি সেদিন বাড়ি ঢুকতে দেব না, তা তোমাকে আগেই জানিয়ে রাখলাম।

তার দরকার হবে না। আমি তাকে কালই খবর দিয়ে দেব।

খুশী হয়ে লীলাবতী বললেন: লোকটা হঠাৎ কেন যাতায়াত শুরু করেছে, বল তো?

নরোত্তমবাবু সংক্ষেপে বললেন: আমার প্রয়োজনে।

লীলাবতী বিস্মিত হলেন।

নরোত্তমবাবু বললেন: বিশ্বাস হল না?

বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

বাঙালীর ছেলে বটে। কিন্তু ব্যবসা বোঝে? তা না হলে চাকরি করতে এসে অত বড় ব্যবসা ফাঁদতে পারে।

তোমার প্রয়োজনের কথা বল।

নরোত্তমবাবু বললেন: আজ থাক আর একদিন বলব।

লীলাবতী আর প্রশ্ন করলেন না। তিনি জানেন, এর চেয়ে বেশি আর জানা যাবে না।

দময়ন্তী তখন জগদীশ মেহতার কথা ভাবছিল। জুনাগড়ে তার মামার কাছে এই লোকটির কথা প্রথম শুনেছিল। মামা পঞ্চমুখে জগদীশের প্রশংসা করেছিলেন। তার মায়ের কাছেই শুধু নয়, তার সামনেও। এই গায়ে-পড়া প্রশংসায় দময়ন্তী একটু আশ্চর্য হয়েছিল।

তারপর আর কে জগদীশের কথা বলেছে তা দময়ন্তীর মনে পড়ছে না। শুধু এইটুকু মনে পড়ছে যে, সে রবিবারে জগদীশ তাদের বাড়িতে আসেনি। তার মা কয়েকদিন ধরে বাড়ি সাজিয়েছিলেন। শুকনো ফুল কেটে-ছেঁটে বাগানের চেহারাটাও বদলে গিয়েছিল। আর রান্না ঘরে এমন সব আয়োজন হয়েছিল যা সচরাচর এদিকে দেখা যায় না।

তার মা ছটফট করে সারাদিন কাটিয়েছিলেন। আর বিকেল বেলায় একজন লোকের হাতে চিঠি এসেছিল যে, জগদীশ আসতে পারল না।

ব্যস্ত হয়ে মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন: কোন অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

না।

তবে?

পত্রবাহক বলেছিল: বোধ হয় কোন কাজে আটকা পড়েছেন।

নরোত্তমবাবু সবই দেখলেন, শুনলেনও সবই। তারপরে বললেন: ও আসবে না।

কেন আসবে না?

তার মর্জি।

লীলাবতী গভীর ভাবে আপত্তি করেছিলেন, বলেছিলেন: ভুল কথা। তাকে তুমি জানো না বলেই এমন কথা বললে। সে নিশ্চয়ই আসবে, নিজে থেকেই আসবে।

নরোত্তমবাবু এ-কথার কোন উত্তর দেন নি।

তারপর?

তারপরে অনেক পত্র বিনিময় হয়েছে। সে জগদীশের সঙ্গে দময়ন্তীর নয়, সে তার মায়ের সঙ্গে। আর দময়ন্তী জগদীশের কথা শুনত তার মায়ের কাছে। ক্রমে ক্রমে তার বিশ্বাস হল যে, জগদীশের মতো যোগ্যপাত্র আর নেই, জগদীশকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখনও সে জগদীশকে দেখেনি, যেমন নিষধরাজ নলকে দেখেনি বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তী, অথচ তাকে মনে মনে বরণ করে ফেলেছে।

ইন্দু এ-সব কথা কোথায় জানল তা দময়ন্তী জানে না। সে কি নিজেই কোন দিন বলে ফেলেছে! না, সবই তার অনুমান।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—রামপ্রসাদ সেন

ঋগ্বেদ

প্রথম সূক্ত

১। সহজাত-জ্যোতি হে দেব অগ্নি বিস্তারি শিখা তব,—
সলিলে, শস্তে, গহনে, শিলায় পুণ্য জনম লভ।
সর্বমানব অধিপতি তুমি, তেজোময় বান্ধব।

২। আহ্বান তব শুনি নব নব, অর্ঘ্য তোমারি তরে।
তোমারি পুণ্য, তোমারি আহুতি, তোমারি আলোক ঝরে।
তুমি সে পুরোধা সত্যসন্ধি, তুমি সে স্বপ্রকাশ,
যজ্ঞ-যাজক, আলয়ে মোদের প্রভু রূপে কর বাস।

৩। তুমি সে বজ্রী, ইন্দ্র-বৃষভ, দূরদূরান্তগামী,
তুমি সে বিষ্ণু, সবার পূজ্য, ব্রহ্মা জগত-স্বামী।
হে পাবক, তুমি সবার পালক, সর্বমানবরক্ষী,
সকল চিন্তা অনুগামী দেবী, তুমি সে নগরলক্ষ্মী।

৪। তুমি সে বরুণ, নৃপতি তুল্য, নিখিল কর্ণধার,
তুমি সে কাম্য মিত্র-শক্তি,—বন্দনা করি তাঁর।
তুমি অর্যমা, জীবের পালক, চির-উল্লাসময়,
তুমি সে অংশ, প্রসাদে তোমার চেতনা বোধিত হয়।

৫। তুমি সে ত্বষ্টা, হে দেব শিল্পী, নিপুণ রচনা তব,
বিচিত্র লীলা বিকাশ আকাশে শিল্প সে নব নব।
হে জ্যোতি-বাহন, তুরঙ্গ তব বিদ্যুৎ বেগগামী,
তুলনাবিহীন সম্পদ তব, সর্বদেবতাস্বামী।

৬। তুমি সে রুদ্র, গগন-বিহারী, অতুল শক্তিধারী,
সর্বদেবতা অনুগামী তব,—দুরাশা পূরণকারী!
সঞ্চার তব হেরি অভিনব রক্তিম ঊষা-পথে,
যাত্রা তোমার অসীম-ভবনে, পবন-বাহন পথে।
হে পূষণ, তুমি কর রক্ষণ তাহারে মমতাভরে,—
নিবেদি তোমারে তনু-মন-প্রাণ বন্দনা যে বা করে।

৭। উদ্যোগী যে বা, সুদৃঢ়চিত্ত, কর্মে নিষ্ঠাবান্,
হে দেব সবিতা লভে সে তোমার অতুল ঋদ্ধি-দান।
হে ভগ নৃপতি, হেরি বিস্ময়ে তব সম্পদরাশি,
যে পূজে তোমারে নিত্যকর্মে, পালহ তাহারে আসি।

৮। শ্রদ্ধাভাজন হে মহারাজন বহ্নি, বিশ্বপতি,
প্রবল অনল, জ্ঞান-উজ্জ্বল, অগণিত তব গতি।

৯। পিতৃতুল্য তুমি হুতাশন, যজ্ঞ আহুতিকালে ;
ভ্রাতৃতুল্য বিরাজ বহ্নি, জগত-কর্মশালে ;
পুত্রতুল্য বৎসল তুমি, যে তোমারে ভালবাসে :
মিত্রতুল্য দৃপ্ত তুমি যে, সংকটে, সন্তাপে।

১০। ঋভু রূপে তুমি হে দেব অগ্নি, কারুকর্মের স্বামী,
ধনভাণ্ডার পূর্ণ তোমার, মোরা সে বিভূতিকামী।
হে চেতনাদাতা মোদের অর্ঘ্য রচিলে সমীপে আসি,
তব জ্যোতিময় দহন শোভায় লভি সম্পদরাশি।

১১। তুমি সে অদিতি, যজ্ঞের মাতা, না হেরি আকার তব,
তুমি সে ভারতী, গীত ঝংকারে ধ্বনিলে মন্ত্র নব।
শত শিশিরেও নাহি মিলে সীমা, ইলা রূপে তব গতি,
তামসনাশিনী আলোকভাষিণী তুমি সে সরস্বতী।

১২। দিকে দিকে তব জ্যোতি-উৎসব ব্যাপিল বিপুল বিশ্বে,
ঝলকে মহিমা বরণে, কিরণে তুলনাবিহীন দৃশ্যে।
সার্থক কর যাত্রা মোদের নিবার সর্বভয়,
কর কর দূর, আঁধার-অসুর, হে দেব জ্যোতির্ময়!

১৩। অগ্নি তোমার গঠিল আস্ত অদিতি তনয়গণ,
রক্তরসনা দেবসংসদ করিল সংগঠন।
সর্বদর্শী, কিরণ বর্ষি দেখাও পন্থা সবে,
তোমারে পূজিলে, সকল অমর মোদের আহুতি লবে।

১৪। মানবমিত্র, অমৃতপুত্র সাধিবারে কল্যাণ,
তোমারি আস্যে লভে প্রকাশে মোদের আহুতিদান।
পুণ্য-জনম, প্রসাদে তোমার বসুধা ঋদ্ধিশালী,
ধরণীর পরে জ্যোতি-নির্ঝরে সুধারস দিলে ঢালি।

১৫। সুজাত তুমি হে, অমরসঙ্গী, অমিত শক্তিধর,
লঙ্ঘিয়া যাও সুর-বিক্রম ঊর্ধ্ব গগন পর।
হেরি যবে তব পূর্ণ প্রকাশ মহা বিস্ময় মানি,
অম্বর ধরা বিভাসিত করা অশেষ আলোকবাণী!

১৬। লভিল যাহারা আলোকদীক্ষা দীপ্তিমন্ত্রপায়ে,
তব সম্পদ প্রসাদে তাহারা কিরণ গোমুখ আনে।
বর্ষিয়া চলে তেজ-কুসুম তব সম্পদ-পথ,
চেতনা আলোকে জাগায়ে বিশ্ব যায় তব জয়রথ।

মরণেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়নি

'অনুসন্ধানী'

চ্যাং ও এ্যাং পৃথিবী বিখ্যাত শ্যামদেশীয় যুগল, প্রথম ধরণীর আলো দেখেছিল ১৮১১ সালে। ওদের মা ছিল শ্যামদেশীয়া, বাপ ছিল চৈনিক, ব্যাংকক্ শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সিয়াম নদীর তীরবর্তী মেকলঙ গ্রামে ছিল তাদের বাড়ী। বুকের হাড়ে একখণ্ড মাংস দ্বারা যুক্ত ছিল ওই যুগল, ওরা যখন বড় হয়ে ওঠে তখন ঐ মাংসখণ্ডটির আয়তন হয় লম্বায় চার ইঞ্চি, চওড়ায় আট ইঞ্চির মত। ব্যাংককের রাজপ্রাসাদে সাদরে গৃহীত হয়েছিল তারা, কিন্তু প্রায় ত্রয়োদশবর্ষীয় হওয়ার আগে কোন ইউরোপীয় মানুষ দেখতে পায়নি তাদের। প্রথম যে পাশ্চাত্য দেশীয় মানুষটি ওদের দেখে তার নাম রবার্ট হান্টার, সামান্য ব্যবসাপাতি করে খেত সে,। যমজ বালক দুটিকে দেখে অর্থোপার্জনের এক নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা দেখা দিল তার মনে। বালক দুটিকে টাকা দিয়ে কিনে নিল হান্টার, ইউরোপে প্রত্যাগমন করে সমস্ত আবশ্যকীয় আয়োজনাদি প্রস্তুত করে, ১৮২৯ সালে ওদের নিতে লোক পাঠালো সে। প্রথমে ওরা গেল বোষ্টন শহরে, নিউ ইংল্যাণ্ডের এই নাক উঁচু জায়গায় হাজার হাজার লোক ওদের দেখলো, সংবাদপত্রে ওরা উল্লিখিত হলো 'অদ্ভুতদর্শন রাক্ষস' বলে। এই নামটাই অতঃপর চালু হয়ে গেল ওদের। ভদ্র ও বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও চ্যাং ও এ্যাংকে মানুষ বলে মনে করা হত না কোথাও, তাদের দর্শনীয় আজব জীব হিসাবেই ধরা হত। সবাই মজা করতো তাদের নিয়ে। কাগজে কাগজে লেখালিখি হতে লাগলো ওদের নিয়ে, তাতে মন্তব্য করা হল যে, ওদের প্রদর্শনী অচিরে বন্ধ করে দেওয়া উচিত কারণ সুকুমারমতি বালকবালিকার মনে অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া জাগতে পারে ওদের দেখলে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু জায়গায় দেখানো হল ওদের। লণ্ডনে প্রখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসকগণ ওদের পরীক্ষা করে করে দেখলেন, ওদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য, কিন্তু সে সম্ভাবনায় বিচলিত হয়ে উঠল ঐ যুগল। একুশ বছর বয়সে নিজেদের প্রদর্শন করা বন্ধ করল ওরা। হান্টারের সঙ্গে এক চুক্তি পত্রের মাধ্যমে নিজেদের মুক্তি ক্রয় করল। নিজেদের সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে, দক্ষিণ ক্যারোলিনার 'মাউন্ট এয়ারি' নামক স্থানে একটি খামার বাড়ী কিনলো ওরা। নিজেদের নামই ছিল এতাবৎ ওদের একমাত্র অভিধা, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল 'বাংকার' এই উপাধি। সেই ক্ষুদ্র পল্লীসমাজ হয়ত ওদের শান্তভাবেই মেনে নিত, কিন্তু আবার দেখা দিল এক নতুন ফ্যাসাদ। প্রেম এল ওদের জীবনে। স্থানীয় এক কৃষকের দুই তরুণী কন্যা, সারা ও এ্যাডেলেড ইয়েটসের কটাক্ষ শরে আহত হল ওরা মোক্ষম ভাবেই। কোথায় ওদের সঙ্গে মেয়ে দুটির প্রথম দেখা হয়েছিল ঠিক জানা যায় না, কিন্তু এক অপরাহ্ণে ওই যুগলের সঙ্গে মেয়ে দুটিকে এক গাড়ীতে করে বেড়াতে দেখে চমকে উঠল সকলে। দুই ভাইয়ের পৃথক পৃথক বাহু অবলম্বনে হাসিখুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠছিল তরুণীদ্বয়, সারা ছিল চ্যাংএর পাশে, এ্যাডেলেড এ্যাং এর পাশে। স্থানীয় লোক শিহরিত হল, প্রথমে বিস্ময় পরে ক্রোধ দেখা দিল ওদের মনে, 'একি বিসদৃশ কাণ্ড'? নিন্দায় মুখরিত হয়ে উঠল গ্রামসমাজ, যমজ যুগলের গৃহ বাতায়নের সব কটি কাঁচের শার্সি ভেঙ্গে তছনছ করে দেওয়া হল; আর কুমারীদ্বয়ের পিতাকে শাসানো হল এই বলে যে, মেয়েদের সামলাতে না পারলে তার গোলাবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হবে। দুঃখিত চিত্তে প্রিয়তমাদের কাছে বিদায় নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করল ঐ বিচিত্র ভ্রাতৃযুগল। কিন্তু হায় সমাজের ভ্রূকুটি কি কোনদিনই রুদ্ধ করতে পেরেছে প্রেমের দুর্বার গতি? গোপন অভিসার চলল প্রেমিক চতুষ্টয়ের, পাহাড়ী উপত্যকায় ছোট নদীটির ধারে ধারে, কখনও বা আর কোথাও। অবশেষে সব কিছু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল তারা, বিবাহ স্থির হয়ে গেল। যমজ যুগল এবার এল ফিলাডেলফিয়ার অস্ত্রচিকিৎসা কেন্দ্রে, উদ্দেশ্য অস্ত্রোপচারের সাহায্যে স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পাওয়া; যদিও তারা জানত যে, এই অস্ত্রোপচার তাদের জীবনাবসানের কারণও হতে পারে। খবর পেয়ে মেয়ে দু'টিও ছুটে এল, না এতবড় ঝুঁকি তারা নিতে দেবে না ওদের, বহু মিনতি ও অশ্রু বন্যার ঝড় বয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত স্থির হল অস্ত্রোপচার হবে না, ঐ ভাবেই যুগল ভ্রাতাকে পতিত্বে বরণ করবে তারা। দু'মাস পরে 'মাউন্ট এয়ারির' ক্ষুদ্র গির্জায় বিচিত্রতম সেই যুগল বিবাহ সম্পন্ন হল যথারীতি। সকলে ছি-ছি করল, কিন্তু ওরা চারজন তাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ তারা ঐ বিচিত্র দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করল আর পাঁচটা স্বাভাবিক সুখী দম্পতির মতই, শারীরিক অসুবিধা বা নৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যকে অতিক্রম করে। দুটি পৃথক্ বাড়ী তৈরী করিয়েছিল ওরা, পালা করে সেগুলোতে বাস করত। কালক্রমে সারা ও চ্যাং-এর দশটি এবং এ্যাডেলেড ও এ্যাং-এর নয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করল। মাঝে মাঝে অস্ত্রোপচারের সাহায্য নেওয়ার কথাও উঠত কারণ চ্যাং-এর পানাসক্তি এ্যাং-এর পক্ষে ক্রমেই বিরক্তিজনক বলে পরিগণিত হয়ে উঠছিল। সে নিজে ছিল সম্পূর্ণরূপে মদ্যপান বিরোধী, আর সেজন্যই পানোন্মত্ত ভ্রাতার সান্নিধ্য স্বাভাবিকভাবেই তার অরুচিকর ঠেকত। এ ছাড়া দম্পতী যুগলের আর কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না, তাদের ছেলেমেয়েরাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যবান হয়ে ছিল। জানুয়ারীর এক শীতল রাত্রিতে চ্যাং-এর হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গেল, প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হল ও যমজদ্বয় শুতে চলে গেল, কিন্তু প্রভাতে চ্যাং আর জাগলো না, রাত্রিতেই মৃত্যু হয়েছিল ওর। শোকাভিভূতা সারার মনে তখন শুধু ভগ্নীপতি এ্যাংকে বাঁচানোর চিন্তা। প্রবল তুষারপাতের মধ্য দিয়ে সে ছুটলো ফিলাডেলফিয়ার অভিমুখে। উদ্দেশ্য যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসককে এনে মৃতের কাছ থেকে জীবিতকে বিচ্ছিন্ন করা। এ্যাডেলেড বসে রইল নিদ্রিত স্বামীর পাশে, এ্যাং-এর নিদ্রা ভঙ্গ হলে চ্যাংএর 'মৃত্যু' তার কাছে গোপন করার সব রকম প্রয়াসই কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল। জাগবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের দিকে চেয়ে আর্ত্ত চীৎকার করে উঠল এ্যাং, অচেতন হয়ে পড়ল সে তৎক্ষণাৎ সেই লুপ্ত চেতনা আর ফিরল না। কোনদিন, মরণও পারল না বিচ্ছেদ আনতে তাদের মধ্যে জীবনে যারা ছিল এক ও অভিন্ন। ওদের মৃতদেহের জন্য হাজার হাজার টাকার প্রলোভন উপেক্ষা করে সারা ও এ্যাডেলেড, মৃতদেহ সমর্পণ করল ফিলাডেলফিয়ার অস্ত্রচিকিৎসা কেন্দ্রে। সেইখানকার অস্ত্রোপচারকগণ বহুপোষিত অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করলেন ওদের মৃতদেহে অস্ত্রোপচার করে। পোষ্টমর্টেম করে দেখা গেল যে তাদের লিভার একটাই ছিল, জীবনে যদি কোন অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি নিতে যেত তারা, তবে অপারেশন টেবিলেই তাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল।
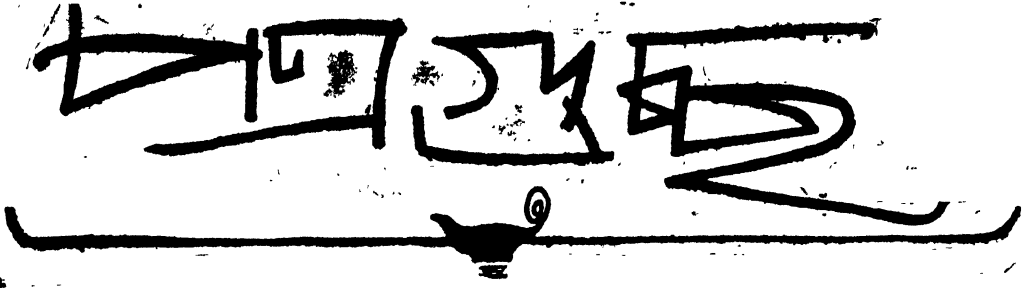
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী

(১)

[স্বামিজী আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে খেতড়িনিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে ইংরাজিতে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন—ইহা তাহারই অনুবাদ।]

বোম্বাই। ২০।৯।১৮৯২।

প্রিয় পণ্ডিতজী মহারাজ—

আমি যথাসময়ে আপনার পত্র পাইয়াছি। আমি প্রশংসার উপযুক্ত না হইলেও, আমাকে কেন যে প্রশংসা করা হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রভু যীশুর কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয়, 'ভাল একজন মাত্রই আছেন—স্বয়ং প্রভু ভগবানই একমাত্র ভাল।' অপর সকলে তাঁহারই হস্তের যন্ত্রমাত্র। মহতো মহীয়ান্ ঈশ্বর এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণই গৌরবপাত্র, আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তি নহে। এ ক্ষেত্রে 'ভৃত্য তাহার বেতনের অধিকারী নহে।' বিশেষতঃ, ফকিরের কোনরূপ প্রশংসা-লাভের অধিকার নাই। ভৃত্য যদি শুধু তাহার কার্য্য করিয়া থাকে, তবে কি আপনি তাহার প্রশংসা করেন?

আশা করি, আপনি সপরিবারে সম্পূর্ণ কুশলে আছেন। পণ্ডিত সুন্দরলালজী ও মদীয় অধ্যাপক (১) যে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

এখন আপনাকে আমি অন্য এক বিষয় বলিতে চাই:—হিন্দুগণ চিরকালই সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা সত্যের বিচার দ্বারা সাধারণ সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন নাই। আমাদের সকল দর্শনেই আমরা দেখিতে পাই,—প্রথমে একটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা ধরিয়া লইয়া, তার পর চুলচেরা বিচার চলিতেছে; কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাটিই হয়ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও বালকোচিত। কেহই এই সকল সাধারণ প্রতিজ্ঞার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা অথবা অনুসন্ধান করে নাই। তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা একরূপ নাই বলিলেই হয়। সেইজন্যই আমাদের দেশে পর্য্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ (Generalisation—বিশেষ বিশেষ সত্য হইতে এক সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া) প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানসমূহের অত্যন্তাভাব দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? ইহার দুইটি কারণ আছে:—প্রথমতঃ, এখানে গ্রীষ্মের অত্যাধিক্য হেতু আমাদিগকে কর্ম্মপ্রিয় না করিয়া শান্তি ও চিন্তাপ্রিয় করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন না। সমুদ্রযাত্রা করিতে বা দূরভ্রমণ করিতে লোকে যে যাইত না, তাহা নহে; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে বণিকগণের সংখ্যাই অধিক ছিল—পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়ে লাভের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, ইহাদিগের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে রোধ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে মনুষ্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধিত না হইয়া ইহার অবনতিই হইয়াছিল কারণ, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ সদোষ ছিল। ইহারা বিভিন্ন দেশের যে বিবরণ প্রদান করিত, তাহা অত্যুক্তিপূর্ণ ও কাল্পনিক ছিল—সুতরাং উহা লোকগ্রাহ্য হয় নাই।

সুতরাং আপনি বুঝিতেছেন, আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একজাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি, আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। আমরা এখন যে বিষম অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা ভাবিলে হাস্যের উদ্রেক হয়। যদি কোন ভাঙ্গী কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, সে যেন সংক্রামক রোগের ন্যায় তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে, কিন্তু যখনই পাদরী সাহেব আসিয়া মন্ত্র আওড়াইয়া তাহার মাথায় খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়, আর সে একটা (যতই ছিন্ন ও জর্জ্জরিত হউক) জামা পরিতে পায়, তখনই সে খুব গোঁড়া হিন্দুর বাড়ীতেও প্রবেশাধিকার পায়। আমি ত এমন লোক দেখিতে পাই না, যে তখন ভরসা করিয়া তাহাকে একখানা চেয়ার দিতে ও তাহার সহিত সপ্রেম কর-মর্দ্দনে অস্বীকার করতে পারে!! এর চেয়ে আর অদৃষ্টের পরিহাস কতদূর হইতে পারে? এখন এই পাদরীরা দক্ষিণে কি কর্‌ছে, দেখ্‌বেন আসুন দেখি। উহারা লাখ, লাখ, নীচ জাতকে খৃষ্টান করে ফেল্‌ছে—আর পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেখানে বেশী, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী, এবং স্ত্রীলোকেরা, এমন কি, রাজবংশীয়া মহিলাগণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীরূপে বাস করা খুব সম্মানের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তথাকার সিকি ভাগ খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে। আর আমি তাদের দোষও দিতে পারি না। তাদের আর কোন বিষয়ে অধিকার আছে বলুন? হে প্রভু, কবে মানুষ অপর মানুষকে ভাই-এর ন্যায় দেখিবে?

আপনারই

বিবেকানন্দ।

১ স্বামিজী খেতড়ীতে জনৈক পণ্ডিতের নিকট পাণিনি শিক্ষা করেন। তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া 'মদীয় অধ্যাপক' বলিতেছেন।

(২)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

George W. Hale,
541, Dearborn Avenue
Chicago.
১১শে মার্চ্চ, ১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু—

এদেশে আসিয়া অবধি তোমাদের পত্র লিখি নাই। কিন্তু হরিদাস ভাই-এর (২) পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। G. C. Ghosh (৩) এবং তোমরা যে হরিদাস ভাই-এর যথোচিত খাতির করিয়াছ, তাহা বড়ই ভাল।

এদেশে আমার কোনও অভাব নাই; তবে ভিক্ষা চলে না, পরিশ্রম অর্থাৎ উপদেশ করিতে হয় স্থানে স্থানে। এদেশে যেমন গরম, তেমনি শীত। গরমি কলকাতার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শীতের কথা কি বলিব, সমস্ত দেশ দু' হাত, তিন হাত, কোথাও চার-পাঁচ হাত বরফে ঢাকা। দক্ষিণভাগে বরফ নাই। বরফ তো ছোট জিনিস। যখন পারা জিরোর উপর ৩২ থাকে, তখন বরফ পড়ে। কলিকাতায় কদাচ ৬০ হয়—জিরোর উপর, ইংলণ্ডে কদাচ জিরোর কাছে যায়। এখানে পারার পো জিরোর নীচে ৪০।৫০ তক নেবে যান। উত্তরভাগে কানাডায় পারা জমে যায়। তখন আলকোহল থার্মোমিটার ব্যবহার করিতে হয়। যখন বড্ড ঠাণ্ডা, অর্থাৎ যখন পারা জিরোর উপর ২০ ডিগ্রিরও নীচে থাকে, তখন বরফ পড়ে না। আমার বোধ ছিল বরফ পড়া একটা বড় ঠাণ্ডা। তা নয়, বরফ অপেক্ষাকৃত গরম দিনে পড়ে। বেজায় ঠাণ্ডায় একরকম নেশা হয়। গাড়ী চলে না, স্লেজ চক্রহীন ঘসড়ে যায়! সব জমে কাঠ—নদী নালা লেকের (হ্রদের) উপর হাতী চলে যেতে পারে। নায়াগারার প্রচণ্ড প্রবাহশালী বিশাল নির্ঝর জমে পাথর!!! কিন্তু আমি বেশ আছি। প্রথমে একটু ভয় হ'য়েছিল, তার পর গরজের দায়ে একদিন রেলে করে কানাডার কাছে, দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ আমেরিকা লেকচার করে বেড়াচ্ছি। গাড়ী ঘরের মত Steam pipe (ষ্টিম পাইপ—নলযোগে চালিত বাষ্প) যোগে খুব গরম, আর চারিদিকে বরফের রাশি ধপ্‌ধপে সাদা—সে অপূর্ব্ব শোভা।

বড় ভয় ছিল যে, আমার নাক কান খসে যাবে, কিন্তু আজিও কিছু হয় নাই। তবে রাশীকৃত গরম কাপড়, তার উপর স লোম চামড়ার কোট, জুতো, জুতোর উপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হ'য়ে বাহিরে যেতে হয়। নিঃশ্বাস বেরুতে না বেরুতেই দাড়িতে জমে যাচ্ছেন। তাতে তামাসা কি জান? বাড়ীর ভেতর জলে এক ডেলা বরফ না দিয়ে এরা পান করে না। বাড়ীর ভেতর গরম কি না, তাই। প্রত্যেক ঘরে, সিঁড়িতে Steam pipe গর রাখবে। কলা-কৌশলে এরা অদ্বিতীয়, ভোগে বিলাসে অদ্বিতী পয়সা রোজগারে অদ্বিতীয়। খরচে অদ্বিতীয়। কুলির রো ৬৲ টাকা, চাকরের তাই, ৩৲ টাকার কম ঠিকা গাড়ী পাও যায় না। চারি আনার কম চুরুট নাই। ২৪৲ টাকা মধ্যবিৎ জুতো একজোড়া। ৫০০৲ টাকায় একটা পোষাক। যেম রোজগার, তেমনি খরচ। একটা লেকচার ২০০।৩০০।৫০০।২০০ ৩০০০ পর্য্যন্ত। আমি ৫০০৲ টাকা (৪) পর্য্যন্ত পাইয়াছি অবশ্য—আমার এখানে এখন পোয়াবার। এরা আমার ভালবাসে হাজার হাজার লোক আমার কথা শুনিতে আসে।

প্রভুর ইচ্ছা—মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড় প্রীতি, পরে যখন চিকাগো শুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙ্গে পড়ে লাগল, তখন—ভায়ার মনে আগুন জ্বললো! * * * *

ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না। * * আমাদে জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হম্‌বড় আর কেউ বড় হবে না। "যে নিঘ্নন্তি পরহিতং নিরর্থকং তে কে জানীমহে;" (৫) ভর্ত্তৃহরি।

এদেশের মেয়ের মত মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধী স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি স তাদের ভেতর। "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু" (যি পুণ্যবানদের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী) এদেশে, আর "পাপাত্মন হৃদয়েষলক্ষ্মীঃ" (পাপাত্মাগণের হৃদয়ে অলক্ষ্মীস্বরূপিণী) আমাদের দেশে এই বোঝ। হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম, "ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ" ইত্যাদি। (তুমিই লক্ষ্মী, তুমি ঈশ্বরী, তুমিই লজ্জাস্বরূপিণী)। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপে সংস্থিতা" (যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা) ইত্যাদি এ দেশের বরফ যেমনি সাদা, তেমন হাজার হাজার মেয়ে আছে যাদের মন তেমনি পবিত্র। আর আমাদের দশ বৎসরে বেটা-বিউনিরা! * * প্রভো, এখন বুঝতে পারছি। আরে দাদা "যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে তত্র দেবতাঃ" (যেখানে স্ত্রীলোকেরা আনন্দে থাকে, দেবতারাও তথায় আনন্দ করেন) বুড় মনু বলেছে। আমর

---

২ হরিদাস ভাই—জুনাগড়ের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান। স্বামিজীর আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বেই ইঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হয় এবং ইঁহার সাহায্যেই তাঁহার ভারতবর্ষের অনেক রাজারাজড়ার সহিত বিশেষ আলাপ হয়।

৩ নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ—

৪ বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতার পর স্বামিজী একটি Lecture Bureau-র (বক্তৃতা কোম্পানি—ইহারা ভাল ভাল বক্তা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইয়া থাকে এবং বক্তৃতার সমুদ বন্দোবস্ত করে। টিকিট বিক্রয় করিয়া যে টাকা পায়, তাহা কতকাংশ ঐ বক্তাকে দিয়া থাকে) সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে অনেকে ইঁহাকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, পয়সা না লইলে তথায় কেহ বক্তৃতা শুনে না। কিন্তু পরে যখন দেখিলেন, ইহাতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করা অসম্ভব, তখন ইহাদের সহিত সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া বক্তৃতালব্ধ অর্থের অধিকাংশ ভারতের নানা সৎকার্য্যে দান করিয়া বিনা পয়সায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

৫ যাহারা নিরর্থক পরের অনিষ্টসাধন করে, তাহারা যে কির লোক, তাহা বলিতে পারি না।

মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। বাপ., আকাশ পাতাল ভেদ!! "যাথাতথ্যতো অর্থান্ ব্যদধাত্তি।" ঈশ-উপ। (যথোপযুক্তভাবে কর্ম্মফল বিধান করেন)। প্রভু কি গপ্পিবাজিতে ভোলেন? প্রভু বলেছেন, "ত্বম্ স্ত্রী ত্বম্ পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী," ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতর-উপ। (তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও তুমিই বালিকা)। আর আমরা বলছি,—"দূরমপসর রে চণ্ডাল।" (ওরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যা); "কেনৈষা নির্ম্মিতা নারী মোহিনী," ইত্যাদি। কে এই মোহিনী নারীকে নির্ম্মাণ করিয়াছে?) দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! * * যে ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম্ম? আমাদের কি আর ধর্ম্ম? আমাদের "ছুৎমার্গ," খালি আমায় ছুঁয়ো না," "আমায় ছুঁয়ো না"। হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু' হাজার বৎসর খালি বিচার করছে, ডান হাতে খাব, কি বাঁ হাতে, ডান্ দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে—* * তাদের অধোগতি হবে না ত কার হবে? "কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ।" (সকলেই নিদ্রিত হইয়া থাকিলেও কাল জাগরিত থাকেন, কালকে অতিক্রম করা বড়ই কঠিন)। তিনি জানিতেছেন, তাঁর চক্ষে কে ধূলো দেয় বাবা!

যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ, সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক। সে ধর্ম্ম, না পৈশাচ নৃত্য! দাদা, এইটি তলিয়ে বোঝ—ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এ দেশ দেখেছি! কারণ বিনা কার্য্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মিলে কি?

সর্ব্বশাস্ত্রপুরাণেষ ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।

(সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুইটি বাক্য আছে—পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরপীড়ন করিলে পাপ উৎপন্ন হয়।)

সত্য নয় কি?

দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে ব'সে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুক্‌রার উপর ব'সে—এই যে আমরা এত জন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; আমরা আজ চারযুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু'পা দিয়ে দলিয়েছি।

মনে কর, * * যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ ক'রে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তা হ'লে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না। (এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না।) ফল কথা—If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain.* গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুল পাঠশালে আসিতে পারে না, আর কবিতা ফবিতা প'ড়ে তাদের কোনও উপকার নাই। **We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and *raise the masses.* The Hindu, the Mahommedan, the Christian, all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from inside, i. e, from the orthodox Hindus. In every country the evils exist not with but against religion. Religion therefore is not to be blamed—but men.**

এটি করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি সহরে আমি ১০।১৫ জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তারপর ঘুরলাম, ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে!!! * * Selfishness Personified—তারা দেবে! তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজকার করব, করে দেশে যাব and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life.

যেমন আমাদের দেশে Social virtueর (যে সকল গুণে সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়, সেই সকল গুণের) অভাব, তেমনি এ দেশে Spirituality নেই, এদের Spirituality দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্চে। কতদিনে সিদ্ধকাম হব জানি না, * * এরা hypocrite (কপট) নয়, আর jealousy (ঈর্ষ্যা) একেবারে নাই। হিন্দুস্থানের কারও উপর depend (নির্ভর) করি না। নিজে প্রাণপণ করে রোজকার করে নিজের plans carry out (উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত) করবো, or die in the attempt (কিম্বা ঐ চেষ্টায় মরবো)। "সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।" (যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন সৎ উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করা বরং ভাল)।

তোমরা হয় ত' মনে করিতে পার, কি Utopian nonsense (অসম্ভব বাজে কথা)! * * কিন্তু গুরুদেব will show me the way out (আমাকে পথ দেখাইবেন) ইতি। Jealousy ত্যাগ করে এককাট্টা হয়ে থাকতে পারে না, ঐটে আমাদের জাতের দোষ, national sin (জাতীয় পাপ)!!! এদেশে ঐটে নাই, তাই এরা এত বড়।

আমাদের মত কূপমণ্ডুক ত' দুনিয়ায় নাই। কোনও একটা নূতন জিনিষ কোনও দেশ থেকে আসুক দিকি, আমেরিকা সকলের আগে নেবে। আর আমরা? আমাদের মত দুনিয়ায় কেউ নেই "আর্য্য" বংশ!!! * * *

(৩)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আমেরিকা, ১৮৯৪।

প্রিয় ধর্ম্মপাল—

আমি তোমার কলিকাতার ঠিকানা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই মঠের ঠিকানায় এই পত্র পাঠাইলাম। আমি তোমার কলিকাতার বক্তৃতা

কথা এবং উহা দ্বারা কিরূপ আশ্চর্য্য ফল হইয়াছিল, তাহা সব শুনিয়াছি। * * *

এখানকার জনৈক কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত মিশনরি আমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া একখানি পত্র লেখেন, তার পর তাড়াতাড়ি আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরটি ছাপিয়ে একটা হুজুগ করবার চেষ্টা করেন। তবে তুমি অবশ্য জানো, এখানকার লোকে এরূপ ভদ্রলোকদের কিরূপ ভাবিয়া থাকে। আবার সেই মিশনরিটিই গোপনে আমার কতকগুলি বন্ধুর কাছে গিয়ে তাঁরা যাতে আমার কোন সহায়তা না করেন, তার চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি তাঁদের কাছ থেকে অবিমিশ্র ঘৃণাই পেলেন। আমি এই লোকটার ব্যবহারে একেবারে অবাক্ হয়ে গেছি। একজন ধর্ম্মের প্রচারক—তাঁর এইরূপ সব কপট ব্যবহার! দুঃখের বিষয়—সব দেশে, সব ধর্ম্মেই এইরূপ ভাব বেজায়!

গত শীতকালে আমি এ দেশে খুব বেড়িয়েছি—যদিও শীত অতিরিক্ত ছিল, আমার তত শীত বোধ হয়নি। মনে করেছিলুম—ভয়ানক শীত ভোগ কর্‌তে হবে, কিন্তু ভাগ্য ভালয় ভালয় কেটে গেছে। 'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' (Free Religious Societyর) সভাপতি কর্ণেল নেগিন্‌সনকে তোমার অবশ্য স্মরণ আছে—তিনি খুব যত্নের সহিত তোমার খবরাখবর সব নিয়ে থাকেন। সেদিন অক্সফোর্ডের (ইংলণ্ড) ডাঃ কার্পেণ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি প্লাইমাউথে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাটি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি খুব সহানুভূতি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি তোমার সম্বন্ধে আর তোমার কাগজের সম্বন্ধে খোঁজ করলেন। আশা করি, তোমার মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এসেছিলেন, তুমি তাঁর উপযুক্ত দাস।

তোমার যখন অবকাশ থাকবে, তখন দয়া করে আমার সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখ্‌বে। তোমার কাগজে আমি সময়ে সময়ে ক্ষণিকের জন্য তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। ইণ্ডিয়ান্ মিররের মহামনা সম্পাদক মহাশয় আমার প্রতি সমান ভাবে অনুগ্রহ করিয়া আসিতেছেন—তজ্জন্য তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পরম ভালবাস ও কৃতজ্ঞতা জানাইবে।

কবে আমি এদেশ ছাড়ব, জানি না। তোমাদের থিওজফিক্যাল্ সোসাইটির মিঃ জজ্, ও অন্যান্য অনেক সভ্যের সহিত আমার পরিচয় হয়েছে। তাঁরা সকলেই খুব ভদ্র ও সরল, আর অধিকাংশই বেশ শিক্ষিত।

মিঃ জজ্ খুব কঠোর পরিশ্রমী—তিনি থিওজফি প্রচারের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করেছেন। এদেশে তাঁদের ভাব লোকের ভিতর খুব প্রবেশ করেছে, কিন্তু গোঁড়া ক্রিশ্চানরা তাঁদের পছন্দ করে না। সে ত' তাদেরই ভুল। ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক কোটি নব্বই লক্ষ লোক কেবল খৃষ্টধর্ম্মের কোন না কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্টিয়ানগণ বাকি লোকদের কোন রকম ধর্ম্ম দিতে পারেন না। যাদের আদতে কোন ধর্ম্ম নেই, থিওজফিষ্টরা যদি তাদের কোন না কোন আকারে ধর্ম্ম দিতে কৃতকার্য্য হন, তাতে গোঁড়াদেরই বা আপত্তির কারণ কি, তা ত' বুঝ্‌তে পারিনি। কিন্তু খাঁটি গোঁড়া খৃষ্টধর্ম্ম এদেশ হতে দ্রুতগতিতে উঠে যাচ্ছে। এখানে খৃষ্টধর্ম্মের যে রূপ দেখতে পাওয়া যায়, তা ভারতের খৃষ্টধর্ম্ম হতে এত তফাৎ যে, বলবার নয়। ধর্ম্মপাল, তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, এদেশে এপিস্কোপ্যাল্ (৬) এমন কি, প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ (৭) চার্চ্চের ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তাঁরা তোমারই মত উদার, আবার তাঁদের নিজের ধর্ম্ম অকপটভাবে বিশ্বাস করেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক সর্ব্বত্রই উদার হয়ে থাকেন। তাঁর ভিতরে যে প্রেম আছে, তাইতে তাঁকে বাধ্য হয়ে উদার হতে হয়। কেবল যাঁদের কাছে ধর্ম্ম একটা ব্যবসামাত্র, তাঁরাই ধর্ম্মের ভিতর সংসারের ঝগড়া বিবাদ স্বার্থপরতা এনে—ব্যবসার খাতিরে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ও বিকটভাবাপন্ন হতে বাধ্য হন।

তোমার চিরভ্রাতৃপ্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

৬। এপিস্কোপ্যাল চার্চ্চ—যাহাতে শাসনভার বিশপগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। ইহাদের অধীনে আর দুই শ্রেণীর যাজক থাকেন।

৭। প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ চার্চ্চ—যাহাতে শাসনভার সমানপদস্থ প্রীষ্ট, বা যাজকগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

রবিবার

পরিমল চক্রবর্তী

ছয়টি দিনের শেষে রবিবার আসে কী নিবিড়
স্বপ্নের সুষমা নিয়ে কর্মশ্রান্ত হৃদয়ের দেশে!
আলস্যের মগ্ন স্রোতে সব কিছু যায়, ভেসে যায়;
দূরায়ত রূপলোকে জীবনের যুবরাজ ধায়
স্মৃতির ঘোড়ায় চড়ে যুবরাণী খুঁজে পেতে; মেশে,
দুইটি চেতনা এক স্থিরকেন্দ্রে—প্রশান্ত, সুস্থির।

সপ্তাহের অন্য সব দিনগুলো ছুটে ছুটে আর
পারে না পারে না বুঝি! বিধাতার অলৌকিক হাত
আশ্চর্য কৌশলে তাই গড়েছে এমন রবিবার।
খুশীতে নিমগ্ন থাকি আমি প্রতি রবিবার; আর
হৃদয় কাটে না সেই সুনির্মম ক্লান্তির করাত—
বরং সত্তায় ফোটে কবিতার স্নিগ্ধ পারিজাত।

সমস্ত বাঁধার শেষে খুঁজে পাই মুক্তির আস্বাদ,
সুরভিত রবিবারে ফিরে পাই জীবনের স্বাদ।

শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ

[গোবর গুহ নামে খ্যাত দিকপাল ব্যায়ামবীর]

ঈশ্বরের অন্তহীন করুণার পুণ্যধারা বন্যার বেগে সারা বাঙালীজাতিকে পরিপ্লাবিত করে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর অভিনব বিকাশ তার শ্রেষ্ঠত্ব, তার অসামান্যতাই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত করে। সকল বিষয়ের মত শক্তিচর্চার ক্ষেত্রেও বাঙালীর অবদান যেমনই অমূল্য তেমনই অবিস্মরণীয়। ঈশ্বরপ্রেরিত স্রষ্টাদের কৃপায় বাঙালীর মানসিক শক্তি যেমনই বৃদ্ধি পেল, তেমনই তার দৈহিক শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে যাঁদের কল্যাণে সেই তালিকায় সসম্মানে লিখিত একটি বিশেষ নাম শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ—গোবর গুহ নামে যিনি ভারত তথা বহির্ভারতের বিপুল খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী। যশোহর জেলার সুপ্রসিদ্ধ গুহ পরিবারোদ্ভব বিরাট গুহের বংশধর যতীন্দ্রচরণের জন্ম ১৮৯২ সালের ১৩ই মার্চ। সেদিন ছিল দোলযাত্রা। প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপাদিত্য এবং বিরাট গুহ উভয় একই বংশের সন্তান ছিলেন। পিতামহ অম্বিকাচরণের সময় থেকে পরিবারে ব্যায়ামচর্চার সূত্রপাত। ১৮৫৭ সালে অম্বিকাচরণ তাঁদের প্রসিদ্ধ আখড়ার পত্তন করেন। শিবচরণের পুত্র স্বর্গত রামচরণ গুহের একমাত্র পুত্র যতীন্দ্রচরণ। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শুরু হয় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের ছাত্র হিসাবে। বাল্যকাল থেকেই ব্যায়ামচর্চায় মনোনিবেশ করেন। পিতৃ-পিতামহের প্রভাব তাঁকে এ ক্ষেত্রে নিদারুণ প্রভাবিত করে। এ জগতে তাঁদের ঐতিহ্য আদর্শ বালক যতীন্দ্রচরণের মনে গভীর ভাবে ছায়াপাত করে। জ্যাঠামশাই ক্ষেত্রচরণের অকালমৃত্যু ব্যায়াম-বিদ্যাজগতে এক বিরাট ক্ষতির রূপ নিয়ে দেখা দেয় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে। তাঁর পতাকা গ্রহণ করার মত উপযুক্ত শক্তি ও যোগ্যতার সঞ্চার করতে উদ্যোগী হলেন তাঁর শিষ্যবর্গ—সকলের মিলিত তত্ত্বাবধানে তিনি রীতিমত নিপুণ ও কুশলী ব্যায়ামবীর হয়ে উঠতে লাগলেন। কুস্তি, ভারোত্তোলন, লাঠিখেলা, বক্সিং (কিছুকাল) প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় তিনি যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করতে শুরু করলেন। ব্যায়ামের হাতেখড়ি অবশ্য তাঁকে দিয়ে যান স্বয়ং ক্ষেত্রচরণ গুহ।

১৯১০ সালে প্রথম বিলাতযাত্রা। এই যাত্রার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। বাড়ীর অমতে কেবলমাত্র কুস্তির মোহে সুদূর বিদেশের দিকে পা বাড়ান। কুস্তি জগতের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত মিঃ বেঞ্জামিন যতীন্দ্রচরণের ভগ্নীপতি ব্যারিস্টার স্বর্গত শরৎচন্দ্র মিত্রকে একদা বলেন—**these types of wrestlers can earn lot of name and money there.** এই উক্তিই যতীন্দ্রচরণের মনে এক নতুন উন্মাদনা এনে দেয়। তবে একলা যেতে ইচ্ছুক না হওয়ায় বড় গামাকে তাঁর সঙ্গে দেওয়া হয়। এদিকে বাড়ীর অমতে তিনি যাত্রা করায় সরকারী সাহায্যে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হল খাস লণ্ডন থেকেই।

লণ্ডন দেখা গেল কিন্তু আসল কাজ হল না। যে জন্যে যাওয়া সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। চলে আসতে হল দেশে—গামা রয়ে গেলেন লণ্ডনেই। কিন্তু উদ্দেশ্য তাঁর ব্যর্থ হল না পুরোপুরি, সাময়িক ব্যর্থতা এনে দিল আশাতীত সফলতা—যে সফলতা বিদেশের দরবারে সারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করল। প্রমাণ করল সকল দিকেই বাঙালী অপ্রতিহত, বহুগুণ বৃদ্ধি করল দেশের মর্যাদা। ১৯১২ সালে আবার বিলেত অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বহু কৃতবিদ্য মল্লবীরকে পরাভূত করে আপন অসামান্য শক্তির পরিচয় দেন। ১৯২০ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতিবাহিত করেন, সেখানেও বহু উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন তবে সাদায় কালোয় লড়াই চিরকালের। সাদারা কালোদের উন্নয়নে অনেকের মতে যতই সহায়তা করুন তবু এ কথা সূর্যের মত সত্য যে, সে সহায়তা ছিল উদ্দেশ্যমূলক এবং তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা কোনদিন তাঁরা দেন নি—চিরদিন পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতেই তাঁরা চেয়েছেন ব্যায়ামের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই কেবলমাত্র ভারতীয় বলেই তাঁর বহু প্রাপ্য গৌরব তাঁকে ইচ্ছাপূর্বক কৌশল করে দেওয়া হয় নি, তবু তা সত্ত্বেও বিদেশ থেকে যে গৌরব তিনি অর্জন করে আনলেন তাও তুলনাহীন। ১৯১৬ সালে কোলাপুরের বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পালোয়ান গণপৎ সঙ্গে ম্যাচে অবতীর্ণ হন। এ খেলা চলে এক নাগাড়ে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস মণ্ডপে ছোট গামার সঙ্গে এঁর কুস্তি হয়। এখানেও তাঁকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়। পেশাদারী কুস্তিগীর হিসেবে তাঁর এই শেষ অবতরণ।

তাঁর মতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের এখনকার যুগে কুস্তির মান নিরূপণ করা শক্ত, তাঁর মতে ব্যায়ামচর্চায় সিদ্ধিলাভ করলে আর্থিক সাফল্যের সম্ভাবনা প্রচুর বিদ্যমান। সাক্ষাৎকারে তাঁর কাছ থেকে জানা গেল যে দলীয় স্বার্থপরতা, প্যাঁচ এবং হীনকৌশল—এ জগতকেও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বা করছে। তাছাড়া তাঁর নিজের জীবনেও যে পরিমাণ দলাদলি ও কৌশলের ঝড় বয়ে গেছে তা ভাষায় বর্ণিত হ'লে একটি ছোট মহাভারতের আকার ধারণ করবে। পিতামহ প্রতিষ্ঠিত আখড়া আজও তাঁর সুযোগ্য ও দরদী নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে ব্যায়ামজগতের অতুলনীয় কল্যাণ সাধন করে চলেছে ও ভবিষ্যতের বহু শক্তিমান বীর্যবন্ত সন্তানের হাতেখড়ি দিয়েছে ও তারা

জীবনের ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ রচনা করে চলেছে। তিনি নিজে শিক্ষাদান করেন এবং সযত্নে প্রতিজনের প্রতি সমান লক্ষ্য রাখেন। বাহাত্তর বছর বয়েসেও তিনি প্রত্যহ দু'বার করে ব্যায়াম করেন।

শক্তিচর্চার ক্ষেত্রে প্রভূত প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও গুহপরিবার সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলার এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ১৯০১ থেকে ইনি সেতার শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন ভগ্নীপতি মিত্র মহাশয়ের উৎসাহে। হাতেখড়ি নিলেন মহম্মদ খাঁর কাছে। ককুভ খাঁ, কেরামতুল্লা খাঁর কাছেও শিক্ষা নেন। এখনও তাঁর অধ্যয়নে বিরাম নেই। সুগ্রন্থ এবং বিবিধ পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পড়ে থাকেন। গান্ধী সাহিত্যে তাঁর প্রবল অনুরাগ। এই সাহিত্যের সাগরে তাঁকে অবগাহন করতে নানাভাবে সহায়তা করেন স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু।

বাঙলার বরণীয় সন্তানদের মধ্যে যতীন্দ্রচরণ অন্যতম। তাঁর কৃতিত্ব বাঙালীর বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যের ইতিহাসে একটি নতুন পরিচ্ছেদ যোজনা করেছে। তাঁর সাধনাকে নমস্কার।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

[দরদী সাহিত্যব্রতী]

শুধু সাহিত্যিক-দক্ষতা নয়, রচনাকুশলতা নয়, বলিষ্ঠ লেখনী নয়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর অনুরাগীমহলে সবচেয়ে যা জনপ্রিয় করে তুলেছে, তা হচ্ছে মানুষের প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ, বন্ধুজনের জন্যে সীমাহীন ভালোবাসা এবং অভিনন্দনীয় মহান পরোপকার ব্রত। সাহিত্যিক-সমাজে "অজাতশত্রু" বিশেষণটি বোধ করি এঁর প্রতিই সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য। মুখে স্মিত হাসি, ব্যবহারে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা, দরদভরা সহানুভূতি, অন্তরে আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচেতনতা—এই আলেখ্যের মধ্যেই তাঁর প্রদীপ্ত জীবনপ্রকাশ। বাঙলা সাহিত্যের গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার ফলে এই পঞ্চাশ বছরের বহু ঘটনা, কাহিনী, আবির্ভাব, তিরোভাব, সৃষ্টির এক উজ্জ্বল সাক্ষী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৩০০ সালের ১১ই ভাদ্র (২৮এ অগাষ্ট ১৮৯৩) পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতৃদেব কামিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষাদান করতেন। তদুপরি কবি ও গায়করূপেও খ্যাতিমান ছিলেন। আর পাঁচজনের মত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের যথারীতি বিদ্যালয়জীবন শুরু হ'ল কিন্তু ইস্কুলের বাঁধাধরা পরিবেশ তাঁর মন ভরাতে পারত না। চার দেওয়ালের বাইরে মুক্ত পরিবেশ উন্মুক্ত পৃথিবী তাঁকে আকর্ষণ করতে থাকে তার অফুরন্ত শোভা নিয়ে। পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে মন উদগ্রীব হয়ে থাকে অন্যান্য গ্রন্থের জন্যে। বাইরের খবর গ্রামে বহন করে আনে হিতবাদী, বঙ্গবাসী। পরে যুক্ত হয় সাহিত্য। বালক পবিত্র এঁদের মধ্যেই পৃথিবীর বিরাট রূপ দেখার চেষ্টা করেন মনের দিক দিয়ে সফলকামও হন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, নবীনচন্দ্রের কবিতা মনের ক্ষুধা মেটায়। বিবাহের প্রীতি-উপহারাদি রচনা করতে থাকেন শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়। আশে-পাশে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সাহিত্যিক জীবনে প্রথম হাতে-খড়ি।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

এসে গেল ১৯০৫ সাল। স্বাধীনতার ইতিহাসের রক্তরাঙা অধ্যায়। সারা বাঙলা মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিল, বিক্রমপুরও দূরে রইল না, তার শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব অবলম্বন করে মরণ পণ করে স্বাধীনতার যুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করল। রাজনীতিতে অংশ নেওয়ায় পাঠাভ্যাসে সাময়িক ছেদ পড়ে। সাহিত্যের আকর্ষণও প্রবল হয়ে ওঠে। চট্টগ্রামের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে যোগ দিলেন।

তদানীন্তন বহু দিকপাল সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হলেন। এই সময় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন স্বর্গত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের কাছে। জীবিকার তাগিদ এসে গেল। বড় ভগ্নীপতি প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় সরকারী উকীল রায়বাহাদুর প্রমোদকিশোর রায়ের মুহুরীর কাজ নিয়ে জোড়হাটে এলেন। প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে এইখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ১৯১৬ সালে। তাঁর সাহিত্যিক জীবনে জোড়হাটের স্মৃতি কখনও মুছে যাওয়ার নয়—জোড়হাটে থাকার সময় সবুজপত্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। এই সময় থেকেই তাঁর কবিতা ও গল্প বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হোতে থাকে। সাহিত্য পরিষদে যুক্ত হলেন। পরলোকগত আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে তিনি পূর্ববঙ্গে প্রচলিত বহু শব্দ সংগ্রহ করে দেন। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের কাহিনী বিক্রমপুরের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। জোড়হাটের

পর ঢাকার ঐতিহাসিক সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত "মাসিক বিক্রমপুর"-এর সহকারী সম্পাদকের কার্য গ্রহণ করেন। কিছুদিন পল্লীগ্রামে শিক্ষকতা করার পর রাজধানী কলকাতায় এসে বাসা বাঁধলেন। জীবনের ইতিহাস এবার নতুন অধ্যায়ের সম্মুখীন হ'ল। প্রমথ চৌধুরীর গৃহেই আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা হ'ল—সবুজপত্র তত্ত্বাবধানের ভার পেলেন। বিক্রমপুরী ভাষায় মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা লিখে বাঙলার ব্রতকথার অমর লেখক শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী লাভ করলেন। সবুজপত্রকে ঘিরে সেই সময় এক বিরাট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সেখানকার সাহিত্যিক আড্ডা হ'ত লোভনীয়। সেই আড্ডায় নিয়মিত যোগ দিতেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশ ঘটক, বরদা গুপ্ত, হারীতকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি। বসুমতীর তৎকালীন সম্পাদক ভারতের বরেণ্য সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তখন সরকারের আমন্ত্রণে বিদেশ সফররত। সুরেশ সমাজপতি তখন সম্পাদকীয় কার্যাদি তত্ত্বাবধান করছেন। সে সময় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে সুরেশবাবুর সঙ্গে বসুমতীতে পরিচিত হন। "ভারতী"র এবং গজেন্দ্র ঘোষের বাড়ীর বিখ্যাত সাহিত্য মজলিসে যাতায়াত শুরু করেন যথাক্রমে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর আমন্ত্রণে। কবি গিরিজাকুমার বসু তখন সরকারী অডিটার, তাঁর প্রচেষ্টায় Improvement Trust-এর হিসাব বিভাগে তিনি মাসের জন্যে চাকুরী নেন। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের মারফৎ ডাক এল "স্বরাজ" পত্রিকার সম্পাদনকার্যে সহকারিত্ব করার। বহু পত্র-পত্রিকায় কর্ম নিয়েছেন পবিত্রকুমার। দিকপাল প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিবের কাজও কিছুদিন করেছেন। "কল্লোল" গোষ্ঠীর মধ্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় একটি উজ্জ্বল নাম। তাঁকে কল্লোলের প্রাণস্বরূপ বললেও বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। শুধু সাহিত্য জগতেই নয়, নাট্যালোক, শিল্পীমহল, আইনজগতেও একটি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদরের আসন তাঁর অধিকারগত। সাহিত্যের নানা বিভাগে তাঁর অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়। সাহিত্যের উন্নয়ন সাধনে যে মহান ব্রত তিনি জীবনের বোধনলগ্নে গ্রহণ করেছেন আজও তা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। সাহিত্যসৃষ্টির মতই সাহিত্যিক আবিষ্কারেও তাঁর কৃতিত্বের তুলনা নেই। আজকের দিনে সর্বজনবন্দিত বিপুল খ্যাতি ও প্রতিভার শীর্ষবিন্দুতে সমাসীন অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্যজগতে প্রথম প্রবেশ ঘটে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। তাঁর সন্ধানীদৃষ্টি এদিক দিয়েও বাঙলা সাহিত্যকে যে কতখানি লাভবান করে তুলেছে তার তুলনা মেলে না। এই তালিকায় দু'টি বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল নাম—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নজরুল ইসলাম।

ডক্টর ভবেশচন্দ্র রায়

[জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রথম ডাইরেক্টার জেনারেল]

বিদ্যা শুধু বিনয়ই আনে না, ব্যবহারিক জীবনে অনাবিল সারল্যও বুঝি সৃষ্টি করে। তার পরিচয় পেলাম শ্রীভবেশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আত্মপ্রচারে সম্পূর্ণ বিমুখ ডঃ রায়ের ভূ-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণামূলক দান বাঙ্গালীর গর্ব, ভারতের সম্পদ। অধুনা পূর্ব-পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলার কায়জ পল্লীগ্রামে শ্রীরায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৭ সনে। কলকাতার রাণী ভবানী স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে জিওলজিতে অনার্স নিয়ে ১৯২৮ সনে বি, এস, সি-তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩১ সনে আমেদাবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইন্‌স্ থেকে এ, আই, এস, এম ডিপ্লোমা (ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট) এবং হেনরী হাইডেন পদক লাভ করেন। সেই সনেই তিনি লণ্ডনে যান এবং সেখানকার বিজ্ঞান ও টেকনোলজি বিষয়ক ইম্পিরিয়াল কলেজে ভর্তি হয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এস-সি ও ডি-আই-সি ডিগ্রি লাভ করেন।

ব্যবহারিক ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সনে ভবেশবাবু ফ্রান্সে গমন করেন এবং সেখানকার ন্যান্সি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। সেখানকার শিক্ষা সমাপনান্তে আবার পাড়ি দেন জার্মানীতে। জার্মানীর মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তিনি তথাকার বিশিষ্ট সম্মান লাভ করেন। ভারতে এসে ভারতীয় জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে যোগদান করেন।

বিশ বৎসরেরও অধিককাল যাবত ডঃ রায় খনিজ, ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক মানচিত্র, ভূ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান ও তত্ত্বানুসন্ধানে রত থেকে বিপুল জ্ঞানলাভ করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর অবদান ভারতের পক্ষে অবিস্মরণীয়। নূতনত্ব বা আবিষ্কারের মোহে তিনি শুধু সারা ভারতের সর্বত্র ঘুরেই ক্ষান্ত থাকেন নি। রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপকভাবে পর্যটন করেছেন। নিজ কৃতিত্বে তিনি ১৯৫৮ সনে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডাইরেক্টার নিযুক্ত হন এবং এই পদে তিনিই প্রথম বাঙ্গালী। শুধু তাই নয়, অত্যন্ত গর্বের বিষয় এই যে, ১৯৬১ সনে তিনি প্রথম ডাইরেক্টার-জেনারেল রূপে নিযুক্ত হন।

এ পদ সৃষ্টি হওয়ার পর ডঃ রায়ই প্রথম পদাধিকারী। ভবেশবাবু জার্মান, ফরাসী ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত। ভূ-বিজ্ঞান বা খনি বিষয়ে তিনি অন্যূন ২৫খানা গ্রন্থ রচনা

ডক্টর ভবেশচন্দ্র রায়

করে দেশের প্রকৃত উপকার করেছেন। ভূ-বিজ্ঞানীরূপে তিনি বিদেশে বহুবার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তন্মধ্যে টোকিও এবং রাশিয়ার "একাফ" সম্মেলনে ভারতীয় নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য। ১৯৬০ সনে কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। আগামী ১৯৬৪ সনে দিল্লীতে আন্তর্জাতিক ভূ-তত্ত্ববিদদের যে অধিবেশনের আয়োজন হচ্ছে (এশিয়ায় প্রথম) তাতে ভবেশবাবু সেক্রেটারী-জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

কথাপ্রসঙ্গে বার বারই ডঃ রায় তাঁর অগ্রজের কথা বলছিলেন এবং তাঁর আদর্শবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করতে বলছিলেম। মাতৃপ্রতিম তাঁর বৌদির অনুপম স্নেহ এবং তাঁর দাদার অকুণ্ঠ আশীর্বাদ তাঁর শিক্ষার মূল। এই অগ্রজই তাঁর শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। বাংলার শিক্ষাবিদ হুগলী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও পুনর্বাসন বিভাগের এডুকেশন অফিসার স্বর্গত কে, সি, রায় ভবেশবাবুর অগ্রজ। ভবেশবাবুর অনাড়ম্বর জীবন সহজেই বিস্ময় উদ্রেক করে। তা ছাড়া তাঁর বিদুষী বিদেশিনী (ফরাসী) স্ত্রী বাঙ্গালী প্রথায় আদর-আপ্যায়নে আমাদের কম বিস্মিত করেন নি। শ্রীরায়ের বিশেষ কোন 'হবি' আছে কি না জানতে চাইলে তাঁর একমাত্র কন্যা বলে উঠলেন,—না কাজের চিন্তা বা ধ্যান-ধারণা ছাড়া বাবার কোন হবি বা সখ নেই, বরং তিনি যখন ঐ নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে চিন্তা-সাগরে ডুব দেন তখন আমরা কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পাই নে। বলার ভঙ্গিতে আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

ডাঃ হেমন্তকুমার ইন্দ্র

(আর জি কর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ)

চিকিৎসা বিদ্যায় অভূতপূর্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া কয়েকজন বাঙ্গালীর যে প্রতিভাধর সন্তানদল বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছেন অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম।

ইংরাজী ১৯০১ সালের ২০শে ডিসেম্বর ডাঃ হেমন্তকুমার ইন্দ্র কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

ডাঃ ইন্দ্রের পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান নদীয়া জেলার শান্তিপুর হইলেও তথাকার সহিত তাঁহার প্রকৃত পক্ষে কোন সম্পর্ক ছিল না। ডাঃ ইন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্র তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের শাসনাধীনে বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পিতার সহিত বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বেড়াইবার ফলে বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে বাল্যের শিক্ষা শেষ করিতে হয়। পরিশেষে ১৯১৮ সালে ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমা স্কুল হইতে ডাঃ ইন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২০ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে আই. এস. সি পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন।

১৯২৬ সালে মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি ডিগ্রি লাভ করিয়া এক বৎসরের জন্য উক্ত কলেজেই এইচ বি ষ্টীনের অধীনে হাউস সার্জেন হিসাবে জেনারেল সার্জিক্যাল বিভাগে কাজ করেন। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডাঃ ইন্দ্র স্থায়ী বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালে রেসিডেন্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হিসাবে সরকারী কার্য পরিচালনা করেন। ইতিমধ্যে ডাঃ ইন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জুবলী রিসার্চ বৃত্তি লাভ করিয়া "অন্ধত্বের কারণ" এই বিষয়-বস্তুর উপর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এবং উক্ত গবেষণা কার্যে সফলতা লাভ করিয়া জুবিলিপদক লাভ করেন। ১৯৩১ সালে পুনরায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের আই (eye) ইনফারমারী বিভাগে ভিজিটিং সার্জেন নিযুক্ত হন এবং ১৯৪০ সালে ঐ একই কলেজে এনাটমির ডিমনস্ট্রেটর নিযুক্ত হন। ১৯৪১-৪২ সালের মাঝামাঝি তিনি বহরমপুর সদর হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত আর্মিতে যোগদান করিয়া ভার[illegible] মেডিক্যাল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৪৬ সালের [illegible] আর্মি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় লেক মে[illegible] কলেজের গঠনমূলক কাজে বিশেষ অফিসার নিযুক্ত হ[illegible] ১৯৪৮ সালে তিনি—জলপাইগুড়ি জেলার সিভিল সার্জেন এবং সদর হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হইয়া জলপাইগুড়িতে যান।

১৯৫০ সালে ডাঃ ইন্দ্র বিলাত গমন করেন এবং মুর ফিল্ডস আই হাসপাতালে এক বৎসর ডি. ও. ডিপ্লোমা লাভ করেন। লণ্ডন হইতে ফিরিয়া ১৯৫১ সালে ডাঃ ইন্দ্র হুগলীর সিভিল সার্জেন নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটী ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে সরকার কর্তৃক আর জি কর মেডিকেল কলেজের ভার গ্রহণ করিবার পর ডাঃ ইন্দ্র তথায় প্রথমে অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করিয়া ১৯৫৮ সালে স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অদ্যাবধি ডাঃ ইন্দ্র উক্ত পদেই সগৌরবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

ডাঃ ইন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী বিট্রিস ইন্দ্র নীলরতন সরকার হাসপাতালের নার্সিং সুপরিন্টেণ্ডেন্ট পদ হইতে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। পারিবারিক জীবনে ডাঃ ইন্দ্রের একমাত্র বিবাহিতা

মুখোস-মোচন

(ব্যঙ্গ রেখাচিত্র)

—রেবতীভূষণ ঘোষ অঙ্কিত

রানীবাঁধে বাঘ শিকার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(এক যাত্রায় তিনটি ব্যাঘ্র ও একটি ভল্লুক শিকারের কাহিনী)

শ্রীজয়কৃষ্ণ দাস

তাহাদের নিকট হইতে এইরূপ উক্তি শুনিয়া কমিশনারবাবু ক্রোধে ও ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন যে এখানে আসিবার পূর্ব্বে কেন এই সকল কথা জানান হয় নাই? ইহা পূর্ব্বে জানিলে তিনি কখনই এখানে কমিশনের কার্য্যে আসিতেন না। আসিবার পথে বনের মধ্যে দিনের বেলা বলিয়া ও সঙ্গে উকিলবাবুর মত বন্দুকধারী শিকারী থাকার জন্য কোনক্রমে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা পাইয়াছে কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে বাঘ যদি আসিয়া হানা দেয় তবে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যাইবে? ইহাতে লোকগুলি বলিল যে মধ্যে মধ্যে দুই একটা মানুষ-খেকো বাঘ দেখা গেলেও এই সকল বাঘ সাধারণতঃ বাধ্য না হইলে মানুষের উপর আক্রমণ করে না। গরু, বাছুর ও ছাগলের উপরেই তাহারা হামলা করিয়া থাকে। কমিশনারবাবু কিন্তু তাহাদের কথায় নিশ্চিন্ত না হইয়া তাঁহার খাটিয়া ঘরের মধ্যে দিবার জন্য বলিয়া এই গরমের মধ্যেও তিনি ঘরে শুইবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। অল্প পরে আমি ভিতরে যাইয়া দেখি যে কমিশনারবাবু তালপাতার পাটীগুলি দিয়া ঘরের পশ্চাৎদিকের জানালার জন্য রাখা ফাঁকা স্থানগুলি অবরোধ করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। বিদ্যালয়টির নির্ম্মাণকার্য্য তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই এবং দরজা-জানালার জন্য রক্ষিত ফাঁকা স্থানগুলিতে তখনও পর্য্যন্ত কোন দরজা-জানালা বসান ছিল না। কমিশনারবাবু কর্ত্তৃক এইরূপ আত্মরক্ষার হাস্যকর প্রচেষ্টা দেখিয়া আমার পক্ষে হাস্য-সংবরণ করিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইল। আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে সামনের দিকে এতগুলি লোকের অবস্থিতি দেখিয়া বাঘ যদি উহার কারণ অনুসন্ধান করিবার কৌতূহলে বিদ্যালয়টির এই পশ্চাৎ দিক হইতে উহাতে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করে তাহা হইলে তালপাতার পাটী তাহাকে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারিবে না; বরং গৃহমধ্যে থাকিলে তথায় বিপদের সম্ভাবনা অধিক। কমিশনারবাবু আমার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া গৃহের বাহিরেই থাকিতে সম্মত হওয়ায় আমি লোকজনকে তাঁহার খাটিয়া বিদ্যালয়টির বারান্দার এক প্রান্তে পাতিতে বলিলাম ও তাঁহাকে ঘিরিয়া তাহাদের অধিকাংশকে অবস্থান করিবার ও অতিশয় সতর্কতার সহিত পাহারা দিবার নির্দ্দেশ দিলাম। এইরূপ ব্যবস্থায় কমিশনারবাবু সেই অবস্থার বিপাকে তবুও খানিকটা নিরাপত্তা বোধ করিয়া তখনকার মত নিশ্চিন্ত হইলেন। আমি বিদ্যালয়টির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেই আমার পূর্ব্বস্থানে খাটিয়ায় থাকিয়া গেলাম। আমার টোটাভরা বন্দুকটি খাটিয়ার বাজুতে হেলান দেওয়া অবস্থায় রাখিয়া দিলাম।

আমাদের রাত্রির আহারের জন্য লুচি ও মাংসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আহার পর্ব্ব সারিয়া লইয়া আমরা পুনরায় নিজ নিজ খাটিয়ায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম। ভীম ও অর্জ্জুন মালের নির্দ্দেশে দুইজন লোক আমার নিকট অগ্রসর হইয়া একজন হাতপাখা দ্বারা আমাকে বাতাস করিতে লাগিল ও অপর জন আমার হাত-পা টিপিয়া দিতে আরম্ভ করিল। আমি ইহাতে অতিশয় লজ্জিত হইয়া ইহার প্রয়োজন নাই বলিয়া নিষেধ করা সত্ত্বেও তাহারা আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। ভীম মাল, অর্জ্জুন মাল, শ্যাম সর্দ্দার, যুধিষ্ঠির ভুঁই, (ভুঁইয়া) রাখাল ভুঁইয়া, প্রহ্লাদ সর্দ্দার, ঈশান সাঁওতাল ও হাড়াম মাঝি প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়েরা আমাকে ঘিরিয়া তাহাদের খাটিয়া পাতিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠির ভুঁইয়া, প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার হইয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই বয়সেও তাহার ঋজু, সরল, দীর্ঘ দেহ ও সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহার শারীরিক অমিতশক্তির পরিচয় দিতেছিল। যুধিষ্ঠির ভুঁইয়া আমায় বলিল যে, আপনারা সহরে মানুষ আপনাদের কি এত হাঁটিবার অভ্যাস আছে? উহারা হাত-পা টিপিয়া দিলে আপনার ভালই লাগিবে। তাহাদের সরল সেবাপরায়ণ মনোবৃত্তি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুভব করিলাম যে, আমার ব্যাঘ্র শিকার আমাকে ইহাদের চোখে এক উচ্চ স্থানে বসাইয়াছে।

এই সময় অনেকক্ষণ হইতেই জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের নিকট হইতে গরুর হাম্বারবের মত একটা শব্দ মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতে শুনিয়া আমি গরুগুলিকে রাত্রে এমন করিয়া জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম যে, উহা গরুর হাম্বারব নহে—উহা বাঘের ডাক। দূর হইতে বাঘের ডাককে গরুর হাম্বারবের মতই শোনায়। আরো শুনিলাম যে সন্ধ্যা হইতেই বাঘ আর পাহাড়ে থাকে না, জঙ্গল ও গ্রামের আশেপাশে শিকার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ইতিমধ্যে সিন্দরী আমগ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে পল্লী-গায়ক দল খোল, করতাল, ঢোলক, নাগরা, একতারা, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র লইয়া তথায় সমবেত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা আমাদিগকে তাহাদের পল্লী-গীতি শুনাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। এই পাণ্ডববর্জ্জিত অঞ্চলে আমাদিগকে পাইয়া তাহাদের

মধ্যে একটা রীতিমত আনন্দ ও উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। গায়ক ও বাদকদলের উপস্থিতিতে আমি চাঙ্গা হইয়া খাটিয়ায় উঠিয়া বসিলাম এবং আমাদের চিত্তবিনোদনের জন্ত তাহাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আগ্রহে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে গীতবাদ্য আরম্ভ করিতে বলিলাম। তাহার পর বেশ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের গীতবাদ্য চলিল। সহজ, সরল গ্রাম্য ভাষায় পল্লী-কবিদের রচিত গীতাবলি। গানগুলির একটা মিষ্টি সুর ও অন্তর স্পর্শ করা মধুর ভাব আমার মনকে মুগ্ধ ও আলোড়িত করিল। এইরূপ আনন্দময় উপভোগ্য পরিবেশের ভিতর দিয়া আমাদের প্রথম রজনীর বেশীর ভাগ অতিবাহিত হইল এবং অবশেষে সঙ্গীতের পরিসমাপ্তির পর আমরা সুষুপ্তির ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলাম।

পরদিন অতি প্রত্যুষে চা ও কিছু হালুয়া খাইয়া লইয়া আমরা জরিপের কার্য্য আরম্ভ করিলাম। সকাল ন'টা দশটার সময় যুধিষ্ঠির ভূঁইয়া ব্রাহ্মণ পাচকের স্কন্ধে খাবার জলের ঘড়া ও হস্তে চিঁড়ে-গুড় ও কলার পুঁটুলিসহ এবং স্বয়ং দুধ লইয়া আমাদের কার্য্য স্থলে আসিয়া আমাদিগকে একটু বিশ্রাম ও জল-খাবার খাইয়া লইবার জন্ত অনুরোধ জানাইল। বলা বাহুল্য যে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়া জরিপের কার্য্য করিতে করিতে আমাদের বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল এবং আমরা তৎক্ষণাৎ হাত মুখ ধুইয়া সেই সকল খাদ্য-বস্তু উদরসাৎ করিলাম। প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মাপের শিকল (chain) টানাটানির পর আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রামের জন্ত বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিলাম। স্নান-ভোজন সমাপনান্তে আমরা তিনটার সময় পুনরায় আমাদের আরব্ধ কার্য্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জরিপের কার্য্য করিলাম। এই সময় আমরা গ্রাম হইতে কিছু দূরে অবস্থিত ভৈরবর্বাকী নদীর তীরের ধার পর্য্যন্ত মাপের কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ হইলাম।

আমরা যখন ভৈরবর্বাকী নদীর ধার দিয়া অগ্রসর হইতে-ছিলাম,—তখন ঠিক নদীর পাড়ের উপরেই একস্থানে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি বৃহৎ বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আকারের পাথরের চাঙড়ার পাশ দিয়া যাইবার সময় সেই সকল পাথরের চাঁই-এর মধ্যে একটি গর্ত্ত দেখাইয়া সঙ্গের লোকজন বলিল যে, উহা ভালুকের আস্তানা এবং ঐ গুহায় ভালুক অবস্থান করে। দেখিলাম গুহার মুখটির সামনের অংশ প্রায় ঘেঁসিয়া একটি বৃহৎ বৃক্ষের বৃষ্টির জলে মাটী ধুইয়া যাওয়া মোটা মোটা শিকড়ের দ্বারা আবরিত। জঙ্গল ও বৃক্ষ পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে প্রকৃতির গঠিত অনুকূল দুর্গম পরিবেশের মধ্যে গুহাটির অবস্থান দেখিয়া উহা যে বাঘ-ভালুকের আবাসের উপযুক্ত স্থল তাহা স্বতঃই অনুমিত হয়। স্থানটির অতি নিকটে আসিয়া বিশেষ চেষ্টায় তবেই গুহা বা গর্ত্তটির মুখের সামান্ত অংশ মাত্র বৃক্ষের মোটা মোটা শিকড়ের মধ্য দিয়া চক্ষুগোচর হয়। সঙ্গের লোকদিগকে প্রস্তুত থাকিতে নির্দ্দেশ দিয়া নদীর বালুকাগর্ভে নামিয়া আমি সেই গুহামুখ লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলী করিলাম। কিন্তু কোন ভালুক বাহির হইয়া আসিল না। বুঝিলাম যে গুহাটির অধিকারী সে সময়ে গুহামধ্যে ছিল না। বোধ হয় সন্ধ্যাসমাগমের পূর্ব্বেই আহার অন্বেষণে বনমধ্যে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

ভৈরবর্বাকী নদীর তীর পর্য্যন্ত পরিমাপ সমাপন করিয়া সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় সেইদিনকার মত আমরা আমাদের জরিপের কার্য্য বন্ধ রাখিলাম। স্থির হইল যে পরদিন প্রত্যুষে আমাদের অসমাপ্ত কার্য্য সেইস্থান হইতেই আরম্ভ করা যাইবে। ফিরিবার পথে নদীগর্ভে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দহে অগভীর জল সঞ্চিত রহিয়াছে দেখিলাম। সঙ্গের লোকেরা সেইরূপ একটি দহের ধারে হরিণের পদচিহ্ন দেখাইল। নদীটির গতিপথ অতিশয় আঁকা-বাঁকা। গ্রামের লোকেরা বলিল যে, নদীগর্ভ এক্ষণে শুষ্ক থাকিলেও বর্ষায় ইহার স্রোত অতি প্রবল বেগ ধারণ করে। বোধ হয় সেইজন্তই নদীটির নাম ভৈরবর্বাকী।

আমাদের অস্থায়ী বসবাসের গৃহ বিদ্যালয়টিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমরা স্নান সারিয়া লইয়া আমাদের খাটিয়ায় বসিয়া চা-পান করিতে করিতে গল্প করিতেছি। সন্ধ্যাদেবী তাঁহার কৃষ্ণবস্ত্র দিয়া সমগ্র স্থানটি ঢাকিয়া দিয়াছেন। মাথার উপরে নির্মেঘ আকাশে তারার ঝিকিমিকি সুরু হইয়াছে এবং তারার আলোতে কাছাকাছি সামান্ত স্থানমাত্র অস্পষ্টভাবে নজরে আসিতেছে। এই পরিবেশে কবিগুরুর কবিতার একটি পঙক্তি "নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার-আঁচল-খসা, হাতে দীপ শিখা—" স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল। এমন সময় আকাশে চাঁদ ভাসিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোর ফুলঝুরির তুবড়ি সৃষ্টি করিল। সর্ব্বত্র রজত-শুভ্র চন্দ্রালোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া হাসিয়া উঠিল। অরণ্যমধ্যস্থ বৃক্ষ-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার কিরণ অনুপ্রবেশ করিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতপুষ্পের কারুকার্য্য ফুটাইয়া তুলিল। আমি নিঝুম হইয়া পড়িয়া থাকিয়া জ্যোৎস্নাস্নাত অরণ্যের এই মনোহারিণী শান্ত সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই আমাদের পাহারাদারগণ তাহাদের রাত্রির আহার সারিয়া যথারীতি অস্ত্র-শস্ত্রসহ তথায় সমবেত হইল ও পরস্পর মধ্যে গল্প করিতে ও চুটিয়া ফুঁকিতে লাগিল। এমন সময় সহসা তথায় সাত-আটজন ব্যক্তি উত্তেজিত অবস্থায় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া সমস্বরে কিছু বলিতে লাগিল। তাহারা সকলেই একত্র একসঙ্গে কথা বলিতে থাকায় তাহারা কি বলিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমি তাহাদিগকে থামাইয়া তাহাদের মধ্যে মোড়ল গোছের একজনকে কি ঘটিয়াছে বলিতে বলিলাম।

মোড়ল যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এই যে নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে একব্যক্তির একটি গাদা বন্দুক আছে। জ্যোৎস্নার আলোকের সুযোগে খরগোস শিকার করিবার উদ্দেশ্যে সে অদ্য সন্ধ্যা হইতে গ্রামের ধারে জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছে চাপিয়া নিস্তব্ধে অপেক্ষা করিতেছিল। খরগোসের দল বাহির হইয়া নিকটস্থ শস্যক্ষেত্রের দিকে আসিলে বা ঘাস খাইতে বাহির হইলে সে খরগোস শিকার করিবে তাহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বৃক্ষে অবস্থান করিয়া সে দেখিল যে খরগোসের পরিবর্ত্তে একটা বৃহদাকার ভালুক তাহার দুইটি বড় বড় শাবককে সঙ্গে লইয়া সেই বৃক্ষের অনতিদূরে আসিয়া শাবকদের সঙ্গে জ্যোৎস্নার আলোকে খেলা করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া তাহার খরগোস শিকার মাথায় উঠিল ও সে নিরাপদে গৃহে ফিরিবার জন্ত ব্যাকুল হইল।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও যখন ভল্লুকমাতা ও

তাহার বাচ্চা দুইটি সেই স্থান হইতে নড়িবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না, তখন সে মরিয়া হইয়া ভালুকটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালায়। ভালুকটির ইহাতে পেছনের পায়ে জখম ও রক্তপাত হইয়াছে এবং খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাচ্চাসহ আমাদের গ্রামের জঙ্গলের দিকে তাহাদের অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে। তাহারা সেই কথা জানাইয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে আসিয়াছে। আমি তাহাদিগকে ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া আমাদের জন্ত এই কষ্ট স্বীকার করার নিমিত্ত ধন্তবাদ প্রদান করিলাম ও ভীম মালদিগকে অধিকতর সাবধান থাকিতে উপদেশ দিয়া আমরা সতর্ক আছি ইহা জানাইয়া সংবাদদাতা লোকগুলিকে সমাদরে বিদায় দিলাম।

এদিকে পাচকঠাকুর গৃহের বাহিরে আসিয়া ঘোষণা করিল যে,—রান্নার জল ফুরাইয়া গিয়াছে,—অবিলম্বে জলের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের পান করিবার জন্ত ও রান্নার নিমিত্ত প্রায় এক মাইল দূরের পাহাড়ের ঝরণা হইতে বাঁকে করিয়া ক্যানেস্তারা টিনে ভরিয়া জল সংগ্রহ করা হইত। শুনিলাম যে বৈকালে রান্না ও পানের জন্ত পর্য্যাপ্ত জল সঞ্চিত করা হইয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমরা সেই জলের বড় বেশী অতিরিক্ত ভাবে খরচ করিয়া স্নান করার জন্তই জল ফুরাইয়া গিয়াছে। "যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়" এই প্রবাদ বাক্য এইখানেও সত্যে পরিণত হইল। জলাভাবের কথা শুনিয়া ভীম মাল তৎক্ষণাৎ কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া বাঁক কাঁধে ঝরণার উদ্দেশ্তে রওয়ানা হইয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া আমি অতিশয় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম এবং আমাদের অবিবেচনার কার্য্যের জন্তই যে বিপদের ঝুঁকি মাথায় করিয়া এই রাত্রিবেলায় লোকগুলিকে জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রায় এক-দেড় মাইল দূরে ঝরণার জল আনিতে যাইতে বাধ্য হইতে হইল ইহা ভাবিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

আমাদের স্নান করিবার সময় পাচকঠাকুর জলের স্বল্পতার কথা বলিলে আমরা কখনই অমন করিয়া অজস্র ভাবে জল খরচ করিয়া স্নানের সুখ উপভোগ করিতাম না। হয়ত রান্নার কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় পাচকঠাকুর তখন উহা লক্ষ্য করে নাই। আমি উন্মুখ হইয়া তাহাদের গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। জ্যোৎস্নার আলোয় বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্টভাবে মাঝে মাঝে দেখা যাইতে লাগিল। এইরূপ ভাবে কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছিল মনে নাই। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে দুই-তিন জনকে দ্রুতগতিতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তাহারা আসিয়া বলিল যে, আহত ভালুকটি তাহার বাচ্চা দুইটিসহ ঝরণার ধারে বসিয়া আছে। ভল্লুক পরিবারকে দেখিয়া তাহারা আর অগ্রসর না হইয়া গাছের আড়ালে লুকাইয়া আছে এবং ইহাদের দ্বারা আমাকে বন্দুক লইয়া যাইবার জন্ত সংবাদ পাঠাইয়াছে।

খবর শুনিয়া আমি বন্দুক লইয়া তাহাদের দ্বারা চালিত হইয়া অতি সন্তর্পণে নিজদিগকে যতটা সম্ভব গোপন করিয়া ঝরণার উদ্দেশ্তে রওয়ানা হইলাম। যদিও জ্যোৎস্না রহিয়াছে তথাপি এই রাত্রিকালে আহত ক্রুদ্ধ ভালুকের সম্মুখীন হওয়া অতীব বিপজ্জনক ইহা জানিতাম। আবার বাচ্চা সঙ্গে থাকায় তাহাদের বিপদাশঙ্কা করিয়া তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত ভল্লুকমাতা যে কতদূর ভয়ঙ্কর হইতে পারে তাহা কল্পনা করিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলাম। এইরূপে যতটা সম্ভব দ্রুত অথচ নিঃশব্দ গতিতে ঝরণার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বৃক্ষান্তরালে অবস্থিত ভীম মাল ও তাহার সঙ্গের লোকদের সাক্ষাৎ পাইলাম। তাহারা একদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া উবু হইয়া বসিয়াছিল। তাহারা বাক্যব্যয় না করিয়া হস্তপ্রসারণ করিয়া আমাকে ভালুকটি দেখাইয়া দিল। তাহাদের প্রসারিত হস্ত অনুসরণ করিয়া কিছু দূরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অরণ্যানীর মধ্যে ঝরণার নিকটে বড়, বড় উপলখণ্ডের সহিত একটা বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ডবৎ মূর্ত্তি উপবিষ্ট অবস্থায় লক্ষ্য করিলাম। অতিশয় সতর্কতার সহিত হামাগুড়ি দেওয়া—অবস্থায় ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে নিজেকে গোপন করিয়া নিঃশব্দে ভালুকটির দিকে শনৈঃ, শনৈঃ অগ্রসর হইলাম।

অবশেষে শেষ কিছুদূর শুইয়া পড়িয়া বুকে হাঁটিয়া ভালুকটির নিকটবর্ত্তী হইয়া একটা ঢালুগর্ত্তমত স্থানে নীচু হইয়া বসিয়া পড়িলাম। তথা হইতে ভালুকটির দূরত্ব ৪০।৫০ হস্তের অধিক হইবে না। আমার এই প্রয়াসে নিঃশ্বাস দ্রুত গতিতে পড়িতে থাকায় তথায় অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ভালুকটিকে লক্ষ্য করিয়া আমার বন্দুক তুলিলাম। জানি না হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বন্দুক তুলিবার সময়—নিজের অজ্ঞাতে হয়তে সামান্ত কোন শব্দ হইয়া থাকিবে, অথবা আমার হাত তুলিবার সময় তাহা দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকিবে, যে কারণ বশতঃই হউক ভল্লুকমাতার কোল ঘেঁষিয়া উপবিষ্ট একটা বাচ্চা একটু লাফাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ভল্লুকমাতা তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং আমি সেই সুযোগে তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি দুই বার গুলী করিলাম। গুলী খাইয়া ভালুকটা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বন্দুকের গুরুগম্ভীর নির্ঘোষে ও তাহাদের মাতাকে মাটিতে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া বাচ্চা দুইটি চক্ষুর পলকে দৌড়াইয়া বনমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। বাচ্চাগুলি নেহাৎ ছোট ছিল না। হয়ত আরো কিছুদিন পরেই মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য মধ্যে স্বাধীন জীবন-যাপন করিবার উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইত।

আমার বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া ভীম মালরা ছুটিয়া নিকটে আসিল। আমার নির্দ্দেশমত কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড ভালুকটার গায়ে নিক্ষেপ করিবার পরও যখন তাহাকে নড়িতে দেখা গেল না তখন ভালুকটির মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা স্থিরনিশ্চয় হইয়া তাহার মৃতদেহের নিকটে আসিলাম। ভীম মালের দলের লোকেরা ভালুকের বাচ্চাদুইটিকে বনের মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি রাত্রিকালে তাহাদের পেছনে বৃথা ছুটাছুটি করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে ও আবার কোন নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে কিনা কে জানে, এই বলিয়া তাহা নিষেধ করিয়া তাড়াতাড়ি জল ভরিয়া ফিরিবার আদেশ দিলাম। অতঃপর ভীম মালের সঙ্গীরা নিকটস্থ একটা শালগাছের মোটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া ভালুকটিকে তাহাতে বাঁধিয়া স্কন্ধে তুলিয়া লইলে পর আমরা সকলে মহানন্দে সোরগোল করিতে করিতে বিতালয় গৃহটিতে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে সকলে মৃত ভালুকটাকে বেষ্টন করিয়া তাহার সুবৃহৎ আকৃতি দেখিয়া উচ্ছসিত আনন্দে আর [illegible]

আমি রাত্রির জন্ত ভালুকটিকে বিভালয়ের একটি কুঠরীতে রাখিতে বলিয়া সকালবেলায় তাহার চামড়া ছাড়াইয়া লইবার নির্দ্দেশ দিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে চা-পানের পর জরিপের কার্য্যে বাহির হইবার সময় কমিশনারবাবু বলিলেন যে, গতদিন সন্ধ্যায় আমরা ভৈরববাঁকী নদীর সীমানা পর্য্যন্ত যখন পরিমাপ শেষ করিয়াছি এবং বিরোধীয় সম্পত্তির সেইদিকস্থ শেষ সীমা যখন ভৈরববাঁকী নদী হইতেছে এবং নদী যখন তাহার গতিপথের স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া সেটেলমেন্টের নক্সায় প্রদর্শিত নদীর যে অবস্থান অঙ্কিত আছে, সেই একই স্থানে আছে, তখন নদীর পাড়ের সীমারেখা ধরিয়া তাহা জরিপ করিবার আর আবশুক হইবে না। সুতরাং তিনি বিবাদীয় সম্পত্তির অপর দিকে মাপের কার্য্য আরম্ভ করিবার পক্ষপাতী। আমিও তাঁহার যুক্তিতে সম্মত হওয়ায় সেইদিন প্রত্যুষে আমরা গতদিনের মাপের পরিসমাপ্তির স্থান ভৈরববাঁকী নদীর ধারে না গিয়া অপরদিকে মাপের কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

আমাদের পূর্ব্ব দিনের কার্য্যসূচীর পরিবর্ত্তনমতে আমরা যে নূতন কর্ম্মক্রম গ্রহণ করিলাম তাহা আমাদের অজ্ঞাতে আমাদিগকে অচির ভবিষ্যতের এবং ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা হইতে যে রক্ষা করিল, তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। হয়ত ইহাতে পরম করুণাময় ভগবানের অদৃশ্য হস্তের লীলা সূচিত হইয়াছিল। দুপুর পর্য্যন্ত জরিপের কার্য্য সমাধা করিয়া আমরা যখন বিভালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সবেমাত্র স্নান ও ভোজন সমাপ্ত করিয়াছি, সেই সময় সংবাদ পাইলাম যে, আমরা গতদিন সন্ধ্যার সময় ভৈরববাঁকী নদীর যে স্থানে আমাদের আরব্ধ কার্য্য স্থগিত রাখিয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থানের সন্নিকটেই নদীগর্ভের পাড় ঘেঁষিয়া এক জায়গায় নদীতে খানিকটা জল সঞ্চিত ছিল, তাহা একেবারে অন্যান্ত স্থানের মত শুকাইয়া যায় নাই। সেইদিন দশটা-এগারটার সময় নদীর তীরে চরণরত গরুর পাল তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই জল পান করিতে নদীগর্ভে নামিলে একটা বাঘ ঝোপ হইতে বাহির হইয়া সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা দুগ্ধবতী গাভী ও একটা বড় বাছুরকে নিহত করিয়াছে।

গরুর পালের সঙ্গের রাখালেরা ইহাতে হৈ হৈ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে বাঘ শিকার ছাড়িয়া জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। রাখালেরা গ্রামে ছুটিয়া আসিয়া এই দুঃসংবাদ জানাইলে গ্রামবাসিগণ বল্লম, টাঙ্গি প্রভৃতি লইয়া অকুস্থলে যাইয়া বাঘ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু বাঘ যে ইতিমধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া গাভীটির কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছে তাহা দেখিতে পায়। শুনিলাম যে সশস্ত্র গ্রামবাসীরা সেই নিহত গাভীটি ও বাছুরটিকে এক্ষণে পাহারা দিতেছে ও আমাকে সেই সংবাদ পাঠাইয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এখানটা কি তাহা হইলে খালি বাঘেরই রাজত্ব? প্রতিরাত্রেই বন-মধ্যস্থ বাঘের ডাক শুনিয়া ইহা ছাড়া আর অপর সিদ্ধান্ত করা যায় না। ভাগ্যে আমরা সেইদিন আমাদের কার্য্যক্রম পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যত্র মাপের কার্য্য করিতেছিলাম নতুবা আমরা বাঘের গোপন অবস্থিতি স্থলের মধ্যেই অত সকাল হইতেই কার্য্যব্যাপৃত থাকিতাম এবং আমাদের কাজের মধ্যে অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়া তাহার রাজত্ব সীমায় আমাদের বিরক্তিকর উপস্থিতি সহ্য করিতে না পারিয়া বাঘ হয়ত আমাদের উপরেও ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিত। যাহা হউক এই সকল চিন্তা সবলে মন হইতে দূরে রাখিয়া আমি কমিশনারবাবুকে বিকালের মাপের কার্য্যে উপস্থিত থাকা হয়ত আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না বলিয়া অবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া সংবাদদাতাগণের সহিত ব্যাঘ্রের শিকার স্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

সিন্দরীআম গ্রাম হইতে প্রায় দুইমাইল দূরে দুই পাশের বনের মধ্য দিয়া ভৈরববাঁকী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। নদী গর্ভের কোন কোন স্থানের জল তখনও প্রখর গ্রীষ্মের তাপে একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। সেইরূপ একটি সঞ্চিত জলের ধারে নদীর পাড়ের উপরের জঙ্গলের মধ্যে দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম যে তথায় বহু লোকজন জমায়েৎ হইয়াছে। নিকটে গিয়া দেখি যে শিকার করা গাভীটিকে বাঘটা একটা ঝোপের মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাহার পশ্চাদ্দিকের কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছে। কিছু দূরে নদী গর্ভে পাড়ের ধারে নিহত অপর বাছুরটি হত্যার স্থানেই পড়িয়াছিল। আমি স্থানটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া মৃত বাছুরটিকে সরাইয়া গ্রামে বহিয়া লইয়া যাইতে বলিলাম এবং মৃত গাভীটিকে ঝোপের সামান্ত বাহিরে টানিয়া আনাইয়া তাহার একটি পা মোটা দড়ি দিয়া একটি গাছের সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিতে বলিলাম। অর্দ্ধভুক্ত শিকার আহার করিতে আসিয়া মৃত গাভীটিকে যাহাতে বাঘে হঠাৎ টানিয়া ঝোপের মধ্যে ঢুকাইয়া আমার বন্দুকের লক্ষ্যের পক্ষে অসুবিধা জন্মাইতে না পারে তাহার জন্যই এই সতর্কতা অবলম্বন করিলাম।

গাভীটিকে আমার নির্দ্দেশানুযায়ী বাঁধা হইলে পর আমি নিকটস্থ একটি সুবিধাজনক বৃক্ষ বাছিয়া লইয়া বৃক্ষটির উপরে সাত আট হাত উচ্চে দড়ির খাটিয়া দিয়া একটি মাচা বাঁধিতে বলিলাম। মাচা বাঁধা হইলে তাহার চতুর্দ্দিকে বেশ করিয়া সেই বৃক্ষেরই ডাল পাতা দিয়া বাঘ যাহাতে মাচায় আমাদিগকে দেখিতে না পায় সেইরূপ ভাবে ঢাকিয়া দিলাম। এই সব ব্যবস্থা করিতে করিতেই বেলা প্রায় পড়িয়া গেল। আমি চা ও কিছু খাইয়া লইয়া টর্চ্চ ও দুই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া সেই মাচায় চড়িয়া বসিলাম—ও সেই সকল সমবেত লোকজনকে নিজেদের মধ্যে জোরে, জোরে কথা বলিতে, বলিতে কোলাহল করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে ও বন্দুকের শব্দ হইলে পর আলো সহ তথায় ফিরিয়া আসিবার জন্ত বলিলাম। বাঘ হয়ত একটু দূরেই ধারে পাশে কোথাও লুক্কায়িত আছে। মুখের গ্রাস ছাড়িয়া বেশী দূরে চলিয়া যাইবার কথা নয়। লোকজন জোর গলায় কথা বলিতে, বলিতে গ্রামের দিকে ফিরিয়া যাইলে সে নিরাপত্তা অনুভব করিয়া পুনরায় অর্দ্ধভুক্ত শিকারের নিকট ফিরিয়া আসিবে ইহা ভাবিয়াই যাহাতে বাঘ যেন বুঝিতে পারে যে সকলে চলিয়া গেল তাহা বাঘকে জানাইয়া দিবার জন্তই লোকদের চীৎকার করিয়া পরস্পর মধ্যে কথা বলিতে বলিতে গ্রামে ফিরিয়া যাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

ক্ষণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ন্যাসিনী সংজ্ঞা দেবী

ধনীর পুত্রবধূ, ধনীর পত্নী হওয়া, মেয়েদের আজন্মের আকাঙ্ক্ষা ; এই পরিস্থিতিতে এ যুগের এক মহিলার ধনে বিতৃষ্ণা,—এ কী সম্ভব ?

হ্যাঁ, তাও সম্ভব ! অসম্ভাব্য কত ঘটনাই যে ঘটে এ জগতে লোকচক্ষুর অন্তরালে, কে রাখে তার খবর ? এমনি এক মনস্বিনী মহিলা শ্রীযুক্তা সংজ্ঞা দেবী। প্রথম তাঁকে দেখি এক আশ্রমে। অতি সাধারণ পোষাকে দীনভাবে বসে আছেন নিরিবিলি এক কোণে, নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হয়ে কিন্তু চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ ; দেখেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই ও পরিচয়ে জানি ইনি পরম ভক্তিমতী সংজ্ঞা দেবী—৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও প্রথম বাঙ্গালী সিভিলিয়ান, পৃথিবী-বরেণ্য কবিগুরুর মেজদা ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ। শুনি, তিনি সব সময় থাকেন পুরীর আশ্রমে, এখন কয়েক দিনের জন্ত এসেছেন কলকাতায়।

এরপর কেটে গেল বহুকাল—অভাবনীয় ভাবে তাঁকে আবার পাই প্রতিবেশিনীরূপে শান্তিনিকেতনে। তখন দেখি তাঁর অপূর্ব্ব মূর্তি, মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়াধারিণী, কাষ্ঠপাদুকা পরিহিতা সর্ব্ব-ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী ! নাম শুনি স্বরূপানন্দ পর্ব্বত। 'সংজ্ঞা-মা' সম্বোধনে হন বিরক্ত—বলেন, ভুলে যাও ও নাম, তার বদলে না হয় বল, সাধুমা।

মনটি তাঁর স্নেহে ভরপুর, ঐ স্নেহাতুর মনের পরিচয় পাই প্রতি বাক্যে প্রতি আচরণে।

তাঁর পুণ্যস্পর্শ লাভ, তাঁর স্নেহালিঙ্গনের লোভে ঘন ঘন যাই তাঁর নিকট। দেখি তাঁর কঠোর সন্ন্যাস-জীবন, কাষ্ঠাসনের উপর কম্বল ও গেরুয়া চাদর আবৃত কঠিন শয্যা, শুদ্ধাচারে প্রস্তুত সংক্ষিপ্ত একাহার ও আনুষঙ্গিক সন্ন্যাস-জীবনের সব কৃচ্ছ্রসাধন। যিনি ছিলেন ধন-দৌলতের শিখরাসীনা, তাঁর এ কী কঠোর সাধন ? ব্যগ্র হয়ে জানতে চাই তাঁর পূর্ব্ব জীবন, কী করে সম্ভব হয় এ অপরূপ মানসিক পরিবর্ত্তন।

তিনি বলেন তাঁর বাল্য-জীবন। বাবা প্রিয়নাথবাবুর তরুণ বয়সে ছিল রেলের চাকুরী। তখনকার দিনে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ইউরোপিয়ানরাই রেলের চাকুরীতে দলে ভারী ; সর্ব্বত্র ছিল তাদের পান-চক্র, ক্লাব প্রভৃতি অবসর-বিনোদনের হাল্কা আশ্রয়। প্রিয়নাথ বাবু স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রবণ, এ সব ক্লাব প্রভৃতিতে যোগদান মোটেই পছন্দ করতেন না ; তিনি ও তাঁর সম স্বভাবের দু' চারটি বন্ধু মিলে ধর্ম্ম-চর্চ্চার মাধ্যমে করতেন অবসর বিনোদন। রেলের চাকুরীতে তাঁর তখন স্থিতি গঙ্গাতীরে 'সাহেবগঞ্জে।' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গঙ্গাবক্ষে বজরায় ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন, জানি না পিতার পদচিহ্ন অনুসরণ করেই বিশ্বকবি তাঁর গঙ্গাবক্ষে ভেসে বেড়াবার প্রেরণা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন কি না !

একদিন মহর্ষিদেবের বজরা এসে লাগল সাহেবগঞ্জের ঘাটে। স্থানীয় লোক দলে দলে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্ত যেতে লাগল মহর্ষি—সাক্ষাতে বজরায়। প্রিয়নাথবাবুও তাঁর দু' একটি বন্ধুসহ গেলেন মহর্ষি-সকাশে ঐ বজরায় এবং তাঁকে আমন্ত্রণ জানান, ধর্ম্ম সম্বন্ধে দু' চারটি কথা তাঁদের অবসর-বিনোদিনী সভায় বলার জন্ত ; এই ভাবেই আলাপের সূত্রপাত এবং কয়েক দিনের মেলামেশায় তা হয় গাঢ়তর। মহর্ষিদেব ভ্রমণান্তে বাড়ী গিয়ে প্রিয়নাথবাবুকে লেখেন দীর্ঘ চিঠি। জানান,—প্রিয়নাথবাবুর মত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির রেলের চাকুরীতে জন্ম কাটানো অনুচিত। তিনি যদি সম্মত হন, তবে মহর্ষিদেব তাঁকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত, তিনি তাঁকে পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লেখেন, তাঁর ভিতরে ধর্ম্মের অঙ্কুর দেখে মোহিত হয়েছেন।

প্রিয়নাথবাবুও সম-পরিমাণ আকৃষ্ট হন, মহর্ষিদেবের সান্নিধ্যে এসে তাঁর প্রতি। এমন সময়ে ঐ চিঠি পেয়ে ছুটে এলেন মহর্ষিরূপ ধর্ম্ম মহীরুহের শীতল ছায়ায়। মহর্ষিদেব আনন্দের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করে, সর্ব্বপ্রথম করেন তাঁর ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা। নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার গুণে প্রিয়নাথ শীঘ্রই হন ধর্ম্মশাস্ত্রে ও দেব ভাষায় সুপণ্ডিত ও লাভ করেন শাস্ত্রী আখ্যা। বিবাহোপযোগী বয়সে উপনীত হলে, পিতৃতুল্য মহর্ষিদেবই তাঁর মনোনীতা ঠাকুরবংশের এক পাত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ ও নিজের জমীদারী সেরেস্তায় দেন কাজ !

প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর কন্তা সংজ্ঞা দেবী আজন্ম ধর্ম্মের পরিবেশে বয়স যখন চতুর্দ্দশ হয়েছে কিনা সন্দেহ, তখন দৃষ্টিপথে আসেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর। তিনি ঐ কিশোরী কন্তাকে দেখে এত আকৃষ্ট হন যে, অবিলম্বে তাকে একমাত্র পুত্রের বধূরূপে ঘরে আনার জন্ত উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। সুরেন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশের ঊর্দ্ধে।

বয়সের দিক দিয়ে এত অসমান বিবাহ কি করে সম্ভব হল, জানতে চাওয়ায় সংজ্ঞা দেবী বলেন,—আমি যতদূর শুনেছি, সুরেন্দ্রনাথ কলকাতার সেণ্টস্ জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি, এ পাশ করার পর ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্য যেতে চান বিলেত। কিন্তু প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান, পাশ্চাত্ত্য রীতি নীতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, নিজে একাধিকবার বিলেত যাত্রা ও সেখানে বহুদিন বসবাস করলেও একমাত্র পুত্রের বিলাত গমনের ইচ্ছায় দেন তীব্র বাধা। নয়ন-মণি একমাত্র পুত্রের অদর্শন পরিণত বয়সে তাঁর অসহ্য মনে হয়। তিনি পুত্রকে বলেন, কী হবে ব্যারিষ্টারী পাশ করে? তোমার অর্থের প্রয়োজন? কত অর্থ তোমার চাই? আমাদের সমস্ত সঞ্চিত বিত্তের উত্তরাধিকারী একমাত্র তুমি, সে অর্থের পরিমাণ ধারণা করাও তোমার সাধ্যাতীত। সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র ভগ্নী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী তখন বিরাট ধনী চৌধুরী পরিবারের বধূ ও নামকরা ব্যারিষ্টার প্রমথ চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী।

সুরেন্দ্রনাথ কখনোই মায়ের কথার প্রতিবাদ করেন নি, এবারও মুখ বন্ধ করেই মায়ের হুকুম মেনে নিলেন, কিন্তু মন হল অভিমানে ভরপুর। তাঁর ২৪।২৫ বৎসর বয়স হবার পর থেকেই মা তাঁকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করার উৎসাহে উদ্যোগী হন, কিন্তু এবার পুত্র বেঁকে বসেন, মায়ের অনুরোধে কিছুতেই হলেন না সম্মত। বহু দিন ধরে চলল মাতা-পুত্রে মান-অভিমানের পালা, জননীর চোখের জলেও পুত্র বিচলিত হয় না এতটুকু,—কিন্তু এ ভাবে অনেক দিন কাটার পর এক সময় আশ্চর্য্য ভাবে হয় তাঁর মতের পরিবর্ত্তন। বয়স ততদিনে ত্রিশ পার হয়ে গিয়েছে। তখন আর উপযুক্ত কন্যা খুঁজে পাওয়া যায় না, এমনি দিনেই মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেখেন সংজ্ঞা দেবীকে, এবং এক কথায় হয় বিবাহ স্থির।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই বিবাহের সংবাদে নাকি এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে সেদিন আহারের সময় এক চামচে ভাত বেশী খেয়েছিলেন, যা নাকি ছিল তাঁর অভিধানে প্রায় অজ্ঞাত!

ছোট মেয়ে সংজ্ঞা দেবী আসেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চৌর রোডের বিশাল বাড়ীতে। বারো বিঘা জমির উপরে বিরাট অট্টালিকা, দু' তিনটি পুষ্করিণী সম্বলিত সে বাড়ী। পরে তা বিড়লাদের হাতে যায় ও বিড়লা পার্ক নামধারণ করে, বর্ত্তমানে আবার সে বিশাল অট্টালিকায় হয়েছে বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনলজিকাল মিউজিয়াম; অবশ্য জমিটা সব ভাগ ভাগ হয়ে গেছে। এখন সে চৌর রোডের নূতন নাম গুরুসদয় দত্ত রোড।

অগণিত দাসদাসী সম্বলিত সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর একমাত্র বধূ সংজ্ঞা দেবী, শ্বশুর-শাশুড়ীর নয়নানন্দদায়িনী, স্বামীর ভালোবাসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিতা। কিন্তু তাতেও যেন মন ভরে না,—তিনি কেবলি ভাবেন এ কোথায় এলাম। এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ভগবান কোথায়? ঠাকুরের আমার সঙ্গে একটি চপল খেলা? তাঁর জন্য শ্রেষ্ঠ বিলাসোপকরণে সজ্জিত কামরাগুলিতে প্রবেশ করেন আর অন্তরে কান্নার সমুদ্র উথলে ওঠে। ঘরের দরজা বন্ধ করে, এমন কি চাবির ফুটোতে ন্যাকড়া গুঁজে, পাছে দাসদাসীও টের না পায়, এমনভাবে বন্ধ করে সে ঘরের বড় বড় আলমারী সদ্যপ্রাপ্ত চাবি দিয়ে খোলেন। দেখেন পাহাড়প্রমাণ শাড়ী, জামা, গহনা-অলঙ্কার, শ্বশুর কত দেশবিদেশ ঘুরেছেন, যেখানে গেছেন পুত্রবধূর জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষটি সংগ্রহ করে রেখেছেন কতদিন ধরে। সাধারণ মেয়ে হলে বোধহয় আনন্দে ফেটে পড়ত, কিন্তু সংজ্ঞা দেবী অসাধারণ,—এই ভোগের আয়োজনে সুখের বদলে দুঃখে ফেটে পড়েন। বন্ধ ঘরে ফুলে ফুলে কেঁদে ভগবানকে জানান প্রাণের আকুতি,—ঠাকুর, আমাকে ঐশ্বর্য্যের মোহে ডুবিয়ে দিও না, তোমার সঙ্গে যোগ রাখতে সাহায্য কর, শাড়ি-গহনা ধন-দৌলতের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে তোমায় যেন না ভুলে যাই প্রভু!

ক্ষুদ্র বালিকার প্রার্থনা ঠাকুর শুনলেন। সংজ্ঞা দেবী সংসারে সবই করেছেন, কিন্তু নির্লিপ্ত হয়ে! সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে আসতে লাগল একটির পর একটি, কোল আলো করে, তিনি তাদের আদর যত্ন করেন সবই, কিন্তু আবদ্ধ হন না মায়ায়। স্বামী সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন রূপে গুণে আদর্শ পুরুষ। যেমন তাঁর সুন্দর আকৃতি তেমনি তাঁর মধুর স্বভাব! সংজ্ঞা দেবী অল্প বয়সে ছিলেন একটু রুগ্ন, তাঁকে সুরেন্দ্রনাথ শত কাজের মধ্যেও নিজের হাতে নাইয়ে খাইয়ে দিতেন, এমন কথাও তাঁদেরই আত্মীয়ের নিকট শুনি।

সেই আত্মীয়ার মুখেই শুনি, উত্তর জীবনে সংজ্ঞা দেবী কি ভাবে বিলিয়ে দিতেন ঘরের জিনিষপত্র। যে এসে যা চাইত তিনি হাসিমুখে খুশী হয়ে তা তাকে দিয়ে দিতেন, সোনা-রূপার বাসন পত্র, আসবাব, শাড়ি, গহনা, কিছুই এর থেকে বাদ যেত না।

সংজ্ঞা দেবীর মুখে শুনে অবাক হই তাঁর অল্প বয়সের ভগবৎ-তৃষ্ণার কথা। তাঁর এক বিধবা দিদির দেব-দ্বিজ-সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি ছিল অগাধ ভক্তি, তিনি যেই এসে খবর দিতেন, এক মস্ত সাধু এসেছেন,—সংজ্ঞা দেবী স্বামীর অনুমতি নিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর দর্শনে ছুটে যেতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের নিজ বাড়ীতে এনে যথাসাধ্য সেবা যত্ন করতেন। মহানুভব সুরেন্দ্রনাথ এতে কোন বাধার সৃষ্টি করেন নি,—এভাবেই সংজ্ঞা দেবী পরিচিতা হন বহু সাধু মহাত্মার সঙ্গে।

বড়ই আশ্চর্য্য মনে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র, সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী হয়ে সংজ্ঞা দেবী কি ভাবে বাড়ীর ব্রাহ্মধর্ম্মের আবহাওয়া কাটিয়ে, হিন্দু আচার-আচরণের প্রতি হয়ে পড়েন এত অনুরক্ত! সুরেন্দ্রনাথের ও কী মহান উদারতা, স্ত্রীর এই ধর্ম্মোন্মাদনায় কখনোই বাধা দেওয়া দূরে থাক, বিরক্তও হননি।

দিন কাটে,—সুরেন্দ্রনাথ নানা ব্যবসায়ের পথপ্রদর্শক হয়ে দেশের বাণিজ্য-বিস্তারে সহায়তা করেন। ইন্সিওরেন্স কোম্পানী তিনিই প্রথম স্থাপন করেন 'হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী' নাম দিয়ে। এ সব কাজে সহায়তা করতে এসে কিছু লোকে তাঁর সরল, উদার মনের সুযোগ নিয়ে এমন ঠকায় যে শেষ জীবনে তিনি প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। কিছু ধারকর্জ্জ রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

তার পর থেকেই সংজ্ঞা দেবীর সংসার বিষবৎ মনে হয়। এতদিনে মেয়েরা বিবাহিতা, ছেলেরা সক্ষম,—কাজেই এবারে তিনি মুক্ত, বাড়ী ঘর বিক্রি করে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে, গেরুয়া নিয়ে হন পরিপূর্ণ সন্ন্যাসিনী। গীতাপাঠ, জপ, ধ্যান এইসব নিয়ে কখনও থাকেন পুরীতে, কখনও কাশীতে।

শান্তিনিকেতনে মেয়ের বাড়ী। সেখানে এসেছেন অল্প কিছুদিনের জন্য, নাতি নাতনীগণকে কী আদর যত্ন! কে কী খেতে

ভালবাসে ভৃত্যকে ডেকে তা প্রস্তুত করার দেন পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ, কারণ তখন কন্যা-জামাতা ছিলেন অনুপস্থিত। একদিন জিজ্ঞাসা করি, আপনি সন্ন্যাস নিলে কি হবে, এখনও ত' দেখছি আমাদের চেয়েও সংসার চালনায় সিদ্ধহস্ত। তিনি হেসে বলেন, জান, আমার ছেলেমেয়েদের আজীবনই আমার উপরে একটা অভিমান রয়ে গেছে যে আমার নিকট ওদের যতটা পাওয়া উচিত তা পায়নি। আমিও ওদের খাওয়ানো-দাওয়ানো, রোগে শুশ্রূষা, সবই করেছি কিন্তু সব সময়েই মনে হত এই নিয়ে ভুলে থাকলে চলবে না, আরও কিছু করার আছে। এখন মনে হয়, বুড়ি ছুঁয়েছি আর ভয় নেই। এখন ওদের প্রাপ্য ওদের প্রাণ খুলে দিই। এবার অনেকটা সেইজন্যই সংসারে এসেছি।

একদিন এলেন আমাদের বাড়ী। আরও কয়েকটি মহিলার আগমনে ছোট একটু সভা হয়। তিনি সেখানে গীতার কয়েকটি শ্লোক এত সুন্দর উচ্চারণে বললেন যে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ভাল সংস্কৃত জানেন? তিনি বলেন, মোটেই না, ১৩/১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ—তারপর ঘন ঘন পুত্র-কন্যার আগমন; অসুস্থ শরীর, এর মধ্যে সময় কোথায় পড়াশোনা করবার? এটুকু অমনি পড়তে পড়তে আপনিই হয়েছে ভগবানের অযাচিত করুণায়। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মত সংসারী মেয়েদের আধ্যাত্মিক উন্নতি করার সহজ উপায় কী? তিনি বলেন—সেবা। সেবাই মেয়েদের আত্মোন্নতির পথে পরম সহায়ক। নির্ব্বিচারে সেবা করে যাও আর সাধুসঙ্গ, সদগ্রন্থ পাঠ, এসব ত' আছেই।

প্রণাম জানাই এই মনস্বিনী মহিলার পায়ে। তিনি এখন যদিও সংসারের প্রাচীর একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে এসেছেন মুক্ত স্থানে, কাশীধামে, তবু তাঁকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে আবার গড়ে উঠছে একটি বৃহত্তর সংসার। বহুলোক মাতৃজ্ঞানে তাঁকে করে অসীম শ্রদ্ধা, শোকে-দুঃখে চায় সহানুভূতি, আশীর্ব্বাণী। তাঁর নিজের মুখেই শুনি, পরিচিত-অপরিচিত কতজনের নিকট হতেই যে আসে দীর্ঘ চিঠি, তার জবাব দিতে কেটে যায় তাঁর দিনের অনেক অংশ।

আশুতোষ জায়া যোগমায়া

ঁশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি মন্ত্রী; দিল্লীর বড়াখাম্বা রোডে তাঁর প্রকাণ্ড সরকারী বাড়ী, আমরাও নিকটেই থাকি, একদিন সকাল বেলা গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে,—কারণ পরিচয় বহুদিনের।

গিয়ে শুনি তাঁর দাদা রমাপ্রসাদবাবু সপরিবারে কলকাতা থেকে এসেছেন ও সকলে মিলে ভোরবেলা মোটরে বৃন্দাবনে গিয়েছেন,—সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফেরার আশা নেই। বাড়ীতে আছেন শুধু ঠাকুমা,—তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। অত বড় প্রাসাদোপম বাড়ীর এককোণে ছোট একখানা ঘরে মাটিতে বিছানা পেতে শুয়ে আছেন ক্ষুদ্র, কৃশ এক বর্ষীয়সী মহিলা, ফরসা ধবধবে রং, মুখশ্রী অত্যন্ত সুন্দর।

নিকটে গিয়ে প্রণামান্তে বলি, এ কী মা, এত বড় বাড়ী ফেলে আপনি পেছনের এই আলো বাতাসহীন এক গুদামে মাটিতে কেন শুয়ে আছেন?

তিনি শিরশ্চালন করে হেসে বললেন, তাতে কী হয়েছে মা? তাহলে একটা গল্প বলি শোন,—

হতেই তাঁর একটি অভ্যাস ছিল, কয়েকটি অতিথি-সেবা না করি তিনি অন্ন গ্রহণ করতেন না। বিবাহের পর স্বামী-গৃহেও তা করে যান, কিন্তু স্বামীর নিকট পান প্রচণ্ড বাধা। ধনী জমিদার বলে এ সব অপব্যয় ছাড়তে হবে,—এখানে ওসব চলবে না। রাজকন্যা অত্যন্ত অসুখী, আহারে বিহারে অতৃপ্তি, কিছুই ভালো লাগে না, নীরবে লুকিয়ে করেন অশ্রু বিসর্জ্জন? এমন সময়ে এক সাধু অযাচিত আগমনে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর আহারের ব্যবস্থা করে এসে বসলেন কাছটিতে। সেদিন জমিদার ছিলেন স্থানান্তরে, কাজেই সাধু সেবার কোন বিঘ্ন হল না। সাধুটি কন্যার মুখের দিকে চেয়ে বলেন, মা তোর মুখ অত শুকনো কেন? কেন তোকে এত অসুখী মনে হচ্ছে, চতুর্দ্দিকে সুখসুবিধা প্রাচুর্য্যের এত সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও। আমাকে বল্-দেখি আমি কোন প্রতিকার করতে পারি কি না।

ম্লানমুখী রাজকন্যা বলেন তখন তাঁর মনের নিদারুণ দুঃখের কথা। বলেন কী হবে এত ঐশ্বর্য্য দিয়ে, যদি তা দিয়ে একজনকেও পেট ভরে খেতে দিতে না পারি? একদিনও আমার এ সংসারে থাকতে ইচ্ছা করে না,—মন চায়, যেদিকে দু'চক্ষু যায় চলে যেতে, কিন্তু দেশাচার, লোকাচার এসে দেয় বাধা!

সাধুজি শুনে নীরবে চলে গেলেন। জমিদারের জমির বাহিরে, কিন্তু তাঁর আসা যাওয়ার পথের ধারে এক গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

জমিদার সে পথে সর্ব্বদাই করেন আসা যাওয়া এবং সাধুটিও বিনীত ভাবে বলেন, শুনুন মহারাজ একটি কথা। কিন্তু মহারাজের আর সময় হয় না কথাটি শোনার, তাচ্ছিল্যভরে দৃষ্টিপাত করে চলে যান। যায় এভাবে কিছুদিন, একদিন জমিদারের মনে হয়, ঐ সাধু ত' আমার নিকট কিছু চায় না, তবে এভাবে ডাকে কেন দিনের পর দিন? পরদিন সাধুডাকামাত্র নিকটে গিয়ে বলেন, কেন আপনি আমাকে রোজই ডাকাডাকি করেন? পয়সাকড়ি আপনাকে আমি দিতে পারব না।

সাধু হেসে বলেন, আপনার কাছে ত' আমি কিছুই চাই না, টাকা-পয়সা আপনি দিতে চাইলেও আমি নেব না।

জমিদার,—তবে কেন ডাকেন?

সাধু—সে অন্য কারণে।

জমিদার কৌতূহলান্বিত হয়ে এসে বসেন সাধুর নিকট।

সাধু বলেন, আমার এক দাদা ছিলেন, তাঁকে আমি যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করতাম, তেমনি ভালবাসতাম। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ দরজি ও তাঁর একটি অতি সূক্ষ্ম সূচ ছিল, যা ছাড়া তিনি সূক্ষ্ম কাজ করতে পারতেন না। কিছুদিন হয় তিনি স্বর্গীয় হওয়ায় আমার সংসারে বিতৃষ্ণা আসে ও গৃহত্যাগী হই। কিছুদিন হয় সর্ব্বদাই তাঁকে স্বপ্নে দেখি ও মনে হয় তিনি যেন বলেন, আমার সেই সূচটি তুই কোন প্রকারে পাঠিয়ে দে। আপনাকে দেখে আমার মনে হয় আপনি আর বেশীদিন পৃথিবীতে থাকবেন না, শীঘ্রই যেতে হবে পরপারে। তা যাবেনই যখন এই সূচটি আমি দিচ্ছি, এটি আপনি যে কোন প্রকারে নিয়ে আমার দাদাকে দেবেন, এই একমাত্র অনুরোধ আমার।

জমিদার হঠাৎ হতচকিত হয়ে সূচটি নিয়ে বাড়ী চলে এলেন ও ক্রমাগত সাধুর কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এক ত' মানুষ নিজের

সময় জামায় বিদ্ধ করে রাখি, তৎক্ষণাৎ মনে হয় কাপড় ত' সঙ্গে যাবে না,—তখন আবার ভাবেন, দেহের চামড়ায় বিদ্ধ করে রাখি, অমনি মনে হয় দেহটাওত চিতার আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে। তবে সঙ্গে কী যাবে? একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূচও যদি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে না পারি তবে কেন এ অতুল ঐশ্বর্য্য! আর জীবনও ত' একটা সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ, এখন না হউক যে কোন সময়ে ত এ প্রাণ যাবেই, পৃথিবীর কারোই ত এ থেকে নিষ্কৃতি নেই, কী মূর্খ আমি, এই নিরর্থক ধন-সঞ্চয়ের নেশায় প্রিয়তমা সাধ্বী পত্নীকেও দিচ্ছি কত কষ্ট। তাঁর চোখে যেন নূতন এক আলো পরিস্ফুট হল। সাধুকে ডাকিয়ে পাত্তার্ঘ্য দিয়ে তাঁকে গুরুপে বরণ করলেন, স্ত্রীকে দিলেন দান-ধ্যানে অবাধ স্বাধীনতা!

গল্পটি শেষ করে বললেন—বলত মা, এর পরেও কি তুমি বলবে, কেন ঐশ্বর্য্য ভোগ করি না? আজ এক মাস এখানে এসেছি, অন্ন গ্রহণ করি না।

চমকে জিজ্ঞাসা করি, কেন? তবে খান কি?

হেসে বললেন, আমার কোন কষ্ট হয় না; ফল, দুধ, মিষ্টি দিয়ে ঠাকুরের ভোগ দিই এই ঘরখানাতেই, তারপর সেই প্রসাদ গ্রহণ করি। এ বাড়ীটা সেদিনও ছিল এক ধনী মুসলমানের। দেশ ভাগাভাগির ফলে সে তার সাজানো বাড়ী সরকারকে বিক্রি করে চলে গেছে পাকিস্তানে। সেদিনও হয়ত এ বাড়ীতে কত গরু-শূয়োর রান্না-খাওয়া হয়েছে, কত ভোগ-বিলাসের উদ্দাম লীলা চলেছে এর কক্ষে কক্ষে, মনে করতেও আমার গা গুলিয়ে ওঠে। সেজন্যই এত শোবার ঘর থাকাতেও আমি এই গুদামে এসে আশ্রয় নিয়েছি; এ ঘরটা এত খারাপ যে বোধ হয় এটা অব্যবহার্য্য হয়ে বন্ধই থাকত। এত বড় বাড়ী-খানার মধ্যে এই ঘরটিই আমার ঠাকুর রাখার উপযুক্ত স্থান মনে হল।

মাসাধিককাল ফলাহার—স্নান যমুনায়। কারণ ম্লেচ্ছ ব্যবহৃত স্নানঘর তিনি ব্যবহার করেন না, তবু মুখে পরিতৃপ্তির হাসি, নেই একটু অভাববোধ অথবা এতটুকু অভিযোগ। কী অসীম মনোবলের অধিকারিণী এই নারী।

এই হলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী, রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত কৃতী পুত্রের জননী লেডী যোগমায়া মুখোপাধ্যায়।

আবার দেখি তাঁকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জির আকস্মিক মৃত্যুর পর। বাড়ীতে শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা, আমন্ত্রণ পেয়ে গিয়ে দেখি, যোগমায়া দেবী ছটফট্ করছেন যেন কাটা পাঁঠা। অশীতিপর বৃদ্ধার এ হেন সন্তান-শোক চোখে দেখা যায় না। বলছেন, আমি রাক্ষসী, ভালগুলোকে সব খেয়ে ফেললাম। কী ছেলে শ্যামাপ্রসাদ—নিজের হার্টের অসুখ অগ্রাহ্য করে আমাকে নিয়ে গেল তীর্থ-ভ্রমণে। সাবিত্রী পাহাড়ে অনেক সিঁড়ি, উঠতে পারি না বাবা আমাকে দু' হাতে কোলে তুলে নিল, যেন পাখীর ছানা। হাজার নিষেধ অগ্রাহ্য করে দেখিয়ে আনল সাবিত্রী-মন্দির। এমন ছেলে হারিয়েও আমাকে বেঁচে থাকতে হবে?

পুত্র রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদের মাতৃ-ভক্তি অতুলনীয়। দেশের শ্রেষ্ঠ কৃতী পুত্রের জননী রত্নগর্ভা যোগমায়া দেবী জীবনে অনেক শোক, আঘাত পেয়েছিলেন। দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে হয়েছিলেন খাঁটি সোনা। নিজেই বলেন,—প্রথমা কন্যা কমলার অকাল বৈধব্য, পুনরায় বিবাহ ও অল্প দিনের মধ্যেই আবার বৈধব্য—তারপর তার অকালে প্রাণ বিয়োগের পর হতেই তিনি সংসার প্রায় ছেড়ে দিয়ে পূজাপাঠ, ধর্ম্মালোচনায় অধিকাংশ সময় কাটান,—তখনও তাঁর বয়স খুব বেশী হয়নি; দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, গুণী স্বামী বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জ্জি তখনও বর্ত্তমান।

ধনীর গৃহিণী ও সকলের নয়নানন্দদায়িনী হয়েও প্রায় সমস্ত জীবনই তিনি ত্যাগের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে গেলেন। ব্রত-উপবাস, পূজা-পাঠ, আচার-নিষ্ঠায় সুদীর্ঘ তাপিত জীবন অতিবাহিত করে কিছু দিন পূর্ব্বে চলে গেলেন সাধনোচিত ধামে।

আজও রসারোড দিয়ে যেতে প্রকাণ্ড অট্টালিকাটির প্রাণকেন্দ্র, গৃহলক্ষ্মী, ধর্ম্মপ্রাণ মহিলাটির কথা মনে হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রসারোডস্থিত বিশাল বসতবাড়ীটি এখন আশুতোষ মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের হস্তগত। শুনে খুবই আনন্দ হল যে, এই বাড়ীতে অদূর ভবিষ্যতে 'যোগমায়া ইনষ্টিটিউশন' নামে একটি মহিলা কলেজ স্থাপিত হবার পরিকল্পনা চলছে। [ক্রমশঃ।

বাইশ বছর

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বাইশ বছর পরে আজকেই চেনবার দিন
বাইশ বছর আগেকার স্মৃতিগুলো ক্ষীণ।
বাইশ বছর সে তো যৌবনের পূর্ণ অভিসার
বাইশ বছর সে কি জীবনের হার?
বাইশ বছর পরে দেখি আজ চোখের তলায়
নানা রেখা। কাটাকুটি। বয়স আলেয়া আলেয়া
চিরে চিরে দেখে।
সময়ের কী কুমকুম মেখে
এলে আজ?
মুছে গেছে বাইশ বছরের মিথ্যে সমাজ।
হায় প্রেম। হিসেব কর কি
বাইশ বছরের সবগুলো ফাঁকি?

বঙ্গযুবতী

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বঙ্গযুবতী সম রূপসী কোথায়?
স্বর্গ নিবসে সারা অঙ্গে তাহার!
চরণপরশে ধূলি হয় উজিয়ার!
হৃদয় হৃদয় পেয়ে প্রেমে মূরছায়!
পেলব দৃষ্টি তার ভুবন ভুলায়!
মুখের কথায় জাগে বুকে তোলপাড়!
দেহের গন্ধে পাই বাস মন্দার!
বসন্ত এলো ভাবি' কোকিল মাতায়!
বুকভরা প্রেম তার, সুধাভরা স্তন!
মন তার বড় মিঠে, টলটলে প্রাণ!
রেখেছে সরস করি' বাঙালী জীবন!
বহিছে মরুভূ মাঝে জাহ্নবীবান!
এ হেন যুবতী করে চিত্তশোভন!
তাই তো জগজ্জয়ী আশা অভিমান!
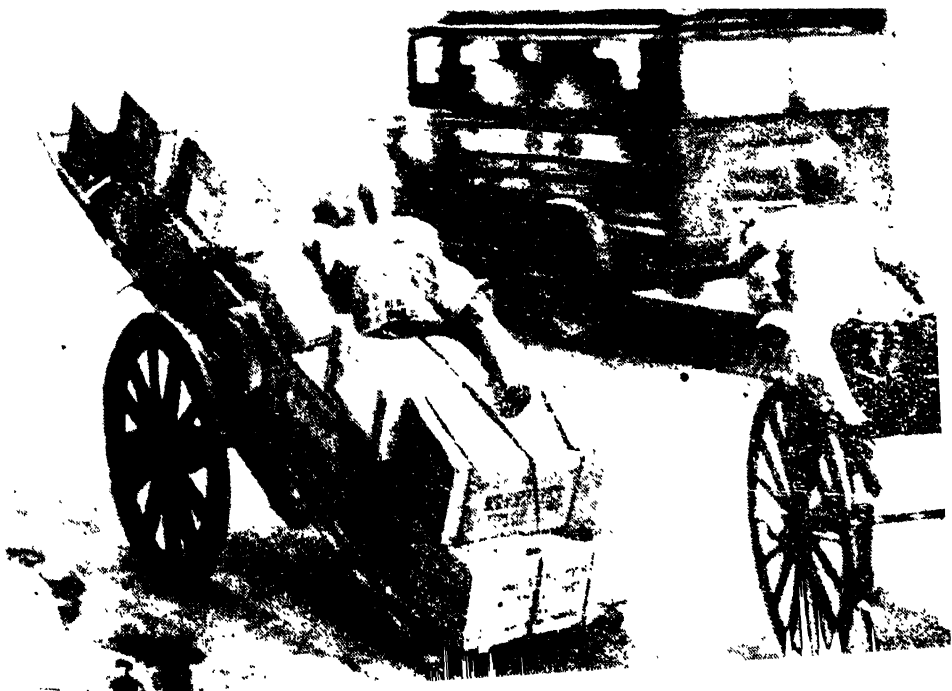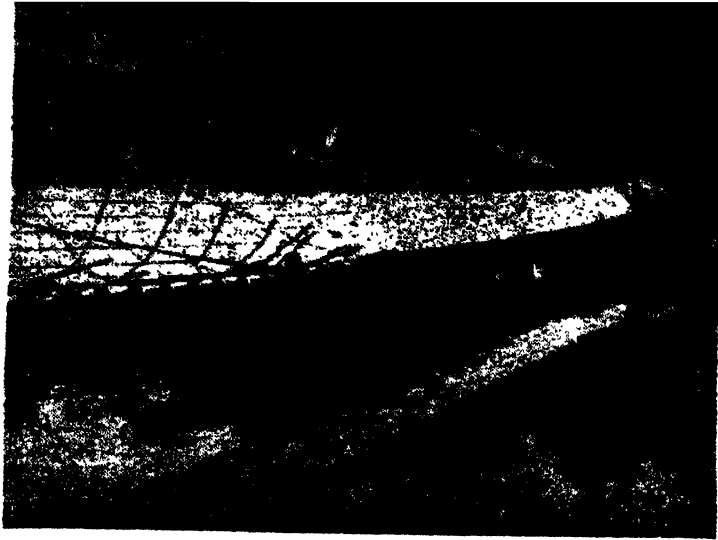
—এস, ধর

ঝুলন্ত হিমসেতু

—বসাক ষ্টুডিও (জলপাইগুড়ি)

একা

-দীপক ঘোষ

খেলা

—আশু ভট্টাচার্য

। মাসিক বসুমতী
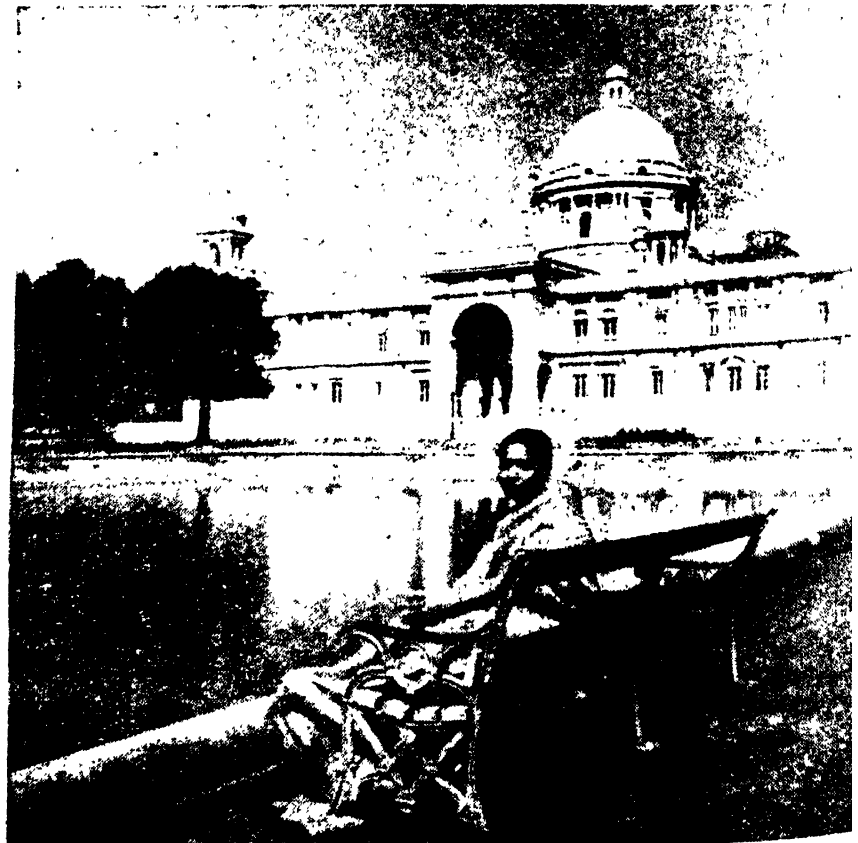
চৈত্র, ১৩৬১ ।

বিবিকা মকবরা (আওরঙ্গাবাদ)

বর পত্নীপ্রেমের নিদর্শন)

—সুশান্ত মিত্র
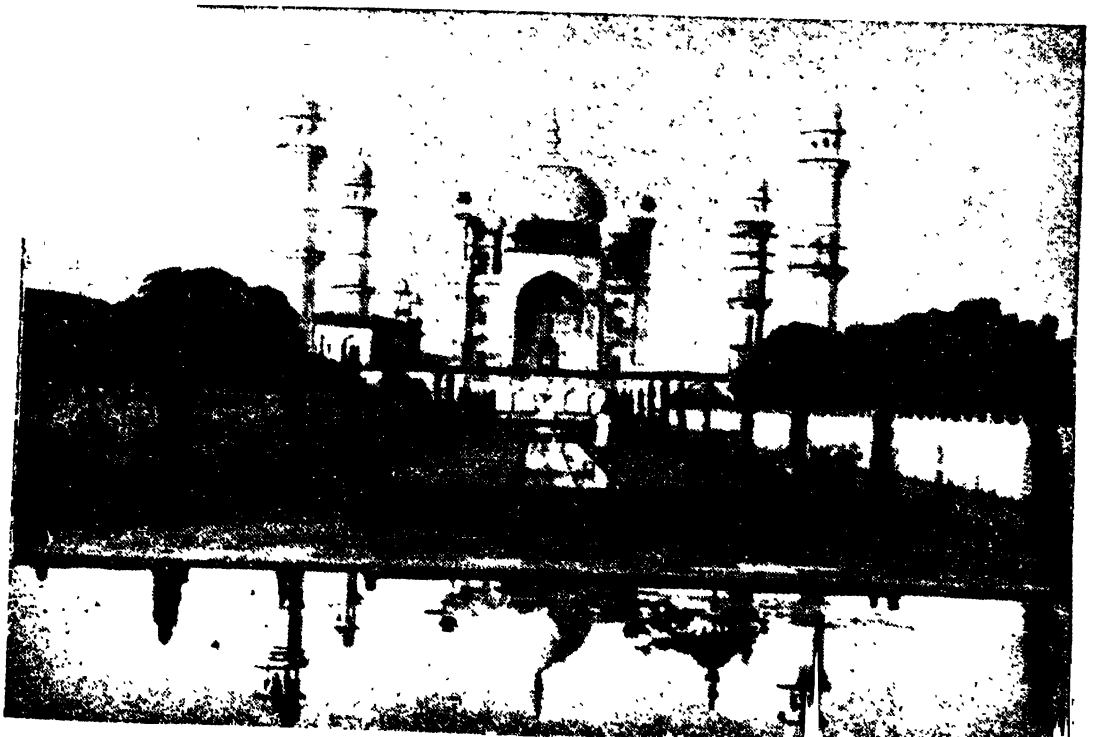
প্রতীক্ষারতা

—এস, মুখার্জী

ই. এম. ফরস্টার

স্নীলকুমার নাগ

গত দু'শো কি আড়াইশ' বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, বয়স এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে জাতি হিসেবে ইংরেজরা মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। এক হ'লো যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক; আর দ্বিতীয় হ'লো ভদ্র, শান্তিপ্রিয় ইংরেজ। সাম্রাজ্যবাদের শুধু সমর্থক বললে সাধারণভাবে যা বোঝায় তা' নয়—রীতিমতো বেপরোয়া সাম্রাজ্যবাদী, সাম্রাজ্যের জন্যে আন্তরিক গর্ববোধ করতেন বা এখনো করে থাকেন প্রথমশ্রেণীর কবি সাহিত্যিকদের মধ্যেও ইংলণ্ডে এরকম অনেককেই দেখা গেছে এবং আজো দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা যতই দুঃখজনক হ'ক না কেন, অত্যন্ত সত্যি। বলাই বাহুল্য, দ্বিতীয় দলে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক নন, এমন কি সক্রিয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী, ভদ্র এবং শান্তিপ্রিয়দের মধ্যেও নিঃসন্দেহে অনেক প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ সাহিত্যস্রষ্টাকে আমরা পেয়েছি। ই· এম ফরস্টার এই শেষোক্ত দলেরই একজন।

এডোয়ার্ড মরগ্যান ফরস্টার (জন্ম ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে) ইংলণ্ডের এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে ছাত্রাবস্থাতেই দেখা গিয়েছিল ফরস্টার স্কুলপাঠ্য বইপত্র ছাড়াও নানা দেশের, বিশেষ করে ইতালীর গল্পের বই একান্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়াশুনো করছেন। কলেজ জীবনে এসে দেখা গেলো বি-এ পাশ করবার আগেই সাহিত্য সম্পর্কে এমন বিচিত্র বই প্রচুর পরিমাণে পড়া শেষ করে ফেলেছেন যে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তি এমন কি অনেক তরুণ অধ্যাপকের পক্ষেও শোনবার মতো অনেক কথাই বলবার মতো জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছেন উনি।

পড়াশুনো শেষ করবার পরে কর্মজীবনে ফরস্টার একজন অধ্যাপক বা সাহিত্য সমালোচক হবেন—বাড়ীর লোকজনের এই রকমই ধারণা ছিল। উনি যে সৃজনধর্মী কোনো কিছু লিখতে পারবেন কখনো, এ কথা কারুরই, মনে হয়নি সে সময়ে। ফরস্টার কিন্তু বি-এ ক্লাশের ছাত্র অবস্থাতেই একটু একটু করে লেখা আরম্ভ করলেন। কয়েকটি ছোটো গল্প লেখা শেষ করে বিরাট একখানা উপন্যাস লেখবার পরিকল্পনাও করে ফেললেন। ফাইন্যাল বি-এ পরীক্ষা সামনে, কাজেই কয়েক মাসের জন্যে এ উপন্যাসখানা লিখতে আরম্ভ করেও বন্ধ করে রাখলেন। বি-এ পাশ করবার পরে অনেক রকমের বই-ই ফরস্টার লিখেছেন, কিন্তু এ উপন্যাসখানায় আর হাত দেন নি। পরবর্তীকালে লেখক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পরে, বন্ধু-বান্ধব, পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগণ এবং প্রকাশকেরা অনেক সময় ফরস্টারকে জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রথম পরিকল্পিত উপন্যাসখানার কি হ'ল? ফরস্টার সকলকেই এক কথা বলে থাকেন উত্তরে, ওখানা আর লেখা হবে না, কারণ প্রেরণা পাই না। যা কিছু হ'ক না কেন লেখা সম্পর্কে প্রেরণা লাভের জন্য এই যে ঐকান্তিকতা এটা ফরস্টারের একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয়।

কেমব্রিজের কিঙস কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই জি, এল, ডিকিনসনের সঙ্গে ফরস্টারের পরিচয় হয়েছিল। এবং মূলত ডিকিনসনের প্রেরণাতেই বি, এ, পাশ করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফরস্টার ছোটো গল্প লিখতে সুরু করেছিলেন। এই সময়কার ছোটো গল্পগুলির বেশিরভাগই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিভিয়্যু পত্রিকায় বের হয়েছিল।

বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি ছোটো গল্প এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরে একদিন শোনা গেলো ফরস্টার ঘোষণা করছেন যে তিনি ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাবেন। চলে যাবেন ইতালীতে। এবং ইতালীতে এসে ইতালীর নাগরিকত্বলাভের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ

ভারতে আগতা এক ভদ্রমহিলা মিসেস মুরের সঙ্গে। মিসেস মুর ভারতীয় প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাবশত বলা মাত্রই মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের সময় নিজের জুতো জোড়া খুলে রাখলেন। প্রাণবন্ত যুবক আজিজকে মিসেস মুরের খুবই ভালো লাগলো। এই বর্ষীয়সী মহিলা একেবারে প্রথম থেকেই আজিজকে স্নেহের সঙ্গে দেখতে লাগলেন। এবং তিনি হলেন ভদ্র, শান্তিপ্রিয় ইংরেজ। কাজেই ভারতীয়দের ছোটো করে বা অবজ্ঞার চোখে দেখেন না। একেবারে সমান সমান ভাবে আজিজকে উনি দেখতে লাগলেন। প্রভু ও দাসের সম্পর্কের কথা ওদের স্পর্শ করলো না।

আজিজ মিসেস মুরের কাছেই শুনলো উনি কেন ভারতে এসেছেন। উনি ভারতে এসেছেন ওঁর ছেলে রনির কাছে। রনি চন্দ্রপুর সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট। মিসেস মুরের সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে আরও একজন এসেছে। সে হ'লো মিস আডেলা কোয়াসটেড। ভারতে আসবার প্রধান উদ্দেশ্য হলো রনির সঙ্গে আডেলার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল কিছুদিন ধরে, তার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা। আডেলা শুনেছে রনি ভারতবর্ষে কি চাকরী করে, কতো বেতন পায় ইত্যাদি সব। কিন্তু ওকে বিয়ে করে ভারতের মতো একটা দূরের দেশে বাসা বাঁধবার আগে আডেলা কর্মরত অবস্থায় একবার রনিকে তো দেখতে চাইই, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ দেশটা কেমন, তাও একবার দেখা দরকার। এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস সম্ভব কি না তা স্বচক্ষে দেশটাকে এবং এখানকার মানুষজনকে না দেখে আডেলা সিদ্ধান্ত করতে নারাজ। তাই ভারতে আসা।

ভারতে আসবার কয়েকদিনের মধ্যেই মিসেস মুর এবং আডেলা দু'জনেরই প্রবল আগ্রহ দেখা দিলো সত্যিকারের ভারতবর্ষকে, ভারতের সাধারণ মানুষজনকে দেখবার জন্যে।

চন্দ্রপুরের ইংরেজ এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় বারটন পরিবার, লেসলী পরিবার বা ক্যালেণ্ডার পরিবার এঁরা কেউই স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে মেলামেশা করেন না। সহরের একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী একটা তাস খেলার আয়োজন করলেন। মিসেস মুর এবং আডেলাও এখানে উপস্থিত। খেলার আগে এবং পরে ঐ সরকারী কর্মচারী এবং তাঁর স্ত্রী নেহাৎ ঘরোয়া পরিবেশে উপস্থিত ভারতীয়দের সঙ্গে যে রকম প্রভুর মতো আচরণ করলেন তা দেখে মিসেস মুর এবং আডেলা দু'জনেই ব্যথা পেলো। নিজের ছেলের তরফ থেকে এই আচরণ দেখে মিসেস মুর আরো দুঃখিত হলেন। এ রকম অভব্য আচরণ কেন? ভারতীয়রা কি মানুষ নয়? জিজ্ঞাসিত হয়ে রনি বললো: আমি খৃষ্টান পাদরী নই, লেবার পার্টির কোনো সভ্য নই বা ভাববিলাসী কবি-সাহিত্যিকও নই। আমি শাসক, একজন সরকারী কর্মচারী মাত্র। আমার ওপরওয়ালারা ভারতীয়দের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে থাকেন ঠিক সেই রকমটি করতে আমি বাধ্য। তার বেশি কিছু করি না, কম কিছু করলে চাকরীতে উন্নতির আশা নেই। সুতরাং···

মিঃ ফিল্ডিং শহরের একটি স্কুলের শিক্ষক। আজিজের সঙ্গে ওঁর প্রগাঢ়তা জন্মে। মিঃ ফিল্ডিং-এর বাড়ীতে বসেই মিসেস মুর এবং আডেলার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা কথাবার্তার পর ঠিক হ'লো যে ওরা দু'জন মারাবার গুহা দেখতে যাবে। আজিজ ওদের সঙ্গে যাবে ওদের দেখাশুনোর জন্যে। এটা বন্ধুভাবে সাহায্য করা ব্যতীত কিছু নয়। আজিজ সানন্দে ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু প্রথম গুহাতে ঢুকবার পরেই মিসেস মুর দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। অন্ধকারের ভেতর কিছুক্ষণ কাটাবার ফলে রীতিমতো অবসন্ন হয়ে পড়লেন। উনি বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে এবং বললেন যে আর ভেতরে যাবেন না। আডেলা তারপরেও আরো একটি গুহায় প্রবেশ করলো এবং যথাসময়ে বেরিয়ে এলো।

তারপরেও ঘটনাবলী একটা নতুন মোড় নিলো দেখা যায়। কারণ আডেলার ধারণা হয়েছিল যে আজিজ নিশ্চয়ই অন্ধকার গুহার মধ্যে ওকে অনুসরণ করেছিল কোনো একটা কুমতলবে। এই রকম একটা অভিযোগ করে প্রকাশ্য আদালতে আজিজের নামে আডেলা মামলা সুরু করে দিলে। ছোট শহর চন্দ্রপুর তোলপাড়। ইংরেজ এবং ভারতীয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দারুণ উত্তেজনা। ইংরেজরা আজিজের যাতে সর্বোচ্চ শাস্তি হয় তার জন্যে সমবেতভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। ভারতীয়—এই মিথ্যে অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে লাগলো। যে কোনো সময়ে একটা ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যেতে পারে—জাতি বিদ্বেষের বন্যা এইরকম একটা অশুভ ইঙ্গিত দিতে লাগলো। কালা আদমী হয়ে খাঁটি ইংরেজের মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া—এ কিছুতেই মার্জনা করা যেতে পারে না। দেখা গেলো ইংরেজ নির্বিশেষে সকলেই এবার একজোট হয়ে গেছে। এবং ভারতীয়রাও নিজেদের এক দলভুক্তই মনে করতে লাগলো। পথে-ঘাটে, দোকানে-বাজারে, ক্লাবে-রেস্তোরায় নানা গুজব রটতে লাগলো। সকলেই অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো বিচারে কি হয় সেই জন্যে।

নির্ধারিত বিচারের দিনে ঘটলো এক তাজ্জব ব্যাপার। প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে আডেলা ঘোষণা করলো যে, ওর একটা মনের ভ্রম হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটা ভালোভাবে চিন্তা করে এ বিষয়ে ও এখন নিশ্চিত হয়েছে যে আজিজ গুহার মধ্যে ওকে আদপেই অনুসরণ করেনি। কাজেই আদালত থেকে ও স্বেচ্ছায় আজিজের বিরুদ্ধে ওর যে অভিযোগ, তা তুলে নিলো।

এরপর দেখা যাচ্ছে যে চন্দ্রপুরের সমস্ত শ্রেণীর ইংরেজ এবং ইয়োরোপীয়গণ আডেলার বিরুদ্ধে ক্ষোভে একেবারে ফেটে পড়লো। কারণ তারা যে প্রকৃতই ভারতীয় বিদ্বেষী এবার তা' একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। এবং ব্যাপারটা প্রকট হয়ে পড়বার পরে কিনা আডেলা সত্যি কথাটা বলে দিলে! তারা সবাই বয়কট করলো আডেলাকে। মিঃ ফিল্ডিং আশ্রয় দিলেন ওকে। দেশে ফিরে যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ হবার আগে কয়েকদিন ও মিঃ ফিল্ডিং এর স্কুলের একটা ঘরে কাটাতে লাগলো।

চন্দ্রপুর সহরে আবার শান্তি ফিরে এলো। মিসেস মুর দেশে ফিরবার পথে মারা গেলেন। আডেলা রনিকে বিয়ে না করেই দেশে ফিরে গেলো। রনি এবং মিঃ ফিল্ডিং সরকারী হুকুমে অন্য একটা প্রদেশে স্থানান্তরিত হলো। আজিজ এবং মিঃ ফিল্ডিং পরস্পরকে ভুল বুঝলো।

কিছুদিন পরে দেখা যায় আজিজের সঙ্গে মিঃ ফিল্ডিং-এর আবার দেখা হয়ে গেলো কিছুটা আকস্মিকভাবে একটা দেশীয় রাজ্যে। দু'জনেই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে লাগলো পূর্বের সৌহার্দ ফিরিয়ে আনবার জন্যে কিন্তু পারলো না। ওরা দু'জনেই বুঝতে পারলো: এখনো সময় আসেনি। ভুল বোঝাবুঝির মূল কারণ অপসারিত

না হওয়া পর্যন্ত—মানুষ হিসেবে সমপর্যায়ে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত—প্রকৃত হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। সে জন্তে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতেই হবে।

ভারতীয় সমস্যা নিয়ে ভদ্র এবং শান্তিপ্রিয় শ্রেণীর ইংরেজরা এক সময় যে কতো গভীরভাবে চিন্তা করতেন 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' আজো তার সাক্ষ্য দেয়। একদল ইংরেজ এ উপন্যাসখানাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় ছুঁইয়েছেন আর একদল বিনা বাক্যব্যয়ে জানালা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আজ যখন হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলবার পথে প্রতিবন্ধক সত্যি সত্যি অপসারিত হয়েছে, তখন আশা করা যায় ইংরেজ সম্পর্কে ভারতীয়গণের এবং ভারতীয়গণ সম্পর্কে ইংরেজদের নতুন করে মূল্যায়নের সময় এসেছে—এবং এবার উভয়ে মানুষ হিসেবে উভয়ের মর্যাদা রক্ষা করে পরস্পরের কাজে লাগতে পারবো।

ফরস্টার তৃতীয়বার ভারতে এসেছিলেন ১৯৪৫ সনে। জয়পুরে অনুষ্ঠিত পি, ই, এন, ভারতীয় শাখার একটি অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে। চতুর্থবার, স্বাধীনতার পরে, ১৯৫৩ সনে ভারতে এসে বহু জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখে গেছেন। এই বছরই স্বদেশের সরকার (যাঁরা দীর্ঘকাল ফরস্টার সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন) ফরস্টারকে "অর্ডার অব দি কমপ্যানিয়নস অব অনার"—জাতীয় সম্মানে ভূষিত করেন। আজ তাঁর সাহিত্য প্রতিভা সর্বজন স্বীকৃত।

'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'র পরে নতুন আর কোনো উপন্যাস ফরস্টার লেখেন নি। বোধ হয় লিখবেনও না। তবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে পূর্ব-প্রকাশিত কতকগুলি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন বেরিয়েছে। এর মধ্যে গল্প সংগ্রহ 'দি ইটারন্যাল মোমেন্ট' (১৯২৮) বিশেষ উল্লেখনীয়। 'অ্যাবিঙ্গার হারভেষ্ট' (১৯২৬) একটি প্রবন্ধ সংকলন। ফরস্টার রচিত ডিকিনসনের জীবনীও একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। সাহিত্য-সম্পর্কিত রচনা হিসেবে কয়েকটি বক্তৃতার সংগ্রহ "অ্যাসপেক্টস অব দি নভেল" ফরস্টারের সুচিন্তিত সাহিত্যাদর্শের নিদর্শন।

কৃষ্ণ

(শ্রীঅরবিন্দ রচিত Krishna)

এই ভয়ংকর মধুর বিশ্বচরাচরে
আত্মার জন্মের অর্থ
খুঁজে পেয়েছি আমি।

অনুভব করেছি
ক্ষুধিত বিশ্বের
স্বর্গ ছাড়িয়ে
কৃষ্ণের পদতলে পৌঁছবার অভীপ্সা ;···
দেখেছি অমর আঁখির রূপ—
শুনেছি প্রেমিকের বাঁশরীর
আবেগময় সুর···
জেনেছি মৃত্যুহীন উল্লাসের চমক···
স্তব্ধ হয়ে গেছে দুঃখ
অন্তরে আমার
চিরতরে।

কাছে আরো কাছে আসে
সংগীত-ধ্বনি
বিচিত্র হরষে
জীবন ওঠে শিহরি'
প্রণয়মুগ্ধ প্রকৃতি
রয়েছে স্থির
প্রিয়তমের স্পর্শ আলিংগন লাগি'।

এই ক্ষণিক মুহূর্তের তরে
কত যুগযুগান্তর হয়েছে অতীত—
কম্পিত ধরণী
মোর মাঝে পেয়েছে পূর্ণতা।

অনুবাদ—সুবীরকান্ত গুপ্ত

হে বাউল

(পূর্ণ দাসের গান শুনে)

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

আবীর কপালে মাখা হারিয়ে গেছে সে চেনা গোধূলি,
তমালী বিনুনী বাঁধা মেয়ে নিয়ে হাসির আকাশ
মাটির শরীর ঘেঁষে করে নাকো আকুলি বিকুলি
তেরটি পার্বণে আর উন্মুখর নয় বারো মাস।

রঙীন ঘুড়ির মত নীলাচারী কোথা সে শৈশব,
কোথায় আমার সেই গানে নাচা বাউল সকাল।
চণ্ডীর মণ্ডপে বসা পুরুতের গুঞ্জরিত স্তব,
সোনালী ধানের গোলা, আঁক টানা মাটির দেয়াল।

এখন কলেজ ষ্ট্রীটে ঠাসাঠাসা পুঁথির শরীরে
আমার ফসলী মন হারিয়ে গেছে, ভাঙা একতারা।
শ্রীমতীর স্বপ্নঘট নিরুদ্দিষ্ট যমুনার তীরে,
গ্রামীণ কন্যার চোখে প্রেম নয়, নাগরী ইসারা।

হঠাৎ তোমার কণ্ঠে হে গেরুয়া-বসনী বাউল,
পাঁচালী কংকন পরা দেখলাম সেই মেয়েটিকে,
খোঁপায় সংবদ্ধ যার লোকায়ত জীবনের ফুল,
সপ্রেমী চাহনি তার খুঁজে ফিরছে হারানো সঙ্গীকে।

আমার সে মেঠো বাংলা কাশ নাচা সে স্নাত শৈশব,
গানে গানে ফিরে পাই কণ্ঠে তার শিশু কাকলি।

মনে পড়ে

(শরৎচন্দ্রের কথা)

সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র এসেছেন ভাগলপুরে গাঙ্গুলিদের বাড়ী জগদ্ধাত্রী পূজোয়। মনে পড়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগের সেই বাড়ীটির কথা !

ভাগলপুর ষ্টেশনে নেমে বাঙ্গালীটোলায় গাঙ্গুলিদের বাড়ী নিয়ে যাবার কথা বললে যে কোনো গাড়োয়ান তার গাড়ী হাঁকিয়ে ক্লক-টাওয়ার অবধি এসে বেঁকে যেত উত্তরমুখে, তারপর মোসাকচক পার হয়ে গলি ঢুকে পড়ত মাণিক সরকার ঘাট রোডে এবং মিনিট দু'তিন পরেই গঙ্গার ধারের সেই সেকেলে বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বলত—এই বাড়ী বাবু।

রাস্তার ওপরে বাঁহাতি দরজা।

দরজা সব সময়েই খোলা !

সাধু-সন্ন্যাসী, অতিথি অভ্যাগতের অবাধ গতি এ বাড়ীতে।

দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে সামনেই খানিকটা উঠোন ; ডানদিকে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে লম্বা বারান্দা, তার কোলে বৈঠকখানা ঘর—লোকজনে গম গম করছে সব সময়।

এই ঘরে জগদ্ধাত্রী পুজো হয় ; পূজোর দিন জগদ্ধাত্রী প্রতিমা রূপে ঘর আলো করে অধিষ্ঠান করেন।

গাঙ্গুলিদের এই বাড়ীটির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় আজ নতুন নয়। ...নকার কথা বলছি তার প্রায় চল্লিশ বছর আগে একদিন শিশু শরৎচন্দ্র তাঁর মার কোলে চড়ে এ বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ করেন। ...দিন তাঁর মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আদরের নাতির ...য়ে সোনার গোট পরিয়ে দিয়ে তাকে কোলে তুলে ...। তারপর, কেদারনাথের ব্যবস্থায় বালক শরৎচন্দ্র লেখাপড়া করবার জন্তে এই বাড়ীতে এবং এইখানেই কাটল তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনেকগুলি দিন। এ বাড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ক্রমে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল।

রেঙ্গুন থেকে ফিরে বাজে শিবপুরে বাসা নিয়ে শরৎচন্দ্র যখন মা সরস্বতীর সেবায় পাকাপাকি ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন, ততদিনে ভাগলপুরে তাঁর এই মামার বাড়ীতে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এ বাড়ীর কর্ত্তা তখন মণীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মণিমামা। মণীন্দ্রনাথ কেদারনাথের কনিষ্ঠ সহোদর অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। বয়সে তিনি শরৎচন্দ্রের চেয়ে মাস ছয়েকের বড় ছিলেন। ছেলে বেলায় এই দু'টি মামা-ভাগ্নে ছিলেন অভিন্নহৃদয় সখা—দু'জনের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা ও প্রীতির সম্পর্ক। দুজনের কেউই সুবোধ বালক ছিলেন না—ছিলেন অতি দুর্দান্ত ও ডানপিটে। গাঙ্গুলিবাড়ীর কঠিন শাসন অবহেলায় তুচ্ছ করে দুজনে যথেচ্ছ মাতামাতি করে বেড়াতেন—ধরা পড়লে শাস্তি ভোগ করতেন মণীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে অন্তর্দ্ধান করতেন।

ছেলেবেলার স্মৃতিতে মধুর গাঙ্গুলিদের এই পুরোণো সেকেলে বাড়ীটা শরৎচন্দ্রকে বরাবর এক দুর্নিবার আকর্ষণে টানত। নিজেই তিনি বলতেন—ভাগলপুর, ভাগলপুরের এই বাড়ী আর এই গঙ্গা আমাকে এমন টানে যে কি বলব! এখানে এসে যে আনন্দ পাই এমন আর কোথাও পাই না। ছেলেবেলার মত এখনো আমার গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে স্নান করতে ইচ্ছে করে।

এই আকর্ষণ শরৎচন্দ্রকে বছরে অন্ততঃ বার দুই ভাগলপুরে টেনে আনত। একবার আসতেন তিনি গরমকালে, ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ জরদালু-বোম্বাই-ল্যাংড়া আম ও তরমুজের সময়ে ; আর একবার তিনি আসতেন শীতকালে, জগদ্ধাত্রী পুজোয়, ভাগলপুরের বিখ্যাত ফুলকপি-বাঁধাকপির মরসুমে।

ভাগলপুরের নামকরা মিষ্টান্ন পান্তুয়া, গোপালভোগ, খেজুরি, টিকরি ইত্যাদি তো বারমাসই পাওয়া যেত—কোনো বিশেষ ঋতুর প্রয়োজন হত না এদের জন্তে ; বিশ্বেশ্বর হালোয়াই (ময়রা) কে ডেকে ফরমাশ দিলেই হল।

অবশ্য, এই থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে শরৎচন্দ্র ভোজনবিলাসী বা লোভী ছিলেন। বস্তুতঃ আহার সম্বন্ধে তাঁর মত নির্লোভ লোক খুব কম দেখা যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পাহারী।

ভাগলপুরে এলে গাঙ্গুলিদের এই গঙ্গার ধারের বাড়ীটা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে তিনি কিছুতেই রাজী হতেন না। বৈঠকখানা ঘরের পুব গায়ে রাস্তার ধারের ছোট ঘরটি তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হত। এই ঘরেই সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র তাঁর আসন বেছাতেন।

সুরেন্দ্রনাথ একবার লিখলেন—

শরৎ, এবারে টিলাকুঠিতে তোমার থাকবার ব্যবস্থা করেছি। কি চমৎকার জায়গা জানো তো! নির্জ্জন, নিরিবিলি, চারিদিক ফাঁকা! তোমার ভাল লাগবে নিশ্চয়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উত্তর এল—

রক্ষে কর সুরেন, আমাকে টিলাকুঠিতে নির্ব্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থা কর না, দোহাই তোমার! টিলাকুঠি চমৎকার জায়গা মানি, কিন্তু অত নির্জ্জনতা আমার ধাতে সয় না। আমি সাধারণ মানুষ, মানুষের মাঝে থাকতেই ভালবাসি। মামারবাড়ীর সেই ছোট ঘরটিই আমার ভাল।

গাঙ্গুলিদের বাড়ীর প্রায় মাইল তিনেক পশ্চিমে গঙ্গার ধারে এক প্রকাণ্ড উঁচু কাঁকরের টিবির ওপর বিরাট দোতলা বাড়ী এই টিলাকুঠি। সেকালের কোনো নীলকরসাহেবের কুঠি এটি; চারিদিকে বিস্তৃত মাঠ, বাগান, পুকুর ইত্যাদি। লোকালয় থেকে দূরে সুতরাং একেবারে নির্জ্জন জায়গা। ভাগলপুরে প্লেগের উপদ্রব হলে গাঙ্গুলিবাড়ীর সকলে এবং আরো অনেকে টিলাকুঠিতে গিয়ে কয়েকমাস অবস্থান করতেন। উঁচু জায়গার ওপর বাড়ী সুতরাং প্লেগের সম্ভাবনা সেখানে ছিল না। বাড়ীটিও এত বড় যে একটা পাড়ার সমস্ত লোক তাতে স্বচ্ছন্দে এঁটে যেত।

শরৎচন্দ্রের কিন্তু পছন্দ নয় এ জায়গা! বেড়াবার পক্ষে সুন্দর—কিন্তু থাকবার পক্ষে নয়।

থাকবার জন্যে 'সম্পর্কীয়' মাতুলদের পুরোনো সেকেলে বাড়ীর সেই ছোট ঘর তাঁর ভাল।

তাঁর জন্ম মামারবাড়ীও ভাগলপুরেই ছিল (এখন নেই)। কিন্তু সেখানে নি কোনোদিন উঠতেন না বা থাকতেন না, এমন কি যেতেনও না।

গাঙ্গুলিদের এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে জ্যেষ্ঠ মণীন্দ্রনাথের স্নেহের আবেষ্টনে বন্দী হয়েছিলেন তাঁর পাঁচ সহোদর।

আর বন্দী হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র।

সে স্নেহপাশ ছিন্ন করার ক্ষমতা এঁদের কারুরই ছিল না।

বিদ্রোহী শরৎচন্দ্রেরও না!

তাঁর মণিমামার প্রতি শরৎচন্দ্রের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বলতেন তিনি প্রায়ই—'বিপ্রদাসে' আমি মণিমামার ঋণ শোধ করেছি।

আরো বলতেন তিনি—'ধর্ম্ম' জিনিসটাকে মণিমামা সত্যিই ভালবাসতেন। তাঁর মণিমামার সাহিত্যবোধের প্রতি শরৎচন্দ্রের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর লেখা কোনো বই পড়ে মণিমামা কি বলেন জানবার জন্যে তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন; মণিমামা 'ভাল হয়েছে' বললে তবেই তিনি সে বই সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতেন।

মণীন্দ্রনাথের অন্তঃকরণের সবটুকুই ছিল খাঁটি জিনিসে ভরা—মেকির স্থান সেখানে ছিল না। ধর্ম্মের ওপরে ছিল তাঁর চরিত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি ও হৃদয়ে ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা, দয়া ও ক্ষমা। এরা পাত্রাপাত্র বিচার করত না, ক্ষীণধারায়ও বইত না কখনো, কৃপণের মত হিসাবের মাপে পা ফেলেও চলত না। অনাবিল স্নেহের ধারা প্রবল উচ্ছ্বাসে তাঁর হৃদয় থেকে বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে দিত সকলকে। দয়া করবার সময় তিনি নিজেকে ভুলে যেতেন, ক্ষমা করবার সময় ভুলে যেতেন অপরাধের গুরুত্ব।

শাক্তবংশের সন্তান মণীন্দ্রনাথ হয়ে পড়লেন বৈষ্ণবধর্ম্মে একান্ত অনুরাগী। নিত্য সন্ধ্যায় বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি সংকীর্ত্তনে বসতেন; বাইরের অনেকেও এসে যোগ দিতেন সে আসরে। কীর্ত্তনের সময় ভাবাবেশে তাঁর দুচোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। তাঁর উদ্যোগে বিশেষ বিশেষ দিনে শহরে নগরসংকীর্ত্তন বার করা হত। তাঁর আমন্ত্রণে নবদ্বীপের সুবিখ্যাত নামকীর্ত্তন গায়ক বৈষ্ণবপ্রবর রামদাসবাবাজী অনেকবার সদলে ভাগলপুরে এসে মধুর নামকীর্ত্তনগানে সকলকে মুগ্ধ করে গেছেন। বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণপ্রেমিক অভিনয় করে গেছেন এবং সেই অভিনয়ে অধুনা বিখ্যাত অশোককুমার রাধিকার ভূমিকায় নৃত্য করেছেন।

এই সময়ে মণীন্দ্রনাথ একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়ে গঙ্গার জলে একটি শ্বেতপাথরের প্রায় এক হাত দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখতে পান। মূর্ত্তিটি অভগ্ন ও সম্ভবতঃ রাম অথবা লক্ষ্মণের মূর্ত্তি। সেটিকে তিনি বাড়ীতে নিয়ে আসেন। 'শ্রীকান্তের' 'ইন্দ্রনাথের' ভাই মণীন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন মণীন্দ্রনাথের বন্ধু এবং একজন দক্ষ শিল্পী। তাঁর তুলিকার স্পর্শে মূর্ত্তিটি কৃষ্ণরূপ ধারণ করে। মণীন্দ্রনাথ 'গোবিন্দ' নাম দিয়ে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

রেঙ্গুন থেকে ফিরে শরৎচন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁর মণিমামার এই প্রগাঢ় অনুরাগ দেখলেন। মামা-ভাগ্নের মধ্যে আর এক বিষয়ে মিল হল। শরৎচন্দ্র নিজেও ছিলেন মনে প্রাণে বৈষ্ণব। মণিমামাকে তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন।

'বিপ্রদাসে' আমি মণিমামার ঋণ শোধ করেছি—শরৎচন্দ্রের এ উক্তিটির তাৎপর্য্য আছে।

শরৎচন্দ্রের পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন তিনি ভাগলপুরে ছিলেন না—ছিলেন মজঃফরপুরে প্রায় অজ্ঞাতবাসে। মণীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত ভগ্নীপতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং সে সময়ে যা করবার সবই করেন—যদিও শরৎচন্দ্রের পিতা তখন গাঙ্গুলিদের বাড়ীতে থাকতেন না—বাঙ্গালীটোলা থেকে বেশ কিছুদূরে খঞ্জরপুরে আলাদা বাসা করে থাকতেন। বহু কষ্টে শরৎচন্দ্রের মজঃফরপুরের ঠিকানা যোগাড় করে মণীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ দেন এবং তাঁর পিতার শ্রাদ্ধাদি করবার জন্যে তাঁকে অবিলম্বে ভাগলপুরে আসতে লেখেন।

শরৎচন্দ্র এলেন। বাঙ্গালীটোলার বাড়ীর সামনে পৌঁছে যখন তিনি গাড়ী থেকে নামলেন তখন তাঁর সাজপোশাকের ঘটা দেখে সকলে হতভম্ব হয়ে গেল। পিতার মৃত্যুর দশ দিনের মধ্যে অন্ততঃ হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান সে রকম সাজপোশাক করে না। একজন বর্ষীয়সী মহিলা তাঁর সেই পোশাকের বাহার দেখে বিদ্রূপ করে বললেন—পোটাচণ্ডীর বেটা চন্দনবিলাস।

মণীন্দ্রনাথ বিকেলে বাড়ী এসে শুনলেন শরৎ এসেছে। শরৎকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কান্না আর থামে না। তারপর, ছুটলেন তিনি তখুনি দেড় মাইল দূরে সেই সুজাগঞ্জের বাজারে শরতের জন্যে কাচার কাপড় কিনতে। ফিরে এসে শরৎকে সঙ্গে নিয়ে চললেন তিনি গঙ্গাস্নানে। গঙ্গা তখন বহুদূরে সরে গেছে। বালির ওপর দিয়ে সেই দীর্ঘপথ হেঁটে শরৎকে গঙ্গাস্নান করিয়ে কাচা পরিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে আবার সেই দীর্ঘপথ বালির ওপর দিয়ে হেঁটে যখন তিনি বাড়ী এসে পৌঁছলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। স্বপাক হবিষ্যান্ন আর চলবে না সেদিন—অতএব ফলাহারের ব্যবস্থা হ'ল শরতের জন্যে!

কিছুদিন পরের কথা। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে। মণীন্দ্রনাথ তাঁর এক জাঠতুতো দিদিকে নিয়ে রেঙ্গুনে গেছেন—ভগ্নীপতি হঠাৎ মারা গেছেন সেখানে—বাসা তুলে দিয়ে সব কিছু নিয়ে আসতে হবে সেখান থেকে। সেখানে গিয়ে শুনলেন তিনি—শরতের খুব অসুখ। ছুটলেন তিনি শরৎকে দেখতে। শরৎচন্দ্র কিন্তু কিছুতেই তাঁর

এলেন মণীন্দ্রনাথ। জানতে পারলেন তিনি—অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কোনো যোগ হওয়ায় শরৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করেনি।

এর পরে শরৎচন্দ্র ফাউন্টেন পেন পাঠিয়ে তাঁর মণিমামাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে পেন ফেরৎ গিয়েছিল।

রেঙ্গুনের বাস তুলে দিয়ে এদেশে ফিরে শরৎচন্দ্র দেখলেন, তাঁর মণিমামার হৃদয়ের দ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে রুদ্ধ ভাগলপুরে তাঁর মামার বাড়ীর দ্বার। এমন যে ঘটতে পারে এ আশঙ্কা যে তাঁর মনে হয়নি তা বোধ হয় না, কারণ তাঁর যে অসামাজিক কাজের জন্তে এই দণ্ড সেটি যে সামান্ত নয় বরং গুরুতর এবং আর সকলে ক্ষমা করলেও তাঁর মণিমামার কাছে যে সে অপরাধের ক্ষমা নেই এ কথা তাঁর চেয়ে ভাল করে আর কেউ জানত না। তিনি তাঁর মণিমামাকে চিনতেন।

সাহিত্য জগতে তখন তাঁর অল্প-স্বল্প প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং অনুরাগী বন্ধু-বান্ধবও অনেক জুটেছে, তবু তাঁর মণিমামার এই বিরূপতাকে উপেক্ষাভরে উড়িয়ে দেওয়া সমাজদ্রোহী শরৎচন্দ্রের পক্ষে সেদিন সম্ভব হয়নি।

বরং তাঁর মণিমামার হৃদয়ে এবং সেই সঙ্গে ভাগলপুরের বাড়ীতে আবার নিজের সেই আগেকার জায়গাটুকু ফিরে পাবার জন্তে তিনি সেদিন রীতিমত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

মণীন্দ্রনাথ তাঁর অনুজদের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন—আমি চাই না যে তোমরা শরতের বাড়ীতে যাও বা খাও, বা তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখ। সে যেন এ বাড়ীতে আর না ঢোকে।

শরৎচন্দ্রের এই অসামাজিক কাজটি কি, সেকথা এখানে বিস্তারিত ভাবে না বললেও চলবে; এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে আশা করি যে, যে-কাজ তিনি করেছিলেন সে-কাজ সেদিনও সমাজ মেনে নেয়নি—আজও তা মানে না। সমাজের চোখে কাজটি নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয়।

মণীন্দ্রনাথের পরের দুই ভাই সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ; এঁদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত—কখনো হাওড়ার পুলে, কখনো হাওড়া ষ্টেশনে, কখনো বা অন্ত কোথাও—শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে নয়। বিচলিত শরৎচন্দ্র এঁদের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করতেন—কি উপায়ে মণিমামার ক্ষমা লাভ করা যায়।

অবশেষে একটা সুযোগ এসে উপস্থিত হ'ল।

মণীন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে সপরিবারে কলকাতায় গিয়ে শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে উঠলেন। বিবাহ সেইখান থেকে হবে। খবরটি শরৎচন্দ্র পেলেন এবং এঁদের—অর্থাৎ শরৎচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের স্থান এবার হ'ল শোভাবাজারের রাজবাড়ীর উদ্যান। শরৎচন্দ্র সেখানে প্রায়ই যেতেন এবং এই বাগানে রক্তকম্বলের গাছের নীচে পাতা বেঞ্চিতে বসে এঁদের যুক্তি-পরামর্শ হ'ত। এঁরা দু' ভাই অনেক ভেবে চিন্তে একদিন শরৎচন্দ্রকে বললেন—শরৎ, তুমি দাদার মেয়ের বিয়েতে তত্ত্ব কর।

শরৎচন্দ্র বললেন—মণিমামা আমার তত্ত্ব নেবেন না—ফিরিয়ে দেবেন।

এঁরা আশ্বাস দিয়ে বললেন—তত্ত্ব ফেরৎ না যায় বৌঠানকে বলে সে ব্যবস্থা আমরা করব; তুমি তত্ত্ব কর ত'।

শরৎচন্দ্র বললেন—তারপর?

এঁরা বললেন—তারপরের ব্যবস্থাও আমরা করব, তুমি আগে তত্ত্ব কর।

অতএব শরৎচন্দ্র বিলম্ব না করে তত্ত্ব পাঠালেন।

মণীন্দ্রনাথ সে তত্ত্ব দেখে জিগেস করলেন—এ তত্ত্ব কে পাঠিয়েছে?

তাঁর সহধর্ম্মিণী বললেন—শরৎ।

—শরৎ পাঠিয়েছে? শরতের তত্ত্ব নেওয়া হবে না—ফিরিয়ে দাও।

তাঁর সহধর্ম্মিণী পূর্ব্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন; তিনি বললেন—তত্ত্ব ত' ফেরাতে নেই—সে যে-ই কেন না করুক; এ তত্ত্বও ফেরানো যাবে না, নিতে হবে।

মণীন্দ্রনাথ আর কিছু বললেন না, অপ্রসন্নমুখে বাইরে চলে গেলেন।

সুরেন্দ্রনাথ এসে বললেন—দাদা, শরৎ এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—কোথায় সে?—জিগেস করলেন মণীন্দ্রনাথ।

—বাগানে বসে আছে—সুরেন্দ্রনাথ বললেন।

বলতে বলতেই শরৎচন্দ্র এসে মণীন্দ্রনাথের পায়ে পড়লেন—মণিমামা আমাকে ক্ষমা করুন!

নিমেষে মণীন্দ্রনাথের রাগ-অভিমান সব জল হয়ে গেল। দু'হাত বাড়িয়ে তিনি শরৎচন্দ্রকে মাটি থেকে তুললেন। দু'জনের স্বরই অবরুদ্ধ—দু'জনের চোখ দিয়েই অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে!

মণীন্দ্রনাথ বললেন—বিয়েতে এস শরৎ, বুঝলে?

মিটে গেল সব। মণীন্দ্রনাথের হৃদয়ের দ্বার এবং সেই সঙ্গে ভাগলপুরের বাড়ীর দ্বার আবার উন্মুক্ত হয়ে গেল শরৎচন্দ্রের কাছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রকে ক্ষমা করলেও তাঁর সেই অসামাজিক কাজটি মণীন্দ্রনাথ ক্ষমা করেন নি; তাই, শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে তিনি কোনোদিন পদার্পণ করেন নি।

প্রায় দেড়শ' বছরের পুরোণো এই জগদ্ধাত্রী পুজোটি গাঙ্গুলিবাড়ীর ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এ বাড়ীর বহু উত্থান-পতনের সঙ্গে ওঠা-পড়া করে আজো এ পুজোটি টিকে আছে। এটি এঁদের ভারি প্রিয় পুজো।

এঁদের এই পুজোর ঘটা বা আড়ম্বর সেদিনও ছিল না, আজো নেই। এঁদের এ পুজোর অর্ঘ্য ছিল এঁদের ভক্তি, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। এই পুজোটির মধ্যে দিয়ে এ-বাড়ীর বৈশিষ্ট্য চমৎকার ফুটে উঠত।

পরিবারের সকলে এই সময় ভাগলপুরে এসে উপস্থিত হতেন এবং মন-প্রাণ দিয়ে লেগে যেতেন এই পুজোয়। প্রতিমা গড়বার জন্তে কারিগর আসত কৃষ্ণনগর থেকে, প্রতিমা সাজাবার ডাকের সাজ আসত কলকাতা থেকে, বাংলা দেশ থেকে আসত ঢুলী। কারিগর, ঢুলী এদের কাউকেই ডাকতে হত না, এরা নিজেরাই ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হত। প্রতিমা সাজাতেন বাড়ীর বড়রা; বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মহা উৎসাহে পুজোর ঘর, দালান ইত্যাদি সাজাত। পুজোর দিন খুব ভোরে উঠে ফুল তুলে আনার ভারও ছিল মেয়েদের ওপর।

এমন প্রতিমা নাকি সারা ভাগলপুরে আর হয় না।

লোক ভেঙ্গে পড়ে প্রতিমা দেখতে।

—অন্ত সব বাড়ীর ঠাকুরও দেখে এলাম—এমন সুন্দর নয়! মা

যেন নিজেই এসেছেন! কি সুন্দর হাসি লেগে রয়েছে মুখে দেখছেন?

প্রতিমা সুন্দর হবে না কেন? কারিগর প্রতিমা গড়ে—এঁরা নিজেরা বসে থেকে তার তদারক করেন। প্রতিমার মুখ আসে কলকাতা থেকে। সব কিছু ভাল করবার কত চেষ্টা এঁদের।—বলাবলি করে তারা।

মণীন্দ্রনাথ নিজেই দেবীর পুজো করেন।

ভক্তি গদগদ মধুর কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করে যখন তিনি দেবীর আবাহন-আরাধনা পুজো করেন, ঘরের বাতাস তাঁর সেই গম্ভীর গলার আওয়াজে যেন ভারী হয়ে ওঠে; মন্ত্রগুলি যেন রূপ ধরে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁর দু'টি নিমীলিত চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় পাঁঠা বলি এ বাড়ীর অনেক দিনের প্রচলিত নিয়ম। মণীন্দ্রনাথের আমলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবার উপক্রম হল। তিনি পাঁঠাবলির বিপক্ষে দাঁড়ালেন—বললেন—মা'র পুজোয় জীবহত্যা করা ঠিক নয়, পাঁঠাবলি তুলে দিতে হবে।

শরৎচন্দ্রও তাঁর সঙ্গে একমত—মণীন্দ্রনাথের ভাইএরাও তাই! বস্তুতঃ, এই পাঁঠাবলি নিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন ভারি করুণ ব্যাপার ঘটত।

মণীন্দ্রনাথ নিজে দেবীর পুজো করতেন—সুতরাং বলির সময় তাঁকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হত। হাড়িকাঠে অসহায় পশুর বলিদানের দৃশ্য তিনি মর্মান্তিক ব্যথা অনুভব করতেন—সারাদিন তাঁর চোখের জল আর শুকোত না।

আর একজন—অর্থাৎ শরৎচন্দ্র—পুজার দিন সকালে উঠে বাড়ী থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। সারাদিন এখানে-ওখানে কাটিয়ে বিকেল বেলা উঠান থেকে বলির রক্ত ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়ে গেলে তবে তিনি বাড়ীতে ঢুকতেন।

পুজোর ক'দিন আগেই এই নশ্বর জীবগুলি এ-বাড়ীতে আসত এবং উঠানের এক পাশে বাঁধা থাকত। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ভাগাভাগি করে এদের এই ক'দিনের দেখাশোনার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করত। কোথায় কচি সবুজ ঘাস হয়েছে খুঁজে খুঁজে তুলে এনে তারা এদের সযত্নে খাওয়াত, এদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করত। এদের প্রতি তাদের মমতার অন্ত থাকত না। পুজোর দিন সকালে যখন যে লোকটি বলি দিত সে এসে দু'টো বড় বড় খাঁড়া বার করে ধার দিতে বসত—তখন থেকেই ছেলেমেয়েদের মন ভীষণ খারাপ হয়ে যেত—নিরীহ পশুগুলির আদর যত্ন আরো বেড়ে যেত। তারপর, এক-একটি পশুকে স্নান করিয়ে এনে যূপকাষ্ঠে ফেলে যখন বলি দেওয়া হত তখন তাদের কান্না উথলে উঠত।

বলির ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী উৎসাহ ছিল দেবেন্দ্রনাথের। দেবেন্দ্রনাথ মণীন্দ্রনাথের জাঠতুতো ভাই—তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট।

মণীন্দ্রনাথ বলির সংখ্যা প্রথমে পাঁচটি থেকে কমিয়ে তিনটিতে আনলেন—তারপরে আনলেন একটিতে।

এই একটিতে এসে কিন্তু তাঁকে থামতে হল।

দেবেন্দ্রনাথের মা তাঁর ছেলের জন্যে প্রতি বছর দেবীর কাছে একটি করে পাঁঠা বলি দেবেন মানত করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মা'র এই মানতরক্ষার অনুরোধ জানালেন মণীন্দ্রনাথের কাছে।

মণীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন জ্যাঠাইমার সত্যরক্ষার কথা ভেবে এই একটি বলি আর তুলতে পারলেন না। শরৎচন্দ্র বললেন—দেবিনের ভয় এই বলিটা তুলে দিলেই সে মরে যাবে। আচ্ছা, দেবিন, তুমি কি চিরকাল বেঁচে থাকবে মনে কর? দেবেন্দ্রনাথ আর কি বলেন, নীরবে মাথা চুলকোতে লাগলেন।

অন্ন বা আশ্রয় প্রার্থী এসে এ বাড়ী থেকে কোনোদিন ফিরে যেত না, সদাব্রত লেগেই থাকত বারো মাস। সাধু-সন্ন্যাসীদের শুভাগমন ত' হত'ই, তা ছাড়াও আসত নানা রকমের লোক। যার যতদিন ইচ্ছে থাকত ও খেত এবং যাবার সময় দক্ষিণাস্বরূপ কেউ কাপড়, কেউ কম্বল, কেউ বা গাড়ীভাড়া নিয়ে যেত। অতিথিবৎসল মণীন্দ্রনাথের আমলে এই ধরণের অতিথিসেবা একটু বেশী পরিমাণে হ'ত। তাঁর সহধর্মিণী সময়ে সময়ে বিরক্ত হয়ে বলতেন—ভাগলপুর ষ্টেশনের কাছে নিশ্চয়ই কেউ আছে যে নতুন কোনো লোককে গাড়ী থেকে নামতে দেখলেই সোজা এই বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়, বলে—বাঙ্গালীটোলায় গঙ্গার ধারে গাঙ্গুলিদের বাড়ী চলে যা—সুখে থাকবি।

এমনি ভাবেই একদিন এক বৈষ্ণব যুবক এ বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন—নাম তাঁর রাসবিহারী দাস। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ তিনি ভাল কীর্তন গাইতে এবং খোল বাজাতে পারতেন। এই গুণের জোরেই তিনি মণীন্দ্রনাথের অনুগ্রহভাজন হয়ে এ বাড়ীতে আশ্রয় পেয়ে গেলেন। তাঁকে পেয়ে মণীন্দ্রনাথের কীর্তনের আসর আরো জমে উঠল।

কীর্তনের আসরে একজন নীরব শ্রোতা নিয়মিত এসে বসতেন তাঁর নাম লালবিহারী সিং। তিনি ছিলেন বিহারী কায়স্থ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলার। মণীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রমে তাঁর প্রগাঢ় হৃদ্যতা হয় এবং তিনিও গোবিন্দের একজন ভক্ত হয়ে ওঠেন। কীর্তনে তাঁর অনুরাগ সকলকে বিস্মিত করেছিল। মণীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সুরেন্দ্রনাথ নিত্য সকালে বাড়ীতে কীর্তনের ব্যবস্থা করেন। লালবিহারীবাবু প্রতিদিন এসে এই আসরে যোগ দিতেন। তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর বাড়ী ছিল এ বাড়ী থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি পালকি করে প্রতিদিন সকালে এ বাড়ীতে এসে উপস্থিত হতেন। পালকি এসে উঠোনে থামত, তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে এসে তাঁর জন্যে পাতা ইজিচেয়ারে শুয়ে কীর্তন শুনতেন। ক্রমে তিনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং পালকি থেকে বার হওয়ার শক্তি আর তাঁর রইল না। কিন্তু কীর্তন তাঁর শোনা চাই-ই, কাজেই তাঁর পালকি একেবারে ঘরের ভেতরে এনে নামানো হ'ত, তিনি পালকিতে শুয়ে শুয়েই কীর্তন শুনতেন। এর ক'দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সুরেন্দ্রনাথ বাড়ীর ছেলেদের নিয়ে গিয়ে তাঁর শবদাহস্থানে কীর্তন করেন।

মণীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে নবদ্বীপের রামদাসবাবাজীর সদলে ভাগলপুরে শুভাগমনের কথা আগেই বলেছি? কখনো কখনো তিনি প্রায় পক্ষকাল ভাগলপুরে থাকতেন এবং নামামৃত বিতরণ করতেন। ভাগলপুরের জনসাধারণের রামদাসবাবাজীর কীর্তন শোনার সৌভাগ্য তার আগে বা পরে আর হয়নি।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরও এ বাড়ীতে মাঝে মাঝে বসত। শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথের দাদা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ভাগলপুরের অধিবাসী ছিলেন।

তিনি ছিলেন সুরসিক, সুগায়ক ও সুলেখক। কার্যোপলক্ষ্যে তাঁকে ভাগলপুরের বাইরেই বেশীর ভাগ থাকতে হ'ত। মাঝে মাঝে তিনি ভাগলপুরে নিজের বাড়ীতে আসতেন, তখন এ বাড়ীতে তাঁর গান হ'ত। তিনি অপূর্ব্ব খেয়াল গান করতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লান্ত ভাবে গান গেয়ে যেতেন। তাঁর মুখে 'পিয়ালা মুঝে ভর দেরে, 'মুঠো মুঠো রাঙ্গা জবা' ইত্যাদি গান যারা শুনেছে তারা আজো তা ভুলতে পারেনি।

যোগীবাবু বলে এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে হঠাৎ এসে উপস্থিত হতেন এবং কয়েকদিন থেকে যেতেন। তিনি ছিলেন ভাল পাখোয়াজ বাদক। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গানের সঙ্গে যেদিন যোগীবাবুর পাখোয়াজ সঙ্গতের যোগাযোগ ঘটে যেত, সেদিনের সঙ্গীতের আসর এমন জমে উঠত যে রাত্রি দু'টো বেজে যেত সে আসর শেষ হতে।

১৯২১ সালে মণীন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যুতে এ বাড়ীর আলো যেন হঠাৎ নিবে গেল; বিমূঢ় হয়ে পড়লেন তাঁর ভায়েরা এই নিদারুণ বিপদে। অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পুজোও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। এত বড় দায়িত্বের ভার নেয় কে?

শরৎচন্দ্র লিখলেন—সুরেন, জগদ্ধাত্রী পুজো যেমন করে হোক করতেই হবে—ফেলে দেওয়া কিছুতেই চলবে না। তোমরা আছ—তোমাদের সঙ্গে আমিও আছি জেনো।

অতএব জগদ্ধাত্রী পুজো হল এবং শরৎচন্দ্র এসে পুজোয় যোগ দিলেন।

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা শুনেছে তাদের শরৎদা জগদ্ধাত্রী পুজোয় আসছেন, আনন্দ আর ধরে না তাদের!

বড়দের একজনকে তারা সাহস করে জিগ্যেস করে ফেললে—কবে আসছেন শরৎদা?

—কাল।

তখন থেকে তাদের একমাত্র চিন্তা হ'ল কাল কবে হবে।

তাদের চেয়ে তাদের শরৎদা বয়সে অনেক বড়; তাদের কাকা-জ্যাঠার বয়সী তিনি! তাঁদের সঙ্গেই তিনি গল্প করেন, খান-দান, বেড়াতে যান। তিনি নাকি বই লেখেন; সেই সব আলোচনা হয় বড়দের সঙ্গে। সকাল থেকে বাইরের ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল গল্প চলে, হাসির চোটে ঘর ফাটে, লোকজন আসে যায়, চা এর পর চা আর তামাকের পর তামাক চলে। তাঁর সঙ্গে আসে ভোলা চাকর; সে কেবল চা করে আর তামাক সাজে। বেলা একটা বেজে যায় দু'টো বেজে যায়, শরৎদার আর হুঁস হয় না গল্পই করে চলেছেন তিনি। বাড়ীর মেয়েরা হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে ওঠেন, রান্নাঘরের পাট চুকতে বেলা চারটে বেজে যায়।

রাত্তিরেও তাই। ডাকতে ডাকতে বাইরের ঘরের গল্প ছেড়ে যদিই বা খেতে এলেন সকলে—খেতে বসে গল্পের পর গল্প চলেছে, খাওয়া শেষ হতে এক ঘণ্টা লেগে যায়। এ বাড়ীর নিয়ম ছিল পুরুষরা এক সঙ্গে খেতে বসতেন, ছোট ছেলেরাও সেই দলে বসে যেত, মেয়েরা পরিবেশন করত। দিনের বেলা অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম হত—ছেলেরা আগে খেয়ে নিয়ে ইস্কুলে চলে যেত। রাত্তিরে কিন্তু তারা আগে খেতে রাজী হত না—একসঙ্গে খাবে বলে বসে থাকত তা সে যত রাতই হোক না কেন। ফলে অনেকদিন এমন হত যে বড়দের গল্প চলেছে আর ছোটরা পাতের সামনে বসে বসে ঢুলছে! একসঙ্গে খেতে বসে খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও বড়দের অনুমতি না নিয়ে উঠে যাওয়া নিয়ম ছিল না। অনেক সময় বড়রা এদের ঢুলতে দেখে বলতেন—তোমাদের খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকে ত উঠে পড়। এরা তখন উঠে পালাত।

রাত্তিরে সকলকে খাইয়ে নিজেরা খেয়ে, সব কাজ সেরে মেয়েরা যখন শুতে যেতেন তখন একটা বেজে যেত।

শরৎচন্দ্র এলে এ বাড়ীর সমস্ত নিয়ম-কানুন ওলট-পালট হয়ে যেত—বাড়ীতে যেন একটা হৈ হুল্লোড় পড়ে যেত!

এটি ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য—নিয়ম-কানুন না মেনে চলা!

বড়দের সঙ্গেই ছিল তাঁর মেশামেশি—তবু কেন এ বাড়ীর ছোটরা তাঁকে অত ভালবাসত? তাঁর আসার পথ চেয়ে দিন গুণত?

এ বাড়ীর বড়রা ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, ছোটরা তাঁদের ভয় করত—তাঁদের কাছে বেশী ঘেঁষত না। শরৎচন্দ্রের মধ্যে এ ধরণের গাম্ভীর্য্য ছিল না—ছিল এক অনাড়ম্বর স্বচ্ছ সরলতা। তিনি বয়সের ব্যবধান সরিয়ে দিয়ে, নিজের বড়ত্বের কথা ভুলে গিয়ে অতি সহজে ছোটদের সঙ্গে মিশে যেতেন—এক হয়ে যেতেন তাদের সঙ্গে। ভয় করবার কথা তাই ছোটদের কখনো মনে হত না।

হাওড়া থেকে যে ট্রেণে তিনি আসতেন সে ট্রেণ সে সময় ভোরবেলা ভাগলপুর ষ্টেশনে এসে পৌঁছত। যেদিন তাঁর আসবার কথা সেদিন খুব সকালে উঠে এ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বাইরের বাড়ীতে গিয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করত—বারে বারে রাস্তায় গিয়ে দেখে আসত—কখন তাঁর ঘোড়ার গাড়ী দেখা যাবে। দূরে তাঁর গাড়ী দেখলেই চেঁচামেচি পড়ে যেত—ঐ আসছেন শরৎদা! তাঁর গাড়ী চেনা যেত ভোলা চাকরকে দেখে—সে গাড়ীর ওপরে গাড়োয়ানের পাশে বসে আছে!

বাড়ীর সামনে পৌঁছে গাড়ী থেকে নেমে শরৎচন্দ্র সোজা চলে যেতেন গঙ্গার ধারে। সেখানে তখন ছটের মেলা বসেছে। রঙিন মাটির পুতুল, তিনকাঠি পাকাটির ফণাধরা কাগজের সাপ, ডুগডুগি, কাগজের বাঁশী, কটকটি ব্যাঙ ও আরো নানারকম খেলনা বিক্রি হচ্ছে সেখানে। ঘুরে ঘুরে দেখে দেখে একগাদা খেলনা কিনে শরৎচন্দ্র বাড়ীতে এসে ঢুকতেন এবং বিলি করে দিতেন সেগুলি ছেলেমেয়েদের মধ্যে। বাড়ীর ঝি-এর ছোট ছেলেটাও বাদ যেত না। [ক্রমশঃ

"হিন্দুদের মধ্যে আমি একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি তথাপি আমার জাতির গৌরব, আমার পূর্ব্বপুরুষের গৌরব আমি যথেষ্টই ক'রে থাকি। নিজেকে 'হিন্দু' বলতে আমার বুক ফুলে ওঠে। ধন্য আমি যে, তোমাদের অধম সেবকদের মধ্যে আমিও একজন। হে তত্ত্বজ্ঞানীদের বংশধরগণ, হে ঋষিদের বংশধরগণ! আমি ধন্য যে, আমি তোমাদের দেশবাসী, তোমাদেরই একজন। অতএব নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, নিজেকে পূর্ব্বপুরুষদের জন্য লজ্জিত না হয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে কর। আর একটি কথা, কখনও পরের অনুকরণ ক'রো না। যখনই পরের অনুকরণ করতে যাবে, তখন থেকেই তোমার স্বাধীনতা আর থাকবে না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আলবেয়ার কাম্যুর একটি বিখ্যাত গল্পে জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ এক বৃদ্ধের উল্লেখ আছে। তার একমাত্র কন্যা আত্মহত্যা করায় হতাশাগ্রস্ত বৃদ্ধটি আত্মঘাতী হবার উদ্দেশ্যে নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই নদীর তীরে দাঁড়িয়ে 'সে জীবনে প্রথম সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের শোভা দেখেছিল। বিশ্ব প্রকৃতির এই শাশ্বত সৌন্দর্যরূপ বৃদ্ধটিকে তার শোক ভুলিয়ে দিয়েছিল। আত্মহত্যা আর তার করা হয়নি।

জার্মাণীতে এসে রাইন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আমি একটি দেশের অতীত বেদনার ইতিহাসকে অবলীলায় ভুলতে পেরেছিলাম হিটলারের রাক্ষসী জার্মাণীকে। ভুলতে পেরেছিলাম যাট লক্ষ ইহুদীর যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠস্বরকে, ভুলতে পেরেছিলাম বিশ শতকের তৃতীয় দশকের সুরু থেকেই মানব সভ্যতার ইতিহাসকে কি নিদারুণ ভাবে কালিমালিপ্ত করেছে একটি দেশ।

ভুলতে পেরেছিলাম—কারণ রাইন নদীর তীরে তখন আমি নতুন সূর্যোদয় দেখেছি। দেখেছি কুজ্ঝটিকার অবগুণ্ঠন থেকে প্রকাশিত একটি জাতির সৌভাগ্যসূর্য জন্ম দিয়েছে একটি সোনালী সকালের! আর প্রভাতের আদিত্যবর্ণ সূর্যকে দেখে কেই বা মনে রাখে নিশীথ রাতের তিমিরাভিসার?

তাই বোধ হয় জার্মাণীর মানুষও মনে রাখে নি। ভুলতে পেরেছে বার্লিনের পতন, ভুলতে পেরেছে যুদ্ধ তার প্রিয়াকে হরণ করেছে, কেড়ে নিয়েছে ঘর-বাড়ি। ভুলতে পেরেছে একজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত গোটা জাতিকে করতে হয়েছে বুকের রুধির দিয়ে।

আজ জার্মাণীতে নবজীবনের জয়গান। অথচ গোটা দু'টো মহাযুদ্ধেই জয়লক্ষ্মী মুখ ফিরিয়েছেন জার্মাণী থেকে আর সে যুদ্ধের খেসারত দিতে হয়েছে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে নয়—পঁচাশি লক্ষ মানুষকে নিজের প্রাণ দিয়ে।

আর আর্থিক জীবনের অবক্ষয়? সে তো রাষ্ট্রিক, জীবনের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আসে অনিবার গতিতে! বন্যা যেমন নিয়ে আসে, অনাবৃষ্টি যেমন আনে আতপতাপের দহন জ্বালা।

—গত পঁচিশ বছরে দু' দু'বার জার্মাণীর মুদ্রার ও সঞ্চিত তহবিলের মূল্যমান হ্রাস পেয়েছে। অর্থনীতির পরিভাষায় যে সংকটটির নাম 'ডি-ভ্যালুয়েশন'।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নি যখন হল নির্বাপিত, তখন দেখা গেল ভস্মস্তূপের মাঝে অর্ধদগ্ধ জার্মাণীর আত্মা তখন কোনক্রমে প্রকাশ করে আছে আপন অস্তিত্ব। জীবনের স্পন্দন তৈলবিহীন স্তিমিত প্রদীপ শিখার মত। শতকরা যাট জন জার্মাণ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। বাকী চল্লিশ জন মানুষের জন্য দেশে তখন যা উৎপাদন তা দিয়ে প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে একটি স্যুট করতে গেলে লাগবে চল্লিশ বছর। এবং সবাইকে একটি করে শার্ট দিতে গেলে লাগবে বছর দশ।

দেখা গেল জার্মাণীর পঞ্চাশ লক্ষ বাড়ি বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত। তার অর্থ অন্তত দু'কোটি মানুষ গৃহহীন। আর শুধু কি গৃহ? যুদ্ধে শত্রুপক্ষের রাস্তাঘাট, সেতু, কারখানা ও দপ্তরগুলির ওপরই বোমারু বিমানের বৈমানিকের নজর যাবে বেশী। জার্মাণীতেও ছিল।

আজ শিল্প ও বাণিজ্যে জার্মাণীর স্থান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের পরেই। ইওরোপে যত কয়লা ও লোহা উৎপন্ন হয় এক জার্মাণীই তার মধ্যে এখন উৎপাদন করে শতকরা চুয়াল্ল ভাগ।

যে জার্মাণীতে কিছুদিন আগেও বেকারীর জ্বালা ছিল প্রবলতর আজ সেখানে কারখানায় কাজ আছে, কাজ করার মানুষ নেই। র‍্যাশনালাইজেশন তাই এখন জার্মাণীর কারখানাগুলির প্রধান নীতি। শুধু তাই নয় জার্মাণীতে রুজির সন্ধানে বিভিন্ন দেশের মানুষের আগমন আজও অব্যাহত, এর মধ্যে আছে ইতালিয়ান, ডাচ, অষ্ট্রীয়ান,—আর ভাগ্যান্বেষী ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের কাছে জার্মাণী তো আজ প্রবাদের দেশ।

আর গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্সের দিক দিয়ে জার্মাণী এখন ইওরোপের ঈর্ষ্যার পাত্র। কারণ ফ্রান্সে যেখানে এই বৃদ্ধির হার শতকরা ৮·৩, বৃটেনে ৭·৮, ইতালিতে ৭·২, সেখানে জার্মাণীতে শতকরা ১০·১।

আপনারাও তো এমনি ভাবেই যান পূর্ব বার্লিনে ?

অনেকে যায়। তার প্রধান কারণ পূর্ব বার্লিনের অপেরা ও থিয়েটারের টিকিট একটু সস্তা পড়ে। আর তাছাড়া ওদের ওখানে প্রায়ই ক্লাসিক্যাল নাটকগুলি হয়। এ বিষয়ে ওদের নামও আছে।

প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে দেখলাম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প্রোগ্রাম বিক্রি হচ্ছে। ঠিক আমাদের দেশের খবরের কাগজের হকারেরা যেমন সোচ্চারে খরিদ্দারকে আকর্ষণ করে। ইংলণ্ডের প্রেক্ষাগৃহে এমনটি কখনও চোখে পড়বে না।

অনেক রাত্তে ফিরলাম হোটেলে। তখন বার্লিনের রাজপথে জনস্রোত মন্দীভূত। হোটেলের কাউণ্টারে তখনও আলো জ্বলছে। ঘরের চাবিটা আমাদের এগিয়ে দিয়ে তরুণী রিশেপসানিষ্ট অধরে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন: গোটেন নখট। শুভরাত্রি।

বার্লিনে সেই বৃদ্ধা মহিলাটি আমাকে যা বলেছিলেন তা চিরদিনই মনে থাকবে।

তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এক প্রেক্ষাগৃহে। সেদিন এক বিখ্যাত জার্মাণ পিয়ানো বাদকের একক প্রোগ্রাম ছিল। বৃদ্ধাটি ভারতীয় দেখে আমার সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাপ করেছিলেন।

ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বৃদ্ধা বলেছিলেন: ক্রুশেভ সেজ উই ওয়াণ্ট ওয়ার। তুমি তো সাংবাদিক। দেশে ফিরে গিয়ে মানুষকে বোল—উই ওয়াণ্ট পিস। উই নো হোয়াট ওয়ার ইজ।

বৃদ্ধার এই কথাই আজ অধিকাংশ জার্মাণ বাসীর মনের কথা। তারা জানে যুদ্ধের অর্থ কী। এবং জানে বলেই কুরফুরস্টেনডামের কাইজার উইলহেম মেমোরিয়াল চার্চটিকে তারা আর নতুন করে গড়তে পারেনি।

পশ্চিম বার্লিন তার যুদ্ধের বীভৎস ক্ষতকে প্রায় ফেলেছে মুছে। চারিদিকে নতুন স্থাপত্য, নতুন দপ্তর, নতুন পথঘাট নতুনের এই চতুরঙ্গের মাঝে কাইজার মেমোরিয়াল চার্চের এই ভগ্নদশা চক্ষুকে পীড়িত করে।

প্রশ্ন করেছিলাম আমার গাইড মিসেস হিলারকে: কনট্রাষ্টটির অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম হল না।

—এই চার্চটিকে সারানো হয়নি ইচ্ছা করে। একে আমরা রেখে দিয়েছি যুদ্ধের ভয়াবহতার প্রতীক হিসাবে। আগামীকালের মানুষ দেখবে নতুন বার্লিনকে। সে বুঝতে পারবে না এই নতুন ইমারত গড়তে বুকের রক্ত দিয়ে কি নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তই না করতে হয়েছে আমাদের পূর্বসূরীদের।

বললাম: বুঝতে পারলাম। এই চার্চ জাতির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে প্রহরীর মত। যুদ্ধের ভয়ংকরী নেশা যদি কোনদিন তার রক্তে জ্বালা ধরায় তাহলে এই চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে তার হাত থেকে খসে পড়বে তলোয়ার। সে এক নিমেষে ফিরে পাবে আপন সম্বিৎ। ইতিহাসের দর্পণে সে প্রত্যক্ষ করবে আপন পরিণাম।

মিসেস হিলার বললেন: ঠিক তাই।

আমি বললাম: ইংলণ্ডেও ঠিক দেখে এসেছি এমন জিনিস কভেনট্রি শহরের নাৎসি বোমা বিধ্বস্ত চার্চটি তারা মেরামত করেনি লিখে রেখেছে ফাদার ফরগিভ দেম—দে নোইথ নট, হোয়াট দে ডুইথ

ইওরোপের সূর্যোদয়
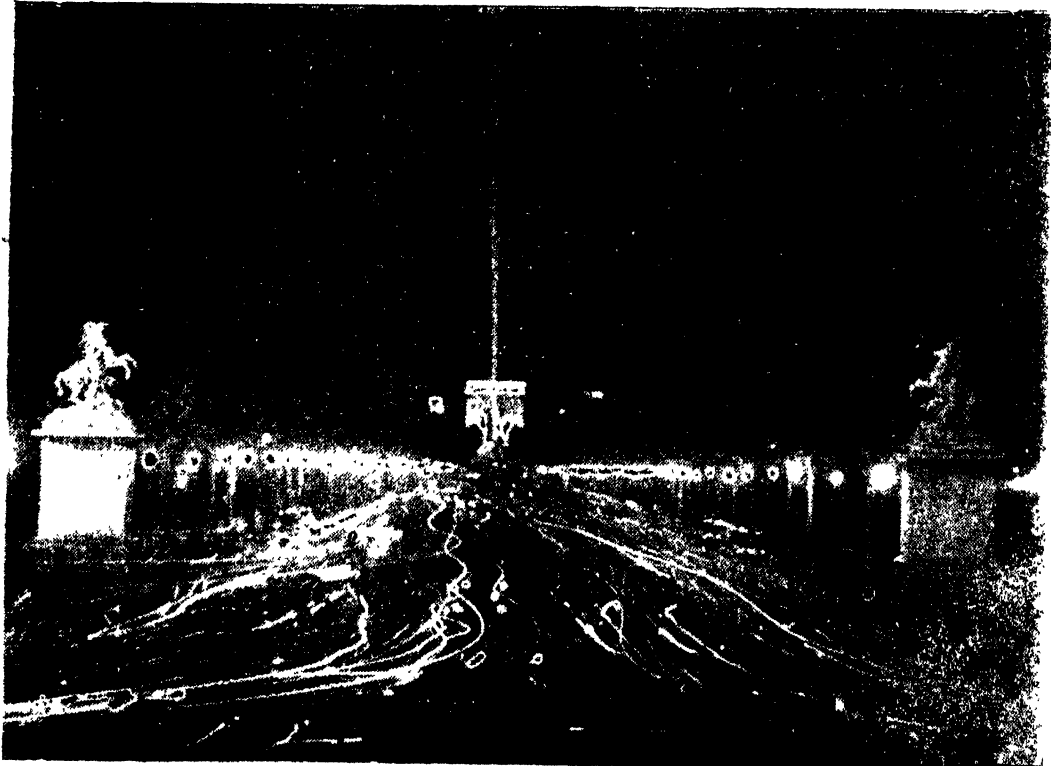
কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা নীরবতা ভঙ্গ করে একসময় আমিই বললাম: মিসেস হিলার। এক এক সময় মনে হয় এই যুদ্ধ বোধ হয় আপনাদের মঙ্গলই করেছে।

মিসেস হিলার বললেন: হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন?

বললাম: এর ফলে যাহা মরণীয় তাহা গেছে মরে। মৃত্যু হয়েছে জার্মাণীর সেই ঘৃণ্য ন্যাশনাল্সিজমের, যে দুর্ভাগ্য জাতির শিরে লেখা ছিল—মৃত্যুর সমুদ্রে অবগাহন করে তা ধুয়ে মুছে গেছে একাকার হয়ে। মিসেস হিলার, ভস্ম অপমান শয্যা ছেড়ে গোটা জাতি আবার জলদচি তনু গ্রহণ করেছে।

মিসেস হিলার বললেন: কিন্তু তার জন্যে দামটা বড় চড়া দিতে হয়েছে। আমার মনে হয় ইটস টু মাচ।

বললাম: দামটা যেখানে চড়া—বিনিময়ে যে জিনিসটা পাওয়া যায় তা খাঁটি। অনেকে যখন বলেন: রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আসেনি বলেই আমরা ভারতবাসীরা তার মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। তখন কথাটা নেহাৎ উড়িয়ে দেবার মত মনে হয় না। বিশ্বাস করি তার রাজনৈতিক মূল্য খুব বেশী না থাকলেও তার একটা মনস্তাত্বিক মূল্য আছে। এবং সেটা খুব কম নয়।

মিসেস হিলার বললেন: বক্তব্যটি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বললাম: তাহলে উদাহরণ দিয়ে বলতে হয়। আজ জার্মাণী অল্পদিনের ভেতরে এত বিস্ময়কর উন্নতি করল কি করে? এর পিছনে বিদেশের সাহায্য আছে সে কথা মানি। স্বদেশের অর্থনৈতিক কারণ আছে তাও মানি। কিন্তু সেটুকুই কি সব? আজ একজন জার্মাণ যখন ভাববে তাদের ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে তারই আত্মীয়স্বজনকে জীবন দিয়ে, তখন সে সতর্ক না হয়ে পারবে না। প্রতিটি পদক্ষেপে যখনই ভাববে জাতি হিসাবে আপন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক দুর্যোগময় রাত্রি তখন দিনের আলোর যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার সে করবেই।

মিসেস হিলার কিছু বললেন না। হয়ত একমত হলেন আমার ভাবনার সঙ্গে। হয়ত হলেন না।

শুধু বললেন: এই শহরের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে আমার জীবনের স্মৃতি আছে জড়িয়ে। সে স্মৃতি কখনও মধুর কখনও বিধুর।

আপনার জন্ম কি এখানেই? আমি প্রশ্ন করিলাম।

মিসেস হিলার বললেন: হ্যাঁ। এই শহরেই আমি প্রথম চোখ মেলে জার্মাণীর আকাশকে দেখেছি। তখন বার্লিন আজকের মত খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়নি। প্রায় সাড়ে তিনশ বর্গ মাইলের শহর। সারা জার্মাণীর রাজধানী।

আমি পড়তাম ফ্রেডারিক উইলহেম ইউনিভার্সিটিতে। সেটি আজ পূর্ব বার্লিনে। হেগেল আর হামবোল্ড এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

হেইনরিখ—আমার স্বামী তখন ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়ে এক ফার্মে ঢুকেছে। আমার পরীক্ষাটি হয়ে গেলেই আমাদের বিয়ে হবে এই ঠিক ছিল।

কিন্তু তারপরেই যুদ্ধ বেধে গেল। হিটলারের লোকেরা এসে হেইনরিখকে ধরে নিয়ে গেল। তাকে যুদ্ধে যেতে হবে।

আমার মনে আছে, তার আগের দিনও আমরা স্পে নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। যুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে। আমরা

প্যারিসে মুক্ত-অঙ্গন হোটেলের জনতা

সেদিন কোন কথা বলতে পারিনি। একটা অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কা কুয়াশার মত আমাদের চারিদিক ঘিরে ধরেছিল।

হেইনরিখ বলেছিল : যদি আমাকে যুদ্ধে যেতে হয়।

আমি বলেছিলাম : না, না, আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখব।

বলেছিলাম বটে। কিন্তু মনে মনে জেনেছিলাম হেইনরিখকে ছেড়ে দিতেই হবে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। প্রতিটি যুবককে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমার সাধ্য নেই আমি তাকে লুকিয়ে রাখি। আর কোথায়ই বা রাখব? চারিদিকে গুপ্ত পুলিশ।

হেইনরিখ বলেছিল : যদি না ফিরি।

ওর মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিয়ে বলেছিলাম : ও কথা বোল না।

কতক্ষণ আমরা বসেছিলাম জানি না। তবে আমরা সেদিন নদীর ধারে সূর্যাস্ত দেখেছিলাম। হেইনরিখ একগুচ্ছ হলুদ রঙের অসটার্ণ ফুল তুলে এনে আমায় দিয়েছিল। গোধূলি নেমে এসেছে। স্পেরলিঙ্গ আর নাইটিগাল পাখিরা বাসায় ফিরে আসছিল।

মিসেস হিলার চুপ করলেন।

আমাদের মোটর তখন জন ফষ্টার ড্যালেস স্থালে হয়ে স্প্রে নদীর ধারে এসে পড়েছে। সামনে প্রেসিডেন্টের আবাস কক্ষ। তার পাশে কংগ্রেস ভবন, যার কোল ঘেঁষে ভিক্টরি টাওয়ারের বিরাট শীর্ষ উঁকি দিচ্ছে আকাশে।

বিসমার্কের বিরাট মূর্তিটির সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম।

মিসেস হিলারকে জিজ্ঞাসা করলাম : তারপর?

: তারপর? সেদিন কিন্তু বুঝিনি যে তার পরের দিনই হেইনরিখকে চলে যেতে হবে। পরের দিন বিকেলে হেইনরিখের বাড়িতে যেতেই শুনলাম আজ সকালে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে নাকি সৈন্যরা। এত অতর্কিতে সমস্ত ঘটনাটি ঘটে গেছে যে কাউকে খবর পর্যন্ত দেওয়ার সময় পায়নি।

পাগলের মত চলে এসেছিলাম! এসেছিলাম স্প্রে নদীর ধারে একাকিনী। মনের ওপর একটা বিরাট পাষাণ যেন চেপে বসেছিল।

মাস কয়েক পরে হেইনরিখের চিঠি পেয়েছিলাম। ট্রেনিং শেষ করে সে ফ্রন্টে যাচ্ছে। সুদূর সোভিয়েত রাশিয়ায়।

তারপর বার্লিনের পতন হল। ১৯৪৫ সালের ২৬শে এপ্রিল ওডার নদী পেরিয়ে লাল ফৌজের দল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বার্লিনে। তাদের পিছনে এলব্ নদীর অপর পারে পশ্চিমী ফৌজেরা অপেক্ষা করছে।

তারপর যা সুরু হল তা না শোনাই ভাল। শুধু এইটুকু বলতে পারি হিটলারের বর্বরতার প্রতিশোধ রাশিয়ানরা নিয়েছিল নিরীহ বার্লিনবাসীর ওপর।

আমরা যারা এখনও বেঁচে আছি তাদের আশ্চর্য লাগে যখন স্মরণ করি সে দিনগুলির কথা। কি করে আমরা বেঁচে রইলাম?

১৯৪৫ সালের ২রা মে বার্লিন নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ করল।

আবার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম : মিঃ হিলারকে পেলেন কি করে?

মিসেস হিলার বললেন : আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। শুনেছিলাম স্টালিন গ্রাডে বন্দী হয়েছে হেইনরিখ। সাইবেরিয়ার বন্দী শিবিরে আছে। সেখান থেকে মুক্তি পাবে কোনদিনও ভাবিনি।

তবু মনের কোণে ক্ষীণ আশা ছিল যদি কোনদিন ফেরে। আমি অপেক্ষা করব সারা জীবন। তাই করেছিলাম। চাকরি নিলাম। সরকারী গাইডের চাকুরি। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। কাজের মাঝে ভুলে থাকব। পাঁচটা মানুষের সঙ্গে মিশতে পারব।

আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়নি। হেইনরিখকে পেলাম। বছর কয়েক আগে সে ফিরল। প্রথমে চিনতে পারিনি। তুমি দেখেছ ওকে? মাথার চুলে পাক ধরেছে। মনে হয় কত বয়স। আসলে ও মাত্র দু'বছরের সিনিয়র আমার চেয়ে।

কিন্তু সাইবেরিয়ার বন্দী শিবিরে ওর সেই রূপ আর স্বাস্থ্যকে সে গচ্ছিত রেখে এল। তবু তো ওকে আমি পেলাম। আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষা—

বিসমার্কের মূর্তির দিকে মিসেস হিলার তাকিয়ে রইলেন। ওপাশে হানজা কোয়ার্টার্স সূর্য কিরণে ঝলমল করছে। তার পাশে আকাদামি অব ফাইন আর্টস। অসংখ্য নতুন স্থাপত্যের সৌধ উঠেছে চতুর্দিকে। ফরাসী, আর্জেন্টাইন, ডেনিশ আধুনিক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যগুলির নিদর্শন।

এইমাত্র যুদ্ধের কথা বলছিলেন মিসেস হিলার। আমরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটি নাকি যুদ্ধের শ্মশান ভূমি। এই শ্মশানের ওপরেই উঠেছে নতুন সৃষ্টির ইমারত।

মানুষ নির্বোধ দস্যুর মত আবার কি আঘাত হানবে নতুন সৃষ্টির ওপর? অভিমানী ছেলের মত ভেঙে চুরমার করবে খেলাঘর?

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে মিসেস হিলার যাকে পেয়েছেন, তাকে কি আবার ছেড়ে যেতে হবে—রাত্রি যবে উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্র রবে?

অথবা জানি না মানব সভ্যতার সাধনা মিথ অফ সিসিফসের অভিশাপের মত কি না। নতুন সৃষ্টির বিরাট পাথরটিকে সে অতি কষ্টে বার বার তুলছে ঢালু পাহাড়টির ওপরে, কিন্তু বার বারই তা গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে।

তবু শাপমুক্তির দিন হয়ত আসবে। সেদিনের কলুষমুক্তির জন্যেই বোধ হয় বিগত দিনের এই কলুষতা।

আধুনিক সংবাদপত্রের কল্যাণে দু'টি শব্দের সঙ্গে পাঠক সাধারণের আজ বহুল পরিচয়। একটি শব্দ হল ক্রাইসিস, অপরটি হল প্রবলেম। একটি হল সংকট অপরটি হল সমস্যা।

বলা বাহুল্য সমস্যা বস্তুটি সংকটের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক। কারণ সংকট আসে সাময়িক ভাবে এবং তা থেকে পরিত্রাণের পথও প্রশস্ততর। কিন্তু সমস্যা জন্মগ্রহণ করে বিষাক্ত ক্ষতের মত এবং তার সমাধান দীর্ঘ সময়ের ফলশ্রুতি।

সুয়েজ সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেছে সহজেই, কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়ত কোনদিনই আর ঘটে উঠবে না।

তাই বার্লিনের ক্রাইসিস মিটে গেছে ১৯৪৫ সালেই। কিন্তু বার্লিন প্রবলেম নিয়ে বিশ্বপরিস্থিতি এখনও অগ্নিগর্ভ।

বার্লিনের বাইরের সৌষ্ঠব আর বৈভবের অন্তরালে তার অন্তরে নিদারুণ অশান্তির জ্বালা। বার্লিনকে তুলনা করা যেতে পারে কোন বৈভবশালী ধনীর সঙ্গে যে জড়িয়ে পড়েছে এক বিরাট মামলায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বার্লিন ছিল মিত্রপক্ষের কণ্ঠের মালা। মিত্রপক্ষের তিনজন হিস্যাদার আমেরিকা, বৃটেন রাশিয়া বার্লিনকে তিন টুকরো করে ভাগ করে নিয়েছিল নিজেদের মধ্যে। পরে ভাগীদার হয়েছিল ফ্রান্সও। চার অংশের দেখা শোনার ভার চার রাষ্ট্রের চারজন সামরিক শাসকের ওপর। এই চারজন মিলে গঠন করেছিল ইণ্টার অ্যালায়েড গভর্ণিং অথরিটি। বার্লিন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত হত এই চারটি শক্তির মতৈক্যের ওপর।

কিন্তু বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। কাজেই কানুর পীরিতির মত তা তিলে তিলে নতুন হোল না—বরং ফাটল ধরল।

১৯৪৬ সালের ২০শে অক্টোবর বৃহত্তর বার্লিনের পৌর নির্বাচন হল অনুষ্ঠিত। এই নির্বাচনে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটপার্টি শতকরা ৪৮.৭ ভোট পেয়ে অর্জন করল সংখ্যা গরিষ্ঠতা। কম্যুনিষ্টপার্টি সুবিধা করতে পারল না। ১৯৪৭ সালের ২৪শে জুন আর্ণষ্ট রয়টার বার্লিনের মেয়র নির্বাচিত হলেন।

কিন্তু অ্যালায়েড গভর্ণিং অথরিটির সোভিয়েত সদস্যরা বললেন: রয়টার হল একজন সোভিয়েত বিরোধী। এবং মেয়র হবার মত তার যোগ্যতা নেই।

একান্নবর্তী পরিবারে অশান্তির যেমন সৃষ্টি হয় বার্লিন নিয়ে হিস্যাদারদের মধ্যে অশান্তিটাও সে রকম। বড় ভাই সোভিয়েতের সঙ্গে বনছে না দেখে মেজ, সেজ ও ছোট ভাই বলল: আমরা আলাদা হয়ে যাব।

হলও তাই। বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স সেক্টরে ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন চালু হল। সোভিয়েত অধিকৃত বার্লিনে স্বতন্ত্র কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা হল। সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর অধিকৃত বার্লিনে আলাদা মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন হল। তবু এতদিন হাঁড়ি এক ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২০শে মার্চ হাঁড়িও আলাদা হয়ে গেল। বড় ভাইয়ের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। সোভিয়েত রাশিয়া অ্যালায়েড গভর্ণিং অথরিটির সদস্যপদ ত্যাগ করল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন চরমপত্র দিল তার পরেই। বার্লিনকে স্বাধীন নগরীতে পরিণত করতে হবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন আর ফ্রান্স—তোমাদের ফৌজ দূর হঠাও। তা না হলে—

তা না হলে বার্লিন অবরুদ্ধ হত। চারিদিকে পূর্ব জার্মাণী। মাঝে দ্বীপের মত বার্লিন। সমস্ত স্থলপথে রুশ ফৌজ থানা বসাল। খাদ্য সরবরাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ। অবরুদ্ধ বার্লিনবাসীকে অনাহারে মারবার প্রচেষ্টা।

দশ মাস ছিল বার্লিন অবরুদ্ধ নগরী। এই দশ মাস বিমানে করে খাদ্য সরবরাহ করেছে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী। বিশ লক্ষ টন খাদ্য এনেছে ’লক্ষ বারে।

ল্যাটিন কোয়ার্টার—প্যারিস

এরপর ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রসংঘে বার্লিন সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা হয়েছে। বার্লিনে যাতে অবাধ স্বাধীন নির্বাচন হতে পারে তার জন্ম প্রচেষ্টা। রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক দল এল বার্লিনে। কিন্তু তারা পূর্ব বার্লিনে যেতে পারল না। বাধা এল রাশিয়ার কাছ থেকে। সুতরাং সে প্রচেষ্টার হল অঙ্কুরেই বিনাশ।

১৯৫৩ সালে পূর্ব বার্লিনে সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান সুরু হয়েছে। সে অভ্যুত্থানের দলিল চিত্র আমি দেখেছি।

১৯৫৪ সালে আর একবার শেষবারের মত আলাপ-আলোচনার চেষ্টা হল। চতুঃশক্তি বৈঠক বসল বার্লিনের অচল অবস্থা অবসানের। কিন্তু জার্মাণ ফেডারাল রিপাবলিকের সরকার বৈঠক শেষে বিবৃতি দিলেন: এই বৈঠক সোভিয়েত যে পরিকল্পনা দাখিল করেছে তা ইওরোপের নিরাপত্তার পক্ষে আশংকার।

১৯৫৮ সালের ২৭শে নভেম্বর আবার সোভিয়েত রাশিয়া চরমপত্র দিল। এবার ষ্টালিন নন—ক্রুশ্চেভ। তিনি বললেন: ছ' মাসের মধ্যে বার্লিনকে মুক্তনগরী বলে ঘোষণা না করলে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব-বার্লিন সরকারের সঙ্গে এক পাক্ষিক চুক্তি করবে।

১৯৫৯ সালে ১১ই মে থেকে ২০শে জুন ও ১৩ই জুলাই থেকে ৫ই আগষ্ট জেনেভাতে আবার চতুঃশক্তি বৈঠক বসল। কিন্তু সে বৈঠকও হল ব্যর্থ। সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্রোমিয়োকো যে শান্তি চুক্তির খসড়া উত্থাপন করলেন মার্কিণ পররাষ্ট্রসচিবের তা পছন্দ হল না। বৈঠক ব্যর্থ হল। মার্কিণ পররাষ্ট্রসচিব তখন ছিলেন জন ফষ্টার ডালেস।

এরপরের বৈঠক আহুত হয়েছিল ১৯৬০ সালে প্যারিসে। সেটি শীর্ষ সম্মেলন। কিন্তু এই সম্মেলনেই ক্রুশ্চেভ ক্রুদ্ধস্বরে ঘোষণা করলেন: মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইউ, টু বিমান প্রেরণ করেছে রাশিয়ায়। উদ্দেশ্য গুপ্তচর বৃত্তি। সম্মেলন ভেঙে গিয়েছিল এক উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে।

বার্লিন সেনেটের এক সদস্যের মুখে সংকটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনেছিলাম এক সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রশ্ন করেছিলাম: বার্লিনকে মুক্তনগরী বলে ঘোষণা করতে আপনাদের বাধা কোথায়?

উত্তর হল: উভয় জার্মাণীর মিলন আগে সাধিত না হলে বার্লিনের মুক্তি আসতে পারে না। বার্লিনের অবস্থান পূর্ব-জার্মাণীর মধ্য ভাগে। পশ্চিম বার্লিন থেকে পশ্চিমী সৈন্যরা যদি চলে যায় তাহলে বার্লিনকে সোভিয়েত রাশিয়ার মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। পূর্ব-জার্মাণীর অংশে রাশিয়ার বাইশ হাজার সৈন্য বার্লিনকে ঘিরে বসে আছে।

যে মুহূর্তে পশ্চিম বার্লিন থেকে বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের ফৌজ সরে যাবে, সেই মুহূর্তে পশ্চিম বার্লিনের অধিবাসী রাশিয়ার কুক্ষিগত হয়ে পড়বে।

বার্লিন সমস্যার সহজ সমাধান কি?

অবাধ নির্বাচন। রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন মিলিয়ে আগে স্বাধীন নির্বাচন হোক, তারপরে বার্লিন মুক্তনগরী হবে।

রাশিয়া তা চায় না। কারণ তারা জানে অবাধ নির্বাচনের অর্থই কম্যুনিষ্ট প্রভুত্ব হারানো।

: পশ্চিম বার্লিনের সঙ্গে পশ্চিম জার্মাণীর সম্পর্ক কি?

: আইনত পশ্চিম বার্লিন পশ্চিম জার্মাণীর অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্যের মত। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে ফেডারেল সরকারের পশ্চিম বার্লিনের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। পশ্চিম বার্লিন বাইশ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পাঠায় বনের আইন সভায়। বন প্রতি বৎসর পশ্চিম বার্লিনকে যে আর্থিক সাহায্য করে তার পরিমাণ বছরে পাঁচ কোটি ডলার।

বার্লিন সমস্যার সমাধান এখনও সুদূর পরাহত যেমন সুদূর পরাহত কাশ্মীর সমস্যা সমাধান। কারণ যুদ্ধ নাকি আধুনিক কালে আর কামান বন্দুকে হয় না—হয় স্নায়ুতে স্নায়ুতে। আর স্নায়ু যুদ্ধই সকল যুদ্ধের চেয়ে লাভজনক। এতে কার্তুজ খরচ হয় না অথচ শত্রু নিধন হয়।

যুদ্ধ যারা চায় তাদের পক্ষে এ ধরণের সুযোগ ছাড়া সম্ভব নয়।

মহাযুদ্ধের কবলে মুমূর্ষু বার্লিনের অবস্থা আজও যদি হৃদয়ঙ্গম করতে চান, তা হলে আসতে হবে তাঁকে পূর্ব বার্লিনে। এই শহরে এসে মনে হবে যুদ্ধ শেষ হয়েছে যেন গত কাল রাত্রে।

মিসেস হিলার বিদায় নিলেন ব্রান্ডেনবুর্গ গেট থেকে। বললেন: পূর্ব বার্লিনে আমি যাই না। গেলে মন খারাপ হয়ে যায়। আপনারা যান দেখে আসুন।

আমাদের ট্যাক্সি চালক বেসরকারী লোক। ইংরাজী ভাষায় তার ব্যুৎপত্তি চলন সই।

সেদিনও পর্যন্ত পূর্ব বার্লিন আর পশ্চিমের অধিবাসীর মধ্যে উভয় অঞ্চলে অবাধ প্রবেশ অধিকার ছিল। শুধু দেখাতে হত পরিচয় পত্র। আজ এই গ্রন্থ রচনার কালে পূর্ব বার্লিন অবরুদ্ধ নগরী। দুই নগরের মাঝে উঠেছে দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

সেদিন পূবের মেয়ে আর পশ্চিমের ছেলে বাসরসজ্জা রচনা করত গ্রুনভালটের সবুজ অরণ্যে। পশ্চিমের স্পেরলিং পাখিরা এসে বসত পূবের একেজ্রেয়ে গাছে।

ব্রান্ডেনবুর্গ গেটে গাড়ি থামিয়ে চেক করল সীমান্তের পুলিশ। আমরা পাশপোর্ট দেখালাম। আবার মোটর ষ্টার্ট নিল।

আমাদের ট্যাক্সি চালক একজন ক্রুদ্ধ যুবক। তার ক্রোধ ক্রুশ্চেভ আর কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে।

বার্লিনে—বার্লিন কেন সারা পশ্চিম জার্মাণীতে যত লোকের সংস্পর্শে এসেছি সকলের মধ্যেই দেখেছি সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ। বিশেষ করে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় জার্মাণরা আজ অত্যধিক রকমের অসহিষ্ণু। তারা এ জন্য দায়ী করে ক্রুশ্চেভকে।

পূর্ব বার্লিনে দেখলাম শুধু ধ্বংসস্তূপ। এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পর যেন শহরে প্রবেশ করেছি।

পথে ঘাটে জনমানব আছে তবে কর্মব্যস্ত জনতা নেই। পথের দু'ধারে নেই পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনের সমারোহ।

ড্রাইভার বললে: এর কারণ পূর্ব জার্মাণীতে সব কিছুই রাষ্ট্রায়ত্ত। পূর্ণ প্রতিযোগিতা নেই, আছে ষ্টেট-মনোপলি। আর যেখানে প্রতিযোগিতা সেখানেই তো খরিদ্দারকে আকর্ষণের প্রশ্ন।

আলেকজাণ্ডার স্কোয়ারকে পিছনে ফেলে আমরা অগ্রসর হলাম ষ্ট্যালিন অ্যালের দিকে। ষ্ট্যালিন অ্যালে হল পূর্ব বার্লিনের

অক্সফোর্ড স্ট্রীট। না, জাঁকজমকের পারিপাট্যে নয়—প্রশস্ততায় আর সৌন্দর্যে।

ড্রাইভার বললঃ যুদ্ধের পর এই একটিমাত্র পথ পূর্ব জার্মাণ সরকার তৈরি করেছেন। রাস্তার একদিকে মস্কোর স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত নতুন প্রাসাদ সৌধ। একদিকে কার্ল মার্কস ষ্টোর্স। বেটি শহরের কেন্দ্রীয় সরকারী বিপণি। তার পাশেই যোশেফ ষ্ট্যালিনের বিরাট প্রস্তরমূর্তি।

শুনেছি আজ নাকি সেখান থেকে সেই বিরাট মূর্তি অপসারিত। ষ্ট্যালিন অ্যালের নামও মুছে ফেলে বসানো হয়েছে নতুন প্লেট—কার্ল মার্কস অ্যালে।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে পিতার আসনে বসি—পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে—মনে পড়ে গেল একটি বহু পঠিত কবিতার কয়েকটি লাইন।

মেইন ষ্টেশন সেন্টারের দ্যুতিও নিষ্প্রভ। ড্রাইভার বললঃ অবিভক্ত বার্লিনে এই ষ্টেশন দিয়ে যাতায়াত করত দৈনিক তিনশত ট্রেণ। কিন্তু মাত্র বাটটি ট্রেণ এখন আসে এই ষ্টেশনে।

কিন্তু মরুভূমির রুক্ষতার মাঝেও আছে মরুদ্যানের পেলবতা। যেমন কলকাতায় বড়বাজারের নরকপুরী অতিক্রম করে যদি কেউ আরও অগ্রসর হন, তাহলে তিনি পেতে পারেন বোটানিক্যাল গার্ডেনসের শ্যামলিমা।

বিধ্বস্ত প্রুশিয়ান লাইব্রেরী আর জীর্ণ হুমবোণ্ডট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে আরও বহুদূর অগ্রসর হবার পর আমরা এলাম ওয়ার মেমোরিয়াল গার্ডেনে।

অমর্ত্যলোকের কোন মানুষকে স্মরণের উদ্দেশ্যে আমি কখনও যাই নি চৈত্রের শালবনে। কিন্তু পূর্ব বার্লিনের এই নির্জনতম প্রদেশে এই শ্যামল অরণ্য শোভায় এসে আমি ভাবলামঃ যদি স্মরণ করতে হয় কাউকে, তাহলে তার পক্ষে এমন স্থানই প্রশস্ততর।

গত যুদ্ধে নাজি সৈন্যদের কবলে যারা প্রাণ দিয়েছে, এই বাগে তাদেরই স্মৃতিতে নির্মিত হয়েছে সৌধ।

মাদার রাশিয়া বিরাট প্রস্তরমূর্তি খোদিত আছে ওয়ার মেমোরিয়াল গার্ডেনে। মাতার ক্রোড়ে রোরুদ্যমানা জার্মাণ শিশু। তাঁকে তিনি আশ্রয় দিচ্ছেন পরম বাৎসল্যস্নেহে। যে মাতা মুক্তি এনেছেন পূর্ব জার্মাণীর মানুষের কাছে। সেই মাতার মুখে স্মিতহাস্য। বরাভয়।

আবার ফিরলাম ছায়াঘন পথ ধরে। দু'পাশে বিরাট বিরাট মহীরুহ শ্রেণী। দেখলাম কয়েক দল ছেলেমেয়ে শুকনো পাতা জড়ো করছে স্থানে স্থানে। তারপর তাতে দিচ্ছে আগুন। জীর্ণ পুরাতন পত্ররাজি পুড়ে যাচ্ছে নিঃশেষ হয়ে।

ড্রাইভার বললেঃ পূর্ব জার্মাণীর অফিস আদালতের সমস্ত কর্মচারীদেরই এমন বাধ্যতামূলক ভাবে সমাজসেবা করতে হয়।

পুরাতন শীর্ণ পাতার আগুন তখন দূর থেকে মনে হচ্ছে দাবানলের মত। [ক্রমশঃ।

কলহান্তরিতা

কুমারী চামেলী ভট্টাচার্য

সেই কোন্ রাতে
খোলা জানালাতে
টোকা দিয়ে গেছে হেসে
তোমার গলার সলজ্জ স্বর চুপে চুপে ফিরে এসে।

বঁধু, কি আর তোমারে বলি,
যাঁহার লাগিয়া নিশিদিন যামি—
সেই আমি,—
সেই আমারি রাঙ্গানো বাঁকা সিঁথিখানি
সেই আমারি সাজানো চরণ দু'খানি
আন্ বাড়ী যায় চলি;
বঁধু কি আর তোমারে বলি।

আয় লো স্মৃতি,
আয় লো দূতী,
ধরিস্ বঁধুর পায়,
তাহারে বলিস্ গাঙের তীরের স্মৃতি,
তাহারে শোনাস্ বকুলমালার গীতি,
তাহারে পুছিস্—'কী কথা হয়েছে না'য় ?'

অধরার প্রতি

প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

বসন্তের এই উতলা বাতাসে
তোমার স্বপ্নেই মন ভরে;
নক্ষত্রখচিত দূরের আকাশে থাকি চেয়ে
নির্জ্জন সন্ধ্যার শান্ত অবসরে।
তোমার আমার যাত্রাপথ
এক হয়ে যাবে মিলে কবে;
কবে যে আমার মন
তোমার মনের ঠিকানা খুঁজে পাবে।
তোমার যৌবন বসন্ত পল্লবের মত ওঠে কেঁপে
সবুজ অরণ্যে বুঝি উঠেছে ঝড় দূরে;
চৈতী হাওয়ায় লাগে দোলা
হৃদয়ের অতলান্ত গভীরে।
তবু তুমি থাকো সরে,—করো অস্পষ্ট আচরণ;
তোমার অস্তিত্ব ঘিরে যেন কুয়াশায় ধোঁয়াটে আবরণ॥

প্রশান্ত চৌধুরী

২৬

সোহাগীর দোতলার ঘরে উঠে শ্যামাঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সাগরের। সোহাগীর তক্তাপোষের ধারে একটা কাঠের টুলের ওপর বসে গল্প করছিল সে সোহাগীর সঙ্গে।

সোহাগী বলল,—এসো বাবা, এসো।

এমন সময়ে শ্যামাপদকে এখানে দেখে একটু আশ্চর্য লাগছিল সাগরের। বলল,—আরে! শ্যামাঠাকুর এমন অসময়ে এখানে যে? মন্দিরের ডিউটি নেই?

শ্যামাপদ আরেকটা টুল টেনে এনে সাগরের বসবার জায়গা করে দিতে দিতে বলল,—ছাঁটাই হয়ে গেছি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। লম্বা ছুটি জুটে গেছে এখন।

—হঠাৎ?

—মন্দিরের কর্তা বদল হয়ে গেল যে।

—কি রকম?

—চিৎপুরের ভেজাল-ঘিয়ের আড়ৎদার রামলাল পাণ্ডে পঞ্চাশ বছরের জন্যে লিজ নিয়ে নিয়েছে মন্দিরটা। সারিয়ে সুরিয়ে ভোল্ পাল্টিয়ে মন্দিরটাকে চটক্‌দার করে তুলবে ঠিক করেছে।

—তাই বুঝি তোমাকে সরিয়ে নতুন চটক্‌দার পুরুৎঠাকুরও রাখবে ঠিক করেছে ওরা?

—ঠিক তাই। রাখা হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

—তা' পুরোনো সবই যখন পাল্টাচ্ছে, তখন পুরোনো ঠাকুরটিকেও তো পাল্টালেই পারত।

সোহাগী শুয়ে শুয়ে শুনতে শুনতে শিউরে উঠে বলল,—মা গো মা, তাই আবার হয় নাকি?

শ্যামাপদ বলল,—প্রায় তাই-ই হচ্ছে কিন্তু। মায়ের রুপোর চোখের জায়গায় পেতলের যে চোখ আসছে, সেটা·····

সোহাগী চম্‌কে উঠে মাঝপথে বাধা দিয়ে বলল,—পেতল কি? সোনা বলো।

শ্যামাপদ বলল,—পেতলই? রামলাল পাণ্ডে নাকি বলেছে যে, দূর থেকে পেতল আর সোনার তফাৎটা বুঝতে পারছে কে? ঝুটমুট বাজে পয়সা খরচ করে লাভ কী?

সাগর গম্ভীর চালে বলল,—খাঁটি কথা।

সোহাগীর ভাল লাগল না কথাটা। বলল,—খাঁটি কথা কী গো বাছা? মায়ের সঙ্গে ফাঁকিবাজি? আর কেউ না বুঝুক, মা নিজে তো বুঝতে পারছেন সোনা বলে পেতল চালাবার ফাঁকিটা।

সাগর মুচকি হেসে বলল,—ফাঁকি কি শুধু ঐ সোনা আর পেতলে? তা' সে যাক গে ওসব কথা। তাহলে চাকরিটি তোমার গেল শ্যামাঠাকুর।

শ্যামাপদ বলল,—ভালই হল। অনেকদিন থেকেই মন্দির ছেড়ে পালাব—পালাব ভাবছিলুম; কিন্তু সাহস পাচ্ছিলুম না। মা এবার আমাকে নিজেই গলাধাক্কা দিয়ে তাড়ালেন।

সাগর বলল,—মা নয়, রামলাল পাণ্ডে। কিন্তু মুস্কিলে পড়লে তাহলে তো তুমি।

শ্যামাপদ উড়ন্ত একটা মশাকে হাতের চাপড়ে মারবার চেষ্টা করতে করতে বলল,—কিছু না, কিছু না। চিনেমাটির পুতুলের কারখানায় চাকরি জুটিয়ে নিয়েছি একটা। আসছে-মাস থেকে কাজে লাগব। যাওয়া-আসা একটু দূর হবে। তা' হোক। ভালই হয়েছে। সত্যিকারের মুস্কিল হবে মুরারিবাবুর।

সাগর বলল,—মুরারিবাবু মানে ঐ শনিঠাকুরের মন্দিরের সেই বাবুটি তো?

শ্যামাপদ এতক্ষণে মশাটাকে হাতের চাপড়ে মারতে পেরে খুশি-খুশি মুখে বলল,—হ্যাঁ, ঐ।

—কিন্তু শীতলামন্দিরের জাঁকজমক হলে শনি-মন্দিরের ভয়টা কী? মুদির দোকানের বাড়-বাড়ন্ত হলে স্যাকরা মুস্কিলে পড়তে যাবে কেন?

শ্যামাপদ বলল,—রামলাল পাণ্ডে যে শনিঠাকুরও আনছে মন্দিরে।

—সে কী?

—হ্যাঁ গো। মাঝখানে শনিঠাকুর, আর ডাইনে-বাঁয়ে শীতলা আর কালী।

—যাঃ চলে! মুরারিবাবু তো বেকায়দায় পড়বে তাহলে এবার।

শ্যামাপদ বলল,—মুরারিবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি তোমার?

সাগর বলল,—আরে সেইখান থেকেই তো আসছি এখন। তোমার কথাও শুনলুম সব সেখানে।

—আমার কথা!

—হ্যাঁ। ঐ যে, আমার দিদির বাড়িতে পেতলার-চন্নামেত্তর খাইয়ে দু'টাকা রোজ পেয়েও ছেড়ে দিলে তুমি,—শুনেছি সে সব কথা।

—তোমার দিদি?

—হ্যাঁ গো। কেন? আমার দিদি থাকতে নেই নাকি?

—মিসেস রায় তোমার দিদি?

—তাই তো জানতুম কাল অবধি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, কেউ ছিল না সে আমার।

সোহাগী কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করল শ্যামাপদকে,—মিসেস রায় আবার কে?

শ্যামাপদ হেঁট হয়ে সোহাগীর কানে কানে মিসেস রায়ের প্রকৃত পরিচয়টা ফিসফিসিয়ে জানিয়ে দিয়ে সাগরের দিকে ফিরে বলল,—উনি কী রকম দিদি হতেন তোমার?

সাগর নিজের মাথার চুল খাম্‌চাতে খাম্‌চাতে মুখখানাকে কেঁচ্‌কে বলল,—আরে দূর, দূর,, দিদি না ছাই! আমি তাকে দিদি বলে মনে করলে কি হবে, সে কি আমাকে ভাই বলে মনে করত ভেবেছ শ্যামাঠাকুর। ঐ মুখেই ভাই-ভাই করত, মনে মনে আমাকে মানুষ বলেই ভাবত না। তা না হলে এমন ব্যবহারটা করতে পারত আমার সঙ্গে?

—কী করল কী?

—আরে, একটা ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে রাস্তা-খোঁড়ার গর্তর মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল, আমি ধরে ফেলে সামলে দিয়েছিলুম। সেই হল গিয়ে প্রথম আলাপ। তা' ঠিকানা দিয়ে বললে বাড়িতে যেতে। গেলুম একদিন। এটা-ওটা খেতে দিয়ে বললে,—'তোমার দিদি আছে?' আমি বললুম,—না। তাই শুনে বললে,—'কি মজা দ্যাখো, তোমারও দিদি নেই যেমন, আমারও তেমনি ভাই নেই একটাও। তারপর আমি মিষ্টি-ফিষ্টি কিচ্ছু না খেয়ে চলে আসছিলুম ব'লে বললে,—'দিদির বাড়ি থেকে ভাইয়ের কি শুধু মুখে ফিরতে আছে নাকি?' আচ্ছা, তুমিই বলো শ্যামাঠাকুর এত সব কাণ্ডর পর আমি যদি তাকে সত্যিসত্যিই আমার দিদি বলে ভেবে থাকি, তাহলে সেটা অন্যায় হয়েছে কি?

—মোটেই না।

সাগর এবার শয্যাগতা সোহাগীকেও সাক্ষী মেনে বলে,—আপনি কি বলেন?

সোহাগী কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না। শ্যামাপদর কাছ থেকে অদেখা মিসেস রায়ের পরিচয় পাওয়ার পরেও এক্ষেত্রে কী তার বলা উচিত ভেবে না পেয়ে সোহাগী শুধু বলে, তাই তো।

সাগর বলল,—কিন্তু আমি দিদি বলে ভাবলে কি হবে, তিনি তো আমাকে জন্তু-জানোয়ার ভেবেছেন। তাই জন্যে নিজের বিপদের সময় আমাকে ডেকে একটা খবর পর্যন্ত না দিয়ে আরেকটা দুঃখী মেয়ের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে পালিয়ে গেলেন চুপিসাড়ে। কেন? কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে আধপেটা খেয়ে না থেকে আমার কাছে বুঝি থাকা চলত না তাঁর? ওরে বাবা, হতে পারি একটা মুখ্যু মিস্তিরি,—স্টোভ মেরামত করে খাই;—কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে তিনি যা খাচ্ছেন, তার চেয়ে অনেক ভাল খেতে-পরতে দেবার হিম্মৎ আছে আমার। যাক্ গে যাক্, মরুক সব, চুলোয় যাক, আমার কি? আমি ব্যাটা তো মানুষ নই, আমার কাছে মানুষ থাকবে কেন?

শ্যামাপদ বলল,—আহা, এত চটবার কি আছে? তিনি হয়ত লজ্জা পেয়েছেন। নিজের পরিচয়টার কথা ভেবে হয়ত তিনি ভেবেছেন যে,—

সাগর খেঁকিয়ে উঠে বলল,—কী? কী ভেবেছেন তিনি? আমি তাঁকে ঠাঁই দেব না? আমি ঘেন্না করব তাঁকে?

—এমন ভাবাটা কি খুব অসম্ভব?

—তার মানেই তো তিনি আমাকে জানোয়ার ভেবেছেন। ঠিক আছে, যা খুশি ভাবুন তিনি। আমি পরোয়া করি নাকি কিছু? আমার অমন যে মা, সেই মরে গেল, তবু আমি দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছি;—আর, তুই তো ভারি কে এক পাতানো দিদি একটা। তোর জন্যে কি আমি মন খারাপ করে বসে থাকতে যাব নাকি? দায় পড়েছে আমার! কচু!

মুখে কচু বললেও ডান হাতের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে যা বোঝাবার চেষ্টা করল সাগর,—সেটা কচু নয়, কলা। এবং কলা দেখিয়ে এমন একটা ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে বসল সাগর যে, মনে হল যেন, ওর সামনে এই মুহূর্তে মিসেস রায় এসে বসেছেন; আর, সাগর কিছুতেই তাঁর দিকে ফিরে তাকাবে না।

শ্যামাপদ বলল,—মিসেস রায়ের মনটা কিন্তু খুব উঁচুদরের ছিল গো সাগরবাবু। একটা পর মেয়েমানুষের জন্যে নিজের অতবড় ক্ষতি করতেও পেছপা হল না।

সাগর তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর দিল,—থাকুন তিনি তাঁর উঁচুদরের মন নিয়ে। আমার কি তাতে? তুমিও তো চন্নামেত্তর খাইয়ে টাকা রোজগারের অমন একটা সহজ উপায় হাতে পেয়েও দুম্ করে ছেড়ে দিয়ে উঁচুদরের মন নিয়ে বসে আছ এখানে গ্যাঁট হয়ে। তাতে আমার কী?—ঠিক আছে। থাকো, থাকো; থাকো সবাই উঁচু দরের মন নিয়ে। আমি ব্যাটা নিচুমনের জানোয়ার, আমাকে মনে পড়বে কেন কারুর? আচ্ছা, চলি আমি।

সাগর উঠেই পড়ল টুল ছেড়ে।

সোহাগী বলল,—ও কি বাবা? হুট্ করে এসে এমন ফট করে চলে গেলে চলে নাকি? আমার চাঁপা যদি শোনে যে, তুমি এসে চলে গেছ, অথচ একটু জলমিষ্টিও খেয়ে যাওনি, তাহলে আমাকে বকেঝকে একসা করবে।

বলেই সোহাগী গলা বাড়িয়ে হাঁক দিল,—ও চাঁপা, চাঁপা রে, এই দেখে যা কে এসেছে।

শ্যামাপদ বলল,—মেয়ে সাজগোজ করতে ঢুকেছে ওর নিজের খোপের মধ্যে। ওর ইস্কুলের এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন। তার ভাইপোর অন্নপ্রাশন। সকালবেলাতেই খাওয়া-দাওয়া।—তুমি বোসো একটু সাগরবাবু, আমি চট করে দু' মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি একটু।

সাগর বলল,—বুঝতে পেরেছি, খাবার আনতে যাচ্ছ। কিন্তু আমি তো—

সোহাগী বলল,—রোজ রোজ না বললে শুনব না কিন্তু। সেদিন কিচ্ছুটি মুখে না দিয়ে সেই যে চলে গেলে, বললে আরেকদিন এসে খাব। তা' এলে কিনা এতকাল বাদে। আজ কিছু মুখে না দিয়ে গেলে বিষম দুঃখ্যু হবে কিন্তু আমাদের।

সাগর বলল,—ঠিক আছে। কিন্তু আনবেই যদি খাবার তো দুটো তিলকুটো এনো শুধু শ্যামাঠাকুর; আর কিছু নয়। ঠানদির কাছে আজ আমার দুপুরবেলার খ্যাঁটের নেমন্তন্ন আছে। এখানে পেট ভরিয়ে সেখানে ফাঁকিতে পড়তে রাজি নই বাবা আমি।

শ্যামাপদ হেসে বলল,—বেশ, তাই হবে।

চলে গেল শ্যামাপদ।

সাগর অসুস্থা সোহাগীর সামনে একলা ব'সে কি করবে ভেবে না পেয়ে নিজের আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। আর, সোহাগী একদৃষ্টে অকপট সরল সেই জোওয়ান ছেলেটার লাজুক মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কতো আজগুবি অবাস্তব কল্পনারই না জাল বুনতে লাগল মনে মনে।

এক সময় সোহাগী বলল,—আচ্ছা, তোমার সেই দিদি যদি তোমাকে ডাকতেন, তা হলে তাঁকে তুমি কোথায় রাখতে?

সাগর বলল,—কোথায় আবার কি? আমার বাসায়। ভাই রইল কালীঘাটে, আর দিদি রইল কোন্নগর,—এ আবার হয় নাকি?

শুনে বুকের ভেতরটায় আনন্দে আর কান্নাতে মিশে কেমন যেন করতে লাগল সোহাগীর। চোখের কোণায় জল ভরে এল। নিশ্বাস দ্রুত হল। সোহাগীর মনে হল, এই মুহূর্তে চিৎকার ক'রে বলে,—ওগো ছেলে, এতই যদি উদার তোমার মন, এতই যদি বুকের পাটা, তা হলে দয়া করে আমার ঐ মেয়েটাকে নাও তুমি। ঠাই দাও তোমার ঘরে। সারাজীবনের হাজার লাঞ্ছনার পর একটু নিশ্চিন্তে মরতে দাও আমাকে।

কিন্তু তাই কি বলা যায়? তাই কি বলা যায় অমন করে?

তাই সোহাগী শুধু বলল,—মেয়েটার ভাবনাতে ঘুম আসে না চোখে। কেবল ভাবি···

বলতে বলতে চাঁপা এসে ঢুকল ঘরে। আর, ঢুকেই সাগরকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

সোহাগী বলল,—দেখেছিস কে এসেছে?

চাঁপা এতক্ষণে বলল,—কতক্ষণ এসেছেন?

সাগর বলল,—তা অনেকক্ষণই হবে। কতো গল্পগুজব করলুম তোমার মা আর বাবার সঙ্গে। কিন্তু কাণ্ড ছাখো তোমার বাবার। দু'খানা তিলকুটো আনতে গিয়ে বুড়ো হয়ে গেলেন একেবারে।

সোহাগী বলল,—ঠানদির শরীর কেমন আছে?

সাগর বলল,—ওর শরীরের আবার ভালমন্দ আছে নাকি? মন্দ হলেও বলবে কাউকে? কেবল লুকোবে।

চাঁপা বলল,—আপনি কিন্তু আগের চেয়ে একটু রোগা হয়েছেন বোধ হয়।

সাগর হাত নেড়ে বলল,—চশমা নাও গে যাও চোখে। দু'মাসে তিন পাউণ্ড ওজন বেড়েছে,—বলে কি না রোগা হয়েছেন! কই, গুলটা একবার টিপে ছাখো দিকিনি দেখি।

সাগর টুল ছেড়ে উঠে হাতের মাসল ফুলিয়ে দাঁড়াল শক্ত হয়ে।

চাঁপা দূর থেকেই বলল,—খুব ভাল।

সাগর বলল,—ও দেখে বললে হবে না। দেখে কী বুঝবে? হাত দিয়ে টিপে ছাখো, তবে না?

চাঁপা ইতস্তত করছিল, সোহাগী বলল,—আহা, বলছে যখন ছাখই না বাপু। সাগর তো আর পর নয় আমাদের।

চাঁপা এগিয়ে গেল এবার। এগিয়ে গিয়ে নিজের নরম আঙুল দিয়ে সাগরের হাতের শক্ত মাসল টিপতে টিপতে বলল,—বাব্বা! লোহার মতন শক্ত।

সাগর বলল,—উঁহু লোহা নয়। লোহায় মরচে ধরে। এ হল গিয়ে ইস্পাত।

বলেই ফট করে নিজের গায়ের জামাটা খুলে ফেলে সাগর খোলা গায়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বুকের পিঠের হাতের পেটের কাঁধের পায়ের মাসল দেখাতে লাগল একটার পর একটা।

সাগরের এ-চেহারা এর আগেও দেখেছে চাঁপা। সেই প্রথম যেদিন আলাপ হয়েছিল, সেইদিনই দেখেছে নিজের খুপরি ঘরের ফোকরের ফাঁক দিয়ে। কিন্তু সে হল দূর থেকে দেখা! আজ কাছ থেকে সাগরের চেহারার বাঁধুনি দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে রইল চাঁপা একদৃষ্টে।

সাগর গর্বভরে বলল,—কী ? দেখতে পাচ্ছো ?

চাঁপা মুচকি হেসে বলল,—এত মাসল নিয়েও তো টিংচার আইডিন লাগাতে ভয় পান।

সাগর সোহাগীর দিকে ফিরে তার সমর্থন আদায়ের চেষ্টা ক'রে ছেলেমানুষী সুরে বলল,—জ্বালা করে যে !

হেসে ফেলল সোহাগী অতবড় জোওয়ান ছেলেটার ছেলেমানুষী দেখে।

সাগর মন-মরা হয়ে গিয়ে বলল,—আপনিও হাসছেন ? আপনিও ? কিন্তু এটা জানবেন যে, শুধু ঐ টিংচার আইডিন ছাড়া এ-দুনিয়ার আর কিচ্ছুকে কেয়ার করি না আমি।

এবারে হাসির পালা চাঁপার। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল সে সাগরের রকম-সকম দেখে।

সেই মুহূর্তে শ্যামাপদ খাবারের ঠোঙা নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল,—কী ব্যাপার ? এত হাসির ধুম কিসের ?

সাগর বলল,—হাসি-রোগে ধরেছে ওদের। তাই হাসছে শুধু শুধু। তিলকুটো এনেছো ?

শ্যামাপদ বলল,—আরে, সেই কতদূর গিয়ে আনতে হল তবে। আজকালকার ময়রারা তিলকুটো বানাতে চায় না চট ক'রে। অনেক খুঁজে-পেতে তবে জোগাড় করে এনেছি। নাও, ধরো।

সোহাগী শয্যা থেকে মাথা উঁচিয়ে বলল,—ওমা ও কী ? একটা রেকাবি নিয়ে আয় চাঁপা।

সাগর শালপাতার ঠোঙা থেকে খপ করে দু'খানা তিলকুটো তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে বলল,—কিছু না, কিছু না ;—এ যথেষ্ট হয়েছে। শুধু এক গেলাস জল এনে দিলেই হবে।

চাঁপা তাড়াতাড়ি জল আনতে গেল।

সোহাগী শ্যামাপদর দিকে ফিরে বলল,—তোমাকে কাজ করতে হবে কিন্তু একটা।

—কি কাজ ?

—চাঁপাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে তার বন্ধুর বাড়িতে। সুবলসখা তার হাপোর সারাতে মুচিপাড়ায় গেছে।

শ্যামাপদ ইতস্তত করতে করতে বলেই ফেলল,—সাগরবাবু একটা উপকার করে দাও না।

—উপকার ?

—হ্যাঁ। তুমি তো ফিরবেই এখনি ঠানদির দোকানে ?

—হুঁ। দেরী হয়ে গেছে অনেক।

তা' ফেরার পথে চাঁপাটাকে একটু পৌঁছে দিও না ওর বন্ধুর বাড়িতে। একটু ঘুর-পথ হবে অবিশ্যি তোমার। কিন্তু খুব বেশি দেরি হয়ে যাবে না তাতে।

চাঁপা ততক্ষণে জলের গ্লাস নিয়ে হাজির হয়ে গেছে। সাগর চাঁপার দিকে তাকিয়ে জলের গ্লাসটা তুলে নিতে নিতে বলল,—আমি ?

শ্যামাপদ বলল,—কেন ? কষ্ট হবে খুব ?

সাগর গ্লাসের জলটাকে খেয়ে নিয়ে বলল,—না, কষ্ট নয়। তবে কথা হচ্ছে কি—

সোহাগী বলে উঠল ;—তবে আর কোনো কথা নেই। তুমিই বাবা পৌঁছে দাও মেয়েটাকে। তারপর ও'বেলা ওর বাপ গিয়ে নিয়ে আসবে ওকে।

বাধ্য হয়েই রাজি হতে হল সাগরকে।

একটু পরেই বেরিয়ে পড়ল ওরা।

শ্যামাপদ ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিজের মনেই বলে উঠল,—ভারি সুন্দর ছেলেটা। না ?

সোহাগী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—চাঁপার জন্তে অমনি একটা ছেলেকে যদি পেতুম গো।

শ্যামাপদ আরো বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বলল,—হুঁ।

সাগর আর চাঁপা ততক্ষণে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে।

সারাটা পথে এতক্ষণেও কথা বলেনি কেউ কারুর সঙ্গে। বেলা বেড়ে গেছে। রাস্তায় মানুষের চলাচল কম হয়েছে অনেকটা। বাসনওলা তার কাঁসার কাঁসিতে ঠং ঠং করে কাঠের ঘা মারতে মারতে চলেছে দু'পাশের বাড়ির দোতলার জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে,—যদি কেউ ডাক দেয়। শ্রীরামপুরের তাঁতের শাড়িওলা তার সাড়ে ছ'টাকা দামের লোভনীয় শাড়ির কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে করতে চলেছে হেঁটে —এই সময়টায় বাড়ির মেয়ে-খদ্দেরদের কাছে কাপড় বেচবার আশা। এই সব ফেরিওয়ালা ছাড়া পথে তখন সাধারণ পথিকের সংখ্যা খুবই কম।

সাগর আর চাঁপা চলেছে পাশাপাশি।

হঠাৎ কুসুমবুড়িকে দেখতে পেল চাঁপা। দূর থেকে আসছে এদিকেই। হাতে সব্জি-বাজারের বেদের দোকান থেকে কেনা কী সব গাছগাছালির শেকড়-বাকড়।

কুসুমবুড়িকে দেখতে পেয়েই ঘেন্নায় আর রাগে গা রী-রী করতে লাগল চাঁপার। সেদিন রাত্রের সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে গেল তার। সেই আধেক রাতে ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ানো, সেই খাঁদুর কান্না, সেই কুসুমবুড়ির টাকা কুড়িয়ে নেওয়া,—সব কিছু।

ডাইনে-বাঁয়ে কোনো একটা গলি থাকলে চাঁপা এই মুহূর্তে নির্ঘাৎ ঢুকে যেত সেই গলির মধ্যে ; যাতে কুসুমবুড়ির সামনাসামনি আসতে না হয় তাকে। কিন্তু সে পথ বন্ধ। ডালপালাহীন গাছের মতন রাস্তাটা সিধে চলে গেছে সামনের দিকে। আর, সেই সামনের দিক থেকে কুসুমবুড়ি আসছে।

কুসুমবুড়িকে শুধু ঘেন্নাই করে না চাঁপা, সেই সঙ্গে ভয়ও করে যথেষ্ট। মুখের আগল নেই ওর। চাঁপাকে দেখতে পেলেই যা-তা কথা বলে, নোংরা রসিকতা করে, অসভ্য ইঙ্গিত করে।

অন্তদিনের চেয়ে আজকে চাঁপার আরো বেশি ভয় করতে লাগল। কারণ, সাগর নামের ঐ স্বল্পপরিচিত ভদ্রলোকটা রয়েছে সঙ্গে। কুসুমবুড়ি কিছু বললে কী ভাববেন ঐ লোকটি ? ছি-ছি-ছি, লজ্জায় একেবারে মাথা কাটা যাবে তখন যে চাঁপার।

ঘৃণায়, রাগে, ভয়ে, আতঙ্কে চাঁপার মাথাটা দপদপ করতে লাগল। সমস্ত শরীরটায় কেমন একটা দুঃসহ অস্বস্তি হতে লাগল তার।

ততক্ষণ কুসুমবুড়ি আর চাঁপা দু'জনে দু'দিক থেকে দু'জনের কাছাকাছি এসে পড়েছে অনেকটা।

চাঁপার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়তে লাগল। ছোট্ট কপালে আর নাকের ডগায় ঘামের ফোঁটা ফুটে উঠতে লাগল।

কুসুমবুড়ি চোখ নাচিয়ে বলল—কী লা সেজেগুজে হেলেদুলে কোথায় ?

চাপা সাড়া দিল না।

—কী লা, আজ বড় ঠ্যাকার দেখছি যে।

চাপা তবু সাড়া দিল না। এগিয়ে চলল।

এবার একেবারে সামনা-সামনি মুখোমুখি হয়েছে চাপা আর কুসুম। আর, যেই মুখোমুখি হয়েছে, অমনি খপ করে কুসুম হাত চেপে ধরেছে চাপার।

—বলি, এত গুমোর কিসের ?

—ছেড়ে দাও আমাকে। আঃ!

—বলি, চলেছিস কোথায় দিদি ?

—তুমি আমার হাত ধরেছ কেন ? কিসের সম্পর্ক আমার তোমার সঙ্গে ?

সাগর একটু তফাতে গিয়ে ছায়ার তলায় দাঁড়িয়েছে।

কুসুম এবার হেসে ঢলে ঢং করে বলল, মরি মরি মরি রে, কী সম্পর্কো গড়ি রে! এই গরভে তোর মাকে ধরেছিলুম যে রে।

—আমার হাত ছাড়ো। তুমি জানোয়ার, তুমি ডাইনী, তুমি ইতর। হাত ছাড়ো আগে।

—বলি এত তেজ কিসের ? পয়সাওলা নতুন আরেকটা বাপ জোগাড় হয়েছে বুঝি ?

আর সহ্য হল না চাপার। যে-হাতটা খোলা ছিল তার, সেই হাতে সজোরে এক চড় মেরে বসল কুসুমবুড়ির গালে। কুসুমবুড়ি থেবড়ি খেয়ে বসে পড়ল রাস্তার ওপর। ছড়িয়ে পড়ল তার হাতের শেকড়-বাকড়।

সেই মুহূর্তে সাগর ছুটে এসে দাঁড়াল কাছে। চাপা বলল,—চলুন। ও একটা পাগলী; ভারি জ্বালাতন করছিল।

চলতে লাগল ওরা আবার।

সাগরের মুখে কথা নেই তখনও একটি।

আর চাপার বুকের মধ্যে তখন কত কিসের তোলপাড় চলছে!

২৭

বন্ধুর বাড়িতে চাপাকে ছেড়ে দিয়ে সাগর চলে গেছে ঠানদির দোকানে। কাজের বাড়ির নানা আমোদ-আহ্লাদ হটগোলের মধ্যে চাপার মন থেকে কুসুমবুড়ির ব্যাপারটার বোঝা নেমে গেছে কোন্ ফাঁকে। চাপা সে কথা ভুলে গিয়ে মেতে উঠেছে বন্ধুরবাড়ির হৈ হল্লায়।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাড়ির স্বল্প আয়োজন হলেও অন্নপ্রাশনের ব্যাপার আর খাওয়া দাওয়া চুকতে দুপুর গড়িয়ে গেল। চাপার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ সবাই।

···আহা, কী সুন্দর মেয়ে। এক দিনেই ঘরের মেয়ে হয়ে গিয়ে কী খাটুনিটাই খাটলে ছাখো। যে-ঘরে যাবে, আলো করবে সে ঘর। ···মুখের হাসি-হাসি ভাবটি দেখেছ মেয়ের? ভারি সুন্দর। ···রঙ ফর্সা না হলে হবে কি, কেমন ভাসা-ভাসা চোখ দু'টি দেখেছ ? আর, চোখের পাতাগুলো কেমন বড় বড়!···

চাপার বন্ধু সুধা চাপাকে ডেকে বলল, আয় চাপা, মেজদার
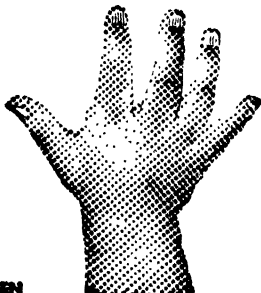
ছাতের ঘরে গিয়ে বসি দু'জনে একটু। বিকেলে কলের জল এলে তখন গা ধোওয়ার জন্তে নিচে নামা যাবেখন।

ছাতের ঘরটা ছোট্ট। মাথায় টালির ছাত। ছোট্ট একটা তক্তাপোষ পাতা আছে ঘরের একধারে। অন্তধারে রথের মেলায় রাস্তার ফুটপাথ থেকে কেনা কাঁঠাল কাঠের টেবিল-চেয়ার। টেবিলে অনেক বই। তক্তাপোষেও কিছু বই ছড়ানো।

সুধা তক্তাপোষের বইগুলো গোছা করে তুলে মেঝেয় নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল,—নে চাঁপা, বালিশটায় মাথা দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে নে একটু।

চাঁপা বলল,—তোর মেজদা কলেজে পড়েন বুঝি?

সুধা বলল,—হ্যাঁ। কলেজ টিমের ভলিবলের ক্যাপ্টেন। ঐ যে ফটো রয়েছে টিমের। যার পায়ের সামনে বল; ঐ আমার দাদা। দেখেছিস তো আজকে।

চাঁপা ফটোর দিকে দেখতে দেখতে বলল,—ঠিক লক্ষ্য করিনি।

সুধা এগিয়ে এসে চিবুক ধরল চাঁপার। নাড়া দিয়ে বলল, লক্ষ্য করোনি? আড়ে-আড়ে তাকাচ্ছিলি খালি খালি, দেখিনি বুঝি আমি?

চাঁপা বলল,—ধ্যাৎ মিথ্যে কথা।

—সত্যি দেখিসনি?

—সত্যি না।

—ওমা! কী শুকনো মেয়ে রে তুই! আমার মেজদার মুখ দেখেও মজিস্ নি? তাহলে তোর কপালে অনেক দুঃখ্যু আছে।

—একটা কেলে মোটা বিটকেল্ বর এসে জুটবে তোর কপালে।

—কেন?

—তোর তো চোখ বলে নেই কিছু। মন বলে নেই কিছু। যা-তা একটার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেবে তোকে।

—ইস্! দিলেই হল!

আয় শুয়ে শুয়ে গল্প করি দু'জনে।

সুধার মেজদার ছোট্ট তক্তাপোষখানিতে একটিমাত্র বালিসে মাথা দিয়ে ঘেঁবাঘেঁষি হয়ে শুয়ে পড়ল দু'জনে।

সুধা বলল,—তোর বিয়ের কথা হচ্ছে চাঁপা?

—দূর।

—আমার কিন্তু হচ্ছে।

—সত্যি?

—সত্যি। আচ্ছা, কী রকম বর আর কী রকম শ্বশুরবাড়ি হলে তুই খুশি হ'স্ রে চাঁপা?

—কিছু ভাবিনি আমি।

—ইস্ রে!

—সত্যি বলছি।

—গা ছুঁয়ে বল আমার।

—এই তো। এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি আমি।

—ধন্যি মেয়ে বাবা তুই। আমি কিন্তু ভেবেছি ভাই। আমার শ্বশুরবাড়িটা হবে ছোটখাটো। মোজাইকের মেঝে। গোল একটা বারান্দা। একটা ফুলওলা লতানে গাছ ছাতের পাঁচিল থেকে রাস্তা অবধি নামবে। গ্যারেজে গাড়ি থাকবে একটা। লটপটে কানওলা একটা বাহারি কুকুর। বাড়ির সামনে ছোট্ট বাগান মতন। সাদা রঙের টেলিফোন থাকবে একটা।

বলতে বলতে একটু থেমে সুধা বলল,—কী রে? সাড়াশব্দ দিচ্ছিস না যে? ভাবছিস কোথা থেকে আসবে এসব? ভাবছিস, অমন ঘরে বিয়ে দেবার সাধ্যি কি আমার বাবার;—এই তো?

—না, না, কিছুই ভাবিনি!

—নিশ্চয়ই ভেবেছিস তুই। কিন্তু তুই বুঝি বায়োস্কোপ সিনেমা দেখিস না তেমন?

—একটাও দেখিনি।

—তাই তোর এমন অবস্থা। বায়োস্কোপ যদি দেখতিস তা হলে আর ওসব কথা ভাবতিস না। আমার চেয়েও কত গরীবের মেয়েকে বিয়ে করে সেখানে বড়লোকের ছেলেরা। জানিস, সে সব ছেলেরা কী সুন্দর। কেমন সুন্দর তাদের বাড়ি। কত ভাল ভাল দামী দামী খাবার ফেলে-ছড়িয়ে খায় তারা। তাদের রান্নাঘরটা আমাদের শোবার ঘরের চেয়েও সাজানো। ওদের বৌকে নিজের গাড়িতে পাশে বসিয়ে ওরা যখন-তখন ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াতে যায়।

বলতে বলতে থামল সুধা। মাথার ওপরকার টালি বসানো ঢালু ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে কল্পনায় নিয়ে গিয়ে বসাল সিনেমার নায়িকার আসনে। মনে মনে কত শাড়ি আর কত গয়নায় সাজাল নিজেকে। রেফ্রিজারেটর থেকে মনে মনে কত রকমারী খাবার বের করে সাজাল টেবিলের ওপর, খাবার-টেবিলের ফুলদানীতে রজনীগন্ধার ষ্টিক সাজাতে সাজাতে মনে মনে কত গানই না গাইল সে।

তারপর হঠাৎ বলল,—আমার খু-উ-ব গান শেখবার ইচ্ছে ছিল; জানিস চাঁপা। কিন্তু হারমোনিয়মের অনেক দাম কি না। মেজদা বলেছে, চাকরি একটা পেলেই হারমোনিয়ম কিনে দেবে।

এর আগে চাঁপা সত্যিই তেমন করে ভাবেনি কোনোদিন নিজের বিয়ের কথা। আজ কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করল তার কেমন। সুধার কথাগুলো শুনতে শুনতে সেও মনে মনে ভাবতে লাগল তার শ্বশুরবাড়ির কথা।

আচ্ছা, কেমন হবে সে-বাড়িটা?

যে-বাড়িটায় তারা থাকে, তেমনি?

হ্যাঁ, তাহলেও চলবে চাঁপার। শুধু তার চারপাশে যেন মোষের খাটাল, আর রাত-জাগা বস্তিটা না থাকে। আর? আর কি থাকবে?

গেরস্থ সংসার বলতে সুধাদের এই সংসারটা ছাড়া আর কিছুই তো দেখবার সৌভাগ্য হয়নি তার জীবনে। তাই সুধাদের সংসারের ছবিটাই বার বার ভেসে উঠতে লাগল তার মনের সামনে।

নিজেকে সুধার বড়বৌদির জায়গায় মনে মনে বসিয়ে দিয়ে চাঁপা ভাবতে লাগল,—সেই তো বেশ। সেই তো যথেষ্টরও বেশি! ছোট্ট রান্নাঘরটি, ঝকঝকে কাঁসার বাসন, কাঠের পিঁড়ি। শ্বশুরের দাঁত নেই মুখে,—পানটি ছেঁচে দিতে হয়। শাশুড়ি যখন যেখানে বসবেন, পিক্‌দানীটাকে মনে করে সেইখানে এগিয়ে দিতে হয়। ছোট দেওরের ফুটবলের ব্লাডার ফেঁসে গেলে, সেটা সারাবার পয়সাটা আঁচল থেকে খুলে লুকিয়ে দিতে হয়। নিজের শখের শাড়িটা জোর করে পরিয়ে দিতে হয় আইবুড়ো ননদকে। আর, সংসারের সমস্ত ঝক্কাট ঘাড়ে নিয়েও হাসতে জানতে হয়। রঙীন সুতো দিয়ে নিজের হাতে বোনা ছবি দিয়ে ঘর সাজাতে হয়। রথের মেলা

মেলাতে কেনা মাটির পুতুল দিয়ে তাক সাজাতে হয়। তালপাতার হাতপাখার ছেঁড়া শাড়ির রঙীন পাড় দিয়ে ঝালর লাগাতে হয়। কাজকর্মের দিনে শত ব্যস্ততার মধ্যেও বাসন-মাজার পুরোনো বুড়িকে তার বাসন আনতে বোলে দু-তিনজনের মতন খাবার-দাবার গুছিয়ে দিতে হয় মনে ক'রে।

আর, স্বামী? সে কেমন? সে কেমন হলে খুশি হয় চাঁপা?

চাঁপার মনের তরল ছড়ানো ভাবনাটা গুটিয়ে ঘনীভূত হবার আগেই সুধা বলল,—তোকে আমার পিসিমার খুব পছন্দ হয়েছে; জানিস চাঁপা। মাকে বলছিল,—আগে যদি মেয়েটাকে দেখতে পেতুম, তাহলে আমার রবির বৌ করতুম ওকে।

—ধ্যাৎ। অসভ্য কোথাকার।

—সত্যি। রবি কে জানিস?

—কে?

আমার পিসতুত দাদা। বৌদিটা নাকি ভাল হয়নি মোটেই। রবিদাকে নিয়ে আলাদা হতে চায়।—এক কাজ করবি চাঁপা?

—কী?

—তুই আমার মেজবৌদি হবি।

—কী অসভ্য।

—সত্যি হ' না রে।

—আমি চলে যাচ্ছি ঘর থেকে।

সুধা বলল,—আচ্ছা বাবা আচ্ছা, বলব না আর কিছু; শো তুই চুপচাপ।

এই সময় নিচের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়।

সুধা বলে,—মানদাবুড়ি এলেন।

—ঝি?

—হুঁ। এককালে কি ছিলেন জানিস?

—কি?

সুধা চাঁপার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে জানায় এককালে কী ছিল মানদাদাসী। শুনে কেমন যেন অস্বস্তি হতে থাকে চাঁপার।

সুধা বলে—মেয়ে না কি এখন মায়ের ব্যবসা নিয়েছে। খুব না কি পয়সা। বুড়িমাকে দিয়েছে তাড়িয়ে। বুড়ি এখন বাসন মেজে দিন চালাচ্ছে তাই।

চাঁপা বলে,—ওসব কথা থাক।

সুধা বলে,—ওদের কথা জানতে আমার খুব ইচ্ছে করে। তোর করে না?

চাঁপা চুপ ক'রে থাকে।

সুধা বলে,—ওদের ছেলে হলে না কি ভিখিরিদের কাছে বেচে দেয়। আর মেয়ে হলে নিজের কাছে রাখে। আচ্ছা ওদের মনগুলো কেমন ভাই? ওদের দুঃখুগুলো কেমন? সুখগুলো কেমন?

সঙ্গে সঙ্গে চাঁপার মনে পড়ে যায় খাঁদুকে। আহা, সে এখন কেমন আছে কে জানে?

সুধা বলে,—আমার বাবাকে আমি চিনি, তোর বাবাকে তুই চিনিস,—কিন্তু কে যে ওদের বাবা তা' ওরা কেউ জানতে পায় না। কী অদ্ভুত না?

চাঁপার কানের কাছে অমনি বাজতে থাকে কুসুমবুড়ির খনখনে গলার স্বর,—তোর বাপ কে রে? তোর বাপ কে রে? তোর বা কে রে?

চাঁপা বলে,—আমি বাড়ি যাই এবার সুধা। কাউকে দি একটা রিক্সা ডাকিয়ে দে, তাহলেই আমি একলা চলে যেতে পারব।

সুধা বলে,—ইস্! এক্ষুণি যেতে দিচ্ছি না কি তোমায়? গা-টা ধুয়ে বিকেলের চা খেয়ে তবে যাবে। তা ছাড়া, আমার হাত থেকে যদিই বা ছাড়া পাও, মা বৌদি পিসিমা এদের হাত থেকে ছাড়া পা না কি তুমি এখনি? সন্ধ্যের আগে কেউ তোমায় ছাড়বে না, দেখো।

একটুক্ষণ পরেই ছাতের ঘরের বাইরে থেকে সুধার বৌদির গলা পাওয়া যায়,—একবার বাইরে এসো তো ঠাকুরঝি।

সুধা বলে,—তুমি এসো না গো বৌদি। ঘরে তোমার ভাসুর নেই কেউ। শুধু আমি আর চাঁপা গো।

তবু বাইরে থেকেই ডাকে বৌদি,—তুমি একবার বাইরে এসো ঠাকুরঝি।

অগত্যা বাইরে বেরিয়ে যায় সুধা। শুধু বাইরে নয়, সিঁড়ি দিয়ে বৌদির সঙ্গে নেমেও যায় নিচে।

চাঁপা চুপচাপ একলা বসে থাকে সুধার মেজদার তক্তাপোষের ওপর।

কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে সুধা। ওর চোখ মুখ কেমন শুকনো দেখায়। যেন এরই মধ্যে একটা ওলোট-পালোট হয়ে গেছে তার মনের মধ্যে। ঘরে ঢুকেও কিছুক্ষণ সুধা যেন তাকাতে পারে না চাঁপার দিকে। তারপর অতি কষ্টে আড়ষ্টতা কাটিয়ে শুধু বলে,—চাঁপা, বাড়ি ফিরে যা-রে তুই।

চাঁপা বলে,—কেন রে সুধা? কী হয়েছে? কারুর শরীর খারাপ?

—না, তা নয়।

—তবে?

—কিছু না। এমনি। তুই বাড়ি চলে যা।

—কী হয়েছে বল্ তো তুই সুধা? তোকে বলতেই হবে।

—না, চাঁপা, না। শুনিসনি তুই। শুধু তুই বাড়ি চলে যা এখুনি।

বলতে বলতে গলা ধরে আসে সুধার। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দাঁড়ায় সে মাথা নিচু ক'রে।

চাঁপা পিছন থেকে দু'টো কাঁধ চেপে ধরে সুধার। বলে,—তা হবে না, তোকে বলতেই হবে সুধা। না শুনে আমি যাব না।

সুধা অতি কষ্টে কান্না চেপে বলে,—কুসুম ব'লে এক ঝিয়ের নাতনী তুই?

চাঁপা বলল,—কে বলেছে? কে?

—ঐ মানদা দাসী। কুসুমের সঙ্গে ওর নাকি অনেক দিনের জানা-শোনা। তোদের পাড়ারই কোন্ বস্তিতে থাকে।

সুধার কাঁধ থেকে হাত দুটো খসে পড়ল চাঁপার। একসঙ্গে একশো'টা ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল ওর মাথার মধ্যে। ভেতর থেকে কিসের ঠেলায় ওর সমস্ত শরীরটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে ছিটকে পড়তে চাইল।

টলতে টলতে নেমে গেল চাঁপা সিঁড়ি দিয়ে।

আর, সুধা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

অজিতকৃষ্ণ বসু

অনেকখানি জায়গা জোড়া বিরাট বাড়ি এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তিরের। চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এ পাঁচিল পুরোনো আমলের অর্থাৎ বাতাসী বিবির আমলের। যখন এ বাড়ির মালিক ছিল বাতাসী বিবি, আর নাম ছিল "বাতাসী মঞ্জিল।" নামটা খোদাই করা ছিল বাড়ির গেটে মোটা থামের বুকে। থামের বুকে সে নাম এখন লুপ্ত, তার বদলে অন্য কোনো নাম বসানো হয় নি, কিন্তু বাড়ির একটা নাম তবু আছে লোকের মুখে মুখে। সে নাম: "এ্যাটর্নী-বাড়ি।"

নিমাই মিত্তিরের বয়স কিছুদিন হল সত্তর পেরিয়েছে। এ্যাটর্নীগিরি থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি। বংশানুক্রমিক এ্যাটর্নীগিরি। এখন করেন তাঁর ছেলে কানাই মিত্তির। এক কালে বাবা নিমাইয়ের কাছ থেকে মাঝে মাঝে এ্যাটর্নীগিরি সংক্রান্ত পরামর্শ নিতেন ছেলে কানাই; এখন আর তা দরকার হয় না পাকা এ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের। তবু নিমাই মিত্তির পাড়ার লোকের কাছে এখনো 'এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির,' এ্যাটর্নী-বাড়ির মালিক। ভৃত্যেরা এবং তৎস্থানীয়রা তাঁকে বলে "বড়বাবু"। কানাই মিত্তিরকে "ছোটবাবু"। এই ছোটত্বে কোনো ক্ষোভ নেই এ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের।

এ্যাটর্নী বাড়ির একটি গ্যারেজে দু'টি গাড়ি। নিমাই মিত্তিরের সবুজ ক্যাডিল্যাক। আর কানাই মিত্তিরের মেরুন-রঙা প্যাকার্ড। গাড়ির সারথিও দু'জন। নিমাই মিত্তিরের "ড্রাইভার," আর কানাই মিত্তিরের 'শোফার'। নাম যথাক্রমে ব্রজরাজ এবং মতিরঞ্জন। গেটের কাছাকাছিই যেখানে এ্যাটর্নী-বাড়ির মোটর গ্যারেজ, ঠিক সেখানেই ছিল পুরোনো আমলে বাতাসী-মঞ্জিলের ঘোড়া-গাড়ির বিরাম-ঘর আর ঘোড়ার আস্তাবল।

এ্যাটর্নী-বাড়ির গেটের প্রায় মুখোমুখি, রাস্তার ওধারে বুড়ো সুলতান মিয়ার 'আদি ও অকৃত্রিম' অম্বুরী তামাকের দোকান। দোকান প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন সুলতান মিয়ার ... তামাক-জগতের প্রাতঃস্মরণীয় দিকপাল ইকবাল আলি। সেই থেকে বংশানুক্রমে এ দোকান সমঝদার সৌখীন মহলে সুগন্ধিত অম্বুরী তামাক জুগিয়ে আসছে। সুলতান মিয়ার অন্যতম সেরা খদ্দের এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির, যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সুলতান মিয়া।

এই সুলতান মিয়ার মুখেই শুনেছিলাম বাতাসী বিবির কাহিনী, তার বহু পুরোনো স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে। বাতাসী বিবিকে শেষ যখন দেখেছিল, তখন সবেমাত্র কৈশোরের দিকে পা বাড়িয়েছে সুলতান মিয়া; আর বাতাসী বিবি তখন বাতাসী-মঞ্জিলের চার দেয়াল ঘেরা রহস্যের মহারাজ্যে মহারাণী, অনেক কিংবদন্তী তার নামের সঙ্গে জড়ানো। সারা দেশ জোড়া গোপন কারবারের বিরাট দল, তারই অধিনায়িকা বাতাসী বিবি। কিন্তু তখন সুলতান মিয়া ছিল বালকমাত্র, আর অল্পদিন মাত্র সঙ্গ পেয়েছিল বাতাসী বিবির। ঐটুকু বয়সে ঐ অল্পকালের ভেতর বাতাসী বিবির কতটুকু দেখেছে, কতটুকু জেনেছে-শুনেছে, আর কতটুকুই বা বুঝতে পেরেছে সে? যেটুকু ধরা পড়েছিল সেই কিশোর সুলতানের চোখে আর মনে, সে আর বাতাসী বিবির আসল ছবির কতটুকু? বাতাসী বিবি সম্বন্ধে শুধু সেইটুকু জানা তো যথেষ্ট নয়।

ঠিক এই প্রশ্ন, এই সংশয় জেগেছিল সুলতান মিয়ার মনেও। তাই বাতাসী বিবির কথা তার সীমাবদ্ধ সাধ্য অনুযায়ী শুনিয়ে আমাকে বলেছিল "বাতাসী বিবির কথা কিছুই বলা হলো না, বাবু-সাহেব। অমন তাড়াহুড়ো করে বলবার জিনিষ নয়। তা'ছাড়া আমি জানি বা কতটুকু? এ্যাটর্নী নেমাই মিত্তির মশায়ের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনতে পারেন—অনেক কিছু, যা আমি জানিনে।"

এবং সুলতান মিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির অতি অমায়িক, সজ্জন ব্যক্তি, অমন ভদ্রলোক দেখা যায় না; সুতরাং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এবং আলাপে কোনোরকম অসুবিধা

হবে, যেচে আলাপ করার বা বেশী কথা কওয়ার তেনার অভ্যেস নেই। কিন্তু আপনারা যাঁদের 'মাই-ডিয়ার' লোক বলেন, বাবু সাহেব, উনি ঠিক সেই দলের মানুষ।"

আমি বলেছিলাম "কিন্তু আমার সঙ্গে যে ওঁর আলাপ নেই, সুলতান মিয়া, আর ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবারও কেউ নেই।"

"আমি একদিন আপমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি, বাবু সাহেব।" বলেছিল অম্বুরী তামাকের দোকানদার সুলতান মিয়া। "কিন্তু তার চেয়ে বরং আপনি নিজেই ফোনে কথা কয়ে দিন-ক্ষণ ঠিক করে একদিম চলে যান। ফোনে বলবেন আমার কথা, বাতাসী বিবির কথা। দেখবেন কত খুশী হবেন উনি। আমাকে তো উনি মেহেরবাণী করে খুবই খাতির করেন। আর বাতাসী বিবিকে খুবই খাতির করতেন তেনার বাবা এ্যাটুর্নী নটবর মিত্তির; বাতাসী বিবি ওনার মক্কেল ছিল কি না।"

সুলতান মিয়ার কথা মতো ফোন করেছিলাম সাক্ষাতের অভিলাষ জানিয়ে। অমায়িক জবাব পেয়েছিলাম, "চলে আসুন যে কোনো সন্ধ্যাবেলা। বিকেলের পর আমি বাইরে কোথাও থাকি না। না পেয়ে ফিরে যাবার ভয় নেই। এলে খুশী হবো।"

"তাহলে আজই সন্ধ্যায় যেতে চাই।"

"চলে আসুন। গেটে দারোয়ানকে বললেই আপনাকে আমার কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে।"

ব্যবস্থা নয়, দারোয়ান নিজেই আমাকে পরম সমাদরে সঙ্গে করে নিয়ে পৌঁছে দিল অবসর-গৃহীত এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তিরের কাছে। গৃহের অভ্যন্তরে নয়, পুকুরের ধারে বাঁধানো ঘাটে সোফায় বসে গড়গড়ায় অম্বুরী তামাকের ধূমপান করছিলেন এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির। স্নানের ঘাট, শ্বেতপাথরে বাঁধানো, শ্বেতপাথরে তৈরি সারি সারি সিঁড়ি ধীরে ধীরে নেমে গেছে জলের ভেতর; চাঁদ হাসছে আকাশে আর পুকুরের বুকে। জলের কাছাকাছি একটা সাদা সিঁড়ির ওপর জলের দিকে তাকিয়ে বসে আছে একটি মধ্যবয়সী লোক, সে নিমাই মিত্তিরের ভৃত্য অথবা ভৃত্যস্থানীয় বলেই মনে হলো। নিমাই মিত্তিরের মুখোমুখি আরেকখানি সোফা অনধিকৃত রয়েছে। বুঝতে দেরী হলো না ওটা আমারই জন্ত। ঐ সোফাটার দিকে দেখিয়ে নিমাই মিত্তির বললেন: "বসুন ধনপতিবাবু। আপনারই প্রতীক্ষা করছিলাম।"

বসলাম। বললাম "আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো। আমাকে 'বাবু' আর 'আপনি' বলার প্রয়োজন নেই।"

"আছে।" বললেন নিমাই মিত্তির। কণ্ঠস্বর এবং বলার ভঙ্গিতে অমায়িক নম্রতা এবং আদেশের বিস্ময়কর সংমিশ্রণ। প্রতিবাদ নিষ্ফল।

"আপনার ফোন পেয়ে আমি চমকে উঠেছিলাম, ধনপতিবাবু।" বলতে লাগলেন নিমাই মিত্তির। "বাতাসী বিবির কথা জানবার জন্তে আমার সঙ্গে যোগাযোগ আপনিই প্রথম করলেন। আর কারও কৌতূহল এতদূর পর্যন্ত এগোয় নি।"

বললাম "হয়তো আমারও এগোতো না, যদি না সুলতান মিয়ার মুখে শুনতাম বাতাসী বিবির কাহিনী আর আপনার কথা। শুনেই মনে মনে ঠিক করলাম—

তর্জনীর ইসারায় আমাকে রুখে দিয়ে নিমাই মিত্তির বলে "আপনি ঠিক করলেন? আপনি?"

'আপনি' শব্দটার ওপর তিনি এমন ভাবে জোর দিলেন (ঠিকটা যে আমিই করেছি, স্বাধীনভাবে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দে নন।

বললাম "আমার ব্যাপার আমি ঠিক না করলে কে কর বলুন?"

এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির বললেন "দেয়ার ইজ এ ডিভিনিটি দ্যা শেপস আওয়ার এণ্ডস··মানে একটা ঐশ্বরিক শক্তি আমাদে নিয়তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, আমরা যাই ভাবি বা করি না কেন।"

শেক্সপীয়ারের 'হ্যামলেট' নাটক থেকে শ্লোক উদ্ধৃত ক শোনাচ্ছেন এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির। ভারি অদ্ভুত লাগল এ্যাটর্নীর মুখ থেকে শেক্সপীয়ার শুনবার আশা করি নি। এ কাছাকাছি আমি আগে কোনোদিন এ্যাটর্নী দেখিনি, অ এ্যাটর্নীদের সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী শুনে শুনে এ্যাটর্নী জাতটা ওপরই মনের ভেতর কেমন একটা বিতৃষ্ণা এবং আধা ভীতির ভ এসেছিল। নিজের মনটাকে যে নিমাই মিত্তিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকা রাজি করাতে পেরেছিলাম তার কারণ তিনি ভূতপূর্ব এ্যাটর্নী, সুলতা মিয়ার কাছে নিশ্চিত জেনেছিলাম নিমাই মিত্তির অতি অমায়ি ভদ্রলোক, আমি তাঁর মক্কেল হতে বা বিষয়-আশয় সংক্রান্ত কোনোরক পরামর্শ নিতে যাচ্ছি না, এবং বাতাসী বিবি সম্বন্ধে সুলতান মিয় মুখে একটুখানি শুনে আরো অনেকটা জানবার অপরিসীম কৌতূহল আমার ধারণা ছিল এ্যাটর্নীরা অতি জটিল এবং কুটিল (এবং ধুরন্ধর বিষয়ী মানুষ, যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য মক্কেলদের সম্পত্তি রক্ষার ভ করে ধীরে ধীরে তা গ্রাস করে ফেলা; ভাবতাম 'সাহিত্য-টাহিত্য' ধার এঁরা ধারেন না।

"সামথিং মোর পাওয়ারফুল দ্যান ইউ থিঙ্ক হ্যাজ সেণ্ট ইউ হিয়ার বুঝলেন, ধনপতিবাবু?" বললেন নিমাই মিত্তির, গড়গড়ার নলে মুখটা নিজের মুখ থেকে নামিয়ে। "আপনাকে যে এখানে আমা কাছে টেনে এনেছে তা আপনার খেয়াল-খুশি নয়। তার চে অনেক, অনে—ক বড় শক্তি। আপনাকে আসতেই হতো। আমি কিছুদিন ধরে আপনারই প্রতীক্ষায় ছিলাম।"

আবার চমকে উঠলাম। বললাম "সে কি? আপনি আমা চিনতেন নাকি?"

নিমাই মিত্তির একটু হেসে বললেন "কোনো কালে নয়। সজ্ঞানে কোনোদিন আপনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পড়বার কথা নয়।"

অথচ আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন কিছুদিন ধরে।

"তাড়া আছে?" শুধালেন নিমাই মিত্তির।

"কিসের?"

"চলে যাবার। মানে, মনটা যদি কেবল উঠি-উঠি করে, তাহলে এখনই উঠুন। উড়ু-উড়ু মন নিয়ে জমিয়ে বসা যায় না। ও আমি পছন্দও করিনে।"

বললাম, আমার উঠবার কোনোই তাড়া নেই, জমিয়ে বসতে এসেছি, আর বাতাসী বিবির কাহিনী তাঁর মুখ থেকে যতটা পারা যায় শুনতে।

"আপনার কথা সুলতান মিয়া বলেছিল আমাকে।" বললেন নিমাই মিত্তির। "অম্বুরী তামাক দিতে এসে হপ্তায় একবার করে নিজেই এসে আমার নিজের হাতে দিয়ে যায় সুলতান মিয়া। অন্তের হাতে পাঠিয়ে বা অন্তের হাতে দিয়ে ওর তৃপ্তি হয় না। এ'তো আর এখনকার মাল ডেলিভারি দেওয়া নয়, এ হলো যেন আপন হাতে অমৃত তৈরি করে অমৃতের খাঁটি খদ্দেরের হাতে তুলে দিয়ে ধন্ত হওয়া। আপনি কি অম্বুরী তামাকের ভক্ত? সুলতান মিয়ার মুখে শুনেছিলাম, ওর দোকানে অম্বুরী তামাক কিনতে এসেই আপনি গল্পে জমে গিয়েছিলেন।"

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু তামাক কিনেছিলাম আমার জন্তে নয়, এক বন্ধুর বাবার জন্তে, যিনি কলকাতার বাইরে থাকেন। খুব নামডাক শুনে এসেছিলাম সুলতান মিয়ার দোকানে। এসে কথায় কথায় উঠল বাতাসী বিবির কথা। একদিনে শোনা শেষ হয়নি। পরে অনেকবার এসেছি। তামাক কিনি নি, সুলতান মিয়ার মুখে বাতাসী বিবির গল্প শুনেছি শুধু। গল্প শুনিয়ে যত খুশী হয়েছে সুলতান মিয়া, তামাক বিক্রি করে তত খুশী হত না।"

"তাহলে আপনার জন্তে তামাকের ব্যবস্থা করবো না? অথবা চুরুট? কিম্বা সিগারেট?"

"আজ্ঞে না, ধন্তবাদ। আমি ধূমপান করি না।"

"তরল?"

"করি। জল, দুধ, সরবত ইত্যাদি।"

"অর্থাৎ সফট্ ড্রিংক? ভৈরব!"

পুকুরের জলের খুব কাছাকাছি সাদা পাথরের তৈরি সিঁড়ির ওপর বসে যে ভৃত্য-ভৃত্য চেহারার মধ্যবয়সী লোকটি জলের দিকে তাকিয়েছিল, সে এই ডাকে সাড়া দিয়ে বলল, "আজ্ঞে?"

লোকটি এদিকে ফিরে তাকাতে লক্ষ্য করলাম, ওর চেহারায় প্রচুর গোবেচারা ভাব এবং ভৈরবত্বের প্রচুর অভাব।

"বাবুকে এক গেলাস কমলালেবুর রস দিয়ে যা।" বলে আমার দিকে মুখ এগিয়ে এনে বললেন "অরেঞ্জ স্কোয়াশ।"

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে বাঁধানো ঘাট থেকে সবুজ ঘাসে নেমে অনতিদূরে এক গাছতলায় গেল ভৈরব।

"ও গাছটা বাতাসী বিবির নিজের হাতে লাগানো।" বললেন নিমাই মিত্তির। বোধ করি তিনি বোঝাতে চাইলেন যে মানুষ চলে যায় কিন্তু গাছ থেকে যায়।

ঐ গাছের আড়াল থেকে যখন বেরিয়ে এল ভৈরব, তখন ওর ডান হাতে এক গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ, বাঁ হাতে একটা টিপয়। টিপয়ের ওপর গ্লাস বসিয়ে আমার সামনে রেখে আবার সাদা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে জলের ধারে আগেকার মতোই বসে পড়ল ভৈরব।

আমি বললাম, "ঐ গাছের আড়ালে কি ভৈরব নানা রকমের পানীয় মজুত রেখেছে?"

নিমাই মিত্তির বললেন, "আমিই রাখিয়েছি। অতিথির জন্তেও বটে, আমার জন্তেও বটে। শুধু পানীয় নয়, মৃদু খাদ্যও আছে

অদ্ভুত রকমের। রোজই থাকে, রোজ সন্ধ্যেবেলায়। রিটায়ার করার পর থেকে সন্ধ্যে হলেই রোজ এখানে এই পুকুরের ধারে বাঁধানো ঘাটের ওপর এসে বসি কি না! তখন কখন পানীয় আর কখন খাদ্য চেয়ে বসব তার তো ঠিক নেই, অথচ এগুলো এখানে একেবারে চোখের সামনে রেখে দেওয়াটাও গোঁয়োমি, যাকে বলে ভালগারিটি। তাই ভৈরব সব যোগাড় ঠিক রাখে, কিন্তু ঐ গাছতলার চোখের আড়ালে, আর নিজে বসে থাকে এখানে জলের ধারে। ওমর খৈয়ামের বাংলা তর্জমা-কবিতা পড়েছেন, ধনপতি বাবু?"

"পড়েছি।"

নিমাই মিত্তির আবৃত্তি করলেন কবি কান্তি ঘোষের তর্জমা করা ওমর খৈয়ামী কথাই ;

"সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙি মোর পাশেতে
গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর,
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার,
সেই বনানী স্বর্গপুর।"

চমৎকার আবৃত্তি শুনে চমৎকৃত হলাম। নিমাই মিত্তির ভূতপূর্ব হলেও এ্যাটর্নী তো বটে! তাঁর মুখে ওমর খৈয়াম আবৃত্তি আশা করি নি।

"কাব্য, স্বপ্ন মঞ্জু সুর যতোই থাক না কেন, খাদ্যও দরকার, পানীয়ও দরকার।" বললেন ভূতপূর্ব এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির। "তাই ওটোরই ব্যবস্থা করে রাখে ভৈরব মণ্ডল। কিন্তু ও ব্যাটাকে দিয়ে আর সখীগিরি হয় না ধনপতি বাবু, আর মঞ্জু সুরও ওর হেঁড়ে গলার কর্ম নয়।"

নিজের নামটা শুনে ভৈরব বলল "আজ্ঞে আমাকে কিছু বলছেন?"

"না, বলছিলাম মঞ্জু সুরের কথা।" বললেন নিমাই মিত্তির।

"সুর মশায়ের বড়ো মেয়ে মঞ্জুদির কথা বলছেন, কর্তা?"

"না রে ব্যাটা। এ আলাদা মঞ্জু সুর।" বললেন নিমাই মিত্তির।

"ওঃ!" বলে আবার নিশ্চিন্ত মনে পুকুরের জল দেখতে লাগল ভৈরব মণ্ডল। নকল খড় মুখে লাগিয়ে গ্লাস থেকে টেনে টেনে শরবৎ খোরাশ পান করতে লাগলাম আমি। গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে অম্বুরী তামাকের সুরভিমধুর ধোঁয়া পান করতে লাগলেন ভূতপূর্ব এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির।

লক্ষ্য করে দেখলাম বিজলী বাতির চমৎকার ব্যবস্থা আছে এই বাঁধানো ঘাটে, নিমাই মিত্তিরের সোফার ঠিক পিছনেই একটি সুইচ, তার বোতাম টিপে দিলেই বিজলী সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের আলোয় ভরে যাবে পুকুরের ধারে এই বাঁধানো ঘাট। কিন্তু বোতাম টেপেন নি বা টেপান নি নিমাই মিত্তির, চাঁদের মৃদু জ্যোৎস্নাকে রূঢ় বিজলীর আঘাত হানতে চাননি বলে। আমার কাছে পুরোনো এ্যাটর্নী-বিমুখতার ঝাঁজ আরেকটু কমল।

"এই যে ঘাট দেখছেন, সবগুলো সিঁড়িশুদ্ধ আগাগোড়া দামী পাথরে বাঁধানো, এ হলো বাতাসী বিবির আমলে বাতাসী বিবির ফরমায়েশ মাফিক তৈরী।" বললেন নিমাই মিত্তির। "বাতাসী বিবি এ বাড়ি কিনবার আগেও এ ঘাট চমৎকার বাঁধানো ছিল বটে, কিন্তু সে বাঁধানো সিমেন্টের।"

"কিন্তু আপনি এ খবর জানলেন কি করে?" প্রশ্নটা হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। নিজের প্রশ্নের অশোভন রূঢ়তায় নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হলেন না নিমাই মিত্তির। বললেন :

"এই সবই বাবার কাছ থেকে নিজের কানে শোনা। বাবার নাম শুনেছেন বোধ হয়, সুলতান মিয়ার কাছে? এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির, সেকালের সবচেয়ে বড়ো এ্যাটর্নী। তাঁর এ্যাটর্নী জীবনের সবচেয়ে দামী মক্কেল—বাতাসী বিবি।"

"বাতাসী বিবির কাছ থেকে এ বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন আপনার বাবা।" বললাম আমি, যেমন শুনেছিলাম সুলতান মিয়ার মুখে। "এ বাড়িই ছিল বাতাসী-মঞ্জিল।"

"ছিল????" বললেন বিস্মিত নিমাই মিত্তির।

"ছিল মানে?" বললাম "মানে বাতাসী বিবির আমলে এ বাড়ি ছিল বাতাসী মঞ্জিল।"

"আজও আছে। আজও আছে, ধনপতিবাবু।" বললেন নিমাই মিত্তির। তারপর আমার দিকে যতটা সম্ভব ঝুঁকে অতি গোপনীয় সংবাদ কানে কানে বলার ভঙ্গিতে বললেন "সবাই জানে এ বাড়ি এ্যাটর্নী বাড়ি। জানে না দিনের শেষে যখন সন্ধ্যা নামে, তখন এ বাড়ির ওপর যেন কিসের যাদু নেমে আসে, এ বাড়ি হয়ে যায় বাতাসী-মঞ্জিল।"

"তারপর?"

"সারারাত বাতসী-মঞ্জিল। তারপর রাত ভোর হয়, রোদ ওঠে, তখন ফের এ্যাটর্নী-বাড়ি।" বললেন নিমাই মিত্তির।

"কি আশ্চর্য!" বললাম আমি।

"দেয়ার আর মোর থিঙ্স্ ইন হেভ্ন্ অ্যাণ্ড আর্থ, হোরাশিও, দ্যান আর ড্রেম্ট্ অভ ইন ইওর ফিলজফি।" বললেন নিমাই মিত্তির, আবার শেক্স্পীয়ারের 'হ্যামলেট' নাটক থেকে ধার করে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ব্যাখ্যা করে বললেন "দুনিয়ায় অনেক অদ্ভুত জিনিষ আছে, ধনপতিবাবু, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।"

বিস্ময় বোধ হল। নিমাই মিত্তিরের মুখে অদ্ভুত কথা শুনে নয় ; কথাটাকে মনে মনেও বাজে বলে উড়িয়ে দিতে না পেরে। আমার যেন সত্যিই মনে হতে লাগল দিনের এ্যাটর্নী-বাড়ি সন্ধ্যায় বাতাসী-মঞ্জিল হয়ে গেছে, বদলে গেছে তার চেহারা আর চরিত্র, ষ্টিভেনসনের বিখ্যাত উপন্যাসে ডাক্তার জেকিলের মিস্টার হাইডে পরিবর্তনের মতো।

আমি বললাম "এই জন্যেই কি আপনি সন্ধ্যের পর বাইরে থাকেন না বলছিলেন?"

"এই জন্যেই।" বললেন নিমাই মিত্তির। "বাতাসী মঞ্জিলের মায়া কাটিয়ে বাইরে থাকতে পারিনে। বাইরে আমার যত বেড়ানো—মানে অনেক বেড়ানো—সব দিনের বেলা, বাতাসী মঞ্জিল যখন অদৃশ্য, উধাও।

বুঝতে চেষ্টা করলাম বৃদ্ধ নিমাই মিত্তিরের মনস্তত্ত্ব। মানুষের জীবনে ভবিষ্যৎ যত কমে আসে মানুষ তত বেশী অতীতের দিকে

পরিবারের জন্য
মায়েদের পছন্দ
ডালডা
ডালডা
খেজুরগাছ মার্কা
বনস্পতি
ডালডা
ডালডা সবচেয়ে সেরা
ভেষজ তেল থেকে তৈরী।
এতে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের
উপযোগী ভিটামিনও রয়েছে।
প্রতারণা-প্রতিরোধক
সিল-করা টিনে স্বাস্থ্যসম্মত
ভাবে প্যাক-করা।
মনে রাখবেন ডালডা কখনও
আল্গা বিক্রী হয় না।
রান্নার খাঁটি, সেরা স্নেহপদার্থ

আকাশ অতীতকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সেই পরিস্থিতি, সেই পর্ব এসেছে নিমাই মিত্তিরের জীবনে। বর্তমান নিয়ে মহা মশগুল বর্তমান এ্যাটর্নী কানাই মিত্তির; এখন অতীত এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তিরের প্রধান সম্বল অতীত।

শুধালাম "আপনি নিশ্চয়ই অনেক দেখেছেন বাতাসী বিবিকে, অনেক আলাপ করেছেন তাঁর সঙ্গে?"

"নিশ্চয়ই না।" বললেন নিমাই মিত্তির। "বাতাসী বিবি এ বাড়ি কিনে এ বাড়িতে এসে বাস করার আগে থেকেই বাবা ছিলেন বাতাসী বিবির এ্যাটর্নী, আইন-কানুন-সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে ওর একমাত্র পরামর্শদাতা। বাবা তখন যেমন নামজাদা এ্যাটর্নী, তেমনি নামজাদা সুপুরুষ, অমন চেহারা লাখে একটা দেখা যেতো না। ছবি দেখলে ঠিক টের পাবেন না বাবা কি ছিলেন, তবু খানিকটা ঝাপসা আন্দাজ করতে পারবেন। এরপর একদিন দেখাব আপনাকে বাবার ছবি। বাবার ওপর ছিল বাতাসী বিবির অগাধ বিশ্বাস, অসীম নির্ভর। ভৈরব!"

ভৈরব বলল "আজ্ঞে!"

"তুই কি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে পারিস নে?" প্রশ্ন করলেন নিমাই মিত্তির।

ভৈরব বলল "বুদ্ধি তো আমি কখনো খাটাইনে বড়বাবু। হুকুম করেন, তামিল করি।"

"তাহলে কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর।" হুকুম করলেন নিমাই মিত্তির।

"অতিথি এসেছেন, তাঁকে শুধু এক গেলাস কমলালেবুর রস খাওয়াই তুই দিবি?"

আমি নিমাই মিত্তিরের ব্যস্ততা দেখে লজ্জিত বোধ করে বললাম "ছি ছি, আমার জন্তে আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

নিমাই মিত্তির গম্ভীর গলায় বললেন "হবো।"

"কিন্তু আমার জন্তে এখন খাবার আনবার কোনো দরকার নেই।"

গম্ভীর স্বরে নিমাই মিত্তির বললেন "আছে।"

ঘাটের সিঁড়ি থেকে ধাপে ধাপে উঠে এসে সবুজ ঘাসে নেমে ভৈরব মণ্ডল আবার চলে গেল বাতাসী বিবির নিজের হাতে লাগানো সেই গাছটার দিকে, যার আড়াল থেকে কিছুক্ষণ আগে আমাকে অরেঞ্জ স্কোয়াশ এনে দিয়েছিল।

"আমাকে এ সময়ে ধূমপান করতে দেখে বিস্ময় বোধ করছেন কি?" প্রশ্ন করলেন নিমাই মিত্তির।

"আজ্ঞে না!" বললাম আমি "ধূমপান রসের রসিক যাঁরা, তাঁরা বলেন ধূমামৃত পানের কোনো অসময় নেই।"

"হুঁ। সিগারেটখোররাও তাই বলে—এভরি টাইম ইজ স্মোকিং টাইম। আমিও বলতাম।"

"আপনিও সিগারেটখোর ছিলেন?" প্রশ্ন করেই নিমাই মিত্তিরের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো বেকাঁস প্রশ্ন করে ফেলেছি।

নিমাই মিত্তির বললেন "একদিন আমারও যৌবন ছিল ধনপতিবাবু। তখন অনেক সিগারেট ফুঁকেছি, সিগারেটের পর সিগারেট, যাকে বলে চেন-স্মোকিং। তার পর কলেজ আর ইউনিভার্সিটি পেরিয়ে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ্যাটর্নী হলাম।"

"তারপর?"

"পাকা এ্যাটর্নী যখন হলাম তখন সিগারেট ছেড়ে চুরুট ধরলাম, কারণ চুরুটের আভিজাত্য সিগারেটে নেই। কিন্তু চুরুট ধরবার আগেই পিতৃহীন হয়েছিলাম ধনপতিবাবু। মাতৃহীন হয়েছিলাম তারও আগে।"

বাতাসী বিবির কথা শুনতে এসে নিমাই মিত্তিরের আত্মচরিত শুনতে হবে, এ আশঙ্কা করিনি, কিন্তু তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত বাক্যস্রোতে বাধা দিতে ভরসা হলো না, ইচ্ছাও হলো না। তাঁর পিতৃশোক এবং মাতৃশোক অন্তরে অনুভব করে সহানুভূতিতে বিষণ্ণ হবার চেষ্টা করলাম।

"অম্বুরী তামাক ধরেছি এ্যাটর্নীগিরি থেকে পেনশন নিয়ে। অর্থাৎ প্রায় সম্প্রতি।" বললেন নিমাই মিত্তির। "যখন দেখলাম আমার একমাত্র সন্তান কানাই নাম করা এ্যাটর্নী হয়ে উঠেছে, বাপকা বেটা বলে নাম কিনেছে বাজারে, তখনই মনে হলো এবারে আমার মানে মানে বিদায় নেওয়া উচিত এ্যাটর্নীগিরির বাজার থেকে, এক জঙ্গলে বাপ ব্যাটা দুই শের থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। শাস্ত্রে আছে 'সর্বতো জয়মন্বিচ্ছেৎ, পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্' অর্থাৎ বুদ্ধিমান লোক সর্বত্র জয় ইচ্ছা করে, কিন্তু পুত্রের কাছে কামনা করে পরাজয়। ভাবলাম এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তিরকে যদি এ্যাটর্নী কানাই মিত্তির ছাপিয়ে ওঠে তো উঠুক, আনন্দের কথা। আমি সরে দাঁড়ালাম। আমি আর এ্যাটর্নী রইলাম না।"

"কিন্তু অম্বুরী তামাক ধরলেন কি করে?" শুধালাম আমি।

নিমাই মিত্তির বললেন "বাবার অতি প্রিয় ছিল অম্বুরী তামাক। আর বাতাসী বিবির উপহার দেওয়া এই গড়গড়াতেই অম্বুরী তামাকের ধূমপান করতেন তিনি। গড়গড়ার গোড়ায় তাকিয়ে দেখুন ধনপতিবাবু। কি দেখছেন?"

তাকিয়ে দেখে বললাম "সুন্দর নক্সা আঁকা।"

নিমাই মিত্তির বললেন "উর্দুতে লেখা বাতাসী বিবির নাম। বাতাসী বিবি বাবাকে শুধু এই গড়গড়াটি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি ধনপতিবাবু, কি হপ্তায় অম্বুরী তামাকের যোগান আসত বাতাসী বিবির ফরমায়েশে, যোগান দিত ইকবাল আলির দোকান, যে দোকানের মালিক এখন তার নাতি বুড়ো সুলতান মিয়া। বাবাকে অম্বুরী তামাকের রসিক বানানোর কৃতিত্ব বাতাসী বিবির। বাতাসী বিবি নিজেও ছিল অম্বুরী তামাকের ভক্ত, ইকবাল আলির দোকানের সবচেয়ে দামী, সবচেয়ে লোভনীয় খদ্দের।"

মেয়েমানুষ গড়গড়ার ভক্ত, ও কথাটা ভাবতেও যেন কেমন লাগল। প্রশ্ন করলাম "বাতাসী বিবি তামাক খেতো?"

"না। অম্বুরী তামাকের পরিশোধিত ধোঁয়া পান করত।" বললেন নিমাই মিত্তির। "বাবার মুখে শুনেছি সে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখে বাবা মুগ্ধ হয়েছিলেন এ বাড়ীতে বাতাসী বিবি আসবার আগেই।"

"তা হলে অম্বুরী তামাক ধরার ব্যাপারে বাতাসী বিবিই আপনার মন্ত্রগুরু?"

"তা বলতে পারেন।" বললেন নিমাই মিত্তির। "বাতাসী বিবি ছিলেন একাধারে আমার পিতৃদেবের মক্কেল এবং মন্ত্রগুরু।"

যে ভাবে তিনি কথাটা বললেন, তাতে মনে হলো যেন এর পরও

অন্তত আরেকটা এবং আছে। কিন্তু ওদিকের আর ছায়াই মাড়ালেন না নিমাই মিত্তির।

"বাতাসী বিবির কাছ থেকে অম্বুরী মন্ত্রে দীক্ষা পাবার আগে বাবা চুরুটখোর ছিলেন। সবচেয়ে সৌখীন, সবচেয়ে দামী চুরুট আসত বাবার জন্যে। কিন্তু অম্বুরী তামাকের নেশা যখন ধরল ভালো করে, তখন থেকে বিস্বাদ মনে হতে লাগল চুরুটের জলস্পর্শহীন শুকনো ধোঁয়া।"

বলে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জলস্পর্শ-মধুর স্নিগ্ধ অম্বুরী ধোঁয়া পান করতে লাগলেন অবসরপ্রাপ্ত এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির। আছে সেই গড়গড়া, সেই পুরোনো দোকানেরই অম্বুরী তামাক; নেই বাতাসী বিবি, নেই তার এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির। নটবর-পুত্র নিমাই সেই গড়গড়ার নলে চুমুক দিয়ে ধূমপান করছেন বাতাসী বিবির শখের ফরমায়েশে তৈরি শ্বেতপাথরে বাঁধানো পুকুর-ঘাটে বসে। এ সব কথাই আমার মনের ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল।

কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েছিলাম অতীতের সেই অম্বুরী রসিকা বাতাসী বিবির কথা ভেবে। খেয়াল করিনি কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ভৈরব মণ্ডল। হঠাৎ যেন স্বপ্নভঙ্গ হল যখন ভৈরব বলল: "খাবার এনেছি আজ্ঞে।"

চেয়ে দেখি দণ্ডায়মান ভৈরব মণ্ডলের হাতে একটা ছোটখাট স্যুটকেসের মতো সাইজের সুন্দর গড়নের বাক্স, তার গায়ের রং নিমাই মিত্তিরের মস্ত ক্যাডিল্যাক গাড়ির মতো সবুজ। মনে হলো বাক্সের সারা দেহ যেন কোমল-স্পর্শ, মোলায়েম, ঘন-সন্নিবিষ্ট সবুজ শ্যাওলা দিয়ে ঢাকা।

বাক্সটা আমার সামনে টিপয়ের ওপর রেখে বাক্সের ডালাটা উল্টে খুলে দিল ভৈরব মণ্ডল। দেখলাম বাক্সের ভেতরে ভিন্ন ভিন্ন পকেটে নানা রকমের পরম লোভনীয় খাবার সাজানো; তাদের চেহারা দেখে চোখ যেমন খুশী হলো, তেমনি নাক খুশী হলো তাদের আলাদা আলাদা এবং সম্মিলিত সুরভিতে, আর এই দু'য়ের ফলে রসনা লালায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু এত কার জন্য?

"গন্ধমাদন মাথায় করে নিয়ে এলি? তুই দেখছি হনুমান হলি-রে ভৈরব।" বললেন নিমাই মিত্তির।

"আজ্ঞে।" বলল ভৈরব মণ্ডল, অর্থাৎ মেনে নিল নিজের হনুমানত্ব। তারপর বলল "গোটা বাক্সই নিয়ে এলাম, উনি সব দেখে-শুনে পছন্দমতো যা দরকার তুলে নিয়ে নিয়ে খেতে পারবেন। আপনিও।"

"তা মন্দ করিস নি। আচ্ছা, এইবার বোস গিয়ে।" বললেন নিমাই মিত্তির। জলের ধারের সিঁড়িতে গিয়ে আগেকার মতোই বসে পড়ে জল দেখতে লাগল ভৈরব মণ্ডল।

ভৈরব ভৃত্য হলেও মানুষ, তারও নাক, চোখ এবং রসনা আছে, এ-কথা ভেবে নিমাই মিত্তিরকে মৃদুস্বরে বললাম—"ভৈরবকে কিছু দিলে হতো না এ থেকে?

"অনাবশ্যক।" বললেন নিমাই মিত্তির। "ওর যা সরাবার,
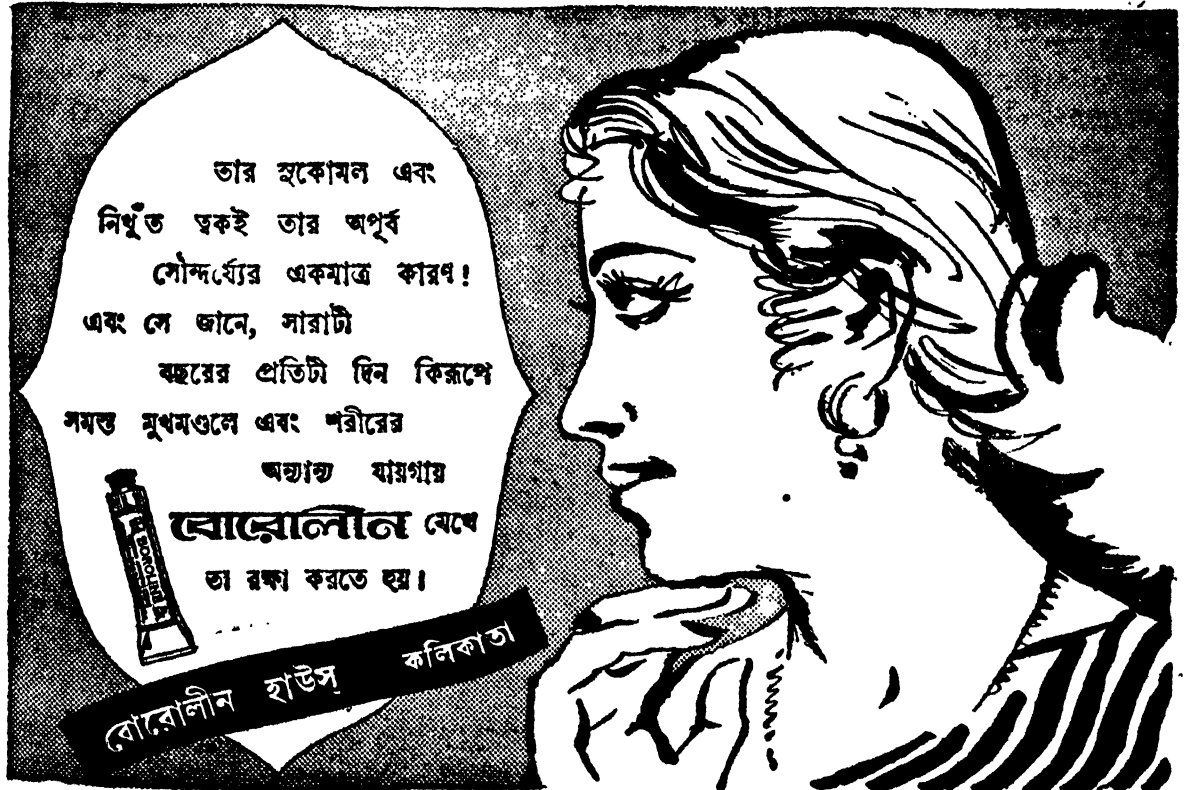
নেপথ্যে সরানো হয়ে গেছে এবং কিছু-কিছু গলাধঃকরণও যে হয়ে যায়নি তাও নয়। এ ধরণের ব্যাপারে খুব পাকা, আপনা-বুঝদার আদমি ভৈরব মণ্ডল, অ্যাণ্ড আই লাইক ইট। এতে আমার সায় আছে।"

এই বলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে যে ভাবে ইসারা করলেন, তাতে মনে হলো আমি খেতে শুরু না করলে ওঁর গভীর ক্রোধের কারণ হবো।

"বাক্সের এধারে গ্লাসে জল আছে। হাতটা ধুয়ে নিন ধনপতিবাবু।" বললেন নিমাই মিত্তির।

আশ্চর্য! বাক্সের ওধারে তাকিয়ে দেখি সত্যিই টিপয়ের ওপর এক গ্লাস জল! কোন্ ফাঁকে যে ভৈরব রেখে গেছে, তা টেরই পাইনি। আশ্চর্য ওর হাত সাফাই।

ডান হাত ধুয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে করতে শুনতে লাগলাম নিমাই মিত্তিরের কথা। পাছে ধৃষ্টতা করে ফেলে তাঁর রাগের কারণ হই, এই ভয়ে তাঁকে আমার অনুকরণ করতে বললাম না।

"বাতাসী বিবির কাহিনী কিছু কিছু সুলতান মিয়ার মুখে শুনেছেন বলছিলেন না?" শুধালেন নিমাই মিত্তির।

"আজ্ঞে, বলেছিলাম।"

"যা শুনেছেন ভুলে যান। মেক ইওর মাইণ্ড এ ক্লীন স্লেট।" বললেন নিমাই মিত্তির, যেন বাতাসী বিবি সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এবং তত্ত্বের একচ্ছত্র স্বত্বাধিকারী এবং বিশেষজ্ঞ তিনি। খাবারের বাক্স থেকে আনমনা হাতে একটা কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে নিজের মুখের ভেতর আস্ত পুরে দিয়ে নীরবে খেয়ে বললেন, "নবীন ময়রা কড়াপাকের সন্দেশ বানায় ভালো। আমরা যেমন অনেক পুরুষ ধরে এ্যাটর্নী, ওদের ময়রাগিরিও তেমনি অনেক পুরুষ ধরে। বাতাসী বিবিকে সন্দেশ যোগাত এই নবীন ময়রারই পূর্বপুরুষ। রোজ সের কয়েক সন্দেশ লাগত বাতাসী বিবির। খেতে ভালবাসত, খাওয়াতে আরো বেশী ভালোবাসত বাতাসী বিবি। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি ধনপতিবাবু। সুলতান মিয়ার মুখে বাতাসী বিবির বিবরণ যা শুনেছেন তা ছাড়া আর কারও মুখে কিছু শুনেছেন কি কখনো?"

আমি বললাম, "সঠিক সুস্পষ্ট বা সুসংবদ্ধভাবে কিছু শুনিনি, যা শুনেছি তা ঝাপসা, গুজব-ধর্মী, ভাসাভাসা, ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে।"

"তা থেকে মোটামুটি কি রকম চরিত্রের মেয়েমানুষ বলে ধারণা হয়?"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "ধারণা হয় একটা মস্ত ক্রিমিন্যাল গ্যাং অর্থাৎ বে-আইনী চোর, ছ্যাঁচোড়, ডাকাত,' গুণ্ডা, চোরা চালানী দলের সর্দারণী ছিল বাতাসী বিবি। সাহিত্য-সম্রাট বংকিমচন্দ্রের মানসকন্যা দেবী চৌধুরাণীর নোংরা সংস্করণ।"

"আর?"

"ছলনায়, চাতুরিতে বাতাসী বিবির জুড়ি ছিল না, ছিল না তার বিবেক বা নারীসুলভ লজ্জাসরমের বালাই, শঠতা আর নির্মমতার চরমে যেতে তার বাধতো না, নিজের দুরন্ত রূপ আর যৌবনের আগুনে অনেককে পুড়িয়ে ছাই করেছে বাতাসী বিবি, নিজের খেয়াল বা দলের স্বার্থ চরিতার্থ করতে একাধিক প্রাণহানি ঘটাতেও সে কুণ্ঠিতা হয়নি।"

"আর কিছু?"

"অনেক লুট করেছে, আবার খেয়াল খুশিতে দিল-দরিয়া হয়ে দরাজ হাতে অনেক ছড়িয়েছে। অনেকের পৌষমাস আর অনেকের সর্বনাশ ঘটিয়েছে বাতাসী বিবি।"

"অর্থাৎ মোটের ওপর ক্রাইমের জগতের এক জাঁহাবাজ মেয়ে ক্রিমিন্যাল, রূপ, যৌবন, মগজ আর দুঃসাহসকে মূলধন হিসেবে যে অনেক মুনাফা লুটেছে আর লুটিয়েছে?"

"কিম্বদন্তী সেই রকম। কিন্তু এ সব কি সত্য নয়?"

"এ প্রশ্নের জবাব এক কথায় হ্যাঁ বা না বলে দেওয়া যায় না ধনপতিবাবু।" বললেন নিমাই মিত্তির। "আপনি যে ধরণের কিম্বদন্তী শুনেছেন বাতাসী বিবি সম্বন্ধে, আমিও সেই রকমই শুনেছি। শুনে শুনে আমার ধারণা হয়েছিল সব সত্যি। বাতাসী বিবি ছিল একটি সুপার ক্রিমিন্যাল, আইন-ভাঙার খেলায় ক্ষণজন্মা পাকা খেলোয়াড়নী। ইংরেজ কবিরা, বিশেষ করে কবি কীটস যে জাতের মেয়ে মানুষকে বলেছেন 'লা বেল দাম সাঁ মার্সি' (La belle dame sans merci) অর্থাৎ হৃদয়হীনা রূপসী, ঠিক তাই। কিন্তু এ্যাটর্নীগিরি থেকে অবসর নেবার পর·····"

"কি হলো আপনার রিটায়ার করবার পর?" মহা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"আমার ধারণায়, চিন্তাধারায় একটা প্রচণ্ড ওলোটপালোট হয়ে গেল।" বললেন নিমাই মিত্তির। "বাংলায় ও ব্যাপারটাকে বোঝাতে তেমন জোরালো জুৎসই কথা খুঁজে পাচ্ছি না। তাই ইংরেজিতে বলি রেভলিউশনারি চেঞ্জ।"

"কিন্তু এ্যাটর্নী যদ্দিন ছিলেন, তদ্দিন?"

"পুরোনো ধারণাই ছিল মনের ভেতর। এক ধাক্কায় সব যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল যখন আর এ্যাটর্নী রইলাম না। হলাম 'ভূতপূর্ব এ্যাটর্নী' নিমাই মিত্তির।"

এ্যাটর্নীগিরিতে ইস্তফা দেবার সঙ্গে এহেন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের কি কার্যকারণ যোগ থাকতে পারে সেটা আমার ঠিক বোধগম্য হলো না।

ভয়ে ভয়ে বললাম "ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। একটু হেঁয়ালি হেঁয়ালি লাগছে।"

নিমাই মিত্তির বললেন "লাগাটাই স্বাভাবিক। কারণ ব্যাপারটা আপনাকে এখনো বুঝিয়ে বলিনি। এইবারে বলি শুনুন।"

"বলুন শুনি।"

লম্বা কাহিনী শুরু করবার আগে একটু দম নিয়ে নেবার জন্যই বোধ করি ধীরে ধীরে ধূমপান করতে লাগলেন নিমাই মিত্তির।

আমি উৎকণ্ঠ, উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। [ক্রমশঃ।

বিজ্ঞান জগতের কথা

ষ্ট্রাটোস্‌কোপ—২

দূরবীণে শুধু দূরের জিনিসই বড় দেখায় না, বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহেও সাহায্য করে।

ষ্ট্রাটোস্‌কোপ-২ নামে একটি টেলিস্কোপকে স্বয়ং চালিত মনুষ্যবিহীন একটি বেলুনে করে সম্প্রতি পালেস্তাইনের টেক্সাস থেকে শূন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

তিনটন ওজনের ৩৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এই টেলিস্কোপটি উত্তরপূর্ব দিকে রাতারাতি ৭০০ মাইল অর্থাৎ ১,১২০ কিলোমিটার বেগে ধাবিত হয়ে ৭৭০০০ ফুট অর্থাৎ ২৩,১০০ মিটার ওপরে ওঠে। তারপর অক্ষত অবস্থায় টেলিস্কোপটিকে টেনিস ভ্যালির পুলস্কিতে নামিয়ে আনা হয়েছে।

মঙ্গলগ্রহে যে জলীয় বাষ্প ও কার্বোন-ডায়োক্সাইড আছে তা ঐ টেলিস্কোপের মাধ্যমে সমর্থিত হয়েছে।

প্রিন্সটন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক ও প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ডাঃ মার্টিন সোয়ারটস্ চিল্ড বলেছেন, মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়ায় জল ও কার্বোন ডায়োক্সাইড ছাড়াও আরও কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বেলুনে যে সব যন্ত্রপাতি আছে সেগুলির কার্য্যকলাপ টেপ রেকর্ডে ধরা পড়ে; ঐ তথ্যগুলি শূন্যে উড়বার সময় বেতারযন্ত্রে প্রেরিত হয়। যন্ত্রপাতি সমম্বিত একখানি ভ্রাম্যমান মোটর গাড়ী নিচে থেকে বেলুনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে; গাড়ীখানির স্থির লক্ষ্য থাকে মঙ্গল গ্রহের দিকে—এই গাড়ীর যন্ত্রে তথ্যগুলি রেকর্ড করা হয়।

টেলিস্কোপটি মঙ্গল গ্রহকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে এসেছে।

পৃথিবীর বিকৃত আবহাওয়ায় শতকরা ১৬ ভাগ বেশী মঙ্গল গ্রহকে ষ্ট্রাটোসকোপ-২ পরীক্ষা করে এসেছে। কাজেই কাগজে কলমে বলা যেতে পারে পৃথিবীর বৃহত্তম টেলিস্কোপ যন্ত্রে যা পারে তার চেয়েও বেশী জোরালো ও বিস্তৃত ছবি সংগ্রহ করা ঐ টেলিস্কোপটির দ্বারা সম্ভব হবে।

কৃত্রিম শ্বাসনালী

কঠিন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত দু'জন রোগীর শ্বাসনালীটি অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়; কৃত্রিম প্লাষ্টিকের শ্বাসনালী পরিয়ে তাদের দু'জনকেই আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

অস্ত্রোপচারের এই সাফল্যের দাবী করেছেন আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি।

৪১ বৎসর বয়স্ক একজন ক্যান্সার রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে চিকিৎসকগণ তার কণ্ঠনালী এবং তার কাছাকাছি শরীরের আরও কিছু অংশ অস্ত্রোপচার করে বাদ দিয়ে দেন এবং দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার দ্বারা ক্যান্সারের ক্ষতটি অপসারিত করে কৃত্রিম শ্বাসনালীটি পরিয়ে দেন। এখন তিন বছর কেটে গিয়েছে, "রোগী সম্পূর্ণ ক্যান্সার মুক্ত এবং তার প্লাষ্টিকের শ্বাসনালীটি নিখুঁত কাজ করে যাচ্ছে" বলে ক্যান্সার সোসাইটি জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় রোগীটি হলো ৬১ বৎসর বয়স্কা একজন স্ত্রীলোক।

১২ মাস ধরে এই নিদারুণ কষ্ট ভোগে তার শরীরের ওজন ৫০ পাউণ্ড কমে যায়। অস্ত্রোপচার করে ক্যান্সারের ক্ষতে আক্রান্ত শ্বাসনালীটি সরিয়ে ফেলা হয় এবং কৃত্রিম একটি প্লাষ্টিকের শ্বাসনালী তার শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর ৮ মাস কেটে গিয়েছে, রোগিণী এখন বেশ ভালই আছে।

ক্যান্সার সোসাইটি বলেন, যদি অস্ত্রোপচার করা না হতো তাঁহলে রোগিণী শ্বাসরোধ হয়ে মারা যেতো।

পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়ার যন্ত্র

আমেরিকান মেসিন এ্যাণ্ড ফাউণ্ডি কোম্পানী সম্প্রতি নৌকা বা গাধাবোটে পানীয় জল পাওয়ার এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। সমুদ্র বা নদীর লবণাক্ত জলের লবণের অংশ এই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে ফেলা যায়; তারপর যে পরিস্রুত পানীয় জল পাওয়া যায়, তা মাঝি মাল্লাদের পিপাসার পরিতৃপ্তি আনতে পারে।

মেক্সিকো উপসাগরে যাতায়াতকারী একটি বার্জে এরূপ একটি লবণ-মুক্ত করার পরিশোধনের ইউনিট বসানো হয়েছে। এই যন্ত্র থেকে বার্জের ৪০ জন খালাসীর জন্যে দৈনিক ৩৬০০০ গ্যালন (১৬৩,৫০০ লিটার) টাটকা পানীয় জল পাওয়া যায়।

সমুদ্রে জলের তলা দিয়ে যে পাইপ লাইন গিয়েছে তা থেকে গ্যাস আর তেল নিয়ে ২৫০ ফুট (৭৫ মিটার) দীর্ঘ জেট আকারের বৃহত্তম এই জলযানটি রোজই আনাগোনা করে থাকে। আমেরিকায় গার্হস্থ্য প্রয়োজনের জন্য বাড়ীর মালিকরা পানীয় জল তৈরীর যে যন্ত্র ব্যবহার করেন, গড়ে তার যা খরচা তার চেয়ে অনেক খরচ কম বার্জের জল তৈরীর ঐ ইউনিটটির। কারণ যে উত্তাপের সাহায্যে বার্জের ইউনিটের লবণকে আলাদা করে পানীয় জলে পরিণত করা হয় সেই উত্তাপ ইঞ্জিনের গরম বাষ্প থেকে আসে; কাজেই অতিরিক্ত কোন জ্বালানীর দরকার হয় না।

সি, ১৫০১

সি ১৫০১ নামে ম্যালেরিয়া রোগের একটি অব্যর্থ ওষুধ সম্প্রতি আমেরিকায় বেরিয়েছে। ওষুধটি অবশ্য এখনও বাজারে ছাড়া হয় নি; পরীক্ষামূলক ভাবে ওটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

বছরখানেক আগে আমেরিকায় একদল স্বেচ্ছাসেবককে ঐ

ঘুরে বেড়ায়। এক মাস অন্তর তারা তাদের শরীরে মশককুলকে যথেচ্ছ কামড়াবার সুযোগ দেয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাদের আর ম্যালেরিয়া হয় না। কিন্তু যাঁরা ঐ ইঞ্জেকসান না নিয়ে ঐ এলাকার মশককে কামড়াবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু যথারীতি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন।

ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক এই ওষুধটির ক্রিয়া শরীরে বহুদিন থাকে; অন্ততঃ বর্ত্তমানে যে সব ওষুধপত্র আছে সেগুলির চেয়ে দশ গুণ বেশী শক্তিশালী ঐ ওষুধটি। এই ওষুধটির ফলাফলের রিপোর্ট আমেরিকান সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন এ্যাণ্ড হারজিনের বৈঠকে পেশ করা হয়েছে।

আন আর বোর, মিসিগানের পার্ক, ডেভিস এ্যাণ্ড কোম্পানীর বৈজ্ঞানিকরা এ ওষুধটি প্রস্তুত করেছেন। সি ১৫০১ প্রাথমিক পরীক্ষায় যে সাফল্য অর্জ্জন করেছে সব পরিস্থিতিতে সেটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়া দূরীকরণ অভিযানে এ ওষুধটি খুবই ফলপ্রদ হবে। প্রতি বছর ২ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং ২০ লক্ষ লোকের ম্যালেরিয়া রোগে আজও মৃত্যু ঘটে।

বিস্ফোরকের জন্মকথা

হাইড্রোজেন বোমা

শ্রীবিশু দাস

পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ হয় ইউরেনিয়াম ২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম ২৩৯ পরমাণু কেন্দ্রীনের পারস্পারিক প্রতিক্রিয়ায় (chain reaction) বিভাজনে (fission)। অথচ হাইড্রোজেন বোমার শক্তি সংগৃহীত হয় হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্রীনের মিলনে (Fusion)। মৌলিক পদার্থগুলোর মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন সবচেয়ে সরল। এর কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন বা পজিটিভ বিদ্যুৎসম্পন্ন কণিকা এবং তার চতুর্দ্দিকে ঘুরছে একটি মাত্র ইলেকট্রন বা নেগেটিভ বিদ্যুৎ সম্পন্ন কণিকা। হাইড্রোজেনের দু'টি Isotope—একটির নাম Deuterium (H_1^2) এবং অন্যটি Tritium (H_1^3)। এদের গঠন বেশ মজার। সাধারণ হাইড্রোজেন (H_1^1) পরমাণুর সাথে Deuterium পরমাণুর পার্থক্য হচ্ছে একটি নিউট্রনের বা বিদ্যুৎহীন কণার। H_1^2 এর কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন ও একটি নিউটন থাকে অথচ ইলেকট্রন কিন্তু একটিই। নিউট্রনের ওজন প্রোটনের সমান বলে H_1^2 এর ওজন সাধারণ হাইড্রোজেনের দ্বিগুণ। সেই কারণে Deuteriumকে ভারী হাইড্রোজেন (Heavy Hydrogen) বলা হয়। রাসায়নিক গুণাগুণ (chemical properties) কিন্তু সাধারণ হাইড্রোজেনের মতই। হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে মিশে H_2O বা জল তৈরী করে। তেমনি H_1^2 (Deuterium) অক্সিজেনের সাথে মিশে D_2O (Deuterium oxide) বা ভারী জল (Heavy water) তৈরী করে।

সাধারণ প্রাকৃতিক জলে মাত্র শতকরা ১ ভাগ ভারী জল থাকে। জলকে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis) করলে প্রথমে হাল্কা অংশ (ordinary water) বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে। ফলে অবশিষ্ট জলে ভারী জলের অনুপাত ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এই উপায়ে কিছু পরিমাণ ভারী জল তৈরী করা সম্ভব। পরে ঐ ভারী জলকে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ করলে ভারী হাইড্রোজেন (H_1^2) বা Deuterium পাওয়া যায়। এই উপায়ে কিন্তু ভারী হাইড্রোজেন তৈরী করা হয় না, কারণ এতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি খরচা হয়, তার তুলনায় প্রাপ্ত ভারী হাইড্রোজেন অত্যন্ত নগণ্য।

হাইড্রোজেনের অন্য একটি Isotope Tritium (H_1^3) কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা যায় লিথিয়াম ধাতুর বা H_1^2 পরমাণুকে নিউট্রন কণিকা দিয়ে আঘাত করে। একটি লিথিয়াম পরমাণুকে একটি নিউট্রন কণিকার সাহায্যে আঘাত করলে একটি Tritium (H_1^3) পরমাণু এবং একটি হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণু (He_2^4) সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানকালে পারমাণবিক চুল্লীতে (Atomic Reactor) ঐ প্রক্রিয়াতেই বেশী পরিমাণ H_1^3 তৈরী করা হচ্ছে।

এখন জানতে হবে হাইড্রোজেন বোমা কোথা থেকে সংগ্রহ করে এত অফুরন্ত শক্তি। হাইড্রোজেন এবং ডিউটেরিয়াম অথবা হাইড্রোজেন এবং ট্রিটিয়াম পরমাণুর কিম্বা দু'টি একই জাতীয় পরমাণুর মিলনে (Fusion) প্রচুর শক্তির উদ্ভব হয় যার প্রকাশ আমরা দেখি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে।

একটি হাইড্রোজেন ও একটি ট্রিটিয়াম পরমাণুর মিলনে উৎপন্ন হয় ১১'৭ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি (সংক্ষেপে এই এককে বলা হয় mev.)। একটি ডিউটেরিয়াম ও একটি ট্রিটিয়াম পরমাণুর মিলনে উৎপন্ন হয় ১৭'৬ mev শক্তি। আবার, দু'টি ট্রিটিয়াম (H_1^3) পরমাণুর পরস্পর মিলনে নির্গত হয় ১১'৩ mev শক্তি। আরও একটি আশ্চর্য্য বিক্রিয়া হতে দেখা যায় একটি লিথিয়াম পরমাণু ও একটি ডিউটেরিয়াম পরমাণুর মধ্যে, যার ফলে নির্গত হয় ২২'৪ mev শক্তি।

একটা শক্ত খোলের (Shell) ভেতর বেশ খানিকটা ডিউটেরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম রেখে তাদের মিলন ঘটাতে পারলে যে শক্তি নির্গত হবে, তার দ্বারা অনায়াসেই একটা বিরাট ধ্বংসকার্য্য সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই মিলন ঘটানোর (Fusion) কাজটা সুরু করা যায় কি ভাবে।

আমরা জানি যে, দু'টি পরমাণু কেন্দ্রীনের (Nucleus) মধ্যে রয়েছে একটা প্রচণ্ড বিকর্ষণী শক্তি, যার ফলে দু'টো কেন্দ্রীনকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। এই বিকর্ষণী শক্তির বাধা (Energy Barrier) অতিক্রম করে দু'টো কেন্দ্রীনকে এক জায়গায় মিলাতে হলে দরকার তাপের, যার পরিমাণ হওয়া চাই প্রায় এক লক্ষ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর মাটিতে কোন প্রক্রিয়াতেই এত প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। পদার্থ বিজ্ঞানীদের বহু দিনের গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, ঐ রকম উত্তাপ রয়েছে সূর্য্যে এবং অন্যান্য নক্ষত্রে। পৃথিবীর বুকে ঐ পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল সেই দিনই, যে দিন প্রথম বিস্ফোরণ হোলো পারমাণবিক বোমার (Atom Bomb)।

অতএব বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন যে, পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ-জনিত শক্তিকে হাইড্রোজেন বোমার 'ফিউজ' (Fuse)

হিসেবে ব্যবহার করবেন। হাইড্রোজেন বোমার ফিউজ হলো তাহলে ইউরেনিয়াম ২৩৫ (U^{235}) অথবা প্লুটোনিয়াম ২৩৯ (P^{239})। তাছাড়াও এই বোমাতে থাকবে হাইড্রোজেনের দু'টো Isotope ডিউটোরিয়াম (H_1^2) এবং ট্রিটিয়াম (H_1^3)।

ইউরেনিয়াম ২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম ২৩৯ এর দু'টি ছোট ছোট খণ্ড (Sub-critical mass) যান্ত্রিক উপায়ে একত্রিত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মিলিত ওজন critical mass এর চেয়ে বেশী হওয়ায় তৎক্ষণাৎ পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (Chain Reaction) আরম্ভ হয়ে যায় এবং বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন হয় লক্ষাধিক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ। এই তাপ H_1^1 এবং H_1^2 পরমাণু কেন্দ্রীনের মিলন (Fusion) ঘটায় এবং এই তাপ পারমাণবিক বিক্রিয়ার (Thermo Nuclear Reaction) ফলে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, তা পারমাণবিক বোমার শক্তির চেয়ে বহু শত-সহস্র গুণ বেশী।

বিস্ফোরণের স্থানে হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসাত্মক শক্তি অনেকটা পারমাণবিক বোমার মতই। তবে বিস্ফোরণের পরবর্ত্তী অবস্থায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের (Radio active Radiation) বেশীর ভাগই নিউট্রন কণিকার সাহায্যে উৎপন্ন।

হাইড্রোজেন বোমা ও পারমাণবিক বোমার মধ্যে প্রধান পার্থক্য নির্গত শক্তির পরিমাণে। হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, তার একটা মোটামুটি হিসেব থেকেই বোঝা যাবে: জাপানের নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল তার শক্তি ছিল ২০,০০০ টন টি, এন, টি'র সমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মাণীতে মিত্রপক্ষ যত বোমা ফেলেছিল তার শক্তি ১,৩০০,০০০ টন টি, এন, টি'র সমান। আর গত মহাযুদ্ধে মোট যত বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল তার শক্তি ৫,০০০,০০০ টন টি, এন, টি-র সমান।

১৯৫৪ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিকিনী দ্বীপে যে হাইড্রোজেন বোমা ফেলা হয়েছিল, তার শক্তির পরিমাণ ছিল ১৫, ০০০, ০০০ টন টি, এন, টি-র সমান।

হিসেব করে দেখা গেছে যে, গত ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় যে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা কার্য্য হয়েছে বা ১৯৫৬ সালের মে মাসে আমেরিকায় যে হাইড্রোজেন বোমা ফাটানো হয়েছে তাতে যতখানি শক্তি নির্গত হয়েছে মানুষের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত মোট যত বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে সে সবের মিলিত শক্তিও এর তুলনায় নগণ্য। একটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে একটি পারমাণবিক বোমার চেয়ে প্রায় ১০০০ গুণ বেশী শক্তি উৎপন্ন হয় এবং হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ও পারমাণবিক বোমার প্রায় দশগুণ বেশী স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে তিন কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে স্থান সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে অথচ সেই তুলনায় হাইড্রোজেন বোমার প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা ৯ কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধের স্থানকে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে আর বিস্ফোরণ বিন্দুর চতুর্দ্দিকে ১৬ কিলোমিটার পর্য্যন্ত জায়গায় যা কিছু থাকবে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে উত্তাপে। এত প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয় হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে যে, কাছাকাছি যত রকম ধাতু থাকে সবই গ্যাস হয়ে উড়ে যায়।

২০ মেগাটন (এক মেগাটন ১লক্ষ টন টি, এন, টি'র সম শক্তি বিশিষ্ট) বোমার বিস্ফোরণে নির্গত হয় ২০,০০০,০০০ টন টি এন, টি-র সমান শক্তি। বিস্ফোরণস্থলের চতুর্দ্দিকে ২০০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে যত ঘর বাড়ী থাকবে সব হবে ধ্বংস। ৫০০ বর্গ কিলোমিটার স্থানের মধ্যের ঘর বাড়ী বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আংশিক ক্ষতি হবে ২৫৮০ বর্গ কিলোমিটার স্থান পর্য্যন্ত।

প্যারিস শহরের আয়তন ১০৪ বর্গ কিলোমিটার এবং লণ্ডনের আয়তন ৩০০ বর্গ কিলোমিটার, শিকাগোর আয়তন ৫৫০ বর্গ কিলোমিটার ও বার্লিনের আয়তন ৮৮৮ বর্গ কিলোমিটার। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে মানব সভ্যতার এই সব কেন্দ্রগুলো এক একটি হাইড্রোজেন বোমার আঘাতেই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে যেতে পারে।

হাইড্রোজেন বোমার বিশেষত্ব এই যে, বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উচ্চশক্তি সম্পন্ন নিউট্রন কণিকার ঝাঁক চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সব নিউট্রন চারিদিকের সমস্ত পদার্থকে করে তোলে তেজস্ক্রিয় (Radio active)।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি হাইড্রোজেন জাতীয় বোমা তৈরীর চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে শোনা গিয়েছিলো যার বিস্ফোরণে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা হবে খুব কম। একে তাঁরা 'clean' বোমা বলে আখ্যা দিয়েছেন। ১৯৫৮ সালে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের জন্যে আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা তাঁদের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন। তবে তাঁরা বলেছিলেন যে, ওটা ঐ 'clean' বোমা অর্থাৎ ওর থেকে বায়ুমণ্ডলের বা প্রাণীদের তেজস্ক্রিয়কর হবার কোন ভয় নেই। কথাটা কতটা সত্যি বলতে পারবেন বৈজ্ঞানিকেরা। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের মতে হয় মানুষের সর্ব্বনাশ করার জন্যে যে অস্ত্র তা যত clean-ই হোক না কেন তার পরীক্ষাকার্য্যকে কোন রকমেই সমর্থন করতে পারি না। এ বিষয়ে একটি মন্তব্য মনে পড়ছে একজন রাজনীতিবিদের —There cannot be a clean bomb if the job it does is dirty." অনেকের মতে ঐ clean শব্দটি একটি বিরাট প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯৫৪ সালের ১লা মার্চ্চ আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনী দ্বীপে যে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন তার শক্তি ছিল ১৫,০০০,০০০ টন টি, এন, টি-র সমান। এটিকে অবশ্য তাঁরা হাইড্রোজেন বোমা বলেই জানিয়েছিলেন যদিও এর শক্তি ছিল হাইড্রোজেন বোমার শক্তির চেয়ে বহুগুণ বেশী। এই বিস্ফোরণের পরে তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতও হয়েছিল প্রচুর। জাপানী বৈজ্ঞানিকেরা এই ভস্মপাত পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে ঐ বোমায় ইউরেনিয়াম এবং ইউরেনিয়ামের Isotope U^{237} ব্যবহার করা হয়েছিল। আবার অনেক বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে, ঐ বোমায় প্রধান বিস্ফোরক ছিল U^{238}. (ইউরেনিয়াম ২৩৮)। ইউরেনিয়াম ২৩৭ কেবল বিস্ফোরণ আরম্ভকারী (Trigger) পদার্থ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ২৩৮ কম গতি সম্পন্ন নিউট্রন কণিকার দ্বারা বিভাজন করা সম্ভব নয়। সেইজন্য এক্ষেত্রে বিভাজনশীল

Reactor) প্রস্তুত প্লুটোনিয়াম ২৩৯ ব্যবহার করা হয়েছিল। ইউরেনিয়াম ২৩৮ কে ১০ mev শক্তি সম্পন্ন নিউট্রন কণিকার সাহায্যে বিভাজিত করা সম্ভব। কেবলমাত্র তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় (Thermo nuclear Reaction) (যে প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন বোমা তৈরী হয়) এত উচ্চ শক্তি নিউট্রন কণিকা যুক্ত করা সম্ভব।

এর থেকে একটা বিশেষ বোমা তৈরীর সম্ভাবনা দেখা যায়। যাকে বলা যায় পারমাণবিক হাইড্রোজেন মিলিত বোমা (Mixed Atom—Hydrogen Bomb)। প্রথম স্তরে ইউরেনিয়াম ২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম ২৩৯ এর বিভাজনে উৎপন্ন হোলো প্রচুর তাপ। দ্বিতীয় স্তরে সেই তাপ ডিউটেরিয়াম (H_1^2) এবং ট্রিটিয়াম (H_1^3) পরমাণুর মিলন ঘটিয়ে নির্গত করলো উচ্চ শক্তির নিউট্রন (Ultra hard Neutron) কণিকা। তৃতীয় স্তরে ঐ নিউট্রন কণিকার আঘাতে বিভাজন ঘটানো হোলো ইউরেনিয়াম ২৩৮এর। যার ফলে উৎপন্ন হোলো ২০,০০০,০০০ টন টি, এন, টি-র সমান শক্তি।

এই রকম একটি বোমা তৈরীর খরচ পড়বে হাইড্রোজেন বোমার মাত্র একশ ভাগের এক ভাগ।

২০ মেগাটন একটি বোমার বিস্ফোরণের এক মিনিট পর তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ হবে ৮'২×১০০,০০০,০০০,০০০,০০ (সংক্ষেপে ৮'২×১০^{১৪}) ক্যুরী। এক ক্যুরী একক মোটামুটি হিসেবে ১ গ্রাম রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার সমান। বিস্ফোরণের পর ১০ থেকে ২০ সেকেণ্ডের মধ্যে ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধের স্থানের মধ্যে যত জীবন্ত প্রাণী থাকবে তারা মারাত্মক রকমের তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়বে।

তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ অবশ্য সময়ের সাথে সাথে কমতে থাকবে বিস্ফোরণের ১০ বছর পরেও তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ থাকবে ৮,০০০,০০ ক্যুরী। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয় ভস্ম সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে গিয়ে প্রাণী জগতকে টেনে নিয়ে যাবে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে।

H_1^1—সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণু।
H_1^2—ডিউটেরিয়াম „ ।
H_1^3—ট্রিটিয়াম „ ।
He_2^4—হিলিয়াম গ্যাসের „ ।
n_0^1—নিউট্রন কণিকা।

উপরের সংখ্যাটি প্রোটন ও নিউট্রনের মিলিত (পরমাণু কেন্দ্রীনে) এবং নীচের সংখ্যাটি ইলেকট্রনের সংখ্যা বোঝাবে।

রসতরঙ্গিণী

উদেতি ঘনমণ্ডলী নটতি নীলকণ্ঠাবলি-
স্তড়িল্লসতি সর্ব্বতো বহতি কেতকীমারুতঃ।
তথাপি যদি নাগতঃ সখি স তত্র মন্যেঽধুনা
দধাতি মকরধ্বজস্ত্রুটিতশিঞ্জিনীকং ধনুঃ।

সজল জলদগণ, ব্যাকুল করায় মন,
তাহে আরো তার কোলে তড়িতের রেখা লো।
কেতকী বনের বায়, মন্দ মন্দ বহে তায়,
আনন্দে ময়ূরগণ ঘন ডাকে কেকা লো।
কি হইবে বল সোই, তথাপি সে এলো কোই,
হেন দিনে কেমনে রহিব আমি একা লো।
বুঝি মদনের পাছে, ধনুর্গুণ ছিঁড়িয়াছে,
অনুমানি সে জনের তাই নাই দেখা লো।

লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিভূষয় কৃশাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
শুদ্ধ এব যদি জীবহারকঃ
সায়কো হি গরলৈর্ন লিপ্যতে।

শুধু সুধামুখি নয়নে তব।
যদি যুবজনা মোহিত সব।
তবে বল দেখি কি ফল দেখে।
উজ্জ্বল করিছ কজ্জল মেখে।
শুধু শরে যদি জীবন হরে।
কি ফল গরল মাখিয়া তারে।

জানীমো বয়মাসনস্থ কমলে তস্যা মুখেন্দোস্থিবা
সংকোচং সমুপাগতে স ভগবান্ ত্বস্থঃ সরোজাসনঃ।
ভুগ্নঃ ভ্রূলতিকাযুগং বিহিতবান্ বক্রে দৃশৌ সৃষ্টবান্
মধ্যং বিস্মৃতবান্ কচাংশ্চ কুটিলান্ বামভ্রুবঃ সৃষ্টবান্।

অনুমানি অনুরাগে, বিধি তার আগে ভাগে,
বদনকমলখানি যতনেতে সৃজিল।
সৃজিতে সৃজিতে তায়, বসিতে ঘটিল দায়,
মুখ দেখে আসনকমল মুখ মুদিল।
ব্যস্ত হয়ে প্রজাপতি, গড়িলেন দ্রুতগতি,
তাই অতি ভুরুপাঁতি, বাঁকা হয়ে রহিল।
বেঁকিল নয়ন শেষ, কুটিল হইল কেশ,
গঠিতে মাঝারদেশ একেবারে ভুলিল।

—[illegible]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

দরবার হল রোড থেকে সমুদ্র খুব বেশী পথ নয়। মন্দিরের পেছনের সর্টকার্ট পথটি ধরে নিঃশব্দে হেঁটে চললাম আমরা। উৎসব-ক্লান্ত এর্ণাকুলাম, এখনও ঝিমিয়ে রয়েছে সুপ্তির কোলে। পথ প্রায় জনশূন্য। আমরা সুভাষ পার্কের ভেতর এসে বসলাম সমুদ্রের ধারে চওড়া বাঁধের ওপর। আকাশের শিমূলরাঙা অরুণাভা, ব্যাকওয়াটার্স-এর গভীর কালো জলের ঢেউ-এ ঢেউ-এ অনুরাগের রং ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এধারে ওধারে ছড়ানো দ্বীপের নারকোল বনে বনে উদ্দাম সাগর বাতাস মাতামাতি করছে। সাঁ সাঁ, সর, সর, শব্দে ভেসে আসছে ওদের প্রভাত সঙ্গীত।

আমরা দুজনেই বলবার মতো কথা হারিয়ে চুপ করে বসেছিলাম কিছুক্ষণ। মারুতি হঠাৎ আমার একটা হাত চেপে ধরে বললো—কাল রাতে আমি দু'টি মারাত্মক রকমের ভুল করে ফেলেছি ভাই।

—ভুল? আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলাম ওর দিকে।

—হ্যাঁ ভাই। প্রথম ভুলটি হচ্ছে তোমার বারণ না শুনে মালাবার হোটেলে যাওয়া, আর দ্বিতীয় ভুল এই যে, কাল হোটেলে আয়েঙ্গারকে দেখেও তার সঙ্গে কথা না বলে চলে আসাটা। কাল যদি আমি নিজেকে একটু কন্‌ট্রোল করতে পারতাম, তাহলে অমন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিটাও ঘটতো না।

আনন্দ উৎসব ক্ষেত্রে কাল ও যা করেছিলো সেটা অস্বাভাবিক বা অন্যায় কিছু নয়। তবুও ক্যাপ্টেন হালদারের সামনে বা বাবার সামনে ও নিজেকে খুব বিব্রত মনে করছিলো, তখন আমারও যে কি হলো,—চট করে বাইরে চলে এলাম। আর সেই কারণেই বোধ হয় ওকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। হায় যখন আমরা গাড়ীতে উঠছি ও' তখন দূরে দাঁড়িয়েছিলো অপরাধীর মত। ওর সেই ম্লান মুখখানা যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না ভাই, সারারাত চোখের সামনে জেগেছিলো তার করুণ চোখ দু'টো। কাল আমি এগিয়ে গিয়ে যদি স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতাম ওর সঙ্গে তা হলে এ-সব কিছুই ঘটতো না ভাই। বিষাদভরা চোখ দু'টি আমার দিকে মেলে দিয়ে চুপ করলো মারুতি।

—যা হয়ে গেছে সে তো আর ফিরবে না ভাই, তবুও একটা কথা না বলে পারছি না মারুতি। তুমি কাল রাতের ঘটনাটিকে কোন মন্ত্রবলে এমন সহজ করে নিতে পেরেছো জানি না তোমার এমন অসাধারণ প্রেম নিষ্ঠা, আর অটল বিশ্বাস দেখে আমি যে কতদূর আশ্চর্য্য হয়েছি, তা তোমাকে বলবার মতো ভাষা আমার নেই ভাই? তোমার অর্দ্ধেক মনোবলও যদি পেতাম আমি তাহলে—তাহলে—

আর বলতে পারলাম না আমি। আমার ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী যে আজও বলা হয়নি ওকে।

—তাহলে, তাহলে কি হতো বন্ধু? আমাকে কি বলা যায় না সে কথা?

আর বিশ্বাস মনোবল বা ধৈর্য্য এরা যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সহায়, সত্যিকারের বন্ধু ভাই!—আমরা যাকে ভালোবাসবো, শুধু কি তার শ্রেষ্ঠ গুণগুলোকেই ভালোবাসবো? তার দোষ বা দুর্বলতাগুলোকেও কি মেনে নেব না? দোষ গুণ মিশিয়ে তো একটি পরিপূর্ণ মানুষ। যখনই অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছি তাকে, তখনই তো তার সব সত্তা সকল বৃত্তিগুলোকেও স্বীকার করে নিয়েছি ভাই। এই পরম সত্যটুকু যদি সর্ব্বদা মনে রাখা যায়,—তবে অনেক ভুল বোঝাবুঝি অনেক কল্পিত দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ঐ সত্যের নির্দ্দেশকে উপেক্ষা করি,—তখনই আসে দুঃখ, বেদনা। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কথা শেষ করলো মারুতি।

এই অনন্যা মেয়েটির অসাধারণ কথাগুলো মনকে আমার আলোড়িত করে তুললো। ওর হাতটা চেপে ধরে ব্যাকুল স্বরে বললাম, আমি বলবো মারুতি! আমার সব কথা আজ বলবো তোমাকে।

এতদিন যে কথা মা ছাড়া আর কারুকে বলতে পারিনি, মানে বলবার মতো উদার মনের বন্ধু পাইনি,—আজ মনে হচ্ছে সে কথা একমাত্র তোমাকেই বলা যায় ভাই!

কাল রাতে ঐ কমলেশকে দেখে কেন যে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম,—কেন যে যেতে চাইনি ঐ মালাবার হোটেলে—সব আজ বলবো তোমায়।

—আমার বল্লার শা'র সেই সোনালী দিনগুলোর কথা,—আর পরে এই মালাবার হোটেলের তিক্ততার কাহিনী, ব্যর্থতার ব্যথা, সবই বললাম ওকে।—তারপর আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লাম ওর বুকের ওপর।

মারুতিরও দু'চোখ দিয়ে দর দর করে জল ঝরে পড়ছিলো।

—তোমার ভালোবাসা যদি সত্য হয়, তবে স্থির জেনো একদিন সে তোমার কাছে ফিরে আসবেই। কোনো অশুভ শক্তিই তোমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না বন্ধু।

দেখছো না, আকাশে আসে দুর্য্যোগের মেঘ, সূর্য্যকে ঢেকে দেয়। কিন্তু সে তো সাময়িক মাত্র, সূর্য্যের দীপ্ততেজকে নষ্ট করার শক্তি কোনো মেঘেরই নেই। খাঁটি প্রেম দুর্ল্লভ বস্তু—তাকে সহজে পাওয়া যায় না ভাই। তার জন্য দিতে হয় উপযুক্ত মূল্য।

সে আসে না সহজ সুখের পথ ধরে, আসে দুঃখ-বেদনার বন্ধুর পথে। এ পথে চলতে হলে অটুট মনোবল বা ধৈর্য্য, ত্যাগ আর নিষ্ঠাই হচ্ছে আমাদের পথের সহায় ও সম্বল।—তুমি আমাকে অকৃত্রিম বন্ধুর অধিকার ও মর্য্যাদা দিয়েছো বলেই এত কথা বলতে তোমাকে পারলাম ভাই।

কখন যে আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে রাশি রাশি কালো মেঘের স্তুপ, তা এতক্ষণ নজরে পড়েনি আমার। হু হু করে বইছে ঝোড়ো বাতাস। একটি নিঃসঙ্গ সমুদ্রবলাকা ঝটপট্ শব্দ করে উড়ে গেল কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে। পার্কে এসেছিলো দু-চারজন, তারাও ব্যস্ত পায়ে চলে গেল।

মারুতি নিজের হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বললো—ইস্! সাতটা বেজে গেছে, বাবার চা খাওয়ার সময় যে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে সে খেয়ালই ছিলো না আমার।

লজ্জিত হলাম আমি। জোর কদমে ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বললাম—আমার জন্যেই তোমার অনর্থক দেরী হয়ে গেল মারুতি।

—বা রে! বেশ মজার কথা তো বলেছো তুমি। ভোরবেলার বাবা কখন চা খান, সেটা কি তোমার জানা ছিলো? ওটা যে আমার কাজ তাই খেয়ালটা আমারই থাকা উচিত। নয় কি?

জবাব দিলো মারুতি, আমার হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে। তারপর একটু হেসে বললো,—মন ঘোড়াটা···ক'দিন বড় বেপরোয়া চালচলন সুরু করেছে দেখছি। শক্ত হাতে ওর লাগাম ধরে কষে দুচার ঘা চাবুক লাগালেই আবার ঠিক হয়ে যাবে ও।

আমার ট্রেনের বার্থ রিজার্ভেশন পাওয়া গেছে, জানুয়ারীর চার তারিখে। ওস্তাদজীকে চিঠি দিয়েছি; মাদ্রাজে উনি থাকবেন আমার জন্য। মারুতিকে সঙ্গে যাবার কথা বলতে পারা গেল না কারণ সে এখন উন্মুখচিত্তে অপেক্ষা করছে আয়েঙ্গারের জন্য। উডল্যাণ্ডসএ ফোন করে জানা গেলো যে আয়েঙ্গার সেখানে আসেনি।

উদ্বিগ্নচিত্তে আরো তিন চার দিন অপেক্ষা করবার পর আমাকে বললো মারুতি—কি করা যায় বলো তো ভাই। আমার "মালাবার" মাসিক পত্রিকাটা ছোট হলেও নিয়ম মেনে চলার জন্যে ওর সুনাম আছে। মাসের প্রথম সপ্তাহেই ওর বাজারে দেখা মিলবেই। এই নিয়ম চলছে এতদিন—কিন্তু এই প্রথম হবে তার ব্যতিক্রম। আয়েঙ্গারের উপন্যাস মরু নদী, ধারাবাহিক চলছে মালাবারে, প্রতি মাসে সবার আগে সে নিজে নিয়ে আসে উপন্যাসের লেখা। এ মাসে তো কৈ নিজেও এলো না লেখা নিয়ে, কিম্বা ডাকেও পাঠালো না। এখন কি যে করি। ওর লেখা বাদ দিয়ে তো আর বই বার করতে পারি না, অথচ···

—ওর কথার জবাবে কি যে বলবো তা ভেবে পাচ্ছি না। তবুও একটা কিছু তো বলতেই হবে। তাই বললাম,—

—আজ কালের মধ্যে মনে হয় ওঁর লেখা তুমি পেয়ে যা মারুতি। বোধ হয় কোনো বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন আয়েঙ্গা তাই দেরী করছেন। তোমার "মালাবারের", কাটতি তো বাজা বেশ ভালোই দেখলাম গ্রাহক-গ্রাহিকার সংখ্যাও মন্দ নয়,—সকলে জানে তোমার নিয়মানুবর্ত্তিতার কথা। তাই দু'একদিন এদিক ওদি হলেও তোমার পত্রিকার সুনাম নষ্ট হবে না।

একটু আশ্বস্ত হলো মারুতি আমার কথায়। আমাকে ছেড়ে দিতে মন কাঁদছে ওর,—আমারও কি উচিৎ হচ্ছে;—ওকে এখ ফেলে চলে যাওয়া?

কিন্তু কি করবো, মন যে আর কিছুতেই চাইছে না এই মালাবা উপকূলে থাকতে। যখন এসেছিলাম, তখন আনন্দে ভরপুর ছিলো মারুতির মনটি।

কত আশার শতদল ফুটেছিলো ওর মানস সরোবরে।

আর আজ? সব ফুল শুকিয়ে ঝরে গেছে বোধ হয়। নিভে গেছে এ বাড়ীর আনন্দ দীপ।

তাই দেখি মারুতির ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল দুটি চোখে, বেদনার ম্লান ছায়া। মিষ্টার মেননের মুখে, নীরব চিন্তা আর বেদনার সুস্পষ্ট ছাপ।

—হায় মাত্র তেইশ চব্বিশ দিন তো এসেছি এখানে। এদের দুঃখ, বেদনা বিপর্য্যয়গুলো কি অপেক্ষা করছিলো আমারই জন্য? তা না হলে এতদিন সব ঠিক ছিলো, আর আমি আসবার পরেই এসব ঘটলো কেন? আমি যে এই ভয়েই আসতে চাইনি মারুতির সঙ্গে। সেই প্রবাদবাক্যটি আমার বার বার মনে পড়ছে।—অভাগা যে দিকে যায়,—সাগর শুখায়ে যায়।।

আমি চলে যাবো আর একদিন পরে। কিছু কেনাকাটা করবার জন্য সকালে বেরুচ্ছি একাই,—কারণ এ সময় মারুতি থাকে ওর বাংলা শিক্ষার ক্লাশ নিয়ে।

বেয়ারা একটি রেজিষ্ট্রি করা লম্বা আকারের ভারি খাম এনে মারুতির হাতে দিলো।

খামটা আসছে আয়েঙ্গারের কাছ থেকে। সই করে খামটি রেখে দিলো মারুতি। ওর চোখে মুখে স্বস্তির আলো ঝিলমিলিয়ে উঠলো।

আমি মৃদু হাসির সঙ্গে বললাম,—যাক্ বাঁচা গেলো! যাবার আগে তোমার মুখের হাসিটা দেখা আমার বরাতে ঘটে গেলো তাহলে। উঃ, যা ভয় হয়েছিলো! তা ওটা আবার রাখলে কেন? পড়ে ফেলো পড়ে ফেলো! চিঠি এলো তোমার,—আর ঢাকঢোল বাজছে যে আমার বুকে!

ছাত্রীদের দিকে চেয়ে একটু হাসলো মারুতি। তার পর বললো— আগে কাজ সেরে নিই। তারপর সারাদিন তো আছে! তুমি ঘুরেই এসো না!

আমি গুন্ গুন্ করে গানের দু'কলি ওকে শুনিয়ে দিয়ে,—হাল্কা মন নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলাম ব্রডওয়েতে।

বিশেষ কিছু এখন কেনা হলো না। বাড়ীতে ফিরে আয়েঙ্গারের চিঠির কথা শোনবার জন্য মনটা উন্মুখ হয়েছিলো। মিষ্টার মেননের
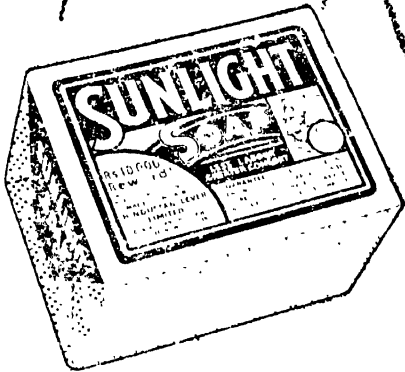
জন্তে একটি হাতির দাঁতের ছুড়ি আর সিল্কের চাদর কিনলাম। আর মারুতির জন্তে কিনলাম গেরুয়া রং জরিপাড় লাগানো বিনীর সিল্ক শাড়ী আর একটি চন্দনকাঠের কটেজ: চন্দনকাঠের কটেজটি ভারি সুন্দর দেখতে। ছোট্ট কাঠের বাংলোর সামনে রঙিন, প্ল্যাষ্টিকের ফুলের বাগান। একপাশে কলাগাছ আর একপাশে নারকোলের কাঁধি সমেত নারকোল গাছ। গাছে উঠছে একটি মানুষ।

নতুন ঘর বাঁধবে মারুতি। তাই সুন্দর ঘরটি ওকে উপহার দেবার ইচ্ছা হলো।

বাড়ীতে ফিরে মনের উল্লাসে, তর তর করে লাফিয়ে উঠে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। মারুতির ঘরের কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়ালাম। ভেতর থেকে ভেসে আসছে মারুতির গানের সুর।

—"জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসো"।

বড্ড করুণ লাগলো যেন সুরটা—আমার কানে।

মনে পড়লো,—এই গানটা—ভারি ভালোবাসে আয়েঙ্গার। বার বার তার অনুরোধে ঐ গানটা মারুতি শুনিয়েছে ওকে। আজ তার চিঠি পেয়ে বুঝি মনে পড়ে গেছে গানটাকে।

আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ মসৃণ পাথরের মেঝেতে পা-টা আমার পিছলে গিয়ে হোঁচট খেলাম। আর তখনই আমার হাত থেকে চন্দনকাঠের বাড়ীটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেলো। হুড়মুড় করে শব্দ হওয়াতে আমার দিকে ফিরে চাইলো মারুতি।

আমি প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম—কি সর্বনাশ করলাম দেখতো ভাই। কি চমৎকার বাড়ীটা কিনে আনলাম তোমার জন্তে, কিন্তু আমার অসাবধানে পড়ে গিয়ে ভেঙে টুক্‌রো হয়ে গেলো?

আস্তে আস্তে উঠে এলো মারুতি। তারপর ছড়ানো টুক্‌রোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বললো—এটা ভেঙে গিয়ে এমন কিছু ক্ষতি হয়নি ভাই—এটা আবার জুড়ে নেওয়া যাবে,—কিন্তু—কিন্তু, আমার আসল ঘরটা যে ভেঙে গেছে,—। সেটা তো আর,—।

—কান্নার ভারে কেঁপে উঠলো ওর কণ্ঠস্বর।

—আসল ঘর?

হাতের জিনিষগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে,—আমি অবাক চোখে চাইলাম ওর দিকে।

—এই যে,—পড়ে দেখো।

লম্বাখামটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ধপ্‌ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়লো মারুতি।

ওর পাশে বসে খাম থেকে এক গোছা কাগজ বার করে পড়তে সুরু করলাম আমি থর থর করে কাঁপছে আমার চিঠিধরা হাতখানা। যন্ত্রণার সাপটা যেন পেঁচিয়ে ধরছে আমার কণ্ঠনালীটা।

মাথা ঘুরছে। ঝাপসা দেখছি চোখে তবুও পড়ছি আয়েঙ্গারের লেখাটা।

—"এতদিন ধরে যে কথাগুলো তোমাকে বলবার জন্ত বার বার আপ্রাণ চেষ্টা করেও বলতে পারিনি,—আমার সেই অপরিসীম লজ্জাকর কলঙ্ক কালিমালিপ্ত জীবন-ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা, তোমাকে নিবেদন করছি মারুতি। যদি পারো এ হতভাগ্যকে ক্ষমা কোরো। তুমি জানো, আমি মাকে হারিয়েছি আমার পাঁচ বছর বয়সে এবং বাড়ীতে আর কোনো স্ত্রীলোক না থাকায় বাবা আমাকে এক বিলাতি স্কুলের বোর্ডিংএ রেখেছিলেন। বা[illegible] আর বিয়ে করেন নি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আদর্শনিষ্ঠ সা[illegible] প্রকৃতির মানুষ। প্রথম জীবনে আমিও অসাধু ছিলাম না মারুতি।

বাবার ছিল ওষুধের কারবার।

আমি ইংরাজিতে এম, এ পাশ করবার পর বাবার ইচ্ছা আমি তাঁর ব্যবসায়ে যোগ দিই। আমার কিন্তু প্রবল বাসনা, একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার।

বাবা রাজি হলেন আমার প্রস্তাবে,—দশ হাজার টাকাও দিলেন।

ঐ টাকায় আমি আমার "সুন্দরম্" পাবলিকেশনের পত্তন সুরু করলাম।

প্রথমে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ ইংরাজি বই-এর অনুবাদ করলাম আমার মাতৃভাষায়। শিক্ষিত মহলে খুব সমাদর পেলো বইগুলো। আমারও কাজে উৎসাহ বেড়ে গেলো। তারপর ভারতের নামকরা সাহিত্যিকদের বই-এর অনুবাদ আর এদেশের সাহিত্যিকদের বই প্রকাশ করে টাকা ও সুনাম দুই-ই অর্জ্জন করলাম।

প্রায় বছর চারেক আগেকার কথা বলছি,—আমার একজন লেখক বন্ধু শ্রীনিবাস আহারের মাধ্যমে আমার আলাপ হল এক পাঞ্জাবী মহিলার সঙ্গে।—নাম ওর কমলেশ কাপুর। মেয়েটি চটপটে, কথাবার্ত্তা নাচ, গান, ফিরিঙ্গিয়ানা ভাব, সব কিছু দিয়ে আমাকে আকৃষ্ট করেছিলো। তবে মাঝে মাঝে আমার মন বলতো, ওর সব কিছু ছেলেধরার জাল বিস্তার করা আর আসল মানুষটা ঝুটো। মনের সে সাবধান বাণীর দিকে আমি কর্ণপাত করিনি, কারণ তখন আমি সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত। বাবার কাছে বললাম, কমলেশকে আমি বিয়ে করবো।

বাবা ঘোরতর আপত্তি জানালেন আমার প্রস্তাবে। অন্য দেশের মেয়ে বলে নয়, বাবার ভালো লাগেনি ওকে। বাবা স্পষ্টই জানালেন যে, ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তিনি নিজে আমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

অগত্যা আমি বললাম কমলেশকে—গোপনে রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করতে ওকে আমি রাজি আছি। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কমলেশ জবাব দিলো—ওতে আমার মত নেই। তোমার পাশে বসে গাড়ীতে আমি বেড়াতে পারবো না। তোমার স্ত্রীর সম্মান কেউ দেবে না। তার চেয়ে আমরা যেমন আছি, এখন তেমনি থাকি। তোমার ব্যবসার আরো উন্নতি হলে, কিম্বা তোমার বাবা যদি হঠাৎ মারা যান তখন বিয়ে হবে।

মাদ্রাজে খুব গোপনে ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে হত বাবার ভয়ে। সেজন্ত ওর বিশেষ চাহিদা মেটাবার জন্ত মাঝে মাঝে উটকামণ্ড, কুনুর অথবা কোচিনে যেতে হতো আমাদের। বাবা জানতেন আমি ব্যবসার জন্ত যাচ্ছি। কমলেশের সব চেয়ে পছন্দ ছিলো কোচিনের সমুদ্রঘেরা উইলিংডন আইল্যাণ্ডের মালাবার হোটেলটিকে।

বেশ নিরিবিলি জায়গাটা, চেনামুখের বালাই নেই। তবে ঘর বেশী নেই তাই যখন-তখন পাওয়া সম্ভব হয় না। কমলেশের অনুরোধে তাই ওখানে দুটি ঘর আমি বার্ষিক ভাড়া দিয়ে রিজার্ভ করে রেখেছিলাম এক বছরের জন্ত। ঐ সময় মালাবার হোটেলে কমলেশের ব্যবস্থাপনায় তোমার বন্ধু রমলারা এসেছিলেন কয়েক দিনের জন্ত।

চাকরী করতো কমলেশ নামে মাত্র। প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের টাকা ওর পেছনে আমাকে খরচ করতে হতো।

ক্রমে ওর কাছে আমি মদ খেতেও শিখলাম। এইভাবে বছর খানেকের মধ্যেই আমার ব্যবসার চরম অবনতি ঘটলো টাকার অভাবে। চারিদিকে দেনা। বাবা অবশ্য আবার আমায় টাকা দিলেন আর সাবধান করে দিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি আর টাকা দেবেন না।

এরপর ব্যবসার দিকে আমি বিশেষ মনোযোগ দিলাম। বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। মালাবার হোটেলের ঘরও ছেড়ে দিলাম। কমলেশকে বললাম—এত খরচ আর আমি চালাতে পারছি না, তার চেয়ে এস আমরা বিয়েটা সেরে ফেলি। তারপর তোমার ফ্ল্যাটেই থাকবো আমি। বইএর বিজনেস ছাড়াও আমি প্রফেসারী করে কিছু উপার্জ্জন করতে পারবো, আর এতেই আমাদের মোটামুটি চলে যাবে।

রাজি হলো না কমলেশ, বললো—তাড়া কি? আরো কিছুদিন যাক না।

তখনও আমি ওকে চিনতে পারিনি, পরে শুনেছিলাম যে আমি ছাড়াও এরকম প্রণয়ী ওর আরো অনেক ছিলো। সে কোনো ধনী ব্যক্তির মনোরঞ্জন করে টাকা উপার্জ্জন করাই ওর পেশা। পাঞ্জাব থেকে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ওর মা-বাপ এসেছিলো কলকাতায়। এখন ওর বাবা সেখানে একটি হোটেল চালাচ্ছে। আর সেই হোটেলেই ওর বাবার সঙ্গে আলাপ হয় মাদ্রাজ রেলওয়ের একজন বড় অফিসারের সঙ্গে। তার সঙ্গে কমলেশ চলে আসে মাদ্রাজে ষ্টেনোর চাকরী পেয়ে। সেই ভদ্রলোকই চাকরীটা করে দেয়। অনেকগুলি ভাই বোন ওরা, হোটেলের আয়ে সংসারের স্বচ্ছলতা আসে না, তাই কমলেশ টাকা পাঠায় ওদের। এসব কথা আমি অনেক পরে শুনেছিলাম।

আমার কাছ থেকে প্রাপ্য টাকার অঙ্ক কমে যাওয়াতে কমলেশের আমার প্রতি আকর্ষণও কমে গেলো! একদিন হঠাৎ কারুকে কিছু না জানিয়ে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো। মাসখানেক পরে একটা ক্যাডিলাক গাড়ীতে দেখলাম ওকে, পাশে বসেছিলেন একজন আধা-বয়সী ভদ্রলোক। লেখক বন্ধু আয়ারের কাছে জানলাম যে কমলেশ বিয়ে করেছে ওকে। ভদ্রলোকটি সিন্ধি, সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে ওঁর। মাদ্রাজে আর বোম্বেতে আছে ওর হীরে-জহরতের গহনার দোকান। কমলেশ ওর স্ত্রীবিয়োগের পর থেকেই মাঝে মাঝে ওঁর দোকানে গিয়ে বাছা বাছা টোপ ফেলে ওঁকে গাঁথবার চেষ্টা করতো, একদিন সেই টোপে ধরা দিলেন ভদ্রলোক। তারপর বোম্বে থেকে শুভকাজ সেরে ফিরেছে কমলেশ!

এতদিনে আমার মোহভঙ্গ হল। স্ত্রীজাতির ওপর মনে জাগলো প্রবল বিতৃষ্ণা! মনে হলো প্রত্যেকটি মেয়েই বোধ হয় এই রকম। তাই বাবার অনেক চেষ্টাতেও আর কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হলাম না আমি! এই সময়ে হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। ওষুধের কারবার দেখাশোনার অভাবে প্রচুর লোকসান হতে লাগলো! অগত্যা ওটা আমি বিক্রি করে দিলাম।

এবারে অধঃপতনের পিছল পথে হু হু করে নেমে চললাম আমি? মদ আর সমাজ পরিত্যক্তা মেয়ে মানুষদের মধ্যে ডুবে রইলাম আমি। তখন আমার মনে হতো যে, সমাজের উঁচুতলায় বাস করে যে সব আলোকপ্রাপ্তা মহিলারা, কালচার নামে খোলসের আড়ালে যাদের আছে শুধু নারকীয় অন্ধকার, ওদের চেয়ে অনেক ভালো এই দেহবিলাসিনীরা। ওরা দেহ দিয়ে পয়সা নেয়, কিন্তু ভালোবাসার ভান করে, বিষের ছুরি বুকে বসায় না। এই ভাবে কেটে গেলো আরো একটি বছর। তারপর জানি না কোন পুণ্য বলে, তোমার সঙ্গে দেখা হলো বোলগাডিন প্যালেসে।

প্রথম আলাপেই মনে হয়েছিলো যে এমন মেয়ে যে এই পৃথিবীতে আছে সে কথা আমার এতদিন জানা ছিলো না।

কেমন করে জানবো বলো।

মা, মাসি, পিসি, কাকি, জেঠি, বা বৌদি, দিদি কারুর সঙ্গই তো পাইনি আমি জীবনে। কমলেশ কাপুরই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। নাটক নভেলে পড়েছি ভালো মেয়েদের কথা, কিন্তু তাদের দেখবার, জানবার সুযোগ আমার জীবনে আসেনি মারুতি!

তাই তোমার সংস্পর্শে আসবার পর আমার মনে হলো, এ পৃথিবীতে শুধু নরকই নেই, স্বর্গও আছে।

[ক্রমশঃ।

বিদুষী আর্য নারী

সাবিত্রী সেনগুপ্তা

পূর্বকালে ভারতের আর্যনারীরা বেদের মন্ত্র পর্যন্ত সংকলন করবার অধিকার লাভ করেছিলেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্ববারা ঘোষা, সূর্যা, ইন্দ্রাণী, যমী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী মহিলাগণ। ঋগ্বেদ পাঠ করলে জানা যায় সে যুগে মহিলারা একাধারে তপশ্চারিণী ও বিদুষী। আর্যগণ যখন অনার্য জাতির সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকতেন, তখন স্বামীদের কল্যাণের জন্য তাঁদের পত্নীগণ যজ্ঞশালায় বসে নিজেরাই হোম করতেন। পুরাকালে মহিলারা যুদ্ধে সৈনিকবৃত্তিও করেছিলেন। এমন উল্লেখও ঋগ্বেদে রয়েছে। নমুচির অধীনে অসংখ্য স্ত্রী-সেনা ছিল। স্ত্রী-সেনারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে যুদ্ধ করত।

নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে আমরা আধুনিক যুগকে অত্যন্ত অগ্রসর যুগ মনে করে গর্ব বোধ করি কিন্তু বৈদিক যুগও সেই অনুপাতে কম অগ্রসর ছিল না। সে যুগেও পুত্র কন্যাদের জীবন সংগঠন করবার জন্য মাতাকে সুশিক্ষা লাভ করতে হত। তখনকার লোকের এই সংস্কার ছিল যে, মাতা সুশিক্ষিতা না হলে পুত্র কন্যাদের সুশিক্ষা সম্পন্ন হতে পারে না।

তাই বৈদিক যুগে শিক্ষাদান বিষয়ে মাতারই ছিল প্রাধান্য। ভারতের প্রাচীনতম জ্ঞান-শাস্ত্রে, উপনিষদে তার উল্লেখ রয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই তারই এক জ্বলন্ত চিত্র। মহারাজ জনক পণ্ডিতমণ্ডলী শোভিত রাজসভায় উপবিষ্ট। এমন সময় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তথায় উপস্থিত হলেন। মহারাজ মহর্ষিকে সম্ভ্রম সহকারে আসন প্রদান করে জিজ্ঞাসা করলেন,—"হে মহর্ষি! আপনি কি পুনরায় স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত গোধন লাভ করবার জন্য এসেছেন অথবা আমার দুর্বোধ্য প্রশ্নসকল শুনবার জন্য এসেছেন?"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বললেন,—"মহারাজ আমি উভয়ের জন্যই এসেছি।" ইতিপূর্বে অনেকবার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজের নিকট থেকে স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত সহস্র ধেনু লাভ করেছিলেন। সেগুলি ছি তাঁর জনক রাজারই কঠিন প্রশ্নের সদুত্তর দানের পারিতোষিক।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করলেন,—"মহারাজ আপনি কার কা থেকে এমন জ্ঞানলাভ করেছেন?"

জনক বললেন,—আচার্য জিত্বার কাছ থেকে আমি এ স মহামূল্য জ্ঞান লাভ করেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—জিত্বার জ্ঞানভাণ্ডার সত্যি পরিপূর্ণ, কার তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। শু ধর্মজ্ঞানই নয়, রাজনীতি-জ্ঞানও জিত্বার অফুরন্ত। জননীর কাছ থেকে তিনি রাজনীতিও শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

এমন দৃষ্টান্ত বৈদিক এবং পৌরাণিক উভয় যুগেই অনেক রয়েছে। পুত্র কন্যাদের শিক্ষাজীবনে মাতার যেখানে পরিপূর্ণ প্রভাব। মদালসার চরিত্রটি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

গন্ধর্ব রাজবংশে মদালসার জন্ম। তিনি ছিলেন রূপবতী, গুণবতী ও বিদুষী। তাঁর পিতার নাম বিশ্বাবসু। ঋতধ্বজ নামক এক রাজার সঙ্গে মদালসার বিবাহ হয়। কালক্রমে তাঁর গর্ভে বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দন ও অলর্ক নামে চারিটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র শৈশবে মাতার নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করে।

একদা জ্যেষ্ঠপুত্র বিক্রান্ত রোদন করতে করতে মায়ের নিকট এসে বলল,—মা, কয়েকটি বালক খেলা করতে করতে আমাকে প্রহার করেছে ও কটুবাক্য বলেছে। আমি রাজপুত্র, তাদের এ ব্যবহার আমার পক্ষে অসহ্য। আপনি বাবাকে বলে শীঘ্র এর প্রতিকার করুন।

মদালসা বললেন,—বৎস তুমি বৃথা ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশ করছ। কারণ, তোমার আত্মা সদা শুদ্ধ, সদা আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ। স্বভাবকে পরিত্যাগ করে কোন বস্তুই পৃথকভাবে থাকে না। অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা। উষ্ণতাকে পরিত্যাগ করে অগ্নি কখনো স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে না। জ্ঞান ও আনন্দই তোমার আত্মার স্বভাব। কাজেই তুমি জ্ঞানহারা হয়ো না। অন্তরে দুঃখ বোধ করাও তোমার উচিত নয়। আত্মার নির্মল প্রকাশ যখন অবিদ্যা ও মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখনই মানুষের মনে জড়তা, ক্ষুদ্রতা ও ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। অহঙ্কার, সম্মানবোধ সমস্তই তোমার মনঃকল্পিত মাত্র। অতএব রাজপুত্র বলে তোমার মত শিক্ষিত বালকের পক্ষে অভিমান করা উচিত নয়।

এই কথা শুনে বিক্রান্তের ক্রোধ ও অভিমান অনেক পরিমাণে লাঘব হল।

মদালসা পুনরায় বললেন,—তোমার দৃশ্যমান এই শরীর, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূতের বিকারমাত্র। তোমার আত্মা দেহস্বরূপ নয়। তোমার আত্মা দেহ হইতে পৃথক পদার্থ। বাল্য, যৌবন, বার্ধক্যবশতঃ দেহের ভিন্ন ভিন্নরূপ পরিণতি ঘটলেও আত্মার কোনরূপ পরিণতি ঘটে না। আত্মা পরিণতিবিহীন অবিনাশী। জড়দেহ ভস্মীকৃত ও মৃত্তিকাময় হয়ে গেলেও চেতন-আত্মা ভস্মীকৃত ও মৃত্তিকাময় হয়ে যায় না। অতএব সেই কটুভাষী দুষ্ট বালকের দুষ্ট ভাষণে তোমার আত্মার কোন ক্ষতিই হয়নি। প্রহারে তোমার শরীর সামান্য আহত হয়েছে মাত্র। নিজের আত্মাকে উন্নত কর, যাতে ক্ষুদ্র চিন্তা মন থেকে দূরীভূত হবে। দেহকে কঠিন কর, যাতে আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা জন্মাবে।

মদালসার এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করে বিক্রান্তের অন্তরে তত্ত্বজ্ঞান জন্মেছিল। সে দুঃখ ও অভিমান ত্যাগ করে বাল্যকালেই বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিল। অগ্রজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুবাহু ও শত্রুমর্দন সেই পথ অবলম্বন করেছিল।

রাজা ঋতধ্বজ শঙ্কিত হলেন। পত্নী মদালসার শিক্ষাদানের ফলে তিন পুত্রই সন্ন্যাসী হল, তা দেখে তিনি ভাবতে লাগলেন মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য কে রক্ষা করবে? রাজার অভাবে রাজ্য হবে অরাজক ও বিদ্রোহে পরিপূর্ণ। এখন একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র অলর্কই আশা ভরসার স্থল। অলর্ককে সংসারে আবদ্ধ করে রাখতে পারলেই রাজ্যের ভাবী মঙ্গল সাধিত হতে পারে।

ঋতধ্বজ মদালসার নিকটে গিয়ে বললেন,—রাণী তোমার শিক্ষা প্রভাবে তিন পুত্রই আজ সংসার বিরাগী। চতুর্থ পুত্রের যদি ঐরূপ দশা ঘটে তা হলে আমার অবর্তমানে কে রাজ্য পালন করবে? তুমি তাকে ঐরূপ শিক্ষা দিও না। আত্মতত্ত্ব শিক্ষা অতি উত্তম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অলর্ককে রাজনীতি শিক্ষা দিও। তাহলেই এই পুত্রটি রাজগুণে বিভূষিত হয়ে প্রজাপালন করতে সমর্থ হবে।

মদালসা রাজার এই কথা শুনে বললেন,—মহারাজ তাই হবে, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি অলর্ককে রাজনীতি শিক্ষাই দেব।

অতঃপর অলর্ক যৌবন প্রাপ্ত হলে মদালসা তাকে রাজনীতি উপদেশ প্রদান করতে লাগলেন। মদালসা বললেন,—হে বৎস অলর্ক, সুবিবেচনা ও সুপরামর্শ সহকারে রাজ্য শাসন করলে রাজা সর্বজনপ্রিয় হয়ে থাকে। যিনি প্রজার চিত্ত রঞ্জন করতে পারেন তিনিই প্রকৃত রাজা। তুমি রাজা হয়ে কখনো প্রজাসত্ত্ব লোপ করো না। রাজা বা রাজপুরুষের দ্বারা ক্রমাগত উৎপীড়িত হলেই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। প্রজার ধর্মে রাজার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বরং যাতে প্রজারা নির্বিঘ্নে স্ব স্ব ধর্ম প্রতিপালন করতে পারে সে বিষয়ে রাজার সহায়তা করা উচিত। যদি তোমার প্রজাগণ তোমার নিকটে কোন প্রকার অভাবের বা কষ্টের অভিযোগ আনয়ন করে, তার যথাসাধ্য প্রতিকার করবে। প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতাই রাজ্যের সুদৃঢ় মূল ভিত্তি।

মিত্র ও সভাসদগণের চাটুবাক্যে কখনো বিমোহিত হয়ো না। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ এবং আশ্রয় এই ছয়টি বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা করে যখন যেখানে যেরূপ বিধেয় তখন সেখানে সেইরূপ কার্য করবে। প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি সম্পন্ন হইও। প্রভুশক্তি অব্যাহত থাকলে রাজপুরুষদের দোষে রাজকার্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না। রাজ্যে শান্তির ব্যাঘাত ঘটে না। রাজপুরুষদের যথেচ্ছাচারিতা লোপ পায়। রাজার মন্ত্রিগণ সুদক্ষ হলে রাজা তাদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেও কিছুক্ষণের জন্য বিদেশ গমন বা পররাজ্য আক্রমণে ব্যাপৃত থাকতে পারেন। রাজার উৎসাহশক্তি অব্যাহত থাকলে রাজ্যে নানা হিতকর কার্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং যুদ্ধে জয়লাভ ঘটে।

এই রূপ বহু মূল্যবান রাজনীতি শিক্ষা মদালসা তাঁর পুত্রকে দিয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় রাজনীতি বিষয়েও নারীদের কি অগাধ জ্ঞান ছিল।

রাজ্য শাসনের নিমিত্ত যে সমস্ত জ্ঞান মদালসা পুত্রকে দিয়েছিলেন তাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতিজ্ঞ পুরুষদের চাইতে মদালসার জ্ঞান কোন অংশে কম ছিল না। পুত্রকে বলেছিলেন,—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চারটি সেনাঙ্গকে সর্বদা পরিপুষ্ট রাখবে। যখন কোন দেশ জয় করবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করবে তখন মৌল, ভৃত্য, সুহৃদ, শ্রেণী, দ্বিষৎ ও আটবিক এই ছয় প্রকার বল সংগ্রহ করবে। বংশ পরম্পরায় রাজ সেবায় নিযুক্ত রাজার চির-ভক্ত সৈন্যের নাম মৌলবল। রাজার বৃত্তি ভোগী সৈন্যের নাম ভৃত্যবল। যুদ্ধকালে নানা স্থান থেকে সমাহৃত নির্ধারিত সময়ের জন্য রাজার প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত নিয়োজিত সৈন্যের নাম শ্রেণীবল। যুদ্ধকালে রাজার সাহায্যার্থে সমাগত মিত্ররাজ-সৈন্যের নাম সুহৃদ্‌বল। উৎকোচ ও ভেদনীতি প্রভৃতি উপায় দ্বারা শত্রু পক্ষ থেকে স্বপক্ষে আনীত সৈন্যের নাম দ্বিষবল। আর গিরিকান্তার বন প্রভৃতি স্থান অতিক্রমে কুশল সর্বত্র গমনক্ষম অরণ্যচর সৈন্যের নাম আটবিকবল।

মহানিষ্টকারী দুর্মতি শত্রুগণকে দমন করবার জন্য ভেদ, দণ্ড, সাম ও দান এই চার প্রকার উপায়ের মধ্যে যে কোন একটি দ্বারা অথবা সমগ্র চারটি উপায় দ্বারা স্বীয় কার্য সাধন করবে। কিন্তু সহসা যুদ্ধ বাধাবে না। যার যেরূপ মান মর্যাদা, তাকে সেরূপ মান মর্যাদা দিবে। গুণীর গুণের সমাদর করবে রাজ্য বিষয়ক অতি গুপ্ত মন্ত্রণা যেন ষটকর্ণে প্রবেশ না করে। অর্থাৎ তুমি তোমার প্রধান মন্ত্রী ও অপর দু' তিনজন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের মধ্যেই যেন সেই মন্ত্রণা সীমাবদ্ধ থাকে। অতি বিশ্বাসী প্রধান গুপ্তচর দ্বারা নিজের প্রজাগণের ও পররাজ্যের অবস্থা অবগত হবে।

এইরূপ ভাবে মদালসা প্রতিদিন নানাবিধ রাজনীতি ও উপদেশ প্রদান করে কনিষ্ঠ পুত্র অলর্ককে সুশিক্ষিত করে তুললেন। কয়েক বছরের মধ্যে অলর্ক রাজা হবার মত উপযুক্ত ও গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তখন রাজা ঋতধ্বজ বুঝতে পারলেন যে তাঁর পত্নী মদালসা কেবল মাত্র ধর্মশাস্ত্রেই সুপণ্ডিতা নহেন, তিনি রাজনীতি শাস্ত্রেও অসাধারণ বিদুষী।

যথাসময়ে রাজা ঋতধ্বজ অলর্ককে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। অনন্তর গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করে রাণী মদালসাকে সঙ্গে নিয়ে করলেন বানপ্রস্থ অবলম্বন। তপোবনে গমন করবার পূর্বে মদালসা অলর্ককে একটি বিরাট অঙ্গুরী প্রদান করে গেলেন। বললেন,—বৎস, যখন তুমি শত্রু কর্তৃক প্রপীড়িত হয়ে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করবে, যখন কোন কারণবশত তোমার ধৈর্য, স্থৈর্য ও শান্তি বিনষ্ট হবে তখনই এই অঙ্গুরীর মধ্যে যা লেখা আছে তা পাঠ করবে।

পিতা মাতা বনে গমন করার পর অলর্ক মাতৃদত্ত রাজনীতি উপদেশ অনুসারে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যেই লাভ করলেন তিনি প্রজানুরঞ্জক রূপে খ্যাতি। রাজার প্রশংসাবাদ গিয়ে পৌঁছাল তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবাহুর কানে। ঈর্ষান্বিত হয়ে তিনি বৈরাগ্য ধর্ম বিস্মৃত হলেন। অলর্কের রাজ্য আত্মসাৎ করবার জন্য তাঁর পরম শত্রু বারাণসী রাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন।

বারাণসী-রাজ দূত পাঠালেন অলর্কের নিকটে। দূত গিয়ে বলল,—রাজকুমার সুবাহু আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিনি এক্ষণে রাজ্যাভিলাষী। ভারতীয় রাজনীতি শাস্ত্র অনুসারে তিনিই রাজ্যের অধিকারী। অতএব আপনি তাঁর হস্তে আপনার রাজ্যভার সমর্পণ

করুন। নতুবা বারাণসী রাজের সহায়তায় তিনি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

রাজা অলর্ক জবাব দিলেন—আমার পিতা ও মাতা আমাকে উপযুক্ত বিবেচনা করেই আমাকে রাজ্য প্রদান করেছেন। কাজেই বারাণসী রাজের কথায় ভীত হয়ে আমি রাজ্য ত্যাগ করব না। তাতে যুদ্ধ বাধে বাধুক।

দূত বারাণসী ফিরে গিয়ে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করল। বারাণসী-রাজ ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হলেন। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। বারাণসী-রাজের অধিক সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ থাকায় অলর্ক সেই যুদ্ধে পরাজিত হলেন।

মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠল অলর্কের মন। ধৈর্য, স্থৈর্য ও শান্তি ব্যাহত হল। এই বিপর্যয়ের সময় তাঁর মাতৃদত্ত অঙ্গুরীর কথা মনে পড়ল। অঙ্গুরী খুলে তিনি পাঠ করলেন মাতৃ উপদেশ। তাতে লিখিত রয়েছে—মূঢ় সংসারাসক্ত মানুষের সংসর্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবে। সাংসারিক কামনা দূর করে মুক্তি পথে অগ্রসর হওয়াই বিজ্ঞতার পরিচায়ক। মুক্তিই বিষাদ রোগের একমাত্র মহৌষধ।

অলর্কের চোখের সামনে যেন এক নতুন জ্ঞানের দ্বার খুলে গেল। বুঝতে পারলেন, ঘূর্ণায়মান জগতে সুখ ক্ষণস্থায়ী। অস্থায়ী রাজ্যের ভোগের প্রত্যাশায় মত্ত হওয়া জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

বিনা দ্বিধায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে রাজ্য তুলে দিয়ে চলে গেলেন অলর্ক। হৃতরাজ্যের জন্য কোন দুঃখ ও ক্ষোভ তাঁর মনে রইল না।

এমন সুন্দর ও নির্বিরোধ রাজনীতির পরিচয় এ যুগেও দুষ্কর। ভ্রাতায় ভ্রাতায় সংঘর্ষ ঘটা যেখানে অস্বাভাবিক নয়—সেখানে এমন কৌশলে বিরাট বিপর্যয়কে এড়িয়ে যাওয়ার সমাধান বাস্তবিক অচিন্তনীয়। এমন কূট রাজনীতি প্রাচীনযুগেও একজন ভারতীয় মহিলার মস্তিষ্ক প্রসূত ছিল—এ-কথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

সুদূর পিয়াসিনীর ডাইরী

শ্রীমতী বনানী সেন

রোজনামার কয়েকটা ছেঁড়া পাতা আজ আপনাদের দরবারে উপস্থিত করছি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অর্ঘস্বরূপ। ভাল লাগবে কি না জানি না, তবু আপনাদের ভাল লাগার উপরই এর মূল্য নির্ভর করছে। সমুদ্রতট থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে বসে নির্জনতার গভীরতম অনুভূতির রোমাঞ্চ অনুভবের মাঝে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই, একদিন কাগজকলমের মিতালিতে মনের যে ভাব মুখর হয়ে উঠতে চেয়েছিল, আজ জনকোলাহল মুখরিত মহানগরীর দরবারে তার মূল্য যাচাই করতে' যাওয়া হয়ত ধৃষ্টতা মাত্র, তবু কত যে অজানারে জেনেছি আমি—তা আপনাদেরও জানিয়ে দেবার সাধ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারলাম না কিছুতেই। বিচিত্র অনুভূতির বিরাট তাগিদ, লেখনীর অক্ষমতাকেও বারে বারে অস্বীকার করে তাই মুখর হয়ে উঠতে চায়।

কুয়াশাচ্ছন্ন বাগোড়া দার্জিলিং জেলার এক পার্বত্য অঞ্চল। অতিথি হিসাবে এখানে আমি ঘর বেঁধেছি মাত্র পনের দিনের জন্য। "একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু" আবিষ্কারের মোহে ন নিতান্তই প্রাণ ধারণের তাগিদে। তবু এই তাগাদার পিছনে মনে অগোচরে হয়ত' বা কিছুটা সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল। নইলে বনানী বিরাট সম্ভাবনাময় এই বিচিত্র রূপের অপূর্ব প্রকাশ কেনই বা আমা চোখে মোহাঞ্জন এঁকে দেবে? জনকোলাহলের সীমানা ছাড়ি সাত হাজার ফুট উঁচুতে বসে বাগোড়া যেন নিজের মধ্যে নিজে আত্মসমাহিত হয়ে আছে। হিমালয়ের আত্মজা সে, তাই তা আত্মসম্মান বুঝি কারো চেয়ে কম নয়। উপযাচিকা হয়ে সে নিজে কথা বলে না, তার কথা শুনতে হলে প্রার্থী হয়ে এগিয়ে যেতে হয় গ্রহীতা হয়ে গ্রহণ করতে হয়, তবেই না হিমের আলয়ের একান্ত গোপনতার কিছুটা হদিস মিলতে পারে।

মাত্র পনের দিনের মেয়াদ। সুসভ্য নগরীর একান্ত কাছে থেকেও উপেক্ষিতার বঞ্চনা সইতে হয় বলেই কি বাগোড়ার বুকের সমস্ত অভিমান অমন করে গুমরে উঠে তার বিস্তৃত অরণ্যানীর মর্মরধ্বনির মাঝে? ঠিক বুঝতে পারি না। তাই শীতের হিমেল হাওয়ায় গায়ে মোটা চাদর জড়িয়ে অবসর সময় আমি বাগোড়ার পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াই; চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে—কখনও বা উঁচু থেকে নীচুতে আবার কখনও বা নীচু থেকে উঁচুতে উঠে যাই। অচেনা পান্থ আমি—অজানা মানুষের সঙ্গলাভের আশায় কান পেতে থাকি তাদের না বোঝা বাণীর মাঝে। জীবনের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়টি শরীরের অজুহাতে বারে বারে তীব্র প্রতিবাদ জানায়—, আমি ত' আরণ্যক নই, কেনই বা আমার এই অনুসন্ধিৎসা। তাকে বোঝাতে পারি না অভ্যাস অনভ্যাসের প্রশ্ন এখানে কই! অজানার আহ্বান জীবনের সমস্ত স্বাভাবিকতাকে অগ্রাহ্য করে যখন বন্ধন হারা হয়ে ছুটে চলতে চায় তখন অভ্যস্ত সড়কের বাঁধা পথে কেনই বা মিছে ঘুরে মরি? "অজানাকে ভয় কি আমার ওরে, অজানাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে—" ক্ষণিক ছুটির অবকাশে বিরাট পাওয়ার সম্ভাবনাকে কোন অজুহাতেই হারাতে রাজি নই আমি। তাই এবার বাঙ্গালী ঘরের লাজ নম্র বধূকে মণিপুর রাজকন্যার মতই বিদ্রোহিণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। পরিণামে মেলে সস্নেহ প্রশ্রয়। অভিজ্ঞতার পরিধি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে; সেই সঙ্গে দিনান্তের স্নিগ্ধ আলোয় কালির আঁচড়ে ভরে উঠে রোজনামার শূন্য পাতাগুলি।

দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলগুলির মধ্যে বাগোড়া অন্যতম। 'ঘুম' পেরিয়ে 'জোড়বাঙ্গলো' দিয়ে পুরানো মিলিটারী সড়ক ধরে অথবা 'টুঙ্' ছাড়িয়ে 'দিলারাম' হয়ে আপনি অনায়াসে এসে পৌঁছাতে পারবেন এই বাগোড়ায়। 'হিলকার্ট' রোডের দু'পাশের সৌন্দর্যও হার মানবে এই পুরানো মিলিটারী সড়কের দু'পাশের সৌন্দর্য লীলার কাছে। প্রকৃতিরাণী তার শিল্প সৃষ্টির অপূর্ব নিদর্শন এঁকে দিয়েছে এই সড়কের দু'পাশের পটভূমির উপর। এই শিল্পসম্ভার প্রকৃতির শান্ত রূপেরই নিদর্শন যেন—অথচ তার মধ্যেই মাঝে মাঝে শাণিত তরবারির মতই ঝিলিক্ দিয়ে উঠেছে ভয়ঙ্করের পূর্বাভাষ। কোথাও নেমেছে ধ্বস, কোথাও পাহাড়ের স্খলিত পাথরকে সঙ্গে করে সশব্দে নেমে আসছে হিমালয়ের বুকে সঞ্চিত পীযূষ নির্ঝর—সংহারের মূর্তিতে যে কোন মুহূর্তেই আপনাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে সর্বনাশের অতল পাথারে। "আসা যাওয়া পথের ধারে"—প্রায়ই লক্ষ্য করেছি প্রকৃতির

এই সৃষ্টি ও প্রলয়ের ভয়ঙ্করতাকে। যেন সমস্যা আর সমাধান এক সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে এগিয়ে চলেছে নূতন সম্ভাবনার আবির্ভাবকে সহজ করে তোলবার জন্য। তাই যেখানে নেমেছে ধ্বস্ সেখানকার গড়িয়ে পড়া পাথররাশির স্তূপ পরিষ্কার করে তিব্বতী সর্বহারার দল বানিয়েছে তাদের পাতার কুটীর; ঝর্ণার পায়ের কাছে জড়ো হওয়া পাথরের উপর ভুটানী মজুরাণী চাপিয়েছে রান্না—দিনের শেষে এই পাতার কুটীরে ফিরে আসবে তার ক্লান্ত বঁধুয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে। তাই হয়ত' আয়োজন চলেছে তার পিপাসা মেটাবার। সাকী না কল্যাণী? কে জানে, যাই হোক্ না কেন, কল্যাণময়ীও বটে। নারীর এই কল্যাণময়ী মূর্তিই ত' তার সমস্ত রুক্ষতা, সমস্ত ভীষণতা ও দীনতাকে অতিক্রম করে শাশ্বত কালের শ্রদ্ধার আসনে নিজেকে করেছে প্রতিষ্ঠিত। "সীমানা স্বর্গের ইন্দ্রাণী নারী"—ঘরের সীমানার মধ্যেই তাই ত' তার মাধুরিমার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে ব্যস্ত।

যাক্ সে কথা। এবার বাগোড়া প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। বাগোড়ায় যেখানে আমি ঘর বেঁধেছিলাম সেটা একটা 'ফরেষ্ট্ রেষ্ট্ হাউস্'। পায়ে চলা পথের বেশ খানিকটা নীচে পাহাড়ের পাশে কিছুটা জায়গা সমতল করে তৈরী করা হয়েছে বাড়িটা। সামনের লনে দাঁড়িয়ে মাথার উপরে তাকালে দেখা যায় পায়ে চলা পথের সড়ককে। আকাশের বুকে শুকতারাটি যখন ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে থাকে আর সমস্ত পূর্বদিগন্ত জুড়ে দেখা দিতে থাকে লালচে আলোর ছটা, ঠিক সেই সময়টা থেকেই এই পথের উপর আরম্ভ হয়ে যায় দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের ছোটাছুটি। তাদের পথ-চলার সমবেত ধ্বনির মাঝে যেন কোন এক অদৃশ্য মহা পথিকের পদধ্বনির গুঞ্জন এসে ভাসে আমার কানে। কখন চমকে জেগে উঠে বাইরে এসে দাঁড়াই, কে জানে? "কোন শূন্য হতে এল কার বারতা?" তাই কি নিজের একান্ত অজ্ঞাতেই শীতের তীব্রতাকে উপেক্ষা করে চড়াই ভেঙ্গে উঠে এসে পথের এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ভুলে গিয়ে মনটা অনাস্বাদিত এক আনন্দের আবেশে যেন ভরপুর হয়ে যায়। সভ্য নগরী যে সমস্যার সমাধানের জন্য দিনরাত মাথা খুঁড়ে মরছে, এখানে বনানীর এই অন্তরালে সেই বিরাট সমস্যাই যেন সমাধানের পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে।

ভুটানী মেয়ের পিঠের অতিরিক্ত বোঝাটা নেপালী ছেলেটি হাসতে হাসতে নিতান্ত সাধারণ ভাবে তুলে নিল নিজের বোঝার উপরই। তিব্বতী বৃদ্ধের ঝুঁকে পড়া দেহের উপর থেকে দুধের ভারী ভারাটা কোন কথা না বলেই ভুটানী মেয়েটি টেনে নেয় নিজের ঘাড়ের উপর। ঘোড়ার পিঠে বোঝা চাপিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলে মাড়োয়ারী মহাজনের সঙ্গে শের্পা কুলির দল। মুসলমান রুটিওয়ালা পশরা মেলে ধরে নেপালী, ভুটানী, তিব্বতী ছেলেমেয়ের মাঝে। আমার অনভ্যস্ত চোখ অবাক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে এই সহজ সমাধানের দিকে। মনে হয় সত্যিই বুঝি তথাকথিত সভ্যতার ধরা ছোঁয়ার বাইরে এমন এক জনপদে এসে পড়েছি যেখানে স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত রাজনীতি কোলাহল মানুষের জীবনকে হলাহলে পূর্ণ করে তুলতে পারেনি এখনও। এই যে একের প্রয়োজনে অন্যের সহজ ভাবে বোঝানও অসম্ভব। এ শুধু ধরা পড়ে আন্তরিক অনুভূতির উপলব্ধির মাঝে। জীবনের গভীরতম সমস্যাও সে কোলাহলকে অতিক্রম করে সহজ সমাধানকে খুঁজে নিতে পারে, শুধু মাত্র আন্তরিকতার যাদুস্পর্শ মনকে রাঙ্গিয়ে তোলে—এ জিনিষটা বাগোড়ার অরণ্যের মাঝে দাঁড়িয়ে সেদিন যেমন গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম তেমন করে বোধ করি আর কোন দিনই সেটা সম্ভব হবে না। আজ যে "সবার রঙ্গে রং মেশাতে হবে—" তাইত অপরের করণীয়কে নিজের বরণীয় করে তোলবার ব্রত গ্রহণ করেছে যে হিমালয়-আত্মজা বাগোড়া, সেই বাগোড়ার বন্ধুর পদচিহ্নের মাঝে সেদিন এঁকে দিয়েছিলাম আমারও পথ-চলার পদরেখাকে। বাগোড়া আমাকে গ্রহণ করেছে কিনা জানি না, তবে আমারই শেখানো গানের ভাষা আজও হয়ত' তার অরণ্যের বাতাসকে প্রতিধ্বনিময় করে তুলছে। বলছি সে কথাও।

বাগোড়ার এই পায়ে চলার পথের উপর দিয়ে দুধ, চা, এলাচি এবং মরসুমের সময় কমলালেবু (স্থানীয় নাম সুন্তলা) দিনারাম হয়ে নেমে যায় শিলিগুড়ির বাজারে বিক্রি হতে। মাড়োয়ারী (অল্প সংখ্যক পাহাড়ীও আছে) মহাজনের মাধ্যমে সেখানের প্রয়োজন মেটে নাগরিকদের। বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই মেটাতে হয় এখানকার অরণ্য-জীবনের সামান্য চাহিদাকে। শ্রমজীবীরা পথ চলার শ্রমকে সহজ করবার জন্য সমবেতকণ্ঠে গেয়ে চলে। '

নও লাখ্ তারা উদায়ও
ধর্তীকো আকাশ হাসেছ শরদ লাগেও বনমা
ফুল্‌লে পৃথী গাছেছ।
ন সময়া আজ নেপালী
সকলে ইহা বসেকো কাড়াকো মাঝ পাহাড়ী ফুল
সুখ ছইনা ইহা হাসেকো।
........' ইত্যাদি

সুন্দর গান, ছন্দবদ্ধবাণী সুরে আবদ্ধ হয়ে অপূর্ব মোহ আবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু এত আধখানা। সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত কই এর মধ্যে? বাগোড়ার ব্রতের সঙ্গে এই সুর যেন ঠিক খাপ খায় না; মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে—সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। অবশেষে মিলে যায় তা। একটা বড় দলের সঙ্গে খচ্চরের পিঠে চেপে চড়াই ভাঙ্গছিল ছোট্ট একটি পাহাড়ী ছেলে। কি কারণে জানি না হঠাৎ আমার সামনে এসে নেহাৎ বেরসিকের মতই বিদ্রোহ করে বসল জন্তুটা। ছেলেটি মুখ থুবড়ে এসে পড়ল 'বাংলোয়' নেমে আসা পথের উপর। রক্তপাত ঘটল সামান্যই, কিন্তু কোলাহলের কমতি হ'ল না! আর্দালীর সাহায্যে বাচ্চাটিকে ঘরে এনে ডেটল জলে ধুইয়ে দিলাম তার আঘাতের স্থান, অল্প একটু গরম দুধ দিলাম খাইয়ে। আমার সহানুভূতি ওদের প্রাণে বোধ হয় জাগালো কৃতজ্ঞতা। এতদিন চোখে চোখে হয়েছে আলাপ, দূর থেকে হাসি ছুঁড়ে দিয়ে রোজ ওরা আমাকে করেছে অভ্যর্থনা—আজ ওদের মধ্যে থেকে আপেল-রাঙ্গা গাল এক ভুটানী মেয়ে এগিয়ে এলো। ওর কালো চোখের কৌতূহল মিশিয়ে জিজ্ঞেস করল—"তিমি বাঙ্গালী!" সামান্য হেসে বললাম, তুমি আমি সবাই ত' বাঙ্গালী।

আমার কথার গূঢ় অর্থ ওদের বোধ হয় বোধগম্য হ'ল না। পরিষ্কার

আরম্ভ করল নিজেদের নেপোয়ালি ভাষায়। হঠাৎ বললাম,—"তোমাদের গানটা কিন্তু খুব সুন্দর—রোজ শুনে শুনে শিখে গিয়েছি আমি। তোমরা আমার ভাষায় শিখবে একটা গান?" নিমেষের মধ্যে কোলাহল গেল থেমে, কৌতূহলী হয়ে উঠল ওরা, ব্যগ্র আগ্রহে রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। তিনটি নেপালী ও দু'টি ভুটানী ছেলেমেয়ে বেছে নিলাম। সাত দিনের আপ্রাণ চেষ্টায় ওদের সুরেলা কণ্ঠে তুলে দিয়ে এলাম আমাদের জাগরণের প্রতীক জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে···"

আতিথ্যের দাক্ষিণ্যে বাগোড়া ভরে তুলেছে আমাকে। তার সম্পূর্ণতার বেদীতলে তার অসম্পূর্ণতাটুকুকে বিসর্জন দিতে চাই আমি। আমার এই প্রয়াস কোন দিন সার্থকতায় ভরে উঠবে কি না জানি না, তবু বাগোড়ার অন্তরের অন্তস্তল হতে যে সুগভীর একাত্ম বোধের ধারা প্রতিনিয়তই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসারিত হতে দেখেছি তাকেই ত' "মন প্রাণ যাহা ছিল সব দিয়ে ফেলেছি।"

মাত্র পনের দিন; তবু আমার জীবনের একটা বিচিত্র বিবর্তনের ক্ষণ যেন এটা—তাই কি দূরে বসে আজ এমন করে স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে, তার আরও একটা কাহিনী। ওর মধ্যে আনন্দমুখর দিন ছিল সেটা। সকাল থেকেই কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্যের প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়েছে বাগোড়ার বিস্তৃত অরণ্যের বুকে। আলোছায়ার লুকোচুরি শুরু হয়েছে পথে-প্রান্তরে। এই হঠাৎ খুশির ঝলক যেন "দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেল" আমারও মনকে। ছাতা, লাঠি, 'রেনকোটের' মায়া ত্যাগ করেই পথে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়েই সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আকাশের বুকে মায়াবী কাঞ্চনজঙ্ঘা তার রূপালী রূপের ঝালর ঝুলিয়ে গর্বে আনন্দে যেন ঝলমল করে উঠছে, অপর পারে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের বুকে-পিঠে আঁকা ছবির মতই কালিম্পং শহরকে। মনের আনন্দে নৈসর্গের এই অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি চড়াই ভেঙ্গে। "এই কি তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ"—মনের কোণ থেকে বারে বারে কেবল যেন এই প্রশ্নই জেগে উঠতে চায়। অমৃতক্ষরণের এই মহা সন্ধিক্ষণে অমৃতময়ের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম জানাই। আনমনেই এগিয়ে চলছিলাম, হঠাৎ থামতে হলো পথের 'মাথিতে' উঠে। বহু লোকের একটা জটলা সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। বৃত্তাকারে ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাই উৎসুক হয়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করছে ভিতরের দিকে। চোখে মুখে সকলেরই যেন একটা চাপা কৌতুকের হাসি ঝলকে উঠতে চাইছে। কি ব্যাপার? নারীর চিরন্তন কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গেলাম সেই দিকে। সবাই সসম্মানে পথ করে দিল। অতিথিকে কোন অবস্থাতেই অবহেলা করতে শেখেনি এরা এখনও।

সম্মুখে তাকিয়ে দেখি বৃত্তের মাঝখানে একজন বুড়ো মত লোক একটা মোরগকে সস্নেহে কোলে নিয়ে বসে রয়েছে। তার ঠিক উল্টো দিকে একজন প্রায় বৃদ্ধা রমণী তারও কোলে একটি হৃষ্টপুষ্ট মোরগ। এদের দু'জনেরই চোখে মুখে অপরের বিরুদ্ধে একটা আক্রোশ যেন ফুটে বেরুচ্ছে। কিছু বোঝবার আগেই হঠাৎ দুই পাশ থেকে সেই ছোট প্রাণী দু'টো একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—যেন "কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে।" ওঃ মুরগীর লড়াই। এতক্ষণে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হ'ল। কিন্তু তখনও বুঝতে বাকি ছিল অনেক কিছুই।

মোরগ দু'টো একটানা ঝাপাঝাপি করে চলেছে, সেই সঙ্গে তাদের অভিভাবকদেরও লম্ফঝম্পের কমতি নেই। এদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন মোরগের পরাজয়ের উপরই এদেরও বাঁচা মরা নির্ভর করছে। সমবেত জনতা মাঝে মাঝে হয়ত চেঁচিয়ে উঠছে 'এ্যা বুড়াকো মোরগ গয়'—সঙ্গে সঙ্গে যে'দিক থেকে চিৎকার উঠছে চোখে মুখে আগুন ছড়িয়ে ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে সে'দিক পানে তাড়া করে উঠে বৃদ্ধ। পরক্ষণেই বৃদ্ধার সকল আনন্দকে শূন্যে মিলিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠে জনতা "আঁ্যা, হাঁ, বুড়ীকো মোরগ একদম লড়ুয়া।" ক্রমশ ঝিমিয়ে আসে জনতার উৎসাহ, তাকিয়ে দেখি রক্তে ভেসে যাচ্ছে প্রাণী দু'টোর গা। সেই সঙ্গে বুড়ো বুড়ির লম্ফঝম্প প্রায় ভীষণতার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। হঠাৎ বৃদ্ধ তার রক্তাক্ত মোরগটিকে টেনে নিয়ে বিদ্যুদ্‌গতিতে জনতাকে ঠেলে দিয়ে ছুটে চলে যায় পাশের······ পাশের ঢালু পথে। আর আহত প্রাণীর রক্তাক্ত শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে স-উচ্চ ক্রন্দনরোলে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে বৃদ্ধা। বৃদ্ধের সচকিত ভাবে পলায়ন আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধার পুত্র শোকাতুরা জননীর মত শোকের এই গভীরতা দুই অবাক করে তুলেছিল আমাকে। আহত প্রাণী দু'টো যে শুধুই উপলক্ষ মাত্র তা বুঝতে একটুও দেরী হয় নি আমার।

জীবনরহস্য আবিষ্কারের মোহে তাই প্রশ্ন করতে হল পার্শ্ববর্তিনীকে। উত্তরে যা শুনলাম তাও কম অবাক হবার পালা-গান নয়। এরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী, যদিও বিবাহিত নয়, তবুও ঐ স্বীকৃতিই তারা পেয়ে আসছে আজ বহু বছর ধরে। প্রথম যৌবনের প্রারম্ভে জীবন সাথী খুঁজতে বেরিয়ে সুদর্শন এক শেরপা যুবক খুঁজে পেয়েছিল এই সাকীকে। সাকী তার জাতিতে নেপালী, তাই সামাজিক রীতিতে কোন দিনই স্বীকৃতি পায় নি তাদের সহবাসের সম্পর্কটুকু! তবু হৃদয়ের দাবী সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে ঘর বাঁধাকে সহজ করে তুলেছিল। আর সেই সহজ প্রবণতার মাঝে অপার আনন্দে নিবিড় থেকে নিবিড়তর ভাবে আপন করে নিয়েছিল একে অপরকে।

বর্তমানকে গ্রহণের আনন্দে আর ভবিষ্যতকে পাওয়ার আশায় এরা [illegible] ভাবে করেছে পরি[illegible], মিতব্যয়ী হয়ে করেছে সঞ্চয়। সাকী যুবকের শুধু প্রেরণাদায়িনীই নয়, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সে তার সহধর্মিণী, প্রয়োজনে হয়েছে সহকর্মিণী। এই ভাবেই বিবর্তনের পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে তাদের জীবনের ক্ষণ, তিথি, মাস ও বছরগুলি। এরই মাঝে তারা কান পেতে থেকেছে এক নতুন আগন্তুকের পদধ্বনি শোনার আশায়। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি এইখানে এসে করেছে তাদের চরম বঞ্চনা। আশা আকাঙ্খা বুকে করে বইতে বইতে একদিন তারা এসে পৌঁছল প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে—আর যেদিন সব আশা বঞ্চনার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল—সেদিন জীবনের সেই শেষ প্রান্তে এসে এরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে করল প্রথম বিদ্রোহ। একজন সমস্ত প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে জীবনের কষ্টার্জিত সমস্ত সঞ্চয়কে উজাড় করে ঢেলে দিল মদিরা দেবীর পায়। আর একজন জীবনের সমস্ত মাধুরিমাকে বিসর্জন দিয়ে ধূসর রুক্ষতায় ভরিয়ে তুলল নিজেকে। একে অপরকে করল দায়ী, অপরের বিরুদ্ধে আক্রোশে ভরিয়ে তুলল প্রাণ ও মন। প্রতি কাজে, প্রতিক্ষণে দেখা দিতে লাগল—

বিরোধ। প্রকাশ্য কলহে আবার কখনও বা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নগ্নভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করল অন্তরের নিবিড়তম ঘৃণা আর বিদ্বেষকে। বঞ্চিত পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা মেটাবার তাগিদেই যেন বেদনার তীব্র বিষে জীবন পেয়ালা ভরিয়ে তুলে আকণ্ঠ পান করল সেই হলাহল। তবু এই জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে কেউ কাউকে পারে না ত্যাগ করতে—এখন পর্যন্তও একত্রেই চলে তাদের ঘর গৃহস্থালী। নিতান্ত অভ্যাসের বসেই যেন একের প্রয়োজনে অন্যে সাড়া দেয়। কিন্তু জীবনে বেঁচে থাকতে হলে চাই কোন একটা অবলম্বন। তাই এরাও বেঁচে থাকার অবলম্বন খোঁজে নানা জন্তু-জানোয়ারকে পোষ্য নিয়ে। এত করেও বুঝি মেটে না এদের মনের জ্বালা। তাই জীবনের সর্বৈব পরিণতির এক অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই মোরগের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। দু'টি নিরীহ প্রাণীর মরণ কামড়, এরা বুঝি নিজেদের অসুস্থ মনের মত্ত আক্রোশের জ্বালাময় অনুভূতি দিয়ে অনুভব করে। জয়-পরাজয়ের ব্যাপারেও তাই এদের ঐ অহেতুক মনোভাব, পোষ্য মোরগের পরাজয় যেন নিজেরই পরাজয়—জীবনের সমস্ত অপূর্ণতার জন্য যেন নিজেই দায়ী, অপরে সম্পূর্ণ নির্দোষ এই ভাব জাগিয়ে তুলে মনকে করে আরও দুর্বল, আরও সর্বহারা করে তোলে। পরাজয়ের এই হাহাকার তাই বঞ্চিতের হাহাকার, সর্বহারার হাহাকার, দায়িত্ব পালনের অক্ষমতা স্বীকারের হাহাকার। আশ্চর্য জীবন দর্শন, জীবনকে বিচার করবার অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি। খুসিতে ঝলমল মন নিয়ে যে পথ দিয়ে পাহাড়ী ভেঙ্গে 'মাথিতে' উঠেছিলাম, অবসাদ ভরে আবার সেই পথ ধরেই ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম।

প্রতিনিয়ত কুয়াশাচ্ছন্ন বাগোড়ার এই রূপও কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হলো। কিন্তু কেন? "বাহিরে যার হাসির ছটা, ভিতরে তার অশ্রুজল"—এ কথা কি ভুলে গেছি? বাগোড়াই বা ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন? তাই কি সে নিজের একান্ত গোপন কথাটিও এমন ভাবে শুনিয়ে দিল আমাকে। নগ্ন প্রকাশই কি অনন্ত রহস্যের চাবিকাঠি? কি জানি আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না—একি আমার প্রতি বাগোড়ার সহৃদয় আন্তরিকতা, না নির্মম ঔদাসিন্যে সমস্ত স্তুতি গানকে অগ্রাহ্য করবার জন্য স্পর্ধিত ভ্রূকুটি মাত্র।

শঙ্করীর সঙ্কল্প

শিপ্রা দত্ত

শঙ্করীর জীবনবৃত্তান্ত একটি সত্যিকারের উপন্যাস। একদিন এক রেঁস্তোরায় বসে শঙ্করী বলেছিল, 'বেলা, তুই লেখিকা। তোর লেখার সুন্দর প্লট পাবি আমার জীবনেতিহাসে।' নিজেকে গল্প বা উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকা রূপে কল্পনা করা মানুষের দুর্বলতা। তাই শঙ্করীর কথা শুনে বেলা নীরবে মুচকে হেসেছিল, শঙ্করী বেলার হাসির রেখায় দেখেছিল অবিশ্বাসের ছায়া। তাই আকুল হয়ে বলেছিল সে 'তুই আগে আমার কাহিনী শোন। তারপর আমার কথার সত্যতা বিচার করিস।'

নিরালা রেঁস্তোয়ার অধিকতর নিরালা একটা টেবিলে মুখোমুখি দু'টো চেয়ারে বসে মোগলাই পরোটা ও ভেজিটেবল চপের সদ্ব্যবহার করতে করতে বেলা শুনলো শঙ্করীর কাহিনী।

শঙ্করীর সঙ্গে বেলার পরিচয় চাকরী জীবনে। একই সোপান বেয়ে চলেছিল দু'জন। শঙ্করীকে নিয়ে সহকর্মীমণ্ডলে চলে নানা রকম ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, হাসাহাসি। শঙ্করীর ক্লাসে ছাত্রীরা লিখে রাখে বোর্ডে "পাগলীদি"। আলাপে কিন্তু সে আর দশজন মেয়ের মতই স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রী বলে তার খ্যাতি ছিল ও খ্যাতি অনুযায়ী সে ফলও দেখিয়েছে। বেশভূষায় সাজগোজে শঙ্করী ছিল অতি সাদাসিধে। মোটা শাড়ী—ততোধিক মোটা ব্লাউস তার পরিধানে। চেহারাও সাধারণ। তবে চেহারার মধ্যে একটা রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। মাথার সামনের দিকে অলকদামে পাক ধরেছে। সাদা সিঁথিতে সিন্দুরের রেখা জ্বল জ্বল করে—বাঁ হাতে এক গাছা লোহাও আছে। স্থূলাঙ্গী বলা চলে। কিন্তু তা স্বাস্থ্যের লক্ষণ কী অস্বাস্থ্যের মন্দির তার বিচারের ভার ডাক্তারের। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় বেশ শক্ত বাঁধুনী।

চাকরীতে ঢুকবার পর হ'তে শঙ্করীর শঙ্কর সম্বন্ধে নানা কথা শুনেছে বেলা। শঙ্কর উচ্চশিক্ষিত, বেশ কয়েকটা বিষয়ের এম-এ ডিগ্রী আছে। সাগর পারেও বার কয়েক ঘুরে এসেছে—পাঠ্যাবস্থায় ও কর্মজীবনে। সুশ্রী, আলাপী, বংশে, জাতে, কুলে, শিক্ষায়—সব কিছুর যোগাযোগে শঙ্করকে বলা যায় রত্ন। অসবর্ণ বিয়ে হয়েছিল তাদের। আট দশটি বছর প্রাণের উচ্ছলতা নিয়ে ভেসে চলে দুইটি হৃদয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ বুঝি ভগবান কারো অদৃষ্টে লেখেন না। তাই আজ শঙ্করী কুমারী নয়—বিধবাও নয়—যাকে বলে স্বামী পরিত্যক্তা।

কলকাতার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বর্ধিষ্ণু ঘরের মেয়ে শঙ্করী। শঙ্করীর মা গোত্রান্তর হয়েছিলেন একাদশের কোঠায় পা দিতেই। মাতুলালয়ের অবস্থাও স্বচ্ছল। বালিকা বধূর প্রথম সন্তান বলে জন্মের পর হতে শঙ্করী মাতামহীর কাছে লালিত পালিত হয়। সেই হতে শঙ্করী মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা। শুচিবায়ুগ্রস্ত দিদিমার নিকট সান্নিধ্য শঙ্করী পায়নি কখনও। কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে কেটেছে শঙ্করীর শৈশব, কৈশোর, প্রাগ্‌যৌবন। শিখেছে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গৃহের সব আচারনিষ্ঠা, গৃহকর্ম, ব্রাহ্মণ গৃহের নিত্যকর্ম, তদুপরি পাঠে শঙ্করী হয়ে উঠল সমান পারদর্শী।

শঙ্করীর বাবা সরকারী ডাক্তার, তাই বদলীর চাকরী। শঙ্করীর আরও কয় ভাইবোনের আগমনবার্তা শুনেছে দিদিমার মুখে। মাঝে মাঝে পুতুলের মত ছোট ছোট ভাই বোনদের নিয়ে মাকে বাপের বাড়ী আসতেও দেখেছে। কিন্তু সে কখনও মার কাছে সহজ হতে পারেনি। মাও কখনও আপন মাতৃত্বের দাবীতে তাকে বুকে টেনে নেন নি। দূর হতে মা'র স্নেহাঞ্চলে ছোট ভাইবোনদের দেখেছে। তার বুভুক্ষু হৃদয় সেই স্নেহের কাঙ্গাল হয়ে ছুটে গেছে। কিন্তু মার শৈথিল্যে ও অগ্নিদৃষ্টিতে শঙ্করীর হৃদয় দমে যেতো। ছোটবেলা হতে সে লক্ষ্য করেছে মা তাকে সহ্য করতে পারেন না। অভিমানী মেয়ে অভিমানে মুখ লুকিয়েছে মাতামহীর আঁচলে। কিন্তু সে আঁচলও যেন তাকে ভরসা দেয়নি—দাবী জানাবার অধিকার দেয়নি। সব সময়েই শঙ্করী নিজেকে একা, অনভিপ্রেত মনে করে এসেছে। মাতামহী যেন কর্তব্যের খাতিরে তাকে রেখেছিলেন—কিন্তু ছিল না কোন স্নেহের বাঁধন।

জীবনের গতি কখনও কারও একই স্রোতে বহে না। শঙ্করীর জীবনের গতিও প্রতিহত হল—তার মাতামহীর মৃত্যুতে। মাতামহীর আবাস হতে তাকে উঠিয়ে আনা হলো পিত্রালয়ে। কিন্তু নিজের বাড়ীকে শঙ্করীর প্রবাস মনে হতো। তার প্রতি মার বিরক্তি বিতৃষ্ণার কোন হেতুই শঙ্করী খুঁজে পেতো না—ভাই বোনদের ব্যবহারে তাকে মনে করিয়ে দিতো যেন এ সংসারে প্রবেশের তার কোন অধিকার নেই। কেউ তাকে 'দিদি' বলে শ্রদ্ধা করে না—ভালবাসে না—করে অবজ্ঞা, অপমান, তাচ্ছিল্য। নীরবে শঙ্করী সব সয়ে যায়। কার কাছে জানাবে ফরিয়াদ? ব্যক্তিত্বশূন্য বাবার কর্ণগোচর করা—আর অরণ্যে রোদন করা সমান। মা? সেই স্নেহে শঙ্করী বঞ্চিত। বেলা মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী। শঙ্করী বলে—বেলা তুই তো মনোবিজ্ঞানের শিক্ষিকা। বলতে পারিস জীবনব্যাপী মা কেন আমার সঙ্গে এমন আচরণ করলেন? পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানেই তো এমন কোন কারণ খুঁজে পাই নি—যাতে মা তাঁর নিজের সন্তানকে ঈর্ষ্যা বা হিংসা করতে পারেন। আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার যেন সপত্নী তনয়া আমি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শঙ্করীর পড়ার খরচ বন্ধ হয়ে গেল বাড়ীর থেকে। যদিও জলপানি পেয়ে শঙ্করী উত্তীর্ণ হয়েছিল। এবারে কিন্তু শঙ্করী সব ব্যাপারের মত এ অন্যায় মাথা পেতে নিতে পারলো না। দুর্বার অভিমান মনে চেপে—সে টিউশনি করতে বের হ'ল। সেই টাকায় সুরু হ'ল তার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যয়ন।

এইভাবে আরও কয়েকটা বছর গড়িয়ে গেল। প্রতিটি পরীক্ষা শঙ্করী কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে, বাইরে সে সবার অভিনন্দন পেয়েছে—ভালবাসা পেয়েছে। কিন্তু গৃহে তার সাফল্যের জন্য এতটুকু আনন্দের হাসি সে কারো ঠোঁটে দেখেনি। শঙ্করীর সীমিত জীবনে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি—তার জীবন-পরীক্ষাগুলির মতই সারবন্দী ভাবে এসেছে ও সফলতার জয়টিকা এঁকে দিয়ে গেছে। শঙ্করীর জ্ঞানের প্রদীপ যতই উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হচ্ছিল—সংসারে তার প্রতি নির্যাতনও সেই অনুপাতেই বেড়ে চলেছিল। এ কাহিনী কে বিশ্বাস করবে? মনের নিভৃত কন্দরে তাই দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিল শঙ্করী। বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এম, এ পাশ করার পুরস্কার পেলো এক রিসার্চ স্কলারশিপ। সংসারের সমস্ত কাজের ভার এসে পড়ল—শঙ্করীর উপর। বিনা প্রতিবাদে শঙ্করী রাত থাকতে উঠে সংসারের যাবতীয় কাজ সেরে—ল্যাবরটারীতে যেতো তার রিসার্চের কাজ করতে। বিব্রত বোধ করেন শঙ্করীর মা। কোন কিছুতেই শঙ্করীকে কাবু করা যাচ্ছে না। সব্যসাচীর মত দু'হাতে সে সংসারের কাজ ও জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে চলেছে। স্নেহশূন্য মরু-জীবন শঙ্করীর কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠ'ল। দেহমনে দেখা দিল বিদ্রোহের বহ্নি-শিখা। কিন্তু তা প্রকাশেও সে অক্ষম। তাই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে সে দার্জিলিং-এ অধ্যাপিকার পদে দরখাস্ত পাঠাল। সঙ্গে সঙ্গে চাকরীও হয়ে গেল। তার সাধনার ধন-গবেষণা আর এগোল না। দীর্ঘকাল ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিল এবার যেন সে ভাগ্যের সঙ্গে যুঝতে বদ্ধপরিকর হলো।

প্রকৃতির লীলাভূমি দার্জিলিং-এ এসে শঙ্করীর ঘুণে ধরা দেহমনে যেন হাওয়া লাগলো; দীর্ঘকাল পর শঙ্করী যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। স্বাধীনতার আনন্দে সে ভেসে বেড়াতে লাগলো। আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সে। কাজ-কাজ-আর কাজের চাপে কিন্তু সে জর্জরিত নয়। প্রকৃতির রম্য নিকেতনে জ্ঞানের রোশনী জ্বালিয়ে—যে অফুরন্ত অবসর শঙ্করীর থাকতো—সেই অবসর সময়ে নিজেকে চিনতে বুঝতে চেষ্টা করত সে। যে যৌবন শঙ্করীর জীবনে অবহেলিত হয়েছে—দীর্ঘকাল যার প্রতি সে ছিল উদাসী—আজ যেন তারই মায়ার ডোরে শঙ্করী আবদ্ধ হলো। অসমাপ্ত গবেষণার চিন্তা মাঝে মাঝে শঙ্করীকে ব্যাকুল করে তোলে। তাই সে মনে মনে স্থির করল—কোন মহানগরীতে চাকরী নিয়ে যাবে—যেখানে আবার সে গবেষণার সাধনা সুরু করতে পারবে। গৃহের কারা প্রাচীর অতিক্রম করে সে যখন বেড়িয়ে পড়েছে—তখন নিজেকে উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিত করবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হ'ল। সুযোগও ভগবান জুটিয়ে দিলেন। বান্ধবী মহানিশা পাটনা কলেজের অধ্যাপিকা। সেই কলেজেই শঙ্করীর জন্য একটা কাজ জুটিয়ে দিল মহানিশা। প্রকৃতির লীলাভূমির মায়া ছিন্ন করে—শঙ্করী বিহারের রাজধানীর পথে অগ্রসর হলো।

শঙ্করীর জীবনে সুরু হলো এক নূতন অধ্যায়। একদিন বান্ধবীর বাড়ীতে শঙ্করীর সঙ্গে আলাপ হ'ল শঙ্কর দাসের। পৌরুষ চেহারা, গাম্ভীর্যপূর্ণ অবয়ব, সুশ্রী মুখশ্রী—সব মিলিয়ে কি এক চুম্বকের আকর্ষণ শঙ্করের মধ্যে ছিল—যা বহু মেয়েকেই ঠেলে দিয়েছিল তার দিকে। প্রথম আলাপেই শিষ্টতা, সৌজন্য কথা বলার ভঙ্গী—সব কিছু মিলিয়েই যেন শঙ্করীর হৃদয়-কোরকে হাতছানি দিয়েছিল শঙ্করকে। রাত্রির মুখে তার বহুমুখী প্রতিভা বিদেশ প্রত্যাগত যুবকের কীর্তি শঙ্করীকে নূতন করে শঙ্করের ধ্যানে মগ্ন করে দিল। শঙ্কর রেডিও অফিসের পদস্থ কর্মচারী। শঙ্করের সহায়তায় শঙ্করী রেডিওতে 'টক্' দেবার সুযোগ পেলো। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জমাট বাঁধলো। সুযোগ পেলেই শঙ্করের মটরে উভয় নানা জায়গায় বেড়িয়ে আসতো। শঙ্কর চালক—পাশে শঙ্করী। শঙ্করী জানতো শঙ্কর অবিবাহিত। সুতরাং মনের কোণে তার উঁকি দিল একটা ছোট্ট রঙীন স্বপ্ন শঙ্করকে ঘিরে। ভগবান শঙ্করীর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে খুব বেশী দেরী করলেন না। শঙ্করের প্রথম প্রস্তাবেই সম্মতি জানাল শঙ্করী। অসবর্ণ বিয়ে তাই ঢাক ঢোল বাজল না। স্ত্রী আচার হলো না, শঙ্খধ্বনি করে বরণ ডালা সাজিয়ে আশীর্বাদ করতে কেউ এলো না। এ একেবারে নব্য প্রথায় দুই তরুণ-তরুণীর হৃদয় বাঁধা পড়লো রেজিষ্টারী অফিসের ৩ নং আইনের নাগপাশে। শঙ্করী জানত এ ধরণের বিয়েতে বাড়ীর মত পাবে না। কখনও স্বজাতে সুপাত্র জুটিয়ে শঙ্করীর বিয়েও তার মা বাবা দেবেন না; তাই বিয়ের পর্ব অর্থাৎ চুক্তি পত্রটা সই করে সে বাড়ীতে খবরটা দিল। জাত ছাড়া অন্য সব দিক দিয়েই যে পাত্র লোভনীয়—তা জানাতে শঙ্করী ভুল করেনি। প্রেমের ডানায় ভর করে দু'টি তরুণ-তরুণীর জীবন উড়ে চলেছিল পাটনা সহরের নীলাকাশের নীচে। শঙ্করী তখনও চাকরী ছাড়েনি।

হঠাৎ একদিন শঙ্করের কলকাতায় বদলীর খবর এলো। এ শুভ সংবাদ কিন্তু শঙ্করীর মনে আনন্দের ঢেউ তুলতে পারেনি। পরন্তু কি এক অশুভ ইঙ্গিত যেন তার সব কাজ কর্মের মধ্যে পেয়েছিল। উচ্চশিক্ষিতা শঙ্করীর মনও সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। শঙ্করকে সে জানালো তার এই অশুভ ইঙ্গিতের কথা। হেসে উড়িয়ে দিল

শঙ্কর। যথাসময়ে উভয়ে এসে শঙ্করের কোয়ার্টারে উঠল। হিন্দুর মেয়ে সংস্কারের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই অল্পদিনের মধ্যে সেই অশুভ বার্তা বয়ে এল। শঙ্করীকে চাকরীতে ইস্তফা দিয়েই আসতে হয়েছে। স্বামী মোটা মাইনে পায়। তাই নূতন চাকরীও শঙ্করী গ্রহণ করেনি।

একদিন দুপুরে অলস মুহূর্তে শঙ্করী একটা মাসিক পত্রের পাতা উল্টাচ্ছিল। এমন সময় দরজার "কলিং বেল"টা বেজে উঠলো। এমন অসময় "বেল" বাজাতে মনে মনে সে বিরক্তই হলো। ঝি এসে জানালো একটি ১৬।১৭ বছরের ছেলে শঙ্করীর সঙ্গে দেখা করতে চায়। বিস্মিত হয়েই শঙ্করী বসবার ঘরে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে গেল। প্রথম প্রশ্ন—"আমার বাবা শঙ্কর দাস কোথায়?" মাথাটা শঙ্করীর যেন ঘুরে গেল। কোন রকমে নিজেকে সামনের 'কোচে' ঠেলে দিল। সম্বিৎ ফিরে আসতে শঙ্করী যা শুনল—এ যেন স্বপ্ন। শ্রীদাম শঙ্করের প্রথমা স্ত্রীর প্রথম সন্তান। শঙ্করীকে বিয়ে করার পূর্ব পর্যন্ত শঙ্কর শ্রীদামের মার কাছে নিয়মিত অর্থ পাঠাতো। শ্রীদামের মাকে শঙ্কর বিয়ে করে বেশ অল্প বয়সে বা পাঠ্যাবস্থায়। শ্রীদামের মা অশিক্ষিতা, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বিদেশ হতে ফিরে শঙ্কর শ্রীদামের মাকে নিয়ে কখনও সংসার করেনি। তবে নিয়মিত টাকা পাঠিয়ে কর্তব্য বা দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে। কিন্তু শঙ্করীকে বিয়ে করার-পর হতেই সে কর্তব্যচ্যুত হয়েছে। তাই এখানে শঙ্করের বদলীর খবর পেয়ে শ্রীদামকে তার মা পাঠিয়েছে জানতে—কি অপরাধে শঙ্কর অকারণে স্ত্রী ও সন্তানকে অনাহারে মারবার চেষ্টা করছে।

পরবর্তী ঘটনায় নূতনত্ব কিছু নেই। দুর্জন ব্যক্তির চিরাচরিত নিয়ম মত শঙ্কর তার প্রথম বিয়ের কথা অস্বীকার করে। কিন্তু পরে স্ত্রী চরিত্রে কলঙ্ক দিয়ে জানায়—তাকে সে পরিত্যাগ করেছে। শ্রীদামের মা শঙ্করের স্বধর্মী, স্বজাতি—হিন্দুমতে বিবাহিতা স্ত্রী। শঙ্কর শঙ্করীকে জানালো এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ তাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আর নেই।

শঙ্করীর হৃদয়ে শঙ্করের প্রতি যে শ্রদ্ধার সৌধ গড়ে উঠেছিল—তা মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হলো! শঙ্করী বুঝলো—শঙ্কর প্রতারণা করেছে শ্রীদামের মায়ের সঙ্গে—শঙ্করীর সঙ্গেও। কিন্তু যে পথে শঙ্করী পা বাড়িয়েছে—সে পথ হতে ফিরে যাবার পথ আর নেই। শঙ্করীর এক বান্ধবীর বাবা ছিলেন হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট। সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি বললেন—'মা শঙ্করী, এক স্ত্রী বর্তমানে তোমাকে শঙ্কর যে রেজিষ্টারী মতে বিয়ে করেছে—তা তো আইনত ঠিক হল না। আইনের মতে এ বিয়ে অসিদ্ধ। একমাত্র হিন্দু আইন মতে যদি তুমি শঙ্করকে তোমাকে বিয়ে করতে রাজী করাতে পার—তবেই তুমি তার যথার্থ স্ত্রীর অধিকার পেতে পার। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ বিয়েটা নাকচ করে দেওয়ার একটা দরখাস্তও তোমাকে কোর্টে দাখিল করতে হবে।' বান্ধবী জয়া বলেছিল—"বাবা! যে লোক এভাবে সরলা উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকে একবার প্রতারণা করতে পারে—আমার মনে হয় তার সঙ্গে আর নূতন করে কোন সম্পর্ক না গড়াই শ্রেয়। কি দরকার এই প্রতারকের সঙ্গে নূতন করে গাঁটছড়া পরা?" শঙ্করীর মুখ জয়ার প্রস্তাবে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। শঙ্কর শঙ্করীকে প্রতারণা করেছিল সত্য। কিন্তু আইনের প্রশস্ত পথ খোলা থাকা সত্ত্বেও—শঙ্করী যা সে পথে যে নারাজ।" শঙ্করীর এই দুর্বলতাই হলো তার জীবনের কাল।

বহুকষ্টে শঙ্করী শঙ্করকে হিন্দুমতে বিয়ে করতে রাজী করিয়েছিল। কারণ অসবর্ণ বিয়ে আইনত তখন প্রচলিত। জয়ার বিচক্ষণ পিতা কেবল দীর্ঘ দশ বছর পর শঙ্করীকে দ্বিতীয়বার বিয়েই দিলেন না। বিয়ের প্রতিটি অনুষ্ঠানের ফটো তুলে রাখলেন। কারণ এসব শিক্ষিত ধোঁকাবাজদের নিয়েই তো তাঁর কোর্টের কারবার। তিনি জানেন এ ধরণের কোন প্রমাণ না রাখলে শঙ্কর হয়ত এই বিয়েটাও ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসবে।

কিন্তু বিধি যেখানে বাম—কোন শৃঙ্খলেই সেখানে কাউকে ধরে রাখা যায় না। শঙ্করী যখন হিন্দু অনুষ্ঠানে বিয়ের পর তার সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হল মনে করেছিল—বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে তখন হেসে ছিলেন। কয়েক মাস পর একদিন শঙ্করের সাথে দীঘায় বেড়াতে যেয়ে হোটেলে আলাপ হ'ল 'স্বাতী' ও তার দাদা শেখরের সঙ্গে। আলাপ ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে এসে দাঁড়াল। 'স্বাতী' বয়সে শঙ্করীর অনেক ছোট। তাই শঙ্করী তার 'দিদি' ও শঙ্কর 'দাদাবাবু'। দীঘার থেকে ফিরে এসেও স্বাতী-শেখর প্রায়ই আসে শঙ্করীদের বাসায়। স্বাতীকে শঙ্করী যথার্থই স্নেহ করে ছোট বোনের মত। স্বাতীর আবদারে নিজে মাঝে মাঝে নানা রকমারী ব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়ায়। শঙ্করীর বান্ধবীরা মাঝে মাঝে বলত—"শঙ্করী, এই আগাছা সরিয়ে ফেল। নয়ত মরবি। একেই তোর শঙ্কর একেবারে ভোলানাথ। শত পত্নীতেও তার অরুচি নেই। তার উপর তুই আবার যেচে পড়ে এক সতীন থাকতে—আর এক সতীনের কাঁটা বাঁধতে যাচ্ছিস্ কেন?"

"তোরা যে কি বলিস? স্বাতী যে একেবারে ছেলে মানুষ। সে কেন আমার সতীন হতে আসবে। বুড়োর মধ্যে সে কি রস পাবে? স্বাতীর জন্য আমিই কেমন কার্তিক জুটিয়ে দেব। তবে মেয়েটার লেখা পড়ায় একদম মন নেই। স্কুল ফাইন্যালটাই ২।৩ বারে পাশ করতে পারছে না।" বান্ধবীরা মুখ বেঁকিয়ে চলে যেতো।

শঙ্করীর জীবনের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়ে এলো—আরও বছর খানেক পরে। একদিন শঙ্কর এসে জানালো অফিসের কাজে তাকে দিল্লী যেতে হবে। মাঝে মাঝেই শঙ্করকে এমনি যেতে হতো। তাই শঙ্করীর এতে সন্দেহ করবার কিছুই ছিল না। যাবার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে—শঙ্করী কি জানত—শঙ্করের সেই যাত্রা অগস্ত্য যাত্রা হবে। দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ গড়িয়ে যায়—শঙ্করের কোন চিঠি আসে না। শঙ্করী অফিসে টেলিগ্রাম পাঠায়—তারও কোন উত্তর নেই। শঙ্করীর যে বান্ধবীরা একদিন তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল—অবশেষে তারাই খোঁজ নিয়ে জানিয়ে গেল—শঙ্কর দিল্লী যায়নি। কলকাতাতেই স্বাতীকে নিয়ে নতুন নীড় বেঁধেছে। বান্ধবীরা এসে শঙ্করীকে গাল দিল। শঙ্করী

বেহায়ার মত ছুটে গেল শঙ্করের কাছে—অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে এল।

দিনের পর দিন শঙ্করী বহু টাকা নষ্ট করেছে নানা সাধু, গণৎকার, পীরের দরগায়—যেন শঙ্করের সুমতি হয়। সে যেন ফিরে আসে। আত্মীয় পরিজনের বিদ্রূপ বাণ, বন্ধুদের তিরস্কার, নিজের বিবেকের দংশনে সত্যি শঙ্করীর কিছুটা মতিভ্রম হয়েছিল। দুঃখ ও অভিমানে সে শঙ্করকে দিয়েছে তাদের দ্বৈত রোজগারের সঞ্চিত অর্থ ও শঙ্করের প্রথম প্রেমের প্রতীক—খানকয়েক গয়না। নির্লজ্জের মত হাসিমুখে হাত পেতে শঙ্কর তা গ্রহণ করেছে এবং আত্মীয় ও বন্ধুমহলে প্রচার করেছে যে শঙ্করীই তাদের রেজিষ্টারী বিয়ে নাকচ করে তাকে পরিত্যাগ করে গেছে—যেহেতু বাল্যের প্রেমিকের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য।

হতভাগী শঙ্করীর জীবনে যে সুখের দোলা লেগেছিল সাময়িক কালের জন্য—তাও থেমে গেল। আবার সে চাকরী গ্রহণ করল। কিন্তু গত কয়েকটা বছরের স্মৃতি সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। তাই আইনের দ্বার খোলা থাকা সত্ত্বেও সে খোরপোষের দাবী বা বিবাহ বিচ্ছেদ কোনটাই করছে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস শঙ্করকে একদিন ফিরে আসতেই হবে। শঙ্কর চলে যাওয়ার পর শঙ্করের কলঙ্কময় গত জীবনের অনেক কাহিনীই শঙ্করী শুনেছে। বেলা বলেছিল সমস্ত কাহিনী শুনে—'শঙ্করের ফিরে আসার ভ্রান্ত ধারণাই—তোর জীবন দীপ নিভিয়ে দেবে। তোর শঙ্কর আর ফিরবে না। তোর কাছে তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। তাই এখন আর শিক্ষিতা মেয়েদের ছায়া সে মাড়াবে না। তাই তো বেছে বেছে মেয়ের বয়সী অল্পশিক্ষিতা স্বাতীকে নিয়ে মজেছে।' বেলার উপদেশ শঙ্করী গ্রহণ করতে পারেনি। তাই শঙ্করের মঙ্গলার্থে সিন্দুর বিন্দু মুছে ফেলতে পারিনি—পারেনি নিজের নামের পাশে শঙ্করের পদবীর লেজটা ছাঁটাই করতে।

আরও বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে। শঙ্করীর কাহিনী বেলার আর লেখা হয়ে ওঠেনি। কারণ শঙ্করী আর বেলাদের কলেজে নেই। শঙ্করের চক্রান্তে কোথাও শঙ্করীর চাকরী স্থায়ী হতে পারে না! নানা মিথ্যে কথা রটনা করে সে একের পর এক শঙ্করীর সব চাকরী শেষ করে দিতো। শঙ্করীর রেজিষ্টারী বিয়ে নাকচের দলিলখানা সর্বত্র দেখিয়ে—তার চরিত্রের নানা অপবাদ দিয়ে চাকরী হতে বরখাস্ত করে শঙ্করের মত শিক্ষিত ভদ্রবেশী শয়তানরা পায় উল্লাস। গৃহের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে শঙ্করী বাল্যকাল হতেই চলতে পারেনি। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দাঁড়িয়ে—শঙ্করী মনের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। তার মধ্যে ক্রমেই দেখা গেল মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। শঙ্করীর সঙ্কল্প—শঙ্করকে ফিরিয়ে আনবেই—তা আর রক্ষা হলো না। পরন্ত শঙ্করীকেই চলে যেতে হলো রাঁচির পাগলা গারদে। হয়'ত সুস্থ মস্তিষ্ক যে শান্তি, সুখ শঙ্করীকে দেয়নি—বিকৃত মস্তিষ্কে শঙ্করী তা পাবে। স্মৃতির নাগপাশের বাঁধন হ'তে সে মুক্তি পাবে। মুক্তি পাবে সংসারের গঞ্জনা—শঙ্করের লাঞ্ছনা হ'তে। আধুনিক যুগে সীতা-সাবিত্রীর পবিত্রতা রক্ষা করতে যেয়েই শঙ্করীর মত মেধাবী, বুদ্ধিমতী, উচ্চশিক্ষিতা বাঁধা পড়েছে পাগলা গারদে।

উপনিবেশী আমেরিকান

শ্রীমায়া চট্টোপাধ্যায়

United States of America-র সংগঠন ও ক্রমবিকা[শ] অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সপ্ত[দশ] ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলিশ কলোনীগুলির উৎপত্তির মাঝখানে। অনুসন্ধানের প্রেরণা প্রথম জাগলো ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের মনে আবিষ্কৃত হোল আমেরিকা। এ যেন সোনার কাঠির ছোঁয়া পে[ল] অভিযানকারীদের মনে। ইওরোপের দ্বার খুলে গেল নতুন দে[শে] যাবার। ইওরোপীয়ান দেশগুলি থেকে দলে দলে লোক এসে উত্ত[র] আমেরিকার আটলান্টিকের ধার ঘেঁষে জায়গাগুলিতে বসবাস আর[ম্ভ] করে দিল। তাঁরা প্রথমে ১৩টি কলোনী তৈরী করলো এবং ইং[ল্যান্ড] এই কলোনীগুলির অধিকার পেল। সেজন্য এগুলো ইংলিশ কলো[নী] নামে পরিচিত হোল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এ[ই] কলোনীগুলি সমষ্টিগতভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো এবং ইংলণ্ডে[র] হাত হতে বেরিয়ে নিজেদের United States of America ব[লে] ঘোষণা করলো।

ইওরোপীয়ানদের এদেশে আসার একমাত্র যান ছিল বড় ব[ড়] কাঠের তৈরী জাহাজ। তাদের যাত্রাকালটাও ছিল নিতান্তই দীর্[ঘ]। তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে আসত জামা-কাপড়, ঘর তৈরীর যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। তখন এদেশে কোন কোন জায়গা এত জলা ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল যে, এই উপনিবেশীদলের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হোল সেই স[ব] অঞ্চলে বসতি স্থাপন করা। ভার্জিনিয়ার 'জেমসটাউন' অঞ্চলে বসতি প্রায় ছিল না বললেই চলে। ধীরে ধীরে জেমসটাউনে ইংরেজ উপনিবেশীরা চিরস্থায়ী দুর্গ স্থাপিত করলো। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা ডাচদের স্থাপিত একটি কলোনী দখল করে নিল আর তার নতুন নাম দিল "নিউ ইয়র্ক"। উপনিবেশীদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এল। তারা নিজের দেশে যা যা করার সুবিধা পায়নি তার সুবিধা এই বিদেশে এসে তারা পেল। দেশে থাকতে অনেকে নিজের ধরণে ও পছন্দমত ধর্মকে গ্রহণ করে উপাসনা করতে পারেনি। এই বিদেশে এসে তারা স্বাধীন হোল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তারা খুব ভাল ফসল পেল চাষবাস করে। সব উপনিবেশীরা একটি দিন ঠিক করে একসঙ্গে ভগবানকে ধন্যবাদ দানের জন্য বিরাট উৎসব করলো। এই হোল আমেরিকানদের প্রথম Thanks giving day.

আমেরিকায় পৌঁছে উপনিবেশীদের প্রথম কাজ হোল থাকার বাসস্থান তৈরী করা। এজন্যে তারা খুব সময় দিতে পারলো না, তাই তাদের প্রথম তৈরী ঘরগুলো ছিলো অনেকটা কুঁড়ে ঘর ধরণের। ক্রমে ক্রমে ঘরের কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন হোল। এই নতুন ধরণের বাড়ীগুলি হোল কাঠের বাড়ী (log cabins)। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই কাঠের বাড়ীই চল ছিল। ধীরে ধীরে কাঠের পাটার তৈরী বাড়ী হতে আরম্ভ হোল। আবার দোতলা বাড়ীও এ সময়ে সৃষ্টি হোল। প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাথর ও ইঁট দিয়ে বাড়ীর ক্রমবিকাশ হোল।

থাকতে থাকতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই উপনিবেশী দল বেশ ধনী হয়ে উঠল এবং তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাসস্থানেরও পরিবর্ত্তন হোল। ছোট ছোট বাসস্থানের

পরিবর্ত্তে বিরাট বিরাট প্রাসাদের প্রচলন হোল। ই ট গুলিতে বিভিন্ন রং করে প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বাড়ানো হোত। প্রাসাদের ভিতর ঘরগুলি মূল্যবান কার্পেট ও আসবাবপত্র দ্বারা সাজান ছিল আর প্রাসাদের বাইরে সুন্দর সুন্দর বাগান তৈরী করা হোত। গ্রীক ও রোমান স্থাপত্যের হুবহু অনুকরণ বলা চলে এই সব প্রাসাদগুলির গঠন ভঙ্গী। উপনিবেশীদের গৃহনির্ম্মাণে আরামপ্রদ তাপমান রান্নাঘরের স্থান সর্ব্বপ্রথমে ছিলো। এইসব রান্নাঘর তখন বহুরকম ভাবে ব্যবহৃত হোত। যেমন রান্নাঘরে যুদ্ধের সরঞ্জাম রাখা হোত, যাতে "আমেরিকান ইণ্ডিয়ান"দের দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হয়েও তাদের না হঠতে হয়। এছাড়া ঘরে জামা কাপড় তৈরী করার জন্ম চরকা ও তার জন্ম অন্যান্য জিনিষ রান্নাঘরেই থাকত। এ সময় আমেরিকানদের খাওয়ার ঘর বলে একটি আলাদা ঘরের প্রচলন হয়নি, তাই তারা রান্নাঘরের মধ্যেই কাঠের তৈরী চেয়ার টেবিল রেখে খাওয়া দাওয়া করত। কাঠ, দস্তা, লোহা ও তামা ঘরের আসবাবপত্র ও বাসন তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হোত। ঘরে আলোর জন্যে মোমবাতি ব্যবহার করা হোত এবং তাহা ঘরেই তৈরী হোত। ধনীদের ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে ঝাড় লণ্ঠন ঝুলানোর প্রচলন এই সময় হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর উপনিবেশীরা যে যে ধরণের জামাকাপড় ব্যবহার করত তা'র মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য ছিল। "ডাচ" উপনিবেশীরা সাধারণতঃ খুব উজ্জ্বল রংএর ঢিলে পোষাক পরত। ছোট ছেলেমেয়েরা কাঠের তৈরী জুতো ব্যবহার করত। ধনীরা তা'দের সব জামাকাপড় ইংলণ্ড হতে আনাত। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিভিন্ন ধরণের জামাকাপড়ের পরিবর্তে সব উপনিবেশীরা একই ধরণের জামাকাপড় ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। এ সময় মাথায় পরচুলা পরে সামাজিক ব্যাপারে যোগদানের প্রচলন প্রবর্ত্তিত হয়।

এদেশে আসার পর উপনিবেশীদের শিক্ষার জগৎ খুব বেশী বিস্তৃত ছিল না। ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ীর মধ্যেই মা কিংবা অন্য কারও কাছে শিক্ষার প্রথম পাঠ নিত। ছোটদের উপযোগী কিছু বইও তখন লেখা হোত। কিন্তু শিক্ষার জগতে উন্নতি সাধনের জন্ম তা'রা খুব বেশীদিন অপেক্ষা করল না। এর প্রমাণ তা'রা প্রথম দেখাল ১৭৬৯ সালে "ডার্টমাউথে" (Dartmouth) কলেজ স্থাপন করে। এখন থেকে উপনিবেশীদের শিক্ষার জগতে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন এলো।

শিক্ষার জগতে পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে উপনিবেশীরা মনোযোগ দিল ধর্ম্মজীবনে উন্নতি সাধনের। প্রথম প্রথম ঈশ্বরকে উপাসনা করার জন্যে কোন গির্জ্জার উৎপত্তি হয়নি। অনেকে মিলে একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিত ও উপাসনা করত। এখনকার দিনের "খ্রীষ্ট"দের মত তখনকার দিনেও তারা একজনকে তা'দের ধর্ম্মজীবনে পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করত। সাধারণতঃ রবিবার দিনটি সকলে বাইবেল পড়ে, উপাসনা করে অতিবাহিত করত। ধীরে ধীরে তা'রা গাছের তলার পরিবর্ত্তে একটি বাড়ীকে উপাসনাগার হিসাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। এইভাবে এদের ধর্ম্মজীবনে গির্জ্জার উৎপত্তি হোল।

উপনিবেশীদের লিখিত ভাষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লেখারও চল্ হয়। তখন কিন্তু চিঠি বিলি করার কোন ব্যবস্থা ছিল না তাই কিছু লোক ঠিক হোল যারা চিঠি এক জায়গা হতে আর এক জায়গায় বিলি করে বেড়াবে। চিঠি ফেলার জন্ম পোষ্ট-অফিসেরও প্রতিষ্ঠা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে খবরের কাগজের উদ্ভাবনে উপনিবেশীদের জীবনে একটি বিস্ময়কর উন্নতিসাধন হোল। এ ছাড়া চোর ডাকাতের হাত হতে নিরাপত্তার জন্ম রাত্রিতে পাহারাওয়ালার পদ সৃষ্টি হোল। এই নিরাপত্তা রক্ষাকারীরাই পরবর্ত্তীকালে পুলিসের স্থান পেল।

তখনকার দিনে উপনিবেশী আমেরিকানদের জীবনযাত্রা কৃষি-কার্য্যের উপরই নির্ভরশীল ছিল। তবে ক্রমে উহাদের জীবন-যাত্রায় ছোট ছোট কুটীরশিল্পের উদ্ভাবন হোল। মাছ ও তিমি ধরার জন্ম নৌকো তৈরী করা, জাহাজ তৈরী করা, ইওরোপে মাল রপ্তানীর জন্যে কাঠের পিপা তৈরী করা ইত্যাদির কারখানা স্থাপিত হোল। এছাড়া কামার, মুচি ইত্যাদি জীবিকাধারী লোকও বহু ছিল। সে যুগে জুতো হাতে করে তৈরী করতে হোত। এই জুতোগুলির মধ্যে ডান পা বাম পা বলে কোন পার্থক্য ছিল না। দু'পায়েই যে কোন জুতো পরা যেত। জুতো কাঠ হতেই তৈরী করা হোত। ঘোড়ার চুল বা সুতো দিয়ে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের জন্ম পরচুলা তৈরী করাও তখন বেশ একটি লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠেছিলো।

এই কলোনিয়েল যুগে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল দক্ষিণের দেশগুলির "প্ল্যানটেশন" (plantations) নিয়মধারার। তামাক, চাল, ভুট্টা, নীল ইত্যাদি প্ল্যানটেশনে চাষ করা হোত। নিগ্রো কৃতদাসরা এইসব প্ল্যানটেশনে থাকতো ও তাদের মালিকদের জন্যে চাষ করত। প্ল্যানটেশনের মালিকরা খুব ধনী ছিল। এই পয়সা তারা নানা ভাবে ব্যয় করত। এর মধ্যে সবটাই প্রায় নিজেদের আকাঙ্খা মেটাতে ও সুখ ভোগের জন্ম ব্যবহৃত হোত ; যেমন—ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্ম ইংলণ্ডে পাঠিয়ে, ইংলণ্ড হতে শিক্ষক এনে এদেশে রেখে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করার জন্যে, বিভিন্ন পার্টিতে গানবাজনা নাচ-এর অনুষ্ঠান করে। তখন ধনীর মেয়েদের মধ্যেও গান গাওয়ার প্রচলন ছিল। এই যুগে ধনীসমাজটা আবার ঠিক ইংরেজ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর নকলরূপে রূপান্তরিত হয়েছিলো।

সব কিছু মিলিয়ে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর উপনিবেশী জীবনধারার মাঝেই বর্ত্তমান কালের উচ্চসভ্যতাসম্পন্ন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সূচনা হয়েছিলো। এই উপনিবেশীরা ঘরবাড়ী ছেড়ে একটি অজানা দেশে যেভাবে এসে পৌছেছিল এবং সব কিছু প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে তা'রা যে অচিন্তনীয় উন্নতি করেছে তা'র আরম্ভ এই উপনিবেশী যুগেই হয়ে গেছে, যেদিন তা'রা প্রথম আমেরিকার মাটিতে পা দিল সেই দিনই জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও সফলতা লাভ করার যে প্রথম পাঠ নিয়েছিলো আজও তা'র শেষ হয়নি। উপনিবেশী যুগের শতাব্দীগুলিই বহন করে এনেছে আজকের উচ্চসভ্যতাসম্পন্ন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্টিকলাকে, তাই এই দুই যুগের সভ্যতার ও জীবনযাত্রার মধ্যে যুগান্তকারী পার্থক্য থাকলেও এরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

জুল্‌ফিকার

সম্ভবতম ব্যয়ে, তাসের মত জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক খেলা আর দুটি আছে কি না, সন্দেহ। নিয়ন আলোক-উদ্ভাসিত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাব ঘরে, ডিনার জ্যাকেট আঁটা সাহেবদের কন্‌ট্রাক্ট ব্রীজ খেলাই হোক, আর ছিটিধর মুদির দোকানের পাশে বকুল তলায় বাঁশের মাচায় বসে মলিন তাসে বিস্তি খেলাই হোক অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে 'কোপরা' বোঝাই জাহাজের পিছন ধারে পিপের আড়ালে, চীনা মাল্লাদের ফান্‌তান্ খেলাই হোক,—আনন্দ ও উত্তেজনা সবটাতেই সমান।

একজোড়া তাস পেলে নির্জনতা বা একঘেঁয়েমীতে ভয় কি? খেলা দশটার সময় তাড়াতাড়ি কোনমতে নাকে মুখে চাটি গুঁজে, স্টেশনে এসে শোনা গেল, আসাম-লিঙ্ক এক্সপ্রেস সাড়ে আট ঘণ্টা লেট! সন্ধ্যে সাতটার এধারে গাড়ী আসচে না। সেরেছে,···এই সুদীর্ঘ আট ন' ঘণ্টা সময় কাটাই কি করে! আমরা দু'জন যাচ্ছি কোচবিহার, জুটে গেলেন আরও দু'জন,—একজন যাবেন গৌহাটি, একজন জোড়হাট। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটী হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে বার করলেন ঝকঝকে এক জোড়া নতুন তাস। ব্যস্, আড্ডা বসে গেল। ইষ্টিশনের বাবুদের কাছ থেকে চেয়ে দু'খানা টুল আর ওয়েটিং রুমের দু'খানা চেয়ার এনে, দরজার পাশে রাখা মস্ত কাঠের বাক্সের উপর খেলা সুরু হল।···সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরও পেলুম না। হুঁস্ হল যখন, গাড়ী প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে।

* * *

তাসের জন্ম কোথায়, সেটা নিয়ে মতান্তর আছে। কারো মতে মিশরীরা এর আবিষ্কর্ত্তা, আবার কেউ বলেন এর উদ্ভাবক হচ্ছে আরবরা। স্যার উইলিয়াম জোন্সের মতে ভারতেই তাস খেলার উৎপত্তি। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটীতে হাজার বছরের পুরাণো ভারতীয় তাস রক্ষিত আছে।···যাই হোক, দাবা খেলার মত তাস খেলাটাও যে প্রাচ্য থেকে ইউরোপ খণ্ডে আমদানী হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। Chaucer ও Boccacio এর লেখায় তৎকালীন ইউরোপের বহু রকমের খেলারই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাস খেলার কথা কুত্রাপি নেই। ইউরোপে তাস খেলার প্রচলন হয়েছে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। মধ্যযুগে ইউরোপে, বিশেষতঃ, সৌখিন সমাজে তাস খেলাটা নিতান্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। জুয়াখেলা ও ভাগ্যগননায় তাস ছিল অপরিহার্য্য। ফরাসী রাজ ষষ্ঠ চার্লসের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবে, হোটেলে, জাহাজীদের আড্ডাখানায় তাসের নেশায় বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি। অবিশ্যি পুরাণো আমলের খেলাগুলো পাল্টেছে। সেকালের খেলাগুলোর মধ্যে Comet, Crimp and hazard, Commerce, Euchre, Ombre, Loo, Quadrille প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। Baccarat (ব্যাকারা), Faro, Whist খেলা অনেকটা আধুনিক। হাল আমলের খেলা Bridge, Poker (আমেরিকায়) Fish ইত্যাদি।

* * *

তাস নিয়ে বহু গল্প, কবিতা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। Pushkin এর 'ইস্কাবনের বিবি' আর Sologub (?) এর 'Grand Slam' রুশ ভাষায় নামকরা গল্প। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' গীতিনাট্য তাঁর শতবার্ষিকীতে বহু জায়গায় অভিনীত হয়ে গেল। Lewis Caroll তাঁর ALICE IN WONDERLANDএ হরতনের বিবিকে অমর করে গেছেন, বিলেতী ছোটদের ছড়ায় (Nursery Rhymes) এ আছে:

'The queen of hearts, she made some tarts—
All on a summer day,
The knave of hearts, he stole those tarts
And took them away'.

Ombre খেলা নিয়ে ইংরেজ কবি Pope তাঁর Rope of the Lookএ লিখে গেছেন—

'An ombre singler to decieve their doom
Let spades be trumps she said
And trumps they were
Spadillo* first unconquerable lord!
Led off two captive trumps and swept the board'

(* ইস্কাবনের টেক্কা)

Euchre খেলায় হরতনের গোলাম হচ্ছে সবচেয়ে সরেস তাস। Loo খেলায় Pam বা চিঁড়িতনের গোলামও অনুরূপ মর্য্যাদা পেত।

'mighty PAM that kings and queens overthrow'

বিখ্যাত মার্কিণী লেখক Bret Harteর নাম অনেকেই শুনে থাকবেন। তাঁর নাম করা কবিতা, 'Heathen Chinee প্রেরণা পেয়েছিলেন Los Angelesএর জনৈক চীনেম্যানের হাতায় আঁকা হরতনের গোলামের ছবি দেখে। Euchre খেলায় এই তাসকে বলা হয় 'right bower' Harte লিখেছেন—

'But the hands that were played
By that heathen chinee
And the points that he made,
Were quite frightful to see,
Till at last he put down a right bower,
Which the same Nye had dealt unto me."

নরদামবারল্যাণ্ড প্রভৃতি ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলে হরতনের চৌকাকে বলা হত 'হব কলিংউড'। Hob Collingwood তরুণ যুবা, বিস্তৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হল হব্। কোন পাত্তা নেই তার। কিছুদিন বাদ তার রক্তাক্ত মৃতদেহ কাছেই একটা পাহাড়ের উপর পড়ে থাকতে দেখা গেল,—হাতের মুঠায় ধরা একখানা তাস,—হরতনের চৌকা। কলিংউডের এই শোচনীয় মৃত্যু অবলম্বনে Percyর কবিতায় বলা হয়েছে:—

'O dead he lay upon the hill
All dabbled in his gore;
Five hearts there were and all are still
For his own did beat no more.'

তাসের পিঠে দু'চার ছত্র কবিতা লিখে উপহার দেওয়ার রেওয়াজ

ছিল সে যুগে। কবি 'গ্রে' একবার একখানা চিঁড়ের নওলার উপর তাঁর Beggar's Operaর কয়েক ছত্র লিখে, তাঁর অনুরাগিণী একজন লেডীকে উপহার দেন।

* * * *

আজকাল যেমন তাসের প্যাকে বায়ান্ন খানা তাস থাকে, আগের দিন তা' ছিল না। মোট তাসের সংখ্যা ছিল তখন আটাত্তর খানা। এই রকম তাসের প্যাকেটকে বলা হত Tarochhi বা tarots। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন বা প্রতীকের দ্বারা তাসদের বর্ণ বিভাগ করা হত। এই প্রতীকগুলি ছিল,—পাতা, ঘণ্টা, একর্ণ (ওক গাছের ফল), তলোয়ার, কাপ, ফল, ছাতা, মাথা ইত্যাদি। জার্মাণীতে তাসের রঙ হিসাবে যে চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হত, তা হচ্ছে, hearts, bells, leaves ও acorns। ইটালীতে চালু ছিল swords, batons, cups, money। বর্তমান যুগের Hearts, Clubs, Diamonds, Spades এদেরই রূপান্তর। হার্ট হচ্ছে পানের আকৃতি হৃৎপিণ্ড। ক্লাব হচ্ছে গদা, ওটা আগে ছিল baton, পরে তিন মাথাওয়ালা ক্লাবে রূপান্তরিত হয়েছে।

ডায়মণ্ড হচ্ছে চতুষ্কোণ হীরা আর স্পেডস হচ্ছে কোদাল (তাহাতে কয়লা যা দিয়ে দেয় বয়লারে, বিলেতী কোদাল সেই সোভেলের (shovel) আকৃতি। ফলাটা এদেশী কোদালের মত হাতলের সাথে সমকোণে না থেকে সমসূত্রে অবস্থিত। চিঁড়ে আর ইস্কাবনের কোঁটার বোঁটা দু'টোকে বাড়িয়ে দিলে, তারা গদা আর কোদালের মতই দেখাবে।

সে আমলেও ছবিওয়ালা তাস ছিল তিনটে—King Chevalier ও Knave, Queen বা বিবি এলেন পরে, Chevalier এর বদলে। তাসের রাজার ছবিতে সে সময়কার রাজারাজড়াদের মুখের আদল খুঁজে পাওয়া যেত। আগেকার দিনে তাসগুলো সব হাতেই আঁকা হত। তাই একজোড়া তাসের যা দাম পড়ত, তাতে করে সাধারণ মানুষের পক্ষে এ খেলা খেলা সম্ভব ছিল না। এ খেলাটা তখন বিলাসের অঙ্গ বলেই গণ্য হত।

* * * *

যদি প্রশ্ন করা হয়, 'পয়লা নম্বর তাস কোন্‌টা? কোন্‌ তাসখানাকে head of the pack (deck) বলে ধরা হবে?' অনেকেই বলবেন, ইস্কাবনের টেক্কা। বর্ত্তমানে হয়ত তাই। কিন্তু আগের যুগে টেক্কার অস্তিত্বই ছিল না। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাসের প্যাকে টেক্কাই থাকত না। সবচেয়ে কুলীন তাসবংশ-অবতংস ছিলেন—হরতনের সাহেব। তাঁরই স্থান ছিল সর্ব্বাগ্রে। তাঁকে বলা হত Carolus। এই নামকরণ হয়েছে, ফ্রান্সের রাজা চার্লস দি সিক্সথের নাম অনুসারে। শোনা যায়, তিনিই নাকি ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম তাসখেলার প্রচলন করেছিলেন। তাঁরই সুরঞ্জিত প্রতিকৃতি সোনালী বর্ডারে ছাপা হয়ে তাসের প্যাকেটের পুরোভাগে হরতনের সাহেব রূপে বিরাজ করত।

* * * *

ফরাসী বিপ্লবের পর ইস্কাবনের সাহেবের মুখটা আঁকা হল রুশোর মুখের মতন, আর আমেরিকায় Lafayette এর মুখের ধাঁচে। ফরাসী তাসে চারটে সাহেবের মুখে চারজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির (philosopher) মুখের সাদৃশ্য ছিল। এঁরা হচ্ছেন মলিয়ার, লা ফঁতে (La Fontaine), ভোলতেয়ার ও রুশো। বিবি বা Queen এর বদলে স্থান পেল চারিটি গুণের (virtue) প্রতিমূর্ত্তি—Prudence, Justice, Temperence এবং Fortitude। ইস্কাবনের সাহেব হাতে পেয়ে বাবার জিতলে সে কালের ফরাসী খেলোয়াড়রা বলে উঠতেন,—'Je joue le grand philosophe de pique।'

১৮৪৮ সালে নিউইয়র্কে যখন প্রথম Republic Cards ছাপা হল, তখন ফরাসীদের দেখাদেখি হরতনের সাহেবের মুখটা আঁকা হল জর্জ্জ ওয়াশিংটনের মত, রুহিতনের জন এ্যাডামসের মত, চিঁড়ের ফ্রাঙ্কলিনের মত আর ইস্কাবনের সাহেবের মুখটা লাফায়েতের মত। বিবিরা হলেন Venus, Fortune, Ceres (শস্যের দেবী) ও Minerva—এই চারজন দেবীর প্রতিমূর্ত্তি।

* * * *

প্রায় প্রত্যেক তাসেরই একটা না একটা চলতি নাম আছে। হরতনের সাহেবকে যেমন বলা হত ক্যারোলাস, হরতনের বিবির তেমনি নাম ছিল লেডী কভেন্ট্রীস কার্ড। রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের আমলে লেডি কভেন্ট্রীর মত সুন্দরী সারা ইংলণ্ডে খুব কমই ছিলেন। কুমারী অবস্থায় ভাগ্যগণনা করতে গিয়ে, তিন তিনবার এই একই তাস তুলেছিলেন তিনি। তা দেখে গণক বলেছিল, তাঁর উচ্চবংশে বিয়ে হবে, প্রচুর বিত্তের অধিকারিণী হবেন তিনি আর অকাল মৃত্যু হবে তাঁর। প্রথম দু'টো ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ঠিক ফলে যাওয়ার লেডী কভেন্ট্রী খুব বিচলিত হয়ে পড়েন মৃত্যুভয়ে। দুশ্চিন্তায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং শেষে মৃত্যু ঘটে। প্রত্যহ ঘুমানোর আগে কিছুক্ষণ তাস খেলতেন তিনি। হরতনের বিবি হাতে এলেই তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। মরার দিন রাতে তাঁর হাতে বার বার হরতনের বিবি আসতে লাগল। তাঁর জীর্ণ স্বাস্থ্য বোধ হয় সে shock সহ্য করতে পারে নি।
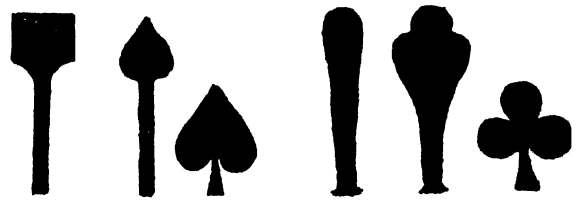
কোদাল   ইস্কাবন   বেটন   চিঁড়িতন
(হাল রূপ)

হরতনের গোলামকে বলা হত Hearty Jackanapes; কেউ কেউ বলত Heathen Chinee. আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা রুহিতনের টেক্কাকে বলে থাকে, 'Earl of Cork,' তাস কুলে এর স্থান সবার নীচে। Earl of Cork ও ছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের দরিদ্রতম Peer. রুহিতনের সাহেবের নাম লা গ্রাঁদ্‌ পাঁদু (Le grand Pendu)—the great hanged one. এটা খুব অপয়া তাস। রুহিতনের দশের অভিধা ছিল Picks (Pyx)। রুহিতনের নওলা হচ্ছে, 'Curse of Scotland.' হরতনের আটার নামটা একটু অদ্ভুত ধরণের, the paranthesis. হরতনের

নওলাকে বলা হত 'Nap' (Napolean)। হরতনের ছক্কার নাম হচ্ছে the grace card। ইস্কাবনের ছক্কার নাম, 'Poor Dicks'। চিঁড়ের পাঞ্জাকে বলা হত, 'Watson's Card' আর ইস্কাবনের দশকে 'Buffalo Bill's Card'।

এই সব নামের প্রত্যেকটার পিছনে একটা না একটা ইতিহাস আছে এবং অনেক ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক ঘটনার সঙ্গে এদের স্মৃতি জড়িত। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে এই ধরণের গোটাকতক গল্প দেওয়া হল।

* * * *

ফ্রান্সে তখন গণতন্ত্র চলছে। Jean Paul Marat এর নৃশংস শাসনে (Reign of terror) দেশের জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই সকালবেলা মারাত স্নানাগারে সরকারী কাগজপত্র নিয়ে বসে আছেন, চর্ম্মরোগের প্রকোপে চিকিৎসকদের নির্দেশ অনুযায়ী অধিকাংশ সময়ই মারাতকে গরম জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে হত। কাগজপত্রের সাথে এক জোড়া Republican cardও ছিল,—একজন তাস নির্ম্মাতার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন ওটা। স্নানের ঘরে বসে বই পড়ছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন অপরিচিতা মেয়ে (শারলোত্তি কর্দে) এসে ঢুকল, সঙ্গে সংগুপ্ত ছুরিকা। মারাত তাসের প্যাকেট থেকে একখানা তাস (চিঁড়ের গোলাম) নিয়ে, পড়ার জায়গাটার পেজ মার্ক দিয়ে, বইটা বন্ধ করে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে যাবেন, এরই মধ্যে ছুরি বার করে মেয়েটা তাঁকে আঘাত করল, সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হল।···হত্যার পর যে জিনিষ যেখানে ছিল, বহুদিন পর্য্যন্ত তেমনিই ছিল,—কোন কিছু সরানো হয়নি। চিঁড়ের গোলাম সেই থেকে অপয়া হয়ে আছে।···আর একটা অশুভ তাস রুহিতনের সাহেব, ফরাসীরা যাকে বলে 'লা গ্রাঁদ পাড়ু'। Joachim Murat তখন নেপলসের রাজা। সুপ্রসিদ্ধ Marianne Lenormand-এর কাছে গেছেন, ভাগ্যগণনা করাতে। লা নর মাঁদের কথামত মুরাত টেবিলের উপর রাখা তাসের প্যাক থেকে একখানা তাস টানলেন। উঠল রুহিতনের সাহেব। তখন টেবিলের উপর দশটি নাপোলিয় (ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা) রেখে আবার তাস তুললেন মুরাত। এবারেও সেই অপয়া সাহেব।···প্রথমে পঞ্চাশ শেষে একশ' স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত দেবার প্রস্তাব করে, শেষ একটা চান্স নিতে চাইলেন মুরাত, কিন্তু লা নর মাঁদ রাগ করে মুরাতের গায়ে তাসগুলো ছুঁড়ে দিয়ে তাঁকে চলে যেতে বললেন। এর অল্পদিন পরই মুরাতের প্রাণদণ্ড হয়।

* * * *

ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে এসে Lord Clive লণ্ডনের সৌখীন মহল্লায়—বার্কলী স্কোয়ারে বাসা বাঁধলেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, দেশে ফিরে নবাব হয়ে বসলেন। প্রকাণ্ড প্রাসাদ, অঢেল টাকার মালিক। সৌখীন অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহেব, বিবিদের আনাগোনা তাঁর বাড়ীতে;—খানাপিনা, খেলাধূলা উৎসব। তবুও কেন যেন শান্তি নেই তাঁর মনে। কী এক অজানা আতঙ্ক তাঁকে উৎকণ্ঠা-জর্জ্জর করে তুলেছিল। ১৭৭৪ সালের ২২শে নভেম্বর রাত্রে ক্লাইভের বাড়ীতে আড্ডা বসেছে। খানাপিনার পর তাসে বসেছেন সবাই। তাস বাটার পর, তরুপের তাস তুলে দেখেন ক্লাইভ, হরতনের সাত। খানিকক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে রইলেন, তাসখানার পানে। তারপর হঠাৎ উঠে সবার কাছে মার্জ্জনা চেয়ে শীগগিরই আসবেন বলে ভিতরে ঢুকলেন। অনেকক্ষণ হলেও যখন ফিরলেন না তখন বন্ধুদের একজন খোঁজ নিতে ভিতরে গিয়ে দেখেন, ক্লাইভের রক্তাপ্লুত দেহ মেঝেতে লোটাচ্ছে,—ছুরি দিয়ে গলা কাটা অবস্থায়। তাসটার রহস্য কিন্তু ভেদ হয়নি আজও।

* * * *

Marie Antoinette পুত্র Dauphinকে খেলার জন্ত যে তাসের প্যাকেটটা দিয়েছিলেন, কারাগারে এই তাস জোড়াই তার খেলার একমাত্র সামগ্রী ছিল। তারপর জেলর সাইমন তা কেড়ে নিয়ে একজন Deputyর (রাষ্ট্রসভার সভ্য) কাছে তা বিক্রী করে। ফলে তাকে Jacobian বলে কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহভাজন হতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাসগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়। শুধু দু'খানা তাস, কি করে যেন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। একখানা Comted' Artoisএর, অপরখানা (ইস্কাবনের সাতা) জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোকের হাতে আসে, তিনি ওটা Lady Schreiberকে উপহার দেন।

* * * *

হরতনের নওলাকে * সাধারণতঃ নাপ বলা হয়, নেপোলিয়নের নাম অনুসারে। ড্রেসডেন মুজিয়ামে একখানা হরতনের নওলা রাখা আছে, যার গায়ে সম্রাট নেপোলিয়ানের স্বহস্তে লিখিত কয়েকটি শব্দ আছে,—come, love, been, house প্রভৃতি। এগুলো তাঁর ইংরেজী শিক্ষার নমুনা। বলা বাহুল্য শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজী শেখা তাঁর হয়ে ওঠেনি।

* * * *

ইংলণ্ডের রাজা James II একবার Royal Societyর সদস্য, বিখ্যাত Sir Issac Newton ও President Halleyকে (খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ) প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। রাজা ওঁদের সাথে comet খেলেছিলেন। এই খেলার স্মারক হিসাবে একখানা রুহিতনের তিরি প্রাসাদে রক্ষিত হয়। পরবর্ত্তী কালে রাজা জেমস্ Royal society ও University of Cambriged কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে যেরূপ দুর্ব্যবহার করেছিলেন, তা সত্যিই খুবই মর্ম্মান্তিক।

ইতালীর বিশ্ব-বিশ্রুত রাজনীতিজ্ঞ কাভুরের (Cavour) তাস খেলার দারুণ নেশা ছিল। খাওয়া ও ঘুমের মত তাস খেলাটাও তাঁর দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীর অঙ্গ ছিল।

আর খেলোয়াড়ও ছিলেন তিনি খুবই উচ্চশ্রেণীর। তবে অত্যন্ত risk নিয়ে খেলতেন। Paris Conference যতদিন চলেছিল, একদিনও খেলা কামাই যায় নি তাঁর। Jockey Club এ রোজ

---

* 'হরতনের নওলা' নামে বাংলা একটা ডিটেকটিভ বই আছে। হরতনের নওলার নয়টি ফোঁটাকে কেটে বাদ দিয়ে তাসখানাকে চিঠির উপরে রেখে, তাসের ফাঁকে ফাঁকে যে শব্দগুলো পাওয়া গেল তাদের সাহায্যেই গোয়েন্দা দুর্ব্বোধ্য গুপ্ত লিপির মর্ম্মোদ্ঘাটন সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খেলতে যাওয়া চাই তাঁর। খেলায় প্রচুর টাকা জিত হয়েছিল কাম্ভ্যুরের,—প্রায় তিন লক্ষ টাকার মত। তাঁর lucky card ছিল,—হরতনের নয়। একদিন এক ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছ থেকে দশ সহস্র ফ্রাঙ্ক জিতে নিলেন কাম্ভ্যুর। সেদিনও তাঁর highest trump ছিল ইস্কাবনের নওলা। এই তাসখানার উপর এক ছত্র লিখে, তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ ভদ্রলোকের হাতে স্মারক হিসাবে তুলে দিয়েছিলেন: 'Ayez de respect pour les petites cartes'.

রাজ্ঞী এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করে, তাঁর স্থলে Mary Queen of Scotts-কে বসানোর জন্য ইংলণ্ডে যে চক্রান্ত হয়, ইতিহাসে তাকে বলা হয়েছে 'Throgmorton Plot. এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে স্প্যানীশ রাজদূত Mendoza-কে ইংলণ্ড থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। ইস্কাবনের গোলামের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত। Throgmorton-এর বাড়ী ছিল London-এর Pauls Wharf-এর কাছে। Morgan-এর চর হিসাবে সে রাণী মেরীকে সংবাদ সরবরাহ করত, আবার মেরীর খবর এনে রাজদূত মেণ্ডোজাকে দিয়ে আসত। ইংরেজ গুপ্ত পুলিশের লোক তাকে প্রায়ই স্পেনের রাজদূতের বাসায় যাওয়া-আসা করতে দেখত। ওর উপর তাই তারা বিশেষ লক্ষ্য রাখল। আরও অনেক সন্দেহজনক অবস্থায় ওকে দেখা গেল। শেষ পর্য্যন্ত Throgmorton-এর নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বেরুলো, সেই সঙ্গে ওর বাড়ী খানাতল্লাসী করার হুকুমও পেল পুলিশের লোক। পুলিশ ক্রমে যখন ওর বাড়ী ঘেরাও করেছে, Throgmorton তখন নীচের ঘরে Mary-র একখানা সাংকেতিক চিঠির পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত। পুলিশ এসে ঢুকতেই সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল, হাতের চিঠিখানা এই ফাঁকে বেমালুম গিলে ফেলেছে।···রাণী মেরীর চিঠিপত্রগুলো একটা ঝাঁপিতে (Casket) রাখা ছিল। পুলিশ ঢোকার আগেই সেটা পরিচারিকার মারফৎ Mendoza-র কাছে পাঠিয়ে দিতে পেরেছিল। একখানা ইস্কাবনের গোলামের উপর সাঙ্কেতিক ভাষায় তাড়াতাড়ি নীচের কয়েক ছত্র লিখে চিঠির ঝাঁপির ভিতর ফেলে দিয়েছিল সে:

'I have sworn I know naugut of anything found here that they must have been left by some one who seeks my deadly hurt. Be not afraid of my constancy. They shall kill me a thousand times ere I betray.'

খবর পেয়ে মেণ্ডোজা সাবধান হয়ে গেলেন। ইংলণ্ড ছেড়ে ক্যাথলিকেরা মরি-পড়ি করে পালাতে শুরু করে দিল। 'There was a flight of Catholics thick as autumn swallows.' Throgmorton শেষ পর্য্যন্ত স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয় এবং বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়।

রুশ সাহিত্যিক পুশ্‌কিনের নামকরা গল্প The Queen of the Spades* অনেকেই পড়ে থাকবেন। এই ইস্কাবনের বিবির সাহায্যে Captain Roger South নামক এক ভদ্রলোকের হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। যে তাসের প্যাক কিনে হত্যাকারী ক্যাপ্টেন রোজারের সঙ্গে খেলছিলেন, রোজারের কোটের পকেটেই তা পাওয়া গেল। আর ইস্কাবনের বিবির মুখের উপর তাঁর রক্তরঞ্জিত বুড়ো আঙুলের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।···বিচারে অপরাধীর ফাঁসি হল।

বিখ্যাত Colonel Cody—যাকে লোকে Buffalo Bill বলত, একবার হাজার ডলার বাজী রেখে, বারো গজ দূর থেকে একখানা ইস্কাবনের দশার প্রত্যেকটি কোঁটা রিভলভারের গুলী দিয়ে বিদ্ধ করেছিলেন। তাসটাকে এরপর নিলামে চড়ানো হয়। কর্ণেলেরই জনৈক ভক্ত ওখানা ডেকে নেন। তাসখানি এখন শিকাগোর DINE MUSEUM এ Curiosities এর মধ্যে স্থান পেয়েছে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Lord Lansdowne হোয়াইট ক্লাবের ড্রইং রুমে whist খেলছিলেন। তাঁর পার্টনার ছিলেন Conservative Party-র হুইপ Col Taylor। ইস্কাবন ট্রাম্প; কিন্তু Lansdowne ভুল করে হরতন খেলে বসলেন। এর পরই তাসগুলো তাঁর হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল। অসুস্থ বোধ করে তিনি গাড়ী আনতে বললেন। অতিকষ্টে ধরাধরি করে তুলে, গাড়ী করে তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হল। গাড়ী থেকে নামাবার সময় তাঁর পোষাকের ভাঁজ থেকে একখানা তাস রাস্তায় পড়ে গেল। সঙ্গী বন্ধুটি তুলে দেখেন একখানা ইস্কাবনের আট। তাসখানা দেখে, Lansdowne ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'Ah! there is that card that distracted me so!' উপরে শোবার ঘর তুলে নিয়ে যাবার অল্পক্ষণ পরেই, লর্ড সাহেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বন্ধুটি মারাত্মক তাসখানি নিয়ে ফিরে গেলেন ক্লাবে। সেই থেকে ইস্কাবনের আটা অপয়া তাস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ইস্কাবনের ছক্কার চলতি নাম Poor Dick। সেকালে St. James Square-এ Roxburg Club নামে একটা আড্ডাখানা ছিল। জোর খেলা চলত সেখানে,—রাত্তির দিন সমানে। আর খুব উঁচু Stake খেলা হত। একবার সেখানে Quartet খেলা হচ্ছে। খেলছিলেন—Harvey Comb, 'Tipoo' (Smith)

---

* গল্পটির সারমর্ম এই:

মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং কোরের জার্মাণবংশীয় হারমান্ আর সব অফিসারের চেয়ে স্বতন্ত্র। অন্যদের মত সে সুরা ও নারী নিয়ে মত্ত হয়ে ওঠে না। অহেতুক টাকা ওড়ায় না। সুদর্শন, চরিত্রবান, হিসাবী যুবক, কিন্তু হৃদয়ে তার অদম্য ধনলিপ্সা। ধনী তাকে হতেই হবে, যে করে হোক! দিনের পর দিন জুয়ার টেবিলের ধারে বসে, খেলা দেখে আর ভাবে। কিন্তু খেলতে নামবার সাহস হয় না। বন্ধুদের উপরোধ-অনুরোধ কানেই তোলে না।

একদিন ওর এক বন্ধুর দিদিমা Countess-এর গল্প শুনল। সে আমলে কাউন্টেসের মত রূপসী খুব কমই ছিলেন। প্যারিস সালোগুলোয় তাঁর অনুরক্ত ভক্ত ও স্তাবকদের অভাব ছিল না। বিখ্যাত সেণ্ট জারমেন (যিনি নাকি পিশাচসিদ্ধ ছিলেন) তাঁদেরই একজন। এঁর কাছ থেকে কাউন্টেস তিনখানা এমন তাসের হদিশ পেয়েছিলেন, যা ধরলে নির্ঘাত জিত। ঋণভারে জর্জরিতা কাউন্টেস জারমেনের নির্দেশমত তাস ধরে প্রচুর টাকা জিতে তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সে তিনখানা তাসের খবর কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আর কেউই জানতে পারেনি তাঁর কাছ থেকে।

Ward ও Sir John Malcolm। সোমবার সকালে খেলা সুরু হয়ে, দু'দিন দু'রাত্তির অষ্টপ্রহর খেলা চলবার পর বুধবার বেলা এগারোটার সময় বন্ধ হল।···খেলার মাঝে হঠাৎ খবর এল, Harveyর অংশীদার Richard Reade এর মৃত্যু হয়েছে। খবর শুনে Harvey Comb এতই বিচলিত হয়ে পড়লেন, যে নিজের খেঁড়ুর তাসের উপরই তুরুপ করে বসলেন,—ইস্কাবনের ছক্কা।···

'বেচারী ডিক।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন Comb। এরপর থেকে তাঁর ভাগ্য আশ্চর্য্যরূপে খুলে গেল।···ক্রমাগত জিত হতে লাগল তাঁর। বিপক্ষের খেলোয়াড়, Sir John, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজে ভারতবর্ষে গিয়ে প্রভূত ধনদৌলত নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। তখনকার দিনের নামজাদা ধনী। Comb তাঁর কাছ থেকে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ চার লক্ষ টাকারও বেশী জিতে নিলেন। খেলায় ভঙ্গ দিয়ে উঠে দাঁড়ান Comb। বললেন, 'ইস্কাবনের ছক্কাটা কেন ঘুরে ঘুরে আসছে আমার হাতে? আশ্চর্য্য। ওতে যেন Dick Reade এর মুখখানা আঁকা দেখতে পাচ্ছি। বড্ডই অসোয়াস্তি লাগছে আমার, আর খেলবো না।' এরপর বন্ধুর অন্ত্যেষ্টি কার্য্যে উপস্থিত হবার জন্য দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ক্লাব থেকে। যাবার সময় Sir Johnএর উদ্দেশে বললেন, You shall have your revenge tomorow। প্রত্যুত্তরে Sir John বললেন 'Thank you। Another sitting of this sort and I shall be forced to return to India.

* * * *

ইংলণ্ডের উপকূলে বাথ স্বাস্থ্যকর স্থান। সেখানকার একটা ক্লাবে Duke of Cumberland একদিন whist খেলতে বসে শুধু একখানা চিঁড়ের টেক্কার অভাবে বিশ হাজার পাউণ্ড বাজী হেরে যান, যাঁরা খেলায় বসেছিলেন, সবাই খুব বিত্তশালী। হাতে এমনি ভাল তাস এসেছিল যে, ডিউক উল্লসিত হয়ে বিশ হাজার পাউণ্ড (পৌনে তিন লাখ টাকার মত) বাজী ধরে বসলেন। তাঁর হাতে ছিল:

♣ K, J, 9, 7; ♦ A, K,

♥ A, K, Q J; ♠ A, K, Q চিঁড়ে

ট্রাম্প (রং)। ডিউকের ডান পাশের বিপক্ষ খেলোয়াড়ের হাতে ছিল, পাঁচখানা ছোট চিঁড়ে আর বাকী আটখানা হরতন ও ইস্কাবন, রুহিতন অফ। বাঁ ধারের ভদ্রলোকটির শুধু চিঁড়ে আর রুহিতন:

♣ A, Q, 10, 8,

♦ Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

ডিউক প্রথমে ছোট চিঁড়ে খেলতেই, তাঁর বাঁ পাশের খেলোয়াড় সেটা ধরে নিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত ঘায়েল করে দিলেন রুহিতনের খেলায়।

একবার এই চিঁড়িতনের টেক্কার উপর Oliver Goldsmith বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Sir Joshua Reynolds কাছে হাণ্ডনোট কেটেছিলেন।

* * * *

চিঁড়ের চৌকাকে বলা হয়, Devil's Bed Post। এ নামটার প্রচলন ইংরেজী ভাষাভাষী সব দেশেই ব্যাপক ছিল এককালে, তাসটা নাকি খুবই অপয়া। এর অপর একটা নামও আছে, 'Ned Stokes', পাদ্রী Rev Edward Stokes এর চার ছেলে। তিনি ঠাট্টা করে বলতেন, 'দু'জনকে দিয়েছি ভগবানকে, আর দু'জনকে শয়তানকে'। অর্থাৎ দুই ছেলে হয়েছিলেন ধর্ম্মযাজক, বাকী দু'জনা এ্যাটর্নী। এ্যাটর্নী ছেলেদের একজন (তাঁর নামও Edwards) দুর্দান্ত whist খেলোয়াড়; সবাই তার পার্টনার হতে চাইতেন। কিন্তু চিঁড়ের চৌকার উপর ওঁর দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। হাতে ও তাসখানা এলেই তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন এবং খেলায় নির্ঘাৎ হেরে

পৌত্রের মুখে দিদিমার গল্প শুনে অবধি হারমানের মনে স্বস্তি নেই। তার অন্তরের উদ্দীপ্ত অর্থ লালসা তাকে অশান্ত করে তোলে। তাস তিনখানার খবর জানতেই হবে তাকে।

কাউণ্টেসের তরুণী পরিচারিকাকে কপট প্রেমে মুগ্ধ করে, এক রাত্রে হারমান সরাসরি কাউণ্টেসের শয়ন-কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হল। বৃদ্ধা কাউণ্টেসের কাছ থেকে গুপ্ত তাসের খবর জানতে ব্যর্থকাম হয়ে, শেষে পিস্তল তুলে ভয় দেখায়—তাঁকে। আচমকা সেই' shock সহ্য করতে না পেরে, অশীতিপর বৃদ্ধা চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় মারা গেলেন। হারমান জানলও না,—কখন তার লুব্ধ-চিত্তের বর্ব্বর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধাকে মৃত্যুর কবলে তুলে দিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত হারমান জানতে পারল, তাস তিনখানার পরিচয়,—মৃতা কাউণ্টেসের মুখেরই অর্দ্ধোচ্চারিত কথা থেকে।

পরদিন সন্ধ্যায় সমস্ত সঞ্চিত অর্থ নিয়ে হারমান হাজির হল তাসের টেবিলে; বলে, 'খেলব আমি।' সবাই বিস্মিত হয়। তাইত! শেষটায় হারমানও খেলতে নামল।

প্রথম তাসে বাজী ধরতেই ওর জিত হল। প্রচুর লাভ!··· এরপর সব টাকা একসঙ্গে বাজী ধরল দুই নম্বর তাসের উপর। কী আশ্চর্য্য! এবারেও বাজী মাৎ। বন্ধুরা ওকে ঘিরে সোৎসাহে কলধ্বনি করে ওঠে সবাই। অভাবনীয় সাফল্য! প্রচণ্ড উত্তেজনায় হারমানের সমস্ত শরীর কাঁপছে; রক্তে তার উম্মাদনার জোয়ার জেগেছে। সে তার সমুদয় অর্থ ধরল তৃতীয় তাস,—ইস্কাবনের বিবির উপর।···'ইস্কাবনের বিবির জিত হয়েছে,' উল্লাসে চীৎকার করে ওঠে হারমান। কিন্তু, ও কী!···তাসের রঙটা যে পাল্টে গেল, আর বিবির মুখটা যেন বুড়ী কাউণ্টেসের মুখের মত হয়ে ওর পানে তাকিয়ে ক্রুর ব্যঙ্গের হাসি হাসছে!···

সর্ব্বস্বান্ত হয়ে হারমান পাগল হয়ে যায়। এখন সে বদ্ধ উন্মাদ। পাগলা গারদের ছোট্ট ঘরখানিতে পায়চারি করে আর বিড় বিড়

চিঁড়ের চৌকার রং বদলানো সম্বন্ধে একটা চলতি গল্প আছে। কবি Robert Southey ও গল্পটি বলে গেছেন। রবিবারে (Subbath) খেলাধূলা খৃষ্টধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কয়েকজন অভিজাত ব্যক্তি একবার শনিবার রাত্রে অপেরা দেখে ফেরার মুখে, Mrs. Street এর ওখানে Faro খেলতে বসেন। মধ্য রাত্রি পার হয়ে যায়, খেলোয়াড়েরা খেলায় তন্ময়।···হঠাৎ ভূমিকম্পে ঘরটা কেঁপে ওঠে আর আকাশে বজ্র নির্ঘোষ শোনা গেল।

খেলায় এমনি মত্ত সবাই, যে খেলা ছেড়ে উঠলেন না কেউ।···

হঠাৎ একজন বলে উঠলেন, 'আরে, এ কী! চিঁড়ের চৌকার কোঁটাগুলো যে রক্তের মত রাঙা হয়ে উঠল। অন্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও দেখেন সত্যিই ত' ওঁর হাতের চৌকার কোঁটাগুলো টুকটুকে লাল হয়ে গেছে। এরপর হরতনের একখানা তাস ফেলতেই দেখা গেল কোঁটাগুলো কালো হয়ে গেছে। ভয় পেয়ে তখন সবাই খেলায় ক্ষান্ত দিলেন।

* * * *

তিরি সম্বন্ধে খেলোয়াড় মহালে প্রচলিত ধারণা : There is no luck in tray। অথচ ইস্কাবনের তিরির সাহায্যে Fritzgerald বলে একজন সম্ভ্রান্ত যুবক (Duke of Leinster এর পূর্ব্বপুরুষ) তাঁর মনোমত ভার্য্যা লাভ করেছিলেন। এই ভদ্রমহিলা বিখ্যাত Orme বংশের মেয়ে, অসাধারণ রূপসী ও প্রভূত সম্পদের উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। ফ্রিট্জিরাল্ডের একজন প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কিন্তু কৌলীন্যে তিনি তাঁর ফ্রিট্জের অনেক নীচে। তবে মেয়েটির পক্ষপাতিত্ব ছিল দ্বিতীয় প্রেমিকের উপর। কার কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করবেন ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটি একজন কানা বেদেনীর শরণাপন্ন হলেন। লোকে এই বেদেনীকে বলত 'কানী কেট'।···এক প্যাক তাস বেশ করে ভেঁজে টেবিলে রেখে বুড়ী বেদেনী প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিজের নিজের ইচ্ছামত তাস তুলে নিতে বলল। দু'জনাই দু'জনার তাস দেখাদেখি করতে পারেন—কিন্তু হাতের তাস অন্য কাউকে দেখানো বারণ। মজা দেখবার জন্য বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের অনেকেই সমবেত হয়েছিলেন, হলঘরে টেবিলের চার পাশে।···জিরাল্ড তুললেন ইস্কাবনের তিরি। তাসটা তুলেই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠলেন।···অলুক্ষণে তাস! প্রতিদ্বন্দ্বী তুললেন হরতনের সাত, lucky card। বেদেনী তারপর বাকী তাসগুলো সাতটা পৃথক পৃথক থাকে সাজালো—দু'ধারে তিনটে তিনটে ছটা, মাঝখানে একটা। সবাই নির্ব্বাক ঔৎসুক্যে বসে আছেন, কার জিত হয় জানবার জন্য।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কেট বুড়ী মেয়েটাকে মাঝের থাক থেকে একখানা তাস ওঠাতে বলল। বিড় বিড় করে মন্ত্র আউড়ে বলল তারপর, 'এই তাসের সাহায্যে আপনার ভাবী স্বামীর দুয়ের ছায়াকে কাছে টেনে আনব আমি।' তাস টেনে মেয়েটা দেখেন, সেখানা ইস্কাবনের তিরি। তাস দেখেই Fritzgerald উল্লসিত হয়ে ওঠে। মেয়েটার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, যখন বুঝলেন ফ্রিজেরই জিত হয়েছে।

কানী বুড়ি আবার নতুন তাস সাজিয়ে টানতে বলল মেয়েটিকে। এবারেও উঠল ইস্কাবনের তিরি। তাস দেখে মেয়েটি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। যাই হোক, মেয়েটি তাঁর সংকল্প অনুযায়ী কাজ করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত Fritzgerald এর সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। উত্তর কালে তাঁদের এই মিলন সুখেরই হয়েছিল।

পরে অবিশ্যি জানা গেল যে, এ ব্যাপারে কানী কেটের কারসাজী ছিল। Fritzgerald এর কাছ থেকে টাকা খেয়ে, সে মাঝের থাকের সব তাসগুলোই ইস্কাবনের তিরি রেখে দিয়েছিল চালাকী করে। যুদ্ধ ও প্রেমের ব্যাপারে প্রবঞ্চনাকে নীতিবিরুদ্ধ বলা চলে না ঠিক। কি বলেন আপনারা?···

অন্যান্য তাসের ইতিহাস বারান্তরে বলবার ইচ্ছা রইল।

কিছু এতটুকু!

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

কিছু এতটুকু মন খুঁজে মরে
সূর্য্যাস্তের প্রথম প্রহরে।
ঘর।
ও ঘরে যে আছে তার চুড়ির স্বাক্ষর।
আলো।
লাগে ভালো
সতেজ মর স্নিগ্ধ।
গুন গুন গান।
অভিমান
কিছু হলে ভুল।
ভাঙা গেলাসেতে রাখা দু' একটা ফুল।

শিশু। হাসি তার।
মার আবেদন কান্না থামার।
নীরবতা।
শুধু মাঝে মাঝে
অকারণ অধীর প্রশ্ন
ছেলেটার গলা শুনি না যে?

দাঁত ভাঙা চিরুণি।
ফ্রেমে আঁটা আয়না।
বায়না
বই চাই
রবাট খাতা কিছু নাই।

খাবার তাড়া।
ডাকলে, অনুরাগের সাড়া।
ঘুমের রেশ।
স্বপ্ন আবেশ।

জেগে, জেনে, জামা ভুলে
ঘুম থেকে তুলে
দু' চোখ ভরা প্রশ্ন চিহ্ন—
'ঘুমোলে?'

ভালোবাসা।
কাছে স'রে আসা। আর
ভঙ্গিটি তার

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

॥ ৫ ॥

মামা কিংশুকের জন্তে দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

কিংশুক রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল, একবার ফিরেও তাকালে না। কিংশুকই অপেক্ষা করতে বলেছিল, কাজেই ওর এভাবে চলে যাওয়াতে মামা বিস্মিত হল।

—কিং। শুকদেব।—মামা চেঁচিয়ে ডাকল।

ডাক শুনে কিংশুক থেমে মামাকে দেখে ফিরে এল।

—কি রে, অমন ভাবে কোথায় যাচ্ছিস্?

—হুঁ।

—হুঁ মানে? কি হয়েছে?

—হয় নি, হবে।

—কি হবে?

—খুন, নারী হত্যা।

—নারী হত্যা! এই মরেছে! তা হত্যা করবার এত জিনিষ থাকতে নারীর ওপর চোট পড়ল কেন বল দেখি। কি ব্যাপার খুলে বল।

সমস্ত শুনে মামার মনে পড়ল তার ঠাকুরখুড়োর কথা, রাগ তারপরেই অনুরাগ টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। মামা দেখল কিংশুক এখন যা চটে আছে তাতে ঠাকুরখুড়োর কথা যদি সত্য হয় তাহলে টাকার দু'পিঠ এক হয়ে যেতে মোটেই দেরী হবে না। কিংশুককে দেখেও মামার মনে হল ঠাকুরখুড়োর কথাই ঠিক। নইলে এত নারী সহরে থাকতে এই বিশেষ নারীটিই বা কেন বাড়ী এসে এ খবরটি দিয়ে যাবে আর এই বা পড়ি কি মরি করে তাকে খুন করতে ছুটবে। প্রেমের বিচ্ছিরী গতি কি ভাবে কাকে কাত করে কে জানে!

মামা বললে—খুন করলে কিস্যু হবে না।

—তবে কিসে হবে?

মামার বাঁ হাতটা এগিয়ে গেল, কিন্তু বুঝতে পারল এখন নিজেই নিজের হাতে খোঁচা খাওয়া ভাল। ও যা রেগে আছে! হাতটা সরিয়ে নিয়ে মামা বললে—আয় ভেতরে আয় বলছি। ভেতরে যেতে যেতে মামা মনে মনে বললে—ঠাকুরখুড়ো তোমার প্ল্যানই খাটাচ্ছি। তাতিয়ে দি'।

কুঞ্জ রাহার বৈঠকখানা গমগম করছে। একপাশে মেঝেতে বসে কয়েকটি ছেলে পোষ্টার লিখছে, ইনচার্জ কেদার ঘোষাল ওরফে কাদা ঘোষাল তার তদারকি করছে। কাদা ঘোষাল সহরের সন্তানদের মধ্যে একজন। ছে'চল্লিশ সালের দাঙ্গার আগে অবধি কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীর ত্রিসীমানায় স্থান হত না, কিন্তু দাঙ্গার সময় প্রাণ বাঁচাতে বাবুরা এই সব সন্তানদের এমন মাথায় তুললেন যে, পরে শোবার ঘর অবধি তাদের অবাধ গতিবিধি হল এবং ঐ কেলেঙ্কারী ঘটবার তাও দু'একটা বাড়ীতে ঘটে গেল। কিন্তু তখন আর উপায় নেই—বিষ খাওয়া হয়ে গেছে? রাস্তার মাল, ঠাকুর ঘরে ঠাঁই নিয়েছে।

কুঞ্জ রাহার ইচ্ছে ছিল না এই দাদাকে বাড়ীর ভেতরে এনে বাড়ীটা অপরিষ্কার করা, কিন্তু বিচ্ছে উকীল বোঝালেন যে, হাওয়া বুঝে নৌকো না ছাড়লে সব কিছু বানচাল হয়ে যাবে। কাদাকে বাড়ীতে ঢোকাতে আপত্তি হচ্ছে, ওদিকে কাদার দাদারা যে এম-এল-এ হয়ে য্যাসেম্বলীতে মস্তানী করছে। অতএব, আগেকার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। তাছাড়া ভোটারদের বেশীর ভাগই যখন পুরোন বাজারের বাসিন্দে তখন ও তল্লাটের জানাশোনা লোককে ইনচার্জ করাই ভাল, কাজের সুবিধে হবে। ভদ্রলোকদের জন্যে ত' আমরা নিজেরাই আছি। কথাটা ফেলবার নয়। অগত্যা কুঞ্জবাবুকে বিষ খেতে হয়েছে।

ফরাসের ওপর কুঞ্জ রাহা, বিচ্ছে উকীল, হেড পণ্ডিত মশায় ও গুঁই চাটুজ্যে বসে। গুঁই চাটুজ্যের ভাল নাম গুঁইরাম চাটুজ্যে কিন্তু 'রাম'টি এখন আর নামের সঙ্গে কেউ বলে না। সবাই গুঁইদাদু বলে ডাকে। গুঁইদাদু বরাবরই কুঞ্জ রাহাকে স্নেহ করেন সেই জন্তে প্রায় সময়ই তাঁকে এ বাড়ীতে বসে থাকতে দেখা যায়। এই বসে থাকায় চাটুজ্যে মশায়ের লাভ ছাড়া লোকসান যে নেই, সেটা বলাই বাহুল্য।

গুঁই চাটুজ্যে উত্তেজিত ভাবে হুঁকোয় বার কয়েক টান মেরে বললেন, বুঝলে কুঞ্জ বাবাজী, জানলেন উকীল বাবু ও কিছুতেই কিছু হবে না। ঐ মাগীরা যেদিকে হেলবে সেই মেশোরই জয় হবে। ভদ্দরলোক ভোটার তো আঙুলে গোণা যায়, বাকী সব দোকানদার আর ঐ মাগীগুলো। রাইমোহনের আবার···হেঁ হেঁ··· বলে তো ওসব অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আর যদি ছেড়েও থাকে তাহলে ঘরগুলো সব জানাশোনা। কাজেই—বলে যেন কোন গোপন কথা বলছেন সেই ভাবে

বললেন, আমাদের বলতে হবে কি ঐ বাড়ীউলী···কে যায় ভেতরে।··ও কাদা, কে একজন ছোকরা ভেতরে গেল, একবার দেখ বাবা।

—যাক্ গে, আবার তো ফিরে আসবে তখন ধরবো শালার টুঁটি চেপে। আমার বলে এখন মরবার ফুরসৎ নেই।

—শোন হতভাগার কথা!—বলে গলা চড়িয়ে চাটুজ্যে মশায় হাঁক দিলেন—কে গেল ?

উত্তর এল—আমি।

কাদা জবাব দিলে—সব মামুই তো আমি। তুমি কোন্ মামু একবার দেখি, ইদিকে এসো।

জবাব এল—আমি শুকদেব, আসতে পারবো না।

শুঁই চাটুজ্যে মুখ আঁধার করে বললেন—রাইমোহনের দলের লোক! এই ভর সন্ধ্যেবেলায় কি মনে করে কে জানে!

কথাটা কুঞ্জ রাহার ভাল লাগল না, একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আমাদের শুকদেব ও রাইমোহনের লোক হবে কেন ? হয়ত' ওর খুড়ীমার কাছে এসেছে।

—না বাবাজী কিছু বিশ্বাস নেই, এখন একটা আপৎকালীন অবস্থা চলছে সাবধানে থাকা ভাল। ও বাড়ীর ছেলে সব করতে পারে।

কাদার পার্শ্বচর নৃসিংহ বললে—তোমাকে তো দাদু কাল ও বাড়ীতে চা-বিস্কুট সাঁটাতে দেখলুম।

শুঁই চাটুজ্যে উত্তেজিত হয়ে বললেন—আমাকে দেখেছিস ?

—হাঁ, তোমাকেই তো দেখলুম।

—হারামজাদা, বদমাইস কাকে না কাকে নেশার ঝোঁকে দেখে—

—গাল দিও না দাদু, ভাল হবে না, হাঁ। চল না ভজিয়ে দিচ্ছি। তুমি বড়ো খলিফা খাট্‌লোক আছ। সাপের গালেও চুমু খাচ্ছো আবার ব্যাঙের গালেও—

—তবে রে হারামজাদা যত বড়—। শুঁই চাটুজ্যে চড় তুললেন।

কাদা এইবার অনুচরের সাহায্যার্থে এগিয়ে এল, বললে, অত তড়পানি ভালো নয় দাদু, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব কিন্তু। ল্যাজ গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকো।

দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখে কিংশুকের সঙ্গে শৈলজার দেখা হল। শৈলজা যেন চেনেন না, জিজ্ঞেস করলেন, কে ?

—আমি শুকদেব খুড়ীমা।

—অঃ! আমি বলি কে না কে। তা তুমি কি মনে করে ?

—গিনী আমাদের বাড়ী গিয়েছিল, আমার সঙ্গে দেখা হয় নি তাই—

—গিনী এখন পড়তে বসবে, তুমি বরং—

— শুকদেবদা, ওপরে এস।

কিংশুক ওপরে তাকিয়ে দেখে এমন ভাবে বারান্দার ওপর রাগিণী ঝুঁকে পড়েছে, যেন ঐখান থেকেই হাত বাড়িয়ে ওকে তুলে নেবে।

ওপরে ওঠবার সময়ের সব চেয়ে বড় বাধা হল পুরোন জিনিষগুলো শৈলজা তখন ওপরে ওঠাতে সুরু করেছেন, দৃষ্টি তাঁর 'সুসাইটির' টপ-ফ্লোর হাকিমগিন্নীর বেয়ান হয়ে তাঁর পাশের চেয়ার দখল করা। কিন্তু পুরোন জিনিষগুলো বড় বাধার সৃষ্টি করছে। এই বাড়ী, ঘর, ব্যবসা, সহর ও তার বাসিন্দেরা এখন শৈলজার দু' চোখের বিষ। পুরোন আমলের যে ক'টা জিনিষ এখনও তাঁর চোখে বিষ হয় নি তা হচ্ছে বাড়ীর সিন্দুক ক'টা, ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট সহরের ও বাড়ীগুলো। অবস্থাটা এমন হয়েছে যে কেউ যদি এখন বলে যে ওঁদের জমিতে এবার ভাল ধান হয়নি কি রবিশস্য খুব হয়েছে তাহলে শৈলজা মনে মনে কেঁদে ফেলে বলেন, ভগবান আর কেন, এবার নাও কত পাপ যে করেছিলুম তার ঠিক নেই, তাই এই শাস্তি পাচ্ছি।

শাস্তি এইজন্যে যে জমি ধান ও রবিশস্য এই কথাগুলো শুনলে যে সব লোকের কথা মনে আসে তারা হল চাষা। 'সুসাইটির টপ-ফ্লোরের' লোকেদের ধান কলাই নিয়ে নাড়াচাড়া কথাটা নিতান্ত অ্যাপেলাস ব্যাপার। কথাটা 'সুসাইটি'তে উঠলে শৈলজার প্রমোশনে বাধা আসবে। কুঞ্জ রাহার বাইরে পাঁচজন বড় বড় লোকের সঙ্গে দহরম মহরম থাকলে কি হয় তিনি এসব হাই ফ্যাসনের বড় বেশী পক্ষপাতী ছিলেন না। নেহাৎ যেটুকু না করলে নয় ততটুকুর বেশী তিনি যেতে নারাজ। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝে খটাখটি বাঁধত। শৈলজাকে বাধ্য হয়েই স্বামীর মতে মত দিতে হত। বলতে গেলে ওঁর জন্যেই সব, উনি খারিজ হয়ে গেলে সব ফ্যাশনই ধুয়ে মুছে যাবে। শৈলজা চাইতেন বেশী কিছু নয়, 'ওল্ড' কর্তাটি একটু নতুন হ'ন। ওল্ড ওয়াইন নিউ বটলএ ঢুকুক। কিন্তু ওল্ড ওয়াইনটি ব্যবসায়ী লোক তিনি নিউ বটল-এ ঢুকতে রাজী নন, বলেন, এ বোতল থেকে ও বোতলে চালাচালি করতে গেলেই কিছুটা নষ্ট হবার সম্ভাবনা। তার চেয়ে বরং ওল্ড বটল-এর গায়েই নতুন লেবেল লাগাও, অল্প খরচেই জেল্লা বাড়বে অথচ আসল মাল একফোঁটাও নষ্ট হবে না।

রাহাবাড়ীর ঠাকুর চাকরদের সাবেককালের ধুতি ফতুয়া উঠে গিয়ে নতুন বেশ অঙ্গে উঠল। খাবার ঘরের আসন পিঁড়ি অদৃশ্য হল, এল চেয়ার টেবিল। থালা বাসন কাঠের বাক্সে চলে গেল এল চীনে মাটির বাসন। কিন্তু চীনেমাটিকে অল্পদিনেই মাটি ছাড়তে হল। চাকর-বাকরদের অনভ্যস্ত হাত সাবানমাখা চীনেমাটির বাসনগুলোকে সামলাতে পারল না। সেগুলো প্রায়ই দুরন্ত শিশুর মত তাদের হাত থেকে মাটিতে পড়ে শতধা হয়ে হেসে উঠত, প্রথম প্রথম ভেঙ্গে যাওয়ার পর কেনা হতে লাগল কিন্তু কয়েকবার কেনবার পরই কুঞ্জ রাহা জানালেন যে, যে হারে ওগুলো ভাঙছে সেই হার যদি চাকর বাকরগুলো বজায় রাখতে পারে তাহলে এরপর

সংসারের অন্ত সব খরচ বন্ধ না করলে প্লেট, ডিশ কেনা সম্ভব হবে না। অগত্যা আবার বাসনের কাঠের বাক্সের তালা খুলতে হল।

যে টেবিলের ওপর খাওয়া হয় তাকে ডাইনিং টেবিল না বলে যে কোনও টেবিল বললে অন্যায় হবে না, কারণ তার ড্রয়ার-এর চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। আহারান্তে আগে তার ওপর গোবর-ন্যাতা বুলানো হত কিন্তু তাতে দেখা গেল যে শুধু টেবিলের পালিশই উঠে যাচ্ছে না, উপরন্তু জল শুকিয়ে গেলে টেবিলের ওপরটা গোবর দিয়ে নিকানো উঠোনের আকার ধারণ করেছে। অতএব তার ওপর গোবর-ন্যাতা আর বুলানো চলে না, জল দিয়ে ধুতে হয়। কিন্তু শুধু জল দিয়ে ধুলে পরিষ্কার হলেও টেবিলটির সকড়িত্ব ঘোচে না। অন্ত সবাই সকড়ি ছুঁয়ে 'ছিষ্টি' নাশ করলেও শৈলজা তা করতে পারেন না, হাজার হোক তিনি বাড়ীর গৃহিণী লক্ষ্মী, সুতরাং খাবার ঘরে ঢুকলেই তাঁকে কাপড় ছাড়তে হয়। ফলে দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার তাঁর পট পরিবর্তন ঘটার ফলে সর্বদাই তিনি ফিটফাট সদা পত্তত্তি ধপধপে। এই ফিটফাট থাকার জন্তে কম জ্বালা শৈলজাকে সইতে হয় না। আগে শাড়ী সেমিজেই চলে যেত। সেমিজের ছাঁটকাট ছিল দরবেশদের আলখাল্লার মত, ব্লাউজ এবং সায়া দুয়ের কাজই এক জিনিষে চলত। এখন এক সেমিজের জায়গায় তিনটে জিনিষ অঙ্গে চাপাতে হয়, সুতরাং খরচ এবং পরিশ্রম দুইই বেড়েছে। তাছাড়া অনভ্যাসের দরুণ নিচেকার অন্তর্বাস বুকে ফাঁস লাগায়, দম বন্ধ হয়ে আসে।

এখন এতখানি কৃচ্ছ্রসাধনে যিনি 'সুসাইটি' মার্গে গোটা পরিবারটিকে টেনে নিয়ে এগোচ্ছেন, তিনি একটু আশা অবশ্যই করবেন যে অন্ত সবাই আর কিছু না পারুক অন্তত বাধার সৃষ্টি করবে না। কিন্তু প্রতি পদে শৈলজাকে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যতই তিনি পুরোন জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন, এরা ততই তা আবার কুড়িয়ে এনে ঘরে তুলবে। ঐ ছোঁড়াটাকে মেয়েটা একেবারে ওপরে ডেকে নিয়ে গেল। এদিকে কাজলের আসবার সময় হয়েছে। সে এসে দেখলে কি ভাববে।

দত্তদের বাড়ী থেকে ফিরে এসে রাগিণী তার নিজের পড়বার ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারী করছিল। কিছু একটা ভাবা দরকার, কিছু একটা করা দরকার নইলে মনের এই অস্থিরতা যাবে না। কিন্তু মুশকিল যে, ভাবা বা করার মত কোন কাজের কথাই ফাঁকা মাথায় আসছে না। মনের এই ন ভাবৌ ন কর্মৌ (কে জানে সমসকৃত ঠিক হল কি না!) অবস্থায় সাধারণত নায়িকার হাতের গোড়ায় একটা বিছানা রাখা হয়। সুন্দরী তার ওপর ধপাস্ করে উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে এবং কোঁপানোর দরুণ সমস্ত শরীর থেকে লহরী খেলে যায়। লেখক পেট রোগা হলে পাতা তিনেক মাংসাল বর্ণনা থাকে। যদি পোকা বিশারদ হন, যাদের ভাল বাংলায় মনস্তাত্ত্বিক বলে, তাহলে ভেতরে যে পোকা নায়িকাকে কাটবার দরুণ এই অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে সেই পোকাটাকে টেনে বার করবার চেষ্টা করেন। কিন্ত ডিরেক্টারেরা ডাঁসা নায়িকা হলে পায়ের কাছ থেকে যৌবন তরঙ্গের 'ক্লোজ আপ' নেন, দর্শকেরা সিটি দিয়ে সে ছবি বরণ করেন। কিছুক্ষণ দেহে ভূমিকম্প হবার পরই দেখা যায় নায়িকা ভাববার বা কিছু একটা করবার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। ব্যাপারটা 'শেক দি বটল বিফোর ইউজ'-এর মত। মাথা 'জ্যাম' হয়ে থাকে তাই নীচের দিকে নেমে যায় ও নাড়া চাড়া পেয়ে আবার তুঙ্গে উঠে আসে।

কিছুক্ষণ পায়চারী করাতে কাজ হল। রাগিণীর ফাঁকা মাথা ভরাট হল, চিন্তা করবার ক্ষমতা ফিরে এল। ছিঃ ছিঃ, কাজটা ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। তনুকার কথা বোধ হয় সত্য নয়। ওকে ত' জানি তিলকে তাল করে বলা ওর স্বভাব। আর সত্য হলেই বা কি? পিসীমা অপমান করেছিলেন, আঘাতটা তাঁকেই সরাসরি করলে হ'ত কেন মিছিমিছি ও বেচারাকে জড়ালুম। ওর কি অপরাধ? এই নিয়ে অনেক লাঞ্ছনা ওকে সইতে হবে। সত্য হলে আপনা থেকেই একদিন না একদিন সব জানাজানি হত। আর যদি মিথ্যে হয়? ছিঃ ছিঃ মিথ্যে আমি ওর লাঞ্ছনার কারণ হলাম। ছিঃ। ক্ষমা কর শুকদেবদা, ক্ষমা কর। আচ্ছা', ছেলেবেলাকার দিনগুলো আবার ফিরে আসে না। শুকদেবদা'র নামে কেউ যদি মিথ্যে করে কিছু বলত' তাহলে ও ভীষণ রেগে যেত, 'নালিশ টালিশের ধার ধারত না যে বলেছে ও এসে তাকে মারতে শুরু করত' ঠিক ক্ষেপীর মিন্সের মত। ক্ষেপী একটু কিছু হলেই বলে,—একটু-আধটু গায়ে মাথায় হাত-পা ঠেকাতো বটে কিন্তু সোহাগ যা করতো তা আর বলবার নয়! মুখপোড়া মিনসে শেষ কালে কি না আমাকে ফেলে একলাই চোখ বুজলে গা।—ক্ষেপীর মিন্সের এ স্বভাব না কি ছেলেবেলা থেকেই ছিল। ছেলেবেলার স্বভাব শুনিছি ···কানে এল নীচে কে যেন মা-র সঙ্গে কথা বলছে। কান খাড়া করে শুনল, কিংশুক! তনুকার কথাটা তাহলে মিথ্যে! মিথ্যে বলেই শুকদেবতা এসেছে, যেমন ভাবে ছেলেবেলায় আসত'। কিন্তু ছেলেবেলায় ত' এসে মারধোর করত'। এখনও কি সেই স্বভাব আছে নাকি! মারধোর করবে না কি ক্ষেপীর মিন্সের মত!

মিন্সে! মারধোর যারা করে তাদেরই বোধ হয় মিন্সে বলে।

যারা তা করে না শুধু ভালবাসে তাদের কি বলে? মন বললে—ফিঁয়াসে। গিনী, তুমি ওকে কি বলে ডাকতে চাও। রাগিণী লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মন বললে—বুঝেছি, দু'টো নামই তোমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু সখি, ভুলে যেও না, মিনসের অনেকগুলো ফ্যাংশানের মধ্যে একটি হচ্ছে মাঝে মাঝে ঠ্যাঙানো। না ভয় পেও না, সব সময় আড়ং ধোলাই নয়, মাঝে মাঝে জলকাচাও হয়।

রাগিণী বারান্দায় এসে দেখলে কিংশুক চলে যাচ্ছে। রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে তাড়াতাড়ি বললে—শুকদেবদা,' ওপরে এস।

শৈলজা ধমক দিয়ে বললেন, ওপরে আসবে কি, পড়তে বসতে হবে না? রাত ক'টা হল সে খেয়াল আছে? কোডি এল বলে। না বাপু শুকদেব, তুমি আজ যাও বরং আর একদিন এসো।

এরপর নেহাৎ দু'কান কাটা ছাড়া আর কেউ থাকতে পারে না। কিংশুক ফেরবার জন্যে পা বাড়াতেই রাগিণী ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললে, যেও না শুকদেবদা, দাঁড়াও।

এর পর আবার যাওয়াও যায় না। চলে এলে রাগিণী কষ্ট পাবে, ওদিকে থাকলে আবার তার মা রুষ্ট হবেন। দু'পক্ষকে তুষ্ট করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বসে পড়া। বোধ হয় ও বসেই পড়ত' কিন্তু তার আগেই ঝড়ের বেগে রাগিণী এসে হাজির, বললে—এস।

গম্ভীর কণ্ঠে শৈলজা বললেন, কথা কানে গেল না বুঝি। পড়তে বসতে হবে না, এখন আড্‌ডা দেবার সময়।

—আড্ডা কোথায় মা। পড়া বুঝে নেব বলেই তো শুকদেবদা'কে আসতে বলেছি।

কিংশুক অবাক হয়ে রাগিণীর দিকে চেয়ে রইল, কেমন অনায়াসে মিথ্যে কথাটা বললে।

শৈলজা বললেন—.কাডিই তো পড়াতে আসছে। আবার ও কেন?

—তোমার কোডি বোঝাতে পারবে না।

কোডি! কথাটা এর আগে কিংশুক শোনেনি। ও জানত যে কাজল রাগিণীকে পড়ায়। এখন বুঝতে পারল কাজল নয়, কোডি হচ্ছে রাগিণীর শিক্ষক। এই মালটির আবার কোনখান থেকে আমদানী হ'ল? তবুও মন্দের ভাল যে কাজল পড়ায় না।

শৈলজা মেয়ের কথায় বিস্মিত হয়ে বললেন,—কোডি পারবে না কিরে! গেজেট ছেলে, ও পারবে না তো কে পারবে শুনি।

—দেখ শুকদেবদা, মা কেমন ইংরিজী শিখেছে। মা, গেজেট ছেলেই হোক আর গ্রাজুয়েট ছেলেই হোক বড়লোকের ছেলে তো? তবে? বড়লোকের ছেলেরা এরিথমেটিক জানে না।

শোন মেয়ের কথা! বড়লোকের ছেলে যা জানে না ভুষি-তিসির কারবারী ঘরের ছেলে তা জানে! এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করি বল ত'? বললেন, বলি কি এমন জিনিষ আছে ঐ এরিমাটি না খড়িমাটি'তে যা কোডির অজানা?

—শুনবে? সে সব ভারী ছোট পড়া। আছে মজুর খাটাতে কত সময় লাগে ফুটো চৌবাচ্চা দু'টো কল খুলে দিলে কতক্ষণে ভর্তি হবে, দেড়মাইল লম্বা তিরিশ ফুট চওড়া রাস্তায় সাড়ে তিন বর্গ ইঞ্চি পাথর কুচি কতটা—।

সত্যিই ছোট পড়া। শৈলজা আর শুনতে চাইলেন না, বললেন,—হয়েছে, হয়েছে।

—তবে? এস শুকদেবদা।—বলে কিংশুকের হাত ধরে এক রকম টানতে টানতেই রাগিণী তাকে ওপরে নিয়ে গেল।

কিংশুককে পড়ার ঘরে এনে রাগিণী বললে,—বস শুকদেবদা, আমি আসছি।

উৎসবে ব্যসনে ত' বটেই, পারলে মেয়েরা বোধ হয় শ্মশানে যাবার আগেও দেহের কলি ফিরিয়ে নিতে কসুর করতেন না। এদিক থেকে দেখতে গেলে পুরুষেরা একেবারে 'ডিস্‌পোজ্যালের' মাল, য্যাজ ইজ হোয়ার ইজ। কারণ, পুরুষের দেহের কলি ফেরান মানেই দাড়ি কামান'। ও কর্মটি আবার ঘন ঘন করবার উপায় নেই কাজেই কেউ এলে ঝট করে তার সামনে বেরিয়ে পড়তে পুরুষের আটকায় না।

মিনিট পাঁচেক পরে খোলস পালটে ঘরে ঢুকে রাগিণী দেখে কিংশুক দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। ও যে এসেছে তা কিংশুক টের পায়নি দেখে রাগিণী শব্দ না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কিংশুককে দেখতে লাগল। মনে হল এ শুধু এ জন্মের নয় জন্মান্তরের চেনা। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল: একে কি করে এতদিন অবহেলা করেছি? ক্ষমা কর শুকদেবদা, ক্ষমা কর। শুধু ক্ষমাই চাইল না, নিজেকে নিঃশেষে মনে মনে উৎসর্গও করল; কিছুক্ষণ পরে, রাগিণী ধীরে ধীরে বললে,—দাঁড়িয়ে আছ কেন, ব'স।

কিংশুক না ফিরেই জবাব দিলে,—বসবার জন্যে আসি নি, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

রাগিণী এগিয়ে গিয়ে কিংশুকের সামনে দাঁড়িয়ে বললে,—বল।

কিংশুক বেগুনগাছ হলেও গাছ, কাজেই উদ্ভিদ নাশক কীটপতঙ্গের ছোঁয়া লাগলে তার শিউরে ওঠবার কথা। রাগিণী কাছে আসতেই কিংশুক সরে গিয়ে একেবারে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, অবস্থাটা হল যেন 'ফাইটিং উইথ ব্যাক টু দি ওয়াল'—একেবারে শেষ অবস্থা। কিংশুকের রকম দেখে রাগিণীর হাসি পেল, একেবারে ছেলে মানুষ। বললে,—বল, কি বলবে? ও কি—মুখ ঘুরিয়ে আছ কেন, আমার দিকে তাকাবে না বুঝি? না, তুমি একেবারে ছেলে মানুষটিই আছ।

এখনকার স্কুলের ছাত্ররাই এক একটি পাকা 'সায়কোলজিষ্ট'

সুতরাং বি, এ, ক্লাসের ছাত্র কিংশুক যে ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না, তা যদি বলি ত' মার খেতে হবে। তবে এমন সুযোগ পেয়েও মুখ ফিরিয়ে আছে কেন। রাগিণীর হাবভাব, রীতিমত স্পষ্ট। তবে? না, কারণ আছে। প্রথম কারণ, ভয়; দ্বিতীয় কারণ, অভিমান। তাছাড়া, মামা পই পই করে নিষেধ করে দিয়েছিল, ভুলে যাস্ নি কি জন্যে ওখানে গেছিস্। আর দেখ, খবরদার চোখের দিকে সিধে তাকাবি না। এক লহমা আড়চোখে দেখে নিয়েই দিষ্টি ফেরাবি। না দেখে তো থাকতে পারবি নি, মন চুক্‌চুক্ করবে। নইলে বলতুম, একদম তাকাবি না।

—তাকালে কি হবে?

—সব গুলিয়ে যাবে। যা বললুম, এক বর্ণও মনে থাকবে না। এত বছর বৌকে নিয়ে ঘর করছি, এখনও সময় সময় বৌ-এর চোখের দিকে তাকাতে পারি না, মনে হয় তলিয়ে যাব। মেয়ে মানুষের চোখ! ওরে বাপরে! আড়চোখে চাইবি। পুরো চাউনীর চেয়ে আড় চাউনী তবু ভাল।

মামা সবজান্তা হলেও 'আই স্পেশ্যালিষ্ট' ছিল না। পুরো চাউনীর চেয়ে আড় চাউনী ভাল বটে কিন্তু বেশীক্ষণ চোখকে 'আড়' করে রাখলে মাথা টন্‌টন্ করে। খুব উঁচুতে উঠে নীচের দিকে চাইলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, মনে হয় নীচে থেকে কে যেন টানছে—পড়লুম বলে। কিন্তু আড়চোখে চাইলে মথো টনটন করে, মনে হয় টেনে নিয়েছে—আর রক্ষে নেই।

আড়চোখে চাইবার ফলে কিংশুকেরও হল তাই। মনে হল, মাথার মধ্যে সব কেমন উল্টে পাল্টে গেছে। রাগিণীর মুখ টিপে মুচকি মুচকি হাসি যেন 'ইরেজার,' মনের সব ঝাঁঝালো ভাবগুলোকে ঘষে তুলে দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ এইভাবে যদি ও হাসতে থাকে তাহলে বায়ুভূক নিরাশ্রয় অবস্থায় পৌঁছে যাব। এখনও জ্ঞান আছে যা বলতে এসেছি এই বেলা বলে পালাই।

বার কয়েক গলা খাঁকার দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে কিংশুক বললে,—আমি বলছিলুম···মানে···।

—বল, থামলে কেন?—বলতে বলতে রাগিণী এগিয়ে গিয়ে কিংশুকের বুকের ওপর হাত রেখে বললে—বল।

বুকে চাপ পড়াতে কিংশুকের মুখ দিয়ে বুলেটের মত কথা বেরিয়ে এল—আমি ভালবাসি···।

এ কথাটা শোনবার জন্যে মনে মনে উন্মুখ হয়ে থাকলেও কথাটা যে শুনতে পাবে এ আশা স্বপ্নেও রাগিণী করে নি, তাই পুরো শোনবার আগেই কিংশুকের মুখে হাত দিয়ে তার বাক্‌রোধ করে দিলে। ভাবটা, যেটুকু শুনেছি তাই যথেষ্ট, এর বেশী শুনলে বদহজম হবে। তারপর এক হাত দিয়ে নিজের বুক চেপে চোখ বুজে রইল, যেন কথাটায় ও ঘায়েল হয়েছে।

সত্যই ঘায়েল হবার মত কথা, আর ঘায়েল যে হয় তার চুপ করে থাকাটাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজকালকার সব কিছুই আলাদা। এখন সব ছায়াছবি অনুসারে ঘটে। হোরাই

ফিল্ম ষ্টারস্ ষ্ঠ্যাণ্ট টুডে জওয়ান-জওয়ানরা ষ্ঠ্যাণ্ট টু মরো। ছায়াছবিতে আবার রসাভাস না হলে 'খচ্‌রিয়া পিকচার' হয় না। ফিল্ম-নায়িকা যদি ভালবাসার কথা শুনে চুপ করে থাকে, তাহলে দর্শকেরা ভাববে যে 'সাউণ্ড ফেইল' করেছে, চেয়ার ভাঙতে থাকবে, সেই জন্যে এই সব জায়গায় ঘূরপাক গান থাকে।

রাগিণী আজকালকার মেয়ে কাজেই বহু ফিল্মী সিচুয়েশুন ওর মাথায় ভীড় করে এল। বেশ বুঝতে পারলে জবাব দেওয়া দরকার। কিন্তু ও বেচারী গান জানে না যে ঘুরপাক খেতে খেতে গান ধরবে। অন্য কিছু হলে না হয় চোখ বড় বড় করে বলতে পারত, তাই না কি! কিন্তু এখন তাই না কি বললে ঠাট্টার মত শোনাবে। হঠাৎ কিছুদিন আগে দেখা শাজাহান নাটকের মহামায়ার একটা ডায়লগ মনে এল। মহামায়া বললে,—গাও চারিণীগণ আবার গাও।—রাগিণী কথা খুঁজে পেল। হাত দু'টো এবার কিংশুকের কাঁধের ওপর রেখে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে বিভোরকণ্ঠে বললে,—বল, আবার বল।

কিংশুক ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে কি মারাত্মক কথাই না মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এক্ষুণি ভুল শোধরান দরকার। কিন্তু এদিকে ওর অবস্থাটাও ভয়াবহ। বেচারা না পারছে সরে যেতে, না

পারছে জোরে নিশ্বাস নিতে। কাঁটাবনের ভেতরে কোনও রকমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই চলে, নড়লে চড়লেই কাঁটা বিঁধবে। কিংশুকেরও অবস্থাটা তাই। রাগিণী এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, জোরে নিশ্বাস নিলেই সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠবে, নড়লে ত' কথাই নেই। কাজেই এই ভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না আবার রাগিণীকে যে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবে, তাও সম্ভব নয়।

রাগিণী চোখ বুজেছিল সুতরাং তাকালে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। কিংশুক এবার ভাল করে দেখতে লাগল। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি চলে গেছে, কুমারীর সিঁথি ঘন কালো চুলের মাঝখানে কেমন এক অদ্ভুত রকমের সাদা রেখা। সিঁথির শেষে ঘাড়ের একটু ওপরে আধলা ইট-এর প্যাটার্ণ-এর খোঁপা। আধলা ইট-এর বদলে কাপড় প্রিণ্টিং-এর 'ডাইস'ও বলা যেতে পারে। কপালের ওপর সিঁথির বাঁ পাশ থেকে বড় কর্ক স্ক্রু-র আকারে একগুচ্ছ চুল ঝুলছে, এটাকে বলে 'লাক-ওপনার।' ঐ চুলে যত বেশী প্যাঁচ থাকবে তরুণ হৃদয়ে নাকি তত মোচড় লাগবে এবং তরুণীর কপালের ঢাকনী খুলে যাবে অর্থাৎ তিনি গাঁথতে পারবেন। ভুরু এর মাঝখানে কুমকুমের এক ইঞ্চি লম্বা একটা দাঁড়ি। আগে এই বস্তুটি গোল ছিল। এখন ইভল্যুশনের ফলে গোল থেকে লম্বা হয়েছে, নামও পালটে গিয়ে টিপ-এর জায়গায় হয়েছে ছিপ। 'সিনিকেরা' অবশ্য বলেন যে, বলি দেবার আগে পাঁঠাদের কপালে ঐ রকম লম্বা ধরণের সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েরা বলতে গেলে···মরুক গে, সিনিকদের কথায় আমাদের থাকবার দরকার নেই, তাঁরা যা প্রাণে চায় তাই বলুন।

রাগিণী চোখ বুজে ছিল, কাজেই কিংশুক বুঝতে পারলে না। দৃষ্টিতে 'ডেপথ' কত, কিশ বাঁও—না হাঁটু অবধি। রক্তিম ঠোঁট দুটো ভেজান থাকবার দরুণ সামনের দাঁতের সামান্য কিছুটা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে—যেন একটুকরো কৌতূহল ঠোঁটের আড়াল থেকে কিংশুককে লক্ষ্য করছে। পরিপূর্ণ শরীর তাই কঠা—তারপরই কিংশুকের কেমন সব তালগোল পাকিয়ে গেল, আর এগোতে সাহস হল না। ওর মনে পড়ল ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়েছিল পাহাড়ীরা পাহাড়ের গায়ে থাক কেটে কেটে চাষ করে, যাকে বলে ঝম প্রথায় চাষ। এখন দেখল তরুণীদের দেহটাও যেন ঐ ঝম প্রথায় তৈরী, এদিকে ওদিকে কয়েকটা থাক-এর সমষ্টিমাত্র।

কিংশুক আর না ভেবে তাড়াতাড়ি বললে,—তুমি জানলে কি করে?

রাগিণী কিংশুকের বুকের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজেই বললে,—জানা যায় গো—জানা যায়।

এবার আর তাড়াতাড়ি না করে ধীরে ধীরে কিংশুক বললে,—বীথি বলেছে বুঝি?

—বীথি! রাগিণীকে এবার মাথা তুলে চোখ খুলে ভ্রূ কোঁচকাতে হল।

গম্ভীরভাবে কিংশুক বললে—বীথিকে আমি ভালবাসি, শীগগিরই আমাদের বিয়ে হবে; কিন্তু এ কথা আমরা দু'জনে ছাড়া আর তো কেউ জানে না। তুমি জানলে কি করে? বীথি বলেছে বুঝি? যেভাবে হোক জেনে থাকলেও মা-পিসীমাকে কথাটা বলা তোমার উচিত হয়নি।

অস্ফুটস্বরে রাগিণী বললে—তন্নুর কথা। তাহলে সত্য!

—কি বলছ?

—না, কিছু না। বীথির সঙ্গে বিয়ে?

—হ্যাঁ।

—ও:!

—হুঁ।

হিসেব মত 'হুঁ' বলেই কিংশুকের প্রস্থান করা উচিত। মামাও তাই বলে দিয়েছিল—বলেই—মড়া পোড়ানো হয়ে গেলে হাঁড়ী ফাটানোর পর শ্মশানবন্ধুরা যেমন ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে কেটে পড়ে, তুইও তেমনি স্রেফ কেটে আসবি।

কিন্তু যেটা শ্মশানে ঘটে, সেটা ঘরে অচল। কিংশুকের কাটতে ইচ্ছে করল না। এখন ইচ্ছে করতে লাগল—এইভাবে অনন্তকাল দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকি।

রাগিণী একটু ভেবে তীব্রদৃষ্টিতে কিংশুকের মুখের দিকে চেয়ে জোরের সঙ্গে বললে,—কক্ষনো না, এ হতেই পারে না।

কিংশুক চমকে উঠে বললে,—কি হতে পারে না।

—তুমি যা বললে তা সব মিথ্যে। আমি জানি।

—ভ্যাট্, মোটেই মিথ্যে নয়।

রাগিণী হঠাৎ কিংশুকের দুই বাহু ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে,—মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে।

—উঃ, লাগছে। মাদুলীটার ওপরে হাত দিয়ে চাপচো কেন, লাগছে যে।

রাগিণী সে কথায় কর্ণপাত না করে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে—না, না, না।

—মা কালীর দিব্যি বলছি লাগছে—উঃ!···ও কে? আহ্লাদে গলায় মাসীমা বলে ডাকছে। কথা কানে যাচ্ছে না। ও কে, মাসীমা বলে ডাকছে।

রাগিণী কিংশুককে ছেড়ে দিয়ে একটু বিস্মিত হয়ে বললে—কাজল।

—কাজল! ও কি জন্যে এসেছে?

রাগিণী কিংশুকের গলারস্বরে অবাক হল, জবাব দিলে না। কিংশুক আবার জিজ্ঞেস করাতে বললে—পড়াতে এসেছে।

পড়াতে? তবে যে খুড়ীমা বললেন, কোডি পড়াতে আসবে।—কাঁদ কাঁদ স্বরে কিংশুক বললে।

রাগিণীর সব ভাবনা দূর হল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অত্যন্ত নিরীহভাবে বললে—কাজলকেই মা কোডি বলে ডাকে। ও কোডিদা' লেখে কিনা।

—কাজলই তাহলে কোডি।

—হ্যাঁ।

—ও:!—কিংশুক আর্তনাদ করে উঠল।

—হুঁ!—রাগিণী গম্ভীরভাবে সে আর্তনাদ সমর্থন করল।

কিংশুকের অবস্থাটা তখন, ধরণী তুমি দ্বিধা হও আমি সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলি। বললে—ও কি রোজ পড়াতে আসে?

—হুঁ রোজই আসে। বলে রাগিণী কিংশুকের কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

—ক'টা অবধি থাকে? শুকনো গলায় কিংশুক জিজ্ঞেস করলে।

রাগিণী চেয়ারে বসে বই-এর পাতা ওলটাতে লাগল, কিংশুকের কথার জবাব দিলে না। কিংশুক ধীরে ধীরে রাগিণীর চেয়ারের কাছে এগিয়ে গেল।

—অনেকক্ষণ থাকে?

—তা দশটা এগারোটা অবধি থাকে কোনও কোন দিন।

—এগারোটা অবধি এগিয়েছে!—বলে হতাশ হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে জিজ্ঞেস করলে—আর কে থাকে ঘরে?

রাগিণী বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিলে—কেউ না।

চোখ বড় বড় করে কিংশুক বললে—একলা থাক?

—বাঃ রে। একলা থাকব কেন? দু'জনে থাকি!

—ওকেই একলা থাকা বলে। ওটা ভাল নয়।

—তা হলে তো এখনও একলা আছি, এটাও তো ভাল নয়। বলে ঘাড় ফিরিয়ে কিংশুকের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে—না ঠিক এখনকার মত একলা থাকি না। পাছে কেউ ডিসটার্ব করে এই জন্তে তখন ক্ষেপী বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়, এদিকে কারুকে আসতে দেয় না।

তবু ভাল এখন যেমন একলা আছে তখন তেমন থাকে না ক্ষেপী থাকে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, ওর আর কাজলের মধ্যে ডিফারেন্সটা হল ক্ষেপী, যেমন আকাশবাণীর সুগম সঙ্গীত আর গ্রামোফোন রেকর্ড-এর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে হারমোনিয়াম, একটাতে বাজে আর একটাতে বাজে না।

রাগিণী বললে—তুমি কটা অবধি থাক!

—আমি কোথায়ও থাকি না।

—কোথাও না—বীথিদের বাড়ীও না।

—বীথিদের বাড়ী?···হ্যাঁ···ওদের বাড়ী মানে নিজেরই বাড়ী ওখানে আবার ক'টা কি।

কালেই তো প্রায়···। বলে কিংশুক থেমে গেল। রাগিণী বলেছে কাজল এগারোটা অবধি থাকে সুতরাং কিংশুক যদি তারও বেশী সময় বীথিদের বাড়ীতে না কাটায়, তাহলে টেক্কা মারা যায় না। কিন্তু এগারোটার পরই হচ্ছে বারোটা। বারোটা অবধি থাকা মানেই ঝরঝরে হয়ে যাওয়া। তাই কটা অবধি থাকলে কাজলের ওপর টেক্কাও মারা যায় অথচ ঝরঝরে হওয়ার হাতও এড়ানো যায়, তাই ভেবে নিয়ে কিংশুক বললে—কালই তো প্রায় রাত সাড়ে এগারোটা অবধি ছিলুম। হাসছো যে?

—হাসি পেলে হাসবো না?

—কেন হাসি পেল?

—বীথি তো কাল বিকেলে কলকাতায় গেছে, সাড়ে এগারোটা অবধি কার সঙ্গে আড্ডা দিলে বীথির ঠাকু'মার সঙ্গে নাকি?—রাগিণী ছাড়ল একখানা।

কিংশুক শুনে দমে গেল তারপর মনে মনে মামার নাম স্মরণ করে গম্ভীরভাবে বললে, এবার কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছে। না, হাসবো না। হাজার হোক তুমি উইকার সেক্স কৃপার পাত্রী, হেসে তোমার মনে ব্যথা দেবো না তুমি জান না, বীথি কাল বিকেলে নয় আজ বিকেলে কলকাতায় গেছে। আজ যাবে বলেই কাল রাত সাড়ে এগারোটা অবধি উই ওয়ার···। বলে একটু হেসে চুপ করে গেল।

রাগিণী এবার কিংশুকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বীথির ব্যাপার যে মিথ্যে তা কিংশুকের কথা থেকে বুঝতে পেরে রগড় দেখবার জন্তেই ও বানিয়ে বীথির কলকাতায় যাবার কথাটা বলেছিল

কিন্তু সে কথাটার যে এমন ধারা জবাব মিলবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। শুনে মনে হল, কিংশুক সত্যিই এই একটু আগে বীথিকে ট্রেণে তুলে দিয়ে এসেছে। কাজলের কথায় কিংশুকের চটে ওঠাতে যে আশঙ্কা দূর হয়েছিল এখন এই কথা শুনে তা শতগুণ হয়ে ফিরে এল। রাগিণীর মনে হয়েছিল কাজলের নাম শুনে কিংশুকের চটে ওঠা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, মানুষের স্বাভাবিক ঈর্ষা। আশ্চর্য তখন এই স্বাভাবিক মনের অবস্থাটার অস্বাভাবিক অর্থ করে নিজেকে বিজয়িনী ভেবে কি আত্মপ্রসাদই না মনে মনে অনুভব করেছিল। যতই মনে পড়তে লাগল এই একটু আগে কেবলমাত্র 'ভালবাসি' কথাটা শুনেই সম্পূর্ণভাবে নিজেকে কিংশুকের কাছে তুলে ধরেছিল ও ন্যাকা ন্যাকা ভাবে চোখ বুজে বলেছিল 'জানা যায় গো, জানা যায়' ততই নিজের ওপর ঘৃণা হতে লাগল।

রাগিণীর মুখের চেহারা দেখে কিংশুকের মায়া হল। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবার মত গুলের বিরুদ্ধে গুল যে গোলা হয়ে আঘাত করতে পারে, এ অভিজ্ঞতা কিংশুকের ছিল না। কারণ গুল সাধারণত মারাত্মক আঘাত করে না। কিন্তু রাগিণীকে ওর কথায় চুপসে যেতে দেখে কিংশুক বুঝতে পারলে যে, অপর পক্ষ গুলোস্তাজ হলেও পাকা নয় প্রবেশনার, এখনও নার্ভ সেট হয়নি। পাকা হলে কাবু না হয়ে আরও একটি গুল ছাড়ত।

কিন্তু এ কথাটা কিংশুক বুঝতে পারলে না যে বীথির কলকাতায় যাওয়ার কথাটা সত্যি হলেই বা তাতে রাগিণী এখন মুষড়ে পড়বে কেন? তবে কি···?

সামান্য যেটুকু থিয়োরিটিক্যাল জ্ঞান ছিল তাই মনে মনে খাটিয়ে কিংশুক বুঝতে পারল যে তবে কি নয়, তাই-ই। নইলে অমন ভাবে 'প্রহিবিটেড, প্রক্সিমিটি'তে এসে রাগিণী দাঁড়াত না। বোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই দেহে অষ্ট তামসিক ভাবের উদয় হল। ইচ্ছে করতে লাগল রাগিণী যেমন ভাবে ওর কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল ও-ও তেমনি রাগিণীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলাকার মত ওর কানে কানে বলে, গিনী, ও গিনী রাগ করলি ভাই?

রাগিণী বুঝতে পারল কিংশুক পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। না জানি আরও কত অপদস্থ ওর কাছে হতে হবে। একবার ভাবলে চেঁচিয়ে মাকে ডাকে। না থাক, তার চেয়ে হঠাৎ বারান্দায় জুতোর আওয়াজ পেলে, বুঝতে পারল কে আসছে। আসুক, বিষও অনেক সময় অমৃত হয়।

কাজল ঘরে ঢুকতেই রাগিণী ছুটে গিয়ে তার একখানা হাত ধরে ঠোঁট ফুলিয়ে বললে,—বাঃ রে? এত দেরী করতে হয় বুঝি, আমি কখন থেকে তোমার জন্যে 'ওয়েট' করছি।

কাজল রাগিণীর এই ব্যবহারে প্রথমটা ভড়কে গেল, এ আবার কি! তারপরেই নজরে পড়ল কিংশুককে। ঘাগী ছেলে ব্যাপারটা বুঝে নিতে আর দেরী হল না। এবার সেও সমান অনুযোগের সুরে বললে,—বাঃ রে! আমি বুঝি জানি যে তুমি ওপরে ওয়েট করছ। আমি নীচে মাসীমার সঙ্গে গল্প করছিলুম।

চ্যাংড়া ছোঁড়া পাড়ার থিয়েটার করবার সময় ষ্টেজে উঠে সুযোগ পেলেই গুরুজনদের গুরুত্ব নস্যাৎ করে দেবার জন্যে নিঃশঙ্কচিত্তে ঘন ঘন সিগারেট ধরায়। কারণ জানে, গুরুজনদের দেখে লবার তাই, সে বুঝতে পারলে এ সুযোগ এ জন্মে আর আসে কি না সন্দে কাজেই যতটা পারা যায় হাতিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ও দিনকয়েক আগে প্যাকাটির মত যে হাত দু'টুকরো হয়ে যাবার ভ রাগিণীর কথায় সরিয়ে নিতে হয়েছিল এখন সেই হাত রাগি কাঁধে রেখে মৃদু চাপ দিয়ে কণ্ঠে মধু ঢেলে বললে—রাণু, এ কে, এ তো চিনলাম না।

রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠলেও রাগিণী একটি কথাও বল পারল না। রাস্তায় নোংরা হওয়া জামা কাপড় যেমন বাড়ী পৌঁছোন অবধি ঘৃণা সত্ত্বেও টেনে বেড়াতে হয় তেমনি যতক্ষণ কিং আছে ততক্ষণ অবধি এ জ্বালা ওকে সহ্য করতেই হবে।

কিংশুক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে কাণ্ডকারখানা দেখছিল। একটু আগে ওর 'থিওরী' দিয়ে যা দাঁড় করিয়েছিল এখন দেখলে 'থিওরী' ভুল। তবে আর এখানে দাঁড়িয়ে এই 'কেলুয়া ভুলুয়া কীর্তি দেখা কেন? মন, এবার চল নিজ নিকেতনে।

পাগল ছাড়া নিজের অবস্থায় আর কেউ সুখী নয়। এ থেকে বিচার করলে ব্রহ্মজ্ঞদের পরই পাগলরা হচ্ছে এক স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ থিতোন জ্ঞান বা ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। কা পাগল নয় কাজেই শুধু এক স্কন্ধে হাত দিয়ে আজকের নাটকে যবনিকা পাত হোক এতে ওর সুখী হবার কথা নয়। স্কন্ধ থে অন্য দিকে হাত বাড়ানোটা ওর পক্ষে স্বাভাবিক, বিশেষত য বেশ জানে ও হচ্ছে 'হাফ এ্যান আওয়ার কা সুলতান'। অতএ খোলা গরম থাকতে থাকতেই···। কিন্তু বিধি বাম। কিং আর মুহূর্তকাল দাঁড়াল না। কিংশুক চলে যেতেই রাগিণী এ ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে দ্রুত বাইরে চলে গেল।

মামা একবাটি রসবড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কিংশুক ঘ ঢুকতেই বললে—কি রে এত দেরী?

—হাঁড়ী না ফাটলে আসি কি করে?

—তুই হাঁড়ী ফাটাস কি?

—না।

—কে ফাটালে?

—আপনা থেকেই ফাটলো।

—আঃ!—বলে গোটা দুই রসবড়া তুলে নিয়ে বাটিটা কিংশুকে দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—গোটাকতক খেয়ে নে। মুখখানা শুকি গেছে দেখছি।

—না, চান না করে আমি কিছু খাব না।

—কি হল আবার?

—গা ঘিন ঘিন করছে।

—গু মাড়িয়েছিস্ বুঝি? জুতোটা তাহলে ঘরে নিয়ে এসি কেন

—না রে বাপু তা নয়।

—তবে।

কিংশুক সব বললে। শুনে মামা বললে—কতটা কা এসেছিল?

—খুব কাছে।

—আরে খুব-এরও তো উনিশ-বিশ আছে! কি রকম

কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধনিকতম কলে
KOLAY Glucose
KOLAY GLUCOSE BISCUITS
Glucose
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

কিংশুক জবাব দেবার মত ভাষা খুঁজে না পেয়ে বললে,—খুব কাছে। ক্লোজ, যাকে বলে স্যাণ্ডউইচ হওয়া।

—ইংরেজী বুঝি না বাবা। সিদে বাংলায় বল দেখি সিনেমায় ঐ রকম হলে কি হত।

—'উলফ হুইসিল' শোনা যেত, চুঁই চুই।

মামা এ কথাটা বুঝল, বললে—ঠিক আছে খেয়ে নে। ও গা' ঘিন ঘিন ভাব চান করলে যাবে না, ডুব দিতে হবে। আর দেখ, গায়ের জামাটা পরেই ঘুমোস ভালো ঘুম হবে, আচ্ছা আচ্ছা স্বপ্ন দেখবি। কাল একবার বীথিদের বাড়ী···সে কালকের কথা কাল হবে, নে হাত লাগা।

কিংশুক চলে গেলে মামা ভেতরে গিয়ে ওর স্ত্রী, বন্ধুদের মামী, বৌদি, অনুপমাকে সব কথা বললে।

—রাগিয়ে তো দিলুম দেখি এখন অনুরাগ আসে কি না। কিং-এর জন্তে ভাবি না ওকে আমি ঠিক টেনে নিয়ে যাব, তোমাকে ও দিকটা সামলাতে হবে। কিং ভিড়তে গেল কিন্তু ও যদি তখন ভাগিয়ে দেয় তাহলেই ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন হবে।

—সে ভার আমি নিলুম। তবে আমি এদিককার কথা কিছু কিছু ওকে বলবো, তুমি কিন্তু শুকদেব ঠাকুরপো'কে কিছু বলবে না। আমিও এখন কিছু রাগিণীর কাছে ভাঙবো না। দু'জনেই ভেবে মরুক। খেলা কেমন জমে একবার দেখো না।

মামা অনুপমার গাল টিপে বললে—জমা খেলা আর মজা আম রস বেশী, না?

—আঃ অসভ্য!

[ক্রমশঃ।

আমরা কেন ভুলে যাই

মানুষের স্মৃতিশক্তি এক বিচিত্র বস্তু। জাগ্রত অবস্থায় প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ করি, যদিও এর প্রকৃতি ও কার্য্যধারা সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। স্মৃতিশক্তির অভাবে সবই অচল হয়ে পড়ে, জীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে বোধ হতে বাধ্য, যদি স্মৃতির মণিকোঠা কোন কারণে হঠাৎ শূন্য হয়ে যায়। এই শক্তির অনুপস্থিতিতে অতীতের দিকে ফিরে তাকাবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না; থাকে না ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করার শক্তি। বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরে মনোবিজ্ঞানিগণ স্মৃতিশক্তির রীতি-প্রকৃতির উৎস সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে আসছেন, তার ফলে এর সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রামাণ্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। যদিও কি করে মস্তিষ্কের মাঝে লুপ্ত প্রায় স্মৃতিগুলির পুনরাবির্ভাব ঘটে, এর কোন সন্তোষজনক মীমাংসা আজও চিকিৎসা বিজ্ঞানে সম্ভবপর হয় নি। কোন কোন চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীর মতে ছোট ছোট বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মস্তিষ্কের মাঝ দিয়ে ললাট পার্শ্বস্থিত ধমনীগুলিকে পরিক্রমার মাধ্যমেই স্মৃতিশক্তির বিকাশ ঘটা সম্ভব। এই মতের পরিপোষণে মনোবিজ্ঞানীর মাথার স্মৃতিশক্তি মূলক স্থানগুলিতে, বিদ্যুৎ সঞ্চালন পূর্ব্বক মানুষের স্মৃতি জগতে আলোড়ন ঘটে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে সুরু করেছেন; তাঁদের মতে এভাবে মানুষ লুপ্ত স্মৃতিও ফিরে পেতে পারে। হিপনটিজম বা সম্মোহন বিদ্যার প্রয়োগও হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে ওই একই উদ্দেশ্যে। স্মৃতিশক্তি মূলতঃ মানুষের সমগ্র কার্য্যক্রমের মধ্যে এক ধারাবাহিকতা বা সংযোগ বজায় রাখার একমাত্র উপায়। মনের খাতায় স্মৃতির আঁচড়ে ধরা থাকে আমাদের জীবনের সর্ব্ববিধ কার্য্যকলাপের ধারাবিবরণী; সব সময় সব কিছু মনে না পড়লেও ক্ষতি নেই, যথাকালে যথোপোযুক্ত পরিবেশে প্রয়োজনীয় স্মৃতিটুকু ধরা দেবেই; সব সময়ে যে আমরা সচেতন ভাবে স্মৃতি আশ্রয়ী হয়ে উঠি তা নয়, কোন কোন পারিপার্শ্বিক, কিছু বা বিক্ষিপ্ত ঘটনা আমাদের স্মৃতির দুয়ারে ঘা মেরে বার করে আনে ভুলে যাওয়া অনেক কথা। হয়ত' যা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও যা ছিল আমাদের মন থেকে সহস্র যোজন দূরে অনেক সময় কিছু মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় না, হতাশাক্লিষ্ট মনে নিরস্ত হওয়ার পর হয়ত' সামান্ত কোন কিছু দেখে বা উপলব্ধি করে খুলে যায় স্মৃতির বন্ধ বাতায়নটা। মনোবৈজ্ঞানিকরা এই স্মৃতি-বিস্মৃতির কার্য্যকারণ অনুসন্ধানে বিরত নন, তাঁদের মতে সচেতন মনের জগতে বিস্মৃতি-স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে অচেতন মন। লুপ্ত স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে নিরলস প্রচেষ্টা করে চলে অচেতন মন, নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে আর তারই পরিণামে সচেতন মানসেও প্রতিফলিত হয় তার প্রতিক্রিয়া। স্মৃতিশক্তি যে মানুষের এক অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু এ কথা প্রথমেই বলেছি, ক্ষেত্র বিশেষে এর বিভিন্ন রূপায়ণ ঘটে, যথা—কেউ কেউ প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন, কেউ বা হন একক্ষেত্রে সাতিশয় দুর্ব্বল। দুর্ব্বল স্মৃতিযুক্ত ব্যক্তির উচিৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্মারক চিহ্নের আশ্রয় নেওয়া। মেয়েরা অনেক সময় কাপড়ের খুঁটে গিঁট বেঁধে রাখেন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে যথাসময়ে অবহিত হওয়ার জন্য দুর্ব্বল স্মৃতি, স্মারক চিহ্নের সাহায্যে সহজেই নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে পারে। যত্ন নিলে স্মৃতিশক্তিকে বাড়িয়ে তোলা মোটেই অসম্ভব নয়, ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের মতে স্মৃতিশক্তি তিন ভাগে বিভক্ত, ধৃতি, ছাপ ও পুনরাহ্বান। কোন শব্দকে রেকর্ড করার প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করলেই স্মৃতির স্বরূপটি যথাযথ ভাবে ধরা পড়ে! মনের উপর কোন ঘটনার ছাপ যত গভীর হয় সেটা মনে থাকেও ততই গভীর হয়ে, আবার ধৃতি না থাকলে ঐ ছাপ গভীর হয়েও ধরা দেয় না, সর্ব্বশেষে পুনরাহ্বান বা ফিরে মনে করার কারণ না ঘটলে স্মৃতির দুয়ারে ঘা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও উপলব্ধি গোচর হয় না। স্বার্থ ও স্মৃতিশক্তির ব্যবহারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে, সচরাচর নিজেদের স্বার্থের পরিপোষক এমন সব ঘটনা বা অনুভূতিকেই আমরা স্মৃতিতে সঞ্চিত রাখি বা রাখতে আগ্রহী হই। এই জন্যই দেখা যায় যে অপ্রয়োজনীয় বা অসুবিধাজনক ঘটনাকে মানুষ ভুলে যেতে চায় স্বেচ্ছায়, স্মৃতির ভাঁড়ারে তাদের জমা না করে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনের অজানা প্রদেশে আমাদের গতিবিধি হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই আরও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠবে, হয়ত বা বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে আলো জ্বালানোর মতই সহজ হয়ে উঠবে স্মৃতিচারণ করাটাও, তবে যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষেরই স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তির একটা উৎস আছে, সে উৎসমুখ যাতে সর্ব্বদাই মুক্ত থাকে সেজন্য সচেষ্ট থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কাপাস, কাবাস—[সং কার্পাসী, হিং কপাস, রুই, বিনোলা, ওং কপা, মং কাপসী, কাপুস, সরকী, গুজং বণরুকপাস, কং হত্তি, কাতহত্তি, তৈং পত্তিচেট্টু, তাং পঞ্জি] তুলাগাছ-বিং gossypium herbaceum. কয়েকটি প্রকারভেদ—(১) তুণ্ডিকেরী—খেরো কাপাস। বাংলায় জন্মে, g. arboreum, var, neglecta, বড় বলিয়া খেরো। (২) সমুদ্রান্তা—বোম্বাই প্রদেশের। (৩) কার্পাসী—ওলনা কাপাস, দেব কাপাস, রাম কাপাস, গাছ কাপাস। গাছ বড় হয় না বলিয়া রামকাপাস। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় জন্মে। (৪) বদরা—বনকার্পাসিকা। নিকৃষ্ট জাতের g. arboreum, var, assamica, var, rosea. আসাম প্রদেশের পর্বতে ও মান্দ্রাজে জন্মে। কাপাস গাছ পূর্বকালে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে হইত। গাছ প্রায় ৩।৪ হাত উঁচু হয়। ফুল পীতবর্ণ, ফলের ভিতর বীজ ও তুলা থাকে। বীজে তৈল আছে। অরণ্য-কার্পাসীকে 'বন ঢ্যাঁরস' বলে কারণ ইহার গাছ ও ফল দেখিতে ঠিক ঢ্যাঁরসের মত—কেবল আকৃতিতে কিছু ছোট, hibiscus vilifolius. মার্কিণ তুলা—g. barbadense.

কাফরি মরিচ—ধানিলঙ্কা বিং, capsicum grossum.

কাফল—কট্‌ফল।

কাফি—[হিং কাওয়া, বন্‌, কফী, কফি] কফি। আরব দেশে জন্মায় coffea arabica, কাফি বীজ বড়, একদিকে গোল অপর দিক চ্যাপ্টা। স্বাদ মধুর, কটু। রং পীত। আচ্ছুকাদিবর্গের ক্ষুপবিং। গাছ ১৫-২০ ফুট লম্বা হয়। শাদা ফুল। প্রতি ফলে দুইটি বীজ। আজকাল এবিসিনিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারতের নেপালে, আসামে ও খাসিয়া পাহাড়েও জন্মায়। বাংলার কফি ফল ঈষদ আয়তাকার c. bengalensis, সুগন্ধি কফি শ্রীহট্ট ও টেনেসেরিয়ামে হয় c.fragrans, আসামী কফি ফল ঈষৎ ডিম্বাকার c. jenkinsu. খাসিয়া কফি ফল ১।৪ ইঞ্চি মোটা c. khasiana, ত্রিবাঙ্কুরের কফি ফল লম্বায় ছোট ও চওড়ায় বড় c. travancorensis, ঝালাবরী কফি ফল ত্রিবাঙ্কুরের মত, কেবল একদিকে গভীর একটি টোল খাইয়া যায় c. wightiana.

কাবরী—[সং চোচ] তেজপত্র দ্রং।

কাবাবচিনি—[সং কঙ্কোলক, কৃতফল, সুগন্ধিমরিচ, হিং শীতলচিনি, গুং চনকবাব, তাং বলমলকু] তাম্বুলাদিবর্গের লতা piper cubeba. জাভা ও মলক্কা দ্বীপে জন্মে। ভারতবর্ষেও অল্প পরিমাণ চাষ হয়।

কাবলি মটর—মটর দ্রং।

কাবাস—কাপাস দ্রং।

কামখড়্গদলা—স্বর্ণকেতকী গাছ।

কামদূতিকা—নাগদন্তী।

কামদূতী—পারুল গাছ।

কামফল—মহারাজাম্র বৃক্ষ।

কামরাঙ্গা—[সং কর্মরঙ্গ, ধারাফল, পীতফল, হিং কমরখ, মং কর্মরে, গুং কমারক, তাং তমারট্টম মরম্‌, তেং তমারটা কয়া, ওং করমঙ্গা] প্রসিদ্ধ অম্লফল তরু, averrhoea carambola. ফল পাঁচশিরা, দুইবার ফলে, শরৎকালে ও শীতকালে। চীনা কামরাঙ্গা—ফল ছোট কিন্তু মিষ্ট।

কামবালি লেবু (দেশজ)—বৃক্ষবিং।

কামরূপিণী—অশ্বগন্ধা গাছ।

কামলতা—কৃষ্ণলতা, তরুলতা দ্রং, ipomoea quamolit.

কামবতী—দারুহরিদ্রা।

কামবাণ—১ পদ্ম, ২ অশোক, ৩ শিরীষ, ৪ আম্র, ৫ উৎপল।

কামবৃক্ষ—বন্দাক, পরগাছা।

কামবৃদ্ধি—গুল্মবিং।

কামবৃন্তা—পারুল গাছ।

কামশর—আম।

কামমখ—আমগাছ।

কামহোগলা (দেশজ)—বৃক্ষচিং, typha angustifolia.

কামাঙ্গ—আমগাছ।

কামায়ুধ—আমগাছ।

কামিজী—[সং রৈন্তক] নিম্বুকাদিবর্গের পুষ্পবৃক্ষ, murraya exotica opaniculata, বন্দা, পরগাছা, দারুহরিদ্রা ফুল সাদা, সুগন্ধ, পাঁচদল, সন্ধ্যায় ফোটে ও সকালে ঝরিয়া পড়ে।

কামিনীশ—সজিনা গাছ।

কামীন—রামসুপারী।

কামুক—১ অশোক গাছ, ২ অতিমুক্তক লতা।

কামুককান্তা—অতিমুক্তলতা, মাধবীলতা।

কাম্পিল্ল, কাম্পিল্লক, কাম্পিলা—কমলাগুঁড়ি।

কাম্পীলক—কমলাগুঁড়ি, পলাশগাছ।
কাম্বুকা—অশ্বগন্ধা।
কাম্বোজ—পুন্নাগবৃক্ষ।
কাম্বোজি—১ কুঁচ, ২ হাকুচ।
কায়ফল (দেশজ)—কট্‌ফল।
কায়স্থা—১ হরীতকী, ২ আমলকী, ৩ বড ও ছোট এলাচ, ৪ তুলসী।
কারিরী (দেশজ)—বৃক্ষবি° mimosa rubicanlis.
কারাপুটী—কাজুপতী দ্র°।
কারণদূধা (দেশজ)—তৃণবি° poa karunduli Buch.
কারণফল (দেশজ)—ফুলবি° clausena heptaphylla.
কারন্ট (দেশজ)—বৃক্ষবি°।
কারম্ভা—প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ।
কারবী—১ মৌরী, ২ কৃষ্ণজীরা, ৩ হিন্দু পত্রী, ৪ ছোট করেলা, ৫ করেলা।
কারবেল্ল—করেলা, উচ্ছে ও কাঁকরোলকে কারবেল্ল কহে। পর্যায়—কঠিল্লক, সুশবী, সুষবী, কণ্ডুর, কাণ্ডকটুক, সুকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, কঠিল্ল, নাসাসম্বেদন, পটু।
কারবেল্লক—করেলা।
কারবেল্লিকা, কারবেল্লী—ছোট করেলা, উচ্ছে।
কারসীর (দেশজ)—বৃক্ষবি° grewia hispida Buch.
কারস্কর—বৃক্ষবি°। পর্যায়—কিম্পাক, বিষতিন্দু কররুম, রম্যফল, কুপীলু, কালকূট।
কারাকুবেট (দেশজ)—বৃক্ষবি° calamus latifolius.
কারাজ (দেশজ)—বৃক্ষবি° gratiola amara.
কারিকা—কণ্টকারী।
কারী—কণ্টকারী ও আকর্ষকারী নামে দুই প্রকার।
কারুজ—নাগকেশর।
কারেলা (দেশজ)—বৃক্ষবি° cleome pentaphylla.
কারোয়া—বিদেশী শাকবি° carum bulbocastanum, কাওরা c. carni, ইহার ফল দ্বারা পানীয় সুগন্ধীকৃত হয়।
কার্থ্রা (দেশজ)—বৃক্ষবি°, curcuma zerumbet.
কার্ত্তিকশালি—যে ধান কার্ত্তিক মাসে পাকে।
কার্পাস—কাপাস দ্র°।
কার্মুক—১ বাঁশ, ২ শ্বেত খদির, ৩ হিজ্জল, ৪ মহানিম্ব।
কার্যা—কারীবৃক্ষ।
কাশ্মরী—১ গাম্ভারী গাছ, ২ শ্রীপর্ণী বৃক্ষ।
কার্ষী—শতমূলী।
কার্ষ—শালগাছ।
কাল—১ কাসমর্দ বৃক্ষ, ২ রক্তচিতা।
কাল আঁকড়া—অঙ্কোট, কাল আঁকড়।
কালকচু—বৃক্ষবি colocacsia antiquorum.
কালকঞ্জ—নীলপদ্ম।
কালকণ্ঠ, কালকণ্ঠক—পীতসারবৃক্ষ।
কালকলায়—১ কাল মটর, কাল মাসকলাই।
কালকস্তুরী—লতাকস্তুরী, hibiscus abelmoschus.
কালকাসুন্দা (দেশজ)—কাসমর্দ দ্র°।
কাল-কুঁচ—বৃক্ষবি° abrus melanos permus.
কালকূটক—কারস্কর বৃক্ষ।
কালকেরা—বৃক্ষবি° capparis brevispina, c. acuminata.
কালকেশী—নীলগাছ।
কালক্লীতক—নীলগাছ।
কালস্কন্ধ—কালকাসুন্দে।
কালচকুমা (দেশজ) গাছবি° quercus fenestrata.
কালজাতী—বৃক্ষবি° eranthemum pulchellum.
কালজাম—জাম্বু দ্র°।
কালজীরা—স্থূলজীরক, nigolla sativa.
কালঝাটি—গুল্মবি, eranthemum nervosum.
কালতাল—তমাল গাছ।
কালতিন্দুক—কুপীলু বৃক্ষ।
কালতিল—কৃষ্ণতিল।
কালতুলসী—কৃষ্ণতুলসী।
কালদেবধান—গবেধুক দ্র°।
কালধান—কৃষ্ণশালি, শ্যামশালি।
কালধুতুরা—কৃষ্ণধুস্তুরক datura jactusa.
কালনাটা (দেশজ)—গুল্মবি°, caesalpinia bonducella.
কালপর্ণ—তগরবৃক্ষ।
কালপর্ণী—কৃষ্ণতুলসী।
কালপীলু, কালপীলুক—কুপীলু।
কালপুষ্প—মটর, কলায়।
কালপুগ—কাল সুপারী।
কালপেশী, কালপেষী—শ্যামলতা। পর্যায়—মহাশ্যামা, সুমদ্রা, উৎপলসারিবা, দীর্ঘমূলা, পানিন্দী, মসুরবিদলা।
কালমরিচ—মরিচ দ্র°।
কালমান, কালমার—কালতুলসী।
কালমারিষ—বড়নটে শাক।
কালমাল—কালতুলসী।
কালমুগ—কৃষ্ণমুদ্গ, কৃষ্ণমুগ, মাষকলায় অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি, phaseolus melanos permus.
কুলেমুষ্কক—ঘণ্টাপারুলি বৃক্ষ।
কালমূল—রক্তচিতা।
কালমেঘ—[স° যবতিক্তা, কিরাত, মহাতিক্ত, হি° কিরয়াত, ও° ভুই নিম্ব] বাসকাদিবর্গের বর্ষায়ু শাকবি°। বাংলা দেশে সুপরিচিত। গাছ সোজা, পাতা মাছের আকার, রোম শূন্য, ধার অখণ্ডিত, ফুল সাদা, চিড়ের মত চ্যাপ্টা ফল। কালমেঘ তিক্ত, কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় andrographis. paniculata, justicia p.
কালমেশিকা—সোমরাজী, শ্যামলতা।
কালমেষী, কালমেষিকা, কালমেষী—কালমেশিকা দ্র°।
কালবিছুটি (দেশজ)—গুল্মবি°।
কালবিহরী (দেশজ)—গুল্মবি°।
কালবৃন্ত—কুলত্থ।

[ক্রমশঃ।

জলযান

—নিখিল ভট্টাচার্য

প্রতীক্ষা

—নিমাইরতন গুপ্ত

কাশীর ঘাট

—দীপক চাকলাদার

চৈতালী

—গোবিন্দলাল দা-

ওরা তিনজন

—মানবেন্দ্রনাথ মিত্র

হাসি

—নীহার ঘোষ

উল্লাস

—দীপক চক্রবর্তী

গুরু-শিষ্য

—বৈদ্যনাথ ভক
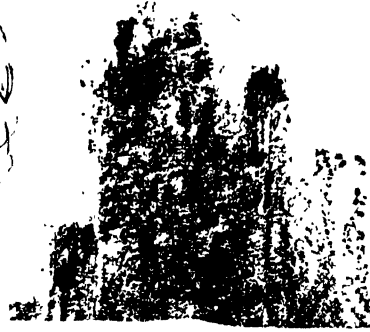
তৃষ্ণা

শ্রীডলি চট্টোপাধ্যায়

মাধবীলতাটার পাশে কটকের নেম-প্লেটটায় ছোট্ট ফুলের মতো ফুটে থাকে শুধু 'মঞ্জরী'।

ঝোলান বারান্দার ওপাশে দরজার সবুজ পর্দাগুলো হাওয়ায় ওড়ে।

···আর সবুজ সংকেতে হাতছানি দেয়···স্তব্ধ নিঝুম···যেন গল্পে পড়া রহস্যপুরী।

"না, না, আর নয়, আর নয়, এবার পাড়া থেকে বিদেয় কর ওটাকে। যত সব ব্যাড এগ্ জাম্পল্"—পাড়ার লোকের কল্পনাও এতদিনে জল্পনায় নেমে আসে। তাঁদের চোখে ঘুম আসে না রাতে··· ঘুম আমারও চোখে আসে না। অফিসক্লান্ত স্বামী ঘুমিয়ে পড়েন। খোকার মুখে একটুকরো হাসি ভেসে ওঠে···লাল বলটার স্বপ্ন দেখছে কিংবা সবুজ বেলুনটার।

এই তো সেদিন। বকুল-ঝরানো গাছটার তলা দিয়েই বিরাট 'প্লিমাউথ' গাড়ীখানা থেকে নেমে এসেছিল মঞ্জরী।

যখন বিকেলের পড়ন্ত রোদ বাড়ীগুলোর মাথায় মাথায় স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে বিদায় নিচ্ছিল।

নেমে এসেছিল মঞ্জরী—শাম্পু করা চুলের স্তবক, হাল্কা সিফনে ছিল নীল সমুদ্রের রং জড়ানো···শুভ্র কণ্ঠ সোহাগে বেষ্টন করেছিল নীল পাথরের মালা। সঙ্গে একটা বোবা-কালা আয়া নিয়ে। তিন তিনটে লরী তো ওর আগেই এসে গেছে—সোফা, কোচ, রেডিও, পিয়ানোর ভিড় নিয়ে—নিয়ে উদ্ধত ঐশ্বর্য্য আর নিয়ে দুরতিক্রম্য অহংকার।

ও-বাড়ীর বারান্দায় সেদিন সবুজ অর্কিড ঝুলেছিল, খাঁচায় রাখা দোয়েলটা শিষ দিয়ে উঠেছিল। সবুজ নেটের আবছা ছায়ার ওপাশে হেসে উঠেছিল মিশিগান্ধা॥

—"এবার পাড়া থেকে বিদায় কর ওটাকে"—রায় বেরিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করে।

মঞ্জরীকে আজও দেখছি দুপুরের ঘুম-ভাঙ্গা নিরালায় যেন রজনীগন্ধার শুভ্র-শিখায় ওর ধূপছায়া শাড়ীর সুঠাম ভঙ্গী···দেখেছি ওর খুসীতে ঝলোমলো মুখে বেলাশেষের আবীর ছড়ানো।

ঘুম আমারও চোখে আসে না। জানলার কাছে উঠে আসি।

দেখি—আগেও দেখেছি কালো বাদুড়ের মতো গাড়ীখানা নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়—মঞ্জরী নিঃশব্দেই উঠে বসে গাড়ীতে আবার নিঃশব্দ অন্ধকারেই মিলিয়ে যায়, নির্নিমেষে চেয়ে থাকে রাস্তার আলোটা।

কিন্তু ও কি মঞ্জরী? কালো নেটের স্বচ্ছছায়ায় মুখের আধখানা ঢাকা ও তো কোন্ রূপসী ইরাণী।

কোন রাতে দেখি পেশোয়াজ আর ওড়নায় ঘেরা কোন হারেম-বন্দিনীর প্রস্ফুট যৌবন। কোন রাতে দেখি, ল্যাংঘা আর আঙ্গিনায় কোন তপ্তকাঞ্চনবর্ণা রাজপুতানী। কখনো দেখি রেশমীবসনা বর্ম্মা-সুন্দরীর পুষ্পিতা কবরী। আবার কখনো দেখি উচ্ছল-চরণা চকিত-নয়না বনহরিণী জিপ্সীবালা···

অন্ধকার গভীর রাত তার কালো বুক দিয়ে ঢেকে নেয় ওকে। গভীর রাতের জ্যোৎস্না মৌন বন্দনায় রূপাঞ্জলি দেয় ওর চরণে, মঞ্জরী হারিয়ে যায়।

এক একদিন সন্ধ্যের দিকে একজন সারেঙ্গীওয়ালাকে আসতে দেখি—শ্বেতশ্মশ্রু শুভ্রবসন বৃদ্ধ। সেদিন সবুজ নেটের আবছা ছায়ায় রূপসী নর্ত্তকীর নূপুর ঝংকারে—কোন বাসবদত্তার স্বপ্ন জাগে।

তারপর সেদিন হেমন্ত দুপুরে শিরীষ গাছের ছায়াটা যখন সোনালী

আমাদের খোকন দাঁড়িয়ে ছিল জানলার ওপর আর আধো আধো ভাষায় যেন কত কি-ই বলে চলেছিল—খাঁচায় রাখা মঞ্জরীর ওই দোয়েলটাকেই।

মঞ্জরী বারান্দায় বেরিয়ে এল—তারপর কি জানি কি মনে করে খোকার দিকে হাত দুখানা বাড়িয়ে দিলে।—খোকা খোকা রেশম কালো চুলের মধ্যে খোকনের সাদা ফুলের মতো তুলতুলে মুখের নীল চঞ্চল চোখ···আর···টুকটুকে হাসির ওপাশে ছোট্ট দুটি দাঁত···।

ছলছল করে ওঠে মঞ্জরীর কালো চোখের দীপ্তি। খোকাও ওর ছোট্ট হাতদুখানা বাড়িয়ে দিলে মঞ্জরীর দিকে আর আধো আধো কাকলীতে ডাকল—"মা, ম্মা—।"

হঠাৎ আসা বৃষ্টিধারার মতো ঝর ঝর করে হেসে উঠল মঞ্জরী। বোবা কালা আয়াটাকে ইসারা করে কি যেন বললে!···নেমে এল আয়াটা। আমাদের বাড়ীর গেটের ভেতর দিয়ে খানিকটা ভেতরে এল।···মঞ্জরী আমাকে ইসারা করলে—খোকাকে পাঠিয়ে দাও। খানিকটা ইতস্তত: করেই পাঠিয়ে দিলুম খোকাকে নীচে পিয়ে। আবার যখন এলুম, দেখলুম, চুমায় চুমায় খোকনের ছোট্ট মুখখানায় আবীর মাখাচ্ছে মঞ্জরী।

···নীলাভ কুয়াশায় গলানো চুনীর রং লাগে···ছড়িয়ে পড়ে মঞ্জরীর নিঃশব্দ মঞ্জিলে। আর উছল প্রতীক্ষায় ছোট্ট অতিথির পথ চেয়ে থাকে মঞ্জরী—কখন দুটি ছোট্ট হাতের নরম ছোঁয়া জড়িয়ে ধরবে গলা। তারপর আসে খোকন। ওর কাকলীতে শিউলিঝরা সকাল হেসে ওঠে।···

—ভিজে চুলের রাশির ওপর রাঙ্গা পাড় সাদা শাড়ীর চাবী বাঁধা আঁচলখানি পিঠের ওপর ফেলে দিয়ে মঞ্জরী খোকার চোখে কাজল আঁকে, ঘুমপাড়ায়, দোলনার তালে তালে মাথা দুলিয়ে গান গায়। আবার ফিডিং-বোতলটা খোকার মুখে ধরে মঞ্জরী চেয়ে থাকে আনমনা, যেন ওর মন ওর খোকাকে নিয়ে চলে যায় দূরে, কাঁচামাটির পথ বেয়ে, কোন পল্লীবধূর প্রদীপ জ্বালানো মাটির কুটিরে।

রঙীন জামায়, ছোট্ট খেলনায় ছোট্ট মুঠি ভরে যায়—আর ভরে যায় মঞ্জরীর ঘর ছোট্ট মুখের কান্নাহাসিতে।

ফ্লাওয়ার ভাসের রাঙ্গা গোলাপটা খোকার কানের পাশে হেসে ওঠে। বেলফুলের মালাটা দিয়ে বেঁধে দেয় খোকার ছোট্ট হাত দুটো।

হয়তো ও মালা সাজতো মঞ্জরীর শিথিল কবরীতে স্তব্ধ নিশীথে যখন ছন্দে ছন্দে বেজে উঠত মঞ্জুবাঈ-এর পায়ের নূপুর, তখন একটি দুটি করে ঝরে পড়ত ওর শুভ্রদল, হয়তো কারো অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল রাঙ্গা গোলাপটা!

মনের মতো সাজিয়ে দিয়ে বিকেলের দিকে খোকনকে আবার বাড়ী পাঠিয়ে দেয় মঞ্জরী। সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়! দীর্ঘ পল্লবের ছায়াঢাকা দুটি চোখ পেতে রাখে—যেখানে ঘুমিয়ে থাকে ওর ছোট্ট খোকা, ছোট্ট কুটীরায়।

রাত্রের অন্ধকারে কালো বাদুড়ের মতো গাড়ীখানা তেমনি নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়। মঞ্জরী ওঠে না—যায় না মুজরো দিতে। বৃদ্ধ সারেঙ্গীওয়ালা আর আসে না, সবুজ নেটের আবছা ছায়ায় ঝংকার তোলে না নর্ত্তকীর নূপুর।

ডাক্তারের গাড়ীটাও বেরিয়ে যায়—সন্ধ্যার আঁচলের ছায়া ছ[...]
পড়ে শিরিষ গাছটার তলায়···

আমার চোখ পড়ে একবার মঞ্জরীর বারান্দার দিকে—দেখি স্তি[...]
আলোয় বিষণ্ণ কান্নার মতো ও তখনো দাঁড়িয়ে আছে চোখের কে[...]
নিয়ে উৎকণ্ঠার অতন্দ্র-শিখা···

আজ ক'দিন হলো খোকন জ্বরে পড়েছে। টলে টলে হাঁটছে খোকা—খিল খিল করে হাসছে না ওর ছোট্ট হাতের ছোট্ট লাঠি[...] বীরত্বে। আধো কথার ফুলঝুরি ঝরে ঝরে পড়ছে না আর ওর [...] মুখের ছোঁয়ায়।

মঞ্জরীর আয়া আসে খোকার খবর নিতে। ম্লান মুখে ফিরে যা[...]

মঞ্জরী পায়চারী করে বারান্দায়। কখনো জলভরা চে[...] অপলক অসহায়তা নিয়ে চেয়ে থাকে খোকার ঘুমন্ত কটখানার দি[...]

ওর কাছে এসে এসে ইসারায় কি যেন বলে বোবা কালা আয়াট[...] মঞ্জরী মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়। বিরস মুখখানা নিয়ে ফি[...] যায় আয়াটা।

প্রতিবেশীর আলো নেভে—ডাক্তারের গাড়ীর হর্ণ আ[...] মোড়ের মাথায় মিলিয়ে যায়, স্তব্ধ হয়ে আসে ঘুমন্ত পৃথি[...] আকুল উৎকণ্ঠায় রাত বাড়ে আর অশান্ত উত্তেজনায় ছট্[...] করে মঞ্জরী।

কত বিনিদ্র রাত দুশ্চিন্তার ছায়ায় কাটে আস্তে আস্তে। তার[...] এক সোনা-ধোওয়া সকালে জ্বর ছেড়ে গেল খোকনের, মঞ্জরী খ[...] পেল। ছড়িয়ে পড়ল ওর শুকনো মুখেও সোনা-ধোওয়া সকালের হাসি[...]

প্রতীক্ষা···অধীর প্রতীক্ষা···আবার খোকন আসবে [...] কোলে। ভুলে যাবে মঞ্জরী তার অতীতকে—লাঞ্ছিত নারীত্ব মা[...] তুলবে আবার। খোকাকে নিয়ে গড়ে তুলবে মঞ্জরী ওর স্বপ্নসৌধ।

নীরব অনুরোধ ঠোঁটের কোলে নিয়ে জলভরা চোখদুটো মে[...] দেয় মঞ্জরী আমার দিকে।

এর কিছুদিন পরে খোকা গায়ে একটু জোর পেলে, একটু [...] হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আবার তাকে পাঠিয়ে দিলাম মঞ্জ[...] বাড়ী। শীর্ণ দু'খানি হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খোকা মঞ্জ[...] কোলের উপর—আলতো হাতে পাখীর ছানার মতো খোকাকে বু[...] তুলে নিলো মঞ্জরী। দুধ-সাদা আঁচল দিয়ে ঢেকে নিলো খোক[...] ছোট্ট গা আর আদরের নরম ছোঁয়া ঝরিয়ে দিলো খোকার কপা[...] গালে, মাথায়।

—"না, যথেষ্ট বাড়াবাড়ি হয়েছে। এসব কাণ্ড আর চলবে [...] মশাই, আপনারা হলেন গিয়ে পাড়ার মাথা, আপনারাই [...] বেবুশ্যেটাকে প্রশ্রয় দেন, আপনার বাড়ীর ছেলেই যদি ওর বা[...] যাওয়া-আসা করে তো আমরা আর আছি কোথায়? হয় ব[...] করুন, না হয়তো বলুন আমরাই পাড়া ছাড়ি।"

বাইরের পর্দ্দায় কান পাতি। পাড়ার সমাজপতিরা এসেছে বোঝাপড়া করতে।

তা সত্যি তো বাপু, দোষ তো আমাদেরই। সমাজ নিয়ে [...] বাস করি না আমরা? দিতে হবে না ছেলের বিয়ে-থৈতে?

তাই ওঁদের আর পাড়া ছাড়তে হয় না, আমরাই বন্ধ করি[...] মঞ্জরী পাঠিয়ে দেয় ওর বোবা-কালা আয়াটাকে। আমার কেন্দ্রী[...] তাকে তাড়িয়ে দেয় অপমান করে। চুপি চুপি জানলায় পাখী

দেখি, বারান্দায় রেলিংটা ধরে পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জরী—স্তব্ধ হয়ে গেছে অসহ্য ব্যথায় আর জলে-ভেজা কালো দু'টো চোখে সে কি মিনতি!

রিক্ত সন্ধ্যা উদাস মুহূর্ত্ত নিয়ে নিশীথে নেমে আসে। বারান্দায় এসে দাঁড়ায় মঞ্জরী। কি এক অব্যক্ত ব্যথায় মূক বেদনাতুর চোখে চেয়ে থাকে খোকার ঘুমন্ত কটখানার দিকে।

কার কান্না-ভেজা দীর্ঘশ্বাসে ভারি হয়ে ওঠে আমার ঘরের বাতাস। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা কার অপমানের প্রতিবাদ জানায় মাথা নেড়ে নেড়ে—এ অন্যায়, এ অন্যায়।

—"মিঃ লর্ড, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আমি রূপপোজীবিনী তবু, তবুও আমি চেয়েছিলুম, ভদ্রপল্লীতে ভদ্র পরিস্থিতিতে পঙ্কিলতার বাইরে বাস করতে। চেয়েছিলুম স্নিগ্ধ পরিবেশ, চেয়েছিলুম পরিচ্ছন্ন পরিচিতি। কিন্তু আমি—আমি পতিতা, হয় তা কোনদিন কোন ভদ্র মুখোশধারী ভদ্রলোকের নির্লজ্জ প্রলুব্ধতাকে হতাশ করেছিলুম বলে আমার মিথ্যে মামলায় জড়ানো হয়েছে। করিনি আমি কোন হৈ-হল্লা, কিনিনি আমি কারো কাছে জড়োয়া নেকলেশ, যার দাম দেওয়া হয়নি।···

—"মিঃ লর্ড, এ মিথ্যা, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা;—কঠিন কাঠগড়ার বুক শিউরে ওঠে মঞ্জরীর মিষ্টি গলার বিদেশী ঝংকারে···।

এ পক্ষের জেরায় ও পক্ষের উকিল ঘর্ম্মাক্ত কপাল মোছেন। এ পক্ষের জেরায় ও পক্ষের মামলা ফেঁসে যায়? ফিরে আসে বিজয়িনী।—জানি না কেন মনটা আমার অনাবিল খুসীতে ভরে ওঠে।

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পরে আবার মঞ্জরীর দরজায় লরী এসে দাঁড়ায়। আবার সোফা, কোচ, রেডিও, পিয়ানো নিয়ে চলে যায়—চলে যায় আহত অপমানের প্রচ্ছন্ন বেদনা নিয়ে···।

বৃষ্টিঝরা রাত ভোর হয়। ভিজে বকুলের তলা দিয়েই কালো বাদুড়ের মতো গাড়ীখানা তেমনি নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়—উঠে বসে বোবা-কালা আয়াটা।

ওপর থেকে নেমে আসে মঞ্জরী, ও আজ আবার রক্তরাঙা শালোয়ার পাঞ্জাবীতে, শ্যাম্পুকরা চুলের স্তবকের ওপর স্বচ্ছ গোলাপী ওড়নাটা আলতো ভাবে তুলে দিয়েছে···।

কান্না ধোওয়া হাসির মতো সকালের রাঙা রোদে, কৃপাণের মতো ঝক্ ঝক্ করে উঠল ওর যৌবনোচ্ছল দেহবল্লরী।

আমার ঘরের দিকে একবার চোখ তুলে চাইল মঞ্জরী—খোকাকে দেখে থর থর করে কেঁপে উঠল ওর অনিন্দ্য দু'টি ঠোঁট···। শুধু একবার—একবার যেন চাইল ওর নীরব আকুতি, খোকাকে ওর কাছে টেনে নিতে। কিন্তু জলে ভরে ওঠা দু'টি চোখ নামিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বসল মঞ্জরী···

নিঃশব্দেই কালো গাড়ীখানা আবার জনারণ্যে মিশে যায়।

শুধু পিছনের লাল আলো দু'টো রাস্তার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত চেয়ে থাকে পাড়াটার দিকে রক্তচক্ষু মেলে।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন
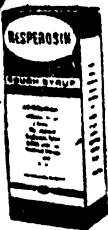
(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

অষ্টাদশ স্তবক

১। 'অন্তরে যিনি ছিলেন, তবে কি তিনি চলে গেলেন? না, না, তা হতেই পারে না। তবে কি আমাদের অন্তঃকরণের হিতের জন্তেই অন্তর্হিত হলেন তিনি?'—

কোনো প্রশ্ন কোনো তর্কই সমর্থন পেল না ব্রজবধূদের হৃদয়ে। সৌহার্দ্যের স্বাভাবিক নীতি-অনুসারে তাঁদের মধ্যে প্রথমেই ঢেউ খেলে গেল পরিহাসের এবং হাসির কোমলতার; কিন্তু তারপরেই, আর যেন কিছুই দেখতে পেলেন না তাঁরা। কেমন যেন ছোট্ট হয়ে গেল তাঁদের নয়নের প্রীতি-বাতায়ন।

২। বিতর্ক-মুখে তাঁরা বললেন,—'সত্যিই তো, এইখানেই তো তিনি ছিলেন,··এই কুঞ্জে, এই আলোর ঘরে। আমরা তো চোখ চেয়েই ছিলুম। আর আমাদের সকলেরি চোখে কি না ধূলো দিয়ে, বলিহারি, বুকের মাণিকখানি চুরি করে পালাল? কেউ নির্ঘাৎ কাকু-বিদ্যা জানে—ভীষণ। দূর থেকে ছেড়েছে মন্তর।···এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে, ঘুরে দেখতে হবে,···এই মোহিনীটি কে;···হৃদয়টিকে কুসুম গন্ধ শোঁকাতে শোঁকাতে উধাও হয়েছেন বন্ধু নিয়ে।'

৩। কুঞ্জ থেকে কুঞ্জান্তরে ঘুরতে লাগলেন সুন্দরীরা, যেমন ঘেরে সেই সব মানুষেরা, যাঁরা ঘুমন্ত অনড় কালভুজঙ্গকেও বিনি-সুতোর-গাঁথা দমনক-ফুলের মালা বলে ভেবে নেয়।

'তাহলে···অন্তর্ধান করে, নিশ্চয় ইনি কোন ভাব-সোহাগিনীর নিভৃত কুঞ্জলীলায় মেতেছেন।'—চড়াৎ করে এই খেয়ালের বিদ্যুৎটাই তাঁদের মাথায় খেলে গেল। তারপরে সকলেরি মুখে ফুটে উঠল একটিই কথা,—

'আমিই খুঁজে আনবো,···আমিই আনবো।' কে আগে কে পরে ভুল হয়ে গেল সব। আমি আগে আমি আগে করে, সকলেই ছুটলেন কুঞ্জ থেকে কুঞ্জান্তরে। কোন কুঞ্জই বাদ পড়ল না। কুঞ্জে কুঞ্জে ধ্বনিত হতে লাগল নিষ্পাপ সুন্দর তাঁদের বাণী,—

···'কোথায় তুমি কোথায় তুমি?'

···'তুমি আপন জনের বিপদ-বারণ, তুমি কোথায়?'

···'এ কঠিন ভুঁই কোমল হল কমল 'পায়ের পরশ রসে, ওগো, তুমি কোথায়?'

···'লোকের হাসি আমাদের হাসুক এই কি তুমি চাও?'

···'তাই কি তুমি অন্তরালে সরিয়ে রেখেছ নিজেকে? সাড়া দাও, ওগো সাড়া দাও।'

···'আমরা জানি কোন কুঞ্জের কোন গভীরে তুমি বসে আছ পণ্ডিতদের বুদ্ধি টলাও টলিও; মিছে ঘুরিও না আমাদের।'

···'সাড়া দাও। কোথায় তুমি কোথায় তুমি, সাড়া দাও।'

কিন্তু কুঞ্জের কুহরে কুহরে খুঁজেও যখন পাওয়া গেল না কৃষ্ণকে তখন ধীরে ধীরে সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে উঠতে লাগল ব্রজ বধূদের মনে আকাশে। এ কি তা হলে পরিহাস নয়? সত্যিই অন্তর্ধান?

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রোমে রোমে ফুটে উঠল কেমন যে একটা নিরপেক্ষ ভাব। আপনা হতেই ম্লান হয়ে এল তাঁদের প[illegible] মুখের অরুণিমা। যেন অভাব ঘটল রসের। যাঁদের কুঞ্জে কু[illegible] খোঁজা শেষ হয়নি, তাঁদেরও ভেঙে পড়ল উদ্যম, উৎসাহ।

৪। 'সম্ভাবনাও নেই আশ্বাসও নেই',—এই চিন্তাই কেব[illegible] ঘুর্ ঘুর্ করতে লাগল তাঁদের মস্তিষ্কের কোটরে কোটরে। [illegible] যেন একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে গেল ব্রজসুন্দরীদের সত্তায়।

তাঁদের মনে হল, তাঁদের পৃথিবীটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে জগতের সকলেই যেন কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছে, কেবল তাঁরাই দেখ[illegible] পাচ্ছেন না; সবাই যেন তাঁকে স্পর্শ করছে, কেবল তাঁরাই ছুঁ[illegible] পারছেন না; কৃষ্ণ কথা কইছেন জেনেও, যেন কানে শুন[illegible] পাচ্ছেন না তাঁর কথা; বাইরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, হৃদয়ে [illegible] অনুভব করেও, যেন বাইরে তাঁকে পাচ্ছেন না দেখতে।

তাঁদের মনে হল;—

দু'টি কানের কুবলয়ের মত তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বাইরে চ[illegible] গেছেন। বক্ষের নীলমণির মত তিনি বুক ছেড়ে আলাদা হ[illegible] সরে গেছেন।

নয়নের কাজলের মত তিনি নয়নের সীমানা পেরিয়ে চলে গেছে দূরে।

তারপরেই উন্মাদিনী-পারা হয়ে গেলেন ব্রজভামিনীরা। যি[illegible] এক, দিশি দিশি তাঁকে দেখতে লাগলেন··স্ফুরন্ত। যিনি দি[illegible] বিদিকে বিরাজমান তাঁকে বারম্বার দেখতে লাগলেন··হৃদ[illegible] প্রবিশন্ত। বলে উঠলেন,—

"ঐ দেখ ভাই, কি লজ্জা গো কি লজ্জা, উনি আমাদের ছুঁচ্ছে[illegible] বুকে জড়াচ্ছেন, মিষ্টি দিচ্ছেন; কিন্তু পোড়া কপাল, আমাদের পর[illegible] গুলোও কি পৌঁছুতে জানে না ওঁর অঙ্গে, আমাদের আলিঙ্গনগুলো কি ওঁর অযোগ্য? এত দেরী হয়েও যায় ফিরিয়ে দিতে মিটি আশ্চর্য্য।"

বলতে বলতে ব্রজভামিনীরা অবশ হয়ে গেলেন মোহে। কু[illegible] ভবনের দেয়ালে দেয়ালে ভিত্তি পুত্তলিকার মত স্তম্ভিত—মাধু[illegible] তাঁরা যেন গ্রথিত হয়ে গেলেন; নিরালম্ব হয়ে আকাশে [illegible] অঙ্কিত হয়ে গেলেন ছবির মত। কে যেন কুঠার দিয়ে মূলোচ্ছে[illegible] করছে জীবনের; জ্বলন্ত অঙ্গারের আলিঙ্গন দিচ্ছে হৃদয়ে; কাল[illegible] ঢেলে দিচ্ছে শরীরে; করাত দিয়ে চিরছে বক্ষঃস্থল।···এমনি [illegible] তাঁদের অনুভূতির দশা। তার উপর··কাটা ঘায়ে নেবুর র[illegible] মত, শুকনো কাঠে আগুনের মত, মর্ম্মস্থলে ছুরির মত, বক্ষে স[illegible] দংশনের মত, শরীরে মহাজ্বরের মত, জঠরে মহাশূলের মত, দু'নয়[illegible] অন্ধতার মত, দু'কানে বধিরতার মত, চর্ম্মে অসাড়তার মত, সন্নি[illegible] মহোন্মাদের মত,···তাঁদের সমস্ত মনে ঘনিয়ে এল দুঃখের এক[illegible] করুণ পরিণামের দারুণতা। পরাস্ত করে দিল মহাভাবময়ী ব্র[illegible] সুন্দরীদের।
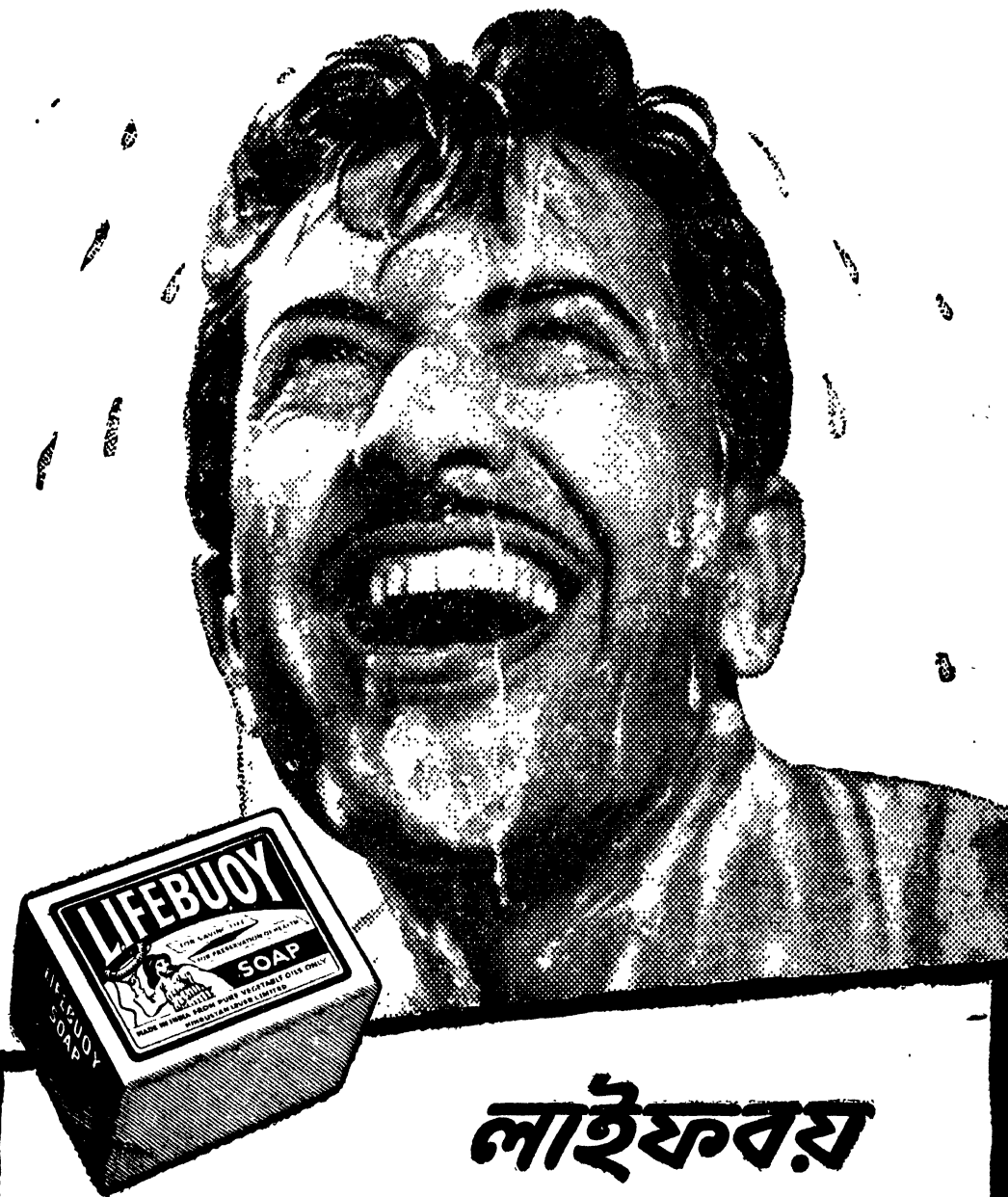
৫। অদ্ভুত এই অন্তর্ধান; অশরণ হয়ে গেল ত্রিভুবন। নিরালোক হয়ে গেল সর্ব্বলোক।

যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল গিরি-দ্রোণী, কেঁদে উঠল গাছপালা, শুকিয়ে গেল লতা, মলিন হল জ্যোৎস্না, মূর্চ্ছা গেল পাখী। যেন মনের আগুনে পুড়ে যেতে লাগল বনের হরিণীরা।

৬। যোগীদের যোগবলে চিত্রপুত্তলিকারা যেমন টক্‌টক্‌ করে কথা বলে, মন্ত্রের জোরে যেমন নাচানো-ঘোরানো কথা কয় সাপে-ছোবলানো মানুষ, মহাভাবময়ীদের মধ্যেও তেমনি চলতে লাগল আলাপ।

…"আশ্চর্য্য না আশ্চর্য্য! নীলপদ্ম ভেবে নিশ্চয় কেউ কবরীতে ওঁকে পরেছে।

…যা বলেছিস সই, বিলাসিনীদেরই এটি হাত-সাফাই।

…না, না গো না, ক্রুর নিষ্ঠুর কলাবতীদেরি এটি কীর্ত্তি। না হয়েই যায় না। হৃদয়টিকে নিয়ে সটকেছেন। এত দুঃখও দিতে জানেন পরকে।

…এতগুলো চোখ, হরিণদের মত ড্যাব্‌ ড্যাব্‌ করছে, তার মধ্যে থেকে অকস্মাৎ কোথায় কেমন করে যে নিয়ে পালাল আমাদের জীবন-মণি?

আশ্চর্য্য না আশ্চর্য্য!"

৭। পরস্পর পরস্পরকে বিপুল সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন তাঁরা। তর্কের পিঠে তর্ক পড়ল, হার মানল বুদ্ধি, কিছুরই কিন্তু মীমাংসা হল না। অবশেষে তাঁদের মুখে কেবল ঐ এক কথা,—"ঘর থেকে তিনি এসেছিলেন। এখানেই এসেছিলেন। আমরা তাঁকে দেখেছি। কত কথা কানে শুনেছি। করুণ কথার রচনা দেখেছি। প্রসন্ন হয়েছেন, ভালবেসেছেন, খেলেছেন। আর আমরাও ঘুমোই নি। তবে কি এ সবই স্বপ্নের খেলা? না, পরম মোহের মহিমা?"

৮। ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন তাঁরা। তারপরেই আবার কলকণ্ঠ উদ্‌ঘাটিত করে বলে উঠলেন,—"নাঃ, তারাই নিয়ে গেছে। কই, আমরা তো নিই নি। উনিই বা গেলেন কেন? কোথায়ই বা গেলেন?…এখন এ জিজ্ঞাসাও মিছে।

তিনি তো আমাদের মন-ইত্যাদি সমস্তই সঙ্গে নিয়ে চলে গেছেন; তবে এ কেমন ধারা অন্তর্ধান? আমাদের মনগুলোকে কোন্‌ পাপীর আবার অন্য রকম করে গড়লো?"

৯। নানান বিকল্প কল্পনার পর, যখন সুনিশ্চিত হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব এবং সুনিশ্চিত হয়ে উঠল ব্রজসুন্দরীদের মরণ, তখন মৃত্যু-নিবারণের উদ্দেশ্যেই হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে মহাভাবময়ীদের অন্তরগুলিকে ব্যবহিত করে দিলেন…শ্রীকৃষ্ণোন্মাদ।

১০। সমুদ্রের মত সেই কৃষ্ণোন্মত্ততার তরঙ্গাঘাতে কোথায় যেন নিমিষে তলিয়ে গেল তাঁদের অন্তঃকরণের বিরহপীড়াময়ী বৃত্তিগুলি। সেই সমুদ্র অবাধে প্রবেশ করল তাঁদের হৃদয়ে। এই প্রবেশের কারণ হল তাঁদেরি হৃদয়ের কৃষ্ণাকারত্ব। সৃষ্টি হয়ে গেল বুদ্ধির অগম্য এক মনোহর নবীন অবস্থার। নগণ্য তার কাছে অন্য সমস্ত ব্যাপার। সেই অবস্থাটিতে ফুটে উঠল পরম প্রিয় কৃষ্ণের সম্পূর্ণ-সার্থক অনুকরণ। সুন্দরীরা চলতে লাগলেন চলতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণের ঢঙে। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে প্রেমের হাসি হাসতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণের ছন্দে। কৃষ্ণের অনুকরণে কটাক্ষের পদ্মপাতা নাচিয়ে সে কি অপূর্ব্ব তাঁদের ভ্রমর তাড়ানোর ভঙ্গী। সমস্তটাই যেন একটা উৎসব। কৃষ্ণের মধু মধু আলাপ ঝরে পড়তে লাগল তাঁদের কণ্ঠস্বরে। কৃষ্ণেরি হাব-ভাব, ভঙ্গী, বিভঙ্গী, নানান রকমের বিলাস, রূপ ধরতে লাগল তাঁদের মধুরিমায়, গরিমায়, গভীরতায় এবং নির্ভীকতায়। এই অবস্থাটিই পথরোধ করে দাঁড়াল ব্রজরমণীদের প্রাণের বহির্গমনের।

১১। প্রাণ যখন বেরুল না, তখন তাঁরা অনুসন্ধান করতে লাগলেন প্রাণের ঈশ্বরকে। অস্ত গেল তাঁদের সমস্ত সন্তোষ। ঝড়ের বাতাসে পদ্মিনীদের মত এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে ছিটকে পড়তে লাগলেন উন্মাদিনীরা। বন থেকে বনান্তরে তাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল বিরহবেদনা, যেন তাঁদের কাটতে লাগল টুকরো টুকরো করে। কৃষ্ণনাম গান করতে করতে তাঁদের লোপ পেয়ে গেল পথ-জ্ঞান, এমন কি অপথ-জ্ঞান। এতই হারিয়ে ফেললেন তাঁরা নিজেদের, যে তাঁদের জ্ঞান-গম্যও হল না, কখন ভগবতী যোগমায়া অলক্ষিতে তাঁদের পিছু নিয়েছেন, তাঁদেরি ছায়ার মত তাঁদেরি করছেন অনুসরণ, হরণ করছেন তাঁদেরি কঙ্করময় কণ্টকময় সমস্ত আঘাতের তীব্রতা।

১২। তাঁরা ছুটতে ছুটতে চলে এলেন বৃক্ষের কাছে, লতার কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন,—

"ওগো অশ্বত্থ, কপিত্থ, কিংশুক, প্লক্ষ, বট… অক্ষয় কল্যাণ হোক্‌ আপনাদের। আপনারা কি গোপেন্দ্রকুমারকে এখানে বিচরণ করতে দেখেছেন? যদি দেখে থাকেন তো দয়া করে বলে দিন।… ও কি আপনারা সব চুপ করে রয়েছেন? বঞ্চনা করবেন না আমাদের। নিশ্চয় আপনারা জানেন কোথায় তিনি। আগো, কোথায় তিনি? তবে কি আপনারা আনন্দের প্রচণ্ড আবেগে জড় হয়ে গেছেন?…স্তব্ধ?"

১৩। এই কথা বলতেই কৃষ্ণানুধ্যানের একতানতায় নত হয়ে গেল তাঁদের মনোবৃত্তি।

"না না, বাইরে এদের প্রকাশ নেই, তাই বোধ হয় গ্রহণ করলেন না আমাদের আবেদন। তাহলে অন্য কোথাও যাই, অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করি…" বলতে বলতে, কিছু দূরে এগিয়ে গিয়েই তাঁরা বলে উঠলেন,—

"ওগো শাল রসাল, ওগো চাম্পেয় পুন্নাগ চম্পক দেবদারু…ওগো পবিত্র-সুন্দর এই পথ দিয়ে শ্যামকে যেতে কি আপনারা দেখেছেন? হায় রে! সে চোর, সে যে আমাদের চিত্ত চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। না না না না…অমন পাতা কাঁপিয়ে মিথ্যে কথা আমাদের বলবেন না। তাই যদি না হবে, তাহলে অমন খাড়া হয়ে উঠছে কেন আপনাদের গায়ের লোম?।"

১৪। যখন কোন উত্তর এল না তখন তাঁরা বলে উঠলেন,—

"ও মা এঁদেরও ঐ একই ব্যাপার? ওঁরা থাম, এঁরা কাঠ। জবাব দেবেন কেমন করে? না না, অন্য কোথাও জিজ্ঞেস করি।"

একটু এগিয়ে যেতেই তাঁদের সামনে পড়ল…তমাল। তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন,—

"বলি ওহে তমাল, কৃষ্ণ তো তোমার বর্ণ-সুহৃৎ। নিশ্চয়ই তুমি তাঁকে দেখেছ। না হয়েই যায় না। তোমায় যে আলিঙ্গন দিয়ে

গেছেন তার পূর্ণ পরিচয় পাচ্ছি তোমার বকুলে। শ্রীঅঙ্গের গন্ধ পেয়ে তাই তো ওখানে লগ্ন হয়ে রয়েছে নীল ভোমরার ঝাঁক।"

১৫-১৬। কিন্তু তমাল নিরুত্তর। অতএব কৃষ্ণোন্মাদিনীরা মুখ ফেরালেন অন্য দিকে, বললেন,—

"কৃষ্ণের আলিঙ্গন ওর সমস্ত জ্ঞান চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। আমরা যা বলছি তা বোঝবার ক্ষমতাও নেই ওর। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ কি? অন্য কোথাও যাই।"

এগিয়েই এবার তার সামনে দেখা পেলেন···তুলসীর। বললেন,—

"কল্যাণি! আমরা জানি নয়নের কমলকে কাঁদিয়ে কৃষ্ণ একদিন তোমার হাতেই রেখেছিলেন তাঁর হাত। প্রণয়ীর নীতিরস আমরা জানি বলেই তোমায় বলছি, ওগো তুলসী! তুমি ধন্যা, তোমার তুলনা নেই কো ভুবনে। আমাদের দয়া করে বলে দাও, কোথায় গেলে পাব তোমার কান্তকে?

তবে হাঁ, তোমার সতীনপনা বলতে পারে,—'নিজের প্রিয়তমের কথা কি কেউ ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়ায় নাকি?'

তা ভাই সত্যি। সে বিষয়ে তো তোমার কোন হাতই নেই। কেন না,—কণ্ঠ থেকে চরণের সীমা পর্য্যন্ত তুমি তো তোমার মাল্যময় শরীর নিয়ে ঝুলেই থাকো। ভূষণ হয়েই যে থাকো সে কথা ঠিক, কিন্তু বনমালীর বক্ষঃস্থল যে ভালবেসে অন্য মালা একেবারে পরেন না, এমন কথা কি সব সময়ে বলা চলে?

তাই তোমার ঈর্ষাহীন সহজ করুণার উপর নির্ভর করে আমরা জিজ্ঞাসা করছি···'আমাদের মত কতকগুলো প্রাণীর মন প্রাণ বুদ্ধি ইত্যাদি যা কিছু গর্ব্বের ছিল, সব কিছু চুরি করতে করতে এই পথ দিয়ে কোথায় গেলেন তোমার প্রিয়তম?···জানানো উচিত আমাদের। নিজের প্রাণ দিয়েও তো সুহৃদ্দের প্রাণ রক্ষা করে সুহৃৎ।"

১৭। তুলসীর কাছ থেকেও যখন উত্তর এল না তখন সুন্দরীরা বলে উঠলেন,—"ও মা, এঁনারও মন দেখছি লেপ্টে গেছে কৃষ্ণে। পরশও পেলেন, আবার বিরহে মনও হারালেন। আশ্চর্য্য। এঁকে প্রশ্ন করে আর লাভ কি? যাঁরা নিজেরাই উত্তপ্ত তাঁরা আবার পরকে শীতল করবেন কি করে?···চল যাই, অন্য কোথাও যাই।"

অন্য দিকে পা বাড়াতেই হঠাৎ মালতীলতার সঙ্গে তাঁদের দেখা। দেখাও যেই প্রশ্নও সেই,—"ওলো সই মালতি, আমাদের বনমালীকে কি দেখেছিস?··তাই বলো চোখ দিয়ে তোর বুক জুড়িয়েছিলেন নিশ্চয়; তাই ফুলের হাসির অত বাহার অত গরব!"

প্রতিবেশিনী মল্লিকা, জাতি, যূথীকে দেখেই আবার তাঁরা প্রশ্ন করলেন,—"বলি ও সখী মল্লিকে, গোপন কোরো না ভাই। গোপরাজের তনয়টিকে নির্ঘাৎ তোমরা দেখেছ।···ও তো নীল ভোমরার দল নয়, কি ছল গো কি ছল, ও মা তাঁর গায়ের লাবণ্যটিকে সাক্ষাৎ চুরি করে নিয়ে বসে আছ?"

তুমি তো জাত-সরলা জাতি ফুল, ঠকিও না সই আমাদের। আমরা জানি, সে চঞ্চল এখানে এসেছিলেন। নখের আঁচড় দিয়ে ঐ তো রাঙা করে দিয়ে গেছেন তোমার কুঁড়িগুলিকে। যুঁইও হয়ে গেল কিনা ভোমরা? আশ্চর্য্য। ওরা কাঁদছে কেন? কাঁদিস্‌নে যুঁই কাঁদিসনে। তাঁকে দেখতে দেখতে মন হারালি, আর আমাদের যে সে চাউনি দিয়েই লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে গেল মন।"

১৮। এত অনুনয়, এত নিবেদন, সমস্তই কিন্তু ব্যর্থ হল। এক অক্ষরও উত্তর এল না। তখন ভাবতে বসলেন কৃষ্ণোন্মাদিনীরা,—

"ও হরি, তাই তো, ওরা যে স্থাবর হয়ে গেছে; কি করতে হবে কিছুই জানে না; পূর্ণ অনভিজ্ঞ; ওরা আবার উত্তর দেবে কি?"

ভাবতে ভাবতে তাঁরা এবার পৌঁছে গেলেন অন্য মহীরুহদের কাছে। বললেন,—"ওগো, কুরুবক, ওগো রক্তাশোক, ক্ষয় করে দাও আমাদের শোক। বলে দাও ওগো বলে দাও, কোন্ পথে গেছেন কৃষ্ণ। তাঁকে এখানে দেখা যায় নি, আমরা শুনতে রাজি নই অমন কথা। তাঁর খর নখরে ছিন্ন হয়েছে তোমাদের পল্লব, ঐ তো দেখছি তার পরিচয়।"

১৯। তারপরে তাঁরা অন্য দিকে নয়ন তুলে বললেন,—"হে কোবিদার, কৃষ্ণ-দর্শন বিষয়ে আপনি তো কোবিদ, আমাদের বলে দিন কোথায় তিনি? তাঁকে আপনি দেখেছেন, তাই তো আপনার হৃদয় থেকে ঐ অনুরাগ ছুটে বেরিয়ে এসে রাঙা কুসুম হয়ে ফুটে উঠে ধন্য হয়েছে।"

২০। আবার ঘুরে এগিয়ে গিয়ে তাঁরা বললেন,—"হে পনস, কোন প্রয়োজন নেই সম্ভ্রমের। সে চোর, আমাদের আত্মা-চোর, কোথায় গেল সে শ্রীহরি,—বলে দিন, আমাদের বলে দিন।

অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
শত্রুর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম।

নিঃসন্দেহে আপনি তাঁকে দেখেছেন, শিউরে উঠেছেন আনন্দে। ওলো সই তোরা দেখ্, এখনও ফলগুলো কণ্টকিত হয়ে রয়েছে পুলকে।"

"হে নয়নাভিরাম মহাসুন্দর রাজজম্বু, নির্ঘাৎ আপনি তাঁকে দেখেছেন। শ্যাম নিশ্চয় এখানে এসেছিলেন। তাঁর অঙ্গের আভা লেগেই তো অমন ঘনশ্যাম হয়ে গেছে আপনার ফলগুলি। ও রঙের বাহারে মলিন হয়ে গেছে অলির দল। বলে দিন, কোথায় গেছেন ঘনশ্যাম?"

২১। কিন্তু সবাই নিরুত্তর।

আরো কিছু দূর এগিয়ে গেলেন কৃষ্ণোন্মাদিনীরা। দেখলেন··· বিলাসভরে দুলছে একটি বিল্বশাখা, কণ্টকিত তার শ্লাঘ্য বপু। হেসে উঠলেন, বললেন, "কি কপালই না করেছিস সই। ধন্যি তুই ধন্যি। প্রেয়সীর পয়োধর ভেবে তোর শ্রীফল দু'টিকেই পরশ করে গেছে তাঁর পদ্মহাত···নির্ভয়ে। ওলো তাই তো কাঁটা দিয়ে উঠেছে গা।" "আর আমাদের বকুল ফুলকেই বা কি বলি সই? উনি যেন নিরাকুল হয়ে রয়েছেন···কৃষ্ণবদন নিরখিয়ে। বলি, বকুল তলায় কুসুম কুড়িয়ে মালা গেঁথে কি পালিয়ে গেছেন তাঁরা গোপেন্দ্রনন্দন?"

২২। বিধশাখা বকুলশাখা,···কেউ যখন সাড়া দিল না, তখন তাঁরা উপস্থিত হয়ে গেলেন আম্রশাখার নিকটে। বললেন,—"নব মুকুলের ডগা ভেঙে দিয়েও সে কি পালালো অমন রঙ্গ করে? এতো ভাই পরিচিত নখরের চিহ্ন দেখছি। ও হরি, ইনি কি কাঁদছেন না হাসছেন? একি মধু-পাত না অশ্রু-নিপাত? ওঁর পক্ষে উত্তর দেওয়াও সম্ভব নয়।"

২৩-২৪। এর পরে সুন্দরীরা পৌঁছে গেলেন নীপবনে। অনেক পাতা···ঝরে পড়ে আছে, কিন্তু লুটিয়ে রয়েছে কদমফুলের কুঁড়ি···মাত্র কয়েকটি। কদমতলায় ভ্রমর নেই। আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন মহাভাবময়ীরা। সবিনয়ে বললেন,—

"অয়ি নীপ, বনপথ দিয়ে চলতে চলতে আপনার অনুকূল মূলটিকেই আশা করি অবলম্বন করেছিলেন শ্রীহরি। অনুমান করছি, কন্দুকের জন্যে কদমফুল পাড়তে পাড়তে তিনি উপরে উঠে গিয়েছিলেন শাখা বেয়ে; আর তাঁর অঙ্গসৌরভে লুব্ধ হয়ে আপনাকে ছেড়ে তাঁরই চরণ শরণ করেছে ভ্রমরেরা।

সত্যি-মিথ্যে আপনিই জানেন। কিন্তু আপনি যখন নড়তেই পারবেন না, দয়া করে তখন আমাদের বলে দিন, কোন্ পথে কোথায় গেলে আপনার গন্ধ-বন্ধুটিকে আমরা পেতে পারি।"

নিরুত্তর নীপবন।

২৫। যমুনার তীর ধরে মহাভাবময়ীরা এ'বার চলতে লাগলেন। কিছুদূর এগিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন তাঁরা। ও মা ওকি, তট-নিবাসী বৃক্ষেরা কি তপস্যা করছেন কৃষ্ণের? পরের দুঃখে পড়ছেন? বলে উঠলেন,—"বলে দাও, বলে দাও, কোথায় গেল শ্রীহরি।"

২৬। আবার এগিয়ে গেলেন আরো কিছুদূর। সেখানে ফল ভারে নুয়ে পড়েছিল অনেক বিপিন-লতার দেহ। তাদের রূপ দেখে গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন উন্মাদিনীরা। বললেন,—

"এমন কপাল পেলি কোত্থেকে? নব-যৌবনের সমস্ত সার ঢেলে দিয়ে যেন একেবারে খুশী করে দিয়েছেন কৃষ্ণকে!···এঁরা কি আর মুখ খুলবেন?"

২৭-২৮। আবার এগিয়ে গেলেন। আবার বললেন,—

"কী নয়নই না কেঁদেছিস সই, ওলো কৃষ্ণসারের বউ? জোড়া নয়ন থেকে ঠিকরে পড়ছে যশের কিরণ। শত পুণ্যি করলে তবে যাঁর কেবল এইটুকু ঘোরানো যায় মনের মুখ, শ্রীহরির সেই সম্মোহন মনটিকে তুই কি না হরণ করেছিস, যুগল চোখের মায়া হেনে? বলিহারি যাই তোর চোখের কীর্ত্তির। তবে এও বলছি, ঐ মদনমোহন রূপের মাধুরী দিয়ে তুই চোখই ভরিয়েছিস, মন ভরাতে পারিস নি। এতেই ধৈর্য্যহারা, তাঁর ভাবনার থপ্‌পরে পড়লে শেষে কি হতিস,···শেষই জানে।

তাই জিজ্ঞেস করছি, আমাদের মাথার দিব্যি দিয়ে বল কোন্ পথে সে গেছে। গায়ে হাত বুলিয়ে খুশী ক'রে গেছেন গাছেদের। উঃ, কী দারুণ তাঁর রীতি! আমাদের মত প্রাণীদের চুরি করে নিয়েছেন মনের নীতি, আর অরুণ কটাক্ষের করুণা ছড়িয়ে তোমার নয়নে ভরে দিয়েছেন প্রীতি। এ কেমন করে হল? ওলো বউ, তোর হৃদয়-ভরা মন্ত্র, বল আমাদের বল, মাথার দিব্যি, ঠকাস্ নি।"

২৯। এই বলতে বলতে, দৈবের খেলা, কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনীরা চোখ বড় বড় করে দেখলেন, ও হরি ভয় নেই ডর নেই, কৃষ্ণসার নারীটি টুকটুক করে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে; হ্যাঁ গো, এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বলাবলি করে উঠলেন বিস্ময়ে,—

"দেখো লো সই দেখো, কি দয়ার শরীর এই কৃষ্ণসারিটির এত তরু, এত লতা, এত মৃগ,···এদের সকলের চেয়ে ওর দয়া বেশী। মালতীর বন দিয়ে চলে যাচ্ছে, যেন দেখাতে দেখাতে যাচ্ছে কৃষ্ণপথ, যেন ছাড়াতে ছাড়াতে যাচ্ছে···আগুনের মত আমাদের গনগনে বিষম জ্বর।"

কৃষ্ণসারির পিছু পিছু ছুটলেন উন্মাদিনীরা। আরো কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ হরিণ-বৌ দাঁড়িয়ে পড়ল! সুন্দরীরা ভাবলেন, এখানেই যখন থেমেছে তখন নিশ্চয় এইখানেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছেন তাঁদের কল্যাণময় ভাগ্যবানটি। স্থির করে ফেললেন, হ্যাঁ, এইখানেই খুঁজবেন, তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবেন এই বৃক্ষ-গহন গহন বন।

৩০। চতুর্দ্দিকে ঘুরতে লাগলেন তাঁরা। ঘুরতে ঘুরতে দেখা পেলেন এক কোকিলের। বললেন,—"তোমার কুহুতান নিশ্চয় তাঁকে টেনেছে। ওগো কোকিল, তাই বোধ হয় তোমার উপর এত সদয় তাঁর দৃষ্টিপাত। আহা, কী অদ্ভুত তোমার মন ভোলানো স্বর! ঐ স্বরে আমরাও যে তাঁর মোহন স্বরের রণন শুনতে পাচ্ছি।

ওগো কোকিল, তুমিও শ্যাম,
তুমিও বনের প্রিয়,
রাঙা তোমার দু'টি নয়ন
বচন কমনীয়।
তোমার ব্যবসা···দুঃখ-দেওয়া
বিরহিণীদের একান্তই
অলস লালসা রসেতে তোমার
রসালে যেমন চূড়ান্তই।
ওগো কোকিল, সমান জাতি,
তুমিও তাঁর প্রিয়।
কালার সাথে নিবিড় তোমার
মৈত্রী লোভনীয়।

ও মা, তাই বুঝি তুমি জেনেও তাঁর কথা আমাদের বলবে না?"

৩১। অতএব কোকিলকে ছেড়ে এবার আর একদিকে আর একটুকু এগোতেই, সুন্দরীরা দেখতে পেলেন একটি মরালীকে। তার সেই নধর নধর নরম নরম হেলন দোলন চলনটি হর্ষ-হাস্য এনে দিল তাঁদের অধরে। তাঁরা বললেন,—

"এস হংসী এস। তোমাকে বুঝি সূর্য্যপুত্রী কালিন্দী দেবী পাঠিয়ে দিয়েছেন? উঃ, কি ভালবাসাটাই না বাসেন তিনি আমাদের। নিশ্চয়ই সেই আমাদের তিনিটি তাঁর তটের কাছে এখন ঘুরঘুর ঘুরঘুর করছেন। তাই বুঝি তোমাকে হুকুম দিয়েছেন, ঝটপট আমাদের ডেকে নিয়ে যেতে? তাই না?

তা ভাই হংসী, দিশাহারাদের দিক দেখিয়ে নিয়ে চল। বনমালীর কৃপার ভিখারিণী আমরা, পথ দেখাও।"

৩২। ফিরে চলল মরালী। তাঁরাও চললেন পিছু পিছু। বাঁ দিকে এগিয়েই দেখতে পেলেন চক্রবাকীকে। দেখেই বলে উঠলেন,—

"মাননীয়া চক্রবাকী, প্রিয়তমকে হারানো বড় কষ্টের। কিন্তু

প্রিয়তমকে প্রতিদিন দেখে দেখে মন থেকে আপনি তো দূর করে ফেলেছেন বিরহের দুঃখ। তাই কি আপনি ছুটে এসেছেন আমাদের তাঁকে দেখিয়ে দিতে? অকারণ বন্ধুত্বের এই তো পথ।"

৩৩। বলতে বলতে, চক্রবাকীর দিকে চলতে চলতে, মহাভাব-ময়ীরা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন ক্ষণকাল। এ কোন সৌরভ ছড়িয়ে রয়েছে বাতাসে? বলে উঠলেন সবিস্ময়ে,—

"এখন বুঝতে পারছি, চক্রবাক-বধূ কেন এসেছেন এখানে। বোধ হয়, কাছেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছেন আমাদের পরাণচোর। সত্যিই তো, চন্দনী বাতাস বইছে এখানে। তাঁর কণ্ঠের বিনোদ-বিনোদ বনমালা···আহা সুরভি-ঢালা শ্রীঅঙ্গের,···তারি কাছ থেকে নিশ্চয়ই এ বাতাস অভ্যেস করে শিখে নিয়েছে রহস্য-শাস্ত্র সৌরভের। গন্ধে উন্মাদ করেছে ভ্রমরদের। বাতাস বইছে কেমন একবার দেখ না। অত সন্দেহে কাজ কি? তা সই, ভ্রমরদেরই এস জিজ্ঞাসা করি।"

৩৪। জিজ্ঞাসা করলেন,—"কুঞ্জে কুঞ্জে এত ফুটে রয়েছে গন্ধফুল, সব ছেড়ে দিয়ে, বলি ও ভোমরার দল, বাতাসে ভর করে অত উড়ছো কেন আকাশে? কারণটা কি জানতে পারি?"

উত্তর পেলেন না। গুনগুন গুনগুন, গুনগুন, গুনগুন···স্বগতই যেন উত্তর দিয়ে গেল ভোমরারা।

৩৫। কৃষ্ণ যে নিকটেই আছেন স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল কৃষ্ণোন্মাদিনীদের। একটু এগোলেন। আঙুলে এসে লাগল নতুন যবের নরম শীষ। কী সুখ-স্পর্শ! আ ম'রি মরি, মহনীয়া মহীদেবীও তা হলে রোমাঞ্চিতা হয়ে উঠেছেন। সিদ্ধান্তটির প্রতিষ্ঠা করতে করতে, মহীদেবীকেই তাঁরা বললেন,—"কৃষ্ণের পাদপদ্মের সংস্পর্শ করে যদি আপনার পুলকিত হয়ে থাকে অঙ্গ, তার চেয়ে মহত্তর কোনো মহিলা কি আশা করতে পারেন আপনি? আপনার সারা অঙ্গে এই যে দেখছি পুলকের সঞ্চার, বলুন দেখি, এ স্থলে তার হেতুটি কে?···বামনের অঙ্ঘ্রি-প্রসঙ্গ, না বরাহের আলিঙ্গন-রঙ্গ?

কৃষ্ণের পাদপদ্মের প্রতি পদক্ষেপটিতে, হে ধরণি, আপনি চুম্বন দান করেন অজস্র; তার জন্য ধন্যি ধন্যি করে স্থাবর, ধন্যি ধন্যি করে জঙ্গম।

···ও মা, তাই বুঝি আমাদের কৃষ্ণটির মন্থর হয়ে গেছে গতি?"

৩৬। এর পরে আর একটু এগোতেই তাঁদের সামনে পড়ল একদল পাখী। চকোরের মত তাদের চেহারা। দেখেই সহর্ষে চিৎকার করে উঠলেন,—"হতেই হবে। এই পথ দিয়েই গেছেন তিনি নির্ঘাৎ। আলো, তিনি যে আমাদের মনের মাণিক চোর। তাঁর যুগল চরণের নখ চন্দ্রমার অমৃত প্রবাহ,···ঐ তো রে দল বেঁধে পান করছে পুরুষ চকোর। এই থেকেই তো আমাদের বোঝা উচিত,···প্রিয়তম এইখানেই আছেন, নিকটেই আছেন কোথাও।"

৩৭। প্রশ্ন, সংশয়, নিশ্চয় ইত্যাদির রসদ যোগাতে যোগাতে যখন ফুরিয়ে এল তার মধ্যম অবস্থা, তখন ক্রমে পরিপক্ক অবস্থায় উপনীত হবার উপক্রম করতে লাগল উন্মত্ততা। তাঁদের চিত্তে প্রবল হয়ে উঠল সদ্ভাবের ভাব, কোথায় ভেসে গেল অহঙ্কার, পরের ব্যথায় ব্যথিয়ে উঠল চিত্ত, আর সেই জ্ঞানসিদ্ধ চিত্তে অবিশ্রান্ত স্ফুরিত হতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের কান্ত আবির্ভাব। সে যেন এক বৈভব। সমস্ত চৈতন্যের উপর দিয়ে, রঙ্গে দু'বাহু

তুলে নৃত্য-ছন্দে ছুটে চলে গেল—'কৃষ্ণোঽহং কৃষ্ণোঽহং'—আমি-কৃষ্ণ আমি-কৃষ্ণের অপরিমেয় তাদাত্ম্য-তরঙ্গ। সীমাহীন সেই সুখের আবেশে তাঁদের চোখে ও কানে ভেসে উঠল শ্রীভগবানের সেই লীলাগুলি, যা অদ্ভুত-ভয়ঙ্কর, যা অদ্ভুত-চমৎকার। উদ্ভট বিলাসে উন্মাদিনীরা তখনি আরম্ভ করে দিলেন সেই লীলাগুলির উদ্দাম অনুকরণ।

৩৮। দু' রকমের প্রকাশ ঘটতে পারে এই কৃষ্ণলীলা-তাদাত্ম্যের। এক,—যেখানে সমস্ত উপকরণগুলি সজাতি-জাতীয় হয়; এবং দুই,—যেখানে উপকরণগুলির সজাতীয় ও বিজাতীয় দু' রকমেরি বৈশিষ্ট্য থাকে।

৩৯। সজাতীয় উপকরণ—মনের অনুকূল হয়, নিয়ে আসে সান্দ্র আস্বাদ; কূলনাশিনী নদীর মত দ্রুত ভিজিয়ে গলিয়ে দিয়ে যায় মনের কূল। বিজাতীয় উপকরণ কিন্তু নিয়ে আসে বিরসতা এবং বাধা ঘটায় তাদাত্ম্যভেদে; কারণ তাতে অভাব ঘটে আবেশের, মানসিক অভিনিবেশের।

৪০। কৃষ্ণোন্মাদিনী এই মহাভাবময়ীদের অনুকূল সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রথম থেকেই গুঢ়ভাব অবলম্বন করে তাঁদেরি সঙ্গে বিরাজ করছিলেন ভগবতী যোগমায়া। লীলা-কৈবল্যের দুর্ব্বলতাটুকু বুঝে নিতে তাঁর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হল না। তিনি বুঝতে পারলেন, বিরোধ-মূলেই তাঁকে সাহায্য করতে হবে এদের। অতএব তিনি স্বীকার করে নিলেন বিজাতীয় উপকরণ। 'আমিই তাহলে পুতনাদির আকার ধারণ করবো'···এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কৃত্রিম আকৃতি গ্রহণ করলেন পুতনার।

পুতনাকে দেখেই নিজেকে বালকৃষ্ণ বলে স্থির করে ফেললেন একটি গোপবালা। আবেগের প্রচণ্ড বেগে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর কোলে। পান করলেন স্তনক্ষীর। সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে গেলেন তাঁর।

৪১। কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে গোপবালার এই যে প্রবৃত্ত, অত্যন্ত লঘু হলেও এর মধ্যে ছিল না কোনও কিছু আরোপের অস্বাভাবিকতা। আমার মনে হয় গোপীদের তথা-তথা লীলার লীলাময় হয়েই তিনি প্রবেশ করেছিলেন তাদের অন্তরে; তাদাত্ম্যের খেলা এ নয়।

৪২। তারপরে ভগবতী যোগমায়া যেই ধারণ করলেন কৃত্রিম শকটাকৃতি, অমনি আশ্চর্য্য আর একটি গোপিকা মুক্তার মত দন্ত বিকশিত করে কাঁদতে বসে গেলেন তখনি; যেন তিনি নিজেই শিশুকৃষ্ণ; যেন ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে তাঁর। এবং তারপরেই নিজের অনিন্দ্য চরণতলে নবপল্লবের নাট্য ফলিয়ে তিনি দুমদাম করে ভেঙ্গে ফেলে দিলেন শকটাকারা দেবী যোগমায়াকে।

এইভাবে কৃষ্ণ সমালীন হয়ে গেলেন সুনয়নাদের সম্বিদে, এবং তাঁদের সম্বিদও আবিষ্ট হয়ে গেল কৃষ্ণে। অন্তরে কৃষ্ণ, তাই নিজেদের স্ত্রীলক্ষণ বহিরাকার-বিষয়ে বিনষ্ট হয়ে গেল তাঁদের সক্রিয় বুদ্ধি। 'আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ'···এই নিরাকুল স্মৃতির প্রীতিতে দীপ্তিময়ী হয়ে উঠলেন সকলে। যেন তাঁরা একদল অতিস্থির দীপান্বিতা দামিনী, যার অন্তরপথে অভাবনীয় ভাবে ঘনিয়ে উঠেছে কৃষ্ণবরণ এক ঘন মেঘ।

দেখতে দেখতে নিথর জ্যোৎস্নায় যেন আলোকিত হয়ে উঠল তাঁদের মেঘাবৃত অন্তর। আবার পরক্ষণেই তাঁদের মনে হল সেই অন্তরটিই যেন রূপ নিচ্ছে একটি কনক-কমলিনীর মণ্ডলের, আর তার উপর চোখ বুজে ঝিমিয়ে রয়েছে কৃষ্ণনীল একটি ভোমরা।

অন্তরের এই বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও কোনো বৈলক্ষণ্যই প্রকাশ পেল না তাঁদের শরীরে। অধিকন্তু, নবদলিত কাশ্মীরকুমকুমের যেন একটা উৎসব মেতে উঠল তাঁদের শরীরে?

৪৩। আর একটি উন্মাদিনী সুন্দরী,···অন্তর-দর্পণে তখনও যাঁর ঝলমল করছে হরি-প্রতিবিম্ব, একান্ত কৃষ্ণানুগত হয়ে রয়েছে যাঁর ইন্দ্রিয়ের বিলোল "বৃত্তি-সঞ্চয়, 'কৃষ্ণোঽহং' ভাবের দুন্দুভি বাজছে যাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ে,···অসহ্য আনন্দে প্রথমেই তিনি স্থির করে ফেললেন,—মারবেনই মারবেন, বধ করবেনই করবেন তৃণাবর্ত্ত অসুরটাকে। সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে যেমনি সমুল্লোসিত হয়ে উঠেছে তাঁর হৃদয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উল্লসিত হয়ে উঠলেন···হৃদয়ের খবর যিনি রাখেন···সেই যোগমায়া। এবার কিন্তু তিনি গ্রহণ করলেন না তৃণাবর্ত্তের ঝঞ্ঝামূর্ত্তি, কেবলমাত্রঅনাচ্ছন্ন করে দিলেন সুন্দরীটির ঔচিত্য-বোধ, উৎসাহ দিয়ে ভাল করে বোঝাতে লাগলেন— 'আমিই তৃণাবর্ত্ত', এবং বোঝাতে বোঝাতেই যেন উড়িয়ে নিলেন তাঁকে। সুন্দরীও তখন তাঁকেই আঘাত করতে করতে প্রতিপন্ন করলেন···'মেরেছি মেরেছি, তৃণাবর্ত্তকে আমিই মেরেছি।'

আর একটি সুন্দরী, অবাক্ কাণ্ড, হামাগুড়ি দিতে লাগলেন। ঝুনঝুন্ করে বাজছে মেখলা, আর ধীরে ধীরে তিনি ফিরে ফিরে চাইছেন। ঐ আওয়াজটুকুতেই···কত যেন ভয়। শঙ্কা-পঙ্কিল শুলগুলে দুটি চোখ। ক্ষণকাল থেমে গেলেন। তারপরেই আবার হামাটানা সুরু হল নির্ভয়ে। মূর্ত্ত হয়ে উঠল নাড়ুগোপালের হামা দেওয়ার ছবি।

আর একটি সুন্দরী,···তিনি ননী চুরি করতে করতে ক্লান্তা হয়েই যেন বসে পড়লেন। সারা মুখে অপরাধের ছায়া। ঐরে, মা আসছেন! জননী-মূর্ত্তিতে দেবী (যোগমায়া)-কে আসতে দেখে কী তাঁর ভয়! তারপরে দেবী যখন তাঁর কোমরে মোটা দড়ি বাঁধবার ভাবখানা দেখালেন, তখন দু'চোখে জল ঝরিয়ে কী তাঁর ফুলে ফুলে কান্না!···আমি কৃষ্ণ, মা আমায় রাগ করে কেন বাঁধছিস,···বলে কী তাঁর সন্ত্রস্ততার লীলাভিনয়।

তিনিই আবার তখনি মাটি ধরে ধরে হামা দিতে লাগলেন। ওমা, ঐ দেখ সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু' দুটো অর্জ্জুন। আর যায় কোথা,···হামা দিতে দিতেই তিনি···ব্যস্···ভেঙ্গে ফেললেন যেন গাছ দুটোকেই।

[ক্রমশঃ।

দিল্লী থেকে ফিরছিলাম। গোটা দুই চালের আড়ৎ রয়েছে কোলকাতায়। তখন কনট্রোলের যুগ। তারই সুযোগে ওগুলোকে একটু বাড়িয়ে তোলা যায় কি না, সেই চেষ্টায় ছিলাম। তার জন্যেই মাঝে মাঝে রাজধানীতে ধর্ণা দেবার প্রয়োজন হত। যাবার সময় যেমন ভারী পকেটে গিয়েছিলাম তেমনি হাত ভরে নিয়ে ফিরছি। উদ্দেশ্য সফল সুতরাং মনও প্রফুল্ল।

মার কাছে শুনেছি, যখন শিশু ছিলাম আমাকে ঘুম পাড়াতে হলে একজন কাউকে দোলার পাশে দাঁড়িয়ে "হেঁইও" "হেঁইও" করে ক্রমাগত দোল দিতে হত। দোলা থামলে ঘুমও উধাও। সেই অভ্যাসটা বোধ হয় বুড়ো বয়সেও রয়ে গেছে। ট্রেন যত জোরে চলে আমার ঘুমও তত গাঢ় হয়, ষ্টেশনে এলেই নাক ডাকা থেমে যায়। তখন গভীর রাত। একটা কোন ষ্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, নড়বার নাম নেই। ঘুমের অপেক্ষায় এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লাম; ছোট ষ্টেশন। টিম টিম করছে কেরোসিনের আলো। দরজার সামনে দিয়ে একটি বাবু যাচ্ছিলেন। হাতে একচক্ষু-লণ্ঠন ঝুলতে দেখে বুঝলাম রেলের লোক। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল সামনে কোথায় অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ী পড়ে গেছে লাইন থেকে। তাকে টেনে তুলে আমাদের গাড়ির পথ করে দিতে সময় লাগবে। কত সময়, জিজ্ঞাসা করতে হাতে একটা হতাশার ভঙ্গি করে জানালেন, কি জানি মশাই? দু' ঘণ্টায় হয়ে যেতে পারে, আবার চব্বিশ ঘণ্টাও লাগতে পারে।

—গাড়িটা পড়ল কেমন করে?

উত্তর দিলেন আমার মাথার উপরে অর্থাৎ আপার বার্থের সহযাত্রী, যেমন করে পড়ে? ফিস্-প্লেটের ফিসী ব্যাপার।

উঁকি মেরে দেখলাম, যা সন্দেহ করেছিলাম, তা নয়। ভদ্রলোক শিবরাম চক্রবর্ত্তী নন। তাঁর কোনো চেলা হবেন হয় তো।

ডিরেলমেণ্টের খবরটা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। আজকাল হলে করত না, ওটা তো প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন যাত্রীর কলরবে গোটা প্ল্যাটফরম জেগে উঠল। সকলের মুখেই 'অ্যাকসিডেণ্ট'-এর উত্তেজনা। তখন আমরা সবে স্বাধীনতা পেয়েছি। তার গরমে জনতার রক্তস্রোত তেমন তেতে ওঠেনি। তাই পঞ্চাশ মাইল দূরে কোন হাঙ্গামা, এঞ্জিনের ড্রাইভার কি করছে না করছে তার জন্তে আমাদের এঞ্জিন ড্রাইভারকে প্রাণ দিতে হল না। ষ্টেশন মাষ্টার এবং তাঁর ষ্টাফও অক্ষত দেহে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ষ্টেশন ঘরের কাচের জানালা অটুট রইল। ভোরবেলা পুরির দোকানে একটা ছোটখাট হামলা ছাড়া জনচাঞ্চল্যের আর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

গাড়ি ছাড়ল পরদিন বিকালের দিকে। রাত্রে ভাল ঘুম হল না। সকালে একটু বেলায় উঠে দেখি ব্যাণ্ডেলে পৌঁছে গেছি। গরম চা আনিয়ে নিলাম এবং সেই সঙ্গে একখানা টাটকা বাংলা কাগজ। মিনিট কয়েক উলটে পালটে এক জায়গায় আসতেই যেন এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে মাথাটা ঝিম ধরে গেল। মনে হল, দেহের রক্তস্রোত হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। একটি শোক-সংবাদ। তিনটি মাত্র লাইন—"১৩ নম্বর বংশী হালদার লেন, হাটখোলা নিবাসী প্রসিদ্ধ চাউল ব্যবসায়ী শ্রীগোলকচন্দ্র সান্যাল গত রাত্রে এলাহাবাদ ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিতে গিয়া অকস্মাৎ পড়িয়া যান এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমরা তাঁহার আত্মার সদগতি কামনা করি।"

আমারই নাম গোলকচন্দ্র সান্যাল। ঠিকানা নির্ভুল। চাউলের ব্যবসা করি, সেটাও সত্যি। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ হয়েছি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে পথ ধরে হয়েছি সেটা ঠিক সাদা পথ নয়, বরং কিঞ্চিৎ মসী-লিপ্ত। হয় তো ঐ সদগতি কামনার মধ্যে সেই ইঙ্গিত রয়ে গেছে।

জরাসন্ধ

আমাদের পাড়ার রিটায়ার্ড জজ সদাশিববাবুর সেদিনকার কথাটা মনে পড়ল। কাগজ পড়তে পড়তে বলছিলেন, আজকাল obituary কি রকম ছড়াছড়ি পড়ে গেছে, দেখেছেন। জানাশুনো, বন্ধুবান্ধব অনেকেই তো গেলেন দেখছি। ভয় হয় কোনদিন সকালের কাগজ খুলেই দেখব আমার খবরটাও বেরিয়ে গেছে। শুনে খুব হেসেছিলাম আমরা, আজ আর হাসি এল না, কেমন যেন গা কাঁটা দিয়ে উঠল। খবরটা সত্যি নয় তো? বৈজ্ঞানিক বিস্ময়ের যুগ। অত্যাশ্চর্য্য ঘটন বা অঘটন রোজই কিছু না কিছু ঘটছে। হয় তো এও তেমন কিছু। আর কিছু না হোক, কোনো বিদীর্ণ এ্যাটম কিংবা হাইড্রোজেন বোমার উড়ন্ত তেজস্ক্রিয় ভস্মের কারসাজি। তারই প্রভাবে অজ্ঞাতে অদৃশ্যভাবে আমার দেহযন্ত্রে কোনো আভ্যন্তরীণ metamorphism ঘটে গিয়ে থাকবে, অন্ততঃ কোনো মারাত্মক metabolism যার নাম মৃত্যু। কাল সারারাত ধরে ঐ রেলওয়ে অ্যাকসিডেণ্টের কথাই ভাবছিলাম। কত লোক মরেছে, কি ভাবে মরেছে, সেই দুশ্চিন্তা অনেকক্ষণ আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি। হয় তো সেই সময়ে দেহান্তর হয়ে গেছে, আমি জানতে পারিনি।

এই যে আমি শ্রীগোলকচন্দ্র সান্যাল দিল্লী—হাওড়া এক্সপ্রেসের একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় বসে খবরের কাগজ পড়ছি, এ হয় তো ঠিক কালকের "আমি" নই। নাড়ী দেখলাম, ঠিক আছে। নিঃশ্বাস? তাও বইছে। হাতে চিমটি কেটে দেখলাম; লাগছে। গাড়ির ওধারটায় রোদ এসে পড়েছিল। উঠে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ; ছায়াও পড়ছে। তবে?

পাশের বেঞ্চিতে যে ভদ্রলোক ছিলেন, বোধ হয় এই আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, কি ব্যাপার, বলুন তো? আপনাকে যেন একটু চঞ্চল মনে হচ্ছে?

বসে পড়ে বললাম, না, না, ও কিছু না। অন্য লোককে কেমন করে বলি আমি মরে গেছি, আর খবরের কাগজে বেরিয়েছে সেই খবর?

ছেলেবেলায় একবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। নাটকটার নাম মনে নেই। তাজ্জব ঘটনা। কে এক যাদব চক্রবর্ত্তী, লোকটা বেজায় কৃপণ। বাড়ির লোকে রটিয়ে দিল তিনি মারা গেছেন। বেচারী যত বলে, আরে, এই তো আমি বেঁচে আছি। কেউ তা মানতে চায় না। আমারও কি সেই দশা হবে? কিন্তু আমি তো কৃপণ নই। এই সেদিন পাড়ার ছোঁড়াগুলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাম করে একশ' টাকা নিয়ে গেল। গৃহিণীর গা ভরা গয়না, ছেলেদের পরণে দামী সার্ট, ট্রাউজারস্, মোটা হাতখরচ, মেয়েদের নিত্য নতুন শাড়ি, রং বেরং-এর হাণ্ডব্যাগ। ধর্ম্ম কর্ম্মও যথারীতি করে থাকি। মাসে মাসে কালীঘাটে পুজো পাঠাতে ভুল হয় না। ও পাড়ার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভায় নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকি, সেদিন খোলের দাম বাবদ থোক পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি। না, আমি যাদব চক্রবর্ত্তী হতে রাজী নই। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো চক্রান্ত আছে। কাগজওয়ালাদের চেপে ধরলে বেরিয়ে যাবে। কোত্থেকে কোন্ সূত্রে কেমন করে এ খবরটা ছাপা হল? কোন মতলব আছে এর পেছনে? সব আমাকে বের করতে হবে। যারা এর মধ্যে আছে, সেই লোকগুলোকে সহজে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। দরকার হলে একটা ড্যামেজ স্যুট—। তার আগে একবার খোঁজ খবর নেওয়া যাক।

হাওড়ায় পৌঁছে বাড়ি না গিয়ে, ট্যাক্সি নিয়ে সোজা সেই খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে উঠলাম।

একটা প্রকাণ্ড টেবিল। পুরানো বনাতে মোড়া; জায়গায় জায়গায় কালির দাগ, মাঝে মাঝে ছেঁড়া। তার উপরে একরাশ কাগজ-পত্র এলোমেলো ছড়ানো। ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে, পিন কুশান, গঁদের শিশি, কাগজ-চাপা তলানিসমেত চায়ের পেয়ালা, তার মধ্যে পোড়া সিগারেটের টুকরো। একদিকের চেয়ারে বসে যে ভদ্রলোক মাথা নীচু করে এক মনে ঝড়ের মত কলম চালিয়ে চলেছেন, তাঁর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুল উসকো খুসকো, চোখে পুরু কাচের চশমা। আমি গিয়ে সামনে দাঁড়াতে দুটো রাত জাগা লালচে চোখ এক পলক উপরের দিকে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললাম, আপনিই কি সম্পাদক?

—সহকারী সম্পাদক, লিখতে লিখতেই উত্তর এল।

এসব গাঁজাখুরি খবর কোত্থেকে আমদানি করেছেন, জানতে পারি?···বলে হাতের কাগজখানা সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

এবার তিনি মাথা তুলে তাকালেন। কিন্তু মুখ খুললেন না। কপালের উপর কয়েকটা প্রশ্নসূচক রেখা ফুটে উঠল। ভূমিকা না বাড়িয়ে সোজাসুজি ব্যাপারটা খুলে বললাম। কিন্তু শুনে এবং কাগজের রিপোর্টটা পড়ে সহকারী সম্পাদক কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হল না। আবার সেই লেখার উপরে ঝুঁকে পড়ে বললেন, একটা প্রতিবাদ পত্র রেখে যেতে পারেন যথারীতি verification-এর পর—

মাঝপথেই বাধা দিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, রেখে দিন আপনার প্রতিবাদ পত্র আর verification এ খবর মিথ্যে। আমি আপনা

মুখের ওপর দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আপনারা যার মৃত্যু সংবাদ ছাপিয়ে বসে আছেন, আমি সেই গোলক সান্যাল। জলজ্যান্ত বেঁচে আছি।

সেটা প্রমাণসাপেক্ষ—অতিশয় শান্তভাবে মিহিগলায় বললেন ভদ্রলোক।

—মানে ?

—মানে, প্রথমত: আপনার এই statement আমাদের ওখানকার correspondent-কে পাঠাতে হবে। দ্বিতীয়ত: লোকাল source-এ অর্থাৎ এখানে যে ঠিকানা দেওয়া আছে, সেখানেও খবর নিতে হবে। তৃতীয়ত:—

—থাক আর তৃতীয়তে দরকার নেই। আপনাদের সেই correspondent, মানে এই 'নিজস্ব সংবাদদাতা'র নাম-ঠিকানা দিন। বোঝাপড়া ওখানেই করে নেবো।

সহকারী মহাশয় স্বরটা আরো মিহি করে জানালেন, আজ্ঞে, সংবাদদাতার নাম ঠিকানা আমরা প্রকাশ করি না।

—কেন ?

—সেটা সাংবাদিক রীতি নয়।

—বুঝেছি। ওসব সংবাদদাতা-ফাতা সব ভুয়ো। এই আজগুবি খবরগুলো নিশ্চয়ই এই নিজস্ব বনাত-ছেঁড়া টেবিলে বসে তৈরী হয়। কিন্তু আপনি ভুল করছেন, আমার নাম গোলক সান্যাল; তিন পুরুষ ধরে চাল বেচে খাই। ক'টা ধানে ক'টা চাল শীগ্‌গিরই টের পাবেন। একটা কাগজ হাতে আছে বলে যখন যাকে খুশি সাবাড় করে দেবেন, মানুষের জীবন নিয়ে চোরা কারবার—এ ব্যবসা বেশিদিন চলবে না। আপনার ঐ সংবাদদাতা থেকে সম্পাদক সবগুলোকে আমি গেঁথে তুলবো।···

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যাকে উদ্দেশ করে এই অবিরাম বর্ষণ করে চলেছি, সে লোকটার মাথা, মুখ, চোখ, কান যায় হৃৎপিণ্ডটাও বোধ হয় পাথরের তৈরী। দম নেবার জন্তে এক সেকেণ্ড থামতেই আবার সেই চিঁচিঁ আওয়াজ কানে এল,—Have you finished ? মানে, আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে ? তাহলে এবার আসতে পারেন। নমস্কার।

—আচ্ছা। বলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলাম। সিঁড়ির মুখে হঠাৎ নজরে পড়ল একজন পিওনগোছের লোক পেছনে ছুটতে ছুটতে আসছে। ফিরে তাকাতেই হাত বাড়িয়ে বলল, আপনার কাগজ।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

বুদাপেস্তে শিশুদের রেলপথ

একটা আধুনিক সহরের কথা ভাবুন, যার মাঝখান দিয়ে দানিউব নদী বয়ে গেছে, আর সেই নদীর বুকে ছোট ছোট ষ্টীমারের ঘন ঘন যাতায়াত চলছে। কল্পনা করুন সেই নদীর বাঁ তীর বরাবর ছড়িয়ে আছে হাঙ্গেরীর বিস্তীর্ণ নীচু সমতল ভূমি যার নাম আলফোল্ড, টেবিলের ওপরের মতই মসৃণ সেই অঞ্চল। তবে নদীর অপর তীর বরাবর রয়েছে পাহাড়, ট্রান্সদানুবিয়ার পাহাড় অঞ্চলেরই একটি অংশ। জানোস পাহাড়ের মাথায় যে চারদিকের দৃশ্য দেখার মিনার রয়েছে সেখান থেকে প্রকৃতি আর মানুষের শ্রমে তৈরি এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়বে আপনার। এই হল বুদাপেস্ত, হাঙ্গেরীর রাজধানী।

সহরের অগণিত দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় স্থানের মধ্যে পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা পাইওনিয়ারদের রেলপথটি হল অত্যন্ত প্রিয়। এই ছোট্ট রেলপথটিকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেশের শিশুদের দান করা হয়েছে। এতে শুধু বুদাপেস্তের শিশুরাই আনন্দ পায় না, সারা দেশের শিশুরাও এই আনন্দের ভাগ নেয়। আর এটা শুধু বাড়িয়ে বলা হয়নি, সিক্লেবেরোতে যে বিরাট পাইওনিয়ার শিবির রয়েছে তাতেই এর প্রমাণ, এই পাইওনিয়ার শিবিরে সারা দেশের সমস্ত কোণ থেকে পাইওনিয়ার বয়সের শ্রেষ্ঠ শিশুরা প্রত্যেক বছর আসে এই শিবিরে।

হাঙ্গেরীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকীর স্মরণে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ পাইওনিয়ারদের রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়। এর নির্মাণ কার্যে বহু কঠিন সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গেছে এই রেলের লাইন। অনেক উঁচু গাঁথুনির রেল ব্রীজ, সোজাসুজি যাওয়ার জন্তে, বহু সুড়ঙ্গ কাটতে হয়েছে এর জন্তে। ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তারপর থেকে ইউরোপের সর্বাধুনিক ক্ষুদ্র রেলপথ হিসেবে গণ্য হচ্ছে এটি।

বছরের সমস্ত ঋতুতেই বিরামহীন ভাবে এটি চালু রয়েছে। একটি সুনির্দ্ধারিত তালিকানুযায়ী এই রেলপথে ট্রেন চলাচল করে এবং এর যাত্রীদের মধ্যে বহুসংখ্যক বয়স্ক লোকও থাকেন। যদি কেউ বুদাপেস্তের কোনো ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, তার সব থেকে আনন্দদায়ক কোন জিনিসটি, তাদের অনেকেই পাইওনিয়ার রেলপথের পক্ষে ভোট দেবে।

এই ছোট্ট রূপকথার রেল-পথটির মোট দূরত্ব হল ১২ কিলোমিটার। একদিকের প্রথম রেলষ্টেশনটি হল হুভোসভোল্‌গি এবং আরেকদিকের শেষ রেল-ষ্টেশনটি রয়েছে সূর্যকরোজ্জ্বল ঘাসে ঢাকা বিরাট জেচেনই পাহাড়ের মালভূমিতে। এখান থেকে দানিউবের আঁকাবাঁকা রূপোলী রেখাকে দেখা যায়। এই দুটি শেষ ষ্টেশনের মাঝে আধুনিক, আরামদায়ক ও সুন্দর লাল রং-এর "পুলম্যান কামরা-ওয়ালা" ছোট্ট ট্রেনটিকে নয়টি ষ্টেশনে থামতে হয়।

একমাত্র ড্রাইভার বাদে এই ট্রেনের সব 'কর্মচারী'ই পাইওনিয়ার অর্থাৎ যে সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয়নি তারা। সমস্ত গার্ড, টেলিগ্রাফকারী, টিকিট-বিক্রয়কারী, লাইনম্যান হল রেল-কোম্পানীর পোষাকপরা হাসিখুসী ছেলেমেয়ের দল, এরা বেশ খেলাচ্ছলেই কাজ করে যাচ্ছে। এ খেলা যেমন পরম আনন্দদায়ক তেমনি আবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে বিনা চেষ্টায় দায়িত্ববোধ জন্মায়। যে সমস্ত পাইওনিয়ারগণ লেখাপড়ায় সব সময়ই ভাল করে, যাদের ব্যবহার সুশৃঙ্খল এবং পাইওনিয়ারের কাজে সততা দেখিয়েছে তারাই শুধু পাইওনিয়ার রেল-কর্মী হবার সম্মান অর্জন করতে পারে। আর পাইওনিয়ারদের পক্ষে এটা এক মস্ত সম্মানও বটে।

বুদাপেস্তের ছেলেমেয়েরা যদি কখনও পাহাড়ে বেড়াতে যায় তবে তাদের যাওয়ার রাস্তা হল এইরকম: তারা ট্রাম বা বাসে চড়ে প্রথমে

যায় ভারোসমাজর। এখান থেকে বুদাপেস্তের আরেকটি আকর্ষণীয় বস্তু, লম্বা কগ-হুইল রেলওয়ের সুরু। তারা কগ-হুইল ট্রেনে চড়ে যায় জেচেনই পাহাড়ে। এই যাত্রাতেই লাইনের নীচে গভীর তলদেশ চোখে পড়ে, চোখে পড়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাড়ির সারি আর ঘোরান ঘোরান আঁকাবাঁকা রাস্তা।

জেচেনই পাহাড়ে পাইওনিয়ার রেলপথের প্রথম ষ্টেশনটি স্থাপত্যের দিক থেকেও সুন্দর। একটি সত্যিকারের ষ্টেশনে যা যা পাওয়ার তার সবই আছে এখানে। একটি পরিচ্ছন্ন বিশ্রামাগার, ট্রাফিক ব্যুরো, টিকিটঘর এবং রেস্তোরাঁ ইত্যাদি সব। টিকিট বিক্রয় হয় খুবই সামান্য দামে। একটি আরামদায়ক গাড়িতে গিয়ে চড়লেই হল, তার পর শুরু হয় ছোট্ট পথে যাত্রা। ঢাকা গাড়ির চওড়া জানলা দিয়ে এবং খোলা গাড়ির মধ্যে বসেই শিশু ও বয়স্কযাত্রীরা একই সঙ্গে চারপাশের নানান দৃশ্য উপভোগ করতে করতে চলে।

প্রথম ষ্টেশন আসে, নরমাদা। রাজা ব্যাথিয়াসের বিরাট গাছের নামানুসারে এ ষ্টেশনটির নাম হয়েছে, বেড়াবার পক্ষে এ খুব পুরোনো আমলের জায়গা। এর পরেই হল পাইওনিয়ার টাউন ষ্টেশন। এ জায়গাটা প্রচুর সূর্যের আলোয় সুন্দর লাগে, চারদিকে ফুল, পতাকা, মোচাকৃতি পাইনের গাছ, বুদার পাতায় ছাওয়া গাছের সার। আর সর্বত্রই পাখীর কলরব! বিখ্যাত সিল্লেবেরোর পাইওনিয়ার দের শিবির তো এখানেই। শিশুদের কাছে এ এক স্বর্গবিশেষ। পর্যবেক্ষণ মিনারের বেশি দূরে নয়। পর্যটকদের আনন্দ দানের জন্য এলোরে ষ্টেশনে একটি রেস্তোরাঁও আছে। এর দৃশ্যও খুব সুন্দর। জানোস পাহাড়-ষ্টেশন থেকে একটি আঁকাবাঁকা রাস্তা গেছে পর্যবেক্ষক মিনারে। এর পরের ষ্টেশন হল সাগভেরী। পর্যটকদের খুবই প্রিয় স্থান? এখানে হাজার হাজার লোক আসে বেড়াতে। তারপর পাইওনিয়ার ট্রেন গিয়ে পৌঁছবে সংরক্ষিত অরণ্য অঞ্চলে, কয়েক'শ বছর আগে রাজারাজড়ার শিকারের জায়গা ছিল এটা। হুরস পাহাড়ের আশেপাশে বহু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। কয়েকটির মধ্যে বলা যায়, বাথোরি গুহা, বিরাট ঝরাপাতার বন। ট্রেনটি অনেক উঁচু পুলের ওপর দিয়ে এবং একটি আধুনিক সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত সে হাজির হয় হুভোসভোলগীর শেষ ষ্টেশনে। এখানে ট্রাম লাইনেরও শেষ।

১২ কিলোমিটারের যাত্রাপথে প্রত্যেক মিনিটে নূতন নূতন জিনিস দেখে অবাক হতে হয়। এখানে ঝরাপাতার বন, পাথরের অদ্ভুত গড়ন, শান্ত উপত্যকায় ছোট ছোট বসতি, ঘাসের মাঠ, দেয়াল, গুহা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর আঁকাবাঁকা রাস্তা। যে একবার এসব দেখেছে, সহজে সে তা ভুলবে না।

যাদুকরী

শ্রীমতী শান্তিকণা দত্ত

ভারতবর্ষ যাদুকরের দেশ বলে একটা প্রবাদ আছে। অনেক বৎসর আগে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের রাণী 'ভানুমতী' যাদুবিদ্যায় অতুলনীয়া ছিলেন। তোমরা দেখবে, রাস্তায় রাস্তায়, যাদুকরেরা পোঁটলা ঝুলিয়ে হাঁক দেয়—ভানুমতীর খেল বাবু, ভানুমতীর খেল্। রাণী ভানুমতীকে উদ্দেশ্য করেই এই কথা বলা হয়।

এখানে তোমাদের একটা সত্যি সত্যি যাদুকাহিনী বলব। ঘটনাটা ঘটেছিল, পাকিস্তানের ঢাকা সহরে, প্রায় সত্তর বৎসর আগে। যিনি এই কাহিনীটি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর মাতামহী এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, আমাকে জানালেন।

ঢাকা সহরের প্রায় জায়গায়ই একজন যাদুকরীকে শীতকালে দেখা যেত। সে একদিন এ-পাড়ায় একদিন ও-পাড়ায় তার যাদুর খেলা দেখাত। যাদুর খেলা শেষ হলে সে তার ঝুলি থেকে, বাঘের দাঁত, হরিণের শিং, এবং নানা গাছের জড়িবুটী ইত্যাদি নানা জিনিষ বের করে, চেঁচিয়ে বলত কারো মাথার ব্যামো হলে, বাতের ব্যথা, পেট ব্যথা করলে, হাত পা কন্ কন্ করলে তার কাছে অব্যর্থ ওষুধ আছে। পুরুষেরা এইসব কথা গ্রাহ্য না করলেও, মেয়েদের মধ্যে তার এই জড়িবুটী ইত্যাদি বেশ বিক্রি হোত। যাদুকরী বের হোত বেলা এগারোটা, বারোটার সময়। তখন পুরুষেরা কাজ কর্মে বাইরে ব্যস্ত থাকতেন। অল্পবয়সী বৌ, বুড়োবুড়ী, বাচ্চা এরা ওর খেলা দেখত।

একদিন যাদুকরী তার পোঁটলা নিয়ে একপাড়ায় বেরিয়েছে। এক বাড়ীতে তার ডাক পড়ল। যাদুকরী যথানিয়মে তার খেলা দেখাচ্ছে। ঐ বাড়ীতে গোটা ছয় সাতেক বাচ্চা ছেলে মেয়ে ছিল। ওদের মধ্যে একজন খেল দেখার ফাঁকে যাদুকরীর একটা পুতুল সরিয়ে ফেলল। যাদুকরী দেখতে পেয়ে বলে উঠলো "এই খোকা, পুতুল দাও, আমার পুতুল।" ওর মুখে একটু দুষ্টু হাসি।

এদিকে যে খোকাটি পুতুল নিয়েছে, সে তো তার মুঠি খুলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। ও মা, কী সুন্দর পুতুলটা সে হাতে নিল, কিন্তু এখন যে হাতে একটা ছোট পাথরের নুড়ি।

খোকার মা তেড়ে এল। বের কর পুতুল, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে। ওর কত ক্ষতি করলি বলত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাদুকরী হাসছে, বলছে, "ও খোকাবাবু আমার পুতুল দাও। আমি আবার অন্য পাড়ায় খেলা দেখাব। ঐ পুতুলটা বড় দরকারী এটার খেলা খোকাখুকুরা খুব ভালবাসে।"

খোকা সমানে চোখের জল মুছে চলেছে। তার মা বলল, "ওগো বাছা তোমার পুতুলের দাম কত বল, দিয়ে দিচ্ছি। বাবা রে বাবা, আর পারি না এ একপাল ছেলে মেয়ে নিয়ে। হাড়-পিত্তি জ্বালিয়ে খেলে।"

যাদুকরী এইবার খোকার হাত থেকে নুড়িটি নিল। তারপর ঐ নুড়িটি একটি বাটির মত ঢাকা দিয়ে ঢেকে তার হাতের যাদুদণ্ডটি দিয়ে ঐ ঢাকার মধ্যে একটা বাড়ি দিয়ে চেঁচাতে লাগল, "লাগ ভেল্কি লাগ ভানুমতীর খেল ভানুমতীর খেল"—এই বলে যেই ঢাকা খুলেছে, সকলে সবিস্ময়ে দেখল, খোকা যে পুতুলটা নিয়েছিল, সেই পুতুলটা নুড়ির জায়গায় বসে আছে, নুড়ি নেই।

খোকার মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বলল, "রক্ষা করলে বাছা। কি বিপদেই যে ছেলেমেয়েরা ফেলে।" খোকার মুখেও তখন হাসি ফুটেছে খোকার মা একটু বেশী পয়সা দিয়েই যাদুকরীকে বিদেয় করল।

কয়দিন পর যাদুকরী আবার অন্য এক পাড়ায় বেরিয়েছে। সেদিনও যাদুর খেলা দেখানোর পর সে যথানিয়মে তার জড়িবুটীর

মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতে করতে বলল, "আমার কাছে এমন ওষুধও আছে, যার ছেলে পিলে হয় নি, সে আমার ওষুধ খেলে তার ছেলেয় মে হবে।"

যাদুকরী যে বাড়ীতে খেলা দেখাচ্ছিল, সেই বাড়ীতে একটি নিঃসন্তান বৌ ছিল। তার বিয়ে হয়েছে বছর কয়েক আগে। কিন্তু আজও ছেলেমেয়ে হয় নি বলে, তার শাশুড়ী তাকে দিনরাত গঞ্জনা দিতেন। বৌটি অন্যের অলক্ষ্যে এক ফাঁকে যাদুকরীকে চোখের ইসারা করে কি বলল। যাদুকরী তার পোঁটলা পুঁটলী নিয়ে তখন চলে গেলেও, ঘণ্টাখানেক পরে ঐ বৌটির বাড়ীর খিড়কি দরজায় এসে দাঁড়ালো। তখন বেলা দু'টো আড়াইটা হবে। প্রায় বাড়ীতেই লোকজন ঘুমিয়ে আছে। বৌটি যাদুকরীকে দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। তারপর আস্তে অথচ ব্যগ্রভাবে যাদুকরীকে বলল, "আচ্ছা, তুমি যে তখন বললে, তোমার কাছে এমন ওষুধ আছে যে, খেলে ছেলে-মেয়ে হয়। আমাকে এমন ওষুধ দিতে পার? কত দাম নেবে?"

যাদুকরী বলল, "অষুধ না থাকলে কি আর চেঁচিয়ে বলে বেড়াই বাছা? তা তুমি যদি চাও, তোমাকে দিতে পারি। তবে আজ হবে না। শনি মঙ্গল বারে এই ওষুধ দিতে হয়। আমি ওষুধ দেব, তুমি মাদুলী করে গলায় পরবে। এক বছরের মধ্যে যদি সন্তান না হয়, তবে আমি কি বলেছি ওষুধের দাম পড়বে পাঁচ টাকা। কবে ওষুধ নিয়ে আসব?"

বৌটি তখন আস্তে আস্তে বলল, "দেখ, তুমি এমনি সময়ে আগামী শনিবারে ওষুধ নিয়ে এসো। আমাদের বাড়ীর কাউকে বলো না। ঐদিন আমি তোমাকে টাকা দিয়ে দেব। যদি এতে উপকার হয়, তবে তোমাকে আমি পরে খুশী করব।"

এক বছর কেটে গেছে। ঐ বৌটির একটি ফুট ফুটে ছেলে হয়েছে। বাড়ীর সবাই খুব খুশী। বৌটি ছেলে কোলে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়েছে। পাশের বাড়ীর এক ভদ্রমহিলা এসে বৌয়ের ছেলেটিকে কোলে নিয়ে অনেক আদর করল। তারপর ছেলেটিকে বৌয়ের কোলে দিয়ে ছলো ছলো চোখে বিদায় নিয়ে বাড়ী গেল। বৌটি শুনতে পেলো এই ভদ্রমহিলার গত বছর কোলের ছেলেটি মারা গেছে। ভদ্রমহিলা সম্পর্কে বৌটির পাড়াতুতো বৌদি। এই মহিলার অবশ্য আরোও কয়েকটি ছেলেমেয়ে আছে।

আবার শীত এসেছে। যাদুকরী আবার খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। একদিন এই বৌটির বাড়ীতেও এল। তারপর নির্জ্জনে এক সময় বৌটিকে বলল, "কি গো, আমার কথা ফলেছে তো? কেমন কোলজোড়া খোকা হয়েছে। এখন আমায় খুশী কর। তুমি কথা দিয়েছিলে।"

বৌটি একখানা নূতন শাড়ী আর আরো পাঁচটাকা যাদুকরীকে দিয়ে বলল, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ঠিক উত্তর দেবে ত'? তুমি আমাকে কি ওষুধ দিয়েছিলে?"

যাদুকরী একটু হেসে বলল, "ওসব আমাদের বলতে নেই বাছা। ওসব গোপন জিনিষ।"

বৌটি কিছুতেই ছাড়বে না। তার জিদ চড়ে গেল। তখন যাদুকরী বলল, "কাউকে বলো না, তোমাকে বলছি তোমার ত' একটিও ছেলে ছিল না। কিন্তু গতবার একবাড়ীতে খেলা দেখাতে গেছলাম তাদের অনেকগুলি বাচ্চা। একটা বাচ্চা ত' আমার একটা পুতুল লুকিয়ে ফেলল। ওদের বাড়ীর কোলের বাচ্চাটার কাঁথা থেকে একদিন লুকিয়ে এক টুকরো কেটে নিয়ে এলাম। শনি, মঙ্গলবারে ঐ টুকরো কাটতে হয়। ঐ কাঁথার টুকরোতে মন্তর টন্তর করে জল ছিটিয়ে তোমাকে ত' ধারণ করতে দিয়ে গেলাম। বললে বিশ্বেস করবে না বাছা, সাতদিনও পেরুলোনা ও বাড়ীর বাচ্চাটি মরে গেল। আর কয়মাস পরেই তোমার ঘর আলো করে তোমার কোলে ছেলে এলো।" যাদুকরীর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

বৌটির সর্ব্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছে। অস্ফুট স্বরে সে বলল, "কী সর্ব্বনেশে কথা! এই তোমার ওষুধ? কার সর্ব্বনাশ করলে তুমি, সেদিন কোন পাড়ায় গিয়েছিল, বল শীগগির বল"—

যাদুকরী এইবার ভড়কে গেল। বলল, "তুমি এত অস্থির হলে কেন? যার ছেলে মরেছে তার দুঃখের কিছু নেই তার অনেকগুলি স বাচ্চা—ও কি, ও কি করছ ছাড় ছাড় লাগে।"

বৌটি পাগলের মত তখন যাদুকরীর দু'হাত চেপে ধরেছে, "বল বল সেদিন তুমি কোন পাড়া থেকে কাঁথার টুকরো এনেছো।"

যাদুকরী তখন ভয় পেয়ে পাড়ার নাম বলল। বৌটি আগেই বুঝতে পেরেছিল এখন নিঃসন্দেহ হোল। তার পাড়াতুতো বৌদির ছেলে, যে একবছর আগে মারা গিয়েছে।

বৌটি আস্তে অথচ তীব্রভাবে বলল, "তুমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও আর কখনও এ পাড়ায় কেন কোন পাড়ায় আর যেও না। যদি আর কোন পাড়ায় তোমার যাওয়ার কথা শুনি, তবে তোমাকে পুলিশে দেব, সর্ব্বনেশে মেয়েছেলে কোথাকার।"

বৌটির অস্বাভাবিক চেহারা আর কথা শুনে, যাদুকরী তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। বৌটি পরদিনই আবার বাপের বাড়ী গিয়ে তার সেই বৌদিকে সব কথা বলে দু'হাতে বৌদির পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো, "বৌদি, তুমি আমায় মাপ কর। তোমার এমন সর্ব্বনাশ হবে জানলে কি আর আমি ওর কাছে ওষুধ চাই। আমার ছেলেকে তুমি নিয়ে নাও। ও আমায় নয়।" ঝর ঝর করে তার চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল।

ভদ্রমহিলাও চোখের জল মুছতে মুছতে বৌটিকে টেনে তুলল। তারপর ধরা গলায় বলল, "তুমি দুঃখ করো না ভাই, তোমার ত' কোন দোষ নেই; তোমার ছেলে তোমার কোলেই সুখে থাক।

দু'জনের চোখের জলে, সেদিনের বিকেলটা যেন বিষন্ন হয়ে উঠলো। বলা বাহুল্য এরপর থেকে আর কোন বছরেই যাদুকরীকে ঢাকা সহরে দেখা যায় নি।

তুতুলের পুতুল

• কার্তিক ঘোষ

—আয় বলছি: ভাত খাবি আয়।

—না, আমি খাবো না—যাও। অভিমানের সুর থাকে তুতুলের কথায়।

—বলছি তো পুতুল তোকে কিনে দেবো।

দুষ্টু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মা বলে, আয় মা আয়—বেলা গেল। খেয়ে নিবি আয়।

'তবুও তুতুলের রাগ কমে না। দুয়ারের বাঁশের খুঁটিটা ধরে মুখ হাঁড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। রান্না ঘরে ভাত বেড়ে মা ঠায় বসে

বসে মেয়ের রাগ ভোলাবার চেষ্টা করে। কতো বোঝায়। কতো কি বলে। তবুও মেয়ের অভিমান আর ভাঙে না। পুতুল কিনে দিতে হবে একটা। ও বাড়ির বাবুয়ার মতো একটা পুতুল। সেই যে পুতুলগুলো নিয়ে কোলকাতার বড় বড় লোকের ছেলেমেয়েরা খেলা করে। ঠিক সেই রকম একটা পুতুল বাবুয়াকে কিনে এনে দিয়েছে বাবুয়ার বাবা। সেই দেখেই বায়না হ'য়েছে তুতুলের। ওরও একটা অমন সুন্দর পুতুল চাই। ঠিক বাবুয়ার মতো পুতুল। কতোবার তো ও বলেছে। তবুও না—কিছুতেই আর একটা ঐরকম পুতুল কিনে এনে দেয় না ওর বাবা। চোখ ডবডবিয়ে জল আসে তুতুলের।

—কি হ'লো রে তুতু। কাঁদছিস্ কেনো শুনি! হঠাৎ ঠাকুমা এ'সে দাঁড়ায় ওর সামনে। দু'হাতে নাতনীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বুড়ী ঠাকুমা সোহাগ-মাখা কণ্ঠে বলে, কি হ'লো বল্ না!

—আমার পুতুল! ধরা ধরা গলায় তুতুল বলে। আমার পুতুল চাই বাবুয়ার মতো—

—আচ্ছা, আচ্ছা! বলেছি তো—পুতুল তোকে কিনে দেওয়া হবে। কিন্তু, কাঁদছিস কেনো!

ঠাকুমার বুকে মুখ লুকিয়ে চাপা অভিমানটা প্রকাশ পায় তুতুলের। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে,—বেশ করবো কাঁদবো·· তোমার কি! আমি কাঁদবো···কাঁদবো আরো অনেক করে কাঁদবো।

—একশো বার কাঁদবি। ঠাকুমা বলে, কেন কাঁদবি না। তোর বাবা তোর পুতুল কিনে না দিলে এবার খুব জোরে কাঁদবি। তোর মা বাপের কান ঝালাপালা করে দিবি। কেমন।

—তোমারও দেবো। বেশ মজা হবে তখন। বেশ মজা হবে।

হোঃ হোঃ করে মা আর ঠাকুমা একসংগে হেসে ওঠে।

এমনি ক'রে হাসি-ঠাট্টায় অনেকটা সময় কেটে যায়। মা এসে বোঝায়। ঠাকুমা বলে,—আমি আজই তোর বাবাকে লিখে দিচ্ছি। সামনের শনিবারে আসবার সময় বাবুয়ার মতো তুতুরও যেন একটা পুতুল আনে।

—তুমি আগে লিখে দাও আমার সামনে। তুতুলের মুখে হাসি আসে।

—বেশ তোর সামনেই লিখে দিচ্ছি। একটা পোষ্টকার্ড নিয়ে সংগে সংগে বুড়ি ঠাকুমা কলম ধরে।

—গোটা গোটা করে লিখে দাও কিন্তু। বাপি যেমন সব পড়তে পারে। দুষ্টু মেয়েকে কোলে টেনে নিয়ে ভাত খাইয়ে দিতে থাকে মা। তুতুলের চোখ তবু ঠাকুমার হাতের পোষ্টকার্ডটার দিকে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সে। খেতে খেতেই বলে,—লিখলে তো··· বাবুয়ার মতন একটা পুতুল। তার যেন থাকে নীল নীল দু'টো চোখ। রেশম রেশম চুল। টিয়ার মতো লাল টুকটুকে ঠোঁট। চুণী মুক্তোর মালা গলায়। দু'পায়ে আলতা। মাথায় রামধনু রঙের ফিতে বাঁধা। হাত নাড়ে। পা নাড়ে। শুধু যা কথা বলে না।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ সব লিখে দিয়েছি। ঠাকুমা বলে,—তোর পুতুল আবার কথা কইবে। দেখিস্!

আনন্দে মায়ের কোল ছেড়ে ঠাকুমার কাছে এসে তুতুল দাঁড়ায়। মুখে হাসির ছোঁয়া। খুসীর পরশ। অবাক দু'চোখ তুলে বলে,— আমার পুতুল আবার কথা কইবে। সত্যি বলছো!!

—হ্যাঁরে হ্যাঁ! বলছি তো—ঠাকুমা বলে, তোর পুতুল কথা কইবে।

খুসীতে ঝলমল করে তুতুলের দু'টো চোখ। ছুটে যায় বাবুয়ার কাছে। বাড়ীতে তাকে খুঁজে পায় না তুতুল।

তাই চলে মাঠের দিকে। কাশ ফুলে ঢাকা নদীর তীরে। হয় তো ওদিকেই আছে বাবুয়া। ডিঙি খেলতে গেছে—না হয় ঘুড়ি ওড়াতে। ছেলেটা যেন কেমন কেমন। দিনরাত লাটাই হাতে ধেই ধেই ক'রে নাচে। সাঁই সাঁই ক'রে ওর নীল ঘুড়ি উড়ে যায় আকাশে। মেঘের কোলে কোলে। কখনো বা আবার হারিয়ে যায়।

ভরা রোদ্দুরে ঠিক খুঁজে বের ক'রে বাবুয়াকে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাটাইয়ে সুতো গুটোচ্ছে। রোদের তাপে ঘেমে গেছে দু'জনেই।

চমকে যায় বাবুয়া। বলে,—কিরে তুতুল···তুই।

—তোর মতন আমার পুতুল আসছে, জানিস্! তুতুল বলে, সে আবার অবিকল মানুষের মতো কথা কইবে।

—তাই নাকি! সত্যি বলছিস!

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সত্যি বলছি! তুতুল ওর গা ছুঁয়ে বলে, তোর গা ছুঁয়ে বলছি। বিশ্বাস কর।

—কিন্তু! পুতুল আবার কথা কয়। অবাক চোখে ওর দিকে তাকায় বাবুয়া। বলে, কই···কোনোদিন তো শুনিনি!

—আচ্ছা দেখিস, আমার পুতুল এলে।

সামনে যাকে চেনা-শোনা পায়, তাকেই পুতুলের কথা বলে তুতুল। দিনটা এমনি ক'রে কাটে। কিন্তু তবুও দিন গোণা চলে ওর। আস্তে আস্তে শনিবারে এসে পড়ে।

সন্ধ্যা হয়। তবুও বাবা আসছে না কেন! বিছানায় বসে বসে ভাবে তুতুল। চোখ জুড়ে ঘুম আসে তার। ঘুমে ঢুলে পড়ে তুতুল।

—তুতুল! তুতুল!

—কে ভাই তুমি?

—এ মা! তা'ও জানো না—আমার নাম পুতুল। তোমার বাবা যে আমাকে কোলকাতা থেকে কিনে আনলো। নীল নীল তার দু'চোখে খুসীর রোশনাই। রেশম রেশম একমাথা ঝাঁকড়া চুলে রামধনু রাঙা ফিতে বাঁধা। মুক্তোর দু'টো-দুল—দুল্ দুল্ দুলিয়ে পুতুল বলে,—তুতুল—আমাকে নিয়ে খেলবে না।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে খেলবো। পুতুলকে জড়িয়ে ধ'রে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। এমনি সময় ঠাকুমা ঠেলা দিয়ে তুললো ওকে।

—ওঠ তুতু ওঠ,। চেয়ে ভাখ, তোর বাবা তোর জন্যে কেমন পুতুল এনেছে।

ঘুম ভেঙে যায় তুতুলের। ঠাকুমার হাত থেকে পুতুলটা কেড়ে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে। ভোর হ'য়ে গেছে অনেক আগে। দাঁড়ের ময়না শিষ টানছে। জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সোনা-চাঁপা রোদ্দুর।

—পুতুল কথা কও। ঘুম জড়ানো চোখে তুতুল বলে,—এই যে কথা কইছিল। এখন কেনো কইছে না আর ঠাকুমা!

—দাঁড়া, আবার একটু পরে কথা কইবে। একটু ভাব কর ওর সংগে! ঠাকুমার মুখে হাসি।

কি বুঝলো তুতুলই জানে! ও কিন্তু ভোরের মিষ্টি সূর্য্যের মত সূর্য্যে হাসি হাসলো। বুকে তখনও ধ'রে আছে ওর পুতুলকে।

কাঁদুনে

অমিতাভ চক্রবর্তী

চোখে নেই কুম্‌কুম্ দৃষ্টি,
তাই দেখে ভোমরা
মুখ করে গোমরা
বলে, এ কী অনাসৃষ্টি।

হাসি নেই, টুপ, টুপ, বৃষ্টি
শুধু জল ঝরছে
প্যাঁচামুখো বলছে
হায়, এ কী অনাসৃষ্টি।

মুখে তার ভাব নেই মিষ্টি
টোপাকুল গালতো
ভেঙে গেল আলতো
ও মা, এ কী অনাসৃষ্টি।

মতলব আজগুবী লিষ্টি
কাঁদুনেটা লিখতো
মিছে নয় ঠিকতো
এ ত' সব অনাসৃষ্টি।

এক বিচিত্র জীব

গৌর আদক

বিচিত্র এই জগৎ। তার চেয়েও বিচিত্র এই জগতের জীবগোষ্ঠী। স্থলে, জলে, বাতাসে কত সহস্র প্রকার প্রাণী যে চরে বেড়াচ্ছে, কে তার হিসাব রাখে? কত বিচিত্রই না তাদের জীবনযাত্রা। ঐ যে বিশাল সমুদ্র, ওপর থেকে শুধু আমরা তার নীল জলরাশি আর তারই ওপরে ভাসমান কয়েকটি জাহাজ আর ষ্টীমার ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। কিন্তু ঐ বিরাট নীল জলরাশির অভ্যন্তরে কি বিরাট ব্যাপারই না চলেছে তা জান? সে একটি আলাদা জগৎ।

আজ তোমাদের কাছে সমুদ্রের তলার একটি বিশেষ রকমের মাছের কথা বলব; মাছটির নাম ইলেক্‌ট্রিক ঈল। ইহা প্রচণ্ড ভাবে ইলেক্‌ট্রিকের মতন শক্ মারে। সমুদ্রের আরো অনেক মাছ ইলেক্‌ট্রিক ঈলের মত শক্ মারে। কিন্তু তাদের মধ্যে ইলেক্‌ট্রিক ঈলই হল সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। মাছ শক্ মারে এ কথাটা শুনে তোমরা বেশ একটু আশ্চর্য্য বোধ করছ, নয়? তোমাদের কাছে এ কথাটা একটু বিচিত্র লাগবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? কারণ ভাবছ মাছ আবার শক্ মারে কি করে? মাছ আমরা প্রত্যহ আহার করি, কত মাছ আমরা হাতে ধরি, কৈ হাতে তো শক্ লাগে না। ঠিক কথাই। তবে তোমরা যে মাছ হাতে ধর বা আহার কর সেগুলি অতি সামান্য ও নগণ্য নদী ও পুকুরের মাছ। সমুদ্রের মাছ তোমরা খেয়েছ নিশ্চয়ই। কারণ আজকাল সমস্ত বাজারেই প্রচুর পরিমাণে সমুদ্রের মাছ পাওয়া যায়। সমুদ্রের এক একটি মাছ কি বিরাট! আর কি অদ্ভুত! তা তোমরা না দেখলে কল্পনাই করতে পারবে না। বাজারে যে সমস্ত সমুদ্রের মাছ বিক্রি হয় তা অতি সামান্য মাছ। আকারে খুব ছোটই তারা।

ইলেক্‌ট্রিক ঈল দশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। দশ ফুট লম্বার মধ্যে দুই ফুট মাথা আর বাকি সবটুকুই হয় লেজ। লেজই হচ্ছে এদের সব, এর মধ্যেই থাকে ইলেক্‌ট্রিক কারেন্ট। যদি কোনরকম ভাবে একবার উহার মাথা আর লেজটি কারুর গায়ে লাগে তাহলে সার্কিটটি সম্পূর্ণ হয়ে ভয়ানক জোরে শক্ লাগে। সে দু'শো একশো ভোল্ট নয়, একেবারে তিনশো ভোল্টের সমান। তা'হলে বুঝতে পারছ, কত জোরে কারেন্ট দেবার ক্ষমতা আছে এই মাছটির। সাধারণতঃ আমাদের প্রায় সকলের বাড়ীতে দু'শো কুড়ি ভোল্ট কারেন্ট-ই দেখা যায়। এই দু'শো কুড়ি ভোল্ট কারেন্টেই প্রাণান্ত হয়ে যায়। তার ওপর তিনশো ভোল্ট কারেন্ট যে কি ব্যাপার তা বেশ ভালই বুঝতে পারছ। তবে এই ঈল মাছের শক্ দেবার শক্তি সব সময় সমান থাকে না। কারণ শক্ দিতে দিতে এদের ইলেক্‌ট্রিক শক্তি একেবারে ক্ষীণ হয়ে আসে। পুনরায় ইলেক্‌ট্রিক শক্তি তৈরী করার জন্য এদের বহুদিন পর্য্যন্ত বিশ্রাম আর প্রচুর পরিমাণে আহারের প্রয়োজন। ইলেক্‌ট্রিক শক্তি যখন না থাকে, এরা বড়ই অসহায় হয়ে পড়ে। তখন অতি সহজেই লোক ইহাদের মারিয়া আহার করে। যাঁরা ঈল মাছ খেয়েছেন, তাঁরা বলেছেন খেতে মন্দ নয়।

এই ইলেক্‌ট্রিক ঈল আমেরিকাতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

রক্তের স্বাক্ষর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভক্তি দেবী

কিন্তু পিছন দিক থেকে অর্থাৎ ঘরের দরজার বাইরে থেকে কার যেন পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বোধ হচ্ছে মেট্রন মিস্ ডরোথি আসছে। তাই না? বেড-টি নিয়ে এর-সীমার ঘুম ভাঙাতে আসবার সময় হল বোধ হয় এবার।

তাড়াতাড়ি আলমারিটাকে ঠেলে আবার সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল সীমা। সরাবার সময় আরও একটু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলে সীমা আলমারিটার গঠন প্রণালীতে। একটা এক ইঞ্চি কাঠের তক্তা আলমারিটার তলায় পাতা। শুধু তাই নয়, সেই তক্তাটাই আলমারিটার পিছন ও পাশের দিক এমন ভাবে ঘিরে রেখেছে যা হঠাৎ দেখলে বা সহজ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে কোনমতেই নজরে আসবে না। অথচ যার ফলে আলমারিটা একটা দরজার কপাটের মত কাজ করে। ঠেলে দিলে নীচের পাতা তক্তা সমেত সেটা সরে যায়, একটুকুও আওয়াজ করে না। উপরন্তু তার জন্যে খুব বেশী গায়ের জোরও দরকার করে না।

সীমা পরিষ্কার বুঝতে পারে কেমন করে তার ঘরে নিত্য অবাঞ্ছিত অতিথির আনাগোনা চলেছে। গতরাত্রে সীমার চোখের সামনে দিয়ে কেমন করে এক কোন পথে সেই অনাহুত লোকটি মিলিয়ে গেল দেওয়ালের গায়ে। তবে শুধু এই কথাটাই বোধ হয় সে ধারণায়

আন্দাজতে পারে নি। সীমার মত একটা অল্পবয়সী মেয়ে টর্চ জেলে উঠে বসে তার সঙ্গে মুখোমুখি হবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারবে। তাই সে কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। আর সেই জন্তেই তাড়াতাড়িতে আলমারিটা ঠেলে সরিয়ে চলে যাবার সময় তার একটু ত্রুটী থেকে গেছে। ঠিকমত বসানো হয় নি আলমারিটাকে।

*   *   *   *

দরজায় মিস্ ডরোথির করস্পর্শ ততক্ষণে বেজে উঠেছে—টক্ টক্ টক্।

সীমা মনের সমস্ত উৎকণ্ঠা চেপে দরজা খুলে দিলো। হাসিমুখেই বললে—ভিতরে এসো।

মিস্ ডরোথি মানুষটি বড় সাদাসিদা। আজও সে একগাল হেসে নিত্যদিনের মত বললে—গুড্ মর্নিং।

সীমাও যথাযথ সৌজন্ত বিনিময় করে চায়ের পেয়ালাটা যখন কাছে টেনে নিলো ততক্ষণে মিস ডরোথি সীমার চোখমুখের শুষ্কভাব লক্ষ্য করেছে।

এ ক'দিন দেখে তার যেন সত্যি সত্যি মায়া পড়ে গেছে মেয়েটার ওপর। তাই অত্যন্ত আন্তরিক ভাবেই সে অনেক অনুযোগ করতে থাকে। বলে—এই কটা দিনই বা তুমি এখানে এসেছ মিস্ রায়, কিন্তু এর মধ্যেই তোমার স্বাস্থ্যের বেশ ক্ষতি হয়েছে। প্রথমদিকে সকালবেলায় তোমায় ফুলের মত তাজা দেখাতো। আজ সকালবেলাতেও তোমার মুখটা কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে। নাঃ, নিজের শরীরের প্রতি তুমি একটুও যত্ন নিতে জানো না। আমায় তুমি স্নেহ করো, সেই দাবীতেই আমি বলছি নিজের জন্ত তোমার আরও একটু ভাবা উচিত।

একে সারারাত থেকে নানান্ ভাবনায় সীমার মনটা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না তাতে মেট্রনের এই অকৃত্রিম স্নেহভাষণে অনেক দিন পরে সীমার মনটা ভারী হয়ে ওঠে।

ধরা গলায় হঠাৎ ও বলে ফেলে—কী হবে আমার শরীরের যত্ন করে? অসুখ করলে কেউ ব্যস্ত হবে; এমন কী একটু ভয় পাবে এমন লোকও যার কেউ নেই।

—ওমা এ আবার কেমন কথা? আজ ব্যস্ত হবার কেউ নেই বলে অসুখ কী তুমি ডেকে আনবে না কী? না না তোমার ও সব কথা আমি শুনবো না। এমন করে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করো না—আমার মিনতি শোনো। নিজের শরীরের দিকে নজর দাও একটু।

নিজের দুর্বলতার কিছু পরিচয় দিয়ে ফেলেই লজ্জিত হয়েছিল সীমা। নিজেকে এত সহজে কারো কাছে প্রকাশ করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই সে নিজেকে সামলে নেয়। যথাসম্ভব সহজ কণ্ঠে বলে—না না মিস ডরোথি তোমার সঙ্গে আমি-তামাসা করছিলাম। এবার থেকে সত্যি সত্যি নিজের সম্বন্ধে আমি সাবধান হবো।

ওর সহজ সরল কথায় ভাবে মিস্ ডরোথিও হাসে। সীমা তার সাথে যে সুন্দর ব্যবহার করে তাতেই সে অত্যন্ত আনন্দিত আর কৃতজ্ঞ।

সীমা তাকে প্রভুত্বের বদলে ভালবাসা দিয়ে তার কাছ থেকে যে আন্তরিকতা আদায় করে নিয়েছে সংসারে সেইটাই সবচেয়ে দুর্লভ সামগ্রী

তাই সকালবেলায় আর কথা বাড়ায় না সে। সীমার পরিত্যক্ত ডিস কাপ নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায় হাসিমুখে। সীমাও আলনা থেকে তার জামাকাপড় টেনে নিয়ে বাথরুমের পথে পা বাড়ায়। তার আলমারির পিছনে যত বড় রহস্যের চাবিকাঠিই লুকানো থাক্ এখন তার অনুসন্ধানে সময় নষ্ট করার মত পর্যাপ্ত সময় হাতে নেই সীমার। ঘড়ির কাঁটা তাকে অফিসের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে তাকে তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

সমস্ত দিনের ছক্‌কাটা বাঁধাধরা রুটিনের ঘণ্টাগুলো আজকে যেন কিসের ঘোরে কেটে গেল।

কমলাক্ষের ঘরে শ্রুতিলিখন লিখতে গিয়ে তার আজ বারবার আটকে গেছে। পিনাকী তার যে চিঠি লিখে দেবার ফরমাস করেছে তাতে সে ঠিকানা ভুল করেছে। এমন কী পিনাকী আর কমলাক্ষ যখন সেই গতকালকার বৈকালিক ঘটনা নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা করছিল তখনও বারবার সে অন্তমনস্ক হয়ে গেছে। আবার কখনও বা খুব উত্তেজিত বোধ করেছে নিজেকে। আর একটু হলেই সে গতকাল সন্ধ্যায় যখন ল'ন পার হয়ে আসছিল তখন তার পাশ দিয়ে একজন লোক চলে যাওয়ার খবরটা বলে ফেলেছিল ওদের কাছে। কিন্তু বলে নি। কয়েকদিন আগে ছবির কথা বলে ফেলে কী রকম অপদস্থ হতে হয়েছিল তা সে ভোলে নি।

তার ওপর মহেন্দ্র সিং গতকাল রাত্রে তাকে এ ব্যাপারে বেশী আগ্রহ বা কৌতূহল প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, তাও তার মনে আছে।

তাই এ আলোচনা সে এড়িয়ে চলে।

ঘড়ির ঘণ্টা কাবার হলে আবার অন্ত ঘরে দ্রুতপদে এগিয়ে যায়। যেমন করেই হোক্ আজ তাকে তাড়াতাড়ি সারতে হবে কাজগুলো।

ন' নম্বর কামরায় জনাব হুসেন আলির ঘরে অবশ্য আজ তার কোন কাজ ছিল না। কারণ দিন তিনেক আগে মামুদপুরের থেকে কী একটা জরুরী তার আসায় তিনি কয়েকদিনের জন্ত তাঁর নিজের দেশে গেছেন।

কিন্তু জনাব আলি না থাকলেও মনোহরপুরের মহারাণীর আজ সীমাকে ভীষণ প্রয়োজন। বারবার ডাকতে পাঠিয়ে সীমাকে তিনি পাকড়াও করলেন।

একা একা থাকতে তাঁর নাকী ভীষণ ভয় করছে। তাই তিনি তাঁর একজন পরিচিত তরুণ গায়ককে গান শোনাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে, মহারাণীর ডান হাতখানি হঠাৎ ভীষণ ভাবে কেটে গেছে। তাই সেই গায়ক ভদ্রলোকটি এসে পৌঁছবার আগেই তাঁকে এবং তাঁর ঘরখানিকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়ার গুরু-দায়িত্ব তিনি সীমাকে দিয়ে বসে আছেন।

সুতরাং নয় নম্বর কামরার খাটুনিটা সুদে আসলেই উশুল করে নেবে মহারাণী।

সীমা বেচারী নিজের মনে একটু চিন্তা করার অবকাশও পেল না।

বিকেলে ল'নে আজ একটুখানি হাজিরা দিয়েই ডুব মারবে—ভেবেছিল সীমা। সেখানেও তাকে আটকালো এঞ্জেলা। ক'দিনই বা তার সাথে চেনা হয়েছে। কিন্তু এত প্রাণ ঢেলে ও সীমাকে ভালোবাসে যে, কোন কথা বলতেই তার আর বাধে না।

সীমার উত্তর যত সংক্ষিপ্তই হোক না কেন আপন খেয়ালে সে গল্প করে চলে।

—জানো সীমা, মা বলেছে—এ হোটেলটায় আর কিছুতেই থাকবে না। এ নাকি একটা গুণ্ডার আড্ডা তৈরী হয়েছে। আমার কিন্তু এ জায়গাটা খুব ভালো লেগেছে। অবশ্য কালকে বিকেলবেলা পিনাকীবাবুর ঘরে যে ব্যাপারটা হয়ে গেল তাতে মনটা যে একটু দমে যায় নি একথা বলতে পারি না। তবে ও ঘটনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী? আমাদেরও কেউ আক্রমণ করতে পারে এমন কথা আমার তো মনে বিশ্বাস হয় না। অবশ্য মা বলছেন—পিনাকীবাবুর ওপরেই বা এ রকম হল কেন? উনি তো খুবই ভালো লোক। আবার মুস্কিল কী হয়েছে জানো, পিনাকীবাবুর ওপরে যত আক্রমণ হচ্ছে মা ততই কমলাক্ষবাবুর জন্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। আমার এমন লজ্জা করে মা এক এক সময় এমন সব কথা বলেন তাতে যেন মনে হয় পিনাকীবাবুর জীবনের কোন দামই নেই। এ কী অন্যায় কথা বল তো? আমার কিন্তু ভাই পিনাকীবাবুর জন্যে সত্যি সত্যিই মন কেমন করে। আমার মায়ের জেদে পড়ে কমলাক্ষবাবুকে যদি সত্যিই শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে চলে যেতে হয়—মানে উনি যদি যদি রাজী হন, পিনাকীবাবুর তাহলে বড় কষ্ট হবে। তাই না?

সীমা অনেকক্ষণ নিজেকে দমন করে রেখেছিল কিন্তু এবার সে বলে ফেলে—আচ্ছা এঞ্জেলা, পিনাকীবাবুকে কে কি জন্যে এমন বারবার খুন করবার চেষ্টা করছে—কিছু আন্দাজ করতে পারো।

এঞ্জেলা উদ্বেগভরা গলায় বলে—কি জানি ভাই। কাল রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমরাও এই বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। মা বললেন—ঐ যে কে একজন বড়লোক পিনাকীবাবুকে পোষ্যপুত্র নিয়েছেন না, সম্ভবত তাঁরই সব আত্মীয়স্বজনরা পিনাকীবাবুর জীবনের ওপর এমন হিংস্র হয়ে উঠেছে। পিনাকী না থাকলে যারা বিষয় পাবে মনে হয় তারাই ওঁকে খুন করতে চায়। আমারও তাই তাই ধারণা। বাবাঃ অমন বিষয়ে কাজ নেই। উনি নিজে যা রোজগার করেন তাই তো যথেষ্ট। বিষয় পেতে গিয়ে শেষে প্রাণটা দিতে হবে কী?···কিন্তু ভাই পিনাকীবাবুর সাহসকে ধন্যবাদ। আমরা সবাই এমন কী কমলাক্ষবাবু পর্যন্ত কত করে বললাম—যে মিলিটারীর এত বড় পোষ্টে কাজ করেন দু'টো বডিগার্ড আনিয়ে সর্বদা কাছে রাখুন। —তা সে কথা কিছুতেই শুনলেন না? বললেন—এতটা অসহায় আমি নই। কাল বাঁ হাতে গুলী করেছিলাম সে গুলী যদি বা আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে থাকে সামনের বার এলে তাকে আর ফিরতে হবে না। ডান হাতটা এবার আমার প্রায় সেরে গেছে।

—বল তো ভাই কী অসম্ভব সাহস!···গল্প করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। দুই বন্ধু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পরস্পরের কাছ থেকে। এঞ্জেলা চলে যায় তার মায়ের কাছে। আর সীমা ভাবে এতক্ষণে তার অবকাশ মিলেছে।

সারাদিন ধরে সীমা ভেবেছিল আজ সন্ধ্যায় সে আলমারিটা সরাবে। রাত ন'টা পর্যন্ত এখানে আলো জ্বলে তাই আলো থাকতে থাকতে যেমন করেই হোক ঐ আলমারির পিছনে কী রহস্য আছে তা তাকে জানতে হবে।

কিন্তু সন্ধ্যায় সময় নিজের ঘরে এসে মত পালটালো সীমা। কেবলই তার মনে হতে লাগলো গত সন্ধ্যার মত মহেন্দ্র সিং যদি হঠাৎ এসে পড়েন? যদি ওঁর সুমুখে সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যায়? বারবার নানান কথার পৃষ্ঠে যিনি সীমাকে তার পরিমিত গণ্ডীর বাইরে কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাতে বারণ করেছেন, তিনি কি সীমার এতটা স্পর্ধা সহ্য করবেন? উনি অবশ্য প্রায়ই বলেন নিত্য সন্ধ্যার সময় ওঁকে এখানকার মালিকের কাছে সমস্ত দিনের কাজের হিসাব দিতে যেতে হয়—কিন্তু কালকে যে রকম নিঃশব্দে উনি সীমার ঘরে এসে পড়েছিলেন তাতে ওঁর কখন কী খেয়াল হয় বলা যায় না।

অবশ্য এমনও হতে পারে যে কালকে ওঁর কোন দাসী চাকরের প্রতি বিশেষ কোন নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। এই বাড়ীটার একতলাতেই তো দাসী-চাকরদের কামরা আছে—তাই উনি এ বাড়ীতে এসেছিলেন। আর বিকেলবেলা সীমাকে কালকে পিনাকীর ঘরে দেখে মনে মনে বিরক্ত ছিলেন আগে হতেই আর সেই জন্যেই ওকে একটু শাসন করে দেবার উদ্দেশ্যেই উনি এসেছিলেন ওপর তলায়।

কিন্তু আজ? আজ তো আর তাঁর এসে পড়বার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নেই। কিন্তু তবু তবুও পারে না সীমা। নিজের ঘরের দরজাটাকে বন্ধ করে দেবার সাহসও পায় না মনে।

আটটায় ডিনার শেষ করে ন'টায় আলো নিভলো।

এতক্ষণে নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করার সুযোগ পেল সীমা। তারপর নিত্যদিনের মত হাঁটু মুড়ে বিছানার ওপর বসে প্রার্থনা করলো সে।

নিজের মনটাকেও প্রস্তুত করে নিতে হবে তো? [ক্রমশঃ।

পেটুক রাজা

গৌর মোদক

এক যে ছিল পেটুক রাজা,
কেবল খেত মটর ভাজা।
না পেলে মোণ্ডা মেঠাই,
ক্ষিদের চোটে স্রেফ গাঁজাই।

রাজার রাণী কেবল খেত,
হাতের কাছে যা কিছু পেত।
গহনা-পত্তর শাড়ী কাপড়,
না পেলে ত' কেবল থাপ্পড়।

সে রাজ্যের প্রজারা সব,
সবই খেত গপ, গপাগপ,।
আর খাবি খেত তখন তারা,
ক্ষিদের চোটে যখন আত্মহারা।

মহাকবি কালিদাস 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' রসসাহিত্যের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন, বর্ত্তমান গ্রন্থটি তারই সরল বঙ্গানুবাদ। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এই গ্রন্থ প্রয়োজনীয় বলেই গৃহীত হবে। সহজ ভাষায়, সাবলীল ছন্দে লেখক এই মহাকাব্যকে ভাষান্তরিত করেছেন। মূল কাব্যের সামগ্রিক রস তাঁর অনুবাদে উপস্থিত, তদুপরি ভাষার লালিত্যে ও সাবলীলতায় কাব্যটির অপরূপ ধ্বনি মাধুর্য্যও পাঠকমনকে দাগ কাটে। স্বাক্ষর ব্যক্তিমাত্রই আলোচ্য অনুবাদটি পাঠ করে কবি কালিদাসের অনুপম রচনা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে সক্ষম হবেন। মহৎ সাহিত্যের এই ধরণের অনুবাদ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ, কারণ এরই মাধ্যমে বৃহত্তর পাঠকসমাজ ক্লাসিক সাহিত্যের সম্যক্ পরিচয়ে ধন্য হয়ে ওঠেন। সাহিত্যের এই বিশেষ প্রয়োজনীয় দিকটি সম্বন্ধে লেখক যে অবহিত হয়ে উঠেছেন তা সত্যই আনন্দের বিষয়। রসসৃষ্টিতে বর্ত্তমান অনুবাদকের ক্ষমতা প্রশংসনীয় আর সেজন্যই এই অনুবাদ কর্ম্মটি যথোপযুক্ত ভাবেই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। গ্রন্থটির আঙ্গিক সৌষ্ঠবও লক্ষ্যণীয়। অনুবাদক—কালীপদ দাস পুরাণরত্ন। প্রকাশনায়—অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস্, পোষ্ট বক্স ২৫৩১, কলিকাতা—১। দাম—পাঁচ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা

মহৎ সাহিত্যিকের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েই শুধু তাঁর অনুরাগী পাঠক-সমাজ তৃপ্ত হয় না, তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্যও উন্মুখ হয়ে থাকে, আর সেজন্যই প্রিয় সাহিত্যিকের অন্তরঙ্গ জীবনের খুঁটিনাটি কথাও সর্ব্বদাই সমাদৃত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক অমরশিল্পী শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সেই ধরণেরই কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। সকলেরই জানা আছে যে, এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সংকোচ ছিল অত্যন্ত অধিক, নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে তিনি কঠোর নিষ্ঠায় সঙ্গে লোক-লোচনের বাইরে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, সেজন্যই তাঁর সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহলও অপরিসীম, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁরা সেই কৌতূহল নিরসনের কিছু কিছু উপাদান পাবেন। গ্রন্থলেখক শরৎচন্দ্রের প্রীতিধন্য, তাঁর রচনায়ও সে ইঙ্গিত আছে, সুতরাং যে সব তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন তাদের প্রামাণ্য বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে স্বর্গত সাহিত্যকারের বেশ একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে লেখনীর যতটা বলিষ্ঠতা থাকলে এ ধরণের রচনা শিল্পোত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব, বর্ত্তমান গ্রন্থলেখক তা থেকে বঞ্চিত সেজন্যই তাঁর রচনা মাঝে মাঝে বোরিং বা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে, তবু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে দু'একটি নতুন কথা পাঠক জানতে পারেন, উপলব্ধি করতে পারেন জনগণ মনজয়ী অজেয় কথাশিল্পীর বিশেষ বিশেষ দু'একটি মানসিকতাকে। লেখকের ভাষা-রীতি সাবলীল, ভঙ্গী সহজ। বইটির আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল, প্রকাশক—শিল্পী-সংস্থা প্রকাশনী বিভাগ, ১৬৩ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫। দাম—দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

সেই বৃদ্ধা রূপসী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক অনুবাদ কর্ম্ম, Will Cather লিখিত 'The Old beauty and Others' নামক পুস্তকের সরল বঙ্গানুবাদ এটি। মোট তিনটি গল্প আছে বর্ত্তমান গ্রন্থে, প্রথম গল্পটির নামেই নামকরণ করা হয়েছে গ্রন্থের, আর নিঃসন্দেহে সেটিই এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প। গল্পের নায়িকা যৌবনোপান্তে উপস্থিতা এক বৃদ্ধা রূপসী—অতীত দিনের স্মৃতিচারণই যাঁর বর্ত্তমানে একমাত্র কাজ। বর্ত্তমানের কর্কশ অশালীন পরিবেশকে ছাড়িয়ে যেতে যাঁর মন সদাই উন্মুখ, একদা বিখ্যাতা সেই সুন্দরী লেডী লংষ্ট্রীটের সকরুণ আর্ত্তি সরাসরি ঘা দেয় পাঠক মনকে, সুন্দর ফুল বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ার মতই তাঁর

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত আর একটি মূল্যবান গ্রন্থ। 'চৈতন্য পরিকর'-এর প্রচ্ছদ চিত্র। লেখক রবীন্দ্রনাথ মাইতি।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত রচিত "গরীয়সী গৌরী" শীর্ষক পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীজননী সারদা দেবীর মানসকন্যা শ্রীশ্রীগৌরী মাতার জীবনী গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য। শিল্পী—কানাই পাল।
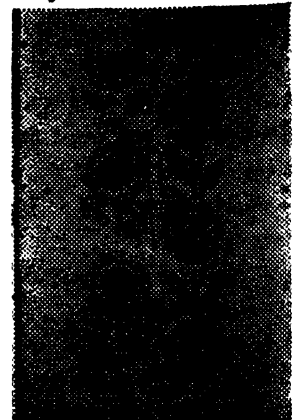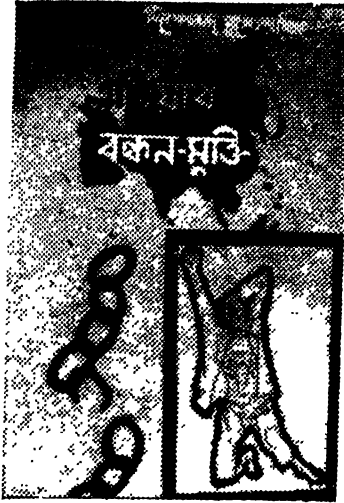
খ্যাতিমান সাংবাদিক ও সুলেখক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "এশিয়ার বন্ধন-মুক্তি" নামক গ্রন্থটির প্রচ্ছদ চিত্র। প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ। শিল্পী—শচীন বিশ্বাস।

জীবনাবসানের অধ্যায়টিও কৌতূহলোদ্দীপক ভঙ্গীতে বিবৃত হয়েছে। অনুবাদিকা মূল কাহিনীর রসকে অবিকৃত রেখেই ভাষান্তরের কঠিন কর্মে সফল হয়েছেন, তাঁর শৈলী স্বচ্ছন্দ ও সুষম পাঠকের রসোপলব্ধির পথে তা সহায়কই হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের গুরুত্ব অল্প নয়, কারণ ভাষানভিজ্ঞতার দেওয়াল ভেঙে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে এরই মাধ্যমে, আর সেইজন্যই সব ভাষার, সব সাহিত্যের ক্ষেত্রেই অনুবাদ কর্মের এক বিশেষ স্থান বর্তমান। আলোচ্য গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের সেই বিশেষ ক্ষেত্রে সমাদৃত হবে বলেই আমরা আশা করি। গ্রন্থটির ছাপা, বাঁধাই ও আঙ্গিক সাধারণ। অনুবাদিকা—রাণু ভৌমিক, প্রকাশক—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এঃ ১৩২, ১৩৩ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা।

নিষিদ্ধ এলাকা

বর্তমানে কথাসাহিত্যের আসরে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীই সর্বাপেক্ষা সমাদৃত হচ্ছে দেখা যায়, কল্পনার রথে চড়ে ভাবের পক্ষীরাজকে লাগাম মুক্ত করে দেওয়ার চেয়ে আজকের কাহিনীকার কঠিন মাটির বুকে দৃঢ় পদসঞ্চারেরই পক্ষপাতী, আলোচ্য গ্রন্থলেখকও তাঁদের দলভুক্ত। কারা প্রাচীরের অন্তরালে প্রতিদিন অভিনীত হচ্ছে জীবনের বিচিত্র সব নাটক, নিছক সত্য ঘটনা হয়েও ওরা বৈচিত্র্যে কল্পনাকেও পরাস্ত করে, আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকটি কাহিনীর মাধ্যমে সেই বৈচিত্র্যকেই পরিবেশন করেছেন লেখক। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী উদার, অনুভূতি মানবিকতার স্বাক্ষরবাহী, অপরাধ ও অপরাধীর নেপথ্যে কার্য্যকরী যে বঞ্চনার, যে নিপীড়নের ইতিহাস বিদ্যমান তাকেই তিনি তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে; অপরাধ করাটাই যে শেষ কথা নয় সেই সত্যের স্বাক্ষরেই চিহ্নিত তাঁর রচনা, আর সেইখানেই নিহিত রয়েছে তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা। বইটি পড়তে পড়তে মনে হয় ভাগ্য বিড়ম্বিত কয়েকটি মানুষকে নিয়ে তিনি রীতিমত চিন্তা করেছেন, বলতে চেয়েছেন তাদের কথা তাদেরই মত করে, আর বোধ করি সেজন্যই একটা সহজ আন্তরিকতায় ধন্য হয়ে উঠতে পেরেছে তাঁর রচনা। লেখকের ভাবরীতি সাধারণ, মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য পীড়াদায়ক ঠেকে, আশা করি ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে তিনি যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করবেন। বইটির প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—কাল-পুরুষ, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১। দাম—তিন টাকা।

বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ খেয়াল

বর্তমানে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত বা মার্গ-সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্য সাধারণের মাঝেও জেগে উঠছে, অন্ততঃ বিগত কয়েক বৎসরের ইতিহাস অনুধাবন করলেই দেখা যায় যে, বহু দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে বাঙ্গলা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখা দিয়েছে রাগ-সঙ্গীত তথা মার্গ-সঙ্গীতের উপর এক অসাধারণ আকর্ষণ, বলা বাহুল্য এ প্রবণতা স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ, বর্তমানে মার্গ-সঙ্গীতের বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্যে খেয়াল গানের প্রভাব প্রতিপত্তিই সমধিক, তার কারণ মার্গ-সঙ্গীতের পীঠস্থান উত্তর-পশ্চিম ভারতে কয়েক বছরের মধ্যেই খেয়াল গানের আদর কদর বেড়ে যাওয়া। বাঙ্গালীর পক্ষে এই গানের সম্যকরূপ পাওয়া সব সময়ে যে সুসাধ্য নয় তার একমাত্র কারণ ভাষার ব্যবধান। গানের ভাষা হিন্দী হওয়ায় বাঙ্গালী শ্রোতা সব সময়ে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হন না, আর এজন্যই বাঙ্গালা ভাষায় খেয়াল গান রচিত হওয়াটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। মার্গ সঙ্গীতের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থের মাধ্যমে। বহুবিধ উপমার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে বাঙ্গলা ভাষায় খেয়াল রচনা করা আদৌ দুঃসাধ্য নয় এবং তার আবেদনও যথেষ্ট। একশত তিনটি গান উদ্ধৃত করা হয়েছে এই গ্রন্থে, একান্নটি রাগের প্রকাশ হয়েছে, যাঁদের মধ্যে গ্রন্থকার স্বয়ং সুপরিচিত সঙ্গীতসাধক নিজের অভিজ্ঞতা ও শ্রম-প্রয়াসে তাঁর রচনা প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই, মার্গ-সঙ্গীতের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের কাছে বর্তমান পুস্তকটি যথাযোগ্য সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবে বলেই মনে হয়। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশক—ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—পাঁচ টাকা।

বিদগ্ধ সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলির "ভবঘুরে ও অন্যান্য" নামক রচনা সংকলনের প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য। শিল্পী—সুধীর মৈত্র।

দ্বিতীয় স্মৃতি

রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিমল গোস্বামী এক সুপরিচিত নাম, স্মৃতিকথামূলক তাঁর এই রচনা নানা কারণেই উল্লেখ্য। বিভিন্ন বিষয় ও ব্যক্তি সম্বন্ধে স্মৃতির ভাণ্ডারে যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তিনি, তাই উপস্থিত করেছেন পাঠকের সামনে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি রচনার মাধ্যমে। বিষয়-বস্তু বৈচিত্র্যে ও আন্তরিকতায় সবভাবেই সিক্ত, বর্ণনার গুণে বিশেষ ভাবেই জীবন্ত। বহু প্রখ্যাত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন লেখক। যার মধ্যে স্বনামধন্য দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) ও ৺শশিশেখর বসুর নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য, লেখকের কুশল কলমে উপরোক্ত চরিত্র দু'টি যেন নতুন করেই ধরা দেয় পাঠক মননে, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনাটি শুধুই কৌতুকাবহ নয়, কৌতূহলোদ্দীপকও। জানার মধ্য দিয়ে অজানাকে সন্ধান করেছেন লেখক, তাঁর রচনাও সেই সন্ধানেরই এক অক্ষয় স্বাক্ষর, তদুপরি রসাশ্রিত বেগবান ভাষার কল্যাণে বিশেষরূপেই মনোহারী। সাহিত্য রস ও কৌতুক-প্রবণতায় গ্রন্থোক্ত রচনাগুলি শুধু রসোত্তীর্ণই নয় রমণীয়ও। রসজ্ঞ পাঠকের কাছে বর্ত্তমান গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান বলেই পরিগণিত হবে। গ্রন্থটির ছাপা, বাঁধাই ও আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—পরিমল গোস্বামী, প্রকাশনায়—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাত রঙ সাত আকাশ

আলোচ্য কাব্য-সংকলনটি বিদেশী কাব্য-সাহিত্যের অনুবাদ। স্বল্প পরিসরে বিশ্বের কাব্য-সাহিত্যের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানে ব্রতী হয়েছেন লেখক। বাংলা-সাহিত্যের অনুবাদ শাখাটি আজ পুষ্পে পল্লবে শোভিত হলেও প্রধানতঃ তা নির্ভর করে কথা-সাহিত্যের উপরেই, কাব্য বিভাগটি যেন অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত, আর সেজন্যই বর্ত্তমান অনুবাদ গ্রন্থটি এক বিশেষ মর্য্যাদা পাওয়ার অধিকারী। অনুবাদক ভূমিকায় বলেছেন যে, কবি ও কবিতা নির্ব্বাচনে ব্যক্তিগত ইচ্ছারই অনুসরণ করেছেন তিনি, অর্থাৎ ভাল বলেই নয়—ভাল লাগে বলেই সংকলনভুক্ত হয়েছে আলোচ্য কবিতা-নিচয়। রসজ্ঞ পাঠকেরও সেই এক কথা, ভাল লাগাই প্রয়োজন আর নিঃসন্দেহে সে প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা আছে আলোচ্য কবিতাগুলির। রসে, রূপে, স্বাদে অতুলনীয় কবিতাগুলি যেন ভোরের শিশিরসিক্ত শিউলী, ছোঁয়া মাত্র টুপটাপ করে ঝরে পড়ে রসপিপাসু পাঠক মননে। কবিতাপ্রিয় পাঠকের হাতে বর্ত্তমান কাব্য-সংকলনখানি যে যোগ্য সমাদরে বঞ্চিত হবে না এ আশা করা অন্যায় নয়। বইটির আঙ্গিক উচ্চমানের। সংকলয়িতা ও অনুবাদক—শান্তিভূষণ রায়। প্রকাশক—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এঃ ১৩২, ১৩৩ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।
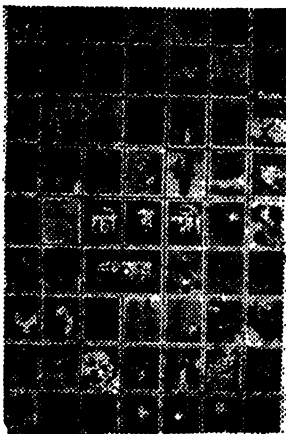
বাক্-সাহিত্য প্রকাশিত শঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস "চৌরঙ্গী" প্রচ্ছদ আলেখ্য। প্রচ্ছদশিল্পী—অজিত গুপ্ত।

শ্রীপান্থ রচিত ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী সঙ্কলন "সাত রাণী আট বেগম" গ্রন্থের প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। শিল্পী—পূর্ণেন্দু পত্রী।

Comparative Studies in Philosophy (Part I)

দর্শনশাস্ত্রের তুলনামূলক বিষয়ে রচিত হয়েছে বর্ত্তমান গ্রন্থটি, ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বিশিষ্ট চিন্তা-নায়কদের দৃষ্টিতে দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা কি রূপ ধরেছে তার এক প্রামাণ্য পরিচয় বিধৃত হয়েছে এর মাঝে। লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, কি ভাবে মানুষের মন বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক, বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কৃতির বাধা অতিক্রম করে দর্শনশাস্ত্রের মূল ভাবধারার ঐক্যসন্ধানী হয়ে উঠেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আপাত বিভিন্নতা সত্বেও যে মূলগত ঐক্য বর্ত্তমান, তাকেও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেন তিনি পাঠকের সামনে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের দর্শন সম্বন্ধে এক সুষ্ঠ তুলনামূলক আলোচনারও সূত্রপাত করেছেন তিনি এই উদ্দেশ্যে। জিজ্ঞাসু ও শিক্ষার্থী উভয়বিধ পাঠকই গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করি। বইটির অঙ্গসজ্জা, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ মানের। লেখক—অনাদিকুমার লাহিড়ী, প্রকাশক—শ্রী এ, কে, লাহিড়ী, ৯।১।১ আরপুলি লেন, কলিকাতা—১২। দাম—পাঁচ টাকা।

নীল শহরের পলি

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সংকলন, কবি চেয়েছেন কয়েকটি সহজ কবিতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে। কবিতাগুলি আশ্চর্য্য সরল, তথাকথিত দুর্ব্বোধ্যতার অলঙ্কার পরানো হয় নি এদের অঙ্গে, আর সেটাই বোধ হয় বিশিষ্ট করে তুলেছে এদের। 'কলকাতা' শীর্ষক

শ্রীনিরপেক্ষ রচিত "নেপথ্যদর্শন" শীর্ষক বহুজনপঠিত রচনাগুলির সংকলন গ্রন্থের প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। গ্রন্থটির প্রকাশ করেছেন—বাক্ সাহিত্য।

কবিতাটিতে কবি যখন বলেন 'বেঁচে আছি, এই কলকাতা—কী ভীষণ বাঁচার দীনতা, অহোরাত্র ট্রামের গোঙানি—যেন এক মুখরা রমণী, পীড়ন করিছে মোরে,' তখন অজ্ঞাতসারেই পাঠকের মনও ঘাড় দুলিয়ে সায় দিয়ে ওঠে। সরলতাও যে এক বিশিষ্ট আর্ট তারই স্বাক্ষর বহন করে আলোচ্য কবিতাগুলি, এদের পড়তে ভাল লাগে আর পড়বার পরেও মনে লেগে থাকে সে ভালো লাগার রেশ। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—জগদীশচন্দ্র দাস, প্রকাশক—অ্যাল্‌ফা-বিটা-পাবলিকেশন্‌স, কলিকাতা-১। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

Agriculture in Third Five years Plan

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান রচনায়। লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষিখাতে ব্যয়-বরাদ্দ করার পেছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে তার সাফল্যের উপরই যে দেশের সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল, তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে সেই সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেখানো হয়েছে এই গ্রন্থে। কৃষি-দপ্তরটি যে সরকারের অন্যান্য দপ্তরের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির এ কথাটা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে, এই আলোচনার উদ্দেশ্য সরকারের খাদ্যোৎপাদন নীতি সম্বন্ধে সাধারণকে ওয়াকিবহাল করে তোলা। অন্যান্য দপ্তর যেমন সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে থাকতে পারে, কৃষিবিভাগের পক্ষে তা সম্ভব নয়, কারণ এ ক্ষেত্রে সরকারকে কাজ চালাতে হয় সমগ্র দেশের কৃষিজীবীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমে। পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করতে শেখানোটাই এখন সরকারের সামনে এ বিষয়ে প্রধানতম সমস্যা। আলোচ্য গ্রন্থে কৃষির বিভিন্ন পর্য্যায় ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে; দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যাটি সম্বন্ধে রচিত আলোচ্য গ্রন্থটি প্রামাণ্য বলেই পরিগণিত হওয়ার যোগ্য; পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী লিখিত ভূমিকা গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধির সহায়ক। প্রকাশক—**Directorate of Agriculture Government of West Bengal, 1962. (For official use only.)**

পথ চলতি

আলোচ্য পুস্তকটি রম্যরচনা জাতীয়, বহু ভাষাবিদবিদগ্ধ লেখক জীবনের পথে চলতে চলতে দেশে বিদেশে বহু ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, পরিচিত হয়েছেন বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের সঙ্গে, সেই সব দেখা ও শোনার কিছু কিছু চিরস্থায়ী ছাপ দিয়ে গেছে তাঁর মননে, আলোচ্য গ্রন্থ তারই স্মৃতিচারণ। বর্ত্তমান পুস্তকের অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ইতিপূর্ব্বে। রচনাগুলিতে যে সাবলীল সৌন্দর্য্য বিদ্যমান তার স্বাদ পাঠকের মননে গভীর ছাপ এঁকে দেয়, বস্তুতঃ সেটাই এ রচনাগুলির মূল প্রাণসত্তা, পড়তে পড়তে পাঠক একাত্ম হয়ে যান লেখকের সঙ্গে, মনে হয় যেন বর্ণিত ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছে তাঁরও। 'শৈশব-স্মৃতি' শীর্ষক রচনাটি বহন করে আনে বিগত দিনের সরল মধুর জীবনযাত্রার এক অমলিন ছবি, আজকের এই সর্ব্বনাশা ভেজালের যুগে চন্দ্রকোণার খাঁটি দানাদার, ভয়সা ঘি-এর বর্ণনা শুধু পাঠকের মনকেই স্পর্শ করে না, রসনাকেও লোভ-চঞ্চল করে তোলে। বাঙ্গালী গৃহস্থ জীবনের পুরাতন সমাজচিত্র হিসাবে উক্ত রচনাটির মূল্য অনস্বীকার্য্য। খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত বিভিন্ন রচনাগুলির বিষয়বস্তুও বিভিন্ন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক ঐক্যের পরিচয় তারা বহন করে, সে ঐক্য নিহিত ভ্রাম্যমান এক পথিকের পথ চলতির ঝোলায়, পাকা রাঁধুনীর হাতের বিভিন্ন অন্ন-ব্যঞ্জন যেমন স্বাদে ও গন্ধে একেরই স্বাক্ষরবাহী। এই গ্রন্থোক্ত রচনাবলীও তাই, পরিবেশন পটুত্বে এক ও অনন্য ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় এরা সমুজ্জ্বল। বইটির প্রচ্ছদ-শিল্পসুষম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

শহরতলীর শয়তান

দার্শনিক শ্রেষ্ঠ বারট্রাণ্ড রাসেল কথাসাহিত্যের আসরে পদক্ষেপ করেছেন পরিণত বয়সে, আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর এই প্রচেষ্টারই প্রথম ফসল। মূল গ্রন্থ থেকে এই প্রচেষ্টাকে বাঙ্গালী পাঠকের সামনে

সুখ্যাত কথাকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস "পরম্পরা" গ্রন্থের প্রচ্ছদ-চিত্র। প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ। শিল্পী—শচীন বিশ্বাস।

তুলে ধরেছেন বর্ত্তমান অনুবাদক। মোট পাঁচটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এই গ্রন্থে, যার প্রতিটিই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মৌলিক, বিশিষ্ট মনীষীর চিন্তাধারার যে স্বাক্ষর তারা বহন করে এনেছে, তাও বিশেষ ভাবেই কৌতূহলোদ্দীপক। ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ নামীয় গল্পটি উল্লেখ্য, আধুনিক মানুষের জড়-বিজ্ঞান নিয়ে মাতামাতি কোন স্তরে উঠতে পারে সুনিপুণ হাতে তারই ছবি এঁকেছেন লেখক এখানে। অনুবাদক স্বচ্ছন্দে গল্পগুলির মর্ম্ম উদঘাটন করেছেন, ভাষার সাবলীলতায় ও গতির সহজতায় তাঁর অনুবাদকর্ম্মটি নিঃসন্দেহে শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে; আমরা গ্রন্থটির সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। বইটির আঙ্গিক রুচি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। অনুবাদক—অজিতকৃষ্ণ বসু (অকৃব)। প্রকাশনায়—রূপা এণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

স্বনামধন্য সাহিত্য শিল্পী রমাপদ চৌধুরীর "দেহলি দিগন্ত" নামক গল্পগ্রন্থের প্রচ্ছদ আলেখ্য। শিল্পী—সুধীর মৈত্র।

তবু প্রেম—তবু প্রাণ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য-সঙ্কলন, কয়েকটি এক জাতীয় রচনা একত্র গ্রথিত হয়েছে এতে। একটি বিশেষ মানসিকতার আভাস পাওয়া যায় বর্ত্তমান কাব্য সমষ্টিটির মধ্যে, যা একাধারে যন্ত্রণা ও আশ্বাসে উজ্জ্বল। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘনছায়ার মাঝেও থরথর করে কাঁপে যে প্রত্যয়ের প্রত্যাশা, লেখিকার মূল সন্ধান তারই উদ্দেশে, তাই তিনি বলেছেন, প্রেতায়িত হিমে আশঙ্কায় থরথর কাঁপা মানুষ উল্লাসে উদভাসিত হোক। অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্দেহ-মলিন জীবন-সংগ্রামে পর্য্যুদস্ত মানুষকে তিনি ডাক দেন শিল্পের আলো দেখতে, অন্বেষণ করেন সেই সংযোজন মন্ত্রের যা মেলাবে মানুষকে মানুষের সঙ্গে। এই বিশ্বাসই তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত, আন্তরিকতার সঙ্গে এই বিশ্বাসকেই তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন পাঠক-মননে। লেখিকা—নমিতা বসু-মজুমদার, প্রকাশক—শ্রীভবানীপ্রসাদ বসু, ৫/১বি।১এ রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা-২, পরিবেশক—ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—দুই টাকা।

সুবিনয় রায় লিখিত ও গীতবীথি প্রকাশনী (কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত "রবীন্দ্র সঙ্গীত সাধনা" গ্রন্থটির প্রচ্ছদ আলেখ্য। শিল্পী—পূর্ণেন্দু পত্রী।

কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন কাকদ্বীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন।

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৫৭

সেই রামকেলিতে প্রভুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই সনাতন আর রূপ আরেক রকম হয়ে গিয়েছে। বিষয়ব্যাপারে বা রাজকাজে আর মন বসছে না। কিন্তু কী করে গুরুভার রাজকার্য ছাড়বে তাও সমস্যা। নবাব যদি টের পায় আস্ত রাখবে না। সনাতন প্রধান মন্ত্রী আর রূপ খাসমুন্সি বা একান্ত সচিব। সরাসরি চাকরি ছাড়া মানেই তো প্রাণদণ্ড।

কিন্তু চাকরিতে আর স্পৃহা নেই। তা ছাড়া চাকরির ফলে বিস্তর পয়সা হয়েছে। বিষয়ত্যাগ না করলেই বা প্রাণে-মনে ভজন করা যায় কী করে? আর এই বিষয় নবাবই বাজেয়াপ্ত করুক এও তো অসহ্য।

দুই ভাই কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল, যাতে নির্বিঘ্নে অচিরে চৈতন্যচরণ পেতে পারে। মন্ত্রের সিদ্ধিলাভের জন্যে যে প্রাথমিক অনুষ্ঠান তাকেই পুরশ্চরণ বলে। কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল যেহেতু গৌরহরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

রূপ নবাবের কাছে ছুটি চাইল। কদিন পৈত্রিক বাড়ি মাড়গ্রামে ঘুরে আসি। গৌড়ের দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলায় এই মাড়গ্রাম।

ছুটি মঞ্জুর হল। সঞ্চিত অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে রূপ নিজের গ্রামে এসে পৌঁছুল। নৌকো ভরা এত ধন নিয়ে সে কী করে, কাকে দেয়? অর্ধেক দিয়ে দিল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সেবায়। বাকি অর্ধেকের অর্ধেক দিল আত্মীয়কুটুম্বকে, আর অবশিষ্ট বিশ্বাসী এক ব্রাহ্মণের কাছে গচ্ছিত রাখল যদি রাজদণ্ডে জরিমানা দিতে হয়। সনাতনের জন্যে গৌড়ে এক মুদির দোকানে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছে।

নীলাচলে রূপ লোক পাঠাল, প্রভু কখন বৃন্দাবনে রওনা হন আমাকে খবর দেবে। আমি অপেক্ষা করছি।

এদিকে সনাতনের কী অবস্থা।

সনাতন অসুখের ছল করল। কাজে ইস্তফা দিল না, ছুটির দরখাস্তও পাঠাল না, অসুখ হয়েছে বলে বাড়িতে বসে রইল। সরাসরি কাজে ইস্তফা দিলে নবাব নিশ্চয়ই তাকে কারারুদ্ধ করবে, ছুটি চাইলেও মঞ্জুর করবে না দরখাস্ত, ক্রুদ্ধ হবে। আর, নবাবের ক্রোধের ফলই কারাদণ্ড। রাজকার্যে মন নেই এই তো অস্বাস্থ্য। তাই অস্বাস্থ্যের কারণে গৃহকোণে বসে থাকি।

গৌড়েশ্বর হুসেন শা-এর প্রধান মন্ত্রী, সনাতন যদি অনুপস্থিত থাকে তবে রাজকাজ চলে কী করে? কী এমন অসুখ, নবাব রাজবৈদ্যকে বললে, যাও, দেখে এস। রাজবৈদ্য এসে বললে, অসুখ ভাণ মাত্র। সনাতন ভালো আছে, বাড়ীতে বসে শাস্ত্রচর্চা করছে।

'বলো কী? আমি নিজে যাচ্ছি।'

আচম্বিতে নবাব সনাতনের বাড়িতে এসে হাজির হল।

'চুপচাপ বাড়িতে বসে আছ, এ কী ব্যাপার?' নবাব হুমকে উঠল। 'এদিকে আমার কাজকর্ম চলে কী করে?'

বিনয়ে অবনত হয়ে সনাতন বললে, 'আমার আর কাজকর্মে রুচি নেই। আমার জায়গায় আর কাউকে বহাল করুন।'

'সে কী? সজ্ঞানে তুমি কাজে অবহেলা করছ?'

'আমি অপরাধী। যদি উচিত মনে করেন শাস্তি

নবাবের মনে হল পালিয়ে যাবার মতলব করছে। বার করছি চালাকি। তখুনি আদেশ দিল, একে নিক্ষেপ কর কারাগারে।

কদিন পরেই উড়িষ্যার সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। নবাব নিজে চলল সৈন্য নিয়ে। সনাতনকে বললে, 'তুমিও আমার সঙ্গে চলো।'

সনাতন বললে, 'মার্জনা করুন। আপনি যদি দেবস্থান কলুষিত করেন তা আমার সহ্য হবে না।'

বটে? নবাব বললে, কারাগারে একে হাতকড়া দিয়ে বেঁধে রাখো।

রূপ সনাতনকে চিঠি লিখে পাঠাল: 'আমি আর অনুপম বৃন্দাবনে যাচ্ছি প্রভুর চরণবন্দন করতে। তুমি যেমন করে পারো চলে এস।' 'তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে।' আরো লিখল: 'মুদির কাছে দশ হাজার মুদ্রা রেখে এসেছি, তাই মুক্তিপণ দিয়ে বেরিয়ে এস কারাগার থেকে।'

প্রয়াগে এসে শুনল প্রভু এখানে আছেন। রূপ আর অনুপমের আনন্দের অবধি রইল না। শুনল প্রভু চলেছেন বিন্দুমাধব দর্শনে। এগুলো দুই ভাই। দেখল পথে লক্ষ লোকের জনতা। 'কেহো কেহো হাসে কেহো নাচে গায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহো গড়াগড়ি যায়।'

ভিড় থেকে দু'ভাই সরে দাঁড়াল। তারা বুঝি পতিত, তারা বুঝি কলুষদৃষ্ট।

বিন্দুমাধব দর্শন করে প্রভুর প্রেমাবেশ হল। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে হরিধ্বনি করতে করতে নাচতে লাগলেন।

দক্ষিণ-ভারতের একজন ব্রাহ্মণ প্রভুর পরিচিত ছিল, সেই প্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিল। সেইখানেই রূপ আর অনুপম হাজির হল। দশনে দুইগুচ্ছ তৃণ ধরে দু'জনে প্রভুর উদ্দেশে দূর থেকেই পড়ল দণ্ডবৎ হয়ে।

প্রভু প্রসন্ন মুখে বললেন, 'ওঠো, এস আমার কাছে। কৃষ্ণের করুণা অপরিসীম। তোমাদের বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন।'

চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও আমার অপ্রিয় যদি সে ভক্তিহীন হয়। আর চণ্ডালও আমার প্রিয় যদি সে আমাতে ভক্তিমান থাকে। সুতরাং সে ভক্তচণ্ডালকেই দান করবে, তার বস্তুই গ্রহণ করবে, তাকেই পূজা করবে আমার মত।

মাথার উপর। তোমরাও যে ভক্তিধনে ধনী। তোমরাও যে তাই আমার হৃদয়গ্রাহ্য।

দু'ভাই প্রভুকে স্তুতি করল।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

কৃষ্ণপ্রেমদাতা মহাদাতা কৃষ্ণচৈতন্যনামধারী গৌর-তনু কৃষ্ণকে প্রণাম করি। দয়ালু যিনি নিজের প্রেম-সম্পদসুধায় অজ্ঞানমত্ত মানুষকে ভবরোগমুক্ত করেন সেই পরমপ্রভুর শরণ নিলাম।

প্রভু বললেন, 'সনাতনের কথা বলো।'

'সে তো রাজগৃহে বন্দী হয়ে আছে।' রূপ বললে, 'তুমি যদি উদ্ধার করো তবেই তার উদ্ধার সম্ভব। নচেৎ নয়।'

প্রভু বললেন, 'ভয় নেই। শিগগিরই সনাতন মুক্ত হবে।

ত্রিবেণী সঙ্গমের কাছেই প্রভুর আসন স্থির হল। দুই ভাই তার কাছেই বাসা নিল। বিপরীত তীরের এক গ্রাম থেকে দেখা করতে এল বল্লভ ভট্ট। কার এত ভাবভক্তির কথা শুনি, দেখি আমি স্বচক্ষে।

দেখতে এসেই চক্ষুস্থির। এ কে সানন্দসুন্দর শুদ্ধ লাবণ্যপ্রদীপমনোহর। তখুনি দণ্ডবৎ করল বল্লভ। প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। তখুনি সুরু হল কৃষ্ণকথা, আর কৃষ্ণকথা সুরু হলে সাধ্য কী, প্রেম সংবরণ করো। 'অন্তরে গরগর প্রেম—নহে সংবরণ।'

প্রভুকে বল্লভ নিমন্ত্রণ করল নিজগৃহে।

এই দুই ভাইকে দেখুন। রূপ আর অনুপম। অনুপমেরও আরেক নাম বল্লভ।

বল্লভ এগিয়ে এল, দু'ভাই দূরে পালাল। বললো, 'আমরা অস্পৃশ্য পামর, আমাদের ছুঁয়ো না।'

সে কী কথা! বল্লভ তাকাল প্রভুর দিকে। দু'ভাইয়ের দৈন্য দেখে প্রভু কিন্তু আনন্দিত। বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে, তুমি বৈদিক যাজ্ঞিক কুলীন, তুমি এদের ছুঁয়ো না। এরা হীন জাতি।'

'হীন জাতি?' বল্লভ বিস্ময় মানল: 'কিন্তু এদের মুখে যে কৃষ্ণনাম। যার জিভে কৃষ্ণনাম নৃত্য করে সে অধম হয় কী করে, অস্পৃশ্য হয় কী করে?' 'দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্তন। এ দুই অধম নহে, হয়ে সর্বোত্তম॥'

'হ্যাঁ, তুমি আমার প্রাণের কথাই বলেছ। যে

হীনতা দগ্ধ হয়ে গেছে। ভক্তিহীন বেদবিৎ-এর চেয়েও সে শ্লাঘ্য। যার ভগবানে ভক্তি নেই তার কৌলীন্য বা শাস্ত্রজ্ঞান বা তার জপতপ সমস্ত নিরর্থক। প্রাণহীন দেহের বসনভূষণের মতই অসার।'

প্রভুকে বল্লভ নিয়ে গেল নিজ ঘরে। নতুন গৈরিক পরিয়ে গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপে অর্চনা করল। ভিক্ষা করিয়ে শয়ন করাল। নিজে বসল পা টিপতে।

ত্রিহুতবাসী পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায় এল দেখা করতে।

'কৃষ্ণে মতি স্থির থাকুক।' প্রভু আশীর্বাদ করলেন। 'বলো কৃষ্ণকথা।'

রঘুপতি বিহ্বল হল আনন্দে। বললে, 'ভব-ভীত মানুষ শ্রুতি স্মৃতি মহাভারত ভজন করে করুক, আমি শুধু নন্দকে বন্দনা করি।'

'নন্দকে?' কে জিগগ্যেস করল।

'হ্যাঁ নন্দেরই অলিন্দে পরব্রহ্ম বিরাজ করছেন।' 'অহমিহ নন্দং বন্দে। যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।'

প্রভু বললেন, 'আরো বলো।'

'কাকেই বা বলব, কে-ই বা বিশ্বাস করবে, যমুনাতটে পরব্রহ্ম অল্পবয়স্কা গোপবধূদের সঙ্গে খেলা করছে!'

প্রভু প্রশ্ন করলেন, 'উপাধ্যায়, কাকে তুমি শ্রেষ্ঠ মানো?'

'কৃষ্ণের শ্যামরূপকেই শ্রেষ্ঠ মানি।' 'শ্যামমেব পরং রূপং।'

'কৃষ্ণের কোন বাসস্থান শ্রেষ্ঠ?'

'বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ।' 'পুরী মধুপুরী বরা।'

'বাল্যপৌগণ্ড কৈশোর—কৃষ্ণের কোন বয়স শ্রেষ্ঠ?'

'কৈশোর।' 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং।' কৈশোরেই কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি।

'আর রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?'

'রসের শ্রেষ্ঠ মধুর।' 'আদ্য এব পরো রসঃ।'

প্রেমাবেশে প্রভু রঘুপতিকে আলিঙ্গন করলেন। এত প্রেম কি মানুষে সম্ভব? রঘুপতি স্থির করল এই সন্ন্যাসীই স্বয়ং কৃষ্ণ। 'মনুষ্য নহে, ইঁহো কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার।'

বল্লভের দুই ছেলে এসে প্রণত হল। ভেঙে পড়ল গ্রামের লোক। আমার বাড়ি চলুন—আমার বাড়ি। নিমন্ত্রণের হুল্লোড় পড়ে গেল। বল্লভ বিরক্ত হয়ে বললে, 'এখান থেকে নিমন্ত্রণ করলে চলবে না। যদি ইচ্ছে থাকে, প্রয়াগে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে।'

তখন নিবৃত্ত হল জনতা।

বল্লভ প্রভুকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল প্রয়াগে। সেখানেও লোকারণ্য। নির্জনতার আশায় প্রভু দশাশ্বমেধ ঘাটে এলেন। রূপকে নিলেন সঙ্গে, শিক্ষা দিতে বসলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সমস্ত ভাগবত-সিদ্ধান্ত। রামানন্দের সঙ্গে বসে যত মীমাংসা করেছিলেন—সমস্ত। পরে বললেন, 'এবার বৃন্দাবনে যাও।'

শোনো তবে ভক্তিরসের লক্ষণ।

ভক্তিরসের সমুদ্র গম্ভীর, সীমাশূন্য। তুমি শুধু এর একবিন্দু আস্বাদ করো। জীব সূক্ষ্মতম বস্তু, সংখ্যায় অনন্ত। স্বীয় কর্মফলে চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করছে। সে ঈশ্বরের শাসনাধীন। ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। জীবের মধ্যে আবার দুরকম ভেদ—স্থাবর আর জঙ্গম। জঙ্গমে আবার তিনরকম ভেদ—জলচর, স্থলচর, তির্যক। মানুষ স্থলচরের মধ্যে। সমগ্র জীবমণ্ডলের তুলনায় অত্যল্প। আবার মানুষের মধ্যেও কত কম লোক বেদনিষ্ঠ। যারা বেদনিষ্ঠ অর্থাৎ যারা বেদ মানে, সেতার মধ্যে অর্ধেক শুধু মুখে মানে, প্রাণে মানে না, অর্থাৎ বেদনির্দিষ্ট কর্ম করে না বরং বেদনিষিদ্ধ পাপকর্ম করে। যারা বেদবিহিত অনুষ্ঠান করে, তাদের মধ্যে জ্ঞানীই বা ক'জন? কোটি কর্মনিষ্ঠের চেয়ে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী জীব-ব্রহ্মের অভেদ মানলেও ভক্তিহীন থাকতে পারে না। জ্ঞানীও ভক্তির জোরেই ব্রহ্মের সঙ্গে সাজুয্য চায়।

কোটি-কোটি জ্ঞানীর মধ্যে যদি একজনমাত্র মুক্ত হয়। আর কোটি মুক্ত মধ্যে যদি একজনমাত্র কৃষ্ণভক্ত হয়। তা হলেই দেখ কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা কত সামান্য। 'দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।'

কৃষ্ণভক্ত কী রকম?

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, তার নিজসুখের বাসনা নেই। তাই সে শান্ত, অচঞ্চল। যারা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী তারা উদ্‌বিগ্ন, তারা অশান্ত। ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করতে-করতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকৃপায় বা কৃষ্ণকৃপায় ভজনাকাঙ্খা পেয়ে যায়। শুধু মহৎকৃপাই কৃষ্ণভক্তির উৎস।

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥'

মহৎকৃপা ছাড়া কিছু হবার নয়। 'মহৎ-কৃপা বিন

কোন ধর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥' আর এই মহৎ-কৃপা দুই রূপে অভিব্যক্ত হয়,—হয় গুরুরূপে, নয় অন্তর্যামিরূপে। 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥' অন্তর্যামী বা চৈত্ত্যগুরুর ইঙ্গিত জীব সহজে বুঝতে পারে না, তাই কৃষ্ণ সাধারণত মহান্ত বা গুরুরূপে জীবকে কৃপা করে। 'জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥'

ভাগ্যবান হব কিসে? সাধুসঙ্গে। সাধুসঙ্গ করে মহৎকৃপা আকর্ষণ করব। আর সেই মহৎকৃপার ফলে কৃষ্ণভক্তি জাগবে। যদি সেই ভজনপ্রবৃত্তি জাগে, তবে তা ভাগ্য ছাড়া আর কী।

তারপরে সেই বীজে জলসেচন করো। শ্রবণ-কীর্তনই সেই জলসেচন। জলে লতার বৃদ্ধি। শ্রবণ-কীর্তনেই ভজনেচ্ছা বলবতী।

'মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন॥'

বীজ থেকে অঙ্কুর। অঙ্কুর থেকে লতা। জল সেচনে বাড়তে-বাড়তে লতা কারণসমুদ্র, ব্রহ্মলোক ও পরব্যোম ভেদ করে একেবারে কৃষ্ণলোকে গোলোক-বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হয়, কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে—বৃক্ষকে আশ্রয় করে—লতা ক্রমশই বিস্তারিত হতে থাকে, পুষ্পিত ও ফলান্বিত হয়। কী ফল ধরে? প্রেমফল।

দেখো, যেন বৈষ্ণবাপরাধ করে বোসো না। বৈষ্ণবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অনাদর করা, ক্রোধ করা, বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষ প্রকাশ না করা—এই সব বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ যেন মত্ত হাতি, অনায়াসেই ভক্তিলতার মূলোচ্ছেদ করে দিতে পারে। সুতরাং সাবধানতার বেড়া দাও। যাতে মূল না ছেঁড়ে, পাতা না শুকোয়। নিরন্তর জলসেকে লতাকে সজীব রাখো।

আরো দেখো—লতার অঙ্গ থেকে উপশাখা না ওঠে। উপশাখা কী? ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা উপশাখা। নিষিদ্ধাচার, প্রাণিহিংসা, লাভ-প্রতিষ্ঠা কুতর্ক-কুটিলতা উপশাখা। উপশাখা জন্মালে লতার পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া অন্য কামনাই দুর্বাসনা। আর দুর্বাসনাই দুঃসঙ্গ।

করবে। বাড়তে দেবে মূলশাখাকে। যত জলসেক সব এই মূলশাখায়।

তারপরেই কালক্রমে লতায় ফল ধরবে, ফল পাকবে। সে তো প্রেমফল। পরম ফল। 'প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।' সেই ফলই পরম পুরুষার্থ। তার কাছে আর চার পুরুষার্থ,—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তৃণতুল্য।

যে একবার কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ পেয়েছে, তার কাছে, অষ্টসিদ্ধি বা সমাধি দূরের কথা, ব্রহ্মানন্দও স্পৃহনীয় নয়।

যে শুদ্ধভক্ত, তার কৃষ্ণছাড়া অন্য বাঞ্ছা নেই, কৃষ্ণ ছাড়া অন্য পূজা নেই। তার সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। চোখে বিগ্রহদর্শন, কানে নামগুণলীলা শ্রবণ, নাকে প্রসাদী তুলসী ও ফুলের ঘ্রাণগ্রহণ, জিভে নামকীর্তন, ত্বকে গন্ধমাল্যের স্পর্শানুভব, হাতে মন্দিরমার্জন, পায়ে তীর্থভ্রমণ, মনে লীলাস্মরণ, বুদ্ধিতে কৃষ্ণসঙ্কল্প গ্রহণ, অহঙ্কারে কৃষ্ণদাসত্বের অভিমান-পোষণ আর চিত্তে কৃষ্ণান্বেষণ। যেহেতু কৃষ্ণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁর সেবা করবে। কৃষ্ণানুকূল্যে যে সেবা তাই ভক্তি। স্বসুখবাসনাহীনা কৃষ্ণসুখসাধিনী সেবা। অবিচ্ছিন্না অনিমিত্তা অব্যবহিতা।

ব্রজগোপীরাই মধুররসের মুখ্য ভক্ত। তাদের রতিই কেবলা রতি, শুদ্ধমাধুর্যময়ী, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখলেও তাদের প্রীতি সঙ্কুচিত হয় না। কৃষ্ণ পরিহাস করলে রুক্মিণীর ভয় হয়, কৃষ্ণ বুঝি তাকে ত্যাগ করবে। ব্রজগোপীদের সেই ভয় নেই। কৃষ্ণের মুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখেও যশোদা সঙ্কুচিত হল না, আপন গর্ভের পুত্র মনে করেই বুকে চেপে ধরল, সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানকে আড়াল করল তার বাৎসল্য। বনপথে চলতে চলতে শ্রান্ত রাধিকা কৃষ্ণকে বললে,—আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমাকে বহন করে নিয়ে চলো। কৃষ্ণ বললে,—বেশ, আমার কাঁধে ওঠ। রাসলীলায় কৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য দেখেছে রাধা, তবু তার মধুরারতি সঙ্কুচিত হয়নি। কে বলে কৃষ্ণ ঈশ্বর, রাধার কাছে সে তার প্রাণবল্লভ ছাড়া কিছু নয়।

শিক্ষাদানের পর প্রভু বললেন—আমি এবার কাশী যাব।

রূপ আর অনুপম সঙ্গী হতে চাইল। প্রভু বললেন,—'বলেছি, তোমরা বৃন্দাবনে যাবে। সেখানে কিছু দিন কৃষ্ণভজন করো। পরে নীলাচলে গিয়ে আমার সঙ্গে

প্রভু নৌকোয় উঠলেন।

স্বপ্নে চন্দ্রশেখর স্বপ্ন দেখল প্রভু আসছেন। ভোর হতেই সে পথে বেরুল, আগ বাড়িয়ে মিলবে প্রভুর সঙ্গে। কিছুদূর এগুলেই দেখতে পেল—ঐ প্রভু। পায়ে লুটিয়ে পড়ল চন্দ্রশেখর।

নিজ গৃহে নিয়ে গেল। তপন মিশ্র বললে, 'যেখানে খুশি থাকো কিন্তু ভিক্ষা একমাত্র আমার ঘরেই করতে হবে।'

'তাই করব।' বললেন প্রভু, 'কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কোথাও একত্র আহার করব না।'

দিন-পাঁচ-সাত তো মোটে থাকবেন। স্থায়ীভাবে তাই তপন মিশ্রের নিমন্ত্রণই স্বীকার করে নিলেন। এখানে সন্ন্যাসীরা কেউ আসবে না। অন্য কেউ নিমন্ত্রণ করতে এলে বলা যাবে আগে থেকে আবদ্ধ হয়ে আছি।

[ক্রমশঃ।

ভারত মহাসাগর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

এই পৃথিবীর মোট আয়তনের শতকরা ১৪ ভাগই হল ভারত মহাসাগর—এর আয়তন ২৮০০০০০০ বর্গমাইল এশিয়া ও আফ্রিকা এই দুটি মহাদেশ একত্র করলে যতখানি তার চেয়েও এই মহাসাগর বড়। সাধারণভাবে এই অঞ্চলের একটা পরিমাপ করা হয়েছে এবং কি কি জীবজন্তু সেখানে রয়েছে সে সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরের গভীরে ভারত মহাসাগরের তুলনায় তিনশ গুণ বেশী তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছে। আর ঐ মহাসাগরের অর্ধেক খণ্ডে কি কি জীবজন্তু যে আছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাই হয়নি, কোন কিছু জানা যায়নি। এ সব বিবেচনা করেই স্পেশ্যাল কমিটি বর্তমানে সায়েণ্টিফিক কমিটি অন ওশ্যানিক রিসার্চ অর্থাৎ মহাসাগরিক গবেষণা সম্পর্কে বিশেষ (বর্তমানে বৈজ্ঞানিক) কমিটি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মিলিত উদ্যোগে প্রথম তথ্য সন্ধানের ক্ষেত্র হিসাবে ভারত মহাসাগরকেই বেছে নিয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মিলিত উদ্যোগে এই মহাসাগরে আরও তথ্যানুসন্ধান চলছে এবং কমিটির অধিকাংশ উদ্যমই এই ব্যবস্থা গড়ে তোলায় নিয়োজিত হয়েছে। ১৯৬০ থেকে এই গবেষণা শুরু হয়েছে, ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এই তথ্যানুসন্ধান চলবে। ভারত মহাসাগর ও তার আশেপাশে তীরবর্তী যে সকল রাষ্ট্র রয়েছে তারা সকলেই এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করছে। তাছাড়া এলাকার বাইরের সাতটি রাষ্ট্রও এতে সহযোগিতা করছে। এরই একটি হল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাহাজ ও বিজ্ঞানীদের এই পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করেছে। এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই তথ্য সংগ্রহে তিন ভাবে সাহায্য করছে। দু' বছরের এই তথ্য-সন্ধানী পরিকল্পনায় বিশ্বের প্রায় ২৫টি রাষ্ট্র ৪৪টি জাহাজ প্রেরণ করেছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে জাহাজ সরবরাহের ব্যাপারে সর্বাধিক সাহায্য করছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অন্ততঃ দশটি জাহাজ প্রেরণ করেছে। এই দশটি জাহাজের মধ্যে দুটিকে ১৯৬০-৬৪ সালে ভারত মহাসাগরে তথ্য-সন্ধানী অভিযানে নিয়োগ করা হচ্ছে। এদের সাহায্যে সামুদ্রিক জীব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ইউ এস এস উইলিয়ামসবার্গ নামে জাহাজটি এই দুটির অন্যতম। এটি ছিল আমেরিকার প্রেসিডেণ্টদের। প্রেসিডেণ্ট হ্যারি ট্রুম্যান এই জাহাজটি ব্যবহার করেছেন। অতঃপর মার্কিণ নৌবাহিনী এই জাহাজটি দিয়েছে ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশানকে। ফাউণ্ডেশানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে উডস হোল ওশ্যানোগ্র্যাফিক ইনষ্টিটিউশান এই জাহাজটিকে তথ্যসন্ধানের কাজে নিয়োজিত করেছেন। বর্তমানে প্রখ্যাত দিনেমার সামুদ্রিক জীব-বিজ্ঞানী অ্যানটন ব্রুনের নামে এই জাহাজটির নূতন নামকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর ছিল বিপুল আগ্রহ। ১৭০০ টন ও ২৪৩ ফুট দৈর্ঘ্যের এই জাহাজটির এজন্য বহু পরিবর্তন করা হয়েছে। যে সকল কামরা প্রেসিডেণ্ট ব্যবহার করতেন সে সকল গবেষণাগারে পরিণত করা হয়েছে। একটি ঘরে আছে সমুদ্রের জলের ট্যাঙ্ক সেখানে জীবন্ত সামুদ্রিক জীব পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করা হয়। আর একটিতে আছে অণুবীক্ষণ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সমুদ্রের তলদেশ থেকে উপকরণ সংগ্রহের জন্য ক্রেন ও উইনচ প্রভৃতি যন্ত্র আছে ঐ জাহাজের ডেকে। এটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এবং খাদ্যবস্তু হিমায়িত করার ব্যবস্থাও এই জাহাজে রয়েছে। এই জাহাজে রয়েছেন ত্রিশ জন বিজ্ঞানী ও সমসংখ্যক নাবিক। ঐ জাহাজটি ভারত, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, মরিশাস, আফ্রিকা, আরব এবং মাদাগাস্কারের উপকূলবর্তী অঞ্চলে তথ্য সংগ্রহ করছে। সমুদ্রের উপর থেকে তলা পর্যন্ত সকল তথ্যই এই জাহাজটির সাহায্যে সংগৃহীত হচ্ছে। সমুদ্রের গভীরে আলো কি পরিমাণে প্রবেশ করে তার পরিমাণ করা হচ্ছে। সমুদ্রের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রাথমিক ও অন্যান্য জীবের অস্তিত্বের সন্ধান করা হচ্ছে। এর ফলে সামুদ্রিক মৎস্য যে পরিবেশে জন্মায় তা জানা যাবে। চিংড়ী, গভীর সমুদ্রের সামুদ্রিক জীবজন্তু এবং গাছপালারও সন্ধান এর ফলে পাওয়া যাবে। এই এলাকার তথ্য সন্ধানের জন্য ভেগা নামে আর একটি জাহাজও নিয়োগ করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগরে সামুদ্রিক মৎস্য ও অন্যান্য জীব প্রচুর পরিমাণে রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই অঞ্চলে মৎস্য সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের ব্যাপারটি ভারত এবং ঐ এলাকার অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন বসতি অঞ্চল হল ঐ এলাকা। এখানে অপুষ্টি জনিত যে সকল সমস্যা রয়েছে এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে তার অনেকখানি রাহা হতে পারে।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আট

। গ ।

বৃন্দাবন। বেচারা বৃন্দাবন। টাকাগুলো কোমরে গুঁজে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। মহেন্দ্র সাহার ঐ বাগান-বাড়িতে অনেকগুলো বছর সে কাটিয়েছে এবং কখনো জীবনে ভাবেনি ঐ বাড়ি ছেড়ে তাকে চলে আসতে হবে।

মহেন্দ্র সাহা লোকটা দুশ্চরিত্র, মাতাল ও খেয়ালী ছিল বটে তবে তার হৃদয় বলে একটা বস্তু ছিল। কখনো কারো প্রতি নির্মম নিষ্ঠুর ব্যবহার করেনি। ক্ষীরোদার প্রতি কেন যে মহেন্দ্র সাহা অমন নিষ্ঠুর ও নির্মম অকস্মাৎ হয়ে উঠেছিল সেটা বৃন্দাবনের সত্যিই বোধগম্য হয়নি।

অবিশ্যি ক্ষীরোদাকেও দুর্বোধ্য লেগেছে রীতিমত বৃন্দাবনের। ক্ষীরোদাকে সত্যিই সে বুঝতে পারেনি। মেয়েমানুষ, অথচ টাকাকড়ি গহনা প্রভৃতির দিকে নজর নেই এ কেমন ধারা মেয়েমানুষ। ক্ষীরোদার মত মেয়েমানুষ সত্যিই বৃন্দাবনের তার আগে আর নজরে পড়েনি।

আশ্চর্য! কিছুরই যেন মেয়েটার প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীর যাবতীয় সব-কিছুর উপরেই যেন বৈরাগ্যের নিস্পৃহতা। শেষ রাত্রের দিকে জনহীন রাস্তা ধরে চলতে চলতে হঠাৎই যেন ক্ষীরোদার মুখখানা বৃন্দাবনের মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

মনে পড়ে বৃন্দাবনের সেই রাতটার কথা।

মেয়েটা ত' নয়, তাকে যে মা বলে ডেকেছিল বৃন্দাবন। কেন যে হঠাৎ মা বলে ক্ষীরোদাকে ডেকেছিল, তা জানে না বৃন্দাবন তবে মা বলে তাকে ডেকেছিল।

মা বলে ক্ষীরোদাকে ডেকে বুকটা তার ভরে গিয়েছিল যেন। নিজের মাকে বৃন্দাবনের মনেও পড়ে না। জন্মাবধি মা-বাপকে সে দেখে নি। অবিশ্যি সে জন্ম বৃন্দাবনের কোন দুঃখও ছিল না। যাদের কোন স্মৃতিই তার মনের মধ্যে ছিল না তাদের জন্ম দুঃখই বা হবে কেন।

যোগীন্দ্র গোয়ালার ঘরে সে মানুষ।

যোগীন্দ্র দুধের জোগান দিত মহেন্দ্র সাহার গৃহে, সেই সূত্রেই যাতায়াত ছিল মহেন্দ্র সাহার গৃহে যোগীন্দ্রর। যোগীন্দ্রই একদিন তার হয়ে মহেন্দ্র সাহার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল, দয়া পরবশ হয়ে মহেন্দ্র সাহা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল।

কিছুদিন মহেন্দ্র সাহার বাড়িতেই ছিল সে তারপর তাকে এনে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িটার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করেছিল।

দীর্ঘ চোদ্দ বছর ছিল ঐ বাগান-বাড়িতে।

আজ চোদ্দ বছর পরে সেই আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে দাঁড়াল রাস্তায়।

মনে পড়লো বৃন্দাবনের মাত্র কয়মাস আগে ঐ বাগানবাড়ি থেকেই বিতাড়িত হয়ে ক্ষীরোদা এসে তারই মত এমনি করে পথে দাঁড়িয়েছিল।

দুর্বল দেহে কোনমতে পায়ে চলে পথ অতিক্রম করে ক্ষীরোদাকে নিয়ে গিয়ে সে উপস্থিত হয়েছিল সে রাত্রে কস্তুরী বাঈজীর গৃহের দ্বারে। এবং দ্বারে তালা ঝুলতে দেখে ক্ষীরোদা বসে পড়েছিল ক্লান্ত অবসন্ন সেই বন্ধ দ্বারের সামনে। তারপরই সহসা জ্ঞান হারিয়েছিল।

ক্ষীরোদার সংজ্ঞাহীন দেহটার সামনে বসে বৃন্দাবন যখন ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠে ডাকছে, মা—মা-গো—ক্ষীরোদার কোন সাড়া নেই, ঐ সময় ছম্‌ব্রো ছম্‌ব্রো শব্দ করতে করতে কাহারেরা এসে কস্তুরীর পাল্কীটা দোরগোড়ায় নামাল।

পাল্কী থেকে নেমে ক্ষীরোদা ও বৃন্দাবনকে ঐ অবস্থায় দেখে কস্তুরী ত' হতভম্ব।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে কস্তুরী—কে। একি বৃন্দাবন—

এসেছো বাঈজী সাহেবা—কেঁদে ফেলে বৃন্দাবন, এই দেখো মা বোধহয় মারা গেছে—

মারা গেছে?

হাঁটু গেড়ে চেতনাহীন ক্ষীরোদার শিয়রের কাছটিতে দামী বেনারসী পরিহিতা, কস্তুরী বাঈজী মাটিতে ধুলাতেই বসে পড়ে।

ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকে, ক্ষীরোদা—ক্ষীরোদা—

সাড়া নেই ক্ষীরোদার। ইতিমধ্যে কস্তুরীর দাসী মোক্ষদা আর মাণিক এসে উপস্থিত হয়; বাঈজীর অনুপস্থিতিতে সে ও ভৃত্য মাণিক দরজায় তালা লাগিয়ে আগের রাত্রে তার বোনঝির ওখানে গিয়েছিল।

কস্তুরী মোক্ষদাকে দেখে ধমকে ওঠে, কোথায় গিয়েছিলি তোরা দরজায় তালা লাগিয়ে—শিগগিরী দরজা খোল।

মোক্ষদা আর মাণিক ছুটিতেই অপ্রস্তুত হয়ে যায়। বাঈজীর আরো ছুটি পুরে ফিরবার কথা ছিল। সে যে দুদিন আগেই চলে আসবে তারা বুঝতে পারেনি।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি? আবার ধমকে ওঠে মোক্ষদাকে কস্তুরী যা শিগগিরী একটা ঘটিতে করে জল নিয়ে আয়।

ইতিমধ্যে মাণিক দরজার তালা খুলে দিয়েছিল, মোক্ষদা ছুটে গিয়ে জল নিয়ে আসে। চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে কিছুক্ষণ পর ক্ষীরোদা চোখ মেলে তাকায়।

ক্ষীণকণ্ঠে অস্ফুট একটা কাতোরক্তি করে ক্ষীরোদা, উঃ মাগো—

মুখের পরে ঝুঁকে পড়ে কস্তুরী, ক্ষীরোদা—

কে?

আমি কস্তুরী, এখন কেমন বোধ করচো?

আমি কোথায়? ক্ষীণকণ্ঠে শুধায় ক্ষীরোদা।

কস্তুরী নিজের কোলের 'পরে ক্ষীরোদার মাথাটা তুলে নিয়েছিল, তার ভিজা চুলে হাত বুলাতে বুলাতে সস্নেহে বলে, তুমি আমার কাছে আছ ক্ষীরোদা। এখন একটু ভাল বোধ করচো কি?

ক্ষীরোদা উঠে বসবার চেষ্টা করে।

বাধা দেয় কস্তুরী, বলে, না-না, উঠো না। শুয়ে থাকো।

কিন্তু ক্ষীরোদা বাধা মানে না। উঠে বসে।

যেতে পারবে বাড়ির ভিতরে? কস্তুরী জিজ্ঞাসা করে।

কেমন যেন অসংশয় দৃষ্টিতে তাকায় কস্তুরীর মুখের দিকে ঐ প্রশ্নে ক্ষীরোদা। বলে, বাড়ি?

হ্যাঁ, যেতে পারবে?

পারবো।

কস্তুরীর সাহায্যেই অতঃপর ক্ষীরোদা কোন মতে টলতে টলতে বাড়ির ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে। একপাশে এতক্ষণ ছল ছল চোখে দাঁড়িয়ে ছিল বৃন্দাবন।

কস্তুরী তাকেও ডাকে, এসো বৃন্দাবন···

বৃন্দাবনের মুখ থেকেই কস্তুরী ক্ষীরোদার দুর্ভাগ্যের আত্যোপান্ত ব্যাপারটা শোনে। শুনতে শুনতে কস্তুরীর দু'চোখের তারা যেন জ্বলে ওঠে। মহেন্দ্র সাহা লোকটা চিরদিনই নীচ ও স্বার্থপর প্রকৃতির কিন্তু সে যে এত নীচ—এত স্বার্থপর সেটাই জানত না কস্তুরী। মনে হয় কস্তুরীর, স্বার্থপর ঐ নীচ পশুটাকে যদি সে উচিত মত শিক্ষা দিতে পারত তবে বুঝি শান্তি পেত। কিন্তু মহেন্দ্র সাহা তার নাগালের বাইরে। তাছাড়া মহেন্দ্র সাহা সহরের মধ্যে একজন প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তি।

কস্তুরীর মত একজন সাধারণ নগণ্য বাঈজী কি করতে পারে তার। কেশস্পর্শও হ সে করতে পারবে না। তাছাড়া, তারা কস্তুরী, ক্ষীরোদা—অধম মেয়ের জাত। আর মহেন্দ্র সাহারা পুরুষের জাত। যারা তাদের মত হতভাগিনীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদের পাপ-পুণ্যের বিধান কর্তা।

ঐ পুরুষদের পদাশ্রয়ই যে তাদের একমাত্র আশ্রয়। তাদের ইহকাল পরকাল।

তারা সামাজিক আশ্রয় দিলেই তাদের জননী—জায়া—কন্যা, আবার তাদের সেই সামাজিক আশ্রয় না দিলেই তারা বারবনিতা—তারা রক্ষিতা। কুলটা, ভ্রষ্টা। তারা যতদিন বেঁচে আছে—স্বামীর গৌরব—তাদের মৃত্যুতে সহমরণ। উপায় ত' নেই। কোন উপায়ই নেই।

জ্ঞান ফিরে আসার পর ক্ষীরোদার দু' চক্ষুর কোণ বেয়ে দর দর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। বৃন্দাবন তখন একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে।

কস্তুরী সযতনে সস্নেহে ক্ষীরোদার চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, কেঁদে আর কি হবে ভাই। আমাদের জীবনে ও অশ্রু ত শেষ হবার নয়। এখানে সেদিন তোমাকে আনতে চাইনি এক কলঙ্ক থেকে আর এক কলঙ্কের মধ্যে এসে পড়তে এই জন্যই। কিন্তু ভগবানই যখন তোমাকে হাতে করে এখানে পৌঁছে দিলেন এখানেই তুমি থাকবে।

ক্ষীরোদার মুখের দিকে চেয়ে সে সময় কিছু বোঝা না গেলেও বৃন্দাবন কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছিল। সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল এই ভেবে যে, যাক অন্তত তার মাকে রাস্তায় গিয়েই শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি দাঁড়াতে হলো না। এবং নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরে এসেছিল সেদিন বৃন্দাবন। কিন্তু কোথায় যাবে বৃন্দাবন।

যোগীন্দ্র অনেক দিন মারা গিয়েছে। এখন যোগীন্দ্রর ছেলেরা সংসারের মালিক তাকে সেখানে কেউই আশ্রয় দেবে না।

শুধু হাতেই মাত্র অরিন্দম সরকারের দেওয়া টাকা ক'টা সম্বল করে রাস্তায় বের হয়ে পড়েছিল বৃন্দাবন একবস্ত্রে।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো প্রায়। দু'একজন মানুষও পথে দেখা যায়। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে চলেছে। অনির্দিষ্ট ভাবে সেই পথ ধরে হাঁটতে থাকে বৃন্দাবন।

মনে পড়ল হঠাৎ বৃন্দাবনের—মেদনীপুরে তার এক দূর সম্পর্কীয় খুল্লতাত থাকে। তার ওখানে গেলে কেমন হয়।

বছর দুই আগে সেই খুল্লতাতের সঙ্গে এই কলকাতা শহরে তার একবার দেখা হয়েছিল। তখন সে তাকে মেদনীপুরে যাবার জন্য বলেছিল কিন্তু বৃন্দাবন সম্মত হয়নি। বলছিল, না—মহেন্দ্র সাহার আশ্রয়ে সে সুখেই আছে। এ শহর ছেড়ে সে কোথায়ও যেতে চায় না। কিন্তু তার পূর্বে একবার ক্ষীরোদা মার সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃন্দাবন কস্তুরীর গৃহের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ক্রমশঃ আরো ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে আসছে। বৃন্দাবন একটু দ্রুতই হেঁটে চলে।

নাতিপ্রশস্ত একটি রাস্তার উপরেই কস্তুরী বাঈজীর গৃহ। গৃহের কাছাকাছি আসতেই বৃন্দাবনের কানে ভেসে আসে সুমিষ্ট একটি সুরালাপ।

মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িতে বহু রাতের আসরে বাঈজীদের কণ্ঠে নানা রাগ-রাগিণী শুনতে শুনতে বৃন্দাবনের সঙ্গে সংগীতের একটা পরিচয় ঘটেছিল।

রাগ-রাগিণীর মোটামুটি জ্ঞান শুনতে শুনতে আপনা হতেই যেন একটা জন্মেছিল বৃন্দাবনের।

বিশুদ্ধ ভৈরবীর সুরালাপ বৃন্দাবন বুঝতে পারে এবং এও বুঝতে পারে যে ভোরে আপন মনে বসে বসে বাঈজী কণ্ঠ সাধছে।

বন্ধ দরজায় এসে ধাক্কা দিতেই ভৃত্য মানিক দরজা খুলে দিল কে গা?

আমি—

বৃন্দাবন মাণিকের অপরিচিত নয়। ক্ষীরোদাকে নিয়ে আসা ছাড়াও ইতিপূর্বে দু'চারবার সে তার মনিবের সংবাদ নিয়ে বাঈজীর গৃহে যাতায়াত করেছে।

মাণিক বলে, বৃন্দাবন কি খবর—এত ভোরে?

বৃন্দাবন মৃদুকণ্ঠে বলে, বাঈজী সাহেবার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

মাণিক আর কোন প্রশ্ন করে না।

দরজাটা পুনরায় বন্ধ করে গৃহকর্মে চলে যায়। দ্বিতলের একটি অপরিসর কক্ষে মেঝের 'পরে বসে তানপুরা নিয়ে কস্তুরী গলা সাধছিল। ঘরের দরজা খোলাই ছিল।

খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বৃন্দাবন।

কিন্তু বৃন্দাবনের দিকে নজর পড়ে না কস্তুরীর! সুরের মধ্যে সে তখন সমাহিতা!

বৃন্দাবনও মন সব ভুলে যায়। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সুরালাপ শুনতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে এক সময় হঠাৎ নজর পড়ে কস্তুরীর দরজার গোড়ায় দণ্ডায়মান বৃন্দাবনের প্রতি। কে! কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

বাঈজী সাহেবা, আমি—

বৃন্দাবন—কি খবর?

ক্ষীরোদামার সঙ্গে একটিবার দেখা করতে এলাম।

ক্ষীরোদা?

নামটা উচ্চারণ করে কেমন যেন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কস্তুরী বৃন্দাবনের মুখের দিকে।

ক্ষীরোদা মাকে দেখছি না, কোথায় তিনি বাঈজী সাহেবা?

সহসা ছল ছল করে ওঠে কস্তুরীর দুটি চক্ষুর কোল অশ্রুতে। নিঃশব্দে মাথা নাড়ে কস্তুরী।

উৎকণ্ঠিত বৃন্দাবন শুধায়, কি, কি হয়েছে ক্ষীরোদামার?

সে নেই বৃন্দাবন—কথাটা বলতে গিয়ে যেন কান্নায় বুজে আসে কস্তুরীর গলা।

নেই। কোথায় গেছে সে?

জানি না। তাকে তুমি এখানে রেখে যাওয়ার মাসখানেক পরে মুজরা নিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম সেই সময়—

বৃন্দাবন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, মা তাহলে আর বেঁচে নেই—

কস্তুরী বলে, তাও জানি না বৃন্দাবন, ক্ষীরোদা বেঁচে আছে কি নেই তাও জানি না। তারপর একটু থেমে আবার বলে, মুজরা নিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে সাতদিন পরে মাণিক আর মোক্ষদার মুখে শুনলাম একদিন ভোরে উঠে তাকে নাকি আর ওরা দেখতে পায়নি। সে এসেছিলই যদি বৃন্দাবন আমার কাছে, ত আবার অমনি করে চলে গেল কেন এটাই আজ পর্যন্ত ভেবে পেলাম না।

খুব কান্নাকাটি করতো বুঝি মা? বৃন্দাবন শুধায়।

কাঁদতে দেখিনি। বেশীর ভাগ সময়ই পাশের ঘরে গিয়ে একা একা চুপচাপ বসে থাকত আর ভোরবেলা যখন তানপুরা নিয়ে আমি রেওয়াজ শুরু করতাম এই ঘরে একপাশে এসে চুপচাপ বসে শুনত।

বৃন্দাবন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মৃদুকণ্ঠে বললে, আমি যাই বাঈজী সাহেবা।

যাচ্ছো!

হ্যাঁ।

বৃন্দাবন ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে পশ্চাৎ থেকে কস্তুরী ডাকে, বৃন্দাবন!

বৃন্দাবন ফিরে দাঁড়াল, কিছু বলচেন!

যদি তার কোন সংবাদ পাও ত' আমাকে একটা খবর দিয়ে যেও।

খবর।

হ্যাঁ—কিন্তু আর কি আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে বাঈজী সাহেবা—

কেন। এ কথা বলচো কেন বৃন্দাবন?

আমিও এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি—

চলে যাচ্ছো?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন! তবে কি তোমাকেও সাহামশাই তাড়িয়ে দিয়েচেন।

সাহামশাইয়ের কাছে ত' আমি ছিলাম না। গত কয়মাস ধরে অরিন্দম সরকারের কাছে ছিলাম—তাঁরও আর আমাকে কোন দরকার নেই—জবাব দিয়ে দিলেন।

তোমার কথা ত' আমি কিছু বুঝতে পারচি না বৃন্দাবন?

সংক্ষেপে তখন সমস্ত কথা বলে বৃন্দাবন। কেবল বলে না আগের রাত্রে হত্যার ব্যাপারটা।

সমস্ত কথা শুনে কস্তুরী কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বৃন্দাবন নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। পথ দিয়ে চলতে চলতে বৃন্দাবন ভাবে, কি হলো ক্ষীরোদার? কোথায় গেল সে! তবে কি সে আত্মঘাতীই হলো। অপমানের আর দুঃখের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতীই হলো। হয়ত তাই। অনেক দুঃখ অনেক অপমান সহ্য করেছে মা তার। হয়ত গঙ্গার জলেই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে। দু'চোখ জলে ভরে আসে বৃন্দাবনের। চলতে চলতেই হাতের পাতায় চোখের জল মুছে নেয়।

হারিয়ে গেল ক্ষীরোদা। সবাই একদিন হারিয়ে যায়। সেও হারিয়ে যাবে। উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে বৃন্দাবন, অনির্দিষ্টভাবে হেঁটে চলে।

[ক্রমশঃ।
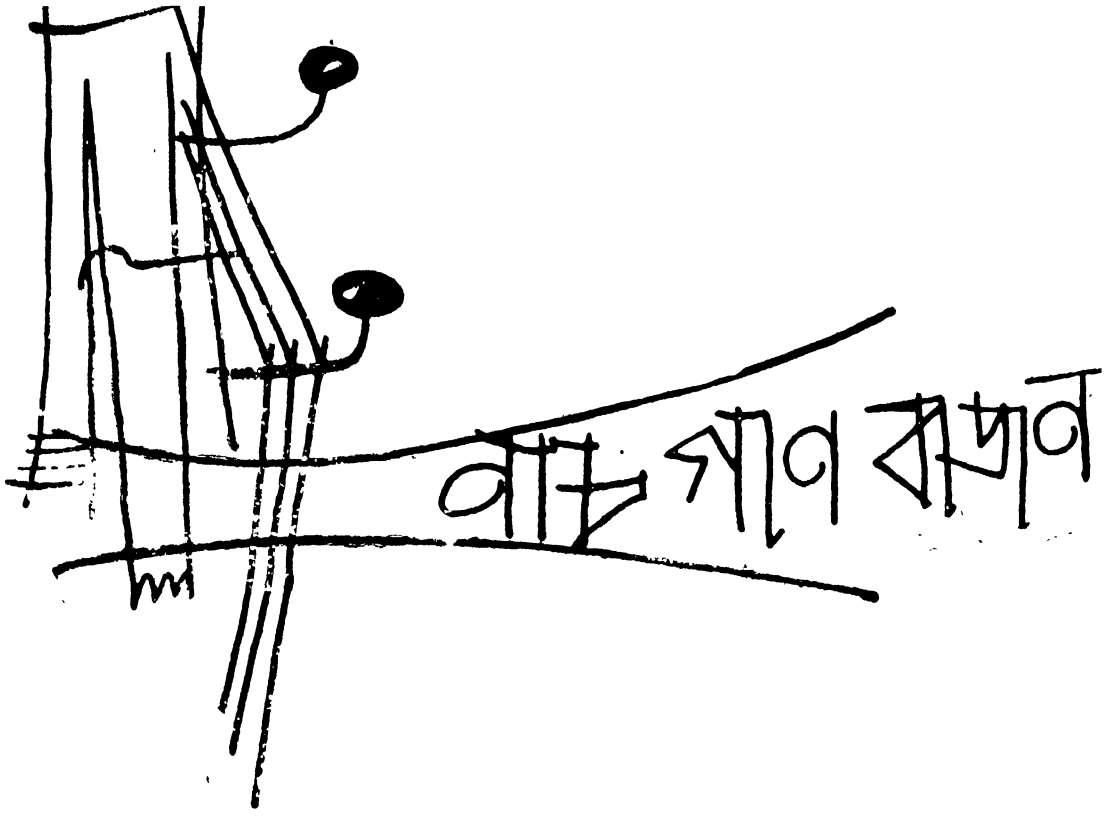
সরোদ শিল্পী আলী আকবর

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পান্নালাল দত্ত

১৯৫৬ সালে দক্ষিণ কলিকাতায় রাজা সীতারাম রোডে 'আলী আকবর কলেজ অব মিউজিক' এই শিক্ষায়তনটি স্থাপন করিয়া উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসঙ্গীত অনুশীলন ও শিক্ষার ব্যাপকতর বাতায়ন খুলিয়া দিয়াছেন। পরলোকগত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী এই পুনরুজ্জীবনকারী প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। সাধারণতঃ তারযন্ত্রগুলিই শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। এইটি প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। সপ্তাহে দুইদিন ক্লাশ বসে,—রবি আর বুধ। তাঁহার পুত্রদ্বয় আশিস ও ধ্যানেসের সঙ্গীতে একাগ্রতা এত বেশী যে, পিতা ছাত্রদের শিক্ষার ভার অনেক সময় তাঁহাদের উপর ছাড়িয়া দেন। এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যে, আশিস ও ধ্যানেসের প্রথম শিক্ষাগুরু কিন্তু তিনি নন,—সুরের গুরু আলাউদ্দীন খানই পৌত্রদ্বয়ের শিক্ষার ভার তাঁহাদের চার বৎসর বয়ঃক্রমকাল হইতে লইয়াছিলেন। আরও যে সকল অধ্যাপক এই শিক্ষায়তনে অধ্যাপনা করেন তাঁহাদের মধ্যে আলাউদ্দীন খানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও আয়েত আলী খানের পুত্র বাহাদুর খানের নাম উল্লেখযোগ্য। ওস্তাদ আলী আকবর খানের শিক্ষাদান প্রণালী গুরুশিষ্যের সহজ সম্পর্কের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বর্ত্তমানে কলিকাতায় আরো তিনটি যন্ত্রশিক্ষায়তনের কথা উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অপূর্ণ থাকিবে। প্রথমটি হইল ওস্তাদ এনায়েত খানের পুত্র ইমরাত খান কর্ত্তৃক পিতার স্মৃতির উদ্দেশে 'সিতার একাডেমী অব মিউজিক।' পরলোকগত এনায়েত খাঁ সাহেবের নাম এখনও বাংলাদেশ অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করে। এই নূতন শিক্ষায়তনটি ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে এনায়েত খানের নামে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হইবে বলিয়াই আমরা জানি। দ্বিতীয়টি, সিতার ও সুরবাহার বাদক শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক ১৯৬০ সালে স্থাপিত 'ইমদাদখানি কলেজ অব মিউজিক।' পরলোকগত এনায়েত খানের পিতার পুণ্যস্মৃতি ইহা বহন করিবে—ইহা আমরা আশা করিতে পারি। তৃতীয়টি হইল সেতার বাদক আলি আহমেদ খান কর্ত্তৃক সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে 'আলাউদ্দীন সঙ্গীত সমাজ।' আলী আহমেদ খানই সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত আছেন।

ওস্তাদ আলী আকবর খানের শিষ্যদের মধ্যে আজ অনেকেই সর্ব্বভারতীয় স্বীকৃত লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শরণরাণী মাথুর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকণা ধরচৌধুরী, ডি, এল, কাবরা ও বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এই

কারণে যে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকে তাঁরা গুরুর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন ভক্তি, নিষ্ঠা এবং সুরারোপের নিখুঁত প্রয়োগদ্বারা। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র শিষ্য যে ওস্তাদ আলাউদ্দীন ও ওস্তাদ আলী আকবর এই উভয় সঙ্গীতকারের নিকট সিতারে তালিম নিয়াছেন। আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্র হইতে যে রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার করা হইয়া থাকে, তাহাতে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শরণরাণী, শিশিরকণা ও ডি এল, কাবরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে আমরা আলী আকবর খানকে নূতন আরেক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে পাই। আনন্দ' উপভোগের জনপ্রিয় মাধ্যম ছায়াচিত্রে শিল্পীর অনবদ্য সুরারোপ পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। ১৯৫১ সালে তিনি প্রথম বোম্বাইতে নবকেতন চিত্রের 'আধিয়া'তে সুরারোপ করেন। তারপর বহু হিন্দী ও বাঙলা চিত্রে সুর দিয়াছেন। তবে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়াছেন তপন সিংহের পরিচালনায় কবিগুরুর "ক্ষুধিত পাষাণ" চিত্রে সুখশ্রাবী আবহসঙ্গীতের ক্ষেত্রে। ফিল্মক্র্যাফট-এর প্রথম নিবেদন "বেনারসী" চিত্রে তাঁহার আবহসঙ্গীত মাজ্জিত, সুপ্রযুক্তও বটে। গল্ড্ ইন পিকচার্স-এর "ন্যায়দণ্ড" চিত্রেও তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন।

যাঁহারা তাঁহার স্বরচিত রাগিণী লাজবন্তী, গৌরীমঞ্জরী, চন্দ্রনন্দন ও মিশ্র শিবরঞ্জনি শুনিয়াছেন তাঁহারাই সৃজনশীল প্রতিভার সাক্ষাৎ পরিচয় পান। এমন কৃতিত্বপূর্ণ কাজ খুব কম। যন্ত্র ধরার সার্থকতা তো এইখানে। কর্ণাটক রীতি পদ্ধতির রাগ 'কিরওয়ানী', 'বাচস্পতি'ও তিনি অতি সুন্দর উত্তরভারতীয় ঢং-এ ও আঙ্গিকে বাজাইয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। 'মিশ্রমান্ড', 'গৌরী মঞ্জরী', 'নটবেহাগ', 'মারুবেহাগ,' 'হেম বেহাগ,' 'মাজ খাম্বাজ,' 'যোগীয়াকালান্দা,' 'পুরিয়া,' 'সিন্ধু-ভৈরব' প্রভৃতি হিন্দোল ও শ্রীরাগের অন্তর্ভুক্ত রাগিণীগুলি বাজাইয়া শ্রোতার মনে বাজনার আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ রাখিতে সমর্থ। নিখুঁত স্বরপ্রয়োগে তাঁহার বাজনায় আমরা আলাপের সহিত রাগের পরবর্ত্তী অংশগুলির পূর্ব্বাপর একটি সঙ্গতির আভাস পাই।

আমরা সারা বছর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকি শীতকালে 'নিখিলভারত তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন,' 'মধ্যকলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলন,' 'নিখিলভারত সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন,' 'নিখিলভারত সঙ্গীত সম্মেলন,' 'ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলন' ও 'আলাউদ্দীন সঙ্গীত সমাজের' বার্ষিক অধিবেশনের জন্য গভীর আগ্রহে। কিন্তু এই প্রত্যাশা কেন? আমরা চাই প্রখ্যাত সর্ব্বভারতীয় শিল্পীর শিল্পস্বভাব ও প্রতিভার মহিমময় স্পর্শ যা আমাদিগকে আলোকতীর্থে পৌঁছাইয়া দিবে। আর চাই নবাগত অথচ তৈরী হাতের গান বাজনা। এই দ্বিবিধ আশাপূরণে কনফারেন্সগুলি কৃতকার্য্য। তবে উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত আরও কিছু নূতন প্রতিভার সন্ধান করা আর এঁদের প্রতিবছর আসরে উপস্থিত করা। আর একটি কথা মনে পড়িল, সঙ্গীতের মহান ঐতিহ্যের কথা না ভাবিয়া উদ্যোক্তারা যেন অর্থকরী দিকটার কথাই কেবল চিন্তা না করেন। নৃত্যপটীয়সীদের আজকাল সেই কারণে আসরগুলিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিম্নমানের হইতে বাধ্য। আসর বিষয়ক সর্ব্বশেষ বক্তব্য সঙ্গীত সভাগুলির অধিবেশনের প্রচারনার সময় বাঁধিয়া দেওয়া এবং ইহা করিলে কেমন হয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে সময় সংক্ষেপ করা হইয়াছে ইতিমধ্যে। যদিও রাগালাপের দীর্ঘচারিতা উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করিবে, তথাপি শ্রোতাদের ও শিল্পীদের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উদ্যোক্তারা যদি প্রতিদিনের অনুষ্ঠান সূচী সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত করেন তাহা হইলে ভাল হয়। এতে শিল্পী ও শ্রোতা কেহই রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হইবেন না, উপরন্তু কেহ ইচ্ছা করিলে পর পর সব কয়টা অধিবেশনই শুনিতে পাইবেন।

মানুষের অবচেতন মনে যে রহস্যের খেলা চলিতেছে তার ঢেউ বহির্মানসে কমই লাগে। যুগে যুগে শুদ্ধ শিল্পবোধের অনুপ্রেরণার উৎসস্থল তো এইখানে। একজন যথার্থ শিল্পী হিসাবে ওস্তাদ আলী আকবর খানের প্রচেষ্টা দুই জগতের সংযোগ রক্ষাকারী সেতুবন্ধ। পুনরভ্যুত্থানের যুগের সরোদের পুরোহিত আলী আকবরের নিজের কথা, 'সঙ্গীত শিল্পীদের উপলব্ধিকে জনচিত্তে সঞ্চারিত করিতে হইলে সুষ্ঠু শিল্পরীতির আশ্রয়ই আমাদের লইতে হইবে, শিল্পরসকে ক্ষুণ্ণ করিয়া সঙ্গীত পরিবেশন করা আর রাজনীতির প্রচার পুস্তিকা দুই-ই সমান।'

বিলীয়মান অতীতকে ইতিহাসের সন তারিখ দিয়া ধরিয়া রাখার সরল প্রচলিত রীতির অনুসরণে আমরা তাঁহার জীবনকথা লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি, জানি না এতে তাঁর আত্মার পরিচয় কতটুকু পাওয়া যাইবে। তবে যুক্তিতর্কের পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগে পঞ্চাশ বছর বাদে শিল্পী সম্বন্ধে প্রাবন্ধিকেরা তাঁহার জীবনের কঠিন বাস্তব ঘটনাকেও বিকৃত রূপ না দেন,—সেই মানসে আমাদের এই স্মৃতিচারণ।

ওস্তাদ আলী আকবর খানের সরোদে প্রচলিত ঝালা ও বোলের সঙ্গে সুরেলা গায়কী তানের সংমিশ্রণ এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশ আনে। বাজনার তত্ত্ব আমার জানা নেই, তবু একথা বলিতে কুণ্ঠা নেই যে, তাঁহার সরোদে বীণাপদ্ধতি ও খেয়ালের তানপদ্ধতির সন্নিবেশ তাঁহাকে ভারতে বিংশশতাব্দীর প্রথমপাদের কয়েকজন স্বনামধন্য যন্ত্রবাদকের পরেই তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। হিন্দুস্থানী যন্ত্রসঙ্গীতের সজ্ঞান প্রতিভূ ও প্রথিতযশা শিল্পী ইন্দোর রাজদরবারের পরলোকগত মজিদ খান, কলিকাতার পরলোকগত কৌকভ খান সরোদী, পরলোকগত আমেদ আলী খান সরোদী, কলিকাতা ও ইন্দোরের পরলোকগত ইমদাদ খান অতুলনীয় সিতার ও সুরবাহার বাদক, বিভিন্ন প্রকার তারযন্ত্রের 'রাজা' মাইহারের পদ্মভূষণ আলাউদ্দীন খান, পদ্মভূষণ হাফিজ আলি খান সরোদী, পরলোকগত মহম্মদ খান, পরলোকগত সাজ্জাদ মহম্মদ, পরলোকগত এনায়েত খান সিতারী ও পরলোকগত কাশেম আলী খান রবাবী প্রমুখেরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যন্ত্র-সঙ্গীতের যে সম্ভাবনাময় রূপ তুলিয়া ধরিয়াছেন,—উত্তরসূরী রূপে আলী আকবর খানের মধ্য দিয়া জীবন দেবতা তাঁহাকে দিয়া তাহাই করাইয়া লইতেছেন। তাঁহার বাজনা লক্ষ্যকে আরও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আমার কথা (৯৭)

শেফালী চক্রবর্ত্তী

গুণের সঙ্গে মিল রেখেই বোধ হয় নাম রাখা হয়েছিল শেফালী। একটি ভোরের শেফালী আর একজন গানের শেফালী। একটি প্রাণহীন অপরটি প্রাণবন্ত। একটির সৌরভ অন্যটির স্বর। শ্যামলা বাংলার শ্যামলী মেয়ে শেফালী। দেশ ভাগ হলো। বাবা মার সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে এলো মেয়ে। বরিশালে কে তাকে চিনতো? কিন্তু আজ জানে সবাই, চেনে সকলে, শুধু বাংলায় নয় ভারতেও।

পূর্ব পাকিস্তানের বরিশাল জেলায় কাউখালি গ্রামের শ্রীজগদীশ চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী শেফালী বরিশাল জেলার হরিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। শ্রীমতী চক্রবর্ত্তীর সঙ্গীত-প্রতিভা সহজাত বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৫৮ সালে আন্তঃকলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়াই তাঁর সহজাত প্রতিভার অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন। ঐ প্রতিযোগিতায়

শ্রীমতী শেফালী চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রগীতি থেকে নজরুলগীতি, রামপ্রসাদ থেকে অতুলপ্রসাদ, ধ্রুপদ থেকে খেয়াল, টপ্পা থেকে ঠুংরি, পুরাতনী থেকে কীর্ত্তনের কোন শাখায়ই দ্বিতীয় হননি শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী। ছোটবেলা থেকেই গানের নেশায় মেতে উঠলেন পণ্ডিতবংশের মেয়ে শেফালী। গান শিখলেও পড়াশুনা বন্ধ রাখেননি একদিনও। ১৯৫৪ সালে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে, ১৯৫৬ সালে আই, এ, ১৯৫৮ সালে ডিগ্রি লাভ করলেন শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী। এ জীবনে বা পরবর্ত্তী জীবনে গানের মূল্য কতটা পাবেন না জানলেও ছাত্রী জীবনে মূল্য পেয়েছেন যথেষ্ট। একটিমাত্র গানে অসাধারণত্ব প্রদর্শন করেই বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন শুধু আই-এ'তেই নয় বি-এ'তেও।

কলেজে প্রবেশের পথেই আহ্বান এলো অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। ১৯৫৫ সালে বেতার সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী। শুধু কলকাতায়ই নয় দিল্লীতেও। বিজয়িনীর জয়টীকা তাঁর কপালে সেখানেও আঁকা হয়ে গেল। শুধু এক বিভাগে বা এক জায়গায়ই নয়, সকল জায়গার সকল বিভাগেই দ্বিতীয় নয় প্রথম হয়েই বেরিয়ে এলেন শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী। যোগ্যতা প্রমাণ করে হলেন বেতারশিল্পী। অস্থায়ী নয় স্থায়ী।

অবশ্য এর আগেও গল্পদাদুর আসরে স্বীয় ক্ষমতার অপূর্ব প্রমাণ দিয়েছিলেন কয়েকবার। ১৯৫৪ সাল। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসব। কলিকাতায় নয় দিল্লীতে। সঙ্গীত অভিযানে পাল্লা দিয়ে চলেছেন কলিকাতার মেয়ে শেফালী। পরাজয়ের প্রশ্ন তো নয়ই, গৌরবেরই ইতিহাস। সকল বিভাগে প্রথমস্থান অধিকার করে বিজয়যাত্রা অব্যাহত রাখলেন একবার নয়—কয়েকবার। একই সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হ'ল সর্বভারতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। বিজয়মাল্য গলায় নিতে বাধা আসেনি সেখানেও। সঙ্গীতের আসর, বেতার আসর জয় করে রেকর্ড জগত থেকে এলো আহ্বান। কলম্বিয়া কোম্পানীর আহ্বানে রেকর্ড করলেন একখানা নয় কয়েকখানা। শুধু বাংলা গানের রেকর্ড করেই ক্ষান্ত হননি, হিন্দি গানেরও রেকর্ড করেছেন কয়েকখানি।

রেকর্ডের পরে সিনেমা জগৎ থেকেও গান প্লে ব্যাক করার আহ্বান পেলেন শ্রীমতী শেফালী চক্রবর্ত্তী—একটি ছবিতে নয় বেশ কয়েকখানা ছবিতেই কণ্ঠদান করেছেন তিনি। বৃন্দাবন লীলা, খনা, রূপ সনাতন, দ্বীপের নাম টিয়ারং প্রমুখ ছায়াচিত্রগুলির নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী আজ শুধু প্রাচীন ইতিহাসে এম, এ'র ছাত্রীই নয় গানেরও ছাত্রী। ভারত সরকারের নিকট হতে বৃত্তি পেয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গবেষণা করছেন টি, এল, রাণার অধীনে।

বিবাহিত জীবনে এখনো প্রবেশ ঘটেনি শ্রীমতী চক্রবর্ত্তীর—ঘটবে না একথাও বলেন না তিনি। তবে পিতৃগৃহ হতে পতিগৃহে যাবার আগে তাঁর সারা জীবনের সাধনার ধন সঙ্গীতের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা তিনি করবেন সর্বাগ্রে।

দিনের শেষে কর্মক্লান্তির মাঝে ছোট বোন কুমারী জুয়েল চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বসে গান গাওয়া ছাড়া ব্যক্তিগত কোন বিশেষ সখ নেই শ্রীমতী চক্রবর্ত্তীর।

মায়ের মমতা ও
অষ্টারমিল্কে
প্রতিপালিত
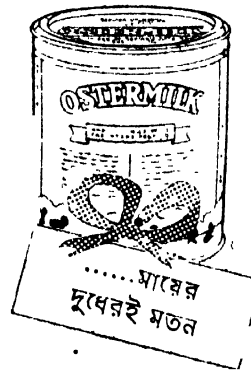
নীলকণ্ঠ

চৌত্রিশ

নিখিল বিশ্বের সকল বিস্ময়ের যিনি উৎস, শব্দের পেছনে যিনি আলো, তমসার ওপারে যিনি জ্যোতির্ময়ী, সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত উদ্ভাসিত করে তিনিই এসেছিলেন ত্রিবেণীর ঘাটে সেদিন। মহাত্মা জ্যোতিজী, ডক্টর গোপীনাথকে বলেছেন—এ দর্শন সত্য, কারণ যিনিই কেবল শাশ্বত, বিবেকযুক্ত অবস্থায় সেদিন সেই সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্মময়ীর সাক্ষাৎই পেয়েছিলেন তিনি এবং ত্রিবেণীর ঘাট থেকে স্থূল-তনুতে আবির্ভূতা জগজ্জননীর সংগে যে কথা বলেছিলেন, কোটিকে গোটিক ভাগ্যবান মহাত্মা, সেকথা বোধ ও বিবেকযুক্ত অবস্থায় আর পাঁচজনের সংগে জাগতিক ভাষায় যেমন ভাবে আলাপ করেন তেমন ভাবেই বলেছিলেন তিনি। আত্মার সেই আলো ত্রিবেণী ক্ষেত্রে অকস্মাৎ দেখা দিয়ে অকস্মাতই মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু জ্যোতিজীর মনে তা জাগিয়ে গেলো অন্বেষণের, অনন্ত অন্বেষণের অনন্তমন প্রয়াস। ক্ষ্যাপার মতো ত্রিবেণীর তীরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। গোপীনাথের ভাষায়,—'ধেনুহারা বৎসের' মতো। রাত্রি শেষ হলো তারও অনেক পরে। জীবনের স্মরণীয়তম রাত্রির অবসানে উদিত হলো জীবনের অবিস্মরণীয়তম সূর্যস্নাতপ্রসন্ন প্রথম প্রভাত।

তম থেকে মহত্তমে উত্তীর্ণ হবার দুঃসাধ্য অধ্যবসায় আরম্ভ হলো সেই। প্রাণের প্রদীপে একটি জ্যোতির্ময়ী অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে দিলো সমস্ত জঞ্জালকে; জাগিয়ে দিলো সব দিয়ে সব পাবার সর্বনাশা নেশা।

জ্যোতিজী বলেছেন কবিরাজ মশাইকে নিজের মুখে, এ দেখাতেও এই শাশ্বতকে সত্য করে দেখাতেও জীবনে চরমের পরম উদ্দেশ্য নয় উদ্‌যাপিত। একে পেতে হলে সর্ব সময়ের জন্যে যেতে হবে আরও অনেক দূর। জ্যোতিজীর মতে, কেউ কেউ যেমনে করেন বিবেক অনবলুপ্ত অবস্থায় একবার এই চরমের দর্শন হলেই জীবনের পরম পাওনা পাওয়া হয়ে গেল এটা ঠিক মনে করা নয়। স্থায়ীভাবে ঐ দর্শনকে ধরতে হলে, বিবেক সহকারে নৈতিক জীবনের মধ্য দিয়ে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। যে সত্য দর্শন জীবনের শাশ্বত রূপান্তর না ঘটায় তা চরমের পরম দর্শন নয়। এবং সে দর্শনের জন্যে তাঁর কৃপা চাই যাঁর কৃপায় পংগু পায় তার খোঁড়া-পায় পাহাড় ডিঙোবার উপায়। গোপীনাথের ভাষায় জ্যোতিজীর একটি উপমা তাঁর বক্তব্যকে বুঝতে সাহায্য করে: 'অন্ন যেমন আগুনের সম্পর্কে থাকিলে অন্নই থাকে, কিন্তু আগুন হইতে দূরে সরিয়া গেলে উহার পূর্ব স্বরূপ তণ্ডুল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে, মানুষের জীবনেও ঠিক সেই প্রকারই ঘটিয়া থাকে। জীবনের পথে এই সকল দৃষ্টান্তের সার্থকতা খুবই আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্বকর্তার দয়া লাভ করিতে হইলে ইহা পর্যাপ্ত নহে, তাহার জন্য অভ্যাসযোগকে আশ্রয় করিয়া বিবেক ও বিচারের সহিত কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে হয়। এইজন্য জাগতিক সাধন-ক্রমেরও মূল্য কম নহে।' [সাধু-দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ: ১ম খণ্ড: মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ]।

ত্রিবেণীতে জগজ্জননীর সংগে নিরুপম সাক্ষাতের পর, যার বাড়িতে তিনি উঠেছিলেন সেখান থেকে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯১৭ সালে জ্যোতিজী জীবনে প্রথমবার কাশী যান। সেখানে অগস্ত্যকুণ্ডে একজনের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন গৃহকর্তার নামে লেখা জ্যোতিজীর এক বন্ধুর পরিচয়পত্র সম্বল করে। সেই বাড়িতে চিঠিখানা নিয়ে যখন জ্যোতিজী হাজির হলেন তখন গৃহস্বামী বাড়ি ছিলেন না। কিন্তু চিঠিটি পড়ে তাঁর কন্যা তিনতলার একখানা ঘর ছেড়ে দিলেন জ্যোতিজীকে। সেখানে মাদুরের ওপর শুয়ে ৺বিশ্বেশ্বর ও ৺কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণার কথা তিনি ভাবতে লাগলেন। একই চেতনা নানাভাবে প্রকটিত কি না এই জিজ্ঞাসায় আকাশ-পাতাল ঢুঁড়ছিলো তাঁর চিন্তা। এমন সময় একটি রমণী কোলে এক শিশুকে নিয়ে ওপরে উঠে এলেন সিঁড়ি দিয়ে জ্যোতিজীর তিনতলার ঘরে। এসে উত্তর দিলেন জ্যোতিজীর অনুচ্চারিত প্রশ্নের: 'বাবা তুমি যা ভাবছ তা সত্যি। ভগবান আছেন সব জায়গায়, ভক্তরা তাঁকে নানাভাবে প্রকট করে থাকেন।'

এই কথা শেষ হবার সংগে সংগে আরেক মহিলা তাঁকে স্নান শেষ করে খাবার অনুরোধ জানাতে এলেন। যে মহিলা এর আগে শিশু কোলে এসেছিলেন তিনি ঐ একই সিঁড়ি দিয়ে তখন নেমে গেছেন, যে সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয় মহিলা খাবার জন্যে অনুরোধ জানাতে উঠে এসেছেন। অথচ এই দ্বিতীয় মহিলা ঐ অদ্বিতীয়া শক্তিকে লক্ষ্য করবার সৌভাগ্যবঞ্চিতা হলেন।

জ্যোতিজী বুঝলেন, পূর্ণ ব্রহ্মময়ী স্বয়ং অন্নপূর্ণাই সেই প্রথম মাতৃরূপিণী, কোলে যার এক শিশু। শুধু তাই নয়, ঐ শিশু জ্যোতিজীরই ক্ষুদ্র রূপ। তাঁর 'দেহের যাবতীয় লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

পৌঁছুবার আগেই কাশীতে জ্যোতিজীর পদার্পণকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন : 'জগজ্জননী, তিনি কাশীর অধিশ্বরী। তাঁহারই একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।'

অন্নপূর্ণা স্বয়ং এসে শিশু ভোলানাথকে কোলে ধরে বলে গলেন—তিনিই সর্বত্র। ভক্ত যেখানেই যাক ভগবান সেখানেই আছেন। জীবমাত্রই শিব।

লোকলোকান্তরের অনায়াস যাত্রায় মহাত্মা জ্যোতিজী একদা ধ্রুবলোকে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি গোপীনাথের কাছে ব্যক্ত করেছেন অকপটে। মহাত্মা যখন ধ্রুবলোকে উপস্থিত হয়েছেন সবে, তখন ধ্রুব ভক্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় জিজ্ঞাসুদের উপদেশ দিচ্ছেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব শ্রীহরির স্থূল বিগ্রহ দর্শনের জন্যে কি কঠোর সাধনা করেছিলেন তাঁর সেই পূর্ব অপূর্ব জীবনের স্মৃতিকথা বলছিলেন। মহাত্মা জ্যোতিজী যে কেবল ধ্রুবের মুখে সেই ইতিকথা শুনছিলেন, তাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যগুলিও সংঘটিত হচ্ছিলো তাঁর চোখের সামনে। কারণ "শুদ্ধস্বরে শব্দের এমনই মহিমা যে, উহার উচ্চারণের সঙ্গে প্রতিপাদ্য অর্থও সম্মুখে আবির্ভূত হয়।"

জ্যোতিজী দেখতে পেলেন : "বালক ধ্রুব ব্যাকুলতা সহকারে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া একলক্ষ্য একপ্রাণ হইয়া বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। আরও দেখিলেন কখনও কখনও তিনি কোন বিশিষ্ট স্থানে উপবেশন পূর্বক শ্রীহরিকে আহ্বান করিতেছেন।"

ঐ সময় তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি প্রকার ছিল তাহা জ্যোতিজীর হৃদয়ে প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছিল। ধ্রুব জগতের প্রতি বস্তুতে শ্রীহরির চৈতন্যময় সত্তা অনুভব করার ফলে অধিকাংশ সময় আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিতেন।

জ্যোতিজী আরও দেখিলেন, কোন সময় ধ্রুব ভীষণ হিংস্র পশুকে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি মনে করিয়া আকুলপ্রাণে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ঐভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিংস্র পশু হিংসা ভুলিয়া গিয়া শান্তভাবে স্থির হইয়া রহিয়াছে। ধ্রুবর সে তীব্র ব্যাকুলতা এবং হৃদয়ের আর্ত-পিপাসা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। ধ্রুব নিজ মুখে নিজের আন্তরিক অবস্থার অথবা বাহ্য ঘটনার কোন বর্ণনা জ্যোতিজীর নিকট করেন নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে পর পর সব অবস্থাই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। জ্যোতিজী দেখিতে পাইলেন, এত গভীর বিরহভাব সত্ত্বেও ধ্রুব শ্রীহরির দর্শন পাইতেছিলেন না। যদিও তিনি প্রতি বস্তুতে, বৃক্ষ-লতায়, পুষ্পে-পত্রে, পশু-পক্ষীতে, জলে-স্থলে, আকাশের ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীহরির অখণ্ড সত্তা অনুভব করিতেছিলেন তথাপি ঐটি তাঁহার বিরহের ভাবনাতে দেখা। কারণ স্থূলে সম্মুখে শ্রীহরির মঙ্গলময় বিগ্রহ তখনও তিনি দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিজী ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, প্রেমের পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত মূর্তির আবির্ভাব হয় না।

ইহার পর জ্যোতিজীর মনে হইল, ধ্রুব শ্রীহরির মূর্তরূপ দর্শন লাভের জন্য কি ক্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা দেখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইলেন, শব্দ ও জ্যোতির স্তর আয়ত্ত করিয়া ধ্রুব তাহাতে গভীরভাবে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। এই মগ্ন অবস্থাতে যে মুহূর্তে তাঁহার রূপ দর্শনের ইচ্ছা জাগ্রত হইল সেই মুহূর্তেই সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি হইতে মূর্তির আবির্ভাব হইল। জ্যোতি ও মূর্তি স্বরূপে যেই একই জিনিষ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও জ্যোতি-দর্শন ও রূপ-দর্শন একই সঙ্গে হয় না। জ্যোতি-দর্শন হওয়ার পর জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠা হইলে, যদি ইচ্ছার উদয় হয় তাহা হইলে ঐ জ্যোতিই ইচ্ছানুরূপ মূর্তির আকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া উঠে। জ্যোতিতে স্থিতি লাভ না করিয়া যে রূপ দর্শন হয়, তাহা মনের কল্পনা মাত্র, তাহার পারমার্থিক মূল্য অনেক কম। তখন শ্রীহরির মূর্তি দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়া ধ্রুব জ্যোতিজীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এই প্রকার ব্যাকুলতা ও প্রীতি যখন শ্রীহরির প্রতি উৎপন্ন হইবে তখন তুমিও তাহার দর্শন পাইবে।" [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : প্রথম খণ্ড : মহাত্মা জ্যোতিজী : পৃ: ২৮-৩১]

জ্যোতিজী তবুও এই দর্শনকে বলেছেন কৃত্রিম। কারণ একজন মহাশক্তিধর পুরুষ যোগবলে তাঁকে ধ্রুবতত্ত্ব প্রত্যক্ষ দেখাবার জন্যে এই সমস্ত সৃষ্টি করেছিলেন। এই মহাশক্তিধর পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে যদি এ ঘটন ঘটানো সম্ভব হ'তো তবেই তা হতো অকৃত্রিম। এই দর্শনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা মহাত্মা জ্যোতিজী কোনও সময়েই কারুর কাছেই একবারও অস্বীকার করেন নি।

মহাত্মা জ্যোতিজীর সংগে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের নানা প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ অনেক কৌতূহলের অসাধারণ নিবৃত্তির উৎস অবারিত হয়েছে

সাধুদর্শন ও সংপ্রসঙ্গ গ্রন্থের প্রথম পর্বে। যেমন, বহু যোগীর আসনে বসে বাহ্যিক সাহায্য ছাড়া যোগবলে আসন ছেড়ে শূন্যে ওঠা কি করে সম্ভব এ নিয়ে তর্কাতর্কির আজও শেষ নেই। কেউ বলেন,—ব্যাপারটা অলীক; কেউ বলেন,—অলৌকিক। মহাত্মা জ্যোতিজী বলেন, ব্যাপারটা অলীকও নয়, অলৌকিকও নয়।

'ইহার কারণ অন্য কিছু নহে! যেমন লৌহ জলে ভাসে না কিন্তু পারদের ওপর ভাসে, আমাদের ঠিক সেই প্রকার অবস্থা। যতদিন মন অথবা ইচ্ছা বাসনায় আবৃত থাকে ততদিন ইহা ভাবসমুদ্রের নিম্নে পড়িয়া থাকে। তেজ অত্যন্ত লঘু পদার্থ, ইহা বায়ু সমুদ্রের উর্ধ্বে উত্থিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। দেহ তেজোময় হওয়ার ফলে লঘু হয় বলিয়া স্বভাবতঃই উপরে উত্থিত হয়।' [সাধুদর্শন ও সংপ্রসঙ্গ]

বেতারে গান শুনলে আমরা অবাক হই না। টেলিভিসানে নাটক দেখলে ওরা অবাক হয় না আজ। মেসিনে দুরূহ আঁক অনায়াসে করে দিলে তা অস্বাভাবিক মনে হয় না; কিন্তু যে মানুষ এই বিস্ময়কর যন্ত্রের স্রষ্টা সেই মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিতে বাইরের সাহায্য ছাড়া কোনও দৈহিক ক্রিয়া দেখাতে পারলে আমরা হতবাক হই। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যখন মানুষের মতো কথা বলে, গান গায়, প্রশ্নের উত্তর দেয়,—তখন আমরা যন্ত্রকে নমো বলি বটে কিন্তু জানি আসলে প্রণম্য হচ্ছে মানুষ—যে এই যন্ত্রের স্রষ্টা। অথচ মানুষ, ভগবানের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র যখন দুনিয়া চালায়, নতুন উপগ্রহ সৃষ্টি করে, জলে-স্থলে-নভোতলে নতুনতর দিগ্বিজয়ের স্বাক্ষর রাখে, তখন মানুষকে আমরা পূজা করি; মানুষ-যন্ত্রের যিনি স্রষ্টা সেই ঈশ্বরকে বলি, তিনি নেই।

মানুষের ট্রাজিডি সেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের যে হতভাগ্য জানে না তার সব ক্রিয়াই স্বয়ং সেই একজনের যিনি আপন আনন্দে বহু হয়েছেন। মানুষের কমিডি হচ্ছে এই যে, সে বেচারা জানে না যে বাইরের সমস্ত শক্তির মূলে আছে অন্তরের নিরুপম নিরাসক্তি। যেদিন মানুষ এ কথা জানবে সেদিন জন্ম নেবে নতুন মানুষ এই পুরোনো পৃথিবীতে। সেই দিব্যচেতনায় দীপ্ত উদ্দীপ্ত মানুষ ফানুস চাইবে না গ্রহে গ্রহান্তরে যেতে। মনে আবার বাসনা জাগা মাত্র লোক-লোকান্তরের যাত্রী হতে পারবে সে।

এ কথা বিশ্বাস করা অসংখ্য কোটি মানুষের পক্ষে যেমন সম্ভব তেমন একটি কি দু'টি মানুষের পক্ষে এ কথা অবিশ্বাস করা তার চেয়েও অসম্ভব।

১৯২৬ সালের ৭-ই ফেব্রুয়ারি, মহাত্মা জ্যোতিজী, যিনি একজন ভালো হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকও বটে, ঐ তারিখে, 'শরীরের কোথায় কোন যন্ত্র আছে এবং কোন ইন্দ্রিয়ের বিশেষ ক্রিয়া হয়' আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তা বোঝবার জন্যে এক মহিলা যোগীর দৈহিক যন্ত্রের ওপর ষটচক্রের ক্রিয়া ও প্রভাব বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে ষটচক্র ভেদ করতে না পেরে ষটচক্রের মধ্যেই অবরুদ্ধ হবার মতো হলেন। ষটচক্র ভেদের প্রথম স্তরে পুরুষ কামময়ী রমণীর এবং স্ত্রীলোক মনোহর পুরুষমানুষকে দেখে, মহাত্মা জ্যোতিজীর সেদিন ষটচক্র ভেদ করতে না পারার কারণ সাময়িক মানসিক মালিন্য। তবুও শেষ পর্যন্ত বিবেকবোধ থাকায় তিনি বেঁচে গেলেন। কিন্তু ক্ষণিক এই পাপবোধের প্রতিকার কিসে তার কোনও উপায় তিনি খুঁজে পেলেন না। রমণীটির চিকিৎসা করা ছেড়ে দিলেও এই গ্লানির বোধ তাঁকে ত্যাগ করল না!

অবসন্ন মহাত্মা জ্যোতিজীর কাছে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আবার এলেন। তাঁর হাতে একখানা ব্রহ্মচর্য চিত্র ছিলো। জ্যোতিজীকে সংগে নিয়ে সেই মহাপুরুষ সবে খেলা সাংগ হওয়া মাঠে পৌঁছেই অন্তর্হিত হলেন। জ্যোতিজী মহাপুরুষের নিয়ে যাওয়া রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা দিয়ে আসবার পথে আরেকজন স্থূলদেহ সন্ন্যাসীর দেখা পেলেন। সেই সন্ন্যাসী জ্যোতিজীকে, ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে একজন পঞ্চমকারের সাধককে দেখা যাবে বললেন। এবং তাঁর প্রণালীতে সাধনা করলে ঈশ্বরদর্শন করা যাবে,—এ কথাও বললেন।

মহাত্মা জ্যোতিজী এর প্রতিবাদে বললেন: পঞ্চমকারের সাধনায় যে দর্শন হয় তা 'ঠিক ঠিক নিত্য চৈতন্যময়' নয়।

প্রহারে উদ্যত ক্রোধদীপ্ত সাধুকে লক্ষ্য করে অতঃপর জ্যোতিজী তাঁর ছেড়ে আসা স্থূলদেহের মধ্যে পুনঃপ্রবেশের জন্যে পরিত্যক্ত শরীরের কাছে পৌঁছে দেখলেন, ত্রিবেণীর ঘাটে যাঁকে দেখেছিলেন তিনিই জ্যোতিজীর মর্ত্যদেহ বেষ্টন করে বসে আছেন। তিনি জ্যোতিজীকে বললেন: 'আমি তোমার সেই মা' বলে জ্যোতিজীর মনের মলিন মেঘকে বিদ্যুতের মতো দ্বিখণ্ডিত করে মিলিয়ে গেলেন মুহূর্তে। জ্যোতিজী তাঁর হারানো মনোভাব ফিরে পেলেন। জ্যোতিজীর কথায়:

'...মন আমাকে আর ফাঁকি দিতে পারিল না। একেবারে যেন নতুন মানুষ হইয়া গেলাম। সেই গ্লানির ভাব, সেই অশান্তি সব দূর হইয়া গেল।...আজ আমি বুঝিতে পারিলাম, মহাপুরুষ আমার মনোময় দেহকে পোড়াইয়া আমার ভুলভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়াছিলেন।' [সংপ্রসঙ্গ ও সাধুদর্শন]।

তিন চারদিন পর রোগিণী সেই স্ত্রীলোকটি আবার এসেছিলেন জ্যোতিজীর কাছে। কিন্তু এবারে আর বিকারের সম্ভাবনা ছিলো না।

তখন সমস্ত রমণী মহাত্মা জ্যোতিজীর চোখে পরম রমণীয় মাতৃমূর্তির প্রতিরূপ মাত্র। [ক্রমশঃ।

পিপার গান

(*R. Browning* এর Pippa Passes হইতে)

এক বসন্তে নিহিত একটি সাল,
দিনের পঞ্জী শুধুই এক সকাল,
সাতটার শুরু প্রভাতের মায়াজাল;
পর্বত-গায় মুক্তা শিশির রাজে;

লার্কের পাখা হাওয়ার উপরে দোলে;
কাঁটা শুঁড় তুলে শম্বুক যায় চলে:
জগদীশ্বর স্বর্গে আছেন বলে—
সবই যথাযথ এই ধরণীর মাঝে!

অনুবাদ—মানসী

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

দেওয়া হয়, তবে কি তাহা এক অক্ষর নির্গ্রহের ব্যাপার হইয়া উঠিবে না? আর তাহা ছাড়া তিন তিনটি ভাষাকে আয়ত্ত করিতেই তো তাহারা গলদঘর্ম হইবে; অন্যান্য বিষয় তাহারা শিখিবে কখন? পঞ্চমশ্রেণী হইতেই যাঁহারা হিন্দী ধরাইতে চান, আশঙ্কা করি, এ-সব কথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। কিংবা ভাবিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারেন নাই যে, ইহাতে হিতের চাইতে অহিতই হইবে বেশী। অথবা এমনও সম্ভব যে, হিন্দী প্রচারকেই তাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র কাজ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; ছাত্রদের হিতাহিতের প্রশ্নটাকে তাই তাঁহারা আমলই দিতেছেন না।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

দৌরাত্ম্যদমনে পুলিশী ব্যর্থতা

"সাঁওতাল পরগণার রাজমহল ও বোরিও থানার কয়েকটি গ্রাম হইতে পাক-সীমান্ত পুলিশ ২১ জন সাঁওতালকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। পাক-সীমান্ত পুলিশের ভারতের অভ্যন্তরে বলবন্তভাবে প্রবেশ করিয়া উপদ্রব সৃষ্টির চেষ্টা নূতন নহে। অবৈধ প্রবেশকারীরা যদি তাহাদের অপকার্যে বাধা না পায়, তাহা হইলে তাহাদের দুঃসাহস বাড়ে। ইহাতে সীমান্তরক্ষী ভারতীয় পুলিশের যে অক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একান্তভাবেই শোচনীয়। ইহা অপেক্ষাও অধিক উদ্বেগের বিষয় এই যে, সীমান্ত বরাবর নানা স্থানে পাকিস্তানী পুলিশ ও দুর্বৃত্তের দল যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতেছে এবং বাধাহীনভাবে ইহা যদি ক্রমাগত চলিতে থাকে, তাহা হইলে সীমান্তরক্ষা উপহাসে পরিণত হইবে, সীমান্তের অধিবাসীরা নিরাপত্তার অভাবে দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে এবং পাক পুলিশের দুষ্কার্যের প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পাইতে থাকিবে। দেশরক্ষা তথা প্রতিরক্ষার নামে অনেক ট্রেনিং-এর কথা প্রচারিত হয়। সেই ট্রেনিং তথা শিক্ষা দিবার ক্যাম্পগুলি সীমান্তে ছড়াইয়া রাখা যায় না?" —যুগান্তর।

জলাভাব প্রসঙ্গে

"গাছের কাঁঠাল দেখিয়া গুম্ফদেশে তৈলসিক্ত করা বড় দরের বোকামি। কিন্তু, বেকায়দার মধ্যে লোকে ঐ জাতীয় বোকামির মধ্যেই স্বস্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। স্বাস্থ্য-সংস্থা, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও মহানগরী পরিকল্পনার হাঁক-ডাকে এবং সরকারী তত্ত্বাবধায়কদের সমীক্ষা-বিবরণীতে আশ্বস্ত কলিকাতাবাসীরা মনে করিতেছিল, জলাভাব মিটিতে দেরী হয় নাই। কিন্তু, লোকসভায় স্বাস্থ্য বিভাগীয় উপমন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, কাঁঠাল ফলিবার আশা সুদূরপরাহত আসলে পনস-বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত। কলিকাতার জলপ্রাচুর্য সম্ভাবনা লইয়া এঞ্জিনীয়ারদের প্রকাণ্ড পরীক্ষাকাণ্ড চলিতেছে। পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট দাখিল করিতে বৎসর তিনেক লাগিবে। তিন বৎসরের মেয়াদ ভদ্রলোকের এক কথায় পর্যবসিত হউক আর না হউক, সুপারিশ হাতে পাওয়ার পর সরকারী বিচার-বিবেচনা, পরিকল্পনা রচনা, টাকার সংস্থান, মালপত্র সংগ্রহ—ইত্যাদিতে বৎসরের পর

অর্থমন্ত্রী ও স্বর্ণকার সমাজ

"শ্রীদেশাই সম্পূর্ণ অ-রসিক না হইলেও তিনি সেই সব ব্যক্তিদেরই একজন, যাঁহাদের নিকট 'রসস্য নিবেদনম্' প্রায় নিষিদ্ধ। স্বর্ণশিল্পীদের সম্পর্কে তিনি যে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে হৃদয় নামক কোন পদার্থের বালাই তাঁহার আছে কি না সন্দেহ। নতুবা স্বর্ণশিল্পীদের আত্মহত্যার পরিসংখ্যান লইয়া তিনি এইরূপ হৃদয়হীন মন্তব্য করিতে পারিতেন না যে, মাত্র পাঁচজন স্বর্ণশিল্পীর আত্মহত্যার সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। তাঁহার সংবাদ ভুল; কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও কতজনের আত্মহত্যার সংবাদে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইতে পারে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠিতে পারে। তবে বেশীদিনের কথা নয়, আমরা লৌহ-হৃদয় শ্রীদেশাইকে অস্বাভাবিকভাবে বিচলিত হইতে দেখিয়াছি। বোম্বাই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেশাই সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হইয়া অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার 'হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি' দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম তাঁহার হৃদয় নামক বস্তুটি বিগড়াইয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই।" —দৈনিক বসুমতী।

ভাষার বোঝা

"বাংলা দেশের ছাত্রদের মধ্যে যাহারা অহিন্দীভাষী এখন তাঁহাদের শুধু ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে হিন্দী পড়িলেই চলে। কিন্তু অতঃপর হয়তো পঞ্চমশ্রেণী হইতেই তাহাদের হিন্দী শিখিতে হইবে। নয়াদিল্লীতে শিক্ষামন্ত্রী-সম্মেলনে নাকি এই প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে তাহা মানিয়াও লওয়া হইয়াছে। মানিয়া লওয়ার কারণ কী, আমরা জানি না। তবে দুই বৎসরের স্থলে তিন বৎসরের জন্য যদি হিন্দী শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়, তবে ছাত্রদের পক্ষে যে তাহা একটা মস্ত বড় অসুবিধার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পঞ্চমশ্রেণীতে যাহারা পড়ে তাহাদের অনেকের বয়সই দশ-এগারো। ঐ বয়সেই তাহাদের বাংলা এবং ইংরেজী, এই দুইটি ভাষা শিখিতে হয়। তাহার উপর যদি আবার হিন্দী চাপাইয়া

বৎসর গড়াইয়া চলা স্বাভাবিক। আখেরে, অর্থাৎ,'বর্তমান শতকের শেষাশেষি জল-যজ্ঞ পূর্ণ হইলে দেখা যাইবে, বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে রচিত এঞ্জিনীয়ারদের রিপোর্টে আর সচলত্ব নাই। সুতরাং? সুতরাং, আবার শুরু হইবে ভাঙাচোরা, দেখাশোনা আর খোঁজখবরের পালা।"

—লোক-সেবক।

বিদ্যুৎ সঙ্কট

"কলিকাতা অঞ্চলে নূতন নূতন স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ফলে চাহিদার অনুপাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অল্প। ফলে প্রত্যহ কোনও না কোনও অঞ্চলে কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থগিত রাখা হইতেছে। কোন্ অঞ্চলে কবে সরবরাহ স্থগিত রাখা হইবে এবং তাহা কতক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইবে, তাহা পূর্বে সংবাদপত্র মারফৎ বিজ্ঞাপিত করা যে একান্ত প্রয়োজন, সে বোধটুকু কলিকাতার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন নামক সংস্থাটির নাই; সেজন্য সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্যবসায়ের যে বিরাট লোকসান ঘটিতেছে তাহার ক্ষতিপূরণ করিবে কে? এ সম্পর্কে মিল-মালিকদের সংস্থার পক্ষ হইতে অভিযোগ উঠিয়াছে যে, পূর্বে সংবাদ না দিয়া সহসা বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থগিত করা হইলে বিদ্যুৎশক্তিতে চালিত দ্রুত চলমান যন্ত্রগুলির অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের এই কর্তব্য পালনে অবহেলার ফলে যন্ত্রপাতিগুলির অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে। হাসপাতালগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়, সহসা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইলে আলোর অভাবে আরব্ধ শল্য চিকিৎসা, প্রসূতির প্রসবকার্য প্রভৃতি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা। খালধারের এক প্রমোদশালায় এক নাট্যাভিনয় দর্শনের জন্য প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু ঠিক অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়াতে কর্তৃপক্ষ টিকিটের মূল্য ফেরৎ দিতে বাধ্য হন। এ প্রকার ও অন্যান্য নানা প্রকার দুর্ভোগ অকারণে ভোগ করার সম্পর্কে আমরা নানা স্থান হইতে অভিযোগ পাইয়াছি। যদি ধরিয়া লওয়া হয় বিদ্যুৎ সরবরাহে যখন ঘাটতি দেখা দিয়াছে, সেজন্য যখন বিদ্যুৎ-শক্তি নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে, তখন নিয়ন্ত্রণজাত কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, তথাপি পূর্বে সংবাদ না দিয়া জনসাধারণকে অকারণ দুর্ভোগে ভোগাইবার কি যুক্তি থাকিতে পারে? বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন; কিন্তু তাহা যে পর্যন্ত না হইতেছে সে পর্যন্ত "সেভিং" ব্যবস্থা করে, কখন কি পর্যন্ত সময় কোন অঞ্চলে চালু হইবে তাহা অন্ততঃ একদিন পূর্বে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ জানাইয়া দেওয়া বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই সংস্থার কর্তৃপক্ষের তেমন বিবেচনার অভাব লক্ষ্য করিতেছে।"

—জনসেবক।

হিন্দী এবং ইংরাজী

"পনরো বছরের চেষ্টাতেও যখন হিন্দীকে জাতে তোলা গেল না, হিন্দীতে পার্লামেন্টারি বিবৃতি এবং বৈদেশিক ডেসপ্যাচ তৈরি যখন কিছুতেই সম্ভব হইল না, তখন হিন্দীর মুখ্য নেতা নেহরু এবং লালবাহাদুর পিছু হটিবেন ইহা স্বাভাবিক। উৎসাহের আতিশয্যে হিন্দী প্রচলনের তারিখ দিয়া যে বেয়াকুবি করা হইয়াছিল তাহা দল কোণঠাসা হইয়া আসিতেছে। ভারতের অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠি এতদিনে নিজ নিজ ভাষার দাবী এবং সর্বভারতীয় ভাষারূপে হিন্দী প্রচলনের অসমীচীনতার প্রতিবাদ সুরু করিয়াছে। ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াও ভারতের ঐক্য সুদৃঢ় করিবার উপায় আছে ইহা এখনও রাষ্ট্রনায়ক এবং চিন্তানায়কেরা স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। ফলে ভাষার লড়াই আরও দীর্ঘস্থায়ী করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। হিন্দী এবং ইংরেজি কোনটিকেই আমরা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া মনে করি না আমাদের বিশ্বাস সরল সংস্কৃত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইলে দেশের ঐক্য এবং ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বাড়িবে।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

রোটারী ক্লাবের অপপ্রচার

"রোটারী ক্লাব একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি যে রাজনীতি ভিত্তিক নয় তা বলাই বাহুল্য। ইহার দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতার জন্যেই বিশ্বের জ্ঞানী গুণীর সপ্রশংস সমর্থন লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক একটি আপত্তিকর বিষয় শুধু রোটারী ক্লাবের এদেশীয় সদস্যদেরই নয় সমগ্র ভারতবাসীকেই যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করিয়াছে। বোঝা যাইতেছে মুখোসধারীদের হস্তে পড়িয়া রোটারী ক্লাব চরিত্র হারাইতে বসিয়াছে। ইণ্টার ন্যাশনাল রোটারী ক্লাব জার্নালে সম্প্রতি "Focus on India" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে যে ম্যাপ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেখানো হয় নাই। ব্যাপারটা অজ্ঞতাবশতঃ ঘটিয়াছে বলা চলে না। কারণ এই দুষ্কৃতির কৈফিয়ৎ হিসাবে এই ম্যাপের সঙ্গে একটি মন্তব্যও প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহাতে লেখা হইয়াছে যে, শ্রীনগর ও কাশ্মীরের অবস্থান বিতর্কমূলক অবস্থার মধ্যে বর্তমান। আশ্চর্য্য! ইহা নাকি এখনও ভারতের অন্তর্ভুক্ত নয়। শুধু ভারতীয় সদস্যরাই নয় আরও অনেক রোটারীয়ানই ব্যাপারটায় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। আন্তর্জাতিক রোটারী সংস্থার কাছে এই জার্নালটিকে প্রত্যাহার করার জন্য দাবী জানানো হইয়াছে। এই সঙ্গে এই আপত্তিকর প্রবন্ধের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্যও অনুরোধ করা হইয়াছে। রোটারী ক্লাব একটি স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। কাজেই এই জার্নাল বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হইয়া কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বক্তব্য দুর্বল করায় সাহায্য করিবে। শুধু ভারত হইতেই নয় সব স্থান হইতেই আমরা এই জার্নালের সমুদয় প্রচার প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছি। রোটারী সংস্থা অবিলম্বে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে অবশ্যই ভারতবাসীর আস্থা ও সমর্থন হারাইবেন।"

—স্বস্তিকা (কলিকাতা)।

অতিরিক্ত মুনাফা

"মনে হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে একটা সুস্থ আবহাওয়ার ব্যাপকতর অভাব লক্ষ্য করিয়াই সুসংঘবদ্ধ হইতে এবং জাতীয় সংকটকালে বৃহত্তম স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সেদিন চীফ কমিশনার ত্রিপুরার ব্যবসায়ী সমাজকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

উপর ভিত্তি করিয়া তিনি যে সুস্পষ্ট পরামর্শ দিয়াছেন তাহা হইল :—(১) ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করা (২) অতিরিক্ত মুনাফা শিকারের লোভ পরিত্যাগ করা (৩) কম ওজনে বিক্রয় না করা (৪) সরকারী কর্মচারীকে প্রলুব্ধ না করা (৫) খাদ্যদ্রব্য ভেজাল না করা, আপৎ সময়ে এ সমস্ত কাজ জাতির স্বার্থ বিরোধী এবং (৬) দেশের বৃহত্তম স্বার্থের জন্য নিজেদের সুসংঘবদ্ধ করা।

ব্যবসায় অতিরিক্ত লাভের ঝোঁক সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইবে। চীফ কমিশনার ঠিকই বলিয়াছেন যে, জনমত শক্তিশালী হয় নাই বলিয়া এখানে মূল্যমান স্থিতিশীল হইতে পারিতেছে না। জনমত গঠন করে সংবাদপত্র। ত্রিপুরার কোন রাজনৈতিক দল জিনিষ-পত্রের দাম বৃদ্ধি লইয়া মাথা ঘামায় না। ফলে সংবাদপত্রও ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিতে অক্ষম। মূল্যবৃদ্ধি পাইলে দল বাঁধিয়া সরকারী দপ্তরে গেলেও ব্লেক মার্কেটার কিংবা মূল্যবৃদ্ধি নাটের গুরুদের দ্বারে যাইতে ইহাদের দেখা যায় নাই। মূল্যবৃদ্ধি সর্বত্রই হইয়াছে। কিন্তু ত্রিপুরায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে একাধিক কারণ বিদ্যমান। অতিরিক্ত মুনাফা শিকারের উৎসাহে ভাঁটা পড়িলে মূল্য শুধু কমিবে না মূল্যের মানও গঠিত হইতে পারিবে।"

—সেবক (আগরতলা)।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব

"পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকট আছে। গুণ ও পরিমাণে কৃষির উন্নয়নের উপরই খাদ্য সংকটের সমাধান নির্ভরশীল। ফসলের দর আছে, চাষী-চাষ বাড়াইতে ব্যগ্র। সে জন্য তাহার প্রয়োজন জলের। অথচ সরকার গ্রামের জমিতে জল সরবরাহের আংশিক দায়িত্ব গ্রামের উপর ছাড়িয়া বন্যা জলের বিপুল অপচয় নিবারণে সহায়তা করিতেছেন না। ইহা শুধু বিসদৃশ নয়, অপরাধও। এ জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চয়ই দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারেন না। গ্রামের বাঁধা নির্মাণের পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রামের বাঁধা, গ্রামের দায়িত্ব, প্রচলিত এই নিয়মের পরিবর্তন আশু প্রয়োজন।. লোক ইহা প্রার্থনা করিয়াছে ; এই মর্মে দাবী জানাইয়াছেন। সরকার অতি প্রয়োজনীয় এই দাবী পূরণ করুন। ডি, ভি, সি, ভুলে ভরা ; তাই বলিয়া একেবারে অসার নহে। গ্রামের বাঁধা লইয়া ডি, ভি, সি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা অসার নহে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে গ্রামাঞ্চলে বাঁধা চলিলে ইন্দ্রনাথের ভাষায় "রাজা প্রজা উভয়েরই সুখ" হইবে। আমারা সরকারকে মনোযোগী হইতে আহ্বান জানাই।"

—দৃষ্টি (বর্ধমান)।

বাঁকুড়ায় খাদ্যাভাব

"সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষ করিয়া কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা অধিকাংশ দিন অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে কাটাইতেছে। বছরের এই সময় অর্থাৎ মার্চ্চ মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত কৃষকদের কোন কাজ থাকে না ফলে কৃষি শ্রমিকরা বেকার হইয়া পড়ে গত বৎসর ভাল ধান না হওয়ায় সাধারণ মধ্যবিত্তের মজুরীর পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসর সরকার টেষ্ট রিলিফ মাধ্যমে কৃষি শ্রমিকদের মজুরীর ব্যবস্থা করিতেন। এ বৎসর সরকারের ভাঁড়ার শূন্য থাকায় টেষ্ট রিলিফের কাজ এক প্রকার বন্ধ আছে। যদি কোথাও বা হইতেছে তাহা ছিটেফোঁটা বলিলেই চলে। ফলে বাঁকুড়া জেলার সমগ্র কৃষি মজুর আজ বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং কাজ না পাওয়ায় খাদ্যাভাবে পড়িয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে অর্থাৎ এখনও তিনমাসের আগে কৃষি মজুরদের কাজ পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অতএব তাহাদের অন্নকষ্ট হইতে বাঁচিবার কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। এ দিকে চাউলের দাম এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, যদি বা কৃষি মজুররা ২।১ দিন কাজ পায় তবে সেই কাজের বেতন হইতে পেট ভরিয়া খাইবার মত রোজগার করিতে পারে না। কারণ আট ঘণ্টা কাজের জন্য মাত্র '৭৫ নয়া পয়সা মজুরী পায় তাহাতে বড় জোর এক সের চাউল পাওয়া যায়। প্রতি পরিবার ছেলে বুড়ো লইয়া পাঁচ জন ধরিলে প্রতি জন দুই বেলায় মাত্র তিন ছটাকের মত চাউল খাইতে পায়। ইহা কম করিয়া ধরিলেও প্রতিজনের দৈনিক প্রয়োজন আধসের হয়। অর্থাৎ প্রতি পরিবারের প্রয়োজন আড়াইসের চাউলের। অতএব অর্দ্ধভোজনও কৃষি শ্রমিকদের হয় না। তাছাড়া এই '৭৫ নয়া পয়সা রোজগারও দৈনিক হয় না। এখন হইতে সরকার এই বিষয়ে যদি কিছু না করেন তবে সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িবে।"

—জি, টি, রোড (আসানসোল)।

বিশ্ব টেবিল টেনিসে এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব

বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ টেবিল টেনিস খেলোয়াড়রা এবার সম্মিলিত হন প্রাগে অর্থাৎ এবার বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসে এখানে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ছয় শতাধিক প্রতিযোগী এখানে এক আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যেরবন্ধনে আবদ্ধ হন।

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় ১৯২৭ সালে। ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত একটানা দীর্ঘ ২৫ বছর বিশ্ব টেবিল টেনিসে ইউরোপের প্রাধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু ১৯৫২ সালে তাদের প্রাধান্ত সর্ব্বপ্রথম নষ্ট হয়। সেবার জাপান প্রথম আত্মপ্রকাশেই ইউরোপের একচেটিয়াকে খর্ব্ব করে সারা দুনিয়ায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেদিন এশিয়ার যে নতুন ইতিহাস রচিত হয় আজও তা বজায় রয়েছে। এশিয়ার দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন ও জাপান এই দু'জনায় টেবিল টেনিসে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। এবারকার পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতা—সোয়েথলিং কাপের ফাইন্যালে প্রজাতন্ত্রী চীন ৫-১ ম্যাচে জাপানকে পরাজিত করার কৃতিত্ব অর্জন করে। এটা তাদের দ্বিতীয় সাফল্য। ১৯৬১ সালে তারা সর্ব্বপ্রথম জয়লাভ করেছিল। মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতা—করবিলান কাপের ফাইন্যালে জাপান ৩-০ ম্যাচে রুমানিয়াকে পরাজিত করেছে। এই সাফল্য তাদের প্রথম নয়। ১৯৫৯ সাল থেকে এক নাগাড়ে তারা এই সম্মান পেয়ে আসছে। এবারকার প্রতিযোগিতায় জাপানের মহিলা খেলোয়াড়দের বৈশিষ্ট্য যে তাঁরা একটা ম্যাচেও পরাজিত হয় নি।

বিশ্ব টেবিল টেনিসের একক প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসের ফ্যাইন্যালে চীনের চুয়াং-শী তুং তাঁর স্বদেশীয় খেলোয়াড় লা-কুয়ুংকে পরাজিত করে এই বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ খেতাব লাভ করেছেন। পুরুষদের ডাবলসে ওয়াং-চী লিয়াং ও চাং-শী লিং সহজেই তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বদেশীয় খেলোয়াড় চুয়াং-শী তুং ও শু-ইন-সিংকে পরাজিত করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

মহিলাদের বিভাগে জাপানে কিমিয়ো মাৎসুজাকি সিঙ্গলস ও ডাবলসে জয়ী হয়ে "ত্রিমুকুট" লাভ করেছেন। সিঙ্গলসে তিনি রুমানিয়ার মেরিয়ো আলেকজাণ্ড্রুকে পরাজিত করেন। ডাবলসে মাৎসুজাকি ও মসাকো সিকি ও ইংলণ্ডের ডাইনে রোরি ও মেরি সাননকে পরাজিত করেন। মিশ্রড ডাবলসে জাপানের তকাজি মিমুরা ও কোমুকো ফিজি মিকি ও সিকিকে পরাজিত করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতা এস, এন, মিত্র কাপের কলিকাতা ও যাদবপুর দলের খেলায় কলিকাতা

ভারতের খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উম্রীগড় প্রথম শ্রেণী ক্রিকেট খেলা হইতে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

এবারকার বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের মধ্যে যেরূপ একটা সৌহার্দ্দ্যের ভাব দেখা গেছে—বহুদিন সে রকম দেখা যায় নি।

প্রাগের এই আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে চারজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত ভারতের দল যোগদান করে। এই দলে ছিলেন পি হালদালকার, আর চাচাদ, গৌতম দেওয়ান ও জয়ন্ত ভোরা। এর মধ্যে হালদালকার ও চাচাদ আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে নবাগত। গৌতম দেওয়ান ১৯৫৮-১৯৬১ পর্য্যন্ত একটানা চার বছর জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং ডর্টমুণ্ডে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জয়ন্ত ভোরা বর্ত্তমান জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। তিনিও ডর্টমুণ্ডে এবং ষ্টকহোলমে বিশ্ব টেবিল টেনিসে প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়রা খুব একটা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে না পারলেও সোয়েথলিং কাপে পোল্যাণ্ড ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে পরাজিত করে। তবে তাদের ইংলণ্ড, জাপান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। ভারতীয় খেলোয়াড়রা কতটুকু সাফল্য অর্জ্জন করল সেটাই বড় কথা নয়—যে অভিজ্ঞতা তাঁরা অর্জ্জন করেছেন ভবিষ্যতে সেটা সম্পদ বলে গণ্য হবে।

রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘেরা মাঠের দায়িত্ব গ্রহণ

কলকাতার ময়দানে ঘেরা মাঠ থেকে দর্শনী বাবদ অর্থ আদায়ের জন্ত নিযুক্ত দীর্ঘদিনের ঠিকাদার জে কে হেডওয়ার্ড এ্যাণ্ড কোম্পানীর মেয়াদ শেষ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজ হস্তে মাঠের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছেন। রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টাকে ক্রীড়া পরিচালক ও ক্রীড়ামোদী সকলেই একবাক্যে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ধূয়া তুলেছেন যে, সরকারের পক্ষে খেলাধুলা বাবদ অর্থ সংগ্রহ অলিম্পিক আইনের পরিপন্থী। কিন্তু দীর্ঘদিন যখন একজন ঠিকাদার অর্থ সংগ্রহ করে এসেছেন—তাতে অলিম্পিক আইনের কোন ব্যাঘাত হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানিয়েছেন যে, ময়দানের খেলাধুলা থেকে টিকিট বাবদে যে অর্থ সংগ্রহ হবে—সমুদয় অর্থ ই খেলাধুলার উন্নতিকল্পে এবং খেলোয়াড়দের কল্যাণের জন্ত ব্যয় করা হবে। এ ছাড়া কোন রাজ্য এসোসিয়েশনের খেলাধুলা পরিচালনার জন্ত বা বার্ষিক ঘাটতি হলে সেটাও সরকার পূরণ করবেন। মাঠ তদারক ও কি ভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া যায় সেই সম্পর্কে বিবেচনার জন্ত রাজ্য সরকার একটি স্পোর্টস কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করেছেন। এই স্পোর্টস কাউন্সিল প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত হবে বলে রাজ্য সরকার আভাষ দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টা সফল হোক এটাই সকলে কামনা করেন। যে সকল স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি কলকাতার খেলাধুলাকে কলঙ্কিত করে তুলেছেন—তাঁরা যেন স্পোর্টস কাউন্সিলে ঢুকতে না পারেন—সেদিকেও রাজ্য সরকারের বিশেষ ভাবে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত।

মাঠ অদল বদল

রাজ্য সরকার ময়দানের ঘেরা মাঠের কর্তৃত্ব গ্রহণ করায় সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ক্লাবের মাঠে অদল বদল করা হয়েছে। মোহনবাগান ক্লাব তাঁদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী ইষ্টবেঙ্গলের মায়া ত্যাগ করে ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে ক্যালকাটা মাঠে তাঁদের নতুন ঘর বেঁধেছে। এরিয়ান্স ক্লাব মোহনবাগানের স্থান দখল করেছে। হাওড়া ইউনিয়ন এরিয়ান্সের তাঁবুতে হাজির হয়েছে। এছাড়া স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ইষ্টবেঙ্গল মাঠে এবং রাজস্থানকে মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁদের তাঁবু যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে। খেলাধুলা জগতে যে নতুন অধ্যায় রচনা হতে চলেছে—সেটা সফল হোক।

এশীয় ফুটবল কাপ

ফুটবলে ইস্রাইলের খ্যাতি এশিয়ার মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অর্জ্জন করেছে। পশ্চিমী ধাঁচে ইউরোপীয় কাপের ন্যায় ইস্রাইল একটা এশীয় কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেছে।

এশিয়ার সর্বত্র ফুটবল বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বাপেক্ষা বেশী। ইস্রাইলের এই নতুন প্রচেষ্টা সফল হোক এটাই সকলে আশা করেন।

বিশ্ব টেনিসে ভারতের মর্য্যাদা বৃদ্ধি

বিশ্ব টেনিসে ভারত এশিয়ার প্রাধান্য অক্ষুন্ন রেখেছে। ভারত ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে ভারত জাপানের সম্মুখীন হয়েছে। ভারতের কাছে জাপানকে পরাজয় বরণ করতে হবে—এটাই সকলের ধারণা। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণাণ ভারতীয় দলের অধিনায়ক। পূর্ব্ববর্ত্তী খেলায় যোগদান করতে না পারলেও ফাইন্যালে প্রেমজিৎ দলভুক্ত হয়েছেন। এছাড়া তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জ্জী ও প্রবীণ খেলোয়াড় নরেশকুমার ভারতীয় দলে আছেন। ভারতের সাফল্য সম্পর্কে সকলেই আশাবাদী। টেনিসে ভারতের আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাক এটাই সকলে চান।

এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি আর একটি আন্তর্জ্জাতিক খেলাধূলার আসর বসে পেনাংএ অর্থাৎ এখানে এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। এশিয়ার জুনিয়ার ফুটবল খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়াই এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য। ভারত এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ভারতের এই ব্যর্থতার মূলে ছিল একটা আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় দল প্রেরণের জন্ত যে উদ্যোগ ও আয়োজনের প্রয়োজন ছিল—সেটায় যথেষ্ট গলদ থাকে। ভারতে ফুটবল মরশুম বহু পূর্ব্বেই শেষ হয়ে গেছে। অকস্মাৎ কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে একদল জুনিয়ার খেলোয়াড়কে নিয়ে দল গঠন করা হয়। খেলোয়াড়দের জন্ত এক শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছিলো—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে কোনরকম সুনিয়ন্ত্রি পরিকল্পনা ছাড়া দল গঠন করলে কি অবস্থা হয়, ভারতীয় দলে এবারকার ক্রীড়ানৈপুণ্যই তা প্রমাণ করিয়ে দেয়। তার উপর যে সকল খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছে তা সত্যি বিস্ময়কর। জুনিয়ার খেলোয়াড়ের নিশ্চয়ই একটা বয়সের সীমা আছে। আর আঠার বছরের বেশী নয় সেটাও ঠিক। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় যে বাঙ্গালার আপ্পালারাজু ও টির্কি কি ভাবে এই পর্য্যায়ে পড়লেন। তাজ্জব বাঙ্গালা দেশ।

জাকার্তায় এশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে ভারত ফুটবলে যে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলো—এবার এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় তাদের সেই সম্মান ধূলায় লুটিয়ে গেছে। এর জন্ত যাঁরা দায়ী—সকলেই দাবী করেন যে এ বিষয়ে তদন্ত হোক এবং উপযুক্ত শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করাটাও বোধ হয় অন্যায় হবে না।

ক্রিকেট মাঠে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা

Cricket—Lords Game—যাকে বলে রাজার খেলা। ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য ছিল—আগে দু'টো দল প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্ত প্রীতি ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করতো। কিন্তু যেদিন থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হ'লো—সেদিন থেকে ক্রিকেটের মাধুর্য্য নষ্ট হতে চলেছে। এখন ক্রিকেট চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। এখন খেলার চেয়ে জয়লাভটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। ফলে ফুটবলের মতন ক্রিকেট মাঠেও তাণ্ডবনৃত্য দেখা যাচ্ছে। এবার সি এ বি ক্রিকেট লীগের ফাইন্যালে মোহনবাগান ও বি এন আর দলের খেলায় দর্শকদের যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গেছে—তাতে ক্রিকেট মাঠকে সম্পূর্ণ কলুষিত করেছে। আম্পায়ার বা খেলোয়াড়—কোনটাতে বাদ যাননি। উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের পাল্লায় তাঁদের নাজেহাল হতে হয়েছে। শুধু কি তাই, একদিকের "স্ক্রিন"ও তাঁরা ছিঁড়ে দিয়েছেন। এ দৃশ্য থেকেই প্রমাণ হয় যে, ক্রিকেট আর ক্রিকেট নেই। সকলেই বাঙ্গালায় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

সি এ বি নক-আউট ক্রিকেট ফাইন্যালে মোহনবাগান বর্ত্তমান বছরের অন্যতম শক্তিশালী দল বি এন আরের কাছে পরাজিত হলেও তারা প্রথম ডিভিশন লীগে কালীঘাটের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জ্জন করেছে। তবে তিনদিন ব্যাপী খেলায় উভয় দলের ইনিংস শেষ না হওয়ায় "টসে" খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়।

বাঙ্গালা ক্রিকেট এসোসিয়েশন ক্রিকেট মরশুম শেষ করেছে। এপ্রিলের কাঠফাটা রোদে ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা যাতে না হয়—সেদিকে ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ একটু নজর দিলে খেলোয়াড়েরা আনন্দেই ...

ভারতের প্রাক্তন টেষ্ট অধিনায়ক জি, এস, রামচাঁদ প্রথম শ্রেণী ক্রিকেট খেলা হইতে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছেন।

ইরাণী কাপের খেলায় শক্তিশালী বোম্বাই-এর বিরুদ্ধে অবশিষ্ট দলের অধিনায়ক হিসাবে পঙ্কজ রায়

লিলি চক্রবর্ত্তীর সৌন্দর্য্যের গোপন কথা...

'লাক্সের মধুর পরশ

আমায় সুন্দর রাখে'

রূপসী লিলি চক্রবর্ত্তী বলেন—

"আমার প্রিয় লাক্স এখন চমৎকার পাঁচটি রঙে!"

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 127-X52 BO

মার্কিণ সাহায্য ও ক্লে কমিটী :—

শিল্প-বিপ্লবের পর তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। তখন সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা কম, অধিকারবোধ জন্মায় নাই, সঙ্ঘশক্তির উদ্ভব ঘটে নাই। দেশের একটি শ্রেণী জাতীয় অর্থনীতির কর্ণধাররূপে অবাধে জাতির অবশিষ্টাংশকে শোষণ করিতে পারিয়াছে; নির্মম সাম্রাজ্যবাদের রূপ লইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অনুন্নত অঞ্চলে তাহারা আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু আজ বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ—কি জাতীয় ক্ষেত্রে কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানুষকে তাহার সমস্ত প্রাপ্যে বঞ্চিত রাখা আর সম্ভব নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ভিত্তি করিয়া কোনও দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা আজ অসম্ভব; বনেদী পুঁজিবাদী দেশসমূহের অর্থনীতির ভিত্তিও এখন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে স্বভাবত: সাম্রাজ্যবাদী শোষণ হইতে মুক্ত দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে আকৃষ্ট হইতেছে; জাতীয় প্রয়োজন ও সঙ্গতি বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত পরিকল্পিত অর্থনীতির আশ্রয়ে তাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করিতেছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আদর্শ শুধু ভারতেই গৃহীত হয় নাই—গৃহীত হইয়াছে প্রাচ্যের সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রে,
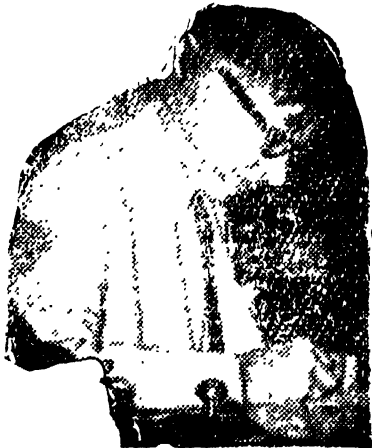
ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বত্রই। যে সব শিল্পোন্নত বৈদেশিক রাষ্ট্র এই সব দেশের আদর্শের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছে এবং রাষ্ট্রায়ত্তক্ষেত্রে বনিয়াদী শিল্প ও ভারি শিল্প গঠনে সহায়তা করিয়া সমাজ-তান্ত্রিক অর্থ-নীতি ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করিতেছে, তাহারা স্বভাবত: এই সব দেশের জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। অন্য অনেকগুলি দেশের মত ভারত সম্পর্কেও এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। তাহার সাহায্যে ভিলাই-এ এশিয়ার বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর এখানে দশ লক্ষ টন ইস্পাত তৈয়ারী হইতেছে; সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্যে এই কারখানা আরও প্রসারিত হইবার পর ১৯৬৬ সালে এখানে বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইবে পঁচিশ লক্ষ টন। সোভিয়েটের সাহায্যে রাঁচিতে ভারি শিল্পের যন্ত্র প্রভৃতির কারখানা নির্ম্মিত হইতেছে। এখানে প্রতি বৎসর ভারি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দশ লক্ষ টন যন্ত্র উৎপন্ন হইবে। ইহা ছাড়া তৈলের সন্ধান লাভের জন্য, তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠায়, খনির যন্ত্র নির্ম্মাণে, জেট জঙ্গী বিমানের কারখানা স্থাপনে এবং অন্য অনেকগুলি বিষয়ে সোভিয়েটের সাহায্য আসিয়াছে ও আসিতেছে। বস্তুত:, সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্য আসিয়াছে। সাহায্যের পরিমাণ অপেক্ষা সাহায্য দানের এই নীতি ভারতবাসীর মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়াছে। তাহা ছাড়া, শতকরা মাত্র আড়াই টাকা সুদে এক সহজ কিস্তিতেও সুবিধাজনক সর্ত্তে সোভিয়েটের ঋণ ভারতের পক্ষে খুবই কল্যাণকর হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, আমেরিকা ১৯৫১ সাল হইতে ভারতকে নানাভাবে লক্ষ লক্ষ ডলার সাহায্য করিয়া আসিলেও সে সাহায্য ভারতের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনে সহায়ক হয় নাই—রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভারি শিল্প বা বনিয়াদী শিল্পের স্থাপনে তাহা নিয়োজিত হয় নাই। এই জন্যই আমেরিকা ভারতের জন্য যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়াছে, সে অনুপাতে ভারতবাসীর হৃদয় জয় করিতে সে পারে নাই। অবশ্য, চৈনিক আক্রমণের সময় বিনা সর্ত্তে ভারতকে সামরিক সাহায্য দানে অগ্রসর হওয়ায় জনসাধারণ আমেরিকার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাকিস্তানের কাজে এই সামরিক সাহায্যকে সর্ত্তাধীন করিবার চেষ্টা হইতেছে; কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত যদি পাকিস্তানকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে, তাহা হইলে মার্কিণ সামরিক সাহায্য ভারত আর পাইবে কি না তাহাতে এখন সন্দেহ হইতেছে। কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের মনস্তুষ্টি যদি ভবিষ্যতে ভারতকে আমেরিকার সামরিক সাহায্যদানের অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ব্বসর্ত্ত হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীর মনে এই ধারণাই সঞ্চার হইবে যে, ভারতের বিপদের সুযোগে পশ্চিমী শক্তির সামরিক জোটের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। যাহা হউক, আমেরিকার সামরিক সাহায্যের প্রসঙ্গ আপাতত: আমাদের আলোচ্য নহে—সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ভারতের গঠনকার্য্যে আমেরিকার ভূমিকা আমরা আলোচনা করিতে চাহিতেছি। আমেরিকার সাহায্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রে প্রসারিত না হওয়ায় সে যে ভারতে সোভিয়েট ইউনিয়নের মত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারিতেছে না, ইহা অধ্যাপক

তলায় মার্কিণ ঋণে বোকারোয় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাতের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু বহু তদন্ত ও বিচার বিবেচনার পর আমেরিকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী আপাততঃ প্রসঙ্গটি চাপা রাখিয়াছেন। চাপা রাখিবার কারণ অবশ্য বহু যুক্তিতর্কের সাহায্যে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রকৃত বাধাটা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সাহায্যদানে আমেরিকার অনুৎসাহ।

এই সময়ে ক্লে কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়াতে বোকারোর ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। গত বৎসর প্রেসিডেন্ট কেনেডি বিদেশে সাহায্য দানের বিষয়টি তদন্ত করিয়া এই সম্পর্কে রিপোর্ট দিবার জন্ত জেনারেল ক্লের নেতৃত্বে এই কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিশ্বব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ইউজিন ব্ল্যাক এই কমিটীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ রিপোর্টে বিদেশে সাহায্যদানের মার্কিণ নীতি সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হইয়াছে; তাহার মধ্যে সোস্তালিষ্ট আদর্শে দেশ গঠনে প্রবৃত্ত রাষ্ট্রগুলির স্মরণ রাখিবার মত কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কমিটী বলেন, "We must be clear as to the kind of economic systems we attempt to foster and assist. Our help should create economic units which utilise not only limited Government resources wisely but mobilise the great potential and range of private individual efforts required for economic vitality and rapid growth.. ..The U. S. should not aid a foreign Government in projects establishing Government owned industrial and commercial enterprises which compete with existing private enterprises. We should not extend aid which is inconsistent with our beliefs, democratic tradition, and knowledge of economic consequences. অর্থাৎ, আমরা কি ধরণের অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে সাহায্য দিতে চাই ও বিকশিত করিতে চাই, তাহা স্পষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের সাহায্যে এমন অর্থনীতি গড়িয়া ওঠা উচিত, যাহা কেবল গভর্ণমেন্টের সীমাবদ্ধ শক্তিকেই কাজে লাগায় না—অর্থনীতিতে প্রাণ শক্তির সঞ্চার এবং উহার দ্রুত উন্নতির জন্ত প্রয়োজনীয় বে-সরকারী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করে। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এমন কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্ত আমেরিকা কোনও গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য দিবে না। আমাদের বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক সংগঠন সম্প:র্ক অভিজ্ঞতার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন কোন প্রকার সাহায্য আমরা দিব না। ক্লে কমিটীর এই মন্তব্যগুলি ভাবতের মত যে সব দেশ মার্কিণ

সমাজ ব্যবস্থা হইতে মূলগত পৃথক সোস্যালিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা গড়িতে চাহিতেছে, তাহাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবার মত। চৈনিক আক্রমণে বিপন্ন ভারতের প্রশ্ন ক্লে কমিটি অবশ্য বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। পাকিস্তানসহ ভারতকে চীনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করিবার প্রয়োজনীয়তা রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই ক্লে কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রেসিডেন্ট কেনেডি গত ২রা এপ্রিল বৈদেশিক সাহায্য দানের নীতি ঘোষণা করিয়াছেন।

আরব ফেডারেশন—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে সমস্ত আরব জগৎ দেশীয় সামন্ততান্ত্রিকতার ও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য যে সংগ্রাম করিতেছে, তাহার ইতিহাসে ১৯৬৩ সালের ১৭ই এপ্রিল একটি স্মরণীয় তারিখ। এইদিন মিশর, সিরিয়া ও ইরাকের তিন কোটি সত্তর লক্ষ নরনারী এক শক্তিশালী ফেডারেশনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। মিশরের (সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের) প্রেসিডেন্ট নাসের এই উপলক্ষে মন্তব্য করেন, "May it be God's wish that this unity will be the mother unity for all Arab lands." অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছায় এই ঐক্য সমগ্র আরবভূমির ঐক্যের প্রসূতি হউক। বস্তুতঃ এই নূতন সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র সমগ্র আরব জাতির পক্ষে অনিবার্য্য আকর্ষণ। ইয়েমেন ইতিমধ্যেই এই সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; আলজেরিয়া এই নূতন সঙ্ঘে যোগ দিবার কথা চিন্তা করিতেছে; জর্ডানে আরব ঐক্যের দাবীতে গণ-বিক্ষোভ আরম্ভ হইয়াছে, যাহার প্রতিক্রিয়ায় মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গা-গড়ার এবং পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে সৌদী আরবেও; কুয়ায়েৎ আইনসভার এক-চতুর্থাংশ সদস্য নূতন সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে যোগ দিবার দাবী জানাইয়াছে।

১৯৬১ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার (যখন সিরিয়ার দক্ষিণপন্থীদের চক্রান্তে ঐ রাষ্ট্রটি তিন বৎসর পূর্ব্বে গঠিত সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হয়) পর সংশ্লিষ্ট তিনটি পক্ষ এবার যথেষ্ট সংযম ও সতর্কতার সহিত নূতন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চুক্তি করিয়াছেন। মিশরের আগ্রহে যেমন কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তেমনি সংশ্লিষ্ট তিনটি রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতাও অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। নূতন ফেডারেশনে প্রেসিডেন্টের হাতে বিপুল ক্ষমতা থাকিবে বটে, কিন্তু প্রেসিডেন্টের শক্তিশালী কাউন্সিলে তিনটি রাজ্যের সম-সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবেন, এবং এই কাউন্সিলের অভিমত প্রেসিডেন্ট অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। স্থির হইয়াছে যে, জাতীয় পরিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য সমস্ত জনপ্রতিষ্ঠানে অর্দ্ধেক আসন কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। আঞ্চলিক আইন পরিষদগুলি প্রেসিডেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষে তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চল প্রধান নিয়োগ করিবেন। নূতন ফেডারেশনে কোনও রাজনৈতিক দল থাকিবে না। শেষ পর্য্যন্ত ইরাক ও সিরিয়ার বাৎ পার্টিরও বিলোপ ঘটিবে। সংবাদপত্রের ও ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে; তবে, ইস্‌লাম হইবে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম। ফেডারেশনে নারীর ও পুরুষের সমান অধিকার থাকিবে।

আরব জাতীয়তাবাদ প্রধানতঃ বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেছে এবং এই সাম্রাজ্যবাদ এতকাল যে দেশীয় প্রতিক্রিয়া শক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া আসিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইয়াছে। আরব দেশগুলির জাতীয় আন্দোলন কোনও বিশেষ শ্রেণীর আন্দোলন নহে; ধনিক শ্রেণীর এক অংশও এই আন্দোলনের সমর্থক। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের যে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ধারা, তাহা এই আন্দোলনে সুস্পষ্ট। সোস্যালিজম্ ও আরব ঐক্যের নামে আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া এবং বিশ্ব-শান্তির সহায়ক হইয়া জাতিগঠনে মনোনিবেশ করা আরব জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে এই আন্দোলনের সাফল্যে যে সব বিঘ্ন ছিল, তাহা সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় দূর হইল; এই সাধারণতন্ত্রের প্রসারে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঘাঁটী ক্রমে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

আরব জাতীয়তাবাদের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার পর স্বভাবতঃ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এখন মধ্যপ্রাচ্যে নূতন কৌশল অবলম্বন করিবে। এত কাল এই অঞ্চলের তৈলস্বার্থে প্রধান কর্তৃত্ব ছিল বৃটেনের; কিন্তু সাম্প্রতিক কালে কর্তৃত্ব প্রসারিত হইয়াছে মার্কিণ তৈল ব্যবসায়ীদের। বৃটেনের মধ্যপ্রাচ্য নীতি রক্ষণশীল; সামন্ততান্ত্রিক নৃপতিদিগকে প্রশ্রয় দিয়া এবং জনসাধারণের কুসংস্কারে পরোক্ষভাবে ইন্ধন যোগাইয়া সে তাহার অসঙ্গত অর্থ নৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হয়; তাহার এই চেষ্টা বহুকাল ফলপ্রসূও হইয়াছে। পক্ষান্তরে, আমেরিকা জাতীয়তাবাদী শক্তিকে প্রভাবিত করিতে সচেষ্ট হয় এবং দেশীয় দক্ষিণপন্থীদিগকে সহযোগিতায় আহ্বান করিয়া মার্কিণ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়াস করে। আমেরিকার এই চালে বৃটেন হারিয়া যাওয়াতেই বিগত দশকে [illegible] দিতে সে

বাধ্য হইয়াছিল। মধ্যপ্রাচ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমেরিকা নূতন আরব ফেডারেশনকে স্বাগত জানাইয়াছে এবং ইয়েমেনকে উপলক্ষ করিয়া মিশর ও সৌদী আরবের মধ্যে যে অঘোষিত যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহা মিটাইয়া ফেলিতে সৌদী আরবকে বাধ্য করিয়াছে। পক্ষান্তরে, বৃটেন এখনও ইয়েমেনের সাধারণতন্ত্রী সালাল গভর্ণমেণ্টকে স্বীকৃতি দেয় নাই এবং বৃটেনের আশ্রিত দক্ষিণ আরব ফেডারেশনের সামন্ততান্ত্রিক শেখের দল ইয়েমেনের নির্ব্বাসিত ইমাম্ বদরকে সাহায্য করিতেছে। আমেরিকার এই চালে বৃটেন অনেকখানি ঘায়েল হইল; আরব জগতে আমেরিকা তাহার মর্য্যাদা অনেকখানি বাড়াইয়া লইল। ইহার পর, সৌদী আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সহিত মিলনের দাবী আমেরিকা সক্রিয়ভাবে সমর্থন না করিলেও উহার বিরোধিতা করিবে না। এই আন্দোলন সফল হইবামাত্র দক্ষিণপন্থী শক্তির সহযোগিতায় আরবের তৈলে মার্কিণ স্বার্থরক্ষায় সে সচেষ্ট হইবে। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ, অর্থনীতিক্ষেত্রে উভয়ের সহযোগিতা নিবিড়। কিন্তু স্বদেশে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের নীতি অত্যন্ত কঠোর। ভারত গভর্ণমেণ্টের কম্যুনিজমের প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব না থাকিলেও অন্য সকল দলের গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের মত কম্যুনিষ্ট পার্টির গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপও এখানে বাধাহীন। আরব সাধারণতন্ত্রে কিন্তু কম্যুনিষ্টদের এই অধিকার স্বীকৃত নয়। এইখানেই প্রকৃত কম্যুনিজম ও কাল্পনিক কম্যুনিজমের ভয় দেখাইয়া আরব জাতীয়তাবাদের দক্ষিণপন্থী শক্তিকে প্রভাবিত করিবার সুযোগ রহিয়াছে। বস্তুতঃ আরব জাতীয়তাবাদের তীব্র কম্যুনিষ্ট বিরোধী মনোভাব দেখিয়াই আমেরিকা উৎসাহিত হইয়াছে; আরব জাতীয়তাবাদের সোস্যালিষ্ট আদর্শ তাহাকে বিমুখ করে নাই। কোনও দেশের সোস্যালিজমের প্রতি মার্কিণ অর্থনীতির সহানুভূতি নাই—রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা তাহার নীতিবিরুদ্ধ। তবুও আরব সোস্যালিজম সম্বন্ধে তাহার উৎকণ্ঠা কম; কম্যুনিজম বিরোধিতার রন্ধ্রপথ দিয়া আরব ফেডারেশনে মার্কিণ বণিক স্বার্থের অনুপ্রবেশ সম্ভব হইবে বলিয়া সে মনে করে এবং সৌদী আরবে, ইরাকে ও কুয়ায়েতে মার্কিণ তৈল স্বার্থের বিশেষ হানি হইবে না বলিয়া সে আশা করে।

লাওসে আবার অশান্তি—

এপ্রিল মাসের প্রথম হইতে লাওসের জার সমতলভূমিতে সশস্ত্র সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। সাম্প্রতিক কালে লাওসের নিরপেক্ষতাবাদী দলে বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে; ইহার একটি অংশ জেনারেল কং লী'র নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া পাথেট লাওর দিকে ঝুঁকিয়াছে। প্রথমে নিরপেক্ষতাবাদীদের এই দুই উপদলে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় নিরপেক্ষতাবাদী প্রধানমন্ত্রী সুভন্না ফুমার সেনাবাহিনীর চিফ অব ষ্টাফ কেটসেনা জার সমতলভূমিতে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। কং লী'র অনুরক্তরা দলত্যাগী পররাষ্ট্রসচিব কুইনিম ফলসেনাকে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ লয়; ইহার পর দলত্যাগীদের একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরও ভিয়েনতিয়েনে নিহত হন। এইভাবে উপদলীয় বিরোধ তীব্র হইয়া ওঠে এবং দুই পক্ষ তাহাদের সমর্থকদের সাহায্য প্রার্থনা

করে—দলত্যাগীরা বামপন্থী পাথেট লাওর সাহায্য চায়, কং লী চান দক্ষিণপন্থী ফুমি নোসাভানের সাহায্য। এইভাবে জার সমতলভূমিতে সশস্ত্র সজ্ঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। এই সজ্ঘর্ষের ফলে কং লী'র সেনাবাহিনী জার সমতলভূমি হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়াছে।

পাথেট্ লাওর অভিযোগ—ফুমি নোসাভানের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী সেনাবাহিনী এখনও আমেরিকার দ্বারা অস্ত্রসজ্জিত হইতেছে এবং নানাবিধ সমরোপকরণ লাভ করিতেছে; দক্ষিণ লাওসে আমেরিকার তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশ হাজার সৈন্ত রহিয়াছে, সাদা পোষাক পরিহিত মার্কিণ সামরিক কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছে; অথচ ১৯৬২ সালের জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরকারী হিসাবে আমেরিকা লাওস হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসরণ করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাথেট্ লাওর রাজনৈতিক শাখা নিও লাও হাক্সাৎ পার্টি লাওস্ হইতে আমেরিকানদের অপসারণের দাবীতে সমগ্র দেশে শত শত সভা ও শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছে। যাহা হউক, লাওস পরিস্থিতির বিপদ এই যে, বিবদমান প্রধান তিনটি দলের স্বাতন্ত্র্য এখনও নষ্ট হয় নাই—জেনেভা চুক্তি অনুসারে তিনটি দলের সেনাবাহিনীর মিলনে এক অখণ্ড সেনাবাহিনী গড়িয়া ওঠে নাই; পুলিশ বিভাগও দলগত স্বাতন্ত্র্যবিবর্জ্জিত জাতীয়চরিত্র লাভ করে নাই। জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ছয় মাস পরেও দলীয় বিভেদ নিশ্চিহ্ন না হইবার কারণ পাথেট লাও সাম্প্রতিক কালে লাওসের গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে; এই দলের প্রভাব এখন এত বেশী যে, লাওসে স্বাধীন নির্ব্বাচন হইলে নিরপেক্ষতাবাদী ও দক্ষিণপন্থী কাহারও পক্ষে পাথেট লাওর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণেও দলীয় স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিতে কেহ সাহসী হইতেছে না; আমেরিকাও দক্ষিণপন্থীদের ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে না। প্রিন্স সুভান্না ফুমার নিরপেক্ষতাবাদীরা লাওসে কম্যুনিষ্ট-ঘেঁষা পাথেট লাও ও মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক সেতুর কাজ করিতেছিল; এই সেতু এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। লাওসের জটিল পরিস্থিতিতে ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। লাওসে আবার অশান্তি আরম্ভ হওয়ায় সর্ব্বত্র উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে। কিন্তু আমেরিকার উৎকণ্ঠা বেশী; আমেরিকার সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ হ্যারিম্যান লণ্ডনে ও প্যারিসে লাওস পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার পর মস্কো গিয়াছেন। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সপ্তম মার্কিণ নৌবহরের টহল আরম্ভ হইয়াছে, থাইল্যাণ্ডে মার্কিণ সৈন্তের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। অজুহাত—লাওস পরিস্থিতিতে বিপন্ন থাইল্যাণ্ডকে রক্ষা করিতে আমেরিকা বদ্ধপরিকর। কিন্তু আজ সমস্যাটা প্রকৃতপক্ষে থাইল্যাণ্ডকে রক্ষা করার নয়—সমস্যা হইল লাওসের রক্ষা পাওয়ার। আমেরিকার সামরিক শক্তির প্যারেডে লাওস রক্ষা পাইবে না—জেনেভা চুক্তির সর্ত্তাবলী যথাযথ পালন করিয়া লাওসকে বাহিরের বৃহৎ শক্তির রাহুগ্রাস হইতে মুক্তি দেওয়াই তাহার রক্ষা পাওয়ার প্রকৃত উপায়।

দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি—

কম্যুনিজমের প্রসার নিবারণের নামে ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার যে নীতি পরলোকগত ডালেস্ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই আজ লাওসের এই দুর্গতি এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। কম্যুনিজম্ প্রতিরোধের নাম করিয়া আমেরিকা এই অঞ্চলে পাঁচ শত কোটিরও বেশী ডলার ব্যয় করিয়াছে। জনগণের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত ও অপব্যয়িত এই অর্থের দুই শত কোটি ডলার গিয়াছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে। বারো হাজার সামরিক ও বে-সামরিক আমেরিকান্ এখন প্রতিক্রিয়াশীল দিয়েমতন্ত্রকে রক্ষার জন্ত নিযুক্ত। অথচ, ভিয়েৎ কং গেরিলাদিগকে দমন করিয়া নো দীন্ দিয়েমের শাসনকে নিরাপদ ও সংহত করিবার সুদূরবর্ত্তী সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি মাইক ম্যান্স্ফিল্ডের নেতৃত্বে কয়েকজন মার্কিণ সেনেটর দক্ষিণ ভিয়েৎনাম পরিদর্শন করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন, "It is most disturbing to find that after seven years of the Republic, South Vietnam appears less, not more stable than it was at the outset, that it appears more removed from, rather than closer to, the achievements of popular responsible and responsive Government. অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার বিষয় যে, প্রারম্ভে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের যে অবস্থা ছিল, সাত বৎসর পরে উহার সংহতি তাহা অপেক্ষা বৃদ্ধি পায় নাই—বরং আরও কমিয়াছে; জনপ্রিয় দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট সেখানে প্রতিষ্ঠার দিকে
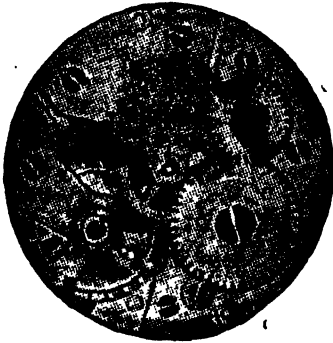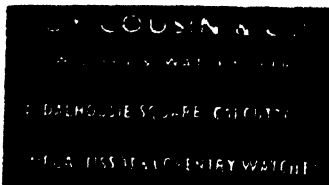
ভিয়েৎনামের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন...the war of the rice paddies, the jungle paths and the mountain trails, the war of terror has resumed and grown to the proportions of a major conflict ..The attacks of the Vietcong guerillas averaged over 100 per week during the year 1962 and ranged in size from squad to battalion level. The numerical strength of the Vietcong guerillas has increased steadily until it is now at the highest point since the cease fire in 1954. অর্থাৎ, ধানের ক্ষেতে, বনের পথে ও গিরিকন্দরে সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ এখন বড় রকমের সঙ্ঘর্ষে পরিণত হইয়াছে। ১৯৬২ সালে প্রতি সপ্তাহে ভিয়েৎ কং গেরিলারা এক শতটি আক্রমণ চালাইয়াছে এবং স্কোয়াড হইতে ব্যাটালিয়নের পর্য্যায়ে এই সব আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছে। ভিয়েৎ কং গেরিলার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ১৯৫৪ সালে যুদ্ধবিরতি পরবর্ত্তী কালের সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছিয়াছে।

দুই শত কোটী ডলার এবং বারো হাজার আমেরিকান নিয়োগ করিয়া মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আজ এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন। এই ব্যর্থতার কারণ—জনগণের অবাঞ্ছিত অগণতান্ত্রিক এক শাসনব্যবস্থাকে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় ভিয়েৎ কং এর প্রধান শক্তি আজ জনগণের সমর্থন, প্রতিবেশী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সাহায্যটা গৌণ। বস্তুতঃ, সম্প্রতি আমেরিকার কিছু সংখ্যক লেখক, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক ও ধর্ম্মযাজক দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আমেরিকার হস্তক্ষেপ বন্ধ করিবার জন্ত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির উদ্দেশ্তে প্রকাশিত এক আবেদন লিপিতে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে' বিজ্ঞাপনের আকারে প্রকাশিত এই আবেদন লিপিতে তাঁহারা বলেন, "দিয়েম বিরোধী বিদ্রোহীরা কম্যুনিষ্ট উত্তর-ভিয়েৎনাম হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইলেও ইহারা দেশবাসীর অন্তর হইতে উৎসারিত ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিস্থানীয়।" পত্রলেখকরা প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, তিনিই এক সময় সেনেটর হিসাবে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ইন্দোচীন নীতির সমালোচনায় বলিয়াছিলেন, সুদূরবর্ত্তী বিজয়ের সম্ভাবনাও যেখানে নাই, সেই ইন্দোচীনের অরণ্যে অর্থ, রসদ ও সৈন্ত প্রেরণ বিপজ্জনকভাবে ব্যর্থ ও আত্মবিধ্বংসী হইবে। অদৃষ্টের পরিহাস, প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকেই তাঁহার নিজের এই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত করার দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এই অসম্ভব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া মার্কিণ সমর বিভাগ সেখানে এক হিংস্র নীতি অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া লিখিয়াছেন, "The United States Government is waging an annihilatory war

in Vietnam. The sole object of this war is to preserve the cruel feudal system in the south and to destroy all opponents of dictatorship... napalm is used without any warning against whole villages and chemical warfare is conducted to destroy crops and livestock, and doom the population to famine." অর্থাৎ, মার্কিণ সরকার ভিয়েৎনামে এক বিধ্বংসী যুদ্ধ চালাইতেছেন। দক্ষিণ অঞ্চলের নির্মম সামন্ততান্ত্রিক প্রথা অক্ষুন্ন রাখা এবং একনায়কত্বের বিরোধীদিগকে ধ্বংস করাই এই যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।...পূর্ব্বে সতর্ক না করিয়া দিয়া সমগ্র গ্রামে নাপাম বোমা বর্ষিত হইতেছে এবং শস্য ও গৃহপালিত পশু ধ্বংস করিয়া জনসাধারণকে উপবাসে মারিবার জন্ত রাসায়নিক যুদ্ধ চালানো হইতেছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল অভিযোগ করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণরা পূর্ব্ব-ইউরোপে এবং জাপানীরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিয়াছিল, এখানে আমেরিকার অবলম্বিত যুদ্ধপদ্ধতি তাহার মতই।

থ্রেসারের সলিল সমাধি—

গত ১১ই এপ্রিল আমেরিকার নব-নির্ম্মিত পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত সাবমেরিণ "থ্রেসার" পরীক্ষামূলকভাবে জলে ডুব দিবার পর ভাসিয়া ওঠে নাই। থ্রেসারের সহিত এক শত উনত্রিশ জন মার্কিণ নাবিকের সলিল সমাধি হইয়াছে। ইঁহাদের কেহই সাধারণ নাবিক ছিলেন না—প্রত্যেকে উচ্চশিক্ষিত এবং যন্ত্রবিদ্যায় উচ্চাঙ্গের শিক্ষাপ্রাপ্ত। কি যুদ্ধের সময়, কি শান্তির সময় এত বড় সাবমেরিণ দুর্ঘটনা ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। "থ্রেসার" নির্ম্মাণের ঘোষিত ব্যয় পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ ডলার; পারমাণবিক অস্ত্রের জন্ত অঘোষিত ব্যয়ের পরিমাণও নিশ্চয়ই কম হইবে না। "থ্রেসার" এবং ঐ শ্রেণীর সাবমেরিণকে "দ্রুততম, গভীরতম সমুদ্রগামী এবং সর্ব্বাপেক্ষা পটু সাবমেরিণ বিধ্বংসী" সাবমেরিণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। যন্ত্রবিজ্ঞানের এই অভিনব সৃষ্টি এবং তৎসহ এক শত উনত্রিশটি অমূল্য জীবন অতলান্তিকের অতল তলে চিরসমাধি লাভ করিল; সেই সঙ্গে অতলান্তিকের জল তেজস্ক্রিয়তায় দূষিত হইল। মার্কিণ নৌ-বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে নিমজ্জিত "থ্রেসারের" অভ্যন্তরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন—বিস্ফোরণ না ঘটিলেও শেষ পর্য্যন্ত অতলান্তিকের জল কলুষিত হইবেই; তবে উহার পরিব্যাপ্তি কতদূর, তাহা কিছুকাল অতিবাহিত না হইলে জানা যাইবে না।

"থ্রেসারের" সলিল সমাধি অবশ্য আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু অস্ত্রসজ্জার নামে আজ আগুন লইয়া কি ভয়ঙ্কর খেলা চলিতেছে, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। ইহার পর এই খেলা বন্ধ করিবার চেষ্টা অধিকতর হইবে বলিয়া কি আশা করা যায়? পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার যে শেষ নাই, ইহা সাম্প্রতিক কালে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি; পারমাণবিক বোমা বেশী দিন আমেরিকার একচেটিয়া থাকে নাই; হাইড্রোজেন বোমা নির্ম্মাণে তাহার অগ্রগতিতে বিলম্ব হইয়াছিল, রকেট নির্ম্মাণে সোভিয়েট ইউনিয়ন সুনির্দ্দিষ্টভাবে আমেরিকার অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী। এখন বিশালকায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা ধ্বংসক্ষম পারমাণবিক সাবমেরিণ তৈয়ারী করিয়া মার্কিণ সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। "থ্রেসার" ধ্বংস হওয়ায় সে চেষ্টা অবশ্য বন্ধ হইবে না। কিন্তু ইহার শেষ কোথায়? —"মিহির"

প্রেম

সুলতা সেনগুপ্ত

ঝঞ্ঝায় দুলিয়া ওঠে বহু যত্নে বাঁধা গেহখানি
পুলক চাঞ্চল্যে তবু চঞ্চলিয়া ওঠে দেহখানি
অঙ্গুলিহেলনে কার ইহকাল-পরকাল কাঁপে
পাষাণ গলিয়া যায় নিঃশ্বাসের গভীর উত্তাপে।

মরুর উষর বক্ষে উচ্ছলিয়া নামে জলধারা
অন্ধ অন্ধকার পায় 'চন্দ্র-লোকে' আলোর ইশারা
সহসা সম্মুখে যেন নেমে আসে পরম বিস্ময়
নয়নে নয়ন রাখি অন্তরের চাহে পরিচয়।
পরিচয়?
কিছু নাহি, আছে শুধু যুগল অন্তর
অসহায় দুটি তনু লাজে ভয়ে কাঁপে থর থর
অসীমের অন্তরালে মনসিজ মৃদু হাসি হাসে
নীলাম্বরে জ্বলে তারা, পদতলে ফুল ফোটে ঘাসে
উদ্ধত পর্ব্বত করে ধরণীরে লুটায়ে প্রণাম
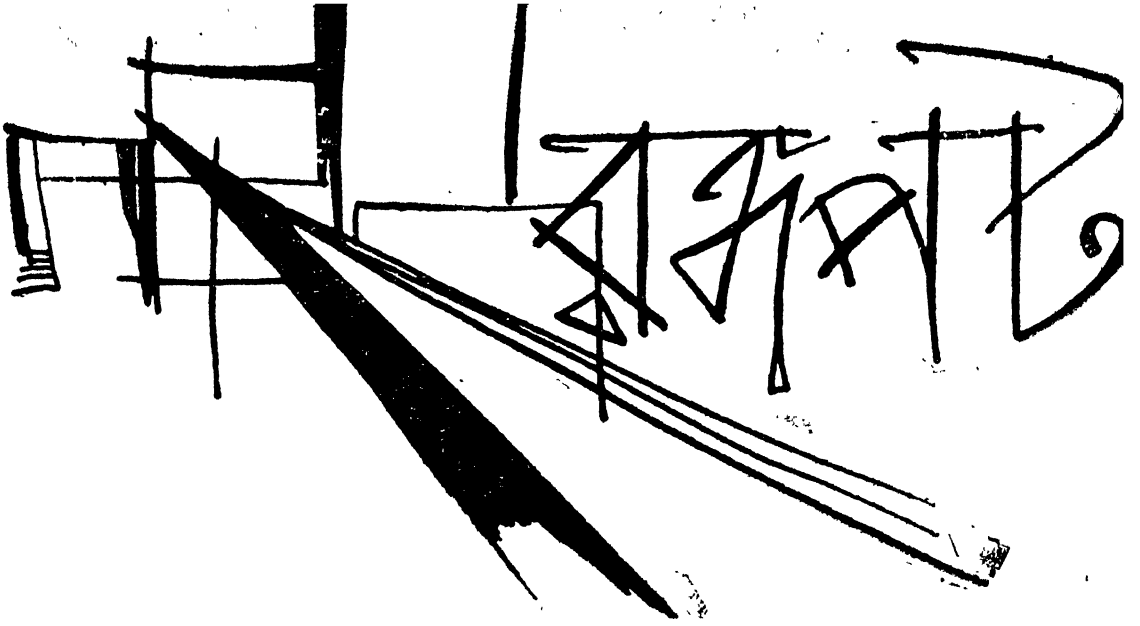
আঠারো শতকের এক রঙ্গালয়

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

অমল মিত্র

ক্যালকাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময় কোন খবরের কাগজ ছিল না। ১৭৮০ সালে প্রথম পত্রিকা জেমস আগষ্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট অব ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার' বেরুল। এরই প্রথম সংখ্যায় দেখি এখানকার একমাত্র রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপন রয়েছে। বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ ফার্কুহরের 'দি বো ষ্ট্র্যাটাজেম' অভিনীত হবে সেখানে। তারপর একে একে 'দি ফয়ার পেনিটেন্ট', 'ভেনিস প্রিজার্ভড', 'বনটন', 'হু ইজ দি ডিউপ', 'দি প্যাডলক', দি পুয়োর সোলজার', 'রিচার্ড দি থার্ড', 'দি অথর,' 'দি মার্চেণ্ট অফ ভেনিস', 'দি আইরিশ উইডো', 'দি রিভেঞ্জ', 'শি ষ্টুপস টু কঙ্কার' এবং 'দি ক্রিটিক' প্রভৃতি বহু নাটক অভিনয়ের সংবাদ পাই। দীর্ঘস্থায়ী এই নাট্যশালায় সেক্সপীয়ার থেকে শুরু করে বেন জনসন, ফ্র্যান্সিস বোমণ্ট এবং জন ফ্লেচার, ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার, জন ফোর্ড, উইলিয়াম কনগ্রীভ, জর্জ ফার্কুহর, নিকোলাস রো, টমাস অটওয়ে, হেনরী ফিল্ডিং ও আর. বি. সেরিডান প্রভৃতি সেদিনের বহু নামকরা নাট্যকারের নাটক অভিনয়ের খবর দেখি প্রাচীন পত্রিকার পাতায় ছড়ান রয়েছে। রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষেরা আন্তরিক চেষ্টা করতেন সকল শ্রেণীর দর্শককেই আকৃষ্ট করতে। তাই, 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ'-এর মত গভীর ও গম্ভীর বিয়োগান্ত নাটকেরই শুধু অভিনয় হত না, 'বনটন', 'হু ইজ দি ডিউপ' প্রভৃতির মত লঘু প্রহসনেরও অভিনয় হত। সঙ্গীত অনুরাগী দর্শকরাও বঞ্চিত হতেন না। গানে গানে ভরা 'হ্যাণ্ডেলস মেশায়া'র মত নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে।

অভিনয়ের ভাল মন্দ সমালোচনাও কাগজে বেরুত। ১৭৮৬

অরফ্যান সোসাইটির সাহায্যার্থে। এদেশে ইংরেজ সেনাদের ছেলেদের জন্যে স্থাপিত হয়েছিল এই সোসাইটি। কারণ ব্যারাকে থাকলে কোন সুযোগই পেত না তারা শিক্ষা দীক্ষা পেয়ে মানুষ হবার। সে পরিবেশ আর যাই হোক শিক্ষার উপযোগী নয়। সেদিনের ইংরেজদের তাদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। যাই হোক সেই সাহায্যকল্প অভিনয় প্রসঙ্গেও সমালোচনা বেরুল 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর পাতায়। বললে,—"The characters were judiciously cast and in general well supported."

পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে একজন অভিনেতা এক প্রস্তাবনা আবৃত্তি করেছিলেন। সহৃদয় দর্শকদের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে। অপূর্ব সুন্দর সেই প্রস্তাবনা সবটাই প্রকাশিত হল গেজেটে। তার ভাব ও ভাষা আজো ভাল লাগবে অনেকের।

পুরণো দিনের নথিপত্র থেকে এরকম বহু নাটকেরই সুষ্ঠু অভিনয়ের কথা জানতে পারি। 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস'-এ শাইলকের ভূমিকা হয়েছিল "...accurate and spirited" এবং ...elegant and interesting" হয়েছিল পোর্সিয়ার অভিনয়ে।

আর এক রাত্রে সেরিডানের 'দি ক্রিটিক' নাটকের অভিনয় দেখে সংবাদপত্র লিখলে, যদিও অভিনয় খুব সুন্দর হয়েছে এবং তার পুনরভিনয়ও কাম্য, তবু 'হ্যামলেট', 'জ্যারা', 'ভেনিস প্রিজার্ভড' এবং 'ম্যাকবেথ'-এর মত বিয়োগান্ত নাটকের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ যেন বেশী।

১৭৮৬ সালে মে মাসের এক সন্ধ্যায় দেখি গীতিবহুল নাটক 'হ্যাণ্ডেলস মেশায়া' অভিনীত হল 'উইথ অ্যাস্টনিসিং সাকসেস্'।

সুরের জাল বুনেছিল নিপুণ শিল্পীরা। এক-একটি গানের শেষে মুগ্ধ দর্শকের করতালধ্বনিতে সারা প্রেক্ষাগৃহ কেঁপে উঠেছিল। সংবাদপত্র সে রাত্রের অভিনয়ের বিবরণে লিখল—

"The songs and recitatives would have been applauded on any theatre in Europe."

তেমনি মনোমুগ্ধকর হয়েছিল যন্ত্রসঙ্গীতও।

এমনি বহু সঙ্গীতবহুল নাটকেরই অভিনয় দেখতে পেতেন সেদিনের দর্শকরা। 'প্যাডলক' নাটকে লিয়োনারার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন একজন নামী অভিনেতা। 'দি ক্রিটিক' অভিনয়ে দর্শকরা প্রথম তাঁর দক্ষতার পরিচয় পেয়েছিলেন। এমনি বহু প্রতিভাবান শিল্পীর সেদিন দেখা পাওয়া যেত এই রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপের সামনে। বাইরে থেকে নামকরা কোন অভিনেতা বা শিল্পী এলেও সংবাদপত্র সে খবর শিল্প-রসিকদের জানিয়ে দিত। ১৭৮৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বরের 'ক্যালকাটা গেজেট' 'পুয়োর সোলজার' নাটকের অভিনয়ের খবরে জানাল, এক অভিনব শিল্পীর 'ফিজরয়'-এর ভূমিকায় অংশ গ্রহণের সংবাদ। ও দেশের রঙ্গমঞ্চে সঙ্গীত-শিল্পী ব্যানিস্টারের গাওয়া দু'খানি গান তিনি গাইবেন, সে খবরও জানাল।

২৮শে রাত্রের অভিনয়সাফল্যটুকু উপলব্ধি করার পক্ষে ঐ খবরটুকুই যথেষ্ট। প্রায় অধৈর্য হয়েই দর্শকরা অপেক্ষা করেছিলেন সেই প্রতিভাটির গান শোনবার জন্যে। অভিনয়রাত্রে প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের স্থান রইল না। সঙ্গীত-সম্মোহনে অভিভূত হয়েছিলেন সেদিনের দর্শকরা। একটু আগে 'ক্রনোহটনথলোগস্' প্রহসনের অভিনয় দেখে সারা প্রেক্ষাগৃহ কেঁপে উঠেছিল যাঁদের প্রাণখোলা হাসিতে, তাঁরা নীরব, স্তব্ধ। এ-রকম কত গৌরবোজ্জ্বল রাত্রি এসেছিল এই ক্যালকাটা থিয়েটারের দীর্ঘজীবনে।

সেই সুনাম ও গৌরবের মূলে ছিল দরদীশিল্পী ও সুদক্ষ পরিচালকদের অক্লান্ত উদ্যম। য়ুরোপের প্রথম শ্রেণীর রঙ্গালয়ের মত করেই ক্যালকাটা থিয়েটারকে গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল তাঁদের। সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। পুরণো দিনের কাগজপত্রে এর বহু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। দর্শকেরা সেদিন য অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতেন, তার সকল মূ চুকিয়ে দিতেন না শুধু প্রবেশপত্রের দাম দিয়ে। শিল্পী ও পরিচালকদের উপযুক্ত সম্মানও তাঁরা দিতেন। এমন কি কোম্পানীর সর্বোচ্চ কর্মচারীও অবহেলা করতেন না এঁদের। একদিন অভিনয় দেখতে নিমন্ত্রিত হলেন বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬)। এদিকে বিশেষ কোন কাজে সেইদিনই নবাব এসে পৌঁছলেন কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে জরুরী পরামর্শে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বড়লাট। নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হল না। পরদিন রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জানালেন। ছোট্ট কিন্তু বিশেষ ঘটনাটুকুর খবর প্রকাশিত হল সংবাদপত্রে। তারা লিখলে—

"We hear the Right Honorable the Governor General being engaged to His Excellency the Nawab on the night of the last play, ordered a very handsome apology to

the impossibility of His Lordship's being present ;—an instance of that polite attention which, in the most minute matters, is so conspicuous in His Lordship's character."

দৃশ্যপট, পোষাকপরিচ্ছদ সম্বন্ধেও কাগজে মন্তব্য থাকত। গ্যারিক প্রেরিত মেসিঙ্ক ছাড়াও ব্যাটল প্রভৃতি আরো কয়েকজন শিল্পী যে দৃশ্যপট আঁকায়, মঞ্চ সাজানোয় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন সে খবরও কাগজে পাওয়া যায়। আরো অনেক সংবাদ সেদিনের পত্রিকায় পাই। আজকের মত সেদিনও দুঃস্থ কোন ব্যক্তি বা কল্যাণকার্যে ব্রতী কোন সংস্থা, কিম্বা রঙ্গালয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীদের জন্য কর্তৃপক্ষেরা যে প্রায়ই বেনিফিট নাইটের ব্যবস্থা করতেন সে খবরও পত্রিকাতেই পাই। কাগজে এও দেখা যায় যে, থিয়েটারগৃহে বড় বড় অনেক নৃত্যানুষ্ঠানও একসময় হয়ে গেছে।

বড়লাট এবং গণ্যমান্য অনেকের শুভেচ্ছা নিয়ে প্রায় লক্ষটাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠাতারা নিঃসংশয় ছিলেন ; কিন্তু তাঁদের সে আশা ব্যর্থ হল। রাতের পর রাত বহু নাটকের সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় হল। দর্শক সমাগমও কম হয় নি। অজস্র প্রশংসায় পত্রিকার পাতাও ভরে যেত দিনের পর দিন। সব সত্ত্বেও অর্থাভাবে রঙ্গালয়ের দুরবস্থা ঘুচল না। ব্যয়ের মাত্রা বেড়েই চলল, ঋণের মাত্রাও। কর্তৃপক্ষরা চিন্তিত, বিভ্রান্ত। আসল দূরের কথা, পাওনা সুদটুকুও অংশীদারদের হাতে তুলে দিতে পারেন না। চেয়ে চেয়ে তাঁরা হতাশ হন। শেয়ারের দাম অর্ধেকের নিচে নেমে গেল। অবস্থা আয়ত্তে আনার সকল চেষ্টা বিফল হল। কর্তৃপক্ষরা শেষপর্যন্ত যোগ্য এক ব্যক্তির সন্ধান করে রঙ্গালয়ের ভার তাঁর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন। নতুন কর্ণধার অনেক কিছু পরিবর্তন করলেন, অদল বদল ঘটালেন। পেশাদার শিল্পীদের আনা হল, অবশ্য এই নবাগতরা যে খুব উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন তা মনে হয় না। দিনের পর দিন পত্রিকায় তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখেও মনে হয় না। পরবর্তী এক রঙ্গালয়ের পেশাদার অভিনেতাদের সম্বন্ধে "Skeches in India"র প্রণেতা যা মন্তব্য করেছিলেন বোধ হয় এঁদের সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে—

> '...after the performance of a play a bombastic account appears the next day in the 'India Gazette, which praises the actors and acting both in prose and verse. Those who have performed well are non-parcils and inimitable, those who have done tolerably are admirable ; and badly, excellent."
>
> ("In the Days of the Company")

অ্যামেচাররা তখনো কিছু কিছু ছিলেন। কয়েকবছরের মধ্যে মিসেস ক্রুশিফিক্স, মিসেস হিউজেস প্রভৃতি অভিনেত্রীরাও এসে যোগ দিলেন। এমনি নানা পরিবর্তন ঘটে গেল লায়ন্স রেঞ্জের থিয়েটারে। তখনকার মত সমস্যার সমাধান হলেও সেই অর্থসঙ্কট আবার দেখা দিল ১৭৯৫ সালে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসেও স্মরণীয় এই বছরটি। এই ১৭৯৫ এ প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা একজন বিদেশী, নাম হেরাসিম লেবেডেফ।

সুদক্ষ শিল্পীর অভাবে বা যে কোন কারণেই হোক, ক্যালকাটা থিয়েটারে উঁচুদরের ভাল নাটকের বদলে হাল্কা প্রহসনের অভিনয় হতে লাগল। রঙ্গালয়ের এই দিনগুলির কথা স্মরণ করেই ডব্লু. এইচ কেরী মন্তব্য করেছিলেন—

> "The theatrical talents must have been at a low ebb indeed, when such a bill of fare as the following was the best that could be given in the way of amusement at the Calcutta Theatre :—'On Wednesday next, the 13th May, 1795, will be performed the farce of Neck or Nothing, and the musical Entertainment of The waterman ; with a view of Westminister Bridge, and *a representation* of the Rowing match."
>
> ("The Good Old Days of the John Company.")

কটনও রঙ্গালয়টি সম্বন্ধে একই অভিমত প্রকাশ করেছেন—

> "The farces and other plays announced from time to time in the Calcutta Gazette are of the most mediocre description, and one learns without surprise that the theatre soon fell into debts."

রঙ্গালয়টির প্রতি অবিচারই করেছেন এঁরা। একদিন 'ম্যাকবেথ,' 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস,' 'রিচার্ড দি থার্ড,' 'ভেনিস প্রিজার্ভড,' 'দি রিভেঞ্জ' প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর বহু নাটকের অভিনয় যেখানে হয়েছিল। সবগুলই সাফল্যমণ্ডিত অভিনয়, যার স্মৃতি দর্শক মন থেকে তখনো মুছে যায় নি বলেই হাল্কা প্রহসনের প্রতিষ্ঠানের তহবিল ভারী হয়ে উঠতে পারে নি। এ সময়ের শোচনীয় পরিস্থিতির ফলে রঙ্গালয়টিকে চালু রাখার জন্যে আবার কিছু রদবদলের অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এবার 'সাবস্ক্রিপসান পার্ফরমেন্স'এর প্রবর্তন করলেন কর্তৃপক্ষরা। নতুন নিয়মে ছ'টি অভিনয় হবে এক মৌসুমে। একশ কুড়ি সিক্কা টাকা দিলে "a ticket for the season for himself, and every lady of his family" দর্শককে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। আর চৌষট্টি সিক্কা টাকায় সারা মৌসুমের সিঙ্গল্

'ঘুম ভাঙার গান' চিত্রের একটি বিশেষ দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়রত অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

টিকিট। ৩০শে অক্টোবর নতুন নিয়মের প্রথম অভিনয় হওয়ার খবর কাগজে পাই। অভিনীত হয়েছিল সে-রাত্রে জনপ্রিয় সঙ্গীতবহুল নাটক 'দি পুয়োর সোলজার' এবং একখানি প্রহসন। ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে চলল আবার কিছুদিন। আশানুরূপ সুবিধে কিছু হল না, বিশেষ করে অর্থের দিক দিয়ে। সেদিনের একমাত্র নাট্যশালা যেন কোনরকমে দাঁড়িয়ে রইল লায়েন্স রেঞ্জের কোণে। তার অতীত গৌরব নির্বাপিত প্রায়। দুর্দিনের সঙ্গে লড়াই করার শক্তিটুকুও ফুরিয়ে এসেছে। তবু প্রবাসী ইংরেজদের আনন্দ দেওয়ার কর্তব্য-বোধেই যেন তখনো দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দুষ্টগ্রহ বিড়ম্বিত তার ভাগ্যে সেটুকুও হবার নয়। আবার সমস্যা দেখা দিল ১৭৯৭এ। নতুন এক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার খবর 'ক্যালকাটা গেজেটে' বেরুল। প্রতিযোগিতায় নামতে হল ক্যালকাটা থিয়েটারকে। অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য সে রঙ্গালয় উঠে গিয়েছিল। বিশ বছরেরও পুরণো রঙ্গালয়েরই তখন অচল অবস্থা, নতুন রঙ্গালয় চলবে না জানা কথাই। বিদেশী রঙ্গালয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোনদিনই এখানে দু'টি রঙ্গালয় একই সময়ে চলা সম্ভব হয় নি। ইংরেজ অধিবাসীদের সংখ্যা সেদিন কম। এতই কম যে, ক্যালকাটা থিয়েটারের বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন (উইলিয়ামসন) মন্তব্য করেন—

"Calcutta can boast of a very tolerable theatre, Centricably situated, and spacious enough to contain as many spectators as are generally to be found within the town."

ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে সকল দর্শকের অনায়াসে স্থান সঙ্কুলান হতে পারত। দু'টি রঙ্গালয় চলার মত দর্শক সেদিন কলকাতায় ছিল না। প্রবেশপত্রের দামও আবার এক সোনার মোহর। ব্যারিষ্টার-পত্নী মিসেস ফেরই তা' বেশি মনে হয়, সাধারণ দর্শকদের তো গায়ে লাগবেই। দু'টি রঙ্গালয়ের একটির পাদপ্রদীপের আলো নিবে যাওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

কল্পু, ছবি, বেলা। স্যুটিংয়ের অবসরে রূপসনাতন চিত্রের তিন শিল্পী

প্রতিযোগিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ভাঙনধরা ক্যালকাটা থিয়েটারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নানান চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু তা আর হবার নয়। ঋণই শুধু বেড়ে গেল। বছরের পর বছর সুদিনের অপেক্ষায় থেকে কর্তৃপক্ষেরা নিরাশ। তবু গড়িয়ে গড়িয়ে আরো ক'টা বছর কাটল। এল ১৮০৮ সাল। দেখি বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের 'দি চিট্স অফ স্ক্যাপাঁ' সেখানে অভিনীত হচ্ছে। যদি দর্শকমন আকৃষ্ট হয় এই আশা। কয়েক রাত অভিনয়ের পর প্রেক্ষাগৃহের শূন্য আসনগুলো হতাশাই বরণ করল শুধু। রঙ্গালয় চালান আর সম্ভব নয় বোঝা গেল। ঋণের বোঝা বাড়ানোর চেয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। করলেনও তাই কর্তৃপক্ষরা। তেত্রিশ বছরের পুরণো নাট্যশালায় চিরদিনের মত যবনিকা নেমে এল। প্রথম রঙ্গালয়ের মত সেও নিলামঘরে পরিণত হল। সে নিলামঘরও কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন। ভবিষ্যদ্বাণীর মতই উইলিয়ামসনের কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল—"the theatre must be sold"। রঙ্গালয়গৃহ, তার জমিজমা সব কিছুই বিক্রী হয়ে গেল একদিন। কিনলেন গোপীমোহন ঠাকুর বাজার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। কাগজের (Calcutta Gazette, 1st Nov. 1808) এক বিজ্ঞাপনে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল—

"Whereas the house and buildings, formerly called the Theatre, wherein Mr. Roworth established an Auction, & Co, was lately purchased by Gopey Mohun Tagore, who has constructed several buildings, that he intends for a new Bazar, known by the name of the New China Bazar, most of the shop-keepers of the Old China Bazar having agreed to remove their shops to the above-mentioned buildings, to commence on which very large investments and various other valuable articles have been purchased. Notice is therefore hereby given to the public, that from and after the twentieth day of November instant, the shops in the New China Bazar, behind the Writers' Buidings, will be open, where Europe and other Articles of every description will be found for sale".

দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের নাট্যধারার অবসান। যেখানে আনন্দের হাট বসত, সেখানে জীবিকার হাট। নিউ চায়না বাজার।

বাঙলা ছবির উন্নয়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী

সম্প্রতি রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে নিখিল ভারত বাঙলা চলচ্চিত্র ও নাট্যদর্শক সম্মেলনে ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন মহাশয়ের প্রধান অতিথির অভিভাষণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্র সম্পর্কে ভিন্ন জগতের মানুষ শ্রীসেনের জ্ঞানের গভীরতা ও ছায়াচিত্রের উন্নতি সম্পর্কে

তাঁর চিন্তাশীল মনের এক বিশেষ পরিচয় এই ভাষণটি বহন করে। তাঁর সারগর্ভ, সুচিন্তিত ও মূল্যবান ভাষণে চলচ্চিত্রের নানা দিক বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, অবাঙালীকে বাঙলা শিখিয়ে বাঙলা ছবির ক্ষেত্র বিস্তার বাস্তবতার দিক দিয়ে যুক্তিসঙ্গত নয়; তার চেয়ে বাঙলা ভাষায় রচিত ছবির অন্য ভাষায় রূপান্তরকরণ অধিকমাত্রায় ফলপ্রসূ হবে। তুলনামূলকভাবে অল্প আয়াসে অধিকমাত্রায় ফললাভ বাঙলা ছবির জগতে এক বিপুল কল্যাণের মূর্তি নিয়ে দেখা দেবে। আইনমন্ত্রীর এই প্রস্তাব চিত্রনির্মাতারা গ্রহণ করলে সকলদিক দিয়ে তা মঙ্গলজনক হবে এবং বাঙলাছবি লাভবান হবে। শ্রীসেনের এই ধারণা বুদ্ধিজীবী মহলে যথাযথ সমর্থন ও সমাদরে বিভূষিত হবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

ফরাসী ও ইতালীয় ছবি এই ভাষান্তরকরণের সাহায্যেই সারা জগতের ভিন্ন ভাষাভাষী মহলে অতুলনীয় জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হচ্ছে। যে সব বাঙলা ছবি আজ সার্থকতা লাভ করছে জগতের দরবারে তার প্রচারের জন্ত অবিলম্বে ভাষান্তরকরণ প্রয়োজন।

দ্বীপের নাম টিয়ারং

মনের মধ্যে তখনই এক বিচিত্র অনুভূতির জন্ম হয়, যখনই চিন্তায় ভারতবর্ষের দুটি ভিন্নধর্মী ছবি ভেসে ওঠে—একদিকে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, সুসভ্য বিরাট বিশাল জনপদসমূহ, উৎকর্ষের শীর্ষে যাদের আসন সসম্মানে নির্ধারিত আর একদিকে বহু পার্বত্য অঞ্চল, দ্বীপপুঞ্জ, ছায়াবীথিধেরা ঘন অন্ধকার, বিপদসঙ্কুল অরণ্যানী যে সব ক্ষেত্রে আজ প্রগতির এই ব্যাপক জয়যাত্রার দিনেও সভ্যতার কণামাত্র আলো প্রবেশে সক্ষম হয়নি। শেষোক্ত তালিকার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপের নাম অনায়াসে উল্লেখ করা যায়। এই দ্বীপগুলির মধ্যে টিয়ারং একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। এই বৈপরীত্যের মধ্যেই ভারতের মানুষ এক মিলনের সূত্র খুঁজে পেয়েছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেই ভারতবর্ষ এক সামগ্রিক রূপ পেয়েছে, ব্যবধানের মধ্যেই এক অখণ্ড ঐক্যের দেবতা অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এই সব অঞ্চলে সভ্যতার আলো তার রশ্মিপাত করতে না পারলেও এদের নিজস্ব একটি সমাজ আছে। আছে আনন্দ, বেদনা, আছে বারো মাসে তের পার্বণ, আছে প্রেম, আছে প্রতিহিংসা। টিয়ারং তার সব কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে দক্ষ কথাশিল্পী রমাপদ চৌধুরীর লেখনীর সার্থক অবদান "দ্বীপের নাম টিয়ারং"এ।

বিশেষ অভিনবত্বে মণ্ডিত এই উপন্যাসটির চিত্ররূপ কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য তার বৈশিষ্ট্য এবং তার অনবদ্যতাকে রক্ষা করতে পারেনি। রমাপদ চৌধুরীর কুশলী লেখনী এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি আর চিন্তার বলিষ্ঠতার ত্রিবেণী-সঙ্গমে যে টিয়ারংকে পাঠকসমাজ জেনেছেন গুরু বাগচীর পরিচালনায় তার সেই রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। তার সেই অনির্বচনীয়তা সেখানে অনুপস্থিত। উপন্যাসের মধ্যেতু লেখক একটি নিটোল গল্পের মধ্যে টিয়া রংকে লে ধরেছেন, ছবিতে পরিচালক একাধিক নয়নবিমোহন দৃশ্য-শোভা প্রাকৃতিক চমৎকারিত্বের নিদর্শনের সাহায্যে টিয়ারংকে দেখিয়েছেন, গল্পের প্রাণসত্তার তাই স্পর্শ এখানে মেলে না। আকাশীর প্রতিহিংসা, অধিবাসীদের টিয়ারং ত্যাগ প্রভৃতি অধ্যায়ে অবশ্য মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া গেছে।

পরিচালক শোভা-সম্পদের প্রতি যে ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, তার ফলে ছবিটি একটি বিশেষ সমাজের জীবনযাত্রার পরিচায়ক এক অত্যুৎকৃষ্ট প্রামাণ্যচিত্রে পরিণত হয়েছে। সাহিত্য-রসপুষ্ট গল্পের পথ থেকে বহু দূরে সরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে স্থানে স্থানে পরিচালক যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আলোকচিত্রের কাজ অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে দেখা দিয়েছে। নৃত্য-গীতে পরিপূর্ণ এই ছবিটি সাধারণ দর্শকের কাছে অবশ্যই এক আবেদন নিয়ে দেখা দেবে। কিন্তু সন্ধানী দর্শককে পরিপূর্ণতায় তৃপ্ত করার মত উপকরণের তার ভাণ্ডারে নিতান্ত অভাব।

অভিনয়ে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন নবাগতা সহ-নায়িকা শিপ্রা সেন। এঁর চরিত্রায়ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। লেখকের আকাশীকে জীবন্ত করে তুলেছে এঁর অনবদ্য অভিনয়। এঁর পরেই উল্লেখনীয় দিলীপ রায়ের নাম। শক্তিমান অভিনেতার সুন্দর অভিনয় পরম

নিখিল ভারত বাঙলা চলচ্চিত্র ও নাট্য দর্শক সম্মেলনে বক্তৃতারত কেন্দ্রী আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন। তাঁর দক্ষিণে শ্রীঅতুল্য ঘোষ উপবিষ্ট।

উপভোগ্য। সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন রায় নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় চরিত্র দুটিতে যথাযথ প্রাণসঞ্চারে পরিপূর্ণ সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। দিলীপ চৌধুরীর এবং দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও মনে দাগ কেটে যায়। যেমনই অকৃত্রিম, তেমনই প্রাণবন্ত। এঁরা ছাড়া শিশির মিত্র, অমিত দে, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, গৌর শী, বিশু বন্দোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, দীপা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় সু-অভিনয় করেছেন।

সাত পাকে বাঁধা

হাসি, কান্না, আনন্দ বেদনায় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ দু'জনে যখন দুটি বিপরীত দিকে পদক্ষেপ শুরু করে, তখনই জীবননাট্যের পটপরিবর্তন হয়। নিরবছিন্ন সুখস্রোতের ভিতর অদৃশ্যভাবে চুপি চুপি দুঃখের ঢেউ আসতে আসতে এক বিশাল রূপ ধারণ করে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং এক সূত্রে বাঁধা দুটি তরণীকে ভিন্নমুখীন করে দেয়। কিন্তু সেখানেই সব কিছুর শেষ নয়, একটি বিন্দু থেকে দুটি রেখা উৎপন্ন হয়ে আবার সেই বিন্দুতেই মিলিত হয়, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তখন মানুষ প্রতীক্ষার সাগরে ডুব দেয় সেই অবগাহনই তাকে উপনীত করে সকল প্রাপ্তির সকল সার্থকতার উপকূলে। জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলেও আত্মার যোগসূত্র ছিন্ন হয় না। অগ্নির উপস্থিতিতে, বেদের পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে যে ভাব যে মিলনের সৌধ গড়ে উঠেছে তা আইনের একটি স্বাক্ষরে ধূলিসাৎ হওয়ার নয়—এ মিলন অনন্তকালের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বেঁচে থাকবে, তাই সাতপাকের বাঁধনের চেয়ে প্রতীক্ষার বাঁধনও কম মূল্যের নয়। আশা ও প্রতীক্ষার আলোই মানুষকে ঝড়-ঝঞ্ঝার ভয়াল ভ্রুকুটির ঘনীভূত অন্ধকার দূরীভূত করে। এই পটভূমিকে উপজীব্য করে সাতপাকে বাঁধার গল্প রূপ নিয়েছে। এই কাহিনীর জন্ম হয়েছে বলিষ্ঠ কথাশিল্পী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখনী থেকে।

"ঘুম ভাঙার গান" এর স্যুটিং শুরু হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে পরিচালক উৎপল দত্তের নির্দেশ গ্রহণ করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

আলোচ্য উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ সম্পর্কে আমরা পূর্বোক্ত সমালোচনায় যে মন্তব্য করেছি, বর্তমানেও তারই পুনরাবৃত্তি করছি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, উপন্যাস সাত পাকে বাঁধা ও ছবি সাত পাকে বাঁধা—এই দু'য়ের প্রভেদ আকাশ পাতাল। খুঁটিনাটি দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করে লেখার আয়তন দীর্ঘ না করা শ্রেয় মনে করে এটুকু অনায়াসে লিপিবদ্ধ করা যায় যে কুশলতা এবং নৈপুণ্যের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর নিয়ে অজয় কর পরিচালিত সাত পাকে বাঁধা ছবিটি দেখা দিতে পারেনি যা পেরেছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস। জীবন সন্ধানী লেখকের যে বুকভরা জিজ্ঞাসা এবং বহুদূরগামী দৃষ্টি আর জীবন সচেতন শিল্পীমনের স্বাক্ষর উপন্যাসের পাতায় আমরা পেয়েছি রজতপটে প্রতিফলিত ছবির দৃশ্যে কিন্তু সে স্বাক্ষর আমরা পেলাম না। সুখেন্দু অর্চনার জীবন বিশ্লেষণই সমগ্র কাহিনীর সার। আসলে সুখেন্দু—সুখেন্দু নয়, অর্চনা—অর্চনা নয়, জীবনের দুটি প্রতীক বিশেষ দুটি প্রতীক অবলম্বন করেই লেখক জীবনের একটি বিশেষ দিকের এক স্পষ্ট আলেখ্য এঁকেছেন, একটি সমস্যার দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন এবং এক নির্দিষ্ট পরিণতিতে কাহিনীকে নিয়ে গেছেন। ছবিতে সেই প্রাণসত্তার অনুপস্থিতিই লক্ষণীয়। চরিত্র বিশ্লেষণের ব্যর্থতাই এর একমাত্র কারণ। বিন্যাস ও কাহিনীর বিস্তারও ত্রুটিমুক্ত নয়। তারপর যেখানে গল্প গতানুগতিক নয়—আমাদের জনজীবনে রেখাপাত করা বলিষ্ঠ আবেদন সম্পন্ন এক বিশেষ বক্তব্যবান গল্প সেখানে তার পরিচর্যাও যথাযথ হয়নি। তার পরিচালনপদ্ধতিও সেই অনুপাতে বিশেষত্ব বিমণ্ডিত হলে ছবির চেহারা বদলে যেত আর গল্পের ধর্ম রক্ষিত হোত, সেই সঙ্গে এই প্রচেষ্টা সত্যিকারের সার্থকতার স্পর্শ পেত। মামুলী এবং গতানুগতিক ভাবধারায় পরিচালনা ছবিটির মধ্যে অনেকখানি দৈন্য এনে দিয়েছে।

অভিনয়াংশে অভূতপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সুচিত্রা সেন, অর্চনার অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রেম, সহনশীলতা, ধৈর্য প্রমুখ সবক'টি দিক মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয়ে। সুখেন্দুরূপী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে স্বীকার্য। অধ্যাপকের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল আত্মভোলা—সাধনায় সমাহিত শিক্ষাব্রতীর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর অভিনয় দর্শকের অন্তরে এক রসঘন অনুভূতির জন্ম দেয়। অন্যান্য চরিত্রে তরুণকুমার, প্রশান্তকুমার, অমর মল্লিক, অমিত দে, সন্তোষ সিংহ, তমাল লাহিড়ী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পতাকী মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, প্রীতি মজুমদার, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, সুব্রতা সেন, তপতী ঘোষ, গীতা দে, সুষমা ঘোষাল প্রমুখ শিল্পিবর্গ আত্মপ্রকাশ করেছেন।

সংবাদ বিচিত্রা

বাঙলা ছায়াছবির আজ সম্মান ও সমৃদ্ধির অন্ত নেই। তার ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্য আজ বিশ্বসভায় সাদরে স্বীকৃত। দিকে দিকে তার বিজয়-বৈজয়ন্তী আজ সগৌরবে উড্ডীয়মান। দূর অতীতে যাঁদের স্বপ্ন, কুশলতা এবং নব সৃষ্টির উন্মাদনা এ দেশের ছায়াছবির বর্তমানকালের এই অপ্রতিহত জয়যাত্রা প্রথম সূচিত করে, তার শুভজন্মের প্রথম উষায় শুভমঙ্গলশঙ্খে ধ্বনিতরঙ্গ তুলে তাকে চলার পথে এগিয়ে দেয় উত্তরকালের অতুলনীয় প্রতিপত্তির পটভূমি রচনা করে বাঙলার সেই সার্থক সন্তানদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়। বাঙলা ছবির শুভজন্মের ইতিহাসে এঁর দান অবিস্মরণীয়। গত ২৬এ মার্চ এই পথিকৃৎ তাঁর জীবনের সত্তর বছর পূর্ণ করেছেন। এ উপলক্ষে তাঁকে এবং তাঁর জীবনব্যাপী নিরলস সাধনার উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভার কার্য যাতে সুপরিচালিত হয় সেজন্যে একটি শক্তিশালী কমিটী গঠন করা হয়েছে—এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে উদয়শঙ্কর, অমলাশঙ্কর, কানাই ঘোষাল কালীশ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকারদের মধ্যে মামা ওয়ারেওয়ারকরের আসন অনেকেরই পুরোভাগে। শুধু নাট্যকলার ক্ষেত্রেই নয় সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও তাঁর প্রতিভার প্রদীপ্ত স্বাক্ষর বিদ্যমান।

এই প্রবীণ সাহিত্যসেবীর বর্ণাঢ্য জীবনের অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক সম্বর্ধনাসভায় তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার ব্যবস্থা চলেছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধেয় সুধীবর আচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ।

হিন্দী ছায়াচিত্রসঙ্গীতির গঠনের ইতিহাসে বাঙালী শিল্পী অনিল বিশ্বাসের দক্ষতা ও কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর শক্তিমত্তা ও নৈপুণ্য আজ ত্রিশ বছর ধরে বোম্বাইয়ের ছায়াছবিকে সঙ্গীতের দিক দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বর্তমানে তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে জাতীয় অর্কেষ্ট্রার পরিচালকরূপে যুক্ত হয়েছেন। নয়া দিল্লী থেকে সংবাদটি প্রচারিত হয়েছে।

বঙ্গীয় চিত্রসাংবাদিক সমিতি সম্প্রতি তাঁদের বাৎসরিক পুরস্কারগুলির ১৯৬২ সালের প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছেন তাঁদের বিচারে কলিকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ দশখানি দেশী ও বিদেশী ছবির নাম ঘোষিত হয়েছে। পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সহ-অভিনেতা, সহ-অভিনেত্রী, সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, সংলাপকার, আলোকচিত্রী এবং শব্দধরদেরও গুণানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়েছে। এই বিচারে এ বছর বাঙলাচিত্রজগতে—শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানলাভ করলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান পেলেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে স্বীকৃত হলেন সত্যজিৎ রায়। তা ছাড়া শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক, শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রীরূপে যথাক্রমে চারুপ্রকাশ ঘোষ, অনুভা গুপ্ত, রবীন চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম ঘোষিত হয়েছে। বাঙলার তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে উক্ত সমিতি আলোচ্য বর্ষের শ্রেষ্ঠ গীতিকাররূপে বরণ করেছেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের উন্নয়নকর্মে মাদ্রাজ এবার একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করল। বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগে ভারতও যে অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে নেই বিশ্ববাসী সে পরিচয় আবার নতুন করে পাবে। এবার মাদ্রাজে সিনেমার ছবি তোলার ক্যামেরা তৈরী হবে সেদিক দিয়ে আর আমাদের বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে জাপান আমাদের কিছু সহযোগিতা করবে। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র ভারতবর্ষের নতুন যুগের নতুন মানুষদের সাধনার ফলস্বরূপ নব নব অবদানের শুভ সংবাদের প্রতীক্ষায় আমরা প্রহর গুণছি, আমরা প্রহর গুণব।

দক্ষিণ ভারতের রঙ্গজগতে এক নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে। ব্যাঙ্গালোর থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী এক স্থানে একটি রঙ্গালয় দারুণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে পরিপূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এ সংবাদ রসিকসমাজে এক অভাবনীয় বেদনার সৃষ্টি করবে।

ভারতের ইতিহাসের এক বিরাট সন্ধিক্ষণে আমরা দেখা পাচ্ছি ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর। ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস জুড়ে আছেন এক বিরাট অধ্যায়। বাঙলাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতের এক সর্বৈব পরিবর্তনের মূল তিনি। অযোধ্যা বেগম আর চৈতসিংয়ের ঘটনা আমাদের মন থেকে আজো মিলিয়ে যায় নি। প্রযোজক জন মার্শাল বর্তমানে হেষ্টিংসের জীবনী চলচ্চিত্র রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে নামভূমিকা এবং বার্কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন যথাক্রমে ট্রেভর হাওয়ার্ড এবং জ স্যাণ্ডার্স। মারিয়ান চরিত্রটির রূপ দিচ্ছেন জীন সিমন্স। আগামী অক্টোবরে ভারতে এর চিত্র গ্রহণ শুরু হবে।

লণ্ডন থেকে এমন একটি সংবাদ ভারতে এসে পৌঁছেছে যা শ্রবণ মাত্রই দর্শক সমাজ আনন্দে অভিভূত হবেন এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না। জানা গেছে যে কুড়ি বছর পর আটান্ন বছর বয়স্কা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো আবার চিত্রাভিনয়ে অংশ নিচ্ছেন। ডেভিড লিন পরিচালিত একটি ছবিতে রোজানো ব্রাজির সঙ্গে ইনি আত্মপ্রকাশ করছেন। বিগত যুগে অভিনেত্রীজগতে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রেটার অধিকারগত ছিল। তাঁরই আর এক নাম ছিল বিস্ময়। তাঁর পুনরাগমনের সংবাদ যে পরিমাণ আলোড়ন আনবে তার তুলনা বিরল এই রহস্যময়ী শিল্পীর পুনরাবির্ভাবকে আমরা স্বাগত জানাই।

বত্রিশ বছর বয়স্কা অভিনেত্রী জেন ম্যানস্ফিল্ড সম্প্রতি কাজের ফাঁকে ফাঁকে আত্মজীবনী রচনা করছেন জানা গেল।

আটচল্লিশ বছর বয়স্কা সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী হেডি-লা-মার গত ৪ঠা মার্চ আইনজ্ঞ লুইস বোইসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বলে সংবাদ এসেছে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

সম্প্রতি পরলোকগতা লেখিকা সুলেখা সান্যালের "সিঁদুরে মেঘ" কাহিনীটির ছায়াচিত্ররূপ দিচ্ছেন সরোজ সেনগুপ্ত প্রোডাকসান। সুর যোজনার ভার নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন বিকাশ রায়, অসিতবরণ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, গীতা দে প্রভৃতি। চিত্রনাট্য পরিচালনা করছেন সুশীল ঘোষ। * * * সিলভার স্ক্রীণ প্রোডাকসানের প্রযোজনায় "অশান্ত ঘূর্ণী" ছবিটি রূপ নিয়েছে। কথাশিল্পী হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন। পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবেন দীপক মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, রেণুকা রায় এবং নবাগতা জ্যোৎস্না বিশ্বাস প্রভৃতি। * * * শৈলেশ দে রচিত "কৃষ্ণ চূড়া" কাহিনীটিকে ছায়াচিত্রের রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন পরিচালক বিশু দাশগুপ্ত। চরিত্রগুলির রূপদান করছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নবাগত গৌতম, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলি দেবী প্রভৃতি।

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন স্বদেশ ঘোষ এবং তারাপদ দাস।

চৈত্র, ১৩৬৯ (মার্চ—এপ্রিল, '৬৩)

অন্তর্দেশীয়—

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ): পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক রাজ্যে ক্রমবর্ধমান খাদ্যাভাব ও বেকারী সম্পর্কে হুঁশিয়ারী—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের দৃঢ় ঘোষণা: পশ্চিমবঙ্গে একটি লোককেও অনাহারে মরিতে দিব না।

২রা চৈত্র (১৬ই মার্চ): ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রীর (৭৪) দিল্লীতে জীবনাবসান।

'ক্ষুধা হইতে মুক্তি সপ্তাহ' উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের বেতার ভাষণ—মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্রতে আত্মোৎসর্গ করার জন্য জাতির প্রতি আহ্বান।

৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ): নাইট্রিক এসিড পান করিয়া স্বর্ণশিল্পী শ্রীসুনীলকুমার কর্মকারের (২৭) আত্মাহুতি—নূতন স্বর্ণবিধিজনিত বেকার জীবনের মর্মান্তিক অবসান।

'আসাম ও ত্রিপুরায় তিন লক্ষাধিক পাকিস্তানীর অনুপ্রবেশ: পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় ৪৬ হাজার'। পাকিস্তানীর বে-আইনী উপস্থিতি।

৪ঠা চৈত্র (১৮ই মার্চ): অবৈধ পাক-চীন সীমান্ত চুক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে (রাষ্ট্রসঙ্ঘ) ভারতের প্রতিবাদ—দিল্লীর পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে তথ্য প্রকাশ।

৫ই চৈত্র (১৯শে মার্চ): পুলিশ বাজেট আলোচনাকালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রবল হৈ-চৈ—বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক অপরাধ ও দুর্নীতি দমনে পুলিশের শোচনীয় ব্যর্থতার অভিযোগ।

৬ই চৈত্র (২০শে মার্চ): 'সীমান্ত চুক্তির পিছনে ভারতকে জব্দ করাই পাকিস্তান ও চীনের আসল উদ্দেশ্য'—কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত পুস্তিকায় মন্তব্য।

৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ): বিধানসভায় (পশ্চিমবঙ্গ) রাজ্য সরকারের কারানীতির কঠোর সমালোচনা—বিভিন্ন প্রশ্নে বিরোধী সদস্যদের কয়েক দফা সভাকক্ষ ত্যাগ।

৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ): স্থলবাহিনীর (ভারতীয়) শক্তি বৃদ্ধির জন্য ছয় ডিভিশন নূতন সৈন্য সংগ্রহের আয়োজন—এন-সি-সি'র সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও সরকারী পরিকল্পনা—চীনের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধে পাহাড়ে-জঙ্গলে রণকৌশল শিক্ষাদানের প্রস্তুতি।

৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (শ্রীসেন) কর্তৃক কংসাবতী সেতুর (পাঁশকুড়ার নিকট) উদ্বোধন।

তিব্বতে চীনা সৈন্য সমাবেশ ও সীমান্তে নূতন সড়ক নির্মাণ—লোকসভায় শ্রীনেহরু কর্তৃক প্রচারিত সংবাদ সমর্থন।

১০ই চৈত্র (২৪শে মার্চ): উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনের ইথিওপিয়া, সুদান ও মিশরে শুভেচ্ছা সফরে যাত্রা।

কলিকাতা ও বরানগরে তিনটি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড—১জন নিহত ও ৮ জন আহত—লালবাজার অঞ্চলে রাসায়নিক গুদাম ভস্মীভূত।

১১ই চৈত্র (২৫শে মার্চ): মধ্যশিক্ষা পর্ষদের (পশ্চিমবঙ্গ) স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা (১৯৬৩) আরম্ভ—এক লক্ষ ৩১ হাজার ছাত্র ছাত্রীর অংশ গ্রহণ।

১২ই চৈত্র (২৬শে মার্চ): 'চাউলের নিম্নতম মূল্য বর্তমানে বাঁধিয়া দেওয়া অনাবশ্যক'—লোকসভায় সরকারী বিবৃতি—কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে পশ্চিমবঙ্গে চাউল সরবরাহের আশ্বাস।

১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ): তিন দিবসব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফরে লাওসের রাজা মিঃ সাভং ভাত্তানার দিল্লী উপস্থিতি—লাওসে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের ভূমিকার প্রশংসা।

১৪ই চৈত্র (২৮শে মার্চ): লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের চারটি আসন বৃদ্ধি—আসামেরও দুইটি বেশী আসন লাভ—ভারতের রাজ্যসমূহের (জম্মু ও কাশ্মীর বাদে) লোকসভা আসনসংখ্যা ৪৮১ স্থলে ৪৯০ নির্ধারিত—নির্বাচন কেন্দ্র সীমা নির্ধারণ কমিশনের ঘোষণা।

১৫ই চৈত্র (২৯শে মার্চ). পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের ঘোষণা: জরুরী অবস্থায় রাজ্যের কম্যুনিষ্ট বন্দীদের মুক্তিদান অসম্ভব।

১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ): বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহের (অনুমোদিত) ছাত্রদের জন্য জুলাই (১৯৬৬) হইতেই এন-সি-সি ট্রেণিং বাধ্যতামূলক ভাবে চালু—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত।

১৭ই চৈত্র (৩১শে মার্চ): মহীয়সী নারী শ্রীযুক্তা সুষমা সেনের (৮৫) লোকান্তর—আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের মাতৃ বিয়োগ।

'যুদ্ধ হউক আর নাই হউক প্রতিরক্ষা উদ্যম শিথিল করা চলিবে না'—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের সতর্কবাণী।

১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল): বাংলাকে দ্রুত পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষারূপে চালু করার দাবী—রাজ্য বিধান পরিষদে কংগ্রেসী ও বিরোধী সদস্যদের ভাষণ—ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হইবে বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের আশ্বাস।

১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল): দরিদ্র ও প্রতিভাবান ছাত্রদের (প্রায় ৬৭ হাজার) উচ্চশিক্ষার্থে ঋণভিত্তিক বৃত্তি দান—কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নূতন পরিকল্পনা—পরিকল্পনাটির জন্য নয় কোটি টাকা বরাদ্দ।

২০শে চৈত্র (৩রা এপ্রিল): 'বিদ্রোহী নাগাদের হিংসাত্মক কার্যে চীনের উস্কানী রহিয়াছে'—নাগাভূমি শাসন পরিষদের প্রধান শ্রীপি শিলু আওয়ের বিবৃতি।

'কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে চীনের সহিত আলোচনা চলিতে পারে না'—কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় মনোভাব।

২১শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল): উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খাতে কেন্দ্র কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ হ্রাস—দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বিপর্যয়ের সম্মুখীন—কলিকাতায় দণ্ডক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বৈঠকে সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা।

২২শে চৈত্র (৫ই এপ্রিল): বাংলা নববর্ষ (১৩৭০) হইতে পৌর এলাকা বহির্ভূত এক বিঘা পর্যন্ত বাস্তুভূমির খাজনা মকুব—বিধান সভায় ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্যের ঘোষণা।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের উক্তি: সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মন্ত্রিসংখ্যা হ্রাসের প্রশ্নই উঠে না।

২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল): চীনা কবলিত প্রতি ইঞ্চি জমি উদ্ধারের দৃঢ় সঙ্কল্প—গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতি ও সমাজতন্ত্রে কংগ্রেসের অবিচল আস্থা প্রকাশ—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে (দিল্লী) সর্বসম্মত প্রস্তাব।

ত্রিপুরার চতুর্দিকে পাকিস্তানী সামরিক তৎপরতা—বিরোধমূলক অঞ্চলসমূহে অনধিকার প্রবেশের সংবাদ।

২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল): রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন—চৌরঙ্গী কেন্দ্রে (কলিকাতা) নির্বাচনকালে উত্তেজনা।

২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল): পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার পাঁচটি শূন্য আসনই কংগ্রেস কর্তৃক অধিকার—উপনির্বাচনের ফলাফল।

কলিকাতা পৌর সভার মেয়র নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জীর জয়লাভ।

২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল): পুনরায় নাগা বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধি—লামডিং-মরিয়াণী সেকশনে ডিনামাইটযোগে যাত্রীবাহী ট্রেণ আক্রমণ—বিস্ফোরণের ফলে রেল লাইন উৎপাটিত—গুলীবর্ষণে ছয় জন নিহত: ২৭ জন আহত।

২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল): কলিকাতায় সারা বাংলা স্বর্ণশিল্পী সম্মেলনে স্বর্ণ আইনের ব্যর্থতার উল্লেখ—প্রবর্তিত ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র শিল্পীর বেকারত্বের কারণ বলিয়া বর্ণনা।

২৮শে চৈত্র (১১ই এপ্রিল): স্বর্ণশিল্পীদের আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধিতে রাজ্যসরকার বিচলিত—অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীগুলির সূক্ষ্ম কাজে নিয়োগের জন্য কেন্দ্রের নিকট রাজ্যসরকারের অনুরোধলিপি।

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল): নাগা বিদ্রোহীদল আক্রান্ত লামডিং-মরিয়াণী সেকশনে রেলপথ ও রেলযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন—রেলমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং-এর ঘোষণা।

চীনা কবলমুক্ত ১৪৪জন ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল): গ্রামীণ জাগরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা—কাকদ্বীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের উদ্বোধনী ভাষণ—সভাপতি: ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

১৯৬৫ সালের পরও ইংরাজী ভাষা চালু রাখার ব্যবস্থা—লোকসভায় শ্রীশাস্ত্রী কর্তৃক বিল উত্থাপন—সভায়বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য সমাজতন্ত্রী ও জনসঙ্ঘ সদস্য মার্শাল কর্তৃক বহিষ্কৃত।

৩১শে চৈত্র (১৪ই এপ্রিল): দার্জিলিং-এ মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের (৭০) জীবনদীপ নির্বাণ।

বহির্দেশীয়—

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ): সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া ও ইরাককে লইয়া ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব—সংশ্লিষ্ট খসড়া চুক্তি অনুমোদনকল্পে গণভোট গ্রহণের প্রস্তুতি।

২রা চৈত্র (১৬ই মার্চ): সামরিক সরকার কর্তৃক কার্যত সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ): সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ায় গণ-বিক্ষোভ।

৫ই চৈত্র (১৯শে মার্চ): বলীদ্বীপের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণে কয়েক শত নর-নারী নিহত—লাভা ও ভস্মরাশি দ্বারা সমগ্র দ্বীপ আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা।

৬ই চৈত্র (২০শে মার্চ): ভারতের জন্য আরও সমর-সজ্জা সংগ্রহের আয়োজন—আমেরিকায় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়কের উদ্যম।

৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ): গুয়েটামালায় বিদ্রোহীদলের সহিত সরকারী সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ।

১০ই চৈত্র (২৪শে মার্চ): নিউইয়র্কের ৮টি সংবাদপত্রে মুদ্রকদের ১০৭ দিনব্যাপী ধর্মঘটের অবসান।

১১ই চৈত্র (২৫শে মার্চ): চীনের নিকট সিংহলী প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের পত্র: কলম্বো প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি নাই

১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ): বে-আইনী পাক-চীন সীমান্ত চুক্তির বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ পিকিং সরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য।

১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ): পশ্চিম সীমান্ত বরাবর চীনাদের ঘাঁটি স্থাপন—ভারতের সীমান্ত সন্নিহিত এলাকায় বিমানঘাঁটি নির্মাণের সংবাদ।

১৭ই চৈত্র (৩১শে মার্চ): গুয়েটামালায় সামরিক অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা দখল।

ইরাণে পুনরায় প্রবল ভূমিকম্প—বহু নর-নারী নিহত: অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ।

১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল): লাওসের পররাষ্ট্র মন্ত্রী (নিরপেক্ষতাবাদী মিঃ কুইনিন ফোলসেনা দেহরক্ষীর গুলীতে নিহত—আততায়ী গ্রেপ্তার

১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল): নেপালে রাজা মহেন্দ্র কর্তৃক নূতন মন্ত্রিসভা গঠন—মন্ত্রিসভার চেয়ারম্যান ডাঃ তুলসী গিরি।

চন্দ্র অভিমুখে সোভিয়েট ইউনিয়নের মনুষ্যবিহীন আবার একটি রকেট যান (লুনিক ৪) প্রেরণ।

২১শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল): মধ্য লাওসে পুনরায় কম্যুনিষ্টপন্থী প্যাথেট লাও বাহিনী ও নিরপেক্ষতাবাদী সৈন্যদলের মধ্যে লড়াই।

২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল): সোভিয়েট রকেট লুনিক-৪'এর চন্দ্রের আকাশ-পথ অতিক্রম।

২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল): কানাডার নির্বাচনে উদারনৈতিক দলের (মিঃ লেষ্টর পিয়ারসনের নেতৃত্বাধীন) জয়লাভ—প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডিফেন বেকারের রক্ষণশীল দল পরাজিত।

২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল): চট্টগ্রামে ধর্মঘটী রেলকর্মীদের উপর পাক-পুলিশের গুলীবর্ষণ—কয়েকজন হতাহত।

চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে জোরদার করার (সামরিক দিক হইতে) লণ্ডনে ইঙ্গ-মার্কিণ সমর নেতাদের বৈঠক।

মিশর সিরিয়া ও ইরাককে লইয়া নূতন যুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র গঠনে তিনটি রাষ্ট্রের সম্মতি।

ইতিহাসের শোচনীয়তম সাবমেরিণ দুর্ঘটনা—আটলান্টিকে মার্কিণ আণবিক সাবমেরিণ ('থেসার') ধ্বংস—শতাধিক ব্যক্তির প্রাণহানি।

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল): ইন্দোনেশিয়া সফরে চীনা প্রেসিডেন্ট লিউ-শাও-চি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন-ই'র জাকার্তা উপস্থিতি।

৩১শে চৈত্র (১৪ই এপ্রিল): কঙ্গোয় আবার অশান্তি সৃষ্টি—চারদিবসব্যাপী দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী আফ্রিকান দলের মধ্যে সংঘর্ষে জাদোৎভিলে ৫২ জনের প্রাণহানি।

ভুখা হু

গ্রীষ্মের দাবদাহ ও উত্তাপমাত্রা যতই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, বাঙলা দেশের আভ্যন্তরীণ চিত্র ততই যেন সর্বজনসমক্ষে প্রকট হইয়া ওঠে। বর্ষাকালের সিক্ততা ও শীতের হিমার্ত বাতাস যতদিন থাকে এই দেশটাকে ততদিন যেন আপাতদৃষ্টিতে চেনা যায় না। দেশের মাটি বর্ষায় সবুজ আকার ধরে। শীতের রঙবেরঙের ফুলের আস্তরণে ঢাকা থাকে বাঙলার মাটি। ঘনঘোর বর্ষণে ও শীতল বাতাসে দেশের সমস্যা-দুর্দশা লুপ্ত না হইলেও সাময়িক আত্মগোপন করিয়া থাকে। গ্রীষ্মঋতু এমনই বেয়াদপ ও নির্লজ্জ যে, বহিরাবরণ খুলিয়া অন্তর্বাস খসাইয়া দেশের নগ্নরূপ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দেয়। প্রখরদিনের দহনজ্বালায় বাঙলা দেশের আসল আকৃতি ধরা পড়িয়া যায়। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যায় অগ্নিকাণ্ড,

জলাভাব, অজন্মার ভয়াবহ ছায়াচিত্র: দাউ দাউ আগুনে গ্রামকে গ্রাম জ্বলিয়া পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত। শত সহস্র গ্রামবাসী গৃহহীন ও সর্বস্বান্ত। দেখা যায়, তৃষ্ণাতুর জনতার চাতক-পক্ষী অবস্থা। জলের জন্য গ্রামে গ্রামে হাহাকার। জলাভাবে মড়ক, মন্বন্তর ও মৃত্যু—বাঙলা দেশের এই চিরকালীন সমস্যার সমাধান আজও হইল না। দেখা যায় ফাটলধরা সর্পিল গহ্বরবিস্তৃত বিশুষ্ক কৃষিক্ষেত্রের ছবি। আমাদের সেচ-পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে তাহারই সাক্ষ্য দেয়। প্রসঙ্গত সাক্ষী হিসাবে 'দামোদর' প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। দ্রব্যমূল্যভারে জর্জর গ্রামবাসীদের জলকষ্ট দূরীকরণের জন্য ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিকপ্রথায় ব্যবস্থা না হইলে বাঙলার আসল রূপের পরিবর্তন সাধন সম্ভব হইবে না। শুনা যাইতেছে দেশের জলাভাব দূর করিতে গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েল খননের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যয়বহুল প্রথায় সরকার সফল হইবেন কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। গ্রীষ্ম পড়িতে না পড়িতে বাঙলার গ্রামাঞ্চল হইতে অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চাউলের মূল্য প্রতি সের প্রায় এক টাকায় উঠিয়াছে। অপথ্য ও কুপথ্য খাইয়া দিনযাপনের খবরও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা অসত্য নহে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্যের ফলে বাঙলার গ্রামে গ্রামে অনাহারের কান্না শুরু হইয়াছে। নিরন্নের দল শহরতলীতে দুই মুঠা ভাতের আশায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

দলীয় রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে, দলাদলির আবর্তে ও চক্রান্তে লিপ্ত থাকিলে দেশনেতা হওয়া যায়, কিন্তু দেশের কাজ করা যায় না। আমাদের শহরবাসী দেশনেতা ও শহুরে 'প্রতিনিধি'র দল বাঙলার গ্রামের প্রতি যথার্থ দৃষ্টিদান না করিলে কোন সমস্যাই দূর হইবে না। ঠাণ্ডা ঘরে বসিয়া ফাইল মারফৎ দেশসেবা করিতে হইলে দীনদরিদ্র গ্রামবাসীর আর্তকণ্ঠ কর্ণগোচর হয় না। কিঞ্চিৎ কষ্টভোগ ও ত্যাগ স্বীকার না করিলে চলে না। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া কোন লাভ নাই। 'সীট' রক্ষা করিতে হইলে চেয়ার ছাড়িয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া জনগণের অভাব অনটন, দুঃখ, কষ্ট লাঘবের কাজে লাগিতে হইবে। কালবিলম্ব নয়, এই মুহূর্তে। কেন না, ভুখ-মিছিলের কাতরকণ্ঠ ইতিমধ্যেই ভাসিয়া উঠিয়াছে। কালরাত্রির ঘনান্ধকারে আমাদেরই দেশবাসীর ক্ষুধার্ত কণ্ঠ চিৎকার করিতেছে—হায় ভুখা হুঁ!

এই দুঃসহ পরিস্থিতিকে অস্বীকারের উপায় নাই। সুতরাং ব্যবস্থা অবলম্বন আশু প্রয়োজন।

হিন্দী চলিবে না

দেশের ঐক্য ও সংহতি আর বুঝি রক্ষা হয় না! সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মুখে হিন্দী ভাষা চালু না হইলে হিন্দীর সমর্থকরা খুশী হইতে পারিতেছেন না। ভিন্ন ভাষাভাষীদের আপন আপন মাতৃভাষা হয়তো অচিরাৎ ভুলিয়া যাইতে হইবে। গণতন্ত্র সরকার গঠনের পর হইতে হিন্দীকে সারা ভারতে প্রচলিত করিতে কংগ্রেসের একদল উগ্রপন্থী নায়ক আদা জল খাইয়া লাগিয়া আছেন। যদিও এই ভাষাটির অযোগ্যতা নানা প্রকারে আজ প্রমাণিত। ভাষাটির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। হিন্দী ব্যাকরণ নিয়মানুগ নয়। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে চারভাষা ফরমূলা বাতিল করিয়া ত্রিভাষা ফরমূলার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী। এই ফাঁকে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসাবে হিন্দী চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। সোজা পথে যখন কাজ হয় না, তখন বাঁকা পথ ধরিতে
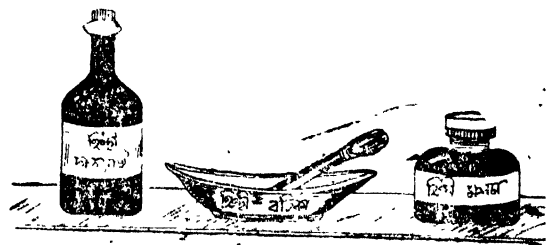
হয়। হিন্দীর ব্যর্থতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হওয়ায় অন্যায় ও অসৎ পথ ব্যতীত হিন্দী প্রচারের আর কোন উপায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকটি প্রদেশে হিন্দীর বিরুদ্ধে চাপা আন্দোলন ধূমায়মান হইতেছে। দক্ষিণ ভারতে হিন্দী ভাষার উপর আলকাতরা মাখাইয়া হিন্দীর মূল্য দেওয়া হইয়াছে। লোকসভার মুক্ত-অঙ্গনে জনমতের জনৈক সদস্য হিন্দীর সমর্থনে ম্যাজিক দেখাইতেও কসুর করিলেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের তিন ভাষা ফর্মুলায় লাভ হইবে এই যে, হিন্দী ভাষাভাষী ছাত্ররা সরকারী পদ ও চাকুরীতে পুরাপুরি প্রাধান্য লাভ করিবে। অতঃপর হিন্দী-রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে পথ মুক্ত হইয়া যাইবে। হিন্দীর দাপটে আজ ইংরাজী ভাষাও (পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা) পালাই পালাই ডাক ছাড়িয়াছে। ভারতবাসী ইংরাজী ভুলিয়া যাইলে হিন্দীওয়ালাদের সুবিধা হয়। ব্যাপক জ্ঞানসঞ্চয়ের রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। দেশের লোক মূর্খ বনিয়া থাকে। কথায় কথায় হিন্দী বুলি কপচাইয়া ভারত-আত্মা আবিষ্কার করা যায়।

কিন্তু ভারতবাসী মাত্রেই মূর্খ নয়। বহু ভাষার জনক ভারতবর্ষ কখনও একটি তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাকে মনের কোণে ঠাঁই দিতে পারিবে না। হিন্দী সমর্থকদের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইবে।

প্রতিরক্ষা শিথিল না হয়

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ আশা করেন যে, ভারত-চীন সম্পর্ক ভবিষ্যতে হয়তো শান্তির পথে অগ্রসর হইবে। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, শান্তির পথে ভারত-চীন সংঘর্ষের মীমাংসা হইলেও আমাদের নিজেদের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করিতেই হইবে। শক্তিবৃদ্ধিতেই আমাদের একমাত্র ভরসা! আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হইলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সম্ভ্রম অর্জন করা যাইবে। ইহাতে দেশের জনগণের মনে আস্থা ফিরিয়া আসিবে। রাধাকৃষ্ণণ আরও বলেছেন, "যুদ্ধ হয় কি না হয়, আমরা আক্রান্ত হই বা না হই, এই ভারতের উপর শত্রুর আক্রমণ পরিচালিত হউক বা না হউক, আমরা পুনরায় যাহাতে অসহায় ও অসতর্ক অবস্থায় আক্রান্ত না হই, তজ্জন্য ব্যবস্থা করা এক অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। আমাদের শক্তি রক্ষা করিতে হইবে। পূর্বে আমাদের দেশ ছিল দুর্বল। ভবিষ্যতে ইহার প্রতিকার প্রয়োজন।" রাষ্ট্রপতির উক্তিসমূহ যেমন সত্য ও অর্থপূর্ণ তেমনই সময়োপযোগী হইয়াছে। নিজেদের দুর্বলতার কথা কেহ স্বীকার করিতে চাহে না। বরং অনেকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া অতিভাষণের দ্বারা শক্তির বড়াই করিয়া থাকে, কিন্তু শক্তির পরিচয় পাইতে কিছু মাত্র বিলম্ব হয় না। সম্মুখসমরে নামিলেই পরস্পরের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
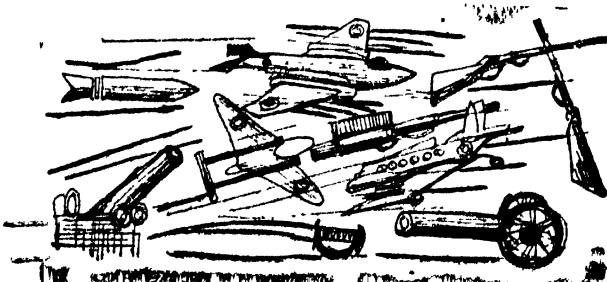
মেননের আশা ও আশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিয়া ভারতবাসী পুরাপুরি ঠকিয়াছে। সীমান্ত-সংঘর্ষে ভারত মার খাইতে খাইতে পিছু হটিয়াছে। প্রতি পদে ভারত উপলব্ধি করিয়াছে, আধুনিক ধরনের সমর-উপকরণ না থাকিলে প্রতিবেশী শত্রুরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ চালানো যায় না। তজ্জন্য অস্ত্রব্যবহার-শিক্ষা প্রয়োজন। বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন বলিতেছেন, 'দেশের সংহতি রক্ষার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা চালাইয়া যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।' নেতাদের কথায় ও কাজে কতটা সঙ্গতি আছে তাহা আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। দেশের নিরাপত্তার জন্য, যুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য এবং শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বা হইতেছে তাহার সঠিক বিবরণ দেশরক্ষার খাতিরে সাধারণের নিকট প্রকাশ করা যাইতে পারে না, গোপন রাখিতে হয়। লোকসভার স্পীকার হুকুম সিং বলিয়াছেন, "ইহা গোপন ও সাধারণের স্বার্থে অপ্রকাশ্য।"

সম্ভাব্য আক্রমণ রোধ করে যে যাহাই বলুন, আমাদের সামগ্রিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। আক্রমণ কোথা হইতে এবং কি ভাবে আসিবে তাহা কেহ স্পষ্ট বলিতে পারে না। তবে বলা যায়, আক্রমণের চিরাচরিত তিনটি পথ থাকে। যথা, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। বলা বাহুল্য এই বাবদে ভারত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। বাজেটে প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ৮৭৬ কোটি টাকা। প্রতিরোধ প্রচেষ্টা যাহাতে অব্যাহত থাকে তজ্জন্য নানাপ্রকার কর আদায়ের ব্যবস্থাও পাকা হইয়াছে। ইদানীং কোন কোন ভারতপ্রেমিক মধ্যে মধ্যে এটা সেটা যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজনের কথা জানাইতেছেন। কেউ বলিতেছেন, রাশিয়ার নিকট হইতে মিগ বিমান পাইলেই কার্য সমাধা হইবে। কেউ আবার বলিতেছেন, শুধুমাত্র জেট বিমানে কাজ হইবে না, স্বয়ংক্রিয় কামান চাই। কেউ বলিতেছেন, আকাশ হইতে ভূমিতে এবং ভূমি হইতে আকাশে নিক্ষেপের জন্য চাই বিস্ফোরক রকেট দূর পাল্লার। কাহারও মতে প্রকাশ পাইতেছে, অস্ত্র অপেক্ষা আমাদের বেশী প্রয়োজন, গেরিলা যুদ্ধের আদব-কায়দা ও রীতিনীতি শিক্ষা পাওয়া। আবার কেহ বলিতেছেন, সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া যাইলেই চীনকে ঠেকানো যাইবে। সম্প্রতি দেশে ও বিদেশে মিসাইল-জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র ও 'ফাইটার' বিমান সম্বন্ধে নানা প্রকার পরস্পরবিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের দেশবাসীর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতেছে। যাহা হউক ভারতীয় সংবাদে প্রকাশ: বর্তমান বৎসরেই পাঁচটি পার্বত্য ডিভিসন গঠিত হইবে। বর্তমান সৈন্যসংখ্যাকে দুই বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ করিতে হইবে। হিমালয়ের উচ্চতায় যুদ্ধচালনার জন্য সৈন্যদলের অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা হইতেছে। লোকবলের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রবলও বৃদ্ধি করা হইবে। অতি-আধুনিক অস্ত্র নির্মাণের জন্য ভারতবর্ষে ছয়টি অস্ত্র তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইবে। জনৈক স্পেশাল অফিসার এই কাজ পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রতিরক্ষার নামে দেশে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে চাহিলে হয়তো ভুল করা হইবে। তবুও যখন একবার আমাদের দেশ চীন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তখন ভবিষ্যতে আবার যে আক্রমণ হইবে না, তাহা সঠিক বলা যায় না। কারণ অনাক্রমণ চুক্তির কথা চৈনিক নেতাদের মুখে উচ্চারিত হইতেছে না। আলাপ-আলোচনার [illegible] গমন ব্যর্থ

হইয়াছে। কলম্বো প্রস্তাব যে বিচারের হুকুমনামা নহে, তাহা স্পষ্ট ভাষায় চীন জানাইয়া দিয়াছে। অধিকন্তু ভারত সংলগ্ন তিব্বত প্রভৃতি স্থানে চীনের সামরিক প্রস্তুতি ও শক্তিবৃদ্ধির সংবাদ প্রায়ই দেখা যাইতেছে। চীনের বিমানঘাঁটি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং সংখ্যাতীত সৈন্য সমাবেশের সংবাদও অতিরঞ্জিত নহে। তাই বলিতেছিলাম, বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে যুদ্ধ চালাইবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা আমাদের করিতেই হইবে। যাহাকে এক কথায় বলে, সামগ্রিক সামরিক আয়োজন। জোট নিরপেক্ষ থাকিয়া একটা জাতি বিদেশীর পদাঘাত সহ্য করিয়া যাইবে, ইহা নীরবে মানিয়া লওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। শান্তির বাণী শুনাইয়া কোন কাজ হয় না।

বাঙালী রেজিমেণ্ট চাই

বাঙালী রেজিমেণ্ট বা বাঙালী সৈন্য-বাহিনী গঠনের প্রস্তাব অনেকে সুনজরে দেখিতেছেন না। সাহিত্যের কল্পিত উক্তি 'বাঙালী কাঁদিতে জানে' জনশ্রুতি স্মরণ করিয়া যাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন, তাঁহারা বোধ করি পৃথিবী-বিখ্যাত বাঙালী পল্টনের নাম স্বেচ্ছায় ভুলিয়া থাকিতে চাহেন। বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, বাঙালীর রণনিপুণতা ও দৈহিক শক্তির বহু উল্লেখযোগ্য কাহিনী। বাঙালীর শারীরিক পটুতা স্বীকৃত হইয়াছে সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহের সামরিক কৌশলে ও লঙ্কাজয়ে। যশোরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের নাম যুদ্ধে ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। তৎকালীন বারো-ভুঁইয়ার সমর দক্ষতা কাহারও অবিদিত নহে। মহারাজা প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বর মাত্মবর সম্রাট আকবরের বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইলেও বস্তুত: তখন হইতেই বাঙালীর মনে রণচেতনা জাগ্রত হইয়াছে। নবাব সিরাজদ্দৌলা (জাতে বাঙালী না হইলেও) বঙ্গসন্তান সেনানায়ক মোহনলালের সহায়তায় ইংরাজের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম ফোর্ট উইলিয়ামস সিরাজ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং কলকাতার পতন হয়। বাঙালী মল্ল, তীরন্দাজ যোদ্ধা ও সৈনিকের যোগ্যতা সম্পর্কে আরও অনেক নজীর উপাপন করা যায়। আশা করি, কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস ও স্বর্গত কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম সকলেরই স্মৃতিপটে আছে। আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলামও যুদ্ধে যোগদান করিয়া সেই যুগে দেশের মানুষের মনে গণচেতনা জাগাইয়াছিলেন। বাঙালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সদম্ভে লিখিয়াছিলেন :

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গ,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।" * * *

অতীতের ঐতিহাসিক তথ্য যদি কাহারও কাহারও মনে না ধরে সেই কারণে প্রসঙ্গত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম করিতে হয়। মনে হয়, নেতাজীর সমর-সংগ্রাম কাহিনী এখনও প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে জাগরূক আছে। নেতাজী আন্তর্ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী গঠন করিয়া সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে স্থান পাইয়াছেন। কিন্তু নেতাজী জাতিতে বাঙালী ছিলেন। বাঙালীর সমরবিদ্যার দক্ষতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা যাঁহারা সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহাদের আরও কয়েকটি নাম শুনানো প্রয়োজন। সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জয়ন্তনাথ চৌধুরী, অজিতঅনিল রুদ্র, লিওনার্ড প্রদীপ সেন প্রভৃতি বিখ্যাত সমরবিশারদ অন্তকার ইতিহাসের এক একটি উজ্জ্বল স্তম্ভ। জেনারেল জয়ন্তনাথের নেতৃত্বে এখন ভারতীয় বাহিনী পরিচালিত হইতেছে। তবে আর বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠনের বিরোধিতার কি

কারণ থাকিতে পারে? কুমায়ুন, জম্মু শিখ, ডোগরা, নেপালী, গাড়োয়াল, মাদ্রাজ প্রভৃতি বাহিনী গঠিত হইলে যদি দোষ না হয়, বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠনের প্রস্তাবে কেন প্রাদেশিকতার দুর্নাম দেওয়া হয়, আমাদের নিকট বোধগম্য হইতেছে না। সম্প্রতি দীঘায় শ্রীনেহেরু স্বীকার করিয়াছেন, এই প্রস্তাবে তাঁহার আপত্তি নাই। তবে প্রথমে টেরিটোরিয়াল আর্মি বা আঞ্চলিক বাহিনী গঠন করিতে হইবে। তবু ভাল, শ্রীনেহেরু শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যদি এই ব্যবস্থার উদ্যোগী হন বাঙালী তাঁহাকে ভুলিবে না।

আমরা আশা করি বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠিত হইলে বাঙালী সন্তান যথাযোগ্য কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইবে। বাঙলার সুনাম অক্ষয় রাখিবে। জরুরী পরিস্থিতির প্রয়োজনে 'বাবু' বাঙালী 'সৈনিকে' রূপান্তরিত হইবে।

গ্রন্থাগার ও রাজনীতি

সম্প্রতি কলিকাতা হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী কাকদ্বীপ অঞ্চলে সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান পরম সমারোহ এবং সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন। শ্রীসেন যে ভাষণ প্রদান করেন, তাহা আপন সারবত্তা ও উৎকর্ষের জন্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীসেন তাঁহার ভাষণের মধ্যে যে চিন্তাশীলতা ও সমাজ চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। বর্তমানে সমাজের সকল ক্ষেত্রে, মনুষ্যের জীবনে রাজনীতি ব্যাপকভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহা সমাজের পক্ষে অনুকূল নহে এবং সর্বৈব কল্যাণেরও বার্তাবহ নহে। শিক্ষাবিস্তারে (বিশেষ করিয়া শহরের বাহিরে) গ্রন্থাগারের অবদান অতুলনীয়। পল্লীবাসীর মধ্যে শিক্ষা-চেতনা গ্রন্থাগারই আনয়ন করে এবং এক ব্যাপক শিক্ষানুশীলনে মঙ্গলের আবির্ভাব ঘটে। সাহিত্যের আরাধনায় শিক্ষাচর্চায়, সৎগ্রন্থপাঠে গ্রন্থাগারই মানুষকে অগ্রণী করিয়া তোলে শিক্ষার বিস্তারে দেশ ও জাতি জাগরণ ও সমৃদ্ধির দিকে ধাপে ধাপে

অগ্রসর হইবার প্রেরণা লাভ করে। অতএব এই জগৎ রাজনীতির আওতায় পড়িবার নহে। রাজনৈতিক গণ্ডী ইহাকে সীমিত করিতে পারে না। গ্রন্থাগারসমূহকে রাজনীতির হস্তক্ষেপ হইতে দূরে সরাইয়া রাখা আজিকার এই সঙ্কটঘন মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন। গ্রন্থাগার এবং রাজনীতি সম্পর্কে শ্রীঅশোককুমার সেনের এই ব্যক্ত মনোভাব কার্যে পরিণত হইলে দেশ বহুলাংশে লাভবান হইবে।

॥ শোক সংবাদ ॥

রত্নগর্ভা সুষমা সেন

সুষমা সেন

স্বর্গত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া সুষমা সেন গত ১৭ই চৈত্র ৮৫ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি আজীবন মানুষের কল্যাণ কামনায় বহু দান ধ্যান করে গেছেন। অপরের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন তাঁর জীবনের মহান ব্রত ছিল। এঁর সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই এই মহীয়সী মহিলার বিরাট অন্তঃকরণ সদালাপী এবং অমায়িক মনোভাবের পরিচয় পেয়েছেন। এঁর ধর্মানুরক্তি নিরহঙ্কারিতা এবং সংস্কৃতির প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়। রত্নগর্ভা জননী হিসাবে ইনি বিপুল প্রসিদ্ধির অধিকারিণী। তাঁর পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য, আপন আপন ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকেই প্রভূত সম্মান ও স্বীকৃতির অধিকারী। সর্বশ্রী সুরকুমার সেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যসচিব ও দণ্ডকারণ্য সংস্থার সভাপতি সুকুমার সেন, প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ অমিয়কুমার সেন, অজিতকুমার সেন, ডঃ অরুণকুমার সেন, চলচ্চিত্রবিদ বিজনকুমার সেন এবং ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক-কুমার সেনের তিনি রত্নগর্ভা জননী। সাত পুত্র ব্যতীত তাঁর দুই কন্যা শ্রীমতী পারুল সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ, পুত্রবধূ, জামাতা, নাতি-নাতনী এবং অন্যান্য আত্মীয় পরিজন বর্তমান। এই মহাপ্রয়াণ আমাদের সমাজজীবন থেকে এক দরদী আদর্শ মহিলার অভাব ঘটাল।

নির্মলকুমার সেন

কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নির্মলকুমার সেন গত ২১শে চৈত্র ৬১ বছর বয়সে আকস্মিকভাবে দেহত্যাগ করেছেন। ব্যারিষ্টার হিসাবে ইনি প্রভূত সুনামের অধিকারী ছিলেন ও ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫০ সালের প্রিভেন্টিভ ডিটেনশান এ্যাক্ট গঠনে এঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

● বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ●

[আগামী সংখ্যা হইতে অর্থাৎ ১৩৭০ সালের বৈশাখের পত্রিকা হইতে 'মাসিক বসুমতীর' সূচীপত্রে এবং অঙ্গসজ্জায় পুনরায় এক অভিনব রূপান্তর লক্ষ্য করা যাইবে। বিভিন্ন ধরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও তথ্যসম্বল সুপাঠ্য রচনা ব্যতীত সুলিখিত কয়েকটি ধারাবাহিক উপন্যাস 'মাসিক বসুমতীর' পাঠমূল্য বৃদ্ধি করিবে। প্রতিভাবান চিত্র-শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রসম্ভার হইবে আমাদের পত্রিকার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। তৎসহ মনোরম ও বিচিত্র আলোকচিত্রের সমন্বয়। মাসিক বসুমতীর সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত নিয়মিত বিভাগসমূহের কিছু কিছু রদবদল করা হইলেও পাঠক পাঠিকার চিত্তবিনোদনের জন্য আরও কয়েকটি অধুনা অপ্রকাশিত বিভাগের প্রবর্তন হইতেছে। বিগত দুই যুগে বাঙলাদেশে সংখ্যাতীত পত্র পত্রিকার আবির্ভাব এবং তিরোভাব সত্বেও মাসিক বসুমতী আপন বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব যথাপূর্ব রক্ষা করিয়াছে। আমরা আশা করি আঙ্গিক এবং বৈষয়িক পরিবর্তনের দ্বারা 'মাসিক বসুমতী' বাঙলাদেশের অগণিত পাঠক পাঠিকাবর্গকে আনন্দ, জ্ঞান ও তৃপ্তিপ্রদানে সমর্থ হইবে। 'মাসিক বসুমতীর' পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা, অনুগ্রাহক, অনুগ্রাহিকা সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতা, পত্রিকা বিক্রয়ের এজেন্টগণ ও আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও আশীর্বাদ আমরা প্রার্থনা করি।]

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীতারকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

পত্রিকা সমালোচনা

মাননীয় মহাশয়, শুভ নববর্ষে আমার আন্তরিক প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন। ১৩৭০ সালের চাঁদা শীগগিরই পাঠাচ্ছি। নূতন বছরের পত্রিকা নিয়মিত পাঠাবেন। বাণি দেবী লিখিত 'মালাবার হোটেল' বেশ লাগছে, 'তালপাতার পুঁথি' আর একটু বড় করে দিলে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যাবে। আশুতোষ মুখার্জীর লেখা কোনও উপন্যাস ছাপাতে চেষ্টা করবেন। আমার স্বামী ওনার লেখার একজন দারুণ ভক্ত। আমার স্বামীর আরও একটা আর্জী যে, 'রাজায় রাজায়' উপন্যাসের মত আরও একটা ক্লাসিক আপনি বসুমতীতে লেখেন, যদি সম্ভব হয় আমাদের আনন্দ দিতে চেষ্টা করবেন। আর একটা কথা, আমার এক বন্ধু দু'-একটি ছোট গল্প মাসিক বসুমতীর 'অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ' বিভাগে ছাপাবার জন্য পাঠাতে চান। গল্প পাঠালে ও আপনার পছন্দ হলে গল্পটা একটু গুছিয়ে-সাজিয়ে নিয়ে আপনি ছাপাতে রাজী আছেন কিনা উনি জানতে চেয়েছেন। আশা করি আপনার মতামত জানাবেন। পত্রিকা নিয়মিত পাঠাবেন। নমস্কারান্তে—নিবেদিকা কল্যাণী রায়। কে, পি, এষ্টেট, এন, এস, মালয়।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, আপনার দৃষ্টি আমি 'মাসিক বসুমতী'র (পৌষ ১৩৬৯) সংখ্যার শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের লেখা 'প্রাচীন ভারতে লেখার উপাদান' প্রবন্ধের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই; এই প্রবন্ধে অনেকাংশই ১৯৩৪ সালের Journal of the Andhra Historical Research Societyর চতুর্থ সংখ্যায় লিখিত এক প্রবন্ধের সঙ্গে মিলে যায়। ঐ পত্রিকার ২০৫—২০৮ পৃষ্ঠায় যে অংশটুকু তারই সঙ্গে এর মিল আছে যথেষ্ট পরিমাণে। ঐ প্রবন্ধটির লেখক এম, রমারাও এম, এ, বি-এড আর প্রবন্ধটির নাম 'Libraries in ancient and mediaeval India (chapter 1—Writing and Writing mateiial) আমার মনে হয় আপনার পত্রিকার লেখকের ঋণ স্বীকার করা উচিত ছিল—আর নিজের না বললে এতে হয়তো লেখকের সম্মানের হানি হত না। ইতি, অনিলকুমার দত্ত, হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী।

শ্রদ্ধাস্পদ মাসিক 'বসুমতী' সম্পাদক মহাশয়, আমার লেখা "আমার দেখা ডাঃ বিধানচন্দ্র" প্রবন্ধটি বসুমতীর আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে কিছু কিছু ভুল দেখা যাইতেছে তাহার মধ্যে একটা মারাত্মক ভুল যেটা সংশোধন করা খুবই প্রয়োজন মনে হইতেছে। ৫৫৩ পৃষ্ঠার ডাইনের কলমে দ্বাদশ পংক্তিতে "ক্ষীরোদবাবু বিধানচন্দ্রের ভৃত্য" স্থলে "ক্ষীরোদবাবু বিধানচন্দ্রের 'ছাত্র'" হইবে। অবশ্য আমার ভুল কি ছাপায় ভুল জানি না। যাহাই ভুল হউক এটা সংশোধন করা প্রয়োজন। জ্ঞাতার্থে লিখিলাম। ইতি—শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শিক্ষক, রেলওয়ে হাইস্কুল, পোঃ আলিপুর দুয়ার, জেলা—জলপাইগুড়ি।

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়, প্রথমেই আপনি আমার শুভ নববর্ষের বিনীত নমস্কার গ্রহণ করুন এবং 'মাসিক বসুমতীকে' জানান আমার অন্তরের ভালবাসা, 'মাসিক বসুমতীর' সাথে আমার পরিচয় অতি পুরাতন এবং সম্বন্ধ অতি নিবিড়। আমি ২০ বৎসর যাবৎ মাসিক বসুমতীর একজন পাঠক সুতরাং আপনি নিজেই ধারণা ক'রতে পারবেন না যে মাসিক বসুমতীকে আমি কতটা ভালবাসছি, বেসেছি বা বাসব। এই সুদূর আসামে বাস ক'রেও মাসিক বসুমতীর মাধ্যমে সমস্ত বাংলা দেশটা যেন আমার চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাই। আচ্ছা সম্পাদক মশাই, অজ্ঞাত শত্রুদা'র লেখা কেন আর মাসিক বসুমতীতে দেখতে পাই না? এ ছাড়া নারায়ণবাবুর (গাঙ্গুলী) লেখারও আমি বিশেষ ভক্ত কাজেই তাঁর লেখাও আমার প্রিয় পত্রিকার মাধ্যমে দেখতে চাই। আমার এ পত্র পাওয়া মাত্র নিম্ন ঠিকানায় মাসিক বসুমতী ভি-পি করিবেন। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়। Majulighaur T. E. Sootea, P. O. Darrang. Assam.

মাননীয় মহাশয়, আমার নববর্ষের নমস্কার গ্রহণ করিবেন। আমি এই পত্রদ্বারা জানাইতেছি যে, আমাকে বাংলা নূতন বছর হইতে (১৩৭০ সাল) মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা করিয়া লইবেন, সেইমত এক বছরের চাঁদা ২৪৲ টাকা মনিঅর্ডার ডাকযোগে পাঠাইলাম, টাকা প্রাপ্তির সংবাদ দিবেন ও উপরোক্ত ঠিকানায় আমার নামে নিয়মিতভাবে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। পত্র ও পত্রিকার আশায় রহিলাম। নিবেদিকা—সন্ধ্যারাণী ভৌমিক। C/o Mr. A. R. Bhowmick, Bukit Siput Estate, Sega Mat, Johore, Malaya.

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীপশুপতি কুণ্ডু, ডাক—পাংসা, জেলা—ফরিদপুর, পূর্ব পাকিস্তান • • • শ্রীললিতমোহন মণ্ডল, এল, ই, কাকিয়ুর গার্ডেন ষ্ট্রীট, মুত্তিয়ালপেট, পণ্ডিচেরী-৪ • • • শ্রীকুমুদবন্ধু দেবনাথ, এজেন্ট, আগরতলা, ১৬ শিবতলা ষ্ট্রীট, ঢাকা পট্টী, কলকাতা-৭ • • • শ্রীকার্তিকচাঁদ মাহাতো, গ্রাম—কুলদিহা, ডাক—কামিযোড়ী,

(ঝাড়গ্রাম হয়ে), জেলা—মেদিনীপুর * * * শ্রীমতী স্বর্ণা মিত্র, অবধায়ক : শ্রী আর, কে, মিত্র, ডেপুটি ম্যানেজার, ১১.২ জি, সি, ক্যান্টিন ষ্টেট, জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ * * * শ্রীমতী মীরা ঘোষ, ১৬০ ভীম রোড, জলন্ধর ক্যান্ট, পাঞ্জাব, * * * শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম—মোল্লারের, ডাক—কাঁদাখোলা (শান্তিপুর হয়ে), জেলা—নদীয়া * * * শ্রীমতী প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়, "শ্রীশ," ২৫১।এ.২১ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৪০ * * * ডাঃ বি, দত্ত, অবধায়ক : ডাঃ এস, বি, দত্ত, একজিবিসান রোড, পাটনা-১ * * * শ্রী এস, কে, মজুমদার, আমগোলা রোড, দুর্গাচকের উত্তর, মজঃফরপুর * * * শ্রীমতী অজিতা ভট্টাচার্য, অবধায়ক : শ্রী এন, সি, ভট্টাচার্য অশোক রাজপথ, পাটনা-৬ * * * শ্রীফকিরচন্দ্র মুর্মু, গ্রাম—বুড়াথাকুরা, ডাক—কোকপাড়া, সিংভূম * * * শ্রীঅমূল্যরতন ভৌমিক, E. E's. Office (ইরিগেশান), পূর্ব মেদিনীপুর বিভাগ, গ্রাম ও ডাক—মেদিনাপুর * * * শ্রীমতী কল্যাণী দাশগুপ্ত, অবধায়ক—জি, কে, দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড সন্স, ডাক—কুলহারিয়া, জেলা—আরা (বিহার) * * * শ্রীবিজয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মিজিকাজন টি, ই, ডাক—মিজি কাজান, জেলা—ডারাং (আসাম) * * * Sm. Uma Bose, C/o Dr. B. Basu, 4, Alexandra Place, New Castle Upon Tyne-I, U. K. * * * শ্রীগৌরহরি দাস, গ্রাম ও ডাক—বীরচন্দ্রপুর (মল্লারপুর হয়ে) বীরভূম * * * Mrs. S. Dasgupta, C/o Dr. A. K. Dasgupta, 2184 Queens Grove Road, Ottowa, Canada * * *

* * * শ্রীপূর্ণকান্ত ভট্টাচার্য, গ্রাম—বীরকোটা, ডাক—ছাতারখোলা, (নারায়ণগড় হয়ে), মেদিনীপুর * * * ডাঃ এম, কে, রায়চৌধুরী, মারিয়ামবাড়ী টি, ই, ডাক—শিমুলবাড়ী, দার্জিলিং * * * শ্রীনিরঞ্জন রায়, ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট গারাজ, গ্রাম ও ডাক—ঢেনকানল (উড়িষ্যা) * * * সচিব, নির্বাচিত ফটকা কোলিয়ারী গ্রন্থাগার, সির্শাচটী, বানবাদ, বিহার * * * শ্রীমতী সন্ধ্যা ভৌমিক, Bukit Siput Estate, Segamat, K. L. List 97/16 * * * ডাঃ এস, এন, দত্ত, ছুটে-বাজে, ডাক—ভরুপ্রতাপপুর, জেলা—বাস্তার (মধ্যপ্রদেশ)।

I am sending herewith Rs. 15/- being subscription for Month'y Basumati from Baisakh to Chaitra.—Kalyani Das Gupta, Arrah.

নববর্ষের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। পারুল চ্যাটার্জী। হাজারিবাগ।

Sending herewith one year's subscription from Sravan—Mrs. Nandita Bose, Sahebganj.

বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম, গীতা বসু, তেজপুর (আসাম)।

Herewith Rs. 15/- for renewal subscription of Monthly Basumati for one year, begining from Baisakh 1370 to Chaitra 1370 B. S.—Ramkrishna Mission Institute of Culture. Calcutta.

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের জন্য চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। তৃপ্তিরাণী চন্দ, বালাঘাট, মধ্যপ্রদেশ।

পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতীর আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। শ্রীমতী রমা ঘোষ, কটক।

Sending herewith Rs. 15/- by M. O. being payment of annual subscription in advance for one year commencing from Falgoon—Rajnagar Colliery Institute, Shahdol (M. P.)

Sending herewith Rs 15/- as subscription for the Bengali year 1370—Mrs. Latika Guha, New Delhi.

Sending herewith Rs 15/- as subscription for Monthly Basumati for 1963-64—Mrs. Anjali Ghose, Patna.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হইবার জন্য এক বৎসরের চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য, বাওয়ালী, ২৪ পরগণা।

I am sending herewith Rs. 15/- as one year's subscription for Monthly Basumati—Mrs. Protima Chatterjee, Calcutta-47.

Herewith renewal subscription for one year Mrs. Protima Chatterjee, Allahabad.

Remitting herewith Rs. 15/- at the annual subscription of Masik Basumati for the year 1370 B. S.—Indian Statistical Institute, Giridih.

মাসিক বসুমতীর জন্য ১৩৭০ সালের চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নববর্ষের শুভেচ্ছা ও নমস্কার লইবেন। শ্রীমতী রেণুকণা মুখার্জী, এলাহাবাদ।

Herewith remitted Rs. 15/- being the annual subscription of Monthly Magazine, "M. Basumati due from the issue of March 1963"—Railway Institute, Tatanagar.

I am remitting herewith Rs. 15/- as subscription for Monthly Basumati for the next year—Rani Ashrumoti Memorial Club, Jalpaiguri.